ওঁ

॥ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

763

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা

সাধক-সঞ্জীবনী

গীতার বিস্তৃত টীকা (পরিশিষ্ট-সহ)

श्रीमद्भगवद्गीता-साधक-संजीवनी परिशिष्टसहित (बँगला)

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব॥

স্বামী রামসুখদাস

ভূমিকা

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের পবিত্রতম ধর্মগ্রন্থ, গীতার এই পরিচয়টুকুই যথেষ্ট নয়। পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বাস করেন। প্রত্যেক ধর্মেরই পবিত্র গ্রন্থ আছে। স্ব স্ব ক্ষেত্রে সেগুলি মহান। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা তার অতিরিক্ত আরও কিছু। শ্রুতিতে বলা হয়েছে **'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'**। অন্যত্র বলা হয়েছে **'রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব'**। এক রূপে রূপে বহু হয়েছেন। অদ্বিতীয় সেই এক নিজেকে বহু রূপে প্রতিভাত করেছেন। তারই প্রতিফলনে বিশ্বের আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে বহু ধর্মমতের প্রকাশ ঘটেছে, অদ্বিতীয় পরমেশ্বর বহু রূপে, বহু নামে পূজিত হয়েছেন। ধর্মের বহিরঙ্গে, আচার-অনুষ্ঠান আলোকে গড়ে ওঠা রীতি-নীতি তথা সেগুলির বাহ্য আচরণে কিছু কিছু ভিন্নতা পরিলক্ষিত হলেও সকল ধর্মের লক্ষ্য এক এবং তা হল সত্যস্বরূপকে আপন অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করা, তাঁর শরণাগত হওয়া। বস্তুতঃ বহু ধর্মেই দিব্য মানবগণের বাণীকে আশ্রয় করে ধর্মগ্রন্থ রচিত হয়েছে। ধর্মও সৃষ্টি হয়েছে সেই দৈবী পুরুষকে অবলম্বন করে। হিন্দুধর্ম সেদিক থেকে ব্যতিক্রম, তা ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়। এটি অনাদি সনাতন ধর্ম, এ ধর্মগ্রন্থ কোনো ব্যক্তিরচিত নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণীর সমাহার।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপলক্ষ করে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণার্থে যে অমূল্য উপদেশ দিয়েছিলেন তা যেমন কোনো বিশেষ সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর একান্ত নিজস্ব নয় তেমনি দেশ ও কালের মধ্যেও তা সীমাবদ্ধ নয়। তার আবেদন সর্বজনীন এবং সর্বকালীন। দেশ-কাল-বর্ণ-ধর্ম-সম্প্রদায়-পরিস্থিতি প্রভৃতি সবকিছুকে অতিক্রম করে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা চির ভাস্বর রূপে বিরাজমান। অনুপম ও অদ্বিতীয় এই গ্রন্থ সনাতন ধর্ম-দর্শন-যোগ মার্গে এক অনির্বাণ আলোকবর্তিকারূপে দীপ্যমান।

বেদান্তে তিনটি প্রকৃষ্ট স্থান বা 'প্রস্থান-ত্রয়'-এর উল্লেখ আছে। প্রথমটি হল শ্রুতি-প্রস্থান। এটি বেদের অন্ত্যভাগস্বরূপ উপনিষদ্। দ্বিতীয়টি ন্যায়-প্রস্থান, ব্রহ্মর্ষি ব্যাসদেব রচিত বেদান্ত দর্শন বা ব্রহ্মসূত্র। তৃতীয়টিই হল গীতা, পার্থসারথি জগৎগুরু শ্রীকৃষ্ণ কথিত বাণী-সমূহ। এটিকে বলা হয় স্মৃতি-প্রস্থান। হিন্দুধর্মের বিশাল প্রাঙ্গণে অন্ততঃ পঁচিশটি গীতা আছে। বিভিন্ন উপাধিতে তারা ভূষিত, যেমন উদ্ধব গীতা, গুরু গীতা, অষ্টাবক্র গীতা, ব্যাধ গীতা, শিব গীতা প্রভৃতি। তবে সাধারণতঃ গীতা বলতে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অর্জুনকে প্রদত্ত উপদেশাবলী সংবলিত এই শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাকেই চিহ্নিত করা হয়। বস্তুত সাতশত শ্লোকবিশিষ্ট এই শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাই গীতাসমূহের মধ্যে প্রধান। আর সেই কারণে সহস্রাধিক বৎসর ধরে এই গ্রন্থ অসংখ্য মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। বহু মনীষী এর ভাষ্য রচনায় এবং টীকা প্রণয়নে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। সকল ভাষ্য ও ব্যাখ্যাই স্ব স্ব ক্ষেত্রে মহান। পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী রামসুখদাস মহারাজ গীতাতত্ত্বের গভীর ও ব্যাপক প্রসারের উদ্দেশ্যে এবং সর্বসাধারণের হিতার্থে গীতার বিস্তৃত টীকা প্রণয়ন করেছেন। এই **'সাধক-সঞ্জীবনী'** তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য, দীর্ঘ অনুধ্যান এবং কঠিন তপশ্চর্যা এবং অনুভূতির ফসল। হিন্দিতে লিখিত মূল গ্রন্থটির ভাষা সরল, প্রকাশভঙ্গী সাবলীল। বাংলা অনুবাদে তাঁর প্রকাশ-শৈলীকে যথাযথ বজায় রাখার প্রয়াস করা হয়েছে সর্বত্র।

হিন্দুধর্ম ও সাধনায় 'যোগ' শব্দ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। যোগ শব্দে পরমাত্মা ও জীবাত্মার অভিন্নতা উপলব্ধির পন্থাকে অভিহিত করা হয়। সেইজন্য বিভিন্ন সাধকের আপন রুচি-সংস্কার অনুযায়ী জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ এবং কর্মযোগ-এর ধারা স্বীকৃত ও পুষ্ট হয়েছে। বাদরায়ণের 'ব্রহ্মসূত্র', পতঞ্জলির 'যোগসূত্র', পরশুরামের 'কল্পসূত্র', নারদ এবং শাণ্ডিল্যের 'ভক্তিসূত্র' আকর গ্রন্থরূপে সনাতন ধর্মক্ষেত্রে সমাদৃত। তিলক এবং কোনো কোনো মনীষী শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাকে কর্মযোগের দিশারিরূপে চিহ্নিত করেছেন। পক্ষান্তরে শ্রীঅরবিন্দ গীতোক্ত যোগকে সর্বযোগের সমন্বয় বলে বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়াও শঙ্করাচার্যকৃত অদ্বৈতবাদী ভাষ্য, শ্রীমৎ রামানুজাচার্যকৃত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ভাষ্য, শ্রীমৎ নিম্বার্কাচার্যকৃত দ্বৈতাদ্বৈতবাদী ভাষ্য, শ্রীমৎ

মধ্বাচার্যকৃত দ্বৈতবাদীভাষ্য, শ্রীমৎ বল্লভাচার্যকৃত শুদ্ধাদ্বৈতবাদী ভাষ্য ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামী শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ও শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণকৃত অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদী ব্যাখ্যাও স্ব স্ব ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত তথা শ্রীমৎ মধুসূদন সরস্বতী, শ্রীধর স্বামী, সন্ত জ্ঞানেশ্বর, মহর্ষি রমণ, স্বামী অভেদানন্দের গীতা-ব্যাখ্যাও সমাদৃত । স্বামী রামসুখদাসজী **'সাধক সঞ্জীবনী'**র প্রাক্‌কথনে 'গীতার যোগ' নামক অংশে লিখেছেন, ''গীতায় কেবল কর্মযোগ অথবা কেবল জ্ঞানযোগ কিংবা শুধু ভক্তিযোগের বর্ণনা করা হয়েছে একথা ঠিক নয়। এতে পূর্বোক্ত তিনটি যোগ সাধন ছাড়াও যজ্ঞ, তপ, ধ্যানযোগ, প্রাণায়াম, হঠযোগ, লয়যোগ আদি সাধনগুলিরও বর্ণনা করা হয়েছে। এর বিশেষ কারণ ছিল এই যে, গীতায় অর্জুন যুদ্ধ নিয়ে প্রশ্ন করেননি ; বরং কল্যাণের বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন এবং ভগবানেরও গীতা বিবৃত করার উদ্দেশ্য যুদ্ধ করাবার জন্য ছিল না। অর্জুন নিজের কল্যাণ প্রার্থনা করেছিলেন। সেইজন্য শাস্ত্রাদিতে যতপ্রকার কল্যাণকারক সাধনার উল্লেখ আছে তার সমস্ত প্রণালীই গীতায় সংক্ষেপে অথচ সম্পূর্ণরূপে বর্ণিত হয়েছে। বাস্তবিকই গীতার মতো এমন সর্বভাব-সমন্বয়ী গ্রন্থ বিশ্বের ধর্মগ্রন্থাবলীতে আর দ্বিতীয়টি নেই।'' স্বামী রামসুখদাসজী আপন অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা রত্নাকরবৎ এই গীতার গভীরে যে অজস্র মণিমাণিক্যের সন্ধান পেয়েছেন, সর্বজনের হিতকল্পে তা তুলে ধরেছেন অকাতরে।

বিভিন্ন ভাবের স্বাভাবিক সমন্বয়ে তথা ভাষার মাধুর্যে ও ভাবের গভীরতায় স্বামী রামসুখদাসজী মহারাজ এই **'সাধক-সঞ্জীবনী'** টীকা-গ্রন্থে প্রতিটি শ্লোকের পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা তো করেছেনই, সেইসঙ্গে প্রতিটি শ্লোককে কেন্দ্র করে অনুসন্ধিৎসু পাঠক ও শরণাগত সাধকের মনে যে সকল প্রশ্ন বা সংশয় জাগতে পারে কিংবা সাধন-জীবনে আচরণগত যেসব সমস্যা দেখা দিতে পারে তার প্রায় প্রতিটিরই তিনি সমাধানের প্রয়াস করেছেন। শ্লোকসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ তথা অধ্যায়গুলির পারম্পর্যও বিন্যস্ত হয়েছে অতি সুচারুভাবে। এই টীকা রচনায় স্বামীজী আপন উপলব্ধিজাত ভাবসমূহই প্রকাশ করেছেন, অপর কোনো মতের সমর্থন বা বিরোধিতার প্রচেষ্টা এতে কোথাও নেই। বস্তুতঃ মানবজীবনের প্রতিটি দিক্‌কেই ভগবদ্‌মুখী ও কল্যাণকর করার প্রেরণা উৎসারিত হয়েছে পদে পদে।

মানবজীবনের চরম লক্ষ্যই হল পরমার্থতত্ত্ব লাভ করা। উপনিষদ্ বলেছেন, **'নায়মাত্মা প্রবচনে লভ্যো ন মেধয়া, ন বহুনা শ্রুতেন।'** অর্থাৎ সমগ্র বেদ অধিগত করে কিংবা মেধার সাহায্যে অথবা বহু শাস্ত্র শ্রবণের দ্বারা আত্মাকে জানা যায় না। একমাত্র ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করেই তা জানা সম্ভব। সেইজন্য জীবনকে ঈশ্বরপরায়ণ করা একান্ত আবশ্যক। গীতা সেই কথা বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। স্বামী রামসুখদাসজী তাঁর গীতা-ভাষ্যে এই কথাই আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে আমাদের জীবনের প্রতিটি কাজ— পারমার্থিক ক্রিয়া এবং দৈহিক জীবন সম্পর্কিত ক্রিয়া— সবই যেন ভগবানের ভজনার দৃষ্টিতে সম্পাদিত হয়। কেননা উৎপত্তি ও বিনাশশীল বস্তুগুলিকে আশ্রয় করা হল বন্ধন এবং সেগুলিকে ত্যাগ করাই হল মুক্তি। তাই জীবনের পরম উদ্দেশ্য যখন সকলপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ, তখন উৎপত্তি ও বিনাশশীল বস্তুসমূহের প্রতি মমত্ব না রেখে জীবনকে ভগবানের শরণাগত করে নিতে হবে। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা এই নির্দেশই দিয়েছে। **'সাধক-সঞ্জীবনী'** গীতার এই শিক্ষাকেই পাঠকবর্গের কাছে তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের পরিমণ্ডলে অত্যন্ত সহজ, সরল এবং বোধগম্য ভাষায় উপস্থাপিত করেছে। অধ্যাত্ম সাধনায় এটি এক অপরূপ সংযোজন। তাই এই **'সাধক-সঞ্জীবনী'** হয়ে উঠেছে ব্রহ্মবিদ্যার এক বিশাল পাদপীঠ, যার আশ্রয়ে সর্বস্তরের মানুষ পেতে পারে আধ্যাত্মিক পরিক্রমার পথনির্দেশ তথা মননের এক অত্যাশ্চর্য ভাণ্ডার।

এই সমগ্র কাজটি ভগবানের শ্রীচরণে নিবেদিত হল। আমাদের বিশ্বাস, যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এটি সম্পন্ন করা হল, শ্রীভগবানের কৃপায় তা সার্থক হয়ে উঠবে।

—প্রকাশক

763 Sadhak Sanjivani (Bangla)_Section_1_2_Back

অনুবাদিকার নিবেদন

'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' বচনে যিনি যুগযুগ ধরে লক্ষকোটি নর-নারীর হৃদয়মন্দিরে বিরাজিত, নরলীলায় পার্থসারথিরূপে তাঁর শ্রীমুখ নিঃসৃত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ মন্ত্রমালা দেবভাষা সংস্কৃতের বাঙ্ময়ী আভরণে প্রকাশিত থাকলেও যুগে যুগে লোকশিক্ষক, আচার্য ও মহামানবগণের ভাষ্য ও ব্যাখ্যায় গীতার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও শিক্ষা সর্বসাধারণের কাছে উপস্থাপিত হয়েছে বিভিন্ন ভাষায় বহুমুখী ভাব ব্যঞ্জনায়। এই গীতা-কেন্দ্রিক আলোকধারা সমূহের এক স্বতঃস্ফূর্ত সমন্বয় ঘটেছে অশেষ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীমৎ স্বামী রামসুখদাস মহারাজ রচিত **'সাধক-সঞ্জীবনী'** নামে খ্যাত মৌলিক এবং বিস্তৃত ও সরল এই টীকায়। বাস্তবিকই এটি এমনই এক গ্রন্থ যার মননে গীতার জ্যোতিঃ প্রবাহ সূর্যের কিরণ ও চন্দ্রের জ্যোৎস্নার মতো সকল স্তরের মানুষের চেতনাকে আলোকিত করে তুলতে পারে, মুমুক্ষুকে দিতে পারে পূর্ণাঙ্গ দিগ্দর্শন।

'উপনিষদ্ রহস্য' বা 'গীতার যৌগিক ব্যাখ্যা' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় সাধক প্রবর শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ দেবশর্মা বলেছেন, 'গীতা লইয়া ধর্ম জগতে হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। কেহ বলেন গীতা ইতিহাসের আদর্শ ধর্মভাবযুক্ত এক অভূতপূর্ব ঘটনা। কেহ বলেন, গীতা কোনও ঐতিহাসিক ঘটনা নহে, ইহা একটি সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিকবিজ্ঞান, রূপক ছলে লিখিত। কেহ বলেন, গীতা কবির আদর্শ কল্পনা। কেহ বলেন, গীতা একখানি যোগশাস্ত্র । নানা চক্ষে গীতা জগতের সমক্ষে নানারূপে রঞ্জিত। গীতা যে ঐতিহাসিক আদর্শ, ধর্মভাবযুক্ত ঘটনা—ইহাও সত্য, তেমনই গীতা আধ্যাত্মিক যোগবিজ্ঞান—ইহাও সত্য।' শ্রীমৎ স্বামী রামসুখদাস মহারাজের এই টীকায় গীতার ঐতিহাসিক আবেদন ও আধ্যাত্মিক মহাযোগ উৎসারিত হয়েছে অপূর্ব যুগলবন্দীতে । এই প্রকাশ পাণ্ডিত্যের ঐশ্বর্যে যেমন উজ্জ্বল, সাধনার মাধুর্যে তেমনই স্নিগ্ধ । তাঁর টীকা ভাষার সাবলীলতায় ও ভাবের গভীরতায় এক অপূর্ব ছন্দোময়রূপে উদ্ভাসিত। তিনি প্রত্যেকটি শ্লোকে বিস্তৃত ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহকেও বিবৃত করে তার সমাধান করেছেন তাঁর নিজস্ব প্রজ্ঞালোকে। তারই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শ্লোকসমূহের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ এবং অধ্যায়গত পারম্পর্যের আলোচনা। অথচ কোথাও কোনও মতবাদ বা সম্প্রদায়গত ভাবধারার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে একটি শব্দও বলা হয়নি।

আপন অসাধারণত্বে ভরপুর হিন্দী ভাষায় রচিত এই গ্রন্থটি দীর্ঘকাল ধরেই বহুল প্রচারিত এবং সমাদৃত। পরে বেশ কয়েকটি ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়ে থাকলেও এটি ভাষান্তরের অভাবে দীর্ঘকাল ধরে বঙ্গভাষাভাষীগণের কাছে অপঠিত ছিল। বর্তমানে গোরক্ষপুরের গীতাপ্রেসের মহান উদ্যোগে অনূদিত ও প্রকাশিত এই গ্রন্থ আধ্যাত্মিক সচেতন বঙ্গভাষীগণের জন্য এক অনুপম আস্বাদনের সূচনা করে দিয়েছে।

পরমানন্দ মাধবের প্রসাদে এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদরূপ বিশাল কর্মটি সম্পন্ন হল আমার মতো এক ক্ষুদ্র মানুষের মাধ্যমে—এই অনুভব এক অনির্বচনীয় অভিজ্ঞতা—আমি ধন্যা। এই 'আমি', 'আমার' উক্তির শূন্যতার মধ্যে যখন অনুভব করি গোবিন্দের কৃপারশ্মি, তখনই মনে হয় এই দীন জীবন কৃতার্থ, আর অন্তরে প্রার্থনা জাগে, 'হে প্রভু ! সদাসর্বদা সর্বতোভাবে যেন তোমার

নব সংস্করণ সম্পর্কে দুটি কথা

কোনো গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ সেই গ্রন্থের জনপ্রিয়তা এবং সেই সঙ্গে গ্রন্থের প্রামাণিকতাও সিদ্ধ করে। স্বামী রামসুখদাস বিরচিত **'সাধক-সঞ্জীবনী'** গ্রন্থ সম্পর্কেও এই কথা সত্য। একথা ঠিক যে গীতার অনেক টীকা আছে। সেগুলি প্রায় সবই বহুল প্রচারিত। তৎসত্ত্বেও স্বামীজী কৃত এই টীকা নানা দিক থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই কারণে রস-পিপাসু মানুষদের কাছে **'সাধক-সঞ্জীবনী'**র মতো বৃহৎ গ্রন্থ আদরণীয় হয়ে উঠেছে এবং ইতিমধ্যেই গ্রন্থটির ২ লক্ষাধিক কপি নিঃশেষিত হয়েছে। মূল হিন্দী গ্রন্থটির ক্ষেত্রে একথা যেমন সত্য, এর বঙ্গানুবাদ সম্পর্কেও একথা তেমনই সত্য। তবে বর্তমান নব সংস্করণটি কেবল পূর্বেকার গ্রন্থের ত্রিশতম পুনর্মুদ্রণ মাত্র নয়। এতে নূতন বিষয়ের সংযোজনও আছে। হিন্দীতে এই সংযোজন আগেই করা হয়েছিল, বঙ্গানুবাদের বর্তমান সংস্করণে সেই কাজ সম্পন্ন করা হল।

স্বামীজী নিজেই বলেছেন—'আমার হৃদয়ে গীতার বিষয়ে যে সকল ভাব উদিত হয়েছিল তা প্রথমে আমি **'সাধক-সঞ্জীবনী'**-র টীকাতে লিখে দিয়েছিলাম। কিন্তু তারপরেও চিন্তা-ভাবনা করায় ভগবৎকৃপায় এবং সন্তকৃপায় গীতার অনেক নতুন নতুন ভাব উদিত হতে থাকে। সেগুলিকে এখন **'পরিশিষ্ট-ভাব'** রূপে **'সাধক-সঞ্জীবনী'**-র টীকার সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে।' তিনি আরও বলেছেন—'পরিশিষ্ট লেখার পরও আমি সন্তুষ্ট নই এবং গীতা নিয়ে আমি চিন্তা-ভাবনা বন্ধ করিনি।' বস্তুতঃ স্বামীজী যথার্থই মনে করেন যে গীতা এমনই এক বিশিষ্ট গ্রন্থ যে, তাঁকে আজ পর্যন্ত কেউ পূর্ণরূপে জানতে পারেনি। এইজন্য নিরন্তর পাঠ ও অনুধ্যানের দ্বারাই গীতার মর্মার্থ উপলব্ধি সম্ভব। সেই অনুধ্যানের ফসল হল **'পরিশিষ্ট-ভাব'**। বর্তমান সংস্করণে এই পরিশিষ্ট-ভাব যুক্ত করা হয়েছে। গ্রন্থটিকে সুখপাঠ্য, সহজবোধ্য এবং যতদূর সম্ভব ভাষা ও অর্থ ত্রুটিমুক্ত করার দৃষ্টিতে এবং অত্যানুধিক যান্ত্রিক মুদ্রণ প্রক্রিয়ার প্রয়োজনে কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং সেইসঙ্গে পূর্বতন সংস্করণের কিছু ত্রুটিও সংশোধিত হয়েছে। আশা করা যায় এই গ্রন্থ পাঠে পাঠকগণ আরও সঞ্জীবিত হতে পারবেন।

পরিশিষ্টসহ সাধক সঞ্জীবনী প্রকাশিত হওয়ার পর মহারাজের উপলব্ধীজাত গীতার কিছু নতুন ভাব **'গীতা প্রবোধনী'** পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। আগ্রহী পাঠকগণকে সেটিও অবলোকন করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

গীতা জয়ন্তী ১৪২০ **প্রকাশক**

॥ শ্রীহরিঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বিশ্বসাহিত্যে অনন্য। মানব কল্যাণের উদ্দেশ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশাবলী এই গ্রন্থের উপজীব্য বিষয়। স্বামী শ্রীরামসুখদাস মহারাজ তাঁর **'সাধক-সঞ্জীবনী'**-তে গীতা সাগরে যে অমূল্য রত্নরাজি আছে সেগুলিকে বর্তমান টীকার মাধ্যমে পরিবেশন করার যথাসাধ্য প্রয়াস করেছেন। তাঁর টীকা বৈশিষ্ট্য দাবি করে। একথা ঠিক যে গীতার অনেক টীকা আছে। কিন্তু এই টীকায় বহু শ্লোকের ভাব নতুন ভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। সাধকগণ এর দ্বারা উপকৃত তো হবেনই, সাধারণ মানুষও এ থেকে সাধন-ভজনের তত্ত্ব সহজভাবে জানতে পারবেন এবং সঠিক পথের নির্দেশ পাবেন। শ্রীরামসুখদাসজী মহারাজকৃত এই টীকা কোনো রকম সাম্প্রদায়িক ভাবনাকে পুষ্ট করে না, আর সেইজন্য সকল ধর্মের মানুষই এই টীকা পাঠে তাঁদের আপন বিশ্বাস ও মতানুসারে উদ্ধারের উপায় প্রাপ্ত হবেন। বস্তুতঃ গীতার এই টীকা কেবল অধ্যয়নেই সীমিত রাখার নয় ; চিন্তন, মনন এবং আচরণকেও তা উদ্বুদ্ধ করে।

নতুন ভাবসমন্বিত কয়েকটি শ্লোকের উল্লেখ করা হল ঃ

প্রথম অধ্যায়ের দশম, উনিশতম, কুড়িতম এবং পঁচিশতম শ্লোক ; দ্বিতীয় অধ্যায়ের উনচল্লিশতম এবং চল্লিশতম শ্লোক ; তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয়, দশম, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ এবং তেতাল্লিশতম শ্লোক ; চতুর্থ অধ্যায়ের অষ্টাদশ এবং আটত্রিশতম শ্লোক ; পঞ্চম অধ্যায়ের ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শ্লোক ; ষষ্ঠ অধ্যায়ের বিশতম এবং আটত্রিশতম শ্লোক ; সপ্তম অধ্যায়ের পঞ্চম এবং উনিশতম শ্লোক ; অষ্টম অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোক ; নবম অধ্যায়ের তৃতীয় এবং একত্রিশতম শ্লোক ; দশম অধ্যায়ের একচল্লিশতম শ্লোক ; একাদশ অধ্যায়ের ছাব্বিশতম, সাতাশতম, পঁয়তাল্লিশতম এবং ছেচল্লিশতম শ্লোক ; দ্বাদশ অধ্যায়ের দ্বাদশতম শ্লোক ; ত্রয়োদশ অধ্যায়ের প্রথম, উনিশতম, কুড়িতম এবং একুশতম শ্লোক ; চতুর্দশ অধ্যায়ের তৃতীয়, দ্বাদশতম, সপ্তদশতম এবং বাইশতম শ্লোক ; পঞ্চদশ অধ্যায়ে সপ্তম এবং একাদশতম শ্লোক ; ষোড়শ অধ্যায়ের পঞ্চম এবং কুড়িতম শ্লোক ; সপ্তদশ অধ্যায়ের সপ্তম, অষ্টম, নবম এবং দশম শ্লোক ; অষ্টাদশ অধ্যায়ের সাঁইত্রিশতম এবং তিয়াত্তরতম শ্লোক প্রভৃতি। যদি সাধকগণ গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন তাহলে তাঁরা আরও কিছু শ্লোকের আংশিকরূপে নতুন ভাবার্থ উপলব্ধি করতে পারবেন।

—**প্রকাশক**

॥ ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

সাধক-সঞ্জীবনী পরিশিষ্টের

বিনীত নিবেদন

ভগবান অনন্ত, তাঁর সব কিছুই অনন্ত। তাহলে তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত গীতার অন্ত কী করে হতে পারে ? বিভিন্ন আচার্য গীতার ভিন্ন ভিন্ন টীকা রচনা করেছেন। তাঁদের টীকাকে অনুসরণ করে জীবনযাপন করলে মানুষের কল্যাণ তো হতেই পারে, কিন্তু মানুষ গীতার সম্পূর্ণ অর্থ বুঝতে পারে না। আজ পর্যন্ত গীতার যত টীকা রচিত হয়েছে সেগুলিকে যদি একত্র করা যায় তাহলেও গীতার অর্থ সম্পূর্ণ হয় না। যেমন কোনো কূপ থেকে শত শত বছর ধরে অসংখ্য লোক জল পান করতে থাকলেও তার জল যেমনকার তেমনই থাকে, তেমনই অসংখ্য টীকা লিখিত হলেও গীতা যেমনকার তেমনই থেকে যায়, তার ভাবের শেষ হয় না। কূপের জল তো সীমিত, কিন্তু গীতার ভাবের কোনো সীমা নেই। তাই গীতার বিষয়ে যদি কেউ কিছু বলেন তাহলে বাস্তবে তিনি তাঁর নিজেরই পরিচয় দেন— **'সব জানত প্রভু প্রভুতা সোঈ। তদপি কহেঁ বিনু রহা ন কোঈ॥'** (শ্রীরামচরিতমানস, বালকাণ্ড ১৩।১)।

ভগবানের বাণী বড় বড় ঋষি-মুনিদের বাণী অপেক্ষা অধিকতর ব্যঞ্জনাময় এবং শ্রেয়। কেননা ভগবান হলেন ঋষি-মুনিদেরও আদি—**'অহমাদির্হি দেবনাং মহর্ষীনাং চ সর্বশঃ'** (গীতা ১০।২)। তাই যত বড় ঋষি-মুনি, সাধু-মহাত্মাই হোন না কেন এবং তাঁদের বাণী যত উঁচুদরেরই হোক না কেন সেগুলি ভগবানের অতি দিব্য বাণী 'গীতা'-র সমকক্ষ হতে পারে না।

পাকদণ্ডীকে 'পদ্ধতি' বলা হয় আর রাজপথ, ঘন্টাপথ অথবা চওড়া রাস্তাকে 'প্রস্থান' বলা হয়। গীতা, উপনিষদ্ এবং ব্রহ্মসূত্র—এই তিনটি হল প্রস্থান এবং বাকি সবগুলি হল পদ্ধতি। এই প্রস্থান তিনটির মধ্যে গীতা খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, কেননা এর মধ্যে উপনিষদ্ এবং ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্যও অন্তর্নিহিত আছে।

গীতা হল উপনিষদের সার, কিন্তু বাস্তবে গীতার কথা উপনিষদ্ অপেক্ষা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কেননা, কারণ-অপেক্ষা কার্য বিশেষ গুণসম্পন্ন হয়ে থাকে, যেমন—আকাশের কেবল একটিই গুণ, তা হল 'শব্দ' কিন্তু তার কার্য বায়ুর হল দুটি গুণ 'শব্দ এবং স্পর্শ'।

বেদ হল ভগবানের নিঃশ্বাস আর গীতা ভগবানের বাণী। নিঃশ্বাস তো স্বাভাবিক হয়ে থাকে, কিন্তু গীতা ভগবান যোগে স্থিত হয়ে বলেছেন[১]। অতএব গীতা বেদ অপেক্ষাও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

সমস্ত দর্শন গীতার অন্তর্গত। কিন্তু গীতা কোনো দর্শনের অন্তর্গত নয়। দর্শন শাস্ত্রে জগৎ কী, জীব কী এবং ব্রহ্ম কী—এসব পঠিত হয়। কিন্তু গীতা পাঠ করায় না, অনুভব করায়।

গীতা কোনো মতের প্রতি আগ্রহ উৎপন্ন করায় না, তার আগ্রহ কেবল জীবের কল্যাণসাধন করা। গীতায় মতান্তর নেই, তা আছে টীকাকারদের মধ্যে। গীতাকে অনুসরণ করে চললে সগুণ ও নির্গুণ উপাসকদের মধ্যে পারস্পরিক মতবিরোধ থাকে না। গীতায় ভগবান সাধককে সমগ্রের দিকে নিয়ে যান। সগুণ-নির্গুণ, সাকার-নিরাকার, দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ, সহস্রভুজ প্রভৃতি সকল রূপ সমগ্র পরমাত্মারই অন্তর্গত। সমগ্র রূপের মধ্যে কোনো রূপই অবশিষ্ট থাকে না। যাঁরই উপাসনা করুন না কেন সকল উপাসনা সামগ্রিক রূপের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। সকল দর্শন সমগ্র-রূপের অন্তর্গত হয়। অতএব সব কিছু পরমাত্মার মধ্যে নিহিত, পরমাত্মা ছাড়া কোনো কিছুই নেই—এই ভাবই গীতায় নিহিত।

গীতার তাৎপর্য **'বাসুদেবঃ সর্বম্'**—এই কথা। এক

---

[১]ন শক্যং তন্ময়া ভূয়স্তথা বক্তুমশেষতঃ।
পরং হি ব্রহ্ম কথিতং যোগযুক্তেন তন্ময়া॥ (মহাভারত, আশ্বমেধিকপর্ব ১৬।১২-১৩)

ভগবান বললেন—'এই সব কিছুকে সেই রূপে পুনরাবৃত্ত করা আমার অধিকারে নেই। সেই সময় আমি যোগযুক্ত হয়ে পরমাত্মতত্ত্বের বর্ণনা করেছিলাম।'

যোগযুক্ত অর্থাৎ যোগে স্থিত হয়ে গীতা বলার তাৎপর্য হল এই যে, শ্রবণকারীর কল্যাণ কী করে হবে ? তার কল্যাণের জন্য কী বলা উচিত ? ভবিষ্যতে যে শুনবে বা পড়বে তার কল্যাণ কী করে হবে ?—এইভাবে সকল সাধকের কল্যাণে স্থিত হয়ে গীতা কথিত হয়েছে।

পরমাত্মতত্ত্বকে ছাড়া অন্য সত্তার স্বীকৃতি থাকলে প্রবৃত্তির উদয় হয় এবং অন্য সত্তার স্বীকৃতি দূর হলে নিবৃত্তি দৃঢ় হয়। প্রবৃত্তির উদয় হল 'ভোগ' এবং নিবৃত্তির দৃঢ়তা হল 'যোগ'। 'সব কিছুই পরমাত্মা'—গীতা এই তত্ত্ব স্বীকার করে এবং এটিকেই গুরুত্ব দেয়। 'জগৎসংসারের কার্যরূপে, কারণরূপে, প্রভাবরূপে, সমস্ত রূপেই কেবল আমিই আছি'—এই কথাটিকে জানাবার জন্য ভগবান গীতার চার জায়গায় (সপ্তম, নবম, দশম এবং পঞ্চদশ অধ্যায়ে) নিজের বিভূতিগুলির বর্ণনা করেছেন। ব্রহ্ম (নির্গুণ-নিরাকার), কৃৎস্ন অধ্যাত্ম (সমুদয় যোনিভুক্ত অনন্ত জীব), অখিল কর্ম (উৎপত্তি-স্থিতি-প্রলয় প্রভৃতি সকল ক্রিয়া), অধিভূত (নিজ শরীরসহ সমগ্র পাঞ্চভৌতিক জগৎ), অধিদৈব (মন-ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাসহ ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ) তথা অধিযজ্ঞ (অন্তর্যামী বিষ্ণু এবং তাঁর সকল রূপ)—এই সব কিছুই **'বাসুদেবঃ সর্বম্'**-এর অন্তর্গত (সপ্তম অধ্যায়ের উনত্রিশ-ত্রিশ শ্লোক)। তাৎপর্য হল এই যে সৎ, অসৎ এবং তৎসংশ্লিষ্ট যা কিছুই আছে সেই সবই পরমাত্মা—**'ত্বমক্ষরং সদসত্তৎপরং যৎ'** (গীতা ১১।৩৭)। নিজের অনুরাগের কারণেই সংসার দৃষ্টিগোচর হয়। অনুরাগের কারণেই দর্শন ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। যদি অনুরাগ না থাকে তাহলে পরমাত্মা ব্যতিরেকে কিছুই থাকে না। যেমন ভগবান বলেছেন—**'সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো'** (গীতা ১৫।১৫)। 'আমি সকল প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত।' যে হৃদয়ে ভগবান থাকেন সেই হৃদয়েই রাগ-দ্বেষ, চাঞ্চল্য, অশান্তি হয়। হৃদয়েই সুখ হয়, দুঃখও হয় হৃদয়েই। সমুদ্র মন্থনের সময় সমুদ্র থেকেই বিষ নির্গত হয়েছিল এবং অমৃতও বার হয়েছিল। ভগবান শঙ্কর বিষ পান করেছিলেন বলেই অমৃত বেরিয়ে এসেছিল। এইভাবে যদি রাগ (আসক্তি)-দ্বেষকে দূর করে দেন, তাহলে পরমাত্মা প্রকাশিত হবেন। সাধু-মহাত্মাদের হৃদয়ে রাগ-দ্বেষ থাকে না, তাই সেখানে পরমাত্মা নিয়ত বিরাজ করেন।

সব কিছুই পরমাত্মা—এটি খোলা চোখের ধ্যান। এতে চোখ বন্ধ (ধ্যান) করবার প্রয়োজন নেই, কান বন্ধ (নাদানুসন্ধান) করবার দরকার নেই, নাক বন্ধ (প্রাণায়াম) করবারও দরকার নেই। এতে না সংযোগের প্রভাব পড়ে, না বিয়োগের প্রভাব পড়ে, না কারোর আগমনের প্রভাব পড়ে, না কারোর চলে যাওয়ার প্রভাব পড়ে। যখন সব কিছুই পরমাত্মা, তাহলে ভিন্ন আসবে কোথা থেকে ? আসবেই বা কেমন করে ?

গীতা সমগ্রকে মানে, তাই গীতার আরম্ভে এবং অন্তে শরণাগতির কথা বলা হয়েছে। শরণাগতির দ্বারাই সমগ্রের প্রাপ্তি হয়। পরমাত্মায় সমগ্ররূপে সকল রূপ সন্নিবিষ্ট থাকলেও প্রাধান্য সগুণেরই। তার কারণ, সগুণের মধ্যে নির্গুণও নিহিত । কিন্তু নির্গুণে গুণের অনস্তিত্ব, সগুণ থাকে না। তাই সগুণই সমগ্র হতে পারে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র—**'অসংশয়ং সমগ্রং মাম্'** (গীতা ৭।১)। গীতা সমগ্রের বাণী, সেইজন্য গীতায় সব কিছু আছে। যে যেরূপ দৃষ্টিতে গীতাকে দেখে গীতায় সেই রূপই তার দ্বারা দৃষ্ট হয়—**'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'** (গীতা ৪।১১)।

কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ—এই তিনটিই যোগ। শরীর (অপরা)-কে নিয়ে কর্মযোগ, শরীরী (পরা)-কে নিয়ে জ্ঞানযোগ এবং শরীর-শরীরী দুটির প্রভু (ভগবান)-কে নিয়ে হল ভক্তিযোগ। ভগবান গীতার প্রারম্ভে শরীরীকে নিয়ে, পরে শরীরকে নিয়ে যথাক্রমে জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগের বর্ণনা করেছেন। তারপরে ধ্যানযোগের বর্ণনা করেছেন ; কেননা এটিও কল্যাণের একটি সাধন। আবার সপ্তম অধ্যায় থেকে ভক্তির বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন যেটি ভগবানের প্রধান লক্ষ্য। মানুষ কর্মযোগের দ্বারা জগতের জন্য, জ্ঞানযোগের দ্বারা নিজের জন্য এবং ভক্তিযোগের দ্বারা ভগবানের জন্য উপযোগী হয়ে থাকে ।

গীতায় সমত্বকে 'যোগ' বলা হয়েছে—**'সমত্বং যোগ উচ্যতে'** (গীতা ২।৪৮)। বাস্তবে 'যোগ'-এর প্রয়োজন আছে কর্মে। জ্ঞানে যোগের প্রয়োজন নেই, আর ভক্তিতে যোগের একেবারেই প্রয়োজন নেই। জ্ঞান এবং ভক্তি বাস্তবে 'যোগ'ই। কর্ম হল জড়, তা হল বন্ধনকারী এবং বিষয়, এইজন্য তাতে যোগের প্রয়োজন—**'যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি'** (গীতা ২।৪৮)। কর্মে যোগই প্রধান—**'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্'** (গীতা ২।৫০)। যোগ ব্যতীত কর্ম কিছুই নয়—**'দূরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়'** (গীতা ২।৪৯)। কর্তৃত্বও কর্ম করলেই আসে। এইজন্য গীতাতে 'যোগ' শব্দ বিশেষ করে 'কর্মযোগ'-এর বাচক রূপে উল্লিখিত হয়েছে। গীতার পুষ্পিকাতেও **'যোগশাস্ত্রে'** পদটির অর্থ কর্মযোগের শিক্ষা।

কর্মযোগের দুটি বিভাগ—কর্মবিভাগ এবং যোগবিভাগ। কর্মবিভাগ হল পূর্বার্ধ এবং যোগবিভাগ উত্তরার্ধ। কর্ম হল করণ-সাপেক্ষ এবং যোগ হল করণ-নিরপেক্ষ। কর্মবিভাগে কর্তব্যপরায়ণতা এবং যোগবিভাগে স্বাধীনতা, নির্বিকারতা, অসঙ্গতা, সমতা থাকে। সংসারে আমাদের যা কর্তব্য সেটি হল অপরের অধিকার রক্ষা। এইজন্য ব্যক্তির যা কর্তব্য সেটি হল পরিবার, সমাজ এবং জগৎসংসারের অধিকার রক্ষা করা। যেমন বক্তার যা কর্তব্য শ্রোতার সেটি অধিকার আর শ্রোতার যেটি কর্তব্য বক্তার সেটি অধিকার। বক্তা কথা বলে শ্রোতার অধিকার রক্ষা করেন আর শ্রোতা শ্রবণ করে বক্তার অধিকার রক্ষা করেন। অপরের অধিকার রক্ষা করার মধ্য দিয়ে মানুষ ঋণমুক্ত হয়ে থাকে এবং তার 'যোগ'-এর প্রাপ্তি ঘটে। অপরের অধিকার রক্ষা করার তাৎপর্য হল—শরীর, বস্তু, যোগ্যতা এবং সামর্থ্যকে নিজের মনে না করে অপরের বলে মনে করে অপরের সেবায় নিয়োজিত করা।

সংসারে বস্তু এবং ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক হয়। যেখানে সম্পর্ক হয় সেখানেই কর্তব্যপালনের প্রয়োজন হয়। বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক হলে সেই বস্তুর প্রতি মমতা না করে তার সদ্ব্যবহার করা অর্থাৎ তাকে অপরের সেবায় নিয়োগ করা হল আমাদের কর্তব্য। লোকজনের সম্পর্কে এলে তাদের প্রতি মমতাসক্ত না হয়ে তাদের সেবা করা, তাদের সুখ-আরাম প্রদান করা আমাদের কর্তব্য। কামনা এবং মমতাশূন্য হয়ে কর্তব্যপালন করলে শরীর-সংসারের সম্পর্ক-বিচ্ছেদ হয়ে থাকে এবং যোগের প্রাপ্তি ঘটে—**'তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগ বিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্'** (গীতা ৬।২৩)। সম্পর্কের বিচ্ছেদ হয়, কিন্তু যোগের কখনও বিচ্ছেদ হয় না। যোগপ্রাপ্ত হলে মানুষ রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ, কাম-ক্রোধ প্রভৃতি বিকার থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে থাকে এবং সে স্বাধীনতা, নির্বিকারতা, অসঙ্গতা, সমতা লাভ করে।

প্রতিটি মানুষ চায় সে যেন চিরকাল বেঁচে থাকে, কখনো না মরে ; সে যেন সব কিছু জানতে পারে, কখনো অজ্ঞানী না থাকে ; সে যেন সব সময় সুখী থাকে, কখনো দুঃখী না হয়। কিন্তু মানুষের এই চাওয়া তার নিজের শক্তিতে অথবা সংসারের দ্বারা কখনো পূর্ণ হতে পারে না। কেননা মানুষ যা চায় তা সংসারের কাছে অপ্রাপ্য। বাস্তবে মানুষের যা প্রার্থিত তা সে আগে থেকেই পেয়ে আছে। সে ভুল যা করে তা হল এই যে, সে সেই বস্তুগুলিই চায় যার সঙ্গে তার সম্পর্ক এবং বিচ্ছেদ হয়ে থাকে। যা পাওয়া যায় তাও ছেড়ে চলে যায়। এটি এক সিদ্ধান্ত যে, যে-জিনিস কখনো আমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তা চিরকালই আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে এবং এখন (বর্তমানে)-ও তা আমাদের থেকে পৃথকই আছে। যেমন, শরীর কোনো এক সময় আমাদের থেকে আলাদা হয়ে যাবে, তাই তা সর্বদাই আমাদের থেকে আলাদা রয়েছে এবং এখনও তা আমাদের থেকে আলাদাই আছে। এইভাবে যে বস্তু (পরমাত্মা) কখনো আমাদের কাছ থেকে আলাদা হন না, তা চিরকালই প্রাপ্ত এবং এখনও আমরা তাঁকে পেয়ে আছি। এর তাৎপর্য হল এই যে, সংসার চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন এবং পরমাত্মা চিরদিনের জন্য সংযুক্ত।

কোনো কোনো আচার্য প্রথমে কর্মযোগ, পরে জ্ঞানযোগ এবং তারপরে ভক্তিযোগ—এই ক্রমকে মানেন আবার কোনো কোনো আচার্য প্রথমে কর্মযোগ, পরে ভক্তিযোগ এবং শেষে জ্ঞানযোগ—এই ক্রমকে মানেন। কিন্তু গীতা প্রথমে জ্ঞানযোগ, পরে কর্মযোগ এবং তারপরে ভক্তিযোগ— এই ক্রমকে মান্যতা দেয়। গীতা কর্মযোগকে জ্ঞানযোগ অপেক্ষা অধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বলে মনে করে—**'তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে'** (৫।২)। কারণ জ্ঞানযোগ ছাড়া কর্মযোগ হতে পারে—**'কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ'** (৩।২০), **'যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে'** (৪।৩৩)। কিন্তু কর্মযোগ ছাড়া জ্ঞানযোগ সিদ্ধ হওয়া কঠিন—**'সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ'** (৫।৬)। শ্রীমদ্ভাগবতেও প্রথমে জ্ঞানযোগ, পরে কর্মযোগ এবং তারপরে ভক্তিযোগ—এই ক্রম উল্লিখিত হয়েছে[১]। একটি বিশেষ কথা হল এই যে, গীতা কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ—এই দুটিকে সমকক্ষ এবং লৌকিক বলেছে—**'লোকেঽস্মিন্দ্বিবিধানিষ্ঠা'** (৩।৩)। ক্ষর (জগৎ) এবং অক্ষর (জীব)—দুটিই লৌকিক—**'দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ'** (গীতা ১৫।১৬), কিন্তু ভগবান অলৌকিক—**'উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ'** (১৫।১৭)। ক্ষরকে নিয়ে কর্মযোগ এবং অক্ষরকে নিয়ে জ্ঞানযোগ সাধিত হয় ; অতএব কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ দুটিই লৌকিক। কিন্তু ভক্তিযোগ সাধিত হয় ভগবানকে আশ্রয় করে, তাই তা অলৌকিক।

গীতা ভক্তিকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলেছে (ষষ্ঠ অধ্যায়ের

সাতচল্লিশতম শ্লোক)। গীতার ভক্তি ভেদাত্মক নয়, তা হল অদ্বৈত ভক্তি। বাস্তবে দেখলে দেখা যায় যে, জ্ঞানে দ্বৈত আছে আর ভক্তিতে আছে অদ্বৈত। তার কারণ জ্ঞানে জড়-চেতন, জগৎ-জীব, শরীর-শরীরী, অসৎ-সৎ, পুরুষ-প্রকৃতি দুটি করে আছে, কিন্তু ভক্তিতে কেবল ভগবানই আছেন—**'বাসুদেবঃ সর্বম্'** (গীতা ৭।১৯), **'সদসচ্চাহম্'** (গীতা ৯।১৯)। ভগবান জ্ঞানের সাধনাগুলিতেও ভক্তির কথা বলেছেন—**'ময়ি চানন্য যোগেন.'** (১৩।১০) এবং গুণাতীত হওয়ার উপায় রূপেও ভক্তির কথা বলেছেন—**'মাং চ য়োঽব্যভিচারেণ.'** (১৪।২৬)। জ্ঞানের পরানিষ্ঠাতেও পরাভক্তি প্রাপ্ত হয়—**'মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্'** (১৮।৫৫)। এই পরাভক্তির দ্বারা জানা, দেখা এবং প্রবেশ করা—তিনটির প্রাপ্তি ঘটে (একাদশ অধ্যায়ের চুয়ান্নতম শ্লোক)। ভগবান তাঁর ভক্তকে সর্বোত্তম যোগী বলেছেন—**'স মে যুক্ততমো মতঃ'** (৬।৪৭), **'তে মে যুক্ততমা মতাঃ'** (১২।২), **'স যোগী পরমো মতঃ'** (৬।৩২)। ধ্যানযোগেও ভক্তির কথা বলা হয়েছে—**'যুক্ত আসীত মৎপরঃ** (৬।১৪) কর্মযোগেও ভগবান ভক্তির কথা বলেছেন—**যুক্ত আসীত মৎপরঃ'** (২।৬১)। ভগবান সকল যোগেতেই তাঁর প্রতি ভক্তির কথা (পরায়ণতা) বলেছেন, এটি ভক্তির বৈশিষ্ট্য। অর্জুনের প্রশ্ন ভক্তিবিষয়ক ছিল না, তা সত্ত্বেও ভগবান তাঁর ভক্তির বর্ণনা করেছেন (অষ্টাদশ অধ্যায়ের ছাপ্পান্ন থেকে ছেষট্টি শ্লোক পর্যন্ত)। ভক্তিতে **'সমগ্র'** পরমাত্মাকে পাওয়া যায় (সপ্তম অধ্যায়ের ঊনত্রিশতম-ত্রিশতম শ্লোক)।

গীতার সপ্তম, নবম এবং পঞ্চদশ অধ্যায় ; দশম অধ্যায়ের প্রারম্ভ তথা অষ্টাদশ অধ্যায়ের ছাপ্পান্ন থেকে ছেষট্টিতম শ্লোকগুলি আমার খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বলে মনে হয়। এইগুলিতে 'অর্জুন উবাচ' নেই অর্থাৎ এইগুলি ভগবান স্বেচ্ছায় অত্যন্ত কৃপা করে বলেছেন।

গীতায় কর্মযোগের বর্ণনাতে জ্ঞানযোগ-ভক্তিযোগের, জ্ঞানযোগের বর্ণনায় কর্মযোগ-ভক্তিযোগের এবং ভক্তিযোগের বর্ণনায় কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের কথাও এসেছে। এর তাৎপর্য হল এই যে সাধক যে কোনো যোগই অবলম্বন করুন না কেন, তাঁর তিনটি যোগেরই প্রাপ্তি ঘটে ; অর্থাৎ তিনি মুক্তি এবং ভক্তি দুটিই লাভ করেন। তার কারণ পরা এবং অপরা উভয় প্রকৃতিই ভগবানের। জ্ঞানযোগ অবলম্বন করে পরাকে আর কর্মযোগ অবলম্বন করে অপরাকে। সেইজন্য কোনো একটি যোগের পূর্ণতা হলে তিনটি যোগেরই পূর্ণতা সম্পন্ন হয়। কিন্তু এতে এই একটি শর্ত আছে যে, **সাধক যেন নিজের মতের প্রতি আগ্রহ না রাখেন, অন্যের মতকে খণ্ডন বা তার নিন্দা না করেন**। নিজের মতের প্রতি আগ্রহ রাখলে এবং অন্যের মতকে ছোট মনে করে খণ্ডন বা নিন্দা করলে সাধকের মুক্তি (তত্ত্বজ্ঞান) হয়তো হতে পারে, কিন্তু ভক্তি (পরমপ্রেম)-র অর্থাৎ পূর্ণতার প্রাপ্তি হতে পারে না।

❋ ❋ ❋

পরিশিষ্ট সম্পর্কে

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা এমন একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ যে তাকে আজ পর্যন্ত কেউ পূর্ণরূপে জানতে পারেনি, তাকে পূর্ণরূপে জানা যায় না এবং তা সম্ভবও নয়। গীতার গভীরে অবগাহন করে অধ্যয়ন-মনন করলে নিত্য নতুন বিশিষ্ট ভাব প্রকট হতে থাকে। গীতাতে যত ভাব অন্তর্নিহিত আছে বুদ্ধিদ্বারা তা ধারণ সম্ভব নয়, বুদ্ধি যতটুকু গ্রহণে সক্ষম, মন তা ধরতে সক্ষম নয়। মনে যতটা আসে ততটা কথায় বলা যায় না। কথায় যতটা বলা যায় লেখাতে ততটা আসে না। গীতা হল অসীম কিন্তু তার টীকা হল সীমিত। আমার হৃদয়ে গীতার বিষয়ে যে সকল ভাব উদিত হয়েছিল তা প্রথমে **'সাধক-সঞ্জীবনী'**-র টীকাতে লিখে দিয়েছিলাম। কিন্তু তার পরেও চিন্তাভাবনা করায় ভগবৎকৃপায় এবং সন্তকৃপায় গীতার অনেক নতুন নতুন ভাব উদিত হতে থাকে। সেগুলিকে এখন 'পরিশিষ্ট-ভাব'রূপে 'সাধক-সঞ্জীবনী'-র টীকার সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে।

'সাধক-সঞ্জীবনী'র টীকা লেখার সময় আমার চিন্তায়

---

[১]যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎ সয়া।
জ্ঞান কর্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২০।৬)

নির্গুণের প্রাধান্য ছিল ; কেননা আমার পঠনে ছিল নির্গুণতার প্রাধান্য এবং সে সম্পর্কেই চিন্তা করেছিলাম। কিন্তু নিরপেক্ষ হয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার ফলে আমি ভগবানের সগুণ (সমগ্র) স্বরূপ এবং ভক্তির প্রাধান্য দেখতে পাই। কেবল নির্গুণকে প্রাধান্য দিলে সকল কথার সঠিক সমাধান হয় না। কিন্তু সগুণকে প্রাধান্য দিলে কোনো সংশয় অবশিষ্ট থাকে না। সমগ্রতা সগুণেতেই আছে, নির্গুণেতে নেই। ভগবানও সগুণকে সমগ্র বলেছেন— **'অসংশয়ং সমগ্রং মাম্'** (গীতা ৭।১)।

পরিশিষ্ট লেখার পরও আমি সন্তুষ্ট নই এবং গীতা নিয়ে চিন্তাভাবনা বন্ধ করিনি। সুতরাং ভবিষ্যতে ভগবৎকৃপায় এবং সন্তকৃপায় কী নতুন নতুন ভাব উদিত হবে তা আমি জানি না, কিন্তু মানবজীবনের পূর্ণতা যে ভক্তি (প্রেম) প্রাপ্তিতেই—এতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

প্রথমে **'সাধক-সঞ্জীবনী'**-র টীকায় অর্থ অন্বয়সহ না করায় তাতে কোথাও কোথাও সঙ্গতির ঘাটতি থেকে গিয়েছিল। এখন শ্লোকগুলির অন্বয়সহ অর্থ দিয়ে সেটি দূর করা হয়েছে। অন্বয়ার্থে কোথাও অর্থকে নিয়ে আবার কোথাও বাক্য বিন্যাসের ক্ষেত্রে বিশেষ চিন্তা করে যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্তন করা হয়েছে।

পাঠকগণ যদি পূর্বের এবং পরের (পরিশিষ্ট) ব্যাখ্যায় কোনো ভিন্নতা দেখেন তাহলে তাঁদের পরবর্তী ব্যাখ্যার ভাবকেই গ্রহণ করতে হবে। সিদ্ধান্ত হল এই যে পূর্বের অপেক্ষা পরবর্তী কালে লিখিত বিষয়ের গুরুত্ব বেশি হয়ে থাকে। তবে এক্ষেত্রে এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছে যে, সাধকদের যেন কোনো প্রকার বিভ্রান্তি না আসে। কেননা এই টীকা প্রধানতঃ সাধকদের হিতার্থেই লিখিত হয়েছে, পাণ্ডিত্য দেখানোর জন্য নয়।

সাধকদের উচিত নিজেদের অন্তরে কোনো পক্ষপাত না রেখে এই টীকা পাঠ করা এবং এ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করা। তাহলে প্রকৃত তত্ত্ব তাঁদের ধারণায় ধরা পড়বে এবং যে কথা এই টীকাতে নেই তাও তাঁরা জানতে পারবেন।

বিনীত

স্বামী রামসুখদাস

৩৪ তম সংস্করণের নম্র নিবেদন

স্বামী রামসুখদাসজী-কৃত গীতার সাধক-সঞ্জীবনী টীকার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত, তাদের কাছে এই ব্যাখ্যা সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলবার নেই। সব অর্থেই সর্বপ্রকারেই অনন্য এই **'সঞ্জীবনী'**-অমৃত যাঁরা পান করেছেন, নিজেদের চিন্তায়, মননে, সাধনায় এর নবীন-অলোক-উন্মেষকারী প্রভাব অনুভব করেছেন তাঁদের জন্য অধিক একটি সুসংবাদ জ্ঞাপনই এই নবতর ভূমিকার উদ্দেশ্য। স্বামীজী দেহে বর্তমান থাকতেই 'সাধক-সঞ্জীবনী-কোশ' নামক একটি পঞ্জী, তাঁর ইচ্ছানুসারেই সংকলন করা হয়েছিল কিন্তু অপরিহার্য কারণে যথাসময়ে এটি সম্পূর্ণ করে ওঠা যায়নি। বিশাল এই সঞ্জীবনী ব্যাখ্যায় যে সকল বিষয় আলোচিত হয়েছে, সেগুলির নির্দেশ প্রত্যেক অধ্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে উল্লিখিত থাকলে পাঠকের পক্ষে তা অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা নেয়, তা বলাই বাহুল্য। এখানে তা সংযোজিত হয়েছে, ফলে এই বিশাল গ্রন্থে আলোচিত কোনো বিষয়ের অনুসন্ধান এখন সহজ হয়ে উঠবে এবং সেই সঙ্গে আরো বহুবিধ তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সংকলিত করে অত্যন্ত উপযোগী এক দিক্-নির্দেশিকা-তুল্য অনুক্রমণী পাঠকদের কাছে নিবেদন করা হয়েছে। ফলতঃ এই মহা-উপযোগী গ্রন্থটির গভীরতা তথা স্বরূপ প্রকাশে এই 'কোশ' যে বিশেষ সহায়ক হবে, তাতে সন্দেহ নেই। পাঠকেরা এর দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন, তাঁদের সন্তোষ বিধানেই আমাদের সার্থকতা।

এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, গীতা সম্পর্কিত অনেক নতুন নতুন বিষয় সম্বন্ধে এষণা-মূলক নিবন্ধ-সমূহের একটি পৃথক সংগ্রহ-গ্রন্থ **'গীতা দর্পণ'** নামে প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে ধর্ম, বর্ণাশ্রম, সৃষ্টি-প্রক্রিয়া, সাধক, সাধনা, সিদ্ধ-পুরুষ, ছন্দ, ব্যাকরণ, সাহিত্য—ইত্যাদি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে গীতার মনন-বিচার করা হয়েছে। গীতা সম্পর্কে যাঁরা গভীরভাবে চিন্তা ও মনন করেন, সেই সাধক ও অনুসন্ধিৎসুগণের এই গ্রন্থখানির প্রতি অবশ্যই দৃষ্টিপাত করা উচিত।

অক্ষয় তৃতীয়া ১৪২৪

—প্রকাশক

ওঁ

।। শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ।।

কৃষ্ণং বন্দে জগদ্‌গুরুম্

পরাকৃতনমদ্‌বন্ধং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতি। সৌন্দর্যসারসর্বস্যং বন্দে নন্দাত্মজং মহঃ ।।
প্রপন্নপারিজাতায় তোত্রবেত্রৈকপাণয়ে। জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃতদুহে নমঃ ।।
বসুদেবসুতং দেবং কংসচাণূরমর্দনম্। দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্‌গুরুম্ ।।

❖❖❖

বংশীবিভূষিতকরান্নবনীরদাভাৎ
পীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ।
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদরবিন্দনেত্রাৎ
কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে।।

❖❖❖

ভীষ্মদ্রোণতটা জয়দ্রথজলা গান্ধারনীলোৎপলা
শল্যগ্রাহবতী কৃপেণ বহনী কর্ণেন বেলাকুলা।।
অশ্বত্থামবিকর্ণঘোরমকরা দুর্যোধনাবর্তিনী
সোত্তীর্ণা খলু পাণ্ডবৈ রণনদী কৈবর্তকঃ কেশবঃ ।।

❖❖❖

একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্রগীতমেকো দেবো দেবকীপুত্র এব।
একো মন্ত্রস্তস্য নামানি যানি কর্মাপ্যেকং তস্য দেবস্য সেবা।।

❖❖❖

॥ শ্রীহরিঃ ॥

বিষয়-সূচী

সাধক-সঞ্জীবনী-কোশ

ওঁ

॥ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

প্রাক্‌কথন

বংশীধরং তোত্রধরং নমামি মনোহরং মোহহরং চ কৃষ্ণম্।
মালাধরং ধর্মধুরন্ধরং চ পার্থস্য সারথ্যকরং চ দেবম্॥
কর্তব্যদীক্ষাং চ সমত্বশিক্ষাং জ্ঞানস্য ভিক্ষাং শরণাগতিং চ।
দদাতি গীতা করুণার্দ্রভূতা কৃষ্ণেন গীতা জগতো হিতায়॥
সঞ্জীবনী সাধকজীবনীয়ং প্রাপ্তিং হরের্বৈ সরলং ব্রবীতি।
করোতি দূরং পথিবিঘ্নবাধা দদাতি শীঘ্রং পরমাত্মসিদ্ধিম্॥[১]

গীতার মহিমা

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার মহিমা অপার ও অসীম। ভগবদ্‌গীতা গ্রন্থটি প্রস্থানত্রয়ের অন্তর্গত বলে স্বীকৃত হয়েছে। মনুষ্য মাত্রেরই উদ্ধারের জন্য তিনটি রাজমার্গকে 'প্রস্থানত্রয়' নামে অভিহিত করা হয়—প্রথমটি হচ্ছে বৈদিক প্রস্থান, এটিকে বলা হয় 'উপনিষদ্' ; অন্যটি হল দার্শনিক প্রস্থান, এটিকে 'ব্রহ্মসূত্র' নামে অভিহিত করা হয়, আর তৃতীয়টি হচ্ছে স্মার্ত প্রস্থান, যেটিকে 'ভগবদ্‌গীতা' বলা হয়। উপনিষদ্ হল মন্ত্র দ্বারা প্রকাশিত ; ব্রহ্মসূত্র হল সূত্র দ্বারা রচিত এবং ভগবদ্‌গীতা হচ্ছে শ্লোকের মাধ্যমে কথিত। ভগবদ্‌গীতা শ্লোকের মাধ্যমে সৃষ্ট হলেও ভগবানের বাণী হওয়ায় এগুলি আসলে মন্ত্র-ই। এই শ্লোকগুলির অর্থ অত্যন্ত গভীর হওয়ায় এগুলিকে সূত্রও বলা যায়। 'উপনিষদ্' অধিকারী ব্যক্তিদের উপযোগী, 'ব্রহ্মসূত্র' বিদ্বান ব্যক্তিদের চর্চার জন্য ; কিন্তু 'ভগবদ্‌গীতা' সকলশ্রেণীর মানুষের জন্যই উপযোগী।

ভগবদ্‌গীতা এক অসাধারণ ও বিচিত্র গ্রন্থ। সাধকদের জন্য উপযোগী সমস্ত সামগ্রীই এতে পাওয়া যায়, তা তিনি যে কোনো দেশ, যে কোনো বেশ, যে কোনো সম্প্রদায়, যে কোনো বর্ণ বা যে কোনো আশ্রমেরই হোন না কেন। এর কারণ হিসাবে বলা যায় যে, এই গ্রন্থে কোনো সম্প্রদায়ের নিন্দা বা প্রশংসা করা হয়নি, বরং প্রকৃত তত্ত্বেরই বর্ণনা করা আছে। প্রকৃত তত্ত্ব (পরমাত্মা) হচ্ছে তাই-ই, যা পরিবর্তনশীল প্রকৃতি এবং প্রকৃতিজাত পদার্থ থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক এবং সমস্ত দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, পরিস্থিতি ইত্যাদিতে সব সময় একরূপে, একইভাবে স্থিত। মানুষ যেখানে যেভাবেই থাকুক না কেন প্রকৃতপক্ষে সেখানেই তিনি পূর্ণরূপে বিরাজমান। কিন্তু এই পরিবর্তনশীল প্রকৃতিজাত বস্তু এবং ব্যক্তিদের প্রতি রাগ-দ্বেষ ইত্যাদির কারণে তা অনুভব করা সম্ভব হয় না। রাগ-দ্বেষাদি রহিত হলেই এটি স্বতঃই অনুভূত হয়।

ভগবদ্‌গীতার উপদেশ অতীব অসাধারণ। এর উপর বহু টীকা রচিত হয়েছে এবং রচিত হচ্ছে, তা সত্ত্বেও সাধু ও

---

[১] 'যিনি নিজের হাতে বাঁশি ও চাবুক এবং গলায় দিব্য মালা ধারণ করে আছেন এবং যিনি প্রাণীদের মন তথা মোহকে হরণ করেন সেই পার্থসারথি ধর্মশিরোমণি দিব্য স্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আমি প্রণাম করি।'

'ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা গীত করুণা-রসে আপ্লুত গীতা জগতের হিতার্থে কর্তব্যের দীক্ষা, সমতার শিক্ষা, জ্ঞানের ভিক্ষা এবং শরণাগতির তত্ত্ব প্রদান করে।'

'পরমাত্মপ্রাপ্তিকে সরলভাবে প্রকাশকারী, সাধকদের সাধন-পথের বাধা-বিঘ্নগুলিকে দূর করে শীঘ্রই পরমাত্মপ্রাপ্তিরূপ পরম সিদ্ধি প্রদানকারী অনুপম গ্রন্থ হল এই 'সাধক-সঞ্জীবনী'।'

মহাত্মাদের এবং বিদ্বান ব্যক্তিদের হৃদয়ে গীতার নব নব ভাবের উন্মেষ ঘটছে। এই গূঢ় গ্রন্থটির উপর যতই আলোচনা করা হোক তবুও এর অন্ত পাওয়া যায় না। যতই এর গভীরে যাওয়া যায় ততই এর মাধ্যমে গভীরতর ভাব প্রকাশিত হতে থাকে। একজন বিদ্বান ব্যক্তির ভাবই যখন সহজে বোঝা সম্ভব হয় না তখন যিনি অনন্ত, যাঁর নাম, রূপ ইত্যাদি সবই অনন্ত—সেই ভগবানের স্ব-কথিত বাণীরূপ গীতার অন্ত কিভাবে পাওয়া সম্ভব ?

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটির বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে যারা সত্যই নিজের মঙ্গল চায় তারা যে কোনো বর্ণ, আশ্রম, দেশ, সম্প্রদায়, মত ইত্যাদির হোন না কেন তারা এই গ্রন্থটি পড়লেই সঠিক পথের সন্ধান পেতে পারে। মানুষ যদি এই গ্রন্থটির সামান্য অংশেরও পঠন-পাঠন বা মনন করে তাহলে সে নিজের উদ্ধারের জন্য অত্যন্ত সন্তোষজনক পথ পেতে পারে। প্রত্যেক দর্শন এবং ধর্মের পৃথক পৃথক অধিকারী থাকে, কিন্তু গীতার বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, যারা নিজেদের মোক্ষ চায়, মঙ্গল চায় তারা সকলেই এইগ্রন্থ পাঠ করার অধিকারী।

ভগবদ্গীতায় সাধনগুলির বর্ণনায়, বিস্তারিত-ভাবে বোঝানোর জন্য এক-একটি সাধনপথের একাধিকবারও আলোচনা করা হয়েছে, তা সত্ত্বেও এই গ্রন্থটি আয়তনে বিরাট হয়নি। এইরূপ সংক্ষেপে অথচ বিস্তারিতভাবে পূর্ণ তত্ত্বের যথাযথ আলোচনা আর কোনো গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। নিজের কল্যাণের জন্য তীব্রভাবে আগ্রহী ব্যক্তি যে কোনো পরিস্থিতিতে পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত করতে সক্ষম হয়, যুদ্ধের মতো কঠিন পরিস্থিতিতেও সে নিজের উদ্ধার করতে সমর্থ হয়—এইপ্রকার শুধুমাত্র ব্যবহার দ্বারাই পরমার্থপ্রাপ্তির উপায় গীতায় উল্লিখিত রয়েছে। সেইজন্য গীতার মতো দ্বিতীয় কোনো গ্রন্থ পাওয়া যায় না।

গীতা একটি দিব্য গ্রন্থ। এটির আশ্রয় নিয়ে পঠনমাত্রই এক বিচিত্র অসাধারণ এবং শান্তিদায়ক ভাবের স্ফুরণ হতে থাকে। এটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করলে খুবই শান্তি পাওয়া যায়। এটি পাঠ করার একটি নিয়ম হচ্ছে এই যে, প্রথমে গীতার সমস্ত শ্লোক অর্থসহ মুখস্থ করতে হয় পরে নির্জনে বসে গীতার অন্তিম শ্লোক **'যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ......'** এইখান থেকে শুরু করে গীতার প্রথম শ্লোক **'ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে....'** পর্যন্ত বইটি না দেখে পাঠ করলে অপার শান্তি পাওয়া যায়। প্রত্যহ যদি সম্পূর্ণ গীতা গ্রন্থটি একবার বা কয়েকবার পাঠ করা যায় তাহলে গীতার বিশেষ অর্থ স্ফুরিত হয়। মনে কোনো প্রশ্ন এলে গীতা পাঠে তার উত্তর আপনিই উদ্ভাসিত হয়।

এই গ্রন্থের মহিমা ঠিকভাবে বর্ণনা করতে কেউই সক্ষম নয়। অনন্ত মহিমাসম্পন্ন এই গ্রন্থের মহিমা কেই বা ব্যক্ত করতে পারে ?

গীতার মূল উদ্দেশ্য

গীতা কোনো বিশেষ মতবাদে আবদ্ধ নয় অর্থাৎ দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, বিশুদ্ধাদ্বৈত, অচিন্ত্যভেদাভেদ ইত্যাদি কোনো মতবাদ বা কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তের দ্বারা সীমিত নয়। গীতার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ যে কোনো মতবাদ বা সিদ্ধান্ত মানুক না কেন, সর্বপ্রকার অবস্থায় যেন তার মঙ্গল হয়, কোনো পরিস্থিতিতেই সে যেন পরমাত্মপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত না হয়। কারণ জীবের প্রকৃত মঙ্গলের জন্যই তার মনুষ্য-জন্ম প্রাপ্তি ঘটে। জগতে এমন কোনো পরিস্থিতি নেই যার দ্বারা মানুষের মঙ্গল না হয়। কারণ পরমাত্মতত্ত্ব প্রত্যেক অবস্থাতেই সমভাবে বিদ্যমান। সুতরাং সাধকের নিকট যে কোনো পরিস্থিতি যেভাবেই উপস্থিত হোক না কেন তার সেটির সদ্ব্যবহার করা উচিত। সদ্ব্যবহার করার অর্থ হচ্ছে যে—দুঃখজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে সুখের আশা ত্যাগ করা এবং সুখদায়ক পরিস্থিতিতে সুখভোগ তথা 'এটি চিরস্থায়ী হোক' এইরূপ ইচ্ছা ত্যাগ করা ও অন্যের উপকারে তা ব্যবহার করা। এইপ্রকার সদুপযোগের দ্বারা মানুষ দুঃখজনক এবং সুখদায়ক পরিস্থিতির প্রভাব থেকে মুক্তি পাবে অর্থাৎ তার প্রকৃত মঙ্গল হবে।

সৃষ্টির আদিতে পরমাত্মার মধ্যে একটি সংকল্প জাগে যে 'এই আমিই বহুরূপ ধারণ করব', এই ইচ্ছা থেকেই সেই এক পরমাত্মা প্রেমলীলার জন্য, প্রেমের আদান-প্রদানের নিমিত্ত নিজেই শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধা—এই দুই রূপ ধারণ করলেন। উভয়ে লীলার উদ্দেশ্যে এক খেলার সৃষ্টি করলেন। সেই লীলাখেলা সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে প্রভুর ইচ্ছায় অনন্ত জীবের (যা অনাদিকাল হতেই ছিল) এবং লীলাখেলার অন্যান্য উপকরণাদি (শরীর ইত্যাদি)

সৃষ্টি হল। খেলা ঠিকমতো হয় তখনই যখন দুইপক্ষের অংশগ্রহণকারীগণ স্বাধীন হয়। তাই ভগবান জীবগণকে স্বাতন্ত্র্যের ভাব প্রদান করেন। এই খেলায় শ্রীরাধার শুধু ভগবানের ওপরই অনুরাগ ছিল, তাঁর কোনো ভুল হয়নি। তাই ভগবান এবং শ্রীরাধার মধ্যে ভালোবাসারই লীলা হয়েছিল। কিন্তু অন্যান্য জীবগণ, এই সব ভুলে জন্ম-মরণশীল প্রকৃতি হতে সৃষ্ট পদার্থের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করে নেয় যার ফলে তারা জন্ম-মৃত্যু চক্রে জড়িয়ে পড়ে।

খেলার সামগ্রী শুধু খেলার জন্যই সৃষ্ট হয়, কারো ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য নয়। কিন্তু জীব সকল খেলা ভুলে খেলার বস্তু অর্থাৎ শরীর ইত্যাদিকে নিজস্ব ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করে প্রাপ্ত স্বাধীন বোধের দ্বারা ভ্রান্ত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়, তাই তারা জাগতিক পদার্থেই বদ্ধ হয়ে ভগবানের প্রতি বিমুখ হয়ে পড়ে। কিন্তু যদি জীবগণ শরীর ইত্যাদি জন্ম-মরণশীল বস্তুসমূহ থেকে বিমুখ হয়ে ভগবানের শরণাগত হয়, তবে তারা জন্ম-মৃত্যুরূপ অনন্ত দুঃখ থেকে চিরদিনের জন্য মুক্ত হতে পারে। সুতরাং জীবগণ যাতে জগৎ-সংসার থেকে বিমুখ হয়ে ঈশ্বরমুখী হয় এবং ভগবানের সঙ্গে তার নিত্য যোগ (সম্বন্ধ) খুঁজে পায় সেইজন্যই এই ভগবদ্গীতার আবির্ভাব হয়েছে।

গীতার যোগ

গীতার যোগ শব্দটির অনেক বিচিত্র প্রকারের অর্থ আছে। সেগুলিকে আমরা তিনটি ভাগে বিভক্ত করতে পারি।

(১) **'যুজির যোগে'** ধাতুর দ্বারা সৃষ্ট 'যোগ' শব্দ, যার অর্থ—সমরূপ ভগবানের সঙ্গে নিত্যসম্বন্ধ যেমন **'সমত্বং যোগ উচ্চতে'** (২।৪৮) ইত্যাদি। এই অর্থটি গীতায় প্রধানভাবে এসেছে।

(২) **'যুজ্ সমাধৌ'** ধাতুর দ্বারা সৃষ্ট 'যোগ' শব্দ, যেটির অর্থ—চিত্তের স্থিরতা অর্থাৎ সমাধিতে স্থিতি যেমন **'যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া'** (৬।২০) ইত্যাদি।

(৩) **'যুজ্ সংযমনে'** ধাতুর থেকে সৃষ্ট 'যোগ' শব্দ, যার অর্থ হচ্ছে—সংযমন, সামর্থ্য, প্রভাব, যেমন **'পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্'** (৯।৫) ইত্যাদি।

গীতায় যে যে স্থানে 'যোগ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তার সর্বত্রই উপরিউক্ত তিনটির মধ্যে একটি অর্থের প্রাধান্য এবং অপর দুই অর্থের গৌণভাব থাকে ; যেমন—'যুজির যোগে'তে 'যোগ' শব্দে সমতার (সম্বন্ধ) প্রাধান্য আছে, কিন্তু সমতা হলে স্থিরতা এবং সামর্থ্য[১] স্বতঃই এসে পড়ে। 'যুজ সমাধৌ' নামক 'যোগ' শব্দটিতে স্থিরতার প্রাধান্য দেখা যায়, আর স্থিরতা এলে সমতা ও সামর্থ্য স্বতঃই আসে। 'যুজ্ সংযমনে' নামক 'যোগ' শব্দে সামর্থ্যের প্রাধান্য আছে, কিন্তু সামর্থ্য এলে সমতা এবং স্থিরতা স্বাভাবিকভাবেই আসে। সুতরাং গীতার 'যোগ' শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক ও গূঢ় অর্থ সংবলিত।

পাতঞ্জল যোগদর্শনে চিত্তবৃত্তির নিরোধকেই 'যোগ' নামে অভিহিত করা হয়েছে—**'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ'** (১।২) এবং ওই যোগের পরিণামের কথাও বলা হয়েছে—**'তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্'** (১।৩)। এইভাবে পাতঞ্জল যোগদর্শনে যোগের যে পরিণামের কথা বলা হয়েছে, সেইটিই গীতায় 'যোগ' নামে অভিহিত হয়েছে (২।৪৮ ; ৬।২৩)। অর্থাৎ গীতা চিত্তবৃত্তিসমূহ থেকে সর্বভাবে সম্পর্ক পরিত্যাগপূর্বক স্বতঃসিদ্ধ স্ব-স্বরূপে স্থিতিকেই যোগ বলে। সেই সমতায় স্থিতি (নিত্যযোগ) হলে আর কখনও তা হতে চ্যুতি হয় না, কখনো বৃত্তিরূপতা হয় না বা ব্যুত্থান হয় না। বৃত্তিগুলি নিরুদ্ধ হলে নির্বিকল্প অবস্থা হয়, কিন্তু সমতায় স্থিতি হলে নির্বিকল্প বোধ হয়। 'নির্বিকল্প বোধ' অবস্থাতীত এবং সমস্ত অবস্থার প্রকাশক।

সমতা অর্থাৎ নিত্যযোগের অনুভব করাবার জন্যই গীতায় তিন প্রকার যোগপথের বর্ণনা করা হয়েছে—কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ। স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ—এই তিনটি শরীরেরই জগতের সঙ্গে অভিন্ন

[১]ভগবানে জগৎসংসার মাত্রেরই উৎপত্তি, স্থিতি, প্রলয় ইত্যাদির যে সামর্থ্য আছে, এই ক্ষমতা যোগীর থাকে না—'জগদ্ব্যাপারবর্জম্' (ব্রহ্মসূত্র ৪।৪।১৭)। যোগীর যে ক্ষমতা হয় তার দ্বারা তিনি শুধুমাত্র সংসারেই বিজয়প্রাপ্তি করতে পারেন (গীতা ৫।১১)। অর্থাৎ যতই অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতি আসুক তাঁর উপর তার কোনো প্রভাব পড়ে না।

সম্বন্ধ থাকে। সুতরাং এই তিনটিকে অপরের হিতার্থে প্রয়োগের নামই কর্মযোগ, স্বয়ং এই তিনটি থেকে অসঙ্গ হয়ে নিজ স্বরূপে স্থিত হওয়ার যে পন্থা তাকেই বলা হয় জ্ঞানযোগ এবং ভগবানে নিজেকে অর্পণ করে দেওয়ার যে পথ তাকে বলা হয় ভক্তিযোগ। এই তিন যোগে সিদ্ধিলাভ করার জন্য অর্থাৎ নিজেকে উদ্ধার করার জন্য মানুষ তিনটি শক্তি লাভ করেছে (১) কিছু করার শক্তি (বল), (২) কিছু জানার শক্তি (জ্ঞান), (৩) কিছু মানবার শক্তি (বিশ্বাস)। কিছু করার শক্তি নিঃস্বার্থভাবে জগতের সেবা করবার জন্য যা কর্মযোগের অন্তর্গত, জানবার শক্তি নিজের স্বরূপ জানার জন্য, যেটিকে জ্ঞানযোগ বলা হয় ; মানবার শক্তি ভগবানকে অর্থাৎ ভগবানে সমর্পিত হবার জন্য, এটি ভক্তিযোগ। যার কর্মে অধিক রুচি বা আগ্রহ থাকে, সে কর্মযোগের অধিকারী। যার মধ্যে নিজেকে জানার আগ্রহ অধিক পরিমাণে থাকে, সে জ্ঞানযোগের অধিকারী। যার ভগবানে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অধিক পরিমাণে থাকে, সে ভক্তিযোগের অধিকারী। এই তিন যোগ-পন্থাই পরমাত্মপ্রাপ্তির পৃথক পৃথক সাধন। এছাড়া আর যা কিছু সাধনা পদ্ধতি আছে তা সবই এই তিনটির অন্তর্গত[১]।

সমস্ত সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে—জড়ত্বের থেকে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করা। সুতরাং জড়তা থেকে সম্পর্ক ছেদ করার প্রক্রিয়াতে (সাধনে) তফাৎ থাকতে পারে কিন্তু জড়ত্ব থেকে মুক্তি প্রাপ্ত হবার পর সমস্ত সাধনই এক হয়ে যায় অর্থাৎ শেষকালে সকল সাধনার দ্বারাই সেই এক সমরূপ পরমাত্মতত্ত্ব লাভ হয়। এই সমরূপ পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তিকেই গীতায় 'যোগ' নামে অভিহিত করা হয়েছে এবং একেই 'নিত্যযোগ' বলা হয়।

গীতায় যে শুধু কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ বা ভক্তিযোগের বর্ণনা করা হয়েছে তা নয়। এতে উপরোক্ত তিন যোগের বিষয় ছাড়াও যজ্ঞ, দান, তপ, ধ্যানযোগ, প্রাণায়াম, হঠযোগ, লয়যোগ ইত্যাদি সাধনার বর্ণনাও করা হয়েছে। এর বিশেষ কারণ হল এই যে গীতায় অর্জুন যুদ্ধ নিয়ে প্রশ্ন করেননি, বরং কল্যাণের বিষয়ে করেছিলেন এবং ভগবানেরও গীতা বিবৃত করার উদ্দেশ্য যুদ্ধ করাবার জন্য ছিল না। অর্জুন তাঁর কল্যাণ প্রার্থনা করেছিলেন (২।৭ ; ৩।২ ; ৫।১)। সেইজন্য শাস্ত্রাদিতে যতপ্রকার কল্যাণকারক সাধনার কথা উল্লিখিত আছে, তার সমস্ত সাধন প্রণালীই গীতায় সংক্ষেপে অথচ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণিত হয়েছে। সেই সব সাধনগুলির জন্যই সাধকজগতে গীতা বিশেষভাবে সমাদৃত। কারণ সাধক যে কোনো মত, সম্প্রদায় বা সিদ্ধান্ত অনুসরণকারীই হোন না কেন, সকলেরই অভীপ্সা হল নিজের কল্যাণসাধন করা।

সাধনার দুটি শৈলী

জীবের মধ্যে একটি হল চেতন পরমাত্মার অংশ, অপরটি জড় প্রকৃতির অংশ। চেতন অংশের প্রাধান্যে সে পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে এবং জড় অংশের প্রাধান্যে সে জাগতিক আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। এই দুটি আকাঙ্ক্ষার মধ্যে পরমাত্মার আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই পূর্ণ হয়, কিন্তু জাগতিক আকাঙ্ক্ষা কখনো পূর্ণ হতে পারে না। কিছু কিছু জাগতিক ইচ্ছা পূর্ণ হতে দেখা গেলেও প্রকৃতপক্ষে তার নিবৃত্তি হয় না, বরং সংসারে আসক্তির জন্য নতুন নতুন কামনা জন্মাতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে জাগতিক ইচ্ছা-পূর্তি অর্থাৎ জাগতিক বস্তুসমূহের প্রাপ্তি ইচ্ছার অধীন নয়, আসলে তা হল কর্মের অধীন। কিন্তু পরমাত্মাপ্রাপ্তি কর্মের অধীন নয়। জীবের তীব্র আগ্রহ

[১] শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান বলেছেন যে—

যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া। জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ। (১১।২০।৬)

নিজ কল্যাণকামী ব্যক্তিগণের জন্য আমি তিনটি যোগপথ বর্ণনা করেছি—জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ এবং ভক্তিযোগ। এই তিনটি ছাড়া কল্যাণপ্রাপ্তির আর কোনো পথ নেই।

এই কথা অধ্যাত্মরামায়ণ এবং দেবীভাগবতেও বলা হয়েছে—

(ক) মার্গাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তাঃ পুরা মোক্ষাপ্তিসাধকাঃ।
কর্মযোগো জ্ঞানযোগো ভক্তিযোগশ্চ শাশ্বতঃ॥ (অধ্যাত্মরামায়ণ ৭।৭।৫৯)

(খ) মার্গাস্ত্রয়ো মে বিখ্যাতা মোক্ষপ্রাপ্তৌ নগাধিপ।
কর্মযোগো জ্ঞানযোগো ভক্তিযোগশ্চ সত্তম॥ (দেবীভাগবত ৭।৩৭।৩)

হলেই পরমাত্মাপ্রাপ্তি হওয়া সম্ভব। কারণ হিসাবে বলা যায় যে, সমস্ত কর্মেরই আদি এবং অন্ত থাকে ; সেইজন্য তার ফলও আদি-অন্ত বিশিষ্ট হয়। সুতরাং আদি ও অন্ত বিশিষ্ট কর্ম দ্বারা অনাদি-অনন্ত পরমাত্মাকে পাওয়া কীরূপে সম্ভব ? কিন্তু সাধকগণ প্রায়শই মনে করেন যে, যেমন ক্রিয়ার প্রাধান্য দ্বারা সাংসারিক বস্তুর প্রাপ্তি ঘটে তেমনি পরমাত্মার প্রাপ্তিও ক্রিয়ার প্রাধান্য দ্বারা সম্ভব হবে এবং জাগতিক পদার্থ সকল লাভ করার জন্য যেমন—শরীর-ইন্দ্রিয়, মন-বুদ্ধির সাহায্য নিতে হয়, তেমন পরমাত্মা লাভের জন্যও সেই প্রকার শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির সাহায্যের প্রয়োজন হয়। সেইজন্য এইরূপ সাধকগণ জড় বস্তুর (শরীর ইত্যাদির) সাহায্যে অভ্যাস করতে করতে ঈশ্বর লাভের জন্য সচেষ্ট হন।

যেমন ধ্যানযোগে দীর্ঘকাল ধরে অভ্যাস করতে করতে অর্থাৎ পরমাত্মার দিকে চিত্তকে চালিত করতে করতে যখন চিত্ত নিরুদ্ধ হয় তখন সেই চিত্তে আর সংসারের কোনো বাসনা না থাকায় এবং তা জড় হওয়ায় পরমাত্মায় মিলিত হতে না পেরে জগৎসংসার থেকে বিরাগী (উপরত) হয়ে যায়। চিত্ত থেকে সম্বন্ধহীন হওয়ার ফলে জড়ত্ব থেকে সাধকের সম্বন্ধ সর্বতোভাবে ছেদ হয় এবং সে তখন নিজেই নিজের দ্বারা পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব করে (গীতা ৬।২০)। কিন্তু যে সাধক প্রথম থেকে পরমাত্মার সঙ্গে নিজ স্বতঃসিদ্ধ নিত্য-সম্বন্ধ মেনে এবং জড়-প্রকৃতির সঙ্গে নিজের কোনও প্রকারের সম্পর্ক না মেনে সাধনা করেন, তিনি অত্যন্ত শীঘ্র এবং অনায়াসে পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব করতে পারেন।

এইভাবে পরমাত্মতত্ত্ব লাভে আগ্রহী সাধকদের জন্য সাধনার দুটি রীতি (শৈলী) আছে। যে রীতিতে অন্তঃকরণের প্রাধান্য থাকে অর্থাৎ যার দ্বারা সাধক জড় বস্তুর সহায়তা সাপেক্ষে সাধন-ভজন করেন, তাকে 'করণ-সাপেক্ষ শৈলী' নামে এবং যে রীতিতে আত্মচেতনার (স্বয়ং-এর) প্রাধান্য থাকে অর্থাৎ যাতে সাধক শুরু থেকেই জড়ত্বের সাহায্য না নিয়ে স্বয়ং সাধনা করেন, তাকে 'করণ-নিরপেক্ষ শৈলী' নামে উল্লেখ করা হয়। যদিও এই দুটি সাধন শৈলী দ্বারা পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তি করণ-নিরপেক্ষ ভাবে অর্থাৎ স্বয়ং-এর দ্বারাই (জড়ত্ব থেকে সর্বতোভাবে সম্বন্ধ ছেদ হলেই) হয়, তবুও 'করণ-সাপেক্ষ-শৈলী' দ্বারা তাঁর প্রাপ্তিতে বিলম্ব ঘটে এবং 'করণ-নিরপেক্ষ শৈলী' অনুসরণ করলে তাঁর প্রাপ্তি শীঘ্র হয়। সাধনের এই দুই রীতি চারটি প্রধান ভাগে বিভক্ত—

(১) করণ-সাপেক্ষ-শৈলীতে জড়ত্বের (শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির) আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়, কিন্তু করণ-নিরপেক্ষ-শৈলীতে জড়ত্বের আশ্রয় নিতে হয় না, বরং জড়ত্বের থেকে সম্পর্ক ত্যাগ করতে হয়।

(২) করণ-সাপেক্ষ শৈলীতে এক নতুন অবস্থার সৃষ্টি হয় কিন্তু করণ-নিরপেক্ষ শৈলীতে অবস্থাগুলির থেকে সম্পর্ক-ছেদ হয়ে (অবস্থাতীত) তত্ত্বের অনুভব হয়।

(৩) করণ-সাপেক্ষ শৈলীতে প্রাকৃত শক্তির (সিদ্ধি) প্রাপ্তিলাভ হয়, কিন্তু করণ-নিরপেক্ষ শৈলীতে প্রাকৃত শক্তিগুলির দিকে সম্পর্ক-ছেদ হয়ে সরাসরি পরমাত্মতত্ত্বের অনুভব হয়।[১]

(৪) করণ-সাপেক্ষ-শৈলীতে কখনো তৎক্ষণাৎ সিদ্ধি পাওয়া যায় না, কিন্তু করণ-নিরপেক্ষ-শৈলীতে জড়ত্ব থেকে সর্বতোভাবে সম্পর্ক-ছেদ হওয়ায়, নিজ স্বরূপে স্থিতি হলে অথবা ভগবানের শরণাগত হলে তৎক্ষণাৎ সিদ্ধিলাভ হয়।

পাতঞ্জল যোগদর্শনে যোগের সিদ্ধির জন্য করণ-সাপেক্ষ-রীতির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, কিন্তু গীতায় যোগের সিদ্ধির জন্য করণ-নিরপেক্ষ রীতির ওপরেই জোর দেওয়া হয়েছে। পরমাত্মায় মন নিবিষ্ট হলে তবে ঠিক আছে, কিন্তু যদি মন তাঁতে সন্নিবিষ্ট না হয় তাহলে কিছুই

[১]যদি করণ-সাপেক্ষ-শৈলী (চিত্তবৃত্তি নিরোধ) দ্বারা সোজা পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তি হয় তাহলে পাতঞ্জল যোগদর্শনের 'বিভূতিপাদ' (যাতে সিদ্ধির বর্ণনা আছে) ব্যর্থ প্রমাণিত হয়। করণ-সাপেক্ষ-শৈলী দ্বারা যে সিদ্ধি প্রাপ্তি ঘটে, তা পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তিতে বিঘ্ন ঘটায়। পাতঞ্জলযোগ দর্শনেও ঐ সিদ্ধিগুলিকে বিঘ্ন বলেই ধরা হয়েছে—'তে সমাধাবুপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ' (৩।৩৭) অর্থাৎ এই সিদ্ধিগুলি সমাধির সিদ্ধিতে বিঘ্নস্বরূপ এবং ব্যুত্থান (ব্যবহার)-এ সিদ্ধিস্বরূপ—স্থান্যুপনিমন্ত্রণে সঙ্গস্ময়াকরণং পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গাৎ (৩।৫১) অর্থাৎ লোকপালক দেবতাদের দ্বারা তাঁদের নিজ নিজ লোকের ভোগের আকাঙ্ক্ষা জাগানো আহ্বান পেলে সেই ভোগাদিতে অনুরাগ বা অভিমান করা উচিত নয়, কারণ এরূপ করলে পুনরায় অনিষ্ট (পতন) হবার সম্ভাবনা থাকে।

হল না—এই হচ্ছে করণ-সাপেক্ষ শৈলী ; আর পরমাত্মায় মন সন্নিবিষ্ট হোক বা না হোক, তাতে কিছু আসে-যায় না, কিন্তু যদি নিজে পরমাত্মার সন্নিহিত হয়—তাকেই বলা হয় করণ-নিরপেক্ষ-শৈলী। অর্থাৎ করণ-সাপেক্ষ-রীতিতে পরমাত্মার সঙ্গে মন ও বুদ্ধির সম্পর্ক ঘটে এবং করণ-নিরপেক্ষ-শৈলীতে মন-বুদ্ধি থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে পরমাত্মার সঙ্গে স্বয়ং-এর সম্পর্ক ঘটে। তাই করণ-সাপেক্ষ-শৈলীতে অভ্যাসের দ্বারা ক্রমশঃ সিদ্ধি প্রাপ্তি ঘটে কিন্তু করণ-নিরপেক্ষ-শৈলীতে অভ্যাসের প্রয়োজন হয় না। কারণ জীবের পরমাত্মার সঙ্গে নিত্য-সম্বন্ধ (নিত্যযোগ) রয়েছে সুতরাং ভগবানের সঙ্গে এই সম্বন্ধ জানা বা মেনে নেওয়াতে অভ্যাসের প্রয়োজন হয় না। যেমন—বিবাহ হলে বধূ বরকে স্বতঃই স্বামী বলে স্বীকার করে, এইজন্য তাকে কোনোরূপ অভ্যাস করতে হয় না। সেইরূপে কেউ জানাল, 'এইটি গঙ্গা' এটি জানবার জন্য কোনো অভ্যাস করতে হয় না।[১] করণ-সাপেক্ষ-শৈলীতে নিজের জন্য সাধন-ভজন করার প্রাধান্য থাকে, কিন্তু করণ-নিরপেক্ষ শৈলীতে জানা (বিবেক) এবং মানা (ভাব)-এর প্রাধান্য থাকে।

'আমার জড়ত্বের (শরীর ইত্যাদির) সঙ্গে সম্পর্কই নেই'—এইরূপ অনুভূতি না হলেও যখন সাধক প্রথম থেকেই দৃঢ়ভাবে এটি মেনে নেন তখন তাঁর এটি স্পষ্টরূপে অনুভব হয়ে যায়। যেমন, তিনি 'আমি শরীর এবং শরীরটা আমার' এই ভুল ধারণাবশতঃ তিনি বদ্ধ ছিলেন তেমনি 'আমি শরীর নই, শরীরটি আমারই নয়'—এইরূপ সত্য চিন্তার দ্বারা তিনি মুক্ত হয়ে থাকেন। কারণ মেনে নেওয়া কথাকে না মানলেই তা দূর হয়ে যায়। এই কথাই ভগবান গীতাতেও বলেছেন যে অজ্ঞানী মানুষ শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক যোগ করে শরীর দ্বারা কৃত কর্মগুলির কর্তা নিজেকে মনে করে—**'অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে'** (৩।২৭)। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ওই কর্মগুলির কর্তা হিসাবে নিজেকে মনে করেন না—**'নৈব কিঞ্চিৎকরোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ'** (৫।৮)। অর্থাৎ অসত্য ভাবনাকে দূর করতে হলে সত্যকেন্দ্রিক ভাবনারই প্রয়োজন হয়।

'আমি হিন্দু', 'আমি ব্রাহ্মণ', 'আমি সাধু' ইত্যাদি মনোভাব এত দৃঢ় হয় যে যতক্ষণ এই মনোভাব নিজে (স্বয়ং) ত্যাগ না করে, ততক্ষণ তা কেউ ছাড়াতে পারে না। তেমনি, 'আমি শরীর', 'আমি কর্তা' এইরূপ মনোভাবও এত দৃঢ় হয় যে, তা ত্যাগ করা সাধকদের পক্ষেও শক্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু লৌকিক মনোভাব অবাস্তবিক এবং অসত্য হওয়ায় চিরস্থায়ী হয় না বরং নষ্ট হয়ে যায়। এর বিপরীত 'আমি শরীর নই', 'আমি ভগবানের' ইত্যাদি মনোভাব বাস্তবিক এবং সত্য হওয়ায় কখনো নষ্ট হয় না। হয়তো বা কখনো তার বিস্মৃতি হতে পারে বা তার থেকে বিমুখতা হতে পারে। সেইজন্য সত্য-কেন্দ্রিক মনোভাব দৃঢ় হলে তা আর শুধু মনোভাবরূপে থাকে না, তা বোধ (অনুভূতিতে)-এ পরিণত হয়।

গীতায় করণ-সাপেক্ষ রীতির বর্ণনা করা হলেও (যেমন ৪।২৪-৩০,৩৪ ; ৬।১০-২৮ ; ৮।৮-১৬ ; ১৫।১১ ইত্যাদি) প্রধানত করণ-নিরপেক্ষ-শৈলীরই বর্ণনা করা হয়েছে (যেমন ২।৪৮, ৫৫ ; ৩।১৭ ; ৪।৩৮ ; ৫।১২র পূর্বার্ধ, ৬।৫ ; ৯।৩০-৩১ ; ১২।১২ ; ১৮।৬২, ৬৬, ৭৩ ইত্যাদি)। এর কারণ হিসাবে বলা যায় যে, ভগবান সাধকদের শীঘ্র ও অনায়াসে নিজেকে প্রাপ্ত করাতে চান। দ্বিতীয়তঃ, অর্জুন ঘোরতর যুদ্ধের প্রাক্কালে নিজের মঙ্গলের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তাঁর মঙ্গলের জন্য করণ-নিরপেক্ষ-শৈলীই ছিল তখন কার্যকরী। কারণ করণ-নিরপেক্ষ রীতিতে মানুষ সকল পরিস্থিতিতে এবং শাস্ত্রবিহিত কর্ম সম্পূর্ণভাবে করেও নিজের মঙ্গল সাধন করতে পারে। এই রীতি অনুসারে (বিনা অভ্যাসে) অর্জুনের মোহ দূর হয়েছিল এবং তাঁর স্মৃতি জাগ্রত হয়েছিল (১৮।৭৩)।

সাধনের করণ-নিরপেক্ষ রীতি সকলের জন্য

[১]প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মাকে মানার এবং জানার বিষয়ে জগতের কোনো দৃষ্টান্তই উপযুক্ত হয় না। কারণ জগৎকে জানার ও মানার ব্যাপারে মন-বুদ্ধি সাহায্য করে, কিন্তু পরমাত্মাকে জানার ও মানার ব্যাপারে মন-বুদ্ধির ভূমিকা নেই অর্থাৎ পরমাত্মার অনুভব স্ব-স্বরূপে হয়, মন-বুদ্ধি দ্বারা নয়। দ্বিতীয়তঃ জগৎকে জানার ও মানার শুরু এবং শেষ আছে, কিন্তু ভগবানকে জানার ও মানার কোনো আদি বা অন্ত নেই। কারণ প্রকৃতপক্ষে জগতের সঙ্গে আমাদের (স্বরূপের) কোনো সম্পর্কই নেই, কিন্তু পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের স্বরূপগত সম্বন্ধ সদাসর্বদা আছে এবং থাকবে।

সমানভাবে উপযোগী। কারণ এতে বিশেষ কোনো যোগ্যতা, পরিস্থিতি ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না। এই রীতিতে শুধুমাত্র পরমাত্মপ্রাপ্তির আত্যন্তিক আগ্রহ হলেই তৎক্ষণাৎ জড়ত্ব থেকে সম্পর্ক-ছেদ হয়ে নিত্যপ্রাপ্ত পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব হয়ে থাকে। যেমন অন্ধকার যত বছরেরই পুরাতন হোক না কেন, একটি দিয়াশলাই-কাঠি জ্বালালেই তা দূর হয়, সেইরূপ জড়ত্ব যতই পুরোনো (অনন্ত-জন্মের) সম্পর্কের হোক না কেন, পরমাত্মপ্রাপ্তির একান্ত ইচ্ছা হলেই, তা দূরীভূত হয়। তাই আত্যন্তিক আগ্রহ করণ-সাপেক্ষতার মাধ্যমে যে সমাধি লাভ হয় তার থেকেও শ্রেষ্ঠ। নির্বিকল্প সমাধি থেকেও ব্যুত্থান হয় আবার ব্যবহারিক জীবন জেগে ওঠে অর্থাৎ সমাধির শুরু এবং শেষ থাকে। যতক্ষণ আদি ও অন্ত থাকে ততক্ষণ জড়ত্বের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে। জড়ের সঙ্গে সম্পর্ক-ছেদ হলে আর সাধনার আদি বা অন্ত থাকে না, তখন সে পরমাত্মার সঙ্গে নিত্যযোগ অনুভব করে।[১]

প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মার সঙ্গে বিচ্ছেদ কখনো হয়ই না, হওয়া সম্ভবই নয়। শুধু জগতের সঙ্গে মেনে নেওয়া সংযোগের জন্যই পরমাত্মার থেকে বিচ্ছিন্নতার ভ্রান্তি হয়। সংসারের সঙ্গে মেনে নেওয়া সংযোগ পরিত্যাগ করলেই পরমাত্মতত্ত্বে আগ্রহী ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ নিত্যযোগ অনুভব করতে পারে এবং স্থায়ী স্থিতি লাভ করে।

অন্তঃকরণ শুদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তাও করণ-সাপেক্ষ-শৈলীতেই আছে, করণ-নিরপেক্ষ-শৈলীতে নেই। যেমন উত্তম কলমের দ্বারা লেখা সুন্দর হতে পারে কিন্তু লেখক তাতে উত্তম হয়ে যায় না, তেমনি অন্তঃকরণ শুদ্ধ হলে কর্ম শুদ্ধ হতে পারে কিন্তু তাতে কর্তার শুদ্ধি হয় না। কর্তার শুদ্ধি হয়— যদি অন্তঃকরণ থেকে তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয় তবেই, কারণ অন্তঃকরণের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক মেনে নেওয়াই হল আসল অশুদ্ধি ।

নিত্যপ্রাপ্ত পরমাত্মতত্ত্বের সঙ্গে জীবের নিত্যযোগ স্বতঃসিদ্ধ, সুতরাং তার প্রাপ্তিতে করণের প্রয়োজন নেই। কেবল সেদিকে দৃষ্টিপাত করা দরকার যেমন শ্রীরামচরিতমানসে আছে—**শংকর সহজ সরূপু সম্হারা** (১।৫৮।৪)। অর্থাৎ ভগবান শঙ্কর তাঁর সহজ স্বরূপ লক্ষ্য করলেন, সেইদিকে দৃষ্টিপাত করলেন। লক্ষ্য করা যায় তাকেই যা আগে থেকেই আমাদের কাছে থাকে এবং দৃষ্টিপাত করলে জানা যায় যে এটি আছে। এরূপ দৃষ্টিপাতমাত্রেই নিত্যযোগের অনুভব হয়ে থাকে। কিন্তু সাংসারিক সুখের কামনা, আশা এবং ভোগাদির জন্য সেদিকে লক্ষ্য করতে, তার অনুভব করতে বেগ পেতে হয়। যতক্ষণ সাংসারিক ভোগ ও সঞ্চয়ের দিকে দৃষ্টি থাকে ততক্ষণ মানুষের সেই ক্ষমতা থাকে না যার দ্বারা সে নিজ স্বরূপের প্রতি দৃষ্টি দেবে। যদি কোনো কারণবশতঃ কোনো বিশেষ কথার দ্বারা তার দৃষ্টি সেদিকে যায়ও, তবু তা স্থায়ী হওয়া অত্যন্ত কঠিন। কারণ অনিত্য বস্তুর প্রতি অনুরাগ মানুষের মধ্যে এমনভাবে আসন নিয়েছে যে তা তাকে ভগবানের স্বতঃসিদ্ধ সম্পর্ক বুঝতে দেয় না এবং কোনো বিশেষ কারণে বা কোনো বিশেষ ব্যাখ্যা দ্বারা বোঝা গেলেও তা মনে স্থির হতে দেয় না। কিন্তু সেই তত্ত্বের অনুভব কীভাবে হবে তা জানার জন্য যদি ঐকান্তিক আগ্রহ জাগে তাহলে সেই ঐকান্তিক আগ্রহের এমনই ক্ষমতা যে তার দ্বারা জাগতিক আসক্তি দূরীভূত হবে।

গীতায় কথিত কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ — এই তিনটি সাধনই করণ-নিরপেক্ষভাবে অর্থাৎ নিজের দ্বারা হয়। কারণ ক্রিয়া ও পদার্থ কারোর নিজস্ব বা নিজের জন্য নয়, বরং অপরের জন্য এবং অপরের সেবার জন্য। 'আমি শরীর নই' এবং 'শরীর আমার নয়', 'আমি ভগবানের' এবং 'ভগবান আমার' এই প্রকার বিবেকপূর্বক করা চিন্তা-ভাবনা করণ-সাপেক্ষ (অভ্যাস) নয়। কারণ এর দ্বারা জড় পদার্থ হতে সম্পর্ক-ছেদ হয়। সুতরাং কর্মযোগে আত্মভাবই জড়ভাবকে পরিত্যাগ করে, জ্ঞানযোগে স্বয়ংই স্বয়ংকে (আত্মাস্বরূপ) জানে আর ভক্তিযোগে স্বয়ংই ভগবানের শরণাগত হয়।

গীতার এই সাধক-সঞ্জীবনী টীকাতেও সাধনার করণ-নিরপেক্ষ-শৈলীকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে কারণ সাধকগণের সহজে এবং শীঘ্রই যাতে উদ্ধার লাভ হয় সেই কথা ভেবেই এই টীকা রচিত হয়েছে।

---

[১] যতক্ষণ জড়ত্বের সম্পর্ক থাকে, ততক্ষণ দুটি অবস্থা থাকে। কারণ পরিবর্তনশীল হওয়ায় জড়প্রকৃতি কখনো একরূপে স্থায়ী হয় না। সুতরাং সমাধি ও ব্যুত্থান এই দুই অবস্থাই জড়ত্বের সম্পর্কে হয়। জড়ের থেকে সম্পর্কছেদ হলে তবে 'সহজাবস্থা' হয়, যাকে মহাপুরুষগণ 'সহজ সমাধি' বলেছেন। এই অবস্থা থেকে আর ব্যুত্থান হয় না।

এই টীকা সম্পর্কে

অল্প বয়স থেকেই আমার গীতার প্রতি বিশেষ আগ্রহ ছিল। গীতাকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করায় এবং বহু সাধু মহাপুরুষের সঙ্গ এবং বচনের দ্বারা গীতার বিষয় অনুধাবন করতে আমার খুব সুবিধা হয়েছে। গীতা মহান শান্তিদায়ী এবং বহু বিচিত্রভাবে পরিপূর্ণ। সেই ভাব সম্পূর্ণ বোঝার এবং তা ভাষায় ব্যক্ত করার সামর্থ্য আমার নেই। কিন্তু কতিপয় গীতাভক্ত ব্যক্তির বিশেষ আগ্রহ এবং প্রেরণায় আমি গীতার ব্যাখ্যা লেখায় প্রবৃত্ত হই—এই ভেবে যে, আমারও এতে গীতার মর্ম এবং ভাব বোধ হবে এবং কেউ যদি এটি মনন করে তারও বোধ হবে। একথা ভেবেই আমি গীতার লেখনকর্মে প্রবৃত্ত হই।

সর্বপ্রথম দ্বাদশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা লেখা হয়। এটি ১৩৮০ সালে **'গীতার ভক্তিযোগ'** নামে প্রকাশিত হয়েছিল। কয়েক বছর পর ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা লেখা হয়েছিল, যেটি ১৩৮৫ সালে **'গীতার জ্ঞানযোগ'** নামে প্রকাশ করা হয়। এটি লেখার পর মনে হল যে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ—যোগ এই তিনপ্রকারের। সুতরাং তিন যোগের ওপরই তিনটি বই রচিত হলে ভালো হয়। সেইদিকে লক্ষ্য রেখে প্রথমে দ্বাদশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যাটি সংশোধন ও পরিবর্ধন করা হয়। পরে তার সঙ্গে পঞ্চদশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যাও সম্মিলিত করে ১৩৮৯ সালে **'গীতার ভক্তিযোগ'** (দ্বিতীয় সংস্করণ) নামে প্রকাশিত করা হয়। তারপর তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা লেখা হয়। এটি দুই খণ্ডে **'গীতার কর্মযোগ'** নামে প্রকাশিত হয়। এটি কিছুকাল পরে ১৩৯০ সালে প্রকাশিত হয়।

উপরিউক্ত **'গীতার ভক্তিযোগ'**, **'গীতার জ্ঞানযোগ'** এবং **'গীতার কর্মযোগ'**—এই তিনটি পুস্তক লেখার রীতি ছিল একটু অন্য প্রকারের। এর প্রথমে সম্বন্ধ, তারপর শ্লোক, পরে ভাবার্থ, অন্বয় এবং সবশেষে পদের ব্যাখ্যা—এই রীতিতে লেখা হয়েছে। এর পিছনে অন্যের প্রেরণাও ছিল। রীতি বদলাবার কারণ হচ্ছে যে পাঠ্যাংশ অল্প কথায় এবং শীঘ্র লেখা যায়, যাতে পাঠকদের পড়ায় বেশি সময় না লাগে এবং বইটিও শীঘ্র তৈরি হয়ে সাধকদের হস্তগত হয়। এই রীতিতে প্রথমে ষোড়শ এবং সপ্তদশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা লিখিত হয়েছে। এটি বাংলা ১৩৮৯ সালে **'গীতার সম্পত্তি এবং শ্রদ্ধা'** নামে প্রকাশিত হয়েছিল। এর পরে অষ্টাদশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা লেখা হয়। এটি ১৩৮৯ সালে **'গীতার সার'** নামে প্রকাশিত হয় ।

যখন ষোড়শ, সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা ছাপা হয়ে যায়, তখন কোনো একজন বলেছিলেন যে, যদি শ্লোকগুলির অর্থ দেওয়া হয় তাহলে ভালো হয়, কারণ পাঠক যদি প্রথমে শ্লোকের অর্থ বুঝতে পারে, তাহলে তার ব্যাখ্যা হৃদয়ঙ্গম করতে সুবিধা হবে। তাই **'গীতার সম্পত্তি এবং শ্রদ্ধা'**র দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩৯০ সালে) শ্লোকগুলির অর্থও দেওয়া হয়। শ্লোকগুলির অর্থ দেওয়ার সঙ্গে পদগুলির ব্যাখ্যা করার ধারাও কিছুটা পরিবর্তিত হয় ।

এরপর দশম এবং একাদশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা লেখা হয়। এটি **'গীতার বিভূতি এবং বিশ্বরূপ-দর্শন'** নামে প্রকাশিত হয়। তারপর সপ্তম, অষ্টম এবং নবম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা লেখা হয়েছে, যেটি **'গীতার রাজবিদ্যা'** নামে প্রকাশিত। এরপরে ষষ্ঠ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা লেখা হয়, যেটি **'গীতার ধ্যানযোগ'** নামে প্রকাশিত হয়েছে, শেষে প্রথম এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যা লেখা হয়েছে। এটি **'গীতার আরম্ভ'** নামে প্রকাশ করা হয়েছে। এই চারটি গ্রন্থ ১৩৯১ সালে প্রকাশিত হয়।

এইভাবে ভগবদ্-কৃপায় সমগ্র গীতার টীকা পৃথকভাবে সর্বশুদ্ধ দশটি খণ্ডে গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত হয়। এটি প্রকাশের কাজে কাগজ ইত্যাদির জন্য কিছু অসুবিধা হয়েছিল, তবুও সৎসঙ্গের সঙ্গে যুক্ত ভ্রাতাগণের উদ্যোগে এর প্রকাশনা চলতে থাকে। সাধারণ ব্যক্তিগণও এই গ্রন্থগুলিকে উৎসাহ এবং আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে, যার জন্য কয়েকটি গ্রন্থ দুটি বা তিনটি করে সংস্করণে প্রকাশিত হয়।

এই টীকা একস্থানে বসে লেখা নয় এবং এর প্রথম অধ্যায় থেকে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যন্ত ক্রমানুসারেও লেখা হয়নি, তাই এতে পূর্বাপর দৃষ্টিতে কিছু পার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু এতে সাধকদের কোনো অসুবিধা হবে না। কোথাও সিদ্ধান্তের বিচারেও পার্থক্য আছে কিন্তু কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ—এই তিনটির মধ্যে যে কোনো একটির দ্বারা স্বতন্ত্ররূপে পরমাত্মার প্রাপ্তি হতে পারে—এ বিষয়ে কোনো বিরোধ নেই।

লেখার সময়—'সাধকদের শীঘ্র কীভাবে পরমাত্মতত্ত্ব লাভ হবে'—এইরূপ উদ্দেশ্য ছিল। সেইজন্য টীকার ভাষা, রীতি ইত্যাদিতে ক্রমাগত পরিবর্তন করা হয়।

এই টীকায় অনেক শ্লোকের বিশ্লেষণ অন্য টীকাগুলির থেকে বিপরীত মনে হতে পারে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে অন্য টীকাগুলিকে ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করা। বরং আমার নিজের যেখানে যেমন নির্বিবাদরূপে উচিত তথা প্রকরণ-সঙ্গতি, যৌক্তিকতা, সন্তোষজনক ও প্রিয় বলে মনে হয়েছে, আমি তেমনভাবেই বিচার করেছি। কারোর মতকে খণ্ডন বা কারোর মত সমর্থন করার প্রবৃত্তি আমার একেবারেই ছিল না।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার অর্থ অত্যন্ত গভীর। এটি পঠন-পাঠন, মনন-চিন্তন এবং আলোচনা করলে অত্যন্ত বিচিত্র এবং নতুন ভাবের স্ফুরণ হতে থাকে যাতে মন ও বুদ্ধি বিস্মিত ও অভিভূত হয়ে যায়। টীকা লেখার সময় যখন এই ভাবগুলি লেখার ইচ্ছা হত, তখন এমন এক বিচিত্র ভাবের প্লাবন আসত যে, কোন ভাবগুলি নিয়ে লেখা হবে এবং কেমন করে লেখা হবে—এই বিষয়ে নিজেকে একবারে অযোগ্য বলে মনে হত। তবুও আমার সঙ্গী, শ্রদ্ধেয় বন্ধু যাঁরা—তাঁদেরই আগ্রহে কিছু লেখা হত। তাঁরা এই ভাবগুলি লিপিবদ্ধ করতেন এবং সংশোধন করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতেন। কখনো আবার গ্রন্থগুলি দেখার প্রয়োজন হলে মনে হত যেন অনেক স্থানে কত লেখা বাকি থেকে গেছে, যেন সমস্ত ঠিক ঠিক লেখা হয়নি, অনেক কথা বাদ থেকে গেছে ; সেইজন্য এতে বারংবার সংশোধন ও পরিবর্তন করা হচ্ছিল। তাই পাঠকদের কাছে অনুরোধ যে তাঁরা যেন পূর্বে লিখিত বিষয়ের থেকে পরে লিখিত বিষয়ের ওপর বেশি গুরুত্ব দেন এবং সেটিকে গ্রহণ করেন।

সম্পূর্ণ গীতার টীকা পৃথকভাবে কয়েকটি খণ্ডে থাকায় এর পুনর্মুদ্রণে এবং এই সবগুলি একত্রে পাওয়ায় কিছুটা অসুবিধা থাকে এই সব চিন্তা করে এবার সম্পূর্ণ গীতার টীকা একটি বাঁধানো গ্রন্থ রূপে প্রকাশিত করা হয়। এটি করার আগে পূর্ব-প্রকাশিত সম্পূর্ণ টীকা পুনরায় দেখে নেওয়া হয়েছে এবং তাতে প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনও করা হয়েছে। ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা ও দ্বিতীয়বার নতুন করে লেখানো হয়েছে। ভাষা ও রীতি প্রায় একই রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। কিছু বাক্য অনাবশ্যকবোধে বাদ দেওয়া হয়েছে, কিছু নতুন বাক্য যুক্ত হয়েছে আবার কিছু বাক্য একস্থান থেকে সরিয়ে অন্যত্র যথোচিত স্থানে সংযুক্ত করা হয়েছে। যে বাক্যগুলির পুনরুক্তি খুব বেশি আছে সেগুলি যথাসম্ভব বাদ দেওয়া হয়েছে, তবে সর্বত্র নয়। বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য বাক্যগুলি বা পুনরুক্তিগুলি সাধকগণের পক্ষে উপযোগী মনে করে সরানো হয়নি। এই কাজে অনেক ভুলই থাকা সম্ভব, যার জন্য আমি পাঠকদের কাছে হাতজোড় করে ক্ষমা চাইছি। এই সঙ্গে পাঠকদের কাছে অনুরোধ যে, তাঁরা কোনো ভুল দেখলে কৃপা করে যেন জানিয়ে দেন ; পরবর্তী সংস্করণে যাতে তা সংশোধন করা সম্ভব হয়।

গীতা সম্পর্কিত অনেক নতুন বিষয়ের তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধের এক সংগ্রহ পৃথকভাবে তৈরি করা হয়েছে, যেটি 'গীতা-দর্পণ' নামে প্রকাশিত হয়েছে।

গীতার মনন এবং বিচারে এবং গীতার টীকা লেখায় আমার খুবই আধ্যাত্মিক লাভ হয়েছে এবং গীতা-বিষয়ে খুব স্পষ্ট বোধও জাগ্রত হয়েছে। অন্যান্য ভ্রাতা-ভগিনীরা যদি এটি মনন করেন, তাহলে তাঁদেরও অবশ্যই আধ্যাত্মিক লাভ হবে—এটি আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস। গীতার মনন ও বিচার করলে যে লাভ হয় এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

কৃষ্ণানুগ্রহদায়িকা সকরুণা গীতা সমারাধিতা
কর্মজ্ঞানবিরাগভক্তিরসিকা মর্মার্থসংদর্শিকা।
সোৎকণ্ঠং কিল সাধকৈরনুদিনং পেপীয়মানা সদা
কল্যাণং পরদেবতেব দিশতী সঞ্জীবনী বর্ধতাম্‌॥[১]

বিনীত—

স্বামী রামসুখদাস

[১]কর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ভক্তির রসে পরিপূর্ণ এই করুণাময়ী গীতার উত্তম রূপে উপাসনা করা হোক (মনন করা হোক, অর্থকে ভালোভাবে উপলব্ধি করা হোক)—তাহলে এটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপা প্রদান করবে। সাধকগণের দ্বারা উদগ্রতার সঙ্গে বারবার পঠন-পাঠনের উপযুক্ত গীতার প্রতিটি পদের গূঢ় অর্থ প্রকাশকারী এবং ইষ্টদেবের মতো কল্যাণ প্রদায়িনী এই **'সাধক-সঞ্জীবনী'** যেন নিরন্তর উৎকৃষ্টতা লাভ করে।

শ্রীপরমাত্মনে নমঃ

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা

অথ করন্যাসঃ

ওঁ অস্য শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা মালা মন্ত্রস্য শ্রীভগবান্ বেদব্যাসঃ ঋষিঃ। অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ। শ্রীকৃষ্ণঃ পরমাত্মা দেবতা। 'অশোচ্যান্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে' ইতি বীজম্। 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' ইতি শক্তিঃ। 'অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ' ইতি কীলকম্।

'নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ' ইতি অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। 'ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ' ইতি তর্জনীভ্যাং নমঃ। 'অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এর চ' ইতি মধ্যমাভ্যাং নমঃ। 'নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ' ইতি অনামিকাভ্যাং নমঃ। 'পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ' ইতি কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ। 'নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ' ইতি করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ নমঃ। ইতি করন্যাসঃ।

অথ হৃদয়াদিন্যাসঃ

'নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ' ইতি হৃদয়ায় নমঃ। 'ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুত' ইতি শিরসে স্বাহা। 'অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এ চ' ইতি শিখায়ৈ বষট্। 'নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ' ইতি কবচায় হুম্। 'পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ' ইতি নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। 'নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ' ইতি অস্ত্রায় ফট্। 'শ্রীকৃষ্ণপ্রীত্যর্থে পাঠে বিনিয়োগঃ'।

ওঁ পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ম্
ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণমুনিনা মধ্যেমহাভারতম্।
অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িণীম্
অম্ব ত্বামনুসন্দধামি ভগবদ্‌গীতে ভবদ্বেষিণীম্॥ ১

নমোঽস্তু তে ব্যাস বিশালবুদ্ধে ফুল্লারবিন্দায়তপত্রনেত্র।
যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ প্রজ্বালিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ॥ ২

প্রপন্নপারিজাতায় তোত্রবেত্রৈকপাণয়ে।
জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃতদুহে নমঃ॥ ৩

বসুদেবসুতং দেবং কংসচাণূরমর্দনম্।
দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্‌গুরুম্॥ ৪

ভীষ্মদ্রোণতটা জয়দ্রথজলা গান্ধারনীলোৎপলা
শল্যগ্রাহবতী কৃপেণ বহনী কর্ণেন বেলাকুলা।
অশ্বত্থামবিকর্ণঘোরমকরা দুর্যোধনাবর্তিনী
সোত্তীর্ণা খলু পাণ্ডবৈ রণনদী কৈবর্তক কেশবঃ॥ ৫

পারাশর্যবচঃসরোজমমলং গীতার্থগন্ধোৎকটং
নানাখ্যানককেসরং হরিকথাসম্বোধনাবোধিতম্।
লোকে সজ্জনষট্‌পদৈরহরহঃ পেপীয়মানং মুদা।
ভূয়াদ্ভারতপঙ্কজং কলিমলপ্রধ্বংসি নঃ শ্রেয়সে॥ ৬

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥ ৭

***

ওঁ

॥ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা

(সাধক-সঞ্জীবনী বাংলা টীকা সম্বলিত)

গজাননং ভূতগণাদিসেবিতং কপিত্থজম্বূফলচারুভক্ষণম্।
উমাসুতং শোকবিনাশকারকং নমামি বিঘ্নেশ্বরপাদপঙ্কজম্॥[১]

ধ্যানাভ্যাসবশীকৃতেন মনসা তন্নির্গুণং নিষ্ক্রিয়ং
জ্যোতিঃ কিঞ্চন যোগিনো যদি পরং পশ্যন্তি পশ্যন্তু তে।
অস্মাকং তু তদেব লোচন চমৎকারায় ভূয়াচ্চিরং
কালিন্দীপুলিনোদরে কিমপি যন্নীলং মহো ধাবতি॥[২]

যাবন্নিরঞ্জনমজং পুরুষং জরন্তং
সংচিন্তয়ামি নিখিলে জগতি স্ফুরন্তম্।
তাবদ্ বলাৎ স্ফুরতি হন্ত হৃদন্তরে মে
গোপস্য কোঽপি শিশুরঞ্জনপুঞ্জমঞ্জুঃ॥[৩]

ন বিদ্যা যেষাং শ্রীর্ন শরণমপীষন্ন চ গুণাঃ
পরিত্যক্তা লোকৈরপি বৃজিনযুক্তাঃ শ্রুতিজড়াঃ।
শরণ্যং যং তেঽপি প্রসৃতগুণমাশ্রিত্য সুজনা
বিমুক্তাস্তং বন্দে যদুপতিমহং কৃষ্ণমমলম্॥[৪]

---

[১] যিনি গজমুণ্ডধারী, ভূতাদি সেবিত, বেল এবং জাম অতিসুন্দররূপে ভক্ষণকারী, শোক বিনাশকারী তথা ভগবতী উমার পুত্র, সেই বিঘ্নেশ্বর শ্রীগণেশের চরণকমলে আমি প্রণাম করি।

[২] যোগিগণ ধ্যানে বশীভূত মন দ্বারা সেই নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় পরম জ্যোতিকে দেখে থাকলে দেখুন, কিন্তু যমুনাতীরে যে নীল তেজঃরাশি ধাবিত হচ্ছে, আমার জন্য যেন তাই চক্ষুতে চিরকাল চমৎকারিত্ব প্রকাশ করতে থাকুক।

[৩] আহা ! যখন আমি সমস্ত জগতে স্ফুরিতোন্মুখ নিরঞ্জন, অজাত এবং পুরাতন পুরুষকে ধ্যান করি, তখন আমার হৃদয়ে অঞ্জনাভ কৃষ্ণবর্ণসম্পন্ন কোনো গোপশিশু সবলে স্ফুরিত হতে থাকে।

[৪] যার বিদ্যাও নেই, অর্থও নেই, কোনো উপায়ও নেই ; যার কোনো গুণ নেই এবং বেদ বা শাস্ত্রেরও কোনো জ্ঞান নেই ; যাকে জগতের সকল ব্যক্তিই পাপী বলে পরিত্যাগ করেছে, এরূপ মানুষও যে শরণাগতের রক্ষাকর্তা প্রভুর শরণ নিয়ে সাধু হয়ে যায় এবং মুক্ত হয়ে যায় সেই ভুবনবিখ্যাত গুণসম্পন্ন অমলাত্মা যদুনাথ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আমি প্রণাম করি।

যস্য শ্রীকরুণার্ণবস্য করুণালেশেন বালো ধ্রুবঃ
স্বেষ্টং প্রাপ্য সমার্যধাম সমগাদ্রঙ্কোঽপ্যবিন্দচ্ছ্রিয়ম্।
যাতা মুক্তিমজামিলাদিপতিতাঃ শৈলোঽপি পূজ্যোঽভবৎ
তং শ্রীমাধবমাশ্রিতেষ্টদমহং নিত্যং শরণ্যং ভজে ।।[১]

বসুদেবসুতং দেবং কংসচাণূরমর্দনম্।
দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম্ ।।[২]

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ।।[৩]

---

[১] যে করুণাসিন্ধু ভগবানের করুণার লেশমাত্রেই বালক ধ্রুব নিজ ইষ্টবস্তু লাভ করে শ্রেষ্ঠ পুরুষদের লোক প্রাপ্ত হয়েছে, দরিদ্র সুদামা লক্ষ্মীলাভ করেছে, অজামিলাদি পাপীগণ মুক্তি লাভ করেছে, গিরি গোবর্ধন পূজ্যরূপে অধিষ্ঠিত হয়েছে, শরণাগতের অভীষ্ট প্রদানকারী সেই ভগবান মাধবের আমি নিত্য ভজনা করি।

[২] যিনি শ্রীবসুদেবের পুত্র, দিব্যরূপধারী, কংস ও চাণুর বধকারী এবং মাতা দেবকীর পরম আনন্দস্বরূপ, সেই জগদ্গুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আমি বন্দনা করি।

[৩] ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং মনুষ্যশ্রেষ্ঠ অর্জুনকে এবং সরস্বতী এবং শ্রীবেদব্যাসকে নমস্কার করে তবেই মহাভারত কথা আলোচনা করা উচিত।

❋ ❋ ❋

॥ ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

অথ প্রথমোঽধ্যায়ঃ

প্রথম অধ্যায়

অবতরণিকা

পাণ্ডবগণ দ্বাদশ বৎসর বনবাস এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাস সমাপ্ত করে যখন প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী নিজেদের অর্ধ রাজ্যের অধিকার চাইলেন, তখন দুর্যোধন অর্ধ রাজ্য তো নয়ই, তীক্ষ্ণ সূঁচের অগ্রবর্তী জমিটুকুও বিনা যুদ্ধে দিতে অস্বীকার করলেন। অতঃপর পাণ্ডবগণ কুন্তী মাতার আদেশানুসারে যুদ্ধ করাই স্থির করলেন। এইভাবে পাণ্ডব ও কৌরবগণের মধ্যে যুদ্ধ স্থির নিশ্চিত হল এবং সেই অনুযায়ী দুই পক্ষ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন।

মহর্ষি বেদব্যাস ধৃতরাষ্ট্রকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। সেই স্নেহের বশবর্তী হয়ে তিনি ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গেলেন এবং বললেন যে, 'যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী এবং এতে ক্ষত্রিয়কুলের ধ্বংসও অবশ্যম্ভাবী, একে কেউ নিবারণ করতে পারবে না। তুমি যদি এই যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করতে চাও, আমি তোমাকে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করতে পারি, এর দ্বারা তুমি এখানে বসেই ভালোভাবে যুদ্ধ দর্শন করতে পারবে।' ধৃতরাষ্ট্র উত্তরে জানালেন যে, 'আমি জন্মান্ধ, এখন নিজকুলের সংহার দেখতে চাই না; তবে যুদ্ধ কীভাবে হচ্ছে—এই সংবাদ জানতে আগ্রহী।' তখন মহর্ষি ব্যাস বললেন, 'আমি সঞ্জয়কে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করছি, এর ফলে সঞ্জয় সমস্ত যুদ্ধ, সম্পূর্ণ ঘটনাবলী, সৈন্যদের মনের ভাবও জানতে পারবে, শুনতে পারবে, দেখতে পাবে এবং সবকিছু তোমাকে জানাতে পারবে। এই বলে তিনি সঞ্জয়কে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করলেন।

নির্ধারিত সময়ে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আরম্ভ হল। সঞ্জয় দশ দিন পর্যন্ত রণাঙ্গনেই অবস্থান করেছিলেন। পিতামহ ভীষ্ম যখন শরবিদ্ধ হয়ে রথচ্যুত হলেন, তখন সঞ্জয় হস্তিনাপুরে (যেখানে ধৃতরাষ্ট্র অবস্থান করছিলেন), এসে তাঁকে এই সংবাদ শোনালেন। এই সংবাদ শুনে ধৃতরাষ্ট্র দুঃখিত চিত্তে বিলাপ করতে লাগলেন। তারপর তিনি সঞ্জয়কে যুদ্ধের সংবাদ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করতে বললেন। ভীষ্মপর্বের চব্বিশতম অধ্যায় পর্যন্ত সঞ্জয় যুদ্ধ সম্পর্কিত বৃত্তান্ত ধৃতরাষ্ট্রকে জানিয়েছেন[১]। পঁচিশতম অধ্যায়ের প্রারম্ভে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করলেন—

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ[২]

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয়॥ ১॥

[**সঞ্জয়** (হে সঞ্জয় !) ; **ধর্মক্ষেত্রে** (ধর্মভূমি) ; **কুরুক্ষেত্রে** (কুরুক্ষেত্রে) ; **যুযুৎসবঃ** (যুদ্ধের ইচ্ছায়) ; **সমবেতাঃ** (একত্রিত) ; **মামকাঃ** (আমার) ; **চ** (তথা) ; **পাণ্ডবাঃ** (পাণ্ডুর পুত্রগণ) ; **কিম্** (কি) ; **অকুর্বত** (করল ?)]

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—হে সঞ্জয়[৩] ! ধর্মভূমি কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের ইচ্ছায় সমবেত আমার এবং পাণ্ডুর পুত্রগণ কী করল ? ॥ ১ ॥

---

[১]মহাভারতে মোট আঠারোটি পর্ব রয়েছে এবং সেইসকল পর্বের অন্তর্গত কয়েকটি অবান্তর পর্বও আছে। তার মধ্যে এই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পর্ব ভীষ্মপর্বের তেরোতম অধ্যায়ে আরম্ভ হয়ে বিয়াল্লিশতম অধ্যায়ে সমাপ্ত হয়েছে।

[২]ধৃতরাষ্ট্র-সঞ্জয়-সংবাদ বৈশম্পায়ন-জনমেজয়-সংবাদের অন্তর্গত এবং শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদ ধৃতরাষ্ট্র এবং সঞ্জয়ের সংবাদের অন্তর্গত।

[৩]সঞ্জয় 'গবল্যাণ' নামক এক শূদ্র-বংশে জন্মেছিলেন। তিনি মুনিগণের ন্যায় জ্ঞানী এবং ধর্মাত্মা পুরুষ ছিলেন—'সঞ্জয়ো মুনিকল্পস্তু সুতো গবল্যণাৎ' (মহাভারত, আদিপর্ব ৬৩।৯৭)। তিনি ধৃতরাষ্ট্রের অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন।

হয়েছিলেন।[১] অর্থাৎ মায়ের আজ্ঞা পালন রূপ ধর্ম রক্ষার উদ্দেশ্যেই যুধিষ্ঠির যুদ্ধের ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। অর্থাৎ দুর্যোধন প্রমুখ রাজ্যলোভে যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু পাণ্ডবগণ ধর্ম রক্ষার জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

'মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব'—পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রকে (তাঁদের পিতার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হওয়ার সুবাদে) পিতার মতোই মান্য করতেন এবং তাঁর আজ্ঞাবাহী ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র অনুচিত আদেশ দিলেও পাণ্ডবগণ উচিত-অনুচিত বিচার না করে তাঁর আদেশ পালন করতেন। সেইজন্য এখানে **'মামকাঃ'** পদটিতে কৌরব[২] এবং পাণ্ডব—উভয় পক্ষকেই বোঝায়। তা সত্ত্বেও **'পাণ্ডবাঃ'** পদটি পৃথক রূপে ব্যবহারের অর্থ এই যে, ধৃতরাষ্ট্রের নিজ পুত্র ও পাণ্ডুপুত্রগণের উপর একই মনোভাব ছিল না। তাঁর পক্ষপাতিত্ব ছিল এবং নিজ পুত্রের উপর মোহ ছিল। তিনি দুর্যোধনদের নিজের বলে মনে করতেন, কিন্তু পাণ্ডবদের তা মনে করতেন না[৩]। সেইজন্যই তিনি নিজ পুত্রদের **'মামকাঃ'** এবং পাণ্ডবপুত্রগণকে **'পাণ্ডবাঃ'** বলে উল্লেখ করেছেন। যে ভাব মানুষের অন্তরে নিহিত থাকে প্রায়শঃই তা বাণীর মাধ্যমে প্রকাশ পেয়ে থাকে। এই দ্বিমুখী আচরণের জন্যই ধৃতরাষ্ট্রকে নিজকুল বিনাশের দুঃখ ভোগ করতে হয়েছিল। এ থেকে প্রত্যেক মানুষের এই শিক্ষাই গ্রহণ করা উচিত যে তার নিজ গৃহে, পল্লীতে, গ্রামে, দেশে এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বিমুখীভাব অর্থাৎ এটি আমার, ওটি অপরের—এইরূপ চিন্তা পোষণ না করা। কারণ এর দ্বারা স্নেহ প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হতে পারে না বরং ঝগড়াঝাটি, বাদ-বিবাদই হয়।

এখানে **'পাণ্ডবাঃ'** পদটির সঙ্গে **'এব'** পদটি দেওয়ার অর্থ এই যে পাণ্ডবগণ অত্যন্ত ধার্মিক, সুতরাং তাঁদের যুদ্ধ না করাই উচিত ছিল। কিন্তু তাঁরাও যুদ্ধার্থে রণভূমিতে সমাগত হয়েছেন। সেখানে তাঁরা কী করছেন ?

[**'মামকাঃ'** এবং **'পাণ্ডবাঃ'**[৪]—এর মধ্যে প্রথমে **'মামকাঃ'** পদটির উত্তর সঞ্জয় দ্বিতীয় শ্লোক থেকে ত্রয়োদশ শ্লোক পর্যন্ত দিয়ে বলেছেন যে, আপনার পুত্র দুর্যোধন পাণ্ডবদের সৈন্যকুল দেখে দ্রোণাচার্যের মনে পাণ্ডবদের প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি করবার জন্য তাঁর কাছে গিয়ে পাণ্ডবদের প্রধান সেনাপতিগণের নাম উল্লেখ করেন। পরে দুর্যোধন নিজ সৈন্যদলের প্রধান যোদ্ধাদের নাম করে

---

[১] কুন্তী খুবই সহিষ্ণু মহিলা ছিলেন। দুঃখ-কষ্ট থেকে দূরে থেকে রাজ্য, সুখ-আরাম ভোগ করার প্রবৃত্তি তাঁর ছিল না। মাতা কুন্তী এমনই একজন মহিলা যিনি ভগবানের কাছে আপদ-বিপদের প্রার্থনা করেছিলেন। কুন্তীর মনে সুখ-ভোগের ইচ্ছা একেবারেই ছিল না ; কিন্তু দুটি কারণে তাঁর মনে খুব দুঃখ ছিল। প্রথমত রাজ্যের জন্য ভাইয়ে-ভাইয়ে (কৌরব ও পাণ্ডব) যুদ্ধ বা অন্য কোনো উপায় অবলম্বন করলে এতে কিছু বলার ছিল না। কিন্তু তাঁর আদরের পুত্রবধূ দ্রৌপদীকে দুর্যোধন প্রভৃতি দুষ্টগণ সভার মধ্যে সকলের সামনে নগ্ন করতে চেয়েছিল, অপমানিত করতে চেয়েছিল। এরূপ জঘন্য কাজ কোনো মানুষের পক্ষেই শোভা পায় না। এই কাজে কুন্তী খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

দ্বিতীয়ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন পাণ্ডবদের দূতরূপে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে হস্তিনাপুর গিয়েছিলেন তখন দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি প্রমুখ ভগবানকে বন্দি করতে চেয়েছিল। এই কথা শুনে কুন্তী মনে মনে ভাবলেন যে, এবার এই শয়তানদের শেষ করে দেওয়া উচিত। কেননা বেঁচে থাকলে এদের পাপ কার্য বাড়তেই থাকবে ফলে এদের গুরুতর ক্ষতি হবে। এই দুটি কারণের জন্য কুন্তী পাণ্ডবদের যুদ্ধ করার আদেশ দিয়েছিলেন।

[২] যদিও **'কৌরব'** শব্দে ধৃতরাষ্ট্রর পুত্র দুর্যোধনাদি এবং পাণ্ডুর পুত্র যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সকলকেই বোঝায়, তবুও এই শ্লোকে ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরাদির জন্য **'পাণ্ডব'** শব্দের প্রয়োগ করেছেন। অতএব ব্যাখ্যায় এক্ষেত্রে **'কৌরব'** শব্দ দ্বারা দুর্যোধনাদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

[৩] ধৃতরাষ্ট্রের মনে দ্বিমুখী-চিন্তা ছিল যে, দুর্যোধনাদি আমার ছেলে কিন্তু যুধিষ্ঠির প্রমুখ আমার নয়, এরা পাণ্ডুর পুত্র। এই দ্বিমুখী-ভাবনার জন্য দুর্যোধন দ্বারা ভীমকে বিষ খাইয়ে জলে ফেলে দেওয়া, লাক্ষাগৃহে আগুন লাগিয়ে পাণ্ডবদের মেরে ফেলার চক্রান্ত করা, যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ছলনা করে জুয়া খেলা, পাণ্ডবদের বিনাশ করার উদ্দেশ্যে সৈন্য নিয়ে বনে যাওয়া প্রভৃতি কার্যের জন্য ধৃতরাষ্ট্র কখনও দুর্যোধনকে নিষেধ করেননি। কেননা তাঁর মনে এই ইচ্ছা ছিল যে, যদি কোনও প্রকারে পাণ্ডবদের শেষ করে দেওয়া যায় তাহলে তাঁর ছেলেদের রাজত্ব সুরক্ষিত থাকবে।

[৪] এখানে উল্লিখিত **'মামকাঃ'** এবং **'পাণ্ডবাঃ'**-এর পৃথক বর্ণনা করার জন্যই পরে সঞ্জয়ের বক্তব্যে **'দুর্যোধনঃ'** (১।২) এবং **'পাণ্ডবঃ'** (১।১৪) শব্দ যুক্ত হয়েছে।

ব্যাখ্যা—**'ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে'**—কুরুক্ষেত্রে দেবতাগণ যজ্ঞ করেছিলেন। রাজা কুরুও এইস্থানে তপস্যা করেছিলেন। যজ্ঞাদি ধর্মমূলক কার্যাদি সম্পন্ন হওয়ায় এবং রাজা কুরুর তপস্যাক্ষেত্র হওয়ার জন্য এই স্থানকে ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র নামে অভিহিত করা হয়েছে।

এখানে **'ধর্মক্ষেত্রে'** এবং **'কুরুক্ষেত্রে'** পদ দুটিতে **'ক্ষেত্র'** ব্যবহার করায় ধৃতরাষ্ট্রের তাৎপর্য এই যে এটি কুরুবংশীয়গণের নিজস্ব ভূমি। এটি যে শুধু যুদ্ধভূমি তা নয়, এটি তীর্থভূমিও। এখানে প্রাণিসকল জীবিতাবস্থায় পুণ্যকর্ম করে নিজ কল্যাণ সাধন করতে পারে। যাতে লৌকিক ও পারলৌকিক সর্বপ্রকার লাভ হয়—এরূপ বিবেচনা করে এবং প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ করে যুদ্ধের জন্য এই ক্ষেত্রটি নির্বাচন করা হয়েছিল।

জগতে প্রায়শ তিনটি বিষয় নিয়ে যুদ্ধ হয়— ভূমি বা রাজ্য, ধন এবং নারী। এই তিনটির মধ্যে যুদ্ধ প্রধানত ভূমি নিয়েই হয়। এখানে **'কুরুক্ষেত্রে'** পদটি দেওয়ার তাৎপর্য হচ্ছে রাজ্য নিয়ে যুদ্ধের প্রাসঙ্গিকতা। কুরুবংশ বলতে ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডু পুত্রগণ—সকলকেই বোঝায়। উভয়েই কুরুবংশীয় হওয়ায় এই দুই পক্ষেরই কুরুক্ষেত্র অর্থাৎ রাজা কুরুর জমির উপর সমান অধিকার বর্তমান। সেইজন্য (কৌরবগণ পাণ্ডবদের রাজ্য প্রত্যর্পণ না করায়) দুইপক্ষ রাজ্য লাভের জন্য যুদ্ধের উদ্দেশ্যে মুখোমুখি হয়েছেন।

যদিও নিজেদের রাজ্য হওয়ায় উভয়ের পক্ষেই **'কুরুক্ষেত্রে'** পদটি ব্যবহার যুক্তিসংগত এবং ন্যায়সংগত, কিন্তু আমাদের সনাতন বৈদিক সংস্কৃতির বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, যে কোনো কার্য আরম্ভ করতে হলে আগে ধর্মকে সংস্থাপন করতে হয়। যুদ্ধ রূপ কর্মও ধর্মভূমি অর্থাৎ তীর্থক্ষেত্রে করা হত যাতে যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিগণের উদ্ধার হয়, কল্যাণ হয়। সেইজন্যই এইস্থানে কুরুক্ষেত্রের সঙ্গে **'ধর্মক্ষেত্রে'** পদটি উল্লিখিত হয়েছে।

আরম্ভেই **'ধর্ম'** পদটির দ্বারা আর একটি অর্থ উদ্ভাসিত হয়—যদি আরম্ভের **'ধর্ম'** পদটি থেকে **'ধর্‌'** শব্দটি গ্রহণ করা হয় এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকের **'মম'** পদটির থেকে **'ম'** শব্দটি গ্রহণ করা হয়, তাহলে **'ধর্ম'** শব্দটি সৃষ্ট হয়। অতএব সমগ্র গীতাটি ধর্মেরই অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ ধর্মপালন করলে গীতা-সিদ্ধান্ত পালন করা হয় এবং গীতা-সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কর্তব্য-কর্ম করলেও ধর্মপালন করা হয়।

'ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে' পদটি থেকে প্রত্যেকের এই শিক্ষাই গ্রহণ করা উচিত যে, কোনো কর্ম করার আগে ধর্মকে সাক্ষী রেখে করা উচিত। সমস্ত কাজই করা উচিত সকলের হিতের কথা ভেবে, শুধু নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবে নয় এবং কর্তব্য বা অকর্তব্য বিষয়ও শাস্ত্রকে সামনে রেখে করা উচিত। (গীতা ১৬।২৪)।

'সমবেতা যুযুৎসবঃ'—নৃপতিগণ বারংবার সন্ধির আবেদন করা সত্ত্বেও দুর্যোধন সন্ধির প্রস্তাব স্বীকার করলেন না। শুধু তাই নয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলা সত্ত্বেও আমার পুত্র দুর্যোধন স্পষ্ট ভাষায় বলেছে যে 'বিনাযুদ্ধে আমি তীক্ষ্ণ সূঁচের অগ্রভাগ পরিমাণ ভূমিও পাণ্ডবদের দেব না[১]।' তখন পাণ্ডবগণ অপারগ হয়ে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়েছে। এইভাবে আমার পুত্রগণ এবং পাণ্ডুপুত্রগণ যুদ্ধার্থ একত্রিত হয়েছে।

উভয় সেনাদলের মধ্যে যুদ্ধেচ্ছা থাকলেও দুর্যোধনের মধ্যে যুদ্ধ করার আগ্রহ বিশেষভাবে ছিল। তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রাজ্যলাভ। সে রাজ্য প্রাপ্তি ধর্ম দ্বারাই হোক বা অধর্ম দ্বারা, ন্যায়ের পথে হোক বা অন্যায় পথে, বিহিত রীতি দ্বারা হোক বা নিষিদ্ধ রীতিতে—যে কোনো প্রকারেই হোক, আমার রাজ্য চাই—এই ছিল তার মনোভাব। তাই দুর্যোধনের পক্ষই বিশেষভাবে যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক ছিল।

পাণ্ডবদের কাছে ধর্মই ছিল প্রধান। তাদের মধ্যে এমন ভাব ছিল যে জীবন যেভাবেই নির্বাহ করা হোক না কেন তাতে ধর্মে যেন কোনোরূপ প্রতিবন্ধকতা না আসে, ধর্মের বিরুদ্ধে যেন চলতে না হয়। এইজন্যই মহারাজ যুধিষ্ঠির যুদ্ধ করতে রাজি হচ্ছিলেন না। কিন্তু যে মায়ের আজ্ঞা পালন করতে চার ভ্রাতার সঙ্গে তিনি দ্রৌপদীকে বিবাহ করেছিলেন, সেই মায়ের আদেশেই তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত

[১]যাবদ্ধি তীক্ষ্ণয়া সূচ্যা বিধ্যেদগ্রেণ কেশব। তাবদপ্যপরিত্যাজ্যং ভূমের্নঃ পাণ্ডবান্ প্রতি॥

(মহাভারত, উদ্যোগপর্ব ১২৭।২৫)

হয়েছিলেন।[১] অর্থাৎ মায়ের আজ্ঞা পালন রূপ ধর্ম রক্ষার উদ্দেশ্যেই যুধিষ্ঠির যুদ্ধের ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। অর্থাৎ দুর্যোধন প্রমুখ রাজ্যলোভে যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু পাণ্ডবগণ ধর্ম রক্ষার জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

'মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব'—পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রকে (তাঁদের পিতার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হওয়ার সুবাদে) পিতার মতোই মান্য করতেন এবং তাঁর আজ্ঞাবাহী ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র অনুচিত আদেশ দিলেও পাণ্ডবগণ উচিত-অনুচিত বিচার না করে তাঁর আদেশ পালন করতেন। সেইজন্য এখানে **'মামকাঃ'** পদটিতে কৌরব[২] এবং পাণ্ডব—উভয় পক্ষকেই বোঝায়। তা সত্ত্বেও **'পাণ্ডবাঃ'** পদটি পৃথক রূপে ব্যবহারের অর্থ এই যে, ধৃতরাষ্ট্রের নিজ পুত্র ও পাণ্ডুপুত্রগণের উপর একই মনোভাব ছিল না। তাঁর পক্ষপাতিত্ব ছিল এবং নিজ পুত্রের উপর মোহ ছিল। তিনি দুর্যোধনদের নিজের বলে মনে করতেন, কিন্তু পাণ্ডবদের তা মনে করতেন না[৩]। সেইজন্যই তিনি নিজ পুত্রদের **'মামকাঃ'** এবং পাণ্ডবপুত্রগণকে **'পাণ্ডবাঃ'** বলে উল্লেখ করেছেন। যে ভাব মানুষের অন্তরে নিহিত থাকে প্রায়শঃই তা বাণীর মাধ্যমে প্রকাশ পেয়ে থাকে। এই দ্বিমুখী আচরণের জন্যই ধৃতরাষ্ট্রকে নিজকুল বিনাশের দুঃখ ভোগ করতে হয়েছিল। এ থেকে প্রত্যেক মানুষের এই শিক্ষাই গ্রহণ করা উচিত যে তার নিজ গৃহে, পল্লীতে, গ্রামে, দেশে এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বিমুখীভাব অর্থাৎ এটি আমার, ওটি অপরের—এইরূপ চিন্তা পোষণ না করা। কারণ এর দ্বারা স্নেহ প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হতে পারে না বরং ঝগড়াঝাটি, বাদ-বিবাদই হয়।

এখানে **'পাণ্ডবাঃ'** পদটির সঙ্গে **'এব'** পদটি দেওয়ার অর্থ এই যে পাণ্ডবগণ অত্যন্ত ধার্মিক, সুতরাং তাঁদের যুদ্ধ না করাই উচিত ছিল। কিন্তু তাঁরাও যুদ্ধার্থে রণভূমিতে সমাগত হয়েছেন। সেখানে তাঁরা কী করছেন ?

[**'মামকাঃ'** এবং **'পাণ্ডবাঃ'**[৪]—এর মধ্যে প্রথমে **'মামকাঃ'** পদটির উত্তর সঞ্জয় দ্বিতীয় শ্লোক থেকে ত্রয়োদশ শ্লোক পর্যন্ত দিয়ে বলেছেন যে, আপনার পুত্র দুর্যোধন পাণ্ডবদের সৈন্যকুল দেখে দ্রোণাচার্যের মনে পাণ্ডবদের প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি করবার জন্য তাঁর কাছে গিয়ে পাণ্ডবদের প্রধান সেনাপতিগণের নাম উল্লেখ করেন। পরে দুর্যোধন নিজ সৈন্যদলের প্রধান যোদ্ধাদের নাম করে

---

[১] কুন্তী খুবই সহিষ্ণু মহিলা ছিলেন। দুঃখ-কষ্ট থেকে দূরে থেকে রাজ্য, সুখ-আরাম ভোগ করার প্রবৃত্তি তাঁর ছিল না। মাতা কুন্তী এমনই একজন মহিলা যিনি ভগবানের কাছে আপদ-বিপদের প্রার্থনা করেছিলেন। কুন্তীর মনে সুখ-ভোগের ইচ্ছা একেবারেই ছিল না ; কিন্তু দুটি কারণে তাঁর মনে খুব দুঃখ ছিল। প্রথমত রাজ্যের জন্য ভাইয়ে-ভাইয়ে (কৌরব ও পাণ্ডব) যুদ্ধ বা অন্য কোনো উপায় অবলম্বন করলে এতে কিছু বলার ছিল না। কিন্তু তাঁর আদরের পুত্রবধূ দ্রৌপদীকে দুর্যোধন প্রভৃতি দুষ্টগণ সভার মধ্যে সকলের সামনে নগ্ন করতে চেয়েছিল, অপমানিত করতে চেয়েছিল। এরূপ জঘন্য কাজ কোনো মানুষের পক্ষেই শোভা পায় না। এই কাজে কুন্তী খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

দ্বিতীয়ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন পাণ্ডবদের দূতরূপে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে হস্তিনাপুর গিয়েছিলেন তখন দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি প্রমুখ ভগবানকে বন্দি করতে চেয়েছিল। এই কথা শুনে কুন্তী মনে মনে ভাবলেন যে, এবার এই শয়তানদের শেষ করে দেওয়া উচিত। কেননা বেঁচে থাকলে এদের পাপ কার্য বাড়তেই থাকবে ফলে এদের গুরুতর ক্ষতি হবে। এই দুটি কারণের জন্য কুন্তী পাণ্ডবদের যুদ্ধ করার আদেশ দিয়েছিলেন।

[২] যদিও 'কৌরব' শব্দে ধৃতরাষ্ট্রর পুত্র দুর্যোধনাদি এবং পাণ্ডুর পুত্র যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সকলকেই বোঝায়, তবুও এই শ্লোকে ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরাদির জন্য 'পাণ্ডব' শব্দের প্রয়োগ করেছেন। অতএব ব্যাখ্যায় এক্ষেত্রে 'কৌরব' শব্দ দ্বারা দুর্যোধনাদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

[৩] ধৃতরাষ্ট্রের মনে দ্বিমুখী-চিন্তা ছিল যে, দুর্যোধনাদি আমার ছেলে কিন্তু যুধিষ্ঠির প্রমুখ আমার নয়, এরা পাণ্ডুর পুত্র। এই দ্বিমুখী-ভাবনার জন্য দুর্যোধন দ্বারা ভীমকে বিষ খাইয়ে জলে ফেলে দেওয়া, লাক্ষাগৃহে আগুন লাগিয়ে পাণ্ডবদের মেরে ফেলার চক্রান্ত করা, যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ছলনা করে জুয়া খেলা, পাণ্ডবদের বিনাশ করার উদ্দেশ্যে সৈন্য নিয়ে বনে যাওয়া প্রভৃতি কার্যের জন্য ধৃতরাষ্ট্র কখনও দুর্যোধনকে নিষেধ করেননি। কেননা তাঁর মনে এই ইচ্ছা ছিল যে, যদি কোনও প্রকারে পাণ্ডবদের শেষ করে দেওয়া যায় তাহলে তাঁর ছেলেদের রাজত্ব সুরক্ষিত থাকবে।

[৪] এখানে উল্লিখিত 'মামকাঃ' এবং 'পাণ্ডবাঃ'-এর পৃথক বর্ণনা করার জন্যই পরে সঞ্জয়ের বক্তব্যে 'দুর্যোধনঃ' (১।২) এবং 'পাণ্ডবঃ' (১।১৪) শব্দ যুক্ত হয়েছে।

তাঁদের রণকৌশল ইত্যাদির প্রশংসা করেছেন। দুর্যোধনকে প্রসন্ন করার জন্য ভীষ্ম উচ্চরবে শঙ্খ বাজালেন। সেই শঙ্খরব শুনে কৌরব সৈন্যগণও শঙ্খ ইত্যাদি বাদ্য বাদন করলেন। আবার চতুর্দশ শ্লোক থেকে ঊনবিংশ শ্লোক পর্যন্ত **'পাণ্ডবাঃ'** পদের উত্তর দিলেন যে, পাণ্ডবপক্ষের রথে আরূঢ় হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খধ্বনি করলেন। তারপর অর্জুন, ভীম, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব প্রমুখ পাণ্ডবগণ নিজ নিজ শঙ্খ বাজালেন, যা শুনে দুর্যোধনের সৈন্যদলের বুক কেঁপে উঠল। তারপরে সঞ্জয় পাণ্ডবদের সম্বন্ধে বিস্তারিত জানিয়ে বিংশতিতম শ্লোক থেকে শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের কথোপকথন প্রসঙ্গ শুরু করেন।]

'কিমকুর্বত'—**'কিম্‌'** শব্দের তিনটি অর্থ হয়—বিকল্প, নিন্দা (আক্ষেপ) এবং প্রশ্ন।

যুদ্ধ হয়েছিল কি না ? এইরূপ বিকল্প এখানে গ্রহণীয় নয় ; কারণ দশদিন ধরে যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং ভীষ্মের পতনের পরই সঞ্জয় হস্তিনাপুরে ফিরে এসে সেখানকার ঘটনাবলী ধৃতরাষ্ট্রকে শোনাচ্ছিলেন।

'আমার পুত্রগণ ও পাণ্ডুপুত্রগণ এ কী করল যে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করতেই হল ! ওদের যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত হয়নি'— এইপ্রকার নিন্দা অথবা আক্ষেপ বাক্যও এই স্থানে গ্রহণীয় নয়। কারণ যুদ্ধ তো আরম্ভ হয়েই গিয়েছিল আর ধৃতরাষ্ট্রের মধ্যেও আক্ষেপপূর্বক জিজ্ঞাসা করার কোন ভাবই ছিল না।

এখানে **'কিম্‌'** শব্দটির অর্থ প্রশ্ন করাই ঠিক বলে মনে হয়। ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের কাছ থেকে ছোট-বড় বিভিন্ন ঘটনা ক্রমানুসারে বিস্তারিত ও সঠিকভাবে জানবার জন্যই প্রশ্ন করছিলেন।

পরিশিষ্ট-ভাব— 'আমার পুত্র' **(মামকাঃ)** এবং 'পাণ্ডুর পুত্র' **(পাণ্ডবাঃ)**— এই অহংকেন্দ্রিক ভেদবোধ থেকেই রাগ-দ্বেষ উৎপন্ন হয়েছিল, যুদ্ধ হয়েছিল, অশান্তির সৃষ্টি হয়েছিল। ধৃতরাষ্ট্রের মধ্যে উৎপন্ন রাগ-দ্বেষের ফলেই একশত কৌরব নিহত হয়েছিল কিন্তু একজনও পাণ্ডব মারা যায়নি।

দধি মন্থন করলে তাতে যেমন আলোড়ন হয় ও তার ফলে মাখন উৎপন্ন হয়, তেমনই **'মামকাঃ'** এবং **'পাণ্ডবাঃ'**র ভেদবোধ থেকে উৎপন্ন হওয়া দ্বন্দ্বরূপ প্রতিক্রিয়াতেই অর্জুনের মধ্যে কল্যাণের আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে এবং তারই ফলে ভগবদ্গীতারূপ মাখন প্রকাশিত হয়।

তাৎপর্য হল এই যে, ধৃতরাষ্ট্রের মনের চাঞ্চল্য থেকে যুদ্ধ শুরু হয় আর অর্জুনের মনের চাঞ্চল্য থেকে গীতা প্রকটিত হয়।

সম্বন্ধ—ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের উত্তর সঞ্জয় পরবর্তী শ্লোক থেকে দিতে শুরু করেন।

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্যোধনস্তদা।
আচার্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ॥ ২ ॥

[তদা (তখন) ! ; ব্যূঢম্‌ (বজ্রব্যূহে দণ্ডায়মান) ; **পাণ্ডবানীকম্‌** (পাণ্ডব সৈন্যগণকে) ; **দৃষ্ট্বা** (দেখে) ; **তু** (অতঃপর) ; **রাজা** (রাজা) ; **দুর্যোধনঃ** (দুর্যোধন) ; **আচার্যম্‌** (দ্রোণাচার্যের) ; **উপসঙ্গম্য** (নিকটে গিয়ে) ; **বচনম্‌** (এই কথা) ; **অব্রবীৎ** (বললেন।)]

সঞ্জয় বললেন—তখন বজ্রব্যূহে দণ্ডায়মান পাণ্ডব সৈন্যগণকে দেখে রাজা দুর্যোধন দ্রোণাচার্যের নিকটে গিয়ে এই কথা বললেন॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা—**'তদা'**— যখন দুই পক্ষের সেনাগণ যুদ্ধের জন্য অপেক্ষা করছিল, সেই সময়ের কথা বলতে গিয়ে সঞ্জয় 'তদা' পদটি ব্যবহার করেছেন। কেননা ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন 'যুদ্ধাভিলাষী আমার ও পাণ্ডুর পুত্রগণ কী করলেন'

সেই সম্পর্কে জানবার জন্যই।

'দৃষ্ট্বা[১] পাণ্ডবানীকং ব্যূঢম্'—বজ্রব্যূহে দণ্ডায়মান পাণ্ডবসেনাদের দেখার তাৎপর্য এই যে, পাণ্ডবদের সেনাদল অত্যন্ত সুচারু রূপে এবং একই উদ্দেশ্য রেখে দণ্ডায়মান ছিল অর্থাৎ সেই সৈন্যদের মধ্যে কোনো ভিন্ন ভিন্ন ভাব ছিল না, মতপার্থক্য ছিল না[২]। তাঁদের দিকে ধর্ম এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন। যাঁদের পক্ষে ধর্ম এবং ভগবান থাকেন, তাঁদের অন্যপক্ষের ওপর এক বিরাট প্রভাব পড়ে। সেইজন্য সংখ্যায় কম হওয়া সত্ত্বেও পাণ্ডব-সেনাদের তেজ (মনোবল) ছিল এবং অপরপক্ষের ওপর তা এক বিরাট প্রভাব ফেলেছিল। এই সুশৃঙ্খল পাণ্ডবসেনার দুর্যোধনের ওপরও খুব প্রভাব বিস্তার করেছিল, সেইজন্যই তিনি দ্রোণাচার্যের নিকট গিয়ে রণনীতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করে কথাগুলি বলেছিলেন।

'রাজা দুর্যোধনঃ'—দুর্যোধনকে রাজা বলার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, ধৃতরাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা বেশি মোহ বা স্নেহ দুর্যোধনের ওপরেই ছিল। বংশগত বিচারে দুর্যোধনই যুবরাজ ছিলেন। রাজ্যের সকল প্রকার কার্যের দেখাশোনাও দুর্যোধনই করতেন। ধৃতরাষ্ট্র নামমাত্রই রাজা ছিলেন। যুদ্ধ হওয়ার প্রধান কারণও ছিলেন দুর্যোধন। এইসব কারণেই সঞ্জয় দুর্যোধনকে 'রাজা' নামে অভিহিত করেছেন।

'আচার্যমুপসঙ্গম্য'—দ্রোণাচার্যের কাছে যাওয়ার তিনটি প্রধান কারণ অনুমান করা যায়—

(১) নিজ স্বার্থ সিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ দ্রোণাচার্যের মনে পাণ্ডবদের প্রতি বিদ্বেষ উৎপন্ন করে তাঁকে নিজের পক্ষে বিশেষভাবে আনার জন্যই দুর্যোধন দ্রোণাচার্যের নিকট গিয়েছিলেন।

(২) ব্যবহারিক দিক থেকে গুরুসুলভ সম্মান জানাবার উদ্দেশ্যেই দ্রোণাচার্যের নিকট যাওয়ার প্রয়োজন ছিল।

(৩) যুদ্ধে যিনি প্রধান, তাঁকে সৈন্যদলের মধ্যে যথাযোগ্য স্থানে অবস্থান করা অত্যন্ত জরুরি ব্যাপার, না হলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। তাই দুর্যোধনের নিজে দ্রোণাচার্যের কাছে যাওয়া অত্যন্ত ন্যায়সংগত ছিল।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে দুর্যোধনের তো পিতামহ ভীষ্মের কাছে যাওয়া উচিত ছিল, কেননা তিনিই ছিলেন সেনাপতি। তা সত্ত্বেও দুর্যোধন গুরু দ্রোণাচার্যের নিকট কেন গেলেন ? তার উত্তরে বলা যায় যে, দ্রোণ এবং ভীষ্ম দুজনেই উভয় দলের পক্ষপাতী ছিলেন অর্থাৎ তাঁরা কৌরব এবং পাণ্ডব দুই দলেরই পক্ষপাতী ছিলেন। এই দুজনের মধ্যে দ্রোণাচার্যকে সন্তুষ্ট করাই বেশি প্রয়োজন ছিল। কারণ দ্রোণাচার্যের সঙ্গে দুর্যোধনের গুরু-শিষ্য সম্পর্কজনিত স্নেহ ছিল, কিন্তু কুটুম্ব-জাত স্নেহ ছিল না। আর অর্জুনের ওপর দ্রোণাচার্যের বিশেষ স্নেহ ছিল। সেইজন্য তাঁকে খুশি করতে দুর্যোধনের তাঁর নিকট যাওয়া অত্যন্ত জরুরি ছিল। ব্যবহারিক জীবনেও দেখা যায় যে, যার সঙ্গে স্নেহের সম্পর্ক থাকে না, তার দ্বারা কোনো স্বার্থসিদ্ধি করাতে হলে সাধারণ মানুষ তাকে অধিক সম্মান দেখিয়ে সন্তুষ্ট করে থাকে।

দুর্যোধনের নিজের বিশ্বাস ছিল যে, ভীষ্ম যেহেতু তাঁর পিতামহ, তাই তাঁর কাছে সশরীরে হাজির না হলেও তাঁর স্নেহের ঘাটতি হবে না। যদি তিনি কোনো কারণে অপ্রসন্নও হন তাহলেও তাঁকে যেকোনোভাবে প্রসন্ন করা সম্ভব। কারণ পিতামহ ভীষ্মের সঙ্গে দুর্যোধনের আত্মীয়তা এবং স্নেহের সম্পর্ক ছিলই, ভীষ্মও দুর্যোধনকে পৌত্র হওয়ার সুবাদে স্নেহ করতেন। সেই কারণেই ভীষ্ম দুর্যোধনকে প্রসন্ন করার জন্য উচ্চরবে শঙ্খধ্বনি করেন (১।১২)।

'বচনমব্রবীৎ'—এখানে **'অব্রবীৎ'** বলাই যথেষ্ট ছিল। কারণ **'অব্রবীৎ'** ক্রিয়ার অন্তর্গত হিসাবে **'বচনম্'**

[১] এই অধ্যায়ে তিনবার 'দৃষ্ট্বা' (দেখে) পদটি প্রয়োগ করা হয়েছে। পাণ্ডবসেনাদের দেখে দুর্যোধনের দ্রোণাচার্যের কাছে গমন করা (১।২) ; কৌরবসেনাদের দেখে অর্জুনের ধনুক উত্তোলন করা (১।২০) এবং নিজ (আত্মীয়) স্বজনদের দেখে অর্জুনের মোহাভিভূত হওয়া (১।২৮)। এই তিনটির মধ্যে দুইবার 'দৃষ্ট্বা' নিজেদের মধ্যে সেনা দেখবার জন্য ব্যবহৃত এবং তৃতীয়বারে 'দৃষ্ট্বা' স্বজনদের দেখবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে যার জন্য অর্জুনের মনোভাব পরিবর্তিত হয়েছিল।

[২] কৌরবসেনাদের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল ; কেননা দুর্যোধন, দুঃশাসন ইত্যাদিগণ যুদ্ধ অভিলাষী ছিলেন কিন্তু ভীষ্ম, দ্রোণ, বিকর্ণ প্রমুখ কেউ কেউ যুদ্ধ করতে চাননি। এটিই নিয়ম যে, যেখানে নিজেদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকে সেখানে তেজ (জোর) থাকে না—

কাঁচ কটোরো কুম্ভ পয় মোতী মিন্ত অবাস। তাল ঘাব তিরিয়া কটক ফাটা করে বিনাস॥

এসে যায়। অর্থাৎ দুর্যোধন বললে কোনো কথাই তো বলবেন। সেইজন্য এই স্থলে '**বচনম্**' শব্দটি দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না। তবুও '**বচনম্**' শব্দটি উল্লেখ করার তাৎপর্য হল এই যে, দুর্যোধন নীতিযুক্ত গূঢ় কথা বলছিলেন, যাতে দ্রোণাচার্যের মনে পাণ্ডবদের প্রতি বিদ্বেষ জন্মায় এবং তিনি দুর্যোধনের পক্ষে থেকে ভালোভাবে যুদ্ধ করেন, যাতে দুর্যোধন বিজয়ী হন এবং তাঁর স্বার্থসিদ্ধি হয়।

*** *** ***

সম্বন্ধ— দ্রোণাচার্যের সমীপে গিয়ে দুর্যোধন কী কথা বললেন—পরের শ্লোকে তা জানানো হয়েছে।

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩ ॥

[**আচার্য** (হে আচার্যদেব !) ; **তব** (আপনার) ; **ধীমতা** (বুদ্ধিমান) ; **শিষ্যেণ** (শিষ্য) ; **দ্রুপদপুত্রেণ** (দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক) ; **ব্যূঢ়াম্** (রচিত ব্যূহে অবস্থিত) ; **পাণ্ডুপুত্রাণাম্** (পাণ্ডবদের) ; **এতাম্** (এই) ; **মহতীম্** (বিশাল) ; **চমূম্** (সৈন্য সমূহ) ; **পশ্য** (লক্ষ্য করুন।)]

হে আচার্যদেব ! আপনার ধীমান শিষ্য দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক রচিত ব্যূহে অবস্থিত এই বিশাল সৈন্য-বাহিনীকে লক্ষ্য করুন॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা—'আচার্য'—দ্রোণকে আচার্য বলে সম্বোধন করায় দুর্যোধনের এই ভাব প্রকটিত হয়ে ওঠে যে, আপনি সকলের অর্থাৎ কৌরব ও পাণ্ডবদের গুরু। শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা প্রদানকারী হওয়ায় আপনি সকলেরই গুরু। তাই আপনার কারুর প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা উচিত নয়।

'তব শিষ্যেণ ধীমতা'—এই পদটি প্রয়োগ করায় দুর্যোধনের এই মনোভাব প্রকটিত হয় যে—আপনি এত সরল যে আপনাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে জন্মগ্রহণ করেছে যে ধৃষ্টদ্যুম্ন, তাকে আপনিই শস্ত্রবিদ্যা শিখিয়েছেন। অপরপক্ষে আপনার শিষ্য ধৃষ্টদ্যুম্ন এতই চতুর যে, সে আপনাকে হত্যা করার জন্যই আপনার কাছে শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা গ্রহণ করেছে।

'দ্রুপদপুত্রেণ'—পদটি বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, আপনাকে বধ করার উদ্দেশ্যেই রাজা দ্রুপদ, যাজ এবং উপযাজ নামক ব্রাহ্মণদের সহায়তায় যজ্ঞ করেছিলেন, তাতে ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্ম হয়। সেই দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন আপনার সম্মুখে প্রতিপক্ষের সেনাপতিরূপে দণ্ডায়মান।

দুর্যোধন এইখানে 'দ্রুপদপুত্রে'র স্থানে 'ধৃষ্টদ্যুম্নও' বলতে পারতেন, কিন্তু দ্রোণাচার্যের সঙ্গে দ্রুপদ রাজার যে শত্রুতা ছিল সেই শত্রুতাকে স্মরণ করাবার উদ্দেশ্যেই দুর্যোধন এখানে '**দ্রুপদপুত্রেণ**' শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, এখন সেই শত্রু সংহার করার উপযুক্ত সুযোগ এসেছে।

'পাণ্ডুপুত্রাণাম্ এতাং ব্যূঢ়াং মহতীং চমূং পশ্য'—দ্রুপদপুত্র রচিত ব্যূহে দণ্ডায়মান এই বিশাল সৈন্য-সমূহকে দেখুন। অর্থাৎ যে পাণ্ডবগণ অতি স্নেহভাজন, সেই পাণ্ডবগণ আপনার বিপক্ষে বিশেষভাবে আপনারই হত্যাকাঙ্ক্ষী দ্রুপদপুত্রকে সেনাপতি নির্বাচন করে ব্যূহ রচনা করার অধিকার দিয়েছে। যদি পাণ্ডবগণ আপনাকে শ্রদ্ধা করত তাহলে যে ব্যক্তি আপনাকে বধ করার জন্য উৎসুক, তাকে তাদের সেনাদলে সেনাপতি হিসাবে নির্বাচন করত না, এতটা অধিকার তাকে দিত না। কিন্তু সবকিছু জেনেও ওরা ধৃষ্টদ্যুম্নকেই সেনাপতি পদে বসিয়েছে।

কৌরবসেনার থেকে পাণ্ডবসেনার সংখ্যা যদিও কম অর্থাৎ কৌরবসৈন্য ছিল একাদশ অক্ষৌহিণী[১] এবং পাণ্ডবদের সৈন্য ছিল মাত্র সাত অক্ষৌহিণী, তা সত্ত্বেও দুর্যোধন পাণ্ডবদের বিশাল সৈন্য সংখ্যা বলেছেন।

---

[১] এক অক্ষৌহিণী সেনা ২১৮৭০ টি রথ, ২১৮৭০ টি হাতি, ৬৫৬১০ টি ঘোড়া এবং ১০৯৩৫০ জন পদাতিক সৈন্য সংবলিত হয়। (মহাভারত, আদিপর্ব ২।২৩-২৬)।

পাণ্ডবসৈন্য বিশাল বলার দুটি তাৎপর্য হল—

(১) পাণ্ডবসৈন্য এমনভাবে ব্যূহসজ্জিত ছিল যে দুর্যোধনের নিকট সেই অল্পসংখ্যক সৈন্য অনেক বেশি বলে প্রতিভাত হয়েছিল।

(২) পাণ্ডবসৈন্যে সকলেই এক মতাবলম্বী ছিল। এই ঐক্য থাকায় পাণ্ডবদের অল্পসংখ্যক সৈন্যও শক্তি ও উৎসাহে অনেক বেশি বলে মনে হত। এইজন্যই পাণ্ডব সৈন্যদের দেখিয়ে দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে জানাতে চেয়েছেন যে, যুদ্ধের সময় পাণ্ডবসেনা সংখ্যায় অল্প দেখে তিনি যেন এদের কম না মনে করেন বরং বিশেষ শক্তি ও সাবধানতা সহকারে যেন তিনি যুদ্ধ করেন। পাণ্ডবদের যিনি সেনাপতি, তিনিও দ্রোণাচার্যেরই শিষ্য, কাজেই তাঁকে হারানো তাঁর পক্ষে খুব বেশি কিছু নয়।

'এতাং পশ্য'— বলার অর্থ এই যে, পাণ্ডবসৈন্য যুদ্ধার্থে প্রস্তুত। সুতরাং আমরা এই সেনাদের হারিয়ে কিভাবে বিজয়ী হতে পারি—সেই বিষয়ে আপনার (দ্রোণাচার্যের) অতি শীঘ্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—দ্রোণাচার্যের সমীপে গিয়ে দুর্যোধন কী কথা বললেন—পরের শ্লোকে তা জানানো হয়েছে।

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ॥ ৪ ॥
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ॥ ৫ ॥
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব এব মহারথাঃ॥ ৬ ॥

[**অত্র** (এইস্থানে) ; **শূরাঃ** (বহু বড় বড় যোদ্ধা আছেন) ; **মহেষ্বাসাঃ** (অনেক বিশাল ধনুক আছে) ; **চ যুধি** (এবং, যুদ্ধে) ; **ভীমার্জুনসমাঃ** (ভীম ও অর্জুনের সমকক্ষ যোদ্ধা) ; **যুযুধানঃ** (সাত্যকি) ; **বিরাটঃ** (রাজা বিরাট) ; **চ** (এবং) ; **মহারথঃ দ্রুপদঃ** (মহারথী দ্রুপদ) ; **ধৃষ্টকেতুঃ** (ধৃষ্টকেতু) ; **চ** (ও) ; **চেকিতানঃ** (চেকিতান) ; **চ** (এবং) ; **বীর্যবান্ কাশিরাজঃ** (পরাক্রমী কাশিরাজ) ; **পুরুজিৎ** (পুরুজিৎ) ; **চ** (ও) ; **কুন্তিভোজঃ** (কুন্তিভোজ) ; **চ** (এবং) ; **নরপুঙ্গবঃ শৈব্যঃ** (নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য) ; **বিক্রান্তঃ** (পরাক্রমী) ; **যুধামন্যুঃ** (যুধামন্যু) ; **চ** (এবং) ; **বীর্যবান্** (পরাক্রমী) ; **উত্তমৌজাঃ** (উত্তমৌজা) ; **সৌভদ্রঃ** (সুভদ্রার পুত্র অভিমন্যু) ; **চ** (এবং) ; **দ্রৌপদেয়া** (দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র) ; **সর্বে, এব** (এঁরা, সকলেই) ; **মহারথাঃ** (মহাপরাক্রমশালী মহারথী।)]

এইস্থানে (পাণ্ডবসৈন্যদলে) বহু বড় বড় বীর যোদ্ধা আছেন, যাঁদের অনেক বিশাল ধনুক আছে এবং যাঁরা ভীম ও অর্জুনের সমকক্ষ যোদ্ধা। এঁদের মধ্যে রয়েছেন যুযুধান (সাত্যকি), বিরাট রাজা এবং মহারথী দ্রুপদ, রয়েছেন ধৃষ্টকেতু, চেকিতান এবং মহাপরাক্রমী কাশিরাজ, আরও আছেন পুরুজিৎ ও কুন্তিভোজ দুই ভাই এবং নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, আছেন পরাক্রমী যুধামন্যু এবং উত্তমৌজা, আছেন সুভদ্রার পুত্র অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র—এঁরা সকলেই মহাপরাক্রমশালী মহারথী ॥ ৪-৬ ॥

ব্যাখ্যা—'অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জুনসমা যুধি'— যার দ্বারা বাণ নিক্ষেপ করা হয়, সেটিকে 'ইষ্বাস' অর্থাৎ ধনুক বলা হয়। এই রকম বিরাট ধনুক (ইষ্বাস) যাঁদের থাকে তাঁরা সকলেই 'মহেষ্বাসা' বা 'মহাধনুর্ধারী'। কারণ এই বিরাট ধনুকে বাণ সংযোজন এবং নিক্ষেপ দুইয়েতেই অত্যন্ত শক্তির প্রয়োজন হয়। জোরে নিক্ষিপ্ত বাণ বিশেষভাবে কার্যকরী হয়। এইরূপ বিরাট ধনুক যাঁদের নিকট থাকে তাঁরা সকলেই মস্ত বলশালী যোদ্ধা হয়ে থাকেন, সাধারণ যোদ্ধা নন। যুদ্ধে তাঁরা ভীম ও অর্জুনের মতোই পারঙ্গম অর্থাৎ দৈহিক বলে ভীমের ন্যায় এবং

অস্ত্র চালনায় অর্জুনের সমকক্ষ।

'যুযুধানঃ'—যুযুধান (সাত্যকি) অর্জুনের কাছেই শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা নিয়েছিলেন। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দুর্যোধনকে নারায়ণী সেনা প্রদান করলেও সাত্যকি কৃতজ্ঞতাবশত অর্জুনের পক্ষেই যুদ্ধ করেন, দুর্যোধনের পক্ষে নয়। দ্রোণাচার্যের মধ্যে অর্জুনের প্রতি বিদ্বেষভাব আনয়নের জন্য দুর্যোধন পাণ্ডব মহারথীর মধ্যে সর্বপ্রথম অর্জুন-শিষ্য যুযুধানের কথা উল্লেখ করেন। অর্থাৎ দেখুন, অর্জুন আপনার নিকট অস্ত্রশিক্ষা করেছে এবং আপনি অর্জুনকে বরও দিয়েছেন, যাতে জগতে তার সমকক্ষ আর কোনো ধনুর্ধারী না হয়[১]। এইভাবে আপনি আপনার শিষ্যের প্রতি স্নেহ দেখিয়েছেন, কিন্তু অর্জুন কৃতঘ্ন হয়ে আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত। আর অর্জুনের শিষ্য যুযুধান অর্জুনেরই পক্ষে অবতীর্ণ হয়েছে।

(যুযুধান মহাভারতের যুদ্ধে হত হননি, তিনি যাদবকুলের মধ্যেই লড়াই করে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন।)

'বিরাটশ্চ'—যাঁর জন্য আমাদের পক্ষের বীর সুশর্মাকে অপমান করা হয়েছিল, আপনাকে সম্মোহন-অস্ত্র দ্বারা মোহিত করা হয়েছিল আর যাঁর গাভীগুলিকে ফেলে রেখে আমাদের যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে হয়েছিল সেই রাজা বিরাট আপনার প্রতিপক্ষরূপে উপস্থিত।

রাজা বিরাটের সঙ্গে দ্রোণাচার্যের তেমন কোনো শত্রুতা বা বিদ্বেষভাব ছিল না । কিন্তু দুর্যোধন ভাবলেন যে, যুযুধানের পরই যদি দ্রুপদের নাম করি তাহলে দ্রোণাচার্যের মনে হতে পারে যে, দুর্যোধন পাণ্ডবদের বিপক্ষে আমাকে উস্কানি দিচ্ছে বিশেষভাবে যুদ্ধ করার জন্য আর আমার মধ্যে পাণ্ডবদের প্রতি বিদ্বেষ জন্মাবার চেষ্টা করছে। সেইজন্য দুর্যোধন দ্রুপদের কথা বলার আগে বিরাটের পরিচয় দিচ্ছেন যাতে করে দ্রোণাচার্য দুর্যোধনের চালাকি ধরতে না পারেন এবং বিশেষভাবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন।

(মহাভারতের যুদ্ধে বিরাট রাজা এবং তাঁর তিন পুত্র উত্তর, শ্বেত এবং শঙ্খ মৃত্যুমুখে পতিত হন।)

'দ্রুপদশ্চ মহারথঃ'—আপনি বাল্যবন্ধু দ্রুপদকে পূর্বের বন্ধুত্ব স্মরণ করিয়েছিলেন কিন্তু তিনি এই বলে আপনাকে অপমান করলেন যে, আমি রাজা আর তুমি ভিখারি ; অতএব তোমার-আমার বন্ধুত্ব কিসের ? এবং বৈরীভাবের জন্য আপনাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে পুত্রের জন্ম দিয়েছেন। সেই মহারথী দ্রুপদ আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে আপনারই বিপক্ষে উপস্থিত।

(দ্রুপদ রাজা যুদ্ধে দ্রোণাচার্যের হাতে হত হয়েছিলেন।)

'ধৃষ্টকেতুঃ'—এই ধৃষ্টকেতু এত মূর্খ যে, তার পিতা শিশুপাল কৃষ্ণের চক্রের আঘাতে পরিপূর্ণ সভার মধ্যে নিহত হয়েছিল, তবু সে কৃষ্ণের পক্ষেই যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত।

(ধৃষ্টকেতু দ্রোণাচার্যের হাতে নিহত হন।)

'চেকিতানঃ'—সকল যাদবসেনাই আমাদের পক্ষে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত, শুধু এই যাদব চেকিতান, পাণ্ডবদের সেনাদলে দণ্ডায়মান রয়েছে।

(চেকিতান দুর্যোধনের হাতে হত হন।)

'কাশিরাজশ্চ বীর্যবান্‌'—এই কাশিরাজ অত্যন্ত বড় যোদ্ধা এবং মহারথী। ইনিও পাণ্ডবসৈন্যদলে রয়েছেন। আপনি সাবধানতা সহকারে যুদ্ধ করবেন, কারণ ইনিও খুব পরাক্রমশালী।

(কাশিরাজ মহাভারতের যুদ্ধে হত হয়েছিলেন।)

'পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ'—পুরুজিৎ এবং কুন্তিভোজ —কুন্তীর এই দুই ভাই যদিও সম্পর্কে আমাদের এবং পাণ্ডবদের মামা হন, কিন্তু এঁদের মধ্যে পক্ষপাতিত্ব থাকায় এঁরা আমাদের বিপক্ষে যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন।

(পুরুজিৎ এবং কুন্তিভোজ উভয়েই দ্রোণাচার্যের হাতে যুদ্ধে নিহত হন।)

'শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ'—শৈব্য ছিলেন যুধিষ্ঠিরের শ্বশুর মহাশয়। ইনি একজন শ্রেষ্ঠ মানব ও অত্যন্ত বলশালী। পারিবারিক সম্পর্কে ইনিও আমাদের কুটুম্ব। কিন্তু ইনি পাণ্ডবপক্ষেই যোগদান করেছেন।

'যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্যবান্‌'—পাঞ্চাল দেশের খুব বলশালী এবং বীর যোদ্ধা যুধামন্যু এবং উত্তমৌজা আমার শত্রু অর্জুনের রথের পার্শ্বদেশ রক্ষায় নিযুক্ত হয়েছে। আপনি এদের দিকেও লক্ষ্য রাখবেন।

---

[১]প্রযতিষ্যে তথা কর্তুং যথা নান্যো ধনুর্ধরঃ। ত্বৎসমো ভবিতা লোকে সত্যমেতদ্‌ ব্রবীমি তে।। (মহাভারত. আদিপর্ব ১৩১।২৭)।

(রাত্রে নিদ্রামগ্ন থাকাকালীন এই দুজনকে অশ্বত্থামা হত্যা করেছিল।)

'সৌভদ্রঃ'—ইনি কৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রার পুত্র অভিমন্যু একজন মস্ত যোদ্ধা। মাতৃগর্ভে থাকাকালীনই অভিমন্যু চক্রব্যূহ প্রবেশের কৌশল অর্জন করেছে। সুতরাং চক্রব্যূহ রচনা করার সময় আপনি সেই কথা স্মরণ রাখবেন।

(যুদ্ধে অন্যায়ভাবে দুঃশাসনের পুত্র দ্বারা মস্তকে গদাঘাত করায় অভিমন্যুর মৃত্যু হয়।)

'দ্রৌপদেয়াশ্চ'—যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব—এই পাঁচ ভ্রাতার ঔরসে দ্রৌপদীর গর্ভে যথাক্রমে প্রতিবিন্ধ্য, সুতসোম, শ্রুতকর্মা, শতানীক এবং শ্রুতসেন জন্মগ্রহণ করেন। এই পাঁচজনকে আপনি দেখে রাখুন। দ্রৌপদী পরিপূর্ণ সভায় আমাকে ব্যঙ্গ করে আমার হৃদয়ে আগুন জ্বালিয়েছে, তার পাঁচ পুত্রকে হত্যা করে আপনি এর প্রতিশোধ নেবেন।

(রাত্রে নিদ্রামগ্ন অবস্থায় এই পাঁচ ভাইকে অশ্বত্থামা হত্যা করে।)

'সর্ব এবং মহারথাঃ'—এরা সকলেই মহারথী। যাঁরা শাস্ত্র এবং শস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী এবং যুদ্ধে একাকীই এক সঙ্গে দশ হাজার যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ করতে সক্ষম, সেই বীর পুরুষকেই 'মহারথী' বলা হয়[১]। এরূপ অনেক মহারথী পাণ্ডবসেনাদলে বিরাজমান।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—দ্রোণাচার্যের মনে পাণ্ডবদের প্রতি বিদ্বেষ জন্মানোর এবং যুদ্ধে উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য দুর্যোধন পাণ্ডবসৈন্যের বিশিষ্টতা জানালেন। দুর্যোধনের মনে চিন্তা এল যে, দ্রোণাচার্য তো পাণ্ডবদের প্রতি পক্ষপাতী আছেনই ; সুতরাং পাণ্ডবসেনাদের মহত্ত্বের কথা জেনে আমাকে বলতে পারেন যে, যখন পাণ্ডবসৈন্যদের এত বৈশিষ্ট্য রয়েছে তাহলে তুমি ওদের সঙ্গে সন্ধি করছ না কেন ? এই কথা মনে আসাতেই দুর্যোধন পরের তিনটি শ্লোকে নিজ সৈন্যদের বৈশিষ্ট্য জানাচ্ছেন।

অস্মাকং তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে।। ৭ ॥

[**দ্বিজোত্তম** (হে দ্বিজোত্তম !) ; **অস্মাকম্** (আমাদের পক্ষে) ; **তু** (ও) ; **যে** (যাঁরা) ; **বিশিষ্টাঃ** (প্রধান) ; **তান্** (তাঁদের) ; **নিবোধ** (লক্ষ করুন !) ; **তে** (আপনাকে) ; **সংজ্ঞার্থং** (স্মরণ করাবার জন্য) ; **মম** (আমার) ; **সৈন্যস্য** (সৈন্যদলে) ; **নায়কাঃ** (প্রধান) ; **তান্** (তাঁদের কথা) ; **ব্রবীমি** (বলছি ।)]

হে দ্বিজোত্তম ! আমাদের পক্ষেও যাঁরা সেনাপ্রধান, তাঁদের সম্বন্ধে আপনি অবগত হোন। আপনাকে স্মরণ করাবার জন্য তাঁদের কথা বলছি ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা—'অস্মাকং তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম'—দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে বললেন যে, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! যেমন পাণ্ডবদের সৈন্যদলে শ্রেষ্ঠ মহারথী আছেন, তেমনি আমাদের সৈন্যদলেও তার চেয়ে কম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মহারথী নেই। বরং ওদের মহারথীদের থেকেও বেশি বৈশিষ্ট্যপূর্ণরা আছেন। তাঁদের আপনি জেনে রাখুন।

তৃতীয় শ্লোকে **'পশ্য'** এবং এখানে **'নিবোধ'** ক্রিয়া ব্যবহারের তাৎপর্য এই যে, পাণ্ডবদের সৈন্য তো সামনে দণ্ডায়মান, তাই তাদের দেখাবার জন্য দুর্যোধন **'পশ্য'** (দেখুন) ক্রিয়ার প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু তাঁর নিজ সৈন্যদল তাঁর সামনে নেই অর্থাৎ দ্রোণাচার্যের পিছনে রয়েছে, তাই তাদের দেখার কথা না বলে, তাঁদের প্রতি মন দেবার জন্য দুর্যোধন **'নিবোধ'** (অবগত হোন) ক্রিয়ার প্রয়োগ করেছেন।

'নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে'—আমার সেনার মধ্যেও বিশিষ্ট সেনাপতি, মহারথী আছেন। আমি শুধু আপনাকে অবগত করাবার জন্যই, আপনার দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করার জন্যই বলছি।

'সংজ্ঞার্থম্'—পদটির অর্থ হচ্ছে এই যে, আমাদের

[১]একো দশসহস্রাণি যোধয়েদ্ যস্তু ধন্বিনাম্। শস্ত্রশাস্ত্রপ্রবীণশ্চ মহারথ ইতি স্মৃতঃ॥

অনেক সেনানায়ক আছেন, তাঁদের আর কী করে নাম বলি ? তাই শুধু সংক্ষেপে তাঁদের কথা জানাচ্ছি ; কারণ আপনি তো সবই জানেন।

এই শ্লোকটিতে দুর্যোধনের এমন ভাব দেখা যায় যে তাঁর পক্ষ যেন কোনো দিক থেকেই দুর্বল নয়। কিন্তু রাজনীতি অনুযায়ী শত্রুপক্ষ যত কম শক্তিশালী হোক আর নিজপক্ষ যত বেশি শক্তিশালী হোক না কেন, এইরূপ অবস্থাতেও শত্রুপক্ষকে কমজোর ভাবা উচিত নয়, আর নিজের মধ্যে উপেক্ষা, উদাসীনতা ইত্যাদির চিন্তা একটুও আনা উচিত নয়। এইজন্য সাবধানতা অবলম্বন করবার জন্যই আমি ওদের সৈন্যদের কথা বলেছি এবং এখন আমাদের সৈন্যের কথা বলছি।

দ্বিতীয় ব্যাপার হচ্ছে এই যে, পাণ্ডবসেনাদের দেখে দুর্যোধনের ওপর বিশাল প্রভাব পড়েছিল এবং তাঁর মনে কিছুটা ভীতি ভাবও এসেছিল। কারণ সংখ্যায় কম হলেও পাণ্ডবসেনাদলে অনেক ধর্মাত্মা ব্যক্তি ছিলেন। তাছাড়া স্বয়ং ভগবান সেখানে ছিলেন। যে পক্ষে ধর্ম ও ভগবান থাকেন, সেই পক্ষের এক বিরাট প্রভাব সকলের ওপর পড়ে। অত্যন্ত পাপী এবং অতি দুষ্ট ব্যক্তির ওপরও তার প্রভাব পড়ে। শুধু তাই নয় পশুপক্ষী, বৃক্ষ-লতা ইত্যাদির ওপরেও তার প্রভাব পড়ে। কারণ ধর্ম ও ভগবান নিত্য। যত উচ্চ শক্তিসম্পন্ন জাগতিক শক্তি হোক না কেন, তা সবই অনিত্য অর্থাৎ মরণশীল। তাই দুর্যোধনের ওপর পাণ্ডবসৈন্যদের খুবই প্রভাব পড়েছিল। তবু তাঁর জাগতিক শক্তির ওপর বেশি বিশ্বাস থাকায় দুর্যোধন দ্রোণাচার্যের মনে আস্থা আনবার জন্য বলেছিলেন যে আমাদের পক্ষে যে বৈশিষ্ট্য আছে তা পাণ্ডবসৈন্যদের মধ্যে নেই। সুতরাং আমরা অতি সহজেই বিজয়ী হব।

❋ ❋ ❋

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তিস্তথৈব চ॥ ৮ ॥

[ভবান্ (আপনি) ; চ (এবং) ; ভীষ্মঃ (পিতামহ ভীষ্মঃ) ; চ (এবং) ; কর্ণঃ (কর্ণ) ; চ (ও) ; সমিতিঞ্জয়ঃ (সংগ্রামবিজয়ী) ; কৃপঃ (কৃপাচার্য) ; চ (এবং) ; তথা, এব (তেমনি) ; অশ্বত্থামা (অশ্বত্থামা) ; বিকর্ণঃ (বিকর্ণ) ; চ (ও) ; সৌমদত্তিঃ (সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবা।)]

আপনি (দ্রোণাচার্য) এবং পিতামহ ভীষ্ম এবং কর্ণ ও সংগ্রামবিজয়ী কৃপাচার্য, তেমনি অশ্বত্থামা, বিকর্ণ ও সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবা ॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা—'ভবান্ ভীষ্মশ্চ'—আপনি এবং পিতামহ ভীষ্ম—উভয়েই অত্যন্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি। আপনাদের দুজনের সমকক্ষ পৃথিবীতে তৃতীয় কেউ নেই। আপনাদের দুজনের মধ্যে যদি একজনও সমস্ত শক্তি দিয়ে যুদ্ধ করেন, তাহলে দেবতা, যক্ষ, রাক্ষস, মানুষ ইত্যাদির মধ্যে এমন কেউ নেই যে আপনাদের সামনে টিকতে পারে। আপনাদের উভয়ের পরাক্রম জগৎপ্রসিদ্ধ। পিতামহ ভীষ্ম আবাল্য ব্রহ্মচারী এবং ইচ্ছামৃত্যু বরপ্রাপ্ত অর্থাৎ তাঁর ইচ্ছা বিনা কেউ তাঁকে বধ করতে পারবে না।

(মহাভারতের যুদ্ধে দ্রোণাচার্য ধৃষ্টদ্যুম্নের হাতে নিহত হয়েছিলেন এবং পিতামহ ভীষ্ম তাঁর নিজ ইচ্ছায় সূর্যের উত্তরায়ণকালে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন।)

'কর্ণশ্চ'—কর্ণও মস্ত বড় যোদ্ধা। আমার বিশ্বাস যে, তিনি একাই পাণ্ডব সেনাদের পরাজিত করতে সক্ষম। তাঁর সঙ্গে অর্জুনও পেরে ওঠে না। এইরূপ কর্ণও আমাদের পক্ষেই আছেন।

(মহাভারতের যুদ্ধে অর্জুন কর্ণকে বধ করেছিলেন।)

'কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ'—কৃপাচার্যের কথা আর কী বলা যায়। তিনি তো চিরজীবী[১], আমাদের পরম হিতৈষী এবং তিনি সমস্ত পাণ্ডবসেনাকে জয় করতে পারেন।

---

[১] অশ্বত্থামা, বলি, বেদব্যাস, হনুমান, বিভীষণ, কৃপাচার্য, পরশুরাম এবং মার্কণ্ডেয়—এই আটজন চিরজীবী ব্যক্তি। শাস্ত্রে আছে—
অশ্বত্থামা বলির্ব্যাসো হনুমানংশ্চ বিভীষণঃ। কৃপঃ পরশুরামশ্চ সপ্তৈতে চিরজীবিনঃ॥
সপ্তৈতান্ সংস্মরেন্নিত্যং মার্কণ্ডেয়মথাষ্টমম্। জীবেদ্বর্ষশতং সোঽপি সর্বব্যাধিবিবর্জিতঃ॥ (পদ্মপুরাণ ৪৯।৭)

এখানে যদিও দ্রোণাচার্য এবং ভীষ্মের পরে কৃপাচার্যের নামই দুর্যোধনের বলা উচিত ছিল ; কিন্তু দুর্যোধনের কর্ণের ওপর যত বিশ্বাস ছিল, কৃপাচার্যের ওপর তত ছিল না। তাই কর্ণের নাম এর মধ্যেই এসে পড়েছিল। পাছে দ্রোণাচার্য এবং ভীষ্ম এতে কৃপাচার্যের প্রতি অপমান মনে করেন, তাই দুর্যোধন কৃপাচার্যকে 'সংগ্রামবিজয়ী' বিশেষণের দ্বারা তাঁদের প্রসন্ন করতে চেয়েছেন।

'অশ্বত্থামা'—ইনি চিরজীবী এবং আপনারই পুত্র। ইনিও বড় যোদ্ধা এবং আপনার কাছেই অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেছেন। অস্ত্রবিদ্যায় ইনি অতি নিপুণ।

'বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তিস্তথৈব চ'—আপনি মনে করবেন না যে শুধু পাণ্ডবগণই ধর্মাত্মা, আমাদের পক্ষে আমার ভাই বিকর্ণও অত্যন্ত ধর্মাত্মা এবং যুদ্ধবীর। তেমনি আমার প্রপিতামহ শান্তনুর ভাই বাহ্লীকের পৌত্র এবং সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবাও খুব ধর্মাত্মা ব্যক্তি। ইনি ব্যয়বহুল অনেক যজ্ঞ করেছেন। ইনিও বড় যোদ্ধা এবং মহারথী।

(যুদ্ধে বিকর্ণ ভীমের হাতে এবং ভূরিশ্রবা সাত্যকির হাতে নিহত হন।)

এখানে এই যোদ্ধাদের নাম উল্লেখ করায় দুর্যোধনের এই ভাব ব্যক্ত হয় যে, 'হে আচার্য ! আমাদের সৈন্যদলে যেমন আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপাচার্য প্রমুখ এত মহাপরাক্রমশালী যোদ্ধা আছেন, সেরূপ পাণ্ডবসেনাদলে দেখা যায় না। আমাদের সৈন্যদলে কৃপাচার্য এবং অশ্বত্থামা—এঁরা দুজন চিরজীবী, কিন্তু পাণ্ডবসৈন্যদলে সেরকম একজনও নেই। আমাদের সৈন্যদলে ধর্মাত্মা ব্যক্তিও কম নেই। তাই আমাদের ভীত হওয়ার কোনো কারণ নেই।'

※ ※ ※

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ॥ ৯ ॥

[অন্যে (এঁরা ছাড়াও) ; বহবঃ (আরও অনেক) ; শূরাঃ (যোদ্ধা) ; মদর্থে (আমার জন্য) ; ত্যক্ত জীবিতাঃ (প্রাণত্যাগে প্রস্তুত) ; চ (এবং) ; নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ (নানাপ্রকার অস্ত্রবিদ্যা জানেন) ; সর্বে (সর্বপ্রকার) ; যুদ্ধবিশারদাঃ (যুদ্ধবিদ্যায় পারঙ্গম।)]

এঁরা ছাড়া আরও যোদ্ধা আছেন, যাঁরা আমার জন্য প্রাণত্যাগে প্রস্তুত হয়েছেন এবং যাঁরা নানাপ্রকার অস্ত্রবিদ্যা জানেন এবং সর্বপ্রকার যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা—'অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ'—আমি এখনও পর্যন্ত আমাদের সৈন্যদলে যত যোদ্ধার নাম উল্লেখ করেছি, তাছাড়াও আমাদের মধ্যে বাহ্লীক, শল্য, ভগদত্ত, জয়দ্রথ প্রমুখ অনেক বড় যোদ্ধা মহারথী আছেন, যাঁরা আমাদের মঙ্গলের জন্য জীবনের আশা ত্যাগ করে আমাদের পক্ষে লড়বার জন্য এসেছেন। এঁরা আমার বিজয় প্রাপ্তির জন্য মৃত্যুবরণ করতেও প্রস্তুত তবু যুদ্ধে পশ্চাদপসরণ করবেন না। তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা আমি কীভাবে আপনার কাছে প্রকাশ করি ?

'নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ'—এঁরা হস্তে ধারণ করে চালনাযোগ্য আয়ুধ যথা তরবারি, গদা, ত্রিশূল ইত্যাদি ব্যবহারে নিপুণ এবং হস্ত-নিক্ষেপের অস্ত্র যেমন বাণ, বর্শা ইত্যাদির চালনাতেও পারদর্শী। যুদ্ধ কেমন করে করা উচিত, কীভাবে কী প্রথায় কোন্ কৌশলে ; কীভাবে সৈন্যদের সাজাতে হয় ইত্যাদি যুদ্ধকলায় এঁরা খুবই পারঙ্গম এবং কুশল।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—দুর্যোধনের কথায় দ্রোণাচার্য কোনো উত্তর দিলেন না। তখন দুর্যোধনের চাতুর্য সফল না হওয়ায় তার মনে কী চিন্তা এল—পরের শ্লোকে সঞ্জয় তা জানিয়েছেন।[১]

অপর্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্॥ ১০॥

[**অস্মাকম্** (আমাদের) ; **তৎ বলম্** (এই সৈন্যগণ) ; **অপর্যাপ্তম্** (পর্যাপ্ত নয় ও অসমর্থ) ; **ভীষ্মাভিরক্ষিতম্** (সংরক্ষক ভীষ্ম) ; **তু** (কিন্তু) ; **এতেষাম্** (পাণ্ডবদের) ; **ইদম্ বলম্** (এই সৈন্যগণ) ; **পর্যাপ্তম্** (পর্যাপ্ত, সমর্থ) ; **ভীমাভিরক্ষিতম্** (ওদের সংরক্ষক ভীমসেন।)]

আমাদের সৈন্যগণ পাণ্ডবদের জয় করার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়, অসমর্থ কারণ তাদের সংরক্ষক হিসাবে আছেন (উভয়েরই পক্ষপাতী) ভীষ্ম। কিন্তু পাণ্ডবসৈন্যগণ আমাদের জয় করার পক্ষে পর্যাপ্ত এবং সমর্থ; কারণ তাদের সংরক্ষক হিসাবে যিনি আছেন তিনি হলেন (নিজ সেনাদলের পক্ষপাতী) ভীম॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা—'অপর্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্'—অধর্ম-অন্যায়ের জন্য দুর্যোধনের মনে ভীতির উদ্রেক হওয়ায় তিনি নিজ সৈন্যদের নিয়ে চিন্তা করছেন যে, আমাদের সৈন্যদল বেশি হলেও অর্থাৎ পাণ্ডবসৈন্যের থেকে চার অক্ষৌহিণী সেনা বেশি হওয়া সত্ত্বেও পাণ্ডবদের জয় করতে অসমর্থ। কারণ আমাদের সৈন্যদলের মধ্যে মতভেদ রয়েছে ; আমাদের মধ্যে সেরূপ একতা (সংগঠন), নির্ভয়তা, সংকোচহীনতা নেই, যা পাণ্ডবদের মধ্যে আছে। আমাদের সৈন্যদলের প্রধান সংরক্ষক পিতামহ ভীষ্ম উভয়দলের প্রতি পক্ষপাতী অর্থাৎ তাঁর মধ্যে কৌরব এবং পাণ্ডব—দুই সৈন্যের প্রতিই আপন-ভাব আছে। তিনি শ্রীকৃষ্ণের একজন বড় ভক্ত। তাঁর হৃদয়ে যুধিষ্ঠিরের প্রতি প্রবল স্নেহ আছে। অর্জুনকেও তিনি অত্যন্ত স্নেহ করেন। সেইজন্যই ইনি আমাদের পক্ষে থাকলেও অন্তরে পাণ্ডবদেরই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, এই ভীষ্মই আমাদের সৈন্যদলের প্রধান সেনাপতি। এইরূপ অবস্থায় আমাদের সৈন্য পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে কী করে সমর্থ হতে পারে ? কিছুতেই হতে পারে না।

'পর্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্'— কিন্তু পাণ্ডবদের সৈন্যদল আমাদের জয় করতে সক্ষম। কারণ তাদের সৈন্যদলে মতানৈক্য নেই, বরং সকলেই এক মতে সংগঠিত। তাদের সেনাদের সংরক্ষক ভীম, যে ছোটবেলা থেকে আমাকে হারিয়ে আসছে। সে একাই আমার শত ভ্রাতাসহ আমাকে হত্যা করবার প্রতিজ্ঞা করে রেখেছে। অর্থাৎ সে আমাদের ধ্বংস করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। তার শরীর বজ্রের ন্যায় শক্ত। আমি তাকে বিষপান করিয়েছিলাম, তবুও সে মরেনি। এই ভীমই পাণ্ডবসেনাদের রক্ষক, কাজেই এই সেনারা প্রকৃতই সক্ষম এবং পূর্ণ।

এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, দুর্যোধন নিজ সেনাদলের রক্ষক হিসাবে ভীষ্মের নাম করেছেন, যিনি সেনাপতি পদে অভিষিক্ত ছিলেন। কিন্তু পাণ্ডবসৈন্যদের রক্ষক হিসাবে ভীমের নাম কেন করেছেন, তিনি তো সেনাপতি ছিলেন না ! তার উত্তর হচ্ছে এই যে, দুর্যোধন এই সময় সেনাপতির কথা ভাবেননি ; দুই পক্ষের সৈন্যদের শক্তি সম্বন্ধে চিন্তা করছিলেন, কোন্ সৈন্যদলের শক্তি অধিক। প্রথম থেকেই দুর্যোধনের ওপর ভীমের শক্তি এবং বলের খুব বেশি রকম প্রভাব পড়েছিল। সেইজন্য তিনি পাণ্ডবসৈন্যদের রক্ষক হিসাবে ভীমের কথাই বলেছেন।

বিশেষ কথা

অর্জুন কৌরবসেনাদের দেখে কারো কাছে না গিয়ে হাতে ধনুক নিলেন (গীতা ১।২০), আর দুর্যোধন পাণ্ডবসেনাদের দেখে দ্রোণাচার্যের কাছে গেলেন এবং তাঁকে পাণ্ডবদের ব্যূহবদ্ধ সৈন্যদের দেখতে বললেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে দুর্যোধনের মনে ভয় বাসা

[১]সঞ্জয় ব্যাসপ্রদত্ত দিব্যদৃষ্টি দ্বারা সৈন্যদের মনের কথাও জানতে সমর্থ হতেন—
প্রকাশং বাপ্রকাশং বা দিবা বা যদি বা নিশি। মনসা চিন্তিতমপি সর্বং বেৎস্যতি সঞ্জয়ঃ॥ (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব ২।১১)

বেঁধেছিল[১]। হৃদয়ে ভয় থাকলেও তিনি চালাকি দ্বারা দ্রোণাচার্যের প্রসন্নতা আনবার চেষ্টা করেছিলেন ; তাঁকে পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে চেয়েছিলেন। কারণ দুর্যোধনের হৃদয়ে ছিল অধর্ম, অন্যায় এবং পাপ। অন্যায়কারী পাপী ব্যক্তি কখনো নির্ভীকভাবে সুখ-শান্তিতে থাকতে পারে না—এই হল নিয়ম। অপরপক্ষে অর্জুনের মধ্যে ছিল ধর্মভাব, ন্যায়ভাব। তাই অর্জুনকে নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোনো চালাকি করতে হয়নি, কোনো ভয়ও তাঁর নেই। যা আছে তা হল উৎসাহ ও বীরত্ব। তাই তো তিনি বীরের মতো সেনা-পরিদর্শন করার জন্য ভগবানকে আদেশ করলেন, 'হে অচ্যুত ! দুই সেনা-বাহিনীর মধ্যে আমার রথ স্থাপন করুন' (১।২১)। অর্থাৎ যার মধ্যে বিনাশশীল ধন-সম্পত্তি ইত্যাদির জন্য মোহ থাকে, আসক্তি থাকে এবং যার মধ্যে অধর্ম, অন্যায়, কু-ভাব থাকে তার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো বল থাকে না। সে ভিতরে ভিতরে শূন্য হয়ে যায় আর কখনো সে নির্ভয় হতে পারে না। অপরপক্ষে যে নিজ ধর্ম পালনের প্রতি নিষ্ঠাবান থাকে এবং ভগবানের আশ্রিত হয় সে কখনোই ভয় পায় না। তার বল সত্যকার বল হয়। সে সর্বদা নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় থাকে। সুতরাং যে সব সাধক নিজের কল্যাণে ইচ্ছুক তাঁদের অন্যায়, অধর্ম ইত্যাদি সর্বভাবে পরিত্যাগ করে একমাত্র ভগবানের শরণাগত হয়ে ভগবানের প্রীতির জন্যই ধর্ম অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। জাগতিক বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে এবং সুখের প্রলোভনে মোহিত হয়ে কখনো অধর্মের আশ্রয় নেওয়া উচিত নয়, কারণ এসবে মানুষের কখনো ভালো হয় না, বরং খারাপই হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব—অর্জুন অস্ত্রশস্ত্রাদি সজ্জিত নারায়ণীসেনা পরিহার করে শস্ত্রহীন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বরণ করেছিলেন[২] এবং দুর্যোধন ভগবানকে পরিহার করে নারায়ণীসেনা গ্রহণ করেছিলেন। এর তাৎপর্য হল যে, অর্জুনের দৃষ্টি ছিল ভগবানের দিকে আর দুর্যোধনের দৃষ্টি ছিল বৈভবের দিকে। যাঁর ভগবানের দিকে দৃষ্টি থাকে তাঁর হৃদয় বলশালী হয়, কেন না ভগবানের বলই সত্যকার বল। কিন্তু যার দৃষ্টি জাগতিক বৈভবের দিকে থাকে, তার হৃদয় দুর্বল হয়, কারণ জাগতিক বল হয় ক্ষণস্থায়ী।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—এবার দুর্যোধন পিতামহ ভীষ্মকে প্রসন্ন করবার জন্য নিজ সৈন্যদলের সমস্ত মহারথীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন যে—

অয়নেষু চ সর্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব এব হি।। ১১।।

[**ভবন্তঃ** (আপনারা) ; **সর্বে, এব** (সকলেই) ; **সর্বেষু, অয়নেষু** (সকল ব্যূহে) ; **যথাভাগম্** (বিভাগানুসারে) ; **অবস্থিতাঃ** (দৃঢ়তাপূর্বক থেকে) ; **হি** (নিশ্চিতভাবে) ; **ভীষ্মম্** (পিতামহ ভীষ্মকে) ; **এব** (ই) ; **অভিরক্ষন্তু** (চতুর্দিক থেকে রক্ষা করুন।)]

আপনারা সবাই সকল ব্যূহে নিজ নিজ স্থানে দৃঢ়তাপূর্বক অবস্থান করে পিতামহ ভীষ্মকে চতুর্দিক থেকে রক্ষা করুন ।। ১১ ।।

ব্যাখ্যা—'অয়নেষু চ সর্বেষু...ভবন্তঃ সর্ব এব হি'— যে যে স্থানে আপনাদের নিযুক্ত করা হয়েছে, আপনারা সকল যোদ্ধা সেই সেই স্থানে দৃঢ়তার সঙ্গে স্থির থেকে সর্বদিক থেকে সর্বপ্রকারে পিতামহ ভীষ্মকে রক্ষা করুন।

---

[১] কৌরবসৈন্যদল যখন শঙ্খ ইত্যাদির ধ্বনি করে পাণ্ডবসৈন্যদলের ওপর তখন ওই শব্দের কোনো প্রভাব পড়ে না। কিন্তু যখন পাণ্ডবসৈন্যদের শঙ্খধ্বনি হয়, তখন সেই শব্দে দুর্যোধনাদির হৃদয় বিদীর্ণ হয় (১।১৩, ১৯)। এতে প্রমাণিত হয় যে, অধর্ম ও অন্যায়ের পক্ষ গ্রহণ করায় দুর্যোধন ও তার সঙ্গীদের হৃদয়ের জোর কমে গিয়েছিল এবং মনে ভীতি জন্মেছিল।

[২] এবমুক্তস্তু কৃষ্ণেন কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ। অযুধ্যমানং সংগ্রামে বরয়ামাস কেশবম্।। (মহাভারত, উদ্যোগপর্ব ৭।২১)

'শ্রীকৃষ্ণ একথা বললে কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় সংগ্রামে (অস্ত্রশস্ত্রাদির দ্বারা সুসজ্জিত এক অক্ষৌহিণী নারায়ণীসেনা ছেড়ে) যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক শস্ত্রবর্জিত সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে (নিজের সাহায্যকারীরূপে) বরণ করলেন।'

ভীষ্মকে সর্বদিক থেকে রক্ষা করুন—এই বলে দুর্যোধন ভীষ্মকে অন্তর থেকে নিজের পক্ষে আনতে চাইলেন। এটি বলার অন্য কারণ ছিল এই যে, যখন ভীষ্ম যুদ্ধ করবেন তখন যেন কোনো বৃহদ্দ্বার দিয়ে শিখণ্ডী তাঁর সামনে এসে না পড়েন—সেটা যেন তারা লক্ষ্য রাখে। যদি শিখণ্ডী এসে পড়েন তাহলে ভীষ্ম তাঁর ওপর কোনো অস্ত্রাঘাত করবেন না। কারণ শিখণ্ডী পূর্বজন্মে নারী ছিলেন এবং এই জন্মেও প্রথমে নারী ছিলেন পরে পুরুষে রূপান্তরিত হয়েছেন। তাই ভীষ্ম এঁকে নারী বলেই মনে করেন এবং সেইজন্য শিখণ্ডীর সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন। এই শিখণ্ডী শিবের বরে ভীষ্মকে বধ করার জন্যই জন্ম গ্রহণ করেছেন। সুতরাং শিখণ্ডীর থেকে ভীষ্মকে রক্ষা করতে পারলেই তিনি অন্য সকলকে বধ করবেন, তাতে আমরা নিশ্চিতভাবে জয়লাভ করব। এইজন্যই দুর্যোধন সমস্ত মহারথীকে ভীষ্মকে রক্ষা করার কথা বললেন।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—দ্রোণাচার্য কোনো উত্তর না দেওয়ায় দুর্যোধনের উৎসাহ ভঙ্গ হল দেখে ভীষ্মের স্নেহ-ভালোবাসার অভিব্যক্তি সঞ্জয় পরের শ্লোকে জানালেন।

তস্য সঞ্জনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্।। ১২ ॥

[**তস্য** (দুর্যোধনের) ; **হর্ষম্** (আনন্দ) ; **সঞ্জনয়ন্** (আনয়নের জন্য) ; **কুরুবৃদ্ধঃ** (কুরুবংশীয় বৃদ্ধ) ; **প্রতাপবান** (প্রভাবশালী) ; **পিতামহঃ** (পিতামহ ভীষ্ম) ; **সিংহনাদম্** (সিংহের মতো) ; বিনদ্ধ (গর্জন করে) ; উচ্চৈঃ (জোরে) ; শঙ্খ (শঙ্খ) ; দধ্মৌ (বাজালেন।)]

দুর্যোধনের হৃদয়ে আনন্দ আনয়নের জন্য কুরুবংশীয় বৃদ্ধ প্রভাবশালী পিতামহ ভীষ্ম সিংহের মতো গর্জন করে উচ্চরবে শঙ্খ বাজালেন ॥ ১২ ॥

ব্যাখ্যা—**'তস্য সঞ্জনয়ন্ হর্ষম্'**—যদিও দুর্যোধনের হৃদয়ে হর্ষ উৎপন্ন করাতে শঙ্খধ্বনিরূপ ক্রিয়া হল কার্য এবং শঙ্খের ধ্বনি হল কারণ, সেইজন্য এইস্থলে শঙ্খধ্বনির বর্ণনা আগে এবং হর্ষিত হওয়ার বর্ণনা পরে করা উচিত ছিল অর্থাৎ এখানে 'শঙ্খ বাজিয়ে দুর্যোধনকে উৎফুল্ল করেছিল'—এরূপ বলা উচিত ছিল। কিন্তু এখানে তা না বলে বলা হয়েছে, 'দুর্যোধনকে হর্ষান্বিত করার জন্য ভীষ্ম শঙ্খধ্বনি করলেন।' এর দ্বারা সঞ্জয় বোঝাতে চাইলেন পিতামহ ভীষ্মের শঙ্খধ্বনি শোনামাত্র দুর্যোধনের হৃদয় আনন্দিত হয়ে উঠবে। ভীষ্মের এই প্রভাবটি বোঝাবার জন্যই সঞ্জয় পরে **'প্রতাপবান্'** বিশেষণটি যোগ করেছেন।

'কুরুবৃদ্ধঃ'—যদিও কুরুবংশীয়দের আয়ুর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে বৃদ্ধ বাহ্লীক (যিনি ভীষ্মের পিতা শান্তনুর ছোট ভাই ছিলেন) ভীষ্মের চেয়ে বয়োবৃদ্ধ ছিলেন, তবুও কুরুবংশে যত বৃদ্ধ এবং বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন, তাঁদের সবার মধ্যে ভীষ্ম ধর্ম এবং ভগবান সম্বন্ধে বিশেষভাবে জ্ঞানী ছিলেন। তাই জ্ঞানবৃদ্ধ হওয়ার জন্য সঞ্জয় ভীষ্মকে **'কুরুবৃদ্ধঃ'** বিশেষণে ভূষিত করেছেন।

'প্রতাপবান্'—ভীষ্মের ত্যাগের খুব প্রভাব ছিল। ইনি কাঞ্চন-কামিনী ত্যাগ করেছিলেন অর্থাৎ তিনি রাজ্য গ্রহণ করেননি এবং বিবাহও করেননি। ভীষ্ম যেমন অস্ত্র চালনায় নিপুণ ছিলেন, তেমনি শাস্ত্রজ্ঞানেও অসামান্য ছিলেন। তাঁর এই দুটি গুণেরই প্রভাব তখনকার ব্যক্তিদের ওপর পড়েছিল।

ভীষ্ম একা যখন তাঁর ভাই বিচিত্রবীর্যের জন্য কাশীরাজের তিন কন্যাকে স্বয়ংবর সভা থেকে অপহরণ করে নিয়ে আসছিলেন, সেইসময় স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত সকল ক্ষত্রিয়যোদ্ধা একযোগে তাঁকে আক্রমণ করেন। কিন্তু ভীষ্ম একাই তাঁদের সকলকে পরাজিত করেন। যে গুরুর কাছে ভীষ্ম অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন, সেই পরশুরামের কাছেও তিনি হার স্বীকার করেননি। সুনিপুণ অস্ত্রচালনায় তাঁর ক্ষত্রিয়দের ওপর খুব প্রভাব ছিল।

ভীষ্ম যখন শরশয্যায় শায়িত ছিলেন, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন, 'ধর্ম সম্বন্ধে যদি

কোনো জিজ্ঞাস্য থাকে তাহলে তা আপনি ভীষ্মের নিকট জিজ্ঞাসা করতে পারেন ; কারণ শাস্ত্রজ্ঞানের সূর্য অস্তাচলে যাচ্ছেন' অর্থাৎ ভীষ্ম ইহলোক থেকে বিদায় নিচ্ছেন।[১] এইভাবে শাস্ত্রের বিষয়েও তাঁর অপ্রতিহত প্রভাব ছিল।

'পিতামহঃ'—এই পদটির বিষয়ে এই মনে হয় যে, দুর্যোধন চতুরতার দ্বারা দ্রোণাচার্যকে যা বলেছিলেন, দ্রোণাচার্য তার কোনো উত্তর দেননি। তিনি ভেবেছিলেন যে দুর্যোধন চাতুরি করে আমাকে প্রভাবিত করতে চাইছে, সেইজন্যই তিনি চুপ করেছিলেন। কিন্তু পিতামহ (ঠাকুরদা) হওয়ার সুবাদে ভীষ্ম দুর্যোধনের চাতুরির মধ্যে তাঁর ছেলেমানুষিই লক্ষ করেছিলেন। সেইজন্য পিতামহ ভীষ্ম দ্রোণাচার্যের মতো চুপ করে না থেকে দুর্যোধনের ছেলেমানুষি ভাবকে আনন্দিত করার জন্য শঙ্খধ্বনি করলেন।

'সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ'—সিংহের গর্জন শুনে হাতি ইত্যাদি বড় বড় পশু যেমন ভীত সন্ত্রস্ত হয়, তেমনি গর্জনের দ্বারা সকলে যেন ভয়বিহ্বল হয় এবং দুর্যোধন খুশি হয়—এই ভাবনার দ্বারা পরিচালিত হয়েই ভীষ্ম সিংহের মতো গর্জন করে জোরে শঙ্খ বাজিয়েছিলেন।

পরিশিষ্ট-ভাব—দুর্যোধনের সঙ্গে দ্রোণাচার্যের গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক ছিল, আর ভীষ্মের সঙ্গে ছিল জন্মগত সম্পর্ক অর্থাৎ কুটুম্বের সম্পর্ক। যেখানে শিক্ষাগত সম্পর্ক সেখানে পক্ষপাতিত্ব হয় না, কিন্তু যেখানে কুটুম্বের সম্পর্ক সেখানে স্নেহবশতঃ পক্ষপাতিত্ব হতে পারে। তাই দুর্যোধনের চাতুর্যপূর্ণ কথা শুনে দ্রোণাচার্য চুপ করে রইলেন, যার ফলে দুর্যোধনের মনের উৎসাহ নষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু ভীষ্ম দুর্যোধনকে বিমর্ষ দেখে কৌটুম্বিক স্নেহবশে শঙ্খধ্বনি করলেন।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—পিতামহ ভীষ্ম শঙ্খ বাজানোয় কী হল, পরের শ্লোকে সঞ্জয় তা জানাচ্ছেন।

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ॥ ১৩॥

[**ততঃ** (তারপর) ; **শঙ্খাঃ** (শঙ্খ) ; **চ** (ও) ; **ভের্যঃ** (ভেরী) ; **চ** (এবং) ; **পণবানকগোমুখাঃ** (ঢোল, মৃদঙ্গ এবং নরসিঙ্গা সমস্ত বাদ্য) ; **সহসা** (একসঙ্গে) ; **এব** (ই) ; **অভ্যহন্যন্ত** (বেজে উঠল) ; **সঃ** (সেইসব) ; **শব্দঃ** (শব্দ) ; **তুমুলঃ** (ভয়ংকর) ; **অভবৎ** (শোনাল।)]

তারপর শঙ্খ, ভেরী (নাকাড়া), ঢোল, মৃদঙ্গ এবং নরশিঙ্গা আদি সমস্ত বাদ্য একসঙ্গে বেজে উঠল। এই সম্মিলিত শব্দ ভয়ংকর শোনাল ॥ ১৩ ॥

ব্যাখ্যা—'ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্যশ্চ পণবানক-গোমুখাঃ'—ভীষ্ম যদিও যুদ্ধারম্ভ ঘোষণা করে শঙ্খধ্বনি করেননি, তিনি দুর্যোধনকে প্রসন্ন করার জন্যই শঙ্খ বাজিয়েছিলেন, কিন্তু কৌরবসৈন্যগণ ভীষ্মের শঙ্খ বাজাবার কারণ হিসাবে যুদ্ধ ঘোষণা বলে ধরে নিয়েছিল। তাই ভীষ্ম শঙ্খধ্বনি করায় কৌরবসেনাদের শঙ্খ ইত্যাদি সমস্ত বাদ্য একসঙ্গে বেজে উঠল।

'শঙ্খ'—এর উৎপত্তিস্থল সমুদ্র। এটি দেবতাদের পূজায় লাগে এবং আরতি ইত্যাদিতে ব্যবহার করা হয়। মাঙ্গলিক কর্মে এবং যুদ্ধের প্রারম্ভে এটি মুখের ফুৎকারে বাজানো হয়। নাকাড়াকে **'ভেরী'** বলা হয় (বড় নাকাড়া নহবত নামে পরিচিত)। নাকাড়া লৌহনির্মিত এবং মহিষের চর্মে আচ্ছাদিত এবং কাষ্ঠদণ্ড দ্বারা বাজানো হয়। এটি দেবদ্বার এবং রাজার দুর্গে রক্ষিত হয়। উৎসব এবং মাঙ্গলিক কর্মে এটি বাজানো হয়ে থাকে। রাজদ্বারে এটি প্রত্যহ বাজানো হয়। ঢোলকে বলা হয় **'পণব'**। এটি লৌহ বা কাষ্ঠনির্মিত হয় এবং ছাগচর্মে আচ্ছাদিত থাকে এবং হস্ত বা কাষ্ঠদণ্ড দ্বারা বাজানো হয়। এটি আকারে ছোট

[১] তস্মিন্নস্তমিতে ভীষ্মে কৌরবাণাং ধরন্ধরে। জ্ঞানান্যস্তং গমিষ্যন্তি তস্মাৎ ত্বাং চোদয়াম্যহম্॥ (মহাভারত, শান্তিপর্ব ৪৬।২৩)

ঢোলকের মতো কিন্তু ঢোলকের থেকে বড় হয়। কোনো কর্মের প্রারম্ভে এটি বাজানো গণেশ পূজার সমান মাঙ্গলিক কার্য বলে মনে করা হয়। **'আনক'** বলা হয় মৃদঙ্গকে। এটির অপর নাম পাখোয়াজ। আকারে এটি কাষ্ঠনির্মিত ঢোলকের ন্যায়। এটি মৃত্তিকা-নির্মিত ও চর্ম আচ্ছাদিত এবং এটি বাদিত হয় হস্ত দ্বারা। নরসিঙ্গাকে বলা হয় **'গোমুখ'**। এটি সর্পের ন্যায় বক্রাকার এবং মুখটি গরুর ন্যায়। এটি মুখের ফুৎকার দ্বারা বাদিত হয়।

'সহসৈবাভ্যহন্যন্ত'[১]—কৌরবসৈন্যদের যুদ্ধোন্মাদনা প্রবল ছিল। তাই পিতামহ ভীষ্মের শঙ্খ বেজে উঠতেই কৌরবসেনাদের সমস্ত বাদ্য সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠল। এগুলি বাজাতে একটুও দেরি হয়নি এবং বাজাতে কোনো পরিশ্রমও অনুভূত হয়নি।

'স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ'—পৃথক পৃথক ভাবে নানা ব্যূহে দণ্ডায়মান কৌরবসৈন্যদের শঙ্খ ইত্যাদি বাদ্য ভয়ংকর শব্দ করে বেজে উঠল অর্থাৎ সেই শব্দের ঝংকার প্রচণ্ডভাবে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

*** *** ***

সম্বন্ধ—এই অধ্যায়ের প্রারম্ভেই ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে আমার এবং পাণ্ডুর পুত্রেরা কী করল ? তাই সঞ্জয় দ্বিতীয় শ্লোক থেকে ত্রয়োদশ শ্লোক পর্যন্ত 'ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ কী করল'—তারই উত্তর দিলেন। এখন পরের শ্লোকগুলিতে 'পাণ্ডুর পুত্রগণ কী করল'—সঞ্জয় তার উত্তর দিচ্ছেন।

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ॥ ১৪ ॥

[**ততঃ** (তারপর) ; **শ্বেতৈঃ হয়ৈঃ** (শ্বেত অশ্ব) ; **যুক্তে** (বাহিত) ; **চ** (এবং) ; **পাণ্ডবঃ** (পাণ্ডুপুত্র অর্জুন) ; **এব** (ও) ; **মহতি স্যন্দনে** (সুন্দর রথে) ; **স্থিতৌ** (উপবিষ্ট) ; **মাধবঃ** (লক্ষ্মীপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) ; **দিব্যৌ** (দিব্য) ; **শঙ্খৌ** (শঙ্খগুলি) ; **প্রদধ্মতুঃ** (উচ্চৈঃস্বরে বাজালেন।)]

তারপর শ্বেত অশ্ববাহিত সুন্দর রথে উপবিষ্ট লক্ষ্মীপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং পাণ্ডুপুত্র অর্জুন তাঁদের দিব্য শঙ্খগুলি উচ্চৈঃস্বরে বাজালেন ॥ ১৪ ॥

ব্যাখ্যা—'ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে'—গন্ধর্ব চিত্ররথ অর্জুনকে একশত দিব্য ঘোড়া দিয়েছিলেন। এই ঘোড়াগুলির বিশেষত্ব ছিল এই যে এরা যুদ্ধে নিহত হলেও কখনোই সংখ্যায় কমত না, অর্থাৎ সবসময়ই পুরো একশত থাকত। এরা পৃথিবী বা স্বর্গ যে কোনো স্থানেই বিচরণ করতে পারত। এদের মধ্য থেকেই চারটি সুন্দর সুশিক্ষিত সাদা ঘোড়া অর্জুনের রথকে চালিত করার জন্য যুক্ত করা হয়েছিল।

'মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ'—যজ্ঞের অগ্নিতে ঘৃত আহুতি দেওয়া হয়, অগ্নিদেব একবার এই ঘৃত আহার করতে করতে অজীর্ণ রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তাই অগ্নিদেব খাণ্ডববন গ্রাস করে (জ্বালিয়ে) নিজ অজীর্ণ রোগ দূর করতে চেয়েছিলেন। কারণ খাণ্ডববনের বহু জড়ি-বুটি হল অজীর্ণের ঔষধস্বরূপ। কিন্তু দেবতাগণ ওই বনের রক্ষক থাকায় অগ্নিদেব এই কার্যে সফল হননি। তিনি যখনই খাণ্ডববন দহন করতে শুরু করেন, তখনই বর্ষার দেবতা ইন্দ্র বৃষ্টির জলে অগ্নি নির্বাপিত করে দেন। শেষকালে অর্জুনের সহায়তায় অগ্নিদেব সমস্ত বনটি দহন করে তাঁর অজীর্ণ রোগ দূর করেন এবং প্রসন্ন হয়ে অর্জুনকে এই বিরাট রথটি উপহার দেন। ন'টি বলদবাহিত শকটে যত অস্ত্রশস্ত্র বহন করা যায়, এই রথটিতে ততটাই বহন করা যেত। রথটি স্বর্ণমণ্ডিত এবং তেজোময়, এর

[১] কর্মকে অত্যন্ত সহজভাবে পরিস্ফুট করবার জন্য যেখানে কর্ম ইত্যাদিকেই কর্তারূপে স্থাপিত করা হয়, সেটিকে **'কর্মকর্তৃ'** প্রয়োগ বলা হয়। যেমন কেউ কাঠ কাটছে, এটিকে সহজভাবে বোঝাবার জন্য 'কাঠ চেরাই হচ্ছে' এরূপ প্রয়োগ করা হয়। সেই রূপই যেখানে 'বাদ্য বাজানো হয়েছে' এরূপ প্রয়োগ করা উচিত ছিল, কিন্তু বাদ্য বাদনকে সহজ বোঝাবার জন্য, সেনাদের উৎসাহ বোঝাবার জন্য 'বাদ্যগুলি বেজে উঠল' এরূপ প্রয়োগ করা হয়েছে।

চাকাগুলি ছিল বিশাল ও দৃঢ় এবং ধ্বজাটি বিদ্যুতের মতো ঝলক দিত। রথের ধ্বজাটি এক যোজন (চার ক্রোশ) দূর থেকে দেখা যেত, কিন্তু তা সত্ত্বেও এটি রথের ভারস্বরূপ ছিল না বা কোথাও থেমে যেত না কিংবা বৃক্ষ ইত্যাদিতে আটকিয়ে যেত না। ধ্বজাটির ওপর হনুমান বিরাজমান ছিলেন।

'স্থিতৌ' বলার তাৎপর্য এই যে, সেই সুন্দর এবং তেজোময় রথে সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর প্রিয় ভক্ত অর্জুন বিরাজমান থাকায় রথটির শোভা এবং তেজ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

'মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব'—'মা' লক্ষ্মীদেবীকে বলা হয়; 'ধব' হচ্ছেন তাঁর স্বামী। সুতরাং **'মাধব'** হলেন 'লক্ষ্মীপতি'। এখানে 'পাণ্ডব' অর্থে অর্জুনকে বোঝাচ্ছে; কারণ সমস্ত পাণ্ডব যোদ্ধাগণের মধ্যে অর্জুনই হলেন প্রধান ব্যক্তি—**'পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ'** (গীতা ১০।৩৭)

অর্জুন হলেন 'নর' এবং শ্রীকৃষ্ণ 'নারায়ণ' নামক দুই 'আপ্তকাম' ঋষির অবতার। মহাভারতের সমস্ত পর্ব আরম্ভের সময় নর (অর্জুন) এবং নারায়ণকে (ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে) নমস্কার করা হয়েছে—**'নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্'**। এই দৃষ্টিতে পাণ্ডবসৈন্যদের মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন—এই দুজন হলেন প্রধান। সঞ্জয়ও গীতার শেষে বলেছেন যে, 'যেস্থানে যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং গাণ্ডীব ধনুকধারী অর্জুন থাকবেন, সেখানেই সৌন্দর্য, বিজয়, বিভূতি এবং অটল নীতি বিরাজ করবে' (১৮।৭৮)।

'দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ'—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের কাছে যে শঙ্খ ছিল সেগুলি তেজোময় এবং অলৌকিক। সেগুলি তাঁরা অত্যন্ত জোরে বাজিয়েছিলেন।

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে, কৌরবপক্ষের প্রধান সেনাপতি ছিলেন পিতামহ ভীষ্ম, সেইজন্য তিনি যে সর্বপ্রথম শঙ্খধ্বনি করেছিলেন তা উচিত কাজ হয়েছিল। কিন্তু পাণ্ডবসৈন্যদলের প্রধান সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন থাকতেও সারথিরূপী শ্রীকৃষ্ণ কেন সর্বপ্রথম শঙ্খধ্বনি করেছিলেন ? এর উত্তর হচ্ছে যে ভগবান সারথি হন বা মহারথী হন, তাঁর প্রাধান্য কখনো কম হয় না। তিনি যে পদেই থাকুন, সর্বদাই সর্বোত্তম হয়ে থাকেন। কারণ তিনি হচ্ছেন অচ্যুত, যিনি কখনো চ্যুত হন না। পাণ্ডব সৈন্যদলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই ছিলেন প্রধান ব্যক্তি এবং তিনিই ছিলেন সবকিছুর পরিচালক। শ্রীকৃষ্ণ যখন ছোটো ছিলেন তখনও নন্দ, উপনন্দ প্রমুখ সকলেই তাঁর কথা শুনতেন। সেইজন্যই তাঁরা বালক শ্রীকৃষ্ণের কথায় বংশানুক্রমে চলে আসা ইন্দ্রপূজা বন্ধ করে গোবর্ধনের পূজা করতে আরম্ভ করেছিলেন। অর্থাৎ ভগবান যে কোনো অবস্থায়, যে কোনো স্থানে এবং যেখানেই অবস্থান করুন, সেখানে তিনি মুখ্য রূপেই বিরাজ করেন। সেইজন্যই ভগবান পাণ্ডবসেনাদের হয়ে সর্বপ্রথম শঙ্খধ্বনি করেন।

যে নিজে ছোট, তাকেই উচ্চস্থানে নিযুক্ত করা হলে বড় বলে মান্য করা হয়। আর যে উচ্চস্থানে থেকে নিজেকে বড় বলে মনে করে, প্রকৃতপক্ষে সেই ছোট হয়। কিন্তু যে নিজে বড়, সে যেস্থানেই থাকুক না কেন, সেই স্থান তার জন্যই বড় হয়ে ওঠে। যেমন ভগবান সারথির স্থান অধিগ্রহণ করায় সেই 'সারথি' পদটিও উচ্চ বলে পরিগণিত হয়েছে।

*** *** ***

সম্বন্ধ—পরবর্তী চারটি শ্লোকে পূর্বশ্লোকটির বিস্তারিত বিবরণ দিতে গিয়ে সঞ্জয় অন্যান্যদের শঙ্খধ্বনির বর্ণনা করছেন।

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ॥ ১৫॥

[**হৃষীকেশঃ** (অন্তর্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) ; **পাঞ্চজন্যম্** (পাঞ্চজন্য) ; **ধনঞ্জয়ঃ** (ধনঞ্জয়) ; **দেবদত্তম্** (দেবদত্ত নামক শঙ্খ বাজালেন) ; **ভীমকর্মা** (ভীষণকর্ম করার উপযুক্ত) ; **বৃকোদরঃ** (বৃকোদর ভীম) ; **পৌণ্ড্রম্** (পৌণ্ড্র নামক) ; **মহাশঙ্খম্** (মহাশঙ্খ) ; **দধ্মৌ** (বাজালেন।)]

অন্তর্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য এবং ধনঞ্জয় অর্জুন দেবদত্ত নামক শঙ্খ বাজালেন এবং ভীতি-

উৎপাদক কর্মকারী বৃকোদর ভীম পৌণ্ড্র নামক মহাশঙ্খ বাজালেন ॥ ১৫ ॥

ব্যাখ্যা—**'পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশঃ'**—সকলের অন্তর্যামী অর্থাৎ সকলের হৃদয়ের কথা যিনি জানেন সেই সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের পক্ষে থেকে 'পাঞ্চজন্য' নামক শঙ্খ বাজালেন। পঞ্চজন নামক শঙ্খরূপধারী দৈত্যকে বধ করে ভগবান তাকে শঙ্খরূপে গ্রহণ করেছিলেন, তাই এই শঙ্খের নাম হল পাঞ্চজন্য।

'দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ'— রাজসূয় যজ্ঞের সময় অর্জুন বহু রাজাকে পরাজিত করে অনেক ধন-সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন। তাই তাঁর নাম হয়েছিল 'ধনঞ্জয়'[১]। নিবাত, কবচ ইত্যাদি দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় ইন্দ্র অর্জুনকে 'দেবদত্ত' নামক শঙ্খ প্রদান করেন। এই শঙ্খধ্বনি অত্যন্ত জোরে হত, যার ফলে শত্রুসৈন্য ভীতচকিত হত। এই শঙ্খটি অর্জুন বাজালেন।

'পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ'— হিড়িম্বাসুর, বকাসুর, জটাসুর ইত্যাদি অসুর এবং কীচক, জরাসন্ধ ইত্যাদি শক্তিশালী বীরদের হত্যা করায় ভীমসেনের নাম হয়েছিল 'ভীমকর্মা'। তাঁর উদরে জঠরাগ্নি ভিন্ন 'বৃক' নামক একটি বিশেষ অগ্নি ছিল, যার জন্য তিনি অত্যধিক খাদ্য হজম করতে পারতেন। সেইজন্য তাঁর আরেকটি নাম হয়েছিল 'বৃকোদর'। এইরূপ বীর ভীমকর্মা বৃকোদর ভীমসেন এক বিশাল আকারের শঙ্খ বাজালেন, যার নাম 'পৌণ্ড্র'।

***

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬ ॥

[**কুন্তীপুত্রঃ** (কুন্তীপুত্র) ; **রাজা** (রাজা) ; **যুধিষ্ঠিরঃ** (যুধিষ্ঠির) ; **অনন্তবিজয়ম্** (অনন্তবিজয়) ; **নকুলঃ** (নকুল) ; **চ** (এবং) ; **সহদেবঃ** (সহদেব) ; **সুঘোষমণিপুষ্পকৌ** (সুঘোষ এবং মণিপুষ্পক ।)]

কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় নামক শঙ্খ বাজালেন এবং নকুল ও সহদেব সুঘোষ এবং মণিপুষ্পক নামক শঙ্খ বাজালেন ॥ ১৬ ॥

ব্যাখ্যা—**'অনন্তবিজয়ং রাজা.........সুঘোষ মণি-পুষ্পকৌ'**—অর্জুন, ভীম এবং যুধিষ্ঠির—এই তিনজন ছিলেন কুন্তীর পুত্র এবং নকুল ও সহদেব—এই দুজন ছিলেন মাদ্রীর পুত্র। এইটি বোঝাবার জন্যই এইস্থানে যুধিষ্ঠিরের জন্য 'কুন্তীপুত্র' বিশেষণটি প্রয়োগ করা হয়েছে।

যুধিষ্ঠিরকে রাজা বলার তাৎপর্য এই যে যুধিষ্ঠির বনবাসে যাওয়ার পূর্বে নিজেদের অর্ধরাজ্যের (ইন্দ্রপ্রস্থের) রাজা ছিলেন এবং নিয়মানুযায়ী দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের পরে তাঁর রাজা হওয়ারই কথা ছিল। 'রাজা' বিশেষণ প্রয়োগ করে সঞ্জয় এই ইঙ্গিত দিলেন যে পরে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সম্পূর্ণ পৃথিবীর নরপতি হবেন।

***

কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭ ॥
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮ ॥

---

[১] সর্বাঞ্জনপদাঞ্জিত্বা বিত্তমাদায় কেবলম্। মধ্যে ধনস্য তিষ্ঠামি তেনাহুর্মাং ধনঞ্জয়ম্॥ (মহাভারত, বিরাটপর্ব ৪৪।১৩)

[পৃথিবীপতে (হে রাজন্ !) ; **পরমেষ্বাসঃ** (শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধারী) ; **কাশ্যঃ** (কাশীরাজ) ; **চ** (এবং) ; **মহারথঃ শিখণ্ডী** (মহারথী শিখণ্ডী) ; **চ** (ও) ; **ধৃষ্টদ্যুম্নঃ** (ধৃষ্টদ্যুম্ন) ; **চ** (এবং) ; **বিরাটঃ** (রাজা বিরাট) ; **অপরাজিতঃ** (অপরাজেয়) ; **সাত্যকিঃ** (সাত্যকি) ; **দ্রুপদঃ** (রাজা দ্রুপদ) ; **চ** (এবং) ; **দ্রৌপদেয়াঃ** (দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র) ; **চ মহাবাহুঃ** (এবং দীর্ঘবাহুসম্পন্ন) ; **সৌভদ্রঃ** (সুভদ্রাপুত্র অভিমন্যু) ; **সর্বশঃ** (চতুর্দিক থেকে) ; **পৃথক্ পৃথক্** (পৃথকভাবে) ; **শঙ্খান্** (শঙ্খগুলি) ; **দধ্মুঃ** (বাজালেন ।)]

হে রাজন্ ! শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধারী কাশীরাজ এবং মহারথী শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং রাজা বিরাট, অপরাজেয় সাত্যকি, রাজা দ্রুপদ এবং দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, দীর্ঘবাহুসম্পন্ন সুভদ্রাপুত্র অভিমন্যু—এঁরা সকলে চতুর্দিক থেকে পৃথক্ পৃথকভাবে (নিজ নিজ) শঙ্খধ্বনি করলেন ॥ ১৭-১৮ ॥

ব্যাখ্যা—**'কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ .... শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্'**—মহারথী শিখণ্ডী খুবই বড় যোদ্ধা ছিলেন। ইনি পূর্বজন্মে নারী (কাশীরাজের কন্যা অম্বা) ছিলেন এবং এই জন্মে দ্রুপদরাজার পুত্রীরূপে জন্ম নেন। পরে এই শিখণ্ডী স্থূণাকর্ণ নামক যক্ষর কাছ থেকে পুরুষত্ব প্রাপ্ত হন। ভীষ্ম এই সমস্ত তথ্যই জানতেন, তাই তিনি শিখণ্ডীকে নারী হিসাবেই দেখতেন। সেইজন্যই তিনি শিখণ্ডীর প্রতি শরনিক্ষেপ করতেন না। যুদ্ধকালে অর্জুন এঁকে সামনে রেখে ভীষ্মের প্রতি শরনিক্ষেপ করে ভীষ্মকে ভূপাতিত করেন।

অর্জুনের পুত্র অভিমন্যুও খুব বড় যোদ্ধা ছিলেন। যুদ্ধের সময় ইনি দ্রোণ রচিত চক্রব্যূহে প্রবেশ করে নিজ পরাক্রমে বহু বীরের প্রাণসংহার করেন। শেষে কৌরব-সেনাদের ছয়জন মহারথী এঁকে অন্যায়ভাবে ঘিরে ধরে অস্ত্রাঘাত করতে থাকেন। দুঃশাসনের পুত্র তাঁর মস্তকে গদাঘাত করলে তাঁর মৃত্যু হয়।

শঙ্খবাদন বর্ণনকালে সঞ্জয় কৌরবসেনাদের যোদ্ধাদের মধ্যে শুধু ভীষ্মের নামই করেছিলেন এবং পাণ্ডবসেনাদের যোদ্ধাদের মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, ভীম প্রমুখ আঠারোজন বীরের কথা বলেছিলেন। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, সঞ্জয়ের মনেও অধর্মের (কৌরবসেনার) প্রতি কোনো শ্রদ্ধা ছিল না। সেইজন্য তিনি অধর্মের পক্ষের বেশি বিবরণ দেওয়া উচিত বলে মনে করেননি। কিন্তু তাঁর মনে ধর্মের (পাণ্ডবসেনাদের) প্রতি শ্রদ্ধা থাকায় এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং পাণ্ডবদের প্রতি শ্রদ্ধাভাব থাকায় সঞ্জয় এঁদের পক্ষের বর্ণনা করাই বেশি উচিত বলে মনে করেছিলেন । তাই তাঁদের পক্ষের বর্ণনা করাতেই তাঁর আনন্দ হচ্ছিল।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—পাণ্ডবসৈন্যদের শঙ্খধ্বনি কৌরবসেনাদের ওপর কী প্রভাব বিস্তার করেছিল—পরের শ্লোকে তা জানানো হয়েছে।

স ঘোষো ধার্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীং চৈব তুমুলো ব্যনুনাদয়ন্॥ ১৯ ॥

[**চ** (এবং) ; **সঃ** (সেই) ; **তুমুলঃ** (ভয়ংকর) ; **ঘোষঃ** (ধ্বনি) ; **পৃথিবীম্** (পৃথিবী) ; **চ** (এবং) ; **নভঃ** (আকাশে) ; **এব** (ও) ; **ব্যনুনাদয়ন্** (এমনভাবে প্রতিধ্বনিত হল যে) ; **ধার্তরাষ্ট্রাণাম্** (অন্যায়পূর্বক রাজ্য দখলকারী দুর্যোধন ও তার সহযোদ্ধাদের) ; **হৃদয়ানি** (হৃদয়) ; **ব্যদারয়ৎ** (বিদীর্ণ হয়ে উঠল ।)]

পাণ্ডবসেনাদের শঙ্খের সেই ভয়ংকর ধ্বনি পৃথিবী ও আকাশে এমনভাবে ধ্বনিত হল যে, অন্যায়পূর্বক রাজ্য দখলকারী দুর্যোধন ও তাঁর সহযোদ্ধাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেল॥ ১৯ ॥

ব্যাখ্যা—**'স ঘোষো ধার্তরাষ্ট্রাণাং .... তুমুলো ব্যনুনাদয়ন্'**—পাণ্ডবসেনাদের সেই শঙ্খধ্বনি এমন বিশাল, গম্ভীর এবং উচ্চস্বরসম্পন্ন ছিল যে তাতে (ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে) পৃথিবী এবং আকাশের মধ্যভাগ

ভয়ংকরভাবে স্পন্দিত হয়ে উঠল। সেই ভীষণ শব্দে অন্যায়পূর্বক রাজ্যদখলকারীদের এবং তাঁদের সাহায্যের জন্য (তাঁদের পক্ষের) দণ্ডায়মান রাজাদের হৃদয় বিদীর্ণ হল। অর্থাৎ অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা বিদীর্ণ হৃদয় যেমন পীড়িত হয়, এই শঙ্খধ্বনির ভয়ংকর আওয়াজেও হৃদয় সেইরূপ পীড়িত হল। সেই শঙ্খধ্বনিতে কৌরবসেনাদের হৃদয়ে যুদ্ধের জন্য যে উৎসাহ, বল ইত্যাদি ছিল তা নিমেষে অন্তর্হিত হল এবং পাণ্ডবসেনাদের প্রতি তাদের ভীতি উৎপন্ন হল।

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে এই ঘটনা শোনাচ্ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের মুখের উপর সঞ্জয়ের দ্বারা তাকে এরূপ বলা 'ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের এবং আত্মীয়গণের হৃদয় বিদীর্ণ করে দিল'—এই কথা শিষ্টাচারযুক্ত এবং যুক্তিসংগত বলে মনে হয় না। কাজেই সেক্ষেত্রে সঞ্জয়ের **'ধার্তরাষ্ট্রাণাম্'** না বলে **'তাবকীনানাম্'** (আপনার পুত্রগণ এবং আত্মীয়গণের) এরূপ বলাই উচিত ছিল, কারণ এরূপ বলাই ভদ্রতা। সেই দৃষ্টিতে দেখলে এখানে **'ধার্তরাষ্ট্রাণাম্'** পদের অর্থ 'যারা অন্যায়ভাবে রাজ্য অধিকার করেছেন'[১]—এরূপ অর্থ করা যুক্তিসংগত এবং শিষ্টতাপূর্ণ বলে মনে হয়। অন্যায়ের পথ গ্রহণ করাতেই এঁদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়েছিল, এই দৃষ্টিতেও এই অর্থ গ্রহণ করা যুক্তিসংগত বলে মনে হয়।

এখানে প্রশ্ন আসে যে কৌরবগণের এগারো অক্ষৌহিণী[২] সৈন্যের শঙ্খ ইত্যাদি নানা বাদ্যযন্ত্র বাদিত হলে সেই শব্দের প্রভাব পাণ্ডবদের ওপর একটুও পড়েনি। কিন্তু পাণ্ডবদের মাত্র সাত অক্ষৌহিণী সেনার শঙ্খ বাজলে সেই শব্দে কৌরবসেনাদের হৃদয় কেন বিদীর্ণ হল ? এর উত্তর হচ্ছে, এই যে অধর্ম, পাপ বা অন্যায় যাঁর হৃদয়ে নেই অর্থাৎ যিনি ধর্ম অনুযায়ী নিজ কর্তব্য পালন করেন তাঁর হৃদয় দৃঢ় হয়, তাঁর হৃদয়ে ভীতি থাকে না। ন্যায়ের পক্ষে থাকায় তাঁর মধ্যে উৎসাহ থাকে, শৌর্য থাকে। বনবাসে যাওয়ার আগেও পাণ্ডবেরা ন্যায় এবং ধর্ম অনুযায়ী রাজ্য পালন করতেন এবং বনবাসের পরেও নিয়ম অনুসারে কৌরবদের কাছে ন্যায়সংগতভাবে রাজ্য ফেরত চেয়েছিলেন। তাই তাঁদের মনে কোনোপ্রকার ভীতি ছিল না, বরং উৎসাহ ছিল, শৌর্য ছিল। অর্থাৎ পাণ্ডবগণ ধর্মের পক্ষেই ছিলেন। সেইজন্যই কৌরবদের একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের বাদ্যযন্ত্রের মিলিত আওয়াজ তাঁদের ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। কিন্তু যারা অধর্ম, পাপ, অন্যায় করে, তাদের হৃদয় স্বাভাবিকভাবেই দুর্বল হয়। তাদের হৃদয় নির্ভয় এবং শঙ্কাহীন হয় না। তাদের নিজকৃত পাপ এবং অন্যায়ই তাদের হৃদয় দুর্বল করে ফেলে। অধর্মই অধার্মিককে শেষ করে। দুর্যোধনাদি ভ্রাতাগণ পাণ্ডবদের অন্যায়ভাবে হত্যা করার অনেক চেষ্টা করেছে। ছল-চাতুরি দ্বারা অন্যায়ভাবে পাণ্ডবদের রাজ্য ছিনিয়ে নিয়েছে এবং তাদের বহু কষ্টও দিয়েছে। সেইজন্যই তাদের হৃদয় সন্ত্রস্ত এবং দুর্বল হয়েছে। অর্থাৎ কৌরবগণ অধর্মের পক্ষেই ছিলেন। সেইজন্য পাণ্ডবদের মাত্র সাত অক্ষৌহিণী সৈন্যের শঙ্খধ্বনিতেই তাঁদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়েছিল, তাঁদের মনে ভীতি জন্মেছিল।

এই প্রসঙ্গের দ্বারা সাধকদের সাবধান থাকা উচিত যে শরীর, বাক্য ও মনের দ্বারা যেন কোনো অন্যায় এবং অধর্ম আচরণ করা না হয়। অন্যায় ও অধর্মপূর্ণ আচরণের ফলে মানুষের হৃদয় শক্তিহীন ও দুর্বল হয়ে পড়ে। তাতে হৃদয়ে

---

[১] 'অন্যায়েন ধৃতং রাষ্ট্রং যৈস্তে ধৃতরাষ্ট্রাঃ' এইরূপ বহুব্রীহি সমাস করার পর 'ধৃতরাষ্ট্রা এব' এই বিগ্রহের স্বার্থে তদ্ধিতের 'অণ্' প্রত্যয় করা হয়েছে, যাতে 'ধার্তরাষ্ট্রাঃ' এইরূপ সৃষ্ট হয়েছে। এখানে ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা হওয়ায় ষষ্ঠীতে 'ধার্তরাষ্ট্রাণাম্' এরূপ প্রয়োগ করা হয়েছে।

[২] দুর্যোধনের পক্ষে একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য হওয়া সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু পাণ্ডবগণ যখন বনবাসে চলে গেলেন, তখন দুর্যোধন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মতো করে রাজ্য চালাতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির যেমন নিজের কর্তব্য মনে করে প্রজাদের সুখে রাখবার জন্য ধর্ম এবং ন্যায়সংগত উপায়ে রাজ্য চালাতেন, দুর্যোধনও তেমনি নিজ রাজ্য স্থাপিত করার জন্য, নিজ প্রভাব বিস্তার করার জন্য প্রজাদের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের মতো ব্যবহার করতে লাগলেন। ত্রয়োদশ বৎসর ধরে প্রজাদের সঙ্গে সুব্যবহার করার ফলে যুদ্ধে বহু সেনা দুর্যোধনের পক্ষে যোগদান করে, যারা আগে পাণ্ডবদের পক্ষে ছিল এবং তাঁদেরই ভালোবাসত। নয় অক্ষৌহিণী সেনা এইভাবে দুর্যোধনের সুব্যবহারের ফলে জমায়েত হয়েছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে এক অক্ষৌহিণী নারায়ণীসেনা দিয়েছিলেন এবং মদ্ররাজ শল্যের এক অক্ষৌহিণী সেনা কুশলতাপূর্বক দুর্যোধন নিজ পক্ষে করে নিয়েছিলেন, যাঁরা আসলে পাণ্ডবের পক্ষে ছিলেন। সেইজন্যই দুর্যোধনের পক্ষে এগারো অক্ষৌহিণী সেনা এবং পাণ্ডবদের পক্ষে সাত অক্ষৌহিণী সেনা ছিল।

ভীতি উৎপন্ন হয়। উদাহরণ হিসাবে আরও বলা যায়, লঙ্কাধিপতি রাবণকে ত্রিলোকের সকলেই ভয় পেত। কিন্তু সেই রাবণ যখন সীতাকে হরণ করতে যাচ্ছিলেন তখন ভয় পেয়ে ইতিউতি দেখছিলেন[১]।

তাই সাধকদের অন্যায় ও অধর্মপূর্ণ ব্যবহার করা কখনো উচিত নয়।

* * *

সম্বন্ধ—ধৃতরাষ্ট্র প্রথম শ্লোকে নিজের এবং পাণ্ডুপুত্রদের বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। দ্বিতীয় শ্লোক থেকে ঊনবিংশ শ্লোক পর্যন্ত সঞ্জয় তার উত্তর দিলেন। সঞ্জয় এবার পরের শ্লোক থেকে ভগবদ্গীতার প্রকটিত হবার প্রসঙ্গ শুরু করলেন।

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ॥ ২০ ॥
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে।

[**মহীপতে** (হে মহীপতে ধৃতরাষ্ট্র !) ; **অথ** (এবার) ; **শস্ত্রসম্পাতে** (শস্ত্রাঘাত) ; **প্রবৃত্তে** (শুরু হবার প্রস্তুতি চলছে) ; **তদা** (সেইসময়) ; **কপিধ্বজঃ** (কপিধ্বজ) ; **পাণ্ডবঃ** (পাণ্ডুপুত্র অর্জুন) ; **ধনুঃ** (গাণ্ডীব) ; **উদ্যম্য** (তুলে নিয়ে) ; **ধার্তরাষ্ট্রান্** (অন্যায়ভাবে রাজ্যদখলকারী রাজন্যবর্গ এবং তাদের সঙ্গীদের) ; **ব্যবস্থিতান্** (ব্যবস্থিত রূপে সম্মুখে দণ্ডায়মান) ; **দৃষ্ট্বা** (দেখে) ; **হৃষীকেশম্** (হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণকে) ; **ইদম্** (এই) ; **বাক্যম্** (কথা) ; **আহ** (বললেন।)]

হে মহীপতে ধৃতরাষ্ট্র ! এবার যখন শস্ত্রাঘাত শুরু হবার প্রস্তুতি চলছে, সেই সময় কপিধ্বজ রথোপবিষ্ট পাণ্ডুপুত্র অর্জুন নিজ গাণ্ডীব তুলে নিয়ে সম্মুখে অন্যায়ভাবে রাজ্য দখলকারী রাজন্যবর্গ এবং তাদের সঙ্গীদের ব্যবস্থিতরূপে দণ্ডায়মান দেখে অন্তর্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বললেন— ॥ ২০ ॥

ব্যাখ্যা—**'অথ'**—অর্থাৎ এবার সঞ্জয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের কথোপকথনরূপ 'ভগবদ্গীতা' শুরু করেন। অষ্টাদশ অধ্যায়ের চুয়াত্তরতম শ্লোকে উদ্ধৃত **'ইতি'** পদ দ্বারা এই কথা সমাপ্ত হয়েছে। এইরকমই দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশ শ্লোক থেকে ভগবদ্গীতার উপদেশ আরম্ভ হয়েছে এবং সেই উপদেশ শেষ হয়েছে অষ্টাদশ অধ্যায়ের ছেষট্টিতম শ্লোকে।

'প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে'—যদিও পিতামহ ভীষ্ম দুর্যোধনকে প্রসন্ন করবার জন্যই শঙ্খধ্বনি করেছিলেন, যুদ্ধারম্ভের ঘোষণার জন্য করেননি তবুও কৌরব ও পাণ্ডব উভয়পক্ষের সেনাগণই একে যুদ্ধারম্ভের ঘোষণা মনে করে অস্ত্রশস্ত্র ঠিক করে হাতে নিয়ে তৈরী হয়ে দাঁড়াল। সেনাদের অস্ত্র ওঠাতে দেখে বীরত্বের প্রতিমূর্তি অর্জুনও নিজ গাণ্ডীব ধনুক হাতে তুলে নিলেন।

'ব্যবস্থিতান্ ধার্তরাষ্ট্রান্ দৃষ্ট্বা'—এই পদটিতে সঞ্জয় বলতে চেয়েছেন যে, 'যখন আপনার পুত্র দুর্যোধন পাণ্ডবসেনাদের দেখল তখন সে দৌড়ে দ্রোণাচার্যের কাছে গেল'। কিন্তু অর্জুন যখন কৌরবসেনাদের দেখলেন, তিনি তখন সোজা গাণ্ডীব ধনুক ধরলেন—**'ধনুরুদ্যম্য'**। এর দ্বারাই বোঝা যায় যে দুর্যোধনের মধ্যে ভয় এবং অর্জুনের মধ্যে অভয়, উৎসাহ ও বীরত্ব ছিল।

'কপিধ্বজঃ'—অর্জুনের নামের সঙ্গে **'কপিধ্বজ'** বিশেষণ দিয়ে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে অর্জুনের রথের ধ্বজায় বিরাজমান হনুমানের কথা স্মরণ করাচ্ছেন। পাণ্ডবগণ

---

[১]সূন বীচ দসকন্ধর দেখা। আবা নিকট জতী কেঁ বেষা॥
জাকেঁ ডর সুর অসুর ডেরাহীঁ। নিসি ন নীদ দিন অন্ন ন খাহীঁ॥
সো দসসীস স্বান কি নাঈঁ। ইত উত চিতই চলা ভড়িহাঈঁ॥
ইমি কুপন্থ পগ দেত খগেসা। রহ ন তেজ তন বুদ্ধি বল লেসা॥ (শ্রীরামচরিতমানস ৩।২৮।৪-৫)

যখন বনবাসে ছিলেন, তখন অকস্মাৎ একদিন হাওয়ায় একটি সহস্রদল কমল এসে দ্রৌপদীর সামনে পড়ল। সেটি দেখে দ্রৌপদী অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে ভীমকে বললেন— 'বীরবর, আমাকে এইরূপ আরও ফুল এনে দিন।' দ্রৌপদীর ইচ্ছাপূরণ করতে ভীম সেখান থেকে যাত্রা করলেন। ভীম যখন কদলীবনে পৌঁছালেন, সেখানে তাঁর সঙ্গে হনুমানের দেখা হল। তখন তাঁদের দুজনের পরিচয় বিনিময় হয়। শেষে হনুমান ভীমকে বরপ্রার্থনা করতে বললেন। ভীম বললেন, 'আমার ওপর আপনার কৃপা যেন বজায় থাকে।' তখন হনুমান বললেন, 'হে বায়ুপুত্র! যখন তুমি বাণ এবং শক্তির আঘাতে ব্যাকুল শত্রুসৈন্য মধ্যে ঢুকে সিংহনাদ করবে, সেই সময় আমি গর্জন করে সেই সিংহনাদকে আরও ভীষণ করে তুলব। তাছাড়াও অর্জুনের রথের ধ্বজায় থেকে আমি সময়মতো এমন ভয়ংকর গর্জন করব যে শত্রুদের প্রাণসংশয় ঘটে, যার ফলে তোমরা অত্যন্ত সহজেই শত্রুদের বধ করতে সক্ষম হবে[১]।' এইরূপ যাঁর রথের ধ্বজায় হনুমান বিরাজ করেন, তাঁর বিজয় সুনিশ্চিত।

'পাণ্ডবঃ'—ধৃতরাষ্ট্র তাঁর প্রশ্নে **'পাণ্ডবাঃ'** পদের প্রয়োগ করেছেন। সেইজন্য ধৃতরাষ্ট্রকে বারংবার পাণ্ডবদের কথা স্মরণ করাবার জন্য সঞ্জয় (১।১৪ এবং এখানে) **'পাণ্ডবঃ'** শব্দটি প্রয়োগ করেছেন।

'হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে'—পাণ্ডবসেনা দেখে দুর্যোধন গুরু দ্রোণাচার্যের নিকট গিয়ে চাতুরিপূর্ণ কথা বলতে লাগলেন, কিন্তু অর্জুন কৌরবসেনা দেখে—যিনি জগদ্গুরু, অন্তর্যামী, মন-বুদ্ধি ইত্যাদির প্রেরক—সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে শৌর্য, উৎসাহ এবং কর্তব্যপূর্ণ (পরে কথিত) বাক্য বললেন।

※ ※ ※

অর্জুন উবাচ

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত॥ ২১ ॥
যাবদেতান্ নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে॥ ২২ ॥

[**অচ্যুত** (হে অচ্যুত !) ; **উভয়োঃ** (উভয়) ; **সেনয়োঃ** (সেনার) ; **মধ্যে** (মধ্যে) ; **মে** (আমার) ; **রথম্** (রথটিকে) ; **স্থাপয়** (স্থাপিত করে রাখুন) ; **যাবৎ** (যতক্ষণ) ; **অহম্** (আমি) ; **এতান্ নিরীক্ষে** (এঁদের দেখি) ; **যোদ্ধুকামান্** (যুদ্ধেচ্ছায় এখানে) ; **অবস্থিতান্** (কারা উপস্থিত হয়েছেন) ; **অস্মিন্** (এই) ; **রণসমুদ্যমে** (যুদ্ধে) ; **ময়া** (আমাকে) ; **কৈঃ** (কার কার) ; **সহ** (সঙ্গে) ; **যোদ্ধব্যম্** (যুদ্ধ করতে হবে।)]

অর্জুন বললেন— 'হে অচ্যুত ! উভয় সেনার মধ্যে আপনি রথটিকে ততক্ষণ স্থাপন করুন, যতক্ষণ না আমি দেখি যুদ্ধেচ্ছায় কারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন এবং এই রণাঙ্গনে কার কার সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করতে হবে।' ॥ ২১-২২ ॥

ব্যাখ্যা—'অচ্যুত সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয়'—উভয়পক্ষের সৈন্যদল যেখানে যুদ্ধ করবার জন্য এক পক্ষ অপর পক্ষের মুখোমুখি দণ্ডায়মান ছিল, সেখানে তাদের মধ্যে যে ব্যবধান ছিল তাতে তারা এক পক্ষ অপর পক্ষের উপর বাণ ছুঁড়তে পারত। দুইভাবে সৈন্যদের মধ্যভাগ হয় —(১) সেনারা যেভাবে প্রস্থে দাঁড়িয়েছিল, সেই প্রস্থের মধ্যভাগ এবং (২) দু'পক্ষের সেনার মধ্যভাগ, যেখান থেকে কৌরব এবং পাণ্ডব—উভয়পক্ষের সেনার অবস্থান সমদূরত্বে থাকে, এইরূপ মধ্যভাগে অর্জুন রথ স্থাপন করার জন্য ভগবানকে আদেশ করেন যাতে দুইপক্ষের সেনাদেরই ভালো করে দেখতে পারেন।

---

[১] তদাহং বৃংহয়িষ্যামি স্বরবেণ রবং তব। বিজয়স্য ধ্বজস্থশ্চ নাদান্ মোক্ষ্যামি দারুণান্॥
শত্রূণাং যে প্রাণহরাঃ সুখং যেন হনিষ্যথ। (মহাভারত, বনপর্ব ১৫১।১৭-১৮)

'সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে' পদটি গীতায় তিনবার উল্লিখিত হয়েছে—এইস্থলে (১।২১), এই অধ্যায়ের চব্বিশতম শ্লোকে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের দশম শ্লোকে। তিনবার উল্লেখ করার তাৎপর্য এই যে প্রথমে অর্জুন শৌর্যের সঙ্গে নিজ রথটি উভয় সেনার মধ্যে স্থাপন করার আদেশ করেন (১।২১), তারপরে ভগবান উভয় সেনার মধ্যে রথ স্থাপন করে কুরুবংশীয়দের দেখতে বলেছেন (১।২৪) এবং শেষে উভয় সেনার মধ্যেই ভগবান বিষাদমগ্ন অর্জুনকে গীতার উপদেশ দিচ্ছেন (২।১০)। এইরূপে অর্জুনের প্রথমে শৌর্য ছিল, মধ্যভাগে যুদ্ধে আত্মীয়স্বজনদের দেখে মোহবশতঃ তাঁর যুদ্ধে বৈরাগ্য উপস্থিত হয় এবং শেষে ভগবানের নিকট গীতার মহান উপদেশ প্রাপ্ত হয়ে অর্জুনের মোহ নাশ হয়। এর দ্বারা এই ভাবই দৃঢ় হয় যে, মানুষ যে কোনো পরিস্থিতিতেই থাকুক, সেখান থেকেই প্রাপ্ত পরিস্থিতির সদুপযোগ করে সে নিষ্কাম হতে পারে এবং পরমাত্মাকে লাভ করতে পারে। কারণ পরমাত্মা যে কোনো পরিস্থিতিতেই সর্বদা একরূপে অবস্থান করেন।

'যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং.............রণসমুদ্যমে'— উভয় সেনার মধ্যে রথ কতক্ষণ স্থাপন করা হবে? তাতে অর্জুন বলছেন যে, যুদ্ধেচ্ছায় কৌরবসেনাদলে উপস্থিত সৈন্যসহ যত রাজন্যবৃন্দ দণ্ডায়মান, তাদের সকলকে যতক্ষণ না তিনি পর্যবেক্ষণ করেন ততক্ষণ যেন রথটি স্থাপিত থাকে। এই যুদ্ধে কাদের সঙ্গে অর্জুনকে যুদ্ধ করতে হবে এবং কারাই বা বলবত্তায় তাঁর সমকক্ষ, কে তাঁর থেকে বলহীন এবং কেই বা তাঁর অপেক্ষা অধিক বলশালী, তাঁদের তিনি উত্তমরূপে পর্যবেক্ষণ করতে চান।

এখানে **'যোদ্ধুকামান্'** পদটি উল্লেখ করার এই তাৎপর্য যে তাঁরা তো সন্ধির কথাই ভেবেছিলেন, কিন্তু দুর্যোধন সন্ধির কথা গ্রাহ্য করেননি। কারণ দুর্যোধনের যুদ্ধ করার ইচ্ছা প্রবল ছিল। অতএব অর্জুন দেখতে চান তাদের কত শক্তি—যার ভরসায় দুর্যোধন অর্জুনদের সঙ্গে যুদ্ধ করার ইচ্ছা পোষণ করেন!

❋ ❋ ❋

যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ॥ ২৩ ॥

[**দুর্বুদ্ধেঃ** (দুর্বুদ্ধি) ; **ধার্তরাষ্ট্রস্য** (দুর্যোধনের) ; **যুদ্ধে** (যুদ্ধে) ; **প্রিয়চিকীর্ষব** (হিতৈষী) ; **যে** (যেসব) ; **এতে** (রাজন্যবর্গ) ; **অত্র** (এই সেনাদলে) ; **সমাগতাঃ** (যোগদান করেছে) ; **যোৎস্যমানান্** (যুদ্ধ করার জন্য যারা অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে আছে) ; **অহম্** (আমি) ; **অবেক্ষে** (দেখি।)]

যুদ্ধে দুর্বুদ্ধি দুর্যোধনকে সাহায্য করার জন্য যে রাজন্যবর্গ এই সেনাদলে যোগদান করেছেন, —যুদ্ধ করবার জন্য যাঁরা অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে আছেন, তাঁদের সকলকে আমি একবার দেখি ॥ ২৩ ॥

ব্যাখ্যা—'ধার্তরাষ্ট্রস্য[১] দুর্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ'— এইস্থানে দুর্যোধনকে দুষ্টবুদ্ধি বলে অর্জুন বলতে চাইছেন যে, 'এই দুর্যোধন আমাদের ধ্বংস করবার জন্য আজ পর্যন্ত নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র করেছে। আমাদের অপমান করার জন্য নানাপ্রকার উদ্যোগ নিয়েছে। নিয়মানুসারে এবং ন্যায়সংগতভাবে আমরা অর্ধরাজ্য প্রাপ্তির অধিকারী, কিন্তু সে সেটিও আত্মসাৎ করতে চায়, আমাদের দিতে রাজি নয়। এমনিতেই সে অতি দুর্বুদ্ধি ব্যক্তি ; আবার এখানে কিছু রাজন্যবর্গ এসেছেন যাঁরা যুদ্ধ দ্বারা দুর্যোধনের ভালো করতে চান!' প্রকৃতপক্ষে মিত্রদের কর্তব্য হচ্ছে এই যে, তাঁরা এমন কার্য করবেন এবং এমন কথা বলবেন যাতে তাঁদের বন্ধুদের ইহলোকে এবং পরলোকে মঙ্গল হয়। কিন্তু এই নৃপতিগণ দুর্যোধনের দুষ্টবুদ্ধিকে শোধরাবার চেষ্টা না করে অপরপক্ষে তা বাড়িয়ে দিচ্ছে এবং দুর্যোধনকে দিয়ে যুদ্ধ করিয়ে, যুদ্ধে তাকে সাহায্য করে, তার পতন ঘটাতে চাইছে। অর্থাৎ দুর্যোধনের হিত কিসে হবে ; সে কীভাবে

[১] **'ধার্তরাষ্ট্র'** পদের দুটি অর্থ হয় — (১) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র এবং আত্মীয়গণ, (২) অন্যায়ভাবে রাষ্ট্র (রাজ্য) ধারণকারী। এখানে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র—দুর্যোধনের উদ্দেশ্যেই **'ধার্তরাষ্ট্রস্য'** পদটি উল্লিখিত হয়েছে।

রাজ্য পাবে আর তার পরলোকে কী করে মঙ্গল হবে—সে সব এঁরা চিন্তা করছেন না। যদি এই রাজারা দুর্যোধনকে কমপক্ষে অর্ধেক রাজ্য নিজে রেখে পাণ্ডবদের প্রাপ্য অর্ধেক রাজ্য তাঁদের দিয়ে দেবার জন্য পরামর্শ দিতেন তাহলে দুর্যোধনের অর্ধেক রাজ্যও থাকত আর পরলোকেও মঙ্গল হত।

'যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ'—'এই যুদ্ধের জন্য যাঁরা উন্মুখ হয়ে আছেন, তাঁদের একবার দেখি তো !' এঁরা অধর্ম এবং অন্যায়ের পক্ষ নিয়েছেন, সেইজন্য এঁরা অর্জুনের সামনে যুদ্ধে দাঁড়াতে পারবেন না, ধ্বংস হয়ে যাবেন।

'যোৎস্যমানান্'—বলার অর্থ এই যে এঁদের মনে যুদ্ধের ইচ্ছা প্রবল, সুতরাং 'ভালো করে দেখি এঁরা কারা ?'

* * *

সম্বন্ধ—অর্জুন এরূপ বলায় ভগবান কী করলেন সঞ্জয় পরের দুটি শ্লোকে তা জানিয়েছেন।

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্॥ ২৪ ॥
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাং চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি॥ ২৫ ॥

[**ভারত** (হে ভরতবংশীয় রাজন্ !) ; **গুড়াকেশেন** (নিদ্রাজয়ী অর্জুন) ; **এবম্ উক্তঃ** (এই কথা বললে) ; **হৃষীকেশঃ** (অন্তর্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) ; **উভয়োঃ, সেনয়োঃ মধ্যে** (উভয় সেনার মধ্যস্থলে) ; **ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ** (পিতামহ ভীষ্ম এবং আচার্য দ্রোণের সম্মুখে) ; **চ, সর্বেষাম্** (এবং সমস্ত) ; **মহীক্ষিতাম্** (রাজন্যবর্গের সম্মুখস্থলে) ; **রথোত্তমম্** (শ্রেষ্ঠ রথটিকে) ; **স্থাপয়িত্বা** (স্থাপন করে) ; **ইতি** (এইভাবে) ; **উবাচ** (বললেন যে) ; **পার্থ** (হে পার্থ !) ; **এতান্, সমবেতান্** (এখানে একত্রিত) ; **কুরূন্** (কুরুবংশীয়দের) ; **পশ্য** (অবলোকন কর।)]

সঞ্জয় বললেন—হে ভরতবংশীয় রাজন্। নিদ্রাজয়ী অর্জুন এই কথা বললে অন্তর্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দুইপক্ষের সেনার মধ্যস্থলে পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ এবং সমস্ত রাজন্যবর্গের সম্মুখস্থলে সেই শ্রেষ্ঠ রথটিকে স্থাপন করে এইভাবে বললেন, 'হে পার্থ ! এখানে একত্রিত কুরুবংশীয়দের অবলোকন করো।' ॥ ২৪-২৫ ॥

ব্যাখ্যা—**'গুড়াকেশেন'**—**'গুড়াকেশ'** শব্দটির দুটি অর্থ হয়— (১) **'গুড়া'** হচ্ছে কোঁচকানো জিনিস এবং **'কেশ'** বলা হয় চুলকে। যার মাথার চুল কোঁকড়ান, তাকে বলা হয় **'গুড়াকেশ'**। (২) **'গুড়াকা'**—নিদ্রাকে বলা হয় এবং **'ঈশ'** হচ্ছেন অধিপতি। যিনি নিদ্রার অধিপতি, অর্থাৎ যিনি ইচ্ছামতো নিদ্রা যেতে পারেন, নাও যেতে পারেন—অর্থাৎ যাঁর নিদ্রার ওপর এইরূপ অধিকার তাঁকে বলা হয় **'গুড়াকেশ'**। অর্জুনের মাথার চুল কোঁকড়ানো ছিল এবং নিদ্রার ওপরও তাঁর আধিপত্য ছিল ; তাই তাঁকে **'গুড়াকেশ'** বলা হয়েছে।

'এবমুক্তঃ'—যে নিদ্রা ও আলস্যসুখের দাস নয় এবং যে বিষয়ভোগের দাস নয়, কেবলমাত্র ভগবানেরই দাস (ভক্ত), সেই ভক্তের কথা ভগবান শোনেন। শুধু শোনেনই না, তাঁর আদেশ পালন করেন। সেইজন্য তাঁর নিজ সখা ও ভক্ত অর্জুন আজ্ঞা করলে অন্তর্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দুইপক্ষের সেনার মধ্যস্থলে অর্জুনের রথ স্থাপন করেছিলেন।

'হৃষীকেশঃ'—ইন্দ্রিয়গুলিকে বলা হয় **'হৃষীক'**। যিনি ইন্দ্রিয়গুলির ঈশ অর্থাৎ অধিপতি, তাঁকে হৃষীকেশ বলা হয়। প্রথমে একুশতম শ্লোকে এবং এখানে **'হৃষীকেশ'** বলার অর্থ এই যে মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি সমস্ত কিছুর প্রেরক এবং সকলকে আদেশদানকারী অন্তর্যামী ভগবানই এখানে অর্জুনের আদেশপালনকারী সেজেছেন ! অর্জুনের প্রতি তাঁর কী অসীম কৃপা !

'সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্'—উভয় সেনার মধ্যস্থলে যে উন্মুক্ত স্থান ছিল, ভগবান সেখানেই অর্জুনের উত্তম রথটিকে স্থাপন করেছিলেন।

'ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাং চ মহীক্ষিতাম্'—সেই রথটিকেও ভগবান অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তাপূর্বক এমন স্থলে স্থাপন করলেন, যে স্থান থেকে অর্জুন তাঁর আত্মীয় পিতামহ ভীষ্ম, বিদ্যাদানকারী আচার্য দ্রোণ এবং কৌরবসেনাপক্ষের প্রধান রাজন্যবর্গকে নিকট থেকে দেখতে পাবেন।

'উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি'— **'কুরু'** পদটির দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র এবং পাণ্ডুর পুত্র—দু'পক্ষকেই বোঝায়। কারণ এঁরা সকলেই কুরুবংশীয়। 'যুদ্ধের উদ্দেশ্যে একত্রিত এই কুরুবংশীয়দের দেখ'—এরূপ বলার তাৎপর্য এই যে, এই কুরুবংশীয়দের দেখে অর্জুনের মনে এই ভাব যাতে উৎপন্ন হয় যে, আমরা তো সবাই এক ! এই পক্ষেরই হোক অথবা ওই পক্ষের, ভালোই হোক অথবা মন্দ, সদাচারী হোক বা দুরাচারী, আসলে সবাই তো আমাদেরই আত্মীয়। এর জন্য অর্জুনের মনে সুপ্ত কৌটুম্বিক মমতাযুক্ত মোহ যাতে জাগ্রত হয় এবং মোহ জাগ্রত হলে অর্জুন জিজ্ঞাসু হন, যাতে অর্জুনকে নিমিত্ত করে ভাবী কলিযুগের জীবগণের কল্যাণের উদ্দেশ্যে গীতার মহান উপদেশ দেওয়া সম্ভব হয়—এই ভাব নিয়েই ভগবান এখানে **'পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূন্'** কথাটি বলেছেন। নচেৎ ভগবান **'পশ্যৈতান্ ধার্তরাষ্ট্রান্ সমানিতি'** এইভাবে বলতে পারতেন। কিন্তু এইভাবে বললে অর্জুনের মনে যুদ্ধ করার জন্য আগ্রহ জন্মাত ; যাতে গীতা প্রকটিত হওয়ার অবকাশ হত না ! এবং অর্জুনের অন্তরের সুপ্ত কুটুম্ব-জনিত মোহও দূরীভূত হত না, যেটি দূর করাকে ভগবান নিজের দায়িত্ব বলে মনে করেছেন। যেমন কোথাও বিস্ফোটক হলে বৈদ্য প্রথমে সেটি পাকাবার ব্যবস্থা করেন এবং যখন সেটি পেকে যায়, তখন সেটি কেটে পরিষ্কার করে দেন। তেমনি ভগবানও ভক্তের অন্তরের সুপ্ত মোহকে প্রথমে জাগিয়ে তুলে তারপর সেটিকে নষ্ট করে থাকেন। এখানেও ভগবান অর্জুনের অন্তরের সুপ্ত মোহকে **'কুরূন্ পশ্য'** বলে জাগ্রত করেছেন, যেটি পরে উপদেশ দ্বারা নষ্ট করবেন।

অর্জুন বলেছিলেন যে, 'এঁদের আমি দেখে নিই'—**'নিরীক্ষে'** (১।২২) **'অবেক্ষে'** (১।২৩)। সুতরাং এখানে ভগবানের **'পশ্য'** (তুমি দেখে নাও)—এরূপ বলার প্রয়োজন ছিল না। ভগবানের শুধু রথটি স্থাপন করলেই হত। কিন্তু ভগবান রথ স্থাপন করে অর্জুনের মোহ জাগ্রত করার জন্য **'কুরূন্ পশ্য'** (এই কুরুবংশীয়দের অবলোকন করো)—এই কথা কটি বললেন।

আত্মীয়বশতঃ স্নেহ এবং ভগবদ্ প্রেম—এই দুটিতে অনেক পার্থক্য। আত্মীয়-কুটুম্বে মমতাযুক্ত স্নেহ জন্মায় যার ফলে আত্মীয়দের দোষের প্রতি লক্ষ থাকে না ; কেবল 'এ আমার'— এরূপ ভাব থাকে। সেইরূপ ভগবানেরও ভক্তের উপর বিশেষ স্নেহ জন্মায়, তখন ভক্তের দোষের প্রতি ভগবানেরও দৃষ্টি যায় না ; শুধু 'এ আমারই'— এই ভাব থাকে। আত্মীয়প্রেমে ক্রিয়া অর্থাৎ পদার্থের (শরীর ইত্যাদির) এবং ভগবদ্প্রেমে ভাবের প্রাধান্য থাকে। কৌটুম্বিক স্নেহে মূঢ়তা (মোহ) এবং ভগবদ্প্রেমে একাত্মভাবের প্রাধান্য থাকে। কৌটুম্বিক স্নেহ তমসাচ্ছন্ন হয় এবং ভগবদ্প্রেম হয় প্রকাশসম্পন্ন। কৌটুম্বিক স্নেহে মানুষ কর্তব্যচ্যুত হয়ে পড়ে আর ভগবৎ প্রেমে লীন হয়ে যাওয়ার জন্যই কর্তব্যপালনের স্মৃতি হয়ত না থাকতে পারে কিন্তু ভক্ত কখনও কর্তব্যচ্যুত হয় না। কৌটুম্বিক স্নেহে আত্মীয়-কুটুম্বের প্রাধান্য থাকে এবং ভগবদ্প্রেমে থাকে ভগবানের প্রাধান্য।

⁂ ⁂ ⁂

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকটিতে ভগবান অর্জুনকে কুরুবংশীয়দের অবলোকন করার জন্য বলেছিলেন। তারপর কী হল— সেই বর্ণনা সঞ্জয় পরের শ্লোকগুলিতে করেছেন।

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা॥ ২৬ ॥
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি।

[**অথ** (তারপরে) ; **পার্থঃ** (পৃথানন্দন অর্জুন) ; **তত্র, উভয়োঃ** (সেই দুই) ; **এব সেনয়োঃ** (সৈন্যদলের মধ্যেই) ; **স্থিতান্** (অবস্থিত) ; **পিতৄন্** (পিতৃব্যগণ) ; **পিতামহান্** (পিতামহগণ) ; **আচার্যান্** (আচার্যগণ) ; **মাতুলান্** (মাতুল-

গণ) ; **ভ্রাতৄন্** (ভ্রাতাগণ) ; **পুত্রাণ্** (পুত্রগণ) ; **পৌত্রান্** (পৌত্রগণ) ; **তথা, সখীন্** (এবং মিত্রগণ) ; **শ্বশুরান্, চ** (শ্বশুরগণ এবং) ; **সুহৃদঃ, অপি** (সুহৃদগণকেও) ; **অপশ্যৎ** (দেখলেন।)]

তারপরে পৃথানন্দন অর্জুন সেই দুই সৈন্যদলের মধ্যে অবস্থিত পিতৃব্যগণ, পিতামহগণ, আচার্যগণ, মাতুলগণ, ভ্রাতৃগণ, পুত্রগণ, পৌত্রগণ এবং মিত্রগণ, শ্বশুরগণ ও সুহৃদগণকে দেখলেন ॥ ২৬ ॥

ব্যাখ্যা—'তত্রাপশ্যৎ .... সেনয়োরুভয়োরপি'— ভগবান অর্জুনকে যখন বললেন যে, এই রণভূমিতে সমবেত কুরুবংশীয়দের দেখ, তখন অর্জুনের লক্ষ দুই পক্ষীয় সেনায় অবস্থিত নিজ আত্মীয়-কুটুম্বদের উপর পড়ল। তিনি দেখলেন যে সৈন্যদলে যুদ্ধের জন্য নিজ নিজ স্থানে দণ্ডায়মান আছেন ভূরিশ্রবা প্রমুখ তাঁর পিতার ভ্রাতারা, যাঁরা তাঁর পিতার তুল্য। ভীষ্ম, সোমদত্ত প্রমুখ পিতামহগণও রয়েছেন। দ্রোণ, কৃপাচার্য প্রমুখ আচার্যগণ (বিদ্যাদানকারী এবং কুলগুরু) আছেন, আছেন পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, শল্য, শকুনি প্রমুখ মাতুলগণ। আছেন ভীম, দুর্যোধন আদি ভ্রাতাগণ। অভিমন্যু, ঘটোৎকচ, লক্ষ্মণ (দুর্যোধনের পুত্র) প্রমুখ পুত্রগণ রয়েছেন। লক্ষ্মণ প্রভৃতির পুত্রগণ যাঁরা অর্জুনদের পৌত্র, তাঁরা আছেন। দুর্যোধনের অশ্বত্থামা প্রমুখ বন্ধুগণ আছেন এবং অর্জুনদের বন্ধুরাও আছেন। আছেন দ্রুপদ, শৈব্য আদি শ্বশুরগণ। আছেন নিঃস্বার্থ পরোপকারী বন্ধু সাত্যকি, কৃতবর্মা আদি আদি।

* * *

সম্বন্ধ—নিজ সমস্ত আত্মীয়স্বজনদের দেখে অর্জুন কী করলেন—এর পরের শ্লোকে তা বলা হয়েছে।

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্॥ ২৭ ॥
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ।

[**অবস্থিতান্** (নিজ নিজ স্থানে অবস্থিত) ; **তান্** (সেই) ; **সর্বান্** (সমস্ত) ; **বন্ধূন্** (বন্ধু-বান্ধবদের) ; **সমীক্ষ্য** (দেখে) ; **সঃ কৌন্তেয়ঃ** (সেই কুন্তীপুত্র অর্জুন) ; **পরয়া** (অত্যন্ত) ; **কৃপয়া** (কাতর) ; **আবিষ্টঃ** (যুক্ত হয়ে) ; **বিষীদন্** (বিষণ্ণতাপূর্বক) ; **ইদম্** (এরূপ) ; **অব্রবীৎ** (বলতে লাগলেন।)]

নিজ নিজ স্থানে অবস্থিত সেই সমস্ত বন্ধুবান্ধবদের দেখে কুন্তীপুত্র অর্জুন অত্যন্ত কাতর ও বিষণ্ণ হয়ে বলতে লাগলেন—॥ ২৭ ॥

ব্যাখ্যা—'তান্ সর্বান্‌বন্ধূনবস্থিতান্ সমীক্ষ্য'— পূর্বশ্লোক অনুসারে অর্জুন যাঁদের দেখেছেন, তাঁরা ছাড়াও বাহ্লীক প্রমুখ প্রপিতামহগণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, সুরথ আদি শ্যালকগণ ; জয়দ্রথ আদি ভগিনীপতিগণ এবং অন্য অনেক আত্মীয়গণকে উভয় সৈন্যদলে অবস্থিত দেখেছেন।

'স কৌন্তেয়ঃ কৃপয়া পরয়াবিষ্টঃ'—এই পদটিতে **'স কৌন্তেয়ঃ'** বলার অর্থ এই যে, কুন্তী যাঁকে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন এবং যিনি বীরত্বের আবেশে 'আমার সঙ্গে কারা যুদ্ধ করতে উপস্থিত'—এইরূপ প্রধান যোদ্ধাগণকে দেখবার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দু'পক্ষের সেনার মধ্যে রথ স্থাপন করার আদেশ করেন, সেই কুন্তীপুত্র অর্জুন অত্যন্ত কাপুরুষভাবাপন্ন হয়ে গেলেন!

উভয়পক্ষের সৈন্যদলে কেবল জন্মসম্বন্ধীয় এবং বিদ্যাসম্বন্ধীয় আত্মীয়দেরই দেখে অর্জুনের মনে এই ভাবনা এল যে, যুদ্ধে এঁরা মারা যান বা অন্য পক্ষের লোক মারা যায়, সবেতে আমাদেরই ক্ষতি, কুলক্ষয় তো আমাদেরই হবে, আমাদের আত্মীয়স্বজনই তো মৃত্যুমুখে পতিত হবেন। এরূপ চিন্তা হওয়ায় অর্জুনের মন থেকে যুদ্ধের ইচ্ছা চলে গিয়েছিল এবং কাপুরুষ ভাবের উদয় হয়েছিল। এই কাপুরুষসুলভ মনোভাবকে ভগবান পরবর্তী শ্লোকে (২।২-৩) **'কশ্মলম্'** এবং **'হৃদয়দৌর্বল্যম্'** বলেছেন, এবং অর্জুন (২।৭) **'কার্পণ্যদোষো-পহতস্বভাব'** বলে এটি স্বীকারও করেছেন।

অর্জুন কাপুরুষতায় আচ্ছন্ন হয়েছিলেন—**'কৃপয়াবিষ্টঃ।'** এতে প্রমাণিত হয় যে, এই কাপুরুষতা তাঁর পূর্বে ছিল না, কিন্তু এখন উপস্থিত হয়েছে। সুতরাং এটি আগন্তুক দোষ। আগন্তুক হওয়ায় এটি স্থায়ী হবে না। অপরপক্ষে শৌর্য ও বীর্য অর্জুনের স্বাভাবিক গুণ। সুতরাং তা চিরস্থায়ী।

অতি কাপুরুষতা কাকে বলে ? অকারণ নিন্দা, তিরস্কার, অপমানকারী, দুঃখদানকারী, শত্রুভাবাপন্ন, ধ্বংস করার ইচ্ছাসম্পন্ন দুর্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি প্রভৃতিকে যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী দেখেও তাঁদের বধ করার চিন্তা না আসা, তাঁদের নাশ করার উদ্যোগ না নেওয়া— এটি অত্যন্ত কাপুরুষতারূপ দোষ। এখানে অর্জুনের মোহ তাঁকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করেছিল যে, যাঁরা তাঁদের অনিষ্টকারী এবং সময়ে-অসময়ে অনিষ্ট করার উদ্যোগ নিয়েছিল, সেই অধার্মিক, পাপীদের ওপরও তাঁর করুণা হয়েছিল (গীতা ১।৩৫, ৪৬) এবং তিনি ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য থেকে চ্যুত হয়েছিলেন।

'বিষীদন্নিদমব্রবীৎ'—যুদ্ধের ফলে, আত্মীয়স্বজন, কুল এবং দেশের কী অবস্থা হবে এই ভেবে অর্জুন অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়েছিলেন এবং তখনই তিনি এই কথা বলেছিলেন, যার বর্ণনা পরবর্তী শ্লোকে করা হয়েছে।

❋ ❋ ❋

অর্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেমং স্বজনং কৃষ্ণ যুযুৎসুং সমুপস্থিতম্॥ ২৮ ॥
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখং চ পরিশুষ্যতি।
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে ॥ ২৯ ॥
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে।
ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ॥ ৩০ ॥

[**কৃষ্ণ** (হে কৃষ্ণ) ; **যুযুৎসুম্** (যুদ্ধেচ্ছু) ; **ইমম্, স্বজনম্** (এই আত্মীয়স্বজনদিগকে) ; **সমুপস্থিতম্, দৃষ্ট্বা** (সম্মুখে উপস্থিত দেখে) ; **মম গাত্রাণি** (আমার শরীর) ; **সীদন্তি** (অবসন্ন হচ্ছে) ; **চ** (এবং) ; **মুখম্ পরিশুষ্যতি** (মুখ শুষ্ক হচ্ছে) ; **চ** (এবং) ; **মে শরীরে** (আমার শরীরে) ; **বেপথুঃ** (কম্প দিচ্ছে) ; **চ** (এবং) ; **রোমহর্ষঃ জায়তে** (রোমাঞ্চ হচ্ছে) ; **হস্তাৎ** (হাত থেকে) ; **গাণ্ডীবম্** (গাণ্ডীব ধনুক) ; **স্রংসতে** (স্খলিত হচ্ছে) ; **চ** (এবং) ; **ত্বক্** (চর্মে) ; **পরিদহ্যতে** (জ্বালাবোধ হচ্ছে) ; **মে** (আমার) ; **মনঃ** (মন) ; **ভ্রমতি, ইব** (বিভ্রান্ত হচ্ছে) ; **চ** (এবং) ; **অবস্থাতুম্ চ** (দাঁড়িয়ে থাকতেও) ; **ন শক্নোমি** (পারছি না।)]

অর্জুন বললেন,— হে কৃষ্ণ ! যুদ্ধেচ্ছু এই আত্মীয়স্বজনদিগকে সম্মুখে উপস্থিত দেখে আমার শরীর অবসন্ন হচ্ছে, মুখ শুষ্ক হচ্ছে, শরীরে কম্প দিচ্ছে এবং রোমাঞ্চ হচ্ছে। হাত থেকে গাণ্ডীব ধনুক স্খলিত হচ্ছে এবং চর্মে জ্বালা বোধ হচ্ছে। আমি যেন কিছুই ঠিক করতে পারছি না, দাঁড়িয়ে থাকতেও আমার কষ্ট হচ্ছে ॥ ২৮-৩০ ॥

ব্যাখ্যা—**'দৃষ্ট্বেমং স্বজনং কৃষ্ণ যুযুৎসুং সমুপস্থিতম্'**—অর্জুনের **'কৃষ্ণ'** নামটি অত্যন্ত প্রিয় ছিল। গীতায় এই সম্বোধনটি নয়বার উল্লিখিত হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উল্লেখ করতে অন্য কোনো সম্বোধন এতবার ব্যবহৃত হয়নি। তেমনি ভগবানেরও **'পার্থ'**—এই নামটি অত্যন্ত প্রিয়। তাই তাঁরা নিজেদের মধ্যে কথোপকথনের সময় কৃষ্ণ এবং পার্থ এই নামগুলি ব্যবহার করতেন এবং এই কথা লোকপ্রসিদ্ধও ছিল। সেইজন্যই সঞ্জয় গীতার শেষে **'কৃষ্ণ'** এবং **'পার্থ'**, নামের উল্লেখ করেছেন—**'যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ'** (১৮।৭৮)।

ধৃতরাষ্ট্র প্রথমে বলেছিলেন **'সমবেতা যুযুৎসবঃ'** এবং অর্জুনও এখানে বললেন **'যুযুৎসুং সমুপস্থিতম্'** ; কিন্তু দু'জনের দৃষ্টিতে অনেক পার্থক্য আছে। ধৃতরাষ্ট্রের চোখে দুর্যোধন আদি তাঁর পুত্র এবং যুধিষ্ঠির আদি পাণ্ডুর পুত্র—

এরূপ বিভেদ ছিল। সেইজন্য ধৃতরাষ্ট্র সেই স্থানে **'মামকাঃ'** এবং **'পাণ্ডবাঃ'** বলেছেন। কিন্তু অর্জুনের চোখে সেই বিভেদ ছিল না, তাই অর্জুন এখানে **'স্বজনম্'** বলেছেন, যাতে দুই পক্ষের লোকেদেরই বোঝায়। এর অর্থ হল এই যে, ধৃতরাষ্ট্রের মনে যুদ্ধে নিজের পুত্রদের নিহত হবার আশঙ্কা ছিল, শোক ছিল। কিন্তু অর্জুনের দুই পক্ষের আত্মীয়গণেরই বধ হবার আশঙ্কায় শোক ছিল— দুই পক্ষের যে কেউ হত হোন না কেন, তিনি তো আমারই আত্মীয়।

এখনও পর্যন্ত **'দৃষ্ট্বা'** পদটি তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে— **'দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকম্'** (১।২) **'ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্তরাষ্ট্রান্'** (১।২০) এবং এখানে **'দৃষ্ট্বেমং স্বজনম্'** (১।২৮)। এই তিনটি পদের অর্থ হল যে দুর্যোধনের দৃষ্টি একই প্রকারের ছিল অর্থাৎ দুর্যোধনের কেবল যুদ্ধের মনোভাবই ছিল। কিন্তু অর্জুনের দেখা দু'প্রকারের ছিল। প্রথমে অর্জুন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে দেখে বীরত্বে ঝলসে উঠে যুদ্ধের জন্য ধনুক হাতে নিয়ে দণ্ডায়মান হয়েছিলেন আর এখন আত্মীয়স্বজনদের দেখে মোহাবিষ্ট হয়ে যুদ্ধ থেকে বিরত হয়েছিলেন, তাঁর হাত থেকে ধনুক পড়ে যাচ্ছিল।

'সীদন্তি মম গাত্রাণি .... ভ্রমতীব চ মে মনঃ' —অর্জুনের মনে যুদ্ধের ভাবী পরিণামের কথা ভেবে চিন্তা হচ্ছিল, দুঃখবোধ হচ্ছিল। সেই চিন্তার ও দুঃখের প্রভাব তাঁর সমস্ত শরীরে পড়েছিল। সেই প্রভাবের কথা অর্জুন স্পষ্টভাবে জানাচ্ছিলেন যে তাঁর শরীরের হাত, পা, মুখ ইত্যাদি একেকটি অঙ্গ শিথিল হয়ে আসছে, মুখ শুষ্ক হচ্ছে, যার জন্য কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে ; সমস্ত শরীর কম্পমান হয়েছে, সারা শরীর রোমাঞ্চিত হচ্ছে। যে গাণ্ডীব ধনুকের টংকারে শত্রু ভীত-সন্ত্রস্ত হয়, সেই গাণ্ডীব হস্তচ্যুত হয়ে পড়ছে। সমস্ত শরীর এবং ত্বকে জ্বালা অনুভূত হচ্ছে[১]। মন ঘুরছে অর্থাৎ তাঁর কী কর্তব্য তা বুঝতে পারছেন না, যুদ্ধস্থলে রথের ওপর দণ্ডায়মান থাকতেও পারছেন না, তাঁর মনে হচ্ছে তিনি মূর্ছা যাবেন। এই অনর্থকারী যুদ্ধে উপস্থিত থাকাকেও তাঁর পাপ বলে মনে হচ্ছে।

***

সম্বন্ধ—পূর্বের শ্লোকে নিজ শরীরের অষ্টচিহ্নের বর্ণনা করে অর্জুন ভাবী পরিণামসূচক অশুভ লক্ষণাদির জন্য যুদ্ধ করা অনুচিত বলে জানাচ্ছেন।

নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব।
ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে॥ ৩১ ॥

[**কেশব** (হে কেশব !) ; **নিমিত্তানি চ** (লক্ষণগুলিও) ; **বিপরীতানি** (বিপরীত) ; **পশ্যামি** (দেখতে পাচ্ছি); **আহবে** (যুদ্ধে) ; **স্বজনম্** (আত্মীয়স্বজনকে) ; **হত্বা** (বধ করে) ; **শ্রেয়ঃ** (শ্রেয়) ; **চ** (ও) ; **ন, অনুপশ্যামি** (দেখতে পাচ্ছি না।)]

'হে কেশব ! আমি লক্ষণগুলিও সব বিপরীত দেখতে পাচ্ছি এবং যুদ্ধে আত্মীয়স্বজনকে বধ করে শ্রেয় (লাভ) কিছু দেখতে পাচ্ছি না।' ॥ ৩১ ॥

ব্যাখ্যা—**'নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব'**— হে কেশব ! আমি লক্ষণগুলিও[২] বিপরীত দেখছি। এর তাৎপর্য হল কোনো কার্য আরম্ভ করার সময় মনে যত বেশি উৎসাহ (আনন্দ) থাকে, সেই উৎসাহ কার্যটিকে করতে

---

[১] চিন্তা চিতাসমা হ্যুক্তা বিন্দুমাত্রং বিশেষতঃ। সজীবং দহতে চিন্তা নির্জীবং দহতে চিতা॥

'চিন্তাকে চিতার সমান বলা হয়েছে, মাত্র একটি বিন্দুর তফাৎ। চিন্তা জীবিত ব্যক্তিকে পোড়ায় আর চিতা মৃত ব্যক্তিকে পোড়ায়।'

[২] যত লক্ষণ আছে, সেগুলি কোনো ভাল অথবা মন্দ ঘটনার নিমিত্ত হয় না, অর্থাৎ সেগুলির দ্বারা কোনো ঘটনা সৃষ্ট হয় না, বরং ভাবী ঘটনার পূর্বাভাস দেয়।

লক্ষণ প্রকাশক প্রাণীও বাস্তবে লক্ষণগুলিকে চেষ্টার দ্বারা বোঝায় না, আপনা থেকেই সেগুলি পরিলক্ষিত হয়।

তত বেশি কার্যকর করে তোলে। কিন্তু যদি কার্যের আরম্ভেই উৎসাহ নষ্ট হয়ে যায়, মনের সংকল্প ঠিক না থাকে তবে সেই কার্যের পরিণতি ভালো হয় না। সেই দৃষ্টিতে অর্জুন বলছেন যে, 'এখন আমার শরীর শিথিল হচ্ছে, কম্পন হচ্ছে, মুখ শুষ্ক লাগছে' ইত্যাদি যে সমস্ত লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, সেইসব ব্যক্তিগত লক্ষণও আমার ভালো বলে মনে হচ্ছে না[১]। এছাড়াও আকাশে উল্কাপাত, অসময়ে গ্রহণ, ভূমিকম্প, পশু-পক্ষীর অস্বাভাবিক রব, চন্দ্রের গায়ে দাগ না দেখা, মেঘ থেকে রক্তবৃষ্টি হওয়া ইত্যাদি চিহ্ন যেগুলি পূর্বে দেখা গেছে, তাও অশুভ লক্ষণ। এইভাবে পূর্বের এবং এখনকার লক্ষণগুলি দেখে আমার মনে ভাবী অনিষ্টের আশঙ্কা জাগছে।'

'ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে'—যুদ্ধে নিজেদের স্বজনগণকে বধ করলে আমাদের লাভ হবে তাও নয়। যুদ্ধের পরিণামে ইহলোক বা পরলোক কোনোটিই আমার পক্ষে হিতকারক বলে মনে হচ্ছে না। কারণ যে নিজ কুলকে ধ্বংস করে সে অত্যন্ত পাপী। সুতরাং কুলক্ষয়ের পাপ আমার হবেই এবং এর ফলে আমার নরকবাস হবে।

এই শ্লোকটিতে **'নিমিত্তানি পশ্যামি'** এবং **'শ্রেয়ঃ অনুপশ্যামি'**[২]— এই দুটি বাক্যের দ্বারা অর্জুন বলতে চাইছেন যে, 'আমি লক্ষণগুলি দেখি বা নিজে চিন্তা করি, দুই ভাবেই যুদ্ধারম্ভ বা তার পরিণতি আমার পক্ষে এবং জগতের পক্ষে হিতকারক নয় বলে আমার মনে হচ্ছে।'

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—যখন কোনো শুভ লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না এবং শ্রেয়ও বোঝা যাচ্ছে না—এই পরিপ্রেক্ষিতে অর্জুন বিজয় লাভের অনিচ্ছা পরের শ্লোকে বিস্তারিতভাবে বলছেন।

ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ।
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা॥ ৩২ ॥

[কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ!); ন বিজয়ম্ কাঙ্ক্ষে (বিজয় চাই না); রাজ্যম্ (রাজ্যও); ন (না); ন, সুখানি (সুখভোগও চাই না); গোবিন্দ (হে গোবিন্দ!); নঃ (আমাদের); রাজ্যেন (রাজ্যে); কিম্ (কি লাভ?); ভোগৈঃ (ভোগেও); বা (অথবা); জীবিতেন (বেঁচে থেকেও); কিম্ (কি লাভ?)]

হে কৃষ্ণ! আমি বিজয় চাই না, রাজ্যও চাই না এবং সুখভোগও চাই না। হে গোবিন্দ! আমাদের রাজ্যে কী লাভ? ভোগে কী লাভ? এবং বেঁচে থেকেই বা কী লাভ? ॥ ৩২ ॥

ব্যাখ্যা—'ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ'—'মানলাম যে যুদ্ধে আমি বিজয়ী হব, তখন সমস্ত পৃথিবীতে আমার রাজত্ব হবে, অধিকারে আসবে। সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হলে আমরা অনেক প্রকার সুখভোগ করব। কিন্তু এসবের কিছুই আমার চাই না, অর্থাৎ যুদ্ধে জয়, রাজ্য বা সুখভোগের কোনো বাসনা আমার নেই।'

'কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা'—'আমার মনে যখন কোনো প্রকার (জয়, রাজ্য বা সুখভোগের) কামনা-বাসনা নেই, তখন যত বিশাল রাজ্যই লাভ হোক না কেন, তাতে আমার কী লাভ? যত সুন্দর সুখভোগ পাওয়া যাক না কেন, তাতেই বা আমার কী হবে? অথবা এই আত্মীয়স্বজনদের হত্যা করে যদি বহু বছর ধরে সুখে রাজ্য ভোগ করি তাতেই বা আমার কী লাভ হবে?' অর্থাৎ এই জয়, রাজত্ব, সুখভোগ তখনই সুখ দেয় যখন হৃদয়ে তার জন্য কামনা-বাসনা থাকে, ভালোবাসা থাকে অথবা গুরুত্ব থাকে। কিন্তু আমার এইসবের জন্য কোনো আকাঙ্ক্ষাই নেই, তাহলে এগুলি আমাকে কী সুখ দেবে? এই সমস্ত আত্মীয়বর্গকে হত্যা করে আমার

[১]অর্জুন যদিও তাঁর শারীরিক লক্ষণগুলিকেও দৈব লক্ষণ বলে মনে করেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলি দৈব লক্ষণ নয়। এগুলি শোক-মোহজনিত কারণে ইন্দ্রিয়, শরীর, মন, বুদ্ধিতে সৃষ্ট বিকার মাত্র।

[২]এখানে 'পশ্যামি' ক্রিয়াটি অতীত এবং বর্তমানের লক্ষণগুলির বিষয়ে এবং 'অনুপশ্যামি' ক্রিয়া ভবিষ্যতের পরিণামের ব্যাপারে ব্যবহৃত হয়েছে।

বাঁচবার কোনো ইচ্ছা নেই ; কেননা এঁরা নিহত হলে এই রাজ্য ও সুখভোগে কার প্রয়োজন ? রাজ্য, সুখভোগ এ সমস্তই আত্মীয়দের জন্যই প্রয়োজন, কিন্তু এঁদের যদি মৃত্যু হয়, তাহলে এগুলি কে ভোগ করবে ? ভোগ করা তো দূরের কথা, বরং তাঁদের অবর্তমানে আমার অধিকতর চিন্তা ও শোক হবে।

*** *** ***

সম্বন্ধ—অর্জুন যুদ্ধে জয়লাভ করতে কেন চান না, পরের শ্লোকে তা জানাচ্ছেন।

যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ।
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ॥ ৩৩ ॥

[**যেষাম্** (যাঁদের) ; **অর্থে** (জন্য) ; **নঃ** (আমাদের) ; **রাজ্যম্** (রাজ্য) ; **ভোগাঃ** (ভোগ) ; **চ, সুখানি** (এবং সুখের) ; **কাঙ্ক্ষিতম্** (ইচ্ছা) ; **তে** (তাঁরাই) ; **ইমে** (নিজ নিজ) ; **প্রাণান্ চ ধনানি** (ধন-সম্পত্তি ও প্রাণের আশা) ; **ত্যক্ত্বা** (ত্যাগ করে) ; **যুদ্ধে** (যুদ্ধে) ; **অবস্থিতাঃ** (উপস্থিত হয়েছেন।)]

'যাঁদের জন্য আমাদের রাজ্য, ভোগ এবং সুখের ইচ্ছা, তাঁরাই নিজেদের ধনসম্পত্তি এবং প্রাণের আশা পরিত্যাগ করেও যুদ্ধে উপস্থিত হয়েছেন।' ॥ ৩৩ ॥

ব্যাখ্যা—'যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ'—'আমরা রাজ্য, সুখ, ভোগ যা কিছু কামনা করি, সেগুলি নিজেদের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নয়, বরং এইসব আত্মীয়-কুটুম্ব, বন্ধু প্রভৃতির জন্য চাই। আচার্যগণ, পিতৃব্যগণ, পিতামহগণ, পুত্রগণ সকলে যাতে সুখ ও আরাম পায়, তাঁদের সেবা করা যায়, তাঁরা প্রসন্ন হন—এইজন্যই আমরা যুদ্ধ করে রাজ্যলাভ করতে চাই, ভোগ-সামগ্রী একত্রিত করতে চাই।'

'ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ'—'কিন্তু তাঁরা সকলেই নিজ নিজ প্রাণ এবং ধনসম্পত্তির আশা ত্যাগ করে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে আমাদের সামনে এই রণভূমিতে দণ্ডায়মান। তাঁদের মনে এখন শুধু যুদ্ধের চিন্তা, তাঁদের প্রাণের মোহ এবং ধনের তৃষ্ণা কিছুই নেই, এই যুদ্ধে যদি মৃত্যুও হয় তবু তাঁরা পশ্চাদ্‌পদ হবেন না। কিন্তু এঁদের যদি মৃত্যুই হয় তবে এ রাজ্য কীসের জন্য ? সুখ কিসের জন্য, ধন কার জন্য ? অর্থাৎ এই সবের আকাঙ্ক্ষা আমরা কার জন্য করব ?'

'প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ'—এর অর্থ হচ্ছে যে, এঁরা প্রাণ এবং সম্পদের আশা ত্যাগ করে উপস্থিত অর্থাৎ তাঁরা জীবিত থাকবেন এবং সম্পদ আহরণ করবেন—এই ইচ্ছা ত্যাগ করে দাঁড়িয়ে আছেন। যদি তাঁদের প্রাণ ও ধন-সম্পত্তির আশঙ্কা থাকত, তাহলে কী তাঁরা যুদ্ধে উপস্থিত হতেন ? অতএব এখানে প্রাণ এবং ধন ত্যাগ করার তাৎপর্য হচ্ছে সেগুলির আশা ত্যাগ করা।

*** *** ***

সম্বন্ধ—যাঁদের জন্য আমরা রাজ্য, ভোগ এবং সুখের আশা করি, তাঁরা কারা—এর বর্ণনা অর্জুন পরের দুটি শ্লোকে করছেন।

আচার্যাঃ[১] পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ।
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা॥ ৩৪ ॥

---

[১] ছাব্বিশতম শ্লোকে 'পিতৃনথ পিতামহান্....' বলে সর্বপ্রথম পিতৃগণ এবং পিতামহগণের নাম বলা হয়েছে, এবং এখানে 'আচার্যাঃ পিতরঃ ....' বলে প্রথমে আচার্যদের নাম নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সেখানে কৌটুম্বিক স্নেহের প্রাধান্য ছিল, তাই পিতার নাম সর্বপ্রথম করা হয়েছিল এবং এখানে বধ না করার কথা আলোচনা হচ্ছে, তাই সর্বপ্রথম আদরণীয় পূজ্য আচার্যগণ ও গুরুজনদের নাম করা হয়েছে, যাঁরা জীবের পরম হিতৈষী।

এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন।
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে॥ ৩৫ ॥

[**আচার্যাঃ** (আচার্য) ; **পিতরঃ** (পিতা) ; **পুত্রাঃ** (পুত্র) ; **চ তথা, এব** (এবং সেইরূপ) ; **পিতামহাঃ** (পিতামহ) ; **মাতুলাঃ** (মাতুল) ; **শ্বশুরাঃ** (শ্বশুর) ; **পৌত্রাঃ** (পৌত্র) ; **শ্যালাঃ** (শ্যালক) ; **তথা, সম্বন্ধিনঃ** (এবং অন্যান্য যত আত্মীয় আছেন) ; **ঘ্নতঃ** (অস্ত্রাঘাত করলে) ; **অপি** (ও) ; **এতান্** (তাঁদের) ; **হন্তুম্** (মারতে) ; **ন ইচ্ছামি** (চাই না) ; **মধুসূদন** (হে মধুসূদন !) ; **ত্রৈলোক্য রাজ্যস্য** (ত্রিলোকের রাজত্বও) ; **হেতোঃ, অপি** (লাভ হয়, তাহলেও) ; **নু মহীকৃতে কিম্** (তবে এই পৃথিবীর অধীশ্বর হবার জন্য কেন বধ করব ?)]

আচার্য, পিতা, পুত্র এবং সেইরূপ পিতামহ, মামা, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক এবং অন্যান্য যত আত্মীয় আছেন, এঁরা আমাকে অস্ত্রাঘাত করলেও আমি এঁদের মারতে চাই না এবং হে মধুসূদন ! আমার যদি ত্রিলোকের রাজত্বও লাভ হয়, তাহলেও আমি এঁদের বধ করতে চাই না, অতএব এই সামান্য পৃথিবীর অধীশ্বর হবার জন্য কেন আমি এঁদের বধ করতে যাব ? ॥ ৩৪-৩৫ ॥

ব্যাখ্যা—[ভগবান পরে ষোড়শ অধ্যায়ের একুশতম শ্লোকে বলেছেন যে, কাম, ক্রোধ এবং লোভ—এই তিনটি হল নরকের দ্বার। প্রকৃতপক্ষে কামেরই এই তিনটি রূপ। সাংসারিক বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদির প্রতি গুরুত্ব দেওয়াতে এই তিনটি উৎপন্ন হয়ে থাকে। কাম অর্থাৎ কামনার ক্রিয়া দুই প্রকারের—ইষ্ট প্রাপ্তি এবং অনিষ্টের নিবৃত্তি। এর মধ্যে ইষ্টের প্রাপ্তিও দুই প্রকারের হয়—সম্পদ সংগ্রহ এবং সুখভোগ। সংগ্রহের ইচ্ছার নাম 'লোভ' এবং সুখভোগের ইচ্ছার নাম 'কাম'। অনিষ্টের নিবৃত্তিতে বাধা এলে 'ক্রোধ' হয় অর্থাৎ সুখভোগ এবং সংগ্রহ প্রাপ্তিতে বাধাদানকারীর ওপর অথবা আমাদের অনিষ্টকারীর ওপর, আমাদের ক্ষতি যারা করে তাদের ওপর ক্রোধ জন্মায়, যার ফলে অনিষ্টকারীকে ধ্বংস করার ক্রিয়া হয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যুদ্ধে মানুষের দুই প্রকারেরই প্রবৃত্তি হয়—অনিষ্টের নিবৃত্তির জন্য অর্থাৎ নিজ ক্রোধের বশীভূত হয়ে ইষ্টলাভের জন্য অর্থাৎ 'লোভ' পূর্তির জন্য। কিন্তু অর্জুন এইখানে এই দুটিতেই 'না' বলেছেন।]

'আচার্যাঃ পিতরঃ .... কিং নু মহীকৃতে'—'আমার আত্মীয়গণ যদি নিজ অনিষ্ট নিবৃত্তির জন্য ক্রোধের বশে আমাকে আঘাত করে, আমাকে বধ করতেও চায়, তাহলেও আমি নিজ অনিষ্ট-নিবৃত্তির জন্য ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁদের বধ করতে চাই না। অর্থাৎ যদি তাঁরা নিজ ঈপ্সিত বস্তুর প্রাপ্তির জন্য, রাজ্য পাবার লোভে আমাকে হত্যা করতে চান, তবুও আমি নিজ ইষ্ট প্রাপ্তির আশায় লোভের বশীভূত হয়ে তাঁদের মারতে চাই না। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, ক্রোধ এবং লোভের বশীভূত হয়ে আমি নরকে যেতে রাজি নই।'

এখানে দুবার **'অপি'** পদের প্রয়োগ করায় অর্জুনের বক্তব্য হচ্ছে এই যে, 'আমি তো এঁদের স্বার্থে কোনো বাধা দিইনি, তাহলে এঁরা কেন আমাকে মারবেন ? তবু মনে কর, আমিই প্রথমে এঁদের স্বার্থে বাধা প্রদান করেছি এইরকম ভেবে যদি এঁরা আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হন, তবুও (**ঘ্নতোঽপি**) আমি এঁদের বধ করতে চাই না। দ্বিতীয়ত এঁদের বধ করলে আমার ত্রিলোকের অধীশ্বর হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই, তবু মনে করা যাক যদি এঁরা নিহত হন তাহলে ত্রিলোকের অধীশ্বর হব তথাপিও (**'অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ**) আমি এঁদের বধ করতে চাই না।'

'মধুসূদন'[১] সম্বোধনের তাৎপর্য হল, ভগবান তো দৈত্যনিধনকারী, কিন্তু দ্রোণ আদি আচার্যগণ এবং ভীষ্মাদি পিতামহ তো দৈত্য নন যে ওঁদের মারতে আমি ইচ্ছুক হব ? এঁরা তো আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়।

'আচার্যাঃ'—এই আত্মীয়দের মধ্যে যে দ্রোণাচার্যাদির সঙ্গে আমাদের বিদ্যা এবং ভালোবাসার সম্পর্ক, সেই পূজ্য আচার্যদের আমার সেবা করা উচিত, তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ

[১] 'মধু' নামক দৈত্যকে বধ করায় ভগবানের আর একটি নাম হয় 'মধুসূদন'।

করা কখনও উচিত নয়। আচার্যদের চরণে তো নিজের মন প্রাণ নিবেদিত করে দেওয়া উচিত। আমাদের তাই কর্তব্য।

'পিতরঃ'—'শরীরের সম্পর্কে যাঁরা আমাদের পিতা বা পিতৃস্থানীয় তাঁদের শরীরের প্রতিরূপই হল আমাদের এই শরীর। শরীরে আমরা তাঁদের স্বরূপ হয়ে ক্রোধ বা লোভবশতঃ সেই পিতাগণকে কী করে হত্যা করব ?'

'পুত্রাঃ'—আমাদের এবং আমাদের ভ্রাতাদের যে পুত্ররা আছে তাদের তো আমাদের লালনপালন করা উচিত। তারা যদি কোনো বিপরীত কর্ম করেই ফেলে, তাহলেও তাদের পালন করা আমাদের ধর্ম।

'পিতামহাঃ'—তেমনি যিনি আমাদের পিতামহ, তিনি আমাদের পিতৃগণেরও পূজ্য এবং আমাদের পরমপূজ্য ব্যক্তি। তিনি আমাদের তিরস্কার করতে পারেন, আমাদের আঘাত করতেও পারেন। কিন্তু তিনি যাতে কোনো রকম দুঃখ না পান, কষ্ট না পান, যাতে সুখী হন, আরাম পান, তাঁর সেবা করা হয়—আমাদের সেই চেষ্টাই করা উচিত।

'মাতুলাঃ'—আমাদের মাতুলগণ, আমাদের পালন-পোষণকারী মায়ের ভাই। অতএব তাঁরা মায়ের সমানই পূজ্য।

'শ্বশুরাঃ'—এই যে শ্বশুরগণ, এঁরা আমার এবং আমার ভ্রাতাদের পত্নীদের পূজনীয় পিতা। অতএব এঁরা আমাদের কাছে পিতার সমান পূজনীয়। এঁদের কী করে হত্যা করব ?

'পৌত্রাঃ'—আমাদের পুত্রদের পুত্র যারা, তারা পুত্রের চাইতেও অধিক পালনীয়।

'শ্যালাঃ'—যাঁরা আমাদের শ্যালক, তাঁরা আমাদের পত্নীদের প্রিয় ভ্রাতৃকুল। তাঁদের কী করে হত্যা করা যাবে ?

'সম্বন্ধিনঃ'—এখানে যত আত্মীয় রয়েছেন এবং এছাড়াও যত আত্মীয় আছেন, তাঁদের তো পালন-পোষণ, সেবা করা উচিত । তাদের কী করে বধ করা যায় ? এঁদের বধ করলে যদি ত্রিলোকের অধীশ্বরও হওয়া যায়, তাহলেও কি এঁদের হত্যা করা উচিত ? এঁদের বধ করা তো সর্বতোভাবে অনুচিত কর্ম।

* * *

সম্বন্ধ—পূর্বশ্লোকে অর্জুন আত্মীয়গণকে বধ না করার দুটি কারণ দেখিয়েছেন। এখন পরিণামের দিকে লক্ষ্য রেখেও আত্মীয়দের হত্যা না করার পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন।

নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রান্নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দন।
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ॥ ৩৬ ॥

[**জনার্দন** (হে জনার্দন) ; **ধার্তরাষ্ট্রান্** (ধৃতরাষ্ট্রের আত্মীয়গণকে) ; **নিহত্য** (হত্যা করে) ; **নঃ** (আমরা) ; **কা প্রীতিঃ স্যাৎ** (কী সুখ পাব ?) ; **এতান্** (এই) ; **আততায়িনঃ** (আততায়ীদের) ; **হত্বা** (হত্যা করলে তো) ; **অস্মান্** (আমাদের) ; **পাপম্ এব** (পাপই) ; **আশ্রয়েৎ** (হবে ।)]

হে জনার্দন ! ধৃতরাষ্ট্রের এই আত্মীয়গণকে হত্যা করে আমরা কী সুখ পাব ? এই আততায়ীদের হত্যা করলে আমাদের পাপই হবে।॥ ৩৬ ॥

ব্যাখ্যা—**'নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রানঃ....হত্বৈতানাততায়িনঃ'**—'ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ এবং তাঁদের পক্ষে অন্য যত সৈন্য আছেন, তাঁদের বধ করে জয় লাভ করলে আমাদের কী এমন আনন্দ হবে ? যদি আমরা ক্রোধ অথবা লোভের তাড়নায় এঁদের হত্যাও করি, তাহলে সেই তাড়না প্রশমিত হলে আমাদের ক্রন্দন করতে হবে, অর্থাৎ ক্রোধ ও লোভের বশবর্তী হয়ে আমরা যে অনর্থ করে ফেলব তাতে আমাদের অনুতাপ করতে হবে। আততায়ী হলেও এই আত্মীয়দের কথা স্মরণে এলে তাঁদের অভাব আমাদের বার বার কষ্ট দেবে। তাঁদের মৃত্যুশোক সর্বক্ষণ পীড়িত করবে। এমতাবস্থায় আমরা কি কখনও প্রসন্নতা লাভ করতে পারব ? অর্থাৎ এঁদের হত্যা করলে আমরা যতদিন ইহলোকে অবস্থান করব, ততদিন আমরা কখনও চিত্তে শান্তি পাব না এবং এঁদের হত্যা করায় আমাদের যে পাপ হবে, তা পরলোকেও আমাদের দুঃখ দেবে।

আততায়ী ছয় প্রকারের হয়—অগ্নিসংযোগকারী,

বিষপ্রদানকারী, অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বধ করতে উদ্যত, সম্পদহরণকারী, জমি (রাজ্য) লুণ্ঠনকারী এবং নারী-অপহরণকারী[১]। দুর্যোধনাদির মধ্যে এই ছটি লক্ষণই ছিল। তাঁরা জতুগৃহে অগ্নিসংযোগ করে পাণ্ডবদের হত্যা করতে চেয়েছিলেন। ভীমকে বিষপান করিয়ে জলে ফেলে দিয়েছিলেন। অস্ত্রধারণপূর্বক পাণ্ডবদের হত্যা করার নিমিত্ত তো প্রস্তুত ছিলেনই। দ্যূতক্রীড়ায় কপটতাপূর্বক এঁরা পাণ্ডবদের ধন এবং রাজ্য হরণ করেছিলেন। পরিপূর্ণ সভাগৃহে টেনে এনে দ্রৌপদীকে, 'আমি তোকে জিতে নিয়েছি তুই এখন আমার দাসী' ইত্যাদি বলে তাঁকে খুবই অপমান করেছিলেন এবং দুর্যোধন প্রভৃতির অনুপ্রেরণায় জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে অপহরণ করেছিলেন।

শাস্ত্রবচন অনুযায়ী আততায়ীকে বধ করলে হত্যাকারীকে কোনো দোষ (পাপ) স্পর্শ করে না—'**নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন**' (মনুস্মৃতি ৮।৩৫১)। কিন্তু আততায়ীকে বধ করা উচিত হলেও বধ করা কাজটি ভালো নয়। শাস্ত্রেও আছে যে, মানুষের কখনও কাউকে হিংসা করা উচিত নয়—'**ন হিংস্যাৎসর্বা ভূতানি**' ; হিংসা না করা পরমধর্ম—'**অহিংসা পরমো ধর্মঃ**'[২] সুতরাং ক্রোধ ও লোভের বশবর্তী হয়ে আমরা কেন আত্মীয়দের হত্যা করব ?'

দুর্যোধন আততায়ী হওয়ায় অর্জুন তাঁকে বধ করতে পারেন ; কিন্তু আত্মীয় হওয়ায় অর্জুনের ধারণা হল দুর্যোধনকে বধ করলে তাঁর পাপ হবে। কারণ শাস্ত্রের কথা হচ্ছে যে, যে নিজ কুল নাশ করে, সে অত্যন্ত পাপ করে—'**স এব পাপিষ্ঠতমো যঃ কুর্যাৎকুলনাশনম্।**' সুতরাং যে আততায়ী ঘনিষ্ঠ আত্মীয় তাঁকে কিভাবে বধ করা যায় ? তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করা বা তাঁর থেকে পৃথক থাকা উচিত, কিন্তু তাঁকে বধ করা উচিত নয়। যেমন নিজের পুত্র যদি আততায়ী হয়ে ওঠে, তবে তার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করা যায় কিন্তু তাকে কি কখনও হত্যা করা যেতে পারে !

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—পূর্বের শ্লোকে যুদ্ধের দুষ্পরিণাম জানিয়ে এবার অর্জুন যুদ্ধ করা যে সর্বরূপে অনুচিত তা জানাচ্ছেন।

তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্তরাষ্ট্রান্ স্ববান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব॥ ৩৭ ॥

[**তস্মাৎ** (সেইজন্য) ; **স্ববান্ধবান্** (নিজেদের বান্ধব) ; **ধার্তরাষ্ট্রান্** (ধৃতরাষ্ট্রের আত্মীয়দের) ; **হন্তুম্** (বধ করার) ; **বয়ম্ ন, অর্হাঃ** (আমরা উপযুক্ত নই) ; **হি** (কারণ) ; **মাধব** (হে মাধব !) ; **স্বজনম্** (নিজ আত্মীয়দের) ; **হত্বা** (বধ করে) ; **কথম্** (কীভাবে) ; **সুখিনঃ** (সুখী) ; **স্যাম** (হব ?)]

সেইজন্য আমরা স্ব-বান্ধব এই ধৃতরাষ্ট্রের আত্মীয়গণকে বধ করার উপযুক্ত নই ; কারণ হে মাধব ! নিজ আত্মীয়দের বধ করে আমরা কীভাবে সুখী হব ? ॥ ৩৭ ॥

---

[১]অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ। ক্ষেত্রদারাপহর্তা চ ষড়েতে হ্যাততায়িনঃ॥ (বশিষ্টস্মৃতি ৩।১৯)

'অগ্নিসংযোগকারী, বিষপ্রদানকারী, অস্ত্রধারণ করে হত্যা করতে উদ্যত, সম্পত্তিহরণকারী, জমিলুণ্ঠনকারী এবং নারী-অপহরণকারী—এই ছয়জন হল আততায়ী।'

[২]আততায়ীকে বধ করো—এটি হল অর্থশাস্ত্র এবং কাউকে হিংসা কোরো না—এটি ধর্মশাস্ত্র । যাতে নিজের কোনো প্রকার স্বার্থ থাকে, তাকে বলা হয় অর্থশাস্ত্র ; আর যার মধ্যে নিজের কোনো স্বার্থ থাকে না, তাকে বলা হয় ধর্মশাস্ত্র। অর্থশাস্ত্রের চেয়ে ধর্মশাস্ত্র বলশালী। সুতরাং শাস্ত্রে যেখানে অর্থশাস্ত্র এবং ধর্মশাস্ত্র দুটির মধ্যে বিরোধ ঘটে, সেখানে অর্থশাস্ত্রকে ত্যাগ করে ধর্মশাস্ত্রকেই গ্রহণ করা উচিত।

'স্মৃত্যোর্বিরোধে ন্যায়স্তু বলবান্ব্যবহারতঃ। অর্থশাস্ত্রাত্তু বলবদ্ধর্মশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ॥'

(যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি ২।২১)

ব্যাখ্যা—'**তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্**'—এখন পর্যন্ত (প্রথম অধ্যায়ের আটাশতম শ্লোক থেকে আরম্ভ করে এ পর্যন্ত) আমি আত্মীয়-স্বজন-গণকে বধ না করার জন্য যত যুক্তি, নথি পেশ করেছি, যত চিন্তা প্রকাশ করেছি, সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এরূপ অনর্থকারী কার্যে কী করে প্রবৃত্ত হতে পারি ? নিজেদের বান্ধব ধৃতরাষ্ট্রের স্বজনদের বধ করার কাজ আমাদের সর্বতোভাবে অযোগ্য এবং অনুচিত। আমার মতো লোকের পক্ষে এরূপ অনুচিত কর্ম কী করে করা সম্ভব ?

'**স্বজনং হি হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব**'—'হে মাধব ! এই আত্মীয়গণের মৃত্যুর আশঙ্কাতেই খুব দুঃখ পাচ্ছি, শোকবিমূঢ় হচ্ছি, তাহলে ক্রোধ এবং লোভের বশীভূত হয়ে আমরা যদি তাঁদের বধ করি তবে কত না দুঃখ হবে! তাঁদের বধ করে আমরা কী সুখী হব ?'

এখানে 'এঁরা আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়'—এই মমত্ব-জনিত মোহের কারণে নিজ ক্ষত্রিয়জনিত কর্তব্যের দিকে অর্জুনের লক্ষ্য নেই। কারণ যেখানে মোহ থাকে সেখানে বিবেক দমিত হয়। বিবেক দমিত হলে মোহের প্রবলতা হয়। মোহ প্রবল হলে নিজের কর্তব্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা হয় না।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—এখানে এই প্রশ্ন আসে যে অর্জুনের পক্ষে দুর্যোধন যেমন আত্মীয়, তেমনি দুর্যোধনাদির নিকটও অর্জুন আত্মীয়। আত্মীয়তার দৃষ্টিতে অর্জুন যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হওয়ার কথা চিন্তা করছেন, কিন্তু দুর্যোধনাদি যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হওয়ার কথা মনে আনছেন না—এর কারণ কী ? এর উত্তর অর্জুন পরবর্তী দুটি শ্লোকে দিয়েছেন।

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্॥ ৩৮ ॥
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দন॥ ৩৯ ॥

[যদ্যপি (যদিও) ; **লোভোপহতচেতসঃ** (লোভবশত বিবেক-বিবেচনা লুপ্ত) ; **এতে** (এই) ; **কুলক্ষয়কৃতম্** (কুলনাশ করায়) ; **দোষম্** (দোষ) ; **চ, মিত্রদ্রোহে** (এবং মিত্রদের হিংসা করায়) ; **পাতকম্** (পাপ) ; **ন, পশ্যন্তি** (লক্ষ করছেন না) ; **জনার্দন** (হে জনার্দন !) ; **কুলক্ষয়কৃতম্ দোষম্** (কুলনাশ করলে যে দোষ হয়) ; **প্রপশ্যদ্ভিঃ, অস্মাভিঃ** (আমরা তা সম্যক্ রূপে জেনেও) ; **অস্মাৎ, পাপাৎ** (এই পাপ থেকে) ; **নিবর্তিতুম্** (বিরত হওয়ার) ; **জ্ঞেয়ম্** (বিচার) ; **কথম্** (কেন) ; **ন** (করব না ?)]

যদিও লোভবশতঃ বিবেক-বিবেচনা লুপ্ত হওয়ায় দুর্যোধনাদি কুলনাশে যে দোষ এবং মিত্রদের হিংসা করায় যে পাপ তা লক্ষ্য করছেন না, তবুও হে জনার্দন ! কুলনাশ করলে যে দোষ হয় আমরা তা সম্যক্‌রূপে জেনেও কেন পাপ থেকে বিরত হব না ? ॥ ৩৮-৩৯ ॥

ব্যাখ্যা—'**যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি.....মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্**'—'এতটা পেয়ে গিয়েছি, আরও এত পেয়ে যাই ; এরকমই যেন পেতে থাকি'—এরূপ সম্পদ, জমি, গৃহ, সম্মান, প্রশংসা, পদমর্যাদা, অধিকার ইত্যাদির বৃদ্ধি পেতে থাকা বৃত্তির নাম 'লোভ'। এই লোভ-বৃত্তির জন্য দুর্যোধনাদির বিবেক লুপ্ত হয়েছে, যার জন্য তাঁরা বিচার করতে পারছেন না যে, যে রাজ্য লাভের জন্য তাঁরা এত বড় পাপ করতে যাচ্ছেন, আত্মীয়দের হত্যা করতে যাচ্ছেন, সেই রাজ্য তাঁরা কতদিন ভোগ করবেন এবং তাঁরাও সেগুলির সঙ্গে কতদিন থাকবেন ? আমাদের জীবিত অবস্থায় যদি এই রাজ্য নাশ হয় তাহলে কী দশা হবে এবং রাজ্য থাকতে যদি মৃত্যু হয় তাহলেও বা কী দশা হবে ? কারণ মানুষ পারস্পরিক সংযোগে যতটা সুখ-আনন্দ পায়, তাদের বিয়োগে ততটাই দুঃখ পেতে হয়।

সংযোগে পরিণামগতভাবে তত সুখ হয় না যত দুঃখ বিয়োগে পেতে হয়। অর্থাৎ অন্তরে লোভ প্রবল হওয়ায় তাঁরা রাজ্য ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। কুলক্ষয় করলে যে কী ভয়ংকর পাপ হতে পারে তা তাঁদের নজরেই পড়ছে না।

যেখানে যুদ্ধ হয়, সেখানে সময়, সম্পত্তি ও শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। নানাপ্রকার চিন্তা, বাধা-বিপত্তি এসে পড়ে। দুই বন্ধুর নিজেদের মধ্যে ঝামেলা বেধে যায়, মনোমালিন্য হয়ে যায়। নানাপ্রকার মতভেদ দেখা দেয়। মতভেদ হওয়ায় শত্রুভাব দেখা যায়, যেমনটি দ্রুপদ এবং দ্রোণের ক্ষেত্রে ঘটেছিল। তাঁরা দুজন ছেলেবেলার বন্ধু ছিলেন। রাজ্য প্রাপ্তির পর দ্রুপদ একদিন দ্রোণকে অপমান করে সেই বন্ধুত্ব নষ্ট করেন। এর দ্বারা রাজা দ্রুপদ এবং দ্রোণাচার্যের মধ্যে শত্রুতা জন্মায়। নিজের অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য দ্রোণ অর্জুনের সাহায্যে দ্রুপদকে পরাস্ত করে তাঁর অর্ধেক রাজ্য দখল করেন। তাতে দ্রুপদ দ্রোণাচার্যকে মেরে ফেলার জন্য এক যজ্ঞ করালেন, যাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং দ্রৌপদী জন্ম নেন। এইরূপ মিত্রদের সঙ্গে শত্রুতা হলে কী ভীষণ পাপ হয়, ওঁরা তা দেখতে পাচ্ছেন না।

বিশেষ কথা

এখন আমাদের যে বস্তুর অভাব, সেগুলি ছাড়াই আমাদের কার্য সম্পন্ন হচ্ছে, আমরা বেশ ভালোভাবেই বেঁচে থাকি। কিন্তু যখন এই বস্তুগুলিকে একবার পেয়ে তারপর হারাতে হয়, তখন সেগুলির অভাব বড় পীড়াদায়ক হয়। এর তাৎপর্য হচ্ছে যে, প্রথম থেকে যে বস্তু থাকে না, তার জন্য তত দুঃখ হয় না, যতটা সেগুলি একবার পাওয়ার পর হারিয়ে যাওয়ায় দুঃখদায়ক হয়। তা সত্ত্বেও মানুষ যার অভাব বোধ করে সেগুলি লোভবশতঃ পাবার চেষ্টা করে। বিচার করলে দেখা যায় যে, যে বস্তুর এখন অভাব আছে, পরে ভাগ্যানুসারে তার প্রাপ্তি ঘটলেও প্রকৃতপক্ষে তার অভাব থেকেই যায়। সুতরাং সেই একই অবস্থা হয়, যা বস্তুগুলি পাবার আগে ছিল। পরে লোভবশতঃ সেই বস্তুগুলি পাওয়ার আশায় শুধু পরিশ্রমই করে যেতে হয়, দুঃখই ভোগ করতে হয়। সেই বস্তুগুলির প্রাপ্তিতে যে সুখানুভব হয় সেটির কারণ হল লোভ। অন্তরে লোভরূপ দোষ যদি না থাকে তাহলে বস্তুগুলির প্রাপ্তিতে সুখানুভব হতে পারে না। তেমনি মোহরূপী দোষ যদি না থাকে তাহলে আত্মীয়সম্পর্কীয় সুখও হতে পারে না। কামনারূপ দোষ না থাকলে সম্পদ সংগ্রহের সুখ হতে পারে না। এর তাৎপর্য এই যে, সংসারের সুখ-প্রাপ্তি হয় কোনো না কোনো দোষ থেকেই। কোনো দোষ না থাকলে সংসারে সুখ আস্বাদন করা সম্ভব হয় না। কিন্তু লোভে অন্ধ থাকায় মানুষ এরূপ বিচার করতে পারে না। এই লোভ তার বিবেক এবং বিচারশক্তি লুপ্ত করে দেয়।

'কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ..........প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দন' —অর্জুন এবার নিজের বিষয়ে বলছেন যে, 'যদিও দুর্যোধন নিজ কুলক্ষয়জনিত দোষ এবং মিত্রদ্রোহজনিত পাপগুলি বুঝতে পারছেন না তাহলেও আমাদের কিন্তু এই কুলক্ষয়জনিত অনর্থ-পরম্পরা বিবেচনা করা উচিত (যার বর্ণনা অর্জুন পরবর্তী চল্লিশতম শ্লোক থেকে চুয়াল্লিশতম শ্লোক পর্যন্ত করবেন) কারণ আমরা কুলক্ষয়জনিত দোষগুলিও ভালোভাবে জানি এবং মিত্রদের সঙ্গে দ্রোহজনিত (শত্রুতা, হিংসা) পাপ সম্বন্ধেও অবহিত। এই মিত্রগণ যদি আমাদের দুঃখ দেন, তাহলে সে দুঃখ আমাদের জন্য অনিষ্টকারক হবে না। বরং তাতে আমাদের পূর্বের পাপই তো ক্ষয় হয়, আমাদের শুদ্ধি হয়। কিন্তু মনে যদি শত্রুতা, হিংসা আসে, তবে তা মৃত্যুর পরেও আমাদের সঙ্গ ছাড়ে না এবং জন্ম-জন্মান্তর ধরে আমাদের পাপ কর্মে প্ররোচিত করতে থাকে, যাতে আমাদের ক্রমশঃ পতন হয়। এইরূপ অনর্থকারী এবং মিত্রদ্রোহ উৎপন্নকারী যুদ্ধরূপী পাপ হতে বাঁচার চিন্তা করা কি উচিত নয় ? অর্থাৎ বিচারপূর্বক আমাদের এই পাপ হতে অবশ্যই দূরে থাকা উচিত।'

এখানে অর্জুনের দৃষ্টি দুর্যোধনের লোভের দিকে ছিল ঠিকই, কিন্তু তিনি, নিজেও যে কৌটুম্বিক স্নেহে (মোহে) আচ্ছন্ন হয়ে এইসব কথা বলছিলেন, সেইদিকে তাঁর দৃষ্টি নেই। কারণ তিনি তাঁর নিজের কর্তব্য বুঝতে পারছিলেন

না। নিয়মই হচ্ছে যে, মানুষ যখন অপরের দোষের দিকে তাকায় তখন নিজের দোষগুলি সে দেখতে পায় না, বরং তার অহংকার হয় এই ভেবে যে, 'ওর মধ্যে তো এই দোষ রয়েছে, কিন্তু আমার এই দোষ নেই।' এরূপ অবস্থায় সে ভাবতেও পারে না যে, যদি অপরের কোনো একটি দোষ থাকে, তবে তার নিজের মধ্যেও অন্য কোনো দোষ থাকতে পারে। যদি নিজের কোনো দোষ নাও থাকে তবুও অপরের দোষ দেখা—এটাও তো একটি দোষ। অন্যের দোষ দেখা এবং নিজের ভালোত্বের জন্য অহংকার করা—এই দুটি দোষ একসঙ্গে অবস্থান করে। অর্জুনও দুর্যোধনাদির মধ্যে দোষ দেখেছিলেন এবং নিজেদের ভালোত্বের অহংকার বোধ করেছিলেন (ভালোত্বের অহংকারের ছায়াতেই দোষ থাকে)। সেইজন্য তিনি নিজের মোহরূপী দোষ দেখতে পাননি।

*** *** ***

সম্বন্ধ—কুলক্ষয় করলে যে দোষ হয় বলে আমরা জানি, সেগুলি কী ? সেই দোষগুলির পরম্পরা পরবর্তী পাঁচটি শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে।

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্মোঽভিভবত্যুত॥ ৪০ ॥

[**কুলক্ষয়ে** (কুলক্ষয় হলে) ; **সনাতনাঃ কুলধর্মাঃ** (চিরন্তন যে কুলধর্ম) ; **প্রণশ্যন্তি** (তা নষ্ট হয়ে যায়) ; **উত** (এবং) ; **ধর্মে** (ধর্ম) ; **নষ্টে** (নষ্ট হলে) ; **কৃৎস্নম্** (সেই সমস্ত) ; **কুলম্** (কুলকে) ; **অধর্মঃ** (অধর্ম) ; **অভিভবতি** (গ্রাস করে।)]

কুলক্ষয় হলে চিরন্তন যে কুলধর্ম তা নষ্ট হয়ে যায় এবং ধর্ম নাশ হলে (যারা বেঁচে থাকে) তাদের সমস্ত কুলকে অধর্ম গ্রাস করে ॥ ৪০ ॥

ব্যাখ্যা—**'কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্মাঃ সনাতনাঃ'** — যুদ্ধ যখন হয়, তখন তাতে কুল (বংশ) ক্ষয় (হ্রাস) হয়। যখন থেকে এই কুল শুরু হয়েছে, তখন থেকে কুলের ধর্ম অর্থাৎ পবিত্র কর্মের পরম্পরা, পবিত্র রীতিনীতি, মর্যাদা ইত্যাদিও পরম্পরাক্রমে চলে আসছে। কিন্তু যখন কুলক্ষয় হয়, তখন সর্বদা কুলের সঙ্গে যে ধর্ম থাকে তা নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ জন্মগ্রহণের সময়, উপনয়নের সময়, বিবাহের সময়, মৃত্যুর সময় এবং মৃত্যুর পর যে সমস্ত আচার-আচরণ পালন করা হয়, যেগুলি জীবিত এবং মৃত মানুষদের জন্য ইহলোকে এবং পরলোকে কল্যাণকারক, সেগুলি সব নষ্ট হয়ে যায়। কারণ কুলই যখন নষ্ট হয় তখন কুলকে আশ্রয় করে থাকে যে ধর্ম তা কার আশ্রয়ে টিকে থাকবে ?

'ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্মোঽভিভবত্যুত'—যখন কুলের পবিত্র মর্যাদা, পবিত্র আচরণ নষ্ট হয়, তখন ধর্ম পালন না-করা এবং ধর্মের বিপরীত কাজ করা অর্থাৎ যা করণীয় তা না করা এবং যা অনুচিত তা করা—এরূপ অধর্ম সমস্ত কুলকে গ্রাস করে অর্থাৎ সমস্ত কুলে অধর্ম ভরে যায়।

এখন এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, যখন কুল নষ্ট হয়ে যাবে, কুল বলে যখন আর কিছুই থাকবে না, অধর্ম তখন কাকে গ্রাস করবে ? এর উত্তর হচ্ছে এই যে, যুদ্ধ করার উপযুক্ত পুরুষগণ তো যুদ্ধেই নিহত হন ; কিন্তু যারা যুদ্ধ করার উপযুক্ত নয়, এইরূপ বালক এবং নারীগণ বেঁচে থাকে, তাদের অধর্ম গ্রাস করে। কারণ যুদ্ধে যখন শস্ত্র ব্যবহারকারী, শাস্ত্রজ্ঞ, ব্যবহারাদিতে পটু ব্যক্তিগণ নিহত হন, তখন অবশিষ্ট জীবিত ব্যক্তিগণকে সুশাসন করার এবং সুশিক্ষা দেবার কেউ থাকেন না। তাই মর্যাদা রক্ষার এবং ব্যবহারিক জ্ঞান না থাকায় তারা যেমন খুশি আচরণ করতে থাকে অর্থাৎ উপযুক্ত কর্ম না করে অনুপযুক্ত কাজ করতে থাকে, তাতেই অধর্ম প্রসারিত হয়।

*** *** ***

অধর্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ॥ ৪১ ॥

[কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ !) ; অধর্মাভিভবাৎ (অধর্ম অত্যধিক বৃদ্ধি পেলে) ; কুলস্ত্রিয়ঃ (কুলস্ত্রীগণ) ; প্রদুষ্যন্তি (দূষিতা হন) ; বার্ষ্ণেয় (হে বার্ষ্ণেয় !) ; স্ত্রীষু, দুষ্টাসু (স্ত্রীলোকগণ দূষিতা হলে) ; বর্ণসংকরঃ (বর্ণসংকর) ; জায়তে (উৎপন্ন হয়।)]

হে কৃষ্ণ ! অধর্ম অত্যধিক বৃদ্ধি পেলে কুলস্ত্রীগণ দূষিতা হন এবং হে বার্ষ্ণেয় ! স্ত্রীলোকগণ দূষিতা হলে বর্ণসংকর উৎপন্ন হয় ॥ ৪১ ॥

ব্যাখ্যা—'অধর্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ.........কুলস্ত্রিয়ঃ'—ধর্মপালন করলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়। অন্তঃকরণ শুদ্ধ হলে বুদ্ধি সাত্ত্বিকী হয়। সাত্ত্বিকী বুদ্ধিতে কি করা উচিত এবং কি করা অনুচিত— সেই বিবেক জাগ্রত থাকে। কিন্তু যখন কুলে অধর্ম বৃদ্ধি পায়, তখন আচরণে অশুদ্ধি দেখা দেয়, ফলে অন্তঃকরণও অশুদ্ধ হয়ে যায়। অন্তঃকরণ অশুদ্ধ হলে বুদ্ধি তামসিক হয়। তামসিক বুদ্ধি হলে মানুষ অকর্তব্যকে কর্তব্য এবং কর্তব্যকে অকর্তব্য বলে মনে করতে থাকে অর্থাৎ তার মধ্যে শাস্ত্রমর্যাদার বিপরীত ভাব উৎপন্ন হয়। এই বিপরীত বুদ্ধিতে কুলস্ত্রীগণ দূষিত অর্থাৎ ব্যভিচারিণী হয়ে ওঠে।

'স্ত্রীষু দুষ্টাসু........বর্ণসঙ্করঃ'—স্ত্রীগণ দূষিত হলে বর্ণসংকর সৃষ্টি হয়[১]। পুরুষ এবং নারী—দুজন পৃথক বর্ণের হলে তাদের যে সন্তান জন্মায়, তাকে বর্ণসংকর বলা হয়।

অর্জুন এখানে 'কৃষ্ণ' সম্বোধন করে এই কথাই বলেছেন, 'আপনি সকলকে আকর্ষণ করেন সেইজন্য আপনাকে 'কৃষ্ণ' বলা হয়, এখন আমাকে বলুন আপনি আমাদের বংশকে কোন্ দিকে আকর্ষণ করবেন অর্থাৎ কোন্ দিকে নিয়ে যাবেন ?'

'বার্ষ্ণেয়' সম্বোধনে এই ভাব প্রকট হয় যে কৃষ্ণ বৃষ্ণি বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন বলেই তাঁকে বার্ষ্ণেয় বলা হয়। কিন্তু যখন অর্জুনের বংশ লোপ পেয়ে যাবে তখন তাঁর বংশ কোন্ কুলের নামে পরিচিতি হবে ? সুতরাং কুল নষ্ট করা উচিত নয়।

※ ※ ※

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥ ৪২ ॥

[সঙ্করঃ (বর্ণসংকর) ; কুলঘ্নানাম্ (কুলঘাতকদের) ; চ কুলস্য (এবং কুলকে) ; নরকায় এব (নরকে নিয়ে যায়) ; লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ (শ্রাদ্ধ-তর্পণ না করায়) ; এষাম্ (এই কুলঘাতকদের) ; পিতরঃ (পিতৃকুল) ; হি (ও) ; পতন্তি (বিচ্যুত হন ।)]

বর্ণসংকর কুলঘাতকদের এবং কুলকে নরকে নিয়ে যায়। শ্রাদ্ধ এবং তর্পণ না করায় এই কুলঘাতকদের পিতৃকুল তাঁদের স্থান থেকে চ্যুত হন ॥ ৪২ ॥

ব্যাখ্যা—'সঙ্করো......কুলস্য চ'—বিশ্রিত বর্ণে অর্থাৎ সংকর বর্ণে যে সব বর্ণসংকর সন্তান জন্মায় তাদের ধর্মবুদ্ধি হয় না। তারা বংশমর্যাদা পালন করে না ; কারণ তারা অমর্যাদার মধ্য দিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। তাই তাদের নিজেদের কুলধর্ম না থাকায়, তারা তা পালন করে না, বরং তার বিপরীত আচরণ করে।

---

[১] পরস্পর-বিরুদ্ধ ধর্মের সংমিশ্রণে যা সৃষ্টি হয়, তাকে 'সংকর' বলা হয়। যখন কর্তব্য পালন করা হয় না তখন ধর্মসংকর, বর্ণসংকর, জাতিসংকর, কুলসংকর, বেশসংকর, ভাষাসংকর, আহারসংকর ইত্যাদি অনেক সংকরদোষ দেখা দেয়।

যারা যুদ্ধে নিজেদের কুল সংহার করেছেন, তাদের 'কুলঘাতী' বলা হয়। এইরূপ কুলঘাতকদের নরকে নিয়ে যায় এই বর্ণসংকর। শুধুমাত্র কুলঘাতকদের নয়, কুল-পরম্পরা নাশ হওয়ায় সমস্ত কুলকেই তারা নরকে নিয়ে যায়।

'পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ'—যারা নিজ কুলনাশ করেছে, এরূপ কুলঘাতকদের পিতৃকুল বর্ণসংকরজাত সন্তান দ্বারা শ্রাদ্ধ ও তর্পণ না হওয়ায় তাদেরও পতন ঘটে। কারণ শ্রাদ্ধ-তর্পণ ঠিকমতো করলে সেই পুণ্যের প্রভাবেই তারা উচ্চলোকে অবস্থান করে। কিন্তু শ্রাদ্ধ-তর্পণ বন্ধ হলেই তাদের সেই উচ্চলোক থেকে পতন হয় অর্থাৎ তাদের স্থিতি আর সেই লোকে থাকে না।

পিতৃকুলের শ্রাদ্ধ এবং তর্পণ বন্ধ হওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে, বর্ণসংকরজাত সন্তানগণের পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা বা ভক্তি থাকে না। সেইজন্য তাদের মধ্যে পিতৃপুরুষদের জন্য শ্রাদ্ধ-তর্পণ করার কোনো চিন্তা থাকে না। যদি লোকলজ্জাবশতঃ তারা শ্রাদ্ধ করে তাহলেও, শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী তাদের শ্রাদ্ধে অধিকার না থাকায় তা পিতৃলোকে পৌঁছায় না। এইরূপে পিতৃগণ শ্রদ্ধা-ভক্তি এবং শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী শ্রাদ্ধ-তর্পণ না পাওয়ায়, নিজেদের স্থান থেকে পতিত হন।

পরিশিষ্ট-ভাব—পিতৃকুলের মধ্যে এক 'আজান' পিতৃকুল থাকে আর এক 'মর্ত্য' পিতৃকুল থাকে। পিতৃলোকে যাঁরা থাকেন তাঁদের 'আজান' বলা হয় এবং যাঁরা মনুষ্যলোক থেকে মৃত হয়ে পিতৃলোকে গেছেন তাঁদের 'মর্ত্য' বলা হয়। শ্রাদ্ধ ও তর্পণ না করলে মর্ত্য পিতৃকুলের পতন হয়। সেই পিতৃকুলেরই পতন হয় যাঁরা আত্মীয়দের সঙ্গে, সন্তানদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন এবং শ্রাদ্ধ-তর্পণাদির আশা করেন।

※ ※ ※

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্মাঃ কুলধর্মাশ্চ শাশ্বতাঃ॥ ৪৩ ॥

[এতৈঃ (এই) ; বর্ণসঙ্করকারকৈঃ (বর্ণসংকর সৃষ্টিকারী) ; দোষৈঃ (দোষে) ; কুলঘ্নানাম্ (কুলঘাতকগণের) ; শাশ্বতাঃ (শাশ্বত) ; কুলধর্মাঃ চ (কুলধর্ম এবং) ; জাতিধর্মাঃ (জাতিধর্ম) ; উৎসাদ্যন্তে (লোপ পায়।)]

এই বর্ণসংকর সৃষ্টিকারী দোষে কুলঘাতকগণের শাশ্বত কুলধর্ম এবং জাতিধর্ম লোপ পায় ॥ ৪৩ ॥

ব্যাখ্যা—**'দোষৈরেতৈঃ......শাশ্বতাঃ'**—যুদ্ধে কুল-ক্ষয় হলে কুলের সঙ্গে সঙ্গে কুলধর্মও নাশ হয়। কুলধর্ম নাশ হলে কুলে অধর্মের বৃদ্ধি ঘটে। অধর্মের বৃদ্ধিতে স্ত্রীগণ দূষিতা হন, স্ত্রীগণ দূষিতা হওয়ায় বর্ণসংকর সৃষ্টি হয়। এইভাবে বর্ণসংকর সৃষ্টিকারী দোষে কুলনাশ-কারীদের জাতিধর্ম (বর্ণধর্ম) নষ্ট হয়ে যায়।

কুলধর্ম এবং জাতিধর্ম কী ? একটি জাতিতে এক এক কুলের যে নিজস্ব পৃথক পৃথক পরম্পরা থাকে, পৃথক পৃথক মর্যাদা থাকে, পৃথক পৃথক আচরণ থাকে, সেগুলি সেই কুলের 'কুলধর্ম' নামে অভিহিত হয়। একটি জাতির সমস্ত কুলের সকলকে নিয়ে যে ধর্ম পালন করা হয়, সেটিই 'জাতিধর্ম' অর্থাৎ 'বর্ণধর্ম' নামে পরিচিত, সেটি ধর্ম এবং শাস্ত্রবিধির দ্বারা পরিচালিত হয়। কুলধর্ম এবং জাতিধর্মের আচরণ লোপ পেলে এই ধর্মগুলি নষ্ট হয়ে যায়।

※ ※ ※

উৎসন্নকুলধর্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দন।
নরকেঽনিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম॥ ৪৪ ॥

[জনার্দন (হে জনার্দন) ; ইতি, অনুশুশ্রুম (আমরা এরূপ শুনে এসেছি) ; উৎসন্নকুলধর্মাণাম্ (যার কুলধর্ম নষ্ট হয়ে যায়) ; মনুষ্যাণাম্ (সেই ব্যক্তিকে) ; অনিয়তম্ (বহু কাল) ; নরকে (নরকে) ; বাসঃ (বাস) ; ভবতি (করতে হয় ।)]

হে জনার্দন ! আমরা এরূপ শুনে এসেছি যে, যাদের কুলধর্ম নষ্ট হয়ে যায়, সেইসকল ব্যক্তিকে বহুকাল নরকে বাস করতে হয় ॥ ৪৪ ॥

ব্যাখ্যা—**'উৎসন্নকুলধর্মাণাম্......অনুশুশ্রুম'**[১]—'ভগবান মানুষকে বিবেক দিয়েছেন, নতুন কর্ম করার অধিকার দিয়েছেন। সুতরাং সে কর্ম করায় অথবা না করায়, ভালো করা বা মন্দ করায় স্বতন্ত্র। তাই তার সর্বদা বিচার-বিবেচনাপূর্বক কর্তব্যকর্ম করা উচিত। কিন্তু মানুষ সুখভোগ ইত্যাদির লোভে নিজের বিবেককে অবহেলা করে এবং রাগ-দ্বেষের বশীভূত হয়ে পড়ে, তাতে তার আচরণ শাস্ত্র এবং কুলমর্যাদার বিপরীত হতে থাকে। পরিণামে সে ইহলোকে নিন্দিত, অপমানিত ও তিরস্কৃত হয় এবং পরলোকে দুর্গতি ও নরক প্রাপ্ত হয়। নিজ পাপের জন্যই তাকে বহুকাল নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। এইসব কথা আমি পরম্পরাক্রমে গুরুজনদের কাছে শুনে এসেছি।'

'মনুষ্যাণাং' পদে কুলঘাতী এবং তার কুলের সমস্ত মানুষকে ধরা হয়েছে অর্থাৎ কুলঘাতকদের অতীতে যাঁরা হয়েছিলেন তাঁদের (পিতৃপুরুষদের), তার নিজের এবং ভবিষ্যতে যারা হবে (বংশধরদের), —সকলকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—যুদ্ধের ফলে ভবিষ্যতে যে সমস্ত অনর্থ হতে পারে, সেগুলির বর্ণনার পরিণামবশতঃ স্বয়ং অর্জুনের ওপর কী প্রভাব ফেলেছিল পরের শ্লোকে তিনি তাই জানাচ্ছেন।

অহো বত মহৎ পাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ৪৫ ॥

[অহো (বড় আশ্চর্যের) ; বত, বয়ম্ (বিষয় যে, আমরা) ; রাজ্যসুখলোভেন (রাজ্য ও সুখের লোভে) ; **স্বজনম্** (নিজ স্বজনদের) ; **হন্তুম্** উদ্যতাঃ (বধ করতে প্রস্তুত হয়ে) ; **মহৎ পাপম্** (একটি বড় পাপ) ; **কর্তুম** (করার জন্য) ; ব্যবস্থিতা (কৃতসংকল্প হয়েছি ।)]

বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, আমরা রাজ্য ও সুখের লোভে নিজ স্বজনদের বধ করতে প্রস্তুত হয়ে ভয়ানক পাপ করার জন্য কৃতসংকল্প হয়েছি ॥ ৪৫ ॥

ব্যাখ্যা—'অহো বত ......স্বজনমুদ্যতাঃ'—এই দুর্যোধনেরা দুষ্ট। ধর্মের প্রতি এদের লক্ষ্য নেই। এদের ওপর লোভ চেপে বসেছে। তাই এরা যদি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয় তবে সেটা কোনো আশ্চর্যের কথা নয়। কিন্তু আমরা তো ধর্ম-অধর্ম, কর্তব্য-অকর্তব্য, পাপ-পুণ্য যে কী তা জানি। এইসব জেনেও মূর্খ ব্যক্তিদের ন্যায় আমরাও এক ভয়ংকর পাপ করতে স্থির নিশ্চয় হয়েছি। শুধু তাই নয়, যুদ্ধে নিজ আত্মীয়স্বজনকে বধ করতে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হয়েছি ! আমাদের পক্ষে এটি অত্যন্ত আশ্চর্যের এবং দুঃখের ব্যাপার অর্থাৎ এটি সর্বতোভাবেই অনুচিত কাজ ।

আমাদের যা জানা আছে, আমরা যা শাস্ত্র থেকে শুনেছি, গুরুজনদের কাছ থেকে শিক্ষা পেয়েছি, নিজেদের জীবন শোধরাবার সিদ্ধান্ত করেছি, তা সমস্ত অবহেলা করে আজ আমরা যুদ্ধরূপ পাপ করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি— এটি মস্ত বড় পাপ—**'মহৎ পাপম্'**।

এই শ্লোকে **'অহো'** এবং **'বত'**—এই দুটি পদ ব্যবহৃত হয়েছে। এর মধ্যে **'অহো'** শব্দটি আশ্চর্যের বাচক। আশ্চর্য হচ্ছে এই যে যুদ্ধের পরিণামস্বরূপ এমন সব অনর্থ-ঘটনাবলী জেনেও তাঁরা যুদ্ধের মতো বড় পাপ করবার স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ! অপর দিকে **'বত'** পদটি খেদের, দুঃখের বাচক। দুঃখ এই যে, যে রাজ্য এবং সুখ ক্ষণস্থায়ী তারই লোভে তাঁরা নিজ আত্মীয়স্বজনদের হত্যা করতে উদ্যত হয়েছেন !

পাপ করতে প্রস্তুত হওয়া এবং স্বজন বধের জন্য উদ্যত

[১] শোকাবিষ্ট হওয়াতেই অর্জুন এখানে **'অনুশুশ্রুম'** পরোক্ষ লিট্ ক্রিয়ার প্রয়োগ করেছেন।

হওয়া—এই দুটির কারণ হল কেবলমাত্র রাজ্য এবং সুখভোগের লোভ। অর্থাৎ যুদ্ধে যদি পাণ্ডবেরা জয় লাভ করেন তাহলে তাঁরা রাজ্যসম্পদ লাভ করবেন, লোকের ভালোবাসা-শ্রদ্ধা পাবেন, তাঁদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে, সমস্ত রাজ্যের ওপর তাঁদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হবে, সর্বস্থানে তাঁদের আদেশ পালিত হবে, অনেক ধনসম্পত্তি হওয়ায় ইচ্ছামতো ভোগসম্পদ সংগ্রহ করবেন এবং আরাম-আয়েশ করবেন—তাঁদের মধ্যেও এমনভাবে রাজ্য এবং সুখের লোভ প্রবেশ করেছে—যা তাঁদের মতো মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে অনুচিত।

এই শ্লোকে অর্জুন বলতে চাইছেন যে, নিজের সৎ বিবেচনা, নিজের জ্ঞানের ওপর শ্রদ্ধা থাকলেই শাস্ত্র, গুরুজন ইত্যাদির আদেশ মান্য করা সম্ভব হয়। কিন্তু, যে ব্যক্তি নিজের সদ্‌ভাবনাকে অবহেলা করে, সে শাস্ত্র, গুরুজন ইত্যাদির সুসিদ্ধান্তগুলি জেনেও সেগুলি হৃদয়ে ধারণ করতে পারে না। নিজের সৎ-চিন্তা, বিচারের প্রতি বারংবার অবহেলা, অনাদর করলে সৎ-চিন্তা সৃষ্টি হয় না। তখন সেই মানুষকে দুর্গুণ-দুরাচার থেকে কে রক্ষা করবে ? তেমনি অর্জুন ভাবছেন যে, তাঁরা যদি তাঁদের জ্ঞানের সমাদর না করেন, তবে তাঁদের অনর্থ-পরম্পরা থেকে কে রক্ষা করবে ? অর্থাৎ কেউই রক্ষা করতে পারবে না।

অর্জুনের দৃষ্টি এখানে রয়েছে যুদ্ধরূপ ক্রিয়ার দিকে। তিনি এই যুদ্ধরূপ কর্মকে দোষযুক্ত মেনে নিয়ে তার থেকে সরে দাঁড়াতে চাইছেন। কিন্তু প্রকৃত দোষ যে কি—সেইদিকে অর্জুনের দৃষ্টি নেই। যুদ্ধে কুটুম্ব-জনোচিত মোহ, স্বার্থপরতা, কামনাই দোষের, কিন্তু সেদিকে অর্জুনের দৃষ্টি না যাওয়ায় অর্জুন আশ্চর্য হয়ে খেদ প্রকাশ করছেন, যা প্রকৃতপক্ষে কোনো বিচারশীল, ধর্মাত্মা, বীরযোদ্ধা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে উচিত নয়।

[অর্জুন প্রথম আটত্রিশতম শ্লোকে দুর্যোধনাদির যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া, কুলক্ষয়জনিত দোষ এবং মিত্রদ্রোহজনিত পাপকে লোভের কারণ বলে জানিয়েছেন এবং এখানেও নিজেরা রাজ্য এবং সুখের লোভেই এই মহাপাপ করতে উদ্যত বলে জানিয়েছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, অর্জুন পাপের কারণ হিসাবে লোভকে নিমিত্ত বলে মনে করেন। তা সত্ত্বেও পরে তৃতীয় অধ্যায়ের ছত্রিশতম শ্লোকে অর্জুন 'মানুষ না চাইলেও পাপাচরণ করে কেন' এই প্রশ্নটি কেন করেছেন ? তার উত্তর এই যে, এখানে কৌটুম্বিক মোহের জন্য অর্জুন যুদ্ধ হতে নিবৃত্ত হওয়াকে ধর্ম এবং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াকে অধর্ম মনে করেছেন অর্থাৎ তাঁর শরীরাদির প্রতি লৌকিক দৃষ্টি থাকায় যুদ্ধে স্বজন-বধ করাকে লোভের হেতু মনে করেছেন। কিন্তু পরে গীতার উপদেশ শুনে তাঁর নিজ শ্রেয় ও কল্যাণের ইচ্ছা জাগ্রত হয় (গীতা ৩।২)। তাই কর্তব্য ত্যাগ করে অকরণীয় কাজে প্রবৃত্ত হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করেছেন—সেখানে (৩।৩৬-এ) অর্জুন কর্তব্য ও সাধকের দৃষ্টিতে প্রশ্ন করেছেন।]

※ ※ ※

সম্বন্ধ—বিস্ময়াবিষ্ট ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে অর্জুন পরের শ্লোকে নিজের সপক্ষে শেষ যুক্তিটি পেশ করছেন।

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ॥ ৪৬ ॥

[যদি (যদি) ; শস্ত্রপাণয়ঃ (অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করে) ; ধার্তরাষ্ট্রা (ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষের লোকেরা) ; রণে (রণাঙ্গণে) ; অশস্ত্রম্ (অস্ত্ররহিত) ; অপ্রতীকারম্ (যুদ্ধ বিমুখ) ; মাম্ হন্যুঃ (আমাকে বধ করে) ; তৎ মে (তা আমার পক্ষে) ; ক্ষেমতরম্ (অত্যন্ত হিতকারক) ; ভবেৎ (হবে।)]

অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করে ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষের লোকেরা যদি অস্ত্ররহিত এবং যুদ্ধবিমুখ অবস্থায় আমাকে বধও

করে, তবে তা আমার পক্ষে অত্যন্ত হিতকারক হবে ॥ ৪৬ ॥

ব্যাখ্যা—'যদি মাম্.......ক্ষেমতরং ভবেৎ'—অর্জুন বলছেন যে, যদি আমি যুদ্ধ থেকে সর্বপ্রকারে বিরত হই তাহলে হয়তো দুর্যোধন ইত্যাদিরাও যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হবেন। কারণ আমরা যদি কিছু না চাই, যুদ্ধ না করি, তাহলে তাঁরা যুদ্ধ করবেন কেন ? কিন্তু যদি হঠাৎ ক্রোধের বশে অথবা অস্ত্রধারী এই ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষের ব্যক্তিরা, 'চিরকালের মতো আমাদের পথের কাঁটা দূর হোক, শত্রুতার শেষ হোক'—এই ভেবে যুদ্ধবিমুখ এবং অস্ত্ররহিত অবস্থায় আমাকে হত্যাও করে তাহলে তাঁদের সেই কাজ আমার পক্ষে অত্যন্ত হিতকারী হবে। কারণ গুরুজনদের যুদ্ধে হত্যা করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আমি যে বিরাট পাপের বোঝা নিতে যাচ্ছিলাম, তার প্রায়শ্চিত্ত হবে এবং সেই পাপ থেকে আমার শুদ্ধিকরণ হবে। অর্থাৎ যুদ্ধ না করলে আমি পাপ হতে রক্ষা পাব এবং আমার বংশেরও নাশ হবে না।

[মানুষ যখন নিজের জন্য কোনো বিষয়ের বর্ণনা করে, সেই বিষয়ের প্রভাব তখন তার ওপর পড়ে। অর্জুনও যখন আটাশতম শ্লোক থেকে শোকাবিষ্ট হয়ে বলতে আরম্ভ করলেন তখন তিনি তত শোকমগ্ন ছিলেন না, যতটা এখন হয়ে পড়েছেন। অর্জুন প্রথমে যুদ্ধে বিরত হননি, কিন্তু শোকাবিষ্ট হয়ে বলতে শুরু করে শেষ পর্যন্ত এমনই বিষাদগ্রস্ত হলেন যে, যুদ্ধে বিরত হলেন এবং ধনুক ত্যাগ করে বসে পড়লেন। ভগবান ভাবলেন যে, 'অর্জুনের কথা শেষ হলে তবে তিনি বলবেন অর্থাৎ অর্জুনের দুঃখ তাঁর কথার সঙ্গে সঙ্গে বের হয়ে আসবে এবং তাঁর আর কোনো দুঃখ অন্তরে জমা থাকবে না, তবেই আমার কথার প্রভাব অর্জুনের ওপর পড়বে।' সেইজন্য ভগবান অর্জুনের বক্তব্যের মাঝখানে কিছু বলেননি।]

বিশেষ কথা

এতক্ষণ পর্যন্ত অর্জুন নিজেকে ধর্মাত্মা মনে করে যত প্রমাণ এবং যুক্তি দেখিয়েছেন, জগতে সংসারী ব্যক্তিগণ সেই প্রমাণই যথার্থ বলে মনে করবেন এবং পরে ভগবান অর্জুনকে যে সব কথা বোঝাবেন, সেগুলি তাদের কাছে ঠিক বলে মনে হবে না। তার কারণ হচ্ছে এই যে, মানুষ যে পরিস্থিতিতে থাকে, সেই পরিস্থিতির, সেই শ্রেণীর কথাকেই তারা ঠিক বলে মনে করে ; তার থেকে উচ্চ শ্রেণীর কথাকে তারা অনুধাবন করতে পারে না। অর্জুনের মধ্যে স্বজনপ্রিয়তার মোহ ছিল এবং সেই মোহে আবিষ্ট হয়ে তিনি ধর্ম এবং সাধুতা সম্বন্ধে বড় বড় কথা বলছিলেন। সুতরাং যাদের মধ্যে স্বজনপ্রিয়তার মোহ থাকে, তাদের অর্জুনের কথা ঠিক বলে মনে হবে। কিন্তু ভগবানের দৃষ্টি থাকে জীবের কল্যাণের দিকে অর্থাৎ তিনি চিন্তা করেন কী করে প্রাণীর কল্যাণ হবে ! ভগবানের সেই উচ্চ ভাবকে তারা (লৌকিক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ) বুঝতে পারে না। সুতরাং তারা ভগবানের কথা ঠিক বলে মেনে নেবে না, বরং তারা মনে করবে যে অর্জুনের পক্ষে এই পাপরূপ যুদ্ধ থেকে দূরে থাকাই উচিত, ভগবান তাঁকে যুদ্ধে নিয়োজিত করে ঠিক করেননি।

প্রকৃতপক্ষে ভগবান অর্জুনকে দিয়ে যুদ্ধ করাননি, বরং তাঁকে তাঁর কর্তব্য জ্ঞান করিয়েছিলেন। অর্জুন নিজ কর্তব্য হিসাবে স্বাভাবিকভাবে যুদ্ধের সম্মুখীন হয়েছিলেন। সুতরাং যুদ্ধ সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা অর্জুনের নিজেরই ছিল ; তিনিই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন এবং ভগবানকে আহ্বান করে এনেছিলেন। এখন সেই কাজকে তাঁর বুদ্ধিতে অনিষ্টকারক বলে মনে হওয়ায় তিনি যুদ্ধে বিমুখ হয়েছেন অর্থাৎ নিজ কর্তব্য থেকে চ্যুত হয়েছেন। তাই ভগবান বলেছেন যে, অর্জুন যে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হচ্ছে, এ হচ্ছে অর্জুনের মোহ। তাই সময়োচিত যে কর্তব্য স্বতঃ সামনে আসে তা ত্যাগ করা উচিত নয়।

কোনো এক ব্যক্তি বদ্রীনারায়ণ যাচ্ছিল ; কিন্তু পথে দিক্‌ভ্রম হওয়ায় সে দক্ষিণকে উত্তর এবং উত্তরকে দক্ষিণ মনে করল। তখন সে বদ্রীনারায়ণের দিকে না গিয়ে বিপরীত পথে চলতে শুরু করল। পথে এক ব্যক্তির সঙ্গে তার দেখা হল, সে জিজ্ঞাসা করল, 'ভাই ! তুমি কোথায় যাচ্ছ ?' প্রথম ব্যক্তি জবাব দিল, 'বদ্রীনারায়ণ'। তখন সেই ব্যক্তিটি বলল, 'ভাই ! বদ্রীনারায়ণ এদিকে নয়, ওইদিকে, তুমি তো উল্টোপথে যাচ্ছ !' সুতরাং এই লোকটি ওই লোকটিকে বদ্রীনারায়ণ পাঠায়নি, সে শুধু দিক্ নির্দেশ করে ঠিক রাস্তাটা দেখিয়েছিল। তেমনি ভগবানও অর্জুনকে তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞান করিয়েছিলেন, যুদ্ধ করাননি।

আত্মীয়স্বজনদের দেখে অর্জুনের মনে হয়েছিল যে, 'আমি যুদ্ধ করব না', **'ন যোৎস্যে'** (২।৯), কিন্তু ভগবানের উপদেশ শুনে অর্জুন বলেননি যে, 'আমি যুদ্ধ করব না', তিনি বলেছিলেন যে, 'আপনার আদেশ পালন করব'—**'করিষ্যে বচনং তব'** (১৮।৭৩) অর্থাৎ তিনি নিজ কর্তব্য পালন করবেন। অর্জুনের বাক্যে এই প্রমাণ হয় যে, ভগবান তাঁকে তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞান দিয়েছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ হওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল। কারণ সবারই আয়ু শেষ হয়েছিল। এর অন্যথা কেউ করতে পারত না। ভগবান স্বয়ং বিশ্বরূপ দর্শন করানোর সময় অর্জুনকে বলেছিলেন যে, 'আমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কাল এবং সকলের সংহার করার নিমিত্ত এখানে উপস্থিত হয়েছি। সুতরাং তুমি যুদ্ধ না করলেও তোমার বিপক্ষের যোদ্ধারা কেউই জীবিত থাকবে না' (১১।৩২)। সুতরাং যুদ্ধরূপী এই সংহার অবশ্যই হওয়ার ছিল। অর্জুন যদি এই সংহারে অংশ না নিতেন, তাহলেও এটি হত। যদি অর্জুন যুদ্ধ না করতেন তবে যিনি মাতৃআজ্ঞায় দ্রৌপদীর সঙ্গে পঞ্চ-ভ্রাতার বিবাহ স্বীকার করে নিয়েছিলেন, সেই যুধিষ্ঠির মায়ের যুদ্ধ করবার আদেশ নিশ্চয়ই পালন করতেন। ভীমও যুদ্ধ থেকে পশ্চাদপসরণ করতেন না ; কারণ তিনি কৌরবদের বধ করার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। দ্রৌপদী এমন কথাও বলেছিলেন যে, 'যদি আমার পতিগণ (পাণ্ডবগণ) কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ না করেন, তাহলে আমার বাবা (দ্রুপদ), ভাই (ধৃষ্টদ্যুম্ন), আমার পঞ্চপুত্র এবং অভিমন্যু কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবেন।'[১] এইরূপ কয়েকটি বিশেষ কারণ ছিল, যাতে যুদ্ধ বন্ধ হওয়া সম্ভব ছিল না।

ভবিতব্য রোধ করা মানুষের হাতে নয়। কিন্তু নিজ কর্তব্য পালন করে মানুষ নিজেকে উদ্ধার করতে পারে এবং কর্তব্যচ্যুত হয়ে নিজের পতন ঘটাতে পারে। অর্থাৎ মানুষ নিজের শুভ-অশুভ করাতে স্বাধীন। সেইজন্য ভগবান অর্জুনকে কর্তব্যের জ্ঞান দিয়ে সমস্ত মানুষকেই উপদেশ দিয়েছেন যে, তাদের শাস্ত্র-উপদেশ অনুযায়ী নিজ কর্তব্য পালনে তৎপর হওয়া উচিত, তার থেকে কখনো বিচ্যুত হওয়া উচিত নয়।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—পূর্বের শ্লোকে অর্জুন নিজ যুক্তিতর্কের শেষ কথা শুনিয়েছেন। তারপর অর্জুন কি করলেন পরের শ্লোকে সঞ্জয় তাই জানাচ্ছেন।

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বার্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ॥ ৪৭ ॥

[**এবম্ উক্ত্বা** (এই কথা বলে) ; **শোকসংবিগ্নমানসঃ** (শোকাকুলমনে) ; **অর্জুনঃ** (অর্জুন) ; **সশরম্ চাপম্** (ধনুর্বাণ) ; **বিসৃজ্য** (পরিত্যাগ করে) ; **সংখ্যে** (যুদ্ধস্থলে) ; **রথোপস্থে** (রথের মধ্যে) ; **উপবিশৎ** (উপবেশন করলেন।)]

সঞ্জয় বললেন—এই কথা বলে শোকাকুল মনে অর্জুন ধনুর্বাণ পরিত্যাগ করে যুদ্ধস্থলে রথের মধ্যে উপবেশন করলেন ॥ ৪৭ ॥

ব্যাখ্যা—**'এবমুক্ত্বার্জুনঃ.......শোকসংবিগ্নমানসঃ'** —যুদ্ধ করা অনর্থের মূল, যুদ্ধ করলে ইহলোকে কুটুম্ব নাশ হবে, পরলোকে নরক প্রাপ্তি হবে ইত্যাদি কথাগুলি যুক্তি এবং প্রমাণপূর্বক জানিয়ে অর্জুন শোকাকুল মনে যুদ্ধ না করার স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যে যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি ধনুক হাতে উৎসাহের সঙ্গে এসেছিলেন, সেখানেই তিনি বামহস্তে গাণ্ডীব ধনুক এবং দক্ষিণহস্তে তীরটিকে নীচে রেখে রথের মধ্যে

[১]যদি ভীমার্জুনৌ কৃষ্ণ কৃপণৌ সন্ধিকামুকৌ। পিতা মে যোৎস্যতে বৃদ্ধঃ সহ পুত্রৈর্মহারথৈঃ॥
পঞ্চ চৈব মহাবীর্যাঃ পুত্রা মে মধুসূদন। অভিমন্যুং পুরস্কৃত্য যোৎস্যন্তে কুরুভিঃ সহ॥
(মহাভারত, উদ্যোগপর্ব ৮২।৩৭-৩৮)

যে স্থান হতে তিনি দুই পক্ষের সৈন্যদলকে নিরীক্ষণ করেছিলেন সেখানেই শোকাকুল হয়ে বসে পড়লেন।

অর্জুনের এরূপ শোকাকুল হওয়ার প্রধান কারণ হল——ভীষ্ম এবং দ্রোণের সামনে রথ সংস্থাপন করে ভগবানের অর্জুনকে কুরুবংশীয়দের দেখতে বলা 'কুরূন্ পশ্য' (গীতা ১।২৫)। তাঁদের দেখে অর্জুনের সুপ্ত মোহ জাগ্রত হয়। মোহ জাগ্রত হওয়ায় অর্জুন বলেছিলেন, 'যুদ্ধে আমার আত্মীয়গণের মৃত্যু হবে। আত্মীয়দের মৃত্যু বড়ই দুঃখজনক। দুর্যোধন প্রভৃতি লোভবশতঃ এই দুঃখের দিকে দৃষ্টিপাত করছে না। কিন্তু যুদ্ধের যে কি ভয়ংকর পরিণাম হবে—সেই কথা চিন্তা করে আমাদের এই পাপ থেকে নিবৃত্ত হওয়া উচিত। আমরা যে রাজ্য এবং সুখের আশায় কুলক্ষয় করার জন্য রণভূমিতে উপস্থিত হয়েছি—এটি আমাদের মস্ত বড় ভুল। সুতরাং যুদ্ধ না-করা অবস্থায়, অস্ত্ররহিত অবস্থায় সামনে উপস্থিত যোদ্ধাগণ যদি আমাকে হত্যাও করেন, তাহলে তা আমার পক্ষে হিতকারক হবে।' অন্তরে এইরূপ মোহ উপস্থিত হলে অর্জুন যুদ্ধে বিরত হওয়াতে তথা নিজ মৃত্যুতেও মঙ্গল দেখলেন এবং শেষে মোহবশতঃ ধনুর্বাণ ত্যাগ করে বিষাদমগ্ন হয়ে উপবেশন করলেন। মোহ-মমতারই কুপরিণাম হল—যে অর্জুন ধনুক নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, সেই অর্জুনই ধনুক ত্যাগ করে অত্যন্ত শোকাকুল হয়ে পড়লেন!

※ ※ ※

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদেঽর্জুনবিষাদযোগো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্ত॥ ১ ॥

এইভাবে ওঁ, তৎ, সৎ—ভগবানের এই নাম উচ্চারণপূর্বক ব্রহ্মবিদ্যা এবং যোগশাস্ত্রময়
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে 'অর্জুনবিষাদ্যোগ' নামক প্রথম অধ্যায় সম্পূর্ণ হল।। ১ ॥

প্রতিটি অধ্যায়ের সমাপ্তিতে মহর্ষি বেদব্যাস যে পুষ্পিকা লিখেছেন, তাতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিশেষ মাহাত্ম্য এবং প্রভাব প্রকট হয়েছে।

'ওঁ, তৎ, সৎ[1]'—এই তিনটি সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মার পবিত্র নাম যা জীবমাত্রেরই কল্যাণকারী। এটি উচ্চারণ করলে জীব পরমাত্মার সম্মুখীন হয় এবং এর দ্বারা শাস্ত্রবিহিত কর্তব্যকর্মের অঙ্গ-বৈগুণ্য দূর হয়। সুতরাং গীতার অধ্যায় পাঠ করার সময় শ্লোক, পদ এবং অক্ষরগুলির উচ্চারণে যে সকল ভ্রান্তি হয় তার পরিমার্জন করার জন্য এবং সংসার থেকে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ করে ভগবৎ-সম্বন্ধ অনুভব করার জন্য প্রত্যেক অধ্যায়ের সমাপ্তিতে **'ওঁ তৎ সৎ'** উচ্চারণ করা হয়েছে।

প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে মহর্ষি বেদব্যাসের **ওঁ** উচ্চারণের অর্থ এই যে, 'আমার রচনার অঙ্গ-বৈগুণ্য যেন দূর হয়,' **'তৎ'** উচ্চারণের অর্থ, 'আমার রচনা ভগবৎপ্রীত্যর্থে যেন হয়', এবং **'সৎ'** উচ্চারণের অর্থ, 'আমার রচনা সৎ অর্থাৎ অবিনাশী ফল প্রদান স্বরূপ যেন হয়'। **'ইতি'**—'ব্যস্ আমার এটুকুই প্রয়োজন। এছাড়া আমার ব্যক্তিগত আর কোনো প্রয়োজন নেই।'

যিনি **'শ্রীমৎ'** অর্থাৎ সর্বশোভাসম্পন্ন এবং যাঁতে সমস্ত ঐশ্বর্য, ধর্ম, যশ, শ্রী, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য— এই ছয়টি **'ভগ'** নিত্য বিদ্যমান থাকে, সেই ভগবানের মুখনিঃসৃত হওয়ার জন্য এটিকে **'শ্রীমৎ ভগবৎ'** বলা হয়েছে।

মানুষ যখন প্রফুল্ল থাকে, আনন্দে থাকে, তখন তার মুখ হতে স্বতঃই গীত উৎসারিত হয়। ভগবানও এটি আনন্দ সহকারে গীত করেছেন, তাই এর নাম **'গীতা'**। সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে যদিও এটির **'গীতম্'** নাম হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু উপনিষদের স্বরূপ হওয়ায়, এটিতে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ 'গীতা'র প্রয়োগ করা হয়েছে।

এটিতে সম্পূর্ণ উপনিষদের সারতত্ত্ব নিহিত রয়েছে এবং এটি স্বয়ং ভগবদ্বাণী হওয়ায় উপনিষদস্বরূপ, তাই একে **'উপনিষদ্'** বলা হয়েছে।

বর্ণ, আশ্রম, সম্প্রদায় ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি না রেখে

[1]গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ের ২৩ থেকে ২৭ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

প্রাণীমাত্রেরই কল্যাণকারী সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা হওয়ায় এটির নাম **'ব্রহ্মবিদ্যা'**। এই ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপ গীতায় কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ, ভক্তিযোগ ইত্যাদি যোগসাধনের শিক্ষাদান করা হয়েছে, যাতে সাধকদের পরমাত্মার সঙ্গে নিজ নিত্য-সম্বন্ধ অনুভূত হয়। সেইজন্য একে **'যোগশাস্ত্র'** বলা হয়েছে।

গীতা সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও ভক্তপ্রবর অর্জুনের কথোপকথন। অর্জুন নিঃসংকোচে প্রশ্ন করেছেন এবং ভগবান উদারভাবে উত্তর দিয়েছেন। দুজনেরই ভাব এতে পরিস্ফুট হয়েছে। সুতরাং এই দুজনের নামেই এই গীতাশাস্ত্রের বিশেষ মহিমা হওয়াতে এটিকে **'শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদ'** নামে উল্লেখ করা হয়।

প্রথম অধ্যায়টিতে অর্জুনের বিষাদের বর্ণনা আছে। এই বিষাদও ভগবান অথবা সাধুসঙ্গ পেয়ে গেলে সংসারে বৈরাগ্য উৎপন্ন করে কল্যাণকারী হয়ে যায়। দুর্যোধন ইত্যাদিরও বিষাদ জন্মেছিল, কিন্তু তারা ভগবানে বিমুখ হওয়ায় তাদের বিষাদ **'যোগ'** হয়নি। কেবল অর্জুনের বিষাদই ভগবদ্মুখী হওয়ায় **'যোগ'** অর্থাৎ ভগবানে নিত্য-সম্বন্ধ-অনুভবকারী হয়েছে। সেইজন্য এই অধ্যায়ের নাম **'অর্জুনবিষাদযোগ'** রাখা হয়েছে।

প্রত্যেক অধ্যায় শেষে পুষ্পিকা দেওয়ার অর্থ এই যে, যদি সাধক একটি অধ্যায়ও ঠিকমতো মনন ও বিচার করে, তবে একটি অধ্যায় থেকেই তার কল্যাণ হবে।

পরিশিষ্ট-ভাব—গীতার পুষ্পিকাতে **'ব্রহ্মবিদ্যায়াম্'**, **'যোগশাস্ত্রে'** এবং **'শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে'**— এই তিনটি পদে একবচন ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু **'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসু'** এবং **'উপনিষৎসু'**— এই দুটি পদে বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হল যে ভগবদ্‌বাণীরূপ সমস্ত উপনিষদগুলির মধ্যে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাও একটি উপনিষদ, যাতে 'ব্রহ্মবিদ্যা' (জ্ঞানযোগ), 'যোগশাস্ত্র' (কর্মযোগ) এবং 'শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদ' (ভক্তিযোগ)— এই তিনটি উদ্ধৃত হয়েছে।

গীতায় 'শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদ'টি আরম্ভ এবং শেষ হয়েছে ভক্তিতেই। আরম্ভে অর্জুন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ভগবানের শরণ নিয়েছিলেন—**'শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্'** (২।৭) এবং শেষে ভগবান **'মামেকং শরণং ব্রজ'** পদটির দ্বারা পূর্ণ শরণাগতির প্রেরণা দিলে অর্জুন সম্পূর্ণভাবে শরণাগত হন—**'করিষ্যে বচনং তব'** (১৮।৭৩)। অর্জুন নিজের শ্রেয় (কল্যাণ)-এর উপায় জানতে চেয়েছিলেন (২।৭, ৩।২, ৫।১), তাই ভগবান গীতায় 'জ্ঞানযোগ' ও 'কর্মযোগ'ও বর্ণনা করেছেন।

প্রথম অধ্যায়ের পদ, অক্ষর এবং উবাচ—(১) এই অধ্যায়ে **'অথ প্রথমোঽধ্যায়ঃ'**-এর তিন, **'ধৃতরাষ্ট্র উবাচ'** **'সঞ্জয় উবাচ'** ইত্যাদি পদের বারো, শ্লোকের পাঁচশত আটান্ন এবং পুষ্পিকার তেরোটি পদ আছে। এইভাবে সমস্ত পদের যোগ সংখ্যা পাঁচশত ছিয়াশি।

(২) এই অধ্যায়ে **'অথ প্রথমোঽধ্যায়ঃ'**-এর সাত, **'ধৃতরাষ্ট্র উবাচ'** **'সঞ্জয় উবাচ'** ইত্যাদি পদের সাঁইত্রিশ, শ্লোকের এক হাজার পাঁচশত চার এবং পুষ্পিকাতে আটচল্লিশটি অক্ষর আছে। এইরূপে সমস্ত অক্ষরগুলির যোগসংখ্যা এক হাজার পাঁচশত ছিয়ানব্বই। এই অধ্যায়ের সমস্ত শ্লোক বত্রিশ অক্ষর সংবলিত।

(৩) এই অধ্যায়ে ছয়টি **'উবাচ'** আছে—একটি **'ধৃতরাষ্ট্র উবাচ'**, তিনটি **'সঞ্জয় উবাচ'** এবং দুটি **'অর্জুন উবাচ'**।

প্রথম অধ্যায়ে প্রযুক্ত ছন্দ

এই অধ্যায়ের সাতচল্লিশটি শ্লোকের মধ্যে পঞ্চম এবং তেত্রিশতম শ্লোকের প্রথম পংক্তি এবং তেতাল্লিশতম শ্লোকের তৃতীয় পংক্তিতে **'র-গণ'** যুক্ত হওয়ায় **'র-বিপুলা'**; পঁচিশতম শ্লোকের প্রথম পংক্তি ও নবম শ্লোকের তৃতীয় পংক্তিতে **'ন-গণ'** প্রযুক্ত হওয়ায় **'ন-বিপুলা'** সংজ্ঞাযুক্ত ছন্দ রয়েছে। অবশিষ্ট বিয়াল্লিশটি শ্লোক যথাযথ **'পথ্যাবক্ত্র'** অনুষ্টুপ ছন্দের লক্ষণযুক্ত।

⁂ ⁂ ⁂

॥ ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

অথ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

দ্বিতীয় অধ্যায়

অবতরণিকা

দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে দুই পক্ষের সেনাদের কথা বললেন, কিন্তু দ্রোণাচার্য কোনো উত্তর দিলেন না। দুর্যোধন তাতে দুঃখিত হলেন। তখন দুর্যোধনকে প্রসন্ন করার জন্য ভীষ্ম জোরে শঙ্খধ্বনি করলেন। ভীষ্মের শঙ্খ বাদনের পর কৌরব এবং পাণ্ডবসেনাদের সকল বাদ্য বাদিত হয়। তারপর (বিংশতিতম শ্লোক থেকে) শ্রীকৃষ্ণার্জুনের কথোপকথন শুরু হয়।

অর্জুন ভগবানকে তাঁর রথটি দুই পক্ষের সৈন্যদলের মধ্যস্থলে স্থাপন করতে বললেন। ভগবান উভয়পক্ষের সেনাদের মধ্যভাগে ভীষ্ম, দ্রোণ ইত্যাদির সম্মুখে রথটিকে স্থাপন করে অর্জুনকে কুরুবংশীয়দের অবলোকন করতে বললেন। উভয়পক্ষের সৈন্যদলেই নিজেদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের দেখে অর্জুনের কৌটুম্বিক মোহ জাগ্রত হয়, পরিণামে অর্জুন যুদ্ধ থেকে বিমুখ হয়ে, ধনুর্বাণ ত্যাগ করে রথের মধ্যভাগে উপবেশন করলেন।

এরপরে বিষাদমগ্ন অর্জুনকে ভগবান কী বললেন—সেই বিষয় ধৃতরাষ্ট্রকে অবগত করাবার জন্য সঞ্জয় দ্বিতীয় অধ্যায়টি শুরু করেন।

সঞ্জয় উবাচ

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ॥১॥

[তথা (এইরূপ) ; কৃপয়া (কাপুরুষতায়) ; আবিষ্টম্ (আবিষ্ট) ; বিষীদন্তম্ (বিষাদমগ্ন) ; অশ্রুপূর্ণা কুলেক্ষণম্ (অশ্রুপূর্ণ অবরুদ্ধ-নেত্র) ; তম্ (অর্জুনকে) ; মধুসূদনঃ (ভগবান মধুসূদন) ; ইদম্ বাক্যম্ (এই কথা) ; উবাচ (বললেন।)]

সঞ্জয় বললেন—কাপুরুষতায় আবিষ্ট, বিষাদমগ্ন এবং অশ্রুপূর্ণ অবরুদ্ধ-নেত্র অর্জুনকে ভগবান এই কথা (পরের শ্লোকগুলিতে) বললেন ॥১॥

ব্যাখ্যা—**'তং তথা কৃপয়াবিষ্টম্'**—রথে সারথিরূপে উপবিষ্ট ভগবানকে অর্জুন আদেশ করলেন, 'হে অচ্যুত! আমার রথটি দুই পক্ষের সেনার মধ্যে স্থাপন করুন, যাতে আমি দেখতে পারি যে এই যুদ্ধে কে কে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছেন। অর্থাৎ আমার মতো বড় যোদ্ধার সঙ্গে কোন কোন যোদ্ধারা যুদ্ধ করতে সাহস করেন? মৃত্যু সম্মুখে দেখেও আমার সঙ্গে যুদ্ধ করার তাদের সাহস কী করে হয়?' যে অর্জুনের মধ্যে এইপ্রকার উৎসাহ, বীরভাব ছিল, সেই অর্জুনই দুইপক্ষের সৈন্যদলে নিজের আত্মীয়স্বজনকে দেখে তাঁদের মৃত্যুর আশঙ্কায় মোহগ্রস্ত হয়ে এত শোকবিহ্বল হলেন যে তাঁর শরীর অবসন্ন, মুখ শুষ্ক, শরীরে কম্পন এবং রোমসমূহ দণ্ডায়মান হয়ে উঠছে, তাঁর হাত থেকে ধনুক পড়ে যাচ্ছে, ত্বকে জ্বালা বোধ হচ্ছে, তাঁর দাঁড়াবার শক্তি নেই এবং মনেও ভ্রান্তি এসে যাচ্ছে। কোথায় অর্জুনের স্বভাব—**'ন দৈন্যং ন পলায়নম্'** আর কোথায় কাপুরুষতা দোষে শোকাবিষ্ট অর্জুনের রথের মধ্যভাগে উপবেশন করা! অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে সঞ্জয় এই ভাবটি উল্লিখিত পদে প্রকটিত করেছেন।

প্রথম অধ্যায়ের আটাশতম শ্লোকেও সঞ্জয় অর্জুনের জন্য **'কৃপয়া পরয়াবিষ্টঃ'** পদটি প্রয়োগ করেছেন।

'অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্'—অর্জুনের মতো মহান যোদ্ধাও আত্মীয়জনিত মোহে আচ্ছন্ন হয়েছিলেন এবং চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। চোখে জল এত বেশি এসে গিয়েছিল যে অর্জুন ভালো করে দেখতেও পাচ্ছিলেন না।

'বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ'—এইপ্রকার কাপুরুষের মতো বিষাদ করতে থাকা অর্জুনকে ভগবান

মধুসূদন এই কথা (পরের দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্লোক) বললেন।

এখানে শুধু **'বিষীদন্তমুবাচ'** বললেও হত, **'ইদং বাক্যম্'** বলার প্রয়োজন ছিল না ; কারণ **'উবাচ'** ক্রিয়ার অন্তর্গত হল **'বাক্যম্'** পদটি। তবুও **'বাক্যম্'** পদটি বলার তাৎপর্য এই যে ভগবানের এই বাক্য, এই বাণী বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অর্জুনের মধ্যে ধর্মের ছদ্মরূপে যে কর্তব্যচ্যুতির দৈন্য এসেছিল তার ওপরে ভগবানের এই বাণী সরাসরি আঘাত করেছিল। যুদ্ধ থেকে বিরত হওয়ার যে সিদ্ধান্ত অর্জুন নিয়েছিলেন তাতে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। অর্জুনকে তাঁর দোষগুলির সম্পর্কে সজাগ করে তাঁর মধ্যে কল্যাণের জিজ্ঞাসা জাগ্রত করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। এই বিশেষ অর্থসম্পন্ন বাণীর প্রভাবেই অর্জুন ভগবানের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁর শরণাগত হন (২।৭)।

সঞ্জয়ের **'মধুসূদনঃ'** পদ বলার তাৎপর্য এই যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 'মধু' নামক দৈত্য সংহারকারী অর্থাৎ দুষ্ট স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিধনকারী। সেইহেতু তিনি দুষ্ট স্বভাবসম্পন্ন দুর্যোধনাদিরও নিধন না করিয়ে ক্ষান্ত হবেন না।

*** *** ***

সম্বন্ধ—ভগবান অর্জুনকে কী বলেছিলেন—পরের দুটি শ্লোকে তা বলা হয়েছে।

শ্রীভগবানুবাচ[১]

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন ॥ ২ ॥

[অর্জুন (হে অর্জুন !) ; বিষমে (এই বিষম সময়ে) ; ত্বা, ইদম্ (তোমার, এই) ; কশ্মলম্ (কাপুরুষতা) ; কুতঃ, সমুপস্থিতম্ (কোথা থেকে এল) ; অনার্যজুষ্টম্ (শ্রেষ্ঠ পুরুষের হয় না) ; অস্বর্গম্ (স্বর্গলাভ হয় না) ; অকীর্তিকরম্ (কীর্তিমানও করে না।)]

শ্রীভগবান বললেন—হে অর্জুন ! এই বিষম সময়ে তোমার মধ্যে এই কাপুরুষতা কোথা থেকে এল, যা কোনো শ্রেষ্ঠ পুরুষের শোভা পায় না, যাতে স্বর্গলাভ হয় না এবং যা কীর্তিমান করে না ॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা—**'অর্জুন'**—এই সম্বোধন করার তাৎপর্য হল যে 'তুমি স্বচ্ছ, নির্মল অন্তঃকরণসম্পন্ন। সুতরাং তোমার স্বভাবে কলুষতা, কাপুরুষতা আসা স্বভাববিরুদ্ধ। তাহলে তোমার মধ্যে এটি কী করে এল ?'

'কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্'—ভগবান বিস্ময় প্রকাশ করে অর্জুনকে বললেন, 'এরূপ যুদ্ধের অবকাশে তোমার মধ্যে শৌর্য এবং উৎসাহ আসা উচিত ছিল, কিন্তু এরূপ বিষম সময়ে তোমার মধ্যে এই কাপুরুষতা কোথা থেকে এল ?'

বিস্ময় দুইভাবে হয়ে থাকে—নিজে না জানার জন্য এবং অপরকে সচেতন করার জন্য। ভগবানের এখানে যেটি বিস্ময়পূর্বক বলা তা শুধু অর্জুনকে সজাগ করার জন্য, যাতে অর্জুনের লক্ষ নিজ কর্তব্যের দিকে যায়।

'কুতঃ' বলার তাৎপর্য এই যে প্রথমে এই কাপুরুষতারূপ দোষ তোমার মধ্যে (স্বয়ং-এ) ছিল না। এটি তো আগন্তুক দোষ, যা সর্বদা থাকবার নয়।

'সমুপস্থিতম্' বলার তাৎপর্য এই যে, 'এই কাপুরুষতা শুধুমাত্র তোমার ধারণা এবং বাক্যেই আসেনি, তোমার বাহ্য আচরণেও এর প্রভাব পড়েছে। এগুলি তোমার উপর খুব ভালোভাবেই প্রভাব ফেলেছে, যার ফলে তুমি ধনুর্বাণ ত্যাগ করে রথের মধ্যভাগে বসে পড়েছ।'

'অনার্যজুষ্টম্'[২]—বুদ্ধিমান মহৎ ব্যক্তিদের মধ্যে যে

---

[১] এখানে 'ভগবান' পদের 'ভগ' শব্দে যে 'মতুপ্' প্রত্যয় করা হয়েছে, সেটি নিত্যযোগের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ; কারণ সমস্ত ঐশ্বর্য, ধর্ম, যশ, শ্রী, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য—এই ছটি 'ভগ' ভগবানে নিত্য বিরাজমান।

[২] 'অনার্যজুষ্টম্' পদে যে 'নঞ্' সমাস থাকে, সেটি 'আর্যৈর্জুষ্টমার্যজুষ্টম্'—এই তৃতীয়া সমাসের পরই করা উচিত ; যেমন—'ন আর্যজুষ্টম্ অনার্যজুষ্টম্'। যদি 'নঞ্' সমাস তৃতীয়া সমাসের আগে করা হয় যেমন 'ন আর্যা অনার্যাঃ

ভাব উৎপন্ন হয়, তা তাদের কল্যাণের উদ্দেশ্যেই হয়। সেইজন্য শ্লোকের উত্তরার্ধে ভগবান সর্বপ্রথম উল্লিখিত পদটির দ্বারা বলেছেন যে, 'তোমার মধ্যে যে কাপুরুষতা এসেছে সেই কাপুরুষ-ভাব মহৎ ব্যক্তিগণ মেনে নেন না। কারণ তোমার এই কাপুরুষতায় নিজের কল্যাণের চিন্তা একেবারেই নেই। কল্যাণাকাঙ্ক্ষী মহৎ ব্যক্তি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি— দুটি কাজেই নিজের কল্যাণ চিন্তা করেন। তাতে তাঁর নিজ কর্তব্যে কোনো কাপুরুষতা দেখা দেয় না। পরিস্থিতি অনুযায়ী যে কর্তব্য তিনি প্রাপ্ত হন, তা তিনি কল্যাণ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে উৎসাহ এবং তৎপরতা সহকারে সুষ্ঠুভাবে সমাপন করেন। তিনি তোমার মতো কাপুরুষ হয়ে যুদ্ধ বা অন্য কোনো কর্তব্যকর্ম হতে বিরত হন না। তাই যুদ্ধরূপে প্রাপ্ত কর্তব্যকর্ম থেকে বিরত হওয়া তোমার পক্ষে কল্যাণপ্রদ নয়।'

'অস্বর্গ্যম্'—'কল্যাণের কথা না ভেবে যদি জাগতিক দৃষ্টিতে দেখা যায়, তাহলে স্বর্গের স্থান খুবই উঁচু। কিন্তু তোমার এই কাপুরুষতা স্বর্গদানেও অসমর্থ অর্থাৎ কাপুরুষতাপূর্বক যুদ্ধে নিবৃত্ত হলে স্বর্গপ্রাপ্তিও অসম্ভব।'

'অকীর্তিকরম্'—'যদি স্বর্গপ্রাপ্তিও লক্ষ্য না হয়, তাহলে মহৎ ব্যক্তি বলে যাঁদের বলা হয়, তাঁরা সেই কাজই করেন যাতে জগতে কীর্তি স্থাপিত হয়। কিন্তু তোমার এই কাপুরুষতার দ্বারা ইহলোকে কীর্তিও স্থাপিত হবে না বরং অপকীর্তি (অপযশই) হবে। সুতরাং তোমার মধ্যে কাপুরুষতা আসা একেবারেই অনুচিত।'

ভগবান এখানে **'অনার্যজুষ্টম্', 'অস্বর্গ্যম্'** এবং **'অকীর্তিকরম্'**—এইরূপ ক্রম দিয়ে ক্রমশঃ তিন প্রকারের মানুষের কথা বলেছেন—(১) বিচারশীল ব্যক্তি নিজের কল্যাণ কামনা করে। কেবলমাত্র কল্যাণই তাঁর ধ্যেয়, উদ্দেশ্য হয়। (২) যে ব্যক্তি পুণ্যাত্মা, তিনি শুভকর্মের দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্তি কামনা করেন। তিনি স্বর্গকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে স্বর্গপ্রাপ্তিকেই উদ্দেশ্য করে রাখেন। (৩) সাধারণ ব্যক্তিগণ সংসারকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। সেইজন্য তাঁরা সংসারে নিজ কীর্তি স্থাপন করতে চান এবং সেই কীর্তি স্থাপনকেই তাঁরা নিজের ধ্যেয় জ্ঞান করেন।

উপরে উল্লিখিত তিনটি পদের দ্বারা ভগবান অর্জুনকে সাবধান করে দিয়েছেন যে, 'তোমার এই যুদ্ধ না করার সিদ্ধান্ত বিচারশীল এবং পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদের যে লক্ষ্য সেই কল্যাণ ও স্বর্গপ্রাপ্তি—তা প্রাপ্ত করাতে সক্ষম নয় এবং সাধারণ মানুষের যে লক্ষ্য কীর্তি প্রাপ্তি, তা প্রাপ্ত করাতেও সক্ষম নয়। সুতরাং মোহবশতঃ তোমার যুদ্ধ না করার সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গর্হিত কর্ম, যা তোমাকে পতনের এবং নরকের পথে নিয়ে যাবে এবং তোমার অপকীর্তির কারণ হবে।'

※ ※ ※

সম্বন্ধ—কাপুরুষতা এসে গেলে এবার কী করবেন ? এই প্রশ্নের মীমাংসা করতে ভগবান বলেছেন যে—

ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥ ৩ ॥

[**পার্থ** (হে পৃথানন্দন অর্জুন !) ; **ক্লৈব্যম্** (এই নপুংসকতা) ; **মাস্ম, গমঃ** (আশ্রয় কোরো না) ; **ত্বয়ি** (তোমার) ; **এতৎ, ন, উপপদ্যতে** (এ উচিত নয়) ; **পরন্তপ** (হে পরন্তপ !) ; **ক্ষুদ্রম্ হৃদয়দৌর্বল্যম্** (তুচ্ছ হৃদয় দৌর্বল্য) ; **ত্যক্ত্বা** (পরিত্যাগ করে) ; **উত্তিষ্ঠ** (প্রস্তুত হও ।)]

হে পৃথানন্দন অর্জুন ! এই নপুংসকতা আশ্রয় কোরো না ; এ তোমার উচিত নয়। হে পরন্তপ ! এই তুচ্ছ হৃদয়-দৌর্বল্য ত্যাগ করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও ॥ ৩ ॥

অনার্যৈর্জুষ্টমনার্যজুষ্টম্' তাহলে এখানে এটি বলা ঠিক হয় না ; কারণ অনার্য ব্যক্তিদের দ্বারা যার সেবা করা হয়, সে অন্যের কাছে আদর্শ নয়।

ব্যাখ্যা—'পার্থ'[১]—কুন্তীর কথা স্মরণ করিয়ে অর্জুনের অন্তরে ক্ষত্রিয়োচিত বীরত্বের ভাব জাগ্রত করাবার জন্য ভগবান অর্জুনকে 'পার্থ' নামে সম্বোধন করছেন[২]। অর্থাৎ 'কাপুরুষের মতো তোমার মাতা পৃথার আদেশ লঙ্ঘন করা উচিত নয়।'

'ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ'—অর্জুন কাপুরুষসুলভ মানসিক দুর্বলতার জন্য যুদ্ধ করাকে অধর্ম এবং যুদ্ধ না করাকে ধর্ম বলে মনে করছেন। তাই অর্জুনকে সজাগ করার জন্য ভগবান বলছেন যে, 'যুদ্ধে অনিহা ধর্মের কথা নয়, এ তো নপুংসকতা। তুমি এই নপুংসক ভাব ত্যাগ কর'।

'নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে'—'তোমার মধ্যে এই নপুংসক ভাব আসা উচিত নয় ; কারণ তুমি কুন্তীর ন্যায় বীর ক্ষত্রিয়-মাতার পুত্র এবং নিজেও যুদ্ধবীর।' অর্থাৎ বংশগত এবং নিজ প্রকৃতিগত কারণেও এই নপুংসক ভাবটি তোমার ক্ষেত্রে একেবারেই অনুপযুক্ত।

'পরন্তপ'—'তুমি স্বয়ং পরন্তপ অর্থাৎ শত্রুদের তাপ দেবার, তাড়িয়ে দেবার মতো বীর, তবে তুমি কি এই সময় যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হয়ে নিজ শত্রুদের আনন্দবর্ধন করবে ?'

'ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ'—এখানে 'ক্ষুদ্রম্' পদের দুটি অর্থ— (১) এটি হৃদয়ের দুর্বলতা, তুচ্ছতাপ্রদানকারী অর্থাৎ মুক্তি, স্বর্গ অথবা কীর্তি-প্রদানকারী নয়। 'তুমি যদি এই তুচ্ছতা পরিত্যাগ না কর তাহলে তুমি নিজেই তুচ্ছ হয়ে পড়বে' ; এবং (২) এটি হৃদয়ের দৌর্বল্য, তুচ্ছ বিষয়। 'তোমার মতো যুদ্ধবীরের এইরূপ তুচ্ছ বিষয় ত্যাগ করা কোনো কঠিন কাজ নয়।'

'তুমি মনে করছ যে তুমি ধর্মাত্মা, যুদ্ধরূপ পাপ করতে চাও না কিন্তু এটি তোমার হৃদয়ের দুর্বলতা, শক্তিহীনতা। এটি পরিত্যাগ করে তুমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও অর্থাৎ প্রাপ্ত কর্তব্য পালন করো।'

এখানে অর্জুনের সম্মুখে যুদ্ধরূপ কর্তব্যকর্ম উপস্থিত। সেইজন্য ভগবান বলছেন, 'ওঠো, প্রস্তুত হও, যুদ্ধরূপ কর্তব্য পালন করো'। ভগবানের অন্তরে অর্জুনের কর্তব্যের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তিনি জানতেন সর্বদিক থেকেই অর্জুনের যুদ্ধে যোগ দেওয়া কর্তব্য। সুতরাং অর্জুনের অযৌক্তিক কথা গ্রাহ্য না করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাঁকে কর্তব্য পালনের জন্য নির্দেশ দিয়ে বললেন, 'সম্পূর্ণভাবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে নাও।'

পরিশিষ্ট-ভাব—এই কথাটি ভগবান বিস্তারিতভাবে পরবর্তী একত্রিশতম থেকে আটত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

※ ※ ※

---

[১]পৃথার (কুন্তী) পুত্র হওয়ায় অর্জুনের আর এক নাম পার্থ। 'পার্থ' সম্বোধনটি ভগবানের সঙ্গে অর্জুনের প্রিয় ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের দ্যোতক। ভগবান গীতায় আটত্রিশবার 'পার্থ' সম্বোধন করেছেন। অন্য সমস্ত সম্বোধনের চেয়ে 'পার্থ' সম্বোধন অধিকবার প্রয়োগ করেছেন। তারপরে 'কৌন্তেয়' সম্বোধন প্রয়োগ করেছেন, এটি চব্বিশবার উচ্চারণ করেছেন।

ভগবানের অর্জুনকে যখন বিশেষ কিছু বলার থাকে বা আশ্বাস দেবার থাকে অথবা তাঁর উপর বিশেষভাবে প্রীতি জন্মায়, তখন ভগবান অর্জুনকে 'পার্থ' বলে সম্বোধন করেন। এর দ্বারা তিনি স্মরণ করাতে চান যে, অর্জুন তাঁর পিসিমার (পৃথা—কুন্তী) পুত্র এবং তাঁর অতি প্রিয় ভক্ত এবং সখাও (গীতা ৪।৩)। সুতরাং তিনি অর্জুনকে বিশেষ কিছু কথা বলছেন যা যথার্থ এবং অর্জুনেরই হিতের জন্য।

[২]কুন্তীর বার্তা ছিল যে—

এতদ্ ধনঞ্জয়ো বাচ্যো নিত্যোদ্যুক্তো বৃকোদরঃ।

যদর্থং ক্ষত্রিয়া সূতে তস্য কালোঽয়মাগতঃ॥ (মহাভারত, উদ্যোগপর্ব ১৩৭।৯-১০)

'তুমি অর্জুনকে এবং যুদ্ধে সদাপ্রস্তুত ভীমকে বলবে যে, যে কার্যের জন্য ক্ষত্রিয়মাতা পুত্রের জন্ম দেয়, এখন সেই সময় উপস্থিত হয়েছে'।

সম্বন্ধ—প্রথম অধ্যায়ে যুদ্ধ না করার পক্ষে অর্জুন অনেক যুক্তি দিয়েছিলেন। সেই যুক্তিকে কোনোপ্রকার প্রশ্রয় না দিয়ে ভগবান অর্জুনকে তৎক্ষণাৎ তাঁর কাপুরুষসুলভ মনোভাবের জন্য তীব্র ভর্ৎসনা করেন এবং যুদ্ধ করতে নির্দেশ দেন। সেই কথায় অর্জুনও নিজের যুক্তিসমূহের সমাধান না পেয়ে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠেন—

অর্জুন উবাচ

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণং চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতি যোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন॥ ৪ ॥

[মধুসূদন (হে মধুসূদন !) ; সংখ্যে (রণভূমিতে) ; ভীষ্মম্ চ দ্রোণম্ (ভীষ্ম এবং দ্রোণের) ; প্রতি (সঙ্গে) ; ইষুভিঃ (বাণ দ্বারা) ; অহম্ (আমি) ; কথম্ যোৎস্যামি (কী করে যুদ্ধ করব ?) ; অরিসূদন (হে অরিসূদন !) ; পূজার্হৌ (দুজনেই পূজনীয়।)]

অর্জুন বললেন—হে মধুসূদন ! রণভূমিতে ভীষ্ম এবং দ্রোণের সঙ্গে বাণ দ্বারা আমি কী করে যুদ্ধ করব ? কারণ হে অরিসূদন ! এঁরা দুজনেই আমার পূজনীয় ॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা—**'মধুসূদন' এবং 'অরিসূদন'**—এই দুটি সম্বোধন দেওয়ার অর্থ হচ্ছে যে, 'আপনি দৈত্য ও শত্রু-বিনাশকারী অর্থাৎ দুষ্ট স্বভাবসম্পন্ন, অধর্ম আচরণকারী এবং মানুষের ক্লেশপ্রদানকারী মধু-কৈটভ ইত্যাদি দৈত্যদের বধ করেছেন এবং যারা অকারণে হিংসা করে, অপরের অনিষ্ট করে এইরূপ শত্রুদেরও আপনি বধ করেছেন। কিন্তু আমার সামনে পিতামহ ভীষ্ম এবং আচার্য দ্রোণ উপস্থিত, যাঁরা আচরণাদিতে শ্রেষ্ঠ, আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন এবং সযত্নে শিক্ষা দিয়েছেন। আমি এইরকম পরম হিতৈষী পিতামহ এবং বিদ্যাগুরুকে কী করে বধ করব ?

'কথং[১] ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণং চ'—'আমি ভীরুতার জন্য যুদ্ধে বিমুখ হইনি, বরং ধর্মের দিকে তাকিয়েই যুদ্ধ থেকে বিরত হচ্ছি। কিন্তু আপনি বলছেন যে এই ভীরুতা, নপুংসকতা আমার মধ্যে কোথা থেকে এল ! আপনি একটু ভেবে দেখুন যে, আমি পিতামহ ভীষ্ম এবং আচার্য দ্রোণের প্রতি কী করে বাণ নিক্ষেপ করব ? হে কেশব ! এ আমার কাপুরুষতা নয়। কাপুরুষতা তখনই হবে, যদি আমি মরতে ভয় পাই। আমি মরতে ভয় পাই না, বরং আমি এঁদের মারতেই ভয় পাই।

'সংসারে দুই প্রকারের সম্পর্ক প্রধান—জন্ম সম্পর্ক এবং শিক্ষা সম্পর্ক। জন্ম সম্পর্কে পিতামহ ভীষ্ম আমাদের পূজনীয়। ছোটবেলা থেকে আমি ওঁর কোলেই পালিত হয়েছি। শিশুকালে আমি যখন ওঁকে 'বাবা' বলে ডাকতাম, উনি তখন আদর করে বলতেন, 'আমি তো তোমার বাবারও বাবা !' এইভাবে ভীষ্ম আমাকে অত্যন্ত আদর ও স্নেহ দিয়ে এসেছেন। শিক্ষার সম্পর্কে আচার্য দ্রোণ আমাদের পূজনীয়, উনি আমার শিক্ষাগুরু। আমার ওপর তাঁর এত স্নেহ যে তিনি তাঁর নিজ পুত্র অশ্বত্থামাকেও আমার সমান শিক্ষা দান করেননি। তিনি ব্রহ্মাস্ত্র চালানো দুজনকে শেখালেও ব্রহ্মাস্ত্রের উপসংহার আমাকেই শিখিয়েছেন, নিজ পুত্রকে নয়। তিনি আমাকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন যে, 'আমার শিষ্যদের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র বিদ্যায় তোমার থেকে শ্রেষ্ঠ কেউ হবে না।' এরূপ পূজনীয় ভীষ্ম এবং আচার্য দ্রোণের সামনে, 'ওরে, তুই' ইত্যাদি উচ্চারণও তাঁদের বধতুল্য পাপ, তাহলে হত্যা করবার জন্য তাঁদের সঙ্গে ধনুর্যুদ্ধ করা কত বড় পাপ !'

'ইষুভিঃ..........পূজার্হৌ'—'সম্পর্কে বড় হওয়ায় পিতামহ ভীষ্ম এবং আচার্য দ্রোণ—দুজনেই অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ও পূজনীয়। আমার ওপর এঁদের পূর্ণ অধিকার আছে। সুতরাং এঁরা বরং আমার ওপর অস্ত্র নিক্ষেপ করতে পারেন, কিন্তু আমি কীভাবে তাঁদের ওপর বাণনিক্ষেপ করব ? তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে যুদ্ধ করা আমার পক্ষে অত্যন্ত পাপকর্ম হবে। কারণ তাঁরা দুজনই আমার সেবার যোগ্য, শুধু তাই নয় আমার তাঁদের পূজা করা উচিত। এইরূপ পূজনীয় ব্যক্তিদের কীভাবে বাণবিদ্ধ করব ?'

❋ ❋ ❋

[১]দ্বিতীয় শ্লোকে ভগবান 'কুতঃ' পদটির দ্বারা বলেছেন যে, 'তোমার মধ্যে এই কাপুরুষতা কোথা থেকে এল ?' সেই 'কুতঃ' পদটির বদলেই অর্জুন এখানে 'কথম্' পদের দ্বারা নিজ বক্তব্য প্রকাশ করছেন।

সম্বন্ধ—পূর্বের শ্লোকটিতে অর্জুন উত্তেজিত হয়ে ভগবানকে নিজ সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছিলেন। এখন ভগবৎ-বাণীর প্রভাবে অর্জুন নিজের এবং ভগবানের সিদ্ধান্তগুলি বিচার করে বলছেন যে—

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্ শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্॥ ৫ ॥

[মহানুভাবান্ (মহানুভব) ; গুরূন (গুরুজনদিগকে) ; অহত্বা (বধ না করে) ; ইহলোকে (ইহলোকে) ; ভৈক্ষ্যম্ ভোক্তুম্ (ভিক্ষান্ন গ্রহণকে) ; অপি (ও) ; শ্রেয়ঃ (শ্রেষ্ঠ) ; হি (কারণ) ; গুরূন্ (গুরুজনদের) ; হত্বা (বধ করে) ; ইহ (এই); রুধিরপ্রদিগ্ধান্ (রক্ত নিষিক্ত) ; অর্থকামান (ধনসম্পদ) ; ভোগান্ (রাজ্য ভোগ) ; এব, তু (তো) ; ভুঞ্জীয় (ভোগ করতে হবে !]

মহানুভব গুরুজনদিগকে বধ করা অপেক্ষা ইহলোকে ভিক্ষান্ন গ্রহণই আমি শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি। কারণ গুরুজনদের বধ করে শোণিতসিক্ত এই ধনসম্পদ এবং রাজ্যই তো ভোগ করতে হবে ! ॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা—[এই শ্লোকটিতে মনে হয় যে, দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্লোকে ভগবানের কথিত বাণী এবার অর্জুনের ওপর প্রভাব ফেলেছে। অর্জুনের মধ্যে এখন এই চিন্তা আসছে যে, 'ভীষ্ম-দ্রোণ ইত্যাদি গুরুজনদের মারা উচিত নয় জেনেও ভগবান কোনো সন্দেহ না রেখে আমাকে যুদ্ধ করতে নির্দেশ দিচ্ছেন, তবে আমার হয়তো কোথাও বোঝার ভুল হয়েছে।' তাই অর্জুন আগের মতো উত্তেজিত না হয়ে বরং কিছু নরম সুরে বলছেন।]

'গুরূনহত্বা ..... লোকে'—অর্জুন এখন আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলছেন যে, 'আমি যদি ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখ গুরুজনের সঙ্গে যুদ্ধ না করি তাহলে দুর্যোধনও একা আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে না। যুদ্ধ না হলে আমার রাজ্যলাভ হবে না, যার ফলে আমাকে দুঃখ পেতে হবে। আমার পক্ষে জীবন নির্বাহ করা কঠিন হয়ে পড়বে। এমনকি ক্ষত্রিয়দের পক্ষে নিষিদ্ধ যে ভিক্ষাবৃত্তি, জীবন নির্বাহের জন্য তাই অবলম্বন করতে হতে পারে। কিন্তু গুরুজনদিগকে বধের অপেক্ষা আমি সেই কষ্টদায়ক ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করাও শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি।'

'ইহ লোকে'—শব্দের অর্থ এই যে, 'যদিও ভিক্ষা করে খেলে এই জগতে আমার অনেক অপমান-অপযশ হবে, লোকে আমার নিন্দা করবে, তবুও গুরুজনকে হত্যা করার তুলনায় ভিক্ষা করাই শ্রেষ্ঠ।'

'অপি'—বলার অর্থ এই যে, 'আমার পক্ষে গুরুজনকে হত্যা করাও নিষিদ্ধ এবং ভিক্ষা করাও নিষিদ্ধ ; কিন্তু এই দুটির মধ্যে গুরুজনকে হত্যা করা আমার কাছে অধিকতর নিষিদ্ধ বলে মনে হয়।'

'হত্বার্থকামাংস্তু .... রুধিরপ্রদিগ্ধান্'—অর্জুন এবার ভগবদ্-বাণীর দিকে নজর রেখে বলছেন যে, 'যদি আমি আপনার নির্দেশানুসারে যুদ্ধ করি, তাহলে যুদ্ধে গুরুজনদের হত্যার পরিণামে আমি তাঁদের শোণিতসিক্ত ধনসম্পত্তিই তো ভোগ করব ! আমার ভোগপ্রাপ্তি হবে, কিন্তু সেই ভোগের বিনিময়ে মুক্তি কি পাওয়া যাবে, শান্তি কি পাওয়া যাবে ?'

এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখ গুরুজনগণ অর্থের জন্যই কৌরবপক্ষের কাছে ঋণী ছিলেন। সুতরাং এখানে **'অর্থকামান্'** পদটি **'গুরূন্'** পদের বিশেষণ বলে মনে করায় আপত্তি কীসের ? তার উত্তরে বলা যায় যে, 'অর্থ কামনাকারী গুরুজন'—এরূপ অর্থ করা উচিত নয়। কারণ পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ প্রমুখ গুরুজন অর্থলিপ্সু ছিলেন না। তাঁরা দুর্যোধনের বৃত্তিভোগী ছিলেন , তাঁর প্রদত্ত অন্ন গ্রহণ করতেন। তাই যুদ্ধের সময় দুর্যোধনের সঙ্গ পরিত্যাগ করা কর্তব্য নয় ভেবেই তাঁরা কৌরবপক্ষে যোগদান করেছিলেন।

অপরপক্ষে অর্জুন ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখের জন্য **'মহানুভাবান্'** পদের প্রয়োগ করেছেন। সুতরাং ওইরূপ শ্রেষ্ঠ ভাবসম্পন্ন ব্যক্তিদের অর্থের কামনাসম্পন্ন বলা কী করে সম্ভব ? তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, যাঁরা মহানুভব ব্যক্তি তাঁরা অর্থলিপ্সু হতে পারেন না এবং যারা অর্থলিপ্সু

তারা মহানুভব হতে পারে না। সুতরাং এখানে 'অর্থকামান্' পদটি 'ভোগান্' পদের বিশেষণ হওয়াই সম্ভব।

বিশেষ কথা

ভগবান দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্লোকে অর্জুনের কল্যাণের জন্যই তাঁকে কাপুরুষতা ত্যাগ করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু অর্জুন তার বিপরীতে এই অর্থ গ্রহণ করেন যে, ভগবান রাজ্যভোগ করার জন্য তাকে যুদ্ধের নির্দেশ দিচ্ছেন[১]।

অর্জুন প্রথমে যুদ্ধ না করার পক্ষে ছিলেন, যার জন্য তিনি ধনুর্বাণ ত্যাগ করে শোকাবিষ্ট হয়ে রথের মধ্যভাগে বসে পড়েছিলেন (১।৪৭)। ভগবানের কথাতে তিনি যুদ্ধ করার জন্য রাজি হন। এর তাৎপর্য এই যে, অর্জুনের মনোভাব ছিল এই যে, 'আমরা জানি ধর্ম কী, কিন্তু দুর্যোধনেরা ধর্ম সম্বন্ধে কিছু জানে না, সেইজন্যই তারা ধনসম্পদ এবং রাজ্যাদির লোভে যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়েছে।' এখন সেই কথা অর্জুন নিজের প্রসঙ্গেও বলছেন যে, 'যদি আমিও আপনার নির্দেশানুসারে যুদ্ধ করি তাহলে পরিণামে গুরুজনদের রক্তে সিক্ত ধনসম্পদ ও রাজ্যই তো প্রাপ্ত হব !' এইরূপে যুদ্ধে অর্জুনের শুধু মন্দ দিকগুলিই নজরে আসছিল।

মন্দ বিষয় যদি মন্দরূপে আসে তাহলে তা দূর করা সহজ হয়। কিন্তু যে মন্দ বিষয় সুন্দরের ছদ্মবেশে আসে তাকে দূর করা বড় কঠিন হয়। যেমন, সীতার কাছে রাবণ এবং হনুমানের কাছে কালনেমি রাক্ষস এলে তাদের সীতা এবং হনুমান কেউই চিনতে পারেননি। কারণ তারা দুজনেই সাধুবেশে ছিল। অর্জুনের দৃষ্টিতে এক্ষণে যুদ্ধরূপ কর্তব্যকর্ম করা মন্দ এবং যুদ্ধ না করা ভালো অর্থাৎ অর্জুনের মনে ধর্ম (হিংসাত্যাগ) রূপ ভালোর ছদ্মবেশে কর্তব্যত্যাগরূপ মন্দভাব এসেছিল। তিনি কর্তব্য-ত্যাগরূপ মন্দভাবকে মন্দরূপে দেখেননি ; কারণ তাঁর স্বজনবর্গের প্রাণহানি বিষয়ে মোহ ছিল। সেইজন্য এই মন্দভাব দূর করতে ভগবানকে অত্যন্ত জোর দিতে হয়েছিল এবং এতে অনেক সময়ও লেগেছিল।

আজকাল সমাজে একতা আনার নামে বর্ণ ও আশ্রমের মর্যাদাকে নষ্ট করার চেষ্টা করা হচ্ছে, এই মন্দ জিনিসটি একতারূপ ভালোর ছদ্মবেশে থাকায় মন্দভাবটি পরিলক্ষিত হচ্ছে না। সুতরাং বর্ণ-আশ্রমের মর্যাদা নষ্ট হলে পরিণামে মানুষ কতটা পতিত হবে, তাদের মধ্যে কত আসুরী ভাব উৎপন্ন হবে—এই দিকে দৃষ্টি যায় না। সেইরূপ অর্থসম্পদরূপী সঞ্চয় ও ভোগবৃত্তি মন্দ হওয়া সত্ত্বেও সুখ-আরামরূপী ভালোর ছদ্মবেশে উপস্থিত হওয়ায় লোকে এগুলি পাওয়ার জন্য মিথ্যা, কপটাচার, বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি দোষকে দোষ বলে মনে করে না। এখানে অর্জুনের মধ্যে ধর্মের আবরণে মন্দভাব এসেছে এইভাবে যে,—'আমরা ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখ মহানুভবদের কী করে বধ করব ? কারণ আমরা ধর্মকে জানি।' অর্থাৎ যেটিকে ভালো বলে মনে করছেন, আসলে সেটি মন্দ ; কিন্তু অর্জুনের মান্যতায় সেটি ভালো হওয়ায় সেটির মন্দভাব নজরে পড়ছে না।

পরিশিষ্ট-ভাব— 'মহানুভাবান্'— ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখ গুরুজনদের অনুভাব, অন্তরের ভাবই শ্রেষ্ঠ, শুদ্ধ, কারণ যুদ্ধাবস্থাতেও তাঁদের মধ্যে কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই।

*** *** ***

[১]শুধুমাত্র জাগতিক দৃষ্টি রাখে যে সব ব্যক্তি, তারা কল্যাণের কথা ভাবতে পারে না। যতক্ষণ জাগতিক দিকে দৃষ্টি থাকে, ততক্ষণ আধ্যাত্মিক স্ফুরণ হয় না। এখানে অর্জুনের দৃষ্টি প্রধানতঃ ছিল শরীরাদি জাগতিক পদার্থের দিকে। তিনি স্বজনমোহে আবদ্ধ হয়ে ধর্মকেও জাগতিক দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। জাগতিক (প্রাকৃত) দৃষ্টির জন্য অতি বিশেষ আধ্যাত্মিক দিকে অর্জুনের লক্ষ নেই অর্থাৎ তাঁর লক্ষ ভৌতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল এবং তিনি স্বজনসম্বন্ধীয় মোহ-মমতায় ভাসমান ছিলেন। তাই তিনি মনে করলেন যে, ভগবান তাঁকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করে রাজ্যলাভ করাতে চান। আসলে ভগবান তাঁর কল্যাণের দৃষ্টিতে এ কথা বলেছিলেন।

সম্বন্ধ—ভগবানের বাণীর এমনই বিশেষ প্রভাব যে তা ক্রমশঃ অর্জুনকে প্রভাবিত করছে, ফলে অর্জুন যুদ্ধ না করার সিদ্ধান্তে আরও বেশি সংশয়াকুল হচ্ছেন। সেই অবস্থায় অর্জুন বলছেন যে—

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষামস্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ ।। ৬ ।।

[এতদ্ (সঠিকভাবে তা) ; চ (ও) ; ন বিদ্মঃ (জানি না) ; কতরৎ (উভয়ের মধ্যে কোনটি) ; নঃ (আমাদের পক্ষে) ; গরীয়ঃ (শ্রেয়স্কর) ; যৎ, বা (অথবা আমরা) ; জয়েম, যদি, বা (জিতব, না) ; নঃ, জয়েয়ুঃ (আমাদের জিতে নেবে) ; যান্, হত্বা (যাদের মেরে) ; ন, জিজীবিষামঃ (আমরা বাঁচতেও চাই না) ; তে, এব (তারাই) ; ধার্তরাষ্ট্রাঃ (ধৃতরাষ্ট্রের আত্মীয়গণ) ; প্রমুখে, অবস্থিতাঃ (সামনে উপস্থিত।)]

আমরা সঠিকভাবে জানি না, যুদ্ধ করা বা না-করা কোনটি আমাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর ; আমরা এও জানি না যে আমরা জয়লাভ করব, না ওঁরা জয়লাভ করবেন। যে ধৃতরাষ্ট্রের আত্মীয়স্বজনদের বধ করে আমরা শুধু জয়লাভ কেন, বাঁচতে পর্যন্ত চাই না, আজ তাঁরাই আমাদের বিপক্ষে উপস্থিত ॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা—**'ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ঃ'**—'আমি যুদ্ধ করব, না বিরত থাকব—তার স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারছি না। কারণ আপনার মতে যুদ্ধ করাই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু আমার মতে গুরুজনদের বধ করা পাপ, তাই যুদ্ধ না করাই শ্রেষ্ঠ। এই দুটি কথা বিবেচনা করলে কোনটি আমার পক্ষে অতীব শ্রেষ্ঠ—তা বুঝতে পারছি না।' এইরূপ উপরিউক্ত পদগুলিতে অর্জুনের কাছে তার এবং ভগবানের—উভয় পক্ষই সমান সমান হয়ে যাচ্ছে।

'যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েযুঃ'—'আপনার নির্দেশানুসারে যদি যুদ্ধ করা হয়, তাহলে আমরা জয়লাভ করব, না তাঁরা (দুর্যোধন প্রমুখ) আমাদের জয় করবে—তাও আমরা জানি না।'

অর্জুন এখানে নিজের শক্তিকে অবিশ্বাস করেননি, বরং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেছেন। কারণ ভবিষ্যতে কী ঘটতে পারে—তাই বা কে জানে?

'যানেব হত্বা ন জিজীবিষামঃ'—'আমি আত্মীয়দের হত্যা করে বাঁচার ইচ্ছাও পোষণ করি না, ভোগ-বাসনা, রাজ্যলাভ করে শাসন করা তো অনেক দূরের কথা! কারণ আমার আত্মীয়রাই যদি মৃত্যুমুখে পতিত হন তাহলে বেঁচে থেকে আমরা কী করব? নিজ হাতে আত্মীয়দের বধ করলে তো তাঁদের জন্য চিন্তা ও শোকই করতে হবে। দুশ্চিন্তা করা এবং শোকমগ্ন হওয়া বা বিচ্ছেদের দুঃখ ভোগ করার জন্য আমি বাঁচতে চাই না।'

'তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ'—'যাঁদের হত্যা করে আমরা বাঁচতেও চাই না, সেই ধৃতরাষ্ট্রের আত্মীয়গণ আমাদের সামনে উপস্থিত। ধৃতরাষ্ট্রের যাঁরা আত্মীয় তাঁরা তো আমাদেরও আত্মীয়। সেই সমস্ত আত্মীয়দের বধ করে বাঁচার প্রয়াসকে ধিক্কার।'

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—নিজ কর্তব্য স্থির করতে অসমর্থ হয়ে অর্জুন ব্যাকুলতাপূর্বক ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছেন।

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।। ৭ ॥

[কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ (কাপুরুষতা দোষে অভিভূত স্বভাবসম্পন্ন) ; ধর্মসম্মূঢ়চেতাঃ (ধর্মে মোহিত অন্তঃকরণ) ; ত্বাম্, পৃচ্ছামি (আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি) ; যৎ, নিশ্চিতম্ (যেটি নিশ্চিতরূপে) ; শ্রেয়ঃ (শ্রেয়) ; স্যাৎ, তৎ (হয় সেটি) ; মে, ব্রূহি (আমাকে বলুন) ; অহম্ (আমি) ; তে শিষ্যঃ (আপনার শিষ্য) ; ত্বাম্ (আপনার) ; প্রপন্নম্ (শরণাগত) ; মাম্ (আমাকে) ; শাধি (শিক্ষা দান করুন।)]

কাপুরুষতারূপ দোষে অভিভূত-স্বভাব এবং ধর্ম বিষয়ে বিমূঢ়চিত্ত আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি যে, যেটি নিশ্চিতরূপে আমার পক্ষে শ্রেয় (কল্যাণকারী), সেটি আমাকে বলুন। আমি আপনার শিষ্য, আপনার শরণাগত, আমাকে শিক্ষা দান করুন ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা—**'কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাব..সংমূঢ়চেতাঃ[১]'**—যদিও অর্জুন মনে মনে যুদ্ধ থেকে সর্বতোভাবে নিবৃত্ত থাকা সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ বলে মনে করতেন না, কিন্তু এই স্থলে পাপের থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য তিনি যুদ্ধে বিরত হওয়া ছাড়া অন্য কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। সেইজন্যই তিনি যুদ্ধে বিরত হতে চাইছিলেন। এই যুদ্ধ-নিবৃত্তিকে তিনি গুণ বলে মনে করছিলেন, কাপুরুষতা-দোষ হিসাবে নয়। কিন্তু ভগবান অর্জুনের এই যুদ্ধের অনিচ্ছাকে কাপুরুষতা এবং হৃদয়-দৌর্বল্য বলে জানিয়েছেন। ভগবানের সেই নিঃসন্দিগ্ধ বাক্যে অর্জুনের মনে এই চিন্তা এল যে, 'যুদ্ধে নিবৃত্ত হওয়া আমার উচিত নয়। এটিও একপ্রকারের ভীরুতা, যা আমার স্বভাববিরুদ্ধ। কারণ আমার ক্ষত্রিয়জনোচিত স্বভাবে দীনতা এবং পলায়ন (পৃষ্ঠপ্রদর্শন)—এই দুটিই নেই[২]।' ভগবান কথিত এইরূপ কাপুরুষতারূপ দোষ স্বীকার করে নিয়ে অর্জুন ভগবানকে বলছেন যে, 'প্রথমতঃ কাপুরুষত্ব দোষে আমার ক্ষত্রিয় স্বভাব একপ্রকার দমে গেছে, আর দ্বিতীয়তঃ আমি নিজবুদ্ধিতে ধর্মের বিষয়ে কোনো স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছি না। আমার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে, ধর্মের বিষয়ে আমার বুদ্ধি কোনো কাজ করছে না।'

তৃতীয় শ্লোকে ভগবান স্পষ্ট ভাষায় অর্জুনকে নির্দেশ দিলেন যে, 'তুচ্ছ হৃদয়-দৌর্বল্য এবং কাপুরুষতা ত্যাগ করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।' এতে অর্জুনের ধর্ম (কর্তব্য) সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকা উচিত ছিল না। তবুও তাঁর সন্দেহ থাকার কারণ হল এই যে, একে তো যুদ্ধে আত্মীয় বধ করা এবং গুরুজনদের হত্যা করা অধর্ম (পাপ), আর দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। যুদ্ধ করতে হবে আত্মীয়দের সঙ্গে, এই পরিস্থিতিতে যুদ্ধ করা উচিত নয়, আবার ক্ষত্রিয়ধর্ম অনুযায়ী যুদ্ধ করাই উচিত—এই দুটি বিষয়ে অর্জুন ধর্মসংকটে পড়ে গেছেন। ধর্ম বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে আসতে তাঁর বুদ্ধি কাজ করছে না। এইরূপ হওয়ায়, 'এখন এইসময় আমার সঠিক কর্তব্য কী? আমার ধর্ম কী?' এটি স্পষ্টভাবে জানবার জন্য তিনি ভগবানকে প্রশ্ন করছেন।

'যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে'—এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে ভগবান বলছেন যে, 'তুমি যে কাপুরুষতাবশে যুদ্ধে নিবৃত্ত হচ্ছ, তোমার এই আচরণ, অনার্যসুলভ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ এইরূপ আচরণ করেন না। যাতে তাঁদের কল্যাণ হয়, সেইরূপ আচরণই তাঁরা করে থাকেন।' এই কথা শুনে অর্জুনের মনে হল যে, আমারও সেরকমই করা উচিত যা মহৎগণ করে থাকেন। এইভাবে অর্জুনের মধ্যে কল্যাণের ইচ্ছা জাগ্রত হয় এবং সেইজন্যই তিনি ভগবানকে নিজ কল্যাণের কথা জিজ্ঞাসা করছেন যাতে তাঁর নিশ্চিত কল্যাণ হয় এবং ভগবান সেইরূপ উপদেশই যেন প্রদান করেন।

অর্জুনের হৃদয় এইভাবে বিষাদগ্রস্ত হওয়ায় এবং এইখানে আবার নিজ কল্যাণের কথা জিজ্ঞাসা করায় প্রমাণিত হয় যে, মানুষ যে স্থিতিতে থাকে, তাতে সে যদি সন্তুষ্ট থাকে তবে তার মধ্যে প্রকৃত উদ্দেশ্য জাগতে পারে না। প্রকৃত উদ্দেশ্য—কল্যাণের জাগৃতি তখনই হয়, যখন মানুষ নিজের বর্তমান স্থিতিতে সন্তুষ্ট না হয়, সেই স্থিতিতে থাকতে না পারে।

'শিষ্যস্তেহহম্'—নিজ কল্যাণের কথা জিজ্ঞাসা করে অর্জুনের মনে একটি ভাবের উদয় হল যে, 'কল্যাণের কথা তো গুরুকে জিজ্ঞাসা করতে হয়, সারথিকে নয়।' এর ফলে অর্জুনের মধ্যে যে রথীসুলভ ভাব ছিল, যার জন্য তিনি আগে ভগবানকেও নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন যে, 'হে অচ্যুত! আমার রথ দুই পক্ষের সেনাদলের মধ্যভাগে স্থাপন করুন।'— সেই ভাবটি দূর হয় এবং কল্যাণের বিষয় জিজ্ঞাসা করে প্রকৃতপক্ষে তিনি ভগবানের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং বলেন, 'হে প্রভু! আমি আপনার শিষ্য, শিক্ষা গ্রহণের পাত্র, আপনি আমার কল্যাণের কথা বলুন।'

---

[১] এখানে 'চেতস্' শব্দটি বুদ্ধির বাচক।

[২] অর্জুনস্য প্রতিজ্ঞে দ্বে ন দৈন্যং ন পলায়নম্।

'শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্'—গুরু উপদেশ প্রদান করেন, যে পথ সম্বন্ধে জ্ঞান নেই, সেই পথের জ্ঞান দান করেন, সকল বিষয় জানিয়ে দেন, কিন্তু সেই পথ ধরে শিষ্যের নিজেকেই চলতে হবে। নিজ কল্যাণ শিষ্যের নিজেকেই করতে হয়। আমি তো এমন চাই না যে, ভগবান আমাকে শুধু উপদেশ দেবেন আর আমি সেই কাজটি সম্পন্ন করব ; কারণ তাতে আমার কাজ হবে না। তাহলে আমার কল্যাণের দায় কেন নিজের ওপরে রাখব ? গুরুর ওপর কেন ছেড়ে দেব না ? অসুস্থ হয়ে পড়লে তা সারাবার জন্য যেমন কেবল মায়ের দুধের ওপর নির্ভরশীল শিশুর মাকে ওষুধ খেতে হয়, তেমনি আমিও যদি সর্বতোভাবে গুরুর শরণাগত হই, গুরুর ওপর নির্ভরশীল হই, তবে আমার কল্যাণের পুরো দায়িত্ব গুরুর ওপরই ন্যস্ত হবে এবং স্বয়ং গুরুকেই আমার কল্যাণের ভার নিতে হবে, এইভাবে আবিষ্ট হয়ে অর্জুন বললেন যে, 'আমি আপনার শরণাগত, আপনি আমাকে শিক্ষা দান করুন।'

অর্জুন এখানে **'ত্বাং প্রপন্নম্'** পদটির দ্বারা ভগবানের শরণাগত হওয়ার কথা বললেও প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ শরণাগত তিনি হননি। তিনি যদি সর্বতোভাবে শরণাগত হতেন, তাহলে তাঁর **'শাধি মাম্'**, 'আমাকে শিক্ষা দিন' বলাটি উপযুক্ত হয় না। কারণ সম্পূর্ণভাবে শরণাগত হলে শিষ্যের নিজের কোনো কর্তব্য থাকে না। দ্বিতীয়তঃ, পরবর্তী নবম শ্লোকে অর্জুন বলেছেন যে, 'আমি যুদ্ধ করব না'—**'ন যোৎস্যে'**। অর্জুনের এই উক্তি শরণাগতের বিরুদ্ধভাবাপন্ন। কারণ শরণাগত হলে 'আমি যুদ্ধ করব, কি করব না'—এই ভাবটিই আর থাকে না। তার এই সম্বন্ধে কোনো চিন্তাই থাকে না যে, যাঁর শরণাগত সে হয়েছে, তিনি কী করাবেন আর কী করাবেন না। তার শুধু এই একটি ভাবই থাকে যে 'এখন আমি যাঁর শরণ নিয়েছি তিনি যা করাবেন, তাই করব।' অর্জুনের এই দ্বন্দ্ব দূর করার জন্যই পরে ভগবানকে, **'মামেকং শরণং ব্রজ'** (১৮।৬৬) 'একমাত্র আমার শরণাগত হও'—এইরূপ বলতে হয়েছিল। আবার অর্জুনও **'করিষ্যে বচনং তব'** (১৮।৭৩) 'আপনার আদেশ পালন করব'—বলে সম্পূর্ণভাবে শরণাগত হয়েছিলেন।

এই শ্লোকে অর্জুন চারটি কথা বলেছেন—**'কার্পণ্যদোষো......ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ'** (২) **'যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে'** (৩) **'শিষ্যস্তেহহম্'** (৪) **'শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্'**। এর প্রথম কথাটিতে অর্জুন ধর্মের সম্বন্ধে জানতে চেয়েছেন, দ্বিতীয়টিতে নিজের কল্যাণ প্রার্থনা করেছেন, তৃতীয়টিতে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন এবং সর্বশেষে ভগবানের শরণাগত হয়েছেন। এখন এই চারটি বিষয় নিয়ে যদি আলোচনা করা হয়, তাহলে প্রথমতঃ মানুষ যাকে জিজ্ঞাসা করে, সে উত্তর দেওয়া বা না-দেওয়ায় স্বাধীন। দ্বিতীয়টিতে, যাঁর কাছে প্রার্থনা করে, তাঁর উত্তর দেওয়া কর্তব্য। তৃতীয়টিতে, যাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সেই গুরুর ওপর শিষ্যকে কল্যাণের পথ দেখানোর বিশেষ দায়িত্ব এসে যায়। চতুর্থ বাক্যে, যাঁর শরণাগত হয় তাঁর শরণাগতকে উদ্ধার করতেই হয় অর্থাৎ শরণাগতকে উদ্ধারের উদ্যোগ স্বয়ং শরণ্যকেই করতে হয়।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকটিতে অর্জুন ভগবানের শরণাগত হলেও তাঁর মনে এই ভাব হল যে, 'ভগবানের ইচ্ছা যুদ্ধ করাবার, কিন্তু আমি এই যুদ্ধকে ধর্মযুদ্ধ বলে মানতে পারছি না। ভগবান যেমন আগেও 'উত্তিষ্ঠ' বলে যুদ্ধ করার আদেশ দিয়েছিলেন, এখনও তিনি সেইরূপ যুদ্ধ করার নির্দেশ দেবেন। দ্বিতীয়তঃ, বোধ হয় ভগবানের কাছে আমি নিজের হৃদয়ের ভাব পুরোপুরি বোঝাতে সমর্থ হইনি।' এই কথা ভেবেই অর্জুন পরের শ্লোকে যুদ্ধ না করার ব্যাপারে নিজের হৃদয়ের অবস্থা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্ যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্॥ ৮ ॥

[হি (কেননা) ; ভূমৌ (পৃথিবীতে) ; ঋদ্ধম্ (ধনধান্যসমৃদ্ধ) ; অসপত্নম্, রাজ্যম্ (নিষ্কণ্টক রাজ্য) ; চ সুরাণাম্ (এবং

স্বর্গলোকে দেবতাদের) ; আধিপত্যম্ (আধিপত্য) ; অবাপ্য (পাওয়া যায়) ; অপি (তাহলেও) ; ইন্দ্রিয়াণাম্ (ইন্দ্রিয়সমূহের) ; উচ্ছোষণম্ (শুষ্ককারী) ; মম (আমার) ; যৎ, শোকম্ (যে শোক) ; অপনুদ্যাৎ (তা দূরীভূত হবে) ; ন, প্রপশ্যামি (মনে হয় না।)]

পৃথিবীতে ধনধান্যসমৃদ্ধ নিষ্কণ্টক রাজ্য এবং স্বর্গে দেবতাগণের আধিপত্য যদি পাওয়া যায়, তাহলেও আমার ইন্দ্রিয়সমূহের সন্তাপক শোক দূরীভূত হবে বলে আমার মনে হয় না ॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা—[অর্জুন ভাবছিলেন যে, ভগবান মনে করছেন—অর্জুন যুদ্ধ করলে বিজয়ী হবে এবং বিজয়ী হলে সে রাজ্যলাভ করবে, যাতে তার দুঃখচিন্তা দূর হবে এবং সন্তোষ লাভ হবে। কিন্তু শোকের জন্য অর্জুনের এমন দশা হয়েছে যে বিজয়ী হলেও যে তার শোক দূর হবে—তা তার মনে হচ্ছে না।]

'অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং রাজ্যম্'—'যদি আমি ধনধান্যসমন্বিত নিষ্কণ্টক রাজ্যলাভ করি অর্থাৎ সেই রাজত্বে প্রজারা খুব সুখে থাকে, প্রজাদেরও অনেক ধনসম্পত্তি থাকে, কোনো জিনিসের অভাব না থাকে এবং রাজ্যের মধ্যে কোনো শত্রুতা না থাকে—তবুও আমার শোক দূর হওয়া সম্ভব নয়।'

'সুরাণামপি চাধিপত্যম্'—'পৃথিবীর এই তুচ্ছ ভোগ-সর্বস্ব রাজ্য তো কোন ছার, ইন্দ্রের দিব্য ভোগসমন্বিত রাজ্যও যদি পাওয়া যায় তবুও আমার শোক, হৃদয়ের জ্বালা এবং চিন্তা দূর হবে না।'

অর্জুন প্রথম অধ্যায়ে বলেছিলেন যে, 'আমি বিজয়ও চাই না, রাজ্যও চাই না, সুখও চাই না ; কারণ ওই রাজ্যে কী হবে ? ভোগে কী হবে ? এবং ওই জীবনেই বা কী হবে ? যাঁদের জন্য আমরা রাজ্য, ভোগ এবং সুখ আকাঙ্ক্ষা করি, তাঁরাই মৃত্যুর জন্য সামনে উপস্থিত' (প্রথম অধ্যায়ের বত্রিশ-তেত্রিশতম শ্লোক)। এখানে অর্জুন বলেছেন যে, 'পৃথিবীর ধনধান্যসমন্বিত নিষ্কণ্টক রাজ্য যদি পাওয়া যায় এবং দেবতাদের আধিপত্যও যদি লাভ হয়, তাহলেও আমার শোক দূর হবে না, আমি তাতে সুখী হতে পারব না।' ওই স্থানে আত্মীয়-মোহ বৃত্তি বেশি হওয়ায় অর্জুনের যুদ্ধের প্রবৃত্তি ছিল না, কিন্তু এখানে তাঁর যুদ্ধে যে প্রবৃত্তির অভাব হয়েছে, তা নিজের কল্যাণের ভাব উৎপন্ন হওয়াতেই হয়েছে। সুতরাং আগের যুদ্ধনিবৃত্তির মনোভাবের সঙ্গে এখনকার যুদ্ধনিবৃত্তির মধ্যে অনেক তফাৎ।

'ন হি প্রপশ্যামি......ইন্দ্রিয়াণাম্'—'আত্মীয়গণের মৃত্যুর আশঙ্কাতেই যখন আমার এত দুঃখ হচ্ছে, তাহলে তাঁদের মৃত্যু হলে আমি না জানি কী পরিমাণ শোকগ্রস্ত হব ! যদি রাজ্যলাভের জন্য আমার দুঃখ হত, তবে রাজ্যলাভ করলেই তা দূর হত। কিন্তু আত্মীয়বধের জন্য যে শোক হচ্ছে রাজ্যলাভ করলে তা কীভাবে দূর হবে ? তার উপশম হওয়া তো দূরের কথা, বরং সেই শোক আরও বর্ধিত হবে। কারণ যুদ্ধে যদি সকলেই নিহত হন তবে প্রাপ্ত রাজ্য কে ভোগ করবে ? সেই রাজ্য কার কাজে লাগবে ? অতএব পৃথিবীর রাজত্ব বা স্বর্গের আধিপত্য— যাই পাওয়া যাক, আমার ইন্দ্রিয় সন্তাপক শোক তাতে দূরীভূত হবে না।'

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ— 'প্রাকৃত পদার্থগুলি প্রাপ্ত হলে যে আমার শোক দূর হবে, তা আমার মনে হয় না' —এই কথা বলে অর্জুন কী করলেন সঞ্জয় পরবর্তী শ্লোকে বর্ণনা করেছেন।

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ॥ ৯ ॥

[পরন্তপ (হে শত্রুতাপন ধৃতরাষ্ট্র !) ; এবম্ উক্ত্বা (এই কথা বলে) ; গুড়াকেশঃ (নিদ্রাজয়ী অর্জুন) ; হৃষীকেশম্

(অন্তর্যামী) ; **গোবিন্দম্** (ভগবান গোবিন্দকে) ; **ন, যোৎস্যে** (আমি যুদ্ধ করব না) ; **ইতি, হ, উক্ত্বা** (স্পষ্টভাবে জানিয়ে) ; **তূষ্ণীম্** (চুপ) ; **বভূব** (করে গেলেন।)]

সঞ্জয় বললেন—হে শত্রুতাপন ধৃতরাষ্ট্র ! এই কথা বলে নিদ্রাজয়ী অর্জুন ভগবান গোবিন্দকে 'আমি যুদ্ধ করব না' স্পষ্টভাবে একথা জানিয়ে চুপ করে গেলেন ॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা—**'এবমুক্ত্বা .....বভূব হ'**—অর্জুন নিজের এবং ভগবানের দুই বক্তব্যকেই সামনে রেখে আলোচনা করলেন, তারপর শেষে এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, যুদ্ধ করলে একমাত্র রাজ্যই প্রাপ্ত করা যাবে, সম্মান হবে এবং পৃথিবীতে যশলাভ করা যাবে। কিন্তু তাঁর হৃদয়ে যে শোক, চিন্তা এবং দুঃখ আছে তা দূর হবে না। অতএব যুদ্ধ না করাই তাঁর পক্ষে যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

অর্জুন যদিও ভগবানের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতেন এবং তা মান্য করতেন, কিন্তু যুদ্ধ করার বিষয়টি তিনি ঠিকমতো গ্রহণ করতে পারছিলেন না। তাই অর্জুন নিজের হৃদয়ের কথাগুলি এখানে স্পষ্টভাবে, এককথায় বলে দিলেন যে, 'আমি যুদ্ধ করব না।' এইভাবে যখন নিজের বক্তব্য, নিজ সিদ্ধান্ত ভগবানকে স্পষ্টরূপে জানিয়ে দিলেন, তখন ভগবানকে বলার মতো তাঁর আর কোনো কথা বাকি রইল না ; সেইজন্য তিনি চুপ করে গেলেন।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—অর্জুন যখন যুদ্ধ করতে স্পষ্ট অস্বীকার করলেন, তারপর কী হল, পরের শ্লোকে সঞ্জয় সেটি জানাচ্ছেন।

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ॥ ১০ ॥

[**ভারত** (হে ভরতবংশোদ্ভব ধৃতরাষ্ট্র !) ; **উভয়োঃ সেনয়োঃ** (দুই পক্ষের সেনার) ; **মধ্যে** (মধ্যস্থলে) ; **বিষীদন্তম্** (বিষাদমগ্ন অর্জুনকে) ; **প্রহসন্, ইব** (স্মিতহাস্যে) ; **হৃষীকেশঃ** (ভগবান হৃষীকেশ) ; **ইদম্** (এই) ; **বচঃ** (কথাগুলি) ; **উবাচ** (বললেন।)]

হে ভরতবংশোদ্ভব ধৃতরাষ্ট্র ! দুই পক্ষের সেনার মধ্যস্থলে বিষাদমগ্ন সেই অর্জুনকে ভগবান হৃষীকেশ স্মিতহাস্যে এই (পরবর্তী শ্লোকে বলা) কথা বললেন ॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা—**'তমুবাচ হৃষীকেশঃ .... বচঃ'**—অর্জুন অত্যন্ত শৌর্য এবং উৎসাহের সঙ্গে যোদ্ধাদের দেখবার জন্য দুই সৈন্যদলের মধ্যে রথটি স্থাপন করতে ভগবানকে জানিয়েছিলেন। ওই স্থানেই অর্থাৎ উভয় সৈন্যদলের মধ্যস্থলে অর্জুন বিষাদমগ্ন হয়ে রইলেন। প্রকৃতপক্ষে হওয়া উচিত ছিল এই যে, অর্জুন যে উদ্দেশ্যে এই যুদ্ধস্থলে এসেছিলেন, সেই উদ্দেশ্য অনুযায়ী যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ানো। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য ত্যাগ করে অর্জুন চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। সুতরাং উভয়পক্ষের সৈন্যদলের মধ্যে ভগবান বিষাদমগ্ন অর্জুনকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করলেন।

'প্রহসন্নিব'—(বিশেষভাবে মৃদু হাস্য) এর তাৎপর্য এই যে, অর্জুনের ভাব পরিবর্তিত হতে দেখে অর্থাৎ প্রথমে যে যুদ্ধ করার ভাব ছিল, তা এখন বিষাদে রূপান্তরিত হয়েছে—এই দেখে ভগবান কৌতুকগ্রস্ত হয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ অর্জুন প্রথমে (দ্বিতীয় অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে) বলেছিলেন যে, 'আমি আপনার শরণাগত, আমাকে শিক্ষাদান করুন,' অর্থাৎ 'আমি যুদ্ধ করব কিনা, আমার কী করা উচিত—সেই শিক্ষা দিন'। কিন্তু এখানে ভগবান যখন দেখলেন তিনি কিছু বলার আগেই অর্জুন সিদ্ধান্ত করে ফেলেছেন যে তিনি যুদ্ধ করবেন না,—একারণেই ভগবান কৌতুক বোধ করলেন। কারণ শরণাগত হলে 'আমি কী করব আর কী করব না' ইত্যাদি চিন্তা করার অধিকারই থাকে না। তখন শরণাগতের কেবল এই কর্তব্য যে, যাঁর শরণাগত সে হয়েছে তাঁর কথানুযায়ী কাজ করা। অর্জুন ভগবানের শরণাগত হওয়ার পরে 'আমি যুদ্ধ করব না' এরূপ বলে শরণাগতির পথ থেকে একপ্রকার বিচ্যুত হয়ে গেলেন। এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করেই ভগবান অলক্ষে হাসলেন। 'ইব'— বলার তাৎপর্য এই যে প্রবল হাস্য

সংবরণ করে ভগবান মৃদু হাস্যে কথাটি বললেন।

অর্জুন যখন বলে ফেললেন যে, 'আমি যুদ্ধ করব না', ভগবানের তখন বলার ছিল যে 'তোমার যেমন ইচ্ছা, তেমনি কর'—'যথেচ্ছসি তথা কুরু' (১৮।৬৩)। কিন্তু ভগবান ভাবলেন যে, মানুষ যখন শোক ও চিন্তায় অস্থির হয় তখন সে তার কর্তব্য স্থির করতে না পেরে কখনো উল্টোপাল্টা কথা বলে ফেলে, অর্জুনেরও সেই অবস্থা হয়েছে। সুতরাং ভগবানের হৃদয়ে অর্জুনের প্রতি অত্যধিক স্নেহ থাকায় কৃপার প্লাবন বয়ে গেল। কারণ ভগবান সাধকের উক্তির দিকে লক্ষ্য না করে তাঁর ভাবের দিকে লক্ষ্য রাখেন। তাই ভগবান অর্জুনের 'আমি যুদ্ধ করব না' কথাটির ওপর গুরুত্ব না দিয়ে (পরবর্তী শ্লোক থেকে) উপদেশ দিতে শুরু করলেন।

যে কেবল বাক্য দ্বারা ভগবানের শরণাগত হয়, ভগবান তাকেও স্বীকার করে নেন। ভগবানের প্রাণীদের প্রতি এমনই দয়া !

'হৃষীকেশ' বলার অর্থ হচ্ছে এই যে, ভগবান অন্তর্যামী অর্থাৎ তিনি প্রাণীদের অন্তরের ভাব জানেন। ভগবান অর্জুনের অন্তরের ভাব জানেন—এখন আত্মীয়জনিত মোহে এবং 'রাজ্যপ্রাপ্তিতেই যে দুঃখ দূর হবে, সুখ-প্রাপ্তি হবে তাও নয়'—এটি মনে করেই অর্জুন বলছেন 'আমি যুদ্ধ করব না'। কিন্তু যখন অর্জুন নিজে সচেতন হবেন, তখন ওই কথা আর তাঁর মনে স্থান পাবে না এবং ভগবান যেমন বলবেন, তিনিও সেইমতো করবেন।

'ইদং বচঃ উবাচ' পদটির মধ্যে শুধু **'উবাচ'** বললেই কাজ হত। কারণ **'উবাচ'**র মধ্যেই রয়েছে **'বচঃ'** পদের অর্থ নিহিত রয়েছে। সুতরাং **'বচঃ'** পদটি দেওয়ায় পুনরুক্তি দোষ দৃষ্ট হয়। কিন্তু এটিতে বাস্তবিক পুনরুক্তি দোষ ঘটেনি, বরং এর দ্বারা এক বিশেষ অর্থ পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তী শ্লোক থেকে ভগবান রহস্যময় জ্ঞান প্রকাশিত করে সরলতাপূর্বক সুবোধ্য ভাষায় বুঝিয়ে যা বলেছেন, সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই এখানে **'বচঃ'** পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

পরিশিষ্ট-ভাব—ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের একদিকে কৌরবসেনা দণ্ডায়মান আর অপর দিকে পাণ্ডবসেনা। উভয় সেনার মধ্যস্থলে শ্বেত অশ্বযুক্ত এক মহৎ রথ দণ্ডায়মান। সেই রথের একাংশে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উপবেশন করে আছেন এবং অন্য অংশে অর্জুন ! অর্জুনকে নিমিত্ত করে মনুষ্যমাত্রেরই কল্যাণের উদ্দেশ্যে ভগবান তাঁর অলৌকিক উপদেশ প্রদান করতে আরম্ভ করলেন এবং প্রথমেই তিনি শরীর এবং শরীরীর বিভাগ বর্ণনা করলেন।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—শোকাবিষ্ট অর্জুনের শোক নিবৃত্তির উপদেশ দেবার জন্য ভগবান পরবর্তী বিষয়ের অবতারণা করেছেন।

শ্রীভগবানুবাচ

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥ ১১ ॥

[**অশোচ্যান্** (যাদের জন্য শোক করা উচিত নয়) ; **ত্বম্** (তুমি) ; **অন্বশোচঃ** (শোক করছ) ; **চ, প্রজ্ঞাবাদান্** (আবার পণ্ডিতদের মতো) ; **ভাষসে** (কথা বলছ) ; **গতাসূন্, চ** (মৃত, এবং) ; **অগতাসূন্** (জীবিত) ; **পণ্ডিতাঃ** (পণ্ডিতগণ) ; **ন অনুশোচন্তি** (শোক করেন না।)]

শ্রীভগবান বললেন—যাদের জন্য শোক করা উচিত নয় তাদের জন্য তুমি শোক করছ, আবার পণ্ডিতদের মতো কথা বলছ ; কিন্তু পণ্ডিতগণ মৃত বা জীবিত—কারো জন্য শোক করেন না॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা—[মানুষের শোক তখন হয়, যখন সে জগতের প্রাণী ও পদার্থগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করে নেয়। সে দুটি হল— এগুলি আমার এবং ওগুলি আমার নয় ; বা এরা আমার নিজের আত্মীয়স্বজন এবং ওরা আমার নিজের কেউ নয়। কিংবা এরা আমার সমাজের, ওরা আমার সমাজের কেউ নয় ; এরা আমার আশ্রমের আর ওরা

আমার আশ্রমের নয় ; এরা আমাদের পক্ষের আর ওরা আমাদের পক্ষের নয়। যারা আমাদের, তাদের জন্য মমতা, কামনা, ভালোবাসা, আসক্তি জন্মায়। এই মমতা, কামনা ইত্যাদির জন্যই শোক, চিন্তা, ভয়, উদ্বেগ, ইত্যাদি দোষ উৎপন্ন হয়। এমন কোনো দোষ বা অনর্থ নেই যা মমতা, কামনা ইত্যাদি থেকে না জন্মায়—এটি হল সিদ্ধান্ত।

গীতায় প্রথমেই ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করেছেন 'আমার এবং পাণ্ডুর পুত্রগণ যুদ্ধস্থলে কী করছে?' যদিও পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রকে পিতার থেকে অধিক শ্রদ্ধা করতেন, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের নিজ পুত্রদের ওপরই অধিক মমতা ছিল। তাই তাঁর মনে এরূপ পক্ষপাতিত্ব ছিল যে 'এরা আমার এবং ওরা আমার নয়।'

মমত্ববোধ অর্জুনের মধ্যেও ছিল। কিন্তু অর্জুনের মমত্ববোধ ধৃতরাষ্ট্রের মতো ছিল না। অর্জুনের মধ্যে ধৃতরাষ্ট্রের মতো পক্ষপাতিত্ব ছিল না ; তাই তিনি সকলকেই আত্মীয় মনে করেছেন—**'দৃষ্ট্বেমং স্বজনম্'** (১।২৮), এবং দুর্যোধনাদিকেও আত্মীয় বলে জানিয়েছেন—**'স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব'** (১।৩৭)। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, সমগ্র কুরুবংশীয়দের প্রতি অর্জুনের মমত্ববোধ ছিল এবং সেইজন্যই তাঁদের মৃত্যুর আশঙ্কায় অর্জুন শোকমগ্ন হয়েছিলেন। এই শোক দূর করার জন্যই ভগবান অর্জুনকে গীতার উপদেশ দিয়েছিলেন, যেটি এই একাদশতম শ্লোক থেকে শুরু হয়েছে। পরিশেষে এই শোক যে অনুচিত সেটি জানিয়ে ভগবান বলেছেন, 'তুমি আমারই শরণাগত হও এবং শোক কোরো না'—**'মা শুচঃ'** (১৮।৬৬), কারণ সংসারের আশ্রয় নিলেই শোক হয় আর অনন্যভাবে আমার শরণাগত হলে শোক, চিন্তা ইত্যাদি সব দূর হয়ে যায়।]

'অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বম্'—জগৎ-সংসার মাত্রেই দুটি বিষয় থাকে—সৎ এবং অসৎ, শরীরী এবং শরীর। এই দুইয়ের মধ্যে শরীরী হচ্ছে অবিনাশী এবং শরীর হল বিনাশী। দুটিই অশোচ্য। অবিনাশী কখনো বিনাশপ্রাপ্ত হয় না, তাই তার জন্য শোক করার কোনো প্রশ্নই নেই এবং যেটি বিনাশী বা বিনাশশীল তা বিনাশপ্রাপ্ত হবেই, তা কোনো সময়েই স্থায়ীরূপে থাকে না, তাই তার জন্যও শোক করা চলে না। অর্থাৎ শোকগ্রস্ত হওয়া যেমন শরীরীর জন্যও উচিত নয়, তেমন শরীরের জন্যও উচিত নয়। শোক কেবলমাত্র মূঢ়তার (অবিবেকের) কারণেই হয়ে থাকে।

মানুষের জীবনে জন্ম-মৃত্যু, লাভ-ক্ষতি ইত্যাদি রূপে যে সকল পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তা সমস্তই প্রারব্ধ অর্থাৎ নিজেরই করা কর্মের ফল। সেই অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য শোক করা বা সুখ-দুঃখ অনুভব করা মূঢ়তা বা বোকামি। কারণ পরিস্থিতি অনুকূল বা প্রতিকূল যাই হোক, তার শুরু এবং শেষ থাকেই অর্থাৎ সেই পরিস্থিতি প্রথমে ছিল না এবং শেষেও থাকবে না। যে পরিস্থিতি আদি ও অন্তে থাকে না তা মধ্যভাগেও মুহূর্তের জন্যও স্থায়ী হয় না। যদি স্থায়ী হত তাহলে শেষ হয় কী করে? আর যদি শেষ হয় তবে স্থায়ী হয় কীভাবে ? এইরূপ প্রতিক্ষণ ব্যয়িত অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য আনন্দিত বা দুঃখিত হওয়া বা সুখ-দুঃখ অনুভব করা শুধুই মূর্খতা।

'প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে'—'একদিকে তুমি পণ্ডিতদের মতো কথা বলছ, অন্যদিকে শোক করছ। তুমি কেবলমাত্র কথাই বলে যাচ্ছ। তুমি প্রকৃতপক্ষে পণ্ডিত নও ; কারণ সত্যিকারের পণ্ডিতগণ কখনও কারও জন্য শোক করেন না।'

'কুলনাশ হলে কুলধর্ম নষ্ট হয়ে যাবে, ধর্ম নষ্ট হলে স্ত্রীগণ দূষিত হবে, যাতে বর্ণসংকরের সৃষ্টি হবে। এর ফলে কুলঘাতকগণ এবং তাদের কুল নরকপ্রাপ্ত হবে। শ্রাদ্ধ-তর্পণ না হওয়ায় এদের পিতৃকুলের পতন ঘটবে—তোমার এইরূপ পণ্ডিতি-বাক্যে প্রমাণিত হয় যে শরীর বিনাশশীল এবং শরীরী অবিনাশী। শরীরী যদি অবিনাশী না হতেন তবে কুলঘাতী এবং কুলের নরকে যাওয়ার ভয় থাকত না বা পিতৃকুলেরও পতন হবার চিন্তা থাকত না। যখন তোমার কুল এবং পিতৃগণের জন্য চিন্তা হচ্ছে তখন এই প্রমাণিত হয় যে, শরীর বিনাশশীল এবং তাতে স্থিত শরীরী হচ্ছে নিত্য। সুতরাং শরীর নষ্ট হবার কথা ভেবে তোমার শোক করা কখনোই উচিত নয়।'

'গতাসূনগতাসূংশ্চ'—সকলের প্রাণ বিয়োগ অবশ্যম্ভাবী। এর মধ্যে অনেকে মারা গেছে এবং জীবিতরাও মারা যাবে। সুতরাং কারও জন্যেই শোক করা উচিত নয়। তুমি যে শোক করছ, এটি তোমার ভুল।

যারা মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়েছে, তাদের জন্য শোক করা খুবই অন্যায়। কারণ মৃত প্রাণীদের জন্য শোক করলে সেই প্রাণীদের দুঃখভোগ করতে হয়। যেমন মৃত ব্যক্তিদের জন্য

শ্রাদ্ধ-তর্পণ করলে, সেটি পরলোকে তাঁরা প্রাপ্ত হন, সেইরূপ মৃতব্যক্তিদের জন্য শোক বা কান্নাকাটি করলে পরিবার পরিজনগণের চক্ষু ও নাসিকা নিঃসৃত অশ্রু, কফ ইত্যাদিও মৃতাত্মাকে বিবশ হয়ে ভক্ষণ করতে হয়।[১]

যারা জীবিত, তাদের জন্যও চিন্তাভাবনা করা উচিত নয়। তাদের পালন-পোষণ এবং ভালোভাবে থাকার সকল প্রকার ব্যবস্থা করা উচিত। ওর কী দশা হবে, ওর ভরণপোষণ কীভাবে হবে, ওকে কে সাহায্য করবে ইত্যাদি চিন্তাভাবনা কখনো করা উচিত নয় ; কারণ চিন্তা-ভাবনাতে কোনো লাভ হয় না।

আমার অঙ্গসকল শিথিল হয়ে যাচ্ছে, মুখ শুষ্ক হচ্ছে ইত্যাদি বিকার উৎপন্ন হওয়ার মূল কারণ হল শরীরের সঙ্গে একাত্মবোধ। কারণ শরীরের সঙ্গে একাত্মবোধ মেনে নিলেই শরীরের পালন-পোষণকারীর সঙ্গে একাত্মবোধ অনুভূত হয় এবং সেই একাত্মবোধের জন্যই আত্মীয়গণের মৃত্যুর আশঙ্কায় অর্জুনের মনে চিন্তা এবং শোক উৎপন্ন হয়েছিল এবং এই চিন্তা ও শোকেই অর্জুনের শরীরে উপরিউক্ত বিকার প্রকটিত হয়েছে। ভগবান এখানে শোকের বিষয় হিসাবে **'গতাসূন্'** এবং **'অগতাসূন্'** বলে জানিয়েছেন। যাঁর প্রাণত্যাগ হয়েছে, তাঁকে **'গতাসূন্'** এবং যিনি এখনও জীবিত রয়েছেন তাঁকে **'অগতাসূন্'** বলা হয়। 'শ্রাদ্ধ-তর্পণ না করলে পিতৃপুরুষ পতিত হন' (১।৪২)—এটি অর্জুনের **'গতাসূন্'** সম্বন্ধে চিন্তা। এবং 'যাদের জন্য আমরা রাজ্য, ভোগ এবং সুখ চাই, তারাই প্রাণ এবং সম্পত্তির মায়া পরিত্যাগ করে যুদ্ধে উপস্থিত' (১।৩৩)— এটি অর্জুনের **'অগতাসূন্'** সম্বন্ধে চিন্তা। উভয় চিন্তা শরীর ধরেই হয়েছে, সুতরাং দুটি চিন্তাই ধাতুরূপে এক। কারণ **'গতাসূন্'** এবং **'অগতাসূন্'** উভয়ই বিনাশশীল।

'গতাসূন' এবং **'অগতাসূন্'** এই দুইয়ের জন্য কর্তব্য পালন করা চিন্তার ব্যাপার নয়। **'গতাসূন্'**-এর জন্য পিণ্ডদান এবং শ্রাদ্ধ-তর্পণ কর্তব্য এবং **'অগতাসূন্'**-এর জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা ও জীবননির্বাহের সংস্থান করা কর্তব্য। কর্তব্য পালন কোনো উদ্বেগের বিষয় নয়, বরং বিবেচনার বিষয়। বিবেচনার সাহায্যে কর্তব্যবোধ জাগ্রত হয় এবং চিন্তায় বিবেচনাবোধ নষ্ট হয়।

'নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ'—সৎ-অসৎ, এই দুটির পার্থক্য যে জানে সেই বিবেকবতী বুদ্ধিকে **'পণ্ডা'** বলা হয়। **'পণ্ডা'** বিকশিত হয়েছে অর্থাৎ যাঁর সৎ-অসৎ-বিষয়ে স্পষ্ট বিবেক হয়েছে, তাঁকে **'পণ্ডিত'** বলা হয়। এইরূপ পণ্ডিতগণ সৎ-অসৎ-এর জন্য শোক করেন না। কারণ সৎকে সৎ বলে মনে করলেও শোক হয় না এবং অসৎকে অসৎ বলে মনে করলেও শোক হয় না। স্ব-স্বরূপ স্বয়ং সৎ-স্বরূপ আর পরিবর্তনশীল শরীর অসৎ-স্বরূপ। অসৎকে সৎ বলে মনে করলেই শোক উৎপন্ন হয় অর্থাৎ এই শরীর ইত্যাদি এরূপই যেন থাকে, কখনো যেন না নষ্ট হয়—এইরূপ ধারণা পোষণ করলেই শোক হয়। সৎ-এর জন্য কখনো উদ্বেগ বা শোক হয় না।

পরিশিষ্ট-ভাব—মানুষের মধ্যে দুটি ভাগ রয়েছে। এক ভাগ শরীরের, অপর ভাগ শরীরীর বা দেহীর। দুটি একে অপরের থেকে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্কবর্জিত। দুইয়ের স্বভাবও পৃথক। একটি জড়, অপরটি চেতন। একটি বিনাশশীল, অন্যটি অবিনাশী। একটি বিকারশীল, অপরটি নির্বিকার। একটি প্রতি মুহূর্তেই পরিবর্তনশীল, অপরটি অনন্তকাল পর্যন্ত একই ভাবে বিরাজমান—**'ভূতগ্রামঃ স এবায়ম্'** (গীতা ৮।১৯), **'সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে**

---

[১](১) শ্লেষ্মাশ্রু বান্ধবৈর্মুক্তং প্রেতো ভুঙ্ক্তে যতোঽবশঃ। তস্মান্ন রোদিতব্যং হি ক্রিয়াঃ কার্যাশ্চ শক্তিতঃ॥

(পঞ্চতন্ত্র, মিত্রভেদ ৩৬৫)

মৃতাত্মাকে নিজ বন্ধুবান্ধব-পরিত্যক্ত শ্লেষ্মাযুক্ত অশ্রু বিবশ হয়ে গ্রহণ করতে হয়, তাই রোদন না করে নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী মৃতাত্মার শান্তির জন্য ঔর্ধ্বদৈহিক ক্রিয়া করা উচিত।

(২) মৃতানাং বান্ধবা যে তু মুঞ্চন্ত্যশ্রূণি ভূতলে। পিবন্ত্যশ্রূণি তান্যদ্ধা মৃতাঃ প্রেতাঃ পরত্র বৈ॥

(স্কন্দপুরাণ, ব্রাহ্ম, সেতু ৪৮।৪২)

মৃতাত্মার জন্য বন্ধুবান্ধব পৃথিবীতে যত অশ্রু ত্যাগ করে, সেই অশ্রু মৃতাত্মাগণ পরলোকে পান করেন।

প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ' (গীতা ১৪।২)

শরীর এবং শরীরী— উভয়ই অশোচ্য। শরীরের সর্বক্ষণ ক্ষয় হয়, তাই তার জন্য শোক করা উচিত নয়, আর শরীরীর কখনোই বিনাশ হয় না, অতএব তার জন্যও শোক করা উচিত নয়। কেবল মূর্খতাবশে শোক করা হয়। শরীরের সর্বক্ষণই সহজনিবৃত্তি হয় এবং শরীরী সর্বক্ষণই সকলের মধ্যে বিরাজিত। যাঁরা শরীর এবং শরীরীর এই ভেদ জানেন, সেই বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ মৃত বা জীবিত কোনো প্রাণীর জন্যই কখনো শোক করেন না। তাঁদের কাছে পরিবর্তনশীল শরীরের বিভাগ এবং অপরিবর্তনশীল শরীরী অর্থাৎ স্বরূপের (সত্তার) বিভাগ পৃথক রূপে প্রকাশিত থাকে।

গীতার উপদেশ আরম্ভ হয়েছে শরীর এবং শরীরীর পার্থক্য নিয়ে। অন্যান্য দার্শনিক গ্রন্থ আত্মা-অনাত্মার বর্ণনা করেছে ইদংতা রূপে অর্থাৎ অঙ্গুলিনির্দিষ্টরূপ শৈলীর দ্বারা। কিন্তু গীতায় সেই শৈলীর অনুকরণ না করে সকলের বোঝবার মতো করে দেহ-দেহী, শরীর-শরীরীর বর্ণনা করা হয়েছে। এটি গীতার একটি বিশেষত্ব। সাধক যদি তাঁর কল্যাণ কামনা করেন তাহলে তাঁর সর্বপ্রথম জানা প্রয়োজন 'আমি কে?' অর্জুনও তাঁর কল্যাণের উপায় জিজ্ঞাসা করেছেন— **'যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে'** (২।৭)। দেহ এবং দেহীর পার্থক্য মেনে নিলেই কল্যাণ হওয়া সম্ভব। যতক্ষণ পর্যন্ত 'আমি দেহ'— এই ধারণা থাকবে, ততক্ষণ যতোই উপদেশ শোনা যাক, শোনানো যাক এবং সাধনও করা হোক, কল্যাণ হবে না।

যে জিনিসটি নিজের নয়, তাকে নিজের বলে মনে করা আর যা প্রকৃতই নিজের, তাকে নিজের মনে না করা এক মস্ত ভুল। নিজের জিনিস তাকেই বলা যায় যা সর্বদা আমার সঙ্গে থাকে এবং আমিও সর্বদা তার সঙ্গে থাকি। শরীর এক মুহূর্তও আমাদের সঙ্গে স্থায়ীভাবে থাকে না আর পরমাত্মা সর্বক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকেন। কারণ শরীর ও জগৎ-সংসার একই জাতীয় আর আমাদের অর্থাৎ শরীরীর সাজাত্য পরমাত্মার সঙ্গে। সেইজন্য পরমাত্মাকে আপন না ভেবে শরীরকে আপন ভাবাই সব থেকে বড় ভুল। এই ভুল দূর করার জন্যই গীতায় সর্বাগ্রে শরীর এবং শরীরীর ভেদ নিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে এবং সাধককে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এই বলে যে, 'যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সে তুমি নও অর্থাৎ তুমি শরীর নও। তুমি জ্ঞাতা (যে জানে) আর শরীর জ্ঞেয় (জানার বিষয়) (গীতা ১৩।১)। তুমি সর্বদেশীয় **'নিত্যঃ সর্বগতঃ'** (গীতা ২।২৪), **'যেন সর্বমিদং ততম্'**(গীতা ২।১৭), আর শরীর একদেশীয়। তুমি চিন্ময়লোকনিবাসী, শরীর জড়-সংসারনিবাসী। তুমি এই আমারই (পরমাত্মারই) অংশ **'মমৈবাংশো জীবলোকে'** (গীতা ১৫।৭), শরীর প্রকৃতির অংশ—**'মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি'** (গীতা ১৫।৭)। তুমি নিরন্তর অমরত্বে অবস্থান কর, শরীর নিরন্তর মৃত্যুর মধ্যে থাকে, শরীরের ক্ষতিতে তোমার কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না। অতএব শরীরের জন্য তোমার শোক, চিন্তা, ভয় ইত্যাদি হওয়া উচিত নয়।'

শরীরী কোনো শরীরে লিপ্ত নয়, তাই একে সর্বব্যাপী বলা হয়েছে—**'সর্বগতঃ'** (গীতা ২।২৪) **'যেন সর্বমিদং ততম্'** (২।১৭)। তাৎপর্য হল যে, স্বরূপ হল শুধুমাত্র অস্তিত্ব। অতএব তা প্রকৃতপক্ষে শরীরী (দেহসম্পন্ন) নয়, তা অশরীরী। এই জন্য ভগবান তাকে অব্যক্তও বলেছেন— **'অব্যক্ত'** (২।২৫) **'অব্যক্তাদীনি ভূতানি'** (২।২৮)। শরীর প্রতিক্ষণেই ক্ষয় হয় অর্থাৎ তা অসৎ। অসতের সত্তা বিদ্যমান নয়—**'নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ'** (২।১৬)। যার সত্তা বিদ্যমান নয়, এমন অসৎ শরীরকে নিয়ে সাধক কি করে শরীরী (শরীরসম্পন্ন) পদবাচ্য হয়? সেইজন্য সাধক শরীর তো নয়ই, শরীরীও নয়। কিন্তু এই প্রকরণে ভগবান সাধককে বোঝানোর জন্য সেই অস্তিত্বকে, স্বরূপকে 'শরীরী' (দেহী) আখ্যা দিয়েছেন। 'শরীরী' কথাটি বলার অর্থ হল যে তুমি শরীর নও।

আমরা যখন শরীর এবং শরীরীকে নিয়ে আলোচনা করি, সেই সময় শরীর ও শরীরী যেভাবে থাকে, যখন আলোচনা করি না তখনও তেমনই থাকে। বিচার করায় বস্তুর অবস্থানের কোনো পার্থক্য হয় না, শুধু সাধকের মোহ দূর হয়, তাঁর মনুষ্যজন্ম সার্থক হয়।

মানুষ বিবেকসম্পন্ন প্রাণী। তাই 'আমি শরীর নই'— মানুষের মধ্যেই এই প্রকার বোধ আসা সম্ভব। শরীরকে 'আমি-আমার' মনে করা মনুষ্যবুদ্ধি নয়, তা হল পশুবুদ্ধি। তাই শ্রীশুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে বলেছেন—

ত্বং তু রাজন্ মরিষ্যেতি পশুবুদ্ধিমিমাং জহি।
ন জাতঃ প্রাগভূতোঽদ্য দেহবত্ত্বং ন নঙ্ক্ষ্যসি॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ১২।৫।২)

'হে রাজন্ ! আমার মৃত্যু হবে, এই পশুবুদ্ধি তুমি এবার পরিত্যাগ করো। শরীর যেমন আগে ছিল না, পরে জন্ম হয়েছে আবার মৃত্যুও হবে, তেমনই তুমি আগে ছিলে না,পরে জন্মেছ এবং পরে মারা যাবে—তেমন নয়।'

※ ※ ※

সম্বন্ধ—সৎ-তত্ত্ব নিয়ে শোক করা অনুচিত কেন ? এই শঙ্কা (জিজ্ঞাসা) সমাধানের জন্য পরের দুটি শ্লোক বলা হয়েছে।

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃ পরম্॥ ১২ ॥

[জাতু (কোনো সময়ে) ; অহম্ (আমি) ; ন, আসম্ (ছিলাম না) ; ত্বম্, ন (তুমি ছিলে না) ; ইমে, জনাধিপাঃ (এই রাজন্যবর্গ) ; ন (ছিল না) ; ন, তু, এব (একথা ঠিক নয়) ; চ (এবং) ; অতঃ,পরম্ (এর পরে) ; বয়ম্ (আমরা) ; সর্বে (সকলে) ; ন, ভবিষ্যামঃ (থাকবে না) ; এব (তাও) ; ন (নয়।)]

কোনো সময়ে আমি ছিলাম না বা তুমি ছিলে না অথবা এই রাজন্যবর্গ ছিল না, একথা ঠিক নয়। আর এর পরে আমি, তুমি এবং এই নৃপতিবৃন্দ—এরা সকলে থাকবে না তাও ঠিক নয় ॥ ১২ ॥

ব্যাখ্যা—[জগতে মাত্র দুইপ্রকার বস্তু আছে—শরীরী (সৎ) এবং শরীর (অ-সৎ)। এই দুটিই অশোচ্য অর্থাৎ শরীরীর (শরীরে যিনি স্থিত তাঁর) জন্যও শোক করা যায় না এবং শরীরের জন্যও শোক করা উচিত নয়। কারণ শরীরীর কখনো নাস্তি হয় না এবং শরীর কখনো স্থায়ী হয় না। এই উভয় বস্তুর জন্য পূর্ব শ্লোকে যে 'অশোচ্যান্' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে তার ব্যাখ্যা এখন শরীরীর নিত্যতা এবং শরীরের অনিত্যতা রূপে করেছেন।]

'ন ত্বেবাহং জাতু .... জনাধিপাঃ'—'সাধারণ ব্যক্তিদের দৃষ্টিতে আমি যতক্ষণ অবতার রূপ ধারণ করিনি ততক্ষণ এই (কৃষ্ণ)রূপে সবার সামনে প্রকট ছিলাম না, তুমিও জন্মগ্রহণের পূর্বে এই (অর্জুন)রূপে সকলের কাছে প্রকট ছিলে না এবং এই নৃপতিবৃন্দও যতক্ষণ জন্মগ্রহণ করেননি, ততক্ষণ এই (রাজা)রূপে সকলের সমক্ষে প্রকট ছিলেন না। তা সত্ত্বেও, আমি, তুমি এবং এই নৃপতিগণ এইরূপে প্রকটিত হবার পূর্বে যে ছিলেন না—এমন কথা নয়।'

এখানে 'আমি, তুমি এবং এই রাজন্যবৃন্দ আগেও ছিলাম'—এরূপ বললেও কাজ হত, কিন্তু এইভাবে না বলে 'আমি, তুমি এবং এই রাজন্যবৃন্দ আগে ছিলাম না, তা ঠিক নয়'—এইভাবে বলা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে এই যে 'আগে ছিলাম না, এমন নয়' এরূপ বলায় আগেও আমরা সকলে অবশ্যই ছিলাম—এই কথাটি দৃঢ় নিশ্চিত হয়। এর তাৎপর্য এই যে, নিত্যতত্ত্ব সর্বদাই নিত্য ; তার কখনো অভাব হয় না। 'জাতু' কথাটি বলার অর্থ এই যে, অতীত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান কালে এবং যে কোনো দেশ, পরিস্থিতি, অবস্থা, ঘটনা, বস্তু ইত্যাদিতে নিত্যতত্ত্বের কিছুমাত্র নাস্তি হওয়া সম্ভব নয়।

এখানে 'অহম্' পদটি দ্বারা ভগবান এক বিশেষ কথা বলেছেন। পরবর্তী চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে, 'আমার এবং তোমার অনেকবার জন্ম হয়েছে, সেগুলি আমি জানি, কিন্তু তুমি তা জান না।' ভগবান এইভাবে নিজ ভগবত্তা প্রকাশ করে জীবের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য দেখিয়েছেন। কিন্তু এই স্থলে ভগবান জীবের সঙ্গে ঐক্যভাব দেখাচ্ছেন। এর তাৎপর্য এই যে, ওখানে (৪।৫-এ) ভগবানের অভিপ্রায় ছিল নিজ মহত্ত্ব, বিশেষত্ব প্রকাশিত করা এবং এখানে তাঁর অভিপ্রায় হচ্ছে তাত্ত্বিক দৃষ্টি দ্বারা নিত্যতত্ত্ব বোধগম্য করানো।

'ন চৈব .... বয়মতঃ পরম্'—ভবিষ্যতে শরীর পূর্বের অবস্থায় থাকবে না এবং এক সময় এই শরীরই থাকবে না ; কিন্তু এরূপ অবস্থাতে আমরা সব থাকব না—তা ঠিক নয়, অর্থাৎ আমরা সকলে অবশ্যই থাকব। কারণ নিত্যতত্ত্বের কখনো অনস্তিত্ব হয়নি এবং কখনো অনস্তিত্ব হবেও না।

'আমি, তুমি এবং নৃপতিবৃন্দ—আমরা সকলে আগে ছিলাম না, এ কথা ঠিক নয়, এবং পরেও থাকব না, তাও ঠিক নয়'—এইভাবে অতীত ও ভবিষ্যতের কথা ভগবান বললেও, বর্তমানের কথা তিনি বলেননি। তার কারণ এই যে শরীরের দৃষ্টিতে আমরা সকলেই বর্তমানে প্রত্যক্ষভাবে আছি। এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। তাই 'আমরা সকলে এখন নেই, এ কথা ঠিক নয়'—এরূপ বলার প্রয়োজনই নেই। যদি তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে দেখা যায় তবে আমরা সকলেই বর্তমানকালে আছি এবং প্রতি মুহূর্তে এই শরীরের পরিবর্তন হয়ে চলেছে—এইপ্রকার শরীরের সঙ্গে পৃথকভাব আমাদের বর্তমানেই অনুভব করা উচিত। অর্থাৎ অতীত ও ভবিষ্যতে যেমন নিজ সত্তার কখনো নাস্তি হয় না, তেমনি বর্তমানেও নিজ সত্তার অনস্তিত্ব নেই—এটি অনুভব করা উচিত।

প্রত্যেক প্রাণীর যেমন নিদ্রা আসার পূর্বে অনুভূতি থাকে যে 'আমি আছি' এবং নিদ্রাভঙ্গের পরও সেই অনুভূতি থাকে যে 'আমি আছি' তাহলে ঘুমন্ত অবস্থাতেও আমরা যেমন, তেমনি ছিলাম। বাহ্যভাবে শুধু জানার করণাদি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহের অনস্তিত্ব ছিল, আমার অনস্তিত্ব ছিল না। এইরূপই আমি, তুমি এবং রাজন্য-বৃন্দ—আমাদের সকলের শরীর আগে ছিল না এবং পরেও থাকবে না এবং এখনও প্রতিক্ষণ এই শরীর নাশ হওয়ার দিকে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের সত্তা আগেও ছিল, পরেও থাকবে এবং এখনও একইভাবে বিরাজমান।

আমাদের সত্তা কালাতীত তত্ত্ব ; কারণ আমরা সেই কালের জ্ঞাতা, অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান—এই তিন কালই আমাদের গোচরে আসে। সেই কালাতীত তত্ত্ব বোঝাবার জন্যই ভগবান এই শ্লোকটি বলেছেন।

বিশেষ কথা

'আমি, তুমি এবং নৃপতিবৃন্দ প্রথমে ছিলাম না— এ কথা ঠিক নয় এবং পরেও থাকব না—এ কথাও ঠিক নয়', এরূপ বলার তাৎপর্য এই যে, এই শরীর যখন ছিল না, তখনও আমরা সকলে ছিলাম এবং এই শরীর যখন থাকবে না তখনও আমরা থাকব অর্থাৎ এই শরীর বিনাশশীল পদার্থ এবং আমরা সব অবিনাশী সত্তা। এই শরীর আগে ছিল না এবং পরেও থাকবে না—এর দ্বারা শরীরের অনিত্যতা প্রমাণিত হয় এবং আমরা সব আগে ছিলাম এবং পরেও থাকব—এর দ্বারা সবার স্বরূপের নিত্যতা সিদ্ধ হয়। এই দুটি বাক্য দ্বারা এই সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হয় যে, আদি এবং অন্তে যেটি থাকে তা মধ্যেও থাকে এবং আদি ও অন্তে যা থাকে না তা মধ্যভাগেও থাকে না।

আদিতে এবং অন্তে যা থাকে না, তা মধ্যভাগে কী করে থাকবে না, কারণ তা তো আমাদের সম্মুখে প্রত্যক্ষ ? এর উত্তর হল এই যে, যে দৃষ্টির সাহায্যে অর্থাৎ যে মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দৃশ্যটি অনুভূত হয়, সেই মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয় সমেত সেই দৃশ্যটিও প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়। এগুলির কোনোটিই একমুহূর্তও স্থায়ী নয়। এরূপ হওয়া সত্ত্বেও যখন চেতনস্বরূপ (স্বয়ং) দৃশ্যটির সঙ্গে তাদাত্ম্য করে, তখন সে দ্রষ্টা হয়ে যায়। যখন দেখার সাধন (মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়) এবং দৃশ্য (মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়ের বিষয়)—এ সমস্তই কোনো সময় স্থায়ী হয় না, তখন দৃশ্য দর্শনকারী যে স্থায়ী তা কি করে প্রমাণ হবে ? তাৎপর্য এই যে, দ্রষ্টার সংজ্ঞা দৃশ্য এবং দর্শনের সম্বন্ধ থেকেই হয়। দৃশ্য এবং দর্শনের কোনো সম্পর্ক না থাকলে দ্রষ্টার কোনো সংজ্ঞা হয় না, বরং তার আধাররূপে যে নিত্যতত্ত্ব থাকে, তাই থেকে যায়। সেই নিত্যতত্ত্বকে আমাদের সবার উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের আধার এবং সমস্ত প্রতীতি অর্থাৎ দৃশ্যমান জগতের প্রকাশক বলা যেতে পারে। কিন্তু এই আধার এবং প্রকাশক নামও আধেয় এবং তা প্রকাশ্যের সম্পর্কেই থাকে। আধেয় এবং প্রকাশ্য না থাকলেও তার সত্তা যেমন তেমনই থাকে। সেই সত্যতত্ত্বের দিকে যাঁর লক্ষ্য থাকে, তাঁর শোক কীভাবে সম্ভব ? অর্থাৎ সম্ভব নয়। এই দৃষ্টিতেই আমি, তুমি এবং রাজন্যবৃন্দ স্বরূপতঃ অশোচ্য।

পরিশিষ্ট-ভাব—এই শ্লোকে পরমাত্মা এবং জীবাত্মার সাধর্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবান বলেছেন যে আমি কৃষ্ণরূপে, তুমি অর্জুনরূপে এবং এরা সকলে রাজন্যবর্গরূপে অতীতে ছিল না এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না। কিন্তু অস্তিত্বরূপে আমরা সবাই অতীতেও ছিলাম এবং ভবিষ্যতেও থাকব। অর্থাৎ আমি, তুমি এবং রাজন্যবর্গ — আমরা সকলে শরীর সম্পর্কে পৃথক পৃথক হলেও, মূল অস্তিত্বে এক এবং অভিন্ন। শরীর অতীতেও ছিল না, ভবিষ্যতেও থাকবে

না, কিন্তু স্বরূপের (স্বয়ং) অস্তিত্ব অতীতেও ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে এবং বর্তমানেও আছে। যখন এই শরীর ছিল না তখনও সত্তা ছিল, আর যখন এ শরীর থাকবে না, সত্তা তখনও থাকবে। এক সত্তা ছাড়া আর কিছুই নেই।

আমি, তুমি এবং এই রাজন্যবর্গ— এই কথাটি বলার অর্থ হল যে পরমাত্মার অস্তিত্ব এবং জীবের অস্তিত্ব দুই-ই এক অর্থাৎ 'আছে' এবং 'আছি'— দুয়েতেই একই চিন্ময় সত্তা বিরাজমান। 'আমি' সম্পর্কিত হলেই 'আছি' ব্যবহৃত হয়। যদি 'আমি'র সম্পর্ক না থাকে তাহলে 'আছি' ব্যবহার করা হয় না, তখন 'আছে' ব্যবহৃত হয়। তিনি 'আছেন' অর্থাৎ চিন্ময় সত্তা মাত্রই আমাদের স্বরূপ, শরীর আমাদের স্বরূপ নয়। তাই শরীরের জন্য শোক করা উচিত নয়।

অতীত এবং ভবিষ্যতের ঘটনা যত দূরের বলে প্রতিভাত হয়, বর্তমানও ততই দূরের। অতীত ও ভবিষ্যতের সঙ্গে যেমন আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই, তেমনই বর্তমানের সঙ্গেও আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। যখন কোনো সম্পর্কই নেই, তখন অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে পার্থক্য কীসের ? এই তিনটিই কালের অন্তর্গত, কিন্তু আমাদের স্বরূপ কালাতীত। কাল খণ্ড হয় কিন্তু স্বরূপ (সত্তা) হল অখণ্ড। শরীরকে নিজের স্বরূপ বলে মনে করলেই অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃতপক্ষে অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই-ই।

বহু যুগ অতিক্রান্ত হলেও শরীরী পরিবর্তিত হয় না, তা একই ভাবে বিরাজ করে, কারণ তা হল পরমাত্মার অংশ। কিন্তু শরীরের পরিবর্তন হতে থাকে, তা কোনো মুহূর্তেই অপরিবর্তিত থাকে না।

※ ※ ※

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩ ॥

[দেহিনঃ (প্রত্যেক দেহধারীরই) ; অস্মিন্ (এই) ; দেহে (মনুষ্যদেহে) ; যথা, কৌমারম্ (যেমন বাল্য) ; যৌবনম্, জরা (যৌবন এবং বার্ধক্য উপস্থিত হয়) ; তথা (তেমনি) ; দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ (দেহান্তরপ্রাপ্তিও হয়) ; ধীরঃ (ধীর ব্যক্তি) ; তত্র (তাতে) ; ন, মুহ্যতি (মোহগ্রস্ত হন না।)]

প্রত্যেক দেহধারীরই এই মনুষ্যদেহে যেমন বাল্য, যৌবন এবং বার্ধক্য উপস্থিত হয়, তেমনি দেহান্তর-প্রাপ্তিও হয়। ধীর ব্যক্তিগণ তাতে মোহগ্রস্ত হন না ॥ ১৩ ॥

ব্যাখ্যা—'দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে[1]...... জরা'— দেহধারণকারীর শরীরে প্রথমে বাল্যাবস্থা আসে, তারপর যৌবন এবং শেষে বৃদ্ধাবস্থা আসে। অর্থাৎ দেহ কখনো এক অবস্থায় থাকে না, তা নিরন্তর পরিবর্তিত হয়।

এখানে 'দেহধারীর এই দেহে'—এরূপ বলায় প্রমাণিত হয় যে, শরীরী এবং শরীর পৃথক। শরীরী দ্রষ্টা এবং শরীর হচ্ছে দৃশ্য। সুতরাং শরীরে যে বাল্যাদি অবস্থাগুলির পরিবর্তন হয়, সেই পরিবর্তন শরীরীর হয় না।

'তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ'—শরীরের যেমন বাল্য, যৌবনাদি অবস্থা প্রাপ্ত হয়, দেহান্তরপ্রাপ্তি বা দ্বিতীয় শরীর-প্রাপ্তিও তেমনই ঘটনা। স্থূলশরীর যেভাবে বাল্যাবস্থা থেকে যৌবন এবং যুবা অবস্থা থেকে বার্ধক্যে পৌঁছায়, এই অবস্থার পরিবর্তনে যেমন কখনো কেউ শোক করে না, তেমনি শরীরী এক শরীর থেকে অন্য শরীরে যখন যায়, তখন সেই বিষয়েও শোক করা উচিত নয়। স্থূলশরীর থাকাকালীন যেমন বাল্য, যৌবন অবস্থা আসে, তেমনি সূক্ষ্ম এবং কারণশরীর থাকাকালীন দেহান্তরপ্রাপ্তি ঘটে অর্থাৎ বাল্য ও যৌবন ইত্যাদি যেমন স্থূলশরীরেরই পরিবর্তন, তেমনি দেহান্তরপ্রাপ্তি (মৃত্যুর পর অন্য শরীর গ্রহণ) সূক্ষ্ম এবং কারণশরীরের অবস্থার পরিবর্তন।

স্থূলশরীরে কৌমারাদি অবস্থাগুলির পরিবর্তন হয়— এটি স্থূলদৃষ্টির বিচার। সূক্ষ্মদৃষ্টি দিয়ে দেখলে দেখা যায় যে, অবস্থাগুলির মতো স্থূলশরীরেও নিরন্তর পরিবর্তন হয়। বাল্যাবস্থাতে যে শরীর ছিল, তা যুবাবস্থায় থাকে না। বাস্তবে এমন কোনো ক্ষণ নেই, যে ক্ষণে স্থূলশরীরের

[1] বাল্য, যৌবন এবং বার্ধক্য প্রতিটি শরীরধারণকারীর শরীরেই হয় ; কিন্তু এখানে 'অস্মিন্ দেহে' পদটিতে 'দেহ' শব্দটি মনুষ্যদেহ বাচক বলে মনে করা উচিত।

পরিবর্তন না হয়। তেমনি সূক্ষ্ম এবং কারণশরীরেও সর্বক্ষণ পরিবর্তন হয়ে থাকে, যা দেহান্তরপ্রাপ্তির দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়[১]।

এখন বিবেচনার বিষয় হল এই যে, স্থূলশরীর সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান থাকে, কিন্তু সূক্ষ্ম এবং কারণশরীর সম্বন্ধে আমাদের কোনো জ্ঞান হয় না, তাহলে তার পরিবর্তন সম্বন্ধে আমরা কীভাবে জানব ? তার উত্তরে বলা যায় যে, স্থূলশরীরের পরিবর্তনের জ্ঞান যেমন তার অবস্থাগুলি থেকে হয়, তেমনি সূক্ষ্ম ও কারণশরীর সম্পর্কে জ্ঞানও তার অবস্থাগুলি থেকে হয়। স্থূল-শরীরকে 'জাগ্রত', সূক্ষ্মশরীরকে 'স্বপ্ন' এবং কারণশরীরকে 'সুষুপ্তি' অবস্থা বলে মানা হয়। মানুষ নিজ বাল্যাবস্থায় স্বপ্নে নিজেকে বালকরূপেই দেখে, যুবক অবস্থায় যুবক এবং বৃদ্ধ অবস্থায় বৃদ্ধরূপে দেখে থাকে। তার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে স্থূলশরীরের সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্মশরীরেরও পরিবর্তন হয়। সেইরূপ বালক-বয়সে সুষুপ্তি-অবস্থা বেশি থাকে ; যুবাকালে খানিকটা ক্ষীণ হয় এবং বৃদ্ধ বয়সে তা অনেকটাই কমে যায় । সুতরাং এর দ্বারা কারণশরীরের পরিবর্তনও প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয়তঃ বালক ও যুবা-বয়সে নিদ্রার পর শরীর ও ইন্দ্রিয় যেমন সতেজ হয়, তেমন সতেজভাব বৃদ্ধ-বয়সে ঘুমোলে হয় না অর্থাৎ বৃদ্ধাবস্থায় বালক ও যুবক-বয়সীদের মতো বিশ্রাম পাওয়া যায় না। এই রীতিতে কারণশরীরের পরিবর্তন প্রমাণিত হয়।

যারা দেবতা, পশু, পক্ষী, রাক্ষস প্রভৃতির দেহ প্রাপ্ত হয়, তাদের সেই শরীরে (দেহাধ্যাসের জন্য অর্থাৎ নিজেকে সেই শরীর মনে করায়) আমি এই-ই, এইরূপ অনুভব হয়, এইটিই হল সূক্ষ্মশরীরের পরিবর্তন হওয়া। এইরূপ কারণশরীরে যে ভাব (প্রকৃতি) থাকে, যাকে স্থূলদৃষ্টিতে স্বভাব বলে ; এই স্বভাব দেবতাদের এক প্রকার হয় এবং পশুপক্ষী ইত্যাদিদের ভিন্ন প্রকার হয়। অতএব এইটি হল কারণশরীরের পরিবর্তন।

যদি শরীরীর (দেহী) পরিবর্তন হত, তবে দৈহিক অবস্থার পরিবর্তন হলেও 'আমি সেই-ই আছি'[২] এরূপ জ্ঞান হত না। কিন্তু দেহের অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 'যে প্রথমে বালক ছিল, যুবক ছিল, এখন সেই আমি'— এইরূপ জ্ঞান হয়ে থাকে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শরীরীর অর্থাৎ স্বরূপের পরিবর্তন হয় না।

এখানে একটি সংশয় আসতে পারে যে, প্রাণীর স্থূলশরীরের অবস্থার পরিবর্তনের জ্ঞান হয়, কিন্তু দেহান্তরপ্রাপ্তির পরে পূর্বশরীরের জ্ঞান কেন হয় না ? পূর্ব-শরীরের জ্ঞান না হওয়ার কারণ এই যে, মৃত্যুর সময় এবং জন্মের সময় অত্যন্ত কষ্ট পেতে হয়, যার জন্য পূর্বজন্মের স্মৃতি বুদ্ধি ধরে রাখতে পারে না। যেমন পক্ষাঘাতে রোগগ্রস্ত হলে তথা অধিক বৃদ্ধ হলে পূর্বের মতো জ্ঞান ও বুদ্ধি থাকে না, তেমনই মৃত্যু এবং জন্মের সময় অত্যধিক কষ্টের ফলে তার পূর্বজন্মের স্মৃতি বা জ্ঞান থাকে না[৩]। কিন্তু মৃত্যুকালে যে এইরূপ কষ্ট পায় না অর্থাৎ যার শরীরের অবস্থান্তর প্রাপ্তির মতোই অনায়াসে দেহান্তর-প্রাপ্তি ঘটে, তার (জ্ঞানে) বুদ্ধিতে পূর্বজন্মের স্মৃতি থাকতে পারে[৪]।

এখন বিচার করা যাক যে, অবস্থান্তর প্রাপ্তির যেমন

---

[১] দেহান্তরপ্রাপ্তি ঘটলে স্থূলশরীর ত্যাগ হয়, কিন্তু মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত সূক্ষ্ম এবং কারণশরীর নষ্ট হয় না। যতক্ষণ মুক্তি না হয় ততক্ষণ সূক্ষ্ম এবং কারণশরীরের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় থাকে।

[২] শাস্ত্রে এই জ্ঞানকে 'প্রত্যভিজ্ঞা' বলা হয়—'তত্তেদন্তাবগাহি জ্ঞানং প্রত্যভিজ্ঞা'।

[৩] ম্রিয়তে রুদতাং স্বানামুরুবেদনয়াস্তধীঃ।। (শ্রীমদ্ভাগবত ৩।৩০।১৮) 'মানুষ রোরুদ্যমান স্বজনদিগের মধ্যে পরিবৃত হয়ে অত্যন্ত বেদনায় অচেতন হয়ে মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়।'

বিনিষ্ক্রামতি কৃচ্ছ্রেণ নিরুচ্ছ্বাসো হতস্মৃতিঃ।। (শ্রীমদ্ভাগবত ৩।৩১।২৩), 'জন্মগ্রহণের সময় তার শ্বাসের গতি অবরোধ হওয়ায় পূর্বস্মৃতি নষ্ট হয়।'

[৪] য মৃতাঃ সহসা মর্ত্যা জায়ন্তে সহসা পুনঃ। তেষাং পৌরাণিকোহভ্যাসঃ কশ্চিৎ কালং হি তিষ্ঠতি।

তস্মাজ্জাতিস্মরা লোকে জায়ন্তে বোধসংযুতাঃ। তেষাং বিবর্ধতাং সংজ্ঞা স্বপ্নবৎ সা প্রণশ্যতি।। (মহাভারত, অনুশাসনপর্ব ১৪৫)

'যে ব্যক্তি সহসা মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়ে আবার কোথাও সহসা জন্মগ্রহণ করে, তার পুরাতন অভ্যাস বা সংস্কার কিছুকাল বজায় থাকে। তাই সে পূর্বজন্মের জ্ঞান নিয়েই ইহলোকে জন্মায় এবং তাকে জাতিস্মর বলে। কিন্তু সে যত বয়ঃপ্রাপ্ত হয় ততই তার স্বপ্নের মতো পুরোনো স্মৃতি নষ্ট হতে থাকে।'

জ্ঞান হয়, দেহান্তরপ্রাপ্তির সেরূপ জ্ঞান হয় না, কিন্তু 'আমি আছি' এইরূপ নিজ সত্তার জ্ঞান সকলেরই থাকে। যেমন, সুষুপ্তিতে (গভীর নিদ্রায়) কোনো কিছুর জ্ঞান থাকে না, কিন্তু জেগে উঠে মানুষ বলে যে, সে এত গভীর নিদ্রা গিয়েছিল যে, তার কোনো জ্ঞান ছিল না, তাহলে 'কোনো জ্ঞান ছিল না'—এই জ্ঞান তো তার ছিলই। 'নিদ্রা যাবার আগে আমি যা ছিলাম, জাগরণের পরে সেই আমিই আছি। তাহলে সুষুপ্তির সময়েও 'আমি সেই ছিলাম'—এইভাবে নিজ সত্তার জ্ঞান নিরন্তর অখণ্ডরূপে থাকে। নিজ সত্তার নাস্তিবোধ কখনো কারো হয় না। শরীরধারীর সত্তার সৎভাব অখণ্ডরূপে বিরাজমান, সেইজন্যই তো মুক্তি হয় এবং মুক্ত অবস্থাতেও স্বয়ং (চেতনস্বরূপ) বিরাজ করে। জীবন্মুক্ত অবস্থায় তাঁর দেহান্তর জ্ঞান যদি না-ও হয়, তবুও তিনি যে স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ এই তিন শরীর হতে পৃথক—এরূপ অনুভব তাঁর হয়েই থাকে।

'ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি'—তাঁকেই ধীর বলা হয়, যাঁর সদসৎ বোধ হয়েছে। এইরূপ ধীর ব্যক্তি ওইরূপ বিষয়ে কখনো মোহগ্রস্ত হন না, তিনি কখনো সন্দেহাক্রান্ত হন না। তার অর্থ এই নয় যে ওই ধীর ব্যক্তির দেহান্তরপ্রাপ্তি ঘটে। উচ্চ-নীচ কুলে জন্ম হয় গুণগুলির সঙ্গ দোষে, সেই গুণগুলি হতে সম্পর্কচ্ছেদ হলে জ্ঞানী (ধীর) ব্যক্তিগণের দেহান্তরপ্রাপ্তি হতেই পারে না।

এখানে 'তত্র' পদটির অর্থ দেহান্তর প্রাপ্তির বিষয়ে নয়, বরং 'দেহ-দেহী'র বিষয়ে বলা হয়েছে। অর্থাৎ দেহ কী ? দেহী কী ? পরিবর্তনশীলতা কী ? অপরিবর্তনশীলতা কী ? অনিত্য কী ? নিত্য কী ? অসৎ কী ? সৎ কী ? বিকারী কী ? অবিকারীই বা কী ? এই সমস্ত বিষয়ের প্রশ্নে তিনি মোহগ্রস্ত হন না। দেহ এবং দেহী সর্বতোভাবে পৃথক—এই বিষয়ে তিনি কখনও মোহগ্রস্ত হন না। তাঁর স্বতঃই অসঙ্গতার অখণ্ড জ্ঞান থাকে।

পরিশিষ্ট-ভাব—শরীর কখনো একভাবে থাকে না এবং সত্তা বা অস্তিত্বের অনেক (নানা) রূপ হয় না। জন্মের আগে এই দেহ বা শরীর ছিল না, মৃত্যুর পরেও থাকবে না এবং বর্তমান সময়েও এটি প্রতি মুহূর্তে মারা যাচ্ছে (ক্ষয় প্রাপ্ত হচ্ছে)। আসলে গর্ভে আসা থেকেই দেহে মৃত্যুর ক্রম (পরিবর্তন) শুরু হয়ে যায়। বাল্যাবস্থা মরে (পরিবর্তিত হয়ে) গিয়ে যৌবনাবস্থা আসে, যৌবনাবস্থার মৃত্যু (পরিবর্তন) হয়ে বৃদ্ধাবস্থা আসে এবং বৃদ্ধাবস্থার মৃত্যু (পরিবর্তন) হয়ে দেহান্তর অবস্থা অর্থাৎ অন্য দেহ প্রাপ্তি হয়। এসব অবস্থাই শরীরকে কেন্দ্র করে হয়। বাল্য, যৌবন, বৃদ্ধাবস্থা— এই তিন অবস্থা স্থূলশরীরের আর দেহান্তরপ্রাপ্তি হল সূক্ষ্মশরীর ও কারণশরীরের। কিন্তু স্বরূপের চিন্ময়সত্তা এই অবস্থাগুলির অতীত। অবস্থার পরিবর্তন হয়, স্বরূপ একই থাকে। এইরূপ শরীর-বিভাগ এবং সত্তা-বিভাগকে পৃথকভাবে যাঁরা জানেন, সেই তত্ত্বজ্ঞ পুরুষগণ কখনো কোনো অবস্থাতে মোহগ্রস্ত হন না।

জীব নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করার জন্য নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, নরকে এবং স্বর্গে গমন করে— এই কথাতেই প্রমাণিত হয় যে চুরাশি লক্ষ যোনি পরিত্যক্ত হয়, স্বর্গ-নরক পরিত্যক্ত হয়, কিন্তু স্বয়ং (শরীরী বা সত্তা) একই রূপে থাকে। শরীর পরিবর্তিত হয়, কিন্তু জীব (শরীরী) পরিবর্তিত হয় না। জীব একই থাকে, সেইজন্যই তো তার পক্ষে সম্ভব হয় নানা যোনিতে পরিভ্রমণ করা, নানা লোকে যাওয়া। সে নানা যোনি পরিভ্রমণ করে, কিন্তু নিজে কারো সঙ্গে লিপ্ত হয় না, কোথাও বদ্ধও হয় না। যদি সে নিজেই লিপ্ত বা বদ্ধ হয়ে যায় তবে চুরাশি লক্ষ যোনি ভোগ করবে কে আর স্বর্গ বা নরকেই বা কে যাবে আর মুক্ত কে হবে ?

জন্মগ্রহণ করা বা মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া আমাদের ধর্ম নয়, তা হল শরীরের ধর্ম। আমাদের (সত্তার) আয়ু অনাদি, অনন্ত, তারই মাঝে বহু শরীর উৎপন্ন হয় এবং লয়ও হয়। আমরা যেমন বস্ত্র পরিবর্তন করে থাকি এবং বস্ত্র বদল করলেও আমরা পরিবর্তিত হই না, একইভাবে থাকি (গীতা ২।২২), তেমনই নানা যোনিতে পরিভ্রমণ করলেও আমাদের সত্তা একইভাবে বিরাজ করে। তাৎপর্য হল যে, আমাদের স্বাতন্ত্র্য এবং অসঙ্গতা স্বতঃসিদ্ধ। কোনো একটিমাত্র দেহে আমার অস্তিত্ব অধীন হয়ে থাকে না। অসঙ্গ হওয়ার ফলে আমি অনেক শরীর ধারণ করলেও একই ভাবে বিরাজ করি, কিন্তু শরীরের সঙ্গে আসক্তি মেনে নেওয়ার ফলে আমাকে অনেক শরীর ধারণ করতে হয়। মেনে নেওয়া সঙ্গ স্থায়ী হয় না, কিন্তু আমরা নতুন নতুন সঙ্গ ধরতে থাকি। আসলে নতুন সঙ্গ না ধরলেই মুক্তি, স্বাধীনতা তখন স্বতঃসিদ্ধ হয়।

❖ ❖ ❖

সম্বন্ধ—অনিত্য বস্তু—শরীরাদিকে নিয়ে যে শোক হয়, তার নিবৃত্তির জন্য বলছেন—

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত॥ ১৪ ॥

[কৌন্তেয় (হে কুন্তীনন্দন !) ; মাত্রাস্পর্শাঃ (ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলির বিষয়) ; তু (তো) ; শীতোষ্ণসুখদুঃখদা (শীত ও উষ্ণ, সুখ-দুঃখ প্রদান করে) ; আগমাপায়িনঃ (উৎপত্তি-বিনাশশীল) ; অনিত্যাঃ (তা অনিত্য) ; ভারত (হে ভরতবংশোদ্ভব অর্জুন !) ; তান্ (সেগুলিকে) ; তিতিক্ষস্ব (সহ্য করো।)]

হে কুন্তীনন্দন ! ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা যার জ্ঞান হয় সেইসকল জড়বস্তু শীত (অনুকূল) এবং উষ্ণ (প্রতিকূল) ভাবনানুযায়ী সুখ ও দুঃখ প্রদান করে। সেগুলি উৎপত্তি ও বিনাশশীল, সুতরাং তা অনিত্য। তাই হে ভরতবংশোদ্ভব অর্জুন ! তুমি এগুলিকে সহ্য করো ॥ ১৪ ॥

ব্যাখ্যা—[এখানে একটি সংশয় জাগে যে, এই চতুর্দশ-পঞ্চদশ শ্লোকগুলির আগে (একাদশ থেকে ত্রয়োদশ পর্যন্ত) এবং পরে (ষোড়শ থেকে ত্রিশতম পর্যন্ত) দেহী এবং দেহ এই দুইয়ের প্রকরণ আছে। তাহলে মাঝখানে 'মাত্রাস্পর্শ'-এর এই দুটি শ্লোক (প্রকরণের থেকে পৃথক) কেমন করে এল ? তার উত্তর এই যে, যেমন দ্বাদশ শ্লোকে ভগবান সমস্ত জীবের নিত্যস্বরূপকে বোঝাবার উদ্দেশ্যে 'কোনো কালে আমি ছিলাম না, তা ঠিক নয়'— এই কথা বলে নিজেকে সেই স্থানে রেখেছেন, তেমনই শরীরাদি সকল প্রাকৃত পদার্থগুলিই যে অনিত্য, বিনাশশীল, পরিবর্তনশীল তা জানাবার জন্য ভগবান এখানে 'মাত্রাস্পর্শ'-এর কথা বলেছেন।]

'তু'—নিত্যতত্ত্বকে দেহ ইত্যাদি বস্তুগুলি থেকে পৃথক জানাবার জন্য এখানে 'তু' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

'মাত্রাস্পর্শাঃ'— যার দ্বারা মাপজোপ করা হয় অর্থাৎ যা হতে জানা যায়, সেই (জানার যন্ত্র) ইন্দ্রিয়গুলির এবং অন্তঃকরণের নাম হচ্ছে **'মাত্রা'**। মাত্রার দ্বারা অর্থাৎ ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণের দ্বারা যার সংযোগ হয়, তার নাম **'স্পর্শ'**। সুতরাং ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ সংযোগের দ্বারা যার জ্ঞান হয়, এরূপ সৃষ্টির সমস্ত পদার্থগুলি হচ্ছে **'মাত্রাস্পর্শাঃ'**।

'মাত্রাস্পর্শাঃ' পদটির দ্বারা এখানে শুধুমাত্র পদার্থই কেন বিবেচিত হবে, পদার্থের সম্বন্ধ কেন নয় ? আমরা যদি এখানে **'মাত্রাস্পর্শাঃ'** পদ দ্বারা শুধু পদার্থের সম্বন্ধ গ্রহণ করি তবে সেই সম্বন্ধকে **'আগমাপায়িনঃ'** (যাতায়াতকারী) বলা যায় না। কারণ সম্বন্ধের স্বীকৃতি কেবল অন্তঃকরণে না হয়ে স্বরূপে (অহং-এ) হয়। স্ব-স্বরূপ নিত্য, সুতরাং এতে যে স্বীকৃতি হয়, তাও নিত্যের মতোই হয়। স্ব-স্বরূপ যতক্ষণ সেই স্বীকৃতি ত্যাগ না করে, ততক্ষণ সেই স্বীকৃতি যেমন তেমনই থাকে অর্থাৎ পদার্থগুলি নষ্ট হলেও, পদার্থগুলি না থাকলেও, সেই পদার্থের সম্বন্ধ বজায় থাকে[১]। যেমন কোনো নারী বিধবা হলে অর্থাৎ তার পতির দেহত্যাগের পঞ্চাশ বছর পরেও যদি কেউ বলে যে, 'ইনি অমুকের পত্নী', তাহলে সেই নারী সচেতন হয়ে ওঠে ! এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সম্পর্কিত ব্যক্তি (পতি) না থাকলেও তাঁর সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক সর্বদা বজায় থাকে। এই দৃষ্টিতে দেখলে এই সম্পর্ককে উৎপন্ন ও বিনাশশীল বলা যায় না। সুতরাং এখানে **'মাত্রাস্পর্শাঃ'** পদটির দ্বারা পদার্থগুলির সম্বন্ধ না নিয়ে শুধু পদার্থগুলিকেই ধরা হয়েছে।

'শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ'—এইস্থানে শীত এবং উষ্ণ শব্দ দুটি অনুকূল এবং প্রতিকূলের বাচক। এর অর্থ যদি ঠাণ্ডা এবং গরম হিসাবে নেওয়া হয় তাহলে সেটি শুধুমাত্র ত্বক-ইন্দ্রিয়ের (ত্বকের) বিষয় হয়ে যাবে। যেটি হল একদেশীয়। সুতরাং শীতের অর্থ অনুকূলতা এবং উষ্ণের অর্থ প্রতিকূলতা বলে গণ্য করাই ঠিক মনে হয়।

[১] এইরূপ মেনে নেওয়া সম্পর্ক শুধুমাত্র অস্বীকৃতির দ্বারা অর্থাৎ নিজের মধ্যে না মেনে নিলে তবেই দূর হয়। নিজ সৎ স্বরূপে সম্বন্ধ নেই, ছিল না এবং হওয়া সম্ভবও নয় ; কিন্তু মেনে নেওয়া সম্বন্ধের অস্বীকৃতি ছাড়া, যতই ত্যাগ করা যাক, যতই কষ্ট করা যাক, শরীরে যতই পরিবর্তন আসুক বা যতই তপস্যা করা যাক, তবুও মেনে নেওয়া সম্পর্ক দূর হয় না, বরং যেমন তেমনই থাকে।

পদার্থমাত্রই অনুকূল-প্রতিকূলতার দ্বারা সুখ বা দুঃখদায়ক হয় অর্থাৎ যাকে আমরা চাই, এরূপ অনুকূল বস্তু, ব্যক্তি, পরিস্থিতি, ঘটনা, দেশ, কাল ইত্যাদি পাওয়া গেলে সুখ অনুভব হয়। আর যা আমরা চাই না, এরূপ প্রতিকূল বস্তু, ব্যক্তি, পরিস্থিতি ইত্যাদি এলে দুঃখ অনুভূত হয়। এখানে অনুকূলতা-প্রতিকূলতা হচ্ছে কারণ এবং সুখ-দুঃখ হল কার্য। প্রকৃতপক্ষে এই পদার্থগুলির মধ্যে সুখ বা দুঃখ দেবার সামর্থ্য নেই। মানুষ এর সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত করে এতে অনুকূলতা বা প্রতিকূলতার চিন্তা করে বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে, যার ফলে এই পদার্থগুলিকে সুখ বা দুঃখদায়ক বলে মনে হয়। তাই ভগবান এগুলিকে '**সুখদুঃখদাঃ**' বলেছেন।

'**আগমাপায়িনঃ**'—পদার্থমাত্রই আদি-অন্ত বিশিষ্ট, উৎপত্তি-বিনাশশীল এবং সংযোগ-বিয়োগশীল। এগুলির স্থিতি নেই, কারণ এগুলি উৎপত্তি হওয়ার পূর্বে ছিল না এবং বিনাশের পরেও থাকবে না। তাই এগুলি হল '**আগমাপায়ী**'।

'**অনিত্যাঃ**'— কেউ যদি বলেন যে এগুলি উৎপত্তির পূর্বে বা বিনাশের পরে যদি নাও থাকে, মধ্য অবস্থানে তো থাকে ? এর উত্তরে ভগবান বলছেন যে, এগুলি অনিত্য হওয়ায় মধ্য অবস্থাতেও স্থায়ী হয় না, এগুলি প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তনশীল। এমনই বেগে এদের পরিবর্তন হয় যে এদের একই রূপ দ্বিতীয়বার কেউ দেখতে পায় না। কারণ আগের মুহূর্তে এগুলি যেমন ছিল, পর মুহূর্তে আর সেইরূপে থাকে না। সেইজন্য ভগবান এগুলিকে '**অনিত্যাঃ**' বলেছেন।

শুধু এই পদার্থগুলিই অনিত্য বা পরিবর্তনশীল নয়, বরং যার দ্বারা ওই পদার্থগুলিকে জানা যায়, সেই ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণও পরিবর্তনশীল। এদের পরিবর্তন কীভাবে বুঝবে ? যেমন দিনের বেলায় কাজ করতে করতে দিনশেষে ইন্দ্রিয়াদিতে ক্লান্তি আসে এবং সকালে নিদ্রাভঙ্গে শরীরে সতেজ ভাব আসে, কিন্তু দিনের শেষে তা স্থায়ী হয় না। তাই পুনরায় নিদ্রার প্রয়োজন হয় এবং ইন্দ্রিয়গুলির ক্লান্তি নিরসন হয় ও সতেজ ভাব অনুভূত হয়। জাগ্রত অবস্থায় যেমন প্রতি মুহূর্তে ক্লান্তি আসতে থাকে, তেমনি নিদ্রায় প্রতি মুহূর্তে সতেজতা আসতে থাকে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ইন্দ্রিয়াদিতে প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তন হয়ে থাকে।

[এইস্থানে পদার্থগুলিকে স্থূলরূপে '**আগমাপায়িনঃ**' এবং সূক্ষ্মরূপে '**অনিত্যাঃ**' বলা হয়েছে। এগুলিকে অনিত্য হতেও সূক্ষ্ম বলার জন্য পরবর্তী ষোড়শ শ্লোকে '**অসৎ**' বলা হয়েছে এবং প্রথমে যে নিত্যতত্ত্বের বর্ণনা করা হয়েছে, তাকে '**সৎ**' বলা হয়েছে।]

'**তাংস্তিতিক্ষস্ব**'—মাত্রাস্পর্শ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ককালে 'এগুলি অনুকূল এবং ওইগুলি প্রতিকূল'—এরূপ ধারণা দোষের নয়, কিন্তু এগুলির জন্য অন্তঃকরণে (হৃদয়ে) রাগ(আসক্তি)-দ্বেষ, হর্ষ-শোক ইত্যাদি বিকার উৎপন্ন হওয়াই দোষের। সুতরাং অনুকূল-প্রতিকূলতার ধারণা হলেও রাগ(আসক্তি)-দ্বেষ ইত্যাদি বিকার উৎপন্ন না হতে দেওয়া অর্থাৎ মাত্রাস্পর্শে নির্বিকার থাকাই হচ্ছে এগুলি সহ্য করা। এই সহ্য করাকেই ভগবান বলেছেন '**তিতিক্ষস্ব**'।

দ্বিতীয়ত 'শরীর, ইন্দ্রিয়সকল এবং অন্তঃকরণ ইত্যাদির ক্রিয়া এবং অবস্থাগুলির আদি এবং অন্ত থাকে অর্থাৎ তার ভাব এবং অভাব হয়। এই ক্রিয়াগুলি বা অবস্থাগুলি তোমার মধ্যে নেই, কারণ এগুলিকে তুমি জান, এর থেকে তুমি আলাদা[১]।'

তুমি স্ব-স্বরূপে যেমন তেমনই থাক। সুতরাং ওই ক্রিয়াগুলিতে এবং অবস্থাগুলিতে তুমি নির্বিকার থাক। এগুলিতে নির্বিকার থাকাকেই তিতিক্ষা বলা হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব—দেহ যেমন কখনো একরূপে থাকে না, তা প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হয়, তেমনই ইন্দ্রিয়াদি মন-বুদ্ধি সহযোগে যে জ্ঞান হয়, সেই সমস্ত জাগতিক পদার্থ (প্রকৃতি এবং প্রকৃতির কার্য মাত্রেই) কখনো একরূপে থাকে না, সেগুলির সংযুক্তি এবং বিযুক্তি হতে থাকে। যেসব পদার্থ বা বস্তু আমরা আকাঙ্ক্ষা করি, তার সংযুক্তিতে আমরা সুখলাভ করি আর বিযুক্তিতে দুঃখ অনুভব করি। যেসব পদার্থ বা বস্তু আমরা না চাই, তার বিযুক্তিতে সুখ হয়, তার সংযুক্তিতে দুঃখ পাই। পদার্থ সকলও উৎপত্তি ও বিনাশশীল অর্থাৎ অনিত্য। তেমনই যার সাহায্যে পদার্থের জ্ঞান হয়,

[১] যে জানে এবং যা জানা যায় (অর্থাৎ জ্ঞেয়) তা পৃথক পৃথক হয়।

সেই ইন্দ্রিয়াদি এবং অন্তঃকরণও উৎপত্তি ও বিনাশশীল অর্থাৎ অনিত্য এবং বিষয়বস্তুর সহযোগে যে সুখ ও দুঃখ হয়, তাও বিনাশশীল এবং অনিত্য। কিন্তু স্ব-স্বরূপ সর্বদা একইভাবে বিরাজমান, নির্বিকার এবং নিত্য। সুতরাং এটি সহ্য করে নেওয়া উচিত অর্থাৎ এগুলির সংযুক্তি ও বিযুক্তিতে সুখী বা দুঃখী না হয়ে নির্বিকার থাকা উচিত। সুখ আর দুঃখ পৃথক পৃথক হলেও, সেগুলি যিনি অনুভব করেন তিনি সেই একই আর ওইগুলির থেকে পৃথক (নির্বিকার) হন। (জগতের) পরিবর্তনশীলতা অনুভব করলে স্ব-স্বরূপের অপরিবর্তনশীলতার (নির্বিকারত্বের) অনুভব স্বতঃই হয়ে থাকে।

এইস্থানে 'শীত' শব্দটি অনুকূল এবং 'উষ্ণ' শব্দটি প্রতিকূলতার বাচক। তাৎপর্য হল যে, বেশি ঠাণ্ডাতেও গাছ শুকিয়ে যায় আবার বেশি গরমেও গাছ শুকিয়ে যায়। সুতরাং পরিণামে শীত এবং গ্রীষ্ম—উভয়ই সমান। এইরূপ অনুকূলতা ও প্রতিকূলতা অভিন্ন। তাই ভগবান এই দুটিকেই সহ্য করার বা এর থেকে ঊর্ধ্বে ওঠার আদেশ দিয়েছেন।

সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদ, রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ, কাম-ক্রোধ ইত্যাদি আসে-যায়, পরিবর্তনশীল। কিন্তু স্ব-স্বরূপ একইরূপে বিরাজমান। সাধকগণ এই মস্ত ভুল করে বসেন যে, তাঁরা স্ব-স্বরূপকে না জেনে এই পরিবর্তনশীল দশাকেই দেখে থাকেন। বহমান দশাকে স্বীকার করেন কিন্তু স্থির স্ব-স্বরূপকে স্বীকার করেন না। দশা আগেও ছিল না, পরেও থাকবে না। অতএব মধ্যভাগে আছে বলে প্রতিভাত হলেও আসলে নেই। অপরপক্ষে স্ব-স্বরূপের আদি, মধ্য বা অন্ত বলে কোনো কিছু নেই। দশা কখনও একরূপে থাকে না আর স্ব-স্বরূপ কখনও বিভিন্ন রূপের হয় না। যা দেখা যায় তাও দশা আর যে দেখে (বুদ্ধি) তাও দশা। যা জানা যায় তাও দশা আর যে জানে সেও দশা। যা দেখা যায় বা যার দ্বারা দেখা যায়—সেটি যেমন সত্তা নয়, তেমনই যা জানা যায় বা যার দ্বারা জানা যায়—সেটিও সত্তা নয়। দৃশ্য এবং দর্শনকারী—এ সবই দশার অন্তর্গত। দৃশ্য এবং দৃশ্যের অবলোকনকারী থাকবে না কিন্তু স্ব-স্বয়ং থাকবে। দশা মিটে যাবে কিন্তু স্ব-স্বরূপ সর্বদাই বিরাজমান। তাৎপর্য হল যে 'দৃশ্যের' সঙ্গে সম্পর্ক হলেই স্ব-স্বরূপকে 'দ্রষ্টা' বলা হয়। যদি দৃশ্যের বা দেখার সঙ্গে সম্পর্ক না থাকে তাহলে স্ব-স্বরূপ থাকলেও তাঁকে দ্রষ্টা বলা যায় না। এইরূপেই 'শরীরের' সঙ্গে সম্পর্ক হলেই স্ব-স্বরূপকে (চিন্ময়সত্তা) 'শরীরী' বলা হয়। যদি 'শরীরের' সঙ্গে সম্পর্ক না হয় তাহলে স্ব-স্বরূপ থাকে, কিন্তু তখন তাকে 'শরীরী' বলা যায় না (গীতা ১৩।১)। সুতরাং ভগবান মানুষকে বোঝাবার জন্যই শুধু 'শরীরী' কথাটি ব্যবহার করেছেন।

***

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে মাত্রাস্পর্শে তিতিক্ষার কথা বলা হয়েছে। এখন তিতিক্ষার ফলে কী হবে—পরবর্তী শ্লোকে তা বলা হয়েছে।

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে॥ ১৫ ॥

[হি (কেননা) ; পুরুষর্ষভ (হে পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন!) ; সমদুঃখসুখম্ (সুখ দুঃখে সমভাবে স্থিত) ; যম্ ধীরম্ (যে ধীর); পুরুষম্ (ব্যক্তিকে) ; এতে (এই স্পর্শজনিত) ; ন, ব্যথয়ন্তি (বিচলিত করে না) ; সঃ অমৃতত্বায় (তিনি অমৃতত্ব লাভে) ; কল্পতে (সমর্থ হন।)]

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন! সুখ-দুঃখে সমভাবে স্থিত যে ধীর ব্যক্তিকে এই বিষয়স্পর্শজনিত সুখ-দুঃখ বিচলিত করে না, তিনি অমৃতত্ব লাভে সমর্থ হন অর্থাৎ তিনি অমরতা লাভ করেন ॥ ১৫ ॥

ব্যাখ্যা—**'পুরুষর্ষভ'**—মানুষ প্রায়শই পরিস্থিতির পরিবর্তনের বিচার করে, যা বদলানো সম্ভব নয়। যুদ্ধরূপ পরিস্থিতি প্রাপ্ত হয়েও অর্জুন সেটি পরিবর্তনের চিন্তা না করে নিজ কল্যাণের চিন্তা করেছেন। এই কল্যাণের চিন্তা করাই হল মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয়।

'সমদুঃখসুখং ধীরম্'—জ্ঞানী (ধীর) ব্যক্তিগণ সুখ-দুঃখে সমভাবাপন্ন হয়ে থাকেন। অন্তঃকরণের বৃত্তির জন্যই সুখ ও দুঃখ পৃথকরূপে প্রতিভাত হয়। সুখ-দুঃখ ভোগ করায় পুরুষই (চেতন) হেতু হয় এবং প্রকৃতিতে স্থিত হলেই সেই হেতুটি কার্যকরী হয় (গীতা ১৩।২০-২১)।

যখন সে স্ব-স্বরূপে স্থিত হয় তখন সুখ বা দুঃখ ভোগ করার কেউ থাকে না। সুতরাং স্ব-স্বরূপে স্থিত হলে সে সুখ ও দুঃখে স্বভাবতই সমভাবাপন্ন হয়।

'যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষম্'—ধীর মানুষদের এই মাত্রাস্পর্শ অর্থাৎ প্রকৃতির পদার্থ ব্যথা দেয় না। প্রাকৃত পদার্থ সহযোগে যে সুখ অনুভূত হয় তাকেও ব্যথা বলা হয় এবং তার বিযুক্তিতে যে দুঃখ অনুভূত হয়, তাকেও ব্যথা বলা হয়। কিন্তু যার দৃষ্টি থাকে সমতার দিকে তাকে এইসকল প্রাকৃত পদার্থ সুখী বা দুঃখী করতে সক্ষম হয় না। সমতার দিকে দৃষ্টি থাকায় অনুকূলতার জন্য সেই সুখ অনুভূত হলেও তার ভোগ না হওয়ায় অন্তঃকরণে সেই সুখের স্থায়ীভাবে কোনো ছাপ পড়ে না। এরূপই, প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়ে সেই দুঃখ অনুভূত হলেও, তার ভোগ না হওয়ায় অন্তঃকরণে সেই দুঃখ স্থায়ীভাবে কোনো ছাপ ফেলে না। এইভাবে সুখ বা দুঃখের কোনো ছাপ অন্তঃকরণে না পড়ায় সে ব্যথিত হয় না। এর অর্থ হল এই যে, অন্তঃকরণে (হৃদয়ে) সুখ বা দুঃখের জ্ঞান হলেও সে স্বয়ং সুখী বা দুঃখী হয় না।

'সোঽমৃতত্বায় কল্পতে'—এইরূপ ধীর ব্যক্তি অমরত্ব-প্রাপ্তির যোগ্য হয় অর্থাৎ তাঁর মধ্যে অমরতা লাভ করার সামর্থ্য এসে যায়। সামর্থ্য এবং যোগ্যতা এলে সে অমরত্ব লাভ করবেই, এতে বিলম্ব হবার কোনো কারণ নেই। কারণ তাঁর অমরত্বপ্রাপ্তি স্বতঃসিদ্ধ। শুধুমাত্র পদার্থগুলির সংযোগ ও বিয়োগে নিজের মধ্যে যে বিকার মানা হত, তা ছিল ভ্রান্তি।

বিশেষ কথা

মনুষ্যজন্ম সুখ-দুঃখ ভোগ করার জন্য সৃষ্ট নয়, বরং সুখ-দুঃখ ছাড়িয়ে মহৎ আনন্দ, পরমশান্তি প্রাপ্তির উদ্দেশ্যেই সৃষ্ট, যে আনন্দ এবং সুখ-শান্তি প্রাপ্ত হলে আর কিছু পাওয়ার বাকি থাকে না (গীতা ৬।২২)। আমরা যদি অনুকূল বস্তু, ব্যক্তি, পরিস্থিতি ইত্যাদি প্রাপ্ত হই বা সেগুলি পাওয়ার সম্ভাবনায় সুখ অনুভব করি অর্থাৎ আমাদের মধ্যে অনুকূল বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদি প্রাপ্ত করার কামনা, লিপ্সা থাকে তাহলে আমরা অনুকূল পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করতে সক্ষম হব না। অনুকূল পরিস্থিতির সদুপযোগ করার সামর্থ্য, শক্তি আমরা প্রাপ্ত করতে পারব না। কারণ অনুকূলতার সদুপযোগ করার শক্তি অনুকূলতার ভোগেই ব্যয়িত হয়। যার জন্য অনুকূলতার সদুপযোগ হয় না; শুধু ভোগই হয়। এই নিয়মে প্রতিকূল ব্যক্তি, বস্তু, পরিস্থিতি, ঘটনা, ক্রিয়া ইত্যাদি এলে অথবা তার আশঙ্কায় যদি আমরা শঙ্কিত হই, তাহলে প্রতিকূলতার সদুপযোগ হয় না, কিন্তু ভোগ হয়। ফলে দুঃখ সহ্য করার সামর্থ্য আমাদের মধ্যে থাকবে না, আমরা প্রতিকূলতার ভোগেই আবদ্ধ থাকব এবং দুঃখী হতে থাকব।

অনুকূল বস্তু, ব্যক্তি, পরিস্থিতি, ঘটনা ইত্যাদির প্রাপ্তিতে যদি সুখসামগ্রীগুলি সুখ, আরাম, সুবিধার জন্য ব্যবহার করা হয় এবং তাতে সন্তুষ্টি হয় তাহলে সেটি অনুকূলতার ভোগ হয়। কিন্তু জীবন-ধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় বস্তু ব্যবহার করে অবশিষ্ট সুখসামগ্রীগুলিকে যদি অভাবগ্রস্তের সেবার জন্য ব্যয় করা হয় তাহলে তা হবে অনুকূলতার সদুপযোগ। অতএব সুখসামগ্রীগুলি দুঃখীদের জন্যই বলে বুঝতে হবে। এতে দুঃখীদেরও দাবি আছে। মনে কর, আমি লক্ষপতি, তাহলে আমার লক্ষপতি হওয়ার সুখ হয়, অহংকার হয়। কিন্তু এরূপ তখনই হয় যখন আশেপাশে আর কোনো লক্ষপতি না থাকে। কিন্তু আমার প্রতিবেশী বা বন্ধুবান্ধব প্রত্যেকেই যদি কোটিপতি হন তাহলে কি আমি লাখপতি হওয়ার সুখ পাব? কখনো নয়। সুতরাং আমাকে লাখপতি হওয়ার সুখ অভাবগ্রস্তেরা, দরিদ্রেরাই দিতে পারে। তাই এই সুখসামগ্রী, যেগুলি আমি প্রাপ্ত হয়েছি, সেগুলির দ্বারা অভাবগ্রস্তদের সেবা না করে নিজেই যদি সুখভোগ করতে থাকি, তাহলে আমি কৃতঘ্নতার দায়ে দোষী হব এবং তার ফলে অনর্থ-পরম্পরা চলতে থাকে। কারণ আমাদের কাছে যে সুখসামগ্রী রয়েছে, সেগুলি দুঃখী ব্যক্তিদেরই দান। সেইজন্য ওই সমস্ত সুখসামগ্রী দুঃখীদের সেবায় ব্যয় করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য।

এবার চিন্তা করতে হবে, প্রতিকূলতার সদুপযোগ কীভাবে করা যায়। সুখের ইচ্ছা এবং আশাই দুঃখের কারণ। প্রতিকূল পরিস্থিতি তখনই দুঃখদায়ক হয় যখন অন্তরে সুখের ইচ্ছা থাকে। সতর্কতার সঙ্গে যদি আমরা অনুকূলতার ইচ্ছা, সুখের আশা পরিত্যাগ করি, তবে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দুঃখ পেতে হয় না অর্থাৎ প্রতিকূল পরিস্থিতি আমাদের দুঃখী করতে পারে না। যেমন, রোগীকে কটু থেকে কটুতর ওষুধ গ্রহণ করতে হলেও, সে

দুঃখিত হয় না। বরং এই ভেবে সে প্রসন্ন থাকে যে, ওই ঔষধে তার রোগ দূর হবে। তেমনি কারো পায়ে গভীরভাবে কাঁটা ফুটে গেলে কণ্টক উত্তোলনকারী সেটি বার করার জন্য সূঁচ দিয়ে গভীর গর্ত করে, যেটি অত্যন্ত পীড়া দেয়। সেই ব্যথায় সে কষ্ট পায়, ব্যাকুল হয়, তবু সে কণ্টক উত্তোলনকারীকে বলে না যে, 'ভাই, ছেড়ে দাও, কাঁটা আর বার কোরো না।' কাঁটা বার হবে, চিরকালের মতো ব্যথা দূর হবে—এই কথা ভেবে সে সেই কষ্টকে প্রসন্নভাবে সহ্য করে। এই যে সুখের ইচ্ছা পরিত্যাগ করে দুঃখকে কষ্টকে প্রসন্নভাবে সহ্য করা, এই হল প্রতিকূলতার সদুপযোগ। যদি সে কটু ওষুধ গ্রহণে বা কণ্টক উত্তোলনের ক্রিয়ায় দুঃখ পেত, তাহলে সেটি হত প্রতিকূলতার ভোগ, যাতে পরিণামে তাকে ভীষণ কষ্ট পেতে হত।

আমরা যদি সুখ ও দুঃখ উপভোগ করতে চাই, তবে ভবিষ্যতেও আমাদের ভোগ-যোনিতে অর্থাৎ স্বর্গ-নরক ইত্যাদিতে গমন করতে হবে। কারণ সুখ ও দুঃখ ভোগ করার স্থানই হচ্ছে স্বর্গ ও নরক। আমরা যদি সুখ ও দুঃখ ভোগ করতে থাকি, সুখ ও দুঃখে সমভাবাপন্ন না থাকি, সুখ-দুঃখের ঊর্ধ্বে ওঠার চেষ্টা না করি, তাহলে আমরা মুক্তির অধিকারী বলে কখনোই বিবেচিত হব না।

চতুর্দশ শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, সাংসারিক পদার্থসমূহ অনুকূল এবং প্রতিকূলতার দ্বারা সুখ এবং দুঃখ প্রদান করে এবং এগুলি গতিশীল অর্থাৎ আসে ও যায়, চিরস্থায়ী নয়। কারণ এগুলি অনিত্য অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী। এগুলি প্রাপ্ত হলে সেইক্ষণ থেকেই এগুলির লয় হতে থাকে। এগুলি সংযুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই বিযুক্ত হতে শুরু করে। এগুলি আগেও ছিল না, পরেও থাকবে না এবং বর্তমানেও সর্বদা লয়ের পথে চলেছে। এগুলিকে ভোগ করে আমরা কেবল আমাদের স্বভাবই নষ্ট করছি, সুখ-দুঃখের ভোগী হয়ে চলেছি। সুখ-দুঃখের ভোগী হয়ে আমরা ভোগ-যোনির পাত্র হচ্ছি, তাহলে আমরা কী করে মুক্তি পাব ? আমাদের যদি ভুক্তিতেই (ভোগেই) রুচি থাকে, তাহলে ভগবান কী করে মুক্তি দেবেন ?

সুখ ও দুঃখ যদি এইভাবে উপভোগ না করে আমরা তার সদ্ব্যবহার করি তবেই আমরা সুখ-দুঃখ অতিক্রম করতে পারব এবং মহৎ আনন্দ অনুভব করতে পারব।

পরিশিষ্ট-ভাব—স্বরূপ হল অস্তিত্বরূপ। অস্তিত্বে কোনো বিকার থাকে না। দেহকে নিজের বলে মেনে নিলেই কিন্তু বিকার আসে। অতএব দেহে নিজের স্থিতি মেনে নিলে তখন আর কোনো মানুষই ব্যথারহিত হয়ে থাকতে পারে না। ব্যথারহিত হওয়ার তাৎপর্য হল— প্রিয় বিষয় প্রাপ্ত করে হর্ষিত না হওয়া এবং অপ্রিয় বিষয়ের সম্মুখীন হয়ে উদ্বিগ্ন না হওয়া (গীতা ৫।২০)। ব্যথারহিত হলে মানুষের বুদ্ধি স্থির হয়—**স্থিরবুদ্ধিরসম্মূঢ়ঃ** (৫।২০)।

সুখ-দুঃখদায়ক পরিস্থিতিতে সুখী বা দুঃখী হওয়াকেই ব্যথিত হওয়া বলে। সুখী বা দুঃখী হওয়া হল সুখ-দুঃখের ভোগ। ভোগী ব্যক্তি কখনো সুখী হতে পারে না। সাধকের সুখ-দুঃখ ভোগ না করে, সুখ-দুঃখের সদ্ব্যবহার করা উচিত। সুখদায়ক বা দুঃখদায়ক পরিস্থিতির প্রাপ্তি হয় প্রারব্ধ দ্বারা (ভাগ্যানুসারে) এবং সেই পরিস্থিতিকে সাধনসামগ্রী মনে করে তার সদ্ব্যবহার করাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। এই মনুষ্যত্বের দ্বারা অমরত্ব লাভ হয়। সুখের সদ্ব্যবহার হল অপরকে সুখী করা, তাদের সেবা করা আর দুঃখের সদ্ব্যবহার হল সুখের ইচ্ছা পরিত্যাগ করা। দুঃখের সদ্ব্যবহার করে সাধক দুঃখের কারণ অনুসন্ধান করেন। দুঃখের কারণ হল—সুখের আকাঙ্ক্ষা—**যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে** (৫।২২)। যিনি সুখ এবং দুঃখভোগ করেন, সেই ভোগীর পতন হয় আর যিনি এই সুখ-দুঃখের সঠিক ব্যবহার করেন, সেই যোগী সুখ-দুঃখ—দুইয়ের ঊর্ধ্বে উঠে অমরত্ব লাভ করেন।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—এতক্ষণ দেহ-দেহীর যে বিবেচনা করা হল, সেটিই ভগবান ভিন্ন ভাবে পরবর্তী তিনটি শ্লোকে বর্ণনা করেছেন।

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ ১৬॥

[অসতঃ, ভাবঃ (অসৎ বস্তুর সত্তা) ; ন, বিদ্যতে (নেই) ; তু (এবং) ; সতঃ, অভাবঃ (সৎ বস্তুর অভাব) ; ন, বিদ্যতে (নেই) ; তত্ত্বদর্শিভিঃ (তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষগণ) ; অনয়োঃ, উভয়োঃ, অপি (এই দুটিরই) ; অন্তঃ (পরিণতি) ; দৃষ্টঃ (অনুভব করেছেন।)]

অসৎ বস্তুর ভাব (অস্তিত্ব) নেই এবং সৎ বস্তুর অনস্তিত্ব নেই। তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষগণ এই দুটিরই পরিণতি অর্থাৎ এ দুটিকে তত্ত্বত দেখেছেন অর্থাৎ অনুভব করেছেন ॥ ১৬ ॥

ব্যাখ্যা—[এখানে (পূর্বার্ধে) ভগবান **'ভূ সত্তায়াম্'** (ভাবঃ,অভাবঃ), **'অস্ ভূবি'** (অসৎ, সৎ) এবং **'বিদ্ সত্তায়াম্'** (বিদ্যতে)—এই তিনটি সত্তাবাচক ধাতুর প্রয়োগ করেছেন। নিত্যতত্ত্বের দিকে লক্ষ্য করানোর জন্য এই তিনটি ধাতুর প্রয়োগ করা হয়েছে।]

'নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ'—উৎপত্তির পূর্বে শরীর ছিল না, মৃত্যুর পরেও থাকবে না এবং বর্তমানেও প্রতি মুহূর্তে তা লয়প্রাপ্ত হচ্ছে। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে অতীত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান—এই তিন কালে শরীর কখনোই স্থায়ীরূপে, একরূপে থাকে না। সুতরাং এটি অসৎ। এইভাবে এই সংসারেরও কোনো স্থায়িত্ব নেই, সুতরাং এটিও অসৎ। শরীর হল জগৎসংসারের একটি ছোট্ট প্রতীক ; সেইজন্য শরীরের পরিবর্তনের দ্বারা জগৎ-সংসারমাত্রই যে পরিবর্তনশীল তা প্রমাণিত হয় অর্থাৎ এই জগতের আগে অনস্তিত্ব ছিল এবং পরেও অনস্তিত্ব থাকবে এবং বর্তমানেও এটি নাস্তির পথে যাচ্ছে।

জগৎসংসার কালরূপী অগ্নিতে কাষ্ঠবৎ নিরন্তর দগ্ধ হচ্ছে। কাষ্ঠ দগ্ধ হলে কয়লা এবং ভস্ম অবশেষ থাকে, কিন্তু জগৎসংসারকে এই কালরূপী অগ্নি এমন বিশেষ নিয়মে দগ্ধ করে যে এর কয়লা বা ভস্ম কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। জগৎকে লয় করে দেয়। তাই বলা হয়েছে যে অসৎ-এর সত্তা বা স্থায়িত্ব নেই।

'নাভাবো বিদ্যতে সতঃ'—যেটি সৎ বস্তু, তার লয় হয় না অর্থাৎ দেহ যখন উৎপন্ন হয়নি, তখনও দেহী ছিল, দেহ নাশ হলেও দেহী থাকবে এবং বর্তমানে দেহ পরিবর্তিত হতে থাকলেও দেহী একইভাবে তাতে বিরাজ করে। এই নিয়মেই, জগৎসংসার যখন সৃষ্ট হয়নি, তখনও পরমাত্মতত্ত্ব ছিল, জগৎ লয়প্রাপ্ত হলেও পরমাত্মতত্ত্ব থাকবে এবং বর্তমানে পরিবর্তনশীল জগতে পরমাত্মতত্ত্ব যেমন, তেমনি রয়েছে।

মর্মকথা

জগৎসংসারকে আমরা একবারই একটি রূপে দেখতে পারি, দ্বিতীয়বার নয়। কারণ জগৎ সর্বদা পরিবর্তনশীল ; সেইজন্য একমুহূর্ত পূর্বে বস্তুটি যেমন ছিল, পর মুহূর্তে তা সেইরূপে থাকে না, যেমন—সিনেমা দেখার সময় পর্দার ওপর দৃশ্য স্থির দেখায় ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাতে প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তন হচ্ছে। মেশিনে ফিল্মটি বেগে চালিত হওয়ায় এই পরিবর্তন আমাদের চোখে ধরা পড়ে না[১]।

এর থেকে আরও বড় মর্মকথা এই যে, প্রকৃতপক্ষে জগৎকে একবারও দেখা যায় না। কারণ শরীর, ইন্দ্রিয়-সকল, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি যে সকল করণ দ্বারা আমরা জগৎকে দেখি—অনুভব করি, সেই করণও জগতেরই। সুতরাং বাস্তবে জগৎই জগৎকে দেখে। যিনি শরীর এবং জগৎসংসার হতে সর্বতোভাবে সম্পর্করহিত, সেই স্ব-স্বরূপ দ্বারা জগৎ কখনো পরিলক্ষিত হয় না ! অর্থাৎ এই স্বরূপে জগতের প্রতীতি নেই। সংসারের সম্বন্ধ থেকেই সংসারের প্রতীতি হয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্বরূপের সংসারের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই।

দ্বিতীয়তঃ জগৎ-সংসারের (শরীর, ইন্দ্রিয়সকল, মন,

---

[১] 'নিত্যদা হ্যঙ্গ ভূতানি ভবন্তি ন ভবন্তি চ। কালেনালক্ষ্যবেগেন সূক্ষ্মত্বাত্তন্ন দৃশ্যতে' (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২২।৪২)।

শরীরের উৎপত্তি ও লয় যদিও প্রতিক্ষণ হয়ে চলেছে, তথাপি কালের গতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম হওয়ায় এর প্রতি মুহূর্তে উৎপন্ন এবং লয়প্রাপ্তি নজরে আসে না।

বুদ্ধির) সাহায্য ব্যতিরেকে চেতন স্বরূপের কিছুই করা সম্ভব নয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ক্রিয়াগুলি জগৎ-সংসার দ্বারা সংঘটিত, স্বরূপের দ্বারা নয়। স্বরূপের ক্রিয়াগুলির সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই।

জগৎসংসারের বাস্তবিক রূপ হল ক্রিয়া এবং পদার্থ। যখন ক্রিয়া বা পদার্থ কারো সঙ্গেই স্বরূপের সম্পর্ক নেই, তখন প্রমাণিত হয় যে, শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধিসহ সমস্ত জগতেরই নাশ হয়। শুধুমাত্র পরমাত্মতত্ত্বেরই সত্তা রয়েছে, যা নির্লিপ্তরূপে সবকিছুর প্রকাশক ও আধার।

'উভয়োরপি........দর্শিভিঃ'—এই দুটি অর্থাৎ সৎ-অসৎ, দেহী-দেহের তত্ত্ব অনুভবকারী মহাপুরুষগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, শুধুমাত্র সৎ-তত্ত্বই বিদ্যমান।

অসৎ বস্তুর তত্ত্বও সৎ এবং সৎ বস্তুর তত্ত্বও সৎ, অর্থাৎ দুটি তত্ত্বই হল এক, সৎ ভাবরূপে দুই তত্ত্বই এক। সুতরাং সৎ এবং অসৎ—এই দুটি যিনি তত্ত্বত জেনেছেন সেই তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষদের গোচরে একমাত্র সৎ তত্ত্বই আছে। অসৎ-এর সত্তা বলে যেটিতে ধারণা জন্মায়, বাস্তবে সেটি সৎ-এরই সত্তা। সৎ-এর সত্তাতেই অসৎকে সত্তাবান বলে ধারণা হয়। এই সৎকে **'পরা প্রকৃতি'** (গীতা ৭।৫), **'ক্ষেত্রজ্ঞ'** (গীতা ১৩।১-২), **'পুরুষ'** (গীতা ১৩।১৯), এবং **'অক্ষর'** (গীতা ১৫।১৬) বলা হয়েছে এবং অসৎকে **'অপরা প্রকৃতি'**, **'ক্ষেত্র'**, **'প্রকৃতি'** এবং **'ক্ষর'** বলা হয়েছে।

অর্জুনও সম্ভাব্য শরীরনাশের জন্য শোক করছিলেন যে, যুদ্ধ করলে স্বজনবর্গ সকলে মৃত্যুমুখে পতিত হবেন। তাতে ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন যে, যুদ্ধ না করলে কি এঁদের মৃত্যু হবে না ? যা অসৎ তা তো মরবেই এবং সর্বক্ষণই মরছে। কিন্তু এর মধ্যে যেটি সৎরূপে থাকে তার কখনো নাশ হয় না। সেইজন্য অবুঝের মতো শোকগ্রস্ত হওয়া অর্জুনের পক্ষে উচিত নয়।

একাদশ শ্লোকে বলা হয়েছে যে, মৃত বা জীবিত, কারোর জন্যই প্রকৃত পণ্ডিত ব্যক্তিগণ শোক করেন না। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শ্লোকে দেহীর নিত্যতার বর্ণনা আছে এবং তাতে **'ধীর'** শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শ্লোকে জগতের অনিত্যতার বর্ণনা আছে এবং এতেও **'ধীর'** শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তেমনিই ষোড়শ শ্লোকটিতে সৎ-অসৎ-এর বিবেচনা করা হয়েছে এবং এতে **'তত্ত্বদর্শী'**[১] শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই শ্লোকগুলিতে **'পণ্ডিত'**, **'ধীর'** এবং **'তত্ত্বদর্শী'** পদ ব্যবহারের তাৎপর্য এই যে, যে বিবেকসম্পন্ন এবং বুদ্ধিমান হয়, তার শোক হয় না। যদি কারোর শোক হয় তাহলে বুঝতে হবে যে সে বিবেকবান বা বুদ্ধিমান নয়।

পরিশিষ্ট-ভাব— অস্তিত্ব মাত্রেই 'সৎ' এবং অস্তিত্ব ব্যতীত যা কিছু প্রকৃতি এবং প্রকৃতির কার্যাদি (ক্রিয়া ও পদার্থ) আছে, সেগুলি সব 'অসৎ' অর্থাৎ পরিবর্তনশীল। যে মহাপুরুষগণ সৎ ও অসৎ— উভয়ই তত্ত্বতঃ জেনেছেন অর্থাৎ যাঁদের সর্বভূতে আত্মভাব হয়েছে, তাঁদের দৃষ্টিতে (অনুভূতিতে) অসৎ-এর কোনো অস্তিত্বই নেই এবং সৎ-এর কোনো অ-ভাব নেই অর্থাৎ অস্তিত্ব (সৎ-তত্ত্ব) ব্যতীত আর কোনো কিছুই নেই।

ভগবান চতুর্দশতম ও পঞ্চদশতম শ্লোকে শরীরের অনিত্যতার বর্ণনা করেছেন, সেই কথাটিই এইস্থানে **'নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ'** পদটির দ্বারা বলা হয়েছে এবং দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শ্লোকে শরীরীর (দেহীর) অনিত্যতার বর্ণনা করেছেন, সেটি এখানে **'নাভাবো বিদ্যতে সতঃ'** পদের দ্বারা বলা হয়েছে।

'নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ'— এই ষোলোটি অক্ষরে সমস্ত বেদ, পুরাণ এবং শাস্ত্রাদির তাৎপর্য লুক্কায়িত আছে। অসৎ এবং সৎ এই দুটিকেই প্রকৃতি এবং পুরুষ, ক্ষর এবং অক্ষর, শরীর এবং শরীরী, অনিত্য এবং নিত্য, বিনাশীল এবং অবিনাশী ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়েছে। দেখা-শোনা-বোঝা-চিন্তা করা-ঠিক করা ইত্যাদি যত কিছু কাজ সবই 'অসৎ'। যার সাহায্যে দেখা-শোনা-চিন্তা ইত্যাদি করা হয়, তাও অসৎ এবং যে দেখে সেও অসৎ।

এই ষোলো অক্ষরের শ্লোকার্ধটিতে তিনটি ধাতু প্রয়োগ করা হয়েছে—

---

[১] 'নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ' (২।১১), 'ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি' (২।১৩), 'সমদুঃখসুখং ধীরম্' (২।১৫)— এই তিন স্থানে যাঁদের 'পণ্ডিত' ও 'ধীর' বলা হয়েছে, তাঁদেরই এইস্থানে 'তত্ত্বদর্শী' বলা হয়েছে।

১) 'ভূ সত্তায়াম্'— যেমন, 'অভাবঃ' এবং 'ভাবঃ'।

২) 'অস্ ভূবি'— যেমন, 'অসতঃ' এবং 'সতঃ'।

৩) 'বিদ্ সত্তায়াম্'— যেমন, 'বিদ্যতে' এবং 'ন বিদ্যতে'।

যদিও এই তিনটি ধাতুর মূল অর্থ এক 'অস্তিত্বই' অর্থাৎ সত্তা তবুও সূক্ষ্মভাবে এই তিনটি অন্য পৃথক অর্থও প্রকাশ করে, যেমন—'ভূ' ধাতুর অর্থ 'উৎপত্তি', 'অস্' ধাতুর অর্থ '**অস্তিত্ব**' (সত্তা) এবং 'বিদ্' ধাতুর অর্থ 'বিদ্যমান' (বর্তমানের অস্তিত্ব)।

'নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ' পদটির অর্থ হল— **'অসতঃ ভাবঃ ন বিদ্যতে'** অর্থাৎ অসতের অস্তিত্ব বিদ্যমান নেই, বরং অসতের অভাবই বিদ্যমান, কারণ এর নিত্য পরিবর্তন হতে থাকে। অসৎ বর্তমান নেই, অসৎ উপস্থিত নেই, অসৎ প্রাপ্ত নয়, অসৎকে পাওয়া যায় না, অসৎ সর্বদা থাকে না, অসতের স্থিতি নেই। যে বস্তু উৎপন্ন হয়, তা অবশ্যই বিনাশপ্রাপ্ত হবে— এটিই হল নিয়ম। উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার বিনাশ শুরু হয়ে যায়। এত দ্রুত তা বিনাশের দিকে এগিয়ে যায় যে, একে দ্বিতীয়বার কেউ একই রূপে দেখতে পায় না অর্থাৎ প্রথমবার তা যেমন ভাবে দেখা যায়, দ্বিতীয়বার আর ঠিক তেমনটি দেখা যায় না। সিদ্ধান্ত হল এই যে, যে বস্তুর কোনো সময় বিনাশ হয়, তা সর্বদা বিনাশ হয়েই থাকে। সুতরাং জগৎ সর্বদাই বিনাশশীল। একে যতই অস্তিত্ব ও গুরুত্ব প্রদান করা হোক, প্রকৃতপক্ষে জগৎ বিদ্যমান নয়। অসৎকে প্রাপ্ত করা যায় না, কখনো প্রাপ্ত করা যায়নি এবং যাবে না। কারণ অসৎকে প্রাপ্ত করা সম্ভব নয়।

'নাভাবো বিদ্যতে সতঃ' পদটির অর্থ হল— **'সতঃ অভাবঃ ন বিদ্যতে'** অর্থাৎ সতের অভাব বিদ্যমান নয়, সৎ-এর ভাব চিরবিদ্যমান, কারণ এর কখনো অ-ভাব বা পরিবর্তন হয় না। কারণ যার অভাব বা পরিবর্তন হয়, তাকে সৎ বলা যায় না। সৎ-এর অস্তিত্ব নিত্যই বিদ্যমান। সৎ নিত্য বিদ্যমান, অব্যয়, নিত্যপ্রাপ্ত, একে নিত্যই পাওয়া যায়, নিত্য উপস্থিত থাকে। কোনো দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, ক্রিয়া, ঘটনা, পরিস্থিতি, অবস্থা ইত্যাদিতে সৎ-এর অভাব (নাস্তি) হয় না। কেননা দেশ, কাল, বস্তু ইত্যাদি অসৎ (অর্থাৎ নিত্য পরিবর্তনশীল), কিন্তু সৎ সর্বদা একইভাবে বিরাজ করে। এতে কখনো বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয় না এবং কোনো ঘাটতি আসে না। সুতরাং সৎ সর্বদাই অপরিবর্তনীয়। পরমাত্মতত্ত্বকে যতই অস্বীকার করা হোক, যতই উপেক্ষা করা হোক, তার প্রতি যতই বিমুখতা আসুক, যতই অবজ্ঞা করা হোক, যতই যুক্তিতর্কের সাহায্যে খণ্ডন করা হোক, প্রকৃতপক্ষে তার অভাব বা পরিবর্তন হয় না, হওয়া সম্ভবই নয়। সৎ-এর পরিবর্তন কেউ কখনো করতে পারে না (গীতা ২।১৭)।

'উভয়োরপি দৃষ্টঃ'— তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষগণ এই সৎ-তত্ত্ব উৎপন্ন করেননি, তাঁরা এটি অনুভব করেছেন। অর্থাৎ অসতের অভাব এবং সৎ-এর ভাব — উভয় তত্ত্বই (নিষ্কর্ষ) যাঁরা জানেন, সেই জীবন্মুক্ত তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষগণ একমাত্র সৎ-তত্ত্বই দেখে থাকেন অর্থাৎ স্বতঃ-স্বাভাবিক যে 'একই বিরাজমান' তাই অনুভব করেন। অসৎ-এর তত্ত্বও সৎ আর সৎ-এর তত্ত্বও সৎ। এটি জানার পর ওইসব মহাপুরুষদের দৃষ্টিতে এক সৎ-তত্ত্ব 'বিরাজ' করা ব্যতীত আর কোনো কিছুর পৃথক সত্তা বা অস্তিত্ব থাকে না।

অসৎ-এর অস্তিত্ব বিদ্যমান না হওয়ায় তার অভাব এবং সৎ-এর অভাব বিদ্যমান না হওয়ায় তার ভাবসিদ্ধ হয়। এর তাৎপর্য হল যে, অসৎ বলে কিছুই নেই শুধুমাত্র সৎই বিদ্যমান। এই সৎ-তত্ত্বে দেহ বা দেহীর কোনো প্রভেদ নেই।

যতক্ষণ অসতের সত্তা (অস্তিত্ব) থাকে ততক্ষণ বিবেক থাকে। অসৎ-এর অস্তিত্ব দূর হলে বিবেকই তত্ত্বজ্ঞানে পরিণত হয়। **'উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ'**-এর মধ্যে **'উভয়োরপি'**-তে বিবেক, **'অন্তঃ'**-তে তত্ত্বজ্ঞান এবং **'দৃষ্টঃ'**-তে অনুভব থাকে অর্থাৎ বিবেক তত্ত্বজ্ঞানে পরিণত হয়ে গেলে শেষ পর্যন্ত শুধুমাত্র সত্তাই থাকে। শুধু অস্তিত্ব বা সত্তা ব্যতীত আর কিছুই নেই—জ্ঞানমার্গের এটিই সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত।

অসতের অস্তিত্ব নেই—একথা যেমন সত্য, সৎ-এর অভাব নেই একথাও তেমনই সত্য। সৎকে স্বীকার করাই হল সাধকের কাজ। সাধকের অনুভূতি হোক বা না-হোক, সৎকে তাঁকে স্বীকার করতেই হবে। 'আছে'-কে স্বীকার করা এবং 'নেই'-কে অস্বীকার করা— একেই বলা হয় বেদান্ত, বেদগুলির প্রকৃত নির্যাস।

জগতে ভাব এবং অভাব — দুটি দেখা গেলেও 'অভাব'ই প্রাধান্য পায়। পরমাত্মাতে ভাব এবং অভাব— দুই-ই

প্রতিভাত হলেও 'ভাব'ই মুখ্য। জগতে 'অভাবের' মধ্যে ভাব-অভাব এবং পরমাত্মাতে 'ভাব'-এর মধ্যে ভাব-অভাব বিরাজ করে। অন্যভাবে বলতে গেলে, জগতে 'নিত্যবিয়োগের' মধ্যে সংযুক্তি-বিযুক্তি থাকে আর পরমাত্মার 'নিত্যযোগে'র মধ্যে যোগ-বিয়োগ (মিলন-বিরহ) থাকে। সুতরাং জগতে অভাবই থাকে আর পরমাত্মাতে থাকে ভাব।

***

সম্বন্ধ—সৎ এবং অসৎ কী—পরবর্তী দুটি শ্লোকে তা বলা হয়েছে।

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি॥ ১৭॥

[অবিনাশি (অবিনাশী) ; তু, তৎ, বিদ্ধি (বলে তাঁকেই জানবে) ; যেন (যিনি) ; ইদম্ সর্বম্ (এই সমস্ত জগতকে) ; ততম্ (পরিব্যাপ্ত করে আছেন) ; অস্য (এই) ; অব্যয়স্য (অবিনাশীর) ; বিনাশম্ (বিনাশ) ; কশ্চিৎ (কেউই) ; কর্তুম্ (করতে) ; ন, অর্হতি (পারে না।)]

অবিনাশী তাঁকেই জানবে, যিনি এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত করে আছেন। এই অবিনাশীর বিনাশ কেউই করতে পারে না ॥ ১৭ ॥

ব্যাখ্যা—**'অবিনাশী তু তদ্বিদ্ধি'**—আগের শ্লোকে যে সৎ-অসৎ-এর কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে প্রথমে 'সৎ'-এর ব্যাখ্যা করার জন্য এখানে 'তু' পদটি এসেছে।

'সেই অবিনাশী তত্ত্বকে তুমি জানো'—এই কথা বলে ভগবান ওই তত্ত্বটিকে পরোক্ষ বলে জানিয়েছেন। পরোক্ষ বলার অর্থ এই যে, এখানে পরিলক্ষিত এই সমগ্র জগৎ-সংসারেই সেই পরোক্ষ তত্ত্ব পরিব্যাপ্ত, পরিপূর্ণ হয়ে আছে। প্রকৃতপক্ষে যা পরিপূর্ণ, তাই 'আছে' এবং সম্মুখে যে জগৎ দেখা যাচ্ছে, সেটি 'নেই'।

এখানে 'তৎ' পদটির দ্বারা সৎ-তত্ত্বকে পরোক্ষ-রীতিতে বলার অর্থ এই নয় যে, ওই তত্ত্ব অনেক দূরের। এটি ইন্দ্রিয় বা অন্তঃকরণের বিষয় নয় বলেই এটিকে পরোক্ষ-রীতির দ্বারা বিবৃত করা হয়েছে।

'যেন সর্বমিদং ততম্'[১]—যাঁকে পরোক্ষে বলেছেন, তাঁরই বর্ণনা করছেন যে, সমস্ত জগৎই ওই নিত্যতত্ত্ব দ্বারা পরিব্যাপ্ত। যেমন স্বর্ণনির্মিত গহনাতে সোনা, লৌহ-নির্মিত অস্ত্রশস্ত্রে লোহা, মৃত্তিকানির্মিত বাসনে মাটি এবং জল থেকে তৈরি বরফে জলই পরিপূর্ণ থাকে, তেমনি জগতে এই সৎ-তত্ত্বই ব্যাপ্ত হয়ে আছে। সুতরাং বাস্তবে এই জগতে সেই সৎ-তত্ত্বই জানার উপযুক্ত।

'বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি'—শরীরী অব্যয়[২] অর্থাৎ অবিনাশী। এই অবিনাশীর বিনাশ কেউ

---

[১] 'যেন সর্বমিদং ততম্'—এই পদটি গীতায় তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে। তার মধ্যে এখানে এটি শরীরীর জন্য এসেছে যে, এই শরীরীর দ্বারা এই সম্পূর্ণ জগৎ পরিব্যাপ্ত। এটি সাংখ্যযোগের দৃষ্টিতে বলা হয়েছে। দ্বিতীয়বার, অষ্টম অধ্যায়ের বাইশতম শ্লোকে ব্যবহৃত, সেখানে বলা হয়েছে যে, যে ঈশ্বর এই সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত তাঁকে অনন্য ভক্তি দ্বারা লাভ করা যায়। অতএব ভক্তির বর্ণনা থাকায় ওই পদটি ঈশ্বরের বিষয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। তৃতীয়বার, অষ্টাদশ অধ্যায়ের ছেচল্লিশতম শ্লোকে ব্যবহৃত। সেখানে বলা হয়েছে যে যাঁর দ্বারা সমস্ত জগৎ পরিপূর্ণ, চার বর্ণের লোকেদের নিজ নিজ কর্ম দ্বারা তাঁর উপাসনা করা উচিত। এই বর্ণনাও ভক্তির দৃষ্টিতে করা হয়েছে।

নবম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে রাজবিদ্যার বর্ণনায় 'ময়া ততমিদং সর্বম্' পদ দ্বারা বলেছেন যে, 'সমস্ত জগৎ আমাদ্বারা পরিব্যাপ্ত'। এইপ্রকার তিন স্থানে 'যেন' পদ দ্বারা ওই তত্ত্বটি পরোক্ষরূপে বলা হয়েছে। অপর একস্থানে 'অস্মৎ' শব্দ—'ময়া' দিয়ে স্বয়ং ভগবান অপরোক্ষভাবে নিজের কথা বলেছেন।

[২] ভগবান গীতায় নানাস্থানে শরীরীকেও অব্যয় বলেছেন এবং নিজেকেও অব্যয় বলেছেন। স্বরূপতঃ দুটিই অব্যয় হলেও ভগবান প্রকৃতিকে নিজ বশে রেখেই (স্বাধীনভাবে) প্রকট এবং অন্তর্ধান হন এবং শরীরী প্রকৃতির বশ হয়ে জন্ম এবং মৃত্যুবরণ করে থাকে, কারণ সে শরীরকে নিজের বলে মেনে রেখেছে।

করতে পারে না। কিন্তু শরীর বিনাশশীল ; কারণ এটি প্রতিক্ষণে ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে। সুতরাং এই বিনাশশীলের বিনাশ বা ধ্বংস কেউ রোধ করতে পারে না। 'তুমি মনে করছ যে তুমি যুদ্ধ না করলে এরা মারা যাবে না', কিন্তু বাস্তবে তোমার যুদ্ধ করা না করায় এই অবিনাশী এবং বিনাশী তত্ত্বে কোনো পার্থক্য হয় না, অর্থাৎ অবিনাশী চিরস্থায়ী থাকে এবং বিনাশশীলের বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

এখানে 'অস্য' পদ দ্বারা সৎ-তত্ত্বকে বিশেষভাবে (অঙ্গুলি নির্দিষ্টরূপে আলাদা করে) বলার অর্থ হল অনুক্ষণ পরিবর্তিত শরীরে যে সত্তা পরিলক্ষিত হয়, তা এই সৎ-তত্ত্বেরই প্রকাশ। 'আমার শরীর এবং আমিই শরীরধারণকারী'—নিজসত্তার এরূপ যে জ্ঞান, তাকেই লক্ষ্য করে ভগবান এখানে 'অস্য' পদটি ব্যবহার করেছেন।

পরিশিষ্ট-ভাব—ব্যবহার কালে আমরা বলে থাকি 'এ মানুষ', 'এ পশু', 'এটি গাছ', 'এটা বাড়ি' ইত্যাদি, কিন্তু কোনো মানুষ, পশু, গাছ, বাড়ি আগে ছিল না, পরেও থাকবে না এবং বর্তমানে এগুলি প্রতি মুহূর্তে বিনাশের পথে যাচ্ছে। অথচ এর মধ্যে 'আছি' বলে যে অস্তিত্ব (সত্তা) থাকে তা সর্বদা একইভাবে বিরাজমান। তাৎপর্য হল যে — 'মানুষ-পশু-গাছ-বাড়ি' এগুলি সব জগৎসংসার (অসৎ) আর 'আছি' হল অবিনাশী আত্মতত্ত্ব (সৎ)। তাই মানুষ-পশু-গাছ-বাড়ি এগুলি পৃথক পৃথক হয়েও এর মধ্যে 'আছি' একই অস্তিত্ব। এইরূপই 'আমি মানুষ', 'আমি পশু', 'আমি দেবতা' ইত্যাদি শরীর পৃথক পৃথক হলেও, 'আছি' বা 'আছে' সব একই থাকে।

'যেন সর্বমিদং ততম্'— এই পদটি জীবাত্মার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ের বাইশতম শ্লোকে এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের ছেচল্লিশতম শ্লোকে এই পদটি পরমাত্মার উদ্দেশ্যে উদ্ধৃত হয়েছে। এর অর্থ হল জীবাত্মার সর্বব্যাপী পরমাত্মার সঙ্গে সাধর্ম্য আছে। অতএব পরমাত্মা যেমন জগৎ-সংসারের প্রতি আসক্তিবিহীন, তেমনই জীবাত্মাও শরীর ও জগতের প্রতি স্বতঃ-স্বাভাবিকভাবে আসক্তিবিহীন—**'অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ'** (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৪।৩।১৫), **'দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ'** (গীতা ১৩।২২)। জীবাত্মার স্থিতি কোনো একটিমাত্র শরীরে নয়। তা কোনো একটিমাত্র শরীরে লিপ্ত হয়ে থাকে না। কিন্তু এই আসক্তি-বর্জিত অবস্থা অনুভূত না হওয়ার ফলে জন্ম-মরণ চক্রে আবর্তিত হতে হয়।

※ ※ ※

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮ ॥

[অনাশিনঃ (অবিনাশী) ; অপ্রমেয়স্য (অপ্রমেয়) ; নিত্যস্য (নিত্যস্থিত) ; শরীরিণঃ (শরীরীর) ; ইমে, দেহা (এই দেহকে) ; অন্তবন্তঃ (নশ্বর) ; উক্তাঃ (বলা হয়েছে) ; তস্মাৎ, ভারত (অতএব, হে অর্জুন !) ; যুধ্যস্ব (যুদ্ধ করো।)]

অবিনাশী, অপ্রমেয় এবং নিত্যস্থিত শরীরীর (জীবাত্মার) আশ্রিত এই দেহকে নশ্বর বলা হয়েছে। অতএব হে অর্জুন ! তুমি যুদ্ধ করো (স্বধর্মের পালন করো) ॥ ১৮ ॥

ব্যাখ্যা—'অনাশিনঃ'—কোনো কালে, কোনো কারণবশতঃ কখনো কিছুমাত্র যার পরিবর্তন হয় না, যার কোনো ক্ষয় হয় না বা যার লয় হয় না, তাকে 'অনাশী' অর্থাৎ 'অবিনাশী' বলা হয়।

'অপ্রমেয়স্য'—যা প্রমাণের বিষয় নয় অর্থাৎ যা অন্তঃকরণ এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয় নয়, তাকে বলা হয় 'অপ্রমেয়'।

অন্তঃকরণ এবং ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা যা প্রমাণিত হয় না, শাস্ত্র এবং সন্ত-মহাপুরুষগণের বক্তব্য দ্বারাই তার যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়। যাঁরা শ্রদ্ধাসম্পন্ন তাঁদের কাছে শাস্ত্র এবং সন্ত-মহাপুরুষগণই হলেন প্রমাণ। যাঁর যে শাস্ত্র এবং সাধুতে শ্রদ্ধা থাকে তিনি সেই শাস্ত্র এবং সাধুর বাক্যই মান্য করেন। সেইজন্য এই তত্ত্ব কেবল শ্রদ্ধার বিষয়[১], প্রমাণের বিষয় নয়।

---

[১]সাধনার প্রারম্ভে এই তত্ত্বটি শ্রদ্ধার বিষয় কিন্তু পরে যখন এটি প্রত্যক্ষ অনুভূত হয় তখন এটি শুধু আর শ্রদ্ধার বিষয় হয়ে থাকে না।

শাস্ত্র বা সাধু মহাত্মাগণ কাউকে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে বাধ্য করেন না। শ্রদ্ধা করায় বা না করায় মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন। যদি কেউ শাস্ত্র এবং সাধুর কথায় শ্রদ্ধাবান হয়, তখন সেই তত্ত্বটি তার শ্রদ্ধার বিষয় হয়। কিন্তু যদি সে ওইগুলিতে শ্রদ্ধা না করে, তবে এই তত্ত্বও তার শ্রদ্ধার বিষয় হয়ে ওঠে না।

'নিত্যস্য'—এটি নিত্য-নিরন্তর স্থায়ী। এটি যে কোনো কালে ছিল না এমন নয় অর্থাৎ এটি সর্বকালেই সর্বদা বর্তমান।

'অন্তবন্ত ইমে দেহা উক্তাঃ শরীরিণঃ'—এই অন্তবিশিষ্ট, অবিনাশী, অপ্রমেয় এবং নিত্য শরীরীর (জীবাত্মার) সমগ্র জগতে যত শরীর আছে, সেই সবগুলিকে অন্তবিশিষ্ট বলা হয়েছে। অন্ত আছে বলার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে এগুলি নিরন্তর শেষ হবার দিকে চলেছে। এদের অবসান ছাড়া আর কিছুই পরিণতি নেই ; কেবল অবসানই আছে।

উপরিউক্ত পদে শরীরীর উল্লেখে একবচন ব্যবহৃত হয়েছে এবং শরীরগুলির জন্য বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে। এর একটি কারণ হল, প্রত্যেক প্রাণীর স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ—এই তিন শরীর থাকে। অপর কারণ হল এই যে, জগতের সমস্ত শরীরগুলিতেই সেই এক শরীরী পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। পরবর্তী চব্বিশতম শ্লোকেও একে **'সর্বগতঃ'** পদ দ্বারা সবকিছুতে ব্যাপক বলে জানানো হয়েছে। শরীরী (জীবাত্মা) অবিনাশী এবং এর প্রকাশক্ষেত্ররূপ সমস্ত শরীর বিনাশশীল। অবিনাশীকে যেমন কেউ বিনাশ করতে পারে না তেমনি বিনাশশীলকেও কেউ অবিনাশী করতে পারে না। যা বিনাশশীল তার বিনাশী ভাব নিত্য বিরাজিত থাকে অর্থাৎ তার নাশ হয়ই।

বিশেষ কথা

এখানে **'অন্তবন্ত ইমে দেহাঃ'** বলার তাৎপর্য এই যে, যে দেহ চক্ষুর গোচরে আসে, তা সবই বিনাশশীল। কিন্তু এই দেহগুলি কার ? **'নিত্যস্য'**, **'অনাশিনঃ'**—এই দেহ নিত্যের, অবিনাশীর। তাৎপর্য হল এই যে, নিত্যতত্ত্ব, যার কখনো বিনাশ হয় না, এই দেহাদিতে আপন বলে মেনে রেখেছে। নিজের বলে মেনে নেওয়ার অর্থ এই যে, নিজেকে শরীরে রেখে দিয়েছে এবং শরীরকে নিজের মধ্যে রেখেছে। নিজেকে শরীরে রাখায় 'অহংভাব' অর্থাৎ 'আমিত্ব' এবং শরীরকে নিজের মধ্যে রাখায় 'মমতা' অর্থাৎ 'আমার' ভাব সৃষ্ট হয়েছে।

স্ব-স্বরূপ যে যে বস্তুতে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন, সেই সেই বস্তুতে 'আমিত্ব' ভাব হতে থাকে ; যেমন নিজেকে ধনের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করলে, 'আমি ধনী' ; নিজেকে রাজ্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করলে, 'আমি রাজা' ; নিজেকে বিদ্যার মধ্যে প্রতিষ্ঠা করলে, 'আমি বিদ্বান', বুদ্ধির মধ্যে প্রতিষ্ঠা করলে, 'আমি বুদ্ধিমান', নিজেকে সিদ্ধির মধ্যে প্রতিষ্ঠা করলে 'আমি সিদ্ধ', শরীরের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলে, 'আমি শরীর' ইত্যাদি।

স্ব-স্বরূপ যে যে বস্তুর মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন, সেই সেই বস্তুতেই 'আমার' ভাব এসে যায় ; যেমন—আত্মীয়দের মধ্যে আপনভাব করলে, 'আত্মীয়রা আমার', অর্থ সম্পদের মধ্যে আপনভাব ধরে রাখলে, 'ধন-সম্পত্তি আমার', বুদ্ধিকে নিজের মনে করলে 'আমার বুদ্ধি', শরীরকে নিজের মনে করলে 'আমার শরীর' ইত্যাদি।

জড়ত্বের সঙ্গে 'আমি' এবং 'আমার'—ভাব হলেই সকল বিকার উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ শরীর এবং স্ব-স্বরূপ দুটিই পৃথক এই চিন্তাকে (বিবেকশক্তিকে) গুরুত্ব না দিলেই বিকার উৎপন্ন হয়। কিন্তু যাঁরা এই বিবেককে গুরুত্ব দেন, মহত্ত্ব প্রদান করেন, তাঁরাই হলেন পণ্ডিত ব্যক্তি। এরূপ পণ্ডিত ব্যক্তিগণ কখনো শোক করেন না ; কারণ তাঁরা সম্যক্‌ভাবে অনুভব করেছেন যে, সৎ সৎই এবং অসৎ অসৎই।

'তস্মাদ্[১] যুধ্যস্ব'—ভগবান অর্জুনকে নির্দেশ দিলেন যে, সৎ-অসৎ-কে ঠিকমতো জেনে যেন অর্জুন যুদ্ধ

[১] এখানে 'তস্মাদ্' পদটি যুক্তি বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ 'যুক্তি বুঝে গেলে এবার যুদ্ধ করো'। এইভাবে গীতায় 'তস্মাদ্' পদের ব্যবহার প্রায়শঃ প্রকরণের সমাপ্তিতে বা যুক্তির সমাপ্তিতে করা হয়েছে ; যেমন—দ্বিতীয় অধ্যায়ের ত্রিশতম, তৃতীয় অধ্যায়ের উনিশতম, অষ্টম অধ্যায়ের সপ্তম এবং সাতাশতম ইত্যাদি শ্লোকগুলিতে 'তস্মাদ্' পদ প্রকরণের সমাপ্তিতে এসেছে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঁচিশতম, সাতাশতম, সাঁইত্রিশতম, আটষট্টিতম এবং একাদশ অধ্যায়ের তেত্রিশতম ইত্যাদি শ্লোকগুলিতে 'তস্মাদ্' পদটি যুক্তির সমাপ্তির জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

করেন অর্থাৎ প্রাপ্ত কর্তব্য পালন করেন। অর্থাৎ শরীর বিনাশশীল এবং শরীরী অবিনাশী—উভয় দৃষ্টিতে শোক হতেই পারে না। 'সুতরাং শোক ত্যাগ করে যুদ্ধ করো'।

বিশেষ কথা

এখানে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ—এই দুই শ্লোকে সৎ-তত্ত্বের আলোচনা বিশেষভাবে করা হয়েছে। কারণ এই সম্পূর্ণ প্রকরণটিতে ভগবানের লক্ষ্য ছিল সৎ-এর উপলব্ধি করানো। সৎ-এর বোধ হলে অসৎ ভাব স্বতঃই নিবৃত্ত হয়ে যায়। তখন আর কোনপ্রকার সন্দেহের অবকাশ থাকে না। এইভাবে সৎকে অনুভব করে নিঃসন্দেহ হয়ে কর্তব্য পালন করা উচিত। এই বিচার দ্বারা এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগ কোনো বিশেষ বর্ণ বা আশ্রমের ওপর নির্ভরশীল নয়। নিজ কল্যাণের জন্য সাংখ্যযোগের অনুষ্ঠানই করা হোক বা কর্মযোগের অনুষ্ঠান করা হোক, তাতে মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে বর্ণ এবং আশ্রম অনুযায়ী শাস্ত্রীয় বিধানের মান্যতার খুবই প্রয়োজনীয়তা আছে, সেইজন্য এখানে ভগবান সাংখ্যযোগ অনুযায়ী সৎ-অসতের বিচার করে অর্জুনকে যুদ্ধ করার অর্থাৎ কর্তব্যকর্ম করার নির্দেশ দিয়েছেন।

পরে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যেখানে জ্ঞানের সাধনগুলির বর্ণনা করা হয়েছে সেখানেও **'অসক্তিরণভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু'** (১৩।৯) বলে পুত্র, স্ত্রী, গৃহ ইত্যাদিতে আসক্তিরহিত হতে বলেছেন। যদি কেবলমাত্র সন্ন্যাসিগণই সাংখ্যযোগের অধিকারী হতেন তবে তাঁদের ক্ষেত্রে পুত্র ইত্যাদিতে আসক্তিবর্জিত হতে বলার কোনো প্রয়োজনীয়তাই ছিল না ; কারণ সন্ন্যাসিগণের স্ত্রী-পুত্রাদি থাকে না।

এইরূপে, গীতার ওপর আলোচনা করলে সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগ—দুটিই পরমাত্মপ্রাপ্তির স্বতন্ত্র সাধন বলে প্রমাণিত হয়। এটি কোনো বর্ণ বা আশ্রমের ওপর বিন্দুমাত্র নির্ভরশীল নয়।

পরিশিষ্ট-ভাব— ভগবান তাঁর উপদেশের প্রথমেই **'গতাসূন্'** (মৃত) এবং **'অগতাসূন'** (জীবিত)— উভয়প্রকার প্রাণী সম্পর্কেই **অশোচ্য** (শোক করা উচিত নয়) বলেছেন। আবার দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শ্লোকে **'গতাসূন'**কে অশোচ্য বোঝাবার জন্য **'সৎ'** (নিত্য) সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন এবং চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শ্লোকে **'অগতাসূন'**কে অশোচ্য বোঝাবার জন্য **'অসৎ'** (অনিত্য)-এর বর্ণনা করেছেন। পরে সৎ ও অসৎ উভয়েরই বর্ণনা করেছেন ষোড়শ শ্লোকে। তারপর সৎ-এর ভাব ও অসতের অভাব-এর আলোচনা প্রধানতঃ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শ্লোকে করে এই প্রকরণ সম্পূর্ণ করেছেন।

যদিও ভাব (হওয়া) আত্মারই হয়ে থাকে, শরীরের নয়, তবুও মানুষ ভ্রমবশতঃ প্রথমে শরীরকে দেখে এবং পরে শরীরে অবস্থিত আত্মাকে অনুভব করে। প্রথমে আকৃতি দেখে পরে ভাবকে অনুভব করে। ওপর হতে চাপানো রং কতক্ষণ টিকবে ? সাধকের বিচার করা উচিত যে আগে আত্মা, না আগে শরীর ? বিচার করলে প্রমাণিত হয় যে আত্মা প্রথমে এবং শরীর পরে ; ভাব প্রথমে, আকৃতি পরে। তাই সাধকের প্রথমে ভাবরূপ আত্মাকে জানা প্রয়োজন, শরীরকে নয়।

❁ ❁ ❁

সম্বন্ধ—আগের শ্লোক পর্যন্ত শরীরীকে অবিনাশী বলে জানিয়েছেন। অন্বয় এবং ব্যতিরেক রীতিতে এখন সেই কথাই দৃঢ় করার জন্য, যে শরীরীকে অবিনাশী বলে জানে না, তার সম্বন্ধে পরবর্তী শ্লোকে জানাচ্ছেন।

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥ ১৯ ॥

[**যঃ** (যে ব্যক্তি) ; **এনম্** (একে) ; **হন্তারম্, বেত্তি** (হত্যাকারী বলে মনে করেন) ; **চ, যঃ** (এবং, যে ব্যক্তি) ; **এনম্** (একে) ; **হতম্, মন্যতে** (নিহত বলে জানেন) ; **তৌ, উভৌ** (তাঁরা উভয়েই) ; **ন বিজানীতঃ** (জানেন না) ; **অয়ম্** (ইনি) ; **ন, হন্তি** (হত্যা করেন না) ; **ন, হন্যতে** (হত হন না।)]

যে ব্যক্তি এই অবিনাশী শরীরীকে হত্যাকারী বলে মনে করে এবং যে ব্যক্তি একে নিহত বলে জানে, তারা উভয়েই একে জানে না কারণ ইনি হত্যা করেন না বা হত হন না॥ ১৯ ॥

ব্যাখ্যা—**'য এনং[1] বেত্তি হন্তারম্'**—যে এই শরীরীকে (জীবাত্মা) হত্যাকারী বলে মনে করে, সে সঠিক জানে না। কারণ জীবাত্মায় কর্তৃত্বভাব নেই। যেমন, কোনো কারিগর যতোই সুদক্ষ হোক, যন্ত্র ছাড়া সে কোনো কাজ করতে পারে না, তেমনি জীবাত্মাও শরীর ব্যতিরেকে কোনো কার্য সম্পন্ন করতে সক্ষম হয় না। তাই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন যে, সকল ক্রিয়া প্রকৃতির দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়—যিনি এইরূপ অনুভব করেন তিনিই জীবাত্মার অকর্তৃত্বের ভাব বুঝতে সক্ষম হন (১৩।২৯)। অর্থাৎ জীবাত্মায় কর্তাভাব নেই, কিন্তু শরীরের সঙ্গে তাদাত্ম্য করে, সম্পর্কযুক্ত হয়ে নিজেকে শরীরের দ্বারা কৃতকর্মগুলির কর্তা হিসাবে মেনে নেয়। শরীরের সঙ্গে যদি তিনি সম্পর্কযুক্ত না হন, তাহলে তিনি কোনো ক্রিয়ারই কর্তা হন না।

'যশ্চৈনং মন্যতে হতম্'— যে একে হত বলে মনে করে, সেও সঠিক জানে না। জীবাত্মা যেমন বধ করে না, তেমনি এর মৃত্যুও নেই ; কারণ এর কখনো কোনো বিকৃতি ঘটে না। যার বিকৃতি হয়, পরিবর্তন হয় এবং উৎপত্তি ও বিনাশ হয়, তারই কেবল মৃত্যু ঘটে।

'উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে'— এরা দুজনেই জানে না অর্থাৎ যে এই জীবাত্মাকে ঘাতক বলে জানে, সেও সঠিক জানে না এবং যে একে মরণশীল বলে জানে, সেও ঠিকমতো জানে না।

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে, যে এই জীবাত্মাকে হত্যাকারী এবং মরণশীল উভয়ই মনে করে সে কি ঠিক জানে ? তার উত্তর হল যে, সেও ঠিক জানে না। কারণ বাস্তবে জীবাত্মা এরূপ নয়। এটি বিনাশকারীও নয়, বিনাশশীলও নয়। এটি নির্বিকাররূপে নিত্য-নিরন্তর একইভাবে থাকে। সুতরাং এই শরীরীর (জীবাত্মা) জন্য শোক করা উচিত নয়।

অর্জুনের নিকট যুদ্ধের প্রসঙ্গ আসাতেই এখানে জীবাত্মাকে হত্যা করা বা হত হওয়ার ক্রিয়া রহিত বলে জানানো হয়েছে। বাস্তবে জীবাত্মা সম্পূর্ণ ক্রিয়া থেকে রহিত।

পরিশিষ্ট-ভাব— এই শরীরী কাউকে মারেন না এবং কারো দ্বারা হত হন না অর্থাৎ এই শরীরী কোনো ক্রিয়ার কর্তা নন এবং কর্মও নন আর এর মধ্যে কোনোপ্রকার বিকারও আসে না। যে ব্যক্তি শরীরের মতো শরীরীকেও বিনাশকারী বা বিনাশশীল বলে মনে করে, সে প্রকৃতপক্ষে শরীর এবং শরীরীর পার্থক্যের গুরুত্ব বোঝে না, এতে স্থিত হয় না, অপরদিকে অবিবেককেই গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—এই শরীরী মৃত্যুধর্মী নয় কেন ? তার উত্তরে ভগবান জানাচ্ছেন—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্ নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ ২০ ॥

[**অয়ম্** (এই শরীরী) ; **কদাচিন্** (কখনো) ; **জায়তে ন বা** (জাত হন না বা) ; **ন, ম্রিয়তে** (মৃত হন না) ; **বা** (এবং) ; **ভূত্বা** (জন্ম নিয়ে) ; **ভূয়ঃ, ভবিতা, ন** (অস্তিত্ব লাভ করেন না) ; **অয়ম্** (ইনি) ; **অজঃ** (জন্মরহিত) ; **নিত্যঃ** (নিত্য) ; **শাশ্বতঃ** (শাশ্বত) ; **পুরাণঃ** (অনাদি) ; **শরীরে** (শরীর) ; **হন্যমানে** (বিনাশপ্রাপ্ত হলেও) ; **ন, হন্যতে** (হত হন না।)]

---

[1] এখানে 'এনম্' পদটি অন্বাদেশে এসেছে। যার বর্ণনা আগে করা হয়েছে, সেটিই দ্বিতীয়বার বলাকে 'অন্বাদেশ' বলা হয়। প্রথমে সপ্তদশ শ্লোকে একটি বিষয় নিয়ে যাকে 'অস্য' পদে বর্ণনা করা হয়েছে, এখন এই স্থলে অপর বিষয় নিয়ে সেই তত্ত্বটি দ্বিতীয়বার বলা হচ্ছে। সেইজন্য এখানে 'এনম্' পদটি প্রয়োগ করা হয়েছে।

এই জীবাত্মা কখনো জাত বা মৃত হন না। ইনি জন্ম নিয়ে অস্তিত্ব লাভ করেন না (অর্থাৎ ইনি নিত্য বিদ্যমান)। ইনি জন্মরহিত, নিত্য, শাশ্বত এবং প্রাচীন (অনাদি)। শরীর বিনাশপ্রাপ্ত হলেও ইনি হত হন না ॥ ২০ ॥

ব্যাখ্যা—[শরীরে ছয়প্রকার বিকার হয়—উৎপন্ন হওয়া, সত্তাবান দৃষ্ট হওয়া, পরিবর্তন, বৃদ্ধি, ক্ষয় হওয়া এবং বিনাশ প্রাপ্ত হওয়া[1]। জীবাত্মা এই ছয়প্রকার বিকার রহিত—এই কথাই ভগবান এই শ্লোকটিতে বলেছেন।[2]]

'ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্'—শরীর যেমন জন্ম নেয়, এই জীবাত্মা সেইরূপ কখনো, কোনও সময়ে জন্ম নেন না। ইনি তো নিত্য বিরাজিত। জীবাত্মাকে ভগবান নিজের অংশ জানিয়ে একে 'সনাতন' বলে উল্লেখ করেছেন—**'মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ'** (১৫।৭)।

এই শরীরী কখনো মরেন না। সেই মরে, যার জন্ম হয় এবং **'ম্রিয়তে'** প্রয়োগও সেখানে হয় যেখানে প্রাণপিণ্ডের বিয়োগ হয়। প্রাণ-পিণ্ডের বিয়োগ শরীরেরই হয়। কিন্তু জীবাত্মায় সংযোগ বা বিয়োগ হয় না। এটি একই রকম থাকে। এর মৃত্যু হয় না।

সকল বিকারের মধ্যে দুটি প্রধান বিকার হল জন্ম এবং মৃত্যু। তাই ভগবান এদের অস্তিত্বকে বোঝাতে দু'বার নিষেধ করেছেন। প্রথমে বলেছেন **'ন জায়তে'**, সেটিকেই দ্বিতীয়বার **'অজঃ'** বলেছেন এবং যাকে প্রথমবার **'ন ম্রিয়তে'** বলেছেন সেটিকেই দ্বিতীয়বারে **'ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে'** বলে জানিয়েছেন।

'অয়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ'—এই অবিনাশী নিত্যতত্ত্ব জন্ম নিয়ে অস্তিত্বপ্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ এটি **'স্বতঃসিদ্ধ'** নির্বিকার। যেমন শিশু জন্মগ্রহণ করলে তবে অস্তিত্ব লাভ করে। যতক্ষণ সে গর্ভে না আসে, ততক্ষণ পর্যন্ত 'শিশু আছে' তার সত্তার এরূপ অস্তিত্বের কথা কেউ বলে না। অর্থাৎ শিশুর সত্তা উৎপন্ন হলে তবে প্রতিষ্ঠিত হয় ; কারণ বিকারশীল সত্তার আদি ও অন্ত থাকে। কিন্তু এই নিত্যতত্ত্বের সত্তা স্বতঃসিদ্ধ এবং নির্বিকার ; কারণ এই অবিকারী সত্তার আদি বা অন্ত হয় না।

'অজঃ'—জীবাত্মার কখনো জন্ম হয় না। তাই একে **'অজঃ'** বা জন্মরহিত বলা হয়েছে।

'নিত্যঃ'—জীবাত্মা নিত্য ও চিরস্থায়ী (শাশ্বত)। সুতরাং এর কোনো ভাবেই ক্ষয় হয় না। ক্ষয় অনিত্য বস্তুর হয়ে থাকে, যা শাশ্বত বা চিরস্থায়ী নয়। যেমন, জীবনের অর্ধেক আয়ু ফুরিয়ে গেলে শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে, শক্তি ক্ষীণ হতে থাকে, ইন্দ্রিয়গুলির শক্তি হ্রাস পেতে থাকে। এইরূপ শরীর, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ ইত্যাদির ক্ষয় হতে থাকে, কিন্তু জীবাত্মার ক্ষয় নেই। এই নিত্যতত্ত্বে কখনো কিছুমাত্র হ্রাস হয় না।

'শাশ্বতঃ'—এই নিত্যতত্ত্ব সর্বদা একরূপ, একরস থাকে। এর অবস্থার কখনো পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ এটি কখনো বদলায় না। এতে পরিবর্তন হওয়া সম্ভবও নয়।

'পুরাণঃ'—এই অবিনাশী তত্ত্ব পুরোনো (পুরাতন) অর্থাৎ অনাদি। এটি এত পুরাতন যে এ কখনো উৎপন্নই হয়নি। উৎপন্নশীল বস্তু লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, সেগুলি পুরাতন হলে আর বৃদ্ধি পায় না, বরং নষ্ট হয়ে যায় ; কিন্তু এটি অনুৎপন্ন তত্ত্ব, এতে বৃদ্ধিরূপ বিকার কী করে সম্ভব ? অর্থাৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্তিরূপ যে বিকার তা উৎপন্ন হওয়া বস্তুগুলিতে হয়, এই নিত্যতত্ত্বে নয়।

'ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে'—শরীর বিনাশপ্রাপ্ত হলেও এই অবিনাশী জীবাত্মার নাশ হয় না। এখানে **'শরীরে'** পদটি ব্যবহারের তাৎপর্য এই যে, এই শরীর বিনাশশীল। এই বিনাশশীল শরীরেই ছয়প্রকার বিকার হয়, শরীরীর নয়।

এই পদটিতে ভগবান শরীর এবং শরীরীর যেরূপ স্পষ্ট বর্ণনা করেছেন, এমন স্পষ্ট বর্ণনা গীতায় আর

[1] জায়তেঽস্তি বিপরিণমতে বর্ধতেঽপক্ষীয়তে বিনশ্যতি। (নিরুক্ত ১।১।২)

[2] জীবাত্মা জন্ম নেন না—'ন জায়তে', 'অজঃ' ; জন্মগ্রহণ করে বিকারশীল সত্তাসম্পন্ন হন না—'অয়ং ভূত্বাভবিতা বা ন ভূয়ঃ' ; এটি পরিবর্তনশীল নয়—'শাশ্বতঃ', এটি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না ; 'পুরাণঃ', ক্ষীণ হয় না—'নিত্যঃ', এবং মৃত্যু হয় না, 'ন ম্রিয়তে', 'ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে'।

দ্বিতীয় কোনো স্থানে নেই।

অর্জুন যুদ্ধে আত্মীয়গণের মৃত্যুর আশঙ্কায় বিশেষভাবে শোকবিহ্বল হয়েছিলেন। সেই শোক দূর করার উদ্দেশ্যে ভগবান বলেছেন যে শরীর মৃত্যুপ্রাপ্ত হলেও শরীরীর মৃত্যু নেই অর্থাৎ এটি বিলীন হয় না। সেইজন্য শোক করা উচিত নয়।

পরিশিষ্ট-ভাব— 'আমাদের' (স্ব-স্বরূপের) এবং শরীরের স্বভাব একেবারে পৃথক। আমরা শরীরে আবদ্ধ নেই, মিশে নেই। শরীরও 'আমাদের' সঙ্গে আবদ্ধ নয় অর্থাৎ মিশে নেই। তাই শরীর না থাকলে 'আমাদের' (আত্মস্বরূপের) কিছুই আসে-যায় না। এখন পর্যন্ত 'আমি' অসংখ্য শরীর ধারণ করেছি, কিন্তু তার ফলে 'আমার' অস্তিত্বে কি পার্থক্য এসেছে ? 'আমার' কি ক্ষতি হয়েছে ? 'আমি' তো একই রকম আছি— **'ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে'** (গীতা ৮।১৯)। তেমনই এই শরীর ত্যাগ হয়ে গেলেও 'আমি' স্বয়ং একইভাবে থাকব।

যেমন হাত-পা-নাক ইত্যাদি শরীরের অঙ্গ, তেমন শরীর শরীরীর (জীবাত্মার) অঙ্গ নয়। যা বহমান ও বিকারশীল, তা 'অঙ্গ' নয়,[1] যেমন— কফ, মূত্র ইত্যাদি বহমান পদার্থ এবং ফোঁড়া ইত্যাদি বিকারশীল হওয়ায় শরীরের অঙ্গ নয়, তেমনই শরীর বহমান (পরিবর্তনশীল) ও বিকারশীল হওয়ায় এটিও শরীরীর অঙ্গ নয়।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—ঊনবিংশতিতম শ্লোকে ভগবান জানিয়েছেন যে জীবাত্মা হত্যাও করে না বা হতও হয় না। এটির মৃত্যু না হওয়ার কথা বিংশতিতম শ্লোকে জানিয়েছেন, এবার পরবর্তী শ্লোকে এটি দ্বারা মৃত্যু না ঘটানোর কথা জানাচ্ছেন।

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্॥ ২১ ॥

[**পার্থ** (হে পৃথানন্দন !) ; **যঃ, পুরুষঃ** (যে ব্যক্তি) ; **এনম্** (এই শরীরীকে) ; **অবিনাশিনম্** (অবিনাশী) ; **নিত্যম্** (নিত্য) ; **অজম্** (জন্মরহিত) ; **অব্যয়ম্** (অব্যয়) ; **বেদ** (জানেন) ; **সঃ, কথম্** (তিনি কিভাবে) ; **কম, হন্তি** (কাকে হত্যা করবেন) ; **কম্** (কিভাবে) ; **ঘাতয়তি** (হত্যা করাবেন ?)]

হে পৃথানন্দন ! যে ব্যক্তি এই শরীরীকে (জীবাত্মাকে) অবিনাশী, নিত্য, জন্মরহিত এবং অব্যয় বলে জানেন, তিনি কীভাবে কাকে হত্যা করবেন বা হত্যা করাবেন ॥ ২১ ॥

ব্যাখ্যা—**'বেদাবিনাশিনম্ ...... হন্তি কম্'**—এই শরীরীর (জীবাত্মার) কখনো নাশ হয় না, এর কখনো কোনো পরিবর্তন হয় না, এ কখনো জন্মায় না এবং এর কখনো কোনোপ্রকার নূন্যতা হয় না—যে ব্যক্তি এটি সম্যক্‌ভাবে অনুভব করেন, তিনি কেমন করে কাকে হত্যা করবেন বা হত্যা করাবেন ? অর্থাৎ অপর ব্যক্তিকে হত করতে বা হত করানোতে তাঁর প্রবৃত্তিই হবে না। তিনি কোনো ক্রিয়ার কর্তা হন না বা কারো দ্বারা করিয়েও নেন না।

ভগবান এইস্থানে শরীরীকে অবিনাশী, নিত্য, অজ এবং অব্যয় বলে তাকে ছয়প্রকার বিকার রহিত বলে জানিয়েছেন, যেমন—**'অবিনাশী'** বলে মৃত্যুরূপ বিকার, **'নিত্য'** বলে অবস্থান্তর হওয়া বা বর্ধিত হওয়া রূপ বিকার, **'অজ'** বলে জন্ম নেওয়া এবং জন্মের পর সত্তাবান হওয়া রূপ বিকার এবং **'অব্যয়'** বলে ক্ষয়রূপ বিকারগুলি না হওয়ার কথা জানিয়েছেন। জীবাত্মায়, কোনো ক্রিয়াতেই কিছুমাত্র বিকার হয় না।

যদি ভগবানের **'ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে'** এবং **'কং ঘাতয়ন্তি হন্তি কম্'**, এই পদগুলিতে জীবাত্মাকে কর্তা না হওয়া এবং কর্ম সৃষ্টি না করার কথা বলার উদ্দেশ্য ছিল, তবে এইস্থানে করা বা না করার কথা না বলে মরা এবং মারার কথা তিনি কেন বলেছেন ? এর উত্তর হচ্ছে যে, যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির জন্য এখানে এই কথা বলার প্রয়োজন ছিল যে শরীরী যুদ্ধে কারোর হত্যাকারী হন না;

[1]অদ্রবং মূর্তিমৎ স্বাঙ্গং প্রাণিস্থমবিকারজম্। অতৎস্থং তত্র দৃষ্টং চ তেন চেত্তৎ তথায়ুতম্॥

কারণ এঁর কর্তৃত্বভাব নেই। শরীরী যখন ঘাতক অর্থাৎ কর্তা হতে পারেন না, তখন তিনি নিহত অর্থাৎ ক্রিয়ার বিষয় (কর্ম) কেমন করে হবেন ? অর্থাৎ শরীরী কোনো ক্রিয়ার কর্তা হন না এবং কর্মও করেন না। সুতরাং নিহত হওয়া বা হত্যা করায় শোক করা উচিত নয় বরং শাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী প্রাপ্ত কর্তব্যকর্মের পালন করা উচিত।

পরিশিষ্ট-ভাব—যে বস্তু উৎপন্ন হয়, তা স্বাভাবিক ভাবেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তাকে বিনাশ করতে হয় না। কিন্তু যে বস্তু উৎপন্ন হয় না, তার কোনো বিনাশ নেই। আমরা চুরাশি লক্ষ শরীর ধারণ করলেও কোনো শরীরই চিরকালের মতো আমাদের সঙ্গে নেই এবং 'আমি'ও কোনো শরীরকে ধরে নেই। 'আমি' একইভাবে পৃথকরূপে বিরাজমান। অন্যান্য শরীরে এটি বোধ করার মতো বুদ্ধি থাকে না, শুধুমাত্র মনুষ্যদেহ দ্বারাই এটি বোধগম্য করা সম্ভব হয়। আমরা যদি এটি অনুভবের চেষ্টা না করি, তাহলে ভগবদ্-প্রদত্ত বিবেকের অনাদর করা হয়।

***

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকগুলিতে জীবাত্মার নির্বিকারত্বের যে বর্ণনা করা হয়েছে, পরের শ্লোকে দৃষ্টান্তরূপে তার বর্ণনা করেছেন।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥ ২২ ॥

[যথা, নরঃ (যেমন, মানুষ) ; জীর্ণানি, বাসাংসি (পুরোনো বস্ত্র) ; বিহায় (পরিত্যাগ করে) ; অপরাণি, নবানি (অন্য নতুন) ; গৃহ্ণাতি (গ্রহণ করে) ; তথা, দেহী (সেইরূপ দেহী) ; জীর্ণানি, শরীরাণি (পুরোনো শরীর) ; বিহায় (পরিত্যাগ করে) ; অন্যানি (অন্য) ; নবানি (নতুন দেহ) ; সংযাতি (প্রাপ্ত হয়।)]

যেমন মানুষ পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করে অন্য নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ দেহীও পুরাতন (জীর্ণ) শরীর পরিত্যাগ করে অন্য নতুন শরীর পরিগ্রহ করে ॥ ২২ ॥

ব্যাখ্যা—'বাসাংসি জীর্ণানি....নবানি দেহী'—এই অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে সূত্ররূপে বলা হয়েছে যে দেহান্তর প্রাপ্তির বিষয়ে ধীর পুরুষগণ (জ্ঞানীপুরুষ) শোক করেন না। ওই কথাটিই এখন উদাহরণ সহকারে স্পষ্টভাবে বলছেন যে, জীর্ণ বস্ত্র পরিবর্তন করলে মানুষ যেমন শোকগ্রস্ত হয় না, তেমন শরীরের পরিবর্তনেও শোক করা উচিত নয়।

মানুষই কাপড় বদলায়, পশুপক্ষী নয় ; সেইজন্য এখানে বস্ত্র পরিবর্তনের উদাহরণে **'নরঃ'** পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। **'নরঃ'** পদটি এইস্থলে মনুষ্যশ্রেণীর বাচক এবং স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা, যুবক-বৃদ্ধ প্রভৃতি সকলেই এর অন্তর্গত।

যেমন মানুষ জীর্ণ পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করে অন্য নতুন বস্ত্র পরিধান করে, তেমনি এই দেহীও পুরাতন শরীর ত্যাগ করে অন্য নতুন দেহ ধারণ করে। পুরাতন দেহ পরিত্যাগ করাকে 'মৃত্যু' বলা হয় এবং নতুন দেহ ধারণ করাকে 'জন্ম নেওয়া' বলা হয়। প্রকৃতির সঙ্গে যতকাল সম্পর্ক থাকে, ততকাল এই দেহী পুরাতন শরীর ত্যাগ করে কর্ম অনুযায়ী বা মৃত্যুকালীন চিন্তাধারা অনুযায়ী নতুন দেহ প্রাপ্ত হতে থাকে।

এখানে **'শরীরাণি'** পদটিতে বহুবচন ব্যবহারের তাৎপর্য এই যে, যতকাল দেহী নিজ যথার্থ স্বরূপের সঠিক বোধ না করে, ততকাল এই দেহী দেহধারণ করতে থাকে। এখনও পর্যন্ত সে কত শরীর ধারণ করেছে, তার গণনা করাও সম্ভব নয়। এই কথার দিকে লক্ষ রেখে **'শরীরাণি'** পদে বহুবচনের প্রয়োগ করা হয়েছে এবং সমস্ত জীবকে লক্ষ্য করাবার জন্য এখানে **'দেহী'** পদ ব্যবহৃত হয়েছে।

শ্লোকের পূর্বার্ধে জীর্ণ বস্ত্রের কথা বলা হয়েছে এবং উত্তরার্ধে বলা হয়েছে জীর্ণ শরীরের কথা। জীর্ণ বস্ত্রের উদাহরণ শরীরে কীভাবে প্রযুক্ত হবে ? কারণ যুবা বা শিশুর শরীরও তো মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়। শুধুমাত্র বৃদ্ধের জীর্ণ দেহই যে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, তা তো নয়। তার উত্তর এই যে,

শরীরের আয়ু শেষ হলে তবেই তা বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং আয়ু শেষ হওয়াই হচ্ছে জীর্ণ হওয়া[১]। শরীর শিশুর, যুবকের অথবা বৃদ্ধের যারই হোক, আয়ু সমাপ্তিতেই এগুলিকে জীর্ণ বলে মানা হয়।

এই শ্লোকটিতে ভগবান **'যথা'** এবং **'তথা'** পদটি দিয়ে বলেছেন যে, মানুষ যেমন পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে তেমনি এই দেহী পুরাতন দেহ ত্যাগ করে নতুন দেহে আশ্রয় নেয়। এখানে একটি সংশয় হয়, যেমন বাল্য, যৌবন এবং বার্ধক্যের অবস্থান্তর স্বতঃই হয়, তেমনই দেহান্তরপ্রাপ্তিও স্বতঃই হয়, (২।১৩)—এইস্থানে **'যথা'** (যেমন) এবং **'তথা'** (তেমন) ঠিকই প্রযুক্ত হয়েছে; কিন্তু (এই শ্লোকে) পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করায় এবং নব বস্ত্র পরিধান করায় মানুষের স্বাধীনতা থাকে, কিন্তু পুরাতন দেহ ত্যাগ করতে এবং নতুন দেহ ধারণ করতে দেহীর স্বাধীনতা নেই। তাহলে এইস্থানে **'যথা'** এবং **'তথা'** কীভাবে প্রযুক্ত হয় ? এর উত্তরে বলা যায় যে, এখানে ভগবানের কথার তাৎপর্য স্বাধীনতার বা পরাধীনতার কথা বলা নয়, বরং শরীরের ত্যাগজনিত শোক দূর করাই তাঁর আসল উদ্দেশ্য। পুরাতন বস্ত্র ত্যাগ করে নববস্ত্র ধারণ করলেও মানুষ সেই একই থাকে, তেমনি পুরাতন দেহ ত্যাগ করে নতুন শরীরে আশ্রয় নিলেও দেহী সেই একই এবং নির্লিপ্তরূপে থাকে। সুতরাং শোক করার কোনো কারণ নেই। এই দৃষ্টিতে দেখলে এই দৃষ্টান্ত ঠিকই আছে।

অপর একটি সংশয় এই যে, পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করে নববস্ত্র পরিধান করলে মনে সুখ হয়, কিন্তু পুরাতন দেহ ত্যাগ করা এবং নতুন দেহ ধারণ করায় দুঃখ হয়। সুতরাং এখানে **'যথা'** এবং **'তথা'** কীভাবে খাটে ? এর উত্তর হল যে, শরীরের মৃত্যু হলে যে দুঃখ হয় তা মৃত্যুর কারণে নয়, আসলে দুঃখ হয় বাঁচার আকাঙ্ক্ষা থেকেই। 'আমি বেঁচে থাকব', বাঁচার এইরূপ ইচ্ছা অন্তরে থাকে এবং তা সত্ত্বেও মৃত্যুবরণ করতে হয়, তাই দুঃখ পেতে হয়। অর্থাৎ মানুষ যখন শরীরের সঙ্গে একাত্ম বোধ করে তখন শরীরের মৃত্যুকে নিজের মৃত্যু বলে মেনে নেয় যার ফলে দুঃখিত হয়। কিন্তু শরীরের সঙ্গে নিজের একাত্মতা যে মেনে নেয় না, মৃত্যুতে তার দুঃখ হয় না, বরং আনন্দ হয়। যেমন মানুষ নিজ বস্ত্রের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করে না বলেই সে বস্ত্র পরিবর্তনে দুঃখবোধ করে না, কারণ তার বিবেক সেখানে স্পষ্টরূপে জাগ্রত থাকে যে কাপড় এবং সে পৃথক বস্তু। কিন্তু এই বস্ত্র পরিবর্তন যদি কোনো ছোট শিশুর করা হয়, তাহলে সে পুরাতন পোশাকের পরিবর্তে নতুন পোশাক পরিধান করতেও কাঁদে। তার এই দুঃখ মূঢ়তার জন্য, কম বুদ্ধির জন্য হয়। এই মূঢ়তা দূর করার জন্যই ভগবান এইস্থানে **'যথা'** এবং **'তথা'** পদটি দিয়ে বস্ত্রের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।

ভগবান এখানে বস্ত্র পরিধানে **'গৃহ্লাতি'** (ধারণ করা) ক্রিয়ার ব্যবহার করেছেন, কিন্তু শরীর ধারণ করায় **'সংযাতি'** (চলে যাওয়া) ক্রিয়া ব্যবহার করেছেন। ভগবান এরূপ ক্রিয়াভেদ কেন করেছেন ? লৌকিক দৃষ্টিতে ঠিক ঠিক না বোঝার জন্য এরূপ মনে হয় যে মানুষ নিজ স্থানে থেকেই বস্ত্র পরিধান করে এবং দেহান্তরপ্রাপ্তি হলে অন্যান্য দেহতে তাকে পরিভ্রমণ করতে হয়। এই লৌকিক দৃষ্টিতে ভগবান এইরূপ ক্রিয়াভেদ করে বুঝিয়েছেন।

বিশেষ কথা

গীতায় **'যেন সর্বমিদং ততম্‌'** (২।১৭), **'নিত্যঃ সর্বগত স্থাণুঃ'** (২।২৪) ইত্যাদি পদ দ্বারা দেহী বা জীবাত্মাকে সর্বত্র ব্যাপ্ত, নিত্য, সর্বগত এবং স্থিরস্বভাব-সম্পন্ন বলা হয়েছে এবং **'সংযাতি নবাণি দেহী'** (২।২২), **'শরীরং যদবাপ্নোতি'** (১৫।৮) ইত্যাদি পদগুলির দ্বারা দেহীর অন্য শরীরে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু যিনি সর্বগত, সর্বত্র ব্যাপ্ত, তাঁর আসা-যাওয়া কী করে হয় ? কারণ কোনো একটি স্থান থেকে অন্যত্র গেলে তাকে 'যাওয়া' বলে এবং অন্য স্থান থেকে এইস্থানে এলে তাকে 'আসা' বলে। কিন্তু দেহীর বিষয়ে তো এই দুটিই প্রযুক্ত হয় না। এর উত্তর হল যে, যেমন কারো বালক অবস্থা থেকে যুবাবস্থা প্রাপ্তি হলে সে বলে 'আমি যুবক হয়ে গেছি।' প্রকৃতপক্ষে সে

[১]বিচার-বিবেচনা করলে দেখা যায় যে আয়ু অনুক্ষণ শেষ হচ্ছে অর্থাৎ শরীর প্রতি মুহূর্তে জীর্ণ হচ্ছে, মৃত্যুর দিকে যাচ্ছে। এক মুহূর্তও এটি স্থির নয়। যেমন যৌবনপ্রাপ্তিতে বালকত্ব লয় পায়, প্রকৃতপক্ষে এই বালকভাব সর্বক্ষণ লয় পাচ্ছে। কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি না থাকায় প্রতি মুহূর্তে সংঘটিত মৃত্যুর দিকে নজর থাকে না। বাস্তবে এটিই হল অজ্ঞানতা।

স্বয়ং (সত্তা) যুবক হয়নি, তার শরীর যুবক হয়েছে। তাই বাল্যাবস্থায় সে যা ছিল, যুবাবস্থাতেও সে তাই আছে এবং বৃদ্ধাবস্থাতেও সে তাই থাকবে। কিন্তু শরীরের সঙ্গে একাত্মভাব মেনে নেওয়ার ফলে সে শরীরের পরিবর্তনকে নিজ শুদ্ধ স্বরূপে আরোপিত করে নেয়। এইরূপই আসা-যাওয়া আসলে শরীরের ধর্ম, কিন্তু শরীরের সঙ্গে তাদাত্ম্য মেনে নেওয়ায় সে এটিকে নিজের আসা-যাওয়া বলে মনে করে। সুতরাং বাস্তবে দেহী বা জীবাত্মার কোথাও আসা বা যাওয়া বলে কিছু নেই, কেবলমাত্র শরীরের সঙ্গে তাদাত্ম্য করাতেই তার আসা-যাওয়া প্রতীত হয়।

প্রশ্ন হতে পারে যে, অনাদি কাল হতে যে জন্ম-মৃত্যু চলে আসছে তার কারণ কী ? কর্মের দৃষ্টিতে দেখতে গেলে তো শুভাশুভ কর্মের ফল ভোগ করার জন্যই জন্ম বা মৃত্যু হয়, জ্ঞানের দৃষ্টিতে অজ্ঞানতার জন্য জন্ম-মৃত্যু হয় এবং ভক্তির দৃষ্টিতে ভগবানের বিমুখ হওয়াতে জন্ম-মৃত্যু হয়। এই তিনটির মধ্যে প্রধান কারণ হল যে, ভগবান প্রাণীদের যে স্বাধীনতা দিয়েছেন, তার ঠিকমতো ব্যবহার না করলেই জন্ম-মৃত্যু হয়। তাহলে এই জন্ম-মৃত্যু রোধ হবে কী করে ? প্রাপ্ত স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করলেই জন্ম-মৃত্যু রোধ হয় অর্থাৎ নিজের স্বার্থের জন্য কর্ম করলে জন্ম-মৃত্যু হয়ে থাকে সুতরাং নিজ স্বার্থ ত্যাগ করে অপরের হিত কামনায় কর্ম করলে জন্ম-মৃত্যু হয় না। নিজ জ্ঞানের প্রতি অশ্রদ্ধা করলে[১] জন্ম-মৃত্যু হয়। সুতরাং নিজ জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা করলে জন্ম-মৃত্যু হয় না। ভগবান হতে বিমুখ হলে জন্ম-মৃত্যু হয়, সুতরাং ভগবানের শরণাগত হলে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তি হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব—মানুষ নতুন নতুন বস্ত্র পেতে চাইলে ভগবান তাকে নতুন নতুন বস্ত্র (শরীরাদি) দিয়ে থাকেন। শরীর বৃদ্ধ হলে ভগবান তাকে নতুন দেহ প্রদান করেন। সুতরাং নতুন নতুন জিনিস আকাঙ্ক্ষার জন্যই জন্ম-মৃত্যু হয়ে থাকে। নতুন নতুন জিনিসের আকাঙ্ক্ষাকারীরা অনন্তকাল পর্যন্ত নতুন নতুন জিনিস পেতে থাকে। মানুষের মধ্যে দুই শক্তি আছে—ইচ্ছাশক্তি ও প্রাণশক্তি। ইচ্ছাশক্তির বর্তমানে যদি প্রাণশক্তি ফুরিয়ে যায়, তবেই নতুন জন্ম হয়। যদি ইচ্ছাশক্তি না থাকে, তাহলে প্রাণশক্তি ফুরোলে পুনর্জন্ম হয় না।

যে কোনো উদাহরণই কেবল এক অংশেই ঘটে, সর্বাংশে নয়। এই স্থানে পুরোনো বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিবর্তন করার দৃষ্টান্ত শুধু এক অংশেই প্রযোজ্য হয়, যেমন মানুষ অনেক বস্ত্র পরিবর্তন করলেও একই থাকে, তেমনই জীবাত্মা নানা জন্মে অনেক শরীর ধারণ করলেও একইভাবে বিরাজ করেন। যেমন পুরোনো বস্ত্র পরিবর্তন করলে আমরা মরে যাই না এবং নতুন বস্ত্র ধারণ করলেই আমরা জন্মাই না, তেমনই পুরোনো দেহ পরিত্যাগ করলে 'আমি' (জীবাত্মা) মরে না এবং নতুন দেহ ধারণ করলেও 'আমি' (জীবাত্মা) জন্ম নেয় না। অর্থাৎ শরীর মরে, 'আমি' (জীবাত্মা) মরে না। যদি 'আমি' মরে যায় তাহলে পাপ-পুণ্যের ফল কে ভোগ করবে ? অন্য জন্ম কে গ্রহণ করবে ? বন্ধন কার হবে ? মুক্ত হবে কে ?

***

সম্বন্ধ—প্রথমে দৃষ্টান্তরূপে শরীরীর নির্বিকারত্বের বর্ণনা করে এবার পরবর্তী তিনটি শ্লোকে তারই প্রকারান্তরে বর্ণনা করেছেন।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩ ॥

---

[১] নিজ জ্ঞানের অশ্রদ্ধা করার অর্থ হল যে আমি যা জানি, সেই অনুযায়ী কাজ না করা। যেমন, সত্য বলা উচিত, মিথ্যা বলা উচিত নয়—এই কথা জেনেও স্বার্থের জন্য আমরা মিথ্যা বলি। কেউ সুখ দিলে ভালো লাগে, দুঃখ দিলে খারাপ লাগে—তা জেনেও নিজ সুখের জন্য আমরা অপরকে দুঃখ দিই। সেইরূপই আমরা জানি যে, শরীর ইত্যাদি সবই বিনাশশীল, কিছুই চিরস্থায়ী নয়, তবুও আমরা এতে মোহ-মমতা করি। এগুলিই হচ্ছে নিজ জ্ঞানের অনাদর করা, অশ্রদ্ধা করা।

[শস্ত্রাণি (শস্ত্র দ্বারা) ; এনম্ (একে) ; ন, ছিন্দন্তি (ছেদন করা যায় না) ; পাবকঃ (অগ্নি) ; এনম্ (একে) ; ন, দহতি (দহন করতে পারে না) ; আপঃ (জল) ; এনম্ (একে) ; ন, ক্লেদয়ন্তি (সিক্ত করতে পারে না) ; চ, মারুতঃ (এবং বায়ু) ; ন, শোষয়তি (শুষ্ক করতে পারে না।)]

শস্ত্র দ্বারা এই শরীরীকে (জীবাত্মাকে) ছেদন করা যায় না, অগ্নি একে দহন করতে পারে না, জল একে সিক্ত করতে পারে না এবং বায়ু একে শুষ্ক করতে পারে না ॥ ২৩ ॥

ব্যাখ্যা—**'নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি'**—শরীরীকে শস্ত্র দ্বারা ছেদন করা যায় না ; কারণ এই শস্ত্রগুলি প্রকৃতি হতে সৃষ্ট ; প্রাকৃত এই শস্ত্র জীবাত্মা পর্যন্ত পৌঁছায় না।

শস্ত্র যত প্রকারের আছে তা সবই পৃথিবী-তত্ত্ব দ্বারা উৎপন্ন হয়। এই পৃথ্বী-তত্ত্ব জীবাত্মার কোনোপ্রকার বিকার ঘটাতে সক্ষম হয় না। শুধু তাই নয়, পৃথ্বী-তত্ত্ব শরীরী পর্যন্ত পৌঁছতেই পারে না, বিকৃতি ঘটানো তো দূরের কথা!

'নৈনং দহতি পাবকঃ'—অগ্নি শরীরীকে পোড়াতে পারে না ; কারণ অগ্নির পক্ষে শরীরীর কাছে যাওয়াই সম্ভব নয়। ওই পর্যন্ত যখন পৌঁছতেই পারে না তখন তার দ্বারা জ্বালানো কেমন করে সম্ভব ? অর্থাৎ অগ্নি-তত্ত্ব এই জীবাত্মায় কোনোপ্রকার বিকার উৎপন্ন করতে পারে না।

'ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপঃ'—জল একে সিক্ত করতে পারে না ; কারণ জলও তার কাছে পৌঁছাতে পারে না। অর্থাৎ জল-তত্ত্ব এই জীবাত্মায় কোনো বিকার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় না।

'ন শোষয়তি মারুতঃ'—জীবাত্মা বায়ুর দ্বারা শুষ্ক হয় না অর্থাৎ বায়ুর এই জীবাত্মাকে শুষ্ক করার সামর্থ্য নেই ; কারণ বায়ু সেখানে পৌঁছতে পারে না । অর্থাৎ বায়ু-তত্ত্ব এই জীবাত্মার কোনো বিকৃতি ঘটাতে সক্ষম হয় না।

ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ—এগুলিকে পঞ্চ মহাভূত বলা হয়। ভগবান এর মধ্যে চারটি মহাভূতের কথা বলেছেন যে ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু এই জীবাত্মার কোনোপ্রকার বিকৃতি করতে সক্ষম নয়। কিন্তু তিনি পঞ্চম মহাভূত ব্যোম বা আকাশ সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করেননি। এর কারণ হল, আকাশের ক্রিয়া সংঘটিত করার কোনো শক্তি নেই। ক্রিয়া (বিকৃত) করার শক্তি এই চারটি মহাভূতেরই শুধু আছে। আকাশ এই সবগুলির উৎস মাত্র হয়।

ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু—এই চারটি তত্ত্ব আকাশ হতেই উৎপন্ন হয়, কিন্তু এগুলি নিজ কারণভূত আকাশে কোনোপ্রকার বিকার উৎপন্ন করতে সক্ষম হয় না, অর্থাৎ পৃথিবী আকাশ ভেদ করতে পারে না, জল সিক্ত করতে পারে না, অগ্নি ভস্ম করতে পারে না, বায়ু শুষ্ক করতে সক্ষম হয় না। এই চারটি তত্ত্ব যখন নিজ কারণভূত আকাশকে, আকাশের কারণভূত মহত্তত্ত্বকে এবং মহত্তত্ত্বের কারণভূত প্রকৃতির কোনো ক্ষতি করতে পারে না, তাহলে প্রকৃতির অতীত শরীরীর কাছে এগুলি কিরূপে পৌঁছাবে ? এই গুণ-সংবলিত পদার্থগুলির ওই নির্গুণ তত্ত্বে পৌঁছনো কেমন করে সম্ভব ? তা সম্ভবই নয়। (গীতা ১৩।৩১)।

শরীরী হল নিত্য-তত্ত্ব। পৃথিবী আদি চারটি তত্ত্বের অস্তিত্বের প্রকাশ এই তত্ত্ব হতেই ঘটে। সুতরাং যেটি থেকে এই তত্ত্বগুলির সত্তা প্রকাশিত হয়, তাকে এইগুলি বিকৃত করবে কীভাবে ? এই শরীরী বা জীবাত্মা সর্বব্যাপী এবং পৃথিবী ইত্যাদি চারটি তত্ত্ব এতে ব্যাপ্য অর্থাৎ জীবাত্মার অন্তর্গত। সুতরাং ব্যাপ্য বস্তু ব্যাপকের ক্ষতি কী করে করবে ? তার কোনো ক্ষতি করা সম্ভবই নয়।

এখানে যুদ্ধের প্রসঙ্গ ছিল। 'এই আত্মীয়েরা সকলে নিহত হবেন'—এই কথায় অর্জুন শোক প্রকাশ করছিলেন। তাই ভগবান বলছেন যে, ওরা কী করে মারা যাবে ? কারণ অস্ত্রশস্ত্রের সাধ্যই নেই জীবাত্মা পর্যন্ত পৌঁছনো অর্থাৎ শস্ত্র দ্বারা শরীরকে কাটতে পারা গেলেও জীবাত্মাকে ছেদন করা যায় না, আগ্নেয়াস্ত্রের দ্বারা শরীর দগ্ধ হলেও জীবাত্মা দগ্ধ হয় না। বরুণাস্ত্রের দ্বারা শরীর সিক্ত হলেও জীবাত্মা সিক্ত হয় না। বায়ব্যাস্ত্রের দ্বারা শরীর শুষ্ক হলেও শরীরী শুষ্ক হয় না। তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা শরীর মৃত হলেও জীবাত্মা মরে না, বরং যেমনকার তেমনই নির্বিকারভাবে থাকে। সুতরাং এটি নিয়ে শোক করা অর্জুনের পক্ষে অত্যন্ত অবুঝের কাজ।

পরিশিষ্ট-ভাব— আমরা বলে থাকি 'শরীর আছে', অতএব পরিবর্তন শরীরে হয়, 'আছে' (জীবাত্মা)-তে হয় না। যেমন 'কাঠ আছে', তাই বিকৃতি কাঠে আসে, 'আছে'তে নয়। কাঠ কাটা হয়, 'আছে'কে কাটা যায় না। কাঠ জ্বালানো হয়, 'আছে' জ্বালানো যায় না। কাঠ ভিজে যায়, 'আছে' ভেজে না। কাঠ শুকিয়ে যায়, 'আছে' শুকনো হয় না। কাঠ কখনো একভাবে থাকে না কিন্তু 'আছে'র কখনো বিভিন্নরূপ হয় না।

❀ ❀ ❀

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥ ২৪ ॥

[**অয়ম্** (এই শরীরী) ; **অচ্ছেদ্যঃ** (খণ্ড করা যায় না) ; **অয়ম্, অদাহ্যঃ** (দগ্ধ করা যায় না) ; **অক্লেদ্যঃ** (সিক্ত করা যায় না) ; **চ** (আর) ; **অশোষ্যঃ, এব** (শুষ্ক করাও যায় না) ; **অয়ম্, নিত্যঃ** (এ নিত্য) ; **সর্বগতঃ** (সর্বব্যাপী) ; **অচলঃ** (অচল) ; **স্থাণুঃ** (স্থির স্বভাবসম্পন্ন) ; **সনাতনঃ** (অনাদি।)]

জীবাত্মাকে খণ্ড করা যায় না, দগ্ধ করা যায় না, সিক্ত করা যায় না এবং শুষ্ক করা যায় না। কারণ জীবাত্মা নিত্য, সর্বব্যাপী, অচল, স্থিরস্বভাবসম্পন্ন এবং অনাদি॥ ২৪ ॥

ব্যাখ্যা—[শস্ত্রাদি এই জীবাত্মার কোনো বিকৃতি কেন করতে পারে না—এই শ্লোকে সেই কথাই বলা হয়েছে।]

'অচ্ছেদ্যোঽয়ম্'—শস্ত্র দ্বারা এই জীবাত্মাকে ভেদ করা যায় না। তার মানে এই নয় যে, শস্ত্রের ছেদন-ক্ষমতা সীমিত বা শস্ত্রচালনায় যোগ্য ব্যক্তির অভাব। প্রকৃত ব্যাপার হল এই যে, ভেদরূপ ক্রিয়া শরীরীতে কার্যকরী হয় না, এটি তাই ছেদন হওয়ার যোগ্য নয়।

শস্ত্রাদি ভিন্ন কোনো মন্ত্র, অভিশাপ ইত্যাদির দ্বারাও জীবাত্মাকে আঘাত করা যায় না। যাজ্ঞবল্ক্যের প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারায় তাঁর অভিশাপে যেমন শাকল্যর মস্তক দেহচ্যুত হয়েছিল (বৃহদারণ্যক), এইভাবে মন্ত্র অথবা বাক্যের দ্বারাও দেহকে কাটা যেতে পারে, কিন্তু দেহী সর্বতোরূপে অচ্ছেদ্য।

'অদাহ্যোঽয়ম্'—এই শরীরী অদাহ্য। কেননা এটি দগ্ধ হতে পারে না। অগ্নি ব্যতিরেকে মন্ত্র অথবা অভিশাপ দ্বারাও একে দহন করা যায় না। দময়ন্তীর অভিশাপে যেভাবে ব্যাধ অগ্নি ব্যতীতই ভস্ম হয়েছিল, এভাবেই যেগুলি দগ্ধ হওয়ার উপযুক্ত সেগুলিই অগ্নি বা অভিশাপে দগ্ধ হতে পারে। কিন্তু জীবাত্মায় এই দহনক্রিয়া কার্যকরী হয় না।

'অক্লেদ্যঃ'—জীবাত্মা সিক্ত হওয়ার উপযুক্ত নয় অর্থাৎ এটি সিক্ত হবার অবস্থার অতীত। জল, মন্ত্র, অভিশাপ, ওষুধ ইত্যাদির দ্বারা এটি সিক্ত হতে পারে না। যেমন, শোনা যায় যে, 'মালকোষ' রাগ ঠিকভাবে গীত হলে পাথর পর্যন্ত সিক্ত হয় ; চন্দ্রকান্ত মণি চন্দ্রের উদয়ে সিক্ত হয়। কিন্তু জীবাত্মা রাগ-রাগিণীর দ্বারা সিক্ত হয় না।

'অশোষ্য'—জীবাত্মা অশোষ্য। এটি এমন বস্তু নয় যে বায়ু দ্বারা এটি শুষ্ক হবে, কারণ শোষণ ক্রিয়া এটিতে ঘটতে পারে না। বায়ু অথবা মন্ত্র, অভিশাপ, ওষধি ইত্যাদির দ্বারা এই জীবাত্মা শুষ্ক হয় না। অগস্ত্য ঋষি যেমন সমুদ্রকে শোষণ করেছিলেন, জীবাত্মাকে সেরূপ কেউ নিজ শক্তিতে শোষণ করতে পারে না।

'এব চ'—বিনাশের আশঙ্কাতে অর্জুন শোক প্রকাশ করছিলেন। তাই জীবাত্মাকে অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য আর অশোষ্য রূপে বিশেষিত করে ভগবান **'এব চ'** পদের দ্বারা বিশেষ জোর দিয়ে বললেন যে, শরীরী তো এই রূপই। অর্থাৎ কোনো ক্রিয়াই এতে প্রবেশ করতে সক্ষম হয় না। সুতরাং জীবাত্মার জন্য শোক করার প্রশ্নই ওঠে না।

'নিত্যঃ'—জীবাত্মা (দেহী) নিত্য, এটি সর্বদা একভাবে বিরাজমান। এই সত্তা কোনো কালে ছিল না বা কোনো কালে থাকবে না এমন নয় ; এটি সর্বকালে একইভাবে বিরাজমান।

'সর্বগতঃ'—এই দেহী বা জীবাত্মা সর্বকালে একইপ্রকার থাকে, তাহলে এটি থাকে কোন স্থানে ? তার উত্তরে বলেছেন যে, এই দেহী (জীবাত্মা) সমস্ত ব্যক্তি, বস্তু, শরীর ইত্যাদিতে সমানরূপে বিরাজমান।

'অচলঃ'—এটি সর্বগত হলেও, কোথাও যাওয়া-আসা করে কি ? এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে এটি স্থির-স্বভাবসম্পন্ন অর্থাৎ এটি এখানে ওখানে আসা-যাওয়া করে না।

'স্থাণুঃ'—এটি স্থিরস্বভাবসম্পন্ন, কোথাও যাতায়াত করে না—সে কথা ঠিক, তাহলে এতে কম্পন তো হয় ? বৃক্ষ যেমন একই স্থানে থাকে, তার আসা-যাওয়া নেই, কিন্তু এক স্থানে থেকেও বৃক্ষ দোলা খায়, নড়ে চড়ে, তেমন জীবাত্মাতেও কি নড়াচড়ার ক্রিয়া হয় ? তার উত্তরে বলেছেন যে, জীবাত্মা স্থাণু অর্থাৎ এর মধ্যে কোনোরূপ স্পন্দন ক্রিয়াই নেই।

'সনাতনঃ'—জীবাত্মা অচল, স্থাণু সে কথা ঠিক হলেও, এটি কি কখনো জন্ম নিয়েছে ? এর উত্তরে বলা হয়েছে এটি সনাতন, অনাদি এবং সর্বকাল থেকে আছে। এটি যে কখনো ছিল না, এমন হতেই পারে না।

বিশেষ কথা

এই জগৎ অনিত্য, এক মুহূর্তও এটি স্থির থাকে না। কিন্তু যা সর্বদা বিরাজমান, যার কখনো কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় না, সেই জীবাত্মার দিকে লক্ষ্য করাবার জন্যই **'নিত্যঃ'** পদটির তাৎপর্য।

দেখা, শোনা, পড়া বা অনুভব করার যোগ্য যা কিছু প্রাকৃত বস্তু গোচরে আসে, এ সবেরই মধ্যে সর্বদা ও সর্বত্র যে পরিপূর্ণ তত্ত্ব আছে, সেই তত্ত্বকে লক্ষ্য করানোই হল **'সর্বগতঃ'** পদের তাৎপর্য।

এই জগতে যা কিছু বস্তু, ব্যক্তি, পদার্থ ইত্যাদি আছে তা সবই গতিশীল। সেই চলমান বস্তু, ব্যক্তি, পদার্থ ইত্যাদিতে স্থিত যে সত্তা নিজ স্বরূপে কখনও চঞ্চল (বিচলিত) হয় না, সেটি বোঝাবার জন্যই এই স্থানে **'অচলঃ'** পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রকৃতি এবং প্রকৃতির কার্য-জগৎ প্রতিক্ষণ ক্রিয়াশীল ও পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। এইরূপ পরিবর্তনশীল জগতে যেটি ক্রিয়ারহিত, পরিবর্তনরহিত, স্থায়ীস্বভাবসম্পন্ন তত্ত্ব, তার দিকে লক্ষ্য করাবার উদ্দেশ্যে **'স্থাণুঃ'** পদ ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রাকৃত পদার্থমাত্রই উৎপন্ন হয় এবং নাশ হয়, অর্থাৎ এগুলি আগেও ছিল না পরেও থাকবে না। কিন্তু যেটি উৎপন্ন হয় না এবং লয়ও পায় না অর্থাৎ যেটি আগেও ছিল এবং পরেও চিরকাল থাকবে—সেই তত্ত্বের (জীবাত্মার) দিকে লক্ষ্য করানোই হচ্ছে **'সনাতনঃ'** পদটির তাৎপর্য।

উপরে উল্লিখিত পাঁচটি বিশেষণের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, জগৎ-সংসারের সঙ্গে তাদাত্ম্য হলেও এবং শরীর-শরীরী ভাবের পৃথকত্ব অনুভব না হলেও বস্তুতঃ শরীরী নিত্য-নিরন্তর একরস, একরূপ থাকে।

পরিশিষ্ট-ভাব—'সর্বগতঃ'—আত্মস্বরূপ দেহগত নয়, প্রকৃতপক্ষে তিনি সর্বগত —এরূপ অনুভব হওয়াই জীবন্মুক্তি। শরীর যেমন জগতে অবস্থান করে, তেমনভাবে 'আমি' (জীবাত্মা) শরীরে অবস্থিত থাকে না । শরীরের সঙ্গে জীবাত্মা কখনো মিশে যায় না, মিশে যাওয়া সম্ভব নয়। শরীর 'আমি' থেকে অনেক তফাতের। কিন্তু কামনা-মমতা-তাদাত্ম্য ইত্যাদি করার জন্য জীবাত্মার সঙ্গে শরীরের একতা প্রতীত হয়।

জীবাত্মার কোনো শরীরের প্রয়োজন নেই। শরীর ব্যতীতও (জীবাত্মা) শরীরী আনন্দে থাকে।

* * *

অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্যোঽয়মচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি॥ ২৫ ॥

[**অয়ম্** (এই দেহী) ; **অব্যক্তঃ** (প্রত্যক্ষ গোচরীভূত নয়) ; **অয়ম্, অচিন্ত্যঃ** (এটি চিন্তা করার বিষয় নয়) ; **অয়ম্** (এটি) ; **অবিকার্যঃ** (বিকার রহিত) ; **উচ্যতে** (বলা হয়) ; **তস্মাৎ** (অতএব) ; **এনম্** (এই দেহীকে) ; **এবম্ বিদিত্বা** (এইরূপ জেনে) ; **অনুশোচিতুম** (শোক করা) ; **ন, অর্হসি** (উচিত নয়।)]

এই দেহী প্রত্যক্ষ গোচরীভূত নয়, এটি চিন্তা করার বিষয় নয় এবং এটি সর্বপ্রকার বিকাররহিত। অতএব দেহী অর্থাৎ জীবাত্মাকে এইরূপ জেনে তোমার শোক করা উচিত নয় ॥ ২৫ ॥

ব্যাখ্যা—'অব্যক্তোঽয়ম্'—শরীর-সংসারকে যেমন স্থূলরূপে দেখা যায়, তেমনি জীবাত্মাকে স্থূলরূপে দেখা যায় না ; কারণ এটি স্থূল সৃষ্টির অতীত।

'অচিন্ত্যোঽয়ম্'—মন, বুদ্ধি, ইত্যাদিকে দেখা না গেলেও, চিন্তায় এদের অস্তিত্ব বোঝা যায় অর্থাৎ এগুলি অনুভবগম্য। কিন্তু জীবাত্মা চিন্তারও বিষয় নয়। কারণ এটি সূক্ষ্ম সৃষ্টির অতীত।

'অবিকার্যোঽয়মুচ্যতে'—এই দেহীকে (জীবাত্মা) বিকাররহিত বলা হয় অর্থাৎ এর কখনো কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় না। জগতের সবকিছুর কারণ হল প্রকৃতি ; সেই কারণভূত প্রকৃতিতেই বিকৃতি হয়। কিন্তু এই জীবাত্মায় কোনোরূপ বিকৃতি হয় না, কেননা এটি কারণ-সৃষ্টির অতীত সত্তা।

এখানে চব্বিশ-পঁচিশতম শ্লোকে অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, অচল, অব্যক্ত, অচিন্ত্য এবং অবিকার্য—এই আটটি বিশেষণের দ্বারা এই জীবাত্মার নেতিবাচক ধারায় বর্ণনা করা হয়েছে এবং নিত্য, সর্বগত, স্থাণু, সনাতন—এই চারটি বিশেষণের দ্বারা দেহীর (জীবাত্মা) ইতিবাচক বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর বর্ণনা করা সম্ভব নয় ; কারণ এটি বাক্যের অতীত বিষয়। যে উৎস থেকে বাক্যাদি প্রকাশিত হয়, সেই জীবাত্মাকে তার দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব নয় ? এই বিবরণ থেকেই জীবাত্মা সম্বন্ধে ধারণা করতে হবে।

'তস্মাদেবং..........নানুশোচিতুমর্হসি'—তাই এই জীবাত্মাকে অচ্ছেদ্য, অশোষ্য, নিত্য, সনাতন, অবিকার্য ইত্যাদি রূপে জানা থাকলে বা ধারণা করলে আর শোক হতেই পারে না।

* * *

সম্বন্ধ—যদি জীবাত্মাকে নির্বিকার মনে না করে বিকারী বলে মনে করা হয় (যা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ), তাহলেও শোক করা উচিত নয়—পরবর্তী দুটি শ্লোকে এই কথাই বলা হয়েছে।

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈবং শোচিতুমর্হসি॥ ২৬॥

[**মহাবাহো** (হে মহাবাহো !) ; **অথ** (যদি) ; **মন্যসে, এনম্** (মনে কর এই জীবাত্মা) ; **নিত্যজাতম্** (সর্বদা জন্মায়) ; **বা, নিত্যম্, চ** (এবং সর্বদাই) ; **মৃতম্** (মৃত্যুমুখে পতিত হয়) ; **তথাপি** (তাহলেও) ; **ত্বম্** (তোমার) ; **এবম্** (এর জন্য) ; **শোচিতুম্** (শোক করা) ; **ন, অর্হসি** (উচিত নয়।)]

হে মহাবাহো ! যদি তুমি মনে কর যে, এই জীবাত্মা সর্বদা জন্মায় এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহলেও তোমার এর জন্য শোক করা উচিত নয় ॥ ২৬ ॥

ব্যাখ্যা—**'অথ চৈনং ..... অর্হসি'**—ভগবান এখানে পক্ষান্তরে **'অথ চ'** এবং **'মন্যসে'** পদ দ্বারা বলেছেন যে 'স্থির সিদ্ধান্ত এবং সত্য কথা যদিও এই যে, দেহী কোনো কালেই জন্মায় না বা মরে না (গীতা ২।২০), তথাপি যদি তুমি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ কথা মেনে নাও যে দেহের মতো দেহীও নিত্য জন্মায় এবং তার নিত্য মৃত্যু হয়, তাহলেও তোমার শোক করা উচিত নয়। কারণ যে জন্মায়, তার মৃত্যু হবেই এবং যার মৃত্যু হয় তার জন্ম অবধারিত—এই নিয়মের কেউ ব্যতিক্রম করতে পারে না।'

মৃত্তিকাতে যদি বীজ বপন করা হয়, তবে সেই বীজ ফুলে ফেঁপে অঙ্কুরিত হয় এবং সেই অঙ্কুর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে বৃক্ষে পরিণত হয়। এবারে একটু গভীরভাবে ভেবে দেখুন যে, সেই বীজটি এক মুহূর্তও কি একরূপে ছিল ? মাটিতে সে প্রথমে নিজ কঠিন খোলস ত্যাগ করে কোমল রূপ ধারণ করে, তারপর কোমলরূপ ত্যাগ করে অঙ্কুররূপী হয়, পরে অঙ্কুর রূপ পরিত্যাগ করে বৃক্ষরূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং শেষে আয়ু ফুরিয়ে গেলে শুকিয়ে যায়। বীজ এইরূপ একমুহূর্তও একরূপে থাকে না, আসলে সে প্রতি মুহূর্তেই পরিবর্তিত হয়। যদি বীজটি একমুহূর্তও একভাবে থাকত, তাহলে বৃক্ষের শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত ক্রিয়া কীভাবে হত ? বীজ তার প্রথম রূপটি যখন ত্যাগ করল তখনই প্রথম রূপের মৃত্যু হল, দ্বিতীয় রূপ ধারণ করলে তার নবজন্ম হল। এইভাবে প্রতি মুহূর্তে তার মধ্যে জন্ম ও মৃত্যুর প্রবাহ

চলতে থাকে। শরীরও এই বীজেরই মতো। অত্যন্ত সূক্ষ্মরূপে বীর্য রজের সঙ্গে মিলিত হয়। এই মিলিত পদার্থ বৃদ্ধি পেয়ে ক্রমশঃ শিশুর রূপ ধারণ করে ও জন্মলাভ করে। জন্মের পর থেকে সে বাড়তে থাকে, পরে আবার হ্রাস পেতে থাকে এবং শেষে মৃত্যু হয়। এইভাবে শরীর একমুহূর্তও একরূপে না থেকে বদলাতে থাকে অর্থাৎ প্রতিক্ষণে জন্মায় এবং মরে।

ভগবান বলেছেন যে, 'যদি তুমি শরীরের ন্যায় শরীরীকেও (জীবাত্মাকে) নিত্য জন্মায় ও বিনষ্ট হয় বলে মেনে নাও, তবুও এটি শোকের বিষয় হতে পারে না।'

❋ ❋ ❋

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥ ২৭ ॥

[**হি, জাতস্য** (কেননা যে জন্মায়) ; **ধ্রুবঃ, মৃত্যুঃ** (মৃত্যু নিশ্চিত) ; **চ** (এবং) ; **মৃতস্য** (মারা যায়) ; **ধ্রুবম্ জন্ম** (জন্মও নিশ্চিত) ; **তস্মাৎ** (অতএব) ; **অপরিহার্যে** (এর পরিহার সম্ভব নয়) ; **অর্থে** (এই বিষয়ে) ; **ত্বম্** (তোমার) ; **শোচিতুম্** (শোক করা) ; **ন, অর্হসি** (উচিত নয়।)]

যে জন্মায় তার মৃত্যু নিশ্চিত এবং যে মরে তার জন্মও নিশ্চিত, এর (জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহের) পরিহার অর্থাৎ নিবারণ হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং এই বিষয় নিয়ে তোমার শোক করা উচিত নয় ॥ ২৭ ॥

ব্যাখ্যা—'জাতস্য হি .... মৃতস্য চ'—আগের শ্লোক অনুযায়ী যদি জীবাত্মার নিত্য জন্ম এবং নিত্য মৃত্যু মেনে নেওয়া যায়, তবুও এটি শোকের বিষয় হতে পারে না। কারণ যার জন্ম হয়েছে, সে অবশ্যই মরবে এবং যে মারা গেছে সে অবশ্যই জন্মাবে।

'তস্মাদপরিহার্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি'—এইজন্য কেউই এই জন্ম-মৃত্যুরূপ প্রবাহকে পরিহার (রোধ) করতে সক্ষম হয় না। কারণ এতে কারোর কিছুমাত্র স্বাধীনতা নেই। এই জন্ম-মৃত্যুরূপ প্রবাহ অনাদিকাল থেকে চলে আসছে এবং অনন্তকাল চলতে থাকবে। এই দৃষ্টিতে দেখলে তোমার শোক করা উচিত নয়।

'এরা ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররূপে জন্মেছে এবং অবশ্যই মারাও যাবে। তোমার এমন কোনো উপায় নেই, যার দ্বারা তুমি এদের বাঁচিয়ে রাখতে পার। যে মারা যাবে, সে নিশ্চয়ই জন্মাবে। সেটাও তুমি রোধ করতে পারবে না। তাহলে কীসের শোক ?'

শোক উসীকা কীজিয়ে, জো অনহোনী হোয়।
অনহোনী হোতী নহীঁ, হোনী হ্যায় সো হোয়॥

অর্থাৎ যা হবার নয় তার জন্য দুঃখ (শোক) করছ, কিন্তু যা না হবার তা কখনই হয় না এবং যা হবার তা হবেই। (অতএব শোক কিসের ?)

যেমন একথা সকলে জানে যে সূর্য যখন উদিত হয়েছে তখন তা অস্ত যাবেই এবং অস্ত গেলে পুনরায় উদিত হবেই। তাই মানুষ সূর্যের অস্ত হলে শোক বা চিন্তা করে না, এও তেমনি। 'হে অর্জুন ! যদি তুমি মনে কর যে শরীরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই ভীষ্ম, দ্রোণ আদি সকলে মারা যাবেন, তাহলে শরীরের সঙ্গে তাঁরা আবার জন্মাবেনও। সুতরাং এইভাবে দেখলেও শোক হতে পারে না।'

ভগবান এই দুটি (ছাব্বিশ-সাতাশতম) শ্লোকে যে কথা বলেছেন, সেটি বাস্তবিক পক্ষে ভগবানের সিদ্ধান্তের কথা নয়। তাই **'অথ চ'** পদটির দ্বারা ভগবান অন্য (শরীর ও শরীরীকে একরূপ মনে করা) পক্ষের কথা বলেছেন যে, 'এটি যদিও সিদ্ধান্ত নয়, কিন্তু যদি তুমি এরূপ মনেও কর, তাহলেও তোমার শোক করা উচিত নয়।'

এই দুটি শ্লোকের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, যদিও জগৎ-সংসারের বস্তুমাত্রেই প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনশীল হওয়ায় আগের রূপটি ত্যাগ করে অন্য রূপ ধারণ করতে থাকে। আগের রূপ ত্যাগ হলে এটির মৃত্যু হয় এবং অন্যরূপ গ্রহণ করলে এটির নতুন জন্ম হয়। এইভাবে যে জন্মায় তার মৃত্যু হয় এবং যার মৃত্যু হয়, সে পুনর্বার জন্মায়—এই প্রবাহ চিরকাল চলছে। এই দৃষ্টিতে দেখলে শোক কীসের ?

পরিশিষ্ট-ভাব— কোনো প্রিয়জনের যদি মৃত্যু হয়, অর্থসম্পদ নষ্ট হয় তাহলে মানুষের শোক হয়। তেমনই

ভবিষ্যতের কথা ভেবেও চিন্তা হয় যে যদি স্ত্রীর মৃত্যু হয়, পুত্রের মৃত্যু হয়, তাহলে কী হবে ? এইসব শোক-ভাবনা নিজ বিবেককে গুরুত্ব না দেওয়ার জন্যই হয়ে থাকে। জগতের পরিবর্তন, পরিস্থিতির পরিবর্তন— এগুলির প্রয়োজন থাকে। পরিস্থিতি যদি না বদলায় তাহলে জগৎ চলবে কী করে ? মানুষ বাল্যাবস্থা থেকে কী করে যৌবনে উপনীত হবে ? মূর্খ দশা থেকে কী করে বিদ্বান হবে ? রোগী দশা থেকে কিভাবে নীরোগ হবে ? বীজ থেকে বৃক্ষ কী করে সৃষ্টি হবে ? পরিবর্তন না হলে জগৎসংসার স্থির চিত্র হয়ে যাবে। আসলে যা মরবার (যা পরিবর্তনশীল) তা মরবেই (পরিবর্তিত হবেই), যা থাকবার তা কখনো মরে না। আমাদের সকলেরই প্রত্যক্ষ অনুভূতি হল যে, মৃত্যুর পর আমাদের সামনে শরীর পড়ে থাকে, শুধু শরীরের যিনি প্রভু সেই জীবাত্মা চলে যান। এই অনুভূতিকে গুরুত্ব দিলে আর শোক চিন্তা হয় না। বালির মৃত্যু হলে ভগবান শ্রীরাম তারাকে এই অনুভূতির কথাই জানিয়েছিলেন।

তারা বিকল দেখি রঘুরায়া। দীন্হ গ্যান হরি লীন্হী মায়া॥
ছিতি জল পাবক গগন সমীরা। পঞ্চ রচিত অতি অধম সরীরা॥
প্রগট সো তনু তব আগেঁ সোবা। জীব নিত্য কেহি লগি তুমহ্ রোবা॥
উপজা গ্যান চরন তব লাগী। লীন্হেসি পরম ভগতি বর মাঁগী॥

(শ্রীরামচরিতমানস, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ১১।২-৩)

চিন্তা করে দেখা উচিত যে যখন চুরাশি লক্ষ জন্মের কোনো শরীরই স্থায়ী হয়নি, তখন এই শরীরই বা থাকবে কেমন করে ? চুরাশি লক্ষ শরীর যখন 'আমি'-'আমার' বলেও থাকেনি, তখন এই শরীরই বা কেন 'আমি'-'আমার' হয়ে থাকবে ? এই গূঢ় বিচার, চিন্তাভাবনা শুধুমাত্র মনুষ্য শরীরেই হতে পারে, অন্য কোনো (প্রজাতির) শরীরে নয়।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—আগের দুটি শ্লোকে পক্ষান্তরের কথা বলে ভগবান এখন পরের শ্লোকটিতে একেবারে সাধারণ দৃষ্টির কথা বলেছেন।

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥ ২৮ ॥

[ভারত (হে ভারত !) ; ভূতানি, অব্যক্তাদীনি (সকল প্রাণী জন্মের পূর্বে অপ্রকট ছিল) ; অব্যক্তনিধনানি (মৃত্যুর পরেও অপ্রকট হবে) ; ব্যক্তমধ্যানি, এব (কেবল মধ্যভাগে প্রকট বলে মনে হয়) ; তত্র (এতে) ; কা, পরিদেবনা (শোক করার কী আছে ?)]

হে ভারত ! সকল প্রাণী জন্মের পূর্বে অপ্রকট ছিল এবং মৃত্যুর পরেও অপ্রকট হবে, কেবল মধ্যভাগে প্রকট বলে মনে হচ্ছে ; সুতরাং এতে শোক কিসের ?

ব্যাখ্যা—'অব্যক্তাদীনি ভূতানি'—যে সকল প্রাণীকে (অর্থাৎ তাদের শরীরকে) দেখা, শোনা এবং বোঝা যায় তারা সকলেই জন্মের পূর্বে অপ্রকট ছিল অর্থাৎ নয়নগোচর ছিল না।

'অব্যক্তনিধনান্যেব'—এই সমস্ত প্রাণীই মৃত্যুর পর অপ্রকট হয়ে যাবে অর্থাৎ এগুলি বিনাশপ্রাপ্ত হলে সবই 'নেই'-এ বিলীন হয়ে যাবে, এদের আর দেখা যাবে না।

'ব্যক্তমধ্যানি'—এই সব প্রাণী মধ্যভাগে অর্থাৎ জন্মের পর এবং মৃত্যুর আগে প্রকট থাকে, অর্থাৎ নয়নগোচর থাকে। যেমন নিদ্রা যাবার আগে স্বপ্ন ছিল না এবং জাগরিত হলেও স্বপ্ন থাকে না, তেমনি এই প্রাণীদেরও জন্মের আগে শরীর ছিল না এবং পরেও শরীর থাকবে না। কিন্তু মধ্যভাগে ভাবরূপে এটি পরিলক্ষিত হলেও প্রকৃতপক্ষে প্রতি মুহূর্তে এটি বিনাশের পথে যাচ্ছে।

'তত্র কা পরিদেবনা'—সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, যা আদিতে এবং অন্তে থাকে না, তা প্রকৃতপক্ষে মধ্যসময়েও থাকে না[১]। সমস্ত প্রাণীরই শরীর আগেও ছিল না এবং পরেও থাকবে না ; সুতরাং প্রকৃতপক্ষে

[১]আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্তমানেঽপি তত্তথা। (মাণ্ডূক্যকারিকা ৪।৩১)

এগুলি মধ্যভাগেও নেই। কিন্তু এই জীবাত্মা প্রথমেও ছিল এবং পরেও থাকবে। সুতরাং এটি তো মধ্যভাগে থাকবেই। তাহলে এর থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা গেল যে, শরীরের সব সময় বিনাশ আছে কিন্তু জীবাত্মার কখনো বিনাশ নেই। সুতরাং এই দুটির জন্য শোক হওয়া উচিত নয়।

পরিশিষ্ট-ভাব— যা আদি এবং অন্তে নেই, তার 'না-থাকা' যেমন নিত্য-নিরন্তর এবং যা আদি এবং অন্তে 'থাকে' তার 'থাকাও' নিত্য-নিরন্তর।[১] যার 'না-থাকা'ই সত্য, তা হল 'অসৎ' (শরীর) এবং যার 'থাকা'ই নিত্য, তা হল 'সৎ' (শরীরী অর্থাৎ জীবাত্মা)। অসতের সঙ্গে আমাদের নিত্যবিচ্ছেদ আর সতের সঙ্গে আমাদের নিত্যযোগ থাকে।

* * *

সম্বন্ধ— ভগবান এবার জীবাত্মার অপ্রাকৃত রহস্য বর্ণনা করছেন।

আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ॥ ২৯ ॥

[**কশ্চিৎ, এনম্** (কেউ এই জীবাত্মাকে) ; **আশ্চর্যবৎ পশ্যতি** (আশ্চর্যতুল্য দেখেন) ; **চ, তথা, এব** (এবং তেমনই) ; **অন্যঃ** (অন্য কেউ) ; **আশ্চর্যবৎ বদতি** (আশ্চর্যরূপে বর্ণনা করেন) ; **চ** (আবার) ; **অন্যঃ, এনম্** (অন্য কেউ একে) ; **আশ্চর্যবৎ** (আশ্চর্যরূপে) ; **শৃণোতি** (শোনেন) ; **চ, এনম্** (এবং এঁর) ; **শ্রুত্বা, অপি** (শুনেও) ; **কশ্চিৎ, এব** (কেউ) ; **ন, বেদ** (জানেন না।)]

কেউ এই জীবাত্মাকে আশ্চর্যতুল্য দেখেন, কেউ এই জীবাত্মাকে আশ্চর্যরূপে বর্ণনা করেন আবার অন্য কেউ একে আশ্চর্যরূপে শোনেন এবং এর বর্ণনা শুনেও কেউ একে ঠিকমতো জানেন না অর্থাৎ এটি দুর্বোধ্য ॥ ২৯ ॥

ব্যাখ্যা—'আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম্'—এই জীবাত্মাকে কেউ আশ্চর্যরূপে জানেন। অর্থাৎ অন্য সমস্ত বস্তু যেমন দেখা, শোনা, পড়া বা জানা যায় এই দেহীকে তেমনভাবে জানা যায় না। কারণ অন্য সকল বস্তু যেমন স্বয়ং থেকে আলাদা হওয়ার ফলে জানা যায় অর্থাৎ সেগুলি জানার বিষয় হয়ে যায়, জীবাত্মা কিন্তু সেরূপ ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির বিষয় নয়। একে তো স্বয়ং-এর দ্বারা (নিজেই-নিজেকে) জানা যায়। যেটিকে নিজে থেকে জানা হয়, সেই জানা লৌকিক জ্ঞানের মতো হয় না, বরং এটি বিলক্ষণ রূপে (জানা) হয়।

'পশ্যতি'—পদের দুটি অর্থ আছে, চোখে দেখা এবং স্ব-স্বরূপকে নিজে থেকে জানা। এখানে **'পশ্যতি'** পদটি নিজের দ্বারা নিজেকে (স্বরূপকে) জানার বিষয়ে ব্যবহৃত হয়েছে (গীতা ২।৫৫ ; ৬।২০ ইত্যাদি)।

যেখানে নেত্রাদিকরণ দ্বারা দেখা (জানা) হয়, সেখানে দ্রষ্টা (দর্শনকারী), দৃশ্য (দেখার বস্তু) এবং দর্শন (দেখা ক্রিয়া)—এই ত্রিপুটি হয়। এই ত্রিপুটি দ্বারাই জাগতিক-জ্ঞান হয়। কিন্তু ত্রিপুটি দ্বারা স্বরূপের জ্ঞান হয় না অর্থাৎ

---

[১] ১) যস্তু যস্যাদিরন্তশ্চ স বৈ মধ্যং চ তস্য সন্। (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২৪।১৭)

'যার আদি ও অন্তে যা থাকে, মধ্যকালেও তাই থাকে এবং সেটিই সত্য।'

২) আদ্যন্তযোরস্য যদেব কেবলং কালশ্চ হেতুশ্চ তদেব মধ্যে॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২৮।১৮)

'এই জগতের আদিতে যা ছিল এবং শেষে যা থাকবে, যা এর মূল কারণ এবং প্রকাশক, সেই পরমাত্মা মধ্যকালেও বিরাজমান।'

৩) ন যৎ পুরস্তাদুত যন্ন পশ্চান্ মধ্যে চ তন্ন ব্যপদেশমাত্রম্। (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২৮।২১)

'যা উৎপন্ন হওয়ার আগে ছিল না, প্রলয়ের পরে থাকবে না, (এরকম বিষয়ের ক্ষেত্রে) মনে করতে হবে যে মধ্যবর্তী সময়েও সেটি নেই, যা আছে তা শুধুমাত্র কল্পনা, নামমাত্র।'

স্বয়ং-এর জ্ঞান করণসাপেক্ষ নয়। স্বয়ং-এর জ্ঞান স্বয়ং-এর দ্বারাই হয় অর্থাৎ এই জ্ঞান করণ-নিরপেক্ষ। যেমন, 'আমি আছি'—এইরকম যে নিজের অস্তিত্বের জ্ঞান থাকে, এতে কোনো প্রমাণের বা কোনো করণের প্রয়োজন নেই। নিজের অস্তিত্বের বিষয় নিজের থেকে আলাদাভাবে অর্থাৎ দৃশ্যরূপে কখনো দেখা যায় না। এর জ্ঞান স্বয়ং-এর দ্বারা স্বয়ং-এ হয়, এটি ইন্দ্রিয়জনিত বা বুদ্ধিজনিত নয়। সেইজন্য নিজেকে জানা আশ্চর্যরূপে হয়ে থাকে।

অন্ধকার ঘরে যেমন কোনো জিনিস আনতে গেলে আমাদের আলোও চাই এবং চক্ষুও চাই। অর্থাৎ ওই অন্ধকার কক্ষে আলোর সাহায্যে আমরা চক্ষু দ্বারা সেই জিনিসটি দেখি, তবে সেটি আনতে পারি। কিন্তু যদি কোথাও প্রজ্বলিত প্রদীপ থাকে এবং আমরা সেটিকে দেখতে যাই, তবে তার জন্য আর আমাদের অন্য কোনো প্রদীপের প্রয়োজন হয় না। কারণ প্রদীপ স্বপ্রকাশ। সেটি নিজেই নিজেকে প্রকাশিত করে। তেমনি নিজ স্বরূপ দেখার জন্য অন্য কোনো প্রকাশের (আলোর) প্রয়োজন হয় না ; কারণ জীবাত্মা (স্বরূপ) স্বয়ং-প্রকাশ। সুতরাং এটি নিজেই নিজেকে জানতে পারে।

স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ—এই তিনটি শরীর আছে। অন্ন-জল থেকে যে শরীর সৃষ্ট তাকে বলা হয় **স্থূলশরীর**। স্থূল শরীর হল ইন্দ্রিয়ের বিষয়। এই স্থূলশরীরের ভিতর পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় এবং পাঁচ প্রাণ এবং মন ও বুদ্ধি —এই সতেরোটি তত্ত্ব দ্বারা সৃষ্ট **'সূক্ষ্মশরীর'** আছে। সূক্ষ্মশরীর ইন্দ্রিয়ের বিষয় নয়, বরং এটি বুদ্ধির বিষয়। যেটি বুদ্ধিরও বিষয় নয়, যাতে প্রকৃতি—স্বভাব থাকে, সেটি হল **'কারণশরীর'**। এই তিনটি শরীরের ওপর আলোচনা করলে জানা যায় যে, স্থূলশরীর আমাদের স্বরূপ নয় ; কারণ এটি প্রতি মুহূর্তে বদলায় এবং এটিকে জানা যায়। সূক্ষ্মশরীরও বদল হয় এবং তাকেও জানা যায় ; সুতরাং এটিও আমাদের স্বরূপ নয়। কারণ-শরীর প্রকৃতিস্বরূপ, কিন্তু দেহী (জীবাত্মা) প্রকৃতিরও অতীত। সুতরাং কারণশরীরও আমাদের স্বরূপ নয়। জীবাত্মা যখন প্রকৃতির বন্ধনরহিত হয়ে যায় তখন নিজেই নিজের স্বরূপ জানতে পারে। এই জানা জাগতিক বস্তুগুলি জানার চেয়ে সর্বতোভাবে বৈশিষ্ট্যপূর্ণভাবে হয়। এইজন্য একে **'আশ্চর্যবৎ পশ্যতি'** বলা হয়েছে।

ভগবান এখানে বলেছেন 'নিজেকে' অনুভবকারী কোনো একজনই হয়—**'কশ্চিৎ'**, এবং পরের সপ্তম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকেও এই কথাই বলেছেন যে কোনো একজন ব্যক্তিই আমাকে তত্ত্বতঃ জানে—**'কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ'**। এই পদ দ্বারা মনে হতে পারে যে এই অবিনাশী তত্ত্ব জানা বড়ই কঠিন এবং দুর্লভ। কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। এই তত্ত্ব জানা কঠিনও নয়, দুর্লভও নয়। বরং এই তত্ত্বকে সত্যকার জানবার জিজ্ঞাসুর অর্থাৎ এইদিকে নিজেকে সমর্পণ করার লোকেরই অভাব। এরূপ কম হওয়ার কারণ হল নিজেকে জানার ইচ্ছা কম থাকা।

'আশ্চর্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ'—তদনুরূপভাবে অপর কেউ এই জীবাত্মাকে আশ্চর্যরূপে বর্ণনা করে ; কারণ এই তত্ত্ব বাণী দ্বারা প্রকাশিত নয়। যাঁর দ্বারা বাণী প্রকাশিত, সেই বাণী তাঁকে কী করে প্রকাশিত করবে ? যে মহাপুরুষ এই তত্ত্বের বর্ণনা করেন, তিনি কেবলমাত্র শাখা-চন্দ্রন্যায়ের মতো[১] শুধু সংকেতই করেন, যাতে শ্রোতার লক্ষ্য এদিকে হয়। তাই এর বর্ণনা আশ্চর্যবৎ হয়।

এখানে যে 'অন্যঃ' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে, তার অর্থ এই নয় যে, যে জানে এবং যে বলে, দুজনে পৃথক ব্যক্তি ; কারণ যে নিজে জানে না সে বর্ণনা করবে কী করে ? সুতরাং এই পদের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, যে সকল ব্যক্তি জানেন, তাঁদের মধ্যে বর্ণনা করার উপযুক্ত মানুষ কোনো একজনই হন। কারণ সমস্ত অনুভবকারী তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষগণও ওই তত্ত্বের বর্ণনা করে শ্রোতাদের সেই তত্ত্ব পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারেন না। তাদের সংশয় ও তর্কযুক্তির পুরোপুরি সমাধান করার ক্ষমতা তাঁদের সকলের থাকে না। সুতরাং বর্ণনাকারীর বিশেষ ক্ষমতা পরিস্ফুট করার জন্যই এখানে 'অন্যঃ' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

'আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি'—অন্য কেউ কেউ এই জীবাত্মাকে আশ্চর্যরূপে শোনে অর্থাৎ শ্রবণকারী, শাস্ত্র এবং লোক-লোকান্তরের যত কথা শুনেছ সেই সব কথার তুলনায় দেহী সম্বন্ধীয় কথা সর্বদাই অন্য স্তরের

---

[১] কোন বালককে অঙ্গুলি দ্বারা ইঙ্গিত করে যেমন তাকে চন্দ্র দেখতে সাহায্য করা হয়।

হয়। কারণ অন্য যা কিছু জানা আছে তা সবই ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি ইত্যাদির বিষয় ; কিন্তু দেহী ইন্দ্রিয়াদির গোচরীভূত বিষয় নয়, বরং এটিই ইন্দ্রিয়াদির বিষয়গুলিকে প্রকাশিত করে। সেইজন্য দেহী সম্বন্ধীয় আলোচনা তার কাছে আশ্চর্যের মতো শোনায়।

এখানে **'অন্যঃ'** পদ ব্যবহারের অর্থ এই যে, যিনি জানেন এবং যিনি বিবৃত করেন—এই দুজনের থেকে শ্রোতা (তত্ত্বজিজ্ঞাসু) ভিন্ন ব্যক্তি।

'শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ'—শুনেও কেউ একে জানতে পারে না। তার মানে এই নয় যে, কেউ শুনেছে, সুতরাং সে আর জানবে না। এর অর্থ হল যে কেবলমাত্র শ্রবণ করে কেউ একে জানতে পারে না। শ্রবণ করার পর যখন সেই ব্যক্তি স্বয়ং তাতে স্থিত হয়, তখন সে আপনিই আপনাকে জানতে পারে[১]।

কেউ যদি বলে যে শাস্ত্র এবং গুরুজনের বাক্য শুনেই তো জ্ঞান হয়, তাহলে এখানে 'শুনেও কেউ জানে না'—এরূপ কেন বলা হয়েছে ? এই বিষয়টি নিয়ে একটু গুরুত্বসহ আলোচনা করলে দেখা যায় যে শাস্ত্রের ওপর শ্রদ্ধা করতে শাস্ত্র বাধ্য করে না এবং গুরুজনের ওপর শ্রদ্ধা করতে গুরুজনেরাও বাধ্য করেন না। সাধক নিজেই শাস্ত্র এবং গুরুজনের ওপর শ্রদ্ধা-বিশ্বাস করেন, নিজেই তাঁদের শরণাগত হন। যদি স্বয়ং-এর সম্মুখীন না হয়েই জ্ঞান প্রাপ্ত করা যেত, তবে আজ পর্যন্ত ভগবানের অনেক অবতার হয়েছেন, অনেক জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ এসেছেন, তাঁদের আগমনে কোনো ব্যক্তিরই অজ্ঞান থাকা উচিত ছিল না অর্থাৎ সকলেরই তত্ত্বজ্ঞান হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সেরূপ দেখা যায় না। শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস নিয়ে শুনলে আত্মোপলব্ধিতে সাহায্য হয় মাত্র, কিন্তু স্বয়ং-ই স্বরূপে স্থিত হয়। সুতরাং উপরিউক্ত পদটির তাৎপর্য তত্ত্বজ্ঞানকে অসম্ভবরূপে ঘোষণা করা নয়, বরং এটি যে করণ-নিরপেক্ষ তাই জানানোই হল এর উদ্দেশ্য। মানুষ যে কোনো প্রকারে যতই তত্ত্বজ্ঞান জানবার চেষ্টা করুক না কেন, শেষ পর্যন্ত নিজেই সে নিজেকে জানতে পারে। শ্রবণ-মনন ইত্যাদি সাধন তত্ত্বজ্ঞানের পরম্পরাগত সাধন প্রণালী বলে মেনে নিলেও, প্রকৃতপক্ষে বোধ করণ-নিরপেক্ষ (নিজের দ্বারাই নিজে) হয়।

আপনাকে আপনি জানা কী করে হয় ? একটি হচ্ছে করা, আরেকটি হল দেখা এবং অপরটি হল জানা। করাতে কর্মেন্দ্রিয়ের, দেখায় জ্ঞানেন্দ্রিয়ের এবং জানায় স্বয়ং-এর প্রাধান্য থাকে।

জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায় না, বরং দেখা হয়, এবং তা ব্যবহারের পক্ষে উপযোগী। কিন্তু স্বয়ং-এর দ্বারা যা জানা হয়, সেটি দু'প্রকারের—একটি হল জগৎসংসারের সঙ্গে আমার নিত্য-ভিন্নতা এবং অপরটি হল পরমাত্মার সঙ্গে আমার সর্বদা অভিন্নতা। অন্য কথায়, পরিবর্তনশীল বিনাশশীল পদার্থগুলির সঙ্গে আমার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই এবং অপরিবর্তনশীল অবিনাশী পরমাত্মার সঙ্গে আমার নিত্য সম্পর্ক রয়েছে। এরূপ জানলে তখনই স্বতঃ অনুভূতি আসে। সেই অনুভূতি বাক্যের দ্বারা বর্ণনা করা যায় না। সেখানে বুদ্ধিও স্তব্ধ হয়ে যায়।

পরিশিষ্ট-ভাব—শুধুমাত্র শুনেই অর্থাৎ অভ্যাসের দ্বারা শরীরীকে জানা যায় না, তবে জিজ্ঞাসু হয়ে তত্ত্বজ্ঞ, অনুভবী মহাপুরুষদের কাছে শুনলে জানা যেতে পারে—**'যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ'** (গীতা ৭।৩)। **'আশ্চর্যবৎবদতি তথৈব চান্যঃ'** বলার অর্থ হল যে, তত্ত্ব অনুভবকারীদের মধ্যেও বর্ণনাকারী কেউ একজন (খুবই কম) হন। যাঁরা অনুভব করেন, তাঁরা সকলেই যে বর্ণনা করতে পারেন, তা নয়।

যেমন, জগতে শোনামাত্রই বিবাহ হয় না, নারী-পুরুষ উভয়ে যদি উভয়কে পতি-পত্নীরূপে স্বীকার করেন, তাহলেই বিবাহ হতে পারে, তেমনই শোনামাত্রই কেউ পরমাত্মতত্ত্ব জেনে ফেলতে পারে না, শোনবার পর যখন সে তাকে স্বীকার করে, তাতে স্থিত হয়, তখনই সে স্ব-স্বরূপকে জানতে সক্ষম হয়। সুতরাং শোনার মাধ্যমে মানুষ জ্ঞানের ভাষা শিখতে

---

[১]নিজেই নিজেকে জানার কথা গীতার কয়েক স্থানে দেখা যায় ; যেমন—

১) আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে। (২।৫৫)

২) যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ। আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে।। (৩।১৭)

৩) যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি।। (৬।২০)

৪) যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।। (১৫।১১)

শিখতে পারে, অন্যকে শোনাতে পারে, লিখতে পারে, ব্যাখ্যা করতে পারে, চিন্তাও করতে পারে, কিন্তু অনুভব করতে সক্ষম হয় না।

শুধুমাত্র শুনলেই পরমাত্মতত্ত্ব জানা যায় না, শোনার পর উপাসনা (সাধনা) করলে তবেই জানা সম্ভব হয়—**'শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে .....'** (গীতা ১৩।২৫)। যদি কোনো অনুভবী মহাপুরুষ পরমাত্মতত্ত্ব বর্ণনা করেন এবং শ্রোতা জিজ্ঞাসু ও শ্রদ্ধাপরায়ণ হন, তাহলে তখনই তাঁর জ্ঞান হতে পারে।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—এবারে দেহ এবং দেহীর (জীবাত্মার) প্রকরণের উপসংহার করা হচ্ছে।

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥ ৩০ ॥

[ভারত (হে ভরতবংশোদ্ভব অর্জুন !) ; সর্বস্য, দেহে (জীবগণের দেহে) ; অয়ম্ দেহী (এই দেহী) ; নিত্যম্ (সর্বদাই) ; অবধ্যঃ (অবধ্য) ; তস্মাৎ (সেইজন্য) ; সর্বাণি (সমস্ত) ; ভূতানি (প্রাণীদের জন্য) ; ত্বম্ (তোমার) ; শোচিতুম্ (শোক করা) ; ন, অর্হসি (উচিত নয়।)]

হে ভরতবংশোদ্ভব অর্জুন ! জীবগণের দেহে এই দেহী সর্বদাই অবধ্য, সেই কারণে এই সমস্ত প্রাণীর জন্য অর্থাৎ কোনো প্রাণীর জন্যই তোমার শোক করা উচিত নয় ॥ ৩০ ॥

ব্যাখ্যা—**'দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্বস্য ভারত'**—মনুষ্য, দেবতা, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি, স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত প্রাণীর শরীরে অবস্থিত এই দেহী সর্বদা অবধ্য অর্থাৎ অবিনাশী।

'অবধ্যঃ' শব্দটির দুটি অর্থ হয়—(১) একে বধ করা উচিত নয় (২) একে বধ করা যায় না। যেমন গরু অবধ্য, অর্থাৎ কখনো কোনো অবস্থাতেই গোহত্যা করা উচিত নয়। কারণ গোহত্যা অত্যন্ত দোষের এবং পাপদায়ক। কিন্তু দেহীর ব্যাপারে 'দেহীকে বধ করা উচিত নয়'—এরূপ কোনো কথা আসে না বরং এই দেহীকে কখনো কোনোপ্রকারে বধ (বিনাশ) করা যায় না এবং কেউ করতে পারে না—**'বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি'** (২।১৭)।

'তস্মাৎ সর্বাণি ভূতানি ত্বং শোচিতুমর্হসি'—সেইজন্য তোমার কোনো প্রাণীর জন্য শোক করা উচিত নয়। কারণ দেহীর বিনাশ কখনোই সম্ভব নয় এবং বিনাশশীল এই দেহ একমুহূর্তও স্থিরভাবে থাকে না।

এখানে **'সর্বাণি ভূতানি'** পদে বহুবচন দেবার অর্থ হল এই যে, কোনো প্রাণী যেন বাদ না যায় অর্থাৎ কোনো প্রাণীর জন্যই শোক করা উচিত নয়।

শরীর বিনাশশীল ; কারণ এর স্বভাবই হচ্ছে নাশ হওয়া। এটি প্রতি মুহূর্তেই ক্ষয় হচ্ছে। কিন্তু যেটি নিজের নিত্যস্বরূপ তার কখনো ক্ষয় হয় না। এই বাস্তবিকতা যদি উপলব্ধি করে নেওয়া যায়, তাহলে শোক হওয়া সম্ভবই নয়।

প্রকরণ সম্পর্কিত বিশেষ কথা

এখানে একাদশ শ্লোক থেকে ত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত যে প্রকরণ আছে, এটি বিশেষভাবে শরীরী-শরীর, নিত্য-অনিত্য, সৎ-অসৎ, অবিনাশী-বিনাশশীল—এই দুটিকে ভিন্নরূপে বিবেচনার জন্য অর্থাৎ এই দুটিকে পৃথক পৃথক জানাবার জন্যই হয়েছে। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত দেহী (জীবাত্মা) ও দেহ পৃথক—এই বিবেক জাগ্রত না হয়, ততক্ষণ কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ইত্যাদি কোনো যোগের অনুষ্ঠানই ঠিকমতো কাজে আসে না। শুধু তাই নয়, স্বর্গাদিলোক প্রাপ্তির জন্যও দেহী ও দেহের পার্থক্য জানা প্রয়োজন। কারণ দেহী যদি দেহ থেকে পৃথক না হয়, তাহলে দেহের মৃত্যু হলে স্বর্গে কে যায় ? সুতরাং অস্তিবাদী যত দার্শনিক আছেন, তাঁরা অদ্বৈতবাদী বা দ্বৈতবাদী, যে কোনো মতেরই হন না কেন, সকলেই দেহী এবং দেহের পার্থক্য স্বীকার করেন। এইস্থানে ভগবান এই পার্থক্য স্পষ্ট করতে চেয়েছেন।

এই প্রকরণে ভগবান যে কথা বলেছেন, তা প্রায় সমস্ত মানুষেরই অনুভবের কথা। যেমন, দেহ পরিবর্তনশীল কিন্তু দেহী অপরিবর্তনীয়। দেহী যদি পরিবর্তনশীল হয় তবে শরীরের পরিবর্তনের কথা কে জানবে ? প্রথমে বাল্যাবস্থা ছিল, তারপর যৌবন এল ; কখনো অসুখ হয়, কখনো বা সেরে যায় এইভাবে অবস্থাগুলি পরিবর্তিত হয়, কিন্তু এই অবস্থাগুলির জ্ঞাতারূপে দেহী একইরূপে থাকে। সুতরাং পরিবর্তনশীল এবং অপরিবর্তনীয়—এই দুটি কখনো এক হতে পারে না। এটি সকলেরই প্রত্যক্ষ অনুভূতি। এইজন্য ভগবান এই প্রকরণে আত্মা-অনাত্মা, ব্রহ্ম-জীব, প্রকৃতি-পুরুষ, জড়-চেতন, মায়া-অবিদ্যা ইত্যাদি কোনো দার্শনিক শব্দের প্রয়োগ করেননি[১]। কারণ লোকে দার্শনিক বিষয়গুলি কেবলমাত্র শেখার জন্য মেনে নেয়। অর্থাৎ এ বিষয়গুলি শুধু পড়ার বিষয় বলে মেনে নেওয়া হয়। এইদিকে লক্ষ রেখে ভগবান এই প্রকরণে দার্শনিক শব্দের প্রয়োগ না করে দেহ-দেহী, শরীর-শরীরী, অসৎ-সৎ, বিনাশী-অবিনাশী শব্দগুলি প্রয়োগ করেছেন। যে এই দুটির পার্থক্য ঠিকমতো জেনে নেয়, সে কখনো বিন্দুমাত্র শোকগ্রস্ত হয় না। যে কেবলমাত্র দার্শনিক কথাগুলি আওড়ায়, তার শোক দূর হয় না।

একটি হল দর্শনশাস্ত্রগুলি নিয়ে পড়াশোনা করা আর একটি হল অনুভব করা। এ দুটি বিষয় পৃথক এবং এগুলির মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। পড়ার ক্ষেত্রে ব্রহ্ম, ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি এবং জগৎ—এই সমস্তই জ্ঞানের বিষয় অর্থাৎ অধ্যয়নকারী জ্ঞাতা এবং ব্রহ্ম, ঈশ্বর ইত্যাদি হল ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের বিষয়। যে অধ্যয়ন করে সে তার জ্ঞান বৃদ্ধি করতে চায়, বিদ্যা সংগ্রহ করতে চায় । কিন্তু যিনি সাধক, মুমুক্ষু, জিজ্ঞাসু এবং ভক্ত হন, তিনি অনুভব করতে চান অর্থাৎ প্রকৃতি এবং জগৎ থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করে এবং নিজেই নিজেকে অনুভব করে ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্নতা অনুভব করতে চান, ঈশ্বরের শরণাগত হতে চান।

পরিশিষ্ট-ভাব— ভগবান একাদশ থেকে ত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত দেহ-দেহীর বিবেকের বর্ণনা করেছেন। এই প্রকরণে ভগবান ব্রহ্ম-জীব, প্রকৃতি-পুরুষ, জড়-চেতন, মায়া-অবিদ্যা, আত্মা-অনাত্মা ইত্যাদি কোনো দার্শনিক শব্দ প্রয়োগ করেননি। এর কারণ হল যে ভগবান এটি শুধুমাত্র পাঠের বিষয় অর্থাৎ শেখার বিষয় না করে অনুভব করার বিষয় করতে চেয়েছেন এবং প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে দেহ-দেহীর পৃথকভাবের অনুভব মানুষমাত্রেই করতে সক্ষম। এর জন্য বিস্তর অধ্যয়ন করার বা অধিকারী হওয়ার প্রয়োজন নেই।

সৎ-অসতের বিচার মানুষ যদি নিজ শরীরকে নিয়ে করে, তাহলে সে সাধক হয় আর যদি জগৎ-সংসারকে ধরে করে, তাহলে বিদ্বান হয়। নিজেকে সরিয়ে রেখে জগতের সৎ-অসতের বিচারকারী মানুষ বক্তা (শিক্ষণপ্রাপ্ত) বা জ্ঞানী হতে পারে, কিন্তু তার নিজের অনুভব হতে পারে না। কিন্তু নিজেকে নিয়ে সৎ-অসতের বিচারকারী মানুষ প্রকৃত (অনুভবী) জ্ঞানী হয়। অর্থাৎ জগতে সৎ-অসতের বিচার হয় শুধু পাণ্ডিত্যের জন্য, কিন্তু গীতা পাণ্ডিত্য করার জন্য নয়। তাই ভগবান দার্শনিক শব্দাদি প্রয়োগ না করে দেহ-দেহী, শরীর-শরীরীর মতো সাধারণ শব্দাদি ব্যবহার করেছেন। যারা জগতে সৎ-অসতের বিচার করে, তারা নিজেকে আলাদা রেখে পাণ্ডিত্যের অধিকারী হয়ে ওঠে। অপরপক্ষে নিজের মধ্যে দেহ-দেহী বিচার করলে মানুষমাত্রেই জ্ঞানপ্রাপ্তির অধিকার লাভ করে। অনুভব করার জন্য দেহ-দেহীর বিচার উপযোগী আর শেখাবার জন্য উপযোগী হল তত্ত্ব-বিচার। তাই সাধক যদি অনুভব করতে চান তাহলে তাঁর সর্বপ্রথম শরীরের থেকে আত্মার পৃথকভাব অনুভব করতে হয়। এইভাবে যে শরীর শরীরীর থেকে সম্পর্করহিত এবং শরীরী শরীরের থেকে সম্পর্করহিত অর্থাৎ 'আমি শরীর নই' এই বোধ হতে থাকে।। সে যত সততার সঙ্গে, দৃঢ়তার সঙ্গে, বিশ্বাসের সঙ্গে, নিঃসন্দেহ হয়ে শরীরের অস্তিত্ব ও গুরুত্ব মেনে নিয়েছে, ততটাই সততা, দৃঢ়তা, বিশ্বাস নিয়ে, নিঃসন্দেহভাবে স্ব-স্বরূপের অস্তিত্ব ও গুরুত্ব মেনে নেওয়া এবং অনুভব করা প্রয়োজন।

শরীর শুধুমাত্র কর্ম করার সাধন (মাধ্যম) আর কর্ম শুধু জগতের জন্যই করা হয়। যেমন, কোনো লেখক যখন লিখতে বসেন, তখন তিনি লেখনী হাতে নেন আর যখন লেখা বন্ধ করেন তখন লেখনী যথাস্থানে রেখে দেন। তেমনই সাধকের

[১]যদিও এই প্রকরণে (পঞ্চদশ এবং একবিংশ শ্লোকে) দুবার 'পুরুষ' শব্দের প্রয়োগ হয়েছে, তবুও এটি দার্শনিক 'প্রকৃতি-পুরুষ'-এর অর্থে প্রযুক্ত না হয়ে 'মনুষ্য'-এর অর্থেই প্রযুক্ত হয়েছে।

কর্ম করার সময় শরীরকে স্বীকার করা উচিত আর কর্ম সমাপ্ত হলেই শরীরকে লেখনীর মতো আলাদা মনে করে যথাবৎ সম্বন্ধশূন্য মনে করা উচিত — তাতে আসক্ত না হওয়া উচিত। কেননা আমাদের যদি কোনো কিছু করার না থাকে তাহলে শরীরকে প্রয়োজন হবে কেন ?

সাধকদের জন্য প্রয়োজনীয় কথা হল—তিনি অসৎরূপে যাকে জানেন সেই অসৎকে পরিত্যাগ করা। সাধক যাকে অসৎ বলে জানেন, তা যদি পরিত্যাগ করেন, তাহলে তাঁর সাধনা সহজ, সুগম হয় এবং শীঘ্রই সিদ্ধিলাভ করেন। সাধকের নিজ সাধ্যে যে প্রীতির ভাব, তাকেই সাধন বলা হয়। এই প্রীতির ভাব কোনো বস্তু, ব্যক্তি, যোগ্যতা, সামর্থ্য ইত্যাদির দ্বারা অথবা কোনো অভ্যাসের সাহায্যে প্রাপ্ত করা যায় না, প্রকৃতপক্ষে সাধ্যতে আপনভাব এলে তবেই তা প্রাপ্ত হয়। সাধক যাকে আপন বলে মনে করেন, তাতেই তাঁর ভালোবাসা স্বতঃস্ফূর্তভাবে জেগে ওঠে। কিন্তু প্রকৃত আপনভাব সেই বস্তুতেই হওয়া উচিত, যাতে এই চারটি ব্যাপার থাকে —

১) যাতে আমার সাধর্ম্য অর্থাৎ স্বরূপগত ঐক্য থাকে।

২) যার সঙ্গে আমি নিত্যসম্পর্কিত।

৩) যার কাছ থেকে আমি কখনও কিছু চাই না।

৪) আমার যা কিছু আছে, সে সব আমি যাকে সমর্পণ করতে পারি।

এই চারটি বিষয় ভগবানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কেননা শরীর এবং জগতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নিত্য স্থায়ী নয় এবং ওগুলির সঙ্গে আমাদের স্বরূপগত ঐক্যও নেই। প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনশীল বস্তুর সঙ্গে অপরিবর্তনশীল বস্তুর ঐক্য কী করে হবে ? আমরা শরীরের সঙ্গে যে ঐক্য দেখে থাকি, তা বাস্তবিক সত্য নয়, সেটি মেনে নেওয়া হয়েছে মাত্র। মেনে নেওয়া ঐক্য শুধু কর্তব্য পালনের জন্য। অর্থাৎ যার সঙ্গে আমাদের ঐক্য মেনে নেওয়া হয়েছে তার সেবা করা যেতে পারে কিন্তু তার সঙ্গে প্রকৃত ঐক্যভাব স্থাপিত হতে পারে না।

যাকে আমরা অসৎ (অনিত্য) বলে জানি তাকে ত্যাগ করার জন্য সাধকের বিবেকবিরুদ্ধ সম্পর্কগুলি পরিত্যাগ করা প্রয়োজন। যার সঙ্গে আমাদের নিত্যসম্পর্ক নেই এবং স্বরূপগত ঐক্যও নেই, সেগুলি নিজের বলে মনে করা বিবেকবিরুদ্ধ সম্বন্ধ। সেই ভাবে দেখলে শরীরকে নিজের মনে করা বিবেকবিরুদ্ধ। এই বিবেকবিরুদ্ধ সম্পর্ক থাকলে কোনো সাধনই সিদ্ধ হতে পারে না। শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে একজন যতই তপস্যা করুক, সমাধি লাভ করুক, লোক-লোকান্তর পরিভ্রমণ করুক না কেন, তাহলেও তার মোহনাশ এবং সত্যতত্ত্ব প্রাপ্তি সম্ভব নয়। বিবেকবিরুদ্ধ সম্পর্ক পরিত্যাগ করলেই মোহনাশ হয় এবং সত্যতত্ত্ব প্রাপ্ত করা যায়। তাই বিবেকবিরুদ্ধ সম্পর্ক ত্যাগ না করা পর্যন্ত সাধকের নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়। আমরা যদি শরীরের সঙ্গে মেনে নেওয়া এই বিবেকবিরুদ্ধ সম্পর্ক পরিত্যাগ নাও করি, তাহলেও শরীর একসময় আমাদের ত্যাগ করবেই। যা আমাদের ত্যাগ করবেই, তাকে ত্যাগ করা এমন কি কঠিন কাজ ? তাই যে কোনো পথের যেমনই সাধক হোন না কেন তাঁকে এই সত্য স্বীকার করতেই হবে যে আমি শরীর নই, শরীর আমার নয় এবং শরীর আমার জন্য নয় ; কেননা আমি অশরীরী, আমার প্রকৃত স্বরূপ হল অব্যক্ত ।

সাধকের যতক্ষণ শরীরের সঙ্গে আমি-আমার সম্পর্ক থাকে, ততক্ষণ সাধনা করলেও সিদ্ধিলাভ হয় না এবং তার সকল শুভকর্ম, সার্থক চিন্তা ও প্রতিষ্ঠা আসক্তিতেই আবদ্ধ থাকে । সাধক যদি যজ্ঞ-তপ-দান ইত্যাদি শুভ কর্ম করতে থাকেন, আত্মা ও পরমাত্মাকে ধ্যান করতে থাকেন বা সমাধিমগ্ন হন তাহলেও তাঁর বন্ধন সম্পূর্ণভাবে দূর হয় না। কারণ শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক মেনে নেওয়াই হল আসল বন্ধন, প্রকৃত দোষ, যার থেকে সমস্ত দোষের উৎপত্তি হয়ে থাকে। সাধকের যদি শরীরের সঙ্গে এই মেনে নেওয়া সম্পর্ক সর্বতোভাবে দূর হয় তাহলে তাঁর দ্বারা অশুভ কর্ম তো হয়ই না উপরন্তু শুভকর্মের আসক্তিও দূর হয়। কোনো অর্থহীন চিন্তা তিনি করেন না এবং সার্থক চিন্তাতেও তাঁর কোনো আসক্তি থাকে না। তাঁর সর্বপ্রকার চাঞ্চল্য দূর হয় এমনকি সমাধিতে বা স্থিরতায় কিংবা নির্বিকল্প স্থিতিতে পর্যন্ত কোনোরূপ আসক্তি থাকে না। এইভাবে স্থূলশরীর দ্বারা সংঘটিত কর্মে, সূক্ষ্মশরীর দ্বারা হওয়া চিন্তায় এবং কারণশরীর দ্বারা হওয়া স্থৈর্যের ফলে আসক্তি নাশ হলে সাধকের সাধন সিদ্ধ হয় অর্থাৎ তাঁর মোহনাশ হয়ে সত্যতত্ত্ব উপলব্ধি হয়। তাই ভগবান তাঁর

উপদেশের প্রারম্ভে শরীরের সঙ্গে বন্ধনের সম্পর্ক সর্বতোভাবে মোচন করার উদ্দেশ্যে শরীর-শরীরীর বিবেকের (পৃথকত্বের) আলোচনা করেছেন।

***

সম্বন্ধ—অর্জুনের মনে আত্মীয়স্বজন বধের শোক ছিল এবং গুরুজনদের বধ করায় পাপের ভয় ছিল অর্থাৎ তাঁর দুঃখ ছিল এই যে, আত্মীয়দের মৃত্যু হলে তাঁদের জন্য ইহলোকে শোক হবে এবং ভয় ছিল যে, পরলোকে পাপের জন্য নরকাদি দুঃখ ভোগ করতে হবে। তাই ভগবান অর্জুনের শোক অপসারণ করার নিমিত্ত একাদশ শ্লোক থেকে ত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত বলেছেন এবং এখন অর্জুনের পাপের ভয় দূর করার জন্য ক্ষাত্রধর্ম-বিষয় নিয়ে পরের প্রকরণটি শুরু করছেন।

স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে॥ ৩১ ॥

[চ (এবং) ; **স্বধর্মম্** (নিজের ক্ষাত্রধর্মকে) ; **অবেক্ষ্য, অপি** (দেখেও) ; **বিকম্পিতুম্** (কম্পিত হওয়া) ; **ন, অর্হসি** (উচিত নয়) ; **হি** (কারণ) ; **ক্ষত্রিয়স্য** (ক্ষত্রিয়ের পক্ষে) ; **ধর্ম্যাৎ, যুদ্ধাৎ** (ধর্মযুদ্ধ অপেক্ষা) ; **অন্যৎ** (আর কিছুই) ; **শ্রেয়ঃ** (কল্যাণকারী) ; **ন, বিদ্যতে** (নেই।)]

স্বধর্মের দিকে লক্ষ্য রেখেও তোমার শিহরিত হওয়া অর্থাৎ কর্তব্যকর্ম হতে বিচলিত হওয়া উচিত নয়; কারণ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্মযুদ্ধ অপেক্ষা আর কিছুই কল্যাণকারী কর্ম নেই ॥ ৩১ ॥

ব্যাখ্যা— [প্রথম দুটি শ্লোকে যুদ্ধ থেকে যে লাভ হতে পারে তার বর্ণনা করা হয়েছে।]

'স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি'—জীব স্বয়ং পরমাত্মার অংশ। এটি যখন শরীরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়, তখন এই 'স্ব'কে অর্থাৎ নিজেকে যা বলে মেনে নেয়, সেইটিকে তার কর্তব্য—স্বধর্ম বলা হয়। যেমন, কেউ নিজেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র বলে মনে করে, তখন নিজ বর্ণ অনুযায়ী কর্তব্যপালন করাই হল তার স্বধর্ম। কেউ নিজেকে শিক্ষক বা কর্মী বলে মনে করলে, শিক্ষক বা কর্মীর কর্তব্য পালন করাই তো তার স্বধর্ম। কেউ নিজেকে যদি কারো পিতা বা পুত্র বলে মনে করে, তাহলে পুত্র বা পিতার প্রতি কর্তব্য পালন করাই তার স্বধর্ম।

এইস্থানে ক্ষত্রিয়দের কর্তব্যকর্মকে 'ধর্ম' নামে বলা হয়েছে[১]। ক্ষত্রিয়ের মুখ্য কর্তব্যকর্ম হল যুদ্ধে বিমুখ না হওয়া। অর্জুন ক্ষত্রিয়, সুতরাং যুদ্ধ করা তাঁর স্বধর্ম। সেইজন্য ভগবান বলেছেন যে, 'যদি স্বধর্ম অনুযায়ী দেখা যায়, তাহলেও ক্ষাত্রধর্ম অনুযায়ী তোমার পক্ষে যুদ্ধ করা কর্তব্য। নিজ কর্তব্য হতে তোমার কখনো বিমুখ হওয়া উচিত নয়।'

'ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে'—ধর্মযুদ্ধ ব্যতিরেকে ক্ষত্রিয়ের আর কোনো কল্যাণকারী কর্ম নেই অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নির্দিষ্ট কর্তব্যের অনুষ্ঠান করাই হল প্রধান কাজ (গীতা ১৮।৪৩)। এইরূপেই ব্রাহ্মণ, বৈশ্য এবং শূদ্রেরও নিজ নিজ কর্তব্যকর্ম করা ব্যতীত অন্য কোনো কল্যাণকারী কর্ম নেই।

সপ্তম শ্লোকে অর্জুন প্রার্থনা করেছিলেন যে, 'আপনি আমার পক্ষে যেটি নিশ্চিতরূপে শ্রেয় সেটি বলুন।' তার উত্তরে ভগবান বলছেন যে, 'শ্রেয় (কল্যাণ) হয় নিজ ধর্ম পালন করলে। যে কোনো কারণেই হোক না কেন নিজ ধর্ম পরিত্যাগ কল্যাণকারক নয়। সুতরাং যুদ্ধরূপ ধর্ম হতে তোমার বিমুখ হওয়া উচিত নয়।'

পরিশিষ্ট-ভাব—দেহ-দেহীর পার্থক্য বর্ণনা করার পরে ভগবান এই শ্লোক থেকে আটত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত দেহীর

[১] অষ্টাদশ অধ্যায়ে যেখানে (১৮।৪২-৪৮-এ) চতুর্বর্ণের কর্তব্যকর্মের বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে মধ্যস্থলে 'ধর্ম' শব্দটিও আছে—'শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ' (১৮।৪৭)-এর দ্বারা 'কর্ম' এবং 'ধর্ম' শব্দ পর্যায়বাচী বলে প্রমাণিত হয়।

স্বধর্মপালনের (কর্তব্যপালনের) বর্ণনা করেছেন। কেননা দেহ-দেহীর পার্থক্য-জ্ঞান থেকে যে তত্ত্ব লাভ হয়, তা দেহের সদুপযোগ ও স্বধর্মপালনের দ্বারাও পাওয়া সম্ভব। বিবেকে মুখ্য ব্যাপার 'জানা' আর স্বধর্মপালনে মুখ্য হল 'করা'। যদিও মানুষের পক্ষে বিবেকই প্রধান, যা ব্যবহারে, পরমার্থে, লোক-পরলোকে সর্বত্রই উপযোগী। কিন্তু যে সব ব্যক্তি দেহ-দেহীর পার্থক্য বুঝতে সক্ষম নয়, তাঁদের জন্য ভগবান স্বধর্ম পালন করার কথা বলেছেন, যাতে তাঁরা শুধুমাত্র তার্কিক জ্ঞানী না হয়ে প্রকৃত তত্ত্ব অনুভব করতে সক্ষম হয়।

অর্থাৎ যেসব ব্যক্তি পরমাত্মতত্ত্ব জানতে আগ্রহী, কিন্তু তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং প্রগাঢ় বৈরাগ্য না থাকায় জ্ঞানযোগের তত্ত্ব জানতে অক্ষম, তাঁরা কর্মযোগ সহযোগে পরমাত্মতত্ত্ব জানতে সক্ষম হন, কারণ জ্ঞানযোগের দ্বারা যে অনুভব হয়, সেই অনুভব কর্মযোগের সাহায্যেও হওয়া সম্ভব (গীতা ৫।৪-৫)

অর্জুন ক্ষত্রিয় ছিলেন, ভগবান তাই এই প্রকরণে ক্ষাত্রধর্মের কথা বলেছেন। আসলে এইস্থানে ক্ষাত্রধর্ম উপলক্ষ্য মাত্র। তাই এই স্থানে ব্রাহ্মণাদি অন্যান্য বর্ণের মানুষদেরও তাঁদের নিজ নিজ ধর্ম (কর্তব্য) পালনের কথা ধরে নিতে হবে। (গীতা ১৮।৪২-৪৩-৪৪)।

['স্বধর্ম'কেই স্বভাবজ কর্ম, সহজ কর্ম, স্বকর্ম ইত্যাদি নামে উল্লেখ করা হয়েছে (গীতা ১৮।৪১-৪৮)। স্বার্থ, অহংকার এবং ফলেচ্ছা পরিত্যাগ করে অন্যের হিতার্থে কর্ম করাই স্বধর্ম। স্বধর্মের পালনই হল কর্মযোগ।]

❋ ❋ ❋

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্॥ ৩২ ॥

[যদৃচ্ছয়া, উপপন্নম্ (আপনা হতে প্রাপ্ত) ; অপাবৃতম্ (মুক্ত) ; স্বর্গদ্বারম্ (স্বর্গদ্বারস্বরূপ) ; পার্থ (হে পার্থ !) ; সুখিনঃ, ক্ষত্রিয়াঃ, চ (ভাগ্যবান ক্ষত্রিয়গণই) ; ঈদৃশম্ (এইরূপ) ; যুদ্ধম্ (যুদ্ধ) ; লভন্তে (লাভ করে থাকেন।)]

আপনা হতে প্রাপ্ত এই যুদ্ধ মুক্ত স্বর্গদ্বারস্বরূপ। হে পার্থ, ভাগ্যবান ক্ষত্রিয়গণই এইরূপ যুদ্ধ লাভ করে থাকেন ॥ ৩২ ॥

ব্যাখ্যা—'যদৃচ্ছয়া......অপাবৃতম্'—পাণ্ডবগণের সঙ্গে পাশা খেলার সময় দুর্যোধন শর্ত রেখেছিলেন যে, 'যদি আপনারা এতে পরাজিত হন, তাহলে আপনাদের দ্বাদশ বর্ষ বনবাস এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাস ভোগ করতে হবে। ত্রয়োদশ বর্ষ পরে আপনারা আপনাদের রাজ্য ফিরে পাবেন। কিন্তু যদি অজ্ঞাতবাসে থাকাকালীন আমরা আপনাদের সন্ধান পাই, তবে পুনর্বার আপনাদের দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ভোগ করতে হবে।' পাশা খেলায় পরাজিত হয়ে শর্তানুযায়ী পাণ্ডবগণ দ্বাদশ বৎসর বনবাস এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করেন। তারপরে যখন তাঁরা শর্ত অনুসারে নিজেদের রাজ্য ফেরত চাইলেন, দুর্যোধন উত্তর দিলেন যে, 'বিনা যুদ্ধে সূচাগ্র মেদিনীও আমি দেব না।' দুর্যোধনের এই কথা শুনেও পাণ্ডবদের পক্ষ থেকে বারংবার সন্ধির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু দুর্যোধন তা গ্রহণ করেননি। সেইজন্যই ভগবান অর্জুনকে বলছেন যে, 'এই যুদ্ধ আপনা হতেই তোমরা প্রাপ্ত হয়েছ। স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্ত ধর্মীয় যুদ্ধে যে ক্ষত্রিয় শৌর্যবীর্যের সঙ্গে সম্মুখীন হয় ও মৃত্যুবরণ করে, তার জন্য স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত থাকে।'

'সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্'— এইরূপ ধর্মীয় যুদ্ধ যে প্রাপ্ত হয়েছে, সেই ক্ষত্রিয় দারুণ সুখী মানুষ। এখানে সুখী বলার অর্থ নিজ কর্তব্যপালন করায় যে সুখ, সেই সুখ সামান্য সংসারসুখ ভোগ দ্বারা পাওয়া যায় না। জাগতিক ভোগসুখ তো পশুপক্ষীরাও পেয়ে থাকে। অতএব যিনি কর্তব্যপালন করার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁকে ভাগ্যবান বলে মনে করা উচিত।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—যুদ্ধ না করলে কী ক্ষতি হয়—পরবর্তী চারটি শ্লোকে তার বর্ণনা করেছেন।

অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্মং কীর্তিং চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি॥ ৩৩ ॥

[অথ, চেৎ (আর যদি) ; ত্বম্, ইমম্ (তুমি এই) ; ধর্ম্যম্, সংগ্রামং (ধর্মযুদ্ধ) ; ন, করিষ্যসি (না কর) ; ততঃ (তাহলে); স্বধর্মম্ (স্বধর্ম) ; চ (এবং) ; কীর্তিম্ (কীর্তি) ; হিত্বা (পরিত্যাগ করে) ; পাপম্ (পাপ) ; অবাপ্স্যসি (যুক্ত হবে।)]

আর যদি তুমি এই ধর্মযুদ্ধ না কর, তাহলে স্বধর্ম ও কীর্তি ত্যাগ করে পাপের ভাগী হবে ॥ ৩৩ ॥

ব্যাখ্যা—'অথ........পাপমবাপ্স্যসি'—এখানে 'অথ' অব্যয়টি পক্ষান্তরে ব্যবহৃত হয়েছে এবং 'চেৎ' অব্যয়টি সম্ভাবনার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর তাৎপর্য হল যে, তুমি যুদ্ধ না করেও থাকতে পারবে না, নিজ ক্ষাত্র-স্বভাবের পরবশ হয়ে তুমি যুদ্ধ করবেই (গীতা ১৮।৬০), কিন্তু যদি এরূপ মনেও করা যায় যে, তুমি যুদ্ধ করবে না, তাহলে তোমার দ্বারা ক্ষাত্রধর্ম পরিত্যক্ত হবে। ক্ষাত্রধর্ম পরিত্যাগ করলে তোমার পাপ হবে এবং তোমার কীর্তিও নষ্ট হবে।

আপনা হতে প্রাপ্ত এই ধর্মরূপ কর্তব্য ত্যাগ করে কী করবে ? নিজ ধর্ম পরিত্যাগ করলে তোমাকে পরধর্ম স্বীকার করতে হবে, তাতে তোমার পাপ হবে। যুদ্ধ পরিত্যাগ করলে অন্য ব্যক্তিরা মনে করবে যে, অর্জুনের মতো যোদ্ধাও মৃত্যুভয়ে ভীত ! এতে তোমার কীর্তি নষ্ট হবে।

* * *

অকীর্তিং চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪ ॥

[চ, ভূতানি (এবং, সকলপ্রাণী) ; অপি, তে (তোমার) ; অব্যয়াম্ (চিরকাল) ; অকীর্তিম্ (অকীর্তি) ; কথয়িষ্যন্তি (বলতে থাকবে) ; অকীর্তিঃ (এই অকীর্তি) ; সম্ভাবিতস্য (সম্মানিত ব্যক্তির পক্ষে) ; মরণাৎ, চ (মৃত্যুর থেকেও) ; অতিরিচ্যতে (দুঃখদায়ক হয়।)]

সকল প্রাণী চিরকাল তোমার অকীর্তির কথা বলতে থাকবে। এই অকীর্তি সম্মানিত ব্যক্তির পক্ষে মৃত্যুর থেকেও দুঃখদায়ক হয় ॥ ৩৪ ॥

ব্যাখ্যা—'অকীর্তিং চাপি .... তেঽব্যয়াম্'—মনুষ্য, দেবতা, যক্ষ, রাক্ষস ইত্যাদি যে সমস্ত প্রাণীর তোমার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই অর্থাৎ যাদের সঙ্গে তোমার মিত্রতা নেই বা শত্রুতাও নেই এরূপ সাধারণ প্রাণীও অপকীর্তি ও অপযশ সম্পর্কে বলে বেড়াবে যে, 'দেখো ! অর্জুন কীরূপ ভীরু, সে নিজ ক্ষাত্রধর্ম থেকে বিমুখ হয়েছে। সে এত বড় যোদ্ধা, কিন্তু যুদ্ধের সময় তার কাপুরুষতা প্রকটিত হয়ে গেল, যা আগে অন্য কেউ জানত না' ইত্যাদি।

'তে' বলার অর্থ হল যে স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতালেও যার এত প্রভাব ! অতএব, তোমার অপকীর্তিও সেইরূপই হবে। 'অব্যয়াম্' বলার অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের জন্য যত বেশি প্রসিদ্ধ হন, তাঁর কীর্তি বা অপকীর্তিও ততই বেশি স্থায়ী হয়।

'সম্ভাবিতস্য চাকীর্তির্মরণাদতিরিচ্যতে'—এই শ্লোকটির পূর্বার্ধে ভগবান সাধারণ প্রাণিগণের দ্বারা অর্জুনের নিন্দা করার কথা বলেছেন। এবার শ্লোকটির শেষার্ধে সকলের পক্ষে প্রযোজ্য সাধারণ বিষয়গুলি জানাচ্ছেন।

জাগতিক দৃষ্টিতে যাকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয়, যাকে লোকেরা অত্যন্ত উচ্চ দৃষ্টিতে দেখে, এরূপ মানুষের যখন অপযশ হয়, তখন তা তার কাছে মৃত্যুর চেয়ে অধিক দুঃখদায়ক হয়। কারণ আয়ু তো মৃত্যুতেই সমাপ্ত হয়, তাতে তার কিছু করার নেই, কিন্তু ধর্মমর্যাদা এবং কর্তব্য থেকে চ্যুত হওয়াতে তার অপযশ হয়। অর্থাৎ সাধারণের মধ্যে যাঁকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয়, তিনি যদি কর্তব্য থেকে চ্যুত হন, তবে তাঁর অত্যন্ত অপযশ হয়।

* * *

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাং চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্॥ ৩৫ ॥

[চ, মহারথাঃ (এবং মহারথিগণ) ; মংস্যন্তে (মনে করবেন) ; ত্বাম্, ভয়াৎ (ভয়বশতঃ তুমি) ; রণাৎ, উপরতম্ (যুদ্ধে বিরত হচ্ছ) ; যেষাম্ (যাঁদের) ; ত্বম্ (তুমি) ; বহুমতঃ (বহুজনের মান্য ব্যক্তি) ; ভূত্বা (হয়েছিলে) ; লাঘবম্ (লঘুত্ব) ; যাস্যসি (প্রাপ্ত হবে।)]

মহারথিগণ মনে করবেন যে ভয়বশতঃ তুমি যুদ্ধে বিরত হচ্ছ। যাঁদের ধারণায় তুমি বহুজনমান্য ব্যক্তি হয়েছিলে, তাঁদের দৃষ্টিতে তুমি লঘুত্ব প্রাপ্ত হবে॥ ৩৫ ॥

ব্যাখ্যা—'ভয়াদ্রণাদুপরতং.........মহারথাঃ'—'তুমি মনে করছ যে তুমি শুধুমাত্র নিজ কল্যাণের জন্য যুদ্ধ থেকে বিমুখ হচ্ছ ; কিন্তু যদি তাই হত এবং যুদ্ধকে তুমি পাপ বলে মনে করতে, তবে প্রথম থেকেই তুমি নির্জনে থেকে ভজন-মনন করতে এবং যুদ্ধে তোমার প্রবৃত্তিই হত না। কিন্তু তুমি একান্তে না থেকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছ। এখন যদি তুমি যুদ্ধে নিবৃত্ত হও, তাহলে বড় বড় রথী- মহারথিগণ মনে করবেন যে, 'যুদ্ধে নিহত হবার ভয়েই অর্জুন যুদ্ধে নিবৃত্ত হয়েছে। সে যদি ধর্ম নিয়ে বিচার বিবেচনা করত তবে যুদ্ধে নিবৃত্ত হত না ; কারণ যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। সুতরাং অর্জুন মৃত্যুভয়েই যুদ্ধে নিবৃত্ত হচ্ছে।'

'যেষাং চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্'—ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, শল্য প্রমুখ যত বড় বড় মহারথী আছেন, তাঁদের দৃষ্টিতে তুমি বহুমান্য হয়ে রয়েছ অর্থাৎ তাঁদের মনে এই বিশ্বাস আছে যে যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে নামী যোদ্ধা তো অর্জুনই ! যুদ্ধে অনেক দৈত্য, দেবতা, গন্ধর্বকেও সে পরাজিত করেছে। যদি এখন তুমি যুদ্ধে বিরত হও, তাহলে ওই সব মহারথীর কাছে তুমি লঘুত্ব (তুচ্ছত্ব) প্রাপ্ত হবে অর্থাৎ তাঁদের দৃষ্টিতে তোমার পতন হবে।

※ ※ ※

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্॥ ৩৬ ॥

[তব, অহিতাঃ (তোমার শত্রুগণ) ; তব, সামর্থ্যম্ (তোমার সামর্থ্যের) ; নিন্দন্তঃ (নিন্দা করে) ; বহূন্ (অনেক) ; অবাচ্যবাদান্ (অকথ্য বাক্য) ; চ, বদিষ্যন্তি (বলবে) ; ততঃ (এর থেকে) ; দুঃখতরম্ (বড় দুঃখ) ; নু, কিম্ (আর কিসে ?)]

শত্রুগণ তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করে অনেক অকথ্য বাক্য বলবে। এর থেকে বড় দুঃখ আর কিসে হতে পারে ? ॥ ৩৬ ॥

ব্যাখ্যা—'অবাচ্যবাদাংশ্চ .... সামর্থ্যম্'—শত্রু অর্থাৎ অহিতকারীকে 'অহিত' বলা হয়। দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ প্রমুখ তোমার যে সকল শত্রু আছে, তুমি তাদের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন না হলেও এরা নিজেরাই তোমার প্রতি বৈরীসম্পন্ন হয়ে তোমার অহিত করবে। এরা জানে যে তুমি অত্যন্ত বীর যোদ্ধা, এরূপ জেনেও এরা তোমাকে নপুংসক বলে তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করবে, বলবে, 'দেখ যুদ্ধের সময়েই তো অর্জুন সরে পড়ল ! থাকলে আমাদের সামনে টিকতে পারত নাকি ? আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে কি পেরে উঠত ?' এইরূপ তোমাকে দুঃখ দেবার জন্য, তোমার মনে জ্বালা ধরাবার জন্য কত অকথ্য বাক্য বলবে ! ওদের কটু কথা তুমি কী করে সহ্য করবে ?

'ততো দুঃখতরং নু কিম্'—এর থেকে বেশি আর কী দুঃখ হতে পারে ? কারণ দেখা যায় যে, মানুষ যেমন তুচ্ছ ব্যক্তির দ্বারা অপমানিত হয়ে তা সহ্য করতে না পেরে নিজ সামর্থ্যের অধিক, যোগ্যতার অধিক দুঃসাহসিক কাজ করে মৃত্যুকেও বরণ করে নেয়, তেমনি যখন শত্রুরা তোমাকে অযথা অপমান করবে, তিরস্কৃত করবে, তখন তুমি তা সহ্য করতে না পেরে ক্রোধান্বিত হয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। তুমি যুদ্ধ

না করে থাকতে পারবে না। এখন তো তুমি যুদ্ধ হতে বিরত হচ্ছ, কিন্তু যখন তুমি উত্তেজনায় যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে, তখন তোমার কত নিন্দা হবে। সেই নিন্দা তুমি কী করে সহ্য করবে ?

***

সম্বন্ধ—পূর্ববর্তী চারটি শ্লোকে যুদ্ধ না করলে কী ক্ষতি তা জানিয়ে ভগবান এবার পরবর্তী দুটি শ্লোকে যুদ্ধ করলে কী লাভ তাই জানাচ্ছেন।

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥ ৩৭ ॥

[**বা, হতঃ** (যদি মৃত্যুও হয়) ; **স্বর্গম্, প্রাপ্স্যসি** (স্বর্গপ্রাপ্তি হবে) ; **বা** (যদি) ; **জিত্বা** (জয়লাভ কর) ; **মহীম্** (পৃথিবীর রাজত্ব) ; **ভোক্ষ্যসে** (ভোগ করবে) ; **তস্মাৎ, কৌন্তেয়** (অতএব হে কুন্তীনন্দন !) ; **যুদ্ধায়** (যুদ্ধের জন্য) ; **কৃতনিশ্চয়ঃ** (স্থির নিশ্চয় হয়ে) ; **উত্তিষ্ঠ** (প্রস্তুত হও।)]

যুদ্ধে যদি তোমার মৃত্যুও হয় তবে তোমার স্বর্গপ্রাপ্তি হবে। আর যদি যুদ্ধে জয়লাভ কর তবে পৃথিবীর রাজত্ব ভোগ করবে। অতএব হে কুন্তীনন্দন ! তুমি যুদ্ধের জন্য স্থির নিশ্চয় হয়ে প্রস্তুত হও ॥ ৩৭ ॥

ব্যাখ্যা—**'হতো বা ....মহীম্'**—এই অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে অর্জুন বলেছিলেন যে, 'আমরা জানি না যুদ্ধে ওরা আমাদের পরাজিত করবে, না আমরা ওদের পরাজিত করব।' অর্জুনের এই সন্দেহ নিরসন করতে ভগবান স্পষ্টরূপে জানাচ্ছেন যে, 'যদি তুমি যুদ্ধে কর্ণ প্রভৃতির হাতে নিহত হও তবে তোমার স্বর্গপ্রাপ্তি হবে আর যদি যুদ্ধে জয় হয় তাহলে পৃথিবীর রাজত্ব ভোগ করবে। এইভাবে তোমার তো দু'দিকেই লাভ। অর্থাৎ যুদ্ধ করলে তোমার উভয়দিকেই লাভ এবং যুদ্ধ না করলে উভয়দিকেই ক্ষতি। অতএব তোমার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াই উচিত।'

'তস্মাৎ ..... কৃতনিশ্চয়ঃ'—এখানে **'কৌন্তেয়'** সম্বোধন করার অর্থ হল এই যে, 'যখন আমি সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে কৌরবসভায় গিয়েছিলাম তখন তোমার মা কুন্তী তোমাকে যুদ্ধ করবার কথাই বলতে বলেছিলেন। সুতরাং তোমার যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হওয়া উচিত নয়, বরং যুদ্ধ করতে স্থির নিশ্চয় হয়ে প্রস্তুত হওয়া উচিত।'

অর্জুন যুদ্ধ না করতে দৃঢ়সংকল্প ছিলেন এবং ভগবান এই অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এতে অর্জুনের মধ্যে সংশয় জন্মেছিল যে যুদ্ধ করা উচিত কি না। তাই ভগবান এখানে সেই সন্দেহ নিরসন করার জন্য বলছেন যে, 'তুমি কোনো সংশয় না রেখে যুদ্ধ করার জন্য দৃঢ়নিশ্চয় হও।'

এখানে ভগবানের কথার এই অর্থ মনে হয় যে, মানুষের কোনো অবস্থাতেই প্রাপ্তকর্তব্য পরিত্যাগ করা উচিত নয়, বরং উৎসাহ এবং তৎপরতার সঙ্গে নিজ কর্তব্য পালন করা উচিত। কর্তব্যপালনেই মানুষের মনুষ্যত্ব।

পরিশিষ্ট-ভাব— ধর্মপালন করলে ইহলোক ও পরলোক উভয়ই সুখপ্রদ হয়ে যায়। অর্থাৎ কর্তব্যপালন এবং অকর্তব্য পরিত্যাগ করলে ইহলোকে ও পরলোকে সিদ্ধিলাভ হয়।

***

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥ ৩৮ ॥

[**জয়াজয়ৌ** (জয়-পরাজয়) ; **লাভালাভৌ** (লাভ-ক্ষতি) ; **সুখদুঃখে** (সুখ-দুঃখকে) ; **সমে, কৃত্বা** (সমান জ্ঞান করে) ; **ততঃ, যুদ্ধায়** (তারপর যুদ্ধে) ; **যুজ্যস্ব** (অবতীর্ণ হও) ; **এবম্** (এইরূপে) ; **পাপম্** (পাপ) ; **ন, অবাপ্স্যসি** (প্রাপ্ত হবে না।)]

জয়-পরাজয়, লাভ-ক্ষতি, সুখ-দুঃখকে সমান (জ্ঞান) করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও। এইরূপে যুদ্ধ করলে তুমি পাপভাগী হবে না ॥ ৩৮ ॥

ব্যাখ্যা—[অর্জুনের আশঙ্কা ছিল যে যুদ্ধে আত্মীয়বধ করলে তাঁর পাপ হবে, কিন্তু ভগবান এখানে বলেছেন যে, 'যুদ্ধ পাপের কারণ নয়, পাপের কারণ হল নিজ কামনা। অতএব কামনা ত্যাগ করে তুমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।']

'সুখ-দুঃখে...........যুজ্যস্ব'—'যুদ্ধে সর্বপ্রথম জয় এবং পরাজয় হয়, জয় ও পরাজয়ের পরিণাম হল লাভ ও ক্ষতি, লাভ ও ক্ষতির পরিণাম হল সুখ ও দুঃখ। জয়-পরাজয়ে এবং লাভ-ক্ষতিতে সুখী বা দুঃখী হওয়া তোমার উদ্দেশ্য নয়। তোমার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই তিনটিতে সমভাবে থেকে নিজ কর্তব্য পালন করা।'

যুদ্ধে জয়-পরাজয়, লাভ-ক্ষতি এবং সুখ-দুঃখ তো হবেই। সুতরাং তুমি প্রথম থেকে এটি ভেবে রাখ যে তোমাকে শুধুমাত্র নিজ কর্তব্য পালন করতে হবে, জয়-পরাজয় ইত্যাদিতে কোনো উদ্দেশ্য থাকা উচিত নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি রেখে যুদ্ধ করলে পাপ হবে না অর্থাৎ সংসার-বন্ধন হবে না।

সকাম এবং নিষ্কাম—দুই ভাবের দ্বারাই নিজের কর্তব্যকর্ম পালন করা প্রয়োজন। যাঁর ভাব সকাম, তাঁর কর্তব্য পালনে আলস্য, প্রমাদ একেবারেই হওয়া উচিত নয়, বরং তৎপরতার সঙ্গে নিজের কর্তব্য সমাপন করা উচিত। যাঁর ভাব নিষ্কাম, যে নিজ কল্যাণ চায়, তাঁরও তৎপরতার সঙ্গে নিজ কর্তব্য পালন করা উচিত।

সুখ এলে ভালো লাগে এবং চলে গেলে খারাপ লাগে, দুঃখ এলে খারাপ লাগে এবং চলে গেলে ভালো লাগে। সুতরাং এদের মধ্যে ভালো কী, খারাপই বা কী ? অর্থাৎ দুই-ই সমান, এক। এইভাবে সুখে-দুঃখে সমবুদ্ধি রেখে তোমার নিজ কর্তব্য পালন করা উচিত।

তোমার কোনো কর্মেই সুখের লোভে প্রবৃত্ত হওয়া এবং দুঃখের ভয়ে নিবৃত্ত না হওয়া উচিত। কর্মে তোমার প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি শাস্ত্র অনুযায়ীই যেন হয় (গীতা ১৬।২৪)।

'নৈবং পাপমবাপ্স্যসি'—এখানে **'পাপ'** শব্দটি পাপ এবং পুণ্য—দুইয়েরই বাচক, যার ফল হল—স্বর্গ এবং নরকপ্রাপ্তিরূপ বন্ধন, যার দ্বারা মানুষ নিজ কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয় এবং বারংবার জন্ম-মৃত্যু বরণ করে। ভগবান বলেছেন যে, 'হে অর্জুন ! সমত্বে স্থিত হয়ে যুদ্ধরূপ কর্তব্যকর্ম করলে পাপ এবং পুণ্য—কোনোটিতেই তোমার বন্ধন হবে না।'

প্রকরণ-সম্পর্কিত বিশেষ কথা

ভগবান একত্রিশতম শ্লোক থেকে আটত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত আটটি শ্লোকে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভাব প্রকট করেছেন ; যেমন—

১) কোনো কিছুর ব্যাখ্যা করতে হলে বা কোনো বিষয় বোঝাতে গেলে কী করতে হবে, ভগবান সেই শৈলী এই আটটি শ্লোকে জানিয়েছেন। যেমন, কর্তব্যকর্ম করা এবং অকর্তব্য না করা—এই বিধি (সমর্থন)-নিষেধের ব্যাখ্যা করতে হলে তাতে প্রথমে বিধি, মধ্যভাগে নিষেধ এবং উপসংহারে আবার বিধির বর্ণনা করে সমাপ্ত করা উচিত। ভগবানও এখানে প্রথমে একত্রিশ-বত্রিশতম শ্লোক দুটিতে কর্তব্যকর্ম করলে যে লাভ হয় তার বর্ণনা করেছেন, পরে মধ্যভাগে তেত্রিশ থেকে ছত্রিশতম চারটি শ্লোকে কর্তব্যকর্ম না করলে কী ক্ষতি হয় তার বর্ণনা করেছেন এবং শেষে সাঁইত্রিশ ও আটত্রিশ দুটি শ্লোকে কর্তব্যকর্ম করলে কী লাভ হয় তার বর্ণনা করে কর্তব্যকর্ম করার আজ্ঞা দিয়েছেন।

২) প্রথম অধ্যায়ে অর্জুন তাঁর মতের সপক্ষে যে যুক্তি দিয়েছিলেন, এই আটটি শ্লোকে ভগবান তার সমাধান করেছেন ; যেমন অর্জুন বলেছেন—'আমি যুদ্ধ করাতে কোনো কল্যাণ দেখতে পাচ্ছি না' (১।৩১), ভগবান বললেন—'ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্মযুদ্ধ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোনো কল্যাণের সাধন নেই' (২।৩১)। অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছেন, 'যুদ্ধ দ্বারা আমি কীভাবে সুখী হতে পারি ?' (১।৩৭), উত্তরে ভগবান জানালেন, 'যে ক্ষত্রিয়ের এরূপ ধর্মযুদ্ধ সামনে এসে পড়ে, সেই ক্ষত্রিয় সুখীই হয়' (২।৩২)। অর্জুন বলেছেন, 'যুদ্ধ করার পরিণাম নরক প্রাপ্তি' (১।৪৪), ভগবান বললেন, 'যুদ্ধ করলে স্বর্গ প্রাপ্তি হয়।' (২।৩২, ৩৭)। অর্জুন বলেছেন, 'যুদ্ধ করলে পাপ হয়' (১।৩৬), ভগবান জানালেন, 'যুদ্ধ না করলে পাপ হয়' (২।৩৩)। অর্জুন বলেছেন, 'যুদ্ধ করলে পরিণামে ধর্ম নাশ হবে' (১।৪০), ভগবান বললেন,

'যুদ্ধ না করলে ধর্ম নাশ হবে' (২।৩৩)।

৩) অর্জুনের ধারণা ছিল যে যুদ্ধরূপী ঘোর কর্ম পরিত্যাগ করে ভিক্ষার দ্বারা জীবন-নির্বাহ করা তাঁর পক্ষে শ্রেয়স্কর (২।৫)। কিন্তু ভগবান তাঁকে যুদ্ধ করতে নির্দেশ দিলেন (২।৩৮)। উদ্ধবের মনে ইচ্ছা ছিল ভগবানের সঙ্গে থাকার, কিন্তু ভগবান তাঁকে উত্তরাখণ্ডে গিয়ে তপস্যা করার আদেশ দেন (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২৯।৪১)। এর অর্থ হল এই যে, নিজ ইচ্ছা বা আগ্রহ ত্যাগ না করলে কল্যাণ হয় না। এই আগ্রহ যে প্রকারেরই হোক না কেন, তা উদ্ধারের পথে বাধাস্বরূপ।

৪) ভগবান এই অধ্যায়ের দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্লোকে যে কথা সংক্ষেপে বলেছেন, সেইগুলিই এখানে বিস্তারিত জানানো হয়েছে ; যেমন—পূর্বে **'অনার্যজুষ্টম্'** বলেছেন, এখানে **'ধর্মাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ'** বলেছেন। আগে **'অস্বর্গ্যম্'** বলেছেন এবং এখানে **'স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্'** বলেছেন। আগে বলেছেন **'অকীর্তিকরম্'**, এখানে **'অকীর্তিংচাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্'** বলেছেন। আগে যুদ্ধের নির্দেশ দিয়েছিলেন—**'ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ'**, সেই নির্দেশই এখানে দিয়েছেন—**'ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব'**।

পরিশিষ্ট-ভাব—গীতা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পরমার্থ লাভের বিশেষ শৈলী অবগত করায়, যাতে মানুষ যে কোনো পরিস্থিতিতে অবস্থান করেও, শাস্ত্রবিহিত সর্বপ্রকার কর্ম করেও নিজ কল্যাণ করতে সক্ষম হয়। অন্যান্য গ্রন্থাদিতে প্রায়শঃই বলা হয়ে থাকে যে, যদি নিজ কল্যাণ চাও তাহলে সব কিছু পরিত্যাগ করে সাধু হও, নির্জনে বসবাস কর, কারণ ব্যবহারিক জীবন ও পরমার্থ—দুই একসঙ্গে চলতে পারে না। কিন্তু গীতায় বলা হয়েছে, আপনি যেখানেই থাকুন, যে মতবাদই মানুন, যে সিদ্ধান্তকেই মেনে নিন অথবা যে ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায়, আশ্রমেরই হোন না কেন, গীতা অনুযায়ী চললে অবশ্যই আপনার কল্যাণ হবে। একান্তে বাস করে বহু বৎসর সাধনা করে মুনি-ঋষিরা যে তত্ত্ব প্রাপ্ত হন, গীতানুযায়ী চললে জাগতিক সম্পর্কযুক্ত হয়েও সেই তত্ত্বেরই প্রাপ্তি হতে পারে। সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমভাবে থেকে নিষ্কামভাবে কর্তব্যকর্ম করাই হল গীতা অনুযায়ী চলা।

যুদ্ধের থেকে বেশি ঘোর পরিস্থিতি ও প্রবৃত্তি আর কি হতে পারে ? যুদ্ধের মতো ভয়ংকর পরিস্থিতি ও প্রবৃত্তিতেও যদি মানুষ তার কল্যাণ করতে সক্ষম হয়, তাহলে এমন কোন পরিস্থিতি আছে, যাতে অবস্থান করে মানুষ তার কল্যাণ না করতে পারে ? গীতার মত অনুযায়ী মানুষ একান্তে আসন পেতে ধ্যানের দ্বারাও নিজের কল্যাণ করতে পারে (গীতা ৬।১০-১৩) আবার যুদ্ধ করেও তার কল্যাণ হতে পারে।

অর্জুনের স্বর্গ অথবা রাজ্য—কোনোটিরই আকাঙ্ক্ষা ছিল না (গীতা ১।৩২, ৩৫, ২।৮)। তিনি শুধু যুদ্ধের ফলস্বরূপ পাপ থেকে রক্ষা পেতে চেয়েছিলেন (গীতা ১।৩৬, ৩৯, ৪৫)। তাই ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, যদি তুমি স্বর্গ বা রাজ্য না চাও এবং পাপ থেকে বাঁচতে চাও তাহলে এই যুদ্ধরূপ কর্তব্য সমত্ববুদ্ধি সহকারে করো, এতে তোমার পাপ হবে না— **'নৈবং পাপমবাপ্স্যসি'**। কারণ পাপের কারণ যুদ্ধ নয়, পাপের কারণ হল বৈষম্য (পক্ষপাতিত্ব), কামনা, স্বার্থপরতা এবং অহংকার। যুদ্ধ তো তোমার কর্তব্য (ধর্ম) ! কর্তব্য না করলে এবং অকর্তব্য করলে পাপ হবে।

আগের শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে যেমন বলেছেন যে, তুমি যদি রাজ্য ও স্বর্গলাভ করতে চাও তাহলেও তোমার কর্তব্যপালন করা উচিত আর এই শ্লোকে বলছেন যে যদি তুমি রাজ্য ও স্বর্গলাভ করতে না চাও তাহলেও তোমাকে সমত্ববুদ্ধি সহকারে কর্তব্যপালন করতে হবে। অর্থাৎ কোনো অবস্থাতেই নিজ কর্তব্য পরিত্যাগ করা উচিত নয়।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে ভগবান যে সমত্বের কথা বলেছেন, পরের দুটি শ্লোকে সেটি শোনার জন্য নির্দেশ দিয়ে তার মহিমা বর্ণনা করছেন।

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি।। ৩৯ ।।

[পার্থ (হে পার্থ !) ; এষা, বুদ্ধিঃ (এই সমত্ববুদ্ধি) ; তে (তোমাকে) ; সাংখ্যে (সাংখ্যযোগে) ; অভিহিতা (বলা

হয়েছে) ; তু, ইমাম্ (এবং এ সম্বন্ধে) ; যোগে (কর্মযোগের মাধ্যমে) ; শৃণু (শ্রবণ করো) ; যয়া, বুদ্ধ্যা (এই সমত্ববুদ্ধি) ; যুক্তঃ (যুক্ত হলে) ; কর্মবন্ধম্ (কর্মবন্ধন) ; প্রহাস্যসি (ত্যাগ করতে পারবে।)]

হে পার্থ ! এই সমবুদ্ধির কথা প্রথমে সাংখ্যযোগে বলা হয়েছে, এখন তুমি এ সম্বন্ধে কর্মযোগের মাধ্যমে শ্রবণ করো। এই সমবুদ্ধিযুক্ত হলে তুমি কর্মবন্ধন ত্যাগ করতে পারবে ॥ ৩৯ ॥

ব্যাখ্যা—**'এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু'**—এখানে **'তু'** পদটি প্রকরণ-সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ প্রথমে সাংখ্য প্রকরণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে এবারে কর্মযোগের প্রকরণ বলা হচ্ছে।

'এষা' পদটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে পূর্বশ্লোকে বর্ণিত সমবুদ্ধির জন্য। এই সমবুদ্ধির বর্ণনা আগে সাংখ্যযোগে (একাদশ থেকে ত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত) ভালোভাবে করা হয়েছে। দেহ এবং দেহীর সঠিক ধারণা হলে সমতাতে স্বতঃসিদ্ধ স্থিতি অনুভূত হয়। কারণ দেহে আসক্তি থাকলেই বিষমভাব উপস্থিত হয়। এইভাবে সাংখ্যযোগে সমবুদ্ধির কথা বলা হয়েছে। এখন এই সমবুদ্ধির কথা তুমি কর্মযোগের বিষয়ে শোনো।

'ইমাম্' বলার অর্থ এই যে, এখন এই সমবুদ্ধির কথা সম্বন্ধে কর্মযোগের বিষয়ে বলা হচ্ছে যে, —এই সমবুদ্ধি কর্মযোগের দ্বারা কীভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায় ? এর স্বরূপ কী ? এর মহিমাই বা কী ? এই বিষয়গুলি বর্ণনার উদ্দেশ্যে ভগবান এই বুদ্ধিকে যোগের বিষয়ে বলছেন।

'বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি'—অর্জুনের মনে ভয় ছিল যে যুদ্ধ করলে পাপ হবার সম্ভাবনা আছে (১।৩৬, ৪৫)। কিন্তু ভগবানের মতে কর্মে বিষমবুদ্ধি (রাগ-দ্বেষ) হলেই পাপ হয়। সমবুদ্ধিসম্পন্ন হলে পাপ হয় না। যেমন, জগতে অনেক কার্যকলাপেই পাপ-পুণ্য হয়ে থাকে, তাতে আমাদের কিন্তু পাপ বা পুণ্য হয় না ; কারণ আমাদের ওসবে সমবুদ্ধি থাকে অর্থাৎ সেগুলিতে আমাদের কোনো পক্ষপাতিত্ব, আগ্রহ, রাগ-দ্বেষ থাকে না। 'তুমিও যদি এইরূপ সমবুদ্ধি-সম্পন্ন হও, তাহলে তোমারও কর্মবন্ধনরূপ পাপ হবে না।'

এই অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে অর্জুন তাঁর কল্যাণের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। সেইজন্য ভগবান কল্যাণের প্রধান সাধনগুলির বর্ণনা করছেন। ভগবান প্রথমে সাংখ্যযোগের সাধন জানিয়ে কর্তব্যকর্ম করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন যে, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্মযুদ্ধ অপেক্ষা শ্রেয় আর কোনো সাধন নেই (২।৩১) ; আবার জানিয়েছেন যে সমবুদ্ধিযুক্ত হয়ে যুদ্ধ করলে পাপ স্পর্শ করে না (২।৩৮)। এখন সেই সমবুদ্ধির কথা কর্মযোগের বিষয়ে জানাচ্ছেন।

কর্মযোগী লোকসংগ্রহের জন্য সকল কর্ম করেন—**'লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি'** (৩।২০)। লোকসংগ্রহের জন্য কর্ম করলে অর্থাৎ নিঃস্বার্থভাবে লোকমর্যাদা সুরক্ষিত রাখার জন্য, জনসাধারণকে অসৎ পথ থেকে সরিয়ে সৎপথে চালিত করার জন্য কর্ম করলে সহজেই সমতাপ্রাপ্তি হয়। সমতাপ্রাপ্তি হলে কর্মযোগী অনায়াসে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হন।

এই (উনচল্লিশতম) শ্লোকটি ত্রিশতম শ্লোকের পরই ঠিকমতো প্রযোজ্য হয় এবং এটি সেখানেই থাকার কথা। তার কারণ এই শ্লোকটিতে দুটি নিষ্ঠার বর্ণনা আছে। প্রথমে একাদশ থেকে ত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত সাংখ্যযোগের দ্বারা নিষ্ঠার (সমতার) কথা বলা হয়েছে এবং এখন কর্মযোগের দ্বারা নিষ্ঠার (সমতার) কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এস্থলে একত্রিশ থেকে আটত্রিশ পর্যন্ত আটটি শ্লোক অসঙ্গত বলে বোধ হয়। তা সত্ত্বেও এই আটটি শ্লোক এখানে ব্যবহারের অর্থ এই যে, কর্মযোগে সমত্বের কথা জানানোর আগে কর্তব্য কী এবং অকর্তব্য কী, অর্জুনের পক্ষে যুদ্ধ করাই কর্তব্য এবং যুদ্ধ না করা অকর্তব্য—এই বিষয়ের বর্ণনা করার প্রয়োজন ছিল। সেইজন্য ভগবান কর্তব্য-অকর্তব্যের বর্ণনা করার জন্যই উপরিউক্ত আটটি শ্লোক (২।৩১-৩৮) বলেছেন, এবং তারপরে সমতার কথা বলেছেন। এর তাৎপর্য হল এই যে প্রথমে একাদশ থেকে ত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত সৎ-অসতের বর্ণনা দ্বারা সমত্বের কথা বলা হয়েছে যে সৎ সৎই এবং অসৎ অসৎই। এর কেউ কোনো পরিবর্তন করতে পারে না। আবার একত্রিশ থেকে আটত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত কর্তব্য-অকর্তব্যের কথা বলে উনচল্লিশতম শ্লোক থেকে অকর্তব্য পরিত্যাগ করে কর্তব্যপালনপূর্বক কর্মের সিদ্ধি-অসিদ্ধি এবং ফলের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিতে সমত্বের বর্ণনা করছেন।

পরিশিষ্ট-ভাব—কর্মযোগের দুই ভাগ আছে—কর্তব্যবিজ্ঞান এবং যোগবিজ্ঞান। ভগবান একত্রিশ থেকে সাঁইত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত কর্তব্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে বলেছেন, যাতে কর্তব্যকর্ম করলে লাভ এবং না করলে ক্ষতির কথা বলা হয়েছে। এবার এই শ্লোক থেকে তিপ্পান্নতম শ্লোক পর্যন্ত ভগবান যোগবিজ্ঞান সম্পর্কে বলেছেন।

আগের শ্লোকে ভগবান্ যে সমতার কথা বলেছেন, তা সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগ— এই উভয় সাধনার দ্বারা প্রাপ্ত হতে পারে। শরীর এবং শরীরীর পার্থক্য জেনে শরীরের থেকে সম্পর্করহিত হওয়াই হল **'সাংখ্যযোগ'** আর কর্তব্য ও অকর্তব্যের পার্থক্য জেনে অকর্তব্যকে ত্যাগ করে কর্তব্যপালন করা হল **'কর্মযোগ'**। মানুষের এই দুইয়ের মধ্যে কোনো একটি সাধনার দ্বারা এই সমতা প্রাপ্ত করা উচিত। কেননা সমতা এলেই মানুষ কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে।

একটি হল ধর্মশাস্ত্র (পূর্ব-মীমাংসা) আর অন্যটি হল মোক্ষশাস্ত্র (উত্তর-মীমাংসা)। এখানে একত্রিশ থেকে সাঁইত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত ধর্মশাস্ত্র এবং উনচল্লিশ থেকে তিপ্পান্নতম শ্লোক পর্যন্ত মোক্ষশাস্ত্রের কথা বলা হয়েছে। ধর্মের দ্বারা লৌকিক ও পারলৌকিক— উভয় প্রকারের উন্নতি হয়ে থাকে[১]। ধর্মশাস্ত্রে কর্তব্যপালনই প্রধান। ধর্ম অথবা কর্তব্য, দুটি একই ব্যাপার।

যা করা উচিত, সেটি না করা অকর্তব্য, আর যা করা উচিত নয়, তা করাও অকর্তব্য। যাতে নিজ সুখের আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়ে অপরকে সুখী করা যায় এবং যাতে নিজের এবং অপরেরও মঙ্গল হয়, তাকে বলা হয় 'কর্তব্য'। কর্তব্য পালন করলে স্বতঃই 'যোগ' প্রাপ্তি হয়। কর্তব্য পালন না করে মানুষ 'যোগারূঢ়' হতে পারে না (গীতা ৬।৩)। যোগের প্রাপ্তি হলে তত্ত্বজ্ঞান স্বতঃই হয়, যা কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ দুইয়েরই পরিণাম (গীতা ৫।৪-৫)।

※ ※ ※

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥ ৪০ ॥

[**ইহ** (জগতে) ; **অস্য** (এই সমবুদ্ধিরূপ) ; **ধর্মস্য** (ধর্মের) ; **ন, অভিক্রমনাশঃ, অস্তি** (প্রচেষ্টা নষ্ট হয় না) ; **প্রত্যবায়ঃ** (কোনো বিপরীত ফল) ; **ন, বিদ্যতে** (হয়, না) ; **স্বল্পম্, অপি** (অল্প আচরণও) ; **মহতঃ** (মহৎ) ; **ভয়াৎ** (ভয় হতে) ; **ত্রায়তে** (রক্ষা করে।)]

জগতে এই সমবুদ্ধিরূপ ধর্মের প্রচেষ্টা নষ্ট হয় না, এই কর্মের কোনো বিপরীত ফলও হয় না এবং এই ধর্মের অল্প আচরণও (জন্ম-মৃত্যুরূপ) মহাভয় হতে রক্ষা করে ॥ ৪০ ॥

ব্যাখ্যা—**'নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি'**—এই সমবুদ্ধির (সমতা) যদি কেবলমাত্র আরম্ভও হয়, তাহলেও সেই প্রারম্ভের বিনাশ হয় না। সমতাপ্রাপ্তি করার জন্য মনে যে আগ্রহ, উৎকণ্ঠা আসে, সেটিই হচ্ছে এই সমতার প্রচেষ্টার আরম্ভ। এই আরম্ভের কখনো বিলুপ্তি হয় না ; কারণ সত্য বস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষাও সত্যই হয়।

এখানে **'ইহ'** বলার অর্থ এই যে, এই মনুষ্যলোকে মনুষ্যই এই সমবুদ্ধি লাভ করার অধিকারী। মানুষ ছাড়া অপর সকলেই ভোগযোনিসম্পন্ন। সুতরাং তাদের বিষমতা রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ দূর করার উপায় নেই। কারণ রাগ-দ্বেষপূর্বক কর্ম করলে তার ফলভোগ হয়ে থাকে। রাগ-দ্বেষ না থাকলে ভোগ হয় না, বরং তাতে সাধনই হয়।

'প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে'— সকামভাবে করা কর্মে মন্ত্র-উচ্চারণ, যজ্ঞ-বিধি ইত্যাদিতে যদি কোনো ন্যূনতা থাকে তবে তার ফল বিপরীত হয়। যেমন, পুত্রপ্রাপ্তির আশায় কেউ যদি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করে এবং তার বিধিতে কোনো ত্রুটি হয় তবে পুত্র হওয়া তো দূরের কথা গৃহে কারো মৃত্যুও হতে পারে। আর নিয়মাদিতে কোনো ঘাটতি থাকলে তত বিপরীত ফল যদি নাও হয়, তাহলেও পুত্র স্বাভাবিক দেহে জন্মায় না! কিন্তু যে ব্যক্তি এই সমবুদ্ধিকে নিজ অনুষ্ঠানে আনার চেষ্টা করে, তার চেষ্টার, অনুষ্ঠানের কখনো বিপরীত ফল হয় না। কারণ তার অনুষ্ঠানে ফলের ইচ্ছা

[১] 'যতোঽভ্যুদয়নিঃ শ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্মঃ' (বৈশেষিক ১।৩)

থাকে না। যতক্ষণ পর্যন্ত ফলের ইচ্ছা থাকে ততক্ষণ সমতা আসে না এবং সমতা এলে ফলেচ্ছা থাকে না। সুতরাং তার অনুষ্ঠানের বিপরীত ফল হয় না, তা হওয়া সম্ভবই নয়।

বিপরীত ফল কী ? সংসারে বিষমভাব রাখাই বিপরীত ফল। সাংসারিক কোনো কার্যে অনুরাগ হওয়া এবং কোনো কার্যে দ্বেষ হওয়াই বিষমতা এবং এই বিষমতা দ্বারাই জন্ম-মৃত্যুরূপ বন্ধন হয়। কিন্তু মানুষের মধ্যে যখন সমত্ববোধ আসে তখন রাগ-দ্বেষ থাকে না এবং রাগ- দ্বেষ না থাকলে বিষমতাও থাকে না, তাহলে আর বিপরীত ফল হওয়ার কোনো কারণই থাকে না।

'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ'—এই সমবুদ্ধিরূপ ধর্মের সামান্য ক্রিয়াও যদি করা হয়, জীবনে যদি সামান্য সমতাও আসে, আচরণে সামান্যতম সমভাবও আসে, তাহলে জন্ম-মৃত্যুরূপ মহাভয় হতে রক্ষা পাওয়া যায়। সকাম কর্ম যেমন ফল প্রদান করে নষ্ট হয়ে যায়, এই সমতা তেমনভাবে ধনসম্পত্তি ইত্যাদি কোনো ফল প্রদান করে বিনষ্ট হয় না, অর্থাৎ এর ফল বিনাশশীল ধনসম্পত্তি ইত্যাদির প্রাপ্তিতে নিঃশেষ হয় না। সাধকের অন্তঃকরণে অনুকূল-প্রতিকূল বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদিতে যে পরিমাণে সমত্বভাব জাগরিত হয়, তা তাঁর অন্তঃকরণে অটল থাকে, এই সমত্ববোধ কোনো কালেই বিনাশ হয় না। যেমন, যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির সাধন অবস্থায় যত সমতা এসে যায়, যত সাধনসম্পদ লাভ হয়, তা তাঁর স্বর্গাদি উচ্চলোকে বহু বর্ষ সুখভোগ করে এবং মর্ত্যলোকে কোনো শ্রীমানের ঘরে জন্ম নিলেও নষ্ট হয় না (৬।৪১, ৪৪)। এই সমতা তথা সাধনসামগ্রী কখনো কিছুমাত্র কম হয় না, বরং সর্বদা যেমনকার তেমনই সুরক্ষিত থাকে ; কারণ এটি হল 'সৎ' অর্থাৎ চিরস্থায়ী।

ধর্মের প্রকাশে দুটি বিভাগ আছে—১) দান করা, অন্ন বিতরণ করা ইত্যাদি পরোপকার করা এবং ২) বর্ণ আশ্রম অনুসারে শাস্ত্রবিহিত নিজ কর্তব্যকর্ম তৎপরতার সঙ্গে পালন করা। এই ধর্ম নিষ্কামভাবে পালন করলে সমত্বরূপ ধর্ম স্বতঃই আসে। কারণ এই সমতারূপ ধর্ম স্ব-স্বরূপের ধর্ম অর্থাৎ স্বরূপ। এইজন্যই এখানে সমবুদ্ধিকে ধর্ম বলা হয়েছে।

সমতা সম্পর্কিত বিশেষ কথা

সাধারণ মানুষের মনে প্রায়শঃ এই ভাব থাকে যে, মন একাগ্র হলে তবেই সাধন-ভজন হয়, মন যদি স্থির না হয় তাহলে জপ করে কী লাভ ? কিন্তু গীতার দৃষ্টিতে মন স্থির হওয়া এমন কোনো বড় জিনিস নয়। গীতার দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ হল—সমতা। অন্য লক্ষণ আসুক বা না আসুক যার মধ্যে সমত্ববোধ এসে গিয়েছে, গীতা তাকে সিদ্ধ বলে স্বীকার করে। যার মধ্যে অন্য সব লক্ষণ প্রকটিত অথচ সমত্ববোধ নেই, গীতা তাকে সিদ্ধ বলে স্বীকার করে না।

সমতা দুই প্রকারের—অন্তঃকরণের সমতা এবং স্বরূপের সমতা। সমরূপ পরমাত্মা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। সেই সমরূপ পরমাত্মাতে যে স্থিত হয়ে যায়, সে সম্পূর্ণ সংসারের ওপর বিজয়প্রাপ্ত হয় এবং জীবন্মুক্ত হয়ে যায়। এটিকে জানা যায় অন্তঃকরণের সমতার দ্বারা (গীতা ৫।১৯)। অন্তঃকরণের সমতা হল—সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সম থাকা (২।৪৮)। প্রশংসা বা নিন্দা যাই করা হোক, কার্য সফল হোক বা না হোক, লাখ টাকা আসুক বা চলে যাক, কিন্তু তার জন্য অন্তরে কোনো ব্যাকুলতা যেন না আসে ; সুখ-দুঃখ, হর্ষ-শোক ইত্যাদি যেন না হয় (৫।২০)। এই সমতার কখনো বিনাশ হয় না। এই সমতার দ্বারা কল্যাণ ব্যতীত কোনো ফল হয় না।

মানুষ তপস্যা, দান, তীর্থ, ব্রত ইত্যাদি যে কোনো পুণ্য কর্ম করুক না কেন, তা ফল প্রদান করেই নষ্ট হয়ে যায় । কিন্তু সাধন করতে করতে অন্তঃকরণে যদি সামান্যতম সমতা (নির্বিকারভাবে) আসে তবে তার বিনাশ হয় না, বরং তা পরিণামে কল্যাণই করে। সেইজন্য সাধনায় সমতা যত উচ্চ বস্তু, মনের একাগ্রতা তত উচ্চ বস্তু নয়। মন একাগ্র হলে সিদ্ধিপ্রাপ্তি হতে পারে, কিন্তু কল্যাণ হয় না। কিন্তু সমতা এলে মানুষ সংসারবন্ধন থেকে সহজেই মুক্ত হতে পারে (৫।৩)।

পরিশিষ্ট-ভাব—ভগবান সমতার মহিমা উনচল্লিশ-চল্লিশতম শ্লোকে চার প্রকারে জানিয়েছেন—

(১) **'কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি'**—মানুষ সমতার সাহায্যে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়।

(২) **'নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি'**—এর আরম্ভ ও বিনাশ হয় না।

(৩) **'প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে'**— এই অনুষ্ঠানের বিপরীত ফল হয় না।

(৪) **'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ'**— এর যৎ-সামান্য কিছু অনুষ্ঠিত হলেও তা জন্ম-মৃত্যুরূপ মহাভয় হতে রক্ষা করে।

যদিও প্রথম বাক্যটির মধ্যেই অবশিষ্ট তিনটি বাক্য এসে পড়ে, তবুও সবগুলির মধ্যে কিছুটা পার্থক্য থাকেই, যেমন—

(১) ভগবান প্রথমে সাধারণ নিয়ম জানিয়েছেন যে সমত্বযুক্ত মানুষ কর্মবন্ধন হতে মুক্ত হয়। বন্ধনের কারণ গুণাদির সঙ্গ অর্থাৎ প্রকৃতি এবং তার কার্যাদির সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক (গীতা ১৩।২১)। সমত্ব বোধ হলে প্রকৃতি এবং তার কার্যাদির সঙ্গে আর সম্পর্ক থাকে না, তাই মানুষ তখন কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়। যেমন জগতে নানাপ্রকার শুভ-অশুভ কর্ম সংঘটিত হয়, কিন্তু এসব কর্ম আমাদের আবদ্ধ করে না। কেননা ওইসব কর্মের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই, তেমনই সমতাযুক্ত ব্যক্তির শরীর দ্বারা যে সব কর্ম হয় সেগুলির সঙ্গেও তাঁর কোনো সম্পর্ক থাকে না।

(২) সমবুদ্ধি যদি শুধু আরম্ভ হয় অর্থাৎ কেবল সমত্বপ্রাপ্ত করাই উদ্দেশ্য হয়, জিজ্ঞাসা যদি মনে উদয় হয় তবে সেই আরম্ভের কখনো বিনাশ হয় না। কারণ অবিনাশীর উদ্দেশ্যও অবিনাশীই হয়ে থাকে এবং বিনাশের উদ্দেশ্য বিনাশী হয়। বিনাশীর উদ্দেশ্য থাকলে নাশ (পতন) হয়, কিন্তু সমতার উদ্দেশ্য শুধু কল্যাণই করে— **'জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে'** (গীতা ৬।৪৪)

(৩) সমত্ব অনুষ্ঠানের ফল কখনো বিপরীত হয় না। সকামভাব নিয়ে করা কর্মে যদি মন্ত্রোচ্চারণ, অনুষ্ঠান-বিধি ইত্যাদির কোনো ত্রুটি হয় তবে তার বিপরীত ফল হয়[১]। কিন্তু যেটুকু সমতা অনুষ্ঠানে ও জীবনে এসেছে, তাতে যদি ব্যবহার বিধিতে কোনো ভুল হয়, খুব সাবধানের সঙ্গে অনুষ্ঠান না করা হয় তাহলেও তাতে কোনো বিপরীত ফল (বন্ধন) হয় না। যেমন, যে আমার কাছে কাজ করে সে অন্ধকারে লণ্ঠন জ্বালাতে গিয়ে যদি সেটা ভেঙে ফেলে তাহলে আমি অসন্তুষ্ট হই। কিন্তু আমার কোনো বন্ধু, যে আমার থেকে কোনোদিন কিছু চায় না, তার হাত থেকে যদি লণ্ঠনটি পড়ে ভেঙে যায়, তাহলে আমার তার ওপর রাগ হয় না। বরং আমি তাকে বলি, আরে তোমার হাত থেকে পড়ে ভেঙেছে তো কি হয়েছে, আমার হাত থেকেও তো কত জিনিস ভেঙে যায়! ছেড়ে দাও, এটা কোনো ব্যাপারই নয়। তাই যারা সকামভাবে কর্ম করে, তাদের কর্মের বিপরীত ফল হতে পারে, কিন্তু যারা কোনোরূপ কিছু আশা করে না, তাদের অনুষ্ঠানের বিপরীত ফল হবে কীকরে? তা হওয়া সম্ভবই নয়।

(৪) যদি অল্প একটুও সমত্বের অনুষ্ঠান হয়, সামান্যতমও যদি সমতা জাগ্রত হয় তবে তা জন্ম-মৃত্যুরূপ মহাভয় থেকে রক্ষা করে অর্থাৎ কল্যাণ করে। সকাম কর্ম যেমন ফলদান করে নষ্ট হয়ে যায়, সমতা তেমন অল্প একটু হলেও ফলপ্রদানের পর নষ্ট হয় না, বরং শেষ পর্যন্ত তা পরিণামে কল্যাণই করে থাকে। যজ্ঞ, দান, তপাদি শুভ কর্ম সকামভাবে যদি করা হয় তাহলে তার ফল বিনাশশীল (ধনসম্পত্তি এবং স্বর্গলাভ) হয় আর যদি নিষ্কামভাবে করা হয় তাহলে তার ফল হয় অবিনাশী (মোক্ষ)। এইরূপ যজ্ঞ-দান-তপ ইত্যাদি শুভ কর্মের দু'প্রকার ফল হয়, কিন্তু সমতার একই ফল হয়— তা হল কল্যাণ।

---

[১]কথিত আছে যে ত্বষ্টা ইন্দ্রকে বধ করার নিমিত্ত পুত্রের জন্য এক যজ্ঞ করেছিলেন। সেই যজ্ঞে ঋষিগণ **'ইন্দ্রশত্রুং বিবর্ধস্ব'** এই মন্ত্রটি দ্বারা পূজা করেছিলেন। **'ইন্দ্রশত্রু'** শব্দটি যদি ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস হয়, তবে তার অর্থ হল **'ইন্দ্রস্য শত্রুঃ'** (ইন্দ্রের শত্রু) আর যদি বহুব্রীহি সমাস হয়, তাহলে তার অর্থ **'ইন্দ্রঃ শত্রুর্যস্য'** (ইন্দ্র যার শত্রু)। সমাসের পার্থক্যে স্বরেও তফাৎ হয়। অতএব ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসে **'ইন্দ্রশত্রু'** শব্দটির উচ্চারণে অন্তিম অক্ষর **'ত্রু'** উদাত্ত স্বরে হবে এবং বহুব্রীহি সমাসে **'ইন্দ্রশত্রু'** শব্দ উচ্চারণে প্রথম অক্ষর **'ই'** উদাত্ত স্বরে হবে। ঋষিগণের উদ্দেশ্য ছিল ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসের **'ইন্দ্রশত্রু'** শব্দটির অন্তিম অক্ষর উদাত্ত স্বরে উচ্চারণ করা, কিন্তু তাঁরা প্রথম অক্ষর **'ই'** উদাত্ত স্বরে উচ্চারণ করেন। এইরূপ স্বরভেদে মন্ত্রোচ্চারণের ফল বিপরীত হয়ে যায়, যার ফলে ইন্দ্রই ত্বষ্টার পুত্র বৃত্রাসুরের হত্যাকারী হয়ে ওঠেন। তাই বলা হয় যে—

মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ। স বাগ্বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ॥

(পাণিনীয়শিক্ষা)

যেমন যদি কোনো পথিক রাস্তায় চলতে চলতে কোনো এক স্থানে বিশ্রাম নেয় বা ঘুমিয়ে নেয় এবং পরে চলতে আরম্ভ করে, তবে সে পুনরায় গোড়া থেকে যাত্রা (যাওয়া) আরম্ভ করে না। বরং যেখানে সে পৌঁছেছিল সেখান থেকেই শুরু করে, তেমনই যে সমতা জীবনে একবার এসেছে তা কখনো নষ্ট হয় না।

'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ'— নিষ্কামভাব অল্পমাত্র উদিত হলেও তা হল সত্য আর ভয় মহান হলেও তা হল অসত্য। যেমন তুলো একমণ হলেও তা পোড়াতে একমণ আগুন লাগে না। তুলো একমণ হোক বা একশত মণ তার জন্য একটি দেশলাই কাঠিই যথেষ্ট। একটি কাঠি জ্বাললেই তা অগ্নিতে পরিণত হবে। তুলো নিজেই সেই আগুনকে সাহায্য করবে। আগুন তুলোকে সঙ্গ দেবে না, তুলো নিজেই জ্বলনশীল হওয়ায় আগুনকে সঙ্গ দেবে। এইরূপ অসঙ্গতা হল আগুন আর জগৎসংসার তুলো। জগৎসংসার থেকে অসঙ্গ (বিচ্ছিন্ন) হলেই জগৎ নিজেই নষ্ট হয়ে যায়। কেননা আসলে জগৎসংসারের অস্তিত্ব না থাকায় তার সঙ্গে কখনো সম্বন্ধ হয়ই না।

অতি সামান্য ত্যাগও হল সৎ, আর যত বড় ক্রিয়াই হোক না কেন, তা হল অসৎ। ক্রিয়ার অন্ত (শেষ) থাকে, কিন্তু ত্যাগ হল অনন্ত। তাই যজ্ঞ, দান, তপাদি ক্রিয়া ফলপ্রদান করে নষ্ট হয়ে যায় (গীতা ৮।২৮), কিন্তু ত্যাগের ফল কখনো নষ্ট হয় না **'ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্'** (গীতা ১২।১২)। একমাত্র অহং ত্যাগ করলেই অনন্ত সৃষ্টি ত্যাগ হয়ে যায়, কারণ অহং সমস্ত জগৎসংসার ধারণ করে রাখে (গীতা ৭।৫)।

যেমন, যত ঘাসই থাক, তা আগুনের কাছে কি টিকতে পারে ? অন্ধকার যতই গাঢ় হোক, সূর্যের কাছে তা থাকে কি ? অন্ধকার ও সূর্যের সঙ্গে লড়াই হলে কি অন্ধকার জেতে ? তেমনই অজ্ঞান ও জ্ঞানের মধ্যে লড়াই হলে কি অজ্ঞান জেতে ? যত মহাভয় হোক তা কি অভয়ের সামনে টিকবে ? সমবোধ যত অল্পই হোক তা হল পূর্ণ আর ভয় যত ভয়ানক হোক তা হল অসম্পূর্ণ। সমতা স্বল্প হলেও তা মহান, কারণ তা সৎ এবং মহাভয় হলে তা হল অল্প (সত্তাহীন অস্তিত্বহীন), কারণ তা অসত।

সমতাকে, নিষ্কামভাবকে 'স্বল্প' বলার তাৎপর্য কী ? প্রকৃতপক্ষে নিষ্কামভাব মহান কিন্তু আমাদের বুদ্ধিতে, আমাদের অনুভূতিতে অল্প ধরা পড়ায় একে স্বল্প বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধি অল্প হলেও সমতা অল্প হয় না। ওদিকে আমাদের দৃষ্টি যদি কম পড়ে তবে তার দোষ আমাদের দৃষ্টির, তত্ত্বের নয়। এইরূপই আমরা অসৎকে বেশি গুরুত্ব দিলেও অসৎ মহৎ হয় না, মহৎ হয় আমাদের গুরুত্ব। তাই আমরা যদি সৎকে বেশি গুরুত্ব দিই তাহলে সৎ মহৎ হয়ে ওঠে অর্থাৎ তার মহত্ত্ব, গুরুত্ব অনুভূত হয় এবং অসৎকে গুরুত্ব না দিলে, অসৎ স্বল্প হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে অসৎ মহৎ হোক বা স্বল্প (ক্ষুদ্র) হোক, তার কোনো অস্তিত্ব নেই—**'নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ'** এবং সৎ মহৎই হোক বা স্বল্প হোক, তার অস্তিত্ব নিত্য নিরন্তর বিদ্যমান— **'নাভাবো বিদ্যতে সতঃ'**। এইজন্যই উপনিষদে পরমাত্মতত্ত্বকে অণু থেকেও অণু এবং মহৎ থেকেও মহৎ বলা হয়েছে— **'অণোরণীয়ান মহতো মহীয়ান্'** (কঠ. ১।২।২০, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ৩।২০)।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—উনচল্লিশতম শ্লোকে ভগবান যোগবিষয়ে যে সমবুদ্ধির কথা শ্রবণ করার জন্য বলেছিলেন, সেই সমবুদ্ধিকে প্রাপ্ত করার সাধন পরবর্তী শ্লোকে জানাচ্ছেন।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥ ৪১ ॥

[**কুরুনন্দন** (হে কুরুনন্দন !) ; **ইহ** (এই) ; **ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ** (নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি) ; **একা** (একই) ; **অব্যবসায়িনাম্** (অস্থিরচিত্ত মানুষদের) ; **বুদ্ধয়ঃ, অনন্তাঃ, চ** (বুদ্ধি অনন্ত এবং) ; **বহুশাখা** (বহুশাখাপ্রযুক্ত) ; **হি** (হয়ে থাকে।)]

হে কুরুনন্দন ! এই সমবুদ্ধিপ্রাপ্তির বিষয়ে ব্যবসায়াত্মিকা (নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধি একই থাকে। অব্যবসায়ী (অস্থিরচিত্ত) মানুষদের বুদ্ধি অনন্ত এবং বহুশাখাযুক্ত হয়ে থাকে॥ ৪১ ॥

ব্যাখ্যা—'ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন'— কর্মযোগী সাধকদের ধ্যেয় (লক্ষ্য) যে সমতাপ্রাপ্তি, তা পরমাত্মারই স্বরূপ। সেই পরমাত্মাস্বরূপ সমতাপ্রাপ্তির জন্য অন্তঃকরণের সমতাই সাধন। সংসারের প্রতি অনুরাগ হল অন্তঃকরণের সমতা অর্জনে বাধা। সেই অনুরাগ দূর করার অথবা পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত করার জন্য যে দৃঢ় নিশ্চয় করা হয়, তার নাম হল—ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি কেন এক হয় ? কারণ এর দ্বারা জাগতিক বস্তু, পদার্থ ইত্যাদির কামনা ত্যাগ করা হয়। এই ত্যাগ এক প্রকারই হয়, তা সে ধনসম্পত্তির কামনা ত্যাগই হোক বা মানমর্যাদার কামনা ত্যাগ হোক। কিন্তু গ্রহণ করার জিনিস অনেক হয়, কারণ এক একটি বস্তু অনেক প্রকারের হয় ; যেমন একই মিষ্টান্ন নানা প্রকারের হয়ে থাকে। সুতরাং এই সমস্ত বস্তু লাভের কামনাও অনেক, অনন্ত হয়ে থাকে।

গীতায় কর্মযোগ (এই শ্লোক) এবং ভক্তিযোগের (৯।৩০) প্রকরণে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু জ্ঞানযোগের প্রকরণে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির বর্ণনা করা হয়নি। এর কারণ হল যে জ্ঞানযোগে প্রথমে স্বরূপের বোধ হয়, তার পরিণামে বুদ্ধি স্বতঃই এক নিশ্চয়সম্পন্ন হয়ে যায়। কিন্তু কর্মযোগ ও ভক্তিযোগে প্রথমে বুদ্ধির এক স্থিতি হয়, তারপর স্বরূপের বোধ হয়। সুতরাং জ্ঞানযোগে জ্ঞানের প্রাধান্য থাকে এবং কর্মযোগ এবং ভক্তিযোগে থাকে এক নিশ্চয়তার প্রাধান্য ।

'বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্'—তিনিই অব্যবসায়ী যাঁর মধ্যে সকামভাব থাকে, যিনি ভোগ এবং সংগ্রহে (সঞ্চয়ে) আসক্ত থাকেন। কামনার জন্য এরূপ ব্যক্তির বুদ্ধি বহুগামী হয় এবং বুদ্ধিও অসংখ্য শাখা-প্রশাখাযুক্ত হয় অর্থাৎ এক-একটি বুদ্ধি বহুরকম শাখাযুক্ত হয়। যেমন পুত্রপ্রাপ্ত করতে হবে—এই একটি বুদ্ধি এবং পুত্রপ্রাপ্তির জন্য কোন ওষুধ খাওয়া যায়, কোন মন্ত্র জপ করা যায়, কোন অনুষ্ঠান পালন করা যায়, কোন সাধুর আশীর্বাদ নেওয়া যায় ইত্যাদি উপায় হল ওই বুদ্ধির অসংখ্য শাখা-প্রশাখা। এইরূপই ধনপ্রাপ্তি করতে হবে—এটি একটি বুদ্ধি এবং ধনলাভের আশায় ব্যবসা করতে হবে, চাকরি করতে হবে, চুরি করতে হবে, ডাকাতি করতে হবে, জাল-জোচ্চুরি করতে হবে ইত্যাদি হল ওই বুদ্ধিরই অনন্ত শাখা-প্রশাখা। এরূপ মানুষের বুদ্ধিতে পরমাত্ম-প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকে না।

পরিশিষ্ট-ভাব— উদ্দেশ্য প্রকৃতপক্ষে একটিই হয়ে থাকে। যতক্ষণ মানুষের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য এক না হয়, ততক্ষণ তার অনন্ত উদ্দেশ্য (লক্ষ্য) থাকে এবং এক-একটি উদ্দেশ্যের নানা শাখা-প্রশাখা হয়ে থাকে। তার কামনাও অনন্ত হয়ে থাকে এবং এক-একটি কামনা পূরণের জন্য তার উপায়ও নানাপ্রকার হয়।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—অব্যবসায়ী (অস্থিরচিত্ত) মানুষদের বুদ্ধি কেন অনন্ত হয়—তার কারণ পরবর্তী তিনটি শ্লোকে জানিয়েছেন।

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥ ৪২ ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি॥ ৪৩ ॥

[**পার্থ** (হে পৃথানন্দন !) ; **কামাত্মানঃ** (যে কামনাতে মগ্ন হয়ে আছে) ; **স্বর্গপরাঃ** (স্বর্গকেই যে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে) ; **বেদবাদরতাঃ** (বেদে কথিত সকাম ধর্মে যে প্রীতি রাখে) ; **অন্যৎ** (ভোগ ছাড়া কিছু) ; **ন, অস্তি, ইতি** (নেই এমন কথা) ; **বাদিনঃ** (যে বলে থাকে) ; **অবিপশ্চিতঃ** (বিবেকহীন ব্যক্তি) ; **ইমাম্, যাম্, পুষ্পিতাম্** (এই প্রকার মনোহর) ; **বাচম্ প্রবদন্তি** (বাক্য বলে থাকে) ; **জন্ম-কর্ম-ফলপ্রদাম্** (জন্ম-মৃত্যুরূপ ফল প্রদানকারী) ; **ভোগৈশ্বর্যগতিম্ প্রতি** (ভোগ-ঐশ্বর্যপ্রাপ্তির জন্য) ; **ক্রিয়াবিশেষ বহুলাম্** (নানাপ্রকার ক্রিয়াকর্মের বর্ণনাকারী।)]

হে পৃথানন্দন ! যারা কামনাতে মগ্ন হয়ে আছে, স্বর্গকেই যারা শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে, বেদে কথিত সকাম

কর্মে যারা প্রীতি রাখে, 'ভোগ ছাড়া আর কিছুই নেই'—এমন কথা যারা বলে, এইরূপ বিবেকহীন ব্যক্তিগণ সেই প্রকার মনোহর (পুষ্পিত) বাক্যই বলে, যা জন্ম-মৃত্যুরূপ কর্মফল প্রদানকারী এবং ভোগ-ঐশ্বর্যপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ নানাপ্রকার ক্রিয়াকর্মের বর্ণনাসূচক ॥ ৪২-৪৩ ॥

ব্যাখ্যা—**'কামাত্মানঃ'**—এরা ভোগবিলাসে এমন-ভাবে ডুবে থাকে যে এরা যেন কামনার প্রতিমূর্তি। এদের মধ্যে কামনা ছাড়া কোনো নিজস্বতা থাকে না। এদের মনে হয়, কামনা-বাসনা ব্যতিরেকে মানুষ বাঁচতে পারে না এবং কামনা ছাড়া কোনো কাজ করতে পারে না, কামনাহীন ব্যক্তি প্রস্তরের মতো নির্জীব হয়ে যায়। এইরূপ ভাবসম্পন্ন ব্যক্তিকে **'কামাত্মানঃ'** বলা হয়।

স্ব-স্বরূপ সর্বদাই একভাবে থাকে, তার কখনো হ্রাস - বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু কামনা আসে এবং যায় ও বাড়ে-কমে। স্ব-স্বরূপ পরমাত্মার অংশ আর কামনা জগতের অংশ। সুতরাং স্ব-স্বরূপ এবং কামনা দুটি সর্বতোভাবে পৃথক। কিন্তু কামনায় মগ্ন ব্যক্তিগণের নিজ স্বরূপের স্বাতন্ত্র্যগত কোনো ধারণাই থাকে না।

'স্বর্গপরাঃ'—স্বর্গে অত্যুৎকৃষ্ট দিব্য ভোগ পাওয়া যায়, সেইজন্য স্বর্গই তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য হয়ে থাকে এবং তারা স্বর্গপ্রাপ্তির আশাতে দিনরাত লেগে থাকে।

এখানে **'স্বর্গপরাঃ'** পদ দ্বারা সেইসব ব্যক্তিদের কথা বলা হয়েছে যারা বেদ এবং শাস্ত্রে বর্ণিত স্বর্গাদি লোকের ওপর আস্থা রাখে।

'বেদবাদরতাঃ........বাদিনঃ'—এরা বেদে কথিত সকামকর্মে প্রীতি রাখে অর্থাৎ বেদের তাৎপর্য বলতে এরা শুধুমাত্র ভোগ এবং স্বর্গপ্রাপ্তি বলেই মনে করে, তার জন্য এরা **'বেদবাদরতাঃ'**। তাদের মনে ইহজগতে এবং স্বর্গে ভোগ ছাড়া আর কিছুই নেই অর্থাৎ তাদের দৃষ্টিতে ভোগ ছাড়া পরমাত্মা, তত্ত্বজ্ঞান, মুক্তি, ভগবৎ প্রেম ইত্যাদি কোনো বস্তুই নেই। সুতরাং তারা ভোগবিলাসেই ডুবে থাকে। ভোগ করাই তাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হয়।

'যামিমাং .... বিপশ্চিতঃ'—যার সৎ-অসৎ, নিত্য-অনিত্য, অবিনাশী-বিনাশী ইত্যাদি বিচারবোধ নেই, এইরূপ অবিবেকী ব্যক্তিগণ বেদে যে সমস্ত বাণীতে সংসার এবং ভোগবিলাসের বর্ণনা আছে, সেই সমস্ত মনোহর বাণীগুলিই বলে থাকে।

এখানে **'পুষ্পিতাম্'** বলার অর্থ হল এই যে, ভোগ এবং ঐশ্বর্যের প্রাপ্তির বর্ণনাকারী বাণীগুলি শুধুমাত্র পত্র-পুষ্পে পল্লবিত, তার কোনো ফল হয় না। ফল দ্বারাই তৃপ্তিলাভ হয়, পত্র-পুষ্পের শোভাতে নয়। ওই বাণীগুলি স্থায়ী ফল প্রদান করে না। ওই বাক্যের যে ফল—স্বর্গাদি ভোগ, তা কেবলমাত্র শুনতেই সুন্দর, তার কোনো স্থায়িত্ব নেই।

'জন্মকর্মফলপ্রদাম্'—এই পুষ্পিত বাক্যসমূহ জন্ম-মৃত্যুরূপ কর্মফল প্রদানকারী, কারণ এগুলিতে সাংসারিক ভোগকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ওই সমস্ত ভোগের অনুরাগই পরবর্তী জন্মের কারণ হয়ে থাকে (গীতা ১৩।২১)।

'ক্রিয়াবিশেষবহুলাং .... প্রতি'—এই সমস্ত পুষ্পিত অর্থাৎ মনোহরণকারী বাক্য দ্বারা ভোগ এবং ঐশ্বর্যপ্রাপ্তির জন্য যে সমস্ত সকাম অনুষ্ঠানের বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে ক্রিয়ার বাহুল্য থাকে অর্থাৎ সেই সমস্ত অনুষ্ঠানে নানাপ্রকার বিধি থাকে, নানাপ্রকার ক্রিয়া করতে হয়, অনেক প্রকার বস্তুর প্রয়োজন হয় এবং শারীরিক পরিশ্রমও খুব করতে হয় (গীতা ১৮।২৪)।

* * *

ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥ ৪৪ ॥

[**তয়া** (এই প্রীতিপ্রদ বাক্যে) ; **অপহৃত চেতসাম্** (যাদের চিত্ত মোহিত হয়েছে) ; **ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাম্** (ভোগ-ঐশ্বর্যে আসক্ত ব্যক্তিদের) ; **সমাধৌ** (পরমাত্মায়) ; **ব্যবসায়াত্মিকা** (নিশ্চয়াত্মিকা) ; **বুদ্ধিঃ** (বুদ্ধি) ; **ন বিধীয়তে** (হতে পারে না।)]

এই সমস্ত আপাত প্রীতিপ্রদ বাক্যে যাদের চিত্ত মোহিত হয়েছে অর্থাৎ ভোগে আসক্ত হয়েছে সেইসব ব্যক্তিদের পরমাত্মায় নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হতে পারে না ॥ ৪৪ ॥

ব্যাখ্যা—**'তয়াপহৃতচেতসাম্'**—আগের শ্লোকে যে শোভাযুক্ত বাক্যের বর্ণনা করা হয়েছে, সেই বাক্যে যাদের অপহৃত চিত্ত অর্থাৎ স্বর্গে অত্যন্ত সুখ, সেখানে দিব্য নন্দন বাগান আছে, সেটি অপ্সরা পরিবেষ্টিত, সেখানে অমৃত পাওয়া যায়—এরূপ বাক্যে যাদের চিত্ত ভোগে মোহিত, তাদের কথা বলা হয়েছে।

'ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাম্'—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ—এই পাঁচ বিষয়, শরীরের সুখ, মান এবং নামযশের মোহ—এই সব কিছুর দ্বারা সুখ গ্রহণ করার নাম হল 'ভোগ'। ভোগ করার উদ্দেশ্যে বস্তু, টাকাপয়সা, অট্টালিকা ইত্যাদি যা সমস্ত সংগৃহীত হয়, তার নাম হল 'ঐশ্বর্য'। এই ভোগ ও ঐশ্বর্যে যাদের আসক্তি, ভালোবাসা, আকর্ষণ আছে অর্থাৎ এই সবকে যারা গুরুত্ব দেয়, তাদের **'ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাম্'** বলা হয়েছে।

যারা কেবল ভোগ এবং ঐশ্বর্যেই মত্ত থাকে তারা আসুরীসম্পদসম্পন্ন হয়। কারণ প্রাণকে বলা হয় **'অসু'** এবং যারা এই প্রাণকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়, সেই প্রাণপোষণপরায়ণ ব্যক্তিদের **'অসুর'** বলা হয়। তারা শরীরকে প্রাধান্য দিয়ে এখানে অথবা স্বর্গে সুখভোগ করতে চায়[১]।

'ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে'—মনুষ্যজন্মের যেটি আসল লক্ষ্য, যার জন্য মনুষ্যদেহপ্রাপ্ত হয়েছে তা হল পরমাত্মাকেই প্রাপ্ত করা—এই ব্যবসায়াত্মিকা (নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধি ওইসব মানুষদের হয় না। তাৎপর্য হল, যা ভোগ করা হয়েছে, যা ভোগ করা যেতে পারে, ভোগের সম্বন্ধে যা শোনা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে শোনা যেতে পারে, সেই সংস্কারের ফলে বুদ্ধিতে যে মালিন্য থাকে, সেই মালিন্যের জন্য জগৎ-সংসার থেকে সর্বতোভাবে বিমুখ হয়ে পরমাত্মামুখী হতে হবে—এরূপ দৃঢ় নিশ্চয় তারা করতে পারে না। এইরূপ, জগতের নানাপ্রকার শিক্ষা, কলা, পাণ্ডিত্য ইত্যাদিতে যারা শিক্ষিত হয়ে 'আমি বিদ্বান', 'আমি অনেক কিছু জানি'—এই অহংকারে সুখী হয়, সেই সুখে আসক্ত ব্যক্তিগণেরও পরমাত্মপ্রাপ্তি বিষয়ে একান্ত নিশ্চিত হয় না।

বিশেষ কথা

পরম দয়ালু প্রভু কৃপা করে এই মনুষ্যদেহে এমন এক বিশেষ বিচারক্ষমতা (বিবেকশক্তি) দিয়েছেন, যার দ্বারা সে সুখ-দুঃখের অতীত হয়ে নিজেকে উদ্ধার করে, সকলের সেবা করে ভগবানকে পর্যন্ত নিজ বশে রাখতে পারে। এতেই মনুষ্যজন্মের সার্থকতা। কিন্তু ভগবানপ্রদত্ত সেই বিচারবোধ শক্তির অবহেলা করে বিনাশশীল ভোগ এবং সম্পদসংগ্রহে আসক্ত হওয়াই হল পশুবুদ্ধি। কারণ পশু-পক্ষীও ভোগ করে, মনুষ্য যদি তেমনই ভোগে মগ্ন হয় তবে পশুপক্ষী এবং মানুষের মধ্যে পার্থক্য কী থাকে?

পশুপক্ষী হল ভোগযোনি। সুতরাং তাদের কাছে কর্তব্যের কোনো প্রশ্ন নেই। কিন্তু মনুষ্য জন্ম হয়েছে শুধুমাত্র নিজ কর্তব্যপালন করে উদ্ধার পাবার জন্যই, ভোগসুখের জন্য নয়। সেইজন্য তার কাছে যে কোনো পরিস্থিতি আসুক তা অনুকূল-প্রতিকূল যাই হোক, তা সবই সাধনসামগ্রী, ভোগের জন্য নয়। যে সেগুলিকে ভোগ-উপকরণ বলে মনে করে, তার পরমাত্মাতে কখনো ব্যবসায়াত্মিকা (নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধি হয় না।

আসলে জাগতিক বস্তুসকল ভগবানের পথে বাধাস্বরূপ নয়, কিন্তু ভোগের যে আকর্ষণ অন্তঃকরণে দৃঢ়মূল হয়ে রয়েছে সেটিই আসল বাধা। ভোগ তত বাধক হয় না, যত ভোগের ভাব বাধক হয়। প্রধান বাধা হল নিজের রুচি এবং স্বভাব। ভোগ এবং সম্পত্তিসংগ্রহের ইচ্ছাকে পোষণ করে যদি কেউ পরমাত্মাকে লাভ করতে চায় তবে ভগবান লাভ তো দূরের কথা, তাঁর প্রাপ্তির একান্ত নিশ্চয়তা সে করতে পারে না। কারণ যেখানে পরমাত্মাকে পাবার ইচ্ছা সেখানেই অর্থাৎ সেই স্থান ভোগ আর

[১]এখানে যে রাজসিক ব্যক্তিদের বর্ণনা করা হচ্ছে, তাদের ভগবান ষোড়শ অধ্যায়ে আসুরীসম্পদসম্পন্নদের প্রকরণে 'কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ' (১৬।১১), 'প্রসক্তা কামভোগেষু' (১৬।১৬), ইত্যাদি পদ দ্বারা বলেছেন। সুতরাং যে শুধুমাত্র ভোগ করতে চায়, তাকে আসুরীসম্পদসম্পন্নই বলা হয়।

সঞ্চয়ের রুচিতে অবরুদ্ধ হয়েছে। যতক্ষণ ভোগ এবং সম্পদসংগ্রহে, মান-যশ-আরামে আসক্তি থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ স্থিরলক্ষ্য হয়ে ভগবান লাভের জন্য চেষ্টা করতে পারে না। কারণ তার হৃদয় ভোগের আসক্তিতে বশীভূত, তার যে শক্তি ছিল তা ভোগ-আরাম এবং সম্পদসংগ্রহে কেন্দ্রীভূত রয়েছে।

পরিশিষ্ট-ভাব— নিজেদের কল্যাণের পথে যদি কোনো প্রতিবন্ধক থাকে, তা হল—ভোগ এবং ঐশ্বর্য (সংগ্রহ) লাভের ইচ্ছা। জালে আবদ্ধ মাছ যেমন এগোতে পারে না, তেমনই ভোগ ও সংগ্রহে আবদ্ধ মানুষের দৃষ্টি পরমাত্মার দিকে যেতেই পারে না। শুধু তাই নয়, এইসব আসক্ত ব্যক্তি পরমাত্মাপ্রাপ্তির লক্ষ্যও স্থির করতে পারে না।

যারা জগৎসংসারকেই সত্য বলে মনে করে, তাদের পক্ষে কর্মযোগই আশু কল্যাণকারী হয়। কর্মযোগী তার কর্তব্য কর্মের সাহায্যে জগতের সেবা করে অর্থাৎ প্রতিটি কর্মই তারা নিষ্কামভাবে অপরের হিতার্থে করে। তারা অন্যের সুখে সুখী এবং অন্যের দুঃখে দুঃখী হয়ে থাকে। অপরের সুখ দেখে সুখী হওয়ায় তাদের মধ্যে 'ভোগের' ইচ্ছা থাকে না এবং অপরের দুঃখে দুঃখী হওয়ায় তাদের মধ্যে সংগ্রহের আকাঙ্ক্ষাও আর থাকে না[১]।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—কোনো বিষয়কে প্রাধান্য দিতে হলে প্রথমে তার দোষ-গুণ—উভয় পক্ষকে এক জায়গায় রেখে, বিচার করে তারপর তাকে জোরদার করতে হয়। এখানে ভগবান নিষ্কামভাবটিকে গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন; সুতরাং আগের তিনটি শ্লোকে সকামভাবসম্পন্ন ব্যক্তিদের বর্ণনা করে এবার পরবর্তী শ্লোকে নিষ্কাম হওয়ার প্রেরণা দিয়েছেন।

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥ ৪৫ ॥

[বেদাঃ (বেদসমূহ) ; **ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ** (তিনগুণের কার্যাদির বর্ণনাকারক) ; **অর্জুন** (হে অর্জুন !) ; **নিস্ত্রৈগুণ্যঃ, ভব** (ত্রিগুণরহিত হও) ; **নির্দ্বন্দ্বঃ** (নির্দ্বন্দ্ব) ; **নিত্যসত্ত্বস্থঃ** (নিত্যসত্ত্বস্থ) ; **নির্যোগক্ষেমঃ** (যোগক্ষেমের ইচ্ছারহিত) ; **আত্মবান্** (পরমাত্মাপরায়ণ।)]

বেদসমূহ গুণত্রয়ের কার্যগুলির বর্ণনাকারক, হে অর্জুন ! তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য হও, নির্দ্বন্দ্ব হও, নিত্যসত্ত্বস্থ হও, যোগক্ষেমরহিত হও এবং পরমাত্মাপরায়ণ হও ॥ ৪৫ ॥

ব্যাখ্যা—'ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ বেদাঃ'—এইস্থানে বেদের তাৎপর্য বলতে বেদের ওই অংশটুকুই ধরা হয়েছে, যাতে ত্রিগুণ এবং ত্রিগুণাদির কার্য—স্বর্গাদি ভোগের বর্ণনা রয়েছে।

এখানে উপরিউক্ত পদগুলির অর্থ বেদের নিন্দা করা নয়, বরং তার দ্বারা নিষ্কামভাবের মহিমাই গীত হয়েছে। যেমন হীরকের বর্ণনা করার কালে তার সঙ্গে কাচের বর্ণনা করলে তার অর্থ কাচের নিন্দা করা নয়, বরং হীরকের মহিমা জানানোই এর উদ্দেশ্য। তেমনি এখানে নিষ্কামভাবের মহিমা জানাবার জন্যই বেদের সকামভাবের বর্ণনা করা হয়েছে, নিন্দা করার জন্য নয়। বেদ যে কেবলমাত্র ত্রিগুণের কার্য জগৎসংসারেরই বর্ণনা করে, তা নয়, বেদে পরমাত্মা এবং তাঁর প্রাপ্তির সাধনার বর্ণনাও করা হয়েছে।

'নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন'—'হে অর্জুন ! তুমি ত্রিগুণের কার্যরূপ জগৎসংসারের বাসনা ত্যাগ করে অসংসারী হও অর্থাৎ সংসারের ঊর্ধ্বে অবস্থান করো।'

'নির্দ্বন্দ্বঃ'—সংসার থেকে ঊর্ধ্বে উঠতে গেলে রাগ-দ্বেষাদি দ্বন্দ্বরহিত হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন, কারণ এগুলিই মানুষের প্রকৃত শত্রু অর্থাৎ এগুলিই মানুষকে সংসারে বদ্ধ

[১] প্রকৃত সেবা বাস্তবে ত্যাগের দ্বারাই হওয়া সম্ভব। অর্থাৎ ভোগ ও সংগ্রহের আকাঙ্ক্ষা সর্বতোভাবে দূর হলেই প্রকৃত সেবা হয়, নতুবা নামমাত্রই সেবা হয়। কিন্তু উদ্দেশ্য যদি খাঁটি হয় তবে নকল সেবাও আসলে পরিণত হয়।

করে রাখে (গীতা ৩।৩৪)[১]। সেইজন্য তুমি দ্বন্দ্ব থেকে সম্পূর্ণভাবে রহিত হও।

ভগবান এইস্থলে অর্জুনকে নির্দ্বন্দ্ব হওয়ার আদেশ কেন দিয়েছেন ? কারণ দ্বন্দ্ব হতেই মানুষ মোহগ্রস্ত হয়, সংসারে আবদ্ধ হয় (গীতা ৭।২৭)। সাধক যখন নির্দ্বন্দ্ব হন, তখনই তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে সাধনভজন করতে পারেন (গীতা ৭।২৮)। নির্দ্বন্দ্ব হলে সাধক অনায়াসে সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত হন (গীতা ৫।৩)। নির্দ্বন্দ্ব হলে মূঢ়তা দূর হয় (গীতা ১৫।৫)। নির্দ্বন্দ্ব সাধক কর্ম করলেও তার দ্বারা আবদ্ধ হন না (গীতা ৪।২২)। অর্থাৎ নির্দ্বন্দ্ব হলেই সাধকের সাধনা দৃঢ় হয়। সেইজন্যই ভগবান অর্জুনকে নির্দ্বন্দ্ব হবার আদেশ দিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত, সংসারে কোনো বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদিতে যদি অনুরাগ হয়, তবে অন্য বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদিতে দ্বেষ হয়—এটিই নিয়ম। এরূপ হলে ভগবান উপেক্ষিত হন—এটিও একপ্রকার দ্বেষ। কিন্তু সাধকের যখন ভগবানে ভালোবাসা জন্মায়, তখন সংসারে দ্বেষ উৎপন্ন হয় না, বরং সংসার থেকে উপরতি হয়। উপরতি হওয়ার প্রথম অবস্থা এরূপ হয় যে সাধকের প্রতিকূলতার প্রতি দ্বেষ হয় না, কিন্তু উপেক্ষা আসে। উপেক্ষার পর উদাসীনতা হয় এবং উদাসীনতার পর উপরতি আসে। উপরতি হলে রাগ-দ্বেষ চিরকালের মতো দূর হয়। এই ক্রমে সূক্ষ্মভাবে দেখলে বোঝা যায় যে, উপেক্ষাতে রাগ ও দ্বেষের সংস্কার থাকে, উদাসীনভাবে রাগ-দ্বেষের সত্তা থাকে, কিন্তু উপরতিতে রাগ-দ্বেষের সংস্কারও থাকে না, সত্তাও থাকে না ; রাগ-দ্বেষ চিরকালের মতো দূরীভূত হয়।

'নিত্যসত্ত্বস্থঃ'—দ্বন্দ্বরহিত হওয়ার উপায় হল, যা নিত্য-নিরন্তর স্থিত, সর্বত্র পরিপূর্ণ, সেই পরমাত্মায় মনকে সর্বদা স্থির রাখা।

'নির্যোগক্ষেমঃ'[২]—'তুমি যোগ এবং ক্ষেমের[৩] ইচ্ছাও রেখো না। কারণ যে আমার শরণাগত, তার যোগক্ষেম আমি নিজেই বহন করি' (গীতা ৯।২২)।

'আত্মবান্'—'তুমি শুধুমাত্র পরমাত্মপরায়ণ হও এবং একমাত্র পরমাত্মতত্ত্বপ্রাপ্তির প্রতিই লক্ষ্য রাখ।'

পরিশিষ্ট-ভাব—'নির্দ্বন্দ্বঃ'—বাস্তবে জড়-চেতন, সৎ-অসৎ, নিত্য-অনিত্য, বিনাশশীল-অবিনাশী ইত্যাদির পার্থক্যও হল দ্বন্দ্ব। যোগ এবং ক্ষেম প্রার্থনা করাও দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্ব হলে 'সব কিছুই ভগবান'— এই প্রকৃত সত্যটির অনুভব হয় না। কারণ সব কিছু যদি ভগবানই হন তাহলে জড়-চেতনের দ্বন্দ্ব কেন থাকবে ? তাই ভগবান অমৃত এবং মৃত্যু, সৎ এবং অসৎ উভয়কেই তাঁর স্বরূপ বলে জানিয়েছেন—**'অমৃতং চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন'** (গীতা ৯।১৯)

* * *

সম্বন্ধ—ত্রিগুণরহিত, নির্দ্বন্দ্ব ইত্যাদি হলে কী হবে—পরের শ্লোকে তাই জানাচ্ছেন।

যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥ ৪৬ ॥

[**সর্বতঃ** (সর্বত্র) ; **সংপ্লুতোদকে** (জলপ্লাবিত মহান জলাশয় পেলে) ; **উদপানে** (ক্ষুদ্র জলাশয়ে মানুষের) ; **যাবান্, অর্থঃ** (যে প্রয়োজন থাকে) ; **বিজানতঃ** (তত্ত্বজ্ঞ) ; **ব্রাহ্মণস্য** (ব্রহ্মনিষ্ঠদের) ; **সর্বেষু, বেদেষু** (সম্পূর্ণ বেদে) ; **তাবান্** (ততটাই।)]

[১]একই বিষয় ও বস্তুতে দুই প্রকার ভাবকে 'দ্বন্দ্ব' বলা হয়। কিন্তু বিষয় ও বস্তু যদি পৃথক হয়, তাহলে দ্বন্দ্ব হয় না ; যেমন 'প্রকৃতি' এবং 'পুরুষ', 'জড়' ও 'চেতন'—এইগুলিকে পৃথক বলে বোঝা কোনো দ্বন্দ্ব নয়। তেমনি জগৎসংসার থেকে বিমুখ হয়ে ভগবানের শরণাগত হওয়াও দ্বন্দ্ব নয়। কিন্তু যদি সংসারেই দুটি ভাব দেখা যায় (রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ, হর্ষ- শোক, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি), তাহলে সেটি দ্বন্দ্ব হয় এবং তাতেই মানুষ আবদ্ধ হয়।

[২]অপ্রাপ্ত বস্তুপ্রাপ্তির নাম 'যোগ' এবং প্রাপ্তবস্তু রক্ষাকে বলা হয় 'ক্ষেম'।

[৩]এখানে যদিও কর্মযোগের প্রকরণ রয়েছে, তাহলেও এইস্থানে 'নির্যোগক্ষেমঃ' পদটি ভক্তিযোগের বাচক বলে মনে করা উচিত। কারণ ভগবান অর্জুনকে স্থানে স্থানে ভক্ত হবার নির্দেশ দিয়েছেন এবং অর্জুনকে ভক্ত বলে মেনেও নিয়েছেন (৪।৩)। ভগবান যে ভক্তের যোগক্ষেম বহন করেন তাও জানিয়েছেন (৯।২২)।

এক বিস্তীর্ণ মহা জলাশয় প্রাপ্ত হলে ক্ষুদ্র জলাশয়ে মানুষের যে প্রয়োজন, অর্থাৎ কোনো প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, বেদ এবং শাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষেরও বেদে ততটাই প্রয়োজন অর্থাৎ কোনো প্রয়োজনই থাকে না ॥ ৪৬ ॥

ব্যাখ্যা—'যাবানর্থ............সংপ্লুতোদকে'—বৃহৎ পরিপূর্ণ, স্বচ্ছ, নির্মল সরোবর প্রাপ্ত হলে মানুষের আর ক্ষুদ্র জলাশয়ের কোনো প্রয়োজন থাকে না। কারণ ক্ষুদ্র জলাশয়ে হস্ত-পদ প্রক্ষালনেই জল নোংরা হয়ে যায়, তার ফলে সেটি আর স্নানের উপযুক্ত থাকে না ; আর যদি স্নান করা হয় তবে তা আর বস্ত্র ধৌত করার উপযুক্ত থাকে না ; আবার যদি বস্ত্র ধৌত করা হয়, তা আর পানের যোগ্য থাকে না। কিন্তু বৃহৎ সরোবর প্রাপ্ত হলে তাতে সমস্ত কিছু করা হলেও তাতে কোনো পার্থক্য হয় না অর্থাৎ তার স্বচ্ছতা, নির্মলতা, পবিত্রতা যেমন তেমনই থাকে।

'তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ'—এইরূপ যে মহাপুরুষ পরমাত্মতত্ত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁর জন্য বেদে কথিত যজ্ঞ, দান, তপ, তীর্থ ইত্যাদি যত পুণ্যকার্য আছে, তাতে তাঁর কোনো প্রয়োজন থাকে না অর্থাৎ এই সমস্ত পুণ্যকর্মগুলি তাঁর কাছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ের মতো হয়ে যায়। এইরূপ দৃষ্টান্তই পরবর্তী সত্তরতম শ্লোকে দেওয়া হয়েছে যে, ওই জ্ঞানী মহাপুরুষ সমুদ্রের মতো বিশাল হয়ে থাকেন। তাঁর নিকটে যত ভোগ্যসামগ্রীই আসুক না কেন, তাতে তিনি কোনোপ্রকার বিচলিত হন না।

যিনি পরমাত্মতত্ত্ব জানেন এবং বেদজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ, সেই মহাপুরুষকে এখানে **'ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ'** পদের দ্বারা বলা হয়েছে।

'তাবান্' বলার অর্থ হচ্ছে এই যে, পরমাত্মতত্ত্বপ্রাপ্ত হলে তিনি ত্রিগুণরহিত হন। তিনি নির্দ্বন্দ্ব হন অর্থাৎ তাঁর রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি থাকে না। তিনি নিত্যতত্ত্বে স্থিত হন। তিনি নির্যোগক্ষেম হয়ে যান অর্থাৎ কোনো বস্তুর প্রাপ্তি ঘটুক এবং প্রাপ্তবস্তু রক্ষিত হতে থাক—এই ভাবও তাঁর হয় না। তিনি সর্বদা পরমাত্মপরায়ণ হয়ে থাকেন।

পরিশিষ্ট-ভাব— জাগতিক ভোগের কোনো অন্ত নেই। ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত আর তাতে অনন্ত প্রকারের ভোগ আছে। কিন্তু যদি সেগুলি পরিত্যাগ করে তাতে আসক্তিশূন্য হওয়া যায়, তবেই তার অন্ত হয়। কামনাও এইরূপ অনন্ত হয়। তাই তাকে যদি পরিত্যাগ করে নিষ্কাম হওয়া যায়, তবেই তার অন্ত হয়।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—ভগবান উনচল্লিশতম শ্লোকে যে সমবুদ্ধি (সমত্ব) শোনার জন্য অর্জুনকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, পরবর্তী শ্লোকে তা প্রাপ্ত করার জন্য কর্ম করতে নির্দেশ দিচ্ছেন।

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি॥ ৪৭ ॥

[**কর্মণি, এব** (কর্তব্যকর্মেই) ; **তে, অধিকারঃ** (তোমার অধিকার) ; **ফলেষু** (কর্মফলে) ; **কদাচন, মা** (কখনও নয়) ; **কর্মফলহেতুঃ** (কর্মফলের হেতু) ; **মা, ভূঃ** (হোয়ো না) ; **অকর্মণি** (কর্ম ত্যাগে) ; **তে** (তোমার) ; **সঙ্গঃ** (আসক্তি) ; **মা** (না) ; **অস্তু** (হয়।)]

কর্তব্যকর্মেই তোমার অধিকার, কর্মফলে কখনো অধিকার নেই ; সুতরাং তুমি কর্মফলের হেতুও হোয়ো না এবং কর্মত্যাগেও যেন তোমার আসক্তি না হয় ॥ ৪৭ ॥

ব্যাখ্যা—'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে'— যে কর্তব্যকর্ম তুমি প্রাপ্ত হয়েছ তাতেই তোমার অধিকার, এতে তুমি স্বাধীন। কারণ হল মানুষের জীবনে কর্মের প্রাধান্য। মানুষ ব্যতীত অন্য কোনো প্রাণীই নতুন কর্ম করার জন্য নয়। পশু-পক্ষী ইত্যাদি জঙ্গম এবং বৃক্ষ-লতাদি স্থাবর প্রাণী কোনো নতুন কর্ম করতে সক্ষম নয়। দেবতাগণ নতুন কর্ম করতে সক্ষম হলেও তাঁরা পূর্বকৃত যজ্ঞ, দানাদি শুভকর্মের ফলভোগই করে থাকেন। তাঁরা ভগবানের বিধান অনুযায়ী মানুষের

জন্য কর্মসামগ্রী দিতে পারেন, কিন্তু তাঁরা সুখভোগে লিপ্ত থাকায় নিজেরা কোনো নতুন কর্ম করতে পারেন না। নারকীয় জীবগণও ভোগযোনি প্রাপ্ত হওয়ায় নিজেদের দুষ্কর্মের ফল ভোগ করে থাকে, নতুন কর্ম করতে সক্ষম হয় না। নতুন কর্ম করার অধিকার শুধুমাত্র মানুষেরই আছে। সেবারূপ নতুন কর্ম দ্বারা নিজেদের উদ্ধার করার জন্য ভগবান মানবকুলকে এই অন্তিম মনুষ্যজন্ম প্রদান করেছেন। কিন্তু এই কর্ম নিজের জন্য হলে তাতে আবদ্ধ হতে হয়, আবার আলস্য-প্রমাদে গা ভাসিয়ে যদি কর্মবিমুখ থাকা হয় তবে জন্ম-মরণ চক্রে বারংবার আবর্তিত হতে হয়। ভগবান সেইজন্যই বলেছেন যে, 'তোমার কেবলমাত্র সেবারূপ কর্তব্যকর্মেই অধিকার আছে।'

'কর্মণি' পদটিতে একবচন ব্যবহারের তাৎপর্য হল এই যে মানুষের কাছে দেশ, কাল, ঘটনা, পরিস্থিতিবশতঃ শাস্ত্রবিহিত নানারূপ কর্ম হতে পারে, কিন্তু মানুষ একটি সময়ে একটিমাত্র কাজই তৎপরতার সঙ্গে করতে সক্ষম হয়। যেমন ক্ষত্রিয় হওয়ায় অর্জুনের যুদ্ধ করা, দান করা ইত্যাদি কর্তব্যকর্মের বিধান আছে, কিন্তু বর্তমানে যুদ্ধের সময় তিনি যুদ্ধরূপ কর্তব্যকর্মই শুধু করতে পারেন, দানাদি কর্তব্যকর্ম করা সম্ভব নয়।

মর্মকথা

মনুষ্যদেহে দুটি ব্যাপার ঘটে—পুরাতন কর্মের ফলভোগ এবং নতুন পুরুষার্থ। অন্যান্য জীবের কেবলমাত্র পুরাতন কর্মের ফলভোগ হয় অর্থাৎ কীট-পতঙ্গ, পশুপক্ষী, দেবতা, ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত জীবই ভোগযোনি। সেইজন্য তাদের প্রতি 'এটি করো', 'ওটি করো না'—এরূপ বিধান নেই। পশুপক্ষী, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি যা কিছু কর্ম করে, তা সমস্তই তাদের কর্মফলেরই ভোগ। কারণ তারা যে কর্ম করে তা সবই প্রারব্ধ অনুযায়ী আগে থেকেই ঠিক করা আছে। তাদের জীবনের অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতির যা কিছু ভোগ তাও ফলভোগ রূপেই থাকে। কিন্তু মনুষ্যজন্ম প্রাপ্তি হয় নতুন পুরুষার্থের জন্য, যাতে সে নিজেকে উদ্ধার করতে পারে।

মানব-জীবনে দুটি বিভাগ থাকে—একটি হল তার নিকট পুরাতন কর্মের ফলস্বরূপ অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া এবং অন্যটি হল তার দ্বারা নতুন কর্ম বা পুরুষার্থ করা। নতুন কর্ম অনুসারে তার ভবিষ্যৎ স্থির হয়। সেইজন্যই শাস্ত্র, সাধু-মহাপুরুষদের বিধি-নিষেধ, সরকারি নিয়মকানুন ইত্যাদির শাসন শুধুমাত্র মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কারণ মানুষেরই থাকে পুরুষার্থের প্রাধান্য ও নতুন কর্ম করার স্বাধীনতা। কিন্তু বিগত কর্মের ফলস্বরূপ প্রাপ্ত অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতির পরিবর্তনে সে পরাধীন। অর্থাৎ মানুষ কর্ম করতে স্বাধীন হলেও ফলপ্রাপ্তিতে সে পরাধীন। কিন্তু অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতির সদুপযোগ করে মানুষ সেগুলিকে তার উদ্ধারের সাধন-সামগ্রী করে নিতে পারে। কারণ এই মানব-জীবন তার উদ্ধারের নিমিত্তেই সৃষ্ট হয়েছে। সেইজন্য এর নতুন পুরুষার্থও উদ্ধারের জন্য এবং পুরোনো কর্মের ফলস্বরূপ প্রাপ্ত পরিস্থিতিও উদ্ধারের জন্যই সৃষ্ট।

এতে বিশেষভাবে বোঝার বিষয়টি হল এই যে, মনুষ্য-জীবনে প্রারব্ধ অনুযায়ী শুভ-অশুভ যে সমস্ত পরিস্থিতির উদ্ভব হয় সেগুলি মানুষ সুখদায়ক বা দুঃখদায়ক বলে মনে করতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই সব পরিস্থিতিতে সুখী বা দুঃখী হওয়া কর্মের ফল নয়, বরং তা মূর্খতার পরিচায়ক। কারণ পরিস্থিতির উদ্ভব বাইরে থেকেই হয় আর সুখী বা দুঃখী হয় স্বয়ং নিজে। সেই পরিস্থিতির সঙ্গে তাদাত্ম্য করেই মানুষ সুখ বা দুঃখের ভোক্তা হয়। মানুষ যদি সেই পরিস্থিতির সঙ্গে তাদাত্ম্য না করে তার সদুপযোগ করে, তবে সেই পরিস্থিতিই তার উদ্ধারের সাধন-সামগ্রী হয়ে ওঠে। সুখদায়ী পরিস্থিতির সদুপযোগ হল—অপরের সেবা করা এবং দুঃখদায়ী পরিস্থিতির সদুপযোগ হল—সুখভোগের ইচ্ছা পরিত্যাগ করা।

দুঃখদায়ক পরিস্থিতিতে মানুষের কখনো উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নয়, বরং চিন্তা করা উচিত যে আমি সুখভোগের আশায় প্রথমে পাপ করেছি, এখন সেই পাপ দুঃখদায়ক পরিস্থিতি রূপে এসে শেষ হচ্ছে। এতে একটি লাভ হচ্ছে এই যে, ওই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে এবং আমার শুদ্ধিকরণ হচ্ছে। আর অন্য লাভ হল এই যে, এটি সতর্কবার্তা বহন করে যে, আমি যদি আবার সুখভোগের আশায় পাপ করি তবে পরে আবার এইরূপ দুঃখদায়ক পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। সুতরাং সুখভোগের আশায় আর কোনো কাজ করা উচিত নয়, বরং প্রাণীমাত্রেরই হিতের

জন্য কাজ করা উচিত।

এর তাৎপর্য হল এই যে, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি প্রাণীদের পুরাতন কর্ম বা নতুন কর্ম সবই ভোগ-রূপে থাকে, কিন্তু মানুষের জন্য পুরাতন কর্মের ফল এবং নূতন (পুরুষার্থ) কর্ম—এই দুই-ই হল উদ্ধারের সাধন।

'মা ফলেষু কদাচন'—ফলে তোমার কিছুমাত্র অধিকার নেই অর্থাৎ ফলপ্রাপ্তিতে তোমার কোনোরূপ স্বাধীনতা নেই। কারণ ফলের বিধান আমার অধীন। সুতরাং ফলের ইচ্ছা না করে কর্তব্যকর্ম করো। যদি তুমি ফলের ইচ্ছা রেখে কর্ম কর তবে তুমি আবদ্ধ হবে—**'ফলে সক্তো নিবধ্যতে'** (গীতা ৫।১২)। কারণ ফলের ইচ্ছা অর্থাৎ ভোগের ইচ্ছার ওপরই কর্তৃত্ব নির্ভর করে অর্থাৎ ভোগবাসনা থেকে কর্তৃত্ব আসে। ফলের আশা সর্বতোভাবে দূর হলে কর্তৃত্ব দূরীভূত হয় এবং কর্তৃত্ব দূর হলে মানুষ কর্ম করেও আবদ্ধ হয় না। এর তাৎপর্য হল এই যে মানুষ কর্তৃত্ব ভাব দ্বারা তত আবদ্ধ হয়ে নেই যত আবদ্ধ সে ফলাকাঙ্ক্ষা বা ভোগের আকাঙ্ক্ষা (ভোক্তৃত্ব) দ্বারা হয়ে আছে[১]।

দ্বিতীয়তঃ যা কিছু কর্ম সম্পাদিত হয় তা সমস্তই প্রাকৃত পদার্থ এবং মানুষের সহযোগে হয়ে থাকে। পদার্থ এবং মানুষের সহযোগিতা ছাড়া স্বয়ং কর্ম করতেই পারে না। সুতরাং এদের সহযোগিতা দ্বারা কৃতকর্মের ফল নিজের জন্য চাওয়া সততা নয়। সুতরাং কর্মের ফল চাওয়া মানুষের পক্ষে হিতকারক নয়।

'ফলে তোমার অধিকার নেই'—এতে প্রমাণিত হয় যে ফলের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করা বা না করায় মানুষ স্বাধীন, সমর্থ। এতে সে পরাধীন এবং অসমর্থ নয়।

'ফলেষু' পদে বহুবচন ব্যবহারের অর্থ হল এই যে, মানুষ একটি কর্ম করলেও তার নানা ফল আশা করে। যেমন, 'আমি এই কর্মটি করছি, যেন এতে আমার পুণ্য হয়, সংসারে আমার নাম হয়, লোকে আমাকে ভালো বলে মনে করে, আমাকে সম্মান করে, যেন অনেক সম্পদ প্রাপ্তি হয়' ইত্যাদি ইত্যাদি।

নিষ্কাম হওয়ার উপায়—(১) কামনা উৎপন্ন হলে অভাব বোধ হয়, কামনা পূর্ণ হলে পরাধীনতা এবং পূর্ণ না হলে দুঃখ হয়। আবার কামনা-পূর্তির সুখ পেলে নতুন কামনা জাগ্রত হয় এবং সকামভাবে নতুন-নতুন কর্ম করার আগ্রহ বাড়তেই থাকে—এটি ঠিকমতো বুঝে নিলে নিষ্কামভাব আপনা হতেই এসে যায়।

(২) কর্ম নিত্য নয় ; কারণ তার আরম্ভ ও শেষ আছে এবং ওই সব কর্মের ফলও নিত্য নয়। কারণ সেগুলিরও সংযোগ এবং বিয়োগ হয়। কিন্তু স্বরূপ নিত্য। অনিত্য কর্ম এবং কর্মফলে নিত্য স্বরূপের কোনোপ্রকার লাভ হয় না। এটি ঠিকভাবে বুঝলে নিষ্কামভাব আসে। নিষ্কাম হলে সাংসারিক সম্বন্ধ চলে যায় এবং পরমাত্মতত্ত্বের প্রাপ্তি ঘটে।

কর্মে নিষ্কাম হতে গেলে সাধকের বিবেকের জোর থাকা দরকার এবং তার মধ্যে সেবার ভাব থাকা প্রয়োজন। কারণ এই দুটি ঠিক রাখলে তবেই কর্মযোগের আচরণ ঠিকমতো পালিত হয়, নতুবা কর্ম 'কর্ম'ই হয় সেটি আর 'যোগ' হয় না। অর্থাৎ নিজ সুখ ও আরাম ত্যাগ করতে বিবেক-বোধের প্রাধান্য থাকা চাই এবং অন্যকে সুখ ও আরাম দেওয়ার জন্য সেবা ভাবের প্রাধান্য থাকা উচিত।

'মা কর্মফলহেতুর্ভূঃ'—'তুমি কর্মফলের হেতুও হয়ো না।' অর্থাৎ শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি কর্ম-সামগ্রীর প্রতি বিন্দুমাত্র মমতা রাখা উচিত নয় ; এগুলিতে মমত্ববোধ হলে মানুষ কর্মফলের হেতু হয়। পরবর্তী পঞ্চম অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকেও ভগবান শরীর, মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়াদিতে **'কেবলৈঃ'** পদটির দ্বারা বলেছেন যে শরীর ইত্যাদিতে বিন্দুমাত্র মমতা থাকা উচিত নয়।

শুভকর্মগুলিতে ফলের ইচ্ছা না থাকলেও 'আমার দ্বারা কেউ উপকৃত হয়েছে, কারো মঙ্গল হয়েছে, কেউ সুখী হয়েছে'—এরূপ ভাব হলেও তা কর্মফলের হেতু হয়ে যায়। কারণ এরূপ ভাব হলে শুভকর্মের সঙ্গে মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদির সম্পর্ক ঘটে, এগুলি হল অসৎ-সম্পর্ক। প্রকৃতপক্ষে অন্তঃকরণ, বহিঃকরণ এবং ক্রিয়াগুলির সঙ্গে

[১] অন্তরে ভোক্তৃত্ব (ফলের ইচ্ছা বা আসক্তি) অধিক পরিমাণে থাকাতেই মানুষ ভগবৎপ্রাপ্তি, তত্ত্বজ্ঞান, প্রেমপ্রাপ্তি ইত্যাদিতে কর্মকেই কারণ বলে মনে করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভগবৎপ্রাপ্তি ইত্যাদি কর্মের উপর নির্ভরশীল নয়, বরং ভাব ও বোধের উপর নির্ভরশীল। কারণ অপ্রাপ্ত পদার্থের প্রাপ্তি তো নির্ভর করে কর্মের ওপরে, কিন্তু নিত্যপ্রাপ্ত তত্ত্বের প্রাপ্তি কর্মের ওপর নির্ভর করে না।

আমাদের কোনো সম্বন্ধ নেই। এগুলির সম্পর্ক কেবলমাত্র সমষ্টিগত জগৎসংসারের সঙ্গে। যেমন, অন্য এক ব্যক্তির দ্বারা অপর কোনো লোকের হিতকার্য হলে তাকে আমরা নিজের বলে মনে করি না বা নিজের নিমিত্ত মনে করি না, তেমনি নিজের বলে কথিত যে শরীর তার দ্বারা যদি কারো হিত হয়, তবে তাতেও নিজেকে নিমিত্ত মনে করা উচিত নয়। নিজেকে যদি কখনোই কোনো ক্রিয়াতে নিমিত্ত বা হেতু বলে মনে না করা হয়, তাহলে আর কর্মফলের হেতু হতে হয় না।

'মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি'—'কর্ম না করাতেও তোমার আসক্তি থাকা উচিত নয়।' কারণ কর্ম না করার আসক্তি হলে আলস্য, প্রমাদ আদি উপস্থিত হয়। কর্মফলে আসক্তি থাকলে যেরূপ আবদ্ধ হতে হয়, তেমনি কর্ম না করাতে যে আলস্য-প্রমাদাদি আসে তাতেও মানুষ আবদ্ধ হয়, কারণ আলস্য-প্রমাদেরও ভোগ ভোগ হয়, অর্থাৎ তারও একপ্রকার সুখ আছে, যেটি তমোগুণের অন্তর্গত **'নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্'** (গীতা ১৮।৩৯) এবং এর ফল হল অধোগতি **'অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ'** (গীতা ১৪।১৮)। অর্থাৎ কোথাও অনুরাগ বা আসক্তি হলে তা সংসারে আবদ্ধই করে—**'কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু'** (গীতা ১৩।২১)।

'কর্মরহিত হলে আমার লৌকিক লাভ হবে, জগতে আমার খ্যাতি হবে' ইত্যাদি কোনো সাংসারিক প্রয়োজনবোধ থাকা উচিত নয় এবং 'সমাধি হলে আধ্যাত্মিক তত্ত্বে আমার স্থিতি হবে' ইত্যাদি কোনোরূপ পারমার্থিক প্রয়োজনবোধও থাকা উচিত নয়। অর্থাৎ 'কর্ম না করলে সাংসারিক এবং পারমার্থিক উন্নতি হবে'—এটিও কর্মরহিত হওয়ার আসক্তি। কারণ প্রকৃততত্ত্ব কর্ম করা বা না করার অতীত।

এই শ্লোকে ভগবানের কথার এই অর্থ ধরা যায় যে, পরিবর্তনশীল বস্তু, ব্যক্তি, পদার্থ, ক্রিয়া, ঘটনা, পরিস্থিতি, অবস্থা, স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ-শরীর ইত্যাদির সঙ্গে সাধকের সর্বতোভাবে নির্লিপ্ত থাকা কর্তব্য।

এই শ্লোকটির চারটি পংক্তিতে চারটি কথা বলা হয়েছে (১) 'কর্ম করাতেই তোমার অধিকার', (২) 'ফলে তোমার কোনো অধিকার নেই', (৩) 'তুমি কর্মফলের হেতুও হয়ো না', এবং (৪) 'কর্মরহিত হওয়াতেও যেন তোমার আসক্তি না হয়'। এর প্রথম এবং চতুর্থ পংক্তির অর্থ এক এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পংক্তির অর্থ এক। প্রথম পংক্তিতে কর্ম করায় অধিকারের কথা বলা হয়েছে আর চতুর্থ পংক্তিতে কর্মরহিত হওয়ার আসক্তি যেন না আসে তাই নিষেধ করা হয়েছে। দ্বিতীয় পংক্তিতে ফলের আশা করতে বারণ করা হয়েছে এবং তৃতীয় পংক্তিতে ফলের হেতু হতে নিষেধ করা হয়েছে।

এর তাৎপর্য হল এই যে, অকর্মণ্যতাতে রুচি হলে প্রমাদ, আলস্য ইত্যাদি **'তামসী বৃত্তি'**র সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ স্থাপিত হবে। কর্ম এবং কর্মফলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলে তোমার **'রাজসিক বৃত্তি'**র সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হবে। প্রমাদ, আলস্য, কর্ম, কর্মফল ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলে যে বিবেকগত সুখের অনুভূতি হয়, প্রকাশ পাওয়া যায়, জ্ঞান আহরণ করা যায় সেগুলির সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে **'সাত্ত্বিক বৃত্তি'**র সঙ্গে সম্পর্ক যোগ হয়। এগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়াই জন্ম-মৃত্যুর কারণ। সুতরাং সাধক কর্ম, কর্মফল এবং এগুলি ত্যাগের যে সুখ—এগুলির কোনোটির সঙ্গেই সম্পর্ক স্থাপন যেন না করে বা এগুলির প্রতি অনুরাগ বা আসক্তি না করে। কর্ম করেও এগুলির সঙ্গে সম্পর্ক না রাখাকেই বলা হয় **কর্মযোগ**।

পরিশিষ্ট-ভাব—কর্মের দুটি বিভাগ আছে, কর্ম-বিভাগ এবং ফল-বিভাগ। মানুষের অধিকার থাকে শুধু কর্ম-বিভাগেই, ফল-বিভাগে নয়। কারণ নতুন পুরুষার্থ হওয়ায় কর্ম-বিভাগ (কর্ম করা) মানুষের অধীন আর পূর্বকৃত কর্মাদির ভোগ হওয়ায় ফল-বিভাগ (হওয়া) প্রারব্ধের (ভাগ্যের) অধীন। কর্মযোগের দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যায় যে মানুষ যে সাধন-সামগ্রী (বস্তু, যোগ্যতা ও সামর্থ্য) লাভ করেছে, তা হল প্রারব্ধ (ভাগ্য)জনিত এবং তার সদব্যবহার করা অর্থাৎ সেগুলি নিজের মনে না করে অপরের বলে মনে করে অপরের সেবায় নিয়োগ করাই হল 'পুরুষার্থ'।

কর্মযোগের প্রধান কথা হল — নিজের কর্তব্যের দ্বারা অন্যের অধিকার রক্ষা করা এবং কর্মফল অর্থাৎ নিজ অধিকার পরিত্যাগ করা। অন্যের অধিকার রক্ষা করলে পুরাতন আসক্তি দূর হয় এবং নিজ অধিকার পরিত্যাগ করলে নতুন কোনো আসক্তি জন্মায় না। এইভাবে পুরাতন আসক্তি দূর হলে এবং নতুন আসক্তি না জন্মালে কর্মযোগী বীতরাগ হন। বীতরাগ

হলে তাঁর তত্ত্বজ্ঞান হয়। কেননা তত্ত্বজ্ঞানপ্রাপ্তিতে বিনাশশীল, অসৎ বস্তুর আসক্তিই হল একমাত্র বাধা—

রাগো লিঙ্গমবোধস্য চিত্তব্যায়ামভূমিষু। কুতঃ শাদ্বলতা তস্য যস্যাগ্নিঃ কোটরে তরোঃ॥

তাৎপর্য হল যে, বস্তু, ব্যক্তি এবং ক্রিয়াতে মনের যে প্রিয়ভাব এবং আকর্ষণ থাকে, তা হল অজ্ঞানের প্রকৃত লক্ষণ। যেমন, কোনো বৃক্ষের কোটরে আগুন লাগলে সে গাছ আর সতেজ-সবুজ থাকে না, শুকিয়ে যেতে থাকে, তেমনই যে ব্যক্তির মধ্যে আসক্তি-রূপ আগুন লেগে রয়েছে, সে কখনও শান্তি পেতে পারে না।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে কর্ম করার নির্দেশ দিয়ে ভগবান এবার কর্ম করার সময়ে সমতা বজায় রাখার প্রণালী জানাচ্ছেন।

যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥ ৪৮ ॥

[**ধনঞ্জয়** (হে ধনঞ্জয় !) ; **সঙ্গম্, ত্যক্ত্বা** (আসক্তি বর্জন করে) ; **সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ** (সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে) ; **সমঃ, ভূত্বা** (সম জ্ঞানে) ; **যোগস্থঃ** (যোগস্থ হয়ে) ; **কর্মাণি, কুরু** (কর্ম করো) ; **সমত্বম্** (সমত্বকেই) ; **যোগঃ** (যোগ) ; **উচ্যতে** (বলা হয়।)]

হে ধনঞ্জয় ! তুমি ফলাসক্তি বর্জন করে, সিদ্ধি-অসিদ্ধিকে সমান জ্ঞান করে, যোগস্থ হয়ে কর্ম করো, কারণ এই সমত্বকেই যোগ বলা হয় ॥ ৪৮ ॥

ব্যাখ্যা—'সঙ্গং ত্যক্ত্বা'—'কোনো কর্মে বা কোনো কর্মের ফলে, কোনো দেশ, কাল, ঘটনা পরিস্থিতি, অন্তঃকরণ, বহিঃকরণ ইত্যাদি প্রাকৃত বস্তুতে যেন তোমার আসক্তি না হয়, তাহলেই তুমি নির্লিপ্ত হয়ে কর্ম করতে পারবে। তুমি যদি কর্ম বা ফল ইত্যাদি কোনো কিছুতে আবদ্ধ হও, তাহলে নির্লিপ্ততা কী করে থাকে ? এবং নির্লিপ্ততা ছাড়া ওই কর্ম কেমন করে মুক্তিদায়ক হবে ?'

'সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা'—আসক্তি ত্যাগের পরিণাম কী ? সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে সমতালাভ হওয়া।

কর্ম সম্পূর্ণ হওয়া বা না হওয়া, জাগতিক দৃষ্টিতে তার ফল অনুকূল হওয়া বা প্রতিকূল হওয়া, ওই কর্ম করায় প্রশংসা বা নিন্দা হওয়া, অন্তঃকরণের শুদ্ধিকরণ হওয়া বা না হওয়া ইত্যাদি যে সমস্ত সিদ্ধি বা অসিদ্ধি আছে, তাতে সম থাকা উচিত (সমান জ্ঞান করা উচিত)।[1]

কর্মযোগীর সমভাব এমন হওয়া উচিত যাতে কর্ম সম্পন্ন হোক বা না হোক, ফলপ্রাপ্তি হোক বা না হোক, নিজের মুক্তি হোক বা না হোক—আমার কেবল কর্তব্য পালন করে যাওয়াই উচিত। সাধকের অনাসক্ত ভাবের অনুভব হোক বা না হোক, তাঁর অন্তরে সাম্যভাব আসুক বা না আসুক, তবু তাঁর উদ্দেশ্য হবে কামনা ত্যাগ করার, সমভাব আনার। যেটি উদ্দেশ্য হিসাবে নেওয়া হয়, তাই শেষকালে সিদ্ধ হয়। সুতরাং সাধনরূপ সমতার দ্বারা অর্থাৎ অন্তরের সমতাতে সাধ্যরূপ সমতা স্বতঃই এসে যায়—**'তদা যোগমবাপ্স্যসি'** (২।৫৩)।

---

[1]এই বিষয়ে শঙ্করাচার্য (গীতা ২।৪৮-এর ব্যাখ্যা করে) বলেছেন যে, 'যোগস্থঃ সন্ কুরু কর্মাণি কেবলমীশ্বরার্থং তত্রাপীশ্বরো মে তুষ্যত্বিতি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়! ফলতৃষ্ণাশূন্যেন ক্রিয়মাণে কর্মাণি সত্ত্বশুদ্ধিজা জ্ঞানপ্রাপ্তিলক্ষণা সিদ্ধিস্তদ্‌বিপর্যয়জা অসিদ্ধিস্তয়োঃ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোরপি সমস্তুল্যো ভূত্বা কুরু কর্মাণি। কোঽসৌ যোগো যত্রস্থঃ কুর্বিত্যুক্তমিদমেব তৎ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমত্বং যোগ উচ্যতে।'—'হে ধনঞ্জয় ! যোগস্থ হয়ে শুধু ঈশ্বরের জন্য কর্ম করো। এতেও 'ঈশ্বর আমার ওপর প্রসন্ন হোন'—এই কামনা ত্যাগ করে কর্ম করো। ফলতৃষ্ণারহিত পুরুষের দ্বারা কর্ম হলে অন্তঃকরণের শুদ্ধিতে উৎপন্ন হওয়া জ্ঞানপ্রাপ্তি হল সিদ্ধি এবং তার বিপরীত (জ্ঞানপ্রাপ্তি না হওয়া) হল অসিদ্ধি। এইরূপ সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমভাবাপন্ন হয়ে অর্থাৎ উভয়কেই তুল্য জ্ঞান করে, কর্ম করো। সেটি কেমন যোগ, যাতে স্থিত হয়ে কর্ম করতে বলা হয়েছে ? সেটি হল এই যে, যাতে সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সম হওয়া যায়, তাকেই বলা হয় যোগ।'

'যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি'—সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সম হওয়ার পরে ওই সমভাবে নিরন্তর অটল থাকাই **'যোগস্থ'** হওয়া। যেমন, কোনো কার্যের প্রারম্ভে গণেশপূজা করা হয়, তারপর সেই কাজ করার সময় পূজার ব্যাপারটি আর সব সময় সঙ্গে রাখা হয় না। এতে যেন কেউ না মনে করে যে শুরুতে একবার সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সম হয়ে গেলে আর সেটিকে সর্বসময় সঙ্গে রাখতে হয় না, রাগ-দ্বেষ করা যেতে পারে। সেইজন্য ভগবান বলেছেন যে কর্তব্য করার সময় সর্বক্ষণই সমতায় স্থিত হয়ে করতে হয়।

'সমত্বং যোগ উচ্যতে'—সমতাই যোগ অর্থাৎ সমতাই হচ্ছে পরমাত্মার স্বরূপ। অন্তরে সেই সমতাকে সর্বক্ষণ বজায় রাখতে হবে। পরবর্তী পঞ্চম অধ্যায়ের উনিশতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে 'যাঁদের মন সাম্যে স্থিত হয়েছে তাঁরা জীবিতাবস্থাতেই জগৎসংসার জয় করেছেন। কারণ ব্রহ্ম নির্দোষ এবং সম ; সুতরাং ব্রহ্মেই তাঁদের স্থিতি।'

'সমতাকে যোগ বলা হয়'—এটি যোগের পরিভাষা। পরের ষষ্ঠ অধ্যায়ের তেইশতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, 'দুঃখের সংস্পর্শের যেখানে আত্যন্তিক অভাব তারই নাম যোগ।' এই দুটি পরিভাষাই বাস্তবে এক। যেমন, দাদ হলে চুলকালে সুখ হয় এবং জ্বালা করলে কষ্ট হয়, কিন্তু এই দুটিই অসুখ হওয়ায় দুঃখস্বরূপ, সেরূপ সাংসারিক সম্পর্কে যে সুখ বা দুঃখ হয়—দুটিই প্রকৃতপক্ষে দুঃখেরই স্বরূপ। এইভাবে জগৎসংসার থেকে সম্পর্ক-বিচ্ছেদকেই বলা হয় **'দুঃখ-সংযোগ-বিয়োগ।'** সুতরাং একে দুঃখ-সংযোগের বিয়োগ অর্থাৎ সুখ-দুঃখের রহিত হওয়া বলা হোক বা সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে অর্থাৎ সুখ-দুঃখে সম হওয়া বলা হোক ; দুটি একই কথা।

এই শ্লোকটির তাৎপর্য হল এই যে স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণশরীর দ্বারা হওয়া ক্রিয়ামাত্রই জগতের সেবার জন্য করা উচিত, নিজের জন্য নয়। এরূপ করলেই সমতা আসবে।

বুদ্ধি এবং সমতা সম্পর্কিত বিশেষ কথা

বুদ্ধি দুই প্রকারের হয়—অব্যবসায়াত্মিকা এবং ব্যবসায়াত্মিকা। যার দ্বারা সাংসারিক সুখ, ভোগ, আরাম, মান, অহংকার ইত্যাদি প্রাপ্তির লক্ষ্য হয়, সেই বুদ্ধিকে 'অব্যবসায়াত্মিকা' বলা হয় (গীতা ২।৪৪)। যার দ্বারা সমতা প্রাপ্ত করা, নিজের কল্যাণ করাই উদ্দেশ্য হয়, তাকে 'ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি' (গীতা ২।৪১) বলা হয়। অব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি অনন্ত হয় আর ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি হয় মাত্র একটি। যার অব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি হয়, সে স্বয়ং অব্যবসায়ী (অব্যবসিত) হয়—**'বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্'** (২।৪১) তথা সে সংসারী হয়। যার ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি হয়, সেই স্বয়ং ব্যবসায়ী (ব্যবসিত) হয়ে থাকে—**'ব্যবসিতো হি সঃ'** (৯।৩০) এবং সে সাধক হয়ে থাকে।

সমতাও দুই প্রকারের হয়—সাধনরূপ সমতা ও সাধ্যরূপ সমতা। সাধনরূপ সমতা হল অন্তঃকরণের এবং সাধ্যরূপ সমতা হল পরমাত্মস্বরূপের। সিদ্ধি-অসিদ্ধি, অনুকূলতা-প্রতিকূলতায় সম থাকা অর্থাৎ অন্তরে রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি না হওয়াই হচ্ছে সাধনরূপ সমতা, যেটি বিশেষভাবে গীতায় বর্ণিত হয়েছে। এই সাধনরূপ সমতার দ্বারা যে স্বতঃসিদ্ধ সমতা প্রাপ্তি হয়, সেটিই হল সাধ্যরূপ সমতা, যার বর্ণনা এই অধ্যায়েরই তিপ্পান্নতম শ্লোকে **'তদা যোগমবাপ্স্যসি'** পদের দ্বারা করা হয়েছে।

এখন এই চারটি বিভেদকে এইভাবে বুঝতে হবে যে একজন সংসারী, অন্যজন সাধক ; একটি সাধন, অপরটি সাধ্য। ভোগ্য বস্তু ভোগ করা এবং সংগ্রহ করা যাদের উদ্দেশ্য, তারা হল সংসারী। তাদের একমুখী ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি হয় না, বরং কামনারূপ শাখা-প্রশাখাযুক্ত বহুদিকগামী বুদ্ধি হয়।

'যাই হোক না কেন আমাকে সমতাপ্রাপ্ত করতেই হবে'—যাঁরা এরূপ স্থির নিশ্চয় করেন তাঁদের বুদ্ধি ব্যবসায়াত্মিকা হয়। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যখন এরূপ সাধক আসেন, তখন সিদ্ধি-অসিদ্ধি, লাভ-ক্ষতি, অনুকূল-প্রতিকূল যে কোনো পরিস্থিতিরই উদ্ভব হোক না কেন, তাতে তিনি সম থাকেন, তাঁর রাগ (আসক্তি) বা দ্বেষ হয় না। এই সাধনরূপ সমতার দ্বারা তিনি জগৎসংসার থেকে ঊর্ধ্বস্তরে আরোহণ করেন—**'ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ'** (গীতা ৫।১৯-এর পূর্বার্ধ)। সাধনরূপ সমতা দ্বারা স্বতঃসিদ্ধভাবে সমরূপ পরমাত্মার প্রাপ্তিলাভ ঘটে—**'নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্‌ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ'** (গীতা ৫।১৯-এর উত্তরার্ধ)।

পরিশিষ্ট-ভাব—পাতঞ্জল যোগদর্শনে চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ সাধনকে 'যোগ' বলা হয়—**'যোগশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ'** (১।২)। এই যোগের পরিণামস্বরূপ দ্রষ্টার স্বরূপে স্থিতিলাভ হয়—**'তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্'** (১।৩)। এইরূপে পাতঞ্জল যোগদর্শনে যোগের যে পরিণামের কথা বলা হয়েছে, গীতায় তাকেই 'যোগ' বলা হয়েছে, **'সমত্বং যোগ উচ্যতে'**, **'তং বিদ্যাদ্ দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসঞ্জিতম্'** (৬।২৩)। তাৎপর্য হল যে, গীতায় চিত্তবৃত্তি থেকে সর্বতোভাবে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ হয়ে স্বতঃসিদ্ধভাবে সম স্বরূপে স্বাভাবিক স্থিতি হলে তাকে 'যোগ' বলা হয়েছে। এই যোগ অর্থাৎ সমতায় স্থিতিলাভ হলে আর কখনো এর থেকে বিচ্ছেদ বা ব্যুত্থান হয় না, সেইজন্য একে 'নিত্যযোগ'ও বলা হয়। চিত্তবৃত্তি নিরোধ হলে তো **'নির্বিকল্প অবস্থা'** হয়, কিন্তু সমত্বে স্বতঃসিদ্ধ স্থিতি হলে **'নির্বিকল্প বোধ'** (সহজাবস্থা) হয়। নির্বিকল্প বোধ কোনো অবস্থা নয়, এ হল সমস্ত অবস্থার অতীত এবং তার প্রকাশক ও সমস্ত যোগ সাধনার ফল। অবস্থা দু'প্রকারের হয়—নির্বিকল্প এবং সবিকল্প। কিন্তু বোধ শুধুমাত্র নির্বিকল্পই হয়ে থাকে। এইরূপে গীতার যোগ পাতঞ্জল যোগদর্শনের যোগের থেকে খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

যারা মূঢ় এবং ক্ষিপ্ত বৃত্তিসম্পন্ন নয়, বরং বিক্ষিপ্ত বৃত্তিসম্পন্ন তারাই পাতঞ্জল যোগদর্শনের যোগের অধিকারী। কিন্তু যে সব ব্যক্তি ভগবদ্প্রাপ্তি করতে চান তাঁরা সকলেই গীতা কথিত যোগের অধিকারী। শুধু তাই নয়, যে সব ব্যক্তি ভোগ এবং সংগ্রহকে গুরুত্ব না দিয়ে এই যোগকেই গুরুত্ব দেন এবং প্রাপ্ত করতে চান সেই যোগ-জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ বেদবর্ণিত সকাম কর্মাদি অতিক্রম করে যান—**'জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে'** (গীতা ৬।৪৪)।

* * *

সম্বন্ধ—উনচল্লিশতম থেকে আটচল্লিশতম শ্লোক পর্যন্ত যে সমবুদ্ধির কথা বর্ণিত হয়েছে, সকাম কর্ম অপেক্ষা সেই সমবুদ্ধির শ্রেষ্ঠতা পরবর্তী শ্লোকে বলা হয়েছে।

দূরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ॥ ৪৯॥

[বুদ্ধিযোগাৎ (বুদ্ধিযোগ) ; **কর্ম** (সকাম কর্ম) ; দূরেণ, **অবরং** (নিতান্তই নিকৃষ্ট) ; **ধনঞ্জয়** (হে ধনঞ্জয়) ; **বুদ্ধৌ** (বুদ্ধির) ; **শরণম্** (আশ্রয়) ; **অন্বিচ্ছ** (গ্রহণ করো) ; **হি** (কারণ) ; **ফলহেতবঃ** (ফলের আশায়) ; কৃপণাঃ (অত্যন্ত হীন।)]

বুদ্ধিযোগ (সমতা) অপেক্ষা সকাম কর্ম নিতান্তই নিকৃষ্ট। অতএব হে ধনঞ্জয় ! তুমি সমবুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করো। কারণ ফলের আশায় যারা কর্ম করে তারা অতি হীন ॥ ৪৯ ॥

ব্যাখ্যা—'দূরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাৎ'—বুদ্ধিযোগ অর্থাৎ সমতার অপেক্ষা সকামভাবে কর্ম করা অতি নিকৃষ্ট। কারণ কর্মের উৎপত্তি হয় এবং নাশ হয় আর ওই সব কর্মের ফলেরও সংযোগ এবং বিয়োগ আছে। কিন্তু যোগ (সমতা) হচ্ছে নিত্য ; তার কখনো বিয়োগ হয় না। এতে কখনো বিকৃতি হয় না। অতএব সমতার থেকে সকাম কর্ম অত্যন্ত নিকৃষ্ট।

সকল কর্মের মধ্যে সমবোধই শ্রেষ্ঠ। সমবোধ ব্যতিরেকে সকল জীবই কর্ম করে থাকে এবং সেই কর্মের পরিণামস্বরূপ তারা জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হয় এবং দুঃখ ভোগ করে। কারণ সমবোধ ব্যতিরেকে কর্মে উদ্ধার হওয়ার সামর্থ্য নেই। কর্মে সমবোধই সঠিক কৌশল। কর্মে যদি সমবোধ না থাকে তাহলে শরীরে অহং ও মমত্ব আসে আর এই শারীরিক অহং, মমত্ব হওয়াই পশুবুদ্ধি। ভাগবতে শুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে বলেছিলেন যে—**'ত্বং তু রাজন্ মরিষ্যেতি পশুবুদ্ধিমিমাং জহি'** (১২।৫।২) অর্থাৎ, 'হে রাজন্! তুমি এখন এই পশুবুদ্ধি বর্জন করো যে, আমার মৃত্যু হবে।'

'দূরেণ' বলার অর্থ এই যে, যেমন আলোর প্রকাশ এবং অন্ধকার কখনো সমকক্ষ হতে পারে না, তেমনি বুদ্ধিযোগ এবং সকাম কর্মও কখনো সমকক্ষ হতে পারে না। এই দুটির মধ্যে দিন ও রাত্রির মতো বিরাট পার্থক্য। কারণ বুদ্ধিযোগ পরমাত্মাপ্রাপ্তি করায় এবং সকাম কর্ম জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত করায়।

'বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ'—'তুমি বুদ্ধির (সমতার) আশ্রয় গ্রহর করো। সমতাতে নিরন্তর স্থিত হওয়াকেই তার আশ্রয় গ্রহণ করা বোঝায়। সমতায় স্থিত হলেই তোমার স্বরূপে নিজ স্থিতির অনুভব হবে।'

'কৃপণাঃ ফলহেতবঃ'—কর্মফলের হেতু হওয়া অত্যন্ত হীন। কর্ম, কর্মফল, কর্মসামগ্রী এবং শরীর ইত্যাদি করণগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করাই হল কর্মফলের হেতু হওয়া। সুতরাং ভগবান সাতচল্লিশতম শ্লোকে **'মা কর্মফলহেতুর্ভূঃ'** বলে কর্মফলের হেতু হতে নিষেধ করেছেন।

কর্ম এবং কর্মফল দুটি পৃথক ভাগে বিভক্ত এবং ও থেকে রহিত যে নিত্যতত্ত্ব সেটির ভাগ পৃথক। এই নিত্য তত্ত্ব অনিত্য কর্মফলের আশ্রিত হয়ে যায়—এর সমান নিকৃষ্টতা আর কী হতে পারে ?

পরিশিষ্ট-ভাব—যোগের থেকে কর্ম অত্যন্তই নিকৃষ্ট অর্থাৎ কল্যাণকারী নয়। যেমন পর্বতের থেকে ধূলিকণা অতি নিকৃষ্ট অর্থাৎ পর্বতের সঙ্গে ধূলিকণার অণু কোনোভাবেই তুলনীয় নয়, তেমনই যোগের তুলনায় কর্ম অতি নিকৃষ্ট অর্থাৎ যোগের সঙ্গে কর্মের কোনো তুলনাই চলে না। কর্মে যোগই কৌশল—**'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্'** (গীতা ২।৫০), তাই যোগ ব্যতীত কর্ম নিকৃষ্ট, নিরর্থক[১] এবং বাধাস্বরূপ—**'কর্মণা বধ্যতে জন্তুঃ'**।

কর্মযোগে 'কর্ম' করণসাপেক্ষ, কিন্তু 'যোগ' করণনিরপেক্ষ। কর্মের দ্বারা যোগপ্রাপ্তি হয় না, সেবা এবং ত্যাগের দ্বারাই তা হয়। অতএব কর্মযোগ কর্ম নয়। কর্মযোগ করণনিরপেক্ষ অর্থাৎ বিবেকপ্রধান সাধন। যদি সেবা ও ত্যাগের প্রাধান্য না থাকে, তাহলে কর্মই হয়, কর্মযোগ হয় না।

সমতা পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তি করায় আর সকাম কর্ম জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত করে। তাই সাধকের উচিত সমতাকে আশ্রয় করা এবং সমতাতেই স্থিত থাকা। সমতায় অবস্থান করলে সাধক আর দীন থাকেন না, তখন তিনি কৃতকৃত্য, জ্ঞাতজ্ঞাতব্য এবং প্রাপ্তপ্রাপ্তব্য হয়ে ওঠেন। কিন্তু যে ব্যক্তি সকামভাবে নিজের জন্যই শুধু কর্ম করে, সে সর্বদা দীন ও বদ্ধ হয়ে থাকে।

গীতায় কর্মযোগের বর্ণনায় তিনটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে—বুদ্ধি, যোগ এবং বুদ্ধিযোগ। কর্মযোগে 'কর্মে'র প্রাধান্য থাকে না। তাতে 'যোগে'রই প্রাধান্য থাকে। কর্মযোগে ব্যবসায়াত্মিকা একনিষ্ঠ বুদ্ধির প্রাধান্য থাকায় একে 'বুদ্ধি' বলা হয় এবং বিবেচনাপ্রসূত ত্যাগের প্রাধান্য থাকায় একে 'যোগ' বা 'বুদ্ধিযোগ' বলা হয়।

ধ্যানযোগে 'মনে'র এবং কর্মযোগে 'বুদ্ধি'র প্রাধান্য থাকে। মন নিরুদ্ধ করার প্রয়াসে স্থিরভাব ও চঞ্চলভাব—দুইই অনেক দূর পর্যন্ত সঙ্গে থাকে, কেননা সাধক মনকে জগৎসংসার থেকে সরিয়ে পরমাত্মাতে নিয়োজিত করতে চান। মনকে জগৎসংসার থেকে সরালেও মনে সংসারের অস্তিত্ব বজায় থাকে। সিদ্ধান্ত হল এই যে, যতক্ষণ অপর কোনো সত্তার ধারণা বজায় থাকে, ততক্ষণ মন সর্বতোভাবে নিরুদ্ধ হয় না। তাই সমাধি পর্যন্ত পৌঁছলেও সমাধি এবং ব্যুত্থান—এই উভয় অবস্থাই থাকে। কিন্তু বুদ্ধির প্রাধান্য থাকলে কর্মযোগে বিবেকের প্রাধান্য হয়। বিবেকে সৎ এবং অসৎ দুই-ই থাকে। কর্মযোগী অসৎ বস্তুসমূহকে সেবার বস্তু মনে করে অন্যের সেবায় ব্যয় করেন, যার ফলে অতি সহজেই তিনি অসতের সম্পর্ক ত্যাগ করতে সক্ষম হন।

মনকে নিরোধ করা সব সময় সম্ভব হয় না, তবে উপযুক্ত সময়ে একান্তে থাকতে থাকতে তা করা সম্ভব হয়। কিন্তু ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি নিরন্তর থাকে।

* * *

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে যে বুদ্ধির আশ্রয়ের কথা বলা হয়েছে, এখন পরের শ্লোকে সেই বুদ্ধির আশ্রয়ের ফল বলা হয়েছে।

[১] যোগ ব্যতীত কর্ম এবং জ্ঞান—উভয়ই অর্থহীন, কিন্তু ভক্তি অর্থহীন নয়। কারণ ভক্তিতে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে, তাই ভগবান স্বয়ং ভক্তকে যোগপ্রদান করে থাকেন—'দদামি বুদ্ধিযোগং তম্' (গীতা ১০।১০)।

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্॥ ৫০ ॥

[**বুদ্ধিযুক্তঃ** (সমবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি) ; **ইহ** (ইহলোকে) ; **সুকৃতদুষ্কৃতে** (পুণ্য এবং পাপ) ; **উভে, জহাতি** (উভয়কেই পরিত্যাগ করেন) ; **তস্মাৎ** (অতএব) ; **যোগায়** (যোগে) ; **যুজ্যস্ব** (সচেষ্ট হও, কারণ) ; **যোগঃ** (যোগ) ; **কর্মসু** (কর্মে) ; **কৌশলম্** (কুশলতা।)]

সমবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ইহলোকে জীবিত অবস্থাতেই পাপ ও পুণ্য পরিত্যাগ করে। সুতরাং তুমি এই যোগ লাভে সচেষ্ট হও, কারণ যোগ প্রাপ্ত করাই হল কর্মে কুশলতা ॥ ৫০ ॥

ব্যাখ্যা—**'বুদ্ধিযুক্তো জহাতীত উভে সুকৃতদুষ্কৃতে'**—সমতাযুক্ত ব্যক্তি ইহজীবনেই পাপ-পুণ্য পরিত্যাগ করে অর্থাৎ তাকে আর পাপ-পুণ্য স্পর্শ করে না, সে এগুলি থেকে রহিত হয়ে যায়। যেমন জগতে পাপ-পুণ্য হয়ে চলেছে কিন্তু সর্বব্যাপী যে পরমাত্মা তাঁর কোনো পাপ বা পুণ্য হয় না, তেমনি যিনি সমতায় নিরন্তর স্থিত থাকেন, তাঁরও পাপ বা পুণ্য হয় না (গীতা ২।৩৮)।

সমতা এমন এক বিদ্যা (কলা), যার দ্বারা মানুষ জগতে থেকেও জগৎসংসার থেকে নির্লিপ্ত থাকতে সক্ষম হয়। পদ্মপত্র যেমন জলে জন্মায় এবং জলেই থাকে, তবু তা জললিপ্ত হয় না; তেমনি সমতাযুক্ত ব্যক্তি সংসারে থেকেও সংসার থেকে নির্লিপ্ত থাকে। পাপ বা পুণ্য তাকে আর স্পর্শ করে না অর্থাৎ সে পাপ-পুণ্য থেকে অসঙ্গ হয়ে যায়।

প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং (চেতনস্বরূপ) তো পাপ-পুণ্য রহিত-ই। শুধুমাত্র অসত পদার্থ—শরীরাদির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার জন্যই পাপ ও পুণ্যের স্পর্শ ঘটে। যদি সে স্বয়ং এই অসৎ পদার্থগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন না করে তবে পাপ বা পুণ্য তাকে স্পর্শ করে না ; সে স্বচ্ছ, আকাশের মতো নির্মল থাকে।

'তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব'—'অতএব তুমি যোগের জন্য সচেষ্ট হও অর্থাৎ সমতায় নিরন্তর স্থিত হও। বাস্তবে সমতাই হল তোমার স্বরূপ। তুমি সর্বদাই সমতায় থাক, কিন্তু রাগ-দ্বেষাদির কারণে তুমি এই সমতা অনুভব করতে পার না। তুমি যদি সর্বসময় সমতায় স্থিত না থাক, তবে সুখ বা দুঃখের অনুভূতি তুমি কীভাবে অনুভব কর ? এই সুখ বা দুঃখকে তুমি আলাদাভাবে জান, কেননা এই দুটিই পৃথক। এই দুটিকে যখন তুমি বুঝতে পার, তাহলে এগুলির আসা বা যাওয়ার কালে তুমি সর্বদা সমরূপেই থাকো। এই সমতাকে তুমি অনুভব করো।'

'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্'—কর্মে যোগই কৌশল অর্থাৎ কর্মের সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে অথবা ওই কর্মফলের প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তিতে সম থাকাই হল কর্মের কৌশল। উৎপত্তি ও বিনাশশীল কর্মে যোগ ছাড়া আর কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নেই।

এই পদটিতে ভগবান যোগের পরিভাষা বলেননি, বরং যোগের মহিমা কী, তাই জানিয়েছেন। পদটির অর্থ যদি ধরা যায় এই যে, 'কর্মে কুশলতাই হচ্ছে যোগ'—তবে তাতে আপত্তি কীসের ? যদি এরূপ অর্থ করা হয়, তাহলে যে অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে ও সাবধানতার সঙ্গে চুরি করে, তার এই চৌর্যবৃত্তি রূপ কর্মও যোগ হিসাবে ধার্য হবে। সুতরাং এরূপ অর্থ করা ঠিক নয়। কেউ বলতে পারেন যে 'আমরা বিহিত কর্মগুলি কুশলতাপূর্বক করাকেই যোগ বলে মনে করি।' কিন্তু এরূপ মনে করলে মানুষ কুশলতাপূর্বক বিভিন্ন কর্মের ফলে আবদ্ধ হবে, ফলে তার সমতায় স্থিতি থাকবে না। সুতরাং এইস্থানে 'কর্মে যোগই কৌশল' এরূপ অর্থ করাই উচিত। কারণ কর্ম করার সময়ও যাঁর অন্তঃকরণে সমবোধ থাকে, কর্ম বা কর্মফল তাকে আবদ্ধ করতে পারে না। সেইজন্য উৎপত্তি ও বিনাশশীল কর্মগুলি করার সময় সমবোধে থাকাই কুশলতা, বুদ্ধিমত্তার পরিচয়।

দ্বিতীয়ত আগের দুটি শ্লোকে এবং এই শ্লোকের পূর্বার্ধেও যোগেরই (সমতার) প্রসঙ্গ রয়েছে। কুশলতার প্রসঙ্গ নয়। সেইজন্য 'কর্মে যোগই কুশলতা' এই অর্থ গ্রহণ করাই প্রসঙ্গ অনুযায়ী ঠিক।

পরিশিষ্ট-ভাব—এই শ্লোকে উদ্ধৃত **'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্'** পদটি আলোচনা করলে দুটি অর্থ পাওয়া যায়—
১) **'কর্মসু কৌশলং যোগঃ'** অর্থাৎ কর্মে কৌশলই হল যোগ।

২) **'কর্মসু যোগঃ কৌশলম্'** অর্থাৎ কর্মে যোগই হল কৌশল।

যদি প্রথম অর্থটি ধরা হয় অর্থাৎ 'কর্মে কৌশলই হল যোগ' তাহলে যারা অত্যন্ত কৌশলে, সতর্কতার সঙ্গে চুরি-জোচ্চুরি করে, তাদের কর্মগুলিও 'যোগ' নামে অভিহিত হবে! কিন্তু তা মনে করা উচিত নয় আর এখানে নিষিদ্ধ কর্ম নিয়েও আলোচনা হয়নি। এখানে যদি শুভকর্মগুলিই কৌশলপূর্বক করাকে 'যোগ' বলে মনে করা হয় তাহলে মানুষ কৌশলে করা সমস্ত শুভকর্মেরই ফলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে— **'ফলে সক্তো নিবধ্যতে'** (গীতা ৫।১২)। সুতরাং তার স্থিতি তখন আর সমতা থাকে না এবং তার দুঃখও দূর হয় না।

শাস্ত্রে বলা হয়েছে **'কর্মণা বধ্যতে জন্তুঃ'** অর্থাৎ কর্মদ্বারা মানুষ আবদ্ধ হয়। সুতরাং যে কর্ম স্বাভাবিকভাবেই মানুষকে আবদ্ধ করে, সেই কর্মই যে প্রকারে মুক্তি প্রদানকারী হয়ে ওঠে সেটিই হল প্রকৃতপক্ষে কর্মের কৌশল। মুক্তি যোগের (সমতার) দ্বারা হয়, কর্মে কৌশলের দ্বারা নয়। যোগের (সমতার) আদি এবং অন্ত নেই। কিন্তু কর্ম যত মহানই হোক, তার আরম্ভ এবং শেষ আছে আর তার ফলেও সংযোগ ও বিয়োগ হয়। যার আরম্ভ ও শেষ থাকে এবং যার সংযোগ ও বিয়োগ হয়, তার দ্বারা মুক্তিলাভ হবে কীকরে ? বিনাশশীলের সাহায্যে কীভাবে অবিনাশীকে পাওয়া সম্ভব ? পরমাত্মার স্বরূপই হল সমতা—**'নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম'** (গীতা ৫।১৯)। সুতরাং মহত্ত্ব যোগেরই, কর্মের নয়।

যদি প্রথম অর্থটি ঠিক বলে মনে করা হয় তাহলে 'কৌশলে'র মধ্যেই সমতা, নিষ্কামভাবকে ধরতে হবে। যদি কর্মে কৌশলই যোগ হয় তাহলে সেই কৌশলটি কি ? এর উত্তর হল যোগই (সমতাই) কৌশল। এরূপ অবস্থায় 'কর্মে যোগই যে কৌশল' এই সোজা অর্থটি কেন ধরা হবে না ? যখন **'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্'** পদটিতে 'যোগ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তখন দ্বিতীয়বার 'কৌশলের' অর্থ যোগ ধরার প্রয়োজন নেই।

প্রকরণ নিয়ে যদি আলোচনা করা যায় তবে দেখা যায় যে যোগ (সমতা) নিয়েই প্রকরণটি চলছে, কর্মের কৌশল নিয়ে নয়। ভগবান **'সমত্বং যোগ উচ্যতে'** বলে যোগের পরিভাষাও জানিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং এই প্রকরণে যোগই বিধেয়, কর্মে কৌশল বিধেয় নয়। যোগই কর্মের কৌশল, অর্থাৎ কর্ম করার সময় হৃদয়ে যেন সমতা থাকে, রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ না থাকে— এটিই হল কর্মের কৌশল। তাই **'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্'**— এই কথা যোগের পরিভাষা নয়, এ হল যোগের মহিমা।

এই (পঞ্চাশতম) শ্লোকের পূর্বার্ধে ভগবান বলেছেন যে সমতাযুক্ত ব্যক্তি পুণ্য এবং পাপ উভয়ই রহিত হন। মানুষ যদি পাপ ও পুণ্য উভয়ই রহিত হয় তাহলে কৌশলের সঙ্গে কোন কর্ম করবে ? সুতরাং পুণ্য ও পাপ রহিত হওয়ার অর্থ এই নয় যে ওই ব্যক্তি কোনো ক্রিয়া করে না, কেন না কোনো ব্যক্তিই ক্রিয়া (কর্ম) না করে একমুহূর্তও থাকতে পারে না (গীতা ৩।৫)। তাই এখানে পাপ-পুণ্য রহিত হওয়ার অর্থ হল তার ফল থেকে মুক্ত হওয়া। পরে একান্নতম শ্লোকেও ভগবান **'ফলং ত্যক্ত্বা'** পদটিতে ফলত্যাগের কথাই বলেছেন।

গীতায় 'কুশল' শব্দটির প্রয়োগ অষ্টাদশ অধ্যায়ের দশম শ্লোকেও হয়েছে। সেখানে 'অকুশল কর্মে'র প্রসঙ্গে সকামভাবে করা এবং শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্মের কথা বলা হয়েছে এবং 'কুশল কর্মের' প্রসঙ্গে নিষ্কামভাবে করা শাস্ত্রবিহিত কর্মের কথা বলা হয়েছে। কুশল এবং অকুশল কর্মের আদি ও অন্ত হয়, কিন্তু যোগের আদি-অন্ত হয় না। রাগ ও দ্বেষ বন্ধনের কারণ, কুশল-অকুশল কর্ম নয়। তাই আসক্তিপূর্বক করা কর্ম যত শ্রেষ্ঠই হোক না কেন, তা বন্ধনকারকই হয়ে থাকে, কারণ ওই কর্মের দ্বারা যদি ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিও হয়, তাহলেও সেখান থেকে ফিরে আসতে হয় (গীতা ৮।১৬)। তাই যে ব্যক্তি অকুশল কর্ম দ্বেষ সহকারে করেন না এবং কুশলকর্মের আচরণ আসক্তিপূর্বক করেন না, তিনিই প্রকৃতপক্ষে ত্যাগী, বুদ্ধিমান, সংশয়রহিত এবং স্ব-স্বরূপে স্থিত (গীতা ১৮।১০)।

উপরিউক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হয় যে **'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্'** পদটির অর্থ হল 'কর্মে যোগই কৌশল'—এটিই মেনে নিতে হবে। ভগবানও যোগে স্থিত হয়ে কর্ম করার নির্দেশ দিয়েছেন—**'যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি'** (২।৪৮)। তাৎপর্য হল এই যে, কর্মের কোনো মহত্ত্ব নেই। যোগেরই (সমতারই) মহত্ত্ব আছে। সুতরাং কর্মে যোগই হল কৌশল।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—এখন আগের শ্লোকটির ভাব দৃঢ় করার উদ্দেশ্যেই ভগবান পরবর্তী শ্লোকে উদাহরণ দিচ্ছেন।

কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ৫১ ॥

[হি (কারণ) ; বুদ্ধিযুক্তাঃ (সমতাযুক্ত) ; মনীষিণঃ (মনীষিগণ) ; কর্মজম্, ফলম্ (কর্মজনিত ফল) ; ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করে) ; জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ (জন্মরূপ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে) ; অনাময়ম্ (নির্বিকার) ; পদম্, গচ্ছন্তি (পদপ্রাপ্ত হন।)]

সমতাযুক্ত বুদ্ধিমান সাধকগণ কর্মজনিত ফল ত্যাগ করে জন্মরূপ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে নির্বিকার পদ-প্রাপ্ত হন ॥ ৫১ ॥

ব্যাখ্যা—**'কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মণীষিণঃ'**—যিনি সমতাযুক্ত, তিনিই বাস্তবে বুদ্ধিমান অর্থাৎ জ্ঞানী। অষ্টাদশ অধ্যায়ের দশম শ্লোকেও বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি দুঃখকর কর্মে দ্বেষ করেন না এবং সুখকর কর্মে আসক্ত হন না, তিনিই প্রকৃত মেধাবী (বুদ্ধিমান)।

কর্ম তো ফলের রূপে পরিণত হয় এবং সেই ফল কেউই পরিত্যাগ করতে পারে না। যেমন, কেউ যদি নিষ্কাম ভাব নিয়ে ক্ষেতে বীজ রোপণ করে, তবে তাতে কি শস্য উৎপন্ন হবে না ? বীজ রোপণ করলে গাছ নিশ্চয়ই উৎপন্ন হবে। তেমনি কেউ নিষ্কামভাব নিয়ে কর্ম করলেও তার ফল অবশ্যই হবে। সুতরাং এই স্থানে কর্মজনিত ফল ত্যাগের অর্থ হল কর্মজনিত ফলের ইচ্ছা, কামনা, মমতা, বাসনা ইত্যাদি পরিত্যাগ করা। সকলেই এগুলি ত্যাগ করতে সক্ষম।

'জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ'—সমতাযুক্ত মনীষী সাধকগণ জন্মরূপ বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে যান। কারণ সমতায় স্থিত হলে তাঁদের আর রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ, কামনা, বাসনা, মমতা ইত্যাদি দোষগুলি বিন্দুমাত্র থাকে না। সেইজন্য তাঁদের আর পুনর্জন্ম হওয়ার কোনো কারণ থাকে না। তাঁরা জন্ম-মৃত্যুরূপ বন্ধন থেকে চিরকালের মতো মুক্ত হয়ে যান।

'পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্'—**'আময়'**-এর অর্থ হল রোগ। রোগ হচ্ছে একপ্রকার বিকার। যাঁর কোনোপ্রকার বিকার থাকে না, তাঁকে 'অনাময়' বা নির্বিকার বলা হয়। সমতাযুক্ত মনীষিগণ এই নির্বিকার পদ প্রাপ্ত হন। এইরূপ নির্বিকার পদকে পঞ্চদশ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে 'অব্যয় পদ' এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের ছাপ্পান্নতম শ্লোকে **'শাশ্বত অব্যয় পদ'** নামে অভিহিত করা হয়েছে।

যদিও গীতায় সত্ত্বগুণকেও অনাময় (১৪।৬) বলা হয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অনাময় (নির্বিকার) হচ্ছে নিজ স্বরূপ বা পরমাত্মতত্ত্ব। কারণ এটি গুণাতীত তত্ত্ব, যা প্রাপ্ত হলে কাউকে আর জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হতে হয় না। পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তির হেতু হওয়ায় ভগবান সত্ত্বগুণকেও অনাময় নামে অভিহিত করেছেন।

অনাময় পদ প্রাপ্ত হওয়া কেমন ? প্রকৃতি হচ্ছে বিকারশীল তাই তার কার্যরূপ শরীর-জগৎসংসারও বিকারশীল। স্বয়ং নির্বিকার হয়েও যখন এই বিকারশীল শরীরের সঙ্গে তাদাত্ম্য করে, তখন সে নিজেকেও বিকারশীল বলে মেনে নেয়। কিন্তু যখন সে শরীরের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক ত্যাগ করে, তখন তার নিজ সহজ নির্বিকার স্বরূপের অনুভব হয়। এই স্বাভাবিক নির্বিকারত্ব অনুভব করাকেই এখানে অনাময় পদপ্রাপ্ত হওয়া বলা হয়েছে।

এই শ্লোকে **'বুদ্ধিযুক্তাঃ'** এবং **'মনীষিণঃ'** পদে বহুবচন দেওয়ার তাৎপর্য এই যে, যাঁরাই সমতাতে স্থিত হন, তাঁরা সকলেই অনাময় পদপ্রাপ্ত হন, মুক্ত হয়ে যান, কেউ আর বাকি থাকেন না। এইরূপ, অনাময়প্রাপ্তির একটি নিশ্চিত উপায় সমতা। এর দ্বারা এই প্রমাণিত হয় যে, উৎপত্তি ও বিনাশশীল পদার্থের সঙ্গে যখন কোনো সম্পর্ক না থাকে, তখন নির্বিকারত্বের অনুভব হয়। তার জন্য কোনো পরিশ্রম করতে হয় না, কারণ এটি সৃষ্টি করতে হয় না, এটি স্বতঃ ও স্বাভাবিকই।

পরিশিষ্ট-ভাব—কর্মে যোগই (সমতা) কৌশল কেন তার কারণ **'হি'** পদটির দ্বারা এই শ্লোকে জানাচ্ছেন। সাত্ত্বিক কর্মের ফল নির্মল, রাজসিক কর্মের ফল দুঃখ এবং তামসিক কর্মের ফল হল মূঢ়তা (গীতা ১৪।১৬)। সমতাযুক্ত

ব্যক্তি এই তিন প্রকারের ফল পরিত্যাগ করেন। কর্মজনিত ফলত্যাগের দুটি অর্থ হয়— ফলেচ্ছা পরিত্যাগ করা এবং কর্মের ফলস্বরূপ অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতি উপস্থিত হলেও তাতে সুখী বা দুঃখিত না হওয়া।

প্রকৃতপক্ষে উৎপত্তি ও বিনাশশীল সমস্ত জগৎসংসারই কর্মফল অর্থাৎ বন্ধন। বিনাশশীল বস্তুমাত্রই কর্মফল। তাই এই জগৎসংসারে কর্মফল ব্যতীত আর কিছুই নেই। কর্মফল ত্যাগ করলে আর কোনো বন্ধনই অবশিষ্ট থাকে না।

'মনীষী' শব্দটির অর্থ হল জ্ঞানী (সমবুদ্ধিসম্পন্ন)। পূর্বশ্লোক অনুযায়ী সমতাপূর্বক কর্ম করাই হল বুদ্ধিমত্তা—**'স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু'** (গীতা ৪।১৮)।

'পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্'— **'গচ্ছন্তি'** পদটির তিনটি অর্থ হয়—১. জ্ঞান হওয়া, ২. গমন করা, ৩. প্রাপ্ত হওয়া। এখানে নির্বিকার পদপ্রাপ্তির অর্থ হল— জন্ম-মরণ থেকে রহিত হওয়া এবং নির্বিকার পদের স্বতঃসিদ্ধপ্রাপ্তির জ্ঞান হয়ে যাওয়া। কারণ নিত্য-নিবৃত্তেরই নিবৃত্তি হয় এবং নিত্যপ্রাপ্তেরই প্রাপ্তি হয়।

এই শ্লোকে প্রমাণিত হয় যে কর্মযোগ মুক্তির ও কল্যাণপ্রাপ্তির পৃথক সাধন। কর্মযোগের দ্বারা সংসারের নিবৃত্তি এবং পরমাত্মতত্ত্বের প্রাপ্তি—উভয়ই হয়ে থাকে।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে বিবৃত অনাময় পদপ্রাপ্তির ক্রমটি পরবর্তী দুটি শ্লোকে বলা হয়েছে।

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥ ৫২ ॥

[**যদা** (যখন) ; **তে, বুদ্ধিঃ** (তোমার বুদ্ধি) ; **মোহকলিলম্** (মোহরূপ কর্দম) ; **ব্যতিতরিষ্যতি** (অতিক্রম করবে) ; **তদা** (তখন) ; **শ্রুতস্য, চ** (শ্রুত ও) ; **শ্রোতব্যস্য** (শ্রবণীয় বিষয় থেকে) ; **নির্বেদম্, গন্তাসি** (বৈরাগ্য লাভ করবে।)]

যখন তোমার বুদ্ধি মোহরূপ কর্দম অতিক্রম করবে, তখন তুমি শ্রুত ও শ্রোতব্য বিষয়-ভোগ থেকে বৈরাগ্য লাভ করবে ॥ ৫২ ॥

ব্যাখ্যা—**'যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি'**—শরীরে অহংভাব এবং মমত্ববোধ করা এবং শরীর সম্পর্কিত মাতা-পিতা, ভাই-বোন, স্ত্রী-পুত্র, বস্তু-পদার্থ ইত্যাদিতে মমত্ববোধ করাকেই **'মোহ'** বলা হয়। কারণ এই শরীরাদিতে নিজস্ব কোনো অহংবোধ বা মমত্ববোধ করার ক্ষমতা নেই, এটি আমরা শুধু মেনে রেখেছি। অনুকূল পদার্থ, বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা ইত্যাদির প্রাপ্তিতে আনন্দিত হওয়া এবং প্রতিকূল পদার্থ, বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদির প্রাপ্তিতে উদ্বিগ্ন হওয়া, সংসার-পরিবারের মধ্যে বিষমভাব, পক্ষপাতিত্ব, ঈর্ষা প্রভৃতি বিকার হওয়া—এ সমস্তই হল **'কলিল'** অর্থাৎ পাঁক। এই মোহরূপ পঙ্কে যখন বুদ্ধি বিপর্যস্ত হয়, মানুষ তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। তখন তার আর কোনো বোধজ্ঞান থাকে না।

এই স্বয়ং নিজে চেতন হয়েও শরীরাদি জড় পদার্থের সঙ্গে অহং ও মমত্ববোধে তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে। কিন্তু বাস্তবে সে, যে যে বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, সেইসব বস্তু তার সঙ্গে সর্বদা থাকে না এবং সেও সেগুলির সঙ্গে চিরকাল থাকতে পারে না। কিন্তু মোহের ফলে তার সেদিকে দৃষ্টি যায় না এবং সে নানাপ্রকার নতুন নতুন সম্পর্ক সৃষ্টি করে জগৎসংসারে অধিকতরভাবে আবদ্ধ হতে থাকে। কোনো পথিক নিজ গন্তব্যে পৌঁছাবার আগে যেমন একটি স্থানে আস্তানা নিয়ে খেলাধুলা বা হাসি-তামাশায় সময় নষ্ট করে, মানুষও তেমনই এই জগতের বিনাশশীল পদার্থ সংগ্রহে এবং তার সুখভোগে তথা ব্যক্তি, পরিবার ইত্যাদিতে মমত্ববোধ নিয়ে, তাতে সুখ আহরণে মগ্ন হয়ে যায়। এই হচ্ছে তার বুদ্ধির মোহরূপ পঙ্কে পতিত হওয়া।

শরীরের প্রতি অহংবোধ ও মমত্ববোধ করে এবং পরিবার পরিজনের প্রতি মমতা করে জীবনযাপনের জন্য আমরা এখানে আসিনি। এতেই আবদ্ধ হয়ে নিজেদের প্রকৃত উন্নতি (কল্যাণ) থেকে কি আমরা বঞ্চিত থাকব? আমাদের এতে আবদ্ধ না হয়ে, নিজেদের কল্যাণ করতে হবে—এটি দৃঢ় নিশ্চিত করে নেওয়াই হল বুদ্ধির মোহরূপ পঙ্ক অতিক্রম করা। কারণ এইরূপ চিন্তা দৃঢ়ভাবে ধরে

থাকলে আমাদের বুদ্ধি সংসারের সম্পর্ককে নিয়ে আটকে থাকবে না অর্থাৎ এতে ডুবে যাবে না।

মোহরূপ পঙ্ক থেকে উদ্ধার পাবার দুটি উপায় আছে—এক হল বিবেক, অপরটি সেবা। বিবেক (যার বর্ণনা ২।১১-৩০-এ করা হয়েছে) যদি প্রখর হয়, তাহলে সেটি অসৎ বিষয়গুলিতে অনীহা এনে দেয়। মনের মধ্যে যদি অপরকে সেবা করা, অন্যকে সুখী করার প্রবল ইচ্ছা জাগে, তবে নিজের সুখ ও আরাম পরিত্যাগ করার শক্তি এসে যায়। অপরকে সুখী করার ইচ্ছা যত প্রখর হবে নিজের জন্য সুখের ইচ্ছারও ততই ত্যাগ হতে থাকবে। যেমন শিষ্যের গুরুকে, পুত্রের মাতা-পিতাকে, পরিচারকের মনিবকে সুখী করার ইচ্ছা জাগ্রত হলে তার নিজের সুখ ও আরামের ইচ্ছা আপনিই অনায়াসে দূর হয়। তেমনি কর্মযোগীর সংসারমাত্রেরই সেবা করার ইচ্ছা হয় এবং এর ফলে তার নিজের সুখভোগের ইচ্ছা আপনিই দূর হয়।

বিবেক-বিচার দ্বারা নিজের ভোগের ইচ্ছা মেটানো কিছু কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ বিবেক যদি অত্যন্ত দৃঢ় না হয়, সেটি ততক্ষণই কার্যকরী হয় যতক্ষণ কোনো ভোগ্যবস্তু সম্মুখে না আসে। ভোগ্যবস্তু এসে পড়লেই সাধক প্রায়শঃ তাতে বিচলিত হয়ে পড়ে। কিন্তু যার মধ্যে সেবাভাব থাকে, তার কাছে অত্যন্ত সুখপ্রদ ভোগও যদি আসে তবে সে সেটি অপরের সেবায় ব্যয় করে। সুতরাং তার নিজের সুখ ও আরামের ইচ্ছা অনায়াসে দূর হয়। সেইজন্য ভগবান সাংখ্যযোগের থেকে কর্মযোগকে শ্রেষ্ঠ (৫।২), সহজ (৫।৩) এবং শীঘ্র সিদ্ধিপ্রদ (৫।৬) বলে জানিয়েছেন।

'তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ'—মানুষ যত প্রকার ভোগের কথা শুনেছে, ভোগ করেছে এবং ভালোভাবে অনুভব করেছে, সেই সমস্ত ভোগ এখানে **'শ্রুতস্য'** পদের মধ্যে ধরা হয়েছে। স্বর্গলোক, ব্রহ্মলোক ইত্যাদি যতরকম ভোগের কথা শোনা যায়, সে সমস্ত এখানে **'শ্রোতব্যস্য'**[১] পদের অন্তর্গত রয়েছে। 'তোমার বুদ্ধি যখন মোহরূপ পঙ্ক অতিক্রম করবে, তখন এই **'শ্রুত'**—ইহলৌকিক এবং **'শ্রোতব্য'**—পারলৌকিক ভোগ ও বিষয়গুলিতে তোমার বৈরাগ্য দেখা দেবে।' অর্থাৎ বুদ্ধি যখন এই মোহপঙ্ককে পার হয়ে যায় তখন বুদ্ধিতে প্রবলভাবে বিবেক জাগরিত হয়। সংসার সর্বক্ষণ পরিবর্তিত হচ্ছে আর আমি সেই একই রয়েছি ; সুতরাং আমি এই পরিবর্তনশীল জগৎ থেকে কি করে শান্তি পেতে পারি ? —আমার অভাব এর দ্বারা কী করে দূর হতে পারে ? এরূপ প্রবল আলোড়ন হলে তবে এইসব **'শ্রুত'** ও **'শ্রোতব্য'** বিষয়গুলিতে স্বাভাবিকভাবে বৈরাগ্য দেখা দেয়।

এখানে ভগবানের **'শ্রুত'** স্থানে ভুক্ত এবং **'শ্রোতব্য'** স্থানে ভোক্তব্য বলাই ঠিক ছিল। কিন্তু এরূপ না বলার অর্থ হল যে জগতে যা কিছু পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ বিষয়ের আকর্ষণ হয় তা শ্রবণ করেই হয়। সুতরাং আকর্ষণের মুখ্য ব্যাপারই হল শ্রবণ করা। জগৎসংসার তথা বিষয় হতে রক্ষা পাবার জন্য যেখানে জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গের বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানেও শ্রবণ করাকেই মুখ্য বলে জানানো হয়েছে। অর্থাৎ সংসারই হোক বা পরমাত্মাই হোক, সবকিছুতে একনিষ্ঠ হওয়াতে শ্রবণই হল প্রধান কারণ।

এখানে **'যদা'** এবং **'তদা'** বলার অর্থ এই যে এই **'শ্রুত'** ও **'শ্রোতব্য'** বিষয়গুলি থেকে কত বছরে, কত মাসে বা কত দিনে বৈরাগ্য লাভ হবে—তার কোনো নিয়ম নেই, বরং যে মুহূর্তে বুদ্ধি মোহরূপ পঙ্ক অতিক্রান্ত করবে, সেই মুহূর্তেই **'শ্রুত'** এবং **'শ্রোতব্য'** বিষয় হতে ভোগে বৈরাগ্য উদয় হবে। এতে বিলম্ব হওয়ার কোনো কারণ নেই।

❋ ❋ ❋

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩ ॥

[**শ্রুতিবিপ্রতিপন্না** (নানাপ্রকার শাস্ত্রীয় মতভেদে বিক্ষিপ্ত) ; **তে, বুদ্ধিঃ** (তোমার বুদ্ধি) ; **যদা, নিশ্চলা, স্থাস্যতি** (যখন নিশ্চল হবে) ; **সমাধৌ** (পরমাত্মায়) ; **অচলা** (অচলা) ; **তদা** (সেই সময়) ; **যোগম্** (যোগ) ; **অবাপ্স্যসি** (প্রাপ্ত হবে।)]

[১] এখানে 'শ্রুতস্য' এবং 'শ্রোতব্যস্য' পদ দুটি রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ—এই পাঁচ প্রকার বিষয়ের উপলক্ষণ।

নানাপ্রকার শাস্ত্রীয় মতভেদে বিক্ষিপ্ত তোমার বুদ্ধি যখন নিশ্চল হয়ে যাবে এবং পরমাত্মায় অচলা হবে, সেই সময় তুমি যোগপ্রাপ্ত হবে ॥ ৫৩ ॥

ব্যাখ্যা— [লৌকিক মোহরূপ পঙ্ক অতিক্রম করলেও নানাপ্রকার শাস্ত্রীয় মতভেদ দ্বারা যে মোহ উৎপন্ন হয়, সেগুলিকে অতিক্রম করবার জন্য ভগবান এই শ্লোকে প্রেরণা দিয়েছেন।]

'শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে .... যোগমবাপ্স্যসি'— অর্জুনের মনে এই শ্রুতিবিপ্রতিপত্তি (শ্রবণের দ্বারা বিক্ষিপ্ত ভাব) এসেছিল যে ; নিজ গুরুজনদের, আত্মীয়দের হত্যা করা উচিত নয় আবার নিজের ক্ষত্রিয়ধর্মও (যুদ্ধ) ত্যাগ করা উচিত নয়। একদিকে আত্মীয়দের রক্ষা করা, অন্য দিকে ক্ষাত্রধর্ম পালন করা—এর মধ্যে যদি আত্মীয়দের রক্ষা করতে হয় তবে যুদ্ধ করা যায় না এবং যুদ্ধ করলে আত্মীয়দের রক্ষা করা যায় না—এই দুই বিষয় নিয়ে অর্জুনের শ্রুতিবিপ্রতিপত্তি হয়েছে, তাতে তাঁর বুদ্ধি বিচলিত হয়েছে[১]। তাই ভগবান শাস্ত্রীয় মতভেদে বুদ্ধিকে স্থির এবং পরমাত্মপ্রাপ্তির ব্যাপারে বুদ্ধিকে অচল রাখার প্রেরণা দিয়েছেন।

সাধকদের মনে এক্ষেত্রে প্রথমে এই দ্বিধা দেখা দেয় যে, সাংসারিক ব্যবহার ঠিক রাখা উচিত, না পরমাত্মপ্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করা উচিত ? ক্রমে এরূপ নিশ্চয় হয় যে, 'আমার শুধু জগৎসংসারের সেবা করা উচিত, জগতের কাছ থেকে আমার নেবার কিছুই নেই।' এরূপ ধারণা বদ্ধমূল হবার পর তাঁদের ভোগের আকাঙ্ক্ষা কমতে থাকে এবং বৈরাগ্য জাগে। এরূপ হলে সাধকগণ যখন ভগবানের দিকে অগ্রসর হন তখন তাঁদের নিকট সাধ্য ও সাধন বিষয়ক নানাপ্রকার শাস্ত্রীয় মতভেদ উপস্থিত হয়। তখন 'আমার কোন সাধ্যকে স্বীকার করা উচিত এবং কোন সাধন পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত'—তা স্থির করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু সাধকগণ যখন সৎসঙ্গের সাহায্যে নিজ রুচি, শ্রদ্ধা-বিশ্বাস এবং যোগ্যতাকে ঠিক করে নেন অথবা ঠিক করতে না পেরে ভগবানের শরণাগত হয়ে তাঁর সাহায্য চান, তখন ভগবৎ কৃপায় তাঁদের বুদ্ধি নিশ্চলা হয়। দ্বিতীয়ত সমস্ত শাস্ত্র, সম্প্রদায় ইত্যাদিতে জীব, জগৎ এবং পরমাত্মা—এই তিনটিরই পৃথকরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এসব বিচার করলে দেখা যায় যে জীবের স্বরূপ যাই হোক না কেন, কিন্তু 'আমি'ই জীব—এতে সকলেই একমত ; জগৎ-সংসারের স্বরূপ যেমনই হোক, এটিকে ত্যাগ করা উচিত—এতেও সকলেই একমত। এরূপ স্থির করে নিলে সাধকদের বুদ্ধি নিশ্চলা হয়। 'আমাকে শুধু পরমাত্মা লাভ করতে হবে'— এই সংকল্প দৃঢ়তার সঙ্গে নিশ্চয় করলে বুদ্ধি অচলা হয়। তখন সাধকগণ সহজভাবে যোগ অর্থাৎ পরমাত্মার সঙ্গে নিত্যযোগ প্রাপ্ত হন।

শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে অথবা নিজ কল্যাণের নিশ্চয়তায় যতো ন্যূনতা থাকে, ততই বিলম্ব ঘটে। কিন্তু এই দুটিতে যখন বুদ্ধি নিশ্চলা এবং অচলা হয়ে যায়, তখনই পরমাত্মার সঙ্গে নিত্যযোগের অনুভব হয়।

জগৎসংসার থেকে সম্পর্ক ছেদ করার জন্য বুদ্ধি 'নিশ্চলা' হওয়া প্রয়োজন। যেটি ষষ্ঠ অধ্যায়ের তেইশতম শ্লোকে **'দুঃখসংযোগবিয়োগম্'** পদে বলা হয়েছে ; আর পরমাত্মার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য বুদ্ধি 'অচলা' হওয়া প্রয়োজন, যেটি দ্বিতীয় অধ্যায়ের আটচল্লিশতম শ্লোকে **'সমত্বং যোগ উচ্যতে'** পদ দ্বারা বলা হয়েছে।

এখানে **'তদা যোগমবাপ্স্যসি'** পদে যে যোগপ্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে সেই যোগ এমন নয় যে পূর্বে পরমাত্মার সঙ্গে বিচ্ছেদ ছিল, সেই বিচ্ছেদ দূর হওয়াতে যোগ হল, বরং ভ্রমবশতঃ অসৎ পদার্থগুলির সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক সর্বতোভাবে বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়াকেই 'যোগ'

[১] জাল দুই প্রকারের—সংসারী এবং শাস্ত্রীয়। সংসারের মোহরূপ পঙ্কে আবদ্ধ হওয়া সাংসারিক জালে পড়া এবং শাস্ত্র, সম্প্রদায় ইত্যাদির দ্বৈত-অদ্বৈতের নানা মতাদিতে সমস্যায় জড়ানোই শাস্ত্রীয় জালে পড়া। সংসারের জাল তো ছটাকখানেক সুতোর মতো আর শাস্ত্রীয় জাল হচ্ছে একশত মণ সুতোর মতো। তাই ভগবান এখানে বলেছেন যে সংসারী ও শাস্ত্রীয়—এই দুই সমস্যাতেই বুদ্ধি নিশ্চলা (এক নিশ্চয়সম্পন্ন) হওয়া উচিত এবং পরমাত্মাতে বুদ্ধি স্থির থাকা উচিত যে,— আমার পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করতেই হবে, তাতে যাই হোক না কেন।

বলে অর্থাৎ মানুষের চিরকালের যে বাস্তবিক স্থিতি (পরমাত্মার সঙ্গে নিত্যযোগ), সেই স্থিতিতে সচেতন হওয়াকেই যোগ বলে। এই বাস্তবিক স্থিতি এত বিশেষ যে এর থেকে কখনো বিচ্ছেদ হয় না, হওয়া সম্ভব নয়। তাতে সংযোগ, বিয়োগ, যোগ কোনো শব্দই প্রযুক্ত হয় না। শুধুমাত্র অসৎ-এর সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক ত্যাগ করাকেই এখানে 'যোগ' নাম দেওয়া হয়েছে। বাস্তবে এই যোগ হল নিত্যযোগের বাচক। এই নিত্যযোগের অনুভূতি কর্মের (সেবার) দ্বারা করা হলে সেটি **'কর্মযোগ'**, বিচার-বিবেচনার দ্বারা করা হলে **'জ্ঞানযোগ'**, প্রেমের দ্বারা করা হলে **'ভক্তিযোগ'**, সংসারের লয়-চিন্তার দ্বারা করা হলে **'লয়যোগ'**, প্রাণায়ামের দ্বারা করা হলে **'হঠযোগ'** এবং সংযম-নিয়ম ইত্যাদি অষ্টাঙ্গের দ্বারা করা হলে **'অষ্টাঙ্গযোগ'** বলা হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব— মোহকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় —**'মোহকলিল'** অর্থাৎ জাগতিক মোহ আর **'শ্রুতিবিপ্রতিপত্তি'** অর্থাৎ শাস্ত্রীয় (দার্শনিক) মোহ। শরীর, স্ত্রী-পুত্র, ধনসম্পত্তি, ইত্যাদিতে যে আসক্তি জন্মায় তাকে বলা হয় 'জাগতিক মোহ'। আর দ্বৈত, অদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত এই সব দার্শনিক মতভেদে জড়িয়ে পড়াকে বলা হয় 'শাস্ত্রীয় মোহ'। এই দু'প্রকারের মোহ পরিত্যাগ করলে মানুষের ভোগে বৈরাগ্য আসে এবং তার বুদ্ধি স্থির হয়। বুদ্ধি স্থির হলে যোগপ্রাপ্তি হয় অর্থাৎ পরমাত্মার সঙ্গে দূরত্ব দূর হয়ে সামীপ্য লাভ হয়। কর্মযোগে সামীপ্যলাভ হয়, জ্ঞানযোগে অভেদ হয় এবং ভক্তিযোগের দ্বারা অভিন্নতা আসে। কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ— উভয়ের মধ্যে একটিতে সিদ্ধি হলে সাধক উভয়েরই ফলস্বরূপ একই তত্ত্ব লাভ করেন (গীতা ৫।৪-৫)।

মানুষের যদি শুধু নিজের কল্যাণের ইচ্ছা থাকে এবং ধনসম্পত্তি, কুটুম্বাদিতে কোনো স্বার্থের সম্পর্ক না থাকে তাহলে সে এই জাগতিক মোহ অতিক্রম করতে সক্ষম হয়। পুস্তক যদি পড়ার উদ্দেশ্যে পড়া না হয় এবং শাস্ত্রীয় কথা জানার উদ্দেশ্য না হয়ে শুধুমাত্র তত্ত্ব অনুভব করার জন্যই পড়া হয় তাহলে মানুষ শাস্ত্রীয় মোহ অতিক্রম করতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ সাধকের জাগতিক মোহের এবং শাস্ত্রীয় মতপার্থক্যের কোনোটিরই প্রাধান্য রাখা উচিত নয়। তাঁর কোনো মত বা সম্প্রদায়ের প্রতি কোনো পক্ষপাত রাখা উচিত নয়। তাহলেই তিনি যোগ, মুক্তি এবং ভক্তির অধিকারী হতে সক্ষম হন। এর থেকে বেশি কোনো অধিকারবিশেষের প্রয়োজন নেই।

❊ ❊ ❊

সম্বন্ধ—মোহপঙ্ক এবং শ্রুতিবিপ্রতিপত্তি অপসারিত হলে যোগপ্রাপ্ত স্থিরবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে অর্জুন প্রশ্ন করছেন।

অর্জুন উবাচ

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্।। ৫৪ ।।

[**কেশব** (হে কেশব !) ; **সমাধিস্থস্য** (পরমাত্মায় স্থিত) ; **স্থিতপ্রজ্ঞস্য** (স্থিতপ্রজ্ঞের) ; **কা, ভাষা** (লক্ষণ কী ?) ; **স্থিতধীঃ** (স্থিতধী ব্যক্তি) ; **কিম্, প্রভাষেত** (কীরূপে কথা বলেন) ; **কিম্, আসীত** (কীরূপে অবস্থান করেন) ; **কিম্** (কেমনভাবে) ; **ব্রজেত** (বিচরণ করেন।)]

অর্জুন বললেন—হে কেশব ! যিনি পরমাত্মায় স্থিত এবং স্থিতপ্রজ্ঞ, তাঁর লক্ষণ কী ? সেই স্থিতধী ব্যক্তি কীরূপে কথা বলেন, কীরূপে অবস্থান করেন এবং কেমনভাবে বিচরণ করেন ?।। ৫৪ ।।

ব্যাখ্যা—[অর্জুন এখানে স্থিতপ্রজ্ঞের বিষয়ে যে প্রশ্ন করেছেন, এই প্রশ্নটি করার আগে অর্জুনের মনে কর্ম ও বুদ্ধি (২।৪৭-৫০) নিয়ে অন্য একটি প্রশ্ন জেগেছিল। কিন্তু ভগবান বাহান্ন ও তিপ্পান্নতম শ্লোকে বলেছিলেন যে, 'যখন তোমার বুদ্ধি মোহরূপ পঙ্ক এবং শ্রুতিবিপ্রতিপত্তি অতিক্রম করবে তখনই তুমি যোগপ্রাপ্ত হবে'—একথায় অর্জুনের মনে প্রশ্ন জাগরিত হল যে, যখন তিনি যোগ-প্রাপ্ত হবেন, স্থিতপ্রজ্ঞ হবেন, তখন তাঁর নিজের লক্ষণ

কেমন হবে ? সেইজন্য অর্জুন এই ব্যক্তিগত সংশয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, পরে কর্ম বা বুদ্ধির জন্য অর্থাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে যে অন্য সংশয় ছিল, সেটি স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণের বর্ণনার পরে (৩।১-২-এ) জিজ্ঞাসা করে নিয়েছেন। অর্জুন যদি এই চুয়ান্নতম শ্লোকেই সিদ্ধান্তগুলি জানতে চাইতেন তাহলে স্থিতপ্রজ্ঞ বিষয়ক প্রশ্নটি করার অবকাশ পেতে অনেক দেরি হত।]

'সমাধিস্থস্য'[১]—যে ব্যক্তি পরমাত্মাকে লাভ করেছেন, তাঁর উদ্দেশ্যে এই স্থানে **'সমাধিস্থস্য'** পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

'স্থিতপ্রজ্ঞস্য'—এই পদটি সিদ্ধ ও সাধক উভয়েরই বাচক। যাঁর বিচার-বিবেচনা দৃঢ়, সাধন হতে যিনি কখনও বিচলিত হন না, এরূপ সাধকও স্থিতপ্রজ্ঞ (স্থির-বুদ্ধিসম্পন্ন) হন। আবার পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব হওয়ায় যিনি স্থিতধী হয়েছেন, এরূপ সিদ্ধকেও স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়। সুতরাং স্থিতপ্রজ্ঞ শব্দটির দ্বারা সাধক এবং সিদ্ধ উভয়কেই বোঝায়। প্রথম একচল্লিশতম শ্লোক থেকে পঁয়তাল্লিশতম শ্লোক পর্যন্ত এবং সাতচল্লিশতম শ্লোক থেকে তিপ্পান্নতম শ্লোক পর্যন্ত সাধকদের বর্ণনা আছে। সেইজন্য পরের শ্লোকগুলিতে সিদ্ধপুরুষের লক্ষণের বর্ণনায় সাধকের লক্ষণও বর্ণনা করা হয়েছে।

এখানে একটি সংশয় দেখা দেয় যে, অর্জুন **'সমাধিস্থস্য'** পদটির দ্বারা স্থিতপ্রজ্ঞের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কিন্তু ভগবান স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বলতে গিয়ে সাধকের কথা কেন জানালেন ? এর উত্তর হচ্ছে এই যে, জ্ঞানযোগী সাধকের প্রায়শই সাধন অবস্থাতে কর্মে উপরতি হয়ে যায়। সিদ্ধ-অবস্থাতে তিনি কর্ম থেকে বিশেষভাবে বিরত হন। ভক্তিযোগী সাধকেরও সাধন অবস্থায় জপ-ধ্যান-সৎসঙ্গ-স্বাধ্যায় ইত্যাদি ভগবৎ সম্পর্কীয় কাজ করার রুচি দেখা যায় এবং এর বহুলতাও হয়। সিদ্ধ-অবস্থায় তাঁর দ্বারা ভগবৎ সম্বন্ধীয় কাজই বিশেষভাবে হয়ে থাকে। এইরূপ জ্ঞানযোগী ও ভক্তিযোগী দুইপ্রকার যোগীর সাধন এবং সিদ্ধ-অবস্থায় তার দ্বারা পার্থক্য দেখা যায়, কিন্তু কর্মযোগীর সাধন এবং সিদ্ধ-অবস্থায় কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। দুই অবস্থাতেই তাঁর কর্মপ্রবাহ একইভাবে চলতে থাকে। অর্থাৎ সাধনাবস্থায় তাঁর কর্মপ্রবাহ ছিল এবং যোগারূঢ় হওয়াতেও কর্মই প্রধান কারণ। তাই ভগবান সিদ্ধের লক্ষণে, সাধক যাতে সিদ্ধ হতে পারেন, তার সাধনপ্রণালী জানিয়েছেন এবং যাঁরা সিদ্ধ হয়েছেন, তাঁদের লক্ষণও জানিয়েছেন।

'কা ভাষা'[২]—সমাধিতে আরূঢ় ব্যক্তিগণকে কোন বাক্যের দ্বারা বর্ণনা করা যায় অর্থাৎ তাঁদের লক্ষণ কীরূপ হয় ? (এর উত্তর ভগবান পরবর্তী শ্লোকে দিয়েছেন।)

'স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত'—সমাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ কেমন করে কথা বলেন ? (এর উত্তর ছাপ্পান্ন-সাতান্ন শ্লোকে ভগবান জানিয়েছেন।)

'কিমাসীত'—তিনি কীভাবে অবস্থান করেন অর্থাৎ সংসার থেকে কীভাবে উপরাম (উপরতি প্রাপ্ত) হন ? (ভগবান এর উত্তর দিয়েছেন আটান্ন থেকে তেষট্টিতম শ্লোকে।)

'ব্রজেত কিম্'—তিনি কীভাবে বিচরণ করেন অর্থাৎ তাঁর ব্যবহার কেমন ? (ভগবান এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন চৌষট্টি থেকে একাত্তরতম শ্লোকে।)

⁂ ⁂ ⁂

সম্বন্ধ—ভগবান এখন পরবর্তী শ্লোকে অর্জুনের প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

শ্রীভগবানুবাচ

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥ ৫৫ ॥

[**পার্থ** (হে পৃথানন্দন !) ; **যদা** (যখন) ; **সর্বান্, মনোগতান** (সমস্ত মনোগত) ; **কামান্** (কামনাগুলি) ; **প্রজহাতি** (সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করে) ; **আত্মনা, আত্মনি** (আপনাতে আপনি) ; **এব** (ই) ; **তুষ্টঃ** (সন্তুষ্ট থাকেন) ; **তদা** (তখন) ; **স্থিতপ্রজ্ঞঃ** (স্থিতপ্রজ্ঞ) ; **উচ্যতে** (বলা হয়।)]

[১] 'সমাধি' পদটি এইখানে পরমাত্মার বাচক। এটিকেই আগে চুয়াল্লিশতম শ্লোকে 'সমাধৌ ন বিধীয়তে' পদ দ্বারা বলেছেন।
[২] 'কয়া ভাষয়া (বাণ্যা) ভাষ্যত ইতি ভাষা।'

শ্রীভগবান বললেন—হে পৃথানন্দন ! যখন সাধক তাঁর সমস্ত মনোগত কামনা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করে আপনাতেই আপনি সন্তুষ্ট থাকেন, তখন তাঁকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয় ॥ ৫৫ ॥

ব্যাখ্যা—[গীতার একটি শৈলী হচ্ছে এই যে, যে সাধক যেরূপ সাধন (কর্মযোগ, ভক্তিযোগ ইত্যাদি) দ্বারা সিদ্ধিপ্রাপ্ত হন, সেই সাধনই তাঁর পূর্ণতা লাভের কারণ বলে বর্ণনা করা হয়। যেমন, ভক্তিযোগের সাধক—ভগবানকে ছাড়া আর কিছু নেই—এরূপ অনন্যযোগ দ্বারা তাঁরা উপাসনা করেন (১২।৬)। সুতরাং সিদ্ধ-অবস্থায় তাঁরা সমস্ত প্রাণীজগতের প্রতি দ্বেষভাবরহিত হন (১২।১৩)। জ্ঞানযোগের সাধক, নিজ স্বরূপকে ত্রিগুণাতীত এবং নির্লিপ্তরূপে দেখেন (১৪।১৯)। সুতরাং সিদ্ধাবস্থায় তাঁরা সমস্ত গুণের অতীত হয়ে যান (১৪।২২-২৫)। কর্মযোগেও এইরূপ প্রধানতঃ কামনা-বাসনা ত্যাগের কথাই বলা হয়েছে । সুতরাং তাঁরা সিদ্ধাবস্থায় কামনা-বাসনা সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করেন—এই শ্লোকে সেই কথাই বলা হয়েছে।]

'প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্'—পদটির তাৎপর্য হল যে কামনা স্বয়ং-এ নেই এবং মনেও নেই। কামনা উৎপন্ন হয় এবং তার লয়ও হয় আর স্বয়ং সর্বদা স্থায়ী। সুতরাং স্বয়ং-এ কী করে কামনা থাকবে ? মন হল একটি করণ বা উপাদান, এতে কামনা সর্বক্ষণ টিকে থাকতে পারে না, মনে কামনার আগমন হয়—**'মনোগতান্'**। অতএব মনে কামনা কী করে থাকবে ? কিন্তু শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি দ্বারা তাদাত্ম্য হওয়ায় মানুষ মনে আসা (আগত) কামনাগুলিকে নিজের বলে মনে করে।

'জহাতি' ক্রিয়ার সঙ্গে **'প্র'** উপসর্গ ব্যবহারের তাৎপর্য এই যে, সাধকগণ কামনাগুলিকে সর্বতোভাবে বর্জন করেন ; কোনো কামনার লেশমাত্রও তাঁদের মধ্যে থাকে না।

নিজের স্বরূপকে কখনো পরিত্যাগ করা যায় না এবং যার সঙ্গে নিজের কোনো সম্পর্ক নেই, তাকেও পরিত্যাগ করা যায় না। কিন্তু ত্যাগ তাকেই করা যায়, যা নিজের নয়, অথচ তাকে নিজের বলে মনে করা হয়। এইরূপই কামনাও আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু তাকে নিজের বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। এই মেনে নেওয়া সম্পর্ক বর্জন করাকেই এখানে **'প্রজহাতি'** পদের দ্বারা বলা হয়েছে।

এখানে **'কামান্'** শব্দটি বহুবচন হওয়ায় **'সর্বান্'** পদটি তার অন্তর্গত হয়ে যায়, তা সত্ত্বেও **'সর্বান্'** পদটি ব্যবহারের তাৎপর্য এই যে, যেন কোনো কামনা না থাকে এবং কোনো কামনার কিছুমাত্র অংশও যেন অবশিষ্ট না থেকে যায়।

'আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ'—যে সময়ে সমস্ত কামনা ত্যাগ করা হয় এবং আপনাতে আপনি সন্তুষ্ট থাকা হয় অর্থাৎ নিজে থেকে নিজের মধ্যে সন্তোষ লাভ হয়।

সন্তোষ দুই প্রকারের হয়—একটি হল গুণ, অপরটি স্বরূপ। অন্তরে কোনোপ্রকার ইচ্ছা না থাকা হল গুণ এবং স্বয়ং-এ অসন্তোষের অত্যন্ত অভাব হওয়া হল স্বরূপ। এই স্বরূপভূত সন্তোষ স্বাভাবিক এবং সর্বদা বিরাজিত। এর জন্য কোনো অভ্যাস বা বিচার করার প্রয়োজন হয় না। স্বরূপভূত সন্তোষে প্রজ্ঞা বা জ্ঞান স্বতঃই স্থির থাকে।

'স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে'—স্বয়ং যখন বহু শাখাবিশিষ্ট অনন্ত কামনাগুলিকে নিজের বলে মনে করত, সেই সময়েও কামনাগুলি প্রকৃতপক্ষে তার নিজের মধ্যে ছিল না এবং স্বয়ং স্থিতপ্রজ্ঞই ছিল। কিন্তু তখন নিজ কামনাবশতঃ বুদ্ধি স্থির না থাকায় তাঁকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলে উল্লেখ করা যেত না অর্থাৎ তাঁর স্থিতপ্রজ্ঞতার অনুভূতি ছিল না। এখন তিনি সমস্ত কামনা বর্জন করেছেন অর্থাৎ তাঁর মেনে নেওয়া সম্পর্কটিকে সরিয়ে দিয়েছেন, এবার তাঁকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায় অর্থাৎ তাঁর এখন স্থিতপ্রজ্ঞতা অনুভব হয়।

সাধক বুদ্ধিকে স্থির রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু কামনাগুলি সর্বাংশে পরিত্যক্ত হলে বুদ্ধি স্থির করার চেষ্টা করতে হয় না, তা স্বতঃ স্বাভাবিক স্থির হয়ে যায়।

কর্মযোগে সাধকের কর্মের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ থাকে। তাঁর যোগারূঢ় হওয়াতেও কর্মই কারণ হয়—**'আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে'** (গীতা ৬।৩)। তাই কর্মযোগীর সাধক-অবস্থা এবং সিদ্ধ-অবস্থা, দুই অবস্থাতেই কর্মের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে। সিদ্ধাবস্থায় মর্যাদা অনুযায়ী কর্মযোগীর কর্মগুলি সম্পন্ন হয়, যা সাধারণের নিকট আদর্শস্বরূপ (গীতা ৩।২১)। চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান এই কথাই বলেছেন যে, কর্মযোগী কর্ম করার সময় নির্লিপ্ত থাকেন এবং নির্লিপ্ত থেকেও কর্ম করেন— **'কর্মণ্যকর্ম**

যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ' (৪।১৮)।

ভগবান তিপ্পান্নতম শ্লোকে যোগপ্রাপ্তিতে বুদ্ধির সম্বন্ধে দুটি কথা বলেছিলেন—সংসার পরিত্যাগে বুদ্ধি নিশ্চলা হয় এবং ভগবানমুখী হলে বুদ্ধি অচলা হয়। অর্থাৎ নিশ্চল শব্দ দ্বারা, সংসার পরিত্যাগ হওয়ার কথা জানিয়েছেন এবং অচল দ্বারা, পরমাত্মায় স্থিতির কথা জানিয়েছেন। সেই দুটি কথা ধরেই তিনি এখানে **'যদা'** এবং **'তদা'** পদ দ্বারা বলেছেন যে, সাধক যখন কামনাগুলি থেকে সর্বতোভাবে বিমুখ হন এবং নিজ স্বরূপে সন্তুষ্ট থাকেন, তখন তাঁকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়। অর্থাৎ যতক্ষণ তাঁর মধ্যে কামনার লেশমাত্রও থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁকে সাধক বলা হয় আর যখন কামনা সর্বাংশে নিবৃত্ত হয় তখন তাঁকে সিদ্ধ বলা হয়। এই অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত ভগবান এই দুটি কথাই বর্ণনা করেছেন ; যেমন—এখানে **'প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্'** পদ দ্বারা সংসার পরিত্যাগের কথা বলেছেন এবং আবার **'আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ'** পদ দ্বারা পরমাত্মাতে স্থিতি বুঝিয়েছেন।

ছাপ্পান্নতম শ্লোকের প্রথমাংশে (তিন পংক্তিতে) সংসার পরিত্যাগ এবং **'স্থিতধীর্মুনিঃ'** পদ দ্বারা পরমাত্মাতে স্থিতির কথা বলেছেন। সাতান্ন এবং আটান্নতম শ্লোকে প্রথমে সংসার ত্যাগের কথা বলেছেন এবং পরে **'তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা'** পদ দ্বারা পরমাত্মাতে স্থিতির কথা বলেছেন। উনষাটতম শ্লোকে প্রথম অংশে সংসার ত্যাগের কথা বলে পরে **'পরং দৃষ্ট্বা'** পদটির দ্বারা পরমাত্মায় স্থিতির কথা বলেছেন। ষাটতম শ্লোক থেকে একষট্টিতম শ্লোক পর্যন্ত প্রথমে সংসার ত্যাগ ও পরে **'যুক্ত আসীত মৎপরঃ'** ইত্যাদি পদগুলির দ্বারা পরমাত্মায় স্থিতির কথা বলেছেন। বাষট্টি থেকে পঁয়ষট্টিতম শ্লোক পর্যন্ত প্রথমে সংসার ত্যাগের কথা বলে পরে **'বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে'** পদ দ্বারা পরমাত্মায় স্থিতির কথা বলেছেন। ছেষট্টি থেকে আটষট্টিতম শ্লোক পর্যন্ত প্রথমে সংসার ত্যাগ ও পরে **'তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা'** পদ দ্বারা পরমাত্মায় স্থিতির কথা বলেছেন। উনসত্তরতম শ্লোকে **'যা নিশা সর্বভূতানাম্'** এবং **'যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি'** পদ দ্বারা সংসার ত্যাগের কথা বলেছেন এবং **'তস্যাং জাগর্তি সংযমী'** এবং **'সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ'** পদ দ্বারা পরমাত্মায় স্থিতির কথা বলেছেন। সত্তর এবং একাত্তরতম শ্লোকের প্রথমে সংসার ত্যাগ এবং পরে **'স শান্তিমধিগচ্ছতি'** পদ দ্বারা পরমাত্মায় স্থিতি জানিয়েছেন। বাহাত্তরতম শ্লোকে **'নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি'** পদ দ্বারা সংসার ত্যাগ এবং **'ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি'** ইত্যাদি পদগুলিতে পরমাত্মায় স্থিতির কথা জানিয়েছেন।

পরিশিষ্ট-ভাব—দুটি বিভাগ আছে, একটি হল স্থিরবুদ্ধিসম্পন্নদের, অপরটি অস্থিরবুদ্ধিসম্পন্নদের। অস্থির-বুদ্ধিসম্পন্নদের সম্বন্ধে একচল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশ শ্লোক পর্যন্ত বলা হয়েছে, এখানে পঞ্চান্ন থেকে একাত্তরতম শ্লোক পর্যন্ত স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের কথা বলা হয়েছে। সাধক যখন জাগতিক আগ্রহ পরিত্যাগ করে নিজ স্বরূপে স্থিত হন, তখন তাঁকে স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন বলা হয়।

যাঁর উদ্দেশ্য থাকে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করার, তাঁর বুদ্ধি একনিশ্চয়সম্পন্ন হয়, কেননা পরমাত্মাও একই। কিন্তু যার জাগতিক বস্তুর আকাঙ্ক্ষা থাকে, তার বুদ্ধি অসংখ্য কামনাসম্পন্ন হয়, কারণ জাগতিক বস্তুও অসংখ্য হয়ে থাকে। (গীতা ২।৪১)।

সমত্বপ্রাপ্তির জন্য বুদ্ধির স্থিরতা অত্যন্ত প্রয়োজন। পাতঞ্জল যোগদর্শনে মনের স্থিরতার (বৃত্তিনিরোধ) গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, কিন্তু গীতা বুদ্ধির স্থিরতাকেই (উদ্দেশ্যের দৃঢ়তা) গুরুত্ব দিয়েছে। কেননা কল্যাণপ্রাপ্তির জন্য মনের স্থিরতার তত গুরুত্ব নেই, যত বুদ্ধির স্থিরতার আছে। মন স্থির হলে লৌকিক সিদ্ধিপ্রাপ্তি হয়, আর বুদ্ধি স্থির হলে পারমার্থিক সিদ্ধি (কল্যাণপ্রাপ্তি) হয়। কর্মযোগে বুদ্ধির স্থৈর্যই প্রধান। যদি মন স্থির হয় তাহলে কর্মযোগী তাঁর কর্তব্যকর্ম কী করে করবেন? কারণ মনস্থির হলে বাহ্য কর্মাদি নিবৃত্ত হয়ে যায়। ভগবানও যোগে (সমতায়) স্থিত হয়ে কর্ম করার নির্দেশ দিয়েছেন—**'যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি'** (২।৪৮)।

'প্রজহাতি' এবং **'কামান্ সর্বান্'** পদ ব্যবহারের তাৎপর্য হল, যেন বিন্দুমাত্র কামনা না থাকে, সম্পূর্ণভাবে যেন কামনা ত্যাগ করা হয়। কারণ কামনাই হল পরমাত্মপ্রাপ্তির পথে প্রধান প্রতিবন্ধক।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—এবার পরবর্তী দুটি শ্লোকে 'স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কীরূপে কথা বলেন ?' এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

[দুঃখেষু (দুঃখ হলে) ; অনুদ্বিগ্নমনাঃ (যিনি উদ্বেগহীন) ; সুখেষু (সুখ হলে) ; বিগতস্পৃহঃ (স্পৃহাশূন্য) ; বীতরাগ-ভয়ক্রোধঃ (সর্বতোভাবে আসক্তি, ভয় ও ক্রোধরহিত) ; স্থিতধীঃ, মুনিঃ (মননশীল স্থিতপ্রজ্ঞ) ; উচ্যতে (বলা হয়।)]

দুঃখে যিনি উদ্বেগহীন, সুখে যিনি স্পৃহাশূন্য, যিনি সর্বতোভাবে আসক্তি, ভয় এবং ক্রোধরহিত হয়েছেন, সেই মননশীল ব্যক্তিকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয় ॥ ৫৬ ॥

ব্যাখ্যা—[অর্জুন 'স্থিতপ্রজ্ঞ কীরূপে কথা বলেন'—এই ক্রিয়াটিকে মুখ্যরূপে রেখে প্রশ্ন করেছিলেন, কিন্তু ভগবান ভাবের প্রাধান্যে উত্তর দিলেন। কারণ ক্রিয়াতে ভাবই প্রধান। ক্রিয়ামাত্রই ভাবপূর্বক হয়। ভাবের পরিবর্তনে ক্রিয়াও পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ বাইরে থেকে ক্রিয়াকে সেইরূপ দেখালেও বাস্তবে সেইরূপ থাকে না। সেই ভাবের কথাই ভগবান এখানে বলছেন[১]।]

'দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ'—দুঃখের সম্ভাবনায় এবং প্রাপ্তিতেও যিনি উদ্বেগহীন অর্থাৎ কর্তব্যকর্ম করার সময় কর্মে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া, নিন্দা বা অপমান হওয়া, কর্মের প্রতিকূল ফল হওয়া ইত্যাদি নানাপ্রকার বাধাতেও যাঁর মনে কোনো উদ্বেগ হয় না।

কর্মযোগীর মনে উদ্বেগ বা চাঞ্চল্য না আসার কারণ হল, তাঁর মুখ্য লক্ষ্য থাকে—অপরের হিতার্থে কর্ম করা, যথাযথভাবে কর্ম সম্পাদন করা, কর্মফলে আসক্তি, মমতা বা কামনা যেন না জন্মায় এই বিষয়ে সাবধান থাকা। এরূপ করলে তাঁর মনে একপ্রকার প্রসন্নতা বিরাজ করে। সেই প্রসন্নতার জন্য যতই প্রতিকূলতা আসুক তাঁর মনে উদ্বেগ আসে না।

'সুখেষু বিগতস্পৃহঃ'—সুখের সম্ভাবনায় বা প্রাপ্তিতেও যাঁর মধ্যে স্পৃহা জাগে না অর্থাৎ বর্তমানের কর্ম সফলতাপূর্বক সম্পাদন হওয়া, উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বা সম্মান, অনুকূল ফলপ্রাপ্তি ইত্যাদি অনুকূলতা এলেও তাঁর মনে 'এরূপ পরিস্থিতি বজায় থাক ; এই পরিস্থিতি সর্বদা লাভ হোক'—এরূপ ইচ্ছা জাগে না। তাঁর অন্তরে অনুকূল অবস্থার কোনোরূপ প্রভাব পড়ে না।

'বীতরাগভয়ক্রোধঃ'—জগৎসংসারের পদার্থগুলি মনের ওপর যে লোভনীয় প্রভাব ফেলে তাকে আসক্তি বলা হয়। যে পদার্থগুলির প্রতি আসক্তি রয়েছে কোনো বলশালী ব্যক্তি যদি সেই পদার্থগুলিকে নষ্ট করে, সেগুলির সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে দেয়, সেগুলির প্রাপ্তিতে বাধাদান করে, তাহলে মনে **'ভয়'** উৎপন্ন হয়। সেই ব্যক্তি যদি হীনবল হয় তাহলে মনে **'ক্রোধ'** জাগে। কিন্তু যাঁর মনে অপরকে সুখী করার, পরের হিত করার, অন্যের সেবা করার ভাব জাগ্রত থাকে, তাঁর আসক্তি স্বাভাবিকভাবে দূর হয়। আসক্তি দূর হলে ভয় এবং ক্রোধও আর থাকে না। সুতরাং তিনি আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হন।

যতক্ষণ পর্যন্ত কিছুমাত্রও উদ্বেগ, ইচ্ছা, আসক্তি, ভয় এবং ক্রোধ থাকে, ততক্ষণ তাঁকে সাধক বলা হয়। এগুলি সর্বতোভাবে দূর হলে তিনি সিদ্ধ হন।

[বাসনা, কামনা ইত্যাদি সবই রাগের (আসক্তির) অভিব্যক্তি। বাসনার তারতম্য হলেই তার পৃথক পৃথক নাম হয় ; যেমন অন্তরের সুপ্ত যে অনুরাগ তাকে **'বাসনা'** বলা হয়। এই বাসনারই নাম **'আসক্তি'** এবং প্রিয়তা। 'আমার যেন ওই বস্তু লাভ হয়'—এই যে ইচ্ছা জাগে, তাকে বলা হয় **'কামনা'**। কামনা পূরণ হওয়ার সম্ভাবনাকে বলা হয় **'আশা'**। কামনা পূরণ হলে বস্তুগুলির বৃদ্ধির বা সেগুলি

[১]গীতায় অর্জুন যেখানেই ক্রিয়ার প্রাধান্য নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, তার উত্তর ভগবান ভাব এবং বোধের প্রাধান্যেই দিয়েছেন। কারণ ক্রিয়াগুলিতে ভাব এবং বোধই প্রধান। ভাব ও বোধ অনুযায়ীই ক্রিয়াগুলি হয়। যেমন, চতুর্দশ অধ্যায়ে অর্জুন প্রশ্ন করেছিলেন গুণাতীত ব্যক্তির আচরণ কীরূপ হয় ? ভগবান তখন ভাবের মুখ্যতা নিয়ে উত্তর দিয়েছিলেন যে, তাঁর আচরণ সমতাপূর্বক হয়।

আরও বেশি করে পাবার যে ইচ্ছা জাগে, তাকে বলা হয় **'লোভ'**। লোভের মাত্রা বেড়ে গেলে তাকে বলা হয় **'তৃষ্ণা'** অর্থাৎ উৎপন্ন ও বিনাশশীল পদার্থগুলির প্রতি যে আকর্ষণ, গুরুত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব বোধ থাকে সেগুলিরই অপর নাম বাসনা, কামনা ইত্যাদি।]

'স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে'—এরূপ মননশীল কর্মযোগীর বুদ্ধি স্থির ও অটল হয়ে যায়। 'মুনি' শব্দটি বাণী-র সঙ্গে সম্পর্কিত, সেইজন্য ভগবান **'কিং প্রভাষেত'**-এর উত্তরে 'মুনি' শব্দটি বলেছেন। কিন্তু বাস্তবে 'মুনি' শব্দটি শুধুমাত্র বাণীতেই অবলম্বিত নয়। সেইজন্য ভগবান সপ্তদশ অধ্যায়ে **'মৌন'** শব্দটি মানসিক তপ বোঝাতে ব্যবহার করেছেন, বাক্যের তপে নয় (১৭।১৬)।

কর্মযোগের প্রকরণ হওয়ায় এখানে মননশীল কর্মযোগীকে মুনি বলা হয়েছে। মননশীলতার তাৎপর্য হল—সাবধানীর মনন অর্থাৎ সচেতন থাকা যাতে মনে কোনোরূপ কামনা-বাসনা না এসে পড়ে। সর্বদা অনাসক্ত থাকাই হল সিদ্ধ কর্মযোগীর সাবধানতা ; কারণ প্রথমে সাধক-অবস্থায় তাঁর এরূপ সাবধানতা থাকে (গীতা ৩।১৯) এবং এর দ্বারাই তিনি পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন।

※ ※ ※

যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৫৭ ॥

[**সর্বত্র** (সর্ববিষয়ে) ; **অনভিস্নেহঃ** (আসক্তিশূন্য হয়ে) ; **তৎ, তৎ, শুভাশুভম্** (সেই সেই বিষয়ের শুভ-অশুভ) ; **প্রাপ্য, যঃ** (প্রাপ্ত করে যিনি) ; **ন, অভিনন্দতি** (আনন্দিত হন না) ; **ন, দ্বেষ্টি** (অসন্তুষ্ট হন না) ; **তস্য** (তাঁর) ; **প্রজ্ঞা** (বুদ্ধি) ; **প্রতিষ্ঠিতা** (স্থির হয়েছে।)]

সব বিষয়ে আসক্তিশূন্য হয়ে সেই সেই বিষয়ের শুভ-অশুভ প্রাপ্তিতে যিনি আনন্দিত ও অসন্তুষ্ট হন না, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ ॥ ৫৭ ॥

ব্যাখ্যা—[আগের শ্লোকে ভগবান নির্বিকার থেকে কর্তব্যকর্ম করার কথা বলেছেন। এবার এই শ্লোকে কর্ম অনুযায়ী প্রাপ্ত অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সম এবং নির্বিকার থাকার কথা বলছেন।]

'যঃ সর্বত্রানভিস্নেহঃ'—যিনি সর্বস্থানে স্নেহরহিত অর্থাৎ যাঁর নিজের বলে কথিত **শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এবং স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, সম্পত্তি ইত্যাদি কোনো কিছুতে বিন্দুমাত্র আসক্তি বা আকর্ষণ থাকে না।**

বস্তু, পদার্থ ইত্যাদি ঠিকভাবে থাকলে আমিও ঠিক থাকব এবং নষ্ট হলে আমিও বিনষ্ট হব, ধনসম্পত্তি পাওয়া গেলে আমি বড় মানুষ হয়ে গেলাম এবং সেগুলি চলে গেলে আমি মারা পড়লাম—বস্তু, পদার্থ ইত্যাদিতে এই যে একাত্মতার মতো ভালোবাসা, একেই বলা হয় **'অভিস্নেহ'**। স্থিতপ্রজ্ঞ কর্মযোগীর কোনো রকম বস্তুর প্রতিই এইরূপ অভিস্নেহ বিন্দুমাত্র থাকে না। বাইরের থেকে বস্তু, ব্যক্তি, পদার্থ ইত্যাদির সঙ্গে সংযোগ থাকলেও তিনি অন্তরে সর্বতোভাবে নির্লিপ্ত থাকেন।

'তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভং নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি'—যখন এই ব্যক্তির নিকট প্রারব্ধবশতঃ শুভ-অশুভ, শোভন-অশোভন, ভালো-মন্দ, অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতি আসে, তখন তিনি অনুকূল পরিস্থিতিতে আনন্দিত হন না এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিকে দ্বেষ করেন না।

অনুকূল পরিস্থিতির জন্য মনে যে প্রসন্নতার উদয় হয়, বাক্যের দ্বারা যে প্রসন্নতা ব্যক্ত হয়, বাইরে থেকে উৎসবের আয়োজন ইত্যাদি করা হয়—এগুলি হল সেই পরিস্থিতিকে অভিনন্দন জানানো। তেমনই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মনে দুঃখ হয়, বিষণ্ণতা আসে এই ভেবে যে এগুলি কী করে এবং কেন হল ! এগুলি না হলে ভালো হত, এখন শীঘ্র মিটে গেলে ভালো হয়—এ সবই হল ওই পরিস্থিতির প্রতি দ্বেষ হওয়া। সর্বত্র স্নেহরহিত, নির্লিপ্ত ব্যক্তি অনুকূল অবস্থায় আনন্দিত হন না এবং প্রতিকূল অবস্থায় অসন্তুষ্ট হন না। অর্থাৎ তিনি অনুকূল-প্রতিকূল অবস্থা লাভ করলেও তাঁর মধ্যে নির্লিপ্তভাব বজায় থাকে।

'তৎ, তৎ' বলার তাৎপর্য হল এই যে, যে সমস্ত অনুকূল-প্রতিকূল বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদিতে বিকার আসার সম্ভাবনা থাকে এবং সাধারণ ব্যক্তিরা তাতে

বিকারগ্রস্ত হয়, সেইসকল অনুকূল বা প্রতিকূল বস্তু ইত্যাদি কোথাও, কখনও এবং কোনো ভাবে প্রাপ্ত হলেও স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি তাতে আনন্দিত বা অসন্তুষ্ট হন না।

'তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা'—তাঁর বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং একরস ও একরূপ হয়। সাধন-অবস্থায় তাঁর যে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি ছিল এখন সেই বুদ্ধি পরমাত্মায় অচল ও অটল রূপে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর বুদ্ধিতে এই বিবেক পরিপূর্ণরূপে জাগ্রত হয় যে, জাগতিক ভালো বা মন্দের সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে তাঁর কোনোপ্রকার সম্পর্কই নেই। কারণ এই ভালো-মন্দ সময়গতভাবে পরিবর্তনশীল, কিন্তু তাঁর স্বরূপ পরিবর্তনশীল নয়, সুতরাং পরিবর্তনশীল বস্তুর সঙ্গে অপরিবর্তনীয়ের সম্পর্ক কীভাবে সম্ভব ?

বাস্তবিকভাবে দেখলে একথা খুবই স্পষ্ট যে, পার্থক্য স্বরূপে হয় না এবং শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধিতেও হয় না। কারণ নিজের যে স্বরূপ তাতে কখনো বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয় না এবং প্রকৃতির কার্যে শরীরাদি স্বাভাবিকভাবে পরিবর্তিত হতে থাকে। তাহলে পার্থক্য কোথায় হয় ? শরীরের সঙ্গে একাত্মভাব মেনে নেওয়ার ফলে বুদ্ধিতে ভুল ধারণা জন্ম নেয়। এই তাদাত্ম্য (একাত্মভাব) যখন দূর হয়, তখন ভুল ধারণা দূরীভূত হয়ে বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় কথা এই যে, এক ব্যক্তির বুদ্ধি যতই ধারালো হোক এবং পরমাত্মার বিষয়ে সে নিজ বুদ্ধির দ্বারা যতই বিচার করুক না কেন, সে কখনোই পরমাত্মাকে বুদ্ধির অন্তর্গত করতে পারবে না। কারণ বুদ্ধি সীমিত আর পরমাত্মা হচ্ছেন অসীম-অনন্ত। কিন্তু সেই অসীম-অনন্ত পরমাত্মায় যখন বুদ্ধি লীন হয়ে যায়, তখন সেই সীমিত বুদ্ধিতে পরমাত্মা ব্যতিরেকে অন্য কোনো সত্তা বিরাজমান হয় না—এই হল বুদ্ধির পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

কর্মযোগী ক্রিয়াশীল হন। সুতরাং ভগবান ছাপ্পান্নতম শ্লোকে ক্রিয়ার সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে নিস্পৃহ এবং নিরুদ্বিগ্ন হওয়ার কথা বলেছেন এবং এই শ্লোকে প্রারব্ধ অনুযায়ী স্বতঃ প্রাপ্ত অনুকূল ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আনন্দিত বা অসন্তুষ্ট না হওয়ার কথা বলেছেন।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—ভগবান এবার পরবর্তী শ্লোকে 'স্থিতপ্রজ্ঞ কীভাবে অবস্থান করেন' ? এই তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৫৮ ॥

[**ইব, চ, কূর্মঃ** (যেমন কচ্ছপ) ; **অঙ্গানি** (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ) ; **সর্বশঃ** (সর্বদিক থেকে) ; **সংহরতে** (সংকুচিত করে) ; **অয়ম্** (এই কর্মযোগীও) ; **যদা** (যখন) ; **ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ** (ইন্দ্রিয়াদির বিষয়সমূহ হতে) ; **ইন্দ্রিয়াণি** (ইন্দ্রিয়গুলি) ; **তস্য, প্রজ্ঞা** (তাঁর বুদ্ধি) ; **প্রতিষ্ঠিতা** (প্রতিষ্ঠিত হয়।)]

যেমন কচ্ছপ নিজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সর্বদিক থেকে সংকুচিত করে রাখে, তেমনি কর্মযোগীও ইন্দ্রিয়াদির বিষয়সমূহ থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে সর্বতোভাবে সংহরণ করে নেন (অপসারণ করে নেন), তখনই তাঁর বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয় (তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ হন) ॥ ৫৮ ॥

ব্যাখ্যা—'যদা সংহরতে ..... প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা'—এইস্থানে কচ্ছপের দৃষ্টান্ত দেওয়ার অর্থ এই যে, যখন কচ্ছপ চলতে থাকে তখন তার ছয়টি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখা যায়—চারটি পদ, একটি লেজ এবং একটি মস্তক। কিন্তু যখন সে তার অঙ্গগুলি লুকিয়ে ফেলে তখন কেবলমাত্র তার পৃষ্ঠদেশ দেখা যায়। তেমনি স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিও পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মন—এই ছয়টিকে তাঁর নিজ নিজ বিষয়গুলি থেকে প্রত্যাহার করে নেন। যদি তাঁর ইন্দ্রিয়গুলির সঙ্গে কোনোরূপ মানসিক সম্পর্ক বজায় থাকে তাহলে তাঁকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায় না।

এখানে **'সংহরতে'** ক্রিয়া ব্যবহারের তাৎপর্য হল এই যে, স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি বিষয়গুলি থেকে ইন্দ্রিয়কে প্রত্যাহার করে নেন অর্থাৎ তিনি বিষয়গুলি নিয়ে কখনো মনে কোনো চিন্তা আসতে দেন না।

এই শ্লোকে **'যদা'** পদটি ব্যবহৃত হলেও **'তদা'** পদটি ব্যবহৃত হয়নি। যদিও **'যত্তদোর্নিত্যসম্বন্ধঃ'** অনুযায়ী যেখানে **'যদা'** ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে 'তদা'র অনুমান করা যায় অর্থাৎ **'যদা'** পদটিরই অন্তর্গত **'তদা'** পদটিও এসে পড়ে। তা সত্ত্বেও এইস্থানে **'তদা'** পদটি প্রয়োগ না করার এক গভীর তাৎপর্য হল এই যে, ইন্দ্রিয়গুলি তাদের নিজ নিজ বিষয় হতে সর্বতোভাবে প্রত্যাহৃত হলে, স্বতঃসিদ্ধভাবে যে তত্ত্ব অনুভূত হয়, তা কালের অধীন নয়, তা কালাতীত। কারণ এই অনুভূতি কোনো ক্রিয়া বা ত্যাগের ফল নয়। এই অনুভব উৎপন্ন হবার মতো বস্তুও নয়। সেইজন্য এইস্থানে কালবাচক **'তদা'** পদটি ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। এটির প্রয়োজন সেখানেই, যেখানে একটি বস্তু অপরটির অধীনে থাকে। যেমন আকাশে সূর্য প্রকাশমান থাকলেও চক্ষু বন্ধ করলে সূর্যকে দেখা যায় না আবার চক্ষু উন্মীলনেই সূর্য দেখা যায়। এইখানে সূর্য এবং চোখের মধ্যে কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক নেই অর্থাৎ চক্ষু উন্মীলনের ফলে সূর্য প্রকাশিত হয়নি। সূর্য প্রথম থেকেই যেমন তেমনই আছে। চক্ষু বন্ধ করার আগেও সূর্য যেমন ছিল, চক্ষু বন্ধ করার পরেও তেমনই আছে। কেবলমাত্র চক্ষু বন্ধ করায় আমাদের সূর্যের অনুভব ছিল না। তেমনই ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় হতে প্রত্যাহার করায় পরমাত্মতত্ত্বের যে স্বতঃসিদ্ধ অনুভূতি হয়েছে, সেই অনুভূতি মনঃসংযোগে ইন্দ্রিয়ের বিষয় নয়। অর্থাৎ এই স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্ব বিষয়ভোগের চিন্তা করা-কালীন, ভোগাস্বাদনে ব্যাপৃত থাকা-কালীনও তেমনই আছে। কিন্তু ভোগ ইত্যাদির সঙ্গে সম্বন্ধরূপ আচ্ছাদন থাকায় তা অনুভূত হয় না, এই আচ্ছাদন অপসারিত হলেই এটি অনুভূত হয়।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—পরের শ্লোকে ভগবান জানাচ্ছেন যে শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় থেকে প্রত্যাহৃত করাই স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ নয়।

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে॥ ৫৯ ॥

[**নিরাহারস্য** (অনাহারী) ; **দেহিনঃ, বিষয়াঃ** (ব্যক্তির বিষয়ভোগ) ; **বিনিবর্তন্তে** (নিবৃত্ত হলেও) ; **রসবর্জম্** (বিষয় তৃষ্ণা) ; **অস্য** (স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির) ; **পরম্, দৃষ্ট্বা** (পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব হওয়ার ফলে) ; **রসঃ, অপি** (বিষয় তৃষ্ণাও) ; **নিবর্ততে** (নিবৃত্ত হয়ে যায়।)]

অনাহারী (ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় হতে প্রত্যাহারকারী) ব্যক্তির বিষয়ভোগ নিবৃত্ত হলেও তার (বিষয়) তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয় না। কিন্তু পরমাত্মতত্ত্ব অনুভূত হওয়ার ফলে স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির বিষয়তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয়ে যায় অর্থাৎ সংসারে তাঁর কোনো রসতৃষ্ণা থাকে না ॥ ৫৯ ॥

ব্যাখ্যা—**'বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ রসবর্জং'**—দুই প্রকারে মানুষ অনাহারী হয়—(১) স্বেচ্ছায় খাদ্যবস্তু বর্জন করা অথবা অসুস্থতার জন্য খাদ্য গ্রহণে অক্ষম হওয়া এবং (২) সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করে একান্তে আসন গ্রহণ করা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলিকে সমস্ত বিষয় থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া।

এইস্থানে **'নিরাহারস্য'** পদটি ব্যবহৃত হয়েছে সেইসব সাধকদেরই উদ্দেশ্যে যাঁরা ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় হতে প্রত্যাহার করে নিতে সচেষ্ট।

রোগীর মনে এই ভাব থাকে যে, 'কী করি, শরীর খাদ্যবস্তু গ্রহণে সক্ষম নয়, এই ব্যাপারে আমি পরবশ; কিন্তু যখন আমি সুস্থ হব, শরীরে সামর্থ্য আসবে, তখন আমি খাদ্য গ্রহণ করব।' তার অন্তরে এইরূপ বিষয়রস-তৃষ্ণা থাকে। এইভাবে ইন্দ্রিয়গুলি বিষয় থেকে প্রত্যাহার করে বিষয়ভোগ নিবৃত্ত করা গেলেও সাধকের অন্তরে বিষয়ের যে রসতৃষ্ণা, সুখতৃষ্ণা তা সদ্য নিবৃত্ত হয় না।

যাঁদের স্বাভাবিকভাবে বিষয়ে অনুরক্তি কম এবং যাঁরা তীব্র বৈরাগ্যবান সেইসব সাধকের রসতৃষ্ণা সাধনাবস্থায়ই নিবৃত্ত হয়ে যায়। কিন্তু যাঁরা তীব্র বৈরাগ্য ব্যতিরেকেই বিচার-বিবেচনার পরে সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, সেই

সাধকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, বিষয়কে বর্জন করলেও তাঁদের রসবুদ্ধি নিবৃত্ত হয় না।

'রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে'—এই স্থিতপ্রজ্ঞের রসবুদ্ধি পরমাত্মাকে অনুভব করে নিবৃত্ত হয়ে যায়। রসতৃষ্ণা নিবৃত্ত হলেই যে তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ হবেন, এমন কোনো নিয়ম নেই। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ হলে রসবুদ্ধি যে থাকে না—এটা অকাট্য নিয়ম।

'রসোঽপ্যস্য' পদটির দ্বারা এই অর্থ পরিস্ফুট হয় যে, রসতৃষ্ণা সাধকের অহংবোধ অর্থাৎ আমিত্বের মধ্যে থেকে যায়। এই রসতৃষ্ণাই স্থূলরূপে আসক্তির রূপ ধারণ করে। সুতরাং সাধকের কর্তব্য হচ্ছে নিজ অহংবোধ থেকে তৃষ্ণা দূর করা এই ভেবে যে, 'আমি তো নিষ্কাম ; আসক্ত হওয়া, কামনা করা আমার উচিত নয়।' এইভাবে নিষ্কামভাব এলে অথবা নিষ্কাম হওয়ার উদ্দেশ্য থাকলে রসতৃষ্ণা অপসৃত হতে থাকে এবং পরমাত্মতত্ত্ব অনুভূত হলে তৃষ্ণা সর্বতোভাবে দূর হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব—ভোগের অস্তিত্ব ও গুরুত্ব মেনে নিলে অন্তরে ভোগের প্রতি যে সূক্ষ্ম আকর্ষণ, প্রিয়তা, ভালোবাসা তৈরি হয়, তাকে বলা হয় **'রস'**। কোনো লোভী ব্যক্তি যদি অর্থ লাভ করে এবং কামুক ব্যক্তি যদি এক নারীকে পায়, তাহলে তার মধ্যে যে উৎফুল্লতার ভাব উৎপন্ন হয়, তাকেই বলা হয় 'রস'। ভোগের পর মানুষ যখন বলে যে — 'কত মজা হয়েছে' সেগুলি হল ওই রসেরই স্মৃতি। এই রস থাকে অহমে (চিৎজড়গ্রন্থিতে)। এই রসেরই স্থূল রূপ হল আসক্তি ও সুখাসক্তি।

যতক্ষণ পর্যন্ত সংযোগজনিত সুখে রসবুদ্ধি থাকে, ততক্ষণ প্রকৃতি এবং তার কার্যাদির (ক্রিয়া, পদার্থ এবং ব্যক্তির) পরাধীনতাও বজায় থাকে। রসবুদ্ধি নিবৃত্ত হলে পরাধীনতা সর্বতোভাবে দূরীভূত হয়, ভোগসুখের পরবশতা থাকে না এবং অন্তরে ভোগের আকাঙ্ক্ষাও থাকে না।

অন্তরে যতক্ষণ বিন্দুমাত্রও ভোগের অস্তিত্ব এবং গুরুত্ব থাকে, ভোগে রসবুদ্ধি থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত পরমাত্মার অলৌকিক রস প্রকটিত হয় না। পরমাত্মারস অনুভব করা তো দূরের কথা, পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করতে হবে সেই দৃঢ়তাও আসে না (গীতা ২।৪৪)। বাহ্যতঃ ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে সম্পর্ক ছেদ হলেও অর্থাৎ ভোগাদি পরিত্যাগ করলেও অন্তরে রসবুদ্ধি বজায় থাকে। তত্ত্ববোধ হলে এই রসবুদ্ধি শুকিয়ে যায় , নিবৃত্ত হয়ে যায়—**'পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে'**। তাৎপর্য হল যখন জগতের সঙ্গে নিজ ভিন্নতা এবং পরমাত্মার সঙ্গে নিজ অভিন্নতা অনুভূত হয়, তখন বিনাশশীল (সংযোগজনিত) রসের নিবৃত্তি হয়। বিনাশী রসের নিবৃত্তি হলে অবিনাশী (অখণ্ড) রস জাগরিত হয়।

তত্ত্ববোধ হলে রস তো সর্বতোভাবে নিবৃত্ত হয়ই, তবে তত্ত্ববোধ হওয়ার পূর্বেও উপেক্ষা, চিন্তাভাবনা, সৎসঙ্গ এবং সন্ত-মহাত্মার কৃপাতেও রস নিবৃত্ত হতে পারে। যাঁর রসবুদ্ধি নিবৃত্ত হয়েছে, তেমন তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষের সঙ্গ দ্বারাও রস নিবৃত্ত হতে পারে।

কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ— এই তিন সাধনার সাহায্যে বিনাশশীল রস নিবৃত্ত হয়। যেমনই কর্মযোগে সেবার রস, জ্ঞানযোগে তত্ত্ব অনুভবের রস এবং ভক্তিযোগে প্রেমের রস পাওয়া যায়, তেমন তেমন বিনাশশীল রস স্বভাবতই দূর হতে থাকে। যেমন শিশুবয়সে খেলনাতে রস পাওয়া যায়, কিন্তু বড় হলে অর্থে রস আস্বাদন হলে খেলনার রস স্বভাবতই দূর হয়ে যায়। তেমনই সাধনায় রস পাওয়া গেলে ভোগের রস স্বতঃই দূর হয়ে যায়।

রসবুদ্ধি থাকলে, ভোগপ্রাপ্তি হলে মানুষের চিত্তচঞ্চল হয় এবং সে ভোগের বশীভূত হয়ে পড়ে। কিন্তু রসবুদ্ধি নিবৃত্ত হওয়ার পর যদি ভোগাদি প্রাপ্তি হয়, তাহলে তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষের চিত্তে বিন্দুমাত্র বিকার উপস্থিত হয় না (গীতা ২।৭০)। তাঁর মনে এমন কোনো বৃত্তি আসে না, যাতে ভোগাদি তাঁকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। কোনো পশুর সামনে টাকার থলি রাখলে পশুটির কোনোপ্রকার লোভ-বৃত্তি জন্মায় না অথবা সুন্দরী নারীকে দেখে তার কাম-প্রবৃত্তি জন্মায় না। পশু টাকা অথবা সুন্দরী নারী সম্বন্ধে জ্ঞাত নয়, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষ টাকা এবং সুন্দরী নারী দুটি সম্পর্কে সম্যক্‌ভাবে জ্ঞাত থাকেন (গীতা ২।৬৯), তা সত্ত্বেও তাঁর লোভ বা কাম-প্রবৃত্তি জন্মায় না। অঙ্গের কোনো অংশে চুলকানি হলে আমরা যেমন আঙুলের সাহায্যে চুলকে নিই আর চুলকোনো হয়ে গেলে আঙুল সম্পর্কে কোনো খেয়াল রাখি না, তেমনই ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে বিষয়াদি সেবন করলেও তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির চিত্তে কোনো বিকার জন্মায় না, তিনি একইভাবে নির্বিকার

চিত্তে থাকেন। কেননা রসবুদ্ধি নিবৃত্ত হওয়ায় তিনি নিজ সুখের জন্য কোনো বিষয়ে কখনোই প্রবৃত্ত হন না। তাঁর প্রত্যেকটি কাজই অন্যের হিত ও সুখের জন্য করা হয়ে থাকে। নিজ-সুখের জন্য বিষয়ের চিন্তাও পতনের কারণ হয় (গীতা ২।৬২-৬৩) এবং নিজ-সুখের কথা চিন্তা না করে বিষয়ভোগ করলেও তা বন্ধনকারক হয় না (গীতা ২।৬৪-৬৫)।

বিনাশশীল রস হল তাৎক্ষণিক, তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। নারী বা অর্থ ইত্যাদি প্রাপ্তির সময় যে রস পাওয়া যায়, পরে আর তা থাকে না। খাদ্য পেলে যে আনন্দ পাওয়া যায়, তা প্রত্যেক গ্রাসে কম হতে হতে শেষে ক্ষিদে দূর হয়ে খাদ্যে অরুচি আসে। কিন্তু অবিনাশী রস কখনো কম হয় না, তা সবসময়ই একই প্রকার (অখণ্ড) থাকে। বিনাশশীল রস ভোগ করলে পরিণামে জড়ত্ব, অভাব, রোগ, শোক, ভয়, উদ্বেগ ইত্যাদি নানাপ্রকার বিকার উৎপন্ন হয়। ভোগী মানুষেরা এই বিকার থেকে রক্ষা পায় না, কারণ এই-ই হল ভোগের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। তাই ভগবান এগুলিতে দুঃখদর্শনের কথা বলেছেন—'দুঃখদোষানুদর্শনম্' (গীতা ১৩।৮)। কামাদি দোষ মুক্ত হলেই মানুষ তার কল্যাণের জন্য আচরণ করতে সক্ষম হয় (গীতা ১৬।২১-২২)।

* * *

সম্বন্ধ—তৃষ্ণার নিবৃত্তি না হলে ক্ষতি কী ? পরবর্তী শ্লোকে সেটি বলা হচ্ছে।

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥ ৬০ ॥

[**হি** (কেননা) ; **কৌন্তেয়** (হে কুন্তীনন্দন) ; যততঃ (যত্নশীল) ; বিপশ্চিতঃ (বিবেকবান) ; **পুরুষস্য, অপি** (মানুষেরও) ; **প্রমাথীনি** (প্রমথনশীল) ; **ইন্দ্রিয়াণি** (ইন্দ্রিয়গুলি) ; **মনঃ** (চিত্তকে) ; **প্রসভম্** (বলপূর্বক) ; **হরন্তি** (হরণ করে।)]

হে কুন্তীনন্দন ! (রসতৃষ্ণা থাকলে) যত্নশীল বিবেকবান মানুষের প্রমথনশীল (চিত্তবিক্ষেপকারী) ইন্দ্রিয়গুলিও তার চিত্তকে বলপূর্বক হরণ করে ॥ ৬০ ॥

ব্যাখ্যা—'যততো হ্যপি......প্রসভং মনঃ'[১] যে ব্যক্তি স্বয়ং যত্নশীল, সাধনা করে, প্রত্যেক কাজ বিচার-বিবেচনাপূর্বক করে, আসক্তি ও ফলেচ্ছা পরিত্যাগ করে, অন্যের যাতে ভালো হয়, সুখ হয়, কল্যাণ হয়—এরূপ ভাব পোষণ করে এবং সেইরূপ কার্যও করে সে কর্তব্য-অকর্তব্য, সার-অসার সম্বন্ধে জানে এবং কী কী কর্ম করলে তার কী পরিণাম হবে—তাও জানে। এইরূপ বিবেকবান ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে **'যততো হ্যপি পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ'** পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। যত্নশীল এইরূপ বিবেকী পুরুষের মনকেও প্রমথনশীল ইন্দ্রিয়গুলি বলপূর্বক হরণ করে অর্থাৎ সে বিষয়ে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। এর কারণ এই যে, যতক্ষণ বুদ্ধি সর্বতোভাবে পরমাত্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত (স্থিত) না হয়, বুদ্ধিতে সামান্য মাত্রায়ও সংসারের সত্তা থেকে যায়, বিষয়েন্দ্রিয় সম্বন্ধ হতে সুখ হয়, আস্বাদিত ভোগ্য পদার্থগুলির সংস্কার থাকে ততক্ষণ সাধন-পরায়ণ বুদ্ধিমান, বিবেকবান ব্যক্তিরও ইন্দ্রিয় সর্বতোভাবে বশে থাকে না। ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি সম্মুখীন হলে আস্বাদিত ভোগ্য পদার্থগুলির নিজস্ব সংস্কারের বলে ইন্দ্রিয়সকল-মন-বুদ্ধি বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। অনেক ঋষির ক্ষেত্রেও এরূপ দেখা যায়, যাঁরা বিষয়ের সম্মুখীন হয়ে বিচলিত হয়ে গিয়েছিলেন।

[১] ভগবান এইস্থানে ইন্দ্রিয়গুলিকে 'প্রমাথীনি' বলেছেন এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ের চৌত্রিশতম শ্লোকে অর্জুন মনকে 'প্রমাথি' বলেছেন। সুতরাং ইন্দ্রিয় ও মন উভয়ই প্রমথনশীল। অতএব এখানে বলা হয়েছে যে ইন্দ্রিয়গুলি চিত্তকে হরণ করে এবং পরে এই অধ্যায়ের ছেষট্টিতম শ্লোকে বলা হয়েছে যে, মন বুদ্ধিকে হরণ করে অর্থাৎ এখানে ইন্দ্রিয়ের প্রাবল্য এবং ওখানে মনের প্রাবল্যের কথা জানিয়েছেন। এর থেকে এই অর্থ দাঁড়ায় যে সাধককে এই দুটিরই সংযম করতে হবে, তাহলেই তিনি সংযমী হতে পারবেন।

সুতরাং সাধকের কখনো 'আমার ইন্দ্রিয়গুলি বশে আছে' বলে নিজের ইন্দ্রিয়গুলির ওপর বিশ্বাস রাখা উচিত নয়[১]। আর কখনো এমন অহংকার করা উচিত নয় যে, 'আমি জিতেন্দ্রিয় হয়ে গেছি।'

※ ※ ※

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে বলা হয়েছে যে রসতৃষ্ণা থাকলে যত্নশীল বিদ্বান ব্যক্তিরও ইন্দ্রিয়গুলি তার মনকে হরণ করে, যার ফলে তার বুদ্ধি পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম হয় না। সেই রসতৃষ্ণা কীভাবে দূর করা যায়—পরের শ্লোকে তার উপায় জানানো হচ্ছে।

তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৬১ ॥

[**যুক্তঃ** (কর্মযোগী সাধক) ; **তানি, সর্বাণি** (ওই সব ইন্দ্রিয়গুলিকে) ; **সংযম্য** (সংযত করে) ; **মৎপরঃ** (আমাতে চিত্ত সমাহিত করে) ; **আসীত** (অবস্থান করেন) ; **হি, যস্য** (কারণ যাঁর) ; **ইন্দ্রিয়াণি** (ইন্দ্রিয়গুলি) ; **বশে** (সংযত) ; **তস্য, প্রজ্ঞা** (তাঁরই বুদ্ধি) ; **প্রতিষ্ঠিতা** (প্রতিষ্ঠিত।)]

কর্মযোগী সাধক সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযত করে যেন আমাতে চিত্ত সমাহিত করে অবস্থান করে ; কারণ যাঁর ইন্দ্রিয়গুলি সংযত, তাঁরই বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত (স্থিতপ্রজ্ঞ) বলা হয় ॥ ৬১ ॥

ব্যাখ্যা—**'তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ'**—বলপূর্বক চিত্তহরণকারী যে ইন্দ্রিয়, সেগুলিকে সংযত করে অর্থাৎ সজাগ থেকে সেগুলিকে ভোগের রংয়ে না ডুবিয়ে আমার শরণাগত হও। এর তাৎপর্য এই যে, সাধক যখন ইন্দ্রিয়কে সংযত করেন, তখন তাঁর নিজের সামর্থ্যের জন্য অহংভাব থাকে যে আমি ইন্দ্রিয়গুলিকে নিজের বশে এনেছি। এই অহংভাব সাধককে উন্নত হতে দেয় না এবং তাঁকে বিপথগামী করে দেয়। সুতরাং ইন্দ্রিয় সংযত করায় সাধকের কখনো নিজের সামর্থ্যের অহংকার করা উচিত নয়। তাঁর নিজের চেষ্টাকেই কারণ হিসাবে না দেখে, বরং ভগবৎ কৃপাকেই কারণ বলে মনে করা উচিত, এই ভেবে যে, 'আমার ইন্দ্রিয়-সংযমের যে সাফল্য, তা ভগবানের কৃপাতেই লাভ হয়েছে।' এরূপ ভগবৎপরায়ণ হলে তবেই তাঁর সাধন সিদ্ধ হয়।

এখানে **'মৎপরঃ'** বলার অর্থ হল যে মানবদেহ লাভ করা, সাধনায় রুচি হওয়া, তাতে ব্যাপৃত থাকা এবং সিদ্ধিলাভ করা—এ সমস্তই ভগবৎ কৃপার ওপর নির্ভর করে। কিন্তু অহংকারবশতঃ মানুষ প্রায়ই এদিকে দৃষ্টি দেয় না। কর্মযোগীর কাছে কর্ম করাই মুখ্য থাকে এবং এতে সে নিজেরই পুরুষার্থ মানে। তাই ভগবান বিশেষ কৃপা করে কর্মযোগী সাধকদেরও তাঁর শরণাগত হওয়ার কথা বলছেন।

ভগবৎপরায়ণ হওয়ার তাৎপর্য হচ্ছে—শুধুমাত্র ভগবানের প্রতিই মহৎ বুদ্ধি হওয়া যে, একমাত্র ভগবানই আমার এবং আমি ভগবানের ; সংসার আমার নয় এবং আমি সংসারের নই। কারণ ভগবান সর্বক্ষণ আমার সঙ্গে থাকেন, সংসার সর্বক্ষণ আমার সঙ্গে থাকে না। এইভাবে সাধকের 'আমি-ভাব' শুধুমাত্র ভগবানের সঙ্গেই সম্পর্কিত থাকা উচিত।

কর্মযোগের প্রকরণ হওয়ায় এখানে ভগবানের কর্মযোগের উপযোগী উপায় জানানোর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু গীতায় গভীর মনোনিবেশ করলে বোঝা যায় যে, সাধনার সফলতা লাভে ভগবৎপরায়ণতাই একমাত্র কারণ। তাই গীতায় ভগবৎপরায়ণতার অনেক মহিমা গীত হয়েছে। যেমন—'যতপ্রকার যোগী আছেন, তার মধ্যে যিনি শ্রদ্ধা ও প্রেমপূর্বক আমার পরায়ণ হয়ে আমার ভজনা করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ' (৬।৪৭) ইত্যাদি।

'বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা'—আগে

---

[১] মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ। বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥ (মনু ২।২১৫)

পুরুষমানুষের কখনো মা, বোন অথবা কন্যার সঙ্গে একান্তে বসা উচিত নয় ; কারণ বলবান ইন্দ্রিয়সকল বিদ্বানকেও বিচলিত করে।

উনষাটতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, ইন্দ্রিয়গুলি বিষয় থেকে সম্পর্করহিত হলেও স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া যায় না, আবার এই শ্লোকে বলছেন যে, যাঁর ইন্দ্রিয় সংযত হয়েছে, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। এর অর্থ এই যে, ওইস্থানে (২।৫৯-এ) ইন্দ্রিয়গুলি বিষয় থেকে সম্পর্কবর্জিত হলেও অন্তরে রসতৃষ্ণা ছিল, সুতরাং ইন্দ্রিয় সংযত হয়নি। কিন্তু এইস্থলে স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির ইন্দ্রিয় সংযত হয়েছে এবং রসতৃষ্ণাও নিবৃত্ত হয়েছে। তাই ইন্দ্রিয়-বিষয় হতে সম্পর্করহিত হলেই সাধক স্থিতপ্রজ্ঞ হয়ে যাবে এরকম কোনো নিয়ম নেই। কারণ তার তো রসতৃষ্ণা থাকতে পারে। বরং বলা যায় যে, স্থিতপ্রজ্ঞ হলে ইন্দ্রিয় সংযত হবেই—এটাই নিয়ম।

পরিশিষ্ট-ভাব—কর্মযোগের সাধকদেরও ভগবান **'মৎপরঃ'** পদের দ্বারা তাঁর শরণাগত হওয়ার কথা বলেছেন, এ হল ভক্তির বৈশিষ্ট্য। কারণ ভগবানের শরণাগত না হলে ইন্দ্রিয়াদি সর্বতোভাবে সংযত করা কঠিন হয়।

কর্মযোগে ত্যাগ এবং ত্যাগ হতে শান্তি ও সুখ পাওয়া যায়। কিন্তু এ সুখ প্রাপ্তিলাভের সুখ নয়, এ হল দুঃখ (অশান্তি) দূর হওয়ার সুখ। কিন্তু ভক্তিতে প্রাপ্তিসুখ পাওয়া যায়। সুতরাং ভক্তির (প্রেমের) সুখ না পেলে ইন্দ্রিয়াদি সর্বতোভাবে সংযত হয় না। দ্বিতীয়ত, কর্মযোগে তীব্র বৈরাগ্য হলে তবেই ইন্দ্রিয়াদি সংযত হয়, কিন্তু ভক্তিতে (ভগবৎপরায়ণ হলে) সামান্য বৈরাগ্যতেই ইন্দ্রিয়াদি সহজে সংযত হয়। তাই এখানে ভগবান **'মৎপরঃ'** পদটি ব্যবহার করেছেন।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—ভগবৎপরায়ণ হলে ইন্দ্রিয়গুলি সংযত হয়ে রসতৃষ্ণা নিবৃত্ত হবেই, কিন্তু ভগবৎপরায়ণ না হলে কী হয়—পরবর্তী দুটি শ্লোকে তা জানানো হচ্ছে।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥ ৬২ ॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥ ৬৩ ॥

[**বিষয়ান্** (বিষয়গুলি নিয়ে) ; **ধ্যায়তঃ, পুংসঃ** (চিন্তা করলে মানুষের) ; **তেষু** (সেগুলির প্রতি) ; **সঙ্গঃ, উপজায়তে** (আসক্তি জন্মায়) ; **সঙ্গাৎ** (আসক্তি থেকে) ; **কামঃ** (কামনা) ; **সঞ্জায়তে** (জন্ম নেয়) ; **কামাৎ** (কামনা প্রতিহত হলে) ; **ক্রোধঃ** (ক্রোধ) ; **অভিজায়তে** (জন্মায়) ; **ক্রোধাৎ** (ক্রোধ থেকে) ; **সম্মোহঃ** (সম্মোহ) ; **ভবতি** (হয়) ; **সম্মোহাৎ** (সম্মোহ থেকে) ; **স্মৃতিবিভ্রমঃ** (স্মৃতিভ্রংশ) ; **স্মৃতিভ্রংশাৎ** (স্মৃতিভ্রষ্ট হলে) ; **বুদ্ধিনাশঃ** (বুদ্ধিনাশ হয়) ; **বুদ্ধিনাশাৎ** (বুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেলে) ; **প্রণশ্যতি** (পতন হয়।)]

বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তা করলে সেগুলির প্রতি মানুষের আসক্তি জন্মায়। আসক্তি থেকে জন্ম হয় কামনা অর্থাৎ বিষয়ভোগের আকাঙ্ক্ষা। সেই কামনা প্রতিহত হলে জন্মায় ক্রোধ, ক্রোধ থেকে জন্ম নেয় সম্মোহ বা মূঢ়তা। মূঢ়তা থেকে হয় স্মৃতিভ্রংশ। স্মৃতিভ্রষ্ট হলে বুদ্ধিনাশ হয় এবং বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে গেলে হয় মানুষের বিনাশ বা পতন ॥ ৬২-৬৩ ॥

ব্যাখ্যা—'ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে' ভগবৎপরায়ণ না হলে, ভগবৎ চিন্তা না করলে বিষয়ের চিন্তাই হতে থাকে। কারণ জীবের একদিকে রয়েছে পরমাত্মা আর অপরদিকে সংসার। সে যখন পরমাত্মার আশ্রয় ছাড়ে, তখন সে সংসারের চিন্তাই করতে থাকে ; কারণ এ ছাড়া তার চিন্তার আর অন্য কোনো বিষয় থাকে না। এইভাবে চিন্তা করতে করতে মানুষের ওই বিষয়ে অনুরাগ, আসক্তি এবং ভালোবাসা জন্মায়। আসক্তি হলে মানুষ সেই বিষয় সেবন করে। বিষয়ভোগ—তা মানসিক হোক অথবা শারীরিক, তাতে যে সুখ হয়, তার জন্যই বিষয়ে ভালোবাসা জন্মায়। ভালোবাসার কারণে সেই বিষয়ে বারংবার চিন্তা হতে থাকে। সেই বিষয়ভোগ করা হোক বা না হোক, তা হলেও সেই বিষয়ের ওপর অনুরাগ জন্মায়—এটিই নিয়ম।

'সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ'—বিষয়গুলির ওপর অনুরাগ জন্মালে ওই সমস্ত বিষয় ভোগ করার এই ইচ্ছা জন্মায় যে, 'ওসব বস্তু ভোগ করার অধিকার যেন আমি পাই।'

'কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে'—কামনা অনুযায়ী সব বস্তু পেতে থাকলে 'লোভ' জন্মায় এবং কামনা পূর্তির সম্ভাবনায় কেউ বাধা দিলে তার ওপর 'ক্রোধ' জন্মায়।

কামনা এমন জিনিস যে এতে বাধা পড়লে ক্রোধের উৎপত্তি হবে না, এমন নয়। বর্ণ, আশ্রম, গুণ, যোগ্যতা ইত্যাদির জন্য নিজের মধ্যে বিশেষত্বের যে অহংকার থাকে, সেই অহংকারে নিজের জন্য শ্রদ্ধা, সম্মান ইত্যাদির যে কামনা থাকে, সেই কামনাতে কোনো ব্যক্তি বাধা হয়ে দাঁড়ালে ক্রোধ উৎপন্ন হয়।

'কামনা' হল রজোগুণ বৃত্তি, 'সম্মোহ' তমোগুণ বৃত্তি এবং 'ক্রোধ' রজোগুণ এবং তমোগুণের মধ্যবর্তী বৃত্তি।

কখনো কোনো ব্যাপারে যদি ক্রোধ উৎপন্ন হয়, তবে বুঝতে হবে এর মূলে কোথাও অবশ্যই আসক্তি রয়েছে। যেমন, ন্যায়-নীতির বিরুদ্ধাচরণ যারা করে তাদের দেখলে যদি ক্রোধ জন্মায়, তাহলে বুঝতে হবে ন্যায়-নীতির ওপর অনুরাগ আছে। অপমান ও তিরস্কারকারীর ওপর যদি ক্রোধ জন্মায়, তাহলে বুঝতে হবে মান ও সম্মানের ওপর অনুরাগ আছে। নিন্দাকারীর ওপর ক্রোধ জন্মালে বুঝতে হবে প্রশংসার ওপর অনুরাগ আছে। দোষারোপণকারীর ওপর ক্রোধ জন্মালে, বুঝতে হবে যে নির্দোষিতামূলক অভিমানে অনুরাগ আছে ইত্যাদি।

'ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহ'—ক্রোধ হতে সম্মোহ আসে অর্থাৎ মূঢ়তা আচ্ছন্ন করে দেয়। প্রকৃতপক্ষে দেখতে গেলে কাম, ক্রোধ, লোভ এবং মমতা—এই চারটি দ্বারাই সম্মোহ আসে ; যেমন—

(১) কামনার দ্বারা যে সম্মোহ হয় তাতে বিচার-বিবেচনা করার বুদ্ধি লোপ পায় এবং মানুষ কামনার বশীভূত হয়ে করার উপযুক্ত নয় এমন কাজও করে ফেলে।

(২) ক্রোধে যে সম্মোহ আসে তাতে মানুষ তার প্রিয়জন এবং পূজ্য ব্যক্তিকে ভালো-মন্দ কথা বলে ফেলে এবং অনুচিত কর্মও করে বসে।

(৩) লোভে যে সম্মোহ আসে তাতে মানুষের সত্যাসত্য, ধর্মাধর্ম ইত্যাদির বিচার থাকে না এবং সে কপট ব্যবহারে লোককে ঠকায়।

(৪) মমতার দ্বারা যে সম্মোহ আসে তাতে মানুষের ব্যবহারে সমতা থাকে না, প্রত্যুত সে পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়ে।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মমতা—এই চারটি থেকে যদি সম্মোহ হয়, তাহলে ভগবান কেন শুধুমাত্র ক্রোধের কথাই বলেছেন ? গভীরভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে কাম, লোভ এবং মমতা—এতে নিজ সুখভোগ এবং স্বার্থের বৃত্তি জাগ্রত থাকে, কিন্তু ক্রোধে যে সম্মোহের উৎপত্তি হয়, তা কাম, লোভ এবং মমতা হতে উৎপন্ন সম্মোহের থেকেও ভয়ংকর হয়। সেইজন্যই ভগবান এখানে শুধুমাত্র ক্রোধ থেকে সম্মোহ হওয়ার কথা বলেছেন।

'সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ'—মূঢ়তায় আচ্ছন্ন হলে স্মৃতিভ্রংশ হয় অর্থাৎ শাস্ত্র দ্বারা, সৎ বিবেচনার দ্বারা যে নিশ্চয়তা আসে যে, 'আমার এরূপ কাজ করা উচিত, এরূপ সাধনা করা উচিত, নিজেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করা উচিত', সেই সমস্ত স্মৃতিই লোপ পায়, সেগুলি স্মরণে থাকে না।

'স্মৃতিভ্রংশাদ্‌বুদ্ধিনাশঃ'—স্মৃতিভ্রংশ হলে বুদ্ধিতে প্রকাশমান বিবেকবোধ লুপ্ত হয়ে যায় অর্থাৎ তার আর নতুন করে বিচার করার ক্ষমতা থাকে না।

'বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি'—বিবেক লুপ্ত হলে মানুষ তার নিজের স্থিতি থেকে চ্যুত হয়। সুতরাং এই পতন থেকে রক্ষা পেতে হলে সকল সাধকেরই ভগবৎপরায়ণ হওয়ার খুবই প্রয়োজন আছে।

এখানে, বিষয়চিন্তা করলেই অনুরাগ (আসক্তি), অনুরাগ থেকে কামনা, কামনা থেকে ক্রোধ, ক্রোধ হতে সম্মোহ, সম্মোহ থেকে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ থেকে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ থেকে পতন— এই যে ক্রম বলা হয়েছে, তার বিচার করতে তো দেরি হতে পারে, কিন্তু এই সমস্ত বৃত্তি উৎপন্ন হতে এবং তার দ্বারা মানুষের পতন হতে দেরি হয় না। বিদ্যুৎ প্রবাহের মতো এই সমস্ত বৃত্তি তৎক্ষণাৎ উৎপন্ন হয়ে মানুষের পতন ঘটায়।

⁂ ⁂ ⁂

সম্বন্ধ—ভগবান এবার পরবর্তী শ্লোকে স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কীভাবে বিচরণ করেন সেই চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥ ৬৪ ॥
প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে॥ ৬৫ ॥

[**তু, বিধেয়াত্মা** (কিন্তু বশীভূত চিত্ত) ; **রাগদ্বেষবিযুক্তৈঃ** (অনুরাগ ও বিদ্বেষমুক্ত হয়ে) ; **আত্মবশ্যৈঃ** (নিজ বশীভূত) ; **ইন্দ্রিয়ৈঃ** (ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা) ; **বিষয়ান্, চরন্** (বিষয় উপভোগ করে) ; **প্রসাদম্** (প্রসন্নতা) ; **অধিগচ্ছতি** (লাভ করেন) ; **প্রসাদে** (প্রসন্নতা জন্মালে) ; **অস্য** (সাধকের) ; **সর্বদুঃখানাম্** (সমস্ত দুঃখ) ; **হানিঃ, উপজায়তে** (দূর হয়) ; **প্রসন্নচেতসঃ** (প্রসন্নহৃদয়) ; **বুদ্ধিঃ** (বুদ্ধি) ; **হি** (নিঃসন্দেহ) ; **আশু** (অতি শীঘ্র) ; **পর্যবতিষ্ঠতে** (স্থিতি লাভ করে।)]

বশীভূতচিত্ত (অন্তঃকরণযুক্ত) সেই কর্মযোগী সাধক, অনুরাগ ও বিদ্বেষমুক্ত হয়ে নিজ বশীভূত ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা বিষয় সেবন করে হৃদয়ে প্রসন্নতা লাভ করেন। হৃদয়ে প্রসন্নতা জন্মালে সাধকের সমস্ত দুঃখ দূর হয়। এইরূপ প্রসন্নহৃদয় সাধকের বুদ্ধি নিঃসন্দেহে অতি শীঘ্র পরমাত্মায় স্থিতি লাভ করে॥ ৬৪-৬৫॥

ব্যাখ্যা—'তু'—পূর্বশ্লোকে ভগবান বলেছেন যে আসক্তি নিয়ে বিষয়চিন্তা করলে পতন হয় আর এখানে বলছেন যে আসক্তি ত্যাগ করে বিষয়ভোগ করলে উত্থান ঘটে। আগে বুদ্ধিনাশের কথা বলেছিলেন আর এখানে বুদ্ধির স্থিতি হওয়ার কথা বলছেন। এইভাবে পূর্বে কথিত বিষয়ের থেকে এই শ্লোকে কথিত বিষয়ের তফাৎটি বোঝাবার জন্যই এখানে 'তু' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

'বিধেয়াত্মা'—সাধকের নিজ চিত্ত নিজের বশে রাখা উচিত। চিত্ত বশীভূত না হলে কর্মযোগে সিদ্ধিলাভ হয় না, বরং তখন কর্ম করতে গেলে বিষয়ে অনুরাগ জন্মায় এবং তাতে পতন হবার সম্ভাবনা থাকে। প্রকৃতপক্ষে সকল সাধকের উচিত নিজ চিত্তকে বশে রাখা। কর্মযোগীর জন্য তো এটির বিশেষ প্রয়োজন আছে।

'আত্মবশ্যৈঃ রাগদ্বেষবিযুক্তৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ'—**'বিধেয়াত্মা'** পদটি যেমন অন্তঃকরণকে বশে রাখার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তেমনি **'আত্মবশ্যৈঃ'** পদটিও ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করার অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ ব্যবহারের সময় ইন্দ্রিয়গুলি নিজের বশীভূত থাকা উচিত আর তা করতে হলে ইন্দ্রিয়গুলির অনুরাগ ও বিদ্বেষ বর্জিত হওয়া আবশ্যক। অতএব কোনো বিষয় ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণের সময় তা যেন অনুরাগপূর্বক না হয় বা কোনো কিছুর ত্যাগও যেন বিরাগপূর্বক না হয়। কারণ বিষয়গুলির গ্রহণে অথবা বর্জনে ততটা গুরুত্ব নেই, যতটা আছে ইন্দ্রিয়গুলিতে অনুরাগ ও বিরাগ না হতে দেওয়ায়। তাই তৃতীয় অধ্যায়ের চৌত্রিশতম শ্লোকে ভগবান সাধকদের সাবধান করে বলেছেন যে, সকল ইন্দ্রিয়েরই অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ভেদে অনুরাগ ও বিদ্বেষ আছে। সাধক যেন এগুলির বশীভূত না হন, কারণ এই দুটিই সাধকের শত্রু। পঞ্চম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, 'যে সাধক রাগ-দ্বেষাদি দ্বন্দ্ব রহিত হয়, তিনি অনায়াসে মুক্তিলাভ করেন।'

'বিষয়ান্ চরন্'—যাঁর চিত্ত নিজ বশীভূত অর্থাৎ যাঁর ইন্দ্রিয়গুলি রাগ-দ্বেষরহিত তথা বশীভূত, এরূপ সাধক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়সেবন অর্থাৎ সেগুলিই সকল প্রকারে ব্যবহার করলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি বিষয়ভোগ করেন না। ভোগবুদ্ধি সহকারে বিষয়সেবন করাই পতনের কারণ। এই ভোগবুদ্ধি না করার জন্যই এইস্থানে **'বিধেয়াত্মা'**, **'আত্মবশ্যৈঃ'** ইত্যাদি পদ ব্যবহৃত হয়েছে।

'প্রসাদমধিগচ্ছতি'—রাগ-দ্বেষবর্জিত হয়ে বিষয়-সেবন করলে সাধক অন্তঃকরণের প্রসন্নতা প্রাপ্ত হন। এই প্রসন্নতা হচ্ছে মানসিক তপস্যা (গীতা ১৭।১৬), যেটি শারীরিক বা বাচিক সংযম থেকে শ্রেষ্ঠ। অতএব সাধকের অনুরাগ পরবশ হয়ে বিষয়সেবন করাও উচিত নয় বা বিদ্বেষপূর্বক বিষয় ত্যাগ করাও উচিত নয়। কারণ রাগ (আসক্তি) ও দ্বেষ এই দুটির দ্বারাই সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

রাগ-দ্বেষরহিত হয়ে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় সেবন করলে যে প্রশান্তি আসে তাতে যদি মন না দেওয়া হয় অর্থাৎ

সেই প্রশান্তিরও যদি সেবন না করা হয় তাহলে সেই অনাসক্তির প্রসাদে পরমাত্মা লাভ হয়।

'প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে'—চিত্ত প্রসন্নতা লাভ করলে সমস্ত দুঃখের নাশ হয় অর্থাৎ কোনো দুঃখ থাকে না। কারণ অনুরাগ জন্মালে চিত্তে বিষণ্ণতা আসে, তার থেকে আসে কামনা এবং কামনা থেকেই হয় যত দুঃখের সৃষ্টি। কিন্তু অনুরাগ দূর হলে চিত্তে প্রসন্নতা আসে এবং সেই প্রসন্নতার দ্বারা সমস্ত দুঃখ দূর হয়।

যতপ্রকার দুঃখ আছে, তার সমস্তই প্রকৃতি এবং প্রকৃতির কার্যরূপ শরীর ও সংসারের সম্পর্ক থেকে সৃষ্টি হয় এবং শরীর ও সংসারের সম্পর্ক হয় সুখের আশায় আর সুখের লিপ্সা জন্মায় অভাববোধ থেকে। কিন্তু যখন প্রশান্তি আসে তখন অভাববোধ দূর হয়। অভাববোধ দূর হলে সুখের লিপ্সা থাকে না, সুখলিপ্সা না থাকলে শরীর ও সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে না এবং সম্বন্ধ না থাকলে সমস্ত দুঃখের অবসান হয়—**'সর্বদুঃখানাং হানি'**। অর্থাৎ প্রসন্নতার দ্বারা দুটি ব্যাপার হয়—সংসার হতে সম্পর্ক বিচ্ছেদ এবং পরমাত্মায় বুদ্ধির স্থিরতা লাভ। এই কথাটি ভগবান প্রথমে তিপ্পান্নতম শ্লোকে **'নিশ্চলা'** এবং **'অচলা'** পদ দুটির দ্বারা এইভাবে বলেছেন—তাঁদের বুদ্ধি সংসারে নিশ্চলা এবং পরমাত্মায় অচলা হয়।

এখানে **'সর্বদুঃখানাং হানিঃ'** বলার অর্থ এই নয় যে তাঁর নিকট কোনো দুঃখদায়ক পরিস্থিতি আসতেই পারে না, বরং এর তাৎপর্য হল এই যে, কর্ম অনুযায়ী তাঁর নিকট দুঃখদায়ক ঘটনা বা পরিস্থিতি আসতে পারে। কিন্তু তাঁর হৃদয়ে দুঃখ, শোক বা কোনো চাঞ্চল্য আদি বিকৃতি আসতে পারে না।

'প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে'—প্রসন্ন (স্বচ্ছ) চিত্তসম্পন্ন ব্যক্তির বুদ্ধি অতি শীঘ্র পরমাত্মায় স্থিত হয় অর্থাৎ সাধক স্বয়ং পরমাত্মায় স্থিত হন, তাঁর বুদ্ধিতে কোনোপ্রকার সন্দেহ থাকে না।

মর্মার্থ

ভগবৎ সম্বন্ধীয় প্রসন্নতা অথবা ব্যাকুলতা—এই দুটির মধ্যে যে কোনো একটি যদি বৃদ্ধি পায়, তাহলে তা শীঘ্র পরমাত্মা লাভে সহায়ক হয়। যেমন, ভগবানের কাছে গমনকালে গোপিনীদের মা-বাবা, ভাই, স্বামী প্রমুখ বাধা দিয়েছিলেন ও গৃহবন্দি করে রেখেছিলেন কিন্তু তাঁদের ভগবানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার যে ব্যাকুলতা ছিল, তাতেই গোপিনীদের সমস্ত পাপ নাশ হয়েছিল এবং ভগবৎচিন্তায় যে প্রসন্নতা এসেছিল, তার দ্বারা তাঁদের পুণ্যও দূর হয়েছিল। এইভাবে পাপ-পুণ্যরহিত হয়ে তাঁরা শরীর থেকে মুক্ত হয়ে সর্বপ্রথম ভগবানের সঙ্গেই মিলিত হন[১]। কিন্তু সাংসারিক বিষয়গুলির সম্পর্কে যে প্রসন্নতা বা ব্যাকুলতা আসে তার দ্বারা ভোগের সংস্কার দৃঢ় হয় অর্থাৎ সাংসারিক বন্ধন দৃঢ় হয়। এর উদাহরণ হল সংসারের সমস্ত প্রাণীই—যারা প্রসন্নতা ও ব্যাকুলতা যুক্ত হয়ে এই সংসারে বদ্ধ হয়ে আছে।

এই প্রসন্নতা ও ব্যাকুলতায় হৃদয় দ্রবীভূত হয়। দ্রবীভূত মোমে রং দিলে যেমন সেই রং স্থায়ী হয় তেমনি অন্তঃকরণ দ্রবীভূত হলে তাতে ভগবৎ-সম্বন্ধীয় বা সংসার-সম্বন্ধীয় যে ভাবই আসে তা স্থায়ী হয়ে যায়। স্থায়ী হলে এই ভাব উত্থান বা পতনকারক হয়ে যায়। সুতরাং সাধকের উচিত সাংসারিক অতি প্রিয় বস্তুর প্রাপ্তি ঘটলেও তাতে প্রসন্ন না হওয়া এবং অত্যন্ত অপ্রিয় বস্তুতেও উদ্বিগ্ন না হওয়া।

পরিশিষ্ট-ভাব—সাধকের ভাবের দুটি ভাগ আছে, একটি হল ভোগের আর অন্যটি যোগের। অনুরাগ ও বিদ্বেষযুক্ত 'ভোগী' ব্যক্তি বিষয়ের চিন্তা করলেও, তার পতন হয় (গীতা ২।৬২-৬৩)। কিন্তু রাগ-দ্বেষবর্জিত 'যোগী' ব্যক্তি যদি বিষয়াদি উপভোগও করেন, তাহলেও তাঁর পতন হয় না, তিনি পরমাত্মাকেই প্রাপ্ত হন।

রাগ-দ্বেষরহিত মানুষ ভোগবুদ্ধি সহ বিষয়াদি সেবন করেন না অর্থাৎ ভোগজনিত সুখ (রস) গ্রহণ করেন না, কারণ তা তাঁর ধ্যেয় (লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য) বিষয়ভোগ নয়। তিনি ভোগগুলিকে অনুরাগসহ ভোগ না করে অনাসক্তিপূর্বক ভোগ

---

[১] অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিদ্ গোপ্যোঽলব্ধবিনির্গমাঃ। কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তা দধ্যুর্মীলিতলোচনাঃ॥
দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহতীব্রতাপধুতাশুভাঃ। ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষনির্বৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ॥
তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ। জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।২৯।৯-১১)
(এই শ্লোকগুলির বিস্তৃত ব্যাখ্যার জন্য গীতাপ্রেস থেকে প্রকাশিত 'অলৌকিক প্রেম' পুস্তক পড়া প্রয়োজন)

করেন (গীতা ৩।৩৪)। তাই তাঁর হৃদয় নির্মল থাকে। আসলে আসক্তিহীন ভোগ কোনো ভোগই নয়। তবে মানুষের কাছে তা ভোগের আচরণ বলেই প্রতিভাত হয়, তাই এইস্থানে '**বিষয়ান্ চরন্**' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

রাগ-দ্বেষরহিত হলে 'প্রসাদ' বা নির্মলতা প্রাপ্তি হয়। সর্বসময় প্রসন্নতা থাকা, কখনো বিষণ্ণতা বা নীরস ভাব না আসা—একেই বলা হয় 'প্রসাদ'। এই 'প্রসাদ' প্রাপ্তিতেও সন্তোষ লাভ না করলে, তা উপভোগ না করলে অতি শীঘ্রই পরমাত্মাপ্রাপ্তি হয়।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—আগের দুটি শ্লোক দ্বারা ভগবান যে কথাগুলি বলেছেন, পরবর্তী দুটি শ্লোকে ব্যতিরেক রীতি দ্বারা ভগবান সেগুলিকেই দৃঢ়ভাবে জানিয়েছেন।

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্॥ ৬৬ ॥

[**অযুক্তস্য** (যার চিত্ত ও ইন্দ্রিয় সংযত নয়) ; **বুদ্ধিঃ** (ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি) ; **ন, অস্তি** (হয় না) ; **চ** (এবং) ; **অযুক্তস্য** (সেই অযুক্ত ব্যক্তির) ; **ভাবনা** (কর্তব্যপরায়ণতার বুদ্ধি) ; **ন** (হয় না) ; **অভাবয়তঃ** (নিষ্কামভাব না থাকায়) ; **শান্তিঃ, ন** (শান্তি পান না) ; **চ** (অতএব) ; **অশান্তস্য** (যার শান্তি নেই) ; **সুখম্, কুতঃ** (সুখী কী করে ?)]

যার চিত্ত ও ইন্দ্রিয় সংযত নয়, তার ব্যবসায়াত্মিকা (নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধি হয় না। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি না হওয়ায় তার মধ্যে নিষ্কামভাব অর্থাৎ কর্তব্যপরায়ণতা আসে না। নিষ্কামভাব না থাকায় তার শান্তি লাভ হয় না। যার শান্তি নেই, সে সুখী হবে কী প্রকারে ? ॥ ৬৬ ॥

ব্যাখ্যা—[এখানে কর্মযোগের বিষয় আলোচিত হয়েছে। কর্মযোগে মন এবং ইন্দ্রিয়গুলির সংযমই মুখ্য বিষয়। বিচার-বিবেচনাপূর্বক সংযম অনুশীলন না করলে কামনা নাশ হয় না। কামনা নষ্ট না হলে বুদ্ধির স্থিরতা হয় না। অতএব কর্মযোগী সাধকের উচিত প্রথমেই মন ও ইন্দ্রিয়—দুই-ই সংযত করা। কিন্তু যাদের মন ও ইন্দ্রিয় সংযত হয়নি, এই শ্লোকটিতে তাদের কথা বলা হয়েছে।]

'নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য'—যার মন ও বুদ্ধি সংযত নয়, এরূপ অযুক্ত (অসংযমী) ব্যক্তির 'আমাকে শুধু পরমাত্মাপ্রাপ্তি করতে হবে'—এরূপ একনিষ্ঠতা হয় না[1]। কারণ মন ও ইন্দ্রিয় সংযত না হওয়ায় সে ভোগ ও সম্পদসংগ্রহে ব্যস্ত থাকে, সে কখনো সম্মান আকাঙ্ক্ষা করে, কখনো সুখ ও আরাম, কখনো অর্থ আবার কখনো বা ভোগসুখ চায়—তার মধ্যে এরূপ নানাপ্রকার কামনা উৎপন্ন হতে থাকে। তাই তার বুদ্ধি একনিষ্ঠ হয় না।

'ন চাযুক্তস্য ভাবনা'—যার ব্যবসায়াত্মিকা (নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধি হয় না, তার মনে এরূপ ভাবনা আসে না যে, 'আমার শুধু নিজকর্তব্য করা উচিত এবং ফলাকাঙ্ক্ষা, কামনা, আসক্তি ইত্যাদি ত্যাগ করা উচিত।' নিজ ধ্যেয় স্থির না হওয়ার ফলে তাদের মধ্যে এরূপ চিন্তা আসে না।

'ন চাভাবয়তঃ শান্তিঃ'— যে কর্তব্যপরায়ণ নয়, সে শান্তি পেতে পারে না। সাধু, শিক্ষক, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি ব্যক্তিগণ নিজ নিজ কর্তব্য যদি তৎপর হয়ে পালন না করেন তাহলে তাঁরা শান্তি পেতে পারেন না। কারণ নিষ্ঠার সঙ্গে নিজ কর্তব্য পালন না করলে অশান্তি উৎপন্ন হয়।

'অশান্তস্য কুতঃ সুখম্'— যে অশান্ত, সে কী করে সুখী হবে ? কারণ তার হৃদয়ে সর্বক্ষণ চাঞ্চল্য থাকে। যতই তার আশানুরূপ ভোগাদিপ্রাপ্তি ঘটুক না কেন তার হৃদয়ের চঞ্চলতা দূর হয় না অর্থাৎ সে সুখী হতে পারে না।

※ ※ ※

[1] অহংভাবের (আমিত্বের) পরিবর্তন না হলে ইন্দ্রিয় বশীভূত হয় না এবং ইন্দ্রিয় বশীভূত না হলে একমুখী নিশ্চয়যুক্ত বুদ্ধি হয় না। যদি অহংভাবের পরিবর্তন হয় যে, আমি সাধক ; সাধন-ভজনই আমার কাজ, তাহলে মন-ইন্দ্রিয় স্বতঃই বশীভূত হয়, সেগুলিকে আর বশে আনার কষ্ট করতে হয় না।

সম্বন্ধ—অসমাহিত চিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি কেন একনিশ্চয়সম্পন্ন হয় না—পরের শ্লোকে তার কারণ জানানো হয়েছে।

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি॥ ৬৭ ॥

[**হি, চরতাম্** (কেননা নিজ নিজ বিষয়ে বিচরণশীল) ; **ইন্দ্রিয়াণাম্** (ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে) ; **যৎ, মনঃ** (যখন মনকে) ; **অনুবিধীয়তে** (নিজের বশীভূত করে) ; **তৎ** (তখন) ; **অম্ভসি** (জলের) ; **বায়ুঃ, ইব** (বায়ুতাড়িত) ; **নাবম্** (নৌকার) ; **অস্য** (এর) ; **প্রজ্ঞাম্** (প্রজ্ঞাকে) ; **হরতি** (হরণ করে নেয়।)]

নিজ নিজ বিষয়ে বিচরণশীল ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে কোনো একটি ইন্দ্রিয় যখন মনকে নিজের বশীভূত করে, তখন সেই মন জলের উপরিস্থিত বায়ুতাড়িত নৌকার ন্যায় প্রজ্ঞাকে হরণ করে নেয় ॥ ৬৭ ॥

ব্যাখ্যা—[মানুষ এই জন্ম লাভ করেছে শুধুমাত্র পরমাত্মাকে পাওয়ার জন্যই। সুতরাং 'আমাকে শুধুমাত্র পরমাত্মাকে লাভ করতে হবে তাতে যাই হোক না কেন'—এইভাবে নিজের উদ্দেশ্যকে দৃঢ় রাখতে হয়। উদ্দেশ্য দৃঢ় হলে সাধকের অহংভাব থেকে ভোগের গুরুত্ব দূর হয়। গুরুত্ব চলে গেলে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দৃঢ় হয়। কিন্তু যতক্ষণ এই বুদ্ধি দৃঢ় না হয়, ততক্ষণ তার কী দশা হয়— তারই বর্ণনা এখানে করা হয়েছে।]

'ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে'[১]—যখন সাধক কর্মক্ষেত্রে নানাপ্রকারের ব্যবহার করেন তখন ইন্দ্রিয়গুলির নিকট নিজ নিজ বিষয় এসে যায়। সেইগুলির মধ্যে যে ইন্দ্রিয়ের নিজ বিষয়ের ওপর অনুরাগ জন্মে, সেই ইন্দ্রিয় মনকে তার অনুগামী করে নেয়, মনকে নিজ সঙ্গী করে নেয় এবং মন সেই বিষয়ের রসাস্বাদন করে অর্থাৎ মনে সুখবুদ্ধি ও ভোগবুদ্ধি উৎপন্ন হয়। সেই বিষয়ের রঙে মন রঙিন হয়ে ওঠে এবং তার গুরুত্ব মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। যেমন, খাদ্য গ্রহণ করার সময় কোনো বস্তুর স্বাদ ভালো লাগলে রসনেন্দ্রিয় তাতে আসক্ত হয়ে মনকে আকৃষ্ট করে এবং মন সেই স্বাদে আনন্দ লাভ করে।

'তদস্য হরতি প্রজ্ঞাম্'—মনে যখন কোনো বিষয়ের গুরুত্ব স্থান পায়, তখন মনই সাধকের প্রজ্ঞা হরণ করে নেয় অর্থাৎ সাধকের মনে কর্তব্যপরায়ণতা আর স্থান পায় না, সেখানে তখন ভোগবুদ্ধি বিরাজ করে। এই ভোগবুদ্ধি হলে সাধকের মনে 'আমাকে পরমাত্মপ্রাপ্তি করতে হবে'—এই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি আর থাকে না। এইরূপ বিবেচনা করতে বিলম্ব ঘটে, কিন্তু বুদ্ধি বিচলিত হতে সময় লাগে না অর্থাৎ যখন ইন্দ্রিয় মনকে নিজের অনুগামী করে এবং মনে ভোগবুদ্ধি উৎপন্ন হয় তখনই বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়।

'বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি'— সেই বুদ্ধি কীভাবে ভ্রষ্ট হয়—সেটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, জলে বিচরণকারী নৌকাকে বায়ু যেমন চালনা করে, তেমনি মন বুদ্ধিকে চালনা করে। যেমন কোনো ব্যক্তি নৌকায় করে নদী বা সমুদ্র পার হয়ে নিজ গন্তব্যে যাত্রাকালীন বিপরীত বায়ু দ্বারা চালিত হয়ে গন্তব্যের বিপরীত মুখে ধাবিত হয়, তেমনি সাধক নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিযোগে যখন সংসার-সমুদ্র অতিক্রম করে পরমাত্মার দিকে যাত্রা করে, সেই সময় কোনো ইন্দ্রিয় যদি মনকে নিজ অনুগামী করে তাহলে কেবলমাত্র ওই মন একাই নৌকারূপী বুদ্ধিকে চালিত করে

[১] এই শ্লোকের পূর্বার্ধে কর্ম-কর্তৃ-প্রয়োগ করার পূর্বে কর্তৃবাচ্য ছিল অর্থাৎ 'চরতাম্ ইন্দ্রিয়াণাম্ ইন্দ্রিয়ম্ যৎ মনঃ অনুবিদধাতি' এইরূপ বাক্য ছিল। এই বাক্যটিতে ইন্দ্রিয় ছিল কর্তা আর মন ছিল কর্ম। কিন্তু বাক্যকে সরল করার সময় যখন 'কর্মকর্তৃ' প্রয়োগ করা হয় অর্থাৎ কর্মকে কর্তা করা হয়, তখন সেখানে ওই কর্তাকে কর্মবৎভাব করা হয়। এতে কর্মের জন্য যে কাজ হয়, তা সমস্তই কর্তার জন্য হয়ে থাকে। এখানে মনের প্রাধান্য দেখাবার জন্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলি ছাড়া মনই সব করে—এটি বোঝানোর জন্যই কর্মরূপ মনকে কর্তা করা হয়েছে। মন প্রথম পুরুষ হওয়ায় প্রথম পুরুষ 'অনুবিধীয়তে' ক্রিয়ার প্রয়োগ হয়েছে। এখন কর্তৃবাচ্যের ফলরূপ যে ইন্দ্রিয় ছিল, তার প্রয়োজনীয়তা না থাকায় সেটি বর্জিত হয়েছে, তাই সম্পূর্ণ বাক্যটি হয়েছে—'ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে'—যেটি ওপরের শ্লোকে আছে। এই কর্ম-কর্তৃ-প্রয়োগের তাৎপর্য হল, ইন্দ্রিয়গুলি যে বিষয়ে বিচরণ করে, সেই বিষয়গুলির মধ্যে মন যে যে বিষয়ে আকর্ষিত হয়, রসাকৃষ্ট হয়, সেই মন একাই বুদ্ধি হরণ করে নেয় অর্থাৎ মনে বিষয়ভোগের প্রাধান্য হয়।

অর্থাৎ বুদ্ধিকে সংসারমুখী করে দেয়। ফলে সাধকের বিষয়গুলির ওপর সুখবুদ্ধি এবং সেই পদার্থগুলিতে মহত্ত্ববুদ্ধি উপস্থিত হয়।

বায়ু নৌকাকে দুই প্রকারে বিঘ্নিত করে—নৌকাকে পথভ্রষ্ট করে কিংবা ডুবিয়ে দেয়। কিন্তু নাবিক দক্ষ হলে সে বায়ুর ক্রিয়াকে নিজ অনুকূলে আনে, তাতে নৌকা নিজ পথ থেকে বিচ্যুত তো হয়ই না উপরন্তু গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে সহায়ক হয়ে ওঠে। তেমনি ইন্দ্রিয়ের অনুগামী হওয়া মন বুদ্ধিকে দুই প্রকারে বিচলিত করে—পরমাত্ম-প্রাপ্তির নিশ্চয়তাকে দাবিয়ে দিয়ে ভোগবুদ্ধির প্রকাশ ঘটায় অথবা অবৈধ ভোগে নিযুক্ত করে পতন ঘটায়। কিন্তু যাঁর মন ও ইন্দ্রিয় নিজ বশীভূত, তাঁর বুদ্ধিকে মন বিচলিত করে না, বরং পরমাত্মার নিকট পৌঁছাতে সাহায্য করে (২।৬৪-৬৫)।

পরিশিষ্ট-ভাব—এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে উপরোক্ত শ্লোকে উদ্ধৃত **'যৎ'** এবং **'তৎ'** পদগুলিতে ইন্দ্রিয়াদির কথা না বলে মনের কথা কেন বলা হয়েছে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কে বুদ্ধিহরণকারী না বলে মনকে বুদ্ধিহরণকারী বলা হয়েছে কেন ? তার উত্তরে বলা যায় যে, এই অধ্যায়ের ষাটতম শ্লোকে ইন্দ্রিয়গুলিকে মনোহরণকারী বলা হয়েছে এবং তৃতীয় অধ্যায়ের বিয়াল্লিশতম শ্লোকে ইন্দ্রিয়াদির থেকে মন এবং মনের থেকে বুদ্ধিকে শক্তিশালী (সূক্ষ্ম, শ্রেষ্ঠ) বলা হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ইন্দ্রিয়াদি মনকে হরণ করে এবং মন বুদ্ধিকে হরণ করে। দ্বিতীয়তঃ বুদ্ধিহরণ করার ব্যাপারে মনই প্রধান, ইন্দ্রিয়াদি নয়। কেননা ইন্দ্রিয়গুলির সঙ্গে মনের যোগ যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ ওই ইন্দ্রিয়ের নিজ বিষয়েরও জ্ঞান থাকে না—**'অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে'** (গীতা ১৫।৯)। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীদত্তাত্রেয় মহারাজ বলেছেন—

তদৈবমাত্মন্যবরুদ্ধচিত্তো ন বেদ কিঞ্চিদ্ বহিরন্তরং বা।
যথেষুকারো নৃপতিং ব্রজন্তমিষৌ গতাত্মা ন দদর্শ পার্শ্বে॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৯।১৩)

'যাঁর চিত্ত আত্মাতেই নিরুদ্ধ হয়, তাঁর অন্তর-বাহিরে কোথাও কোনো পদার্থের জ্ঞান থাকে না। আমি এক বাণ-প্রস্তুতকারীকে দেখেছিলাম, সে তার কাজে এত তন্ময় ছিল যে সপারিষদ রাজার শোভাযাত্রা তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেও সে তা বুঝতেও পারেনি।'

বাণ-প্রস্তুতকারকের কর্ণেন্দ্রিয় ছিল এবং কর্ণেন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দও ছিল। কিন্তু তার মন কাজে নিবিষ্ট থাকায় সে কোনো শব্দ শুনতে পায়নি। অর্থাৎ মন সঙ্গে থাকলে তবেই ইন্দ্রিয়গুলির নিজ নিজ বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান থাকে। মন সঙ্গ না দিলে যখন ইন্দ্রিয়ের নিজবিষয় সম্বন্ধেও জ্ঞান থাকে না, তখন সেই ইন্দ্রিয় বুদ্ধিকে কী করে হরণ করবে ? তা কখনোই সম্ভব নয়।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—অসমাহিত ব্যক্তির বুদ্ধি কেন নিশ্চয়াত্মিকা হয় না, তার কারণ পূর্বশ্লোকে বলা হয়েছে। এবার যাঁরা সমাহিত হয়েছেন, তাঁদের স্থিতি পরের শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে।

তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮ ॥

[**তস্মাৎ, মহাবাহো** (সেইহেতু, হে মহাবাহো!) ; **যস্য** (যে ব্যক্তির) ; **ইন্দ্রিয়াণি** (ইন্দ্রিয়সমূহ) ; **ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ** (ইন্দ্রিয়াদির ভোগ্য বিষয় হতে) ; **সর্বশঃ** (সর্বতোভাবে) ; **নিগৃহীতানি** (প্রত্যাহৃত হয়েছে) ; **তস্য, প্রজ্ঞা** (তাঁরই বুদ্ধি) ; **প্রতিষ্ঠিতা** (স্থির।)]

সেইহেতু, হে মহাবাহো ! যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সমূহ ভোগ্যবিষয়গুলি হতে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহৃত হয়েছে, তাঁরই প্রজ্ঞা স্থির হয়েছে বলে জানবে ॥ ৬৮ ॥

ব্যাখ্যা—'তস্মাদ্ যস্য .... প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা'—ষাটতম শ্লোক থেকে মন ও ইন্দ্রিয়গুলি বশীভূত করা নিয়ে যে আলোচনা চলছে, তার উপসংহারে **'তস্মাৎ'** পদ দ্বারা বলেছেন যে, যাঁর মন ও ইন্দ্রিয়ে সংসারের প্রতি আকর্ষণ

নেই তাঁর প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত বলা হয়।

এখানে **'সর্বশঃ'** পদটি ব্যবহারের তাৎপর্য এই যে সাংসারিক ব্যবহারকালে বা একান্তে চিন্তার সময়ে—কোনো অবস্থাতেই সাধকের ইন্দ্রিয়ভোগ বা বিষয়ে যেন প্রবৃত্তি না হয়। কর্মক্ষেত্রে তিনি যে কোনো ভোগ্যবিষয়াদির সম্মুখীন হন না কেন, তিনি সেগুলির দ্বারা বিচলিত হন না। তাঁর মন ইন্দ্রিয়ের বশবর্তী হয়ে তাঁর বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করতে পারে না। পর্বতকে যেমন কেউ নড়াতে পারে না, তেমনি তাঁর বুদ্ধিতে এমন দৃঢ়তা এসে যায় যে তাঁর মন কোনো অবস্থাতেই বুদ্ধিকে তাঁর লক্ষ্য থেকে চ্যুত করতে সক্ষম হয় না। কারণ তাঁর মনে বিষয়ের কোনো গুরুত্ব থাকে না।

'নিগৃহীতানি' কথাটির অর্থ হল যে, ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় হতে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করা হয়েছে অর্থাৎ বিষয়ের প্রতি সাধকের বিন্দুমাত্র অনুরাগ, আসক্তি বা আকর্ষণ নেই। যেমন সাপের বিষ-দাঁত তুলে নিলে তার আর বিষ থাকে না। সেই সাপ কাউকে কামড় দিলেও আর কোনো ক্ষতি হয় না। তেমনি ইন্দ্রিয় থেকে রাগ-দ্বেষ দূর করাও যেন সাপের বিষ-দাঁত তুলে দেওয়ার মতো ব্যাপার। তখন ওই ইন্দ্রিয়গুলিতে সাধকের পতন ঘটাবার আর কোনো সামর্থ্য থাকে না।

এই শ্লোকটির তাৎপর্য হল এই যে সাধককে দৃঢ়তার সঙ্গে স্থির করতে হয় যে, 'আমার লক্ষ্য হল পরমাত্মাকে লাভ করা, ভোগ-বিলাস বা সম্পদসংগ্রহ আমার উদ্দেশ্য নয়।' সাধকের হৃদয়ে যদি সর্বক্ষণ এই সাবধানতা থাকে তবে তাঁর বুদ্ধি স্থিতিলাভ করে।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—যাঁর ইন্দ্রিয়গুলি বশীভূত হয়েছে, তাঁর এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে পার্থক্য কী—পরের শ্লোকটিতে তাই জানানো হয়েছে।

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥ ৬৯ ॥

[**সর্বভূতানাম্** (সমস্ত মানুষের পক্ষে) ; **যা, নিশা** (যা রাত্রিস্বরূপ) ; **তস্যাম্** (তাতে) ; **সংযমী** (সংযমী মানুষ) ; **জাগর্তি** (জাগরিত থাকেন) ; **যস্যাম্** (যাতে) ; **ভূতানি** (সাধারণ মানুষ) ; **জাগ্রতি** (জাগরিত থাকে) ; **সা, মুনেঃ** (তা মুনিগণের) ; **পশ্যতঃ** (দৃষ্টিতে) ; **নিশা** (রাত্রিস্বরূপ।)]

সমস্ত মানুষের পক্ষে যা নিশাস্বরূপ (পরমাত্মাতে বিমুখতা), তাতে সংযমী ব্যক্তি জাগরিত থাকেন এবং যাতে সাধারণ মানুষ জাগরিত থাকে অর্থাৎ ভোগ এবং সঞ্চয়ে মজে থাকে, আত্মদর্শী মুনিগণের পক্ষে তা রাত্রিস্বরূপ ॥ ৬৯ ॥

ব্যাখ্যা—**'যা নিশা সর্বভূতানাম্'**—যাদের ইন্দ্রিয় এবং মন নিজ বশীভূত নয় এবং যারা ভোগে আসক্ত, তারা সকলেই পরমাত্মার বিষয়ে নিদ্রিত। পরমাত্মা কী বস্তু ? তত্ত্বজ্ঞান কাকে বলে ? আমরা কেন দুঃখ ভোগ করি ? শোক-তাপ কেন হয় ? আমরা যা কিছু করি, তার পরিণাম কী হবে ?—এই দিকে দৃষ্টি না দেওয়াই হল তাদের পক্ষে রাত্রিস্বরূপ, যা অন্ধকারাচ্ছন্ন।

এইস্থলে **'ভূতানাম্'** বলার তাৎপর্য হল এই যে, পশুপক্ষী যেমন সারাদিন খাওয়াদাওয়াতেই ব্যস্ত থাকে, এইরূপই যে সব ব্যক্তি দিনরাত খাওয়াদাওয়া, সুখ-আরাম, ভোগ-বিলাসে এবং অর্থসংগ্রহেই ব্যস্ত থাকে, তাদের পশুপক্ষীর সামিল বলে ধরা হয়। কারণ পরমাত্মতত্ত্বে যারা বিমুখ হয় তাদের সঙ্গে পশুপক্ষীর কোনো পার্থক্য থাকে না। এরা উভয়েই পরমাত্মাপ্রাপ্তির সাধনায় নিদ্রিত। যদি কোনো পার্থক্য থাকে তা হল এই যে পশুপক্ষীর মধ্যে বিবেক-বুদ্ধি ততো জাগ্রত নয়, তাই তারা খাওয়াদাওয়া ইত্যাদিতেই লেগে থাকে। আর মানুষের মধ্যে ভগবৎ কৃপায় সেই বিবেক-বুদ্ধি জাগ্রত থাকে, যাতে তারা নিজ কল্যাণ করতে সক্ষম হয়, প্রাণীদের সেবা করতে পারে এবং পরমাত্মাকে লাভ করতে পারে। কিন্তু সেই বিবেক-বুদ্ধির সদ্ব্যবহার না করে মানুষ ধনসম্পদ সংগ্রহ এবং ভোগলিপ্সায় ব্যাপৃত থাকে, যার ফলে তারা

সংসারের পক্ষে পশুপক্ষীদের চাইতেও বেশি দুঃখদায়ক হয়। কারণ পশুপক্ষী তো সংগ্রহ করে না, তারা শুধুমাত্র যতটা খেলে পেট ভরে ততটাই খায় ; কিন্তু মানুষ যেখানে যা কিছু পায়, তা কাজে আসুক বা না আসুক সেটিকে সংগ্রহ করে রাখে, যার ফলে অপরের প্রয়োজনীয় বস্তুতে অভাবের সৃষ্টি করে।

'তস্যাং জাগর্তি সংযমী'—সাধারণ মানুষের পক্ষে যা রাত্রিস্বরূপ অর্থাৎ পরমাত্মার দিক থেকে, নিজ কল্যাণের দিক থেকে যে বিমুখতা, সংযমী ব্যক্তি তাতে জাগরিত (সংযত) থাকেন। যিনি ইন্দ্রিয় এবং মনকে বশীভূত করেছেন, ভোগ-লিপ্সা এবং সম্পদসংগ্রহে আসক্ত নন, যাঁর ধ্যেয় কেবল পরমাত্মা, তিনি হচ্ছেন সংযমী পুরুষ। পরমাত্মতত্ত্ব, নিজস্বরূপ, জগৎসংসারকে যথার্থরূপে জানা হল তাঁর পক্ষে জাগরিত থাকা।

'যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি'—যে ভোগ এবং সংগ্রহের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকে, প্রত্যেকটি পয়সার হিসাব রাখে, সম্পত্তির প্রতিটি ইঞ্চির খবর রাখে, তার অধিকারে যত সম্পদ থাকে তা বৈধ হোক বা অবৈধ, তাতে সে খুশি হয়ে মনে করে যে, 'আমার এত সম্পদ হয়েছে, আমার এত লাভ হয়েছে'—এইরূপে যে সাংসারিক ক্ষণস্থায়ী ভোগগুলি গ্রহণে এবং মান-সম্মান, যশ-প্রতিপত্তি ইত্যাদি প্রাপ্ত করতে ব্যস্ত থাকে এবং সতর্ক থাকে, সেইরকম বিষয়চিন্তায় নিরত মানুষের পক্ষে এসব হল জাগরণ।

'সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ'—সাংসারিক ভোগ-সংগ্রহে যে মানুষ নিজেকে অতি বুদ্ধিমান এবং চতুর বলে ভাবে এবং তাতেই খুশি থাকে, মননশীল সংযমী ব্যক্তিদের কাছে (যাঁরা সংসার এবং পরমাত্মতত্ত্ব—উভয়ই সম্যক্‌রূপে জানেন)—সেইসব সাংসারিক মানুষের ক্রিয়াকলাপ তমসাচ্ছন্ন রাত্রিস্বরূপ।

শিশুরা যেমন খেলার সময় নুড়ি-পাথর, নানা রঙের কাচের টুকরো নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে, কেউ যদি একটি পেয়ে যায় তবে এই ভেবে খুশি হয় যে, 'আমার কত লাভ হল' আর না পেলে দুঃখিত মনে ভাবে 'আমার অনেক ক্ষতি হল।' কিন্তু যাঁর কাছে এই নুড়ি-পাথরের কোনো গুরুত্ব নেই সেই বুদ্ধিমান ব্যক্তি মনে করেন যে, এই নুড়ি-পাথরের প্রাপ্তিতে লাভ কী আর না পেলেই বা ক্ষতি কীসের ? এইসব শিশু নুড়ি-পাথর যদি পেয়েও যায় তা কতক্ষণই বা তা তাদের সংগ্রহে থাকবে ? এইরূপ ভোগসংগ্রহে ব্যস্ত মানুষ ভোগাদির জন্য লড়াই-ঝগড়া, মিথ্যাচার, বেইমানি ইত্যাদি করতে থাকে এবং সেগুলি পেয়ে খুশি হয় আর ভাবে 'আমার অনেক লাভ হল।' কিন্তু সংসার ও পরমাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞাত মননশীল সংযমী ব্যক্তিগণ পরিষ্কার অনুভব করেন যে ভোগ করলে, শ্রদ্ধা-মান পেলে, সুখ-আরাম ভোগ করলে, খাওয়াদাওয়ায় আনন্দ পেলে বা সাজগোজ করলে কী হয় ? এর দ্বারা মানুষ কী পায় ? এগুলির মধ্যে কোনটি তার সঙ্গে থাকবে ? কতক্ষণ ভোগসুখ তাদের সঙ্গে থাকবে ? এই যে ভোগ-বৃত্তি, তাই বা কতদিন থাকবে ?—এইভাবে তাঁদের দৃষ্টিতে বিষয়াসক্ত প্রাণীদের জাগরণ রাতেরই সমান।

সেই মননশীল সংযমী ব্যক্তি পরমাত্মা, নিজস্বরূপ তথা সংসারের পরিণাম তো জানেনই, তিনি সেই সমস্ত বস্তুগুলিকেও জানেন যে, এইগুলির মধ্যে কোনটি কার হিতার্থে লাগবে বা এর দ্বারা অন্যের কী সুবিধা হবে। তাঁরা সেইসব বস্তু যথাযথ স্থানে ঠিকভাবে ব্যবহার করেন, সেগুলিকে অন্যের সেবায় লাগান।

যেমন, চোখে দোষ থাকলে যখন আমরা আকাশের দিকে তাকাই, তখন আকাশে ময়ূরের পাখার মতো নানাপ্রকার জালের মতো দাগ দেখতে পাই এবং চোখ বন্ধ করলেও সেই জাল দেখতে পাই ; এরূপ দেখলেও আমাদের এই স্থির বিশ্বাস থাকে যে আকাশে কোনোপ্রকার জাল নেই। এইরূপেই ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ দিয়ে সংসারকে লক্ষ করলেও মননশীল সংযমী ব্যক্তির স্থির বিশ্বাস থাকে যে জগৎ-সংসার প্রকৃতপক্ষে নেই, এগুলি সব প্রতীতিমাত্র।

পরিশিষ্ট-ভাব— সাংসারিক ব্যক্তি রাত-দিন ভোগ এবং সম্পদসংগ্রহে ব্যস্ত থাকেন, সেসবেই গুরুত্ব দেন, সাংসারিক কাজে অত্যন্ত সাবধান ও নিপুণ হন, নানাপ্রকার কলাকৌশল শেখেন, নানা বস্তু আবিষ্কার করেন, লৌকিক বস্তুর প্রাপ্তি হলে নিজের উন্নতি হয়েছে বলে মনে করেন, সাংসারিক বস্তুসমূহের প্রশংসা করেন। তাঁরা যতকাল বেঁচে থাকেন সুখভোগের উদ্দেশ্যে বড় বড় যাগযজ্ঞ করেন, দেবতাদের পূজা-অর্চনা, জপতপ করেন। কিন্তু জীবন্মুক্ত , তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষ এবং সত্যকার সাধকদের কাছে এই বিষয়চিন্তা হল রাত্রি, অন্ধকার, তার কিছুমাত্র গুরুত্ব

তাঁদের কাছে থাকে না। কারণ তাঁদের দৃষ্টিতে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত কোনো জগৎ বলে কিছু নেই-ই—**'নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ'** (গীতা ২।১৬), **'আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন'** (গীতা ৮।১৬)।

সাংসারিক লোক সংসারেই মজে থাকেন এবং মনে করেন যা কিছু আছে তা সব ভোগ-সুখেরই জন্য—**'নান্যদস্তীতি বাদিনঃ'** (গীতা ২।৪২)। **'কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চতাঃ'** (গীতা ১৬।১১)। পারমার্থিক বিষয়ের দিকে তাঁদের বুদ্ধি যায় না। কিন্তু পারমার্থিক সাধক পারমার্থিক বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক বিষয়ও জানেন। তাই তাঁদের জন্য **'পশ্যতঃ'** পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। সংসারী লোক শুধু রাতই দেখেন, দিনকে দেখেন না। কিন্তু যোগী দিন ও রাত উভয়ই দেখেন—উভয়ের মধ্যে এই পার্থক্য থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বালক শুধু বালকভাবই দেখেছে, যৌবন দেখেনি, কিন্তু বৃদ্ধ ব্যক্তি বৃদ্ধাবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বালকভাব, যৌবনভাবও দেখেছেন। যিনি অর্থসংগ্রহ করে শুধু সঞ্চয় করেন তিনি অর্থত্যাগ করতে জানেন না। কিন্তু যিনি প্রাপ্ত অর্থ ত্যাগ করেছেন তিনি অর্থ জমাতেও জানেন, ত্যাগ করতেও জানেন। সিদ্ধান্ত হল এই যে সংসারে ব্যাপৃত ব্যক্তি সংসারের রহস্য বিষয়ে অজ্ঞ। সংসার থেকে পৃথক হলে তবেই সে সংসারকে জানতে সক্ষম হয়, কারণ তখন সে যথার্থই সংসারের পরিচয় জানতে পারে। এরূপই পরমাত্মার সঙ্গে একাত্ম হয়েই মানুষ পরমাত্মাকে জানতে সক্ষম হয়, কারণ সে প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মার সঙ্গে একাত্ম।

যিনি 'আছে'তে স্থিত হয়েছেন, তিনি 'আছে' এবং 'নেই'— দুটিকেই জানেন, কিন্তু যিনি 'নেই'তে অবস্থান করেন, তিনি 'নেই'কেও সম্যক্‌ভাবে জানেন না, তাহলে 'আছে'কে জানবেন কী করে ? জানা সম্ভবই নয়। তাঁর জানার সামর্থ্যই নেই। যাঁরা 'আছে' জানেন তাঁদের সঙ্গে 'নেই' মতবাদী ব্যক্তিদের নিয়ে কোনো বিরোধ হয় না, কিন্তু 'নেই'কে যাঁরা মানেন তাঁরা 'আছে' বলে মানা ব্যক্তিদের সঙ্গে বিরোধ করেন।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—মননশীল সংযমী ব্যক্তি সংসারকে রাত্রিস্বরূপ দেখেন। এতে প্রশ্ন আসে যে তিনি কি সাংসারিক বস্তুসমূহের সংস্পর্শে আসেনই না ? যদি না আসেন তবে তাঁর জীবন-নির্বাহ হয় কীভাবে ? আর যদি সাংসারিক সম্পর্কে থাকেন তাহলে তাঁর স্থিতি কী হয় ? এই বিষয়গুলি আলোচনা করার জন্য পরের শ্লোকটি কথিত হয়েছে।

আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥ ৭০ ॥

[**আপূর্যমাণম্, সমুদ্রম্** (জলপূর্ণ সমুদ্রে) ; **যদ্বৎ** (যেমন) ; **আপঃ** (জলরাশি) ; **প্রবিশন্তি** (এসে পড়ে) ; **অচলপ্রতিষ্ঠম্** (অচলরূপে বিরাজ করে) ; **তদ্বৎ** (তেমনি) ; **যম্** (যে সংযমী মানুষের মাঝে) ; **সর্বে, কামাঃ** (সমস্ত বিষয়) ; **প্রবিশন্তি** (প্রবেশ করে) ; **সঃ** (তিনিই) ; **শান্তিম্, আপ্নোতি** (পরমশান্তি লাভ করেন) ; **ন, কামকামী** (যারা ভোগকামনা করে, তারা শান্তি পায় না।)]

জলপূর্ণ সমুদ্রে যেমন নদ-নদীর জলরাশি এসে চারদিক থেকে পড়ে মিশে যায়, কিন্তু সমুদ্র নিজমহিমায় অচলরূপে বিরাজ করে ; তেমনি যে সংযমী মানবের মধ্যে বিষয়সকল প্রবেশ করে বিলীন হয়ে যায়, কোনোরূপ বিকার উৎপন্ন করে না, তিনিই পরমশান্তি লাভ করেন। যিনি ভোগকামনা করেন, তিনি শান্তি পান না ॥ ৭০ ॥

ব্যাখ্যা—'আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশ্যন্তি যদ্বৎ'—বর্ষাকালে নদ-নদীর জল অত্যন্ত বেড়ে যায়, অনেক নদীতে বান আসে, কিন্তু এই সমস্ত জল যখন সর্বদিকে জলপূর্ণ সমুদ্রে এসে পড়ে, সমুদ্র তখন কলেবর বৃদ্ধি করে না, নিজমহিমায় অচলরূপে অবস্থান করে। গ্রীষ্মকালে যখন নদ-নদীর জল অত্যন্ত কম হয়ে যায়, তখনও সমুদ্র কমে যায় না। অর্থাৎ নদ-নদীর জল বেশি পরিমাণে আসাতে বা কম পরিমাণে আসাতে অথবা না আসাতে কিংবা বাড়বানল (জলে প্রকটিত অগ্নি) এবং সূর্য দ্বারা শোষিত হওয়া সত্ত্বেও সমুদ্রে কোনো তফাৎ হয় না,

এটি বাড়েও না বা কমেও না। সমুদ্র নদ-নদীর জলের অপেক্ষা রাখে না। এটি সর্বদা একইপ্রকার পরিপূর্ণ থাকে এবং নিজমহিমা ত্যাগ করে না।

'তদ্বৎ কামা[১] যং প্রবিশন্তি সর্বে স শান্তিমাপ্নোতি'—এইরূপে সংসারের সমস্ত ভোগই পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞ সংযমী মানব প্রাপ্ত হন। কিন্তু এগুলি তাঁর নিজের বলে কথিত শরীর এবং অন্তরে সুখ বা দুঃখরূপ বিকার উৎপন্ন করতে সক্ষম হয় না। সুতরাং তিনি পরমশান্তি-প্রাপ্ত হন। তাঁর যে শান্তিলাভ হয় তা পরমাত্মতত্ত্বের কারণেই হয়, ভোগ্যপদার্থের জন্য নয় (গীতা ২।৪৬)।

এখানে যে সমুদ্র এবং নদীর জলের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে তা স্থিতপ্রজ্ঞ সংযমী ব্যক্তির বিষয়ে সম্পূর্ণ খাটে না। কারণ সমুদ্র এবং নদীর জলে স্বজাতীয়তা আছে অর্থাৎ যে জলে সমুদ্র পরিপূর্ণ, সেই জলই নদ-নদীর দ্বারা বাহিত হয়ে আসে ; আবার নদ-নদীতে যে জল থাকে সেই একই জলে সমুদ্র ভরা থাকে। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ এবং সাংসারিক ভোগ্যপদার্থগুলির মধ্যে পার্থক্য বোঝাতে দিন-রাত, আকাশ-পাতালের দৃষ্টান্তও ঠিকমতো উপযুক্ত হয় না। কারণ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি যে তত্ত্বে স্থিত হন তা হল চেতন-তত্ত্ব, নিত্য-তত্ত্ব, তা সত্য, অসীম এবং অনন্ত। আর সাংসারিক ভোগ্যপদার্থগুলি হচ্ছে জড়, অনিত্য, অসৎ, সসীম এবং সেগুলি সমাপ্ত হয়।

অপর পার্থক্যটি হল এই যে, সমুদ্রে নদীর জল এসে পৌঁছায়, কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি যে তত্ত্বে স্থিত হন, সেখানে এই সাংসারিক ভোগ্যপদার্থ পৌঁছাতে সক্ষম নয়, তা কেবলমাত্র তাঁর বলে কথিত শরীর ও অন্তঃকরণ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। সুতরাং সমুদ্রের দৃষ্টান্ত শুধুমাত্র তাঁর বলে কথিত শরীর ও অন্তঃকরণের স্থিতি জানাবার জন্যই দেওয়া হয়েছে। তাঁর প্রকৃত স্বরূপ জানাবার মতো কোনো প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত নেই।

'ন কামকামী'—যাদের মনে ভোগ্যপদার্থগুলির কামনা থাকে, যারা সেগুলিকেই গুরুত্ব দেয় এবং যাদের দৃষ্টি সেদিকেই থাকে, তাদের সাংসারিক ভোগ্যবস্তুর যতই প্রাপ্তি ঘটুক না কেন, তবুও তৃপ্তি হয় না ; তাদের কামনা, দুঃখ, শোক কখনো মেটে না ; তাহলে তারা কী করে শান্তি পাবে ? আসলে চেতন-স্বরূপের কখনও জড়-বস্তুর দ্বারা তৃপ্তি হতেই পারে না।

পরিশিষ্ট-ভাব— নিজ নিজ কামনার জন্যই এই জগৎকে জড়বৎ বলে মনে হয়। বাস্তবে জগৎও চিন্ময় পরমাত্মা—**'বাসুদেবঃ সর্বম্'** (গীতা ৭।১৯), **'সদসচ্চাহমর্জুন'** (গীতা ৯।১৯)। সুতরাং মানুষ যখন কামনারহিত হয়, তখন তার দ্বারা সকল বস্তুই প্রসন্ন হয়। বস্তু প্রসন্ন হওয়ার ব্যাপারটা জানা যায় তখনই, যখন দেখা যায় সেই নিষ্কাম মহাপুরুষের প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি সময়মতো আপনিই তাঁর কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। তাঁর কাছে গিয়ে সফল হবার জন্যই যেন বস্তুগুলি লালায়িত থাকে। কিন্তু কামনারহিত হওয়ায় বস্তুসমূহ প্রাপ্ত হওয়ায় বা না হওয়ায় তাঁর মধ্যে কোনো বিকার উৎপন্ন হয় না। তাঁর দৃষ্টিতে বস্তুসমূহের কোনো গুরুত্বই থাকে না। এর বিপরীত হল কামনাসম্পন্ন মানুষেরা বস্তু প্রাপ্ত হোক বা না হোক, তাঁদের মনে সর্বদাই অশান্তি বিরাজ করে।

⁂ ⁂ ⁂

সম্বন্ধ—পরবর্তী শ্লোকে 'স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কীভাবে বিচরণ করেন ?' —এই প্রশ্নের উত্তরের উপসংহার করছেন।

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১ ॥

[**যঃ, পুমান্** (যে ব্যক্তি) ; **সর্বান্, কামান্** (সমস্ত কামনা) ; **বিহায়** (পরিত্যাগ করে) ; **নিঃস্পৃহঃ** (নিঃস্পৃহ হয়ে) ; **নির্মমঃ** (মমতাশূন্য) ; **নিরহঙ্কারঃ** (অহংকাররহিত) ; **চরতি** (বিচরণ করেন) ; **সঃ** (তিনিই) ; **শান্তিম্** (শান্তি) ; **অধিগচ্ছতি** (প্রাপ্ত হন।)]

যে ব্যক্তি সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করে নিঃস্পৃহ মমতাশূন্য এবং অহংকাররহিত হয়ে আচরণ করেন, তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হন ॥ ৭১ ॥

[১] এইস্থলে 'কামাঃ' পদটি কামনার বাচক নয়, যে বস্তুগুলির কামনা করা হয় সেই ভোগ্যপদার্থগুলির বাচক।

ব্যাখ্যা—**'বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহ'**—অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তির ইচ্ছাকে **'কামনা'** বলা হয়। স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করেন। কামনা পরিত্যাগ করলেও শরীর নির্বাহের জন্য দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, পদার্থ ইত্যাদির যে প্রয়োজনীয়তা হয় অর্থাৎ জীবননির্বাহের জন্য প্রাপ্ত এবং অপ্রাপ্ত বস্তুর যে প্রয়োজন থাকে, তাকে বলা হয় **'স্পৃহা'**। স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি এই 'স্পৃহা'ও পরিত্যাগ করেন। কারণ যে জন্য এই শরীর লাভ হয়েছে এবং যা ছিল অতি আবশ্যক সেই তত্ত্ব-লাভ হয়েছে, এখন শরীর থাক বা না থাক, শরীর নির্বাহ হোক বা না হোক—তিনি আর তাতে খেয়াল রাখেন না। এই-ই হল তাঁর নিস্পৃহতা।

নিস্পৃহ হওয়ার অর্থ এই নয় যে তিনি জীবন-নির্বাহের বস্তুসমূহ একেবারেই গ্রহণ করেন না। তিনি ওই সব বস্তু গ্রহণ করেন এবং পথ্য-কুপথ্য সম্বন্ধেও অবহিত অর্থাৎ সাধনাবস্থায় শরীর ইত্যাদির প্রতি তাঁর ব্যবহার যেমন ছিল, এখনও তেমনই থাকে। তবে এখন শরীর থাকলে ভালো হয়, জীবননির্বাহের বস্তুসমূহ পাওয়া গেলে ভালো হয়—এরূপ কোনো বাসনা তাঁর ভিতর থাকে না।

এই অধ্যায়ের পঞ্চান্নতম শ্লোকে **'প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্'** পদের দ্বারা কামনাত্যাগের যে কথা বলা হয়েছে, সেই কথাটিই এইস্থানে **'বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্'** পদের দ্বারা বলা হয়েছে। এর অর্থ হল যে কর্মযোগে সমস্ত কামনা পরিত্যাগ না করলে স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া যায় না। কারণ কামনাগুলির জন্যই সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় থাকে। কামনা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করলে সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক থাকতেই পারে না।

'নির্মমঃ'—স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষ মমতা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেন। মানুষ যে সব বস্তুকে নিজের বলে মনে করে, তা প্রকৃতপক্ষে নিজের নয়, তা কেবল জগৎসংসার থেকে প্রাপ্ত হয়েছে। প্রাপ্ত বস্তুসমূহকে নিজের বলে মনে করা ভুল। এই ভুল দূর হলে স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি বস্তু-ব্যক্তি-পদার্থ-শরীর-ইন্দ্রিয়াদিতে মমত্বরহিত হন।

'নিরহঙ্কারঃ'—'আমিই এই শরীর'—শরীরের সঙ্গে এইপ্রকার একাত্ম হওয়াকে বলা হয় অহংকার (অহংভাব)। স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির এই অহংভাব থাকে না। শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি সমস্তই কোনো প্রকাশের দ্বারা পরিলক্ষিত হয়, আর যে 'আমি'-ভাব থাকে, তারও ধারণা হয় কোনো প্রকাশের দ্বারা। সুতরাং প্রকাশের দৃষ্টিতে দেখলে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহংভাব (আমি-ভাব)—এগুলি সবই দৃশ্য। নিয়ম হচ্ছে এই যে দ্রষ্টা দৃশ্যের থেকে আলাদা হন। এটি অনুভব করে স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি নিরহংকার হয়ে যান।

'স শান্তিমধিগচ্ছতি'—স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি শান্তিলাভ করেন। কামনা, স্পৃহা, মমত্ববোধ এবং অহংবোধরহিত হলে তবেই যে তাঁর মধ্যে শান্তি আসে—তা নয়, প্রকৃতপক্ষে শান্তি মনুষ্যমাত্রেই সদা বিরাজমান। শুধুমাত্র বিনাশশীল বস্তুগুলির থেকে সুখভোগের কামনা থাকায়, সেগুলির সঙ্গে মমত্বের সম্পর্ক রাখার ফলে অশান্তি আসে। যখন সংসারের কামনা, স্পৃহা, মমত্ববোধ ও অহংবোধ চিরকালের মতো পরিত্যক্ত হয় তখন শান্তি স্বতঃসিদ্ধভাবে অনুভূত হয়।

এই শ্লোকে কামনা, স্পৃহা, মমত্ববোধ ও অহংবোধ—এই চারটির মধ্যে অহংবোধই প্রধান। কারণ একমাত্র অহংবোধ না থাকলেই সবকিছু দূর হয় অর্থাৎ যদি 'আমি'-ভাব না থাকে, তাহলে 'আমার'-ভাব কী করে আসবে এবং কামনাই বা কে করবে এবং কেন করবে ?

শুধু **'নিরহঙ্কারঃ'** বলাতেই যখন কামনাদির ত্যাগ বোঝায়, তাহলে আবার কামনাদির ত্যাগের বর্ণনা কেন করা হয়েছে ? এর উত্তর হল কামনা, স্পৃহা, মমতা এবং অহং—এই চারটির মধ্যে কামনা হচ্ছে স্থূল। কামনা থেকে স্পৃহা সূক্ষ্ম, স্পৃহা থেকে মমতা সূক্ষ্ম এবং মমতা থেকে অহংবোধ আরও সূক্ষ্ম। সেইজন্য সাধক যদি সর্বপ্রথমে কামনা, স্পৃহা ও মমতা ত্যাগ করেন, তাহলে অহংভাবের ত্যাগ করা সহজ হয়।

শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে প্রথমে কামনার ত্যাগ তারপরে স্পৃহা, মমতা এবং অহংভাব পরিত্যাগের কথা বলা হয়ে থাকে। কিন্তু সাধকের দৃষ্টিতে প্রথমে মমতার ত্যাগ এবং পরে ক্রমশঃ কামনা, স্পৃহা এবং অহংভাবের পরিত্যাগ করা যথার্থ মনে হয়। প্রাপ্তবস্তুতে মমতা এবং অপ্রাপ্তবস্তুর কামনা হয়ে থাকে। সর্বপ্রথমে মমতাকে ত্যাগ করা সহজ। সর্বাগ্রে মমতার দ্বারা অর্থাৎ প্রাপ্তবস্তুতে আসক্তি করে মানুষ আবদ্ধ হয়। অতএব মমতাকে ত্যাগ করলে নিষ্কাম হওয়ায় সামর্থ্য আসে, কামনার ত্যাগ করলে নিস্পৃহ হওয়ার

সামর্থ্য লাভ হয় এবং স্পৃহা ত্যাগ করলে অহং-ভাব ত্যাগ করার সামর্থ্য আসে। শাস্ত্রীয় প্রক্রিয়া অনুসরণ করলে মানুষ পাণ্ডিত্য অর্জন করে কিন্তু সাধকের পদ্ধতি অনুসরণ করলে মানুষের তত্ত্বের অনুভূতি হয়।

অহংবোধ ও মমত্ববোধ থেকে মুক্ত হওয়ার উপায়

কর্মযোগের দৃষ্টিতে—'কোনো কিছুই আমার নয়, কারণ আমার কোনো বস্তু, ব্যক্তি, পরিস্থিতি, ঘটনা, অবস্থা ইত্যাদির ওপর স্বাধীনভাবে অধিকার নেই। যখন কিছুই আমার নয় তখন আমার কিছুর দরকার নেই ; কারণ শরীর যদি আমার হয় তবে অন্ন-জল-বস্ত্রাদিরও আমার প্রয়োজন থাকে, কিন্তু শরীরই যদি আমার না হয় তাহলে আমার কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই। যখন আমার কিছু নয় এবং আমার কিছুরই প্রয়োজন নেই, তখন 'আমি' কোথায় থাকে ? কারণ 'আমি' তো কোনো বস্তু, শরীর, অবস্থা ইত্যাদি ধরেই হয়।

'আমার' বলে কথিত এই শরীরাদির শুধুমাত্র সংসারের সঙ্গেই অভিন্ন-সম্পর্ক হয়ে থাকে। সেইজন্য নিজের বলে কথিত এই শরীর দ্বারা যা কিছু করার তা শুধু জগতের হিতের জন্যই করতে হয়। কারণ আমার কিছুরই প্রয়োজন নেই ; এরূপ ভাব হলে 'আমি'-র একদেশীয় বোধ স্বতঃই দূর হয় এবং কর্মযোগী অহং ও মমত্ববোধ-রহিত হন।

সাংখ্যযোগের দৃষ্টিতে—প্রাণীমাত্রেরই 'আমি আছি' এইপ্রকার নিজ স্বরূপের স্বতঃসিদ্ধ সত্তার জ্ঞান থাকে। এর মধ্যে 'আমি' হচ্ছে প্রকৃতির অংশ এবং 'আছি' হল সত্তা। এই 'আছি' বাস্তবে 'আমি'কে নিয়েই থাকে। যদি 'আমি' না থাকে, তাহলে 'আছি'ও থাকে না, তাহলে 'আছে' থাকে।

'আমি আছি', 'তুমি আছ', 'এ আছে', 'সে আছে'—এই চারটির অস্তিত্ব হয় ব্যক্তি এবং দেশ-কাল নিয়েই। যদি এই চারটি অর্থাৎ ব্যক্তি এবং দেশ-কালকে না ধরা হয় তাহলে শুধু 'আছে'ই থাকে—'আছে'-তেই এর স্থিতি হয়। 'আছে'তে স্থিতি হওয়ায় সাংখ্যযোগী অহংবোধ ও মমত্ববোধরহিত হন।

ভক্তিযোগের দৃষ্টিতে—যাকে 'আমি' এবং 'আমার' বলা হয়, তা সবই প্রভুর। কারণ আমার বলে যে সকল বস্তু, তার ওপর আমার কোনো অধিকার নেই ; কিন্তু প্রভুর সেগুলির ওপর সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তিনি যেভাবে বস্তুগুলিকে রাখেন, রাখতে চান, সেগুলি সেভাবেই থাকে। সুতরাং এ সমস্তই তাঁর। তাই এগুলি প্রভুর সেবাতেই লাগানো উচিত। আমার বলে যে শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি আছে—এ সমস্তই তাঁর আর আমিও তাঁর। এরূপ ভাব হলে ভক্তিযোগী অহংবোধ ও মমত্ববোধরহিত হন।

পরিশিষ্ট-ভাব— প্রথমে **'সোঽমৃতত্বায় কল্পতে'** (২।১৫) বলে জ্ঞানযোগের সিদ্ধির (পূর্ণতার) কথা বলা হয়েছে, এবার **'স শান্তিমধিগচ্ছতি'** বলে কর্মযোগের সিদ্ধির কথা জানিয়েছেন। তাৎপর্য হল যে চিন্ময়তাতে স্থিতিলাভ হলে অমরত্বপ্রাপ্তি হয় এবং জড়ত্ব (অহং) ত্যাগ হলে শান্তিলাভ হয়।

অহংভাব নিজস্বরূপে মেনে নেওয়া হয়েছে, বাস্তবে তা নেই। এটি যদি বাস্তব হত, তাহলে আমরা কখনও নিরহংকার হতে সক্ষম হতাম না এবং ভগবানও কখনো নিরহংকার হওয়ার কথা বলতেন না। কিন্তু তিনি **'নিরহঙ্কারঃ'** কথাটি বলেছেন, সুতরাং আমরা অহংকাররহিত হতে সক্ষম। আমাদের অনুভবও তাই যে, স্বরূপ প্রকৃতই অহংকাররহিত। গভীর নিদ্রার সময় অহং-এর অভাব এবং স্ব-স্বরূপের (নিজ সত্তার) ভাব সকলেই অনুভব করে থাকে, যা জাগরিত হবার পর স্পষ্ট বোধ হয়। সুষুপ্তিকালে অহং অবিদ্যায় লীন হয়ে যায়, কিন্তু স্ব-স্বরূপ বিরাজমান থাকে। তাই গভীর নিদ্রার পর আমরা জেগে উঠে বলি 'আমি এত আরামে ঘুমিয়েছি যে আমি কিছু জানিই না।' এই স্মৃতির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আরাম অনুভবকারী এবং 'কিছু না জানা'র অনুভবকারী তো ছিলই। না হলে আরাম কে অনুভব করছে এবং 'কিছু জানি না'— এ কথাটা কে জানল ? সুতরাং 'কিছু জানি না'— হল অহং-এর অভাব এবং এই জ্ঞান যার আছে, তিনিই সেই অহংবর্জিত স্ব-স্বরূপ।

এক মহিলার নাকের নথ কুয়াতে পড়ে গিয়েছিল। সেটি তোলার জন্য এক ব্যক্তি কুয়াতে নেমে জলের মধ্যে নথটি খুঁজতে লাগল। খুঁজতে খুঁজতে সে নথটি পাওয়ায় খুব খুশি হল। কিন্তু সে জলের মধ্যে থাকায় কোনো কথা বলতে পারল না, কারণ বাক্য (অগ্নি) এবং জলের মধ্যে বিরোধ আছে। তাই জলের বাইরে এসে সে বলতে পারল যে 'নথ পাওয়া

গেছে!' তেমনই গভীর নিদ্রায় লীন হলে মানুষ সুখ অনুভব করলেও ব্যক্ত করতে পারে না, কারণ তখন বলার অবস্থা থাকে না। নিদ্রা ভঙ্গ হলে তখনই তার সুষুপ্তির সুখস্মৃতি অনুভব হয়। তাই বলা হয়— **'অনুভবজন্যং জ্ঞানং স্মৃতি'**।

এইরূপ সুষুপ্তিতে অহং-এর অভাব সকলেই অনুভব করে, কিন্তু স্ব-স্বরূপের অভাব কেউই অনুভব করে না। অহংকার আমাদের ছেড়ে থাকতে পারে না, কিন্তু আমি (স্ব-স্বরূপ) অহংকার বিনা থাকতে পারে এবং থাকেই। আমাদের স্বরূপ চিন্ময় সত্তা। এই নিত্য সত্তার কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই, কিন্তু সত্তার (স্ব-স্বরূপের) প্রয়োজন আছে সকলেরই। আমরা যদি অহং থেকে পৃথক না হয়ে অহংকাররূপই হতাম, তবে গভীর নিদ্রায় অহংকার লীন হলে আমরাও থাকতাম না। সুতরাং অহংকার ব্যতীতও আমাদের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। জাগ্রত এবং স্বপ্নে অহং প্রকটিত থাকে, সুষুপ্তিতে অহং লীন হয়ে যায়, কিন্তু আমি (স্ব-স্বরূপ) নিত্য নিরন্তর বিরাজমান। যা প্রকট ও লীন হয় না, সেটিই হল আমাদের স্বরূপ।

কামনা ত্যাগ হলেও শরীর নির্বাহের জন্য কিছু কিছু বস্তু, ব্যক্তি, পদার্থ ইত্যাদির প্রয়োজন থেকে যায়, যাকে বলা হয় **'স্পৃহা'**। স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষদের শরীর নির্বাহের প্রয়োজনীয়তা তো দূরের কথা শরীরেও প্রয়োজন থাকে না। কেননা শরীরের প্রয়োজনই মানুষকে পরাধীন করে দেয়। প্রয়োজনীয়তা তখনই দেখা দেয় যখন মানুষ সেই বস্তুকে স্বীকার করে নেয় যা স্বরূপতঃ তার নয়। কর্মযোগী কোনো বস্তুকেই নিজের এবং নিজের জন্য বলে মনে করেন না, তিনি সেগুলি জগৎ এবং জগতেরই জন্য বলে মনে করেন। তাই তাঁর কোনো বস্তুরই প্রয়োজন থাকে না।

'কামনা' এবং 'স্পৃহা'— এই দুটি ত্যাগ করার তাৎপর্য হল যে বস্তুর কামনাও যেন না থাকে এবং নির্বাহের জন্য কামনাও (শরীরের প্রয়োজন) না থাকে। কারণ নির্বাহের জন্য কামনাও সুখভোগ। শুধু তাই নয়, শান্তি-মুক্তি-তত্ত্বজ্ঞান ইত্যাদি প্রাপ্ত করার ইচ্ছাও কামনা। সুতরাং যথার্থ নিষ্কামভাবে মুক্তিরও কামনা করা হয় না।

এই শ্লোকে অপরা-প্রকৃতির নিষেধ আছে। জীব অহংকারবশতঃ অপরা-প্রকৃতিকে (জগৎকে) ধারণ করেছে— **'যযেদং ধার্যতে জগৎ'** (গীতা ৭।৫)। সুতরাং নিরহংকার হলে অপরা-প্রকৃতির নিষেধ (সম্পর্কবিচ্ছিন্ন) হয় এবং জীব জন্ম-মৃত্যুরূপ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়। সবকিছু ত্যাগ হলেও অহংকার থেকে যায় কিন্তু অহংকার ত্যাগ হলেই সবকিছু ত্যাগ হয়।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—কামনা, বাসনা, মমতা এবং অহংবোধরহিত হলে তাঁর কী স্থিতি হয়—পরবর্তী শ্লোকে তারই বর্ণনা করে এই বিষয়ের উপসংহার করছেন।

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২ ॥

[**পার্থ** (হে পৃথানন্দন!) ; **এষা** (ইহাই) ; **ব্রাহ্মী, স্থিতিঃ** (ব্রাহ্মীস্থিতি) ; **এনাম্, প্রাপ্য** (এই অবস্থা প্রাপ্ত হলে) ; **ন, বিমুহ্যতি** (মোহগ্রস্ত হয় না) ; **অন্তকালে, অপি** (মৃত্যুকালেও যদি) ; **অস্যাম** (এই অবস্থায়) ; **স্থিত্বা** (স্থিতি থাকে) ; **ব্রহ্মনির্বাণম্** (নির্বাণ) ; **ঋচ্ছতি** (লাভ ঘটে।)]

হে পৃথানন্দন! একেই বলা হয় ব্রাহ্মীস্থিতি (ব্রহ্মজ্ঞানে অবস্থিতি)। জীবের এই অবস্থাপ্রাপ্তি হলে তিনি কখনো আর মোহগ্রস্ত হন না। মৃত্যুকালেও যদি এই অবস্থায় স্থিত হন, তাহলে নির্বাণ লাভ হয় অর্থাৎ তাঁর ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় ॥ ৭২ ॥

ব্যাখ্যা—**'এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ'**—এই হল ব্রাহ্মী-স্থিতি অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্ত মানুষের স্থিতি। অহংবোধরহিত হলে যখন কর্তৃত্বভাব দূর হয়, তখন স্বতঃই ব্রহ্মে স্থিতি হয়। কারণ সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক থাকলেই অহংভাব থাকে। সেই সম্পর্ক চিরকালের মতো ত্যাগ করলে যোগীর কোনো ব্যক্তিগত স্থিতি থাকে না।

অতি নিকটের বাচক হওয়ায় এখানে **'এষা'** পদটি পূর্বশ্লোকে বর্ণিত **'বিহায় কামান্'**, **'নিঃস্পৃহঃ'**, **'নির্মমঃ'**

এবং **'নিরহঙ্কারঃ'** পদগুলিকে লক্ষ্য করায়।

ভগবানের শ্রীমুখ নিঃসৃত—'তোমার বুদ্ধি যখন মোহকর্দম এবং নানা কথায় বিক্ষিপ্ত না হবে, তখন তুমি যোগপ্রাপ্ত হবে'—এই বাক্য শুনে অর্জুনের মনে প্রশ্ন জেগেছিল যে সেই স্থিতি কীরূপ হয় ? তাই তিনি স্থিতপ্রজ্ঞের বিষয়ে চারটি প্রশ্ন করেছিলেন। সেই চারটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ভগবান এইস্থানে বলেছেন যে সেই স্থিতিকে ব্রাহ্মীস্থিতি বলা হয়। অর্থাৎ সেটি কোনো ব্যক্তিগত স্থিতি নয়, এতে কোন অহংভাব থাকে না। এটি নিত্যযোগের প্রাপ্তি, তাতে একটিমাত্র তত্ত্বই থাকে। সেই বিষয়ের দিকে লক্ষ করাবার জন্যই এখানে **'পার্থ'** সম্বোধন করা হয়েছে।

'নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি'—শরীরে যতক্ষণ অহংভাব থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত মোহগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যখন অহংভাব সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে ব্রহ্মে স্থিতি অনুভূত হয় তখন অহংবোধ নষ্ট হওয়ায় আর কখনো মোহগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

সৎ এবং অসৎকে ঠিকভাবে না জানাই হচ্ছে মোহ। তাৎপর্য হল যে, স্বয়ং সৎ হয়েও অসতের সঙ্গে নিজের একাত্মতা মানতে থাকাই হল মোহ। সাধক যখন অসৎকে সম্যক্‌রূপে জেনে নেন, তখন তাঁর অসতের থেকে সম্পর্কছেদ হয়[১] এবং সৎ-এ নিজ-প্রকৃত-স্থিতি অনুভূত হয়। এই স্থিতি অনুভূত হলে আর কখনো মোহগ্রস্ত হতে হয় না (গীতা ৪।৩৫)।

'স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি'—এই মনুষ্যদেহ লাভ হয়েছে কেবলমাত্র পরমাত্মপ্রাপ্তির জন্যই। তাই ভগবান, অত্যন্ত সাধারণ এবং অতি পাপীব্যক্তিদেরও সুযোগ দিয়েছেন যে, যদি তারা মৃত্যুকালেও পরমাত্মাতে নিজ স্থিতি করে অর্থাৎ জড়ত্বের থেকে সম্পর্ক ছেদ করে নেয়, তাহলে তারাও ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করে জন্ম-মৃত্যু চক্র থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে। এই কথাই ভগবান সপ্তম অধ্যায়ের ত্রিশতম শ্লোকেও এইভাবে বলেছেন, 'অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞ সবই এক ভগবান— মৃত্যুকালেও যে ব্যক্তি আমাকে এইভাবে জানেন, তিনিই আমাকে যথার্থরূপে জানতে পারেন অর্থাৎ আমাকেই প্রাপ্ত হন।' অষ্টম অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকেও বলেছেন, 'মৃত্যুর সময়ে যিনি আমাকে স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করেন, তিনি যে আমাকেই প্রাপ্ত হন, তাতে কোনো সংশয়ই নেই।'

দ্বিতীয়ত—উল্লিখিত পদটির দ্বারা ভগবান সেই ব্রাহ্মীস্থিতির এই মহিমা বর্ণনা করছেন যে, মৃত্যুকালেও কেউ যদি এতে স্থিত হন, তবে তিনি নির্বাণ ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন। সমবুদ্ধির বিষয়ে যেমন ভগবান জানিয়েছেন যে এর অল্প অনুষ্ঠানও মহাভয় হতে রক্ষা করে (২।৪০), তেমনি এখানেও জানিয়েছেন যে মৃত্যুকালেও যদি ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ হয়, জড়ত্ব থেকে সম্পর্ক ছেদ হয় তাহলে নির্বাণস্বরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। এই স্থিতি অনুভূত হওয়ার পথে জড়ত্বের প্রতি অনুরাগই হল একমাত্র বাধা। মৃত্যুকালেও যদি কেউ আসক্তি ত্যাগ করেন তাহলে তৎকালে তাঁর নিজ স্বতঃসিদ্ধ বাস্তবিক স্থিতি অনুভূত হয়।

এখানে একটি সংশয় আসতে পারে যে, সমস্ত জীবন ধরে যে অনুভূতি হয়নি, মৃত্যুকালে তা কেমন করে হবে? অর্থাৎ সুস্থ অবস্থায় সাধকের বুদ্ধিও সুস্থ থাকে, বিচার করার ক্ষমতা থাকে, সাবধানতা থাকে, তবেই ব্রাহ্মীস্থিতি অনুভব করা সহজ হয়। কিন্তু মৃত্যুকালে, দেহত্যাগের সময় বুদ্ধি বিকল হয়, সাবধানতা থাকে না—এইরূপ অবস্থায় ব্রাহ্মীস্থিতির অনুভব কী করে সম্ভব ? এর উত্তর হল এই যে, মৃত্যুকালে, প্রাণত্যাগের সময় শরীরাদি থেকে যখন স্বতঃই সম্পর্ক ছেদ হতে থাকে, সেই সময় যদি স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্বের দিকে দৃষ্টি রাখা যায় তাহলে সহজে তার অনুভব হতে পারে। কারণ নির্বিকল্প অবস্থাপ্রাপ্তিতে বুদ্ধি, বিবেক ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা থাকে কিন্তু সর্ব অবস্থাতীত তত্ত্বপ্রাপ্তিতে শুধুমাত্র লক্ষ্যের প্রয়োজন হয়[২]। সেই লক্ষ্যে পূর্বের অভ্যাস থেকেই হোক বা কোনো

[১] অসৎকে জানলে অসতের নিবৃত্তি হয় ; কারণ অসতের স্বাধীন সত্তাই নেই। সৎ হতেই অসৎ সত্তা লাভ করে। অসৎকে জানলেও যদি অসতের নিবৃত্তি না হয় তবে প্রকৃতপক্ষে অসৎকে জানা যায়নি, শেখা হয়েছে মাত্র। শেখা জ্ঞানের দ্বারা অসতের নিবৃত্তি হয় না ; কারণ মনে অসতের সত্তা থেকে যায়।

[২] নির্বিকল্প অবস্থার প্রাপ্তিতে অভ্যাস, বিচার, নিদিধ্যাসন ইত্যাদি কাজ করে কিন্তু নির্বিকল্পবোধের (অবস্থাতীত ব্রাহ্মী স্থিতির) প্রাপ্তিতে বুদ্ধি কোনো কাজ করে না। এতে বুদ্ধির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়। কারণ নির্বিকল্পবোধ হচ্ছে করণনিরপেক্ষ অর্থাৎ এতে করণের কোনো প্রয়োজন থাকে না। করণ থেকে সম্পর্ক-বিচ্ছেদই হল এর প্রাপ্তির কারণ।

শুভসংস্কার থেকে হোক অথবা ভগবান বা কোনো সন্ত মহাপুরুষের অহৈতুকী কৃপায় হোক, সেই লক্ষ্য হলেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি স্বতঃসিদ্ধ হয়।

এইস্থলে **'অপি'** পদটির তাৎপর্য হল এই যে, মৃত্যুকালের পূর্বে অর্থাৎ জীবিত অবস্থায় এই স্থিতি হলে জীবন্মুক্তি লাভ হয় ; কিন্তু যদি মৃত্যুকালেও এই স্থিতি লাভ হয় অর্থাৎ কেউ মমত্ববোধহীন এবং অহংকারবোধশূন্য হয় তাহলেও মুক্তিলাভ হয়। এর তাৎপর্য হল যে এটিতে তৎক্ষণাৎ স্থিতি লাভ হয়। স্থিতির জন্য অভ্যাস, ধ্যান বা সমাধির কোনো প্রয়োজন হয় না।

ভগবান এইস্থলে কর্মযোগের প্রকরণে **'ব্রহ্মনির্বাণম্'** পদটি ব্যবহার করেছেন। এর তাৎপর্য হল এই যে, সাংখ্যযোগীর যেমন **'নির্বাণ'** ব্রহ্ম লাভ হয় (গীতা ৫।২৪-২৬), কর্মযোগীরও তেমনি **'নির্বাণ'** ব্রহ্ম লাভ হয়। এই কথাটি পঞ্চম অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে বলেছেন এইভাবে যে ; সাংখ্যযোগী যে স্থান প্রাপ্ত হন, সেই স্থান কর্মযোগীও প্রাপ্ত করতে সক্ষম হন।

বিশেষ কথা

সংসারে দুটি বিভাগ রয়েছে—জড় ও চেতন। প্রাণীমাত্রেরই স্বরূপ হল চেতন, কিন্তু তা জড়ের সঙ্গে সম্বন্ধিত। জড়ত্বের দিকে আকর্ষিত হলে পতনের পথে যেতে হয় আর চিন্ময় (চিৎ-ময়)-তত্ত্বের দিকে আকর্ষণ হলে উত্থান হয়, নিজকল্যাণ হয়। জড়ত্বের পথে যাওয়ার প্রধান কারণ হল 'মোহ' এবং পরমাত্মতত্ত্ব জানার প্রধান কারণ হল 'বিবেক'।

বোঝাবার জন্য মোহ এবং বিবেকবোধকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়—১) অহং-মমত্ববোধযুক্ত মোহ এবং কামনাযুক্ত মোহ, ২) সৎ-অসৎ বিবেক এবং কর্তব্য-অকর্তব্যের বিবেকবোধ।

প্রাপ্ত বস্তু ও শরীরাদিতে অহংবোধ ও মমত্ববোধ করা—এটি হল অহং-মমত্ববোধযুক্ত মোহ ; এবং অপ্রাপ্ত বস্তু, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদি কামনা করা—এটি হল কামনাযুক্ত মোহ। শরীরী (যিনি শরীরে অবস্থান করেন) ও শরীর দুই পৃথক, শরীরী হল সৎ আর শরীর হচ্ছে অসৎ, শরীরী চেতন এবং শরীর হল জড়—এগুলি ঠিকমতো পৃথকভাবে জানাই হল সৎ-অসতের বিবেকবোধ। আর কর্তব্য কী, অকর্তব্য কী, ধর্ম কাকে বলে, অধর্মই বা কাকে বলে—এগুলি ঠিকভাবে বুঝে সেই অনুযায়ীই কর্তব্য করা এবং অকর্তব্য ত্যাগ করাই হল কর্তব্য-অকর্তব্যের বিবেকবোধ।

প্রথম অধ্যায়ে অর্জুনেরও দুই প্রকারের মোহ জন্মেছিল ; যাতে প্রাণীমাত্রেই আবদ্ধ হয়ে আছে। অহংবোধে সৃষ্ট মোহ—আমি সমস্ত দোষের কথা জানা ধর্মাত্মা এবং মমত্ববোধ সৃষ্ট মোহ—'আমার আত্মীয়রা হত হবেন', এটি হল অহং ও মমত্ববোধযুক্ত মোহ। 'আমার পাপ না হয়, কুলনাশের দোষ না স্পর্শ করে, মিত্রদ্রোহের পাপ না লাগে, নরকে যেন যেতে না হয়, পূর্বপুরুষের পতন না হয়'—এইসব হল কামনাযুক্ত মোহ।

উল্লিখিত দুই প্রকারের মোহ দূর করার জন্য ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ে দুই প্রকারের বিবেকের কথা বলেছেন—দেহী-দেহের, সৎ-অসৎ-এর বিবেক (২।১১-৩০) এবং কর্তব্য-অকর্তব্যের বিবেক (২।৩১-৫৩)।

শরীরী এবং শরীরের বিবেকের কথা বলতে গিয়ে ভগবান বলেছেন যে, 'আমি, তুমি এবং এই রাজন্যবর্গ প্রথমে ছিলাম না—এটি ঠিক নয়, পরেও থাকব না—তাও ঠিক নয়' অর্থাৎ আমরা সবাই আগেও ছিলাম, পরেও থাকব অর্থাৎ এই শরীর আগে ছিল না এবং পরেও থাকবে না এবং মধ্যকালেও প্রতিক্ষণ পরিবর্তিত হচ্ছে। যেমন দেহে বাল্য, যৌবন এবং বার্ধক্যের অবস্থা আসে, যেমন মানুষ পুরাতন বস্ত্রাদি পরিত্যাগপূর্বক নববস্ত্র পরিধান করে, জীবও তেমন পূর্বেকার শরীর পরিত্যাগ করে অন্য নূতন শরীর ধারণ করে। এটি এক অকাট্য নিয়ম। এতে চিন্তার বা শোকের কী আছে ?

কর্তব্য-অকর্তব্যের বিবেকের কথা বলতে গিয়ে ভগবান বলেছেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধের থেকে বড় কোনো ধর্ম নেই। অনায়াসে প্রাপ্ত যুদ্ধ স্বর্গলাভের পক্ষে উন্মুক্ত দ্বারস্বরূপ। যুদ্ধরূপ স্বধর্মপালন না করলে অর্জুন পাপভাগী হবেন। যদি তিনি জয়-পরাজয়, লাভ-ক্ষতি এবং সুখ-দুঃখকে সমভাবে দেখে যুদ্ধ করেন, তাহলে তাঁর পাপ হবে না। কারণ কর্তব্য-কর্মেই তোমার অধিকার আছে, ফলে কখনো নয়। তাই ভগবান বলেছেন যে, 'তুমি কর্মফলের হেতু কখনও হোয়ো না এবং কর্ম না করাতেও যেন আসক্ত হোয়ো না। সুতরাং তুমি কর্মের সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সম হয়ে এবং সমত্বে স্থিত হয়ে কর্ম

করো ; কারণ সমত্বই যোগ। যে ব্যক্তি সমবুদ্ধিযুক্ত হয়ে কর্ম করে, সে জীবিতাবস্থাতেই পাপ-পুণ্যরহিত হয়ে যায়।'

'যখন তোমার বুদ্ধি মোহরূপ পঙ্ক এবং শ্রুতিবিপ্রতিপত্তি (শাস্ত্রীয় মতভেদে বিভ্রান্তি) অতিক্রম করবে, তখনই তুমি যোগপ্রাপ্ত হবে।'

পরিশিষ্ট-ভাব— নির্মম (মমত্ববোধহীন) এবং নিরহংকার হলে সাধকের অসৎ-এর সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছেদ হয় এবং সৎ-এ অর্থাৎ ব্রহ্মতে নিজ স্বতঃ স্বাভাবিক স্থিতি অনুভূত হয়। একেই বলা হয় ব্রাহ্মীস্থিতি। এই ব্রাহ্মীস্থিতি প্রাপ্ত হলে শরীরের কোনো মালিক বা প্রভু থাকে না, অর্থাৎ শরীরকে 'আমি' 'আমার' বলার কেউ থাকে না, ব্যক্তিত্বভাব দূর হয়। অর্থাৎ আমাদের স্থিতি অহংকারের আশ্রিত নয়। অহংকার দূর হলেও আমাদের স্থিতি বজায় থাকে, যাকে বলা হয় 'ব্রাহ্মীস্থিতি'। একবার এই ব্রাহ্মীস্থিতি (নিত্যযোগ) অনুভূত হলে আর কখনো মোহ আসে না (গীতা ৪।৩৫)। যদি মৃত্যুর সময়েও মানুষ নির্মম ও নিরহংকার হয়ে ব্রাহ্মীস্থিতি অনুভব করে, তাহলে তার তখনই নির্বাণ ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়।

নির্মম নিরহংকার হলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি এবং তত্ত্বজ্ঞান হয়। তখন মানুষ মমত্বরহিত, কামনারহিত এবং কর্তৃত্বরহিত হয়ে যায়। কারণ জীব অহং-এর জন্যই জগৎ ধারণ করেছে— **'অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে'** (গীতা ৩।২৭), **'জীবভূতাং মহাবাহো যযেদং ধার্যতে জগৎ'** (গীতা ৭।৫)। মানুষ যদি অহং পরিত্যাগ করে তাহলে জগৎ থাকে না। ব্রহ্মপ্রাপ্তি হলে (যদি ভক্তির সংস্কার থাকে তাহলে) স্বতঃই যথার্থ পরমাত্মাপ্রাপ্তি হয়, কারণ সমগ্র পরমাত্মা ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা।

আমার কিছু নেই— একথা স্বীকার করলে মানুষ 'নির্মম' (মমত্ববোধহীন) হয়ে যায়, আমার কিছু চাই না— এটি স্বীকার করলে সে 'নিষ্কাম' হয়ে যায়। আমার নিজের জন্য কিছু করার নেই— একথা স্বীকার করে নিলে মানুষ 'নিরহংকার' হয়।

※ ※ ※

ওঁ তৎ সৎ ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে সাংখ্যযোগো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

এইভাবে ওঁ, তৎ, সৎ এই ভগবৎ নাম উচ্চারণপূর্বক ব্রহ্মবিদ্যা এবং যোগশাস্ত্রময় শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতোপনিষদ্‌রূপ শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে 'সাংখ্যযোগ' নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ হল।। ২ ॥

কর্মযোগ, সাংখ্যযোগ, ভক্তিযোগ ইত্যাদি সমস্ত সাধনগুলির মধ্যে বিবেকবোধের অত্যন্ত প্রয়োজন। সাংখ্যযোগে এই বিবেকবোধের প্রাধান্য থাকে এবং ভগবান সাংখ্যযোগ দ্বারাই তাঁর উপদেশ আরম্ভ করেছেন ; সুতরাং এই অধ্যায়টির নাম রাখা হয়েছে **'সাংখ্যযোগ'**।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের পদ, অক্ষর এবং উবাচ ঃ

১) এই অধ্যায়ে **'অথ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ'**-এর তিন, **'সঞ্জয় উবাচ'**, **'শ্রীভগবানুবাচ'** ইত্যাদি পদগুলির চোদ্দো, শ্লোকগুলির ন'শো সাতান্ন এবং পুষ্পিকার তেরোটি পদ আছে। এইভাবে সম্পূর্ণ পদগুলির যোগফল হল নয়শত সাতাশি।

২) এই অধ্যায়ে **'অথ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ'**-এর সাত, **'সঞ্জয় উবাচ'**, **'শ্রীভগবানুবাচ'** ইত্যাদি পদের পঁয়তাল্লিশ, শ্লোকগুলির দু'হাজার চারশো তিনটি এবং পুষ্পিকাতে পঁয়তাল্লিশটি অক্ষর আছে। এইভাবে সমস্ত অক্ষরগুলির যোগফল হল দু'হাজার পাঁচশো। এই অধ্যায়ের বাহাত্তরটি শ্লোকের মধ্যে পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম, বিশতম, বাইশতম এবং সত্তরতম—এই ছয়টি শ্লোক চুয়াল্লিশ অক্ষরে গঠিত, ষষ্ঠ শ্লোকটি ছেচল্লিশ অক্ষরে এবং উনত্রিশতম শ্লোকটি পঁয়তাল্লিশটি অক্ষরে রচিত। অন্য চৌষট্টিটি শ্লোক বত্রিশ অক্ষরে রচিত।

৩) এই অধ্যায়ে সাতটি উবাচ আছে—দুটি **'সঞ্জয় উবাচ'**, তিনটি **'শ্রীভগবানুবাচ'** এবং দুটি **'অর্জুন উবাচ'**।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রযুক্ত ছন্দ

এই অধ্যায়ের বাহাত্তরটি শ্লোকের মধ্যে পঞ্চম, ষষ্ঠ,

সপ্তম, অষ্টম, বিশতম, বাইশতম, উনত্রিশতম এবং সত্তরতম—এই আটটি শ্লোক **'উপজাতি'** ছন্দযুক্ত। দ্বিতীয় অধ্যায়ের বাহান্নতম এবং সাতষট্টিতম শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে **'নগণ'** প্রযুক্ত হওয়ায় **'ন-বিপুলা'** ; দ্বাদশ, ছাব্বিশ এবং বত্রিশতম শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে এবং একষট্টি এবং তেষট্টিতম শ্লোকের তৃতীয় পংক্তিতে **'রগণ'** প্রযুক্ত হওয়ায় **'র-বিপুলা'**, ছত্রিশ এবং ছাপান্নতম শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে **'ভগণ'** প্রযুক্ত হওয়ায় **'ভ-বিপুলা'** ; একাত্তরতম শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে এবং একত্রিশতম শ্লোকের তৃতীয় পংক্তিতে **'মগণ'** প্রযুক্ত হওয়ায় **'ম-বিপুলা'** ; ছেচল্লিশতম শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে **'সগন'** প্রযুক্ত হওয়ায় **'স-বিপুলা'** ; পঁয়ত্রিশতম শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পংক্তিতে **'নগণ'** প্রযুক্ত হওয়ায় **'জাতিপক্ষ বিপুলা'** ; এবং সাতচল্লিশতম শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে **'ভগণ'** এবং তৃতীয় পংক্তিতে **'নগণ'** প্রযুক্ত হওয়ায় **'সংকীর্ণ-বিপুলা'** সংজ্ঞাযুক্ত ছন্দ আছে। শেষ উনপঞ্চাশটি শ্লোক **'পথ্যাবক্ত্র'** অনুষ্টুপ ছন্দের লক্ষণ দ্বারা যুক্ত।

※ ※ ※

॥ ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

অথ তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

তৃতীয় অধ্যায়

অবতরণিকা

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার উপদেশ সকল মানুষের অভিজ্ঞতার উপর আধারিত। এর দিব্য উপদেশের (২।১১ থেকে) প্রারম্ভেই সর্বপ্রথম ভগবান এটি স্পষ্ট করেছেন যে শরীর এবং শরীরী একটি অপরটির থেকে সর্বতোভাবে পৃথক। শরীর অনিত্য, অসৎ, একদেশীয় এবং বিনাশশীল এবং শরীরী নিত্য, সৎ, সর্বব্যাপী এবং অবিনাশী। সুতরাং বিনাশশীল বস্তুর বিনাশ দেখে দুঃখী না হওয়া এবং অবিনাশী বস্তুর অবিনাশিত্ব দেখে সেটি ধরে রাখার প্রয়াস না করাকে 'বিবেক' বলা হয়। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ—এই তিনটি যোগমার্গেই বিবেকের অত্যন্ত প্রয়োজন থাকে। 'আমি শরীর থেকে সর্বতোভাবে পৃথক'—এরূপ বিবেকবোধ জাগলেই মুক্তির ইচ্ছা জাগ্রত হয়। মুক্তির কথা দূরে থাক, স্বর্গপ্রাপ্তির কামনাও, নিজেকে শরীর থেকে পৃথক ভাবলে তবেই উৎপন্ন হওয়া সম্ভব। সেইজন্য ভগবান তাঁর উপদেশ শুরু করেই সর্বপ্রথম বিবেক নিয়ে আলোচনা করেছেন।

গীতায় এই বিবেকের প্রকরণ দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশ শ্লোক থেকে শুরু হয়ে ত্রিশতম শ্লোকে শেষ হয়েছে। বিবেকের এই প্রকরণে ভগবান আত্মা, অনাত্মা, প্রকৃতি, পুরুষ, ব্রহ্ম, অবিদ্যা, ঈশ্বর, জীব, জগৎ, মায়া ইত্যাদি কোনো দার্শনিক শব্দ ব্যবহার করেননি, বরং যাতে সকল ব্যক্তি সহজ ভাবে বুঝতে পারে, তেমনভাবে ভগবান এর বর্ণনা করেছেন। এর অর্থ হল এই যে, মানুষমাত্রেই পরমাত্মপ্রাপ্তির অধিকারী, কারণ এই মনুষ্যদেহ পরমাত্মপ্রাপ্তির জন্যই লাভ হয়েছে। সুতরাং উল্লিখিত বিবেককে গুরুত্ব দিলে মনুষ্যমাত্রেই পরমাত্মপ্রাপ্তি করতে সক্ষম হয়।

এই প্রকরণে ভগবান 'বুদ্ধি' শব্দটিও ব্যবহার করেননি। বাস্তবে নিত্য এবং অনিত্য, সৎ এবং অসৎ, অবিনাশী এবং বিনাশী, শরীরী এবং শরীরকে পৃথকভাবে বোঝবার জন্য 'বিবেকবোধেরই' প্রয়োজন, 'বুদ্ধি'র নয়। বিবেক বুদ্ধির থেকে শ্রেষ্ঠ। যেমন প্রকৃতি ও পুরুষ হল অনাদি (গীতা ১৩।১৯), তেমনি তার বিভিন্নতা প্রকাশকারী বিবেকও অনাদি। এই বিবেক বুদ্ধিতে প্রকটিত হয়। ভগবৎপ্রদত্ত এই বিবেক প্রাণীমাত্রেরই নিত্যপ্রাপ্ত। পশু-পক্ষীও খাদ্য-অখাদ্য পদার্থের ভিন্নতা জানে। লতা-বৃক্ষাদিতেও শীত-গ্রীষ্ম, অনুকূল-প্রতিকূল প্রভৃতির ভিন্নতার জ্ঞান থাকে। বুদ্ধিপ্রধান হওয়ায় মানুষ এই বিবেক বিশেষভাবে প্রাপ্ত। পশু-পক্ষীর মধ্যে শুধুমাত্র জীবন-নির্বাহের প্রয়োজনে জড় পদার্থের বিবেক থাকে। কিন্তু মানুষ তার বিবেক দ্বারা জন্ম-মরণরূপ বন্ধন হতে চিরদিনের মতো মুক্ত হয়ে শাশ্বত শান্তি প্রাপ্ত করতে সক্ষম হয়। এই হল মানুষের বিবেকের বিশেষত্ব।

বিবেক জাগ্রত হলে অর্থাৎ শরীর ও শরীরীর পার্থক্য বোধগম্য হলে নিজের বলে অনুভূত শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি সহ সমস্ত জগৎ-সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ চিরকালের মতো বিচ্ছেদ ঘটে যা শাশ্বত এবং বুদ্ধি শুদ্ধতা অর্থাৎ সমত্ব লাভ করে অর্থাৎ বুদ্ধির বিষমভাব দূর হয়।

কর্মযোগে বুদ্ধির একনিশ্চয়তার প্রাধান্য থাকে—**'ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ'** (গীতা ২।৪১)[১]। মানুষের যখন নিজ কল্যাণ অথবা পরমাত্মপ্রাপ্তিই একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে, তখন অনুকূলতা বা প্রতিকূলতা তার প্রতিবন্ধক হতে পারে না এবং কোনো সাধন ব্যতিরেকেই তার বুদ্ধি সমত্ব লাভ করতে থাকে। বুদ্ধিকে সম করার জন্য ততক্ষণই চেষ্টা করতে হয়, ততক্ষণ বুদ্ধিতে জগৎ-সংসারের গুরুত্ব, আকর্ষণ, আসক্তি থাকে। এক নিশ্চয়াত্মিকা

---

[১] সাংখ্যযোগে বিবেকের, ভক্তিযোগে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের এবং কর্মযোগে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির প্রাধান্য থাকে। কর্মযোগে বিবেক বা শ্রদ্ধা-বিশ্বাস যে থাকে না—তা নয় ; কিন্তু নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির প্রাধান্যই পরিলক্ষিত হয়। এইরূপ সাংখ্যযোগ ও ভক্তিযোগেও একনিশ্চয়াত্মিক বুদ্ধি দেখা যায়।

বুদ্ধি হলে সংসারের গুরুত্ব, আকর্ষণ ও আসক্তি স্বতঃই দূর হতে থাকে। ভোগ এবং সম্পদ সংগ্রহ এই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি লাভের পথে বিরাট বাধাস্বরূপ বলে কথিত আছে (গীতা ২।৪৪)।

*এইরূপ কর্মযোগে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি অত্যন্ত আবশ্যক বলার পর ভগবান অর্জুনকে সমভাবাপন্ন হয়ে কর্তব্যকর্ম করতে বিশেষভাবে আহ্বান করেছেন ; যেমন—**'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে'** (২।৪৭), **'যোগস্থঃ কুরুকর্মাণি'** (২।৪৮) 'কর্ম করাতেই তোমার অধিকার, সমত্বে স্থিত হয়ে তুমি কর্ম করো।' এর সঙ্গে আরও বলেছেন যে **'দূরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাৎ'** (২।৪৯) 'সকামকর্ম বুদ্ধিযোগের (সমত্ব) থেকে অনেক তুচ্ছ', পরে বলেছেন **'বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ'** (২।৪৯), **'বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে। তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্॥'** (২।৫০) 'তুমি সমবুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করো', সমত্ববুদ্ধিযুক্ত পুরুষ পাপ ও পুণ্য—উভয়ই জীবিতাবস্থায় ত্যাগ করে, সুতরাং তুমি সমত্ব লাভের চেষ্টা করো, কারণ সমতাই হল কর্মের কৌশল।*

*অর্জুনের মনে আগে থেকেই যুদ্ধ না করার ইচ্ছা ছিল। প্রথম অধ্যায়ের একত্রিশতম শ্লোকে অর্জুন বলেছেন, 'যুদ্ধে স্বজনদের নিহত করে কোনো শ্রেয় (কল্যাণ) আমি দেখতে পাচ্ছি না'—**'ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।'** আবার পঁয়তাল্লিশতম শ্লোকে তিনি বলেছেন,—'হায় ! এটি অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে বুদ্ধিমান হয়েও আমরা যুদ্ধের মতো ভয়ানক পাপ করতে প্রবৃত্ত হয়েছি'—**'অহো বত মহৎ পাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়ম্'**। পরে দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে অর্জুন বলেছেন যে, 'যুদ্ধ করার চেয়ে আমি ভিক্ষান্ন গ্রহণও শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি'—**'শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে'** এবং নবম শ্লোকে ভগবানের নির্দেশের **'উত্তিষ্ঠ পরন্তপ'** (২।৩) বিরুদ্ধে নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন যে 'আমি যুদ্ধ করব না'—**'ন যোৎস্যে'** (২।৯)।*

সাধারণ নিয়ম এই যে শ্রোতা আগে থেকেই নিজের মত নির্ধারিত করে রেখে যদি বক্তার মতামত শ্রবণ করে, তাহলে সে বক্তার কথা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারে না। এরই ফলে, অর্জুন আগে থেকেই (যুদ্ধ না করার) আগ্রহ রেখে (উপরিউক্ত প্রকরণে উল্লিখিত) ভগবানের কথা শুনেও তার মর্ম উপলব্ধি করতে পারেননি অর্থাৎ কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ—উভয়েরই প্রশংসা শুনে অর্জুন তাঁর পক্ষে কোন সাধন-পথ উপযুক্ত এটি ঠিক অনুধাবন করতে না পেরে পরবর্তী শ্লোকে ভগবানকে প্রশ্ন করেছেন।

অর্জুন উবাচ

জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দন।
তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব॥ ১ ॥
ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্॥ ২ ॥

[**জনার্দন** (হে জনার্দন !) ; **চেৎ, তে** (যদি আপনি) ; **কর্মণঃ** (কর্ম থেকে) ; **বুদ্ধিঃ** (বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞানকে) ; **জ্যায়সী, মতা** (শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন) ; **তৎ** (তাহলে) ; **কেশব** (হে কেশব !) ; **মাম্** (আমাকে) ; **ঘোরে, কর্মণি** (এই ঘোর কর্মে) ; **কিম্** (কেন) ; **নিয়োজয়সি** (নিযুক্ত করছেন ?) ; **ব্যামিশ্রেণ, ইব** (এই মিশ্রিত) ; **বাক্যেন** (বচন দ্বারা) ; **মে, বুদ্ধিম্** (আমার বুদ্ধিকে) ; **মোহয়সি, ইব** (যেন মোহিত করছেন) ; **নিশ্চিত্য** (নিশ্চিত করে) ; **তৎ, একম্** (এমন কথা) ; **বদ** (বলুন) ; **যেন, অহম্** (যাতে আমি) ; **শ্রেয়ঃ** (কল্যাণ) ; **আপ্নুয়াম্** (লাভ করতে সক্ষম হই।)]

অর্জুন বললেন, হে জনার্দন ! যদি আপনি কর্ম থেকে বুদ্ধিকে (জ্ঞান) শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন, তাহলে হে কেশব ! আমাকে এই ঘোর কর্মে কেন নিযুক্ত করছেন ? আপনি আপনার এই বিমিশ্র বচন দ্বারা কেন আমার

বুদ্ধিকে মোহিত করছেন ? সুতরাং আপনি নিশ্চিত করে আমায় এমন কথা বলুন যার দ্বারা আমি কল্যাণ লাভ করতে সক্ষম হই ॥ ১-২ ॥

ব্যাখ্যা—'**জনার্দন**'—এই পদটির দ্বারা অর্জুন এই ভাব প্রকটিত করছেন যে, 'হে শ্রীকৃষ্ণ ! আপনি সবার মনস্কামনা পূরণকারী, সুতরাং আমার মনস্কামনা তো নিশ্চয়ই পূরণ করবেন।'

'**জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে .... নিয়োজয়সি কেশব**'—মানুষের স্বভাবের একটি দুর্বলতা এই যে, সে প্রশ্ন করে তার উত্তরে বক্তার কাছে নিজের কথার বা সিদ্ধান্তের সমর্থনই পেতে চায়। একে দুর্বলতা এই জন্য বলা হয়েছে যে, বক্তার নির্দেশ অনুকূল অথবা প্রতিকূল যাই হোক, ঠিকভাবে পালন করাই হল শৌর্য। তাছাড়া আর সবকিছুকেই কাপুরুষতা বলা যায়। এই দুর্বলতার জন্যই মানুষ প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হলে অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে। যখন সে প্রতিকূলতার কষ্ট সহ্য করতে পারে না তখন সে ভালোত্বের অজুহাতে অর্থাৎ তখন ভালোর ছদ্মবেশে মন্দগুলি আসে। মন্দগুলি যখন সুন্দরের রূপ ধরে আসে, তখন তা পরিত্যাগ করা কঠিন হয়। এইস্থানে অর্জুনের মনেও হিংসাত্যাগরূপী ভালোর সাজে কর্তব্য-ত্যাগরূপ মন্দ চিন্তা এসেছিল। সেইজন্য তিনি কর্তব্যকর্ম থেকে জ্ঞানকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেছিলেন। তাই তিনি এখানে প্রশ্ন করেছেন যে, 'আপনি যদি কর্ম হতে জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন, তাহলে আমাকে যুদ্ধরূপ ঘোর কর্মে কেন নিয়োজিত করছেন ?'

ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ের উনচল্লিশতম শ্লোকে '**বুদ্ধির্যোগে**' পদটিতে সমবুদ্ধির (সমত্ব-এর) কথা বলেছেন। কিন্তু অর্জুন এটিকে জ্ঞান বলে মনে করেছিলেন। তাই তিনি ভগবানকে বলেছেন, 'হে জনার্দন ! আপনি প্রথমে 'সাংখ্য'-এ এই বুদ্ধির কথা বলেছেন এবং এটিকেই আমাকে যোগ-বিষয়ে অনুধ্যান করতে বলেছিলেন। এরূপ বুদ্ধিযুক্ত হলে আমারও কর্মবন্ধন মুক্ত হবার কথা জানিয়েছিলেন। কিন্তু কর্মবন্ধন হতে তখনই মুক্তি হয় যখন জ্ঞান হয়। আপনি আরও বলেছিলেন যে, বুদ্ধিযোগ অর্থাৎ জ্ঞান হতে কর্ম অত্যন্ত নিকৃষ্ট (২।৪৯)। যদি আপনার মতে কর্ম হতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ বা উত্তম হয় তাহলে আমাকে শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞ, দান, তপস্যা ইত্যাদি শুভকর্মে প্রবৃত্ত করানো উচিত নয়, শুধুমাত্র জ্ঞানেই প্রবৃত্ত করানো উচিত। কিন্তু তা না করে আপনি এর বিপরীতধর্মী কর্ম অর্থাৎ যুদ্ধের মতো অতি ক্রূর ব্যাপার, যাতে কেবল মনুষ্য নিধন করতে হয়, সেইরূপ কর্মে কেন নিয়োগ করছেন ?'

অর্জুনের মনে প্রথমে যুদ্ধ করার উৎসাহ ছিল এবং সেই উৎসাহবশেই তিনি ভগবানকে বলেছিলেন, 'হে অচ্যুত ! দুইপক্ষের সৈন্যদলের মধ্যে এমন স্থানে রথটিকে স্থাপন করুন যাতে কারা আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছে, তা যেন আমি দেখতে পাই।' কিন্তু ভগবান দুইপক্ষের সৈন্যের মধ্যস্থলে ভীষ্ম ও দ্রোণের রথের সম্মুখে এবং অন্যান্য রাজন্যবর্গের সামনে রথ স্থাপন করে যেই বললেন যে, 'তুমি এই কুরুবংশীয়দের দেখ', তখনই অর্জুনের মনে কৌটুম্বিক মোহ জেগে উঠল। মোহ জাগ্রত হওয়ার ফলে অর্জুনের মনোভাব যুদ্ধ অর্থাৎ কর্ম হতে নিবৃত্ত হয়ে জ্ঞানের পথে জেগে উঠল। কারণ জ্ঞানমার্গে যুদ্ধের মতো নিষ্ঠুর কর্ম আবশ্যক হয় না। তাই অর্জুনের জিজ্ঞাসা যে, ভগবান কেন তাঁকে এই নিষ্ঠুর কর্মে প্রবৃত্ত করছেন ?

এখানে '**বুদ্ধিঃ**' পদটির অর্থ হিসাবে জ্ঞানকে ধরা হয়েছে। এইস্থানে '**বুদ্ধিঃ**' পদটির অর্থ যদি '**সমবুদ্ধি**' (সমত্ব) ধরা হয় তাহলে বিমিশ্র বচন সিদ্ধ হয় না। কারণ দ্বিতীয় অধ্যায়ের আটচল্লিশতম শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে যোগে (সমত্বে) স্থিত হয়ে কর্ম করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। বিমিশ্র বচন তখনই প্রমাণিত হয় যখন অর্জুনের ধারণায় দুটি বিষয় থাকে আর তখন এই প্রশ্ন আসে, 'যদি আপনার মতে কর্ম হতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ হয়, তাহলে আমাকে কেন এই নিষ্ঠুর কর্মে নিয়োজিত করছেন ?' দ্বিতীয়তঃ ভগবান প্রথমে অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে দুটি নিষ্ঠার কথা জানিয়েছিলেন—জ্ঞানীদের জ্ঞানযোগে নিষ্ঠা এবং যোগীদের কর্মযোগে নিষ্ঠা। এতেও অর্জুনের প্রশ্নে '**বুদ্ধিঃ**' পদটির অর্থ '**জ্ঞান**'কে গ্রহণ করাই যুক্তিসংগত মনে হয়।

যে কোনো সাধক শ্রদ্ধাপূর্ণভাবে প্রশ্ন করলে তবেই প্রশ্নের সঠিক উত্তর পেতে পারেন। আক্ষেপপূর্বক আশঙ্কা করলে সঠিক উত্তর পাওয়া সম্ভব নয়। ভগবানের ওপর

অর্জুনের পূর্ণ শ্রদ্ধা ছিল। তাই ভগবান নির্দেশ করলে অর্জুন যে নিজ কল্যাণের জন্য যুদ্ধরূপ নিষ্ঠুর কর্মেও প্রবৃত্ত হতে পারেন—তাঁর প্রশ্নে এরূপ ভাবই প্রকটিত হয়েছে।

'ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে'—এই পদটির দ্বারা অর্জুনের এই ভাব প্রকটিত হয় যে, 'কখনো আপনি বলছেন যে কর্ম করো'—**'কুরু কর্মাণি'** (২।৪৮) আবার কখনো বলছেন যে জ্ঞানের আশ্রয় নাও—**'বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ'** (২।৪৯)। আপনার এই বিমিশ্র বচনে আমার বুদ্ধি মোহগ্রস্ত হচ্ছে অর্থাৎ আমি স্পষ্টরূপে বুঝতে পারছি না আমার কর্ম করা উচিত, না জ্ঞানের আশ্রয় নেওয়া উচিত।

এখানে দুবার 'ইব' পদের প্রয়োগ দ্বারা ভগবানের ওপর অর্জুনের শ্রদ্ধার প্রকাশ বোঝানো হয়েছে। শ্রদ্ধার জন্যই অর্জুন ভগবানের উক্তি ঠিক বলে মেনে নিয়েছেন এবং বুঝেছেন যে ভগবান তাঁর বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করছেন না। কিন্তু ভগবানের উক্তি ঠিকমতো অনুধাবন করতে না পারায় অর্জুনের মনে হয়েছে যে ভগবানের কথাগুলি মিশ্রিত এবং তাঁর এও মনে হয়েছে যে, যেন ভগবান বচন দ্বারা তাঁর বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করছেন। কিন্তু ভগবানই যদি অর্জুনের বুদ্ধি মোহাচ্ছন্ন করেন তবে সেই মোহ দূর করবে কে?

'তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্'—আমার কল্যাণ কর্ম করলে হবে, না জ্ঞানের দ্বারা হবে—আপনি যে কোনো একটিকে নিশ্চিত করে বলুন, যার দ্বারা আমার কল্যাণ সাধিত হয়। আমি আগেও আপনাকে বলেছি যে, নিশ্চিতরূপে যাতে আমার কল্যাণ হয়, আমাকে তাই বলুন—**'যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে'** (২।৭), এখনও আমি সেই কথাই বলছি।

পরিশিষ্ট-ভাব— জগতের অস্তিত্ব যতক্ষণ মেনে নেওয়া হয়, ততক্ষণ কর্মকে ভয়ানক অথবা সুন্দর বলে মনে হয়। কারণ জগৎকে অস্তিত্ব বলে ধরে নিলে কর্মের দিকে দৃষ্টি থাকে, নিজ কর্তব্যের দিকে নয়। কর্তব্যের দিকে দৃষ্টি থাকলে কর্মকে ভয়ানক বা সুন্দর বলে মনে হয় না।

* * *

সম্বন্ধ—এবার পরবর্তী তিনটি (তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম) শ্লোকে ভগবান অর্জুনের ***'ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন'*** *(মিশ্রিত বচনের) পদের উত্তর দিচ্ছেন।*

শ্রীভগবানুবাচ

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্॥ ৩ ॥

[**অনঘ** (হে নিষ্পাপ অর্জুন!) ; **অস্মিন্, লোকে** (এই মনুষ্যলোকে) ; **দ্বিবিধা** (দুই প্রকারের) ; **নিষ্ঠা** (নিষ্ঠা আছে) ; **ময়া, পুরা** (আমি আগেই) ; **প্রোক্তা** (বলেছি) ; **সাংখ্যানাম্** (জ্ঞানীদের) ; **জ্ঞানযোগেন** (জ্ঞানযোগে) ; **যোগিনাম্** (যোগীদের) ; **কর্মযোগেন** (কর্মযোগে।)]

শ্রীভগবান বললেন—হে অনঘ অর্জুন! এই মনুষ্যলোকে দুই প্রকারের নিষ্ঠা আছে, একথা আমি আগেই বলেছি। তা হল জ্ঞানীদের নিষ্ঠা জ্ঞানযোগের দ্বারা এবং যোগীদের নিষ্ঠা কর্মযোগের দ্বারা ঘটে ॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা—[অর্জুন যুদ্ধ করতে চাননি, সেইজন্য তিনি সমত্ববাচক 'বুদ্ধি' শব্দের অর্থ ধরেছিলেন 'জ্ঞান'। কিন্তু ভগবান প্রথমে 'বুদ্ধি' এবং 'বুদ্ধিযোগ' শব্দ দ্বারা সমত্বের বর্ণনা করেছেন (২।৩৯, ৪৯ ইত্যাদি) ; তাই এখানেও ভগবান জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগ—এই দুইয়ের দ্বারা প্রাপণীয় সমত্বের বর্ণনা করছেন।]

'অনঘ'—অর্জুন কর্তৃক নিজ শ্রেয়ের (কল্যাণের) কথা জিজ্ঞাসা করাই তাঁর নিষ্পাপতার লক্ষণ ; কারণ স্বীয় কল্যাণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা হলেই সাধকের পাপ দূর হয়।

'লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ'—এখানে **'লোকে'** পদটির অর্থ হিসাবে মনুষ্য-শরীর বুঝতে হবে ; কারণ জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগ—দুই প্রকারের সাধনা করার অধিকার অথবা সাধক হওয়ার অধিকার একমাত্র মনুষ্য-শরীরেই আছে।

'নিষ্ঠা'—অর্থাৎ সমত্বে স্থিতি এক প্রকারেরই হয়, যেটি দুই ভাবে প্রাপ্ত করা যায়—জ্ঞানযোগ দ্বারা অথবা কর্মযোগ দ্বারা। এই দুই প্রকারের যোগের পৃথক বিভাগ করার জন্য ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ের উনচল্লিশতম শ্লোকে বলেছেন, 'এই সমবুদ্ধির কথা আমি সাংখ্যযোগের বিষয়ে (একাদশ থেকে ত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত) বলেছি, এবার এটিকে কর্মযোগের বিষয়ে (উনচল্লিশতম থেকে তিপ্পান্নতম শ্লোক পর্যন্ত) বলছি, শোনো—

'এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।'

'পুরা' পদটির অর্থ 'অনাদিকাল'ও হতে পারে আবার 'কিছুক্ষণ আগে'ও হতে পারে। এখানে এই পদের অর্থ হল—কিছুক্ষণ আগে অর্থাৎ পূর্বের অধ্যায়, যেখানে অর্জুনের সংশয় ছিল। যদিও দুই প্রকার নিষ্ঠা নিয়ে পূর্বের অধ্যায়ে পৃথকভাবে বলা হয়েছে, তবুও কোনো নিষ্ঠাতেই কর্মত্যাগের কথা বলা হয়নি।

মর্মকথা

ভগবান এই স্থলে দুইপ্রকার নিষ্ঠার কথা বলেছেন—সাংখ্যনিষ্ঠা বা জ্ঞানযোগ এবং যোগনিষ্ঠা বা কর্মযোগ। ইহজগতে যেমন নিষ্ঠা দুই প্রকারের—**'লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা'** তেমনি পুরুষও দুই প্রকারের হয়—**'দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে'** (গীতা ১৫।১৬) ; যেমন—ক্ষর (বিনাশশীল সংসার) এবং অক্ষর (অবিনাশী স্বরূপ)। ক্ষর-এর সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে এবং প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিতে সম থাকাকে বলা হয় 'কর্মযোগ' এবং ক্ষর হতে বিমুখ হয়ে অক্ষরে স্থিত হওয়াকে বলা হয় 'জ্ঞানযোগ'। কিন্তু ক্ষর এবং অক্ষর—এই দুই ব্যতিরেকে অন্য এক উত্তম পুরুষ আছেন, যাঁকে পরমাত্মা বলা হয়— **'উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ'** (১৫।১৭)। এই পরমাত্মা ক্ষরেরও অতীত এবং অক্ষর হতেও উত্তম সেইজন্য শাস্ত্রে এবং বেদে তিনি 'পুরুষোত্তম' নামে খ্যাত (১৫।১৮)। এই পরমাত্মায় সর্বতোভাবে পূর্ণরূপে শরণাগত হওয়াকেই 'ভগবন্নিষ্ঠা' (ভক্তিযোগ) বলা হয়। তাই ক্ষরের প্রাধান্যে কর্মযোগ, অক্ষরের প্রাধান্যে জ্ঞানযোগ এবং পরমাত্মার প্রাধান্যে ভক্তিযোগ হয়।[১]

সাংখ্যনিষ্ঠা এবং যোগনিষ্ঠা—এই দুটি সাধকদের নিজ নিজ নিষ্ঠা ; কিন্তু ভগবৎনিষ্ঠা সাধকদের নিজস্ব নিষ্ঠা নয়। কারণ সাংখ্যনিষ্ঠা এবং যোগনিষ্ঠাতে সাধকদের 'আমি আছি' এবং 'জগৎ-সংসার আছে'—এরূপ অনুভব হয়। অতএব জ্ঞানযোগী জগৎ-সংসার থেকে সম্পর্ক ছেদ করে নিজ স্বরূপে স্থিত হন এবং কর্মযোগী সংসারের বস্তুসমূহ (শরীরাদি) সংসারেরই সেবায় ব্যয় করে সংসার হতে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করেন। কিন্তু ভগবৎনিষ্ঠায় সাধকের প্রথমে 'ভগবান আছেন'—এই অনুভূতি হয় না ; কিন্তু তাঁর বিশ্বাস থাকে যে, স্বরূপ ও সংসার—এই দুটির থেকেও বিশেষরূপ কোনো তত্ত্ব (ভগবান) আছেন। সুতরাং তিনি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সহকারে ভগবানকে মেনে নিয়ে নিজেকে তাঁর শ্রীচরণে সমর্পণ করেন। তাই সাংখ্যনিষ্ঠা এবং যোগনিষ্ঠায় 'জানবার' প্রাধান্য থাকে এবং ভগবৎনিষ্ঠায় 'মানা' (শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস)-এর প্রাধান্য থাকে।

জানা এবং মানা—দুইয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। 'জানা'ও যেমন সন্দেহরহিত (দৃঢ়) হয়, তেমনি 'মানা'ও সন্দেহরহিত হয়। মেনে নেওয়ার ব্যাপারে বিচার-বিবেচনার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। যেমন 'অমুক আমার মা'—এটি একটি মেনে নেওয়া ব্যাপার, এই ব্যাপারে কখনো সন্দেহের উদয় হয় না, জিজ্ঞাসা আসে না, বিচার করার প্রয়োজন হয় না। সেইজন্য গীতায় ভক্তিযোগের প্রকরণে যে স্থানে জানার ব্যাপার আছে সেইগুলিতে মেনে নেওয়াই বোঝানো হয়েছে ধরতে হবে। এইভাবে জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগের প্রকরণে যে যে স্থানে মেনে নেবার কথা আছে, সেগুলি জানবার অর্থে ধরে নিতে হবে।

সাংখ্যনিষ্ঠা এবং যোগনিষ্ঠা সাধন-সাধ্য এবং সাধকের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু ভগবৎনিষ্ঠা সাধন-সাধ্য নয়। ভগবৎনিষ্ঠাতে সাধক নির্ভর করে থাকেন ভগবান এবং তাঁর কৃপার ওপর।

গীতায় স্থানে স্থানে ভগবৎনিষ্ঠার বর্ণনা আছে ; যেমন—এই অধ্যায়ে প্রথমে দ্বিবিধ নিষ্ঠার বর্ণনা করে

[১] প্রকৃতপক্ষে কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ, দুটি যোগেই ভগবানের সম্বন্ধ থাকে ; কারণ তিনিই এই দুটির বিধায়ক। তাঁর দ্বারাই কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগে কল্যাণের বিধান হয়। তাই কর্মযোগী ও জ্ঞানযোগী উভয়েই ভগবানের মতই (সিদ্ধান্ত) পালন করেন। এঁদের মধ্যে শুধুমাত্র ভগবানের পরায়ণতা হয় না।

পরে ত্রিশতম শ্লোকে **'ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্য'** পদটির দ্বারা ভক্তির বর্ণনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়েও দ্বিবিধ নিষ্ঠার বর্ণনা করে দশম শ্লোকে **'ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি'** এবং শেষে **'ভোক্তারং যজ্ঞতপসাম্...'** ইত্যাদি পদগুলির দ্বারা ভক্তির বর্ণনা করা হয়েছে, ইত্যাদি।

'জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাম্'—'প্রকৃতি হতে উৎপন্ন সমস্ত গুণই গুণসমূহে প্রবৃত্ত হচ্ছে, সকল ক্রিয়াই গুণ ও ইন্দ্রিয়গুলিতেই হচ্ছে (গীতা ৩।২৮) এবং এগুলির সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধ নেই'—এইরূপ ভেবে সমস্ত ক্রিয়ায় কর্তৃত্বের অভিমান সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করাকেই বলা হয় 'জ্ঞানযোগ'।

গীতা-উপদেশের প্রারম্ভেই ভগবান সাংখ্যযোগের (জ্ঞানযোগের) বর্ণনাকালে বিনাশশীল শরীর এবং অবিনাশী শরীরীর কথা বলেছেন, (গীতা ২।১৬) যাকে 'অসৎ' এবং 'সৎ' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

'কর্মযোগেন যোগিনাম্'—বর্ণ, আশ্রম, স্বভাব এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী যে সমস্ত শাস্ত্রবিহিত কর্তব্যকর্ম উপস্থিত হয়, সেগুলিতে অর্থাৎ সেই কর্ম ও তার ফলে কামনা, মমতা এবং আসক্তি সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা এবং সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমভাবে থাকাকেই 'কর্মযোগ' বলা হয়।

ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ের সাতচল্লিশ এবং আটচল্লিশতম শ্লোকে প্রধানতঃ কর্মযোগেরই বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে সাতচল্লিশতম শ্লোকে কর্মযোগের সিদ্ধান্তগুলি জানানো হয়েছে এবং আটচল্লিশতম শ্লোকে কর্মযোগের অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় বিধি বলা হয়েছে।

পরিশিষ্ট-ভাব— কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ— এই উভয় নিষ্ঠাই লোকে (জগতে) হওয়ায় একে (লৌকিক) বলা হয় **'লোকেঽস্মিন দ্বিবিধা নিষ্ঠা'**। কর্মযোগে 'ক্ষর' (জগৎ)-এর প্রাধান্য এবং জ্ঞানযোগে 'অক্ষর' (জীবাত্মা)-এর প্রাধান্য থাকে। ক্ষর এবং অক্ষর দুই-ই জগতে অবস্থিত—**'দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ'** (গীতা ১৫।১৬)। সুতরাং কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ— এই দুটিই হল লৌকিক নিষ্ঠা।

জীব এবং জগৎকে গুরুত্ব দেওয়াতেই এই দুটি নিষ্ঠা হয়ে থাকে। জীব ও জগৎকে প্রাধান্য না দিয়ে যদি পরমাত্মাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, তাহলে এই দুটি নিষ্ঠা আসে না। তখন শুধুমাত্র অলৌকিক ভগবদ্‌নিষ্ঠা (ভক্তি) হয়।

লৌকিক নিষ্ঠাতে (কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগে) সাধকের প্রধানতঃ নিজের উদ্যোগই থাকে। তিনি সাধনাতে নিজের পুরুষার্থ মনে করেন। কিন্তু যখন তিনি ভগবদ্ আশ্রয়ে থেকে সাধন-ভজন করেন, নিজের উদ্যোগই প্রধান বলে মনে করেন না, তখন তাঁর নিষ্ঠা হয় অলৌকিক। কেননা ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত হলে সবই অলৌকিক হয়ে ওঠে। যতক্ষণ ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক না হয়, ততক্ষণ সবই লৌকিক থাকে।

কাউকে খারাপ বলে মনে না করলে, কারো ক্ষতি না চাইলে এবং কারো ক্ষতি না করলে 'কর্মযোগ' আরম্ভ হয়। আমার বলে কিছু নেই, আমার কোনো কিছু চাওয়ার নেই এবং আমার নিজের জন্য কিছু করার নেই— এই সত্য স্বীকার করে নিলে 'জ্ঞানযোগ' আরম্ভ হয়।

* * *

ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥ ৪ ॥

[**পুরুষঃ** (মানুষ) ; **কর্মণাম্** (কর্ম) ; **অনারম্ভাৎ** (আরম্ভ না করলেই) ; **নৈষ্কর্ম্যম্, অশ্নুতে** (নৈষ্কর্ম্য প্রাপ্ত হয়) ; ন (তা নয়) **চ, সন্ন্যসনাৎ** (এবং কর্ম ত্যাগ করলেই) ; **সিদ্ধিম্** (সিদ্ধি) ; **এব** (ই) ; **সমধিগচ্ছতি** (লাভ হয়) ; ন (তাও নয়।)]

মানুষ কর্মচেষ্টা না করলেই যে নৈষ্কর্ম্যপ্রাপ্ত হয় তা নয়, আর কর্মত্যাগ করলেই যে সিদ্ধি লাভ হয় তাও নয় ॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা—'ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে'—কর্মযোগে কর্ম করা অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ নিষ্কামভাবে কর্ম করলেই কর্মযোগে সিদ্ধিলাভ হয়,[১] কর্ম না করলে এই সিদ্ধি লাভ হয় না।

মানুষের হৃদয়ে কর্ম করার যে প্রবণতা থাকে তা প্রশমিত করার জন্য কামনা ত্যাগ করে কর্তব্যকর্ম করা প্রয়োজন। কামনা নিয়ে কর্ম করলে এই প্রবণতা দূর হয় না, বরং বেড়েই চলে।

'নৈষ্কর্ম্যম্ অশ্নুতে'—পদটির তাৎপর্য হল যে, কর্মযোগ আচরণকারী ব্যক্তি কর্ম দ্বারাই নৈষ্কর্ম্য প্রাপ্ত হয়। যে স্থিতি হলে মানুষের কর্মগুলি অকর্ম হয়ে যায় অর্থাৎ বন্ধনকারক হয় না সেই স্থিতিকে বলা হয় **'নৈষ্কর্ম্য'**।

যেরূপ ভাজা বীজ অঙ্কুর উদ্‌গমে অসমর্থ হয়, সেইরূপ কামনারহিত হয়ে কর্ম করলে তা ফলদানে সর্বতোরূপে অসমর্থ হয়। সুতরাং নিষ্কাম ব্যক্তি দ্বারা সংঘটিত কর্মে পুনরায় জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তন করাবার শক্তি থাকে না।

কামনা ত্যাগ তখনই সম্ভব, যখন সমস্ত কর্মই অপরের হিতার্থে করা হয়, নিজের জন্য নয়। কারণ কর্মমাত্রেরই সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে এবং নিজ (স্বরূপের) সম্বন্ধ থাকে পরমাত্মার সঙ্গে। নিজের সঙ্গে কর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। সেইজন্য যতক্ষণ পর্যন্ত স্বার্থবশতঃ কর্ম করা হয় ততক্ষণ কামনা ত্যাগ হয় না এবং যতকাল কামনাশূন্য না হওয়া যায় ততকাল নৈষ্কর্ম্যপ্রাপ্তিও ঘটে না।

'ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি'—এই শ্লোকের পূর্বার্ধে কর্মযোগের দৃষ্টিতে ভগবান বলেছিলেন যে, কর্মারম্ভ না করে কর্মযোগীর পক্ষে কখনোই নৈষ্কর্ম্য-প্রাপ্তি সম্ভব নয়। এখন শ্লোকের উত্তরার্ধে সাংখ্যযোগের দৃষ্টিতে বলছেন যে, কর্মগুলি কেবলমাত্র বাহ্যিকভাবে ত্যাগ করলেই সাংখ্যযোগীর সিদ্ধি অর্থাৎ নৈষ্কর্ম্যপ্রাপ্তি ঘটে না। সিদ্ধিলাভ করতে হলে তাঁর কর্তৃত্বভাব (অহংভাব) পরিত্যাগ করা অত্যন্ত আবশ্যক। সুতরাং সাংখ্যযোগীর জন্য কর্মগুলি বাহ্যতঃ ত্যাগ করা প্রধান নয়, প্রধান হল অহং-কর্তৃত্বকে পরিত্যাগ করা।

সাংখ্যযোগে কর্ম করাও যায় আবার কোনো এক সীমা পর্যন্ত কর্ম পরিত্যাগও করা যায়। কিন্তু কর্মযোগে সিদ্ধি-প্রাপ্তির জন্য কর্ম করাই আবশ্যক (গীতা ৬।৩)।

মর্মার্থ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মানুষকে আচরণের দ্বারা পরমার্থ সিদ্ধির কলা শেখান। এর উদ্দেশ্য কর্তব্যকর্ম করানো—কর্তব্যকর্ম ত্যাগ করানো নয়। সেইজন্য ভগবান কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ—উভয় যোগ সাধনেই কর্ম করার কথা বলেছেন।

একটি স্বাভাবিক ব্যাপার হল এই যে, যখন সাধক নিজ কল্যাণ কামনা করেন তখন তিনি সাংসারিক কর্মে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেন এবং সেগুলি বর্জন করতে চান। অর্জুনও সেইরূপ কর্মে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ভগবানকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ—উভয় যোগ সাধনেরই তাৎপর্য যখন সমত্ব লাভ, তাহলে আপনি আবার আমাকে কর্ম করতে নির্দেশ দিচ্ছেন কেন ? কেনই বা আমাকে যুদ্ধের মতো নিষ্ঠুর কর্মে নিয়োগ করছেন ?' কিন্তু ভগবান উভয় প্রকার সাধনেই অর্জুনকে কর্ম করার আদেশ দিয়েছেন ; যেমন—কর্মযোগে **'যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি'** (গীতা ২।৪৮) এবং সাংখ্যযোগে **'তস্মাদ্যুধ্যস্ব ভারত'** (গীতা ২।১৮)। এতেই প্রমাণিত হয় যে ভগবানের অভিপ্রায় মূলতঃ কর্ম ত্যাগ করানো নয়, বরং তাঁর অভিপ্রায় কর্ম করানো। তবে একথা ঠিক যে ভগবান কর্মের মধ্যে যেগুলি বিষাক্ত অংশ—কামনা-মমতা-বাসনা, সেগুলি বর্জন করে কর্ম করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

কর্মকে স্বরূপতঃ ত্যাগ না করে সাধকের উচিত সেগুলি থেকে নিজ আসক্তি বিচ্ছিন্ন করা। কর্মযোগী নিঃস্বার্থভাবে কর্ম করে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, পদার্থ ইত্যাদিকে সংসারের সামগ্রী মনে করে সংসারের হিতার্থে ব্যয় করেন এবং কর্ম বা তার সম্বন্ধীয় পদার্থগুলির সঙ্গে নিজের কোনো সম্বন্ধ মেনে নেন না (গীতা ৫।১১)। জ্ঞানযোগে সৎ-অসৎ বিবেকের প্রাধান্য থাকে। সুতরাং জ্ঞানযোগী

[১] যিনি যোগারূঢ় হতে চান, সমত্ব লাভ করতে চান, তাঁর জন্য (কর্মযোগের দৃষ্টিতে) নিষ্কামভাবে কর্ম করা প্রয়োজন—'আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে' (গীতা ৬।৩)। যদি তিনি কর্মই না করেন তবে জানবেন কী করে যে তিনি সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমভাবে বিরাজ করছেন, নাকি বিচলিত হয়ে পড়ছেন ?

মনে করেন যে, 'গুণই গুণগুলিতে প্রবৃত্ত হচ্ছে অর্থাৎ শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদির দ্বারাই কর্ম নিষ্পন্ন হয়। কর্মের সঙ্গে আমার বিন্দুমাত্রও সম্পর্ক নেই' (গীতা ৩।২৮ ; ৫।৮-৯)

প্রায় সমস্ত সাধকেরই অনুভূতি হল এই যে, কল্যাণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হলেই কর্ম, পদার্থ এবং ব্যক্তি (পরিবার) সম্পর্কে তাঁদের অরুচি জন্মায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় আরাম ও বিশ্রামের ইচ্ছাই সাধকের উন্নতিতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সাধকের মনে এইরূপ ভাব থাকে যে, 'কর্ম, পদার্থ এবং ব্যক্তিদের স্বরূপতঃ পরিত্যাগ করলে তবেই আমি পারমার্থিক পথে আগুয়ান হতে পারব।' কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলি ত্যাগ না করে এর থেকে আসক্তি ত্যাগ করাই প্রয়োজন। সাংখ্যযোগে তীব্র বৈরাগ্য না হলে আসক্তি ত্যাগ অত্যন্ত কঠিন হয়। কিন্তু বৈরাগ্য কম হওয়া সত্ত্বেও কর্মযোগে অন্যের হিতার্থে কর্ম করায় অতি সহজেই আসক্তি ত্যাগ হয়।

একান্তে অবস্থিত থেকে সাধন-ভজন করাকেও গীতায় সমাদর করা হয়েছে। সাত্ত্বিক পুরুষ একান্তে থেকে সাধন-ভজনে সময় ব্যয় করলেও, রাজসিক পুরুষ সংকল্প-বিকল্পে এবং তামসিক পুরুষ নিদ্রা-আলস্য ও প্রমাদে সময় অতিবাহিত করে, যার ফলে পতন অবশ্যম্ভাবী হয়। সেইজন্য সাধকের একান্তে বসবাসের রুচি থাকলেও অর্থাৎ সাংসারিক কর্ম পরিত্যাগ করে পারমার্থিক কাজ করতে তাঁর প্রবৃত্তি থাকলেও কর্তব্যরূপে যা তাঁর সম্মুখীন হয় তৎপরতার সঙ্গে সেটি তাঁর পালন করা উচিত, তবে সেই কর্মে তাঁর আসক্ত হওয়া উচিত নয়। ব্যক্তিসমুদয়ে কিংবা কর্মে অনীহা—কোনোটির প্রতিই তাঁর আসক্তি থাকা উচিত নয়। কোথাও আসক্তির বন্ধন না হলে সাধকের খুব শীঘ্রই কল্যাণ হয়। শারীরিকভাবে একান্তে বাসকেই প্রকৃত একান্ত মনে করা হল ভ্রম ; কারণ শরীর এই সংসারেরই অংশবিশেষ। সুতরাং শরীর হতে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা অর্থাৎ তাতে অহংভাব বা আসক্তি না থাকাই হল প্রকৃত একান্তে থাকা।

পরিশিষ্ট-ভাব—যা নিজের, নিজের মধ্যেই আছে এবং এখনই বর্তমান আছে তা প্রাপ্ত করতে কোনো কিছু করতে হয় না, কারণ তার কখনো অপ্রাপ্তি হয় না। আমি কিছু করলে তবে আমার কিছু প্রাপ্তি লাভ ঘটবে— এই ভাব দেহাভিমানকে বাড়িয়ে দেয়। প্রত্যেক ক্রিয়ার আরম্ভ ও শেষ থাকে। সুতরাং ক্রিয়ার দ্বারা সেই জিনিস প্রাপ্তি হয় যা বিদ্যমান নয়। কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যেই ক্রিয়া করার আগ্রহ থাকে। ফলে সে ক্রিয়া না করে থাকতে পারে না। ক্রিয়ার আগ্রহ দূর করার জন্য প্রয়োজন হল এই যে, যা করা উচিত নয়, তা না করা এবং যা করা উচিত, তা মমতাশূন্য হয়ে নিষ্কামভাবে করা অর্থাৎ নিজের জন্য কিছু না করে শুধু অপরের মঙ্গলের জন্য করা। নিজের জন্য করলে ক্রিয়ার আগ্রহ কখনো শেষ হয় না, কারণ নিজ স্বরূপ হল নিত্য আর কর্ম অনিত্য। সুতরাং নিষ্কামভাবে অন্যের হিতার্থে কর্ম করলে ক্রিয়ার আগ্রহ দূর হয়ে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছেদ হয়ে যায় এবং সর্ব দেশ, কাল ইত্যাদিতে বিরাজমান পরমাত্মতত্ত্ব প্রকটিত হয়ে যায়, তা অনুভবে আসে।

※ ※ ※

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥ ৫ ॥

[**কশ্চিৎ, হি** (কোনো ব্যক্তিই) ; **জাতু** (কোনো অবস্থায়) ; **ক্ষণম্, অপি** (ক্ষণকালও) ; **অকর্মকৃত** (কর্ম না করে) ; **ন, তিষ্ঠতি** (থাকতে পারে না) ; **হি** (কেননা) ; **অবশঃ** (প্রকৃতির গুণে বশীভূত হয়ে) ; **সর্বঃ** (প্রাণীসমূহ) ; **প্রকৃতিজৈঃ** (প্রকৃতিজাত) ; **গুণৈঃ** (গুণ দ্বারা) ; **কর্ম** (কর্ম) ; **কার্যতে** (করতে বাধ্য হয়।)]

কোনো ব্যক্তিই কোনো অবস্থায় ক্ষণকালও কর্ম না করে থাকতে পারে না, কেননা প্রকৃতিজাত গুণে বশীভূত প্রাণী কর্ম করতে বাধ্য হয়॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা—**'ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ'**—কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ যে কোনো যোগপথই হোক না কেন সাধক কর্ম না করে থাকতে পারেন না। এখানে **'কশ্চিৎ'**, **'ক্ষণম্'** এবং জাতু—এই

তিনটি বিশেষ পদ আছে। এর মধ্যে **'কশ্চিৎ'** পদের প্রয়োগ করে ভগবান বলছেন যে, কোনো মানুষই কর্ম না করে থাকতে পারে না, তা সে জ্ঞানী বা অজ্ঞানী যেই হোক। যদিও জ্ঞানীর নিজ শরীরের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ থাকে না, তা সত্ত্বেও তাঁর শরীর দ্বারা ক্রিয়াদি নিয়মিত হয়ে থাকে। **'ক্ষণম্'** পদটির প্রয়োগ করে ভগবান বলছেন, 'যদিও মানুষ "আমি সর্বময় কর্ম করি" একথা মেনে নেয় না, তবুও সে যতক্ষণ শরীরের সঙ্গে তার সম্পর্ক মেনে নেয়, ততক্ষণ সে একমুহূর্তও কর্ম না করে থাকে না।' **'জাতু'** পদটির প্রয়োগ করে ভগবান বলছেন যে, জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, মূর্ছা ইত্যাদি কোনো অবস্থাতেই মানুষ কর্ম না করে থাকতে পারে না। এই শ্লোকের উত্তরার্ধে এর কারণ হিসাবে ভগবান **'অবশঃ'** পদটির দ্বারা বলছেন, 'প্রকৃতির বশ হয়ে তাকে কর্ম করতেই হয়।' প্রকৃতি সর্বদা পরিবর্তনশীল। সাধকের নিজের জন্য কিছু করার প্রয়োজন নেই। বিহিত কর্মরূপে যা সাধকের সম্মুখীন হয়, অপরের হিতের দিকে দৃষ্টি রেখে কেবল সেই কাজগুলো করে দিতে হয়। পরমাত্মপ্রাপ্তির উদ্দেশ্য থাকায় সাধকের পক্ষে নিষিদ্ধ কর্ম করা সম্ভবই নয়।

অনেকে শুধুমাত্র স্থূলদেহের ক্রিয়াগুলিকেই কর্ম বলে মনে করেন ; কিন্তু গীতা মানসিক ক্রিয়াগুলিকেও কর্মরূপে গণ্য করে। গীতা শারীরিক, বাচিক এবং মানসিকভাবে কৃত ক্রিয়ামাত্রকেই কর্ম রূপে গণ্য করে— **'শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ'** (গীতা ১৮।১৫)। শারীরিক বা মানসিক যে সমস্ত ক্রিয়ার সঙ্গে মানুষ নিজ সম্বন্ধ স্থাপন করে সে সমস্ত ক্রিয়াই কর্মরূপ ধারণ করে আর বন্ধনের কারণ হয়, অন্যগুলি নয়।

মানুষদের এমন এক ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, তারা সন্তান পালন-পোষণ, জীবিকা-নির্বাহ, ব্যবসায়, চাকরি, অধ্যাপনা ইত্যাদিকেই কর্ম বলে গণ্য করে। আর এর অতিরিক্ত খাওয়াদাওয়া, শোওয়া-বসা, চিন্তা করা এগুলিকে কর্ম বলে ধর্তব্যের মধ্যে আনে না। সেইজন্য অনেকে ব্যবসায় ইত্যাদি কর্মগুলিকে ত্যাগ করে মনে করে যে তারা কোনো কর্ম করছে না। এগুলি তাদের এক মস্ত ভ্রান্তি। শরীর-নির্বাহ সম্পর্কীয় স্থূলশরীরের ক্রিয়া ; ঘুমানো, চিন্তা করা ইত্যাদি সূক্ষ্ম শরীরের ক্রিয়াগুলি এবং সমাধি ইত্যাদি কারণ-শরীরের ক্রিয়াসকল—এ সমস্তই কর্ম। যতক্ষণ দেহে অহংবোধ ও মমত্ববোধ থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত শরীর দ্বারা সম্পাদিত ক্রিয়ামাত্রই কর্ম নামে পরিগণিত হয়। কারণ-শরীর হল প্রকৃতির কার্য এবং প্রকৃতি কখনো নিষ্ক্রিয় থাকে না। সুতরাং দেহে অহংবোধ ও মমত্ববোধ থাকলে কোনো মানুষই কোনো অবস্থাতে একমুহূর্ত কর্ম না করে থাকতে পারে না, তা সে অবস্থা প্রবৃত্তির বা নিবৃত্তির, যাই হোক।

'কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ'—প্রকৃতিজনিত গুণ প্রকৃতির বশীভূত প্রাণীদিগের দ্বারা কর্ম করায়। বশীভূত হওয়ায় প্রকৃতির গুণগুলির প্রভাবে প্রাণী কর্ম করতে বাধ্য হয় কেননা প্রকৃতি এবং তার গুণ নিরন্তর ক্রিয়াশীল (গীতা ৩।২৭ ; ১৩।২৯)। যদিও আত্মা নিজে নিষ্ক্রিয়, অসঙ্গ, অবিনাশী, নির্বিকার এবং নির্লিপ্ত, কিন্তু যতক্ষণ সে প্রকৃতি এবং তার কাজ—স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ-শরীরের কোনো একটির সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করে, তার দ্বারা সুখ কামনা করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে প্রকৃতির বশ হয়ে থাকে (১৪।৫)। এই বশ্যতাকেই এখানে **'অবশঃ'** পদে বলা হয়েছে। নবম অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে এবং অষ্টম অধ্যায়ের উনিশতম শ্লোকেও প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক মেনে নেওয়ায় জীবের পরবশ হয়ে কর্ম করার কথা বলা হয়েছে।

স্বভাব তৈরি হয় বৃত্তি থেকে, বৃত্তি সৃষ্টি হয় গুণের দ্বারা এবং গুণ উৎপন্ন হয় প্রকৃতি থেকে। সুতরাং স্বভাবের পরবশ বলা হোক বা গুণগুলির পরবশ বলা হোক অথবা প্রকৃতির পরবশ বলা হোক ব্যাপার একই। সবার মূলেই আছে প্রকৃতপক্ষে সেই প্রকৃতিজনিত পদার্থগুলির পরবশতা। এই পরবশতা থেকেই সমস্ত প্রকার পরবশতার সৃষ্টি। সুতরাং প্রকৃতিজনিত পরবশতাকেই কোনো স্থানে কালের, কোথাও স্বভাবের, কোথাও কর্মের আবার কোনো জায়গায় গুণের পরবশতা রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। তাৎপর্য হল এই যে, জীব যতক্ষণ প্রকৃতি এবং তার গুণগুলির প্রভাব থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত না হয়, তার পরমাত্মপ্রাপ্তি না হয়, ততক্ষণ জীব কাল, স্বভাব ইত্যাদির পরবশ হয়েই থাকে। অর্থাৎ যতক্ষণ প্রকৃতির সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নেয়, প্রকৃতিতে স্থিত থাকে, ততক্ষণ কখনো গুণের, কখনো কালের, কখনো স্বভাবের পরবশ হতে থাকে, সে কখনো স্ববশ (স্বাধীন) হয় না।

এভাবেই সে পরিস্থিতি, ব্যক্তি, স্ত্রী, পুত্র, ধনসম্পত্তি ইত্যাদির পরবশ হয়ে থাকে। কিন্তু যখন সে গুণের অতীত নিজ স্বরূপের অথবা পরমাত্মতত্ত্বের অনুভব করতে সক্ষম হয়, তখন তার আর এই পরবশতা থাকে না এবং সে স্বতঃই স্বতন্ত্রতা প্রাপ্ত হয়।

বিশেষ কথা

প্রকৃতির সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় (সূক্ষ্ম) দুটি অবস্থা রয়েছে। যেমন কর্ম করা হল সক্রিয় অবস্থা আর কর্ম না করা (নিদ্রা ইত্যাদি) হল নিষ্ক্রিয় অবস্থা। বাস্তবে নিষ্ক্রিয় অবস্থাতেও প্রকৃতি কখনো নিষ্ক্রিয় থাকে না, এতে সূক্ষ্মরূপ সক্রিয়তা থাকে। যেমন কোনো নিদ্রিত ব্যক্তিকে তার ঘুম ভাঙার আগে জাগালে সে অভিযোগ করে যে কাঁচা ঘুম থেকে তাকে জাগানো হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে নিদ্রার নিষ্ক্রিয় অবস্থাতেও নিদ্রা গাঢ় হবার কাজটি হচ্ছিল। সম্পূর্ণ নিদ্রার পর মানুষ যখন জাগ্রত হয় তখন সে ওরকম কথা বলে না ; কারণ তার নিদ্রা পরিপূর্ণ হয়েছে। এইরূপ সমাধি, প্রলয়, মহাপ্রলয় ইত্যাদি অবস্থাতেও ক্রিয়াগুলি সূক্ষ্মরূপে হতে থাকে।

বাস্তবে দেখলে বোঝা যায় যে প্রকৃতির কখনো নিষ্ক্রিয় অবস্থা হয় না ; কারণ এটি প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনশীল। স্বয়ং আত্মায় কর্তৃত্বভাব নেই ; কিন্তু শরীরাদি প্রকৃতির কার্যগুলির সঙ্গে সম্পর্ক মেনে নিলে সে প্রকৃতির বশ হয়ে যায়। এই পরবশতার জন্যই স্বয়ং অকর্তা হয়েও নিজেকে কর্তা বলে মনে করে। প্রকৃতপক্ষে আত্মায় কোনো পরিবর্তনরূপ ক্রিয়া হয় না। প্রকৃতির দ্বারা যেমন সৃষ্টির সকল ক্রিয়াই স্বাভাবিকভাবে হতে থাকে, তেমনি প্রকৃতির দ্বারা বাল্য, যৌবন ইত্যাদি অবস্থা এবং খাদ্য পরিপাক, শ্বাস-প্রশ্বাস, দেখা, শোনা ইত্যাদি সমস্ত ক্রিয়াই স্বাভাবিক রূপে হতে থাকে। কিন্তু জীবাত্মা কিছু ক্রিয়াতে নিজেকে কর্তা বলে মনে করে বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয়।

প্রকৃতি সর্বদা পরিবর্তনশীল, কিন্তু শুদ্ধ স্বরূপে কখনো কোনো পরিবর্তন হয় না । বাস্তবে প্রাকৃতিক পদার্থগুলির কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নেই। যা প্রতিক্ষণ পরিবর্তিত হয় তাকেই পদার্থ বলা হয় অর্থাৎ পরিবর্তনের পুঞ্জকেই পদার্থ বলা হয়। পদার্থগুলির সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে কোনো মানুষ কোনো অবস্থাতেই ক্ষণমাত্র কর্মবিহীন অবস্থায় থাকতে পারে না। সাধক যদি ঠিকমতো এটি অনুভব করেন যে, সমস্ত ক্রিয়াই পদার্থগুলিতে হচ্ছে এবং পদার্থগুলির সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধ নেই তবে তিনি এই পরবশতা থেকে মুক্ত হতে পারেন । কর্মযোগী সর্বদা পরিবর্তনশীল পদার্থের কামনা, মমতা এবং আসক্তি পরিত্যাগ করে পরবশতা দূর করেন।

ভগবান এই শ্লোকে যে কথা বলেছেন, তা তিনি অষ্টাদশ অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকেও এইভাবে বলেছেন যে, প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক রেখে কোনো ব্যক্তিই সম্পূর্ণভাবে কর্মত্যাগ করতে সক্ষম হয় না **'ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ'**।

পরিশিষ্ট-ভাব— শুধু প্রকৃতিতেই ক্রিয়া হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে নিজ একাত্মতা মেনে নেওয়ার ফলেই মানুষ প্রকৃতিজাত গুণাদির অধীন হয়ে পড়ে— **'অবশঃ'** এবং তার ক্রিয়াগুলির সঙ্গে সম্পর্ক গঠিত হয়। সেইজন্য প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক যারা মেনে নেয় সেইসব ব্যক্তি জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, মূর্ছা, সমাধি এবং সর্গ-মহাসর্গ, প্রলয়-মহাপ্রলয় ইত্যাদি কোনো অবস্থাতেই কোন ক্ষণে কর্ম না করে থাকতে পারে না।

সুষুপ্তি, মূর্ছা এবং সমাধি অবস্থাতে কী করে ক্রিয়া হয় ? মানুষ যখন ঘুমায় তখন যদি কেউ তার ঘুম ভাঙায় তখন সেই ব্যক্তি বলে আমার কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে দিলে ! এতে প্রমাণিত হয় যে সুষুপ্তিকালেও নিদ্রা গাঢ় হবার ক্রিয়া হতে থাকে। তেমনই মূর্ছা এবং সমাধির সময়েও ক্রিয়া জারি থাকে, পাতঞ্জল যোগদর্শনে এই ক্রিয়াকে বলা হয় 'পরিণাম'[১]। পরিণামের অর্থ হল, পরিবর্তনের বহমান ধারা অর্থাৎ বদলের প্রবাহ[২]। অর্থাৎ সমাধির আরম্ভ থেকে ব্যুত্থান হওয়া পর্যন্ত ক্রিয়া হতে থাকে। যদি ক্রিয়া না হয় তাহলে ব্যুত্থান হওয়া সম্ভবই নয়। সমাধির সময় পরিণাম হয় আর সমাধি অন্তে হয় ব্যুত্থান।

---

[১] ব্যুত্থাননিরোধসংস্কারয়োরভিভবপ্রাদুর্ভাবৌ নিরোধক্ষণচিত্তান্বয়ো নিরোধপরিণামঃ ॥৯॥ সর্বার্থতৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদয়ৌ চিত্তস্য সমাধিপরিণামঃ ॥১১॥ ততঃ পুনঃ শান্তোদিতৌ তুল্যপ্রত্যয়ৌ চিত্তস্যৈকাগ্রতাপরিণামঃ ॥১২॥ (বিভূতিপাদ)

[২] 'অথ কোঽয়ং পরিণামঃ ? অবস্থিতস্য দ্রব্যস্য পূর্বধর্মনিবৃত্তৌ ধর্মান্তরোৎপত্তিঃ পরিণামঃ (যোগদর্শন, বিভূতি ১৩-এর ব্যাসভাষ্য)। এই পরিণাম কী ? অবস্থিত দ্রব্যের পূর্বধর্ম নিবৃত্ত হয়ে অন্য ধর্মের উৎপত্তিকেই (অবস্থান্তরকেই) বলা হয় পরিণাম।'

প্রকৃতির সমস্ত অবস্থার অতীত হল— সহজাবস্থা অথবা সহজ সমাধি। সহজাবস্থা হয় স্ব-স্বরূপের, যাতে বিন্দুমাত্র কোনো ক্রিয়া নেই এবং হওয়া সম্ভবও নয়। সুতরাং সহজ অবস্থায় পরিণাম বা ব্যুত্থান কখনোই হয় না। কেননা ক্রিয়াগুলি প্রকৃতি-বিভাগের অন্তর্গত, স্বরূপ বিভাগের অন্তর্গত নয়।

'কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম'— কর্ম করার ব্যাপারে আমরা পরাধীন হলেও তাতে রাগ (আসক্তি) বা দ্বেষ করা না করার ব্যাপারে আমরা স্বাধীন।

*** *** ***

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে বলা হয়েছে যে কোনো মানুষই কোনো অবস্থাতে ক্ষণমাত্র কর্ম না করে থাকতে পারে না। তাতে প্রশ্ন আসতে পারে যে মানুষ হঠকারী হয়ে ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া রুদ্ধ করেও নিজেকে নিষ্ক্রিয় মনে করতে পারে। তার উত্তরে ভগবান পরবর্তী শ্লোকে জানাচ্ছেন—

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥ ৬ ॥

[যঃ, **কর্মেন্দ্রিয়াণি** (যে কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে) ; **সংযম্য** (রুদ্ধ করে) ; **মনসা** (মন দ্বারা) ; **ইন্দ্রিয়ার্থান্** (ইন্দ্রিয়গুলির বিষয়) ; **স্মরন্, আস্তে** (চিন্তা করতে থাকে) ; **সঃ, বিমূঢ়াত্মা** (সেই মূঢ়মতি ব্যক্তিকে) ; **মিথ্যাচারঃ, উচ্যতে** (মিথ্যাচারী বলা হয়।)]

যে কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে (সব ইন্দ্রিয়গুলিকে) হঠতাপূর্বক রুদ্ধ করে মন দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলির বিষয় চিন্তা করতে থাকে, সেই মূঢ়মতি ব্যক্তিকে মিথ্যাচারী (মিথ্যা আচরণকারী) বলা হয় ॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা—**'কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য .... মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে'**— এখানে **'কর্মেন্দ্রিয়াণি'** পদটির উদ্দেশ্য পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ই (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ) শুধু নয়, বরং এর সঙ্গে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ও (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক) আছে। কারণ জ্ঞানেন্দ্রিয় ব্যতিরেকে শুধুমাত্র কর্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোনো কর্ম করা সম্ভব নয়। তাছাড়া হস্ত, পদাদি কর্মেন্দ্রিয়ের কর্মসকল বন্ধ করে তার সঙ্গে চক্ষু, কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কর্মসকল বন্ধ না করলে তাকে ঠিক মিথ্যাচার বলা যায় না।

গীতায় জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে কর্মেন্দ্রিয়ের অন্তর্গত বলেই মানা হয়েছে। সেইজন্য গীতায় **'কর্মেন্দ্রিয়'** শব্দটি দেখা যায়, কিন্তু **'জ্ঞানেন্দ্রিয়'** শব্দটি কোথাও দেখা যায় না। পঞ্চম অধ্যায়ের অষ্টম-নবম শ্লোকে দেখা, শোনা, স্পর্শ করা ইত্যাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াগুলিকেও কর্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াগুলির সঙ্গে সম্মিলিত করা হয়েছে, যাতে প্রমাণিত হয় যে গীতায় জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে কর্মেন্দ্রিয়ের মধ্যেই ধরা হয়েছে। মনের ক্রিয়াগুলিকে গীতায় কর্ম বলে মানা হয়েছে—**'শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ'** (১৮।১৫)। তাৎপর্য এই যে প্রকৃতিমাত্রই ক্রিয়াশীল হওয়ায় প্রকৃতির কার্যমাত্রই স্বতঃ ক্রিয়াশীল।

'সংযম্য' পদটির অর্থ যদিও ধরা হয় যে ইন্দ্রিয়গুলির যথাযথ নিয়মন করা অর্থাৎ সেইগুলিকে বশে আনা, তবুও এইস্থানে এই পদটির অর্থ ইন্দ্রিয়গুলিকে বশ করা না হয়ে সেগুলিকে হঠতাপূর্বক সংযত করা বলা হয়েছে। কারণ ইন্দ্রিয়গুলি বশ হলে মিথ্যাচার বলা কথাটি খাটে না।

মূঢ় বুদ্ধিসম্পন্ন (সদসৎ বিবেকরহিত) ব্যক্তি বাহ্যতঃ ইন্দ্রিয়াদির কর্ম হঠতাপূর্বক রুদ্ধ করে কিন্তু মনে মনে ওই ইন্দ্রিয়াদির বিষয়সমূহ চিন্তা করতে থাকে এবং ওই স্থিতিকে সে ক্রিয়ারহিত বলে মনে করে। সেইজন্যই তাকে মিথ্যাচারী অর্থাৎ মিথ্যা আচরণকারী বলা হয়।

যদিও সে ইন্দ্রিয়াদির বিষয়গুলি বাহ্যতঃ বর্জন করেছে এবং মনে করছে যে, আমি কর্ম করি না, তবুও এই অবস্থাতেও সে প্রকৃতপক্ষে কর্মরহিত হয় না। কারণ বাহ্যতঃ ক্রিয়ারহিত মনে হলেও অহং-কর্তৃত্ব, মমত্ব এবং কামনাবশতঃ বিষয়চিন্তার ফলস্বরূপ তার বিষয়ভোগ রূপ কর্ম অব্যাহত থাকে।

সাংসারিক ভোগগুলি বাহ্যভাবে ভোগ করা যায় আবার মানসিক ভাবেও ভোগ করা যায়। আসক্তিপূর্বক বাহ্যভাবে ভোগ করলে অন্তঃকরণে ভোগের যেরূপ সংস্কার তৈরি হয়, মানসিকভাবেও যদি আসক্তিপূর্বক ভোগের চিন্তা করা হয় তাহলে সেইরূপ সংস্কারই হয়ে থাকে। মানুষ বিচার-বিবেচনা করে, লোকভয়ে এবং

অসদ্-ব্যবহার করে ফেলার লজ্জায় অনেক সময় বাহ্যভাবে ভোগ বর্জন করে কিন্তু তার মানসিক ভোগের ক্ষেত্রে বাইরে থেকে বাধা আসে না। সুতরাং সে মনে মনে ভোগ করতে থাকে এবং মিথ্যা অহংকার নিয়ে থাকে যে, 'আমি ভোগ ত্যাগ করেছি'। মানসিক ভোগ বিশেষভাবে ক্ষতিকারক হয়ে থাকে কারণ এটি উপভোগ করার জন্য বিশেষ অবসর পাওয়া যায়। সুতরাং সাধকের উচিত যে, সে যেমন বাহ্যভোগ থেকে দূরে থাকে, সেইগুলি বর্জন করে, তেমনি মনের ভোগচিন্তা থেকেও বিশেষ সাবধান হয়ে যেন তা ত্যাগ করে।

অর্জুনও কর্মগুলি বাহ্যিকভাবে বর্জন করতে ইচ্ছুক, তাই ভগবানকে জিজ্ঞাসা করেছেন, 'আপনি আমাকে এই ঘোরকর্মে কেন নিযুক্ত করছেন ?' উত্তরে ভগবান এখানে জানিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি অহং-কর্তৃত্ববোধ, মমত্ববোধ, আসক্তি, কামনা ইত্যাদি পোষণ করে শুধুমাত্র বাহ্যভাবে কর্ম ত্যাগ করে নিজেকে ক্রিয়ারহিত বলে মনে করে, তার আচরণ মিথ্যা। অর্থাৎ সাধকদের বাস্তবে কর্ম বর্জন না করে, কামনা-বাসনারহিত হয়ে তৎপরতাপূর্বক সেইগুলি পালন করা উচিত।

পরিশিষ্ট-ভাব— জাগতিক ভোগাদি বাহ্যিকভাবেও ভোগ করা যায় আবার মন থেকেও ভোগ করা যায়। বাহ্যতঃ ভোগ করা এবং মনে মনে সেইগুলি চিন্তা করে তার থেকে রস (সুখ) মানসিকভাবে গ্রহণ করা—এই দুইয়ে কোনো পার্থক্য নেই। বাহ্যতঃ অনুরাগপূর্বক ভোগ করলে যেরূপ সংস্কার লাভ হয়, মনে মনে ভোগ করলেও অর্থাৎ মনে তার চিন্তা করলেও সেইরূপ সংস্কারই পড়ে। ভোগের কথা স্মরণে এনে তার স্মৃতি থেকে রসগ্রহণ করা হয়, তা বহুদিন পর্যন্ত একইভাবে থেকে যায়। সুতরাং অতীত ভোগের চিন্তা (মানসিকভাবে সুখভোগ) করলেও তা নতুন ভোগের মতোই প্রভাব ফেলে। শুধু তাই নয়, মনে মনে (মানসিকভাবে) ভোগের রস গ্রহণ করাতে বিশেষ ভাবে ক্ষতিও হয়। কারণ মানুষ লোক-লজ্জায়, ব্যবহারের ভুল-ত্রুটির জন্য অনেক ভোগ বাহ্যতঃ করতে পারে না, কিন্তু মনে মনে ভোগ করায় সেইসব বাধা থাকে না। সুতরাং মনের দ্বারা ভোগের জন্য মানুষের যথেষ্ট সুযোগ থাকে। তাই মানসিকভাবে ভোগ করাতে সাধকদের অনেক ক্ষতি হয়। আসলে মন থেকে ভোগের ত্যাগই হল প্রকৃত ত্যাগ (গীতা ২।৬৪)।

* * *

সম্বন্ধ—চতুর্থ শ্লোকে ভগবান কর্মযোগ এবং সাংখ্যযোগ—উভয় দৃষ্টিতেই কর্ম ত্যাগ করা অনাবশ্যক বলে জানিয়েছেন। আবার পঞ্চম শ্লোকে বলেছেন যে, কোনো মানুষই কোনো অবস্থাতেই কর্ম না করে ক্ষণমাত্র থাকতে পারে না। ষষ্ঠ শ্লোকে হঠতাপূর্বক ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া রুদ্ধ করে নিজেকে ক্রিয়ারহিত বলে মনে করাকে মিথ্যাচরণ বলে জানিয়েছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে কর্ম স্বরূপতঃ বর্জন করলেই সেইগুলি প্রকৃতপক্ষে বর্জন নয়। সেইজন্য ভগবান পরবর্তী শ্লোকটিতে আসল ত্যাগ কাকে বলে তাই জানাচ্ছেন।

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জুন।
কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥ ৭ ॥

[**তু, অর্জুন** (হে অর্জুন !) ; **যঃ, মনসা** (যিনি মনের দ্বারা) ; **ইন্দ্রিয়াণি** (ইন্দ্রিয়গুলি) ; **নিয়ম্য** (সংযত করে) ; **অসক্তঃ** (অনাসক্ত হয়ে) ; **কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ** (কর্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে) ; **কর্মযোগম্** (কর্মযোগ) ; **আরভতে** (অনুষ্ঠান করেন) ; **সঃ** (তিনিই) ; **বিশিষ্যতে** (শ্রেষ্ঠ।)]

হে অর্জুন ! যিনি মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলি সংযত করে অনাসক্ত হয়ে (নিষ্কামভাবে) কর্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে কর্মযোগ পালন করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা—'তু'—এখানে অনাসক্ত হয়ে যাঁরা কর্ম করেন তাঁরা কেবল মিথ্যাচারীদের থেকেই নয় বরং সাংখ্যযোগীদের থেকেও শ্রেষ্ঠ, সে কথা জানানোর জন্যই এখানে 'তু' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

'অর্জুন'—'অর্জুন' শব্দটির অর্থ স্বচ্ছ। ভগবান এইস্থানে 'অর্জুন' সম্বোধন ব্যবহার করে এই ভাব প্রকাশ

করেছেন যে, তুমি নির্মল হৃদয়সম্পন্ন ; সুতরাং তোমার মনে কর্তব্যকর্ম বিষয়ক এই সন্দেহ কেন ? অর্থাৎ 'তোমার মধ্যে এই সংশয় থাকা উচিত নয়।'

'যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্য'—এখানে **'মনসা'** পদটি সমস্ত অন্তঃকরণের (মন, বুদ্ধি, চিত্ত এবং অহংকার) বাচক এবং **'ইন্দ্রিয়াণি'** পদটি ষষ্ঠ শ্লোকে বর্ণিত **'কর্মেন্দ্রিয়াণি'** পদটির ন্যায় দশটি ইন্দ্রিয়ের বাচক।

মন দ্বারা ইন্দ্রিয় বশ করার অর্থ হল যে বিবেকসম্পন্ন বুদ্ধির দ্বারা অনুভব করা যে, 'মন এবং ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে স্বরূপের কোনো সম্পর্ক নেই।' মনের সাহায্যে ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করলে তাদের স্বতন্ত্র কোনো আগ্রহ থাকে না অর্থাৎ সেগুলিকে ইচ্ছামতো সন্নিবিষ্ট করা যায় এবং সরানো যায়।

ইন্দ্রিয়গুলিকে তখনই বশে আনা যায়, যখন সেগুলির প্রতি মমত্ব (আমার-ভাব) দূর হয়। দ্বাদশ অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকেও কর্মযোগীর ইন্দ্রিয়গুলিকে বশ করার কথা বলা হয়েছে—**'সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্'** অর্থাৎ বশীভূত ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই কর্মযোগের আচরণ করা সম্ভব।

পূর্ববর্তী (ষষ্ঠ) শ্লোকে ভগবান **'সংযম্য'** পদটির দ্বারা মিথ্যাচারের প্রসঙ্গে ইন্দ্রিয়গুলিকে হঠতাপূর্বক রুদ্ধ করার কথা বলেছিলেন ; কিন্তু এখানে **'নিয়ম্য'** পদটিতে শাস্ত্র-মর্যাদা অনুসারে ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার (নিষিদ্ধ কর্ম থেকে সরিয়ে শাস্ত্রবিহিত কর্তব্যকর্মে নিযুক্ত করার) কথা বলা হয়েছে। নিয়ন্ত্রণ করলে স্বতঃই ইন্দ্রিয়গুলি সংযত হয়।

'অসক্তঃ'—দুই স্থানে আসক্তি হতে পারে—(১) কর্মে এবং (২) তার ফলে। সমস্ত দোষই আসক্তিতে জন্মে, কর্মে বা তার ফলে নয়। আসক্তি থাকলে যোগসিদ্ধ হওয়া হয় না। আসক্তি ত্যাগ করলে তবেই যোগ সিদ্ধ হয়। সুতরাং সাধকদের কর্ম ত্যাগ না করে সেটির প্রতি আসক্তি ত্যাগ করাই কর্তব্য। আসক্তিরহিত হয়ে সাবধানতা এবং তৎপরতাপূর্বক কর্তব্যকর্ম না করলে কর্ম থেকে সম্পর্ক-বিচ্ছেদ হতে পারে না। সাধক তখনই আসক্তিরহিত হতে পারেন যখন তিনি শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধিকে 'নিজের' অথবা 'নিজের জন্য' না ভেবে, শুধুমাত্র সংসারের হিতের উদ্দেশ্যে তৎপর হয়ে কর্তব্য-কর্মের আচরণ করতে থাকেন। অর্থাৎ যখন তিনি নিজের জন্য কোনো কর্ম না করে কেবল অপরের হিতের উদ্দেশ্যে সমস্ত কর্ম করেন, তখন তাঁর ফলাসক্তি স্বতঃই দূর হয়।

কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা হওয়া সাধারণ ক্রিয়াগুলি থেকে আরম্ভ করে চিন্তা ও সমাধি পর্যন্ত সমস্ত ক্রিয়াগুলিরই আমাদের স্বরূপের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই (গীতা ৫।১১)। কিন্তু স্বরূপ অনাসক্ত হলেও জীবাত্মা স্বয়ং আসক্তি দ্বারা সংসারের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করে।

আসক্তিরহিত হওয়াতেই কর্মযোগীর প্রকৃত মহিমা। কর্ম দ্বারা প্রাপ্ত কোনো ফলেরই আকাঙ্ক্ষা না করা অর্থাৎ সেইগুলি থেকে অসঙ্গ হওয়াকেই বলা হয় আসক্তিরহিত হওয়া।

সাধারণ মানুষ নিজ কামনা পূরণের উদ্দেশ্যেই কোনো কাজে প্রবৃত্ত হয়ে থাকে । কিন্তু সাধক কর্মে প্রবৃত্ত হন আসক্তি ত্যাগের উদ্দেশ্যেই। এরূপ সাধকদেরই এইস্থানে **'অসক্তঃ'** বলা হয়েছে।

যখন জ্ঞানযোগী এবং কর্মযোগী উভয়েই ফলেচ্ছা এবং আসক্তি পরিত্যাগ করেন তখন জ্ঞানযোগ অপেক্ষা কর্মযোগ অতি সুগম প্রমাণিত হয়। কেননা জ্ঞানযোগীর দেহাভিমান এবং জাগতিক ক্রিয়া ও পদার্থের আসক্তি দূর করার জন্য কর্মযোগের (নিষ্কামভাবে কর্ম করার) আবশ্যকতা থাকে এবং কর্মযোগীর অন্য কোনো সাধনার প্রয়োজন থাকে না (৫।৬ ; ১৫।১১)। কর্মযোগে আসক্তি ত্যাগই হল মুখ্য বিষয়, এর দ্বারা কর্মযোগী সমবুদ্ধি প্রাপ্ত হন। সেইজন্য ভগবান বলেছেন যে, কর্ম ত্যাগ করার প্রয়োজন নেই বরং আসক্তিরহিত হয়ে কর্ম করাই প্রয়োজন।

কর্ম ত্যাগ করা উচিত কি উচিত নয়—বস্তুতঃ এই নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা গীতার উদ্দেশ্য নয়। গীতা অনুযায়ী কর্মে আসক্তিই (দোষ হওয়ার কারণে) পরিত্যাজ্য। কর্মযোগে 'কর্ম' সর্বদা অপরের হিতার্থে করা হয় এবং 'যোগ' নিজের জন্য নয়। অর্জুন কর্মকে 'নিজের জন্য' মনে করেছিলেন, সেইজন্য যুদ্ধরূপ কর্তব্যকর্ম তাঁর কাছে ঘোরতর বলে মনে হয়েছিল। তাই ভগবান স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন যে আসক্তিই ভয়ংকর দোষ, কর্ম নয়।

'কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগম্ আরভতে'—এই শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে যেমন **'ইন্দ্রিয়াণি'** পদটির অর্থ দশ ইন্দ্রিয় বোঝায় তেমনি এখানে **'কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ'** পদটিকেও দশ ইন্দ্রিয়ের বাচক বলে ধরতে হবে। **'কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ'** পদটির দ্বারা যদি শুধু হস্ত-পদ-বাক্ ইত্যাদিকে ধরা হয় তাহলে

দেখা-শোনা বা মন দ্বারা বিচার করা ছাড়া কর্মগুলি কী প্রকারে সাধিত হয় ? এখানে তাই সমস্ত করণগুলিকেই অর্থাৎ অন্তঃকরণ এবং বহিঃকরণ—উভয়কেই কর্মেন্দ্রিয় বলে ধরা হয়েছে। কারণ এই সবগুলির সাহায্যেই কর্ম সাধিত হয়।

কর্ম যখন নিজের জন্য না করে অন্যের হিতের উদ্দেশ্যে করা হয় তখন তাকে কর্মযোগ বলা হয়। নিজের জন্য কর্ম করলে কর্মের সঙ্গে এবং কর্মফলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আর কর্ম নিজের জন্য না করে অন্যের জন্য করলে কর্ম এবং কর্মফলের সম্পর্ক অন্যের সঙ্গে এবং পরমাত্মার সঙ্গে নিজের সম্পর্ক হয়, যা আসলে সর্বদাই বর্তমান। এইভাবে দেশ, কাল, পরিস্থিতি ইত্যাদি অনুযায়ী প্রাপ্ত কর্তব্যকর্মগুলি নিঃস্বার্থভাবে পালন করাই হচ্ছে কর্মযোগের আরম্ভ। কর্মযোগী সাধক দুই শ্রেণীর হন—

(১) যাঁর মধ্যে কর্ম করার আগ্রহ, আসক্তি এবং রুচি আছে কিন্তু তাঁর নিজ কল্যাণ করার ইচ্ছাই প্রধান, এরূপ সাধকের নতুন নতুন কর্ম আরম্ভ করার প্রয়োজন নেই, তাঁর শুধুমাত্র প্রাপ্ত পরিস্থিতির সদুপযোগ করাই উচিত।

(২) যাঁর মধ্যে নিজ কল্যাণ করার ইচ্ছা প্রধান নয় এবং সংসারের সেবা করায়, সকলকে সুখী করায় এবং সমাজ সংস্কার করার কাজে যাঁর অধিক আগ্রহ, যাঁর এই ধারণা যে ওসব কাজ করলে অনেকের সেবা করা সম্ভব, সমাজের উন্নতি হওয়া সম্ভব, ইত্যাদি—এরূপ সাধক যদি নতুন নতুন কর্ম শুরু করেন তবে তাতে কোনো দোষ নেই। তবে, নতুন কর্মের আরম্ভ শুধুমাত্র কর্ম করার আসক্তি মেটানোর উদ্দেশ্যেই করা উচিত।

ভগবান গীতায় অর্জুনকে প্রাপ্ত পরিস্থিতির সদুপযোগ করতে বলেছেন, কারণ অর্জুনের প্রধান ইচ্ছা ছিল নিজ কল্যাণ করা (গীতা ২।৭ ; ৩।২ ; ৫।১)।

'স বিশিষ্যতে'—যিনি নিজ স্বার্থ এবং ফলের আসক্তি পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র প্রাণীদের হিতের উদ্দেশ্যে কর্ম করেন তিনিই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। কারণ তাঁর ক্রিয়াসকল সংসারের প্রতি হওয়ায় তাতে স্বতঃই অসঙ্গতা আসে।

সাধকের যখন নিজ কল্যাণ করার ইচ্ছা জাগে, তখন তিনি কর্মগুলিকে সাধনের বিঘ্ন মনে করে তার থেকে বিরত হতে চান। কিন্তু বাস্তবে কর্ম করা দোষের নয় বরং কর্মে সকামভাব থাকা হচ্ছে দোষের। সুতরাং ভগবান বলেছেন যে বাহ্যতঃ ইন্দ্রিয় সংযম করে অন্তরে বিষয় চিন্তাকারী মিথ্যাচারী ব্যক্তি অপেক্ষা আসক্তিরহিত হয়ে অন্যের হিতার্থে কর্ম করা শ্রেষ্ঠ। বাস্তবে মিথ্যাচারী ব্যক্তি অপেক্ষা স্বর্গাদিপ্রাপ্তির আশায় সকামভাবে যে কর্ম করে সেও শ্রেষ্ঠ। অতএব অপরের কল্যাণার্থে নিষ্কামভাবে যে কর্মযোগী কর্ম করেন তিনি যে শ্রেষ্ঠ হবেন—তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। পঞ্চম অধ্যায়ে অর্জুন যখন প্রশ্ন করলেন যে, সন্ন্যাস এবং যোগ—উভয়ের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ তখন তার উত্তরে ভগবান দুটিকেই কল্যাণকারী বলে জানালেন এবং বললেন যে, কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ। এখানেও বিষয়াদিতে স্বার্থভাব পরিত্যাগ করে অপরের হিতার্থে কর্ম করেন যে কর্মযোগী, তাঁকেই শ্রেষ্ঠ বলে জানানো হয়েছে।

পরিশিষ্ট-ভাব— নিজের কল্যাণের আকাঙ্ক্ষা, স্বভাবে উদারতা আর হৃদয়ে করুণা অর্থাৎ অন্যের সুখে সুখী (আনন্দিত) এবং দুঃখে দুঃখী— এই তিনটি থাকলে মানুষ কর্মযোগের অধিকারী হয়ে যায়। কর্মযোগের অধিকারী হলে কর্মযোগ সহজেই হতে থাকে।

কর্মযোগের একটি ভাগ হল **'কর্ম'** (কর্তব্য) অন্য ভাগটিকে বলা হয় **'যোগ'**। প্রাপ্ত বস্তু, সামর্থ্য এবং যোগ্যতার সদ্ব্যবহার করা এবং মানুষের সেবা করা হল কর্তব্য। কর্তব্য পালন করলে জগৎ-সংসারের সঙ্গে মেনে নেওয়া বন্ধন দূর হয়ে যায়— একেই বলা হয় যোগ। কর্তব্যের সম্পর্ক থাকে জগৎসংসারের সঙ্গে আর যোগের সম্বন্ধ হল পরমাত্মার সঙ্গে।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—গীতা নিজ শৈলী অনুযায়ী প্রথমে উপস্থাপিত বিষয়টি সম্বন্ধে আলোচনা করে। তারপর সেটি করলে লাভ হবে, না ক্ষতি হবে তা জানায়। তারপরে সেটি পালন করার নির্দেশ প্রদান করে। এখানেও ভগবান অর্জুনের (আমাকে ঘোরকর্মে কেন নিযুক্ত করছেন ?) প্রশ্নটির উত্তর দিতে গিয়ে প্রথমেই বলেছেন কর্ম সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা অসম্ভব। তারপর কর্ম স্বরূপতঃ ত্যাগ করে মনে মনে বিষয়চিন্তা করাকে মিথ্যাচার বলে নিষ্কামভাবে কর্ম যিনি করেন তাঁকে শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করেছেন। পরবর্তী শ্লোকে ভগবান সেই অনুযায়ী কর্তব্যকর্ম করার নির্দেশ দিচ্ছেন।

নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্মণঃ॥ ৮ ॥

[**ত্বম্** (তুমি) ; **নিয়তম্** (শাস্ত্রবিধিসম্মত) ; **কর্ম, কুরু** (কর্ম করো) ; **হি** (কারণ) ; **অকর্মণঃ** (কর্ম না করার থেকে) ; **কর্ম, জ্যায়ঃ** (কর্ম করা শ্রেষ্ঠ) ; **চ** (এবং) ; **অকর্মণঃ** (কর্ম না করলে) ; **তে** (তোমার) ; **শরীরযাত্রা, অপি** (শরীর নির্বাহও) ; **ন, প্রসিদ্ধ্যেৎ** (হতে পারে না।)]

তুমি শাস্ত্রবিধিসম্মত (নির্দিষ্ট) কর্ম করো, কারণ কর্ম না করার থেকে কর্ম করা শ্রেষ্ঠ, কর্ম না করলে তোমার শরীর নির্বাহও হতে পারে না ॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা—**'নিয়তং কুরু কর্ম ত্বম্'**—শাস্ত্রবিহিত এবং নিয়ত—দুই প্রকার কর্ম করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিহিত কর্মের তাৎপর্য হল—সাধারণভাবে শাস্ত্রে কথিত আজ্ঞারূপ কর্ম, যেমন—ব্রত-উপবাস-উপাসনা ইত্যাদি। এই বিহিত কর্মগুলি সম্পূর্ণরূপে করা একজন ব্যক্তির পক্ষে খুবই কঠিন। কিন্তু নিষিদ্ধ কর্মগুলি পরিত্যাগ করা সহজ। বিহিত কর্ম না করলে তেমন ক্ষতি হয় না, যতটা লাভ হয় নিষিদ্ধ কর্ম পরিত্যাগ করলে ; যেমন মিথ্যা কথা না বলা, চুরি না করা, হিংসা না করা ইত্যাদি নিষিদ্ধ কর্মগুলি ত্যাগ করলে বিহিত কর্ম স্বাভাবিকভাবে হতে থাকে। নিয়ত কর্মের তাৎপর্য হল—বর্ণ, আশ্রম, স্বভাব এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রাপ্ত কর্তব্যকর্ম ; যেমন— খাদ্য গ্রহণ করা, ব্যবসা করা, গৃহ নির্মাণ, পথভ্রান্ত ব্যক্তিকে সঠিক পথ দেখানো ইত্যাদি।

কর্মযোগের দৃষ্টিতে বর্ণ-ধর্ম অনুকূল যে শাস্ত্রবিহিত কর্তব্যকর্ম প্রাপ্ত হয় তা নিষ্ঠুর বা সৌম্য যাই হোক, সেইগুলি নিয়ত কর্ম। এখানে **'নিয়তং কুরু কর্ম'** পদটির দ্বারা ভগবান অর্জুনকে বলছেন, 'ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম হওয়ার জন্য নিজ বর্ণ-ধর্ম অনুযায়ী পরিস্থিতি দ্বারা প্রাপ্ত যুদ্ধ করাই হল তোমার স্বাভাবিক কর্ম' (১৮।৪৩)। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধরূপ হিংসাত্মক কর্ম নিষ্ঠুর বলে মনে হলেও নিষ্ঠুর নয়, বরং তার পক্ষে এটি নিয়ত কর্মই। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন, 'স্বধর্মের দিকে দৃষ্টি রেখে যুদ্ধ করাও তোমার পক্ষে নিয়ত কর্ম'—**'স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি'** (২।৩১)। প্রকৃতপক্ষে স্বধর্ম এবং নিয়ত কর্ম দুই-ই এক। দুর্যোধনাদির জন্যও যদিও যুদ্ধ বর্ণ ধর্ম অনুযায়ী প্রাপ্ত কর্ম ; কিন্তু এটি অন্যায়যুক্ত হওয়ায় নিয়ত কর্মের থেকে আলাদা। কারণ এরা যুদ্ধ করে অন্যায়ভাবে রাজ্য ছিনিয়ে নিতে চাইছে। সুতরাং তাদের কাছে এটি নিয়ত বা ধর্মযুক্ত কর্ম নয়।

'কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ'—এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে (অর্জুনের প্রশ্নে) উল্লিখিত **'জ্যায়সী'** পদটির উত্তর ভগবান **'জ্যায়ঃ'** পদের দ্বারা দিয়েছেন। সেখানে অর্জুন প্রশ্ন করেছিলেন, 'যদি আপনি কর্ম অপেক্ষা জ্ঞানকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন, তাহলে আমাকে এই ঘোর কর্মে কেন নিয়োজিত করছেন ?' তার উত্তরে ভগবান বলেছেন, 'কর্ম না করার থেকে কর্ম করাকেই আমি শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি।' এইরূপ অর্জুনের যুক্তি ছিল যুদ্ধরূপ ঘোর কর্ম হতে নিবৃত্ত হওয়ার এবং ভগবানের মত ছিল অর্জুনকে যুদ্ধরূপ নিয়ত কর্মে প্রবৃত্ত করানো। সেইজন্য অষ্টাদশ অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন, 'দোষযুক্ত হলেও সহজ (নিয়ত) কর্ম পরিত্যাগ করা উচিত নয়'—**'সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ'** (১৮।৪৮)। কারণ এটি পরিত্যাগ করলে দোষ হয় এবং কর্মগুলির সঙ্গেও সম্পর্ক টিকে থাকে। সুতরাং কর্ম ত্যাগ অপেক্ষা নিয়ত কর্ম করাই শ্রেষ্ঠ। আর আসক্তিবর্জিত হয়ে কর্ম করা তো শ্রেষ্ঠতর বলে মানা হয়েছে। কারণ এর দ্বারা কর্মগুলির সঙ্গে সর্বতোভাবে সম্পর্ক ছেদ হয়ে যায়। সুতরাং ভগবান এই শ্লোকের পূর্বার্ধে অর্জুনকে নিরাসক্তভাবে নিয়ত কর্ম করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং উত্তরার্ধে বলেছেন, 'কর্ম না করলে তোমার জীবননির্বাহও হবে না।'

কর্মযোগে **'কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ'**—ভগবানের এটি হল প্রধান সিদ্ধান্ত। এটিকেই ভগবান **'মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি'** (গীতা ২।৪৭) পদটির দ্বারা স্পষ্টভাবে বলেছেন, 'হে অর্জুন ! কর্ম না করাতে যেন তোমার আসক্তি না জন্মায়। কারণ কর্তব্যকর্মে অমনোযোগী ব্যক্তি প্রমাদ, আলস্য এবং নিদ্রাতে নিজ অমূল্য সময় ব্যয় করে অথবা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্মাদি করে যাতে তার পতন ঘটে।'

কর্মকে স্বরূপতঃ পরিত্যাগ করার থেকে কর্ম করতঃ তার থেকে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ করাই শ্রেষ্ঠ। কারণ কামনা,

বাসনা, ফলাকাঙ্ক্ষা, পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদিই কর্মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে দেয়, তা মানুষ কর্ম করুক আর নাই করুক। কামনাদি ত্যাগের উদ্দেশ্য নিয়ে কর্মযোগের আচরণ করলে কামনা ইত্যাদি অতি সহজেই পরিত্যক্ত হয়।

'শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্মণঃ'—অর্জুনের মনে হয়েছিল যে কর্ম না করলে স্বতঃই কর্মের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হয়ে যায়। সেইজন্য ভগবান নানা যুক্তির সাহায্যে তাঁকে কর্ম করার প্রেরণা দিয়েছেন। এই যুক্তিগুলির মধ্যে একটি যুক্তির ব্যাখ্যা করে ভগবান বলছেন, 'হে অর্জুন! তোমাকে কর্ম তো করতেই হবে, অন্য কথা বাদ দাও, কর্ম না করলে তোমার শরীরনির্বাহ (স্নানাহার আদি) পর্যন্ত অসম্ভব হয়ে পড়বে।'

জ্ঞানযোগে যেমন বিবেক সহযোগে সংসারের থেকে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয় তেমনি কর্মযোগে কর্তব্যকর্ম ঠিকভাবে পালন করলে সংসার থেকে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ হয়ে যায়। সুতরাং জ্ঞানযোগের থেকে কর্মযোগকে কোনও ভাবেই ছোট বলে মনে করা উচিত নয়। কর্মযোগী তাঁর শরীরকে এই জগতেরই বস্তু মনে করে সংসারের সেবায় তাকে নিয়োজিত করেন অর্থাৎ শরীরের ওপর তাঁর কোনো নিজস্ববোধ থাকে না। তিনি স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ দেহের ঐক্য ক্রমশঃ স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণরূপ সংসারের মধ্যে বিস্তার করেন, যেমন জ্ঞানযোগী ব্রহ্মের সঙ্গে ঐক্যবোধ অনুভব করেন। এইরূপ কর্মযোগী জড়-তত্ত্বের ঐক্য স্থাপন করেন আর জ্ঞানযোগী ঐক্য করেন চেতন-তত্ত্বের সঙ্গে।

সাধন সম্পর্কিত মর্মকথা

অর্জুনের কর্মে অরুচি হয়েছিল অর্থাৎ তাঁর মনে কর্ম না করার আগ্রহ দেখা দিয়েছিল। শুধু অর্জুনই নয়, প্রত্যুত পারমার্থিক পথে বিচরণকারী অন্যান্য সাধকেরাও প্রায়শঃ এই ব্যাপারে ভুল করে থাকেন। যদিও তাঁদের সাধন-ভজন করারই ইচ্ছা থাকে এবং তা করেও থাকেন তবুও তাঁরা নিজেদের পছন্দ মতো পরিস্থিতি, অনুকূলতা এবং সুখ-বুদ্ধিও বজায় রাখেন যা তাঁদের সাধনায় বিরাট বাধাস্বরূপ।

যে সাধক তত্ত্বপ্রাপ্তির পথে সুগমতার ইচ্ছা করেন এবং তা শীঘ্র লাভ করতে চান তিনি প্রকৃতপক্ষে সুখেরই অনুরাগী, সাধনপ্রেমী নন। যিনি সহজভাবে তত্ত্বপ্রাপ্তি করতে চান, তাঁকে কাঠিন্য সহ্য করতে হয় এবং যিনি শীঘ্র তত্ত্বপ্রাপ্তির আশা করেন তাঁকে বিলম্ব সইতেই হয়। কারণ সহজভাবে এবং শীঘ্র পাবার চেষ্টায় সাধকের দৃষ্টি 'সাধনার' দিকে না থেকে 'ফলের' দিকে থাকে, যাতে সাধনে বিঘ্ন ঘটে এবং সাধ্য প্রাপ্তিতে বিলম্ব হয়। যাঁর উদ্দেশ্য দৃঢ় থাকে যে, 'যেমন ভাবেই হোক, আমাকে তত্ত্বলাভ করতেই হবে', তাঁর দৃষ্টি সহজপথ বা দ্রুততার দিকে থাকে না। তৎপর মনস্বী ব্যক্তি যখন নিজ উদ্দেশ্য পূর্তির জন্য তৎপর হন তখন তিনি নিজের সুখ-দুঃখের দিকে নজর পর্যন্ত দেন না—**'মনস্বী কার্যার্থী ন গণয়তি দুঃখং ন চ সুখম্'** (ভর্তৃহরিনীতিশতক)। সাধকদের আর কি কথা, সাধারণ লোভী ব্যক্তিও কষ্টের দিকে তাকায় না। প্রায়শঃ দেখা যায় যে, ঘর্মাক্ত কলেবর বা তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির শৌচকার্যে যাওয়ার জন্য বিশেষ তাগিদ থাকলেও যদি পণ্য দ্রব্য বিক্রির তথা অর্থাগমের বিশেষ সুযোগ আসে, তবে সে পূর্বোক্ত সব কষ্ট সহ্য করে যায়। লোভী ব্যবসায়ীর মতো সাধকেরও সাধ্যের ওপর নিষ্ঠা হওয়া উচিত। সাধ্য প্রাপ্তি না করা পর্যন্ত তিনি যেন শান্তি না পান, জীবন যেন তাঁর কাছে ভারস্বরূপ মনে হয়, খাওয়াদাওয়া, আরাম ইত্যাদি কিছুই যেন ভালো না লাগে এবং হৃদয়ে সাধনের জন্য শ্রদ্ধা এবং তৎপরতা যেন বজায় থাকে। সাধ্য প্রাপ্তির উৎকণ্ঠা থাকায় বিলম্ব অসহ্য মনে হয়, কিন্তু তা শীঘ্র লাভ হোক—এমন আকাঙ্ক্ষা হয় না।

উৎকণ্ঠা এক ব্যাপার এবং শীঘ্র পাবার আশা অন্য ব্যাপার। আসক্তিযুক্ত সাধন-ভজনকারী সাধক সাধনাতে সুখভোগ করে থাকেন কিন্তু তাতে বিলম্ব হলে বা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হলে তিনি ক্রোধান্বিত হন এবং সাধনার দোষ দেখেন। কিন্তু শ্রদ্ধা এবং প্রেমযুক্ত সাধনকারী সাধক সাধনে বিলম্ব হলে বা প্রতিবন্ধকতা এলে আর্তভাবে ক্রন্দন করেন এবং তাঁর উৎকণ্ঠা আরও বেড়ে যায়। ক্ষিপ্রতা এবং উৎকণ্ঠাতে এই পার্থক্য লক্ষণীয়। ক্ষিপ্রতায় সাধকের সুখ-সুবিধার এই ভাব বিরাজ করে যে, তত্ত্বপ্রাপ্তি তাড়াতাড়ি হলে পরে আরাম করা যাবে। এইরূপ ফলের দিকে দৃষ্টি থাকায় সাধনে শ্রদ্ধাভাব কমে যায়। **কিন্তু উৎকণ্ঠাতে সাধক তাঁর সাধনকেই আরাম ভেবে মনে করেন যে, সাধন-ভজন ছাড়া আর করার কীই বা আছে? এর চেয়ে ভালো কাজ আর কী আছে যে করব? সুতরাং সাধনই করা উচিত, তা সে সহজভাবে বা কঠিনভাবে যাই**

হোক কিংবা শীঘ্র বা বিলম্বেই ঘটুক। এইজন্য তাঁর সম্পূর্ণ শক্তি সাধনে নিয়োজিত হয়, যাতে তিনি শীঘ্রই তত্ত্ব লাভ করেন। কিন্তু যারা শীঘ্র সিদ্ধিলাভ আশা করে, তাদের সাধ্য প্রাপ্তিতে বিলম্ব ঘটলে তারা নিরাশও হয়ে যেতে পারে। সুতরাং সাধকের উচিত সাধ্যের থেকেও সাধনে অধিক মনোযোগ প্রদান করা। যেমন মাতা পার্বতী বলেছেন—

জন্ম কোটি লগি রগর হমারী।
বরউঁ সম্ভু ন ত রহঁউ কুআরী॥
তজউঁ ন নারদ কর উপদেসু।
আপু কহহিঁ সত বার মহেসু॥

(শ্রীরামচরিতমানস ১।৮১।৩)

মাতা পার্বতীর ভাবেতে শীঘ্রতার তাড়া নেই। এতে সাধনায় সাধ্যের থেকেও বেশি শ্রদ্ধা দেখানো হয়েছে।

এই শ্লোকটিতে ভগবান অর্জুনকে নিমিত্ত করে সাধকদের সাবধান করে দিচ্ছেন যে তাঁদের নিজ অনুকূল এবং সুখবুদ্ধি (যেটি সাধনের প্রধান বাধা) পরিত্যাগ করে অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে কর্তব্যকর্ম করায় মনোনিবেশ করা উচিত।

পরিশিষ্ট-ভাব— নিষ্কামভাবে কর্ম করেন যে কর্মযোগী, তিনি যাঁরা বাহ্যতঃ কর্ম ত্যাগ করেন তাঁদের থেকে অথবা সকামভাবে যাঁরা কর্ম করেন তাঁদের থেকেই শুধু শ্রেষ্ঠ নন, এমনকি জ্ঞানযোগীদের থেকেও তিনি শ্রেষ্ঠ—**'তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগোবিশিষ্যতে'** (গীতা ৫।২)। তাই ভগবান উপস্থিত প্রকরণটিতে নিষ্কামভাবে কর্ম করার ওপরে বিশেষ জোর দিয়েছেন।

※ ※ ※

*সম্বন্ধ—আগের শ্লোকটিতে ভগবান কর্ম না করলে শরীর-নির্বাহ করা যায় না, সে কথা বলেছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে কর্ম করা খুবই প্রয়োজন। কিন্তু কর্ম করলে তো মানুষ আবদ্ধ হয়—**'কর্মণা বধ্যতে জন্তুঃ'**, তাহলে এই বন্ধন হতে মুক্তি পাবার জন্য মানুষের কী করা উচিত—ভগবান পরবর্তী শ্লোকে তা জানাচ্ছেন।*

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥ ৯ ॥

[**যজ্ঞার্থাৎ** (যজ্ঞের উদ্দেশ্যে করা) ; **কর্মণঃ** (কর্মগুলি) ; **অন্যত্র** (অন্য) ; **অয়ম্ লোকঃ** (মনুষ্যসকল) ; **কর্মবন্ধনঃ** (কর্মে আবদ্ধ হয়) ; **কৌন্তেয়** (হে কুন্তীনন্দন !) ; **মুক্তসঙ্গঃ** (আসক্তিবর্জিত হয়ে) ; **তদর্থম্** (যজ্ঞের উদ্দেশ্যে) ; **কর্ম** (কর্তব্য-কর্ম) ; **সমাচর** (করো।)]

যজ্ঞের (কর্তব্য পালনের) উদ্দেশ্যে করা কর্মগুলি ব্যতিরেকে অন্য কর্ম (নিজের জন্য করা কর্ম) করলে মানুষ তাতে আবদ্ধ হয়, সেইজন্য হে কুন্তীনন্দন ! তুমি আসক্তিবর্জিত হয়ে যজ্ঞের উদ্দেশ্যেই কর্তব্যকর্ম করো ॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা—**'যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র'**—গীতা অনুযায়ী কর্তব্যমাত্রই 'যজ্ঞ'। যজ্ঞ, দান, তপস্যা, হোম, তীর্থ-ভ্রমণ, ব্রত, বেদাধ্যায়ন ইত্যাদি সমস্ত শারীরিক, ব্যবহারিক এবং পারমার্থিক ক্রিয়াগুলিকেই যজ্ঞ বলা হয়। কর্তব্য মনে করে ব্যবসায়, চাকুরি, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, ইত্যাদি শাস্ত্রবিহিত কর্ম করার নামও যজ্ঞ। অপরের সুখের জন্য বা তাদের হিতের উদ্দেশ্যে যে কর্ম করা হয় সেগুলি সবই যজ্ঞার্থ কর্ম। যজ্ঞার্থ কর্ম করলে আসক্তি খুব শীঘ্রই দূর হয় এবং কর্মযোগীর সমগ্র কর্ম বিনষ্ট হয় (গীতা ৪।২৩), অর্থাৎ ওই কর্মগুলি নিজে তো বন্ধনকারক হয়ই না বরং সঞ্চিত কর্মসমূহকেও বিনষ্ট করে।

মানুষের স্থিতি হয় প্রকৃতপক্ষে তার উদ্দেশ্য অনুযায়ী, ক্রিয়া অনুযায়ী নয়। ব্যবসায়ীর প্রধান উদ্দেশ্য হল অর্থ উপার্জন ; সুতরাং তার বাস্তবে স্থিতি অর্থেই থাকে এবং দোকান বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে তার বৃত্তি অর্থের দিকে চলে যায়। তেমনি যজ্ঞার্থ কর্ম করার কালে কর্মযোগীর স্থিতি, তাঁর উদ্দেশ্য পরমাত্মাতেই থাকে এবং কর্ম সমাপ্ত হলেই তাঁর বৃত্তি পরমাত্মার দিকে চলে যায়।

সমস্ত বর্ণের লোকেরই পৃথক পৃথক কর্ম থাকে। একটি বর্ণের লোকের কাছে যেটি স্বধর্ম, অন্য বর্ণের লোকের

কাছে সেটি (বিহিত কর্ম না হওয়ায়) পরধর্ম অর্থাৎ অন্যায় কর্ম রূপে প্রতিভাত হয় ; যেমন—ব্রাহ্মণের নিকট ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা-নির্বাহ স্বধর্ম হলেও ক্ষত্রিয়ের কাছে এটি পরধর্ম। এইরূপ নিষ্কামভাবে কর্তব্যকর্ম করা মানুষের স্বধর্ম এবং সকামভাব নিয়ে কর্ম করা হল পরধর্ম। যতপ্রকার সকাম এবং নিষিদ্ধ কর্ম আছে তা সবই 'অন্যত্র কর্মের' শ্রেণীভুক্ত। নিজ সুখ-মান-অহংকার-আরাম ইত্যাদির জন্য যে সব কর্ম করা হয় সেগুলি সমস্তই 'অন্যত্র কর্ম'[১]। সুতরাং ক্ষুদ্র বা বৃহৎ যেরূপ কর্মই করা হোক না কেন, তাতে সাধকের সাবধান থাকতে হয়, যেন কোনো স্বার্থভাবনায় চালিত হয়ে সেই কর্ম না করতে হয়। সাধক তাঁকেই বলা হয়, যিনি সর্বক্ষণ সতর্ক থাকেন। সেইজন্য সাধকের নিজ সাধনার প্রতি সতর্ক এবং সজাগ থাকা উচিত।

'অন্যত্র কর্ম'-এর বিষয়ে দুটি গোপন ভাব—

১) কোনো অতিথি এলে যদি তাঁকে কেউ 'আসুন, বসুন' ইত্যাদি শ্রদ্ধামূলক শব্দে আপ্যায়ন করে এবং অন্তরে নিজের মধ্যে ভালো মানুষের অভিমান আরোপ করে অথবা 'এরূপ করলে অতিথির ওপর আমার ভালো প্রভাব পড়বে'—এই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে তাহলে স্বার্থভাব সুপ্ত থাকায়, এটি 'অন্যত্র কর্ম' রূপে বিবেচিত হয়, যজ্ঞার্থ কর্ম রূপে নয়।

২) সৎসঙ্গ, সভা ইত্যাদিতে যদি কোনো ব্যক্তি প্রশ্ন করার সময় মনে এইভাব রাখেন যে বক্তা এবং শ্রোতাগণ তাঁর সম্বন্ধে ভালো ধারণা পোষণ করবেন এবং তাঁদের ওপর প্রশ্নকারীর ভালো প্রভাব পড়বে তবে এটিও 'অন্যত্র কর্ম' রূপে বিবেচিত হয়, যজ্ঞার্থ কর্ম রূপে নয়।

অর্থাৎ সাধকের স্বার্থ, কামনা ইত্যাদি ভাব পরিত্যাগ করে কর্ম করা উচিত। কর্মের নিষেধ নয়, নিষিদ্ধ হল সকামভাব।

সাধকের ভোগাকাঙ্ক্ষা এবং ঐশ্বর্যবুদ্ধি নিয়ে কোনো কর্ম করা উচিত নয় কারণ ওরূপ বুদ্ধিতে ভোগাসক্তি এবং কামনা থাকে, যার ফলে কর্মযোগের আচরণ পালিত হতে পারে না। নির্বাহ-বুদ্ধিতে কর্ম করলেও বাঁচার আগ্রহ থাকে। সুতরাং নির্বাহ-বুদ্ধিও পরিত্যাজ্য। সাধকের কেবলমাত্র সাধন-বুদ্ধিতেই সমস্ত কর্ম করা উচিত। তিনিই সর্বাপেক্ষা উত্তম সাধক যিনি নিজ মুক্তির জন্যও কর্ম না করে শুধুমাত্র অন্যের হিতের জন্য কর্ম করেন। কারণ অপরের হিতার্থে কর্ম করলেই নিজের হিত হয়, নিজের জন্য কর্ম করলে নয়। অন্যের হিতেই নিজের হিত। অপরের হিতের থেকে নিজ-হিতকে পৃথক করে দেখা ভুল। সেইজন্য লৌকিক এবং শাস্ত্রীয় যে কর্মই করা হোক, তা সবই শুধুমাত্র লোক-হিতার্থে করা উচিত।

নিজ সুখ বা হিতের জন্য কর্ম করলে তা বন্ধনকারক হয়। শুধু নিজ হিতের দিকেই দৃষ্টি রাখলে ব্যক্তিত্ব-ভাব বজায় থাকে। সেইজন্য অন্য কাজ তো নিশ্চয়ই, জপ-চিন্তা-ধ্যান-সমাধি ইত্যাদি কর্মও লোকহিতার্থে করা উচিত। তাৎপর্য এই যে, স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ—এই তিন শরীর দ্বারা হওয়া ক্রিয়া জগৎ-সংসারের জন্যই যেন করা হয়, নিজের জন্য নয়। 'কর্ম' জগৎসংসারের জন্য এবং সংসার থেকে সম্বন্ধ ছেদ হলে পরমাত্মার সঙ্গে 'যোগ' নিজের জন্য। এরই নাম কর্মযোগ।

'লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ'—কর্তব্যকর্ম (যজ্ঞ) করার অধিকার প্রধানতঃ মানুষেরই থাকে। ভগবান পরে এর বর্ণনা সৃষ্টিচক্রের প্রসঙ্গেও (৩।১৪-১৬) করেছেন। যার উদ্দেশ্য থাকে প্রাণীমাত্রেরই হিত করা, তাদের সুখী করা, তার দ্বারাই কর্তব্যকর্ম সাধিত হয়। মানুষ যখন অন্যের হিতার্থে কর্ম না করে শুধু নিজের সুখের জন্য কর্ম করে, তখন সে আবদ্ধ হয়ে যায়।

আসক্তি এবং স্বার্থযুক্ত হয়ে কর্ম করাই হল বন্ধনের কারণ। আসক্তি এবং স্বার্থ না থাকলে স্বতঃই অপরের হিতার্থে কর্ম করা হয়ে থাকে। ভাবের দ্বারাই বন্ধন হয়, ক্রিয়ার দ্বারা নয়। মানুষের বন্ধনের কারণ কর্ম নয়, বরং কর্মের মধ্যে সে যে আসক্তি ও স্বার্থভাব রাখে তার দ্বারাই সে আবদ্ধ হয়।

'তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর'—এখানে ভগবানের **'মুক্তসঙ্গঃ'** পদটি বলার তাৎপর্য এই যে, কর্মে বা পদার্থে অথবা যা দ্বারা কর্ম করা হয়, সেই শরীর-মন-বুদ্ধি ইত্যাদিতে মমতা-আসক্তি হওয়াই বন্ধনের কারণ। মমতা-আসক্তি থাকলে কর্তব্যকর্মও স্বাভাবিক বা ত্রুটিহীন হয় না। মমতা-আসক্তি না থাকলে পর-হিতের জন্য করা কর্তব্যকর্মের আচরণ স্বতঃস্ফূর্ত হয় এবং যদি কর্তব্যকর্ম

[১] নিজের জন্য কর্ম করলে সকামভাব থাকে এবং সকামভাব থাকলে নিষিদ্ধ কর্ম হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা থাকে।

প্রাপ্ত না হয় তাহলে স্বতঃই নির্বিকল্পতায়, স্বরূপে স্থিতি হয়। পরিণামে সাধন নিরন্তর হয় এবং কখনো সাধনবিহীন অবস্থা হয় না।

আলস্য এবং প্রমাদের জন্য নিয়তকর্ম পরিত্যাগ করাকে 'তামস ত্যাগ' বলা হয় (গীতা ১৮।৭), যার ফল হয় মূঢ়তা অর্থাৎ মূঢ়যোনিপ্রাপ্তি—**'অজ্ঞানং তমসঃ ফলম্'** (গীতা ১৪।১৬)। কর্মকে দুঃখদায়ক মনে করে পরিত্যাগ করাকে 'রাজস ত্যাগ' বলা হয় (গীতা ১৮।৮) যার ফল দুঃখপ্রাপ্তি—**'রজসস্তু ফলং দুঃখম্'** (গীতা ১৪।১৬)। সেইজন্য ভগবান এখানে অর্জুনকে কর্ম ত্যাগ করার কথা বলেননি, বরং স্বার্থ, মমত্ব, ফলাসক্তি, কামনা, বাসনা, পক্ষপাত ইত্যাদি রহিত হয়ে শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী সুচারুভাবে উৎসাহপূর্বক কর্তব্যকর্ম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। একেই 'সাত্ত্বিক ত্যাগ' বলা হয় (গীতা ১৮।৯)। ভগবান স্বয়ং পরে একথা বলেছেন, 'আমার করার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই, তবুও আমি সতর্কতাপূর্বক কর্মানুষ্ঠান করি' (গীতা ৩।২২-২৩)।

কর্তব্যকর্ম উত্তমরূপে পালন করায় দুটি কারণে শিথিলতা আসে—১) মানুষের স্বভাব হল যে, সে আগে ফল কামনা করে তবেই কর্মে প্রবৃত্ত হয়। যখন সে দেখে যে কর্মযোগ অনুযায়ী ফলের কামনা রাখা উচিত নয়, তখন সে চিন্তা করে, 'তবে কর্ম করব কেন ?' (২) কর্ম শুরু করার পর যখন সে বুঝতে পারে যে এর বিপরীত ফল হবে, তখন সে ভাবে, 'আমি তো উত্তম কর্মই করেছি, তার ফল যদি বিপরীত হয়, তাহলে আর কর্ম করবই বা কেন ?'

কর্মযোগীর কোনো কামনাও থাকে না বা তিনি কোনও বিনাশশীল ফলও আশা করেন না, তিনি সংসারের হিতার্থে কর্তব্যকর্মগুলি করে থাকেন মাত্র। অতএব উপরের দুটি কারণে তাঁর কর্তব্যকর্মে কোনো শৈথিল্য আসতে পারে না।

মর্মকথা

মানুষের প্রায়শঃ এরূপ স্বভাব দেখা যায় যে, সে যে কর্মের মধ্যে নিজ স্বার্থ দেখতে পায়, সেই কর্ম অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে করে কিন্তু সেই কর্মটি তার পক্ষে বন্ধনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই বন্ধন হতে মুক্তি পাবার জন্য তার কর্মযোগের আচরণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

কর্মযোগে সমস্ত কর্মই অপরের জন্য করা হয়, নিজের জন্য কখনো নয়। অপর কারা ?—এটা বোঝা অত্যন্ত জরুরি। নিজ শরীর ব্যতিরেকে অন্য প্রাণী বা পদার্থ তো ভিন্ন বটেই, কিন্তু নিজের বলে এই যে স্থূলশরীর, সূক্ষ্মশরীর (ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি-প্রাণ) এবং কারণশরীর (যাতে 'আমিত্ব' ভাব পোষণ করা হয়) তাও স্বয়ং-এর থেকে পৃথক[১]। কারণ স্বরূপ (জীবাত্মা) হল চেতন পরমাত্মার অংশ এবং শরীরাদি অন্য যা কিছু তা সব হল জড় প্রকৃতির অংশ, সমস্ত ক্রিয়াগুলিই জড়ে এবং জড়ের জন্য হয়ে যায়। চেতন বা চেতনের জন্য কখনো কোনো ক্রিয়া হয় না। সুতরাং 'করা' নিজের জন্য করাই যায় না, কখনো হয়নি এবং হওয়া সম্ভব নয়। তবে জগৎ-সংসারের সঙ্গে মিলিত হয়ে শরীরাদি জড় পদার্থকে যতটা অংশে চেতন 'আমি', 'আমার' এবং 'আমার জন্য' বলে মেনে নেয়, সেই অংশটিতে তার স্বভাবে 'নিজের জন্য' করা হয়। অতএব অপরের জন্য কর্ম করলে মমত্ববোধ ও আসক্তি সহজেই দূর হয়।

শারীরিক অবস্থা (বাল্য, যৌবন ইত্যাদি) পরিবর্তনেও প্রাণীমাত্রেরই 'আমি সে-ই' এইরূপে আপন এক স্থির সত্তার অনুভব হয়। এই অপরিবর্তনশীল সত্তার (নিজস্ব স্ব-বোধের) পরমাত্মতত্ত্বের সঙ্গে স্বতঃসিদ্ধ ঐক্য থাকে এবং পরিবর্তনশীল শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদির জগৎ-সংসারের সঙ্গে স্বতঃই ঐক্য থাকে। আমাদের দ্বারা যে সমস্ত ক্রিয়া সাধিত হয় তা সবই শরীর, ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা

[১]সংসার যেমন 'অন্য', তেমনি শরীর-ইন্দ্রিয়াদি-মন-বুদ্ধিও 'অন্য' অর্থাৎ অপর। সুতরাং কর্মযোগী এগুলিকে নিজের মনে না করেও এগুলির পরিচর্যা করেন। শরীরকে নিদ্রালু, অলস, প্রমাদী, নিষ্কর্মা এবং ভোগী হতে না দেওয়াই হল 'শরীরের' পরিচর্যা বা সেবা। ইন্দ্রিয়গুলিকে সাংসারিক ভোগে না লাগানোই হল 'ইন্দ্রিয়গুলির' পরিচর্যা। মনকে কারো অহিত-চিন্তা, বিষয়-চিন্তা বা অর্থহীন চিন্তায় ব্যাপৃত হতে না দেওয়াই হল 'মনে'র পরিচর্যা। বুদ্ধিকে অন্যের কর্তব্য বিচার করতে না দেওয়া, অপরে কী করছে বা করছে না—এইসব ভাবতে না দেওয়াই হল বুদ্ধির পরিচর্যা। প্রকৃতপক্ষে শরীর-ইন্দ্রিয়াদি-মন এবং বুদ্ধিতে মমত্ববোধ ও আসক্তি না রাখাই হল এগুলির প্রকৃত 'সেবা'।

সাধিত হয়। কারণ ক্রিয়ামাত্রেরই সম্পর্ক থাকে প্রকৃতি এবং প্রকৃতিজনিত পদার্থের সঙ্গে, স্বয়ং (নিজ স্বরূপ)-এর সঙ্গে নয়। সেইজন্য শরীরের সাহায্য ছাড়া আমরা কোনো ক্রিয়া করতে সক্ষম নই। এর দ্বারা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় যে, আমাদের নিজের জন্য কিছুই করার নেই, যা কিছু কর্তব্য সবই জগৎসংসারের জন্য। কারণ 'করা' তার ওপরই প্রযোজ্য, যে স্বয়ং করতে সক্ষম। যে স্বয়ং কিছু করতেই পারে না, তার জন্য 'করা'র বিধানই নেই। যা কিছু করা হয়, সংসারের সাহায্যেই তা করা হয়। সুতরাং 'করা' জগৎসংসারেরই জন্য। নিজের জন্য করলেই মানুষ কর্ম দ্বারা আবদ্ধ হয়—**'যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ'**।

বিনাশশীল এবং পরিবর্তনশীল শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদির সঙ্গে নিজ অবিনাশী এবং অপরিবর্তনশীল স্বরূপের কোনো সম্বন্ধ নেই, সেইজন্য নিজস্ব এবং নিজের জন্য কিছুই নেই। শরীর ইত্যাদির সাহায্য ছাড়া আমরা কিছু করতে সক্ষম নই, তাই নিজের জন্য কিছুই করার নেই। নিজের সৎ-স্বরূপে কখনো কোনোপ্রকার ঘাটতি হয় না এবং ঘাটতি না থাকায় ইচ্ছাও জাগে না, তাই আসলে নিজের জন্য কিছুই প্রয়োজন হয় না। এইভাবে ক্রিয়া এবং পদার্থ থেকে যখন সর্বতোভাবে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয় (যেটি বাস্তবে সত্য), তখন জ্ঞানের সংস্কার থাকলে স্বরূপের সাক্ষাৎ লাভ হয়, আর যদি ভক্তির সংস্কার থাকে, তাহলে ভগবানের প্রতি প্রেম উদয় হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব— মানুষ কর্ম করলে আবদ্ধ হয় না, প্রত্যুত 'অন্যত্র কর্ম' করলে অর্থাৎ নিজের জন্য কর্ম করলে আবদ্ধ হয় (গীতা ৩।১৩)। অতএব **'যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ'** পদটির তাৎপর্য হল — নিজের জন্য কিছু করা উচিত নয়।

মানুষ কর্মবন্ধন থেকে তখনই মুক্ত হতে সক্ষম হয়, যখন সে জগৎ-সংসার থেকে প্রাপ্ত শরীর, বস্তু, যোগ্যতা এবং সামর্থ্য জগতেরই সেবায় নিয়োজিত করে এবং তার পরিবর্তে কোনো কিছু আশা না করে। কেননা আমরা প্রকৃতপক্ষে যা চাই জগৎ আমাদের তা দিতেই পারে না। আমরা সুখ চাই, অমরত্ব চাই, নিশ্চিন্ততা চাই, নির্ভয় হতে চাই, স্বাধীনতা চাই। কিন্তু এসব সংসার থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। সংসার থেকে সম্পর্ক ছেদ হলেই তা পাওয়া সম্ভব। সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার জন্য আমাদের উচিত সংসার থেকে প্রাপ্ত বস্তু সংসারের সেবাতেই নিয়োগ করা।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে যজ্ঞের (কর্তব্যকর্মের) অতিরিক্ত যে কোনো কর্মই বন্ধনকারক হয়ে থাকে। অতএব এই বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কর্মগুলি বাহ্যতঃ ত্যাগ না করে কর্তব্য মনে করে করা প্রয়োজন। এখন কর্মগুলি করার আবশ্যকতার ভাব দৃঢ় করতে ভগবান আরও কয়েকটি কারণ জানাচ্ছেন।

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্॥ ১০ ॥
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥ ১১ ॥

[**প্রজাপতিঃ** (প্রজাপতি ব্রহ্মা) ; **পুরা** (সৃষ্টির আরম্ভে) ; **সহযজ্ঞাঃ** (কর্তব্যকর্মের বিধান সহ) ; **প্রজাঃ** (প্রজা) ; **সৃষ্ট্বা** (সৃষ্টি করে তাদের) ; **উবাচ** (বলেছিলেন) ; **অনেন** (এই কর্তব্য দ্বারা) ; **প্রসবিষ্যধ্বম্** (সকলের সমৃদ্ধি করো) ; **এষঃ** (এই) ; **বঃ** (তোমাদের) ; **ইষ্টকামধুক্** (কর্তব্যপালনের অভীষ্ট সামগ্রী প্রদানকারী) ; **অস্তু** (হোক) ; **অনেন** (এই কর্তব্যকর্ম দ্বারা) ; **দেবান্** (দেবতাগণের) ; **ভাবয়ত** (সংবর্ধন করো) ; **তে** (এই) ; **দেবাঃ** (দেবতাগণ) ; **বঃ** (তোমাদের) ; **ভাবয়ন্তু** (মানোন্নয়ন করুন) ; **পরস্পরম্** (পরস্পরের) ; **ভাবয়ন্তঃ** (সংবর্ধনার দ্বারা) ; **পরম্** (পরম) ; **শ্রেয়ঃ** (কল্যাণ) ; **অবাপ্স্যথ** (প্রাপ্ত হবে।)]

প্রজাপতি ব্রহ্মা সৃষ্টির আরম্ভে কর্তব্যকর্মের বিধানসহ প্রজা (মানুষাদি) সৃষ্টি করে তাদের (প্রধানতঃ মনুষ্যজাতিকে) বলেছিলেন যে, তোমরা এই কর্তব্য (যজ্ঞ) দ্বারা সকলের সমৃদ্ধি করো এবং এই কর্তব্যরূপ যজ্ঞ তোমাদের কর্তব্য পালনের অভীষ্ট সামগ্রী প্রদানকারী হোক। এই কর্তব্যকর্ম (যজ্ঞ) দ্বারা তোমরা দেবতাগণের সংবর্ধন করো এবং দেবতাগণও তাঁদের কর্তব্য দ্বারা তোমাদের মানোন্নয়ন (সংবর্ধন) করুন। এইভাবে পরস্পরের সংবর্ধনার দ্বারা তোমরা পরম কল্যাণ প্রাপ্ত হবে ॥ ১০-১১ ॥

ব্যাখ্যা—**'সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ'** —ব্রহ্মা প্রজা (সৃষ্টি)র রচয়িতা এবং তাদের প্রভু তাই নিজ কর্তব্য পালনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রজাদের রক্ষা এবং তাদের কল্যাণের চিন্তাও করে থাকেন। কারণ যিনি যেটি সৃষ্টি করেন, সেটি রক্ষা করাও তাঁর কর্তব্য হয়ে থাকে। ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করে তার রক্ষায় তৎপর থাকেন এবং সর্বদা তাদের হিতের কথা চিন্তা করেন। সেইজন্য তাঁকে 'প্রজাপতি' বলা হয়।

সৃষ্টি অর্থাৎ সর্গের (কল্পের) প্রারম্ভে ব্রহ্মা কর্তব্যকর্ম করার যোগ্যতা এবং বিবেক-বুদ্ধিসহ মনুষ্যজাতির সৃষ্টি করেন[১]। অনুকূল এবং প্রতিকূল পরিস্থিতির সদুপযোগে কল্যাণ হয়। তাই ব্রহ্মা অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতির সদুপযোগ করার বিবেক-বিচার প্রদান করে মানুষ সৃষ্টি করেছেন।

সৎ-অসৎ-এর বিচার করায় অসমর্থ পশু-পক্ষী-বৃক্ষ ইত্যাদির দ্বারা স্বাভাবিক পরোপকার (কর্তব্য) পালিত হয়। কিন্তু মানুষ ভগবৎ-কৃপায় বিশেষভাবে বিবেচনা করার শক্তি (বিবেক) লাভ করেছে। সুতরাং সে যদি নিজ বিবেচনাকে (বিবেককে) গুরুত্ব দিয়ে কোনোরূপ অকর্তব্য না করে, তবে তার দ্বারা স্বাভাবিকভাবেই লোক-হিতার্থ কর্ম হওয়া সম্ভব।

দেবতা, ঋষি, পিতৃপুরুষ, মানুষ এবং অন্য (পশু, পক্ষী, বৃক্ষ ইত্যাদি) সমস্ত প্রাণীই হল 'প্রজা'। এদের মধ্যে যোগ্যতা, অধিকার এবং সাধনের বিশেষত্বের জন্য অন্য সকল প্রাণীর পালন-পোষণের দায়িত্ব মানুষের উপর বর্তায়। সুতরাং এইস্থলে 'প্রজা' পদটি বিশেষভাবে মানুষের উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হয়েছে।

অনাদিকাল থেকে এই কর্মযোগের অনুষ্ঠান চলে আসছে। চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে **'পুরাতনঃ'** পদটিতেও ভগবান বলেছেন, 'যে কর্মযোগের কথা আমি পুনরায় বলেছি, তা বহুকাল ধরে প্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।' সে কথাই এইস্থানেও 'পুরা' পদের দ্বারা ভগবান অন্যভাবে বলছেন, 'কেবল আমিই নই, ব্রহ্মাও সৃষ্টির আদিতে কর্তব্যসহ প্রজা সৃষ্টি করে তাদের সেই কর্মযোগের আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।' অর্থাৎ এই কর্মযোগের (নিঃস্বার্থভাবে কর্তব্যকর্ম করার) পরম্পরা অনাদিকাল থেকে চলে আসছে। এটি কোনো নতুন বিষয় নয়।

চতুর্থ অধ্যায়ে (চব্বিশতম থেকে ত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত) পরমাত্মপ্রাপ্তির যতগুলি সাধনের কথা বলা হয়েছে, তা সবই 'যজ্ঞ' নামে অভিহিত। যেমন দ্রব্যযজ্ঞ, তপযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ, প্রাণায়াম ইত্যাদি। 'যজ্ঞ' শব্দটি প্রায়শঃ হোম সম্পর্কিত ক্রিয়ার জন্যই প্রসিদ্ধ ; কিন্তু গীতায় 'যজ্ঞ' শব্দটি শাস্ত্র-বিধিপূর্বক কৃত সমস্ত বিহিত ক্রিয়াগুলিরও বাচক। নিজ বর্ণ, আশ্রম, ধর্ম, জাতি, স্বভাব, দেশ, কাল ইত্যাদি অনুযায়ী প্রাপ্ত সমস্ত কর্তব্যকর্মগুলি 'যজ্ঞের' অন্তর্গত। অপরের মঙ্গল চিন্তা নিয়ে করা সমস্ত কর্মই 'যজ্ঞ' নামে অভিহিত। মানুষের দায়িত্ব হচ্ছে এইরূপ যজ্ঞের (কর্তব্য) অনুষ্ঠান করা।

'অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্'[২]—ব্রহ্মা মানুষকে বললেন, 'তোমরা নিজেদের কর্তব্য পালন দ্বারা সবকিছুর বৃদ্ধিতে সহায়তা করো, উন্নতিতে সাহায্য করো। এরূপ করলে তোমরা কর্তব্যকর্ম করার উপযোগী সামগ্রী পেতে থাকবে, কখনো তার অভাব হবে না।'

---

[১] এইখানে বুঝতে হবে যে ভগবানের নির্দেশে এবং তাঁর শক্তিতে ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করেন। সুতরাং মূল স্রষ্টা প্রকৃতপক্ষে ভগবানই। (গীতা ৪।১৩ ; ১৭।২৩)।

[২] 'ইষ্ট' শব্দ 'যজ্' ধাতুর দ্বারা কৃদন্তে 'ক্ত' প্রত্যয় করলে হয়, যেটি যজ্ঞের (কর্তব্যকর্মের) বাচক হয় এবং 'কাম' শব্দটি 'কমু' ধাতুর যোগে 'অণ্' প্রত্যয় করলে হয়, যেটি হল পদার্থের (সামগ্রীর) বাচক।

অর্জুনের কর্ম না করায় যে রুচি ছিল, তা দূর করার জন্য ভগবান বলেছেন, 'প্রজাপতি ব্রহ্মার বচন থেকেও তোমার কর্তব্যকর্ম করার শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। অন্যের হিতার্থে কর্তব্যকর্ম করলেই তোমার লৌকিক এবং পারলৌকিক উন্নতি হওয়া সম্ভব।'

নিষ্কামভাবে শুধুমাত্র কর্তব্যপালনের জন্য কর্ম করলে মানুষ মুক্ত হয়ে যায় এবং সকামভাবে কর্ম করলে মানুষ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। আলোচ্য অধ্যায়টিতে নিষ্কামভাবে পালিত কর্তব্যকর্মের কথা আলোচিত হয়েছে। তাই এইস্থানে **'ইষ্টকাম'** পদটির অর্থ 'ঈপ্সিত ভোগ-সামগ্রী' (যা হল সকামভাবের সূচক) গ্রহণ করা উচিত বলে মনে হয় না। এখানে এই পদটির অর্থ হল যজ্ঞ (কর্তব্যকর্ম) করার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি[১]।

কর্মযোগী অপরের সেবা বা মঙ্গল করার জন্য সর্বদা তৎপর থাকেন। তাই ব্রহ্মার বিধান অনুযায়ী অন্যের সেবা করার সামগ্রী, সামর্থ্য এবং শরীর-নির্বাহের প্রয়োজনীয় বস্তুগুলির অভাব কখনো তাঁর হয় না। সমস্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী সহজেই তিনি প্রাপ্ত হতে পারেন। ব্রহ্মার বিধান অনুসারে যাঁর যে বস্তু কর্তব্যকর্ম করার জন্য প্রাপ্তিলাভ হয়েছে, সেগুলি কর্তব্যপালন করার জন্য পূর্ণমাত্রায় প্রাপ্ত রয়েছে। কর্তব্যপালন করার বস্তু কখনো স্বল্পমাত্রায় প্রাপ্তি হয় না। ব্রহ্মার বিধানে কখনো ত্রুটি হয় না কারণ কর্তব্যপালনের বিধান যখন তিনি নিশ্চিতরূপে করেছেন তখন কর্তব্যপালন করার জন্য যতটা বস্তু আদির প্রয়োজন ততটা বস্তু আদি প্রদানের দায়িত্বও তাঁর উপর বর্তায়।

মানুষের শরীর প্রকৃতপক্ষে ভোগসুখের জন্য নয়—**'এহি তন কর ফল বিষয় ন ভাই'** (শ্রীরামচরিতমানস ৭।৪৪।১)। তাই 'সাংসারিক সুখভোগ করো'—এরূপ নির্দেশ বা বিধান কোনো সৎ-শাস্ত্রে নেই। সমাজও ইচ্ছামতো সুখ ভোগ করার নির্দেশ দেয় না। শাস্ত্র এবং সমাজ অপরকে সুখী করার নির্দেশই দিয়ে থাকে। যেমন দেখা যায়, পিতাকে বিধান দেওয়া হয়েছে যেন তিনি পুত্রের পালন পোষণ করেন। কিন্তু এমন বিধান দেখা যায় না যে পিতা পুত্রের কাছ থেকে সেবা চেয়ে নেবেন। এইরূপ পুত্র, স্ত্রী ইত্যাদি অন্যান্য সম্বন্ধের সম্পর্কেও বুঝতে হবে।

কর্মযোগী সর্বদা দেওয়ার ভাবই পোষণ করেন, গ্রহণ করার নয়। কারণ গ্রহণের ভাবই বন্ধনকারক। গ্রহণের ইচ্ছা থাকলে কল্যাণপ্রাপ্তিতে বাধা আসে এবং তার সঙ্গে সাংসারিক বস্তুসামগ্রী প্রাপ্তিতেও অন্তরায়ের সৃষ্টি হয়। প্রায় সকলেই অনুভব করে যে সংসারে যারা চাহিদা পোষণ করে তাদের কেউই কিছু দিতে চায় না। তাই ব্রহ্মা বলেছেন যে কোনো কিছুর আশা না করে নিঃস্বার্থভাবে কর্তব্যপালন করলেই মানুষ নিজ উন্নতি (কল্যাণ) সাধন করতে সক্ষম হয়।

'দেবান্ ভাবয়তানেন'—এখানে 'দেব' শব্দটি উপলক্ষ মাত্র, এই পদটির দ্বারা মানুষ, দেবতা, ঋষি, পিতৃলোক ইত্যাদি সমস্ত প্রাণীদেরই বুঝতে হবে। কারণ কর্মযোগীর উদ্দেশ্য থাকে কর্তব্যকর্মের দ্বারা সমস্ত প্রাণীকেই সুখী করা। সেইজন্য সকল প্রাণীর উন্নতির জন্য মানুষকে কর্তব্যকর্মরূপ যজ্ঞপালনের আদেশ দিয়েছেন ভগবান ব্রহ্মা। নিজ কর্তব্য যথাযথ পালন করলে মানুষের স্বতঃই কল্যাণ সাধিত হয় (গীতা ১৮।৪৫)। কর্তব্য-পালনরূপ কর্মের পূর্ণ অধিকারী হল মানুষ। কারণ মানুষই স্বাধীনভাবে কর্ম করার অধিকার পেয়েছে। সুতরাং তাদের এই স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করা উচিত।

'তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ'—যেমন বৃক্ষ, লতাদিতে স্বাভাবিকভাবেই ফুল-ফল হয়, কিন্তু গাছে যদি সার এবং জল দেওয়া হয়, তাহলে ফুল-ফলের বৃদ্ধি ও পুষ্টি বিশেষ রূপে দেখা যায়। এইরূপ পূজা-আরাধনার দ্বারা দেবতাদের পুষ্টি হয়, ফলে দেবতাদের কর্মগুলি বিশেষভাবে ন্যায়প্রদ হয়। কিন্তু মানুষ যখন নিজ কর্তব্য-কর্মের দ্বারা দেবতাগণের পূজা-আরাধনা না করে, তখন দেবতাদের

[১]আগের শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে যজ্ঞ ভিন্ন অন্য কর্মে অর্থাৎ সকামভাবে করা কর্ম দ্বারা মানুষ আবদ্ধ হয় এবং পরে ত্রয়োদশতম শ্লোকেও বলেছেন যে, যারা নিজেদের জন্য অর্থাৎ সকামভাবে কর্ম করে তারা পাপী এবং পাপই ভক্ষণ করে। এইভাবে পিছনের এবং পরের শ্লোকগুলি দেখলে দুই স্থানেই সকামভাব ত্যাগের কথা আছে দেখা যায়। সুতরাং মধ্যস্থানের (দশম, একাদশ ও দ্বাদশ) শ্লোকগুলিতেও সকামভাব ত্যাগের কথা যুক্তিসংগত মনে হয়। যদি এখানে 'ইষ্টকাম' পদটির অর্থ 'ঈপ্সিত' বস্তু ধরা হয় তবে তা (প্রকরণ-বিরুদ্ধ হওয়ার জন্য) দূষণীয়। কারণ ঈপ্সিত বস্তু পাবার জন্য যে কর্ম করা হয়, ভগবানের মতে সেই কর্ম বন্ধনের কারণ। সুতরাং 'ইষ্টকাম' পদটির অর্থ হল 'কর্তব্যের জন্য প্রয়োজনীয় পদার্থ সকল'।

পুষ্টিপ্রাপ্তি হয় না, এতে তাদের কর্তব্য-পালনের ঘাটতি এসে যায়। তাদের কর্তব্যপালনের ঘাটতি হওয়াতে জগতে বিপ্লব আসে অর্থাৎ অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি দেখা দেয়।

'পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ'—এই পদটিতে এই অর্থ প্রকাশ করে না যে যদি অন্যে আমার সেবা করে তবেই আমি তার সেবা করব। বরং এই অর্থ প্রকাশ করে যে কেউ আমার সেবা করুক বা না করুক, আমার কর্তব্য হল তাকে সেবা করা। অন্যে কী করে, কী করে না ; আমাকে সুখ দেয়, না দুঃখ দেয় এসব আমার দেখার দরকার নেই ; কারণ অপরের কর্তব্যের খোঁজ যে করে সে নিজ কর্তব্য হতে বিচ্যুত হয়। পরিণামে তার পতন ঘটে। অন্যকে দিয়ে কর্তব্যপালন করানো আমার অধিকার নয়। সকলের হিতার্থে শুধু আমাদের নিজের নিজের কর্তব্যপালন করতে হবে যাতে সবাই সুখী হয়। সেবা করার সময় নিজের বুদ্ধি, সামর্থ্য, সময় এবং বস্তুসামগ্রী পুরোপুরিভাবে অপরের হিতার্থে নিয়োগ করা চাই অর্থাৎ যৎকিঞ্চিৎও নিজের জন্য অবশিষ্ট রূপে রাখা উচিত নয়। তাহলেই জড়ত্বের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হবে।

আমাদের যত সাংসারিক সম্পর্কজনিত ব্যক্তি আছেন, যেমন মা-বাবা, স্ত্রী-পুত্র, ভাই-ভাজ ইত্যাদি তাদের সকলকেই আমাদের সেবা করা উচিত। নিজের সুখের জন্য এই সম্পর্ক নয়। যাঁর সঙ্গে আমাদের যেরূপ সম্পর্ক, সেই অনুযায়ী তাঁকে সেবা করা, মর্যাদা অনুসারে তাঁকে সুখী করা আমাদের কর্তব্য। তাঁদের থেকে কোনো কিছু আশা করা এবং তাঁদের ওপর নিজেদের অধিকার ফলানো মস্ত বড় ভুল। আমরা তাঁদের কাছে ঋণী এবং সেই ঋণ পরিশোধের জন্যই আমাদের এইস্থানে জন্ম হয়েছে। সুতরাং নিঃস্বার্থভাবে আত্মীয়দের সেবা করে আমাদের ঋণ পরিশোধ করা—এটি আমাদের প্রাথমিক অবশ্য কর্তব্য। সেবা সকলকেই করা উচিত ; কিন্তু আমাদের ওপর যাঁরা নির্ভরশীল তাঁদের সেবা সর্বপ্রথম করা কর্তব্য।

শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, পদার্থ ইত্যাদি কিছুই নিজস্ব নয় এবং নিজের জন্যও নয়—এটি হল সিদ্ধান্ত। সুতরাং নিজ নিজ কর্তব্যপালন করলে স্বতঃই পরস্পরের উন্নতি হয়।

কর্তব্য এবং অধিকার সম্পর্কিত মর্মকথা

মানুষ যখন নিজ কর্তব্যপালন দ্বারা অন্যের অধিকার রক্ষা করে, তখনই কর্মযোগের পালন হয়। যেমন মাতাপিতার সেবা করা পুত্রের কর্তব্য এবং মাতাপিতার তা প্রাপ্য। যেটি অপরের প্রাপ্য, সেটি পালন করা আমাদের কর্তব্য। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ কর্তব্যপালন দ্বারা অপরের (প্রাপ্তির) অধিকার রক্ষা করা উচিত, কিন্তু অন্যের কর্তব্য দেখা উচিত নয়। অন্যের কর্তব্য দেখতে গেলে মানুষ স্বয়ং কর্তব্যচ্যুত হয়ে পড়ে। কারণ অপরের কর্তব্যে লক্ষ্য রাখা আমাদের কর্তব্য নয়। অর্থাৎ অন্যের মঙ্গল করা উচিত—এটি আমাদের কর্তব্য আর অপরের অধিকার। অধিকার যদিও কর্তব্যেরই অধীন, তবুও মানুষের নিজের অধিকারের দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত নয়, বরং নিজ অধিকার পরিত্যাগ করতে হয়। শুধু অন্যের অধিকার রক্ষা করার জন্য নিজ কর্তব্যপালন করতে হয়। অন্যের কর্তব্যের দিকে লক্ষ্য রাখা এবং সেই অনুযায়ী নিজ অধিকার প্রয়োগ করা, ইহলোকে এবং পরলোকে মহা পতনকারক। বর্তমানে গৃহে, সমাজে যে অশান্তি, কলহ, সংঘর্ষ দেখা যায় তার আসল কারণ হল এই যে সকলেই নিজ অধিকার রক্ষায় ব্যস্ত, কেউই কর্তব্যপালন করতে প্রস্তুত নয়। সেইজন্যই ব্রহ্মা, দেবগণ ও মনুষ্যগণকে উপদেশ দিয়েছেন যে পরস্পরের মঙ্গল করাই তোমাদের কর্তব্য।

'শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ'—প্রায়ই এইরূপ ধারণা করা হয়ে থাকে যে, এখানে পরম কল্যাণপ্রাপ্তির কথাগুলি অতিশয়োক্তি, কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। যদি কারো এতে কোনো সংশয় থাকে তবে সে এর পালন করে নিজেই পরীক্ষা করতে পারে। যেমন কারো গচ্ছিত রাখা বস্তু ফেরত দিয়ে দেবার পর আমাদের সেই ব্যক্তি ও বস্তুর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকে না তেমনি সাংসারিক বস্তুগুলি সংসারের সেবায় ব্যয় করলে সংসার এবং সংসারের বস্তুগুলির সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক থাকে না। সংসারের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হলেই চিন্ময়তার অনুভব হয়। সুতরাং ব্রহ্মার বচনগুলি অতিশয়োক্তি মনে করা উচিত নয়।

এটি একটি সিদ্ধান্ত যে, মানুষ যতক্ষণ নিজের জন্য কর্ম করে ততক্ষণ তার কর্মের সমাপ্তি হয় না এবং সে ওই কর্মের দ্বারা ক্রমশঃই আবদ্ধ হতে থাকে। সেই কীর্তিমান,

যে নিজের জন্য কখনও কিছু করে না। নিজের জন্য কিছু না করলে পাপাচরণও হয় না। কারণ কামনার জন্যই মানুষ পাপাচরণ করে থাকে (৩।৩৭)। সুতরাং যে সাধক নিজ কল্যাণ চান তাঁর শাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী ফলের ইচ্ছা এবং কামনা ত্যাগ করে কর্তব্যকর্মগুলি তৎপরতার সঙ্গে করা উচিত। তবেই তাঁর স্বতঃসিদ্ধ কল্যাণ হয়।

নিজ কামনা পরিত্যাগ করলেই সংসারের মঙ্গল হয়। যে নিজ কামনা পূর্তির জন্য আসক্তিযুক্ত হয়ে ভোগ করে সে নিজের পতন তো ঘটায়ই উপরন্তু যাদের এই সমস্ত ভোগ্যসামগ্রীর অভাব আছে তাদেরও দুঃখ দেয়। কারণ অভাবগ্রস্ত মানুষের সেই ভোগ্যদ্রব্যের অভাবে দুঃখ পাওয়া স্বাভাবিক। এইভাবে সুখভোগকারী ব্যক্তি নিজে হিংসা থেকে রক্ষা পায় না। অপরদিকে পারমার্থিক পথে যাঁরা বিচরণ করেন তাঁদের দেখে অপরে স্বতঃই শান্তি পায় ; কারণ পারমার্থিক ধনে সকলের সমান অধিকার থাকে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষ নিজে কামনা-বাসনা ত্যাগ করে কর্তব্যপালন করতে থাকলে ব্রহ্মার বচন অনুসারে অবশ্যই তার পরম কল্যাণ হয়, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

এইস্থানে পরম কল্যাণপ্রাপ্তি প্রধানতঃ মানুষেরই জন্য বলা হয়েছে, দেবতাদের জন্য নয়। কারণ দেবতাগণকে তাঁদের নিজেদের কল্যাণ করার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়নি। মানুষ যে সব কর্ম করে তদনুযায়ী ফল প্রদানের জন্য, তাদের কর্মসামগ্রীর সংস্থান করাবার জন্য এবং তাদের সুকর্মের ফল ভোগ করবার জন্যই দেবতাগণকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাঁরাও যে নিষ্কামভাবে কর্মসামগ্রী প্রদান করেন তা নয়। দেবতার মধ্যেও যদি কারোর নিজ কল্যাণের ইচ্ছা জাগ্রত হয়, তবে সেই ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই অর্থাৎ যদি কোনো দেবতা নিজ কল্যাণ চান তবে তা তিনি পেতে পারেন। অত্যন্ত ঘোর পাপী ব্যক্তিরও যখন নিজ কল্যাণ করাতে কোনো বাধা থাকে না, তবে দেবতাগণের পক্ষে (যাঁদের পুণ্যযোনি বলা হয়) নিজের উদ্ধার করাতে অন্তরায় কেন হবে ? কিন্তু তা সত্ত্বেও দেবতাদের লক্ষ্য ভোগ-বিলাসের দিকেই থাকে, তাই প্রায়শঃ তাঁদের মধ্যে নিজেদের কল্যাণের ইচ্ছা থাকে না।

পরিশিষ্ট-ভাব—মানবজীবন হল কর্মযোনি এবং চুরাশি লক্ষ যোনি, দেবতা, নারকীয় জীব ইত্যাদি হল ভোগযোনি। সকামভাবসম্পন্ন ব্যক্তিরা ভোগ করার জন্যই স্বর্গে গমন করেন। সুতরাং দেবতারা নিষ্কামভাব না রেখে কেবলমাত্র তাঁদের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। অতএব এখানে কল্যাণের কথাগুলি মানুষের উদ্দেশ্যেই বলা হয়েছে বলে বুঝতে হবে।

মুক্তি হল স্বাভাবিক ব্যাপার, বন্ধনই অস্বাভাবিক। নিজ কল্যাণ করার জন্যই মনুষ্য জন্ম হয়ে থাকে। তাই যারা নিজ কর্তব্যপালন করে, স্বাভাবিক ভাবেই তাদের কল্যাণ হয়—**'পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ'**। কল্যাণের জন্য নতুন কিছু করার প্রয়োজন নেই, বরং যে কাজ করা হয়ে থাকে, সেগুলি স্বার্থ, অহং-অভিমান এবং ফলেচ্ছা পরিত্যাগ করে অন্যের হিতার্থে করলে কল্যাণ লাভ হয়। নিষ্কামভাব ব্যতীত যদি নিজ কর্তব্যপালন করা হয়, তাহলে স্বর্গাদি পুণ্যলোকপ্রাপ্তি হয়। বড় বড় যজ্ঞ করলে যে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, ক্ষত্রিয় শুধুমাত্র নিজ কর্তব্যকর্ম—যুদ্ধ করেই তা প্রাপ্ত করতে সক্ষম হয়।

ব্রহ্মা, দেবতা ও মানুষকে পরস্পরের হিত করার কথা বলেছেন, এথেকে মানুষের চার বর্ণেরও একে অন্যের হিত করার কথা বুঝে নিতে হবে। চার বর্ণের মানুষ যদি পরস্পর হিতার্থে নিজ নিজ কর্তব্যকর্ম করে তাহলে তারা পরম কল্যাণ লাভ করবে।

সম্পূর্ণ জগতের এমনভাবেই সৃষ্টি যে, নিজের জন্য কোনো কিছুই (বস্তু বা ক্রিয়া) নয়, সবই অন্যের জন্য — **'ইদং ব্রহ্মণে ন মম'**। পতিব্রতা নারীর যেমন পতির জন্যই পাতিব্রত্য, তার নিজের জন্য নয়। স্ত্রী অঙ্গ পুরুষকে সুখদান করে, স্ত্রীলোককে নয়। পুরুষ অঙ্গ নারীকে সুখ দেয়, পুরুষকে নয়। মায়ের দুধ শিশুকে খাওয়াবার জন্যই, মায়ের নিজের জন্য নয়। শিশুর কর্মোদ্যম মাকে সুখ দেয়, শিশুকে নয়। মাতা-পিতা সন্তানের জন্য আর সন্তান মাতা-পিতার জন্য। শ্রোতা বক্তার বক্তৃতা শোনার জন্য হয় আর বক্তা শ্রোতাকে শোনানোর জন্যই হন। অর্থাৎ নিজে সুখগ্রহণ না করে অপরকে সুখ প্রদান করাই কর্তব্য। ভোগের জন্য জগৎ সৃষ্ট হয়নি, জগৎ সৃষ্ট হয়েছে উদ্ধার লাভের জন্য।

দেবগণও নিঃস্বার্থভাবে অন্যের হিত করতে সক্ষম। তাই দেবতাদের মধ্যেও নারদের মতো ঋষি হয়েছেন। যদিও ভগবানের দিক থেকে কারোর কোনো বাধা নেই, তা হলেও কল্যাণের প্রধান এবং স্বতঃসিদ্ধ অধিকারী হল মানুষই।

প্রশ্ন হতে পারে যে আমরা তো অন্যের ভালো করব, কিন্তু অন্যে যদি আমাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার না করে মন্দ ব্যবহার করে তাহলে **'পরস্পরং ভাবয়ন্ত'** কীভাবে সিদ্ধ হয় ? তার উত্তর হল যে আমরা যদি অপরের ভালো করি তাহলে অন্য কেউ আমাদের কিছু খারাপ করতে পারে না। তাদের কোনো সামর্থ্যই থাকে না আমাদের মন্দ করার। যদি তারা তেমন কিছু করেও, তাহলে পরে তার জন্য দুঃখ পাবে, কাঁদবে। যদি তারা আমাদের কিছু ক্ষতি করে, তবে এমন কেউ হাজির হবেন যিনি আমাদের দুঃখ দূর করবেন, সহানুভূতি প্রকাশ করবেন। আসলে কোনোক্ষেত্রেই কারো ক্ষতি করার কথা বলা হয়নি। মানুষই ঈর্ষা পরবশ হয়ে অন্যের ক্ষতি করে। **'পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ'** এটি হল মানবতার বাণী। এই মানবিকতা না থাকার ফলেই মানুষ দুঃখ পায়।

※ ※ ※

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ॥ ১২ ॥

[**যজ্ঞভাবিতাঃ** (যজ্ঞ দ্বারা পুষ্ট) ; **দেবাঃ, হি** (দেবগণ) ; **বঃ, ইষ্টান্, ভোগান্** (তোমাদের কর্তব্যপালনের আবশ্যক সামগ্রী) ; **দাস্যন্তে** (প্রদান করে যাবেন) ; **তৈঃ, দত্তান্** (দেবতা প্রদত্ত ভোগ্যবস্তু) ; **এভ্যঃ, অপ্রদায়** (অন্যের সেবায় ব্যয় না করে) ; **যঃ, ভুঙ্‌ক্তে** (যে ব্যক্তি উপভোগ করে) ; **সঃ** (সে ব্যক্তি) ; **স্তেনঃ, এব** (অবশ্যই চোর।)]

যজ্ঞ দ্বারা পুষ্ট (সংবর্ধিত) দেবগণ তোমাদের (বিনা প্রার্থনাতেই) কর্তব্যকর্মের জন্য আবশ্যক সামগ্রী প্রদান করে যাবেন। দেবতা প্রদত্ত এই সামগ্রী অন্যের সেবায় ব্যয় না করে যে ব্যক্তি স্বয়ং ভোগ করে, সে অবশ্যই চোর ॥ ১২ ॥

ব্যাখ্যা—'ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞ ভাবিতাঃ'—এখানেও **'ইষ্টভোগ'** শব্দের অর্থ ঈপ্সিত পদার্থ হতে পারে না। কারণ আগের (একাদশ) শ্লোকে পরম কল্যাণ প্রাপ্ত হবার কথা বলা হয়েছে এবং সেই হেতু এই (দ্বাদশ) শ্লোকটি এসেছে। ভোগের ইচ্ছা থাকা পর্যন্ত পরম কল্যাণ কখনো হতে পারে না। সুতরাং এখানে 'ইষ্ট' শব্দটি 'যজ্' ধাতুর দ্বারা নিষ্পন্ন হওয়ায় এবং 'ভোগ'[১] শব্দটির অর্থ প্রয়োজনীয় সামগ্রী হওয়ায় উপরোক্ত পদটির অর্থ হয়—'এই দেবগণ তোমাদের যজ্ঞ (কর্তব্যকর্ম) করার প্রয়োজনীয় বস্তুসকল দিতে থাকবেন।'

এখানে **'যজ্ঞভাবিতাঃ দেবাঃ'** পদটির তাৎপর্য হল এই যে, দেবতা তাঁর অধিকার অনুযায়ী মানুষকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী প্রদান করেই থাকেন। মানুষের উচিত শুধু নিজেদের কর্তব্য ঠিকমতো পালন করা।

'তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে'—ব্রহ্মা দেবতাদের উদ্দেশ্যে **'তে দেবাঃ'** পদটি প্রয়োগ করেছেন ; কেননা তাঁর সম্মুখে মানুষ ছিল, দেবতা নন এবং এইস্থলে **'এভ্য'** পদটির (যা **'ইদম্'** শব্দ থেকে সৃষ্ট) প্রয়োগ করা হয়েছে, যেটি সামীপ্যের দ্যোতক। ভগবানের কাছে সবই নিকটে (গীতা ৭।২৬)। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে এখন এইস্থল থেকে ভগবানের বচন আরম্ভ হল।

এখানে **'ভুঙ্‌ক্তে'**[২] পদটির তাৎপর্য কেবলমাত্র ভোজন ক্রিয়াতে নয়। বরং শরীর-নির্বাহের সকল প্রয়োজনীয় বস্তু (খাদ্য, বস্ত্র, অর্থ, গৃহ ইত্যাদি) নিজের

---

[১] 'ভূজ্ পালনাভ্যবহারয়োঃ' (সিদ্ধান্তকৌমুদী ১৫৪৮)—'ভূজ্' ধাতুর দুটি অর্থ হয়—পালন এবং ভক্ষণ। এখানে 'পালন' অর্থটিই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।

[২] এইস্থলে অনবনার্থক 'ভূজ্' ধাতু দ্বারা 'ভুঙ্‌ক্তে' পদটি নিষ্পন্ন হয়। অনবন অর্থ হল—ভক্ষণ অর্থাৎ বস্তুগুলিকে নিজের কাজে গ্রহণ করা (ব্যবহার করা।)

সুখের জন্য কার্যকরী করাতেই আছে।

এই দেহ মাতা-পিতার থেকে পাওয়া এবং পালনকারীও তাঁরাই। বিদ্যালাভ হয়েছে গুরুস্থানীয় ব্যক্তিদের কাছ থেকে। দেবগণ সকলকে কর্তব্যপালনের বস্তুসমূহ প্রদান করেন, ঋষিগণ প্রদান করেন জ্ঞান। পিতৃব্যগণ মানুষকে সুখ-সুবিধা প্রাপ্তির উপায় জানান। পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা ইত্যাদি অন্যের সুখের জন্য নিজেদের সমর্পিত করে (যদিও তাদের এই বোধ থাকে না যে তারা কারো উপকার করছে, কিন্তু তাদের দ্বারা স্বতঃস্ফূর্ত উপকার হয়ে থাকে)। এইরূপ আমাদের যা সামগ্রী—বল, যোগ্যতা, পদ, অধিকার, ধন, সম্পত্তি ইত্যাদি আছে, তা সমস্তই অন্যের কাছ থেকে লাভ করা। তাই সেইগুলো অপরের সেবায় লাগানোই উচিত।

আমাদের শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি সমস্ত বিষয় জগৎ-সংসার থেকে সংগৃহীত। এগুলি কখনোই নিজস্ব নয় আর তা হতেও পারে না। সুতরাং এগুলি নিজের মনে করে এগুলির দ্বারা সুখভোগ করাই বন্ধনের কারণ। বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার সহজ পথ হল এই যে যাঁর থেকে আমরা এই বস্তুগুলি পেয়েছি, এগুলি তাঁরই মনে করে, তাঁর সেবায় নিষ্কামভাবে লাগানো। এটিই আমাদের পরম কর্তব্য।

সাধকের মনে প্রায়ই এমন ভাবের উদয় হয় যে, 'যদি আমরা সংসারের সেবা করি, তবে সংসারের প্রতি আমাদের আসক্তি আসবে এবং আমরা সংসারে আবদ্ধ হয়ে পড়ব !' কিন্তু ভগবানের বাক্যে প্রমাণিত হয় যে, সেবা করলে আবদ্ধ হতে হয় না বরং নিজের জন্য কিছু করলে তবেই আবদ্ধ হতে হয়। তাই গ্রহণ করার ভাব পরিত্যাগ করে দেবগণের মতো অপরকে সুখী করাই মনুষ্যমাত্রেরই পরম কর্তব্য হওয়া উচিত।

কর্মযোগের সিদ্ধান্ত হল প্রাপ্ত সামগ্রী, সামর্থ্য, সময় এবং বুদ্ধির সদুপযোগ করা। প্রাপ্ত সামগ্রীর চেয়ে ভিন্ন বস্তুর (নতুন নতুন বস্তুর) কামনা করা কর্মযোগের সিদ্ধান্ত নয়। সুতরাং প্রাপ্ত বস্তুর সদুপযোগ করে অন্যের হিতার্থেই নিয়োগ করা উচিত। অধিকের কোনোই আবশ্যকতা নেই। এ বিষয়ে যুক্তি হল যার যতটা শক্তি থাকে, তার কাছে ততটাই আশা করা হয় সুতরাং ভগবান বা দেবতা তার থেকে বেশি কী করে আশা করবেন ?

'স্তেন এব সঃ'—এখানে **'সঃ স্তেন'** পদটিতে একবচন ব্যবহারের তাৎপর্য এই যে, নিজ কর্তব্য পালনে অনিচ্ছুক ব্যক্তি অন্য সকলের প্রাপ্য সামগ্রী (অন্ন, জল, বস্ত্রাদি) অপরকে না দিয়ে একাই ভোগ করে, অতএব সে চোর পদবাচ্য।

যে ব্যক্তি অপরকে তার প্রাপ্য ভাগ না দিয়ে একাই সমস্ত ভোগ করে, সে তো চোরই। কিন্তু যে ব্যক্তি সর্বপ্রকারেই নিজ স্বার্থসিদ্ধ করতে চায় অর্থাৎ বস্তু-সামগ্রীগুলি মান, যশ ইত্যাদি লাভের উদ্দেশ্যে সেবার কাজে লাগায় সেও সেই অংশে চোর। এরূপ ব্যক্তির অন্তঃকরণ কখনো শুদ্ধ এবং শান্ত থাকতে পারে না।

এই ব্যষ্টি শরীর কোনোভাবেই সমষ্টি জগৎ থেকে পৃথক নয় এবং পৃথক হওয়া সম্ভবও নয়। কারণ সমষ্টির অংশকেই ব্যষ্টি বলা হয়। তাই ব্যষ্টিকে (শরীর) নিজের বলে মনে করা এবং সমষ্টিকে (জগৎ) নিজের বলে না মানাই হল রাগ-দ্বেষাদি দ্বন্দ্বের মূল এবং এটিই হল অহংভাব এবং ব্যক্তিত্ব বা বৈষম্য[১]। কর্মযোগ পালন করলে এই সমস্ত (রাগ-দ্বেষাদি) সহজেই দূরীভূত হয়। কারণ কর্মযোগীর এই ভাব থাকে, 'আমি যা কিছু করছি, তা নিজের জন্য নয়, বরং জগৎ-সংসারের জন্য করছি।' এতে আরও একটি বড় মর্মকথা হল এই যে, কর্মযোগী নিজ কল্যাণের জন্য কোনো কর্ম না করে সংসারের কল্যাণের নিমিত্তই করে থাকেন। কারণ সকলের কল্যাণের থেকে নিজ কল্যাণকে পৃথক করে দেখাই হচ্ছে ব্যক্তিস্বার্থ এবং বৈষম্যের জন্ম হওয়া, যেটি সাধকের উন্নতির পথে বাধাস্বরূপ। শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি যা কিছু আমাদের আছে, তা সবই এই জগৎ-সংসার থেকে প্রাপ্ত। সুতরাং জগৎ হতে প্রাপ্ত সামগ্রী শুধুমাত্র নিজ স্বার্থে ব্যবহার করা সততার কাজ নয়।

[১]আত্মাপি চায়ং ন মম সর্বা বা পৃথিবী মম॥ (মহাভারত, আশ্বমেধিক ৩২।১১) 'এই শরীরও আমার নয় অথবা এই সমগ্র পৃথিবীই আমার।'

কর্তব্য সম্পর্কিত বিশেষ কথা

হিন্দু সংস্কৃতির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের কল্যাণ করা। সেই উদ্দেশ্যেই ব্রহ্মা (সৃষ্টির আদিতে) সকল মনুষ্যকে নিঃস্বার্থভাবে নিজ নিজ কর্তব্যের দ্বারা একে অপরকে সুখী করার নির্দেশ দিয়েছেন (গীতা ৩।১০)।

সংসারে ভ্রাতা, ভগিনী, মাতা ইত্যাদি সকলেই কর্ম করে থাকেন ; কিন্তু তাঁদের একটি মস্ত ভুল হয় এই যে, তাঁরা কামনা-মমতা-বাসনা স্বার্থ ইত্যাদির বশীভূত হয়ে কর্ম করেন। সুতরাং লৌকিক বা পারলৌকিক কোনো লাভই তাঁদের হয় না, বরং ক্ষতিই হয়ে থাকে। স্বার্থ দ্বারা তাড়িত হয়ে কর্ম করলে নিজেদের মধ্যে মারামারি, ঝগড়া, ঈর্ষা ইত্যাদি উৎপন্ন হয় এবং পরলোকে দুর্গতি হয়। অন্যের সেবা করে তার প্রতিদানে কিছু আশা করলে বস্তু এবং ব্যক্তির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। যে কোনো কর্মের সঙ্গেই স্বার্থ-সম্পর্ক যুক্ত হলে সেই কর্ম তুচ্ছ এবং বন্ধনকারক হয়ে দাঁড়ায়। স্বার্থপর ব্যক্তিকে জগতে কেউই ভালো বলে না। যে কেবল চায়, তাকে কেউ বেশি দিতে চায় না। প্রায়শঃ এরূপ দেখা যায় যে গৃহে কোনো ভোগী বা রাগী (আসক্তিযুক্ত) ব্যক্তি থাকলে বস্তুগুলি তাঁর অলক্ষে রাখা হয়। অপরপক্ষে আমাদের যত বুদ্ধি, সময়, সামর্থ্য এবং সামগ্রী থাকে, ততটাই যদি আমরা অপরের সেবায় ব্যয় করি তবে তার দ্বারা কল্যাণ তো হয়ই, তাছাড়া বস্তু-সামগ্রী, সুখ, মান-যশ-শ্রদ্ধা ইত্যাদির আশা না করলেও সেগুলি স্বতঃই প্রাপ্ত হতে থাকে। কর্মযোগীর মান-যশ ইত্যাদির আকাঙ্ক্ষাই থাকে না। কারণ তিনি জানেন আশা এবং সুখভোগই হল বন্ধনকারক।

'আমি সুখ পাব কী করে ?'—শুধুমাত্র এই আকাঙ্ক্ষার জন্যই মানুষ কর্তব্যচ্যুত ও পতিত হয়ে যায়। সুতরাং অন্যে কী করে সুখী হবে—এই ভাবটি কর্মযোগীর সর্বদা বজায় রাখা উচিত। গৃহে মা-বাবা, ভাই-বোন, স্ত্রী-পুত্র আদি যত ব্যক্তি থাকে, তাদের সকলেরই একের অন্যের হিতের কথা ভাবা উচিত। সেবকের প্রায়শঃ একটি ভুল হয়ে থাকে । 'আমি সেবা করছি, আমি জিনিস প্রদান করছি'—এই ভেবে সে মিথ্যা অভিমানের বশবর্তী হয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে সেবক ব্যক্তিটি সেব্যের (যার সেবা করে তার) বস্তুই তাকে প্রদান করে। মাতৃ-দুগ্ধে যেমন মায়ের নিজের কোনো প্রয়োজন থাকে না, তা সন্তানের খাদ্যরূপেই বিবেচিত হয়, তেমনি যে সমস্ত সামগ্রী মানুষের কাছে থাকে প্রকৃতপক্ষে তা অপরের সেবার জন্যই থাকে। সুতরাং প্রাপ্ত বস্তুতে তার কোনো মমতা থাকা বা সেটি তার নিজস্ব বলে মনে করার কোনো অধিকার নেই। মমতা করলেও সেটি তার কাছে চিরকালের জন্য থাকবে না, শুধুমাত্র মমতারূপ বন্ধনটি থেকে যাবে। সেইজন্যই ভগবান বলেছেন যে, প্রাপ্ত সামগ্রীগুলিকে নিজের বলে মনে করে যারা ভোগ করে তারা প্রকৃতপক্ষে চোরই।

দেবতা-ঋষি-পিতৃপুরুষ-পশুপক্ষী-বৃক্ষলতা ইত্যাদি সকলের স্বভাবই হল সকলের পরোপকার করা। মানুষ এদের থেকে সর্বদা সহযোগিতা পাওয়ায় এদের কাছে ঋণী। এই ঋণ থেকে মুক্তি পাবার জন্যই পঞ্চ মহাযজ্ঞের (ঋষিযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ এবং মনুষ্যযজ্ঞের) বিধান আছে। মানুষই একমাত্র প্রাণী যে বুদ্ধিপূর্বক নিজ কর্তব্যকর্ম পালন করে সকলকে তৃপ্ত করতে সক্ষম । সুতরাং মানুষের উপরই সব থেকে বেশি দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। তার এমন স্বাধীনতা আছে যার সদ্ব্যবহার করে সে পরম শ্রেয় লাভে সক্ষম।

দেবতাগণ তো তাঁদের কর্তব্যপালন করেনই। মানুষ যদি তার কর্তব্যপালন না করে তাহলে শুধু দেবগণের মধ্যেই নয়, উপরন্তু ত্রিলোকেই নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এবং তার পরিণামে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে থাকে। ভগবানও (গীতা ৩।২৩-২৪ শ্লোকে) বলেছেন, 'আমি যদি সতর্ক হয়ে কর্তব্যপালন না করি তাহলে এই সমস্ত লোক (সৃষ্টি) উৎসন্ন হবে।' যেমন গতিশীল শকটের একটি চাকা ভেঙে গেলে সমস্ত গাড়িটিতেই তীব্র আলোড়ন হয়, তেমনি গতিশীল সৃষ্টিচক্রে একজন ব্যক্তিও যদি কর্তব্যচ্যুত হয় তাহলে তার বিরূপ প্রভাব সমগ্র সৃষ্টির ওপর পড়ে। অন্যভাবে বললে শরীরের একটি পীড়িত অঙ্গ যদি সুস্থ হয়ে যায় তাহলে সমস্ত শরীরের স্বতঃই হিত হয়, তেমনি নিজ কর্তব্য ঠিকমতো পালনকারী ব্যক্তির দ্বারা স্বতঃই সমস্ত জগতের হিত সাধিত হয়।

প্রজাপতি ব্রহ্মা, দেবতা এবং মানুষ—উভয়কেই তাদের নিজ নিজ কর্তব্যপালন করার নির্দেশ দিয়েছেন।

দেবতাগণ মর্যাদা সহকারে আচরণ করে থাকেন। কেবলমাত্র মানুষই নিজ নির্বুদ্ধিতার দোষে মর্যাদা নষ্ট করে। কারণ অপরের সেবার জন্য যে সমস্ত সামগ্রী সে পায় সে সেগুলিকে নিজের মনে করে অধিকার করে বসে। অনন্ত জন্মের কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি পাবার জন্য মানুষ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়েছে কিন্তু সে সেই স্বাধীনতার অসদ্‌ব্যবহার দ্বারা কর্ম এবং কর্মফলে মমতা ও আসক্তি পোষণ করতে থাকে। তার ফলে তার নতুন কর্মবন্ধন উৎপন্ন হয় ও সে তাতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং পরবর্তী অনেক জন্মের জন্য দুঃখ ভোগের রাস্তা তৈরি করে ফেলে। সুতরাং মানুষের উচিত, সে যা কিছু বস্তু প্রাপ্ত হয় তার দ্বারা ত্রিজগতের সেবা করা অর্থাৎ সেই সামগ্রীগুলি ভগবান, দেবতা, ঋষি, পিতৃপুরুষ, মানুষ ইত্যাদি সমস্ত প্রাণীর সেবায় নিয়োজিত করা।

প্রশ্ন—প্রাপ্ত বস্তুসামগ্রী সবই যদি অপরের সেবায় নিযুক্ত করা হয়, তাহলে কর্মযোগীর জীবন কীভাবে নির্বাহ হবে ?

সমাধান—প্রকৃতপক্ষে শরীরের সঙ্গে নিজ একাত্মতা বোধ করলে অর্থাৎ শরীরকেই স্বরূপ মনে করলে এই প্রশ্ন জাগে। কিন্তু কর্মযোগী শরীরের সঙ্গে নিজের কোনো সম্পর্ক মেনে নেন না, বরং সেটি জগতের এবং জগতেরই জন্য মনে করে জগৎ-সংসারের সেবাতে নিযুক্ত করেন। তাঁর দৃষ্টি থাকে অবিনাশী স্বরূপের দিকে, বিনাশশীল শরীরের প্রতি নয়। যার লক্ষ্য থাকে শরীরের দিকে তারই মনে এইরূপ প্রশ্ন উদিত হয় যে কর্মযোগীর জীবন কীভাবে নির্বাহ হবে ?

ভোগেচ্ছা যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ বেঁচে থাকার ইচ্ছা এবং মরার ভয় থাকে । কর্মযোগীর ভোগেচ্ছা থাকে না; কারণ তাঁর সমস্ত কর্ম নিজের জন্য না হয়ে অন্যের সেবার্থে হয়ে থাকে। সুতরাং কর্মযোগী তাঁর জীবনের পরোয়া করেন না। তাঁর মনে এই প্রশ্নও আসে না যে তাঁর জীবিকা-নির্বাহ হবে কী প্রকারে ! প্রকৃতপক্ষে যাঁর অন্তরে জগতের কোনো কিছুর জন্যই প্রয়োজনবোধ থাকে না, জগতেরই তাঁকে প্রয়োজন হয়। তাই তাঁর জীবন-নির্বাহের ব্যবস্থা জগৎ নিজেই করে দেয়।

যাঁর জীবন পরোপকারে সমর্পিত, এরূপ পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, বৃক্ষলতা ইত্যাদি সমস্ত সাধারণ প্রাণীর জীবন-নির্বাহেরও যখন ব্যবস্থা আছে, তখন শরীরসহ সমস্ত প্রাপ্ত সামগ্রীগুলি যিনি জগতের মঙ্গলার্থে ব্যয় করেন, তাঁর জীবন-নির্বাহের কোনো ব্যবস্থা হবে না, এটি কী করে সম্ভব ?

সবার পালনকর্তা ভগবানের অসীম কৃপায় জীবন-নির্বাহের বস্তুসামগ্রী সমস্ত প্রাণী সমানভাবে পায়। এর প্রত্যক্ষ উদাহরণ সবার সামনেই আছে। মায়ের শরীরে যেখানে শুধুমাত্র রক্তই থাকে, সেখানেও গর্ভের সন্তানের জন্য সুমিষ্ট এবং পুষ্টিকর দুধ আপনিই সৃষ্ট হয়। সুতরাং প্রারব্ধকেই মানা হোক বা ভগবৎ কৃপাই বলা হোক, জীবননির্বাহের সামগ্রী মানুষ স্বতঃই পেয়ে যায়। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ, চিন্তা, শোক এবং বিচার করা উচিত নয়। ভগবানের রাজ্যে যখন অত্যন্ত পাপী এবং নাস্তিক ব্যক্তিরও জীবন-নির্বাহ হয় তখন কর্মযোগীর জীবন-নির্বাহে কি বাধা হতে পারে ? সুতরাং এই প্রশ্ন ওঠাই ভ্রম।

পরিশিষ্ট-ভাব—**'যজ্ঞভাবিতাঃ'** পদটির অর্থ যজ্ঞদ্বারা পরিপুষ্ট, পূজিত এবং সংবর্ধিত। মধ্যলোকে থাকায় মানুষ ঊর্ধ্ব ও অধঃ—সমস্ত লোকে অবস্থিত প্রাণীদের পরিপুষ্ট করতে সক্ষম। মানুষকে মধ্যলোকে রাখার কারণই হল যাতে তারা সকলের মঙ্গল করতে সক্ষম হয়। সুতরাং মনুষ্যমাত্রই হল কল্যাণ লাভের অধিকারী।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—নবম শ্লোকে ভগবান বলেছিলেন যে, 'যজ্ঞাদির জন্য কর্ম করলে তার দ্বারা মানুষ আবদ্ধ হয় না'—এরূপ বলে তিনি যজ্ঞের জন্য কর্ম করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ব্রহ্মার বচন দ্বারা এই নির্দেশকে দৃঢ় করে নবম শ্লোকে বলা তাঁর নিজের কথার জের টেনে ভগবান পরবর্তী শ্লোকে যজ্ঞ (কর্তব্যকর্ম) করা বা না করার ফল স্পষ্টরূপে বর্ণনা করছেন।

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥ ১৩ ॥

[**যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ** (যজ্ঞাবশেষ অনুভবকারী) ; **সন্তঃ** (শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ) ; **সর্বকিল্বিষৈঃ, মুচ্যন্তে** (সর্ব পাপ থেকে মুক্ত হন) ; **তু, যে** (কিন্তু যারা) ; **আত্মকারণাৎ** (নিজের জন্যই) ; **পচন্তি, তে** (সমস্ত কর্ম করে, তারা) ; **পাপাঃ** (পাপীরা) ; **অঘম্** (পাপরাশিই) ; **ভুঞ্জতে** (ভক্ষণ করে থাকে।)]

যজ্ঞাবশেষ (যোগ) অনুভবকারী শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ সর্বপাপ থেকে মুক্ত হন। কিন্তু যারা সমস্ত কর্ম কেবল নিজের জন্যই করে সেইসকল পাপী ব্যক্তি শুধু পাপরাশিই ভক্ষণ করে থাকে ॥ ১৩ ॥

ব্যাখ্যা—'যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তঃ'—নিষ্কামভাবে বিধি-পূর্বক কর্তব্যকর্ম করলে (যজ্ঞাবশিষ্টরূপে) যোগ অথবা সমতাই শেষ পর্যন্ত থেকে যায়। কর্মযোগের প্রধান বিষয় হচ্ছে এই যে, জগৎ-সংসার থেকে প্রাপ্ত বস্তু দ্বারাই কর্ম করা হয়ে থাকে এবং সংসারের কার্যে ব্যয় করাতেই কর্ম 'যজ্ঞ' সিদ্ধ হয়। যজ্ঞসিদ্ধির পরে স্বাভাবিকভাবেই অবশিষ্ট 'যোগ' নিজের জন্য থেকে যায়। এই যোগই (সমত্ব) **'যজ্ঞাবশিষ্ট'** নামে অভিহিত, একে ভগবান চতুর্থ অধ্যায়ে **'অমৃত'** বলেছেন—**'যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ'** (৪।৩১)।

'মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ'—**'কিল্বিষৈঃ'** পদটি এখানে বহুবচনান্ত। এর অর্থ পাপ থেকে অর্থাৎ 'বন্ধনগুলি থেকে'। কিন্তু ভগবান এই পদটির সঙ্গে আবার 'সর্ব' পদটিও প্রয়োগ করেছেন, যার বিশেষ তাৎপর্য হল এই যে যজ্ঞশেষ অনুভূত হলে মানুষের আর কোনো প্রকারের বন্ধন থাকে না। তার সমস্ত কর্ম (সঞ্চিত, প্রারব্ধ এবং ক্রিয়মাণ) বিলীন হয়ে যায়[১] (গীতা ৪।২৩)। সমস্ত কর্ম বিলীন হয়ে গেলে তার সনাতন ব্রহ্ম-প্রাপ্তি হয় (গীতা ৪।৩১)।

এই অধ্যায়ের নবম শ্লোকে ভগবান যজ্ঞার্থে কৃত কর্ম ভিন্ন অন্য কর্মগুলিকে বন্ধনকারক বলে জানিয়েছেন এবং চতুর্থ অধ্যায়ের তেইশতম শ্লোকে যাঁরা যজ্ঞার্থে কর্ম করেন তাঁদের কর্ম সম্পূর্ণভাবে বিলীন হওয়ার কথা বলেছেন। এই দুটি শ্লোকে (৩।৯ এবং ৪।২৩) যে কথা বলা হয়েছে, সেইকথাই এইস্থানে **'সর্বকিল্বিষৈঃ'** পদের দ্বারা বলা হয়েছে। এর তাৎপর্য হল এই যে যজ্ঞশেষ অনুভবকারী ব্যক্তি বন্ধনরূপ সমস্ত কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে যায়। পাপাদি কর্ম তো বন্ধনকারক হয়ই, সকামভাবে করা পুণ্য কর্মও (ফলপ্রদানকারী হওয়ায়) বন্ধনকারক হয়। যজ্ঞশেষ (সমত্ব) অনুভূত হলে পাপ বা পুণ্য, কোনোটাই থাকে না—**'বুদ্ধিযুক্তো জহাতীত উভে সুকৃতদুষ্কৃতে'** (গীতা ২।৫০)।

বিচার করে দেখতে হবে যে বন্ধনের প্রকৃত কারণ কী ? এরূপ হওয়া উচিত আর এরূপ হওয়া উচিত নয়—এই ভাবনাতেই বন্ধন সৃষ্ট হয়। এই ভাবনারূপ কামনাই হচ্ছে সমস্ত পাপের মূল (গীতা ৩।৩৭)। সুতরাং কামনা পরিত্যাগ করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

প্রকৃতপক্ষে কামনার কোনো স্বতন্ত্র সত্তা (অস্তিত্ব) নেই। কামনা অভাব থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে এবং স্বয়ং-এ (স্বরূপে) কোনো অভাব হতেই পারে না এবং হয়ও না। তাই স্বয়ং-এর কোনো কামনাই থাকে না। কেবলমাত্র ভ্রমক্রমে শরীরাদি অসৎ পদার্থের সঙ্গে নিজ ঐক্য মেনে নিয়ে মানুষ অসৎ পদার্থগুলির অভাবকেই নিজের অভাব বলে মনে করতে থাকে এবং অভাব পূরণের নিমিত্তে আবার অসৎ পদার্থই আকাঙ্ক্ষা করতে থাকে। সাধকের এইদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে যে, যে ক্রিয়াগুলির শুরু এবং শেষ আছে তার সঙ্গেই উৎপত্তি ও বিনাশশীল পদার্থগুলির সম্পর্ক হয়। কিন্তু এসব পদার্থ দ্বারা মানুষের অভাব কখনো পূরণ হতে পারে না। যখন এগুলির দ্বারা অভাব পূরণ হওয়ার কোনো প্রশ্ন নেই, তখন এসব পদার্থের কামনা

[১] কামনা না থাকলে সঞ্চিত কর্ম বিলীন হয়। যতক্ষণ শরীর থাকে, প্রারব্ধ অনুসারে ততক্ষণ অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতি আসতেই থাকে । কিন্তু এতে সে সুখী বা দুঃখী হয় না অর্থাৎ এসব পরিস্থিতির কোনো প্রভাবই তার ওপর পড়ে না—এই হল প্রারব্ধ কর্মের বিলীন হওয়া। ফলেচ্ছা না থাকলে ক্রিয়মাণ কর্ম অকর্ম হয়ে যায় অর্থাৎ ফলপ্রসূ হয় না—এটি হল ক্রিয়মাণ কর্মের বিলীন হওয়া।

করাই ভুল। এইভাবে ঠিকঠিক বিচার-বিবেচনা করলে সহজেই কামনার নিবৃত্তি হয়।

নিজের বলে কথিত যে শরীরাদি বস্তু, তাকে নিজের বলে মনে না করে অপরের সেবায় নিয়োজিত করলে শরীরাদি পদার্থ থেকে স্বতঃ সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ হয়ে যায় এবং তৎক্ষণাৎ নিজ সৎস্বরূপের বোধ হয়। যার মনে কোনোপ্রকার কামনা বা আকাঙ্ক্ষা থাকে না সে জীবিত অবস্থাতেই মুক্ত হয়ে যায়।

'যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ'—নিজের জন্য কোনো কিছুর আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ স্বার্থ, কামনা, মমতা, আসক্তি এবং অপরে যাতে আমাকে ভালো মনে করে এরূপ সামান্য মাত্র ভাবনাও **'আত্মকারণাৎ'** পদের অন্তর্গত। যে মানুষের স্বার্থবুদ্ধি যত অধিক হয়, সে তত বেশি পাপী হয়।

এখানে **'পচন্তি'** পদটি উপলক্ষক, এর অর্থ শুধুমাত্র জীর্ণ (হজম) করা না হয়ে খাওয়াদাওয়া, চলা-ফেরা, শোওয়া-বসা ইত্যাদি সমস্ত সাংসারিক ক্রিয়ার সিদ্ধি বোঝায়।

নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোনো ব্যক্তি নিজের জন্যই রন্ধন করুক বা অপরের জন্য রন্ধন করুক, প্রকৃতপক্ষে সেটিও সে নিজের জন্যই করে। এর বিপরীতে নিজের স্বার্থভাব পরিত্যাগ করে কর্তব্যপালনকারী সাধক নিজ শরীরের জন্য রন্ধন করুক বা অন্যের জন্যে করুক সেটি প্রকৃতপক্ষে অন্যের জন্যই করা হয়। জগতে আমরা যে সমস্ত বস্তু আহরণ করেছি, তা জগতের সেবায় ব্যয় না করে নিজ সুখের উদ্দেশ্যে ব্যয় করাকেই নিজের জন্য (পাক) ব্যবহার করা বোঝায়। জগৎ থেকে প্রাপ্ত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র শারীরিক অংশাদিও নিজের বলে মনে না করে এটিকে প্রয়োজনানুসারে অন্ন, জল বস্ত্রাদি যোগানো এবং একে অলস, প্রমাদী বা ভোগী তৈরি না করাই হচ্ছে এই শরীরের সেবা। এতে শরীরে মমতা বা আসক্তি থাকে না।

মানুষকে তার নিজের কর্মের ফল অবশ্যই ভুগতে হয়। কিন্তু তার কৃতকর্মের ফল সমস্ত সংসারের ওপর প্রভাব ফেলে। নিজের জন্যই যে কর্ম করে, সে নিজ কর্তব্য থেকে চ্যুত হয় এবং কর্তব্যচ্যুত হলেই দেশে অকাল, মহামারী, মৃত্যু ইত্যাদি মহাকষ্ট, ভয় উপস্থিত হয়। সুতরাং মানুষের উচিত তার নিজের (স্বার্থের) জন্য কিছু না করা, নিজের বলে কোনো কিছু না মনে করা এবং নিজের জন্য কিছু আশা না করা।

কর্মফলের (উৎপত্তি ও বিনাশশীল সকল বস্তুর) আশ্রয় নেওয়াই হল নিজের জন্য রন্ধন প্রস্তুত করার সামিল। এইজন্যই ভগবান ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে **'অনাশ্রিতঃ কর্মফলম্'** পদটির দ্বারা কর্মযোগীকে কর্মফলের আশ্রয় গ্রহণ না করতে বলেছেন। সর্বতোভাবে অনাশ্রিত হলে তখনই মানুষ আর নিজের জন্য কোনো কিছু করে না, যার ফলে সে যোগস্থ হয়।

'ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপাঃ'—এই পদটির দ্বারা ভগবান সভ্য ভাষায় শুধু 'নিজের জন্য' যারা কর্ম করে তাদের নিন্দা করছেন। আত্মস্বার্থের জন্য কর্ম করলে মানুষ এত পাপ সংগ্রহ করে যে চুরাশি লক্ষ জন্ম এবং নরকের দুঃখ ভোগ করলেও তা শেষ হয় না, বরং সঞ্চিত রূপে সেটি থেকেই যায়। মনুষ্যজন্ম এমন এক অদ্ভুত কৃষিক্ষেত্র যে এতে পাপ বা পুণ্য যে বীজই রোপণ করা হোক না কেন তা বহু জন্ম পর্যন্ত ফল দিতে থাকে[১]। সুতরাং মানুষের শীঘ্রই এই অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া উচিত যে, 'আমি আর পাপ (স্বার্থের জন্য কর্ম) করব না।' এই স্থির-নিশ্চয়তা এক বড় শক্তি। সত্য হল এই যে, পরমাত্মার দিকে চলার দৃঢ় নিশ্চয়তা থাকলে পাপ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

পরিশিষ্ট-ভাব— মানুষের শরীর, যোগ্যতা, পদ, অধিকার, বিদ্যা, বল ইত্যাদি যা কিছু আছে তা সবই প্রাপ্ত হওয়া এবং সেগুলি চিরকাল থাকবে না। তাই সেগুলি তার নিজের অথবা নিজের জন্য নয়, অন্যের সেবার জন্য। এটিই হল আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতির মূল কথা। আমাদের দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন আমাদের শরীরেরই হিতের জন্য, তেমনই জগতের প্রত্যেকটি মানুষই জগতের হিতের জন্য সৃষ্ট হয়েছে। মানুষ যে কোনো দেশ, বেশ, বর্ণ বা আশ্রমের হোক না কেন, সে স্বীয় কর্মের দ্বারা অপরের সেবা করে সহজেই নিজ কল্যাণ করতে সক্ষম হয়।

---

[১]মনুষ্য-জন্মই প্রকৃতপক্ষে সমস্ত জন্মের আদি এবং অন্তিম জন্ম। মানুষ যদি পরমাত্মাপ্রাপ্ত হয়, তাহলে এটিই হয় তার শেষ জন্ম, আবার পরমাত্মাপ্রাপ্তি না করলে এটি হয় অনন্ত জন্মের আদি জন্ম।

আমাদের যা কিছু বিশেষত্ব, তা অন্যের জন্য, নিজের জন্য নয়। যদি প্রত্যেক ব্যক্তিই এ সত্য উপলব্ধি করে, তাহলে কেউই আর বদ্ধ থাকবে না, সকলেই জীবন্মুক্ত হয়ে যাবে। প্রাপ্ত বস্তুগুলি অন্যের সেবায় নিয়োজিত করলে নিজের তো কিছুই ব্যয় হয় না, বিনা ব্যয়েই কল্যাণপ্রাপ্তি হয়ে যায়। এছাড়া মুক্তিলাভের জন্য আর কিছুই করার প্রয়োজন নেই। আমাদের কাছে যা আছে, সেটুকুই আমাদের সেবায় নিয়োগ করার অধিকার, তার চেয়ে বেশির প্রয়োজনও নেই। তার বেশি মানুষ করতেও পারে না। যতটুকু সামর্থ্য, যোগ্যতা ও বস্তু নিজের কাছে থাকে, সেটুকু সম্পূর্ণভাবে সেবায় ব্যয় করলে পূর্ণরূপে কল্যাণ লাভ করা যায়।

আসলে শরীরের সাহায্যে জগৎ-সংসারের কাজই হয়,নিজের কাজ হয় না। কারণ শরীর আমার জন্য নয়। কিছু কাজ করার জন্যই শরীরের প্রয়োজন হয়। কোনো কিছু যদি করা না হয় তাহলে শরীরের দরকার কী ? তাই শরীর দ্বারা নিজের জন্য কিছু করাই দোষের। প্রাপ্ত বস্তুর দ্বারা আমরা নিজেদের প্রকৃত কল্যাণের জন্য কিছু করতে সক্ষম হই না, তা দিয়ে জগতের সেবা করতে পারি। শরীর এই জগতেরই অংশ, সুতরাং তা দিয়ে যা কাজ হবে, তা জগতের জন্যই হবে। জগৎকে শরীর-মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদি কখনোই অতিক্রম করতে পারে না, কেননা এগুলিকে জগৎ থেকে পৃথক করা যায় না। তাই নিজের সুখের জন্য কাজ করা মনুষ্যত্বের পরিচায়ক নয়, তা হল রাক্ষসীভাব বা আসুরীভাবের পরিচয়। তাকেই মানুষ বলা হয়, যে অপরের হিতার্থে কর্ম করে। নিজ সুখের জন্য যারা কর্ম করে তারা পাপ ভক্ষণ করে অর্থাৎ সর্বদাই দুঃখে থাকে আর অন্যের হিতার্থে যাঁরা কর্ম করেন তাঁরা সম্পূর্ণভাবে পাপমুক্ত থাকেন অর্থাৎ সদাসুখী হন—**'যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজোযান্তিব্রহ্ম সনাতনম্'** (গীতা ৪।৩১)।

* * *

সম্বন্ধ— 'এই নিষ্ঠুর কর্মে আমাকে কেন নিয়োজিত করছেন ?'—অর্জুনের এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ভগবান পরবর্তী দুটি শ্লোকে সৃষ্টিচক্র সুরক্ষার জন্যও যজ্ঞ (কর্তব্যকর্ম) করার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করছেন।

অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ॥ ১৪ ॥
কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥ ১৫ ॥

[ভূতানি (সমস্ত প্রাণী) ; **অন্নাৎ, ভবন্তি** (অন্ন থেকে উৎপন্ন হয়) ; **অন্নসম্ভবঃ** (অন্ন উৎপন্ন হয়) ; **পর্জন্যাৎ** (জল অর্থাৎ মেঘ থেকে) ; **পর্জন্যঃ** (মেঘ) ; **যজ্ঞাৎ, ভবতি** (জন্মায় যজ্ঞ থেকে) ; **যজ্ঞঃ** (যজ্ঞ) ; **কর্মসমুদ্ভবঃ** (কর্ম হতে নিষ্পন্ন হয়) ; **কর্ম** (কর্মকে) ; **ব্রহ্মোদ্ভবম্** (বেদ হতে উৎপন্ন) ; **বিদ্ধি** (জানবে) ; **ব্রহ্ম** (বেদ) ; **অক্ষরসমুদ্ভবম্** (পরব্রহ্ম হতে প্রকটিত) ; **তস্মাৎ** (সেই হেতু) ; **সর্বগতম্, ব্রহ্ম** (সর্বব্যাপী পরমাত্মা) ; **যজ্ঞে** (যজ্ঞে) ; **নিত্যম্** (নিত্য) ; **প্রতিষ্ঠিতম্** (প্রতিষ্ঠিত।)]

সমস্ত প্রাণী অন্ন থেকে উৎপন্ন হয়, অন্ন উৎপন্ন হয় মেঘ (জল) থেকে, মেঘ জন্মায় যজ্ঞ থেকে, যজ্ঞ নিষ্পন্ন হয় কর্ম থেকে। বেদ থেকে কর্ম উৎপন্ন হয় এবং বেদ পরব্রহ্ম থেকে প্রকটিত বলে জানবে। সেইহেতু এই সর্বব্যাপী পরমাত্মা যজ্ঞে (কর্তব্যকর্মে) নিত্য প্রতিষ্ঠিত ॥ ১৪-১৫ ॥

ব্যাখ্যা—'অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি'—প্রাণধারণের নিমিত্ত যে আহার্য গ্রহণ করা হয়, তাকে 'অন্ন'[১] বলা হয়।

যে প্রাণীর যা খাদ্য, যা গ্রহণ করলে শরীরের উৎপত্তি, পোষণ এবং পুষ্টি হয়, তাকেই এখানে 'অন্ন' নামে অভিহিত করা হয়েছে; যেমন—মৃত্তিকার কীট মৃত্তিকা দ্বারা জীবন ধারণ করে, তাই মৃত্তিকাই হল তার জন্য অন্ন।

[১]'অদ্ ভক্ষণে' ধাতুর দ্বারা 'ক্ত' করলে 'অদোহনন্নে' (অষ্টা. ৩।২।৬৮) সূত্রের নিপাতন দ্বারা 'অন্ন' শব্দটি সৃষ্ট হয় অন্যথায় 'অদো জগ্ধির্ল্যপ্তি কিতি' (অষ্টাদশ ২।৪।৩৬) দ্বারা 'জগ্ধ' শব্দ সৃষ্ট হয়।

জরায়ুজ (মনুষ্য, পশু ইত্যাদি), উদ্ভিদ (বৃক্ষ, লতাদি), অণ্ডজ (পক্ষী, সর্পাদি) এবং স্বেদজ (কীটাদি) এই চারপ্রকার প্রাণী অন্ন হতে উৎপন্ন হয় এবং অন্ন দ্বারাই প্রাণ ধারণ করে[১]।

'পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ'—সমস্ত খাদ্যপদার্থের উৎপত্তি হয় জল থেকে। ঘাস-পাতা, সবজি ইত্যাদি তো জল থেকে উৎপন্ন হয়ই, মৃত্তিকার উৎপত্তির কারণও জল। অন্ন, জল, বস্ত্র, গৃহ ইত্যাদি শরীর-নির্বাহের সমস্ত সামগ্রীই স্থূল বা সূক্ষ্মরূপে জলের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং বৃষ্টিপাত হচ্ছে জলের আধার।

'যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যঃ'—'যজ্ঞ' শব্দটি প্রধানতঃ আহুতি দান করা ক্রিয়ার বাচক। কিন্তু গীতার সিদ্ধান্ত এবং কর্মযোগে প্রস্তুত প্রকরণ অনুযায়ী এখানে 'যজ্ঞ' শব্দটি সমস্ত কর্তব্যকর্মের উপলক্ষ। যজ্ঞে ত্যাগের প্রাধান্য থাকে। আহুতি দিতে অন্ন, ঘি ইত্যাদি বস্তু ত্যাগ করতে হয়, দান করাতে বস্তু ত্যাগ হয়, তপস্যা করতে গেলে সুখভোগ ত্যাগ করতে হয়, কর্তব্যকর্ম করতে গেলে নিজ স্বার্থ, আরাম ইত্যাদি ত্যাগ করতে হয়। সুতরাং 'যজ্ঞ' শব্দটি যজ্ঞ (হোম), দান, তপ ইত্যাদি সমস্ত শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়াগুলিরও উপলক্ষ।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে একটি কাহিনী বলা হয়েছে। প্রজাপতি ব্রহ্মা দেবতা, মানুষ এবং অসুর—এই তিনজনকে সৃষ্টি করে তাদের 'দ'—এই অক্ষরের উপদেশ দিয়েছিলেন। দেবতাগণের নিকট ভোগ্যসামগ্রীর আধিক্য থাকায় তাঁরা 'দ'-এর অর্থ 'দমন করো' ধরলেন। মানুষের মধ্যে সংগ্রহের প্রবৃত্তি বেশি থাকায় তাঁরা 'দ' এর অর্থ ধরলেন 'দান করো'। অসুরদের অপরকে নির্যাতন করার প্রবৃত্তি বেশি থাকায় তাঁরা 'দ' এর অর্থ ধরলেন 'দয়া করো'। এইরূপ দেবতা, মানুষ ও অসুর—তিনজনকে দেওয়া উপদেশের অর্থ হল অপরের হিত করা। বর্ষার সময় মেঘ যে গর্জন করে 'দ-দ-দ', তা আজও ব্রহ্মার উপদেশ (দমন করো, দান করো, দয়া করো) রূপে কর্তব্যকর্ম স্মরণ করিয়ে দেয় (বৃহদারণ্যক ৫।২।১-৩)।

নিজের কর্তব্যপালনে বৃষ্টি হওয়া কীভাবে সম্ভব ? অন্যের ওপর বাক্যের থেকে আচরণের প্রভাব বেশি মাত্রায় পড়ে—**'যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্ত দেবেতরো জনঃ'** (গীতা ৩।২১)। মানুষ নিজ নিজ কর্তব্য ঠিকমতো পালন করলে দেবতাদের ওপরও তার প্রভাব পড়ে, যাতে তাঁরাও তাঁদের কর্তব্যপালন করেন, বৃষ্টিপাত ঘটান (গীতা ৩।১১)। এই বিষয়ে একটি গল্প আছে—চারজন কৃষক ছিল। আষাঢ় মাস এলো কিন্তু বৃষ্টি হল না দেখে তারা আলোচনা করতে লাগল যে, চাষ করবার সময় এসে গেল। 'বর্ষা হল না তো কী করা যাবে, আমরা সময়মত আমাদের কর্তব্যপালন করতে থাকি।' এই ভেবে তারা ক্ষেতে গিয়ে হাল দিতে শুরু করল। ময়ূরেরা তাদের হাল চালাতে দেখে ভাবতে লাগল কী ব্যাপার ? এখনও বর্ষা শুরু হয়নি, অথচ এরা হাল দিতে শুরু করেছে ? তারপর তারা জানতে পারল যে কৃষকরা তাদের কর্তব্য-পালন করছে, তখন ময়ূরগুলো ভেবে দেখল যে কৃষকরা যখন তাদের কর্তব্যপালন করছে তখন আমরাই বা কেন পিছনে থাকি ? এই ভেবে ময়ূরগুলোও কেকারব করতে লাগল। ময়ূরদের কেকারবে মেঘ ভাবতে লাগল, 'আমার গর্জন না শুনেই ময়ূর কেন কেকারব তুলেছে ?' সমস্ত ব্যাপার জানতে পেরে মেঘ ভাবতে লাগল, 'তাহলে আমিই বা কেন আমার কর্তব্য থেকে দূরে থাকি ?' মেঘও গর্জন শুরু করল। মেঘের গর্জন শুনে ইন্দ্র ভাবলেন 'আরে, ব্যাপার কী ?' তিনি যখন জানতে পারলেন যে, এরা সকলেই তাদের নিজ নিজ কর্তব্যপালন করছে, তখন ইন্দ্র ভাবলেন, 'আমি বা কেন আমার কর্তব্যপালনে পিছিয়ে থাকি ?' এই ভেবে তিনিও মেঘকে বৃষ্টি শুরু করার নির্দেশ দিলেন।

'যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ'—নিষ্কামভাবে করা লৌকিক এবং শাস্ত্রীয় সমস্ত বিহিত কর্মকেই 'যজ্ঞ' বলা হয়। ব্রহ্মচারীদের পক্ষে অগ্নিহোত্র করাই হল 'যজ্ঞ'। সেইরূপ নারীদের খাদ্য প্রস্তুত করাকেও 'যজ্ঞ' বলা হয়[২]। আয়ুর্বেদ জ্ঞাতা কেবল লোকের হিতার্থে যদি বৈদ্য-কর্ম করেন, তাহলে সেটি হল

---

[১]অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। অন্নেন জাতানি জীবন্তি (তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ৩।২)।

[২]বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ। পতিসেবা গুরৌ বাসো গৃহার্থোঽগ্নিপরিক্রিয়া॥ (মনুস্মৃতি ২।৬৭)

বিবাহিতা নারীর পক্ষে বৈবাহিক বিধি পালন করাই হল বৈদিক সংস্কার (যজ্ঞোপবীত), পতি সেবা করাই হল গুরুকুল নিবাস (বেদাধ্যয়ন) এবং গৃহকার্য করাই হল অগ্নিহোত্র (যজ্ঞ)।

তাঁর পক্ষে 'যজ্ঞ'। এইরূপ বিদ্যার্থী নিজের অধ্যয়ন এবং ব্যবসায়ী নিজের ব্যবসায়কে (এটি যদি শুধুমাত্র অপরের হিতার্থে নিষ্কামভাবে করা হয়) 'যজ্ঞ' বলে মনে করতে পারেন। এইভাবে বর্ণ, আশ্রম, দেশ, কালের মর্যাদা রক্ষা করে নিষ্কামভাবে করা সমস্ত শাস্ত্রবিহিত কর্তব্যকর্মই 'যজ্ঞ' নামে অভিহিত হয়। যজ্ঞ যেরূপই হোক তা ক্রিয়াভিত্তিক হয়।

বিভিন্ন তীব্র বিষগুলিকেও বৈদ্যগণ যখন শুদ্ধ করে ওষুধরূপে দেন, তখন সেই বিষগুলিও অমৃতের ন্যায় কঠিন অসুখ দূর করে দেয়। এইরূপই কামনা, মমতা, আসক্তি, পক্ষপাতিত্ব, বৈষম্য, স্বার্থপরতা, অহং-অভিমান ইত্যাদি সবই হল কর্মের মধ্যে বিষের মতো। কর্মের এই বিষাক্ত অংশ নষ্ট করে দিলেই এইসব কর্ম অমৃতময় হয়ে জন্ম-মরণরূপ মহৎ রোগ দূর করতে সক্ষম হয়। এইরূপ অমৃতময় কর্মকেই 'যজ্ঞ' বলা হয়।

'কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি'—বেদ কর্তব্যকর্ম পালনের বিধি নির্দেশ করে (গীতা ৪।৩২)। মানুষের কর্তব্যকর্ম পালনের বিধির জ্ঞান বেদ থেকে হওয়ার জন্য বেদ হতেই কর্মের উৎপত্তি বলা হয়েছে।

'বেদ'-এর অন্তর্গত ঋক্‌বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদের সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস (রামায়ণ, মহাভারত) ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার্যগণের অনুভবের কথা—ইত্যাদি সমস্ত বেদানুকুল সৎশাস্ত্র গ্রহণ করা উচিত।

'ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্'—'ব্রহ্ম' পদ এখানে বেদের বাচক। সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মা হতে বেদ প্রকটিত হয় (গীতা ১৭।২৩)। অতএব পরমাত্মাই সমস্ত কিছুর মূল।

বেদ পরমাত্মা থেকেই প্রকটিত, এটি কর্তব্যপালনের নিয়মাবলী ব্যক্ত করে। মানুষ সেই কর্তব্য বিধিপূর্বক পালন করে। কর্তব্যপালনের দ্বারা যজ্ঞ হয় এবং যজ্ঞ হতে বৃষ্টি হয়, বর্ষা হলে অন্ন জন্মায়, তা থেকে প্রাণী সৃষ্টি হয়। সেই প্রাণীদের মধ্যে মানুষই কর্তব্যরূপে যজ্ঞ করে[১]। সৃষ্টিচক্র এইভাবে আবর্তিত হচ্ছে।

'তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্'—'ব্রহ্ম' পদটি এইস্থলে অক্ষর (সগুণ-নিরাকার পরমাত্মা)-এর বাচক। সুতরাং সর্বগত (সর্বব্যাপী) হচ্ছেন স্বয়ং পরমাত্মা, বেদ নয়। সর্বব্যাপী হলেও পরমাত্মা বিশেষভাবে 'যজ্ঞে'ই (কর্তব্যকর্মে) সর্বদা বিদ্যমান থাকেন। এর তাৎপর্য হল এই যে, নিষ্কামভাবে কর্তব্যকর্ম যেখানে পালন করা হয়, পরমাত্মা সেখানেই বিরাজ করেন। সুতরাং যাঁরা পরমাত্মাপ্রাপ্তি করতে চান তাঁরা নিজ নিজ কর্তব্যকর্ম দ্বারা অতি সহজেই তাঁকে লাভ করতে পারে—**'স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ'** (গীতা ১৮।৪৬)।

প্রশ্ন—যদি পরমাত্মা সর্বব্যাপী হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁকে শুধুমাত্র যজ্ঞে নিত্য প্রতিষ্ঠিত বলা হয়েছে কেন ? তিনি কি তবে অন্য স্থানগুলিতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত নন ?

উত্তর—পরমাত্মা সর্বত্র সমভাবে নিত্য বিদ্যমান। তিনি অনিত্য অথবা একদেশীয় নন। সেইজন্যই তাঁকে এখানে 'সর্বগত' বলা হয়েছে। যজ্ঞে (কর্তব্যকর্মে) নিত্য প্রতিষ্ঠিত বলার অর্থ হল এই যে, যজ্ঞ হচ্ছে তাঁর উপলব্ধি-স্থান। যেমন ভূমিতে সর্বত্র জল থাকলেও, কূপাদিতে এটি উপলব্ধ হয়, সর্বত্র নয়। পাইপে সর্বত্র জল থাকলেও একমাত্র কলের মুখ বা ছিদ্র থেকেই সেটি পাওয়া যায়। তেমনি পরমাত্মা সর্বগত হলেও, যজ্ঞতেই তাঁকে প্রাপ্ত করা যায়।

নিজের জন্য কর্ম করলে অথবা জড়ের (শরীরাদি) সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নিলে সর্বব্যাপী পরমাত্মার প্রাপ্তিতে বাধা আসে। নিষ্কামভাবে কেবলমাত্র অন্যের হিতের জন্য নিজ নিজ কর্তব্যপালন করলে এই বাধা দূর হয় এবং নিত্যপ্রাপ্ত পরমাত্মা স্বতঃই অনুভূত হয়। এইজন্যই অর্জুন যখন নিজ কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হতে যাচ্ছিলেন, তখন ভগবান তাঁকে নানা যুক্তির সাহায্যে কর্তব্যপালনের বিশেষ গুরুত্ব দেখিয়েছেন।

*** *** ***

[১]মানুষ ছাড়া অন্যান্য স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণীদের দ্বারা স্বতঃই যজ্ঞ (পরোপকার) হতে থাকে, কেননা এদের দ্বারা ভেবে-চিন্তে যজ্ঞ অনুষ্ঠান হওয়া সম্ভব নয়। একমাত্র মানুষই বুদ্ধিপূর্বক যজ্ঞ করতে পারে। কারণ যজ্ঞ করার যোগ্যতা এবং অধিকার একমাত্র মানুষেরই আছে।

সম্বন্ধ—সৃষ্টিচক্র অনুসারে নিজের কর্তব্যপালন করার দায় মানুষের। সুতরাং যেসব ব্যক্তি নিজ কর্তব্যপালন করে না, পরবর্তী শ্লোকে ভগবান তাদের তিরস্কার করেছেন।

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥ ১৬ ॥

[**পার্থ** (হে পার্থ !) ; **যঃ** (যে ব্যক্তি) ; **ইহ** (ইহলোকে) ; **এবম্‌** (এই প্রকার) ; **প্রবর্তিতম্‌** (প্রচলিত) ; **চক্রম্‌** (সৃষ্টি-চক্রের) ; **ন, অনুবর্তয়তি** (অনুযায়ী না চলে) ; **ইন্দ্রিয়ারামঃ** (ইন্দ্রিয়সুখে ভোগাসক্ত) ; **অঘায়ুঃ, সঃ** (পাপাচারী সেই ব্যক্তি) ; **মোঘম্‌** (বৃথাই) ; **জীবতি** (জীবনধারণ করে।)]

হে পার্থ ! যে ব্যক্তি ইহলোকে এইপ্রকার পরম্পরা দ্বারা প্রচলিত সৃষ্টিচক্র অনুযায়ী চলে না, ইন্দ্রিয়সুখাসক্ত পাপাচারী সেই ব্যক্তি বৃথাই এই জগতে জীবনধারণ করে থাকে ॥ ১৬ ॥

ব্যাখ্যা—'পার্থ'—নবম শ্লোকে যে প্রকরণ শুরু করা হয়েছিল তার উপসংহার করতে গিয়ে ভগবান অর্জুনকে এখানে 'পার্থ' নামে সম্বোধন করে বলতে চেয়েছেন যে, 'তুমি সেই পৃথার (কুন্তীর) পুত্র, যিনি আজীবন কষ্ট সহ্য করেও তাঁর কর্তব্যপালন করেছেন। অতএব তোমার দ্বারাও কর্তব্যে অবহেলা হওয়া উচিত নয়। যে যুদ্ধকে তুমি নিষ্ঠুর কর্ম বলে মনে করছ, তা তোমার পক্ষে নিষ্ঠুর কর্ম নয়, বরং সেটি হল যজ্ঞ (কর্তব্য) কর্ম। একে পালন করাই সৃষ্টিচক্র অনুযায়ী চলা আর এটি পালন না করা হল সৃষ্টি-চক্র অনুযায়ী না চলা।'

'এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ'—রথের চাকার ক্ষুদ্র একটি অংশ ভেঙে গেলেও যেমন সমস্ত রথটিতে এবং তার আরোহীদের আঘাত লাগে, তেমনি যে ব্যক্তি চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শ্লোকে বর্ণিত সৃষ্টিচক্র অনুযায়ী চলে না, সে সমষ্টিগত সৃষ্টির সঞ্চালনে বাধা উৎপাদন করে।

জগৎ এবং ব্যক্তি দুটি (বিজাতীয়) বস্তু নয়। যেমন শরীরের সঙ্গে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে শরীরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে তেমনি জগতের সঙ্গে ব্যক্তির এবং ব্যক্তির সঙ্গে জগতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যখন কামনা, বাসনা, মমত্ব ও অহং-কর্তৃত্ববোধ পরিত্যাগ করে নিজ কর্তব্যপালন করে, তখন তার দ্বারা সমগ্র সৃষ্টি স্বতঃই সুখী হয়।

'ইন্দ্রিয়ারামঃ'—যে ব্যক্তি কামনা, বাসনা, মমত্ববোধে যুক্ত হয়ে ইন্দ্রিয়াদির ভোগে ব্যাপৃত থাকে, এখানে তাকে ভোগাদিতে বিচরণকারী বলে জানানো হয়েছে। এরূপ মানুষ পশু অপেক্ষাও হীন, কারণ পশু নতুন কোনো পাপ করতে সক্ষম নয়, তারা পূর্বকৃত পাপের ফল ভোগ করে নির্মলতার পথে অগ্রসর হয় কিন্তু 'ইন্দ্রিয়ারাম' ব্যক্তি নব নব পাপের দ্বারা ক্রমশঃ পতনের দিকে অগ্রসর হয় এবং তার সঙ্গে সৃষ্টিচক্রে বাধা উৎপন্ন করে সমস্ত সৃষ্টিকে দুঃখগ্রস্ত করে।

'অঘায়ুঃ'—সৃষ্টিচক্র অনুসারে যে ব্যক্তি কর্তব্যপালন করে না, তার জীবন পাপময়। কারণ ভোগবুদ্ধি সহকারে ইন্দ্রিয়ভোগে ব্যাপৃত হওয়ায়, সেই ব্যক্তি হিংসারূপ পাপের হাত থেকে রক্ষা পায় না। স্বার্থপর, অহংকারী, ভোগী এবং সম্পদ-সংগ্রহকারী ব্যক্তির দ্বারা অন্যের অহিত হয় ; সুতরাং এরূপ মানুষের জীবন হয়ে ওঠে পাপময়। গোস্বামী শ্রীতুলসীদাস বলেছেন যে,—

পর দ্রোহী পর দার রত পর ধন পর অপবাদ।
তে নর পাঁবর পাপময় দেহ ধরেঁ মনুজাদ॥
(শ্রীরামচরিতমানস ৭।৩৯)

'মোঘং পার্থ স জীবতি'— যেসব মানুষ নিজ কর্তব্য-পালন করে না, তাদের সভ্য ভাষায় নিন্দা বা তিরস্কার করে ভগবান বলেছেন যে, 'জগতে এরূপ মানুষের বেঁচে থাকাই বৃথা অর্থাৎ তাদের মৃত্যু হলেও ক্ষতি নেই!' এর তাৎপর্য হল এই যে, তারা নিজ কর্তব্যপালন করে যদি সৃষ্টিচক্রকে সুখী নাও করতে পারে তাহলে অন্তত দুঃখী যেন না করে। যেমন, ভগবান শ্রীরাম বনবাসে থাকাকালীন অযোধ্যাবাসীগণ তাঁকে দেখতে চিত্রকূটে এলে সেখানকার কোল, কিরাত, ভীল ইত্যাদি অরণ্যবাসীগণ তাঁদের বলেছিল যে, 'আমরা যে তোমাদের বস্ত্র ও বাসন প্রভৃতি চুরি করিনি, এটিই আমাদের সব থেকে বড় সেবা কার্য'—**য়হ হমারি অতি বড়ি সেবকাঈ। লেহিঁ ন বাসন** বসন

চোরাঈ॥ (শ্রীরামচরিতমানস ২।২৫১।২), এরূপই নিজ কর্তব্য যারা পালন করে না, সেইসব ব্যক্তি অন্তত সৃষ্টিচক্রে যদি বিঘ্ন না ঘটায় তাহলে সেটিও তাদের পক্ষে মস্ত বড় সেবা।

সৃষ্টিচক্র অনুসারে যারা কাজ করে না ভগবান তাদের প্রথমে **'স্তেন এব সঃ'** (৩।১২) 'তারা চোর' এবং **'ভুঞ্জতে তে ত্বঘম্'** (৩।১৩) 'এরা পাপই ভক্ষণ করে' এরূপ কথা বলেছিলেন এবং এই শ্লোকে **'অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামঃ'** তারা পাপজীবন এবং ভোগাসক্ত—এই কথা বলে তাদের জীবন বৃথা বলে জানিয়েছেন।

গোস্বামী তুলসীদাসও বলেছেন—

তেজ কৃসানু রোষ মহিষেসা।
অঘ অবগুন ধন ধনী ধনেসা॥
উদয় কেত সম হিত সবহী কে।
কুম্ভকরন সম সোবত নীকে॥

(শ্রীরামচরিতমানস ১।৪।৩)

পরিশিষ্ট-ভাব— নবম শ্লোক থেকে এই শ্লোক পর্যন্ত যে বর্ণনা আছে, তার তাৎপর্যই হল নিঃস্বার্থভাবে অন্যের সেবা করা।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—জগৎ-সংসার থেকে সম্পর্কছেদ করার জন্য যারা নিজ কর্তব্যপালন করে না, পূর্ব শ্লোকটিতে তাদের তিরস্কার করা হয়েছে। কিন্তু যাঁরা নিজ নিজ কর্তব্যপালন দ্বারা সংসার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন সেই মহাপুরুষদের স্থিতির বর্ণনা পরবর্তী দুটি শ্লোকে ভগবান করেছেন।

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে॥ ১৭ ॥

[**তু** (কিন্তু) ; **যঃ, মানবঃ** (যে ব্যক্তি) ; **আত্মরতিঃ, এব** (নিজেতেই প্রীত) ; **চ, আত্মতৃপ্তঃ** (নিজেতেই তৃপ্ত) ; **চ, আত্মনি এব** (এবং নিজেতেই) ; **সন্তুষ্টঃ** (সন্তুষ্ট) ; **স্যাৎ** (থাকেন) ; **তস্য** (তাঁর) ; **কার্যম্** (কোনো কর্তব্য) ; **ন, বিদ্যতে** (থাকে না।)]

কিন্তু যে ব্যক্তি নিজেতেই প্রীত, নিজেতেই তৃপ্ত এবং নিজেতেই সন্তুষ্ট, তাঁর নিজের জন্য কোনো কর্তব্য থাকে না ॥ ১৭ ॥

ব্যাখ্যা—'যস্ত্বাত্মরতিরেব..........সন্তুষ্টস্তস্য'— এখানে 'তু' পদটি পূর্বশ্লোকে বর্ণিত নিজ কর্তব্যে অবহেলাকারী ব্যক্তির অপেক্ষা কর্তব্যকর্ম দ্বারা সিদ্ধিপ্রাপ্ত মহাপুরুষদের বিশেষত্ব জানাবার জন্য প্রযুক্ত হয়েছে।

মানুষ যতক্ষণ সংসারের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নেয় ততক্ষণ সে তার অনুরাগ ইন্দ্রিয়াদির ভোগে ও স্ত্রী-পুত্র-পরিবার ইত্যাদিতে এবং তৃপ্তি ভোজনাদিতে ও সন্তুষ্টি ধনসম্পদে আছে বলে মনে করে। কিন্তু এইসবে তার অনুরাগ, তৃপ্তি বা সন্তুষ্টি কখনো পূর্ণ হয় না এবং তা স্থায়ীও হয় না, কারণ জগৎ-সংসার প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তনশীল, জড় এবং বিনাশশীল। কেবল স্বয়ং 'স্বরূপ' হলেন সর্বদা একরসে বিদ্যমান, চেতন এবং অবিনাশী। এর তাৎপর্য হল যে 'স্বয়ং' বা স্বরূপ-এর সংসারের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। সুতরাং স্বয়ং-এর প্রীতি, তৃপ্তি এবং সন্তুষ্টি কীভাবে সংসারের দ্বারা হতে পারে ?

কোনো ব্যক্তিরই সাংসারিক প্রীতি চিরকাল থাকতে পারে না—এটি সকলেই অনুভব করেছেন। বিবাহকালে নারী-পুরুষের মধ্যে যে প্রীতি বা আকর্ষণ দেখা যায় একটি বা দুটি সন্তান হওয়ার পর তা আর থাকে না। কোনো কোনো স্থানে এমনও দেখা যায় যে একজন নারী তাঁর বৃদ্ধ পতিকে বলছেন যে, 'বুড়ো মরে গেলে বাঁচি !' ভোজনে তৃপ্তিও কিছু সময়ের জন্যই দেখা যায়। অর্থপ্রাপ্তির যে সন্তুষ্টি দেখা যায় তাও ক্ষণিক, কারণ ধনসম্পদের আসক্তি সর্বদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেইজন্য অভাববোধ সর্বদাই বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ সংসারে প্রীতি, তৃপ্তি এবং সন্তুষ্টি কখনো স্থায়ী থাকতে পারে না।

মানুষের সাংসারিক বস্তুগুলিতে প্রীতি, তৃপ্তি এবং সন্তুষ্টির কেবল প্রতীতিই জন্মায়, প্রকৃতপক্ষে তা টেকে না। যদি সত্যই তা হত তাহলে এসবে অপছন্দ, অতৃপ্তি বা

অসন্তুষ্টি আসত না। স্বরূপে তৃপ্তি, প্রীতি এবং সন্তুষ্টি স্বতঃস্ফূর্ত। স্বরূপ হচ্ছে সৎ। সতের কখনো কিছুমাত্র অভাব হয় না—**'নাভাবো বিদ্যতে সতঃ'** (গীতা ২।১৬) এবং অভাব না থাকলে কোনো কামনা উৎপন্ন হয় না। তাই স্বরূপের নিষ্কামভাব স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু যখন জীব ভ্রমবশতঃ সংসারের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নেয়, তখন সে সংসারে প্রীতি, তৃপ্তি ও সন্তুষ্টি অন্বেষণ করতে থাকে এবং তার জন্য সাংসারিক বস্তু কামনা করতে থাকে। আকাঙ্ক্ষা করার পর যখন সেই বস্তু (ধনাদি) প্রাপ্ত হয়, এবং কামনা মিটে যাওয়ায় (অন্য আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হবার পূর্বে) তার নিষ্কামভাব আসে। তখন সে নিষ্কামতার সুখ অনুভব করে। কিন্তু সেই সুখকে মানুষ ভুল করে সাংসারিক বস্তুপ্রাপ্তিজনিত সুখ বলে মনে করে এবং সেটিকেই প্রীতি, তৃপ্তি ও সন্তুষ্টি নামে অভিহিত করে। বস্তুপ্রাপ্তিতেই যদি সে সুখী হত তবে সেটি প্রাপ্তির পরে সেটি থাকাকালীন সর্বদা সে সুখীই থাকত, কখনো দুঃখ পেত না এবং পুনর্বার কোনো বস্তুর আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে উৎপন্ন হত না। কিন্তু সাংসারিক বস্তু দ্বারা কখনো পরিপূর্ণ (সর্বদার জন্য) প্রীতি, তৃপ্তি এবং সন্তুষ্টি প্রাপ্ত না হওয়ায় এবং সংসারে মমতার বন্ধন থাকায় সে আবার নতুন নতুন আকাঙ্ক্ষা করতে থাকে। কামনা উৎপন্ন হলে নিজের মধ্যে অভাব এবং কাম্য বস্তু লাভ হলে তার মধ্যে এক পরাধীন ভাব অনুভূত হয়। সুতরাং আকাঙ্ক্ষাকারী ব্যক্তি সর্বদা দুঃখিত থাকে।

এখানে লক্ষণীয় হল এই যে, সাধক নিষ্কামতাকে সুখের মূল কারণ বলে মনে করেন এবং কামনাকে মনে করেন দুঃখের কারণ। কিন্তু সংসারাসক্ত ব্যক্তিগণ বস্তুগুলির প্রাপ্তিতেই সুখ বলে মনে করেন এবং অপ্রাপ্তিকে দুঃখ বলে মনে করেন। সংসারাসক্ত ব্যক্তিগণও যদি সাধকদের দৃষ্টিকোণ দিয়ে চিন্তা করে তদনুসারে আচরণ করে তাহলে তারাও শীঘ্রই স্বতঃসিদ্ধ নিষ্কামতা লাভ করতে পারে।

সকাম ব্যক্তিদের কর্মযোগের অধিকারী বলা হয়েছে—**'কর্মযোগস্তু কামিনাম্'** (শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ১১।২০।৭)। সকাম ব্যাক্তিদের প্রীতি, তৃপ্তি এবং সন্তুষ্টি সংসার থেকে হয়। তাই কর্মযোগে সিদ্ধ নিষ্কাম মহাপুরুষদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে ভগবান বলেছেন যে, এঁদের প্রীতি, তৃপ্তি এবং সন্তুষ্টি সকাম ব্যক্তিদের ন্যায় সংসারের প্রতি না হয়ে আত্মস্বরূপের প্রতি প্রত্যক্ষভাবে হয়ে থাকে (গীতা ২।৫৫), যেটি পূর্ব হতেই স্বরূপতঃ বর্তমান।

প্রকৃতপক্ষে প্রীতি, তৃপ্তি ও সন্তুষ্টি—তিনটি পৃথক না হলেও সাংসারিক সম্বন্ধের জন্য সেগুলি ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হয়। সেইজন্য সংসার থেকে সম্পর্ক বিচ্ছেদ হলে ওই মহাপুরুষের প্রীতি, তৃপ্তি এবং সন্তুষ্টি—তিনটি একই তত্ত্বে (স্বরূপে) হয়।

ভগবান এই শ্লোকটিতে দু'বার এবং পরবর্তী শ্লোকে একবার **'এব'** এবং **'চ'** পদ দুটি প্রয়োগ করেছেন। এর দ্বারা এই ভাবটি প্রকটিত হয় যে কর্মযোগীর প্রীতি, তৃপ্তি এবং সন্তুষ্টিতে কোনোপ্রকার ত্রুটি থাকে না এবং তত্ত্বের অতিরিক্ত অন্য কিছুর প্রয়োজনীয়তাও থাকে না (গীতা ৬।২২)।

'তস্য কার্যং ন বিদ্যতে'—মানুষের জন্য যে সব কর্তব্যকর্মের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার উদ্দেশ্য হল পরম কল্যাণস্বরূপ পরমাত্মাকে লাভ করা। যে কোনো সাধন (কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ অথবা ভক্তিযোগ) দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে মানুষের পক্ষে আর কিছু করা, জানা অথবা পাওয়া বাকি থাকে না, এটিই হল মনুষ্য জীবনের পরম সফলতা।

মানুষের বাস্তবিক স্বরূপে কোনো কিছুর অভাব না থাকলেও যতক্ষণ সে সাংসারিক সম্পর্কের জন্য নিজের মধ্যে অভাব বোধ করে এবং দেহকে 'আমি' তথা 'আমার' বলে মনে করে, 'নিজের জন্য' কর্ম করে, ততক্ষণ তার কর্তব্য করা অবশিষ্ট থেকে যায়। কিন্তু যখন সে 'নিজের জন্য' কিছু না করে 'অন্যের জন্য' অর্থাৎ শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, প্রাণের জন্য, মা, বাবা, স্ত্রী, পুত্র, সংসারের জন্য, সমাজের জন্য, দেশের জন্য এবং জগতের জন্য কর্ম করে, তখন তার জগৎ-সংসার থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সংসার থেকে চিরকালের মতো আসক্তির সম্পর্ক ছেদ হলে তার নিজের জন্য কোনো কর্তব্য আর বাকি থাকে না। কারণ স্বরূপে কোনো ক্রিয়া হয় না। সমস্ত ক্রিয়াই সাংসারিক সম্পর্ক থেকে এবং সাংসারিক বস্তু দ্বারাই হয়। সুতরাং সংসারের সঙ্গে যার আসক্তির সম্বন্ধ থাকে, তার জন্য কর্তব্যও থেকে যায়।

যখন কোনো কিছু পাবার আকাঙ্ক্ষা থাকে তখনই কর্ম হয়ে থাকে। আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয় অভাব থেকে। সিদ্ধ মহাপুরুষদের কোনো কিছুর অভাব থাকেই না, তাহলে তাঁদের আর করারই বা কী থাকে ?

কর্মযোগের দ্বারা সিদ্ধ মহাপুরুষদের রতি, তৃপ্তি এবং সন্তুষ্টি যখন তাঁদের মধ্যে আপনা থেকেই হয়ে যায়, তখন কৃত-কৃত্য, জ্ঞাত-জ্ঞাতব্য এবং প্রাপ্ত-প্রাপ্তব্য হয়ে যাওয়ায় তাঁরা বিধিনিষেধের ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন। যদিও শাস্ত্রের অনুশাসন তাঁদের ওপর থাকে না, তাহলেও তাঁদের সমস্ত ক্রিয়া স্বাভাবিকভাবে শাস্ত্রানুকূল এবং অপরের আদর্শ স্বরূপ হয়।

এখানে **'তস্য কার্যং ন বিদ্যতে'** পদটির মানে এই নয় যে এইসব মহাপুরুষের দ্বারা কোনো ক্রিয়া হয় না। কোনো কাজ অসমাপ্ত না থাকলেও লোকসংগ্রহের জন্য তাঁদের ক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে হয়ে থাকে। যেমন চক্ষুর উন্মীলন, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, খাদ্য পরিপাক স্বতঃ (প্রকৃতিতে) হয়ে যায়, তেমনি মহাপুরুষদের দ্বারা সমস্ত আদর্শ শাস্ত্রানুকূল কর্মও (কর্তৃত্বাভিমান না থাকায়) স্বতঃ হয়ে যায়।

পরিশিষ্ট-ভাব— কর্মযোগী নিঃস্বার্থভাবে জগৎসংসারের সেবার জন্যই সমস্ত কর্ম করে থাকেন। গঙ্গাজলে যেমন গঙ্গাপূজা হয়, তেমনই জগৎ থেকে প্রাপ্ত শরীর ইন্দ্রিয়াদি মন বুদ্ধি এবং অহংকে জগতের সেবাতেই নিয়োজিত করলে একমাত্র চিন্ময় সত্তা অবশিষ্ট থাকে। তাই তাঁর প্রীতি, তৃপ্তি এবং সন্তুষ্টিও স্বরূপেরই হয়।

জাগতিক বিধি ও নিষেধ — এ দুটিই প্রকৃতপক্ষে নিষেধ। কারণ দুটিই শেষ পর্যন্ত থাকে না। তাই জগৎ-সংসার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন হলে কর্মযোগীর আর কোনো বিধিনিষেধ থাকে না — **'তস্যং কার্যং ন বিদ্যতে'**।

※ ※ ※

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ॥ ১৮ ॥

[তস্য (তাঁর) ; **ইহ** (ইহ জগতে) ; **কৃতেন** (কর্মানুষ্ঠানের) ; **ন, কশ্চন, অর্থঃ** (কোনোই প্রয়োজন থাকে না) ; **ন, অকৃতেন** (কর্ম থেকে বিরত) ; **এব** (থাকারও) ; **চ** (এবং) ; **সর্বভূতেষু** (সমস্ত প্রাণীর মধ্যে) ; **অস্য** (এঁদের) ; **কশ্চিৎ** (কোনো-প্রকার) ; **অর্থব্যপাশ্রয়ঃ** (স্বার্থের সম্বন্ধ) ; **ন** (থাকে না।)]

সেই (কর্মযোগে সিদ্ধ) মহাপুরুষের এই জগতে কর্মানুষ্ঠানের কোনো প্রয়োজন নেই বা কর্ম থেকে বিরত থাকারও কোনো প্রয়োজন নেই এবং প্রাণীগণের সঙ্গেও তাঁর কোনো প্রকার স্বার্থের সম্পর্ক থাকে না ॥ ১৮ ॥

ব্যাখ্যা—'নৈব তস্য কৃতেনার্থঃ'—প্রত্যেক মানুষেরই কিছু করার ইচ্ছা থাকে। যতক্ষণ এই ইচ্ছা কোনো জাগতিক বস্তু পাবার জন্য থাকে ততক্ষণ তার নিজের জন্য 'করা' অসমাপ্ত থাকে। নিজের জন্য কিছু পাবার আকাঙ্ক্ষাই মানুষের বন্ধনের কারণ। সেই ইচ্ছা নিবৃত্তির জন্যই কর্তব্যকর্ম করার প্রয়োজন থাকে।

কর্ম দুই প্রকারের হয়। কামনাপূরণের জন্য এবং কামনা নিবৃত্তির জন্য। সাধারণ মানুষ কামনা পূরণের উদ্দেশ্যে কর্ম করে, কিন্তু কর্মযোগী কামনা নিবৃত্তির জন্য কর্ম করেন। কর্মযোগে সিদ্ধ মহাপুরুষদের কোনো কামনা না থাকায় কর্তব্যের সঙ্গে তাঁদের কোনোপ্রকার সম্পর্ক তৈরি হয় না। তাঁদের দ্বারা নিঃস্বার্থভাবে কৃত সকল কর্তব্যকর্ম স্বতঃই সৃষ্টির হিতের জন্য হয়ে যায়।

কর্মযোগে সিদ্ধ মহাপুরুষদের কর্মের সঙ্গে তাঁদের নিজেদের (ব্যক্তিগত সুখ ও আরামের) কোনো সম্বন্ধ থাকে না। তাঁরা অনুভব করেন যে এই পদার্থ, শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, অন্তঃকরণ ইত্যাদি সবই জগৎ-সংসারের এবং এখান থেকেই প্রাপ্ত, তাঁদের ব্যক্তিগত নয়। সুতরাং এগুলির দ্বারা শুধুমাত্র সংসারের জন্য কর্ম করতে হয়, নিজের জন্য নয়, যদিও সংসারের সাহায্য ছাড়া কোনো কর্মই করা সম্ভব নয়। প্রাপ্ত কর্মসামগ্রীর সম্পর্কও সমষ্টি সংসারের সঙ্গেই থাকে, নিজের সঙ্গে নয়। তাই কোনো কিছুই নিজের নয়। ব্যষ্টির জন্য সমষ্টি হতেই পারে না। মানুষ এই ভুল করে ফেলে যে তারা নিজেদের জন্য সমষ্টির ব্যবহার করতে চায়, তার জন্যই অশান্তি পায়। যদি সে তার শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, পদার্থ ইত্যাদি সমষ্টির জন্য ব্যবহার করে, তাহলে সে মহৎ শান্তি প্রাপ্ত হতে পারে। কর্মযোগে সিদ্ধ মহাপুরুষদের এক বিশেষত্ব

এই যে, তাঁদের নিজেদের বলে কথিত শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, পদার্থ ইত্যাদির ব্যবহার কেবল সংসারেরই জন্য হয়। সুতরাং তাঁদের শারীরিক ক্রিয়াদিতে নিজেদের কোনো প্রয়োজন থাকে না। প্রয়োজন না থাকলেও স্বাভাবিকভাবে তাঁদের দ্বারা জনগণের জন্য আদর্শস্বরূপ উত্তম কর্ম অনুষ্ঠিত হয়। যার কর্ম প্রয়োজনের তাগিদে সম্পাদিত হয় তার দ্বারা আদর্শ কর্ম হয় না—এটি সিদ্ধান্ত।

'নাকৃতেনেহ কশ্চন'—যে ব্যক্তি শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদিতে নিজের সম্পর্ক আছে বলে মনে করে এবং আলস্য, প্রমাদ ইত্যাদিতে আসক্তি নিয়ে থাকে, সে অপরের জন্য কর্ম করতে চায় না ; কারণ তার প্রয়োজন থাকে তামস-সুখের, যার উৎপত্তি হয় প্রমাদ, আলস্য এবং আরাম থেকে (গীতা ১৮।৩৯)। কিন্তু এইসব মহাপুরুষ, যাঁরা সাত্ত্বিক সুখেরও ঊর্ধ্বে অবস্থিত, তামস-সুখে তাঁদের প্রবৃত্তি কেন হবে ? শরীরাদির সঙ্গে তাঁদের বিন্দুমাত্র বন্ধন থাকে না, তাই তাঁদের আলস্য বা আরামে রুচি থাকার প্রশ্নই আসে না।

মর্মকথা

সাধকগণ প্রায়শঃ কর্ম না করার ওপরই গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তাঁরা কর্মে বিরত থেকে সমাধিতে স্থিত হতে চান, যাতে কোনো প্রকারের চিন্তাভাবনার অবকাশ না থাকে। এ অতি উত্তম এবং লাভপ্রদ বিষয়, কিন্তু এটি সিদ্ধান্ত নয়। যদিও প্রবৃত্তির (করার) থেকে নিবৃত্তি (না-করা) শ্রেষ্ঠ, তবুও এটি কোনো তত্ত্ব নয়।

প্রবৃত্তি (করা) এবং নিবৃত্তি (না-করা)—দুই-ই প্রকৃতির রাজ্যে অবস্থিত। নির্বিকল্প সমাধি পর্যন্ত সমস্তই প্রকৃতির রাজ্য, কারণ নির্বিকল্প সমাধি থেকেও ব্যুত্থান হয়। ক্রিয়ামাত্রই প্রকৃতির দ্বারা হয়—**'প্রকর্ষেণ করণং (ভাবে ল্যুট্) ইতি প্রকৃতিঃ'** এবং ক্রিয়া ছাড়া ব্যুত্থান হওয়া সম্ভব নয়। সেইজন্য চলা, বলা, দেখা, শোনা ইত্যাদির মতোই শোওয়া, বসা, দাঁড়ানো, মৌন থাকা, মূর্ছিত হওয়া এবং সমাধিস্থ হওয়াও ক্রিয়া[১]। বাস্তবিক তত্ত্বে (চেতন স্বরূপে) প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি—কোনোটিই নেই। এটি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির নির্লিপ্ত প্রকাশক মাত্র।

শরীরের সঙ্গে একাত্ম হলেই (শরীরকে ধরে) 'করা' এবং 'না-করা'—এই দুটি বিভাগ (দ্বন্দ্ব) হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে 'করা' বা 'না-করা' দুটি একই বিষয়। দেহের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে 'না-করা' প্রকৃতপক্ষে 'করা'ই হয়। যেমন **'গচ্ছতি'** (যাচ্ছে) হল ক্রিয়া, তেমনি **'তিষ্ঠতি'**ও (দাঁড়ানো) ক্রিয়া। যদিও স্থূল দৃষ্টিতে দেখলে **'গচ্ছতি'** তে ক্রিয়াটি দেখা যায় এবং **'তিষ্ঠতি'**তে ক্রিয়া দেখা যায় না। তবুও সূক্ষ্মভাবে দেখলে বোঝা যায় যে, যে শরীরে 'যাওয়া' ক্রিয়াটি ছিল তাতেই 'দাঁড়িয়ে থাকা'টিও একটি ক্রিয়া। সেইরূপই যে কোনো কাজ, তা 'করা'-ই হোক বা 'না-করা'—দুটিই ক্রিয়া। অতএব যেসব ক্রিয়া স্থূলভাবে দেখা প্রকৃতিতেই থাকে, সেইপ্রকার স্থূলদৃষ্টিতে না-দেখা ক্রিয়াও প্রকৃতিতেই থাকে। যাঁর প্রকৃতি বা তার কার্যাদিতে ভৌতিক, আধ্যাত্মিক এবং লৌকিক বা পারলৌকিক কোনোরূপ প্রয়োজন থাকে না, সেই মহাপুরুষের কর্ম করা বা না করাতে কোনো স্বার্থ থাকে না।

জড়ত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত হলে তবেই করা বা না করার প্রশ্ন আসে। কারণ জড়ের সম্পর্ক ছাড়া কোনো ক্রিয়া হতে পারে না। এরূপ মহাপুরুষের জড়ত্বের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্ক ছেদ হয়ে যায় এবং প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি—এই দুটির অতীত সহজ-নিবৃত্তি-তত্ত্বে নিজ স্বাভাবিক স্থিতি অনুভূত হয়। সুতরাং সাধকের জড়ত্ব (শরীরের অহংভাব এবং মমত্ব) থেকে সম্পর্ক ছেদ করার প্রয়োজন থাকে। তত্ত্ব সর্বদাই একরূপে বিরাজমান।

'ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ'—শরীর অথবা সংসারের সঙ্গে কোনোরূপ স্বার্থের সম্পর্ক না থাকায় মহাপুরুষদের সকল কার্যাদি স্বতঃই অপরের

---

[১]প্রকৃতি সর্বদা ক্রিয়াশীল, সুতরাং তার সঙ্গে সম্পর্কিত কোনো প্রাণী কোনো অবস্থাতে ক্ষণমাত্রও কর্ম বিনা থাকতে পারে না (গীতা ৩।৫ ; ১৮।১১)। সুতরাং যতক্ষণ প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত থাকা হয় ততক্ষণ সমাধিও কর্মরূপেই বিবেচিত হয়, যাতে সমাধি এবং ব্যুত্থান—এই দুই অবস্থা হয়। কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হলে আর এই দুই অবস্থা হয় না, বরং 'সহজ সমাধি' বা 'সহজাবস্থা' হয়, যার থেকে কখনো ব্যুত্থান হয় না। কারণ অবস্থান্তর প্রকৃতিতেই ঘটে, স্বরূপে নয়। তাই সহজাবস্থাকে সর্বাপেক্ষা উত্তম অবস্থা বলা হয়েছে।

উত্তমা সহজাবস্থা মধ্যমা ধ্যানধারণা। কনিষ্ঠা শাস্ত্রচিন্তা চ তীর্থযাত্রাঽধমাঽধমা॥

হিতার্থে হয়ে থাকে। শরীরের সকল অঙ্গ যেমন স্বতঃ শরীরের হিতার্থে নিয়োজিত থাকে, তেমনি মহাপুরুষদের নিজের বলে যে শরীর (যেটি জগতের একটি ছোট্ট অঙ্গ) তা স্বতঃই জগতের হিতে নিয়োজিত হয়ে থাকে। তাদের সমস্ত ভাব এবং কর্মপ্রচেষ্টা জগতের হিতার্থেই হয়ে থাকে। নিজের হাতে নিজের মুখ প্রক্ষালনে যেমন কোনো স্বার্থ, প্রত্যুপকার বা অভিমানের ভাব থাকে না, তেমনি তাঁদের শরীর দ্বারা জগতের হিতসাধন হলেও মহাপুরুষদের মধ্যে কিছুমাত্র স্বার্থ, প্রত্যুপকার বা অভিমানের ভাব আসে না।

আগের শ্লোকে ভগবান সিদ্ধ মহাপুরুষদের সম্পর্কে বলেছিলেন যে, তাঁদের কোনো কর্তব্য থাকে না—**'তস্য কার্যং ন বিদ্যতে'**। তার কারণ জানাতে গিয়ে ভগবান ওই মহাপুরুষদের উদ্দেশ্যে এই শ্লোকে তিনটি কথা বলেছেন—(১) তাঁদের কর্ম করার কোনো প্রয়োজন থাকে না। (২) তাঁদের কর্ম না করারও কোনো প্রয়োজন থাকে না এবং (৩) কোনো প্রাণী বা পদার্থের সঙ্গে তাঁদের বিন্দুমাত্র স্বার্থের সম্পর্ক অর্থাৎ কিছু পাবার প্রয়োজনও থাকে না।

প্রকৃতপক্ষে স্বরূপের করা বা না-করার কোনো প্রয়োজন নেই এবং কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর সঙ্গেও কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ শুদ্ধ স্বরূপ দ্বারা কোনো ক্রিয়া সংঘটিত হয় না। যে কোনো ক্রিয়া সংঘটিত হয় প্রকৃতি বা প্রকৃতিজনিত পদার্থগুলির সম্পর্ক থেকে, সেইজন্য স্বরূপের করা বলে কিছু নেই।

যতক্ষণ মানুষের মধ্যে কিছু করার আকাঙ্ক্ষা, পাবার ইচ্ছা, বাঁচার আশা এবং মরার ভয় থাকে, ততক্ষণ তার ওপর কর্তব্যের দায়িত্ব থাকে। কিন্তু যাঁর মধ্যে কিছু করা বা না করার কোনো আকাঙ্ক্ষা থাকে না, জগৎ হতে কোনো কিছু পাওয়ার ইচ্ছা থাকে না, প্রাণরক্ষার জন্য ব্যস্ততা বা মৃত্যুভয় থাকে না, তাঁকে কোনো কর্তব্য করতে হয় না। কিন্তু তাঁর দ্বারা স্বতঃই কর্তব্যকর্ম হতে থাকে। যেখানে অ-কর্তব্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেখানেই প্রেরণা থাকে কর্তব্য পালন করার।

বিশেষ কথা

গীতায় ভগবানের বলার এমনই শৈলী যে, তিনি বিভিন্ন সাধনমার্গের দ্বারা পরমাত্মামুখি সাধকদের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ অনুযায়ী পরমাত্মাপ্রাপ্তকারী সিদ্ধ মহাপুরুষদের লক্ষণগুলি বর্ণনা করেছেন। এখানে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শ্লোক দুটিতেও এইরূপ রীতি প্রযুক্ত হয়েছে।

যে সাধনা যে স্থান থেকে শুরু হয়, তার সমাপ্তিও সেইস্থানেই হয়। যদিও গীতায় কর্মযোগের প্রকরণ আরম্ভ হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ের উনচল্লিশতম শ্লোক থেকে, তবুও কর্মযোগের মূল সাধনার বিচার-বিবেচনা দ্বিতীয় অধ্যায়ের সাতচল্লিশতম শ্লোকে করা হয়েছে। ওই শ্লোকের চারটি পংক্তিতে বলা হয়েছে—

১) **কর্মণ্যেবাধিকারস্তে** (কর্মেই তোমার অধিকার)।

২) **মা ফলেষু কদাচন** (কর্মফলে তোমার কখনো অধিকার নেই)।

৩) **মা কর্মফলহেতুর্ভূঃ** (তুমি কর্মফলের হেতু হয়ো না)।

৪) **মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি** (কর্ম ত্যাগেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়)।

এই শ্লোকটিতেও (৩।১৮) উপরিউক্ত সাধনার সিদ্ধির কথাই আছে। এখানে (২।৪৭) দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পংক্তিতে সাধকদের যে কথা বলা হয়েছে, এই শ্লোকের উত্তরার্ধে সিদ্ধ মহাপুরুষদের প্রসঙ্গেও সেটি বলা হয়েছে, যে তাঁদের কোনো প্রাণী বা পদার্থের সঙ্গে কোনোরূপ স্বার্থের সম্পর্ক থাকে না। সেখানে প্রথম এবং চতুর্থ পংক্তিতে সাধকদের জন্য যে কথা বলা হয়েছে, সেই কথাই এই শ্লোকের পূর্বার্ধে সিদ্ধ মহাপুরুষদের জন্য বলা হয়েছে যে, তাঁদের কর্ম করা বা না করা—দুইয়েতেই কোনো প্রয়োজন থাকে না। এইভাবে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শ্লোকে 'কর্মযোগ' দ্বারা সিদ্ধ মহাপুরুষদের লক্ষণগুলি বর্ণিত হয়েছে।

কর্মযোগ সাধনের দৃষ্টিতে দেখলে প্রকৃতপক্ষে অষ্টাদশ শ্লোকটি আগে অর্থাৎ সপ্তদশ শ্লোকটি তার পরে আসা উচিত ছিল। কারণ কর্মযোগে সিদ্ধ মহাপুরুষের যখন কর্ম করা বা না করায় কোনো প্রয়োজন থাকে না এবং কোনো প্রাণী বা পদার্থের সঙ্গে তাঁর কোনোরূপ স্বার্থের সম্পর্ক থাকে না, তখন তাঁর অনুরাগ, তৃপ্তি এবং সন্তুষ্টি নিজের মধ্যেই হয়ে থাকে। কিন্তু ষোড়শ শ্লোকে ভগবান **'মোঘং পার্থ স জীবতি'** পদটির দ্বারা কর্তব্যে অবহেলাকারী ব্যক্তির বেঁচে থাকা অর্থহীন বলে জানিয়েছেন। সুতরাং সপ্তদশ শ্লোকে **'যঃ তু'** পদটি দিয়ে এই কথা জানাচ্ছেন যে, সিদ্ধ মহাপুরুষ যদি কর্তব্যকর্ম নাও করেন

তবুও তাঁর বেঁচে থাকা অর্থহীন হয় না বরং মহাসার্থক হয়। কারণ মনুষ্য-জন্মের উদ্দেশ্য তিনি সম্পূর্ণ করেছেন। সুতরাং তাঁর কোনো কাজ আর অসমাপ্ত থাকে না।

যে স্থিতিতে অবস্থান করলে কোনো কর্তব্য অসমাপ্ত থাকে না, অতি সাধারণ ব্যক্তিও যে কোনো অবস্থাতে তৎপরতা এবং আগ্রহ সহকারে নিষ্কামভাবে কর্তব্যকর্ম করলে তা প্রাপ্ত হতে পারে কারণ সেই স্থিতি লাভ করাতে সকলেই অধিকারী এবং স্বাধীন। প্রত্যেক পরিস্থিতির সঙ্গেই কর্তব্যের সম্পর্ক আছে। তাই প্রত্যেক পরিস্থিতিতেই কর্তব্য নিহিত থাকে। মানুষ সুখের লালসাতেই কর্তব্য বিস্মৃত হয়। যদি সে নিঃস্বার্থভাবে অপরের সেবা করে নিজ সুখ-লালসা দূর করে, তাহলে সে জীবনের সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্তি পায় ও পরমশান্তি লাভ করতে সক্ষম হয়। এই পরমশান্তি লাভ করায় সকলের সমান অধিকার। জগতের সমস্ত পদার্থ, পদ ইত্যাদি সবার পক্ষে সমানভাবে পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু পরমশান্তি সকলেরই সমানভাবে প্রাপ্তি হতে পারে।

পরিশিষ্ট-ভাব— জগতে 'করা' আর 'না-করা'— দুটি পরস্পরের আপেক্ষিক। তাই 'আমি কিছু করব না'— এটিও 'করা'ই। কিন্তু পরমাত্মতত্ত্বে 'না-করা' নিরপেক্ষ, স্বাভাবিক। কারণ চিন্ময় সত্তার ক্রিয়া করা বা না-করা, কোনোটির সঙ্গেই সম্পর্ক থাকে না। তাই পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত কর্মযোগী মহাপুরুষের কোনো বস্তু, ব্যক্তি বা ক্রিয়া, কোনোকিছুর সঙ্গেই কোনো সম্পর্ক থাকে না—**'যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে'** (গীতা ১৪।২৩)। তাঁর দৃষ্টিতে একমাত্র চিন্ময় সত্তা ব্যতীত আর কিছুই থাকে না।

* * *

সম্বন্ধ—পূর্বের দুটি শ্লোকে বর্ণিত মহাপুরুষদের স্থিতিলাভ করার জন্য সাধকদের কী করা উচিত—পরবর্তী শ্লোকে ভগবান সেই সাধন প্রণালী জানাচ্ছেন।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ॥ ১৯ ॥

[**তস্মাৎ** (অতএব) ; **সততম্** (সর্বদা) ; **অসক্তঃ** (আসক্তিশূন্য) ; **কার্যম্ কর্ম** (কর্তব্যকর্ম) ; **সমাচর** (ঠিকভাবে পালন করো) ; **হি** (কারণ) ; **অসক্তঃ** (অনাসক্ত) ; **কর্ম** (কর্ম) ; **আচরন্** (করলে) ; **পূরুষঃ** (মানুষ) ; **পরম্** (পরমাত্মা) ; **আপ্নোতি** (লাভ করে।)]

অতএব তুমি সর্বদা আসক্তিশূন্য হয়ে যথাযথভাবে কর্তব্যকর্ম পালন করো। কারণ অনাসক্ত হয়ে কর্ম করলে মানুষ পরমাত্মাকে (মোক্ষ) লাভ করে ॥ ১৯ ॥

ব্যাখ্যা—'তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর' আগের শ্লোকটির সঙ্গে এই শ্লোকের সম্পর্ক জানাবার জন্যই এখানে **'তস্মাৎ'** পদটি প্রযুক্ত হয়েছে। আগের শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে সিদ্ধ মহাপুরুষদের নিজেদের জন্য কোনো কর্ম করার কোনো প্রয়োজন না থাকলেও লোকসংগ্রহের উদ্দেশ্যে তাঁদের দ্বারা কর্ম সংঘটিত হয়। সেইজন্য অর্জুনকেও নিষ্কামভাবে কর্তব্যকর্মের দ্বারা পরমাত্মা লাভ করার নির্দেশ দেবার জন্যই ভগবান এইস্থানে **'তস্মাৎ'** পদটি প্রয়োগ করেছেন। কারণ নিজ স্বরূপ—**'স্ব'**-এর জন্য কর্ম করা বা না-করা কোনোটিরই প্রয়োজন নেই। কর্ম সর্বদাই **'পরের'** (অন্যের) জন্য হয়, **'স্ব'**-এর জন্য নয়। সুতরাং অন্যের জন্য কর্ম করলে কর্ম করার আসক্তি দূর হয় এবং স্বরূপে স্থিতি লাভ হয়।

নিজ স্বরূপ থেকে বিজাতীয় (জড়) পদার্থের প্রতি আকর্ষণকেই বলা হয় 'আসক্তি'। আসক্তিশূন্য হওয়ার জন্য আসক্তির কারণ জানা প্রয়োজন। 'আমি শরীর' এবং 'শরীর আমার'—এরূপ মনে করলে শরীর ইত্যাদি বিনাশী পদার্থগুলির গুরুত্ব হৃদয়ে ছাপ ফেলে। সেইজন্যই ওসব পদার্থে আসক্তি আসে।

আসক্তিই পতন ঘটায়, কর্ম নয়। আসক্তির জন্যই মানুষ শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি জড় পদার্থের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করে নিজের আরাম ও সুখভোগের জন্য বিভিন্ন প্রকারের কর্ম করে। এইরূপ জড়ত্বের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্বন্ধই মানুষের বারংবার জন্ম-মৃত্যুর কারণ

হয়—**'কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু'** (গীতা ১৩।২১)। আসক্তিশূন্য হয়ে কর্ম করলে জড়ত্ব হতে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

জগৎ হতে প্রাপ্ত সামগ্রী (শরীরাদি) দ্বারা আমরা আজ পর্যন্ত কেবলমাত্র নিজেদের জন্যই কর্ম করেছি। সেইগুলি নিজেদের সুখভোগ এবং সম্পদ সংগ্রহের কাজে লাগিয়েছি। সেইজন্য আমরা এই জগতের ঋণে আবদ্ধ । সেই ঋণ শোধ করার জন্য শুধুমাত্র জগতের হিতার্থে কর্ম করা অত্যন্ত আবশ্যক। নিজের জন্য (ফলের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে) কর্ম করায় পুরাতন ঋণ শোধ তো হয়ই না, উপরন্তু নতুন ঋণের উৎপত্তি হয়ে যায়। ঋণমুক্ত হবার জন্য আমাদের বারংবার জন্মগ্রহণ করতে হয়। শুধুমাত্র অপরের হিতার্থে সমস্ত কর্ম করলে পুরোনো ঋণ শোধ হয়ে যায় এবং নিজের জন্য কিছু না করলে বা কিছু আশা না করলে নতুন ঋণ উৎপন্ন হয় না। এইভাবে পুরোনো ঋণ যখন শেষ হয় এবং নতুন ঋণ উৎপন্ন হয় না, তখন আবদ্ধ হওয়ার কোনো কারণ না থাকায় মানুষ স্বতঃই মুক্ত হয়ে যায়।

কোনো কর্মই চিরকালের জন্য স্থায়ী হয় না, কিন্তু (হৃদয়ে) আসক্তি চিরকাল থেকে যায়, সেইজন্য ভগবান **'সততম্ অসক্ত'** পদের দ্বারা চিরদিনের মতো আসক্তিশূন্য হতে বলেছেন। সাধকের মনে এরূপ কথা চিরকাল জাগরূক থাকা প্রয়োজন যে—'আমার কখনো আসক্ত হওয়া উচিত নয়।' সবসময় আসক্তিশূন্য থেকে, যে বিহিত কর্ম সামনে আসে, কর্তব্য মনে করে তা করে ফেলা উচিত—উপরিউক্ত পদটির এই হল ভাবার্থ।

প্রকৃতপক্ষে কারো অন্তরেই আসক্তি চিরস্থায়ী হয় না। জগৎ-সংসারই যখন চিরস্থায়ী নয়, প্রতিমুহূর্তে তার পরিবর্তন হচ্ছে, তখন আসক্তি কি করে চিরস্থায়ী হবে ? তা সত্ত্বেও মেনে নেওয়া 'অহং'-এর সঙ্গে আসক্তি চিরস্থায়ী বলে ধারণা হয়।

'কার্যম্' অর্থাৎ কর্তব্য তাকেই বলে, যা করা যায় এবং যা অবশ্যই করণীয়। অন্য ভাষায়, কর্তব্যের অর্থ হল—নিজ স্বার্থ ত্যাগ করে অন্যের হিতসাধন। যথাসাধ্য অপরের শাস্ত্রবিহিত ন্যায়সংগত চাহিদা পূরণ রূপ কর্তব্যপালনের তাৎপর্য হল অপরের হিতসাধন করা।

কর্তব্যপালনে সকলেই স্বতন্ত্র এবং সমর্থ, কেউই পরাধীন বা অসমর্থ নয়। তবে প্রমাদ অথবা আলস্যবশতঃ অকরণীয় কাজ করার মন্দ অভ্যাস হলে বা ফলের ইচ্ছা থাকলেই কর্তব্যপালন কঠিন বলে মনে হয়, নতুবা কর্তব্য পালনের মতো সহজ আর কিছুই নেই। পরিস্থিতি অনুযায়ী কর্তব্যের সঙ্গে সম্পর্ক হয়। মানুষ যে কোনো পরিস্থিতিতে স্বাধীনভাবে কর্তব্যপালনে সক্ষম। কর্তব্যপালন দ্বারাই আসক্তি দূর হয়। অকরণীয় কাজ করলে বা কর্তব্যপালন না করলে আসক্তি আরও বেড়ে যায়। কর্তব্য অর্থাৎ অন্যের হিতার্থে কর্ম করলে বর্তমানের আসক্তি এবং কিছু আকাঙ্ক্ষা না থাকলে ভবিষ্যতের আসক্তিও দূর হয়।

'সমাচর' পদটির অর্থ এই যে, অত্যন্ত সাবধানতা সহকারে, উৎসাহ এবং তৎপরতার সঙ্গে বিধিপূর্বক কর্তব্যকর্ম করা উচিত। কর্তব্যপালনে একটুও অসাবধান হলে কর্মযোগের সিদ্ধিতে বাধা আসতে পারে।

বর্ণ, আশ্রম, প্রকৃতি (স্বভাব) এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী যে ব্যক্তির জন্য যে শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য করার কথা বলা হয়েছে, যথোপযুক্ত পরিস্থিতিতে সেটিই তার পক্ষে স্বাভাবিক বা 'সহজ কর্ম'। সহজ কর্মে যদি কোনো দোষ দেখা যায়, তাহলেও সেটি পরিত্যাগ করা উচিত নয় (গীতা ১৮।৪৮)। কারণ সহজ কর্ম করলে মানুষের পাপ হয় না (গীতা ১৮।৪৭)। সেইজন্যই ভগবান এইস্থানে অর্জুনকে বলছিলেন যে, 'তুমি ক্ষত্রিয় ; অতএব যুদ্ধ করা (নিষ্ঠুর মনে হলেও) তোমার পক্ষে সহজ কর্ম ; নিষ্ঠুর কর্ম নয়। সুতরাং তোমার সম্মুখে উপস্থিত যে সহজ কর্ম, অনাসক্ত হয়ে সেটি তোমার করা উচিত। অনাসক্ত হলেই সমতা প্রাপ্ত হওয়া যায়।'

বিশেষ কথা

জীব যখন মনুষ্য-জন্ম গ্রহণ করে, তখন সে শরীর, অর্থ, জমি, বাড়ি ইত্যাদি সমস্ত সামগ্রী পেয়ে থাকে ; কিন্তু যখন ইহলোক ত্যাগ করে তখন এই সবই পরিত্যক্ত হয়। এই সহজ কথায় এটি স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে শরীর ইত্যাদি সমস্ত সামগ্রীই আমরা বাইরে থেকে প্রাপ্ত হই, কোনোটিই আমাদের নিজস্ব নয়। যেমন মানুষ কাজ করার জন্য কোনো অফিসে গেলে সে চেয়ার, টেবিল, কাগজ ইত্যাদি সমস্ত সামগ্রী অফিসের কাজের জন্য পায় ; এর কোনোটিই নিজের মনে করে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য নয়। তেমনি জগতে শরীরাদি সমস্ত সামগ্রী জগতের কাজের (সেবার) জন্যই পাওয়া, নিজের জন্য নয়। মানুষ তৎপরতা এবং উৎসাহের সঙ্গে অফিসের কাজ করলে তার বিনিময়ে সে বেতন পায়। কাজটি অফিসের জন্য করা

হয় এবং বেতন নিজের জন্য পাওয়া যায়। একইভাবে জগতের জন্য সমস্ত কাজ করলে জগতের থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয় এবং যোগের (পরমাত্মার সঙ্গে নিজ নিত্য সম্বন্ধের) অনুভব হয়। 'কর্ম' ও 'যোগ' এই দুটি মিলে কর্মযোগ হয়। জগতের জন্য করা হয় কর্ম আর যোগ হয় নিজের জন্য। এই যোগই হল যেন বেতন।

সংসার সাধনার ক্ষেত্র। এখানকার প্রত্যেক সামগ্রী সাধনের জন্য, ভোগ বা সংগ্রহের জন্য নয়। জাগতিক বস্তু নিজস্ব বা নিজের জন্য নয়। নিজস্ব বস্তু—পরমাত্মতত্ত্ব। তা পাওয়া গেলে আর অন্য কোনো বস্তু পাবার আকাঙ্ক্ষা থাকে না (গীতা ৬।২২)। কিন্তু জাগতিক বস্তু যতই প্রাপ্ত হওয়া যাক তা পাবার আকাঙ্ক্ষা কখনো দূর হয় না বরং বেড়েই চলে।

মানুষ যখন প্রাপ্তবস্তুগুলি নিজের বলে মনে করে তখন এই ভ্রান্তির জন্য সে আবদ্ধ হয়ে যায়। এই ভ্রান্তি দূর করার জন্য কর্মযোগ অনুষ্ঠানই হল সহজ এবং শ্রেষ্ঠ উপায়। কর্মযোগী কোনো বস্তুকে নিজের জন্য মনে না করে অন্যের সেবায় (তাদেরই মনে করে) ব্যয় করেন। সেইজন্য তিনি সহজেই সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান।

সকল প্রাণীই কর্ম করে থাকে, কিন্তু সাধারণ প্রাণীর করা কর্ম এবং কর্মযোগীর করা কর্মের মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকে। সাধারণ মানুষ (কর্মী) কামনা, বাসনা, মমতা ইত্যাদি নিয়ে কর্ম করে থাকে এবং কর্মযোগী এই সমস্ত পরিত্যাগ করে কর্ম করেন। সাধারণ মানুষের কর্ম-প্রবাহ স্বার্থকেন্দ্রিক হয় এবং কর্মযোগীর কর্মপ্রবাহ জগৎমুখী হয়। তাই সাধারণ মানুষ আবদ্ধ হয় আর কর্মযোগী মুক্ত হন।

'অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম'—মানুষই তার কামনা-বাসনা দ্বারা জগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে, জগৎ নয়। সুতরাং মানুষের কর্তব্য হল জগতের হিতের জন্যই সমস্ত কর্ম করা এবং তার বিনিময়ে কোনো ফল আশা না করা। এইপ্রকার আসক্তিশূন্য হয়ে অর্থাৎ 'আমার কারো কাছে কিছু চাইবার নেই'—এইভাবে জগতের জন্য কর্ম করলে জগৎসংসার হতে স্বতঃই সম্পর্ক ছেদ হয়ে যায়।

কর্মযোগী জগতের সেবা করায় বর্তমানের সামগ্রী থেকে এবং কিছু আকাঙ্ক্ষা না থাকায় ভবিষ্যতের বস্তুসামগ্রী থেকে তাঁর (আসক্তিমূলক) সম্বন্ধ ত্যাগ হয়ে যায়।

মেলার সময় স্বেচ্ছাসেবকগণ তাদের কর্তব্য মনে করে সারাদিন যাত্রীদের সেবা করে, তার পরিবর্তে তারা কিছু চায় না। সেইজন্য রাত্রে ঘুমের সময় তাদের মনে লাভ-লোকসানের কোনো হিসাব থাকে না। কারণ তারা কিছু আশা করে সেবা করেনি। এইরূপ সেবার ভাব নিয়ে যে অন্যের জন্য সমস্ত কর্ম করে এবং কারো কাছ থেকে সম্মান, মর্যাদা ইত্যাদি কোনো কিছু আশা করে না, তার মনে জগৎসংসারের কোনো প্রভাব থাকে না, সে অতি সহজেই সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

কর্ম সকলেই করে, কিন্তু তখনই কর্মযোগ হয় যখন আসক্তিশূন্য হয়ে অন্যের জন্য কর্ম করা হয়। শাস্ত্রবিহিত কর্ম করলেই আসক্তি দূর হওয়া সম্ভব—**'ধর্ম তেঁ বিরতি'** (শ্রীরামচরিতমানস ৩।১৬।১)। শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম করলে আসক্তি কখনো দূর হয় না।

'পরমাপ্নোতি পূরুষঃ'—ত্রয়োদশ অধ্যায়ের চৌত্রিশতম শ্লোকে যেমন ভগবান **'পরম্'** পদ দ্বারা সাংখ্যযোগীর পরমাত্মাপ্রাপ্তির কথা বলেছিলেন, তেমনি এখানে **'পরম্'** পদ দ্বারা কর্মযোগীর পরমাত্মাপ্রাপ্তির কথা জানিয়েছেন। তাৎপর্য এই যে সাধক (রুচি, বিশ্বাস এবং যোগ্যতা অনুযায়ী) যে কোনো পথের পথিক হন—তা সে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ বা ভক্তিযোগ যাই হোক না কেন, তাঁর প্রাপ্তিযোগ্য বস্তু সেই এক পরমাত্মাই (গীতা ৫।৪-৫)। প্রাপ্তিযোগ্য তত্ত্ব তাই হতে পারে, যার প্রাপ্তিতে বিকল্প, সন্দেহ এবং নিরাশা (আশাহীনতা) না থাকে এবং যা সদা বিরাজমান, সর্বত্র বিরাজমান, সর্বকালে বিরাজমান, সকলের জন্য বিরাজমান, সকলের নিজস্ব এবং যে তত্ত্ব থেকে কেউ কখনো কোনো অবস্থায় কোনোভাবেই পৃথক হতে পারে না অর্থাৎ যিনি সর্বদা সকলের কাছে অভিন্নরূপে স্বতঃ প্রাপ্ত হয়েই আছেন।

প্রশ্ন—কর্ম করতে করতে কর্মযোগীর কর্তৃত্বাভিমান কীভাবে মেটা সম্ভব ? কর্তৃত্বাভিমান দূর না হলে তো পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব হওয়া সম্ভব নয় !

সমাধান—সাধারণ মানুষ সমস্ত কর্মই নিজের জন্য করে থাকে। নিজের জন্য কর্ম করলে তাতে কর্তৃত্বাভিমান থাকে। কর্মযোগী কোনো কর্ম নিজের জন্য করেন না। তিনি মনে করেন শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, পদার্থ, অর্থ ইত্যাদি যা কিছু বস্তু জগৎ থেকে পাওয়া গেছে তা সবই জগৎসংসারেরই জন্য নিজের নয়। যখনই তিনি সুযোগ

পান, তখনই তিনি প্রাপ্ত সমস্ত পদার্থ, সময়, সামর্থ্য ইত্যাদি জগতের সেবায় ব্যয় করেন এবং তিনি মনে করেন যে জগৎ-সংসারের জিনিসই তিনি সংসারের সেবায় ব্যয় করছেন অর্থাৎ সামগ্রী, সময়, সামর্থ্য ইত্যাদি সব তারই, যার সেবায় এগুলি ব্যয় করা হচ্ছে। এরূপ মনে করায় তাঁর আর কর্তৃত্বাভিমান থাকে না।

কর্তৃত্বের কারণ হল—ভোক্তৃত্ব। কর্মযোগী ভোগের আশা রেখে কর্ম করেন না। ভোগের আশা যারা রাখে তারা কর্মযোগী হয় না। নিজ হস্তে মুখ ধৌত করলে যেমন মনে হয় না যে 'আমি আমার কোনো উপকার করেছি', কারণ মানুষ হাত ও মুখ দুটিকেই আপন অঙ্গ বলে মনে করে, তেমনি কর্মযোগীও তাঁর শরীরকে জগৎ-সংসারের অঙ্গ বলে মনে করেন। সুতরাং অঙ্গ যদি অঙ্গেরই সেবা করে তবে তাতে কর্তৃত্বাভিমান কীসের ?

এই হল নিয়ম যে, মানুষ যে উদ্দেশ্য নিয়ে কর্মে প্রবৃত্ত হয়, কর্ম সমাপ্ত হলে তা সেই লক্ষ্যেই লীন হয়ে যায়। যেমন কোনো ব্যবসায়ী অর্থের উদ্দেশ্য নিয়ে যদি ব্যবসায় করে তাহলে দোকান বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে তার লক্ষ্য স্বতঃই অর্থের দিকে যায় এবং সে হিসাব দেখতে বসে। যেসব গ্রাহক তার কাছে এসেছিল, তারা কোন জাতি ইত্যাদির দিকে তার কোনো লক্ষ্য থাকে না। কারণ গ্রাহকদের জাতি-বিচারে তার কোনো প্রয়োজন নেই। জগতের উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষ যতই কর্মে তন্ময় হোক না কেন, তার জগৎ-সংসারের সঙ্গে কখনো ঐক্য হতে পারে না। কারণ প্রকৃতপক্ষে জগতের সঙ্গে তার ঐক্য নেই-ই। জগৎ-সংসার সর্বদা পরিবর্তনশীল, জড় পদার্থ, কিন্তু 'স্বয়ং' (স্বরূপ) চিরস্থায়ী এবং চেতনাসম্পন্ন। যাঁরা পরমাত্মাকে উদ্দেশ্য করে কর্ম করেন তাঁদের পরমাত্মার সঙ্গে মিলন ঘটে (সাধক তা অনুভব করুন বা নাই করুন)। কারণ 'স্বয়ং'-এর পরমাত্মার সঙ্গে স্বতঃসিদ্ধ (তত্ত্বগত) ঐক্য থাকে। এইভাবে কর্তা যখন 'কর্তব্য' হয়ে নিজ উদ্দেশ্যের (পরমাত্মতত্ত্বের) সঙ্গে এক হয়ে যায়, তখন আর কর্তৃত্বাভিমানের প্রশ্ন থাকে না।

কর্মযোগী যে উদ্দেশ্যে পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তির জন্য সকল কর্ম করেন তাতে (পরমাত্মতত্ত্বে) কর্তৃত্বাভিমান অথবা কর্তাভাব থাকে না। সুতরাং প্রত্যেক ক্রিয়ার প্রারম্ভে এবং শেষে ওই উদ্দেশ্যের সঙ্গে ঐক্য অনুভূত হওয়ায় কর্মযোগীর কর্তৃত্বাভিমান থাকতে পারে না।

প্রাণীমাত্রের কৃত প্রত্যেক কর্মেরই আরম্ভ এবং শেষ থাকে। কোনো কর্মই সবসময় ধরে হয় না। সুতরাং কারো কর্তৃত্বই চিরকাল থাকে না, কর্ম শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কর্তৃত্বও শেষ হয়ে যায়। কিন্তু মানুষ এই ভুল করে যে, সে যখন কোনো কর্ম করে, নিজেকে সে সেই কর্মের কর্তা বলে মনে তো করেই, যখন সে আর ওই কর্মটি করে না তখনও সে নিজেকে আগের মতো কর্তা বলেই ভাবতে থাকে। এইভাবে সর্বদা নিজেকে কর্তা বলে মনে করতে থাকায় তার কর্তৃত্বাভিমান দূর হয় না, বরং দৃঢ় হতে থাকে। যেমন, কোনো ব্যক্তি কোনো বিষয় ব্যাখ্যা করার সময় হয় বক্তা (ব্যাখ্যাকর্তা), কিন্তু অন্য সময়েও সে যদি নিজেকে বক্তা বলে মনে করে তাহলে তার কর্তৃত্বাভিমান দূর হয় না। নিজেকে সর্বক্ষণ ব্যাখ্যাকর্তা বলে মনে করলেই মনে এইভাবটি আসে যে, 'শ্রোতারা যেন আমার সেবা করে', 'আমাকে সম্মান করে', 'আমার প্রয়োজনগুলি মেটায়', এবং 'এই সাধারণ ব্যক্তিদের সঙ্গে কী করে আমি একত্রে অবস্থান করব', 'এই সাধারণ কাজ আমি কী করে করব ?' ইত্যাদি। এইরূপ ভাবনার দ্বারা তার ব্যাখ্যাকর্তারূপ কর্মের সঙ্গে সর্বদা সম্পর্ক বজায় থাকে। এর কারণ হল—ব্যাখ্যাকর্তারূপে তার ধন-মান-মর্যাদা-ভোগ-আরাম ইত্যাদি কোনো কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকা। নিজের জন্য যদি কিছু পাওয়ার চিন্তা না থাকে তাহলে কর্ম করা পর্যন্তই কর্তৃত্বভাব সীমিত থাকে এবং কর্ম সমাপ্ত হলেই সেটি তার উদ্দেশ্যে লীন হয়ে যায়।

যেমন, খাদ্যগ্রহণ করার সময়েই মানুষ নিজেকে ভোক্তা অর্থাৎ ভোজনকারী ব্যক্তি বলে মনে করে, ভোজন করার পরে আর করে না। তেমনই কর্মযোগীও ক্রিয়া করার সময়েই কেবল নিজেকে কর্তা বলে মনে করে, অন্য সময় করে না। যেমন, কোনো কর্মযোগী যদি ব্যাখ্যাকর্তা হন এবং সাধারণ ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁর সুখ্যাতিও থাকে, তথাপি কখনো কোথাও ব্যাখ্যা শোনার অবকাশ যদি ঘটে তাহলে তিনি সাধারণ লোকের সঙ্গে বসেও অত্যন্ত সহজভাবে ব্যাখ্যা শুনতে পারেন। সেইসময়ে তাঁর কোনো সম্মানের বা উচ্চ আসনেরও প্রয়োজন নেই। তখন তিনি নিজেকে একজন সাধারণ শ্রোতা হিসাবেই দেখেন, ব্যাখ্যাকর্তা হিসাবে নয়। কখনো ব্যাখ্যা করার কাজ শেষে

তাঁর কোনো ঘর পরিষ্কার করার দরকার হলে, সেই কাজও তিনি অতি তৎপরতার সঙ্গে করে থাকেন, যেমন তৎপরতায় তিনি ব্যাখ্যা করে থাকেন। তাঁর মনে কখনো এই চিন্তা আসে না যে, 'এত বড় ব্যাখ্যাকর্তা হয়ে আমি এই অতি তুচ্ছ ঘর-পরিষ্কার করার কাজ কী করে করব ? লোকেই বা কী বলবে ? আমার সম্মান তো মাটিতে মিশে যাবে' ইত্যাদি। তিনি ব্যাখ্যা করার সময় নিজেকে ব্যাখ্যাকর্তা, ব্যাখ্যা শোনার সময় শ্রোতা এবং ঘর পরিষ্কার করার সময় সাফাইকারী বলে মনে করেন। সুতরাং তাঁর কর্তৃত্বাভিমান সর্বক্ষণ থাকে না। যে বস্তু সর্বক্ষণ থাকে না, অবিরাম বদলায়, তা প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্ববান হয় না এবং তার সম্পর্কও চিরকাল থাকে না—এটি হল সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের দিকে দৃষ্টি গেলেই সাধকের প্রকৃত বিষয়ের (কর্তৃত্বাভিমানরহিত স্বরূপের) অনুভব হয়ে যায়।

কর্মযোগী সমস্ত ক্রিয়া সেইভাবে করে থাকেন, যেভাবে বিভিন্ন সাজে পাত্রপাত্রীরা নাটকে অভিনয় করে। যেমন নাটকে হরিশ্চন্দ্রের চরিত্রে অভিনয় করার সময়েই অভিনেতা হরিশ্চন্দ্রের মতো সাজে এবং নাটক শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার ওই ভূমিকা শেষ হয়। তেমনই কর্মযোগীর কর্তৃত্বভাবও নাটকের চরিত্রাভিনয়ের মতো নির্দিষ্ট ক্রিয়াটুকুর জন্যই সীমিত থাকে। নাটকের হরিশ্চন্দ্র যেমন হরিশ্চন্দ্রের সমস্ত ক্রিয়াগুলি ঠিকমতো করলেও বাস্তবে নিজেকে ওই ক্রিয়াগুলির কর্তা (অর্থাৎ প্রকৃত হরিশ্চন্দ্র) বলে মনে করে না, তেমনি কর্মযোগী শাস্ত্রবিহিত সকল কর্ম করলেও বাস্তবে নিজেকে ওই ক্রিয়ার কর্তা বলে মনে করেন না। কর্মযোগী শরীরাদি সকল বস্তুকেই নাটকের সাজ-এর মতো নিজস্ব বা নিজের জন্য না মনে করে সেগুলি (সংসারের মনে করে) সংসারের সেবায় ব্যয় করেন। সুতরাং কোনো অবস্থাতেই কর্মযোগীর মনে বিন্দুমাত্র কর্তৃত্বাভিমান থাকতে পারে না।

কর্মযোগী যেমন সর্বক্ষণ নিজেকে কর্তা বলে মনে করেন না, তেমনই মা-বাবা, স্ত্রী-পুত্র, দাদা-বৌদি ইত্যাদির সঙ্গেও নিজ সম্পর্ক সবসময় মানেন না। শুধুমাত্র সেবা করার সময়েই তাদের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে থাকেন। যেমন, পতি তার পত্নীর কাছেই পতি, তা সেই পত্নী যতই রূঢ়ভাষিণী, কুরূপা, কলহপরায়ণা হোক না কেন। তাঁকে পত্নীরূপে স্বীকার করে নিলে সেই পতি নিজ যোগ্যতা এবং সামর্থ্য অনুযায়ী পত্নীর ভরণপোষণ করতে বাধ্য। পতির কর্তব্য হল প্রয়োজনে পত্নীকে সৎ পরামর্শ দেওয়া তা সে মানুক বা না মানুক। কিন্তু সর্বসময় তার নিজেকে স্বামী ভাবার প্রয়োজন নেই। কারণ এই স্ত্রী যে আগের জন্মেও তারই স্ত্রী ছিল তার কি ঠিক আছে ? এবং মৃত্যুর পরেও যে সে তার স্ত্রীই থাকবে তারই বা কি নিশ্চয়তা আছে ? তাছাড়া বর্তমান সময়েও সে কারো মা, কারো কন্যা, কারো ভগিনী, কারো বা বৌদি এবং ননদ ইত্যাদি। সে তো সর্বদা কেবল স্ত্রী-ই নয়। এরূপ মনে করলে তার কাছ থেকে সুখ আদায়ের ইচ্ছা স্বতঃই দূর হয় এবং 'শুধুমাত্র ভরণপোষণ (সেবা) করার জন্যই সে পত্নী'—এই ধারণা দৃঢ় হয়। এইরূপ কর্মযোগী জগতে পিতা-পুত্র-পতি-ভাই ইত্যাদি রূপে যে সব আত্মজন পেয়েছেন, তাদের সঙ্গে যথাযথ সম্পর্ক বজায় রাখেন। অপরে তাদের কর্তব্য ঠিকমতো করছে কিনা, সেদিকে তিনি লক্ষ্য রাখেন না। নিজের মধ্যে কর্তৃত্বাভিমান হলেই অপরের কর্তব্যের দিকে লক্ষ্য যায় এবং অন্যের কর্তব্যে দৃষ্টি দিলেই মানুষ নিজের কর্তব্য হতে চ্যুত হয়। কারণ অন্যের কর্তব্য দেখা নিজের কর্তব্য নয়।

কর্মযোগী যেমন জগতের প্রাণীদের সঙ্গে নিজ সম্বন্ধ সবসময় মনে রাখেন না, তেমনি বর্ণ, আশ্রম, জাতি, সম্প্রদায়, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদির সঙ্গে সম্বন্ধও সবসময় মনে রাখেন না। যে বস্তু সর্বক্ষণ থাকে না তার অভাব হওয়া স্বাভাবিক। তাই কর্মযোগীর কর্তৃত্বাভিমান স্বাভাবিকভাবে দূর হয়।

মর্মকথা

যাঁর কর্তৃত্ব নেই অর্থাৎ যিনি সমস্ত কর্তৃত্বের অতীত সেই পরমাত্মার সঙ্গে প্রাণীমাত্রেরই ঐক্য স্বতঃসিদ্ধ। সাধকদের এই ভুলটি হয় যে তাঁরা এই বাস্তবিকতার দিকে লক্ষ্য রাখেন না।

যেমন দোলনা যত জোরেই চালানো হোক না কেন, প্রত্যেকবারই এটি সমতায় (সমস্থিতিতে) আসে অর্থাৎ যে স্থান হতে দোলনার রজ্জুটি বাঁধা হয়েছে, আগে পিছে দোলার সময় এটি প্রত্যেকবার সেইস্থানে আসে। তেমনি প্রত্যেকটি ক্রিয়ার পরে অক্রিয় অবস্থা (সমতা) আসেই। অন্য ভাষায়, প্রথম ক্রিয়াটির শেষে এবং দ্বিতীয় ক্রিয়াটির আরম্ভের মধ্যসময়ে এবং প্রত্যেক সংকল্প বা বিকল্পের

মধ্যেও সমতা থাকেই।

অপরপক্ষে, বাস্তবিকভাবে দেখতে গেলে বোঝা যায় যে দোলনা চলার সময় (অসম দেখালেও) সেটি সবসময় সমতাতেই থাকে অর্থাৎ এটি সামনে-পিছনে যাতায়াত করলেও সর্বক্ষণ (যেখান থেকে দোলনার দড়ি বাঁধা হয়েছে, তার) বরাবরই থাকে। এইরূপ জীবও প্রত্যেক ক্রিয়াতেই সমতায় স্থিত থাকে। তার ঐক্য সবসময় থাকে পরমাত্মার সঙ্গে। ক্রিয়াকালে তাকে সমতায় স্থিত না দেখালেও প্রকৃতপক্ষে সমতা থাকেই, কেউ যদি সেটিকে অনুভব করতে চায় তবে ক্রিয়া সমাপ্ত হলেই (সেই সমতা) অনুভূত হয়। যদি সাধক সবসময় এই ব্যাপারে সচেতন থাকেন তাহলে তাঁর এই সর্বক্ষণ স্থিত সমতা বা পরমাত্মার সঙ্গে নিজ ঐক্য অনুভূত হয়, যেখানে কর্তৃত্ব থাকে না।

এই মেনে নেওয়া কর্তৃত্বাভিমান দূর করার জন্য প্রতীতি এবং প্রাপ্তির পার্থক্য বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। যেটি দেখা যায় অথচ পাওয়া যায় না, তাকে বলা হয় 'প্রতীতি' এবং যেটি পাওয়া যায় অথচ দেখা যায় না, তাকে বলা হয় 'প্রাপ্ত'। যা দেখা এবং শোনা যায় সেই প্রতিক্ষণ পরিবর্তনশীল জগৎ হচ্ছে 'প্রতীতি', এবং সর্বত্র নিত্য পরিব্যাপ্ত পরমাত্মতত্ত্ব হল 'প্রাপ্ত'। পরমাত্মতত্ত্ব ব্রহ্ম থেকে পিপীলিকা পর্যন্ত সকলেই সমভাবে স্বতঃ প্রাপ্ত।

'ইদং' বোধে (অর্থাৎ 'এই দেখছি' বোধে) দেখা প্রতীতির প্রতিক্ষণ নাশ হচ্ছে। দৃশ্যমাত্রই প্রতিক্ষণ অদৃশ্য অর্থাৎ পরিবর্তিত হয়ে যায়। যার দ্বারা প্রতীত হয়, সেই ইন্দ্রিয়গুলি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদিও প্রতীতি মাত্র। নিত্য নিশ্চলরূপ যে স্বয়ং স্বরূপ তাঁর কোনো প্রতীতি হয় না। সদা সর্বত্র স্থিত পরমাত্মতত্ত্ব তো 'স্বয়ং'-এ নিত্যপ্রাপ্ত। সেইজন্য 'প্রতীতি' হচ্ছে অভাবরূপ এবং 'প্রাপ্ত' হল ভাবরূপ—**'নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ'** (গীতা ২।১৬)।

সকল পদার্থ এবং ক্রিয়াই হল 'প্রতীতি'। ক্রিয়ামাত্রই নিষ্ক্রিয়াতে লীন হয়। সমস্ত ক্রিয়ার আদি এবং অন্তে সহজ (স্বাভাবিক) নিষ্ক্রিয় তত্ত্ব বিদ্যমান থাকে। সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে—যা আদি এবং অন্তে থাকে তা মধ্যেও থাকে। সুতরাং ক্রিয়াকালেও অখণ্ড এবং সহজ নিষ্ক্রিয় তত্ত্ব যেমন ছিল তেমনই থাকে। এই সহজ নিষ্ক্রিয় তত্ত্ব (চেতনস্বরূপ অথবা পরমাত্মতত্ত্ব) নিষ্ক্রিয় এবং সক্রিয়—উভয় অবস্থাকেই প্রকাশিত করে অর্থাৎ এটি প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি (করা বা না করা) দুইয়েরই অতীত।

প্রতীতির (দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, ক্রিয়া ইত্যাদির) সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্বন্ধ অর্থাৎ আসক্তির জন্যই নিত্যপ্রাপ্ত পরমাত্মতত্ত্বের অনুভব হয় না। আসক্তি দূর হলেই নিত্যপ্রাপ্ত পরমাত্মতত্ত্বের অনুভব হয়। সুতরাং আসক্তিশূন্য হয়ে প্রতীতিকে (নিজের বলে যে শরীর এবং অন্য পদার্থগুলি) প্রতীতির (সংসারমাত্রের) সেবায় নিয়োগ করলে প্রতীতির (শরীরাদি পদার্থের) প্রবাহ প্রতীতির (সংসারের) দিকে হয় এবং স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্ত পরমাত্মতত্ত্ব অবশিষ্ট থাকে (অনুভূত হয়)।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—আসক্তিশূন্য হয়ে কর্ম করলে অর্থাৎ নিজের জন্য কোনো কর্ম না করে কি কেউ পরমাত্মাকে লাভ করতে পেরেছে ? পরবর্তী শ্লোকে ভগবান তার উত্তর দিচ্ছেন।

কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি॥ ২০ ॥

[**জনকাদয়ঃ** (রাজা জনকের মতো মহাপুরুষগণ) ; **কর্মণা, হি, এব** (কর্ম দ্বারাই) ; **সংসিদ্ধিম্** (পরমাসিদ্ধি) ; **আস্থিতাঃ** (লাভ করেছেন) ; **লোকসংগ্রহম্** (লোকসংগ্রহের দিকে) ; **সম্পশ্যন্** (দৃষ্টি রেখে) ; **অপি** (ও) ; **কর্তুম্** (কর্ম করা) ; **এব** (ই) ; **অর্হসি** (উচিত।)]

রাজা জনকের মতো মহাত্মাগণ কর্ম দ্বারাই পরম সিদ্ধি লাভ করেছেন। তাই লোকসংগ্রহের দিকে দৃষ্টি রেখে তোমারও নিষ্কামভাবে কর্ম করা উচিত ॥ ২০ ॥

ব্যাখ্যা—**'কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ'**—'আদি' পদটি 'আরম্ভ' তথা 'প্রকার' দুটিরই বাচক বলে মানা হয়। এখানে উদ্ধৃত 'আদি' পদটিকে যদি 'আরম্ভ'র বাচক মনে করা হয় তাহলে **'জনকাদয়ঃ'** পদটির অর্থ হয়—যার আদিতে (আরম্ভে) আছেন রাজা জনক অর্থাৎ রাজা জনক এবং তাঁর পরে হওয়া মহাপুরুষগণ। কিন্তু এখানে এই অর্থ ঠিকমতো মানা যায় না, কারণ জনক রাজার আগেও অনেক মহাপুরুষ কর্ম দ্বারা সিদ্ধিলাভ করেছিলেন ; যেমন সূর্য, বৈবস্বত মনু, রাজা ইক্ষ্বাকু প্রমুখ (গীতা ৪।১-২)। সুতরাং এখানে 'আদি' পদটিকে 'প্রকার'-এর বাচক মনে করাই উচিত, সেই অনুসারে **'জনকাদয়ঃ'** পদটির অর্থ হল—রাজা জনকের মতো গৃহস্থাশ্রমে থেকে নিষ্কামভাবে সমস্ত কর্ম করে পরমসিদ্ধিপ্রাপ্ত মহাপুরুষ—যাঁরা রাজা জনকের পূর্বে বা পরে (আজ পর্যন্ত) হয়েছেন।

কর্মযোগ এক অতি প্রাচীন যোগ, যার দ্বারা রাজা জনকের মতো অনেক মহাপুরুষ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়েছেন। সুতরাং বর্তমান সময়ে বা ভবিষ্যতেও যদি কেউ কর্মযোগের দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করতে চায় তাহলে তার উচিত, সে যেন কখনো প্রাকৃত বস্তুগুলিকে (শরীরাদিকে) নিজস্ব বা নিজের বলে মনে না করে। কারণ বাস্তবে এগুলি কারো নিজস্ব নয়, বরং জগৎ-সংসারের জন্যই। এই সত্যকে মেনে নিয়ে সংসার থেকে প্রাপ্ত বস্তুগুলি সংসারের সেবাতে ব্যয় করলে সহজেই সংসার থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে পরমাত্মপ্রাপ্তি ঘটে। সেইজন্য কর্মযোগ হল পরমাত্মপ্রাপ্তির সহজ, শ্রেষ্ঠ এবং স্বতন্ত্র সাধন—এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

এখানে **'কর্মণা এব'** পদটির আগের শ্লোকের **'অসক্তো হ্যাচরন্‌কর্ম'** পদের অর্থাৎ আসক্তিশূন্য হয়ে কর্ম করার সঙ্গে সম্বন্ধ আছে। কারণ আসক্তিরহিত হয়ে কর্ম করলেই মানুষ কর্মবন্ধন হতে মুক্ত হয়, শুধু কর্ম করলেই হয় না। শুধু কর্ম করলে প্রাণী আবদ্ধ হয়— **'কর্মণা বধ্যতে জন্তুঃ'** (মহাভারত, শান্তিপর্ব ২৪১।৭)।

গীতার রীতি হল যে ভগবান পূর্বশ্লোকে বর্ণিত বিষয়ের প্রধান অংশটি (যেটি সাধকের পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী) সংক্ষিপ্তরূপে পরের শ্লোকে পুনর্বার জানিয়ে দেন, যেমন আগের (উনিশতম) শ্লোকটিতে আসক্তিশূন্য হয়ে কর্ম করার নির্দেশ দিয়ে এই বিশতম শ্লোকে সেই কথাটিকেই সংক্ষেপে **'কর্মণা এব'** পদের দ্বারা জানাচ্ছেন। এইরূপই পরবর্তী দ্বাদশ অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে বর্ণিত বিষয়ের প্রধান কথাটি সপ্তম শ্লোকে সংক্ষিপ্তভাবে **'ময্যাবেশিতচেতসাম্‌'** (আমাতে চিত্ত প্রদানকারী ভক্ত) পদ দ্বারা পুনরায় জানালেন।

এইস্থানে ভগবান **'কর্মণা এব'**-এর স্থানে **'যোগেন এব'**ও বলতে পারতেন। কিন্তু অর্জুনের আগ্রহ ছিল কর্মকে স্বরূপতঃ ত্যাগ করা এবং আসক্তিশূন্য হয়ে কর্ম করার প্রসঙ্গ চলছে বলে **'কর্মণা এব'** পদের প্রয়োগ করা হয়েছে। সুতরাং এইস্থানে এই পদের তাৎপর্য হল আগের শ্লোক অনুযায়ী আসক্তিশূন্য হয়ে কৃত কর্মযোগ।

প্রকৃতপক্ষে জড় কর্ম দ্বারা চিন্ময় পরমাত্মার প্রাপ্তিলাভ হয় না। নিত্যপ্রাপ্ত পরমাত্মাকে অনুভব করার লক্ষ্যে কর্মসমূহ আসক্তিশূন্য হয়ে করলে প্রতিবন্ধকতাগুলি দূর হয়ে যায়। তখন সর্বব্যাপী পরিপূর্ণ পরমাত্মার স্বতঃই অনুভব হয়। এইভাবে পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব করার প্রতিবন্ধকতাগুলি দূর করার জন্য এইস্থানে কর্ম দ্বারা পরমসিদ্ধি (পরমাত্মতত্ত্বের) প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে।

পরমাত্মপ্রাপ্তি সম্পর্কিত মর্মকথা

মানুষ মনে করে সাংসারিক বস্তু প্রাপ্তির মতোই পরমাত্মাপ্রাপ্তিও কর্ম দ্বারা সম্ভব হয়। তারা মনে করে যে কোনো উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে গেলে যখন অনেক পরিশ্রম করতে হয়, তখন অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের নায়ক পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হতে গেলে তো আরও বেশি পরিশ্রম (তপস্যা, ব্রতাদি) করতে হবে। কিন্তু সাধকদের এটি মস্ত বড় ভুল।

কর্মের সঙ্গে মানুষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। সেইজন্য মনুষ্য-জন্মকে 'কর্মসঙ্গী' বা 'কর্মে আসক্তিসম্পন্ন' বলা হয়েছে—**'রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্মসঙ্গিষু জায়তে'** (গীতা ১৪।১৫)। এইজন্যই মানুষের কর্মে বিশেষ প্রবৃত্তি থাকে এবং সে কর্ম দ্বারাই তার অভীষ্ট বস্তু প্রাপ্ত করতে চায়। সে কর্ম সহযোগে ভাগ্যক্রমে সাংসারিক অভীষ্ট বস্তু প্রাপ্ত করেও থাকে ; যার ফলে তার দৃঢ় ধারণা হয় যে সমস্ত বস্তুই কর্ম দ্বারা লাভ হয়েছে এবং এভাবেই তা হতে পারে। পরমাত্মার বিষয়েও তার এই ধারণা থাকে এবং সে চেতন

পরমাত্মাকেও জড় কর্মের দ্বারা প্রাপ্ত করার জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কর্ম দ্বারা পরমাত্মাকে পাওয়া যায় না। এটি খুব গভীরভাবে বোঝা দরকার।

কর্ম দ্বারা বিনাশশীল বস্তু (জগৎসংসার) প্রাপ্ত হওয়া যায়, অবিনাশী বস্তু (পরমাত্মা) নয়। কারণ সমস্ত কর্মই এই বিনাশশীল বস্তু (শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন) দ্বারাই সংঘটিত হয়। কিন্তু পরমাত্মার প্রাপ্তি হয় এই বিনাশী পদার্থে সর্বতোভাবে আসক্তিশূন্য হলে তবেই।

সমস্ত কর্মেরই আরম্ভ এবং শেষ আছে, সেইজন্য কর্ম দ্বারা প্রাপ্ত বস্তুরও উৎপত্তি হয় এবং বিনাশও অবশ্যম্ভাবী। কর্ম দ্বারা সেই বস্তুই লাভ করা যায়, যেটি দেশ-কাল ইত্যাদির দৃষ্টিতে অলভ্য। সংসারের বস্তুসমূহ এক দেশ, কাল ইত্যাদিতে অবস্থানকারী, উৎপন্ন যা বিনাশশীল এবং সর্বক্ষণ পরিবর্তনশীল। সুতরাং কর্ম দ্বারা এগুলি প্রাপ্ত করা সম্ভব। অপরপক্ষে পরমাত্মা সমস্ত দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদিতে পরিব্যাপ্ত (নিত্যপ্রাপ্ত)[১] এবং সর্বতোভাবে উৎপত্তি বা বিনাশরহিত এবং পরিবর্তনরহিত। সুতরাং তাঁর প্রাপ্তি কর্ম দ্বারা সম্ভব নয়, তা স্বতঃসিদ্ধ। এই কারণেই সাংসারিক পদার্থ চিন্তার দ্বারা প্রাপ্ত করা যায় না, আর পরমাত্মার প্রাপ্তিলাভে চিন্তাই মুখ্য বিষয়। চিন্তার দ্বারা সেই বস্তুই পাওয়া সম্ভব যা তার অতিশয় সন্নিকটে রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মার প্রাপ্তি চিন্তারূপ ক্রিয়া দ্বারাও সম্ভব নয়। তাঁর (পরমাত্মার) চিন্তার তাৎপর্য হল অন্য (সাংসারিক) চিন্তা ত্যাগ করানোয়। সাংসারিক চিন্তা সর্বতোভাবে দূর হলেই পরমাত্মার অনুভব হয়ে যায়।

আমাদের থেকে সর্বত্রব্যাপ্ত পরমাত্মার কোনো দূরত্ব নেই এবং তা থাকা সম্ভবও নয়। যাকে আমরা আমাদের থেকে দূরের বলে মনে করি না, সেই 'আমি' ভাবের থেকেও পরমাত্মা আমাদের অধিকতর নিকটে। 'আমি' ভাব তো পরিচ্ছিন্ন (একদেশীয়), কিন্তু পরমাত্মা কোনোভাবেই পরিচ্ছিন্ন নন। এরূপ যে পরমাত্মা আমাদের অত্যন্ত নিকটস্থ, নিত্যপ্রাপ্ত, তাঁকে অনুভব করার জন্য জাগতিক বস্তুপ্রাপ্তির তুল্য তর্ক এবং যুক্তি উত্থাপন করার অর্থ নিজেকে নিজেই প্রবঞ্চনা করা।

জাগতিক বস্তুর ইচ্ছামাত্রই প্রাপ্তি হয় না। কিন্তু পরমাত্মার প্রাপ্তি তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকলেই হয়ে যায়। এই তীব্র বাসনা জাগ্রত হওয়ায় জাগতিক ভোগ এবং সংগ্রহেচ্ছাই বাধা, অন্য কোনো বাধা এতে নেই। পরমাত্মাপ্রাপ্তির জন্য তীব্র তথা একাগ্র বাসনা যদি এখনই জাগ্রত হয়, তাহলে এই মুহূর্তেই পরমাত্মা অনুভূত হন।

কর্ম করা এবং তার ফল ভোগ করাই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য নয়। সাংসারিক ভোগবাসনা এবং সম্পদ সংগ্রহের ইচ্ছা ত্যাগপূর্বক পরমাত্মা প্রাপ্তির একান্ত আগ্রহ তখনই হওয়া সম্ভব যখন সাধকের সারাজীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয় পরমাত্মাকে লাভ করা। অর্থাৎ পরমাত্মাকে লাভ করা ছাড়া অন্য কোনো কার্যের কোনোরূপ গুরুত্ব না থাকে। প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মপ্রাপ্তি ভিন্ন মনুষ্যজীবনের দ্বিতীয় কোনো উদ্দেশ্য নেই। শুধু প্রয়োজন হল উদ্দেশ্যটি জানা এবং তাকে সম্পূর্ণ করাই হচ্ছে জীবনের লক্ষ্য।

এখানে উদ্দেশ্য এবং ফলেচ্ছা—দুটির পার্থক্যটি জেনে নেওয়া দরকার। 'উদ্দেশ্য' হল নিত্য পরমাত্মতত্ত্বকে প্রাপ্ত করা এবং 'ফলেচ্ছা' হল অনিত্য (উৎপত্তি-বিনাশশীল) বস্তু প্রাপ্তি নিয়ে। উদ্দেশ্য পূরণ হয় কিন্তু ফলেচ্ছা বিনাশশীল। স্বরূপবোধ এবং ভগবৎপ্রাপ্তি—এই দুটিই হল উদ্দেশ্য, ফল নয়। উদ্দেশ্যপ্রাপ্তির জন্য কৃতকর্মকে সকাম বলা হয় না। সেইজন্য নিষ্কাম পুরুষের (কর্মযোগীর) সমস্ত কর্মই উদ্দেশ্যের জন্য হয়, ফলেচ্ছার জন্য নয়।

কর্মযোগে কর্ম (জড়ত্বের) থেকে সম্পর্ক ছেদ করার উদ্দেশ্য নিয়ে শাস্ত্রবিহিত শুভকর্ম করা হয়। সকাম ব্যক্তি ফলের ইচ্ছা নিয়ে নিজের জন্য কর্ম করে এবং কর্মযোগী ফলের ইচ্ছা ত্যাগ করে অপরের জন্য কর্ম (সেবা) করেন। কর্মই ফলরূপে পরিণত হয়, সুতরাং কর্মের সঙ্গেই ফলের সম্বন্ধ হয়। কিন্তু উদ্দেশ্য কর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। অপরের হিতার্থে নিষ্কামভাবে কর্ম করলে 'পরমাত্মা দূরে আছেন' এই ধারণা দূরীভূত হয়।

'লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যান্ কর্তুমর্হসি'—'লোক' শব্দটির তিনটি অর্থ হয়—১) 'মনুষ্যলোক' প্রভৃতি লোক (স্থান), (২) ওই লোকে অবস্থানকারী প্রাণী, এবং (৩) শাস্ত্র (বেদ ছাড়া অন্য সব শাস্ত্র)। মনুষ্যলোকের তথা তাতে অবস্থানকারী প্রাণীদের এবং শাস্ত্রাদির মর্যাদা

[১]দেস কাল দিসি বিদিসিহু মাহীঁ। কহহু সো কহাঁ জহাঁ প্রভু নাহীঁ॥ (শ্রীরামচরিতমানস ১।১৮৫।৩)

অনুসারে হওয়া সমস্ত আচরণগুলিকেই (জীবনচর্যাকেই) লোকসংগ্রহ বলা হয়।

লোকসংগ্রহের তাৎপর্য হল—লোকমর্যাদা সুরক্ষিত রাখার উদ্দেশ্যে, সাধারণ ব্যক্তিদের অসৎ পথ থেকে বিমুখ করে সৎ-এর অনুগামী করার জন্য নিঃস্বার্থভাবে কর্ম করা। গীতায় এটি 'যজ্ঞার্থ কর্ম' বলেও অভিহিত। নিজ আচরণ এবং বাক্যের দ্বারা সাধারণ লোককে অসৎ পথ হতে বিমুখ করে সৎ পথের অনুগামী করা অত্যন্ত মহৎ সেবা। কারণ সৎ-এর অনুগামী হলে লোকে মার্জিত হয়ে যায় এবং উদ্ধার হয়ে যায়।

লোককে শুধুমাত্র দেখাবার জন্য নিজ কর্তব্যপালন করলে তা লোকসংগ্রহ হয় না। কেউ দেখুক বা না দেখুক লোকমর্যাদা অনুযায়ী নিজ-নিজ (বর্ণ-আশ্রম-সম্প্রদায় ইত্যাদি অনুসারে) কর্তব্যপালন করলে স্বাভাবিকভাবে লোকসংগ্রহ হয়।

কোনো কর্তব্যই ছোট বা বড় হয় না। তুচ্ছতম এবং শ্রেষ্ঠ কর্মকেও কেবল কর্তব্য মনে করে (সেবা ভাবে) করলে তা সমানই হয়। দেশ-কাল-পরিস্থিতি-অবসর-বর্ণ-আশ্রম-সম্প্রদায় ইত্যাদি অনুসারে যা কর্তব্যকর্ম রূপে সম্মুখীন হয়, সেই কর্মই শ্রেষ্ঠ। কর্মকে স্বরূপ এবং ফলের দৃষ্টিতে ছোট বা বড়, নিষ্ঠুর বা সৌম্য বলে ধারণা হয়[১]। ফলেচ্ছা ত্যাগ করলে সকল কর্মই উদ্দেশ্যসিদ্ধকারী হয়ে যায়। সুতরাং জড়ত্বের থেকে সম্পর্ক-বিচ্যুত করায় ছোট বা বড় সকল কর্মই সমান হয়ে থাকে।

কোনো ব্যক্তির জীবন অন্যের সহায়তা ভিন্ন চলতে পারে না। মাতা-পিতার নিকট হতে শরীরপ্রাপ্তি হয় এবং বিদ্যা, যোগ্যতা, শিক্ষা ইত্যাদি গুরুজনের নিকট হতে পাওয়া যায়। যে অন্ন গ্রহণ করা হয়, সেটি অপরে উৎপন্ন করে ; যে বস্ত্র পরিধান করা হয়, তা অপরে তৈরি করে ; যে গৃহে বাস করা হয়, সেটির নির্মাণ অপরে করেছে ; যে পথ দিয়ে চলা হয়, সেটিও অন্যের দ্বারা প্রস্তুত, ইত্যাদি। এইভাবে প্রত্যেক ব্যক্তিরই জীবন-নির্বাহ অন্যের কর্মের উপরে আশ্রিত থাকে। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তিরই অন্যের কাছে ঋণ থাকে, যেটি শোধ করার জন্য যথাসাধ্য নিঃস্বার্থভাবে অপরের সেবা (হিত) করা প্রয়োজন। নিজের বলে মনে করা এই শরীর এবং জগতের পদার্থগুলিকে বিন্দুমাত্রও নিজস্ব এবং নিজের জন্য মনে না করলে মানুষ এই ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

পরিশিষ্ট-ভাব— এখানে উদ্ধৃত **'কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতাঃ'** পদটির দ্বারা সিদ্ধ হয় যে কর্মযোগ মুক্তির স্বতন্ত্র সাধন। জনকাদি রাজন্যগণ কর্মযোগের সাহায্যে পরমসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, কেননা তাঁরা শুধুমাত্র অপরের সেবার জন্য, তাদের সুখী করার জন্যই রাজত্ব করেছিলেন, নিজেদের সুখের জন্য নয়।

'লোকসংগ্রহমেবাপি সম্পশ্যন্ কর্তুমর্হসি' পদটির তাৎপর্য হল যে তোমার এই কর্মযোগের আদর্শ জনসাধারণের মধ্যে স্থাপন করতে হবে যে, কর্মযোগের পালন করলে পরমসিদ্ধির প্রাপ্তি হয়।

*** *** ***

সম্বন্ধ—কর্ম করলে কীভাবে লোকসংগ্রহ হয়—পরবর্তী শ্লোকে ভগবান তার আলোচনা করছেন।

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে॥ ২১ ॥

[**শ্রেষ্ঠঃ** (শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি) ; **যৎ, যৎ, আচরতি** (যা যা আচরণ করেন) ; **ইতরঃ, জনঃ** (অন্যান্য সাধারণ ব্যক্তিও) ; **তৎ, তৎ, এব** (তাই করে থাকে) ; **সঃ** (তিনি) ; **যৎ** (যা কিছু) ; **প্রমাণম্** (প্রামাণ্য) ; **কুরুতে** (বলে ধরেন) ; **লোকঃ** (সাধারণ মানুষও) ; **তৎ, অনুবর্ততে** (সেই অনুযায়ী আচরণ করেন।)]

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যা যা আচরণ করেন, অন্যান্য সাধারণ ব্যক্তিগণও তাই করে থাকে। তিনি যা কিছু প্রামাণ্য বলে ধরেন, সাধারণ মানুষেরা সেই অনুযায়ী আচরণ করে থাকে ॥ ২১ ॥

---

[১] উদাহরণার্থ—কর্মকে প্রধান করে দেখলে ঝাড়ু দেওয়া ছোট কাজ এবং শাস্ত্র ব্যাখ্যা করা বড় কাজ বলে ধারণা হয় এবং কর্মফলের দৃষ্টিতে দেখলে অল্প দান করলে কম পুণ্য এবং বেশি দান করলে অধিক পুণ্য হয় বলে ধারণা হয়।

ব্যাখ্যা—**'যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ'**—তিনিই শ্রেষ্ঠ পুরুষ যিনি জগৎ-সংসারকে (শরীরাদি পদার্থকে) এবং স্বয়ংকে (নিজ স্বরূপকে) তত্ত্বতঃ জানেন। তাঁর স্বাভাবিকভাবে অনুভব হয় যে এই শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, অর্থ, আত্মীয়, সম্পত্তি ইত্যাদি সবই জগৎ-সংসারের, নিজের নয়। শুধু তাই নয়, এই শ্রেষ্ঠ পুরুষটি ত্যাগ, বৈরাগ্য, প্রেম, জ্ঞান, সদ্‌গুণ ইত্যাদিও নিজের বলে মনে করেন না। কারণ এগুলিকেও নিজের বলে মনে করলে ব্যক্তিত্ব ('অহং' ভাব) পরিপুষ্ট হয়, যেটি তত্ত্বপ্রাপ্তির বাধাস্বরূপ। 'আমি ত্যাগী', 'আমি বৈরাগী', 'আমি সেবক', 'আমি ভক্ত' ইত্যাদি ভাবও 'অহং'ভাব পুষ্টির সহায়ক হওয়ায় তত্ত্বপ্রাপ্তির পথে বাধাস্বরূপ হয়। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির (জড়ত্বের সম্পর্কে হওয়া) 'ব্যষ্টি অহংকার' তো হয়ই না এবং 'সমষ্টি অহংকার' কেবলমাত্র ব্যবহারিক কারণে হয়ে থাকে, যা সংসারের সেবাতেই ব্যাপৃত থাকে। কারণ অহংকর্তৃত্বভাবও জগৎ-সংসারেরই (গীতা ৭।৪ ; ১৩।৫)।

জগৎ হতে প্রাপ্ত শরীর, অর্থ, পরিবার-পরিজন, পদ, যোগ্যতা, অধিকার ইত্যাদি সমস্ত পদার্থই সদুপযোগ অর্থাৎ অন্যের সেবায় ব্যয় করার জন্যই প্রাপ্ত হয়েছে, ভোগ করার জন্য বা নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নয়। যে এগুলিকে নিজস্ব এবং নিজের জন্য মনে করে উপভোগ করে, তাকে ভগবান চোর বলেছেন—**'যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ'** (গীতা ৩।১২)। এই সমস্ত পদার্থই সমষ্টির, কখনোই কোনোভাবে ব্যষ্টির নয়। প্রকৃতপক্ষে এগুলির সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নিজের বলে যে শরীর ইত্যাদি বস্তু তা (সংসারের হওয়ায়) স্বতঃই স্বাভাবিকভাবে সংসারের সেবায় নিয়োজিত হয়। জগতের সকল প্রাণীর হিতে তাঁর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থাকে।

'দেওয়ার' ভাব হতে সমাজে ঐক্য, প্রেম উৎপন্ন হয় এবং 'নেওয়ার' ভাব পতনকারক হয়। দেহকে 'আমি', 'আমার' অথবা 'আমার জন্য' মনে করলেই 'নেওয়ার' ভাব উৎপন্ন হয়। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি শরীরের সঙ্গে নিজের কোনো সম্পর্ক না মানায় তাঁর মধ্যে 'নেওয়ার' ভাব বিন্দুমাত্র থাকে না। তাই তাঁর প্রত্যেকটি ক্রিয়াই অপরের হিতকারী হয়ে ওঠে। এরূপ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির দর্শন, স্পর্শ, বার্তালাপ, চিন্তন ইত্যাদি থেকে স্বাভাবিকভাবে লোকের হিতসাধন হয়। শুধু তাই নয়, তাঁর স্পর্শের বায়ুও সাধারণ লোকের পক্ষে হিতকারী হয়ে থাকে।

এরূপ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি দু'প্রকারের হয়—১) অবধূত কোটি এবং ২) আচার্য কোটি। অবধূত কোটির শ্রেষ্ঠ পুরুষ অবধূত সম্প্রদায়ের জন্য আদর্শ হয়ে থাকেন, সাধারণ ব্যক্তিদের জন্য নয়। কিন্তু আচার্য কোটির শ্রেষ্ঠ পুরুষ মনুষ্যমাত্রের কাছেই আদর্শ ব্যক্তি হন। এখানে আচার্য কোটির শ্রেষ্ঠ পুরুষের বর্ণনা করা হয়েছে, যাঁর আচার-আচরণ সর্বদাই শাস্ত্র-মর্যাদা অনুকূল হয়ে থাকে, কেউ দেখুক বা না দেখুক। অহংভাব ও মমত্ববোধ না থাকায় তাঁর দ্বারা সমস্ত কর্তব্যই স্বাভাবিকরূপে পালিত হয়। যেমন অরণ্যে পুষ্প প্রস্ফুটিত হয় এবং পরে সেটি শুষ্ক হয়ে ঝরে যায়। কেউ সেটি লক্ষ্য না করলেও, পুষ্প তার চারিদিক সুগন্ধ দ্বারা মোহিত করে দুর্গন্ধ নাশ করে থাকে। এইরূপ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির দ্বারা (সর্বতোভাবে পরহিতের অসীম ভাব থাকায়) সমগ্র সংসারের স্বাভাবিকভাবে অনেক উপকার হয়ে থাকে, তা কেউ বুঝুক বা নাই বুঝুক। কারণ ব্যক্তির অহংভাব ও মমত্ব দূর হওয়ায় ভগবানের পালনশক্তির সঙ্গে তাঁর ঐক্য ঘটে, যার ফলে সমগ্র সংসারের হিত হয়ে থাকে।

শরীরের সমস্ত অঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন হলেও যেমন আসলে এক হয়ে থাকে (যেমন, কোনো একটি অঙ্গে কিছু হলে মানুষ তাকে নিজের অসুখ বলে মনে করে), তেমনি জগতের সমস্ত প্রাণী ভিন্ন ভিন্ন হলেও প্রকৃতপক্ষে সবই এক। শরীরের কোনো পীড়িত অঙ্গ সুস্থ হলে যেমন সমস্ত শরীরই স্বচ্ছন্দ হয়ে যায়, তেমনি প্রাপ্ত বস্তু, সময়, পরিস্থিতি ইত্যাদি অনুযায়ী মর্যাদা সহকারে নিজ কর্তব্য-পালনকারী ব্যক্তির দ্বারা সমস্ত জগতের স্বতঃই হিত হয়।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের আচরণ এবং বাক্যের প্রভাব (স্থূলশরীর দ্বারা হওয়ার জন্য) স্থূল রীতিতেই হয়, অর্থাৎ তা সীমিত হয়। কিন্তু তাঁর ভাবের প্রভাব সূক্ষ্ম রীতিতে পড়ে থাকে, যা অসীম, অনন্ত। 'ক্রিয়া' সীমিত হলেও, 'ভাব' অসীম হয়।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ আচরণে যে ভাবের প্রকাশ করে থাকেন, অন্যান্য ব্যক্তির ওপর তার প্রভাব অত্যন্ত বেশি হয়। তিনি নিজ বর্ণ, আশ্রম, সম্প্রদায় ইত্যাদির আচরণ সুচারুভাবে পালন করায় অন্যান্য বর্ণের আশ্রমের এবং সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের ওপরও তাঁর বাক্যের প্রভাব পড়ে।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যদিও নিজের জন্য কিছুই করেন না এবং তাঁর কোনো কর্তৃত্বাভিমানও থাকে না, তবুও সাধারণের দৃষ্টিতে তাঁর আচরণ পরিলক্ষিত হওয়ায় এইস্থানে **'আচরতি'** ক্রিয়া প্রযুক্ত হয়েছে। সকলের উপকারের জন্য স্বাভাবিকভাবে তাঁর দ্বারা ক্রিয়াগুলি হয়। তাঁর নিজের কোনো স্বার্থ না থাকায় তাঁর দ্বারা হওয়া ছোট বড় প্রতিটি ক্রিয়াই মানুষের হিতসাধন করে। যদিও তাঁর কোনো কর্তব্য থাকে না—**'তস্য কার্যং ন বিদ্যতে'** (গীতা ৩।১৭) এবং তাঁর অহংকর্তৃত্ববোধক অভিমানও নেই—**'নির্মমো নিরহঙ্কারঃ'** (গীতা ২।৭১), তবুও তাঁর দ্বারা স্বভাবতই সুচারুরূপে কর্তব্য পালিত হয়। এইভাবে স্বাভাবিক রূপে তাঁর দ্বারা লোকসংগ্রহ হয়।

বিশেষ কথা

প্রায়শঃ দেখা যায় যে, সমাজ, সম্প্রদায়, জাতি, বর্ণ, আশ্রম ইত্যাদিতে যে ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলে নির্ণয় করা হয় এবং যাঁকে সাধারণ লোক শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নিয়ে শ্রদ্ধার চোখে দেখে, তিনি যেরূপ আচরণ করেন, সেই সমাজ, সম্প্রদায়, জাতি প্রভৃতির লোকও তেমনই আচরণ করতে থাকে।

অন্তরে অর্থ এবং পদের মহত্ত্ব এবং লোভ থাকায় লোকেরা অর্থশালী (লক্ষপতি, কোটিপতি) বা উচ্চ পদাধিকারী (নেতা, মন্ত্রী ইত্যাদি) ব্যক্তিদের শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নেয় এবং তাঁদের খুবই সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে। যাদের অন্তরে জড় পদার্থের (অর্থ, পদ ইত্যাদির) গুরুত্ব থাকে, তারা বাস্তবে নিজেরাও শ্রেষ্ঠ হয় না এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির মর্মও বুঝতে পারে না। এরা যাদের শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে, তারা বাস্তবিক শ্রেষ্ঠ নয়। যাদের হৃদয়ে অর্থের প্রতি অধিক আসক্তি থাকে তাদের ওপর ধনী ব্যক্তিদেরই প্রভাব পড়ে ; যেমন—চোরের ওপর চোরের সর্দারের প্রভাবই পড়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে শ্রেষ্ঠ না হয়েও লোকে এদের শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নেওয়ায় এইসব ধনী বা উচ্চ পদাধিকারী ব্যক্তিদের আচরণ সমাজে স্বাভাবিকভাবে প্রচার পেয়ে থাকে। যেমন—অর্থের জন্য যাঁকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয়, সেই ব্যক্তি কোন কোন উপায়ে অর্থ উপার্জন করেছেন এবং সঞ্চয় করেছেন, লোকের মধ্যে তা স্বতঃই প্রচারিত হয়ে যায়, সেটি যতই গোপন ব্যাপার হোক না কেন। সেইজন্যই বর্তমান সময়ে মিথ্যা, কপটাচার, বেইমানি, ধোঁকাবাজি, চুরি ইত্যাদি কুব্যবহার সমাজে কোনো পাঠশালাতে না পড়ালেও স্বতঃই প্রচারিত হচ্ছে।

দুঃখ এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এখন লোকেরা লক্ষপতি ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নেয় কিন্তু যিনি প্রতিদিন লক্ষ বার ভগবৎ নাম জপ করেন তাঁকে মানে না। তারা এটা বিচার করে না যে লক্ষপতি ব্যক্তি তার মৃত্যুর পর একটি কানাকড়িও সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে না, কিন্তু ভগবৎ নাম জপকারীর মৃত্যুর পর সম্পূর্ণ ভগবৎ নামরূপ ঐশ্বর্য তাঁর সঙ্গে যাবে। একটি নামও পড়ে থাকবে না।

স্ব স্ব স্থানে বা ক্ষেত্রে যে ব্যক্তিকে প্রধান বলা হয়, সেই অধ্যাপক, ব্যাখ্যাকারী, আচার্য, গুরু, নেতা, শাসক, মোহন্ত, কথাকার, পূজারী—সকলেরই নিজ নিজ আচরণে সাবধানতা অবলম্বনের খুবই প্রয়োজন রয়েছে যাতে অপরের ওপর তাঁর ব্যবহারের ভালো প্রভাব পড়ে। এইরূপই পরিবারের মুখ্য ব্যক্তিরও (কর্তার) তাঁর আচরণে সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন আছে। কারণ তাঁর দিকেই পরিবারের সকলের দৃষ্টি থাকে। রেলগাড়ির চালকের ন্যায় সমাজের প্রধান ব্যক্তির ওপরও বিশেষ দায়িত্ব থাকে। রেলগাড়িতে যারা ওঠে তারা শুয়ে বা বসে ভ্রমণ করতে পারে, কিন্তু চালককে সর্বদা সজাগ থাকতে হয়। তাঁর সামান্য অসতর্কতায় দুর্ঘটনা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেইজন্য সংসারে নিজ নিজ ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ বলে যাঁকে মেনে নেওয়া হয় তাঁর নিজ আচরণের ওপর বিশেষ নজর রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন।

'স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে'—যাঁর অন্তরে কামনা, বাসনা, মমতা, স্বার্থপরতা, পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি দোষ নেই এবং বিনাশশীল বস্তুর গুরুত্ব বা কিছু পাবার আকাঙ্ক্ষা নেই, এরূপ ব্যক্তির কথিত বাক্যের প্রভাব স্বতঃই অন্যের ওপর পড়ে এবং সাধারণ মানুষ তাঁর কথা অনুযায়ী আচরণেও প্রবৃত্ত হয়।

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে, আচরণের কথাই যখন বলা হয়েছে তখন প্রমাণের কথা বলার কী প্রয়োজন এবং প্রমাণের কথা বললে আচরণের কথা বলারই বা কী প্রয়োজন ? তার উত্তর হল এই যে, যদিও আচরণই প্রধান, কিন্তু একটি মানুষের দ্বারা সমস্ত বর্ণ, আশ্রম, সম্প্রদায় ইত্যাদির অনুরূপ আচরণ করা সম্ভব নয়। সেইজন্য শ্রেষ্ঠ

ব্যক্তি নিজে যে বর্ণ, আশ্রম ইত্যাদিতে রয়েছেন, সেই অনুযায়ী তিনি যথার্থ আচরণ তো করেনই উপরন্তু অন্যান্য বর্ণ, আশ্রম, সম্প্রদায় ইত্যাদির লোকদেরও তিনি শাস্ত্র, ইতিহাস ইত্যাদি থেকে প্রমাণসহ বাক্য দ্বারা শিক্ষা দেন যে, স্বার্থের জন্য কিছু না করে সকল প্রাণীর হিতার্থে নিজ নিজ (বর্ণ, আশ্রম, সম্প্রদায় অনুসারে) কর্তব্যপালন করাই তাদের কল্যাণের সহজ এবং শ্রেষ্ঠ সাধনা (গীতা ১৮।৪৫)। তাঁর বচনে প্রভাবিত হয়ে অন্যান্য বর্ণ, আশ্রম, সম্প্রদায় ইত্যাদির লোকও তাঁর কথা অনুযায়ী নিজ নিজ কর্তব্যপালন করতে থাকেন।

যদিও আচরণের ক্ষেত্র সীমিত এবং প্রমাণের (বাক্যের) ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়, তা সত্ত্বেও ভগবানের শ্রেষ্ঠ পুরুষের আচরণে পাঁচটি পদ—'যৎ', 'যৎ', 'তৎ', 'তৎ' এবং (বিশেষভাবে) 'এব' দেওয়ার অর্থ হল এই যে, তাঁর আচরণের প্রভাব সমাজে পাঁচগুণ (বেশি) পরিলক্ষিত হয় এবং প্রমাণে দুটি পদ—'যৎ' এবং 'তৎ' দেওয়ার অভিপ্রায় হল এই যে, প্রমাণের প্রভাব সমাজের ওপর শুধুমাত্র দ্বিগুণ (অপেক্ষাকৃত কম) পড়ে। সেইজন্য ভগবান বিশতম শ্লোকে লোকসংগ্রহের উদ্দেশ্যে নিজ কর্তব্যপালনের ওপরই বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যদি নিজে তাঁর বর্ণ, আশ্রম ইত্যাদি অনুযায়ী আচরণ না করে শুধুমাত্র বাক্যেই উদাহরণ দেন, তবে লোকের ওপর তার বিশেষ কোনো প্রভাব পড়ে না। তাতে লোকের মনে এমন একটা ধারণা জন্মায় যে, 'এটি তো কেবল মুখের কথা, যিনি বলছেন তিনি তো নিজ কর্তব্যপালন করেন না।' এরূপ ধারণা হওয়ায় লোকের মনে নিজ কর্তব্যের প্রতি অশ্রদ্ধা এবং অরুচি হবার সম্ভাবনা থাকে। সেইজন্য শ্রেষ্ঠ পুরুষ নিজে আচরণের দ্বারা এবং বাক্যের উদাহরণ দ্বারা—দুইভাবেই সাধারণ লোককে নিজ নিজ কর্তব্যপালনে নিয়োজিত করে তাদের হিত সাধন করান।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আচরণ তাঁরাই অনুসরণ করেন, যাঁরা তাঁকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে শ্রেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও যদি তাঁকে শ্রেষ্ঠ বলে কেউ মনে না করে, তাহলে সে ওই শ্রেষ্ঠ পুরুষের আচরণ এবং তাঁর কথা অনুযায়ী কাজ করতে পারে না।

বর্তমানে পারমার্থিক (ভগবৎ সম্বন্ধীয়) ভাবের প্রচারকারী বহু ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও লোকের ওপর তাঁদের ভাবের প্রভাব খুবই কম দেখা যায়। এর কারণ হল যে, বক্তা যা বলে থাকেন প্রায়শঃই তিনি নিজে সেইরূপ আচরণ করেন না। নিজে আচরণ করে সেইমতো উপদেশ দিলে, সেইসব কথা বন্দুকের গুলির মতোই অব্যর্থ হয়ে থাকে। এর বিপরীত বিনা আচরণে বলা উপদেশগুলি কেবল বারুদভরা বন্দুকের মতো হয়, যা কেবল আওয়াজ করেই চুপ করে যায়। তবে পারমার্থিক উপদেশ এইভাবে নষ্ট হয় না, তা কিছু না কিছু প্রভাব ফেলেই। ভগবৎচর্চা, হরিকথা বা কীর্তন ইত্যাদির কিছু প্রভাব সবার ওপরে পড়েই। শ্রোতার যদি শ্রদ্ধা থাকে এবং তিনি সাধন-ভজন করেন বা করতে চান, তাহলে তাঁর ওপর (নিজ শ্রদ্ধা এবং সাধনায় আগ্রহ থাকার জন্য) এইসব বাক্যের প্রভাব অধিক পরিমাণে পড়ে থাকে।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—ভগবান এবার পরবর্তী তিনটি শ্লোকে তাঁর নিজের উদাহরণ দিয়ে লোকসংগ্রহের ব্যাপারটিকে দৃঢ় করেছেন।

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি॥ ২২ ॥

[**পার্থ** (হে পার্থ !) ; **মে** (আমার) ; **ত্রিষু, লোকেষু** (ত্রিলোকে) ; **কিঞ্চন, কর্তব্যং, ন, অস্তি** (কোনো কর্তব্য নেই) ; **চ** (এবং) ; **ন, অবাপ্তব্যম্** (প্রাপ্ত করার যোগ্য) ; **অনবাপ্তম** (অপ্রাপ্ত নেই) ; **কর্মণি** (কর্তব্যকর্মে) ; **এব** (ই) ; **বর্ত** (ব্যাপৃত আছি।)]

হে পার্থ ! ত্রিলোকে আমার কোনো কর্তব্য নেই এবং প্রাপ্ত করার যোগ্য কোনো বস্তুই অপ্রাপ্ত নেই, তবুও আমি কর্তব্যকর্মেই ব্যাপৃত আছি ॥ ২২ ॥

ব্যাখ্যা—'ন মে পার্থাস্তি....নানবাপ্তমবাপ্তব্যং'— ভগবান কোনো একটিমাত্র লোকে (স্থানে) সীমিত হয়ে নেই। তাই তিনি ত্রিলোকে নিজের কোনো কর্তব্য না থাকার কথা বলেছেন।

ত্রিলোকে ভগবানের কোনো কর্তব্য নেই কারণ তাঁর কিছু পাওয়ার নেই। কিছু পাওয়ার আশাতেই সকলে (মানুষ, পশু, পক্ষী) কর্ম করে থাকে। ভগবান উপরের পদটিতে বিশেষভাবে এই কথাটি বলেছেন যে কিছু করার বা পাওয়ার বাকি না থাকলেও তিনি কর্ম করে চলেছেন।

নিজের জন্য কোনো কর্তব্য না থাকলেও ভগবান অপরের হিতার্থে অবতাররূপ গ্রহণ করেন এবং সাধুজনেদের উদ্ধার, পাপীদের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য কর্ম করে থাকেন (গীতা ৪।৮)। অবতার হওয়া ছাড়াও ভগবানের এই জগৎ রচনাও জীবমাত্রেরই উদ্ধারের জন্য হয়ে থাকে। পুণ্য কর্মের ফল ভোগের জন্য স্বর্গবাস এবং পাপ-কর্মের জন্য নরকবাস ও চুরাশি লক্ষ জন্ম হয়ে থাকে। পুণ্য এবং পাপ—দুইয়ের ঊর্ধ্বে উঠে নিজ কল্যাণের জন্যই মনুষ্য-জন্ম হয়ে থাকে। এটি তখনই সম্ভব হয় যখন মানুষ নিজের জন্য কিছু না করে। তার সমস্ত কর্ম অর্থাৎ স্থূলশরীর দ্বারা হওয়া 'ক্রিয়া', সূক্ষ্মশরীর দ্বারা 'চিন্তা' এবং কারণশরীর দ্বারা হওয়া 'স্থিরতা' সে শুধু অন্যের হিতার্থে করে, নিজের জন্য নয়। কারণ যার দ্বারা এই কর্মগুলি করা হয় সেই স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ—তিন শরীরই জগতের, নিজের নয়। সেইজন্য কর্মযোগী শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, পদার্থ ইত্যাদি সমস্ত সামগ্রীকেই (যেগুলি প্রকৃতপক্ষে জগৎ-সংসারেরই) জগৎ-সংসারের বলে মনে করেন এবং সেগুলিকে জগতেরই সেবায় নিয়োজিত করেন। মানুষ যদি জগতের সামগ্রীগুলি জগতের সেবায় নিয়োগ না করে নিজের সুখভোগে নিয়োগ করে তাহলে সেটি তার মস্ত ভুল। জগতের বস্তুগুলিকে নিজের মনে করলেই ফল-কামনা আসে এবং ফলপ্রাপ্তির জন্যই কর্ম করা হয়ে থাকে। এইভাবে মানুষ যতক্ষণ কিছু পাওয়ার আশায় কর্ম করে, ততক্ষণ তার কর্তব্য বাকি থেকে যায়।

গভীরভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে মনুষ্যমাত্রেরই নিজের জন্য কোনো কর্তব্য থাকে না। কারণ প্রাপণীয় বস্তু (পরমাত্মতত্ত্ব) হল নিত্যপ্রাপ্ত এবং স্ব-স্বরূপও নিত্য। কিন্তু কর্ম এবং কর্মফল হল অনিত্য অর্থাৎ এগুলি উৎপত্তিমূলক ও বিনাশশীল। অনিত্যের (কর্ম এবং তার ফলের) নিত্যের (স্বরূপের) সঙ্গে সম্পর্ক কীভাবে সম্ভব হয় ? কর্মের সম্পর্ক হচ্ছে পরের (শরীর এবং জগতের) সঙ্গে, 'স্ব'-এর সঙ্গে নয়। কর্ম সর্বদাই 'পর'-এর দ্বারা এবং 'পরের' জন্যই হয়। সুতরাং নিজের জন্য কিছু করা সম্ভবই নয়। মানুষের জন্যই যখন কোনো কর্তব্য থাকে না, তখন ভগবানের জন্য কর্তব্য কী করে থাকে ?

কর্মযোগে সিদ্ধ মহাপুরুষদের জন্য ভগবান এই অধ্যায়ের সতেরো-আঠারোতম শ্লোকে বলেছেন যে, ওই মহাপুরুষদের কোনো কর্তব্য থাকে না কারণ তাঁদের রতি, তৃপ্তি এবং সন্তুষ্টি নিজে থেকে নিজেদের মধ্যেই হয়ে থাকে। তাই তাঁদের জগতে কিছু করা বা না করার কোনো প্রয়োজন থাকে না এবং তাঁদের কোনো প্রাণীর সঙ্গে বিন্দুমাত্র স্বার্থের সম্পর্ক থাকে না। এরূপ হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা লোকসংগ্রহার্থে কর্ম করে থাকেন। এইভাবে ভগবান এখানে নিজের প্রসঙ্গে জানাচ্ছেন যে, কোনো কর্তব্য বাকি না থাকলেও বা কিছু পাওয়ার না থাকলেও তিনি লোকসংগ্রহার্থ কর্ম করেন। এর তাৎপর্য হল যে তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষের ভগবানের সঙ্গে ঐক্য ঘটে—**'মম সাধর্ম্যমাগতাঃ'** (গীতা ১৪।২)। ভগবান যেমন ত্রিলোকের শ্রেষ্ঠ পুরুষ (গীতা ৩।২৩ ; ৪।১১), জগতে তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিও সেইরূপ আদর্শ (গীতা ৩।২৫) পুরুষ ।

'বর্ত এব চ কর্মণি'—এইস্থানে **'এব'** পদটি ব্যবহার করার ভগবানের উদ্দেশ্য এই যে, 'আমি উৎসাহ এবং তৎপরতাপূর্বক, আলস্যবর্জিত হয়ে, সাবধানতার সঙ্গে কর্তব্যকর্মের যথাযথ অনুষ্ঠান করি, কর্মগুলি ত্যাগ করি না বা উপেক্ষাও করি না।'

যেমন রেলের ইঞ্জিন চলা শুরু করলে, তার সঙ্গে সংযুক্ত কামরাগুলিও চলতে থাকে, তেমনি ভগবান এবং সন্ত-মহাত্মাগণ (যাঁদের কিছু করার বা পাবার আকাঙ্ক্ষা থাকে না) ইঞ্জিনের ন্যায় কর্তব্যকর্ম করেন, যাতে অন্যান্য ব্যক্তিগণ তাঁদের অনুসরণ করতে পারে। সাধারণ ব্যক্তিদের মধ্যে করার এবং পাবার আকাঙ্ক্ষা থাকে। নিষ্কামভাবে কর্তব্যকর্ম করলে এই ইচ্ছাগুলি দূরীভূত হয়। ভগবান এবং সন্ত-মহাত্মাগণ যদি কর্তব্যকর্ম না করেন, তাহলে অন্যান্য সাধারণ ব্যক্তিও কর্তব্যকর্ম পালন করবে না, যার ফলে তাদের মধ্যে প্রমাদ-আলস্য ইত্যাদি দেখা

দেবে এবং তারা অকর্তব্য করতে শুরু করবে। তাহলে তাদের কামনা কীভাবে দূরীভূত হবে ? তাই সমস্ত মানুষের হিতার্থে ভগবান এবং সন্ত-মহাত্মাগণের দ্বারা স্বাভাবিকভাবে কর্তব্যকর্ম অনুষ্ঠিত হয়।

ভগবান সর্বদা কর্তব্যপরায়ণ থাকেন, কখনও তিনি কর্তব্যচ্যুত হন না। সুতরাং ভগবৎপরায়ণ সাধকেরও কখনো কর্তব্যচ্যুত হওয়া উচিত নয়। কর্তব্যচ্যুত হলেই তিনি ভগবৎতত্ত্ব অনুভব থেকে বঞ্চিত হন। সর্বদা কর্তব্যপরায়ণ হয়ে থাকলে সাধকের ভগবৎতত্ত্বের অনুভব অতি সহজেই হওয়া সম্ভব।

পরিশিষ্ট-ভাব—ভগবান মহাভারতে উতঙ্ক ঋষিকেও ত্রিলোকে তাঁর কর্তব্যের কথা বলেছিলেন—

ধর্মসংরক্ষণার্থায় ধর্মসংস্থাপনায় চ। তৈস্তৈর্বেষৈশ্চ রূপৈশ্চ ত্রিষু লোকেষু ভার্গব॥

(মহাভারত, অশ্বমেধপর্ব ৫৪।১৩-১৪)

'আমি ধর্মের রক্ষা এবং স্থাপনার নিমিত্ত ত্রিলোকে নানা যোনিতে অবতার রূপ ধারণ করে সেইসব রূপ ও আকৃতি অনুসারে ব্যবহার করে থাকি।'

※ ※ ※

যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥ ২৩ ॥
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কর্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥ ২৪ ॥

[**হি, পার্থ** (কারণ, হে পার্থ !) ; **যদি, অহম্** (যদি আমি) ; **জাতু, অতন্দ্রিতঃ** (সাবধানতাপূর্বক) ; **কর্মণি** (কর্তব্যকর্ম) ; **ন, বর্তেয়ম্** (না করি) ; **মনুষ্যাঃ** (সাধারণ মানুষ) ; **সর্বশঃ** (সর্বপ্রকারে) ; **মম, বর্ত্ম** (আমার পথই) ; **অনুবর্তন্তে** (অনুসরণ করবে) ; **চেৎ** (যদি) ; **অহম্** (আমি) ; **কর্ম** (কর্ম) ; **ন, কুর্যাম্** (না করি) ; **ইমে, লোকাঃ** (এই সকল লোক) ; **উৎসীদেয়ুঃ** (পথভ্রষ্ট হবে) ; **চ** (এবং) ; **সঙ্করস্য** (বর্ণসংকরাদির) ; **কর্তা** (হেতুকারক) ; **স্যাম্** (হব) ; **ইমাঃ** (এই সমস্ত) ; **প্রজাঃ** (প্রজাদের) ; **উপহন্যাম্** (বিনাশের হেতু হব।)]

হে পার্থ ! যদি আমি সাবধানতাপূর্বক কর্তব্যকর্ম না করি (তাহলে অত্যন্ত ক্ষতি হবে ; কারণ) সাধারণ মানুষ সর্বপ্রকারে আমার পথই অনুসরণ করবে। যদি আমি কর্ম না করি, তাহলে সকল মানুষ পথভ্রষ্ট হবে এবং আমি বর্ণসংকরাদির হেতু এবং এই সমস্ত প্রজাদের বিনাশের কারণ হব ॥ ২৩-২৪ ॥

ব্যাখ্যা—(বাইশতম শ্লোকে ভগবান অন্বয়-রীতি দ্বারা কর্তব্যপালনের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করেছেন এবং এই শ্লোকগুলিতে ভগবান ব্যতিরেক-রীতি দ্বারা কর্তব্য-পালন না করলে যে ক্ষতি হয় তা প্রতিপাদন করেছেন।)

'যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ'—পূর্বশ্লোকে উদ্ধৃত **'বর্ত এব চ কর্মণি'** পদটি দৃঢ়তর করার জন্যই এখানে **'হি'** পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

ভগবান বলেছেন, 'আমি সাবধানতাপূর্বক কর্ম করব না—এরূপ হতেই পারে না' ; কিন্তু 'যদি এমন মনে কর যে, আমি কর্ম না করি'—সেই অর্থে ভগবান এখানে **'যদি জাতু'** পদটি ব্যবহার করেছেন।

'অতন্দ্রিতঃ' পদটির অর্থ হল এই যে কর্তব্যকর্ম করতে আলস্য বা প্রমাদ করা উচিত নয় এবং সেগুলি অত্যন্ত সাবধানতা এবং তৎপরতার সঙ্গে করা উচিত। সাবধানতাপূর্বক কর্তব্যকর্ম না করলে মানুষ আলস্য ও প্রমাদের বশবর্তী হয়ে নিজ অমূল্য জীবন নষ্ট করে।

কর্মে শৈথিল্য না ঘটিয়ে সাবধানতা এবং তৎপরতার সঙ্গে কর্ম করলেই কর্মের থেকে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয়। যেমন গাছের শক্ত ডাল শীঘ্রই ভেঙে যায়, কিন্তু যেটি অর্ধভগ্ন অবস্থায় ঝুলে থাকে, সেই শিথিল ডাল শীঘ্র ভাঙে না। তেমনি সাবধানতা এবং তৎপরতাপূর্বক কর্ম করলে কর্মের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়, কিন্তু আলস্য ও প্রমাদ সহকারে (শৈথিল্যপূর্বক) কর্ম করলে কর্মের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হয় না। সেইজন্য ভগবান উনিশতম শ্লোকে **'সমাচর'** পদ

এবং এই শ্লোকে **'অতন্দ্রিতঃ'** পদের প্রয়োগ করেছেন।

যদি কোনো কর্মের কথা বারংবার স্মরণে আসে, তবে বুঝতে হবে যে কর্মটি করায় কোনো ত্রুটি (কামনা, আসক্তি, অপূর্ণতা, আলস্য, প্রমাদ বা উপেক্ষা) ইত্যাদি ছিল, যার জন্য ওই কর্ম হতে সম্বন্ধচ্ছেদ হয়নি। সম্বন্ধচ্ছেদ না হওয়াতেই ওই পূর্বকৃত কর্মটি বারংবার স্মরণে আসে।

'মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ'—এই পদটির দ্বারা ভগবান বলেছেন যে, 'আমার পথ অনুসরণ-কারীগণই বাস্তবিক মনুষ্য নামের উপযুক্ত। যারা আমার আদর্শ না মেনে আলস্য ও প্রমাদবশতঃ কর্তব্য-কর্ম না করে শুধুমাত্র অধিকার আকাঙ্ক্ষা করে, তারা আকৃতিগতভাবে মানুষ হলেও প্রকৃতপক্ষে মানুষ নামের অযোগ্য।'

এই অধ্যায়ের একুশতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আচরণ এবং উদাহরণই সকল মানুষ অনুসরণ করে থাকে এবং এই শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে মানুষ সর্বপ্রকারে তাঁর পথ অনুসরণ করে। এর অর্থ এই যে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি একটিমাত্র লোকেই (মনুষ্যলোকে) আদর্শ পুরুষ হয়ে থাকেন, কিন্তু ভগবান তিনটি লোকেরই আদর্শ পুরুষ।

জগৎ-সংসারে মানুষের কীভাবে থাকা উচিত—তা জানাবার জন্যই ভগবান মনুষ্যলোকে অবতরণ করেন। জগৎ-সংসারে নিজের জন্য থাকা উচিত নয়—এই হচ্ছে সংসারে থাকার বিদ্যা। প্রকৃতপক্ষে এই জগৎ-সংসার হচ্ছে একটি বিদ্যালয়, যেখানে আমাদের কামনা, মমতা, স্বার্থ, ইত্যাদি পরিত্যাগ করে অপরের হিতের জন্য কর্ম করা শিখতে হয় এবং সেই অনুযায়ী কর্ম করে নিজ উদ্ধার সাধন করতে হয়। সংসারের সকল ব্যক্তিই একে অপরের সেবা (হিত) করার জন্যই আছে। সেইজন্য পিতা-পুত্র, পতি-পত্নী, ভাই-বোন ইত্যাদি সকলেরই উচিত যে তারা যেন একে অপরের অধিকার অনুযায়ী নিজ নিজ কর্তব্য-পালন করে এবং একে অপরের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করে।

'উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কর্ম চেদহম্'—ভগবান তেইশতম শ্লোকে **'যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ'** পদের দ্বারা কর্মে সাবধানতা অবলম্বন না করলে যে ক্ষতি হতে পারে সেই কথা বলেছেন এবং এই (চব্বিশতম) শ্লোকে কথিত পদটিতে কর্ম না করলে যে ক্ষতি হতে পারে তার কথা বলেছেন।

যদিও এরূপ হতেই পারে না যে আমি কর্তব্যপালন করছি না, তবুও যদি এরূপ মনে করা হয় সেই দৃষ্টিতেই ভগবান এখানে **'চেৎ'** পদটির প্রয়োগ করেছেন।

এই পদটির তাৎপর্য এই যে, মানুষের কর্ম না করাতেও আসক্তি হওয়া উচিত নয়—**'মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি'** (গীতা ২।৪৭)। সেইজন্য ভগবান নিজের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, 'আমার কোনো কিছু পাবার বাকি না থাকলেও আমি কর্ম করি। আমি যদি (যে বর্ণ, আশ্রম ইত্যাদিতে আমি অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করেছি, সেই অনুযায়ী) নিজ কর্তব্যপালন না করি তাহলে সমস্ত মানুষ উৎসন্নে (নষ্ট-ভ্রষ্ট) যাবে অর্থাৎ তাদের পতন ঘটবে। কারণ কর্তব্য ত্যাগ করলে মানুষের মধ্যে তামসিক ভাব উৎপন্ন হয়, যাতে তার অধোগতি হয়'—**'অধোগতি গচ্ছন্তি তামসাঃ'** (গীতা ১৪।১৮)।

ত্রিলোকে ভগবানই একমাত্র আদর্শ পুরুষ এবং সমস্ত প্রাণীই তাঁকে অনুসরণ করে। সেইজন্য ভগবান যদি কর্তব্যপালন না করেন তাহলে ত্রিলোকে কেউই নিজ কর্তব্যপালন করবে না। নিজ কর্তব্য পালন না করলে তাদের স্বতঃই পতন ঘটবে।

'সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ'—আমি যদি কর্তব্যকর্ম পালন না করি তাহলে সমস্ত লোক উৎসন্নে যাবে এবং আমি তাদের ধ্বংস হওয়ার কারণ হব, যা কখনও সম্ভব নয়।

পরস্পর বিরুদ্ধ দুটি ধর্ম বা ভাব যদি একত্র মিলিত হয় তাহলে সেটিকে **'সংকর'** বলা হয়।

প্রথম অধ্যায়ের চল্লিশতম এবং একচল্লিশতম শ্লোকে অর্জুন বলেছিলেন, 'আমি যদি যুদ্ধ করি, তাহলে কুলক্ষয় হবে। কুলক্ষয় হলে সনাতন কুলধর্ম নষ্ট হয়ে যায়। ধর্ম নষ্ট হলে সমস্ত কুল পাপে ভরে যায়। পাপ অত্যন্ত বেশি হলে কুলস্ত্রীগণ ব্যভিচারিণী হয় এবং নারীগণ ব্যভিচারিণী হলে বর্ণসংকর উৎপন্ন হয়।' এখানে অর্জুনের মনোভাব ছিল যে যুদ্ধ করলে বর্ণসংকর উৎপন্ন হবে[১]। কিন্তু এখানে ভগবান অন্য কথা বলেছেন, তিনি বলেছেন যে, যুদ্ধরূপ

[১]অর্জুনের মত অনুযায়ী যদি বিচার করা হয় তাহলে বাস্তবে কর্তব্যপালন না করাই বর্ণসংকরতার কারণ। যুদ্ধে কুলনাশ হলে

কর্তব্য-কর্ম না করলে বর্ণসংকরতার উৎপত্তি হয়। এতে ভগবান তাঁর নিজের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, 'যদি আমি কর্তব্য-কর্ম না করি তাহলে কর্ম, ধর্ম, উপাসনা, বর্ণ, আশ্রম, জাতি প্রভৃতি সবকিছুতে স্বাভাবিকভাবে সংকরতা এসে যায়।' অর্থাৎ কর্তব্যকর্ম না করলেই সংকরতার উৎপত্তি হয়। সেইজন্য এখানে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন, 'তুমি যুদ্ধরূপ কর্তব্যকর্ম না করলে বর্ণসংকর উৎপত্তিকারক বলে গণ্য হবে, যুদ্ধ করলে নয় (যা তুমি মনে করছ)।'

বিশেষ কথা

অর্জুনের মূল প্রশ্নের ('আমাকে এই নিষ্ঠুর কর্মে কেন নিয়োজিত করছেন') উত্তরে ভগবান বাইশ, তেইশ এবং চব্বিশতম—তিনটি শ্লোকে নিজের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, 'আমি যে তোমাকেই কর্মে নিয়োগ করছি তা নয়, আমি নিজেও কর্মে ব্যাপৃত থাকি, প্রকৃতপক্ষে যদিও এই ত্রিলোকে আমার কর্তব্য বা প্রাপ্তব্য বলে কিছুই নেই।'

ভগবান অর্জুনকে এই কথার ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে এখন এই অবতাররূপ তুমিও এবং আমিও স্বীকার করে নিয়েছি যে তুমি রথী হবে আর আমি সারথি হব, তাহলে দেখ, ক্ষত্রিয় হয়েও আজ আমি তোমার সারথি হয়ে নিজ কর্তব্য সাবধানতা এবং তৎপরতার সঙ্গে পালন করছি। আমার এই কর্তব্যপালনের প্রভাবও ত্রিলোকে পড়বে কারণ আমি হচ্ছি এই ত্রিলোকের আদর্শ ব্যক্তি। সকল প্রাণী আমারই পথ অনুসরণ করে। তাই তোমারও নিজ কর্তব্যকর্ম উপেক্ষা না করে আমার মতো সাবধানতার সঙ্গে তৎপর হয়ে পালন করা উচিত।

*** *** ***

সম্বন্ধ—আগের তিনটি শ্লোকে ভগবান নিজে যেমন সাবধানতার সঙ্গে কর্ম করার বর্ণনা করেছেন, তেমনি পরবর্তী দুটি শ্লোকে জ্ঞানী মহাপুরুষদেরও সাবধানতার সঙ্গে কর্ম করার প্রেরণা দিয়েছেন।

সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত।
কুর্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥ ২৫ ॥
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।
জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ২৬ ॥

[**ভারত** (হে ভরতবংশোদ্ভব অর্জুন!) ; **কর্মণি, সক্তাঃ** (কর্মে আসক্ত) ; **অবিদ্বাংসঃ** (অজ্ঞব্যক্তিরা) ; **যথা, কুর্বন্তি** (যেরূপ করেন) ; **অসক্তঃ** (আসক্তি বর্জিত) ; **বিদ্বান্** (জ্ঞানী ব্যক্তিগণের) ; **লোকসংগ্রহম্** (লোকসংগ্রহার্থে) ; **চিকীর্ষুঃ** (মনে করি) ; **তথা, কুর্যাৎ** (সেরূপ কর্ম করা উচিত) ; **যুক্তঃ** (সাবধান) ; **বিদ্বান্** (তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষগণ) ; **কর্মসঙ্গিনাম্** (কর্মে আসক্ত) ; **অজ্ঞানাম্** (অজ্ঞ ব্যক্তিদের) ; **বুদ্ধিভেদম্** (বুদ্ধিতে ভ্রম) ; **ন, জনয়েৎ** (উৎপন্ন করবেন না) ; **সর্বকর্মাণি** (সমস্ত কর্ম) ; **সমাচরন্** (ভালোভাবে অবহিত হয়ে) ; **জোষয়েৎ** (নিযুক্ত করবেন।)]

হে ভরতবংশোদ্ভব অর্জুন! কর্মে আসক্ত অজ্ঞ ব্যক্তিরা যেরূপ কর্ম করেন, আসক্তিবর্জিত জ্ঞানী ব্যক্তিগণেরও লোকসংগ্রহার্থে সেরূপ কর্ম করা উচিত। তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষগণ সতর্ক থেকে কর্মে আসক্ত অজ্ঞ ব্যক্তিদের বুদ্ধিতে ভ্রম উৎপন্ন করবেন না, বরং তাঁরা নিজেরা সমস্ত কর্ম ভালোভাবে পালন করতঃ অজ্ঞ ব্যক্তিদেরও সেইরূপে কর্মে নিযুক্ত করে রাখবেন ॥ ২৫-২৬ ॥

নারীগণের ব্যভিচারিণী হওয়া একপ্রকার কর্তব্যচ্যুত হওয়াই এবং নারী কর্তব্যচ্যুত হলেই বর্ণসংকরতা আসে। যদি নারীদের মধ্যে এই ভাব থাকে যে আমাদের স্বামীরা যুদ্ধরূপ কর্তব্যপালন কালে প্রাণত্যাগ করেছেন, তা সত্ত্বেও তাঁরা কর্তব্য ত্যাগ করেননি, তবে আমরা কেন আমাদের কর্তব্য ত্যাগ করব? তাহলে আর তারা কর্তব্যচ্যুত হবে না। কর্তব্যচ্যুত না হলে তাদের সতীত্ব বজায় থাকে যার ফলে বর্ণসংকরতা আসতে পারে না।

ব্যাখ্যা—'সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত' —যেসব ব্যক্তির শাস্ত্র, শাস্ত্র-পদ্ধতি এবং শাস্ত্রবিহিত শুভ কর্মগুলির ওপর সামগ্রিক শ্রদ্ধা আছে এবং 'শাস্ত্রবিহিত কর্মের ফল অবশ্যই পাওয়া যায়'—এই কথার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে ; যাঁরা তত্ত্বজ্ঞও নন বা দুরাচারীও নন কিন্তু কর্ম, ভোগ এবং পদার্থসকলে আসক্ত, এইসব মানুষের জন্য এখানে **'সক্তাঃ', 'অবিদ্বাংসঃ'** ইত্যাদি পদ ব্যবহৃত হয়েছে। শাস্ত্রজ্ঞান থাকা সত্ত্বেও শুধু কামনার কারণে এরূপ ব্যক্তিদের অবিদ্বান (অজ্ঞ) বলা হয়েছে। এইসব ব্যক্তি শাস্ত্রজ্ঞ হলেও তত্ত্বজ্ঞ নন। এঁরা শুধুমাত্র নিজের জন্যই কর্ম করে থাকেন, সেইজন্য তাঁদের অজ্ঞ বলা হয়।

এই সমস্ত অজ্ঞ ব্যক্তি কর্মে কখনো প্রমাদ, আলস্য প্রভৃতি না করে সাবধানতা এবং তৎপরতাপূর্বক যথাযথ বিধি সহকারে কর্ম করে থাকে। কারণ তাদের ধারণা থাকে যে কর্মে কোনো ঘাটতি থাকলে তার ফলেও ঘাটতি আসবে। ভগবান তাদের এইরূপ কর্ম করার রীতিকে আদর্শ বলে চিহ্নিত করে আসক্তিশূন্য বিদ্বান ব্যক্তিদেরও ওইরূপ রীতিতেই লোকসংগ্রহার্থে কর্ম করার প্রেরণা দেন।

'কুর্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্'—যাঁর মধ্যে থেকে কামনা, বাসনা, মমতা, আসক্তি, পক্ষপাতিত্ব, স্বার্থপরতা ইত্যাদি সর্বতোভাবে দূরীভূত হয়েছে এবং শরীরাদি বস্তুর প্রতি কোনো আকর্ষণ নেই, এরূপ তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষের উদ্দেশ্যেই এখানে **'আসক্তঃ, বিদ্বান্'** পদ উদ্ধৃত হয়েছে[১]।

বিংশতিতম শ্লোকে **'লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্'** কথাটি বলে আবার একুশতম শ্লোকে যার ব্যাখ্যা করা হয়েছে, সেটিই এইস্থানে **'লোকসংগ্রহং চিকীর্ষুঃ'** পদটির দ্বারা কথিত হয়েছে।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের (আসক্তিশূন্য বিদ্বান ব্যক্তিদের) সমস্ত আচরণ স্বাভাবিকভাবেই যজ্ঞের জন্য, মর্যাদা সুরক্ষিত রাখার জন্য হয়ে থাকে। যেমন ভোগী মানুষের ভোগে, মোহগ্রস্ত মানুষের আত্মীয়স্বজনে এবং লোভী মানুষের অর্থে আসক্তি হয়, তেমনি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির প্রাণীমাত্রেরই হিতে অনুরাগ দেখা যায়। তাঁর অন্তরে 'আমি লোকহিতে কর্ম করছি'—এরূপ ভাবও হয় না, বরং তাঁর দ্বারা স্বাভাবিকভাবেই লোকহিত কার্য হয়ে থাকে। প্রাকৃত পদার্থগুলি থেকে সর্বতোভাবে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ায় ওই জ্ঞানী মহাপুরুষের প্রতীয়মান শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদিও **'লোকসংগ্রহ'** পদে উদ্ধৃত **'লোক'** শব্দটির অন্তর্গত।

অন্য ব্যক্তিরা এই জ্ঞানী মহাপুরুষদের লোকসংগ্রহের ইচ্ছাসম্পন্ন বলে মনে করেন, কিন্তু তাঁরা প্রকৃতপক্ষে লোকসংগ্রহের ইচ্ছাও পোষণ করেন না। কারণ তাঁরা জগৎ-সংসার থেকে প্রাপ্ত শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, পদার্থ, পদ, অধিকার, অর্থ, যোগ্যতা, সামর্থ্য ইত্যাদিকে সাধনাবস্থাতে কখনো নিজের বা নিজের জন্য বলে মনে করেন না, বরং এগুলি সবই তাঁরা জগতের এবং জগতের সেবার জন্য বলে মনে করেন, যেটি বাস্তব-সত্য। সেই প্রবাহের জন্যই সিদ্ধাবস্থায়ও তাঁদের বলে কথিত শরীরাদি পদার্থগুলি কোনো আগ্রহ ছাড়াই স্বাভাবিকভাবে সংসারের সেবায় ব্যাপৃত থাকে।

এই শ্লোকে **'যথা'** এবং **'তথা'** পদগুলি কর্ম করার প্রকারের অর্থে ব্যবহৃত। এর অর্থ হল এই যে, অজ্ঞ (সকাম) ব্যক্তি যেমন নিজ স্বার্থের জন্য সাবধানতা ও তৎপরতার সঙ্গে কর্ম করে, জ্ঞানী ব্যক্তিও সেইরূপ লোকসংগ্রহ অর্থাৎ অপরের হিতার্থে কর্ম করেন। জ্ঞানী ব্যক্তির প্রাণীমাত্রেরই প্রতি হিতের ভাবনা রেখে সমস্ত লৌকিক এবং বৈদিক কর্মের আচরণ করে যাওয়া উচিত। কী করে সবার কল্যাণ হবে ?—এই ভাব নিয়ে কর্তব্য-কর্ম করলে পৃথিবীতে তাঁর সুন্দর ভাবের প্রচার স্বতঃই হয়ে থাকে।

অজ্ঞ ব্যক্তিগণ ফলপ্রাপ্তির আশায় সাবধানতা এবং তৎপরতার সঙ্গে বিধিপূর্বক কর্তব্যকর্ম করে, কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তির ফলে আসক্তি থাকে না এবং তাঁর কোনো কর্তব্যও থাকে না। তাই তাঁর পক্ষে কর্মকে উপেক্ষা করা সম্ভব হতে

[১]যদিও পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হলে সাংখ্যযোগী এবং কর্মযোগী—দুই-ই এক হয়ে যান (গীতা ৫।৪-৫) তা সত্ত্বেও সাধনাবস্থায় উভয়ের সাধনপ্রণালীতে পার্থক্য থাকায় সিদ্ধ অবস্থাতেও তাঁদের লক্ষণ ও স্বভাবে কিছুটা পার্থক্য থেকে যায়। সাংখ্যযোগীর কর্মে বিশেষভাবে সংযম দেখা যায় কিন্তু কর্মযোগীর কর্মে অত্যন্ত তৎপরতা থাকে। কারণ প্রথমে সাধনাবস্থায় তার কর্ম করার স্বভাব ছিল, যদিও কোনো কোনো স্থানে এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়।

পারে। এইজন্যই ভগবান কর্ম করার বিষয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিদেরও অজ্ঞ ব্যক্তিদের মতোই কর্ম করার নির্দেশ দিয়েছেন।

একুশতম শ্লোকে বিদ্বান ব্যক্তিকে **'আদর্শ'** বলা হয়েছিল, কিন্তু এইখানে তাঁকে **'অনুগামী'** বলেছেন। এর তাৎপর্য হল এই যে, বিদ্বান ব্যক্তি আদর্শই হন বা অনুগামী, তাঁর দ্বারা স্বভাবতই লোকসংগ্রহ হয়। যেমন ভগবান শ্রীরাম প্রজাদের উপদেশও দেন আবার পিতার আদেশ পালন করে বনবাসেও যান। এই দুটি পরিস্থিতিতেই তাঁর দ্বারা লোকসংগ্রহ হয়। কারণ তাঁর কর্ম করা বা না করায় নিজের কোনো প্রয়োজন ছিল না।

বিদ্বান ব্যক্তি যখন আসক্তিশূন্য হয়ে কর্তব্যকর্ম করেন তখন আসক্ত-চিত্ত ব্যক্তির অন্তঃকরণেও বিদ্বান ব্যক্তির কর্মের প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই পড়ে, তা সেই ব্যক্তি 'এই মহাপুরুষ নিষ্কামভাবে কর্ম করছেন'— এটি প্রত্যক্ষভাবে দেখুক বা না দেখুক। একের নিষ্কামভাবের প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই অন্যের ওপর পড়ে—এটি একটি সিদ্ধান্ত। সেইজন্য আসক্তিশূন্য বিদ্বান ব্যক্তির ভাব ও আচরণের প্রভাব শুধু মানুষের ওপরই নয়, পশু-পক্ষীর ওপরও পড়ে।

বিশেষ কথা

মানুষ যতক্ষণ নিষ্কামভাব নিয়ে বিহিত কর্ম না করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার জন্ম-মৃত্যু চক্রে ঘোরা রোধ হয় না। যতক্ষণ সে নিজের জন্য কর্ম করে, ততক্ষণ সে কৃতকৃত্য হয় না অর্থাৎ তার কাজ শেষ হয় না। কারণ 'স্বয়ং' (স্বরূপ) চিরস্থায়ী এবং কর্ম ও তার ফল বিনাশশীল। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্বার্থ ত্যাগ করে (নিজের জন্য না করে অন্যের হিতার্থে) কর্তব্যকর্ম করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

সাংসারিক বস্তুগুলিকে মূল্যবান মনে করার কারণেই কর্মযোগ (নিষ্কামভাবপূর্বক কর্তব্যকর্ম) পালন করা কঠিন বোধ হয়। আমরা যদি অন্যের কাছে কিছু আশা না করে শুধুমাত্র অন্যের হিতার্থে সব কাজ করা উচিত বলে স্বীকার করে নিই তাহলে তখনই আমাদের কর্মযোগ-পালনের পথ সহজ হয়ে যায়।

প্রকৃতপক্ষে পদার্থগুলির কোনো গুরুত্ব নেই, গুরুত্ব আছে সেগুলির ব্যবহারের। আচরণের প্রভাবও তখনই প্রতিফলিত হয় যখন অন্তরে ওই পদার্থগুলির গুরুত্ব না থাকে। কোনো বস্তুই ব্যক্তিগত নয় শুধু ব্যবহারের জন্যই সেগুলি ব্যক্তিগত। বস্তুগুলিকে ব্যক্তিগত বলে মনে করলেই অন্যের হিতার্থে সেগুলি ত্যাগ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কোনো পদার্থ বা ক্রিয়াই বন্ধনকারক নয়, সেগুলির সম্বন্ধই হল বন্ধনকারক।

বিদ্বান ব্যক্তিদের দ্বারাও লোকসংগ্রহের জন্য সকল কর্ম হয়ে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও 'আমি লোকসংগ্রহ করছি'—এই অভিমান তাঁদের মধ্যে থাকে না। কারণ এই শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, বিদ্যা, যোগ্যতা, পদ আদি সমস্ত জগতের এবং জগৎ থেকেই পাওয়া। জগৎ হতে পাওয়া বস্তুসমূহ জগতের সেবাতে লাগানোই যথাযথ কর্ম। ওই বস্তুসমূহকে অত্যন্ত সততার সঙ্গে, মর্যাদার সঙ্গে জগতের জন্যই সমর্পণ করা উচিত। এই সমর্পণ তেমন কোনো মাহাত্ম্যব্যঞ্জক কর্ম নয়। যেমন, কেউ যদি আমার কাছে কিছু টাকা গচ্ছিত রাখে এবং কয়েকদিন পরে ফেরৎ চাইলে আমি যদি তাকে সেই টাকাটা ফেরৎ দিই, তাহলে তাতে কি এমন মহৎ কাজ করা হল ? হতে পারে, এতে আমার দায়িত্ব শেষ হল, আমি ঋণমুক্ত হলাম। এইরূপ জগতের বস্তুগুলি জগৎকে সমর্পণ করে দিলে আমার দায়িত্ব শেষ হয়, আমি ঋণমুক্ত হই—জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে চিরকালের জন্য মুক্তি পেয়ে যাই। সুতরাং সাংসারিক বস্তুগুলি জগতের কাজে লাগিয়ে কোনো দান-পুণ্য করা নয় বরং নিজেকে দায়মুক্ত করা হয়।

'ন বুদ্ধিভেদং ...... বিদ্বানযুক্তঃ সমাচরন্'— পঁচিশতম শ্লোকে **'অসক্তঃ'**, **'বিদ্বান্'** পদগুলির দ্বারা যার বর্ণনা করা হয়েছে, সেই আসক্তিশূন্য বিদ্বান ব্যক্তিকে এখানে **'যুক্তঃ বিদ্বান্'** পদটির দ্বারা বলা হয়েছে।

যাঁর অন্তরে সর্বদাই স্বাভাবিক সমত্ববোধ থাকে, যাঁর স্থিতি নির্বিকার, যিনি ইন্দ্রিয়াদিকে জয় করেছেন এবং যাঁর কাছে মাটি, পাথর ও স্বর্ণ সমান, এইরূপ তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষকেই **'যুক্তঃ বিদ্বান্'** বলা হয় (গীতা ৬।৮)।

পূর্বের (পঁচিশতম) শ্লোকে **'সক্তাঃ, অবিদ্বাংসঃ'** পদ দ্বারা যাঁর বর্ণনা করা হয়েছে, সেই শাস্ত্রবিহিত শুভকর্মে আসক্তিসম্পন্ন অজ্ঞ ব্যক্তিদের এইস্থানে **'কর্মসঙ্গিনাম্, অজ্ঞানাম্'** পদটি দ্বারা বলা হয়েছে।

শাস্ত্রবিহিত কর্মগুলি নিজের জন্য (সুখভোগ, মান-

মর্যাদা ইত্যাদি প্রাপ্তির আশায়) করার কারণে এই ব্যক্তিদের 'কর্মসঙ্গী' এবং 'অজ্ঞানী' বলা হয়েছে।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের বিশেষ দায়িত্ব থাকে কারণ অন্য ব্যক্তিরা তাঁদের স্বাভাবিকভাবেই অনুসরণ করে থাকে। সেইজন্য ভগবান উপরিউক্ত পদটির দ্বারা বিদ্বান ব্যক্তিদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে তাঁরা যেন এমন কোনো আচরণ না করেন বা এমন কোনো কথা না বলেন যাতে অজ্ঞ (কামনাযুক্ত) ব্যক্তিদের বর্তমান স্থিতি থেকে পতন হয়। অজ্ঞ ব্যক্তি বর্তমানে যে স্থিতিতে আছে, সেই স্থিতি থেকে তাকে বিচলিত করাই (পতন ঘটানো) তার মধ্যে 'বুদ্ধিভেদ' উৎপন্ন করা। সুতরাং বিদ্বান ব্যক্তির সকলের প্রতি হিতের ভাব রেখে নিজ বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুযায়ী শাস্ত্রবিহিত শুভকর্মের আচরণ করা উচিত, যাতে অন্য ব্যক্তিদের মধ্যেও নিষ্কামভাবে কর্তব্যকর্ম করার প্রেরণা জাগে। সমাজ এবং পরিবারের প্রধান ব্যক্তিদের জন্যও একথা প্রযোজ্য। তাঁদেরও নিজ কর্তব্যকর্ম সাবধানতার সঙ্গে যথাযথ পালন করা উচিত, যাতে সমাজ এবং পরিবারের ওপর তার ভালো প্রভাব পড়ে।

বুদ্ধিভেদ উৎপন্ন করার কিছু উদাহরণ হচ্ছে এইরূপ—

১) 'কর্মে কী আছে ? কর্ম দ্বারা জীব আবদ্ধ হয়, কর্ম অতি নিকৃষ্ট ; কর্ম ত্যাগ করে জ্ঞানে মনোনিবেশ করা উচিত' ইত্যাদি উপদেশ দেওয়া বা এইভাবে নিজ আচরণ বা বাক্য দ্বারা অন্যের মনে কর্তব্যকর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা-অবিশ্বাস উৎপন্ন করা।

২) 'যেখানেই দেখো, সেখানেই স্বার্থ, স্বার্থ ছাড়া কেউ থাকতেই পারে না। সকলেই স্বার্থের জন্য কর্ম করে, মানুষ যে কাজই করুক না কেন, তাতে ফলের আশা থাকেই, ফলের আশা না থাকলে সে কাজ করবেই বা কেন ?' ইত্যাদি উপদেশ দেওয়া।

৩) 'ফলের আশা করে (নিজের জন্য) কর্ম করলে (ফল ভোগ করার জন্য) বারংবার জন্মগ্রহণ করতে হয়' ইত্যাদি উপদেশ প্রদান। এইপ্রকার উপদেশের ফলে কামনাশীল ব্যক্তিদের কর্মফলের ওপর বিশ্বাস থাকে না। তার ফলে তাঁদের (ফলের) আসক্তি তো দূর হয় না, বরং শুভকর্মগুলি অনিবার্যভাবে পরিত্যক্ত হয়। আসক্তিই বন্ধনের কারণ, কর্ম নয়। এইভাবে লোকের মনে বুদ্ধিভেদ উৎপন্ন না করে, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির উচিত হল নিজ বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুসারে কর্তব্যকর্ম করা এবং অপরকেও সেইভাবে করতে উদ্দীপিত করা। তাঁর উচিত নিজ আচরণ বা বাক্যে অজ্ঞ ব্যক্তিদের বুদ্ধিভ্রম না ঘটিয়ে বর্তমান স্থিতি থেকে তাদের ক্রমশঃ উচ্চ স্থিতিতে উত্তরিত করা। যে শাস্ত্রবিহিত শুভকর্ম অজ্ঞ ব্যক্তিরা ইদানীং করে থাকে তাঁরা যেন সেইগুলিকে বিশেষভাবে প্রশংসা করেন এবং তাদের কর্মে যে ভুলত্রুটি থাকে সেগুলি তাদের অবগত করান যাতে তারা সেই ত্রুটিগুলি সংশোধনপূর্বক যথাবিধি কর্ম পালন করতে সক্ষম হয়। এ ছাড়াও জ্ঞানী ব্যক্তির এরূপ উপদেশ দেওয়া উচিত যে, যজ্ঞ, দান, পূজা, পাঠ ইত্যাদি শুভকর্ম করা খুবই ভালো, তবে ওইসব কর্মে ফলের আশা করা উচিত নয় কারণ পাথরের বিনিময়ে হীরে বিক্রি করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। সুতরাং সকামভাব পরিত্যাগ করে শুভকর্ম করলে লাভই হয়ে থাকে। এইভাবে সকামভাব দ্বারা নিষ্কামভাবের দিকে অগ্রসর হওয়া বুদ্ধিভেদ নয়, বরং বাস্তবিকতা।

অনুরূপভাবে উপাসনার ব্যাপারেও তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির বুদ্ধিভেদ উৎপন্ন করা উচিত নয়। যেমন, লোকে প্রায়শই বলে থাকে যে নাম-জপের সময় ভগবানে মন না রাখলে নাম-জপ ব্যর্থ হয়। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির এই কথা না বলে বলা উচিত যে নাম-জপ কখনো ব্যর্থ হতে পারে না। কারণ ভগবানের প্রতি কিছু না কিছু ভাব থাকলেই নাম-জপ সম্ভব হয়। ভাব না থাকলে নাম-জপে প্রবৃত্তিই হয় না। সুতরাং কোনো অবস্থাতেই নাম-জপ পরিত্যাগ করা উচিত নয়। এই যে বলা হয়েছে যে **'মনুবাঁ তো চহুঁ দিসি ফিরৈ, য়হ তো সুমিরন নাহিঁ'** এরও অর্থ হল এই যে মন না লাগলে এটি স্মরণ নয়, কিন্তু 'জপ' তো বটেই। অবশ্য মনোনিবেশ-পূর্বক ধ্যান ও নাম-জপ করলে খুব তাড়াতাড়ি লাভ হয়।

কোনো ব্যক্তিই সর্বতোভাবে গুণরহিত হয় না, কিছু না কিছু গুণ তার মধ্যে থাকেই। তাই তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষের কোনো ব্যক্তিকে (তার উন্নতির জন্য) কোনো শিক্ষা দিতে হলে বা কিছু বোঝাতে গেলে তাকে নিন্দা বা অপমান না করে তার গুণের প্রশংসা করা উচিত। গুণের প্রশংসা করে স্নেহের সঙ্গে তাকে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তার উপর সেই শিক্ষার প্রভাব বিশেষভাবে পড়ে। সমাজ ও পরিবারের প্রধান ব্যক্তিদেরও এই রীতিতে অন্যকে শিক্ষা দান করা উচিত।

'সমাচরন্' এবং **'জোষয়েৎ'** পদ দুটির দ্বারা ভগবান

বিদ্বানদের দুটি নির্দেশ দিয়েছেন—(১) নিজে সাবধানতা সহকারে শাস্ত্রবিহিত কর্মগুলি ভালোভাবে করা এবং (২) কর্মে আসক্ত অজ্ঞ ব্যক্তিদেরও ওইভাবে কর্ম করানো। অপরকে দেখিয়ে যে কর্ম করা হয়, তাকে বলে দম্ভ, যা পতনকারী, আসুরী-সম্পদের লক্ষণ (গীতা ১৬।৪)। সুতরাং লোক দেখানোর জন্য নয়, বরং লোকসংগ্রহের উদ্দেশ্যেই কর্তব্যকর্ম করার নির্দেশ ভগবান দিয়েছেন।

কর্ম করাতে নিজের কোনো প্রয়োজন না থাকলেও তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির উচিত সমস্ত কর্তব্যকর্ম সুচারুরূপে পালন করা, যাতে কর্মে আসক্ত ব্যক্তির নিষ্কাম কর্মের প্রতি মহৎ বুদ্ধি জাগ্রত হয় এবং তারাও নিষ্কামভাবে কর্ম করতে প্রেরণা লাভ করে। এর তাৎপর্য হল যাতে ওই মহাপুরুষের আসক্তিশূন্য ব্যবহার দেখে অন্যান্য ব্যক্তিগণও ওইরূপ ব্যবহার করতে চেষ্টা করেন।

এইরূপে জ্ঞানী ব্যক্তিদের উচিত তাঁরা যেন কর্মে আসক্ত ব্যক্তিদের সশ্রদ্ধভাবে বুঝিয়ে তাদের নিষিদ্ধ কর্মগুলি স্বরূপত (সর্বতোভাবে) পরিত্যাগ করান এবং বিহিত কর্মে সকামভাব ত্যাগ করার প্রেরণা দেন।

পরিশিষ্ট-ভাব—তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষ এবং ভগবান—উভয়েরই কোনো কর্তৃত্বাভিমান থাকে না। সুতরাং তাঁরা লোকসংগ্রহের জন্যই কর্তব্যকর্ম করে থাকেন, নিজেদের জন্য নয়। সাধকদেরও নিজেদের জন্য কিছু করা উচিত নয়, কেননা স্বরূপে কোনো কর্তৃত্ব নেই। সাধারণ লোকেদের উন্মার্গ (বিপথ) থেকে সরিয়ে সন্মার্গে (সৎপথে) নিয়ে আসাকেই বলা হয় লোকসংগ্রহ। লোকসংগ্রহের উপায় হল — শাস্ত্রানুযায়ী আচরণ করা এবং অন্তরে সাধক এমন ভাব পোষণ করবেন যে, আমি সাধক, আমার নিজের জন্য কিছুই করার নেই। তিনি লোকেদের মধ্যে একথা প্রচার করবেন না যে, আমি নিজের জন্য কিছু করি না।

* * *

সম্বন্ধ—জ্ঞানী এবং অজ্ঞ ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য কী ?—পরবর্তী শ্লোকটিতে ভগবান তা জানাচ্ছেন।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে॥ ২৭ ॥

[**কর্মাণি** (সকল কর্ম) ; **সর্বশঃ** (সর্বপ্রকারে) ; **প্রকৃতেঃ গুণৈঃ** (প্রকৃতির গুণগুলির দ্বারা) ; **ক্রিয়মাণানি** (করা হয়ে থাকে) ; **অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা** (অহংকারমোহিত অন্তঃকরণবিশিষ্ট অজ্ঞ ব্যক্তি) ; **ইতি মন্যতে** (মনে করে যে) ; **অহম্** (আমিই) ; **কর্তা** (কর্তা !)]

সকল কর্ম সর্বতোভাবে প্রকৃতির গুণগুলির দ্বারা সম্পন্ন হয় ; কিন্তু অহংকারে মোহান্ধ অজ্ঞ ব্যক্তি মনে করে 'আমিই কর্তা' ॥ ২৭ ॥

ব্যাখ্যা—**'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ'**— যে অখণ্ড (সমষ্টি) শক্তির সাহায্যে শরীর, বৃক্ষ ইত্যাদি জন্ম নেয় এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও বিলুপ্ত হয়, গঙ্গা ইত্যাদি নদীসকল প্রবাহিত হয়, গৃহাদি পদার্থগুলির মধ্যে পরিবর্তন হয়, সেই সমষ্টিশক্তির সহায়তাতেই মানুষের দেখা, শোনা, খাওয়া ইত্যাদি সকল ক্রিয়া হয়ে থাকে। কিন্তু মানুষ অহংকারে মোহগ্রস্ত হয়ে অজ্ঞতাবশতঃ এক সমষ্টি শক্তি দ্বারা হওয়া ক্রিয়াগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করে নেয়—এক, স্বাভাবিকভাবে হতে থাকা ক্রিয়াগুলি, যেমন—শরীরের গঠন, খাদ্য হজম ইত্যাদি ; আর দুই, জ্ঞানপূর্বক হওয়া ক্রিয়াগুলি ; যেমন—দেখা, কথা বলা, খাওয়া ইত্যাদি। জ্ঞানপূর্বক হওয়া ক্রিয়াগুলিকে মানুষ অজ্ঞতাবশতঃ নিজের দ্বারা কৃত বলে মনে করে।

প্রকৃতি থেকে জাত গুণগুলির (সত্ত্ব-রজ-তমের) কার্য হওয়ায় বুদ্ধি, অহংকার, মন, পঞ্চমহাভূত, দশ ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়াদির পাঁচটি বিষয়—এগুলিকেও প্রকৃতির গুণ বলা হয়। উপরের পদটিতে ভগবান স্পষ্টরূপে জানিয়েছেন যে, সমস্ত ক্রিয়াই (সমষ্টিরই হোক বা ব্যষ্টির) প্রকৃতির গুণাদির দ্বারাই সংঘটিত হয়, স্বরূপের দ্বারা নয়।

'অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা'—অন্তরের একটি বৃত্তির নাম হল **'অহংকার'**। 'স্বয়ং' (স্বরূপ) হলেন সেই বৃত্তির জ্ঞাতা। কিন্তু ভ্রমবশতঃ 'স্বয়ং'কে ওই বৃত্তির সঙ্গে এক করে নিলে

অর্থাৎ ওই বৃত্তিকেই নিজ স্বরূপ বলে মনে করলে, তাকে (সেই মানুষকে) বিমূঢ়াত্মা বলা হয়।

যেমন শরীর হল **'ইদম্'** (এই), তেমনি অহংকারও হল **'ইদম্'** (এই)। **'ইদম্'** (এই) কখনো **'অহম্'** (আমি) হতে পারে না এই হল সিদ্ধান্ত। মানুষ যখন ভ্রমবশতঃ **'ইদম্'**কে **'অহম্'** অর্থাৎ 'এই'টিকে 'আমি' বলে মেনে নেয়, তখনই তাকে **'অহংকার বিমূঢ়াত্মা'** বলা হয়। এই মেনে নেওয়া অহংকার কোনো উদ্যমের প্রভাবে দূর হয় না, কারণ সেই উদ্যমের মধ্যেও অহংকার থেকে যায়। এই মেনে নেওয়া অহংকার দূর হয় একমাত্র অস্বীকৃতি দ্বারা অর্থাৎ মেনে না নিলেই।

বিশেষ কথা

'অহম্' দু'প্রকারের হয়—(১) প্রাকৃত (আধাররূপ) 'অহম্'[১] ; যেমন 'আমি আছি' (নিজ সত্তামাত্র)। (২) অপ্রাকৃত (মেনে নেওয়া) 'অহম্' ; যেমন 'আমি এই শরীর'।

'বাস্তবিক অহং' হল স্বাভাবিক ও নিত্য এবং 'অবাস্তবিক অহং' হল অস্বাভাবিক এবং অনিত্য। সুতরাং 'বাস্তবিক অহং' বিস্মৃত হতে পারে, কিন্তু তা কখনো নষ্ট হতে পারে না। 'অবাস্তবিক অহং' প্রতীত হলেও, এটি কখনও স্থায়ী হতে পারে না। মানুষ এই ভুল করে যে সে 'বাস্তবিক অহম্' (নিজ স্বরূপ) বিস্মৃত হয়ে 'অবাস্তবিক অহম্' (আমি এই শরীর) কে-ই সত্য বলে মেনে নেয়।

'কর্তাহমিতি মন্যতে'—যদিও সকল কর্ম সর্বপ্রকারে প্রকৃতির গুণাদির দ্বারাই সংঘটিত হয়ে থাকে, তবুও অহংকারে বিমুগ্ধচিত্ত অজ্ঞ ব্যক্তি কোনো কোনো কর্মের কর্তা হিসাবে নিজেকে মেনে নেয়। কারণ সে অহংকারকেই (অহংকর্তৃত্ব বোধ) নিজ স্বরূপ বলে মনে করে। অহংকর্তৃত্ববশতই মানুষ শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন ইত্যাদিতে 'আমিত্ব' করে নেয় এবং ওই (শরীরাদির) ক্রিয়াগুলির কর্তা হিসাবে নিজেকে মেনে নেয়। এই বিপরীত ভাবার কাজ মানুষ নিজেই করেছে, তাই এটিকে দূর করতে কেবল সেই পারে। এটি দূর করার উপায় হল —বিচার-বিবেচনাপূর্বক না মানা, কারণ মেনে নেওয়ার (মান্যতা) দ্বারাই মেনে নেওয়া (মান্যতা) দূর করা যায়।

'করা' এক ব্যাপার, 'না-করা' আর এক ব্যাপার। 'করা' যেমন একটি ক্রিয়া, তেমনি 'না-করা'ও একটি ক্রিয়া। ঘুমানো, জেগে থাকা, বসা, চলা, সমাধিস্থ হওয়া এ সবই ক্রিয়া। ক্রিয়ামাত্রই প্রকৃতিতে হয়ে থাকে। **'স্বয়ং'**-এ (চেতন স্বরূপে) করা এবং না-করা— কোনোটিই নেই। কারণ চেতনতত্ত্ব এই দুইয়েরই অতীত। তিনি অক্রিয় এবং সবকিছুর প্রকাশক। 'স্বয়ং'-এ যদি ক্রিয়া সংঘটিত হত, তাহলে তিনি ক্রিয়ার (শরীরাদির পরিবর্তনরূপ ক্রিয়াগুলির) জ্ঞাতা কী করে হতেন ? করা বা না-করা সেখানেই সম্ভব যেখানে 'অহম্' (আমি) থাকে। 'অহম্' না থাকলে ক্রিয়ার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকে না। করা এবং না-করা—দুই-ই যাঁর দ্বারা প্রকাশিত হয়, সেই অক্রিয় তত্ত্বে (নিজ স্বরূপে) মানুষের স্বাভাবিক স্থিতি থাকে। কিন্তু 'অহং'বশতঃ মানুষ প্রকৃতিতে সংঘটিত ক্রিয়াগুলির সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করে নেয়। প্রকৃতির (জড়ের) সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ককেই 'অহম্' বলা হয়।

মর্মকথা

যেমন সমুদ্রেরই অংশ হওয়ায় সমুদ্রের ঢেউ এবং সমুদ্রের মধ্যে স্ব-জাতীয় ঐক্য থাকে অর্থাৎ ঢেউ যে জাতির সেই জাতিরই হল সমুদ্র, সেইরূপ জগতেরই অংশ হওয়ায় শরীরের জগতের সঙ্গে স্বজাতীয় ঐক্য আছে। মানুষ জগৎসংসারকে 'আমি' বলে মনে করে না, কিন্তু ভ্রমবশতঃ শরীরকে 'আমি' বলে মনে করে।

যেমন সমুদ্র ছাড়া ঢেউ-এর কোনো পৃথক অস্তিত্ব নেই, তেমনই জগৎ-সংসার ছাড়া শরীরেরও কোনো পৃথক অস্তিত্ব নেই। কিন্তু অহংকারে বিমুগ্ধচিত্ত মানুষ যখন শরীরকে 'আমি' (নিজ স্বরূপ) বলে মেনে নেয়, তখন

[১]এখানে যাকে 'বাস্তবিক অহম্' বলা হয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে 'অহম্' নয়। তা হল সৎ-রূপ, চিৎ-রূপ তত্ত্ব। এটিকে 'বাস্তবিক অহম্' এইজন্য বলা হয়েছে যে এটি কখনো পরিবর্তিত হয় না। কিন্তু 'অবাস্তবিক অহম্' পরিবর্তিত হয়। যেমন কোনো ব্যক্তি অশিক্ষিত হলে, সে বলে, আমি মূর্খ, নিরক্ষর আর পড়াশোনা শিখে সেই বলে যে, 'আমি বিদ্বান, শিক্ষিত'। এইরূপ 'অহম্'-এর পরিবর্তনেও নিজ সত্তা ('আমি আছি') পরিবর্তিত হয় না। মেনে নেওয়া 'অহম্'-এর সঙ্গে সর্বদা থাকা সেই সত্তাকে বলা হয় 'বাস্তবিক অহম্'। মেনে নেওয়া 'অহম্'-এর সঙ্গ বর্জিত হলেই অর্থাৎ ওখান থেকে দৃষ্টি সরে গেলেই সেই 'বাস্তবিক অহম্' সচ্চিদানন্দ স্বরূপ হয়ে যায়।

তার মধ্যে নানাপ্রকার কামনা উৎপন্ন হতে থাকে ; যেমন 'আমার যেন স্ত্রী, পুত্র, অর্থ ইত্যাদি লাভ হয়', 'লোকে আমাকে যেন ভালো বলে মনে করে', 'আমাকে যেন শ্রদ্ধা ও সম্মান করে', 'আমার মতানুযায়ী যেন চলে' ইত্যাদি। তার এদিকে দৃষ্টিই যায় না যে শরীরকে নিজ স্বরূপ বলে মনে করে সে প্রথম থেকেই আবদ্ধ হয়ে রয়েছে, আবার কামনা বাসনার দ্বারা সেই বন্ধন দৃঢ়তর করছে, নিজেকে বিপদের দিকে নিয়ে যাচ্ছে!

সাধনার সময়ে 'আমি (স্বয়ং) প্রকৃতিজনিত গুণাগুণ হতে সম্পূর্ণরূপে অতীত'—এরূপ অনুভব না হওয়া সত্ত্বেও সাধক যখন সেরকম মনে করেন, তখন তাঁর ওইরূপ অনুভবই হয়ে যায়। এইভাবে তিনি যেমন ভুল মান্যতা করে আবদ্ধ হয়েছিলেন তেমনভাবেই সঠিক মান্যতা করে তিনি মুক্ত হয়ে যান, কারণ সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে মেনে নেওয়া ব্যাপারকে না মানলেই তা মিটে যায়। এই কথাই ভগবান পঞ্চম অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে—**'নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ'** পদটিতে **'মন্যেত'** পদ দ্বারা প্রকটিত করেছেন যে 'আমি কর্তা'—এই অবাস্তবিক মান্যতা দূর করার জন্য 'আমি কিছুই করি না'—এরূপ মান্যতা করা প্রয়োজন।

'আমি শরীর, আমি কর্তা' ইত্যাদি অসত্য স্বীকৃতিগুলিও এত দৃঢ় হয়ে যায় যে সেগুলি ত্যাগ করা কঠিন মনে হয়। তাহলে 'আমি শরীর নই ; আমি অকর্তা' ইত্যাদি সত্যকার স্বীকৃতিগুলি কেন দৃঢ় হবে না ? আর যদি একবার ঠিকভাবে দৃঢ়তা লাভ করে তাহলে তা দূর হবে কীভাবে ?

পরিশিষ্ট-ভাব— জড় বিভাগেই সমস্ত কর্ম সম্পাদিত হয়। চেতন বিভাগে কখনোই বিন্দুমাত্র কোনো ক্রিয়া হয় না। চিত্ত অহংকারে মোহগ্রস্ত হওয়ায় অজ্ঞানী ব্যক্তিরা মনে করে যে 'আমিই কর্তা'। 'অহং দ্বারা বিমূঢ় চিত্ত' কথার তাৎপর্য এই যে, অপরা প্রকৃতির অংশ যে অহং তার সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ স্বীকার করা অর্থাৎ অহংকেই নিজের স্বরূপ বলে মেনে নেওয়া যে এটিই 'আমি'। একেই তাদাত্ম্য বলে।

নিজেকে যে কর্তা বলে মানে, প্রকৃতপক্ষে সে চেতন কিন্তু জড় অহংকে নিজের স্বরূপ বলে মেনে নেয়। তাৎপর্য হল যে, অহংকে যাঁরা নিজ স্বরূপ বলে মানেন, নিজেকে একদেশীয় (পরিচ্ছিন্ন) বলে মনে করেন তাঁরা স্বয়ং পরমাত্মারই অংশ। সেই স্বয়ং-এ (পরমাত্মার অংশে) কর্তাভাব থাকা সম্ভবপরই নয় (গীতা ১৩।২৯)। বাস্তবে স্বয়ং কখনো শরীরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে পারে না **'শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে'** (গীতা ১৩।৩১), কিন্তু মানুষ একাত্ম বলে মেনে নেয়—**'কর্তাহমিতি মন্যতে'**। আসলে তাদাত্ম্য হয় না, তাদাত্ম্য মেনে নেওয়া হয়। তাৎপর্য হল যে স্বয়ং কর্তা হন না, বিবেক-বুদ্ধিপূর্বক বিবেচনা না করে নিজের মধ্যে কর্তাভাব মেনে নেন— **'মন্যতে'**। নিজেকে কর্তা বলে মনে করলেই তার ওপর শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ জারি হয়ে যায় এবং তাকে কর্মের ফলভোগ করতে হয়।

স্ব-স্বরূপের (স্বয়ং) কোনো ক্রিয়া নেই। ক্রিয়া সেখানেই হওয়া সম্ভব, যেখানে শূন্যস্থান থাকে। সর্বতোভাবে পূর্ণ স্বরূপে কর্ম কোথায় হবে ? কিন্তু নিজেকে কর্তা বলে মনে করলে, সে প্রকৃতির যে ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, সেই ক্রিয়া তার জন্য ফলরূপ 'কর্ম' হয়ে ওঠে। যার ফল তাকে ভোগ করতেই হয়। কারণ কর্তাকেই ভোক্তা হতে হয়।

কারকমাত্রেরই স্বরূপের সঙ্গে সর্বতোভাবে সম্পর্ক-বিচ্ছেদ হয়। তাই স্বরূপে লেশমাত্রও কর্তৃত্ব থাকে না। কর্তৃত্বের ভাগ আলাদা। আজ পর্যন্ত দেবতা, মানুষ, পশু, পক্ষী, যক্ষ, রাক্ষস ইত্যাদি নানা শরীর দ্বারা যেসব কর্ম করা হয়েছে, তার কোনোটিই স্বরূপ পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়নি এবং কোনো শরীরও স্বরূপের কাছে পৌঁছয়নি, কারণ কর্ম এবং পদার্থ (শরীর), এই দুটি হল আলাদা বিষয় আর স্বরূপ হল পৃথক বিষয়। কিন্তু মানুষ এই ব্যাপারে গুরুত্ব না দেওয়ায় তারা কর্ম এবং ফলে আবদ্ধ হয়।

যতক্ষণ 'করা' আছে, ততক্ষণ অহংকারের সম্পর্ক বজায় থাকে, কারণ অহংকার (কর্তৃত্ব ভাব) ব্যতীত 'করা' সিদ্ধ হয় না। করার অহংকার হলেই কর্তৃত্বাভিমান এসে যায়। কর্তৃত্বাভিমান হলে 'করা' হয় এবং (কর্ম) করলে কর্তৃত্বাভিমান পুষ্ট হয়। তাই কোনো কিছু করার দ্বারা সাধক কখনো অহংকাররহিত হতে পারেন না। অহংকার সহকারে করা কর্ম কখনো কল্যাণ সাধন করে না, কেননা অহংকারই সর্ব অনর্থের এবং জন্ম-মৃত্যুর মূল কারণ। নিজের জন্য কিছু না করলে অহংকারের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে না অর্থাৎ প্রকৃতি মাত্র থেকেই সম্পর্ক ছিন্ন হয়। তাই সাধকদের উচিত কর্মকে গুরুত্ব না

দিয়ে নিজের বিবেককে গুরুত্ব দেওয়া। বিবেককে গুরুত্ব দিলে বিবেক স্বতঃসিদ্ধ ভাবে স্পষ্ট হতে থাকে এবং সাধককে মার্গ (পথ) দর্শন করায়। পরিণামে এই বিবেকই তত্ত্বজ্ঞানে পরিণত হয়।

***

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে।। ২৮ ।।

[তু, মহাবাহো (কিন্তু হে মহাবাহো !) ; গুণকর্ম, বিভাগয়োঃ (গুণবিভাগ ও কর্মবিভাগ) ; তত্ত্ববিৎ (তত্ত্বতঃ যে মহাপুরুষ জেনেছেন) ; গুণাঃ (সমস্ত গুণ) ; গুণেষু (গুণগুলিতে) ; বর্তন্তে (আবর্তিত হয়) ; ইতি, মত্বা (এরূপ মেনে নিয়ে) ; ন, সজ্জতে (সেগুলিতে আসক্ত হন না।)]

হে মহাবাহো ! যে মহাপুরুষ গুণবিভাগ এবং কর্মবিভাগকে তত্ত্বতঃ জেনেছেন, তিনি 'সমস্ত গুণই গুণগুলিতে প্রবৃত্ত হয়'—এইরূপ মেনে নিয়ে সেগুলিতে আসক্ত হন না ॥ ২৮ ॥

ব্যাখ্যা—**'তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ'**— আগের শ্লোকে বর্ণিত **'অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা'** (অহংকারে বিমুগ্ধচিত্ত ব্যক্তি) থেকে তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক এবং বিশেষরূপে জানাবার জন্য এখানে 'তু' পদটি প্রযুক্ত হয়েছে।

সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ—এই তিনটি প্রকৃতিজনিত গুণ। এই তিনটি গুণের কার্য হওয়ায় সমস্ত সৃষ্টি হল ত্রিগুণাত্মিকা। সুতরাং শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, প্রাণী, পদার্থ ইত্যাদি সমস্ত পদার্থ হচ্ছে গুণময় ; একেই 'গুণ-বিভাগ' বলা হয়। এর (শরীরাদি) দ্বারা হওয়া ক্রিয়াকে 'কর্মবিভাগ' বলা হয়।

গুণ এবং কর্ম অর্থাৎ পদার্থ এবং ক্রিয়া নিরন্তর পরিবর্তনশীল। পদার্থ উৎপত্তি ও বিনাশশীল এবং ক্রিয়াগুলির আরম্ভ ও শেষ থাকে। এই সত্য ঠিকমতো অনুভব করাই হল গুণ এবং কর্মবিভাগকে তত্ত্বতঃ জানা। চেতনে (স্বরূপে) কখনো কোনো ক্রিয়া হয় না, তা সদা নির্লিপ্ত নির্বিকার থাকে অর্থাৎ তার কখনো প্রাকৃত পদার্থ বা ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক হয় না। এগুলি ঠিকভাবে অনুভব করাই হল চেতনকে তত্ত্বতঃ জানা।

অজ্ঞ ব্যক্তি যখন এই গুণবিভাগ এবং কর্মবিভাগের সঙ্গে নিজ সম্বন্ধ মেনে নেয়, তখন সে আবদ্ধ হয়ে যায়। শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে এই বন্ধনের প্রধান কারণ 'অজ্ঞানতা' হলেও, সাধকের দৃষ্টিতে 'আসক্তি'ই হল এর প্রধান কারণ। এই আসক্তি অবিবেক থেকে উৎপন্ন হয়। বিবেক জাগরিত হলে আসক্তির নাশ হয়। মানুষের মধ্যে এই বিবেক থাকে এক বিশেষরূপে। গুরুত্ব সহকারে এই বিবেককে জাগরিত করাই হচ্ছে প্রধান কাজ। সুতরাং সাধকের (বিবেককে জাগ্রত করে) বিশেষভাবে এই আসক্তি দূর করা উচিত।

তত্ত্ব জিজ্ঞাসু সাধকও যদি গুণ (পদার্থ) এবং কর্মতে (ক্রিয়া) নিজের কোনো সম্পর্ক স্বীকার না করেন, তাহলে তিনিও গুণবিভাগ এবং কর্মবিভাগকে তত্ত্বতঃ জানতে পারেন। গুণবিভাগ এবং কর্মবিভাগকে তত্ত্বগতভাবে জানা এবং 'স্বয়ং'কে (চেতন স্বরূপ) তত্ত্বগতভাবে জানা, দুইয়ের পরিণাম একই হবে।

গুণ-কর্মবিভাগকে তত্ত্বতঃ জানার উপায়

১) শরীরে অবস্থিত থেকেও চেতন-তত্ত্ব (স্বরূপ) সর্বদা অক্রিয় এবং নির্লিপ্ত থাকে (গীতা ১৩।৩১)। প্রকৃতির কার্যকে (শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদিকে) **'ইদম্'** (ইহা) বলা হয়। **'ইদম্'** (ইহা) কখনো **'অহম্'** (আমি) হয় না। যখন 'এটি' (শরীরাদি) 'আমি' নয় তখন 'এটি'তে হওয়া ক্রিয়াগুলিই বা 'আমার' কীভাবে হয় ? এর তাৎপর্য হল এই যে, শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি সবই প্রকৃতির কার্য এবং 'স্বয়ং' এগুলি হতে সর্বতোভাবে অসম্বন্ধ ও নির্লিপ্ত। সুতরাং এগুলির মধ্যে হওয়া ক্রিয়াগুলির কর্তা 'স্বয়ং' কীভাবে হতে পারে ? এইভাবে পদার্থ এবং ক্রিয়াগুলির থেকে যিনি নিজেকে পৃথক বলে অনুভব করেন, তিনি আর আবদ্ধ হন না। সকল অবস্থাতেই **'নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি'** (গীতা ৫।৮)

'আমি (স্ব-স্বরূপে) কিছুই করি না'—এরূপ অনুভব করাই হল নিজেকে ক্রিয়াগুলির থেকে পৃথক বলে জানা অর্থাৎ অনুভব করা।

(২) দেখাশোনা, খাওয়াদাওয়া ইত্যাদি সবই 'ক্রিয়া' আর দেখাশোনা ইত্যাদির বিষয়, খাওয়া-দাওয়ার সামগ্রী ইত্যাদি সমস্তই 'পদার্থ'। এই ক্রিয়া এবং পদার্থগুলি আমরা ইন্দ্রিয় (চোখ, কান, মুখ ইত্যাদি) দ্বারা জানি। ইন্দ্রিয়গুলি 'মন' দ্বারা, মনকে 'বুদ্ধি' দ্বারা এবং বুদ্ধিকে মেনে নেওয়া অহং (আমিত্ব) দ্বারা জানা যায়। এই 'অহম্'ও একটি সাধারণ প্রকাশ (চেতন) দ্বারা প্রকাশিত হয়। এই সর্বব্যাপী প্রকাশই সবকিছুর জ্ঞাতা, সবকিছুর প্রকাশক এবং সবকিছুর আধার।

'অহম্' এর অতীত নিজ স্বরূপকে (চেতন) কীভাবে জানা যায় ? গভীর নিদ্রায় যদিও বুদ্ধি অবিদ্যায় লীন হয়, তাহলেও মানুষ ঘুম থেকে জেগে উঠে বলে, 'আমি খুব আরামে ঘুমিয়েছি'। এইরূপ জেগে ওঠার পর 'আমি আছি' অনুভবটি সকলেরই হয়ে থাকে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে সুষুপ্তিতে নিজের অস্তিত্ব ছিল। তা যদি না হত, তাহলে 'আমি আরামে নিদ্রা গিয়েছি' ; 'আমি কিছুই জানতে পারিনি'— এরূপ স্মৃতি বা অনুভূতি হত না। স্মৃতি হয় অনুভূতি থেকেই[১]। সুতরাং সকলের সব অবস্থাতেই নিজ অস্তিত্বের অখণ্ড অনুভূতি হয়ে থাকে। কোনো অবস্থাতেই নিজ অস্তিত্বহীনতার ('আমি নেই') অনুভূতি হয় না। যিনি এই মেনে নেওয়া 'অহম্' (অহংবোধ) থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করে নিজ স্বরূপকে ('আছি') অনুভব করেছেন, তাঁকে 'তত্ত্ববিৎ' বলা হয়।

অপরিবর্তনশীল পরমাত্মতত্ত্বের সঙ্গে আমাদের স্বাভাবিকভাবে নিত্য সম্পর্ক থাকে। প্রকৃতপক্ষে এই পরিবর্তনশীল প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই, এটি কেবল মেনে নেওয়া সম্পর্ক। বিচারবিবেচনার দ্বারা প্রকৃতির সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক যখন ছেদ করা হয় তখন তাকে বলা হয় 'জ্ঞানযোগ'। আর যদি সেই সম্পর্ক পরহিতার্থে কর্ম করে ছেদ করা যায়, তাহলে তাকে বলা হয় কর্মযোগ। প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হলেই 'যোগ' (পরমাত্মার সঙ্গে নিত্য সম্পর্কের অনুভূতি) হয়। অন্যথায় শুধুমাত্র 'জ্ঞান' বা 'কর্ম'ই হয়ে থাকে। সুতরাং প্রকৃতি হতে সম্পর্ক-বিচ্ছেদপূর্বক পরমাত্মার সঙ্গে নিজ নিত্য সম্পর্ক উপলব্ধিকারী ব্যক্তিই হলেন 'তত্ত্ববিৎ'।

'গুণা গুণেষু বর্তন্তে'—প্রকৃতিজাত গুণাগুণ হতে উৎপন্ন হওয়ায় শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদিকেও 'গুণ'ই বলা হয় এবং এগুলির দ্বারাই সমস্ত কর্ম সংঘটিত হয়। বিবেক জাগ্রত না থাকার কারণে অজ্ঞ ব্যক্তি এই গুণগুলির সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করে এর দ্বারা সংঘটিত ক্রিয়াগুলির কর্তা হিসাবে নিজেকে মেনে নেয়[২]। কিন্তু স্বয়ং-এ (সামান্যরূপে বা সর্বানুস্যূত চেতন) নিজ স্বাভাবিক স্থিতি অনুভূত হলে 'আমি কর্তা'—এই ভাব আসতেই পারে না।

রেলগাড়ির ইঞ্জিন চলে অর্থাৎ তাতে ক্রিয়া হতে থাকে ; কিন্তু চলবার শক্তি আসে ইঞ্জিন এবং চালকের মিলিত শক্তি থেকে। আসলে গাড়িকে চালাবার শক্তি ইঞ্জিনেরই আছে, কিন্তু চালক সঞ্চালন না করা পর্যন্ত তা গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে সক্ষম হয় না। কারণ ইঞ্জিনে ইন্দ্রিয় বা মন, বুদ্ধি নেই, তাই তার ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধিসম্পন্ন চালক (মানুষ) প্রয়োজন। অনুরূপভাবে মানুষেরও শরীররূপ ইঞ্জিন আছে আর তা সঞ্চালনের জন্য ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধিও আছে। শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি—এই চারটি এক সর্বানুস্যূত (সর্বব্যাপী) প্রকাশ (চেতন) থেকে সত্তা এবং স্ফূর্তি পেলে তবেই কার্য করতে সমর্থ হয়। সর্বব্যাপী প্রকাশের (জ্ঞানের) প্রতিবিম্ব পড়ে বুদ্ধিতে, বুদ্ধির জ্ঞানকে মন গ্রহণ করে, ইন্দ্রিয়াদি গ্রহণ করে সেই মনের জ্ঞানকে, তখনই শরীররূপ ইঞ্জিন সঞ্চালিত হতে সক্ষম হয়। বুদ্ধি-মন-ইন্দ্রিয়াদি-শরীর— এ সবই গুণ এবং এগুলির প্রকাশক অর্থাৎ এগুলিকে অস্তিত্ব ও স্ফূর্তির যোগানদাতা 'স্বয়ং' এই গুণগুলি হতে সম্পর্কশূন্য এবং নির্লিপ্ত থাকেন। সুতরাং বাস্তবে সমস্ত গুণই গুণগুলিতে প্রবৃত্ত হচ্ছে।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের আচরণই সকলে অনুসরণ করে থাকে। তাই ভগবান জ্ঞানী মহাপুরুষদের দ্বারা কীভাবে

[১]অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ। (যোগদর্শন ১।১১)

[২]উদাহরণ—বাণী হল 'পদার্থ' ; বলার প্রবৃত্তি হচ্ছে 'ক্রিয়া' এবং বাক্য হয় সমষ্টি শক্তির দ্বারা অর্থাৎ গুণই গুণগুলির মধ্যে প্রবৃত্ত হচ্ছে। কিন্তু মানুষ অজ্ঞতাবশতঃ পদার্থ এবং ক্রিয়াকে নিজের বলে মনে করে নিজে কর্তা হয়ে যায়।

লোকসংগ্রহ হয়—তার বর্ণনা করতে গিয়ে জানাচ্ছেন যে, যেরূপ ওই মহাপুরুষগণ 'সমস্ত গুণই গুণগুলিতে আবর্তিত হচ্ছে'—এরূপ অনুভব করে তাতে আসক্ত হন না, সেইরূপ সাধকদেরও সেই প্রকার মেনে নিয়ে ওইগুলিতে আসক্ত হওয়া উচিত নয়।

প্রকৃতি ও পুরুষ সম্পর্কিত মর্মকথা

আকর্ষণ সর্বদা স্বজাতীয় বস্তুর মধ্যে হয়ে থাকে ; যেমন— কানের সম্পর্ক শব্দের সঙ্গে, ত্বকের সম্পর্ক স্পর্শের, চোখের সম্পর্ক রূপের, জিভের সম্পর্ক রসের সঙ্গে এবং নাকের গন্ধের প্রতি আকর্ষণ হয়। এইভাবে পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের নিজ নিজ বিষয়ের প্রতিই আকর্ষণ ঘটে থাকে। একই ইন্দ্রিয়ের অন্য ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে কখনো আকর্ষণ ঘটে না। তাৎপর্য হল এই যে একটি বস্তুর অপর বস্তুটির প্রতি আকর্ষণ হওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে দুটি বস্তুর মধ্যে স্বজাতীয়তা।

আকর্ষণ, প্রবৃত্তি এবং প্রবৃত্তির সিদ্ধি স্বজাতীয়ের মধ্যেই হয়ে থাকে। বিজাতীয় বস্তুগুলির মধ্যে আকর্ষণও হয় না, প্রবৃত্তিও হয় না এবং প্রবৃত্তির সিদ্ধিও হয় না। সেইজন্য আকর্ষণ, প্রবৃত্তি এবং প্রবৃত্তির সিদ্ধি স্বজাতীয়তার জন্য 'প্রকৃতি'তেই হয়। কিন্তু পুরুষ (চেতন)-এ বিজাতীয় প্রকৃতির (জড়ের) যে আকর্ষণ বোধ হয় তাতেও প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির অংশই প্রকৃতির দিকে আকর্ষণ করে। করা এবং ভোগ করা, এই দুটি ক্রিয়াই প্রকৃতির, পুরুষে নয়। পুরুষ (চেতন) সর্বদা নির্বিকার, নিত্য, অচল এবং একরস থাকেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের একত্রিশতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে শরীরে স্থিত হলেও (চেতন) পুরুষ প্রকৃতপক্ষে কিছু করেনও না বা লিপ্তও হন না— **'শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে।'** পুরুষ শুধুমাত্র প্রকৃতিস্থ হওয়ার ফলেই অর্থাৎ প্রকৃতির সঙ্গে তাদাত্ম্য করাতেই সুখ-দুঃখ ভোক্তৃত্বের হেতু বলে বলা হয়েছে—**'পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে'** (গীতা ১৩।২০) এবং **'পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্'** (গীতা ১৩।২১)। এর তাৎপর্য হল এই যে, যদিও সমস্ত ক্রিয়া এবং ক্রিয়ার সিদ্ধি ও আকর্ষণ প্রকৃতিতেই হয়, তা সত্ত্বেও প্রকৃতির সঙ্গে তাদাত্ম্য করায় মানুষ 'আমি সুখী', 'আমি দুঃখী'—এরূপ মেনে নিয়ে ভোক্তৃত্বের হেতু হয়ে যায়। কারণ সুখী বা দুঃখী হবার অনুভূতি প্রকৃতির (জড়ের) মধ্যে থাকতেই পারে না, এবং প্রকৃতি (জড়) ব্যতিরেকে কেবলমাত্র পুরুষ (চেতন) সুখ বা দুঃখের ভোক্তা হতে পারেন না।

পুরুষের মধ্যে প্রকৃতির পরিবর্তনশীল ক্রিয়া বা বিকার নেই ; কিন্তু তাঁর মধ্যে সম্পর্ক মানা বা না-মানার যোগ্যতা অবশ্যই থাকে। তিনি পাথরের মতো জড় নন, তিনি জ্ঞানস্বরূপ। পুরুষের মধ্যে যদি সম্পর্ক মানার বা না-মানার যোগ্যতা না থাকত, তাহলে তিনি কী করে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন ? প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে ক্রিয়াগুলির সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ কী করে মানেন এবং নিজেকে সেই কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বের সঙ্গে সম্পর্ক কীভাবে স্বীকার করেন। সম্পর্কগুলিকে মানা বা না-মানাকে 'ভাব' বলা হয়, 'ক্রিয়া' নয়।

পুরুষের সম্পর্ক স্থাপন করা অথবা না করার যোগ্যতা তো থাকে, কিন্তু ক্রিয়া করার যোগ্যতা তাঁর মধ্যে থাকে না। ক্রিয়া করার যোগ্যতা তারই থাকে, যার মধ্যে পরিবর্তন (বিকার) হয়। পুরুষে (চেতনে) পরিবর্তনের স্বভাব নেই, কিন্তু প্রকৃতিতে পরিবর্তনের স্বভাব বিদ্যমান অর্থাৎ প্রকৃতির ক্রিয়াশীলতা স্বাভাবিক ব্যাপার। সেইজন্য প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলেই পুরুষ (চেতন) নিজের মধ্যে ক্রিয়াশীলতাকে মেনে নেয়—**'কর্তাহমিতি মন্যতে'** (গীতা ৩।২৭)।

পুরুষের কোনো পরিবর্তন হয় না, এটি (পরিবর্তন না হওয়া) তাঁর কোনো অসামর্থ্য বা ঘাটতি নয়, বরং এটি তাঁর মহত্ত্ব। তিনি সর্বদা একরস, একরূপ থাকেন। পরিবর্তিত হওয়া তাঁর স্বভাবই নয় ; যেমন বরফের গরম হওয়ার স্বভাব বা যোগ্যতা নেই। পরিবর্তনরূপ ক্রিয়া হওয়া প্রকৃতিরই স্বভাব, পুরুষের নয়। কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন না করার পূর্ণ সামর্থ্য, যোগ্যতা এবং স্বাধীনতা এঁর আছে। কেননা প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির সঙ্গে মূলে এঁর সম্পর্ক (তাদাত্ম্য) নেই।

প্রকৃতির অংশ এই শরীরকে যখন পুরুষ নিজ স্বরূপ বলে মনে করেন, তখন প্রকৃতির ওই অংশে (স্বজাতীয় প্রকৃতির) আকর্ষণ, ক্রিয়া এবং তার ফল প্রাপ্তি হতে থাকে। এরই ইঙ্গিত করা হয়েছে **'গুণাঃ গুণেষু বর্তন্তে'** এই

পদটিতে। গুণেতেই নিজ স্থিতি মেনে নিয়ে পুরুষ (চেতন) সুখী বা দুঃখী হয়ে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে সুখ বা দুঃখের পৃথক কোনো অস্তিত্ব নেই। সেইজন্য ভগবান গুণগুলির সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক ছেদ করার জন্য বিশেষ জোর দিয়েছেন।

তত্ত্বের দৃষ্টিতে দেখা যায় যে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ আগের থেকেই (অনাদিকাল থেকে) হয়ে আছে। শুধু ভ্রমবশতঃ সম্বন্ধ মেনে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং এই মেনে নেওয়া সম্পর্ক অস্বীকার করে 'গুণই যে গুণগুলির মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে' এই বাস্তবিক ব্যাপারটিকেই কেবল উপলব্ধি করতে হবে।

'ইতি মত্বা ন সজ্জতে'—এখানে **'মত্বা'** পদটি 'জানা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষ প্রকৃতি (জড়) এবং পুরুষকে (চেতন) স্বাভাবিকভাবে পৃথকরূপে জানেন। সেইজন্য তিনি প্রকৃতিজনিত গুণগুলিতে আসক্ত হন না।

ভগবান **'মত্বা'** পদটির প্রয়োগ দ্বারা সাধকদের যেন এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁরাও প্রকৃতিজনিত গুণগুলিকে পৃথক মেনে নিয়ে সেগুলিতে যেন আসক্ত না হন।

বিশেষ কথা

কর্মযোগী এবং সাংখ্যযোগী—এই দুজনের সাধন-প্রণালীর মধ্যে একতা নেই। কর্মযোগী গুণগুলিতে (শরীরাদিতে) মেনে নেওয়া ঐক্য দূর করার চেষ্টা করে থাকেন। সেইজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে **'কর্মযোগস্তু কামিনাম্'** (১১।২০।৭) বলা হয়েছে। ভগবানও সেইজন্য কর্মযোগীর কর্ম করার প্রয়োজনীয়তার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন ; যেমন—'কর্ম আরম্ভ না করে মানুষ নৈষ্কর্ম প্রাপ্ত করতে পারে না' (গীতা ৩।৪) 'যোগারূঢ় হওয়ার ইচ্ছাসম্পন্ন মননশীল ব্যক্তির কর্ম করাই হেতু' (গীতা ৬।৩)। কর্মযোগী কর্ম করলেও তা নিজের জন্য করেন না, বরং অপরের হিতার্থে করে থাকেন ; সেইজন্য তিনি আর ভোক্তা হন না। ভোক্তা না হওয়ায় অর্থাৎ ভোক্তৃত্বের নাশ হলে স্বতঃ তার কর্তৃত্বের নাশ হয়। এর তাৎপর্য হল এই যে, কর্তৃত্বের মধ্যে যে কর্তাভাব থাকে তা ফলের জন্যই হয়ে থাকে। ফলের উদ্দেশ্য না থাকলে কর্তৃত্বভাব থাকে না। তাই বাস্তবে কর্মযোগীও কর্তা হতে পারেন না।

সাংখ্যযোগীর মধ্যে বিবেক এবং বিচারের প্রাধান্য থাকে। তিনি 'প্রকৃতিজনিত গুণই গুণগুলির মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে' এরূপ জেনে নিজেকে ওই ক্রিয়াগুলির কর্তা বলে মনে করেন না। এই কথাই ভগবান পরবর্তী ত্রয়োদশ অধ্যায়ের উনত্রিশতম শ্লোকে বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সমস্ত কর্ম সর্বপ্রকারে প্রকৃতির দ্বারাই ক্রিয়মান বলে দেখেন এবং 'স্বয়ং'কে (আত্মা) অকর্তারূপে অনুভব করেন তিনিই যথার্থদর্শী। সাংখ্যযোগী এইভাবে কর্তৃত্ব নাশ করেন। কর্তৃত্ব নাশ হলে ভোক্তৃত্ব স্বাভাবিকভাবে নাশ হয়।

তৃতীয় অধ্যায়ের আরম্ভেই ভগবান নানা উদাহরণ এবং দৃষ্টিকোণ দ্বারা কর্ম করার ওপর জোর দিয়েছেন ; যেমন—'জনক ইত্যাদি মহাপুরুষগণও নিষ্কামভাবে কর্ম করে পরমসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছেন' (৩।২০), 'আমিও কর্ম করে থাকি' (৩।২২) ; 'জ্ঞানী মহাপুরুষগণও অজ্ঞ ব্যক্তিদের ন্যায় লোকসংগ্রহার্থে কর্ম করে থাকেন' (৩।২৫-২৬)। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে সবদিক থেকে কর্ম করাই শ্রেয়।

পরিশিষ্ট-ভাব— যাঁরা অহংকারে মোহগ্রস্ত হন না, তাঁদের বলা হয় 'তত্ত্ববিৎ'। এই তত্ত্ববিৎকেই দ্বিতীয় অধ্যায়ের ষোড়শ শ্লোকে 'তত্ত্বদর্শী' বলা হয়েছে। তত্ত্ববিৎ গুণ ও কর্মবিভাগ অর্থাৎ পদার্থ ও ক্রিয়া থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হয়ে যান।

সাধকের যতক্ষণ জগতের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁকে 'তত্ত্ববিৎ' বলা যায় না। কেননা জগৎ-সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে কেউই জগৎকে জানতে সক্ষম হয় না। জগতের থেকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা হলে তবেই জগৎকে জানা সম্ভব হয়— এই হল নিয়ম। বিপরীতক্রমে পরমাত্মা থেকে পৃথক হয়ে কেউই পরমাত্মাকে জানতে সক্ষম হয় না। পরমাত্মার সঙ্গে এক হলে তবেই পরমাত্মাকে জানা যায় —এই নিয়ম। প্রকৃতপক্ষে আমরা জগৎ থেকে পৃথক এবং পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্ন। জগতের সঙ্গে শরীরের ঐক্য থাকে আর আমাদের (স্বয়ং-এর) সঙ্গে পরমাত্মার একত্ব থাকে।

❋ ❋ ❋

প্রকৃতের্গুণসম্মূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ॥ ২৯ ॥

[**প্রকৃতেঃ** (প্রকৃতিজনিত) ; **গুণসম্মূঢ়াঃ** (গুণে মোহিত অজ্ঞ ব্যক্তিগণ) ; **গুণকর্মসু** (গুণ এবং কর্মে) ; **সজ্জন্তে** (আসক্ত থাকে) ; **তান্, অকৃৎস্নবিদঃ** (সেই সম্পূর্ণরূপে অবুঝ) ; **মন্দান্** (অল্পবুদ্ধি) ; **কৃৎস্নবিৎ** (পূর্ণজ্ঞানী মহাপুরুষগণ) ; **ন, বিচালয়েৎ** (বিচলিত যেন না করেন।)]

প্রকৃতিজনিত গুণে মোহিত অজ্ঞ ব্যক্তিগণ গুণ এবং কর্মে আসক্ত থাকে। এই অল্পবুদ্ধি অজ্ঞ ব্যক্তিগণকে যথার্থ জ্ঞানী মহাপুরুষের কর্ম থেকে বিচলিত করা উচিত নয় ॥ ২৯ ॥

ব্যাখ্যা—**'প্রকৃতের্গুণসম্মূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্মসু'**—সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ—প্রকৃতিজনিত এই তিনটি গুণই মানুষের বন্ধনের কারণ। সত্ত্বগুণ সুখ ও জ্ঞানের আসক্তি দ্বারা, রজোগুণ কর্মের আসক্তি দ্বারা এবং তমোগুণ প্রমাদ, আলস্য এবং নিদ্রা দ্বারা মানুষকে আবদ্ধ করে (গীতা ১৪।৬-৮)। উপরিউক্ত পদটিতে ওইসব অজ্ঞব্যক্তিদের বর্ণনা করা হয়েছে যারা প্রকৃতিজনিত গুণগুলিতে মোহগ্রস্ত হয়েছে অর্থাৎ আবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু তাদের শাস্ত্র, শাস্ত্রবিহিত শুভকর্ম এবং ওই সমস্ত কর্মের ফলে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে। এই অধ্যায়ের পঁচিশ এবং ছাব্বিশতম শ্লোকে ওইরূপ অজ্ঞ পুরুষদের **'সক্তাঃ অবিদ্বাংসঃ'** এবং **'কর্মসঙ্গিনাম্', 'অজ্ঞানাম্'** নামে বর্ণনা করা হয়েছে। লৌকিক এবং পারলৌকিক ভোগের কামনার জন্য এই ব্যক্তিগণ পদার্থ এবং কর্মে আসক্ত থাকেন। সেইজন্য তাঁরা এর ঊর্ধ্বে ওঠার কথা ভাবতেই পারেন না। তাই ভগবান এঁদের অজ্ঞ বলেছেন।

'তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্'—অজ্ঞ ব্যক্তিরা শুভকর্ম করে কেবল স্থিতিহীন বিনাশশীল পদার্থ লাভের উদ্দেশ্যে। অর্থ সম্পদ ইত্যাদি প্রাপ্ত পদার্থে তারা মমত্বসম্পন্ন হয় এবং অপ্রাপ্ত পদার্থ পাবার আকাঙ্ক্ষা করে। এইভাবে মমত্ববোধ এবং কামনা দ্বারা আবদ্ধ থাকায় তারা গুণ (পদার্থ) এবং কর্মের তত্ত্ব পূর্ণরূপে জানতে সক্ষম হয় না।

অজ্ঞ ব্যক্তিগণ শাস্ত্রবিহিত কর্ম এবং তার বিধি ঠিকমতো জানলেও গুণ এবং কর্মের তত্ত্ব ঠিকমতো না জানায় তাদের **'অকৃৎস্নবিদঃ'** (পূর্ণভাবে না জানা ব্যক্তি) বলা হয়েছে এবং সাংসারিক ভোগ এবং সংগ্রহের আগ্রহ থাকায় তাদের **'মন্দান্'** (মন্দবুদ্ধি) বলা হয়েছে।

'কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ'—গুণ এবং কর্মবিভাগকে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত এবং কামনা-বাসনা রহিত জ্ঞানী ব্যক্তির উচিত হল তিনি যেন পূর্ববর্ণিত (সকামভাবে শুভকর্মে নিযুক্ত) অজ্ঞ ব্যক্তিদের শুভকর্ম থেকে বিচলিত না করেন, যাতে এই অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ তাদের বর্তমান স্থিতি থেকে স্খলিত না হয়। এই অধ্যায়ের পঁচিশ-ছাব্বিশতম শ্লোকে এরূপ জ্ঞানী ব্যক্তিদের **'অসক্তঃ, বিদ্বান্'** এবং **'যুক্তঃ, বিদ্বান্'** নামে বর্ণনা করা হয়েছে।

ভগবান তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষকে পঁচিশতম শ্লোকে **'কুর্যাৎ'** পদ দ্বারা নিজে কর্ম করার এবং ছাব্বিশতম শ্লোকে **'জোষয়েৎ'** পদ দ্বারা অজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারাও ওই রূপেই কর্ম করাবার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু এখানে ভগবান **'ন বিচালয়েৎ'** পদের দ্বারা ওইরূপ নির্দেশ না দিয়ে কিছুটা নমনীয়ভাব দেখিয়েছেন যাতে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ বেশি কিছু না করতে পারলেও অন্তত এটুকু লক্ষ্য রাখেন যে তাঁদের সংকেত, বাক্য এবং কোনো ক্রিয়ার দ্বারা অজ্ঞ ব্যক্তিরা নিজ নিজ কর্ম থেকে যেন বিচলিত না হয়। কারণ হল, জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের ওপর ভগবান এবং শাস্ত্রবিধি তাঁদের শাসন জারি করেন না। তাঁদের বলে কথিত যে শরীর, তার দ্বারা স্বাভাবিকভাবেই লোকসংগ্রহের উদ্দেশ্যে ক্রিয়াগুলি হয়ে থাকে।[১]

তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষগণ কর্মযোগীই হন বা জ্ঞানযোগী—সকল কর্ম করলেও তাঁদের কর্ম বা পদার্থের সঙ্গে

---

[১]ক্রিয়া এবং কর্ম—এই দুয়ের মধ্যেও পার্থক্য আছে। ক্রিয়ার সঙ্গে যখন 'আমি, কর্তা' এইরূপ অহং ভাব থাকে, তখন সেই ক্রিয়াটি কর্মরূপে পরিগণিত হয় এবং তার ইষ্ট, অনিষ্ট এবং মিশ্রিত—তিন প্রকার ফল পাওয়া যায় (গীতা ১৮।১২)। কিন্তু যেখানে 'আমি কর্তা নই' এইরূপ ভাব থাকে সেখানে ক্রিয়াটি 'কর্ম' হয় না অর্থাৎ সেটি ফলদায়ক হয়ে ওঠে না। তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষের দ্বারা ফলদায়ক কর্ম হয় না, বরং ক্রিয়া (চেষ্টা) মাত্রই হয়ে থাকে (গীতা ৩।৩৩)।

কোনোপ্রকার সম্বন্ধ স্বতঃই থাকে না যেটি বস্তুতঃ আগে থেকেই নেই।

অজ্ঞ ব্যক্তিগণ স্বর্গলাভের আশায় শুভকর্ম করে থাকে। সেইজন্য ভগবান এরূপ ব্যক্তিদের বিচলিত না করার নির্দেশ দিয়েছেন অর্থাৎ মহাপুরুষগণ তাঁদের আচরণ, বাণী এবং ক্রিয়া দ্বারা যেন এমন কোনো ব্যাপার প্রকটিত না করেন, যার দ্বারা ওইসব সকাম ব্যক্তিদের শাস্ত্রবিহিত শুভকর্মে অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস বা অরুচি জন্মায় যাতে তারা ওই সমস্ত শুভকর্ম পরিত্যাগ করে। কারণ এরূপ করলে তাদের পতন হবার আশঙ্কা থাকে। সেইজন্য এরূপ অজ্ঞ ব্যক্তিদের শুধুমাত্র সকামভাব থেকে বিচলিত করা উচিত, শাস্ত্রীয় কর্ম থেকে নয়। জন্ম-মৃত্যুরূপী বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার জন্যই তাদের সকামভাব থেকে বিচলিত করা উচিত এবং আবশ্যকও।

পরিশিষ্ট-ভাব— অর্জুন প্রশ্ন করেছিলেন, 'আমাকে এই ভয়ানক কর্মে কেন নিয়োগ করছেন ?' তার উত্তরে ভগবান বিভিন্নভাবে জানিয়েছেন 'আমার উদ্দেশ্য ভয়ানক কর্মে নিয়োগ করা নয় বরং কর্ম হতে সম্বন্ধ-ছেদ করাই হল আমার আসল উদ্দেশ্য।' কর্মযোগের উদ্দেশ্যই হল কর্ম হতে সম্পর্ক ছিন্ন করা।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—যে কর্মের দ্বারা মানুষ আবদ্ধ হয়ে পড়ে, সেই কর্ম এবং কর্মফলের আসক্তি থেকে মুক্তি পাবার জন্য কী করা উচিত—পরবর্তী শ্লোকে ভগবান তা জানাচ্ছেন।

ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সন্ন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ।। ৩০ ।।

[**অধ্যাত্মচেতসা** (বিবেক বুদ্ধি সহকারে) ; **সর্বাণি, কর্মাণি** (সমস্ত কর্তব্যকর্ম) ; **ময়ি** (আমাতে) ; **সন্ন্যস্য** (অর্পণ করে) ; **নিরাশীঃ** (কামনারহিত) ; **নির্মমঃ** (মমত্ববোধ) ; **বিগতজ্বরঃ, ভূত্বা** (সন্তাপরহিত হয়ে) ; **যুধ্যস্ব** (যুদ্ধরূপ কর্তব্য-কর্ম করো।)]

তুমি বিবেক-বুদ্ধি সহকারে সমস্ত কর্তব্যকর্ম আমাতে অর্পণ করে কামনা, মমতা এবং সন্তাপ পরিত্যাগ করে যুদ্ধরূপ কর্তব্যকর্ম করো ॥ ৩০ ॥

ব্যাখ্যা—'ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সন্ন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা'— সাধকদের মনে প্রায়শই এই চিন্তার উদয় হয় যে, কর্মের ফলে বন্ধন হয়, আবার কর্ম না করে কেউ থাকতে পারে না, তাই কীভাবে কর্ম করা উচিত, যাতে কর্ম বন্ধনকারক না হয়ে বরং মুক্তিদায়ক হয়। এই বিচারের মীমাংসার উদ্দেশ্যে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন, 'তুমি অধ্যাত্ম-চিত্ত (বিচার-বিবেচনাযুক্ত হৃদয়) দ্বারা সমস্ত কর্তব্যকর্ম আমাতে অর্পণ করে দাও অর্থাৎ এতে তোমার নিজের কোনো সম্পর্ক আছে বলে মনে করো না। কারণ প্রকৃতপক্ষে জগতের সমস্ত ক্রিয়াই কেবলমাত্র আমার শক্তিতেই হয়ে থাকে। শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, পদার্থ ইত্যাদিও আমার এবং শক্তিও আমারই। এইজন্য সবকিছুই ভগবানের এবং ভগবান আমার— গভীরভাবে এই বিচার করে যখন তুমি কর্তব্যকর্ম করবে, তখন এই কর্মগুলি আর তোমার বন্ধনকারক হবে না, বরং মুক্তিদায়ক হয়ে উঠবে।'

শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, পদার্থ ইত্যাদি কোনো কিছুর ওপরই কোনো অধিকার খাটে না—মানুষমাত্রেই এটি অনুভব করে থাকে। এগুলি সবই প্রকৃতির— **'প্রকৃতিস্থানি'** এবং 'স্বয়ং' হল পরমাত্মার **'মমৈবাংশো জীবলোকে'** (গীতা ১৫।৭)। সুতরাং শরীর ইত্যাদি পদার্থে ভ্রমবশতঃ যে নিজস্ববোধ মেনে নেওয়া হয়েছে তা ভগবানের বলে মেনে নেওয়াকে (যেটি চিরন্তন সত্য) 'অর্পণ' বলা হয়। সুতরাং নিজ বিবেককে গুরুত্ব দিয়ে পদার্থ এবং কর্মসমূহে মূর্খতাবশতঃ মেনে নেওয়া সম্পর্ক ত্যাগ করাই হল প্রকৃত অর্পণ করা।

'অধ্যাত্মচেতসা' পদটির দ্বারা ভগবান এই অর্থই ব্যক্ত করেছেন যে, সাধক যে পথেরই হন না কেন তাঁর উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক হওয়া উচিত, লৌকিক নয়। কেননা উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন সর্বদাই নিত্যতত্ত্বের (আধ্যাত্মিক) হয় আর কামনা হয়ে থাকে অনিত্য তত্ত্বের (অর্থাৎ যার উৎপত্তি এবং

বিনাশ আছে)। সাধকদের উদ্দেশ্য থাকা উচিত, কিন্তু কামনা নয়। যে অন্তরে (অন্তঃকরণে, হৃদয়ে) উদ্দেশ্য থাকে তা বিবেক-বিচার সম্পন্ন হয়ে থাকে।

দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক কোনো দৃষ্টিতেই শরীরাদি ভৌতিক পদার্থ ব্যক্তির নিজস্ব বলে প্রমাণিত হয় না। প্রকৃতপক্ষে এইসব পদার্থ নিজস্ব এবং নিজের জন্য নয়, বরং এগুলি ঠিকমতো ব্যবহারের জন্যই প্রাপ্ত হয়েছে। এইগুলি নিজের নয় বলেই এর ওপর কোনোপ্রকার আধিপত্য খাটে না।

জগৎ-সংসারমাত্রই পরমাত্মার, কিন্তু ভ্রমবশত জীব পরমাত্মার বস্তুসমূহ নিজের বলে মনে করে এবং এইজন্যই সে বন্ধনগ্রস্ত হয়। সুতরাং বিচারবিবেচনার দ্বারা এই ভ্রম সংশোধন করে সমস্ত পদার্থ এবং কর্মকেই অধ্যাত্মতত্ত্বের (পরমাত্মার) বলে স্বীকার করে নেওয়াকে অধ্যাত্মচিত্তের দ্বারা তার অর্পণ বোঝায়।

এই শ্লোকটিতে **'অধ্যাত্মচেতসা'** পদটি মুখ্যরূপে এসেছে। এর তাৎপর্য হল এই যে, অবিবেকবশতঃ উৎপত্তি ও বিনাশশীল এই শরীর (জগৎ-সংসার) নিজের বলে প্রতীয়মান হয়। যদি বিবেক-বিচার সহকারে লক্ষ্য করা যায়, তাহলে এই শরীর বা জগৎ-সংসার আর নিজের বলে মনে হয় না, বরং এক অবিনাশী পরমাত্মতত্ত্বকেই নিজের বলে অনুভব হয়। জগৎ-সংসারকে নিজের বলে দেখলেই পতন হয় এবং নিজের বলে না দেখলে উত্থান হয়—

দ্ব্যক্ষরস্তু ভবেন্ মৃত্যুস্ত্র্যক্ষরং ব্রহ্ম শাশ্বতম্।
মমেতি চ ভবেন্ মৃত্যুর্ন মমেতি চ শাশ্বতম্॥

(মহাভারত, শান্তিপর্ব ১৩।৪ ; আশ্বমেধিক. ৫১।২৯)

দুটি অক্ষরের **'মম'** (এটি আমার—এই ভাব) হল মৃত্যু আর তিনটি অক্ষরের **'ন মম'** (এ আমার নয়—এই ভাব) হল অমৃত—সনাতন ব্রহ্ম।

অর্পণ সম্পর্কিত বিশেষ কথা

ভগবান **'ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সন্ন্যস্য'** পদটির দ্বারা সমস্ত কর্ম অর্পণ করার কথা এইজন্য বলেছেন যে, মানুষ করণ (শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, প্রাণ), উপকরণ (কর্ম করার উপযোগী বস্তুগুলি) এবং ক্রিয়াগুলিকে ভ্রমবশতঃ নিজের বা নিজের জন্য বলে মনে করে যা কখনো তার ছিল না, নেই এবং হতে পারেও না। উৎপত্তি এবং বিনাশশীল বস্তুগুলির সঙ্গে অবিনাশীর সম্পর্ক কোথায় ? সুতরাং কর্মগুলি জগতে অর্পণ করা হোক বা প্রকৃতিকে অর্পণ করা হোক অথবা ভগবানকে অর্পণ করা হোক—তিনটির একই পরিণাম হয়। কারণ জগৎ হল প্রকৃতির কার্য আর ভগবান হলেন প্রকৃতির প্রভু। এই দৃষ্টিতে দেখলে জগৎ-সংসার এবং প্রকৃতি দুই-ই ভগবানের। সুতরাং 'আমি ভগবানের এবং আমার বলে যা কিছু আছে সবই ভগবানের' এই ভাব নিয়ে সমস্ত কিছু ভগবানকে অর্পণ করে দেওয়া উচিত, অর্থাৎ বস্তু থেকে নিজের মমতা তুলে নেওয়া প্রয়োজন। এরূপ করার পর সাধকের জগতের থেকে অথবা ভগবানের কাছ হতে আর কিছুই চাওয়ার প্রয়োজন হয় না। কারণ তাঁর যা প্রয়োজন তার ব্যবস্থা ভগবান নিজেই করে থাকেন। অর্পণ করার পর শরীরাদি পদার্থগুলিকে আর নিজের বলে মনে করা উচিত নয়। যদি নিজের বলে মনে হতে থাকে তাহলে প্রকৃত অর্পণ করা হয়নি। সেইজন্য ভগবান বিবেক ও বিচারযুক্ত হৃদয়ে অর্পণ করার কথা বলেছেন, যাতে এই বাস্তব সত্যটি ঠিকমতো বোঝা যায় যে এই পদার্থগুলি ভগবানের, নিজের নয়।

ভগবানকে অর্পণ করাতে এমন বিশেষত্ব আছে যে, যে কোনো ভাবে (এমনকি উত্যক্ত হয়েও যদি) অর্পণ করা যায় তাহলেও তাতে লাভই হয়ে থাকে। কারণ কর্ম এবং বস্তুসমূহ নিজের নয়। কর্মগুলি করার পরেও সেগুলি অর্পণ করা যায়, কিন্তু বাস্তবিক অর্পণ হয় তখনই যখন পদার্থ এবং কর্মসমূহ থেকে সম্পর্ক ছেদ হয়ে যায়। পদার্থ এবং কর্ম হতে সম্পর্ক বিচ্ছেদ হওয়া সম্ভব তখন যখন ঠিকমতো হৃদয়ঙ্গম হয় যে, করণ (শরীর ইত্যাদি), উপকরণ (জাগতিক পদার্থ), কর্ম এবং 'স্বয়ং'—এ সমস্তই ভগবানের। সাধকগণ প্রায়শই এই ভুল করে বসেন যে এই উপকরণগুলি যে ভগবানের তা তাঁরা মানার চেষ্টা করেন কিন্তু 'করণ এবং স্বয়ংও যে ভগবানেরই'—এইদিকে তাঁরা নজর দেন না। সেইজন্য তাঁদের অর্পণ সম্পূর্ণ হয় না। সুতরাং সাধকদের করণ, উপকরণ, ক্রিয়া এবং 'স্বয়ং'-এ সবকিছুই ভগবানের বলে মেনে নেওয়া উচিত—যা

বাস্তবিকই ভগবানের।

কর্ম এবং পদার্থগুলি বাহ্যতঃ ত্যাগ করাকে অর্পণ বলে না। ভগবানের বস্তুসামগ্রী ভগবানের বলে মেনে নেওয়াই হল অর্পণ। যে ব্যক্তি বস্তুগুলিকে নিজের বলে মনে করে ভগবানে অর্পণ করে—ভগবান তার পরিবর্তে তাকে অনেক জিনিস প্রদান করেন। যেমন জমিতে যত বীজ বপন করা হয়, তার কয়েকগুণ অধিক শস্য পৃথিবী ফিরিয়ে দেয়, কিন্তু শস্য যত অধিকই হোক না কেন, তার সীমা থাকে। অপরপক্ষে বস্তুটি নিজের নয় মনে করে (ভগবানের মনে করে) ভগবানকে যে অর্পণ করে, ভগবান তার নিকট নিজেকেই সমর্পণ করেন এবং তার কাছে ঋণী হয়ে যান। অর্থাৎ বস্তুগুলি নিজের মনে করে অর্পণ করলে (হৃদয়ে বস্তুগুলির গুরুত্ব থাকলে) সেই বস্তুর পরিবর্তে বস্তুই পাওয়া যায় আর প্রত্যর্পণের সময় নিজের বলে মনে না করলে স্বয়ং ভগবানকে লাভ করা যায়।

প্রকৃত অর্পণে ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন হন। তার মানে এই নয় যে, অর্পণ করায় ভগবানের কোনো সাহায্য হয়। তাতে অর্পণকারী কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায় এবং এতেই ভগবান প্রসন্ন হন। যেমন একটি ছোট্ট ছেলে পড়ে যাওয়া চাবি তার বাবাকে খুঁজে দিলে তিনি খুশি হন। ছোট্ট ছেলেটিও বাবার, বাড়ির অঙ্গনও বাবার এবং চাবিটিও বাবার। প্রকৃতপক্ষে চাবিটি পাওয়াতেই যে বাবা খুশি হয়েছেন তা নয়, তিনি খুশি হয়েছেন ছেলেটির (প্রত্যর্পণের) ভাব দেখে। তাই তিনি আশীর্বাদ করে বলেন, 'তুমি অনেক বড় হও।' অর্থাৎ তাকে নিজের থেকেও বড় দেখতে চান। এইরূপ সকল পদার্থ, শরীর এবং শরীরী (স্বয়ং) ভগবানেরই ; সুতরাং ওইগুলির থেকে আপন-ভাব দূর করা এবং সেগুলি ভগবানকে অর্পণ করার ভাব দেখেই তিনি (ভগবান) প্রসন্ন হন এবং ঋণী হয়ে যান।

সকাম ভাব-সম্বন্ধে বিশেষ কথা

পরমাত্মা বড়ই অনুপমভাবে এই মনুষ্য-শরীর রচনা করেছেন। মানুষের জীবন-নির্বাহ এবং সাধনার জন্য যে সমস্ত সামগ্রী প্রয়োজন তা মানুষ প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হয়েছে। ভগবৎ প্রদত্ত বিবেকও তার মধ্যে বিদ্যমান। সেই বিবেককে গুরুত্ব না দিয়ে মানুষ যখন প্রাপ্ত বস্তুগুলির ঠিকমতো সদ্ব্যবহার করে না, বরং সেইগুলিকে নিজের মনে করে নিজের জন্যই সেইগুলির ব্যবহার করতে থাকে এবং প্রাপ্ত বস্তুসমূহে মমত্ববোধ এবং অপ্রাপ্ত বস্তুর কামনা করতে থাকে, তখন সে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধনে আবদ্ধ হয়। যে সমস্ত বস্তু, ব্যক্তি, পরিস্থিতি, ঘটনা, যোগ্যতা, শক্তি, শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, প্রাণ, বুদ্ধি ইত্যাদি বর্তমানে আমাদের রয়েছে বলে মনে হয়, এগুলি পূর্বে আমাদের ছিল না, পরেও আমাদের থাকবে না। কারণ এগুলি কখনও একভাবে স্থায়ী নয়, প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তনশীল, এই বাস্তবিক সত্য মানুষ জানে। মানুষ যেরূপ জানে, সেইরূপই যদি মেনে নেয় এবং আচরণও যদি তদনুসারে করে তাহলে তার উদ্ধার হওয়ায় কোনোরূপ সন্দেহ থাকে না। যেরূপ জানে, সেইরূপই মেনে নেওয়ার অর্থ হল এই যে শরীরাদি পদার্থগুলি নিজস্ব বা নিজের জন্য বলে না মনে করা, তার আশ্রিত না হওয়া এবং সেইগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে তার পরাধীনতা স্বীকার না করা। বড় ভুল হয় পদার্থগুলিকে গুরুত্ব দেওয়াতেই। পদার্থগুলির প্রাপ্তিতে নিজেকে কৃতার্থ মনে করাই হল সব থেকে বড় বন্ধন। এই বিনাশশীল পদার্থগুলিতে গুরুত্ব দিলেই নতুন নতুন কামনার উদ্ভব হয়। কামনাই হল সমস্ত পাপ-তাপ-দুঃখ-অনর্থ-নরক ইত্যাদির মূল কারণ। কামনার দ্বারা কোনো বস্তু লাভ হয় না, যদি প্রারব্ধবশতঃ প্রাপ্তি হয়ও, তবুও তা চিরস্থায়ী হয় না। কারণ এই সমস্ত পদার্থ গতিশীল, অস্থায়ী ; চিরস্থায়ী একমাত্র 'স্বয়ং'ই। সুতরাং কামনা ত্যাগ করে মানুষের উচিত কর্তব্যকর্ম পালন করা।

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে কামনা ছাড়া কর্মে প্রবৃত্তি আসবে কীভাবে ? তার সমাধান হল এই যে, কামনার পূর্তি এবং নিবৃত্তি—এই দুটির জন্যই কর্মে প্রবৃত্তি হয়। সাধারণ মানুষ কামনা পূর্তির উদ্দেশ্যেই কর্মে প্রবৃত্ত হয় আর সাধক প্রবৃত্ত হন আত্মশুদ্ধির জন্য, কামনা নিবৃত্তির জন্য (গীতা ৫।১১)। প্রকৃতপক্ষে কর্মে প্রবৃত্তি কামনা নিবৃত্তির জন্যই হওয়া উচিত, কামনা পূর্তির জন্য নয়।

এই মনুষ্য-দেহ যে উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রাপ্ত হয়েছে তা পূর্ণ হলে আর কিছুই পাবার বাকি থাকে না। যে সব মানুষ তাদের আসল উদ্দেশ্য (নিত্যতত্ত্ব পরমাত্মার প্রাপ্তি) ভুলে থাকে তারাই কামনা পূর্তির উদ্দেশ্য নিয়ে কর্ম করে। এইসব মানুষকে ভগবান 'কৃপণ' (দীন বা দয়ার পাত্র) নামে অভিহিত করেছেন—'**কৃপণাঃ**

ফলহেতবঃ' (গীতা ২।৪৯)। অন্যপক্ষে যে সব ব্যক্তি উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য রেখে (কামনা নিবৃত্তির জন্য) কর্মে প্রবৃত্ত হন, ভগবান তাঁদের **'মনীষী'** (বুদ্ধিমান বা জ্ঞানী) নামে অভিহিত করেছেন **'ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ'** (গীতা ২।৫১)। উদ্দেশ্য হল সেবা, স্বরূপ-বোধ এবং ভগবৎ প্রাপ্তি, এগুলি কামনা নয়। বিনাশশীল পদার্থ আকাঙ্ক্ষার ভাবই হল কামনা। সুতরাং কামনা বা আকাঙ্ক্ষা ছাড়া কর্মে প্রবৃত্তি হয় না—এরূপ মনে করা ভুল। প্রকৃত উদ্দেশ্য পূর্তির লক্ষ্য নিয়েও সুচারুরূপে কর্ম করা যায়।

নিজ অংশী পরমাত্মা হতে বিমুখ হয়ে জগৎ-সংসার-এর (জড়ত্বের) সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করলেই প্রয়োজনীয়তা এবং কামনা—দুইয়ের উদ্ভব হয়। জগৎ-সংসারের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করলেই আবশ্যকতা পূরণ হয় এবং কামনার নিবৃত্তি ঘটে।

'নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ'—সকল কর্ম এবং পদার্থ (কর্মসামগ্রী) ভগবানে অর্পণ করার পরও কামনা, বাসনা এবং সন্তাপের যৎকিঞ্চিৎ অবশেষ থেকে যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—আমি কাউকে কোনো বই দিলে, সে যখন সেটি পড়তে থাকে, তখন আমার মনে হয় যে ওটি আমার বই। এই হল আংশিক মমত্ববোধ, যা পুস্তকটি দেবার পরেও থেকে যায়। এই শেষাংশটি দূর করার জন্য ভগবান অর্জুনকে বলেছেন, 'তুমি নতুন কোনো বস্তুর কামনা কোরো না, প্রাপ্ত বস্তুতেও মমতা কোরো না এবং বিনাশশীল বস্তুর জন্য সন্তাপ (শোক) কোরো না, 'আমাকে' সবকিছু অর্পণ করার প্রমাণ হল কামনা, মমতা বা সন্তাপের কিঞ্চিৎমাত্রও তোমার মধ্যে থাকবে না।'

যে সব সাধকের সবকিছুই ভগবানে অর্পণ করার পরেও পূর্ব সংস্কারবশতঃ শরীরাদি পদার্থের প্রতি কামনা, মমতা এবং সন্তাপ দেখা যায়, তাঁদের নিরাশ হওয়া উচিত নয়। কারণ যার মধ্যে কামনা দেখা যায়, সেই কামনারহিত হয় ; যার মধ্যে মমতা দেখা যায়, সেই মমতাশূন্য হয় এবং যার মধ্যে সন্তাপ দেখা যায়, সেই সন্তাপ বিবর্জিত হতে পারে। এইরূপই যে দেহকে **'অহম্'** (আমি) মনে করে সেই বি-দেহ (অহং-রহিত) হতে পারে। সুতরাং মানুষমাত্রেরই পূর্ণ অধিকার আছে কামনা-বাসনা এবং সন্তাপরহিত হওয়ার।

গীতার **'জ্বর'** শব্দটি শুধুমাত্র এখানেই ব্যবহৃত হয়েছে। যুদ্ধে আত্মীয়জনিত স্নেহ ইত্যাদি থেকে শোক পাবার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং যুদ্ধরূপ কর্তব্যকর্ম করার কালে সবিশেষ সাবধানতা অবলম্বনের জন্য ভগবান **'বিগতজ্বরঃ'** পদটি ব্যবহার করে অর্জুনকে বলেছেন যে 'তুমি শোকরহিত হয়ে যুদ্ধরূপ কর্তব্যকর্ম করো।'

অর্জুনের নিকট কর্তব্যকর্ম ছিল যুদ্ধ, তাই ভগবান **'যুধ্যস্ব'** পদটির দ্বারা তাঁকে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। ভগবানের এই কথার তাৎপর্য নিছক যুদ্ধ করা নিয়েই নয়, বরং তা হল কর্তব্যকর্ম করাতে। সেইজন্য যে সমস্ত কর্তব্যকর্ম এসে উপস্থিত হয়, সাধকদের সেগুলি নিষ্কাম, মমত্বহীন এবং নিঃসন্তাপ হয়ে ভগবদর্পণ বুদ্ধিতে করা উচিত। তার সিদ্ধি বা অসিদ্ধির দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত নয়। সিদ্ধি-অসিদ্ধি, অনুকূল-প্রতিকূল অবস্থায় সমভাবাপন্ন থাকাকেই বলা হয় **'বিগতজ্বরঃ'** ; কারণ অনুকূল অবস্থার প্রসন্নতা এবং প্রতিকূল অবস্থার উদ্বিগ্নতা —দুই-ই হচ্ছে **'জ্বর'** (সন্তাপ)। রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ, সুখ-দুঃখ, কাম-ক্রোধ ইত্যাদি বিকারকেও **'জ্বর'** বলা হয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে রাগ-দ্বেষ, চিন্তা-উদ্বেগ, ব্যাকুলতা ইত্যাদি যতপ্রকার মানসিক বিকৃতি আছে, সেই সবগুলিই হল **'জ্বর'** এবং সেগুলি থেকে রহিত হওয়াকেই বলা হয় **'বিগতজ্বরঃ'**।

বিশেষ কথা

যখন সাধকের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় পরমাত্মপ্রাপ্তি, তখন তাঁর যা কিছু সামগ্রী (বস্তু, পরিস্থিতি ইত্যাদি) রয়েছে সবই সাধন সামগ্রীতে পরিণত হয়। তখন সেই সামগ্রীগুলিতে আর ভালো বা মন্দ ভাব থাকে না। সুতরাং সামগ্রী যেমনই থাক, সেইভাবেই ভগবানকে অর্পণ করা উচিত। ভগবান যেমন দিয়েছেন, সেইমতোই তাঁকে প্রত্যর্পণ করা উচিত।

সকল কর্ম ভগবানে অর্পণ করার পরেও যে কামনা, মমতা ও অন্তরে শোক প্রতীত হয়, তাও ভগবানকে অর্পণ করে দিতে হয়। ভগবানে অর্পণ করলে সে ভগবদ্‌নিষ্ঠ হয়ে যায়।

বলা হয় কর্মই যোগারূঢ় হওয়ার হেতু—**'আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে'** (গীতা ৬।৩)।

কারণ কর্তব্যকর্ম করলেই সাধক জানতে পারেন যে তাঁর কোথায় এবং কিসে ত্রুটি (কামনা-বাসনা ইত্যাদি) আছে ?[১] এইজন্য দ্বাদশ অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে ধ্যান অপেক্ষা কর্মফল ত্যাগকেই (কর্মযোগ) শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। কারণ ধ্যানের সময়ে সাধকের দৃষ্টি বিশেষভাবে মানসিক চাঞ্চল্যের দিকেই থাকে এবং ধ্যেয়তে মনোনিবেশ হলেই ধ্যানের সফলতা সম্বন্ধে তিনি নিঃসংশয় হয়ে যান। কিন্তু মানসিক চঞ্চলতা ছাড়া অন্য ত্রুটির (কামনা-মমতা ইত্যাদির) দিকে দৃষ্টি তখনই যায়, যখন তিনি কর্ম করেন। সেইজন্য ভগবান উপস্থিত শ্লোকটিতে **'যুধ্যস্ব'** পদটির দ্বারা কর্তব্যকর্ম করার নির্দেশ দিয়েছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের আটচল্লিশতম শ্লোকে যেমন সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সম হয়ে কর্তব্যকর্ম করার নির্দেশ ভগবান দিয়েছেন, তেমনি এইস্থানে (ত্রিশতম শ্লোকে) নিষ্কাম, নির্মম এবং নিঃসন্তপ্ত হয়ে যুদ্ধ অর্থাৎ কর্তব্যকর্ম করার নির্দেশ দিয়েছেন। যুদ্ধের মতো নিষ্ঠুর কর্মও যখন সমত্ব-ভাব রেখে করা সম্ভব, তখন এমন কী কর্ম আছে, যা সমভাবাপন্ন হয়ে করা না যায় ? সমভাব তখনই হওয়া সম্ভব যখন 'শরীর আমি নয়, আমার নয় এবং আমার জন্য নয়'—এরূপ ভাব আসে, যেটি বাস্তব সত্য।

কর্তব্যকর্ম পালন তখনই সম্ভব, যখন সাধকের উদ্দেশ্য জগতের জন্য না হয়ে শুধুমাত্র পরমাত্মার জন্যই হয়। পরমাত্মপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সাধক যেমন যেমন কর্তব্যপরায়ণ হতে থাকেন তেমন তেমনই কামনা-বাসনা, মমতা ইত্যাদি দোষ স্বতঃই দূর হতে থাকে এবং সমতায় স্বাভাবিক স্থিতি অনুভূত হলেই অহং-কর্তৃত্ববোধ লোপ পায় এবং উদ্দেশ্যের সঙ্গে ঐক্য হয়। নিয়ম হল এই যে নিজের জন্য কোনো কিছু পাবার বা করার ইচ্ছা না থাকলে **'অহম্'** (ব্যক্তিত্ব) স্বতঃই দূর হয়।

অর্জুন শ্রেয় (কল্যাণ) চাইলেও যুদ্ধরূপ কর্তব্য করতে চাইছিলেন না। তাই অর্জুন তাঁর শ্রেয়ের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে ভগবান তাঁকে যুদ্ধরূপ কর্তব্যকর্ম করার নির্দেশ দেন ; কারণ ভগবানের মতে কর্তব্যকর্মের পালন করলে অর্থাৎ কর্মযোগ সহযোগেও শ্রেয়োলাভ করা যায় এবং জ্ঞানযোগ বা ভক্তিযোগ দ্বারাও শ্রেয়োলাভ করা যায়।

পরিশিষ্ট-ভাব— এতক্ষণ পর্যন্ত ভগবান অর্জুনের প্রশ্নের (আমাকে নিষ্ঠুর কর্মে কেন নিয়োগ করছেন ?) বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উত্তর দিয়েছেন। এবার এই শ্লোকটিতে তিনি ভগবদ্‌নিষ্ঠা অনুসারে কর্ম করার বিধি জানিয়েছেন।

'সকল কর্ম আমাকে অর্পণ করো'—একথা বলার অর্থ হল যে ক্রিয়া এবং পদার্থকে নিজের এবং নিজের জন্য মনে না করে আমার এবং আমার জন্য বলে মনে করো। কারণ ভগবান সমগ্র এবং সমস্ত কর্ম ও পদার্থ (অধিভূত)—সব কিছুই ভগবানের অন্তর্গত (গীতা ৭।২৯-৩০)। সেই সমগ্র ভগবানের জন্যই এখানে **'ময়ি'** পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

এই শ্লোকে **'ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সন্ন্যস্য'** পদটিতে ভক্তিযোগের, **'অধ্যাত্মচেতসা'** পদে জ্ঞানযোগের এবং **'নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ'** পদটিতে কর্মযোগের কথা উদ্ধৃত হয়েছে।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকটিতে নিজ সিদ্ধান্ত জানিয়ে পরবর্তী দুটি শ্লোকে ভগবান নিজ মতের পুষ্টি সাধন করেছেন।

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্মভিঃ॥ ৩১ ॥

[**যে, মানবাঃ** (যে মানবগণ) ; **অনসূয়ন্তঃ** (দোষদৃষ্টিরহিত হয়ে) ; **শ্রদ্ধাবন্তঃ** (শ্রদ্ধাসহকারে) ; **মে** (আমার) ; **ইদম্** (এই) ; **মতম্** (মতের) ; **নিত্যম্, অনুতিষ্ঠন্তি** (সর্বদা অনুসরণ করেন) ; **তে, অপি** (তাঁরাও) ; **কর্মভিঃ** (সমস্ত কর্মবন্ধন হতে) ; **মুচ্যন্তে** (মুক্ত হয়ে যান।)]

[১]উদাহরণ—একজন ব্যক্তি কোনো একটি সেবাসমিতিতে মন দিয়ে সেবাকার্য করে কিন্তু যখন কেউ তাকে সম্মান দেখায় বা পুরস্কৃত করে তখন সে তাতে মনে মনে সুখ অনুভব করতে পারে, তার মধ্যে আসক্তি দেখা দিতে পারে। এই ধরনের অপরিপক্বতা কর্ম করলে তবেই সে বুঝতে পারে।

যে সকল মানুষ দোষদৃষ্টিরহিত হয়ে শ্রদ্ধা সহকারে আমার এই মতের (পূর্বশ্লোকে বর্ণিত) সর্বদা অনুসরণ করেন, তাঁরাও সমস্ত কর্মবন্ধন হতে মুক্ত হয়ে যান ॥ ৩১ ॥

ব্যাখ্যা—**'যে মে মতমিদং... শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো'**—যে কোনো বর্ণ, আশ্রম, ধর্ম, সম্প্রদায় ইত্যাদির কোনো মানুষই যদি কর্মবন্ধন হতে মুক্ত হতে চায় তাহলে তাকে এই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে তা অনুসরণ করতে হবে। শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, পদার্থ, কর্ম ইত্যাদি কোনো কিছুই নিজের নয়—এই প্রকৃত সত্যটি জেনে গেলে সকল মানুষই কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

ভগবান এবং তাঁর মতকে প্রত্যক্ষের ন্যায় নিঃসন্দেহ দৃঢ় বিশ্বাসী এবং পূজ্যভাবযুক্ত মানুষকে **'শ্রদ্ধাবন্তঃ'** পদের মাধ্যমে বলা হয়েছে।

শরীর ইত্যাদি জড় পদার্থগুলিকে নিজের বা নিজের জন্য মনে না করলে মানুষ মুক্ত হয়ে যায়—এই প্রকৃত সত্যে শ্রদ্ধা জাগলে জড় পদার্থগুলির সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক ত্যাগ করা সহজ হয়।

শ্রদ্ধাবান সাধকই সৎ-শাস্ত্র, সৎ-চর্চা এবং সৎসঙ্গ প্রসঙ্গ করে থাকেন এবং সেগুলির আচরণ করেন।

পরমাত্মপ্রাপ্তির জন্যই এই মনুষ্যদেহ লাভ হয়েছে। সুতরাং পরমাত্মাকে লাভ করার তীব্র ইচ্ছা জাগলে সাধকের মধ্যে শ্রদ্ধা, তৎপরতা, সংযতেন্দ্রিয়তা ইত্যাদি গুণ স্বতঃই আসে। অতএব সাধকদের প্রধানতঃ পরমাত্মপ্রাপ্তির ইচ্ছাকেই তীব্রভাবে জাগ্রত করা উচিত।

আগের (ত্রিশতম) শ্লোকটিতে ভগবান যে মত ব্যক্ত করেছেন তাতে দোষদৃষ্টি না দেওয়ার জন্য এইস্থানে **'অনসূয়ন্তঃ'** পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। গুণের মধ্যে দোষ দেখাকে **'অসূয়া'** বলা হয়। **'অসূয়া'** (দোষদৃষ্টি) রহিত মানুষকে এখানে **'অনসূয়ন্তঃ'** বলা হয়েছে।

যেখানে শ্রদ্ধা থাকে, সেখানেও কিছুটা দোষদৃষ্টি থাকতে পারে। তাই ভগবান **'শ্রদ্ধাবন্তঃ'** পদটির সঙ্গে **'অনুসূয়ন্তঃ'** পদটিও যোগ করে মানুষকে সম্পূর্ণভাবে দোষদৃষ্টি রহিত (পূর্ণ শ্রদ্ধাবান) হতে বলেছেন। এইরূপই গীতা শ্রবণের মাহাত্ম্য জানাতে গিয়েও ভগবান **'শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ'** (গীতা ১৮।৭১) পদটির দ্বারা শ্রোতাকে শ্রদ্ধাযুক্ত এবং দোষদৃষ্টিরহিত হতে বলেছেন।

'ভগবানের কথাগুলি ভালো, কিন্তু তিনি এত আত্মশ্লাঘা এবং অহংকারের কথা বলেছেন যে, সবকিছু আমাকে অর্পণ করে দাও' অথবা 'এই কথাগুলি ভালো বটে, কিন্তু কর্মের দ্বারা কী করে ভগবৎপ্রাপ্তি হতে পারে ? কর্ম তো জড় এবং বন্ধনকারক হয়।' —ইত্যাদি ভাব মনে আনাই হল ভগবানের অভিমতগুলিকে দোষদৃষ্টিতে দেখা। সাধকদের ভগবান এবং তাঁর অভিমত—দুইয়েতেই দোষদৃষ্টি করা উচিত নয়।

প্রকৃতপক্ষে সবই ভগবানের কিন্তু মানুষ ভ্রমবশতঃ ভগবানের এই বস্তুসামগ্রী নিজের বলে মনে করে বদ্ধ হয়ে যায় এবং কামনা-বাসনার বশবর্তী হয়ে দুঃখ পেতে থাকে। সুতরাং এই আপনত্ব পরিত্যাগ করিয়ে মানুষের উদ্ধারের জন্য (যেন সে চিরকালের জন্য সুখী হয়) ভগবান তাঁর স্বাভাবিক করুণায় সমস্ত কর্ম তাঁকেই অর্পণ করার কথা বলেছেন। সুতরাং এটিকে দোষদৃষ্টিতে দেখা উচিত নয়। এ তো প্রকৃতপক্ষে ভগবানের পরম সৌহার্দ্য, করুণা এবং বাৎসল্যেরই পরিচায়ক যে তাঁর কোনো অপূর্ণতা এবং প্রয়োজনীয়তা না থাকলেও শুধুমাত্র মানব কল্যাণের উদ্দেশ্যেই তিনি সমস্ত কর্ম তাঁকে অর্পণ করার কথা বলেছেন।

ভগবানের মতবাদই জগতে 'সিদ্ধান্ত' নামে পরিচিত। সর্বোপরি সিদ্ধান্তকেই এইস্থানে **'মতম্'** পদ দ্বারা বলা হয়েছে। ভগবান তাঁর সহজ সারল্য এবং নিরভিমানতার জন্যই সর্বোচ্চ সিদ্ধান্তকে 'মত' নামে অভিহিত করেছেন। এই মত বা সিদ্ধান্ত তিনকালেই একইভাবে বিদ্যমান অর্থাৎ এতে কখনো কোনোরূপ পরিবর্তন হয় না, তা একে কেউ শ্রদ্ধা করুক বা না করুক।

এখানে **'নিত্যম্'** পদটি **'মতম্'**-এর বিশেষণ নয়, এটি **'অনুতিষ্ঠন্তি'** পদেরই বিশেষণ। কারণ ভগবান হলেন নিত্য। সুতরাং তাঁর সম্পর্কিত সকল বস্তুই নিত্য। ভগবানের মতও নিত্য। ভগবানের মত হল সর্বোপরি সিদ্ধান্ত এবং সিদ্ধান্ত তাকেই বলা হয় যা কখনো বদলায় না। সুতরাং ভগবানের মত নিত্য তো বটেই, তাই তার অনুষ্ঠানও সর্বকালে হওয়া উচিত। এইস্থানে ক্রিয়াবিশেষণ **'নিত্যম্'** পদটি ব্যবহারের তাৎপর্য হল এই যে, ভগবানের মতের প্রতি নিত্য নিরন্তর (সর্বদা) স্থিরচিত্ত থাকাই হল এর অনুষ্ঠান করা।

প্রশ্ন—ভগবানের মত কী ? এবং এর অনুষ্ঠান সর্বদা কী করে করা যায় ?

উত্তর—প্রাপ্ত কোনো বস্তুই নিজের নয়—এই হল ভগবানের মত। শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, প্রাণ, অর্থ, সম্পদ, পদার্থ ইত্যাদি সবই প্রকৃতির কার্য এবং জগৎ-সংসারও প্রকৃতির কার্য। তাই এই বস্তুগুলির জগতের সঙ্গে ঐক্য থাকে এবং পরমাত্মার অংশ হওয়ায় 'স্বয়ং'-এর পরমাত্মার সঙ্গে ঐক্য থাকে। সুতরাং এই বস্তুগুলি কারো ব্যক্তিগত নয়, বরং এগুলির ব্যবহারের অধিকার ব্যক্তিগত। তাছাড়া সদ্‌গুণ, সদাচার, ত্যাগ, বৈরাগ্য, দয়া, ক্ষমা ইত্যাদিও ব্যক্তিগত নয়, বরং ভগবানের। এই সম্পদ দৈবী অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপ্তির সম্পদ হওয়ায় এগুলিও ভগবানেরই। এই সদ্‌গুণ, সদাচার ইত্যাদি যদি ব্যক্তিগত হত তাহলে এর ওপর আমার সম্পূর্ণ অধিকার থাকত এবং আমার সম্মতি ছাড়া এতে আর কারো অধিকার থাকত না। এগুলি নিজের মনে করলে অভিমান (অহং-কর্তৃত্বভাব) জন্মায়, যা আসুরী সম্পদের মূলকারণ।

যে বস্তু নিজের নয়, তাকে নিজের বলে মনে করলে এবং সেটি লাভের আশায় কর্ম করলে, তা বন্ধনের কারণ হয়। শরীরাদি বস্তুগুলি নিজস্ব তো নয়ই 'নিজের জন্য'ও নয়। এগুলি যদি আমাদের নিজের হত, তবে এর প্রাপ্তিতে আমাদের পূর্ণ তৃপ্তি বা সন্তোষ লাভ হত, পূর্ণতার অনুভব হত। কিন্তু জাগতিক বস্তু যতই সংগৃহীত হোক না কেন, তার দ্বারা কখনো তৃপ্তি হয় না। তৃপ্তি বা পূর্ণতার আস্বাদন সেই বস্তু (ভগবান) পেলে হয়, যেটি সত্যই নিজের। নিজের প্রকৃত বস্তুটি প্রাপ্ত হলে আর স্বপ্নেও কোনো কিছু পাবার আকাঙ্ক্ষা থাকে না। যেমন, জগতের সমস্ত পুত্রবতী নারীই জননী, কিন্তু বালকের যে কোনো মাকে পেলে আনন্দ হয় না, তার নিজের মাকে পেলেই সে সন্তুষ্ট হয়। সেইরূপ যতক্ষণ আরও পাবার বাসনা থাকে, ততক্ষণ বুঝতে হবে যে নিজের বস্তুটি পাওয়া যায়নি। প্রাপ্ত বস্তুগুলিকে যতই নিজের বলে মনে করা হোক, প্রকৃতপক্ষে এগুলি নিজের নয়, তাই এগুলির থেকে তৃপ্তিও পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রাপ্ত কোনো বস্তুই নিজস্ব এবং নিজের জন্য নয়।

শরীর ইত্যাদি প্রাপ্ত বস্তুগুলি আমরা সঙ্গে নিয়ে আসিনি, সঙ্গে নিয়েও যেতে পারব না এবং বর্তমানেও প্রতিমুহূর্তে এসব আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে যেটিকে নিজের বলে প্রতীতি হয়, সেটিও সদ্ব্যবহার করার অর্থাৎ অপরের হিতের জন্যই, নিজের অধিকার রক্ষার্থে নয়। সুতরাং প্রাপ্ত বস্তুর সদ্ব্যবহারেই আমাদের অধিকার আছে, নিজের মনে করাতে নয়। ভগবান এই সমস্ত পদার্থ এত উদারভাবে এবং এমন রূপে প্রদান করেছেন যে মানুষ এগুলি নিজের বলেই ধারণা করে বসে। এই বস্তুগুলিকে নিজের বলে মনে করা ভগবানের উদারতার অপব্যবহার করা। যে সমস্ত বস্তু নিজের নয়, কিন্তু ভুলবশতঃ নিজের বলে মনে করা হয় ; সেই ভুল অপসারণ করতে সাধকের অধ্যাত্মচিত্তে গভীরভাবে বিচার করে সেগুলি ভগবানকে অর্পণ করে দেওয়া উচিত অর্থাৎ ভ্রমবশতঃ মনে করা আপনত্ব দূর করা উচিত।

যে সাধকের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে অধ্যাত্মতত্ত্বকে (পরমাত্মা) প্রাপ্ত করা, তিনি যদি গভীরভাবে আলোচনা করেন তাহলে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবেন যে প্রাপ্ত কোনো বস্তুই নিজের নয়, বরং এই সবেরই বিচ্ছেদ হয়ে যায়। শরীর, পদ, অধিকার, শিক্ষা, যোগ্যতা, ধনসম্পদ, জমিজায়গা ইত্যাদি যা কিছু প্রাপ্ত হয় তা সবই এই জগৎ থেকে পাওয়া এবং জগতেরই জন্য। এই প্রাপ্ত বস্তুসমূহ জগৎসংসারের (কার্য) বলেই মনে করা হোক অথবা প্রকৃতির (কারণের) বলে মনে করা হোক বা ভগবানের (জগৎ-প্রভুর) বলে মনে করা হোক, প্রকৃত সত্য হল এই যে এগুলি নিজের নয়। যে বস্তু নিজের নয়, তা নিজের জন্য কীভাবে হতে পারে ?

সাধকের কোনো **'বস্তুই'** নিজের বলে মনে করা উচিত নয় বা কোনো **'কর্ম'**ও নিজের জন্য করা উচিত নয়। নিজের জন্য কার্য করলে তা বন্ধনকারক হয় (গীতা ৩।৯) অর্থাৎ যজ্ঞের (নিষ্কামভাবে পরহিতার্থে করা কর্তব্য-কর্মের) অতিরিক্ত অন্য কর্ম (নিজের জন্য করা) মানুষের বন্ধনের কারণ হয়। যে সাধক যজ্ঞের জন্য কর্ম করেন, তাঁর সমস্ত কর্ম, সঞ্চিত কর্ম পর্যন্ত বিলীন হয়ে যায় (গীতা ৪।২৩)। ভগবান সমস্ত লোকের ঈশ্বর (স্বামী)—**'সর্বলোকমহেশ্বরম্'** (গীতা ৫।২৯)। মানুষ যখন নিজেকে ওই সমস্ত বস্তুর মালিক বলে মনে করে, তখন সে তার প্রকৃত প্রভুকে ভুলে যায়। কারণ সে নিজেকে যখন যে

বস্তুর মালিক বলে মনে করে, তখন তার সেই বস্তুর চিন্তাই হতে থাকে। তাই ভগবানকে বিশ্বের প্রভু মনে করে জগতে সাধকের সেবকের মতো থাকতে হয়। সেবক প্রভুর সমস্ত কাজ করলেও নিজেকে কখনো প্রভু বলে মনে করে না। সুতরাং সাধকের শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, পদার্থ ইত্যাদি নিজের মনে না করে, ভগবানের বলে মনে করে নিজ কর্তব্য পালন করা উচিত ; নিমিত্তমাত্র হয়ে কর্ম করা উচিত। নিজেকে প্রভু বলে অহংবোধ আনা উচিত নয়।

সমস্ত কর্ম ভগবানকে অর্পণ করে লাভ-ক্ষতি, মান-অপমান, সুখ-দুঃখ যা কিছু আসে তা সমস্তই ভগবানের বলে মনে করে সাধকের আর তাতে নিজের কোনো সম্পর্ক রাখা উচিত নয়। মানুষের কাছে কর্তব্যমাত্রেরই প্রাপ্তি হয়ে থাকে পরিস্থিতি অনুযায়ী। পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রসন্নতাপূর্বক নিজ কর্তব্য পালন করতে হয়। এই হল ভগবানের মতের সর্বদা অনুসরণ।

'মুচ্যন্তে তেঽপি কর্মভিঃ'—ভগবান অর্জুনকে বলেছেন, 'আমি তোমাকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিচ্ছি যে তুমি তোমার সর্বস্ব আমাকে অর্পণ করে কর্তব্যকর্ম পালন করো, আমার নির্দেশ পালন করলে তোমার মুক্তি লাভের পথে কোনো বাধাই থাকবে না এবং যাদের আমি এরূপ স্পষ্ট নির্দেশ দিই না, তারাও যদি এই মত (প্রাপ্ত বস্তু নিজের না মনে করে কর্তব্যকর্ম পালন করা) অনুযায়ী কর্ম করে, তাহলে তারাও মুক্তি পদ লাভ করে। কারণ এই মতটিই এমন যে, আমাকে কেউ মান্য করুক বা না করুক, শুধুমাত্র এই মত পালন দ্বারাই মানুষ মুক্তিলাভ করতে পারে।'

পরিশিষ্ট-ভাব— ভগবানের মত হল বাস্তবিক সত্য এবং সর্বোপরি সিদ্ধান্ত। এতেই সমস্ত মত-মতান্তর অন্তর্ভুক্ত থাকে। কিন্তু ভগবান অত্যন্ত নিস্পৃহভাবে, বিনয়ের সঙ্গে তাঁর সিদ্ধান্তকে 'মত' বলে জানিয়েছেন। তাৎপর্য হল যে, ভগবান তাঁর নিজের অথবা অন্য কারো মতের প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ করেননি, তিনি নিরপেক্ষভাবে তাঁর মত প্রকাশ করেছেন।

মত কখনো সর্বাত্মক হয় না, তা ব্যক্তিগতই হয়। ব্যক্তি ভেদে মত ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু সিদ্ধান্তই হল সবার ওপরে, যা সকলকেই মানতে হয়। তাই গুরু-শিষ্যেও মতপার্থক্য হতে পারে, কিন্তু সিদ্ধান্তের পার্থক্য হয় না। ঋষি-মুনি, দার্শনিকগণ তাঁদের নিজ নিজ মতকে প্রায়শঃ 'সিদ্ধান্ত' বলে থাকেন, কিন্তু ভগবান গীতাতে তাঁর সিদ্ধান্তকে 'মত' বলে জানিয়েছেন। ঋষি-মুনি, দার্শনিক, আচার্যদের মতেও দ্বিরুক্তি (মতভেদ) থাকে, কিন্তু ভগবানের মত অর্থাৎ সিদ্ধান্তে কোনো মতভেদ থাকে না।

※ ※ ※

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ॥ ৩২ ॥

[**তু, যে** (কিন্তু যে ব্যক্তি) ; **অভ্যসূয়ন্তঃ** (দোষদৃষ্টিবশতঃ) ; **মে** (আমার) ; **এতদ্, মতম্** (এই মত) ; **ন, অনুতিষ্ঠন্তি** (পালন করে না) ; **তান্** (সেই) ; **সর্বজ্ঞানবিমূঢ়ান** (সর্বজ্ঞানবিমূঢ়) ; **অচেতসঃ** (বিবেকহীন ব্যক্তিকে) ; **নষ্টান্** (বিনষ্ট বলেই) ; **বিদ্ধি** (জেনো।)]

যারা দোষদৃষ্টিবশতঃ আমার এই মত পালন না করে, সেই সর্বজ্ঞানবিমূঢ়, বিবেকহীন ব্যক্তিদের বিনষ্ট বলেই জেনো অর্থাৎ তাদের পতন হয় ॥ ৩২ ॥

ব্যাখ্যা—'যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্'—ত্রিশতম শ্লোকে বর্ণিত সিদ্ধান্ত অনুসরণকারীদের লাভের বর্ণনা একত্রিশতম শ্লোকে করা হয়েছে, তার পরে সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যারা না চলে তাদের পৃথক করার জন্যই এখানে 'তু' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

যেমন জগৎ-সংসারে সকল স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তি আশা করে যে, আমিই যেন সমস্ত বস্তু পাই, আমার যেন লাভ হয়—ভগবানও এইরূপ চান যে সমস্ত কর্ম তাঁকেই অর্পণ করা হোক, তাঁকেই প্রভু বলে মানা হোক—এইরূপ মনে করা হল 'ভগবানের' ওপর দোষারোপ করা।

কামনা-বাসনা ছাড়া জগৎসংসারের কার্য কীভাবে চলবে ? মমত্ববোধ সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করা যায় না,

রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি বিকাররহিত হওয়া অসম্ভব—এইরূপ মনে করার অর্থ হল ভগবানের মতের ওপর দোষারোপ করা।

ভোগ এবং সম্পদসংগ্রহের ইচ্ছাসম্পন্ন মানুষ—যারা শরীর ইত্যাদি পদার্থগুলিকে নিজস্ব এবং নিজের জন্য বলে মনে করে এবং সকল কর্মই নিজের জন্য করে, তারা ভগবানের মত অনুযায়ী কার্য করে না।

'সর্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্ তান'—যেসব ব্যক্তি ভগবানের মত অনুসরণ করে না, তারা সর্বপ্রকার জাগতিক জ্ঞানে (বিদ্যা-কলা ইত্যাদিতে) মোহগ্রস্ত হয়ে থাকে। তারা মোটর, এরোপ্লেন, রেডিয়ো, টেলিভিশন ইত্যাদির আবিষ্কারে, সেগুলির কলাকৌশল অর্জনে এবং নতুন নতুন আবিষ্কারেই ব্যস্ত থাকে। সন্তরণ, গৃহনির্মাণ, চিত্রাঙ্কন ইত্যাদি শিল্পকলায়, মন্ত্র, তন্ত্র, যন্ত্রাদির বিদ্যা শিখতে এবং সেগুলির দ্বারা চমৎকারিত্ব প্রদর্শনে, দেশ-বিদেশের ভাষা, লেখন, রীতি-রেওয়াজ, খাওয়াদাওয়া ইত্যাদি শিক্ষাতেই লেগে থাকে। যা কিছু আছে, তা সব এই-ই—তাদের এই বিশ্বাস জন্মায় (গীতা ১৬।১১)। এইরূপ ব্যক্তিদেরই এখানে সকল জ্ঞানে মোহগ্রস্ত বলা হয়েছে।

'অচেতসঃ'—যারা ভগবানের মত অনুসরণ করে না তাদের সৎ-অসৎ, সার-অসার, ধর্ম-অধর্ম, বন্ধন- মোক্ষ ইত্যাদি পারমার্থিক বচনের জ্ঞানও (বিবেক) হয় না। তাদের চৈতন্য হয় না, পশুর মতোই তারা বেহুঁশ হয়ে থাকে। তারা ব্যর্থ আশা, ব্যর্থ কর্ম এবং ব্যর্থ জ্ঞানসম্পন্ন বিক্ষিপ্তচিত্ত মূঢ় ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হয়—**'মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ'** (গীতা ৯।১২)।

'বিদ্ধি নষ্টান্'—মনুষ্য-দেহ লাভ করেও যারা ভগবানের মত অনুসারে চলে না, তারা নষ্ট হয়ে গেছে বলেই ধরে নেওয়া উচিত—অর্থাৎ তারা জন্ম-মৃত্যু চক্রেই আবদ্ধ থাকবে।

মনুষ্যজীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মুক্তির সম্ভাবনা থাকে (গীতা ৮।৫)। সুতরাং যে ব্যক্তি বর্তমান সময়ে ভগবানের মত অনুসরণ করে না, সেও ভবিষ্যতে সৎসঙ্গ ইত্যাদির প্রভাবে ভগবানের মতানুযায়ী আচরণ করে মুক্তিলাভ করতে সক্ষম হয়। কিন্তু ওই ব্যক্তির ভাব যদি বর্তমানের মতো ভবিষ্যতেও অপরিবর্তিত থাকে তাহলে তার (ভগবদ্প্রাপ্তিতে বঞ্চিত থাকায়) পতন হয়েছে বলেই বুঝতে হবে। এইজন্যই ভগবান এইসব ব্যক্তির উদ্দেশ্যে **'নষ্টান্ বিদ্ধি'** পদটির প্রয়োগ করেছেন।

যে সব ব্যক্তি ভগবানের মত অনুসরণ করে না, তারা সমস্ত কাজই আসক্তি বা দ্বেষপূর্বক করে। আসক্তি (রাগ) ও দ্বেষ—দুই-ই মানুষের বিষম শত্রু—**'তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ'** (গীতা ৩।৩৪)। বিনাশশীল হওয়ার জন্য পদার্থ এবং কর্ম সর্বদা সঙ্গী হয় না, কিন্তু রাগ-দ্বেষ সহকারে কর্ম করলে মানুষ তাদাত্ম্য, মমত্ববোধ এবং কামনা দ্বারা আবদ্ধ হয়ে বারংবার নীচ জন্ম এবং নরক-প্রাপ্ত হতে থাকে। সেইজন্যই এরূপ ব্যক্তিদের পতন হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

একত্রিশতম ও বত্রিশতম—এই দুটি শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে তাঁর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যারা কর্ম করে তারা কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায় এবং যারা এরূপ করে না তাদের পতন হয়। এর তাৎপর্য হল এই যে, মানুষ ভগবানকে মানুক বা না মানুক তাতে ভগবানের কোনো আগ্রহ নেই; কিন্তু তাঁর (ভগবানের) মত (সিদ্ধান্ত) অবশ্যই পালন করা উচিত—এই হল ভগবানের আদেশ। যদি মানুষ তা না করে তাহলে তার পতন অবশ্যম্ভাবী। সাধক যদি ভগবানকে মান্য করে তাঁর মত অনুযায়ী কর্ম করেন তবে ভগবান নিজেকেই তাঁর নিকট সমর্পণ করেন। আর যদি সাধক ভগবানকে না মেনে কেবলমাত্র তাঁর মতানুযায়ী কর্ম করেন, তাহলে ভগবান তাঁর উদ্ধার করেন। অর্থাৎ ভগবানকে যাঁরা মানেন তাঁরা 'প্রেম' লাভ করেন আর যাঁরা ভগবানের মতটিকে শুধুমাত্র মেনে চলেন তাঁরা 'মুক্তি' লাভ করেন।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—ভগবানের মতানুযায়ী কর্ম না করলে মানুষের পতন হয়—এরূপ কেন ? পরবর্তী শ্লোকে ভগবান তার উত্তর দিচ্ছেন।

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥ ৩৩ ॥

[ভূতানি (সমস্ত প্রাণী) ; **প্রকৃতিম্, যান্তি** (প্রকৃতিকে অনুসরণ করে) ; **জ্ঞানবান্, অপি** (জ্ঞানী ব্যক্তিও) ; **স্বস্যাঃ** (নিজের) ; **প্রকৃতেঃ** (প্রকৃতি) ; **সদৃশম্** (অনুযায়ী) ; **চেষ্টতে** (চেষ্টিত হন) ; **নিগ্রহঃ** (নিগ্রহের জন্য জেদ) ; **কিম্, করিষ্যতি** (করে কী হবে ?)]

সমস্ত প্রাণী প্রকৃতিকে অনুসরণ করে, জ্ঞানী ব্যক্তিও নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কর্ম সম্পাদনের জন্য চেষ্টা করেন। তাহলে নিগ্রহের জন্য জেদ করে কী হবে ? ॥ ৩৩ ॥

ব্যাখ্যা—'প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি'—যত কর্ম করা হয় তা সবই স্বভাব এবং সিদ্ধান্ত[1] অনুযায়ী হয়। স্বভাব দু'প্রকারের হয়—রাগ-দ্বেষরহিত এবং রাগ-দ্বেষযুক্ত। যেমন—পথ চলার সময় কোনো বোর্ড দেখা গেলে এবং তার ওপর কিছু লেখা থাকলে সেটি কোনোরূপ রাগ-দ্বেষ বা সিদ্ধান্ত থেকে পাঠ করা হয় না, সেটি রাগ-দ্বেষরহিত স্বভাব থেকেই পাঠ করা হয়ে থাকে। কিন্তু কোনো বন্ধুর পত্র এলে সেটি অনুরাগসহ পঠিত হয় এবং শত্রুর পত্রের প্রাপ্তি ঘটলে সেটিকে দ্বেষপূর্বক পাঠ করা হয়। তাহলে এগুলি রাগ-দ্বেষযুক্ত স্বভাব দ্বারা হয়। গীতা-রামায়ণ ইত্যাদি সৎ গ্রন্থ পাঠ সিদ্ধান্ত সহকারেই পঠিত হয়। মনুষ্য-জন্ম পরমাত্মপ্রাপ্তির জন্যই হয়েছে। তাই পরমাত্মপ্রাপ্তির উদ্দেশ্য নিয়ে কর্ম করাও সিদ্ধান্ত অনুসারে হয়।

এইরূপ দেখা, শোনা, গন্ধ শোঁকা, স্পর্শ করা ইত্যাদি ক্রিয়ামাত্রই স্বভাব ও সিদ্ধান্ত— দুইয়ের দ্বারা হয়। রাগ-দ্বেষবর্জিত যে স্বভাব তা দোষযুক্ত হয় না, বরং রাগ-দ্বেষযুক্ত স্বভাব দোষী হয়। রাগ-দ্বেষপূর্বক করা কর্মগুলি মানুষের বন্ধনের কারণ হয়, কারণ এতে স্বভাব অশুদ্ধ হয় এবং সিদ্ধান্তের আশ্রয়ে যে কর্মগুলি করা হয় তা উদ্ধারকারী হয় কারণ এতে স্বভাব শুদ্ধ হয়। স্বভাব অশুদ্ধ হওয়াতেই জগতের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক ছেদ হয় না। স্বভাব শুদ্ধ হলে জগতের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক অতি সহজেই ছেদ হয়।

জ্ঞানী মহাপুরুষদের নিজের বলে যে শরীর তার দ্বারা ক্রিয়াগুলি স্বতঃই হয়ে যায়, কারণ তাঁদের মধ্যে কর্তৃত্বভাব থাকে না। পরমাত্মপ্রাপ্তির জন্য চেষ্টিত সাধকগণের ক্রিয়া শুধু সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়। লোভী ব্যক্তি যেমন সর্বদা সাবধান থাকে, যেন লোকসান না হয়ে যায়, তেমনি সাধক সর্বক্ষণ সতর্ক থাকেন, যেন তাঁর কোনো ক্রিয়া রাগ-দ্বেষপূর্বক হয়ে না যায়। এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করায় সাধকের স্বভাব শীঘ্র শুদ্ধ হয়ে যায় এবং এর পরিণাম-স্বরূপ তিনি কর্মবন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করেন।

যদিও ক্রিয়ামাত্রই স্বাভাবিকভাবে প্রকৃতি সংযোগে হয়ে থাকে তবুও অজ্ঞ ব্যক্তিগণ ক্রিয়াগুলির সঙ্গে নিজ সম্বন্ধ স্থাপন করে নিজেকে ওই ক্রিয়াগুলির কর্তা বলে মনে করে (গীতা ৩।২৭)। পদার্থ এবং ক্রিয়াসমূহের সঙ্গে নিজ সম্বন্ধ স্থাপন করার জন্যই রাগ-দ্বেষ উৎপন্ন হয় এবং জন্ম-মৃত্যু রূপ বন্ধন হয়ে থাকে। অপরপক্ষে যে সাধক প্রকৃতির সঙ্গে নিজ সম্বন্ধ যোগ করেন না, তিনি নিজেকে সর্বদা অকর্তারূপে অনুভব করেন (গীতা ১৩।২৯)।

স্বভাবে প্রধান দোষই হল প্রাকৃত পদার্থের প্রতি আসক্তি। স্বভাবে যতক্ষণ আসক্তি থাকে, ততক্ষণ পর্যন্তই অশুদ্ধ কর্ম হয়ে থাকে। সুতরাং আসক্তিই সাধকের পক্ষে বন্ধনের মুখ্য কারণ। আসক্তি থাকে মেনে নেওয়া 'অহং'-বোধেই এবং মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহে এর প্রভাব দেখা যায়।

'অহং' দু'প্রকারের হয়—

(১) চেতন দ্বারা জড়ের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্বন্ধ থেকে সৃষ্ট তাদাত্ম্যরূপ 'অহম্'।

(২) জড় প্রকৃতির ধাতুরূপ 'অহম্'—**'মহাভূতান্যহংকারঃ'** (গীতা ১৩।৫)।

জড় প্রকৃতির ধাতুরূপ 'অহং'-এ কোনো দোষ নেই কারণ মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদির মতো এটিও একটি করণ। তাই সমস্ত দোষ হয় এই মেনে নেওয়া 'অহম্'এ। জ্ঞানী মহাপুরুষদের মধ্যে এই তাদাত্ম্যরূপ 'অহম্'-এর সর্বতোভাবে অভাব দেখা যায়। সুতরাং তাঁদের বলে কথিত শরীর দ্বারা যে সকল ক্রিয়া হয় তা প্রকৃতির ধাতুরূপ 'অহং' দ্বারাই হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত প্রাণীর সকল ক্রিয়াই সংঘটিত হয় এই প্রকৃতির ধাতুরূপ 'অহং' দ্বারা। কিন্তু জড় শরীরকে 'আমি' এবং 'আমার' মনে করা অজ্ঞানী মানুষ

[1]সিদ্ধান্ত তাকেই বলা হয় যেটি শাস্ত্র এবং ভগবানের নির্দেশানুযায়ী হয়। যা কিছু শাস্ত্র এবং ভগবানের নির্দেশের বিপরীত তাকে সিদ্ধান্ত বলে গণ্য করা হয় না।

সেই ক্রিয়াগুলিকে নিজের এবং নিজের বলে মনে করে এবং আবদ্ধ হয়ে যায়। কারণ এই ক্রিয়াগুলিকে নিজের বা নিজের জন্য মনে করলেই আসক্তি জন্মায়[১]।

'সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি'—যদিও অন্তরে রাগ-দ্বেষ না থাকায় জ্ঞানী মহাপুরুষদের স্বভাব—প্রকৃতি নির্দোষ হয় এবং তাঁরা প্রকৃতির বশ হন না, তবুও তাঁদের চেষ্টা নিজ প্রকৃতির (স্বভাব) অনুযায়ীই হয়ে থাকে। যেমন কোনো জ্ঞানী মহাপুরুষ যদি ইংরাজি না জানেন, তাহলে তাঁকে ইংরাজি বলতে বললে তিনি তা বলতে পারবেন না। তিনি যে ভাষা জানেন সেই ভাষাতেই বলবেন।

ভগবানও নিজ প্রকৃতিকে (স্বভাব) বশীভূত করে যখন যে যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন, সেই স্বভাব অনুযায়ীই কর্ম করেন, যেমন—ভগবান, শ্রীরাম বা শ্রীকৃষ্ণরূপে মনুষ্য অবতার গ্রহণ করলে অথবা মৎস্য, কূর্ম, বরাহ ইত্যাদি রূপে অবতাররূপ গ্রহণ করলে, সেই সেই প্রকাশ অনুযায়ীই কর্ম করেন।

এর তাৎপর্য হল এই যে, ভগবানের অবতার-দেহেও বর্ণ এবং যোনি অনুযায়ী স্বভাবের পার্থক্য থাকে কিন্তু বশ্যতা থাকে না। এইরূপ যে সকল মহাপুরুষদের প্রকৃতি (জড়ত্ব) হতে সম্পর্ক ছেদ হয়েছে, তাঁদের স্বভাবে পার্থক্য থাকলেও বশ্যতা থাকে না। কিন্তু যে মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি, তার স্বভাবে পার্থক্য এবং বশ্যতা—দুই-ই থাকে।

এখানে **'স্বস্যাঃ'** পদটির অর্থ হল এই যে, জ্ঞানী মহাপুরুষের প্রকৃতি নির্দোষ হয়। তিনি প্রকৃতির বশ হন না, বরং প্রকৃতি তাঁর বশ হয়ে থাকে। কর্মের ফলের উৎসের মূল বীজ হল কর্তৃত্বাভিমান এবং স্বার্থবুদ্ধি। জ্ঞানী মহাপুরুষের কর্তৃত্বাভিমান এবং স্বার্থবুদ্ধি থাকে না। তাঁদের দ্বারা শুধুমাত্র চেষ্টা করা হয়। কর্মই বন্ধনকারক হয়ে থাকে, চেষ্টা বা ক্রিয়া নয়। সেইজন্য এইস্থানে **'চেষ্টতে'** পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁদের স্বভাব এত শুদ্ধ হয় যে তাঁদের করা ক্রিয়াগুলিও অত্যন্ত শুদ্ধ এবং সাধকদের জন্য আদর্শ হয়ে থাকে।

পূর্বেকার এবং বর্তমান জন্মের সংস্কার, বাবা-মায়ের সংস্কার এবং বর্তমানের সঙ্গী, শিক্ষা, পরিবেশ, অধ্যয়ন, পূজা, চিন্তা, ক্রিয়া, ভাব ইত্যাদি অনুযায়ী স্বভাব গড়ে ওঠে। প্রত্যেক মানুষের স্বভাব বিভিন্ন প্রকারের হয় এবং তাকে নির্দোষভাবে গড়ে তোলার ব্যাপারে সকলেই স্বাধীন। ব্যক্তিগত স্বভাবের পার্থক্য জ্ঞানী মহাপুরুষদেরও থাকে।

চেতনে কোনোপ্রকার পার্থক্য থাকে না এবং প্রকৃতিতে (স্বভাবে) স্বাভাবিকভাবে পার্থক্য থাকে। প্রকৃতির কাজই হল বৈষম্য। যেমন আম একই জাতের হলেও নানান আমে নানাপ্রকার পার্থক্য থাকে। তেমনই প্রকৃতি (স্বভাব) শুদ্ধ হলেও জ্ঞানী মহাপুরুষদের প্রকৃতিতে পার্থক্য থাকে।

জ্ঞানী মহাপুরুষের স্বভাব শুদ্ধ (রাগ-দ্বেষরহিত) হয় তাই তিনি প্রকৃতির বশ হন না। এর বিপরীতে অশুদ্ধ (রাগ-দ্বেষযুক্ত) স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তি তার নিজেরই সৃষ্ট স্বভাবের বশে বাধ্য হয়ে কর্ম করে।

'নিগ্রহ কিং করিষ্যতি'—যাঁর স্বভাব অত্যন্ত শুদ্ধ এবং শ্রেষ্ঠ, তাঁর ক্রিয়াগুলিও তাঁর প্রকৃতি অনুযায়ী হয় তাহলে যার স্বভাব অশুদ্ধ (রাগ-দ্বেষযুক্ত) সেই ব্যক্তির ক্রিয়া তো তার প্রকৃতি অনুযায়ী হবেই। এবিষয়ে ব্যতিক্রম হবার উপায় নেই। যার যেমন স্বভাব, তাকে সেই অনুযায়ীই কাজ করতে হয়। স্বভাব অশুদ্ধ হলে তা অশুদ্ধ কর্মে এবং শুদ্ধ হলে তা শুদ্ধ কর্মে মানুষকে নিয়োজিত করে।

অর্জুনও যখন জেদের বশে যুদ্ধরূপ কর্তব্যকর্ম পরিত্যাগ করতে চেয়েছিলেন, তখন ভগবান তাঁকে এ কথাই বলেছিলেন, 'তোমার স্বভাব তোমাকে বলপূর্বক যুদ্ধে নিয়োজিত করবে'—**'প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি'** (১৮।৫৯) 'কারণ তোমার স্বভাবে ক্ষাত্রকর্ম (যুদ্ধাদি) করার প্রবাহ রয়েছে। তাই স্বাভাবিক কর্মে আবদ্ধ হয়ে, বশীভূত হয়ে তুমি যুদ্ধ করবে অর্থাৎ এতে তোমার জেদে কিছু হবে না'—**'করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ'** (১৮।৬০)।

যেমন কোনো গাড়ির নির্দিষ্ট গতিসীমা একশো মাইল হলে সেটি তার চেয়ে বেশি বেগে চলে না, তেমনি জ্ঞানী মহাপুরুষের দ্বারাও নিজ শুদ্ধ প্রকৃতির বিপরীতে যাওয়ার চেষ্টা থাকে না। অশুদ্ধ প্রকৃতির ব্যক্তিদের স্বভাব খারাপ

[১]শরীরের বৃদ্ধি এবং পরিবর্তন ইত্যাদি ক্রিয়াগুলির ন্যায় শরীর-নির্বাহের ক্রিয়াগুলিও স্বাভাবিকভাবে হয়, কিন্তু রাগ-দ্বেষাদি থাকায় সাধারণ ব্যক্তিগণের এই (ব্যবহারিক) ক্রিয়াতে লিপ্ততা থাকে ; কিন্তু জ্ঞানী মহাপুরুষদের রাগ-দ্বেষ না থাকায় লিপ্ততা থাকে না।

হওয়া গাড়ির মতো। খারাপ হয়ে যাওয়া গাড়ি সারাবার দুটি প্রধান উপায় হল—১) গাড়িটি নিজে সারানো, ২) গাড়িটিকে কারখানাতে পৌঁছে দেওয়া। তেমনি অশুদ্ধ-চিত্ত ব্যক্তিদের শুধরাবারও দুটি প্রধান উপায় আছে—১) রাগ-দ্বেষরহিত হয়ে কর্ম করা (গীতা ৩।৩৪) এবং ২) ভগবানের শরণাগত হওয়া (গীতা ১৮।৬২)। গাড়ি যদি ঠিক থাকে তবে আমরা গাড়ির অধীন নই, আর যদি গাড়ি খারাপ হয়ে থাকে, তাহলে আমরা তার অধীন হয়ে যাই। তেমনই জ্ঞানী মহাপুরুষের প্রকৃতি শুদ্ধ হওয়ায় তিনি প্রকৃতির বশ হন না আর অজ্ঞ ব্যক্তির প্রকৃতি অশুদ্ধ হওয়ায় তিনি প্রকৃতির বশ হয়ে থাকেন।

যার বুদ্ধিতে জড়ত্বের (জাগতিক ভোগ এবং সংগ্রহের) প্রতি গুরুত্ব থাকে সেই ব্যক্তি যতই বিদ্বান হোক না কেন, তার পতন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যার জড়ত্বের প্রতি কোনো মোহ নেই এবং ভগবৎপ্রাপ্তি করাই যার উদ্দেশ্য এরূপ ব্যক্তি বিদ্বান না হলেও তার উত্থান অবশ্যম্ভাবী। কারণ যার উদ্দেশ্য ভোগ এবং সম্পদ-সংগ্রহ না হয়ে শুধুমাত্র পরমাত্মপ্রাপ্তি হয়ে থাকে, তার সমস্ত ভাব, বিচার, কর্ম ইত্যাদি তার উন্নতির সহায়ক হয়ে থাকে। সুতরাং সাধকের সর্বপ্রথম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত পরমাত্মপ্রাপ্তি, তথা সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য রাগ-দ্বেষ রহিত হয়ে কর্তব্যকর্ম করা। রাগ-দ্বেষরহিত হওয়ার সহজ উপায় হল—প্রাপ্ত শরীরাদি পদার্থগুলিকে নিজস্ব বা নিজের জন্য মনে না করে অপরের সেবার্থে নিয়োগ করা এবং তার পরিবর্তে কিছু আকাঙ্ক্ষা না করা।

প্রকৃতির অধীন না হওয়ার জন্য সাধকের উচিত কোনো আদর্শ সামনে রেখে কর্তব্যকর্ম করা। আদর্শ দু'প্রকার হতে পারে—(১) ভগবানের মত (সিদ্ধান্ত) এবং (২) শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষদের আচরণ। যারা আদর্শ সামনে রেখে কর্ম করে তাদের প্রকৃতি শুদ্ধ হয়ে যায় এবং নিত্যপ্রাপ্ত পরমাত্মতত্ত্ব অনুভূত হয়। অপরপক্ষে আদর্শ সামনে না রেখে যারা কর্ম করে তারা রাগ-দ্বেষপূর্বকই সমস্ত কর্ম করে থাকে, যার জন্য রাগ-দ্বেষ দৃঢ়তর হয় এবং তাদের পতন হয় **'নষ্টান্ বিদ্ধি'** (গীতা ৩।৩২)।

নদীর স্রোতকে যেমন আমরা রুদ্ধ করতে পারি না, কিন্তু খাল কেটে তার গতি ঘুরিয়ে দিতে পারি, তেমনই কর্মের প্রবাহ আমরা বন্ধ করতে পারি না, কিন্তু তার গতি অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিতে পারি। নিঃস্বার্থভাবে শুধুমাত্র অন্যের হিতের উদ্দেশ্যে কর্ম করা হল—কর্মপ্রবাহের গতি বদলানো। নিজের জন্য কর্ম করলে কর্মের গতি বদলায় না। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, শুধুমাত্র অপরের হিতার্থে কর্ম করলে কর্মপ্রবাহ জগতের দিকে যায় এবং সাধক কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান।

পরিশিষ্ট-ভাব—জ্ঞানী মহাপুরুষগণও যখন ব্যবহারিক প্রয়োজনে কর্ম সম্পাদন করেন তখন সেটিও তাঁদের প্রকৃতি (স্বভাব) অনুসারে সম্পাদিত হয়। কেননা করণাদি (যন্ত্র) ব্যতীত কেউ কোনো কাজ করতে পারে না। যেমন আচার্য বালকের স্থিতিতে এসে তাকে বর্ণমালা (ক-খ-গ) ইত্যাদি শেখান, তেমনই জ্ঞানী মহাপুরুষ সাধারণ মানুষের স্থিতিতে এসে তাদের বোঝান, কর্মের সম্পাদন করেন।

'চেষ্টতে' পদটির অর্থ হল তিনি কর্ম করেন না, তাঁর প্রকৃতি অনুসারে স্বতঃই ক্রিয়া হয়ে থাকে। যেমন গাছের পাতা নড়লে তাতে কোনো ফলরূপ (পাপ বা পুণ্য) কর্ম হয় না, তেমনই কর্তৃত্বাভিমান না থাকায় তাঁর দ্বারা শুভ-অশুভ কোনো কর্ম হয় না।

জ্ঞানী মহাপুরুষগণ অপরের হিতে ব্যাপৃত থাকেন, কেননা সাধনাবস্থা থেকেই তাঁদের স্বভাব থাকে প্রাণীদের হিত করার দিকে— **'সর্বভূতহিতে রতাঃ'** (গীতা ৫।২৫, ১২।৪)। তাই তাঁদের কোনো কিছু করা, জানা, এবং পাওয়া বাকি না থাকলেও তাঁদের মধ্যে সকলের মঙ্গল করার স্বভাব থেকে যায়। তাৎপর্য হল যে, অন্যের হিতের জন্য কাজ করতে করতে যখন তাঁদের জগৎ-সংসার থেকে সর্বতোভাবে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়, তখন তাঁদের আর চেষ্টা করতে হয় না, স্বভাববশে তাঁদের দ্বারা স্বতঃই অন্যের হিতসাধন হয়ে থাকে।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—প্রত্যেক মানুষই প্রকৃতি (স্বভাব) সঙ্গে নিয়েই জন্মগ্রহণ করে ; তাই তার নিজ প্রকৃতি অনুযায়ীই কর্ম করতে হয়। সেইজন্য ভগবান পরবর্তী শ্লোকে প্রকৃতি শুদ্ধ করার উপায় জানাচ্ছেন।

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ॥ ৩৪ ॥

[**ইন্দ্রিয়স্য, ইন্দ্রিয়স্য** (ইন্দ্রিয়-ইন্দ্রিয়ে) ; **অর্থে** (প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই) ; **রাগদ্বেষৌ** (রাগ এবং দ্বেষ) ; **ব্যবস্থিতৌ** (স্থিতি হয়) ; **তয়োঃ** (ওইসবের) ; **বশম্, ন, আগচ্ছেৎ** (বশে আসা উচিত নয়) ; **হি** (কারণ) ; **তৌ** (এই দুটিই) ; **অস্য** (এর) ; **পরিপন্থিনৌ** (বিঘ্নপ্রদানকারী শত্রু।)]

'ইন্দ্রিয়-ইন্দ্রিয়ে' অর্থাৎ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই নিজ নিজ বিষয়ে মানুষের রাগ এবং দ্বেষ (অনুকূল ও প্রতিকূল) ব্যাপারে স্থিতি হয়। মানুষের ওইগুলির বশীভূত হওয়া উচিত নয় ; কারণ এই দুটিই জীবের (পারমার্থিক পথে বিঘ্ন প্রদানকারী) শত্রু ॥ ৩৪ ॥

ব্যাখ্যা—**'ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ'**—প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের প্রতিটি বিষয়ের রাগ-দ্বেষ পৃথক পৃথক জানাবার জন্যই এখানে **'ইন্দ্রিয়স্য'** পদটি দুবার ব্যবহৃত হয়েছে। তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকের) প্রতিটি বিষয়ে (রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ) অনুকূল ও প্রতিকূলতায় মানুষের রাগ-দ্বেষ স্থিত হয়ে থাকে। ইন্দ্রিয়ের কোনো বিষয়ে অনুকূল ভাব হলে মানুষের সেটির ওপর রাগ (আসক্তি) জন্মায় এবং প্রতিকূল মনোভাবে ওই বিষয়ে 'দ্বেষ' হয়।

প্রকৃতপক্ষে রাগ এবং দ্বেষ ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে অবস্থিত থাকে না। যদি বিষয়গুলিতে রাগ-দ্বেষের অবস্থিতি হত তবে একটি বিষয় সকলের নিকট সমানভাবে প্রিয় বা অপ্রিয় হত। কিন্তু সেইরূপ হয় না ; যেমন—বর্ষা কৃষকের প্রিয় ঋতু হলেও, কুম্ভকারের নয়। কোনো মানুষের ক্ষেত্রেও কোনো বস্তু সর্বদা প্রিয় বা অপ্রিয় থাকে না, যেমন—ঠাণ্ডা হাওয়া গ্রীষ্মকালে ভালো লাগলেও শীতকালে ভালো লাগে না। এইরূপ সব বিষয়ই নিজ অনুকূল-প্রতিকূল ভাব অনুযায়ী প্রিয় বা অপ্রিয় হয়ে থাকে অর্থাৎ মানুষ বিষয়গুলিকে নিজের অনুকূল-প্রতিকূল ভাব দ্বারাই সেগুলির ভালো-মন্দ বিচার করে রাগ-দ্বেষ করে থাকে। তাই ভগবান রাগ-দ্বেষকে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের প্রত্যেক বিষয়ে অবস্থিত বলেছেন।

রাগ এবং দ্বেষ প্রকৃতপক্ষে মেনে নেওয়া 'অহম্'-এ (আমিত্বতে) থাকে[১]। শরীরের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ককেই 'অহম্' বলা হয়। সুতরাং শরীরে যতক্ষণ এই সম্পর্ক বজায় থাকে ততক্ষণ তাতে রাগ-দ্বেষ থাকে এবং সেই রাগ-দ্বেষই বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়সমূহ এবং ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয়ে লক্ষ্য করা যায়। এই অধ্যায়ের সাঁইত্রিশ থেকে তেতাল্লিশতম শ্লোক পর্যন্ত ভগবান এই রাগ-দ্বেষকেই 'কাম' এবং 'ক্রোধ' নামে অভিহিত করেছেন। রাগ এবং দ্বেষই স্থূলরূপে হল কাম এবং ক্রোধ। চল্লিশতম শ্লোকে বলা হয়েছে যে এই 'কাম' ইন্দ্রিয়সমূহ, মন এবং বুদ্ধিতে অবস্থান করে। বিষয়ের ন্যায় এগুলিতে (ইন্দ্রিয়াদি, মন এবং বুদ্ধিতে) 'কাম' প্রতীত হওয়ায় ভগবান এগুলিকে 'কাম'-এর নিবাসস্থল বলে জানিয়েছেন। বিষয়ে রাগ-দ্বেষ প্রতীতিমাত্র। ইন্দ্রিয়সমূহ, মন ও বুদ্ধি—এগুলি কেবল কর্ম করার করণ (যন্ত্র)। এগুলিতে কাম-ক্রোধ বা রাগ-দ্বেষ কোথায় ? তাছাড়া দ্বিতীয় অধ্যায়ের উনষাটতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, ইন্দ্রিয় সহযোগে বিষয়কে গ্রহণ না করলে বিষয়ভোগ নিবৃত্ত হয় বটে কিন্তু অন্তরস্থিত রাগ নিবৃত্ত হয় না। পরমাত্মার সাক্ষাৎ পেলেই এই রাগ বা আসক্তি নিবৃত্ত হয়ে যায়।

'তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ'—পদটির দ্বারা ভগবান সাধককে এই বলে আশ্বাস দিচ্ছেন যে রাগ-দ্বেষ বৃত্তি উৎপন্ন হলেও তাঁর সাধন বা সাধ্য হতে নিরাশ হওয়া উচিত

[১]ভগবান 'রসবর্জং রসোঽপ্যস্য' (গীতা ২।৫৯) পদটিতে 'অস্য' পদ দ্বারা জানিয়েছেন যে রাগ (আসক্তি) ও দ্বেষ (সাধকের) মেনে নেওয়া 'অহম্'-এ থাকে।

নয়, উপরন্তু রাগ-দ্বেষের বশীভূত হয়ে ওই ব্যক্তির কোনো কর্মে প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হওয়া উচিত নয়। কর্মে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি শাস্ত্র নির্দেশ অনুযায়ীই হওয়া উচিত (গীতা ১৬।২৪)। রাগ-দ্বেষবশতঃ যদি কোনো সাধকের কর্মে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি হয় তবে তার মানে এই যে, সাধক রাগ-দ্বেষের বশীভূত। আসক্তিপূর্বক প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি হলে আসক্তি দৃঢ় হয় আর দ্বেষ সহকারে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি হলে দ্বেষ পরিপুষ্ট হয়। এইভাবে রাগ-দ্বেষ পরিপুষ্ট হওয়ার ফলে পতনই হয়ে থাকে।

সাধক যখন সংসারের কর্ম ত্যাগ করে সাধন-ভজনে ব্যাপৃত হয় তখন জগতে নানাপ্রকার ভালো-মন্দ ভাবের স্ফুরণ হতে থাকে, যার ফলে সাধক বিচলিত হয়ে যায়। কিন্তু ভগবান এইস্থানে তাদের আশ্বস্ত করেছেন যে সাধকদের ওই স্ফুরণগুলিতে ভয় পাবার কিছু নেই। এই স্ফুরণগুলির আসলে কোন অস্তিত্ব নেই কারণ এগুলির উৎপত্তি হয়েছে, আর সিদ্ধান্ত অনুসারে যে বস্তু উৎপন্ন হয় তার নাশও হয়। সুতরাং বিচার করলে দেখা যায় যে স্ফুরণগুলি আসছে না, বরং চলে যাচ্ছে। সংসারের কার্য করার সময় ব্যস্ততার জন্য এই স্ফুরণগুলি দমিত হয়ে থাকে এবং সংসারের কার্যত্যাগ করায় ব্যস্ততার অবসানে পুরাতন সংস্কারগুলি স্ফুরণরূপে প্রকাশিত হয়। সুতরাং সাধকদের এই ভালো বা মন্দ স্ফুরণগুলিতে কোনোপ্রকার রাগ-দ্বেষ করা উচিত নয়, বরং সাবধান হয়ে এগুলিকে উপেক্ষা করে নিজে নিরপেক্ষ থাকা উচিত। এইরূপ তাদের পদার্থ, ব্যক্তি, বিষয় ইত্যাদিতেও রাগ-দ্বেষ রাখা উচিত নয়।

রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ জয় করার উপায়

রাগ-দ্বেষের বশীভূত হয়ে কর্ম করলে রাগ-দ্বেষ পুষ্ট (প্রবল) হতে থাকে এবং অশুদ্ধ প্রকৃতির (স্বভাবের) রূপ ধারণ করতে থাকে। প্রকৃতি অশুদ্ধ হলে প্রকৃতির অধীনতা থাকে। এইরূপে অশুদ্ধ প্রকৃতির অধীনতায় কৃত কর্ম মানুষকে আবদ্ধ করে। সুতরাং রাগ-দ্বেষের বশীভূত হয়ে কোনো কর্মে প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হওয়া উচিত নয়—এই উপায়টি এখানে জানানো হয়েছে। এর আগে ভগবান বলেছেন, 'যারা আমার মত অনুসরণ করে, তারা কর্ম-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়' (গীতা ৩।৩১)। সেইজন্যই রাগ-দ্বেষাদি বৃত্তির বশীভূত না হয়ে ভগবানের মতানুসারে কর্ম করলে সহজেই রাগ-দ্বেষ দূর হয়। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, সাধক যেন সমস্ত কর্ম এবং নিজেকেও সম্পূর্ণভাবে ভগবানে অর্পণ করে দেন এবং এরকম মনে করেন যে, কর্ম তাঁর জন্য নয়, তা ভগবানেরই জন্য। যার দ্বারা কর্ম সংঘটিত হয়, সেই শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি সবই ভগবানের এবং তিনি নিজেও ভগবানেরই। তাই নিষ্কাম, মমত্ববর্জিত এবং নিঃসন্তাপ হয়ে কর্তব্যকর্ম করলে রাগ-দ্বেষ দূর হয়। এইভাবে ভগবানের মত বা সিদ্ধান্তকে সম্মুখে রেখেই কোনো কার্যে প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হওয়া উচিত।

সমস্ত সৃষ্টিই প্রকৃতির কার্য এবং শরীর সৃষ্টির একটি অংশ। এই শরীরের প্রতি যতক্ষণ মমত্ববোধ থাকে ততক্ষণ রাগ-দ্বেষও থাকে অর্থাৎ মানুষ তার ইচ্ছামতো বস্তুগুলি গ্রহণ বা পরিত্যাগ করে। এই ইচ্ছা-অনিচ্ছাই রাগ-দ্বেষের সূক্ষ্ম রূপ। রাগ-দ্বেষপূর্বক প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হলে রাগ-দ্বেষ পরিপুষ্ট হয়। কিন্তু শাস্ত্রানুসারে কোনো কর্মে প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হলে রাগ-দ্বেষ দূর হয়। কারণ শাস্ত্রানুযায়ী কর্ম করলে নিজ ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রাধান্য আর থাকে না। যারা শাস্ত্র জানে না তাদের জন্য মহর্ষি বেদব্যাসের শাস্ত্রের সার কথা হল—

শ্রূয়তাং ধর্মসর্বস্বং শ্রুত্বা চৈবাবধার্যতাম্।
আত্মনঃ প্রতিকূলানি পরেষাং ন সমাচরেৎ॥

(পদ্মপুরাণ, সৃষ্টি. ১৯।৩৫৫-৫৬)

'হে মানব ! তোমরা ধর্মের সার শোনো এবং শুনে ধারণ করো যে, যা আমরা নিজেদের জন্য চাই না, তা অপরের প্রতি যেন না করি।'

জীবন্মুক্ত মহাপুরুষও শাস্ত্র-মর্যাদাকে মান্য করেন। তাই শ্রাদ্ধে পিণ্ডদানের সময় পিতার হাত প্রত্যক্ষভাবে দেখা দিলেও ভীষ্ম শাস্ত্রের নির্দেশানুযায়ী কুশের উপরই পিণ্ডদান করেছিলেন (মহাভারত, অনুশাসনপর্ব ৮৪।১৫-২০)। তাই সাধকগণের উচিত শাস্ত্রানুমোদিত কর্ম করা।

রাগ-দ্বেষ দূর করতে আগ্রহী সাধকদের কর্ম করার জন্য শাস্ত্র প্রমাণের প্রয়োজনীয়তা থাকে, কিন্তু রাগ-দ্বেষ হতে সর্বতোভাবে মুক্ত মহাপুরুষদের অন্তঃকরণ এত শুদ্ধ ও নির্মল হয় যে তাতে বেদের তাৎপর্য স্বতঃই প্রকটিত হয়, তা

তিনি বিদ্বান হন বা না হন। তাঁর অন্তরে যে কথা জাগরিত হয়, তা শাস্ত্রানুকূলই হয়ে থাকে[১]। রাগ-দ্বেষ সর্বতোভাবে রহিত হওয়ায় ওই মহাপুরুষের দ্বারা শাস্ত্রনিষিদ্ধ ক্রিয়া কখনো হয় না। তাঁর স্বভাব স্বাভাবিকভাবে শাস্ত্রানুযায়ী হয়ে যায়। সেইজন্যই এরূপ মহাপুরুষের আচরণ এবং বাণী অন্যান্য ব্যক্তিদের পক্ষে আদর্শস্বরূপ হয়ে থাকে (গীতা ৩।২১)। সুতরাং তাঁদের আচরণ এবং বাণী অনুসরণ করলে সাধকের রাগ-দ্বেষ দূর হয়।

কেউ কেউ মনে করে যে রাগ-দ্বেষ অন্তঃকরণের ধর্ম। তাই এগুলি দূর করা যায় না। কিন্তু একথা যুক্তিসংগত বলে মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে রাগ-দ্বেষ অন্তঃকরণেরই আগন্তুক বিকার, তা ধর্ম নয়। এসব যদি অন্তঃকরণের ধর্ম হত তবে যে সময় অন্তঃকরণ জাগ্রত থাকে, সেই সময় রাগ-দ্বেষও থাকত অর্থাৎ এগুলি সর্বদাই মনে হতে থাকত। কিন্তু রাগ-দ্বেষ ভাব সর্বদা থাকে না, কখনো কখনো অনুভূত হয়ে থাকে মাত্র। সাধন-ভজন করতে থাকলে রাগ-দ্বেষ উত্তরোত্তর স্তিমিত হতে থাকে—এটি সাধকেরা অনুভব করে থাকেন। যে বস্তু ক্ষয় হয় তার লয়ও হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, রাগ-দ্বেষ অন্তঃকরণের ধর্ম নয়। রাগ-দ্বেষকে ভগবান 'মনোগত' বলেছেন—**'কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্'** (গীতা ২।৫৫)। অর্থাৎ এটির মনে আগমন হয়, সর্বদা থাকে না। তাছাড়া ভগবান রাগ-দ্বেষকে বিকার বলে জানিয়েছেন (গীতা ১৩।৬) এবং প্রিয় ও অপ্রিয় প্রাপ্তিতে চিত্তকে সর্বদা সম রাখাকেই সাধন বলে জানিয়েছেন (গীতা ১৩।৯)। রাগ-দ্বেষ যদি অন্তঃকরণের ধর্ম হত, তাহলে এটি সমচিত্ততারূপ সাধন হতে পারত না। ধর্ম স্থায়ী হয়ে থাকে এবং বিকার অস্থায়ী হয় অর্থাৎ সেটি যাওয়া-আসা করে। রাগ-দ্বেষ অন্তরে আসে এবং চলে যায় সুতরাং এটি দূর করাও সম্ভব।

প্রকৃতি (জড়) এবং পুরুষ (চেতন)—দুটি ভিন্ন বিষয়। এই দুইয়ের-ই বিবেক স্বতঃসিদ্ধ। পুরুষ এই বিবেককে গুরুত্ব না দিয়ে প্রকৃতিজনিত শরীরের সঙ্গে ঐক্য করে নেয় এবং নিজেকে একদেশীয় বলে মেনে নেয়। এই জড় এবং চেতনের একাত্মতাকেই 'অহম্' (আমিত্ব) বলা হয় এবং রাগ-দ্বেষ থাকে অহম্-এই। তাৎপর্য হল এই যে, অহংবোধ (আমি-বোধ) রাগ-দ্বেষের বাসস্থান আবার রাগ-দ্বেষ থেকেই অহংবোধ পরিপুষ্টও হয়। এই রাগ-দ্বেষ বুদ্ধিতে প্রতীত হয়, যার জন্য সিদ্ধান্তগুলির প্রসঙ্গে নিজ বুদ্ধিতে নিজের মতামত প্রিয় লাগে এবং অন্যের মতামত অপ্রিয় মনে হয়। আবার এই রাগ-দ্বেষ মনে প্রতীত হয়, যাতে মনের অনুকূল বিষয় প্রিয় এবং প্রতিকূল বিষয় অপ্রিয় লাগে। এই রাগ-দ্বেষ ইন্দ্রিয়াদিতে প্রতীত হওয়ায় ইন্দ্রিয়াদির অনুকূল বিষয় প্রিয় এবং প্রতিকূল বিষয় অপ্রিয় লাগতে থাকে। এই রাগ-দ্বেষ ইন্দ্রিয়াদির বিষয়সমূহে (রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শে) নিজস্ব অনুকূল ও প্রতিকূল ভাবনানুসারে প্রতীত হয়। সুতরাং জড় ও চেতনের গ্রন্থিরূপ অহংবোধ (আমিত্ব) দূর হলে রাগ- দ্বেষেরও সর্বতোভাবে অভাব হয়ে যায় ; কেননা রাগ-দ্বেষ বজায় থাকে অহংবোধেরই ওপর।

'আমি সেবক আমি জিজ্ঞাসু, আমি ভক্ত'—এই সেবক বা জিজ্ঞাসু বা ভক্ত যে 'আমি'-বোধে অবস্থান করে, সেই 'আমি'তেই অবস্থান করে রাগ-দ্বেষ। কেবলমাত্র জড়ে বা কেবলমাত্র চেতনে রাগ-দ্বেষ থাকতে পারে না, জড় ও চেতনের মেনে নেওয়া সম্পর্কেই অবস্থান করে রাগ ও দ্বেষ। জড়-চেতনের মেনে নেওয়া সম্পর্কের মধ্যে এর অবস্থিতি হলেও, প্রধানতঃ জড়েই রাগ-দ্বেষ অবস্থান করে। জড়-চেতনের তাদাত্ম্যে জড়ের আকর্ষণ জড় অংশতেই হয়, কিন্তু তাদাত্ম্যতার জন্য তা চেতনের বলে মনে হয়। জড়ের প্রতি আকর্ষণকেই রাগ (আসক্তি) বলা হয়। তাই সাধক যখন শরীরকেই (জড়) নিজ স্বরূপ বলে মনে করে, তখন তার রাগ-দ্বেষ দূর করা কঠিন বলে মনে হয়। কিন্তু চেতন-স্বরূপের দিকে লক্ষ্য থাকলে রাগ-দ্বেষ দূর করা কঠিন হয় না। কারণ রাগ বা দ্বেষ স্বতঃসিদ্ধ নয়, এটি জড়-এর (অসৎ) সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত হয়।

---

[১]যে ব্যক্তি কখনো ধর্মকে পরিত্যাগ করে না তার অন্তঃকরণও শুদ্ধ হয়ে যায়। রাজা দুষ্মন্তের বর্ণনাকালে মহাকবি কালিদাস লিখেছেন যে—'সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ॥' (অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ ১।২১) 'যেখানে সন্দেহ হয় সেখানে সৎপুরুষের অন্তঃকরণের প্রবৃত্তিই প্রমাণ হয়ে থাকে।'

সৎসঙ্গ, ভজন, ধ্যান ইত্যাদিতে যদি 'রাগ' বা অনুরাগ হয় তবে সংসারের প্রতি দ্বেষভাব আসে। কিন্তু 'প্রেম' হলে সংসারের প্রতি দ্বেষ ভাব আসে না, তখন সংসারের প্রতি উপেক্ষা (বিমুখ) ভাব দেখা যায়[১]। জগতের কোনো একটি বিষয়ে আসক্তি হলে অন্য বিষয়ে দ্বেষ হয় কিন্তু ভগবানে প্রেম হলে সংসারে বৈরাগ্য দেখা দেয়। বৈরাগ্য হলে সংসার থেকে সুখ পাবার চিন্তা দূর হয়ে যায় এবং স্বাভাবিকভাবে জগৎ-সংসারের সেবা হয়ে থাকে। এর দ্বারা শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন এবং বুদ্ধির সঙ্গে 'অহং'ও স্বাভাবিকভাবে সংসারের সেবায় ব্যাপৃত হয়। পরিণামে শরীরাদির সঙ্গে সঙ্গে 'অহং'বোধ থেকেও সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়ায় রাগ-দ্বেষ সর্বতোভাবে দূরীভূত হয়ে যায়।

মানুষের সমস্ত ক্রিয়াই তার স্বভাব অথবা সিদ্ধান্তকে নিয়ে হয়ে থাকে। কেবল আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য যে কর্ম সেই কর্মই সিদ্ধান্ত অনুসারে করা হয়। স্বভাব দু'প্রকারের হয়—রাগ-দ্বেষরহিত (শুদ্ধ) এবং রাগ-দ্বেষযুক্ত (অশুদ্ধ)। স্বভাবকে তো দূর করা যায় না কিন্তু এটিকে শুদ্ধ অর্থাৎ রাগ-দ্বেষরহিত করা অবশ্যই সম্ভব। যেমন গঙ্গার উৎপত্তি গঙ্গোত্রী থেকে, গঙ্গোত্রী যে উচ্চতায় অবস্থিত যদি সেই উচ্চতায় বা ততোধিক উচ্চতায় বাঁধ তৈরি করা যায়, তবে গঙ্গার প্রবাহ রোধ করা যেতে পারে। কিন্তু এই কাজ সহজ নয়। তবে খাল কেটে গঙ্গার প্রবাহকে ঘোরানো যায়। এইরূপই স্বাভাবিক কর্মের প্রবাহ রোধ করা না গেলেও তাকে বদল করা যায় অর্থাৎ তাকে রাগ-দ্বেষবর্জিত করা সম্ভব—এই-ই হচ্ছে গীতার মর্মগত সিদ্ধান্ত। রাগ-দ্বেষযুক্ত যে ক্রিয়াগুলি হয় তাতে প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি তত বাধক নয়, যতটা রাগ-দ্বেষ বাধক। এইজন্য ভগবান রাগ-দ্বেষ ত্যাগ করা ব্যক্তিকেই প্রকৃত ত্যাগী বলে অভিহিত করেছেন (গীতা১৮।১০)। রাগ- দ্বেষের দিকে বেশির ভাগ সাধকেরই নজর থাকে না। সেইজন্য তাঁর প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি রাগ-দ্বেষপূর্বকই হয়ে থাকে। সুতরাং রাগ-দ্বেষরহিত হবার জন্য সাধকের সমস্ত ক্রিয়া সিদ্ধান্ত অনুসারে করা উচিত। তাহলেই তাঁর স্বভাব স্বাভাবিকভাবে সিদ্ধান্ত অনুরূপ তথা শুদ্ধ হয়ে যায়।

রাগ-দ্বেষযুক্ত স্ফুরণ উৎপন্ন হলে এবং সেই অনুযায়ী কর্ম করলে রাগ-দ্বেষ দৃঢ়তর হয় এবং সেই অনুযায়ী কর্ম না করে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কর্ম করলে রাগ-দ্বেষ দূর হয়।

মনের শুভ এবং অশুভ স্ফুরণগুলির জন্য রাগ-দ্বেষ হওয়া উচিত নয়। সাধকের কর্তব্য হল মনে জাগ্রত ওই স্ফুরণগুলিকে নিজ স্বরূপের বলে মনে না করে তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক স্থাপন না করা এবং সেগুলির সমর্থন বা বিরোধ—কোনোটাই না করা।

সাধক যদি রাগ-দ্বেষ দূর করতে সক্ষম না হন তাহলে তাঁর সর্বসমর্থ পরম সুহৃদ প্রভুর শরণাগত হওয়া উচিত। তবেই প্রভুর কৃপায় তাঁর রাগ-দ্বেষ দূর হয়ে যায় (গীতা ৭।১৪) এবং পরমশান্তি প্রাপ্তি হয় (গীতা ১৮।৬২)। নিজের বলে মেনে নেওয়া 'অহং'-এর সঙ্গে শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, প্রাণ এবং সাংসারিক পদার্থ সমস্তই ভগবানের—এরূপ মনে করাই হল ভগবানের শরণাগত হওয়া। ভগবানের প্রসন্নতা লাভের জন্য ভগবানেরই প্রদত্ত সামগ্রী দ্বারা ভগবানের প্রাণীদের সেবা করা উচিত এবং পরিবর্তে কিছুই আশা করা উচিত নয়। পরিবর্তে কিছু আশা করলেই জড়ত্বের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় থাকে।

রাগ-দ্বেষ দূর করার অব্যর্থ উপায় হল নিষ্কামভাবে জগৎ-সংসারের সেবা করা। স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণশরীর থেকে শুরু করে তথাকথিত 'অহং' পর্যন্ত যা কিছু নিজের বলে আছে তা সবই জগৎ-সংসারের সেবায় লাগানো উচিত। কারণ এইসব পদার্থই তত্ত্বতঃ সংসারের সঙ্গে অভিন্ন। এগুলিকে জগৎ থেকে পৃথক (নিজের বলে) মনে করাই বন্ধন। স্থূলশরীর দ্বারা ক্রিয়া এবং বিষয়গত সুখ,

---

[১]সাধকের সৎসঙ্গাদিতে আসক্তি অথবা প্রেম রয়েছে তা এই উদাহরণ দ্বারা জানা সম্ভব,—সৎসঙ্গ, ভজন ইত্যাদিতে কেউ বাধা দিলে তার ওপর ক্রোধ হলে বুঝতে হবে সৎসঙ্গাদিতে 'আসক্তি' আছে এবং (ওই ব্যক্তির ওপর রাগ না হয়ে) যদি কান্না এসে যায় তবে বুঝতে হবে সৎসঙ্গাদিতে 'প্রেম' আছে। কারণ নিজের দৃঢ়তা কম থাকলেই সাধনায় বাধা আসে। তাই বাধা প্রাপ্ত হলে নিজের দৃঢ়তার অভাব দেখে সাধক দুঃখিত হন। তেমনই অন্য ধর্ম, সম্প্রদায় ইত্যাদির ব্যক্তিদের আমাদের ভালো না লাগলে বুঝতে হবে যে, আমাদের নিজেদের ধর্ম-সম্প্রদায়ের ওপর 'আসক্তি' আছে। প্রকৃতপক্ষে সৎসঙ্গ, ভজন-ধ্যান ইত্যাদিতে আসক্তি আসা তত খারাপ নয় কারণ যেভাবেই হোক ভগবানে মন স্থির করা ভালো—

'তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ'। (শ্রীমদ্ভাগবত ৭।১।৩১)

সূক্ষ্মশরীর দ্বারা চিন্তার সুখ এবং কারণশরীর দ্বারা অনুভূত স্থিরতার সুখকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে মনুষ্যদেহ নিজের সুখের জন্যই নয়—

'এহি তন কর ফল বিষয় ন ভাঈ'।

(শ্রীরামচরিতমানস ৭।৪৪।১)

অপরপক্ষে যে শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, পদার্থ দ্বারা সেবা করা যায়, সে সবই এই পৃথিবীর অংশ। এই পৃথিবীই যখন নিজস্ব নয়, তাহলে তার অংশ নিজস্ব হয় কীভাবে ? শরীরাদি পদার্থগুলিকে নিজের বলে মনে করলে সত্যকার সেবা হওয়া সম্ভব নয়। কারণ তাতে মমতা এবং স্বার্থপরতা উৎপন্ন হয়। সুতরাং এই পদার্থগুলি তার বলেই মনে করা উচিত, যার সেবা করা হয়। ভক্ত যেমন পদার্থগুলিকে ভগবানের মনে করে তাঁকেই অর্পণ করেন—**'ত্বদীয়ং বস্তু গোবিন্দ তুভ্যমেব সমর্পয়ে'** তেমনই কর্মযোগী পদার্থগুলিকে জগৎ-সংসারের মনে করে জগৎকেই অর্পণ করেন।

সেবা সম্পর্কিত মর্মকথা

সেবা সেই করতে পারে যে নিজের জন্য কখনো কিছু আশা করে না। সেবাকার্য করার জন্য অর্থ কামনা তো কামনাই, সেবা করার আকাঙ্ক্ষা করাও কামনা। কারণ সেবার আকাঙ্ক্ষা হলেই অর্থ ও পদার্থের আকাঙ্ক্ষা হয়। তাই সুযোগ পেলে এবং যোগ্যতা থাকলে সেবা করা উচিত, কিন্তু সেবার আকাঙ্ক্ষা করা উচিত নয়।

অপরকে সুখী করে 'আমি অপরকে সুখী করছি'— এই ভাব রাখা, সেবার বিনিময়ে সামান্য পরিমাণেও মান, যশ আশা করা এবং সেই মান-যশে আনন্দিত হওয়াও হল প্রকৃতপক্ষে ভোগ । কারণ এরূপ করলে সেবা সুখভোগে পরিণত হয় অর্থাৎ সেই সেবা সুখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সেবা করে যদি তার থেকে কিছুমাত্র সুখ গ্রহণ করা হয় তবে সেই সুখ, অর্থ ইত্যাদিতে গুরুত্ব আনে এবং তাতেই ক্রমশঃ মমতা এবং কামনার উৎপত্তি হয়।

'আমি কাউকে কিছু দান করছি'—যার এরূপ ভাব রয়েছে সে একথা বুঝতে পারে না এবং তার বুদ্ধিতে এ-কথা অনুভূত হয় না। কেউ তাকে এ-কথা সহজে বোঝাতেও পারে না যে, সেবাকার্যে ব্যবহৃত পদার্থগুলি যার সেবায় ব্যবহৃত হচ্ছে তারই। যার জিনিস তাকেই যখন দেওয়া হচ্ছে, তখন পরিবর্তে কিছু আশা করার অধিকার আসে কোথা হতে ? যার গচ্ছিত ধন তাকেই প্রত্যার্পণ করায় কৃতজ্ঞতা কিসের ? নিজ হস্তে নিজ মুখ ধৌত করলে তার পরিবর্তে কি আমরা কিছু আশা করি ?

প্রশ্ন—অর্থ ইত্যাদি বস্তুর দ্বারাই সেবাকার্য সম্ভব। বস্তু ছাড়া সেবাকার্য কী করে করা যায় ? সুতরাং সেবার জন্যও বস্তুগুলির আকাঙ্ক্ষা না করার তাৎপর্য কী ?

সমাধান—স্থূল বস্তুগুলির দ্বারা সেবা করা তো খুবই স্থূল ব্যাপার। প্রকৃতপক্ষে সেবা হল ভাব, কর্ম নয়। কর্ম দ্বারা বন্ধন এবং সেবা দ্বারা মুক্তি লাভ হয়। সেবার ভাব হলে নিজের যা কিছু থাকে তা স্বাভাবিকভাবে সেবায় ব্যয় হয়। সেবার ভাব হলে নিজের কাছে যা কিছু থাকে তার দ্বারাই পরিপূর্ণভাবে সেবা হয় ; অধিক আর কোনো বস্তু সংগ্রহের প্রয়োজনই হয় না।

বস্তুগুলিতে গুরুত্ববোধ না থাকলে তবেই প্রকৃত সেবা হওয়া সম্ভব। স্থূল বস্তুর দ্বারাও সেবা করতে সেই পারে যার বস্তুগুলির প্রতি কোনো মহত্ত্ববুদ্ধি নেই। বস্তুগুলিতে গুরুত্ববোধ থাকলে সেবাকার্যে অহংভাব এসে যায়। অন্তরে যতক্ষণ বস্তুর প্রতি গুরুত্বভাব থাকে ততক্ষণ সেবকের মধ্যে ভোগবুদ্ধি থাকে, তা কেউ জানুক বা না জানুক।

সেবা প্রকৃতপক্ষে ভাব থেকে হয়, বস্তু থেকে নয়। বস্তু দ্বারা কর্ম হয়, সেবা নয়। সুতরাং বস্তুসামগ্রী প্রদান করলেই সেবা হয় না। দোকানদারও বস্তুসামগ্রী দিয়ে থাকে কিন্তু সেই সঙ্গে তার কিছু পাবার আশা থাকে বলে তাতে পুণ্য হয় না। তেমনি প্রজা রাজাকে কর-রূপে ধন প্রদান করে কিন্তু সেটি দান হয় না। কাউকে জল পান করিয়ে 'আমি ওকে জল পান করানোয় সে সুখী হয়েছে'— এ হল দোকানদারি মনোভাব। 'আমি মান-যশ চাই না, কিন্তু জল পান করালে পুণ্য হবে' অথবা 'দান করলে পুণ্য হবে'— এই ভাব থাকলেও ফলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় অন্তরে জল, অর্থ ইত্যাদি বস্তুর গুরুত্ব প্রভাব ফেলে। বস্তুগুলির গুরুত্বের প্রভাব পড়লে প্রকৃত সেবা হয় না, বরং নেওয়ার ভাব থাকায় অসৎ-এর সঙ্গে সম্পর্ক বজায় থাকে, তা সে বুঝে বা না বুঝে যেভাবেই করুক। তাই বস্তুগুলি অপরের সেবার্থে নিয়োগ করে তার দ্বারা দান বা পুণ্যের কথা ভাবা উচিত নয়, বরং সেগুলি থেকে নিজ সম্পর্কই ত্যাগ করা উচিত।

আমি জিনিসটি তাকেই দিতে পারি, যার সেই জিনিসটির উপর অধিকার আছে অর্থাৎ জিনিসটি প্রকৃতই যার। বস্তুটি তাকে দিলে আমার ঋণ শোধ হয়। যদি কারো কোনো বস্তুর আমার থেকেও বেশি প্রয়োজন (ক্ষিদে) থাকে, তবে সেই ওই বস্তুটির প্রকৃত অধিকারী। সে নিজ অধিকারের (প্রাপ্য) বস্তুই নিয়ে থাকে। আমার অধিকারের দ্রব্য অন্যে নিতেই পারবে না।

একটি ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে হয় যে আন্তরিকতার সঙ্গে অপরের সেবা করলে যার সেবা করা যায় তার হৃদয়েও সেবাভাব জাগরিত হয়—এটিই নিয়ম। সত্যিকার হৃদয় দিয়ে সেবা করে যে ব্যক্তি, স্থূলদৃষ্টিতে দেখলে সে পদার্থ দ্বারাই সেবা করে বটে, কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যায় যে, সে সেব্যের হৃদয়ে সেবাভাব জাগিয়ে তোলে। সেব্যের হৃদয়ে সেবাভাব জাগ্রত না হলে সাধকের বুঝতে হবে যে তাঁর সেবায় কোনো ত্রুটি (নিজের জন্য কোনো আকাঙ্ক্ষা) আছে। সুতরাং সাধককে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করেই অপরের সেবা করা উচিত এবং নিজ ত্রুটিগুলি খুঁজে দূর করা উচিত। 'অন্যে আমাকে ভাল বলুক'— সেবার মধ্যে এই ভাব একেবারে রাখা উচিত নয়। এই ভাব মনে উদয় হলে সঙ্গে সঙ্গে তা দূর করতে হয়। কারণ এই ভাব অভিমান বৃদ্ধিকারী।

প্রত্যেক সাধকের পক্ষে জগৎ-সংসার শুধুমাত্র কর্তব্য- পালনের স্থান, সুখী বা দুঃখী হওয়ার স্থান এটি নয়। সংসার সেবার জন্য। এই সংসারে সাধককে সেবাই করে যেতে হয়। সেবা করার সময় মনে সর্বপ্রথম সাধককে এই ভাব রাখতে হয় যে, 'আমার দ্বারা কারো যেন কিছুমাত্র অহিত (ক্ষতি) না হয়'। জগতে কিছু প্রাণী দুঃখী এবং কিছু প্রাণী সুখী। দুঃখী প্রাণীদের দেখে দুঃখিত হওয়া এবং সুখী প্রাণীদের দেখে সুখী হওয়াও সেবা। কারণ এতে দুঃখী এবং সুখী—উভয় ব্যক্তির সুখ অনুভূত হয় এবং তারা ভরসা পায় যে তাদের কেউ সঙ্গী আছে। দুঃখী মানুষের সঙ্গে আমরাও আন্তরিকভাবে দুঃখিত হয়ে যাই এবং দেখি যে কীভাবে তার দুঃখ দূর হবে ? প্রীতিপূর্বক যদি তার কথা শুনি এবং তার সঙ্গে কথাবার্তা বলি, তাকে বলি যে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বিচলিত হওয়া উচিত নয় । এরূপ পরিস্থিতিতে ভগবান রাম এবং রাজা নল, হরিশ্চন্দ্র প্রমুখ মহান ব্যক্তিদেরও পড়তে হয়েছিল । তোমার থেকেও অনেক বেশি দুঃখী মানুষ আজকাল নজরে পড়ে, কোনো সাহায্য প্রয়োজন থাকলে বলো—ইত্যাদি। এইরূপ কথায় ওই ব্যক্তি খুব খুশি হবে। এইভাবে সুখী ব্যক্তির সঙ্গে মিলিত হয়ে যদি আমরা আন্তরিকভাবে সুখী হই এবং প্রকাশ করি এটি খুবই ভালো হয়েছে, তাহলে সেও খুশি হয়। এইভাবে আমরা দুঃখী এবং সুখী লোকেদের সেবা করতে পারি। অন্যের দুঃখ এবং সুখে যোগ দিয়ে আমরা তাদের সুখী করতে পারি। প্রয়োজন হল সর্বক্ষণ অপরের হিতের কথা চিন্তা করা। যিনি অন্যের দুঃখে দুঃখী এবং সুখে সুখী হন, তিনি সাধুরূপে পরিগণিত হন। গোস্বামী শ্রীতুলসীদাস মহারাজ সাধুদের লক্ষণ জানাতে গিয়ে বলেছেন—**'পর দুখ দুখ সুখ সুখ দেখে পর'**

(শ্রীরামচরিতমানস ৭।৩৮।১)

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, আমরা যদি অপরের দুঃখে দুঃখিত হতে থাকি তাহলে তো আমাদের দুঃখ কখনো দূর হবে না। কারণ জগতে দুঃখী লোকেরই বেশি দেখা পাওয়া যায়। এর সমাধান হল যে, আমাদের কোনো দুঃখ হলে আমরা যেমন সেটিকে দূর করার চেষ্টা করি, তেমনই অপরের দুঃখ দেখলে নিজ সাধ্যানুযায়ী তার দুঃখ দূর করার চেষ্টা করা উচিত। তার দুঃখ দূর করার জন্য সত্যিকারের আগ্রহ থাকা উচিত। তাই অপরের দুঃখে দুঃখিত হওয়ার তাৎপর্য হল যে, দুঃখীর দুঃখ দূর করার আগ্রহ বা চেষ্টা করা, যার দ্বারা হৃদয়ে প্রসন্নতাই আসে, দুঃখ নয়। অপরের দুঃখে দুঃখিত হলে আমাদের যা শক্তি, যোগ্যতা, পদার্থ ইত্যাদি থাকে তা সবই স্বাভাবিকভাবে অপরের দুঃখমোচনে লেগে যায়। দুঃখী ব্যক্তিকে সুখী করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু তার দুঃখ দূর করার জন্য নিজ সুখ-সামগ্রী তার প্রয়োজনে লাগানো আমাদের নিজেদের সাধ্যের মধ্যে। সুখ-সামগ্রীগুলি পরিত্যাগ করলে সেই মুহূর্তেই শান্তি লাভ হয়।

সেবা করার অর্থ হল—সুখী করা। সাধকের ভাব **'মা কশ্চিদ্ দুঃখভাগ্‌ভবেৎ'** (কারো বিন্দুমাত্র দুঃখ যেন না হয়) হলে তিনি সকলকেই সুখী করেন অর্থাৎ সকলেরই সেবা করে থাকেন। সাধক সকলকে সুখী করতে সক্ষম না হলেও এরূপ ইচ্ছা তো তিনি পোষণ করতেই পারেন। ইচ্ছা পোষণ করায় সকলেই স্বাধীন, পরাধীন কেউই নয়। তাই সেবার জন্য অর্থ-সামগ্রীর প্রয়োজনীয়তা নেই, যতটা

প্রয়োজন আছে সেবা করার ইচ্ছার। ক্রিয়া এবং পদার্থ যতই হোক তা সীমিত হয়। সীমিত ক্রিয়া এবং পদার্থের দ্বারা সীমিত সেবা হয়ে থাকে। তাহলে সীমিত সেবার দ্বারা অসীম তত্ত্ব (পরমাত্মা) লাভ কীভাবে সম্ভব হয় ? কিন্তু ভাব হচ্ছে অসীম। এই অসীম ভাব দ্বারা সেবাও অসীম হয়, তাই অসীম সেবা দ্বারা অসীম তত্ত্ব প্রাপ্তি হয়। সেইজন্য অসীম ভাবযুক্ত ব্যক্তির ক্রিয়া এবং পদার্থ সীমিত হলেও তার সেবা কম হল বলে মনে করা উচিত নয়, কারণ তার ভাব হয় অসীম।

সাধকের কর্তব্যপালনের ক্ষেত্র সীমিত হলেও যাদের সঙ্গে তাঁর মেলামেশা তাদের সুখী দেখে তিনি সুখ পান এবং দুঃখিত দেখে দুঃখ পেয়ে থাকেন। পদার্থ, শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি নিজের এবং নিজের জন্য নয় —এটিই হল প্রকৃত সত্য। দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, যোগ্যতা, সামর্থ্য ইত্যাদি কোনো কিছুই ব্যক্তিগত নয়। ভ্রমবশতঃ এইসব পদার্থের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক সকলেই পরিত্যাগ করতে পারে, তা যে যত দরিদ্রই হোক বা ধনী হোক, বিদ্বান বা মূর্খ হোক। এইরূপ ত্যাগ করাতে সকলেই স্বাধীন এবং সমর্থ।

প্রকৃত সেবকের মনোবৃত্তি বিনাশশীল পদার্থের দিকে যায়ই না। কারণ তাঁর হৃদয়ে বস্তু-সামগ্রীর কোনো গুরুত্বই থাকে না। অন্তরে বস্তু-সামগ্রীর গুরুত্ব থাকলে তবেই সেই বস্তুগুলি নিজের বলে মনে হয়। সাধকদের প্রথম থেকে মনে করা উচিত যে, 'বস্তু-সামগ্রী আমাদের নয় এবং আমাদের জন্যও নয়।' বস্তুগুলি নিজস্ব ও নিজের বলে মনে করলে ভোগই হয়, সেবা নয়। এইরূপ বস্তুসামগ্রী নিজস্ব এবং নিজের জন্য নয় মনে করে সেব্যের কাজে ব্যয় করলে রাগ-দ্বেষ সহজেই দূর হয়।

'তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ'—পারমার্থিক মার্গে রাগ-দ্বেষই হল সাধকের সাধন-সম্পদ অপহরণকারী প্রধান শত্রু। কিন্তু সাধকগণ প্রায়শঃ সেইদিকে লক্ষ্য করেন না। সেইজন্যই সাধন-ভজন করলে যতটা আধ্যাত্মিক উন্নতি হওয়া উচিত, সাধকদের ততটা হয় না। সাধকদের প্রায়ই এই অভিযোগ থাকে যে মন লাগে না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মন না লাগা তত বাধা নয়, যত বাধা রাগ-দ্বেষ করার ফলে হয়। তাই সাধকের কর্তব্য হল মনের একাগ্রতায় দৃষ্টি না দেওয়া এবং যে যে স্থানে রাগ-দ্বেষ উৎপন্ন হতে থাকে সেই স্থান থেকে মন তৎক্ষণাৎ সরিয়ে নেওয়া। রাগ-দ্বেষ দূর হলে মনোনিবেশ করাও সহজ হয়ে যায়।

স্বাভাবিক কর্ম ত্যাগ করা সহজ না হলেও ওই কর্মগুলি রাগ-দ্বেষপূর্বক করা বা না করা সাধকের সাধ্যের মধ্যে। সাধকের পক্ষে যেটি করা সম্ভব, ভগবান তাই করার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন যে রাগ-দ্বেষযুক্ত স্ফুরণ হলে সেই অনুযায়ী কাজ করা উচিত নয় ; কারণ এই দুটিই পারমার্থিক পথের শত্রু। এরূপ করায় সাধক স্বাধীন। প্রকৃতপক্ষে রাগ-দ্বেষ স্বাভাবিকভাবে নষ্ট হতে থাকে, কিন্তু সাধক ওই রাগ-দ্বেষগুলিকে নিজের বলে মনে করে তাতে সত্তা আরোপ করেন এবং সেই অনুযায়ী কর্ম করে থাকেন, সেইজন্য এগুলি দূরীভূত হয় না। সাধক যদি এগুলি নিজের বলে না মনে করেন এবং সেই অনুযায়ী কর্ম না করেন তাহলে এগুলি স্বাভাবিকভাবে নষ্ট হয়ে যায়।

পরিশিষ্ট-ভাব—অপরকে সুখ-দুঃখের কারণ মেনে নিলেই সুখ-দুঃখ হয়, রাগ-দ্বেষ জন্মায় অর্থাৎ যাকে সুখপ্রদানকারী মনে করা হয়, তার প্রতি অনুরাগ এবং যে দুঃখ দেয় বলে মনে করা হয় তার প্রতি দ্বেষ জন্মায়। সুতরাং রাগ-দ্বেষ নিজের ভুলের জন্যই হয়। এর আর অন্য কোনও কারণ নেই। এই রাগ-দ্বেষ হওয়ার জন্যই জগৎ ভগবৎস্বরূপ বলে প্রতিভাত হয় না, জড় ও বিনাশশীল বলে প্রতীত হয়। রাগ-দ্বেষ না থাকলে জড়তা থাকেই না, তখন সব কিছুই হয় চিন্ময় পরমাত্মা— **'বাসুদেবঃ সর্বম্'** (গীতা ৭।১৯)।

মন ও বুদ্ধিতে যদি রাগ-দ্বেষাদি কোনো দোষ উৎপন্ন হয়, তাহলে তার বশীভূত হওয়া উচিত নয় অর্থাৎ সেই অনুযায়ী কোনো নিষিদ্ধ (অনুচিত) কাজ করা ঠিক নয়। বশীভূত হয়ে কাজ করলে সেই দোষ দৃঢ় হয়ে যায়। কিন্তু বশীভূত হয়ে ক্রিয়া না করলে মনে একপ্রকার বল ও প্রেরণা জাগবে। যেমন, কেউ আমাকে কটু কথা বললে যদি আমার ক্রোধ না হয়, তাহলে আমার মনে এই ভেবে আনন্দ ও প্রেরণা জাগে যে, যাক আজ আমাকে ক্রোধের বশীভূত হতে হয়নি। সুতরাং আত্মসংবরণকে নিজের শক্তি না ভেবে ভগবানেরই কৃপা বলে মনে করতে হয়, ভাবতে হয় যে তাঁর কৃপাতেই আমি রক্ষা

পেয়েছি, না হলে আমাকে ক্রোধের বশীভূত হতে হত। এইভাবে সাধক কখনও কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পড়লে তার বশীভূত যেন না হন এবং পরিস্থিতিকে নিজের মধ্যে যেন পোষণ না করেন। যদি রাগ-দ্বেষ নিজের মধ্যে উৎপন্ন হয়, তাহলে যতক্ষণ নিজের অস্তিত্ব থাকে, ততক্ষণ রাগ-দ্বেষও থাকা উচিত। কিন্তু এটি সকলেই অনুভব করেন যে আমি নিরন্তর বিরাজমান, কিন্তু রাগ-দ্বেষ নিরন্তর থাকে না, আসে ও যায়। অস্তিত্বরূপ স্ব-স্বরূপে রাগ-দ্বেষ পৌঁছতেই পারে না। কারণ আমার (স্ব-স্বরূপের) বিভাগ আলাদা আর রাগ-দ্বেষের বিভাগ আলাদা। যার রাগ-দ্বেষ আসা-যাওয়ার স্থান থাকে, সে রাগ-দ্বেষ থেকে পৃথকই থাকে। সুতরাং রাগ-দ্বেষ আমার থেকেও পৃথক এবং যাতে এটি প্রতীত হয়, সেই মন ও বুদ্ধি থেকেও পৃথক— **'মনোগতান্'** (গীতা ২।৫৫)।

'ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ' পদটির অর্থ হল যে অনুকূল ও প্রতিকূল কোনো অবস্থাতেই যেন অনুরাগ না থাকে, বরং সেটির সদ্ব্যবহার করা উচিত অর্থাৎ অনুকূল অবস্থায় অন্যের সেবা করা এবং প্রতিকূল অবস্থায় অনুকূলতার ইচ্ছা ত্যাগ করা। **'তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ'** পদটির তাৎপর্য হল যে, অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থায় সুখী বা দুঃখী হয়ো না। সুখী বা দুঃখী হলে ফলাসক্ত হতে হয় যার দ্বারা মানুষ আবদ্ধ হয়— **'ফলে সক্তো নিবধ্যতে'** (গীতা ৫।১২)।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—আসক্তি এবং দ্বেষের বশবর্তী না হয়ে কী করা উচিত এবং কী করা উচিত নয়—পরবর্তী শ্লোকে ভগবান তার উত্তর দিয়েছেন।

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ॥ ৩৫ ॥

[**স্বনুষ্ঠিতাৎ** (উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত) ; **পরধর্মাৎ** (পরধর্ম অপেক্ষা) ; **বিগুণঃ** (স্বল্পগুণবিশিষ্ট) ; **স্বধর্মঃ** (নিজ ধর্ম) ; **শ্রেয়ান্** (শ্রেষ্ঠ) ; **স্বধর্মে** (স্বধর্মে) ; **নিধনম্** (মৃত্যু) ; **শ্রেয়ঃ** (কল্যাণকারী) ; **পরধর্মঃ** (পরধর্ম) ; **ভয়াবহঃ** (ভয়সংকুল।)]

উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা স্বল্পগুণবিশিষ্ট নিজ ধর্ম শ্রেষ্ঠ। স্বধর্মে মৃত্যুও কল্যাণকারী, কিন্তু পরধর্ম ভয়প্রদানকারী, বিপজ্জনক ॥ ৩৫ ॥

ব্যাখ্যা—'শ্রেয়ান্[১] স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ'—অপর বর্ণ, আশ্রম ইত্যাদির ধর্ম বাইরে থেকে যতই গুণসম্পন্ন দেখাক, তার পালনে যতই সুগমতা থাকুক বা মনোনিবেশ হোক, এতে যতই অর্থ-সম্পদ, সুখ-সুবিধা, মান-যশ ইত্যাদির প্রাপ্তি হোক, আজীবন যতই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিশ্রুতি থাক না কেন, পরধর্ম পালন বিহিত না হওয়ায় এটি পরিণামে ভয়ই (দুঃখ) প্রদান করে থাকে। অপরপক্ষে নিজ বর্ণ, আশ্রম ইত্যাদির ধর্ম বাহ্যতঃ যতই স্বল্প গুণবিশিষ্ট মনে হোক, সেটি পালনে যতই কষ্ট হোক, মনঃসংযোগ না হোক অথবা ধনসম্পদ, সুখ-সুবিধা, মান-যশ ইত্যাদি না পাওয়া যাক, এটির পালনে জীবনভর যত কষ্টই সহ্য করতে হোক না কেন, তবুও স্বধর্ম নিষ্কামভাবে পালন করলে পরিণামে তা কল্যাণ প্রদান করে থাকে। তাই কোনো অবস্থাতেই মানুষের নিজধর্ম পরিত্যাগ করা উচিত নয়, বরং নিষ্কাম হয়ে মমত্ববোধ ত্যাগ করে, অনাসক্তভাবে স্বধর্ম পালন করা কর্তব্য।

মানুষের পক্ষে স্বধর্ম পালন করা সহজ ও স্বাভাবিক। মানুষের 'জন্ম' কর্ম অনুযায়ী হয় এবং জন্ম অনুসারেই ভগবান কর্ম স্থির করেছেন (গীতা ১৮।৪১)। সুতরাং নিজ নিজ নির্দিষ্ট কর্ম পালন করলে মানুষ কর্মবন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করে অর্থাৎ তার কল্যাণ হয় (গীতা ১৮।৪৫)। সুতরাং দোষযুক্ত মনে হলেও নির্দিষ্ট কর্ম অর্থাৎ স্বধর্ম ত্যাগ করা উচিত নয় (গীতা ১৮।৪৮)।

[১]অর্জুনের মূল প্রশ্নে উদ্ধৃত 'জ্যায়সী' (৩।১) এবং এখানে উল্লিখিত 'শ্রেয়ান্'—দুটি একই শব্দ। এতে মনে হয় যে, ভগবান অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর প্রধানতঃ এই শ্লোকের মাধ্যমে দিয়েছেন।

যুদ্ধাপেক্ষা ভিক্ষান্ন গ্রহণ করে জীবন-নির্বাহ শ্রেষ্ঠ বলে অর্জুন মনে করেছেন (গীতা ২।৫)। কিন্তু ভগবান এইস্থানে অর্জুনকে যেন জানাচ্ছেন যে ভিক্ষান্নে জীবন-নির্বাহ করা ভিক্ষুকের পক্ষে স্বধর্ম হলেও অর্জুনের কাছে সেটি পরধর্ম। কারণ অর্জুন গৃহস্থ ক্ষত্রিয়, ভিক্ষুক নন। প্রথম অধ্যায়েও যখন অর্জুন বলেছিলেন যে যুদ্ধ করলে 'পাপই হবে'— 'পাপমেবাশ্রয়েৎ' (১।৩৬), তখনও ভগবান তাঁকে জানিয়েছেন, 'ধর্মযুদ্ধ না করলে তুমি স্বধর্ম এবং কীর্তিচ্যুত হয়ে পাপভোগী হবে' (২।৩৩)। ভগবান পুনরায় জানিয়েছেন যে, জয়-পরাজয়, লাভ-ক্ষতি, সুখ-দুঃখকে সমান মনে করে যুদ্ধ করলে অর্থাৎ রাগ-দ্বেষরহিত হয়ে নিজ কর্তব্য (স্বধর্ম) পালন করলে পাপ হয় না (২।৩৮)। পরবর্তী অষ্টাদশ অধ্যায়েও ভগবান বলেছেন যে স্বভাবনির্দিষ্ট স্বধর্মরূপ কর্তব্যপালন করলে মানুষ পাপভাগী হয় না (১৮।৪৭)। তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, স্বধর্মপালনকালে আসক্তি বা দ্বেষ থাকলেই পাপ হয়, অন্যথায় নয়। রাগ-দ্বেষরহিত হয়ে ঠিকভাবে স্বধর্ম পালন করলে 'সমতা' (যোগ) অনুভূত হয় এবং সমতা অনুভূত হলে দুঃখ নাশ হয় (গীতা ৬।২৩)। তাই ভগবান বারংবার অর্জুনকে রাগ-দ্বেষ (আসক্তি ও দ্বেষভাব) রহিত হয়ে যুদ্ধরূপ স্বধর্ম পালন করার উপর জোর দিয়েছেন।

ভগবান অর্জুনকে যেন বলছেন, 'ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম হওয়ায় ক্ষাত্রধর্ম অনুযায়ী যুদ্ধ করা তোমার স্বধর্ম (কর্তব্য) ; অতএব যুদ্ধে জয়-পরাজয়, লাভ-ক্ষতি এবং সুখ-দুঃখকে সমানরূপে দেখা উচিত' এবং 'যুদ্ধরূপ ক্রিয়ার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই'—এরূপ মনে করে শুধুমাত্র কর্মাসক্তি ক্ষয় করার জন্যই কর্ম করা উচিত। শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, পদার্থ ইত্যাদি সবই কর্তব্যপালনের জন্য।

বর্ণ, আশ্রম ইত্যাদি অনুযায়ী নিজ নিজ কর্তব্য নিঃস্বার্থভাবে পালন করাই হল 'স্বধর্ম'। আস্তিক ব্যক্তি যাকে 'ধর্ম' বলে থাকেন, সেটিই হল কর্তব্য। স্বধর্মপালন করা বা নিজ কর্তব্যপালন করা, দুটি একই ব্যাপার।

কর্তব্য বলা হয় তাকে, যা সহজে করা যায়, যেটি অবশ্য করণীয় এবং যা করলে প্রাপ্য বস্তুর প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী হয়। ধর্ম পালন করা সুগম হয়, কারণ সেটিও কর্তব্য হয়ে থাকে। এটি একটি নিয়ম যে, শুধুমাত্র নিজ ধর্ম ঠিকমতো পালন করলে মানুষের বৈরাগ্য উদয় হয় **'ধর্ম তেঁ বিরতি ...'** (শ্রীরামচরিতমানস ৩।১৬।১)। কর্তব্য মনে করে ধর্ম পালন করলে কর্মপ্রবাহ প্রকৃতিতে লয় হয় এবং কর্তার সঙ্গে কর্মের সম্পর্ক থাকে না।

বর্ণ, আশ্রম ইত্যাদি অনুযায়ী সকল মানুষেরই নিজ নিজ কর্তব্য (স্বধর্ম) কল্যাণপ্রদ হয়ে থাকে। কিন্তু অন্যান্য বর্ণ, আশ্রম ইত্যাদির কর্তব্য দেখলে নিজ কর্তব্য অপেক্ষাকৃত কম গুণসম্পন্ন মনে হয় ; যেমন—ব্রাহ্মণের কর্তব্য (শম, দম, তপ, ক্ষমা ইত্যাদি) থেকে ক্ষত্রিয়ের কর্তব্যে (যুদ্ধাদিতে) অহিংসাদি গুণগুলি কম দেখায়। তাই এইস্থানে **'বিগুণঃ'** পদটি দেওয়ার অর্থ হল এই যে অন্যের কর্তব্য থেকে নিজ কর্তব্যের গুণগুলি কম বলে প্রতিভাত হলেও সেটি কল্যাণকারী হয়। সুতরাং কোনো অবস্থাতেই নিজ কর্তব্য পরিত্যাগ করা উচিত নয়।

বর্ণ, আশ্রম অনুসারে বাহ্যতঃ কর্মগুলি পৃথক (ঘোর বা সৌম্য) বলে প্রতিভাত হলেও পরমাত্মপ্রাপ্তিরূপ উদ্দেশ্যে তা একই ফল দিয়ে থাকে। যদি পরমাত্মপ্রাপ্তির উদ্দেশ্য না থাকে এবং অন্তরে প্রাকৃত পদার্থের গুরুত্ব থাকে তাহলেই কর্ম ঘোর বা সৌম্য রূপে প্রতিভাত হয়।

'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ'—স্বধর্ম পালন করাতে যদি সর্বদা সুখ-আরাম, ধন-সম্পত্তি, মান-যশ, সমাদর-সম্মান ইত্যাদি পাওয়া যেত তাহলে আজকাল ধর্মাত্মাদের ভিড় দেখা যেত। কিন্তু স্বধর্মপালন সুখ বা দুঃখের দিকে দৃষ্টি রেখে করা যায় না, ভগবান অথবা শাস্ত্রের নির্দেশ মেনে নিষ্কামভাবেই এটি পালন করতে হয়। তাই স্বধর্ম পালনকালে কোনো কষ্ট অনুভব হলে সেই কষ্টও উন্নতিকারক হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে এটিকে কষ্ট না বলে, তপস্যা বলা উচিত। এই কষ্ট দ্বারা তপস্যার চেয়েও শীঘ্র উন্নতি লাভ হয়। কারণ তপস্যা নিজের জন্য করা হয় এবং কর্তব্য করা হয় অন্যের জন্য। জেনেশুনে তপস্যা করলে যা লাভ হয় তার চেয়ে অনেক বেশি লাভ হয় স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্ত কষ্টরূপ তপস্যাতে। যিনি স্বধর্ম-পালনকালে কষ্ট সহ্য করেন এবং মৃত্যুবরণ করতেও কুণ্ঠিত হন না, সেই ধর্মাত্মা মানব অমরত্ব লাভ করেন। লৌকিকভাবে দেখলেও যিনি কষ্ট এলেও নিজ ধর্মে (কর্তব্যে) অটল থাকেন তাঁর খুবই প্রশংসা এবং গৌরব হয়। যেমন, দেশ স্বাধীন করার জন্য যেসব ব্যক্তি কষ্ট সহ্য করেছিলেন, বারবার জেলে

গিয়েছিলেন, ফাঁসি বরণ করেছিলেন, আজও তাঁদের প্রশংসা ও গৌরব গীত হয়। অপরপক্ষে মন্দ কর্ম করে জেলে গেলে সর্বত্রই নিন্দা হয়ে থাকে। অর্থাৎ নিষ্কামভাবে নিজ ধর্ম পালনকালে কষ্টই হোক বা মৃত্যুই আসুক, তাতে তার ইহলোকে প্রশংসা এবং পরলোকে কল্যাণ হয়।

স্বধর্মপালনকারী ব্যক্তির ধর্মের দিকে দৃষ্টি থাকে। ধর্মের দিকে লক্ষ্য থাকায় ধর্মের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ থাকে। সুতরাং ধর্মপালনকালে যদি তাঁর মৃত্যুও ঘটে, তবু তিনি উদ্ধার পেয়ে যান।

শঙ্কা—স্বধর্ম পালনকালে মৃত্যু হলে যে কল্যাণই হবে, তা কী করে মানব ?

সমাধান—গীতা স্বয়ং ভগবানের বাণী, সুতরাং এতে শঙ্কার কোনো স্থান নেই। তাছাড়া এটি চর্ম-চক্ষুর প্রত্যক্ষ বিষয় নয়, বরং এটি হল শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের ব্যাপার। তাহলেও এই সম্বন্ধে কিছু কথা জানানো হচ্ছে।

১) যে বিষয় আমরা জানি না, তা আমাদের শাস্ত্র থেকেই জানতে হয়[১]। শাস্ত্রে আছে, যে ধর্মকে রক্ষা করে, ধর্ম তাকে রক্ষা (কল্যাণ) করে—**'ধর্ম রক্ষতি রক্ষিতঃ'** (মনুস্মৃতি ৮।১৫)। সুতরাং যে ধর্ম পালন করে তার কল্যাণের ভার ধর্মের ওপর অর্থাৎ ধর্মের উপদেষ্টা ভগবান, বেদাদি, শাস্ত্রাদি, ঋষিগণ এবং মুনিগণের ওপর ন্যস্ত থাকে, তাই এঁদের শক্তি সহযোগেই ওই ব্যক্তির কল্যাণ হয়। যেমন আমাদের ধর্মে আছে যে পাতিব্রত্য ধর্ম পালন করলে স্ত্রীগণের কল্যাণ হয়। এক্ষেত্রে পাতিব্রত্য ধর্ম পালনের নির্দেশ প্রদানকারী ভগবান, বেদ, শাস্ত্রাদির শক্তিতেই কল্যাণ হয়ে থাকে, পতির শক্তিতে নয়। ধর্ম পালন করার জন্য ভগবান, বেদসমূহ, শাস্ত্র, ঋষি-মুনিগণ এবং সাধু-মহাপুরুষদের নির্দেশ থাকে, তাই ধর্মপালন-কালে মৃত্যু হলে তাঁদের শক্তিতেই কল্যাণ হয়ে থাকে, এতে কোনো সন্দেহ-ই নেই।

২) পুরাণ এবং ইতিহাসের দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে নিজধর্ম পালনকারীর কল্যাণ হয়। যেমন, অনেক কষ্ট, নিন্দা, অপমান ইত্যাদি সহ্য করতে হলেও রাজা হরিশ্চন্দ্র তাঁর 'সত্য' ধর্ম থেকে বিচলিত হননি এবং তারই প্রভাবে তিনি সমস্ত প্রজাসহ পরমধাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন[২] আজও তাঁর মহিমা এবং গৌরব বিদ্যমান।

৩) বর্তমানে পুনর্জন্ম সম্বন্ধীয় নানা ঘটনা দেখা, শোনা বা জানা যায়, যাতে মৃত্যুর পর জীবের যে সমস্ত সদ্গতি বা দুর্গতি হয় তার বিষয়ে জানা যায়[৩]।

৪) নিঃস্বার্থভাবে নিজ কর্তব্য ঠিকমতো পালন করলে আস্তিক ব্যক্তি তো বটেই, যারা পরলোক মানে না, সেইরূপ নাস্তিক ব্যক্তির চিত্তেও সাত্ত্বিক প্রসন্নতা আসে। এই প্রসন্নতা কল্যাণের দ্যোতক । কারণ কল্যাণের প্রকৃতরূপ হল 'পরমশান্তি'। সুতরাং নিজ অনুভব দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে অকর্তব্য সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করে কর্তব্যপালন করলে কল্যাণ হয়।

মর্মকথা

স্বরূপতঃ স্বয়ং পরমাত্মার অংশ হওয়ায় প্রকৃতপক্ষে স্বধর্ম হল নিজ কল্যাণ করা, নিজেকে ভগবানের বলে মনে করা এবং ভগবান ব্যতীত অন্য কাউকে নিজের বলে মনে না করা, নিজেকে জিজ্ঞাসুরূপে দেখা, নিজেকে সেবক ভাবা। কারণ এগুলিই হল প্রকৃত ধর্ম, স্ব-স্বরূপের ধর্ম, মন বা বুদ্ধি পরিচালিত ধর্ম নয়। এছাড়া বর্ণ, আশ্রম, শরীর ইত্যাদি নিয়ে যতপ্রকার ধর্ম আছে, সেগুলি কর্তব্য-পালনের নিমিত্ত স্বধর্ম হলেও, তা পরধর্মই । কারণ ওই সমস্ত ধর্মই আরোপিতমাত্র, স্বয়ং-এর নয়। ওইসব ধর্মপালনে অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন হয় অর্থাৎ ওগুলি অন্যের অধীন। অপরপক্ষে যেটি নিজের প্রকৃত ধর্ম তাতে কারো সহায়তার প্রয়োজন থাকে না অর্থাৎ সেগুলির স্বাধীনভাবে পালন সম্ভব। তাই যে প্রেমিক সে স্বয়ংই প্রেমিক, জিজ্ঞাসু যে সে স্বয়ংই জিজ্ঞাসু এবং সেবকও স্বয়ংই সেবক। সুতরাং প্রেমিক প্রেমের সঙ্গে প্রেমাস্পদে মিশে যায়, জিজ্ঞাসু জিজ্ঞাস্য হয়ে জ্ঞাতব্য-তত্ত্বের সঙ্গে

---

[১]অনেকসংশয়োচ্ছেদি পরোক্ষার্থস্য দর্শকম্। সর্বস্য লোচনং শাস্ত্রং যস্য নাস্ত্যন্ধ এব সঃ।।

যা বহু সংশয় দূরকারী এবং পরোক্ষ (অপ্রত্যক্ষ) বিষয় দর্শনকারক সেই শাস্ত্র সকলেরই চক্ষুস্বরূপ। সুতরাং যার শাস্ত্রজ্ঞান নেই তাকে অন্ধই বলা যায়।

[২] দ্রষ্টব্য—মার্কণ্ডেয়পুরাণ, দেবীভাগবত ইত্যাদি।

[৩]দ্রষ্টব্য—'কল্যাণ' মাসিক পত্রের ৪৩তম বর্ষ (১৯৬৮) বিশেষ ভাগ 'পরলোক ও পুনর্জন্ম'।

একীভূত হয় এবং সেবক সেবা হয়ে সেব্যের সঙ্গে এক হয়ে যায়। এইভাবেই সাধকমাত্রেই সাধনা দ্বারা এক হয়ে সাধ্যস্বরূপ হয়ে ওঠেন।

যে সাধকগণ পরমাত্মপ্রাপ্তি লাভ করতে ইচ্ছুক, তাঁদের অর্থ-যশ-মান-মর্যাদা-শ্রদ্ধা-আরাম ইত্যাদি পাবার ইচ্ছা জাগে না। তাই অর্থ যশ না পেলেও তাঁদের মনে কোনো চিন্তা হয় না আর যদি প্রারব্ধবশতঃ এগুলি পেয়েও যান তাতেও তাঁরা আনন্দিত হন না। কারণ তাঁদের ধ্যেয় হয় শুধুমাত্র পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করা, অর্থ-যশ প্রাপ্ত করা নয়। তাই কর্তব্যরূপে প্রাপ্ত লৌকিক কর্মাদিও তাঁদের দ্বারা সুচারুভাবে এবং পবিত্রতাপূর্বক সম্পন্ন হয়। তাঁদের উদ্দেশ্য পরমাত্মপ্রাপ্তি হওয়ায় তাঁদের সমস্ত কর্ম পরমাত্মার উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে। যেমন, অর্থলাভ ধ্যেয় হওয়ায় ব্যবসায়ী সুখ-আরাম পরিত্যাগ করে কষ্ট সহ্য করে, যেমন চিকিৎসক (রোগীর দেহে) ফোড়াকে ছুরি দিয়ে কাটলেও 'পরিণামে ভালোই হবে' ভেবে রোগী হৃদয়ে প্রসন্নতা অনুভব করে, তেমনি পরমাত্মপ্রাপ্তি লক্ষ্য হওয়ায় (জগৎ) সংসারে পরাজয়, ক্ষতি, কষ্ট ইত্যাদিতেও সাধকের হৃদয়ে স্বাভাবিকভাবে প্রসন্নতা থাকে। অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতিগুলি তাঁর কাছে সাধন-সামগ্রী হয়ে থাকে।

সাধক যখন নিজ কল্যাণ করাই দৃঢ় নিশ্চয় করে স্বধর্ম (নিজ স্বাভাবিক কর্ম) পালনে তৎপরতার সঙ্গে লেগে যান তখন যে কোনো কষ্ট, দুঃখ, কঠিনতা আসুক না কেন, তিনি তাতে বিচলিত হন না। শুধু তাই নয়, সেই কষ্ট, দুঃখ ইত্যাদি তাঁর কাছে তপস্যা রূপে অর্থাৎ প্রসন্নতা প্রদানকারী হয়ে থাকে।

শরীরকে 'আমি' এবং 'আমার' বলে মনে করলেই সংসারে রাগ (আসক্তি) ও দ্বেষ উৎপন্ন হয়। রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ থাকলে মানুষের স্বধর্ম এবং পরধর্মের সম্পর্কে জ্ঞান হয় না। যদি শরীর 'আমি' (স্বরূপ) হত তাহলে 'আমি' থাকলে শরীরও থাকত এবং শরীর না থাকলে 'আমি'ও থাকত না। যদি শরীর 'আমার' হত তাহলে এটি পাবার পরে আর কিছু পাবার ইচ্ছা থাকত না। ইচ্ছা বজায় থাকলে প্রমাণ হয় যে প্রকৃতপক্ষে 'আমার' (নিজের) বস্তু এখনও পাওয়া যায়নি এবং যেগুলি লাভ হয়েছে সেই বস্তু (শরীরাদি) 'আমার' নয়। শরীরকে সঙ্গে করে আনা হয়নি এবং সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, ইচ্ছানুযায়ী এতে পরিবর্তন আনা যায় না, তাহলে এটি 'আমার' কীরূপে হল ? এইপ্রকার 'শরীর আমি নয় এবং আমার নয়' এই জ্ঞান (বিবেকবোধ) সব সাধকেরই থাকে। কিন্তু এই জ্ঞানে গুরুত্ব আরোপ না করলে রাগ-দ্বেষ দূর হয় না। যদি শরীরে কখনো 'আমি' ভাব এবং 'আমার' ভাব পরিলক্ষিত হয়, তবে সাধকের তাতে গুরুত্ব আরোপ না করে নিজের বিবেককেই গুরুত্ব দিতে হবে অর্থাৎ 'শরীর আমি নয় এবং আমার নয়' এই বিষয়ে দৃঢ়তা থাকা উচিত। নিজের বিবেককে গুরুত্ব দিলে প্রকৃত তত্ত্ব বোধ হয়। বোধ সম্পন্ন হলে আর রাগ-দ্বেষ থাকে না। রাগ-দ্বেষ না থাকলে অন্তরে স্বধর্ম ও পরধর্মের জ্ঞান স্বাভাবিকভাবে প্রকটিত হয় এবং সেই অনুযায়ী স্বতঃই চেষ্টা হতে থাকে।

'পরধর্মো ভয়াবহ'—পরধর্ম পালন যদিও আপাত সহজ বলে মনে হয়, কিন্তু এর পরিণাম ভয়াবহ হয়ে যায়। মানুষ যদি 'স্বার্থপরতা' পরিত্যাগ করে পরহিতের জন্য স্বধর্ম পালন করে তবে তার কখনো কারো হতে ভয় হয় না।

প্রশ্ন—অষ্টাদশ অধ্যায়ের বিয়াল্লিশতম, তেতাল্লিশতম এবং চুয়াল্লিশতম শ্লোকে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রদের স্বাভাবিক কর্মের ক্রম বর্ণনা করে ভগবান সাতচল্লিশতম শ্লোকের পূর্বার্ধেও সেই কথাই (**শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎস্বনুষ্ঠিতাৎ**) বলেছেন। সুতরাং যখন এখানে (উপস্থিত শ্লোকটিতে) অপরের স্বাভাবিক কর্মকে ভয়াবহ বলা হয়েছে, তখন অষ্টাদশ অধ্যায়ের বিয়াল্লিশতম শ্লোকে বলা ব্রাহ্মণের 'স্বাভাবিক কর্ম'ও অপরের (ক্ষত্রিয় ইত্যাদির) পক্ষে ভয়াবহ হওয়া উচিত কিন্তু শাস্ত্রে সকল মানুষকেই তা পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর তাৎপর্য কী ?

উত্তর—মনের নিগ্রহ, ইন্দ্রিয়াদি দমন এগুলি সব হল 'সাধারণ ধর্ম' (গীতা ১৩।৭-১১ ; ১৬।১-৩), যেগুলি সকলেরই পালন করা উচিত। কারণ এগুলি সকলেরই স্বধর্ম। এই সাধারণ ধর্ম ব্রাহ্মণের পক্ষে 'স্বাভাবিক কর্ম' কারণ এটি পালনে তাঁর কোনো পরিশ্রম হয় না। কিন্তু অন্য বর্ণের মানুষদের এটি পালন করতে সামান্য পরিশ্রম হতে পারে। স্বাভাবিক কর্ম এবং সাধারণ কর্ম—এই দুটিই স্বধর্মের অন্তর্গত। সাধারণ ধর্ম ভিন্ন নিজ স্বাভাবিক কর্ম পাপময় মনে হলেও তাতে প্রকৃতপক্ষে পাপ হয় না ;

যেমন—শুধুমাত্র নিজের কর্তব্য মনে করে (স্বার্থ, দ্বেষ ইত্যাদি পরিত্যাগপূর্বক) শৌর্যবীর্য সহকারে যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক ধর্ম হওয়ায় এটি পাপকার্য মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এতে পাপ হয় না—**'স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্'** (গীতা ১৮।৪৭)।

সাধারণ কর্ম ব্যতীত অপরের স্বাভাবিক কর্ম (পরধর্ম) ভয়াবহ। কারণ এটি শাস্ত্রনিষিদ্ধ আচরণ এবং অন্যের জীবিকা অপহরণকারক। অপরের ধর্ম ভয়াবহ এইজন্য যে সেটি স্থান বিশেষে এবং জন্ম বিশেষে নরকরূপ ভীতি প্রদানকারী। তাই ভগবান যেন অর্জুনকে বলছেন, 'ভিক্ষান্নে জীবিকা নির্বাহ করা অপরের জীবিকা অপহরণকারী এবং ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিষিদ্ধ হওয়ায় তোমার পক্ষে শ্রেয়স্কর নয়, বরং তোমার পক্ষে যুদ্ধরূপে স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্ত সহজ কর্ম পালনই শ্রেয়স্কর।'

স্বধর্ম এবং পরধর্ম সম্পর্কিত মর্মকথা

পরমাত্মা এবং তাঁর অংশ (জীবাত্মা) হল 'স্বয়ং' এবং প্রকৃতি এবং তার কার্য (শরীর এবং জগৎ) হল 'অন্য'। 'স্বয়ং'-এর ধর্মকে 'স্বধর্ম' এবং 'অন্যের' ধর্মকে 'পরধর্ম' বলা হয়। সুতরাং সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখলে নির্বিকারত্ব, নির্দোষত্ব, অবিনাশত্ব, নিত্যতা, নিষ্কামতা, নির্মমতা ইত্যাদি যা কিছু স্বয়ং-এর ধর্ম, সেগুলি সবই 'স্বধর্ম'। উৎপন্ন হওয়া, উৎপন্ন হয়ে থাকা, পরিবর্তন হওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া, ক্ষীণ হওয়া বা নাশ হওয়া[১] এবং ভোগ ও সংগ্রহের ইচ্ছা, মান যশের আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি যা কিছু শরীরের, জগৎ-সংসারের ধর্ম, সেগুলি সবই 'পরধর্ম'—**'সংসারধর্মৈরবিমুহ্যমানঃ'** (শ্রীমদ্‌ভাগবত ১১।২।৪৯)। স্বয়ং-এ কখনো কোনো পরিবর্তন হয় না, তাই তার নাশও হয় না ; কিন্তু শরীরে নিরন্তর পরিবর্তন হয়, তাই সেগুলি নাশ হয়। এই দৃষ্টিতে দেখলে স্বধর্ম হল অবিনাশী এবং পরধর্ম বিনাশশীল।

ত্যাগ (কর্মযোগ), বোধ (জ্ঞানযোগ) এবং প্রেম (ভক্তিযোগ)—এই তিনটি স্বতঃসিদ্ধ হওয়ায় এগুলি হল স্বধর্ম। স্বধর্মে অভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা নেই। কারণ অভ্যাস শরীরের সম্পর্কে হয় এবং শরীরের সম্পর্কে যা কিছু হয় সে সবই পরধর্ম।

যোগী হওয়া স্বধর্ম এবং ভোগী হওয়া হল পরধর্ম। নির্লিপ্ত থাকা হল স্বধর্ম আর লিপ্ত হওয়া পরধর্ম। সেবা করা স্বধর্ম আর কোনো কিছু আকাঙ্ক্ষা করা হল পরধর্ম। প্রেমী হওয়া হল স্বধর্ম আর আসক্ত হওয়া হল পরধর্ম। নিষ্কাম, নির্মম এবং অনাসক্তি হচ্ছে স্বধর্ম এবং কামনা, মমতা ও আসক্তি হল পরধর্ম। এর তাৎপর্য হল এই যে প্রকৃতির সম্পর্ক ব্যতীত (স্বয়ং-এ) যা কিছু হয় তা সবই 'স্বধর্ম' এবং প্রকৃতির সংস্পর্শে যা কিছু হয় তা সব 'পরধর্ম'। স্বধর্ম হল 'চিন্ময় ধর্ম' আর পরধর্ম হল 'জড় ধর্ম'।

পরমাত্মার অংশ (শরীরী) হচ্ছে 'স্ব' এবং প্রকৃতির অংশ (শরীর) হল 'পর'। 'স্ব'-এর দুটি অর্থ হয়—এক হল 'স্বয়ং' এবং অন্যটি হল 'স্বকীয়' অর্থাৎ পরমাত্মা। এই দৃষ্টিতে নিজ স্বরূপবোধের আকাঙ্ক্ষা এবং স্বকীয় পরমাত্মার ইচ্ছা—দুই-ই 'স্বধর্ম'।

'পুরুষের' (চেতনের) ধর্ম হল—স্বতঃসিদ্ধ স্বাভাবিক স্থিতি এবং 'প্রকৃতির' (জড়ের) ধর্ম হল—স্বতঃসিদ্ধ স্বাভাবিক পরিবর্তনশীলতা। পুরুষের ধর্ম হল 'স্বধর্ম' এবং প্রকৃতির ধর্ম হল 'পরধর্ম'।

মানুষের মধ্যে দুই প্রকারের ইচ্ছা থাকে—'সাংসারিক' অর্থাৎ ভোগ এবং সম্পদ-সংগ্রহের ইচ্ছা এবং 'পারমার্থিক' অর্থাৎ নিজ কল্যাণের ইচ্ছা। এর মধ্যে ভোগ এবং সম্পদ-সংগ্রহের ইচ্ছাকে বলা হয় 'পরধর্ম' অর্থাৎ শরীরের ধর্ম। কারণ অসৎ শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলেই ভোগ এবং সংগ্রহের ইচ্ছা জাগে। নিজ কল্যাণের ইচ্ছা হল 'স্বধর্ম'। কারণ পরমাত্মারই অংশ হওয়ায় স্বয়ং-এর ইচ্ছাও পরমাত্মারই ইচ্ছা, জগৎ-সংসারের নয়।

স্বধর্ম পালন করায় মানুষ স্বাধীন। কারণ নিজ কল্যাণ করায় শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা নেই, বরং এগুলির থেকে বিমুখ হওয়ার প্রয়োজন থাকে। কিন্তু পরধর্ম পালন করায় মানুষ অপরের অধীন, কারণ এতে শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদির প্রয়োজন থাকে। শরীরাদির সহায়তা ভিন্ন পরধর্মের পালন সম্ভবই নয়।

স্বয়ং পরমাত্মার অংশ এবং শরীর হল জগৎ-সংসারের অংশ। মানুষ যখন পরমাত্মাকে আপন বলে

[১]'জায়তেঽস্তি বিপরিণমতে বর্ধতেঽপক্ষীয়তে বিনশ্যতি........' (নিরুক্ত ১।১।২)।

মেনে নেয় তখন সেটি তার 'স্বধর্ম' হয়ে যায় আর যখন শরীর-সংসারকে আপন বলে মেনে নেয় তখন সেটি তার 'পরধর্ম' হয়— যেটি হচ্ছে শরীর-(সংসার) ধর্ম। মানুষ যখন শরীরের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক না মেনে পরমাত্মপ্রাপ্তির জন্য সাধনা করে, সেই সাধনা তখন 'স্বধর্ম' হয়ে ওঠে। নিত্যপ্রাপ্ত পরমাত্মার অথবা নিজ স্বরূপের অনুভবকারী সমস্ত সাধন, 'স্বধর্ম' এবং সংসারের দিকে আকর্ষণকারী সমস্ত কর্মই হল 'পরধর্ম'। এইভাবে দেখলে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ—এই তিনটি যোগই মনুষ্যমাত্রের 'স্বধর্ম'। অপরপক্ষে শরীরের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করে ভোগ এবং সম্পদ-সংগ্রহে ব্যাপৃত থাকা মনুষ্যমাত্রেরই 'পরধর্ম'।

স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ—এই তিন শরীর দ্বারা করা তীর্থ, ব্রত, দান, তপস্যা, চিন্তা, ধ্যান, সমাধি ইত্যাদি সমস্ত শুভকর্ম সকামভাবে অর্থাৎ নিজের জন্য করলে সেটি 'পরধর্ম' হয়ে ওঠে আর নিষ্কামভাবে অর্থাৎ অন্যের জন্য করলে সেটি 'স্বধর্ম' হয়ে যায়। কারণ স্বরূপ হচ্ছে নিষ্কাম এবং সকামভাব প্রকৃতির সংস্পর্শ থেকে আসে। তাই কামনার উদ্ভব হলে পরধর্ম বন্ধনকারী হয়।

মানুষের বিশেষ কাজ হল—পরধর্ম হতে বিমুখ হওয়া এবং স্বধর্মের শরণাগত হওয়া। মানুষের পক্ষেই কেবল এটি করা সম্ভব। স্বধর্মে সিদ্ধিলাভের উদ্দেশ্যেই মনুষ্য-দেহ প্রাপ্ত হয়েছে। পরধর্ম অন্যান্য যোনি এবং ভোগপ্রধান স্বর্গাদি লোকেও আছে। স্বধর্ম পালনে মনুষ্যমাত্রেই সমর্থ, যোগ্য এবং স্বাধীন আর পরধর্ম পালনে মনুষ্যমাত্রেই নির্বল, অযোগ্য এবং পরাধীন। প্রকৃতিজনিত বস্তুর কামনাতে অভাবরূপ দুঃখ হয় এবং বস্তুটি প্রাপ্ত হলে সেই বস্তুটির পরাধীনতা হয়, যেটিকে বলা হয় পরধর্ম। কিন্তু প্রকৃতিজনিত বস্তুগুলির কামনাসমূহ নাশ হলে অভাব এবং পরাধীনতা চিরকালের মতো দূর হয়, যেটিকে 'স্বধর্ম' বলা হয়। এই স্বধর্মে স্থিত অবস্থায় যতই কষ্ট আসুক, এমনকি যদি দেহত্যাগও হয়, তবুও তা কল্যাণই করে। কিন্তু পরধর্মের থেকে অধিক সুখ-সুবিধা প্রাপ্ত হলেও সেটি ভয়াবহ অর্থাৎ তা বারংবার জন্ম-মৃত্যু চক্রে প্রেরণ করে।

জগতে যত দুঃখ, শোক, চিন্তা ইত্যাদি আছে, তা সবই পরধর্মের আশ্রয় নেওয়ার জন্যই হয়। পরধর্মের আশ্রয় পরিত্যাগ করে স্বধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করলে চিরকালের মতো শাশ্বত পরিপূর্ণ আনন্দের প্রাপ্তি ঘটে, যা স্বতঃসিদ্ধ।

পরিশিষ্ট-ভাব— সাধক জন্ম ও কর্ম অনুসারে 'স্ব'কে অর্থাৎ নিজেকে যা বলে মনে করেন, তার ধর্ম (কর্তব্য) তাঁর কাছে 'স্বধর্ম' এবং যা তাঁর পক্ষে নিষিদ্ধ, তাকে বলা হয় 'পরধর্ম'। যেমন সাধক নিজেকে যে বর্ণ এবং আশ্রমের বলে মনে করেন, সেই বর্ণ এবং আশ্রমের ধর্ম তাঁর কাছে স্বধর্ম। তিনি ছাত্র বা অধ্যাপক হলে পড়া বা পড়ানো তাঁর স্বধর্ম। তিনি নিজেকে সেবক, জিজ্ঞাসু বা ভক্ত বলে মনে করলে সেবা, জিজ্ঞাসা ও ভক্তি তাঁর কাছে স্বধর্ম। যাতে অন্যের অহিতের, অনিষ্টের ভাব থাকে, সেই চুরি, হিংসা ইত্যাদি কর্ম কারো স্বধর্ম নয়, সেগুলি হল কুধর্ম অথবা অধর্ম[১]।

নিষ্কামভাবে অপরের হিতার্থে কর্ম করাকে (কর্মযোগ) স্বধর্ম বলে। স্বধর্মকেই গীতায় সহজ কর্ম, স্বকর্ম এবং স্বভাবজ কর্ম নামে অভিহিত করা হয়েছে।

কর্তব্যের বিরুদ্ধ কর্ম করা অকর্তব্য এবং কর্তব্যপালন না করাও অকর্তব্য (গীতা ২।৩৩)।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ— 'স্বধর্ম কল্যাণকারক এবং পরধর্ম ভয়াবহ'—এরূপ জেনেও মানুষ কেন তবে স্বধর্মে প্রবৃত্ত হয় না ? অর্জুন তাই নিয়ে প্রশ্ন করছেন।

---

[১]প্রত্যেক ধর্মেই কুধর্ম, অধর্ম এবং পরধর্ম— এই তিনটি থাকে। অন্যের অনিষ্ট চিন্তা, কূটনীতি ইত্যাদিকে বলা হয় 'ধর্মে কুধর্ম'। যজ্ঞে পশুবলি দেওয়াকে বলে 'ধর্মে অধর্ম'। যা নিজের জন্য নিষিদ্ধ— এরূপ অন্য বর্ণ, আশ্রম ইত্যাদির ধর্ম হল 'ধর্মে পরধর্ম'। কুধর্ম, অধর্ম, পরধর্ম— এই তিনটির দ্বারা কল্যাণ হয় না। নিজ স্বার্থ এবং অহং অভিমান মুক্ত যে ধর্ম অন্যের হিতে করা হয় তার দ্বারাই কল্যাণ হওয়া সম্ভব।

অর্জুন উবাচ

অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥ ৩৬ ॥

[**বার্ষ্ণেয়** (হে বার্ষ্ণেয় !) ; **অথ, অয়ম্** (তাহলে) ; **পূরুষঃ** (মানুষ) ; **অনিচ্ছ ন অপি** (অনিচ্ছা সত্ত্বেও) ; **বলাৎ** (বলপূর্বক) ; **নিয়োজিতঃ, ইব** (সংযুক্তির ন্যায়।) **কেন, প্রযুক্তঃ** (কার দ্বারা প্রেরিত হয়ে) ; **পাপম্** (পাপের) ; **চরতি** (আচরণ করে ?)]

অর্জুন বললেন—হে বার্ষ্ণেয় ! তাহলে মানুষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও কার দ্বারা বলপূর্বক পাপাচরণ করার জন্য প্রেরিত হয়ে থাকে ? ॥ ৩৬ ॥

ব্যাখ্যা—**'অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং ..... বলাদিব নিয়োজিতঃ'**—যদুকুলে 'বৃষ্ণি' নামক একটি বংশ ছিল। সেই বৃষ্ণিবংশে অবতাররূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করায় তাঁর আর একটি নাম হয় বার্ষ্ণেয়। পূর্বশ্লোকে ভগবান স্বধর্মপালনের প্রশংসা করেছেন। ধর্ম 'বর্ণ' এবং 'কুলে'র হয়ে থাকে ; সুতরাং অর্জুনও কুলের (বংশের) নামেই ভগবানকে সম্বোধন করে প্রশ্ন করেছেন।

বিচারসম্পন্ন ব্যক্তি পাপ করতে চান না ; কারণ পাপের পরিণাম হল দুঃখ আর কোনো প্রাণীই দুঃখ চায় না।

এখানে **'অনিচ্ছন্'** পদটির তাৎপর্য ভোগ ও সম্পদ-সংগ্রহের ইচ্ছার ত্যাগ নয়, তাৎপর্য হল পাপ করার ইচ্ছা-ত্যাগ। কারণ ভোগ ও সম্পদ-সংগ্রহের ইচ্ছাই হল সমস্ত পাপের মূল, যেটি না থাকলে পাপ হয় না।

বিচারশীল ব্যক্তি যদিও পাপ করতে চায় না, কিন্তু তার মধ্যে জাগতিক ভোগ এবং সম্পদ-সংগ্রহের ইচ্ছা থাকায় সে করণীয় কর্তব্যকর্ম করতে সক্ষম হয় না, অকরণীয় পাপ-কাজ করে ফেলে।

'অনিচ্ছন্' পদটির প্রাবল্য বোঝাতে অর্জুন **'বলাদিব নিয়োজিতঃ'** পদটি ব্যবহার করেছেন। এর তাৎপর্য হল এই যে, পাপবৃত্তি উৎপন্ন হলে বিচারশীল ব্যক্তি সেই পাপের পরিণাম জেনে তার থেকে সর্বতোভাবে দূরে থাকতে চায় ; কিন্তু তা সত্ত্বেও সে সেই পাপাচরণে এমনভাবে প্রবৃত্ত হয়, যাতে মনে হয় কেউ যেন তাকে বলপূর্বক পাপ-কাজে প্রবৃত্ত করাচ্ছে যেন পাপ-কাজে প্রবৃত্ত হওয়ার কোনো বিশেষ শক্তিশালী কারণ আছে।

পাপ-কাজে প্রবৃত্ত হওয়ার মূল কারণ হল—'কাম' অর্থাৎ জাগতিক সুখভোগ এবং সম্পদ-সংগ্রহের কামনা। কিন্তু এই কারণের দিকে দৃষ্টি না দেওয়ায় মানুষ বুঝতে পারে না, কে পাপে প্রবৃত্ত করায় ? সে মনে করে যে, 'আমি তো পাপকে জেনে তার থেকে নিবৃত্ত হওয়ার চেষ্টা করি, কিন্তু আমাকে যেন কেউ বলপূর্বক পাপাচরণে প্রবৃত্ত করছে।' যেমন দুর্যোধন বলেছেন যে—

জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তি-
র্জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
কেনাপি দেবেন হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি॥

(গর্গসংহিতা, অশ্বমেধ ৫০।৩৬)

'আমি ধর্মকে জানি, কিন্তু তাতে আমার প্রবৃত্তি নেই, আর অধর্মকেও জানি, কিন্তু তা থেকে আমি নিবৃত্ত হতে পারি না। আমার হৃদয়ে অবস্থিত কোনো একজন দেবতা আমাকে দিয়ে যা করান, আমি সেইরূপই করে থাকি।'

দুর্যোধন কথিত এই 'দেব' প্রকৃতপক্ষে 'কাম'ই (ভোগ এবং সম্পদ-সংগ্রহের ইচ্ছা), যার ফলে মানুষ বিচারবিবেচনা প্রয়োগ করেও ধর্মকে পালন বা অধর্মকে পরিত্যাগ করতে সক্ষম হয় না।

'কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি' পদটিতেও **'অনিচ্ছন্'** পদের প্রাবল্য বোঝায়। এর তাৎপর্য হচ্ছে যে বিচারশীল ব্যক্তি নিজে পাপ করতে চায় না ; কিন্তু মনে হয় যেন কেউ তাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে পাপে প্রবৃত্ত করায় ! অর্জুনের প্রশ্ন ছিল যে, সেই অপরটি কে ?

ভগবান আগের চৌত্রিশতম শ্লোকে বলেছেন যে রাগ ও দ্বেষ (যা কাম এবং ক্রোধেরই সূক্ষ্মরূপ) সাধকের মহাশত্রু অর্থাৎ এই দুটি হল পাপের কারণস্বরূপ। কিন্তু সাধারণভাবে এটি বলায় অর্জুন এর তাৎপর্য বুঝতে পারেননি। তাই তিনি প্রশ্ন করছেন, 'মানুষ বিবেচনা দ্বারা পাপ করতে না চাইলেও কার দ্বারা প্রেরিত হয়ে পাপাচরণ করতে বাধ্য হয় ?'

অর্জুনের প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল যে [একত্রিশতম থেকে পঁয়ত্রিশতম শ্লোকে বর্ণিত] অশ্রদ্ধা, অসূয়া (দোষদৃষ্টি) ক্ষতিকর মনোভাব, মূঢ়তা প্রকৃতির (স্বভাবের) বশবর্তী হওয়া, রাগ-দ্বেষ, স্বধর্মে অরুচি ও পরধর্মে রুচি—এর মধ্যে আসল কারণ কোনটি, যার দ্বারা মানুষ তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাপে প্রবৃত্ত হয় ? তাছাড়াও ঈশ্বর, প্রারব্ধ, যুগ, পরিস্থিতি, কর্ম, কুসঙ্গ, সমাজ, রীতি, লোকাচার, সরকারি নিয়ম ইত্যাদি কী কারণে মানুষ পাপে প্রবৃত্ত হয় ?

***

সম্বন্ধ—ভগবান পরবর্তী শ্লোকে অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

শ্রীভগবানুবাচ

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥ ৩৭ ॥

[**রজোগুণ-সমুদ্ভবঃ** (রজোগুণ হতে উৎপন্ন) ; **এষঃ, কামঃ** (এই কাম) ; **এষঃ** (এটিই) ; **ক্রোধঃ** (ক্রোধে পরিণত হয়) ; **মহাশনঃ** (দুষ্পূরণীয়) ; **মহাপাপ্মা** (মহাপাপী) ; **ইহ** (এই বিষয়ে) ; **এনম্** (একে) ; **বৈরিণম্, বিদ্ধি** (শত্রু বলে জানবে।)]

শ্রীভগবান বললেন——রজোগুণ হতে উৎপন্ন এই কাম অর্থাৎ কামনাই হল পাপের কারণ। এই কামনাই ক্রোধে পরিণত হয়। এটি দুষ্পূরণীয় অর্থাৎ কিছুতেই তৃপ্ত হয় না এবং মহাপাপী। এই বিষয়ে তুমি একেই শত্রু বলে জানবে ॥ ৩৭ ॥

ব্যাখ্যা—**'রজোগুণসমুদ্ভবঃ'**—পরবর্তী চতুর্দশ অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, তৃষ্ণা (কামনা) এবং আসক্তি থেকেই রজোগুণ উৎপন্ন হয় আর এখানে বলছেন যে রজোগুণ থেকে কাম উৎপন্ন হয়। এর থেকে বুঝতে হবে যে রাগ (আসক্তি) থেকে কামনা উৎপন্ন হয় আর কামনা থেকে আসক্তি (রাগ) বৃদ্ধি পায়। তাৎপর্য হল যে, জাগতিক বিষয়গুলিকে সুখদায়ক মনে করলেই আসক্তি উৎপন্ন হয়, যাতে অন্তরে তার গুরুত্ব দৃঢ়তা লাভ করে। তাই ওই পদার্থগুলি সংগ্রহ করার এবং তার থেকে সুখাস্বাদনের কামনা উৎপন্ন হয়। পুনরায় কামনার প্রভাবে পদার্থগুলিতে আসক্তি বৃদ্ধি পায়। এই ক্রম যতক্ষণ চলতে থাকে, ততক্ষণ পাপকর্ম হতে সর্বতোভাবে নিবৃত্তি হয় না।

'কাম এষ ক্রোধ এষঃ'—'আমার মনোমত হোক'—এই হল কাম[১]। উৎপত্তি ও বিনাশশীল জড় পদার্থ সংগ্রহের আকাঙ্ক্ষা, সংযোগজনিত সুখের ইচ্ছা, সুখের আসক্তি—এ সমস্তই হল কামনার ভিন্ন ভিন্ন রূপ।

পাপ কর্ম কখনো 'কাম'-এর বশীভূত হয়ে করা হয় আবার কখনো ক্রোধের বশীভূত হয়ে করা হয়ে থাকে। দুটির পাপ পৃথক ধরনের হয়। সেইজন্য দুটি পদ ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কাম অর্থাৎ উৎপত্তি-বিনাশশীল পদার্থের কামনা, প্রিয়তা এবং আকর্ষণই সমস্ত পাপের মূল[২]। কামনায় বাধা-প্রাপ্ত হলেই কাম ক্রোধে পরিণত হয়ে যায়। সেইজন্য ভগবান শুধু কামনাকেই পাপ-কর্মগুলির মূল জানাবার জন্য উপরিউক্ত পদে একবচনের প্রয়োগ করেছেন।

কামনার পূরণ হলে 'লোভ' উৎপন্ন হয়[৩] এবং কামনাতে বাধা পড়লে যে বাধা দেয় তার ওপর 'ক্রোধ' উৎপন্ন হয়। বাধাপ্রদানকারী যদি তার থেকে বেশি শক্তিশালী হয় তাহলে ক্রোধ না হয়ে 'ভয়' উৎপন্ন হয়। সেইজন্য গীতায় কোনো স্থানে কামনা ও ক্রোধের সঙ্গে সঙ্গে ভয়ের কথাও বলা হয়েছে ; যেমন—

---

[১]'ইদং মে স্যাদিদং মে স্যাদিতীচ্ছা কামশব্দিতা' (এটি আমার প্রাপ্তি হোক, এটি আমার প্রাপ্তি হোক—এইরূপ ইচ্ছাকে 'কাম' বলা হয়।)

[২]যদিও ভগবৎপ্রদত্ত বিবেককে গুরুত্ব না দেওয়া এবং ভগবানের থেকে বিমুখ হওয়াই পাপের হেতু তা সত্ত্বেও 'কাম'কেই এখানে পাপের হেতু বলার উদ্দেশ্য এই যে, এই (তৃতীয়) অধ্যায়টি কর্মযোগের, আর কর্মযোগের প্রধান লক্ষ্যই হল কামনা দূর করা।

[৩]'জিমি প্রতি লাভ লোভ অধিকাঈ' (শ্রীরামচরিতমানস ১।১৮০।১ ; ৬।১০২।১)।

'বীতরাগভয়ক্রোধাঃ' (৪।১০) এবং 'বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ' (৫।২৮)।

কামনা সম্পর্কে বিশেষ কথা

সমস্ত পাপ, সন্তাপ, দুঃখ ইত্যাদির উৎস হল কামনা। কামনাসম্পন্ন ব্যক্তির জাগ্রত অবস্থায় সুখ পাওয়া তো দূরের কথা, স্বপ্নেও কখনো সুখ মেলে না **'কাম অছত সুখ সপনেহুঁ নাহীঁ'** (শ্রীরামচরিতমানস ৭।৯০।১)। যা চাওয়া যায় তা হয় না আর যা চাওয়া হয় না, সেটি হয়—একেই দুঃখ বলা হয়। যদি 'চাওয়া' এবং 'না-চাওয়া'কে পরিত্যাগ করা যায়, তাহলে দুঃখ কোথায় ?

বিনাশশীল পদার্থের আকাঙ্ক্ষাকেই কামনা বলা হয়। অবিনাশী পরমাত্মাকে লাভ করার ইচ্ছা কামনার মতো মনে হলেও সেটি প্রকৃতপক্ষে 'কামনা' নয়। কারণ উৎপত্তি ও বিনাশশীল পদার্থের কামনা কখনো পূর্ণ হয় না, বরং সেটি বাড়তেই থাকে, কিন্তু পরমাত্মাকে লাভ করার আকাঙ্ক্ষা (পরমাত্মপ্রাপ্তি) পূর্ণ হয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ কামনা হয় নিজ হতে ভিন্ন বস্তুর জন্য, কিন্তু পরমাত্মা হচ্ছেন নিজ হতে অভিন্ন। এইরূপ সেবা (কর্মযোগ), তত্ত্বজ্ঞান (জ্ঞানযোগ) এবং ভগবদ্‌প্রেমের (ভক্তিযোগের) আকাঙ্ক্ষাও 'কামনা' নয়। পরমাত্মপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা প্রকৃতপক্ষে জীবনের বাস্তবিক প্রয়োজনীয় বস্তু (ক্ষুধা)। জীবের তো পরমাত্মাকেই প্রয়োজন। কিন্তু বিবেক অবদমিত হওয়ায় সে বিনাশশীল পদার্থের কামনা করতে থাকে।

প্রশ্ন আসতে পারে যে, কামনা না করলে জগতের কাজ কিভাবে সম্পন্ন হবে ? উত্তরে বলা যায় যে, জগতের কাজ-কর্ম বস্তুর দ্বারা, ক্রিয়ার দ্বারা হয়, মনের কামনা দ্বারা নয়। বস্তুর সম্বন্ধ থাকে কর্মের সঙ্গে, তা সে কর্ম প্রারব্ধেরই হোক অথবা বর্তমানের উদ্যোগগত হোক। কর্ম হল বাইরের জিনিস আর কামনা হল অন্তরের। বাইরের কর্মের ফলও (বস্তু, পরিস্থিতি ইত্যাদির রূপে) বাইরেই পাওয়া যায়।

কামনার সম্পর্ক ফলের (পদার্থ, পরিস্থিতি ইত্যাদির) প্রাপ্তির সঙ্গে থাকে না। যে বস্তু কর্মের অধীন, তা কামনা দ্বারা কীভাবে প্রাপ্ত হবে ? জগতে দেখা যায় যে অর্থের কামনা থাকা সত্ত্বেও মানুষের দারিদ্র্য দূর হয় না। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ ব্যতীত অন্য সকলেই বেঁচে থাকার আশা সঙ্গে রেখেই মরে। কামনা থাক বা না থাক, যে ফল পাবার তা পাওয়া যাবেই। তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, যা হবার তা হবেই এবং যা না হবার তা কখনো হবে না, তা সেটি কামনা করা হোক বা না হোক। যেমন কামনা না করলেও প্রতিকূল পরিস্থিতি এসে পড়ে, তেমনি কামনা না করলে অনুকূল অবস্থাও আসবে। রোগের কামনা না করলেও অসুখ হয় এবং কামনা না করলেও শরীর নীরোগ থাকে। নিন্দা, অপমানের কামনা না করলেও নিন্দা এবং অপমান এসে থাকে এবং কামনা না করলেও প্রশংসা ও সম্মান লাভ হয়। প্রতিকূল পরিস্থিতি যেমন কর্মের ফলে হয়, তেমনি অনুকূল পরিস্থিতিও কর্মের ফলেই হয়ে থাকে। তাই বস্তু, পরিস্থিতি ইত্যাদি প্রাপ্ত হওয়া অথবা না হওয়া কর্মের সঙ্গেই সম্পর্কিত, কামনার সঙ্গে নয়।

তাৎক্ষণিক সুখের যেমন কামনা হয় আবার ভাবী সুখেরও কামনা জাগে। ভোগ ও সংগ্রহের ইচ্ছা হচ্ছে তাৎক্ষণিক সুখের কামনা আর কর্মফল প্রাপ্তির ইচ্ছা হল ভাবী সুখের কামনা। এই দুই কামনাতেই কেবল দুঃখই থাকে। কারণ কামনা শুধুমাত্র বর্তমানেই দুঃখ দেয় তা নয়, এটি ভবিষ্যত জন্মের কারণ হওয়ায় ভবিষ্যতেও দুঃখ দেয়। অতএব এই দুই কামনাই পরিত্যাগ করা উচিত।

কর্ম এবং বিকর্ম (নিষিদ্ধ কর্ম)—এই দুটিই কামনার কারণ হয়ে থাকে। কামনার জন্য 'কর্ম' হয় আর কামনা অধিকতর হলে 'বিকর্ম' হয়। কামনার জন্যই অসৎ-এ আসক্তি দৃঢ় হতে থাকে। কামনা না থাকলে অসৎ হতে সম্পর্ক-বিচ্ছেদ হয়ে যায়।

কামনা পূরণ হলে আমরা কামনা উৎপন্ন হওয়ার আগের অবস্থায় ফিরে যাই। যেমন কারো মনে কামনার উদ্ভব হল যে, 'আমি যেন একশো টাকা পাই'। এর আগে তার মনে একশো টাকা পাবার আকাঙ্ক্ষা জাগেনি ; সুতরাং অনুভব দ্বারা প্রমাণিত হয় যে কামনা উদ্ভবশীল। যতক্ষণ একশো টাকার আকাঙ্ক্ষা হয়নি, ততক্ষণ 'নিষ্কাম' স্থিতি ছিল। চেষ্টা দ্বারা, প্রারব্ধবশতঃ যদি একশো টাকা লাভ হয় তাহলে সেই 'নিষ্কাম' স্থিতি চলে আসে। কিন্তু জাগতিক সুখাসক্তির জন্য এটি স্থায়ী হয় না এবং নতুন নতুন কামনার উদ্ভব হয় যে, আমি যেন হাজার টাকা পেয়ে যাই। এইভাবে কামনার পরিপূর্তিও হয় না এবং পূর্ণ তৃপ্তিও লাভ হয় না, শুধুমাত্র পরিশ্রম ছাড়া আর কিছুই লাভ হয় না।

'কাম' অর্থাৎ জাগতিক পদার্থের কামনা পরিত্যাগ করা কঠিন নয়। একটু গভীরভাবে বিচার করতে হয় যে প্রকৃতপক্ষে কামনা কি দূর হয় না, নাকি স্থায়ী হয় না। দেখা যায় যে কামনা বাস্তবিকই স্থায়ী হয় না। সেটি নিরন্তর মিটে যেতে থাকলেও মানুষ নতুন নতুন কামনার বশীভূত হয়। কামনা উৎপন্ন হয় এবং যা উৎপন্ন হয় তার ক্ষয়ও অবশ্যম্ভাবী। তাই কামনাও স্বতঃই মিটে যায়। মানুষ যদি নতুন কামনা পোষণ না করে তাহলে পুরাতন কামনাগুলি পূরণ হয়ে বা কখনো পূরণ না হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই দূর হয়ে যায়।

কামনা পূর্তি সকলের জন্য এবং সর্বদার জন্য নয়। কিন্তু কামনা ত্যাগ সকলের জন্য এবং চিরকালের জন্য হতে পারে। কারণ কামনা অনিত্য আর ত্যাগ হচ্ছে নিত্য। নিষ্কাম হওয়ায় বাধা কীসের ? আমরা মমত্ববোধরহিত হই না, আসল বাধা এইটিই। মমত্ববোধ রহিত হলে নিষ্কাম হবার শক্তি আসে আবার নিষ্কাম হলে মমতারহিত হবার শক্তি এসে যায়। মমত্ববোধরহিত, নিষ্কাম এবং সঙ্গবর্জিত হলে নির্বিকারত্ব, শান্তি এবং স্বাধীনতা স্বাভাবিকভাবে এসে যায়।

একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মনোনিবেশ করা যাক। কামনা পরিত্যাগ করা খুব কঠিন বলে আমরা মনে করে থাকি। কিন্তু ভেবে দেখা যাক যে যদি কামনা পরিত্যাগ করা কঠিন হয়, তাহলে কামনা পূরণ কি সহজ ? জগতে আজ পর্যন্ত কারোরই সমস্ত কামনা পূর্ণ হয়নি। আমাদের কথাই শুধু নয়, ভগবান রামের পিতারও (দশরথের) সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়নি। সুতরাং কামনাগুলির পূর্তি হওয়া অসম্ভব ব্যাপার, কিন্তু কামনা পরিত্যাগ করা অসম্ভব নয়। আমরা যদি মনে করি কামনাগুলি পরিত্যাগ করা শক্ত, তাহলে কঠিন কথাও অসম্ভব কথার (কামনা পূরণের) থেকে সহজই হয়ে ওঠে ; কারণ কামনা পরিত্যাগ করা যায়, কিন্তু কামনার পূর্তি হওয়া সম্ভবই নয়। তাই কামনাগুলির পূরণ অপেক্ষা কামনাগুলি ত্যাগ করাই সহজ। আমাদের এই ভুল হয় যে, যেটি করা সম্ভব নয়, আমরা সেটির জন্যই চেষ্টা করি, আর যেটি করতে আমরা সক্ষম, সেটি করি না। সেইজন্য সাধকদের কামনাগুলি পরিত্যাগ করা উচিত, যা তাঁরা করতে সক্ষম।

কামনাগুলিকে চার ভাগে ভাগ করা হয়—

১) শরীর-নির্বাহের জন্য আবশ্যক কামনা পূরণ করে নেওয়া[১]।

২) যে কামনা ব্যক্তিগত এবং ন্যায়সংগত এবং যা পূর্ণ করা আমাদের সামর্থ্যের বাইরে, সেগুলিকে ভগবানে অর্পণ করে মিটিয়ে ফেলা হয়।[২]

৩) অপরের যেটি ন্যায়সংগত এবং হিতকারী কামনা যেটি পূর্ণ করতে আমরা সক্ষম, তা পূরণ করা উচিত। এইভাবে অন্যের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করলে আমাদের কামনা ত্যাগের ক্ষমতা এসে যায়।

৪) উপরিউক্ত তিন প্রকারের কামনার অতিরিক্ত সকল কামনা বিবেচনা দ্বারা যেন মিটিয়ে ফেলা হয়।

'মহাশনো মহাপাপ্মা'— কোনো কোনো শত্রু এমনও থাকে যে তারা পূজা-উপচারে অথবা স্তব-স্তুতিতে শান্ত হয়, কিন্তু এই 'কাম' এমন শত্রু যে কোনো কিছুতেই

---

[১]এরূপ কামনাতে চারটি ব্যাপার থাকে—

১) যে কামনার এখন উৎপত্তি হয়েছে (যেমন, ক্ষুধার সময় খাদ্যের কামনা)

২) যেটি পূর্ণ করার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এখন পাওয়া সম্ভব।

৩) যেটি পূরণ না করলে বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে ওঠে।

৪) যার পূর্তির দ্বারা নিজের বা অন্যের—কারো কোনো ক্ষতি না হয়।

এইরূপ শরীর নির্বাহের অত্যাবশ্যক কামনাগুলি পূরণ করা উচিত। আবশ্যক কামনাগুলি পূরণ করলে অনাবশ্যক কামনাগুলি পরিত্যাগ করার শক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু আবশ্যক কামনাগুলি পূরণের সুখ গ্রহণ করা উচিত নয়। কারণ তাতে করে নতুন নতুন কামনার উৎপত্তি হয়, যার কোনো অন্ত থাকে না।

[২]উদাহরণ—'জগতে অন্যায় অত্যাচার যেন না হয়'—এরূপ তীব্র ব্যক্তিগত কামনা ন্যায়সংগত অথচ আমাদের সাধ্যের অতীত। সুতরাং এরূপ কামনা ভগবানে অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হতে হয়। এরূপ ভগবানে অর্পিত কামনা ভবিষ্যতে (ভগবান ইচ্ছা করলে) পূর্ণ হয়।

সে শান্ত হয় না। এই কামের কখনো তৃপ্তি হয় না—

বুঝৈ ন কাম অগিনি তুলসী কহুঁ,
বিষয়-ভোগ বহু ঘী তে।। (বিনয়পত্রিকা ১৯৮)

অর্থ প্রাপ্তি হলে যেমন অর্থের কামনা বেড়েই যায় ; তেমনই ভোগ যতই পাওয়া যাক কামনা সেইভাবেই বাড়তে থাকে। তাই কামনাকে বলা হয়েছে **'মহাশনঃ'**।

সমস্ত পাপের কারণই হল কামনা। চুরি, ডাকাতি, হিংসা ইত্যাদি যত পাপ, সব কামনা থেকেই উৎপন্ন হয়ে থাকে। তাই কামনাকে **'মহাপাপ্‌মা'** বলেও অভিহিত করা হয়েছে।

কামনা উৎপন্ন হলেই মানুষ নিজ কর্তব্য থেকে, নিজ স্বরূপ থেকে এবং নিজ ইষ্ট (ভগবান) থেকে বিমুখ হয় এবং এই বিনাশশীল জগতের আশ্রয় গ্রহণ করে। বিনাশশীলের আশ্রয় নেওয়াতে পাপ হয় এবং তার ফলস্বরূপ নরক এবং নীচজন্ম প্রাপ্তি হয়।

সংযোগজনিত সুখের কামনা করার ফলেই জগৎ সত্য বলে প্রতীত হয় এবং নিরন্তর পরিবর্তনশীল শরীর ইত্যাদিকে স্থির বলে ভ্রম হয়। জাগতিক পদার্থগুলি স্থির বলে মনে করেই মানুষ সেগুলি হতে সুখভোগ করে এবং সেগুলির আকাঙ্ক্ষা করে। সুখভোগের সময় জগতের ক্ষণভঙ্গুরতার দিকে দৃষ্টি যায় না এবং মানুষ ভোগকে এবং নিজেকে স্থায়ী বলে মনে করে। যেটি প্রতিমুহূর্তে বিনাশ প্রাপ্ত হচ্ছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সেই জগৎ থেকে স্থায়ী সুখ পাবার ইচ্ছা কী করে হয় ? কিন্তু 'জগৎ প্রতিমুহূর্তে বিনাশের পথে যাচ্ছে' এই জ্ঞানকে অগ্রাহ্য করলেই সাংসারিক (জাগতিক) সুখভোগের ইচ্ছা জাগে। সিনেমার মধ্যে পাকা আঙুর দেখলেও সেটি খাবার ইচ্ছা হয় না, যদি সেই ইচ্ছা হয় তবে বুঝতে হবে আমরা সেটিকে স্থির বলে মেনে নিয়েছি। পরিবর্তনশীল জগৎকে স্থির বলে মনে করলে বাস্তবে যেটি স্থির তত্ত্ব, সেই পরমাত্মতত্ত্বের দিকে অথবা নিজ স্বরূপের দিকে দৃষ্টি যায় না। সেদিকে দৃষ্টি না দেওয়ায় মানুষ তা থেকে বিমুখ হয়ে বিনাশশীল সুখভোগে আবদ্ধ হয়ে যায়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে প্রকৃত তত্ত্ব থেকে বিমুখ না হলে কোনো জাগতিক সুখভোগ করা সম্ভব হয় না এবং আসক্তি সহকারে জাগতিক সুখভোগ করলে মানুষ পরমাত্মা থেকে বিমুখ হয়ে যায়।

ভোগবুদ্ধিতে জাগতিক সুখভোগকারী মানুষ হিংসারূপ পাপ হতে রক্ষা পায় না। সে নিজের এবং অপরের (হিংসা) পতন ঘটায়। যেমন কোনো ব্যক্তি অর্থ সংগ্রহ করে তার দ্বারা সুখভোগ করলে, নির্ধন ব্যক্তি তাই দেখে হৃদয়ে অর্থ ও ভোগের জন্য বিশেষ দুঃখ অনুভব করে এবং তার অন্তরে হিংসা জন্মায়। ভোগ করলে সে স্বয়ং নিজেরও পতন ঘটায়, কারণ স্বয়ং পরমাত্মার চেতন অংশ হয়েও জড়ের (অর্থের) গুরুত্ব দেওয়ায় সে প্রকৃতপক্ষে জড়ের দাস হয়ে যায়, তাতেই তার পতন ঘটে। জগতের সমস্ত ভোগ্যপদার্থই সীমিত হয়ে থাকে। সুতরাং মানুষ যে ভোগ করে তা অন্যের অংশ থেকে আসে। তবে শরীর নির্বাহ করার জন্য পদার্থ গ্রহণ করলে মানুষের পাপ হয় না। শরীর নির্বাহের ব্যাপারেও নিজের জন্য সুখভোগ করা নিষিদ্ধ। মা-বাবা, গুরু, বালক, নারী, বৃদ্ধ আদিদের প্রথমে শরীর নির্বাহের প্রয়োজনীয় বস্তু দিয়ে তারপর নিজে গ্রহণ করা উচিত।

ভোগবুদ্ধি সহকারে ভোগকারী ব্যক্তি নিজের পতন তো ঘটায়ই, ভোগ্য বস্তুগুলির অপব্যবহার করে সেগুলিও নষ্ট করে এবং অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের হিংসার কারণ হয়ে ওঠে। কিন্তু জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদের ব্যাপারে এটি প্রযোজ্য নয়। তাঁদের দ্বারা হিংসারূপ পাপকার্য হয় না ; কারণ তাঁদের ভোগবুদ্ধি থাকে না এবং নিষ্কামভাবে তাঁদের দ্বারা শুধুমাত্র শরীর নির্বাহের জন্য শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়া হয়ে থাকে। (গীতা ৪।২১ ; ১৮।১৭)। ওইসব মহাপুরুষের ব্যবহৃত বস্তু বিকাশ লাভ করে, পতনকারী হয় না অর্থাৎ বস্তুগুলি তাঁদের ব্যবহৃত হওয়ায় সেগুলির সদ্ব্যবহার হয়ে সার্থক হয়ে ওঠে। জগতে যে পর্যন্ত এইরূপ মহাপুরুষ শরীর ধারণ করে থাকেন সে পর্যন্ত তাঁদের দ্বারা স্বাভাবিকভাবে সকল প্রাণীরই উপকার হয়ে থাকে।

শরীর-নির্বাহের প্রয়োজনীয়তা **'মহাশনঃ'** এবং **'মহাপাপ্‌মা'** নয়। কারণ কেবলমাত্র শরীর নির্বাহের আবশ্যকতা 'কামনা' নয়। আবশ্যকতার পূরণ ঘটে ; যেমন—ক্ষুধাবোধ হলে আহার করলে তৃপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু কামনা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

'বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্‌'—যদিও বাস্তবে জাগতিক পদার্থের কামনা ত্যাগ হলেই সুখ-শান্তি অনুভূত হয়, তা সত্ত্বেও মানুষ অজ্ঞতাবশতঃ পদার্থ হতে সুখ হয় বলে মনে করে। এইভাবে মানুষ পদার্থগুলিকে কামনার সুখের কারণ বলে মনে করে সেগুলিকে নিজ বন্ধু এবং হিতৈষী বলে মনে করে। এইজন্য তার কামনা কখনো দূর হয় না।

ভগবান সেইজন্যই এখানে বলেছেন, 'এই কামনাকে বন্ধু নয়, শত্রু বলে মনে করবে।' কামনাকে মানুষের শত্রু বলা হয় এইজন্য যে এটি মানুষের বিবেককে আবৃত করে পাপে প্রবৃত্ত করায়।

একমাত্র কামনাই হল জগতের সমস্ত পাপ, দুঃখ, নরক ইত্যাদির মূল কারণ। ইহলোকে বা পরলোকে যেখানেই কেউ দুঃখ পাক না কেন, (অসতের) কামনাই হল তার কারণ। সমস্ত দুঃখেরই উৎপত্তি হয় কামনা থেকে, অন্য কিছু থেকে নয়।

বিশেষ কথা

'কাম' দূর করার প্রধান এবং সরল উপায় হল— অপরের সেবা করা, তাদের সুখী করা। অন্যান্য দেহ-ধারণকারী তো বটেই, নিজের বলে যে দেহ, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, প্রাণ—তাও অপরেরই। সুতরাং এগুলির নির্বাহও সেবা মনোভাবে করা উচিত, ভোগবুদ্ধিতে নয়। এগুলি হতে সুখ গ্রহণ করা উচিত নয়।

কর্মযোগে স্থূলশরীর দ্বারা সংঘটিত 'ক্রিয়া', সূক্ষ্ম-শরীরের দ্বারা হওয়া 'চিন্তা' এবং কারণশরীর দ্বারা হওয়া 'স্থৈর্য'—তিনটিই নিজের জন্য নয়, জগতেরই জন্য। কারণ স্থূলশরীরের স্থূলজগতের সঙ্গে, সূক্ষ্মশরীরের সূক্ষ্মজগতের সঙ্গে এবং কারণশরীরের কারণজগতের সঙ্গে ঐক্য থাকে। সুতরাং শরীর, পদার্থ এবং ক্রিয়া দ্বারা অপরের সেবা করা উচিত হলেও তা নিয়ে সেবকের অহংকার করা উচিত নয়। সূক্ষ্মশরীর দ্বারা পরহিত চিন্তা করা উচিত হলেও তার থেকে সুখ গ্রহণ করা অনুচিত। কারণশরীর দ্বারা স্থিত হওয়া উচিত হলেও, সেই স্থৈর্যের সুখ গ্রহণ করা উচিত নয়[১]। এইভাবে সুখ গ্রহণ না করলে ফলাসক্তি দূর হয়। ফলের আসক্তি দূর হলে কর্মের আসক্তিও সহজেই দূর হয়।

'আমার আদেশ যেন বজায় থাকে ; অমুক ব্যক্তি যেন আমার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে ; অমুক বস্তু যেন আমার কাজের উপযুক্ত হয় ; আমার কথাই যেন থাকে'— এগুলি সবই কামনার স্বরূপ। উৎপত্তি ও বিনাশশীল (অসৎ) জগৎ থেকে কিছু নেওয়ার কামনা প্রচণ্ড হানিকারক হয়। অন্যের ন্যায়সংগত কামনা (যাতে তার হিত হয় এবং যেটি পূরণ করার সামর্থ্য আমাদের মধ্যে থাকে) পূর্ণ করলে নিজ কামনা ত্যাগ করার শক্তি এসে যায়। অন্যের কামনা পূর্ণ করতে সক্ষম না হলেও সেটি পূর্ণ করার ইচ্ছা হৃদয়ে থাকা উচিত।

তাদাত্ম্য অহংভাব (নিজেকে শরীর বলে মনে করা), মমত্ববোধ (শরীরাদি পদার্থগুলিকে নিজের বলে মনে করা) এবং কামনা (অমুক বস্তুর প্রাপ্তি ঘটে—এরূপ ইচ্ছা)— এই তিনটির দ্বারাই জীবসকল জগতে আবদ্ধ হয়ে যায়। তাদাত্ম্য দ্বারা পরিচ্ছিন্নতা, মমতা দ্বারা বিকার এবং কামনা হতে অশান্তি সৃষ্টি হয়। কামনা ত্যাগ করলে মমতা এবং মমতা ত্যাগ করলে কামনা দূর হয়। কর্মযোগী সিদ্ধান্ত অনুসারে এগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত হন না। কারণ তিনি শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, অহংবোধ, পদার্থ ইত্যাদি কোনোটিই নিজের বা নিজের জন্য বলে মনে করেন না। তিনি এই শরীর ইত্যাদিকে কেবল জগতের এবং জগতের সেবার জন্যই বলে মনে করেন ।

'কাউকে দুঃখ দেব না'—এরূপ চিন্তা মনে এলে সেবাকাজ শুরু হয়ে যায়। সুতরাং সাধকের অন্তরে 'কেউ যেন দুঃখ না পায়'—এরূপ মনোভাব সবসময় রাখা উচিত। ভুলক্রমে কাউকে দুঃখ দিয়ে ফেললে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে হয়। সে ক্ষমা না করলেও চিন্তা নেই। কারণ অকৃত্রিমভাবে ক্ষমা যে চায় ভগবানের কাছ থেকে সে ক্ষমা লাভ করে। সেবা করার সময় সাধকের সদা সতর্ক থাকা উচিত যেন সেবার পরিবর্তে কিছু পাবার আশা তাঁর মধ্যে এসে না পড়ে। এইভাবে সেবা করলে 'কামরূপী' শত্রু সহজেই বিনষ্ট হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব—বস্তু, ব্যক্তি এবং ক্রিয়া থেকে সুখ আশা করার নাম হল 'কাম' (কামনা)। এই কামরূপ একটি দোষেই অনন্ত দোষ, অনন্ত বিকার, অনন্ত পাপ পরিপূর্ণ থাকে। সুতরাং যতক্ষণ মানুষের মধ্যে কাম (কামনা) থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে সর্বতোভাবে নির্দোষ, নির্বিকার, নিষ্পাপ হতে পারে না। নিজের সুখের জন্য কিছু আশা করাতেই সকল দোষের জন্ম হয়। যে কারো কাছ থেকে কিছু আশা করে না, সেই সম্পূর্ণরূপে দোষমুক্ত হতে পারে।

---

[১]সেবা, পরহিত-চিন্তা, স্থৈর্য ইত্যাদির সুখ গ্রহণ করা এবং এগুলি বজায় থাকুক এরূপ আশা করাও পরমাত্মতত্ত্বপ্রাপ্তির বাধক (গীতা ১৪।৬)। তাই সাধকের সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক—তিনটি গুণ হতেই সঙ্গবর্জিত হতে হয়, কারণ স্বরূপ স্বতঃই সঙ্গ-বিবর্জিত ।

কর্মফল তিন প্রকারের— ইষ্ট, অনিষ্ট এবং মিশ্র (গীতা ১৮।১২)। এই তিনটির মধ্যে 'কাম' থেকে শুধু 'অনিষ্ট' ফলই পাওয়া যায়।

শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম প্রারব্ধ (ভাগ্য) থেকে হয় না, 'কাম' থেকে হয়। প্রারব্ধ থেকে (ফলভোগের জন্য) কর্ম করার প্রবৃত্তি হলেও, নিষিদ্ধ কর্ম হয় না, কেননা প্রারব্ধের ফল ভোগ করার জন্য নিষিদ্ধ আচরণের কোনো প্রয়োজনই নেই।

'কাম' উৎপন্ন হয় রজোগুণ থেকে। সুতরাং পাপের কারণ হল রজোগুণ আর সেটির কার্য (পরিণাম) হল তমোগুণ। সকল পাপই রজোগুণ থেকে উৎপন্ন হয়।

* * *

সম্বন্ধ— 'এটি পাপ'—তা জেনেও মানুষ পাপে প্রবৃত্ত হয় ; অতএব এই জ্ঞানের প্রভাব আচরণে না আসার কারণ কী ? এর বিশ্লেষণ পরবর্তী দুটি শ্লোকে ভগবান করছেন।

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্॥ ৩৮ ॥

[**যথা** (যেমন) ; **ধূমেন** (ধূম দ্বারা) ; **বহ্নিঃ, চ** (বহ্নি এবং) ; **মলেন** (ময়লা দ্বারা) ; **আদর্শঃ** (দর্পণ) ; **আব্রিয়তে** (আবৃত হয়) ; **যথা, উল্বেন** (জরায়ু দ্বারা) ; **গর্ভঃ** (গর্ভ) ; **আবৃতঃ** (আবৃত থাকে) ; **তথা** (সেইরূপ) ; **তেন** (কামের দ্বারা) ; **ইদম্** (এই জ্ঞান অর্থাৎ বিবেক) ; আবৃতম্ (আবৃত থাকে।)]

যেমন ধূম দ্বারা বহ্নি (অগ্নি), ময়লা দ্বারা দর্পণ এবং জরায়ু দ্বারা গর্ভ আবৃত থাকে, সেইরূপ কামের দ্বারা জ্ঞান অর্থাৎ বিবেক আবৃত থাকে ॥ ৩৮ ॥

ব্যাখ্যা— 'ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নি'—ধূম দ্বারা যেমন অগ্নি আবৃত থাকে, তেমনি কামনা দ্বারা মানুষের বিবেক আবৃত থাকে অর্থাৎ স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় না।

বিবেক প্রকটিত হয় বুদ্ধিতে। বুদ্ধি তিন প্রকারের— সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক। সাত্ত্বিক বুদ্ধিতে কর্তব্য-অকর্তব্য সম্বন্ধে স্পষ্ট জ্ঞান থাকে, রাজসিক বুদ্ধিতে কর্তব্য-অকর্তব্যের জ্ঞান ঠিকমতো থাকে না আর তামসিক বুদ্ধিতে সব বস্তুতে বিপরীত বুদ্ধি হয় (গীতা ১৮।৩০-৩২)। কামনা উৎপন্ন হলে সাত্ত্বিক বুদ্ধিও ধোঁয়া দ্বারা অগ্নির মতো আবৃত হয়ে যায়, তাহলে রাজসিক এবং তামসিক বুদ্ধির কথা তো বলাই বাহুল্য !

জাগতিক আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হলেই পারমার্থিক পথ ধূমাবৃত হতে থাকে। এই অবস্থায় সাবধানতা অবলম্বন না করলে কামনা আরও বৃদ্ধি পায়। কামনা বৃদ্ধি পেলে পারমার্থিক পথ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়।

উৎপত্তি ও বিনাশশীল জড় বস্তুগুলিতে প্রিয়ত্ব, মহত্ত্ব, সুখ, সৌন্দর্য, বিশেষত্ব ইত্যাদি দেখলে কামনা উৎপন্ন হয়। এই কামনাই আসলে বিবেককে আবৃত করে। অন্যান্য শরীর অপেক্ষা মনুষ্য-শরীরেই বিবেক বিশেষভাবে প্রকটিত হয়। কিন্তু জড় পদার্থের কামনার জন্য বিবেক (জ্ঞান) কাজ করে না। কামনা উৎপন্ন হলেই বিবেক কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ধূমাচ্ছন্ন হলেও যেমন অগ্নি কাজ করে, তেমনই কামনা উৎপন্ন হলেই যদি সাধক সতর্ক হয়ে যায়, তাহলে তাঁর বিবেক কাজ করতে সক্ষম হয়।

প্রথম অবস্থাতে কামনাকে দূর করার সহজ উপায় হল এই যে, কামনা উৎপন্ন হলেই সাধকের বিচার করা উচিত যে, আমি যে বস্তুটির কামনা করছি, সেই বস্তুটি সর্বদা আমার সঙ্গে থাকবে না। আগেও সেটি আমার সঙ্গে ছিল না এবং পরেও সেটি আমার সঙ্গে থাকবে না এবং মধ্যেও সেটি নিরন্তর আমা হতে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। এরূপ বিবেচনা করলে কামনা থাকে না।

'যথাদর্শো মলেন চ'—যেমন ময়লাতে দর্পণ আবৃত হলে প্রতিবিম্ব দেখা যায় না, তেমনি কামনার বেগ বৃদ্ধি পেলে 'আমি সাধক, এটি আমার কর্তব্য, এটি আমার কর্তব্য নয়'—এই জ্ঞান আর থাকে না। অন্তরে বিনাশশীল বস্তুর গুরুত্ব বেশি হলে মানুষ সেইসব বস্তুগুলির ভোগ এবং সংগ্রহ করার কামনা করে। এই কামনা যেমন যেমন বাড়তে থাকে, মানুষের পতনও তেমন তেমনই হতে থাকে।

বাস্তবে গুরুত্ব সেই বস্তুটির নয়, গুরুত্ব হল তার ব্যবহারের। অর্থ, বিদ্যা, বল ইত্যাদি কিছুই তত গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুরুত্ব হল এগুলির সদ্ব্যবহারে—এটি বুঝতে পারলেই আর ওইসব বস্তুর আকাঙ্ক্ষা থাকে না। কারণ আমাদের কাছে যেসব বস্তু আছে, সেগুলি ঠিকমতো ব্যবহার করার দায়িত্ব আমাদেরই। ওইগুলিই ঠিকমতো কাজে লাগাতে হয়, আরও বেশি আকাঙ্ক্ষা করে কী হবে ? কারণ কেবল কামনা করলেই বস্তুগুলি পাওয়া যায় না।

জাগতিক বস্তুর গুরুত্ব যেমনি কম হতে থাকবে, সাধকের অন্তরে পরমাত্মার মহত্ত্বও তেমনি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। জাগতিক বস্তুর গুরুত্ব সর্বতোভাবে দূর হলে পরমাত্মার অনুভূতি হবে এবং কামনা চিরতরে বিনষ্ট হবে।

‘যথোল্বেনাবৃতো গর্ভঃ’—দর্পণে ময়লা পড়লে তাতে মুখ দেখা না গেলেও, এটি যে ‘দর্পণ’ এই জ্ঞান থাকে। কিন্তু যেমন জরায়ু দ্বারা গর্ভ আবৃত থাকায় গর্ভস্থ সন্তান পুত্র, না কন্যা তা জানা যায় না তেমনি কামনার তৃতীয়াবস্থায় কর্তব্য-অকর্তব্যের জ্ঞান থাকে না অর্থাৎ বিবেক সম্পূর্ণরূপে আবৃত হয়। বিবেক আবৃত হলে কামনার বেগ বৃদ্ধি পায়।

কামনায় বাধাপ্রাপ্ত হলে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। তার থেকে সম্মোহ হয়, সম্মোহ থেকে বুদ্ধিভ্রংশ হয়। বুদ্ধি নষ্ট হলে মানুষ উপযুক্ত কর্ম না করে ছল, কপটতা, বেইমানি, অন্যায়, পাপ, অত্যাচার ইত্যাদি নিষিদ্ধ-কর্ম করতে আরম্ভ করে। ভগবান এরূপ ব্যক্তিদের মনুষ্য নামের অনুপযুক্ত বলে জানিয়েছেন। সেইজন্য ষোড়শ অধ্যায়ের যে স্থানে এইরূপ ব্যক্তিদের বর্ণনা আছে, সেখানে ভগবান (অষ্টম থেকে অষ্টাদশ শ্লোক পর্যন্ত) মনুষ্যবাচক কোনো শব্দ ব্যবহার করেননি। স্বর্গলোক কামনাকারী ব্যক্তিদেরও ভগবান **‘কামাত্মানঃ’** (গীতা ২।৪৩) বলে উল্লেখ করেছেন, কারণ এরূপ ব্যক্তি কামনার স্বরূপই হয়ে থাকে। কামনাতে লীন থাকায় তাদের ধারণা হয় যে, জাগতিক সুখের থেকে বেশি আর কিছুই নেই (গীতা ১৬।১১)।

যদিও কামনার এই তৃতীয়াবস্থায় মানুষের লক্ষ্য তার প্রকৃত উদ্দেশ্যের (পরমাত্মপ্রাপ্তির) দিকে যায় না, তবুও কোনো পূর্বসংস্কারবশতঃ বর্তমানের কোনো সুসঙ্গের দ্বারা বা অন্য কোনো কারণবশতঃ তার নিজ উদ্দেশ্য জাগরিত হলে তার কল্যাণ সাধিত হয়।

‘তথা তেনেদমাবৃতম্’—এই শ্লোকে ভগবান এক কামেরই দ্বারা বিবেক আবৃত হওয়ার তিনটি উদাহরণ দিয়েছেন। সুতরাং উপরিউক্ত পদটির তাৎপর্য হল এই যে, শুধুমাত্র কামনার দ্বারা বিবেক আবৃত হলেই কামের তিনটি অবস্থা পরিস্ফুট হয়।

কামনা উৎপন্ন হলে এই তিনটি অবস্থা সকলের হৃদয়ে উপস্থিত হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি কামনাকেই সুখের কারণ বলে মনে করে তার আশ্রয় নেয় এবং কামনা যে পরিত্যাজ্য তা মেনে নেয় না, সে কামনার প্রকৃত পরিচয় পায় না। কিন্তু যে পরমার্থে আস্থা রাখে এবং সাধন-ভজন করে সে এই কামনাকে চিনে নেয়। যে ব্যক্তি কামনাকে চিনে ফেলে, সেই একে নাশ করতে সক্ষম হয়।

এই শ্লোকে ভগবান কামনাকে নাশ করার উদ্দেশ্যে কামনার তিনটি অবস্থার বর্ণনা করেছেন। যে নির্দেশ তিনি পরবর্তী একচল্লিশ এবং তেতাল্লিশতম শ্লোকে দিয়েছেন। বাস্তবে কামনা উৎপন্ন হলেই তার বেগ এরূপ দ্রুত বেড়ে চলে যে তার উপরিউক্ত তিনটি ক্রম বর্ণনাতে তো সময় লাগে কিন্তু কামনার বৃদ্ধি পেতে সময় লাগে না। কামনা বৃদ্ধি পেলে অনর্থ হতে থাকে। সমস্ত পাপ, সন্তাপ, দুঃখ ইত্যাদি হয়ে থাকে কামনার কারণেই। সুতরাং মানুষের উচিত নিজ বিবেককে জাগ্রত রাখা যাতে কামনা উৎপন্ন না হয়। কামনা যদি উৎপন্নও হয়, তবে প্রথম বা দ্বিতীয়াবস্থাতেই তাকে নষ্ট করে দিতে হয় যাতে সেটি তৃতীয়াবস্থায় পৌঁছাতে না পারে।

বিশেষ কথা

ধোঁয়া দেখা গেলে বোঝা যায় যে কাছেই আগুন আছে ; কারণ সেখানে আগুন না থাকলে ধোঁয়া কোথা থেকে আসবে ? সুতরাং ধোঁয়াচ্ছন্ন থাকলেও যেমন আগুন থাকার সম্বন্ধে জ্ঞান হয়ে যায়, ময়লাতে ঢাকা থাকলেও যেমন দর্পণ সম্বন্ধে জ্ঞান হয় এবং জরায়ুতে আবৃত থাকলেও যেমন গর্ভ সম্বন্ধে জ্ঞান সকলেরই থাকে, তেমনি কামনা দ্বারা আবৃত থাকলেও বিবেক (কর্তব্য-অকর্তব্যের জ্ঞান) সকলেরই থাকে, কিন্তু কামনার জন্য সেটি কার্যকর হয় না।

শাস্ত্রানুসারে পরমাত্মার প্রাপ্তিতে তিনটি দোষ বাধাস্বরূপ—মল, বিক্ষেপ এবং আবরণ। এই দোষগুলি অসৎ (সংসারের) সম্পর্কে উৎপন্ন হয়। অসৎ-এর সম্বন্ধ

কামনা থেকে হয়। সুতরাং কামনাই হল মূল দোষ। কামনার সর্বতোপ্রকারে নাশ হলেই অসৎ হতে সম্পর্ক ছেদ হয়ে যায়। অসৎ-এর সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হলেই সমস্ত দোষ দূরীভূত হয় এবং বিবেক প্রকটিত হয়।

পরমাত্মপ্রাপ্তির পথে প্রধান বাধা হল—জাগতিক পদার্থগুলিকে বিনাশশীল জেনেও সেগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া। হৃদয়ে যতক্ষণ বিনাশশীল পদার্থের গুরুত্ব থাকে এবং সেগুলিকে সত্য, সুন্দর এবং সুখদায়ক বলে মনে হতে থাকে, ততক্ষণ মল, বিক্ষেপ এবং আবরণ—এই তিনটি দোষ থাকে। এই তিনটির মধ্যে আবার মলদোষকেই অধিকতর বাধাস্বরূপ মনে করা হয়। মল দোষের (পাপের) প্রধান কারণই হল কামনা। কারণ সমস্ত পাপই কামনার জন্য হয়। যখন সাধক দৃঢ় নিশ্চয় করে যে, 'আমি আর পাপ করব না', তখন সমস্ত দোষের মূলচ্ছেদ হয় এবং মলদোষও দূর হতে থাকে। সর্বতোভাবে নিষ্কাম হলে মলদোষও সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান কামনাসম্পন্ন ব্যক্তিদের কর্মযোগই (নিষ্কাম-কর্ম) কল্যাণের উপায় বলে জানিয়েছিলেন **'কর্মযোগস্তু কামিনাম্'** (১১।২০।৭)। সুতরাং কামনাযুক্ত ব্যক্তিদের নিজ কল্যাণের ব্যাপারে নিরাশ হতে নেই; কারণ যার মনে কামনা উৎপন্ন হয়েছে সেই নিষ্কাম হতে পারে। কর্মযোগ দ্বারা কামনাগুলি সহজেই নষ্ট হয়ে যায়। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বা বৃহৎ থেকে বৃহত্তর যে কোনো লৌকিক বা পারমার্থিক কাজই করা হোক না কেন যদি ওই কাজটি এইভাবে সতর্ক হয়ে করা যায় যে, 'আমি কেন করছি এবং কীভাবে করছি ?' তাহলে তার উদ্দেশ্য জাগ্রত হয়। সর্বক্ষণ উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টি থাকলে অশুভকর্ম সম্পাদিত হয় না এবং শুভকর্মগুলিও আসক্তি ও ফলেচ্ছা ত্যাগ করে সম্পাদন করায় নিষ্কামভাব অনুভূত হয় এবং মানুষের কল্যাণ সাধিত হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব—পরমাত্মতত্ত্বপ্রাপ্তিতে কামনাই হল প্রধান অন্তরায়। যেমন জলে পূর্ণ একটি কলশি রয়েছে। আমাকে দুটি কাজ করতে হবে। কলশিটিকে খালি করতে হবে এবং তাতে আকাশ (শূন্য) ভরতে হবে। কিন্তু বাস্তবে আমার দুটি কাজ করতে হবে না, একটি কাজ করলেই হবে, কলশিটিকে খালি করতে হবে। কলশি থেকে জল ফেলে দিলে স্বতঃই কলশির মধ্যে আকাশ (শূন্য) ভরে যাবে। তেমনই কামনা ত্যাগ করা এবং পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করা, দুটি পৃথক কাজ নয়। কামনা পরিত্যাগ করলে স্বতঃই পরমাত্মপ্রাপ্তি হয়। কামনাবশতঃই পরমাত্মাকে অপ্রাপ্ত বলে প্রতিভাত হয়।

※ ※ ※

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ॥ ৩৯ ॥

[**কৌন্তেয়** (হে কৌন্তেয় !) ; **এতেন, অনলেন** (অগ্নির ন্যায়) ; **দুষ্পূরেণ** (দুষ্পূরণীয়) ; **চ** (এবং) ; **জ্ঞানিনঃ** (জ্ঞানীদের) ; **কামরূপেণ, নিত্যবৈরিণা** (চিরশত্রু কামনা দ্বারা) ; **জ্ঞানম্** (জ্ঞান) ; **আবৃতম্** (আচ্ছন্ন থাকে।)]

হে কৌন্তেয় ! বিবেকশীল পুরুষের চিরশত্রু অগ্নির ন্যায় দুষ্পূরণীয় এই কাম অর্থাৎ কামনার দ্বারা মানুষের বিবেক-বুদ্ধি (জ্ঞান) আচ্ছন্ন থাকে ॥ ৩৯ ॥

ব্যাখ্যা—'এতেন'—সাঁইত্রিশতম শ্লোকে ভগবান জানিয়েছিলেন যে, পাপ করাবার মুখ্য কারণ হল 'কাম' অর্থাৎ কামনা। সেই কামনার উদ্দেশ্যেই এইস্থানে **'এতেন'** পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

'দুষ্পূরেণানলেন চ'—যেমন অগ্নিতে ঘি আহুতি দিলে অগ্নি কখনও তৃপ্ত হয় না, বরং বৃদ্ধি পেতে থাকে, তেমনি কামনার অনুকূল ভোগ করতে থাকলে কামনা তৃপ্ত না হয়ে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে[১]। যে বস্তুই সামনে

[১]ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ৯।১৯।১৪ ; মনুস্মৃতি ২।৯৪)

আসুক না কেন কামনা অগ্নির ন্যায় সেটিকে গ্রাস করতে থাকে।

ভোগ এবং সম্পদ-সংগ্রহের কামনা কখনো পূর্ণ হয় না। ভোগ্যসামগ্রী যতই প্রাপ্ত হতে থাকে ততই তার জন্য তৃষ্ণা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কারণ জড় পদার্থেরই কামনা হয়, তাই জড়ের সম্বন্ধে এটি কখনো দূর হয় না, বরং ক্রমশঃ সেটি বেড়েই চলে। সুন্দরদাস মহারাজ লিখেছেন—

জো দস বীস পচাস ভয়ে সত,
হোই হজার তো লাখ মঁগেগী।
কোটি অরবব খরবব অসংখ্য,
পৃথ্বীপতি হোন কী চাহ জগৈগী॥
স্বর্গ পতালকো রাজ করৌ,
তৃষ্ণা অধকী অতি আগ লগৈগী।
'সুন্দর' এক সন্তোষ বিনা সঠ,
তেরী তো ভূখ কভী ন ভগৈগী॥

যেমন, একশো টাকা পেলে হাজার টাকা পাবার ইচ্ছা মনে জাগে, এতে বোঝা যায় যে নয় শত টাকার ঘাটতি রয়েছে। হাজার টাকা পেলে তখন দশ হাজার টাকা পাবার বাসনা হয়, তাহলে এবার নয় হাজার টাকার ঘাটতি হয়। দশ হাজার টাকা পেলে আবার এক লাখ টাকা পাবার ইচ্ছা হয়, তখন আবার নব্বই হাজার টাকার ঘাটতি হয়। এক লক্ষ টাকা পেলে দশ লক্ষ না হলে সন্তুষ্টি হয় না, তারপর সোজাসুজি কোটিপতি হবার বাসনা জাগরিত হয়, তাতে নিরানব্বই লক্ষ টাকার ঘাটতি থাকে। এইভাবে মনে হতে থাকে যে লাভের অংশ বেড়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঘাটতির অংশই বেড়ে যায়। যত অর্থ প্রাপ্তি হয়, ততই দারিদ্র্য (অর্থের আকাঙ্ক্ষা) বেড়ে চলে। বাস্তবে যার অর্থের আকাঙ্ক্ষা নেই, তারই দারিদ্র্য দূর হয়।

চাহ গয়ী চিন্তা মিটী, মনুয়াঁ বেপরবাহ।
জিনকো কছু ন চাহিয়ে, সো সাহনপতি সাহ॥

প্রকৃতপক্ষে অর্থ তত বাধা (অন্তরায়) নয় যত বাধা হয় তার কামনা। ধনী বা নির্ধন যারই অর্থের কামনা হোক, সে-ই পরমাত্মপ্রাপ্তিতে বঞ্চিত হয়। কারুরই কামনা কখনো পূর্ণ হয় না ; কারণ এটি পূর্ণ হবার নয়। কামনা দূর হলে তবেই কামনারহিত হওয়া সম্ভব।

'কামরূপেণ'—জড় সম্পর্কিত বস্তু থেকে সুখ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকেই 'কাম' বলা হয়। বিনাশশীল জগতের প্রতি সামান্যতমও গুরুত্ববোধ থাকলে তাকে 'কাম' বলা হয়।

অপ্রাপ্ত বস্তু প্রাপ্ত করার আকাঙ্ক্ষাকেই 'কামনা' বলা হয়। হৃদয়ে যে নানাপ্রকার সূক্ষ্ম কামনা অবদমিত থাকে তাকে 'বাসনা' বলা হয়। বস্তুগুলির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করাকেই 'স্পৃহা' বলে। বস্তুগুলির উত্তম এবং প্রিয়ভাব নজরে আসাকে 'আসক্তি' বলা হয়। সেইগুলি লাভ করার সম্ভাবনাই হল 'আশা' আর অধিক পরিমাণে পাবার আকাঙ্ক্ষাকে বলা হয় 'লোভ' বা 'তৃষ্ণা'। বস্তুগুলি পাবার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পেলে বলা হয় 'যাচ্‌না'। এগুলি সমস্তই 'কাম'-এরই বিভিন্ন রূপ।

'জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা'—এখানে **'জ্ঞানিনঃ'** পদটি সাধন-ভজনে ব্যাপৃত বুদ্ধিমান সাধকদের প্রতি প্রযোজ্য। কারণ বিবেকবান সাধকই এই কামরূপ শত্রুকে চিনতে পারেন এবং তাকে নাশ করেন। সাধনাহীন ব্যক্তিরা এগুলিকেই জানেই না, বরং এগুলিকে সুখদায়ক বলে মনে করে।

ভগবান বলেছেন যে, এই কামনা বিবেকবান সাধকদের নিত্যশত্রু। কামনা উৎপন্ন হলেই বিবেকবান সাধকদের চিন্তা আসে যে এবার কোনো একটা বিপত্তি আসবে ! কামনাতেই নিহিত থাকে জগতের গুরুত্ব এবং আশ্রয়, যেটি পারমার্থিক পথের বিরাট বাধাস্বরূপ। বিবেকবান সাধকের কামনার অনুভূতি হলেই কাঁটা বিঁধতে থাকে। কারণ পরিণামে কামনা সকলকেই দুঃখ দেয়। সেইজন্য এটি সাধকের নিত্যশত্রু।

ভোগে ব্যাপৃত অজ্ঞানী ব্যক্তিদের এই কামনা বন্ধুর মতো অনুভব হয়, কারণ কামনাবশতঃই ভোগে সুখ অনুভূত হয়। কামনা না থাকলে ভোগ্যপদার্থগুলি সুখ দিতে পারে না, উপরন্তু শেষ পর্যন্ত তা দুঃখ, শোক, কারাবাস, নরক ইত্যাদির প্রাপ্তি ঘটায়। তাই বাস্তবে এই কামনা অজ্ঞানীদেরও নিত্য শত্রু। কিন্তু অজ্ঞানীদের বোধ জাগ্রত থাকে না, আর জ্ঞানী বিবেকবান সাধকদের বোধ জাগ্রত থাকে।

'আবৃতং জ্ঞানম্'—প্রাণীমাত্রেরই বিবেক (জ্ঞান) থাকে। পশু-পক্ষী ইত্যাদি মনুষ্যেতর প্রাণীর এই বোধ বিকশিত হয় না, কেবলমাত্র তাদের জীবন-নির্বাহের প্রয়োজনানুযায়ী সেই পর্যন্ত এটি সীমিত থাকে। মানুষের যদি

763 Sadhak Sanjivani (Bangla) Section 11 1_Front

কামনা না থাকে তবে এই বিবেক বিকশিত হতে পারে ; কারণ কামনাতেই এই বিবেক আবৃত থাকে। বিবেক আবৃত থাকলে মানুষ নিজ পরমাত্মপ্রাপ্তির লক্ষ্যে এগোতে পারে না, কারণ কামনা তাকে চিন্ময়-তত্ত্বের দিকে অগ্রসর হতে দেয় না, বরং তাকে জড়-তত্ত্বে আবদ্ধ করে রাখে।

নিজের প্রতি যদি অন্য কেউ অপ্রিয় এবং অসত্য কথা প্রয়োগ করে তাহলে খারাপ লাগে এবং প্রিয় ও সত্য কথা বললে ভালো লাগে। তার অর্থ হল এই যে, ভালো-মন্দ, সদ্‌গুণ-দুর্গুণ, কর্তব্য-অকর্তব্য ইত্যাদির জ্ঞান অর্থাৎ বিবেক সকল মানুষেরই থাকে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে অপ্রিয় এবং মিথ্যা কথা বলে এবং নিজ কর্তব্যপালন করে না—এর কারণ হল, যে কামনা তার বিবেককে আবৃত করে রেখেছে।

কামনাবশতঃই ত্যাগে যে সুখ বিরাজিত—সেই জ্ঞান কার্যকরী হয় না। অনুকূল ভোগ্যপদার্থ প্রাপ্তি ঘটলে সুখী হওয়া যায়, এই হল মানুষের ধারণা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ওই সমস্ত ত্যাগেই সুখ হয়। সকলেই অনুভব করে যে জাগ্রত অবস্থায় বা স্বপ্নে ভোগ্যপদার্থের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকায় সুখ ও দুঃখ দুই-ই অনুভূত হয়। কিন্তু সুষুপ্তিতে (গভীর নিদ্রাকালে ভোগ্যপদার্থের কোনো স্মৃতি না থাকায়) সুখানুভূতিই হয়, দুঃখ নয়। সেইজন্য গভীর নিদ্রা হলে সে বলে 'আমি খুব আরামে ঘুমিয়েছি।' তাছাড়াও জাগ্রত অবস্থায় এবং স্বপ্ন দেখাকালীন ক্লান্তি এসে যায়, কিন্তু সুষুপ্তিতে ক্লান্তি দূর হয়ে প্রফুল্লভাব ফিরে আসে। এতেই প্রমাণিত হয় যে ভোগ্যপদার্থ ত্যাগ করলেই সুখ পাওয়া যায়।

অর্থের আকাঙ্ক্ষা হলেই মনের দ্বারা অর্থ ধৃত হয় অর্থাৎ অর্থ মনে ঘর করে। যখন বাহ্যতঃ ধন প্রাপ্ত হয়, তখন মনের দ্বারা ধৃত অর্থ পরিত্যক্ত হয় এবং সুখের প্রতীতি হয়। সুতরাং বাস্তবে সুখের ধারণা বাহ্যতঃ অর্থপ্রাপ্তিতে হয়নি, তা হয়েছে মনের দ্বারা ধৃত অর্থ ত্যাগ করাতেই। অর্থপ্রাপ্তিতে যদি সুখ নিহিত থাকত তাহলে অর্থ থাকা অবস্থায় কখনো দুঃখ আসত না ; কিন্তু অর্থ থাকলেও দুঃখ আসে।

মানুষ যখন কোনো বস্তু আকাঙ্ক্ষা করে, তখন সে তার অধীন হয়ে যায়। যেমন তার ঘড়ির জন্য বাসনা হল। বাসনা উৎপন্ন হতেই তার ঘড়ির অভাবে দুঃখ অনুভূত হয়—এটি হল ঘড়ির জন্য পরাধীনতা। সে ভাবতে থাকে টাকা পেলে সে তৎক্ষণাৎ ঘড়ি ক্রয় করবে অর্থাৎ টাকা থাকলে নিজেকে স্বাধীন এবং টাকা না থাকায় নিজেকে পরাধীন বলে মনে করে। কিন্তু এরূপ মনে করা একেবারে উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে টাকা পেলে ঘড়ির জন্য পরাধীনতা না থাকলেও, টাকার পরাধীন তো হতেই হয় ; কারণ টাকাও 'পর', 'স্ব' নয়। বস্তুর কামনা হলে যেমন মানুষ বস্তুর পরাধীন হয়, তেমনি অর্থের কামনা হলে অর্থের শোকে পরাধীন হতে হয়, পরাধীনতা একই প্রকার থেকে যায় ! কিন্তু কামনা দ্বারা বিবেকবোধ আবৃত হওয়ায় মানুষ বস্তুর পরাধীনতা অনুভব করলেও অর্থের পরাধীনতা তার অনুভূত হয় না, বরং অর্থের জন্য তার স্বাধীনতাই অনুভূত হয়ে থাকে। যে পরাধীনতা স্বাধীনতার মতো মনে হয়, সেটি দূর করা বড়ই কঠিন।

জগৎ মাত্রই ক্ষণভঙ্গুর। শরীর, অর্থ, জমি, বাড়ি ইত্যাদি যত জাগতিক বস্তু আছে, তা সবই প্রতিমুহূর্তে বিনাশের দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং আমাদের থেকে বিযুক্তও হচ্ছে। কিন্তু ভোগের সময় আমাদের এই ক্ষণভঙ্গুরতার কথা মনে থাকে না। ভোগ্য পদার্থসকল নিত্য এবং স্থির বলে মনে না করলে সুখভোগ হতেই পারে না। সাধারণ মানুষই কেবল নয়, সাধকরাও অনেকে সুখভোগকে নিত্য এবং স্থির মনে করেই তাতে আবদ্ধ হন। কামনা দ্বারা বিবেক আবৃত হওয়াই হচ্ছে এর কারণ।

বিশেষ কথা

মানুষকে চিরকালের জন্য মহৎ এবং চিরতরে সুখী করার উদ্দেশ্যে ভগবান কামনা-বাসনাকে 'নিত্যশত্রু' বলে তার থেকে রক্ষা পাবার জন্য সাবধান করেছেন। কারণ কামনাই হল সমস্ত পাপ এবং দুঃখের কারণ। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে খুঁজছিল। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল—তোমার স্ত্রীর নাম কী ? সে জবাব দিল 'বেইজ্জতি'। আবার তারা জিজ্ঞাসা করল—তোমার নাম কী ? সে বলল 'বদমাশ'। লোকেরা বলল—চিন্তা কোরো না, তোমার স্ত্রী অত্যন্ত পতিব্রতা, নিজেই ফিরে আসবে ! তাৎপর্য হল বদমায়েশের বেইজ্জতি অবশ্যই হবে। এইরূপ জগতে বিনাশশীল ভোগের আকাঙ্ক্ষাকারী মানুষের নিকট দুঃখ নিজে থেকেই আসে।

মানুষ দুঃখের হাত থেকে রক্ষা পেতে চায়, কিন্তু দুঃখগুলির কারণ যে 'কাম' (কামনা) তাকে ছাড়ে না। কামনা থাকতে স্বপ্নেও সুখ পাওয়া যায় না—**'কাম অছত সুখ সপনেহুঁ নাহীঁ'** (শ্রীরামচরিতমানস ৭।৯০।১)। ভগবান **'অনলেন'**, **'দুষ্পূরেণ'** পদের দ্বারা বলতে

চেয়েছেন যে, ভোগ্যপদার্থের দ্বারা কামনা কখনো পূরণ হয় না। যেমন ভোগ্যপদার্থ লাভ হতে থাকে তেমনই ক্রমান্বয়ে তার কামনাও বেড়ে চলে, আর যেমন কামনা বাড়তে থাকে, তেমনই অভাব অনুভূত হয় এবং সেই অভাব দূর করার জন্য মানুষ পাপ-কর্মে প্রবৃত্ত হয়। যেমন অর্থের কামনা উৎপন্ন হলে মানুষ অর্থপ্রাপ্তির আশায় ন্যায়-অন্যায় বিচার করে না। তেমনি কামনা বৃদ্ধি পেলে (পরবর্তী অবস্থায়) সে চুরি, ডাকাতি ইত্যাদিতেও প্রবৃত্ত হয়। কামনার আরও অধিক বৃদ্ধি হলে (তৃতীয় অবস্থায়) সে অর্থ লোভে অন্য ব্যক্তিকে হত্যা পর্যন্ত করে বসে। এইভাবে বিনাশশীল সুখের কামনায় মানুষ ইহলোক এবং পরলোক—দুটিকেই অত্যন্ত দুঃখদায়ী করে তোলে।

পরিশিষ্ট-ভাব— সাধনার পথে প্রধান বাধা হল সংযোগজনিত সুখের কামনা। সাধনপথে এই বাধা বহুদূর পর্যন্ত সঙ্গে থাকে। সাধক যেখানে সুখ গ্রহণ করেন সেখানেই বদ্ধ হয়ে যান। এমন কি সাধক যদি সমাধি থেকে সুখ আহরণ করেন তাহলে সেখানেও তিনি বাঁধা পড়েন[১]। সাত্ত্বিক সুখের কামনা এবং আসক্তিও বন্ধনকারক হয়ে যায়— **'সুখসঙ্গেন বধ্নাতি'** (গীতা ১৪।৬)[২]। তাই ভগবান এখানে সংযোগজনিত সুখের কামনাকে বুদ্ধিমান সাধকদের নিত্যবৈরী বলে জানিয়েছেন— **'ন তেষু রমতে বুধঃ'** (গীতা ৫।২২), **'দুঃখমেব সর্বং বিবেকিনঃ'** (যোগদর্শনঃ ২।১৫)।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—কোনো শত্রুর বিনাশ করতে হলে তার অবস্থান জানা অত্যন্ত প্রয়োজন, সেইজন্য ভগবান পরবর্তী শ্লোকে জ্ঞানীদের চিরশত্রু কাম-এর আশ্রয় স্থান জানাচ্ছেন।

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্॥ ৪০ ॥

[**ইন্দ্রিয়াণি** (ইন্দ্রিয়াদি) ; **মনঃ, বুদ্ধিঃ** (মন ও বুদ্ধি) ; **অস্য** (এগুলি কামনার) ; **অধিষ্ঠানম্** (আশ্রয়স্থান) ; **উচ্যতে** (বলা হয়েছে) ; **এষঃ** (কামনা) ; **এতৈঃ** (এগুলিকে) ; **জ্ঞানম্, আবৃত্য** (জ্ঞানকে আবৃত করে) ; **দেহিনম্** (দেহাভিমানী মানুষকে) ; **বিমোহয়তি** (মোহগ্রস্ত করে।)]

ইন্দ্রিয়াদি, মন ও বুদ্ধি—এগুলিকে কামনার আশ্রয় স্থান বলা হয়েছে। কামনা এগুলিকে (ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি) অবলম্বনপূর্বক জ্ঞানকে আবৃত করে দেহাভিমানী মানুষকে মোহগ্রস্ত করে ॥ ৪০ ॥

ব্যাখ্যা— 'ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে'— কাম পাঁচটি স্থানে পরিলক্ষিত হয়—(১) পদার্থসমূহে (গীতা ৩।৩৪), (২) ইন্দ্রিয়াদিতে, (৩) মনে, (৪) বুদ্ধিতে এবং (৫) মেনে নেওয়া অহং-এ ('আমি') অর্থাৎ কর্তাতে (গীতা ২।৫৯)। এই পাঁচ স্থানে পরিলক্ষিত হলেও প্রকৃতপক্ষে 'কাম' থাকে মেনে নেওয়া অহং-এ (চিদ্-জড় গ্রন্থিতে)। তা সত্ত্বেও উপরিউক্ত পাঁচ স্থানে অনুভূত হওয়ায় ঐগুলিকে কামনার বাসস্থান বলা হয়।

সমস্ত ক্রিয়া শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন এবং বুদ্ধি দ্বারাই হয়ে থাকে। এই চারটি হল কর্ম করার সাধন (মাধ্যম)। যদি এগুলিতে কাম নিহিত হত তবে এগুলির দ্বারা পারমার্থিক কর্ম করা সম্ভব হত না। সেইজন্য কর্মযোগী নিষ্কাম, নির্মম এবং অনাসক্ত হয়ে শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন এবং বুদ্ধি সহযোগে অন্তরের (অন্তঃকরণের) শুদ্ধির জন্য কর্ম করে থাকেন (গীতা ৫।১১)।

কাম প্রকৃতপক্ষে অহং-এ (জড়-চেতনের তাদাত্ম্য) থাকে। অহং অর্থাৎ আমিত্ব-ভাব শুধুমাত্র মেনে নেওয়া হয়েছে। 'আমি অমুক বর্ণ, আশ্রম, সম্প্রদায়ভুক্ত'—এটি

---

[১] ভোগের সুখ সংযোগজনিত আর সমাধির সুখ বিয়োগজনিত। সংযোগজনিত সুখ গ্রহণ করলে পতন হয় আর বিয়োগজনিত সুখ গ্রহণ করলে সেই সুখেই আবদ্ধ হয়ে থাকতে হয়।

[২] পরমাত্মপ্রাপ্তির পথে সাত্ত্বিক সুখের আসক্তি বাধা প্রদান করে এবং রাজসিক-তামসিক সুখের আসক্তি পতন ঘটায়।

কেবল মেনে নেওয়া। মেনে নেওয়া (মান্যতা) ব্যতিরেকে এর অন্য কোনো প্রমাণ নেই। এই মেনে নেওয়া সম্বন্ধতেই কামনা বিরাজ করে। কামনা থেকেই সমস্ত পাপের উৎপত্তি। পাপ ফলভোগ হলেই বিনষ্ট হয়, কিন্তু অহং থেকে কামনা দূরীভূত না হলে নতুন নতুন পাপ উৎপন্ন হতে থাকে। অতএব কামনাই হচ্ছে জীবের বন্ধনের কারণ। মহাভারতে বলা হয়েছে যে,—

কামবন্ধনমেবৈকং নান্যদস্তীহ বন্ধনম্।
কামবন্ধনমুক্তো হি ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥

(শান্তিপর্ব ২৫১।৭)

জগতে কামনাই হল একমাত্র বন্ধন, আর কোনো বন্ধন নেই। যে এই কামনার বন্ধন থেকে মুক্তি পায়, সে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত করতে সক্ষম হয়।

'এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্'— কামনাবশতঃই মানুষের যা করা উচিত সে তা করে না এবং যা করা উচিত নয় সেটি করে বসে। এইভাবে কামনা দেহাভিমানী ব্যক্তিকে মোহগ্রস্ত করে রাখে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন যে, কামনা থেকে ক্রোধ উৎপন্ন হয়—**'কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে'** (২।৬২) এবং ক্রোধ থেকে সম্মোহ (অত্যন্ত মূঢ়ভাব) উৎপন্ন হয়— **'ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ'** (২।৬৩)। এতে বোঝা যায় যে কামনায় বাধাপ্রাপ্ত হলে ক্রোধ উৎপন্ন হয়, কিন্তু যদি কামনা বাধাপ্রাপ্ত না হয়, তাহলে কামনা থেকে লোভ এবং লোভ থেকে সম্মোহ উৎপন্ন হয়[১]। অর্থাৎ কামনার ভোগ্যপদার্থ পাওয়া না গেলে 'ক্রোধ' উৎপন্ন হয়, আর সেই পদার্থ পেলে 'লোভ' উৎপন্ন হয়। তার থেকে 'মোহ' জন্মায়। কামনা হল রজোগুণের কাজ আর মোহ হল তমোগুণের কাজ। রজোগুণ এবং তমোগুণ পাশাপাশি বিরাজ করে। সুতরাং কাম-ক্রোধ-লোভ ও মোহ পাশাপাশি বিরাজ করে থাকে[২]। কাম ইন্দ্রিয়াদি, মন এবং বুদ্ধি সহযোগে দেহাভিমানী ব্যক্তিকে মোহগ্রস্ত (বেহুঁশ) করে রাখে। এইভাবে 'কাম' রজোগুণের কার্য হলেও তমোগুণের কার্য রূপ মোহে পরিণত হয়।

কামনা উৎপন্ন হলে মানুষ প্রথমে ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা ভোগ করার কামনা করে। প্রথমে ভোগ্যবস্তুর অভাববোধ হয়, পরে পাওয়া গেলেও সেগুলি স্থায়ী হয় না। তবুও সেগুলি কোনোমতে প্রাপ্ত করার জন্য মানুষ মনের মধ্যে নানাপ্রকার কামনা করতে থাকে। সেগুলি প্রাপ্ত করার জন্য বুদ্ধি দ্বারা নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করে। এইভাবে কামনা প্রথমে ইন্দ্রিয়াদির সংযোগজনিত সুখের প্রলোভনে ব্যাপৃত করে। পরে ইন্দ্রিয়গুলি মনকে তার দিকে আকর্ষণ করে। অতঃপর ইন্দ্রিয়গুলি এবং মন মিলিত হয়ে বুদ্ধিকেও নিজেদের দিকে আকর্ষিত করে। এইভাবে কামনা দেহাভিমানীর জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে ইন্দ্রিয়াদি, মন এবং বুদ্ধি সহযোগে তাকে মোহগ্রস্ত করে ফেলে এবং পতনের পথে ঠেলে দেয়।

সিদ্ধান্ত এই যে ভৃত্য ভালো হলেও গৃহকর্তা তাকে যদি তিরস্কার করে তাড়িয়ে দেয় তাহলে তার উত্তম ভৃত্য পাওয়া কঠিন হয়। তেমনি গৃহকর্তা ভালো হলেও, ভৃত্য যদি তাকে কুকথা শোনায়, তাহলে তারও আর উত্তম গৃহকর্তা মেলে না। এইভাবেই মানুষ পরমাত্মপ্রাপ্তি না করে শরীরকে জাগতিক ভোগ এবং সম্পদ-সংগ্রহেই যদি ব্যাপৃত করে রাখে, তবে তার আর মনুষ্যদেহ প্রাপ্তি হয় না। অন্তঃকরণ অপবিত্র হলে উত্তম বস্তুর অপব্যবহার করা হয় এবং অন্তঃকরণ অপবিত্র হয় কামনার দ্বারা। তাই সর্বপ্রথম কামনা দূর করতে হয়।

'দেহিনম্ বিমোহয়তি' পদটির তাৎপর্য হল এই যে, দেহাভিমানী পুরুষকেই এই কাম মোহগ্রস্ত করে রাখে। শরীরকে 'আমি' এবং 'আমার' বলে যে মনে করে তাকেই দেহাভিমানী বলা হয়। ভগবান তাঁর উপদেশের প্রারম্ভেই দেহ (শরীর) এবং দেহী (শরীরী, আত্মা) সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করেছেন (গীতা ২।১১-৩০)। সকলেই অনুভব করে যে দেহ এবং দেহী দুই-ই-পৃথক। দেহাভিমানীদের (যারা দেহকেই নিজ স্বরূপ বলে মনে করে) জ্ঞান কামনা দ্বারা আবৃত হয়ে তাদের আবদ্ধ করে রাখে, দেহীকে (শুদ্ধ স্বরূপকে) নয়। যে শরীরের সঙ্গে

---

[১]রাগাৎ কামঃ প্রভবতি কামাল্লোভোঽভিজায়তে। লোভাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ॥
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥ (মার্কণ্ডেয়পুরাণ ৩।৭১-৭২)

[২]তমোগুণ, রজোগুণ এবং সত্ত্বগুণ—তিনটির মধ্যে (ক্রম অনুযায়ী ১, ১০ ও ১০০ নম্বরের মতো) দশগুণের পার্থক্য। তাহলেও তমোগুণ (১) থেকে রজোগুণ (১০) কাছাকাছি থাকে কিন্তু সত্ত্বগুণ (১০০) এই দুটির থেকে দূরে অবস্থিত।

নিজের সম্বন্ধ মেনে নেয় না, তাকে এটি আবদ্ধ করতে পারে না। দেহকে 'আমি', 'আমার' এবং 'আমার জন্য' মনে করলেই মানুষ উৎপত্তি ও বিনাশশীল জড় পদার্থগুলিকে গুরুত্ব দেয়। যার ফলে তার ওই বস্তুগুলিতে অনুরাগ উৎপন্ন হয়। অনুরাগ উৎপন্ন হলে জড়ের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। জড়ত্বের সঙ্গে সম্পর্ক হলেই কামনার উৎপত্তি হয়। কামনা উৎপন্ন হলে জীব মোহগ্রস্ত হয়ে সংসারে আবদ্ধ হয়।

***

সম্বন্ধ—পরবর্তী তিনটি শ্লোকে ভগবান কাম বিনাশ করার পদ্ধতি জানিয়ে সেগুলি বিনাশ করার নির্দেশ দিচ্ছেন।

তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্‌মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্‌॥ ৪১ ॥

[**তস্মাৎ** (সেইহেতু) ; **ভরতর্ষভ** (হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন!) ; **ত্বম্‌, আদৌ** (তুমি সর্বাগ্রে) ; **ইন্দ্রিয়াণি** (ইন্দ্রিয়গুলিকে) ; **নিয়ম্য** (বশীভূত করে) ; **এনম্‌, জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্‌** (এই জ্ঞান-বিজ্ঞান বিনাশী) ; **পাপ্‌মানম্‌** (ঘোর পাপস্বরূপ কামকে) ; **হি** (অবশ্যই) ; **প্রজহি** (সবলে বিনাশ করো।)]

সেইহেতু, হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন! তুমি সর্বাগ্রে ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করে, জ্ঞান-বিজ্ঞানবিনাশী ঘোর পাপস্বরূপ কামকে (কামনাকে) সবলে বিনাশ করো ॥ ৪১ ॥

ব্যাখ্যা—**'তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ'**—ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয়-ভোগে প্রবৃত্ত হতে না দেওয়া, কেবলমাত্র জীবন নির্বাহের জন্য অথবা সাধন-ভজনে প্রবৃত্ত হতে দেওয়াই হল সেগুলিকে বশীভূত করা। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলি যেন আসক্তিপূর্বক বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত না হয় বা দ্বেষপূর্বক নিবৃত্ত না হয় (গীতা ১৮।১০)। অনুরাগপূর্বক প্রবৃত্ত এবং দ্বেষপূর্বক নিবৃত্ত হলে রাগ- দ্বেষ পরিপুষ্ট হয় এবং মানুষ না চাইলেও তাকে পতনের দিকে নিয়ে যায়। সেইজন্য প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি অথবা কর্তব্য এবং অকর্তব্য জানার জন্য শাস্ত্রই হল প্রমাণ (গীতা ১৬।২৪)। শাস্ত্র অনুযায়ী কর্তব্য পালন এবং অকর্তব্য ত্যাগ করলে ইন্দ্রিয়াদি বশীভূত হয়।

'কাম' বিনাশ করার জন্য সর্বপ্রথম ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করতে বলার কারণ হল এই যে, মানুষ যতক্ষণ ইন্দ্রিয়াদির বশীভূত হয়ে থাকে, ততক্ষণ সে তত্ত্বের দিকে দৃষ্টি দিতে পারে না এবং তত্ত্বের দিকে দৃষ্টি না দিলে অর্থাৎ তত্ত্ব অনুভব না করলে 'কাম' সর্বতোভাবে লয় পায় না।

মানুষের প্রবৃত্তি ইন্দ্রিয়াদি সহযোগেই হয়। তাই সে প্রথমে ইন্দ্রিয়াদি বিষয়েই আবদ্ধ হয়, যাতে তার মধ্যে ওই বিষয়সমূহে কামনা উৎপন্ন হয়। সকামভাবে কর্ম করলে মানুষ সম্পূর্ণভাবে ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হয় এবং তাতেই তার পতন ঘটে। কিন্তু যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করে নিষ্কামভাবে কর্তব্যকর্ম করে, সে শীঘ্রই উদ্ধার পায়।

'এনম্‌ জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্‌'—**'জ্ঞান'** পদের অর্থ শাস্ত্রীয় জ্ঞানও ধরা যায় ; যেমন—ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্মের অন্তর্গত **'জ্ঞানম্‌'** পদটি শাস্ত্রীয় জ্ঞানের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে (গীতা ১৮।৪২)। কিন্তু এইস্থানে প্রসঙ্গ অনুযায়ী 'জ্ঞানে'র অর্থ বিবেক (কর্তব্য ও অকর্তব্যকে ভিন্ন রূপে জানা) গ্রহণ করাই উচিত বলে মনে হয়। **'বিজ্ঞান'** পদটির অর্থ হল বিশেষ জ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান (অনুভব জ্ঞান, প্রকৃত জ্ঞান বা বোধ)।

বিবেক এবং তত্ত্বজ্ঞান—দুটিই স্বতঃসিদ্ধ। তত্ত্বের অনুভূতি সকলের থাকে না, কিন্তু বিবেকের অনুভব সকলের থাকে। মানুষের মধ্যে এই বিবেক বিশেষভাবে বিরাজমান। অর্জুনের প্রশ্নে (মানুষ না চাইলেও কেন পাপ করে?) উদ্ধৃত **'অনিচ্ছন্নপি'** পদটিতেও এটিই সিদ্ধ হয় যে মানুষের অন্তরে বিবেক আছে এবং তার দ্বারাই সে পাপ ও পুণ্য কী, তা জানে এবং পাপ করতে অনিচ্ছুক থাকে। পাপ না করার ইচ্ছা বিনা বিবেকে হয় না। কিন্তু 'কাম' সেই বিবেকবোধকে আবৃত করে এবং তাকে জাগ্রত হতে দেয় না।

বিবেক জাগ্রত হলে মানুষ ভবিষ্যতের দিকে অর্থাৎ পরিণামের দিকে লক্ষ রেখেই সমস্ত কার্য করে। কিন্তু কামনার দ্বারা বিবেক আবৃত হলে পরিণামের দিকে দৃষ্টি

যায় না, সেইজন্যই সে তখন পাপ করে বসে।

এরূপ যে বিবেকের অনুভব সকলেই বোধ করে, সেই বিবেককেই যখন এই 'কাম' জাগরিত হতে দেয় না, তখন যেটি সকলের অনুভবগত নয়, সেই তত্ত্বজ্ঞানকে কী করে জাগ্রত হতে দেবে ? সেইজন্যই এইস্থানে 'কাম'কে জ্ঞান (বিবেক) এবং বিজ্ঞান (বোধ) দুয়েরই নাশক বলে জানানো হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে এই 'কাম' জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের নাশ (অনস্তিত্ব) করে না, বরং ওই দুটিকেই আবৃত করে রাখে অর্থাৎ প্রকট হতে দেয় না। ওইগুলিকে আবৃত করার ব্যাপারটিকেই এখানে নাশ করা বলে জানানো হয়েছে। কারণ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের কখনো নাশ হয় না। বাস্তবে যার নাশ হয় তা হল 'কাম' অর্থাৎ কামনা। যেমন চোখের সামনে মেঘ এলে 'মেঘে সূর্য ঢাকা পড়েছে' এরূপ বলা হয়, কিন্তু বাস্তবে সূর্য আচ্ছাদিত হয় না, বরং দৃষ্টিই আবৃত হয়, তেমনি 'কামনার দ্বারা জ্ঞান-বিজ্ঞান আবৃত হয়েছে' এরূপ বলা হলেও, বাস্তবে জ্ঞান-বিজ্ঞান আবৃত হয় না, আসলে বুদ্ধিই আচ্ছাদিত হয়।

'পাপ্‌মানং হি প্রজহি'—কামনা হল সমস্ত পাপের মূল। তাই কামনা উৎপন্ন হলেই পাপ হবার সম্ভাবনা থাকে। পরবর্তী সময়ে কামনা মানুষের বিবেককে আবৃত করে তাকে অন্ধ করে দেয়, যাতে তার আর পাপ-পুণ্যের জ্ঞান থাকে না, যার ফলে সে পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়। তাতে তার মহাপতন হয়। তাই ভগবান কামনাকে মহাপাপকারী বলে সেটি অবশ্যই বিনাশ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

গৃহস্থজীবন ঠিক নয়, সাধু হয়ে যাই, একান্তে চলে যাই—এরূপ চিন্তা করে মানুষ তার কার্যধারা পরিবর্তিত করতে চায়, কিন্তু এসবের মূল কারণ 'কামনা'কে পরিত্যাগ করে না ; সেটি ত্যাগ করার কথা চিন্তাই করে না। যদি সে কামনা পরিত্যাগ করে তাহলে তার সমস্ত কাজ স্বতঃই ঠিক হয়ে যায়। মানুষ যখন বাঁচার কামনা অথবা অন্য কামনা নিয়ে মারা যায়, তখন এই কামনাগুলি তার পুনর্জন্মের কারণ হয়ে ওঠে। অর্থাৎ যতক্ষণ মানুষের মধ্যে কামনা থাকে, ততক্ষণ সে এই জন্ম-মৃত্যুরূপ চক্রে আবর্তিত হতে থাকে। এইভাবে, বন্ধন ছাড়া কামনা দ্বারা আর কোনো কার্য সিদ্ধ হয় না।

মানুষ যখন জড় পদার্থগুলিতে আকর্ষণ বোধ করে তখনই তার কামনা উৎপন্ন হয়। কামনা উৎপন্ন হলেই বিবেকবোধ অবদমিত হয়ে ইন্দ্রিয়গুলি প্রাধান্য পায়। ইন্দ্রিয়গুলি মানুষকে শুধুমাত্র শব্দাদিবিষয়ক সুখভোগে প্রবৃত্ত করে। পশু-পক্ষীর প্রবৃত্তিও ইন্দ্রিয়বিষয়ক সুখ পর্যন্ত সীমিত। কিন্তু কামনাতে বিবেক আবৃত হওয়ায় মানুষ ইন্দ্রিয়জনিত সুখের আশায় ভোগ্য-পদার্থের কামনা করতে থাকে এবং সেই পদার্থ-সংগ্রহের জন্য অর্থের আকাঙ্ক্ষা করতে থাকে। শুধু তাই নয়, তার দৃষ্টি ক্রমশঃ অর্থের থেকে সরে গিয়ে অর্থ-সংগ্রহের দিকে চলে যায়। শুধুমাত্র জীবন নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অপেক্ষা অধিকতর অর্থ-সংগ্রহের বৃত্তি আরও বেশি করে পতন ঘটায় এবং সংগ্রহ অপেক্ষা সেগুলির সংখ্যাবৃদ্ধি আরও হানিকারক হয়। অর্থ বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে তখন সে ছল-কপটতা-মিথ্যা-চুরি ইত্যাদি পাপ-কর্মাদিও করতে শুরু করে এবং অর্থবৃদ্ধি হলে তার অহংকার জন্মায়, যা আসুরী সম্পদের মূল কারণ। এইভাবে কামনার জন্যই মানুষ মহাপতনের দিকে অগ্রসর হয়। সেইজন্যই ভগবান এই মহাপাপী কামকে সম্পূর্ণভাবে নাশ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

※ ※ ※

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥ ৪২ ॥
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্॥ ৪৩ ॥

[**ইন্দ্রিয়াণি** (ইন্দ্রিয়সমূহ) ; **পরাণি** (স্থূল দেহ থেকে শ্রেষ্ঠ) ; **আহুঃ** (বলা হয়) ; **ইন্দ্রিয়েভ্যঃ** (ইন্দ্রিয়গুলি অপেক্ষা) ; **পরম্, মনঃ** (শ্রেয়তর হল মন) ; **মনসঃ, তু** (মনের থেকেও) ; **পরা, বুদ্ধিঃ** (শ্রেয়তর হল বুদ্ধি) ; **যঃ, বুদ্ধেঃ** (বুদ্ধির থেকে যে) ; **তু, পরতঃ** (উপরে আছে) ; **সঃ** (তা হল কাম) ; **এবম্, বুদ্ধেঃ** (এইভাবে বুদ্ধির চেয়েও) ; **পরম্** (উপরে) ; **বুদ্ধ্বা** (জেনে

নিয়ে) ; আত্মনা, আত্মানাম্ (নিজের দ্বারা নিজেকে) ; সংস্তভ্য (বশীভূত করে) ; মহাবাহো (হে মহাবাহো !) ; কামরূপম্ (কামরূপ) ; দুরাসদম্, শত্রুম্ (দুর্জয় শত্রুকে) ; জহি (নাশ করো।)]

ইন্দ্রিয়গুলিকে (স্থূলশরীর অপেক্ষা) শ্রেষ্ঠ, সবল, প্রকাশ, ব্যাপক এবং সূক্ষ্ম বলা হয় ; ইন্দ্রিয়গুলি অপেক্ষা শ্রেয়তর হল মন, মনের থেকে শ্রেয়তর বুদ্ধি, বুদ্ধির থেকেও যা প্রবল তা হল কাম। এইভাবে বুদ্ধির চেয়েও পর অর্থাৎ কামকে জেনে নিজের দ্বারা নিজেকে (আত্মশক্তির দ্বারা) বশীভূত করে, হে মহাবাহো ! তুমি এই কামরূপ দুর্জয় শত্রুকে নাশ করো॥ ৪২-৪৩ ॥

ব্যাখ্যা—'ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুঃ'—শরীর বা বিষয়গুলির থেকে শ্রেয়তর হচ্ছে ইন্দ্রিয়সকল। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা বিষয়সমূহের জ্ঞান হয়, কিন্তু বিষয়াদির দ্বারা ইন্দ্রিয়াদির সম্পর্কে জ্ঞান হয় না। বিষয় ব্যতিরেকেও ইন্দ্রিয়গুলি থাকে কিন্তু ইন্দ্রিয়াদি ব্যতীত বিষয়ের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রকাশিত করার সামর্থ্য বিষয়ের থাকে না, বরং ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়গুলিকে প্রকাশ করে। ইন্দ্রিয়গুলি একই থাকে, কিন্তু বিষয় পরিবর্তিত হয়। ইন্দ্রিয়াদি হল ব্যাপক এবং বিষয় হচ্ছে ব্যাপ্য অর্থাৎ বিষয় ইন্দ্রিয়গুলির অন্তর্গত হয়ে থাকে কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়ের অন্তর্গত নয়। বিষয়ের থেকে ইন্দ্রিয়গুলি সূক্ষ্ম। তাই বিষয়গুলি অপেক্ষা ইন্দ্রিয়াদি শ্রেষ্ঠ, সবল, প্রকাশক, ব্যাপক এবং সূক্ষ্ম।

'ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ'—ইন্দ্রিয়গুলি মনকে জানতে পারে না, কিন্তু সমস্ত ইন্দ্রিয়ই মনের গোচর। ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে আবার প্রতিটি ইন্দ্রিয় তার নিজ নিজ বিষয়ে অবহিত, অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে নয় ; যেমন—কান শুধুমাত্র শব্দকেই অনুভব করতে পারে, কিন্তু গন্ধ, স্পর্শ, রূপ বা রসকে নয় ; ত্বক্ শুধুমাত্র স্পর্শকেই অনুভব করতে পারে, কিন্তু শব্দ, গন্ধ, রূপ বা রসকে নয় ; চক্ষু কেবলমাত্র রূপকেই চেনে কিন্তু শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ বা রসকে নয় ; তেমনি রসনা শুধু অনুভব করতে পারে রসকেই ; শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ বা রূপকে নয় ; নাসিকা শুধু গন্ধেরই আঘ্রাণ নিতে সক্ষম, শব্দ, স্পর্শ, রূপ বা রসের নয় ; একমাত্র মনই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং তার বিষয়গুলিকে জানতে সক্ষম। তাই মন হল ইন্দ্রিয়গুলির থেকে শ্রেষ্ঠ, সবল, প্রকাশক, ব্যাপক এবং সূক্ষ্ম।

'মনসস্তু পরা বুদ্ধিঃ'—মন বুদ্ধিকে জানে না, কিন্তু বুদ্ধি মনকে জানে। মন কেমন ? শান্ত, না ব্যাকুল ? ঠিক, না বেঠিক ? ইত্যাদি বিষয়গুলি বুদ্ধি জানে। ইন্দ্রিয়গুলি ঠিকমতো কাজ করছে কিনা—তাও বুদ্ধি জানে, অর্থাৎ বুদ্ধি মন এবং ইন্দ্রিয়গুলি এবং তার বিষয়গুলিকেও জানে। তাই ইন্দ্রিয়গুলির থেকে শ্রেয়তর যে মন, সেই মনের থেকেও বুদ্ধি শ্রেয়তর (শ্রেষ্ঠ, বলবান, প্রকাশক, ব্যাপক এবং সূক্ষ্ম)।

'যঃ বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ'—বুদ্ধির কর্তা হচ্ছে 'অহং', তাই বলা হয় 'আমার বুদ্ধি'। বুদ্ধি হচ্ছে করণ আর 'অহং' হল কর্তা। করণ পরতন্ত্র হয়, কিন্তু কর্তা হল স্বতন্ত্র। এই 'অহং'-এর জড় অংশেই থাকে 'কাম'। জড় অংশের সঙ্গে তাদাত্ম্য হওয়ায় এই 'কাম' স্বরূপে (চেতনে) প্রতীত হয়।

বাস্তবে 'কাম' 'অহং'-এ বাস করে। কারণ সে-ই ভোগের আকাঙ্ক্ষা করে এবং সুখ-দুঃখের ভোক্তা হয়। ভোক্তা, ভোগ এবং ভোগ্য—এই তিনটির মধ্যে স্বজাতীয়তা (একই শ্রেণীভুক্ত) থাকে। এতে স্বজাতীয়তা না থাকলে ভোক্তার ভোগ্যের প্রতি কামনা বা আকর্ষণ হতে পারে না। যিনি ভোক্তা-ভাবের প্রকাশক, যাঁর প্রকাশে ভোক্তা, ভোগ এবং ভোগ্য—এই তিনটিই সিদ্ধ হয়, সেই পরম প্রকাশে (শুদ্ধ চেতনে) 'কাম' থাকে না। 'অহং' পর্যন্ত সবই প্রকৃতির অংশ। সেই 'অহং'-এরও পরে সাক্ষাৎ পরমাত্মার অংশ 'স্বয়ং' বিরাজ করেন, যিনি শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি এবং অহং—এই সবের আশ্রয়, আধার, কারণ এবং প্রেরক। তিনি শ্রেষ্ঠ, বলবান, প্রকাশক, ব্যাপক এবং সূক্ষ্ম।

জড়ের (প্রকৃতির) অংশই সুখ-দুঃখরূপে পরিণত হয় অর্থাৎ এই সুখ-দুঃখরূপ বিকার জড়েই হয়ে থাকে। চেতনে কোনো বিকার নেই। চেতন হল বিকৃতির জ্ঞাতা ; কিন্তু জড়ের সঙ্গে তাদাত্ম্য হওয়ায় চেতনই সুখ ও দুঃখের ভোক্তা হয়ে থাকে অর্থাৎ তখন চেতনই সুখী বা দুঃখী হয়। শুধুমাত্র জড়ের সুখী বা দুঃখী হওয়া সম্ভব নয়। তাৎপর্য এই

যে 'অহং'-এর সঙ্গে যে জড় অংশ থাকে তার সঙ্গে তাদাত্ম্য করাতে চেতনও নিজেকে 'আমি ভোক্তা' বলে মেনে নেয়। পরমাত্মতত্ত্ব অনুভূত হলেই রসবুদ্ধি নিবৃত্ত হয়ে যায়—**'রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে'** (গীতা ২।৫৯)। এতে **'অস্য'** পদটি ভোক্তারূপ **'অহং'**-এর বাচক এবং ভোক্তা-ভাব থেকে নির্লিপ্ত যে তত্ত্ব, তা হল পরমাত্মার বাচক **'পরম'** পদ। সেই পরমাত্মার জ্ঞান হলে রস অর্থাৎ 'কাম' নিবৃত্ত হয়ে যায়। কারণ কামনা হয় সুখ পাবার জন্য এবং স্বরূপ হল সহজ সুখরাশি। তাই পরমাত্মতত্ত্বের অনুভব হলে 'কাম' (সংযোগজনিত সুখের আকাঙ্ক্ষা) সর্বতোভাবে দূর হয়।

মর্মকথা

স্থূলশরীর হল 'বিষয়' ; ইন্দ্রিয়গুলি 'বহিঃকরণ' এবং মন-বুদ্ধি হল 'অন্তঃকরণ'। স্থূলশরীরের উপরে হল ইন্দ্রিয়গুলি (শ্রেষ্ঠ, সবল, প্রকাশক, ব্যাপক এবং সূক্ষ্ম) এবং ইন্দ্রিয়গুলির উপরে হল বুদ্ধি। বুদ্ধির উপরে হল 'অহম্' অর্থাৎ কর্তা। 'কাম' অর্থাৎ জাগতিক আকাঙ্ক্ষা এই 'অহম্'-এ (কর্তা) থাকে।

নিজ সত্তা (স্ব-অস্তিত্ব) অর্থাৎ নিজ স্বরূপ চেতন, নির্বিকার এবং সৎ-চিৎ-আনন্দরূপ। এটি যখন জড়ের (প্রকৃতিজাত শরীরের) সঙ্গে তাদাত্ম্য করে নেয় তখন উৎপন্ন হয় 'অহম্' এবং স্বরূপ কর্তা হয়ে যায়। এইরূপ কর্তায় এক দিকে জড় অংশ থাকে এবং আর এক দিকে চেতন অংশ থাকে। জড় অংশের প্রাধান্য থাকে সংসারে এবং চেতন অংশের প্রাধান্যে পরমাত্মার দিকে আকর্ষণ হয়[১]। অর্থাৎ এর জড় অংশের প্রাধান্যে লৌকিক (জাগতিক) ইচ্ছা থাকে এবং চেতন অংশের প্রাধান্যে পারমার্থিক (পরমাত্ম-প্রাপ্তির) ইচ্ছা থাকে। জড় অংশ বিনাশশীল তাই লৌকিক আকাঙ্ক্ষাও বিনাশশীল এবং চেতন অংশ সদা স্থিতিশীল, সেইজন্য পারমার্থিক ইচ্ছার সার্বিক পূরণ সম্ভব। তাই লৌকিক ইচ্ছা (কামনা)-গুলির নিবৃত্তি এবং পারমার্থিক ইচ্ছা (সংসার থেকে মুক্তির ইচ্ছা, স্বরূপবোধের জিজ্ঞাসা এবং ভগবৎ প্রেমের অভিলাষ) পূরণ হয়। লৌকিক ইচ্ছাগুলি উৎপন্ন হলেও স্থায়ী হয় না কিন্তু পারমার্থিক ইচ্ছা দমিত হলেও দূর হয় না। কারণ লৌকিক ইচ্ছাগুলি অবাস্তবিক আর পারমার্থিক ইচ্ছা হল বাস্তবিক। সেইজন্য সাধকের যেমন লৌকিক ইচ্ছাগুলি পূর্ণ হবার আশা করা উচিত নয়, তেমনই পারমার্থিক ইচ্ছা পূরণ না হলে নিরাশ হওয়াও উচিত নয়।

প্রকৃতপক্ষে, ইচ্ছা মূলে একই, যা হল নিজ অংশী পরমাত্মাকে পাওয়ার। কিন্তু জড়ের সংস্পর্শে এসে এই ইচ্ছার দুটি ভাগ হয়ে যায় এবং মানুষ নিজের বাস্তবিক ইচ্ছার পূর্তি পরিবর্তনশীল জড়ের (জগতের) দ্বারা করার জন্য জড় পদার্থগুলি কামনা করতে থাকে, এটিই হচ্ছে তার ভুল। কারণ লৌকিক আকাঙ্ক্ষাগুলি হল 'পরধর্ম' এবং পারমার্থিক ইচ্ছা হল 'স্বধর্ম'। কিন্তু সাধকের মনে লৌকিক ও পারমার্থিক—দুইপ্রকার ইচ্ছা থাকায় দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলে সাধকের ভজন-ধ্যান-সৎসঙ্গ ইত্যাদির সময় পারমার্থিক ইচ্ছা জাগ্রত থাকে কিন্তু অন্য সময়ে সেই পারমার্থিক ইচ্ছা অবদমিত হয় এবং লৌকিক (ভোগ এবং সম্পদ সংগ্রহের) কামনা জাগ্রত হয়ে ওঠে। লৌকিক ইচ্ছাগুলি থাকা পর্যন্ত সাধকের সাধনে স্থির নিশ্চয়তা থাকা সম্ভব নয়। পারমার্থিক ইচ্ছা জাগ্রত না হলে সাধকের উন্নতি হয় না। সাধকের যখন একমাত্র পরমাত্মকে লাভ করার দৃঢ় উদ্দেশ্য হয় তখন এইসব দ্বন্দ্ব দূর হয় এবং একমাত্র পারমার্থিক ইচ্ছা প্রবল থাকায় সাধক সহজেই পরমাত্মকে লাভ করে (গীতা ৫।৩)। সেইজন্য লৌকিক এবং পারমার্থিক ইচ্ছার দ্বন্দ্ব দূর করা সাধকের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন।

শুদ্ধ স্বরূপে নিজের অংশী পরমাত্মার প্রতি স্বাভাবিকভাবে এক আকর্ষণ বা রুচি থাকে, যাকে 'প্রেম'

---

[১]জড়-চেতনের তাদাত্ম্য এবং আকর্ষণকে বোঝবার জন্য একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল। চতুষ্কোণ একটি লোহার অগ্নির সঙ্গে তাদাত্ম্য অর্থাৎ সম্বন্ধ হলে সেই লোহাটির দগ্ধ করার ক্ষমতা না থাকলেও সেটি দগ্ধকারক হয়ে ওঠে। আর অগ্নি চতুষ্কোণ বিশিষ্ট না হয়েও চতুষ্কোণ সমন্বিত হয়ে ওঠে। অগ্নির সঙ্গে তাদাত্ম্য হলেও চুম্বক দ্বারা লোহাই আকর্ষিত হয়, অগ্নি নয় কারণ চুম্বকের সঙ্গেই লোহার স্বজাতীয়ত্ব থাকে। অগ্নি নিজ স্বজাতীয় নিরাকার অগ্নিতত্ত্বের দিকেই আকর্ষিত হয় এবং তা ক্রমশঃই শান্ত হয়ে যায়। এইরূপ জড় এবং চেতনের তাদাত্ম্যে জড় অংশ জগতের দিকে এবং চেতন অংশ পরমাত্মার দিকে আকর্ষিত হয়। চেতন অংশ পরমাত্মার প্রতি আকৃষ্ট হলে জড় অংশ দূর হয় কারণ এটি অনিত্য। কিন্তু জড় অংশ জগতের প্রতি আকৃষ্ট হলেও চেতন অংশ দূর হয় না কারণ চেতন হল নিত্য।

বলা হয়। যখন সে জগৎ-সংসারের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নেয় তখন এই 'প্রেম' দমিত হয় এবং 'কাম' উৎপন্ন হয়ে যায়। যতক্ষণ 'কাম' বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণ 'প্রেম' জাগরিত হয় না। প্রেম জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত 'কাম' সম্পূর্ণভাবে বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। জড় অংশের প্রাধান্যে যার মধ্যে জাগতিক ভোগাদির আকাঙ্ক্ষা (কাম) থাকে, তার মধ্যেই চেতন অংশের প্রাধান্যে পরমাত্মা-লাভের ইচ্ছাও থাকে। সুতরাং বাস্তবে 'কাম'-এর নিবাস স্থূল জড় অংশেই হয়ে থাকে কিন্তু সেটিও চেতনের সম্বন্ধ থেকেই হয়। চেতনের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ হলেই 'কামের' নাশ হয়ে যায়। এর তাৎপর্য হল এই যে, চেতনের দ্বারা জড়ের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছেদ হলেই জড় ও চেতনের তাদাত্ম্যরূপ 'অহম্'-এর নাশ হয়ে যায় এবং 'অহম্' নাশ হলেই 'কাম'ও নষ্ট হয়ে যায়।

'অহম্'-এ যে জড় অংশ থাকে, 'কাম' তাতেই বাস করে—এর সপক্ষে প্রবল যুক্তি হল এই যে দৃশ্যরূপে পরিলক্ষিত যে জগৎ তাকে দর্শনকারী ইন্দ্রিয়াদি তথা বুদ্ধি এবং তাকে দর্শন করে যে ভোক্তা—এই তিনটির মধ্যে জাতীয় (ধাতুগত) ঐক্য না থাকলে ভোক্তার ভোগ্যের প্রতি আকর্ষণ হতেই পারে না। কারণ স্বজাতীয়ের মধ্যেই আকর্ষণ হয়ে থাকে, বিজাতীয়ে নয় ; যেমন—রূপের প্রতিই নেত্র আকর্ষণ বোধ করে, শব্দের প্রতি নয়। এই কথা সমস্ত ইন্দ্রিয় সম্পর্কে প্রযোজ্য। বুদ্ধিরও আকর্ষণ হয় বোঝার বিষয়ের (বিবেক-বিচারের) প্রতি, শব্দাদি বিষয়ের প্রতি নয় (যদি হয় তাহলে ইন্দ্রিয় সহযোগী হলেই হয়)। এরূপই স্বয়ং-এর (চেতনের) পরমাত্মার সঙ্গে তত্ত্বগত ঐক্য থাকে, সেইজন্য স্বয়ং-এর (চেতন) পরমাত্মার প্রতি আকর্ষণ থাকে। এই তাত্ত্বিক একতা জড়-অংশকে সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করলে অর্থাৎ জড়ের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করলে তবেই অনুভূত হয়। এটি অনুভূত হলেই 'প্রেম' জাগরিত হয়। প্রেমে জড়ত্বের (অসৎ-এর) লেশমাত্র অবশেষ থাকে না অর্থাৎ জড়ত্বের সম্পূর্ণ বিলোপ হয়ে যায়।

প্রকৃতির কার্য মহতত্ত্বের (সমষ্টি বুদ্ধির) অতি সূক্ষ্ম অংশ 'কারণশরীর'ই হল 'অহম্'-এর জড় অংশ। এই কারণশরীরেই থাকে 'কাম'। কারণশরীরের সঙ্গে তাদাত্ম্য বোধের জন্যই 'কাম' স্বয়ং-এ পরিলক্ষিত হয়। তাদাত্ম্য দূর হলে 'কাম'-এর লেশও থাকে না বলে নিজ শুদ্ধ স্বরূপের অনুভব হয়ে থাকে। স্বরূপ অনুভূত হলে 'কাম' সর্বতোভাবে নিবৃত্ত হয়।

'এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা'—প্রথমে শরীর থেকে শ্রেয়তর ইন্দ্রিয়াদি, ইন্দ্রিয়াদি থেকে শ্রেয়তর মন, মন থেকে শ্রেয়তর বুদ্ধি এবং বুদ্ধি থেকেও যা শ্রেয়তর তা 'কাম' বলে বলা হয়েছে। এখন উপরিউক্ত পদটিতে বুদ্ধি থেকে শ্রেয়তর 'কাম'কে জানতে বলার অভিপ্রায় হল এই যে এই 'কাম'-এর বসতি 'অহম্'-এ। বাস্তবিক স্বরূপে 'কাম' নেই। স্বরূপে যদি 'কাম' থাকত তবে এটি কখনো দূর হত না। বিনাশশীল জড়ের সঙ্গে তাদাত্ম্য করলেই 'কাম' উৎপন্ন হয়। তাদাত্ম্যতে 'কাম', বাস্তবে জড়ে থাকে কিন্তু পরিলক্ষিত হয় স্বরূপে, তাই বুদ্ধির থেকে শ্রেয়তর এই 'কাম'কে জেনে তার নাশ করা উচিত।

'সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা'—বুদ্ধির থেকে শ্রেয়তর 'অহম্'-এ স্থিত 'কাম'কে নাশ করার উপায় হল নিজের দ্বারা নিজেকে সংযত করা অর্থাৎ শুধু নিজ শুদ্ধ স্বরূপের সঙ্গে বা নিজ অংশী ভগবানের সঙ্গেই সম্পর্ক রাখা, যা হল ধ্রুব সত্য। ষষ্ঠ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে **'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্'** পদটির দ্বারা এবং ষষ্ঠ শ্লোকে **'যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ'** পদটির দ্বারাও এই কথাই বলা হয়েছে।

স্বরূপ (স্বয়ং) সাক্ষাৎ পরমাত্মার অংশ এবং শরীর ইন্দ্রিয়াদি মন-বুদ্ধি জগৎ-সংসারের অংশ। স্বরূপ যখন নিজ অংশী পরমাত্মা হতে বিমুখ হয়ে প্রকৃতিমুখী (জগৎ-সংসারগামী) হয় তখন তার মধ্যে কামনা উৎপন্ন হয়ে থাকে। কামনা অভাব থেকে উৎপন্ন হয় এবং অভাব হয় সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক থেকে ; কারণ জগৎ-সংসারই হচ্ছে অভাবরূপ—**'নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ'** (২।১৬)। সংসার থেকে সম্বন্ধ-ছেদ হলেই কামনাগুলির নাশ হয়ে যায় কারণ স্বরূপে কোনো অভাব নেই—**'নাভাবো বিদ্যতে সতঃ'** (গীতা ২।১৬)।

পরমাত্মা থেকে বিমুখ হয়ে জগতের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নিলেও জীবের (প্রয়োজনীয়তা বা ক্ষুধা) তার নিজ অংশী পরমাত্মাকে প্রাপ্তিলাভ করার প্রকৃত ইচ্ছা জেগে থাকে। 'আমি যেন চিরকাল বেঁচে থাকি ; আমি যেন সবকিছু জ্ঞাত হই ; আমি চিরসুখী হই'—এইরূপে আসলে সে সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ পরমাত্মাকেই আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় সে ভ্রমক্রমে

এই আকাঙ্ক্ষাগুলি জাগতিক পদার্থ দ্বারা পূর্ণ করতে চায়—একেই বলা হয় 'কাম'। এই কামনা কখনো পূরণ হতে পারে না। সেইজন্য এই কামকে নাশ করতে হয়।

যিনি জগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন, তিনিই তাকে ত্যাগ করতে পারেন। তাই ভগবান নির্দেশ দিয়েছেন যে, নিজেকেই জগৎ-সংসার হতে সম্পর্ক-ছেদ করে 'কাম'কে নাশ করতে হবে।

নিজেকে নিজে সংযত করতে কোনো অভ্যাস করতে হয় না, কারণ অভ্যাস জগতের (শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন ও বুদ্ধির) সাহায্যেই হয়। তাই অভ্যাসের জন্য জাগতিক সম্বন্ধের সাহায্য নিতে হয়। বাস্তবে নিজ স্বরূপে স্থিতি বা পরমাত্মার প্রাপ্তি জগতের সাহায্যে হয় না সেটি জগতের সঙ্গত্যাগ (সম্বন্ধ-ছেদ) দ্বারা আপনা থেকেই ঘটে যায়।

মর্মকথা

চেতন যখন জড়ের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নেয় তখন তার যেমন সাংসারিক (ভোগের) বাসনা জাগে তেমনি পরমাত্মাপ্রাপ্তির ইচ্ছাও থাকে। জড়ের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করায় জীবের ভুল এখানেই যে, সে সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ সেই পরমাত্মার প্রাপ্তির ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে জগতের পদার্থ দ্বারা পূর্ণ করার জন্য জাগতিক পদার্থসমূহ কামনা করতে থাকে। পরিণামে তার উভয় ইচ্ছাই (স্বরূপবোধ ব্যতিরেকে) দূর হয় না।

জগৎ-সংসারকে জানার জন্য তার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং পরমাত্মাকে জানার জন্য তাঁর সঙ্গে অভিন্ন হওয়া প্রয়োজন, কারণ বাস্তবে 'স্বয়ং'-এর সংসারের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা এবং পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্নতাই থাকে। কিন্তু জাগতিক আকাঙ্ক্ষা করলে 'স্বয়ং' জগতের সঙ্গে নিজ অভিন্নভাব বা সামীপ্য স্বীকার করে নেন, যা আসলে কখনো বাস্তবায়িত হয় না। পরমাত্মা লাভের আকাঙ্ক্ষা করলে 'স্বয়ং' পরমাত্মার থেকে নিজ পার্থক্য বা দূরত্ব মেনে নেয়, কিন্তু তারও কোনো বাস্তবিক সম্ভাব্যতা থাকে না। এটা ঠিক যে জাগতিক আকাঙ্ক্ষা মেটানোর জন্য পারমার্থিক ইচ্ছা খুবই উপযোগী। পারমার্থিক ইচ্ছা যদি তীব্র হয় তাহলে লৌকিক আকাঙ্ক্ষাগুলি স্বাভাবিকভাবে দূর হয়। লৌকিক আকাঙ্ক্ষা সর্বতোভাবে দূর হলে পারমার্থিক ইচ্ছা পূরণ হয় অর্থাৎ নিত্যপ্রাপ্ত পরমাত্মা অনুভূত হন[১]। কারণ পরমাত্মা সদা সর্বত্র বিদ্যমান, কিন্তু লৌকিক আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান থাকলে সেটি অনুভব করা যায় না।

'জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্'— **'মহাবাহো'**র অর্থ হল সবল বাহু সমন্বিত শূরবীর। অর্জুনকে **'মহাবাহো'** অর্থাৎ শূরবীর বলে ভগবান জানাতে চাইছেন যে, 'তুমি এই কাম রূপ শত্রুকে দমন করতে সক্ষম।'

জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে 'কাম' দূর করা অত্যন্ত কঠিন। এই কাম অনেক বড় বড় গণ্যমান্য ব্যক্তিরও বিবেক আবৃত করে তাঁদের কর্তব্যচ্যুত করে দেয়, তাতে তাঁদের পতন ঘটে। সেইজন্য ভগবান কামকে দুর্জয় শত্রু বলেছেন।

'কাম'কে দুর্জয় শত্রু বলার অর্থ হল এর থেকে সাবধান থাকতে হয়, দুর্জয় ভেবে নিরাশ হওয়ার জন্য নয়।

যে কোনো কামনার উৎপত্তি, পূর্তি, অপূর্তি এবং নিবৃত্তি হয়ে থাকে। এইজন্য সমস্ত কামনাই উৎপন্ন হয় এবং বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু 'স্বয়ং' চিরস্থায়ী এবং এই কামনাগুলির উৎপত্তি ও বিনাশ সম্বন্ধে সে জ্ঞাত। সুতরাং সে সহজেই কামনাগুলির থেকে সম্পর্ক-ছেদ করতে পারে কেননা বাস্তবে তো এই সম্পর্ক নেই-ই। তাই সাধকদের কামনাগুলির থেকে ভয় পাওয়া উচিত নয়। সাধকদের যদি নিজ কল্যাণের দৃঢ় উদ্দেশ্য জাগে[২] তবে তাঁরা সহজেই কামকে জয় করতে পারেন।

কামনা পরিত্যাগ করায় অথবা পরমাত্মার প্রাপ্তি লাভে সকলেই স্বাধীন, অধিকারী, যোগ্য এবং সক্ষম। কিন্তু কামনা পূরণে কেউই স্বাধীন, অধিকারী, যোগ্য বা সক্ষম

---

[১]যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ। অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥

(কঠোপনিষদ্ ২।৩।১৪ ; বৃহদারণ্যক উপনিষদ্. ৪।৪।৭)

'সাধকের হৃদিস্থিত (হৃদয়ে অবস্থিত) কামনা যখন সমূলে নষ্ট হয়ে যায় তখন মরণশীল মানুষ অমরত্ব লাভ করে এবং এইটি হল (মনুষ্য- দেহেই) ব্রহ্মকে সম্যক্ অনুভব করা।'

বিমুঞ্চতি যদা কামান্ মানবো মনসি স্থিতান্। তর্হ্যেব পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবত্ত্বায় কল্পতে॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ৭।১০।৯)

'কমলনয়ন ! মানুষ যখন তার সমস্ত মনস্কামনা পরিত্যাগ করে তখনই সে ভগবৎস্বরূপকে প্রাপ্ত করে।'

[২]উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সর্বদাই অবিনাশীর (চেতনতত্ত্ব বা পরমাত্মার) হয়ে থাকে, বিনাশশীলের (জগৎসংসারের) নয়।

নয়। কারণ কামনা পূর্ণ হবারই নয়। পরমাত্মা এই মনুষ্য-দেহ দিয়েছেন তাঁকে লাভ করারই জন্য। তাই কামনা পরিত্যাগ করা কঠিন ব্যাপার নয়। জাগতিক ভোগ্য বস্তুগুলিকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্যই কামনা পরিত্যাগ করা শক্ত বলে মনে হয়।

সুখের (অনুকূলতার) কামনা দূর করার জন্যই ভগবান কখনো কখনো দুঃখ (প্রতিকূলতা) প্রদান করে জানিয়ে দেন, 'সুখের আশা কোরো না, আশা করলেই দুঃখ পেতে হবে।' জাগতিক পদার্থ কামনাকারী মানুষ কখনো দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ পায় না—এই হল নিয়ম। কারণ সংযোগজনিত ভোগই দুঃখের হেতু হয়ে থাকে (গীতা ৫।২২)।

স্বয়ং-এর (স্বরূপের) অনন্ত বল। তাঁর সত্তা এবং বল অবলম্বন করেই বুদ্ধি, মন এবং ইন্দ্রিয়াদি সত্তাবান এবং বলবান হয়ে থাকে। কিন্তু জড়ের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে সে এই শক্তির কথা বিস্মৃত হয় এবং নিজেকে বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়ের অধীন বলে মনে করে। সুতরাং 'কাম'-রূপ শত্রুকে বিনাশ করার জন্য সাধকের নিজেকে জানা এবং নিজ শক্তির উপর আস্থা থাকা খুবই প্রয়োজন।

'কাম' জড়ের সম্বন্ধ থেকে এবং জড়েই হয়ে থাকে। তাদাত্ম্যের ফলে সেটি স্বয়ং-এর বলে প্রতীত হয়। জড়ের সঙ্গে সম্পর্কীভূত না হলে 'কাম' থাকে না। তাই এইস্থলে 'কাম' নাশ করার অর্থ প্রকৃতপক্ষে 'কাম'-এর সর্বথা অভাবের কথাই বলা হয়েছে। এর পরিবর্তে 'কাম' অর্থাৎ কামনার অস্তিত্ব মেনে তাকে যদি মেটাবার চেষ্টা করা হয় তাহলে সেটি মেটানো কঠিন। কারণ বাস্তবে কামনার কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই-ই। কামনা উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন হয় যে বস্তু তা বিনাশ প্রাপ্ত হবেই—এই হল নিয়ম। নতুন কামনা না করলে আগের কামনাটি স্বতঃই নষ্ট হয়ে যায়। এইজন্যই কামনা মেটাবার অর্থ হল—নতুন কোনো কামনা না করা।

শরীর ইত্যাদি জাগতিক বস্তুগুলিকে 'আমি', 'আমার' এবং 'আমার জন্য' বলে মনে করলেই নিজের মধ্যে অভাব অনুভূত হয়। কিন্তু মানুষ ভুলবশতঃ সেই অভাব সাংসারিক পদার্থ দ্বারা পূরণ করতে চায়। সেইজন্য সে ওইসব বস্তু কামনা করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আজ পর্যন্ত জাগতিক পদার্থ দ্বারা কারোরই অভাবের (নিবৃত্তি বা) পূর্তি হয়নি, হবে না এবং হওয়া সম্ভবও নয়। কারণ স্বয়ং হচ্ছে অবিনাশী এবং পদার্থ হল বিনাশশীল। স্বয়ং অবিনাশী হয়েও বিনাশশীল পদার্থের কামনা করায় কোনো লাভ হয় না এবং ক্ষতির কিছু বাকি থাকে না। সেইজন্য ভগবান কামনাকে শত্রুরূপে জানিয়ে তাকে বিনাশ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

কর্মযোগের দ্বারা অতি সহজেই এই কামনা নাশ হয়। কারণ কর্মযোগী সাধক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বা অতিবৃহৎ প্রতিটি জাগতিক ক্রিয়াই পরমাত্মপ্রাপ্তির উদ্দেশ্য নিয়ে অন্যের হিতার্থে করে থাকেন, কামনা পূরণের উদ্দেশ্যে নয়। তিনি প্রত্যেক ক্রিয়াই নিষ্কামভাবে এবং অপরের হিত ও সুখের জন্য করে থাকেন, নিজের জন্য কখনো কিছু করেন না। সময়, বুদ্ধি, সামগ্রী এবং শক্তি যা কিছু তাঁর থাকে, তার কিছুই তাঁর নয়, বস্তুত এগুলি তাঁর প্রাপ্তি হয়েছে এবং পরিত্যাগও হয়ে যাবে। সেইজন্য তিনি সেগুলি কখনো নিজের বলে মনে করেন না বরং জগতের বলে মনে করে নিঃস্বার্থভাবে জগতের সেবায় ব্যয় করেন। নিজের জন্য রাখেন না এবং নিজের মনে করেন না বলেই তিনি তা সম্পূর্ণভাবে সেবায় লাগাতে পারেন, অন্যথায় নয়।

কর্মযোগী নিজের জন্য কিছু করেন না, কিছু চান না এবং কোনো কিছুই নিজের বলে মানেন না। তাই তাঁর কামনাগুলি সহজেই নাশ হয়। কামনা সর্বতোভাবে নাশ হলে তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় এবং তিনি নিজের মধ্যে স্বরূপ দর্শন করে কৃত-কৃত্য, জ্ঞাত-জ্ঞাতব্য এবং প্রাপ্ত-প্রাপ্তব্য হয়ে যান। অর্থাৎ তাঁর আর কোনো কিছু করার, জানার বা পাওয়ার বাকি থাকে না।

পরিশিষ্ট-ভাব—ভগবান ইন্দ্রিয়াদি, মন ও বুদ্ধির কথা বললেও 'অহং'-এর কথা বলেননি। অহং বুদ্ধির অতীত। সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকেও ভগবান বুদ্ধির পর অহং-এর কথা বলেছেন— '**ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো-বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে....**'। তাই এখানেও 'সঃ' পদটির দ্বারা অহং-এ স্থিত 'কাম'কেই ধরতে হবে।

বিনাশশীলের কামনা হয়, উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য তাই হয় যা মানুষ নিরন্তর কামনা করে। তার শরীর যদি ছিন্ন-বিচ্ছিন্নও করা হয় তবুও তার উদ্দেশ্য একই থাকে। উদ্দেশ্যের সিদ্ধিলাভ অবশ্যই হয়। কিন্তু কামনার সিদ্ধিলাভ হয় না বরং সেটি নাশ হয়। উদ্দেশ্য সর্বদা একভাবে বিরাজমান কিন্তু কামনা পরিবর্তনশীল।

যতক্ষণ স্ব-স্বরূপের অনুভূতি না হয়, ততক্ষণ অহং-এ কাম থাকে। স্ব-স্বরূপের সাক্ষাৎ হলে অহং-এ আর কাম থাকে না— **'পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে'** (গীতা ২।৫৯)। সুখ থাকে স্বরূপে, কিন্তু কামের জন্য মানুষ জড়কে গুরুত্ব ও অস্তিত্ব প্রদান করে, তার থেকে সুখ আশা করে। জড়ত্বের সঙ্গে যতক্ষণ সম্পর্ক থাকে, ততক্ষণ 'কাম' থাকে। জড়ত্বের সঙ্গে সম্পর্ক-ছিন্ন হলে 'প্রেম' জাগ্রত হয়।

'কাম' নিজের মধ্যে থাকে—**'রসোঽপ্যস্য'** (গীতা ২।৫৯)। নিজের মধ্যে থাকার জন্যই কাম আমাদের বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। কাম যদি আমাদের মধ্যে না থেকে অন্য কিছুর (ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির) মধ্যে থাকত, তাহলে আমাদের কিসের বাধা! নিজের মধ্যে কাম হলেই স্বয়ং সুখী বা দুঃখী হয়, কর্তা-ভোক্তা হয়। প্রকৃতপক্ষে কাম নিজের মধ্যে নেই, একে শুধু মেনে নেওয়া হয়, তাই এটি দূর হয়। অতএব কাম নিজের মধ্যে থাকলেও, সেটি মেনে নেওয়াই হয়েছে, বাস্তবে তা নেই।

অহং-এ যা থাকে সেসব জিনিস মানুষ নিজের বলে মেনে নেয়। যে অহংকে নিজের বলে মেনে নেওয়া হয় সেই অহং-এই কাম থাকে। সুতরাং যতক্ষণ অহং থাকে, ততক্ষণ অহং-এর জাতির আকর্ষণ অর্থাৎ 'কাম'ও থাকে আর যখন অহং থাকে না, তখন স্বয়ং-এর জাতির আকর্ষণ অর্থাৎ 'প্রেম' প্রকাশিত হয়। 'কাম'-এ জগৎ-সংসারের দিকে এবং 'প্রেম'-এ পরমাত্মার দিকে আকর্ষণ হয়।

সমস্ত ত্রিলোক, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড হল 'বিষয়'। বিষয় ইন্দ্রিয়াদির এক অংশে থাকে, ইন্দ্রিয়াদি মনের অন্য এক অংশে থাকে, মন বুদ্ধির এক অংশে থাকে, বুদ্ধি অহং-এর এক অংশে থাকে এবং অহং চেতনের (স্ব-স্বরূপের) এক অংশে থাকে। সুতরাং চেতন অত্যন্ত মহান, যার মধ্যে সম্পূর্ণ ত্রিলোক, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান। কিন্তু অপরা প্রকৃতির এক অংশ অহং-এর সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করে মানুষ নিজেকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র (একদেশীয়, পরিচ্ছিন্ন) বলে মনে করে!

***

ওঁ তৎসৎইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে কর্মযোগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায় ॥ ৩ ॥

এইপ্রকার ওঁ, তৎ, সৎ—এই ভগবৎ নাম উচ্চারণপূর্বক ব্রহ্মবিদ্যা এবং যোগশাস্ত্রময় শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতোপনিষদ্‌রূপ শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে 'কর্মযোগ' নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

এই তৃতীয় অধ্যায়টির নাম 'কর্মযোগ'। কারণ এই তৃতীয় অধ্যায়ে কর্মযোগের যে বিশদ বর্ণনা আছে গীতার অন্য কোনো অধ্যায়ে তা নেই।

তৃতীয় অধ্যায়ের পদ, অক্ষর এবং উবাচ

(১) এই অধ্যায়ে **'অথ তৃতীয়োঽধ্যায়'**-এর তিন, **'অর্জুন উবাচ'** ইত্যাদি পদের আট, শ্লোকগুলির পাঁচশত বিয়াল্লিশ এবং পুষ্পিকার তেরোটি পদ আছে। এইভাবে সমস্ত পদগুলির যোগফল হল পাঁচশত ছেষট্টি।

(২) এই অধ্যায়ে **'অথ তৃতীয়োঽধ্যায়'**-এর সাত, **'অর্জুন উবাচ'** ইত্যাদি পদের ছাব্বিশ, শ্লোকগুলির এক হাজার তিনশত ছিয়াত্তর এবং পুষ্পিকার পঁয়তাল্লিশটি অক্ষর আছে। এতে সমস্ত অক্ষরের যোগসংখ্যা এক হাজার চারশত চুয়ান্ন। এই অধ্যায়ের সমস্ত শ্লোক বত্রিশ অক্ষর সমন্বিত।

(৩) এই অধ্যায়ে চারটি উবাচ আছে—দুটি **'অর্জুন উবাচ'** এবং দুটি **'শ্রীভগবানুবাচ'**।

তৃতীয় অধ্যায়ে প্রযুক্ত ছন্দ

এই অধ্যায়ের তেতাল্লিশটি শ্লোকের মধ্যে প্রথম এবং সাঁইত্রিশতম শ্লোকের প্রথম চরণে এবং একাদশ শ্লোকের তৃতীয় চরণে **'রগণ'** যুক্ত হওয়ায় **'র-বিপুলা'**; পঞ্চম শ্লোকের প্রথম চরণে **'নগণ'** যুক্ত হওয়ায় **'ন-বিপুলা'**, উনিশ, ছাব্বিশ এবং পঁয়ত্রিশতম শ্লোকের প্রথম চরণে ও অষ্টম, একুশতম শ্লোকের তৃতীয় চরণে **'ভগণ'** প্রযুক্ত হওয়ায় **'ভ-বিপুলা'**; এবং সপ্তম শ্লোকের প্রথম চরণে **'নগণ'** এবং তৃতীয় চরণে **'রগণ'** যুক্ত হওয়ায় **'সংকীর্ণ-বিপুলা'** সংজ্ঞাযুক্ত ছন্দ হয়েছে। বাকি তেত্রিশটি শ্লোক ঠিক **'পথ্যাবক্ত্র'** অনুষ্টুপ ছন্দের লক্ষণ যুক্ত।

***

ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ

অথ চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

চতুর্থ অধ্যায়

অবতরণিকা

শ্রীভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ের উনচল্লিশতম শ্লোকে অর্জুনকে বলেছিলেন, 'জ্ঞানযোগে নিজ বিবেক-বিচার অনুযায়ী চললে যে সমবুদ্ধি প্রাপ্তি হয়, সেটিই তুমি কর্মযোগ প্রসঙ্গে শোনো অর্থাৎ কর্মযোগে নিষ্কামভাব সহকারে পরহিতার্থে কর্তব্য-কর্ম করলে এই সমবুদ্ধি কীরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাই শোনো'— ***'এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।'*** *অতঃপর কর্মযোগের বর্ণনাকালে প্রসঙ্গানুসারে অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ জানিয়ে বর্ণনার সমাপ্তি করেছেন।*

তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে অর্জুন প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনার মতে যখন বুদ্ধিকেই শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করা হয়েছে, তাহলে আপনি আমাকে এই নিষ্ঠুর কর্মে (যুদ্ধে) কেন নিয়োজিত করছেন ?' ভগবান এর উত্তরে চতুর্থ থেকে উনিশতম শ্লোক পর্যন্ত নানাভাবে কর্তব্য-কর্ম করার প্রয়োজনীয়তা দেখিয়ে প্রমাণ করলেন যে, কর্তব্য-কর্ম করলেই যোগস্থ (সমবুদ্ধি) হওয়া যায়। এরপর ত্রিশতম শ্লোকে ভগবৎনিষ্ঠা অনুযায়ী কর্তব্য-কর্ম সম্পাদনের তিনি বিশেষ বিধি জানিয়েছেন, 'বিবেকপূর্বক সমস্ত কর্ম আমাকে অর্পণ করে এবং নিষ্কাম, নির্মম ও নিঃসন্তাপ হয়ে শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য-কর্ম করা উচিত।' কর্তব্য-কর্ম করার এই বিধিকে 'নিজমত' জানিয়ে ভগবান একত্রিশ-বত্রিশতম শ্লোকদুটিতে অন্বয় এবং ব্যতিরেক বিধি দ্বারা নিজের মত সুদৃঢ় করেছেন এবং পঁয়ত্রিশতম শ্লোকে এই বিধি পালনে বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন যে, নিজ কর্তব্য পালনের প্রয়োজনে মৃত্যুও শ্রেয়স্কর— ***'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ'।*** *তারপর অর্জুন ছত্রিশতম শ্লোকে প্রশ্ন করেন, 'মানুষ না চাইলেও কার দ্বারা নিয়োজিত হয়ে পাপ (অকর্তব্য) করে ?' তার উত্তরে ভগবান 'কাম' অর্থাৎ কামনাকেই সমস্ত পাপ ও অনর্থের হেতু জানিয়ে পরে এই কামরূপী শত্রুকে বধ করার নির্দেশ দিয়েছেন।*

যদিও তৃতীয় অধ্যায়ের সাঁইত্রিশতম শ্লোক থেকে ভগবান নিরবচ্ছিন্নভাবে উপদেশ দিয়ে চলেছেন, তবুও তেতাল্লিশতম শ্লোকে অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শেষ হলে মহর্ষি বেদব্যাস তৃতীয় অধ্যায়ের সমাপ্তি করেছেন এবং নতুন একটি অধ্যায় (চতুর্থ) শুরু করেছেন। এতে মনে হয় যে অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়ে গেলে ভগবান কিছুক্ষণ থেমেছিলেন। অতঃপর দ্বিতীয় অধ্যায়ের সাতচল্লিশ-আটচল্লিশতম শ্লোকে কর্মযোগের যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছিল, সেটিই চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে ***'ইমম্'*** *পদের দ্বারা পুনরায় আরম্ভ করেছেন। সুতরাং চতুর্থ অধ্যায়টিকে তৃতীয় অধ্যায়ের পরিশিষ্ট বলে মনে করা হয়।*

কর্মযোগে দুটি বিষয় মুখ্য—(১) কর্তব্য-কর্মের আচরণ এবং (২) কর্তব্য-কর্ম বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান। অর্জুন কর্মকে বাহ্যতঃ ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন, তাই তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে ভগবানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে কেন ভগবান তাঁকে এই নিষ্ঠুর কর্মে প্রবৃত্ত করাচ্ছেন ? অতএব তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান নানাভাবে কর্তব্য-কর্মের আচরণাদির প্রয়োজনীয়তার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন এবং তার সঙ্গে কর্মযোগকে বোঝার জন্য তাত্ত্বিক ব্যাপার নিয়েও আলোচনা করেছেন, কিন্তু এই (চতুর্থ) অধ্যায়ে কর্মযোগের তাত্ত্বিক দিকটি বোঝার ওপর বিশেষভাবে জোর দিয়ে কর্তব্য-কর্ম পালন করা আবশ্যক বলে জানিয়েছেন। এর তাৎপর্য হল এই যে, তৃতীয় এবং চতুর্থ—দুটি অধ্যায়েই

*উপরিউক্ত দুটি বিষয়ে বলা হয়েছে ; কিন্তু তৃতীয় অধ্যায়ে প্রাধান্য পেয়েছে কর্তব্য-কর্মের আচরণের বিষয়টি এবং চতুর্থ অধ্যায়ের প্রধান বিষয় হল কর্তব্য-কর্মের বিষয়ে জ্ঞানের কথা—**'তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ'** (৪।১৬)।*

অনাদি হওয়া সত্ত্বেও যে কর্মযোগ ভূমণ্ডলে বিশেষভাবে অনুভবকারী মহাপুরুষের অভাবে অনেকদিন ধরে লুপ্তপ্রায় হয়েছিল, তারই বর্ণনা পুনর্বার আরম্ভ করতে গিয়ে ভগবান প্রথম তিনটি শ্লোকে কর্মযোগের ঐতিহ্য (পরম্পরা) জানিয়ে তার অনাদিত্ব প্রমাণিত করছেন।

শ্রীভগবানুবাচ

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ॥ ১ ॥

[**অহম্** (আমি) ; **ইমম্, অব্যয়ম্** (এই অবিনাশী) ; **যোগম্** (যোগ) ; **বিবস্বতে** (সূর্যকে) ; **প্রোক্তবান্** (বলেছিলাম) ; **বিবস্বান্, মনবে** (সূর্য মনুকে) ; **প্রাহ** (বলেছিলেন) ; **মনুঃ** (মনু) ; **ইক্ষ্বাকবে** (রাজা ইক্ষ্বাকুকে) ; **অব্রবীৎ** (বলেছিলেন।)]

শ্রীভগবান বললেন—আমি এই অবিনাশী যোগ সূর্যকে বলেছিলাম, সূর্য (তাঁর পুত্র) মনুকে এবং মনু (তাঁর পুত্র) ইক্ষ্বাকুকে বলেছিলেন ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা—'ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্' —ভগবান যে সূর্য, মনু এবং ইক্ষ্বাকু রাজাদের কথা বলেছেন, এঁরা সকলেই গৃহস্থ ছিলেন এবং গৃহস্থাশ্রমে থেকেই কর্মযোগ সহযোগে পরমসিদ্ধি লাভ করেছিলেন ; সুতরাং এই **'ইমম্'**, **'অব্যয়ম্'**, **'যোগম্'** পদের অর্থ পূর্ব প্রকরণ অনুযায়ী তথা রাজপরম্পরা অনুযায়ী 'কর্মযোগ' বলে গ্রহণ করাই উচিত মনে হয়।

যদিও পুরাণাদিতে এবং উপনিষদেও কর্মযোগের বর্ণনা আছে, কিন্তু সেগুলি গীতায় বর্ণিত কর্মযোগের মতো পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং বিস্তৃত নয়। গীতায় ভগবান নানা যুক্তি দ্বারা কর্মযোগের সরল ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন। কর্মযোগের এত বিশদ বর্ণনা পুরাণ ও উপনিষদে দেখা যায় না।

ভগবান নিত্য এবং তাঁর অংশ জীবাত্মা নিত্য তথা ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধও নিত্য। অতএব ভগবৎ প্রাপ্তির সমস্ত পথ (যোগপথ, জ্ঞানপথ, ভক্তিপথও নিত্য)[১] এখানে **'অব্যয়ম্'** পদের দ্বারা ভগবান কর্মযোগের নিত্যতার উল্লেখ করেছেন।

পরমাত্মার সঙ্গে জীবের স্বতঃসিদ্ধ সম্বন্ধ (নিত্যযোগ) থাকে। যেমন, পতিব্রতা স্ত্রীকে নিজেকে পতির হওয়ার জন্য কিছু করতে হয় না, কারণ সে তো পতিরই, তেমনি সাধককেও পরমাত্মার হওয়ার জন্য কিছু করতে হয় না, কারণ তিনি তো পরমাত্মারই। কিন্তু যখন তিনি অনিত্য ক্রিয়া, পদার্থ, ঘটনা ইত্যাদির সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করেন, তখন তাঁর 'নিত্যযোগ' অর্থাৎ পরমাত্মার সঙ্গে নিজের নিত্য সম্বন্ধ অনুভব হয় না। সুতরাং সেই অনিত্যের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক দূর করার জন্য কর্মযোগী শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি প্রাপ্ত সমস্ত বস্তুগুলিকে জগতের মনে করে জগতেরই সেবায় নিয়োজিত করেন। তিনি মনে করেন যে, যেমন ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র ধূলিকণাও এই বিশাল পৃথিবীর অংশবিশেষ তেমনি এই শরীরও বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের অংশবিশেষ। এরূপ মনে করলে 'কর্ম' সংসারের জন্য এবং 'যোগ' (নিত্যযোগ) নিজের জন্য হয় অর্থাৎ নিত্যযোগ অনুভব হয়ে থাকে।

ভগবান **'বিবস্বতে প্রোক্তবান্'** পদটির দ্বারা সাধককে বোঝাতে চেয়েছেন যে, সূর্য যেমন সর্বদা পরিক্রমণ রত রয়েছেন অর্থাৎ কর্ম করে চলেছেন এবং সবকিছু প্রকাশিত করছেন কিন্তু স্বয়ং নির্লিপ্ত রয়েছেন, তেমনি সাধকদেরও প্রাপ্ত পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজ কর্তব্য পালন করা উচিত

[১]গীতার অষ্টম অধ্যায়ে ভগবান শুক্ল এবং কৃষ্ণ—এই দুটি গতিকেও নিত্য বলে জানিয়েছেন—**'শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে'** (গীতা ৮।২৬)।

(গীতা ৩।১৯) এবং অন্যদেরও কর্মযোগের শিক্ষা দিয়ে লোকসংগ্রহ করা উচিত, কিন্তু নিজেকে এসবে নির্লিপ্ত (নিষ্কাম, নির্মম এবং নিরাসক্ত) রাখা উচিত।

সৃষ্টির মধ্যে আদি সৃষ্টি হল সূর্য। সৃষ্টি রচনাকালেও সূর্য পূর্বকল্পে যেমন ছিলেন তেমনভাবেই প্রকটিত হয়েছেন— **'সূর্যাচন্দ্রমসৌধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ।'** ওই (সকলের আদি) সূর্যকে ভগবান অবিনাশী কর্মযোগের উপদেশ দিয়েছিলেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ভগবান সকলেরই আদি গুরু এবং কর্মযোগও অনাদি। তাই ভগবান অর্জুনকে যেন বললেন, 'যে কর্মযোগের কথা আমি তোমাকে জানাচ্ছি সেটি আজকের কোনো নতুন বিষয় নয়। যে যোগ সৃষ্টির আদি থেকে অর্থাৎ চিরকাল ধরে রয়েছে, সেই যোগের কথাই আমি তোমাকে জানাচ্ছি।'

প্রশ্ন—ভগবান সৃষ্টির আদিকালে সূর্যকে কেন কর্মযোগের উপদেশ দিয়েছিলেন ?

উত্তর—(১) সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবান সূর্যকেই কর্মযোগের প্রকৃত অধিকারী মনে করে তাঁকেই সর্বপ্রথম এই যোগ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছিলেন।

(২) সৃষ্টিতে যা প্রথম উৎপন্ন হয়, তাকেই উপদেশ দেওয়া হয়, যেমন ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রজাগণকে উপদেশ দিয়েছিলেন (গীতা ৩।১০)। উপদেশ প্রদানের অর্থ হল— কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত করা। সৃষ্টির প্রথমে সূর্যের উৎপত্তি হয়েছিল, পরে সূর্যের থেকে সমস্ত চরাচর উৎপন্ন হয়। সকলের সৃষ্টির যিনি কর্তা[১] সেই সূর্যকে সর্বপ্রথম উপদেশ দেওয়ার অভিপ্রায় হল, তাঁর থেকে উৎপন্ন সমস্ত সৃষ্টির কাছে পরম্পরা ক্রমে কর্মযোগকে সহজসাধ্য করা।

(৩) সূর্য হচ্ছেন জগতের চক্ষু। তাঁর দ্বারাই সকলের জ্ঞান প্রাপ্ত হয় ও তাঁর উদয়ের সঙ্গেই প্রায় সমস্ত প্রাণী জেগে উঠে নিজ নিজ কর্মে ব্যাপৃত হয়। সূর্যের দ্বারাই মানুষের মধ্যে কর্তব্যপরায়ণতার ভাব আসে। তাই সূর্যকে সমস্ত জগতের আত্মা বলা হয়—**'সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ'**[২]।

সুতরাং সূর্য যে উপদেশ প্রাপ্ত হবেন, সমস্ত প্রাণী স্বতঃই তা প্রাপ্ত হবে। তাই ভগবান প্রথমে সূর্যকে উপদেশ দিয়েছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে নারায়ণরূপে উপদেশ প্রদান এবং সূর্যরূপে উপদেশ গ্রহণ জগৎনাট্যসূত্রধার ভগবানের এক অপরূপ লীলা বলেই মনে করা ঠিক—যা জগতের হিতের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। অর্জুন যেমন মহাজ্ঞানী নর-ঋষির অবতার ছিলেন, তথাপি লোকসংগ্রহার্থে তাঁরও উপদেশ গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা ছিল, ঠিক তেমনই ভগবান স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ সূর্যকে উপদেশ প্রদান করেছিলেন, যার ফলে জগতের মহান উপকার সাধন হয়েছিল, হয়ে চলেছে এবং হতে থাকবে।

'বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ'—গৃহস্থের নিজস্ব বিদ্যা হল কর্মযোগ। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস—এই চারটি আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রম হল প্রধান। কারণ গৃহস্থাশ্রম থেকে অন্য আশ্রম সৃষ্টি ও পোষণ হয়।

---

[১]শাস্ত্রে সূর্যকে 'সবিতা' বলা হয়েছে, এর অর্থ হল—উৎপন্নকারী। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানও সূর্যকে সমস্ত সৃষ্টির কারণ বলে মনে করেন।

[২]মহাভারতে সূর্যকে বলা হয়েছে—

ত্বং ভানো জগতশ্চক্ষুস্ত্বমাত্মা সর্বদেহিনাম্। ত্বং যোনিঃ সর্বভূতানাং ত্বমাচারঃ ক্রিয়াবতাম্॥
ত্বং গতিঃ সর্ব সাংখ্যানাং যোগিনাং ত্বং পরায়ণম্। অনাবৃতার্গলদ্বারং ত্বং গতিস্ত্বং মুমুক্ষতাম্॥
ত্বয়া সংধার্যতে লোকস্ত্বয়া লোকঃ প্রকাশ্যতে। ত্বয়া পবিত্রীক্রিয়তে নির্ব্যাজং পাল্যতে ত্বয়া॥

(মহাভারত, বনপর্ব ৩।৩৬-৩৮)

'সূর্যদেব ! আপনি সমস্ত জগতের চক্ষু এবং সকল প্রাণীর আত্মা। আপনিই সকল জীবের উৎপত্তিস্থল এবং কর্মানুষ্ঠানে নিয়োজিত পুরুষদের সদাচার (এর প্রেরক)।'

'সকল সাংখ্যযোগীর প্রাপ্তব্য স্থানও আপনি, আপনিই সকল কর্মযোগীর আশ্রয়, আপনি মোক্ষের উন্মুক্ত দ্বার এবং আপনিই মুমুক্ষুদের একমাত্র গতি।'

'আপনি সমস্ত জগতকে ধারণ করে আছেন, আপনার দ্বারা এই চরাচর প্রকাশিত হয়েছে। আপনি এগুলিকে পবিত্র করেছেন এবং আপনার দ্বারাই নিঃস্বার্থভাবে এগুলি প্রতিপালিত হয়ে থাকে।'

মানুষ গৃহস্থাশ্রমে থেকে নিজ কর্তব্য পালন করে সহজেই পরমাত্মপ্রাপ্তি করতে পারে। পরমাত্মপ্রাপ্তির জন্য তার আশ্রম পরিবর্তন করার কোনো প্রয়োজন হয় না। সূর্য, মনু, ইক্ষ্বাকু প্রমুখ রাজাদের উল্লেখ করে ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, কল্পের আদিতে গৃহস্থেরাই কর্মযোগের বিদ্যা জেনেছিল এবং গৃহস্থাশ্রমে থেকেই কামনা নাশ করে তারা পরমাত্মতত্ত্ব লাভ করেছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনও গৃহস্থ ছিলেন। তাই ভগবান অর্জুনের মাধ্যমে সমস্ত গৃহস্থকে যেন সচেতন (উপদেশ) করেছেন যে তারা ঘরের শিক্ষা 'কর্মযোগ' পালন করে ঘরে থেকেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করতে সক্ষম, অন্য কোনো স্থানে তাদের যাবার কোন প্রয়োজন নেই।

গৃহস্থ হওয়া সত্ত্বেও অর্জুন প্রাপ্ত কর্তব্য-কর্ম (যুদ্ধ) পরিত্যাগ করে ভিক্ষান্নের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেছিলেন (গীতা ২।৫) অর্থাৎ নিজ কল্যাণের জন্য গৃহস্থাশ্রম অপেক্ষা সন্ন্যাসাশ্রমকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেছিলেন। সেইজন্যই উপরিউক্ত পদের দ্বারা ভগবান যেন বলতে চেয়েছেন, 'তুমি রাজ পরিবারের শ্রেষ্ঠ গৃহস্থ, কর্মযোগ তোমার স্ব-গৃহের শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, সেইজন্য তোমার পক্ষে এটি পালন করাই শ্রেয়স্কর।' সন্ন্যাসীগণ যে পরমাত্মতত্ত্ব লাভ হন, সেই তত্ত্ব গৃহস্থাশ্রমে থেকেও কর্মযোগী স্বাধীনতাপূর্বক লাভ করতে সক্ষম হন। সুতরাং কর্মযোগ গৃহস্থদের প্রধান বিদ্যা হলেও সন্ন্যাস ইত্যাদি অন্যান্য আশ্রমের ব্যক্তিগণও এটি পালন করে পরমাত্মতত্ত্ব লাভ করতে সক্ষম হয়। প্রাপ্ত পরিস্থিতির সঠিক ব্যবহারই হল কর্মযোগ। সুতরাং বর্ণ, আশ্রম, সম্প্রদায়, দেশ, কাল প্রভৃতির যে কেউ হোক না কেন কর্মযোগ পালন করতে সকলেই সক্ষম।

কোনো বিষয়ে শ্রেষ্ঠ এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নাম করলে সেই বিষয়ের মহিমা প্রকটিত হয়, তাতে অন্যেও সেইরূপ করতে উৎসাহিত হয়। যাদের হৃদয়ে জাগতিক বস্তুর গুরুত্ব থাকে, তাদের ওপর ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিদের প্রভাব বেশি পড়ে। তাই ভগবান সৃষ্টির প্রারম্ভে সূর্য এবং মনু প্রমুখ প্রভাবশালী রাজাদের উল্লেখ করে কর্মযোগ পালন করার প্রেরণা দিয়েছেন।

বিশেষ কথা

ক্রিয়া এবং পদার্থসমূহে অনুরাগ হলে অর্থাৎ সেগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলে কর্মযোগ হওয়া সম্ভব নয়। গৃহে থাকলেও কালক্রমে সাংসারিক ভোগাদিতে অরুচি (উপরতি বা কামনার অভাব) হয়ে থাকে। কেননা স্বাভাবিক নিয়ম এই যে, যে কোনো ভোগেরই শেষে অরুচি উৎপন্ন হয়ে থাকে। ভোগারম্ভের সময় যতটা আগ্রহ (কামনা) থাকে, ভোগের সময় তা আর ততটা থাকে না, ভোগ করতে করতে ক্রমশঃ তা শেষ হয়ে যায়। যেমন—মিষ্টান্ন খেতে আরম্ভ করার আগে যে রুচি থাকে, খেতে খেতে সেই রুচি কমতে থাকে এবং শেষে এতে অরুচি এসে পড়ে। কিন্তু মানুষের ভুল এই যে, সে এই অরুচিকে গুরুত্ব দিয়ে তাকে স্থায়ী করতে চায় না, সে এই অরুচিকেই তৃপ্তি বলে ধরে নেয়। আসলে অরুচির তাৎপর্য হল ভোগে ক্লান্তি অর্থাৎ ভোগ করার শক্তিরই অভাব সূচিত করা।

যে রুচি বা কামনার কখনো অভাব হয় বা আগ্রহ কমে যায়, সে রুচি বা কামনা বাস্তবে 'স্বয়ং'-এর হতে পারে না। যে বস্তুতে অরুচি উৎপন্ন হয়, তার সঙ্গে আমাদের প্রকৃত সম্পর্ক থাকতে পারে না। যাঁর সঙ্গে আমাদের প্রকৃত সম্বন্ধ বিদ্যমান, সেই সৎ-স্বরূপ পরমাত্মতত্ত্বের দিকে অগ্রসর হলে তাঁর প্রতি কখনো রুচির অভাব হয় না, বরং রুচি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে—এমনকি পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হলেও এই রুচি 'প্রেম' রূপে বৃদ্ধি পেতে থাকে। 'স্বয়ং' যে সৎ-স্বরূপ, তাই নিজের অভাবের ইচ্ছা কারোরই হয় না।

কর্ম, করণ (শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন ইত্যাদি) এবং উপকরণ (পদার্থ অর্থাৎ কর্ম করার উপযোগী সামগ্রী)—এই তিনটিই উৎপত্তি ও বিনাশশীল। তাহলে এর থেকে প্রাপ্ত ফল কীভাবে নিত্য হতে পারে ? সেগুলিও স্বভাবতঃই বিনাশশীল। অবিনাশীর প্রাপ্তিতে যে তৃপ্তি লাভ হয়, বিনাশশীল বস্তু প্রাপ্ত হলে সেই তৃপ্তি লাভ কীভাবে সম্ভব ? তাই সাধকের কর্ম, করণ এবং উপকরণ—এই তিনের থেকেই সম্পর্ক ছেদ করতে হয়। এসব থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়া সম্ভব কেবলমাত্র তখনই যখন সাধক নিজের জন্য কিছুই করেন না, নিজের জন্য কিছু আশা করেন না বা নিজের বলে কিছু মনে করেন না। বরং নিজের বলতে যে কর্ম, করণ এবং উপকরণ—এইগুলির থেকে সম্পর্ক ছেদ করার জন্য তিনি এগুলিকে জগৎ-সংসারের বলে মনে করে জগতেরই সেবায় ব্যয় করেন।

কর্মযোগী কর্ম করলেও তাতে তাঁর কামনা, মমতা বা আসক্তি হয় না, তাতে তাঁর প্রীতি এবং নিষ্ঠা থাকে। কামনা, মমতা ও আসক্তি অপবিত্রকারক এবং প্রীতি ও

নিষ্ঠা পবিত্রতাদায়ক। কামনা, মমতা এবং আসক্তি সহযোগে কোনো কর্ম করলে তাতে পতন এবং পদার্থের নাশ হয়ে থাকে এবং ওই কর্ম বারংবার স্মরণ হতে থাকে অর্থাৎ ওই কর্মটির সঙ্গে সম্পর্ক বন্ধন ঘটে। কিন্তু প্রীতি এবং তৎপরতা সহযোগে কর্ম করলে নিজের উন্নতি এবং পদার্থের সঠিক ব্যবহার হয়, নাশ হয় না এবং ওই কর্মটি পুনর্বার স্মরণে আসে না অর্থাৎ ওই কর্মটির সম্পর্ক বন্ধন ছিন্ন হয়। ফলে নিত্যপ্রাপ্ত স্বরূপ অথবা পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব হয়ে থাকে।

মানুষ যেমনই হোক না কেন, সে সহজেই এটি বুঝতে পারে যে, যা কিছু তার আছে, সেগুলি তার নয়, বস্তুতঃ কারো থেকে পাওয়া ; যেমন শরীর পিতামাতার থেকে পাওয়া, বিদ্যা-যোগ্যতা গুরুজনদের থেকে পাওয়া ইত্যাদি। অর্থাৎ পরস্পরের সহায়তাতেই সকলের জীবনধারা চলে। অত্যন্ত ধনী ব্যক্তির জীবনও অপরের সহায়তা বিনা চলে না। আমরা যদি কারো নিকট থেকে কিছু নিই, তাহলে কাউকে কিছু দেওয়া, সাহায্য করা, সেবা করা আমাদেরও পরম কর্তব্য হয়ে যায়। এরই নাম কর্মযোগ। মানুষমাত্রই এটি পালন করতে সক্ষম এবং এটির পালনে কখনো বিন্দুমাত্রও অসামর্থ্য বা পরাধীনতা নেই।

কর্তব্য তাকেই বলা হয় যেটি সুখপূর্বক করা সম্ভব, যেটি অবশ্য করণীয় অর্থাৎ যেটি করার উপযুক্ত এবং যেটি পালন করলে উদ্দেশ্যের সিদ্ধি অবশ্যই হয়ে থাকে। যা করা সম্ভব নয়, সেটি করার দায়িত্ব কারোর ওপর নেই এবং যেটি করা উচিত নয় সেটি করতেই নেই। যেটি করা উচিত নয়, সেটি না করলে দুটি অবস্থা স্বাভাবিকভাবে হয়—নির্বিকার অবস্থা অর্থাৎ কিছু না করা অথবা যেটি করা উচিত, সেটি করা।

কর্তব্য সর্বদা নিষ্কামভাবে পরহিতের দিকে দৃষ্টি রেখে করা হয়। সকামভাবে যে কর্ম করা হয় সেগুলি বন্ধনকারক হয়ে থাকে, তাই সেগুলি করা উচিত নয়। নিষ্কামভাবে করা কর্ম ফলের কামনারহিত হয়, উদ্দেশ্যরহিত নয়। উদ্দেশ্যরহিত কর্ম কেবল পাগলদের হয়। ফল এবং উদ্দেশ্য—দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। ফল উৎপন্ন হয় এবং নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু উদ্দেশ্য নিত্য। উদ্দেশ্য নিত্যপ্রাপ্ত পরমাত্মার অনুভূতির হয়ে থাকে, যার জন্য এই মনুষ্যজন্ম লাভ হয়েছে। নিজ কর্তব্য পালন না করলে পরমাত্মাকে অনুভব করা যায় না। সকামভাব, প্রমাদ, আলস্য ইত্যাদি থাকলে নিজ কর্তব্য পালন করা কঠিন বলে মনে হয়।

প্রকৃতপক্ষে কর্তব্যকর্ম পালনে কোনো ক্লান্তি নেই। কর্তব্যকর্ম সহজ ও স্বাভাবিক হয়, কারণ এটি হল স্বধর্ম। যখন অহংভাব, আসক্তি, মমতা, কামনা যুক্ত হয়ে অর্থাৎ 'নিজের জন্য' কর্ম করা হয়, তখনই ক্লান্তি আসে। সেইজন্য ভগবান রাজসিক কর্মকে পরিশ্রমসাধ্য বলে জানিয়েছেন (গীতা ১৮।২৪)।

ভগবানের দ্বারা যেমন প্রাণীমাত্রেরই হিতসাধন হয়ে থাকে তেমনি ভগবানের শক্তি প্রাণীমাত্রেরই হিতে নিরন্তর ব্যাপৃত থাকে। যেমন আকাশবাণী কেন্দ্র দ্বারা প্রসারিত বিশেষ শক্তিসম্পন্ন ধ্বনি সমস্ত স্থানে প্রচারিত হয়ে থাকে, কিন্তু রেডিওতে যে স্থানে ঐ ধ্বনিটি ধরা যায় সেখানে রেডিওর কাঁটা রাখলে তবেই ধ্বনি ধরা সম্ভব হয়। এইরূপ কর্মযোগী যখন স্বার্থপরতা ত্যাগ করে কেবলমাত্র জগতের হিতের ভাব নিয়ে সমস্ত কর্ম করেন তখন ভগবানের সর্বব্যাপী হিতৈষিণী শক্তির সঙ্গে তাঁর সংযোগ হয় এবং তাঁর কর্ম বিশেষ ক্ষমতাশালী হয়। ভগবানের শক্তির সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ায় তাঁর মধ্যে ভগবানের শক্তিই কাজ করে এবং সেই শক্তির দ্বারা লোকের হিতসাধন হয়ে থাকে। সেইজন্য কর্তব্যকর্মে কোনো বাধাও আসে না এবং ক্লান্তিও বোধ হয় না।

কর্মযোগে পরাশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা নেই। প্রাপ্ত পরিস্থিতি অনুযায়ী কর্মযোগ পালন করতে হয়। কর্মযোগে কোনো বিষয়ে কারো সহায়তার প্রয়োজন হলে, সেটি করার নামই 'সেবা'। যেমন কারো গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে, সে সেটি ঠেলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে, আমি যদি তার সেই কাজে সাহায্য করি, তাকেই বলা হয় 'সেবা'। বিশেষভাবে বিচার বিবেচনা করে যে সেবা করে, সে আসলে কর্ম করে, সেবা নয়। কারণ এতে তার উদ্দেশ্য পারমার্থিক না হয়ে লৌকিক হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি অনুযায়ী নির্বিচারে পরহিতে করা কর্মকে সেবা বলে। কর্মযোগী পরিস্থিতির পরিবর্তনও করেন না বা ছোট-বড় বিচারও করেন না। তিনি প্রাপ্ত পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করেন মাত্র। প্রাপ্ত পরিস্থিতির সদ্ব্যবহারকেই কর্মযোগ বলা হয়।

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ॥ ২ ॥

[**পরন্তপ** (হে পরন্তপ !) ; **এবম্** (এইরূপে) ; **পরম্পরাপ্রাপ্তম্** (পরম্পরাগতভাবে প্রাপ্ত) ; **ইমম্** (এই কর্মযোগ) ; **রাজর্ষয়ঃ** (রাজর্ষিগণ) ; **বিদুঃ** (অবগত ছিলেন) ; **মহতা, কালেন** (দীর্ঘসময় অতিবাহিত হওয়ায়) ; **সঃ, যোগঃ** (এই যোগ) ; **ইহ** (মনুষ্যলোকে) ; **নষ্টঃ** (লুপ্তপ্রায় হয়েছে।)]

হে পরন্তপ ! এইরূপে পরম্পরাপ্রাপ্ত এই যোগ রাজর্ষিগণ অবগত ছিলেন। কিন্তু দীর্ঘসময় অতিবাহিত হওয়ায় মনুষ্যলোকে এই যোগ লুপ্তপ্রায় হয়েছে ॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা—**'এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ'**—সূর্য, মনু, ইক্ষ্বাকু প্রমুখ রাজর্ষিগণ এই কর্মযোগ সঠিকভাবে জেনে নিজেরা সেইমত আচরণ করতেন এবং প্রজাদেরও সেইরূপ আচরণ করতে শেখাতেন । এইভাবে পরম্পরাক্রমে রাজর্ষিদের মধ্যে এই কর্মযোগ চলে এসেছে। এটি রাজাদের (ক্ষত্রিয়দের) নিজস্ব বিদ্যা, প্রত্যেক রাজারই তাই এটি জানা কর্তব্য। এইভাবে পরিবার, সমাজ, গ্রাম ইত্যাদির যিনি প্রধান ব্যক্তি তাঁরও এই বিদ্যা জানা অবশ্য কর্তব্য।

প্রাচীনকালে কর্মযোগের জ্ঞানসম্পন্ন রাজাগণ রাজ্যভোগে আসক্ত না হয়ে উত্তমরূপে রাজ্য পরিচালনা করতেন। প্রজার হিতসাধনে তাঁদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থাকত। সূর্যবংশীয় রাজাদের সম্বন্ধে মহাকবি কালিদাস লিখেছেন—

প্রজানামেব ভূত্যর্থং স তাভ্যো বলিমগ্রহীৎ।
সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তে হি রসং রবিঃ॥
(রঘুবংশ ১।১৮)

'এই রাজন্যবর্গ তাঁদের প্রজাদের মঙ্গলের জন্য প্রজাদের থেকে সেইরূপ কর গ্রহণ করতেন যেমনভাবে সহস্রগুণে বৃদ্ধি করে বৃষ্টিপাতের জন্য সূর্য পৃথিবী হতে জল গ্রহণ করেন।'

অর্থাৎ রাজাগণ প্রজাদের নিকট থেকে কর ইত্যাদি বাবদ যে অর্থ গ্রহণ করতেন, তা প্রজাদেরই মঙ্গলার্থে ব্যয় করতেন, নিজেদের জন্য তার কিছুই গ্রহণ করতেন না। তাঁদের নিজেদের জীবন-নির্বাহের জন্য তাঁরা পৃথকভাবে চাষের কাজ করাতেন। কর্মযোগ পালন করার ফলে ওইসব রাজাদের বিশেষ জ্ঞান ও ভক্তি স্বতঃই প্রাপ্ত হতো। সেইজন্যই প্রাচীনকালে বড় বড় ঋষিগণও জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্যে ওইসব রাজাদের কাছে যেতেন। শ্রীবেদব্যাসের পুত্র শ্রীশুকদেবও জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্যে রাজর্ষি জনকের কাছে গিয়েছিলেন। ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ে আছে যে ব্রহ্মবিদ্যা লাভের উদ্দেশ্যে ছয়জন ঋষি একই সঙ্গে মহারাজ অশ্বপতির নিকট গিয়েছিলেন।[১]

তৃতীয় অধ্যায়ের বিংশতি শ্লোকে জনকাদি রাজাদের এবং এইস্থলে সূর্য, মনু, ইক্ষ্বাকু প্রমুখ রাজাদের কর্মযোগী বলে অভিহিত করে ভগবান যেন অর্জুনকে দেখাতে চেয়েছেন যে, গৃহস্থ এবং ক্ষত্রিয় হওয়ার সুবাদে তোমারও নিজ পূর্বপুরুষদের (বংশ-পরম্পরা) ন্যায় কর্মযোগ অবশ্য পালন করা উচিত (গীতা ৪।১৫)। তাছাড়া নিজ বংশের কৃত্য (কর্মযোগ বিদ্যা) নিজের পালন করা সহজ, তাই তা অবশ্য পালনীয়।

'স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ'—পরমাত্মা নিত্য এবং তাঁর প্রাপ্তির সাধনাগুলি—কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ইত্যাদিও পরমাত্মার দ্বারা স্থিরিকৃত হওয়ায় নিত্য। তাই এগুলি কখনো অবিদ্যমান হয় না—**'নাভাবো বিদ্যতে সতঃ'** (গীতা ২।১৬)। এটি আচরণে পরিলক্ষিত না হলেও নিত্য বিরাজিত। তাই এখানে উদ্ধৃত **'নষ্টঃ'** পদটির অর্থ হল লুপ্ত বা অপ্রকটিত হওয়া, অনস্তিত্ব হওয়া নয়।

প্রথম শ্লোকে কর্মযোগকে **'অব্যয়ম্'** অর্থাৎ অবিনাশী

[১]এই প্রসঙ্গে মহারাজ অশ্বপতির এই কথাটি লক্ষণীয়—

ন মে স্তেনো জনপদে ন কদর্যো ন মদ্যপঃ। নানাহিতাগ্নির্নাবিদ্বান্ন স্বৈরী স্বৈরিণী কুতঃ॥ (ছান্দোগ্য. ৫।১১।৫)

আমার রাজ্যে কোনো চোর নেই, কোনো কৃপণ নেই, কেউ মদিরাসক্ত নয়, অগ্নিহোত্র করে না এমন কেউ নেই, কোনো মূর্খ নেই, পরদারগামী কোনো ব্যক্তি নেই, সুতরাং কুলটা নারী কী করে থাকবে ?

বলা হয়েছে। সুতরাং এখানে **'নষ্টঃ'** পদটির অর্থ যদি কর্মযোগের অনস্তিত্ব মনে করা হয় তবে এরূপ বিরোধাভাস হয় যে কর্মযোগ যদি অবিনাশী হয় তাহলে তার আবার অনস্তিত্ব কী করে হয় ? এবং নাস্তি হলে সেটি অবিনাশী হওয়া কী করে সম্ভব ? তাছাড়া ভগবান পরবর্তী (তৃতীয়) শ্লোকে কর্মযোগকে পুনর্বার প্রকটিত করার কথা বলেছেন। এটি যদি লোপই পেয়ে থাকে, তাহলে পুনরায় প্রকটিত হতে পারে না। ভগবানের বক্তব্যে বিরুদ্ধভাব থাকাও সম্ভব নয়। তাই এখানে **'ইহ নষ্টঃ'** পদটির অর্থ হল এই যে, এই অবিনাশী কর্মযোগ তত্ত্বের বর্ণনাকারী গ্রন্থ এবং এই তত্ত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ও আচরণকারী শ্রেষ্ঠ পুরুষদের ইহলোকে যেন অভাব প্রতীয়মান হয়।

যে বিষয়টি যেখান থেকে আরম্ভ হয়, সেটি পরম্পরাক্রমে যত দূরে যেতে থাকে, ততই তাতে পরিবর্তন হতে থাকে—এটিই হল নিয়ম। ভগবান বলেছেন যে, কল্পের আদিতে আমি এই কর্মযোগ সূর্যকে বলেছিলাম এবং পরম্পরাক্রমে এটি রাজর্ষিগণ জেনেছিলেন। সুতরাং এটিতে ক্রমশঃ পরিবর্তন ঘটেছে এবং বহু বছর পার হওয়ায় এখন এই যোগ পৃথিবীতে লুপ্তপ্রায় হয়েছে। সেইজন্যই বর্তমানে এই কর্মযোগের কথা খুব কম শোনা বা দেখা যায়।

কর্মযোগের আচরণ লুপ্তপ্রায় হলেও এর সিদ্ধান্ত (নিজের জন্য কিছু না করা) সর্বদাই বিরাজমান। কারণ এই সিদ্ধান্ত মেনে না নিলে কোনো যোগই (জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ইত্যাদির) নিরন্তর সাধনা হওয়া সম্ভব নয়। মনুষ্যমাত্রকেই তো কর্ম করতে হয়। জ্ঞানযোগী বিচার দ্বারা কর্মগুলি বিনাশশীল মনে করে কর্ম থেকে সম্পর্ক-ছেদ করেন, ভক্তিযোগী কর্মকে ভগবানে অর্পণ করে কর্মগুলি হতে সম্পর্ক ছেদ করেন। সুতরাং জ্ঞানযোগী বা ভক্তিযোগী কর্মযোগের অনুষ্ঠান না করলেও কর্মযোগের সিদ্ধান্ত তাঁদের মানতেই হবে। তাৎপর্য হল এই যে, বর্তমান সময়ে কর্মযোগ লুপ্তপ্রায় হওয়া সত্ত্বেও সিদ্ধান্ত হিসাবে এখনও বিদ্যমান।

বাস্তবে দেখতে গেলে কর্মযোগের 'কর্ম' লুপ্ত হয়নি, বরং (কর্মের প্রবাহ নিজের দিকে হওয়ায়) 'যোগ'ই লোপ পেয়েছে। তাৎপর্য হল, জাগতিক পদার্থগুলি যেমন কর্ম করলে পাওয়া যায়, পরমাত্মাকেও তেমনি কর্ম করলে পাওয়া যায়—এই কথাটি সাধকদের মনে এতো দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে যে 'পরমাত্মা হলেন নিত্যপ্রাপ্ত'—এই বাস্তবিকতার দিকে তাঁদের লক্ষ্য যায় না। 'কর্ম' সর্বদা জগতের জন্য হয় এবং 'যোগ' হয় নিজের জন্য। 'যোগে'র জন্য কর্ম করতে হয় না, কারণ যোগ স্বতঃসিদ্ধ[১]। সুতরাং 'যোগ'-প্রাপ্তির জন্য কর্ম করতেই হবে এই মনে করা হল যোগের লুপ্ত হওয়া।

এই মনুষ্যদেহ কর্মযোগ পালন করার অর্থাৎ অপরের নিঃস্বার্থ সেবা করার জন্যই প্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু এখন মানুষ দিন-রাত নিজ সুখ-সুবিধা-সম্মান ইত্যাদি প্রাপ্তির জন্যই চেষ্টা করে। স্বার্থপরতা বেড়ে যাওয়াতেই অপরের সেবার দিকে মানুষের লক্ষ্য যায় না। যে জন্য এই মনুষ্যদেহ প্রাপ্তি, সেটি বিস্মরণ হওয়াই হল কর্মযোগের লুপ্ত হওয়া।

মানুষ সেবার দ্বারা পশু-পক্ষী থেকে মানুষ-দেবতা-পিতৃপুরুষ, ঋষি-সাধু-মহাত্মা এবং ভগবানকে পর্যন্ত নিজের অধীন করতে পারে। কিন্তু এই সেবাভাব ভুলে মানুষ নিজে ভোগের বশীভূত হয়, যার পরিণামে তাকে নরক এবং চুরাশি লক্ষ জন্ম ভ্রমণ করতে হয়। এটিই হল কর্মযোগের অপ্রত্যক্ষ হয়ে যাওয়া।

*** *** ***

---

[১]লোকহিতার্থে নিজ কর্তব্য (স্বধর্ম) পালন করলে 'যোগ' সিদ্ধ হয় ; সুতরাং এই 'করা'ও বাস্তবে না করার জন্য অর্থাৎ 'করা' শেষ করারই জন্য—'আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে' (গীতা ৬।৩)। 'কর্ম করার বেগ' প্রশমিত করার জন্যই শুধু সেবার ভাবে কর্তব্য-কর্ম করা উচিত। সকামভাবে অর্থাৎ নিজের জন্য কর্ম করলে 'কর্ম করার বেগ' বাড়তে থাকে, আর অপরের জন্য কর্ম করলে 'কর্মের বেগ' সমাপ্ত হয়। অর্থাৎ অন্যের জন্য করলেই 'করা' শেষ হয় আর নিজের জন্য করলে 'করা' বাকি থেকে যায়। 'করা' সমাপ্ত হলে স্বতঃসিদ্ধ 'যোগ'-এর অনুভব হয়।

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্‌।। ৩ ।।

[**মে** (আমার) ; **ভক্তঃ, চ, সখা, অসি** (ভক্ত এবং সখা) ; **ইতি** (সেইজন্য) ; **সঃ, এব** (এই) ; **অয়ম্‌, পুরাতনঃ** (সেই পুরাতন) ; **যোগঃ** (যোগ) ; **অদ্য, ময়া** (আজ আমি) ; **তে** (তোমাকে) ; **প্রোক্তঃ** (বললাম) ; **হি** (কারণ) ; **এতৎ** (এটি); **উত্তমম্‌** (অতি গূঢ়) ; **রহস্যম্‌** (রহস্য।)]

তুমি আমার ভক্ত এবং প্রিয় সখা, সেইজন্য এই পুরাতন যোগ আজ তোমাকে বললাম, কারণ এটি অতি গূঢ় রহস্য ।। ৩ ।।

ব্যাখ্যা—'ভক্তোঽসি মে সখা চেতি'—অর্জুন প্রথম থেকেই ভগবানকে তাঁর প্রিয়সখা বলে মনে করতেন (গীতা ১১।৪১-৪২)। এখন তিনি ভক্তও হয়েছেন (গীতা ২।৭) অর্থাৎ অর্জুন সখারূপ ভক্ত আগেই ছিলেন দাসরূপ ভক্ত এখন হলেন। আদেশ এবং উপদেশ দাস বা শিষ্যকেই দেওয়া হয়, সখাকে নয়। অর্জুন ভগবানের শরণাগত হলে, তবেই ভগবান উপদেশ দিতে শুরু করেন।

যে কথা সখাকেও বলা যায় না, তা শরণাগত শিষ্যের কাছে প্রকটিত করা যায়। অর্জুন ভগবানকে বলছেন, 'আমি আপনার শিষ্য এবং শরণাগত, আমাকে শিক্ষা দিন।' সেইজন্য ভগবান অর্জুনের কাছে নিজেকে প্রকটিত করলেন, রহস্যের জাল উন্মোচন করলেন।

ভগবানের প্রতি অর্জুনের বিশেষ মনোভাব ছিল, সেইজন্যই তিনি বৈভব এবং অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত 'নারায়ণী সেনা' পরিত্যাগ করে নিরস্ত্র ভগবানকে নিজের 'সারথি' রূপে বরণ করেছিলেন [১]।

সাধারণ মানুষ ভগবানের দেয় বস্তুগুলিকে নিজের বলে মনে করে (যেগুলি প্রকৃতপক্ষে নিজের নয়), কিন্তু ভগবানকে নিজের বলে মনে করে না, (যিনি বাস্তবে নিজেরই)। তারা বৈভবশালী ভগবানকে না দেখে তাঁর বৈভবেই আকৃষ্ট থাকে। বৈভবই সত্য মনে করায় তাদের বুদ্ধি এতটাই ভ্রষ্ট হয় যে তারা ভগবানেরই অভাব মেনে নেয় অর্থাৎ ভগবানের দিকে তাদের দৃষ্টিই যায় না। কিছু ব্যক্তি আবার ঐশ্বর্য প্রাপ্তির আশায় ভগবানের ভজন-পূজন করে। ভগবানকে চাইলে বৈভব পিছন পিছন এসে হাজির হয়, কিন্তু বৈভব বা ঐশ্বর্য চাইলে ভগবান আসেন না। ঐশ্বর্য ভক্তদের চরণে লুটোয়, কিন্তু সত্যিকারের যে ভক্ত তিনি ঐশ্বর্য প্রাপ্তির আশায় ভগবানের আরাধনা করেন না। তিনি ঐশ্বর্য চান না, শুধু ভগবানকেই চান। ঐশ্বর্য কামনাকারী মানুষ ঐশ্বর্যেরই দাস হয় আর ভগবানের কামনাকারী মানুষ ভগবানেরই ভক্ত হয়। অর্জুন ঐশ্বর্য (নারায়ণী সেনা) পরিত্যাগ করে কেবল ভগবানকেই নিজের করে চেয়েছিলেন, তাই যুদ্ধক্ষেত্রে ভীষ্ম, দ্রোণ, যুধিষ্ঠির প্রমুখ মহাপুরুষগণ থাকতেও গীতার মহান দিব্য উপদেশ একমাত্র অর্জুনই লাভ করেছিলেন এবং যথাসময়ে তিনি রাজ্যও পেয়েছিলেন।

'স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ'—এই পদটির তাৎপর্য এই নয় যে, আমি বিস্তারিতভাবে কর্মযোগের কথা বলে দিয়েছি, বরং এর তাৎপর্য এই যে, যা কিছু বলেছি তা সম্পূর্ণ। পরে ভগবানের জন্ম নিয়ে অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ভগবান পুনরায় ওই কর্মযোগেরই বর্ণনা করতে আরম্ভ করেন।

ভগবান বলেছেন, 'সৃষ্টির আদিতে সূর্যকে আমি যে কর্মযোগের উপদেশ দিয়েছিলাম, তাই আজ পুনর্বার তোমায় জানাচ্ছি। বহুদিন পার হয়ে যাওয়ায় এই যোগ অপ্রকটিত হয়েছিল এবং আমিও অপ্রকটভাবে ছিলাম। এখন আমি অবতাররূপে আবির্ভূত হয়েছি এবং যোগকেও পুনরায় প্রকটিত করেছি। সুতরাং অনাদিকাল থেকে যে কর্মযোগ মানুষকে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত করে এসেছে, আজও তা তাঁদের কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত করে দেবে।'

'রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্‌'—ভগবান যেভাবে অষ্টাদশ অধ্যায়ের ছেষট্টিতম শ্লোকে অর্জুনকে **'সর্বগুহ্যতম'** কথা

---

[১] এবমুক্তস্তু কৃষ্ণেন কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ। অযুধ্যমানং সংগ্রামে বরয়ামাস কেশবম্‌।। (মহাভারত, উদ্যোগপর্ব ৭।২১)

'শ্রীকৃষ্ণ এরূপ বলায় কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় রণভূমিতে (অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত এক অক্ষৌহিণী নারায়ণী সেনা পরিত্যাগ করে) যুদ্ধ করতে বিমুখ নিরস্ত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই (নিজের সাহায্যকারী হিসাবে) বেছে নিলেন।'

বলেছিলেন, 'তুমি আমার শরণাগত হও, আমি তোমাকে সর্বপাপ হতে মুক্ত করে দেব', সেইরূপ এখানে 'উত্তম রহস্য' (গুহ্যতত্ত্ব) প্রকাশিত করেছেন এই বলে, 'আমিই সৃষ্টির আদিতে সূর্যকে উপদেশ দিয়েছিলাম এবং সেই উপদেশই আজ তোমাকে দিচ্ছি।'

ভগবান যেন অর্জুনকে বলছেন, 'তোমার সারথি হয়ে, তোমার নির্দেশ পালনকারী হয়েও আমি আজ তোমাকে সেই উপদেশই দিচ্ছি, যা আমি সৃষ্টির আদিতে সূর্যকে দিয়েছিলাম। আমি সাক্ষাৎ সেই এবং এখন অবতাররূপে গুপ্তভাবে প্রকটিত হয়েছি—এটি অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ কথা। সেই রহস্যের কথা আজ আমি তোমাকে জানাচ্ছি, কেননা তুমি আমার ভক্ত ও প্রিয় সখা।'

সাধারণ মানুষের কথা ছেড়ে দিলেও, সাধকের দৃষ্টিও সাধারণতঃ উপদেষ্টার থেকে উপদেশের দিকেই বেশি থাকে। এই প্রসঙ্গটি জানলে বা পড়লে, উপদিষ্ট 'যোগ'-এর দিকে দৃষ্টি গেলেও উপদেষ্টা শ্রীকৃষ্ণ ভগবান যে স্বয়ং আদি নারায়ণ—সেদিকে সাধারণতঃ দৃষ্টি যায় না। যে ব্যাপারটি সহজে ধরা যায় না, সেটিকে 'রহস্য' বলা হয়। সেইজন্য ভগবান এই স্থানে '**রহস্যম্**' পদটির দ্বারা নিজ পরিচয় দিয়েছেন। এর অর্থ হল সাধকের দৃষ্টি সর্বদা ভগবানের প্রতি থাকা উচিত।

নিজেকে 'আদি উপদেষ্টা' বলে ভগবান যেন মানবমাত্রেরই 'গুরু' বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। নাটক করার সময় মানুষ সাধারণের কাছে প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করে না, তবে কোনো আপন-জনের কাছে নিজ পরিচয় প্রকাশ করতেও পারে। তেমনি ভগবান মনুষ্যাবতারের সময়ও অর্জুনের কাছে নিজ ঈশ্বরভাব প্রকটিত করেছেন অর্থাৎ যে বিষয়টি গোপন রাখা উচিত ছিল, সেটি প্রকাশ করে দিয়েছেন। এ এক উত্তম রহস্য।

কর্মযোগকেও উত্তম রহস্য বলা যেতে পারে। যে সব কর্মের দ্বারা জীব আবদ্ধ হয় (**কর্মণা বধ্যতে জন্তুঃ**), সেই সকল কর্মের সাহায্যেই তারা মুক্তিলাভ করে—এ এক উত্তম রহস্য। বস্তুগুলিকে নিজস্ব বলে মনে করে নিজের জন্য কর্ম করলে বন্ধন ঘটে আর বস্তুগুলিকে নিজের বলে মনে না করে (অন্যের মনে করে) শুধুমাত্র অপরের হিতার্থে নিঃস্বার্থভাবে নিয়োজিত করলে মুক্তি লাভ হয়। অনুকূল-প্রতিকূল, ধনী-নির্ধন, সুস্থ-অসুস্থ ইত্যাদি পরিস্থিতি যেমনই হোক, প্রত্যেক পরিস্থিতিতেই স্বাধীনভাবে এই কর্মযোগ পালন করা সম্ভব। কর্মযোগে রহস্যের তিনটি দিক প্রধান—

১) কোন কিছুই আমার নয়। কারণ আমার স্বরূপ হল সৎ বা অবিনাশী এবং যা কিছু প্রাপ্তি হয়েছে তা সবই অসৎ বা বিনাশশীল, এই অবস্থায় অসৎ পদার্থগুলি কী করে আমার হতে পারে ? নিত্যের সঙ্গে অনিত্য সম্পর্কিত কীভাবে হবে ?

২) আমার কিছুতেই প্রয়োজন নেই। কারণ স্বরূপের (সৎ-এর) কোনো কিছুর অভাব হয় না। তাহলে কোন বস্তুর কামনা হবে ? অনুৎপন্ন অবিনাশী তত্ত্বের কাছে উৎপন্ন হওয়া বিনাশশীল পদার্থ কোন কাজে আসবে ?

৩) নিজের জন্য কিছুই না করা। তার প্রথম কারণ হল এই যে, স্বয়ং হলেন চেতন পরমাত্মার অংশ এবং কর্ম হল জড়। স্বয়ং নিত্য নিরন্তর স্থিতিশীল কিন্তু কর্মের এবং তার ফলের আদি-অন্ত থাকে। সেইজন্য নিজের জন্য কর্ম করলে আদি ও অন্তসম্পন্ন কর্ম এবং তার ফলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কর্ম এবং তার ফল সমাপ্ত হলেও তার সঙ্গ (আসক্তি) থেকে যায় এবং তা জন্ম-মৃত্যুর কারণ হয়—'**কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু**' (গীতা ১৩।২১)।

দ্বিতীয় কারণ হল যে 'করা'-র দায়িত্ব তার ওপরই বর্তায় যে করতে সক্ষম অর্থাৎ যার করার যোগ্যতা আছে এবং যে কিছু পাওয়ার আশা রাখে। নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার, অপরিবর্তনীয় এবং পূর্ণ হওয়ায় চেতন স্বরূপ, শারীরিক সম্পর্ক ব্যতিরেকে কোনো কিছু করতে সক্ষম নন। সুতরাং এই বিধান মানতেই হয় যে স্বরূপ নিজের জন্য কিছু করেন না।

তৃতীয় কারণ হল স্বরূপ সৎ এবং পূর্ণ। সুতরাং তাতে কখনো কোন অপূর্ণতা আসতে পারে না, আসার সম্ভাবনাও নেই—'**নাভাবো বিদ্যতে সতঃ**' (গীতা ২।১৬)। অপূর্ণতা না আসার কারণ হল যে, তাঁর কোনো কিছু পাওয়ার ইচ্ছাই জাগে না। এর দ্বারা স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে স্বরূপের কোনো কিছু 'করা'-র দায়িত্ব নেই অর্থাৎ তাঁর নিজের জন্য কিছুই করার নেই।

কর্মযোগের 'কর্ম' সংসারের জন্য হয় এবং 'যোগ' হয় নিজের জন্য। কিন্তু নিজের জন্য কর্ম করলে 'যোগ'

অনুভূত হয় না। 'যোগ' তখনই অনুভূত হয় যখন কর্মের সম্পূর্ণ প্রবাহ জগৎ-সংসারের দিকেই প্রবাহিত হয়। কারণ শরীর-ইন্দ্রিয়াদি-মন-বুদ্ধি-পদার্থ-ধন-সম্পত্তি ইত্যাদি আমাদের যা কিছু আছে তা সমস্তই জগৎ-সংসারের সঙ্গে অভিন্ন, জগতেরই। তাই সেগুলি জগতের সেবাতেই ব্যয় করা উচিত। সুতরাং বস্তু এবং ক্রিয়ারূপ জগৎ থেকে সম্পর্ক-ছেদ করার জন্যই অপরের জন্য কর্ম করতে হয়। একেই বলে কর্মযোগ। কর্মযোগ সিদ্ধ হলে কর্ম করার আসক্তি, পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, বাঁচার আশা এবং মৃত্যুভয়—এসবই দূর হয়ে যায়।

সূর্য প্রকাশিত হলে যেমন লোকে অনেক প্রকার কর্ম করে, কিন্তু সূর্যের সঙ্গে ওইসব কর্মের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকে না, তেমনিই 'স্বয়ং'-এর (চেতনের) প্রকাশে সব কর্ম হয়, কিন্তু তার সঙ্গে 'স্বয়ং'-এর কোনো সম্পর্ক থাকে না, কারণ 'স্বয়ং' চেতন বা অপরিবর্তনশীল এবং কর্ম জড় বা পরিবর্তনশীল। কিন্তু যখন 'স্বয়ং' ভ্রমবশতঃ ওই বস্তুসমূহে এবং কর্মগুলির সঙ্গে সামান্যতম সম্পর্কও মেনে নেয় অর্থাৎ সেগুলিকে নিজের এবং নিজের জন্য মনে করে, তখনই সেই কর্ম অবশ্যম্ভাবীরূপে তাঁকে আবদ্ধ করে।

কোনো অবস্থাতেই নিত্যকর্ম ত্যাগ না করা এবং নিয়মিত সময়ে কার্যের জন্য তৎপর থাকা সূর্যের এক বিশেষত্ব। কর্মযোগীও সূর্যের ন্যায় তাঁর বিহিতকর্ম যথাসময়ে করার জন্য সর্বদাই তৎপর থাকেন।

ঠিকভাবে কর্মযোগ পালন করলে কর্মযোগীর যদি জ্ঞানের সংস্কার থাকে তাহলে তাঁর জ্ঞান প্রাপ্তি হয়, আর যদি ভক্তির সংস্কার থাকে তাহলে তাঁর ভক্তি প্রাপ্তি স্বতঃই হয়ে যায়। কর্মযোগ পালন করলে শুধু নিজেরই নয়, জগৎমাত্রেরই পরম হিত হয়। অন্য কেউ দেখুক বা না দেখুক, বুঝুক বা না বুঝুক, মানুক বা না মানুক, নিজ কর্তব্য ঠিকমতো পালন করলে অন্যান্য ব্যক্তিদেরও স্বতঃই কর্তব্য পালনের প্রেরণা হয় এবং এইভাবে সকলের সেবা করাও হয়।

মর্মকথা

গীতায় ভগবান উপদেশের প্রারম্ভে দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশতম শ্লোক থেকে ত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত মনুষ্যমাত্রের অনুভবের (বিবেকের) বর্ণনা করেছেন। এটি কেবলমাত্র মানুষের অনুভবের কথা নয়, বরং জীবমাত্রেরই অনুভবের কথা ; কারণ 'আমি আছি'— এইরূপ নিজের সত্তার অনুভব স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত প্রাণীরই থাকে। বৃক্ষ, পর্বতাদিরও এই অনুভব থাকে। কিন্তু তারা তা প্রকাশ করতে পারে না। পশুপক্ষীর মধ্যে এটি প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায়, যেমন—পশুপক্ষী নিজেদের মধ্যে মারামারি করে, এটি তাদের নিজ-নিজ সত্তার জন্যই হয়। নিজের সত্তা পৃথক বলে অনুভূত না হলে এরা কেন মারামারি করবে ? মানুষের মধ্যে তো এটি প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত, তবুও সে এই অনুভবের দিকে লক্ষ্যও করে না এবং একে মর্যাদাও দেয় না। এই অনুভবকেই বলা হয় বিবেক বা নিজ-জ্ঞান। সবার মধ্যে এই বিবেক স্বতই থাকে এবং এটি ভগবদপ্রদত্ত।

ইন্দ্রিয়াদি, মন এবং বুদ্ধি প্রকৃতির অংশ। তাই এগুলির দ্বারা যে জ্ঞান আহরিত হয় সেগুলি হল প্রকৃতিজনিত জ্ঞান। শাস্ত্রাদি পড়ে বা শুনে এই ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি সহযোগে যে পারমার্থিক জ্ঞান আহরিত হয়, তাও একপ্রকার প্রকৃতিজনিতই বলা যায়। এই প্রকৃতিজনিত জ্ঞানাপেক্ষা পরমাত্মতত্ত্বকে নিজ জ্ঞান (স্বয়ং থেকে পাওয়া জ্ঞান) সহযোগেই জানা যেতে পারে। নিজ জ্ঞান অর্থাৎ বিবেককে প্রাধান্য দিলে 'আমি কে ?' 'আমার কী আছে ?' 'জড় এবং চেতন কী ?' 'প্রকৃতি এবং পরমাত্মা কী ?'—এই সমস্ত জানার শক্তি জন্মায়। এই বিবেক কর্মযোগেও কাজ করে—এ এক গূঢ় কথা।

কর্মযোগে বিবেকের মুখ্য কথা হল—(১) নিজের অস্তিত্বে ('আমি আছি' এই ভাবনায়) কোনো সন্দেহ থাকে না এবং (২) যে বস্তু এখন সংগৃহীত হয়েছে তার ওপর নিজের কোনো অধিকার নেই ; কারণ এগুলি আগেও নিজের ছিল না, পরেও নিজের থাকবে না। আমি (স্বয়ং) নিত্য, স্থায়ী এবং এই মিলিত সামগ্রীগুলি—শরীর ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি নিত্য পরিবর্তনশীল এবং এগুলির নিত্য বিয়োগ হয়ে থাকে। কর্মগুলির যেমন শুরু ও শেষ হয়, তেমনি তার ফলও সংযুক্ত এবং বিযুক্ত হয়ে থাকে। তাই কর্ম এবং পদার্থগুলি জগতের সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত, স্বয়ং-এর সঙ্গে নয়। এইভাবে বিবেক জাগরিত হলে কামনা নাশ হয়। কামনা নাশ হলে নিষ্কামতা স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রকটিত হয় অর্থাৎ কর্মযোগ পূর্ণভাবে সিদ্ধ হয়।

কামনা দ্বারা বিবেক আবৃত হয় (গীতা ৩।৩৮-৩৯)। স্বার্থবুদ্ধি, ভোগ করার বুদ্ধি, সংগ্রহের বুদ্ধি থাকলে মানুষ নিজ কর্তব্য ঠিকভাবে স্থির করতে পারে না। সে বিভ্রম অর্থাৎ শরীর-ইন্দ্রিয়াদি-মন-বুদ্ধির দ্বারা বিভ্রম থেকে মুক্তি পেতে চায় এবং সেইজন্য এই বর্তমান পরিস্থিতির পরিবর্তন করার চেষ্টা করে। কিন্তু পরিস্থিতির পরিবর্তন করা তার নিজের হাতে নয়, কাজেই বিভ্রম থেকে পরিত্রাণ তো হয় না বরং তা উত্তরোত্তর বেড়েই চলে। বিবেক জাগরিত হলে যখন স্বার্থ-বুদ্ধি, ভোগ করার ইচ্ছা এবং সংগ্রহের বুদ্ধি আর থাকে না তখন নিজ কর্তব্য স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় এবং সমস্ত বিভ্রম স্বতঃই দূর হয়।

কর্ম অনুসারে বাহ্য পরিস্থিতির উদ্ভব হয় অর্থাৎ সেগুলি কর্মেরই ফল। অর্থ-দারিদ্র্য, নিন্দা-স্তুতি, শ্রদ্ধা-অবহেলা, যশ-অপযশ, লাভ-ক্ষতি, জন্ম-মৃত্যু, আরোগ্য-রুগ্নতা ইত্যাদি সমস্ত পরিস্থিতিই কর্মের অধীন[১]। শুভ এবং অশুভ কর্মের ফলরূপে অনুকূল এবং প্রতিকূল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। কিন্তু সেগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে সুখী বা দুঃখী হওয়া মূর্খতা। তাৎপর্য হল এই যে, অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতির উদ্ভব হয় কর্মের ফলে এবং তাতে সুখী বা দুঃখী হওয়া নিজের অজ্ঞতার জন্য হয়ে থাকে। কর্মের ফল মেটানো কারো নিজের বশে নয়, কিন্তু মূর্খতা দূর করা সম্পূর্ণ নিজের হাতে। যাকে দূর করা সম্ভব, সেই অজ্ঞতাকে দূর করার চেষ্টা না করে, পরিস্থিতি বদলানোর চেষ্টা করা—এক বিরাট ভুল। সেইজন্য নিজের বিবেকবোধকে প্রাধান্য দিয়ে এই অজ্ঞতা দূর করা উচিত এবং অনুকূল-প্রতিকূল অবস্থার সদ্ব্যবহার করে তার ঊর্ধ্বে উঠতে হয় অর্থাৎ সেগুলির সঙ্গ বর্জিত হতে হয়। কোনো পরিস্থিতির সঙ্গেই সম্পর্ক স্থাপন না করে তার সঠিক ব্যবহার করে অর্থাৎ যে অনুকূল পরিস্থিতিতে অপরের সেবা করে এবং প্রতিকূল পরিস্থিতি এলে দুঃখিত হয় না অর্থাৎ সুখের আশা করে না, সে সহজেই সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে।

যে প্রতিকূল পরিস্থিতি মানুষ কখনো আশা করে না, সেগুলি পূর্বকৃত অশুভ (পাপ) কর্মের ফলেই হয়ে থাকে। তাই পাপকর্ম করাই উচিত নয়। কারো কষ্ট হয়, স্বপ্নেও তেমন কাজ করা উচিত নয়। বর্তমান সময়ে পাপাদি (নতুন) কর্ম না করলেও পুরানো পাপ-কর্মের ফলস্বরূপ যখন প্রতিকূল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তখন অন্তরে চিন্তা, শোক, ভয় ইত্যাদিও এসে উপস্থিত হয়। এর কারণ হল চিন্তা ও শোককে আমরা বেশি ঘনিষ্ঠ বলে মনে ধরে রেখেছি। যেমন, বিক্রিত গাভী পুরানো পরিচিত স্থানে বারংবার ফিরে আসে। তাকে প্রতিবার নতুন স্থানে পৌঁছে দিতে দিতে তবেই সে পুরানো স্থানে আসা বন্ধ করে। তেমনি আজ এই মুহূর্তে দৃঢ়ভাবে বিচার করতে হবে যে, এই সমস্ত (পরিবর্তনশীল-উৎপত্তি বিনাশশীল) পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে চিন্তা বা শোক করা ভুল, এই ভুল আমরা আর করব না, তাহলেই এই সমস্ত চিন্তা ও শোকের পথ রুদ্ধ হবে।

বিবেক পূর্ণরূপে জাগ্রত না হলেও কর্মযোগীর এরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি থাকে যে, যা নিজের নয় তার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করা এবং জাগতিক সুখভোগ না করে কেবলমাত্র সেবা করা উচিত। এই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির জন্যই তাঁর অন্তরে জাগতিক সুখের গুরুত্ব থাকে না। তাই 'ভোগেই সুখ নিহিত'—এই ভ্রমে তাঁকে আর কেউ আবদ্ধ করতে পারে না। সুতরাং এই একটি বিশ্বাসে অটল থাকলেই তাঁর কল্যাণ হয়। সৎসঙ্গ এবং স্বাধ্যায় দ্বারা এই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি শক্তিলাভ করে। সুতরাং প্রত্যেক সাধককেই অন্তত এইরূপ কল্যাণকারী নিশ্চয়তা অবশ্যই দৃঢ়তার সঙ্গে ধারণ করতে হয়। এরূপ নিশ্চয়তা ধারণে সকলেই স্বাধীন, পরাধীন কেউই নয়। কারো বিন্দুমাত্র সাহায্য ছাড়াই এটি করা সম্ভবপর হয়, কারণ এতে সে পুরোপুরি সক্ষম।

❋ ❋ ❋

[১]সুনহু ভরত ভাবী প্রবল বিলখি কহেউঁ মুনিনাথ। হানি লাভু জীবনু মরনু জসু অপজসু বিধি হাথ॥
(শ্রীরামচরিতমানস ২। ১৭১)

সম্বন্ধ— 'সৃষ্টির আদিতে সূর্যকে আমিই উপদেশ দিয়েছিলাম এবং সেই আমিই আজ তোমায় উপদেশ দিচ্ছি'—এটি শুনে অর্জুনের মনে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগ্রত হল যে, 'যিনি আমার সামনে উপস্থিত, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টির প্রারম্ভে কী করে সূর্যকে উপদেশ দিলেন ?' সেই ব্যাপারটি ভালোভাবে বোঝার জন্যই অর্জুন পরবর্তী শ্লোকে ভগবানকে প্রশ্ন করছেন।

অর্জুন উবাচ

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি॥ ৪ ॥

[**ভবতঃ, জন্ম** (আপনার জন্ম) ; **অপরম্** (এখন হয়েছে) ; **বিবস্বতঃ, জন্ম** (সূর্যের জন্ম হয়েছে) ; **পরম্** (অনেক আগে); **ত্বম্** (আপনিই) ; **আদৌ** (সৃষ্টির আদিতে) ; **এতৎ** (এই যোগ) ; **প্রোক্তবান্** (বলেছিলেন) ; **ইতি** (একথা) ; **কথম্** (কী করে) ; **বিজানীয়াম্** (বুঝব ?)]

অর্জুন বললেন, 'আপনার জন্ম তো এখন হয়েছে আর সূর্যের জন্ম হয়েছে অনেক আগে, সুতরাং আপনিই যে সৃষ্টির আদিতে এই যোগ সম্বন্ধে সূর্যকে বলেছিলেন—তা আমি কী করে বুঝব ?' ॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা—'অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ'— 'কিছুকাল আগে (আপনি) শ্রীবসুদেবের গৃহে জন্মগ্রহণ করেছেন, কিন্তু সূর্যের জন্ম হয়েছে সৃষ্টির প্রারম্ভে। তাহলে আপনি কী করে সূর্যকে কর্মযোগ সম্বন্ধে বললেন ?'

অর্জুনের এই প্রশ্নটিতে তর্ক অথবা আক্ষেপ নেই, আছে শুধু জিজ্ঞাসা। তিনি ভগবানের জন্ম-সম্পর্কিত রহস্যটি সহজভাবে বোঝার জন্যই প্রশ্নটি করেছেন। কারণ ভগবানের জন্ম-রহস্য স্বয়ং ভগবানই উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম।

'কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি'— 'আপনিই যে সৃষ্টির আদিতে উপদেশ দিয়েছিলেন তা কেমন করে জানব ?' অর্জুনের এই প্রশ্নটির তাৎপর্য হল এই যে, সূর্যকে উপদেশ দেওয়ার পর সূর্যবংশের (মনু, ইক্ষ্বাকু আদি) কয়েক পুরুষ অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু আপনি অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করেছেন কিছুদিন পূর্বে। সুতরাং সৃষ্টির আদিতে আপনি কীভাবে সূর্যকে উপদেশ দিয়েছিলেন—এই কথাটি আমি ভালোভাবে বুঝতে চাই। সূর্য এখনও বিদ্যমান, তাঁকে এখনও উপদেশ দেওয়া সম্ভব কিন্তু আপনি সূর্যকে উপদেশ দেবার পরে সূর্যবংশের উত্তরাধিকারীদের বর্ণনাও করেছেন, যাতে প্রমাণিত হয় যে সূর্যকে আপনি এখন কোনো উপদেশ দেননি। তাহলে কল্পের প্রারম্ভে কী করে আপনি সূর্যকে উপদেশ দিয়েছিলেন ?

※ ※ ※

সম্বন্ধ—অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে নিজ অবতার-রহস্য প্রকটিত করার জন্য ভগবান প্রথমে নিজ সর্বজ্ঞতার দিক্‌দর্শন করিয়েছেন।

শ্রীভগবানুবাচ

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥ ৫ ॥

[**পরন্তপ** (হে পরন্তপ) ; **অর্জুন** (অর্জুন !) ; **মে, চ, তব** (আমার এবং তোমার) ; **বহূনি, জন্মানি** (বহু জন্ম) ; **ব্যতীতানি** (অতীত হয়েছে) ; **অহম্** (আমি) ; **তানি, সর্বাণি** (সেইসব) ; **বেদ** (জানি) ; **ত্বম্** (তুমি) ; **ন, বেত্থ** (জান না।)]

শ্রীভগবান বললেন—হে পরন্তপ অর্জুন ! আমার এবং তোমার বহু জন্ম অতীত হয়েছে। আমি সে সব জানি, কিন্তু তুমি জান না ॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা—তৃতীয় শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে তাঁর ভক্ত এবং প্রিয় সখা বলে জানিয়েছিলেন, তাই আগের শ্লোকে অর্জুন নিঃসঙ্কোচে নিজ হৃদয়ের কথা জিজ্ঞাসা করেছেন। অর্জুনের মনে ভগবানের জন্ম-রহস্য জানার প্রবল আগ্রহ হয়েছিল, সেইজন্য বন্ধুত্বের খাতিরে ভগবান অর্জুনের কাছে তাঁর জন্ম-রহস্য প্রকাশিত করেছেন। নিয়মই হচ্ছে এই যে, শ্রোতার জানার প্রবল আগ্রহ থাকলে বক্তা কিছু গোপন করতে পারেন না। সেইজন্যই সাধু-মহাত্মাগণও তাঁদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিদের কাছে নিজেকে প্রকাশিত করেন[১]—

গূঢ়উ তত্ত্ব ন সাধু দুরাবহিঁ।
আরত অধিকারী জহঁ পাবহিঁ॥

(শ্রীরামচরিতমানস ১।১১০।১)

'বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন'—তোমার এবং আমার অনেক জন্ম অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু আমার জন্ম এক প্রকারের (যার বর্ণনা পরবর্তী ষষ্ঠ শ্লোকে আছে) এবং তোমার (জীবের) জন্ম অন্য প্রকারের (যার বর্ণনা অষ্টম অধ্যায়ের উনিশ এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ের একুশ ও ছাব্বিশ সংখ্যক শ্লোকে করা হয়েছে)। তাৎপর্য হল যে, আমার এবং তোমার অনেকবার জন্ম হলেও তা পৃথক প্রকারের।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে, 'আমি (ভগবান) এবং তুমি এবং এই রাজন্যবর্গ (জীব) যে প্রথমে ছিলাম না বা পরেও থাকব না—এমন নয়।' তাৎপর্য হল যে, ভগবান এবং তাঁর অংশ জীবাত্মা—দুই-ই অনাদি এবং নিত্য।

'তান্যহং বেদ সর্বাণি'—জগতে এরূপ 'জাতিস্মর' জীবও দেখা যায়, যাঁদের পূর্বজন্মের জ্ঞান থাকে। তদ্রূপ যাঁরা সাধনা করে সিদ্ধ হন, সেই মহাপুরুষদের 'যুঞ্জান যোগী' বলা হয়। সাধনা করতে করতে এঁদের বৃত্তি এমনই শক্তি অর্জন করে যে যেখানেই এই বৃত্তি স্থাপন করা হয়, সেখানকারই জ্ঞান তাঁরা অর্জন করেন। এরূপ যোগীরা নিজেদের বিগত কিছু জন্মের কথা জানতে পারেন, সমস্ত জন্মের নয়। এর বিপরীত হলেন 'যুক্তযোগী' ভগবান স্বয়ং। যিনি সাধনা ব্যতিরেকেই স্বতঃসিদ্ধ নিত্যযোগী। জন্মান্তরগুলি জানার জন্য তাঁকে বৃত্তি ব্যবহার করতে হয় না, তিনি তাঁর নিজের এবং জীবগণের সমস্ত জন্ম-জন্মান্তর সম্পর্কে স্বভাবতঃই সর্বদা অবহিত থাকেন। তাঁর জ্ঞানে অতীত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানে কোনো পার্থক্য নেই, তাঁর অখণ্ড জ্ঞানে সবকিছুই নিত্য বর্তমান থাকে (গীতা ৭।২৬)। কারণ ভগবান সমস্ত দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, পরিস্থিতি ইত্যাদিতে পূর্ণরূপে অবস্থান করেও সর্বতোভাবে এগুলির অতীত।

['আমি ওই সবগুলি জানি'—ভগবানের এই বাক্যে সাধকদের এই ভেবে আনন্দিত হওয়া উচিত যে, 'আমরা ভগবানের গোচরে রয়েছি, ভগবান সব সময় আমাদের দেখছেন। আমরা যাই হই না কেন, ভগবানের জানার মধ্যেই আছি।']

'ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ'—জন্ম সম্বন্ধে না জানার প্রধান কারণ হল—হৃদয়ে বিনাশশীল বস্তুর আকর্ষণকে প্রাধান্য দেওয়া। এইজন্যই মানুষের জ্ঞান বিকশিত হয় না। অর্জুনের হৃদয়ে বিনাশশীল বস্তু এবং ব্যক্তিদের গুরুত্ব ছিল, সেইজন্যই তিনি আত্মীয় বধে ভীত হয়ে যুদ্ধ করতে রাজি হচ্ছিলেন না। প্রথম অধ্যায়ের তেত্রিশতম শ্লোকে অর্জুন বলেছিলেন 'যাদের জন্য আমাদের রাজ্য, ভোগ এবং সুখের আকাঙ্ক্ষা, সেই আত্মীয়গণই প্রাণ এবং সম্পত্তির আশা ত্যাগ করে যুদ্ধে উপস্থিত'—এতে প্রমাণিত হয় যে অর্জুন রাজ্য, ভোগ এবং সুখ কামনা

---

[১]সাধু-মহাত্মাগণও গোপনে অবস্থান করেন, সকলের কাছে আত্মপ্রকাশ করেন না। কিন্তু নিম্নোক্ত তিনটি ক্ষেত্রে তাঁরা নিজেদের প্রকাশ করেন—

ক) যখন অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল কেউ মহাপুরুষের সম্মুখীন হন এবং তিনি ওই মহাপুরুষের সম্বন্ধে জানতে তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন।

খ) যখন তাঁর কোন ভক্তের প্রাণত্যাগের সময় হয়।

গ) যখন সাধু-মহাত্মার নিজ প্রাণত্যাগের সময় হয়।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সময়ে মহাপুরুষগণ অন্য ব্যক্তির কাছেও নিজেকে প্রকাশিত করেন, যিনি হয়ত ততো শ্রদ্ধাশীল নন, কিন্তু তিনি ওই মহাপুরুষকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসেন এবং তাঁর সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী।

করতেন। অতএব বিনাশশীল পদার্থের কামনা থাকায় তিনি তাঁর পূর্বজন্মের কথা জানতেন না।

মমতা ও আসক্তিপূর্বক নিজের সুখভোগ ও আরামের জন্য অর্থ ইত্যাদি বস্তু সংগ্রহ করাকে 'পরিগ্রহ' বলা হয়। পরিগ্রহ সর্বতোভাবে ত্যাগ করা অর্থাৎ নিজের সুখ, আরাম ইত্যাদির জন্য কোনো বস্তু সংগ্রহ না করাকেই 'অপরিগ্রহ' বলা হয়। অপরিগ্রহ দৃঢ়তর হলে পূর্বজন্মের জ্ঞান হয়ে থাকে—

'অপরিগ্রহস্থৈর্যে জন্মকথন্তাসংবোধঃ।'

(পাতঞ্জল যোগদর্শন ২।৩৯)

সংসার (ক্রিয়া এবং পদার্থ) সর্বদা পরিবর্তনশীল এবং অসৎ। তাই তা নিশ্চিতভাবে অনস্তিত্ব হয়। এই অনস্তিত্ব সম্পন্ন জগৎ-সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার জন্যই মানুষ নিজের মধ্যে অভাব অনুভব করতে থাকে। অভাব অনুভব হওয়ায় তার মধ্যে এরূপ কামনা উৎপন্ন হয় যে, ওই অভাব যেন পূরণ হয় এবং আরও কিছু প্রাপ্তি ঘটে। সেই কামনার পূরণের জন্যই সে দিনরাত ব্যাপৃত থাকে। কিন্তু কামনা পূর্ণ হবার নয়। তবুও কামনার জন্যই মানুষ কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। সুতরাং এই সব মানুষের অন্যান্য জন্মের জ্ঞান তো দূরের কথা, ইহজন্মের কর্তব্য-জ্ঞানও (কী করছি আর কী করা উচিত) হয় না।

* * *

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকটিতে ভগবান বলেছেন, 'আমার এবং তোমার অনেক জন্ম অতীত হয়েছে।' এবার পরবর্তী শ্লোকে ভগবান তাঁর (অবতার) জন্মের বিশেষত্ব জানাচ্ছেন।

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥ ৬ ॥

[**অজঃ** (জন্মরহিত) ; **অব্যয়াত্মা** (অবিনশ্বর) ; **সন, অপি** (হয়েও) ; **ভূতানাম্** (সমস্ত প্রাণীকুলের) ; **ঈশ্বরঃ** (ঈশ্বর) ; **সন, অপি** (হওয়া সত্ত্বেও) ; **স্বাম্, প্রকৃতিম্** (নিজ প্রকৃতিকে) ; **অধিষ্ঠায়** (বশীভূত করে) ; **আত্মমায়য়া** (যোগমায়ায়) ; **সম্ভবামি** (আবির্ভূত হই।)]

আমি জন্মরহিত, অবিনশ্বর হয়েও এবং সমস্ত প্রাণীকুলের ঈশ্বর হওয়া সত্ত্বেও নিজ প্রকৃতিকে অধীন করে যোগমায়া দ্বারা আবির্ভূত হই ॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা—এটি ষষ্ঠ শ্লোক এবং এতে ছটি কথা বলা হয়েছে। অজ, অব্যয় এবং ঈশ্বর—এগুলি ভগবানের সম্বন্ধে প্রযোজ্য[১], প্রকৃতি এবং যোগমায়া—এই দুটি ভগবানের শক্তির বিষয় এবং আর একটি হল ভগবানের

[১]গীতায় ভগবান তাঁর অজ, অব্যয় এবং ঈশ্বর—এই তিনটি রূপ জানা ও না জানার কথা বলেছেন ; যেমন—

(ক) 'অজ' স্বরূপকে জানার কথা—

যো মামজমনাদি চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্। অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্যেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ (১০।৩)

অজ স্বরূপকে না জানার কথা—

মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥ (৭।২৫)

(খ) 'অব্যয়' স্বরূপকে জানার বিষয়—

ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্॥ (৯।১৩)

অব্যয় স্বরূপকে না জানার বিষয়—

পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥ (৭।২৪)

(গ) 'ঈশ্বর' স্বরূপকে জানার কথা—

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্। সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥ (৫।২৯)

ঈশ্বর স্বরূপকে না জানার কথা—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্। পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ (৯।১১)

আবির্ভূত হওয়ার কথা।

'অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা'—এই পদটিতে ভগবান জানাচ্ছেন যে, তাঁর জন্ম সাধারণ মানুষদের মতো নয় এবং তাঁর মৃত্যুও সাধারণ মানুষদের মতো নয়। 'মানুষ জন্মগ্রহণ করে এবং মারা যায় কিন্তু আমি জন্মরহিত হয়েও আবির্ভূত হই এবং অবিনশ্বর হয়েও অন্তর্ধান করে থাকি। আবির্ভূত হওয়া এবং অন্তর্হিত হওয়া—দুটিই আমার অলৌকিক লীলা।'

সমস্ত প্রাণী জন্মের পূর্বে অপ্রকট (অব্যক্ত) রূপে থাকে এবং মৃত্যুর পরেও অপ্রকট (অব্যক্ত) হয়ে যায়। কেবল মধ্যবর্তী সময়েই প্রকট (ব্যক্ত) থাকে (গীতা ২।২৮)। কিন্তু ভগবান সূর্যের মতো সদাই প্রকটিত। এর তাৎপর্য হল এই যে, সূর্য উদয় হওয়ার আগে যেমন থাকে, অস্ত যাবার পরেও তেমনই থাকে অর্থাৎ সূর্য সদা বিরাজমান। কিন্তু স্থান বিশেষের ব্যক্তিদের কাছে এটির উদয় ও অস্ত পরিলক্ষিত হয়। তেমনি ভগবানের আবির্ভাব ও অন্তর্ধান মানুষের দৃষ্টিতেই হয়, প্রকৃতপক্ষে ভগবান সর্বদা বিরাজমান।

অন্যান্য প্রাণী যেমন কর্মের ফল স্বরূপ জন্মগ্রহণ করে, ভগবানের সেরূপ জন্ম হয় না। কর্মের ফল রূপে জন্ম হলে দুটি ব্যাপার থাকে—আয়ু এবং সুখ বা দুঃখভোগ। ভগবানের এই দুটির কোনোটাই হয় না।

অন্যান্য ব্যক্তি জন্মাবার পর প্রথমে বালক অবস্থা ও পরে যুবাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তারপর বৃদ্ধাবস্থা আসে এবং তার মৃত্যু হয়। কিন্তু ভগবানের এরূপ পরিবর্তন হয় না। তিনি অবতাররূপে এসে বাল্যলীলা করেন এবং কিশোর বয়স (পনেরো বছর) পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবার লীলা করেন। কিশোর বয়সে পৌঁছে তিনি সেই অবস্থাতেই থেকে যান। বহু বৎসর পার হলেও তিনি সেই সুন্দর স্বরূপেই বিরাজ করতে থাকেন। সেইজন্য ভগবানের যত চিত্র দেখা যায়, তাতে তাঁর শ্বশ্রূ-গুম্ফ দেখা যায় না (এখন যদি কেউ এঁকে দেয়, সেটা পৃথক ব্যাপার)। যাই হোক, অন্য প্রাণীদের মতো ভগবানের জন্ম হয় না, পরিবর্তন হয় না বা মৃত্যুও হয় না।

'ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্'—প্রাণীদের ঈশ্বর (নিয়ন্তা) হয়েও তিনি অবতারপর্বে সাধারণ বালকের রূপ ধারণ করেন। কিন্তু বালকরূপ ধারণ করলেও তাঁর ঈশ্বর ভাবের (নিয়ন্ত্রণ শক্তির) কোনো ব্যত্যয় হয় না। যেমন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মাত্র ছয়দিন বয়সেই পুতনা রাক্ষসীকে বধ করেছিলেন। পুতনার দেহের বিস্তার ছিল আড়াই যোজন এবং সে ছিল মহা ভয়ঙ্কর রাক্ষসী। শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে ঈশ্বরত্ব না থাকলে পুতনা রাক্ষসীর সংহার সম্ভব হোত কি? মাত্র তিনমাস বয়সে ভগবান শকটাসুরকে, এক বছর বয়সে তৃণাবর্তকে এবং পাঁচ বছর বয়সে অঘাসুরকে বধ করেন। এইভাবে বাল্যাবস্থাতেই ভগবান অনেক রাক্ষস সংহার করেন। সাত বছর বয়সে তিনি মাত্র এক আঙুলে গোবর্ধন পর্বতকে ধারণ করেন!

সমস্ত প্রাণীর ঈশ্বর হওয়া সত্ত্বেও ভগবান অবতাররূপে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে যান এবং যে কোনো সামান্য কাজও করে থাকেন। এখানেই বাস্তবিক ভগবানের ভগবত্তা। ভগবান অর্জুনের অশ্বের চালক হয়েছেন এবং তাঁর নির্দেশ পালন করছেন, তা সত্ত্বেও ভগবানের অর্জুন এবং অন্যান্য প্রাণীদের ওপর ঈশ্বরভাবের প্রভাব একই প্রকার আছে। সারথি হয়েও তিনি অর্জুনকে গীতার মহৎ উপদেশ দিয়েছিলেন। ভগবান শ্রীরাম পিতার আদেশ অমান্য না করে চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাসে গিয়েছিলেন, তা সত্ত্বেও ভগবানের দশরথ বা অন্যান্য প্রাণীদের ওপর ঈশ্বরভাবের প্রভাব একই প্রকার ছিল।

'প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায়'—সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ—এই তিনটি গুণের থেকে যেটি পৃথক, তাই হচ্ছে ভগবানের শুদ্ধ প্রকৃতি। এই শুদ্ধ প্রকৃতি হল ভগবানের স্বকীয় সচ্চিদানন্দঘনস্বরূপ। একে বলা হয় সন্ধিনী শক্তি, সংবিৎ শক্তি এবং আহ্লাদিনী শক্তি[১]। একেই চিন্ময় শক্তি, কৃপাশক্তি ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। শ্রীশ্রী রাধা[২],

[১]সন্ধিনী শক্তি হল 'সৎ'-স্বরূপা, সংবিৎ-শক্তি 'চিৎ'-স্বরূপা এবং আহ্লাদিনী শক্তি হল 'আনন্দ'-স্বরূপা।

[২]অবতরণের সময় ভগবান নিজ শুদ্ধ প্রকৃতিরূপ শক্তিকে আশ্রয় করে অবতরণ করে থাকেন এবং অবতাররূপে এই শক্তির দ্বারা কাজ করেন। শ্রীমতী রাধা ছিলেন ভগবানের শক্তি, তাঁর অনুগামিনী আরো অনেকে সখী ছিলেন, যাঁরা ভক্তিরূপা এবং ভক্তি প্রদানকারী হয়ে বিরাজ করতেন। যারা ভক্তিহীন তারা এঁদের সম্পর্কে জানতে পারে না। এঁদের জানা সম্ভব হয় এঁদের (ভগবান এবং শ্রীমতী রাধার) কৃপাতেই।

শ্রীশ্রী সীতা প্রভৃতি এই শক্তি রূপেরই প্রকাশ। ভগবানকে লাভ করার 'ভক্তি' এবং 'ব্রহ্মবিদ্যা'ও তাই।

প্রকৃতি হল ভগবানের শক্তি। যেমন অগ্নিতে দুটি শক্তি থাকে—প্রকাশ করার শক্তি এবং দাহিকা শক্তি। প্রকাশিকা-শক্তি অন্ধকার নাশ করে এবং ভয় দূর করে। দাহিকা-শক্তি দগ্ধ করে এবং শীত দূর করে। এই দুটি শক্তি অগ্নি হতে ভিন্নও নয়, অভিন্নও নয়। এইজন্য ভিন্ন নয় যে এগুলি অগ্নিময় অর্থাৎ এগুলিকে অগ্নি হতে পৃথক করা সম্ভব নয়। আর অভিন্ন নয় এইজন্য যে অগ্নি থাকলেও মন্ত্র, ঔষধ ইত্যাদির দ্বারা অগ্নির দাহিকা শক্তিকে সঙ্কুচিত করা যায়। এইরূপেই ভগবানের যে শক্তি তা ভগবানের থেকে ভিন্ন না অভিন্ন—কোনোটিই বলা সম্ভব নয়।

দেশলাইতে যেমন অগ্নির সত্তা সর্বদা বিরাজমান, কিন্তু তার প্রকাশিকা এবং দাহিকা উভয় শক্তিই সুপ্ত থাকে ; তেমনি ভগবানও সমস্ত দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদিতে সর্বদা বিরাজিত হলেও তাঁর শক্তি গুপ্তভাবে থাকে। সেই শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে অর্থাৎ নিজ বশে এনে তার দ্বারা ভগবান প্রকটিত হন। অগ্নি যেমন তার প্রকাশিকা এবং দাহিকা শক্তি সহ যতক্ষণ প্রকটিত না হয় ততক্ষণ সদা বর্তমান থেকেও দৃষ্টিগোচর হয় না, তেমনি যতক্ষণ ভগবান তাঁর শক্তি সহ প্রকটিত না হন, ততক্ষণ ভগবান সর্বদা বিরাজমান হলেও নয়নগোচর হন না।

রাধা, সীতা, রুক্মিণী প্রভৃতি সকলেই ভগবানেরই দিব্যশক্তি। ভগবান সাধারণভাবে সর্বত্র থাকলেও কোনো কর্ম করেন না। কোনো কর্ম যখন করেন তখন তাঁর দিব্যশক্তি সহকারেই করে থাকেন। সেই দিব্যশক্তি সহযোগে তিনি বিচিত্র লীলা করে থাকেন। তাঁর লীলা এতো বিচিত্র এবং অলৌকিক যে, তা শ্রবণ করে, গান করে এবং স্মরণ করেও জীব পবিত্র হয়ে উদ্ধার লাভ করতে সমর্থ হয়।

নির্গুণ-উপাসনাতে যে শক্তি 'ব্রহ্মবিদ্যা' বলে অভিহিত হয়, সগুণ-উপাসনাতে সেই শক্তিই 'ভক্তি' নামে অভিহিত হয়ে থাকে। জীব ভগবানেরই অংশ। সে যখন অন্যের ওপর থেকে মমত্ববোধ দূর করে শুধুমাত্র ভগবানেই স্বতঃসিদ্ধ প্রকৃত আত্মীয়তা জাগ্রত করে, তখন ভগবানের শক্তি তার মধ্যে ভক্তিরূপে প্রকটিত হয়। এই ভক্তির এমন বিশেষ ক্ষমতা থাকে যে তা নিরাকার ভগবানকেও সাকাররূপে প্রকটিত করায়, ভগবানকেও আকর্ষিত করে থাকে। এই ভক্তি ভগবানেরই প্রদত্ত।

ভগবানের ভক্তিরূপ শক্তির দুটি প্রকার হয়—বিরহ এবং মিলন। ভগবান বিরহ[১] প্রদান করেন, আবার মিলনও প্রদান করেন। ভগবান যখন বিরহ প্রদান করেন তখন ভক্ত ভগবানের অভাব বোধে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সেই ব্যাকুলতার আগুনে জগৎ-সংসারের আসক্তি পুড়ে ছাই হয়ে যায় এবং ভগবান প্রকটিত হন। জ্ঞানমার্গে প্রথমে প্রগাঢ় জিজ্ঞাসারূপে ভগবানের শক্তি কাজ করে (যার ফলে সাধক তত্ত্বগুলি সঠিক না জানা পর্যন্ত ক্ষান্ত হন না) এবং ব্রহ্মবিদ্যারূপে জীবের অজ্ঞানতা দূর করে তার বাস্তবিক স্বরূপ প্রকাশিত করে। কিন্তু ভগবানের সেই দিব্যশক্তি, ভগবান যা বিরহরূপে প্রেরণ করেন, সেটি এর থেকেও আরো বিশেষ। 'ভগবান কোথায় ?' 'আমি কী করব ?' 'কোথায় পাব ?'—ভক্ত এই কথা ভেবে ব্যাকুল হয়ে ওঠে, আর এই ব্যাকুলতা সমস্ত পাপ ভস্ম করে ভগবানকে সাকাররূপে প্রকটিত করে দেয়। ব্যাকুলতার দ্বারা যত শীঘ্র কার্য সিদ্ধি হয়, বিবেক-বিচারপূর্বক কৃত সাধনাতে তত নয়।

বিশেষ কথা

ভগবান নিজ প্রকৃতির সাহায্যে অবতাররূপ গ্রহণ করেন এবং নানাপ্রকার লীলা করে থাকেন। যেমন অগ্নি নিজে কিছু করে না, তার প্রকাশিকা শক্তি সবকিছু প্রকাশ করে এবং দাহিকা শক্তি দহন করে। তেমনই ভগবান নিজে কিছু করেন না, তাঁর দিব্যশক্তিই সমস্ত কাজ সম্পন্ন করে। শাস্ত্রে আছে যে সীতা বলেছেন—'রাবণ বধ ইত্যাদি সব

---

[১]সাধুদের বাণীতে আছে—'দরিয়া হরি কিরপা করী, বিরহা দিয়া পঠায়।' অর্থাৎ ভগবান কৃপা করে আমার জন্য বিরহ প্রেরণ করেছেন।

কাজ আমিই করেছি। শ্রীরাম কিছু করেননি।'

যেমন মানুষ আর তার বল (ক্ষমতা), তেমনই ভগবান এবং তাঁর শক্তি। এই শক্তি ভগবানের থেকে পৃথকও বলা যায় না, আবার একও বলা যায় না। মানুষের যে বলবত্তা, মানুষ সেটি পৃথক করে দেখাতে সক্ষম হয় না, সুতরাং সেটি তার থেকে পৃথক নয়। মানুষ (একইপ্রকার) থাকে, কিন্তু তার শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি হয়, তাই সেটি মানুষের সঙ্গে এক বা অচ্ছেদ্যও নয়। মানুষের সঙ্গে যদি সেটির একত্ব থাকত তবে সেটি স্বরূপের সঙ্গে চিরকাল একইপ্রকার থাকত, হ্রাস-বৃদ্ধি হোত না। সুতরাং ভগবান এবং তাঁর শক্তিকে ভিন্ন বা অভিন্ন কিছুই বলা যায় না। দার্শনিকগণও একে ভিন্ন বা অভিন্ন বলেননি। এই শক্তি অনির্বচনীয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপাসকগণ এই শক্তিকে রাধা নামে অভিহিত করেন।

নারী ও পুরুষ যেমন দুজন ভিন্ন, শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীশ্রী রাধা কিন্তু তেমন ভিন্ন বা দুই নয়। জ্ঞানে দ্বৈত অদ্বৈত হয়ে যায় অর্থাৎ দুই হয়েও এক হয়ে যায় আর ভক্তিতে অদ্বৈত দ্বৈত হয় অর্থাৎ এক হয়েও দুই রূপ হয়ে যায়। জীব এবং ব্রহ্ম এক (অভিন্ন) বোধ হলে 'জ্ঞান' হয় আবার একই ব্রহ্ম দুই রূপ ধারণ করলে 'ভক্তি' হয়ে যায়। একই অদ্বৈত তত্ত্ব প্রেমলীলা করার জন্য, প্রেম আস্বাদন করার জন্য সকল জীবকে প্রেমের আনন্দ দেবার জন্য কৃষ্ণ এবং রাধা—এই দুই রূপে প্রকটিত হয়েছেন [১]। দুটি রূপ হওয়া সত্ত্বেও দুজনের মধ্যে কে বড় এবং কে ছোট, কে প্রেমিক আর কে প্রেমাস্পদ, তা ধরাই যায় না। দুজনের ক্ষেত্রেই একজনকে অপরের থেকে বিশেষ বলে মনে হয়। দুজনেই একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকেন। রাধাকে দেখে ভগবান (শ্রীকৃষ্ণ) প্রসন্ন হন এবং ভগবানকে দেখে প্রীতা হন রাধা। দুজনের পরস্পরের প্রেমলীলায় রসবৃদ্ধি হয়। একেই বলা হয় 'রাস'।

ভগবানের শক্তি অনন্ত, অপার। তাঁর দিব্যশক্তিতে ঐশ্বর্য এবং মাধুর্য দুই-ই আছে। ঐশ্বর্য শক্তির দ্বারা ভগবান এরূপ বিচিত্র এবং মহৎ কর্ম করেন যা অন্য কেউ করতে সক্ষম নয়। ঐশ্বর্য শক্তির জন্য তাঁর মধ্যে যে মহত্ত্ব, বিশেষত্ব, অলৌকিকত্ব দেখা যায় তিনি ছাড়া আর কারো মধ্যে এটি দেখা বা শোনা যায় না। মাধুর্য শক্তিতে ভগবান তাঁর ঐশ্বর্য ভুলে যান। ভগবানকেও মোহিত করে যে মাধুর্য-শক্তি তাতে এক মধুরতা, মিষ্টতা থাকে, যার জন্য ভগবানকে এতো মধুর ও প্রিয় বলে মনে হয়। ভগবান যখন গোপবালকদের সঙ্গে খেলা করেন, এই মাধুর্য শক্তি তখন প্রকটিত হয়। ওই সময় ঐশ্বর্য শক্তি প্রকটিত হলে সমস্ত খেলাই পণ্ড হবে, গোপবালকগণ ভয় পাবে এবং খেলাও হবে না। এইভাবেই ভগবান কোথাও বন্ধুরূপে, কোথাও পুত্ররূপে এবং কোথাও স্বামীরূপে প্রকটিত হন। সেই সময় তাঁর ঐশ্বর্যশক্তি সুপ্ত হয়ে থাকে এবং মাধুর্য শক্তি প্রকটিত থাকে। অর্থাৎ ভগবান ভক্তের ভাব অনুযায়ী তাঁদের আনন্দ দেবার জন্যই নিজ ঐশ্বর্য গোপন করে মাধুর্য শক্তি প্রকটিত করে থাকেন।

যখন মাধুর্য শক্তি প্রকটিত থাকে তখন ঐশ্বর্য শক্তি প্রকাশ পায় না আবার যখন ঐশ্বর্য শক্তি প্রকটিত থাকে তখন মাধুর্য শক্তি প্রকাশ হয় না। ঐশ্বর্য শক্তি কেবলমাত্র তখনই প্রকটিত হয় যখন মাধুর্য ভাবের মধ্যে কোনো সন্দেহ উৎপন্ন হয়। যেমন মাধুর্য শক্তি প্রকাশ থাকা কালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবৎসকে খুঁজছিলেন, কিন্তু 'গোবৎসটি কোথায় গেল ?' এই সন্দেহ উদ্ভূত হতেই ঐশ্বর্যশক্তি প্রকটিত হল এবং ভগবান তৎক্ষণাৎ জেনে গেলেন যে ব্রহ্মা গোপনে গোবৎস নিয়ে গেছেন।

ভগবানে সৌন্দর্য শক্তিও থাকে, যার জন্য প্রাণীসকল তাঁতে আকৃষ্ট হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য দেখে মথুরা নিবাসী নারীগণ নিজেদের মধ্যে বলতে থাকেন—

---

[১]যেয়ং রাধা যশ্চ কৃষ্ণো রসাব্ধির্দেহশ্চৈকঃ ক্রীড়নার্থং দ্বিধাভূত্।

'রাধা আর এই কৃষ্ণ, রসের সাগর, তাঁরা আসলে অভিন্ন, লীলার জন্য দুই রূপ ধারণ করেছেন মাত্র।'

(শ্রীরাধাতাপনীয়োপনিষদ্)

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং
লাবণ্যসারমসমোর্ধ্বমনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ-
মেকান্তধাম যশসঃ প্রিয় ঐশ্বরস্য॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৪৪।১৪)

'ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রূপ সমস্ত সৌন্দর্যের সার, সৃষ্টিতে কোনো রূপই তাঁর রূপের সমান নয়। তাঁর রূপ সাজানো-গোছানো অথবা গহনা-কাপড় দ্বারা সজ্জিত নয়, এটি স্বয়ংসিদ্ধ। এই রূপ দেখে দেখে তৃপ্তি হয় না ; কেননা তিনি নিত্য নবীন। সমস্ত যশ, সৌন্দর্য এবং ঐশ্বর্য এই রূপকে আশ্রয় করে থাকে। এই রূপের দর্শন করা অত্যন্ত দুর্লভ। গোপিনীরা এমন কী যে তপস্যা করেছিলেন জানি না, যে তাঁরা তাঁদের দুই চক্ষু ভরে সর্বদা এই অপরূপ রূপ-মাধুরী পান করে থাকেন।'

শুকদেব বলেছেন—

নিরীক্ষ্য তাবুত্তমপূরুষৌ জনা
মঞ্চস্থিতা নাগররাষ্ট্রকা নৃপ।
প্রহর্ষবেগোৎকলিতেক্ষণাননাঃ
পপুর্ণ তৃপ্তা নয়নৈস্তদাননম্॥
পিবন্ত ইব চক্ষুর্ভ্যাং লিহন্ত ইব জিহ্বয়া।
জিঘ্রন্ত ইব নাসাভ্যাং শ্লিষন্ত ইব বাহুভিঃ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৪৩।২০-২১)

'হে পরীক্ষিৎ ! মঞ্চের উপর যাঁরা বসেছিলেন, সেই মথুরার নাগরিকবৃন্দ এবং রাষ্ট্রের জনগণ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীবলরামকে দেখে এত প্রসন্ন হলেন যে তাঁদের চক্ষু ও মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হল এবং উৎকণ্ঠায় ভরে গেল। তাঁরা শুধুমাত্র চক্ষু দ্বারা তাঁদের মুখের রূপমাধুরী পান করে তৃপ্ত হচ্ছিলেন না, তাঁরা চক্ষু দ্বারা তো সেবন করছিলেন, জিহ্বা দ্বারাও যেন লেহন করছিলেন, নাসিকা দ্বারা শোঁকছিলেন এবং বাহু দ্বারা যেন আকর্ষণ করে হৃদয়ে মিশিয়ে রাখছিলেন!'

ভগবান শ্রীরামের সৌন্দর্য অবলোকন করে বিদেহ রাজা জনকও বিদেহ অর্থাৎ দেহবুদ্ধি রহিত হয়েছিলেন—

মূরতি মধুর মনোহর দেখী।
ভয়উ বিদেহু বিদেহু বিসেষী।
(শ্রীরামচরিতমানস ১।২১৫।৪)

এবং বলেছেন—

সহজ বিরাগরূপ মনু মোরা।
থকিত হোত জিমি চন্দ চকোরা॥
(শ্রীরামচরিতমানস ১।২১৬।২)

বনে বসবাসকারী কোল ভীলও ভগবানের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়—

করহিঁ জোহারু ভেঁট ধরি আগে।
প্রভুহি বিলোকহিঁ অতি অনুরাগে॥
চিত্র লিখে জনু জহঁ তহঁ ঠাঢ়ে।
পুলক সরীর নয়ন জল বাঢ়ে॥
(শ্রীরামচরিতমানস ২।১৩৫।৩)

প্রেমিকদের কথা আর কী বলা যায়, শত্রুভাবাপন্ন রাক্ষস খর-দূষণও ভগবানের মূর্তির সৌন্দর্য দেখে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে বলতে থাকেন—

নাগ অসুর সুর নর মুনি জেতে।
দেখে জিতে হতে হম কেতে॥
হম ভরি জন্ম সুনহু সব ভাঈ।
দেখী নহিঁ অসি সুন্দর তাঈ॥
(শ্রীরামচরিতমানস ৩।১৯।২)

অর্থাৎ ভগবানের দিব্য সৌন্দর্য দেখে প্রেমিক, বৈরাগী, জ্ঞানী, মূর্খ, শত্রু, অসুর এবং রাক্ষস পর্যন্ত সকলের মন আকৃষ্ট হয়ে যায়।

'সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া'—যে ব্যক্তি ভগবানে বিমুখ হয়ে থাকে, তার কাছে ভগবান নিজ যোগমায়ায় আবৃত হয়ে সাধারণ ব্যক্তির মতো দেখা দেন। মানুষ যখনই তাঁর শরণাগত হতে আরম্ভ করে, ভগবান তখনই তার কাছে প্রকটিত হতে থাকেন। এই যোগমায়ার আশ্রয়ে থেকেই ভগবান নানা বিচিত্র লীলা করে থাকেন।[১]

---

[১]যোগমায়ার আশ্রয় নিয়েই ভগবান রাসলীলা করেন—

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শরদোৎফুল্লমল্লিকাঃ। বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।২৯।১)

ভগবদ্‌বিমুখ মূর্খ ব্যক্তিদের সামনে দুটি আচ্ছাদন থাকে—একটি হল তাদের অজ্ঞতার আর অপরটি হল ভগবানের যোগমায়ার আচ্ছাদন (গীতা ৭।২৫)। নিজ অজ্ঞতার জন্য ভগবানের প্রভাব সামনে প্রকাশিত হলেও তা তারা অনুধাবন করতে পারে না ; যেমন—দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করার জন্য দুঃশাসন তার সমস্ত বল প্রয়োগ করেছিল, কিন্তু সে ক্লান্ত হয়ে পড়লেও শাড়ির অন্ত হয়নি—

দ্রুপদ সুতা নিরবল ভই তা দিন,
তজি আয়ে নিজ ধাম।
দুস্‌সাসন কী ভুজা থকিত ভঈ,
বসন-রূপ ভএ স্যাম॥

এইভাবে সভার মধ্যে ভগবান তাঁর ঐশ্বর্য প্রকটিত করেছিলেন। কিন্তু অজ্ঞতাবশতঃ দুঃশাসন, দুর্যোধন, কর্ণ প্রমুখের ওপর এর কোনো প্রভাব পড়েনি, —দ্রৌপদী ভগবানকে আহ্বান করামাত্র তিনি কিরূপ বিশেষভাবে প্রকটিত হলেন ! একটি নারীর বস্ত্র হরণই করতে পারলো না তাহলে আর তারা কী করতে পারে !—এই অসামর্থ্যের দিকে তাদের লক্ষ্যই গেল না। ভগবানের প্রভাব সামনে দেখেও তারা সেটি সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়নি।

জীব যদি নিজ মূঢ়তা (অজ্ঞান) দূর করে তাহলে তার নিজ স্বরূপ অথবা পরমাত্মতত্ত্ব বোধ হলেও, ভগবানের দর্শন হয় না[১]। ভগবানের দর্শন লাভ তখনই সম্ভব, যখন তিনি তাঁর যোগমায়ার আবরণ সরিয়ে দেন। মানুষ নিজ অজ্ঞানতা চেষ্টা দ্বারা দূর করতে সক্ষম হলেও যোগমায়ার বাধা দূর করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হলে ভগবান তাঁর শক্তি দ্বারা মানুষের অজ্ঞানতা দূর করতে পারেন এবং দর্শনও দিতে থাকেন।

ভগবান তাঁর সমস্ত লীলাই যোগমায়ার আশ্রয় নিয়ে করে থাকেন। সেইজন্যই তাঁর লীলা দেখা যায় ও অনুভব করতে পারা যায়। তিনি যদি যোগমায়ার সাহায্য না নেন তবে তাঁর লীলা কারো পক্ষে দেখা বা আস্বাদন করা সম্ভবই হয় না।

অবতার সম্পর্কিত বিশেষ কথা

অবতার-এর অর্থ হল—অবতরণ করা। সর্বত্র পরিব্যাপ্ত সচ্চিদানন্দরূপ পরমাত্মা তাঁর অনন্য ভক্তদের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য তাঁর অত্যধিক কৃপাবশে স্থান-বিশেষে অবতাররূপ গ্রহণ করেন এবং সাধারণের মতো হয়ে যান। অন্যান্য ব্যক্তিদের প্রভাব বা মহত্ত্ব তো বড় হলে হয়, কিন্তু ভগবানের প্রভাব বা মহত্ত্ব সাধারণ অবস্থাতেও সেইরূপই প্রভাবশালী হয়। কারণ অপার, অসীম, অনন্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি অতি সাধারণের মতো দেখান—এই হচ্ছে তাঁর বিশেষত্ব। যেমন, ভগবান অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করলেও, একটি পর্বত ধারণ করায় তিনি 'গিরিধারী' নামে প্রসিদ্ধ হলেন। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর প্রতিটি রোমকূপে অবস্থিত[২] সেই পরমেশ্বর একটিমাত্র পর্বতকে তুলবেন এটি বিরাট কিছু নয় ; কিন্তু এই সাধারণ বিষয়েও ভগবানের বিশেষত্ব দেখা যায়। এইরূপ অবতার রূপ ধারণ করাতেই ভগবানের বিশেষত্ব।

সাধারণ মানুষ যেখানে যেরূপ ব্যবহার করে, সেই স্থানে ভগবানও সেইরূপই লীলা করেন। বাল্যে একেবারে সাধারণ বালকের মতো আচরণ করেন। গোপবালক-গণের সঙ্গে খেলার সময় অন্য বালকদের কাছে হার মানেন। যে গোপবালক জয়ী হয় সে অশ্বারোহী সাজে এবং ভগবান ঘোড়ার সাজ নেন। এই হল তাঁর বিশেষ মহত্ত্ব।

ভগবানের মহিমা যাঁরা জানেন সেই জ্ঞানী মহাত্মাগণ

---

[১]নিজ স্বরূপ বোধ হলেই যে ভগবানের দর্শন হবে—এমন কোন নিয়ম নেই। কিন্তু তাঁর দর্শন হলে স্বরূপ বোধ হয়ে যায়। তাই ভগবান বলেছেন—

মম দরসন ফল পরম অনূপা। জীব পাব নিজ সহজ সরূপা॥ (শ্রীরামচরিতমানস ৩।৩৬।৬)

[২]রোম রোম প্রতি লাগে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড (শ্রীরামচরিতমানস ১।২০১)

তাঁর স্বরূপাস্বাদনে মত্ত হয়ে থাকেন ; কিন্তু ভক্তদের তাঁর এই সাধারণ অজ্ঞ বালকের মতো অবোধ আচরণ অত্যন্ত বিচিত্র ও মধুর বলে মনে হয়। এটি জ্ঞানীদের জ্ঞানের গণ্ডির অতীত। জ্ঞানীদের শিরোমণি ব্রহ্মাও ভগবানের লীলা দেখে আশ্চর্যান্বিত হন ! বড়ো বড়ো মুনি-ঋষি, যোগী-তপস্বী, সাধু-মহাত্মাও তাঁর লীলারহস্য জানতে পারেন না এবং এই বিষয়ে হতবাক্ হন । ভগবান কৃপা করে তাঁর যে সব প্রিয় অন্তরঙ্গ ভক্তকে জানাতে চান, শুধু তাঁরাই তাঁর এই লীলার তত্ত্ব জানতে পারেন—**'সোই জানই জেহি দেহু জনাঈ'** (শ্রীরামচরিতমানস ২।১২৭।২)। গোচারণকালে গোপবালকদের সঙ্গে খেলার সময়ও ভগবান অনেক বড় বড় দুঃসাধ্য কার্য সমাধা করেছেন। অনেক বড় রাক্ষসও এককথায় বধ করেছেন। ছোট বালকের রূপে থাকলেও তাঁর প্রভাব তেমনই ছিল।

কোনো বিদ্বান ব্যক্তি যেমন ছোট বালককে বর্ণমালা শেখাবার সময় তার হাত ধরে তাকে 'ক খ গ .....' লেখান এবং মুখে নিজেও তাই উচ্চারণ করতে থাকেন। তার অর্থ এই নয় যে সেই বিদ্বান নিজে বর্ণমালা শিখছেন। তিনি নিজে বালকের মতো হয়ে তাকে শেখান, যাতে সেই বালকটি সহজে শিখতে পারে। সেইরূপই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ামক ভগবান আমাদের মধ্যে এসে আমাদের মতো হয়ে আমাদের শিক্ষা দেন। তাঁর এমনি অনেক অলৌকিক বিচিত্র লীলা হয়ে থাকে, যেগুলি শ্রবণ, পাঠ ও ভজন করলে লোকের উদ্ধার হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব—ভগবান প্রকৃতির সাহায্যেই ক্রিয়া (লীলা) করেন। তাই সীতা বলেছেন, সমস্ত কাজই আমি করেছি, ভগবান রাম কিছুই করেননি (অধ্যাত্মরামায়ণ, বালকাণ্ড ১।৩২-৪৩)। কিন্তু ভগবান মানুষের ন্যায় প্রকৃতির অধীন হন না—**'প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায়।'** কেননা ভগবানের কাছে প্রকৃতি 'পর' নয় বরং 'অভিন্ন' (গীতা ৭।৪-৫)। প্রকৃতিতে স্থিত মানুষের মধ্যে ভগবানকে প্রকটিত হতে হয়, তাই তিনি প্রকৃতিকে স্বীকার করেই প্রকটিত হন, তবেই মানুষ তাঁর সাক্ষাৎ পেতে সক্ষম হয়।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—পরবর্তী শ্লোকে ভগবান এবার তাঁর অবতরণের সময় জানাচ্ছেন।

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ ৭ ॥

[ভারত (হে ভরতবংশীয় অর্জুন !) ; যদা, যদা (যখনই) ; ধর্মস্য (ধর্মের) ; গ্লানিঃ (গ্লানি এবং) ; অধর্মস্য (অধর্মের) ; অভ্যুত্থানম্, ভবতি (উদ্ভব হয়) ; তদা, হি (সেই সময়েই) ; অহম্ (আমি) ; আত্মানম্ (নিজেকে) ; সৃজামি (প্রকট করি।)]

হে ভরতবংশীয় অর্জুন ! যখনই ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, সেই সময়েই আমি নিজেকে সাকাররূপে প্রকট করি (দেহ ধারণ করি) ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা—'যদা যদা হি ধর্মস্য .... অভ্যুত্থানমধর্মস্য'—ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের বৃদ্ধির তাৎপর্য হল—ভগবদ্‌প্রেমী, ধর্মাত্মা, সদাচারী, নিরপরাধ এবং নির্বল মানুষদের ওপর নাস্তিক, পাপী, দুরাচারী, বলবান ব্যক্তিদের অত্যাচার বৃদ্ধি পাওয়া এবং মানুষের মধ্যে সদ্‌গুণ-সদাচার অত্যন্ত কমে গিয়ে দুর্গুণ-দুরাচারের অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়া।

'যদা যদা' পদটির তাৎপর্য হল যে যখন যখন প্রয়োজন হয়, তখন তখনই ভগবান অবতীর্ণ হন। একটি যুগে যতবার প্রয়োজন এবং অবকাশ হয়, ততো বারই তিনি

অবতরণ করেন। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, সমুদ্র মন্থনের সময় ভগবান অজিতরূপে সমুদ্র মন্থন করেছিলেন। কচ্ছপরূপে মন্দারপর্বতকে ধারণ করেছিলেন এবং সহস্রবাহুরূপে মন্দার পর্বতকে ওপর থেকে চেপে রেখেছিলেন। আবার দেবগণকে অমৃতের ভাগ দেবার জন্য মোহিনীরূপ ধারণ করেছিলেন। এইভাবে ভগবান একসঙ্গে অনেকরূপ ধারণ করেছিলেন।

অধর্ম বৃদ্ধি এবং ধর্ম হ্রাস হওয়ার প্রধান কারণ হল—বিনাশশীল পদার্থের প্রতি আকর্ষণ। যেমন মাতা এবং পিতা হতে দেহ সৃষ্টি হয় তেমনি প্রকৃতি এবং পরমাত্মা সহযোগে জগৎ সৃষ্ট হয়। এতে প্রকৃতি এবং তার কার্য জগৎ-সংসার প্রতিক্ষণ পরিবর্তিত হচ্ছে, কখনো একমুহূর্তও একভাবে থাকে না। অপরপক্ষে পরমাত্মা ও তাঁর অংশ জীবাত্মা—উভয়ই সমস্ত দেশ, কাল ইত্যাদিতে নিত্য নিরন্তর অবস্থান করেন, এতে কখনো কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় না। জীব যখন অনিত্য, উৎপত্তি ও বিনাশশীল প্রাকৃত পদার্থ থেকে সুখ পাবার ইচ্ছা পোষণ করে এবং সেগুলির প্রাপ্তিতে সুখী হয়, তখন তার পতন আরম্ভ হয়। মানুষের সাংসারিক ভোগ এবং সম্পদ সংগ্রহে যেমন যেমন আসক্তি বাড়তে থাকে সমাজে অধর্ম তেমনভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং অধর্ম যেমন বৃদ্ধি পেতে থাকে, সমাজে পাপাচরণ, কলহ, বিদ্রোহ ইত্যাদি দোষও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি—এই চার যুগের দিকে দৃষ্টি দিলে বোঝা যায় যে, এগুলিতে ধর্ম ক্রমশঃ হ্রাস হয়ে থাকে। সত্যযুগে ধর্মের চারটি চরণ থাকে, ত্রেতাযুগে থাকে ধর্মের তিনটি চরণ, দ্বাপরযুগে দুটি চরণ আর কলিযুগে মাত্র একটি চরণই থাকে। যখন কোনো যুগ ধর্মের প্রয়োজনীয় মূল্যমানের থেকেও অধিক হ্রাস পায়, তখনই ভগবান তা পুনঃস্থাপন করার নিমিত্ত অবতীর্ণ হন।

'তদাত্মানং সৃজাম্যহম্'—যখনই ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের বৃদ্ধি হয়, তখনই ভগবান অবতাররূপ গ্রহণ করেন। সুতরাং ভগবানের অবতরণের প্রধান প্রয়োজন হল ধর্ম সংস্থাপন করা এবং অধর্মকে নাশ করা।

ধর্মের হানি এবং অধর্ম বৃদ্ধি হলে মানুষের অধর্মে প্রবৃত্তি হয়। অধর্মে প্রবৃত্তি হলে তাদের পতন স্বাভাবিক হয়। ভগবান প্রাণীমাত্রেরই পরম সুহৃদ। তাই মানুষের পতন রোধ করার জন্য তিনি স্বয়ং অবতার রূপ ধারণ করেন।

কর্মে মানুষের সকামভাব প্রবল হওয়াই হল ধর্মের গ্লানি এবং নিজ নিজ কর্তব্য থেকে চ্যুত হয়ে নিষিদ্ধ আচরণ করাই হল অধর্মের অভ্যুত্থান। 'কাম' অর্থাৎ কামনা থেকেই সবরকম অধর্ম, পাপ, অন্যায় ইত্যাদি হয় (গীতা ৩। ৩৭)। সুতরাং এই 'কাম' নাশ করার জন্য এবং নিষ্কাম-ভাবের প্রসার করার জন্য ভগবান অবতীর্ণ হন।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, বর্তমান সময়ে ধর্মের হ্রাস এবং অধর্মের বৃদ্ধি হচ্ছে, তাহলে ভগবান কেন অবতাররূপে জন্ম নিচ্ছেন না? তার উত্তর হল যে, যুগটি দেখে মনে হয় সেইরূপ সময় এখনো আসেনি, যাতে ভগবান অবতীর্ণ হবেন। ত্রেতাযুগে রাক্ষসেরা ঋষি-মুনিদের বধ করে তাঁদের হাড় দিয়ে পাহাড় তৈরি করে ফেলেছিল। এখন ত্রেতাযুগের থেকেও অধমাবস্থার কলিযুগ আরম্ভ হয়েছে, কিন্তু এখনও ধর্মাত্মা ব্যক্তি আছেন, তাঁদের কেউ বধ করে না। আর একটি ব্যাপার আছে, যখন ধর্মের হ্রাস হয়ে অধর্মের বৃদ্ধি হয়, তখন ভগবানের নির্দেশে এই পৃথিবীতে মহাপুরুষ আসেন অথবা এখানে বিশেষ কোনো সাধক প্রকটিত হন এবং ধর্ম সংস্থাপন করেন। কখনো কখনো ঈশ্বরকোটির মহাপুরুষও জগৎ উদ্ধারের নিমিত্ত আগমন করেন। সাধক এবং মহাপুরুষ যেখানে বাস করেন, সেখানে অধর্ম ততো বিস্তার লাভ করে না এবং ধর্মের স্থাপনা হয়।

যখন লোকে সাধক এবং সন্ত-মাহাত্মাদেরও মানতে চায় না, বরং তাদের বিনাশ করতে আরম্ভ করে এবং প্রকৃত ধর্মপ্রচারকের সংখ্যা অত্যন্ত কমে যায় এবং যে যুগে যেমন ধর্মব্যবস্থা হওয়া উচিত তার থেকে ধর্ম ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়—ভগবান স্বয়ং তখন আবির্ভূত হন।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—পূর্ববর্তী শ্লোকে নিজ অবতার গ্রহণের সময় বর্ণনা করে ভগবান এবার তাঁর অবতারত্ব গ্রহণের প্রয়োজন জানাচ্ছেন।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ৮ ॥

[**সাধূনাম্** (সাধুগণকে) ; **পরিত্রাণায়** (রক্ষা করার জন্য) ; **দুষ্কৃতাম্** (দুষ্কৃতিকারীদের) ; **বিনাশায়** (বিনাশ করার জন্য) ; **চ** (এবং) ; **ধর্মসংস্থাপনার্থায়** (ধর্মকে স্থাপন করার জন্য) ; **যুগে, যুগে** (যুগে যুগে) ; **সম্ভবামি** (অবতীর্ণ হই।)]

সাধু (ভক্ত)গণকে রক্ষা করার জন্য, দুষ্কৃতি (পাপকর্ম)কারীদের বিনাশ করার জন্য এবং ধর্মকে যথাযথ সংস্থাপন করার জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই ॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা—'পরিত্রাণায় সাধূনাম্'—সাধু ব্যক্তিদের দ্বারাই অধর্মের নাশ এবং ধর্মের প্রসার হয়, তাই তাঁদের রক্ষা করার জন্য ভগবান অবতার হয়ে আসেন।

অপরের মঙ্গল করাই যাঁর স্বভাব এবং যিনি ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, প্রভাব, লীলা ইত্যাদি শ্রদ্ধা এবং প্রেমপূর্বক স্মরণ-কীর্তন করেন ও লোকসাধারণে সেগুলি প্রচার করে থাকেন, এরূপ ভগবদ্ আশ্রিত ব্যক্তিদের এখানে **'সাধূনাম্'** বলা হয়েছে।

পরমাত্ম-প্রাপ্তি করাই যাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য, তাঁকে সাধু বলা হয়[১] এবং বিনাশশীল সংসারের আশ্রয় যার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে, তাকে অসাধু বলা হয়।

অসৎ এবং পরিবর্তনশীল বস্তুতে সদ্ভাব রাখলে এবং তাতে গুরুত্ব দিলে কামনা উৎপন্ন হয়। কামনা যে অনুপাতে নষ্ট হতে থাকে, সাধুভাবও সেই মতো বৃদ্ধি পেতে থাকে আবার কামনা যেমন বৃদ্ধি পেতে থাকে, সাধুভাবও সেইরকম লোপ পেতে থাকে। কারণ অসাধুতার মূল কারণই হল কামনা। সাধুতার দ্বারা নিজ উদ্ধার এবং মানুষের উপকার স্বতঃই হয়ে থাকে।

সাধু ব্যক্তিদের ভাব এবং ক্রিয়ায় পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, পর্বত, মানুষ, দেবতা, পিতৃপুরুষ, ঋষি, মুনি ইত্যাদি সকলেরই হিত হয়ে থাকে—

হেতুরহিত জগ জুগ উপকারী।
তুম্হ তুম্হার সেবক অসুরারী॥
(শ্রীরামচরিতমানস ৭।৪৭।৩)

যদি মানুষ এই সব ব্যক্তিদের মাহাত্ম্য জানতে পারে, তাহলে তারা তাঁদের চরণের দাস হয়ে যায়। অপর পক্ষে মানুষ যদি কুলোকের মনের কথা জানতে পারে তাহলে দিনের মধ্যে তাকে কয়েকবার প্রহারের পরিস্থিতি উপস্থিত হয়।

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে, ভগবান যদি সাধু ব্যক্তিদের রক্ষাই করে থাকেন তাহলে সাধু ব্যক্তিদের এতো দুঃখ পেতে দেখা যায় কেন ? তার উত্তর হল এই যে, সাধু ব্যক্তিদের রক্ষার অর্থ হল তাঁদের ভাবকে রক্ষা করা ; তাঁদের শরীর, ধন-সম্পত্তি বা সম্মান-মর্যাদা রক্ষা করা নয়, কারণ তাঁরা ওইসব জাগতিক বস্তুকে গুরুত্ব দেন না। ভগবানও এই বস্তুগুলির প্রতি গুরুত্ব দেন না। কারণ জাগতিক বস্তুতে গুরুত্ব দিলেই অসাধু ভাব উৎপন্ন হয়ে থাকে।

ভক্তদের মনে জাগতিক পদার্থের মহত্ত্ব বা উদ্দেশ্য থাকেই না, সেইজন্যই তাঁরা ভক্ত। ভক্তগণ প্রতিকূল (দুঃখদায়ক) অবস্থাতে বিশেষভাবে প্রসন্ন হন ; কারণ প্রতিকূল অবস্থায় যত আধ্যাত্মিক লাভ হয়, তা আর অন্য কোনো সাধনায় হয় না। বাস্তবে ভক্তিও প্রতিকূলতাতেই বৃদ্ধি পায়। জাগতিক অনুরাগ এবং আসক্তিতেই পতন হয়, প্রতিকূলতাতে সেই আসক্তি দূর হয়। তাই ভগবানের ভক্তদের প্রতি প্রতিকূল অবস্থা প্রেরণ করাও প্রকৃতপক্ষে তাঁদের রক্ষা করা।

'বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্'—দুষ্কৃতকারী ব্যক্তি অধর্মের

[১]সাধুরেব স মন্তব্য সম্যগ্ব্যবসিতো হিত সঃ॥ (গীতা ৯।৩০)

প্রচার এবং ধর্মের হানি করে। সেইজন্যই তাদের বিনাশ করতে ভগবান অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করেন।

যেসকল ব্যক্তি কামনার অতিবৃদ্ধি হওয়ায় মিথ্যা, কপটাচার, ছল, বিশ্বাসভঙ্গ ইত্যাদি দুর্গুণ-দুরাচারে ব্যাপৃত থাকে, নিরপরাধ, সদ্‌গুণী, সদাচারী সাধুদের ওপর অত্যাচার করে, অন্যের অহিত করার কাজে ব্যাপৃত হয়, প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি কী তা জানে না, ভগবান এবং বেদাদি শাস্ত্রের বিরোধিতা করাই যাদের স্বভাব, এরূপ আসুরী স্বভাবযুক্ত হয়ে বদ আচরণ করা মানুষদের উদ্দেশ্যে **'দুষ্কৃতাম্'** পদটি উল্লিখিত হয়েছে। ভগবান অবতার হয়ে এসে এরূপ দুষ্কৃতকারী মানুষদেরই বিনাশ করেন।

প্রশ্ন—ভগবান তো সকলের কাছেই সম এবং তাঁর শত্রু কেউ নেই (**'সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যঃ'** গীতা ৯।২৯)। তাহলে তিনি দুষ্টের বিনাশ করেন কেন ?

উত্তর—সকল প্রাণীরই পরম সুহৃদ হওয়ায় ভগবানের শত্রু কেউ নেই । কিন্তু যে ব্যক্তি, ভক্তের কোনো ক্ষতি করে, সে ভগবানের শত্রু হয়ে যায়—

সুনু সুরেস রঘুনাথ সুভাউ।
নিজ অপরাধ রিসাহিঁ ন কাউ॥
জো অপরাধু ভগত কর করঈ।
রাম রোষ পাবক সো জরঈ॥
(শ্রীরামচরিতমানস ২।২১৮।২-৩)

ভগবানের এক নাম হল **'ভক্তভক্তিমান্'** (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৮৬।৫৯)। সুতরাং তাঁর ভক্তদের কষ্টপ্রদানকারী দুষ্কৃতিদের বিনাশ ভগবান নিজেই করেন। ভক্তরা পাপবিনাশ করেন এবং ভগবান পাপীদের বিনাশ করেন।

সাধুগণের পরিত্রাণে তাঁর যত কৃপা থাকে, তত কৃপাই থাকে দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করায়[১]। বিনাশের দ্বারা ভগবান তাদের শুদ্ধ ও পবিত্র করে তোলেন।

সাধু-মহাত্মাগণ ধর্ম সংস্থাপন করলেও দুষ্টের বিনাশ করেন না। দুষ্টের বিনাশ ভগবান নিজেই করে থাকেন, যেমন—সাধারণভাবে ওষুধ দেওয়া বা ব্যাণ্ডেজ করার কাজ কম্পাউণ্ডার করলেও, বড় অপারেশন করতে হলে শল্য-চিকিৎসক নিজেই করে থাকেন, আর কেউ নয়।

মা এবং বাবা—দুজন সমানভাবে পুত্রের মঙ্গল চান। পুত্র পড়াশোনা করে না, দুষ্টুমি করে, তখন মাও তাকে বোঝান এবং বাবাও বোঝান। তবুও বালক দুষ্টুমি করা না ছাড়লে বাবা তাকে মারধোর করেন। কিন্তু বালকটি যখন ভয় পেয়ে যায়, তখন মা এসে বাবার প্রহার থেকে বালকটিকে রক্ষা করেন। মা পতিব্রতা হলেও, পতিকে অনুসরণ করা তাঁর ধর্ম হলেও তার অর্থ এই নয় যে স্বামী পুত্রকে প্রহার করলে তিনিও সঙ্গে সঙ্গে পুত্রকে প্রহার করবেন। তিনি যদি এইরূপ করেন তবে বেচারি বালকটি কোথায় যাবে ? বালকটিকে রক্ষা করলে তাঁর পাতিব্রত্য ধর্ম নষ্ট হয় না। কারণ প্রকৃতপক্ষে বাবাও সন্তানকে মারধোর করতে চান না, তিনি চান তার দুর্গুণ-দুরাচার রোধ করে তাকে ভালো করে তুলতে। ভগবানও এইরূপ বাবারই মতো আর তাঁর ভক্তরা হলেন মায়ের মতো। ভগবান এবং সাধু-মহাত্মারা মানুষকে বোঝাতে থাকেন। তা সত্ত্বেও যদি মানুষ দুষ্কর্ম ত্যাগ না করে তাহলে তাকে বিনাশ করতে ভগবান নিজেই অবতীর্ণ হন। যদি সে দুষ্কর্ম পরিত্যাগ করে তবে তার বধের আর প্রয়োজন থাকে না।

নির্গুণ ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকৃতি, মায়া, অজ্ঞান ইত্যাদির বিরোধী নন বরং ওইগুলির অস্তিত্ববাচক স্ফুরণ প্রদানকারী এবং পোষক। অর্থাৎ প্রকৃতি, মায়া ইত্যাদির যা কিছু সামর্থ্য, তা সব সেই নির্গুণ ব্রহ্মেরই। এইভাবেই সগুণ ভগবানও কোনো জীবের ওপর দ্বেষ বা শত্রুভাব রাখেন

[১](ক) 'অরিহুক অনভল কীন্‌হ ন রামা' (শ্রীরামচরিতমানস ২।১৮৩।৩)

(খ) যে যে হতাশ্চক্রধরেণ রাজংস্ত্রৈলোক্য নাথেন জনার্দনেন। তে তে গতা বিষ্ণুপুরীং প্রয়াতাঃ ক্রোধোঽপি দেবস্য বরেণ তুল্যঃ॥ (পাণ্ডবগীতা)

'হে রাজন্ ! ত্রৈলোক্যাধিপতি চক্রধারী ভগবান জনার্দন দ্বারা যারা নিহত হয়েছে তারা সকলেই বিষ্ণুলোকে গমন করেছে। এই (জনার্দন) দেবের ক্রোধও বরদানের ন্যায় কল্যাণপ্রদ।

না, বরং সমানভাবে সকলকে সামর্থ্য দেন এবং তাদের পোষণ করেন। শুধু তাই নয়, ভগবানের সৃষ্ট এই পৃথিবীও সবাইকে বসবাস করার জন্য সমানভাবে স্থান দেয়। সাধু-মহাত্মাদের বিশেষ স্থান দেওয়া এবং দুষ্কৃতকারীদের কোনোরকম আশ্রয় না দেওয়া, এসব পক্ষপাতিত্ব তাঁর নেই। এরূপভাবেই অন্ন সকলেরই ক্ষুধা সমভাবে দূর করে, জল সকলেরই পিপাসা সমানভাবে দূর করে, বায়ু সকলকে একই প্রকারে প্রাণবায়ু প্রদান করে, সূর্য একইভাবে সকলের কাছে প্রকাশিত হয়। যদি পৃথিবী, খাদ্য, জল ইত্যাদি দুষ্কর্মকারীদের বাসস্থান, অন্ন, জল ইত্যাদি দেওয়া বন্ধ করে তাহলে তো তারা বাঁচতেই পারবে না। এইভাবে ভগবানের বিধান অনুযায়ী চালিত পৃথিবী, অন্ন, জল, বায়ু ইত্যাদিতে যদি এতো উদারতা, সমতা থাকে তবে এই বিধানের যিনি বিধায়ক (ভগবান) তাঁর বিশেষ উদারতা ও সমতা সম্বন্ধে কী বলার আছে ? তিনি ঔদার্যের খনি। এই বিধায়ক (ভগবান) এবং তাঁর বিধানের দিকে যদি একটু দৃষ্টিপাত করা যায় তাহলে মানুষ ভাববিহ্বল হয়ে পড়ে এবং ভগবানের চরণে তার অনুরাগ বেড়ে যায়।

ভগবানের দুষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে কোনো বিরোধ নেই, তাঁর বিরোধ কেবল দুষ্কর্মের সঙ্গে। কারণ এই দুষ্কর্মের ফলে জগতের এবং ওইসব দুষ্ট ব্যক্তিদেরও অহিত হয়ে থাকে। ভগবান সকলেরই সুহৃদ্ তাই তিনি জগতের এবং দুষ্ট লোকেদেরও মঙ্গলের জন্যই দুষ্টের বিনাশ করেন। তিনি যেসকল পাপী ব্যক্তিদের বধ করেন তাদের তিনি নিজ ধামে প্রেরণ করেন—এ তাঁর এক অপার উদারতা !

এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, যদি আমরা পাপ কাজ করতে থাকি তাহলে আমাদের দমন করতেও কি ভগবানকে আসতে হবে ? যদি তাই হয় তবে ভগবানের হাতে মৃত্যু হলে আমাদের কল্যাণই হবে ; তবে শ্রমসাধ্য সদ্গুণ-সদাচার পালন কেন করব ? এর উত্তরে বলা যায় যে, ভগবান সেই সব পাপীদের বধ করতে আসেন, যারা ভগবান ছাড়া আর কারো হাতে বধ্য নয়। দ্বিতীয়তঃ শুভ কর্মে যতটা লেগে থাকা যায়, ততোটাই পুণ্য লাভ হয়, কিন্তু অশুভ কর্মে ব্যাপৃত থাকা অবস্থায় যদি হঠাৎ মৃত্যু হয় বা অন্য কেউ বধ করে তাহলেই মুশকিল ! ভগবানের হাতে বধ হয়ে মুক্তি পাবার আশা কীভাবে পূর্ণ হবে ! তাই অশুভ-কর্ম করা উচিত নয়।

'ধর্মসংস্থাপনার্থায়'—নিষ্কামভাবের উপদেশ, আদেশ এবং প্রচার করাই হল ধর্ম সংস্থাপন করা। কারণ নিষ্কামভাবের অভাবে এবং অসৎ বস্তুর অস্তিত্বকে গুরুত্ব দিলেই অধর্ম বৃদ্ধি পায়, যার দ্বারা মানুষ দুষ্ট স্বভাবসম্পন্ন হয়ে ওঠে। সেইজন্যই ভগবান অবতাররূপ ধারণ করে স্বীয় আচরণের দ্বারা নিষ্কামভাব প্রচার করতে আসেন। নিষ্কামভাবের প্রচারে ধর্মের স্থাপনা স্বতঃই হয়ে থাকে।

ভগবানই হলেন ধর্মের আশ্রয়[১] (গীতা ১৪। ২৭)। সেইজন্য শাশ্বত ধর্ম সংস্থাপন করার প্রয়োজনে ভগবান অবতার হয়ে আসেন। সংস্থাপনা করার অর্থ হল—সম্যক্‌ভাবে স্থাপন করা। তাৎপর্য হল এই যে, ধর্ম কখনো লুপ্ত হয় না ; তার শুধু হ্রাসই হতে পারে। ধর্ম হ্রাস পেলে ভগবান পুনরায় তাকে ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন (গীতা ৪।১-৩)।

'সম্ভবামি যুগে যুগে'—প্রয়োজন হলে ভগবান প্রত্যেক যুগে অবতাররূপে আসেন। এক যুগের মধ্যেও যতবার প্রয়োজন হয় ততবার ভগবান অবতাররূপ ধারণ করেন। 'কারক-পুরুষ'[২] এবং সাধু-মহাত্মার রূপেও ভগবান অবতীর্ণ হন। ভগবান এবং কারক পুরুষের অবতার হচ্ছে 'নৈমিত্তিক', কিন্তু সাধু-মহাত্মাদের অবতারকে 'নিত্য' বলে মানা হয়।

[১](ক) 'শ্রুতি সেতু পালক রাম তুম্হ' (শ্রীরামচরিতমানস ২। ১২৬)
(খ) 'ধর্মস্য প্রভুরচ্যুতঃ' (মহাভারত, অনুশাসনপর্ব ১৪৯। ১৩৭)

[২]যে মহাপুরুষ ভগবানকে প্রাপ্ত করেছেন এবং ভগবৎ ধামে অবস্থান করেন, তাঁকে 'কারক-পুরুষ' বলা হয়।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, ভগবান তো সর্বসমর্থ, তবে সাধুদের রক্ষা করা, দুষ্টদের বিনাশ করা এবং ধর্মের স্থাপনা করা—তিনি কি এই সব কাজ অবতার না হয়ে করতে পারেন না ? তার উত্তরে বলা যায় যে, তিনি অবতার না হয়ে যে এগুলি পারেন না তা নয়। যদিও ভগবান অবতার না হয়েও অনায়াসেই সবকিছু করতে পারেন এবং করেনও, তবুও জীবের ওপর বিশেষভাবে কৃপা করে তাদের মঙ্গল করার জন্য ভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ হন[১]। অবতার কালে ভগবানের দর্শন, স্পর্শ, কথাবার্তা ইত্যাদির দ্বারা, পরবর্তীকালে তাঁর দিব্যলীলাদির শ্রবণ, চিন্তন এবং ধ্যানের দ্বারা তাঁর উপদেশ অনুযায়ী আচরণ করলে লোক সহজেই উদ্ধার পেয়ে যায়। এইভাবে লোকের সর্বদা যাতে উদ্ধার হতে থাকে, অবতার হয়ে ভগবান এই রীতি প্রবাহিত রাখেন।

ভগবানের এমন প্রেমিক ভক্ত আছেন, যাঁরা ভগবানের সঙ্গে ক্রীড়া করতে চান, তাঁর সঙ্গে থাকতে চান। তাঁদের ইচ্ছা পূরণের জন্যও ভগবান অবতাররূপ ধারণ করেন এবং তাঁদের কাছে এসে তাঁদের সঙ্গে সমভাবে ক্রীড়া করেন।

যে যুগে যতটুকু কার্য করা প্রয়োজন, ভগবান সেই অনুসারে অবতার হয়ে সেই কার্যটি সম্পূর্ণ করেন। সেইজন্য ভগবানের অবতার ভিন্ন ভিন্ন হলেও স্বয়ং ভগবানে কোনো ভিন্নতা নেই। সমস্ত অবতারেই ভগবান পূর্ণ এবং পূর্ণভাবেই বিরাজ করেন।

ভগবানের কোনো কর্তব্য নেই এবং কিছু পাবারও বাকী নেই (গীতা ৩। ২২), তবুও জগতের প্রয়োজনে অবতার হয়ে কেবল জগতের মঙ্গল করার জন্যই তিনি সব কর্ম করেন। তাই মানুষের শুধু অপরের হিতার্থে কর্তব্য-কর্ম করা উচিত।

চতুর্থ শ্লোকে উদ্ধৃত অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান মানুষের জন্ম এবং নিজের জন্ম (অবতার) সম্পর্কে তিনটি বড় পার্থক্যের কথা বলেছেন—

১) **জানার পার্থক্য**—মানুষের এবং ভগবানের অনেকবার জন্ম হয়েছে। সেই সব জন্মের কথা মানুষ জানে না, কিন্তু ভগবান জানেন (৪।৫)।

২) **জন্মে পার্থক্য**—মানুষ প্রকৃতির বশ হয়ে নিজের পাপ-পুণ্যের ফল ভোগ করার জন্য এবং ফলভোগপূর্বক পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করার উদ্দেশ্যে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু ভগবান নিজ প্রকৃতিকে অধীন করে স্বেচ্ছাক্রমে নিজ যোগমায়ার সাহায্যে প্রকটিত হন (৪।৬)।

৩) **কর্মে পার্থক্য**—সাধারণত মানুষ নিজ কামনা পূর্তির জন্য কর্ম করে থাকে, যেটি মনুষ্য জন্মের উদ্দেশ্য নয় আর ভগবান কেবলমাত্র জীবের কল্যাণের নিমিত্ত কর্ম করেন (৪।৭-৮)।

*** *** ***

সম্বন্ধ—চতুর্থ শ্লোকে উদ্ধৃত অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান তাঁর জন্মের দিব্যতার বর্ণনা আরম্ভ করেছিলেন। এখন নিজে থেকেই নিষ্কাম কর্মের (কর্মযোগের) তত্ত্ব জানাবার উদ্দেশ্যে তাঁর জন্মের দিব্যতার সঙ্গে সঙ্গে নিজ কর্মের দিব্যতা জানারও মাহাত্ম্য বলছেন।

---

[১]অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ। ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩৩।৩৭)

ভগবান জীবকে বিশেষ কৃপা করার জন্যই নিজেকে মনুষ্যরূপে প্রকটিত করেন এবং এমন লীলা করেন যে, যা শুনে জীব ভগবৎ পরায়ণ হয়।

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন॥ ৯ ॥

[অর্জুন (হে অর্জুন !) ; মে (আমার) ; জন্ম, চ, কর্ম (জন্ম এবং কর্ম) ; দিব্যম্ (সবই দিব্য) ; এবম্ (এইভাবে) ; যঃ (যে সব ব্যক্তি) ; তত্ত্বতঃ (তত্ত্বতঃ) ; বেত্তি (জেনে নেন) ; সঃ (তাঁরা) ; দেহম্, ত্যক্ত্বা (দেহত্যাগ করার পর) ; পুনঃ, জন্ম (পুনর্জন্ম) ; ন, এতি (প্রাপ্ত হন না) ; মাম্ (আমাকেই) ; এতি (প্রাপ্ত হন।)]

হে অর্জুন ! আমার জন্ম এবং কর্ম সবই দিব্য। এইভাবে (আমার জন্ম ও কর্মকে) যে সব ব্যক্তি তত্ত্বতঃ জানেন অর্থাৎ দৃঢ় নিশ্চয় হয়ে মেনে নেন, তাঁরা দেহত্যাগ করার পর আর পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না, তাঁরা আমাকেই প্রাপ্ত হন ॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা—'জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্'—ভগবান জন্ম-মৃত্যু থেকে সর্বতোভাবে অতীত—অজ এবং অবিনাশী। তাঁর মানুষরূপে অবতরণ হলে সেই অবতীর্ণ মানবরূপ সাধারণ মানুষের মতো হয় না। তিনি কৃপাবশে শুধুমাত্র জীবসকলের হিতার্থে স্বাধীনভাবে মনুষ্যাদির রূপে জন্ম গ্রহণের লীলা করে থাকেন। তাঁর জন্ম কর্মের বশ নয়। তিনি স্বেচ্ছায় দেহ ধারণ করেন।[১]

ভগবানের সাকার রূপ জীবের শরীরের মতো অস্থিমজ্জাময় হয় না। জীবের দেহ পাপ-পুণ্যময়, অনিত্য, রোগগ্রস্থ, লৌকিক, বিকারশীল, পঞ্চভূতময় এবং রজ-বীর্য হতে উৎপন্ন হয়ে থাকে কিন্তু ভগবানের দেহ পাপ-পুণ্য রহিত, নিত্য, অনাময়, অলৌকিক, বিকাররহিত, পরম দিব্য এবং প্রকাশ্য। অন্যান্য জীব অপেক্ষা দেবতাদের দেহও দিব্য হয়, কিন্তু ভগবানের দেহ তাঁদের থেকেও বিশেষভাবের হয়, দেবতাগণও তাই তাঁকে দর্শন করতে উৎসুক থাকেন (গীতা ১১।৫২)।

ভগবান যখন শ্রীরাম অথবা শ্রীকৃষ্ণরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন তখন তিনি মা কৌশল্যা বা মা দেবকীর গর্ভে উৎপন্ন হননি। প্রথমে তিনি তাঁর শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী স্বরূপের দর্শন দিয়ে তারপর মায়েদের প্রার্থনাতে বাল্যলীলা করেছিলেন। ভগবান শ্রীরামের উদ্দেশ্যে গোস্বামী শ্রীতুলসীদাস শ্রীরামচরিতমানসে বলেছেন—

ভএ প্রগট কৃপালা দীনদয়ালা কৌসল্যা হিতকারী।
হরষিত মহতারী মুনি মন হারী অদ্ভূত রূপ বিচারী॥
লোচন অভিরামা তনু ঘনশ্যামা নিজ আয়ুধ ভুজ চারী।
ভূষন বনমালা নয়ন বিসালা শোভাসিন্ধু খরারী॥
...॥
মাতা পুনি বোলী সো মতি ডোলী তজহু তাত য়হ রূপা।
কীজৈ সিসুলীলা অতি প্রিয়সীলা য়হ সুখ পরম অনুপা॥
সুনি বচন সুজানা রোদন ঠানা হোই বালক সুরভূপা।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রসঙ্গে আছে—

উপসংহার বিশ্বাত্মন্নদো রূপমলৌকিকম্।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মশ্রিয়া জুষ্টং চতুর্ভুজম্॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩।৩০)

মা দেবকী বলেছেন—'বিশ্বাত্মন্ ! শঙ্খ-চক্র-গদা এবং পদ্মের শোভাযুক্ত এই চতুর্বাহুসম্পন্ন তোমার অলৌকিক দিব্যরূপ এবার সংবৃত (অপসারিত) করো।' তখন ভগবান মা-বাবার সম্মুখে নিজ মায়া দ্বারা তৎক্ষণাৎ এক সাধারণ শিশুর রূপ ধারণ করলেন—

'পিত্রোঃ সম্পশ্যতোঃ সদ্যো বভূব প্রাকৃতঃ শিশুঃ'॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩।৪৬)

ভগবান শ্রীরাম যখন স্বধামে প্রস্থান করেন তখন তিনি

---

[১](ক) 'নিজ ইচ্ছাঁ প্রভু অবতরই', (শ্রীরামচরিতমানস ৪।২৬)

(খ) বিপ্র ধেনু সুর সন্ত হিত লীন্হ মনুজ অবতার। নিজ ইচ্ছা নির্মিত তনু মায়া গুণ গো পার॥
(শ্রীরামচরিতমানস ১।১৯২)

(গ) উদ্ধব ভগবানকে বলেছেন—'ত্বং ব্রহ্ম পরমং ব্যোম পুরুষঃ প্রকৃতে পরঃ। অবতীর্ণোঽসি ভগবন্ স্বেচ্ছোপাত্তপৃথগ্‌বপুঃ॥' (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১১।২৮)

'আপনি প্রকৃতির অতীত পুরুষোত্তম এবং চিদাকাশস্বরূপ ব্রহ্ম। তা সত্ত্বেও আপনি স্বেচ্ছায় পৃথক্ দেহ ধারণ করে অবতাররূপ গ্রহণ করেছেন।'

সশরীরে অন্তর্হিত হন। জীবের ন্যায় তাঁর দেহ এখানে পড়ে ছিল না, তিনি সশরীরে নিজ ধামে চলে গিয়েছিলেন—

পিতামহবচঃ শ্রুত্বা বিনিশ্চিত্য মহামতিঃ।
বিবেশ বৈষ্ণবং তেজঃ সশরীরঃ সহানুজঃ॥

(বাল্মীকি রামায়ণ, উত্তর. ১১০।১২)

'মহামতি ভগবান শ্রীরাম পিতামহ ব্রহ্মার কথা শুনে তদনুযায়ী স্থির চিত্তে নিজের তিন ভ্রাতার সঙ্গে সশরীরের বৈষ্ণব তেজে প্রবেশ করেন।'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্কেও এরূপ উদ্ধৃতি আছে—

লোকাভিরামাং স্বতনুং ধারণাধ্যানমঙ্গলম্।
যোগধারণয়াঽঽগ্নেয্যাদগ্ধ্বা ধামাবিশৎ স্বকম্॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৩১।৬)

'ধারণা এবং ধ্যানের জন্য অত্যন্ত মঙ্গলরূপ নিজ লোকাভিরাম মোহিনী মূর্তিকে যোগধারণাজনিত অগ্নির দ্বারা ভস্ম না করেই ভগবান সশরীরে নিজ ধামে প্রবেশ করেন।'

ভগবানের দিব্য শরীরের ব্যাপারে মহামুনি বাল্মীকি ভগবান শ্রীরামকে বলেছেন যে—

চিদানন্দময় দেহ তুম্হারী। বিগত বিকারী জান অধিকারী।
নর তনু ধরেহু সন্ত সুর কাজা। কহহু করহু জস প্রাকৃত রাজা॥

(শ্রীরামচরিতমানস ২।১২৭।৩)

একদা সনকাদি ঋষি বৈকুণ্ঠধামে যাচ্ছিলেন, সেখানে ভগবানের দ্বারী তাঁকে ভিতরে যেতে বারণ করে। তখন সনকাদি দ্বারীকে অভিশাপ দিলেন। নিজ অনুচর দ্বারা সনকাদির অপমান করা হয়েছে জেনে ভগবান নিজে ওই স্থানে পদার্পণ করলেন। সেই সময় ভগবানের দর্শন লাভ করে তাঁদের বিশেষ দশা প্রাপ্তি হয়। তাঁরা ভগবানের শ্রীচরণে প্রণাম জানালেন—

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ—
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ॥
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৩।১৫।৪৩)

'প্রণাম করামাত্র সেই কমলনেত্র ভগবানের চরণ-কমলের পরাগ হতে মিলিত তুলসী-মঞ্জরীর গন্ধময় বায়ু তাঁদের নাসিকায় প্রবেশ করে অক্ষর পরমাত্মায় নিত্য স্থিতিশীল সেই জ্ঞানী মহাত্মাদেরও চিত্ত এবং শরীরকে চঞ্চল করেছিল।'

শব্দাদি বিষয়ের গন্ধ এমন কোনো বিশেষ বস্তু নয়, যাতে মন আকৃষ্ট হবে। কিন্তু ভগবানের চরণ-কমলের সুগন্ধে সর্বদা পরমাত্ম-স্বরূপে নিমগ্ন সনকাদির চিত্তেও চাঞ্চল্য উৎপন্ন হয়েছিল। কারণ এই সুগন্ধ কোনো পার্থিব বিকারজনিত গন্ধ নয়, এটি হল দিব্য সুগন্ধ। ভগবানের প্রত্যেকটি বস্তুই (বস্ত্র, অলঙ্কার, অস্ত্র ইত্যাদি) এইরূপ দিব্য, চিন্ময় এবং অতিশয় বিশিষ্ট হয়ে থাকে।

ভগবানের লীলাকাহিনী শোনা, পড়া, স্মরণ করা ইত্যাদিতে মানুষের অন্তঃকরণ নির্মল, পবিত্র হয়ে ওঠে এবং তাঁদের অজ্ঞানতা দূর হয়ে যায়—এই হল ভগবানের কর্মের দিব্যভাব। জ্ঞানস্বরূপ ভগবান শঙ্কর ও ব্রহ্মা, সনকাদি ঋষি, দেবর্ষি নারদ প্রমুখও তাঁর লীলা গান করেন এবং শুনে মগ্ন হয়ে যান। ভগবানের অবতাররূপের লীলাস্থলে আস্তিকভাবে, শ্রদ্ধা-প্রেমপূর্বক বসবাস করলে এবং সেই স্থান দর্শন করলেও মানুষের কল্যাণ সাধিত হয়। এর তাৎপর্য হল এই যে, ভগবান শুধুমাত্র জীবগণের কল্যাণের উদ্দেশ্যেই অবতার হয়ে আসেন এবং লীলা করেন। সুতরাং তাঁর লীলা পাঠে, শ্রবণে এবং মনন চিন্তনে স্বাভাবিকভাবে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

চতুর্থ শ্লোকে অর্জুন ভগবানকে শুধু তাঁর জন্মের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কিন্তু এইস্থলে ভগবান অর্জুনের জিজ্ঞাসা ছাড়াই নিজ হতেই 'কর্ম' সম্বন্ধে বলতে শুরু করলেন। এতে ভগবানের এই অভিপ্রায় ব্যক্ত হয় যে, 'আমার কর্ম যেমন দিব্য, তোমার কর্মও তেমনি দিব্য হওয়া উচিত'। কারণ মানুষের জন্ম দিব্য হওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু তার কর্ম অবশ্যই দিব্য হতে পারে ; কারণ তার জন্মই হয়েছে সেইজন্য। কর্মের দিব্যতা (শুদ্ধি) আসে যোগ সহযোগেই। যে কর্ম বন্ধনকারক হয়, দিব্যতা এলে সেই কর্মই মুক্তি প্রদানকারী হয়ে ওঠে। কর্ম দিব্য (ফলেচ্ছা, মমতা-আসক্তি বর্জিত) হলে কর্তা প্রথমতঃ তাতে আবদ্ধ থাকেন না, মুক্ত হয়ে যান ; দ্বিতীয়তঃ তিনি তাঁর পূর্বের কর্মেও আবদ্ধ থাকেন না মুক্ত হয়ে যান ; আর তৃতীয়তঃ তাঁর কৃর্তকর্মের দ্বারা অপরেরও স্বাভাবিকভাবে মঙ্গল হয়ে থাকে।

গভীরভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে উৎপত্তি ও বিনাশশীল বস্তুগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলেই কর্মে

মালিন্য আসে এবং সেগুলি বন্ধনকারক হয়ে ওঠে। বিনাশশীল পদার্থের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলে অন্তঃকরণ, কর্ম এবং পদার্থ—এই তিনটিই মলিন হয়ে যায় এবং বিনাশশীল পদার্থের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক দূর হওয়ায় এই তিনটিই স্বাভাবিকভাবে পবিত্র হয়ে যায়। সুতরাং মূল প্রতিবন্ধক হল বিনাশশীল বস্তুর সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক।

'এবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ'—অজ ও অবিনাশী হয়েও এবং প্রাণীমাত্রেরই ঈশ্বর হওয়া সত্ত্বেও ভগবান শুধুমাত্র জীবগণের হিতের উদ্দেশ্যে নিজ প্রকৃতিকে বশীভূত করে স্বাধীনভাবে যুগে যুগে মনুষ্যাদি রূপে অবতরণ করেন—এটি তত্ত্বতঃ জানা অর্থাৎ দৃঢ়তাপূর্বক মেনে নেওয়াই হল ভগবানের জন্মের দিব্যতাকে জানা।

সমস্ত ক্রিয়া করতে থাকলেও ভগবান অকর্তাই থাকেন অর্থাৎ তাঁর মধ্যে ক্রিয়াদি সম্পন্ন করার অভিমান থাকে না (গীতা ৪। ১৩) এবং কোনো কর্মফলেই তাঁর স্পৃহা (ফলেচ্ছা) নেই (গীতা ৪। ১৪)—এই তত্ত্বটিকে জানাই হল ভগবানের কর্মের দিব্যতাকে জানা।

ভগবানের জন্মধারণ যেমন স্বাভাবিকভাবে জীবের হিতের জন্য হয় এবং কর্মে নির্লিপ্ততা থাকে, তেমনি মানুষের মধ্যেও সমস্ত জীবের হিতের চিন্তা এবং কর্মে নির্লিপ্ততার জাগরণই হল প্রকৃতপক্ষে ভগবানের জন্ম ও কর্মের তত্ত্বকে জানা।

'ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি'—ভগবানের ত্রিভুবনে কিছু করার বাকি নেই আর কিছু পাবারও বাকি নেই (গীতা ৩। ২২)। তা সত্ত্বেও তিনি শুধুমাত্র জীবের উদ্ধারের জন্য কৃপা করে এই পৃথিবীতে অবতাররূপে আসেন এবং নানাপ্রকার অলৌকিক লীলা করেন। সেই লীলাকথা গান করলে, শুনলে, পড়লে এবং সেগুলি মনন করলে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হলে জগৎ সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক দূর হয়। জগতের সঙ্গে সম্পর্ক দূর হলে পুনর্জন্ম হয় না অর্থাৎ মানুষ জন্ম-মৃত্যুরূপ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

প্রকৃতপক্ষে কর্ম বন্ধনকারক নয়। কর্মে বন্ধন করার যে শক্তি তা কেবল মানুষেরই নিজের সৃষ্ট (কামনা)। কামনা পূরণের জন্য আসক্তিপূর্বক নিজের জন্য কর্ম করলেই মানুষ কর্মের দ্বারা আবদ্ধ হয়। পরে কামনা যেমন বাড়তে থাকে, পাপেও তেমনি প্রবৃত্তি হতে থাকে। এইভাবে তার কর্ম অত্যন্ত মলিন হয়ে যায়, যার জন্য সে বারংবার নীচ জন্ম লাভ করে এবং নরকে পতিত হয়। কিন্তু যখন সে অপরের সেবার জন্য নিষ্কামভাবে কর্ম করে তখন তার কর্মে দিব্যতা এবং বিশেষভাব আসতে থাকে। এইভাবে কামনা সর্বতোভাবে নাশ হলে তার কর্ম দিব্য হয়ে ওঠে অর্থাৎ সেটি আর বন্ধনকারক থাকে না, তার আর পুনর্জন্মের প্রশ্নও থাকে না।

'মামেতি সোঽর্জুন'—বিনাশশীল কর্মের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করায় নিত্যপ্রাপ্ত পরমাত্মাকেও অপ্রাপ্ত বলে মনে হয়। নিষ্কাম-ভাব সহকারে কেবলমাত্র অপরের হিতার্থে সমস্ত কাজ করলে কর্মের প্রবাহ কেবল জগতের অভিমুখে যায় এবং নিত্যপ্রাপ্ত পরমাত্মা অনুভূত হন।

জীবের ওপর অশেষ কৃপাই ভগবানের জন্মের কারণ—এইভাবে ভগবানের জন্মের দিব্যতা জানলে ভগবানের উপর মানুষের ভক্তি হয়[১]। ভক্তির দ্বারা ভগবান লাভ হয়। ভগবানের কর্মের দিব্যতা জানলে মানুষের কর্মও দিব্য হয়ে যায় অর্থাৎ সেগুলি বন্ধনকারক না হয়ে তার নিজের এবং অপরেরও কল্যাণকারক হয়ে ওঠে, তাতে জগৎ-সংসার হতে সম্পর্ক-বিচ্ছেদপূর্বক ভগবদ্‌প্রাপ্তি ঘটে।

মর্মকথা

সমস্ত কর্মই শুরু এবং শেষ হয় (এবং কর্মের ফলস্বরূপ যা পাওয়া যায় তাও অনিত্য এবং বিনাশশীল হয়ে থাকে)। কিন্তু স্বয়ং (জীবাত্মা) সর্বদা অস্তিত্ববান। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং (স্বরূপ)-এর সঙ্গে কর্মের কোনো সম্পর্কই নেই, এটি মেনে নেওয়া হয় মাত্র। সুতরাং সমস্ত কর্ম করলেও তার সঙ্গে নিজের কোন সম্পর্ক নেই—এরূপ অনুভব করলে তার কর্ম দিব্য হয়ে যায়—কর্মের তত্ত্ব হল তাই। একেই বলে কর্মযোগ।

ক্রিয়াশীল প্রকৃতির সঙ্গে তাদাত্ম্য হওয়ায় মানুষ মাত্রেরই কর্ম করার প্রবণতা থাকে। সে কর্ম না করে মুহূর্তমাত্র থাকতে পারে না (গীতা ৩।৫)। কারণ সংসারে সে দেখে যে কর্মের দ্বারাই সিদ্ধি (বস্তু প্রাপ্তি) লাভ হয়।

[১]'উমা রাম সুভাউ জেহিঁ জানা। তাহি ভজনু তজি ভাব ন আনা'॥ (শ্রীরামচরিতমানস ৫। ৩৪। ২)

এইজন্যই সে পরমাত্মাকেও কর্ম দ্বারা লাভ করতে চায়। কিন্তু এ তার বিরাট ভ্রম। কারণ বিনাশশীল কর্ম দ্বারা বিনাশশীল বস্তুই লাভ করা যায়, অবিনাশীকে নয়। অবিনাশীর প্রাপ্তি কেবল কর্ম থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হলে তবেই হয়। কর্ম থেকে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ কর্মযোগের দ্বারা (জ্ঞানযোগ অপেক্ষা) অতি সহজেই হয়। কারণ কর্মযোগে স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ— এই তিন শরীর-দ্বারা হওয়া সমস্ত কর্ম নিষ্কামভাবে শুধুমাত্র জগতের হিতের উদ্দেশ্যে হওয়ায় কর্মের প্রবাহ জগতের অভিমুখে যায় এবং তার কর্ম থেকে সম্পর্ক-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

এখানে ভগবান **'মাম্ এতি'** পদ দ্বারা এই ভাব প্রকট করেছেন যে, মানুষ কর্মের দ্বারা যে সিদ্ধি চায়, সেই পরমাত্মতত্ত্ব স্বতঃসিদ্ধ (নিত্যপ্রাপ্ত)। স্বতঃসিদ্ধ বস্তুর জন্য করার কী আছে ? যে বস্তু প্রাপ্ত হয়েই আছে তাকে আবার প্রাপ্ত করা কী ? কর্মের দ্বারা সেই বস্তুই পাওয়া যায় যা অপ্রাপ্ত।

একটি হল উৎপত্তি আর একটি হল অন্বেষণ। উৎপত্তি সেটির হয়, যার পৃথক অস্তিত্ব নেই, যার প্রথমে অস্তিত্ব ছিল না এবং পরে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অন্বেষণ তারই হয়, যার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, যেটি আগেও ছিল এবং নিত্য বর্তমান। কিন্তু সেটি ক্রিয়া এবং পদার্থরূপ জগতের গুরুত্ব মেনে নেওয়ায় লুক্কায়িত রয়েছে। মানুষ যখন ক্রিয়া এবং পদার্থগুলি কেবলমাত্র অন্যের সেবায় নিয়োজিত করে তখন ক্রিয়া-পদার্থরূপ জগৎ-সংসার থেকে স্বাভাবিক-ভাবে সম্পর্ক ছেদ হয় এবং নিত্যপ্রাপ্ত পরমাত্মার সাক্ষাৎ অনুভূতি হয়। একেই বলা হয় নিত্যপ্রাপ্তের অন্বেষণ।

কর্তব্য-কর্ম না করে প্রমাদ-আলস্যে দিন যাপন করা এবং কর্তব্য-কর্ম করে তার ফলের আশা করা— এই দুটি হল মানুষের নিত্যপ্রাপ্ত পরমাত্মার অনুভবে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার মূল কারণ। এই বাধা দূর করার উপায় হল ফলের আশা না রেখে অন্যের প্রতি সেবার ভাবে কর্তব্য-কর্ম করা। ফলের আশা না রেখে কর্তব্য-কর্ম করলে কর্ম হতে সম্পর্ক-ছেদ হয়। কর্ম থেকে সম্পর্ক-ছেদ হলেই, পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের যে স্বতঃসিদ্ধ সম্পর্ক তা অনুভূত হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব— নিষ্কামভাবে শুধুমাত্র অন্যের হিতার্থে কর্ম (সেবা) করলে বা ভগবানের জন্য কর্ম (পূজা) করলে, সেই কর্ম দিব্য ও মুক্তিদায়ক হয়ে ওঠে। কিন্তু কামনাপূর্বক নিজের জন্য কর্ম করলে সেই কর্ম মলিন ও বন্ধনকারক হয়।

কর্মে কর্তৃত্ব না থাকাই হল দিব্যতা। নিজের জন্য কিছু না করলে কর্তৃত্ব থাকে না !

ভগবানের অতি ক্ষুদ্র ক্রিয়া এবং অতি বৃহৎ ক্রিয়া— প্রত্যেকটি ক্রিয়াই তাঁর লীলা। ভগবান সামান্য মানুষের ন্যায় ক্রিয়া করেও নির্লিপ্ত (গীতা ৪।১৩)। ভগবানের লীলা সবই দিব্য। এই দিব্যতা দেবগণের দিব্যভাব থেকেও বিশিষ্ট। দেবগণের দিব্যতা মানুষের সাপেক্ষ হওয়ায় তা সীমিত, কিন্তু ভগবানের দিব্যতা নিরপেক্ষ এবং অসীম। জীবন্মুক্ত, তত্ত্বজ্ঞ, ভগবদ্-প্রেমিক মহাপুরুষদের ক্রিয়াগুলি দিব্য হলেও ভগবদ্লীলার ন্যায় দিব্য হয় না। ভগবানের সাধারণ লীলাও অত্যন্ত অসাধারণ হয়। যেমন, ভগবানের রাসলীলা সাধারণভাবে লৌকিক বলে প্রতিভাত হলেও এটি পঠন-পাঠন দ্বারা সাধকের কাম-বৃত্তির বিনাশ হয় (শ্রীমদ্ভাগবত, দশম স্কন্ধ ৩৩।৪০)।

এই জগৎ ভগবানের আদি অবতার— **'আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য'** (শ্রীমদ্ভাগবত, ২।৬।৪১)। তাৎপর্য হল যে, ভগবানই জগৎ রূপে প্রকটিত হয়ে আছেন। কিন্তু জীব ভোগাসক্তিবশতঃ জগৎকে ভগবদ্রূপে স্বীকার না করে বিনাশশীল জগৎ-রূপেই মেনে নেয়— **'জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ'** (গীতা ৭।৫)। এই ধারণা দূর করার জন্য সাধকের দৃঢ়তার সঙ্গে স্বীকার করা উচিত যে, যা দেখা যায়, তা ভগবানের স্বরূপ এবং যেসব ঘটনা ঘটে, সেসব ভগবানেরই লীলা। এরূপ মেনে নিলে (স্বীকার করলে) জগৎ আর জগৎরূপে থাকে না এবং 'ভগবান ব্যতীত আর কিছুই নেই'— এটি অনুভূত হয়। অন্যভাবে বলা যায়, এর ফলে জগৎ-সংসার লুপ্ত হয়ে শুধু ভগবানই বিরাজিত থাকেন। কেননা প্রতিটি বস্তু ও ব্যক্তিকে ভগবানের স্বরূপ এবং প্রত্যেক ক্রিয়াকে ভগবদ্লীলা বলে মনে করলে ভোগাসক্তি এবং রাগ-দ্বেষ থাকে না। ভোগাসক্তির বিনাশ হলে যেসব ক্রিয়া আগে লৌকিক বলে মনে হত, সেই সব ক্রিয়া অলৌকিক ভগবদ্লীলারূপে প্রতিভাত হয় এবং যেখানে প্রথমে ভোগাসক্তি থাকে, সেখানে পরে তা ভগবৎ প্রেমে পরিবর্তিত হয়।

ভগবান যেমন রূপ ধারণ করেন, তদনুযায়ী লীলা করে থাকেন [১]। যখন তিনি অর্চাবতার বা মূর্তি ধারণ করেন, তখন তিনি মূর্তির ন্যায় অচলের লীলা করেন। তিনি যদি অচল না থাকেন তাহলে অর্চাবতার হবেন কী করে ? তিনি রাম-কৃষ্ণাদি রূপ এবং মৎস্য, কূর্মাদি রূপও ধারণ করেছেন। তিনি যেমন রূপ ধারণ করেন, তেমনই লীলা করেন। বরাহাবতারে যেমন তিনি শূকর রূপে লীলা করেছেন, আবার বামনাবতারে ব্রহ্মচারী হয়ে লীলা করেছেন। এর দ্বারা সাধকদের বুঝতে হবে যে এখন যা কিছু হচ্ছে, তা সবই ভগবৎলীলা।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—পরবর্তী শ্লোকে ভগবান তাঁর জন্ম-কর্মের দিব্যতা সম্বন্ধে যাঁরা জানেন তাঁদের সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন।

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ।। ১০ ।।

[**বীতরাগভয়ক্রোধাঃ** (আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ বর্জিত হয়ে) ; **মন্ময়াঃ** (আমাতে তদগতচিত্ত) ; **মাম্** (আমার) ; **উপাশ্রিতাঃ** (শরণাপন্ন) ; **জ্ঞানতপসা, পূতাঃ** (জ্ঞানরূপ তপস্যায় পবিত্র হয়ে) ; **বহবঃ** (অনেকে) ; **মদ্ভাবম্, আগতাঃ** (আমার স্বরূপ লাভ করেছেন।)]

আসক্তি, ভয় এবং ক্রোধবর্জিত হয়ে, আমাতে তদ্‌গতচিত্ত এবং আমার শরণাপন্ন তথা জ্ঞানরূপ তপস্যা দ্বারা পবিত্র হয়ে অনেক ভক্ত আমার স্বরূপ লাভ করেছেন ।। ১০ ।।

ব্যাখ্যা—'বীতরাগভয়ক্রোধাঃ'—পরমাত্মাতে বিমুখ হলে বিনাশশীল পদার্থে আসক্তি জন্মায়। আসক্তি থেকে প্রাপ্ত বস্তুতে 'মমতা' এবং অপ্রাপ্ত বস্তুতে 'কামনা' উৎপন্ন হয়। প্রিয় বস্তুর প্রাপ্তি হলে 'লোভ' হয়, আর সেগুলি প্রাপ্তিতে বাধা পড়লে (বাধা প্রদানকারীর ওপর) 'ক্রোধ' জন্মায়। বাধাপ্রদানকারী ব্যক্তি যদি নিজের থেকে শক্তিশালী হয় এবং তার ওপর নিজের ক্ষমতা জারী করা সম্ভব না হয় বা সেও কোনো সময় আমার ক্ষতি করতে পারে, যদি এই সম্ভাবনা থাকে—তবে 'ভয়' উৎপন্ন হয়। এইপ্রকার বিনাশশীল পদার্থের আসক্তি থেকেই ভয়-ক্রোধ-লোভ-মমতা-কামনা ইত্যাদি সকল দোষের উৎপত্তি হয়। আসক্তি দূর হলে এই দোষগুলিও দূর হয়। বস্তুগুলিকে নিজের বা নিজের জন্য মনে না করে অপরের এবং অপরের জন্য মনে করে তাদের সেবা করলে

---

[১]ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উতঙ্ক ঋষিকে বলেছেন—

ধর্মসংরক্ষণার্থায় ধর্মসংস্থাপনায় চ। তৈস্তৈর্বেষৈশ্চ রূপৈশ্চ ত্রিষু লোকেষু ভার্গব।।

(মহাভারত, অশ্বমেধপর্ব ৫৪।১৩-১৪)

'আমি ধর্মরক্ষা এবং ধর্ম স্থাপনার জন্য ত্রিলোকে নানা যোনিতে অবতরণ করে সেই সেই রূপ এবং আকৃতি অনুসারে ব্যবহার করে থাকি।'

যদা ত্বহং দেবযোনৌ বর্তামি ভৃগুনন্দন। তদাহং দেববৎ সর্বমাচরামি ন সংশয়ঃ।।
যদা গন্ধর্বযোনৌ বা বর্তামি ভৃগুনন্দন। তদা গন্ধর্ববৎ সর্বমাচরামি ন সংশয়ঃ ।।
নাগযোনৌ যদা চৈব তদা বর্তামি নাগবৎ। যক্ষরাক্ষসযোন্যোস্তু যথাবদ্ বিচরাম্যহম্।।

(মহাভারত, অশ্বমেধপর্ব ৫৪। ১৭-১৯)

'হে ভৃগুনন্দন ! যখন আমি দেবযোনিতে অবতরণ করি, তখন দেবতাদের ন্যায় সমস্ত আচার ব্যবহার করি, এতে কোনো সংশয় নেই।'

'যখন গন্ধর্ব যোনিতে প্রকটিত হই, আমার সব আচার-ব্যবহার গন্ধর্বদের ন্যায় থাকে, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই।'

'আমি যখন নাগরূপে জন্মাই তখন নাগেদের মতোই আচরণ করি। যক্ষ-রাক্ষসাদি রূপেও প্রকটিত হলে আমি তাদের মতোই আচরণ করে থাকি।'

আসক্তি দূর হয়। কারণ বাস্তবে এই সব পদার্থ বা ক্রিয়ার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্কই নেই।

নিজের কোনো প্রয়োজন না থাকলেও ভগবান কেবলমাত্র আমাদের কল্যাণের জন্যই অবতাররূপ গ্রহণ করেন। কারণ প্রাণীমাত্রেরই তিনি পরম সুহৃদ এবং তাঁর সমস্ত ক্রিয়াই জীবগণের কল্যাণের নিমিত্ত হয়ে থাকে। ভগবানের সহৃদয়তার ওপর এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপিত হলে ভগবানে আকর্ষণ জন্মায়। ভগবানে আকর্ষণ সৃষ্টি হলে সংসারের আকর্ষণ (আসক্তি) স্বতঃই দূর হয়। যেমন, বালকেরা বাল্যকালে নুড়ি-পাথরে আকর্ষণ বোধ করে এবং তার দ্বারা খেলাধুলা করে। খেলার সময় তারা এই নুড়ি-পাথরের অধিকার নিয়ে মারামারিও করে, কেউ বলে 'এটা আমার', অন্যে বলে 'এটা আমার'। এইভাবে রাস্তায় পড়ে থাকা নুড়ি-পাথরকেও তারা দামি বস্তু মনে করে। কিন্তু যখন এদের বয়োবৃদ্ধি হয় তখন নুড়ি-পাথরের টুকরো থেকে তাদের আকর্ষণ মিটে গিয়ে টাকা-পয়সাতে হয়। অর্থের ওপর আকর্ষণ বৃদ্ধি পাওয়ায় তখন তাদের আর নুড়ি-পাথর বা খেলনাতে আকর্ষণ থাকে না। এইভাবেই মানুষ যখন পরমাত্মাতে মগ্ন হয় তখন তাদের অর্থ-সম্পদ ইত্যাদি জাগতিক বস্তুর প্রতি আর কোনো আকর্ষণ থাকে না, সবই অর্থহীন হয়ে যায়। জগতের আকর্ষণ এবং আসক্তি দূর হয়। আসক্তি দূর হলেই ভয় এবং ক্রোধ—এই দুটি দূর হয়, কারণ এই দুটিই আসক্তির আশ্রয়ে অবস্থান করে।

'মন্ময়াঃ'—ভগবানের জন্ম এবং কর্মের দিব্যভাব তত্ত্বতঃ জানলে মানুষের ভগবানের ওপর ভালোবাসা জন্মায়, ভালোবাসা জন্মালে সে ভগবানের শরণাগত হয় এবং শরণাগত হলে সে স্বয়ং **'মন্ময়াঃ'** অর্থাৎ ভগবৎময় হয়ে যায়।

জগৎ-সংসারের ভোগে আসক্ত মানুষ ভোগাদির কামনায় তন্ময় হয়ে যায়—**'কামাত্মানঃ'** (গীতা ২।৪৩) তদ্রূপ ভগবানে আকৃষ্ট হলে মানুষ ভগবানে তন্ময় হয়ে যায়—**'তন্ময়াঃ'** (নারদ ভক্তিসূত্র ৭০)। সে সর্বদা ভগবানেই লীন হয়ে থাকে। তার বিচার-বিবেচনা-আচরণ ইত্যাদিতে ভগবানেরই প্রাধান্য প্রকাশ পায়। প্রেমের আধিক্যবশতঃ সেও ভগবৎস্বরূপ হয়ে যায়, যেন তার আর পৃথক কোনো সত্তাই নেই।[১]

'মামুপাশ্রিতাঃ'—**'বীতরাগভয়ক্রোধাঃ'**-তে জগৎ-সংসার থেকে সম্পর্ক-ছেদ হয়ে যায় এবং **'মন্ময়াঃ মাম্ উপাশ্রিতাঃ'**-তে ভগবানে একাত্মতা হয়।

কারো আশ্রয় না নিয়ে মানুষ বাঁচতেই পারে না। ভগবানের অংশ জীব ভগবান হতে বিমুখ হয়ে অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করলে সেই আশ্রয় চিরস্থায়ী হয় না, অচিরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। অর্থ ইত্যাদি বিনাশশীল পদার্থের আশ্রয় পতন ঘটায়। শুধু তাই নয়, শুভ কর্ম করার বুদ্ধি, ভগবৎ প্রাপ্তির সাধনাদি এবং ভোগ ও সম্পদ-সংগ্রহ ত্যাগেরও আশ্রয় নিলে ভগবদ্-প্রাপ্তিতে বিলম্ব হয়। মানুষ যতক্ষণ স্বয়ং (স্বরূপ দ্বারা) ভগবানের শরণাগত না হয়, ততক্ষণ তার পরাধীনতা দূর হয় না এবং সে দুঃখ ভোগ করতেই থাকে।

জাগতিক পদার্থে মানুষের আকর্ষণ এবং আশ্রয় পৃথক পৃথক স্থানে হয়ে থাকে, যেমন মানুষের আকর্ষণ স্ত্রী-পুত্র ইত্যাদিতে থাকে এবং সে আশ্রয় নেয় বড়োর কাছেই। কিন্তু ভগবদ্‌মুখী মানুষের ভগবানেই আকর্ষণ থাকে এবং সে ভগবানেরই শরণাগত হয়ে থাকে, কারণ প্রিয় থেকে প্রিয়তম হলেন ভগবান আর মহৎ থেকেও অতি মহৎ সেই ভগবানই।

'বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ'—জ্ঞানযোগে (সাংখ্যনিষ্ঠা) যদিও মানুষ পবিত্র হতে পারে, তা সত্ত্বেও এইস্থানে ভগবানের দিব্যজন্ম এবং কর্মের তত্ত্ব জানাকেই 'জ্ঞান' বলা হয়েছে। এই জ্ঞানের দ্বারা মানুষ পবিত্র হয়, কারণ তিনি পবিত্র হতেও পবিত্র—**'পবিত্রাণাং পবিত্রং**

---

[১]গতিস্মিতপ্রেক্ষণভাষণাদিষু প্রিয়াঃ প্রিয়স্য প্রতিরূঢ়মূর্তয়ঃ। অসাবহং ত্বিত্যবলাস্তদাত্মিকা ন্যবেদিষুঃ কৃষ্ণবিহারবিভ্রমাঃ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩০।৩)

'নিজ প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের চাল-চলন, হাস্য-বিলাস এবং চিত্তবন-বিহার ইত্যাদিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় গোপিনীগণ তাঁরই মতো হয়ে গিয়েছিলেন ; তাঁদের দেহেও সেই গতি-মতি, সেই ভাব-ভঙ্গী অনুরণিত হচ্ছিল। তাঁরা নিজেদের স্বরূপ ভুলে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ হয়ে গিয়েছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিলাস অনুকরণ করতে করতে 'আমিও শ্রীকৃষ্ণ'—এইরূপ বলতে শুরু করেছিলেন।

যঃ'। ভগবানের অংশীভূত হওয়ায় জীবের মধ্যেও স্বাভাবিকভাবে পবিত্রতা থাকে—**'চেতন অমল সহজ সুখ রাসী'** (শ্রীরামচরিতমানস ৭।১১৭।১)। বিনাশশীল পদার্থকে গুরুত্ব দিলে, সেগুলিকে নিজের বলে মনে করলেই অপবিত্রভাব আসে। কারণ বিনাশশীল পদার্থের আসক্তিই হল মলিনতা (অপবিত্রতা)[১]। ভগবানের জন্ম ও কর্মের তত্ত্ব জানলে বিনাশশীল পদার্থের আকর্ষণ, আসক্তি সর্বতোভাবে দূর হয়, সমস্ত মালিন্য চলে যায় ও মানুষ পরম পবিত্র হয়ে ওঠে।

কর্মযোগের প্রসঙ্গ হওয়ায় উপরিউক্ত পদে উল্লেখিত **'জ্ঞান'** শব্দটির অর্থ হিসাবে কর্মযোগের জ্ঞানকেও মানা যেতে পারে। কর্মযোগের জ্ঞান হল—শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, পদ, যোগ্যতা, অধিকার, অর্থ, সম্পত্তি ইত্যাদি প্রাপ্ত বস্তুগুলি জগৎ-সংসারের এবং জগৎ-সংসারেরই জন্য, নিজস্ব বা নিজের জন্য নয়। কারণ স্বয়ং (স্বরূপ) হল নিত্য, অতএব তার সঙ্গে অনিত্য বস্তু সর্বদা কীভাবে থাকতে পারে এবং সেইগুলি তার কী কাজেই বা লাগতে পারে ? শরীরাদি বস্তুগুলি জন্মের পূর্বেও আমাদের সঙ্গে ছিল না এবং মৃত্যুর পরও থাকবে না এবং বর্তমানেও প্রতিমুহূর্তে এটির সম্পর্কচ্ছেদ হচ্ছে। এই প্রাপ্ত বস্তুগুলির সদ্ব্যবহার করার অধিকারই আমাদের আছে, নিজের বলে মনে করার কোনো অধিকার নেই। এই বস্তুগুলি জগতেরই, সুতরাং জগতেরই সেবায় এগুলি ব্যয় করতে হয়। এই হল এগুলির সদ্ব্যবহার। এগুলি নিজস্ব বা নিজের বলে মনে করাই হল বাস্তবিক বন্ধন বা অপবিত্রতা।

এইপ্রকার বিনাশশীল বস্তুগুলিকে নিজস্ব বা নিজের বলে মনে না করাই হল **'জ্ঞানতপস্যা'**, যার দ্বারা মানুষ পরম পবিত্র হয়। যত তপস্যা আছে, 'জ্ঞানতপস্যা' তার মধ্যে সবচেয়ে বড় তপস্যা। জ্ঞানতপস্যার দ্বারা জড়ের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক সর্বতোভাবে বিচ্ছিন্ন হয়। মানুষ যতক্ষণ জড়ের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক বজায় রাখে, ততক্ষণ অন্য কোনো তপস্যায় সে ততো পবিত্র হয় না, যত পবিত্রতা জ্ঞানতপস্যার সাহায্যে জড়ের সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ হয়। এই জ্ঞানতপস্যার দ্বারা পবিত্র হয়ে মানুষ ভগবানের ভাবকে (অস্তিত্ব) অর্থাৎ সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হয়। এর তাৎপর্য হল এই যে, ভগবান যেমন নিত্য এবং নিরন্তর অবস্থান করেন ; ভগবান যেমন নির্লিপ্ত ও নির্বিকার ভাবে থাকেন, সেও তেমনি নির্লিপ্ত ও নির্বিকার ভাব প্রাপ্ত হয়, ভগবানের যেমন কিছু করা বাকি থাকে না, তারও তেমনি কিছু করা বাকি থাকে না। জ্ঞানমার্গ দ্বারাও মানুষ এইরূপ ভগবানের ভাব প্রাপ্ত হয় (গীতা ১৪।১৯)।

আগেও অনেক ভক্ত জ্ঞানতপস্যার দ্বারা পবিত্র হয়ে ভগবানকে লাভ করেছেন। সুতরাং বর্তমানেও সাধকদের জ্ঞানতপস্যার সাহায্যে পবিত্রতা লাভ করে ভগবানকে লাভ করা উচিত। ভগবানকে পাওয়ায় সকলেই স্বাধীন, কেউই পরাধীন নয়। কারণ এই মানব-দেহ পরমাত্ম-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যেই পাওয়া।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—ভগবানের জন্মের দিব্যতা সম্বন্ধে বর্ণনা করা হল, এবার তাঁর কর্মের দিব্যতা কী সেই বিষয়ের সূচনা করা হচ্ছে।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্‌।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥ ১১ ॥

[**পার্থ** (হে পৃথানন্দন !) ; **যে, যথা** (যে ভক্ত যেভাবে) ; **মাম্‌** (আমার) ; **প্রপদ্যন্তে** (শরণাগত হয়) ; **অহম্‌** (আমি) ; **তান্‌, তথা, এব** (তাকে সেইভাবেই) ; **ভজামি** (আশ্রয় দান করে থাকি) ; **মনুষ্যাঃ** (সকল মনুষ্য) ; **সর্বশঃ** (সর্বপ্রকারে) ; **মম** (আমারই) ; **বর্ত্ম** (পথের) ; **অনুবর্তন্তে** (অনুসরণ করে।)]

হে পৃথানন্দন ! যে ভক্ত যে-ভাবে আমার শরণাগত হয়, আমি তাকে সেইভাবেই আশ্রয় দান করে থাকি ; কারণ সকল মনুষ্য সর্বপ্রকারে আমারই পথের অনুসরণ করে ॥ ১১ ॥

---

[১] 'মমতা মল জরি জাই' (শ্রীরামচরিতমানস ৭।১১৭ক) ; 'মমতামেধ্যদূষিতঃ' (যোগবাসিষ্ঠ ৬।২।৫৩।১১)।

ব্যাখ্যা—**'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'**—ভক্ত যে-ভাবে, যে সম্বন্ধ নিয়ে, যে প্রকারে ভগবানের শরণাগত হয় ভগবানও তাকে সেইভাবে, সেই সম্বন্ধ অনুসারে, সেইভাবে আশ্রয় দেন। যেমন, ভক্ত যদি ভগবানকে গুরু বলে মেনে নেয়, তাহলে তিনি শ্রেষ্ঠ গুরু হয়ে থাকেন, শিষ্য বলে মনে করলে, শ্রেষ্ঠ শিষ্য হয়ে যান, বাবা-মা বলে মনে করলে, তিনি আদর্শ বাবা-মা হয়ে থাকেন, পুত্র বলে মনে করলে, শ্রেষ্ঠ পুত্র হন, ভাই বলে মনে করলে আদর্শ ভাই হন, সখা বলে মনে করলে শ্রেষ্ঠ সখা হন, সেবক বলে মনে করলে, শ্রেষ্ঠ সেবক রূপে থাকেন। ভক্ত যদি ভগবানকে না পেয়ে ব্যাকুল হয়ে যায়, তাহলে ভগবানও ভক্তের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন।

ভগবানের প্রতি অর্জুনের সখ্যভাব ছিল এবং তিনি তাঁকে নিজের সারথিরূপে চেয়েছিলেন, তাই ভগবান সখ্যভাবে তাঁর সারথি হলেন। ঋষি বিশ্বামিত্র ভগবান শ্রীরামকে নিজের শিষ্য বলে মনে করতেন এবং ভগবান তাঁর শিষ্য হয়েছিলেন। এইরূপ, ভগবানের নীতিই হল ভক্তদের শ্রদ্ধার ভাব অনুযায়ী তাদের প্রতি সেইরকম আচরণ করা।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু ভগবানও তাঁর সৃষ্ট সাধারণ মানুষের ভাব অনুযায়ী ব্যবহার করেন, এ তাঁর কী মহান ঔদার্য, দয়া এবং সমপ্রাণতা!

ভগবান বিশেষভাবে ভক্তদের জন্যই অবতাররূপ গ্রহণ করেন—এটি বর্তমান আলোচনা (প্রকরণ) থেকে প্রমাণিত হয়। ভক্তেরা যেভাবে, যে রূপে ভগবানের সেবা করতে চান, ভগবানকেও তাঁদের জন্য সেই রূপে আসতে হয়। যেমন, উপনিষদে বলা আছে—**'একাকী ন রমতে'** (বৃহদারণ্যক ১।৪।৩)—একাকী ভগবানের মন মানে না, তাই তিনি নানারূপে প্রকটিত হয়ে ক্রীড়ারত হন। এইভাবে যখন ভক্তদের মনে ভগবানের সঙ্গে ক্রীড়ার ইচ্ছা জাগে, তখন ভগবান তাঁর ভক্তদের সঙ্গে ক্রীড়া (লীলা) করার জন্য প্রকটিত হন। ভক্ত ভগবান ব্যতিরেকে যেমন থাকতে পারেন না তেমনই ভগবানও ভক্ত বিনা থাকতে পারেন না।

এখানে উল্লেখিত **'যথা'** এবং **'তথা'**—বাচক পদগুলির তাৎপর্য হল 'সম্বন্ধ', 'ভাব' এবং 'একাগ্রতা'। ভক্ত এবং ভগবানের ভাব একই রকমের হলেও একটি বড় পার্থক্য হচ্ছে এই যে, ভগবান ভক্তের সামর্থ্যানুযায়ী নিজের সামর্থ্য বা শক্তির প্রয়োগ করেন না বরং নিজের শক্তি অনুসারেই আচরণ করে থাকেন[১]। ভগবান সর্বত্র বিদ্যমান, সর্ব সমর্থ, সর্বজ্ঞ, পরম সুহৃদ এবং সত্যসঙ্কল্প। ভক্তকে কেবল নিজের সম্পূর্ণ শক্তি নিয়োজিত করতে হবে, তাহলে ভগবানও তদনুরূপভাবে ভক্তের জন্য পূর্ণশক্তি নিয়োগ করেন।

সাধক নিজেই ভগবদ্প্রাপ্তিতে বাধা সৃষ্টি করেন। কেননা ভগবদপ্রাপ্তির জন্য প্রাপ্ত বুদ্ধি, সামগ্রী, সময় এবং শক্তিকে তিনি নিজের বলে মনে করেন, সেগুলিকে পুরো ব্যবহার না করে নিজের জন্য কিছুটা রেখে দেন। সাধক যদি সেগুলি নিজের বলে না মনে করে সেগুলি পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করেন, তাহলে তাঁর শীঘ্রই ভগবদ্প্রাপ্তি হয়ে থাকে। কারণ ওই সমস্ত কোনো বস্তুই তাঁর নয়, সেগুলি ভগবান হতে প্রাপ্ত, ভগবানেরই সামগ্রী। তাই সেগুলিকে নিজের বলে মনে করাই বাধাস্বরূপ। সাধক নিজেও ভগবানেরই অংশ। তথাপি তিনি নিজেই ভগবানের থেকে নিজেকে পৃথক বলে মনে করেন, কিন্তু ভগবান তা মনে করেন না।

ভক্তি (প্রেম) কর্মজনিত অর্থাৎ কোনো সাধন বিশেষের ফল নয়। সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হলে ভক্তি স্বতঃই পাওয়া যায়। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মাধুর্য ইত্যাদি ভাবগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল শরণাগতির ভাব। এখানে ভগবান যেন এই কথাই বলতে চেয়েছেন, 'তুমি তোমার সবকিছু আমায় দিলে আমিও আমার সমস্ত তোমায় দেব আর তুমি যদি তোমাকেই আমায় দাও, তবে আমিও নিজেকে তোমায় দেব।' ভগবৎ প্রাপ্তির কী সহজ এবং সুলভ ব্যবস্থা!

ভগবৎ চরণে নিজেকে সমর্পণ করলে ভগবান ভক্তের অতীতের ভুল-ভ্রান্তিগুলি আর মনে রাখেন না। তিনি সাধকের হৃদয়ের বর্তমানের দৃঢ় ভাবটি শুধু লক্ষ্য করেন—

রহতি ন প্রভু চিত চূক কিএ কী।
করত সুরতি সয় বার হিএ কী॥
(শ্রীরামচরিতমানস ১।২৯।৩)

এই (একাদশ) শ্লোকে দ্বৈত-অদ্বৈত, সগুণ-নির্গুণ, সাযুজ্য-সামীপ্য ইত্যাদি শাস্ত্রীয় বিষয়ের বর্ণনা নেই, বরং

[১]দরিয়া দূষণ দাস মেঁ, নহীঁ রাম মে দোষ। জন চালে ইক পাঁবড়ো, হরি চালে সৌ কোস॥

বর্ণনা আছে ভগবানের আপন ভাবের। যেমন নবম শ্লোকে ভগবানের জন্ম কর্মের দিব্যতা জানলে কীভাবে ভগবদ্‌ প্রাপ্তি হয় তাই বর্ণনা করা হয়েছে। 'একমাত্র ভগবানই আমার এবং আমি ভগবানের, অন্য কেউ আমার নয় এবং আমিও কারোর নই'—এইভাবে ভগবানের সঙ্গে একাত্মতা করলে তাঁর প্রাপ্তি শীঘ্র এবং অনায়াসে হয়। সুতরাং সাধকের কেবল ভগবানকেই আপন বলে মেনে নেওয়া উচিত (যেটি বাস্তব সত্য), তা বোঝা যাক বা না যাক। শুধু মেনে নেওয়াতেই যখন জাগতিক মিথ্যা সম্পর্কগুলি সত্য বলে প্রতীয়মান হয়, তখন ভগবানের সঙ্গে আমাদের যে সম্বন্ধ নিত্য নিয়ত, তাঁর সম্বন্ধ কেন অনুভবে আসবে না ? অর্থাৎ অবশ্যই অনুভবে আসবে।

প্রশ্ন—ভগবানকে যে যেভাবে উপাসনা করে, ভগবানও তার সঙ্গে সেইভাবেই ব্যবহার করেন। তাহলে কেউ যদি ভগবানের সঙ্গে দ্বেষ বা শত্রুতা ইত্যাদি ভাব রেখে সম্বন্ধ স্থাপন করে তাহলে ভগবানও কি তার সঙ্গে সেই (দ্বেষ ইত্যাদি) ভাব দ্বারাই ব্যবহার করেন ?

উত্তর—এখানে **'প্রপদ্যন্তে'** পদটির দ্বারা ভগবানের প্রপত্তি অর্থাৎ শরণাগতির বিষয় বোঝায় ; দ্বেষ বা শত্রুতার বিষয় নয়। সুতরাং এখানে সেই বিষয়ে প্রশ্ন জাগতেই পারে না। তা সত্ত্বেও এটি নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় ভগবানকে স্বীকার করার তাৎপর্য হল—কল্যাণ করা। ভগবানকে যে যেভাবে উপাসনা করে, ভগবানও তার সঙ্গে সেইরূপই আচরণ করে অন্তিমকালে তার কল্যাণ করেন।[১] ভগবান প্রাণীমাত্রেরই পরম সুহৃদ (গীতা ৫।২৯), তাই যার যাতে মঙ্গল হয়, ভগবান তার জন্য সেরূপ ব্যবস্থাই করে থাকেন। হিংসা দ্বেষ যারা করে তাদেরও যাতে কল্যাণ হয়, ভগবান সেইরূপই করে থাকেন। (হিংসা-দ্বেষকারীরা ভগবানের কী ক্ষতিই বা করতে পারে ?) অঙ্গদকে রাবণের সভায় পাঠাবার সময় ভগবান শ্রীরাম বলেছিলেন যে, এমন কথা বলবে যাতে আমাদের কাজও হয় আর রাবণের মঙ্গল হয়— **'কাজু হমার তাসু হিত হোঈ'** (শ্রীরামচরিতমানস ৬।১৭।৪)।

ভগবানের সৌহৃদ্যের কথা তো বলাই বাহুল্য, তাঁর ভক্তও সমস্ত প্রাণীর সুহৃদ হয়ে থাকেন—**'সুহৃদঃ সর্বদেহিনাম্‌'** (শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২৫।২১)। ভক্ত দ্বারাই যখন কারো কিছুমাত্র অহিত কার্য হয় না, তখন ভগবানের দ্বারা কারো অহিত হওয়া কী করে সম্ভব ? ভগবানের সঙ্গে যে-কোনোভাবে সম্পর্ক স্থাপন করলেই তা কল্যাণকর হয়, কারণ ভগবান পরম দয়ালু, পরম সুহৃদ এবং চিন্ময়। যেমন বৈশাখ মাসে বা মাঘ মাসে যখনই গঙ্গাস্নান করা হোক না কেন, দুই সময়েই মাহাত্ম্য একই থাকে, তবুও বৈশাখ মাসে স্নান করলে মন যত প্রসন্ন হয়, মাঘ মাসের স্নানে সেই প্রসন্নতা আসে না। এইরূপ ভক্তি এবং প্রেম সহকারে ভগবানে সম্পর্ক স্থাপনকারীর যেরূপ আনন্দ লাভ হয়, হিংসা ও শত্রুতাপূর্বক সম্পর্ক স্থাপনকারী সেইরূপ আনন্দ পায় না।

'মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ'—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যেমন আচরণ করেন, অন্যান্য ব্যক্তিগণও সেই অনুযায়ী আচরণ করতে থাকে (গীতা ৩। ২১)। ভগবান সব থেকে শ্রেষ্ঠ (সবার ওপরে)। তাই সকলেই তাঁর পথ অনুসরণ করে। তৃতীয় অধ্যায়ের তেইশতম শ্লোকের উত্তরার্ধেও এই কথাই (উপরিউক্ত শব্দ দ্বারা) বলা হয়েছে।

সাধক ভগবানের সঙ্গে যেরূপ সম্পর্ক মেনে নেন, ভগবান তার সঙ্গে সেই সম্পর্কই মানার জন্য প্রস্তুত থাকেন। রাজা দশরথ ভগবান শ্রীরামকে পুত্ররূপে চেয়েছিলেন, তাই ভগবান তাঁর পুত্র হয়েই জন্মেছিলেন এবং পূর্ণ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও 'পিতা' দশরথের বাক্য লঙ্ঘনে নিজেকে অসমর্থ বলে জানিয়েছিলেন।[২]

---

[১]'কামাদ্‌ দ্বেষাদ্‌ ভয়াৎ স্নেহাদ্‌ যথা ভক্তেশ্বরে মনঃ। আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্‌গতিং গতাঃ।।' (শ্রীমদ্ভাগবত ৭।১।২৯)
'অনেক ব্যক্তি কাম, হিংসা, ভয় এবং স্নেহ দ্বারা নিজের মনকে ভগবানে নিয়োজিত করে এবং নিজের সমস্ত পাপ ধৌত করে ভগবানকে তেমন করে লাভ করে, ভক্ত যেমন ভক্তি দ্বারা লাভ করেন।'

[২]অহং হি বচনাদ্‌ রাজ্ঞঃ পতেয়মপি পাবকে। ভক্ষয়েয়ং বিষং তীক্ষ্ণং পতেয়মপি চার্ণবে।।
(বাল্মীকি রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড ১৮।২৮-২৯)
ভগবান শ্রীরাম বলেছেন—'আমি আমার পিতার কথায় অগ্নিতে প্রবেশ করতে পারি, তীক্ষ্ণ বিষ ভক্ষণ করতে পারি এবং সমুদ্রেও ঝাঁপ দিতে পারি।'

এইরূপ আচরণ দ্বারা ভগবান এই রহস্য প্রকটিত করেছেন যে, যদি তোমার জগতে কারো সাথে কোনো সম্বন্ধজনিত প্রিয়ভাব থাকে, তবে সেই সম্পর্ক তুমি আমার সঙ্গে স্থাপন করো, যেমন—মায়ের ওপর প্রিয়ভাব থাকলে তুমি আমাকে তোমার মা বলে মনে করো, বাবার ওপর প্রিয়ভাব থাকলে তুমি আমাকে তোমার বাবা বলে মনে করো, পুত্রের ওপর প্রিয়ভাব থাকলে আমাকে তোমার পুত্র বলে মনে করো ইত্যাদি। এরূপ ভাবলে প্রকৃতই আমার ওপর ভালবাসা জন্মাবে এবং অতি সহজেই আমাকে প্রাপ্ত হবে।

দ্বিতীয়তঃ, ভগবান তাঁর আচরণের দ্বারা এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, আমার সঙ্গে যে যে-প্রকার সম্পর্ক স্থাপন করে, আমি তার জন্য সেইরূপই হয়ে থাকি। সেইভাবে তোমার সঙ্গে যে যেমন সম্পর্ক স্থাপন করে, তুমিও তার প্রতি সেইরূপই হয়ে যাও। যেমন—মা-বাবার কাছে সুপুত্ররূপে থাক, স্ত্রীর নিকট সুযোগ্য স্বামীরূপে থাক, ভগিনীর কাছে শ্রেষ্ঠ ভ্রাতা হয়ে থাক ইত্যাদি। কিন্তু পরিবর্তে তুমি কিছু আশা কোরো না, কিছু পাবার আশায় মা-বাবাকে আপন না ভেবে কেবল সেবা করার জন্যই তাঁদের আপন বলে ভাববে। এরূপ মনে করাই হল ভগবানের পথ অনুসরণ করা। অভিমান রহিত হয়ে নিঃস্বার্থভাবে অন্যের সেবা করলে শীঘ্রই অন্যের প্রতি মমতা ভগবানের প্রীতিতে পরিণত হয়, যার দ্বারা ভগবদ্-প্রাপ্তি হয়।

বিশেষ কথা

অহংকার বর্জিত হয়ে নিঃস্বার্থভাবে কাউকে ভালোবাসলে সেই প্রেম স্বতঃই প্রেমময় ভগবানের দিকে যায়। কারণ অহংকার এবং স্বার্থপরতাই ভগবদ্ প্রেমে বাধা প্রদান করে। এই দুটির জন্যই মানুষের প্রেমভাব সীমিত হয়ে যায় এবং এটি পরিত্যাগ করলে তার প্রেমভাব ব্যাপক হয়। প্রেমভাব ব্যাপক হলে তার মেনে নেওয়া সমস্ত বানানো সম্পর্কই দূর হয় এবং ভগবানের সঙ্গে স্বাভাবিক নিত্য-সম্পর্ক জাগ্রত হয়।

জীবমাত্রেরই পরমাত্মার সঙ্গে স্বাভাবিক নিত্য সম্পর্ক থাকে (গীতা ১৫।৭)। কিন্তু জীব যতক্ষণ এই সম্পর্কটি চিনতে না পেরে অন্য সম্পর্ক স্থাপন করতে থাকে, ততক্ষণ সে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। তার এই বন্ধন দুদিক থেকে হয়—এক, সে ভগবানের সঙ্গে তার নিত্য সম্পর্কটি জানে না এবং দুই, যার সঙ্গে তার বাস্তবিক কোনো সম্পর্ক নেই, তার সঙ্গে সে তার সম্পর্ককে স্থায়ীরূপে গণ্য করে নেয়। জীব যখন **'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে'** অনুযায়ী তার সম্পর্ক কেবল ভগবানের সঙ্গে মেনে নেয় অর্থাৎ জেনে নেয়, তখন তার ভগবানের সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ অনুভূত হয়।

ভগবানের সঙ্গে নিত্য-সম্পর্ক অনুভব করাও ভগবানের শরণাগত হওয়া। শরণাগত হলে ভক্ত নিশ্চিন্ত, নির্ভয়, নিঃশোক ও নিঃশঙ্ক হয়ে যায়। তারপর আর তার দ্বারা ভগবানের নির্দেশ বিরুদ্ধ কোনো কাজ হওয়া কি সম্ভব ? তার সমস্ত কাজই তখন ভগবানের নির্দেশানুযায়ী হয়—**'মম বর্ত্মানুবর্তন্তে'**।

পরিশিষ্ট-ভাব—এই জগৎ-সংসার যদিও সাক্ষাৎ পরমাত্মার স্বরূপ, তা সত্ত্বেও যে তাঁকে যে রূপে দেখে, তার কাছে তিনি সেই রূপেই প্রকটিত হন। আমরা নিজেকে শরীর ভেবে যখন নিজের জন্য বস্তুর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি, তখন ভগবান সেই বস্তুর রূপধারণ করে আমাদের সামনে উপস্থিত হন। আমরা অসৎ-এ স্থিত হলে ভগবানও সেই অসৎ-রূপে প্রতিভাত হন। যেমন ছেলেরা খেলনা চাইলে বাবা টাকা খরচ করেও তার জন্য খেলনা কিনে এনে দেন, তেমনই আমরাও যা চাই পরম দয়ালু ভগবান (সর্বদা সৎস্বরূপ হয়েও) সেই রূপে আমাদের কাছে প্রকটিত হন। আমরা যদি ভোগাদি না চাই তাহলে তাঁকে আর কেন ভোগরূপে আসতে হবে ? সাজানো রূপ কেনই বা ধারণ করতে হবে ?

ভগবানের নিয়মে 'যেখানে যেমন, সেখানে তেমন' হলেও জীবের প্রতি তাঁর কৃপা অসাধারণ, কারণ কোথায় জীব আর কোথায় ভগবান ! অহং-অভিমান ব্যতীত জীবের আর কী ক্ষমতা আছে ? তা সত্ত্বেও জীব যদি ভগবানে আকৃষ্ট হয়, ভগবানও জীবে আকৃষ্ট হন। যেমন, বিদুরপত্নী নিজ ভাবে বিভোর হয়ে ভুল করে শ্রীকৃষ্ণকে কলার খোসা খেতে দিলে ভগবানও নিজেকে ভুলে গিয়ে সেটি খেয়ে নিলেন এবং তাতেই আনন্দ পেলেন !

ভগবানের নিয়মে 'যেখানে যেমন' ব্যাপারটি শুধু ক্রিয়াতে আছে, ভাবে নয়। অত্যন্ত আস্তিক ব্যক্তির প্রতি ভগবানের যে স্নেহ ও কৃপা থাকে, তেমনই স্নেহ ও কৃপা অতি নাস্তিকের প্রতিও থাকে। তাই ভগবানের 'যেখানে যেমনে' স্বার্থভাব নেই, বরং এ তাঁর মহত্ত্ব। ভগবান হয়েও তিনি জীবকে আপন বলে মেনে নেন, নিজের মতোই ভাবেন ! তাঁর সব

থেকে বড় মহত্ত্ব হল যে তিনি নিজের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের ভাব রাখেন না।

সম্বন্ধ— আগের শ্লোকটিতে ভগবান বলেছেন যে, যে আমাকে যে-ভাবে স্বীকার করে, আমিও তাকে সেইভাবে গ্রহণ করি অর্থাৎ আমাকে প্রাপ্ত হওয়া অত্যন্ত সরল ও সহজ। তা সত্ত্বেও লোকে কেন ভগবানের শরণাগত হয় না— পরবর্তী শ্লোকে তার কারণ জানাচ্ছেন।

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা।। ১২ ।।

[**কর্মণাম্, সিদ্ধিম্** (কর্মসিদ্ধি) ; **কাঙ্ক্ষন্তঃ** (আকাঙ্ক্ষাকারী ব্যক্তি) ; **দেবতাঃ** (দেবতাদের) ; **যজন্তে** (পূজা ও আরাধনা করে) ; **হি** (কারণ) ; **ইহ, মানুষে, লোকে** (এই মনুষ্যলোকে) ; **কর্মজা** (কর্ম হতে উৎপন্ন) ; **সিদ্ধিঃ** (ফল) ; **ক্ষিপ্রম্** (শীঘ্রই) ; **ভবতি** (পাওয়া যায়।)]

কর্মসিদ্ধি (ফল) আকাঙ্ক্ষাকারী ব্যক্তি দেবতাদের পূজা-আরাধনা করে, কারণ এই মনুষ্যলোকে কর্ম হতে উৎপন্ন ফল শীঘ্রই পাওয়া যায় ।। ১২ ।।

ব্যাখ্যা—**'কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ'**—মানুষ নতুন কর্ম করার অধিকার লাভ করেছে। কর্ম করলেই যে সিদ্ধিলাভ হয় তা প্রত্যক্ষ করা যায়। সেইজন্য মানুষের হৃদয়ে স্থির থাকে যে বিনা কর্মে কোনো বস্তু পাওয়া যায় না। তারা এমনও মনে করে যে জাগতিক পদার্থের ন্যায় ভগবৎপ্রাপ্তিও কর্ম (তপ, ধ্যান, সমাধি ইত্যাদি) করলে লাভ হয়। বিনাশশীল পদার্থের আসক্তিবশতঃ তাদের দৃষ্টি এই বাস্তবিকতার দিকে যায় না যে জাগতিক বস্তুগুলি কর্মজনিত, একদেশীয় তথা সেগুলি নিত্যপ্রাপ্ত নয় ; সেসব আমাদের থেকে পৃথক এবং পরিবর্তনশীল। তাই সেগুলি প্রাপ্ত করতে হলে কর্ম করার প্রয়োজন হয়। কিন্তু ভগবান কর্মজনিত নন, তিনি ব্যাপ্তি-স্বরূপ আমাদের নিত্যপ্রাপ্ত, আমাদের থেকে পৃথক নন এবং অপরিবর্তনশীল। তাই ভগবৎ-প্রাপ্তিতে জাগতিক বস্তু প্রাপ্তির নিয়ম খাটে না। শুধুমাত্র প্রগাঢ় আকাঙ্ক্ষা থাকলেই ভগবদ্‌প্রাপ্তি হয়। তীব্র ইচ্ছা না হওয়ার মুখ্য কারণই হল জাগতিক ভোগের কামনা।

ভগবান পিতার মতো এবং দেবতা দোকানদারের মতো। দ্রব্য না দিলে দোকানদারের অর্থ গ্রহণ করার অধিকার থাকে না। কিন্তু পিতার অর্থ গ্রহণের অধিকারও থাকে এবং দ্রব্য প্রদানেরও। পিতার কাছ থেকে কোনো বস্তু নিতে গেলে পুত্রকে তার মূল্য দিতে হয় না, কিন্তু দোকানদারের কাছ থেকে কোনো বস্তু নিলে তার মূল্য দিতে হয়। তেমনই ভগবানের নিকট থেকে কিছু নিতে গেলে তার দাম দেওয়ার প্রয়োজন নেই, কিন্তু দেবতাদের কাছ থেকে কিছু পেতে গেলে বিধিপূর্বক ক্রিয়াকর্ম করতে হয়। দোকানদারের নিকট থেকে শিশু দেশলাই, ছুরি ইত্যাদি ক্ষতিকারক দ্রব্যাদিও দাম দিয়ে কিনতে পারে। কিন্তু সেই বালক যদি তার পিতার কাছে ওইসব ক্ষতিকারক বস্তু চায় তাহলে তিনি তাকে সেগুলি দেন না এবং পয়সাও নিয়ে নেন। পিতা তাকে এমন বস্তু প্রদান করেন যাতে তার ভালো হয়। এইরূপ দেবতারা তাঁদের উপাসকদের (তাঁদের উপাসনা বিধিপূর্বক হলে) হিতাহিত বিচার না করেই আকাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রদান করেন। কিন্তু পরমপিতা ভগবান তাঁর ভক্তদের তাঁর ইচ্ছাতে এমন বস্তু প্রদান করে থাকেন যাতে তাদের পরম মঙ্গল হয়। এতদ্ সত্ত্বেও বিনাশশীল পদার্থের আসক্তি, মমতা এবং কামনাবশতঃ অল্পবুদ্ধি মানুষ ভগবানের মহত্ত্ব এবং সৌহার্দ জানতে পারে না, তাই তারা অজ্ঞানতাবশতঃ দেবতাদের উপাসনা করে থাকে (গীতা ৭।২০-২৩; ৯।২৩-২৪)।

'ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা'—এই মনুষ্যলোক হল কর্মভূমি—**'কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে'** (গীতা ১৫।২)। এটি ছাড়া আর সবই (স্বর্গ-নরক ইত্যাদি) হল ভোগভূমি। মনুষ্যলোকেও নতুন কোনো কর্ম করার

অধিকার মানুষেরই আছে, পশু-পক্ষী ইত্যাদির নেই। মনুষ্য-জন্মে কৃতকর্মের ফলই ইহলোক ও পরলোকে ভোগ করতে হয়।

মনুষ্যলোকে কর্মে আসক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা বাস করে —**'কর্মসঙ্গিষু জায়তে'** (গীতা ১৪।১৫)। কর্মে আসক্তি থাকায় তারা কর্মজনিত সিদ্ধিতে প্রলুব্ধ হয়ে থাকে। কর্ম থেকে যে সিদ্ধি, তা শীঘ্র প্রাপ্তি হলেও চিরস্থায়ী হয় না। যে কর্মের আদি এবং অন্ত থাকে, তার থেকে প্রাপ্ত সিদ্ধি (ফল) কী করে স্থায়ী হতে পারে ? সুতরাং বিনাশশীল কর্মের ফলও বিনাশশীল হয়। কিন্তু কামনাগ্রস্ত ব্যক্তিদের লক্ষ্য শীঘ্রপ্রাপ্ত ফলের ওপর থাকলেও সেগুলির বিনাশের দিকে যায় না। বিধিপূর্বক করা কর্মের ফল দেবতাদের দ্বারা শীঘ্রই প্রাপ্তি হয়, সেইজন্য তারা দেবতাদের শরণাগত হয় এবং তাঁদেরই উপাসনা করে থাকে। এইভাবে কর্মজনিত ফল আকাঙ্ক্ষা করায় তারা কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না যার জন্য তাদের বারংবার জন্ম-মৃত্যু গ্রহণ করতে হয়।

প্রকৃত সিদ্ধি কর্মজনিত নয়। প্রকৃত সিদ্ধি হল ভগবদ্-প্রাপ্তি। ভগবদ্প্রাপ্তির সাধন—কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ বা ভক্তিযোগও কর্মের ওপর নির্ভরশীল নয়। কর্মের দ্বারা যোগের সিদ্ধি হয় না, বরং কর্মের সঙ্গে সম্পর্ক-ছেদ করলেই হয়ে থাকে।

প্রশ্ন—বলা হয়েছে যে, কর্ম করলেই 'কর্মযোগে'-র সিদ্ধি হয়—**'আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে'** (গীতা ৬।৩), তাহলে কর্মযোগ কর্মজনিত নয় কেন ?

উত্তর—কর্ম থেকে এবং কর্মসামগ্রী থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্যই কর্মযোগে কর্ম করা হয়। যোগ (পরমাত্মার সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ) হল স্বতঃসিদ্ধ এবং স্বাভাবিক। সুতরাং যোগ অথবা পরমাত্মপ্রাপ্তি কর্মের দ্বারা হয় না। কর্ম প্রকৃতপক্ষে সত্য নয়, বরং পরমাত্মপ্রাপ্তির সাধনরূপ কর্মের যে বিধান, তা সত্য। যে কর্ম কোনো সৎ উদ্দেশ্যে করা হয় তার পরিণাম সৎ হওয়ায় সেই কর্মকেও সৎ কর্ম বলা হয়—**'কর্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে'** (গীতা ১৭।২৭)।

নিজের জন্য কর্ম করলেই 'যোগ' (পরমাত্মার সঙ্গে নিত্য যোগ) অনুভূত হয় না। কর্মযোগে অন্যের জন্য সব কর্ম করা হয়, নিজের জন্য অর্থাৎ ফল প্রাপ্তির জন্য নয়—**'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'** (গীতা ২।৪৭)। নিজের জন্য কর্ম করলে মানুষ তাতে আবদ্ধ হয় (গীতা ৩।৯) এবং অপরের জন্য কর্ম করলে সে মুক্ত হয়ে যায় (গীতা ৪।২৩)। কর্মযোগে অন্যের জন্যই সমস্ত কর্ম করা হয় বলে কর্ম এবং ফলের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, এটি হল যোগ অনুভব করার হেতু।

কর্ম করার জন্য 'পর' অর্থাৎ শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, পদার্থ, ব্যক্তি, দেশ, কাল ইত্যাদি পরিবর্তনশীল বস্তুসমূহের সাহায্য নিতে হয়। 'পর'-এর সাহায্য নেওয়া পরাধীনতা। স্বরূপ যেমন তেমনই থাকে, তাঁর কখনো কোনো পরিবর্তন হয় না। তাই তাঁর অনুভূতিতে 'পর' বলে বর্ণিত শরীর ইত্যাদি পদার্থের সাহায্যের লেশমাত্রও অপেক্ষা বা প্রয়োজন নেই। 'পর'-এর সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্কগুলি ত্যাগ করলেই স্বরূপে স্বতঃ স্বাভাবিক স্থিতি অনুভূত হয়।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—অষ্টম শ্লোকে নিজ অবতাররূপের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে নবম শ্লোকে ভগবান তাঁর কর্মের দিব্য ভাব জানার মাহাত্ম্য বলেছেন। কর্মজনিত সিদ্ধি আকাঙ্ক্ষা করলেই কর্মে অদিব্যতা (মলিনতা) আসে। তাই কর্মে দিব্যতা (পবিত্রতা) কীভাবে আসে—তা জানাবার জন্য ভগবান এখন তাঁর কর্মের দিব্যভাব বিশেষভাবে বর্ণনা করছেন।

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্॥ ১৩ ॥
ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে॥ ১৪ ॥

[**ময়া** (আমার দ্বারা) ; **গুণকর্মবিভাগশঃ** (গুণ ও কর্ম বিভাগ অনুসারে) ; **চাতুর্বর্ণ্যম্** (চারটি বর্ণের) ; **সৃষ্টম্** (রচনা করা হয়েছে) ; **তস্য** (সেই) ; **কর্তারম্, অপি** (কর্তা হলেও) ; **মাম্** (আমাকে) ; **অব্যয়ম্** (অব্যয় পরমেশ্বর) ; **অকর্তারম্, বিদ্ধি**

(অকর্তা বলে জেনো) ; **কর্মফলে** (কর্মের ফলে) ; **মে, স্পৃহা, ন** (আমার স্পৃহা নেই) ; **কর্মাণি** (কর্ম) ; **মাম্‌** (আমাকে) ; **ন, লিম্পন্তি** (লিপ্ত করতে পারে না) ; **ইতি** (এইভাবে) ; **যঃ, মাম্‌** (যে আমাকে) ; **অভিজানাতি** (তত্ত্বতঃ জেনে যায়) ; **সঃ** (সে) ; **কর্মভিঃ** (কর্মের দ্বারা) ; **ন, বধ্যতে** (আবদ্ধ হয় না।)]

আমার দ্বারা গুণ এবং কর্মের বিভাগ অনুসারে চারটি বর্ণের রচনা করা হয়েছে। আমি এই সৃষ্টির কর্তা হলেও অব্যয় পরমেশ্বর আমাকে অকর্তারূপে জানবে। কারণ কর্মের ফলের প্রতি আমার কোনো স্পৃহা নেই, তাই কর্ম আমাকে লিপ্ত করতে পারে না। এইরূপে যে আমাকে তত্ত্বতঃ জানতে পারে, সেও কর্মের দ্বারা আবদ্ধ হয় না ॥ ১৩-১৪ ॥

ব্যাখ্যা—**'চাতুর্বর্ণ্যং[১] ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ'**—পূর্বজন্মের কৃত-কর্ম অনুযায়ী জীবের সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি গুণের তারতম্য থাকে। সৃষ্টির সময় ভগবান এই সমস্ত গুণ এবং কর্ম অনুযায়ী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারটি বর্ণ সৃষ্টি করেন[২]। মানুষ ছাড়াও দেবতা, পিতৃগণ, তির্যক ইত্যাদি অন্যান্য প্রাণীর সৃষ্টিও ভগবান গুণ ও কর্মানুসারে করে থাকেন। এতে তাঁর কোনো বৈষম্য থাকে না।

'চাতুর্বর্ণ্যম্‌'—এই পদটি হল প্রাণীদের উপলক্ষ্য। এর তাৎপর্য হল এই যে, কেবল মানুষই চার প্রকারের হয় না, পশু-পক্ষী-বৃক্ষাদিও চার প্রকারের হয় ; যেমন—পক্ষীকুলে পায়রা হল ব্রাহ্মণ, বাজ ইত্যাদি হল ক্ষত্রিয়, চিল ইত্যাদি বৈশ্য এবং কাক ইত্যাদি হল শূদ্র। এইরূপ গাছের মধ্যেও হয়, যেমন—অশ্বত্থ ইত্যাদি হল ব্রাহ্মণ, নিম ইত্যাদি হল ক্ষত্রিয়, তেঁতুল ইত্যাদি হল বৈশ্য এবং বাব্‌লা ইত্যাদি হল শূদ্র। কিন্তু এই স্থানে **'চাতুর্বর্ণ্যম্‌'** পদটির দ্বারা বিশেষভাবে মানুষের কথাই বলা হয়েছে, কারণ বর্ণবিভাগের বিষয়টি মানুষই বুঝতে পারে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করতে পারে। কর্ম করার অধিকার একমাত্র মানুষেরই আছে।

'চারটি বর্ণের সৃষ্টি আমিই করেছি'—এই কথায় ভগবানের এই ভাবও পরিস্ফুট হয় যে প্রথমতঃ, জীব তাঁর অংশ এবং দ্বিতীয়তঃ তিনি সমস্ত প্রাণীর সুহৃদ, তাই তিনি সর্বদা তাদের মঙ্গলের দিকেই লক্ষ্য রাখেন। এর বিপরীত জীব দেবতার অংশ নন এবং দেবতাগণও সকলের সুহৃদ নন। অতএব মানুষের কর্তব্য হল নিজ বর্ণ অনুযায়ী সমস্ত কর্তব্য কর্ম দ্বারা তাঁরই উপাসনা করা (গীতা ১৮।৪৬)।

'তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্‌'—এখানে **'অকর্তারম্‌'** পদটি কর্ম করলেও কর্তৃত্বাভিমান থাকে না—এই কথা বলার জন্য উল্লেখিত হয়েছে। সৃষ্টি, পালন, সংহার ইত্যাদি সমস্ত কর্ম করেও ভগবান ওই কর্মগুলি থেকে সর্বতোভাবে অতীত ও নির্লিপ্তই থাকেন।

সৃষ্টি রচনাতে ভগবানই উপাদান কারণ এবং তিনিই নিমিত্ত কারণ। মৃত্তিকাপাত্রের মৃত্তিকা হল উপাদান কারণ এবং কুম্ভকার হল নিমিত্ত কারণ। মৃত্তিকাপাত্র নির্মাণ করতে মৃত্তিকা ব্যয় (খরচ) হয় এবং সেটির নির্মাণে কুম্ভকারের শক্তি ব্যয়িত হয়। কিন্তু সৃষ্টি রচনাতে ভগবানের কোনো কিছু ব্যয় হয় না। তিনি একই প্রকার থাকেন। তাই তাঁকে **'অব্যয়ম্‌'** বলা হয়েছে।

জীবও ভগবানের অংশ হওয়াতে অব্যয় স্বরূপই। বিচার করতে হবে যে শরীরাদি সমস্ত বস্তু জগৎ-সংসারের এবং জগৎ থেকেই আহরিত। সুতরাং জগতের জিনিস জগতের জন্যই ব্যয় করলে নিজের কী ক্ষতি ? আমরা তো স্বরূপতঃ অব্যয়ই থাকি। সেইজন্য সাধক যদি শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, ধন, সম্পত্তি ইত্যাদি সমস্ত জাগতিক পদার্থগুলি নিজের এবং নিজের জন্য মনে না করেন, তাহলেই তাঁর নিজ অব্যয় ভাব অনুভূত হবে।

এখানে **'বিদ্ধি'** পদটির দ্বারা ভগবান তাঁর কর্মের দিব্যতা অনুভব করার নির্দেশ দিয়েছেন। কর্ম করার সময়েও কর্ম, কর্ম-সামগ্রী এবং কর্মফলের সঙ্গে নিজের কোনো সম্পর্ক না রাখাকেই বলা হয় কর্মের দিব্যতা।

'ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা'—এই

---

[১]'চত্বারোবর্ণাশ্চাতুর্বর্ণ্যম্‌' এই স্থানে 'চতুর্বর্ণাদীনাং স্বার্থে উপসংখ্যানম্‌' এই বার্তিক দ্বারা স্বার্থে ব্যঞ্‌ প্রত্যয় করা হয়েছে।

[২]সত্ত্বগুণের প্রাধান্যে ব্রাহ্মণের, রজোগুণের প্রাধান্যে এবং সত্ত্বগুণের গৌণতায় ক্ষত্রিয়ের, রজোগুণের প্রাধান্যে ও তমোগুণের গৌণতায় বৈশ্যের এবং তমোগুণের প্রাধান্যে শূদ্রের বিভাগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

বিশ্ব আদি সমস্ত রচনা কর্ম করলেও ভগবানের এই কর্মগুলির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। তাঁর কর্মে বিষমভাব, পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি দোষের লেশমাত্র থাকে না। তাঁর কর্মফলে বিন্দুমাত্র আসক্তি, মমত্ববোধ বা কামনাও নেই। তাই কর্মগুলি ভগবানকে লিপ্ত করে না।

উৎপত্তি ও বিনাশশীল বস্তুমাত্রই হল কর্মফল। ভগবান বলেছেন যে, যেমন আমার কর্মফলে কোনো স্পৃহা নেই, তেমনই তোমারও কর্মফলে স্পৃহা থাকা উচিত নয়। কর্মফলে স্পৃহা না থাকলে সমস্ত কর্ম করেও তুমি কর্মের দ্বারা আবদ্ধ হবে না।

আগের (ত্রয়োদশ) শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, সৃষ্টি রচনা ইত্যাদি সমস্ত কর্মের কর্তা হয়েও আমি অকর্তাই থাকি। অর্থাৎ আমার কোনো কর্তৃত্বাভিমান নেই, আর এই শ্লোকে বলেছেন যে, কর্মফলে আমার স্পৃহা নেই অর্থাৎ আমার ভোক্তৃত্বাভিমানও নেই। সুতরাং সাধকদেরও এই দুটি হতে রহিত হওয়া উচিত। ফলেচ্ছা ত্যাগ করে শুধুমাত্র অন্যের জন্য কর্ম করলে কর্তৃত্ব এবং ভোক্তৃত্ব—কোনটিই থাকে না। কর্তৃত্ব এবং ভোক্তৃত্বই হল সংসার। অতএব এই দুটি না থাকলে মুক্তি স্বতঃসিদ্ধ হয়।

'ইতি মাং যোঽভিজানাতি'—মানুষের যখন কামনা উৎপন্ন হয়, তখন তার লক্ষ্য থাকে উৎপত্তি-বিনাশশীল বস্তুগুলির ওপর। উৎপত্তি-বিনাশশীল (অনিত্য) পদার্থের দিকে লক্ষ্য থাকলে সে নিত্য ভগবানকে তত্ত্বতঃ জানতে পারে না। কিন্তু কামনা দূর হলে যখন অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়, তখন স্বতঃই ভগবানের দিকে লক্ষ্য যায়। দৃষ্টি ভগবানের দিকে গেলেই মানুষ জানতে পারে যে ভগবান প্রাণীমাত্রেরই পরম সুহৃদ, তাই তাঁর দ্বারা কৃত সমস্ত ক্রিয়াই প্রাণীদের মঙ্গলের জন্যই হয়ে থাকে। ভগবান মানুষকে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্যই মনুষ্য-দেহ প্রদান করেন, কিন্তু মানুষ এটি অনুধাবন না করে নতুন নতুন সম্পর্ক সৃষ্টি করে বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এইজন্যই কর্তৃত্বভাব এবং ফলেচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও তিনি কৃপাপূর্বক জীবকে কর্মবন্ধন থেকে মুক্তির জন্য, তাদের উদ্ধার করার জন্যই এই সৃষ্টি রচনার কার্য করেন। ভগবানকে এইভাবে জানলে মানুষ ভগবানের দিকে আকৃষ্ট হয়—

উমা রাম সুভাউ জেহি জানা।
তাহি ভজনু তজি ভাব ন আনা॥

(শ্রীরামচরিতমানস ৫।৩৪।২)

'কর্মভির্ন স বধ্যতে'—ভগবানের কর্ম তো দিব্যই, সাধু-মহাত্মাদের কর্মও দিব্য হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে শুধু সাধু-মহাত্মাই নন, মানুষমাত্রই তার কর্মকে দিব্যকর্মে পরিণত করতে সক্ষম। কর্মে যখন মালিন্য (কামনা, মমতা, আসক্তি ইত্যাদি) আসে, তখন সেগুলি বন্ধনকারী হয়ে ওঠে। এই মালিন্য দূর হলে কর্ম দিব্য হয়ে ওঠে, তখন মানুষ তাতে আবদ্ধ হয় না। শুধু তাই নয় এই দিব্য কর্ম সেই কর্তার এবং অন্যেরও (তাঁর মতো আচরণকারীদের) মুক্তিকারক হয়।

নিজ কর্মকে দিব্যতায় পরিণত করার সহজ উপায় হল—জগৎ-সংসার হতে প্রাপ্ত বস্তুসমূহকে নিজস্ব এবং নিজের জন্য বলে মনে না করে (জগতের এবং জগতের জন্য মেনে নিয়ে) জগতের সেবায় নিয়োগ করা।

বিচার করে দেখতে হয় যে, আমাদের দেহ ইত্যাদি যে সব বাহ্য বস্তু আছে, সেগুলি আমরা সঙ্গে করে নিয়ে আসিনি এবং সঙ্গে করে নিয়ে যাবোও না। সেগুলি থাকাকালীনও আমরা ইচ্ছানুযায়ী সেগুলির পরিবর্তন ঘটাতে পারি না, ইচ্ছামতো সেগুলি ধরে রাখতে পারি না অর্থাৎ সেগুলির ওপর আমাদের কোনো আধিপত্য খাটে না। এইভাবে জন্ম-জন্মান্তর ধরে সঙ্গে থাকা সূক্ষ্ম এবং কারণ-শরীরও পরিবর্তনশীল এবং প্রকৃতির কার্যস্বরূপ, তাই এগুলির সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। এগুলি 'নিজের জন্য'ও নয় কারণ এগুলির প্রাপ্তিতে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকে যায়। যদি এগুলি আমাদের নিজস্ব বস্তু হত তাহলে আর পাবার ইচ্ছা থাকত না। এই অবস্থায় ওই বস্তুসমূহকে নিজের বলে মনে করা কত বড় ভ্রম ! ওই বস্তুগুলিতে যে আপনভাব বোধ হয় তা কেবল ওইগুলির সুব্যবহারের জন্য, ওইগুলির ওপর অধিকার কায়েম করার জন্য নয়।

সেবা করার জন্যই সবকিছু নিজের হয়ে থাকে, গ্রহণ করবার জন্য নয়। জগৎ তো নয়ই, এমনকি ভগবানও যে কিছু পাইয়ে দেবার জন্য আপন, তা নয়। অর্থাৎ ভগবানের নিকট থেকেও কিছু চাওয়া উচিত নয় বরং তাঁর কাছে শুধু নিজেকে সমর্পণ করে দিতে হয়। কারণ আমাদের যা প্রয়োজন এবং যা দ্বারা আমাদের মঙ্গল হয়, ভগবান সেগুলি আমরা না চাইতেই আগে থেকে আমাদের দিয়ে রেখেছেন ; অপ্রতুলতা রাখেননি। আমাদের প্রয়োজন যতটা ভগবান বোঝেন, ততটা আমরা বুঝি না, কারণ তিনি

সর্বজ্ঞ এবং সদাহিতকামী। তাঁর কাছে আমরা নিতান্তই অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন। অতএব তাঁর কাছে কী চাইব ? যা কিছু আমরা প্রাপ্ত হয়েছি, সেগুলির সুব্যবহার করাই হল আমাদের কাজ। বস্তুসমূহকে নিজস্ব বা নিজের বলে মনে না করে সেগুলি নিষ্কামভাবে অন্যের হিতার্থে নিয়োজিত করাই হল সেগুলির সদ্ব্যবহার। এর দ্বারা কর্ম ও পদার্থসমূহ থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয় এবং পরমানন্দময় পরমাত্মার অনুভব হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব— জগৎ সংসার সৃষ্টি করলেও যেমন ভগবানের অকর্তা-ভাব (একই ভাবে) অক্ষুণ্ণ থাকে, তেমনই জীবেরও স্বরূপতঃ অকর্তা-ভাব যথাযথ সুরক্ষিত থাকে —**'শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে'** (গীতা ১৩।৩১)। কিন্তু মানুষ মূঢ়তাপূর্বক নিজের মধ্যে কর্তাভাব স্বীকার করে নেয়—**'অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে'** (গীতা ৩।২৭)।

কর্ম, ক্রিয়া এবং লীলা—আপাততঃ এক মনে হলেও, বাস্তবে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। যে ক্রিয়া কর্তৃত্বাভিমান নিয়ে করা হয় এবং অনুকূল-প্রতিকূল ফল পাওয়া যায়, সেই ক্রিয়া 'কর্ম' নামে অভিহিত হয়। যা কর্তৃত্বাভিমানপূর্বক করা হয় না এবং ফলপ্রদানকারী নয়, সেগুলিকে বলা হয় 'ক্রিয়া'। যেমন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, চোখ খোলা-বন্ধ করা, নাড়ী চলা, হৃৎপিণ্ডের কার্য হওয়া ইত্যাদি। যেসব ক্রিয়া কর্তৃত্বাভিমান এবং ফলেচ্ছা রহিত হয় এবং তারই সঙ্গে দিব্য এবং সকলের হিতের জন্য করা হয়, তাকে বলা হয় 'লীলা'। সাংসারিক লোকেরা যা করে, তাকে বলা হয় 'কর্ম', মুক্ত পুরুষদের দ্বারা ক্রিয়া[১] সংঘটিত হয় আর ভগবানের কাজকে বলা হয় 'লীলা'—**'লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্'** (ব্রহ্মসূত্র ২।১।৩৩) অর্থাৎ যেমন জগৎ না থাকলেও তা প্রতিভাত হয়, তেমনই ভগবানের সৃষ্টি কার্যাদি শুধু লীলামাত্র। অর্থাৎ ভগবান কর্তা না হলেও লীলায় তিনি কর্তা বলে প্রতিভাত হন।

'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ' পদটির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে গীতায় জন্মসূত্রে জাতিভেদ মানা হয়। যে ব্যক্তি যে বর্ণে, যে জাতির মাতা-পিতা হতে জাত, তার দ্বারাই সেই জাতকের জাতি মানা হয়। জাতি শব্দটি **'জনী প্রাদুর্ভাবে'** ধাতু দ্বারা সৃষ্ট—যেটি জন্ম থেকে জাতি প্রমাণ করে। কর্ম থেকে 'কৃতি' শব্দ হয়, যেটি **'ডুকৃঞ্করণে'** ধাতুদ্বারা সৃষ্ট হয়। তবে জাতির সম্পূর্ণতা পায় সেই অনুসারে কর্তব্য-কর্ম করলেই।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকটিতে নিজ উদাহরণ দিয়ে পরবর্তী শ্লোকে ভগবান মুমুক্ষু ব্যক্তিদের উদাহরণ দিয়ে অর্জুনকে নিজ কর্তব্য-কর্ম নিষ্কামভাবে সম্পাদন করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্মৈব তস্মাৎ ত্বং পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতম্॥ ১৫ ॥

[**পূর্বৈঃ** (পূর্ববর্তী) ; **মুমুক্ষুভিঃ, অপি** (মুমুক্ষুগণও) ; **এবম্** (এরূপ) ; **জ্ঞাত্বা** (জেনে) ; **কর্ম** (কর্ম) ; **কৃতম্** (করেছিলেন) ; **তস্মাৎ** (তাই) ; **ত্বম্** (তুমি) ; **পূর্বৈঃ** (পূর্ববর্তীগণের দ্বারা) ; **পূর্বতরম্** (পূর্ব পূর্ব কালে) ; **কৃতম্, কর্ম** (কৃত কর্মগুলিই) ; **এব** (তাঁদের মতো করে) ; **কুরু** (করো।)]

পূর্ববর্তী মুমুক্ষুগণ এরূপ জেনে কর্ম করেছিলেন, তাই তুমিও পূর্ববর্তীগণের দ্বারা সর্বদা কৃত কর্মগুলিই (তাঁদের মতো করে) করো ॥ ১৫ ॥

ব্যাখ্যা—(নবম শ্লোকে ভগবান তাঁর কর্মের দিব্যতা নিয়ে যে প্রসঙ্গ শুরু করেছেন, এখানে তার উপসংহার করেছেন।)

'এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ'—অর্জুন মুমুক্ষু ছিলেন, অর্থাৎ নিজ কল্যাণ চাইতেন। কিন্তু যুদ্ধরূপে প্রাপ্ত কর্তব্য-কর্ম তাঁর নিকট কল্যাণপ্রদ বলে মনে হয়নি বরং সেটিকে ভয়ানক কর্ম মনে করে ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন (গীতা ৩।১)। তাই ভগবান অর্জুনকে

[১] গীতায় একে 'চেষ্টা'ও বলা হয়েছে— 'সদৃশ্যং চেষ্টতে' (৩।৩৩)।

প্রাচীনকালের মুমুক্ষু ব্যক্তিদের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে, তাঁরাও তাঁদের কর্তব্য পালন করেই কল্যাণ লাভ করেছেন, অতএব তোমারও তাঁদের মতো নিজ কর্তব্য পালন করা উচিত।

তৃতীয় অধ্যায়ের বিশতম শ্লোকে রাজা জনক প্রভৃতির উদাহরণ দিয়ে এবং এই (চতুর্থ) অধ্যায়ের প্রথম-দ্বিতীয় শ্লোকে বিবস্বান, মনু, ইক্ষ্বাকু প্রমুখের উদাহরণ দিয়ে ভগবান যে কথা বলেছিলেন, সেই কথা এই শ্লোকেও বলেছেন।

শাস্ত্রে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, মুমুক্ষা জাগ্রত হলে কর্ম স্বরূপতঃ ত্যাগ করা উচিত। কারণ মুমুক্ষার পরে মানুষ আর কর্মের অধিকারী থাকে না ; বরং সে তখন জ্ঞানের অধিকারী হয়ে যায়[১]। কিন্তু ভগবান এইস্থানে বলেছেন যে, মুমুক্ষু ব্যক্তিরাও কর্মযোগের তত্ত্ব জেনে কর্ম করেছেন। তাই মুমুক্ষুত্ব জাগ্রত হলেও নিজ কর্তব্য-কর্ম করে যাওয়া উচিত।

কর্মযোগের তত্ত্ব হল—কর্ম করতঃ যোগস্থ থাকা এবং যোগস্থ হয়ে কর্ম করা। কর্ম জগৎ-সংসারের জন্য এবং যোগ নিজের জন্য করা হয়। কর্ম করা এবং কর্ম না-করা দুটি ভিন্ন অবস্থা। সুতরাং প্রবৃত্তি (কর্ম করা) এবং নিবৃত্তি (কর্ম না-করা)—দুটিই হল প্রবৃত্তি (কর্ম করা)। প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি—এই দুটি থেকে উচ্চে আরোহণ করাই হল যোগ, যেটি হল পূর্ণ নিবৃত্তি। পূর্ণ নিবৃত্তি কোনো অবস্থা নয়।

চতুর্দশ শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে কর্মফলে আমার কোনো স্পৃহা নেই, তাই কর্ম আমাকে আবদ্ধ করে না। যে ব্যক্তি কর্ম করার এই বিদ্যা (কর্মযোগ) অবগত হয়ে ফলেচ্ছা ত্যাগ করে কর্ম করে, সেও কর্ম দ্বারা আবদ্ধ হয় না। কারণ ফলেচ্ছার দ্বারাই মানুষ আবদ্ধ হয়—**'ফলে সক্তো নিবধ্যতে'** (গীতা ৫।১২)। মানুষ যদি তার সুখভোগের জন্য অথবা অর্থ, মান, মর্যাদা, স্বর্গ ইত্যাদির জন্য কর্ম করে, তবে সেই কর্ম তাকে আবদ্ধ করে (গীতা ৩।৯) কিন্তু যদি তার লক্ষ্য উৎপত্তি-বিনাশশীল জগতের দিকে না থাকে এবং সে জগৎ-সংসার থেকে সম্পর্ক ছেদ করার জন্য নিঃস্বার্থ সেবাভাবে কেবলমাত্র অন্যের হিতার্থে কর্ম করে, তাহলে সেই কর্ম তাকে আবদ্ধ করে না (গীতা ৪।২৩)। কারণ অন্যের জন্য কর্ম করলে কর্মপ্রবাহ জগতের দিকে হয়, যার ফলে কর্মের সম্পর্ক (অনুরাগ) দূর হয় এবং ফলেচ্ছা না থাকায় নতুন সম্পর্ক সৃষ্টি হয় না।

'কুরু কর্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতম্'—এই পদটির দ্বারা ভগবান অর্জুনকে এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, তুমি মুমুক্ষু, সেইজন্য পূর্বে অন্যান্য মুমুক্ষুগণ লোকহিতার্থে যেমনভাবে কর্ম করেছিলেন, তুমিও সেইরূপ জগৎ-হিতার্থে কর্ম করো।

শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন ইত্যাদি কর্মের সামগ্রীগুলি নিজের থেকে ভিন্ন এবং জগতের সঙ্গে অভিন্ন। এগুলি জগৎ-সংসারের এবং জগতের সেবার জন্যই প্রাপ্ত। সেগুলি নিজের মনে করে নিজের জন্য কর্ম করলে কর্মের সম্বন্ধ নিজের সঙ্গে হয়ে যায়। সমস্ত কর্ম যখন কেবল অন্যের হিতার্থে করা হয়, তখন কর্ম আর আমাদের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকে না। কর্ম হতে সর্বতোভাবে সম্পর্ক ছেদ হলে 'যোগ' অর্থাৎ পরমাত্মার সঙ্গে নিত্যসিদ্ধ সম্পর্ক অনুভূত হয়, যা প্রথম থেকেই আছে।

পরিশিষ্ট-ভাব—ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শ্লোকগুলিতে ভগবান জানিয়েছেন যে, কর্তৃত্বাভিমান এবং ফলেচ্ছারহিত হয়ে জগৎ-সৃষ্টি রূপ কার্য করায় তা তাঁকে আবদ্ধ করে না। ভগবান আরো জানিয়েছেন যে, মুমুক্ষু ব্যক্তিগণও পূর্ব পূর্ব কালে এইরূপ কর্তৃত্বাভিমান ও ফলেচ্ছা ত্যাগ করে কর্ম করেছেন। কারণ কর্তৃত্বাভিমান এবং ফলেচ্ছা থাকলেই কর্ম বন্ধনকারক হয়। অতএব তুমিও সেইভাবেই কর্ম করো।

জ্ঞানযোগে প্রথমে কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করা হয়, পরে স্বতঃই ফলেচ্ছা ত্যাগ হয়। কর্মযোগে প্রথমে ফলেচ্ছা ত্যাগ করা

---

[১]তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা। মৎ কথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২০।৯)

'কর্ম ততক্ষণই করা উচিত, যতক্ষণ বৈরাগ্য উদয় না হয় অথবা যতক্ষণ আমার (ভগবানের) বাক্যাদি শ্রবণে শ্রদ্ধা না উৎপন্ন হয়।'

হয়, পরে সহজেই কর্তৃত্বাভিমানের ত্যাগ হয়ে যায়।

* * *

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে 'এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম' পদটির দ্বারা কর্ম সম্বন্ধে জানার কথা বলা হয়েছে। ভগবান এবার পরবর্তী শ্লোক থেকে কর্ম 'তত্ত্ব' দ্বারা জানার প্রকরণ শুরু করছেন।

কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥ ১৬ ॥

[**কর্ম, কিম্** (কর্ম কী) ; **অকর্ম, কিম্** (অকর্ম কাকে বলে) ; **ইতি, অত্র** (এই বিষয়ে) ; **কবয়ঃ, অপি** (বিদ্বান ব্যক্তিগণ); **মোহিতাঃ** (মোহগ্রস্ত হন) ; **তৎ** (এই) ; **কর্ম** (কর্মতত্ত্ব) ; **তে** (তোমাকে) ; **প্রবক্ষ্যামি** (সম্যক্‌রূপে জানাচ্ছি) ; **যৎ** (যা) ; **জ্ঞাত্বা** (জানলে) ; **অশুভাৎ** (অশুভ হতে) ; **মোক্ষ্যসে** (মুক্তিলাভ করবে।)]

কর্ম কী এবং অকর্মই বা কাকে বলে—এই বিষয়ে বিদ্বান ব্যক্তিগণও মোহগ্রস্ত হয়ে যান। সুতরাং আমি এই কর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে তোমাকে সম্যক্‌রূপে জানাচ্ছি, যা জানলে তুমি অশুভ (সংসার-বন্ধন) হতে মুক্তি লাভ করবে ॥ ১৬ ॥

ব্যাখ্যা—'কিং কর্ম'—সাধারণত মানুষ তার দেহ এবং ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা সাধিত ক্রিয়াকেই কর্ম বলে মনে করে এবং দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া বন্ধ হলে তাকে অকর্ম বা কর্মহীন অবস্থা বলে মনে করে। কিন্তু ভগবান দেহ, বাক্য এবং মন দ্বারা যে সমস্ত ক্রিয়া সংগঠিত হয় সবগুলিকেও কর্ম বলেছেন—**'শরীরবাঙ্‌মনোভির্যৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ'** (গীতা ১৮।১৫)।

ভাব অনুসারেই কর্মের সংজ্ঞা হয়। ভাব পরিবর্তিত হলে কর্মের সংজ্ঞাও পরিবর্তিত হয়। যেমন কর্ম স্বরূপতঃ সাত্ত্বিক দেখালেও কর্তার ভাব যদি রাজসিক বা তামসিক হয়, তাহলে তার কর্মও রাজসিক অথবা তামসিক হয়ে পড়ে। যেমন, কেউ দেব-দেবীর উপাসনারূপ কর্ম করছে, যা স্বরূপতঃ সাত্ত্বিক কর্ম। কিন্তু উপাসনাকারী যদি তা কোনো কামনা সিদ্ধির জন্য করেন, তাহলে সেটি রাজসিক কর্ম হয়ে যায়, আর কর্মটি যদি কাউকে বধের উদ্দেশ্যে করা হয় তবে তা তামসিক কর্ম হয়ে যায়। সেইরূপই কর্মকারীর যদি ফলেচ্ছা, মমত্ববোধ এবং আসক্তি না থাকে তাহলে তার কৃত কর্মগুলি 'অকর্ম' হয়ে যায় অর্থাৎ সেগুলি কর্মফলে আবদ্ধ হয় না। তাৎপর্য হল এই যে, কেবল বাহ্যিক ক্রিয়া করা বা না করার দ্বারা কর্মের প্রকৃত স্বরূপের জ্ঞান হয় না। এই বিষয়ে শাস্ত্রজ্ঞ বিশিষ্ট পণ্ডিতগণও মোহগ্রস্ত হন অর্থাৎ কর্মতত্ত্ব যথার্থভাবে নিরূপণ করতে সক্ষম হন না। যে ক্রিয়াগুলিকে তাঁরা কর্ম বলে মনে করেন, সেইগুলি কর্ম, অকর্ম অথবা বিকর্ম যে কোনোটি হতে পারে। কারণ, কর্তার ভাব অনুযায়ী কর্মের স্বরূপ পরিবর্তিত হয়। সেইজন্য যেন ভগবান জানাচ্ছেন, প্রকৃত কর্ম কী ? এটি কেন আবদ্ধ করে ? কেমন করে আবদ্ধ করে এবং এর থেকে কীভাবে মুক্ত হওয়া যায় ?— এইসবগুলি সম্পর্কে আমি আলোচনা করব যা জেনে কর্ম করলে কর্ম আর বন্ধনকারক হবে না।

মানুষের মধ্যে যদি মমতা, আসক্তি এবং ফলেচ্ছা থাকে, তবে কর্ম না করলেও বাস্তবে তার দ্বারা কর্মই হয়ে থাকে অর্থাৎ কর্মে লিপ্ততা থাকে। কিন্তু যদি মমতা, আসক্তি এবং ফলেচ্ছা না থাকে, তাহলে কর্ম করলেও, কর্ম করা হয় না অর্থাৎ কর্মে সে নির্লিপ্ত থাকে। তাৎপর্য হল এই যে, কর্তা নির্লিপ্ত হলে তার কর্ম করা অথবা না-করা— দুটিই অকর্ম হয়ে যায় এবং কর্তা যদি লিপ্ত হয় তাহলে কর্ম করা বা না-করা দুটিই কর্ম বলে বিবেচিত হয় এবং বন্ধনকারী হয়ে থাকে।

'কিমকর্মেতি'—ভগবান কর্মের দুটি ভাগের কথা বলেছেন—কর্ম এবং অ-কর্ম। কর্মের দ্বারা জীব আবদ্ধ হয় এবং অ-কর্ম দ্বারা (অন্যের জন্য কর্ম করলে) মুক্ত হয়।

কর্মত্যাগ করা অ-কর্ম নয়। মোহবশতঃ কর্মত্যাগ করাকে ভগবান 'তামস' ত্যাগ বলে জানিয়েছেন। (গীতা ১৮।৭)। শারীরিক ক্লেশের ভয়ে যে কর্মত্যাগ করা হয় তাকে বলা হয় 'রাজস' ত্যাগ (গীতা ১৮।৮)। তামস এবং

রাজস ত্যাগে কর্ম স্বরূপতঃ ত্যাগ হলেও কর্ম থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয় না। কর্মে ফলেচ্ছা এবং আসক্তি ত্যাগ হলে তাকে 'সাত্ত্বিক' ত্যাগ বলা হয় (১৮।৯)। সাত্ত্বিক ত্যাগে বাহ্যিকভাবে কর্ম করলেও সেটি বাস্তবে অ-কর্ম। কারণ সাত্ত্বিক ত্যাগে কর্ম হতে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ হয়। সুতরাং কর্ম করলেও তাতে নির্লিপ্তি থাকায় তা বস্তুতঃ অ-কর্ম।

শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তিও অ-কর্ম কী—সেই বিষয়ে মোহগ্রস্ত হয়ে থাকেন। অতএব কর্ম করা অথবা না-করা—দুই অবস্থাতেই জীব যাতে আবদ্ধ না হয়, এই তত্ত্বটি হৃদয়ঙ্গম হলেই কর্ম কী এবং অ-কর্মই বা কী ?—তা অনুভব করা যায়। যুদ্ধরূপ কর্ম না করাকেই অর্জুন কল্যাণকর বলে মনে করেছিলেন। তাই ভগবান বলেছিলেন যে, যুদ্ধরূপ কর্ম ত্যাগ করলেই তুমি কর্মহীন অবস্থা (বন্ধন হতে মুক্তি) লাভ করবে না (গীতা ৩।৪), বরং যুদ্ধ করেও তুমি সেই কর্মহীন অবস্থা লাভ করতে সক্ষম (গীতা ২।৩৮), অতএব অ-কর্ম কী—এই তত্ত্বটি তুমি আগে বোঝ।

নির্লিপ্ত হয়ে কর্ম করা অথবা কর্ম করাকালীনও নির্লিপ্ত থাকা—এটিই হল প্রকৃত অ-কর্ম অর্থাৎ কর্মহীন অবস্থা।

'কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ'—সাধারণ মানুষের এত ক্ষমতা নেই যে, তারা কর্ম এবং অকর্মের তাত্ত্বিক নির্ণয় করতে পারে। শাস্ত্রজ্ঞ বড় বড় পণ্ডিত ব্যক্তিও এই বিষয়ে ভুল করেন। কর্ম এবং কর্মহীনতার তত্ত্ব জানতে তাঁদের বুদ্ধিও হতবাক্ হয়ে যায়। এর তাৎপর্য হল এই যে, এই তত্ত্ব কর্মযোগ দ্বারা সিদ্ধ তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষগণ জানেন, নয়তো ভগবানই একমাত্র জানেন।

'তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি'—জীব কর্ম দ্বারা আবদ্ধ হয় এবং কর্ম দ্বারাই সে মুক্ত হয়। এখানে ভগবান জোর দিয়ে বলেছেন যে, আমি কর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে তোমাকে এমনভাবে অবহিত করব, যাতে কর্ম করলেও সেটি বন্ধনকারক না হয়। তাৎপর্য হল এই যে, কর্ম করার এমন বিদ্যা জানাব, যাতে কর্ম করলেও তুমি জন্ম-মৃত্যুরূপ বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পার।

কর্ম করার দুটি পথ—প্রবৃত্তিমার্গ এবং নিবৃত্তিমার্গ। প্রবৃত্তিমার্গকে বলা হয় 'কর্ম-করা' এবং নিবৃত্তিমার্গকে বলা হয় 'কর্ম না-করা'। দুটি পথই বন্ধনকারক নয়। বন্ধনকারী হল কামনা, মমতা, আসক্তি—তা সে প্রবৃত্তিমার্গেই হোক অথবা নিবৃত্তিমার্গে। কামনা, মমতা, আসক্তি না থাকলে মানুষ প্রবৃত্তিমার্গ বা নিবৃত্তিমার্গ— দুই অবস্থাতেই স্বতঃ মুক্ত হয়ে যায়। এই তত্ত্ব জানাই হল কর্ম-তত্ত্বকে ঠিকমতো জানা।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চাশতম শ্লোকে ভগবান **'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্'** কর্মে যোগই হল কৌশল—এই বলে কর্মতত্ত্ব জানিয়েছেন। তাৎপর্য হল যে, কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হবার প্রকৃত উপায় হল 'যোগ' অর্থাৎ সমত্ববোধ। কিন্তু অর্জুন এই তত্ত্বটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। তাই ভগবান এই তত্ত্বটি পুনর্বার বোঝাবার জন্য প্রতিজ্ঞা করেছেন।

বিশেষ কথা

কর্মযোগের অর্থ কর্ম নয়, এটি হল সেবা। সেবাতে ত্যাগের প্রাধান্য থাকে। সেবা এবং ত্যাগ এর কোনটিই কর্ম নয়। কেননা এই দুটিতেই বিবেকের প্রাধান্য থাকে।

আমাদের শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি যত সামগ্রী আছে, তা সবই প্রাপ্ত হয়েছে এবং এগুলি সবই পরিত্যক্ত হবে। প্রাপ্ত বস্তুগুলিকে নিজের মনে করার অধিকার আমাদের নেই। জগৎ হতে প্রাপ্ত বস্তুগুলিকে জগতের সেবায় নিয়োজিত করারই অধিকার আমাদের আছে। যে বস্তু বাস্তবে নিজের, তাকে (স্বরূপ বা পরমাত্মা) কখনো ত্যাগ করা যায় না এবং যে বস্তু নিজের নয়, সেই শরীর বা জগৎ-এর ত্যাগ স্বতঃসিদ্ধ । সুতরাং ত্যাগ তাকেই করা যায়, যেটি নিজের নয়, কিন্তু যাকে ভুলবশতঃ নিজের বলে মনে করা হয়েছে অর্থাৎ আপন বলে প্রত্যয় করার যে ভাব, সেটিই পরিত্যক্ত হয়। যে বস্তু আদৌ নিজের নয় সেটিকে নিজের বলে না মানা ত্যাগ হয় কী করে ? এটি তো বিবেক।

কর্মসামগ্রীগুলি (শরীর-ইন্দ্রিয়াদি-মন-বুদ্ধি ইত্যাদি) নিজস্ব বা নিজের জন্য নয়, এগুলি অপরের এবং অপরের জন্যই। এগুলি জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত। এর থেকে স্বয়ং সদা-সর্বদা নির্বিকার ও একরসরূপে বিরাজমান। কিন্তু কর্মসামগ্রীগুলি আগে আমার কাছে ছিল না এবং পরেও থাকবে না আর বর্তমানে এটি নিরন্তর বিচ্ছেদের দিকে যাচ্ছে। তাই এর দ্বারা যে কর্ম সাধিত হয়, তা অন্যের জন্যই হয়, নিজের জন্য নয়। এর আর একটি মর্মকথা হল এই যে, কর্মসামগ্রী ছাড়া কোনো কর্মই সংঘটিত হয় না। যেমন—যত বড়ো লেখকই হোক না

কেন, কালি-কলম-কাগজ ছাড়া সে কিছুই লিখতে পারবে না। অতএব যখন কর্মসামগ্রী ছাড়া কোনো কিছু করা সম্ভব নয়, তখন এই বিধান মানতেই হবে যে নিজের জন্য কিছু করার নেই। কারণ কর্মসামগ্রী জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত, নিজের সঙ্গে নয়। তাই কর্মসামগ্রী এবং কর্ম সর্বদা অন্যেরই মঙ্গলের জন্য, যাকে সেবা বলা হয়। অন্যেরই বস্তু অন্যে পেলে সেবা হয় কীভাবে ? এটিই তো বিবেক।

অতএব ত্যাগ এবং সেবা—এই দুটিই কর্মসাধ্য নয়, বরং বিবেকসাধ্য। প্রাপ্ত বস্তু নিজের নয়, সেগুলি অন্যের এবং অন্যের সেবারই জন্য—এই হল বিবেক। তাই কর্মযোগ মূলতঃ কর্ম নয়, বরং তা হল বিবেক।

বিবেক কোনো কর্মের ফল নয়, আসলে অনাদিকাল হতে প্রাণীমাত্রেই এটি স্বতঃপ্রাপ্ত। যদি কোনো শুভকর্মের ফল হিসাবে বিবেক জাগ্রত হয়ে থাকে, তাহলে বিবেক-শূন্য অবস্থায় সেই শুভকর্ম সম্পাদিত করে কে ? কারণ শুভ-অশুভ কর্মের বিভিন্নতা মানুষ বিবেকের দ্বারাই জানতে পারে এবং সেইজন্যই সে অশুভ কর্ম ত্যাগ করে শুভকর্ম করে থাকে। অতএব বিবেক হল শুভ কর্মের কারণ, কার্য নয়। এই বিবেক হল স্বতঃসিদ্ধ, কর্মযোগও স্বতঃসিদ্ধ অর্থাৎ কর্মযোগে পরিশ্রম নেই। এইরূপ জ্ঞানযোগে নিজ অসঙ্গ স্বরূপ স্বতঃসিদ্ধ এবং ভক্তিযোগে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কও স্বতঃসিদ্ধ।

'যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ'—জীব স্বয়ং শুভ এবং পরিবর্তনশীল জগৎ-সংসার হল অশুভ। জীব স্বয়ং পরমাত্মার নিত্য অংশ হয়েও পরমাত্মাতে বিমুখ হওয়ায় এই অনিত্য জগৎ-সংসারের ফাঁদে আটকে পড়েছে। ভগবান বলেছেন যে, আমি সেই কর্ম-তত্ত্ব বর্ণনা করছি, যা জেনে কর্ম করলে তুমি অশুভ অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু রূপ সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবে।

এই শ্লোকে কর্মকে জানার যে প্রকরণ শুরু হয়েছে, তার উপসংহার করা হয়েছে বত্রিশতম শ্লোকে **'এবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে'** পদটির দ্বারা।

মর্মকথা

কর্মযোগের অর্থ হল—কর্ম জগতের জন্য এবং যোগ নিজের জন্য। কর্মের দুটি অর্থ হয়—করা এবং না-করা। কর্ম করা এবং না-করা—দুটিই প্রাকৃত অবস্থা। দুটিতেই অহংবোধ থাকে। কর্ম করায় 'কার্য' রূপে অহংবোধ থাকে এবং কর্ম না-করায় থাকে 'কারণ' রূপে। যতক্ষণ অহংবোধ থাকে, ততক্ষণ জগতের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে, এবং যতক্ষণ জগতের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে, ততক্ষণ অহংবোধ থাকে। কিন্তু 'যোগ' এই দুই অবস্থারই অতীত। সেই যোগ অনুভব করার জন্য অহংবোধ-শূন্য হওয়া প্রয়োজন। অহংবর্জিত হওয়ার উপায় হল—কর্ম করা বা না-করার সময়ে যোগে অবস্থান করা এবং যোগে অবস্থিত হয়ে কর্ম করা বা না-করা। তাৎপর্য হল এই যে, কর্ম করা বা না-করা এই দুই অবস্থাতেই যেন নির্লিপ্ততা বজায় থাকে—**'যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি'** (গীতা ২।৪৮)।

কর্ম করলে জগৎ-সংসারে এবং কর্ম না করলে পরমাত্মাতে প্রবৃত্তি হয়—এরূপ মনে করে সংসার-কর্ম থেকে নিবৃত্ত হয়ে একান্তে ধ্যান সমাধিতে লেগে থাকাও কর্ম করা। একান্তে ধ্যান এবং সমাধিতে ব্যাপৃত থাকলে পরমতত্ত্ব উপলব্ধি হবে এই ভাব নিয়ে ভবিষ্যতে পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত করার ভাবও কর্মের সূক্ষ্মরূপ। কারণ করা আধারের উপরই ভবিষ্যতে তত্ত্ব লাভের আশা থাকে। কিন্তু পরমাত্মতত্ত্ব করা বা না-করা—দুইয়েরই অতীত।

ভগবান বলেছেন যে, আমি সেই কর্ম-তত্ত্ব বলব, যা জানলে তুমি তখনই পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হবে। এটি ভবিষ্যতের অপেক্ষা রাখে না, কারণ পরমাত্মতত্ত্ব সমগ্র দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, প্রাণ ইত্যাদিতে সমভাবে পরিপূর্ণ। মানুষ যেখানে নিজে আছে বলে মনে করে, পরমাত্মাও সেখানে। কর্ম করা অথবা না-করা—দুই অবস্থাতেই পরমাত্মতত্ত্ব আমাদের সঙ্গে একইভাবে বিরাজ করে। শুধুমাত্র প্রকৃতিজনিত ক্রিয়া এবং পদার্থগুলির সঙ্গে সম্পর্ক মেনে নেওয়ার জন্য আমাদের তা অনুভব হয় না।

অহংবোধ নিয়ে করা সাধন এবং সাধনের অভিমান যতক্ষণ বজায় থাকে, ততক্ষণ অহংবোধ দূর হয় না, বরং দৃঢ় হতে থাকে, তা সে স্থূলরূপেই (কর্ম করার সঙ্গে) হোক অথবা সূক্ষ্মরূপে (কর্ম না-করাতে) হোক।

'আমি করি'—এর মধ্যেও সেইরূপ অহংভাব থাকে। নিজের জন্য কিছু না করলে অর্থাৎ কর্মমাত্রেই জগতের মঙ্গলের জন্য করলে অহংবোধ জগৎ-সংসারে বিলীন হয়ে যায়।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—এবার ভগবান কর্মের তত্ত্ব জানার প্রেরণা দিয়েছেন।

কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যং চ বিকর্মণঃ।
অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ॥ ১৭ ॥

[**কর্মণঃ, অপি** (কর্মের ও) ; **বোদ্ধব্যম্** (জানা উচিত) ; **চ, অকর্মণঃ** (এবং অকর্মের) ; **বোদ্ধব্যম্** (জেনে রাখা উচিত) ; **চ, বিকর্মণঃ** (বিকর্ম) ; **হি** (কারণ) ; **কর্মণঃ** (কর্মের) ; **গতি** (গতি) ; **গহনা** (দুর্জ্ঞেয়।)]

কর্মের তত্ত্বও জানা উচিত এবং অ-কর্মের তত্ত্বও জেনে রাখা উচিত তথা বিকর্ম কাকে বলে তাও জানা উচিত। কারণ কর্মের গতি (তত্ত্ব) দুর্জ্ঞেয়॥ ১৭ ॥

ব্যাখ্যা—**'কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যম্'**—কর্ম করার সময় নির্লিপ্ত থাকাই হল কর্মতত্ত্বকে জানা, যার বর্ণনা পরবর্তী অষ্টাদশ শ্লোকে **'কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেৎ'** পদের দ্বারা করা হয়েছে।

কর্ম স্বরূপতঃ এক দেখালেও অন্তরের ভাব অনুযায়ী তার তিনটি ভাব হয়—কর্ম, অকর্ম এবং বিকর্ম। সকামভাবে করা শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়াগুলি 'কর্ম' নামে অভিহিত হয়। ফলাকাঙ্ক্ষা, মমতা এবং আসক্তি রহিত হয়ে শুধুমাত্র অন্যের হিতের জন্য যে কর্ম করা হয় তাকে 'অ-কর্ম' বলা হয়। বিহিত কর্মও যদি অন্যের অহিতের জন্য বা কাউকে দুঃখ দেবার উদ্দেশ্যে করা হয় তাহলে সেটিকে 'বিকর্ম' বলা হয়। নিষিদ্ধ কর্মমাত্রই যে 'বিকর্ম', তা বলাই বাহুল্য।

'অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যম্'—নির্লিপ্ত থেকে কর্ম করা হল অ-কর্মের তত্ত্বকে জানা, যার বর্ণনা পরবর্তী আঠারোতম শ্লোকে **'অকর্মণি চ কর্ম যঃ'** পদের দ্বারা করা হয়েছে।

'বোদ্ধব্যম্ চ বিকর্মণঃ'—কামনার দ্বারা কর্ম হয়। কামনা যখন বৃদ্ধি পায়, তখন বিকর্ম (পাপ কর্ম) হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের আটত্রিশতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, যুদ্ধের মতো হিংসাযুক্ত ভয়ানক কর্মও যদি শাস্ত্রনির্দেশ এবং সমতাপূর্বক (জয়-পরাজয়, লাভ-ক্ষতি এবং সুখ-দুঃখকে সমান মনে করে) করা হয়, তাহলে এতে পাপ হয় না। তাৎপর্য হল এই যে, 'বিকর্মে'র ন্যায় প্রতিভাত হলেও আসলে তা 'অকর্ম'ই হয়।

শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্মকে 'বিকর্ম' বলা হয়। বিকর্ম করার হেতুই হচ্ছে কামনা (গীতা ৩।৩৬-৩৭)।[১] সুতরাং বিকর্মের তত্ত্ব হল—বিকর্মকে ক্রিয়াগতভাবে ত্যাগ করা এবং বিকর্মের মূল কারণ কামনা ত্যাগ করা।

'গহনা কর্মণো গতিঃ'—কোন্ কর্ম মুক্তি প্রদানকারী এবং কোন্ কর্ম বন্ধনকারী—এটি ঠিক করা অত্যন্ত কঠিন। কর্ম কী, অ-কর্ম কী এবং বিকর্মই বা কী—এর যথার্থ তত্ত্ব ঠিক করতে বড় বড় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতও অসমর্থ হন। অর্জুনও এই তত্ত্ব না জানায় যুদ্ধরূপ কর্তব্য-কর্মকে ভয়ানক নিষ্ঠুর কর্ম বলে মনে করেছিলেন। সুতরাং কর্মের গতি (জ্ঞান বা তত্ত্ব) অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়।

প্রশ্ন—এই (সতেরোতম) শ্লোকে ভগবান **'বোদ্ধব্যং চ বিকর্মণঃ'** পদটির দ্বারা বলেছেন যে বিকর্মের তত্ত্বও জানা উচিত। কিন্তু উনিশ থেকে তেইশতম শ্লোকের প্রকরণে ভগবান 'বিকর্মে'র কোনো ব্যাখ্যাই করেননি। তবে তিনি শুধুমাত্র এই শ্লোকেই বিকর্মের কথা কেন বলেছেন ?

উত্তর—উনিশ থেকে তেইশতম শ্লোক পর্যন্ত প্রকরণে ভগবান প্রধানতঃ 'কর্মে অকর্ম' সম্বন্ধে বলেছেন, যাতে সমস্ত কর্ম অকর্ম হয়ে যায় অর্থাৎ কর্ম করলেও তাতে বন্ধন যেন না হয়। বিকর্ম কর্মেরই খুব কাছাকাছি ; কারণ কর্মে কামনাই হল বিকর্মের প্রধান হেতু। অতএব কামনা ত্যাগ করার জন্য এবং বিকর্মকে নিকৃষ্ট জানাবার জন্যই ভগবান বিকর্মের কথা বলেছেন।

যে কামনার জন্য 'কর্ম' হয়ে থাকে, সেই কামনা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলেই 'বিকর্ম' হতে থাকে। কিন্তু কামনা নাশ হলে সমস্ত কর্ম 'অকর্মে' পরিণত হয়। এই প্রকরণটির মূল

---

[১]ষোড়শ অধ্যায়ে যে স্থানে আসুরী-সম্পদের বর্ণনা আছে, সেই স্থানে অষ্টম শ্লোক থেকে তেইশতম শ্লোক পর্যন্ত 'কাম' শব্দটি মোট ন'বার ব্যবহৃত হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে 'কাম' অর্থাৎ কামনাই হল সমস্ত আসুরী-সম্পদের (বিকর্মের) কারণ।

তাৎপর্য 'অকর্ম'-কে জানা এবং 'অকর্ম' হয় কামনা নাশ হলে। কামনা নাশ হলে বিকর্ম হয়ই না। সুতরাং বিকর্মের আলোচনার প্রয়োজনই নেই। তাই এই প্রকরণে বিকর্মের কথা বলা হয়নি। দ্বিতীয়তঃ পাপজনক এবং নরকপ্রাপ্তির কারণ হওয়ায় বিকর্ম সর্বথা পরিত্যাজ্য। সেইজন্যও এটি বিস্তারিতভাবে বলা হয়নি। তবে বিকর্মের মূল কারণ 'কামনা' ত্যাগের কথা এই প্রকরণে প্রধানরূপে আছে; যেমন—**'কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ'** (৪।১৯), **'ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গম্'** (৪।২০), **'নিরাশীঃ'** (৪।২১), **'সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ'** (৪।২২), **'গতসঙ্গস্য'**, **'যজ্ঞায়াচরতঃ'** (৪।২৩)।

এইভাবে বিকর্মের মূল 'কামনা' ত্যাগের বর্ণনা করার জন্যই এই শ্লোকে বিকর্মকে জানার কথা বলা হয়েছে।

পরিশিষ্ট-ভাব— আমাদের পক্ষে এবং অন্যের পক্ষে, বর্তমানে এবং পরিণামে কোন্ কর্মের জন্য কী ফল লাভ হবে, তা বোঝা অত্যন্ত কঠিন। কোনো কর্ম থেকে মানুষ নিজের ভালো হবে মনে করে, কিন্তু হয়ে যায় মন্দ! সে লাভের জন্য কর্ম করতে গেলে হয়ে যায় লোকসান! সুখের জন্য করতে গেলে পায় দুঃখ! কারণ কর্তৃত্বাভিমান এবং ফলেচ্ছা (সুখাসক্তি) থাকায় মানুষ কর্মের গতি বুঝতে সক্ষম হয় না।

* * *

সম্বন্ধ—ভগবান এবার কর্মের তত্ত্বজ্ঞানীর প্রশংসা করছেন।

কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ॥ ১৮ ॥

[**যঃ** (যে ব্যক্তি); **কর্মণি** (কর্মে); **অকর্ম, পশ্যেৎ** (অকর্ম দেখেন); **চ, যঃ** (এবং যিনি); **অকর্মণি** (অকর্মে); **কর্ম** (কর্ম); **সঃ, মনুষ্যেষু** (মানুষের মধ্যে তিনিই); **বুদ্ধিমান্** (বুদ্ধিমান); **সঃ** (তিনি); **যুক্তঃ** (যোগী); **কৃৎস্নকর্মকৃৎ** (সর্ব কর্মকারী।)]

যে ব্যক্তি কর্মে অকর্ম দেখেন এবং যিনি অকর্মে কর্ম দেখেন, মানুষের মধ্যে তিনিই বুদ্ধিমান, তিনিই যোগী এবং সর্বকর্মকারী ॥১৮ ॥

ব্যাখ্যা—'কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেৎ'—কর্মে অকর্ম দেখার তাৎপর্য হল—কর্ম করা কালে অথবা না-করা কালে তাতে নির্লিপ্ত থাকা অর্থাৎ নিজের জন্য কোনো প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি না করা। অমুক কর্মটি আমি করেছি, এই কর্মের অমুক ফল আমার লাভ হোক—এই ভাব নিয়ে কর্ম করলেই মানুষ কর্মে আবদ্ধ হয়। প্রত্যেক কর্মেরই আরম্ভ এবং শেষ থাকে, তাই চতুর্দশ শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, কর্ম আমাকে বাঁধতে পারে না। কারণ আমার কর্মফলে কোনো স্পৃহা নেই। ফলের স্পৃহা বা আকাঙ্ক্ষাই বন্ধনকারক হয়—**'ফলে সক্তো নিবধ্যতে'** (গীতা ৫।১২)।

ফলের ইচ্ছা না থাকলে নতুন করে আসক্তি উৎপন্ন হয় না এবং অন্যের হিতার্থে কর্ম করলে পূর্ব আসক্তি নাশ হয়। এইভাবে অনুরাগরূপী বন্ধন না থাকলে সাধক সর্বপ্রকারে বীতরাগ (অনাসক্ত) হন। বীতরাগ হলে সমস্ত কর্মই অকর্ম হয়ে যায়।

কর্মের অনুবন্ধেই (উপলক্ষে) জীবের জন্ম হয়। যেমন যে পরিবারে জন্ম হয়, সেই পরিবারের লোকেদের সঙ্গে তার ঋণানুবন্ধ ছিল অর্থাৎ কারো ঋণ শোধ করার ছিল বা কারো কাছ থেকে ঋণ আদায় করার ছিল। কারণ অনেক জন্মে অনেক লোকের সঙ্গে আদান-প্রদান হয়েছে। এই আদান-প্রদান বহু জন্ম ধরে চলে আসছে। এটি রোধ না করলে জন্ম-মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। এটি রোধ করার উপায় হল, এখন থেকে নেওয়া বন্ধ করা অর্থাৎ নিজ অধিকার ত্যাগ করা এবং আমাদের ওপর যাদের অধিকার আছে, তাদের সেবা করা। এইভাবে নতুন করে আর ঋণ না করা এবং পুরানো ঋণ যা আছে তা (অন্যের জন্য কর্ম করে) মিটিয়ে ফেলা। তাহলেই এই ঋণানুবন্ধ (আদান-প্রদানের ব্যবহার) শেষ হয়ে যাবে অর্থাৎ জন্ম-মরণের কারণ থাকবে না (গীতা ৪।২৩)। যেমন, কোনো দোকানদার তার কারবার গুটিয়ে নিতে

চাইলে, তাকে দুটি কাজ করতে হবে—এক, যাকে দেবার আছে, তাকে দিয়ে দিতে হবে এবং দুই, যার থেকে তার নেওয়ার আছে তা নিয়ে নেবে অথবা ছেড়ে দেবে। এইরূপ করলে সে কারবার বন্ধ করতে পারবে। যদি সে এই চিন্তা করে যে, যা নেওয়ার আছে, তা সব আদায় করব তাহলে তার ব্যবসা উঠবে না। কারণ যতক্ষণ সে নেবার ইচ্ছায় সামগ্রী দিতে থাকবে ততক্ষণ দোকানও চালু থাকবে, বন্ধ হবে না।

নিজের জন্য কিছু না করলে বা কিছু আকাঙ্ক্ষা না করলে অসঙ্গবোধ স্বতঃই জাগ্রত হয়। কারণ করণ (শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, প্রাণ) এবং উপকরণ (কর্ম করার সামগ্রী) জগতের এবং জগতের সেবার জন্যই প্রাপ্ত হয়েছে, নিজের জন্য নয়। তাই সমস্ত কর্তব্য-কর্ম (সেবা, ভজন, জপ, ধ্যান এবং সমাধিও) শুধুমাত্র জগতের হিতার্থে করলে কর্মের প্রবাহ সংসারের দিকে প্রবাহিত হয় এবং সাধক স্বয়ং অসঙ্গ, নির্লিপ্ত থাকেন। এই হল কর্মে অকর্ম দর্শন করা।

প্রকৃতির সঙ্গে যতক্ষণ সম্পর্ক থাকে, ততক্ষণ কর্ম করা বা না-করা—দুই-ই 'কর্ম' হয়ে থাকে। তাই কর্ম করা বা না-করা—দুটি অবস্থাতেই কর্মযোগীর নির্লিপ্ত থাকা উচিত। কর্মে নির্লিপ্ত থাকার অর্থ হল—কর্ম করলে আমার ভালো ফল লাভ হবে, আমার সিদ্ধি প্রাপ্তি ঘটবে, লোকে আমাকে সম্মান করবে, ইহলোকে ও পরলোকে সুখভোগ হবে—এইরূপ কোনো ইচ্ছা পোষণ না করা। এইরূপেই কর্ম না-করায় নির্লিপ্ত থাকার তাৎপর্য হল— কর্মত্যাগ করলে আমি মান, মর্যাদা, ভোগ, শারীরিক সুখ ইত্যাদি প্রাপ্ত হব—এমন ইচ্ছা বিন্দুমাত্রও পোষণ না করা।

দুঃখ ভেবে এবং শারীরিক কষ্টের ভয়ে কর্মত্যাগ হল রাজস ত্যাগ এবং মোহ, আলস্য, প্রমাদের জন্য কর্মত্যাগ করাকে বলা হয় তামস ত্যাগ। এই দুই প্রকার ত্যাগই সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। এসব ছাড়াও যদি নিজের বিশেষ স্থিতি লাভের জন্য, সমাধির সুখভোগের উদ্দেশ্যে এবং জীবন্মুক্তির আনন্দ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কর্মত্যাগ করা হয়, তাহলে সেই ত্যাগ দ্বারাও প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হয় না। কারণ কর্ম না-করার সঙ্গে যতক্ষণ সম্পর্ক থাকে, ততক্ষণ প্রকৃতির সঙ্গেও সম্পর্ক বজায় থাকে। প্রকৃতির সঙ্গেও সর্বতোভাবে সম্পর্ক-বিচ্ছিন্ন হলে কর্মযোগী কর্ম করা এবং না-করা—এই দুই অবস্থাতেই সমভাবে নির্লিপ্ত থাকেন।

'অকর্মণি চ কর্ম যঃ'—অকর্মে কর্ম দেখার তাৎপর্য হল এই যে, নির্লিপ্ত হয়ে কর্ম করা বা না করা। এটির ভাব হল যে, কর্ম করার অথবা না করার সময়েও নিত্য-নিরন্তর নির্লিপ্ত থাকা।

জগতের কাজ করতে প্রবৃত্ত হলে তার কাছে প্রবৃত্তি (করা) এবং নিবৃত্তি (না-করা) দুই-ই উপস্থিত হয়। কোনো কাজে প্রবৃত্তি হয় আবার কোনো কাজে নিবৃত্তি হয়। কিন্তু কর্মযোগীর প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি দুই-ই নির্লিপ্ততাপূর্বক এবং জগতের মঙ্গলের জন্যই হয়ে থাকে। প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি কিছুতেই তাঁর কোনো প্রয়োজন থাকে না—**'নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন'** (গীতা ৩।১৮), যদি প্রয়োজন থাকে, তাহলে তিনি কর্মযোগী হন না, কর্মী হয়ে থাকেন।

সাধক প্রকৃতির সঙ্গে যতক্ষণ নিজ সম্পর্ক মেনে চলেন, ততক্ষণ তিনি কর্ম করাতে নিজ সাংসারিক উন্নতি মেনে নেন এবং কর্মত্যাগে নিজ পারমার্থিক উন্নতি মনে করেন। কিন্তু প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি—দুই-ই প্রকৃতপক্ষে প্রবৃত্তি ; কারণ দুটিতেই প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক থাকে। চলা-ফেরা, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি যেমন স্থূল শারীরিক ক্রিয়া, তেমনই একান্তে থাকা, চিন্তা করা, ধ্যান করা সূক্ষ্ম শরীরের ক্রিয়া এবং সমাধিস্থ হওয়া কারণ-শরীরের ক্রিয়া। তাই নির্লিপ্তভাবে থাকলেও লোক-সংগ্রহার্থে কর্তব্য-কর্ম করা উচিত। একেই বলা হয় অকর্মে কর্ম। দ্বিতীয় অধ্যায়ের আটচল্লিশতম শ্লোকে এটিকেই **'যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি'** (যোগ অর্থাৎ সমত্বে স্থিত হয়ে কর্ম করো) পদ দ্বারা বলা হয়েছে।

জাগতিক প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি—দুটিই হল 'কর্ম'। প্রবৃত্তি অথবা নিবৃত্তি কালে নির্লিপ্ত থাকা এবং নির্লিপ্ত থেকে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি করা। এইভাবে প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি—দুয়েতেই সর্বপ্রকারে নির্লিপ্ত থাকাকে 'যোগ' বলা হয়। একেই বলা হয় কর্মযোগ।

প্রশ্ন—কর্ম করাকালীন অথবা না-করাকালীন নির্লিপ্ত থাকা এবং নির্লিপ্ত হয়ে কর্ম করা বা না-করা—এই দুইয়েতে 'অকর্ম' অর্থাৎ নির্লিপ্ততাই প্রধান। তাহলে ভগবান কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম—এই দুটি কথা কেন বলেছেন ?

উত্তর—কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম—এই দুটিতে এক নির্লিপ্তভাব সার হলেও প্রথমে (কর্ম অকর্মতে) কর্ম করাকালে অথবা না-করার কালে—দুটি অবস্থাতেই স্থায়ী নির্লিপ্ত ভাবের প্রাধান্য থাকে এবং দ্বিতীয়টিতে (অকর্মে কর্ম) নির্লিপ্ত হয়েও কর্ম করা বা না-করার প্রাধান্য থাকে। তাৎপর্য হল এই যে, নির্লিপ্ততা নিজের জন্য এবং কর্ম জগতের জন্য ; কারণ নির্লিপ্ততার সম্পর্ক 'স্ব' (স্বরূপ)-এর সঙ্গে। তাই নির্লিপ্ততা হল স্বধর্ম এবং কর্ম করা বা না-করার সম্পর্ক হল 'পর' (শরীর, জগৎ)-এর সঙ্গে। তাই কর্ম করা বা না-করা হল পরধর্ম। এই দুটি যে দুই ভাগে বিভক্ত তা সম্পূর্ণভাবে জানাবার জন্যই ভগবান উপরিউক্ত কথা দুটি বলেছেন।

কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম—এই দুটি কর্মযোগের কথা, যার তাৎপর্য হল এই যে, প্রকৃতি হতে সর্বতোভাবে সম্পর্ক-বিচ্ছেদ যেন হয় অর্থাৎ করা বা না-করায় নিজের কোনো প্রয়োজন যেন না থাকে এবং লোক-সংগ্রহার্থে যেন কর্মগুলি করা, বা না-করা হয়, কারণ কর্ম করা কালে নির্লিপ্ত থাকা এবং নির্লিপ্ত হয়েও অন্যের হিতার্থে কর্ম করা—এই দুটিই গীতার সিদ্ধান্ত।

প্রবৃত্তি (করা) এবং নিবৃত্তি (না-করা) দুটিই রয়েছে প্রকৃতির রাজত্বে। প্রকৃতি সদা পরিবর্তনশীল, তাই প্রবৃত্তিরও আদি-অন্ত থাকে এবং নিবৃত্তিরও আদি-অন্ত থাকে। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে এর অতীত যে পরম নিবৃত্ত-তত্ত্ব অর্থাৎ নিজ স্বরূপ-এর আদি ও অন্ত হয় না। সেটি প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি চলাকালীনও একইভাবে বিরাজ করে। সেটি প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি—দুয়েরই প্রকাশক এবং আধার। তাই তাতে প্রবৃত্তিও নেই নিবৃত্তিও নেই—এই তত্ত্বটি বোঝার জন্য এবং তাতে স্থিত হয়ে লোকসংগ্রহার্থ (যজ্ঞার্থ) কর্ম করার জন্য এখানে কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম—এই দুটির কথা বলা হয়েছে।

'স বুদ্ধিমান মনুষ্যেষু'—যে ব্যক্তি কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম দেখেন অর্থাৎ সর্বদা নির্লিপ্ত থাকেন, বাস্তবে তিনিই কর্ম-তত্ত্ব জানেন। যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি নির্লিপ্ত না হন অর্থাৎ কর্ম এবং পদার্থকে তিনি নিজস্ব এবং নিজের জন্য বলে মনে করে থাকেন, ততক্ষণ তিনি কর্মতত্ত্ব বুঝে উঠতে সক্ষম হন না।

পরমাত্মাকে জানতে গেলে স্বয়ং-এর পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্নতা অনুভব করতে হয় এবং জগৎ-সংসারকে জানতে গেলে স্বয়ং-এর জগৎ-সংসার (ক্রিয়া এবং পদার্থ) থেকে সর্বতোভাবে পার্থক্য অনুভব করতে হয়। কারণ প্রকৃতপক্ষে আমরা (স্বরূপতঃ) পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্ন এবং জগৎ-সংসার থেকে পৃথক। তাই কর্ম থেকে পৃথক হলে অর্থাৎ নির্লিপ্ত হলেই কর্ম-তত্ত্বকে জানতে পারা সম্ভব। কর্ম আদি ও অন্ত বিশিষ্ট এবং আমি (জীব স্বয়ং) নিত্য স্থিত । অতএব আমি স্বরূপতঃ কর্ম হতে পৃথক (নির্লিপ্ত)—এই প্রকৃত তত্ত্ব অনুভব করাই হল প্রকৃত জ্ঞান। প্রকৃত তত্ত্বের গভীরে না পৌঁছলে এই জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়।

যেমন, কাজলের ঘরে ঢুকে কাজলে নির্লিপ্ত থাকা সাধারণ লোকের কাজ নয়, তেমনি সমস্ত কতর্ব্য-কর্ম করেও কর্মে সর্বতোভাবে নির্লিপ্ত থাকা সাধারণ বুদ্ধির লোকের কাজ নয়। তাই ভগবান এরূপ কর্মযোগীকে মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমান বলে অভিহিত করেছেন। অষ্টাদশ অধ্যায়ের দশম শ্লোকেও ভগবান এদের 'মেধাবী' (বুদ্ধিমান) বলে অভিহিত করেছেন।

সপ্তদশ শ্লোকে ভগবান কর্ম, অকর্ম এবং বিকর্ম—এই তিনটির তত্ত্ব বুঝতে বলেছেন। এখানে **'মনুষ্যেষু বুদ্ধিমান্'** পদটি দিয়ে ভগবান যেন জানাতে চেয়েছেন যে, যিনি কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্মের তত্ত্ব জেনে নিয়েছেন, তিনি সব কিছুই অবগত হয়েছেন অর্থাৎ তিনি জ্ঞাত-জ্ঞাতব্য হয়ে গেছেন।

'স যুক্তঃ'—সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে কর্মযোগী সমভাবে থাকেন। কর্মের ফল প্রাপ্তি হোক বা না হোক তাতে তাঁর বৈষম্য আসে না ; কারণ তিনি ফলেচ্ছা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করেছেন। সমত্বের অপর নাম হল যোগ। তিনি নিত্য-নিরন্তর সমত্বে স্থিত থাকেন, সেইজন্য তাঁকে যোগী বলা হয়।

প্রাণীমাত্রেরই পরমাত্মার সঙ্গে স্বতঃসিদ্ধ নিত্যযোগ থাকে। কিন্তু মানুষ জগৎ-সংসারের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করে রেখেছে, এইজন্য তার নিত্যযোগ বিস্মরণ হয়েছে। তাৎপর্য হল এই যে, জড়ত্বের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার অর্থই হল পরমাত্মার সঙ্গে নিজ নিত্য-সম্পর্কের বিস্মরণ হওয়া। কর্মযোগী ফলেচ্ছা, মমত্ববোধ এবং আসক্তি পরিত্যাগ করে কেবল অন্যের জন্য কর্তব্য-কর্ম করেন, যাতে তাঁর জড়ত্বের সঙ্গে স্থাপন করা সম্বন্ধ দূর হয়

এবং পরমাত্মার সঙ্গে স্বাভাবিক নিত্যযোগ অনুভূত হয়। সেইজন্য তাঁকে যোগী বলা হয়েছে।

'যুক্তঃ' পদে এই ভাব প্রকটিত হয় যে যোগী প্রাপ্ত করার উপযুক্ত তত্ত্ব লাভ করেছেন অর্থাৎ তিনি প্রাপ্ত-প্রাপ্তব্য হয়েছেন।

'কৃৎস্নকর্মকৃৎ'—যতক্ষণ কিছু 'পাওয়া' বাকি থাকে, ততক্ষণ 'করা'ও বাকি থাকে অর্থাৎ যতক্ষণ কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকে, ততক্ষণ করবার আসক্তি দূর হয় না।

বিনাশশীল কর্মের ফল বিনাশশীলই হয়ে থাকে। যতক্ষণ বিনাশশীল ফলের আকাঙ্ক্ষা থাকে, ততক্ষণ (কর্ম) করা শেষ হয় না। কিন্তু যখন বিনাশশীল পদার্থ থেকে সর্বতোভাবে সম্পর্কচ্ছেদ হয়ে পরমাত্মপ্রাপ্তিরূপ অবিনাশী ফল প্রাপ্তি হয়, তখন (কর্ম) করা চিরকালের মতো সমাপ্ত হয় এবং কর্মযোগীর কর্ম করা বা না-করার কোনো প্রয়োজন থাকে না। এরূপ কর্মযোগী সমস্ত কর্ম সম্পন্নকারী অর্থাৎ তাঁর আর কোনো কর্ম করা বাকি থাকে না। তিনি কৃতকৃত্য হয়ে যান।

করবার, জানবার এবং পাবার বাকি না থাকলে সেই কর্মযোগী এই অশুভ সংসার-বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে যান (গীতা ৪।১৬, ৩২)।

পরিশিষ্ট-ভাব— দুটি বিভাগ আছে, একটি কর্মের অন্যটি অকর্মের। এই দুইয়ের মধ্যে অকর্মই সার তত্ত্ব। তাই যে ব্যক্তি কর্মে অকর্ম দেখেন অর্থাৎ কর্ম করেও নির্লিপ্ত থাকেন এবং যে ব্যক্তি অকর্মে কর্ম দেখেন অর্থাৎ নির্লিপ্ত হয়েও কর্ম করেন, তাঁর কোনো কিছু করা, জানা বা পাওয়ার বাকি থাকে না। যেমন কোনো কর্মের-প্রারম্ভে গণেশপূজা করা হয়, কিন্তু কর্ম করার সময় আর গণেশের পূজা সবসময় করা হয় না। তেমনই কেউ যেন না মনে করেন যে কর্মের আরম্ভ নির্লিপ্তভাবে করা হয়েছে, পরে আর নির্লিপ্ত থাকার প্রয়োজন নেই! সেই জন্যই ভগবান এখানে উপরোক্ত কথা দুটি বলেছেন। অর্থাৎ নিজের মধ্যে কখনো লিপ্ততা (ফলেচ্ছা এবং কর্তৃত্বাভিমান) আসা উচিত নয়, সর্বদা নির্লিপ্ত থাকা উচিত।

তৃতীয় অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে কর্ম না-করার থেকে কর্ম করাই শ্রেষ্ঠ—**'কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ'** এবং এখানে বলেছেন কর্ম করার থেকেও অ-কর্মকে (অকর্তৃত্ব) দেখা শ্রেষ্ঠ এবং যে ব্যক্তি এরূপ দেখেন তাঁর আর কোনো কিছু করা, জানা এবং পাওয়া বাকি থাকে না। এতেই প্রমাণিত হয় যে মানুষের ফলেচ্ছা এবং কর্তৃত্বাভিমান থাকা উচিত নয়, কারণ এই দুটিতেই মানুষ আবদ্ধ হয়।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—ভগবান এবার পরবর্তী দুটি শ্লোকে কর্মে অ-কর্ম এবং অ-কর্মে কর্ম যাঁরা দেখেন অর্থাৎ কর্মের তত্ত্বজ্ঞানী সিদ্ধ মহাপুরুষের কথা বর্ণনা করছেন।

যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥ ১৯ ॥

[**যস্য** (যাঁর) ; **সর্বে, সমারম্ভাঃ** (সমস্ত কর্মের আরম্ভই) ; **কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ** (সঙ্কল্প ও কামনাবর্জিত) ; **জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং** (যাঁর সকল কর্ম জ্ঞানরূপ অগ্নিতে দগ্ধ হয়েছে) ; **তম্** (সেই ব্যক্তিকে) ; **বুধাঃ** (জ্ঞানীগণও) ; **পণ্ডিতম্** (পণ্ডিত) ; **আহুঃ** (বলে থাকেন।)]

যাঁর সমস্ত কর্মের আরম্ভই সংকল্প এবং কামনা-বর্জিত এবং যাঁর সকল কর্ম জ্ঞানরূপ অগ্নিতে ভস্মীভূত হয়েছে, সেই ব্যক্তিকে জ্ঞানীগণও পণ্ডিত (বিদ্বান) বলে থাকেন ॥ ১৯ ॥

ব্যাখ্যা—'যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ'[১] ।—বিষয়গুলির বারংবার চিন্তন হলে, সেগুলি স্মরণে

[১]যেখানে দুটির পদের অর্থই প্রধান হয়ে থাকে, সেখানে 'দ্বন্দ্বসমাস' হয়। এখানে 'সঙ্কল্প' এবং 'কাম' দুটি শব্দই নিজ নিজ অর্থে প্রধান। অতএব এইস্থানে 'সংকল্পাশ্চ কামাশ্চ'—এইরূপ দ্বন্দ্বসমাস হওয়ায় 'সংকল্পকামাঃ'—এইরূপ হয়েছে। কিন্তু দ্বন্দ্বসমাসের যে পদটিতে কম স্বর হয়, তার প্রয়োগ আগে হয়ে থাকে। এখানেও 'কাম' শব্দটিতে কম স্বর হওয়ায় তার প্রয়োগ আগে

এলে ওই বিষয়ে 'এই বিষয়টি ভালো, কাজের উপযোগী, জীবনের উপযোগী এবং সুখদায়ক'—এইরূপ সম্যক্-বুদ্ধির উদয় হওয়াকে বলা হয় 'সঙ্কল্প' এবং 'এই বিষয়বস্তু আমার পক্ষে ভালো নয়, ক্ষতিকারক'—এরূপ বুদ্ধিকে বলা হয় 'বিকল্প'। বুদ্ধিতে এরূপ সঙ্কল্প ও বিকল্প হতে থাকে। বিকল্প দূর হয়ে যখন শুধুমাত্র সঙ্কল্প থাকে, তখন 'এই বিষয়-বস্তু আমার চাই, এটি আমার হতে হবে'—এইরূপ সেটি প্রাপ্ত করার জন্য অন্তরে যে দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়, তাকেই বলা হয় 'কাম' (কামনা)। কর্মযোগে সিদ্ধ মহাপুরুষদের সঙ্কল্প এবং কামনা—দুটিই থাকে না অর্থাৎ তাঁদের মনে কামনাজনিত সঙ্কল্পও থাকে না এবং সঙ্কল্পের কার্য কামনাও থাকে না। সুতরাং তাঁরা যে কর্ম করেন, তা সবই সঙ্কল্প ও কামনাবর্জিত হয়ে থাকে।

সঙ্কল্প এবং কামনা—এই দুটি হল কর্মের বীজ। সঙ্কল্প এবং কামনা না থাকলে কর্ম অ-কর্ম হয়ে যায় অর্থাৎ কর্ম বন্ধনকারক হয় না। সিদ্ধ মহাপুরুষদের সঙ্কল্প এবং কামনা না থাকার জন্য তাঁদের দ্বারা যে কর্ম হয় তা বন্ধনকারক হয় না। তাঁদের দ্বারা লোকসংগ্রহার্থে, কর্তব্য পরম্পরা বজায় রাখার জন্য সমস্ত কর্ম ঠিকমতো হলেও তিনি ওই কর্ম হতে স্বতঃই সর্বথা নির্লিপ্ত থাকেন।

ভগবান কোনোস্থানে সঙ্কল্প (৬।৪), কোথাও কামনা (২।৫৫) এবং কোনো জায়গায় সঙ্কল্প ও কামনা—দুটিই (৬।২৪-২৫) ত্যাগ করার কথা বলেছেন। সুতরাং যেস্থানে শুধু সঙ্কল্প ত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে, সেখানে কামনা এবং যেখানে শুধু কামনা ত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে, সেখানে সঙ্কল্প ত্যাগের কথাও বুঝে নিতে হবে ; কারণ সঙ্কল্প হল কামনার কারণ এবং কামনা হল সঙ্কল্পের কার্য। তাৎপর্য হল এই যে, সাধকদের সমস্ত সঙ্কল্প এবং কামনা ত্যাগ করা উচিত।

মোটরগাড়ি চার রকম অবস্থায় থাকে—

১) গাড়ি যখন গ্যারেজে থাকে তখন ইঞ্জিন বা চাকা কোনোটিই চলে না ; ২) মোটর চালু করলে ইঞ্জিন চললেও চাকা তখনও অনড় থাকে ; ৩) গাড়ি চালু করলে ইঞ্জিন ও চাকা দুই-ই চলতে থাকে ; ৪) নিরাপদ ঢালু রাস্তা এলে ইঞ্জিন বন্ধ করলেও চাকা চলতে থাকে। মানুষেরও এইরকম চার প্রকার অবস্থা হয়—১) কামনাও উৎপন্ন হয় না এবং কর্মও হয় না ; ২) কামনা উৎপন্ন হয়, কিন্তু কর্ম হয় না ; ৩) কামনাও থাকে এবং কর্মও হয় ; ৪) কামনা থাকে না, কর্ম হয়।

মোটর গাড়ির সব থেকে ভাল (চতুর্থ) অবস্থা হল এই যে, ইঞ্জিন বন্ধ থাকে এবং চাকা চলতে থাকে অর্থাৎ তেল খরচ না হয়েও রাস্তা অতিক্রম করা যায়। এইরূপ মানুষের সর্বাপেক্ষা উত্তম অবস্থা হল—কামনা থাকে না এবং কর্মও হয়ে যায়। এরূপ অবস্থার মানুষকে জ্ঞানী ব্যক্তিগণও পণ্ডিত বলে উল্লেখ করেন।

'সমারম্ভাঃ'[(১)] পদটির ভাব হল এই যে কর্মযোগে সিদ্ধ মহাপুরুষগণ নানা কর্ম সুচারুভাবে, যথাযথরূপে তৎপরতার সঙ্গে করে থাকেন। দ্বিতীয় একটি ভাব দেখা যায় যে, তাঁদের কৃত কার্যসমূহ শাস্ত্রসম্মত হয়। তাঁদের দ্বারা করণীয় কর্মই হয়ে থাকে। কারো অহিত হতে পারে এমন কোনো কর্ম তাঁদের দ্বারা হয় না।

'সর্বে' পদটির ভাব হল এই যে, তাঁদের কৃত কর্মগুলির সবই সঙ্কল্প এবং কামনাবর্জিত হয়। প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ থেকে রাত্রের বিশ্রাম পর্যন্ত স্নান-খাওয়া-পূজা-পাঠ-জপ-ধ্যান-সমাধি ইত্যাদি শরীর-নির্বাহ সম্পর্কীয় সমস্ত কর্মই সঙ্কল্প এবং কামনাবর্জিত হয়ে থাকে।

'জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণম্'—কর্মের সম্পর্ক অপরের (শরীর-সংসার) সঙ্গে, স্ব (স্বরূপ)-এর সঙ্গে নয় ; কারণ কর্মের আরম্ভ ও শেষ থাকে, কিন্তু স্বরূপ সর্বদা একইভাবে বিরাজমান—এই তত্ত্বটি ঠিকমতো জানাকেই বলা হয় 'জ্ঞান'। এই জ্ঞানরূপ অগ্নিতে সমস্ত কর্ম ভস্মীভূত হয় অর্থাৎ কর্মগুলির ফল দেবার (আবদ্ধ করার) শক্তি থাকে না (গীতা ৪।১৬, ৩২)।

প্রকৃতপক্ষে শরীর এবং ক্রিয়া—দুই-ই জগতের সঙ্গে

হয়েছে ; সুতরাং 'কাম-সঙ্কল্পা' এই রূপে তৈরি হয়েছে। এখন 'কামসঙ্কল্পৈর্বর্জিতাঃ'—এতে তৃতীয়া সমাস হওয়ায় সম্পূর্ণ পদটি 'কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ' রূপ ধারণ করেছে।

[(১)]এইস্থানে 'সমারম্ভাঃ' পদটি সিদ্ধ কর্মযোগীর রাগ-দ্বেষবর্জিত যথাযথ প্রবৃত্তির বাচক, চতুর্দশ অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে উল্লিখিত 'আরম্ভ' পদের বাচক নয়। কারণ ওখানে 'প্রবৃত্তি' এবং 'আরম্ভ'—এই দুটি শব্দ আছে। সুতরাং সেখানে কর্তব্য-কর্ম করা 'প্রবৃত্তি' এবং ভোগ ও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নতুন কর্ম আরম্ভ করাকে 'আরম্ভ' বলা হয়।

অভিন্ন। কিন্তু স্বয়ং সর্বতোভাবে পৃথক হয়েও ভ্রমবশতঃ এগুলির সাথে নিজ সম্পর্ক মেনে নেয়। মহাপুরুষেদেরও নিজের বলে যে শরীর তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না থাকায়, জগৎমাত্রেই যেমন সমস্ত কর্ম হয়ে থাকে তেমনই তাঁদের বলে কথিত যে শরীর—তার দ্বারাও স্বতঃ কর্মাদি হয়ে যায়। কর্মে এইরূপ নির্লিপ্ততা অনুভব করায় ওই মহাপুরুষদের কেবল বর্তমান কর্মই নষ্ট হয় না, উপরন্তু সঞ্চিত কর্মও সর্বতোভাবে নষ্ট হয়ে যায়। শুধুমাত্র প্রারব্ধ কর্ম অনুকূল বা প্রতিকূল পরিস্থিতিরূপে তাঁদের জীবনে উপস্থিত হয় আবার লুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু ফলে অনাসক্ত হওয়ায় তাঁরা সেগুলির ভোক্তা হন না অর্থাৎ তাঁরা তাতে বিন্দুমাত্র সুখী বা দুঃখী হন না। সেইজন্য প্রারব্ধ কর্মও অস্থায়ী, কেবল পরিস্থিতির উদ্ভব করে নষ্ট হয়ে যায়।

'তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ'—যে ব্যক্তি কর্মকে স্বরূপতঃ ত্যাগ করে পরমাত্মাতে মন নিবিষ্ট করেছে, তাকে বোঝা সহজ হয়, কিন্তু যে ব্যক্তি কর্মে বিন্দুমাত্রও লিপ্ত না হয়ে তৎপরতার সঙ্গে কর্ম করে, তাকে বোঝা কঠিন। সন্ত-মহাপুরুষদের বাণীতে আছে—

ত্যাগী শোভা জগৎমেঁ করতা হৈ সব কোয়।
হরিয়া গৃহস্থী সন্তকা ভেদী বিরলা হোয়॥

অর্থাৎ জগতে (বাহ্য ত্যাগকারী) ত্যাগী ব্যক্তির মহিমা-কীর্তন সকলেই করে থাকে, কিন্তু সংসারী ব্যক্তি সকল কর্তব্য-কর্ম পালন করেও যে নির্লিপ্ত থাকে, সেই (অন্তর থেকে ত্যাগ) সংসারী ব্যক্তিকে জানার মতো ব্যক্তি বিরল হয়ে থাকে।

পদ্মপত্র যেমন জলে উৎপন্ন হয় এবং জলেই থাকে অথচ জলে লিপ্ত হয় না, তেমনি কর্মযোগী কর্মযোনিতে (মনুষ্য-দেহ) উৎপন্ন হয়েও এবং কর্মময়-জগতে বাস করে কর্ম করতে থাকলেও কর্মে লিপ্ত হন না[১]। কর্মে লিপ্ত না হওয়া সাধারণ বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আগের অষ্টাদশ শ্লোকে ভগবান এরূপ কর্মযোগীকে 'মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমান' বলে জানিয়েছেন এবং এখানে বলেছেন যে এঁকে জ্ঞানী ব্যক্তিরাও পণ্ডিত অর্থাৎ বুদ্ধিমান বলে অভিহিত করেন। একথার তাৎপর্য এই যে, এইরূপ কর্মযোগী পণ্ডিতদেরও পণ্ডিত, জ্ঞানীদের মধ্যেও অগ্রগণ্য হয়ে থাকেন[২]।

❋ ❋ ❋

ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥ ২০ ॥

[**কর্মফলাসঙ্গম্** (কর্ম ও ফলাসক্তি) ; **ত্যক্ত্বা** (পরিত্যাগ করে) ; **নিরাশ্রয়ঃ** (কারো আশ্রয় গ্রহণ না করে) ; **নিত্যতৃপ্তঃ** (সদা তৃপ্ত থাকেন) ; **সঃ কর্মণি** (তিনি কর্মে) ; **অভিপ্রবৃত্তঃ, অপি** (বিশেষভাবে প্রবৃত্ত থাকলেও) ; **কিঞ্চিৎ, এব** (কিছুই) ; **ন, করোতি** (করেন না।)]

যিনি কর্ম এবং ফলের আসক্তি পরিত্যাগ করে, কারো আশ্রয় গ্রহণ না করে সদা তৃপ্ত থাকেন, তিনি কর্মে বিশেষভাবে প্রবৃত্ত থাকলেও বাস্তবে কিছুই করেন না ॥ ২০ ॥

ব্যাখ্যা—'ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গম্'—কর্ম করার সময় যখন কর্তার এই ভাব থাকে যে, এই শরীরাদি কর্মসামগ্রী আমার, আমি কর্ম করি, কর্মগুলি আমার এবং আমার জন্য, এগুলির দ্বারা আমার এই ফল প্রাপ্তি হবে—তখন কর্তা কর্মফলের হেতু হয়ে যান। কর্মযোগে সিদ্ধ মহাপুরুষদের প্রাকৃত পদার্থ হতে সর্বপ্রকারে সম্পর্কচ্ছেদ অনুভব হয়, তাই কর্মসামগ্রী, কর্মে এবং কর্মফলে তাঁদের বিন্দুমাত্র আসক্তি থাকে না, তাই তাঁরা কর্মফলের হেতু হন না।

সৈন্য বিজয় লাভের আকাঙ্ক্ষায় যুদ্ধ করে। বিজয় প্রাপ্তি হলে তা সৈন্যদলের না হয়ে রাজার বলে মানা হয় । কারণ রাজাই সৈন্যদলের জীবন-নির্বাহের ব্যবস্থা

---

[১]নিবৃত্তিরপি মূঢ়স্য প্রবৃত্তিরুপজায়তে। প্রবৃত্তিরপি ধীরস্য নিবৃত্তি ফলদায়িনী॥ (অষ্টাবক্রগীতা ১৮।৬১)
'মূঢ় ব্যক্তির নিবৃত্তিও প্রবৃত্তি উৎপন্নকারী হয় এবং জ্ঞানী ব্যক্তির প্রবৃত্তিও নিবৃত্তি-রূপ ফল প্রদানকারী হয়ে থাকে।'

[২]গৃহেষু পণ্ডিতাঃ কেচিৎ কেচিন্মূর্খেষু পণ্ডিতাঃ। সভায়াং পণ্ডিতাঃ কেচিৎ কেচিৎ পণ্ডিত পণ্ডিতাঃ॥

করেছেন ; তিনি যুদ্ধসামগ্রীর যোগান দিয়েছেন এবং যুদ্ধপ্রেরণাও তাঁরই দেওয়া, সৈন্যদলও রাজার জন্যই যুদ্ধ করে। এইভাবে শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি কর্ম-সামগ্রীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলেই জীব সেগুলির দ্বারা করা কর্মের ফলভোগী হয়ে যায়।

কর্ম-সামগ্রীর সঙ্গে সম্পর্ক না হওয়ায় কর্মফলের সঙ্গে মহাপুরুষদের কোনো সম্বন্ধ হয় না।

কর্মফলের সঙ্গে স্বরূপের বাস্তবিক কোনোই সম্পর্ক নেই। তার কারণ স্বরূপ হল চেতন, অবিনাশী এবং নির্বিকার। কিন্তু কর্ম ও কর্মফল—উভয়ই জড় অর্থাৎ বিকারযুক্ত এবং সেগুলির আরম্ভ ও শেষ থাকে। স্বরূপের সঙ্গে সর্বদা কোনো কর্মও থাকে না এবং কর্মফলও থাকে না। এইভাবে কর্মফল এবং কর্মফলের সঙ্গে যদিও স্বরূপের কোনো সম্পর্ক থাকে না, তা সত্ত্বেও জীব ভ্রমক্রমে ওইগুলির সঙ্গে নিজের সম্পর্ক স্থাপন করে নেয়। এই মেনে নেওয়া সম্পর্কই বন্ধনের কারণ হয়ে যায়। এই মেনে নেওয়া সম্পর্ক যদি দূর হয়, তাহলে কর্ম এবং তার ফলে জীবের স্বাভাবিক নির্লিপ্ততা আসে।

'নিরাশ্রয়ঃ'—দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, পরিস্থিতি ইত্যাদির কোনোরূপ সাহায্য গ্রহণ না করাই হল **'নিরাশ্রয়'** বা আশ্রয়রহিত হওয়া। যতো বড় ধনী, রাজা ও মহারাজা হোক না কেন, তাকেও দেশ, কাল ইত্যাদির সাহায্য বা আশ্রয় নিতে হয়। কিন্তু কর্মযোগ দ্বারা সিদ্ধ মহাপুরুষ দেশ, কাল ইত্যাদির কোনো আশ্রয় নেন না। আশ্রয় পাওয়া যাক বা না যাক তা তিনি কিছুমাত্র গ্রাহ্য করেন না। তাই তিনি আশ্রয়রহিত হয়ে থাকেন।

'নিত্যতৃপ্তঃ'—জীব (আত্মা) পরমাত্মার সনাতন অংশ হওয়ায় সৎ-স্বরূপ। সৎ-এর কখনো অনস্তিত্ব হয় না **'নাভাবো বিদ্যতে সতঃ'** (গীতা ২।১৬)। কিন্তু যখন জীব অ-সতের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করে নেয়, তখন তার নিজের মধ্যে অভাব অর্থাৎ ঘাটতি অনুভূত হয়। সেই অভাব পূর্ণ করার জন্য সে জাগতিক বস্তু কামনা করতে থাকে। ঈপ্সিত বস্তুর প্রাপ্তিতে যে তৃপ্তি হয়, তা হয় ক্ষণিক, চিরস্থায়ী নয়। কারণ জগতের প্রত্যেক বস্তু, ব্যক্তি, পরিস্থিতি ইত্যাদি প্রতি মুহূর্তে লয়-এর দিকে চলেছে। সুতরাং সেগুলিকে আশ্রয় করলে স্থায়ী তৃপ্তি-লাভ কী করে সম্ভব ? সৎ-বস্তুর তৃপ্তি অসৎ-বস্তুর দ্বারা কী করে সম্ভব হয় ? সুতরাং জীব যতক্ষণ পর্যন্ত উৎপত্তি-বিনাশশীল ক্রিয়া এবং পদার্থের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক বজায় রাখে এবং তার আশ্রয় (সাহায্য) গ্রহণ করে ততক্ষণ সে স্বাভাবিক নিত্য-তৃপ্তি অনুভব করতে সক্ষম হয় না।

কর্মযোগ দ্বারা সিদ্ধ মহাপুরুষ আশ্রয়রহিত অর্থাৎ জগতের আশ্রয় থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হন। সেইজন্য তাঁর স্বাভাবিকভাবে নিত্য-তৃপ্তি অনুভব হয়। তৃতীয় অধ্যায়ের সপ্তদশতম শ্লোকে **'আত্মতৃপ্তঃ'** পদের দ্বারাও এই নিত্য-তৃপ্তির কথা উল্লেখিত হয়েছে।

'কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ'—**'অভিপ্রবৃত্তঃ'** পদটির তাৎপর্য হল যে মহাপুরুষদের দ্বারা কৃত সমস্ত কর্মই যথাযথভাবে হয়ে থাকে কারণ তাঁদের কর্মফলে কোনো আসক্তি থাকে না। তাঁদের সব কর্মই শুধুমাত্র জগৎ হিতার্থে হয়।

যার কর্মফলে আসক্তি থাকে, সে যথাযথভাবে কর্ম করতে সক্ষম হয় না। কারণ ফলের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকায় কর্ম করা কালে মাঝে মাঝে ফলের চিন্তা উদয় হওয়ায় তার শক্তির অপব্যয় হয়ে থাকে। ফলে তার পূর্ণ শক্তি কর্মে নিয়োজিত হতে পারে না।

'অপি' পদটির তাৎপর্য হল যে, যথাযথভাবে সমস্ত কর্ম করেও, মুক্তপুরুষ প্রকৃতপক্ষে কোনো কর্মই করেন না ; কারণ সর্বতোভাবে নির্লিপ্ত হওয়ায় কর্ম তাঁকে স্পর্শ করে না তাঁর সমস্ত কর্মই অকর্মে পরিণত হয়।

তিনি যখন কিছুই করেন না, তখন তিনি কর্মফলে আবদ্ধ হবেন কী করে ? তাই অষ্টাদশ অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, কর্মফল পরিত্যাগকারী কর্মযোগীর কর্মের ফল কোথাও (ইহলোকে বা পরলোকে) ভোগ করতে হয় না—**'ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ'**।

প্রকৃতি সর্বদা ক্রিয়াশীল। সুতরাং যতক্ষণ প্রকৃতির গুণাদির (ক্রিয়া ও পদার্থের) সঙ্গে সম্পর্ক থাকে, ততক্ষণ কর্ম না করলেও মানুষের কর্মের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় থাকে। প্রকৃতির গুণের সঙ্গে সম্পর্ক না করলে মানুষ কর্ম করলেও কিছু করে না। কর্মযোগে সিদ্ধ মহাপুরুষদের প্রকৃতিজনিত গুণাদিতে কোনো সম্পর্ক থাকে না, তাই তাঁরা লোকহিতার্থে সমস্ত কর্ম করেও, বাস্তবে কিছুই করেন না।

পরিশিষ্ট-ভাব—মানুষের মধ্যে যতক্ষণ কর্তৃত্বভাব থাকে, ততক্ষণ তিনি কিছু করলেও 'করা' হয় এবং কিছু না করলেও 'করা' হয়। কিন্তু কর্তৃত্বভাব দূর হলে তাঁর দ্বারা কখনো কিছুই 'করা' হয় না।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—উনিশতম-কুড়িতম শ্লোকে কর্মযোগে সিদ্ধ মহাপুরুষদের কর্মে নির্লিপ্ততা বর্ণনা করে ভগবান এবার একুশতম শ্লোকে নিবৃত্তিপরায়ণ এবং বাইশতম শ্লোকে প্রবৃত্তিপরায়ণ কর্মযোগী সাধকের কর্ম থেকে নির্লিপ্ততার কথা বর্ণনা করেছেন।

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ২১ ॥

[**যতচিত্তাত্মা** (যিনি শরীর ও অন্তঃকরণকে বশীভূত করেছেন) ; **ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ** (যিনি সর্বপ্রকারের সঞ্চয় বর্জন করেছেন, এরূপ) ; **নিরাশীঃ** (আশারহিত) ; **কেবলম্** (কেবল) ; **শারীরম্** (শরীর সম্বন্ধীয়) ; **কর্ম, কুর্বন** (কর্ম করেও) ; **কিল্বিষম্** (পাপভাগী) ; **ন, আপ্নোতি** (হন না।)]

যিনি শরীর ও অন্তঃকরণকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করেছেন, যিনি সর্বপ্রকার ভোগোপকরণ বর্জন করেছেন, এইরূপ আশারহিত কর্মযোগী কেবল শরীর সম্বন্ধীয় কর্ম করেও পাপভাগী হন না ॥ ২১ ॥

ব্যাখ্যা—**'যতচিত্তাত্মা'**—জগতে আশা বা আকাঙ্ক্ষা থাকলেই শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ইত্যাদি বশীভূত হয় না। এই শ্লোকে **'নিরাশীঃ'** পদটির দ্বারা ভগবান বলেছেন যে কর্মযোগীর আকাঙ্ক্ষা বা কামনা থাকে না। তাই তাঁর শরীর, ইন্দ্রিয়সমূহ ও অন্তঃকরণ স্বাভাবিকভাবে তাঁর বশে থাকে। এগুলি বশে থাকায়, এগুলির দ্বারা কোনো ব্যর্থ ক্রিয়া সংঘটিত হয় না।

'ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ'—কর্মযোগী যদি সন্ন্যাসী হন, তাহলে তিনি সর্বপ্রকার ভোগ্য-সামগ্রীর সংগ্রহ বাহ্যতঃ পরিত্যাগ করেন। যদি তিনি গৃহস্থ হন তাহলে ভোগ করার ইচ্ছায় (নিজের সুখের জন্য) কোনো সামগ্রী সংগ্রহ করেন না। তাঁর কাছে যে সমস্ত সামগ্রী থাকে সেগুলি নিজের বলে মনে না করে জগতের বলে মনে করেন এবং জগতের সুখেই সেই সামগ্রীগুলি ব্যয় করেন। ভোগেচ্ছার জন্য সংগ্রহ ত্যাগ করা তো প্রত্যেক সাধকেরই অবশ্য প্রয়োজন।

[এইরূপ নিবৃত্তি-সূচক শ্লোক গীতায় আর কোনো স্থানে উল্লেখিত হয়নি। ষষ্ঠ অধ্যায়ের দশম শ্লোকে ধ্যানযোগীর জন্য এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের তিপ্পান্নতম শ্লোকে জ্ঞানযোগীদের জন্য পরিগ্রহ ত্যাগ করার কথার উল্লেখ আছে। কিন্তু তার থেকেও উচ্চ শ্রেণীর পরিগ্রহ ত্যাগের কথা **'ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ'** পদটির দ্বারা এখানে বলা হয়েছে । কারণ 'পরিগ্রহ'র সঙ্গে 'সর্ব' শব্দটি একমাত্র এখানেই বলা হয়েছে। দ্বাদশ অধ্যায়ের উনিশতম শ্লোকে ভক্তিযোগীর জন্য **'অনিকেতঃ'** পদটি ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু সেখানে এর অর্থ হল বাসস্থানের প্রতি মমতা ও আসক্তি থেকে মুক্ত হওয়া।]

'নিরাশীঃ'—কর্মযোগীর আশা, কামনা, স্পৃহা, বাসনা ইত্যাদি থাকে না। তিনি যে শুধু বাহ্য ভোগ সামগ্রীর সংগ্রহ ত্যাগ করেন তাই নয়, তিনি অন্তরেও ভোগ সামগ্রীর কামনা ও আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করেন। আকাঙ্ক্ষা এবং কামনা সর্বতোভাবে ত্যাগ করা সম্ভব না হলেও তাঁর উদ্দেশ্য থাকে এগুলি ত্যাগ করারই।

'শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্'—**'শারীরম্ কর্ম'** (শরীর সম্বন্ধীয় কর্ম) পদটির দুই অর্থ হয়—এক হল শারীরিক কর্ম এবং অন্যটি হল শরীর-নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় কর্ম। শরীরের দ্বারা হওয়া কর্ম (শারীরিক কর্ম)-এর কথা পঞ্চম অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকেও বলা হয়েছে। এর তাৎপর্য হল যে সমস্ত কর্মই শুধুমাত্র শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধির দ্বারাই হয়ে থাকে, তার সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধ নেই, এরূপ মনে করে কর্মযোগী চিত্ত (অন্তঃকরণ) শুদ্ধির নিমিত্ত কর্ম করেন। কিন্তু এখানে উদ্ধৃত শ্লোকটি নিবৃত্তি-সূচক, তাই এইস্থানে উদ্ধৃত শ্লোকটির অর্থ কেবলমাত্র শরীর-নির্বাহের জন্য করা আবশ্যক কর্ম (খাওয়া, শুচি-স্নান ইত্যাদি) মনে করাই উপযুক্ত বলে মনে হয়। নিবৃত্তি-পরায়ণ কর্মযোগী কেবল সেটুকু কর্মই করেন,

যাতে তাঁর শরীর-নির্বাহ হয়।

'নাপ্নোতি কিল্বিষম্'— যে ব্যক্তি কর্ম করা বা না-করার সঙ্গে নিজের কিছুমাত্রও সম্পর্ক রাখে, সে পাপে অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুরূপ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কামনারহিত কর্মযোগী কর্ম করা অথবা না-করার সঙ্গে নিজের কোনো সম্পর্ক রাখেন না, তাই তিনি পাপভাগী হন না অর্থাৎ তাঁর সমস্ত কর্মই অকর্ম হয়ে যায়।

নিবৃত্তিপরায়ণ হলেও কর্মযোগী কখনো আলস্য বা প্রমাদ-পরায়ণ হন না। আলস্য-প্রমাদও একপ্রকার ভোগ। একান্তে এমনি পড়ে থাকলে আলস্যের ভোগ হয় এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ অথবা নিরর্থক কর্মতে প্রমাদ ভোগ হয়। এইভাবে নিবৃত্তিতে আলস্যের সুখভোগ এবং প্রবৃত্তিতে প্রমাদের সুখভোগ হতে পারে। এরূপ আলস্য-প্রমাদ দ্বারা মানুষ পাপে লিপ্ত হয়। কিন্তু অনেক কম কর্ম করলেও নিবৃত্তি-পরায়ণ কর্মযোগীর বিন্দুমাত্রও আলস্য-প্রমাদ আসে না। তাঁর মধ্যে যদি একটুও আলস্য-প্রমাদের উদয় হয়, তাহলে **'কিল্বিষম্ ন আপ্নোতি'** পদটি প্রযোজ্য হয় না। তিনি হলেন, **'যতচিত্তাত্মা'** অর্থাৎ তাঁর শরীর, ইন্দ্রিয় এবং চিত্ত সংযত, তাই তাঁর মধ্যে আলস্য বা প্রমাদ আসতেই পারে না। শরীর-ইন্দ্রিয়-চিত্ত বশীভূত হওয়ায়, ভোগ্য-সামগ্রী ত্যাগ করায় এবং আশা, আকাঙ্ক্ষা, মমতা রহিত হওয়ায় তাঁর দ্বারা নিষিদ্ধ কর্ম হওয়া সম্ভবই নয়।

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে, তাঁর দ্বারা যখন কোনো পাপকর্ম হওয়া সম্ভবই নয়, তখন একথা কেন বলা হয়েছে যে তিনি পাপভাগী হন না ? তার উত্তর হল এই যে, ক্রিয়া মাত্রেই অনিবার্যভাবে দোষ হয়ে থাকে—**'সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ'** (গীতা ১৮।৪৮)। কিন্তু মূলতঃ অসৎ সঙ্গ অর্থাৎ কামনা, মমতা, এবং আসক্তি থাকলে তবেই পাপ হয়ে থাকে। কর্মযোগীর কামনা, মমতা এবং আসক্তি থাকেই না অথবা তাঁর কামনা, মমতা ও আসক্তির কোনো উদ্দেশ্য থাকে না, তাই তাঁর কর্ম করা বা না করায় কোনো প্রয়োজন থাকে না। এইজন্যই তাঁকে কর্মের যে আনুষঙ্গিক দোষ থাকে তাও স্পর্শ করে না এবং শাস্ত্রবিহিত কর্ম ত্যাগের পাপও বর্তায় না।

অপর একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান সিদ্ধ মহাপুরুষকেও (তাঁর নিজের কোনো কর্তব্য বাকি না থাকলেও) লোকসংগ্রহার্থে কর্ম করার প্রেরণা দিয়েছেন (৩।২৫-২৬)। নিজের জন্যও ভগবান জানিয়েছেন যে ত্রিলোকে তাঁর কোনো কর্তব্য এবং প্রাপ্তব্য না থাকলেও তিনি সতর্কতার সঙ্গে কর্ম করেন (৩।২২-২৪)। সুতরাং কেবল শরীর-নির্বাহের জন্য যদি এমন কর্মযোগীগণ কর্ম করেন তবে তাঁদের লোকসংগ্রহ ত্যাগের দোষ কি বর্তাবে না ? এর উত্তর হল এই যে, কামনা, মমতা ইত্যাদি না থাকায় তাঁদের কোনো দোষ হয় না। যদিও সিদ্ধ মহাপুরুষদের এবং ভগবানের কামনা-মমতা ইত্যাদি বিন্দুমাত্র থাকে না, তা সত্ত্বেও তাঁরা লোকসংগ্রহার্থে যে কর্ম করেন, তা তাঁদের দয়া এবং কৃপাই বলা যায়। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা লোকসংগ্রহ করুন বা না করুন, তাতে তাঁরা স্বাধীন, তাঁদের ওপর কোনো দায়িত্ব নেই (গীতা ৩।১৮)। বাস্তবে এটিও নিবৃত্তি-পরায়ণ সাধকদের জন্য একপ্রকার লোকসংগ্রহই বলা যায়। লোকসংগ্রহ করা হয় না, এটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে হয়।

তৃতীয় একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, তৃতীয় অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে ভগবান যারা শুধু নিজের শরীর রক্ষণাবেক্ষণ করে তাদের পাপী বলে অভিহিত করেছেন। আবার এখানে বলেছেন যে শরীর-নির্বাহের জন্য কর্ম করলে কোনো পাপ স্পর্শ করে না। এ দুটির সামঞ্জস্য হয় কীভাবে ? এর উত্তর হল এই যে, যতক্ষণ ভোগবুদ্ধি থাকে ততক্ষণ কর্ম করা অথবা না-করায় পাপভাগী হতেই হয়, সেইজন্য সেইস্থানে **'পচন্তি আত্মকারণাৎ'** পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু উল্লিখিত কর্মযোগীদের ভোগবুদ্ধি নেই এবং কর্ম ও পদার্থে আসক্তিও নেই, সুতরাং সর্বতোরূপে নির্লিপ্ত হওয়ায় তাঁরা কর্ম করা বা না-করাতে কিছুমাত্রও পাপভাগী হন না।

প্রশ্ন—এই শ্লোকটিকে সাংখ্যযোগীর জন্য মনে করলে কি আপত্তির কিছু আছে ? কারণ এতে উল্লিখিত সব লক্ষণই সাংখ্যযোগীর মধ্যে দেখা যায়।

উত্তর—প্রথমতঃ, এটি কর্মযোগের প্রসঙ্গ, তাই এই শ্লোকটি মুখ্যতঃ কর্মযোগীরই। দ্বিতীয়তঃ, সাংখ্যযোগী নিজেকে কর্তা বলে মনেই করেন না। তাঁর মধ্যে 'আমি কিছুই করি না' (গীতা ৫।৮) এরূপ স্পষ্ট বিবেকবোধ থাকে ; তাহলে তাঁর পক্ষে 'কর্ম করলেও পাপ হয় না'—এরূপ বলা কীভাবে সম্ভব হয় ?

কর্মযোগের সাধকদের মনে এরূপ স্পষ্ট বিবেকবোধ জাগরিত না হলেও তাঁরা এই বোধে নিশ্চিত থাকেন যে, 'কিছুই আমার নয় ; আমার কিছুতে প্রয়োজন নেই এবং

আমার জন্য কিছু করার প্রয়োজন নেই।' এই তিনটি বিষয়ে দৃঢ় নিশ্চয় হওয়ায় তাঁরা কর্ম করলেও তাতে নির্লিপ্তভাবে থাকেন।

মানুষের মনে প্রায়শঃ এই ধারণা থাকে যে, কর্মযোগী থাকেন গৃহস্থাশ্রমে এবং জ্ঞানযোগী (সাংখ্যযোগী) থাকেন সন্ন্যাস আশ্রমে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ঠিক নয়। যাঁর শরীর হতে নিজ পৃথক সত্তার স্পষ্ট অনুভূতি থাকে, তিনিই জ্ঞানযোগী ; তা তিনি গৃহস্থাশ্রমেই থাকুন অথবা সন্ন্যাসাশ্রমে থাকুন। যাঁর মধ্যে বিবেক ততো দৃঢ় নয়, কিন্তু উপরিউক্ত তিনটি বিষয়ে ধারণা দৃঢ় নিশ্চয়রূপে থাকে, তিনি কর্মযোগী, তাতে তিনি গৃহস্থাশ্রমে অথবা সন্ন্যাসাশ্রমে— যেখানেই থাকুন না কেন।

* * *

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে॥ ২২ ॥

[**যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ** (নিজে থেকে যা পাওয়া যায় তাতে সন্তুষ্ট থাকেন) ; **বিমৎসরঃ** (যিনি ঈর্ষারহিত) ; **দ্বন্দ্বাতীতঃ** (দ্বন্দ্বের অতীত) ; **সিদ্ধৌ চ অসিদ্ধৌ** (সিদ্ধি অসিদ্ধিতে) ; **সমঃ** (সম থাকেন) ; **কৃত্বা, অপি** (করলেও) ; **ন, নিবদ্ধ্যতে** (আবদ্ধ হন না।)]

যিনি (কর্মযোগী) ফলাকাঙ্ক্ষা ব্যতিরেকে নিজে থেকেই যা পাওয়া যায় তাতে সন্তুষ্ট থাকেন এবং ঈর্ষা-রহিত, দ্বন্দ্বের অতীত এবং সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সম থাকেন তিনি কর্ম করলেও তাতে আবদ্ধ হন না ॥ ২২ ॥

ব্যাখ্যা—'যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ'—কর্মযোগী নিষ্কামভাবে সম্পূর্ণরূপে সমস্ত কর্তব্য-কর্ম সমাধা করেন। ফল প্রাপ্তির আশা না রেখে কর্ম করলে কর্মফলরূপে তাঁর অনুকূলতা বা প্রতিকূলতা, লাভ বা ক্ষতি, মান বা অপমান, স্তুতি বা নিন্দা ইত্যাদি যা কিছু ঘটে তাতে কর্মযোগীর চিত্তে (অন্তঃকরণে) কোনো অসন্তোষ সৃষ্টি হয় না। যেমন তিনি যদি ব্যবসায়ী হন তবে ব্যবসায়ে লাভ হোক বা ক্ষতি হোক, তাতে তাঁর চিত্তে কোনো প্রভাব পড়ে না। তিনি সকল পরিস্থিতিতে সমানভাবে সন্তুষ্ট থাকেন। কারণ তাঁর মনে ফলের ইচ্ছা থাকে না। তাৎপর্য হল এই যে, ব্যবসায়ে লাভ-ক্ষতির জ্ঞান তাঁর থাকে এবং তিনি তার জন্য যথোপযুক্ত চেষ্টাও করে থাকেন, কিন্তু তার পরিণামে তিনি সুখী বা দুঃখী হন না। সাধকের চিত্তে যদি কিছু প্রভাব পড়েও, তবুও তাতে ব্যাকুল হবার কিছু নেই। কারণ সাধকের অন্তরে এর প্রভাব স্থায়ী হয় না, শীঘ্রই দূর হয়ে যায়।

উপরিউক্ত পদে 'লাভ' শব্দটি প্রাপ্তির অর্থে ব্যবহৃত, এর তাৎপর্য শুধু লাভ বা অনুকূলতার প্রাপ্তিই লাভ নয়, বরং লাভ-ক্ষতি, অনুকূলতা-প্রতিকূলতা ইত্যাদি যা কিছুরই প্রাপ্তি ঘটুক, এ সবই লাভ।

'বিমৎসরঃ'—কর্মযোগী সমস্ত প্রাণীর সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেন—**'সর্বভূতাত্মভূতাত্মা'** (গীতা ৫।৭)। সেইজন্য তাঁর কোনো প্রাণীর ওপর কিছুমাত্র ঈর্ষার ভাব থাকে না।

'বিমৎসরঃ' পদটি পৃথকভাবে দেবার উদ্দেশ্য হল যে, কোনো প্রাণীর প্রতি বিন্দুমাত্র ঈর্ষার ভাব যাতে না আসে, কর্মযোগী সেই ব্যাপারে অত্যন্ত সাবধান থাকেন। কারণ কর্মযোগীর সমস্ত ক্রিয়াই প্রাণীদের হিতার্থে হয় ; সুতরাং তাঁর মধ্যে যদি কিছুমাত্র ঈর্ষার ভাব আসে, তাহলে তাঁর কর্ম অন্যের হিতার্থে হতে পারে না।

ঈর্ষা-দোষ অত্যন্ত সূক্ষ্ম ব্যাপার। উদাহরণতঃ দুজন দোকানদারের মধ্যে ঘনিষ্ট বন্ধুত্ব। এদের মধ্যে একজনের দোকানে অপরের থেকে ভালো বিক্রি-বাট্টা হলে অন্যজনের মধ্যে এমন ঈর্ষাভাব দেখা দেয় যে, ওর দোকান আমার-দোকানের চেয়ে ভালো চলছে। এইরূপ ঈর্ষাদোষে বন্ধুও বন্ধুর উন্নতি সহ্য করতে পারে না। যেখানে পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা থাকে, একতা থাকে, মিত্রতা থাকে, সেখানেও ঈর্ষা-দোষ এসে পড়ে। তাহলে যেখানে শত্রুতা, ভিন্নতা ইত্যাদি থাকে, সেখানকার কথা তো বলাই বাহুল্য। সেইজন্য সাধকদের এই দোষ থেকে দূরে থাকার জন্য বিশেষভাবে সাবধান থাকা উচিত।

'দ্বন্দ্বাতীতঃ'—কর্মযোগী লাভ-ক্ষতি, মান-অপমান, নিন্দা-প্রশংসা, অনুকূলতা-প্রতিকূলতা, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি দ্বন্দ্বের অতীত হন। সেইজন্য তাঁর চিত্তে ওই দ্বন্দ্ব থেকে উদ্ভূত রাগ-দ্বেষ, হর্ষ-শোক ইত্যাদি বিকার

উৎপন্ন হয় না।

দ্বন্দ্ব নানা প্রকারের হয় ; যেমন—ভগবানের সগুণ-সাকাররূপ ঠিক, না নির্গুণ-নিরাকার ঠিক ! অদ্বৈত সিদ্ধান্ত ঠিক, না দ্বৈত সিদ্ধান্ত ঠিক, ভগবানে মন লাগে কি লাগে না, নির্জন স্থান পেলাম কি না, শান্তিলাভ হয়েছে কি না, সিদ্ধি প্রাপ্তি হয়েছে কি না ইত্যাদি। এই সব দ্বন্দ্বের সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকলে তবেই সাধক নির্দ্বন্দ্ব হন। ওজনের কাঁটা যেমন এক দিকে ভারী হয়ে গেলে তাকে আর সমান বলা যায় না, তেমনই সাধকের চিত্ত কোনো এক দিকে ঝুঁকে গেলে তাঁকে আর দ্বন্দ্বাতীত বলা যায় না।

কর্মযোগী সর্বপ্রকার দ্বন্দ্বের অতীত হন, সেইজন্য তিনি সন্তোষের সঙ্গে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে থাকেন (গীতা ৫।৩)।

'সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ'—কোনো কর্তব্য-কর্ম নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হওয়াকে সিদ্ধি এবং কোনোপ্রকার বিঘ্ন, বাধার জন্য সেটি সম্পন্ন না হওয়াকে অসিদ্ধি বলা হয়। কর্মের ফল প্রাপ্তিকে বলা হয় সিদ্ধি এবং অপ্রাপ্তিকে বলা হয় অসিদ্ধি। সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে রাগ-দ্বেষ, হর্ষ-শোক ইত্যাদি বিকার না হওয়াই হল সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সম থাকা। দ্বিতীয় অধ্যায়ের আটচল্লিশতম শ্লোকে **'সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা'** পদটিতেও এই ভাব আছে।

আমার কিছুই নয়, নিজের জন্য কিছুই চাই না এবং নিজের জন্য কিছুই করার নেই—এই তিনটি বিষয় ঠিকমতো অনুধাবন করলে তাহলেই সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে পূর্ণ সমতা আসে।

'কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে'—এখানে **'কৃত্বা অপি'** পদটির তাৎপর্য হল এই যে, কর্মযোগী কর্ম করলেও তাতে আবদ্ধ হন না, তাই কর্ম না করে আবদ্ধ হওয়ার কথাই ওঠে না। তিনি উভয় অবস্থাতেই নির্লিপ্ত থাকেন।

যেমন শুধুমাত্র শরীর নির্বাহের জন্য যে কর্মযোগী কর্ম করেন তিনি কর্মতে আবদ্ধ হন না, তেমনি শাস্ত্রবিহিত সমস্ত কর্ম করেন যে কর্মযোগী তিনিও কর্মতে আবদ্ধ হন না।

এর তাৎপর্য হল এই যে কর্মযোগে কর্ম করা, কর্ম বেশি করা, কম করা অথবা না করা বন্ধন বা মুক্তির কারণ নয়। এগুলির সঙ্গে যে লিপ্ততা থাকে, সেটিই হল বন্ধনের কারণ এবং নির্লিপ্ততা হল মুক্তির কারণ। নাটকে যেমন এক ব্যক্তি লক্ষ্মণের এবং অন্য ব্যক্তি মেঘনাদের রূপ ধারণ করেন এবং দুজনেই নিজ নিজ চরিত্র অনুযায়ী কাজ করেও তাতে নির্লিপ্ত থাকেন অর্থাৎ বাস্তবে নিজেদের লক্ষ্মণ বা মেঘনাদ বলে মনে করেন না। তেমনই কর্মযোগী নিজ বর্ণ, আশ্রম ইত্যাদি অনুসারে কর্তব্য পালন করেও তাতে নির্লিপ্ত থাকেন অর্থাৎ তাদের কোনো সম্পর্ক মানেন না। তাঁর সম্পর্ক নিত্য-নিরন্তর স্থিত স্বরূপের সঙ্গে থাকে, প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তনশীল প্রকৃতির সঙ্গে নয়। সেইজন্য তাঁর স্থিতি স্বাভাবিকভাবে সমতায় থাকে। সমত্বে স্থিত হওয়ায় তিনি কর্ম করলেও তাতে আবদ্ধ হন না।

বিশেষভাবে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে সমতা স্বতঃসিদ্ধ। প্রত্যেক মানুষ অনুভব করে যে অনুকূল পরিস্থিতিতে যে (স্বয়ং) থাকে, প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও সেই থাকে। যদি সে (স্বয়ং) একই না থাকতো তাহলে দুটি পৃথক (অনুকূল-প্রতিকূল) পরিস্থিতির জ্ঞান হতো কীভাবে ? এতে প্রমাণিত হয় যে পরিবর্তন হলেও স্বরূপে আমরা সম (যেমন তেমনই) থাকি। ভুল শুধু এই হয় যে, আমরা পরিস্থিতির দিকটাই লক্ষ্য করি, স্বরূপের দিকটা উপেক্ষিত থাকে। নিজ 'সম' স্বরূপের দিকে দৃষ্টি না রাখার জন্যই আমরা নানাপ্রকার পরিস্থিতির দ্বারা সুখী বা দুঃখী হই।

***

সম্বন্ধ—তৃতীয় অধ্যায়ের নবম শ্লোকের পূর্বার্ধে ভগবান 'ব্যতিরেক রীতি'-তে বলেছেন যে, যজ্ঞের অতিরিক্ত কর্ম মানুষের বন্ধনের কারণ হয়। এবার তেইশতম শ্লোকের উত্তরার্ধে সেই কথাটি 'অন্বয় রীতি'-তে বলেছেন।

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥ ২৩ ॥

[**গতসঙ্গস্য** (যিনি ফলাসক্তিবর্জিত) ; **মুক্তস্য** (রাগদ্বেষ হতে মুক্ত) ; **জ্ঞানাবস্থিত চেতসঃ** (যাঁর বুদ্ধি স্বরূপের জ্ঞানে অবস্থিত); **যজ্ঞায়** (যজ্ঞার্থে) ; **আচরতঃ** (কর্মকারী মানুষের) ; **সমগ্রম্** (সম্পূর্ণ) ; **কর্ম** (কর্ম) ; **প্রবিলীয়তে** (ফলসহ বিলীন হয়ে যায়।)]

যিনি সম্পূর্ণরূপে ফলাসক্তিরহিত , রাগ-দ্বেষ হতে মুক্ত, যাঁর বুদ্ধি (জ্ঞান) স্বরূপের জ্ঞানে অবস্থিত, এরূপ শুধুমাত্র যজ্ঞার্থে কর্মকারী মানুষের সমস্ত কর্ম (ফলসহ) বিলীন হয়ে যায় ॥ ২৩ ॥

ব্যাখ্যা—[কর্মযোগীর সমস্ত কর্ম (ফলসহ) বিলীন হওয়ার কথা সমগ্র গীতার মধ্যে শুধুমাত্র এই শ্লোকেই আলোচিত হয়েছে, তাই এটি কর্মযোগের প্রধান শ্লোক। এইরূপ চতুর্থ অধ্যায়ের ছত্রিশতম শ্লোকটি জ্ঞানযোগের এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের ছেষট্টিতম শ্লোকটি ভক্তিযোগের প্রধান শ্লোক।]

'গতসঙ্গস্য'—ক্রিয়া, পদার্থ, ঘটনা, পরিস্থিতি এবং ব্যক্তির প্রতি যে আসক্তি, সেগুলির প্রতি যে আন্তরিক আকর্ষণ সেটিই প্রকৃতপক্ষে বন্ধন-কারক অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর কারণ (গীতা ১৩।২১)। স্বার্থবুদ্ধি ত্যাগ করে শুধুমাত্র অপরের হিতার্থে, লোকসংগ্রহার্থে কর্ম করতে থাকলে কর্মযোগী ক্রিয়া এবং পদার্থ ইত্যাদিতে আসক্তিশূন্য হন অর্থাৎ তাঁর আসক্তি সর্বতোভাবে দূর হয়ে যায়।

বাস্তবে মানুষ স্বরূপতঃই আসক্তিশূন্য—**'অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ'** (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৪।৩।১৫)। কিন্তু আসক্তিবিহীন হলেও সে শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, পদার্থ, পরিস্থিতি, ব্যক্তি ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্ক মেনে নিয়ে সুখের আশায় তাতে আবদ্ধ হয়ে যায়। আমার মনোগ্রাহী হোক অর্থাৎ আমি যা চাই, তাই হোক এবং যা আমি চাই না, তা যেন না হয়—যতক্ষণ এরূপ ভাব থাকে, ততক্ষণ এই আসক্তি বাড়তেই থাকে। বাস্তবে যা হবার, তাই হয়। চাওয়া হোক বা না হোক যা হবার তা হবেই এবং যা হবার নয়, তা চাইলেও হবে না। সুতরাং মনে মনে আকাঙ্ক্ষা করে মানুষ ব্যর্থ (বিনা কারণে) আবদ্ধ হয় এবং দুঃখভোগ করে।

কর্মযোগী জগৎ হতে প্রাপ্ত শরীরাদি বস্তুগুলিকে নিজের এবং নিজের জন্য না ভেবে সেগুলি জগতের বলে মনে করে জগতেরই সেবায় অর্পণ করে দেয়। তাতে বস্তু এবং ক্রিয়াদির প্রবাহ জগতের দিকেই প্রবাহিত হয় এবং নিজ আসক্তিশূন্য স্বরূপ যেমনকার তেমনই থেকে যায়।

কর্মযোগীর 'অহং'-ও সেবায় নিয়োজিত হয়। তাৎপর্য হল এই যে, তাঁর মধ্যে 'আমি সেবক' এই ভাবও থাকে না। এই ভাবটি মানুষকে 'সেবকত্বের' অভিমানে আবদ্ধ করে। সেবকত্বের অভিমান তখনই হয়, যখন সেবা-সামগ্রীগুলির সঙ্গে নিজত্ববোধ গড়ে ওঠে। সেবার সামগ্রীগুলি যার ছিল, তাকেই দেওয়াতে সেবার অভিমান কিসের ? আমি তার কাছ থেকে ঋণমুক্ত হলাম মাত্র। তাই সেবক যেন না থাকে, কেবল সেবাই থাকে। এইভাব যেন থাকে যে, সেবার পরিবর্তে অর্থ-মান-মর্যাদা-পদ-অধিকার ইত্যাদি কিছুই নেওয়ার নেই ; কারণ এগুলির ওপর আমাদের কোনো অধিকার নেই। তাই সেগুলি স্বীকার করা অনধিকার প্রয়াস। লোকে আমাকে সেবক বলবে—এরূপ ভাব যেন না থাকে এবং এরূপ বললে তাতেও অন্তর থেকে খুশি হওয়া উচিত নয়। এইরূপ জাগতিক বস্তুগুলি জগতের সেবায় সর্বতোভাবে নিয়োজিত করলে চিত্তে প্রসন্নতা আসে। সেই প্রসন্নতাও যদি উপভোগ না করা হয় তাহলে স্বতঃসিদ্ধ অসঙ্গতা অনুভব হয়।

'মুক্তস্য'—নিজ স্বরূপ থেকে যা সম্পূর্ণতঃ পৃথক, সেই ক্রিয়া এবং শরীরাদি পদার্থের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক না থাকলেও কামনা, মমতা এবং আসক্তিপূর্বক সেগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলে মানুষ তাতে আবদ্ধ হয় অর্থাৎ সেগুলির অধীন হয়ে যায়। কর্মযোগ পালন করলে যখন মেনে নেওয়া (অবাস্তবিক) সম্পর্ক দূর হয়, তখন কর্মযোগী সর্বতোভাবে আসক্তিবর্জিত হন। আসক্তিবর্জিত হলেই তিনি সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হতে পারেন অর্থাৎ কারো অধীন থাকেন না।

'জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ'—যাঁর বুদ্ধিতে স্বরূপের জ্ঞান সদা-সর্বদা জাগরূক থাকে তাঁকে **'জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ'** বলা হয়। স্বরূপের জ্ঞান হলেই তাঁর স্বরূপে স্থিতি হয়ে যায়, যেটি বাস্তবে প্রথম থেকেই আছে।

জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে জগতেরই হয়। স্বরূপের জ্ঞান হয় না ; কারণ স্বরূপ স্বতঃ জ্ঞানস্বরূপ। ক্রিয়া এবং পদার্থই হচ্ছে জগৎ। ক্রিয়া এবং পদার্থের বিভাগ আলাদা এবং স্বরূপের বিভাগও আলাদা এবং ক্রিয়া ও পদার্থের স্বরূপের সঙ্গে কোনোমাত্র সম্পর্ক নেই। ক্রিয়া এবং পদার্থ হল প্রকাশ্য এবং স্বরূপ হল প্রকাশক। এইভাবে ক্রিয়া ও পদার্থের স্বরূপের সঙ্গে পার্থক্য সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান হলেই ক্রিয়া এবং পদার্থরূপ জগৎ হতে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে

স্বতঃসিদ্ধ আসক্তিবর্জিত স্বরূপের স্থিতি অনুভূত হয়।

'যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে'—'কর্মে অকর্ম' দেখারই অন্য একটি রূপ—'যজ্ঞার্থ কর্ম' অর্থাৎ যজ্ঞের জন্য কর্ম করা। নিঃস্বার্থভাবে কেবলমাত্র অন্যের হিতার্থে কর্ম করাকে 'যজ্ঞ' বলা হয়। যে শুধুমাত্র যজ্ঞের জন্যই সমস্ত কর্ম করে, সে কর্ম-বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে যায় আর যে যজ্ঞার্থে কর্ম করে না অর্থাৎ নিজের জন্য কর্ম করে, সে কর্ম দ্বারা আবদ্ধ হয়—**'যজ্ঞার্থাৎকর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ'** (গীতা ৩।৯)।

প্রকৃতির কার্য হল—ক্রিয়া এবং পদার্থ। এই দুটির মধ্যে ক্রিয়ারও আদি-অন্ত থাকে এবং পদার্থেরও আদি-অন্ত থাকে। ক্রিয়া আরম্ভ হওয়ার আগে ছিল না এবং সমাপ্ত হবার পরেও থাকবে না, অতএব মধ্যবর্তী সময়েও নেই—এটিই প্রমাণিত হয়। এইরূপই পদার্থ উৎপন্ন হওয়ার আগেও ছিল না এবং নষ্ট হবার পরেও থাকবে না, অতএব মধ্যকালেও সেটি নেই—এটিই প্রমাণ হয়। সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, যে বস্তু আদি ও অন্তকালে থাকে না, সেটি মধ্যকালেও (বর্তমানে) থাকে না[১]। কিন্তু চেতন স্বরূপের আদি বা অন্ত হয় না, এটি সর্বদা ক্রিয়াহীনভাবে একইরূপে বিরাজ করে। এই চেতনতত্ত্ব ক্রিয়া এবং পদার্থ—দুইয়েরই প্রকাশক। এইরূপে ক্রিয়া এবং পদার্থের সঙ্গে কোনোরূপ সম্বন্ধ না থাকা সত্ত্বেও যখন সেটি এগুলির সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নেয়, তখনই সে আবদ্ধ হয়ে যায়। এই বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার উপায় হল—ফলেচ্ছা ত্যাগ করে শুধুমাত্র অন্যের হিতার্থে কর্ম করা।

জগতে নানাপ্রকার ক্রিয়া হয়ে চলেছে এবং নানাপ্রকার পদার্থও বিদ্যমান। কিন্তু মানুষ যে সমস্ত ক্রিয়া এবং পদার্থে আসক্তি, মমতা এবং কামনাপূর্বক নিজ সম্পর্ক মেনে নেয়, সেই ক্রিয়া এবং পদার্থের দ্বারাই সে আবদ্ধ হয়। মানুষ যখন কামনা-বাসনা-মমতা ত্যাগ করে কেবল অন্যের হিতার্থে সব কর্ম করে এবং প্রাপ্ত বস্তুগুলি অন্যের বলে মনে করে তাদেরই সেবায় নিয়োগ করে, তখন কর্মযোগীর সমস্ত (ক্রিয়মাণ, সঞ্চিত এবং প্রারব্ধ) কর্ম বিলীন হয়ে যায় অর্থাৎ তাঁর কর্মের সঙ্গে নিজ স্বতঃসিদ্ধ অনাসক্তি অনুভূত হয়।

বিশেষ কথা

১) কর্তা, করণ এবং কর্ম—এই তিনটির মিলনে কর্মসঞ্চয় হয় (গীতা ১৮।১৮)। কর্তৃত্ববোধ না থাকলে কর্ম সংগ্রহ হয় না। কারণ করণ এবং কর্ম দুই-ই কর্তার অধীন। অতএব কর্মসঞ্চয়ের প্রধান হেতু হল কর্তৃত্বই।

গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, কোনো কিছু পাবার আশাতেই করার ইচ্ছা উৎপন্ন হয়, যার ফলে কর্তৃত্ববোধ উৎপন্ন হয়। কর্তৃত্ববোধের দ্বারা বন্ধন ঘটে। মানুষ যখন কোনোকিছু পাবার আশায় নিজের জন্য কর্ম করে, তখন তার কর্তৃত্ববোধ দৃঢ় হয়। পাবার ইচ্ছা ত্যাগ করে, শুধুমাত্র যজ্ঞার্থে অর্থাৎ অপরের হিতার্থে যখন কর্মযোগী কর্ম করেন, তখন তাঁর কর্তৃত্বভাব হয় অপরের প্রয়োজনে, তার ফলে তিনি আসক্তিবর্জিত অবস্থা লাভ করেন। সেইজন্য তাঁর করা কর্মগুলির সঞ্চয় হয় না। কারণ আধার (কর্তৃত্বভাব) না থাকলে, কর্ম থাকবে কোথায়?

কর্মযোগে 'মমত্ববোধ' (আমার ভাব) পরিত্যাগ এবং জ্ঞানযোগে 'অহংভাব' (আমি ভাব) পরিত্যাগ করাই হল প্রধান। মমত্ববোধ পরিত্যাগ করলে অহংভাব এবং অহংভাব পরিত্যক্ত হলে মমত্ববোধ স্বতঃই পরিত্যক্ত হয়। তাই কর্মযোগে প্রথমে 'মমত্ববোধ' দূর হয়, পরে 'অহংভাব' স্বতঃই দূর হয়,[২] এবং জ্ঞানযোগে প্রথমে অহংভাব, পরে মমত্ববোধ স্বতঃই দূর হয়ে যায়। অহংভাব ও মমত্ববোধ নাশ হলে কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বও নাশ হয়।

কর্মযোগী নিজের জন্য কোনো কর্ম করেন না এবং কিছু আকাঙ্ক্ষাও করেন না ; অতএব তিনি কর্মফলের ভোক্তা হন না। যেমন, কোনো এক ব্যক্তিকে বিভিন্ন মামলায় আলাদা করে সাজা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সে যদি মারা যায় তবে তার সমস্ত সাজাও সমাপ্ত হয়। কারণ সাজা প্রাপ্ত ব্যক্তিটিই যদি জীবিত না থাকে, তাহলে সাজা ভোগ করবে কে? এরূপেই কর্মযোগীর ভোক্তৃত্বভাবই যখন নাশ হয়ে

[১]আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্তমানেঽপি তৎ তথা। (মাণ্ডূক্যকারিকা ৪।৩১)

[২]অহংভাবের সঙ্গে মমত্ববোধও থাকে ; যেমন—আমার অহংকার। সেইজন্য কর্মযোগে মমত্ববোধ সর্বতোভাবে পরিত্যক্ত হলে অহংভাবের সঙ্গেও মমত্ববোধ থাকে না। তখন অহংভাব (নামমাত্র রূপে) জগতের সেবার জন্য থেকে যায়।

যায়, তখন তাঁর সমস্ত কর্মও শেষ হয়ে যায়। কারণ ভোক্তাই যখন না থাকে, কর্মফল ভোগ করবে কে ?

২) এই অধ্যায়ের নবম শ্লোকে ভগবান জানিয়েছেন যে, তাঁর জন্ম ও কর্ম দিব্য—তাই যে ব্যক্তি তাঁকে তত্ত্বতঃ জানতে পারে সে ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। ভগবানের জন্মই দিব্য হয়, কিন্তু মানুষ যদি চায় তবে সে তার কর্মকে দিব্য করতে পারে। তাই এই অধ্যায়ের চতুর্দশ শ্লোকে ভগবান তাঁর কর্মের দিব্যতার কারণ জানিয়ে বলেছেন যে, কর্মফলে আমার কোনো স্পৃহা নেই, তাই কর্ম আমাকে লিপ্ত করে না অর্থাৎ আমার কর্মগুলি অকর্ম হয়ে যায়। এইভাবে কর্মের তত্ত্ব জেনে যে কর্ম করে, তার কর্মগুলিও অকর্ম হয়ে যায়। আবার পঞ্চদশ শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, মুমুক্ষু ব্যক্তিগণও এইরূপ জেনে কর্ম করেন। তারপর ষোড়শ শ্লোকে ভগবান কর্মের তত্ত্ব জানাবার অঙ্গীকার করেছেন এবং সপ্তদশ শ্লোকে বলেছেন যে, কর্ম, বিকর্ম এবং অকর্ম—তিনটিরই তত্ত্ব জানা উচিত। আবার অষ্টাদশ শ্লোকে ভগবান প্রধানতঃ কর্মের তত্ত্বই (অকর্ম অথবা নির্লিপ্ততার কথা) জানিয়েছেন।

কামনা থেকে 'কর্মে'র সৃষ্টি হয়, কামনা বৃদ্ধি পেলে 'বিকর্ম' হয় এবং কামনা না থাকলে 'অকর্ম' হয়। এই (ষোড়শ থেকে বত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত) প্রকরণের মূল তাৎপর্য হল 'অকর্মে'র বর্ণনা করা। সেইজন্য ভগবান কর্ম এবং বিকর্ম—দুইয়েরই মূল কারণ 'কামনা' ত্যাগের এবং 'অকর্মে'র বর্ণনা উনিশ থেকে তেইশতম শ্লোক পর্যন্ত প্রত্যেক শ্লোকেই করেছেন এবং শেষে বত্রিশতম শ্লোকে এই প্রকরণের উপসংহার করেছেন।

পরিশিষ্ট-ভাব— একটি হল 'ক্রিয়া' অন্যটিকে বলা হয় 'কর্ম' এবং আর একটি হল 'কর্মযোগ'। শরীরের শিশু অবস্থা থেকে যৌবন প্রাপ্তি এবং যৌবন থেকে বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্তিকে বলা হয় 'ক্রিয়া'। ক্রিয়ার দ্বারা পাপ হয় না, পুণ্যও হয় না, বন্ধন হয় না, মুক্তিও হয় না। যেমন, গঙ্গার ক্রিয়া হল বয়ে যাওয়া এবার তাতে যদি কেউ ডুবে মারা যায়, গঙ্গার তাতে যেমন পাপ হয় না, তেমনই ওই বয়ে যাওয়া জলে চাষ-বাসাদি পুণ্যকর্ম হলেও গঙ্গার তাতে পুণ্য হয় না। মানুষ যখন ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে কর্তা হয়ে বসে অর্থাৎ ক্রিয়া নিজের জন্য করে, তখন সেই ক্রিয়া ফলদায়ক 'কর্ম' হয়ে ওঠে।

কর্মদ্বারা বন্ধন হয়—**'যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ'** (গীতা ৩।৯)। কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি পাবার উদ্দেশ্যে মানুষ যখন নিজের জন্য কিছু না করে, বরং নিঃস্বার্থভাবে শুধুমাত্র অপরের হিতার্থেই কর্ম করে, তখন সেটি হয়ে ওঠে 'কর্মযোগ'। কর্মযোগে বন্ধন দূর হয় **'যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে'**। বন্ধন দূর হলে যোগ হয় অর্থাৎ পরমাত্মার সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ অনুভূত হয়।

এই তেইশতম শ্লোকটি কর্মযোগের মুখ্যতম শ্লোক। যেমন ভগবান **'জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে'** (৪।৩৭) পদটিতে জ্ঞানাগ্নি দ্বারা জ্ঞানযোগীর সমস্ত পাপ ভস্ম হওয়ার কথা বলেছেন এবং **'অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি'** (১৮।৬৬) পদটির দ্বারা ভক্তের সমস্ত পাপ নষ্ট হওয়ার কথা বলেছেন, তেমনই এই শ্লোকে **'যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে'** পদটিতে কর্মযোগীর সমস্ত কর্ম (পাপ) নষ্ট হওয়ার কথা বলেছেন।

❈ ❈ ❈

উদাহরণতঃ—কামনা ত্যাগের কথা এই পদগুলিতে উদ্ধৃত হয়েছে—'কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ' (৪।১৯) ; 'ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গম্' (৪।২০) ; 'নিরাশীঃ' (৪।২১) ; 'যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ' (৪।২২) ; এবং 'গতসঙ্গস্য' (৪।২৩)।

অকর্মের কথা এই পদগুলিতে উদ্ধৃত হয়েছে—'জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণম্' (৪।১৯) ; 'নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ' (৪।২০) ; 'কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্' (৪।২১) ; 'কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে' (৪।২২) ; এবং 'কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে' (৪।২৩)।

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকটিতে ভগবান বলেছেন যে যজ্ঞার্থে কর্ম করলে সমস্ত কর্ম বিলীন হয়ে যায়। সাধকদের রুচি, বিশ্বাস এবং যোগ্যতার ভিন্নতার জন্য সাধনও বিভিন্ন প্রকারের হয়। সেইজন্য পরবর্তী সাতটি শ্লোকে (চব্বিশ থেকে ত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত) ভগবান ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের সাধনসমূহের যজ্ঞরূপে বর্ণনা করেছেন।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা॥ ২৪ ॥

[**অর্পণম্** (অর্পণ) ; **ব্রহ্ম** (ব্রহ্ম) ; **হবিঃ** (হুতাদিত পদার্থ) ; **ব্রহ্ম** (ব্রহ্ম) ; **ব্রহ্মণা** (ব্রহ্মরূপ কর্তার দ্বারা) ; **ব্রহ্মাগ্নৌ** (ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে) ; **হুতম্** (আহুতি প্রদান ক্রিয়া) ; **ব্রহ্মকর্মসমাধিনা** (যে ব্যক্তির ব্রহ্মেই কর্ম সমাধি হয়েছে) ; **তেন** (তাঁর) ; **গন্তব্যম্** (প্রাপ্তব্য ফলও) ; **ব্রহ্ম, এব** (ব্রহ্মই হয়।)]

যে যজ্ঞে অর্পণ (অর্থাৎ যে সকল পাত্র দ্বারা যজ্ঞাদিতে বস্তু অর্পিত হয়) ব্রহ্ম, ঘৃতাদিও ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মরূপ কর্তার দ্বারা ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে আহুতি প্রদানরূপ ক্রিয়াও ব্রহ্ম,—এরূপ যজ্ঞকারী যে ব্যক্তির ব্রহ্মেই কর্ম-সমাধি হয়েছে, তাঁর উপযুক্ত কর্মের ফল প্রাপ্তিও ব্রহ্মই হয় ॥ ২৪ ॥

ব্যাখ্যা—যজ্ঞে আহুতি হল প্রধান কৃত্য। সেই আহুতি প্রদান তখনই পূর্ণ হয় যখন হব্য পদার্থটিও অগ্নির রূপ ধারণ করে, তার আর পৃথক সত্তা থাকে না। এইরূপ যতপ্রকার সাধনা আছে, তা সবই সাধ্যরূপ হলে, তবেই যজ্ঞ হয়ে থাকে।

যতপ্রকার যজ্ঞ আছে, তার মধ্যে পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব করা কোনো ভাবনা নয়, বরং প্রকৃত সত্য। ভাবনা তো পদার্থেরই হয়ে থাকে।

এই চব্বিশতম শ্লোক থেকে ত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত যে যজ্ঞের বর্ণনা করা হয়েছে, তা সবই 'কর্মযোগে'র অন্তর্গত। কারণ ভগবান এই প্রকরণের উপক্রমেও **'তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজজ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ'** (৪।১৬)—বলেছিলেন ; এবং উপসংহারেও **'কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে'** (৪।৩২) বলেছিলেন এবং মধ্যভাগেও বলেছিলেন যে—**'যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে'** (৪।২৩)। আসল কথা হল এই যে যিনি এইরূপ যজ্ঞ করেন তাঁর সমস্ত কর্মই যেন অকর্ম হয়ে যায়। কেবলমাত্র পরম্পরা রক্ষার জন্যই যদি যজ্ঞ করা হয়, তবে সমস্ত কর্মই অকর্ম হয়ে যায়। সুতরাং এই সব যজ্ঞে 'কর্মে অকর্ম'র বর্ণনাই করা হয়েছে।

'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ'—যে পাত্র থেকে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়, সেই স্রুক, স্রুবাদি পাত্রগুলিকে এখানে **'অর্পণম্'** পদ দ্বারা বলা হয়েছে—**'অর্প্যতে অনেন ইতি অর্পণম্'**। সেই অর্পণকেও ব্রহ্ম বলেই মনে করবে।

তিল, যব, ঘৃত ইত্যাদি যে পদার্থগুলি দ্বারা যজ্ঞ করা হয়, সেই পদার্থগুলিকেও ব্রহ্ম বলে মনে করবে।

'ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্'—যিনি আহুতি প্রদান করেন তিনিও ব্রহ্ম (গীতা ১৩।২), যে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করা হয় সেই অগ্নিও ব্রহ্ম এবং আহুতি প্রদানরূপ ক্রিয়াও ব্রহ্ম, এরূপই মনে করা উচিত।

'ব্রহ্মকর্মসমাধিনা'—যেমন যজ্ঞকারী ব্যক্তি যজ্ঞের সমস্ত দ্রব্য, অগ্নি ইত্যাদি সবকিছুকেই ব্রহ্মের স্বরূপ বলে মনে করেন, তেমনি যে প্রত্যেক কর্মে কর্তা, করণ, কর্ম এবং পদার্থ সবগুলিকে ব্রহ্মরূপ বলে অনুভব করে, সেই ব্যক্তির ব্রহ্মেই কর্ম-সমাধি হয়। অর্থাৎ তার সকল কর্মেই ব্রহ্মবুদ্ধি হয়। তার পক্ষে সমস্ত কর্মই তখন ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে যায়। ব্রহ্ম ব্যতিরেকে কর্মগুলির আর কোনো পৃথক স্বরূপ থাকে না।

'ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যম্'—ব্রহ্মে কর্ম-সমাধি হওয়ায় যাঁর সমস্ত কর্ম ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে যায়, তার ফলরূপে তিনি নিঃসন্দেহে ব্রহ্মপ্রাপ্তি লাভ করেন। কারণ তাঁর দৃষ্টিতে ব্রহ্ম ছাড়া আর কোনো পৃথক সত্তা থাকতেই পারে না।

বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই চব্বিশতম শ্লোকটি আহারের পূর্বে আবৃত্তি করেন, যার ফলে ভোজনরূপ কর্মও যজ্ঞে পরিণত হয়। ভোজনরূপ কর্মে ব্রহ্মবুদ্ধি এইভাবে করা হয়—

১) যে হস্ত দ্বারা অর্পণ করা হয়, সেটি ব্রহ্মরূপ—**'সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ'** (গীতা ১৩।১৩)।

২) ভোজ্য পদার্থও ব্রহ্মরূপ—**'অহমেবাজ্যম্'** (গীতা ৯।১৬)।

৩) ভোজনকারীও ব্রহ্মরূপ—**'মমৈবাংশো জীব-লোকে'** (গীতা ১৫।৭)।

৪) জঠরাগ্নিও ব্রহ্মস্বরূপ—**'অহং বৈশ্বানরঃ'** (গীতা ১৫।১৪)।

৫) ভোজনরূপ ক্রিয়া অর্থাৎ জঠরাগ্নিতে অন্নের আহুতিরূপ ক্রিয়াও ব্রহ্ম—**'অহং হুতম্'** (গীতা ৯।১৬)।

৬) এইরূপ ভোজনকারী ব্যক্তির দ্বারা প্রাপ্ত করার যোগ্য ফলও ব্রহ্মই হয়ে থাকে—**'যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্'** (গীতা ৪।৩১)।

মর্মকথা

প্রকৃতির কার্য অর্থাৎ জগতের স্বরূপ হল—ক্রিয়া এবং পদার্থ। বাস্তবিকভাবে দেখলে বোঝা যায় যে, প্রকৃতি বা সংসার ক্রিয়ারই রূপ[১]। কারণ পদার্থ কোনো সময় স্থিরভাবে থাকে না ; এতে সর্বক্ষণ পরিবর্তন হতে থাকে। সুতরাং বাস্তবে পদার্থগুলি হল পরিবর্তনশীল ক্রিয়াপুঞ্জ। শুধুমাত্র আসক্তির জন্য পদার্থগুলিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। সমস্ত ক্রিয়াই লয়ের পথে যাচ্ছে। অতএব জগৎ হল লয়রূপ। ভাবরূপে কেবলমাত্র এক অক্রিয় তত্ত্ব ব্রহ্মই বিদ্যমান ; যাঁর সত্তায় লয়রূপ জগৎও সত্তাবান (অস্তিত্ব-সম্পন্ন) বলে প্রতিভাত হয়। জগতের লয়রূপকে এইভাবে বোঝা যায়—

জগতের তিনটি অবস্থা দেখা যায়—উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয় ; যেমন—কোনো বস্তু উৎপন্ন হয়, কিছুকাল থাকে এবং শেষে নষ্ট হয়ে যায় অথবা মানুষ জন্মগ্রহণ করে, বেঁচে থাকে এবং শেষকালে মারা যায়। এর থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে কেবল উৎপত্তি এবং প্রলয়েরই ক্রম আছে, স্থিতি প্রকৃতপক্ষে নেই-ই। যেমন—কোনো ব্যক্তির আয়ু যদি পঞ্চাশ বছর হয়, তাহলে কুড়ি বছর পার হলে তার আয়ু থাকে মাত্র ত্রিশ বছর। এর পর বিচার করলে দেখা যায় যে শুধু প্রলয়ই আছে উৎপত্তি নেই-ই ; অর্থাৎ আয়ু যতটা পার হয়েছে, সেই কটি বছরের জন্য মানুষটি মারা গেছে। এইভাবে মানুষের প্রতিমুহূর্তে মৃত্যু (নাশ) হচ্ছে, তার জীবন প্রতিক্ষণ মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। দৃশ্যমাত্রই অদৃশ্যের দিকে যাচ্ছে। নাস্তিই হল প্রলয়, তাই নাস্তিই শেষ পর্যন্ত থাকে। নাস্তির অস্তিত্ব ভাবরূপ ব্রহ্মের উপরই নির্ভরশীল। সুতরাং ভাবরূপে একমাত্র ব্রহ্মই বিদ্যমান থাকেন—**'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'** (ছান্দোগ্য. ৩।১৪।১) ; **'বাসুদেবঃ সর্বম্'** (গীতা ৭।১৯)।

***

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি॥ ২৫ ॥

[**অপরে, যোগিনঃ** (অন্য অনেক যোগী) ; **দৈবম্** (ভগবদর্পণ রূপ) ; **যজ্ঞম্, এব** (যজ্ঞেরই) ; **পর্যুপাসতে** (অনুষ্ঠান করেন) ; **অপরে** (অপর কোনো যোগীগণ) ; **ব্রহ্মাগ্নৌ** (ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে) ; **যজ্ঞেন, এব** (যজ্ঞের দ্বারাই) ; **যজ্ঞম্** (যজ্ঞের) ; **উপজুহ্বতি** (অনুষ্ঠান করেন।)]

অন্য অনেক যোগী ভগবদর্পণরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন এবং অপর কোনো কোনো যোগী ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে বিচাররূপ যজ্ঞের দ্বারাই জীবাত্মারূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন ॥ ২৫ ॥

ব্যাখ্যা—'দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্যুপাসতে' —আগের শ্লোকে ভগবান সর্বত্র ব্রহ্মদর্শনরূপ যজ্ঞকারী সাধকদের বর্ণনা করেছেন। এখানে ভগবান **'অপরে'** পদের দ্বারা তার থেকে আলাদা প্রকারের যজ্ঞকারী সাধকদের বর্ণনা করছেন।

এখানে **'যোগিনঃ'** পদটি যজ্ঞার্থ কর্মকারী নিষ্কাম সাধকদের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয়েছে।

সমস্ত ক্রিয়া এবং পদার্থগুলিকে নিজস্ব বা নিজের জন্য মনে না করে সেগুলি শুধুমাত্র ভগবানের এবং ভগবানের জন্যই মনে করা হল 'দৈবযজ্ঞ' অর্থাৎ ভগবদর্পণরূপ যজ্ঞ। ভগবান দেবগণেরও দেবতা, তাই সমস্ত কিছু তাঁকে অর্পণ করে দেওয়াকেই এখানে 'দৈবযজ্ঞ' বলা হয়েছে।

[১]প্রকর্ষেণ করণং (ভাবে ল্যুট্) ইতি প্রকৃতিঃ। সস্যগ্রীত্যা সরতীতি সংসারঃ।

কোনো ক্রিয়া এবং পদার্থে বিন্দুমাত্র আসক্তি, মমত্ববোধ এবং কামনা না রেখে সেগুলি সর্বতোভাবে ভগবানের বলে মনে করাই দৈবযজ্ঞের সঠিক অনুষ্ঠান।

'ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি'—এই শ্লোকের পূর্বার্ধে উল্লিখিত দৈবযজ্ঞ ছাড়া অন্য যজ্ঞের বর্ণনা করার জন্য এখানে **'অপরে'** পদটি উল্লিখিত হয়েছে।

চেতনের সঙ্গে জড়ের তাদাত্ম্য হওয়াতেই তাকে জীবাত্মা বলা হয়। বিচার-বিবেচনা করে জড় হতে সর্বতোভাবে বিমুখ হয়ে পরমাত্মাতে লীন হয়ে যাওয়াকেই এখানে 'যজ্ঞ' বলা হয়েছে। লীন হওয়ার তাৎপর্য হল—পরমাত্মতত্ত্ব হতে নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কোনো পার্থক্য না রাখা।

পরিশিষ্ট-ভাব— 'ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি' কথাটির এই অর্থও করা যায় যে অপর যোগীগণ জগৎ সংসাররূপ ব্রহ্মের সেবার জন্য শুধু লোক সংগ্রহরূপ যজ্ঞের উদ্দেশ্যেই কর্তব্য-কর্মরূপ যজ্ঞ করেন অর্থাৎ যজ্ঞার্থে কর্মাদি করে থাকেন। (গীতা ৩।৯ এবং ৪।২৩)।

❋ ❋ ❋

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি॥ ২৬ ॥

[**অন্যে** (অন্য যোগীগণ) ; **শ্রোত্রাদীনি, ইন্দ্রিয়াণি** (চক্ষু, কর্ণাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে) ; **সংযমাগ্নিষু** (সংযমরূপ অগ্নিতে); **জুহ্বতি** (আহুতি দেন) ; **অন্যে** (অপর যোগীগণ) ; **শব্দাদীন, বিষয়ান্** (শব্দাদি বিষয়গুলিকে) ; **ইন্দ্রিয়াগ্নিষু** (ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে) ; **জুহ্বতি** (আহুতি দেন।)]

অন্য যোগীগণ চক্ষু-কর্ণ ইত্যাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযমরূপ অগ্নিতে আহুতি দেন এবং অপর যোগীগণ শব্দাদি বিষয়গুলিকে ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে আহুতি দেন ॥ ২৬ ॥

ব্যাখ্যা—**'শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি'**—সংযমরূপ আগুনে ইন্দ্রিয়গুলি আহুতি দেওয়াকে এইস্থানে যজ্ঞ বলা হয়েছে। তাৎপর্য হল এই যে, একান্তে থাকাকালে চক্ষু-কর্ণ-জিহ্বা-নাসিকা-ত্বক—এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় তাদের নিজ নিজ বিষয়ে (যথাক্রমে রূপ-শব্দ-রস-গন্ধ ও স্পর্শ) যেন মোটেই প্রবৃত্ত না হয়। ইন্দ্রিয়গুলি যেন সংযত থাকে।

সম্পূর্ণ সংযম তখনই বুঝতে হবে যখন ইন্দ্রিয়াদি-মন-বুদ্ধি এবং অহং—এই সবগুলি থেকে অনুরাগ ও আসক্তি চিরতরে নাশ হয়ে যায় (গীতা ২।৫৮-৫৯, ৬৮)।

'শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি'—রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ—এই পাঁচটি বিষয় আছে। বিষয়গুলি ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে আহুতি দিলে সেটি যজ্ঞ হয়ে যায়। তাৎপর্য হল এই যে, ব্যবহারকালে বিষয়গুলি ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে সংযোগ হয়ে কাজ করলেও ইন্দ্রিয়াদিতে যেন কোনো বিকার উপস্থিত না হয় (গীতা ২।৬৪-৬৫)। ইন্দ্রিয়গুলি যেন আসক্তি ও অনুরাগবর্জিত হয়। বিষয়গুলির ইন্দ্রিয়াদিতে অনুরাগ বা আসক্তি উৎপন্ন করার শক্তি যেন মোটেই না থাকে।

এই শ্লোকে কথিত দুই প্রকার যজ্ঞে অনুরাগ ও আসক্তি সর্বতোভাবে নাশ হলেই সিদ্ধি (পরমাত্ম) প্রাপ্তি হয়। অনুরাগ ও আসক্তি দূর করার জন্যই দ্বিবিধ প্রক্রিয়াকে যজ্ঞরূপে বর্ণনা করা হয়েছে—

প্রথম প্রক্রিয়াতে সাধক একান্তে থাকাকালে ইন্দ্রিয়গুলির সংযম করে। বিচার-বিবেচনা, জপ-ধ্যান ইত্যাদির দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলি সংযত হতে থাকে। সম্পূর্ণ সংযম হলে যখন আসক্তির লয় হয়, তখন একান্তে এবং ব্যবহারাদির সময়—দুই অবস্থাতেই তাঁর স্থিতি একইপ্রকার থাকে।

দ্বিতীয় প্রক্রিয়াতে সাধক ব্যবহারকালে রাগ-দ্বেষশূন্য ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা মন, বুদ্ধি এবং অহংবোধ থেকেও অনুরাগ ও আসক্তি দূর করে দেয়। আসক্তি দূর হলে ব্যবহারের সময় বা একান্তে থাকার সময় —উভয় সময়েই তাঁর স্থিতি সমান (একইপ্রকার) থাকে।

❋ ❋ ❋

সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে॥ ২৭ ॥

[অপরে (অন্য যোগীগণ) ; **সর্বাণি** (সমস্ত) ; **ইন্দ্রিয়কর্মাণি, চ** (ইন্দ্রিয়ের কর্মগুলি এবং) ; **প্রাণকর্মাণি** (প্রাণের ক্রিয়াগুলি) ; **জ্ঞানদীপিতে** (জ্ঞানদ্বারা প্রকাশিত) ; **আত্মসংযমযোগাগ্নৌ** (আত্মসংযমরূপ অগ্নিতে) ; **জুহ্বতি** (হোম করে থাকেন।)]

অন্য যোগীগণ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াগুলি এবং প্রাণের ক্রিয়াগুলি জ্ঞান দ্বারা প্রকাশিত আত্মসংযমযোগরূপ অগ্নিতে হোম করে থাকেন ॥ ২৭ ॥

ব্যাখ্যা—**'সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে'**—এই শ্লোকটিতে সমাধিকে যজ্ঞের রূপ দেওয়া হয়েছে। কোনো কোনো যোগী দশ ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াগুলিকে সমাধিতে যজ্ঞাহুতি দেন। তাৎপর্য হল এই যে, সমাধি অবস্থাতে মন-বুদ্ধি সহ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের (জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয়) ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়।

সমাধিরূপ যজ্ঞে প্রাণের ক্রিয়াও আহুতি দেওয়া হয় অর্থাৎ সমাধিকালে প্রাণের ক্রিয়াও বন্ধ হয়ে যায়। সমাধি অবস্থায় প্রাণের গতি বন্ধ হয় দুই প্রকারে—

একটি হল হঠযোগের সমাধি, যাতে প্রাণবায়ু রোধ করার জন্য কুম্ভক করা হয়। কুম্ভকের অভ্যাস বাড়তে বাড়তে প্রাণের গতি রুদ্ধ হয়, যা কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েকদিন পর্যন্ত রুদ্ধ হতে পারে। এই প্রাণায়াম দ্বারা আয়ু বৃদ্ধি পায়। যেমন—বর্ষার জল প্রবাহিত হলে জলের সঙ্গে সঙ্গে বালিও আসে এবং তাতে ব্যাঙ চাপা পড়ে যায়। বর্ষা চলে গেলে বালি যখন শুকিয়ে যায় ব্যাঙগুলি তার তলায় চুপচাপ পড়ে থাকে। সেগুলির প্রাণবায়ু তখন রুদ্ধ থাকে। আবার যখন বর্ষা আসে, তখন বর্ষার জল তাদের ওপরে পড়লে ব্যাঙগুলি পুনরায় সচেতন হয়ে ওঠে এবং ডাকতে থাকে।

দ্বিতীয় প্রকারে মনকে একাগ্র করা হয়। মন সর্বতোভাবে একাগ্র হলে প্রাণের গতি স্বতঃই রুদ্ধ হয়।

'জ্ঞানদীপিতে'—সমাধি এবং নিদ্রা—দুটিতেই কারণ-শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে, তাই বাহ্যতঃ দুটি অবস্থায় একরূপ প্রতিভাত হয়। এখানে **'জ্ঞানদীপিতে'** পদটির দ্বারা সমাধি এবং নিদ্রার মধ্যে পার্থক্য দেখানো হয়েছে। তাৎপর্য হল এই যে, বাহ্যতঃ একরূপ দেখালেও সমাধি অবস্থায় 'এক সচ্চিদানন্দ পরমাত্মাই সর্বত্র পরিপূর্ণ হয়ে আছেন' এই জ্ঞান প্রকাশিত (জাগ্রত) থাকে এবং নিদ্রাকালে সমস্ত বৃত্তিই অবিদ্যায় লীন হয়ে যায়। সমাধি অবস্থায় প্রাণের গতি রুদ্ধ হয় এবং নিদ্রাকালে প্রাণের গতি চলতে থাকে। তাই নিদ্রা এলে সমাধি হয় না।

'আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি'—চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ অর্থাৎ সমাধিরূপ যজ্ঞকারী যোগীগণ ইন্দ্রিয় এবং প্রাণের ক্রিয়াগুলি সমাধি-যোগরূপ অগ্নিতে আহুতি দেন অর্থাৎ মন-বুদ্ধি সহ সকল ইন্দ্রিয় এবং প্রাণের ক্রিয়াগুলিকে রুদ্ধ করে সমাধিতে স্থিত হন। সমাধিকালে সব ইন্দ্রিয় এবং প্রাণ চাঞ্চল্য ত্যাগ করে। তখন এক সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মার জ্ঞানই শুধু জাগ্রত থাকে।

* * *

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥ ২৮ ॥

[**অপরে** (অন্যান্য) ; **সংশিতব্রতাঃ** (প্রশংসনীয় ব্রত পালনকারী) ; **যতয়ঃ** (প্রযত্নশীল সাধক) ; **দ্রব্যযজ্ঞাঃ** (দ্রব্য সম্বন্ধীয় যজ্ঞ করেন) ; **তপোযজ্ঞাঃ** (তপোযজ্ঞ করেন) ; **তথা, যোগযজ্ঞা** (যোগযজ্ঞ করেন) ; **চ** (এবং) ; **স্বাধ্যায় জ্ঞানযজ্ঞাঃ** (স্বাধ্যায়রূপ জ্ঞানযজ্ঞ করেন।)]

অন্যান্য প্রশংসনীয় ব্রত পালনকারী যত্নশীল সাধক দ্রব্য সম্বন্ধীয় যজ্ঞ করেন, কেউ কেউ তপোযজ্ঞ

করেন, অন্য কেউ আবার যোগযজ্ঞ করেন, অপর কিছু সাধক স্বাধ্যায়রূপ জ্ঞানযজ্ঞ করেন ॥ ২৮ ॥

ব্যাখ্যা—**'যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ'**—অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (অচৌর্য), ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ (ভোগবুদ্ধি সহকারে সংগ্রহের অভাব)—এই পাঁচটি হল 'যম' (নিয়ম)[১], যেগুলিকে **'মহাব্রত'** বলা হয়েছে। শাস্ত্রে এই মহাব্রতের অনেক প্রশংসা এবং মাহাত্ম্য বলা হয়েছে। এই ব্রতের সার হল এই যে, মানুষ যেন সংসার বিমুখ হয়। এই ব্রত পালনকারী সাধকদের উদ্দেশ্যে এখানে **'সংশিতব্রতা'** পদটির উল্লেখ রয়েছে। এছাড়াও এই শ্লোকে উদ্ধৃত চারটি যজ্ঞে যে পালনীয় ব্রত বা নিয়ম আছে, সেগুলিতে অবিচলিত থেকে যাঁরা সেগুলি পালন করেন তাঁদেরও **'সংশিতব্রতাঃ'** বলা হয়। নিজ নিজ যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রযত্নশীল হওয়ার জন্য এঁদের **'যতয়ঃ'** বলা হয়েছে।

'সংশিতব্রতাঃ' পদটির সঙ্গে (**'দ্রব্যযজ্ঞাঃ'**, **'তপোযজ্ঞাঃ'**, **'যোগযজ্ঞাঃ'** এবং **'জ্ঞানযজ্ঞাঃ'**র মতো) **'যজ্ঞাঃ'** পদটি ব্যবহার না করায় এটিকে আলাদা করে যজ্ঞ বলে মানা হয়নি।

'দ্রব্যযজ্ঞাঃ'—সংসারের হিতার্থে কূপ, পুকুর, মন্দির, ধর্মশালা ইত্যাদি নির্মাণ, অভাবগ্রস্ত লোকেদের মধ্যে অন্ন-জল-বস্ত্র-ঔষধ-পুস্তক ইত্যাদি বিতরণ, দান এগুলিকে বলা হয় 'দ্রব্যযজ্ঞ'। দ্রব্য (তিনটি শরীরসহ সমস্ত পদার্থ)গুলিকে নিজের বলে না মনে করে নিঃস্বার্থভাবে অন্যের মনে করে অপরের সেবায় ব্যয় করলে দ্রব্যযজ্ঞ সিদ্ধ হয়।

শরীর ইত্যাদি যত পদার্থ আমরা পেয়েছি, তার দ্বারাই যজ্ঞ করা সম্ভব, তার বেশির প্রয়োজন হয় না। মানুষ একটি বালকের নিকট থেকে ততটাই আশা করে, যতটা সেই বালকের দ্বারা হওয়া সম্ভব, তবে সর্বজ্ঞ ভগবান এবং জগৎ আমাদের ক্ষমতার থেকে বেশি আশা করবেন কীভাবে?

'তপোযজ্ঞাঃ'—নিজ কর্তব্য (স্বধর্ম) পালনে যে সমস্ত প্রতিকূলতা, বাধা আসে, সেগুলি প্রসন্নতাপূর্বক সহ্য করা হল **'তপোযজ্ঞ'**। লোকহিতার্থে একাদশী ইত্যাদি ব্রত পালন, মৌন ধারণ ইত্যাদিও **'তপোযজ্ঞ'** অর্থাৎ তপস্যারূপ যজ্ঞ। কিন্তু অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতি, বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা উপস্থিত হলেও সাধক যদি প্রসন্নতাপূর্বক তাঁর কর্তব্য পালন করতে থাকেন, নিজ কর্তব্যে যদি বিচলিত না হন, তাহলে সেটিই হয় সব থেকে বড় তপস্যা, যা শীঘ্রই সিদ্ধি প্রদান করে।

গ্রামের সমস্ত নোংরা, আবর্জনা যদি কোনোস্থানে ফেলে রাখা হয়, তবে তা পরিবেশ দূষণ ঘটায়। কিন্তু ওই নোংরা আবর্জনাই যদি ক্ষেতে ফেলা হয় তবে তা থেকে চাষের পক্ষে অত্যন্ত ভালো সার তৈরি হয়। অনুরূপভাবে প্রতিকূলতা আমাদের অপছন্দ এবং আমরা তা আবর্জনার মতো পরিত্যাগ করি অর্থাৎ সেগুলিকে গুরুত্ব দিই না। কিন্তু ওই প্রতিকূলতাই আমাদের কর্তব্য পালনের পক্ষে অত্যন্ত উত্তম সামগ্রী হয়। অতএব অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতি যদি প্রসন্নভাবে গ্রহণ করা যায় তবে অন্য কোনো তপস্যা তার সমকক্ষ হয় না। কিন্তু ভোগে আসক্তি থাকায় অনুকূল অবস্থা ভালো লাগে এবং প্রতিকূলতা খারাপ লাগে। সেইজন্যই প্রতিকূলতার গুরুত্ব আমরা বুঝতে পারি না।

'যোগযজ্ঞাস্তথাপরে'—এখানে অন্তঃকরণের সমত্বকে যোগ বলা হয়েছে। সমত্বের অর্থ হল—কার্যের পূর্তি বা অপূর্তিতে, ফলের প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তিতে, অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতিতে, নিন্দা ও স্তুতিতে, আদর-অবহেলায় সমভাবাপন্ন থাকা অর্থাৎ চিত্তে চাঞ্চল্য, রাগ-দ্বেষ, হর্ষ-শোক, সুখ-দুঃখ না হওয়া। এইভাবে সম থাকাকেই বলা হয় **'যোগযজ্ঞ'**।

'স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাঃ'—কেবল লোকহিতের জন্য গীতা, রামায়ণ, ভাগবত, বেদ, উপনিষদ্ ইত্যাদি যথাযথভাবে মনন-বিচারপূর্বক পঠন-পাঠন করা, নিজের মনোবৃত্তি তথা জীবনের বিচার-বিশ্লেষণ করা—এ সবই হল স্বাধ্যায়রূপ **'জ্ঞানযজ্ঞ'**।

গীতার শেষে ভগবান বলেছেন যে, যে এই গীতাশাস্ত্র অধ্যয়ন করবে, আমি তার জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা পূজিত হব—

[১]অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহা যমাঃ॥ (যোগদর্শন ২।৩০)

এই হল আমার মত (১৮।৭০)। তাৎপর্য হল এই যে, গীতার স্বাধ্যায় হল 'জ্ঞানযজ্ঞ'। গীতার গভীরে প্রবেশ করে বিচার করা, তার ভাব বোঝার চেষ্টা করা ইত্যাদি সবই হল স্বাধ্যায়রূপ জ্ঞানযজ্ঞ।

** ** **

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ॥ ২৯ ॥
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।
সর্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ॥ ৩০ ॥

[**অপরে** (অন্যান্য যোগী) ; **প্রাণায়ামপরায়ণাঃ** (প্রাণায়াম পরায়ণ হয়ে) ; **অপানে, প্রাণম্** (অপানে প্রাণকে) ; **প্রাণাপানগতী** (প্রাণ এবং অপানের গতি) ; **রুদ্ধ্বা** (রোধ করে) ; **প্রাণে, অপানম্** (প্রাণে অপানের) ; **জুহ্বতি** (আহুতি দেন) ; **তথা, অপরে** (অন্য কত) ; **নিয়তাহারাঃ** (পরিমিতাহারী সাধক) ; **প্রাণান্, প্রাণেষু** (প্রাণকে, প্রাণেই) ; **জুহ্বতি** (আহুতি দেন) ; **এতে, সর্বে, অপি** (এই সব সাধক) ; **যজ্ঞক্ষপিত কল্মষাঃ** (যজ্ঞাদির দ্বারা পাপনাশ করেন) ; **যজ্ঞবিদঃ** (তাঁরা যজ্ঞগুলির জ্ঞাতা।)]

আবার অন্যান্য কত যোগী প্রাণায়াম পরায়ণ হয়ে অপানে প্রাণকে পূরক করেন, প্রাণ ও অপানের গতি রুদ্ধ করেন, পরে প্রাণে অপানের আহুতি দেন ; অন্য কত পরিমিতাহারী সাধক প্রাণকে প্রাণেই আহুতি দেন। এইসব সাধক যজ্ঞাদির দ্বারা পাপ নাশ করেন, তাঁরা যজ্ঞগুলির জ্ঞাতা ॥ ২৯-৩০ ॥

ব্যাখ্যা—'অপানে জুহ্বতি...প্রাণায়ামপরায়ণাঃ'[১]—প্রাণের স্থান হৃদয়ে (ওপরে) এবং অপানের স্থান হল গুহ্যে (নীচে)[২]। শ্বাস ছাড়ার সময় বায়ুর গতি উপর দিকে এবং শ্বাস নেবার সময় বায়ুর গতি নীচের দিকে হয়ে থাকে। সেইজন্য শ্বাস ত্যাগ করা হল 'প্রাণ'-এর কাজ এবং শ্বাসকে ভেতরে নেওয়া হল 'অপান'-এর কাজ। যোগীগণ প্রথমে বাইরের বায়ু বাম নাসিকা (চন্দ্রনাড়ী) দ্বারা ভেতরে টেনে নেন। এই বায়ু হৃদয়ে অবস্থিত প্রাণবায়ুকে সঙ্গে করে নাভি থেকে স্বাভাবিকভাবেই অপানে লীন হয়ে যায়। একে বলা হয় 'পূরক'। এরপর প্রাণবায়ু এবং অপানবায়ু—দুইয়েরই গতি রুদ্ধ করা হয়। তখন শ্বাস বাইরেও যায় না এবং ভেতরেও আসে না। একে বলা হয় 'কুম্ভক'। যোগীগণ এর পরে ভেতরের বায়ুকে দক্ষিণ নাসিকা (সূর্যনাড়ী) দিয়ে বার করেন । সেই বায়ু স্বাভাবিকভাবে প্রাণবায়ু এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অপানবায়ুকে নিয়ে বেরিয়ে যায়। এটিই হল প্রাণবায়ুতে অপানবায়ুর হোম (আহুতি) করা। একে বলা হয় 'রেচক'। চারবার ভগবৎ নামে পূরক, ষোলবার ভগবৎ নামে কুম্ভক এবং আটবার ভগবৎ নামে রেচক করা হয়।

এইভাবে যোগীগণ প্রথমে চন্দ্রনাড়ীর দ্বারা পূরক, পরে কুম্ভক এবং তারপরে সূর্যনাড়ী দ্বারা রেচক করে থাকেন। এরপর আবার সূর্যনাড়ী দ্বারা পূরক, পরে কুম্ভক এবং তারপরে চন্দ্রনাড়ীতে রেচক করে থাকেন। এইভাবে বারংবার পূরক-কুম্ভক-রেচক করাই হল প্রাণায়ামরূপ যজ্ঞ করা। পরমাত্মপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে নিষ্কামভাবে প্রাণায়ামপরায়ণ হলে সমস্ত পাপ নাশ হয়[৩]।

'অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি'—নিয়মিতভাবে আহার বিহার করেন যে সাধকগণ, তাঁরাই প্রাণকে প্রাণে আহুতি দিতে পারেন। অধিক ভোজনকারী বা খুবই কম ভোজনকারী অথবা উপবাসকারীগণ এই

[১]এই (উনত্রিশতম) শ্লোকে 'অপরে' কর্তা এবং 'জুহ্বতি' ক্রিয়া একইভাবে এসেছে ; সুতরাং এখানে পূরক, কুম্ভক এবং রেচকপূর্বক ক্রিয়াকে একই প্রাণায়ামরূপ যজ্ঞ ধরা হয়েছে।

[২]হৃদি প্রাণঃ স্থিতো নিত্যমপানো গুদমণ্ডলে। (যোগচূড়ামণ্যুপনিষদ্ ২৩)

[৩]গীতাধ্যয়নশীলস্য প্রাণায়ামপরস্য চ। নৈব সন্তি হি পাপানি পূর্বজন্মকৃতানি চ॥

প্রাণায়াম করতে পারেন না (গীতা ৬।১৬-১৭)।

প্রাণকে প্রাণে আহুতি দেওয়ার অর্থ হল—প্রাণকে প্রাণে এবং অপানকে অপানে আহুতি দেওয়া অর্থাৎ প্রাণ এবং অপানকে নিজ নিজ স্থানে রুদ্ধ করা। শ্বাস ছাড়াও নয় এবং শ্বাস গ্রহণ করাও নয়। একে 'স্তম্ভবৃত্তি প্রাণায়াম্'ও বলা হয়। এই প্রাণায়াম অভ্যাস করলে স্বাভাবিকভাবে বৃত্তিগুলি শান্ত হয়ে যায় এবং পাপ নাশ হয়। শুধু পরমাত্মপ্রাপ্তির উদ্দেশ্য নিয়ে প্রাণায়াম করলে অন্তঃকরণ নির্মল হয় এবং পরমাত্মপ্রাপ্তি হয়।

'সর্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ'—চব্বিশতম শ্লোক থেকে ত্রিশতম শ্লোকের পূর্বার্ধ পর্যন্ত যে যজ্ঞগুলি বর্ণিত হয়েছে, তার অনুষ্ঠানকারী সাধকদের উদ্দেশ্যে **'সর্বেঽপ্যেতে'** পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। ওই যজ্ঞগুলির অনুষ্ঠান করতে থাকলে তাঁদের সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে যায় এবং অবিনাশী পরমাত্মার প্রাপ্তি হয়।

প্রকৃতপক্ষে সমস্ত যজ্ঞই কর্ম হতে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার জন্য—যাঁরা এরূপ জানেন তাঁদের **'যজ্ঞবিৎ'** অর্থাৎ যজ্ঞের তত্ত্বজ্ঞানী বলা হয়। কর্ম থেকে সর্বতোভাবে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হলে পরমাত্মার অনুভব হয়। যারা অবিনাশী পরমাত্মাকে জানার জন্য যজ্ঞ করে না, বরং ইহলোক এবং পরলোকে (স্বর্গ ইত্যাদিতে) বিনাশশীল ভোগপ্রাপ্তির জন্যই শুধু যজ্ঞ করে থাকে, তারা যজ্ঞের তত্ত্ব জানতে পারে না। কারণ বিনাশশীল পদার্থের কামনাই হল বন্ধনের কারণ—**'গতাগতং কামকামা লভন্তে'** (গীতা ৯।২১)। সুতরাং মনে কামনা-বাসনা পোষণ করে পরিশ্রম সহকারে বড় বড় যজ্ঞ করলেও জন্ম-মরণের বন্ধন বজায় থাকে।

মিটী ন মনকী বাসনা, নৌ তত ভয়ে ন নাস।
তুলসী কেতে পচ মুয়ে, দে দে তন কো ত্রাস॥

বিশেষ কথা

যজ্ঞের সময় আগুনে আহুতি দেওয়া হয়। আহুতি দেবার বস্তুগুলির রূপ প্রথমে আলাদা আলাদা থাকে । কিন্তু আগুনে আহুতি দেবার পর সেগুলি আর বিভিন্ন রূপের থাকে না, তখন সবই অগ্নিরূপ ধারণ করে। এইরূপ পরমাত্মপ্রাপ্তির জন্য যে সাধনগুলিকে যজ্ঞরূপে বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলিতে আহুতি দেবার তাৎপর্য হল এই যে, আহুতি দেওয়া বস্তুগুলির পৃথক পৃথক সত্তা যেন না থাকে, সবই ভস্ম হয়ে যায়। যতক্ষণ তার পৃথক অস্তিত্ব বজায় থাকে, ততক্ষণ প্রকৃত আহুতি দেওয়াই হয়নি অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠানই হয়নি।

এই অধ্যায়ের ষোড়শ শ্লোক থেকে ভগবান কর্মতত্ত্বের (কর্মে অকর্মের) বর্ণনা করেছেন। কর্মের তত্ত্ব হল—কর্ম করেও তাতে আবদ্ধ না হওয়া। কর্মে আবদ্ধ না হওয়ারই একটি সাধন হল—যজ্ঞ। অগ্নিতে প্রদান করলে সব বস্তুই যেমন ভস্ম হয়ে যায়, তেমনই শুধুমাত্র লোকহিতার্থে কর্ম করলে সমস্ত কর্মই ভস্ম হয়ে যায়—**'যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে'** (গীতা ৪।২৩)।

লোকহিতার্থে নিষ্কামভাবে করা অত্যন্ত সাধারণ কর্ম দ্বারাও পরমাত্মা প্রাপ্তি হয়। অপরপক্ষে সকামভাব রেখে করা অত্যন্ত বিশাল কর্মের দ্বারা পরমাত্মা প্রাপ্তি সম্ভব নয়। কারণ উৎপত্তি ও বিনাশশীল পদার্থের কামনাই হল বন্ধনের কারণ। পদার্থ এবং ক্রিয়ারূপ জগতের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করলে মানুষমাত্রেরই পদার্থ পাবার এবং কর্ম করার এরূপ আসক্তি থেকে যায় যে, —আমার যেন কিছু প্রাপ্তি হতে থাকে এবং আমি যেন কোনো কর্মের মধ্যেই থাকি। একেই 'পাবার আকাঙ্ক্ষা' এবং 'কর্মের বেগ' বলা হয়।

মানুষের মধ্যে স্বভাবতঃ যে পাবার আকাঙ্ক্ষা থাকে, তা প্রকৃতপক্ষে নিজ অংশী পরমাত্মাকে লাভ করারই আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু পরমাত্মা হতে বিমুখ হয়ে জগৎমুখী হওয়াতেই মানুষ এই আকাঙ্ক্ষা জাগতিক পদার্থের দ্বারা মেটাতে চায়। জাগতিক পদার্থগুলি বিনাশশীল হয় আর জীব হল অবিনাশী। অবিনাশীর আকাঙ্ক্ষা বিনাশশীল পদার্থ দ্বারা কীভাবে মিটবে ? কিন্তু যতক্ষণ জগতের সম্মুখীন থাকা হয় ততক্ষণ কিছু পাবার বাসনাও থাকে। যতক্ষণ মানুষের পাবার বাসনা থাকে, ততক্ষণ কর্মের বেগও বজায় থাকে। এইভাবে যতক্ষণ পাবার আকাঙ্ক্ষা এবং কর্মের বেগ বজায় থাকে অর্থাৎ পদার্থ এবং ক্রিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় থাকে, ততক্ষণ জন্ম-মৃত্যু রোধ হয় না। এর থেকে মুক্তি পাবার উপায় হল কিছু পাবার আশা না করে শুধু অন্যের হিতার্থে কর্ম করা। একেই লোকসংগ্রহ, যজ্ঞার্থ কর্ম, লোকহিতার্থে কর্ম ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়।

শুধুমাত্র অপরের হিতার্থে কর্ম করলে জগতের সঙ্গে

সম্পর্ক দূর হয় এবং অনাসক্তি আসে। যদি শুধুমাত্র ভগবানের জন্য কর্ম করা হয়, তবে জগৎ হতে সম্পর্কচ্যুত হয়ে আসক্তি বর্জন তো হয়ই, তাছাড়া আর একটি বিশেষ প্রাপ্তি হয় সেটি হল ভগবানের প্রেম প্রাপ্তি।

পরিশিষ্ট-ভাব—নিঃস্বার্থভাবে শুধুমাত্র অপরের হিতার্থে কর্তব্য কর্ম করাকে বলা হয় 'যজ্ঞ'। যজ্ঞে সকল কর্মই অকর্ম হয়ে যায় অর্থাৎ সেগুলি আর বন্ধনের কারণ হয় না। চব্বিশ থেকে ত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত যে মোট বারো প্রকার যজ্ঞের কথা জানানো হয়েছে, তা নিম্নে জানানো হল—

১) **ব্রহ্ম যজ্ঞ**—প্রত্যেক কর্মে কর্তা, করণ, ক্রিয়া, পদার্থ ইত্যাদি সব কিছুকেই ব্রহ্মরূপে অনুভব করা।

২) **ভগবদর্পণরূপ যজ্ঞ**—সমস্ত ক্রিয়া এবং পদার্থগুলিকে শুধু ভগবানের এবং ভগবানের জন্য বলে মনে করা।

৩) **অভিন্নতারূপ যজ্ঞ**—অসৎ হতে বিমুখ হয়ে পরমাত্মাতে লীন হওয়া অর্থাৎ পরমাত্মা ব্যতীত নিজের কোনো পৃথক অস্তিত্ব না রাখা।

(**কর্তব্যকর্মরূপ যজ্ঞ**—শুধু অন্যের হিতার্থে সমস্ত কর্তব্য কর্ম করা।)

৪) **সংযমরূপ যজ্ঞ**—একান্তে থাকার সময়ে ইন্দ্রিয়াদির বিষয়মুখী না হওয়া।

৫) **বিষয়আহুতিরূপ যজ্ঞ**—ব্যবহারের সময় ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়ের সংস্পর্শে এলেও তাতে রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ হতে না দেওয়া (গীতা ২।৬৪-৬৫)।

৬) **সমাধিরূপ যজ্ঞ**—মন বুদ্ধি সহ সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং প্রাণের ক্রিয়া রুদ্ধ করে জ্ঞান দ্বারা প্রকাশিত সমাধিতে স্থিত হওয়া।

৭) **দ্রব্যযজ্ঞ**—সমস্ত পদার্থকে নিঃস্বার্থভাবে অপরের সেবায় নিয়োগ করা।

৮) **তপোযজ্ঞ**—কর্তব্য পালনের সময় বাধা-বিপত্তি এলে সেগুলি প্রসন্নতা সহকারে মেনে নেওয়া।

৯) **যোগযজ্ঞ**—কাজের সিদ্ধি-অসিদ্ধি এবং ফলের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিতে সমভাবে থাকা।

১০) **স্বাধ্যায়রূপ জ্ঞানযজ্ঞ**—অন্যের হিতার্থে সৎ শাস্ত্রের পঠন-পাঠন, নাম-জপ ইত্যাদি করা।

১১) **প্রাণায়ামরূপ যজ্ঞ**—পূরক, কুম্ভক এবং রেচকপূর্বক প্রাণায়াম করা।

১২) **স্তম্ভবৃত্তি (চতুর্থ) প্রাণায়ামরূপ যজ্ঞ**—সংযমিত আহার দ্বারা প্রাণ এবং অপানকে নিজ নিজ স্থানে রুদ্ধ করা।

—এই সবকিছুর তাৎপর্য হল যে আমাদের ক্রিয়ামাত্রই যজ্ঞরূপ হওয়া উচিত, তাহলেই জীবন সফল হবে। অর্থাৎ আমাদের নিজেদের জন্য কিছু করতে নেই। ক্রিয়া এবং পদার্থের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্বন্ধ নেই, আমাদের সম্বন্ধ পরমাত্মার সঙ্গে, যিনি ক্রিয়া ও পদার্থরহিত।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—চব্বিশতম শ্লোক থেকে ত্রিশতম শ্লোকের পূর্বার্ধ পর্যন্ত ভগবান মোট বারো প্রকার যজ্ঞের বর্ণনা করেছেন এবং ত্রিশতম শ্লোকের শেষার্ধে যজ্ঞকারী সাধকদের প্রশংসা করেছেন। এবার পরের শ্লোকে ভগবান যজ্ঞ করলে কী লাভ হয় এবং না করলে কী ক্ষতি হয়, তাই জানাচ্ছেন।

যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম॥ ৩১ ॥

[**কুরুসত্তম** (হে কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জুন !) ; **যজ্ঞাশিষ্টামৃতভুজো** (যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃত অভিলাষী ব্যক্তি) ; **সনাতনম্, ব্রহ্ম** (সনাতন পরমব্রহ্ম পরমাত্মাকে) ; **যান্তি** (প্রাপ্ত হন) ; **অযজ্ঞস্য** (যারা যজ্ঞ করে না তাদের পক্ষে) ; **অয়ম্, লোকঃ** (ইহলোকই) ; **ন, অস্তি** (সুখদায়ক নয়) ; **অন্যঃ** (পরলোক) ; **কুতঃ** (কী করে সুখদায়ক হবে ?)]

হে কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জুন ! অমৃতরূপ যজ্ঞাবশিষ্ট অভিলাষী ব্যক্তি সনাতন পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন। যারা যজ্ঞ করে না তাদের পক্ষে ইহলোকই সুখদায়ক নয়, অতএব পরলোক সুখদায়ক হবে কী করে? ॥ ৩১

ব্যাখ্যা—**'যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্'**— যজ্ঞ করলে অর্থাৎ নিষ্কামভাবে অন্যকে সুখী করলে যে সমত্বের অনুভূতি হয়, সেটিই হল 'যজ্ঞশিষ্ট অমৃতে'র অনুভূতি। অমৃত অর্থাৎ অমরত্ব অনুভবকারী ব্যক্তি সনাতন পরব্রহ্ম পরমাত্মা প্রাপ্ত হন (গীতা ৩।১৩)।

মানুষ স্বরূপতঃ অমর। মরণশীল বস্তুর সংস্পর্শে এসেই মানুষ মৃত্যুকে অনুভব করে। এই বস্তুগুলি জগতের হিতার্থে নিয়োগ করে মানুষ যখন আসক্তিরহিত হয় তখন সে স্বতঃই অমরত্ব অনুভব করে।

কর্তব্যগুলিকে কেবল কর্তব্য মনে করলে সেগুলি যজ্ঞে পরিণত হয়। অন্যের হিতার্থে করা কর্মগুলিই কর্তব্য বলে অভিহিত হয়। যে কর্মগুলি নিজের জন্য করা হয়, সেগুলিকে কর্তব্য বলা হয় না, শুধু কর্ম বলা হয়, যার দ্বারা মানুষ আবদ্ধ হয়ে যায়। তাই যজ্ঞে কেবলমাত্র প্রদানই করা হয়, নেওয়া হয় শুধু শরীর নির্বাহের জন্য (গীতা ৪।২১)। শরীর যাতে যজ্ঞ করার জন্য সক্ষম থাকে— সেইজন্য শুধু শরীর নির্বাহের জন্য বস্তুগুলির ব্যবহার করাও যজ্ঞের অন্তর্গত। মনুষ্য-দেহ যজ্ঞের জন্যই সৃষ্ট। সেটিকে মান-মর্যাদা, সুখ-আরাম ইত্যাদিতে নিয়োজিত রাখা বন্ধন-কারক হয়ে থাকে। শুধু যজ্ঞের জন্য কর্ম করলে মানুষ বন্ধনরহিত (মুক্ত) হয় এবং সনাতন ব্রহ্মপদ লাভ করে।

'নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম'— তৃতীয় অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে ভগবান বলেছিলেন যে, কর্ম না করলে তোমার শরীর-নির্বাহও করা হবে না। আবার এখানে বলেছেন যে, যজ্ঞ না করলে তোমার ইহলোকই সুখপ্রদ হবে না, পরলোকের আর কথা কী ! কেবল স্বার্থভাবে (নিজের জন্য) কর্ম করলে ইহলোকে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়, সুখ-শান্তি নষ্ট হয় এবং পরলোকেও কল্যাণ হয় না।

নিজ নিজ কর্তব্য পালন না করলে গৃহেও অশান্তির সৃষ্টি হয়, ঝামেলা শুরু হয়। গৃহে যদি কোনো স্বার্থপর, লোভী ব্যক্তি থাকে, তাহলে গৃহের লোকেদের তাকে সহ্য হয় না। স্বার্থপরতা ত্যাগ করে নিজ কর্তব্য দ্বারা সকলকে সুখী করাই হল গৃহে অথবা জগতে থাকার শিক্ষা। নিজে কর্তব্য পালন করলে অন্যেও কর্তব্য পালনের প্রেরণা পায়। এতে গৃহে ঐক্য এবং শান্তি স্বাভাবিকভাবে বিরাজ করে। কিন্তু নিজ কর্তব্য পালন না করলে ইহলোকেই সুখে বসবাস করা অসম্ভব হয় আর পরলোকের তো কথাই নেই! অপরপক্ষে নিজ কর্তব্য ঠিকভাবে পালন করলে ইহলোক এবং পরলোক দুই-ই সুখদায়ক হয়।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—এই অধ্যায়ের ষোড়শ শ্লোকে ভগবান কর্মতত্ত্ব জানাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে এবার তার উপসংহার করেছেন।

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে॥ ৩২ ॥

[**এবম্** (এইরূপ) ; **বহুবিধাঃ, যজ্ঞা** (বহুবিধ যজ্ঞের কথা) ; **ব্রহ্মণঃ, মুখে** (বেদের বাণীতে) ; **বিততাঃ** (বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে) ; **তান্, সর্বান্** (ওইসবগুলিকে) ; **কর্মজান্** (কর্মজনিত বলে) ; **বিদ্ধি** (জানবে) ; **জ্ঞাত্বা** (জেনে) ; **বিমোক্ষ্যসে** (মুক্তিলাভ করবে।)]

এইরূপ আরো বহুবিধ যজ্ঞের কথা বেদের বাণীতে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। ওই সবগুলিকে তুমি কর্মজনিত বলে জানবে। এইভাবে জেনে যজ্ঞ করলে তুমি (কর্মবন্ধন হতে) মুক্তিলাভ করবে ॥ ৩২ ॥

ব্যাখ্যা—**'এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে'**— চব্বিশ থেকে ত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত যে বারোটি যজ্ঞের বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলি ছাড়াও বেদে আরও অনেক প্রকার যজ্ঞের বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ সাধকদের প্রকৃতি অনুযায়ী তাঁদের নিষ্ঠাও নানাপ্রকারের হয় এবং তদনুযায়ী তাঁদের সাধন প্রণালীও বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে।

বেদে সকাম অনুষ্ঠানের বিস্তারিত বর্ণনা আছে। কিন্তু সেগুলি হতে বিনাশশীল ফলই প্রাপ্ত হয়, অবিনাশী নয়। তাই বেদে বর্ণিত সকাম যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ব্যক্তি স্বর্গলোকে

গমন করেন এবং পুণ্য ক্ষয় হলে পুনরায় ইহলোকে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা এইভাবে জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবদ্ধ থাকেন (গীতা ৯।২১)। কিন্তু এখানে ওইসব সকাম অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়নি। এখানে সেই সব নিষ্কামকর্মরূপ যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে, যার অনুষ্ঠান দ্বারা পরমাত্মার প্রাপ্তি হয়—**'যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্'** (গীতা ৪।৩১)।

বেদাদিতে কেবলমাত্র স্বর্গপ্রাপ্তির সাধনরূপ সকাম অনুষ্ঠানগুলির বর্ণনাই আছে তা নয়, এতে পরমাত্মপ্রাপ্তির সাধনরূপে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, প্রাণায়াম, সমাধি ইত্যাদি অনুষ্ঠানগুলির বিষয়ও বর্ণিত আছে। উপরিউক্ত পদের সেটিই হল লক্ষ্য।

তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্দশ-পঞ্চদশ শ্লোকগুলিতে বলা হয়েছে যে, যজ্ঞ বেদ হতে উদ্ভূত এবং ব্যাপ্তি স্বরূপ পরমাত্মা ওই যজ্ঞে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। যজ্ঞে পরমাত্মা নিত্য প্রতিষ্ঠিত থাকায় যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান কেবলমাত্র পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তির জন্যই করা উচিত।

'কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বান্'—চব্বিশ থেকে ত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত যে দ্বাদশ যজ্ঞের বর্ণনা করা হয়েছে এবং ওইরূপই বেদাদিতে যে সব যজ্ঞের বর্ণনা করা আছে, সেই সমস্ত যজ্ঞের উদ্দেশ্যেই এখানে **'তান্ সর্বান্'** পদটি উল্লিখিত হয়েছে।

'কর্মজান্ বিদ্ধি' পদটির তাৎপর্য এই যে, এই সমস্ত যজ্ঞ কর্মজনিত অর্থাৎ কর্ম দ্বারা সংঘটিত হয়। শরীর দ্বারা যে ক্রিয়াদি হয়, বাণী দ্বারা যে বাক্য নিঃসৃত হয় এবং মন দ্বারা যে সংকল্প করা হয় সেগুলিকে কর্ম বলা হয়—**'শরীরবাঙ্‌মনোভির্যৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ'** (গীতা ১৮।১৫)।

অর্জুন নিজ কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা করলেও যুদ্ধরূপ কর্তব্য-কর্মকে পাপ মনে করে সেটি পরিত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। তাই **'কর্মজান্ বিদ্ধি'** পদটির দ্বারা ভগবান অর্জুনকে এই বলতে চেয়েছেন যে, যুদ্ধরূপ কর্তব্য পরিত্যাগ করে তুমি নিজ কল্যাণের জন্য যে সাধনাই কর, তাও কর্ম বলেই বিবেচিত হবে। কল্যাণ প্রকৃতপক্ষে কর্ম দ্বারা হয় না, কর্ম থেকে সর্বতোভাবে সম্পর্ক-ছিন্ন হলে তবেই কল্যাণ হয়। তাই তুমি যদি যুদ্ধরূপ কর্তব্য-কর্মকেও নির্লিপ্তভাবে পালন করতে পারো তবে তাতেও তোমার কল্যাণ হবে। কারণ কর্ম মানুষকে আবদ্ধ করে না, প্রকৃতপক্ষে (কর্ম এবং তার ফলের) আসক্তিই বন্ধনের কারণ হয় (গীতা ৬।৪)। যুদ্ধ তোমার স্বধর্ম, সেইজন্য সেটি করা তোমার পক্ষে সহজসাধ্যও বটে।

'এবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে'—ভগবান এই অধ্যায়ের চতুর্দশতম শ্লোকে বলেছেন যে, কর্মফলে আমার স্পৃহা নেই, তাই কর্ম আমাকে আবদ্ধ করতে পারে না—যে আমাকে এরূপভাবে জানে, সেও কর্ম দ্বারা আবদ্ধ হয় না। তাৎপর্য হল এই যে, যে ব্যক্তি কর্মে নির্লিপ্ত থাকার বিদ্যা (কর্মফলে স্পৃহা না রাখা) আয়ত্ত এবং হৃদয়ঙ্গম করেছে, সেও কর্ম-বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে যায়। আবার পঞ্চদশ শ্লোকে ভগবান এই কথাই **'এবং জ্ঞাত্বা'** পদে বলেছেন। সেখানেও এই ভাব আছে যে, মুমুক্ষু ব্যক্তিগণও এরূপ জেনে কর্ম করে থাকেন। ষোড়শ শ্লোকে কর্ম থেকে নির্লিপ্ত থাকার এই তত্ত্বটিকে বিস্তারিতভাবে জানাতে ভগবান দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন এবং **'যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ'** পদ দ্বারা সেটি জানলে মুক্তি হয় বলে জানিয়েছেন। এখন এই শ্লোকে **'এবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে'** পদটির দ্বারা ওই বিষয়ের উপসংহার করছেন। তাৎপর্য হল এই যে, ফলেচ্ছা ত্যাগ করে শুধুমাত্র লোকহিতার্থে কর্ম করলে মানুষ কর্ম-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়।

জগতে অসংখ্য ক্রিয়া চলেছে, কিন্তু মানুষ যে সব ক্রিয়ার সঙ্গে নিজের সম্পর্ক স্থাপন করে, তাতেই সে আবদ্ধ হয়। জগতের কোনো স্থানে যে কোনো ক্রিয়া বা ঘটনা ঘটুক, মানুষ তার সঙ্গে নিজের সম্পর্ক স্থাপন করলে এবং তাতে সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হলে সেই ক্রিয়ার সঙ্গে সে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু শরীর বা জগতে ঘটিত কোনো ক্রিয়ার সঙ্গে যদি তার বিন্দুমাত্র সম্বন্ধ না থাকে অর্থাৎ তার উপর ক্রিয়ার প্রভাব না পড়ে তাহলে সে কর্ম-বন্ধন হতে মুক্তি লাভ করে।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—যজ্ঞের বর্ণনা শুনে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এইসব যজ্ঞের মধ্যে কোন্ যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ? ভগবান পরবর্তী শ্লোকে তার উত্তর দিয়েছেন।

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্‌যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥ ৩৩ ॥

[**পরন্তপ, পার্থ** (হে পরন্তপ অর্জুন !) ; **দ্রব্যময়াৎ, যজ্ঞাৎ** (দ্রব্যময় যজ্ঞ থেকে) ; **জ্ঞানযজ্ঞঃ, শ্রেয়ান্** (জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ) ; **সর্বম্** (সমস্ত) ; **কর্ম** (কর্ম) ; **অখিলম্, জ্ঞানে** (পদার্থ জ্ঞানে) ; **পরিসমাপ্যতে** (পরিসমাপ্ত হয়।)]

হে পরন্তপ অর্জুন ! দ্রব্যময় যজ্ঞ থেকে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। কারণ সমস্ত কর্ম এবং পদার্থ জ্ঞানে (তত্ত্বজ্ঞানে) বিলীন হয় ॥ ৩৩ ॥

ব্যাখ্যা—**'শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্‌যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ'**—যে সব যজ্ঞে দ্রব্য (পদার্থ) এবং কর্মের প্রয়োজনীয়তা থাকে, সেইসব যজ্ঞ হল 'দ্রব্যময়'। 'দ্রব্য' শব্দের সঙ্গে 'ময়' প্রত্যয় প্রাচুর্যের অর্থে ব্যবহৃত। যেমন মাটির প্রাধান্যে প্রস্তুত পাত্রকে 'মৃন্ময়' বলা হয় তেমনি দ্রব্যের প্রাধান্যে যে যজ্ঞ করা হয় তাকে 'দ্রব্যময়' যজ্ঞ বলা হয়। এরূপ দ্রব্যময় যজ্ঞের থেকে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, কারণ জ্ঞানযজ্ঞে দ্রব্য এবং কর্মের প্রয়োজনীয়তা থাকে না।

সব যজ্ঞকেই ভগবান কর্মজনিত বলেছেন (৪।৩২)। ভগবান এইস্থানে বলছেন যে, সমস্ত কর্ম জ্ঞানযজ্ঞে বিলীন হয় অর্থাৎ জ্ঞানযজ্ঞ কর্মজনিত নয়, এটি বিবেক ও বিচারজনিত। অতএব এখানে যে জ্ঞানযজ্ঞের উল্লেখ করা হয়েছে, তা পূর্ববর্ণিত দ্বাদশ যজ্ঞের অন্তর্গত যে জ্ঞানযজ্ঞ (৪।২৮) তার বাচক নয়, এটি হল পরবর্তী (চৌত্রিশতম) শ্লোকে বর্ণিত জ্ঞান প্রাপ্ত করার প্রচলিত প্রক্রিয়ার বাচক। পূর্ববর্ণিত দ্বাদশ যজ্ঞের বাচক হল এই 'দ্রব্যময় যজ্ঞ'। দ্রব্যময় যজ্ঞ সম্পন্ন করেই জ্ঞানযজ্ঞ করা হয়।

যদি সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখা যায় তাহলে বোঝা যায় যে জ্ঞানযজ্ঞও ক্রিয়াজনিত, কিন্তু এতে বিবেক-বিচারের প্রাধান্য থাকে।

'সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে'—**'সর্বম্'** এবং **'অখিলম্'**—দুটি শব্দ পর্যায়বাচক এবং এগুলির অর্থ হল 'সম্পূর্ণ'। তাই এইস্থানে **'সর্বম্ কর্ম'**-এর অর্থ হল সমস্ত কর্ম (কর্মমাত্র) এবং **'অখিলম্'**-এর অর্থ সমস্ত দ্রব্য (পদার্থমাত্র) ধরাই ঠিক বলে মনে হয়।

মানুষ যতক্ষণ নিজের জন্য কর্ম করে, ততক্ষণ তার সম্পর্ক ক্রিয়া এবং পদার্থের সঙ্গে বজায় থাকে। যতক্ষণ ক্রিয়া এবং পদার্থের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে অন্তঃকরণে ততক্ষণ পর্যন্ত অশুদ্ধি থাকে । তাই নিজের জন্য কর্ম না করলেই অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়।

অন্তঃকরণে তিন প্রকারের দোষ থাকে—মল (সঞ্চিত পাপ), বিক্ষেপ (চিত্ত-চাঞ্চল্য) এবং আবরণ (অজ্ঞান)। নিজের জন্য কোনো কর্ম না করলে অর্থাৎ শুধুমাত্র জগতের সেবায় কর্ম করলে যখন সাধকের অন্তঃকরণে স্থিত মল ও বিক্ষেপ দুটি দোষ দূর হয়, তখন তিনি জ্ঞান প্রাপ্তির সাহায্যে আবরণ-দোষ দূর করার জন্য কর্মগুলি স্বরূপতঃ পরিত্যাগ করে গুরুর নিকট গমন করেন। সেই সময় তিনি কর্ম এবং পদার্থ থেকে উচ্চে আরোহণ করেন অর্থাৎ তখন তাঁর আর কর্ম বা পদার্থের দিকে লক্ষ্য থাকে না, তখন একমাত্র চিন্ময় তত্ত্বই হয় তাঁর লক্ষ্য। এই হল সমস্ত কর্ম এবং পদার্থগুলির তত্ত্বজ্ঞানে পরিসমাপ্তি।

জ্ঞানপ্রাপ্তির প্রচলিত প্রক্রিয়া

শাস্ত্রাদিতে জ্ঞানপ্রাপ্তির আটটি অন্তরঙ্গ সাধনের কথা বলা হয়েছে—(১) বিবেক, (২) বৈরাগ্য, (৩) শম ইত্যাদি ছয় সম্পত্তি (শম, দম, শ্রদ্ধা, উপরতি, তিতিক্ষা ও সমাধান), (৪) মুমুক্ষুত্ব, (৫) শ্রবণ, (৬) মনন, (৭) নিদিধ্যাসন, (৮) তত্ত্বপদার্থ সংশোধন। এর মধ্যে প্রথম সাধন হল বিবেক। সৎ ও অসৎকে পৃথকভাবে জানার নামই হল 'বিবেক'। সৎ-অসৎকে পৃথকভাবে জেনে অসৎকে পরিত্যাগ করা বা সংসার বিমুখ হওয়াকেই বলা হয় 'বৈরাগ্য'। এর পর শম-দম ইত্যাদি দুটি সম্পত্তি ধারণ হয়। মনকে বিষয় থেকে সরিয়ে নেওয়াকে বলা হয় 'শম', ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় থেকে সরাবার নাম হল 'দম'। ঈশ্বর, শাস্ত্র ইত্যাদিতে শ্রদ্ধা সহকারে এবং প্রত্যক্ষের চেয়েও বেশি বিশ্বাস রাখাকে বলা হয় 'শ্রদ্ধা'। বৃত্তিসমূহের সংসার বিমুখ হওয়াকে বলা হয় 'উপরতি', শীত-গ্রীষ্ম ইত্যাদি নানাপ্রকার দ্বন্দ্ব সহ্য করা বা উপেক্ষা

করাকে বলা হয় 'তিতিক্ষা', অন্তঃকরণে কোনো প্রশ্ন না থাকাকে বলা হয় 'সমাধান' এরপর চতুর্থ সাধন হল 'মুমুক্ষুত্ব', সংসার থেকে মুক্তি পাবার ইচ্ছাকে বলা হয় 'মুমুক্ষা'।

'মুমুক্ষা' জাগ্রত হলে বস্তুসমূহ এবং কর্ম স্বরূপতঃ ত্যাগ করে সাধক শ্রোত্রিয় (বৈদজ্ঞ ব্রাহ্মণ) এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর কাছে যান। গুরুর নিকট থাকাকালে শাস্ত্রাদি শুনে তার অর্থ উপলব্ধি করা বা ধারণ করাকে বলা হয় 'শ্রবণ'। 'শ্রবণ' করলে প্রমাণগতঃ সংশয় দূরীভূত হয়। যুক্তি এবং বিচার দ্বারা পরমাত্মতত্ত্ব চিন্তা করাকে 'মনন' বলা হয়। 'মনন' দ্বারা প্রমেয়গত সংশয় দূর হয়। জগৎ-সত্তা মেনে নেওয়া এবং পরমাত্মতত্ত্বের অস্তিত্ব না-মানাকে 'বিপরীত চিন্তা' বলা হয়। এই 'বিপরীত চিন্তা' দূর করার নাম হল 'নিদিধ্যাসন'। প্রকৃতিজাত পদার্থগুলির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে এক চিন্ময়তত্ত্ব শেষ পর্যন্ত থাকলে তাকে বলা হয় 'তত্ত্বপদার্থ সংশোধন'। একেই বলা হয় 'তত্ত্ব সাক্ষাৎকার'[১]।

বিচার-বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, এইসব সাধনের তাৎপর্য হল—অ-সাধন অর্থাৎ অসৎ-এর সম্পর্ক পরিত্যাগ। ত্যাজ্য বস্তু নিজের জন্য নয়, কিন্তু ত্যাগের পরিণাম (তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার) নিজের জন্যই হয়ে থাকে।

পরিশিষ্ট-ভাব— দ্রব্যময় যজ্ঞে ক্রিয়া এবং পদার্থের প্রাধান্য থাকে, তাই সেইগুলি করণসাপেক্ষ। জ্ঞানযজ্ঞে বিচার-বিবেচনার প্রাধান্য থাকে, সুতরাং তা করণনিরপেক্ষ। সেইজন্য দ্রব্যময় যজ্ঞ থেকে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানযজ্ঞে সমস্ত ক্রিয়া এবং পদার্থের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান হয়। তখন আর কিছু করা, জানা এবং পাওয়ার বাকি থাকে না, কারণ একমাত্র পরমাত্মতত্ত্ব ব্যতীত অন্য কোনো অস্তিত্বই নেই।

* * *

সম্বন্ধ—অর্জুন নিজের কল্যাণ চেয়েছিলেন অতএব কল্যাণ প্রাপ্তির নানা সাধন যজ্ঞরূপে বর্ণনা করে ভগবান এবার জ্ঞানযজ্ঞের সাহায্যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার প্রচলিত নিয়ম বর্ণনা করছেন।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ ৩৪ ॥

[তৎ, **বিদ্ধি** (সেই তত্ত্বদর্শীর শিক্ষা অবগত হও) ; **প্রণিপাতেন** (তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে) ; **সেবয়া** (সেবার দ্বারা সন্তুষ্ট করে) ; **পরিপ্রশ্নেন** (সরলতাপূর্বক প্রশ্ন করলে) ; **তে, তত্ত্বদর্শিনঃ** (সেই তত্ত্বদর্শী) ; **জ্ঞানিনঃ** (জ্ঞানী মহাপুরুষ) ; **জ্ঞানম্, উপদেক্ষ্যন্তি** (তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করবেন।)]

সেইটিকে (তত্ত্বজ্ঞান-তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী মহাপুরুষের কাছে গিয়ে) অবগত হও। তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে, সেবার দ্বারা সন্তুষ্ট করে সরলতাপূর্বক প্রশ্ন করলে সেই তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী মহাপুরুষ তোমাকে ওই তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করবেন ॥ ৩৪ ॥

ব্যাখ্যা— 'তদ্বিদ্ধি'—অর্জুন আগে বলেছিলেন যে, যুদ্ধে আত্মীয়স্বজনদের হত্যা করায় আমি কোনো কল্যাণ দেখছি না (গীতা ১।৩১), এই আততায়ীদের (হত্যা করতে প্রস্তুত) মারলে তো পাপই হবে (গীতা ১।৩৬)। যুদ্ধ করার থেকে আমি ভিক্ষা করে জীবন-নির্বাহ করাকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি (গীতা ২।৫)। এইরূপে অর্জুন যুদ্ধরূপ কর্তব্য-কর্মকে পরিত্যাগ করা শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেছিলেন, কিন্তু ভগবানের মত অনুসারে জ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য কর্মত্যাগ করার প্রয়োজন নেই (গীতা ৩।২০ ; ৪।১৫)। তাই ভগবান যেন এখানে অর্জুনকে বলেছেন যে, তুমি যদি কর্মকে স্বরূপতঃ ত্যাগ করে জ্ঞান প্রাপ্ত করাকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে কর, তাহলে তুমি কোনো তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী মহাপুরুষের নিকট গিয়ে বিধিপূর্বক জ্ঞান লাভ করো, এরূপ উপদেশ আমি তোমাকে দেব না।

[১]যিনি সাংসারিক ভোগ এবং সম্পদ সংগ্রহে ব্যাপৃত থাকেন, তাঁর দ্বারা 'শ্রবণ' হয় শাস্ত্রের, 'মনন' হয় বিষয়ের, 'নিদিধ্যাসন' হয় অর্থের এবং 'সাক্ষাৎকার' হয় দুঃখের।

প্রকৃতপক্ষে ভগবানের অভিপ্রায় নয় অর্জুনকে কোনো জ্ঞানী মহাপুরুষের কাছে পাঠানো, এটা শুধু তাঁকে সতর্ক করার জন্য বলা। যেমন, কোনো মহাপুরুষ কোনো ব্যক্তিকে তার কল্যাণের কথা বললে শ্রদ্ধার অভাববশতঃ যদি তা তার পছন্দ না হয়, তখন সেই মহাপুরুষ তাকে বলে দেন যে, তুমি অন্য কারো কাছে গিয়ে তোমার কল্যাণের পথ জিজ্ঞাসা করো। তেমনি, ভগবান যেন এইরূপই বলছেন যে, যদি তোমার আমার কথা পছন্দ না হয়, তবে তুমি কোনো জ্ঞানী মহাপুরুষের কাছে গিয়ে প্রচলিত প্রণালী দ্বারা জ্ঞান লাভ করো। জ্ঞান প্রাপ্ত করার প্রচলিত প্রণালী হল—কর্মকে স্বরূপতঃ ত্যাগ করে, শ্রোত্রিয় এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর কাছে গিয়ে বিধিপূর্বক জ্ঞান লাভ করা[১]।

পরে আটত্রিশতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, নিজ কর্তব্য-কর্ম করতে থাকলে (কর্মযোগ সিদ্ধ হলে) অন্য কোনো সাধন ছাড়াই এই তত্ত্বজ্ঞান নিজেই লাভ করবে। তার জন্য আর কারো কাছে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

'প্রণিপাতেন'—জ্ঞান লাভের জন্য গুরুর কাছে গিয়ে তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করবে। অর্থাৎ গুরুর কাছে নম্র ও বিনয়ী হয়ে থাকবে—**'নীচবৎ সেবেত সদ্‌গুরুম্'**, যাতে কোনো ভাবে গুরুর কখনো কোনোপ্রকার অনাদর, অবহেলা না হয়। বিনম্রভাবে, সারল্যের সঙ্গে জিজ্ঞাসু হয়ে তাঁর কাছে থেকে তাঁকে সেবা করতে হয়। নিজেকে তাঁর কাছে সমর্পণ করবে, তাঁর অধীন হয়ে থাকবে। শরীর এবং বস্তু ইত্যাদি সবই তাঁকে সমর্পণ করবে। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম দ্বারা শরীর এবং সেবা দ্বারা নিজের সকল বস্তু তাঁকে অর্পণ করবে।

'সেবয়া'—শরীর এবং সমস্ত বস্তুর দ্বারা গুরুর সেবা করবে। তিনি যাতে প্রসন্ন হন, সেরূপ কর্ম করবে। তাঁর প্রসন্নতা যদি লাভ করতে হয় তাহলে নিজেকে সর্বতোভাবে সঁপে দিতে হয়। তাঁর মনোভাব, আদেশ-নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করবে। একেই বাস্তবিক সেবা বলা হয়।

সাধু এবং মহাপুরুষদের সব থেকে বড় সেবা হল তাঁদের আদর্শ অনুযায়ী নিজ জীবন গঠন করা। কারণ তাঁদের আদর্শ তাঁদের জীবনের থেকেও বেশি মূল্যবান হয়ে থাকে। সিদ্ধান্ত (আদর্শ) রক্ষার জন্য মহাপুরুষ নিজের জীবনও সানন্দে পরিত্যাগ করতে পারেন। তাই সত্যিকার সেবক কায়মনোবাক্যে তাঁর আদর্শ পালন করে।

'পরিপ্রশ্নেন'—শুধুমাত্র পরমাত্মতত্ত্ব জানার জন্য জিজ্ঞাসু হয়ে, সরলতার সঙ্গে, বিনম্রভাবে গুরুকে প্রশ্ন করবে। নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করার জন্য বা তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য প্রশ্ন করবে না।

আমি কে ? সংসার কী ? বন্ধন কাকে বলে ? মোক্ষ কী ? পরমাত্মতত্ত্ব কীরূপে অনুভব করা যায় ? আমার সাধনার পথে কী কী বিঘ্ন আছে, সেগুলি কীরূপে দূর করা সম্ভব ? তত্ত্ব বুঝতে কেন অসুবিধা হচ্ছে ? ইত্যাদি প্রশ্ন শুধু নিজে বোঝার জন্যই (যেমন সন্দেহ হবে তদনুযায়ী জিজ্ঞাসা) করবে।

'জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ'—**'তত্ত্বদর্শিনঃ'** পদের অর্থ হল, সেই মহাপুরুষ পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব করেছেন ; এবং **'জ্ঞানিনঃ'** পদের তাৎপর্য হল, তাঁর বেদ এবং শাস্ত্রের যথাযথ জ্ঞান (ব্যুৎপত্তি) আছে। এরূপ তত্ত্বদর্শী এবং জ্ঞানী মহাপুরুষের কাছে গিয়েই জ্ঞান লাভ করা উচিত।

অন্তঃকরণের শুদ্ধতা অনুসারে জ্ঞানের অধিকারী তিন প্রকারের হয়ে থাকে—উত্তম, মধ্যম এবং কনিষ্ঠ। উত্তম অধিকারী শোনামাত্রই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে[১]। মধ্যম অধিকারীর শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন করলে তত্ত্বজ্ঞান

---

[১]আদৌ স্ববর্ণাশ্রমবর্ণিতাঃ ক্রিয়াঃ কৃত্বা সমাসাদিতশুদ্ধমানসঃ।
সমাপ্য তৎপূর্বমুপাত্তসাধনঃ সমাশ্রয়েৎ সদ্‌গুরুমাত্মলব্ধয়ে।। (অধ্যাত্মরামায়ণ, উত্তরকাণ্ড ৫।৭)

'সর্বপ্রথম নিজ বর্ণ ও আশ্রমের জন্য শাস্ত্র-বর্ণিত ক্রিয়াগুলি যথাযথ পালন দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হলে পরে ওই ক্রিয়াগুলি ত্যাগ করতে হয়। তারপর শম-দমাদি সাধন দ্বারা সম্পন্ন হয়ে আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য সদ্‌গুরুর শরণাগত হতে হয়।'

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্। (মুণ্ডক.১।২।১২)

সেই জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য জিজ্ঞাসু সাধক হাতে সমিধ (যজ্ঞকাষ্ঠ) নিয়ে বিনয়াবনত হয়ে বেদশাস্ত্রের জ্ঞাতা এবং তত্ত্বজ্ঞানী গুরুর কাছে যাবেন।

লাভ হয়। কনিষ্ঠ অধিকারী তত্ত্ব জানবার জন্য নানাপ্রকার প্রশ্ন করে থাকে। সেই প্রশ্নের সমাধানের জন্য বেদ এবং শাস্ত্রসমূহের যথোপযুক্ত জ্ঞান থাকা প্রয়োজন ; কারণ শুধুমাত্র যুক্তি দ্বারা তত্ত্ব বোঝানো যায় না। সুতরাং গুরু যদি তত্ত্বদর্শী হন অথচ জ্ঞানী না হন তবে তিনি শিষ্যের নানাপ্রকার প্রশ্নের সমাধান করতে অক্ষম হন। আবার গুরু যদি শাস্ত্রজ্ঞ হন অথচ তত্ত্বদর্শী না হন তবে তাঁর কথায় সেই গুরুত্ব থাকে না যাতে শ্রোতার জ্ঞান লাভ হতে পারে। তিনি নানা কথা বলতে পারেন, বই দেখাতে পারেন কিন্তু শিষ্যের বোধ আনতে পারেন না। সেইজন্য গুরুর তত্ত্বদর্শী এবং জ্ঞানী—দুই-ই হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন।

'উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানম্'—মহাপুরুষকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলে, তাঁকে সরলতার সঙ্গে প্রশ্ন করলেই তিনি তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দেবেন—এর অর্থ এই নয় যে, তিনি এগুলির আশা করেন। আসলে প্রণাম, সেবা ইত্যাদি কোনো কিছুর শর্তই তাঁর নেই। এইসব বলার অর্থ হল যে, সাধক যখন জিজ্ঞাসু হন এবং বিনম্রভাবে মহাপুরুষের নিকট অবস্থান করেন তখন ওই মহাপুরুষের অন্তঃকরণে তাঁর প্রতি এক বিশেষ ভাব উৎপন্ন হয়, যাতে সাধকের পারমার্থিক উন্নতি হয়। সাধক যদি এইভাবে তাঁর নিকট অবস্থান না করেন, তবে জ্ঞানলাভ হলেও সাধক তা ধারণ করতে পারেন না।

'জ্ঞানম্' পদটি এইস্থানে তত্ত্বজ্ঞান অথবা স্বরূপবোধের বাচক। প্রকৃতপক্ষে স্বরূপের জ্ঞান হয় না, জ্ঞান হয় জগৎ-সংসারের। জগতের জ্ঞান হলেই জগৎ-সংসার থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপ অনুভূত হয়।

'উপদেক্ষ্যন্তি'—এই পদের তাৎপর্য হল এই যে, মহাপুরুষ জ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ দিলেও সাধকের যে তাতে বোধ হবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। পরবর্তী উনচল্লিশতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করেন—**'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্'**। কারণ শ্রদ্ধা হৃদয়ের বস্তু। কিন্তু কপটতাপূর্বকও প্রণাম-সেবা-প্রশ্নাদি করা সম্ভব হয়। তাই এইস্থানে মহাপুরুষ কর্তৃক জ্ঞানের উপদেশ দেবার কথাই বলা হয়েছে এবং উনচল্লিশতম শ্লোকে বলা হয়েছে যে শ্রদ্ধাবান সাধকই জ্ঞানলাভ করতে সক্ষম।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত করার প্রচলিত রীতির বর্ণনা করে ভগবান পরবর্তী তিনটি (পঁয়ত্রিশ, ছত্রিশ এবং সাঁইত্রিশতম) শ্লোকে তত্ত্বজ্ঞানের প্রকৃত মাহাত্ম্য জানাচ্ছেন।

যজ্ জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি॥ ৩৫ ॥

[**যজ্, জ্ঞাত্বা** (যা অনুভব করলে) ; **পুনঃ, এবম্** (আর, এরূপ) ; **মোহম্, ন, যাস্যসি** (মোহগ্রস্ত হবে না) ; **পাণ্ডব** (হে অর্জুন !) ; **যেন** (যার দ্বারা) ; **ভূতানি** (সকল প্রাণীকে) ; **অশেষেণ** (সার্বিকভাবে) ; **আত্মনি** (নিজের মধ্যে) ; **অথো** (তারপরে) ; **ময়ি** (আমাতে সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মায়) ; **দ্রক্ষ্যসি** (দেখতে সক্ষম হবে।)]

যা (তত্ত্বজ্ঞান) অনুভব করলে তুমি আর এরূপ মোহগ্রস্ত হবে না এবং হে অর্জুন ! যে (তত্ত্বজ্ঞানের) দ্বারা তুমি সকল প্রাণীকে সামগ্রিকরূপে প্রথমে নিজের মধ্যে এবং পরে আমার (সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মায়) মধ্যে দেখতে সক্ষম হবে ॥ ৩৫ ॥

ব্যাখ্যা—'যজ্ জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব'—আগের শ্লোকে ভগবান বলেছিলেন যে এই মহাপুরুষগণ তোমাকে তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ দেবেন ; কিন্তু উপদেশ শুনলেই বাস্তবিক বোধ অর্থাৎ স্বরূপের

[১]উত্তম অধিকারী সেই হয়, যার তত্ত্বপ্রাপ্তি করার তীব্র ইচ্ছা থাকে, যার তত্ত্বপ্রাপ্তির ব্যাপারে ভবিষ্যৎ ভালো লাগে না, অর্থাৎ যে বর্তমানে তখনই তত্ত্বপ্রাপ্তি করতে চায়।

যাথার্থ্য অনুভব হয় না—**'শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ'** (গীতা ২।২৯) ; এবং বাস্তবিক বোধের বর্ণনাও কেউ করতে পারেন না। কারণ বাস্তবিক বোধ হল করণ-নিরপেক্ষ অর্থাৎ এটি মন ও বাণীর অতীত। সুতরাং বাস্তবিক বোধ স্বয়ং-এর দ্বারা স্বয়ং-এরই হয়ে থাকে এবং এটি তখনই হয়, যখন মানুষ নিজ বিবেককে (জড়-চেতনের ভেদাভেদ জ্ঞানকে) গুরুত্ব দিয়ে থাকে। বিবেককে গুরুত্ব দিলে যখন অবিবেক সর্বতোভাবে দূর হয়, তখন সেই বিবেক-ই বাস্তবিক বোধে পরিণত হয় এবং জড়ত্বের থেকে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে দেয়। বাস্তবিক বোধ হলে আর কখনো মোহ হয় না।

গীতার প্রথম অধ্যায়ে অর্জুনের এই মোহ হয়েছিল যে, যুদ্ধে সমস্ত আত্মীয়-কুটুম্বের মৃত্যু হলে তাঁদের জন্য শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি কে করবে ? শ্রাদ্ধ-তর্পণ না করলে তাঁদের নরকে পতন হবে। আর যারা জীবিত থাকবে, সেই নারী এবং শিশুদের জীবন-নির্বাহ এবং প্রতিপালন কীভাবে হবে ? ইত্যাদি। তত্ত্বজ্ঞান হলে এই মোহ আর থাকে না। বোধ জাগ্রত হলে জগতের সঙ্গে যখন 'আমি' ও 'আমার' ভাব থাকে না তখন পুনরায় মোহ উৎপন্ন হবার প্রশ্ন থাকে না।

'যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মনি'—তত্ত্বজ্ঞান হওয়ামাত্র এরূপ অনুভূতি হয় যে, আমার অস্তিত্বই যেন সর্বত্র পরিপূর্ণ এবং সেই অস্তিত্বের মধ্যেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে। স্বপ্নোত্থিত মানুষ যেমন স্বপ্নাবস্থার সৃষ্টিকে নিজের মধ্যে দেখে, তেমনি তত্ত্বজ্ঞান হলে মানুষ সমস্ত প্রাণীকে (জগৎকে) আপনাতে দেখে। ষষ্ঠ অধ্যায়ের উনত্রিশতম শ্লোকে উদ্ধৃত **'সর্বভূতানি চাত্মনি'** পদের দ্বারাও এই স্থিতির বর্ণনা করা হয়েছে।

'অথো ময়ি'—তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত করার যে প্রচলিত প্রক্রিয়া আছে, সেই অনুসারে ভগবান বলেছেন যে গুরুর নিকট হতে বিধিপূর্বক (শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসনপূর্বক) তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত করলে সাধক প্রথমে নিজ স্বরূপে সমস্ত প্রাণীকুল অবলোকন করেন—এটি হল 'ত্বম্' পদের অনুভব, এবং তখন তিনি স্বরূপকে অর্থাৎ সমস্ত প্রাণীকুলকে এক সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাতে অবলোকন করেন—এটি হল 'তৎ' পদের অনুভব। এইভাবে তাঁর প্রথম 'ত্বম্' (স্বরূপের) এবং পরে 'তৎ' (পরমাত্মতত্ত্বের) সঙ্গে 'ত্বম্' এর ঐক্য অনুভব হয়। শেষে একমাত্র ব্রহ্মই বিদ্যমান থাকেন। এই অবস্থায় দ্রষ্টা, দৃশ্য এবং দর্শন—তিনটির কোনোটিই থাকে না। কিন্তু লোকের দৃষ্টিতে তাঁর নিজের বলে যে অন্তঃকরণ তাতে যে ভাব দেখা যায়, সেটিকে ধরে ভগবান বলেছেন যে, তিনি আমাতেই সব কিছু দেখেন। স্থূল দৃষ্টিতে দেখলে সমুদ্র এবং তার ঢেউয়ের কোনো পৃথক অস্তিত্ব নেই। এক জলেরই দুই অস্তিত্ব। জলতত্ত্বে সমুদ্রও নেই, ঢেউও নেই। পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় সমুদ্রও সীমিত, ঢেউও সীমিত। কিন্তু জলতত্ত্ব সীমিত নয়। সুতরাং সমুদ্র এবং শরীররূপী ঢেউয়ে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। শরীর জগতেই উৎপন্ন এবং লুপ্ত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জগৎ এবং শরীর ইত্যাদির কোনো পৃথক অস্তিত্ব নেই। পরমাত্মতত্ত্বে জগৎও নেই, শরীরও নেই। প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় জগৎ এবং শরীর—সবই সীমিত। কিন্তু পরমাত্মতত্ত্ব সীমিত নয়। অতএব জগৎ বা শরীরে দৃষ্টিপাত না করে একমাত্র পরমাত্মতত্ত্বকে দেখাই হল যথার্থ দেখা (গীতা ১৩।২৭)।

পরিশিষ্ট-ভাব— তত্ত্বজ্ঞান অথবা অজ্ঞান নাশ একবারই হয় এবং তা হয় চিরকালের জন্যই। তাৎপর্য হল যে, তত্ত্বজ্ঞানের পুনরাবৃত্তি হয় না। এটি একবার অনুভূত হওয়া মানেই চিরকালের জন্য অনুভূত হওয়া। কারণ অজ্ঞানের যেহেতু কোনো পৃথক অস্তিত্ব থাকে না, তাই পুনরায় অজ্ঞানতা আসে না। সুতরাং নিত্যনিবৃত্ত যে অজ্ঞান তারই নিবৃত্তি হয় এবং নিত্যপ্রাপ্ত যে তত্ত্ব তারই প্রাপ্তি হয়।

স্ব-স্বরূপ অস্তিত্বমাত্র এবং বোধস্বরূপ। বোধকে অনাদর করার অর্থ অসৎকে স্বীকার করা এবং অসৎকে স্বীকার করলে বিবেকহীন হতে হয়। তাৎপর্য হল যে আমরা বোধ থেকে বিমুখ হয়ে অসৎকে অস্তিত্ব দিই এবং অসৎকে অস্তিত্ব দেওয়ায় বিবেকের অসম্মান হয়। প্রকৃতপক্ষে বোধের অনাদর করা হয়নি, অনাদিকাল থেকে এর অনাদর আছে। যদি মনে করা হয় যে আমরা বোধের অনাদর করেছি, তাহলে প্রমাণ হয় যে আগে বোধকে মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং এখন মর্যাদা দিলে পুনর্বার অনাদর হতে পারে। কিন্তু বোধ একবারই হয় এবং তা চিরকালের জন্যই হয়।

তত্ত্বজ্ঞান হলে আর মোহ হয় না, কেননা প্রকৃতপক্ষে মোহ বলে কিছু নেই-ই। সেটিই মিটে যায়, যা নেই আর পাওয়া যায় তাকেই, যা আছে।

জগৎ জীবের অন্তর্গত আর জীব পরমাত্মার অন্তর্গত, তাই সাধক প্রথমে জগৎকে নিজের মধ্যে দেখেন— **'দ্রক্ষ্যস্যাত্মনি'**, তারপর নিজেকে পরমাত্মার মধ্যে দেখেন—**'অথো ময়ি'**। **'দ্রক্ষ্যস্যাত্মনি'**-তে আত্মজ্ঞান (জ্ঞান) আছে আর **'অথো ময়ি'**-তে পরমাত্মজ্ঞান (বিজ্ঞান) থাকে। আত্মজ্ঞানে নিজানন্দ আর পরমাত্মজ্ঞানে থাকে পরমানন্দ। লৌকিক নিষ্ঠা (কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ) দ্বারা আত্মজ্ঞান অনুভবে আসে আর অলৌকিক নিষ্ঠা (ভক্তিযোগ) দ্বারা পরমাত্মজ্ঞান অনুভূত হয়।

সবই ভগবান—এই সার্বিক জ্ঞানই হল **'পরমাত্মজ্ঞান'**। আত্মজ্ঞানের দ্বারা মুক্তি লাভ হলেও অহং-এর সূক্ষ্মরেশ থেকে যায়, যার ফলে দার্শনিকদেরও তাঁদের দর্শনে মতপার্থক্য থেকে যায়। সূক্ষ্ম অহংবোধ না থাকলে মতপার্থক্য হবে কেন? অপরপক্ষে পরমাত্মজ্ঞানে সূক্ষ্ম অহং-এর কোনো রেশ থাকে না এবং সূক্ষ্ম অহং থেকে উদ্ভূত সমস্ত দার্শনিক মতপার্থক্য শেষ হয়ে যায়। তাৎপর্য হল এই যে যতক্ষণ **'আত্মনি'** থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত দার্শনিক মতপার্থক্য থাকে। যখন **'বাসুদেবঃ সর্বম্'** অনুভূত হয় তখন সমস্ত মতপার্থক্য দূর হয়ে **'অথো ময়ি'** হয়ে যায়। **'অথো ময়ি'**-তে একমাত্র পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কোনো অস্তিত্ব থাকে না।

※ ※ ※

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥ ৩৬ ॥

[**চেৎ, পাপেভ্যঃ** (যদি সকল) ; **পাপেভ্যঃ, অপি** (পাপীর থেকেও) ; **পাপকৃত্তমঃ, অসি** (অধিক পাপী হও) ; **জ্ঞানপ্লবেন** (জ্ঞানরূপী নৌকার সাহায্যে) ; **এব, সর্বম্** (নিঃসন্দেহে সমস্ত) ; **বৃজিনম্** (পাপ সমুদ্র) ; **সন্তরিষ্যসি** (পার হতে পারবে।)]

যদি তুমি সকল পাপীর থেকেও অধিক পাপী হও, তাহলেও তুমি জ্ঞানরূপ নৌকার সাহায্যে নিঃসন্দেহে সমস্ত পাপ-সমুদ্র সম্পূর্ণরূপে পার হতে পারবে ॥ ৩৬ ॥

ব্যাখ্যা—**'অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ'**—পাপ আচরণকারীদের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(১) **'পাপকৃৎ'** অর্থাৎ পাপাচরণকারী, (২) **'পাপকৃত্তর'** অর্থাৎ দুজন পাপীর মধ্যে একজনের থেকে বেশি পাপাচরণকারী, (৩) **'পাপকৃত্তম'** অর্থাৎ সকল পাপীর মধ্যে সব থেকে বেশি পাপাচরণকারী। এখানে **'পাপকৃত্তমঃ'** পদের প্রয়োগ করে ভগবান বলছেন যে, তুমি যদি সমস্ত পাপীদের মধ্যেও সবচেয়ে বেশি পাপকারী হও, তাহলেও তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে তুমি সমস্ত পাপ হতে উদ্ধার পেতে সক্ষম।

ভগবানের এই কথাটি অত্যন্ত আশ্বাসপ্রদ। তাৎপর্য হল এই যে, যে ব্যক্তি পাপকাজ ত্যাগ করে সাধনে ব্যাপৃত হয়েছে, তার তো কথাই নেই, যে আগে অনেক পাপ করেছে, তারও চিত্তে যদি তত্ত্বজিজ্ঞাসা জাগ্রত হয় তবে তাকে নিজ উদ্ধারের বিষয়ে হতাশ হতে হয় না। কারণ ঘোরতর পাপী ব্যক্তিও যদি ইচ্ছা করে তবে সে এ জন্মেই নিজ কল্যাণ প্রাপ্ত হতে সক্ষম হয়। পুরানো পাপ ততো বাধা হয় না, যতো বাধা নতুন পাপে হয়। মানুষ যদি বর্তমানে পাপ হতে নিবৃত্ত হয় এবং দৃঢ়নিশ্চিত হয় যে সে আর কখনো পাপ করবে না, শুধু তত্ত্বজ্ঞান লাভের চেষ্টা করবে, তাহলে তার পাপ দূর হতে বিলম্ব হয় না।

যে স্থান শত বৎসর ধরে ঘন অন্ধকারে আবৃত, সেই স্থানে প্রদীপ জ্বালালে সেই অন্ধকার দূর হতে একশো বছর লাগে না, প্রদীপ জ্বালানো মাত্রই অন্ধকার দূরীভূত হয়। এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান উদয় হলেই পূর্বকৃত সমস্ত পাপ সঙ্গে সঙ্গে দূর হয়।

'চেৎ' (যদি) ব্যবহারের তাৎপর্য হল এই যে, এরূপ মানুষ সাধারণতঃ পরমাত্মায় শরণাগত হয় না। কিন্তু তারা যে শরণাগত হতে পারে না তা নয়। কোনো মহাপুরুষের সংস্পর্শে অথবা কোনো ঘটনা, পরিস্থিতি, পরিবেশ

ইত্যাদির প্রভাবে যদি তাদের মনে এরূপ বিশ্বাস হয় যে, পরমাত্মতত্ত্ব-জ্ঞান অতি অবশ্যই প্রাপ্ত করা উচিত, তবে তারাও সমগ্র পাপ-সাগর থেকে সামগ্রিকভাবে উত্তীর্ণ হয়ে যায়।

নবম অধ্যায়ের ত্রিশ-একত্রিশতম শ্লোকেও ভগবান এরূপ কথাই যাঁরা অনন্যভাবে তাঁর ভজনা করেন তাঁদের সম্বন্ধে বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, অত্যন্ত দুরাচারী ব্যক্তিও যদি স্থির করে যে, এবার সে ভগবানেরই ভজনা করবে তাহলে তারও অত্যন্ত শীঘ্র কল্যাণ লাভ হয়।

'সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি'—প্রকৃতির কার্য শরীর এবং জগতের থেকে সমস্ত পাপ উদ্ভূত হয়। তত্ত্বজ্ঞান হলে যখন এই সব পাপ থেকে সর্বতোভাবে সম্পর্ক-বিচ্ছেদ হয়, তখন আর পাপ কী করে থাকবে ?—**'মূলাভাবে কুতঃ শাখা'**।

পরমাত্মার স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানকে নৌকার সঙ্গে তুলনা করে **'জ্ঞানপ্লব'** অর্থাৎ জ্ঞানরূপ নৌকার প্রাপ্তি বলা হয়েছে। মানুষ যতই পাপী হয়ে থাকুক না কেন, জ্ঞানরূপ নৌকার সাহায্যে সে এই পাপরূপ সাগর নিরাপদে পার হয়ে যায়। জ্ঞানরূপ এই নৌকা কখনো ফুটো হয় না বা ভেঙে যায় না, এটি কখনো ডোবেও না। এই নৌকা মানুষকে পাপ-সাগর পার করায়।

'জ্ঞানযজ্ঞ' (৪।৩৩) দ্বারাই এই জ্ঞানরূপ নৌকা লাভ করা যায়। জ্ঞানযজ্ঞের শুরু থেকেই **'বিবেক'** থাকে এবং **'তত্ত্বজ্ঞানে'** এটি পূর্ণতা লাভ করে। পূর্ণতা প্রাপ্ত হলে আর লেশমাত্র পাপ থাকে না।

পরিশিষ্ট-ভাব—ভগবান এই স্থানে **'পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ'** পদের সাহায্যে সর্বাপেক্ষা অধিক পাপীর কথা বলেছেন ! **'পাপেভ্যঃ'** পদটি বহুবচন হওয়ায় যদিও এটি সমস্ত পাপীদের বাচক, তা সত্ত্বেও ভগবান এখানে **'সর্বেভ্যঃ'** পদটি ব্যবহার করেছেন। **'সর্বেভ্যঃ'** পদটিও সম্পূর্ণতারই বাচক। এই দুটি পদ ব্যবহারের পরও ভগবান **'পাপকৃত্তমঃ'** পদটি ব্যবহার করেছেন, যা অতিশয়তার বাচক। শব্দটি প্রথমে **'পাপকৃৎ'**, পরে **'পাপকৃত্তর'** আর তার পরে **'পাপকৃত্তম'** হয়। এর থেকে অর্থ দাঁড়ায় যে, সমস্ত জগতে যত পাপী থাকতে পারে, সেই সব পাপী থেকেও যে অধিক পাপী, সেও জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম। কেননা পাপ যতই হোক, তা অসৎ আর জ্ঞান হল সৎ। সৎ-এর সামনে অসৎ থাকতে পারে না। পাপ অপবিত্র, কিন্তু জ্ঞান পরমপবিত্র (এই অধ্যায়ের আটত্রিশতম শ্লোক)। অপবিত্র বস্তু কী করে পবিত্র বস্তুকে রোধ করবে ? সুতরাং পাপ কখনো জ্ঞানকে রুদ্ধ করতে সক্ষম হয় না। জ্ঞান প্রাপ্তির প্রধান প্রতিবন্ধক হল বিনাশশীল সুখের আসক্তি (গীতা ৩।৩৭-৪১)। ভোগাসক্তির জন্যই মানুষের পারমার্থিক বিষয়ে রুচি হয় না এবং রুচি না হলে জ্ঞান প্রাপ্তি অত্যন্ত দুষ্কর হয়।

* * *

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।। ৩৭ ।।

[**অর্জুন** (হে অর্জুন !) ; **যথা** (যেমন) ; **সমিদ্ধঃ, অগ্নি** (প্রজ্বলিত অগ্নি) ; **এধাংসি** (ইন্ধন সমূহকে) ; **ভস্মসাৎ, কুরুতে** (সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত করে) ; **জ্ঞানাগ্নি, তথা** (তেমনি জ্ঞানরূপ অগ্নি) ; **সর্বকর্মাণি** (কর্মসমূহকে) ; **ভস্মসাৎ** (সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত) ; **কুরুতে** (করে দেয়।)]

হে অর্জুন ! প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন ইন্ধনসমূহকে সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত করে, জ্ঞানরূপ অগ্নি তেমনই কর্মসমূহকে সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত করে দেয় ।। ৩৭ ।।

ব্যাখ্যা—'যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন'—আগের শ্লোকে ভগবান জ্ঞানরূপী নৌকার সাহায্যে পাপ-সমুদ্র পার হওয়ার কথা বলেছিলেন। তাতে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে, পাপ-সমুদ্র তো শেষ পর্যন্ত থেকেই যায়, সেটির কি হয় ? তাই ভগবান অন্য আর একটি উদাহরণ দিয়ে জানাচ্ছেন যে, প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন সমস্ত কাষ্ঠ ইত্যাদি ইন্ধনকে সম্পূর্ণভাবে ভস্ম করে, তার আর কোনো অবশেষ থাকে না, তেমনি জ্ঞানরূপ অগ্নি সমস্ত পাপকে এমনভাবে ভস্ম করে যে তার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

'জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা'—অগ্নি যেমন কাঠকে ভস্ম করে দেয়, তেমনি তত্ত্বজ্ঞান-রূপ অগ্নি সঞ্চিত, প্রারব্ধ এবং ক্রিয়মাণ—এই তিন কর্মকেই ভস্মীভূত করে দেয়। যেমন অগ্নিতে কাঠের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, তেমনই তত্ত্বজ্ঞান হলে সমস্ত কর্ম আপনিই বিনষ্ট হয়ে থাকে । তাৎপর্য হল এই যে, জ্ঞান হলে কর্ম থেকে এবং জগৎ-সংসার থেকে সম্পর্ক সর্বতোভাবে বিচ্ছিন্ন হয়। সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হলে জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অনুভূত হয় না। প্রকৃতপক্ষে এক পরমাত্মতত্ত্বই শেষ পর্যন্ত বিদ্যমান হয়ে থাকে।

বাস্তবে ক্রিয়ামাত্রই প্রকৃতি দ্বারা সংঘটিত হয় (গীতা ১৩।২৯)। সেই ক্রিয়াগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলেই সেটি কর্ম হয়। শিরা-উপশিরায় রক্ত-প্রবাহিত হওয়া, শরীরের বাল্যাবস্থা থেকে যুবাবস্থা প্রাপ্তি, শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া, খাদ্য হজম হওয়া ইত্যাদি ক্রিয়া যে সমষ্টি প্রকৃতির দ্বারা সংঘটিত হয়, সেই প্রকৃতির দ্বারাই খাওয়া-দাওয়া, চলা-বসা, দেখা, কথা বলা ইত্যাদি ক্রিয়াও হয়। কিন্তু মানুষ অজ্ঞানতাবশতঃ ওই ক্রিয়াগুলির সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করে অর্থাৎ নিজেকে ওই ক্রিয়াগুলির কর্তা বলে ভেবে নেয়। তাতেই এই ক্রিয়াগুলি 'কর্ম' রূপ ধারণ করে মানুষকে আবদ্ধ করে। এইরূপ মেনে নেওয়া সম্বন্ধ দ্বারাই ক্রিয়াগুলি 'কর্ম' হয়ে যায়।

তত্ত্বজ্ঞান হলে বহু জন্মের সঞ্চিত কর্ম সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। কারণ সকল সঞ্চিত কর্মই অজ্ঞানকে আশ্রয় করে থাকে । সুতরাং জ্ঞানলাভ হলেই (আশ্রয়, আধাররূপ অজ্ঞান না থাকায়) এগুলি নষ্ট হয়ে যায়। তত্ত্বজ্ঞান হলে কর্তৃত্বাভিমান থাকে না ; তখন সমস্ত ক্রিয়মাণ কর্ম অকর্ম হয়ে যায় অর্থাৎ ফলদায়ক হয় না। প্রারব্ধ-কর্মের ফলগুলি (অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতি), শরীর যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ থাকলেও জ্ঞানী ব্যক্তিদের ওপর তার প্রভাব পড়ে না। কারণ তত্ত্বজ্ঞান হলে ভোক্তৃত্ব থাকে না। অতএব অনুকূল বা প্রতিকূল পরিস্থিতি উপস্থিত হলে তিনি সুখী বা দুঃখী হন না। এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান হলে সঞ্চিত, প্রারব্ধ এবং ক্রিয়মাণ—তিন কর্মের সঙ্গেই কিছুমাত্র সম্পর্ক থাকে না। কর্মের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকায় কর্ম থাকে না, ভস্ম থেকে যায় অর্থাৎ সমস্ত কর্মই অকর্মে পরিণত হয়।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—ভগবান পরবর্তী শ্লোকের পূর্বার্ধে তত্ত্বজ্ঞানের মাহাত্ম্য জানিয়ে শেষার্ধে কর্মযোগের বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রকটিত করেছেন।

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮ ॥

[**ইহ** (এই মনুষ্যলোকে) ; **জ্ঞানেন, সদৃশম্** (জ্ঞানের সমান) ; **পবিত্রম্** (পবিত্রতাকারক) ; **হি, ন, বিদ্যতে** (আর কোনো সাধন নেই) ; **যোগসংসিদ্ধঃ** (যার যোগ ঠিকভাবে সিদ্ধ হয়েছে) ; **তৎ** (এই তত্ত্বজ্ঞানকে) ; **কালেন, স্বয়ং** (অবশ্যই আপনিই) ; **আত্মনি** (নিজের মধ্যে) ; **বিন্দতি** (লাভ করেন।)]

এই মনুষ্যলোকে নিঃসন্দেহে জ্ঞানের সমান পবিত্রকারী আর কোনো সাধন নেই। যে ব্যক্তির যোগ যথাযথ সিদ্ধ হয়েছে, সেই কর্মযোগী পুরুষ অবশ্যই এই তত্ত্বজ্ঞানকে নিজেই নিজের মধ্যে লাভ করে থাকেন ॥ ৩৮ ॥

ব্যাখ্যা—**'ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে'** — এখানে **'ইহ'** পদটি মনুষ্যলোকের বাচক ; কারণ সমস্ত পবিত্রতা এই মনুষ্যলোকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। পবিত্রতা প্রাপ্ত হওয়ার অধিকার এবং সুযোগ একমাত্র মনুষ্য-দেহেই আছে। অন্য কোনো দেহধারীর এই অধিকার থাকে না। অন্যান্য লোকে যাওয়ার অধিকারও মনুষ্যলোক থেকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

জগৎ-সংসারের স্বতন্ত্র সত্তা মেনে নিলে এবং তার থেকে সুখ পাবার আশা করলেই সমস্ত দোষ উৎপন্ন হয় (গীতা ৩।৩৭)। তত্ত্বজ্ঞান হলে যখন জগতের পৃথক (স্বতন্ত্র) সত্তাই বিলুপ্ত হয়ে যায়, তখন সমস্ত পাপ সর্বতোভাবে দূরীভূত হয়ে যায় এবং মহাপবিত্রভাব আসে।

এইজন্য জগতে জ্ঞানের ন্যায় পবিত্রকারী অন্য কোনো সাধন নেই।

জগতে যজ্ঞ-দান-তপস্যা-পূজা-ব্রত-উপবাস-জপ-ধ্যান-প্রাণায়াম ইত্যাদি যতপ্রকার সাধন আছে এবং গঙ্গা-যমুনা-গোদাবরী ইত্যাদি যত তীর্থ আছে, সেগুলি সমস্তই পাপ নাশ করে মানুষকে পবিত্র করে। কিন্তু এই সবের মধ্যেও তত্ত্বজ্ঞানের মতো পবিত্রকারী কোনো সাধন বা তীর্থাদি নেই। কারণ এগুলি সবই হল তত্ত্বজ্ঞানের সাধন এবং তত্ত্বজ্ঞান হল সাধ্য।

পরমাত্মা সকল পবিত্রের চেয়েও পবিত্র—**'পবিত্রাণাং পবিত্রম্'** (বিষ্ণুসহস্রনাম ১০)। সেই পরমপবিত্র পরমাত্মার অনুভবকারী হওয়ায় তত্ত্বজ্ঞানও অত্যন্ত পবিত্র।

'যোগসংসিদ্ধঃ'—যাঁর কর্মযোগ সিদ্ধ হয়েছে অর্থাৎ কর্মযোগের অনুষ্ঠান সর্বাঙ্গীণভাবে পূর্ণ হয়েছে, সেই মহাপুরুষকে এখানে **'যোগসংসিদ্ধঃ'** বলা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে তাঁকেই **'যোগারূঢ়'** বলা হয়েছে। কর্মযোগের একেবারে চরম অবস্থাকে বলা হয় **'যোগারূঢ়'** হওয়া। যোগারূঢ় হলেই তত্ত্ববোধ হয়। তত্ত্ববোধ হলে জগৎ-সংসার হতে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্ক- ছেদ হয়ে যায়।

কর্মযোগের প্রধান বিষয় হল—নিজের জন্য কিছু না করে সমস্ত কর্ম জগতের হিতার্থে করা। এরূপ করলে সামগ্রী এবং ক্রিয়াশক্তি—দুইয়েরই প্রবাহ জগতের সেবার্থে হয়। প্রবাহ জগৎ সেবার্থে হলে 'আমি সেবক' এরূপ (অহং)ভাবও থাকে না অর্থাৎ সেবক থাকে না, শুধু সেবা থেকে যায়। এইরূপে সেবক যখন সেবা হয়ে সেব্যে লীন হয়ে যান, তখন প্রকৃতির কার্য—শরীর এবং সংসার থেকে সর্বতোভাবে সম্পর্ক ছেদ হয়ে যায়। সম্পর্ক ছেদ হলে জগতের আর পৃথক সত্তা বলে কিছু থাকে না কেবল ক্রিয়াই থাকে। একেই বলা হয় যোগ-সংসিদ্ধি অর্থাৎ সম্যক্ সিদ্ধি।

কর্ম এবং ফলাসক্তির জন্যই 'যোগ' অনুভব হয় না। প্রকৃতপক্ষে কর্ম এবং পদার্থগুলি থেকে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া স্বতঃসিদ্ধ। কারণ কর্ম এবং পদার্থ অনিত্য (অর্থাৎ এগুলি আদি ও অন্ত বিশিষ্ট) এবং নিজ স্বরূপ হল নিত্য। অনিত্য কর্ম থেকে নিত্যস্বরূপ কী পেতে পারে ? তাই কর্মের দ্বারা স্বরূপের কিছুই পাবার নেই—এই হল **'কর্মবিজ্ঞান'**। কর্মবিজ্ঞান সাধিত হলে কর্মফল থেকে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ হয়ে যায় অর্থাৎ কর্মজনিত সুখ গ্রহণ করার আসক্তি সর্বতোভাবে দূর হয়, যেটি দূর হলেই পরমাত্মার সঙ্গে নিজ স্বাভাবিক নিত্যসম্পর্ক অনুভূত হয়, যাকে বলা হয় **'যোগবিজ্ঞান'**। যোগবিজ্ঞান অনুভব হওয়াই হল যোগের সংসিদ্ধি।

'তৎ স্বয়ং কালেনাত্মনি বিন্দতি'—যে তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে সমস্ত কর্ম ভস্ম হয়ে যায় এবং যার সমান পবিত্রকারক জগতে আর দ্বিতীয় কোনো সাধন নেই, কর্মযোগী যোগসংসিদ্ধ হলে অন্য কোনো সাধন ছাড়াই সেই তত্ত্বজ্ঞান নিজে থেকেই তৎক্ষণাৎ প্রাপ্ত হন।

চৌত্রিশতম শ্লোকে ভগবান জানিয়েছেন যে, প্রচলিত প্রণালী অনুযায়ী কর্মত্যাগ করে গুরুর কাছে গেলে তিনি তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দেবেন—**'উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানম্'**। কিন্তু গুরু উপদেশ দিলেই যে তত্ত্বজ্ঞান হবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু ভগবান এখানে বলেছেন যে, কর্মযোগ অনুসারে যাঁরা কর্ম করেন তাঁদের যোগসংসিদ্ধি হলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়।

উপরিউক্ত পদে উদ্ধৃত **'কালেন'** পদটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করার যোগ্য। ভগবান ব্যাকরণের দৃষ্টিতে **'কালেন'** পদটিতে তৃতীয়া বিভক্তি প্রযুক্ত করে জানাচ্ছেন যে, কর্মযোগের দ্বারা অবশ্যই তত্ত্বজ্ঞান অথবা পরমাত্মতত্ত্বের অনুভব হয়ে থাকে[১]।

'স্বয়ম্' পদ ব্যবহারের তাৎপর্য হল এই যে, তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত করার জন্য কর্মযোগীর কোনো গুরু, গ্রন্থ বা অপর কোনো সাধনের উপর নির্ভর করতে হয় না। কর্মযোগ

[১]'কালেন'—এই শব্দটিতে 'কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগে' (পাণিনিসূত্র ২।৩।৫)-এর দ্বারা প্রাপ্ত দ্বিতীয়া বিভক্তির নিষেধ করে 'অপবর্গে তৃতীয়া' (ঐ ২।৩।৬) দ্বারা তৃতীয়া বিভক্তি হয়েছে। যে স্থানে অবশ্যই ফলপ্রাপ্তির অর্থাৎ কার্যসিদ্ধি হওয়ার দ্যোতন হয়, সেখানেই তৃতীয়া বিভক্তি হয়। কিন্তু যেখানে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়, সেখানে ফল প্রাপ্তির দ্যোতন নিশ্চিত নয় ; যেমন—'মাসম্ অধীতে' পদটি দ্বিতীয়াতে প্রযুক্ত হয়, এর অর্থ হল এক মাসেও পুরো না পড়তে পারা। কিন্তু এই পদটিই যদি 'মাসেন অধীতে' এইভাবে তৃতীয়াতে প্রযুক্ত হোত, তবে এর অর্থ হোত এক মাসেই পুরো পড়ে নেওয়া। এইজন্য ভগবান এখানে দ্বিতীয়াতে 'কালম্' পদ না দিয়ে তৃতীয়াতে 'কালেন' পদ ব্যবহার করেছেন, যাতে অর্থ হয় যে, কর্মযোগ দ্বারা অবশ্যই ফলপ্রাপ্তি (সিদ্ধি) হয়।

বিধিতে কর্তব্য-কর্ম করতে করতেই তাঁর আপনিই তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হয়।

'আত্মনি বিন্দতি'—পদটির তাৎপর্য হল এই যে, তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার জন্য কর্মযোগীর অন্যত্র যাবার প্রয়োজন হয় না। কর্মযোগ সিদ্ধ হলে তাঁর নিজের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান অনুভব হয়।

সর্বত্র পরিপূর্ণ হওয়ায় পরমাত্মা নিজের মধ্যেও স্থিত। সাধক যেখানে 'আমি' রূপে নিজেকে মনে করেন, সেখানেও পরমাত্মা বিরাজ করেন। কিন্তু পরমাত্মা হতে বিমুখ হয়ে জগতের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করলে নিজ মধ্যস্থ পরমাত্মাকে অনুভব করা যায় না। ঠিকভাবে কর্মযোগের অনুষ্ঠান পালন করলে যখন জগৎ-সংসার হতে একেবারে সম্পর্ক-ছেদ হয়ে যায় অর্থাৎ জগতের সঙ্গে তাদাত্ম্য, মমতা, কামনা দূর হয়ে যায়, তখন তাঁর আপনিই অতি সহজে তত্ত্ব অনুভব হয়ে থাকে—**'নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে'** (গীতা ৫।৩)।

পরমাত্মতত্ত্বের জ্ঞান হল করণ-নিরপেক্ষ। সেইজন্য এর অনুভব আপনা হতেই হতে পারে, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি করণের দ্বারা হয় না। সাধক যে কোনো উপায়েই তত্ত্ব জানার চেষ্টা করুন না কেন, শেষঅবধি তিনি নিজে নিজেই তত্ত্ব জেনে যান। তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তির অসম্ভাবনা, বিপরীত ভাবনা ইত্যাদি বাধাগুলি দূর করার জন্য শ্রবণ-মনন ইত্যাদি সাধনকে পরম্পরাগত সাধন বলে মনে করলেও, প্রকৃতপক্ষে বোধ আপনিই হয়, কারণ মন-বুদ্ধি ইত্যাদি সবই হল জড় (পদার্থ)। জড়ের দ্বারা এই চিন্ময় তত্ত্বকে জানা কী করে সম্ভব, যা সর্বতোভাবে জড়ের অতীত ? বাস্তবে, জড়ের সঙ্গে সম্পর্ক-ছেদ হলেই তত্ত্ব অনুভব হয়, জড়ের দ্বারা হয় না। যেমন চোখের দ্বারা জগৎকে দেখা গেলেও চোখের দ্বারা চোখকে দেখা যায় না। তবে এটি বলা যায় যে, যার দ্বারা দেখা হচ্ছে সেটি চোখ। এইরূপ যিনি সকলের সবকিছুকে জানছেন তাঁকে কার দ্বারা জানা সম্ভব—**'বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ'** (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ২।৪।১৪) ? যার দ্বারা সমস্ত বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান হয়, পরমাত্মতত্ত্ব হল তাই।

বিশেষ কথা

এই অধ্যায়ের তেত্রিশ থেকে সাঁইত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত ভগবান জ্ঞান সম্পর্কে যে কথা বলেছেন, তাতে জ্ঞানযোগের বিশেষ মহিমার প্রকাশ দেখা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটিকে জ্ঞানযোগের মহিমা বলেই মেনে নেওয়া ঠিক নয়। গভীরভাবে বিচার করলে দেখা যায় এতে অর্জুনের প্রতি ভগবানের এই গূঢ় অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে যে, যে তত্ত্বজ্ঞান এতো মহান ও পবিত্র এবং যে জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য আমি তোমাকে তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের নিকট যেতে নির্দেশ দিচ্ছি, সেই জ্ঞান তুমি কর্মযোগের সাহায্যে নিজেই প্রাপ্ত করতে সক্ষম—**'তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি'** (গীতা ৪।৩৮)। এইভাবে জ্ঞানযোগের প্রশংসাসূচক এই শ্লোকটি প্রকৃতপক্ষে প্রকারান্তরে কর্মযোগের বিশেষত্ব এবং মাহাত্ম্য জানাতেই বলা হয়েছে। অর্জুন জ্ঞানী ব্যক্তিদের কাছে গিয়ে জ্ঞান আহরণ করুক, এমন অভিপ্রায় ভগবানের ছিল না। ভগবানের অভিপ্রায় ছিল এই যে, যে জ্ঞান এত কষ্টসাধ্য উপায়ে, জ্ঞানীদের কাছে বাস করে, তাঁদের সেবা করে, বিনীত প্রশ্নোত্তরের দ্বারা, শ্রবণ-মনন ও নিদিধ্যাসন করে প্রাপ্ত করতে হয়, সেই জ্ঞানই তুমি কর্মযোগের বিধি অনুসারে প্রাপ্ত কর্তব্য (যুদ্ধ) পালনের দ্বারা লাভ করবে। যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার জন্য আমি তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের কাছে যাবার প্রেরণা দিয়েছি, সেই তত্ত্বজ্ঞান সেভাবে যে প্রাপ্ত হবেই, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। কারণ যে ব্যক্তির কাছে যাবে—তিনি যে তত্ত্বদর্শী, তা কী করে জানবে ? এবং ওই মহাপুরুষের প্রতি তোমার শ্রদ্ধাও কম থাকতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, এই প্রক্রিয়াতে প্রথমে সমস্ত প্রাণীকে এক পরমাত্মতত্ত্বে দেখতে (গীতা ৪।৩৫) হবে। এইরূপ জ্ঞান প্রাপ্ত করার রীতিতে সংশয় ও বিলম্বের সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু কর্মযোগের সাহায্যে অন্য ব্যক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে অচিরে নিশ্চিতভাবে তত্ত্বজ্ঞান অনুভব হয়। 'তাই আমি মনে করি কর্মযোগই তোমার পক্ষে ঠিক পথ ; অতএব প্রচলিত রীতিতে কোনো জ্ঞান, উপদেশ আমি তোমাকে দেব না।'

ভগবান তো মহাপুরুষদেরও মহাপুরুষ। সুতরাং তিনি অর্জুনকে অন্য কোনো মহাপুরুষের কাছে জ্ঞান আহরণের কথা কেন বলবেন ? এই অধ্যায়ের পরবর্তী একচল্লিশতম শ্লোকে ভগবান কর্মযোগের প্রশংসা করে বিয়াল্লিশতম শ্লোকে অর্জুনকে সমতাতে স্থিত হয়ে যুদ্ধ করার জন্য স্পষ্টভাবে আদেশ দিয়েছেন।

পরিশিষ্ট-ভাব— 'পবিত্রমিহ'— জাগতিক সম্পর্ক থেকেই অপবিত্রতা আসে। তত্ত্বজ্ঞান হলে যখন জগৎ-সংসার অত্যন্ত গুরুত্বহীন হয়ে যায়, তখন অপবিত্রতা থাকার প্রশ্ন আসে না। তাই জ্ঞানে বিন্দুমাত্র অপবিত্রতা, জড়তা এবং বিকার নেই।

'ইহ' পদটি **'লোক'**-এর বাচক। তাৎপর্য হল যে তত্ত্বজ্ঞান লৌকিক, আর পরমাত্মজ্ঞান হল অলৌকিক।

*** *** ***

সম্বন্ধ—ভগবান এবার পরবর্তী শ্লোকে জ্ঞানপ্রাপ্ত করার উপযুক্ত পাত্রের পরিচয় জানাচ্ছেন।

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥ ৩৯ ॥

[**সংযতেন্দ্রিয়ঃ** (জিতেন্দ্রিয়) ; **তৎপরঃ** (সাধনপরায়ণ) ; **শ্রদ্ধাবান্** (শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি) ; **জ্ঞানম্, লভতে** (জ্ঞানলাভ করেন) ; **জ্ঞানম্, লব্ধ্বা** (আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে) ; **অচিরেণ** (অচিরেই) ; **পরাম্, শান্তিম্** (পরম শান্তি) ; **অধিগচ্ছতি** (লাভ করেন।)]

যিনি জিতেন্দ্রিয় এবং সাধনপরায়ণ এরূপ শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করেন এবং আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে তিনি অচিরেই পরম শান্তি লাভ করেন ॥ ৩৯ ॥

ব্যাখ্যা—'তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়'—এই শ্লোকে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তির জ্ঞান লাভ করার কথা বলা হয়েছে। নিজের মধ্যে শ্রদ্ধার ভাব কম থাকলেও মানুষ ভ্রমবশতঃ নিজেকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাযুক্ত বলে মনে করতে পারে। তাই ভগবান শ্রদ্ধাকে জানবার উপযুক্ত দুটি বিশেষণ ব্যবহার করেছেন—**'সংযতেন্দ্রিয়ঃ'** এবং **'তৎপরঃ'**।

যাঁর ইন্দ্রিয়াদি সম্পূর্ণ নিজ বশীভূত, তিনি **'সংযতেন্দ্রিয়'** আর যিনি একাগ্রভাবে তাঁর সাধনায় ব্যাপৃত, তিনি হলেন **'তৎপরঃ'**। সাধনায় তৎপরতার বিচার হল—ইন্দ্রিয়ের সংযম। ইন্দ্রিয় যদি সংযত না হয় এবং তা বিষয় ভোগের জন্য ব্যস্ত হয়, তবে বুঝতে হবে সাধন-পরায়ণতার অভাব রয়েছে।

'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্'—পরমাত্মায়, মহাপুরুষে, ধর্মে এবং শাস্ত্রে সশ্রদ্ধ প্রত্যক্ষবৎ বিশ্বাস হওয়াকে **'শ্রদ্ধা'** বলা হয়।

পরমাত্মতত্ত্ব যতক্ষণ অনুভবে না আসে, ততক্ষণ প্রত্যক্ষের থেকেও বেশি করে পরমাত্মাতে বিশ্বাস রাখতে হয়। প্রকৃতপক্ষে দেশ-কাল ইত্যাদি পরমাত্মার থেকে দূরে নেই, দূরত্ব শুধু মেনে নেওয়া হয়েছে। এই দূরত্ব মানার জন্যই পরমাত্মা সর্বত্র বিদ্যমান হলেও, অনুভূত হন না। তাই 'পরমাত্মা আমার মধ্যে আছেন, এরূপ মেনে নেওয়াকেই শ্রদ্ধা বলা হয়। মানুষ যেমনই হোক না কেন, সে যদি একমাত্র পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করতে চায়' এবং 'পরমাত্মা আমার মধ্যেই আছেন' এরূপ শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়, তবে তাঁর পরমাত্মতত্ত্বের জ্ঞান অবশ্যম্ভাবী হয়ে থাকে।

জগৎ প্রতিমুহূর্তে গতিময়, একমুহূর্তও স্থির নয়। এর কোনো পৃথক অস্তিত্ব নেই। পরমাত্মার সত্তাতেই এর অস্তিত্ব প্রকাশমান। এইরূপ জগতের পৃথক অস্তিত্ব না মেনে একমাত্র পরমাত্মার অস্তিত্বকে মেনে নেওয়াই হল শ্রদ্ধা। এরূপ শ্রদ্ধা হলে শীঘ্রই জ্ঞান লাভ হয়।

যতক্ষণ ইন্দ্রিয়াদি সংযত না হয় এবং সাধনে তৎপরতা না আসে, ততক্ষণ শ্রদ্ধার অভাব আছে বলে বুঝতে হবে। যদি ইন্দ্রিয়াদি বিষয় সংসর্গে যায়, তাহলে সাধনে তৎপরতা আসে না। সাধনে তৎপরতা না হলে অন্য পরায়ণতা অর্থাৎ অন্য পদার্থের প্রতি ভালোবাসা আসে। সাধনায় পরায়ণতা না আসা পর্যন্ত শ্রদ্ধাও পুরোপুরি আসে না। শ্রদ্ধা পুরোপুরি না থাকায় তত্ত্ব অনুভবে বিলম্ব ঘটে, নচেৎ নিত্যপ্রাপ্ত তত্ত্ব-অনুভবে বিলম্বের কোনো কারণই নেই।

এই অধ্যায়ের চৌত্রিশতম শ্লোকে ভগবান গুরুর নিকট গিয়ে বিধিপূর্বক জ্ঞানলাভের প্রণালী বর্ণনা করতে গিয়ে তিনটি সাধনের কথা জানিয়েছেন—প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন এবং সেবা। এখানে ভগবান জ্ঞানলাভ করার একটি

সাধনের কথা জানিয়েছেন—তা হল শ্রদ্ধা। চৌত্রিশতম শ্লোকে **'উপদেক্ষ্যন্তি'** পদ দ্বারা গুরুর জ্ঞান বা উপদেশ পেলেই যে জ্ঞানলাভ হবে, এমন কথা সেখানে বলা হয়নি। কিন্তু এই শ্লোকে **'লভতে'** পদ দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। তাৎপর্য হল এই যে, চৌত্রিশতম শ্লোকে কথিত সাধনের সাহায্যে জ্ঞান যে প্রাপ্ত হবেই তার কোনো নিশ্চয়তা নেই, কিন্তু এই শ্লোকে কথিত সাধনার সাহায্যে জ্ঞান নিশ্চিতরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কারণ হল এই যে, চৌত্রিশতম শ্লোকে কথিত সাধনটি বহিরঙ্গ হওয়ায় এটি কপটভাবে বা সাধারণভাবে করা সম্ভব। কিন্তু এই শ্লোকে কথিত সাধনটি অন্তরঙ্গ হওয়ায় কপটভাবে বা সাধারণভাবে সেটি করা সম্ভব নয় (গীতা ১৭।৩)। সেইজন্য জ্ঞান প্রাপ্তিতে শ্রদ্ধাই হল প্রধান।

এমন একটি তত্ত্ব বা বোধ আছে, যেটি আমি অনুভব করতে সক্ষম এবং এখনই তা পারি—এটিই হল প্রকৃতপক্ষে শ্রদ্ধা। তত্ত্বও বিদ্যমান, আমিও বিদ্যমান, সেই তত্ত্ব আমি অনুভব করতেও আগ্রহী, তবে দেরি কিসের ?

বিশেষ কথা

অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা হল এই যে, যা নিত্য বর্তমান, সেটি প্রিয় বলে মনে হয় না আর যা সর্বক্ষণ পরিবর্তিত হয়ে চলেছে, গতিশীল রয়েছে, সেই জগৎ প্রিয় বলে মনে হয়। এর কারণ হল এই, যে জগৎ একমুহূর্তও স্থির থাকে না, নিরন্তর ক্ষয়ের দিকে চলেছে, অথচ তাকে আমরা স্থায়ী বলে মনে করি। স্থায়ী মানার জন্যই তার থেকে স্থায়ী সুখ আস্বাদন করতে চাই, যেটি সর্বপ্রকারেই অসম্ভব।

সুখ পাবার জন্য আমরা জগতের সঙ্গে 'আপন-ভাব' তৈরি করে নিই, যা কোনো কালেই আপন নয়। নিজস্ব বস্তু হল তাই, যা কখনো আমাদের থেকে বিচ্যুত না হয় এবং আমরাও যা থেকে বিচ্যুত হতে না পারি। জগৎ-সংসার যদি আমাদের আপন হত তবে প্রত্যেক পরিস্থিতিই আমাদের সঙ্গে থাকত। কিন্তু পরিস্থিতিও আমাদের সঙ্গে থাকে না এবং আমরাও পরিস্থিতির সঙ্গে থাকি না। অতএব তা কোনোভাবেই আমাদের নয়। যে অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদির সহায়তায় আমরা জগৎ-সংসারকে দেখি, ভ্রমবশতঃ সেগুলিকেও আমরা নিজের বলে মনে করি। কিন্তু এগুলির ওপরও আমাদের কোনো অধিকার খাটে না। চিত্ত এবং ইন্দ্রিয়াদিসহ সমস্ত জগৎ প্রলয়ের পথে অগ্রসর হচ্ছে। এগুলির কোনো স্থায়িত্ব-ই নেই।

জগতের কেবলই প্রতীতি হয়ে থাকে, তাই তার প্রাপ্তি কখনোই সম্ভব নয়। জগৎ নিজ স্বরূপ পর্যন্ত যেতেই পারে না, কিন্তু স্বরূপ সর্বত্রই অস্তিত্ব রূপে বিরাজ করে। জগতের পৃথক কোনো অস্তিত্ব নেই, কিন্তু স্বরূপের অস্তিত্ব নিত্য-নিরন্তর বিদ্যমান। স্বরূপের অর্থাৎ নিজের অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ অনুভব হয়। স্বরূপ অপরিবর্তনীয়, এটি যদি পরিবর্তনশীল হত তাহলে জগতের পরিবর্তন অনুভব করত কে ? জগতের নিরন্তর পরিবর্তন এবং লয়ের অনুভব করলেও নিজের (স্বয়ং-এর) পরিবর্তন কিংবা লয় কখনোও অনুভব করি না। তবুও পরিবর্তনশীল শরীরের সঙ্গে নিজ স্বরূপের তাদাত্ম্য করে, শরীরের পরিবর্তনকে ভ্রমবশতঃ নিজ পরিবর্তন বলে মনে করি। শরীরের সঙ্গে নিজ সম্বন্ধ স্থাপন করে শরীরের অবস্থাকে নিজ অবস্থা বলে মেনে নিই। বিচার করে দেখতে হয় যে, যদি শারীরিক অবস্থার সঙ্গে আমরা এক হই, তাহলে অবস্থা চলে গেলে, আমাদেরও যেতে হত। এতেই প্রমাণিত হয় যে, পরিবর্তনশীল অবস্থা হল এক আর আমি হলাম অন্য। এইভাবে নিজ নিত্য সিদ্ধ স্বরূপের অনুভব হওয়াই হল 'জ্ঞান'।

দ্বিতীয়তঃ এই উনচল্লিশতম শ্লোকে **'লভতে'** পদটি আছে, যার তাৎপর্য হল—যে বস্তু নির্মিত হয় না, সেইরূপ নিত্যসিদ্ধ বস্তুর প্রাপ্তি। যে বস্তু নির্মিত হয় অর্থাৎ যে বস্তু আগে ছিল না, যাকে তৈরি করা হয়েছে সেই বস্তুর প্রাপ্তিকে **'লভতে'** বলা যায় না। কারণ যে বস্তু প্রথমে ছিল না এবং পরেও থাকবে না, সেরূপ বস্তুর প্রতীতি (ধারণা) হলেও, প্রাপ্তি হয় না। প্রতীত হওয়া বস্তুকে প্রাপ্ত বলে মনে করলে নিজের বিবেককে অসম্মান করা হয়।

যা জগৎ উৎপত্তি হওয়ার আগেও থাকে, জগৎ (উৎপন্ন হয়ে থাকার) স্থিতিতেও থাকে এবং জগৎ লয় হবার পরেও থাকে, সেই তত্ত্বকেই 'আছে' বলে বলা হয় এবং 'আছে'র প্রাপ্তিকেই **'লভতে'** বলা হয়। কিন্তু যে বস্তু উৎপন্ন হবার আগেও ছিল না এবং নষ্ট হবার পরেও থাকবে না এবং মধ্যবর্তী সময়েও সর্বদা লয়ের দিকে যাচ্ছে সেই বস্তুকে 'নেই' বলা হয়। 'নেই'-এর ধারণা (প্রতীতি) হয়, প্রাপ্তি হয় না। যা 'আছে' তা তো আছেই। আর যা

নেই, তা নেই-ই। 'নেই'-কে 'নেই' রূপে মেনে নিয়ে 'আছে'-কে 'আছে' রূপে মানা-ই হল শ্রদ্ধা, যাতে নিত্যসিদ্ধ জ্ঞান প্রাপ্তি হয়—**'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্'**।

'জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি'—নবম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে ভগবান নিষেধাত্মক ভাবে জানিয়েছিলেন যে, শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি তাঁকে প্রাপ্ত না হয়ে জন্ম-মরণরূপ চক্রে আবর্তিত হয়। সেই কথাই এখানে বিধিসম্মত বাক্যে জানাচ্ছেন যে, শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি পরমশান্তি প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ভগবানকে লাভ করে জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার-চক্র থেকে মুক্তি পান।

পরমশান্তি এখনই অনুভব না হওয়ার কারণ হল যে, যে বস্তু নিজের মধ্যেই আছে, তাকে সেখানে না খুঁজে অন্যত্র খোঁজার চেষ্টা করা। প্রত্যেক প্রাণীরই পরমশান্তি স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু মানুষ পরমশান্তি-স্বরূপ পরমাত্মা হতে বিমুখ হয়ে জাগতিক বস্তুতে শান্তি খুঁজে বেড়ায়। তাই বহু জন্ম ধরে শান্তির খোঁজে ঘুরে বেড়ালেও সে শান্তি পায় না। এই উৎপত্তি ও বিনাশশীল বস্তুসমূহে শান্তি পাবেই বা কীভাবে ? তত্ত্বজ্ঞান অনুভূত হলে যখন দুঃখরূপ জগৎ হতে সম্পর্ক চিরতরে বিচ্ছিন্ন হয়, স্বতঃসিদ্ধভাবে তখনই পরমশান্তি অনুভূত হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব—'শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্'— শ্রদ্ধা বিশ্বাস এবং বিচার বিবেচনার প্রয়োজন সমস্ত সাধকেরই থাকে। তবে কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগে বিচারের প্রাধান্য থাকে আর ভক্তিযোগে থাকে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের প্রাধান্য। আরম্ভে 'তত্ত্বজ্ঞান আছে' - এরূপ শ্রদ্ধা হলে, তাহলেই সাধক তার প্রাপ্তির জন্য সাধন করেন।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—যে ব্যক্তি জ্ঞানলাভের যোগ্য নয়, এরূপ বিবেকহীন সংশয়াত্মা মানুষদের পরবর্তী শ্লোকে ভগবান নিন্দা করেছেন।

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥ ৪০ ॥

[**অজ্ঞঃ** (বিবেকবোধহীন) ; **চ** (এবং) ; **অশ্রদ্দধানঃ** (শ্রদ্ধাবর্জিত) ; **সংশয়াত্মা** (সংশয়াকুল ব্যক্তির) ; **বিনশ্যতি** (পতন হয়) ; **সংশয়াত্মনঃ** (সংশয়াকুল ব্যক্তির) ; **ন, অয়ম্, লোকঃ** (ইহলোক) ; **অস্তি** (নেই) ; **ন, পরঃ** (পরলোকও নেই) ; **চ** (এবং) ; **ন, সুখম্** (সুখ নেই।)]

বিবেকবোধহীন (অজ্ঞ) এবং শ্রদ্ধাবর্জিত সংশয়াকুল ব্যক্তির পতন হয়। এরূপ সংশয়াকুল ব্যক্তির ইহলোক-পরলোক নেই এবং সুখও নেই ॥ ৪০ ॥

ব্যাখ্যা—'অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি'— যে ব্যক্তির বিবেক এখনো জাগ্রত হয়নি বা যতটা জাগ্রত হয়েছে তাতে গুরুত্ব দেয় না এবং যারা শ্রদ্ধাহীন—এরূপ সংশয়যুক্ত ব্যক্তিদের পারমার্থিক পথ থেকে পতন হয়। কারণ সংশয়াত্মা ব্যক্তির বুদ্ধি প্রাকৃত অর্থাৎ শিক্ষারহিত, এরা অন্যের বাক্যে মর্যাদা দেয় না, তাই এই ব্যক্তিদের সংশয় দূর হবে কীরূপে ? আর সংশয় দূর না হলে তাদের উন্নতি হওয়াই বা সম্ভব হয় কীভাবে ?

নানারকম কথা শুনে 'এটি ঠিক না ওইটি ঠিক ?' এরূপ সংশয়াপন্ন ব্যক্তিকে বলা হয় সংশয়াত্মা। পারমার্থিক পথের বিচরণকারী সাধকের সংশয় উৎপন্ন হওয়া স্বাভাবিক, তার কারণ তিনি কোনো বিষয়ে অনুধাবন করলে কিছু বোঝেন আর কিছু বুঝতে পারেন না। যে বিষয়ে কিছুই বোঝেন না, তাতে তাঁর সংশয় জন্মায় না আর যেটি পুরোপুরি বোঝেন, তাতেও সংশয় থাকে না। অতএব অর্ধজ্ঞান থেকেই সংশয় উৎপন্ন হয়, একেই বলা হয় অজ্ঞান[১]। অতএব সংশয় উৎপন্ন হওয়া হানিকর নয়, আসলে সংশয় বজায় রাখা এবং সেটি অপসারণের চেষ্টা না করাই হানিকর। সংশয় দূর করার চেষ্টা না করলে সেটিই ক্রমশঃ 'সিদ্ধান্তে' পরিণত হয়। কারণ সংশয় দূর না হলে,

[১]অজ্ঞানের অর্থ জ্ঞানের অভাব নয়। অর্ধজ্ঞানকে পূর্ণজ্ঞান বলে মনে করাই হল অজ্ঞানতা। কারণ পরমাত্মার অংশীভূত হওয়ায় জীবের জ্ঞানের অভাব হতেই পারে না। কেবলমাত্র বিনাশশীল অসৎ বস্তুর অস্তিত্ব মেনে নিয়ে তাকে গুরুত্ব দেওয়া, অসৎ

পারমার্থিক পথের সবই বুজরুকি—এরূপ ভাবনার উদয় হয়ে থাকে। এই ভেবে যে সেই পথ ত্যাগ করে সে নাস্তিক হয়ে যায়। পরিণামে তার পতন হয়। তাই সাধকের মনে সংশয় থাকলে তাঁর সে বিষয়ে উদ্বেগ থাকা উচিত। উদ্বেগ থাকলে মনে প্রশ্ন উদয় হয়, যার পূরণে সংশয়-বিনাশক জ্ঞান লাভ হয়।

সাধকের লক্ষণ হল—অনুসন্ধান করা। যদি তিনি মন ও ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে দেখা ও জানা ব্যাপারকেই সত্য বলে মনে করেন, তাহলে ওখানেই থেমে থাকতে হয়, আর অগ্রসর হতে পারেন না। সাধকের সর্বক্ষণ এগিয়ে যেতে হয়। যেমন রাস্তায় চলার সময় পথিকের দেখা উচিত নয় সে কত রাস্তা অতিক্রম করেছে, বরং দেখতে হয় আর কত পথ বাকি আছে, তবেই সে লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। তেমনি সাধকেরও দেখা উচিত নয় সে কতটা জেনেছে অর্থাৎ নিজের জ্ঞানে সন্তুষ্ট না হয়ে বরং যা সে ঠিকমতো জানে না, সেটি জানবার চেষ্টা করা উচিত । তাই মনে সংশয় থাকলে কখনো সন্তুষ্ট হতে নেই, বরং অগ্নিবৎ জিজ্ঞাসায় প্রজ্বলিত থাকা উচিত। এরূপ হলে সাধকের সংশয় সাধু-মহাত্মা অথবা গ্রন্থাদি, কোনো না কোনো প্রকারে দূর হয়। সংশয় দূর করার অন্য কেউ না থাকলে ভগবৎ কৃপাতেই তার সংশয় দূর হয়।

বিশেষ কথা

জীবাত্মা পরমাত্মার অংশীভূত—**'মমৈবাংশো জীবলোকে'** (গীতা ১৫।৭)। তাই যখন তাঁর নিজ অংশী পরমাত্মাকে লাভ করার ক্ষুধা জাগে এবং সেটি পূরণ না হলে দুঃখ হয়, তখন ভগবান সেই দুঃখ সহ্য করতে পারেন না। তখন ভগবান স্বয়ং তা পূরণ করেন। এইরূপে যখন সাধকের নিজের মনের সংশয়ে ব্যাকুলতা বা দুঃখ আসে, তখন সেই দুঃখ ভগবানের অসহ্য হয়। সংশয় দূর করার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে হয় না, যে সংশয় নিয়ে সাধক দুঃখ পান, ভগবান নিজেই তা দূর করে তাঁর দুঃখ মোচন করেন। অন্তরে কোনো সংশয়ের জন্য দুঃখ হলে সেই অন্তরের ডাক ভগবানের কাছে আপনিই পৌঁছে যায়।

সংশয়ের জন্য সাধকের প্রকৃত উন্নতির গতি রুদ্ধ হয়, কাজেই সেই সংশয় দূর করলেই তাঁর মঙ্গল হয়। ভগবান প্রাণীমাত্রেরই সুহৃদ—**'সুহৃদং সর্বভূতানাম্'** (গীতা ৫।২৯), তাই যখন কোনো সংশয় নিয়ে মানুষ ব্যাকুল হয় এবং ব্যাকুলতা তার কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে, তখন যে কোনো প্রকারেই হোক না কেন ভগবান সেই সংশয় দূর করেন। ভুল এই হয় যে, মানুষ যতটুকু জানে সেটিকেই সম্পূর্ণ মনে করে অহংকার করে যে, সে সব জানে। এই অভিমান হল মহাপতনকারী।

'নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ'—এই শ্লোকে এরূপ সংশয়-চিত্ত ব্যক্তিদের বর্ণনা করা হয়েছে যারা 'অজ্ঞ' এবং 'শ্রদ্ধাহীন'। তাৎপর্য হল এই যে, মনে সংশয় থাকলেও এই সব মানুষের নিজ বিচারবুদ্ধি তো নেই-ই এবং অপরের কথাও তারা মেনে নেন না। সেইজন্য এই সংশয়-চিত্ত ব্যক্তির পতন হয়। তাদের ইহলোক-পরলোক এবং সুখ কোনটিই নেই।[২]

সংশয়াত্মা ব্যক্তির ব্যবহার ইহলোকে খারাপ হয়ে থাকে। তার কারণ সে প্রত্যেক বিষয়ে সন্দিগ্ধ হয়, যেমন—এই ব্যক্তি ঠিক, না বেঠিক ? এই খাদ্য ভালো, না মন্দ ? এতে আমার ভালো হবে, না মন্দ হবে ? ইত্যাদি। এই সংশয়াত্মা ব্যক্তির পরলোকেও কল্যাণ লাভ হয় না। কারণ কল্যাণ প্রাপ্ত হতে গেলে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির প্রয়োজন হয়। সংশয়চিত্ত ব্যক্তি দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ায় কোনো বিষয়েই স্থির সিদ্ধান্ত করতে পারে না ; যেমন—জপ করব, না স্বাধ্যায় ? সাংসারিক কাজ-কর্ম করব, না পরমাত্মা প্রাপ্তির চেষ্টা করব ? ইত্যাদি। মনে সংশয় থাকায় তার মনেরও স্থিরতা থাকে না। তাই বিবেক-বুদ্ধি এবং শ্রদ্ধার সাহায্যে সংশয় দূর করা অতি অবশ্যই প্রয়োজন।

দুটি পৃথক পৃথক বিষয় পড়লে বা শুনলে সংশয় উৎপন্ন হয়। সেই সংশয় বিবেক-বিচারের সাহায্যে দূর হতে পারে বা শাস্ত্র অথবা সাধু-মহাত্মার কথা শ্রদ্ধা সহকারে মেনে নিলেও দূর হতে পারে। তাই সংশয়যুক্ত ব্যক্তির যদি

বস্তুগুলিকে অসৎ বলে মেনেও অসৎ বস্তু থেকে বিমুখ না হওয়াকেই বলা হয় অজ্ঞানতা। তাই মানুষের যেটুকু জ্ঞান থাকে, যদি সেই অনুযায়ী সে তার নিজ জীবন গড়ে নেয়, তবে অজ্ঞানতা চিরতরে দূর হয়ে জ্ঞান প্রকাশিত হয়। কারণ অজ্ঞানতার কোনো পৃথক অস্তিত্ব নেই।

[২]কুছ শ্রদ্ধা, কুছ দুষ্টতা, কুছ সংশয়, কুছ জ্ঞান। ঘরকা রহা ন ঘাটকা, জ্যোঁ ধোবিকা স্বান (কুকুর)॥

অজ্ঞতা থাকে তবে তার বিবেক-বিচার বাড়াতে হয় আর যদি অশ্রদ্ধা থাকে তাহলে শ্রদ্ধা বাড়াতে হয়। কারণ এই দুটির মধ্যে কোনো একটি বিশেষভাবে মেনে না নিলে সংশয় দূর হয় না।

পরিশিষ্ট-ভাব— জ্ঞান হলে সংশয় দূর হয় —**'জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্'** (গীতা ৪।৪১) এবং শ্রদ্ধা হলেও সংশয় দূর হয়ে যায়—**'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্'** (গীতা ৪।৩৯)। কিন্তু জ্ঞান ও শ্রদ্ধা— এই দুটিই যদি না থাকে তাহলে সংশয় দূর হয় না। তাই যেসব সংশয়াত্মা ব্যক্তিদের জ্ঞান (বিবেচনা) ও শ্রদ্ধা কোনোটাই নেই অর্থাৎ যারা নিজেরাও জানে না আবার অন্যের কথাও মানে না, তাদের পতন হয়।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—ভগবান তেত্রিশতম শ্লোক থেকে জ্ঞানযোগের প্রকরণ শুরু করে জ্ঞান প্রাপ্তির উপায় ও জ্ঞানের মহিমা জানিয়েছেন। যে জ্ঞান গুরুর কাছে থেকে তাঁর সেবা করলে পাওয়া যায়, সেই জ্ঞান কর্মযোগ সিদ্ধ মানুষ আপনিই লাভ করে থাকে—এটি জানিয়ে ভগবান জ্ঞান প্রাপ্তির অধিকারীর বর্ণনা করে প্রকরণের উপসংহার করেছেন। এবার প্রশ্ন হল সিদ্ধ হবার জন্য কর্মযোগীর কী করতে হবে ? ভগবান পরবর্তী শ্লোকে তা জানাচ্ছেন।

যোগসন্ন্যস্তকর্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়॥ ৪১ ॥

[**ধনঞ্জয়** (হে ধনঞ্জয় !) ; **যোগসন্ন্যস্তকর্মাণম্** (যোগের দ্বারা যাঁর সমস্ত কর্ম হতে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়েছে) ; **জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্** (আত্মজ্ঞান দ্বারা যাঁর সকল সংশয় নাশ হয়েছে) ; **আত্মবন্তম্** (স্বরূপ পরায়ণ ব্যক্তিকে) ; **কর্মাণি, ন, নিবধ্নন্তি** (কর্ম আবদ্ধ করতে পারে না।)]

হে ধনঞ্জয় ! যোগ (সমতা) দ্বারা যাঁর সমস্ত কর্ম হতে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং আত্মজ্ঞান দ্বারা যাঁর সকল সংশয় নাশ হয়েছে, এইরূপ স্বরূপ-পরায়ণ ব্যক্তিকে কর্ম আবদ্ধ করতে পারে না ॥ ৪১ ॥

ব্যাখ্যা—'যোগসন্ন্যস্তকর্মাণং'—শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি যে সকল বস্তু আমরা প্রাপ্ত হয়েছি এবং যেগুলিকে আমাদের নিজের বলে মনে হয়, তা সবই অপরের সেবার্থে প্রাপ্ত, নিজ অধিকারে রাখার জন্য নয়। এই দৃষ্টিতে যখন ওই সব বস্তু অন্যের সেবায় (তাদেরই মনে করে) ব্যয় করা হয়, তখন কর্ম এবং বস্তুর প্রবাহ জগতের দিকে প্রবাহিত হয় এবং নিজের মধ্যে স্বতঃ সমত্ব অনুভূত হয়। এইভাবে যোগ (সমত্ব) সহযোগে যিনি কর্ম হতে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন তাঁকে বলা হয় **'যোগসন্ন্যস্তকর্মা'**।

কর্মযোগী যখন কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম দেখেন অর্থাৎ কর্ম করা কালীন বা না করা কালীন—উভয় অবস্থাতেই সবসময় আসক্তি শূন্য থাকেন, তখন তাঁকেই প্রকৃতপক্ষে **'যোগসন্ন্যস্তকর্মা'** বলা হয়।

'জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্'—মানুষের মধ্যে প্রায়ই এই সংশয় দেখা যায় যে, কর্মরত অবস্থায় কর্ম হতে তার সম্পর্ক কীভাবে ছিন্ন হবে ? নিজের জন্য কিছু না করলে কল্যাণ কী করে হবে ? ইত্যাদি। কিন্তু যখন সে ভালোভাবে কর্ম-তত্ত্ব জেনে যায়[১] তখন তাঁর সমস্ত সংশয় দূর হয়ে যায়। তাঁর এই বিষয়ে স্পষ্ট জ্ঞান হয়ে যায় যে, কর্মের এবং তার ফলের শুরু এবং শেষ থাকে, কিন্তু স্বরূপ সর্বদা যেমন তেমনই থাকে। তাই কর্মমাত্রেরই সম্পর্ক 'পর' (সংসার)-এর সঙ্গে থাকে, স্ব (আত্মস্বরূপের)-এর সঙ্গে একেবারেই নয়। এই দৃষ্টিতে নিজের জন্য কর্ম করলে কর্মের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয় আর নিষ্কামভাবে শুধুমাত্র অপরের জন্য কর্ম করলে কর্ম হতে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়। এতেই প্রমাণিত হয় যে অন্যের জন্য কর্ম করলেই নিজের কল্যাণ হয়, নিজের জন্য কর্ম করলে নয়।

'আত্মবন্তম্'—কর্মযোগীর উদ্দেশ্য হল স্বরূপবোধ

[১]এই অধ্যায়েরই ষোল থেকে বত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত প্রকরণে কর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তার মধ্যে অষ্টাদশতম শ্লোকটি মুখ্য।

লাভ করা, তাই তিনি সর্বদা স্বরূপ (আত্ম) পরায়ণ হয়ে থাকেন। তাঁর সমস্ত কর্মই জগতের জন্য হয়ে থাকে। সেবা তো প্রত্যক্ষভাবে অন্যের হিতার্থে হয়ই, খাওয়া-দাওয়া, শোওয়া-বসা ইত্যাদি জীবন নির্বাহের সকল ক্রিয়া অপরের জন্যই হয়ে থাকে, কারণ ক্রিয়াগুলির সম্বন্ধ জগৎ-সংসারের সঙ্গেই থাকে, স্বরূপের সঙ্গে নয়।

'ন কর্মাণি নিবধ্নতি'—কর্মযোগী নিজের জন্য কোনো কর্ম না করায় সমস্ত কর্ম থেকে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয় অর্থাৎ তিনি চিরকালের মতো সংসার-বন্ধন হতে সর্বতোভাবে মুক্ত হয়ে যান (গীতা ৪।২৩)।

কর্ম স্বরূপতঃ বন্ধনকারক নয়। কর্মে ফলেচ্ছা, মমতা, আসক্তি এবং কর্তৃত্বাভিমানই বন্ধনকারক হয়।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—ভগবান আগের শ্লোকে জানিয়েছেন যে, জ্ঞানের দ্বারা সংশয় নাশ হয় এবং সমত্বের সাহায্যে কর্ম হতে সম্পর্ক-বিচ্ছিন্ন হওয়া যায়। এবার পরবর্তী শ্লোকে ভগবান জ্ঞানের সাহায্যে নিজ সংশয় নাশ করে সমত্বে স্থিত হবার জন্য অর্জুনকে নির্দেশ দিয়েছেন।

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত॥ ৪২ ॥

[তস্মাৎ (অতএব) ; ভারত (হে অর্জুন !) ; **হৃৎস্থম্** (হৃদয়স্থিত) ; **এনম্ অজ্ঞানসম্ভূতম্** (এই অজ্ঞান হতে উৎপন্ন) ; **আত্মনঃ, সংশয়ম্** (নিজ সংশয়কে) ; **জ্ঞানাসিনা** (জ্ঞানরূপ খড়্গ দ্বারা) ; **ছিত্ত্বা** (ছেদন করে) ; **যোগম্** (সমত্বে) ; **অতিষ্ঠ** (স্থিত হও) ; **উত্তিষ্ঠ** (প্রস্তুত হও।)]

অতএব হে অর্জুন ! হৃদয়স্থিত এই অজ্ঞান হতে উৎপন্ন নিজ সংশয়কে জ্ঞানরূপ খড়্গ দ্বারা ছেদন করে সমত্বে স্থিত হও (এবং যুদ্ধের জন্য) প্রস্তুত হও ॥ ৪২ ॥

ব্যাখ্যা—**'তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং....ছিত্ত্বৈনং সংশয়ম্'**—আগের শ্লোকে ভগবান এই সিদ্ধান্তটি জানিয়েছেন যে, যিনি সমত্বের দ্বারা সকল কর্ম হতে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন এবং জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত সংশয় নষ্ট করেছেন, সেই আত্মপরায়ণ কর্মযোগীকে কর্ম আবদ্ধ করে না, অর্থাৎ তিনি জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান। এখন ভগবান **'তস্মাৎ'** পদ দ্বারা অর্জুনকেও সেভাবেই জেনে কর্তব্য-কর্ম করার প্রেরণা দিয়েছেন।

অর্জুনের মনে সংশয় ছিল যে, যুদ্ধরূপ ভয়ানক কর্মের দ্বারা কল্যাণ হবে কী করে ? আর কল্যাণ লাভের জন্য আমি কর্মযোগের অনুষ্ঠান করব, না জ্ঞানযোগের ? বর্তমান শ্লোকে ভগবান এই সংশয় দূর করার প্রেরণা দিয়েছেন ; কারণ সংশয় থাকলে কর্তব্য ঠিকমতো পালিত হয় না।

'অজ্ঞানসম্ভূতম্'—পদটির ভাব হল এই যে, সমস্ত সংশয়ই অজ্ঞান হতে অর্থাৎ কর্ম এবং যোগের তত্ত্ব ঠিকমতো না জানার জন্যই সৃষ্ট হয়। ক্রিয়া এবং পদার্থগুলিকে নিজস্ব এবং নিজের জন্য মনে করাই হল অজ্ঞানতা। এই অজ্ঞানতা যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ অন্তঃকরণে সংশয় থাকে । কারণ ক্রিয়া এবং পদার্থ হচ্ছে বিনাশশীল আর স্বরূপ হল অবিনাশী।

তৃতীয় অধ্যায়ে কর্মযোগের আচরণ করার এবং এই চতুর্থ অধ্যায়ে কর্মযোগ তত্ত্বতঃ জানার কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে। কারণ কর্ম করার সঙ্গে সঙ্গে কর্মকে জানারও প্রয়োজনীয়তা আছে। ঠিকমতো না জানলে কোনো কর্মই ভালোভাবে সম্পন্ন হয় না। তাছাড়া কর্মকে ঠিকভাবে জেনে করলে, সেই কর্ম আর বন্ধনের কারণ হয় না, বরং মুক্তিপ্রদ হয়ে ওঠে (গীতা ৪।১৬, ৩২)। তাই এই অধ্যায়ে ভগবান কর্মকে তত্ত্বতঃ জানার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন।

আগের শ্লোকেও **'জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্'** পদটি এই অর্থেই উদ্ধৃত। যে ব্যক্তি কর্ম করার বিদ্যা আয়ত্ত করে নেয়, তাঁর সমস্ত সংশয় নাশ হয় । কর্ম করার বিদ্যা হল—নিজের জন্য কিছু করার প্রয়োজন-ই নেই।

'যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত'—অর্জুন তাঁর ধনুর্বাণ ত্যাগ করে রথের মধ্যে বসে পড়েছিলেন (১।৪৭)। তিনি

ভগবানকে পরিষ্কারভাবে জানিয়েছিলেন যে, তিনি যুদ্ধ করবেন না—**'ন যোৎস্যে'** (গীতা ২।৯)। এখানে ভগবান অর্জুনকে যোগস্থ হয়ে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। ভগবান এই কথাই দ্বিতীয় অধ্যায়ের আটচল্লিশতম শ্লোকে **'যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি'** (যোগযুক্ত হয়ে কর্তব্য-কর্ম কর) পদ দ্বারাও বলেছেন। যোগের অর্থ হল 'সমত্ব'—**'সমত্বং যোগ উচ্যতে'** (গীতা ২।৪৮)।

অর্জুন যুদ্ধ করাকে পাপ বলে মনে করতেন (গীতা ১।৩৬, ৪৫)। তাই ভগবান অর্জুনকে সমত্বে স্থিত হয়ে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ সমত্বে স্থিত হয়ে যুদ্ধ করায় পাপ হয় না (গীতা ২।৩৮)। তাই সমত্বে স্থিত হয়ে কর্তব্য-কর্ম করাই হল কর্ম-বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার উপায়।

জগতে দিনরাত নানাপ্রকার কর্ম সংঘটিত হচ্ছে, কিন্তু সেইসব কর্মে আমাদের আসক্তি বা অনুরাগ না থাকায় আমরা সেই সকল কর্ম দ্বারা আবদ্ধ হই না, নির্লিপ্ত থাকি। যে সব কর্মে আমাদের অনুরাগ বা আসক্তি আসে, সেই কর্ম দ্বারা আমরা আবদ্ধ হই, কারণ রাগ-দ্বেষের দ্বারাই কর্মের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। যখন রাগ-দ্বেষ থাকে না অর্থাৎ সমত্ববোধ জাগ্রত হয়, তখন কর্মের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয় না ; অতএব মানুষ কর্মবন্ধন হতে মুক্ত হয়ে যায়।

নিজ স্বরূপ লক্ষ্য করলে জানা যায় যে তাতে সমত্ব স্বতঃসিদ্ধ। বিচার করলে দেখা যায় যে প্রত্যেক কর্মেরই শুরু এবং শেষ থাকে। সেই কর্মের ফলও আদি ও অন্ত সম্পন্ন হয়। কিন্তু স্বরূপ সবসময় একইরূপে বিরাজিত। কর্ম এবং ফল অনেক প্রকার হয়, কিন্তু স্বরূপ একই থাকে। সুতরাং কোনো কর্ম নিজের জন্য না করলে এবং কোনো পদার্থ নিজস্ব এবং নিজের বলে মনে না করলে যখন ক্রিয়া-পদার্থরূপ জগৎ হতে সর্বতোভাবে সম্পর্ক-ছিন্ন হয়ে যায়, তখন স্বতঃসিদ্ধ সমত্ব আপনিই অনুভূত হয়।

***

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে জ্ঞানকর্মসন্ন্যাসযোগো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

এইভাবে ওঁ, তৎ, সৎ— এই ভগবদ্ নাম উচ্চারণপূর্বক ব্রহ্মবিদ্যা এবং যোগশাস্ত্রময় শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতোপনিষদ্ রূপ শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে জ্ঞানকর্মসন্ন্যাসযোগ নামক চতুর্থ অধ্যায় সম্পূর্ণ হল ॥ ৪ ॥

তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য কর্মযোগ এবং সাংখ্যযোগের বর্ণনা হওয়ায় এই চতুর্থ অধ্যায়টির নাম **'জ্ঞানকর্মসন্ন্যাসযোগ'**।

চতুর্থ অধ্যায়ের পদ, অক্ষর এবং উবাচ

১) এই অধ্যায়ে **'অথ চতুর্থোঽধ্যায়ঃ'** এর তিন, **'অর্জুন উবাচ'** ইত্যাদি পদের ছয়, শ্লোকাদির পাঁচশত এগারো এবং পুষ্পিকার তেরোটি পদ আছে। এইভাবে সমস্ত পদের যোগসংখ্যা হল পাঁচশত তেত্রিশ।

২) এই অধ্যায়ে **'অথ চতুর্থোঽধ্যায়ঃ'**—এর সাত, **'অর্জুন উবাচ'** ইত্যাদি পদের কুড়ি, শ্লোকাদির এক হাজার তিনশত চুয়াল্লিশ এবং পুষ্পিকার পঞ্চাশটি অক্ষর আছে। এইভাবে সম্পূর্ণ অক্ষরগুলির যোগসংখ্যা হল এক হাজার চারশত একুশ। এই অধ্যায়ের সমস্ত শ্লোকই বত্রিশ অক্ষরের।

৩) এই অধ্যায়ে তিনটি উবাচ আছে—দুটি **'শ্রীভগবানুবাচ'** এবং একটি **'অর্জুন উবাচ'**।

চতুর্থ অধ্যায়ে প্রযুক্ত ছন্দ

এই অধ্যায়ের বিয়াল্লিশটি শ্লোকের মধ্যে—একত্রিশতম এবং আটত্রিশতম শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে এবং দ্বিতীয়, দশম, ত্রয়োদশ এবং চল্লিশতম শ্লোকের তৃতীয় পংক্তিতে **'নগণ'** প্রযুক্ত হওয়ায় **'ন-বিপুলা'** ; ষষ্ঠ শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে **'রগণ'** প্রযুক্ত হওয়ায় **'র-বিপুলা'** ; এবং চব্বিশতম শ্লোকের প্রথম পংক্তি এবং ত্রিশতম শ্লোকের তৃতীয় পংক্তিতে **'ভগণ'** প্রযুক্ত হওয়ায় **'ভ-বিপুলা'** সংজ্ঞাযুক্ত ছন্দ হয়েছে। অবশিষ্ট তেত্রিশ শ্লোক ঠিক **'পথ্যাবক্ত্র'** অনুষ্টুপ ছন্দের লক্ষণযুক্ত।

***

॥ ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

অথ পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

পঞ্চম অধ্যায়

অবতরণিকা

শ্রীভগবান চতুর্থ অধ্যায়ের তেত্রিশ থেকে সাঁইত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত কর্ম এবং পদার্থকে বাহ্যতঃ ত্যাগ করে তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের নিকটে জ্ঞান প্রাপ্ত করার প্রচলিত রীতির প্রশংসা করেছেন এবং অর্জুনকে সেই শিক্ষা লাভ করার উপদেশ দিয়েছেন (৪।৩৪)। তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তির এই রীতিতে কর্ম ত্যাগ করে নির্জনে থেকে পরমাত্মতত্ত্বের মনন করা প্রয়োজন। অর্জুনের মনে প্রথম থেকেই যুদ্ধরূপ কর্ম না করার ইচ্ছা ছিল। কারণ তিনি নিজ কল্যাণ চাইতেন এবং যুদ্ধকে পাপ বলে মনে করতেন। তাই অর্জুন মনে করলেন যে, ভগবান আমাকে এইরূপ কর্ম স্বরূপতঃ (বাহ্যতঃ) ত্যাগ করে জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য সাধন-ভজন করতে বলছেন।

আবার চতুর্থ অধ্যায়ের আটত্রিশতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, সাধক কর্মযোগের মাধ্যমে অবশ্যই সেই তত্ত্বজ্ঞান নিজে নিজেই লাভ করেন। অর্থাৎ কর্মযোগী সাধকদের জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য অন্য সাধনপ্রণালী অনুসরণ অথবা তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। এর দ্বারা স্পষ্টতঃই তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তিতে কর্মযোগের বিশেষভাবে প্রশংসা করা হয়েছে।

*এইরূপে অর্জুন চতুর্থ অধ্যায়ের তেত্রিশতম শ্লোকে জ্ঞান প্রাপ্তির প্রচলিত রীতির প্রশংসা শুনলেন এবং চৌত্রিশতম শ্লোকে **'বিদ্ধি'** পদ দ্বারা ওই রীতিতে জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য নিজের জন্য বিশেষ উপদেশ মনে করলেন। আবার আটত্রিশতম এবং একচল্লিশতম শ্লোকে কর্মযোগের প্রশংসা শোনেন। বিয়াল্লিশতম শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে **'যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ'** পদটি দ্বারা কর্মযোগের বিধিতে যুদ্ধ করার আদেশ দিলেন। এইভাবে জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগ—উভয়ের প্রশংসা শুনে এবং দুটির জন্য উপদেশ পেয়ে অর্জুন স্থির করতে পারছিলেন না যে এই দুটির মধ্যে কোন্ সাধনটি তাঁর পক্ষে শ্রেষ্ঠ ? তাই ভগবানকে দিয়ে এটি স্থির করানোর জন্য অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন।*

অর্জুন উবাচ

সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগং চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্॥ ১ ॥

[**কৃষ্ণ** (হে কৃষ্ণ !) ; **সন্ন্যাসম্, কর্মণাম্** (স্বরূপতঃ কর্মত্যাগ করতে বলেছেন) ; **চ, পুনঃ** (এবং, পুনরায়) ; **যোগম্** (কর্মযোগের) ; **শংসসি** (প্রশংসা করেছেন) ; **এতয়োঃ** (এই দুই সাধনের মধ্যে) ; **যৎ, একম্, সুনিশ্চিতম্** (যেটি নিশ্চিতভাবে) ; **শ্রেয়ঃ** (কল্যাণকারী) ; **তৎ** (সেইটি) ; **মে** (আমাকে) ; **ব্রূহি** (বলে দিন।)]

অর্জুন বললেন—হে কৃষ্ণ ! আপনি স্বরূপতঃ কর্ম ত্যাগ করতে বলছেন আবার কর্মযোগেরও প্রশংসা করছেন। সুতরাং এই দুটি সাধনের মধ্যে যেটি নিশ্চিতভাবে কল্যাণকারী, আমাকে সেইটি বলে দিন॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা—'সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ'—পরিবার-পরিজনদের প্রতি স্নেহবশতঃ অর্জুনের মনে যুদ্ধ না করার ইচ্ছা উৎপন্ন হয়েছিল। এর সমর্থনে অর্জুন প্রথম অধ্যায়ে অনেক তর্ক করেছিলেন এবং যুক্তি দেখিয়েছিলেন। তিনি যুদ্ধ করাকে পাপ বলে অভিহিত করেছিলেন (গীতা ১।৪৫)। অর্জুন যুদ্ধ করা অপেক্ষা ভিক্ষান্নে জীবন-নির্বাহ

করাও শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেছিলেন (২।৫) এবং তিনি ভগবানকে নিশ্চিতভাবে স্পষ্টভাষায় বলেও দিয়েছিলেন যে, কোনো পরিস্থিতিতেই তিনি যুদ্ধ করবেন না (২।৯)।

শ্রোতা প্রায়ই বক্তার শব্দগুলির অর্থ নিজের চিন্তা অনুযায়ী করে থাকেন। আত্মীয় এবং স্বজনদের দেখে অর্জুনের হৃদয়ে যে মোহ উৎপন্ন হয়েছিল, সেই অনুসারেই তাঁর যুদ্ধরূপ কর্ম ত্যাগ করা উচিত বলে মনে হয়েছিল। তাই তিনি ভগবানের কথার নিজ চিন্তা অনুযায়ী এই অর্থ করলেন যে, ভগবান কর্মকে স্বরূপতঃ পরিত্যাগ করে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তিরই প্রশংসা করছেন।

'পুনর্যোগং চ শংসসি'—চতুর্থ অধ্যায়ের আটত্রিশতম শ্লোকে ভগবান কর্মযোগীর অন্য কোনো সাধন ছাড়াই তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তির কথা বলেছেন। সেটি লক্ষ্য করেই অর্জুন ভগবানকে বলছেন, 'আপনি তো কখনো জ্ঞানযোগের (৪।৩৩) প্রশংসা করছেন আবার কখনো বা কর্মযোগের প্রশংসা (৪।৪১) করছেন'।

'যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্'—এইপ্রকার প্রশ্ন অর্জুন দ্বিতীয় অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকেও **'যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে'** পদে করেছিলেন। তার উত্তরে ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ের সাতচল্লিশ-আটচল্লিশতম শ্লোকে কর্মযোগের ব্যাখ্যা করে সেই অনুযায়ী আচরণ করতে বলেছিলেন। আবার তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে অর্জুন **'তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্'** পদটির দ্বারা নিজের কল্যাণের কথা জিজ্ঞাসা করেছেন। যার উত্তরে ভগবান তৃতীয় অধ্যায়ের ত্রিশতম শ্লোকে নিষ্কাম, মমতাশূন্য এবং শোকশূন্য হয়ে যুদ্ধ করবার উপদেশ দিয়েছেন এবং পঁয়ত্রিশতম শ্লোকে নিজধর্ম পালনকেই শ্রেয় বলে জানিয়েছেন।

এখানে উপরোক্ত পদগুলিতে অর্জুন যা জিজ্ঞাসা করেছেন, তার উত্তরে ভগবান বলেছেন, কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ (৫।২), কর্মযোগী অনায়াসে সংসার বন্ধন হতে মুক্ত হন (৫।৩), কর্মযোগ ব্যতিরেকে সাংখ্যযোগের সাধনে সিদ্ধিলাভ করা কঠিন ; কিন্তু কর্মযোগী সত্বর ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন (৫।৬)। এই কথা বলে ভগবান অর্জুনকে যেন বলছেন যে, কর্মযোগই অর্জুনের পক্ষে সত্বর এবং সহজে ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথ। অতএব তাঁর কর্মযোগের সাধনই করা উচিত।

অর্জুনের মনে প্রধানতঃ নিজ কল্যাণেরই আকাঙ্ক্ষা ছিল। তাই বারংবার তিনি ভগবানের কাছে শ্রেয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করছিলেন (২।৭ ; ৩।২ ; ৫।১)। কল্যাণ প্রাপ্তিতে ইচ্ছার প্রাধান্য থাকে। সাধনার সাফল্যে বিলম্বের হেতুও এই যে, কল্যাণের আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ জাগরিত না হওয়া। যে সাধকদের বৈরাগ্য তীব্র হয়নি, কল্যাণের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হলে তারাও অনায়াসে কর্মযোগের সাধন করতে পারে[১]। অর্জুনের হৃদয়ে ভোগে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য জাগেনি অথচ তাঁর নিজ কল্যাণের ইচ্ছা বর্তমান, সেইজন্যই তিনি কর্মযোগের অধিকারী।

প্রথম অধ্যায়ের বত্রিশতম এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোক দেখলে এটি বোঝা যায় যে, অর্জুন স্বর্গলোক তো নয়ই ত্রিলোকের রাজত্বও চান না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অর্জুনের যে ভোগবিলাসে বা রাজ্যলাভে সম্পূর্ণ অনীহা ছিল, তা নয়। তাঁর বক্তব্য ছিল এই যে, যুদ্ধে কুটুম্বদের বধ করে বিজয়ী হয়ে তিনি রাজ্য লাভ করতে চান না। অর্থাৎ স্বজনদের বধ না করে যদি রাজ্য লাভ করা সম্ভব হয় তাহলে তিনি তাতে প্রস্তুত । দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে অর্জুন সেই কথাই বলেছেন যে গুরুজনদের বধ করে রাজ্যভোগ করা উচিত নয়। এতে পরিস্ফুট হয় যে গুরুজনদের বধ না করে যদি রাজ্য লাভ করা যায় তবে তা স্বীকার্য। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে অর্জুন বলেছেন, কে জিতবে—তা আমরা জানি না এবং ওঁদের হত্যা করে আমার বাঁচবারও আকাঙ্ক্ষা নেই। অর্থাৎ যদি অর্জুনের পক্ষের বিজয় নিশ্চিত বলে মনে হয় এবং ওঁদের না মেরে রাজ্য লাভ করা যায় তাহলে তিনি রাজ্য গ্রহণে প্রস্তুত। পরে আবার দ্বিতীয় অধ্যায়ের সাঁইত্রিশতম শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে, 'তোমার তো উভয়তেই লাভ ; যদি তুমি যুদ্ধে হত হও তবে তোমার স্বর্গপ্রাপ্তি হবে, আর যদি বিজয়ী

---

[১]যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।......................................
.... তেষ্বনির্বিণ্ণচিত্তানাং কর্মযোগস্তু কামিনাম্।
(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২০।৬-৭)

হও তাহলে রাজ্য লাভ করবে।' অর্জুনের মনে স্বর্গ এবং রাজ্যের প্রতি যদি বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষা না থাকত তাহলে ভগবান হয়ত এমন কথা বলতেন না। সুতরাং অর্জুনের হৃদয়ে যেটি জাগরিত হয়েছিল, তা সত্যকার বৈরাগ্য নয়। কিন্তু তাঁর মধ্যে নিজ কল্যাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল, সেটি এই শ্লোকেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—এবার ভগবান অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করছেন।

শ্রীভগবানুবাচ

সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে॥ ২ ॥

[**সন্ন্যাসঃ** (সন্ন্যাস) ; **চ**, **কর্মযোগঃ** (এবং কর্মযোগ) ; **উভৌ** (দুটিই) ; **নিঃশ্রেয়সকরৌ** (নিশ্চিতরূপে কল্যাণকারী) ; **তু**, **তয়োঃ** (কিন্তু এই দুটির মধ্যে) ; **কর্মসন্ন্যাসাৎ** (কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা) ; **কর্মযোগঃ** (কর্মযোগ) ; **বিশিষ্যতে** (শ্রেষ্ঠ।)]

শ্রীভগবান বললেন——সন্ন্যাস (সাংখ্যযোগ) এবং কর্মযোগ——দুটিই কল্যাণকারী ; কিন্তু এই দুটির মধ্যে কর্মসন্ন্যাস (সাংখ্যযোগ) অপেক্ষা কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা—[ভগবানের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগের পালন প্রতিটি বর্ণ, আশ্রম এবং সম্প্রদায়ের মানুষ করতে পারে। কারণ, তাঁর এই সিদ্ধান্ত কোনো বিশেষ বর্ণ, আশ্রম বা সম্প্রদায়ের জন্য নয়। এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে অর্জুন কর্মত্যাগ করে যথাবিধি জ্ঞান প্রাপ্ত করার প্রচলিত প্রথাকে 'কর্মসন্ন্যাস' নামে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ভগবানের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য সাংখ্যযোগের পালন প্রত্যেক মানুষই স্বাধীনভাবে করতে পারে এবং সেটি পালন করতে হলে কর্মকে স্বরূপতঃ ত্যাগ করার কোনো প্রয়োজনও নেই। সেইজন্য ভগবান প্রচলিত মতের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নিজ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।]

'সন্ন্যাসঃ'—এইস্থানে **'সন্ন্যাসঃ'** পদটির অর্থ 'সাংখ্যযোগ', কর্মকে স্বরূপতঃ (বাহ্যতঃ) ত্যাগ করা নয়। অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ভগবান কর্মত্যাগ করে সন্ন্যাসের কথা না ভেবে কর্মরত অবস্থায় জ্ঞান প্রাপ্ত করার যে পথ সাংখ্যযোগে উল্লিখিত রয়েছে, সেটি জানাচ্ছেন। এই সাংখ্যযোগের দ্বারা মানুষ বর্ণ, আশ্রম, সম্প্রদায় নির্বিশেষে যে কোনো পরিস্থিতিতে স্বাধীনভাবে জ্ঞান প্রাপ্ত করতে পারে অর্থাৎ নিজ কল্যাণ লাভ করতে সক্ষম।

সাংখ্যযোগের সাধনায় বিচার এবং বিবেকের প্রাধান্য থাকে। বিবেচনাপূর্বক তীব্র বৈরাগ্য না হলে এই সাধনা সফল হয় না। এই সাধনায় জগতের পৃথক অস্তিত্ব দূরীভূত হয়ে শুধুমাত্র পরমাত্মতত্ত্বের উপর লক্ষ্য থাকে। মন থেকে আসক্তি দূর না হলে জগতের স্বতন্ত্র সত্তার প্রভাব দূর হওয়া অত্যন্ত কঠিন। সেইজন্য ভগবান বলেছেন যে, দেহাভিমানী ব্যক্তিদের পক্ষে এই সাধনা ক্লেশদায়ক (গীতা ১২।৫)। এই অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকেও ভগবান বলেছেন যে, কর্মযোগের সাধনা ছাড়া সন্ন্যাসের সাধনা সিদ্ধ হওয়া কঠিন ; কারণ সংসারের আসক্তি হতে মুক্ত হওয়ার কর্মযোগই হল সহজ পথ।

'কর্মযোগশ্চ'—মনুষ্য মাত্রেরই কর্মের প্রতি আসক্তি অনাদিকাল থেকে চলে আসছে, সেটির নিবৃত্তির জন্যই কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক (গীতা ৫।৩)। কিন্তু এইসব কর্ম কোন্ ভাব এবং উদ্দেশ্য নিয়ে কীভাবে করা যায় যাতে আসক্তি সম্পূর্ণরূপে দূর হয়, সেই কর্তব্য-কর্ম করার কৌশলকেই 'কর্মযোগ' বলা হয়। কাজটি ছোট, না বড় কর্মযোগে সেটি লক্ষ্য করা হয় না, কর্তব্য-কর্ম হিসাবে যা উপস্থিত হয়, তা নিষ্কামভাবে অপরের হিতার্থে করণীয়। কর্ম থেকে সম্বন্ধ-ছেদ করার জন্য প্রয়োজন হল নিজের জন্য কোনো কর্ম না করা। নিজের জন্য কর্ম না করার অর্থ কর্মের বিনিময়ে কিছু পাবার আশা না থাকা। যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের জন্য কিছু পাবার আকাঙ্ক্ষা থাকে, ততক্ষণ কর্মের সঙ্গে সম্বন্ধ বজায় থাকে।

'নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ'—অর্জুন প্রশ্ন করেছিলেন যে,

সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগ এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টি নিশ্চিতরূপে কল্যাণকারী ? উত্তরে ভগবান বলছেন, 'হে অর্জুন ! এই উভয় সাধনাই নিশ্চিতরূপে কল্যাণকারী। কারণ উভয় পথই সমতা প্রাপ্তির উপায়।' এই অধ্যায়ের চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্লোকেও ভগবান এই বক্তব্য সমর্থন করেছেন। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের চব্বিশতম শ্লোকেও ভগবান সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগ—এই দুটির দ্বারা পরমাত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করার কথা বলেছেন। সেইজন্য এই উভয় পথই পরমাত্মপ্রাপ্তির পৃথক সাধন প্রণালী (গীতা ৩।৩)।

'তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ'—এক সাংখ্যযোগেরই দুটি বিভাগ আছে। প্রথমটি চতুর্থ অধ্যায়ের চৌত্রিশতম শ্লোকে বিবৃত সাংখ্যযোগ, যাতে কর্ম স্বরূপতঃ ত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে এবং পরেরটি, দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশ থেকে ত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত বিবৃত সাংখ্যযোগ, যাতে কর্মকে স্বরূপতঃ ত্যাগ করার কথা বলা হয়নি। এখানে **'কর্মসন্ন্যাসাৎ'** পদ উভয় প্রকার সাংখ্যযোগেরই বাচক।

'কর্মযোগো বিশিষ্যতে'—পরবর্তী (তৃতীয়) শ্লোকে ভগবান এই পদটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে কর্মযোগীকে নিত্যসন্ন্যাসী মনে করা উচিত, কারণ সে অনায়াসে সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। আবার ষষ্ঠ শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে কর্মযোগ ব্যতিরেকে সাংখ্যযোগের সাধনা কঠিন এবং কর্মযোগীর শীঘ্রই ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়। অর্থাৎ সাংখ্যযোগে কর্মযোগেরও প্রয়োজন হয়, কিন্তু কর্মযোগে সাংখ্যযোগের প্রয়োজনীয়তা নেই। তাই দুটি সাধনাই কল্যাণকারী হওয়া সত্ত্বেও ভগবান কর্মযোগকেই শ্রেষ্ঠ বলেছেন।

কর্মযোগী লোকসংগ্রহের জন্য কর্ম করেন— **'লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি'** (গীতা ৩।২০)। লোকসংগ্রহের তাৎপর্য হচ্ছে— সমাজের মর্যাদা সুরক্ষিত রাখার উদ্দেশ্যে, নিজের কোনো স্বার্থ না রেখে মানুষকে কুপথ থেকে সুপথে চালিত করার উদ্দেশ্যে কর্ম করা অর্থাৎ কেবলমাত্র অন্যের হিতার্থে কর্ম করা। গীতায় এটিকেই **'যজ্ঞার্থ কর্ম'** নামে অভিহিত করা হয়েছে। যে কেবল নিজের জন্য কর্ম করে সে আবদ্ধ হয় (৩।৯, ১৩)। কিন্তু কর্মযোগী নিঃস্বার্থভাবে কেবলমাত্র অপরের হিতার্থে কর্ম করে। সুতরাং সে কর্মবন্ধন হতে সহজেই মুক্ত হয়ে যায় (৪।২৩)। এইজন্যই কর্মযোগকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে।

যে কোনো পরিস্থিতিতে, যে কোনো ব্যক্তি কর্মযোগের সাধনা করতে পারে, তা সে ব্যক্তি যে কোনো বর্ণ, আশ্রম বা সম্প্রদায়ের হোক না কেন ! কিন্তু অর্জুন যে কর্মসন্ন্যাসের কথা বলেছেন তা কেবল এক বিশেষ অবস্থাতেই করা সম্ভব (গীতা ৪।৩৪) ; কারণ তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পাওয়া, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জন্মানো এবং তাঁর নিকটে বাস করা—সকল মানুষের কাছে এরূপ সুযোগ আসে না। সুতরাং প্রচলিত রীতির সাংখ্যযোগের সাধন একটি বিশেষ অবস্থাতেই পালন করা সম্ভব। কিন্তু কর্মযোগের সাধন যে কোনো পরিস্থিতিতে এবং যে কোনো ব্যক্তিই করতে পারে। সেইজন্যই কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ।

প্রাপ্ত পরিস্থিতির সদুপযোগ করাকেই কর্মযোগ বলা হয়। যুদ্ধের মতো ভয়ানক পরিস্থিতিতেও কর্মযোগ পালন করা যায়। যে কোনো ব্যক্তি, যে কোনো পরিস্থিতিতেই কর্মযোগ পালনে সমর্থ ; কারণ কর্মযোগে কোনো কিছু লাভের আশা থাকে না। কোনো কিছু প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা থাকলেই কর্তব্য-কর্মে অসমর্থতা এবং অনীহা আসে।

কর্তৃত্ব এবং ভোক্তৃত্ব নিয়েই জগৎ-সংসার। সাংখ্যযোগী এবং কর্মযোগী উভয়কেই সংসার থেকে সম্পর্ক ছেদ করতে হয়, তাই উভয় যোগীরই কর্তৃত্ব এবং ভোক্তৃত্ব—এই দুই বাসনার অবসান ঘটানোর প্রয়োজনীয়তা থাকে। তীব্র বৈরাগ্য এবং তীক্ষ্ণ সচেতনতার দ্বারা সাংখ্যযোগী কর্তৃত্বের অবসান ঘটান। বৈরাগ্যের অত তীব্রতা না থাকায় এবং সচেতনতা কম হওয়ায় কর্মযোগী অন্যের হিতার্থে কর্ম করে ভোক্তৃত্বের অবসান ঘটান। এইভাবে সাংখ্যযোগী কর্তৃত্ব ত্যাগ করে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হন এবং কর্মযোগী ভোক্তৃত্ব অর্থাৎ কিছু পাবার আশা ত্যাগ করে সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হন। এটাই নিয়ম যে, কর্তৃত্ব ত্যাগ করলে ভোক্তৃত্ব ত্যাগ হয় এবং ভোক্তৃত্ব ত্যাগ করলে কর্তৃত্ব স্বতঃই পরিত্যক্ত হয়। কোনো কিছু পাবার ইচ্ছাতেই কর্তৃত্ব আসে। যে কর্মে নিজের জন্য কোনোপ্রকার সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা থাকে না, সেটি ক্রিয়ামাত্র, কর্ম নয়। যন্ত্রে যেমন কর্তৃত্ব থাকে না, তেমনি কর্মযোগীরও কর্তৃত্ব থাকে না।

সাধক জগতের প্রাণী, বস্তু, পরিস্থিতি ইত্যাদিতে নিজের আসক্তি স্পষ্ট অনুভব করেন। এই আসক্তিকে তিনি নিজ বন্ধনের মুখ্য কারণ বলে মনে করেন এবং

সেটি দূর করার চেষ্টাও করেন। সেই আসক্তি দূর করার জন্য কর্মযোগী কোনো প্রাণী বা পদার্থকেই নিজের বলে মনে করেন না[১], নিজের জন্য কিছু করেন না বা নিজের জন্য কোনো কিছুর আকাঙ্ক্ষাও রাখেন না। ক্রিয়ার মাধ্যমে সুখভোগের কামনা না থাকায় কর্মযোগীর ক্রিয়ার পরিণাম সকলের হিত এবং বর্তমানকালে সকলের সুখ ও আনন্দের জন্যই হয়ে থাকে। ক্রিয়ার থেকে সুখ আহরণের ভাব থাকলে ক্রিয়াগুলিতে অহংকার (কর্তৃত্ব) এবং মমতা জন্মায়। কিন্তু ক্রিয়ার থেকে সুখ আহরণের বিন্দুমাত্র ভাব না থাকলে কর্তৃত্ব আসে না। কারণ ক্রিয়া দোষের নয়, ক্রিয়াজনিত আসক্তি এবং ক্রিয়ার ফলাকাঙ্ক্ষাই দোষের। সাধক যদি ক্রিয়া হতে সুখ না চান এবং ক্রিয়ার ফল আশা না করেন তাহলে কর্তৃত্ব কী করে থাকে ? কারণ কর্তৃত্ব বজায় থাকে ভোক্তৃত্বের ওপর। ভোক্তৃত্ব না থাকলে কর্তৃত্ব নিজ উদ্দেশ্যে (যার জন্য কর্ম করা, তাতে) লীন হয়ে যায়, তখন কেবল পরমাত্মতত্ত্বই অবশিষ্ট থাকে।

কর্মযোগীর 'অহং' অর্থাৎ 'আমিত্ব' শীঘ্র এবং সহজেই নাশ হয়, কিন্তু জ্ঞানযোগীর 'অহং' সাধনার উচ্চাবস্থাতেও বজায় থাকে। কারণ এই যে 'আমি সেবক' (কেবলমাত্র সেবার জন্যই সেবক, নিজের জন্য নয়)—এইরূপ মনোভাব থাকায় কর্মযোগীর 'অহং'ও সেব্যর সেবায় নিয়োজিত থাকে । কিন্তু 'আমি মুমুক্ষু' এরূপ মনোভাব থাকায় জ্ঞানযোগীর 'অহং' অপরিবর্তিতই থাকে। কর্মযোগী নিজের জন্য কিছু না করে কেবলমাত্র অপরের হিতার্থে সমস্ত কর্ম করে, কিন্তু জ্ঞানযোগী সাধন করেন নিজের হিতার্থে। নিজের হিতের জন্য সাধন করলে 'অহম্' যেমনকার তেমনই বজায় থাকে।

জ্ঞানযোগের মূল বিষয় হল জগতের স্বাধীন সত্তার অনস্তিত্ব উপলব্ধি করা এবং কর্মযোগের মূল বিষয় হল আসক্তির অনস্তিত্ব উপলব্ধি করা। জ্ঞানযোগী বিচারের সাহায্যে জগতের সত্তার অনস্তিত্ব বোধ করতে চেষ্টা করেন কিন্তু জাগতিক বিষয়বস্তুর ওপর আসক্তি থাকায় জগতের সত্তার অনস্তিত্ব অনুভব করা খুবই কঠিন। যদিও জ্ঞানযোগের সাধকের বিচার কালে বিষয়বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তার অনস্তিত্ব বোধ হয় কিন্তু ব্যবহারকালে পদার্থ সমূহের স্বতন্ত্র সত্তা প্রতীত হয়। অপরপক্ষে কর্মযোগী সাধকের লক্ষ্য অপরকে সুখী করার জন্যই নির্দিষ্ট থাকায় তাঁর আসক্তি স্বতঃই দূর হয়। তাছাড়াও আহরিত বস্তুসমূহ বর্জন করা কর্মযোগীর পক্ষে যত সহজ, জ্ঞানযোগীর পক্ষে তত নয়। জ্ঞানযোগীর কাছে কোনো বস্তুকে মায়া মনে করে ত্যাগ করা কঠিন হয়ে পড়ে অপরদিকে সেই বস্তুই যদি দেখা যায় অন্যের প্রয়োজন আছে, তবে সেটি ত্যাগ করা সহজ হয়। যেমন, আমার কাছে কম্বল আছে, সেইটি অন্যের প্রয়োজন আছে জেনে পরিত্যাগ করা বা তার থেকে আসক্তি সরানো, অত্যন্ত সহজ কথা। কিন্তু (যদি বৈরাগ্য খুব তীব্র না হয়) কম্বলটি বিচার দ্বারা অনিত্য, ক্ষণভঙ্গুর, মায়াময় মনে করে সেটিকে পরিত্যাগ করা সহজ হয় না। দ্বিতীয়তঃ মায়ামাত্র মনে করে ত্যাগ করায় (বৈরাগ্যের তেজ যদি না থাকে), যে সকল বস্তু আমাদের ভালো লাগে না, সেই মন্দ বস্তুগুলি সহজেই পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু যেগুলি আমাদের ভালো লাগে, সেই সুন্দর বস্তুগুলি ত্যাগ করতে কষ্ট হয়। আবার অন্যের কাজে লাগে দেখে যে বস্তুগুলি ভালো লাগে তা সহজেই ত্যাগ করা যায় ; যেমন—খাবারের সময় থালায় বেশি রুটি যদি কম করতে হয় তবে বাসি, ঠাণ্ডা রুটিই আগে তুলে দেব। কিন্তু যদি অন্যকে দিতে হয় তাহলে ভালো রুটিই দেব, খারাপ বা বাসি নয়। তাই কর্মযোগের প্রক্রিয়ায় আসক্তি দূর না করলে সাংখ্যযোগের সাধন হওয়া খুবই কঠিন। বিচার-পূর্বক পদার্থগুলির সত্তা না মানা হলেও পদার্থগুলির উপর স্বাভাবিক আসক্তি থাকায় ভোগে লিপ্ত হয়ে পতন পর্যন্ত হবার সম্ভাবনা থেকে যায়।

শুধুমাত্র মিথ্যা জেনে অর্থাৎ অসৎ বস্তুকে অসৎ জানার দ্বারা আসক্তির নিবৃত্তি হয় না[২]। যেমন চলচ্চিত্রে দৃশ্যমান পদার্থগুলি বাস্তবিক নয়—এরূপ জানা সত্ত্বেও তাতে

---

[১]কর্মযোগী সেবা করার জন্য সকলকেই আপন বলে মনে করেন, কিন্তু নিজের জন্য (স্বার্থের জন্য) কাউকেও আপন বলে মনে করেন না।

[২]অসতকে অসত বলে জানলে তার (অসতের) নিবৃত্তি তখনই হয় যখন স্ব-স্বরূপে স্থিত হয়ে অসতকে অসত বলে জানা হয়। স্বরূপে স্থিতি করণ-নিরপেক্ষ। কিন্তু বুদ্ধি ইত্যাদি করণ দ্বারা অসৎকে অসৎ জানলে তার নিবৃত্তি হয় না ; কারণ বুদ্ধি ইত্যাদি করণও হল অসৎ। সুতরাং অসৎ-এর দ্বারা অসৎকে জানলে অসতের নিবৃত্তি হবে কীভাবে ?

আসক্তি জন্মায়। সিনেমা দেখলে চরিত্র, সময়, চোখের দীপ্তি এবং অর্থ—এই চারটি নষ্ট হয়—এটি জেনেও আসক্তিবশতঃ সিনেমা দেখা হয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে বাস্তবে বস্তু না থাকলেও তাতে আসক্তি বা সম্পর্ক থাকতে পারে। যদি আসক্তি না থাকে তাহলে পদার্থের সত্তা স্বীকার করলেও তাতে আসক্তি জন্মায় না। সেইজন্য সাধকের প্রধান কাজ হল—আসক্তির বিনাশ করা, পদার্থের সত্তার নয়। কারণ আসক্তিই বন্ধনের কারণ, বস্তু নয়। পদার্থ সৎ হোক বা অসৎ, এমনকি সৎ-অসতের চেয়ে অসাধারণ হলেও এতে যদি আসক্তি থাকে তাহলে তা বন্ধনকারী হবেই। প্রকৃতপক্ষে কোনো পদার্থই বন্ধনের কারণ নয়। বন্ধন হয় তাদের সঙ্গে আমাদের সৃষ্ট সম্বন্ধ দ্বারা এবং সম্বন্ধ জন্মায় আসক্তির দ্বারা। সুতরাং সেই আসক্তি দূর করার দায়িত্ব আমাদের উপরই বর্তায়।

পরিশিষ্ট-ভাব— যদিও 'যোগ' ব্যতীত কর্ম এবং জ্ঞান— দুই-ই বন্ধনকারক, তবুও কর্ম করলে পতন তত হয় না, যত হয় বাচিক (বাহ্যিক) জ্ঞানের দ্বারা। বাচিক জ্ঞান নরকগামী করতে পারে—

অজ্ঞস্যার্ধপ্রবুদ্ধস্য সর্বং ব্রহ্মেতি যো বদেৎ।
মহানিরয়জালেষু স তেন বিনিয়োজিতঃ॥

(যোগবাসিষ্ঠ, স্থিতি. ৩৯)

'যারা নির্বোধ মানুষকে 'সবই ব্রহ্ম' এরূপ উপদেশ দেয়, তারা ওই ব্যক্তিকে ভীষণ নরকের ফাঁদে ঠেলে দেয়।'

সুতরাং বাচিক জ্ঞানীর থেকে কর্ম সম্পাদনকারী ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ। অতএব যাঁরা কর্মযোগের আচরণ করেন, তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব আর বলার অপেক্ষা রাখে না ! জ্ঞানযোগী শুধু নিজের জন্যেই উপযোগী হন, কিন্তু কর্মযোগী জগৎ সংসার সকলের পক্ষেই উপযোগী। যিনি জগতের উপযোগী, তিনি নিজেরও উপযোগী হবেন—এটিই নিয়ম। তাই কর্মযোগ হল বিশিষ্ট।

সাংখ্যযোগ ব্যতীত কর্মযোগের অনুষ্ঠান সম্ভব হলেও কর্মযোগ ব্যতীত সাংখ্যযোগের পালন কঠিন (গীতা ৫।৬)। তাই সাংখ্যযোগের থেকে কর্মযোগ বিশিষ্ট। সাংখ্যযোগের থেকে কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ এবং কর্মযোগের থেকে ভক্তিযোগ শ্রেষ্ঠ (গীতা ৬।৪৭)। তাই গীতায় প্রথমে সাংখ্যযোগ, তারপর কর্মযোগ এবং পরে ভক্তিযোগ—এই ক্রম অনুসারে বর্ণনা করা হয়েছে[১]।

ফলপ্রাপ্তিতে কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ এক (সমান) (গীতা ৫।৪-৫)। সাধন করা-কালে কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ এক— **'মৈত্রঃ করুণ এব চ'** (গীতা ১২।১৩), কারণ কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ—দুটিতেই অপরকে সুখপ্রদান করার ভাব থাকে। কর্ম করায় কর্মী ও কর্মযোগী এক (সমান) (গীতা ৩।২৫) এবং তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষ ও ভগবানেরও কর্ম করায় একত্ব থাকে (গীতা ৩।২২-২৬)। এইভাবে কর্মী, জ্ঞানযোগী, ভক্তিযোগী ও ভগবান—এই চারপ্রকার ব্যক্তির সঙ্গে কর্মযোগী এক হয়ে যান। এটাই কর্মযোগের বৈশিষ্ট্য।

সাংখ্যযোগে অহং-এর সূক্ষ্ম সংস্কার থাকতে পারে, কিন্তু কর্মযোগে ক্রিয়া এবং পদার্থের থেকে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ায় অহং-এর সূক্ষ্ম সংস্কারও থাকে না। কর্মযোগে অ-কর্ম (অ-ভাব) অবশিষ্ট থাকে (গীতা ৪।১৮) এবং সাংখ্যযোগে থাকে আত্ম-তত্ত্ব (গীতা ৬।২৯)।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—ভগবান এবার কর্মযোগকে শ্রেষ্ঠ বলার কারণ বলছেন।

---

[১]ভাগবতেও এই ক্রম আছে—

যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২০।৬)

'যে সব ব্যক্তি নিজ কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা করে তাদের আমি তিনটি যোগপথের কথা বলেছি— জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ এবং ভক্তিযোগ। এই তিনটি ছাড়া কল্যাণের অন্য কোনো পথ নেই।'

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥ ৩ ॥

[মহাবাহো (হে মহাবাহো !) ; যঃ (যে ব্যক্তি) ; ন, দ্বেষ্টি (কাউকে দ্বেষ করেন না) ; ন, কাঙ্ক্ষতি (কোনো কিছু আকাঙ্ক্ষা করেন না) ; সঃ, নিত্যসন্ন্যাসী (তাঁকে, সর্বদা সন্ন্যাসী) ; জ্ঞেয়ঃ (বলে জানতে হয়) ; হি, নির্দ্বন্দ্বঃ (কারণ দ্বন্দ্বরহিত ব্যক্তি) ; সুখম্, বন্ধাৎ (অনায়াসে সংসার বন্ধন) ; প্রমুচ্যতে (মুক্ত হন।)]

হে মহাবাহো ! যে ব্যক্তি কাউকে দ্বেষ করেন না এবং কোনো কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না, তাঁকে (কর্মযোগীকে) সর্বদা সন্ন্যাসী বলে জানতে হয় ; কারণ দ্বন্দ্বরহিত ব্যক্তি অনায়াসে সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হন ॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা—**'মহাবাহো'**—**'মহাবাহো'** সম্বোধনের দুটি অর্থ হয়—একটি হল যাঁর ভুজদ্বয় (বাহু) দীর্ঘ এবং বলশালী অর্থাৎ যিনি শক্তিমান যোদ্ধা। অপরটি হল, যাঁর বন্ধু অথবা ভাই একজন বড় মানুষ। প্রাণীমাত্রেরই সুহৃদ্ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন অর্জুনের বন্ধু এবং অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির ছিলেন অর্জুনের ভাই। এই সম্বোধন করে ভগবান যেন অর্জুনকে বলছেন যে, কর্মযোগ অনুযায়ী সকলকে সেবা করার ক্ষমতা তাঁর মধ্যে নিহিত আছে, অতএব তিনি সহজেই কর্মযোগ পালন করতে সক্ষম।

'যো ন দ্বেষ্টি'—যিনি কোনো প্রাণী, বস্তু, পরিস্থিতি, সিদ্ধান্ত ইত্যাদিতে রাগ (আসক্তি) বা দ্বেষ করেন না, তিনিই কর্মযোগী। সকলকে সেবা করা এবং সুখী করাই হল কর্মযোগীর উদ্দেশ্য। কর্মযোগীর যদি কারো ওপর বিন্দুমাত্র রাগ (আসক্তি) বা দ্বেষ জন্মায় তাহলে তাঁর দ্বারা যথার্থ কর্মযোগ পালন করা মোটেই সম্ভব নয়। সুতরাং যার প্রতি তাঁর কিছুমাত্র দ্বেষ থাকে, তার সেবা কর্মযোগীর সর্বপ্রথম করা উচিত।

'ন দ্বেষ্টি' সর্বপ্রথমে বলার অর্থ এই যে, যে কাউকে খারাপ মনে করে বা কারো ক্ষতি কামনা করে, সে কর্মযোগের তত্ত্ব বুঝতেই সক্ষম নয়।

মর্মকথা

প্রাণীমাত্রেরই হিতের জন্য কর্মযোগীর নিজের দোষ ত্যাগ করা যত প্রয়োজন, অন্যের ভালো করা তত প্রয়োজন নয়। কারো ভালো করলে শুধুমাত্র ব্যক্তির বা সমাজের উপকার হয় ; অপরপক্ষে দোষরহিত হলে সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ হয়। কারণ ভালো কাজে ক্রিয়া এবং পদার্থের প্রাধান্য সীমিত থাকে কিন্তু দোষরহিত হওয়ায় হৃদয়ের অসীম ভাবের প্রাধান্য থাকে। হৃদয়ের কু-ভাব যদি দূর না হয় তাহলে দৃশ্যতঃ ভালো কাজ করলেও অহংকার জন্মায়, যেটি আসুরী-সম্পদের মূল। ভালো কাজ করার অহংকার তখনই জন্মায় যখন হৃদয়ে কোনো না কোনো দোষ থাকে। যেখানে অপূর্ণতা থাকে, সেখানেই অহং-অভিমান জন্মায়। কিন্তু যেখানে পূর্ণতা বিদ্যমান সেখানে অভিমানের প্রশ্নই থাকে না।

গভীরভাবে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে বিনাশশীল পদার্থ ছাড়া কারো সেবা করা যায় না। যে বস্তু বা পদার্থের সাহায্যে আমরা কাউকে সাহায্য করি, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে আমাদের নয় ; বরং তাদেরই, যাদের আমরা সাহায্য করছি। তবু যদি সেবার অহংকার হয় তাহলে সেটি বিনাশশীল পদার্থের প্রতি আসক্তির জন্যই হয়। যতক্ষণ বিনাশশীল পদার্থের প্রতি আসক্তি থাকে, ততক্ষণ 'যোগে' সিদ্ধিলাভ হয় না। 'আমি ভালো কাজ করেছি'—এই অহংকার কুকর্মের থেকেও ভয়ঙ্কর কারণ এই ভাবটি 'আমিত্বের' মধ্যে বাসা বাঁধে। কর্ম এবং তার ফল শেষ হয়ে যায়, কিন্তু যতক্ষণ 'আমিত্ব' থাকে, ততক্ষণ 'আমিত্বে' আশ্রয় নেওয়া আত্মপ্রসাদের অহংকার দূর হয় না। অপরপক্ষে, খারাপকে আমরা খারাপ বলে জানি। কিন্তু ভালোকে আমরা খারাপ-রূপে জানি না। সেইজন্য ভালোত্বের অহংকার ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন, যেমন হাতের লোহার বেড়ি পরিত্যাগ করা যায়, কিন্তু সোনার বেড়ি পরিত্যাগ করা যায় না, কারণ সেটি অলঙ্কাররূপে রয়েছে। তাই কু-ভাব-রহিত হয়েই সুকর্ম করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে কু-ভাব ত্যাগ হলে বিশ্বের মঙ্গল আপনা থেকেই হয়, করতে হয় না। সেইজন্য কু-ভাব রহিত মহাপুরুষ যদি হিমালয়ের একান্ত গুহাতেও অবস্থান করেন, তাহলেও তাঁর দ্বারা বিশ্বের বহু কল্যাণ সাধিত হয়।

'ন কাঙ্ক্ষতি'—কর্মযোগে প্রধান হল কামনা ত্যাগ।

কর্মযোগী কোনো প্রাণী, পদার্থ, পরিস্থিতি ইত্যাদির কামনা করেন না। কামনা ত্যাগ ও পরোপকার এই দুটিতে পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। নিষ্কাম হবার জন্য অপরের মঙ্গল করা আবশ্যক। অপরের মঙ্গল করলে কামনা ত্যাগে উৎসাহ আসে।

কর্মযোগে কর্তা নিষ্কাম হয়, কর্ম নয় ; কারণ কর্ম জড় হওয়ায় তা নিষ্কাম কিংবা সকাম হতে পারে না। কর্তার অধীন কর্ম, সেইজন্য কর্মের অভিব্যক্তি কর্তার দ্বারাই হয়ে থাকে। কর্তা নিষ্কাম হলে তাঁর কর্মও নিষ্কাম হয়। একে কর্মযোগ বলা হয়। সুতরাং কর্মযোগই বলা হোক বা নিষ্কাম কর্ম বলা হোক, দুয়েরই অর্থ এক। কর্মযোগ সকাম হয় না। নিষ্কাম হলে কর্তা কর্মফল থেকে মুক্ত হয়। কিন্তু যদি কর্তার মধ্যে সকামভাব এসে পড়ে তবে সে কর্মফলের দ্বারা আবদ্ধ হয় (গীতা ৫।১২)। সকামভাব নষ্ট হয় তখনই, যখন কর্তা নিজের জন্য কোনো কর্ম না করে, অপরের হিতার্থে সকল কর্ম করে। সেইজন্য কর্তার নিত্য-নিরন্তর নিষ্কাম থাকা উচিত, কর্তার মধ্যে যতই নিষ্কামভাব থাকবে তাঁর কর্মযোগের আচরণও তত সঠিক হবে। কর্তা সর্বতোভাবে নিষ্কাম হলে কর্মযোগ সিদ্ধ হয়।

'জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী'—অর্জুন যুদ্ধ না করে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনে জীবন-নির্বাহ করার বাসনা প্রকাশ করেছিলেন—**'গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্ শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে'** (গীতা ২।৫)—অর্থাৎ গুরুজনদের হত্যা করার চেয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করাই শ্রেষ্ঠ। ভগবান তার উত্তরে যেন বলছেন, 'হে অর্জুন ! তোমার এই সন্ন্যাস তো গুরুজনের মৃত্যুভয়ে গ্রহণ করা বাইরের সন্ন্যাস, কিন্তু কর্মযোগীর সন্ন্যাস হল রাগ(আসক্তি)-দ্বেষ রহিত নিত্যসন্ন্যাস অর্থাৎ অন্তরের সত্যিকারের সন্ন্যাস।'

এর পর ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকেও ভগবান শুধুমাত্র যজ্ঞাদি কর্ম ত্যাগকারী অর্থাৎ কেবলমাত্র যাঁরা সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করেছেন, তাঁদের সন্ন্যাসী না বলে হৃদয় থেকে সংসারের আশ্রয় ত্যাগী কর্মযোগীকেই প্রকৃত সন্ন্যাসী বলেছেন। ভগবানের বিবেচনায় এইরূপ কর্মযোগীই বাস্তবিক সন্ন্যাসী।

কর্ম সম্পাদন কালেও কর্মের সঙ্গে কোনোপ্রকার সম্বন্ধ না রাখার নামই সন্ন্যাস। যিনি কর্মের সঙ্গে কোনোরকম সম্বন্ধ রাখেন না, তিনি কখনো কোনো অবস্থাতেই কর্মের কিঞ্চিৎমাত্র ফলও প্রাপ্ত হন না—**'ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ'** (গীতা ১৮।১২)। সেইজন্য শাস্ত্রবিহিত সকল কর্মাদি করলেও কর্মযোগী হলেন সর্বদাই সন্ন্যাসী।

কর্মযোগের অনুষ্ঠান না করে সাংখ্যযোগ পালন করা কঠিন । সেইজন্য সাংখ্যযোগের সাধক প্রথমে কর্মযোগী এবং পরে সন্ন্যাসী (সাংখ্যযোগী) হন। কিন্তু কর্মযোগের সাধকদের সাংখ্যযোগের অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না। তাই কর্মযোগী প্রথম থেকেই সন্ন্যাসী।

যিনি রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ মুক্ত তাঁর সন্ন্যাস-আশ্রমে যাওয়ার প্রয়োজনই নেই। কোনো ব্যক্তি, বস্তু, শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি নিজের নয় এবং নিজের জন্যও নয়— নিশ্চিতরূপে এটি জানা হলে রাগ-দ্বেষ দূর হয়ে তাঁর অন্তরে যথার্থভাবে সন্ন্যাস অনুভব হয়, তখন ব্যবহারকালে সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক দেখালেও অন্তরে (রাগ-দ্বেষ না থাকায়) সেগুলির সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক হয়ই না। একেই 'নিত্যসন্ন্যাস' বলে। লৌকিক বা পারলৌকিক যে কোনো কাজ করার কালে কর্মযোগীর সংসারে সর্বথা সন্ন্যাসভাব থাকে। এইজন্যই তিনি নিত্যসন্ন্যাসী বলে পরিচিত হবার যোগ্য।

সংসারে সম্পর্ক-ছেদ বা বন্ধনের অ-ভাবই সন্ন্যাস আর কর্মযোগীর রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ না থাকায় সংসারে বন্ধন থাকে না। সুতরাং কর্মযোগী নিত্যসন্ন্যাসী।

'নির্দ্বন্দ্বো হি .... সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে'[১]—সাধনার প্রথম পর্যায়ে সাধকের অন্তঃকরণে দ্বন্দ্ব থাকে। সৎসঙ্গ, স্বাধ্যায়, বিচার ইত্যাদি দ্বারা তিনি পরমাত্ম-প্রাপ্তিকে নিজ ধ্যেয় বলে মেনে নেন ঠিকই কিন্তু তাঁর নিজের বলে কথিত মন, ইন্দ্রিয় ইত্যাদির রুচি স্বাভাবিকভাবে ভোগবিলাস বা সম্পদ সংগ্রহের দিকেই থাকে। তাই সাধক কখনো পরমাত্মতত্ত্ব পেতে চান আবার কখনো ভোগ ও সম্পদ আহরণের দিকে যেতে চান। তিনি যখন যেমন সঙ্গ পান তখন সেই অনুসারে তাঁর ভাব

---

[১]গীতায় উল্লিখিত 'কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি' (২।৩৯) ; 'ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ' (২।৪০) ; 'জহাতীহ উভে সুকৃত দুষ্কৃতে' (২।৫০) ; 'মোক্ষসেঽশুভাৎ' (৪।১৬, ৯।১) ; 'বৃজিনং সন্তরিষ্যসি' (৪।৩৬) ; 'নাপ্নুবন্তি দুঃখালয়মশাশ্বতম্' (৮।১৫); 'শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ' (৯।২৮) ; 'মৃত্যুসংসারসাগরাৎ সমুদ্ধর্তা ভবামি' (১২।৭) ইত্যাদি পদগুলি 'বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে' পদগুলির পর্যায়বাচী হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে।

পরিবর্তন হয়। এরূপ হতে থাকলেও তিনি নিশ্চিন্তে ভোগবিলাসে মগ্ন থাকতে পারেন না। কারণ সৎসঙ্গাদির সংস্কার তাঁর হৃদয়ে বৈরাগ্য (ভোগবিলাসে অরুচি) সৃষ্টি করে। এইভাবে সাধকের হৃদয়ে দ্বন্দ্ব (ভোগ করব, না সাধনভজন করব) চলতে থাকে। এই দ্বন্দ্বের ওপরই অহংভাব নির্ভর করে। সাংসারিক ভোগবিলাসে এবং সম্পদ-সংগ্রহে মত্ত থাকা নয়, একমাত্র পরমাত্মতত্ত্বকেই প্রাপ্ত করা উচিত—এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় হলে আর দ্বন্দ্ব থাকে না এবং অহংভাব পরমাত্মতত্ত্বে লীন হয়ে যায়।

প্রকৃতপক্ষে সংসারের গুরুত্ব অন্তঃকরণে ছাপ ফেলে বলেই দ্বন্দ্ব জাগে। ভোগবিলাস করলে, অপরের থেকে সুখ চাইলে, জগতের প্রাণী ও বস্তুসমূহের গুরুত্ব অন্তরে অঙ্কিত হয়। তার থেকে সুখ গ্রহণ করলে সেই গুরুত্ব ক্রমশঃ বাড়তে থাকে, ফলে সেগুলি প্রাপ্ত করার ইচ্ছা প্রবল হয়। এই ভাব পরমাত্মপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যকে স্থায়ী এবং দৃঢ় হতে দেয় না। এতে সাধকের মনে দ্বন্দ্ব থেকে যায়। উদ্দেশ্যের দৃঢ়তার জন্য সাধককে দৃঢ়চিত্তে বিচার করতে হয় যে, 'যতই সুখ, আরাম বা ভোগ পাওয়া যাক না কেন, আমি তা গ্রহণ করব না এবং পরহিতের জন্য তা ত্যাগ করব।' এই বিচার যত দৃঢ় হয়, সাধকও ততই নির্দ্বন্দ্ব হন।

নির্দ্বন্দ্ব হওয়ার প্রধান কথা **'ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি'** শ্লোকের এই পদটিতে বলা হয়েছে ; যার অর্থ হল রাগ-দ্বেষ রহিত হওয়া। রাগ-দ্বেষ দূর করার জন্য বিচার করা উচিত যে, আমাদের না চাওয়া সত্ত্বেও অনুকূল-প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ নিজের আকাঙ্ক্ষায় অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং না চাইলে প্রতিকূল অবস্থা আসে না—তা নয়। অনুকূল-প্রতিকূল অবস্থা প্রারব্ধ অনুযায়ী আসে এবং যায়, তাহলে এর আসা-যাওয়ায় আকাঙ্ক্ষা কিসের ? অনুকূল অবস্থার প্রতি আসক্তি এবং প্রতিকূল অবস্থার প্রতি দ্বেষ হয় কেবল নিজের ভ্রমে। এইরূপ চিন্তা করলে ভ্রম দূর হয়ে চিরকালের মতো রাগ (আসক্তি)-দ্বেষের সম্পূর্ণ অবসান হয়।

আর একটি কথা হল এই যে, নিজের (স্বয়ং-এর) সত্তা স্বাধীন, তা কোনো পদার্থ, ব্যক্তি বা ক্রিয়ার অধীন নয়। কেননা সুষুপ্তিতে অর্থাৎ গাঢ় নিদ্রায় যখন আমরা জগৎ-সংসারকে ভুলে যাই, তখনও তা বিরাজমান থাকে। জাগ্রত এবং স্বপ্ন উভয় অবস্থাতেই আমরা প্রাণী, পদার্থ ছাড়াই থাকতে সক্ষম হই। তাহলে (নিজের স্বাধীন সত্তা হওয়া সত্ত্বেও) রাগ-দ্বেষ করে আমরা তার অধীন হব কেন ? এইভাবে চিন্তা করলে রাগ-দ্বেষ দূর হয়।

সংসারের প্রতি আসক্তি উৎপন্ন হয় এবং নাশও হয়। এই আসক্তি কখনো স্থায়ী হয় না। কিন্তু আমরা নতুন নতুন প্রাণী ও পদার্থের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এই আসক্তি বজায় রাখার চেষ্টা করি। পক্ষান্তরে পরমাত্মার ইচ্ছা উৎপন্ন ও নষ্ট হয় না। কারণ পরমাত্মারই অংশ হওয়ায় পরমাত্মার সঙ্গে জীবের অখণ্ড সম্পর্ক থাকে। পরমাত্মা প্রাপ্তির ইচ্ছা কখনো কমে না বা বাড়ে না। কেবলমাত্র সংসারে আসক্তি বেশি হলে এটি কম এবং আসক্তি কম হলে এটি বাড়ে বলে মনে হয়। সেইজন্য 'আমি যেন চিরকাল জীবিত থাকি, আমি যেন সবকিছু জেনে নিই, আমি যেন সদা সুখে থাকি'—এইভাবে সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ পরমাত্মা প্রাপ্তির ইচ্ছা জীবমাত্রের মধ্যে সবসময়ই থাকে। যখন সাংসারিক আসক্তি দূর হয় এবং একমাত্র পরমাত্মা লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়, তখন আর কোনো দ্বন্দ্ব থাকে না।

কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ—তিন যোগেই নির্দ্বন্দ্ব হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। যতক্ষণ দ্বন্দ্ব থাকে, ততক্ষণ মুক্তি হয় না (গীতা ৭।২৭)। পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তিতে রাগ (আসক্তি) এবং দ্বেষ এই দুটিই শত্রু (গীতা ৩।৩৪)। নির্দ্বন্দ্ব হলে এই দুটি দূর হয় এবং এদের অবসানে সুখপূর্বক পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তি হয়।

সংসারে বন্ধনের কারণ দুটি—রাগ (আসক্তি) এবং দ্বেষ। যত সাধন-পথ সবই এই রাগ-দ্বেষ দূর করার জন্য[১]। রাগ-দ্বেষ দূর হলে নিত্যপ্রাপ্ত পরমাত্মতত্ত্বের অনুভূতি স্বতঃসিদ্ধ হয়। এতে কোনো পরিশ্রমই নেই। কারণ অ-সতকে গুরুত্ব দিলে পরমাত্মতত্ত্বের অনুভব হওয়া সম্ভব নয়, বরং অসৎ ত্যাগ করলেই পরমাত্মতত্ত্ব লাভ হয়। অ-সতের অস্তিত্ব রাগ (আসক্তি) ও দ্বেষের ওপর নির্ভরশীল। অসৎ সংসারতো নিজে থেকে নষ্ট হয়ে যেতে থাকে, কিন্তু নিজের মধ্যে রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি থাকায় জগৎ-সংসারকে স্থির বলে মনে হয়, যা ভ্রম। সুতরাং যে জগৎ সর্বদাই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তাতে যদি আসক্তি বা দ্বেষ না থাকে তাহলে মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। তাই নির্দ্বন্দ্ব অর্থাৎ রাগ-দ্বেষ রহিত ব্যক্তি পরমানন্দে সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

---

[১]এতাবানেব যোগেন সমগ্রেণেহ যোগিনঃ। যুজ্যতেঽভিমতো হ্যর্থো যদসঙ্গস্তু কৃৎস্নশঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ৩।৩২।২৭)

—যোগীদের সমস্ত যোগ-সাধনের একমাত্র অভীষ্ট ফল হচ্ছে—সংসারে সম্পূর্ণভাবে আসক্তিরহিত হওয়া।

পরিশিষ্ট-ভাব—বাহ্যিক সুখ-দুঃখে (সুখ-দুঃখদায়ক পরিস্থিতিতে) সম এবং অভ্যন্তরীণ সুখ-দুঃখ থেকে রহিত হওয়াকে 'নির্দ্বন্দ্ব' অর্থাৎ দ্বন্দ্বরহিত বলা হয়।

তাদাত্ম্যে চেতন অংশের প্রাধান্যে 'জিজ্ঞাসা' থাকে এবং জড় অংশের প্রাধান্যে 'কামনা' থাকে। মানুষের 'অবিনাশী-তত্ত্বের' ক্ষুধা থাকে, কিন্তু রুচি থাকে বিনাশশীলের, তাই অবিনাশীর ক্ষুধা সে বিনাশশীলের সাহায্যে দূর করতে চায়। ক্ষুধা আর রুচির এই দ্বন্দ্বই মানুষের সংসার বন্ধনকে দৃঢ় করে। যখন মানুষের সংসারে রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ থাকে না, তখন তার জিজ্ঞাসা পূর্ণ হয় এবং কামনা দূর হয় অর্থাৎ সে তখন নির্দ্বন্দ্ব হয়।

⁂ ⁂ ⁂

সম্বন্ধ—এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকের পূর্বার্ধে ভগবান জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগ—দুটিকেই পরম কল্যাণকারী বলে জানিয়েছেন। তার ব্যাখ্যা পরের দুটি শ্লোকে করছেন।

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্॥ ৪ ॥

[**বালাঃ** (নির্বোধ ব্যক্তিগণ) ; **সাংখ্যযোগৌ** (সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগের) ; **পৃথক্, প্রবদন্তি** (ভিন্ন ভিন্ন ফলের কথা বলে); **ন, পণ্ডিতাঃ** (পণ্ডিতেরা বলেন না) ; **একম্, অপি** (এই যে কোনো একটিতে) ; **সম্যক্** (ভালোভাবে) ; **অস্থিতঃ** (স্থিত হলে মানুষ) ; **উভয়োঃ** (দুটি সাধনারই) ; **ফলম্** (ফল) ; **বিন্দতে** (প্রাপ্ত হয়।)]

অজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলে থাকে যে সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগের ফল ভিন্ন ভিন্ন হয়, কিন্তু পণ্ডিতগণ এরূপ বলেন না। কারণ এই দুটি সাধনের যে কোনো একটির সাধনা সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত হলে মানুষ দুই সাধনারই ফলস্বরূপ সেই পরমাত্মাকেই প্রাপ্ত হয় ॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা—**'সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ'**—এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে অর্জুন কর্ম পরিত্যাগ করে তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের কাছে গিয়ে জ্ঞান লাভ করার সাধনকেই **'কর্মসন্ন্যাস'** নামে বলেছেন। ভগবানও দ্বিতীয় শ্লোকে নিজের সিদ্ধান্তের প্রাধান্য ব্যাখ্যা করার জন্য একে **'সন্ন্যাস'** এবং **'কর্মসন্ন্যাস'** নামে অভিহিত করেছেন। এখন সেই সাধনকে ভগবান এইস্থানে **'সাংখ্য'** নামে অভিহিত করেছেন। ভগবান শরীর এবং শরীরীর পার্থক্য বিচার করে স্বরূপে স্থিত হওয়াকেই **'সাংখ্য'** বলেছেন। ভগবানের মতে **'সন্ন্যাস'** এবং **'সাংখ্য'** হল পর্যায়বচী শব্দ ; যাতে দৃশ্যতঃ কর্ম ত্যাগ করার প্রয়োজনীয়তা নেই।

অর্জুন যাকে **'কর্মসন্ন্যাস'** নামে বলেছেন, সেটিও নিঃসন্দেহে ভগবান কথিত **'সাংখ্য'**-এরই আর এক রূপ। কারণ গুরুবাক্য অনুসারেও সাধক শরীর এবং শরীরীর পার্থক্য বিচার করে।

'বালাঃ' পদটির দ্বারা ভগবান বলছেন যে, বয়স এবং বুদ্ধিতে বড় হয়েও যারা সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগকে ভিন্ন ভিন্ন ফলদায়ক বলে মনে করে তারা বালকের ন্যায় অজ্ঞ।

যে মহাপুরুষগণ সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগের তত্ত্ব যথার্থ বুঝেছেন, তাঁরাই পণ্ডিত অর্থাৎ বুদ্ধিমান, দুটি যে পৃথক পৃথক ফল প্রদানকারী তা তাঁরা বলেন না। কারণ তাঁরা ওই দুই সাধন প্রণালী না দেখে তাদের সত্যকার পরিণামটি দেখেন।

সাধন-প্রণালীর প্রতি লক্ষ্য রেখে স্বয়ং ভগবান তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগকে দু'প্রকারের সাধন বলে স্বীকার করেছেন। দুটির সাধন প্রণালী পৃথক পৃথক হলেও সাধ্য পৃথক পৃথক নয়।

'একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্'—গীতায় স্থানে স্থানে সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগের পরমাত্মাপ্রাপ্তির রূপ ফল একই বলা হয়েছে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের চব্বিশতম শ্লোকে দুটি সাধন দ্বারা একই পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব হওয়ার কথা বলা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ের উনিশতম শ্লোকে কর্মযোগীর পরমাত্মাপ্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে এবং দ্বাদশ অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ের চৌত্রিশতম শ্লোকে জ্ঞানযোগীর পরমাত্মাপ্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে। এইপ্রকারে ভগবানের মতে দুটি সাধন একই ফলদায়ক।

পরিশিষ্ট-ভাব—যারা নানা শাস্ত্রীয় কথা জানে, কিন্তু সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগের তত্ত্বকে গভীরভাবে জানে না, তারা প্রকৃতপক্ষে বালক অর্থাৎ নির্বোধ।

সমগ্র গীতাতে অবিনাশী তত্ত্বের উদ্ধৃতিতে 'ফল' শব্দটি শুধুমাত্র এই শ্লোকেই বলা হয়েছে। 'ফল' শব্দটির অর্থ পরিণাম। কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ—উভয় সাধনে প্রাপ্ত হওয়া তত্ত্বকে 'ফল' বলার অর্থ হল, এই দুটি সাধনায় মানুষের নিজ উদ্যোগই হল প্রধান। জ্ঞানযোগে বিবেকরূপ উদ্যোগ প্রধান আর কর্মযোগে পরহিত ক্রিয়ারূপ উদ্যোগ হল প্রধান। সাধকের নিজ উদ্যোগ ও পরিশ্রম সফল হয়েছে, তাই একে বলা হয়েছে 'ফল'। এই ফল নষ্ট হবার নয়। কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ—এই দুটির ফল হল আত্মজ্ঞান অথবা ব্রহ্মজ্ঞান।

কর্তব্য-কর্ম করাকে বলা হয় কর্মযোগ আর কিছু না করা হল জ্ঞানযোগ। কিছু না করলে যে তত্ত্ব প্রাপ্তি হয়, কর্তব্য-কর্ম করলেও সেই তত্ত্বলাভ হয়। এই 'করা' এবং 'না-করা'-কে বলা হয় 'সাধন' এবং এগুলির দ্বারা যে তত্ত্বলাভ হয় তাকে বলা হয় 'সাধ্য'।

※ ※ ※

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ ৫ ॥

[**সাংখ্যৈঃ** (সাংখ্যযোগীগণের দ্বারা) ; **যৎ, স্থানম্** (যে তত্ত্বের) ; **প্রাপ্যতে** (প্রাপ্তি ঘটে) ; **যোগৈঃ, অপি** (কর্মযোগীদের দ্বারাও) ; **তৎ** (সেই) ; **গম্যতে** (প্রাপ্তি ঘটে) ; **যঃ** (যে ব্যক্তি) ; **সাংখ্যম্, চ** (সাংখ্যযোগ এবং) ; **যোগম্** (কর্মযোগকে) ; **একম্** (এক) ; **পশ্যতি** (দেখে) ; **সঃ, চ** (সেই ঠিক) ; **পশ্যতি** (দেখে।)]

সাংখ্যযোগীদের যে তত্ত্বের প্রাপ্তি হয় কর্মযোগীদেরও সেই তত্ত্বেরই প্রাপ্তি হয় । সুতরাং যিনি সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগকে (ফলরূপে) এক দেখেন, তিনিই যথার্থরূপে দেখেন ॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা—**'যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্যোগৈরপি গম্যতে'**—পূর্ব শ্লোকের উত্তরার্ধে ভগবান বলেছিলেন যে, একটি সাধনে ঠিকভাবে স্থিত হলেই মানুষ দুই সাধনের ফলস্বরূপ একই পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত করতে পারে। সেই কথাটি প্রতিষ্ঠিত করতে ভগবান উপরিউক্ত পদে অন্যভাবে জানালেন যে, যে-তত্ত্ব সাংখ্যযোগী প্রাপ্ত করেন, সেই তত্ত্ব কর্মযোগীও প্রাপ্ত করেন।

সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, কর্মযোগের দ্বারা কল্যাণ হয় না, কল্যাণ কেবল জ্ঞানযোগের দ্বারা হয়—এই ভ্রম দূর করার জন্য এখানে **'অপি'** অব্যয় প্রয়োগ করা হয়েছে।

সাংখ্যযোগী এবং কর্মযোগী—উভয়েরই পরিণামে কর্ম থেকে অর্থাৎ ক্রিয়াশীল প্রকৃতি থেকে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ হয়। প্রকৃতি থেকে সম্বন্ধ-রহিত হলে দুটি যোগই এক হয়ে যায়। সাধনকালেও সাংখ্যযোগের বিবেক (জড় ও চেতনের সম্পর্কছেদ) কর্মযোগীকে গ্রহণ করতে হয় এবং কর্মযোগের রীতি (নিজের জন্য কর্ম না করা) সাংখ্যযোগীকে গ্রহণ করতে হয়। সাংখ্যযোগের বিবেক প্রকৃতি ও পুরুষের সম্বন্ধ-ছেদ করার জন্য হয় আর কর্মযোগের বিবেক জগতের সেবার জন্য হয়। সিদ্ধি প্রাপ্তি হলে সাংখ্যযোগী এবং কর্মযোগী—উভয়েরই এক অবস্থা হয়, কারণ দুই যোগীরই নিজ নিজ সাধনায় নিষ্ঠা থাকে (গীতা ৩।৩)।

সংসার অতি বিষম (অর্থাৎ সমভাবের নয়)। ঘনিষ্ঠতম সাংসারিক সম্পর্কেরও বৈষম্য থাকে। কিন্তু পরমাত্মা হচ্ছেন সম। সুতরাং জগৎ-সংসার থেকে সর্বতোভাবে সম্পর্ক-রহিত হলেই সমরূপী পরমাত্মাকে লাভ করা সম্ভব হয়। সংসার থেকে সম্পর্ক-ছেদ করার দুটি যোগপথ আছে—জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগ। 'আমার সৎ-স্বরূপে কখনো অ-ভাব হয় না, কামনা এবং আসক্তিতেই অ-ভাব জন্মায়'—এরূপ চিন্তা থেকে মুক্ত হওয়াকেই জ্ঞানযোগ বলে। যে সকল পদার্থে সাধকের আসক্তি, সেগুলি অন্যের সেবায় ব্যয় করা এবং যে ব্যক্তিদের ওপর আসক্তি, তাদের নিঃস্বার্থভাবে সেবা করা—তাকেই বলা হয় কর্মযোগ। এইভাবে জ্ঞানযোগে বিবেক ও বিচার দ্বারা এবং কর্মযোগে সেবার দ্বারা সংসার থেকে সম্পর্ক-ছেদ হয়।

'একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি'—আগের শ্লোকের পূর্বার্ধে ভগবান ব্যতিরেক রীতিতে বলেছিলেন যে, অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিরাই সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগের পৃথক পৃথক পরিণামের কথা বলে থাকে। সেই কথাই অন্বয় রীতিতে বলেছেন যে, যে ব্যক্তি এই দুই সাধনের পরিণাম একই রূপে দেখে, সে-ই যথার্থদর্শী।

এইরূপ চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্লোকের সার হল এই যে, ভগবান সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগ দুটিকে পৃথক সাধন বলে মনে করেন এবং দুটিরই পরিণামে এক পরমাত্মাপ্রাপ্তি বলে মানেন। যারা এই সত্যকার তথ্য জানে না তাদের ভগবান অল্পবুদ্ধি বলেন, আর যাঁরা এটি জানেন তাঁদের ভগবান যথার্থদর্শী বা বুদ্ধিমান বলেছেন।

বিশেষ কথা

কোনো সাধনাতে পূর্ণতা পেলেই বাঁচার আশা, মৃত্যুর ভয়, পাওয়ার লোভ এবং কিছু করার আসক্তি—এই চারটিই পুরোপুরি দূর হয়।

যা সর্বক্ষণ নষ্ট হচ্ছে অর্থাৎ যা সর্বক্ষণ অনস্তিত্বের দিকে যাচ্ছে ; সেই শরীরে মৃত্যুভয় থাকে না ; আর যা নিত্য বিরাজমান, সেই স্বরূপে বাঁচবার ইচ্ছা থাকতে পারে না। তাহলে বাঁচার ইচ্ছা এবং মৃত্যুর ভয় কার হয় ? স্বরূপ যখন শরীরের সঙ্গে একাত্ম হয়, তখন তাতে বাঁচার ইচ্ছা, মৃত্যুর ভয় জন্মায়। বাঁচার ইচ্ছা এবং মৃত্যুভয়—জ্ঞানযোগে (বিবেকের দ্বারা) এ দুইয়ের অবসান ঘটে।

পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তারই হয়, যার মধ্যে কোনো অভাব আছে। নিজ স্বরূপ ভাবময়, এতে কখনো অ-ভাব হতে পারে না, তাই স্বরূপের কখনো কিছু পাওয়ার ইচ্ছা থাকে না। পাওয়ার ইচ্ছা না থাকায় তার মধ্যে ক্রিয়ার আসক্তিও হয় না। স্বরূপ নিজে ভাবময় হলেও যখন অ-ভাবরূপ শরীরের সঙ্গে একাত্ম হয় তখন তার অ-ভাব বোধ হতে থাকে, যার ফলে তার পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা জন্মায় এবং সেই আকাঙ্ক্ষার ফলে করবার অনুরাগ জন্মায়। পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা এবং করবার আসক্তি—এই দুটিই কর্মযোগের দ্বারা দূর হয়।

জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগ—এই দুটি সাধনের কোনো একটিতে পূর্ণতা প্রাপ্তি হলে, বাঁচার ইচ্ছা, মৃত্যুভয়, কিছু পাওয়ার ইচ্ছা এবং কিছু করার আসক্তি—এই চারটি সর্বতোভাবে দূর হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব—সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগ—লৌকিক হওয়ায় উভয় সাধনই এক। সাংখ্যযোগে সাধক চিন্ময়তত্ত্বে স্থিত হয় আর চিন্ময়তত্ত্বে স্থিত হলে জড়ত্ব দূর হয়। কর্মযোগে সাধক জড়ত্ব ত্যাগ করে, আর জড়ত্ব ত্যাগ হলে চিন্ময়তত্ত্বে স্থিতি হয়। এইভাবে সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগ—উভয় সাধনের পরিণামে চিন্ময়তত্ত্ব প্রাপ্তি অর্থাৎ চিন্ময় স্বরূপে স্থিতি অনুভব হয়।

শরীরকে জগৎ-সংসারের সেবায় নিয়োগ করা হল কর্মযোগ আর শরীর থেকে নিজেকে পৃথক অনুভব করা হল জ্ঞানযোগ। শরীরকে জগৎ-সংসারের কাজে নিয়োগ করাই হোক অথবা শরীরকে নিজের থেকে পৃথক বলে মনে করাই হোক—উভয়েরই পরিণাম এক অর্থাৎ উভয় সাধনার দ্বারাই জগৎ সংসার থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে স্ব-স্বরূপে স্থিতিলাভ হয়।

এখানে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকের মধ্যে—চতুর্থ শ্লোকের পূর্বার্ধের সঙ্গে পঞ্চম শ্লোকের উত্তরার্ধের আর পঞ্চম শ্লোকের পূর্বার্ধের সঙ্গে চতুর্থ শ্লোকের উত্তরার্ধের সম্বন্ধ রয়েছে।

কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ—এই তিন সাধনের মধ্যে জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের প্রচার বেশি। কিন্তু কর্মযোগের প্রচার অত্যন্ত কম। ভগবানও গীতায় বলেছেন যে 'বহু সময় অতিবাহিত হওয়ায় এই কর্মযোগ পৃথিবী থেকে লুপ্তপ্রায় হয়ে গেছে (৪।২)।' তাই কর্মযোগের সম্পর্কে এমন ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে এটি পরমাত্মাপ্রাপ্তির কোনো পৃথক সাধন নয়। ফলে কর্মযোগের সাধক হয় জ্ঞানযোগ অবলম্বন করেন, নতুবা ভক্তিযোগ অবলম্বন করেন, যেমন—

তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে। (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২০।৯)

'কর্ম ততক্ষণই করা উচিত , যতক্ষণ ভোগাদিতে বৈরাগ্য না আসে, (জ্ঞানযোগের অধিকারী না হয়) অথবা আমার লীলা কথা শ্রবণে শ্রদ্ধা না আসে (ভক্তিযোগের অধিকারী না হয়)।'

কিন্তু ভগবান এখানে জ্ঞানযোগের মতো কর্মযোগকেও পরমাত্মপ্রাপ্তির পৃথক সাধন বলে জানিয়েছেন। উপরিউক্ত

চতুর্থ-পঞ্চম শ্লোক ব্যতীত গীতায় নানাস্থানে কর্মযোগের দ্বারা পৃথকভাবে তত্ত্বজ্ঞান, পরমশান্তি, মুক্তি অথবা পরমাত্মতত্ত্বপ্রাপ্ত হওয়ার কথা রয়েছে ; যেমন—**'তৎস্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি'** (৪।৩৮), **'যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম নচিরেণাধিগচ্ছতি'** (৫।৬), **'যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে'** (৪।২৩), **'জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ -কর্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ'** (৪।১৯), **'যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্'** (৫।১২)।

শ্রীমদ্ভাগবতেও কর্মযোগকে পরমাত্মপ্রাপ্তির পৃথক সাধন বলা হয়েছে—

স্বধর্মস্থো যজন্ যজ্ঞৈরনাশীঃ কাম উদ্ধব। ন যাতি স্বর্গনরকৌ যদ্যন্যন্ন সমাচরেৎ॥ (১১।২০।১০)

'যিনি স্বধর্মে থেকে এবং ভোগ-কামনা ত্যাগ করে নিজ কর্তব্যকর্ম দ্বারা ভগবদ্ পূজা করেন এবং সকামভাবে কোনো কর্ম করেন না, তাঁকে স্বর্গ বা নরক কোনো লোকেই যেতে হয় না অর্থাৎ তিনি কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করেন।'

অস্মিন্ লোকে বর্তমানঃ স্বধর্মস্থোঽনঘঃ শুচিঃ। জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতি মদ্ভক্তিং বা যদৃচ্ছয়া॥ (১১।২০।১১)

'স্বধর্মে স্থিত সেই কর্মযোগী ইহলোকে সর্বপ্রকার কর্তব্য কর্ম করেও পাপ-পুণ্য থেকে মুক্ত হয়ে অনায়াসে তত্ত্বজ্ঞান অথবা পরমপ্রেম (পরাভক্তি) প্রাপ্ত হন।'

তাৎপর্য হল যে কর্মযোগ সাধককে জ্ঞানযোগ অথবা ভক্তিযোগের অধিকারী করে তোলে এবং পৃথকভাবে তাঁর কল্যাণও সাধন করে। অন্যার্থে কর্মযোগের দ্বারা জ্ঞান অথবা ভক্তিরও প্রাপ্তি হতে পারে এবং সাধ্য-জ্ঞান (তত্ত্বজ্ঞান) অথবা সাধ্য-ভক্তিও (পরমপ্রেম বা পরাভক্তি) প্রাপ্তি হতে পারে।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—এই অধ্যায়েরই দ্বিতীয় শ্লোকে ভগবান সন্ন্যাস (সাংখ্যযোগ) অপেক্ষা কর্মযোগকে শ্রেষ্ঠ বলেছেন। এখন সেই কথাই তিনি অন্যভাবে বলছেন।

সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম নচিরেণাধিগচ্ছতি॥ ৬ ॥

[**তু, মহাবাহো** (কিন্তু, হে মহাবাহো !) ; **অযোগতঃ** (কর্মযোগ ব্যতিরেকে) ; **সন্ন্যাসঃ**[1] (সন্ন্যাস) ; **আপ্তুম্, দুঃখম্** (সিদ্ধ হওয়া কঠিন) ; **মুনিঃ** (মননশীল) ; **যোগযুক্তঃ** (কর্মযোগী) ; **নচিরেণ** (শীঘ্রই) ; **ব্রহ্ম, অধিগচ্ছতি** (ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়।)]

কিন্তু হে মহাবাহো ! কর্মযোগ ব্যতিরেকে সাংখ্যযোগ সিদ্ধ হওয়া কঠিন। মননশীল কর্মযোগী শীঘ্রই ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন ॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা—**'সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ'**—সাংখ্যযোগের সাফল্যের জন্য কর্মযোগের সাধনা অতি আবশ্যক। কারণ এটি ছাড়া সাংখ্যযোগে সিদ্ধিলাভ করা কঠিন। কিন্তু কর্মযোগে সিদ্ধি প্রাপ্ত হতে গেলে সাংখ্যযোগ সাধনার প্রয়োজন নেই। এই ভাব এখানে **'তু'** পদটির দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে।

সাংখ্যযোগীর লক্ষ্য হল পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব করা। কিন্তু আসক্তি থাকলে এই সাধন দ্বারা পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব করা তো দূরের কথা, এটি হৃদয়ঙ্গম করাই কঠিন হয়ে পড়ে।

আসক্তি দূর করার সহজ উপায় হল—কর্মযোগের অনুষ্ঠান করা। কর্মযোগে সকল ক্রিয়াই অন্যের হিতার্থে করা হয়। অন্যের হিতের ভাবনা জাগলে নিজের প্রতি অনুরাগ স্বতঃই দূর হয়। সেইজন্য কর্মযোগের আচরণ দ্বারা আসক্তি দূর করে সাংখ্যযোগের সাধন করা সহজ হয়। কর্মযোগের সাধন না করে সাংখ্যযোগে সিদ্ধিলাভ করা কঠিন হয়।

'যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম নচিরেণাধিগচ্ছতি'—নিষ্কামভাবে অপরের হিতের কথা যিনি মনন করেন, সেই কর্মযোগীকে এখানে **'মুনিঃ'** বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

---

[1]যদিও এখানে 'সন্ন্যাস' পদ 'আপ্তুম্' ক্রিয়ার কর্ম হওয়ায় এতে দ্বিতীয়া হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু 'তু' পদকে নিপাত সংজ্ঞা মেনে এতে কর্ম উক্ত হওয়ায় 'সন্ন্যাস' পদে প্রথমা হয়েছে।

কর্মযোগী ক্ষুদ্র বা বৃহৎ যে কোনো ক্রিয়া করার সময় বিচার করে যে তার ভাব নিষ্কাম, না সকাম ? সকামভাব এলেই সে সেটিকে দূর করে ; কেননা সকামভাব এলেই সেই ক্রিয়াটি তার নিজের এবং নিজের জন্য হয়ে যায়।

অন্যের হিত কী করে হবে ? এইরূপ চিন্তা করলে আসক্তি সহজেই ত্যাগ করা যায়।

উপরের পদগুলি দ্বারা ভগবান কর্মযোগের বৈশিষ্ট্য বলেছেন। কর্মযোগী শীঘ্রই পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত করে থাকে। পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তিতে বিলম্বের কারণ হল—সংসারে আসক্তি। নিষ্কামভাবে কেবল অন্যের হিতার্থে কর্ম করলে কর্মযোগীর আসক্তি সম্পূর্ণ দূর হয় এবং আসক্তি সম্পূর্ণ দূর হলে স্বতঃসিদ্ধ পরমাত্মতত্ত্বের অনুভূতি হয়। এই বিষয়েই ভগবান চতুর্থ অধ্যায়ের আটত্রিশতম শ্লোকে **'তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধ কালেনাত্মনি বিন্দতি'** পদে বলেছেন যে, যোগসংসিদ্ধ হলেই আপনা আপনি নিশ্চিতভাবে তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তি হয়ে যায়। এই সাধনায় অন্য কোনো সাধনের প্রয়োজন নেই। এর সিদ্ধিতে কোনো জটিলতা নেই বা এতে বিলম্বও হয় না।

অপর একটি কারণ এই যে, দেহধারী—দেহাভিমানী ব্যক্তি সম্পূর্ণ কর্ম ত্যাগ করতে পারেন না, কিন্তু যিনি কর্মফল ত্যাগ করেন, তাঁকে ত্যাগী বলা হয় (১৮।১১)। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, দেহধারী ব্যক্তি সর্বতোভাবে কর্ম ত্যাগ করতে পারেন না, কিন্তু কর্মফল অর্থাৎ কর্মফলের ইচ্ছা ত্যাগ করতে পারেন। সেইজন্য কর্মযোগ সুগম।

কর্মযোগের মহিমার কথা বলতে গিয়ে ভগবান বলেছেন যে, কর্মযোগী তৎক্ষণাৎ শান্তি প্রাপ্ত হন—**'ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্'** (গীতা ১২।১২)। তিনি সংসার-বন্ধন হতে অনায়াসে মুক্ত হন—**'সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে'** (গীতা ৫।৩)। অতএব কর্মযোগের সাধনা সহজ, শীঘ্র ফলপ্রদ এবং অন্য সাধন ছাড়াই পরমাত্মপ্রাপ্তির এক পৃথক সাধন প্রণালী।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—ভগবান এবার কর্মযোগীর লক্ষণগুলি বর্ণনা করছেন।

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে॥ ৭ ॥

[**জিতেন্দ্রিয়ঃ** (যাঁর ইন্দ্রিয় বশীভূত) ; **বিশুদ্ধাত্মা** (যাঁর অন্তঃকরণ নির্মল) ; **বিজিতাত্মা** (যাঁর শরীর স্ববশ এবং) ; **সর্বভূতাত্মভূতাত্মা** (সকল প্রাণীর আত্মাই যাঁর আত্মা) ; **যোগযুক্তঃ** (কর্মযোগী) ; **কুর্বন, অপি, ন, লিপ্যতে** (কর্ম করলেও তাতে লিপ্ত হন না।)]

যাঁর ইন্দ্রিয় নিজবশ, যাঁর অন্তঃকরণ নির্মল, যাঁর শরীর স্ববশ এবং সকল প্রাণীর আত্মাই যাঁর আত্মস্বরূপ, এরূপ যে কর্মযোগী—তিনি কর্ম করলেও তাতে লিপ্ত হন না ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা—'জিতেন্দ্রিয়ঃ'—ইন্দ্রিয় বশীভূত হওয়ার অর্থ—ইন্দ্রিয়াদির রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ থেকে মুক্ত হওয়া। রাগ-দ্বেষ রহিত হলে ইন্দ্রিয়াদির মনকে বিচলিত করার শক্তি আর থাকে না[১]। সাধক তখন ইন্দ্রিয়াদিকে নিয়ন্ত্রিত করে ইচ্ছানুকূল কাজে লাগাতে পারেন।

কর্মযোগের সাধকদের ইন্দ্রিয় বশে রাখা অত্যন্ত আবশ্যক। তাই ভগবান কর্মযোগের প্রণালীতে ইন্দ্রিয়গুলিকে বশে রাখার কথা বিশেষভাবে বলেছেন ; যেমন—**'যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্য'** (৩।৭) ; **'তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য'** (৩।৪১)। কর্মযোগীর কর্মের সঙ্গে সম্বন্ধ অধিক থাকে, সেইজন্য ইন্দ্রিয়গুলি বশে না থাকলে তাঁর বিচলিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কর্মযোগ সাধনে অন্যের হিতের জন্য সেবার ভাব রেখে কর্তব্য-কর্ম করতে হয়, সেইজন্যই ইন্দ্রিয়গুলিকে বশে রাখা অত্যন্ত জরুরী।

[১]শ্রুত্বা স্পৃষ্ট্বা চ দৃষ্ট্বা চ ভুক্ত্বা ঘ্রাত্বা চ যো নরঃ। ন হৃষ্যতি গ্লায়তি বা স বিজ্ঞেয়ো জিতেন্দ্রিয়ঃ। (মনুস্মৃতি ২।৯৮)
'যে ব্যক্তি শুনে, স্পর্শ করে, দেখে, খেয়ে এবং ঘ্রাণ নিয়ে প্রসন্ন বা খিন্ন হন না, তাঁকে জিতেন্দ্রিয় বলে জানবে।'

ইন্দ্রিয়গুলি বশে না থাকলে কর্মযোগের সাধন করা কঠিন হয়।

'বিশুদ্ধাত্মা'—অন্তঃকরণের মলিনতার হেতু হল সাংসারিক বস্তুকে গুরুত্ব দেওয়া। যেখানে সাংসারিক বস্তুর গুরুত্ব থাকে, সেখানেই তার কামনা থাকে। সাধক তখনই নিষ্কাম হন, যখন তাঁর অন্তরে সাংসারিক বস্তুর গুরুত্ব না থাকে। যতক্ষণ বস্তুগুলির গুরুত্ব থাকে, ততক্ষণ তিনি নিষ্কাম হতে পারেন না।

একমাত্র পরমাত্মপ্রাপ্তির দৃঢ় উদ্দেশ্য থাকলে অন্তঃকরণ যত শীঘ্র এবং যেমন শুদ্ধ হয়, তেমন শীঘ্র ভাবে, সেরূপ শুদ্ধি অন্য কোনো সাধনপথে হয় না। সেইজন্যই কর্মযোগে এক উদ্দেশ্যের যে মহিমা তেমন অন্য কিছুতে নেই।

'বিজিতাত্মা'—কর্মযোগে শরীরের সুখ-আরাম ত্যাগ করার অত্যন্ত প্রয়োজন আছে। শরীরে যদি আলস্য-প্রমাদ আসে তবে কর্মযোগের অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয় না। তাই শরীর বশে রাখার কথা ভগবান বলেছেন।

'সর্বভূতাত্মভূতাত্মা'—কর্মযোগীর সমস্ত প্রাণীজগতের সঙ্গে নিজের একাত্মতা অনুভূত হয়[১]। যেমন শরীরের কোনো অংশে আঘাত লাগলে অন্য অঙ্গ তার সেবা করার জন্য স্বাভাবিকভাবে, কোনো অহংভাব ব্যতিরেকে, কৃতজ্ঞতার আশা না করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করে, তেমনি কর্মযোগীও অন্যকে তৃপ্তি দেওয়ার জন্য সহজভাবে, অহংভাব এবং কোনো কামনা ব্যতিরেকে, কৃতজ্ঞতার আশা না করে স্বতঃই কাজ করেন। তিনি কোনো প্রাণীকেই নিজের থেকে পৃথক ভেবে সেবা করেন না, সকলকেই নিজ অঙ্গ বলে মনে করেন।

শরীরের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গের প্রতি ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন হলেও সমস্ত প্রতঙ্গেই যেমন তার আপনভাব একই রকম বজায় থাকে, তেমনি কর্মযোগীরও মর্যাদা অনুযায়ী সংসারে বিভিন্ন জনের প্রতি ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার হলেও সকলের প্রতি তাঁর একাত্মভাব একই রকম থাকে।

নিজ অনুরাগ দূর করার জন্য **'সর্বভূতাত্মভূতাত্মা'** হওয়া অর্থাৎ সকল প্রাণীর সঙ্গে নিজ একত্ব মেনে নেওয়া অত্যন্ত জরুরী। কর্মযোগীর স্বভাব হল—উদারতা। সর্বভূতাত্মভূতাত্মা না হলে এইভাব আসে না।

বিশেষ কথা

ক্রিয়া এবং বস্তুর সঙ্গে আমরা নিরন্তর থাকতে পারি না এবং এগুলিও আমাদের সঙ্গে নিরন্তর থাকতে পারে না। কারণ ক্রিয়া এবং বস্তুর নিরন্তর পরিবর্তন হয়, কিন্তু আমাদের (স্বরূপের) কোনো পরিবর্তন হয় না। তাই ক্রিয়া এবং বস্তু সর্বক্ষণ আমাদের পরিত্যাগ করছে। আমরাও এদের অন্তর থেকে পরিত্যাগ করলেই মুক্তি পেতে পারি, পরম শান্তি লাভ করতে পারি। এসবের সঙ্গে সংযোগ রাখলে আমরা মুক্তি ও পরমশান্তি লাভ করতে পারব না। কারণ এগুলির সঙ্গে থাকা আমাদের স্বভাব নয় এবং এগুলিরও আমাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকা স্বভাবগত নয়। তাই ক্রিয়া এবং বস্তু অন্যের সেবাতেই নিয়োজিত করা উচিত। এই দুটিকে অন্যের সেবায় নিয়োজিত করাতে আমাদের পক্ষে মহত্ত্বের কিছু নেই, বরং এটিই বাস্তবিকতা। যেটি বাস্তবিক সেটিই সহজ, অর্থাৎ তাতে পরিশ্রম বা অভিমান হয় না। যা অবাস্তবিক তাতেই পরিশ্রম হয় এবং তাতে অভিমান আসে।

ক্রিয়া এবং বস্তুগুলি অন্যের সেবায় তখনই লাগানো সম্ভব, যখন আমাদের মধ্যে 'উদারতা' আসে। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল যে, উদারতা আমাদের স্বরূপ[২]। তাই উদারতা ধন-সম্পদ বা পরিশ্রম কোনো কিছুরই অপেক্ষা রাখে না। প্রয়োজনীয়তা আছে শুধু এটুকুই যে, সুখী ব্যক্তিকে দেখে আনন্দিত হওয়া এবং দুঃখী ব্যক্তিদের দেখে দয়ালু হওয়া। যথাযথই সুখী ব্যক্তিকে দেখে মনে

---

[১]আপন শরীরে হতে অসঙ্গ হোক অথবা প্রাণীজগতের সকল শরীরের সঙ্গে নিজ একাত্মবোধ হোক—দুটিরই পরিণাম এক। জ্ঞানযোগী নিজ শরীর থেকে অসঙ্গ হয় এবং কর্মযোগী সকল শরীরের সঙ্গে নিজের শরীরকে একাত্ম মনে করেন। একত্ববোধ জাগলে তিনি উদারতা লাভ করেন।

[২]উদারতা গুণ হলেও এটি আমাদের স্বরূপও বটে। আমাদের যা কিছু আছে, তা অন্যের সেবার জন্য—এইভাবে সেগুলি অপরের সেবায় লাগানোকে উদারতা বলা হয় এবং এটি একটি 'গুণ'। আমাদের যা কিছু আছে, সেগুলি আমাদের নয়—এরূপ ভেবে সেগুলি অপরের সেবায় লাগানোর উদারতা হল আমাদের 'স্বরূপ', কারণ এতে পদার্থগুলির থেকে সম্পর্ক তিরোহিত হয় এবং স্বরূপ যেমন তেমনই থাকে।

যেন এই ভাব আসে যে, হৃদয়ে যেন এই করুণা উৎপন্ন হয় যে সকলেই কীভাবে সুখী হতে পারে! সকলেই সুখী হোক আর দুঃখীদের দেখে কেউ যেন দুঃখী না থাকে এই ভাব আসে।

ভগবান ভোগ এবং সংগ্রহকে সাধনের পথে বাধা বলে ব্যক্ত করেছেন (গীতা ২।৪৪)। সুখী ব্যক্তিদের দেখে আনন্দিত হলে ভোগ বাসনার ইচ্ছা দূর হয় ; কারণ ভোগবিলাসে যে সুখ, যদি অন্যকে সুখী দেখেই সেই সুখ হয় তাহলে আমাদের ভোগবিলাসের আর কোনো প্রয়োজনীয়তা থাকে না। দুঃখী মানুষকে দেখে দুঃখ পেলে সংগ্রহের ইচ্ছা দূর হয় ; কারণ নিজ দুঃখ দূর করার জন্য যে বস্তুসকল আমরা সংগ্রহ করি এবং ব্যয় করি, তা স্বতঃই অন্যের দুঃখ দূর করতে খরচ হবে। যেমন নিজের কোনো কষ্ট হলে আমরা সেটি দূর করার চেষ্টা করি, তেমনি অন্যের কষ্ট দেখে নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী তা দূর করার চেষ্টা হবে।

প্রসন্নতা এবং করুণায় এক বিশেষ সুখ রয়েছে। সেই সুখ (ভাব) ক্রিয়া এবং পদার্থ থেকে সম্পর্ক ছেদ করে জীবকে পরমাত্মরূপ নিত্য-রসের (ভাবের) সঙ্গে অভিন্ন করে দেয়।

'যোগযুক্তঃ'—জিতেন্দ্রিয়, বিশুদ্ধাত্মা, বিজিতাত্মা এবং সর্বভূতাত্মভূতাত্মা—পূর্বোক্ত এই চারটি লক্ষণযুক্ত যে সকল কর্মযোগী, এখানে তাঁদেরই **'যোগযুক্তঃ'** বলা হয়েছে।

সাধনায় স্বাভাবিক প্রবৃত্তি না হওয়ার কারণ হল—উদ্দেশ্য এবং রুচির ভিন্নতা। অন্তরে যতক্ষণ সংসারের গুরুত্ব থাকে, ততক্ষণ উদ্দেশ্য এবং সাংসারিক আকর্ষণের সংঘর্ষ প্রায় দূরই হয় না। অবিনাশী পরমাত্মার প্রাপ্তিই মানুষের আসল উদ্দেশ্য হয়েও প্রায়শঃই আগ্রহ থাকে নশ্বর সংসারের প্রাণী, বস্তু, পরিস্থিতি ইত্যাদির দিকে। উদ্দেশ্য এবং আগ্রহ এক হয়ে গেলে সাধনা আপনা-আপনি দ্রুত সফল হয়। এখানে **'যোগযুক্তঃ'** পদটি সেই কর্মযোগীর জন্য ব্যবহৃত ; যাঁর উদ্দেশ্য ও আকর্ষণ অভিন্ন। অর্থাৎ উদ্দেশ্য ও আকর্ষণ—দুই এক পরমাত্মার মধ্যেই বিলীন হয়ে রয়েছে।

যে কর্মফল উৎপন্ন হয় ও নাশ হয়, তার আকাঙ্ক্ষা বিন্দুমাত্র না থাকলে তবেই কর্মযোগের পালন হয়। ফল এবং উদ্দেশ্য দুই ভিন্ন। কর্মযোগীর ফলের ইচ্ছা থাকে না কিন্তু উদ্দেশ্য অবশ্যই থাকে। কর্মযোগীর একটিই উদ্দেশ্য থাকে, যা সকলে পেতে পারে এবং যা সর্বদা সঙ্গে থাকে। যা কেউ পায় এবং কেউ পায় না, যা কখনো থাকে আর কখনো থাকে না, তা কর্মযোগীর লক্ষ্য নয়। সেই দৃষ্টির লক্ষ্য হল সর্বদা পরমাত্মতত্ত্বের প্রতি। পরমাত্মতত্ত্ব কোনো কর্ম, অভ্যাস ইত্যাদির ফল নয়। ফল তো তৈরি হয় আবার নষ্ট হয়, কিন্তু পরমাত্মা নিত্য বিরাজমান। যা সৃষ্টি হয় এবং নাশ হয় কর্মযোগী তা চান না। কারণ সেগুলির আকাঙ্ক্ষা পরমাত্মপ্রাপ্তির পথে বাধাস্বরূপ। পরমাত্মাই কর্মযোগীর একমাত্র লক্ষ্য হওয়ায় কর্মযোগীকে **'যোগযুক্ত'** বলা হয়েছে।

এইস্থানে যাঁকে **'যোগযুক্তঃ'** বলা হয়েছে, ষষ্ঠ অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে তাঁকেই **'যোগারূঢ়ঃ'** বলা হয়েছে।

'কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে'—কর্মযোগী কর্ম করলেও কর্মের দ্বারা বাঁধা পড়েন না। কর্মের বন্ধনের নানা হেতু থাকে। যেমন, কর্মের প্রতি আসক্তি, কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা, কর্মজনিত সুখের আশা এবং তার ভোগ ও কর্তৃত্বাভিমান[১]। সার কথা হল এই যে, কর্ম দ্বারা কিছু পাওয়ার ইচ্ছাই বন্ধনের কারণ। বিন্দুমাত্র পাওয়ার আশাও না থাকলে কর্মযোগী কর্ম করলেও তাতে বাঁধা পড়েন না। অর্থাৎ কর্মযোগীর কর্ম অ-কর্মে পরিণত হয়।

সাংখ্যযোগীগণ **'গুণা গুণেষু বর্তন্তে'** (গীতা ৩।২৮) 'গুণই গুণের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে'—এরূপ মনে করে কর্মে বাঁধা পড়েন না। তেমনি কর্মযোগীগণ পরহিতের জন্য কর্ম করেন বলে তাঁরাও কর্মে বাঁধা পড়েন না। কেবলমাত্র অন্যের জন্য কর্ম করায় তাঁদের কর্মও **'গুণা গুণেষু বর্তন্তে'**-র মতো হয়।

এখানে **'অপি'** পদটিতে আর একটি ভাব প্রকাশ পায় যে, কর্মযোগী কর্ম করার সময় নির্লিপ্ত তো থাকেনই, কর্ম যখন করেন না তখনও নির্লিপ্ত থাকেন (গীতা ৪।১৮)।

---

[১]দ্বিতীয় অধ্যায়ের সাতচল্লিশতম শ্লোকে কর্মযোগের স্বরূপ জানাতে গিয়ে ভগবান **'মা কর্মফলহেতুর্ভূঃ'** পদটির দ্বারা কর্মের প্রতি আসক্তি, কর্মজনিত সুখের আশা এবং তার ভোগ ও কর্তৃত্বাভিমান দূর করার কথা বলেছেন এবং **'মা ফলেষু কদাচন'** পদটির দ্বারা কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা দূর করার কথা বলেছেন।

তাঁর কর্ম করা বা না করায় কোনো পার্থক্য থাকে না (গীতা ৩।১৮)। তিনি সর্বদা নির্লিপ্ত থাকেন।

তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, সাংখ্যযোগী জড়ত্ব ত্যাগ করে চিন্ময়ের সঙ্গে নিজ একত্ব মেনে নেন এবং কর্মযোগী নিজের বলে কথিত শরীর, মন, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি সংসারের সঙ্গে একত্ব মানেন অর্থাৎ বস্তু, শরীর, মন, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি এবং তাদের দ্বারা সংঘটিত ক্রিয়াগুলিকে নিজের বলে মনে করেন না ; সেগুলিকে জগতের এবং জগতের জন্যই বলে মনে করেন। কর্মযোগী যখন পদার্থ, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি এবং তাদের ক্রিয়াগুলিকে শুধুমাত্র জগতের জন্য বলে মনে করেন, তখন এইসকল করণাদির দ্বারা কারো উপকার করা হলে, কাউকে আনন্দ দিলে, কারো হিত হলে, 'আমি করেছি', 'আমার জন্যই এটি হয়েছে'—এরূপ কী করে মনে করবেন ? মনে করতে পারেন না। সেইজন্যই তিনি কর্ম করলেও কর্তা হন না অর্থাৎ কর্ম দ্বারা লিপ্ত হন না।

পরিশিষ্ট-ভাব—শরীর, ইন্দ্রিয়াদি এবং অন্তঃকরণ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ায় যখন কর্মযোগীর সমস্ত প্রাণীর সঙ্গে ঐক্য অনুভূত হয়, তখন কর্ম করলেও তাতে কর্তৃত্ব থাকে না। কর্তৃত্ব না থাকায় তাঁর কৃত কর্ম বন্ধনকারক হয় না (গীতা ১৮।১৭)।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—কর্ম হওয়ার বিষয়ে কর্মযোগীর কথা বলে ভগবান এখন পরের দুটি শ্লোকে সাংখ্যযোগের সাধনের কথা বলছেন।

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্ নশ্নন গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্॥ ৮ ॥
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্॥ ৯ ॥

[**তত্ত্ববিৎ** (তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন) ; **যুক্তঃ** (সাংখ্যযোগী) ; **পশ্যন্, শৃণ্বন্** (দেখা-শোনা) ; **স্পৃশন্, জিঘ্রন্** (স্পর্শকরা ও ঘ্রাণ নেওয়া) ; **অশ্নন্, গচ্ছন্** (খাওয়া, চলা) ; **গৃহ্নন, প্রলপন্** (গ্রহণ করা, কথা বলা) ; **বিসৃজন্** (ত্যাগ করা) ; **স্বপন্** (শয়ন করা) ; **শ্বসন্** (শ্বাস গ্রহণ করা) ; **উন্মিষন্** (চক্ষু খোলা) ; **নিমিষন্** (বন্ধ করা) ; **অপি** (সত্ত্বেও) ; **ধারয়ণ** (দৃঢ়ভাবে) ; **ইতি** (তিনি, এরূপ) ; **ইতি, মন্যেত** (মনে করেন) ; **ইন্দ্রিয়াণি** (সকল ইন্দ্রিয়ই) ; **ইন্দ্রিয়ার্থেষু** (ইন্দ্রিয় সকলের) ; **বর্তন্তে** (কাজ করছে) ; **কিঞ্চিৎ, এব** (কিছুই) ; **ন, করোমি** (করি না।)]

তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন সাংখ্যযোগীগণ দেখা, শোনা, স্পর্শ করা, ঘ্রাণ নেওয়া, খাওয়া, চলা, গ্রহণ করা, বলা, ত্যাগ করা, শয়ন করা, শ্বাস গ্রহণ করা, চক্ষু উন্মীলন এবং বন্ধ করা—এইসকল করা সত্ত্বেও মনে করেন যে, সকল ইন্দ্রিয়ই তাদের নিজেদের বিষয়ে কাজ করছে, আমি (স্বয়ং) কিছুই করি না ॥ ৮-৯ ॥

ব্যাখ্যা—**'তত্ত্ববিৎ যুক্তঃ'**—এখানে এই পদটি সাংখ্যযোগের বিবেকশীল সাধকের বাচক, যিনি তত্ত্ববিদ্ মহাপুরুষদের ন্যায় অভ্রান্তভাবে তত্ত্ব অনুভব করতে তৎপর থাকেন। তাঁর মধ্যে এইরূপ বিবেক জাগরিত হয়েছে, যাতে তিনি মনে করেন যে, সমস্ত ক্রিয়া প্রকৃতিতেই সঙ্ঘটিত হচ্ছে, সেগুলির সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কই নেই।

যিনি নিজের মধ্যে অর্থাৎ স্বরূপে কখনো কিছুমাত্র কোনো ক্রিয়ায় কর্তৃত্ব ভাব দেখেন না, তিনিই **'তত্ত্ববিৎ'**। তাঁর মধ্যে সদা এই সতর্কতা থাকে যে স্বরূপে কর্তৃত্বভাব নেই। প্রকৃতির কার্য শরীর, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়সকল, প্রাণ ইত্যাদির সঙ্গে তিনি কখনো নিজ অভিন্নতা স্বীকার করেন না, অতএব এইসকল করণাদির দ্বারা কৃত ক্রিয়াগুলি তিনি স্বকৃত ক্রিয়া বলে কীভাবে মেনে নেবেন ?

প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বরূপতঃ উপরিউক্ত স্থিতিতে অবস্থিত। কিন্তু তারা ভ্রমবশতঃ স্বরূপকে

ক্রিয়াগুলির কর্তা বলে মনে করে (গীতা ৩।২৭)। পরমাত্মার যে শক্তির দ্বারা জগতের সমষ্টিগত ক্রিয়াগুলি হয়, সেই শক্তি দ্বারাই ব্যষ্টি শরীরের ক্রিয়াগুলিও সাধিত হয়। কিন্তু সমষ্টির ক্ষুদ্র অংশের (ব্যষ্টির) সঙ্গে নিজের সম্পর্ক যোগ করায় মানুষ ব্যষ্টির কিছু ক্রিয়াকে নিজের ক্রিয়া বলে মনে করে। এই ধারণা দূর করার জন্যই ভগবান বলেছেন যে, সাধকদের নিজেদের কখনো কর্তা বলে মনে করা উচিত নয়। যতক্ষণ তাঁর মধ্যে সামান্য অংশেও কর্তৃত্বের স্বীকৃতি থাকে ততক্ষণ তাঁকে সাধক বলা হয়। যখন তাঁর অহংকর্তৃত্ববোধ সর্বতোভাবে দূর হয় এবং স্বরূপের অনুভব হয়, তখন তাঁকে তত্ত্ববিৎ মহাপুরুষ বলা হয়। যেমন—স্বপ্ন থেকে জাগরিত হলে মানুষের স্বপ্নের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক থাকে না, তেমনি তত্ত্ববিৎ মহাপুরুষদের শরীরাদিতে হওয়া ক্রিয়াগুলির সঙ্গে বিন্দুমাত্রও সম্পর্ক (কর্তৃত্বভাব) থাকে না।

এখানে **'তত্ত্ববিৎ'** তিনিই, যিনি প্রকৃতি ও পুরুষের বিভাগকে সম্যক্ অনুভব করেন। অর্থাৎ গুণ এবং ক্রিয়া সবই প্রকৃতির, প্রকৃতির অতীত তত্ত্বে গুণ এবং ক্রিয়া নেই। প্রকৃতির অতীত নির্বিকার তত্ত্ব হল সমস্ত কিছুর আধার এবং প্রকাশক। সবকিছুর প্রকাশক হয়েও তা প্রকাশ্যের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে বিরাজমান। প্রকাশ্যের (শরীর ইত্যাদির) মধ্যে ওতপ্রোত হয়ে থাকলেও প্রকাশক প্রকাশকই এবং প্রকাশ্য প্রকাশ্যই থাকে। এইরূপ তিনি সকলের আধার হয়েও সকলের (আধেয়ের) কণায় কণায় ব্যাপ্ত আছেন, কিন্তু তিনি কখনো আধেয় হন না। কারণ যিনি প্রকাশক এবং আধার, তাঁর করা এবং হওয়া নেই। করা এবং হওয়ারূপ পরিবর্তন কেবলমাত্র প্রকাশ্য কিংবা আধেয়তে সম্ভব। এইরূপ প্রকাশক এবং প্রকাশ্য, আধার এবং আধেয়র প্রভেদ বা বিভাগগুলি যিনি সম্যক্‌রূপে জানেন, তিনিই **'তত্ত্ববিৎ'**। এই প্রকৃতি (ক্ষেত্র) এবং পুরুষ (ক্ষেত্রজ্ঞ)-এর বিভাগকে জানবার কথা ভগবান পূর্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ের ষোড়শ শ্লোকে এবং পরে সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্থ-পঞ্চম এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয়, উনিশতম, তেইশতম এবং চৌত্রিশতম শ্লোকেও বলেছেন।

'পশ্যন্ শৃণ্বন্ .... উন্মিষন্নিমিষন্নপি'—এখানে দেখা, শোনা, স্পর্শ করা, ঘ্রাণ নেওয়া এবং খাওয়া—এই পাঁচটি ক্রিয়া (ক্রম অনুসারে নেত্র, শ্রোত্র, ত্বক, নাসিকা, জিহ্বা—এই পাঁচটি) জ্ঞানেন্দ্রিয়ের। চলা, গ্রহণ করা, বলা, মল-মূত্রাদি ত্যাগ করা এই চারটি ক্রিয়া (ক্রম অনুসারে পদ, হস্ত, বাক্, উপস্থ ও পায়ু—এই পাঁচটি) কর্মেন্দ্রিয়ের[১]। শোওয়া—এটি হল অন্তরের ক্রিয়া, শ্বাসগ্রহণ হল প্রাণের ক্রিয়া এবং চক্ষু খোলা ও বন্ধ করা এই দুই ক্রিয়া হল **'কূর্ম'** নামক উপপ্রাণের।

উপরিউক্ত ত্রয়োদশ ক্রিয়া দ্বারা ভগবান জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ, প্রাণ এবং উপপ্রাণ দ্বারা সংঘটিত সমগ্র কর্মের উল্লেখ করেছেন। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, সকল ক্রিয়াই প্রকৃতির কার্য শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, প্রাণ ইত্যাদির দ্বারা হয়, স্ব-স্বরূপের দ্বারা নয়। অন্য একটি ভাবও পরিস্ফুট হয় যে, সাংখ্যযোগীর দ্বারা বর্ণ, আশ্রম, স্বভাব, পরিস্থিতি ইত্যাদি অনুযায়ী শাস্ত্রবিহিত শরীর নির্বাহের ক্রিয়া খাওয়া-দাওয়া, কাজকর্ম করা, উপদেশ দেওয়া, লেখা, পড়া, শোনা, চিন্তা করা ইত্যাদি যে হয় না— তা নয়। তাঁর দ্বারা এই সমস্ত ক্রিয়াও হতে পারে।

মানুষ মন ও বুদ্ধি দ্বারা যে সমস্ত কর্ম করে, নিজেকে সেগুলিরই কর্তা বলে মনে করে ; যেমন পড়া, লেখা, চিন্তা করা, দেখা, খাওয়া ইত্যাদি। কিন্তু এমন অনেক ক্রিয়া আছে যেগুলি মানুষ অজান্তেই করে থাকে ; যেমন শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করা, চোখ খোলা ও বন্ধ করা ইত্যাদি। তাহলে এই ক্রিয়াগুলির কর্তা নিজেকে না স্বীকার করার কথা এই শ্লোকে কেন বলা হয়েছে ? এর উত্তর হল এই যে, সাধারণত শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া স্বাভাবিকভাবে হয় ; কিন্তু প্রাণায়াম ইত্যাদিতে মানুষ শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া ইচ্ছানুরূপ করে থাকে। তেমনি চোখ খোলা ও বন্ধ করা জ্ঞাতসারে করা সম্ভব। সেইজন্য এই সমস্ত ক্রিয়ার কর্তাকেও নিজেকে অস্বীকার করতে বলা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ মানুষ যেমন **'শ্বসন্ উন্মিষন্ নিমিষন্'** (শ্বাসগ্রহণ ও চোখ খোলা বন্ধ করা)—এই ক্রিয়াগুলিকে স্বাভাবিক মনে করে এতে নিজের কর্তৃত্ব স্বীকার করে না, তেমনি অন্যান্য ক্রিয়াগুলিকেও স্বাভাবিক

---

[১]এখানে পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াগুলির বর্ণনা চারটি ক্রিয়ার অন্তর্গত করা হয়েছে অর্থাৎ 'বিসৃজন্' ক্রিয়ার অন্তর্গতই উপস্থ ও পায়ুর ক্রিয়াগুলির বর্ণনা করা হয়েছে।

মনে করে তাতে নিজ কর্তৃত্ব স্বীকার করা উচিত নয়।

এখানে **'পশ্যন্'** ইত্যাদি যে তেরোটি ক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে, সেগুলি কোনো আধার ব্যতিরেকে হওয়া সম্ভব নয়। এই ক্রিয়াগুলি যার আশ্রিত অর্থাৎ ক্রিয়াগুলির যে আধার, তাতে কখনো কোনো ক্রিয়া হয় না। এরূপে প্রকাশিত এইসব ক্রিয়া কোনো প্রকাশ ছাড়া সিদ্ধ হয় না। যে প্রকাশের দ্বারা এই সব ক্রিয়া প্রকাশিত হয়, যে প্রকাশের অন্তর্গত হয়, সেই প্রকাশে কখনো কোনো ক্রিয়া হয়নি, হয় না, হবে না, হতে পারে না এবং হওয়া সম্ভবও নয়। এরূপ ওই তত্ত্ব সকলের আধার, প্রকাশক এবং স্বয়ং-প্রকাশস্বরূপ। তিনি সবের মধ্যে থেকেও কিছু করেন না। সেই তত্ত্বকে সম্যকরূপে জানাবার জন্যই উপরে ত্রয়োদশ ক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে।

'ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্'—স্ব-স্বরূপে যখন কর্তৃত্বভাব নেই, তখন ক্রিয়াগুলি কী করে এবং কার দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে ? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ভগবান উপরের পদটিতে বলেছেন যে সমস্ত ক্রিয়াই ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা, ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে হচ্ছে। এখানে ভগবানের বলার উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয়ের কর্তৃত্ব জানানো নয়, বরং স্ব-স্বরূপের কর্তৃত্ব-রহিত অবস্থা (নির্লিপ্ততা) জানানো।

এখানে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ, প্রাণ, উপপ্রাণ ইত্যাদি সবগুলিকেই 'ইন্দ্রিয়াণি' পদের অন্তর্গত ধরা হয়েছে। ইন্দ্রিয়ের বিষয় পাঁচটি—শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ। এই বিষয়গুলিই ইন্দ্রিয়ের কর্মক্ষেত্র। সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং তাদের বিষয় প্রকৃতির কার্য। সেইজন্য ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সমস্ত ক্রিয়া হয় তা প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতিরই কার্য হয়—

১) **প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।**
(গীতা ৩।২৭)

২) **প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ।**
(গীতা ১৩।২৯)

গুণগুলির কার্য হওয়ায় ইন্দ্রিয়সকল এবং তাদের বিষয়গুলিকে 'গুণ'ই বলা হয়। অতএব গুণই গুণের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে—**'গুণা গুণেষু বর্তন্তে'** (গীতা ৩।২৮)। গুণগুলি ছাড়া আর কেউ কর্তা নয়—**'নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি'** (গীতা ১৪।১৯)। তাৎপর্য হল, ক্রিয়ামাত্রকেই প্রকৃতি দ্বারা হওয়া বলা হোক, প্রকৃতির কার্য গুণের দ্বারা হওয়া বলা হোক বা ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা হওয়া বলা হোক, বাস্তবপক্ষে সব একই কথা।

ক্রিয়ার তাৎপর্য হল—পরিবর্তন। পরিবর্তনরূপ ক্রিয়া প্রকৃতিতেই হয়। স্বরূপে পরিবর্তনরূপ ক্রিয়া বিন্দুমাত্র নেই। কারণ প্রকৃতি সর্বক্ষণ ক্রিয়াশীল এবং স্বরূপ কর্তৃত্বভাব রহিত। প্রকৃতি কখনো ক্রিয়াহীন হতে পারে না এবং স্বরূপের কখনো ক্রিয়া হওয়া সম্ভব নয়। ক্রিয়ামাত্রই প্রকাশ্য এবং স্বরূপ হচ্ছে প্রকাশক।

'নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি মন্যেত'—এখানে 'আমি (স্বরূপতঃ) কর্তা নই'—তার অর্থ এই নয় যে 'আমি (স্বরূপ) আগে কর্তা ছিলাম'। স্বরূপের কর্তৃত্বভাব বর্তমানে নেই, অতীতে ছিল না এবং ভবিষ্যতেও হবে না। ক্রিয়ামাত্রই প্রকৃতিতেই সংঘটিত হয়। কারণ প্রকৃতি সর্বদাই ক্রিয়াশীল এবং পুরুষ অর্থাৎ চেতন-তত্ত্ব সর্বদা ক্রিয়ারহিত। চেতন যখন ভ্রমবশে প্রকৃতির কার্যের সঙ্গে তাদাত্ম্য করে নেয় তখন সে প্রকৃতির ক্রিয়াগুলি নিজের ক্রিয়া বলে মনে করে এবং ওই সমস্ত ক্রিয়ার কর্তা হয়ে বসে (গীতা ৩।২৭)।

যেমন, এক ব্যক্তি চলন্ত রেলগাড়ির কামরায় বসে আছেন, তিনি চলছেন না ; কিন্তু রেলগাড়িটি চলমান, সেইজন্য সেই ব্যক্তির না চলেই চলা হয়ে যাচ্ছে। রেলগাড়িতে আরূঢ় অবস্থায় এখন ওই ব্যক্তির পক্ষে থেমে থাকা সম্ভব নয়। এইরূপ ক্রিয়াশীল প্রকৃতির কার্যরূপ স্থূল, সূক্ষ্ম বা কারণ—যে কোনো অবয়বের সঙ্গে যখন কেউ নিজ সম্পর্ক স্থাপন করে, তখন স্বরূপ কোনো কর্ম না করলেও সে ওই শরীরের দ্বারা কৃত কর্মগুলির কর্তা না হয়ে থাকতে পারে না।

সাংখ্যযোগী কখনো শরীর, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ ইত্যাদির সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্বীকার করেন না। তাই তিনি কর্মগুলির কর্তৃত্ব কখনো অনুভব করেন না (গীতা ৫।১৩)। যেমন শরীরের বালক থেকে যুবকে পরিণত হওয়া, কালো চুলের সাদা হওয়া, খাদ্যদ্রব্য হজম হওয়া, শরীর সবল অথবা দুর্বল হওয়া ইত্যাদি ক্রিয়াগুলি স্বাভাবিকভাবে (নিজে নিজেই) হচ্ছে, তেমনি অন্য সব ক্রিয়াও সাংখ্যযোগী অনুভব করেন স্বাভাবিকভাবেই হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ তিনি নিজেকে কোনো ক্রিয়ারই কর্তা বলে মনে করেন না।

স্বরূপকে যারা কর্তা মনে করে গীতায় তাদের নিন্দা করা হয়েছে (৩।২৭)। সেইরূপ শুদ্ধ স্বরূপকে যারা কর্তা বলে ভাবে তাদের বলা হয়েছে মলিন অন্তঃকরণযুক্ত এবং দুর্মতি

(১৮।১৬)। আবার স্বরূপকে যাঁরা অকর্তা বলে মনে করেন, তাঁদের প্রশংসা করা হয়েছে (১৩।২৯)।

'এব' পদ ব্যবহারের তাৎপর্য হচ্ছে, সাধক যেন কখনো নিজেকে কোনোভাবেই কর্তা না মনে করেন অর্থাৎ কখনো কোনো অংশেই নিজেকে কোনো কর্মের কর্তা না ভাবেন। এইভাবে নিজের মধ্যে যখন কর্তৃত্বভাব না থাকে তখন তার দ্বারা কৃত 'কর্ম' গুলির সংজ্ঞা বদলে যায় এবং তা 'ক্রিয়া' নামে অভিহিত হয়। তাকে কেবল 'চেষ্টা' মাত্র বলা যায়। এই দৃষ্টিতেই তৃতীয় অধ্যায়ের তেত্রিশতম শ্লোকে জ্ঞানী মহাপুরুষ দ্বারা কৃত ক্রিয়া-গুলিকে **'চেষ্টতে'** পদের দ্বারা বলা হয়েছে।

এখানে **'এব'** পদটি দেওয়ার দ্বিতীয় অর্থ হল স্বয়ং-এর শরীরের সঙ্গে তাদাত্ম্য হলেও বা শরীরের সঙ্গে সে যতই ওতঃপ্রোত হয়ে যাক, এবং নিজেকে 'আমি কর্তা' মেনে নিলেও স্বরূপে কখনো কর্তৃত্ব আসেও না আর কখনো আসতে পারেও না। কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে তাদাত্ম্য করে তিনি নিজের মধ্যে কর্তৃত্ব মেনে নেন। কারণ তাঁর মধ্যে মানা ও না-মানার সামর্থ্য ও স্বাধীনতা থাকে। সেইজন্য তিনি নিজেকে কর্তা বলে মনে করেন এবং যখন নিজের দিকে দৃষ্টি দেন তখন অকর্তাভাবও তাঁর অনুভবে আসে। এই দুইপ্রকার বক্তব্য (নিজেকে কর্তা মানা এবং না-মানা) থাকলেও স্বরূপের মধ্যে কখনো কর্তৃত্ব আসেই না। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের একত্রিশতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে—শরীরের আশ্রয়ে থাকলেও ইনি কিছু করেন না এবং লিপ্তও হন না। প্রকৃতিস্থ পুরুষই ভোক্তা হন (গীতা ১৩।২১)। গুণগুলির ক্রিয়ার ফলের ভোক্তা হলেও ইনি প্রকৃতপক্ষে নিজ স্বরূপ থেকে চ্যুত হন না। কিন্তু নিজ স্বরূপের দিকে দৃষ্টি না থাকায় নিজের মধ্যে লিপ্ততার ভাব উৎপন্ন হয়।

যদিও পুরুষ স্বয়ং স্বরূপতঃ নির্লিপ্ত, তাঁর মধ্যে ভোক্তৃত্ব নেই, থাকা সম্ভবও নয় ; তা সত্ত্বেও সুখদুঃখের ভোক্তা স্বয়ং পুরুষ (চেতন)ই হন অর্থাৎ সুখী বা দুঃখী স্বয়ং পুরুষ (চেতন)ই হয়ে থাকেন, জড়বস্তু নয়। কারণ জড়ে সুখী বা দুঃখী হওয়ার শক্তি বা যোগ্যতা কোনটাই নেই। তাহলে পুরুষের ভোক্তৃত্বভাব নেই অথচ সুখ-দুঃখের ভোক্তা পুরুষ—এ'দুটি কীভাবে সম্ভব ? এর কারণ হল ভোগের সময় যে ভোগাকার—সুখ বা দুঃখের বৃত্তি তৈরি হয়, সেটি প্রকৃতির এবং প্রকৃতিতেই থাকে। কিন্তু সেই বৃত্তির সঙ্গে তাদাত্ম্য হলে সুখী-দুঃখী হওয়া অর্থাৎ 'আমি সুখী, আমি দুঃখী'—এরূপ মেনে নেওয়া স্বয়ং পুরুষ নিজেই করেন। কারণ এরূপ স্বীকৃতি পুরুষের দ্বারাই সম্ভব, অর্থাৎ এটা পুরুষই মেনে নিতে পারে, জড় নয় ; এই দৃষ্টিতে পুরুষকে ভোক্তা বলা হয়েছে। সুখী বা দুঃখী হওয়া নিজে মানলেও অর্থাৎ সুখের সময় সুখী এবং দুঃখের সময় দুঃখী—এরূপ মনে করলেও পুরুষ স্বয়ং নিজ স্বরূপ থেকে নির্লিপ্ত এবং সুখ ও দুঃখের প্রকাশকই হয়ে থাকে ; এইভাবে দেখলে পুরুষে ভোক্তৃত্ব ভাব নেই এবং থাকতেও পারে না। কারণ একদেশীয়ভাব দ্বারাই ভোক্তৃত্ববোধ আসে এবং একদেশীয়ভাব অহংকার থেকে আসে। অহংকার প্রকৃতির কার্য এবং প্রকৃতি হল জড়। সুতরাং তার কার্য জড়ই হয় অর্থাৎ ভোক্তৃত্বভাবও জড়। এইজন্য ভোক্তৃত্বভাব পুরুষ (চেতন)-এ থাকে না। যদি পুরুষ সুখের সময় সুখী এবং দুঃখের সময় দুঃখী হত, তাহলে তার স্বরূপও পরিবর্তনশীল হত। কারণ সুখের আদি ও অন্ত আছে এবং দুঃখেরও আদি ও অন্ত আছে। তাহলে পুরুষও আদি ও অন্ত বিশিষ্ট হবে, যা একেবারেই অসম্ভব। কারণ গীতায় এঁকে অক্ষর, অব্যয় এবং নির্লিপ্ত বলা হয়েছে এবং তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষগণ এঁর স্বরূপ একরস, একরূপ বলে মেনে নিয়েছেন। যদি এই পুরুষকে সুখের সময় সুখী এবং দুঃখের সময় দুঃখী হন বলে মানা হয়, তাহলে পুরুষ সর্বদা একরস, একরূপ থাকেন—এরূপ কীভাবে বলা যায় ?

বিশেষ কথা

তৃতীয় অধ্যায়ের সাতাশতম শ্লোক **'অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে'**—তে ব্যবহৃত **'মন্যতে'** পদ দ্বারা যে কথা বলা হয়েছে, তারই নিষেধ এখানে **'নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ'** শ্লোকে ব্যবহৃত **'মন্যেত'** পদ দ্বারা করা হয়েছে। **'মন্যেত'** পদের অর্থ মানা নয়, বরং অনুভব করা বোঝায় ; কারণ স্বরূপে ক্রিয়া থাকে না—এটি অনুভব ; মান্যতা নয়। কর্ম করার সময় অথবা না করার সময়—দুই অবস্থাতেই স্বরূপের অকর্তৃত্বভাব যেমন তেমনই থাকে। সেইজন্য তত্ত্ববিৎ পুরুষ অনুভব করেন যে কর্ম করার সময় তিনি যেমন ছিলেন, কর্ম না করার সময়েও ঠিক তেমনই ছিলেন। অতএব কর্ম করা

বা না করায় তাঁর নিজ স্বরূপে (নিজ সত্তা) কী পার্থক্য হয় ? অর্থাৎ স্বরূপ সর্বদা অকর্তাই থাকে। এইরূপ প্রকৃতির পরিবর্তনের জ্ঞান (অনুভব) সকলের হয়, কিন্তু নিজ স্বরূপের পরিবর্তনের জ্ঞান কারোর হয় না। স্বরূপ সমস্ত ক্রিয়াগুলির নির্লিপ্তরূপ আশ্রয়, আধার এবং প্রকাশক। তাঁর মধ্যে কখনো বিন্দুমাত্র পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই।

স্বরূপে কখনো অভাব হয় না। যখন তা প্রকৃতির সঙ্গে অনুরাগবশতঃ তাদাত্ম্য মেনে নেয়, তখন তার মধ্যে অভাববোধ মনে হতে থাকে। সেই অভাব পূরণের নিমিত্ত পদার্থসকল আকাঙ্ক্ষা করতে থাকে। কামনা পূরণ করতে তার মধ্যে কর্তৃত্বভাব আসে। কারণ কামনা না জাগলে কর্তৃত্বভাব আসে না।

প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ ব্যতীত স্বরূপ কোনো ক্রিয়া করতে পারে না। কারণ যে করণসমূহ দ্বারা কর্ম হয়, সেগুলি প্রকৃতির অঙ্গ। কর্তা করণের অধীন। যেমন স্বর্ণকার যত দক্ষই হোক না কেন সে হাতুড়ি ইত্যাদি যন্ত্রপাতি ছাড়া কোনো কাজই করতে পারে না, তেমনি করণ ছাড়া কর্তাও কোনো কাজ করতে পারে না। এইভাবে যোগ্যতা, সামর্থ্য এবং করণ—এই তিনটি প্রকৃতিতেই আছে এবং প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধের জন্যই তা নিজের বলে মনে হয়। এই তিনটি সর্বদাই বাড়ে বা কমে কিন্তু স্বরূপ সর্বদা অপরিবর্তিত থাকে। অতএব এদের স্বরূপের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই।

কর্তৃত্বভাব প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধহেতু আসে, সেইজন্য নিজেকে কর্তা জ্ঞান করা পরধর্ম। স্বরূপে কর্তাভাব নেই, তাই নিজেকে অকর্তা মনে করা স্বধর্ম। যেমন ব্রাহ্মণ নিজের ('আমি ব্রাহ্মণ')ভাবে সর্বক্ষণ স্থিত থাকেন, তেমনি তত্ত্ববিৎ নিজ অকর্তাভাবে (স্ব-ধর্মে) সর্বদা স্থিত থাকেন—এই হল **'নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ'** পদটির ভাব।

পরিশিষ্ট-ভাব—বিবেকবান জ্ঞানযোগী প্রথমে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ এবং প্রাণের দ্বারা হওয়া সমস্ত ক্রিয়াগুলি সম্পাদন করেও 'আমি নিজে কিছুই করি না'—এইরূপ মনে করেন, পরে সেটি তাঁর অনুভব হয়। প্রকৃতপক্ষে চিন্ময় সত্তা মাত্রেই না-করা এবং না-হওয়া ব্যাপারটি আছে। স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ শরীরে হওয়া সকল ক্রিয়াই প্রকৃতিতে হয়, স্বরূপে নয়। সুতরাং স্ব-স্বরূপের কোনো ক্রিয়ার সঙ্গেই বিন্দুমাত্র সম্পর্ক থাকে না।

অবিবেচনাবশতঃ অহংকে নিজের স্বরূপ বলে মনে করলে যিনি **'অহংকার বিমূঢ়াত্মা'** হয়েছিলেন (গীতা ৩।২৭), তিনিই বিবেক-বিচার দ্বারা নিজেকে অহং-এর থেকে পৃথক বলে অনুভব করলে **'তত্ত্ববিৎ'** হয়ে ওঠেন অর্থাৎ তাঁর মধ্যে তখন আর কর্তৃত্বভাব থাকে না। তিনি নিত্য চিন্ময় তত্ত্বে স্থিত হয়ে যান।

অহংকারে মোহিত হয়ে স্বয়ং ভ্রমক্রমে নিজেকে কর্তা বলে মনে করলে তিনি কর্ম এবং তার ফলে বদ্ধ হয়ে যান এবং চুরাশী লক্ষ জন্ম পরিভ্রমণ করেন। কিন্তু তিনি যদি নিজেকে অহং থেকে পৃথক বলে মনে করেন এবং নিজেকে কর্তা না ভাবেন অর্থাৎ স্বয়ং বাস্তবিক যা, তাই অনুভব করেন তাহলে তাঁর পক্ষে তত্ত্ববিৎ (মুক্ত) হওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়। অর্থাৎ যা অসত্য, তাকে সত্য বলে মেনে নিলেও (যখন সেটি সত্য বলেই প্রতিভাত হয়,) তখন যা বাস্তবিক সত্য, তাকে মেনে নিলে সেটি যে তেমনই দেখাবে তাতে আর আশ্চর্যের কী আছে ?

প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং যখন নিজেকে কর্তা-ভোক্তা বলে মনে করেন, তখনও তিনি কর্তা বা ভোক্তা নন— **'শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে'** (গীতা ১৩।৩১)। কারণ নিজ স্বরূপ শুধুমাত্র সত্তা। সত্তায় অহং নেই আর অহং-এরও সত্তা নেই। সুতরাং 'আমি কর্তা'—এই মনোভাব যতই দৃঢ় হোক না কেন তা ভুলই ! ভুলকে ভুল বলে মনে করলেই তা দূর হয়—এটিই নিয়ম। কোনো গুহায় হাজার বছর ধরে অন্ধকার থাকলেও আলো প্রবেশ করলেই তা তৎক্ষণাৎ আলোকিত হয়ে ওঠে, আলোকিত হতে তার বহু মাস বা বছর লাগে না। তাই সাধকেরও দৃঢ়তার সঙ্গে মানা উচিত যে 'আমি কর্তা নই'। তখন এই স্বীকৃতি আর মেনে নেওয়া রূপে থাকে না, অনুভবে পরিণত হয়।

জড় চেতনের তাদাত্ম্য হলে 'আমি'র প্রয়োগ জড় (তাদাত্মরূপ অহং)-এর জন্যও হয় আবার চেতন (স্বরূপ)-এর জন্যও হয়। যেমন, 'আমি কর্তা'—এতে জড়ের দিকে দৃষ্টি থাকে এবং 'আমি কর্তা নই'—এতে (জড়ের নিষেধ থাকায়) চেতনের দিকে দৃষ্টি থাকে। যার দৃষ্টি জড়ের দিকে থাকে অর্থাৎ যিনি অহংকে নিজ স্বরূপ বলে মনে করেন, তিনি **'অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা'** এবং যাঁর দৃষ্টি চেতন (অহংবর্জিত স্বরূপ)-এর দিকে, তিনি **'তত্ত্ববিৎ'** হন।

সাধক যখন বর্তমানে 'আমি স্বয়ং কিছুই করি না'—এইভাবে স্বয়ংকে অকর্তা অনুভব করার চেষ্টা করেন, তখন তাঁর কাছে এক সমস্যা এসে হাজির হয়। যখন তাঁর অতীতের কৃত সুকর্মগুলি স্মরণে আসে, তখন তিনি প্রসন্ন হয়ে ভাবেন যে আমি খুব ভালো কাজ করেছি, ঠিক করেছি। আবার যখন তাঁর কুকর্মগুলি স্মরণে আসে, তখন দুঃখিত হয়ে ভাবেন, আমি খুব খারাপ কাজ করেছি, ভুল করেছি। এইভাবে অতীতের কর্মসংস্কারগুলি তাঁকে সুখী বা দুঃখী করে তোলে। এই বিষয়ে একটি মর্মকথা হল যে স্বরূপের কর্তৃত্বভাব বর্তমানে নেই, অতীতে ছিল না এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না। সুতরাং সাধকের জানা উচিত যে তিনি যেমন বর্তমানে অকর্তা, তেমনই অতীতেও অকর্তাই ছিলেন। কারণ বর্তমানই অতীত কালে বিগত হয়েছে। স্বরূপ সত্তামাত্র (অস্তিত্বমাত্র) এবং সত্তায় কোনো কর্মই সম্পাদিত হয় না। শুধুমাত্র অহংকারে মোহগ্রস্ত চিত্ত অজ্ঞানী মানুষের দ্বারাই কর্ম সম্পাদিত হয় (গীতা ৩।২৭)। সাধকের অতীতের কৃতকর্ম স্মরণে এলে যে সুখ-দুঃখের চিন্তা হয়, তাও প্রকৃতপক্ষে অহংকারবশতঃই হয়। বর্তমানে অহংকারবিমূঢ়াত্মা হয়ে অর্থাৎ অহংকারবশতঃ নিজ সম্পর্ক মেনেই সাধক সুখী বা দুঃখিত হয়। স্থূলদৃষ্টিতে দেখলে অতীতকাল যেমন এখন নেই, তেমনই অতীতে করা কর্মগুলিও এখন প্রত্যক্ষভাবে অনুপস্থিত। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখলে যেমন অতীতে বর্তমান ছিল না, তেমনি অতীতও ছিল না। এইরূপ বর্তমানে যেমন অতীত নেই, তেমনই বর্তমানও নেই। কিন্তু সত্তার নিত্য-নিরন্তর অবস্থা বিরাজমান। অর্থাৎ সত্তা (অস্তিত্ব) মাত্রেই অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই তিনটিরই সর্বতোভাবে অভাব আছে। সত্তা কালাতীত। তাই সে কোনো কালেই কর্তা নয়। সেই কালাতীত এবং অবস্থাতীত সত্তায় কোনো কালবিশেষ এবং অবস্থাবিশেষকে নিয়ে কর্তৃত্ব বা ভোক্তৃত্বের আরোপ করাই অজ্ঞতা। অতএব অতীতের কৃতকর্মগুলির স্মৃতি অহংকার বিমূঢ়াত্মার স্মৃতি, তত্ত্ববিদের নয়।

'নৈব কিঞ্চিৎকরোমি'-র অর্থ হল ক্রিয়া নেই কিন্তু সত্তা বা অস্তিত্ব আছে। সুতরাং সাধকের দৃষ্টি শুধুমাত্র অস্তিত্বের দিকেই থাকা উচিত। এই অস্তিত্ব চিন্ময় হওয়ায় জ্ঞানস্বরূপ এবং নির্বিকার হওয়ায় আনন্দস্বরূপ। এই আনন্দ অখণ্ড, শান্ত এবং একরস।

শরীরের সঙ্গে তাদাত্ম্য হওয়ায় প্রত্যেক ক্রিয়াতেই স্বয়ং-এর এরূপ প্রাধান্য থাকে যে আমি দেখছি, আমি শুনছি ইত্যাদি ক্রিয়া শরীরে হয় কিন্তু আমরা তাকে নিজের বলে মনে করি। স্বয়ং-এর কোনো ক্রিয়া নেই, তিনি করা এবং না-করা—দুই-ই রহিত (গীতা ৩।১৮), তাই শরীরের সাহায্যে ক্রিয়া সম্পাদিত হলেও শুধুমাত্র আমার বাস্তবিক স্বরূপ-এর ওপরই দৃষ্টি রাখা উচিত যে আমি কোনো কিছুই করি না।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—সপ্তম শ্লোকে কর্মযোগীর এবং অষ্টম-নবম শ্লোক দুটিতে সাংখ্যযোগীর কর্ম হতে নির্লিপ্ততার কথা জানিয়ে ভগবান এবার ভক্তিযোগীর কর্ম হতে নির্লিপ্ততার কথা বলছেন।

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥ ১০ ॥

[যঃ (যে ভক্তিযোগী); **কর্মাণি** (সমস্ত কর্ম); **ব্রহ্মণি** (ভগবানে); **আধায়** (অর্পণ করে); **সঙ্গম্, ত্যক্ত্বা** (আসক্তি ত্যাগ করে); **করোতি** (কর্ম করে); **সঃ, অম্ভসা** (সে জলমধ্যে); **পদ্মপাত্রম্, ইব** (কমল পত্রের ন্যায়); **পাপেন** (পাপে); **ন, লিপ্যতে** (লিপ্ত হয় না।)]

যিনি (ভক্তিযোগী) সমস্ত কর্ম পরমাত্মায় অর্পণ করেন এবং আসক্তি ত্যাগ করে কর্ম করেন তিনি জলে পদ্মপত্রের ন্যায় পাপে লিপ্ত হন না ॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা—**'ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি'**—শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, প্রাণ ইত্যাদি সবকিছু ভগবানেরই, নিজের নয়। সুতরাং এদের দ্বারা হওয়া ক্রিয়াগুলিকে ভক্তিযোগী কী করে নিজের বলে মনে করবেন? সেইজন্য তাঁর এই ভাব

থাকে, 'ক্রিয়ামাত্রই ভগবানের দ্বারা এবং ভগবানের জন্যই হচ্ছে, আমি তো নিমিত্তমাত্র।'

ভগবানই নিজ (আমার) ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নিজেই সব ক্রিয়া করছেন—এই কথাটি ঠিকভাবে উপলব্ধি করে সমস্ত ক্রিয়াগুলির কর্তা ভগবান—এরূপ স্বীকার করা হল উপরের পদগুলির অর্থ।

শরীরাদি বস্তুসকল নিজের নয়, বস্তুতঃ এগুলি এখানে প্রাপ্ত হয়েছে এবং ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এগুলি ভগবানের জন্য, ভগবৎ প্রীত্যর্থে অপরের সেবা করার জন্যই পাওয়া গিয়েছে। এগুলির উপর আমাদের স্বতন্ত্র অধিকার নেই অর্থাৎ এগুলি আমরা নিজ ইচ্ছানুযায়ী রাখতেও পারি না, পরিবর্তন করতেও পারি না এবং মরে গেলে সঙ্গেও নিয়ে যেতে পারি না। সেইজন্যই এই শরীর ইত্যাদিকে এবং এর দ্বারা হওয়া কর্মসকলকে নিজের বলে মনে করা সততা নয়। অতএব মানুষকে সততার সঙ্গে, যাঁর বস্তু তাঁর (অর্থাৎ ভগবানের) বলে মানতে হবে। কারণ এই সমস্ত বস্তুই তাঁর।

কর্মযোগী তাঁর সমস্ত ক্রিয়া এবং পদার্থ 'জগৎ-সংসার'-কে, জ্ঞানযোগী 'প্রকৃতি'-কে এবং ভক্তিযোগী 'ভগবান'-কে অর্পণ করেন। প্রকৃতি এবং সংসার—দুয়েরই প্রভু ভগবান। সুতরাং ক্রিয়া এবং পদার্থ সমস্ত ভগবানকে অর্পণ করাই হল শ্রেষ্ঠতা।

'সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ'—কোনো প্রাণী, পদার্থ, শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, প্রাণ, ক্রিয়া ইত্যাদিতে বিন্দুমাত্র অনুরাগ, আকর্ষণ, আসক্তি, গুরুত্ব, মমতা, কামনা ইত্যাদি না থাকাই হল সর্বতোভাবে আসক্তি ত্যাগ।

শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে জন্ম-মৃত্যুর কারণ 'অজ্ঞান' হলেও সাধনের দৃষ্টিতে আসক্তি-ই জন্ম-মৃত্যুর প্রধান কারণ—**'কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু'** (গীতা ১৩।২১)। অজ্ঞান (জ্ঞানের অভাব) আসক্তির ওপরে স্থিত। সেইজন্য আসক্তি চলে গেলে অজ্ঞানও নাশ হয়। এই অনুরাগ বা আসক্তি হতেই কামনা উৎপন্ন হয়—**'সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ'** (গীতা ২।৬২)। কামনাই সমস্ত পাপের মূল (গীতা ৩।৩৭)। এইজন্য পাপের মূল কারণ আসক্তি ত্যাগের কথা এখানে বলা হয়েছে। কারণ এটি থাকলে মানুষ পাপের হাত থেকে রক্ষা পায় না আর এটি না থাকলে মানুষ পাপে লিপ্ত হয় না।

কোনো ক্রিয়া করার সময় ক্রিয়াজনিত সুখ গ্রহণ করলে বা তার ফলে আসক্ত হলে সেই ক্রিয়া হতে সম্বন্ধ ত্যাগ হয় না, বরং আসক্তি দূর হওয়ার পরিবর্তে আরো বেড়ে যায়। কোনো ক্ষুদ্র বা বৃহৎ কর্মের ফলস্বরূপ কোনো বস্তু কামনা করাই যে আসক্তি তাই নয়, এমনকি ক্রিয়ার সময়ও আপনাতে মহত্ব বা ভালোত্ব আরোপ করা আর অন্যদের দিয়ে ভালো বলানোর ভাব পোষণ করাও আসক্তিই। সেইজন্য নিজের জন্য কিছু করতে নেই। যে কর্ম দ্বারা নিজের বিন্দুমাত্র সুখ পাবার ইচ্ছা হয়, সেই কৃতকর্ম নিজের জন্য হয়ে যায়। নিজ সুখ-সুবিধা এবং সম্মানের ইচ্ছা সর্বতোভাবে ত্যাগ করে কর্ম করা—এই হল উপরিউক্ত পদগুলির অভিপ্রায়।

'লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা'—এটি অত্যন্ত লক্ষণীয় বিষয় যে, ভগবানের শরণাগত হয়ে ভক্তিযোগী সংসারে থেকে ভগবানে নিবেদিতভাবে কর্মসম্পন্ন করলে কর্ম দ্বারা বন্ধনপ্রাপ্ত হন না। যেমন পদ্মপাতা জলে উৎপন্ন হয়ে, জলে থেকেও জল থেকে নির্লিপ্ত থাকে, তেমনি ভক্তিযোগী সংসারে থেকে সমস্ত কর্ম করলেও ভগবানের শরণাগত হওয়ায় সংসার থেকে সর্বদা সর্বতোভাবে নির্লিপ্ত থাকেন।

ভগবানের প্রতি বিমুখ হয়ে সংসারের কামনা করাই হল সমস্ত পাপের প্রধান কারণ। কামনা উৎপন্ন হয় আসক্তি থেকে। আসক্তি সর্বতোভাবে দূর হলে কামনা থাকে না। তাই পাপ হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে না।

ধূম্রে অগ্নির ন্যায় সকল কর্মেই কোনো না কোনো দোষ যুক্ত থাকে (গীতা ১৮।৪৮)। কিন্তু যিনি আশা, কামনা এবং আসক্তি ত্যাগ করেছেন, তাঁকে এই দোষগুলি স্পর্শ করে না। আসক্তি রহিত হয়ে ভগবানের জন্য কর্ম করলে এর প্রভাবে সঞ্চিত সমস্ত পাপ বিলীন হয়ে যায় (গীতা ৯।২৭-২৮)। সুতরাং ভক্তিযোগীর কোনোভাবেই পাপের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে না।

এখানে **'পাপেন'** পদটি কর্ম দ্বারা হওয়া সেই পাপ-পুণ্যরূপ ফলের বাচক, যেটি পরবর্তী জন্ম আরম্ভের কারণ হয়। ভক্তিযোগী সেই পাপ-পুণ্যরূপ ফলে কখনো লিপ্ত হন না অর্থাৎ বন্ধনপ্রাপ্ত হন না। এই কথাই নবম অধ্যায়ের আটাশতম শ্লোকে **'শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ'** পদ দ্বারা বলা হয়েছে।

পরিশিষ্ট-ভাব—এখানে সগুণ ঈশ্বরকে 'ব্রহ্ম' বলার অর্থ হল যে ঈশ্বর সগুণ, নির্গুণ, সাকার, নিরাকার সবই; কারণ তিনি সমগ্র। সমগ্রর মধ্যে সবই অন্তর্ভুক্ত (গীতা ৭।২৯-৩০)। শ্রীমদ্ভাগবতেও ব্রহ্ম (নির্গুণ-নিরাকার), পরমাত্মা (সগুণ-নিরাকার) এবং ভগবান (সগুণ-সাকার) এই তিনকে একই বলা হয়েছে[১]। তাৎপর্য এই যে 'সগুণ'-এর মধ্যে ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান—এই তিনটিই অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু 'নির্গুণ'-এর মধ্যে কেবল ব্রহ্মকেই ধরা হয়, কারণ নির্গুণে গুণ নিষিদ্ধ। তাই নির্গুণ সীমিত আর সগুণ সমগ্র।

বৈষ্ণবভক্তগণ সগুণ-সাকার ভগবানের উৎসবকে **'ব্রহ্মোৎসব'** নামে অভিহিত করেন। অর্জুনও ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে **'ব্রহ্ম'** নামে অভিহিত করেছেন—**'পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্‌'** (গীতা ১০।১২)। গীতায় ব্রহ্মকে তিনটি নামে অভিহিত করা হয়েছে—'ওঁ', 'তৎ' এবং 'সৎ' (১৭।২৩)। নাম-নামীর সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় এটিও সগুণ।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—ভগবান এবার কর্মযোগীর কর্ম করার রীতি জানাচ্ছেন।

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে।। ১১ ।।

[**যোগিনঃ** (কর্মযোগী) ; **সঙ্গম্‌, ত্যক্ত্বা** (আসক্তি ত্যাগ করে) ; **কেবলৈঃ** (কেবল) ; **ইন্দ্রিয়ৈঃ, কায়েন** (ইন্দ্রিয়, শরীর) ; **মনসা, বুদ্ধ্যা** (মন ও বুদ্ধি সহযোগে) ; **আত্মশুদ্ধয়ে** (অন্তঃকরণের শুদ্ধির জন্য) ; **অপি** (ই) ; **কর্ম** (কর্ম) ; **কুর্বন্তি** (করেন।)]

কর্মযোগী আসক্তি ত্যাগ করে শুধুমাত্র (মমতারহিত) ইন্দ্রিয়-শরীর-মন-বুদ্ধি সহযোগে অন্তঃকরণের শুদ্ধির জন্যই কর্ম করেন ।। ১১ ।।

ব্যাখ্যা—'যোগিনঃ'—এখানে **'যোগিনঃ'** পদটি কর্মযোগীর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যে যোগী ভগবদ্‌-অর্পণ বুদ্ধিতে কর্ম করেন, তাঁকে ভক্তিযোগী বলা হয়। কিন্তু যে যোগী শুধু সংসারের সেবার জন্য নিষ্কামভাবে কর্ম করেন, তাঁকে কর্মযোগী বলা হয়। কর্মযোগী তাঁর শরীর, মন প্রভৃতির দ্বারা কর্ম করলেও, সেগুলিকে নিজের বলে মনে করেন না, বরং এগুলি সংসারেরই বলে মনে করেন। কেন-না শরীর ইত্যাদির জগৎ-সংসারের সঙ্গেই ঐক্য থাকে।

'কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি'—যে শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধিকে সাধারণ মানুষ নিজের বলে মনে করে প্রকৃতপক্ষে সেগুলি কোনোভাবেই তার নিজের নয়, সে এগুলো প্রাপ্ত হয়েছে এবং এগুলি তাকে ছেড়ে চলে যাবে। তাই এগুলিকে নিজের বলে মনে করা সম্পূর্ণ ভুল। জগতের সঙ্গে এগুলির স্বতঃসিদ্ধ ঐক্য থাকে।

বিচার করলে দেখা যায় যে, শরীর ইত্যাদি বস্তু কোনোপ্রকারেই নিজের নয়। মালিকানার বিচারে দেখলে এগুলি ভগবানের। কারণের দৃষ্টিতে দেখলে এরা প্রকৃতির আর কাজের দৃষ্টিতে দেখলে এরা জগতের (সংসার থেকে অভিন্ন)। এইরূপ যে কোনোভাবেই এগুলিকে নিজের বলে মনে করা, এগুলিতে মমত্ব রাখা ভুল। সর্বতোভাবে মমত্ব দূর করার জন্য এখানে **'কেবলৈঃ'** পদটি প্রযুক্ত হয়েছে।

'কেবলৈঃ' পদটি এখানে বহুবচনে ব্যবহৃত হওয়ায় ইন্দ্রিয়গুলিরই বিশেষণ বুঝতে হবে। কিন্তু শুধু ইন্দ্রিয়গুলি থেকে মমত্ব দূর করার জন্যই বলা হয়েছে শরীর, মন, বুদ্ধি থেকে দূর করার জন্য বলা হয়নি—এরকম সম্ভবপর নয়। শরীর ইত্যাদির সম্পর্ক সমগ্র সমষ্টি সংসারের সঙ্গে। ব্যষ্টি কখনও সমষ্টি থেকে পৃথক হতে পারে না। সেইজন্য ব্যষ্টির (শরীরাদির) সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলে সমষ্টির (সংসারের) সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। যেমন একটি মেয়ের সঙ্গে বিবাহ হলে অর্থাৎ সম্পর্ক

[১]বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্‌। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।। (১।২।১১)

স্থাপিত হলে শাশুড়ি, শ্বশুর ইত্যাদি শ্বশুরবাড়ির সমস্ত আত্মীয়ের সঙ্গে আপনিই সম্বন্ধ হয়, তেমনিই জগৎ-সংসারের কোনো বস্তুর (শরীর ইত্যাদির) সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলে অর্থাৎ সেটিকে নিজের বলে মেনে নিলে সমস্ত সংসারের সঙ্গে স্বতঃই সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সুতরাং **'কেবলৈঃ'** পদটি শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি প্রভৃতি সমস্ত বস্তু থেকেই মমত্ব দূর করার প্রেরণা প্রদান করেন।[১]

প্রকৃতপক্ষে কর্তার স্বয়ং নির্মম হওয়া প্রয়োজন। যদি কর্তা স্বয়ং নির্মম হন তাহলে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি থেকে মমত্ববোধ সর্বতোভাবে দূর হয়। কারণ প্রকৃতপক্ষে শরীর, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি স্বরূপ থেকে সর্বতোভাবে পৃথক ; সুতরাং এতে মমত্ববোধ শুধু মেনে নেওয়া হয়েছে, বাস্তবে নেই।

কর্মযোগ সাধনায় ফলেচ্ছা ত্যাগই প্রধান (গীতা ৫।১২)। সাধারণ ব্যক্তি ফলপ্রাপ্তির আশায় কর্ম করে, কিন্তু কর্মযোগী ফলাসক্তি দূর করার জন্য কর্ম করেন। কিন্তু যিনি শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, প্রাণ ইত্যাদিকে নিজের বলে মনে করেন, তিনি ফলেচ্ছা ত্যাগ করতেই পারেন না[২]। কারণ তাঁর মনোভাব হয় যে শরীর ইত্যাদি যখন তাঁর নিজের তখন তার দ্বারা কৃত কর্মের ফলও তাঁরই প্রাপ্য। এইভাবে শরীর ইত্যাদিকে নিজের বলে মনে করলে স্বতঃই ফলাকাঙ্ক্ষা জন্মায়। তাই ফলাকাঙ্ক্ষা দূর করার জন্য শরীর ইত্যাদিকে কখনো নিজের বলে মনে না করা অবশ্য কর্তব্য।

'কেবলৈঃ' পদের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, যেমন বর্ষা বা মেঘ জল বর্ষণ করে, তাতে লোকের উপকার হয়। কিন্তু তার মধ্যে এই ভাব থাকে না যে 'আমি বর্ষা, আমার জন্য অন্যের হিত হবে, অন্যের সুখ হবে।' এইরূপ ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা যে হিতকর্ম হয় তাতে কোনো অহংভাব যেন প্রকাশ না পায়। কিন্তু শরীর, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ব্যক্তি বিশেষের কোনো অভিষ্ট সিদ্ধ হলে বা কারো মনস্কামনা পূর্ণ হলে যদি (নিজের) মনে প্রসন্নতা আসে তবে মন, বুদ্ধি ইত্যাদিতে আসক্তিশূন্যতা থাকে না, বরং তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়, মমত্ববোধ জন্মায়।

'সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে'—(পূর্বে দশম শ্লোকেও **'সঙ্গং ত্যক্ত্বা'** পদটি ব্যবহৃত হয়েছে ; অতএব এটির ব্যাখ্যা সেখানেই দেখা উচিত।)

সাধারণতঃ মল, বিক্ষেপ এবং আবরণ-দোষ দূর হওয়াকেই অন্তঃকরণের শুদ্ধি বলে মনে করা হয়। কিন্তু বাস্তবিক অন্তঃকরণশুদ্ধি তখনই হয় যখন শরীর-ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি থেকে মমত্ববোধ সর্বতোভাবে দূর হয়। শরীর ইত্যাদি কখনও বলে না যে 'আমরা তোমার' বা 'তুমি আমাদের'। আমরাই তাদের নিজের বলে মনে করি। ওগুলি নিজের বলে মনে করাই অশুদ্ধি—**'মমতা মল জরি জাঈ'** (শ্রীরামচরিতমানস ৭।১১৭ক)। অতএব শরীরাদির প্রতি অহংভাব-মমত্ববোধ ইত্যাদি কাল্পনিক সম্পর্কের সর্বতোভাবে অভাবকেই আত্মশুদ্ধি বলা হয়।

এই শ্লোকে ব্যবহৃত **'কেবলৈঃ'** পদটির দ্বারা শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি ইত্যাদি নিজের বলে মনে না করার কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ **'কেবলৈঃ'** পদটিতে নিজের মমত্বভাব দূরীভূত করার উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে এবং এখানে আত্মশুদ্ধয়ে পদে মমত্বকে সর্বতোভাবে দূর করার কথা বলা হয়েছে। তাৎপর্য এই যে, অন্তঃকরণ শুদ্ধির জন্য (মমত্বভাব সর্বতোভাবে দূর করার উদ্দেশ্যে) শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধিকে নিজের বলে না ভাবলেও একটি সূক্ষ্ম মমত্বভাব এদের মধ্যে থেকে যায়। সেই সূক্ষ্ম মমত্বভাব সর্বতোভাবে দূরীভূত করাই হল আত্মশুদ্ধি অর্থাৎ অন্তঃকরণশুদ্ধি।

অহংবোধেও মমত্ববোধ থাকে। মমত্ববোধ সর্বতোভাবে দূর হলে যখন অহংবোধেও মমত্ববোধ থাকে না তখনই সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধি হয়।

'কর্ম কুর্বন্তি'—শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধিতে যে সূক্ষ্ম মমত্বভাব থেকে যায় তাকে সর্বতোরূপে দূর করার জন্যই কর্মযোগী কর্ম করেন।

মানুষ যতক্ষণ কর্মের দ্বারা নিজের কোনোপ্রকার সুখ আকাঙ্ক্ষা করে অর্থাৎ ফলের কামনা করে এবং শরীর-

---

[১]এখানে 'অর্থবশাদ্ বিভক্তিপরিণামঃ' অনুসারে 'কেবলৈঃ' পদের বিভক্তির পরিণাম করে নেওয়া উচিত অর্থাৎ 'কেবলেন কায়েন', 'কেবলেন মনসা', 'কেবলয়া বুদ্ধ্যা'—এইভাবে বিভক্তির পরিবর্তন করা উচিত।

[২]মানুষ যদি কর্মফলের আশা না করে, তাহলেও শরীর ইত্যাদিকে নিজের বলে মনে করলে সে কর্মফলের হেতু হয়, যেটি ভগবান নিষেধ করেছেন—**'মা কর্মফলহেতুর্ভূঃ'** (গীতা ২।৪৭)

ইন্দ্রিয়-মন ইত্যাদি কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে নিজের বলে মনে করে, ততক্ষণ সে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না। সেইজন্য কর্মযোগী ফলেচ্ছা ত্যাগ করে এবং কর্ম-সামগ্রীগুলিকে নিজের বলে মনে না করে অপরের হিতার্থে কর্ম করে। কেন-না যোগারূঢ় হতে ইচ্ছুক মননশীল যোগীর জন্য (অন্যদের হিতের জন্য) কর্ম করাকেই হেতু বলা হয়। **'আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে'** (গীতা ৬।৩)। এইভাবে অন্যের হিতের উদ্দেশ্যে তিনি যেমন যেমন কর্ম করেন, তেমনিভাবে তাঁর মমতা-আসক্তি ক্রমশঃ দূর হতে থাকে এবং অন্তঃকরণের শুদ্ধিলাভ হতে থাকে।

পরিশিষ্ট-ভাব— শুদ্ধ করলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় না, কারণ শুদ্ধ করলে অন্তঃকরণের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত **'আমার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হোক'**—এই ভাব বজায় থাকে, ততক্ষণ অন্তঃকরণের শুদ্ধি হতে পারে না, কারণ মমতাই হল যথার্থ অশুদ্ধি । তাই রামায়ণে আছে—**'মমতা মল জরি জাই'** (শ্রীরামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ১১৭ ক)। ভগবানও এখানে **'কেবলৈঃ'** পদ দ্বারা অন্তঃকরণের সঙ্গে মমত্ববোধ না রাখার কথা বলেছেন। শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিতে মমত্ববোধ সর্বতোভাবে দূর হওয়াই হল অন্তঃকরণের শুদ্ধি। তাই অন্তঃকরণে মমত্ববোধ (আপনভাব) সর্বতোভাবে দূর করার জন্য কর্মযোগী অনাসক্তভাবে কর্ম করে থাকেন। তিনি নিজের জন্য কোনো কর্ম করেন না। কারণ মমত্ববোধ থাকলে কর্ম করা হয়, কর্মযোগ হয় না। নিজের জন্য কোনো কর্ম না করলে কর্মযোগীর গতি স্বরূপ অভিমুখী হয়।

কর্মযোগী প্রথমে মমত্বরহিত হওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে কর্ম করেন, পরে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

* * *

সম্বন্ধ—এবার ভগবান পরবর্তী শ্লোকে অন্বয় ও ব্যতিরেক রীতির সহযোগে কর্মযোগের মহিমা বর্ণনা করছেন।

যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে॥ ১২ ॥

[**যুক্তঃ** (কর্মযোগী) ; **কর্মফলম্, ত্যক্ত্বা** (কর্মফল ত্যাগ করে) ; **নৈষ্ঠিকীম্, শান্তিম্** (নৈষ্ঠিক শান্তি) ; **আপ্নোতি** (প্রাপ্ত হন) ; **অযুক্তঃ** (সকাম ব্যক্তি) ; **কামকারেণ** (কামনাবশতঃ) ; **ফলে, সক্তঃ** (ফলে আসক্ত হয়ে) ; **নিবধ্যতে** (বন্ধন দশা প্রাপ্ত হন।)]

কর্মযোগী কর্মফল ত্যাগ করে নৈষ্ঠিক শান্তি (নির্বাণ, মোক্ষ) প্রাপ্ত হন। কিন্তু সকাম ব্যক্তি কামনাবশতঃ ফলে আসক্ত হয়ে বন্ধন দশা প্রাপ্ত হন॥ ১২ ॥

ব্যাখ্যা—'যুক্তঃ'—এই পদটির অর্থ প্রসঙ্গানুযায়ী গৃহীত হয় ; যেমন—এই অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে নিজেকে অকর্তা বলে মনে করেন যেসব সাংখ্যযোগী, তাঁদের জন্য **'যুক্তঃ'** পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। তেমনি এইস্থানে কর্মফল ত্যাগকারী কর্মযোগীদের জন্য **'যুক্তঃ'** পদটি উল্লিখিত হয়েছে।

যাঁদের উদ্দেশ্য 'সমতা' লাভ করা, তাঁরা সকলেই যুক্ত অর্থাৎ যোগী। এইস্থানে কর্মযোগীর রীতি আলোচনা হচ্ছে, তাই এখানে **'যুক্তঃ'** পদটি এইরূপ কর্মযোগীর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত, বুদ্ধি ব্যবসায়াত্মিকা (নিশ্চয়াত্মিকা) হওয়াতে যাঁর মধ্যে সাংসারিক কামনা-বাসনা নেই।

'কর্মফলং ত্যক্ত্বা'—এখানে কর্মফল ত্যাগ করার অর্থ ফলেচ্ছা, আসক্তি ত্যাগ করা। কারণ প্রকৃতপক্ষে ত্যাগ কর্মফলের হয় না, বরং হয় কর্মফলের ইচ্ছার। কর্মফলের ইচ্ছা ত্যাগ করার অর্থ—যে কোনো কর্ম এবং কর্মফলে নিজের জন্য কখনও বিন্দুমাত্র সুখ পাওয়ার আশা না রাখা। কর্ম করলে প্রথমতঃ একটি তৎকালীন ফল (সুখ) পাওয়া যায় এবং দ্বিতীয়তঃ কর্মের পরিণামে ফল পাওয়া যায়—এই দুই প্রকার ফলের ইচ্ছাই ত্যাগ করতে হয়। কিছুই নিজের নয়, নিজের জন্য কিছুই করার নেই এবং নিজের জন্য কিছুই প্রয়োজন নেই—এইভাবে কর্তা সর্বপ্রকারে নিষ্কাম হলে কর্মফলের ইচ্ছা ত্যাগ হয়।

সঞ্চিত কর্ম অনুসারে প্রারব্ধ সৃষ্ট হয়, প্রারব্ধ অনুযায়ী মানুষ জন্মগ্রহণ করে এবং মনুষ্য-জন্মে নতুন কর্ম সৃষ্ট

হওয়ায় নতুন কর্ম-সংস্কার সঞ্চিত হয়। কিন্তু কর্মফলের আসক্তি ত্যাগ করে কর্ম করলে কর্ম ভর্জিত বা সিদ্ধবীজের ন্যায় সংস্কার উৎপন্ন করতে অসমর্থ হয় এবং তার সংজ্ঞা 'অকর্মে' পরিণত হয় (গীতা ৪।২০)। বর্তমানকালে নিষ্কামভাবে কৃত কর্মপ্রভাবে পুরাতন কর্ম-সংস্কার (সঞ্চিত কর্মফল)ও শেষ হয় (গীতা ৪।২৩)। এইভাবে তার পুনর্জন্মের কারণই শেষ হয়ে যায়।

কর্মফল চার প্রকারের হয়—

১) **দৃষ্ট কর্মফল**—বর্তমান সময়ে করা নতুন কর্মের ফল, যা তৎক্ষণাৎ প্রত্যক্ষ প্রাপ্ত হয় ; যেমন—আহার করলে তৃপ্তিলাভ করা ইত্যাদি।

২) **অদৃষ্ট কর্মফল**—বর্তমান সময়ে করা নতুন কর্মের ফল, যেটি এখন সঞ্চিতরূপে সংগৃহীত হচ্ছে, কিন্তু ভবিষ্যতে ইহলোকে এবং পরলোকে অনুকূল বা প্রতিকূল রূপে প্রাপ্ত হবে।

৩) **প্রাপ্ত কর্মফল**—প্রারব্ধ অনুযায়ী বর্তমানে প্রাপ্ত শরীর, জাতি, বর্ণ, ধন, সম্পত্তি, অনুকূল এবং প্রতিকূল পরিস্থিতি ইত্যাদি।

৪) **অপ্রাপ্ত কর্মফল**—প্রারব্ধ কর্মের ফলরূপে যে অনুকূল বা প্রতিকূল পরিস্থিতি ভবিষ্যতে মিলতে পারে।

উপরিউক্ত চার প্রকারের কর্মফলগুলিতে দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট কর্মফল 'ক্রিয়মাণ কর্মের' অধীন তথা প্রাপ্ত এবং অপ্রাপ্ত কর্মফল 'প্রারব্ধকর্মের' অধীন। কর্মফল ত্যাগ করার অর্থ—দৃষ্ট কর্মফলের আগ্রহ না রাখা এবং তা পেলে প্রসন্ন বা অপ্রসন্ন না হওয়া এবং অদৃষ্ট কর্মফলের আশা না করা ; প্রাপ্ত কর্মফলে মমত্ববোধ না করা এবং সুখী বা দুঃখী না হওয়া ও অপ্রাপ্ত কর্মফলের কামনা না করা যে, যেন দুঃখ দূর হয় এবং সুখ আসে।

সাধারণ মানুষ কোনো-না-কোনো কামনা নিয়ে কর্ম আরম্ভ করে এবং কর্মের সমাপ্তি পর্যন্ত তারই চিন্তা করতে থাকে। যেমন, ব্যবসায়ী অর্থ লাভের ইচ্ছায় ব্যবসা আরম্ভ করলে তার বৃত্তিগুলি অর্থের লাভ-ক্ষতির দিকেই থাকে, যেন তার লাভ হয়, ক্ষতি না হয়। অর্থ লাভ হলে সে প্রসন্ন হয় আর ক্ষতি হলে দুঃখিত হয়। এইভাবে সকল ব্যক্তিই স্ত্রী, পুত্র, ধন, মান, কীর্তি ইত্যাদি কোনো না কোনো অনুকূল ফলের আশা নিয়েই কর্ম করে। কিন্তু কর্মযোগী ফলেচ্ছা ত্যাগ করে কর্ম করেন।

এখানে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, যদি কোনো ইচ্ছাই না থাকে তাহলে লোকে কর্ম করবে কেন ? এর উত্তরে সর্বপ্রথম কথা হল এই যে, কোনো মানুষ কোনো অবস্থায় কর্ম সর্বতোভাবে ত্যাগ করতে পারে না (গীতা ৩।৫)। যদি এরূপ মেনে নেওয়াও যায় যে মানুষ বেশির ভাগ কর্ম স্বরূপতঃ ত্যাগ করতে পারে, তাহলেও মানুষের অন্তরে যতক্ষণ সংসারের প্রতি আসক্তি থাকে, ততক্ষণ সে শান্তি পায় না অর্থাৎ কর্ম না করে থাকতে পারে না। তার বিষয় চিন্তা অবশ্যই হবে, যেটিকে কর্ম করাই বোঝায়। বিষয়ের চিন্তা হওয়ায় সে ক্রমশঃ পতনের দিকে চলে যাবে (গীতা ২।৬২-৬৩)। সেইজন্য যতক্ষণ আসক্তি সর্বতোভাবে দূর না হয়, ততক্ষণ মানুষ কর্ম থেকে মুক্তি পায় না। কর্ম করলে পুরাতন আসক্তি নাশ হয় এবং নিঃস্বার্থভাবে পরহিতের জন্য কর্ম করলে নতুন ভাবে আসক্তি উৎপন্ন হয় না।

বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, কর্মফলের ইচ্ছা রেখে কাজ করা অত্যন্ত অবিবেচকের কাজ। প্রথমতঃ প্রত্যেক কর্মই যখন আরম্ভ এবং সমাপ্ত হয়, তখন তার ফল কীভাবে নিত্য হতে পারে ? ফলও প্রাপ্ত হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ কর্ম এবং কর্মফল—দুই-ই নশ্বর। হয় ফল থাকবে না, না হয় আমাদের বলতে যে শরীর, তা থাকবে না। দ্বিতীয়তঃ ইচ্ছা থাক বা না থাক যে ফল পাবার, তা পাওয়া যাবেই। ইচ্ছা করলে বেশি ফল পাওয়া যায় এবং ইচ্ছা না করলে ফল কম পাওয়া যায়, এমন নয়। অতএব ফল কামনা করা অবিবেচনা-প্রসূতই।

নিষ্কামভাবে অর্থাৎ ফলের কামনা না করে লোকহিতার্থে কর্ম করলে তা থেকে সম্পর্ক ছেদ হয়। কর্মযোগীর কর্ম উদ্দেশ্যহীন অর্থাৎ পাগলের কর্মের ন্যায় হয় না, বরং পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তির মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি লোকহিতার্থে সকল কর্ম করেন। তাঁর কর্মের উদ্দেশ্য পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তি, সাংসারিক বস্তু বা সুখ নয়। শরীরে মমত্ববোধ না থাকলে, তাতে আলস্য বা অকর্মণ্যতা ইত্যাদি দোষ আসে না। তিনি সমস্ত কর্ম সুচারুরূপে এবং তৎপরতার সঙ্গে সম্পন্ন করেন।

মর্মকথা

যে সকল কর্ম করলে নশ্বর পদার্থের প্রাপ্তি হয়, সেই

কর্মসমূহ নিষ্কামভাবে একমাত্র পরমাত্মপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে লোকহিতার্থে করলে সেটি নিত্যসিদ্ধ পরমাত্মতত্ত্ব লাভের হেতু হতে পারে। তৃতীয় অধ্যায়ের বিংশতম শ্লোকে বলা হয়েছে যে, কর্ম দ্বারাই জনকাদি কর্মযোগীগণ পরমাত্ম-প্রাপ্তিরূপ সিদ্ধিলাভ করেছেন এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে বলা হয়েছে যে, যোগারূঢ় হবার জন্য কর্ম করা আবশ্যক। এই সমস্ত আলোচনাতে এই অর্থ পরিস্ফুট হয় যে, পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তি কর্ম দ্বারাই লাভ করা সম্ভব। পার্বতী, মনু-শতরূপা প্রমুখ তপস্যারূপ কর্ম দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্ত হয়েছেন। একথাও বলা হয় যে, জপ-ধ্যান-সৎসঙ্গ-স্বাধ্যায়-শ্রবণ-মনন ইত্যাদি সাধন দ্বারা তত্ত্বের সাক্ষাৎ হয়। এর বিপরীত এমন কথাও শোনা যায় যে তপস্যা ইত্যাদি কর্ম দ্বারা ভগবৎ প্রাপ্তি হয় না (গীতা ১১।৫৩), পরমাত্মা কোনো কর্মের ফলের লভ্য নয় ইত্যাদি। এই দুটি কথার সামঞ্জস্য কীভাবে সম্ভব ?

এর উত্তর হচ্ছে এই যে, প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মা লাভ কোনো কর্মের দ্বারা হয় না। তিনি কোনো কর্মের ফল নন। পরমাত্মা প্রতিটি দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদিতে সদা-সর্বদা বিদ্যমান। ইনি সর্বদা সকলের প্রাপ্ত এবং তাঁতেই সব সময় সকল প্রাণীর অবস্থান। পরমাত্মা হতে কখনো কোনো ব্যক্তি পৃথক ছিল না, নেই, থাকবে না এবং থাকা সম্ভবও নয়। কিন্তু জড়-প্রকৃতির কার্য শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি-বস্তু ইত্যাদিতে অহংকার ও মমত্ববশতঃ নিজের সঙ্গে সম্পর্ক স্বীকার করতে থাকায় মানুষ পরমাত্মা হতে বিমুখ হয়ে যায় এবং যা বাস্তবিক নিজের, সেই পরমাত্মাকে নিজের না মনে করে, যা নিজের নয় সেই নশ্বর বস্তুগুলি নিজের বলে মনে করতে থাকে। তাৎপর্য হল জড় পদার্থের সঙ্গে জীবের যে আসক্তিযুক্ত সম্বন্ধ থাকে, তাকে দূর করাতেই সমস্ত সাধনের সার্থকতা থাকে।

জড়ত্ব থেকে সর্বতোভাবে সম্পর্ক-ছেদ হলেই নিত্যপ্রাপ্ত পরমাত্মার অনুভব হয়। সুতরাং তপস্যাদি সাধনা করতে করতে যখন জড়ত্ব থেকে সম্পর্ক-ছেদ হয় তখনই পরমাত্মপ্রাপ্তি ঘটে। সেই সম্পর্ক খুব অনায়াসে ত্যাগ হয়, যখন নিষ্কামভাবে শুধুমাত্র লোকহিতের উদ্দেশ্যে কর্তব্য-কর্ম করা হয়।

পরমাত্মাকে কোনো কিছুর দ্বারা কেনা যায় না ; কেননা প্রকৃতির সমস্ত বস্তু একত্র করলেও চিন্ময় এবং অবিনাশী পরমাত্মার বিন্দুমাত্র সমকক্ষ হতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ মূল্য দিয়ে যে বস্তু পাওয়া যায়, তা ঐ মূল্যের চেয়ে দুর্বল বা কম মূল্যবানই হয়। কর্ম দ্বারা যদি পরমাত্মা লাভ হয়, তাহলে তিনি কর্মের থেকে দুর্বল বা কম মূল্যবান বলে প্রমাণিত হন।

এখানে একটি মর্মকথা বোঝার আছে যে, বহু সাধকই যে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদির সাহায্যে সাধনা করেন সেইগুলির প্রতি সম্বন্ধ, মহত্ত্বভাব এবং আশ্রয় রেখেই সাধনা করেন। এই শরীরের সঙ্গে যতক্ষণ বিন্দুমাত্র সম্পর্ক বজায় থাকে ততক্ষণ জড়ত্বের সঙ্গেও সম্পর্ক বজায় থাকে। জড়ত্বের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় থাকলে পরমাত্মতত্ত্বের অনুভব হয় না। পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তি জড়ত্বের দ্বারা হয় না, বরং অন্তর থেকে জড়ত্বের গুরুত্ব ত্যাগ করলে হয়।

জগৎ-সংসার এবং শরীর-মন-ইন্দ্রিয়-বুদ্ধি এসবই সমগোত্রীয়। অতএব এগুলিকে জগতেরই মনে করে, জগতের সেবায় লাগানো উচিত (যাকে কর্মযোগ বলা হয়)। কিন্তু এই শরীর ইত্যাদিকে কোনোভাবেই নিজের বলে মনে না করা, এদের গুরুত্ব না দেওয়া, এদের আশা না রাখা উচিত। কারণ অ-সতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে অ-সৎ সম্পূর্ণভাবে নিবৃত্ত হতে পারে না। অসৎ থেকে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করার জন্য নিষ্কামভাবে করা সমস্ত কর্মই সহায়ক হয়। অ-সৎ থেকে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্ক বিচ্ছেদ হলেই পরমাত্মার দিকে যে বিমুখতা জন্মেছিল, তা দূর হয় এবং নিত্যপ্রাপ্ত পরমাত্মতত্ত্বের অনুভূতি হয়।

'শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্'—এই সত্য অভিজ্ঞতা-প্রসূত যে, সাংসারিক বস্তুসমূহের কামনা এবং মমত্ব ত্যাগ করলে শান্তি লাভ হয়। সুষুপ্তিতে যখন জগৎ-সংসারের বিস্মৃতি হয়, তখন তাতেও শান্তি অনুভূত হয়। যদি জাগ্রত-অবস্থাতেই জগৎ-সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক-বিচ্ছেদ (কামনা ও মমত্ব ত্যাগ) হয়, তাহলে তো আর কোনো কথাই নেই। নিদ্রামগ্ন হওয়া, কোনো কার্যে সফল হওয়া, কন্যার বিবাহ দেওয়া ইত্যাদি কার্যেও একপ্রকার শান্তি পাওয়া যায়। এর তাৎপর্য হল সাংসারিক কামনা, মমতা ও আসক্তির ত্যাগেও শান্তি পাওয়া যায়। কিন্তু এই শান্তি উপভোগ করলে অর্থাৎ এর থেকে সুখ গ্রহণ করলে এবং

একেই লক্ষ্য মনে করলে সাধক এই শান্তির ফলস্বরূপ প্রাপ্য 'নৈষ্ঠিক শান্তি'[১] অর্থাৎ পরমশান্তি থেকে বঞ্চিত হন। কারণ, এই শান্তি সাধকের উদ্দেশ্য নয়, কেন-না, এই শান্তি হল পরমশান্তির কারণ মাত্র—**'যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে'** (গীতা ৬।৩)।

সংসারের সম্বন্ধ-ছেদ থেকে যে শান্তি পাওয়া যায় তা সত্ত্বগুণসম্পন্ন সাত্ত্বিকী শান্তি। সাধক যতক্ষণ এই শান্তি উপভোগ করেন, অর্থাৎ এই শান্তির দ্বারা 'আমি শান্তিতে আছি' এইপ্রকার আত্মসন্তুষ্টিতে থাকেন, ততক্ষণ পরিচ্ছিন্নতা থাকে (গীতা ১৪।৬) এবং যতক্ষণ পরিচ্ছিন্নতা থাকে ততক্ষণ অখণ্ড একরস, প্রকৃত শান্তির অনুভব হয় না।

'অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে'—যিনি কর্মযোগী নন, কিন্তু কর্মী, সেই সকাম ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে এখানে **'অযুক্তঃ'** পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

কামনাযুক্ত ব্যক্তি নতুন নতুন কামনার জন্যই ফলে আসক্ত হয়ে জন্ম-মরণরূপ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কামনা দ্বারা কোনো বস্তুই পাওয়া যায় না, যদি পাওয়া যায়ও তাহলে তা চিরস্থায়ী হয় না—এইকথা প্রত্যক্ষভাবে জেনেও বস্তু কামনা করা ভ্রম। শ্রীতুলসীদাস বলেছেন যে—

অন্তহুঁ তোহি তজৈঁগে পামর তূ ন তজৈ অবহী তে॥

(বিনয়পত্রিকা ১৯৮)

এর অর্থ এই নয় যে, পদার্থগুলিকে স্বরূপতঃ ত্যাগ কর। স্বরূপতঃ ত্যাগই যদি মুক্ত হত তাহলে মরণোন্মুখ (শরীর ত্যাগকারী) সকলেই মুক্ত হয়ে যেত। বস্তুসমূহ তো স্বতঃই স্বরূপ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চলেছে। সুতরাং বাস্তবে ওই পদার্থগুলিতে যে কামনা, বাসনা, আসক্তি থাকে, সেগুলি ত্যাগ করতে হয়। কারণ পদার্থগুলিতে মেনে নেওয়া কামনা-বাসনা-আসক্তিরূপ সম্পর্কই জন্ম-মৃত্যুরূপ বন্ধনের কারণ হয়ে থাকে। কর্মযোগের আচরণ দ্বারা (কর্মপ্রবাহ কেবলমাত্র পরহিতের জন্য হলে) এই মেনে নেওয়া সম্পর্ক অতি সহজেই ত্যাগ হয়ে যায়।

পরিশিষ্ট-ভাব— বাস্তবে মুক্তির জন্য অথবা পরমাত্মপ্রাপ্তির জন্য সাধন করাও ফলাসক্তি। মানুষের অভ্যাস হল যে সে ফলের কামনা নিয়ে প্রতিটি কাজ করে, তাই বলা হয় মুক্তি লাভের জন্য, পরমাত্মপ্রাপ্তির জন্য সাধনা করো। প্রকৃতপক্ষে সাধন করা হয় কেবল অ-সাধন দূর করার জন্যই। মুক্তি স্বতঃসিদ্ধ। পরমাত্মা নিত্যলভ্য। পরমাত্মপ্রাপ্তি কোনো ক্রিয়ার ফল নয়। অতএব কিছু করলে যে পরমাত্মপ্রাপ্তি হবে এরূপ ইচ্ছা হওয়াও ফলেচ্ছা।

সাধকের এরূপ আশা করা উচিত নয় যে আমি এই সাধনার দ্বারা এইরূপ ফল পাব। ফলের আশা করাই ফলাসক্তি। যার ফলে সাধন বর্তমানে ঠিকমতো হয় না। সুতরাং ফলের দিকে দৃষ্টি না রেখে নিজের সাধনের দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত এবং তৎপর হয়ে সাধনা করা উচিত। তাহলে সিদ্ধি স্বতঃই আসবে। সাধক যদি ফলের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন, তাহলে সিদ্ধিলাভ হয় না।

আমরা যদি নির্বিকল্প ও নিষ্কাম হতে পারি, তাহলে অত্যন্ত সুখলাভ করতে পারি—এইভাবে মূলে সুখ পাবার যে আকাঙ্ক্ষা থাকে, সেটিও ফলেচ্ছা, যা সাধককে নির্বিকল্প, নিষ্কাম হতে দেয় না।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—কর্মযোগের বর্ণনা করে ভগবান এখন আবার সাংখ্যযোগের বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

সর্বকর্মাণি মনসা সন্ন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্ ন কারয়ন্॥ ১৩ ॥

[**বশী** (জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি) ; **দেহী, নবদ্বারে, পুরে** (নয় দ্বারবিশিষ্ট শরীরের) ; **সর্বকর্মাণি** (সমস্ত কর্ম) ; **মনসা** (মানসিকভাবে) ; **সন্ন্যস্য** (ত্যাগ করে) ; **ন, কুর্বন** (না করে) ; **ন, কারয়ন্** (না করিয়ে) ; **সুখম্, আস্তে** (পরমসুখে অবস্থান করেন।)]

জিতেন্দ্রিয় (ইন্দ্রিয়, মন বশীভূত) ব্যক্তি নবদ্বারবিশিষ্ট শরীরে অবস্থান করলেও সমস্ত কর্ম বিবেকপূর্বক

[১]'নৈষ্ঠিক শান্তি' পরমাত্মপ্রাপ্তিরই রূপ। একেই গীতায় কোথাও 'শশ্বচ্ছান্তিম্' (৯।৩১) পদ দ্বারা, কোথাও 'পরাং শান্তিম্' (৪।৩৯ ; ১৮।৬২) পদ দ্বারা এবং কোথাও 'শান্তিম্' (৫।২৯ ; ২।৭০-৭১) পদ দ্বারাও বলা হয়েছে।

মানসিকভাবে ত্যাগ করে নিঃসন্দেহে পরম সুখে বাস করেন, কারণ তিনি কিছু করেনও না এবং কিছু করানও না ॥ ১৩ ॥

ব্যাখ্যা—**'বশী দেহী'**—ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদিতে মমতা ও আসক্তি হলেই এগুলি মানুষের ওপর অধিকার বিস্তার করে। কামনা-বাসনা না থাকলে স্বতঃই এগুলি নিজের বশে থাকে। সাংখ্যযোগীর ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদির ওপর কোনো মমতা বা আসক্তি না থাকায় এগুলি সবসময় তাঁর বশে থাকে। এইজন্য এখানে তাঁকে **'বশী'** বলা হয়েছে।

মানুষের যতক্ষণ প্রকৃতির কার্যের (শরীর, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি) সঙ্গে কোনোরূপ সংস্রব থাকে, ততক্ষণ সে প্রকৃতির **'অবশ'** অর্থাৎ বশীভূত থাকে—**'কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ'** (গীতা ৩।৫)। প্রকৃতি সর্বক্ষণ ক্রিয়াশীল থাকে। সুতরাং প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় মানুষ কর্মরহিত হতেই পারে না। কিন্তু প্রকৃতির কার্য স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ—এই তিন শরীরের সঙ্গে মমতা ও আসক্তিযুক্ত কোনো সম্পর্ক না থাকায় সাংখ্য- যোগী তাঁর ক্রিয়াগুলির কর্তা হন না। যদিও সাংখ্যযোগীর নিজ শরীরের সঙ্গে কোনোরূপ সম্পর্ক থাকে না, তাহলেও সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে তিনি শরীরধারী বলেই পরিলক্ষিত হন। সেইজন্য তাঁকে **'দেহী'** বলা হয়েছে।

'নবদ্বারে পুরে'—শব্দাদি বিষয় অনুধাবন করার জন্য দুটি কান, দুটি চক্ষু, দুই নাসিকাছিদ্র এবং একটি মুখ—এই সপ্তদ্বার শরীরের উপর অংশে আছে, এবং মলমূত্রাদি ত্যাগ করার দুটি দ্বার শরীরের নিম্নাংশে আছে। এই নয়টি দ্বারবিশিষ্ট শরীরকে **'পুর'** অর্থাৎ নগর বলার তাৎপর্য এই যে, যেমন নগর এবং তাতে বসবাসকারী ব্যক্তি পৃথক হয়, তেমনই এই শরীর এবং তাতে অবস্থানকারী জীবাত্মা—এই দুটিই পৃথক। নগরে অবস্থিত মানুষ যেমন নগরের কার্যকলাপগুলি নিজের ক্রিয়া বলে মনে করে না, তেমনি সাংখ্যযোগী শরীরে হওয়া ক্রিয়াগুলিকেও নিজের বলে মনে করেন না।

'সর্বকর্মাণি মনসা সন্ন্যস্য'—এই অধ্যায়ের অষ্টম-নবম শ্লোকে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এবং প্রাণ দ্বারা হওয়া যে তেরোটি ক্রিয়ার বর্ণনা করা হয়েছে, এখানে সেইসব ক্রিয়াগুলির বোধক এই **'সর্বকর্মাণি'** পদটি।

এখানে **'মনসা সন্ন্যস্য'** পদ দু'টির অভিপ্রায় হল বিবেকপূর্বক মন হতে পরিত্যাগ করা। এই পদ দু'টির অর্থ যদি কেবল মন থেকে ত্যাগ করা মনে করা হয় তাহলে তা ত্রুটিপূর্ণ হবে। কারণ মন থেকে ত্যাগ করাও মনের একটি ক্রিয়া এবং গীতা মনের দ্বারা হওয়া ক্রিয়াকেও **'কর্ম'** বলে মনে করে—**'শরীরবাঙ্‌মনোভির্যৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ'** (১৮।১৫)। শরীর দ্বারা হওয়া ক্রিয়াগুলির কর্তৃত্বভাব মন থেকে ত্যাগ করলেও মনের (ত্যাগরূপ) ক্রিয়ার কর্তৃত্বভাব তো থেকেই গেল! তাই **'মনসা সন্ন্যস্য'** পদ দুটির তাৎপর্য হচ্ছে—সততাপূর্ণ ভাবে মন হতে ক্রিয়াগুলির কর্তৃত্বভাব ত্যাগ করা অর্থাৎ অহংভাবে স্বীকার করা সম্বন্ধগুলি ত্যাগ করা। যেখান থেকে আমিত্বের সম্পর্ক স্বীকার করা হয়েছে সেখান থেকে সেই সম্পর্কের অবসান ঘটানো প্রয়োজন। সাংখ্যযোগী নিজের মধ্যে কর্তৃত্বভাব না মেনে তাকে শরীরেই রেখে দেন অর্থাৎ কর্তৃত্বভাব শরীরেই আছে, নিজের মধ্যে কখনো নেই।

'নৈব কুর্বন্ন কারয়ন্'—সাংখ্যযোগীর মধ্যে কর্তৃত্ব এবং কারয়িতৃত্ব (অন্যের দ্বারা কাজ করানো)—দুই-ই থাকে না অর্থাৎ তিনি কিছু করেনও না এবং কিছু করানও না।

শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদিতে বিন্দুমাত্র অহংভাব ও মমত্বের সম্বন্ধ না হওয়ার জন্য সাংখ্যযোগী নিজেকে ওগুলির দ্বারা কৃত কর্মসমূহের কর্তা কী করে মনে করবেন ? অর্থাৎ কখনও মানতে পারেন না। এই অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকেও **'নৈব কিঞ্চিৎ করোমি'** পদগুলি দ্বারাও এই কথাই বলা হয়েছে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের একত্রিশতম শ্লোকেও ভগবান **'শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি'** পদগুলি দ্বারা বলেছেন যে শরীরের মধ্যে থেকেও এই অবিনাশী আত্মা কিছুই করেন না।

এখানে সংশয় জাগতে পারে যে জীবাত্মা নিজে কোনো কাজ করে না ; কিন্তু সে প্রেরক হয়ে কাজ করাতে সক্ষম তো হয়! এর নিরসনে বলা যায় যে, সূর্যোদয় হলে সমগ্র জগৎ আলোকিত হয়, সকলে নিজ নিজ কর্মে ব্যাপৃত হয় ; কেউ চাষের কাজে যান, কেউ বেদপাঠ করেন, কেউ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন ইত্যাদি। কিন্তু সূর্যদেব কোনো বিহিত বা নিষিদ্ধ কর্মের প্রেরক নন ; তাঁর থেকে সবাই আলো পান কিন্তু কেউ সেই আলোকের সদ্ব্যবহার বা অপব্যবহার করুক

এতে তাঁর কোনো প্রেরণা থাকে না। যদি তাঁর কোনো প্রেরণা থাকতো তাহলে পাপ বা পুণ্যের ভাগ তাঁকেই নিতে হত। এইরূপ চেতনতত্ত্বের দ্বারাই প্রকৃতি সত্তা এবং শক্তি প্রাপ্ত তো হয়, কিন্তু সে কোনো ক্রিয়ার প্রেরক হয় না। এই কথাই ভগবান এখানে **'ন কারয়ন্'** পদ দুটির দ্বারা বোঝাচ্ছেন।

'আস্তে সুখম্'—মনুষ্যমাত্রেরই স্বরূপে স্বাভাবিক স্থিতি থাকে। কিন্তু মানুষ শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, প্রাণ ইত্যাদিতে তার স্থিতি মনে করে, যার জন্য তার এই স্বাভাবিক স্থিতি অনুভব হয় না। কিন্তু সাংখ্যযোগীর নিরন্তর স্বরূপে নিজ স্বাভাবিক স্থিতি অনুভূত হতে থাকে। স্বরূপ সদা-সর্বদা সুখস্বরূপ। এই সুখ অখণ্ড, একরস এবং পরিচ্ছিন্নতারহিত।

একটি বস্তুর অপর বস্তুতে যেরূপ স্থিতি হয়, স্বরূপে সেরূপ হয় না, কারণ স্বরূপ যেমন তেমনই থেকে যায়। ওই স্বরূপে মানুষের স্থিতি স্বতঃ এবং স্বাভাবিক ; সুতরাং তাতে স্থিত হওয়ার জন্য কোনো শ্রম বা উদ্যম থাকে না। স্বরূপকে জানতে পারলে শুধু স্বরূপই থাকে। শুধু জানার ব্যাপার বোঝানোর জন্যই এখানে **'আস্তে'** পদের ব্যবহার হয়েছে। এটিই চতুর্দশ অধ্যায়ের চব্বিশতম শ্লোকে **'স্বস্থঃ'** পদ দ্বারা বলা হয়েছে।

'আস্তে' ক্রিয়াটি এখানে যে তত্ত্বের সত্তা প্রকাশ করছে, তা সমস্ত আধারের আধার। সমস্ত উৎপন্ন তত্ত্ব এই অনুৎপন্ন তত্ত্বের আশ্রিত। সেই সর্বঅধিষ্ঠানরূপ তত্ত্বের কোনো আধারের প্রয়োজনীয়তাই বা কী ? সেই স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্বে স্বাভাবিক স্থিতিকেই এখানে **'আস্তে'** পদ দ্বারা বলা হয়েছে। এটিকেই পরে কুড়িতম শ্লোকে **'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ'** পদসমূহ দ্বারা বলা হয়েছে।

পরিশিষ্ট-ভাব— 'নৈব কুর্বন্ন কারয়ন্'— তত্ত্বপ্রাপ্তিতে করার ভাবই বাধাস্বরূপ। করার ভাব থেকে কর্তৃত্ব আসে আর কর্তৃত্ব থেকেই ব্যক্তিত্ব আসে। প্রকৃতিতেই ক্রিয়া বর্তমান, স্বরূপ স্বতঃই অক্রিয়। সুতরাং কিছু করলে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয় আর কিছু না করলে স্বতঃই স্বরূপে স্থিতিলাভ হয়। **'আমার কিছু করার নেই'**—এই ভাবও **'করা'**রই অন্তর্গত। সুতরাং কিছু করার মধ্যেও যেমন কামনা থাকা উচিত নয় তেমনই কিছু না করার মধ্যেও এই ভাব থাকা উচিত নয়— **'নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন'** (গীতা ৩।১৮)। স্বরূপ করা আর না-করা—উভয়ই রহিত অর্থাৎ নিরপেক্ষ তত্ত্ব।

বশী-গুণাদির সংস্পর্শেই জীব **'অবশ'** অর্থাৎ পরাধীন হয় (গীতা ৩।৫)। জ্ঞানযোগের সাহায্যে অবশতা বা বশ্যতা দূর হয় এবং জীব **'বশী'** অর্থাৎ স্বাধীন, নিরপেক্ষ হয়ে যায়।

* * *

সম্বন্ধ—পূর্বের শ্লোকে বলা হয়েছে যে সাংখ্যযোগী কর্ম করেনও না বা করানও না কিন্তু ভগবান তো কর্ম করান ? এর উত্তর পরবর্তী শ্লোকে দেওয়া হয়েছে।

ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে॥ ১৪ ॥

[**প্রভুঃ** (পরমেশ্বর) ; **লোকস্য** (মানুষদের) ; **ন** (না) ; **কর্তৃত্বম্** (কর্তৃত্বভাবের) ; **কর্মাণি** (কর্মের) ; **কর্মফলসংযোগম্** (কর্মফলের সঙ্গে সংযোগ) ; **ন সৃজতি** (সৃষ্টি করেন না) ; **তু** (কিন্তু) ; **স্বভাবঃ** (স্বভাব) ; **প্রবর্ততে** (আবর্তিত হতে থাকে।)]

পরমেশ্বর মানুষের মধ্যে কর্তৃত্বভাব এবং কর্ম প্রেরণা সৃষ্টি করেন না তথা কর্মফলের সঙ্গে কোনো সংযোগও সৃষ্টি করেন না ; কিন্তু স্বভাবই প্রবৃত্ত হয়॥ ১৪ ॥

ব্যাখ্যা—'ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ'—সৃষ্টি রচনা সগুণ ভগবানের কাজ, তাই তাঁকে **'প্রভুঃ'** বলা হয়েছে। ভগবান সর্বকার্যে সমর্থ এবং সকলের শাসক ও নিয়ামক। সৃষ্টি রচনা করলেও তিনি অকর্তাই (গীতা ৪।১৩) থাকেন।

কোনো কর্মেরই কর্তৃত্বভাবের সম্পর্ক ভগবানের সৃষ্ট

নয়। মানুষ নিজেই কর্মে কর্তৃত্বভাব আরোপ করে। সমস্ত কর্মই প্রকৃতির দ্বারা হচ্ছে ; কিন্তু মানুষ অজ্ঞতাবশতঃ প্রকৃতির সঙ্গে তাদাত্ম্য করে নেয় এবং তার কৃত কর্মের নিজেকে কর্তা মনে করে (গীতা ৩।২৭)। যদি কর্তৃত্বভাবের সম্পর্ক ভগবানের সৃষ্ট হত, তাহলে ভগবান এই অধ্যায়েরই অষ্টম শ্লোকে **'নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ'**—এই কথা কী করে বলেন ? এর তাৎপর্য হচ্ছে, কর্তৃত্বভাব ভগবানের সৃষ্ট নয়, বরং এটা জীবের নিজেরই মনে করা। সুতরাং সে এটিকে বর্জন করতে পারে।

ভগবান এমন বিধানও দেন না যে অমুক জীবকে অমুক শুভ বা অশুভ কর্ম করতে হবে। ভগবান যদি এরূপ বিধান দিতেন তাহলে বিধি-নিষেধ আরোপকারী শাস্ত্র, গুরু, শিক্ষা ইত্যাদি সবই ব্যর্থ হয়ে যেত, এই সবের কোনো সার্থকতাই থাকত না এবং জীবকে কর্মের ফলও ভুগতে হোত না। **'ন কর্মাণি'** পদের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষ কর্ম করাতে স্বাধীন।

'ন কর্মফলসংযোগম্'—জীব যেমন কর্ম করে, তাকে তেমনি ফল ভোগ করতে হয়। জড় হওয়ার জন্য কর্ম নিজের ফল ভোগ করাতে অসমর্থ, তাই ভগবান কর্মফলের বিধান করেন—**'লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্‌হি তান্'** (গীতা ৭।২২)। ভগবান কর্মের ফল দিলেও, তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন না, বরং জীব তার সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করে। জীব অজ্ঞতাবশতঃ কর্মের কর্তা হয়ে এবং কর্মফলে আসক্ত হয়ে কর্মফলের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করে সুখী বা দুঃখী হয়। জীব যদি কর্মফলের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন না করে, তবে সে কর্মফলের সম্পর্ক থেকে মুক্ত থাকতে পারে। যাঁরা এরূপ কর্মফলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন না, তাঁদের অষ্টাদশ অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে **'সন্ন্যাসিনাম্'** আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ইহলোকে বা পরলোকে তাঁদের কর্মের ফল ভোগ করতে হয় না। কর্মফলের সম্বন্ধ যদি ভগবান যোগ করতেন তবে কোনো জীবই কর্মফল হতে মুক্ত হতে পারত না।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের সাতচল্লিশতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন—**'মা কর্মফলহেতুর্ভূঃ'** অর্থাৎ 'কর্মফলের হেতু হয়ো না'। অর্থাৎ সুখী বা দুঃখী হওয়া বা না হওয়া অর্থাৎ কর্মফলের হেতু হওয়া বা না হওয়া মানুষের নিজের হাতে। কর্মফলের সম্বন্ধ যদি ভগবানের সৃষ্ট হত, তাহলে মানুষ কখনো সুখ-দুঃখে সম হতে পারত না এবং নিষ্কামভাবে কর্মও করতে পারত না, যেটি করার কথা ভগবান গীতার স্থানে স্থানে বলছেন (যেমন ৪।২০ ; ৫।১২ ; ১৪।২৪ ইত্যাদি)।

সংশয়—শ্রুতিতে আছে যে ভগবান যার ঊর্ধ্বগতি করাতে চান, তার দ্বারা শুভকর্ম করান আর যার অধোগতি করাতে চান, তার দ্বারা অশুভকর্ম করান[১]। ভগবানই যখন শুভ ও অশুভ কর্ম করান তাহলে 'ভগবান কারোর কর্তৃত্ব, কর্ম এবং কর্মফল সংযোগের সৃষ্টি করেন না'— এরূপ বলা হলে তো শ্রুতির সঙ্গে বিরোধ হয় !

সমাধান—বাস্তবে শ্রুতিতে উপরিউক্ত বক্তব্যের তাৎপর্য হল, শুভাশুভ কর্ম করিয়ে মানুষের ঊর্ধ্বগতি এবং অধোগতি করাতে নয়, বরং প্রারব্ধ অনুযায়ী কর্মফল ভোগ করিয়ে তাকে শুদ্ধ করে নেওয়াতেই[২]। অর্থাৎ শুভাশুভ কর্মের ফল ভোগ করে মানুষ যাতে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর সত্যিকার প্রেম পাবার উপযুক্ত হয়ে ওঠে, ভগবান কৃপা করে তাকে তার প্রারব্ধ (ভাগ্য) অনুযায়ী সেইরূপ পরিস্থিতি এবং বুদ্ধি প্রদান করেন। যেমন, যে ব্যক্তির প্রারব্ধ (ভাগ্য) অনুযায়ী অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে, ভগবান তাকে ব্যবসায় ইত্যাদিতে তদনুরূপ প্রেরণা দেন অর্থাৎ ঐ সময় তার তেমনি বুদ্ধি হয় এবং যার প্রারব্ধ অনুযায়ী ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, তাকে ব্যবসায় ইত্যাদিতে তেমনি প্রেরণা দেন। তাৎপর্য এই যে, মানুষ যাতে নিজ শুভ ও অশুভ কর্মের ফল ভোগ করতে পারে,

---

[১]'এষ হ্যেব সাধু কর্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষত এষ হ্যেবাসাধু কর্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে।' (কৌষীতকিব্রাহ্মণোপনিষদ্ ৩।৮)।

[২]মূলে শুভ (পুণ্য) এবং অশুভ (পাপ) কর্ম, কামনার বশীভূত হয়েই মানুষ করে থাকে (গীতা ৩।৩৭), যার ফলে ক্রমশঃ ঊর্ধ্বগতি (স্বর্গলোক ইত্যাদি প্রাপ্তি) এবং অধোগতি (নরক প্রাপ্তি) হয়। মানুষ মুক্তির জন্য ভগবান প্রদত্ত স্বাধীনতার অসদ্ব্যবহার করেই কামনা করে থাকে।

ভগবৎপ্রেরণাতে তার তেমনিই পরিস্থিতি ও বুদ্ধি তৈরি হয়।

শ্রুতির যদি এই অর্থ গ্রহণ করা যায় যে, ভগবান যার ঊর্ধ্বগতি এবং অধোগতি করাতে চান, তাকে দিয়ে শুভ বা অশুভ কর্ম করান, তাহলে মানুষ কর্ম করায় সম্পূর্ণ পরাধীন হয়ে যায় এবং শাস্ত্র, সাধু- মহাত্মা প্রভৃতির বিধি-নিষেধ, গুরুর শিক্ষা ইত্যাদি সমস্তই ব্যর্থ হয়ে যায়। সুতরাং এখানে শ্রুতির তাৎপর্য এই যে, কর্মের ফল ভোগ করিয়ে মানুষকে শুদ্ধ করা।

'স্বভাবস্তু প্রবর্ততে'—কর্তৃত্বভাব, কর্ম এবং কর্মফলের সম্বন্ধ—এই তিনটি মানুষ নিজের স্বভাবের বশে করে থাকে। এখানে **'স্বভাবঃ'** পদটি ব্যষ্টি প্রকৃতির (স্বভাব) বাচক, যেটি জীব নিজেই সৃষ্টি করেছে। স্বভাবে যতক্ষণ রাগ (আসক্তি) ও হিংসা থাকে ততক্ষণ স্বভাব শুদ্ধ হতে পারে না, যতক্ষণ স্বভাব শুদ্ধ না হয়, ততক্ষণ জীব সেই স্বভাবের বশীভূত থাকে।

তৃতীয় অধ্যায়ের তেত্রিশতম শ্লোকে **'প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি'** পদগুলির দ্বারা ভগবান বলেছেন যে, মানুষ তার প্রকৃতি অর্থাৎ স্বভাবের বশীভূত হয়ে কর্ম করে। এই কথাই ভগবান এখানে **'তু স্বভাবঃ প্রবর্ততে'** পদগুলির দ্বারা বলেছেন।

যতক্ষণ প্রকৃতি অর্থাৎ স্বভাবের সঙ্গে জীব নিজ সম্পর্ক বজায় রাখে ততক্ষণ কর্তৃত্ব, কর্ম এবং কর্মফলের সঙ্গে সম্বন্ধ—এই তিনটিতে জীবের পরাধীনতা বজায় থাকে, যেটি জীবের নিজেরই তৈরি।

উপরে উল্লিখিত পদগুলিতে ভগবান বলেছেন যে কর্তৃত্ব, কর্ম এবং কর্মফলসংযোগ (ভোক্তৃত্ব)—তিনটিই জীবের নিজের সৃষ্ট, তাই সে নিজে এগুলি ত্যাগ করে নির্লিপ্ত হতে সক্ষম।

পরিশিষ্ট-ভাব— কর্তৃত্বভাব, কর্ম এবং কর্মফলের সংযোগ পরমাত্মার সৃষ্টি নয়, তা জীবেরই সৃষ্টি। তাই জীবেরই এটি ত্যাগ করার দায়িত্ব।

'স্বভাবস্তু প্রবর্ততে'— জগতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া প্রকৃতপক্ষে স্বাভাবিক ব্যাপার, কিন্তু অস্বাভাবিকতার মধ্যে স্বাভাবিকতা দেখার কারণে জগতের সম্পর্ক স্বাভাবিক বলে প্রতীত হয়। এই স্বভাব স্বতঃ নয়, এটি হল কৃত্রিম বা বানানো।

* * *

সম্বন্ধ—ভগবান যখন কারো কর্তৃত্ব, কর্ম এবং কর্মফলের সংযোগ রচনা করেন না, তাহলে তিনি কারো কর্মের ফলভাগী কীভাবে হবেন ?—এই কথাটি পরের শ্লোকে স্পষ্টরূপে জানানো হয়েছে।

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥ ১৫ ॥

[**বিভুঃ** (সর্বব্যাপী পরমাত্মা) ; **কস্যচিৎ** (কারোর) ; **পাপম্** (পাপকর্ম) ; **চ** (এবং) ; **সুকৃতম্, এব** (পুণ্যকর্ম) ; **ন, আদত্তে** (গ্রহণ করেন না) ; **অজ্ঞানেন** (অজ্ঞানের দ্বারা) ; **জ্ঞানম্** (জ্ঞান) ; **আবৃতম্** (আবৃত থাকায়) ; **তেন** (তার দ্বারা) ; **জন্তবঃ** (সকল জীব) ; **মুহ্যন্তি** (মোহগ্রস্ত হয়ে থাকে।)]

সর্বব্যাপী পরমাত্মা কারো পাপ বা কারো পুণ্য গ্রহণ করেন না ; কিন্তু অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকায়, সকল জীব মোহগ্রস্ত হয়ে থাকে ॥ ১৫ ॥

ব্যাখ্যা—**'নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ'**—পূর্ব শ্লোকটিতে যাঁকে **'প্রভুঃ'** পদ দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে, সেই পরমাত্মাকে এখানে **'বিভুঃ'** পদটির দ্বারা বোঝানো হয়েছে।

কর্মফলের অংশীদার হওয়া দুইপ্রকারে হয়—যে কর্ম করে সে কর্মফলের অংশীদার হয় এবং যে অপরের দ্বারা কর্ম করায় সেও কর্মফলের অংশীদার হয়। কিন্তু পরমাত্মা কর্ম করেনও না এবং কাউকে দিয়ে কর্ম করানও না ; সুতরাং তিনি কোনোরূপ কর্মফলের ভাগী হন না।

সূর্য সমস্ত জগৎকে আলো দেয় এবং সেই আলোতে মানুষ পাপ এবং পুণ্য কর্ম করে ; কিন্তু সেই সকল কর্মের সঙ্গে সূর্যের কোনোরূপ সম্বন্ধ থাকে না। সেইরূপ পরমাত্মতত্ত্ব হতে প্রকৃতি তার সত্তা লাভ করে অর্থাৎ সমস্ত জগৎ সত্তা লাভ করে। সেই সত্তা লাভ করেই প্রকৃতি এবং

তার কার্য জগৎ-সংসার এবং শরীরাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করে। ঐ শরীরাদির দ্বারা কৃত পাপ-পুণ্যের সঙ্গে পরমাত্মতত্ত্বের বিন্দুমাত্র সম্বন্ধ থাকে না। কারণ ভগবান মানুষমাত্রকেই স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছেন। সুতরাং মানুষ ওই সকল কর্মের ফলভাগী নিজেকেও মনে করতে পারে অথবা ভগবানকেও মনে করতে পারে অর্থাৎ সমস্ত কর্ম এবং কর্মফলকে ভগবানে অর্পণ করতে পারে। যে ভগবানের দেওয়া স্বাধীনতার অপব্যবহার করে নিজেকে সমস্ত কর্মের কর্তা এবং ভোক্তা বলে মনে করে, সে বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তার কর্ম এবং কর্মফল ভগবান গ্রহণ করেন না। কিন্তু যে মানুষ সেই স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করে কর্ম এবং কর্মফল ভগবানে অর্পণ করে, সে মুক্ত হয়। তার কর্ম এবং কর্মফল ভগবান গ্রহণ করেন।

যেমন সপ্তম অধ্যায়ের পঁচিশতম শ্লোকে **'সর্বস্য'** পদ দ্বারা এবং ছাব্বিশতম শ্লোকে **'কশ্চন'** পদ দ্বারা সাধারণ মানুষের কথা বলা হয়েছে, তেমনি এখানে **'কস্যচিৎ'** পদ দ্বারা নিজেকে কর্তা এবং ভোক্তা মনে করে যারা কর্ম করে সেই সাধারণ ব্যক্তিদের কথা বলা হয়েছে, ভক্তদের নয়। কারণ ভাবগ্রাহী হওয়ায় ভগবান ভক্তদের অর্পণ করা পত্র, পুষ্প ইত্যাদি পদার্থ এবং সমস্ত কর্ম গ্রহণ করেন (গীতা ৯।২৬-২৭)।

'অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানম্'—সকল মানুষের মধ্যে স্বরূপের জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধভাবে থাকে ; কিন্তু সেটি অজ্ঞানে আবৃত থাকে। সেই অজ্ঞানতাবশতঃই জীব মূঢ়তা প্রাপ্ত হয়। নিজেকে কর্তা বলে মনে করা মূঢ়তা (গীতা ৩।২৭)। ভগবান প্রত্যেক মানুষকেই বিবেক দিয়েছেন, যার দ্বারা এই মূঢ়তা নাশ করা যায়। এইজন্য এই অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে বলা হয়েছে যে, সাংখ্যযোগীগণ যেন কখনো নিজেকে কোনো কর্মের কর্তা বলে মনে না করেন এবং ত্রয়োদশ শ্লোকে সমস্ত কর্মের কর্তৃত্ব বিবেকপূর্বক মন হতে ত্যাগ করতে বলা হয়েছে।

শরীর ইত্যাদি সমস্ত বস্তুতে সর্বক্ষণ পরিবর্তন হতে থাকে। স্ব-স্বরূপে কখনো কোনো পরিবর্তন হয় না। স্বরূপতঃ অপরিবর্তনশীল হওয়া সত্ত্বেও পরিবর্তনশীল বস্তুসমূহের সঙ্গে একত্ব স্বীকার করা হল অজ্ঞানতা। শরীর ইত্যাদি সকল বস্তুই পরিবর্তিত হচ্ছে—যে এরূপ উপলব্ধি করে সে স্বয়ং কখনও পরিবর্তিত হয় না। এইজন্য নিজের পরিবর্তন কেউ অনুভব করে না। সুতরাং 'আমি পরিবর্তিত হই না'—এইভাবে পরিবর্তনশীল বস্তুসমূহের সঙ্গে নিজ অসঙ্গতা অনুভূত হলে অজ্ঞানতা দূরীভূত হয় এবং তত্ত্বজ্ঞান স্বতঃই প্রকাশিত হয়। কারণ প্রকৃতির কার্যগুলির সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্বীকার করতে থাকলে তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হয় না।

'অজ্ঞান' শব্দের মধ্যে যে **'নঞ্'** সমাস আছে, তা জ্ঞানের অভাবের বাচক নয়, বরং এটি অল্পজ্ঞান বা অসম্পূর্ণজ্ঞানের বাচক। কারণ অনুভব হোক বা না হোক জ্ঞানের অভাব কখনো হয় না। সেইজন্য অসম্পূর্ণ জ্ঞানকেই অজ্ঞান বলা হয়। ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞান অসম্পূর্ণ। এই অসম্পূর্ণ জ্ঞানকে গুরুত্ব দিলে বা এর প্রভাবে প্রভাবিত হলে প্রকৃত জ্ঞানের প্রতি দৃষ্টি পড়ে না—অজ্ঞানের দ্বারা এইভাবেই জ্ঞান আবৃত হয়।

ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান সীমিত। ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান অপেক্ষা বুদ্ধির জ্ঞান অসীম। কিন্তু বুদ্ধির জ্ঞান মন এবং ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানকেই (জানা এবং অজানা) প্রকাশিত করে অর্থাৎ বুদ্ধি নিজ বিষয়ই প্রকাশ করে। বুদ্ধি যে প্রকৃতির কার্য আর প্রকৃতি যে বুদ্ধির কারণ, বুদ্ধি সেই প্রকৃতিকে প্রকাশ করে না। বুদ্ধি যখন প্রকৃতিকেও প্রকাশ করতে পারে না, তখন প্রকৃতির অতীত যে চেতন-তত্ত্ব তাকে কী করে প্রকাশ করবে ? সেইজন্য বুদ্ধির জ্ঞানও অসম্পূর্ণ।

'তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ'—ভগবান **'জন্তবঃ'** পদটির দ্বারা যেন মানুষকে তিরস্কৃত করেছেন এই বলে যে, যে ব্যক্তি নিজের বিবেককে গুরুত্ব দেয় না, সে প্রকৃতপক্ষে জন্তু অর্থাৎ তাকে পশুই বলা যায়[১] ; কারণ তাদের ও পশুদের মধ্যে জ্ঞানের কোনো পার্থক্য থাকে না। শুধুমাত্র আকৃতির জন্য কেউ মনুষ্য (পদবাচ্য) হয় না। সেই মানুষ, যে নিজের বিবেককে প্রাধান্য দেয়। ইন্দ্রিয়গত ভোগ পশুও করে থাকে, কিন্তু মানুষের লক্ষ্য সেই ভোগ নয়, সুখ-

[১]আহারনিদ্রাভয়মৈথুনানি সমানি চৈতানি নৃণাং পশুনাম্।
জ্ঞানং নরাণামধিকো বিশেষো জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।। (চাণক্যনীতি ১৭।১৭)

'আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন—মানুষ এবং পশুর মধ্যে সমভাবে থাকে। মানুষের বিশেষত্ব এই যে, তার মধ্যে বিবেক (বিচারবোধ) থাকে। বিবেকহীন মানুষ পশুর সমান।'

দুঃখ রহিত তত্ত্ব প্রাপ্ত করাই মনুষ্য জীবনের লক্ষ্য। যাঁর নিজ কর্তব্য ও অকর্তব্য সম্পর্কে সম্যক্ জ্ঞান থাকে তিনিই সাধক নামের যোগ্য।

নিজেকে কর্মসমূহের কর্তা মনে করা এবং কর্মফলের হেতু হয়ে সুখী বা দুঃখী হওয়া—এগুলি অজ্ঞানজাত মোহ থেকে হয়। 'পাপ-পুণ্য আমাকে করতেই হয়, এর থেকে আমি কী করে মুক্তি পাব ? সুখী বা দুঃখী হওয়া আমাদের কর্মের ফল, এর থেকে কী করে মুক্তি পাব ?'—এই ধারণা পোষণ করাই হল অজ্ঞানে মোহগ্রস্ত হওয়া।

জীব স্বরূপতঃ অকর্তা এবং সুখ-দুঃখ রহিত। আপন মূর্খতার জন্য সে নিজেকে কর্তা মনে করে এবং কর্মফলের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত করে সুখী বা দুঃখী হয়। এই মূঢ়তা (অজ্ঞান)কেই এখানে **'তেন'** পদ দ্বারা বলা হয়েছে। এই মূঢ়তায় অজ্ঞানী মানুষ সুখী বা দুঃখী হয়, এখানে **'তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ'** পদগুলির দ্বারা সেই কথাই বলা হয়েছে।

পরিশিষ্ট-ভাব—অন্ধকারের যেমন সূর্যকে আবৃত করার ক্ষমতা নেই, তেমনই অজ্ঞানের দ্বারাও জ্ঞানকে আবৃত করার সামর্থ্য থাকে না। অস্বাভাবিককে স্বাভাবিক বলে মনে করা—এটিই হল অজ্ঞানতা, এতেই মানুষ মোহগ্রস্ত হয়ে থাকে। সুতরাং যদিও অজ্ঞানের সাহায্যে জ্ঞানকে আবৃত করার কথা মূঢ়তাবশতঃ মেনে নেওয়া হয়, বাস্তবে তা সত্য নয়। মানুষ ইচ্ছা করলে নিজের বিচার-বুদ্ধিকে গুরুত্ব দিয়ে এই মোহ দূর করতে পারে (গীতা ৫।১৬)।

জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে আবৃত হয় না, আবৃত হয় বুদ্ধি। কিন্তু মানুষ মনে করে জ্ঞান ঢাকা পড়ে গেছে, তাই এখানে **'আবৃত'** শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই কথাই তৃতীয় অধ্যায়ের উনচল্লিশতম শ্লোকেও **'আবৃতং জ্ঞানমেতেন'** পদগুলির দ্বারা বলা হয়েছে। অজ্ঞান অভাবরূপ, তার কোনো অস্তিত্ব নেই। যার অভাব আছে (অস্তিত্বহীন), তার দ্বারা কোনো কিছু আবৃত হতে পারে না। অতএব বিপরীত জ্ঞান অর্থাৎ অস্বাভাবিকতায় স্বাভাবিকত্ব আরোপ করাই হল অজ্ঞান[১]। অস্বাভাবিকত্ব দূর হয়ে যদি স্বাভাবিকত্ব আসে তাহলে সর্বব্যাপী পরমাত্মার সঙ্গে ঐক্য অনুভূত হয়। ব্যক্তিভাবই পাপ-পুণ্য, সুকৃতি-দুষ্কৃতি গ্রহণ করে, অতএব সর্বব্যাপী পরমাত্মার সঙ্গে ঐক্য অনুভূত হলে অর্থাৎ ব্যক্তিভাব দূর হলে পাপ-পুণ্য আর স্পর্শ করে না।

অজ্ঞান অর্থাৎ বিপরীত জ্ঞানের (অস্বাভাবিককে স্বাভাবিক বুদ্ধি) জন্য মানুষ **'জন্তু'** হয়ে যায়—**'তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।'** এইভাবে জড়ের সঙ্গে সম্পর্ক মানার জন্য জীব **'জগৎ'** (জড়) হয়ে যায় (গীতা ৭।১৩)।

যা আমাদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে আছে, সেই পরমাত্মাকে নিজের থেকে পৃথক বলে মনে করা আর যা আমাদের থেকে পৃথক সেই শরীরকে নিজের বলে ভাবাই হল অজ্ঞানতা।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—পূর্বের শ্লোকটিতে ভগবান বলেছেন যে অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকায় সমস্ত জীব মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকে। নিজ বিবেক দ্বারা সেই অজ্ঞান দূর করলে যে জ্ঞান প্রকাশিত হয়, পরের শ্লোকটিতে তার মহিমা জানানো হয়েছে।

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎ পরম্॥ ১৬ ॥

[**তু** (কিন্তু) ; **যেষাম্** (যিনি) ; **আত্মনঃ** (নিজের সেই) ; **জ্ঞানেন** (জ্ঞানের সহায়তায়) ; **তৎ অজ্ঞানম্** (এই অজ্ঞানকে) ; **নাশিতম্** (দূর করেছেন) ; **তেষাম্, তৎ, জ্ঞানম্** (তাঁর সেই জ্ঞান) ; **আদিত্যবৎ** (সূর্যের প্রভার ন্যায়) ; **পরম** (পরমতত্ত্ব

[১]অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা। (যোগদর্শন ২।৫)
'অনিত্যে নিত্য, অপবিত্রে পবিত্র, দুঃখে সুখ এবং অনাত্মায় আত্মভাবের অনুভূতিই হল অবিদ্যা।'

পরমাত্মাকে) ; প্রকাশয়তি (প্রকাশ করে।)]

কিন্তু যিনি সেই নিজ জ্ঞানের (বিবেকের) সহায়তায় অজ্ঞানকে দূর করেছেন, তাঁর সেই জ্ঞান সূর্যের প্রভার ন্যায় পরমতত্ত্ব পরমাত্মাকে প্রকাশিত করে ॥ ১৬ ॥

ব্যাখ্যা—**'জ্ঞানেন .... নাশিতমাত্মনঃ'**—পূর্বের শ্লোকে কথিত বাক্যের চেয়ে বিশেষ কথা বলার জন্য এখানে **'তু'** পদের প্রয়োগ করা হয়েছে।

পূর্বের শ্লোকে যাকে **'অজ্ঞানেন'** পদে উল্লেখ করা হয়েছে, তাকেই এখানে **'তৎ অজ্ঞানম্'** পদে বলা হয়েছে।

নিজ সত্তাকে এবং শরীরকে পৃথক মনে করা হচ্ছে 'জ্ঞান' আর দুটিকে অভিন্ন মনে করাকে বলা হয় 'অজ্ঞান'।

এই সৃজনশীল-বিনাশশীল জগতের কোনো এক অংশে আমরা নিজেদের স্থান দিয়েছি অর্থাৎ আমিত্ব (অহংভাব) আরোপ করে রেখেছি এবং কোনো অংশকে নিজের মধ্যে স্থান দিয়েছি অর্থাৎ মমতায় জড়িয়ে রেখেছি। নিজ সত্তার উপলব্ধি নিরন্তর হয়ে থাকে এবং অহং বা মমত্বও যে পরিবর্তনশীল তা প্রত্যক্ষ করা যায় ; যেমন—প্রথমে আমি বালক ছিলাম এবং আমার নিজস্ব খেলার সামগ্রী ছিল, এখন আমি যুবক বা বৃদ্ধ এবং আমার স্ত্রী, পুত্র, অর্থ, গৃহ ইত্যাদি রয়েছে। এইভাবে আমিত্ব ও মমত্ব পরিবর্তনের জ্ঞান আমাদের আছে, কিন্তু নিজ সত্তার পরিবর্তনের জ্ঞান আমাদের নেই—এই উপলব্ধিই হল জ্ঞান বা বিবেক।

আমিত্ব এবং মমত্বকে জড়ের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত না করে সাধকের নিজ বিবেককে এরূপ গুরুত্ব দেওয়া উচিত যে 'আমি ও আমার ভাব'—যার সঙ্গে যোগ করা হচ্ছে, সে সবই পরিবর্তনশীল। কিন্তু আমি এবং আমার বলে কথিত যে আমি (আমার সত্তা) তা একই থাকে। জড়ের পরিবর্তন বা অভাব অনুভব করা যায়, কিন্তু স্বরূপের পরিবর্তন এবং অভাব কারো বোধগম্য হয় না। কারণ স্বরূপের অতি সামান্যও পরিবর্তন বা অভাব কখনো কোনোভাবেই হয় না। এই বিবেকের দ্বারা 'আমিত্ব ও আমার বোধ' ত্যাগ করা উচিত যে, এই শরীর 'আমি' নই এবং যা কিছু পরিবর্তনশীল তা 'আমার' নয়। এই বিবেকের সহায়তায় অজ্ঞানতা দূর করতে হয়। পরিবর্তনশীল বস্তুর সঙ্গে অপরিবর্তনশীলের সম্পর্ক হয় অজ্ঞানতার ফলে অর্থাৎ বিবেককে গুরুত্ব না দেওয়ায়। যিনি বিবেককে জাগ্রত করে পরিবর্তনশীল 'আমি ও আমার' ভাবগুলির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন, তাঁর এই বিবেক সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাকে প্রকাশিত করে অর্থাৎ অনুভব করিয়ে দেয়।

'তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্'—বিবেক সম্পূর্ণরূপে জাগ্রত হলে পরিবর্তনশীলে স্পৃহার নিবৃত্তি হয়। পরিবর্তনশীলের নিবৃত্তি হলে নিজ স্বরূপের স্পষ্ট বোধ হয়, ফলে পরিপূর্ণ পরমাত্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয় অর্থাৎ তার সঙ্গে নিজ অভিন্নতা অনুভূত হয়।

এখানে **'পরম্'** পদটি পরমাত্মতত্ত্বের জন্য প্রযুক্ত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের উনষাটতম শ্লোকে এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ের চৌত্রিশতম শ্লোকেও পরমাত্মতত্ত্ব উল্লেখ করতেই **'পরম্'** পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

'প্রকাশয়তি' পদটির তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, সূর্য উদয় হলে নতুন বস্তু নির্মিত হয় না। বরং অন্ধকারে আবৃত থাকায় যে বস্তুগুলি দেখা যাচ্ছিল না সেগুলি দেখা যেতে লাগল। এইরূপ পরমাত্মতত্ত্ব স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু অজ্ঞানতায় আবৃত থাকায় তা অনুভব হচ্ছিল না। বিবেকের প্রকাশে অজ্ঞান দূরীভূত হলেই সেই স্বতঃসিদ্ধ পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব হতে থাকে।

পরিশিষ্ট-ভাব—যুক্তি বিচারের সাহায্যেই অজ্ঞান দূর হয়, উদ্যমের দ্বারা নয়— **'যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ'** (গীতা ১৫।১১)। কেন-না অজ্ঞানের বিনাশ ক্রিয়া সাধ্য, পরিশ্রমসাধ্য নয়। পরিশ্রম করলে শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় থাকে, কারণ শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত না হলে পরিশ্রম হয় না। দ্বিতীয়তঃ, অজ্ঞান দূর করার চেষ্টা করলে অজ্ঞান দৃঢ় হয় ; কেন-না তার অস্তিত্ব মেনে নিয়েই সেটি দূর করার জন্য প্রয়াস করা হয়।

অস্বাভাবিকতায় স্বাভাবিকতার বিপরীত চিন্তা (অজ্ঞান) নিজের মধ্যেই থাকে। তাই বিচার-বুদ্ধির ওপর নির্ভর করলে তার নিরাকরণ হয়।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—যে স্থিতিতে সর্বত্র পরিপূর্ণ পরমাত্মতত্ত্বের অনুভব হয়, সেই স্থিতি প্রাপ্তির জন্য যে সাধন, সেটি পরের শ্লোকে বলা হয়েছে।

তদ্ বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ॥ ১৭ ॥

[**তদাত্মানঃ** (তাঁতেই যাঁদের আত্মভাব) ; **তদ্‌বুদ্ধয়ঃ** (যাঁদের বুদ্ধি তাঁতে নিবিষ্ট রয়েছে) ; **তন্নিষ্ঠাঃ** (যাঁদের নিষ্ঠা পরমাত্মতত্ত্বে) ; **তৎপরায়ণাঃ** (পরমাত্মপরায়ণ সাধকেরা) ; **জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ** (জ্ঞানের দ্বারা পাপরহিত হয়ে) ; **অপুনরাবৃত্তিম্** (অপুনরাবর্তি) ; **গচ্ছন্তি** (প্রাপ্ত হন।)]

যাঁদের বুদ্ধি তাঁর প্রতি নিবিষ্ট, যাঁদের আত্মভাব সেই পরমাত্মতত্ত্বেই রয়েছে, যাঁদের মন তাঁর প্রতি তন্ময়, এইরূপ পরমাত্মপরায়ণ সাধকদের জ্ঞানের দ্বারা পাপরহিত হওয়ায় পুনরাবৃত্তি হয় না অর্থাৎ তাঁরা পরমগতি প্রাপ্ত হন ॥ ১৭ ॥

ব্যাখ্যা—[পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব করার জন্য দুই প্রকারের সাধন আছে—একটি হল বিবেকের দ্বারা অসৎকে ত্যাগ করে সৎ-এর স্বরূপে স্বাভাবিকভাবে স্থিতি লাভ করা এবং দ্বিতীয়টি সৎ-এর চিন্তা করতে করতে সৎ-এর প্রাপ্তি হওয়া। চিন্তনের দ্বারা সৎ-এরই প্রাপ্তি হয়। অ-সৎ প্রাপ্তি হয় কর্মের দ্বারা, চিন্তার দ্বারা নয়। সৃজনশীল ও বিনাশশীল বস্তু কর্মের দ্বারা পাওয়া যায় এবং নিত্য পরিপূর্ণ তত্ত্ব চিন্তার দ্বারা পাওয়া যায়, চিন্তার দ্বারা কীভাবে পরমাত্মাকে পাওয়া যায়—তার বিধি এই শ্লোকটিতে বলা হয়েছে।]

'তদ্‌বুদ্ধয়ঃ'—নিশ্চয়কারী বৃত্তির নাম 'বুদ্ধি'। সাধক প্রথমে বুদ্ধির দ্বারা স্থিরনিশ্চয় করেন যে, সর্বত্র এক পরমাত্মতত্ত্বই পরিপূর্ণ। এই জগৎ-সংসার সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেও পরমাত্মা ছিলেন এবং জগৎ লয় হবার পরেও তিনি থাকবেন। এর মাঝেও যে জগৎ প্রবাহ চলমান তাতেও পরমাত্মা একইভাবে আছেন। এইভাবে পরমাত্মার সত্তাতে স্থিরনিশ্চয় হওয়ার তাৎপর্য **'তদ্‌বুদ্ধয়ঃ'** পদের দ্বারা বোঝানো হয়েছে।

'তদাত্মানঃ'—'আত্মা' শব্দটি এখানে মনের বাচক। বুদ্ধিতে পরমাত্মতত্ত্ব স্থিরনিশ্চয় হওয়ামাত্র স্বতঃ স্বাভাবিক পরমাত্মা-চিন্তা হতে থাকে। সকল ক্রিয়া করাকালীন এই চিন্তা অখণ্ড থাকে যে, সত্তারূপে সর্বস্থান পরমাত্মতত্ত্বে পরিপূর্ণ। চিন্তায় জগৎ-সংসারের সত্তা আসেই না।

'তন্নিষ্ঠাঃ'—সাধকের মন ও বুদ্ধি যখন পরমাত্মার সঙ্গে একাত্ম হয়, তখন তিনি সর্বদা পরমাত্মাতে নিজ (স্ব-স্বরূপের) স্বতঃ-স্বাভাবিক স্থিতি অনুভব করেন। মন বুদ্ধি যতক্ষণ পর্যন্ত না পরমাত্মায় একাত্ম হয় অর্থাৎ মনে পরমাত্মার চিন্তা এবং বুদ্ধিতে পরমাত্মার সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয়তা না হয়, ততক্ষণ পরমাত্মাতে নিজ স্বাভাবিক স্থিতি থাকা সত্ত্বেও তা অনুভূত হয় না।

'তৎপরায়ণাঃ'—পরমাত্মা হতে নিজ সত্তা পৃথক না থাকাই পরমাত্মপরায়ণ হওয়া বোঝায়। পরমাত্মাতে নিজ স্থিতি অনুভব করলে সাধকের সত্তা পরমাত্মার সত্তায় লীন হয় এবং তিনি স্বয়ং পরমাত্মস্বরূপ হয়ে যান।

সাধক যতক্ষণ সাধনের সঙ্গে একাত্ম না হন ততক্ষণ সাধনা অখণ্ড থাকে না, ভঙ্গ হতে থাকে। যখন সাধকত্ব অর্থাৎ আমিত্ব চলে যায় তখন সাধন সাধ্যরূপই হয়ে যায়। কারণ প্রকৃতপক্ষে সাধন এবং সাধ্য—দুইয়ের মধ্যে নিত্য ঐক্য থাকে।

'জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ'—জ্ঞান অর্থাৎ সদসৎ বিবেকের যথার্থ জাগরণ হলে অসৎ সর্বতোরূপে নিবৃত্ত হয়। অসৎ-এর সম্পর্কেই পাপ-পুণ্যরূপ দোষ সৃষ্টি হয়, যার দ্বারা মানুষ বন্ধন প্রাপ্ত হয়। অসৎ হতে সর্বতোভাবে সম্বন্ধ-

বিচ্ছেদ হলে পাপ এবং পুণ্য দূর হয়।

'গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিম্'—অ-সৎ-এর সঙ্গই পুনরাবৃত্তির (পুনর্জন্ম) কারণ **'কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু'** (গীতা ১৩।২১)। অ-সৎ সঙ্গ সর্বতোভাবে দূর হলে পুনরাবৃত্তির প্রশ্ন ওঠে না।

যে বস্তুটি একদেশীয়, তারই আসা-যাওয়া থাকে। কিন্তু যা সর্বত্র পরিপূর্ণ, তা কোথা থেকে আসবে আর কোথায়ই বা যাবে ? পরমাত্মা সমস্ত দেশ, কাল, বস্তু, পরিস্থিতি ইত্যাদিতে একভাবে পরিপূর্ণ থাকেন। তাঁর কোথাও আসা বা যাওয়া থাকে না। সেইজন্য যে মহাপুরুষ পরমাত্মস্বরূপই হয়ে যান তাঁরও কোনো আসা বা যাওয়া থাকে না। শ্রুতিতে বলা আছে যে—

'ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি'

(বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৪।৪।৬)

'তাঁর প্রাণ উৎক্রমণ হয় না, তিনি ব্রহ্ম হয়েই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।'

তাঁর বলে কথিত যে শরীর সেই শরীর ধরেই বলা হয় যে তাঁর আর পুনর্জন্ম হয় না। প্রকৃতপক্ষে এখানে **'গচ্ছন্তি'** পদটির তাৎপর্য হচ্ছে—বাস্তবিক বোধ হওয়া, যেটি হলেই নিত্যপ্রাপ্ত পরমাত্মতত্ত্বের অনুভব হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব— অস্বাভাবিকতায় স্বাভাবিকত্বের চিন্তা দূর হলে এক পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কারো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না এবং সাধক পরমাত্মস্বরূপ হয়ে যান, যা প্রকৃতপক্ষে স্বতঃসিদ্ধ। অতএব তাঁকে পুনর্বার সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয় না— **'সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ'** (গীতা ১৪।২)।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—পূর্বের শ্লোকটিতে বর্ণিত সাধন দ্বারা সিদ্ধ মহাপুরুষদের জ্ঞান ব্যবহারকালে কেমন হয়—পরবর্তী শ্লোকে তা বলা হয়েছে।

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ ১৮ ॥

[**পণ্ডিতাঃ** (জ্ঞানী মহাপুরুষগণ) ; **বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে** (বিদ্যাবিনয়যুক্ত) ; **ব্রাহ্মণে, চ** (ব্রাহ্মণে এবং) ; **শ্বপাকে, চ** (চণ্ডালেও) ; **গবি** (গাভী) ; **হস্তিনি, শুনি** (হস্তি এবং সারমেয়) ; **এব** (ইত্যাদিতেও) ; **সমদর্শিনঃ** (সমরূপে পরমাত্মাকেই অবলোকন করেন।)]

বিদ্যাবিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণ এবং চণ্ডাল ও গাভী, হস্তি এবং সারমেয় (কুকুর) ইত্যাদিতে জ্ঞানী মহাপুরুষগণ সমদর্শী হন॥ ১৮ ॥

ব্যাখ্যা—'বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে .... সমদর্শিনঃ'—ব্রাহ্মণকে এখানে দুটি বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে—বিদ্যাযুক্ত এবং বিনয়যুক্ত অর্থাৎ এমন ব্রাহ্মণ যিনি বিদ্বান এবং বিনম্র স্বভাবসম্পন্ন (ব্রাহ্মণত্বের অহংভাব বর্জিত)। ব্রাহ্মণ হওয়ায় তিনি উচ্চ জাতি তো বটেই, তার সঙ্গে বিদ্যা এবং বিনয় দ্বারা সমৃদ্ধ—ব্রাহ্মণত্বের এটিই পূর্ণতা। যেখানে পূর্ণতা সেখানে অহংভাব থাকে না। অহংকার সেখানেই হয় যেখানে অপূর্ণতা থাকে।

ব্রাহ্মণ এবং চণ্ডালে তথা গাভী, হস্তী এবং কুকুরের মধ্যে আচরণে বৈষম্য অনিবার্য। এদের প্রতি সম আচরণের কথা শাস্ত্রেও বলা নেই, উচিতও নয় এবং করা সম্ভবও নয়। যেমন, বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণেরই পূজা হওয়া সম্ভব, চণ্ডালের নয়, গাভীর দুধই পান করা সম্ভব, কুকুরের নয় ; হস্তীর পিঠেই আরোহণ করা যায়, কুকুরের নয়। এই পাঁচটি প্রাণীর উদাহরণ দিয়ে ভগবান বলেছেন যে এগুলির সঙ্গে মানুষের আচরণের সমতা আনা সম্ভব না হলেও তত্ত্বতঃ সকলের মধ্যে এক পরমাত্মতত্ত্বই পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান। মহাপুরুষগণের দৃষ্টি সদা-সর্বদা সেই পরমাত্মতত্ত্বের ওপরই থাকে। সেইজন্য তাঁদের দৃষ্টি কখনো বৈষম্য দুষ্ট হয় না।

একটি সংশয় এখানে আসতে পারে যে, দৃষ্টিতে বিভেদ না হলে তাঁদের আচরণে ভিন্নভাব কীভাবে

হতে পারে ? তার উত্তর হচ্ছে এই যে, নিজ শরীরের সকল অঙ্গে (মস্তক, পদ, হস্ত, গুহ্যাদিতে) আমাদের দৃষ্টি অর্থাৎ নিজস্বভাব এবং হিতের চিন্তা সমান থাকে, তাহলেও আমরা এগুলির ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার করি ; যেমন—কারো গায়ে পা লেগে গেলে আমরা ক্ষমা চেয়ে নিই, কিন্তু হাত স্পর্শ করলে করি না। মাথা এবং হাত দিয়ে প্রণাম করে থাকি, পা দিয়ে নয়। গুহ্যে হাত স্পর্শ করলে আমরা হাত ধৌত করি, হাতের সঙ্গে হাত লাগলে নয়। কেবল তাই নয়, একটি হাতে আঙুলগুলির মধ্যেও ব্যবহারে পার্থক্য থাকে। সকলেই জানেন কাউকে তর্জনী দেখানো আর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানোর পার্থক্য। এইরূপ, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহারে পার্থক্য তো থাকে, কিন্তু আত্মীয়তায় কোনো পার্থক্য থাকে না। সেইজন্য শরীরের কোনো অঙ্গ পীড়িত হলে উপেক্ষা করা হয় না। ব্যবহারে পার্থক্য থাকলেও অসুস্থতা দূর করার জন্য আমরা একইরূপ ব্যবহার করি। শরীরের সকল অঙ্গের ভালো-মন্দে আমাদের একরূপ ভাবই থাকে (গীতা ৬।৩২)। এইরূপ প্রাণীসকলের খাওয়া-দাওয়া, গুণাগুণ, আচরণ, জাতি ইত্যাদির পার্থক্য তাদের প্রতি জ্ঞানী মহাপুরুষগণের ব্যবহারেও পার্থক্য আনে আর সেটিই সঙ্গত। কিন্তু সেইসব প্রাণীতে এক পরমাত্মতত্ত্ব পরিপূর্ণ থাকায় মহাপুরুষদের দৃষ্টিতে কোনো পার্থক্য থাকে না। প্রাণীদের প্রতি মহাপুরুষদের স্নেহ, ভালোবাসা, কল্যাণচিন্তা, দয়া ইত্যাদি ভাবের কখনো পার্থক্য হয় না। তাঁদের অন্তঃকরণে রাগ-দ্বেষ, মমতা, আসক্তি, অভিমান, পক্ষপাত, বিষমতা ইত্যাদির সর্বতোভাবে অভাব থাকে। নিজ শরীরের কোনো অঙ্গের কষ্ট দূর করার জন্য যেমন স্বাভাবিক প্রচেষ্টা থাকে, তেমনি অন্য প্রাণীর দুঃখ জানতে পারলে, তার দুঃখ দূর করে তাকে সুখী করার চেষ্টাও তাঁদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে থাকে। এইজন্যই ভগবান মহাপুরুষদের সমদর্শী বলেছেন, সমবর্তী নয়। গীতায় অন্যত্রও সমদর্শী বা সমবুদ্ধির কথাই বলা হয়েছে, যেমন—**'সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে'** (৬।৯) ; **'সর্বত্র সমদর্শনঃ'** (৬।২৯) ; **'আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি'** (৬।৩২) ; **'সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ'** (১২।৪) ; **'সমং সর্বেষু ভূতেষু ...... যঃ পশ্যতি স পশ্যতি'** (১৩।২৭) এবং **'সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র'** (১৩।২৮)।

শ্রীশঙ্করাচার্য মহারাজ বলেছেন, **'ভাবাদ্বৈতং সদা কুর্যাৎ ক্রিয়াদ্বৈতং ন কুত্রচিৎ'**। (তত্ত্বোপদেশ)

ভাবে সর্বদা অদ্বৈত হওয়া উচিত, ক্রিয়ায় (ব্যবহারে) কখনও নয়।

সমত্ব সম্পর্কে বিশেষ কথা

আজকাল সম ব্যবহার নিয়ে খুব তর্ক করা হচ্ছে। সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহার করো—এরূপ প্রচার করা হচ্ছে। কিন্তু সমত্ব কাকে বলে এবং তা কেমন করে আসে —বাস্তবিক এটি বোঝার খুবই প্রয়োজন আছে।

সমত্ব কোনো ছেলেখেলা নয়, এটি পরমাত্মার সাক্ষাৎস্বরূপ। যাঁর মন সমত্বে স্থির হয়, তিনি জীবিতাবস্থায়ই জগতে বিজয় লাভ করেন এবং পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে অনুভব করেন (গীতা ৫।১৯)। এই সমত্বভাব তখনই আসে, যখন অপরের দুঃখ নিজ দুঃখ, অপরের সুখ নিজের সুখ বলে মনে হয়। গীতায় ভগবান বলেছেন, 'হে অর্জুন ! যে ব্যক্তি নিজ শরীরের ন্যায় আমাকে সবকিছুতে সমান দেখে এবং সুখ অথবা দুঃখকে সর্বত্র সমভাবে দেখে সেই যোগীকে পরম শ্রেষ্ঠ বলে মানা হয়' (৬।৩২)।

যেমন শরীরের কোনো অঙ্গে পীড়া হলে তাকে দূর করার জন্য আগ্রহ হয়, তেমনি কোনো প্রাণীর দুঃখ, শোক হলে যদি তা দূর করার জন্য মনে তীব্র ইচ্ছা জাগে তাহলে সমত্বভাব আসে। সন্ত মহাপুরুষদের লক্ষণেও আছে—

'পর দুখ দুখ সুখ সুখ দেখে পর'

(শ্রীরামচরিতমানস ৭।৩৮।১)

যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের সুখের আকাঙ্ক্ষা থাকে, ততক্ষণ যত চেষ্টাই করা হোক না কেন, সমত্ব আসে না। কিন্তু যখন হৃদয়ে এই আগ্রহ জাগে যে অন্যদের কী করে সুখ হবে, তাদের কীসে আরাম হবে, তাদের কীসে লাভ হবে, তাদের কল্যাণ কীভাবে হবে, তখন সমত্বভাব আপনিই এসে যায়। এটি প্রথমে নিজগৃহ থেকেই আরম্ভ করতে হয়। হৃদয়ে এমন ভাব যেন হয় যাতে কারুর বিন্দুমাত্র দুঃখ বা কষ্ট না হয়, কারো কখনো যেন অনিষ্ট না হয়। আমি যত কষ্টই পাই, কিন্তু আমার বাবা-মা, স্ত্রী-পুত্র, ভাই-ভাইয়ের স্ত্রী এরা যেন সুখে থাকে। পরিবারে সকলকে সুখ আরাম দিলে নিজের হৃদয়ে শান্তি আসবেই। যেখানে নিজের কোনো সম্পর্ক নেই, সেখানে সুখ দিতে পারলে হৃদয়ে এক বিশেষ আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায়। কিন্তু মমতা যুক্ত

হয়ে যদি সুখ দেওয়া হয় তাতে আমাদের উন্নতি হয় না। যেখানে আমাদের মমতার সম্পর্ক নেই, সেখানে সুখী করা বা যেখানে আমরা মমতাপূর্বক সুখী করি, সেখান থেকে মমতা সরিয়ে নেওয়া—দুটির পরিণাম একই হয়।

চিত্রকূটে লক্ষ্মণ, ভগবান শ্রীরাম ও সীতার সেবা কেমন করে করেন, তা জানাতে গিয়ে গোস্বামী তুলসীদাস বলেছেন—

সেবহিঁ লখনু সীয় রঘুবীরহি।
জিমি অবিবেকী পুরুষ সরীরহি॥

(শ্রীরামচরিতমানস ২।১৪২।১)

অর্থাৎ লক্ষ্মণ ভগবান শ্রীরাম এবং সীতাকে এমনভাবে সেবা করেন, যেমন অজ্ঞানী ব্যক্তি নিজ শরীরের সেবা করে। নিজ শরীরের সেবা করা এবং তাকে সুখ দেওয়া কোনো বুদ্ধিমত্তার কাজ নয়। নিজের শরীরের পরিচর্যা পশুও করে। যেমন বাঁদর-মায়ের নিজ বাচ্চার ওপর এতো মমতা থাকে যে বাচ্চাটির মৃত্যু হলেও সে তার শরীরটিকে ধরে রাখে, ছাড়তে চায় না। কিন্তু যখন কোনো খাদ্যবস্তু জোগাড় হয়, তখন সে নিজেই সেটি খেয়ে নেয়, বাচ্চাকে খেতে দেয় না। বাচ্চাটি খাবার চেষ্টা করলে তাকে এমন ধমক দেয় যে সে চীৎকার করে পালিয়ে যায়। সুতরাং মমতা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ সমত্ব আসা অসম্ভব।

যার কাছ থেকে আমাদের পাওয়ার কিছু নেই, যার কাছে আমাদের কোনো স্বার্থ নেই, সেরূপ ব্যক্তির সঙ্গেও আমাদের প্রীতিপূর্ণ সুব্যবহার করা উচিত, যাতে তার মঙ্গল হয়। কোনো ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হয়ে সঠিক পথের কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করে এবং আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তাকে পথ দেখাই অথবা যদি কিছু দূর পর্যন্ত তার সঙ্গে যাই (গিয়ে ঠিক পথটি চিনিয়ে দিই), তাহলে হৃদয়ে প্রত্যক্ষ সুখ এবং শান্তি অনুভব হয়। কিন্তু আমি জেনেশুনেও যদি তাকে সঠিক রাস্তা না দেখাই, তাহলে আমার হৃদয়ে সেই সুখ অনুভব হবে না। এটি অভিজ্ঞতার ব্যাপার, কেউ (পরীক্ষা) করে দেখতে পারেন। কারো পিপাসা পেলে, তাকে বলা উচিত, 'ভাই, এদিকে এসো, ঠাণ্ডা জল আছে।' তারপর দেখবে হৃদয়ে প্রসন্নভাব আসবে, সুখ অনুভব হবে। এই সুখ কল্যাণকারী সুখ। অন্যে দুঃখ পাক, কিন্তু আমি সুখ পেয়ে নিই—এই সুখ পতনকারী হয়। এতে ব্যবহারিক জীবনেও উন্নতি হয় না ; পরমার্থেও নয় । আমরা সৎসঙ্গের আয়োজন করি। এতে আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের বসার ব্যবস্থা করি এবং প্রীতিপূর্ণ বাক্যে বলি, 'আসুন, এখানে বসুন।' তাঁকে এমন স্থানে বসাই যেখান থেকে তিনি ভালোভাবে শুনতে পাবেন। তিনি কী করে আরাম করে বসবেন ? কী করে ভালোভাবে শুনবেন—এই ভাব মনে রেখে যেন তাঁর সঙ্গে ব্যবহার করি। এরূপ করলে আমাদের হৃদয়ে প্রত্যক্ষভাবে শান্তি আসে। কিন্তু এটিই যদি আদেশ করার মতো বলি যে, 'কী করছেন ? এদিকে বসুন, এখানে নয়', তাহলে বাক্য এক হলেও হৃদয়ে শান্তি পাওয়া যায় না। অন্তরে যে অভিমান থাকে তা অপরকে আঘাত করে, কষ্ট দেয়। এরূপ ব্যবহার করে যদি কেউ আশা করে যে সমত্ববোধ আসবে, তবে তা কখনও (আসবে না) সম্ভব নয়।

সবার হিতে যাঁর প্রীতি অনুভব হয়, তিনি ভগবান প্রাপ্ত হন—**'তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ'** (গীতা ১২।৪)। কারণ ভগবান প্রত্যেক প্রাণীরই পরম সুহৃদ (গীতা ৫।২৯)। তিনি প্রত্যেক প্রাণীরই পালন ও পোষণকারী। পরম আস্তিকই হোক বা পরম নাস্তিক, উভয়ের জন্যই ভগবানের এক বিধান। এক ব্যক্তি অত্যন্ত আস্তিক, ভগবানকে মানে এবং তাঁকে লাভ করার জন্য সাধন-ভজন করে আর এক ব্যক্তি অত্যন্ত নাস্তিক, জগৎ থেকে ভগবানের নাম মুছে ফেলতে চায়, (দ্বিতীয় ব্যক্তি) হৃদয়ে এমন ভাব রাখে যে, ভগবানকে মানার ফলে এবং ভগবানের জন্যই এই জগৎ কষ্ট পাচ্ছে, ভগবান নামক কোনো বস্তুই নেই ; এই তার হৃদয়ের ভাব এবং এইরূপ সে প্রচারও করে। এইরূপ ঘোর নাস্তিক ব্যক্তিরও পিপাসা দূর হয় যে জলের দ্বারা, পরম আস্তিক ব্যক্তিও সেই জলের দ্বারা তৃষ্ণা দূর করে। জলে এমন বৈষম্য নেই যে তা আস্তিকের পিপাসা ঠিকমতো মেটাবে এবং নাস্তিকের পিপাসা দূর করবে না ! জল একই নিয়মে সকলের তৃষ্ণা দূর করে। সূর্যও তেমনই সমানভাবে সকলকে আলো দেয়, হাওয়াও একইভাবে সকলকে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণের সুযোগ দেয়। পৃথিবী সমানভাবে সকলকে স্থান দেয়। ভগবান রচিত প্রত্যেক বস্তুই এইভাবে সকলে সমানভাবে উপভোগ করে।

সমত্ব মানে এই নয় যে সবার সাথে সমানভাবে আহার-বিহার বা বিবাহ সম্বন্ধ করা। ব্যবহারিক সমত্ব পতন ঘটায়। সমব্যবহার হল যমরাজ অর্থাৎ মৃত্যুর আর এক নাম, কারণ এর ব্যবহারে অসমভাব নেই। মহাত্মাই হোন বা গৃহস্থ, সাধুই হন বা পশু অথবা দেবতা মৃত্যুতে

সকলেরই এক পরিণতি। তাই যমকে (যমরাজকে) 'সমবর্তী' (সম-ব্যবহারকারী) বলা হয়েছে[১]। সুতরাং যারা সমব্যবহার করে, তারাও যমরাজ।

পশুদের মধ্যেও সমান ব্যবহার দেখা যায়। কুকুর ব্রাহ্মণের পাকশালায় পা না ধুয়েই যায়। রান্নাঘর ব্রাহ্মণের বা হরিজনের যারই হোক, সে যে অবস্থায় থাকে, সেভাবেই চলে যায় ; কারণ এটিই তার সমত্ব। কিন্তু মানুষের পক্ষে এটি সমত্ব নয় বরং বলা যায় বিকট পশুত্ব। সমত্ব তারই নাম যার দ্বারা মনে হয় অপরের দুঃখ কী করে দূর হবে, অন্যে কী করে সুখী হবে, আরাম পাবে। এরূপ সমত্ব রেখে, ব্যবহারে পবিত্র নির্মল ভাব রাখা উচিত। ব্যবহারে পবিত্রভাব থাকলে অন্তঃকরণ পবিত্র, নির্মল হয়। কিন্তু যদি ব্যবহারে অপবিত্রতা থাকে, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি এক করলে হৃদয়ে অপবিত্রতা আসে, যাতে অশান্তি বৃদ্ধি পায়। শুধু বাইরের ব্যবহারে সমত্ব রাখা শাস্ত্র এবং মর্যাদা বিরুদ্ধ। এর দ্বারা সমাজে সংঘর্ষ হয়।

বর্ণগুলির মধ্যে ব্রাহ্মণ উচ্চ এবং শূদ্র নীচ—এটি শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত নয়। ব্রাহ্মণ উপদেশের দ্বারা, ক্ষত্রিয় রক্ষণের দ্বারা, বৈশ্য ধন-সম্পত্তি আবশ্যকীয় বস্তু দ্বারা এবং শূদ্র শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা সকল বর্ণের সেবা করবে। তার অর্থ এই নয় যে অন্যে নিজ কর্তব্য পালনে পরিশ্রম করবে না, বরং নিজ কর্তব্য পালনে সমানভাবে সকলে পরিশ্রম করবে। যার কাছে যে প্রকারের শক্তি, বিদ্যা, কলা ইত্যাদি আছে, তার দ্বারাই চার বর্ণের মানুষ চার বর্ণেরই সেবা করবে, অপরের কার্যের সাহায্যকারী হবে। কিন্তু চার বর্ণের সেবার মধ্যে কোনো ভেদাভেদ রাখবে না।

আজকাল বর্ণাশ্রম দূর করে দলাদলি চলছে। বর্ণাশ্রমে এখন তত দ্বন্দ্ব নেই, যত দ্বন্দ্ব দলাদলি নিয়ে হচ্ছে—এটি প্রত্যক্ষ কথা। প্রাচীনকালে লোক চতুর্বর্ণ এবং আশ্রমের মর্যাদা অনুসারে চলত এবং সুখ-শান্তিতে বসবাস করত। এখন বর্ণাশ্রমের মর্যাদা দূর করে অনেক দল-সম্প্রদায় সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ বেড়েই চলেছে। গ্রামে সকলের পানীয় জল পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়েছে। যার অধিকারে একটি কূপ আছে, সে বলে, 'তুমি অমুক দলকে ভোট দিয়েছ, তুমি এখান থেকে জল নিতে পারবে না।' পিতা-মাতা-পুত্র তিনজনই পৃথক-পৃথক দলকে ভোট দেয় এবং গৃহে এ নিয়ে ঝগড়াঝাটিও করে। হৃদয়ে শত্রুতা ভরে রাখে যে 'তুমি ওই দলের, আমি এই দলের'। কত ভয়ানক অনর্থ হচ্ছে!

যদি সমত্ব আনতে হয় তাহলে অপর ব্যক্তি তা সে যে কোনো বর্ণ, আশ্রম, ধর্ম, সম্প্রদায় বা মতের হোক না কেন, তাকে সুখী করতে হবে, তার দুঃখ দূর করতে হবে এবং তার প্রকৃত হিত করতে হবে। তার মধ্যে এই পার্থক্য থাকতে পারে যে, 'তুমি রাম-রাম জপো, আমি কৃষ্ণ-কৃষ্ণ জপি' ; 'আপনি বৈষ্ণব, আমি শৈব' ; 'আপনি মুসলমান, আমি হিন্দু' ইত্যাদি। কিন্তু এতে কোনো বাধা হয় না, বাধা তখনই আসে যখন এই ভাব থাকে যে 'এরা আমার দলের নয়, সেইজন্য ওদের দুঃখ হোক, কিন্তু আমি এবং আমার দলের লোকেরা যেন সুখে থাকি'। এই ভাব পোষণ করলে ভয়ানক অনর্থ হয়। তাই যে কোনো বর্ণের মানুষই কষ্ট পাক না কেন, তার হিতের জন্য চিন্তা সমভাবেই করা উচিত এবং তার সুখ হলে, তাতে সমানভাবে প্রসন্ন হওয়া উচিত। যেমন ব্রাহ্মণ এবং হরিজনদের মধ্যে সংঘর্ষ হল, এতে হরিজনদের হার হলে এবং ব্রাহ্মণরা জিতে গেলে যদি আমাদের মনে আনন্দ হয় অথবা ব্রাহ্মণরা হেরে গেলে এবং হরিজনদের জিত হলে যদি আমাদের মনে দুঃখ হয়, তবে এটি অসম ব্যবহার, যা অত্যন্ত হানিকারক। ব্রাহ্মণ এবং হরিজন—সকলের প্রতিই আমাদের হৃদয়ে হিতের চিন্তা সমানভাবে থাকা উচিত। কারো অহিত যেন আমাদের সহ্য না হয়। সকলের দুঃখই যেন সমভাবে আমাদের নাড়া দেয়। ব্রাহ্মণ দুঃখী হলে তাকে সুখী করব এবং হরিজন যদি দুঃখ পায় তাকে সুখী করব না—এরূপ পক্ষপাতিত্ব করা উচিত নয়, বরং হরিজনকে সুখী করারই বিশেষ চেষ্টা হওয়া উচিত আবার হরিজনকে সুখী করতে গিয়ে ব্রাহ্মণদের দুঃখকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। এইরূপ কোনো বর্ণ, আশ্রম, ধর্ম, সম্প্রদায় ইত্যাদির জন্য পক্ষপাত থাকা উচিত নয়। সকলের প্রতি সমানভাবে হিতকর ব্যবহার করা উচিত। যদি কোনো নিম্নবর্গের লোককে উচ্চ মর্যাদা দেওয়ার থাকে তাহলে সেই বর্গের লোকেদের ভাব এবং

[১]'সমবর্তী পরেতরাট্' (অমরকোষ ১।১।৫৮)

আচরণগুলি শুদ্ধ এবং সুন্দর করা দরকার। তাদের কোনো কিছুর অভাব থাকলে সেগুলি পূরণ করতে হয়, তাদের সাহায্য করতে হয়, কিন্তু তাদের উত্তেজিত করে তাদের হৃদয়ে অন্য বর্গের প্রতি ঈর্ষা এবং দ্বেষভাব উৎপন্ন করে দেওয়া অত্যন্ত অহিতকর, মারাত্মক। এটি ইহলোকে এবং পরলোকে পতনকারক হয়। কারণ ঈর্ষা, দ্বেষ, অভিমান ইত্যাদি মানুষকে পতনোন্মুখ করে। এরূপ ভাব ব্রাহ্মণের হলে তারও পতন হয় এবং হরিজনের হলে তারও পতন হয়। উত্থান তো হয় সদ্‌ভাব, সদ্‌গুণ এবং সদাচারের দ্বারা।

যাদের খাদ্য, বস্ত্র, গৃহ ইত্যাদি শরীর নির্বাহের বস্তুর অভাব থাকে, তাদের বিশেষ করে ওই সমস্ত বস্তু দেওয়া উচিত, তা তারা যে কোনো বর্ণ, আশ্রম, ধর্ম, সম্প্রদায়ের হোক না কেন। সকলেরই জীবনযাপন সুখপূর্ণ হওয়া উচিত। সকলে সুখী হোক, সকলে নীরোগ হোক, সকলের ভালো হোক, কারো কখনো যেন বিন্দুমাত্র দুঃখ না হয়[১]—এরূপ ভাব মনে রেখে সকলের সঙ্গে যথাযোগ্য ব্যবহার করাই হল সমত্ববোধ, যা সমস্ত মানুষের পক্ষে হিতকারক।

পরিশিষ্ট-ভাব—ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, গাভী, হস্তি, সারমেয়—জীবজগৎ নিত্যপরিবর্তনশীল এবং এগুলি লয়ের দিকে যাচ্ছে, কিন্তু এগুলির মধ্যে শাশ্বত যে ভাবরূপ সৎ-তত্ত্ব বিরাজমান তার কোনো পরিবর্তন নেই, তা নিত্য নিরন্তর একইভাবে বিরাজমান। জ্ঞানীগণ সেই সৎ-তত্ত্বই অনুভব করেন। যেমন পিঁপড়ে বালির মধ্যে মিশে থাকা চিনির দানা মুখে নিয়ে চলে আসে তেমনই জ্ঞানীদের জ্ঞানচক্ষু অসৎ জগতে পরিব্যাপ্ত সৎ-তত্ত্বকে খুঁজে নেয়। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হোক বা চণ্ডাল, গাভী হোক বা সারমেয়, হাতি হোক বা পিঁপড়ে নানাপ্রকার বিপরীতধর্মী প্রাণীর মধ্যেও তাঁদের দৃষ্টি সর্বদা সম-ই থাকে। আচরণ বৈষম্যমূলক (যথাযোগ্য) হলেও তাঁদের দৃষ্টি কখনও বিষম হয় না।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—ভগবান এখন পূর্বশ্লোকে বর্ণিত সমত্বের বিশেষ মহিমা জানাচ্ছেন।

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥ ১৯ ॥

[**যেষাম্, মনঃ** (যাঁর মন) ; **সাম্যে, স্থিতম্** (সমত্বে স্থিত) ; **তৈঃ, ইহ, এব** (তিনি জীবিতাবস্থাতেই) ; **সর্গঃ** (সমস্ত জগৎকে) ; **জিতঃ** (জয় করেছেন) ; **হি, ব্রহ্ম** (কারণ ব্রহ্ম) ; **নির্দোষম্, সমম্** (নির্দোষ এবং সম) ; **তস্মাৎ** (সেইজন্য) ; **তে, ব্রহ্মণি** (তিনি ব্রহ্মেই) ; **স্থিতাঃ** (স্থিত থাকেন।)]

যাঁর অন্তঃকরণ সমত্বে স্থিত, তিনি জীবিতাবস্থাতেই সমস্ত জগৎকে জয় করেছেন ; কারণ ব্রহ্ম নির্দোষ এবং সম, সেইজন্য তিনি ব্রহ্মেই স্থিত থাকেন ॥ ১৯ ॥

ব্যাখ্যা—'যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ'—পরমাত্মতত্ত্ব অথবা স্বরূপে স্বাভাবিক স্থিতি অনুভূত হলে যখন মন ও বুদ্ধিতে রাগ-দ্বেষ-কামনা-অসমব্যবহার ইত্যাদি সম্পূর্ণ দূর হয় তখন মন ও বুদ্ধিতে স্বতঃ স্বাভাবিক সমত্ববোধ এসে যায়, আনতে হয় না। বাইরে থেকে দেখলে মহাপুরুষ এবং সাধারণ মানুষের খাওয়া-পরা, চলা-ফেরা ইত্যাদি ব্যবহারগুলি একইপ্রকার দেখায়, কিন্তু মহাপুরুষদের অন্তরে নিরন্তর সমত্ব, নির্দোষভাব, শান্তি ইত্যাদি থাকে এবং সাধারণ মানুষদের হৃদয়ে অসমভাব, দোষ, অশান্তি ইত্যাদি থাকে।

পূর্ব এবং পশ্চিম দুদিকে পর্বত থাকলে যেমন পূর্বদিকে সূর্যের উদয় দেখা যায় না ; কিন্তু পশ্চিমে স্থিত পর্বত চূড়ায় আলোর জ্যোতি দেখে সূর্যের উদয় সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ থাকে না। কারণ সূর্য উদিত না হলে পশ্চিমের পর্বতের চূড়ায় আলোর জ্যোতি দেখা সম্ভব নয়। তেমনি যাঁর মন ও বুদ্ধিতে মান, অপমান, নিন্দা-স্তুতি, সুখ-দুঃখ ইত্যাদির কোনো প্রভাব পড়ে না অর্থাৎ যিনি মন-বুদ্ধি রাগ-দ্বেষ, হর্ষ-শোক ইত্যাদি বিকার রহিত, তাঁর স্বরূপে

[১]সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ। সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্ দুঃখভাগভবেৎ।

স্বাভাবিক স্থিতি অবশ্যম্ভাবী। কারণ স্বরূপের স্বাভাবিক স্থিতি না থাকলে মন ও বুদ্ধিতে অটল এবং একরসসম্পন্ন সমত্ব থাকা সম্ভবই হয় না।

'ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গঃ'—এখানে **'তৈঃ'** পদে বহুবচন ব্যবহারের অর্থ এই যে, সকল মানুষই পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত করতে সক্ষম এবং সমস্ত জগতে বিজয় লাভ করতেও তারা সক্ষম।

'ইহ এব' পদ দুটির তাৎপর্য হল মানুষ বর্তমানে এবং জীবিতাবস্থাতেই এই জগৎকে জয় করতে পারে অর্থাৎ জগৎ-সংসাররূপ পাশ থেকে মুক্ত হতে পারে।

শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, প্রাণী, বস্তু, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদি সমস্তই 'পর' আর যে এর অধীনে থাকে, তাকে 'পরাধীন' বলা হয়। এই শরীরাদি বস্তুগুলিতে গুরুত্ব দেওয়া এবং এগুলির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা অর্থাৎ এগুলির কামনা করাই এগুলির অধীনে থাকা। পরাধীন ব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে পরাজিত হয়ে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত পরাধীন ভাব দূর না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সে পরাধীনই থাকে।

যার মনে জাগতিক বস্তুগুলির কামনা থাকে, সেই ব্যক্তি যদি অপর প্রাণী, রাজ্য ইত্যাদির প্রভুত্ব লাভ করে তাহলেও প্রকৃতপক্ষে তাকে পরাজিত বলা যায়। কারণ সে ওই সমস্ত পদার্থে গুরুত্ব দেয় এবং নিজেকে এগুলির অধীন মনে করে। শারীরিক শক্তির দ্বারা পশুও বিজয়ী হতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক বিজয় লাভ হয় হৃদয় থেকে বস্তুগত অধীনতা দূর হলেই।

পরাজিত ব্যক্তিই অন্যকে পরাজিত করতে চায়, অপরকে নিজের অধীনে আনতে চায়। প্রকৃতপক্ষে নিজে পরাজিত না হয়ে কেউই অন্যকে পরাজিত করতে পারে না। যেমন—কোনো রাজা বা বিদ্বান ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির ওপর জয়লাভ করতে গেলে তাকে সর্বপ্রথম নিজ সেনা, সামর্থ্য, বুদ্ধি, বিদ্যা ইত্যাদির সাহায্য নিতেই হয়।

কামনার উদ্ভব হলেই মানুষ পরাধীন হয়ে পড়ে। এই পরাধীনতা, কামনার পূর্তি হোক বা না হোক—উভয় অবস্থাতেই যেমন তেমনই থাকে। কামনার পূর্তি না হলে মানুষ বস্তুর অভাববশতঃ পরাধীনতা অনুভব করে এবং কামনা পূরণ হলে অর্থাৎ সেই বস্তুটি লাভ হলে—সে সেই বস্তুর পরাধীন হয়ে পড়ে ; কারণ উৎপত্তি ও বিনাশশীল বস্তুমাত্রই 'পর'। কামনার পূর্তি না হলে মানুষ পরাধীনতা তো অনুভব করেই, কিন্তু কামনা পূর্তি হলে তার এমন বুদ্ধিভ্রংশ হয় যে সে পরাধীন হলেও তা অনুভব করে না, বরং নিজেকে স্বাধীন বলে অনুভব করে।

জ্ঞানী মহাপুরুষের কামনা সর্বতোভাবে ত্যাগ হলে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে যান। স্বাধীন ব্যক্তিই বিজয়ী হন। কিন্তু সেই স্বাধীন ব্যক্তির মনে কখনো কাউকে পরাজিত করার ভাবনা আসে না। তিনি জগতের (কোনো বস্তুর) বিন্দুমাত্র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না, বরং জগৎই তাঁর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।

যিনি জগৎ জয় করেছেন, এরূপ সমদর্শী মহাপুরুষকে জগতের অতি বড় সুখ বা প্রলোভনও আকৃষ্ট করতে পারে না এবং গুরুতর দুঃখও তাঁকে বিচলিত করতে পারে না (গীতা ৬।২২)।

তাঁর মনে জগতের কোনো প্রাণী, পদার্থ, পরিস্থিতি ইত্যাদির জন্য কিছুমাত্র কামনা, বাসনা, স্পৃহা, তৃষ্ণা ইত্যাদি থাকে না। যদিও তাঁর অনুকূল বা প্রতিকূলতার জ্ঞান থাকে এবং সেই অনুযায়ী তিনি যথোচিত চেষ্টাও করেন, তাহলেও এই অনুকূলতা বা প্রতিকূলতার কোনো প্রভাব তাঁর অন্তঃকরণে পড়ে না।

'নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম'—পরমাত্মতত্ত্বে দোষ, বিকার বা বিষমতা থাকেই না। যা কিছু দোষ বা বিষমতা আসে, তা সবই প্রকৃতির সঙ্গে অনুরাগ-সম্পর্ক স্বীকার করলেই উৎপন্ন হয়। পরমাত্মতত্ত্ব প্রকৃতির সম্বন্ধ থেকে সর্বতোভাবে নির্লিপ্ত, তাই তাতে সামান্যও দোষ বা বিষমতা নেই।

'তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ'—পরমাত্মতত্ত্ব হচ্ছে নির্দোষ এবং সম, সেইজন্য যে মহাপুরুষগণের অন্তঃকরণ নির্দোষ এবং সম হয়েছে, তাঁরা পরমাত্মতত্ত্বে স্থিত হয়েছেন।

অসতের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেই সমস্ত দোষ এবং বিষমতার উৎপত্তি হয়। জগৎ-সংসার অসৎ। অসৎ তাকেই বলে যা প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তিত হয় এবং মূলে যার

স্বতন্ত্র সত্তা নেই। অসতের সঙ্গে সম্পর্ক (একাত্ম) করে দোষ এবং বিষমতা হতে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব। মহাপুরুষদের অন্তঃকরণে অসতের কোনো গুরুত্ব না থাকায় তাঁদের ওপর অসতের কোনো প্রভাব পড়ে না। অসতের কোনো প্রভাব না থাকায় তাঁদের অন্তঃকরণ নির্দোষ এবং সম হয়। নির্দোষ এবং সম হওয়ায় পরমাত্মতত্ত্বে তাঁদের স্থিতি স্বতঃ ও স্বাভাবিক হয়, যা আগে থেকেই আছে। যেমন, যেখানে ধোঁয়া সেখানে অগ্নি নিশ্চয়ই আছে, কারণ অগ্নি ব্যতিরেকে ধোঁয়া অসম্ভব। তেমনি যাঁর অন্তঃকরণে সমতা থাকে, তিনি নিশ্চয়ই পরমাত্মতত্ত্বে স্থিত আছেন কারণ পরমাত্মতত্ত্বে স্থিত না হলে পূর্ণ সমতা আসা সম্ভব নয়।

নিজ (স্বয়ং-এর) স্থিতি পরমাত্মতত্ত্ব অথবা সমতাতে থাকার জন্যই অন্তঃকরণে সমতা আসে। সেইজন্য অন্তঃকরণে সমতা এলেই ওই মহাপুরুষদের পরমাত্মতত্ত্বে বা সমতায় স্থিত বলে পরিচিতি ঘটে। গীতায় এই সমতাকেই 'যোগ' বলা হয়—**'সমত্বং যোগ উচ্যতে'** (২।৪৮), এবং এই প্রাপ্তিকেই গীতা মনুষ্য-জন্মের পূর্ণতা বলে মনে করে।

জ্ঞানযোগের এই প্রকরণ ত্রয়োদশ শ্লোক থেকে শুরু হয়েছে। পঞ্চদশ শ্লোকের শেষে **'জন্তবঃ'** পদ দ্বারা বহুবচনের প্রয়োগ শুরু হয়েছে, যেটি এই উনিশতম শ্লোক পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়েছে। সবগুলিতে বহুবচন প্রয়োগের তাৎপর্য এই যে, যে সকল মানুষ মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল, তারা সকলেই পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত করতে সক্ষম। কিন্তু এই শ্লোকে **'ব্রহ্মণি'** পদে একবচন ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ হল, সমস্ত মানুষ একই পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হয়। মুক্তি ব্রাহ্মণেরই হোক বা চণ্ডালের, উভয়েই সেই এক তত্ত্বই লাভ করে। কেবলমাত্র শরীরেরই পার্থক্য হয়, যা বস্তুতঃ উপাধিমাত্র। তত্ত্বের কোনো পার্থক্য থাকে না। পূর্বে যত সনকাদি মহাত্মা হয়েছেন, তাঁরা যে তত্ত্ব প্রাপ্ত করেছেন, আজও সেই তত্ত্বই প্রাপ্ত হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব— এখানে উদ্ধৃত **'মন'** শব্দটিকে বুদ্ধির বাচক বলে বুঝতে হবে, কারণ সমতায় মন স্থিত হয় না, বুদ্ধিই স্থিত হয়। মন স্থিত হয় ধ্যানে। এটি স্থিরবুদ্ধির প্রকরণ। মনের স্থিরতা থাকে শুধু ধ্যানাবস্থাতে, আচরণে নয়, কিন্তু বুদ্ধির স্থৈর্য সর্বক্ষণ থাকে। মনের স্থৈর্যের দ্বারা কল্যাণ হয় না, বরং তা হয় বুদ্ধির স্থৈর্যের সাহায্যে। মনের স্থৈর্যে সিদ্ধিলাভ হয়। সুতরাং মনের স্থৈর্য তত উচ্চ নয় যত বুদ্ধির। ভগবানও দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞ (স্থিরবুদ্ধি) হওয়ার মহিমা জানিয়েছেন। পরবর্তী শ্লোকেও ভগবান বলেছেন—**'স্থিরবুদ্ধিরসম্মূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ।'**

সাধক যাতে ভ্রমবশতঃ নিজেকে তত্ত্বজ্ঞ না মনে করেন সেই জন্য তার চেনার উপায় জানিয়েছেন। তাঁর বুদ্ধিতে সমত্ব যদি না এসে থাকে তবে বুঝতে হবে এখনও তত্ত্বজ্ঞান হয়নি, শুধু ভ্রম হয়েছে! বুদ্ধির সমত্বের স্বরূপ হল— রাগ (আসক্তি), দ্বেষ, হর্ষ, শোক ইত্যাদি না হওয়া। তত্ত্বপ্রাপ্তি হলে বুদ্ধিতে সর্বসময় সমতা থাকে। এই সমতা হলে বুদ্ধির কখনো উত্থান-পতন হয় না।

যাঁর বুদ্ধি সমত্বে স্থিত হয়েছে, তাঁর মধ্যে রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ থাকে না। তাঁর মধ্যে এই সমবুদ্ধি সর্বদা অটল থাকে যে, সব কিছুই এক পরমাত্মা। একমাত্র পরমাত্মা ছাড়া যখন অন্য আর কিছুই নেই, তখন কে হিংসা করবে এবং কাকে করবে? যখন একটি সত্তাই অবিচলভাবে অনুভব হয়, তখন আর কোনো কামনা থাকে না এবং কোনো অশান্তিও থাকে না।

* * *

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে যে স্থিতির বর্ণনা করা হয়েছে, সেটি প্রাপ্তির সাধন এবং সিদ্ধের লক্ষণগুলি পরবর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে।

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসম্মূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ॥ ২০ ॥

[**প্রিয়ম্** (প্রিয়কে) ; **প্রাপ্য** (লাভ করে) ; **ন, প্রহৃষ্যেৎ, চ** (আনন্দিত হন না এবং) ; **অপ্রিয়ম্, প্রাপ্য** (অপ্রিয় প্রাপ্ত হয়ে) ; **ন, উদ্বিজেৎ** (উদ্বিগ্ন হন না) ; **স্থিরবুদ্ধিঃ** (স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন) ; **অসম্মূঢ়ঃ** (মূঢ়তা রহিত) ; **ব্রহ্মবিৎ** (ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি) ; **ব্রহ্মণি** (ব্রহ্মেই) ; **স্থিতঃ** (স্থিত থাকেন।)]

যিনি প্রিয়লাভে আনন্দিত হন না এবং অপ্রিয় প্রাপ্ত হয়েও উদ্বিগ্ন হন না, সেই স্থির বুদ্ধিসম্পন্ন, মূঢ়তারহিত ব্রহ্মবিদ ব্যক্তি ব্রহ্মেই স্থিত থাকেন ॥ ২০ ॥

ব্যাখ্যা—**'ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্'**—শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, সিদ্ধান্ত, সম্প্রদায়, শাস্ত্র ইত্যাদির অনুকূল প্রাণী, বস্তু, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদি লাভ করাকেই প্রিয়লাভ করা বলে।

শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, সিদ্ধান্ত, সম্প্রদায়, শাস্ত্র ইত্যাদির প্রতিকূল প্রাণী, পদার্থ, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদি প্রাপ্তিকেই অপ্রিয় প্রাপ্তি বোঝায়।

প্রিয় বা অপ্রিয় প্রাপ্তিতেও সাধকের অন্তরে আনন্দ বা দুঃখ হওয়া উচিত নয়। এইস্থানে প্রিয় এবং অপ্রিয় প্রাপ্তির অর্থ এই নয় যে, সাধকের হৃদয়ে অনুকূল বা প্রতিকূল প্রাণী বা বস্তুর প্রতি আকর্ষণ বা বিদ্বেষ আছে, বরং ওইসব প্রাণী বা বস্তুর প্রাপ্তির জ্ঞানকেই প্রিয় বা অপ্রিয় প্রাপ্তি বলা হয়েছে। প্রিয় বা অপ্রিয়, প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তির জ্ঞান হওয়া দোষের নয়। হৃদয়ে এগুলির প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তির প্রভাব পড়া অর্থাৎ আনন্দ বা দুঃখের বিকার হওয়াই দোষের।

প্রিয় বা অপ্রিয়ের জ্ঞান অন্তঃকরণে হয় আর আনন্দিত বা উদ্বিগ্ন হয় কর্তা। অহংভাবে মোহগ্রস্ত অন্তঃকরণসম্পন্ন পুরুষ প্রকৃতির কার্যকারণাদি নিয়ে 'আমি কর্তা'—এরূপ মনে করে এবং আনন্দিত বা উদ্বিগ্ন হতে থাকে। কিন্তু যাঁর মোহ অপসারিত হয়েছে, যিনি তত্ত্ববেত্তা, 'গুণই গুণে আবর্তিত হচ্ছে'—এরূপ জেনে তিনি নিজের মধ্যে (স্বরূপে) প্রকৃত অকর্তৃত্ব অনুভব করেন (গীতা ৩।২৮)। স্বরূপে আনন্দিত এবং উদ্বিগ্ন হওয়া অসম্ভব।

'স্থিরবুদ্ধিঃ'—স্বরূপের জ্ঞান স্বয়ং-এর দ্বারাই স্বয়ং-এ হয়ে থাকে। এতে জ্ঞাতা বা জ্ঞেয়র ভাব থাকে না। এই জ্ঞান করণ নিরপেক্ষ হয় অর্থাৎ এতে শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি কোনো করণের প্রয়োজন হয় না। করণ দ্বারা লব্ধ জ্ঞান সন্দেহ রহিত বা স্থির হয় না, তাই সেটিকে স্বল্পজ্ঞান বলা হয়। কিন্তু স্বয়ং-এর জ্ঞান (নিজ সত্তার জ্ঞান) স্বয়ং-এর দ্বারা হওয়ায় এতে কোনো পরিবর্তন বা সন্দেহ আসে না। যে মহাপুরুষের এইরূপ করণ-নিরপেক্ষ জ্ঞানের অনুভূতি হয়েছে, তাঁর (লোকের দৃষ্টিতে) বুদ্ধিতে এই জ্ঞান এতই স্থির থাকে যে এতে কখনো বিকল্পভাব, সন্দিগ্ধতা, বিপরীত চিন্তা, অসম্ভাবনা ইত্যাদি আসেই না। সেইজন্য একে **'স্থিরবুদ্ধিঃ'** বলা হয়।

'অসম্মূঢ়ঃ'—যে পরমাত্মতত্ত্ব সর্বদা সর্বত্র বিরাজমান, তাকে যথার্থরূপে অনুভব না করা এবং যার কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নেই, সেই উৎপত্তি ও বিনাশশীল জগৎ-সংসারকে সত্য বলে মনে করা—এইরূপ মূঢ়তা সাধারণ মানুষে বিদ্যমান। এই মূঢ়তা যাঁর মধ্য থেকে সম্পূর্ণভাবে অপসারিত হয়েছে, এইস্থানে তাঁকে **'অসম্মূঢ়'** বলা হয়েছে।

'ব্রহ্মবিৎ'—পরমাত্মা হতে পৃথক হয়ে পরমাত্মার অনুভব হয় না। পরমাত্মার অনুভব হলে অনুভবিতা, অনুভব এবং অনুভাব্য—এই ত্রিপুটি থাকে না, বরং ত্রিপুটিরহিত অনুভবমাত্রই (জ্ঞানমাত্র) থাকে। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মকে কে জানেন—এটি বলা সম্ভব নয়। কারণ ব্রহ্মকে যিনি জানেন তিনি ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যান[১]। সেইজন্য তিনি নিজেকে ব্রহ্মবিৎ বলে মনে করেন না অর্থাৎ তাঁর মধ্যে 'আমি ব্রহ্মকে জানি' এই অহংভাব থাকে না।

'ব্রহ্মণি স্থিতঃ'—বাস্তবে সমস্ত প্রাণীই তত্ত্বতঃ সর্বক্ষণই ব্রহ্মে অবস্থিত। কিন্তু ভ্রমক্রমে নিজ স্থিতি শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদিতে মেনে নেওয়ার ফলে মানুষ ব্রহ্মে নিজ স্বাভাবিক অবস্থিতি অনুভব করতে পারে না। যাঁদের ব্রহ্মে আপন স্বাভাবিক স্থিতি অনুভূত হয়েছে,

[১]'ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি' (মুণ্ডক. ৩।২।৯) ; 'ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি' (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৪।৪।৬)

সেইসব মহাপুরুষদের জন্য এইস্থানে 'ব্রহ্মণি স্থিতঃ' পদ দু'টি প্রয়োগ করা হয়েছে। এরূপ মহাপুরুষদের সবরকম পরিস্থিতিতে ব্রহ্মে নিত্য-নিরন্তর আপন স্বাভাবিক স্থিতি অনুভব হয়।

যদিও এক বস্তুর অপর বস্তুতে অবস্থিতি ঘটতে পারে, তবুও ব্রহ্মে স্থিতি কিন্তু সেই প্রকারের নয়। কারণ ব্রহ্ম অনুভব হলে সর্বত্র এক ব্রহ্মই অনুভব হয়। তাতে অন্য কিছুর পৃথক সত্তাই থাকে না। যতক্ষণ কেউ ব্রহ্মাতেই নিজের স্থিতি মেনে নেয়, ততক্ষণ বিভেদ থাকে, ব্রহ্মের প্রকৃত অনুভূতিতে ঘাটতি থাকে।

পরিশিষ্ট-ভাব— সুষুপ্তি এবং মূর্ছায় মানুষের শরীর হতে অজানতে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ হয় অর্থাৎ মন অবিদ্যায় লীন হয়। তাই এই অবস্থায় মানুষের প্রিয় এবং অপ্রিয়ের, শারীরিক কষ্ট ইত্যাদির কোনো জ্ঞানই থাকে না। কিন্তু জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের সজ্ঞানেই শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয়। তাই তাঁর প্রিয়-অপ্রিয়, শারীরিক কষ্ট ইত্যাদির জ্ঞান থাকলেও তিনি তাতে আনন্দিত-উদ্বিগ্ন, সুখী বা দুঃখী হন না। তাঁর শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির বশ্যতা দূর হয়।

ব্রহ্মকে জানা এবং তাঁতে স্থিত হওয়া—উভয়ই এক।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—ব্রহ্মে নিজের স্বাভাবিক স্থিতির অনুভব কী প্রকারের হয়, তার বিশ্লেষণ পরবর্তী শ্লোকে করা হচ্ছে।

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে॥ ২১ ॥

[**বাহ্যস্পর্শেষু** (বাহ্যবিষয়ে) ; **অসক্তাত্মা** (অনাসক্ত অন্তঃকরণের সাধক) ; **আত্মনি** (আত্মায়) ; **যৎ, সুখম্** (যে আনন্দে আছে) ; **বিন্দতি** (লাভ করেন) ; **সঃ** (সেই) ; **ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা** (ব্রহ্মে অভিন্ন চিত্ত পুরুষ) ; **অক্ষয়ম্, সুখম্, অশ্নুতে** (অক্ষয় আনন্দ অনুভব করেন।)]

বাহ্যবিষয়ে (প্রাকৃতবস্তু মাত্রেই) অনাসক্ত অন্তঃকরণযুক্ত সাধক অন্তঃকরণে যে সুখ (সাত্ত্বিক সুখ) আছে তা লাভ করেন, অতঃপর তিনি ব্রহ্মে অভিন্নভাবে স্থিত হয়ে অক্ষয় আনন্দ অনুভব করেন ॥ ২১ ॥

ব্যাখ্যা—'বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা'—পরমাত্মা ব্যতীত শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, প্রাণ ইত্যাদিতে এবং শব্দ, স্পর্শ ইত্যাদি বিষয়ের সংযোগজনিত সুখে যিনি (যাঁরা) আসক্তিরহিত হয়েছেন, সেইসব সাধকদের উদ্দেশ্যে এই পদটি প্রযুক্ত হয়েছে। যেসব সাধকের আসক্তি এখনও দূর হয়নি, কিন্তু যাঁদের উদ্দেশ্য এই সমস্ত আসক্তি বর্জন করা, তাঁদেরও আসক্তিরহিত বলে মনে করা উচিত। কারণ উদ্দেশ্যর দৃঢ়তা থাকায় তাঁদের আসক্তি শীঘ্রই দূর হয়।

আগের শ্লোকে বর্ণিত 'প্রিয়বস্তুর প্রাপ্তিতে হর্ষান্বিত এবং অপ্রিয় প্রাপ্তিতে উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নয়'—এইরূপ স্থিতি লাভ করার জন্য বাহ্যবিষয়ে আসক্তিরহিত হওয়া প্রয়োজন।

উৎপত্তি ও বিনাশশীল বস্তুমাত্রকেই 'বাহ্যস্পর্শ' বলা হয়, তা সেটির সম্পর্ক বাইরের থেকে বা অন্তর থেকে যাই হোক। এই 'বাহ্যস্পর্শে' যতক্ষণ আসক্তি থাকে, ততক্ষণ নিজ স্বরূপের অনুভব হয় না। বাহ্য বস্তুসকল সদা পরিবর্তনশীল, কিন্তু আসক্তির জন্য মনোযোগ সেই পরিবর্তনের দিকে যায় না এবং তাতেই সুখ অনুভব হয়। পদার্থগুলিকে অপরিবর্তনশীল ও স্থির বলে মনে করেই মানুষ তা থেকে সুখ নেয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ওইসব পদার্থে সুখ থাকে না। পদার্থগুলি থেকে সম্পর্ক-বিচ্ছিন্ন করলে সুখ হয়। সেইজন্য গাঢ় নিদ্রার সময় যখন সমস্ত পদার্থের সঙ্গে সম্পর্কে বিস্মৃতি আসে, তখনই প্রশান্তি আসে।

ভ্রম হচ্ছে এই যে, মানুষ পদার্থ বিনা বেঁচে থাকতে পারে না। কিন্তু প্রকৃতভাবে দেখলে বোঝা যায় যে বাহ্য-পদার্থগুলির প্রভাব চলে না গেলে মানুষ বাঁচতেই পারে না। সেইজন্য সে নিদ্রা যায় ; কারণ গাঢ় নিদ্রায় সে পদার্থগুলিকে বিস্মৃত হতে পারে। পদার্থগুলির কথা শুধু ভুলে গেলেও নিদ্রায় যে সুখ, সতেজতা, শক্তি, নীরোগভাব, নিশ্চিন্ততা ইত্যাদি পাওয়া যায় জাগ্রত অবস্থায় পদার্থগুলির সংস্পর্শে তা লাভ করা যায় না। তাই জাগ্রত অবস্থায় মানুষের বিশ্রাম নেবার, প্রাণী ও পদার্থগুলির

থেকে বিচ্ছিন্ন হবার ইচ্ছা জাগে। সে নিদ্রাকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে করে ; আসলে পদার্থগুলি থেকে দূরে থাকলেই মানুষ জীবন লাভ করে।

নিদ্রার দুটি দিক থাকে—প্রথম হল মানুষ বাহ্যপদার্থগুলির সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় এবং দ্বিতীয়তঃ তার মধ্যে এই ভাব থাকে যে নিদ্রাভঙ্গে তাকে এই কাজ করতে হবে। এই দুটি ব্যাপারের মধ্যে পদার্থ বা বস্তুগুলির সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করতে চাওয়া হল নিজের ইচ্ছা, যেটি সর্বদা একইভাবে থাকে, কিন্তু কার্য করার যে ভাব তা পরিবর্তিত হতে থাকে। কার্য করার ভাব প্রবল থাকার জন্য মানুষের দৃষ্টি পদার্থগুলি থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়ার দিকে যায় না। সে পদার্থগুলির সঙ্গে সম্বন্ধ বজায় রেখেই নিদ্রা যায় এবং জাগরিত হয়।

অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা হল এই যে, সম্পর্কিত জিনিস বা ব্যক্তি বাস্তবে না থাকলেও সম্পর্কটি থেকে যায়। তার কারণ হল যে, স্বয়ং (অবিনাশী চেতন) যে সম্পর্ককে নিজের বলে মেনে নেয়, তা দূর হয় না। এই মেনে নেওয়া সম্পর্ক দূর করার উপায় হল নিজের মধ্যে সম্পর্কটিকে না মানা। কারণ প্রাণী বা পদার্থের সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে কোনো সম্পর্ক নেই, এটি কেবল মেনে নেওয়া হয়েছে। মেনে নেওয়া ব্যাপারটি না মানলে তার সম্পর্ক থাকতে পারে না আবার মেনে নেওয়াকে ধরে থাকলে তা অন্য কোনো সাধনার দ্বারা দূর করা যায় না। তাই মেনে নেওয়া সম্পর্ক ভিতর থেকে অস্বীকার করতে হয়। তবেই মুক্তি স্বতঃসিদ্ধ হয়।

বাহ্য পদার্থের সঙ্গে সম্পর্ক অবাস্তব কিন্তু পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বাস্তব। সুখের আশায় মানুষ বাইরের পদার্থগুলির সঙ্গে নিজের সম্পর্ক গড়ে তোলে, কিন্তু পরিণামে সে কেবল দুঃখই পায় (গীতা ৫।২২)। এটি অনুভব করলে বাহ্য পদার্থে আসক্তি দূর হয়।

'বিন্দত্যাত্মনি যৎসুখম্'—বাইরের পদার্থগুলির আসক্তি দূর হলে অন্তঃকরণে সাত্ত্বিক সুখ অনুভূত হয়। বাইরের পদার্থ দ্বারা যে সুখ হয় তাকে বলা হয় রাজস সুখ। মানুষ যতক্ষণ রাজস সুখ উপভোগ করতে থাকে, ততক্ষণ সে সাত্ত্বিক সুখ অনুভব করতে পারে না। রাজসিক সুখে অনাসক্ত হলে সাত্ত্বিক সুখ অনুভূত হয়।

'স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা'—সংসারে অনুরাগ দূর হলে তবেই ব্রহ্মে অভিন্ন চেতনায় স্বাভাবিক স্থিতি লাভ হয়। যেমন অন্ধকার দূর হওয়া এবং আলোর প্রকাশ হওয়া—দুটি একই সঙ্গে হয়, কিন্তু মনে করা হয় যে আগে অন্ধকার দূর হয় আর তারপরে হয় আলোর প্রকাশ। এইরূপই আসক্তি বর্জন করা এবং ব্রহ্মে স্থিত হওয়া—দুটি একই সঙ্গে হলেও প্রথমে আসক্তি নাশ (**'বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা'**) এবং পরে ব্রহ্মে স্থিতি (**'ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা'**) বলে মনে করা হয়। যেমন ত্রয়োদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে ক্ষেত্রজ্ঞের (জীবাত্মার) দ্বারা নিজেকে ক্ষেত্র (শরীর) হতে সর্বতোভাবে পৃথক অনুভব করার কথা বলা হয়েছে ; আবার দ্বিতীয় শ্লোকে ক্ষেত্রজ্ঞের দ্বারা নিজেকে পরমাত্মতত্ত্বের সঙ্গে সম্পূর্ণ অভিন্ন অনুভব করার কথা বলা হয়েছে। তেমনই এইস্থানে প্রথমে **'বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা'** পদটির দ্বারা শরীর-সংসার থেকে নিজেকে সর্বতোভাবে পৃথক অনুভব করার কথা বলে আবার **'ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা'** পদটিতে নিজেকে পরমাত্ম-তত্ত্বের সঙ্গে সর্বভাবে এক ও অভিন্ন অনুভব করার কথা বলা হয়েছে।

ভোগে বিরত হয়ে সাত্ত্বিক সুখ উপভোগ করার পরে 'আমি সুখী', 'আমি জ্ঞানী', 'আমি নির্বিকার', 'আমার কোনো কর্তব্য নেই' এইরূপ অহং-এর সূক্ষ্ম রেশ থেকে যায়। সেটি দূর করার জন্য একমাত্র পরমাত্মতত্ত্বে অভিন্নতা অনুভব করা প্রয়োজন। কারণ পরমাত্মতত্ত্বে সম্পূর্ণ এক না হলে নিজ সত্তা ও নিজ ব্যক্তিত্ব (পৃথক ভাব ও একদেশীয় ভাব) সর্বতোভাবে দূর হয় না।

'সুখমক্ষয়মশ্নুতে'—সাধক যতক্ষণ সাত্ত্বিক সুখ উপভোগ করতে থাকেন, ততক্ষণ তাঁর মধ্যে সূক্ষ্ম 'অহং', সূক্ষ্ম পরিচ্ছিন্নতা থেকে যায়। সাত্ত্বিক সুখও উপভোগ না করলে 'অহং' সর্বতোভাবে দূর হয় এবং সাধকের পরমাত্মস্বরূপ, চিন্ময়, নিত্য, একরসসম্পন্ন অবিনাশী সুখ অনুভব হয়। এই অক্ষয় সুখকেই 'আত্যন্তিক সুখ' (৬।২১), 'অত্যন্ত সুখ' (৬।২৮), 'ঐকান্তিক সুখ' (১৪।২৭) ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়েছে। এর অনুভব হলে ওই পরমাত্মতত্ত্বে এক স্বাভাবিক আকর্ষণ জন্মায়, যাকে বলা হয় প্রেম (গীতা ১৮।৫৪)। এই প্রেমে কখনো ভাঁটা পড়ে না, বরং এটি দিন দিন বেড়েই চলে। এই তত্ত্বের প্রসঙ্গ আলোচিত হলে, এর ওপর বিচার-বিবেচনা হলে আগের থেকে একটু নতুনত্ব দেখা যায়। একেই বলে প্রতিক্ষণ প্রেমের বৃদ্ধি হওয়া। এতে একটি বোঝার ব্যাপার হল যে প্রেম প্রতি মুহূর্তে বাড়লেও যদি

মনে হয় 'আগে কম ছিল এবার পূর্ণ হয়েছে', তাহলে এটি হল সাধন-অবস্থা, আর যদি নতুন ভাব দেখলেও 'আগে কম ছিল এখন পূর্ণ হয়েছে' এটি মনে না হয় তাহলে বুঝতে হবে সেটি সিদ্ধ-অবস্থা।

❖ ❖ ❖

সম্বন্ধ—পূর্ব শ্লোকে ভগবান বিষয়ে অনাসক্ত ব্যক্তির অক্ষয় সুখ প্রাপ্তির কথা বলেছেন। এবার বিষয়ে আসক্তি বর্জিত কীভাবে হওয়া যায়—পরের শ্লোকে সেটি আলোচনা করেছেন।

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥ ২২ ॥

[**হি** (কারণ) ; **কৌন্তেয়** (হে কুন্তীনন্দন !) ; **সংস্পর্শজাঃ** (ইন্দ্রিয় ও বিষয় সংযোগে উৎপন্ন) ; **যে, ভোগাঃ** (যে সমস্ত ভোগসুখ) ; **তে, আদ্যন্তবন্তঃ** (তা আদি-অন্তবিশিষ্ট) ; **দুঃখযোনয়** (দুঃখের) ; **এব** (হেতু) ; **বুধঃ** (বিবেকবান ব্যক্তি) ; **তেষু** (তাতে) ; **ন, রমতে** (আসক্ত হন না।)]

কারণ হে কুন্তীনন্দন ! ইন্দ্রিয় ও বিষয় সংযোগে উৎপন্ন যে সমস্ত ভোগ (সুখ), তা আদি-অন্তবিশিষ্ট এবং দুঃখের হেতু। সুতরাং বিবেকবান ব্যক্তি তাতে আসক্ত হন না ॥ ২২ ॥

ব্যাখ্যা—**'যে হি সংস্পর্শজা ভোগাঃ'**—রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ—এই বিষয়গুলিতে আসক্তিপূর্বক ইন্দ্রিয়ের সম্পর্ক হলে যে সুখ প্রতীত হয়, তাকেই বলা হয় ভোগ। সম্পর্কজনিত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জনিত ভোগে মানুষ কখনও স্বাধীন নয়। সুখ-সুবিধা এবং মান-মর্যাদা পেয়ে প্রসন্ন হওয়াকেও ভোগ বলা হয়। নিজের বুদ্ধিতে যে সিদ্ধান্তটিকে মর্যাদা দেওয়া হয়, অপর ব্যক্তি দ্বারা সেই সিদ্ধান্তের প্রশংসা শুনে যে তৃপ্তি ও সুখ হয় তাও এক প্রকারের ভোগ। তাৎপর্য হল এই যে, পরমাত্মা ছাড়া প্রকৃতিজাত যত প্রাণী, পদার্থ, পরিস্থিতি, অবস্থা ইত্যাদি আছে, তার মধ্যে যে কোনো প্রকৃতিজাত করণ সহযোগে সুখভোগ করাকেই ভোগ বলা হয়।

শাস্ত্রনিষিদ্ধ ভোগ সর্বতোভাবে ত্যাজ্য তো বটেই শাস্ত্রবিহিত ভোগও পরমাত্মপ্রাপ্তির পথে বাধা সৃষ্টিকারী হওয়ায় পরিত্যাজ্য। কারণ জড়ত্বের সম্পর্ক ছাড়া ভোগ হয় না এবং পরমাত্মপ্রাপ্তির জন্য জড়ত্বের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করা অত্যন্ত আবশ্যক।

'আদ্যন্তবন্তঃ'—সমস্ত ভোগই আদি-অন্ত বিশিষ্ট, তা অনিত্য এবং পরিবর্তনশীল (গীতা ২।১৪)। তা কখনোই একভাবে স্থির থাকতে পারে না। অর্থাৎ এই ভোগগুলির স্বয়ং (স্বরূপ)-এর সঙ্গে কোনোভাবেই ঐক্য নেই। ভোগ আদি ও অন্তবিশিষ্ট এবং স্বয়ং সর্বদা স্থিররূপে বিরাজমান। ভোগ হল জড় আর স্বয়ং চেতনবিশিষ্ট। ভোগ হচ্ছে বিকারী এবং স্বয়ং নির্বিকার। ভোগ হল আদি-অন্তবিশিষ্ট এবং স্বয়ং হলেন অনাদি-অনন্ত। সেইজন্য ভোগ হতে কখনোই স্বয়ং সুখলাভ করতে পারে না। জীব হল পরমাত্মার অংশ—**'মমৈবাংশো জীবলোকে'** (গীতা ১৫।৭), সুতরাং পরমাত্মা হতেই তার অক্ষয় সুখ-প্রাপ্তি সম্ভব—**'স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে'** (গীতা ৫।২১)।

ভোগ অস্থায়ী অর্থাৎ সেটি সংযোগ-বিয়োগসম্পন্ন—এইদিকে দৃষ্টি দিলেই সুখ-দুঃখের প্রভাব কমে যায়। সেইজন্য **'আদ্যন্তবন্তঃ'** পদটি ভোগের প্রভাব দূর করার জন্য ঔষধস্বরূপ।

'দুঃখযোনয় এব তে'—সম্বন্ধজনিত যত সুখ আছে, তা সবই দুঃখের উৎপত্তি-স্থান। সম্বন্ধজনিত সুখগুলির উৎপত্তি হয় দুঃখ থেকে এবং তা দুঃখেই শেষ হয়। প্রথমে কোনো বস্তুর অভাবরূপ দুঃখ অনুভব হয়, পরে সেই বস্তুর প্রাপ্তিতে সুখ হয়। বস্তুর অভাবরূপ দুঃখ যে পরিমাণে হয়, তার প্রাপ্তিতে সুখও সেই পরিমাণে হয়।

ভোগী ব্যক্তি দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পায় না। কারণ জড়ত্বের সম্পর্ক থেকেই ভোগ হয় আর জড়ত্বের সম্পর্কই জন্ম-মৃত্যুরূপ গভীর দুঃখের কারণ হয়।

পাতঞ্জল যোগদর্শনে বলা হয়েছে যে—

পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্বং বিবেকিনঃ। (২।১৫)

'পরিণামদুঃখ, তাপদুঃখ এবং সংস্কারদুঃখ—এই তিন প্রকারের দুঃখ সকলের মধ্যে বিদ্যমান থাকায় এবং তিনটি গুণের বৃত্তি পরস্পর বিরোধী হওয়ায় বিবেকবান ব্যক্তিদের কাছে সমস্ত ভোগই দুঃখরূপ হয়ে থাকে।'

সমস্ত বিষয়ভোগই আরম্ভে সুখাবহ মনে হলেও পরিণামে তা দুঃখই প্রদান করে (গীতা ১৮।৩৮)। কারণ ভোগের পরিণামে নিজ শক্তি হ্রাস হয় এবং ভোগ্যপদার্থ নাশ হয়—এই-ই হল **'পরিণামদুঃখ'**।

নিজ অপেক্ষা অপর ব্যক্তির বেশি ভোগ্যসামগ্রী দেখলে, নিজ ইচ্ছানুযায়ী ভোগ্যবস্তু না পেলে, অন্তরে ভোগবাসনা সত্ত্বেও ভোগ করার সামর্থ্য না থাকলে এবং প্রাপ্ত ভোগ হারানোর আশঙ্কায় ভোগের মধ্যে থাকলেও হৃদয়ে যে সন্তাপ থাকে, তাকেই বলা হয় **'তাপদুঃখ'**।

কোনো কারণবশতঃ ভোগের সমাপ্তি ঘটলে মানুষ সেই ভোগকে স্মরণ করে দুঃখিত হয়,—এটি হল **'সংস্কারদুঃখ'**।

ভোগে রুচি হওয়ায় মন সেইগুলি ভোগ করতে ইচ্ছা করে, কিন্তু বিবেকের প্রভাবে বুদ্ধি তাকে সেই ভোগ থেকে নিবৃত্ত করে। এইরূপই সৎসঙ্গ করার সময় তামসিক বৃত্তির জন্য নিদ্রা আসে এবং নিদ্রাসুখ মানুষকে সেই দিকেই আকর্ষণ করে ; কিন্তু সাত্ত্বিক বৃত্তির জন্য তার মনে এই চিন্তা আসে যে, 'এখন সৎসঙ্গ করে নাও ; কারণ এই সুযোগ বারবার আসে না'—এটি হল **'গুণবৃত্তি-বিরোধ'**, এরজন্য সাধকের খুব দুঃখ হয়।

ভোগ প্রাপ্ত হওয়া কারো নিজের হাতে নয় ; কারণ এতে প্রারব্ধের প্রাধান্য এবং নিজের পরাধীনতা থাকে। কিন্তু ভগবদ্ প্রাপ্তি সকল মানুষের পক্ষেই সম্ভব ; কারণ তাঁকে লাভ করার জন্যই এই মনুষ্যদেহ লাভ হয়েছে। দুটি মানুষ সমানভাবে ভোগসামগ্রী পেতে পারে না, কিন্তু মনুষ্যমাত্রেই ভগবানকে সমানভাবে লাভ করতে পারে। সত্যযুগ ইত্যাদিতে শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ যে ভগবানকে লাভ করেছিলেন, তা আজ কলিযুগেও সকলেই লাভ করতে পারেন। ভোগপ্রাপ্তি সকলের চিরদিনের জন্য হয় না, কিন্তু ঈশ্বর-প্রাপ্তি চিরদিনের জন্য হয় এবং সবার জন্য হয়। অর্থাৎ ভোগের (জড়বস্তুর) প্রাপ্তির বিভিন্নতা থাকেই, আর এগুলি ত্যাগ করলে সব এক হয়ে যায়।

'এব' পদটির অর্থ হল যে ভোগ নিঃসন্দেহে, নিশ্চিতরূপেই দুঃখের কারণ। সেগুলিতে সুখ আছে বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তাতে সুখের লেশমাত্র নেই।

'ন তেষু রমতে বুধঃ'—সাধারণ মানুষের যেসব ভোগে সুখ আছে বলে মনে হয়, বিবেকবান ব্যক্তিগণ তাকে দুঃখরূপ জানেন। সেইজন্য তাঁরা সেই ভোগে রত হন না, তার অধীন হন না, তাতে আসক্ত হন না।

বিবেকবান মানুষের এই জ্ঞান থাকে যে জগতের সমস্ত দুঃখ, শোক, পাপ, নরক ইত্যাদি সংযোগজনিত সুখের ইচ্ছার ওপরই ন্যস্ত। নিজের এই জ্ঞানকে গুরুত্ব দেওয়াতেই তাঁরা হলেন বুদ্ধিমান। অপরপক্ষে যারা এই ভোগ দুঃখদায়ক জেনেও, এইসব ভোগ কামনা করেন এবং তাতেই রত থাকেন, তারা প্রকৃতপক্ষে নিজ জ্ঞানের যথাযথ গুরুত্ব না দেওয়ায় বুদ্ধিমান বলার উপযুক্ত নন। নিজের জ্ঞানকে গুরুত্ব প্রদানকারী বুদ্ধিমান মানুষ কখনো ভোগের কামনা পোষণ করেন না বা তাতে রত থাকতে পারেন না।

পরিশিষ্ট-ভাব— বস্তু, ব্যক্তি এবং ক্রিয়ার সম্পর্কে যে সুখ হয় তা হল দুঃখের কারণ। সুখ ভোগকারী ব্যক্তিকে প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে দুঃখভোগ করতেই হয়। সুখের আশা, কামনা এবং ভোগ থেকে প্রকৃত সুখ পাওয়া যায় না, বরং দুঃখই মেলে। ভোগের সংযোগ অনিত্য, বিয়োগই নিত্য। মানুষ সেই অনিত্যকে গুরুত্ব দিয়েই দুঃখ পেয়ে থাকে। তার চিন্তা করা উচিত যে সুখ চাইলেই কি সুখ পাওয়া যাবে আর দুঃখনাশ হবে ? সুখের আশা করলে সুখ তো পাওয়া যায় না, দুঃখও দূর হয় না। দুঃখ দূর করার জন্য সুখের আশা করাই হল দুঃখের মূল কারণ।

একটি হল দুঃখভোগ আর অন্যটি হল দুঃখের প্রভাব। মানুষ যখন দুঃখভোগ করে তখন তার মধ্যে সুখের ইচ্ছা জন্মায় আর যখন তার ওপর দুঃখের প্রভাব হয়, তখন তার সুখের ইচ্ছা দূর হয়, তাতে অরুচি জন্মায়। দুঃখভোগের দ্বারা মানুষ দুঃখী হয় আর দুঃখের প্রভাবে মানুষ দুঃখ থেকে উত্তীর্ণ হয়। দুঃখের প্রভাবে সে দুঃখে ভেঙে না পড়ে তার কারণগুলি খুঁজতে থাকে যে আমার কেন দুঃখ হল ? এইভাবে চিন্তা করলে সে বুঝতে পারে যে সুখাসক্তি ব্যতীত দুঃখের

আর কোনো কারণ নেই, ছিল না এবং হবে না, হতে পারেও না। পরিস্থিতিও দুঃখের কারণ নয়, কারণ সেটি প্রতিমুহূর্তেই বদলাতে থাকে। কোনো প্রাণীও দুঃখের কারণ নয়, কারণ তারা আমাদের পূর্বের পাপগুলিকে নষ্ট করে আমাদের উন্নতিতে সাহায্য করে। জগৎও দুঃখের কারণ নয়, কারণ তাতে যা পরিবর্তন হয় সেগুলি আমাদের দুঃখ দেবার জন্য নয়, আমাদের উন্নতির জন্যই হয়। যদি পরিবর্তন না হয় তাহলে উন্নতি হবে কী করে ? পরিবর্তন ছাড়া বীজ থেকে বৃক্ষ হবে কী করে ? রজঃ বীর্য থেকে শরীর কীভাবে তৈরি হবে ? বালক কী করে যুবকে পরিণত হবে ? মূর্খ কী করে বিদ্বান হবে ? রোগী কিভাবে নিরোগ হবে ? তাৎপর্য হল স্বাভাবিক পরিবর্তন বিকশিত করে। জগতে পরিবর্তনই সার। পরিবর্তন ব্যতীত জগৎ এক অচল, স্থির চিত্রের ন্যায় হত। সুতরাং পরিবর্তন দোষাবহ নয়, কিন্তু তাতে সুখবুদ্ধি করাই হল দোষের। ভগবানও দুঃখের কারণ নন, কেন-না তিনি আনন্দঘন, তাঁর কাছে কোনো দুঃখই নেই।

'ন তেষু রমতে বুধঃ'—বিবেকবান মানুষ ভোগে রত থাকেন না ; কারণ ভোগ-কামনা বিবেকবান ব্যক্তিদের নিত্য বৈরী স্বরূপ— **'জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা'** (গীতা ৩।৩৯)। অজ্ঞ ব্যক্তিদের ভোগ ভালো লাগে, কারণ অজ্ঞতার কারণেই দোষাদিতে গুণবুদ্ধি হয়। সব ভোগই দোষজনিত। অন্তরে কোনো দোষ না থাকলে ভোগবুদ্ধি হয় না। বিবেকবান ব্যক্তিরাই দোষ দেখতে পান। তাই তাঁরা ভোগে রত হন না অর্থাৎ তার থেকে সুখগ্রহণ করেন না।

যা সর্বদা থাকে না বা ক্ষণস্থায়ী তেমন বস্তুর ইচ্ছা বিচারশীল ব্যক্তি করেন না। কেন-না তিনি জানেন যে প্রাপ্ত কোনো বস্তু, ব্যক্তি, যোগ্যতা, সামর্থ্য তাঁর নয় এবং তাঁর জন্যও নয়। শুধু তাই নয়, এই অনন্ত বিশ্বে এমন কোনো বস্তু নেই, যা তাঁর বা তাঁর জন্য। অত্যন্ত প্রিয় বস্তুও চিরকাল তাঁর থাকবে না বা তাঁর সঙ্গে থাকবে না। তাই বিবেকমান ব্যক্তির এই দৃঢ় নিশ্চয়তা থাকে যে, যে বস্তু এবং ব্যক্তি সর্বদা তাঁর সঙ্গে থাকবে না, সেগুলি ব্যতীতই তিনি চিরপ্রসন্ন থাকতে সক্ষম।

* * *

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে সংযোগজনিত সুখ ভোগকারী দুঃখের হাত থেকে নিস্তার পায় না, তাহলে সুখী কে হয়—পরবর্তী শ্লোকে তা জানাচ্ছেন।

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥ ২৩ ॥

[**ইহ** (এই মনুষ্যদেহেই) ; **যঃ** (যে ব্যক্তি) ; **শরীরবিমোক্ষণাৎ, প্রাক্, এব** (মরণের পূর্বেই) ; **কামক্রোধোদ্ভবম্** (কামক্রোধ হতে উৎপন্ন) ; **বেগম্** (বেগ) ; **সোঢুম্** (সহ্য করতে) ; **শক্নোতী** (সমর্থ হন) ; **সঃ, নরঃ** (তিনিই) ; **যুক্তঃ** (যোগী) ; **সঃ** (তিনিই) ; **সুখী** (সুখী ব্যক্তি ।)]

এই মনুষ্যদেহেই যে ব্যক্তি মরণের পূর্বেই কাম-ক্রোধ হতে উৎপন্ন বেগ সহ্য করতে সমর্থ হন, তিনিই যোগী এবং সুখী ব্যক্তি ॥ ২৩ ॥

ব্যাখ্যা—**'শক্নোতীহৈব যঃ .... কামক্রোধোদ্ভবং বেগম্'**—সকল প্রাণীই এক অলৌকিক বিবেক প্রাপ্ত হয়ে থাকে। পশু-পক্ষী ইত্যাদি প্রাণীতে এই বিবেক সুপ্ত থাকে। তাদের কেবলমাত্র নিজ নিজ জন্ম অনুযায়ী শরীর-নির্বাহের বুদ্ধি থাকে। দেবতাদের মধ্যে এই বিবেক আবরিত থাকে। কারণ ভোগের জন্যই তাঁদের জন্ম হয়। তাই তাঁদের মধ্যে ভোগের বাহুল্য এবং উদ্দেশ্যও থাকে ভোগের। মনুষ্যজন্মেও ভোগী এবং সংগ্রহকারীর বিবেক আচ্ছাদিত থাকে। আচ্ছাদিত থাকলেও এই বিবেক সময় সময়ে মানুষকে ভোগ এবং সংগ্রহরূপ দুঃখ এবং দোষ দর্শন করায়। কিন্তু মানুষ তাতে গুরুত্ব না দিয়ে ভোগ এবং সংগ্রহের কাজে ব্যাপৃত থাকে। সুতরাং মানুষের উচিত, এই বিবেককে গুরুত্ব দিয়ে তাকে স্থায়ী করে রাখা। এতে তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। বিবেককে স্থায়িত্ব দিয়ে সে রাগ-দ্বেষ, কাম-ক্রোধ ইত্যাদি বিকার সর্বতোভাবে ত্যাগ করতে সক্ষম হয়। তাই ভগবান **'ইহ'** পদটির দ্বারা মানুষকে সতর্ক করে বলছেন যে, এখন মানুষ এই দুর্লভ সুযোগ পেয়েছে, যার দ্বারা সে কাম-ক্রোধ জয় করে

চিরকালের মতো সুখী হতে পারে।

মুক্তি পাবার জন্যই এই মনুষ্যদেহের উৎপত্তি। তাই মানুষমাত্রেই কাম-ক্রোধের বেগ সহ্য করতে সক্ষম এবং অধিকারী। এটি কোনো বর্ণ, আশ্রম ইত্যাদির উপর নির্ভর করে না।

মৃত্যু যে কখন আসবে কেউ জানে না, সুতরাং কাম-ক্রোধের বেগ প্রথম থেকেই সহ্য করা উচিত। কাম-ক্রোধের বশীভূত না হয়ে পড়ি সেই সতর্কতা আজীবন পালন করতে হয়। একমাত্র মানুষ নিজেই এটি করতে সক্ষম, আর কেউ নয়। মনুষ্য শরীরেই এই কাজ করার সুযোগ আছে, অন্য দেহে নয়। তাই শরীর ত্যাগ করার আগেই এটি অবশ্য করে নিতে হবে—এই পদগুলিতে এই ভাবই পরিস্ফুট হয়েছে।

উপরের পদগুলি থেকে এই ভাবও নেওয়া যেতে পারে যে, কাম-ক্রোধের বশীভূত হয়ে শরীর কোনো কাজ করার পূর্বেই—সেই বেগ সহ্য করে নেওয়া কর্তব্য। কারণ কাম-ক্রোধের ক্রিয়া একবার শুরু হলে শরীর এবং তার বৃত্তিগুলি আর নিজের বশে থাকে না।

ভোগ্য-সামগ্রী পাবার আগে তার ইচ্ছা জাগে। ইচ্ছা জাগলেই সতর্ক হতে হয় যে, 'আমি তো সাধক, আমার ভোগে আবদ্ধ হওয়া উচিত নয়, কারণ এটি সাধকের কাজ নয়।' এইভাবে ইচ্ছা উৎপন্ন হওয়ামাত্রই তা ত্যাগ করতে হয়।

পদার্থের প্রতি আসক্তি (কামনা) থাকায় 'অমুক পদার্থ সুন্দর এবং সুখদায়ক' এইরূপ সংকল্প সৃষ্টি হয়। সংকল্পের উৎপত্তির পর সেই পদার্থ প্রাপ্তির জন্য কামনা উৎপন্ন হয় এবং সেগুলির প্রাপ্তিতে যে বাধা দেয় তার প্রতি ক্রোধ উৎপন্ন হয়।

কাম-ক্রোধের বেগ সহ্য করার তাৎপর্য হল এই যে—কাম-ক্রোধের বেগ উৎপন্নই না হতে দেওয়া। কাম-ক্রোধের উৎপত্তি হলে তবেই বেগ আসে এবং বেগ এলে তখন কাম-ক্রোধ রোধ করা কঠিন হয়ে পড়ে, তাই কাম-ক্রোধের সংকল্প জাগতে না দেওয়াতেই উপরোক্ত পদগুলির ভাব প্রতীত হয়। কারণ কাম-ক্রোধের সঞ্চার হলে অন্তরে অশান্তি, উত্তেজনা, সংঘর্ষ ইত্যাদি হতে থাকে, যার ফলে মানুষ সুখী হতে পারে না। কিন্তু এই শ্লোকটিতে **'স সুখী'** পদ দু'টির দ্বারা কাম-ক্রোধের বেগ সহনকারী ব্যক্তিকে 'সুখী' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ কাম-ক্রোধের বেগ মানুষ শক্তিশালী ব্যক্তির ভয়ে দমিয়ে রাখতে পারে অথবা ব্যবসায়ে লাভ হতে দেখলে সেই লোভের বশবর্তী হয়েও দমিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু এইভাবে ভয় বা লোভের জন্য কাম-ক্রোধের বেগ সহন করলে সে সুখী হয় না। কারণ সে যেমন ক্রোধের দ্বারা আবদ্ধ ছিল, তেমনি ভয় এবং লোভেও বদ্ধ হয়ে গেছে। তৃতীয়তঃ এই শ্লোকে **'যুক্তঃ'** পদটির দ্বারা কাম-ক্রোধের বেগ সহনকারী ব্যক্তিকে যোগী বলা হয়েছে ; কিন্তু সংকল্প ত্যাগ না করলে মানুষ কখনও যোগী হতে পারে না (গীতা ৬।২)। তাই কাম ও ক্রোধের বেগ রোধ করা ভালো হলেও সাধকের এরূপ ইচ্ছা জাগতে না দেওয়াই হল অতি উত্তম।

কাম-ক্রোধের সংকল্প রোধ করার উপায় হল—কাম ও ক্রোধকে নিজের মধ্যে না মানা। কারণ আমি স্বয়ং চিরস্থায়ী এবং কাম ও ক্রোধ উৎপত্তি ও বিনাশশীল। অতএব এগুলি আমার সঙ্গে এক থাকতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, কাম ও ক্রোধকে আমরা নিজের থেকে পৃথক বলেও জানি। যাকে আমরা পৃথক বলে জানি, সেই বস্তু নিজের মধ্যে থাকে না। তৃতীয়তঃ, কাম-ক্রোধ রহিত হওয়া সম্ভব—**'কামক্রোধবিযুক্তানাম্'** (গীতা ৫।২৬), **'এতৈর্বিমুক্তঃ'** (গীতা ১৬।২২)। সেই এগুলি থেকে রহিত হতে সক্ষম, যে বাস্তবে প্রথম থেকেই এগুলি সম্পর্কে সজাগ থাকে। চতুর্থতঃ, ভগবান কাম-ক্রোধকে (যেটি রাগ-দ্বেষেরই স্থূলরূপ) ক্ষেত্র অর্থাৎ প্রকৃতির বিকার বলে জানিয়েছেন (গীতা ১৩।৬)। সুতরাং এই সমস্ত প্রকৃতিতেই হয়ে থাকে, নিজের মধ্যে নয়। কারণ স্বরূপ হল নির্বিকার। এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে কাম-ক্রোধ নিজের মধ্যে থাকে না। এটিকে নিজের বলে মনে করার অর্থ একে আমন্ত্রণ করা।

'স যুক্তঃ নরঃ'—যার জ্ঞান অজ্ঞানমূঢ়তায় আবৃত, সেইরূপ ব্যক্তিকে ভগবান এই অধ্যায়ের পনেরোতম শ্লোকে জন্তু (**জন্তবঃ**) নামে অভিহিত করেছেন। এই স্থানে কাম-ক্রোধের বেগ সংবরণে সক্ষম মানুষকে **'নরঃ'** নামে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ এর ভাব হল—কাম-ক্রোধের বশীভূত যে, সে মানুষ নামের উপযুক্ত নয়। যিনি কাম-ক্রোধ জয় করেছেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি 'মানুষ', শূরবীর।

সমতায় স্থিত মানুষকে যোগী বলা হয়। যে নিজ বিবেককে গুরুত্ব দিয়ে কাম-ক্রোধের বেগ সংযত করে,

সেই যোগে (সমত্বে) স্থিত হতে পারে।

'স সুখী'—কেবলমাত্র মানুষ নয়, পশু-পক্ষীও কাম-ক্রোধের বেগ উৎপন্ন হলে সুখ-শান্তিতে থাকতে পারে না। তাই যে ব্যক্তি কাম-ক্রোধ ত্যাগ করেছে, সেই প্রকৃতপক্ষে সুখী। কারণ কাম-ক্রোধের সংকল্প জাগলেই মানুষের অন্তরে অশান্তি, চাঞ্চল্য ইত্যাদি দোষ উৎপন্ন হয়। এই দোষগুলি থাকলে তাকে সুখী বলা সম্ভব নয়। কাম-ক্রোধের বশীভূত হলে সে দুঃখী হয়। নিয়মই হচ্ছে যে, উৎপত্তি ও বিনাশশীল বস্তুগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে সুখ কামনাকারী ব্যক্তি কখনো সুখী হতে পারে না।

পরিশিষ্ট-ভাব— প্রথমে স্ফুরণ হয়। এই স্ফুরণে সত্তা, আসক্তি এবং আগ্রহ জন্মালে সেই ভাব দৃঢ় হয়ে সংকল্প হয়ে ওঠে। সংকল্প থেকে মনোরথ বা মনোরাজ্য হয়, যার থেকে কাম-ক্রোধাদির বেগ উৎপন্ন হয় (গীতা ২।৬২-৬৩)। সাধকদের জন্য প্রথম কথা হল যে তাঁরা যেন এই বেগ উৎপন্ন হতে না দেন অর্থাৎ সংকল্প না করেন। তাতে সক্ষম না হলে অন্তত পক্ষে বেগ উৎপন্ন হলেও যেন তাতে বশীভূত হয়ে তদনুসারে ক্রিয়া না করেন।

* * *

সম্বন্ধ—বাহ্য সম্পর্কের থেকে পাওয়া সুখের দুষ্পরিণামের বর্ণনা করে ভগবান এখন আভ্যন্তর অনুভূতিতে যে সুখ হয় তার মহিমার বর্ণনা করছেন।

যোঽন্তঃ সুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি॥ ২৪ ॥

[যঃ (যে ব্যক্তির) ; **অন্তঃসুখ** (পরমাত্মাতেই সুখ) ; **অন্তরারামঃ** (যিনি পরমাত্মাতেই রত) ; তথা, যঃ (এবং যিনি) ; **অন্তর্জ্যোতিঃ**, এব (কেবল পরমাত্মাতেই জ্ঞানযুক্ত) ; **সঃ**, **ব্রহ্মভূতঃ** (ব্রহ্মে নিজস্থিতি অনুভবকারী সেই) ; যোগী (সাংখ্যযোগী) ; **ব্রহ্মনির্বাণম্**, **অধিগচ্ছতি** (নির্বাণ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন।)]

যে ব্যক্তির কেবল পরমাত্মাতেই সুখ এবং কেবল যে পরমাত্মাতেই রত এবং যিনি কেবল পরমাত্মাতেই জ্ঞানযুক্ত, ব্রহ্মে নিজ স্থিতি অনুভবকারী সেই সাংখ্যযোগী নির্বাণ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন ॥ ২৪ ॥

ব্যাখ্যা—**'যোঽন্তঃ সুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ'**—যাঁর প্রকৃতিজাত বাহ্যপদার্থে সুখ অনুভব হয় না, একমাত্র পরমাত্মা হতেই সুখ অনুভব হয় এরূপ সাধককে এইস্থানে **'অন্তঃসুখঃ'** বলা হয়েছে। পরমাত্মতত্ত্ব ভিন্ন অন্য কিছুতেই তাঁর সুখ-বুদ্ধি থাকে না। সর্বদা তাঁর পরমাত্মতত্ত্বের সুখ অনুভব হতে থাকে । কারণ তাঁর সুখের আধারে বাহ্যপদার্থগুলির কোনো সম্বন্ধ থাকে না।

স্বয়ং নিজ সত্তায় স্থিত থাকার জন্য বাহ্যপদার্থের বিন্দুমাত্র প্রয়োজনীয়তা নেই। স্বয়ং-এর স্বয়ং থেকে কোনো দুঃখ হয় না, কোনো অরুচি হয় না—একেই বলা হয় অন্তঃসুখ।

যে বস্তু চিরদিনের জন্য পাওয়া যায় না এবং সকলে পায় না, তাকে বলা হয় 'বাহ্য'। কিন্তু যা চিরদিনের জন্য সকলে পেতে পারে তাকে বলা হয় 'আভ্যন্তর'।

যে ভোগ্যবস্তুতে সুখভোগ না করে শুধুমাত্র পরমাত্মতত্ত্বে সুখানুভব করে এবং ব্যবহারিক জীবনেও যে শুধুমাত্র পরমাত্মতত্ত্বের সঙ্গেই সম্পর্কিত, সেই সাধককে এখানে **'অন্তরারামঃ'** বলা হয়েছে।

ইন্দ্রিয়জনিত জ্ঞান, বুদ্ধি সম্পর্কিত জ্ঞান ইত্যাদি যতপ্রকার সাংসারিক জ্ঞান আছে, সে সবের প্রকাশক এবং আধার হল পরমাত্মতত্ত্বের জ্ঞান। যে সাধকের এই জ্ঞান সর্বদা জাগ্রত থাকে, তাঁকে এখানে **'অন্তর্জ্যোতিঃ'** বলা হয়েছে।

সাংসারিক জ্ঞানের আরম্ভ ও শেষ হয়, কিন্তু এই পরমাত্মতত্ত্ব জ্ঞানের আরম্ভ বা শেষ থাকে না। এটি নিত্য-নিরন্তর স্থিতিশীল। তাই 'সবের মধ্যে এক পরমাত্মতত্ত্বই পরিপূর্ণ হয়ে আছে'—এইরূপ জ্ঞান সাংখ্যযোগীর মধ্যে সর্বদা স্বতঃ স্বাভাবিকভাবে বিরাজ করে।

'স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি'—সাংখ্যযোগের উচ্চপর্যায়ের সাধক ব্রহ্মে নিজ স্থিতি অনুভব করেন, যেটি পরিচ্ছিন্নতার দ্যোতক। কারণ সাধকের 'আমি স্বাধীন', 'আমি মুক্ত', 'আমি ব্রহ্মে স্থিত'—

এইপ্রকার পরিচ্ছিন্নতার সংস্কার থাকে। ব্রহ্মভূত সাধকের নিজের মধ্যে এই পরিচ্ছিন্নতার অনুভব হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত বিন্দুমাত্র পরিচ্ছিন্নতা বা ব্যক্তিত্ব বাকি থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে তত্ত্বনিষ্ঠ হতে পারে না। তাই এই অবস্থায় সন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়।

'ব্রহ্মনির্বাণম্' পদটির অর্থ হল—যাতে কখনো কোনো ব্যাকুলতা ছিল না, নেই বা হবে না এবং হওয়া সম্ভবও নয়—ব্রহ্ম হলেন এরূপ নির্বাণ অর্থাৎ শান্ত।

ব্রহ্মভূত সাংখ্যযোগীর ব্যক্তিত্ব যখন নির্বাণ ব্রহ্মে লীন হয়ে যায়, তখন একমাত্র নির্বাণ ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকে। অর্থাৎ সাধক পরমাত্মতত্ত্বের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যান—তত্ত্বতঃ এক হয়ে যান, যা স্বতঃসিদ্ধ। ব্রহ্মভূত অবস্থায় সাধক তো ব্রহ্মেই নিজ স্থিতি অনুভব করেন, কিন্তু ব্যক্তিত্ব নাশ হলে অনুভবকারী আর কেউ থাকে না। সাধক তখন নিজেই ব্রহ্ম হয়ে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত করেন—**'ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি'** (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৪।৪।৬)।

পরিশিষ্ট-ভাব—এখানে **'অন্তঃ'** পদটিকে **'অন্তঃকরণে'**র অর্থ মনে না করে **'পরমাত্মা'**র অর্থ বলে ধরতে হবে। কারণ অন্তঃকরণে সুখসম্পন্ন অথবা অন্তঃকরণে রমণকারী বা অন্তঃকরণে জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয় না। অন্তঃকরণ থেকে সম্পর্ক-বিচ্ছিন্ন হলেই ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—পূর্বশ্লোকে ভগবান সাংখ্যযোগের নিবৃত্তিগত সাধনার কথা জানিয়েছেন। পরবর্তী শ্লোকে প্রবৃত্তিগত সাংখ্যযোগের সাধনার কথা জানাচ্ছেন।

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ॥ ২৫ ॥

[**যতাত্মানঃ** (যাঁর দেহ-মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদি নিজ বশীভূত) ; **সর্বভূতহিতে রতাঃ** (যিনি সর্বভূতহিতে রত) ; **ছিন্নদ্বৈধা** (যিনি সংশয়শূন্য) ; **ক্ষীণকল্মষাঃ** (যাঁর সমস্ত দোষ দূর হয়েছে) ; **ঋষয়ঃ** (বিবেকসম্পন্ন সাধক) ; **ব্রহ্মনির্বাণম্** (ব্রহ্ম নির্বাণ) ; **লভন্তে** (লাভ করেন।)]

যাঁর দেহ মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদি নিজের বশীভূত, যিনি সর্বভূতহিতে রত, যিনি সংশয়শূন্য, যাঁর সমস্ত কল্মষ (দোষ) দূরীভূত হয়েছে, সেই বিবেকসম্পন্ন সাধক ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হন ॥ ২৫ ॥

ব্যাখ্যা—'যতাত্মানঃ'—নিত্য সত্যতত্ত্বপ্রাপ্তি দৃঢ় লক্ষ্য হওয়ায় সাধকদের শরীর-ইন্দ্রিয়াদি-মন-বুদ্ধিকে বশীভূত করতে হয় না, বরং তা স্বাভাবিকভাবে সহজেই বশীভূত হয়ে যায়। বশীভূত হওয়ায় এগুলি রাগ (আসক্তি)-দ্বেষাদি দোষরহিত হয় এবং এগুলি দ্বারা সংঘটিত সমস্ত কর্মই অপরের হিতে হয়ে থাকে।

শরীর-ইন্দ্রিয়াদি-মন-বুদ্ধিকে নিজস্ব এবং নিজের জন্য মনে করতে থাকলেই এগুলি বশে থাকে না এবং এগুলিতে রাগ-দ্বেষ, কাম-ক্রোধ ইত্যাদি দোষ বিরাজ করে, যতক্ষণ এই দোষগুলি বজায় থাকে ততক্ষণ সাধক এদের বশীভূত থাকে। সেইজন্য সাধকের এই শরীরাদিকে কখনও নিজস্ব বা নিজের জন্য বলে মনে করা উচিত নয়। এরূপ মনে করলে এগুলির আগ্রহ শেষ হয় এবং এগুলি বশীভূত হয়। সুতরাং যাঁর শরীর-ইন্দ্রিয়াদি-মন-বুদ্ধিতে আপনত্বের ভাব নেই এবং যিনি এই শরীর ইত্যাদিকে নিজ স্বরূপ বলে মনে করেন না, এরূপ সতর্ক সাধকদের উদ্দেশ্যে এইস্থানে **'যতাত্মানঃ'** পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

'সর্বভূতহিতে রতাঃ'—সাংখ্যযোগের সিদ্ধিতে ব্যক্তিত্বের অভিমান হল মূল বাধা। এই ব্যক্তিত্বের অভিমান দূর করে তত্ত্বে নিজ স্বাভাবিক স্থিতি অনুভব করার জন্য সমস্ত প্রাণীর হিতে রত হওয়া প্রয়োজন। সমগ্র প্রাণীকুলের হিতে প্রীতিভাবই তাঁর ব্যক্তিত্ব (অভিমান) দূর করার সহজ পথ।

যিনি সর্বস্থানে পরিপূর্ণ পরমাত্মতত্ত্বের সঙ্গে অভিন্ন ভাব অনুভব করতে চান, তাঁর পক্ষে প্রাণীমাত্রের হিতে প্রীতিভাব থাকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যেমন নিজের বলে যে শরীর তার আকৃতি, অবয়ব, কার্য, নাম ইত্যাদি বিভিন্ন হলেও এমন ভাব থাকে যে, সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই আরাম

পাক, কোনো অঙ্গের যেন ক্লেশ না হয়, তেমনি বর্ণ, আশ্রম, সম্প্রদায়, সাধন-পদ্ধতি ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন হলেও সমস্ত প্রাণীকুলের হিতে স্বাভাবিক প্রীতি হওয়া উচিত, যেন সকলে সুখী হয়, সকলের মঙ্গল হয়, কেউ যেন বিন্দুমাত্র কষ্ট না পায়। কারণ বাহ্যতঃ ভিন্ন ভিন্নরূপ প্রতীয়মান হলেও অন্তরে সেই এক পরমাত্মতত্ত্বই সমভাবে সর্বত্র পরিপূর্ণ হয়ে আছে। সুতরাং প্রাণীমাত্রেরই হিতে প্রীতি হলে ব্যক্তিগত স্বার্থভাব সহজেই দূর হয়ে পরমাত্মতত্ত্বের সঙ্গে নিজ অভিন্নতা অনুভব হয়।

'ছিন্নদ্বৈধাঃ'—যতক্ষণ পরমাত্মপ্রাপ্তি সম্বন্ধে দৃঢ়-নিশ্চয়তা না হচ্ছে, ততক্ষণ উচ্চ স্থিতিসম্পন্ন সাধকদের অন্তরেও কিছু না কিছু দ্বিধা থেকে যায়। দৃঢ়নিশ্চিত হলে সাধকদের আর নিজ সাধনায় কোনো সংশয়, বিকল্প, ভ্রম ইত্যাদি থাকে না এবং তাঁরা অসন্দিগ্ধ চিত্তে তৎপরতার সঙ্গে সাধন-ভজনে ব্যাপৃত হন।

'ক্ষীণকল্মষাঃ'—প্রকৃতির সঙ্গে মেনে নেওয়া যা কিছু সম্পর্ক থাকে, তা সবই কল্মষ অর্থাৎ দোষ ; কারণ প্রকৃতির সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্কগুলিই সমস্ত কল্মষ অর্থাৎ পাপ, দোষ ও বিকারের হেতু। প্রকৃতি এবং তার কার্য শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদিতে স্পষ্টভাবে নিজ পৃথকত্ব অনুভব হলে সাধকদের স্বতঃই নির্বিকার ভাব আসে।

'ঋষয়ঃ'—'ঋষ্' ধাতুর অর্থ হল জ্ঞান। এই জ্ঞানকে (বিবেক) যাঁরা গুরুত্ব দেন তাঁদের ঋষি বলা হয়। প্রাচীনকালে ঋষিগণ গৃহে বাস করেও পরমাত্মতত্ত্ব পেয়েছিলেন। এই শ্লোকেও জাগতিক ব্যবহার সত্ত্বেও বিচার-বিবেচনাপূর্বক পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তির আশায় সাধন-ভজনকারী সাধকদের বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং নিজ বিবেককে প্রাধান্য প্রদানকারী এই সাধকগণও ঋষিপদবাচ্য।

'লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণম্'—ব্রহ্ম সদা-সর্বদা সকলেরই প্রাপ্ত। কিন্তু পরিবর্তনশীল দেহাদিতে নিজ একত্ব মেনে নেওয়াতেই মানুষ ব্রহ্ম হতে বিমুখ হয়ে থাকে। যখন উৎপত্তি ও বিনাশশীল এই শরীরাদি বস্তুগুলি থেকে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন সমস্ত বিকার এবং সংশয় নাশ হয়ে সর্বত্র পরিপূর্ণ ব্রহ্মানুভূতি হয়।

'লভন্তে' পদটির তাৎপর্য হল যে, যেমন সমুদ্রে তরঙ্গ লীন হয়ে যায়, তেমনি সাংখ্যযোগীও ব্রহ্মে লীন হয়ে যান। জলতত্ত্বে যেমন সমুদ্র ও তরঙ্গের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, তেমনি নির্বাণ ব্রহ্মে আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

পরিশিষ্ট-ভাব—লোকের দৃষ্টিতে মনে হয় জ্ঞানযোগী অন্যের হিত (**সর্বভূতহিতে রতাঃ**) করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি তা করেন না, আসলে তাঁর দ্বারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অন্যের হিত সাধন হয়।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—চব্বিশ-পঁচিশতম শ্লোকে ভগবান সাংখ্যযোগের সাধকদের নির্বাণ ব্রহ্ম প্রাপ্ত করার কথা বলেছেন। এখন পরবর্তী শ্লোকে জানাচ্ছেন ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্তি হলে তাঁর কীরূপ অনুভূতি হয়।

কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্॥ ২৬ ॥

[**কামক্রোধবিযুক্তানাম্** (কামক্রোধবর্জিত) ; **যতচেতসাম্** (সংযতচিত্ত) ; **বিদিতাত্মনাম্** (আত্মদর্শী) ; **যতীনাম্** (সাংখ্যযোগীগণের) ; **অভিতঃ** (উভয়দিকেই) ; **ব্রহ্মনির্বাণম্, বর্ততে** (নির্বাণ ব্রহ্ম পরিপূর্ণ।)]

কাম-ক্রোধ হতে মুক্ত, সংযতচিত্ত এবং আত্মদর্শী সাংখ্যযোগীগণের উভয় দিকেই অর্থাৎ দেহ থাকাকালীন অথবা দেহত্যাগের পর—সর্বত্রই নির্বাণ ব্রহ্ম পরিপূর্ণ ॥ ২৬ ॥

ব্যাখ্যা—'কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাম্'—উপরি-উক্ত পদগুলির দ্বারা ভগবান পরিষ্কারভাবে জানাচ্ছেন যে, সিদ্ধ মহাপুরুষে কাম-ক্রোধাদি দোষ লেশমাত্রও থাকে না। কাম-ক্রোধাদি দোষ উৎপত্তি ও বিনাশী অসৎ বস্তুর (শরীর-ইন্দ্রিয়াদি-মন-বুদ্ধি ইত্যাদির) সংস্পর্শে উৎপন্ন হয়। সিদ্ধ মহাপুরুষের উৎপত্তি ও বিনাশরহিত সৎ-তত্ত্বে স্বাভাবিক স্থিতি অনুভব হয়। সুতরাং উৎপত্তি ও বিনাশশীল অসৎ বস্তুগুলির সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক

থাকে না। তাঁর অনুভবে নিজের বলে কথিত শরীর—অন্তঃকরণ সহ সমস্ত জগতের সঙ্গে নিজের (স্বয়ং-এর) সম্পর্ক সর্বতোভাবে রহিত হয়ে যায়, তাই তাঁর কাম-ক্রোধাদি বিকার উৎপন্ন হবে কী করে ? কাম-ক্রোধ সূক্ষ্মরূপেও যদি থাকে তবে নিজেকে জীবন্মুক্ত বলে মনে করা ভ্রম।

উৎপত্তি ও বিনাশশীল বস্তুর কামনা করাকে 'কাম' বলা হয়। কাম বা কামনা অভাব থেকে উৎপন্ন হয়। অভাব সদা অসতের মধ্যে বাস করে। সৎ-স্বরূপে কোনো অভাবই নেই। কিন্তু স্বরূপ যখনই অসৎ-এর সঙ্গে তাদাত্ম্য করে তখন অসৎ-অংশের অভাবকে সে নিজের বলে মনে করে। নিজের মধ্যে অভাব মনে করলেই কামনার সৃষ্টি হয় এবং সেই কামনা পূরণে বাধা উপস্থিত হলে ক্রোধ জন্মায়। এইরূপ স্বরূপে কামনা না থাকলেও তাদাত্ম্যতার জন্য নিজের মধ্যে কামনা প্রতীয়মান হয়। কিন্তু যাঁর এই তাদাত্ম্য দূর হয়েছে এবং স্বরূপে স্বাভাবিক স্থিতি অনুভব হয়েছে, তাঁর স্বয়ং-এ অসৎ-এর অনস্তিত্ব অনুভব হবে কীভাবে ? অর্থাৎ তা হতে পারে না।

সাধনার দ্বারা কাম-ক্রোধ কমে যায়—সাধকেরা এইরূপ অনুভব করেন। যেটি কম হতে থাকে সেটি ক্রমশঃ লোপ পায়, সুতরাং যে সাধনার দ্বারা কাম-ক্রোধাদি হ্রাস পেতে থাকে, সেই সাধনার দ্বারাই তা লোপও হয়।

সাধকের অনুভব হতে থাকে যে (১) কাম-ক্রোধাদি দোষগুলি আগে যত শীঘ্র সৃষ্টি হত, এখন আর তত শীঘ্র হয় না। (২) আগে যেরূপ তীব্রতায় আসতো, এখন আর তা আসে না এবং (৩) আগে যত দীর্ঘ স্থায়ী হতো, এখন আর তত হয় না। কখনো আবার সাধকের এমনও মনে হয় যে, কাম-ক্রোধের তীব্রতা আগের থেকে বেশি হচ্ছে। তার কারণ হল এই যে (১) সাধনার দ্বারা ভোগাসক্তি কমতে থাকলেও পূর্ণাবস্থা এখনও প্রাপ্ত হয়নি (২) অন্তঃকরণ শুদ্ধ হওয়ায় অল্প কাম-ক্রোধও সাধকের কাছে বেশি বলে মনে হয়। (৩) মনের বিরুদ্ধে কেউ কোনো কাজ করলে সাধকের তা খারাপ লাগে, কিন্তু সাধক তা গ্রাহ্য করেন না। খারাপ লাগার ব্যাপারটি ভিতরে জমতে থাকে। শেষে সামান্য ব্যাপারেও অধিক ক্রোধ এসে যায়, কারণ ভিতরে যা জমে থাকে তা একসঙ্গে বেরিয়ে আসে। এতে অন্যান্য ব্যক্তিরা আশ্চর্যান্বিত হয়ে পড়ে যে, এই সামান্য ব্যাপারে তিনি কেন এতো রেগে গেলেন।

কখনো কখনো বৃত্তিগুলি ঠিকমতো হলে সাধকের মনে হয় যে, তিনি পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যতক্ষণ তিনি অনুভব করেন যে তিনি পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন, ততক্ষণ তাঁর (ব্যক্তিত্ব বজায় থাকায়) পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয় না।

'যতচেতসাম্'—যতকাল অসৎ-এর সঙ্গে সম্পর্ক থাকে ততকাল মন বশীভূত হয় না। অসৎ সম্পর্ক সর্বতোভাবে দূর হলে মহাপুরুষদের মন স্বতঃই বশীভূত থাকে।

'অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্'—নিজের স্বরূপের প্রকৃত জ্ঞান যাঁদের হয়েছে সেইসকল মহাপুরুষদের **'বিদিতাত্মনাম্'** নামে এখানে অভিহিত করা হয়েছে। অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত এবং মনুষ্যজন্মের যে মহিমা গীত হয়েছে, তা তাঁরা উপলব্ধি করেছেন।

দেহ থাকাকালীন বা বিদেহী অবস্থায়—সর্বদা এই মহাপুরুষগণ নির্বাণ ব্রহ্মে স্থিত থাকেন। বিভিন্ন ক্রিয়াকালে সাধারণ মানুষ যেমন নিজ শরীরে অবস্থান করেন, মহাপুরুষগণের এইরূপ বিভিন্ন ক্রিয়ার সময়েও এক ব্রহ্মেই তাঁদের নিরন্তর অবস্থান থাকে। তাঁদের স্বাভাবিক স্থিতিতে কখনো কোনো ব্যতিক্রম হয় না। কারণ যে ভাগে ক্রিয়াগুলি হয়, সেই বিভাগের (অসৎ-এর) সঙ্গে তাঁদের কোনো সম্পর্ক থাকে না।

*** *** ***

সম্বন্ধ—এখন পরবর্তী দুটি শ্লোকে ভগবান জানাচ্ছেন যে, যে তত্ত্ব জ্ঞানযোগী এবং কর্মযোগী প্রাপ্ত করতে সক্ষম, সেই তত্ত্ব ধ্যানযোগীও প্রাপ্ত করতে পারেন[১]।

---

[১]ধ্যানযোগ সাধকদের একক স্বতন্ত্রভাবে পরমাত্মা প্রাপ্ত করায় এবং কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের সাধকেরাও এর সাহায্য নিতে পারেন। জপ, ধ্যান, সৎসঙ্গ এবং স্বাধ্যায়—এগুলি প্রতিটি সাধকের পক্ষে উপযোগী এবং প্রয়োজনীয়ও বটে।

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ॥ ২৭ ॥
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ॥ ২৮ ॥

[**বাহ্যান্, স্পর্শান্** (বাহ্য বিষয়সকল) ; **বহিঃ, এব** (বাইরেই) ; **কৃত্বা** (পরিত্যাগ করে) ; **চ** (এবং) ; **চক্ষুঃ** (চক্ষুর দৃষ্টি) ; **ভ্রুবোঃ, অন্তরে** (ভ্রূর মধ্যস্থলে স্থাপন করে) ; **নাসাভ্যন্তরচারিণৌ** (নাসিকায় বিচরণকারী) ; **প্রাণাপানৌ** (প্রাণ ও অপান-বায়ুকে) ; **সমৌ, কৃত্বা** (সমান রেখে) ; **যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ** (যাঁর ইন্দ্রিয়াদি, মন ও বুদ্ধি স্ববশে) ; **যঃ** (যিনি) ; **মোক্ষপরায়ণঃ** (মোক্ষপরায়ণ) ; **বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ** (ইচ্ছা-ভয়-ক্রোধ হতে মুক্ত) ; **সঃ, মুনিঃ** (সেই মননশীল ব্যক্তি) ; **সদা** (সর্বদাই) ; **মুক্তঃ, এব** (মুক্ত।)]

বাহ্য বিষয়সকল বাহিরেই পরিত্যাগ করে চক্ষুর দৃষ্টি ভ্রূমধ্যে স্থাপন করে, নাসিকায় বিচরণকারী প্রাণ ও অপানবায়ুকে সমান রেখে যিনি ইন্দ্রিয়াদি, মন ও বুদ্ধিকে বশে রেখেছেন, যিনি মোক্ষপরায়ণ, ইচ্ছা-ভয়-ক্রোধ হতে মুক্ত, সেই মননশীল ব্যক্তি সর্বদাই মুক্ত ॥ ২৭-২৮ ॥

ব্যাখ্যা—**'স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যান্'**—পরমাত্মা ব্যতিরেকে সমস্ত বিষয়ই বাহ্য। বাহ্য বিষয়সকল বাইরেই ত্যাগ করে দেওয়ার অর্থ হল এগুলির চিন্তা মনে না আনা।

বাইরের বিষয়বস্তুর সম্পর্ক ত্যাগ কর্মযোগে সেবার দ্বারা এবং জ্ঞানযোগে বিচার-বিবেচনার দ্বারা করা যায়। ভগবান এইস্থানে ধ্যানযোগের দ্বারা বাহ্য-বিষয় থেকে সম্পর্ক-ত্যাগের কথা বলছেন। ধ্যানযোগে একমাত্র পরমাত্মাই চিন্তার বিষয় হওয়ায় বাহ্য-বিষয়ে বিমুখতা আসে।

বাহ্য বিষয়সকল বস্তুতঃ কোনো বাধা নয়। বাধা হল—এগুলির সঙ্গে আসক্তিপূর্বক নিজ সম্পর্ক মেনে নেওয়া। সেই মেনে নেওয়া সম্পর্ক ত্যাগ করাই হল উপরিউক্ত পদগুলির অর্থ।

'চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ'—এখানে **'ভ্রুবোঃ অন্তরে'** পদটির দ্বারা চক্ষুর দৃষ্টি দুই ভ্রূমধ্যে স্থাপন করা বা দৃষ্টিকে নাসিকার অগ্রভাগে স্থাপন করা (গীতা ৬।১৩)—দুটি অর্থই নেওয়া যেতে পারে।

ধ্যানের সময় পুরোপুরি চোখ বন্ধ করে রাখলে লয়দোষ অর্থাৎ নিদ্রা আসার সম্ভাবনা থাকে এবং চোখ সম্পূর্ণ খোলা থাকলে (সামনে সুন্দর দৃশ্য থাকলে) বিক্ষেপদোষ আসার সম্ভাবনা থাকে। এই দুপ্রকার দোষ দূর করার জন্য চক্ষু অর্ধমুদ্রিত করে দৃষ্টি দুই ভ্রূর মধ্যস্থলে স্থাপন করার কথা বলা হয়েছে।

'প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ'—নাসিকা থেকে যে বায়ু বহির্গত হয় তাকে বলা হয় 'প্রাণ' বায়ু এবং যেটি নাসিকার মধ্যে গ্রহণ করা হয় তাকে বলা হয় 'অপান' বায়ু।

প্রাণবায়ুর গতি হয় দীর্ঘ এবং অপানবায়ুর গতি লঘু হয়। এই দুটিকে সমান করার জন্য প্রথমে বাম নাসিকা দ্বারা অপানবায়ু ভেতরে প্রবেশ করিয়ে ডান নাসিকা দ্বারা প্রাণবায়ুকে বাইরে আনতে হয়। আবার ডান নাসিকা দ্বারা অপানবায়ু ভেতরে টেনে নিয়ে বাম নাসিকা দ্বারা প্রাণবায়ু বাইরে ত্যাগ করতে হয়। এই দুই ক্রিয়াতে সমান সময় লাগা উচিত। এইভাবে নিত্য অভ্যাস করলে প্রাণ এবং অপানবায়ুর গতি সম, শান্ত ও সূক্ষ্ম হয়। যখন নাসিকার বাইরে, ভিতরে বা কণ্ঠ দেশে বায়ুর স্পর্শ অনুভূত হয় না, তখন বুঝতে হবে যে প্রাণ-অপানের গতি সমান হয়েছে। এই দুটির গতি সমান হলে (পরমাত্মা যদি উদ্দেশ্য হন) স্বাভাবিকভাবে মনে পরমাত্মার চিন্তা এসে যায়। ধ্যানযোগে এই প্রাণায়ামের প্রয়োজনীয়তা থাকে, তাই উপরে লিখিত পদগুলিতে তার উল্লেখ করা হয়েছে।

'যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ'—প্রত্যেক মানুষেরই ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির সম্পর্কে জ্ঞান থাকে। ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির মধ্যস্থলেই হল মনের নিবাস। মানুষকে লক্ষ্য করতে হবে যে তার মনের ওপর ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের প্রভাব পড়ে, না বুদ্ধির জ্ঞানের প্রভাব পড়ে অথবা দুটি জ্ঞানেরই আংশিক প্রভাব পড়ে। ইন্দ্রিয়াদির জ্ঞানে 'সংযোগে'র প্রভাব পড়ে এবং

বুদ্ধির জ্ঞানে 'পরিণামে'র। যে মানুষের মনে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় জ্ঞানের প্রভাব থাকে, সে সংযোগজনিত সুখভোগে ব্যাপৃত হয়। আর যার মনে বুদ্ধির জ্ঞানের প্রভাব থাকে, সে (পরিণামের দিকে দৃষ্টি থাকায়) সুখভোগ ত্যাগ করতে সমর্থ হয়—**'ন তেষু রমতে বুধঃ'** (গীতা ৫।২২)।

প্রায়শঃ সাধকদের মনে আংশিকরূপে ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি—দুই জ্ঞানের প্রভাবই থাকে। তাঁদের মনে ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির জ্ঞানের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। সেইজন্য তাঁরা বিচার-বিবেচনাকে গুরুত্ব দিতে পারেন না এবং যা করতে চান, তা করে উঠতে পারেন না। এই দ্বন্দ্বই ধ্যানের পথে বাধাস্বরূপ। সুতরাং এখানে মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করার অর্থ হল যে মনের ওপর কেবলমাত্র বুদ্ধির জ্ঞানেরই যেন প্রভাব থাকে, ইন্দ্রিয়াদির জ্ঞানের প্রভাব যেন সর্বতোভাবে দূর হয়।

'মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ'—পরমাত্মপ্রাপ্তিই যাঁর লক্ষ্য, এরূপ পরমাত্মা স্বরূপের মননকারী সাধককে এইস্থানে **'মোক্ষপরায়ণঃ'** বলা হয়েছে। পরমাত্মতত্ত্ব সমস্ত দেশ, কাল ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ থাকায় সকলে সদা-সর্বদা প্রাপ্ত হয়ে রয়েছে। কিন্তু উদ্দেশ্য দৃঢ় না হওয়ায় এই নিত্যপ্রাপ্ত তত্ত্ব অনুভূত হতে বিলম্ব হচ্ছে। যদি উদ্দেশ্যে দৃঢ় হয় তাহলে তত্ত্ব অনুভূত হতে সময় লাগে না। বাস্তবে প্রথম থেকেই এই উদ্দেশ্য স্থির হয়ে আছে ; কারণ এই মনুষ্যদেহ তো পরমাত্মপ্রাপ্তির জন্যই পাওয়া গিয়েছে। সেই উদ্দেশ্যটি কেবল চিনে নিতে হয়। সাধক যখন এই উদ্দেশ্যটি চিনে যান, তখনই তাঁর পরমাত্মপ্রাপ্তির বাসনা উৎপন্ন হয়। এই বাসনা জগতের সমস্ত কামনা দূর করে সাধককে পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব করায়। সুতরাং পরমাত্মপ্রাপ্তির উদ্দেশ্য জেনে নেওয়ার জন্যই এইস্থানে **'মোক্ষপরায়ণঃ'** পদটি প্রযুক্ত হয়েছে।

কর্মযোগ, সাংখ্যযোগ, ধ্যানযোগ, ভক্তিযোগ ইত্যাদি সমস্ত সাধনেই এক দৃঢ় নিশ্চয়তা বা উদ্দেশ্যের অত্যন্ত প্রয়োজন। নিজ কল্যাণ করার উদ্দেশ্যই যদি দৃঢ় না হয়, তাহলে সাধনা দ্বারা সিদ্ধি কী করে পাওয়া যাবে ? তাই এখানে **'মোক্ষপরায়ণঃ'** পদটির দ্বারা ধ্যানযোগে দৃঢ়-নিশ্চয় হওয়ার আবশ্যকতার কথা বলা হয়েছে।

'বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ'—নিজের ইচ্ছাপূরণে বাধাদানকারী প্রাণীকে নিজের থেকে সবল বলে মনে করলে তার প্রতি ভয় উৎপন্ন হয় এবং দুর্বল বলে মনে করলে তার ওপর ক্রোধ জন্মায়। এরূপেই বাঁচার ইচ্ছা থাকলে মৃত্যুতে ভয় হয় এবং অপরের দ্বারা নিজ ইচ্ছা-পূরণের বা অন্যের ওপর নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার ইচ্ছা থেকে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। সুতরাং ভয় বা ক্রোধ উৎপন্ন হওয়াতে ইচ্ছাই মুখ্য। মানুষের যদি ইচ্ছাপূরণের উদ্দেশ্য না থাকে এবং পরমাত্মপ্রাপ্তিই যদি একমাত্র লক্ষ্য হয় তাহলে ভয় ও ক্রোধসহ সমস্ত ইচ্ছা সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়। ইচ্ছা সম্পূর্ণভাবে দূর হলে মানুষ মুক্ত হয়ে যায়। কারণ বস্তুসামগ্রীর ও বাঁচার আকাঙ্ক্ষায় মানুষ জন্ম-মৃত্যুর বন্ধনে পড়ে। সাধককে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে যে, ইচ্ছা করলেই কি বস্তুগুলি পাওয়া যায় ? আর, বাঁচার ইচ্ছা করলে কি মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব ? বাস্তব সত্য হল এই যে, আমরা বস্তুর আকাঙ্ক্ষাও পূর্ণ করতে পারি না এবং মৃত্যুর হাত থেকেও বাঁচতে পারি না। সেইজন্য সাধক যদি দৃঢ়নিশ্চয় হন যে, এক পরমাত্মপ্রাপ্তি ছাড়া তাঁর আর কিছুই প্রয়োজন নেই, তাহলে তিনি তখনই মুক্ত হতে পারেন। কিন্তু যদি বস্তু এবং বাঁচার আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহলে সেই ইচ্ছা তো কখনো পূর্ণ হয়ই না এবং মৃত্যু ভয় থেকেও রক্ষা পাওয়া যায় না বা ক্রোধের হাত থেকেও মুক্তি মেলে না। তাই মুক্তি পাবার জন্য আকাঙ্ক্ষা রহিত হওয়া আবশ্যক।

যদি বস্তু প্রাপ্ত হবার থাকে তাহলে আকাঙ্ক্ষা না করলেও প্রাপ্তি হবে আর যদি না পাবার হয় তবে আকাঙ্ক্ষা করলেও তা পাওয়া যায় না। সুতরাং বস্তু পাওয়া বা না পাওয়া ইচ্ছাধীন নয়, বরং তা অন্য কোনো বিধানের অধীন। যে বস্তু আমাদের ইচ্ছাধীন নয়, তা পাওয়ার ইচ্ছা ত্যাগ করায় কষ্ট কীসের ? বস্তু লাভের ইচ্ছা যদি পূর্ণ হত তবে সেটি পূর্ণ করার জন্য চেষ্টা করা যেত এবং যদি বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হত তাহলে মৃত্যু থেকে বাঁচার চেষ্টা করা যেত। কিন্তু ইচ্ছানুসারে বস্তুসামগ্রী পাওয়া যায় না বা মৃত্যুর হাত থেকেও রক্ষা পাওয়া যায় না। বস্তুসামগ্রীর আকাঙ্ক্ষা না থাকলে জীবন আনন্দময় হয়ে ওঠে আর যদি বাঁচার ইচ্ছা না থাকে তাহলে মৃত্যুও আনন্দময় হয়ে ওঠে। জীবন তখনই কষ্টদায়ক হয় যখন বস্তুসামগ্রীর আকাঙ্ক্ষা থাকে আর মৃত্যুও তখনই কষ্টকর হয় যখন বাঁচার আকাঙ্ক্ষা থাকে। তাই যিনি বস্তুসামগ্রী এবং বাঁচার আকাঙ্ক্ষা সর্বতোভাবে ত্যাগ করেছেন তিনি জীবিতাবস্থাতেই মুক্ত হয়ে যান, অমর হয়ে যান।

'সদা মুক্ত এব সঃ'—উৎপত্তি ও বিনাশশীল বস্তুগুলির সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করাই হল বন্ধন। এই মেনে নেওয়া সম্পর্ক সর্বতোভাবে ত্যাগ করাই হল মুক্তি। যে মুক্তিলাভ করেছে, তাঁর ওপর কোনো ঘটনা-পরিস্থিতি, নিন্দা-স্তুতি, অনুকূলতা-প্রতিকূলতা, জীবন-মরণ ইত্যাদি কোনো কিছুরই প্রভাব পড়ে না।

'সদা মুক্ত এব' পদগুলির তাৎপর্য হল এই যে, বাস্তবে সাধক স্বরূপতঃ সর্বদাই মুক্ত। শুধুমাত্র উৎপত্তি ও বিনাশশীল বস্তুসামগ্রীর সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করাতেই তার নিজ মুক্ত স্বরূপের অনুভূতি হয় না। জগৎ-সংসারের সঙ্গে স্বীকৃত সম্বন্ধ দূর হলেই স্বতঃসিদ্ধ মুক্তির অনুভূতি হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব— বাহ্যিক পদার্থ বাইরেই পরিত্যাগ করার অর্থ হল—স্ব-স্বরূপকে শরীর থেকে পৃথক করে নেওয়া যে আমি শরীর নই, শরীর আমার নয় এবং আমার জন্যও নয়। এই তিনটি কথা সাধককে মানতেই হয়, —তা তিনি যে কোনো যোগপথেরই পথিক হোন না কেন। শরীরের সঙ্গে নিজের কোনো সম্পর্ক না মানলে মুক্তি স্বতঃসিদ্ধ।

পূর্বে চব্বিশতম শ্লোকে **'অন্তঃ'** শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তাই এখানে **'বাহ্য'** শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বাহ্য কোনো বস্তু নয়, এটি হল বৃত্তি। **'বাহ্য'** শব্দটির প্রয়োগ হয় অন্য সত্তা মেনে নিয়ে, যদিও প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্ব একই। তাই **'স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যান্'** পদগুলির তাৎপর্য হল যে এক তত্ত্ব ব্যতীত অন্য কোনো সত্তার স্বীকৃতি না থাকা।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—ভগবান যোগনিষ্ঠা এবং সাংখ্যনিষ্ঠার বর্ণনা করে উভয়ের পক্ষে উপযোগী ধ্যানযোগের বর্ণনা করেছেন। এখন তিনি সরলভাবে কল্যাণকারী ভগবদ্নিষ্ঠার বর্ণনা করছেন।

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥ ২৯ ॥

[মাম্ (আমাকে) ; যজ্ঞতপসাম্ (সকল যজ্ঞ ও তপস্যার) ; ভোক্তারম্ (ভোক্তা) ; সর্বলোকমহেশ্বরম্ (সর্বলোকের মহেশ্বর) ; সর্বভূতানাম্, সুহৃদম্ (সকল প্রাণীর সুহৃদ) ; জ্ঞাত্বা (জেনে) ; শান্তিম্, ঋচ্ছতি (শান্তি লাভ করেন।)]

ভক্তগণ আমাকে সকল যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, সর্বলোকের মহেশ্বর এবং সকল প্রাণীর সুহৃদ্ (স্বার্থবর্জিত, দয়ালু এবং প্রেমিক) জেনে শান্তি লাভ করেন ॥ ২৯ ॥

ব্যাখ্যা—**'ভোক্তারং যজ্ঞতপসাম্'**—মানুষ যখন কোনো শুভ কর্ম করে, তখন যেগুলির সাহায্যে শুভ কর্ম করে, —সেই শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, পদার্থ ইত্যাদিকে নিজের বলে মনে করে এবং যার জন্য শুভ কর্ম করে, তাকে ওই কর্মের ভোক্তা বলে মনে করে ; যেমন—কোনো দেবতার পূজা করলে, ওই দেবতাকে পূজারূপ কর্মের ভোক্তা বলে মনে করে। কারোর সেবা করলে তাকে সেবারূপ কর্মের ভোক্তা বলে মেনে নেয়। ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে অন্ন দান করলে, তাকে অন্নের ভোক্তা বলে মানে ইত্যাদি। এই মেনে নেওয়া দূর করার জন্য ভগবান উপরের পদগুলিতে বলেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে তিনিই সমস্ত শুভকর্মের ভোক্তা। কারণ প্রাণীমাত্রেরই হৃদয়ে ভগবান বিদ্যমান[১]। তাই কাউকে পূজা করা, কাউকে অন্ন-জল দান করা, কাউকে রাস্তা দেখানো ইত্যাদি যত শুভ কর্ম আছে, সেই সবেরই ভোক্তা বলে ভগবানকে মানা উচিত। লক্ষ্য ভগবানের দিকেই থাকা উচিত, প্রাণীর ওপর নয়।

নবম অধ্যায়ের চব্বিশতম শ্লোকেও ভগবান নিজেকেই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা বলে জানিয়েছেন—**'অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা'**।

দ্বিতীয়তঃ যেগুলির সাহায্যে শুভ কর্ম সম্পাদিত হয়, সেই শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, পদার্থ ইত্যাদি নিজের নয়, এগুলি আসলে ভগবানেরই। সেগুলিকে নিজের মনে

[১]'হৃদি সর্বস্য বিষ্ঠিতম্' (গীতা ১৩।১৭), 'সর্বস্য চাহং হৃদি সংনিবিষ্টঃ' (গীতা ১৫।১৫), 'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি' (গীতা ১৮।৬১)।

করাই ভুল। সেগুলি নিজের ভেবে নিজের জন্য শুভকর্ম করলে মানুষ স্বয়ং ওই কর্মের ভোক্তা হয়ে যায়। তাই ভগবান বলেছেন যে, 'তুমি সমস্ত শুভ কর্ম কখনো নিজের জন্য না করে কেবল আমারই জন্য করো। এরূপ করলে তুমি ওইসব কর্মের ফলভাগী হবে না এবং কর্ম থেকে তোমার সম্পর্ক-ছেদ হয়ে যাবে।'

সব অশুভ কর্মই কামনার জন্য হয়ে থাকে। কামনা ত্যাগ করে শুধুমাত্র ভগবানের জন্য সব কর্ম করলে অশুভ কর্ম স্বরূপতঃ হয় না এবং শুভ কর্মের সঙ্গেও সম্পর্ক থাকে না। এইভাবে সমস্ত কর্ম থেকে সর্বতোভাবে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হলে পরমশান্তি লাভ হয়।

'সর্বলোকমহেশ্বরম্'—ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন ঈশ্বর হতে পারেন ; কিন্তু তাঁরা সকলেই ভগবানের অধীন। ভগবান সমগ্র লোকের ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর, সেইজন্য এইস্থানে **'সর্বলোকমহেশ্বরম্'** পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টির প্রভু একমাত্র ভগবানই, সুতরাং কোনো সৎ ব্যক্তি সৃষ্টির কোনো জিনিসকে কী করে নিজের বলে মনে করবে ?

শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, প্রাণ, স্ত্রী, পুত্র, অর্থ, সম্পদ, গৃহ ইত্যাদিকে নিজের বলে মনে করে প্রায়শঃ লোকে বলে থাকে যে, ভগবানই সমস্ত জগতের প্রভু। কিন্তু এরূপ বলা সততার পরিচয় নয়। কারণ মানুষ যতক্ষণ শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ইত্যাদিকে নিজের বলে মনে করে, ততক্ষণ ভগবানকে সমস্ত জগতের প্রভু বলা নিজেকেই নিজে প্রতারণা করা হয়। কারণ সকলেই যদি শরীর ইত্যাদি বস্তুগুলি নিজের বলে মনে করতে থাকে, তবে আর অবশিষ্ট কী থাকল ভগবানকে যার প্রভু বলা যায় ? অর্থাৎ তাঁর বলতে আর কিছুই থাকে না। সুতরাং একমাত্র সেই বলতে পারে 'সবই ভগবানের'—যে শরীর ইত্যাদি কোনো পদার্থকেই নিজের বলে মনে করেই না। যে কোনো বস্তুকে নিজের বলে মনে করে, সে প্রকৃতপক্ষে ভগবানকে যথার্থরূপে সর্বলোকমহেশ্বর বলে মনে করেই না। সে যতগুলি বস্তু নিজের বলে মনে করে, সেই অংশে ভগবানকে সর্বলোকমহেশ্বর বলে মনে করার ভাবে ঘাটতি থাকে।

মানুষের কেবল শরীর ইত্যাদি পদার্থগুলি সদ্ব্যবহার করার অধিকারই আছে, নিজের বলে মনে করার নয়। এই পদার্থগুলিকে নিজের বলে না মনে করে, ভগবানের বলে মেনে নিয়ে তাঁরই সেবায় নিয়োগ করলে পরমশান্তি পাওয়া যায়।

'সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি'—যিনি সর্বলোকের ঈশ্বরেরও ঈশ্বর, তিনি স্বাভাবিকভাবেই বিনাকারণে প্রাণীদের হিত করেন, প্রাণীদের রক্ষা করেন এবং প্রাণীদের ভালোবাসেন এবং তাঁর মতো এরূপ হিতৈষী, রক্ষক এবং প্রেমিক অপর আর কেউ নেই—এইপ্রকার জেনে[১] নিলে পরমশান্তি লাভ হয়। কারণ তিনি বাস্তবিকই এইরূপ । অসীম শক্তিশালী ভগবান কোনো প্রয়োজন না হলেও আমাদের পরম সুহৃদ, তাহলে আর ভয়, ভাবনা, উদ্বেগ, অশান্তি ইত্যাদি কী করে হওয়া সম্ভব ?

বিনাকারণে জীবের হিতকারী মাত্র দুজন আছেন—ভগবান এবং তাঁর ভক্ত[২]। ভগবানের কারো কাছ থেকেই কিছু পাবার নেই—**'নানবাপ্তমবাপ্তব্যম্'** (গীতা ৩।২২), তাই স্বাভাবিকভাবেই তিনি সকলের সুহৃদ। ভক্তও নিজের জন্য কারো কাছে কিছু চান না এবং সকলেরই মঙ্গল চান এবং মঙ্গল করেন। সেইজন্য তিনিও সকলের সুহৃদ হন—**'সুহৃদঃ সর্বদেহিনাম্'** (শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২৫।২১)। ভক্তদের মধ্যে যে সুহৃদ্ ভাব দেখা যায় তাও মূলতঃ ভগবান হতেই প্রাপ্ত।

ভগবান সমস্ত যজ্ঞ এবং তপস্যার ভোক্তা, তিনি সমগ্র লোকের ঈশ্বর এবং আমাদের পরম সুহৃদ—এই তিনটি সত্যের মধ্যে কোনো একটি বিষয়ও যদি দৃঢ়তার সঙ্গে মেনে নেওয়া যায়, তাহলে ভগবৎ প্রাপ্তিরূপ পরমশান্তি লাভ হয়। আর যদি তিনটিই মেনে নেওয়া হয় তাহলে তো কথাই নেই।

নিজের জন্য কোনো কিছু আশা করা, কোনো বস্তুকে নিজের বলে মনে করা এবং ভগবানকে নিজের বলে মনে না করা—ভগবদ্ প্রাপ্তির পথে এই তিনটি প্রধান বাধা। ভগবান **'ভোক্তারং যজ্ঞতপসাম্'** পদ দুটির দ্বারা বলেছেন যে, নিজের জন্য কিছু আশা করা বা কোনো কিছু করা উচিত নয়। **'সর্বলোকমহেশ্বরম্'** পদের দ্বারা বলেছেন কোনো

[১]এখানে জানার অর্থ হল—দৃঢ়তা সহকারে মানা। 'মানা' জেনে নেওয়ার থেকে দুর্বল নয়। এইজন্য দৃঢ়তা সহকারে মেনে নেওয়াও জানার সমকক্ষ।

[২]হেতুরহিত জগ জুগ উপকারী। তুম্হ তুম্হার সেবক অসুরারী ॥ (শ্রীরামচরিতমানস ৭।৪৭।৩)

কিছু নিজের বলে মনে করা উচিত নয় অর্থাৎ সুখের আকাঙ্ক্ষা এবং বস্তু ও ব্যক্তির ওপর আধিপত্য ত্যাগ করা উচিত এবং **'সুহৃদং সর্বভূতানাম্'** পদে বলেছেন যে, 'শুধু আমাকেই নিজের বলে মনে করবে, অন্য কোনো বস্তু বা ব্যক্তিকে নিজের বলে মনে করবে না।' এই তিনটির মধ্যে যে কোনো একটিকে মেনে নিলে অন্য দুটি স্বাভাবিকভাবে এসে যায় এবং ভগবৎ প্রাপ্তি হয়।

নিজের জন্য সুখের আশা তখনই ত্যাগ করা যায়, যখন মানুষ কোনো প্রাণী বা পদার্থকে আর নিজের বলে মনে না করে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো পদার্থকে সে আপন বলে মনে করবে ততক্ষণ সে বিনিময়ে সুখের আশা করবেই। সুখের ইচ্ছা ত্যাগ করলে মমতা ত্যাগ এবং মমতা ত্যাগ করলে সুখের ইচ্ছা ত্যাগ হয়। যখন সমস্ত বস্তু ও ব্যক্তিতে মমতা ত্যাগ করা হয় তখন ভগবানই একমাত্র আপন থেকে যান। যে আর কাউকে আপন বলে মনে করে সে প্রকৃতপক্ষে ভগবানকে সর্বতোরূপে আপন বলে মনে করে না, শুধু বলার জন্য বলতে থাকে যে, 'ভগবান আমার'। মেনে নেওয়া সম্পর্ক দূর হলে ভগবানের সঙ্গে সত্যিকার আত্মীয়তা জাগ্রত হয়। এর তাৎপর্য হল যে, সুখের ইচ্ছা পরিত্যাগ করা হোক বা মমতার অনস্তিত্ব হোক বা ভগবানের সঙ্গে সত্যিকার আপন সম্পর্ক হোক ; এগুলো হলেই পরম শান্তি অনুভূত হয়। কারণ, এর যে কোনো একটি ভাব দৃঢ়রূপে থাকলে অন্য ভাবগুলিও স্বতঃই এসে যায়।

প্রথমতঃ কর্ম করা উচিত এবং দ্বিতীয়তঃ, কর্ম করার বিদ্যা বা জ্ঞান থাকা উচিত। মানুষ যখন কর্ম করে অথচ কর্মটি সম্পাদন করার বিদ্যা জানে না অথবা কর্ম করার বিদ্যা জানলেও কর্মটি করে না, তখন তার দ্বারা সুচারুরূপে কর্ম করা সম্ভব হয় না। তাই ভগবান তৃতীয় অধ্যায়ে কর্ম করার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন কিন্তু তার সঙ্গে কর্মতত্ত্ব ভালোভাবে জানার কথাও বলেছেন। আবার চতুর্থ অধ্যায়ে কর্মের তত্ত্ব জানার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন এবং তার সঙ্গে কর্ম করার কথাও বলেছেন। পঞ্চম অধ্যায়ে যদিও কর্মযোগ এবং সাংখ্যযোগ—উভয়ের দ্বারা কল্যাণ হওয়ার কথা বলা হয়েছে, তাহলেও ভগবান সাংখ্যযোগের থেকে কর্মযোগকেই শ্রেষ্ঠ বলে জানিয়েছেন। এই অধ্যায়ে ক্রমানুসারে কর্মযোগ এবং সাংখ্যযোগের বর্ণনা করে পরে সংক্ষেপে ধ্যানযোগের বর্ণনা করেছেন এবং অবশেষে সংক্ষিপ্তাকারে ভক্তিযোগের বর্ণনা করেছেন—যা হল ভগবানের মুখ্য উদ্দেশ্য।

❋ ❋ ❋

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে কর্মসন্ন্যাসযোগো নামক পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

এইপ্রকার ওঁ, তৎ, সৎ—এই ভগবদ্ নাম উচ্চারণপূর্বক ব্রহ্মবিদ্যা এবং যোগশাস্ত্রময় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে কর্মসন্ন্যাসযোগ নামক পঞ্চম অধ্যায় সম্পূর্ণ হল ॥ ৫ ॥

কর্মযোগ এবং সাংখ্যযোগ উভয়েরই বর্ণনা হওয়ায় এই পঞ্চম অধ্যায়ের নাম হয়েছে **'কর্মসন্ন্যাসযোগ'**।

পঞ্চম অধ্যায়ের পদ, অক্ষর এবং উবাচ

১) এই অধ্যায়ে **'অথ পঞ্চমোঽধ্যায়'** এর তিন, **'অর্জুন উবাচ'** ইত্যাদি পদের চার, শ্লোকগুলির তিনশত বাহান্ন এবং পুষ্পিকার তেরটি পদ আছে। এইভাবে সমস্ত পদগুলির যোগসংখ্যা হল তিনশত বাহাত্তর।

২) এই অধ্যায়ে **'অথ পঞ্চমোঽধ্যায়'** এর সাত, **'অর্জুন উবাচ'** ইত্যাদি পদের তের, শ্লোকগুলির নয়-শত আটাশ এবং পুষ্পিকায় আটচল্লিশটি অক্ষর আছে। এইভাবে সমস্ত অক্ষরগুলির যোগসংখ্যা হল নয়শত ছিয়ানব্বই। এই অধ্যায়ের সমস্ত শ্লোক বত্রিশ অক্ষরের।

৩) এই অধ্যায়ের দুটি **'উবাচ'** আছে—একটি হল **'অর্জুন উবাচ'** অপরটি হল **'শ্রীভগবানুবাচ'**।

পঞ্চম অধ্যায়ে প্রযুক্ত ছন্দ

এই অধ্যায়ের উনত্রিশটি শ্লোকের মধ্যে—ত্রয়োদশ এবং উনত্রিশতম শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে **'নগণ'** প্রযুক্ত হওয়ায় **'ন-বিপুলা'** ; এবং বাইশতম শ্লোকের তৃতীয় পংক্তিতে 'মগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় **'ম-বিপুলা'** সংজ্ঞাযুক্ত ছন্দ হয়েছে। বাকি ছাব্বিশটি শ্লোক **'পথ্যাবক্ত্র'** অনুষ্টুপ ছন্দের লক্ষণ যুক্ত।

❋ ❋ ❋

॥ ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

অথ ষষ্ঠয়োঽধ্যায়ঃ

ষষ্ঠ অধ্যায়

অবতরণিকা

পঞ্চম অধ্যায়ের প্রারম্ভে অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগ—এই দুটির মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ ? এর উত্তরে ভগবান বলেছিলেন যে দুটিই কল্যাণকারক ; কিন্তু কর্মসন্ন্যাস এবং কর্মযোগ—এই দুটির মধ্যে কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ— 'তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে' (৫।২)।

দুটিই কীভাবে কল্যাণকারক হয়—তার বর্ণনা ভগবান পঞ্চম অধ্যায়ের ছাব্বিশতম শ্লোক পর্যন্ত করেছেন। পরে তিনি সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগের পক্ষে উপযুক্ত এবং স্বতন্ত্রভাবে কল্যাণকারক ধ্যানযোগের বর্ণনা সংক্ষেপে দুটি শ্লোকে করার পর নিজে থেকেই ভক্তির নিষ্ঠার কথা জানিয়ে পঞ্চম অধ্যায়ের উপসংহার করেন।

পুনরায় কর্মযোগের শ্রেষ্ঠতা জানানোর জন্য ভগবান ষষ্ঠ অধ্যায় আরম্ভ করছেন।

শ্রীভগবানুবাচ

অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥ ১ ॥

[**কর্মফলম্** (কর্মফলের) ; **অনাশ্রিতঃ** (আশ্রয় না নিয়ে) ; **যঃ** (যে) ; **কার্যম্, কর্ম** (কর্তব্য-কর্মের পালন) ; **করোতি** (করে) ; **সঃ** (সেই) ; **সন্ন্যাসী** (সন্ন্যাসী) ; **চ, যোগী** (এবং যোগী) ; **চ** (আর) ; **নিরগ্নি** (যিনি অগ্নি ত্যাগ করেছেন) ; **ন** (নন) ; **চ** (অথবা) ; **অক্রিয়ঃ** (ক্রিয়া ত্যাগ করলে) ; **ন** (না।)]

শ্রীভগবান বললেন—কর্মফলের আশ্রয় না নিয়ে যিনি কর্তব্য-কর্ম করেন, তিনিই সন্ন্যাসী এবং যোগী। যিনি শুধু অগ্নি (যজ্ঞাদি) ত্যাগ করেছেন তাঁকে সন্ন্যাসী বলা যায় না বা শুধু কর্মত্যাগ করলেই যোগী হওয়া যায় না ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা—**'অনাশ্রিতঃ কর্মফলং'**—এই পদটির তাৎপর্য হল যে, মানুষের কোনো উৎপত্তি-বিনাশশীল বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা, পরিস্থিতি, ক্রিয়া ইত্যাদির আশ্রিত থাকা উচিত নয়। কারণ জীব স্বয়ং পরমাত্মার অংশ হওয়ায় নিত্য স্থিতিশীল আর সে যে বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদির আশ্রয় গ্রহণ করে, সেগুলি উৎপত্তি ও বিনাশশীল এবং প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তনশীল। এগুলি পরিবর্তনশীল হওয়ায় বিনাশ প্রাপ্ত হয় আর জীব রিক্তই (নিঃস্ব) থেকে যায়। শুধু রিক্তই থাকে না, বরং সেগুলির আসক্তিকে ধরে থাকে। যতক্ষণ সে আসক্তিকে ধরে থাকে ততক্ষণ তার কল্যাণ হয় না অর্থাৎ এই আসক্তি তার উচ্চ-নীচ কুলে জন্মগ্রহণের কারণ হয় (গীতা ১৩।২১)। যদি সে এই আসক্তি ত্যাগ করে তাহলে সে স্বতঃই মুক্ত হয়ে যায়। সে আসলে সদা-মুক্ত, শুধুমাত্র আসক্তির জন্য সে এই মুক্তি উপলব্ধি করতে পারে না। তাই ভগবান বলেছেন যে, মানুষ যেন কর্মফলের প্রত্যাশা না রেখে শুধু কর্তব্য-কর্ম করে যায়। কর্মফলের প্রত্যাশা না রাখলে নৈষ্ঠিক শান্তি প্রাপ্ত হয়, কিন্তু কর্মফলের আসক্তি থাকলে বন্ধন প্রাপ্ত হয় (গীতা ৫।১২)।

স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ—এই তিন শরীরই **'কর্মফল'**। এই তিনটির কোনোটিরই আশ্রয় না নিয়ে এগুলি অপরের হিতে ব্যবহার করা উচিত। যেমন, স্থূলশরীর দ্বারা হওয়া ক্রিয়া ও পদার্থগুলি জগতেরই—এরূপ জেনে তার ব্যবহার জগতের সেবায় করা, সূক্ষ্মশরীর দ্বারা অন্যের মঙ্গল কীভাবে হবে, সকলে কী করে সুখী হবে, সবাই কীভাবে উদ্ধার পাবে—এরূপ চিন্তা করা এবং কারণশরীর দ্বারা হওয়া স্থিরতার (সমাধি) সমস্ত ফল জগতের হিতার্থে

অর্পণ করা। কারণ এই তিনটি শরীরই নিজস্ব (ব্যক্তিগত) নয় এবং নিজের জন্যও নয়, এগুলি জগতের এবং জগতেরই সেবার জন্য। এই তিন শরীরের সঙ্গে জগতের অভিন্নতা আছে এবং নিজের স্বরূপের সঙ্গে ভিন্নতা আছে। এইভাবে এই তিনটির শরণ (আশ্রয়) গ্রহণ না করাই 'কর্মফলের আশ্রয় না করা' এবং এই তিন শরীর দ্বারা শুধুমাত্র জগতের হিতের জন্য কর্ম করাই হল 'কর্তব্য-কর্ম করা'।

আশ্রয় না নেওয়ার অর্থ হল যে সাধনজ্ঞানে শরীর ইত্যাদিকে অপরের হিতার্থে নিয়োগ করা, কিন্তু নিজে নিরাসক্ত থাকা অর্থাৎ এগুলিকে নিজস্ব বা নিজেরই জন্য বলে মনে না করা। কারণ মনুষ্য-জন্মে এই শরীরের কোনো নিজস্ব গুরুত্ব নেই, গুরুত্ব আছে শরীরাদির দ্বারা কৃত সাধন-ভজনের। সুতরাং জগৎ হতে প্রাপ্ত বস্তু জগৎকেই দিয়ে দিলে, জগতের সেবায় নিয়োগ করা হলে তবেই আমরা প্রকৃত 'সন্ন্যাসী' হতে পারি এবং প্রাপ্ত বস্তুগুলিতে নিজত্বভাব ত্যাগ করলেই আমরা প্রকৃত অর্থে 'ত্যাগী' হতে পারি।

কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা না করে কর্তব্য-কর্ম করলে কী হয় ? নিজের জন্য কর্ম না করলে নতুন করে আর আসক্তির সৃষ্টি হয় না আর শুধুমাত্র অপরের হিতার্থে কর্ম করলে পুরানো আসক্তি দূর হয়ে যায় এবং কর্মের বেগও নাশ হয়। এইরূপে সর্বতোভাবে আসক্তি দূর হলে মুক্তি স্বতঃসিদ্ধ হয়। উৎপত্তি ও বিনাশশীল বস্তুকে আশ্রয় করার নাম হল বন্ধন আর সেগুলি ত্যাগ করাকে বলা হয় মুক্তি। উৎপত্তি ও বিনাশশীল বস্তুর আকর্ষণ থেকে মুক্তি পাবার উপায় হল—সেগুলির আশ্রয় না নেওয়া অর্থাৎ সেগুলির ওপর মমতা না রাখা এবং নিজের জীবনকে ওইসবের আশ্রিত মনে না করা।

'কার্যং কর্ম করোতি যঃ'—কর্তব্যমাত্রেরই নাম হল কার্য। কার্য এবং কর্তব্য—এই দুটি শব্দ হল পর্যায়বাচী। তাকেই কর্তব্য-কর্ম বলা হয়, যেগুলি আমরা স্বাভাবিকভাবে করে থাকি, যেগুলি অবশ্যই করা উচিত এবং যেগুলি কখনোই ত্যাগ করা উচিত নয়।

'কার্যং কর্ম' অর্থাৎ কর্তব্য-কর্ম অসম্ভব হয় না এবং কঠিনও হয় না। যেগুলি করা অনুচিত, সেগুলি কর্তব্য-কর্ম নয়, সেগুলি অকর্তব্য অর্থাৎ অকার্য। এই অকর্তব্যও দুই প্রকারের হয় (১) যেগুলি আমরা করতে পারি না অর্থাৎ আমাদের ক্ষমতার বাইরে এবং (২) যেগুলি অনুচিত কর্ম অর্থাৎ যা শাস্ত্র এবং লোকমর্যাদার বিরুদ্ধ। অকর্তব্য কখনোই করা উচিত নয়। তাৎপর্য হল এই যে, কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা না করে শাস্ত্রবিহিত এবং লোকমর্যাদা অনুযায়ী প্রাপ্ত কতর্ব্য-কর্ম নিষ্কামভাবে অপরের হিতের জন্যই করা উচিত।

কর্ম দুই ভাবে করা হয়ে থাকে—ফলের প্রাপ্তির জন্য এবং কর্ম তথা তার ফলের আসক্তি দূর করার জন্য। এখানে কর্ম এবং তার ফলের আসক্তি দূর করার জন্যই প্রেরণা দেওয়া হয়েছে।

'স সন্ন্যাসী চ যোগী চ'—এইভাবে যিনি কর্ম করেন তিনিই সন্ন্যাসী এবং যোগী। তিনি কর্তব্য-কর্ম করেও নির্লিপ্ত থাকেন, সেইজন্য তিনি 'সন্ন্যাসী' এবং কর্তব্য-কর্ম করার সময়েও তিনি সুখী বা দুঃখী হন না অর্থাৎ কর্মের সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সম থাকেন, সেইজন্য তিনি 'যোগী'।

এর তাৎপর্য হল এই যে, কর্মফলের আশ্রয় না নিয়ে কর্ম করলে তাঁর কর্তৃত্ব এবং ভোক্তৃত্ব দূর হয় অর্থাৎ তাঁর কর্মের সঙ্গে ও তার ফলের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকে না, সেইজন্য তিনি 'সন্ন্যাসী'। তিনি কর্মে এবং কর্মফল প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিতে সম থাকেন, তাই তিনি 'যোগী'।

এখানে প্রথমে 'সন্ন্যাসী' পদটি বলায় এই ভাব প্রকাশিত হয় যে, অর্জুন স্বরূপতঃ কর্ম ত্যাগকেই শ্রেষ্ঠ বলে মানতেন। তাই তিনি (২।৫) বলেছিলেন যে, যুদ্ধ করা অপেক্ষা ভিক্ষান্নে জীবন-নির্বাহ করা শ্রেষ্ঠ। অতএব ভগবান এইস্থানে প্রথমে **'সন্ন্যাসী'** পদটি দ্বারা অর্জুনকে বলেছেন, হে অর্জুন ! তুমি যাকে সন্ন্যাস বলে মনে কর, বাস্তবে সেটি সন্ন্যাস নয়। যে ফলের আশা ত্যাগ করে নিজ কর্তব্যরূপ কর্ম শুধুমাত্র অপরের হিতার্থে কর্তব্যবুদ্ধির সাহায্যে করে, সেই বাস্তবে প্রকৃত সন্ন্যাসী।

'ন নিরগ্নিঃ'—কেবল অগ্নি রহিত হলেই সন্ন্যাসী হন না অর্থাৎ বাহ্যতঃ যিনি যজ্ঞ, হবি ইত্যাদি ত্যাগ করেছেন, বস্তু-পদার্থ ত্যাগ করেছেন, কিন্তু যাঁর অন্তরে ক্রিয়া এবং পদার্থের আসক্তি আছে, গুরুত্ব আছে, মমত্ব আছে, তিনি কখনও সত্যকার সন্ন্যাসী হতে পারেন না।

'ন অক্রিয়ঃ'—প্রায়শঃ লোকেদের ধারণা হল যে, যে ব্যক্তি কোনো কর্ম করে না, ক্রিয়া এবং পদার্থগুলি বাহ্যতঃ

পরিত্যাগ করে বনে চলে যায় অথবা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় সমাধিতে বসে থাকে, সেই যোগী। কিন্তু ভগবান বলেছেন যে, যতক্ষণ মানুষ উৎপত্তি ও বিনাশশীল বস্তুগুলির আশ্রয় ত্যাগ না করে এবং মনে মনে সেগুলির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকে, ততক্ষণ সে যতই ক্রিয়াহীন অবস্থায় থাকুক, বৃত্তিগুলি থেকে চিত্ত সর্বতোভাবে নিরোধ করে রাখুক, সে কখনো যোগী হতে পারে না। অবশ্য যদি চিত্তের বৃত্তিগুলি সর্বতোভাবে নিরোধ করা হয়, তাহলে সে নানাপ্রকার সিদ্ধি প্রাপ্ত হতে সক্ষম হলেও তার দ্বারা তার কল্যাণ হতে পারে না। এর তাৎপর্য হল এই যে, শুধু বাহ্যত নিষ্ক্রিয় হলেই যোগী হওয়া যায় না। তিনিই যোগী হতে পারেন, যিনি উৎপত্তি ও বিনাশশীল বস্তুর (কর্মফলের) আশ্রিত না থেকে কর্তব্য-কর্ম করেন।

মানুষের কর্ম করার একটি স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে। সেটি কর্মযোগের বিধির সাহায্যে কর্ম দ্বারাই প্রশমিত করা সম্ভব, নাহলে সেটি মেটে না। প্রায়শঃ দেখা যায় যে, যে সাধক সমস্ত ক্রিয়া থেকে মুক্ত হয়ে একান্তে থেকে জপ-ধ্যান ইত্যাদি সাধন-ভজন করেন, এরূপ নির্জনতাপ্রিয় উচ্চাবস্থাপন্ন সাধকদের মনেও লোকের হিত করার প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয় এবং তাঁরা একান্তবাস ও সাধন ত্যাগ করে লোকহিতকর কার্যে প্রবৃত্ত হন।

সকামভাবে অর্থাৎ নিজের জন্য কর্ম করলে কর্মের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এটি তখনই প্রশমিত হয় যখন সাধক নিজের জন্য কখনো বিন্দুমাত্র কর্ম না করে সমস্ত কর্ম লোকহিতার্থে করেন। এইভাবে নিষ্কামভাব সহযোগে অপরের জন্য কর্ম করলে কর্মের প্রবণতা দূর হয় এবং সমতা প্রাপ্ত হওয়া যায়। সমতা প্রাপ্ত হলে সমরূপ পরমাত্মতত্ত্ব অনুভূত হয়।

বিশেষ কথা

শরীর এবং জগৎ-সংসার বিষয়ে অহংবোধ ও মমত্ববোধ হওয়া কর্মের ফল নয়। এই অহং ও মমত্ববোধ মানুষের মেনে নেওয়া, তাই এটির পরিবর্তন হয়। যেমন, মানুষ গৃহস্থ জীবনে নিজেকে গৃহস্থ বলে মনে করে, আবার সে-ই যখন সাধু হয়ে যায় তখন নিজেকে সাধু বলে মনে করে অর্থাৎ তার গৃহস্থ-বোধের অহং দূর হয় এবং সাধু- বোধের অহং আসে। তেমনই 'এটি আমার' এই ভাব থেকে মানুষের ওই বস্তুটিতে মমত্ববোধ থাকে আবার সেটি যখন অন্যকে দিয়ে দেয় তখন তার আর ওই বস্তুটির মমতা থাকে না। এতে প্রমাণিত হয় যে অহং-মমত্ববোধ কেবল মেনে নেওয়া, বাস্তবে এটি নেই। যদি এটি বাস্তব হতো তবে কখনো এটি দূর হত না—'নাভাবো বিদ্যতে সতঃ' আর যদি দূর হয় তাহলে এটি বাস্তব নয়—'নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ' (গীতা ২।১৬)।

অহং ও মমত্ববোধের যিনি আধার ও আশ্রয় তিনি তো স্বয়ং পরমাত্মার অংশ। তাঁর কখনো অনস্তিত্ব হয় না। ব্যাপ্তিস্বরূপ পরমাত্মার সঙ্গে তাঁর ঐক্য থাকে। তাঁর মধ্যে অহংবোধ ও মমত্ববোধের লেশমাত্র থাকে না। প্রাকৃত বস্তুর সঙ্গে তাদাত্ম্য করলেই অহং ও মমত্ববোধ প্রতীত হয়। মানুষ এই তাদাত্ম্য করা বা না করায় সম্পূর্ণ স্বাধীন। যেমন—'আমি গৃহস্থ', 'আমি সাধু' এরূপ মনে করায় অর্থাৎ অহং-মমত্ববোধ স্থাপন করায় বা ত্যাগ করায় মানুষ স্বাধীন ও সক্ষম। তারা এই বিষয়ে পরাধীন বা অসমর্থ নয়। কারণ শরীরাদির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে চেতন (স্বয়ং), শরীর বা সংসার নয়। সুতরাং যিনি সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন তিনি সম্পর্ক ত্যাগ করতেও সক্ষম।

সম্পর্ক স্থাপন করার থেকে সম্পর্ক ত্যাগ করা সহজ। যেমন, মানুষ বাল্যাবস্থায় 'আমি বালক' এবং যুবাবস্থায় 'আমি যুবক'—এরূপ মনে করে। এইভাবে সে বাল্যাবস্থায় 'খেলনাগুলি আমার' এবং যুবাবস্থায় 'টাকা-পয়সা আমার'—এরূপ মনে করে থাকে। এইভাবে মানুষ বাল্যাবস্থা এবং খেলনা ইত্যাদির সঙ্গে সম্বন্ধ সে নিজেই স্থাপন করে। কিন্তু এগুলির সঙ্গে সম্পর্কগুলি ত্যাগ করার প্রয়োজন হয় না কারণ সেই সম্পর্ক স্বতঃই পরিত্যক্ত হয়। এর তাৎপর্য হল যে, বাল্যাবস্থা ইত্যাদির অহংভাব শরীর থাকা বা না থাকার উপর নির্ভরশীল নয়, এটি নির্ভরশীল নিজের মেনে নেওয়ার ওপর। সেরূপই খেলনা ইত্যাদির প্রতি মমতা বস্তু থাকা বা না থাকায় নির্ভর করে না, নির্ভর করে মেনে নেওয়ার ওপর। সেইজন্য কর্মফল (শরীর, বস্তু ইত্যাদি) বজায় থাকলেও তার আশ্রয় সহজেই ত্যাগ করা যায়।

'স্বয়ং' হলেন নিত্য এবং শরীর ও জগৎ হল অনিত্য। নিত্যের সঙ্গে অনিত্যের সম্পর্ক কখনোই টিকে থাকতে পারে না। কিন্তু স্বয়ং যখন অহং অভিমান ও মমত্ববোধের সঙ্গে সম্পর্কিত হন তখন সেই অহং-অভিমান ও মমত্ববোধকেও নিত্য বলে মনে হয়। তখন সেটি ত্যাগ করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। কারণ তিনি নিত্য-স্বরূপে অনিত্য

অহং-মমত্বকে ('আমি' এবং 'আমার ভাব'-কে) আরোপ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে দেহের সঙ্গে নিজের যে সম্পর্ক তা মেনে নেওয়া হয়েছে মাত্র। কারণ শরীর হল প্রকাশ্য এবং স্বয়ং (স্বরূপ) প্রকাশক। শরীর একদেশীয় আর স্বরূপ সর্বদেশীয় বা দেশাতীত। শরীর হচ্ছে জড় আর স্বয়ং হল চেতন। শরীর জ্ঞেয় আর স্বরূপ জ্ঞাতা। স্বরূপের এই জ্ঞাতার ভাবও শরীরের দৃষ্টিতেই সম্ভব। শরীর থেকে দৃষ্টি যদি সরিয়ে নেওয়া হয় তাহলে স্বরূপ জ্ঞাতৃত্বরহিত চৈতন্য হয়ে থাকে অর্থাৎ কেবলমাত্র চিৎরূপে বিরাজ করেন অর্থাৎ চৈতন্য রূপে বিরাজ করেন। এই চৈতন্য স্বরূপে 'আমি' বা 'আমার ভাব' থাকে না। তাতে অহংকর্তৃত্ববোধ এবং মমত্বও থাকে না। তা হল কেবল চৈতন্যমাত্র ব্রহ্ম-স্বরূপ, ব্রহ্মে 'আমি' বা 'আমার' ভাব কখনো ছিল না, নেই এবং হওয়া সম্ভবও নয়।

পরিশিষ্ট-ভাব—কীট থেকে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত জগৎই হল কর্মফল। জগৎ-সংসারের স্বরূপ হল—বস্তু, ব্যক্তি এবং ক্রিয়া। বস্তুমাত্রেরই প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি থাকে। ব্যক্তিমাত্রেরই থাকে সংযোগ ও বিয়োগ আর ক্রিয়ামাত্রেরই থাকে আরম্ভ ও শেষ। যিনি বস্তু, ব্যক্তি এবং ক্রিয়া—এই তিনেরই সংস্পর্শ ত্যাগ করে প্রাপ্ত কর্তব্য পালন করেন তিনি সত্যকার সন্ন্যাসী ও যোগী। যিনি কর্মফল ত্যাগ না করে শুধু অগ্নি ত্যাগ করেন তিনি প্রকৃত সন্ন্যাসী নন এবং যিনি কেবলমাত্র ক্রিয়াগুলিকে ত্যাগ করেন, তিনি যথার্থ যোগী নন। কারণ মানুষ কর্মফলে আবদ্ধ হয়, অগ্নি অথবা ক্রিয়ার দ্বারা নয়।

তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে ভগবান দুটি নিষ্ঠার কথা বলেছেন—সাংখ্যনিষ্ঠা (সাংখ্যযোগ) এবং যোগনিষ্ঠা (কর্মযোগ)। আবার পঞ্চম অধ্যায়ের চতুর্থ-পঞ্চম শ্লোকে সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগ—উভয়কেই ভগবান একই ফলসম্পন্ন বলে জানিয়েছেন। এখন এইস্থানে ভগবান সেই ভাবটি ধরেই বলেছেন যে যিনি কর্মফল ত্যাগ করেছেন, তিনিই সত্যকার সাংখ্যযোগী এবং কর্মযোগী। তাৎপর্য হল যে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করলেই কেউ যোগী হয় না। একমাত্র কর্মফল ত্যাগ করলেই যোগী হওয়া সম্ভব। কেন-না যতক্ষণ কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা থাকে, ততক্ষণ বৃত্তিনিরোধ করে সিদ্ধাই লাভ হলেও কল্যাণ হয় না।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—পূর্বশ্লোকে বলা হয়েছে যিনি সন্ন্যাসী, তিনিই যোগী। কিন্তু এর ঐক্য কিসে তার বর্ণনা করা হয়েছে পরবর্তী শ্লোকে।

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসন্ন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন॥ ২ ॥

[**পাণ্ডবঃ** (হে অর্জুন!) ; **যম্** (যাকে) ; **সন্ন্যাসম্, ইতি, প্রাহুঃ** (সন্ন্যাস বলে) ; **তম্** (তাকেই) ; **যোগম্** (যোগ বলে) ; **বিদ্ধি** (জানবে) ; **হি** (কারণ) ; **অসন্ন্যস্তসংকল্পো** (সংকল্প ত্যাগ না করলে) ; **কশ্চন** (কেউ) ; **যোগী** (যোগী) ; **ন, ভবতি** (হতে পারে না।)]

হে অর্জুন ! লোকেরা যাকে সন্ন্যাস বলে, তাকেই তুমি যোগ বলে জানবে ; কারণ সংকল্প ত্যাগ না করলে মানুষ কোনো প্রকারেরই যোগী হতে পারে না ॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা—'যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব'—পঞ্চম অধ্যায়ের প্রারম্ভে ভগবান বলেছেন যে, সন্ন্যাস (সাংখ্যযোগ) এবং যোগ (কর্মযোগ)—এই দুটিই স্বতন্ত্রভাবে কল্যাণকারী (৫।২) এবং দুটির ফলও এক (৫।৫) অর্থাৎ সন্ন্যাস এবং যোগ দুটি পৃথক নয়, দুটি একই। ভগবান সেকথাই এখানে বলেছেন যে, সন্ন্যাসী যেমন সর্বতোভাবে ত্যাগী হন, কর্মযোগীও তেমনি সর্বতোভাবে ত্যাগী হন।

অষ্টাদশ অধ্যায়ের নবম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে ফল এবং আসক্তি সর্বতোভাবে ত্যাগ করে শুধুমাত্র কর্তব্য মনে করে নিয়ত কর্ম করাকে 'সাত্ত্বিক ত্যাগ' বলা হয়, যার দ্বারা পদার্থ এবং ক্রিয়া হতে সর্বতোভাবে সম্পর্ক-ছেদ

হয়ে যায় এবং ফলতঃ মানুষ ত্যাগী অর্থাৎ যোগী হয়। এইভাবে সন্ন্যাসীও কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করেন। সুতরাং উভয়েই ত্যাগী। অর্থাৎ যোগী এবং সন্ন্যাসীতে কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্য নেই বলেই ভগবান পঞ্চম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে বলেছেন যে রাগ-দ্বেষ বর্জনকারী যোগীই হলেন 'সন্ন্যাসী'।

'ন হ্যসন্ন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন'—মনে যে সব স্ফুরণ হয় অর্থাৎ নানা ব্যাপার স্মরণে আসে, তার মধ্যে যেটিতে মন আবদ্ধ হয়, যার সঙ্গে প্রিয় বা অপ্রিয় সম্পর্ক স্থাপিত হয়, সেটিকে বলা হয় 'সঙ্কল্প'। এই সঙ্কল্প ত্যাগ না করলে মানুষ যোগী হতে পারে না, সে ভোগীই থেকে যায়। কারণ পরমাত্মার সঙ্গে সম্পর্ককে বলা হয় 'যোগ' আর যার অন্তরে বস্তুর সম্পর্কে আকর্ষণ, প্রিয়তা এবং সুখবুদ্ধি থাকে, সে (অন্তরে ভোগ্য-পদার্থের সঙ্গে সম্পর্ক মেনে নেওয়ায়) 'ভোগী' হয়, যোগী হতে পারে না। সে যোগী তখনই হয়, যখন তার এই সব অনিত্য বস্তুতে আকর্ষণ এবং সুখবুদ্ধি না থাকে এবং তখনই সে সমস্ত সঙ্কল্পের ত্যাগী হয় এবং ভগবানের সঙ্গে তার নিত্য সম্পর্ক অনুভূত হয়।

এখানে **'কশ্চন'** পদের এই অর্থও গ্রহণ করা যায় যে, সঙ্কল্প ত্যাগ না করে মানুষ কোনো প্রকারেরই যোগী অর্থাৎ কর্মযোগী, জ্ঞানযোগী, ভক্তিযোগী, হঠযোগী, লয়যোগী ইত্যাদি হতে পারে না। কারণ তার উৎপন্ন ও বিনাশশীল জড় পদার্থের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে, অতএব তাকে যোগী বলা যায় না। সে ভোগীই থেকে যায়। শুধু মানুষ নয়, পশু-পক্ষীও এরূপ ভোগী হয় ; কারণ তারাও সঙ্কল্প ত্যাগ করেনি।

এর অর্থ হল এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত অসৎ (অনিত্য) বস্তুর সঙ্গে বিন্দুমাত্রও সম্পর্ক থাকবে অর্থাৎ নিজেকে কিছু একটা মনে করবে, ততক্ষণ মানুষ কোনো পথেরই যোগী হতে পারবে না। অর্থাৎ অ-সৎ বস্তুগুলির সঙ্গে সম্বন্ধ বজায় রেখে যত সাধন অভ্যাসই করুক, যতই নির্জনে, গিরিগুহায় বাস করুক, গীতার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাকে যোগী বলা যাবে না।

এইভাবে সন্ন্যাস এবং যোগ-সাধনা ভিন্ন প্রকারের হলেও সঙ্কল্প ত্যাগে দুটি সাধনই এক।

* * *

সম্বন্ধ—পূর্ববর্তী শ্লোকে যে যোগের প্রশংসা করা হয়েছে, পরবর্তী শ্লোকে সেটি লাভের উপায় জানানো হয়েছে।

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥ ৩ ॥

[যোগম্ (যে যোগে) ; আরুরুক্ষোঃ (আরূঢ় হতে ইচ্ছুক, এরূপ) ; মুনেঃ (মননশীল যোগীর পক্ষে) ; কর্ম, কারণম্ (কর্তব্য কর্মকেই কারণ) ; উচ্যতে (বলা হয়) ; তস্য, এব (সেই) ; যোগারূঢ়স্য (যোগারূঢ় মানুষের) ; শমঃ (শান্তিকেই) ; কারণম্ (পরমাত্মপ্রাপ্তির কারণ) ; উচ্যতে (বলা হয়।)]

যোগে আরূঢ় হতে ইচ্ছুক, এরূপ মননশীল যোগীর পক্ষে কর্তব্য-কর্ম করাই হল কারণ এবং সেই যোগারূঢ় মানুষের (শম) শান্তিই হচ্ছে পরমাত্মপ্রাপ্তির কারণ॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা—**'আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে'**—যোগারূঢ় হতে ইচ্ছুক, এরূপ মননশীল যোগীর (যোগারূঢ় হওয়ার উদ্দেশ্যে) নিষ্কামভাবে কর্তব্য-কর্ম করাই হচ্ছে কারণ। তাৎপর্য হল এই যে কর্মের বেগ প্রশমন করার জন্য প্রাপ্ত কর্তব্য-কর্ম করাই হচ্ছে কারণ ; কারণ কোনো ব্যক্তির জন্মানো, লালিত হওয়া এবং জীবিত থাকা অন্যের সাহায্য ছাড়া হওয়া সম্ভব নয়। তার শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি এবং অহংবোধ পর্যন্ত এমন কোনো জিনিস নেই যেটি প্রকৃতির দান নয়। তাই যতক্ষণ সে এইসকল প্রাকৃত পদার্থ জগতের সেবায় নিয়োগ না করে, ততক্ষণ সে যোগারূঢ় হতে পারে না অর্থাৎ সমত্বে স্থিত হতে পারে না। কারণ প্রাকৃত বস্তুমাত্রেরই জগতের সঙ্গে ঐক্য আছে, নিজের (স্বয়ং-এর) সঙ্গে নয়।

প্রাকৃত পদার্থে যে নিজস্বভাব দেখা যায় তার অর্থ হল এই যে, আমাদের সেগুলি শুধু অপরের হিতে নিয়োগ করার দায়িত্ব রয়েছে। সুতরাং ওই সব পদার্থ অপরের

সেবায় নিয়োগ করার ইচ্ছা জাগলে সমস্ত ক্রিয়া-প্রবাহ জগৎমুখী হয় এবং তিনি স্বয়ং যোগারূঢ় হন। ভগবান অন্যত্র এই কথাই অম্বয়-ব্যতিরেক রীতিতে জানিয়েছেন যে, যজ্ঞার্থে অর্থাৎ অপরের হিতার্থে যাঁরা কর্ম করেন তাঁদের সম্পূর্ণ কর্ম লয় হয়ে যায় অর্থাৎ তা বন্ধনের কারণ হয় না (গীতা ৪।২৩) এবং যজ্ঞ ছাড়া অন্য কর্ম অর্থাৎ নিজের জন্য কর্ম করলে তা বন্ধনকারক হয় (গীতা ৩।৯)।

কর্ম কেন যোগারূঢ় হওয়ার কারণ হয় ? কারণ, ফল প্রাপ্তিতে আমাদের সমতা আছে কি, নেই, আমাদের ওপর এর কী প্রভাব পড়ে—তা তখনই বোঝা যাবে যখন আমরা কর্ম করবো। সমতার পরিচয় কর্ম করাকালেই প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ কর্ম করার সময়ে যদি আমাদের মধ্যে সমত্বের ভাব থাকে, অনুরাগ বা বিদ্বেষ না হয়, তাহলে ঠিক আছে ; সেই কর্ম তখন 'যোগে'র কারণ হয়ে যায়। কিন্তু যদি আমাদের মধ্যে সমত্ব না থাকে, অনুরাগ বা বিদ্বেষ উৎপন্ন হয় ; তাহলে জড়ত্বের সঙ্গে সম্পর্ক হওয়ায় সেই কর্ম 'যোগে'র কারণ হয় না।

'যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে'—অসতের (অনিত্যের) সঙ্গে সম্পর্ক রাখলেই অশান্তি উৎপন্ন হয়। এর কারণ হল এই যে, অসৎ-পদার্থের (শরীরাদির) সঙ্গে স্বয়ং-এর সম্বন্ধ একবারের জন্যও হতে পারে না বা থাকতেও পারে না। কারণ স্বয়ং সর্বদা বিরাজমান এবং শরীরাদি পদার্থমাত্রই প্রতিমুহূর্তে লয়ের দিকে যাচ্ছে। প্রতিমুহূর্তে বিনাশের দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে এরূপ অনিত্যের সঙ্গে স্বয়ং তার সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়, এটিকে স্থায়ী রাখতে চায়। কিন্তু এই সম্পর্ক স্থায়ী হয় না। তাই সেটি হারাবার ভয় এবং হারিয়ে যাওয়াতে অশান্তি উৎপন্ন হয়। যখন শরীরাদি অনিত্য বস্তুগুলি জগতের সেবায় নিযুক্ত করে তার থেকে নিজ সম্পর্ক চিরকালের মতো ছেদ করা হয় তখন অনিত্য বস্তু ত্যাগে স্বাভাবিকভাবে শান্তি পাওয়া যায়। কিন্তু সাধক যদি সেই শান্তি থেকেই সুখ আহরণ করতে থাকেন তাহলে তিনি তাতেই আটকে পড়েন। যদি তিনি ওই শান্তিতে অনুরাগ বা সুখ বোধ না করেন তবে ওই শান্তি পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তির কারণ হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব—যোগারূঢ় হতে ইচ্ছুক যোগীর পক্ষে যোগারূঢ় হওয়ার জন্য নিষ্কাম ভাবে কর্ম করাই হল কারণ এবং তার থেকে প্রাপ্ত শান্তি হল পরমাত্মপ্রাপ্তির কারণ। তাৎপর্য হল যে পরমাত্মপ্রাপ্তিতে কর্ম কারণ নয়, সম্পর্ক ছেদ থেকে যে শান্তিলাভ হয়, তাই-ই হল প্রকৃত কারণ। এই শান্তি হল সাধন, সিদ্ধি নয়।

বিবেচনা সহকারে কর্ম করলেই কর্মের বেগ প্রশমিত হয়, কেন-না এই বেগ প্রশমনের শক্তি কর্মে নেই, তা আছে বিচার-বিবেচনাতে। যার যোগারূঢ় হবার আকাঙ্ক্ষা থাকে, সে সকল কর্মই বিবেচনা সহকারে করে থাকে। বিবেক বুদ্ধি তখনই বিকাশলাভ করে, যখন সাধক বা যোগী কামনা পূর্তিতে পরাধীনতা ও অপূর্তিতে অভাব অনুভব করে। পরাধীনতা এবং অভাব কেউই চায় না। কিন্তু কামনা করলে এই দুটি দূর হয় না।

যোগারূঢ় অবস্থাতে সন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়, কেন-না সন্তুষ্ট হলে যোগী ওই স্থানেই থেমে যাবেন, তাতে পরমাত্মপ্রাপ্তিতে অনেক সময় লেগে যায় (গীতা ১৪।৬)। যেমন,শিশুর প্রথমে খেলার ওপর ঝোঁক থাকে। কিন্তু পরে যখন সে বড় হয় তখন তার ঝোঁক টাকার দিকে যায় এবং খেলার আগ্রহ আপনিই দূর হয়। তেমনই যতক্ষণ পরমাত্ম-প্রাপ্তির অনুভব না হয় ততক্ষণ এই শান্তিতে আগ্রহ থাকে অর্থাৎ শান্তিকেই অতি উত্তম বলে মনে হয়। কিন্তু যদি এই শান্তি উপভোগ না করে তা থেকে বিরত থাকা যায় তাহলে সেই আগ্রহ আপনিই দূর হয়ে শীঘ্রই পরমাত্মাপ্রাপ্তি অনুভূত হয়।

যোগারূঢ় হওয়াতে কর্ম করাই হল কারণ, অর্থাৎ নিঃস্বার্থভাবে অপরের হিতার্থে কর্ম করতে করতে যখন সব কিছুরই বিয়োগ হয়, তখনই সাধক যোগারূঢ় হন। কর্মের সমাপ্তি হয় আর যোগ নিত্য স্থায়ী হয়।

কর্মী (ভোগী) কর্ম করে আর কর্মযোগীও কর্ম করে, কিন্তু এদের দুজনের উদ্দেশ্যে মস্ত বড় পার্থক্য থাকে। একজন আসক্তি পূরণের উদ্দেশ্যে অথবা কামনা পূর্তির জন্য কর্ম করে আর অপরজন আসক্তি ত্যাগ করার জন্য কর্ম করে। ভোগী কর্ম করে নিজের জন্য আর কর্মযোগী করে অপরের জন্য। সুতরাং কর্ম একপ্রকার হলেও যে আসক্তি ত্যাগ করে অন্যের উদ্দেশ্যে কর্ম করে, সে যোগী (যোগারূঢ়) হয়। কর্ম দ্বারাই যোগীকে চেনা যায়। নচেৎ **'বৃদ্ধা নারী পতিব্রতা'** !

এইস্থানে যাকে 'শম' (শান্তি) নামে অভিহিত করা হয়েছে, দ্বিতীয় অধ্যায়ের চৌষট্টিতম শ্লোকে তাকেই 'প্রসাদ'

(অন্তরের প্রসন্নতা) বলা হয়েছে। এই শান্তিকে উপভোগ না করলে **'নির্বাণপরমা শান্তি'** লাভ হয় (গীতা ৬।১৫)। ত্যাগের দ্বারা শান্তিলাভ করা যায় (গীতা ১২।১২)। শান্তি উপভোগ না করলে অখণ্ডরস (তত্ত্বজ্ঞান) প্রাপ্তি হয়। আবার এই অখণ্ডরসেও সন্তুষ্ট না হলে অনন্তরস (পরমপ্রেম) লাভ হয়।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—যোগারূঢ় কে হতে পারে—পরবর্তী শ্লোকে তার উত্তর দিয়েছেন।

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্মস্বনুষজ্জতে।
সর্বসংকল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে॥ ৪ ॥

[হি (কেননা) ; যদা (যখন) ; ন (না) ; ইন্দ্রিয়ার্থেষু (ইন্দ্রিয় ভোগে) ; কর্মসু (কর্মে) ; ন, অনুষজ্জতে (আসক্ত হয় না) ; তদা (তখন) ; সর্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী (সর্বসঙ্কল্পত্যাগী ব্যক্তিকে) ; যোগারূঢ়ঃ (যোগারূঢ়) ; উচ্যতে (বলে অভিহিত করা হয়।)]

তিনি যখন ইন্দ্রিয় ভোগ বা কর্মে আসক্ত হন না, তখন সেই সর্বসংকল্পত্যাগী ব্যক্তিকে যোগারূঢ় বলে অভিহিত করা হয় ॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা—'যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু (অনুষজ্জতে)'—সাধক ইন্দ্রিয়াদিতে অর্থাৎ প্রারব্ধ অনুসারে প্রাপ্ত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—এই পাঁচটি বিষয়ে, অনুকূল বস্তু, ব্যক্তি, পরিস্থিতি, ঘটনাদি এবং দেহের আরাম, মান, অহংকার ইত্যাদিতে আসক্তি না করেন, ভোগবুদ্ধি নিয়ে যেন এগুলি ভোগ না করেন, সন্তুষ্ট না হন, বরং এটি অনুভব করতে থাকেন যে এই সমস্ত বিষয়, বস্তু ইত্যাদি আসে এবং যায়। এগুলি অনিত্য, তাহলে এতে সন্তুষ্টির কী আছে—এই ভেবে নির্লিপ্ত থাকেন।

ইন্দ্রিয়গুলির ভোগে আসক্ত না হবার উপায় হল ইচ্ছাপূরণ থেকে সুখ গ্রহণ না করা। যেমন, কোনো মনোগ্রাহী কথা শোনা গেল ; পছন্দ অনুযায়ী বস্তু, ব্যক্তি, পরিস্থিতি, ঘটনা ঘটল এবং যা বাঞ্ছিত নয় তা থাকল না, তাতে মানুষ প্রসন্ন হয় এবং তার থেকে সুখগ্রহণ করে। সুখগ্রহণ করলে মানুষের ইন্দ্রিয়ভোগে আসক্তি বৃদ্ধি পায়। সুতরাং সাধকের উচিত অনুকূল বস্তু, পদার্থ, ব্যক্তি ইত্যাদি পাবার আশা না করা এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে অনুকূল বস্তুসমূহ যদি পাওয়া যায়, তাতে প্রসন্ন না হওয়া। এরূপ হলে ইন্দ্রিয়ভোগে আসক্তি আসে না।

দ্বিতীয়তঃ, মানুষের অনুকূল জিনিস না থাকলে সে সেই বস্তুটির প্রয়োজন অনুভব করে, আর যখন সেটি প্রাপ্ত হয় তখন সে তার অধীন হয়ে যায়। যে সময় ওই বস্তুটির প্রয়োজন অনুভব করেছিল তখনও সে পরাধীন ছিল, আবার এটি পাওয়াতেও 'এটি না হারিয়ে যায়'— এই ভেবে সেই বস্তুর পরাধীন হয়ে যায়। সুতরাং পদার্থগুলি পাওয়া এবং না পাওয়ার পার্থক্য এইটুকু থাকে যে, জিনিসটি পাওয়া না গেলে সেটির অভাব অনুভব হয়, আর পাওয়া গেলে পরাধীনতা বোঝা না গেলেও, তাতে তাকে স্বাধীন বলে মনে হলেও—এটি আসলে তার মনের ভ্রম ছাড়া কিছু নয়। যেমন কেউ কারো সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তেমনি অনুকূল পরিস্থিতিতে সন্তুষ্ট হওয়ার অর্থ হল নিজের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা। কারণ সে তখন অনুকূল পরিস্থিতির অধীন হয়ে যায়, যেটি পেতে থাকলে তার স্বভাব খারাপ হতে থাকে এবং বারংবার সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা জাগতে থাকে। এই সুখভোগের কামনাই তার জন্ম-মৃত্যুর কারণ হয় । তাৎপর্য হল এই যে, অনুকূলতার আকাঙ্ক্ষা করা, আশা করা এবং অনুকূল বিষয়ে সন্তুষ্ট হওয়া—এগুলি হল সমস্ত অনর্থের মূল। এতে অনর্থ এবং পাপের শেষ থাকে না। এটি ত্যাগ করলে মানুষ যোগারূঢ় হয়।

তৃতীয়তঃ, জীবন নির্বাহের অতিরিক্ত যে সমস্ত অনুকূল ভোগ্যবস্তু আমাদের কাছে থাকে, সেগুলি আমাদের নয়। সেগুলি কার, তা আমাদের জানা নেই। যখন কোনো অভাবগ্রস্ত প্রাণী আমাদের গোচরে আসে, সেই সামগ্রীগুলিকে তার মনে করে তাকেই দেওয়া উচিত [এটি তোমারই ছিল—মুখের উপর এরূপ বলা ঠিক নয়] । তাকে প্রদান করে মনে করতে হয় যে জীবন নির্বাহের অতিরিক্ত যে বস্তু আমার কাছে ছিল, সেই ঋণ থেকে আমি মুক্ত

হলাম। এর অর্থ হল এই যে, জীবন নির্বাহের অতিরিক্ত বস্তুগুলিকে নিজের বা নিজের জন্য মনে না করলে ভোগে মানুষের আসক্তি হয় না।

'ন কর্মস্বনুষজ্জতে'[১]—ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে যেমন আসক্ত হওয়া উচিত নয়, তেমনি কর্মেও আসক্ত হওয়া উচিত নয় অর্থাৎ ক্রিয়মাণ কর্মের পূর্তি-অপূর্তিতে এবং সেই কর্মের তাৎকালিক ফলের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিতেও আসক্তি থাকা উচিত নয়। কারণ, কর্ম করলে কর্মের প্রতি অনুরাগ উৎপন্ন হয়। তাতে একপ্রকার সুখবোধ হয়। আর কর্ম ঠিকমতো অনুষ্ঠিত না হলে তাতে মনে দুঃখবোধ জন্মায়। এই সুখ-দুঃখ বোধই হল কর্মের আসক্তি। সুতরাং সাধকের বিধিপূর্বক তৎপরতার সঙ্গে কর্ম করা উচিত হলেও তাতে আসক্ত না হয়ে সাবধানতার সঙ্গে নির্লিপ্ত হতে হবে যে, এই কর্মগুলি আসে এবং যায় আর আমি নিত্য-নিরন্তর স্থিতিশীল, সুতরাং এই কর্মগুলি হওয়া বা না হওয়া এবং এর আসা-যাওয়াতে আমার কী যায় আসে ?

কর্মে আসক্তি কীভাবে জানা যায় ? ক্রিয়মাণ (বর্তমানে করতে থাকা) কর্মের পূর্তি-অপূর্তি আর তার থেকে পাওয়া ফলের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিতে অর্থাৎ সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে মানুষ যদি নির্বিকার না থাকতে পারে, অর্থাৎ তার অন্তরে হর্ষ-শোক ইত্যাদি বিকার দেখা দেয়, তবে বুঝতে হবে তার কর্মে এবং তাৎক্ষণিক ফলে আসক্তি রয়েছে।

ইন্দ্রিয়ের এবং কর্মে আসক্ত না হওয়ার তাৎপর্য হল এই যে, স্বয়ং (স্বরূপ) চিন্ময় পরমাত্মার অংশ হওয়ায় নিত্য অপরিবর্তনশীল এবং পদার্থ ও ক্রিয়াগুলি প্রকৃতির কার্য হওয়ায় নিত্য-নিরন্তর পরিবর্তনশীল। কিন্তু যখন স্বয়ং ওই পরিবর্তনশীল পদার্থ এবং ক্রিয়াগুলিতে আসক্ত হন, তখন তিনি ওগুলির অধীন হয়ে যান এবং বারংবার জন্ম-মৃত্যুরূপ মহাদুঃখ সহ্য করতে থাকেন। ওই পদার্থ এবং ক্রিয়াগুলি হতে অর্থাৎ প্রকৃতি থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হওয়ার জন্য ভগবান দুটি পথ বলেছেন, ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপারে অর্থাৎ পদার্থগুলিতে আসক্তি না করা এবং কর্মে (ক্রিয়াদিতে) আসক্তি না রাখা। এরূপ করলেই মানুষ যোগারূঢ় হয়।

এখানে একটি উপলব্ধির ব্যাপার হল এই যে, ক্রিয়াগুলির ওপর ভালোবাসা সাধারণতঃ ফলকে ধরেই হয় এবং ফল হল ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য। সুতরাং ইন্দ্রিয়াদির ভোগের আসক্তি যদি সর্বতোভাবে দূর হয় তাহলে ক্রিয়ার আসক্তিও দূর হয়। তা সত্ত্বেও ভগবান পৃথকভাবে ক্রিয়াগুলির আসক্তি দূর করার কথা কেন বলেছেন ? তার কারণ হল এই যে, ক্রিয়ার প্রতি একটা স্বাভাবিক আসক্তি থাকে। ফলেচ্ছা না থাকলেও মানুষের কর্ম করার একটি প্রবণতা থাকে। এই প্রবণতাই হল ক্রিয়ার আসক্তি যার জন্য মানুষ কিছু না করে থাকতে পারে না, কিছু না কিছু কাজ সে করতেই থাকে। অন্যের জন্য কর্ম করলে অথবা ভগবানের জন্য কর্ম করলে তবেই এই আসক্তি দূর হয়। সেইজন্য ভগবান দ্বাদশ অধ্যায়ে প্রথমে অভ্যাসযোগ সম্বন্ধে বলেছেন। কিন্তু অন্তরে কর্মের প্রবণতা থাকলে অভ্যাসে মন লাগে না। সুতরাং কর্ম-প্রবণতা দূর করার জন্য দশম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, 'সাধক যেন আমার জন্যই কেবল কর্ম করে' (১২।১০)। তাৎপর্য হল পারমার্থিক কার্য ইত্যাদিতে যাঁর মন লাগে না এবং অন্তরে কর্ম করার আসক্তি থাকে, সেই ভক্তিযোগের সাধক যেন কেবল ভগবানের জন্যই কর্ম করেন, এতে তাঁর আসক্তি দূর হবে। এইরূপ কর্মযোগী সাধক শুধু জগতের হিতার্থেই যেন কর্ম করেন, তাহলে তাঁর কর্ম করার প্রবণতা (আসক্তি) দূর হয়ে যাবে।

কর্ম করার আসক্তি যেমন হয়, তেমনি কর্ম না-করার আসক্তিও হয়। কর্ম না-করার আসক্তিও হওয়া উচিত নয়। কারণ কর্ম না-করার আসক্তি থেকে আলস্য এবং প্রমাদ উৎপন্ন হয়, যেটি হল তামসিক বৃত্তি এবং কর্ম করার আসক্তি ব্যর্থ চেষ্টায় ব্যাপৃত হয়, যেটিকে বলা হয় রাজসিক বৃত্তি।

সাধক কতদিনে, কত মাসে অথবা কত বছরে যোগারূঢ় হতে সক্ষম ? তার জন্য ভগবান 'যদা' এবং 'তদা' পদটি দিয়ে জানাচ্ছেন যে, যখনই মানুষ ইন্দ্রিয়াদি এবং ক্রিয়াগুলি হতে সর্বতোভাবে আসক্তি রহিত হয় তখনই সে যোগারূঢ় হতে সক্ষম। যেমন, যদি কেউ স্থির করে যে,

[১]'কর্মসু' পদটি এইস্থানে বহুবচনে ব্যবহৃত হয়েছে, যার তাৎপর্য হল এই যে, আসক্ত ব্যক্তির একাধিক কর্ম এবং সেইগুলিতে ফলের আশা থাকে। কিন্তু অষ্টাদশ অধ্যায়ের পঁয়তাল্লিশতম শ্লোকে 'কর্মণি' পদটি একবচন দেওয়া হয়েছে, যার তাৎপর্য হল যে, আসক্তিরহিত ব্যক্তি অনেক কর্ম করলেও তাতে কর্তব্যবুদ্ধি অভিন্নই থাকে।

'আজ থেকে আর কখনও ইচ্ছাপূরণের সুখ গ্রহণ করব না' এবং সে তার এই সিদ্ধান্তে (প্রতিজ্ঞায়) দৃঢ় থাকে, তাহলে সে তখনই যোগারূঢ় হতে সক্ষম হয়। এটি জানাবার জন্যই ভগবান 'যদা' এবং 'তদা' পদটির সঙ্গে 'হি' পদটি যোগ করেছেন।

পদার্থ এবং ক্রিয়াগুলিতে আসক্তি করা বা না করায় ভগবান প্রত্যেক মানুষকেই এই স্বাধীনতা দিয়েছেন যে, তুমি সাক্ষাৎ আমার অংশ এবং এই সমস্ত পদার্থ ও ক্রিয়া হল প্রকৃতিজনিত। এর মধ্যে পদার্থগুলি হল উৎপত্তি-বিনাশশীল এবং ক্রিয়াগুলির আরম্ভ ও শেষ আছে। সুতরাং এগুলি নিত্য স্থায়ী নয় আর তুমি নিত্য স্থিতিশীল। তুমি নিত্য হয়েও অনিত্যে আবদ্ধ হও, অনিত্যেই আসক্তি এবং প্রীতি কর। এতে তোমার কিছু লাভ হয় না শুধু দুঃখই পেতে থাকো। সুতরাং তুমি এখনই ঠিক করে নাও যে তোমার প্রাপ্ত পদার্থ বা ক্রিয়াগুলি থেকে সুখ গ্রহণ করবে না। তাহলে তুমি এখনই যোগারূঢ় হতে পারবে। কারণ যোগ অর্থাৎ সমত্ব-বোধ তোমার নিজেরই জিনিস। সমত্ব হল তোমার স্বরূপ এবং স্বরূপ হল সৎ (নিত্য)। সৎ-এর কখনো অনস্তিত্ব হয় না এবং অসৎ-এর কখনো স্থিতি হয় না। এরূপ সৎ-স্বরূপ তুমি অসৎ পদার্থ এবং ক্রিয়াগুলিতে আসক্ত হয়ো না ; তাহলেই তুমি স্বতঃ স্বাভাবিক যোগারূঢ় অবস্থা অনুভব করতে পারবে।

'সর্বসংকল্পসন্ন্যাসী'—আমাদের মনে যত স্ফুরণ হতে থাকে, তার মধ্যে যেটিতে আমাদের সুখ অনুভূত হয় এবং যেটিকে নিয়ে মনে চিন্তা হতে থাকে যে, 'আমি যদি এটি পেতাম ; তাহলে আমি খুব সুখী হতে পারতাম' এইরূপ স্ফুরণে লিপ্ত হলে তাকে বলা হয় 'সংকল্প'। সংকল্প অনুকূল এবং প্রতিকূল অবস্থার কারণে সুখ বা দুঃখদায়ক হয়। যেমন সুখদায়ক সংকল্পে লিপ্ততা (অনুরাগ বা বিদ্বেষ) আসে, তেমনি দুঃখদায়ক সংকল্পেও লিপ্ততা আসে। অতএব দুটি সংকল্পই বন্ধনকারক হয়। এতে ক্ষতি ছাড়া লাভ হয় না। কারণ সংকল্প নিজ স্বরূপ বোধ হতে তো সাহায্য করেই না বা অন্যের সেবা করতেও দেয় না, ভগবানে প্রীতি জন্মাতে দেয় না এবং ভগবানে মনোনিবেশ করতেও দেয় না বা নিজ নিকট আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্কিত হতেও সাহায্য করে না। এর তাৎপর্য হল এই যে, নিজে সংকল্প ধরে থাকলে, নিজের কল্যাণ তো হয়ই না, জগৎ-সংসারের কল্যাণও হয় না, আত্মীয়দের কোনো সেবা করাও হয় না, ভগবদ্প্রাপ্তিও হয় না এবং নিজ স্বরূপ বোধও হয় না। এর দ্বারা শুধু ক্ষতিই হয়। এটি বুঝে সাধককে সমস্ত সংকল্প রহিত হতে হয়, যেটি প্রকৃতপক্ষে সত্যই।

মনে উঠতে থাকা স্ফুরণ যদি সংকল্পের রূপ না ধারণ করে, তবে সেগুলি আপনিই নষ্ট হয়ে যায়। স্ফুরণ হলে মানুষের তত ক্ষতি বা পতন হয় না ; কিন্তু এতে সময় তো নষ্ট হয়ই। সুতরাং এই স্ফুরণগুলিও ত্যাজ্য। সাধকের সংকল্প অবশ্যই ত্যাগ করা উচিত। কারণ সংকল্প ত্যাগ না করে অর্থাৎ মনকে দূরে না সরালে সাধক যোগারূঢ় হতে পারেন না এবং যোগারূঢ় না হলে পরমাত্মাকে লাভ করা যায় না, কৃতকৃত্য হওয়া যায় না, মনুষ্যজন্ম সার্থক হয় না, ভগবানে প্রীতি জন্মায় না, দুঃখের অন্ত হয় না।

দ্বিতীয় শ্লোকে ভগবান ব্যতিরেক রীতিতে বলেছেন যে, সংকল্প ত্যাগ না করে মানুষ কোনোভাবেই যোগী হতে পারে না। আবার এখানে অন্বয়-রীতির দ্বারা বলেছেন যে, সংকল্প ত্যাগ করলে মানুষ যোগারূঢ় হয়। এর তাৎপর্য হল যে, সাধকের কোনো প্রকারেরই সংকল্প রাখা উচিত নয়।

সংকল্প ত্যাগের উপায়—(১) ভগবান নিজের দিক থেকে আমাদের শেষ জন্ম মনুষ্যরূপে করেছেন, যাতে আমরা নিজেদের উদ্ধার করতে সক্ষম হই। সুতরাং এই অমূল্য, মুক্তিদায়ক মনুষ্যজন্মকে আমাদের নিরর্থক কাজে নষ্ট করা উচিত নয়—এরূপ চিন্তা করে সংকল্প ত্যাগ করতে হবে।

(২) কর্মযোগের সাধক নিজের কর্তব্য পালন করে। কর্তব্যের সম্বন্ধ থাকে বর্তমানের সঙ্গে, অতীত বা ভবিষ্যতের সঙ্গে নয়। কিন্তু সংকল্প-বিকল্প অতীত-ভবিষ্যৎ কাল নিয়ে হয়, বর্তমান নিয়ে নয়। তাই সাধকের নিজ কর্তব্য ত্যাগ করে অতীত ভবিষ্যৎ কালের সংকল্প-বিকল্পের মধ্যে আবদ্ধ হওয়া উচিত নয়, বরং আসক্তি রহিত হয়ে কর্তব্য-কর্মে ব্যাপৃত থাকা প্রয়োজন (গীতা ৩।১৯)।

(৩) জ্ঞানযোগের সাধককে এরূপ দৃঢ় নিশ্চয় হতে হয় যে প্রকৃতপক্ষে সত্তা একমাত্র পরমাত্মার রয়েছে। সংকল্প কিংবা সংসারের বাস্তবে কোনো সত্তা নেই। অতএব যদি কখনো কোনো সংকল্প জাগে তাহলে তাতে নিরপেক্ষ

থাকতে হবে। ওতে আসক্তি কিংবা বিদ্বেষ করবে না।

(৪) ভক্তিযোগের সাধককে চিন্তা করে বুঝতে হয় যে, মনে যত সংকল্প আসে, তা সবই প্রায় অতীত কালকে নিয়ে, যা এখন নেই। অথবা ভবিষ্যতের জন্য আসে, যেটি পরে হতে পারে অর্থাৎ এখন নেই। অতএব যা এখন নেই, তার চিন্তায় সময় নষ্ট করা আর যে ভগবান এখন আছেন, নিজের মধ্যে আছেন, আমাদের নিজের, তাঁর চিন্তা না করা—এ কত বড় ভুল! এরূপ ভাবনা-চিন্তা করে সংকল্পকে দূর করতে হয়।

'যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে'—সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সম থাকার নামই হল 'যোগ' (গীতা ২।৪৮)। এই যোগ অর্থাৎ সমত্বে আরূঢ় হওয়া, স্থিত হওয়াকেই বলা হয় যোগারূঢ় হওয়া। যোগারূঢ় হলে পরমাত্মা প্রাপ্তি হয়।

দ্বিতীয় শ্লোকে ভগবান বলেছিলেন যে, সংকল্প ত্যাগ না করলে কোনো যোগই সিদ্ধ হয় না এবং এখানে বলেছেন যে সম্পূর্ণভাবে সংকল্প ত্যাগ করলে তবেই সে যোগারূঢ় হয়। এতে সিদ্ধ হয় যে সর্বপ্রকারের যোগেই যোগারূঢ় অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। যদিও এইস্থানে কর্মযোগের প্রকরণই রয়েছে, কিন্তু সংকল্প ত্যাগ করলে যোগারূঢ় অবস্থায় সবই এক হয়ে যায় (গীতা ৫।৫)।

পরিশিষ্ট-ভাব—যোগারূঢ়কে কীভাবে চেনা যায়? এখানে সেই সম্পর্কে তিনটি কথা বলা হয়েছে—পদার্থের (বস্তু এবং ব্যক্তির) প্রতি আসক্ত না হওয়া, ক্রিয়াদিতে আসক্ত না হওয়া এবং সমস্ত সংকল্প অর্থাৎ মনোবাঞ্ছা ত্যাগ করা। তাৎপর্য হল যে ইন্দ্রিয়াদির ভোগাদিতে এবং ক্রিয়াতে যেন আসক্তি না হয় এবং মনের মধ্যে এই ইচ্ছা যেন না থাকে যে এটা হওয়া উচিত অথবা ওটি হওয়া উচিত নয়। যাঁর পদার্থ থাকায় বা না থাকায় কোনো আসক্তি নেই, ক্রিয়াদি থাকায় বা না থাকায় কোনো আসক্তি নেই এবং কোনো প্রকার সংকল্প নেই, তিনিই 'যোগারূঢ়'। অর্থাৎ পদার্থ পাওয়া যাক বা না যাক, ব্যক্তি থাকুক বা না থাকুক, ক্রিয়াদি হোক বা না হোক—এসবে কোনো আগ্রহ থাকা উচিত নয় (গীতা ৩।১৮)।

সাধকের চিন্তা করে দেখা উচিত, এমন কোন্ বস্তু আছে যা সর্বদা আমাদের কাছে থাকবে আর আমরাও সর্বদা তার কাছে থাকব? এমন কোন্ ব্যক্তি আছেন যিনি সর্বদা আমাদের সঙ্গে থাকবেন আর আমরাও সর্বদা তাঁর সঙ্গে থাকব? এমন কোন্ ক্রিয়া আছে যা আমরা সর্বদা করতে পারব এবং যা সর্বদা আমাদের দ্বারা হতে থাকবে? কোনো বস্তুই সর্বকালের জন্য আমাদের সঙ্গে থাকে না, কোনো ব্যক্তি এবং ক্রিয়াও থাকে না। একদিন আমাদের বস্তু, ব্যক্তি এবং ক্রিয়া থেকে পৃথক হতেই হবে। আমরা যদি এখনই তাদের থেকে পৃথকত্ব স্বীকার করে নিই, তাদের সঙ্গ ত্যাগ করি তাহলে জীবন্মুক্তি স্বতঃসিদ্ধ হয়ে যায়। তাৎপর্য হল যে বস্তু, ব্যক্তি ও ক্রিয়াদির সংযোগ অনিত্য কিন্তু বিয়োগ নিত্য। নিত্যকে স্বীকার করলে নিত্য তত্ত্ব প্রাপ্তি হয় এবং কোনো কিছুর অভাব আর থাকে না।

ইন্দ্রিয়াদির ভোগ এবং কর্মে আসক্ত না হওয়ার অর্থ হল—কামনা রহিত এবং কর্তৃত্ব রহিত হওয়া। ইন্দ্রিয়াদির ভোগে, পদার্থে আসক্ত না হলে সাধক কামনারহিত হন এবং ক্রিয়াদিতে আসক্ত না হলে কর্তৃত্বরহিত হন। কামনারহিত এবং কর্তৃত্বরহিত হলে স্বরূপে স্বতঃই স্থিতিলাভ হয়। বাস্তবে নতুন করে স্থিতিলাভ হয় না, স্থিতি স্বতঃই রয়েছে। কিন্তু কামনাশূন্য ও কর্তৃত্বশূন্য না হলে সেই স্থিতি অনুভূত হয় না। কামনা ও কর্তৃত্বের সর্বতোভাবে ত্যাগ হলে স্বরূপে স্বতঃসিদ্ধির স্থিতি অনুভূত হয়।

লেখার সময় যেমন কলম কাজে লাগে আর লেখার কাজ সম্পূর্ণ হলে কলম যেমনকার তেমন রেখে দেওয়া হয় তেমনই সাধক কাজের সময় তাঁর শরীরকে কাজে ব্যবহার করবেন এবং কাজটি সম্পূর্ণ হলে তার সঙ্গ রহিত হবেন, তাহলে প্রত্যেকটি ক্রিয়ার পরেই তাঁর যোগে (সমত্বে) স্থিতিলাভ হয়। ক্রিয়া থেকে যদি সর্বতোভাবে সম্পর্ক ছিন্ন হয় তাহলে তিনি যোগারূঢ় হন।

ক্রিয়া (ভোগ) এবং পদার্থের (ঐশ্বর্যের) আসক্তি থেকেই পতন হয় (গীতা ২।৪৪)। তাই ক্রিয়াতেও আসক্ত হতে নেই এবং তার ফলেও আসক্তি থাকা উচিত নয় (গীতা ২।৪৭, ৫।১২)। সংকল্পজনিত সুখের ভোগও যেন না হয় অর্থাৎ সংকল্পপূর্তির সুখও নেওয়া উচিত নয়। নিজ মুক্তির ইচ্ছাও যেন না থাকে, কারণ মুক্তির ইচ্ছাতে বন্ধনের সত্তা দৃঢ় হয়। সুতরাং কোনো সংকল্প বা ইচ্ছা না রেখে উদাসীন থাকা উচিত।

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকটিতে ভগবান যোগারূঢ় মানুষের লক্ষণ জানাতে গিয়ে 'যদা' এবং 'তদা' পদের দ্বারা যোগারূঢ় হওয়াতে অর্থাৎ নিজেকে উদ্ধার করতে মানুষ যে স্বাধীন তা জানিয়েছেন। পরবর্তী শ্লোকে ভগবান প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার উদ্ধারের জন্য প্রেরণা দিয়েছেন।

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥ ৫ ॥

[আত্মনা (নিজের দ্বারা) ; আত্মানম্, উদ্ধরেৎ (নিজেকে উদ্ধার করতে হবে) ; আত্মানম্ (নিজের) ; ন, অবসাদয়েৎ (পতন যেন না করা হয়) ; হি (কারণ) ; আত্মা, এব (নিজেই) ; আত্মনঃ, বন্ধুঃ (নিজের বন্ধু) ; আত্মা, এব (নিজেই) ; আত্মনঃ, রিপুঃ (নিজের শত্রু।)]

নিজের দ্বারা নিজেকে উদ্ধার করতে হবে, নিজের পতন যেন না করা হয় ; কারণ নিজেই নিজের বন্ধু এবং নিজেই নিজের শত্রু ॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা—'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং'—নিজের দ্বারা নিজের উদ্ধার করতে হবে—এর তাৎপর্য হল এই যে শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, প্রাণ ইত্যাদির প্রভাব থেকে নিজেই নিজেকে মুক্ত করতে হবে। নিজ স্বরূপে যে একদেশীয় 'আমি' ভাব দেখা যায়, তার থেকেও নিজেকে মুক্ত করতে হবে। কারণ, শরীর, ইন্দ্রিয়াদি এবং 'অহং'ভাব—এইগুলি সবই প্রকৃতির ব্যাপার ; নিজের স্বরূপ নয়। যেটি নিজের স্বরূপ নয়, তার থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হয়।

নিজ স্বরূপ পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্ন এবং শরীর, ইন্দ্রিয়াদি এবং 'আমি' ভাব প্রকৃতির সঙ্গে অভিন্ন। যদি নিজের উদ্ধারের জন্য, নিজেকে এর প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদির আশ্রিত থাকা হয় তবে জড়ত্ব ত্যাগ হবে কীভাবে ? কারণ জড় বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা, তার প্রয়োজনীয়তা মেনে নেওয়া, তার সাহায্য নেওয়াই হল প্রকৃত বন্ধন। যেটি নিজের, নিজের মধ্যে আছে, এখন আছে এবং এখানেই আছে, সেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করার জন্য শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন বা বুদ্ধির কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ অসতের দ্বারা সৎ-কে লাভ করা যায় না, বরং অসৎ ত্যাগেই সৎ-প্রাপ্তি হয়।

দ্বিতীয় ভাব, যেটি আগের শ্লোকে বলা হয়েছে যে, প্রাকৃত পদার্থ, ক্রিয়া এবং সংকল্পে আসক্ত না হওয়া, তাতে আবদ্ধ না হওয়া, বরং তার থেকে নিজেকে মুক্ত করা। সকলেরই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এই যে, পদার্থ, ক্রিয়া এবং সংকল্পের আরম্ভ এবং শেষ থাকে, সেগুলি সংযুক্ত ও বিযুক্ত হয়, কিন্তু নিজের (স্বয়ং-এর) অনস্তিত্ব এবং পরিবর্তন কখনো কারো অনুভূত হয় না। স্বয়ং সর্বদা একরূপে বিরাজমান। সুতরাং উৎপত্তি ও বিনাশশীল পদার্থ ইত্যাদিতে আবদ্ধ না হওয়া, তার অধীন না হওয়া এবং সেগুলিতে নির্লিপ্ত থাকাই হল নিজের উদ্ধার করা।

প্রত্যেক মানুষেরই এমন বিচারশক্তি রয়েছে—সেটি কার্যকরী করলে সে নিজেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। 'জ্ঞানযোগে'র সাধক সেই বিচারশক্তির দ্বারা জড়-চেতনকে পৃথক করে চেতনে (নিজ স্বরূপে) স্থিত হন এবং জড় (শরীর-সংসার) থেকে সম্পর্ক-ছেদ করে নেন। 'ভক্তিযোগে'র সাধক 'আমি ভগবানের এবং ভগবান আমার' এইভাবে ভগবানের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক করে নিজেকে উদ্ধার করেন। 'কর্মযোগে'র সাধক ওই বিচারশক্তির দ্বারা শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি যেগুলি প্রাপ্ত হয়েছে, সেগুলি জগৎ-সংসারের মেনে নিয়ে জগতের সেবায় নিয়োজিত করে ওই পদার্থগুলি থেকে সম্পর্ক-বিচ্ছিন্ন করেন এবং নিজ স্বরূপে স্থিতিলাভ করেন। এইভাবে মানুষ তার বিচারশক্তিকে কাজে লাগিয়ে যে কোনো যোগ-পথেই নিজ কল্যাণ করতে সক্ষম হয়।

উদ্ধার সম্পর্কে বিশেষ কথা

ভেবে দেখতে হয় যে, 'আমি' শরীর নই ; কারণ শরীর পরিবর্তনশীল আর আমি একই থাকি। এই শরীরও 'আমার' নয় ; কারণ শরীরের ওপর আমার কোনো প্রভুত্ব খাটে না অর্থাৎ শরীরকে আমি যেমন রাখতে চাই, এটি সেভাবে থাকতে পারে না ; যতদিন রাখতে চাই, ততদিন থাকে না এবং যেমন সুগঠিত করতে চাই, তেমন তৈরি

হয় না। এই শরীর 'আমার জন্য'ও নয় ; কারণ যদি এটি আমার জন্য হতো তাহলে এই শরীর প্রাপ্তির পরে আর কোনো ইচ্ছাই জন্মাতো না। দ্বিতীয়তঃ, শরীর পরিবর্তনশীল এবং আমি অপরিবর্তনীয়। পরিবর্তনশীল অপরিবর্তনীয়র কী করে কাজে লাগবে ? লাগতে পারে না। তৃতীয়তঃ, এটি যদি আমার জন্য হত তাহলে সর্বদা আমার সঙ্গেই থাকত, কিন্তু এটি চিরকাল আমার সঙ্গে থাকে না। এইভাবে 'শরীর আমি নয়', 'আমার নয়' এবং 'আমার জন্য নয়'—এই বাস্তব সত্যে মানুষ দৃঢ় থাকলে, আপনিই তার উদ্ধার লাভ হয়।

এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে, ঈশ্বর, সাধু-মহাত্মা, গুরু, শাস্ত্র—এসবের দ্বারাও তো মানুষের উদ্ধার হয় ; তাহলে নিজেই নিজের উদ্ধার করবে—এরূপ কেন বলা হয়েছে ? তার উত্তর হল এই যে, ঈশ্বর, সাধু-মহাত্মা তখনই আমাদের উদ্ধার করতে পারেন, যখন তাঁদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা হবে। সেই শ্রদ্ধা আমাদের নিজেদেরই করতে হবে। আমরা যদি শ্রদ্ধা না করি, তাহলে তাঁরা কি আমাদের দিয়ে শ্রদ্ধা করাতে পারেন ? তা তাঁরা পারেন না। যদি ঈশ্বর বা সাধুগণকে আমরা শ্রদ্ধা না করলেও জোর করে আমাদের শ্রদ্ধা উৎপন্ন করিয়ে আমাদের উদ্ধার করতেন, তাহলে আমাদের উদ্ধার বহু আগেই হয়ে যেত। কারণ আজ পর্যন্ত ভগবানের অনেক অবতার আবির্ভূত হয়েছেন, নানাপ্রকার সাধু-মহাত্মা, জীবন্মুক্ত, ভগবদ্-প্রেমী জন্মগ্রহণ করেছেন । কিন্তু আজ পর্যন্ত আমাদের উদ্ধার পাওয়া সম্ভব হয়নি। এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, যারা মহাত্মাদের শ্রদ্ধা করে না, তাঁদের শরণাগত হয় না, তাঁদের কথা মেনে চলে না, তাদের উদ্ধার হয় না। কিন্তু যাঁরা তাঁদের শ্রদ্ধা করেছেন, তাঁদের শরণাগত হয়েছেন, তাঁদের কথা মেনে চলেছেন, তাঁরা উদ্ধার পেয়েছেন । সুতরাং সাধকের শাস্ত্র, ভগবান, গুরু ইত্যাদিতে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস করে এবং তাঁদের নির্দেশ পালন করে নিজের উদ্ধার করা উচিত।

ভগবান, সাধু-মহাত্মাগণ থাকা সত্ত্বেও আমাদের উদ্ধার হয়নি, তার মানে যে উদ্ধারের সামগ্রীর কোনো অভাব ছিল তা নয়, অথবা আমরা নিজেদের উদ্ধারে যে অসমর্থ, তাও নয়। আমরা নিজ উদ্ধারের জন্য প্রস্তুত হইনি, তাই এগুলি সব মিলেও আমাদের উদ্ধার করতে সক্ষম হয়নি। যদি আমরা নিজেদের উদ্ধারের জন্য সংকল্পবদ্ধ হই, শরণাগত হই তবে মনুষ্য-জন্মের মতো এমন জন্ম এবং কলিযুগের মতো এমন সুযোগ লাভ করে আমরা একাধিকবার নিজেদের উদ্ধার করতে সক্ষম হই। কিন্তু এটি তখনি সম্ভব যখন আমরা স্বয়ং উদ্ধার আগ্রহী হব।

দ্বিতীয়তঃ, স্বয়ংই নিজের পতন ঘটিয়েছে অর্থাৎ সেই জগৎ-সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, জগৎ তার সঙ্গে আত্মীয়তা করেনি। যেমন, বালক অবস্থাকে সে ত্যাগ করেনি, সেটি স্বাভাবিকভাবেই ত্যাগ হয়েছে। তারপর সে যুবক অবস্থার সঙ্গে সম্পর্ক ঘটিয়েছে এইভাবে যে, 'আমি যুবক', কিন্তু যুবাবস্থার সঙ্গেও তার সম্পর্ক স্থায়ী হয় না। তাৎপর্য হল এই যে, সে যদি নতুন সম্পর্ক স্থাপন না করে তবে তার পুরানো সম্পর্ক স্বতঃই ত্যাগ হয়ে যায়। পুরানো সম্পর্ক স্থায়ী হয় না কিন্তু সে নতুন নতুন করে সম্পর্ক স্থাপন করে—এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সম্পর্ক স্থাপন করতে বা ত্যাগ করতে সে স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র। যদি সে নতুন সম্পর্ক স্থাপন না করে, তাহলে তার উদ্ধার সে নিজেই করতে সক্ষম হয়।

শরীর এবং জগৎ-সংসারের সঙ্গে যে সম্পর্ক, তা প্রতিমুহূর্তে বিয়োগ হচ্ছে। সেই স্বাভাবিক বিয়োগ অবস্থাকে সংযুক্তির সময়েই স্বীকার করে নিলে সে নিজেই নিজেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

'নাত্মানমবসাদয়েৎ'—সে নিজেকে পতনের দিকে যেন না নিয়ে যায়—এর তাৎপর্য হল এই যে, পরিবর্তনশীল প্রাকৃত পদার্থের সঙ্গে যেন সম্পর্ক স্থাপন না করে অর্থাৎ সেগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে তার ক্রীতদাস যেন না হয়, তার অধীন না হয়, সেগুলিকে নিজের জন্য প্রয়োজনীয় বলে যেন না মনে করে। যেমন কারুর অর্থ-প্রাপ্তি হয়েছে, পদোন্নতি হয়েছে, অধিকার হস্তগত হয়েছে, এগুলি পাওয়ায় সে নিজেকে অনেক বড় এবং শ্রেষ্ঠ ও স্বাধীন বলে মনে করে। কিন্তু বিচার করতে হবে যে, সে স্বয়ং বড় হয়েছে, না কি অর্থ, পদ, অধিকার দ্বারা বড় হয়েছে ? স্বয়ং চেতন এবং একইরূপ থাকা সত্ত্বেও এই সব প্রাকৃত বস্তুর অধীন হয়ে যায় এবং নিজ পতন ঘটায়। আশ্চর্যের কথা হল এই যে, এই পতনকেও সে তার উন্নতি বলে মনে করে এবং এগুলির অধীন হয়েও নিজেকে স্বাধীন মনে করে।

'আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুঃ'—সে নিজেই নিজের বন্ধু। সে নিজে ছাড়া তার আর কোনো বন্ধু নেই। সুতরাং স্বয়ং-এর কারো প্রয়োজন নেই, তার নিজের উদ্ধারের জন্য কোনো যোগ্যতার প্রয়োজন নেই, শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদির প্রয়োজন নেই এবং কোনো বস্তু, ব্যক্তি, পরিস্থিতি ইত্যাদিরও প্রয়োজন নেই। এর তাৎপর্য হল এই যে, প্রাকৃত পদার্থ সহায়ক বা বাধক কোনোটাই নয়। সে স্বয়ংই নিজেকে উদ্ধার করতে সক্ষম, তাই সে স্বয়ংই তার বন্ধু (মিত্র)।

যিনি আমাদের সাহায্যকারী, রক্ষক, উদ্ধারকর্তা, তাঁকে যখন আমরা শ্রদ্ধা-ভক্তি করি, তাঁর কথা মেনে চলি, তখনি তিনি আমাদের বন্ধু, সাহায্যকারী ইত্যাদি হন। সুতরাং আসলে আমরাই আমাদের বন্ধু । কারণ আমরা না মেনে নিলে, শ্রদ্ধা-বিশ্বাস না করলে তাঁরা আমাদের উদ্ধার করতে পারেন না—এই হল নিয়ম।

'আত্মৈব রিপুরাত্মনঃ'—নিজেই নিজের শত্রু অর্থাৎ যে নিজের দ্বারা নিজের উদ্ধার করে না, সে নিজেই তার শত্রু। সে নিজে ছাড়া তার আর কোনো শত্রু নেই। প্রকৃতিজাত শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদিও তার কোনো অপকার করতে সক্ষম নয়। এগুলি যেমন অপকার করতে পারে না, তেমনি উপকারও করতে পারে না। যখন স্বয়ং ওই শরীরাদিকে নিজের বলে মেনে নেয়, তখন সে স্বয়ং নিজের শত্রু হয়ে যায়। অর্থাৎ এসব প্রাকৃত পদার্থে নিজস্বতা মেনে নিলেই নিজের সঙ্গে নিজের শত্রুতা করা হয়।

শ্লোকটির উত্তরার্ধে দুবার **'এব'** পদটি ব্যবহারের অর্থ হল এই যে, জীবের মিত্র বা শত্রু সে নিজেই, অন্য কেউ মিত্র বা শত্রু হতেই পারে না এবং হওয়া সম্ভবও নয়। প্রকৃতির কার্যাদির সঙ্গে বিন্দুমাত্র সম্পর্ক মেনে না নিলে নিজেই নিজের মিত্র হয়ে থাকে এবং প্রকৃতির কার্যাদির সঙ্গে বিন্দুমাত্র সম্পর্ক স্থাপন করলে নিজেই নিজের শত্রু হয়ে থাকে ।

পরিশিষ্ট-ভাব— নিজেকে উদ্ধার করা বা নিজের পতন হওয়ার ব্যাপারে মানুষ নিজেই উপলক্ষ্য হয়ে থাকে, অন্য কেউ নয়। ভগবান মানুষকে মনুষ্য-শরীর দিয়েছেন এবং নিজের কল্যাণ করার সবরকম সামগ্রী পুরোপুরি দিয়েছেন। তাই তার নিজ কল্যাণের জন্য অন্য কারো সাহায্যেরই দরকার হয় না। তার পতনও অন্য কারো দ্বারা হয় না। জীব নিজেই গুণাদির সঙ্গে লিপ্ত হয়ে জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হয় (গীতা ১৩।২১)।

গুরু, সাধু এবং ভগবানও তখনই উদ্ধার করতে সক্ষম হন যখন মানুষ নিজে তাঁদের ওপর শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস রাখে, তাঁদের মেনে নেয়, তাঁদের শরণাগত হয়ে তাঁদের আদেশ পালন করে। মানুষ যদি তাঁদের স্বীকার না করে, তাহলে তাঁরা কীকরে উদ্ধার করবেন ? করা সম্ভবই নয়। শিষ্য যদি নিজে থেকে শিষ্যত্ব স্বীকার না করে তাহলে গুরু কী করবেন ? যেমন অন্যে খাদ্য পরিবেশন করলেও খিদেটা নিজেরই হওয়া চাই। খিদে না হলে অন্যে যতই খাদ্য পরিবেশন করুক, তাতে কী হবে ? তেমনই নিজের ইচ্ছা না হলে গুরু, সাধু-মহাত্মাদের উপদেশে কাজ কী হবে ?

গুরু, সাধু বা ভগবানের কখনো অভাব হয় না। বহু বড় বড় সাধু হয়েছেন, গুরু হয়েছেন, ভগবানের অবতার হয়েছেন, কিন্তু এখনও আমরা উদ্ধার পাইনি, তার দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে আমরাই তাঁদের স্বীকার করিনি। সুতরাং আমাদের উদ্ধার বা পতনের জন্য আমরা নিজেরাই দায়ী। যারা নিজেদের উদ্ধার এবং পতনের জন্য অন্যকে দায়ী করে, তাদের উদ্ধার কখনোই সম্ভব নয়।

প্রকৃতপক্ষে ভগবানও আছেন, গুরুও আছেন, তত্ত্বজ্ঞানও আছে এবং মানুষের নিজের যোগ্যতা এবং সামর্থ্যও আছে। শুধুমাত্র বিনাশশীল বস্তু থেকে সুখের আশার ফলে সেটি প্রকাশ পেতে বাধা পায়। সেই বিনাশশীল সুখের আসক্তি দূর করার দায়িত্ব সাধকেরই, কারণ ওই আসক্তির জন্য দায়ী সে-ই।

গুরু হওয়া বা গুরু তৈরি করা গীতার সিদ্ধান্ত নয়। মানুষ নিজেই তার গুরু। নিজেকেই তার উপদেশ দিতে হবে। সব কিছুই যখন পরমাত্মা (**বাসুদেবঃ সর্বম্**), তখন অন্য কেউ কী করে গুরু হবে আর কে কাকে উপদেশ দেবে ? তাই **'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্'** কথাটির তাৎপর্য হল অন্যের মধ্যে যে অভাব তা না দেখে নিজের মধ্যের অভাবগুলি দেখে সেগুলি দূর করার চেষ্টা করা। নিজেকেই উপদেশ দিতে হয়। নিজেই নিজের গুরু হও, নিজেই নিজের নেতা হও, নিজেই নিজের শাসক হয়ে ওঠো।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকটিতে ভগবান জানিয়েছেন যে, স্বয়ং-ই তার মিত্র এবং স্বয়ং-ই তার শত্রু। স্বয়ং তার মিত্র এবং শত্রু কীভাবে হয় পরবর্তী শ্লোকে ভগবান তা জানিয়েছেন অর্থাৎ আগের শ্লোকটির উত্তরার্ধের ব্যাখ্যা পরের শ্লোকটিতে করেছেন।

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ॥ ৬ ॥

[**যেন** (যিনি) ; **আত্মনা** (নিজেকে) ; **আত্মা** (নিজেই) ; **জিতঃ** (জয় করেছেন) ; **তস্য** (তিনি) ; **আত্মা, এব** (নিজেই) ; **আত্মনঃ** (নিজের) ; **বন্ধুঃ** (বন্ধু) ; **তু** (এবং) ; **অনাত্মনঃ** (অনাত্মার) ; **আত্মা, এব** (আত্মাই) ; **শত্রুত্বে** (শত্রুতায়) ; **শত্রুবৎ** (শত্রুতা করে) ; **বর্ততে** (অনিষ্ট সাধন করে।)]

যে নিজেই নিজেকে জয় করেছে, সে নিজেই নিজের বন্ধু এবং যে নিজে নিজেকে জয় করতে পারেনি, এরূপ অনাত্মার আত্মাই শত্রুতা করে স্বীয় অনিষ্টসাধন করে ॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা—**'বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ'** — নিজের মধ্যে নিজের ছাড়া অন্য কোনো সত্তার অস্তিত্ব নেই। সুতরাং যে নিজের মধ্যে নিজেকে ছাড়া অপরের (শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদির) বিন্দুমাত্র প্রয়োজনীয়তা রাখেনি অর্থাৎ অসৎ পদার্থের প্রত্যাশা সর্বতোভাবে ত্যাগ করে তার সম স্বরূপে স্থিত হয়েছে, সেই নিজেকে জয় করেছে।

সে যে আত্মাতে স্থিত হয়েছে—তা কীভাবে জানা যাবে ? তার অন্তর সমত্বে স্থিতি লাভ করবে ; কারণ ব্রহ্ম নির্দোষ এবং সমত্ব-ভাবে তার অন্তর পূর্ণ হবে। এর দ্বারাই জানা যাবে যে, সে ব্রহ্মে স্থিত হয়েছে (গীতা ৫।১৯)। এর তাৎপর্য হল এই যে, ব্রহ্মস্থিত ব্যক্তি নিজেই নিজেকে জয় করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মস্থিতি নিত্য-নিরন্তর হয়েই রয়েছে, কেবলমাত্র মন-বুদ্ধি ইত্যাদিকে আপন বলে মনে করায় সেই স্থিতি অনুভূত হয় না।

জগতে অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে কেউই কাউকে জয় করতে পারে না এবং অন্যের সাহায্য নেওয়াই হল স্বয়ংকে পরাজিত করা। এইভাবে দেখা যায় যে, 'স্বয়ং' প্রথমে পরাজিত হয়েই অন্যকে জয় করে। যেমন কেউ কাউকে অস্ত্র-শস্ত্র সাহায্যে পরাজিত করল তার অর্থ, অন্যকে পরাজিত করতে হলে অস্ত্র-শস্ত্রের আশ্রয় বা অধীনতা নিতে হয়। কেউ আবার শাস্ত্রের সাহায্যে, বুদ্ধির দ্বারা শাস্ত্রার্থ করে অন্যের উপর কর্তৃত্ব লাভ করে। সেখানে সে প্রথমে শাস্ত্র বা নিজ বুদ্ধির নিকট পরাজিত হয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো কিছুর দ্বারা কারুর উপর জয় লাভ করে, সে নিজে আগে সেই বস্তুসমূহের অধীন হয়। নিয়ম হল এই যে, স্বয়ং পরাজিত (অধীন) না হয়ে অন্যকে জয় করা যায় না। সুতরাং যে নিজের জন্য অন্যের ওপর বিন্দুমাত্র নির্ভর করে না সেই নিজেকে জয় করতে পারে এবং স্বয়ংই তার বন্ধু হয়ে থাকে।

'অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ'—যে স্বয়ং ব্যতীত অন্যের অর্থাৎ শরীর-ইন্দ্রিয়াদি-মন-বুদ্ধি-ধন-বৈভব-রাজ্য-সম্পত্তি-পদ-অধিকার প্রভৃতিকে নিজের জন্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করে, তাকেই 'অনাত্মা' বলা হয়। এর তাৎপর্য হল যে, যা নিজের স্বরূপ নয়, আত্মা নয়, সেগুলিকে নিজের প্রয়োজন এবং সহায়ক বলে মনে করে এবং সেগুলিকেই নিজের স্বরূপ বলে মেনে নেয়। এরূপ অনাত্মা ব্যক্তি নিজেই নিজের সঙ্গে শত্রুতা করে। যদিও সে মনে করে যে, মন-বুদ্ধি ইত্যাদিকে নিজের ভেবে তার ওপর সে আধিপত্য বিস্তার করেছে, সেগুলিকে সে জয় করেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে (সেগুলি নিজের মনে করায়) সে নিজেই পরাভূত হয়। এইভাবে অন্যের কাছে পরাজিত হয়ে নিজেকে জয়ী ভাবাই হল নিজের সঙ্গে শত্রুতা করা।

'শত্রুত্বে' বলা হয় এই অর্থে যে, যা নিজের নয়, তার সঙ্গে 'আমি' এবং 'আমার' সম্পর্ক মেনে নেওয়াই হল নিজেই নিজের সঙ্গে শত্রুতা করা। এর দ্বারা প্রতিপাদিত হয় যে, স্বয়ং প্রকৃতিজনিত পদার্থের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করলেই শত্রুতার শুরু হয়। মানুষ প্রাকৃত বস্তুর ওপর যতই অধিকার বিস্তার করতে থাকে ততই সে

নিজেকে পরাধীন করতে থাকে। উপরন্তু সে মান-মর্যাদা-কীর্তি ইত্যাদি আকাঙ্ক্ষা করে ক্রমশঃ আরো বেশি করে পতিত হতে থাকে। সে মনে করে 'আমি ঠিক করছি, আমার উন্নতি হচ্ছে', কিন্তু ব্যাপারটি একেবারে বিপরীত হয়। এভাবে সে নিজেই নিজের সঙ্গে শত্রুতা বাড়িয়ে তোলে।

খুবই আশ্চর্যের কথা হল এই যে, মানবদেহ সর্বতোভাবে জড়তাকে পরিহার করে শুধুমাত্র চিন্ময়তত্ত্ব লাভের উদ্দেশ্যেই প্রাপ্ত হয়েছে, সেই উদ্দেশ্য ভুলে মানুষ বর্তমানে এবং মৃত্যুর পরও নিজের মূর্তি, ছবি ইত্যাদির দ্বারা যাতে তার নাম স্থায়ী হয়—এইভাবে জড়ত্বকে গুরুত্ব দিয়ে সেগুলিকে বজায় রাখতে প্রয়াসী হয়। এইভাবে চিন্ময় হওয়া সত্ত্বেও জড়ত্বের দাসত্বে আবদ্ধ হয়ে সে নিজেরই সঙ্গে শত্রুর মতো আচরণ করে।

'শত্রুবৎ' বলায় এই ভাব প্রকাশিত হয় যে, শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি নিজের বলে মনে করে সে নিজেকে এগুলির অধিপতি বলে মনে করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে তার দাস হয়ে যায়! যদিও তার নিজের দৃষ্টিতে তার ব্যবহার নিজের অহিত করার দিকে থাকে না, কিন্তু পরিণামে এতে তার অহিতই হয়। তাই ভগবান বলেছেন যে তার ব্যবহার নিজের সঙ্গে শত্রুবৎ অর্থাৎ শত্রুর মতোই হয়ে থাকে।

তাৎপর্য হল এই যে, কোনো ব্যক্তিই স্ব-ইচ্ছায় নিজের সঙ্গে শত্রুর মতো ব্যবহার করে না। কিন্তু অসৎ বস্তুর আশ্রয় নিয়ে মানুষ নিজের হিত সাধনের জন্য যা কিছু করে, তা প্রকৃতপক্ষে তার পক্ষে শত্রুর মতোই হয়ে দাঁড়ায়; কারণ অসৎ বস্তুর আশ্রয় নিলে পরিণামে সেটি জন্ম-মৃত্যুরূপ মহাদুঃখদায়ক হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব— শরীরে আমি ও আমার ভাব যদি না থাকে তাহলে নিজেই নিজের মিত্র আর যদি শরীরকে নিজের বলে মনে করা হয় তাহলে নিজেই নিজের শত্রু হয় অর্থাৎ অনাত্মাতে গুরুত্ব দিলে তার পরিণাম শত্রুর মতোই হয়।

'শত্রুবৎ'— শত্রু যে ক্ষতি করে, সেই ক্ষতি সে নিজের প্রতি নিজেই করে। ভোগী মানুষ প্রকৃতপক্ষে নিজের যত ক্ষতি করে, তার শত্রুও তত ক্ষতি করতে পারে না। বাস্তবে দেখা যায় শত্রুদের দ্বারা আমাদের ক্ষতির পরিবর্তে ভালোই হয়। তারা আমাদের কোনো ক্ষতি করতেই পারে না। কেন-না তারা বস্তু পর্যন্তই পৌঁছতে পারে, স্ব-স্বরূপ পর্যন্ত পৌঁছায় না। সুতরাং বিনাশশীল বস্তুর বিনাশ করা ব্যতীত তারা আর কীই-বা করতে পারে? বিনাশশীল বস্তুর বিনাশে আমাদের মঙ্গলই হয়। আসলে আমাদের ভাব (বিচার-বোধ) নষ্ট হলেই আমাদের ক্ষতি হয়।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—নিজের দ্বারা নিজের জয় প্রাপ্তির পরিণাম কী? পরবর্তী তিনটি শ্লোকে তার উত্তর দেওয়া হয়েছে।

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ॥ ৭ ॥

[**জিতাত্মনঃ** (যিনি নিজেকে জয় করেছেন); **শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু** (শীত-গ্রীষ্ম সুখ-দুঃখে); **তথা** (এবং); **মানাপমানয়োঃ** (মান অপমানে); **প্রশান্তস্য** (প্রশান্ত নির্বিকার মানুষের নিকট); **পরমাত্মা** (পরমাত্মা); **সমাহিতঃ** (নিত্যপ্রাপ্ত।)]

যিনি নিজেকে জয় করেছেন এবং শীত-গ্রীষ্ম (অনুকূল-প্রতিকূল), সুখ-দুঃখ এবং মান-অপমানে সর্বদাই প্রশান্ত সেই নির্বিকার মানুষের কাছে পরমাত্মা সর্বদাই নিত্যপ্রাপ্ত ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা—[ষষ্ঠ শ্লোকে **'অনাত্মনঃ'** পদ এবং এইস্থানে **'জিতাত্মনঃ'** পদ ব্যবহৃত হয়েছে। এর তাৎপর্য হল যে, যে **'*অনাত্মা*'**, সে শরীরাদি প্রাকৃত পদার্থের সঙ্গে 'আমি' এবং 'আমার' ভাব করে নিজের সঙ্গে শত্রুর মতো ব্যবহার করে এবং যে **'*জিতাত্মা*'**, সে শরীরাদি প্রাকৃত পদার্থগুলির সঙ্গে নিজের সম্পর্ক স্থাপন না করে নিজের সঙ্গে মিত্রতা করে। এইভাবে অনাত্মা মানুষ নিজের পতন ঘটায় এবং জিতাত্মা মানুষ নিজের উদ্ধার করে।]

'জিতাত্মনঃ'—যে শরীর-ইন্দ্রিয়াদি-মন-বুদ্ধি ইত্যাদি কোনো প্রাকৃত পদার্থকে নিজের জন্য প্রয়োজনীয় বলে মনে

করে না এবং ওই প্রাকৃত পদার্থগুলির সঙ্গে কিছুমাত্র আপন ভাব রাখে না, তাকে বলা হয় 'জিতাত্মা'। জিতাত্মা ব্যক্তি নিজের মঙ্গল তো করেই, তার দ্বারা জগতেরও অনেক উপকার সাধিত হয়।

'শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু প্রশান্তস্য'—এখানে 'শীত' এবং 'উষ্ণ'—এই দুটি পদের ভাব গভীরভাবে বিচার করলে বোঝা যায় যে, এর দ্বারা কেবল ঠাণ্ডা বা গরমের কথা বলা হচ্ছে না। কারণ সে দুটি কেবল ত্বক (স্পর্শ)-ইন্দ্রিয়ের বিষয়। জিতাত্মা ব্যক্তি যদি শুধুমাত্র স্পর্শেন্দ্রিয়ের বিষয়ে প্রশান্ত থাকেন তবে কর্ণ, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা—এই ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি বাকি থাকে অর্থাৎ এইগুলিতে তাঁর প্রশান্ত হওয়া বাকি থেকে যায়। ফলে তাঁর পূর্ণতা আসে না। অতএব এইস্থানে 'শীত' এবং 'উষ্ণ' পদ অনুকূল এবং প্রতিকূল বিষয়ের বাচক।

শীত অর্থে অর্থাৎ অনুকূল অবস্থা প্রাপ্ত হলে অন্তরে একপ্রকার শীতল ভাব অনুভূত হয় এবং উষ্ণ বা প্রতিকূল অবস্থা প্রাপ্ত হলে অন্তরে একপ্রকার সন্তাপ অনুভূত হয়। তাৎপর্য হল এই যে, অন্তরে শীতলতা বা সন্তাপ কিছুই থাকবে না, বরং এক সমশান্তি বিরাজ করবে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির অনুকূল-প্রতিকূল বিষয়, বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদি প্রাপ্ত হলেও অন্তরে শান্তি ভঙ্গ হয় না। কারণ অন্তরের যে স্বতঃসিদ্ধ শান্তি থাকে, সেটি অনুকূল অবস্থায় সন্তুষ্ট হলে এবং প্রতিকূল অবস্থায় অসন্তুষ্ট হলে ভঙ্গ হয়ে যায়। সুতরাং শীত-উষ্ণতে প্রশান্ত থাকার অর্থ হল বাহ্য সংযোগ-বিয়োগের প্রভাব অন্তরে যেন না পড়ে।

এখন বিচার করে দেখতে হবে যে 'সুখ' এবং 'দুঃখ' পদের কী অর্থ হতে পারে ? সুখ এবং দুঃখ দুই প্রকারের হয়—

১) সাধারণ লৌকিক দৃষ্টিতে যার ধন-সম্পত্তি-বৈভব, স্ত্রী-পুত্র ইত্যাদি অনুকূল সামগ্রীর প্রাচুর্য থাকে, তাকে লোকে 'সুখী' বলে। যার ধন-সম্পত্তি-বৈভব, স্ত্রী-পুত্র ইত্যাদি অনুকূল সামগ্রীর অভাব থাকে, লোকে তাকে 'দুঃখী' বলে।

২) যার কাছে বাহ্য সুখদায়ক সামগ্রী নেই, সে কী খাবে—তার ঠিক নেই, পরনের কাপড় নেই, মাথা গোঁজার স্থান নেই, দেখাশোনা করার কেউ নেই—এই অবস্থা হওয়া সত্ত্বেও যাঁর মনে দুঃখ বা সন্তাপ না থাকে এবং যিনি কোনো বস্তু, ব্যক্তি, পরিস্থিতি ইত্যাদির কোনো প্রয়োজনীয়তা অনুভব না করেন, বরং সর্বাবস্থায় অত্যন্ত প্রসন্নভাবে থাকেন, তাঁকেই 'সুখী' বলা হয়। কিন্তু যার বাহ্য সুখদায়ক সামগ্রী পূর্ণভাবে বিদ্যমান, উত্তম খাদ্যবস্তু থাকে, উত্তম পরিধেয় বস্ত্রাদি থাকে, থাকবার জন্য সুরম্য প্রাসাদ থাকে, গৃহে দাস-দাসী পরিবৃত থাকে—এইরূপ অবস্থায়ও যে দিনরাত চিন্তা করতে থাকে যে, আমার এই সমস্ত যেন নষ্ট না হয়ে যায়, এগুলি যেন ঠিকভাবে থাকে, কীভাবে এর বৃদ্ধি করা যায় ইত্যাদি ইত্যাদি তাহলে এইরূপ বাহ্য-সামগ্রী থাকা সত্ত্বেও অন্তরে যে সর্বদা দুঃখ পেতে থাকে, তাকেই 'দুঃখী' বলা হয়।

উপরিউক্ত দু'প্রকারের সুখ-দুঃখ বলার তাৎপর্য হল এই যে—বাহ্য-সামগ্রীর দ্বারা সুখী ও দুঃখী হওয়া এবং অন্তরে প্রসন্নতা বা বিষণ্ণতাকে ধরে সুখী বা দুঃখী হওয়া। গীতায় যেখানে সুখ-দুঃখে 'সম' থাকার কথা বলা হয়েছে সেখানে বাহ্য-সামগ্রীতে সম থাকার কথা বলা হয়েছে ; যেমন—**'সমদুঃখসুখঃ'** (১২।১৩ ; ১৪।২৪), **'শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ'** (১২।১৮) ইত্যাদি। যেস্থানে সুখদুঃখরহিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেখানে অন্তরের প্রসন্নতা এবং বিষণ্ণতা 'রহিত' হওয়ার কথা বলা হয়েছে; যেমন—**'দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ'** (১৫।৫) ইত্যাদি। যেখানে সুখ-দুঃখে সম হওয়ার কথা আছে, সেখানে সুখ-দুঃখের অস্তিত্ব থাকে, কিন্তু তার প্রভাব পড়ে না এবং যেখানে সুখ-দুঃখ রহিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেখানে সুখ-দুঃখের অস্তিত্বই থাকে না। এইভাবে বাহ্য সুখ-দুঃখদায়ক সামগ্রী প্রাপ্তিতে অন্তরে সমত্বের কথা বলা হোক বা অন্তরে সুখ-দুঃখ রহিত অবস্থা বলা হোক—দুইয়ের তাৎপর্য একই ; কারণ সমত্ব এবং বর্জন দুই-ই অন্তরের বিষয়।

এখানে শীত-উষ্ণ এবং সুখ-দুঃখে প্রশান্ত (সম) থাকার কথা বলা হয়েছে। অনুকূল অবস্থায় সুখ অনুভূত হয়—**'অনুকূলবেদনীয়ং সুখম্'** এবং প্রতিকূলতায় দুঃখ অনুভূত হয়—**'প্রতিকূলবেদনীয়ং দুঃখম্'**। তাই শীত-উষ্ণের অর্থ যদি অনুকূল ও প্রতিকূল বলে ধরা হয় তবে পুনরায় সুখ-দুঃখ বলার কোনো অর্থ হয় না এবং সুখ-দুঃখ ধরলে শীত-উষ্ণ বলা ব্যর্থ হয়ে যায়। কারণ সুখ-দুঃখ পদ শীত ও উষ্ণেরই (অনুকূল-প্রতিকূল অবস্থারই) বাচক।

তাহলে এই স্থানে শীত-উষ্ণ এবং সুখ-দুঃখ পদের সার্থকতা কীভাবে সিদ্ধ হয় ? 'শীত-উষ্ণ' পদটির দ্বারা প্রারব্ধ অনুযায়ী হওয়া অনুকূল-প্রতিকূল বিষয়কে যদি ধরা হয় এবং 'সুখ-দুঃখ' পদের দ্বারা বর্তমানে করা ক্রিয়মাণ কর্মগুলির পূর্তি-অপূর্তি এবং সেগুলির তাৎকালিক ফলের সিদ্ধি-অসিদ্ধিকে যদি ধরা হয় তবে এই পদটির সার্থকতা সিদ্ধ হয়। তাৎপর্য এই হয় যে, প্রারব্ধ অনুযায়ী অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতি হোক অথবা ক্রিয়মাণ কর্মের তৎকালিক সিদ্ধি বা অসিদ্ধি হোক—এই দুই ব্যাপারেই প্রশান্ত (নির্বিকার) থাকা উচিত।

এই প্রকরণ অনুসারেও উপরের অর্থই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। কারণ এই অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে উপস্থাপিত **'নেন্দ্রিয়ার্থেষু (অনুষজ্জতে)'** পদটিকে এইস্থানে 'শীত-উষ্ণ' পদের দ্বারা বলা হয়েছে এবং **'ন কর্মসু অনুষজ্জতে'** পদটিকে এখানে সুখ-দুঃখ পদের দ্বারা বলা হয়েছে অর্থাৎ ওইস্থানে প্রারব্ধ অনুযায়ী উপস্থিত অনুকূল-প্রতিকূল অবস্থাতে এবং ক্রিয়মাণ কর্মগুলির পূর্তি-অপূর্তিতেও তৎকালিক ফলের সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে আসক্তিবর্জিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এইস্থানে ওই দুই বিষয়ে প্রশান্ত থাকার কথা বলা হয়েছে।

'তথা মানাপমানয়োঃ'—তেমনই যিনি এইরূপ মান-অপমানেও প্রশান্ত (নির্বিকার) থাকেন। এখানে কেউ যদি প্রশ্ন করেন যে, মান-অপমানও তো প্রারব্ধেরই ফল ; সুতরাং সেটি শীত-উষ্ণেরই (অনুকূল-প্রতিকূল অবস্থারই) অন্তর্গত। তাহলে সেটি পৃথকভাবে কেন ধরা হবে ? মান-অপমানকে পৃথকভাবে এইজন্য ধরা হবে যে শীত-উষ্ণ হল দৈবেচ্ছা (নৈর্ব্যক্তিক) কৃত প্রারব্ধের ফল, আর মান-অপমান হল পরেচ্ছাকৃত (ব্যক্তি নির্ভর) প্রারব্ধের ফল। পরেচ্ছাকৃত প্রারব্ধ মান-সম্মানেও হয়, আবার নিন্দা-স্তুতিতেও হয়। সুতরাং 'মান-অপমান' পদের দ্বারা যদি নিন্দা-স্তুতি (প্রশংসা) যদি গ্রহণ করা হয়, তাও গ্রহণ করা যেতে পারে। তাৎপর্য হল এই যে, কর্মযোগী অন্যের দ্বারা করা মান-অপমানেও প্রশান্ত থাকেন অর্থাৎ তাঁর শান্তিতে কোনো ব্যাঘাত হয় না।

মান-অপমানে প্রশান্ত থাকার উপায়—সাধককে কেউ মান-সম্মান যদি করে, তাহলে সাধক যেন মনে না করেন যে এটি আমার কর্মের, আমার গুণের, আমার ভালোত্বের ফল। বরং তাঁর মনে করা উচিত যে, যিনি আমার প্রশংসা করছেন—এ তাঁরই ভদ্রতা, উদারতা। তাঁর ভদ্রতাকে নিজের গুণ বলে মনে করা সততার কাজ নয়। কেউ অপমান করলে মনে করতে হবে এটি আমারই কর্মের ফল। এতে অপমানকারীর কোনোই দোষ নেই, বরং সে তো দয়ার পাত্র। কারণ সে বেচারী আমার পাপের ফল ভোগ করার নিমিত্ত হয়ে আমাকে শুদ্ধ হওয়ার সুযোগ দিয়েছে। এইরূপ মনে করলে সাধক মান-অপমানে প্রশান্ত ও নির্বিকার হতে পারবেন। যদি তিনি সম্মানকে নিজের গুণ এবং অপমানকে অন্যের দোষ বলে মনে করেন, তাহলে তিনি মান ও অপমানে প্রশান্ত থাকতে সক্ষম হবেন না।

'পরমাত্মা সমাহিতঃ'—শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ এবং মান-অপমান—এই ছ'টি বিষয়ে প্রশান্ত ও নির্বিকার থাকলে প্রমাণিত হয় যে, সেই ব্যক্তি পরমাত্মাপ্রাপ্ত হয়েছে। কারণ অন্তরে বিশেষভাবে আনন্দ প্রাপ্তি না হলে বাহ্য অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থা, সিদ্ধি-অসিদ্ধি এবং মান-অপমানে সে প্রশান্ত থাকতে পারে না। যে প্রশান্ত থাকে, সে অবশ্যই সেই একরসসম্পন্ন বিশেষ আনন্দ প্রাপ্ত হয়েছে। তাই গীতায় স্থানে স্থানে বলা হয়েছে যে, 'যে ব্যক্তির মন সাম্যে (সমত্বে) স্থিত হয়েছে, তিনি জীবিতাবস্থাতেই জগৎকে জয় করেছেন' (৫।১৯) ; যা প্রাপ্তি হলে তার থেকে বেশি লাভের কথা মনে আসতে পারে না এবং যাতে স্থিত হলে বড় বড় দুঃখও বিচলিত করতে পারে না (৬।২২) ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট-ভাব— যাঁর আত্মা নিজের মিত্র অর্থাৎ যাঁর শরীরের প্রতি আমি বা আমার ভাব নেই, তিনি অনুকূল-প্রতিকূল, সুখ-দুঃখ এবং মান-অপমানে সম এবং নির্বিকার থাকেন। এরূপ মানুষকে সিদ্ধ কর্মযোগী অর্থাৎ তাঁর পরমাত্মার অনুভব হয়েছে—এরূপ মনে করা উচিত। কেন-না অনুকূল-প্রতিকূল অবস্থা, সুখ-দুঃখ এবং মান-অপমান আসে আবার চলেও যায়। কিন্তু পরমাত্মতত্ত্ব একইভাবে বিরাজ করে।

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ॥ ৮ ॥

[**জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা** (যাঁর অন্তঃকরণ জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা পরিতৃপ্ত) ; **কূটস্থঃ** (যিনি কূটের মতো নির্বিকার) ; **বিজিতেন্দ্রিয়** (জিতেন্দ্রিয়) ; **সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ** (মৃত্তিকা, প্রস্তর ও স্বর্ণে সমবুদ্ধিসম্পন্ন) ; **ইতি, যোগী** (এইরূপ যোগীকে) ; **যুক্তঃ, উচ্যতে** (যোগারূঢ় বলা হয়।)]

যাঁর অন্তঃকরণ জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা পরিতৃপ্ত, যিনি কূটের (কামারের নেহাই-এর) ন্যায় নির্বিকার, জিতেন্দ্রিয় এবং মৃৎখণ্ড, পাথর এবং সুবর্ণে সমবুদ্ধিসম্পন্ন—এরূপ যোগীকে যুক্ত (যোগারূঢ়) বলা হয় ॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা—'জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা'—এটি কর্মযোগের প্রকরণ। সুতরাং এইস্থানে কর্ম করার শিক্ষাকে বলা হয় 'জ্ঞান' এবং কর্মের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সম থাকাকে বলা হয় 'বিজ্ঞান'।

স্থূলশরীর দ্বারা যে সব ক্রিয়া হয়, সূক্ষ্মশরীর দ্বারা যে সব চিন্তন ইত্যাদি হয় এবং কারণ-শরীর দ্বারা যে সমাধি হয়—এই তিনটিই যদি নিজের জন্য করা হয়, তাকে 'জ্ঞান' বলে না। কারণ ক্রিয়া, চিন্তন, সমাধি ইত্যাদি সমস্ত কর্মেরই আদি এবং অন্ত হয়। কিন্তু স্বয়ং পরমাত্মার অংশ হওয়ায় নিত্য বিদ্যমান। অতএব অনিত্য কর্ম এবং তার ফল দ্বারা এই নিত্য স্বরূপের তৃপ্তি কী করে হবে ? জড়ের দ্বারা চেতন কীভাবে তৃপ্তিলাভ করবে ? যদি এটি ঠিকমতো উপলব্ধি হয় যে কর্মের দ্বারা আমার কিছু পাবার নেই, তবে এটি হল কর্ম করার 'জ্ঞান'। এই জ্ঞান হলে সে কর্মের পূর্তি-অপূর্তি এবং পদার্থের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিতে সম থাকে—একে বলা হয় 'বিজ্ঞান'। এই জ্ঞান ও বিজ্ঞান দ্বারা সে স্বয়ং তৃপ্তিলাভ করে। তখন তার আর কিছু করা, জানা এবং পাবার বাকি থাকে না।

'কূটস্থঃ'[১]—কূট (অহরণ) হল একপ্রকার লৌহ-পিণ্ড, যার ওপর লোহা, সোনা, রূপা ইত্যাদি পেটাই করে নানারূপ জিনিস তৈরি করা হয়, কিন্তু কূট একইরূপে থাকে । এইরূপ সিদ্ধ মহাপুরুষদের নিকট নানাপ্রকার পরিস্থিতি উপস্থিত হয়, কিন্তু তিনি কূটের ন্যায় একই রকম নির্বিকারভাবে থাকেন।

'বিজিতেন্দ্রিয়ঃ'—কর্মযোগী সাধকের ইন্দ্রিয়ের ওপর বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হয় । কারণ কর্মে প্রবৃত্তি থাকায় তাঁর কোনো না কোনো বিষয়ে আসক্তি বা বিদ্বেষ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই গীতায় বলা হয়েছে যে,—'সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্' (১২।১১) অর্থাৎ কর্মফল ত্যাগ করতে হলে জিতেন্দ্রিয় হওয়াই প্রধান কর্তব্য। এইরূপে সাধনাবস্থায় ইন্দ্রিয়গুলির বিষয়ে বিশেষভাবে সতর্ক থাকা সাধক সিদ্ধাবস্থায় স্বাভাবিক-ভাবেই 'বিজিতেন্দ্রিয়' হয়ে ওঠেন।

'সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ'—মাটির ঢেলাকে বলা হয় 'লোষ্ট', 'অশ্ম' হচ্ছে পাথর এবং সোনাকে বলা হয় 'কাঞ্চন'—এই সব বিষয়ে সিদ্ধ কর্মযোগী সমভাব পোষণ করেন। সম থাকার অর্থ এই নয় যে তাঁর মাটির ঢেলা, পাথর এবং স্বর্ণ সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান থাকে না। কোনটি কী, সে বিষয়ে তিনি যথার্থ অবহিত থাকেন এবং সেগুলির ব্যবহারও তাঁর সম্যক্‌রূপে জানা থাকে অর্থাৎ সোনাকে সিন্দুকে সুরক্ষিত রাখা এবং মাটির ঢেলা ও পাথরকে বাইরে রাখা ঠিকই করে থাকেন। তা সত্ত্বেও সোনা হাতছাড়া হলে বা অর্থ নষ্ট হলে তাঁর মনে তা কোনো প্রভাব ফেলে না এবং স্বর্ণ হস্তগত হলে, তাতেও তাঁর মনে কোনো বিকার হয় না। অর্থাৎ এগুলির আসা-যাওয়াতে তিনি আনন্দ বা বিষাদ বোধ করেন না—এটাকেই বলা হয় তাঁর সম থাকা। তাঁর কাছে সোনা এবং পাথরের মূল্যবোধ একই ; সোনাও যেমন মাটির ঢেলাও তেমনই। সুতরাং এর কোনটি যদি হাতছাড়া হয় তাহলে কী হবে ? নষ্ট হলেই বা কী হবে—এই সবে তাঁর মনে কোনো বিকার উৎপন্ন হয় না। প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলেই এইসব স্বর্ণাদি প্রাকৃত পদার্থের মূল্য প্রতীত হয় এবং তখনই এগুলির হ্রাস-বৃদ্ধিতে অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু এগুলির প্রকৃত পরিচয় বোধ হলে যখন প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক-ছেদ হয়ে যায়, তখন কর্মযোগীর অন্তরে এই সব প্রাকৃত (ভৌতিক) পদার্থের আর কোনোই মূল্য থাকে না অর্থাৎ

[১]যে কূটের (অহরণ অর্থাৎ কামারের বেদী) ন্যায় নির্বিকার থাকে, তাকে 'কূটস্থ' বলা হয়— 'কূটবৎ তিষ্ঠতীতি কূটস্থঃ'।

এর হ্রাস-বৃদ্ধিতে তাঁর মধ্যে সমভাব বজায় থাকে।

এর আসল ব্যাপার হল এই যে, তাঁর দৃষ্টি পদার্থগুলির উৎপন্ন এবং বিনাশ হওয়ার দিকে থাকে অর্থাৎ তাঁর দৃষ্টিতে এইসব প্রাকৃত পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশে কোনো তফাৎ থাকে না। সোনাও উৎপন্ন এবং নষ্ট হয়। পাথরও উৎপন্ন ও নষ্ট হয়, তথা মাটির ঢেলাও তেমন উৎপন্ন এবং নষ্ট হয়। এই অনিত্যতার সত্য তাঁর জানা থাকায় সোনা, পাথর বা মাটির ঢেলায় তিনি তত্ত্বতঃ কোনো পার্থক্য দেখেন না। এই তিনটি জিনিসের নাম এইজন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, এগুলি যথাযোগ্যভাবে ব্যবহৃত হওয়া উচিত এবং যথাযোগ্যভাবে এগুলি ব্যবহার করা উচিতও বটে। যথাযোগ্য ব্যবহার করেও এগুলির বিনাশশীলতার মূলে মহাপুরুষের দৃষ্টি থাকে। এগুলির মধ্যে যে পরমাত্মতত্ত্ব সমানরূপে পরিপূর্ণ থাকে, সেই পরমাত্মতত্ত্বের স্বতঃসিদ্ধ সমতা তাঁর মধ্যে বিরাজ করে।

'যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী'—এরূপ জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা তৃপ্ত, নির্বিকার, জিতেন্দ্রিয় এবং সমত্ববুদ্ধিযুক্ত সিদ্ধ কর্মযোগীকে যুক্ত অর্থাৎ যোগারূঢ়, সমত্বে স্থিত বলা হয়েছে।

※ ※ ※

সুহৃন্মিত্রার্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু ।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে॥ ৯ ॥

[**সুহৃন্মিত্রার্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু** (সুহৃদ্, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য এবং আত্মীয়গণে) ; **চ** (এবং) ; **সাধুষু** (সাধু আচরণকারী) ; **পাপেষু, অপি** (পাপ আচরণকারীদের প্রতিও) ; **সমবুদ্ধিঃ** (সমবুদ্ধিবিশিষ্ট মানুষ) ; **বিশিষ্যতে** (শ্রেষ্ঠ।)]

সুহৃদ্, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য, স্বজন, সৎ-আচরণকারী এবং পাপাচরণকারীদের প্রতিও যিনি সমবুদ্ধিবিশিষ্ট তিনিই শ্রেষ্ঠ ॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা—[অষ্টম শ্লোকে পদার্থগুলিতে সমত্ব ভাবের কথা বলা হয়েছে এবং এই শ্লোকে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের প্রতি সমতার কথা বলা হয়েছে। মানুষের প্রতি সমতার কথা বলার অর্থ হল এই যে, বস্তু নিজে কোনো ক্রিয়া করে না ; সুতরাং তাতে সমবুদ্ধি হওয়া সহজ হয়। কিন্তু ব্যক্তি নিজের জন্য এবং অপরের জন্য ক্রিয়া করে । সুতরাং তাতে সমবুদ্ধি হওয়া কঠিন। তাই ব্যক্তিদের আচরণেও যার বুদ্ধি, বিচারে কোনো বিষমভাব বা পক্ষপাতিত্ব থাকে না, সেই সমবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ।]

'সুহৃন্মিত্রার্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু'—যে ব্যক্তি মায়ের মতো, কিন্তু মমতাশূন্য হয়ে কোনো কারণ ব্যতিরেকে সকলের হিত চায় এবং মঙ্গল করার স্বভাবসম্পন্ন হয়, তাকে 'সুহৃদ্' বলা হয় এবং যে উপকারের পরিবর্তে প্রত্যুপকার করে তাকে 'মিত্র' বলা হয়।

সুহৃদের স্বভাব যেমন বিনা কারণে অপরের হিতকারী হয়, তেমনি বিনা কারণে অপরের অনিষ্ট করা যার স্বভাব, তাকে 'অরি' বলা হয়। যে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অথবা অন্য কোনো বিশেষ কারণে অন্যের অনিষ্ট, অপকার করে, তাকে 'দ্বেষ্য' বলা হয়।

দুটি পক্ষ নিজেদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক করছে, তাদের দেখেও যে পৃথক থাকে, কারুর প্রতি কোনো পক্ষপাতিত্ব করে না বা নিজে থেকে কিছু বলে না, তাকে 'উদাসীন' বলা হয়। পক্ষান্তরে দু'পক্ষের বিবাদ যেন মিটে যায় এবং দুজনেরই মঙ্গল হয়—এরূপ ভাবসহ যারা চেষ্টা করে তাদের 'মধ্যস্থ' বলা হয়।

একজন হল 'বন্ধু' অর্থাৎ আত্মীয় এবং অপরজন বন্ধু নয়, কিন্তু এই দু'জনের সঙ্গে ব্যবহারে তার মনে কোনো বিষমভাব উদয় হয় না। যেমন, তার পুত্র অথবা অন্য কারোর পুত্র কোনো অন্যায় কাজ করেছে, তাহলে সে তাদের অপরাধ অনুযায়ী দু'জনকেই সমান শাস্তি দেয়। তেমনই তার পুত্র অথবা অন্যের পুত্র কোনো ভালো কাজ করেছে, সেই দু'জনকেই পুরস্কৃত করাতেও তার কোনো পক্ষপাতিত্ব থাকে না।

'সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে'—শ্রেষ্ঠ আচরণকারী এবং পাপাচরণকারীদের মধ্যে ব্যবহারে পার্থক্য থাকে এবং পার্থক্য থাকাই উচিত । কিন্তু এই দু'পক্ষেরই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় অর্থাৎ তাদের মঙ্গল করায়, দুঃখের সময় তাদের সাহায্য করায়, সমভাবসম্পন্ন ব্যক্তির

অন্তরে কোনো বিষমভাব বা পার্থক্য থাকে না। 'সবার মধ্যে এক পরমাত্মা বিরাজমান' এরূপ ভাব তাঁর স্বয়ং-এ (নিজের মধ্যে) থাকে। তাই বুদ্ধিতে সকলের মঙ্গল কামনা হয়, মনে সবার জন্য মঙ্গল চিন্তা হয় এবং ব্যবহারে আপন-পর-এ মমত্ব রহিত হয়ে সকলের সুখ সম্পাদিত হয়।

যে স্থানে বিষমবুদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা অধিকভাবে থাকে, সেখানেও সমবুদ্ধি হওয়া একটা বিশেষত্ব। সেখানে যদি সমবুদ্ধি হয়, তবে সর্বত্রই সমবুদ্ধি হতে পারে।

এই শ্লোকে ভাব, গুণ, আচরণ ইত্যাদির পার্থক্য ধরে নয় প্রকার প্রাণীর নাম করা হয়েছে। এই প্রাণীদের ভাব, গুণ, আচরণ ইত্যাদির পার্থক্যের জন্য সেগুলির সঙ্গে ব্যবহারে যদি কোনো বৈষম্য আসে, তবে তাতে কোনো দোষ হয় না। কারণ সেই ব্যবহার তাদের ভাব, আচরণ, পরিস্থিতি ইত্যাদি অনুযায়ীই তাদের জন্য হয়, নিজের জন্য নয়। কিন্তু তাদের সকলের মধ্যেও যে পরমাত্মা পরিপূর্ণভাবে আছেন—এই উপলব্ধিতে কোনো ভেদ যেন না আসে এবং নিজের দিক থেকে সকলের সেবার ভাব যেন বজায় থাকে—এই ভাবেও কোনো পার্থক্য হওয়া উচিত নয়।

তাৎপর্য হল এই যে, যে কোনো পথেই তত্ত্ববোধ হোক না কেন, সর্বত্রই তাঁর সমবুদ্ধি হয়ে থাকে অর্থাৎ কোথাও তাঁর পক্ষপাতিত্ব না হয়ে সমানভাবে সকলের সেবা এবং হিতের চিন্তা আসে। যেমন ভগবান সমস্ত প্রাণীর সুহৃদ্— **'সুহৃদং সর্বভূতানাম্'** (গীতা ৫।২৯), তেমনি এই সিদ্ধকর্মযোগীও সমস্ত প্রাণীর সুহৃদ্ হন—**'সুহৃদঃ সর্বদেহিনাম্'** (শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২৫।২১)।

এখানে সুহৃদ্, মিত্র ইত্যাদির নাম করার পর শেষকালে **'সাধুষ্বপি চ পাপেষু'** বলার তাৎপর্য হল এই যে, শ্রেষ্ঠ আচরণকারী ও নীচ আচরণকারী ব্যক্তিদের প্রতি যাঁর সমবুদ্ধি হয়, তাঁর সর্বত্রই সমবুদ্ধি হয়। কারণ জগতে আচরণেরই প্রাধান্য থাকে, আচরণেরই প্রভাব পড়ে, আচরণ দ্বারাই মানুষের পরীক্ষা হয়, আচরণের সহায়তাতেই শ্রদ্ধা-অশ্রদ্ধা জন্মে, স্বাভাবিকভাবে দৃষ্টি আচরণের ওপরই পড়ে এবং আচরণ দ্বারাই সদ্ভাব-দুর্ভাব উৎপন্ন হয়। ভগবানও **'যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ'** (৩।২১) বলে আচরণের কথাই প্রধান বলে জানিয়েছেন। তাই শ্রেষ্ঠ আচরণকারী এবং নিকৃষ্ট আচরণকারীদের মধ্যে সমভাব হলে সর্বত্রই সমভাব হয়। এই দুইয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আচরণকারী ব্যক্তিদের প্রতি সদ্‌ভাব হওয়া সহজ, কিন্তু পাপাচরণকারীদের প্রতি সদ্‌ভাব হওয়া কঠিন হয়। তাই ভগবান এখানে **'অপি চ'** দুটি অব্যয়ের ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ হল পাপাচরণ-কারীদের প্রতিও যাঁর সমবুদ্ধি থাকে, তিনিই শ্রেষ্ঠ।

এখানে বিভিন্ন ধরনের জাগতিক পদার্থাদিকে অবলোকনকারীর আন্তরিক দৃষ্টির কথা উত্থাপিত হয়েছে তাই **'সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে'** বলা হয়েছে। সত্যদর্শনকারীর যে সমবুদ্ধি হয় তা সকলের বোধগম্য হয় না, কিন্তু সাধকদের জন্য সেটিই হল প্রধান ; কারণ সাধক 'আমি নিজ দৃষ্টিতে কেমন', এই ভাবে নিজেকে দেখে থাকে। সেইজন্যই নিজেকে নিজের উদ্ধার করার কথা বলা হয়েছে (৬।৫)।

জগতে লোকের সাধারণতঃ অন্যের ব্যবহারের দিকেই দৃষ্টি থাকে। সাধককে চিন্তা করে দেখতে হয় যে, আমার দৃষ্টি আমার ভাবের ওপর থাকে, না কি অন্যের আচরণের ওপর থাকে ? অন্যের আচরণের দিকে দৃষ্টি থাকলে যে দৃষ্টির দ্বারা নিজের কল্যাণ হয়, সেই দৃষ্টি বন্ধ হয়ে তমসাচ্ছন্ন হয়ে যায়। তাই অপরের ভালো-মন্দ ব্যবহারের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে তাঁদের প্রকৃত যে স্বরূপ, সেইদিকে দৃষ্টি রাখতে হয়। স্বরূপের দিকে দৃষ্টি থাকলে তাঁর লোকের আচরণের দিকে লক্ষ্য যায় না। কারণ স্বরূপ সর্বদা একইপ্রকার থাকে, কিন্তু আচরণ পরিবর্তনশীল। সত্য-তত্ত্বের ওপর যে দৃষ্টি থাকে তাও সত্যই হয়। কিন্তু যার দৃষ্টি কেবল আচরণের দিকেই থাকে, তার দৃষ্টি অসৎ-এর দিকে থাকায় অসৎ-ই হয়। এর মধ্যেও অশুদ্ধ আচরণের দিকেই যার বেশি দৃষ্টি থাকে, বুঝতে হবে যে তার পতন হয়েছে। এর তাৎপর্য হল এই যে, যে আচরণ বাঞ্ছনীয় নয়, সেই অশুদ্ধ আচরণকে যে প্রাধান্য দেয়, সে নিজের পতন ঘটায়। তাই ভগবান এইস্থানে অশুদ্ধ আচরণকারী পাপীদের প্রতিও সমত্ববুদ্ধিসম্পন্নদের শ্রেষ্ঠ বলে জানিয়েছেন। কারণ তাঁর লক্ষ্য সত্য-তত্ত্বের ওপর থাকায় তাঁর দৃষ্টিতে সবকিছু পরমাত্মতত্ত্বরূপে বিরাজ করে। পরবর্তী পর্যায়ে সবকিছু থাকে না কেবল পরমাত্মতত্ত্বই বিরাজ করে। তাঁরই মহিমা এইস্থলে গীত হয়েছে **'সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে'** পদের দ্বারা।

বিশেষ কথা

গীতার যোগ হল 'সমতা'—'**সমত্বং যোগ উচ্যতে**' (২।৪৮)। গীতার দৃষ্টিতে যদি সমত্ব এসে যায় তাহলে আর কোনো লক্ষণের প্রয়োজন নেই অর্থাৎ যাঁর প্রকৃত সমত্ব প্রাপ্তি হয়েছে, তাঁর মধ্যে সমস্ত সদ্গুণ এবং সদাচার স্বাভাবিকভাবে এসে যায় এবং তাঁর সংসারে জয় হয় (৫।১৯)। বিষ্ণুপুরাণে শ্রীপ্রহ্লাদও বলেছেন যে, সমত্বই ভগবানের উপাসনা (ভজনা)—'**সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য**' (১।১৭।৯০)। এইভাবে যে সমত্বের অসীম, অপার, অনন্ত মহিমা, যার বর্ণনা কেউ করতে সক্ষম নয়, সেই সমত্ব প্রাপ্তির উপায় হল—মন্দবুদ্ধিরহিত হওয়া। মন্দবুদ্ধি রহিত হওয়ার উপায় হল—(১) কাউকে মন্দ (খারাপ) মনে না করা, (২) কারো মন্দ না করা, (৩) কারো ক্ষতি করার চিন্তা না করা, (৪) কারো মন্দ না দেখা, (৫) কারো মন্দ কিছু না শোনা, (৬) কাউকে মন্দ কিছু না বলা। এই ছ'টি বাক্য দৃঢ়তার সঙ্গে পালন করলে মন্দরহিত হওয়া যায়। মন্দবুদ্ধিরহিত হলেই স্বতঃ স্বাভাবিকভাবে আমাদের মধ্যে ভালোত্ব এসে যায়। কারণ ভালোত্বই হল আমাদের স্বরূপ।

ভালো হওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করি, সাধনা করি, কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে সাধনা করলেও বাস্তবিক ভালো আমরা হতে পারি না এবং সাধনা করেও নিজেরা সন্তুষ্ট হই না। মনে এই চিন্তা আসে যে এত সাধনা করেও সদ্গুণ-সদাচারসম্পন্ন হতে পারলাম না। অতএব এই সদ্গুণ-সদাচার হবার নয়—এই ভেবে আমরা সাধনাতে হতাশ হয়ে পড়ি। হতাশ হবার প্রধান কারণ হল যে, আমরা ভালো হওয়াকে চেষ্টাসাধ্য ব্যাপার বলে মনে করেছি এবং মন্দবুদ্ধিকে ঠিকমতো ত্যাগ করিনি। মন্দবুদ্ধিকে সর্বতোভাবে ত্যাগ না করলে অংশতঃ ভালোবুদ্ধি মন্দবুদ্ধির সহায়ক হয়ে ওঠে। কারণ অংশতঃ ভালো হলে ভালোত্বের অহংকার হয়। যত মন্দভাব থাকে তা সবই ভালোত্বের অহংকার অবলম্বন করে থাকে। পুরোপুরি ভালো হলে আর ভালোত্বের অহংকার হয় না এবং মন্দবুদ্ধিও উৎপন্ন হয় না। সুতরাং মন্দবুদ্ধি ত্যাগ করলে বিনা উদ্যোগে ভালোত্ব স্বতঃই এসে যায়। ভালোত্ব যখন আমাদের মধ্যে আসে, তখন আমরা ভালো হয়ে যাই। আমরা ভালো হলে, স্বাভাবিকভাবে আমাদের দ্বারা ভালো কাজ হতে থাকে। যখন ভালো হতে থাকে, তখন সৃষ্টিচক্রের নিয়মে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের জীবন-নির্বাহ হতে থাকে অর্থাৎ জীবিকা-নির্বাহের জন্য আমাদের কোনো পরিশ্রম করতে হয় না এবং অন্যের অধীনও হতে হয় না। এরূপ অবস্থায় আমরা জগতের প্রভাব থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হতে পারি। জগতের প্রভাব থেকে মুক্তি পেলেই আমাদের স্বতঃসিদ্ধ সমত্ব প্রাপ্তি হয় এবং আমরা কৃতকৃত্য হই, জীবন্মুক্ত হই।

পরিশিষ্ট-ভাব—সমতা এবং বিষমতা দুটির বিভাগ পৃথক পৃথক। পরমাত্মতত্ত্ব হল সম আর জগৎ-সংসার বিষম। সিদ্ধ কর্মযোগীর বিষম ব্যবহারেও সমবুদ্ধি থাকে। আচরণের ক্ষেত্রে যার সঙ্গে কখনও ঐক্য হতে পারে না, ঐক্য হওয়া উচিতও নয় এবং ঐক্য করা যায় না, সেই মাটির ঢেলা, পাথর এবং স্বর্ণে এবং সুহৃদ্, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য এবং সাধু ও পাপী ব্যক্তিদের সঙ্গে আচরণেও তাঁর সমবুদ্ধি বজায় থাকে। কারণ তিনি অনুভব করেছেন যে 'একমাত্র পরমাত্মা ব্যতীত আর কিছুই নেই।'

একটি স্বর্ণনির্মিত বিষ্ণুমূর্তি এবং একটি স্বর্ণনির্মিত কুকুরমূর্তি যদি ওজনে এক সমান হয়, তাহলে উভয়ের দামও একই হয়। শ্রীবিষ্ণু সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা এবং পরম পূজনীয় আর কুকুর অস্পৃশ্য জন্তু এবং অপূজ্য। বাহ্যতঃ দুই মূর্তির মধ্যে বড় পার্থক্য থাকলেও স্বর্ণের মূল্যে তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না! তেমনই জগতে কেউ মিত্র, কেউ শত্রু, কেউ মহাত্মা, কেউ দুরাত্মা, কেউ ভালো, কেউ মন্দ, কেউ সজ্জন, কেউ দুর্জন, কেউ সদাচারী, কেউ দুরাচারী, কেউ ধর্মাত্মা, কেউ পাপাত্মা, কেউ বিদ্বান, কেউ মূর্খ—এসবই বাহ্যিক দৃষ্টিতে। কিন্তু তত্ত্বতঃ সবই সেই ভগবান। এক ভগবানই অনন্তরূপে প্রকটিত হয়েছেন। জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাঁকে চিনতে পারেন, অন্যেরা পারেন না।

স্নানের সময় সাবান মেখে আয়নায় প্রতিবিম্ব দেখলে সেটি অত্যন্ত নোংরা, বিশ্রী দেখায়, মনে হয় সারা গায়ে সাদা সাদা ফোস্কা বা অন্য কিছু হয়েছে। কিন্তু তাতে মনে কোনো দুঃখ বা হতাশা আসে না। কারণ আমাদের মনে এই ভাব থাকে যে জল ঢাললেই ওগুলি চলে গিয়ে শরীর পরিষ্কার হয়ে যাবে। তেমনই সবকিছুই পরমাত্মার স্বরূপ, কিন্তু ওপর থেকে

পৃথক পৃথক শরীরে পৃথক পৃথক দেখায়। প্রকৃতপক্ষে যা দেখা যায় তাও পরমাত্মার স্বরূপ, কিন্তু রাগ (আসক্তি)-দ্বেষাদির জন্য এদের পৃথক বলে প্রতিভাত হয়।

পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে **'কর্মযোগী বিশিষ্যতে'** পদটির দ্বারা যে কথা বলা হয়েছে, সেই কথাই এখানে **'সমবুদ্ধিবিশিষ্যতে'** পদের দ্বারা বলা হয়েছে। সমবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ নির্লিপ্ত থাকেন। নির্লিপ্ত থাকলে 'যোগ' হয়, লিপ্ততা হলে 'ভোগ' হয়। তিনটি যোগেই সমবুদ্ধি থাকে, কিন্তু কর্মযোগে বিশেষ ভাবে থাকে, কারণ ভৌতিক সাধনা হওয়ায় কর্মযোগীর সাধন-পথে বৈষম্য বিশেষভাবে উপস্থিত হয়।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—যে সমত্ব (সমবুদ্ধি) প্রাপ্তি কর্মযোগ দ্বারা হয়, সেই সমতা ধ্যানযোগ দ্বারাও প্রাপ্ত হয়ে থাকে। তাই ভগবান ধ্যানযোগের প্রকরণ আরম্ভ করার আগে ধ্যানযোগের জন্য প্রেরণা দিচ্ছেন।

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥ ১০ ॥

[**অপরিগ্রহঃ** (ভোগবুদ্ধিতে দ্রব্যসংগ্রহে বিরত) ; **নিরাশীঃ** (আকাঙ্ক্ষারহিত) ; **যতচিত্তাত্মা** (সংযতচিত্ত ও সংযতদেহ) ; **যোগী** (যোগী) ; **একাকী, রহসি** (একাকী নির্জনস্থানে) ; **স্থিতঃ** (স্থিত হয়ে) ; **সততম্** (সর্বদা) ; **আত্মানম্** (মনকে) ; **যুঞ্জীত** (স্থিত করে রাখবেন।)]

ভোগবুদ্ধিতে ভোগ্যপদার্থ সংগ্রহে ইচ্ছাশূন্য, আকাঙ্ক্ষারহিত এবং সংযতচিত্ত ও সংযতদেহ যোগী একাকী নির্জন স্থানে স্থিত হয়ে সর্বদা মনকে পরমাত্মায় স্থিত রাখবেন ॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা—[পঞ্চম অধ্যায়ের সাতাশ-আটাশতম শ্লোকে যে ধ্যানযোগের কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে, এখন সেটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে।

'যুজ্ সমাধৌ' ধাতু দ্বারা যে 'যোগ' শব্দ সৃষ্টি হয়, তার অর্থ হল চিত্তবৃত্তিগুলিকে নিরোধ করা[১]। সেই যোগের বর্ণনা এখানে দশম শ্লোক থেকে শুরু করা হচ্ছে।]

'অপরিগ্রহঃ'—চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ যোগের সাধন সংসারবিমুখ হয়ে এবং শুধুমাত্র পরমাত্মার সম্মুখীন হয়ে করা হয়। অতএব তার জন্য প্রথমে সাধনের কথা বলেছেন—**'অপরিগ্রহঃ'** অর্থাৎ নিজের সুখবুদ্ধির জন্য কিছুই সংগ্রহ না করা। কারণ নিজ সুখের জন্য ভোগ এবং সম্পদ সংগ্রহ করলে তাতে মনে আকর্ষণ থাকে। যার ফলে সাধকের মন ধ্যানে সংলগ্ন হয় না। সুতরাং ধ্যানযোগের সাধকদের অপরিগ্রহ হওয়া খুবই প্রয়োজন।

'নিরাশীঃ'[২]—প্রথমে **'অপরিগ্রহঃ'** পদটির দ্বারা বাহ্যিক ভোগ্য-পদার্থ ত্যাগের কথা বলেছেন, এবার **'নিরাশীঃ'** পদটির দ্বারা ভোগ এবং সংগ্রহের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগের কথা বলেছেন। তাৎপর্য হল এই যে, অন্তরে ভোগবুদ্ধিতে কোনো ভোগ্য বস্তুকে ভোগ করার ইচ্ছা, কামনা বা আশা যেন না থাকে। কারণ মনে উৎপত্তি-বিনাশশীল পদার্থের গুরুত্ব, আশা, কামনা পরমাত্মপ্রাপ্তির পথে এক মস্ত বাধা। অতএব সাধককে এর থেকে সাবধান থাকতে হয়।

'যতচিত্তাত্মা'—সুখভোগের জন্য বাহ্যিকভাবে বস্তু ও সংগ্রহের ইচ্ছা এবং ভিতর থেকে সেগুলির কামনা ও আশা ত্যাগ করলেও অন্তঃকরণে নতুন করে আসক্তি উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই এখানে তৃতীয় সাধন প্রণালী জানাচ্ছেন—**'যতচিত্তাত্মা'** অর্থাৎ সাধক অন্তঃকরণসহ শরীরকে বশীভূত রাখুক। এগুলি বশীভূত হলে আর নতুন আসক্তি উৎপন্ন হয় না। এগুলি বশে আনার উপায় হল—আসক্তি সহকারে কোনো নতুন কাজ না করা। কারণ আসক্তিপূর্বক কর্মে প্রবৃত্ত হলে শরীর আরাম-আয়েসে, ইন্দ্রিয়াদি ভোগে এবং ভোগ-চিন্তায় অথবা ব্যর্থ চিন্তায় প্রবৃত্ত হয়, সেইজন্য অন্তঃকরণ এবং

[১] 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ' (পাতঞ্জল যোগদর্শন ১।২)

[২] 'আশিষ্' বলা হয় ইচ্ছাকে এবং 'নিস্'-এর অর্থ হল রহিত হওয়া, সুতরাং 'নিরাশীঃ'র অর্থ হল—ইচ্ছা রহিত হওয়া।

শরীরকে বশে রাখার কথা বলা হয়েছে।

'যোগী'—যাঁর ধ্যেয় এবং লক্ষ্য থাকে শুধুমাত্র পরমাত্মাতে মিলিত হওয়া অর্থাৎ যিনি পরমাত্মপ্রাপ্তির জন্যই ধ্যানযোগ করেন, সিদ্ধি বা ভোগপ্রাপ্তির আশায় নয়, এখানে তাঁকেই 'যোগী' বলা হয়েছে।

'একাকী'—ধ্যানযোগের সাধক নিঃসঙ্গ হবেন, তাঁর কোনো সহায়ক যেন না থাকে। কারণ দু'জন হলেই কথাবার্তা হতে থাকবে এবং সঙ্গে কেউ সাহায্যকারী হলে আসক্তিবশতঃ তার কথা স্মরণ হতে থাকবে, তাতে মন ভগবানের দিকে যাবে না।

'রহসি স্থিতঃ'—সাধককে কোথায় স্থিত হতে হবে—তা জানাতে গিয়ে বলেছেন যে তিনি যেন একান্তে স্থিত হন অর্থাৎ এমন স্থানে অবস্থান করেন যেখানে ধ্যানের বিরুদ্ধ পরিবেশ না হয়। যেমন নদীর ধার, বনের নির্জনতা, নির্জন মন্দির ইত্যাদি অথবা গৃহের এক নির্জন কক্ষ যেখানে একান্তে ধ্যান-ভজন করা যায়। সেই স্থানে যেন নিজে বা অপর কেউ আহার বা শয়ন যেন না করে।

'আত্মানং সততং যুঞ্জীত'—উপরিউক্ত ভাবে একান্তে বসে মনকে সর্বক্ষণ ভগবানে নিযুক্ত রাখা উচিত। মনকে সর্বদা ভগবানে নিযুক্ত রাখার জন্য প্রধান উপায় হল এই যে, যখন ধ্যান করার জন্য একান্ত স্থানে যাবে, তখন মনে মনে এই চিন্তা করতে হয় যে, 'এখন আমার সংসারের কোনো কাজ করার নেই, এখন কেবলমাত্র ভগবানের ধ্যানে নিযুক্ত থাকব, এখন ভগবান ছাড়া অন্য কিছুই চিন্তা করব না'—এই ভাবনায় সতর্ক থাকতে হয়, কেননা সতর্কতা-ই হল সাধনা।

সাধকের পক্ষে আর একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় হল যে, ধ্যানের সময় তো তিনি তৎপরতার সঙ্গে ভগবানের চিন্তায় ডুবে থাকবেনই, ব্যবহারিক কাজের সময়ও নির্লিপ্ত থেকে ভগবানের চিন্তা করা প্রয়োজন, কারণ কাজের সময় ভগবানের চিন্তা না থাকলে সংসারের লিপ্ততা বেড়ে যায়। কার্যাদির সময়ও ভগবানের মনন করলে ধ্যানের সময় চিন্তা করা সহজ হয় এবং ধ্যানের সময় ঠিকমতো চিন্তা হওয়ায় কার্যাদির সময়ও মনন হতে থাকে অর্থাৎ উভয় সময়ে ধ্যান ও চিন্তা করা একটি অপরটির সহায়ক হয়। তাৎপর্য হল এই যে, সাধকদের সাধন যেন সব সময় চলতে থাকে। তিনি জগতে ভগবানকে মিলিয়ে নিলেও ভগবানের সঙ্গে যেন জগৎ-সংসারকে মিলিয়ে না ফেলেন অর্থাৎ সংসারের কার্যাদির সময়ও যেন ভগবৎস্মরণ করতে থাকেন।

ধ্যানে বসার সময় যদি সাধক 'অমুক কাজ করতে হবে, এত নিতে হবে, এত দিতে হবে, অমুক স্থানে যেতে হবে, অমুকের সঙ্গে দেখা করতে হবে' ইত্যাদি বিষয় মনে করেন অর্থাৎ মনে সেগুলির চিন্তা রাখেন, তাহলে তাঁর মন ভগবানের ধ্যানে নিরত হতে পারে না। অতএব ধ্যানে বসার সময় দৃঢ়নিশ্চয় করতে হয় যে, যাই হোক না কেন, যদি গলাও কাটা যায় তবুও আমাকে ভগবানের ধ্যান করতেই হবে। এরূপ দৃঢ় সংকল্প হলে ভগবানে মন নিবিষ্ট করতে খুব সুবিধা হয়।

সাধকের অভিযোগ থাকে যে ভগবানে মন নিবিষ্ট হয় না, এর কারণ কী ? এর কারণ হল সাধক জগতের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে ধ্যান করেন না, বরং সম্পর্ক বজায় রেখেই করেন। সুতরাং নিজের সুখ এবং সেবার আশায় অন্তরে কাউকে নিজের বলে যেন মনে না করেন অর্থাৎ কারো প্রতি মমত্ববোধ না রাখেন। কারণ মন সেখানেই যায়, যেখানে মমতা থাকে। তাই উদ্দেশ্য যেন পরমাত্মাকে লাভের জন্য থাকে এবং অন্য সবকিছুতে নির্লিপ্ততা থাকে, তবেই ভগবানে মন নিবিষ্ট করা সম্ভব হবে।

বিশেষ কথা

অর্জুন আগেও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন এবং শেষকালে তিনি যুদ্ধ করেও ছিলেন। শুধু মধ্যবর্তী সময়ে তিনি যুদ্ধ করাকে পাপ বলে ভেবেছিলেন। তখন ভগবান বুঝিয়ে দিলে তিনি যুদ্ধ করতে রাজী হয়েছিলেন। এইভাবে কর্মের প্রসঙ্গ হওয়ায় গীতাতে কর্মযোগের বিষয় আলোচনা করা ঠিকই হয়েছে। কিন্তু এতে জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ইত্যাদি নানাপ্রকার পারমার্থিক সাধনের বর্ণনা কেন করা হয়েছে ? এর মধ্যে এইস্থানে ধ্যানযোগের বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে কেবল নির্জনে থেকে ধ্যান করতে হয়। এই প্রসঙ্গই বা কেন এইস্থানে আলোচিত হয়েছে ?

অর্জুন যখন পাপের ভয়ে যুদ্ধে বিরত হচ্ছিলেন, তখন তাঁর মধ্যে কল্যাণের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। তাই তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন যাতে তাঁর শ্রেয় (কল্যাণ) নিশ্চিত হয়, তিনি যেন তাঁকে সেই উপদেশ দেন (২।৭ ; ৩।২ ; ৫।১)। সেইজন্য শ্রেয়স্কর যতগুলি পথ

আছে, সেই সবই ভগবানকে বলতে হয়েছে। তার মধ্যে দান, যজ্ঞ, তপ, বেদাধ্যয়ন, প্রাণায়াম, ধ্যানযোগ, হঠযোগ, লয়যোগ ইত্যাদির কথা জানানোও কর্তব্য ছিল। সেইজন্য ভগবান গীতায় কল্যাণকারী সাধন-গুলি জানিয়েছেন। সেই সব সাধনে ভগবান এ কথাই বলেছেন যে, উৎপত্তি-বিনাশশীল বস্তুর দিকে যাদের লক্ষ্য থাকে তারাই আবদ্ধ হয়। সাধকের লক্ষ্য যদি শুধু পরমাত্মার দিকে থাকে, তাহলে তাঁর নিকট যে কোনো কর্তব্য-কর্ম আসুক না কেন, তা সমভাবে করা হবে। সমভাবে করা সমস্ত কর্তব্য-কর্মই কল্যাণকারক হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব— কর্মযোগ[১], জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ হল করণ নিরপেক্ষ সাধন, কিন্তু ধ্যানযোগ হল করণ-সাপেক্ষ সাধন। ভগবান এবার ধ্যানযোগের বর্ণনা আরম্ভ করছেন।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকটিতে ভগবান ধ্যানযোগের জন্য প্রেরণা দিয়েছেন। ধ্যানযোগের সাধন কেমন করে করা যায় পরবর্তী তিনটি শ্লোকে সেই কথা জানাচ্ছেন।

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্॥ ১১ ॥

[**শুচৌ** (পবিত্র) ; **দেশে** (স্থানে) ; **চৈলাজিনকুশোত্তরম্** (কুশ, মৃগচর্ম এবং তার ওপর বস্ত্র আবৃত করে বসবে) ; **ন, অত্যুচ্ছ্রিতম্** (অতি উচ্চ নয়) ; **ন অতিনীচম্** (অতি নিম্ন না হয়) ; **আত্মনঃ** (নিজ) ; **আসনম্** (আসন) ; **স্থিরম্** (স্থিরভাবে) ; **প্রতিষ্ঠাপ্য** (স্থাপন করে।)]

পবিত্র স্থানে ক্রমশঃ কুশ, মৃগচর্ম এবং তার ওপর বস্ত্রাবৃত করে আসন স্থাপন করবে, সেই আসন যেন অতি উচ্চ বা অতি নিম্ন না হয়, এইভাবে নিজ আসন স্থিরভাবে স্থাপন করবে ॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা—**'শুচৌ দেশে'**—ভূমি দুইপ্রকারে শুদ্ধ হয়—১) স্বাভাবিক শুদ্ধ স্থান—যেমন গঙ্গার কিনারা, বনাঞ্চল, তুলসী, আমলকী, বট ইত্যাদি পবিত্র বৃক্ষের পাশের স্থান প্রভৃতি এবং (২) যে স্থান শুদ্ধ করা হয়েছে—যেমন, গোময় দিয়ে জায়গাটি পরিষ্কার করা হয়েছে অথবা জল ছিটিয়ে শুদ্ধ করা হয়েছে। যেখানে মাটি আছে, সেখানে ওপরের চার-পাঁচ আঙুল মাটি তুলে ফেলে জমি শুদ্ধ করা হয়। এরূপ স্বাভাবিক অথবা শুদ্ধ করা সমতল জমিতে কাঠ বা পাথরের চৌকি ইত্যাদি পেতে নিতে হয়।

'চৈলাজিনকুশোত্তরম্'—যদিও উপরিউক্ত প্রণালীতে ক্রমশঃ বস্ত্র, মৃগচর্ম এবং কুশ পাতা উচিত[২], তা সত্ত্বেও প্রথমে কুশ পাতা উচিত তার ওপর হনন না-করা অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে মৃত মৃগের চর্ম পাতা উচিত। কারণ বধ-করা মৃগের চর্ম অশুদ্ধ হয়। যদি এরূপ মৃগচর্ম না পাওয়া যায়, তবে কুশের ওপর চটের আসন অথবা উলের কম্বল পাতা উচিত এবং তার ওপর কোমল সুতি বস্ত্র পাততে হবে।

ভগবানের বরাহ অবতাররূপের লোম থেকে উৎপন্ন হওয়ায় কুশকে পবিত্র বলে মানা হয়। তাই তার থেকে তৈরি আসন কাজে নেওয়া হয়। গ্রহণ ইত্যাদির সময় শুদ্ধির জন্য বিভিন্ন দ্রব্য এবং কাপড় ইত্যাদির মধ্যে কুশ রাখা হয়। পবিত্রীকরণ, প্রোক্ষণ ইত্যাদির সময়ও কুশ দিয়ে কাজ করা হয়। তাই ভগবান কুশ বিছাবার নির্দেশ দিয়েছেন।

কুশ যাতে দেহে ব্যথা না দেয় এবং আমাদের শরীরে যে বিদ্যুৎশক্তি থাকে তা যাতে আসনের মধ্য দিয়ে ভূমিতে না চলে যায় সেইজন্য মৃগচর্ম পাতার বিধান দেওয়া হয়েছে।

---

[১]কর্মযোগে 'কর্ম' করণ সাপেক্ষ কিন্তু 'যোগ' করণ নিরপেক্ষ।

[২] শ্লোকে যেমন আছে, যদি সেইমত ধরা হয় তবে নীচে বস্ত্র, তার ওপর মৃগচর্ম এবং তার ওপর কুশ পাততে হয়। কিন্তু এই ক্রম যুক্তিসঙ্গত নয় ; কারণ কুশ গায়ে ফোটে। অতএব নীচে কুশ, তার ওপর মৃগচর্ম এবং তার ওপর বস্ত্র এই ক্রম নেওয়া হয়েছে ; কারণ পাঠক্রম থেকে অর্থক্রম বলবান হয়— 'পাঠক্রমাদর্থক্রমো বলীয়ান্'।

মৃগচর্মের লোম শরীরে যাতে না লাগে এবং আসন নরম থাকে সেইজন্য মৃগচর্মের ওপর শুদ্ধ সুতিবস্ত্র পাতার কথা বলা হয়েছে। মৃগচর্মের পরিবর্তে যদি কম্বল পাতা হয়, যাতে গরম না লাগে সেইজন্য তার ওপর সুতিবস্ত্র বিছাতে হয়।

'নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচম্'—সমতল পবিত্র স্থান, যেখানে চৌকি পাতা যায়, সেই স্থান যেন অতি উচ্চ বা অতি নিম্ন না হয়। কারণ অত্যন্ত উচ্চস্থান হলে ধ্যানের সময় নিদ্রা হলে সেখান থেকে পড়ে আঘাত পাবার সম্ভাবনা থাকে। আবার অত্যন্ত নিম্নস্থান হলে নানারকম ছোটখাটো কীটপতঙ্গ শরীরে উঠে কামড় দিলে ধ্যানে বিক্ষেপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেইজন্যই অতি উঁচু বা অতি নিচু জায়গায় আসন করতে নিষেধ করা হয়েছে।

'প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ'—ধ্যানের জন্য যে আসন—চৌকি বা তক্তা পাতা হবে তা যেন নড়বড়ে না হয়। জমির ওপর তার চারটি পায়া যেন ঠিকমতো স্থির হয়ে থাকে।

যে আসনে বসে ধ্যানাদি করা হয়, সেটি নিজস্ব হওয়া উচিত, অন্যের নয়। অপরের আসন গ্রহণ করলে তাতে অপরের পরমাণু থেকে যায়। তাই এইস্থানে 'আত্মনঃ' পদটির দ্বারা নিজ নিজ আসন পৃথক রাখার বিধান দেওয়া হয়েছে। এইভাবে গোমুখী (জপমালার থলি), মালা, সন্ধ্যারতির পঞ্চপাত্র, আচমন পাত্র ইত্যাদিও নিজস্ব আলাদা রাখা উচিত। শাস্ত্রে এও বলা আছে যে, অপরের বসার আসন, পরবার জুতো, খড়ম, জামা ইত্যাদি ব্যবহার করলে তার পাপ-পুণ্যেরও ভাগীদার হতে হয়। পুণ্যাত্মা সাধু-পুরুষদের আসনেও বসা উচিত নয়। কারণ তাঁদের আসন, বস্ত্র ইত্যাদি পায়ে লাগলে, তাঁদের অমর্যাদা হয়, এতে অপরাধ হয়।

※　※　※

তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে॥ ১২ ॥

[তত্র, আসনে (সেই আসনে) ; উপবিশ্য (উপবেশন করে) ; যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ (চিত্ত ও ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াকে বশীভূত করে) ; মনঃ (মনকে) ; একাগ্রম্, কৃত্বা (একাগ্র করে) ; আত্ম-বিশুদ্ধয়ে (অন্তঃকরণ শুদ্ধির জন্য) ; যোগম্ (যোগের) ; যুঞ্জ্যাৎ (অভ্যাস করবে।)]

সেই আসনে উপবেশন করে চিত্ত ও ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াকে বশীভূত করে মনকে একাগ্র রেখে অন্তঃকরণ শুদ্ধির জন্য যোগ অভ্যাস করবে ॥ ১২ ॥

ব্যাখ্যা—[আগের শ্লোকে আসন পাতার নিয়ম জানাবার পর ভগবান এবার দ্বাদশ ও ত্রয়োদশতম শ্লোকে আসনে বসার নিয়ম জানাচ্ছেন।]

'তত্র আসনে'—যে আসনে ক্রমান্বয়ে কুশ, মৃগচর্ম এবং বস্ত্র পাতা হয়েছে, সেই আগের শ্লোকে বর্ণিত আসনটিকে এই স্থানে 'তত্র আসনে' পদটিতে বলা হয়েছে।

'উপবিশ্য'—সেই বিছানো আসনে সিদ্ধাসন, পদ্মাসন, সুখাসন ইত্যাদি যে প্রণালীতে সুখপূর্বক বসা সম্ভব, সেই প্রণালীতে বসতে হবে। আসনের বিষয়ে বলা হয়েছে যে, যে আসনেই বসা হোক না কেন, তাতে একনাগাড়ে তিন ঘণ্টা বসে থাকতে হবে। সেই সময়ে এদিক-সেদিক করা চলবে না। বসবার এরূপ অভ্যাস হয়ে গেলে মন এবং প্রাণ স্বতঃই স্বাভাবিকভাবে শান্ত (চাঞ্চল্যশূন্য) হয়ে যায়। কারণ মনের চাঞ্চল্য শরীরকে স্থির হতে দেয় না এবং শরীরের চাঞ্চল্য, ক্রিয়া-প্রবণতা মনকে স্থির হতে দেয় না। সেইজন্য ধ্যানের সময় শরীরকে স্থির রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন।

'যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ'—আসনে বসার সময় চিত্ত এবং ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া নিজ বশে রাখা উচিত। ব্যবহারের সময়েও শরীর-মন-ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়ার ওপর নিজের অধিকার থাকা উচিত। কারণ ব্যবহারের সময় চিত্ত ও ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া নিজ বশে না থাকলে ধ্যানের সময়েও এই ক্রিয়া শীঘ্র বশে আসে না। সুতরাং ব্যবহারের সময় চিত্ত ইত্যাদির ক্রিয়া বশে রাখা প্রয়োজন। তাৎপর্য হল এই যে, নিজ জীবন ঠিকমতো সংযত করে রাখা উচিত। পরবর্তী ষোড়শ-সপ্তদশ শ্লোকেও সংযত জীবন যাপনের কথা বলা হয়েছে।

'একাগ্রং মনঃ কৃত্বা'—মনকে একাগ্র করবে অর্থাৎ মনকে সংসারের চিন্তা থেকে একেবারে দূরে রাখবে। তার জন্য এরূপ চিন্তা করবে যে, এখন আমি ধ্যান করার জন্য আসনে উপবিষ্ট হয়েছি। এই সময় যদি আমি সংসারের চিন্তা করি তবে সংসারের কাজ তো হবেই না বরং সংসারের চিন্তায় পরমাত্মার ধ্যান ও চিন্তন নষ্ট হবে। এইভাবে দু'দিকেই আমি নিঃস্ব হয়ে যাব এবং ধ্যানের সময়ও অতীত হয়ে যাবে। অতএব এই সময় আমার সংসারের চিন্তা করা উচিত নয়, বরং মন শুধুমাত্র ভগবানের চিন্তায় লাগানো উচিত। এরূপ দৃঢ়-নিশ্চয় হয়ে ধ্যানে বসতে হয়। এরূপ দৃঢ়তা নিয়ে বসলেও যদি সংসারের কোনো চিন্তা মনে আসে তবে বুঝতে হবে এই চিন্তা আমি করিনি। এটি নিজে থেকেই উদিত হয়েছে। যেটি নিজে থেকে উদিত হয়, সেটির পরোয়া না করা, অর্থাৎ সেটি অনুমোদনও করব না বা বিরোধিতাও করব না, এইভাবে চললে সেই চিন্তা আপনা থেকেই ক্রমশঃ নির্জীব হয়ে নাশ হয়ে যায়। যেমনভাবে মনে উদিত হয়েছিল তেমনিভাবেই সেটি বিস্মরণে চলে যায়। কারণ যেটি উৎপন্ন হয়, তার নাশ হবেই—এই হল নিয়ম। যেমন জগতে নানাপ্রকার ভালো-মন্দ কার্য হচ্ছে, কিন্তু আমরা যদি তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক স্থাপন না করি, তবে সেগুলি আমাদের ওপর কোনো প্রভাব ফেলে না। অর্থাৎ এসবের পাপ বা পুণ্য আমাদের স্পর্শ করে না। তেমনি নিজে থেকে উদয় হওয়া চিন্তাগুলির সঙ্গে যদি আমরা কোনো সম্পর্ক স্থাপন না করি, তাহলে ওই চিন্তাগুলির কোনো প্রভাব আমাদের ওপর পড়ে না, আমাদের মনও তাতে আবদ্ধ হয় না। মন যদি আবদ্ধ না হয় তবে তা স্বতঃই একাগ্র ও শান্ত হয়ে যায়।

'যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে'—অন্তঃকরণ শুদ্ধির জন্যই ধ্যানযোগের অভ্যাস করবে। জাগতিক পদার্থ, ভোগ, মান, অহংবোধ, আরাম, যশ-প্রতিষ্ঠা, সুখ-সুবিধা ইত্যাদির আকাঙ্ক্ষা করা অর্থাৎ এগুলির কামনা করাই হল অন্তঃকরণের অশুদ্ধি এবং জাগতিক পদার্থ ইত্যাদি প্রাপ্তির কামনা না করে শুধুমাত্র পরমাত্ম-প্রাপ্তির উদ্দেশ্য রাখাই হল অন্তঃকরণের শুদ্ধিকরণ।

ঋদ্ধি, সিদ্ধি ইত্যাদি প্রাপ্তির জন্য এবং অপরকে দেখাবার উদ্দেশ্যেও যোগাভ্যাস করা যায়। কিন্তু তার দ্বারা যে অন্তঃকরণের শুদ্ধি হবে—এমন কোনো কথা নেই। 'যোগ' হল এক প্রকারের শক্তি, যেটি জাগতিক ভোগ-প্রাপ্তির আশায় নিয়োগ করলে ভোগ-সিদ্ধি প্রাপ্ত করা যায় এবং পরমাত্মপ্রাপ্তির জন্য নিয়োগ করলে পরমাত্মপ্রাপ্তির সহায়ক হয়।

※ ※ ※

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সম্প্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্॥ ১৩ ॥

[কায়শিরোগ্রীবং (শরীর, মস্তক এবং গ্রীবাকে) ; সমম্ (সোজা) ; অচলম্, ধারয়ন্ (নিশ্চলভাবে রেখে) ; চ (এবং) ; দিশঃ (অন্যদিকে) ; অনবলোকয়ন্ (না তাকিয়ে) ; স্বম্ (নিজের) ; নাসিকাগ্রম্ (নাসিকার অগ্রভাগে) ; সম্প্রেক্ষ্য (দৃষ্টি নিবিষ্ট করে) ; স্থিরঃ (স্থির হয়ে।)]

শরীর, মস্তক এবং গ্রীবা সোজা নিশ্চলভাবে রেখে এবং অন্য দিকে না তাকিয়ে নিজ নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি নিবিষ্ট করে স্থির হয়ে বসবে ॥ ১৩ ॥

ব্যাখ্যা—'সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং'—যদিও 'কায়' হল শরীরের নাম, তবুও এখানে (আসনে বসার পর) কোমর থেকে গলা পর্যন্ত দেহাংশকে 'কায়' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। 'শির' হল উপরিভাগ অর্থাৎ মস্তক এবং 'গ্রীবা' হল মস্তক ও শরীরের মধ্যবর্তী গলার অংশ। ধ্যান করার সময় এই কায়া, শির এবং গ্রীবা সমান এবং সরল থাকবে অর্থাৎ মেরুদণ্ডের যে অস্থি, সেগুলির সব যেন ঠিকমতো খাঁজে খাঁজে থাকে এবং তার ওপর গ্রীবা এবং মস্তক থাকে। তাৎপর্য হল এই যে, শরীর, মস্তক ও গ্রীবা—এই তিনটি যেন একটি সূত্রে অচল থাকে। কারণ এই তিনটি সামনে ঝুঁকলে ঘুম আসে ও পিছনে ঝুঁকলে জড়তা আসে এবং ডাইনে-বামে ঝুঁকলে চাঞ্চল্য আসে। তাই সামনে-পিছনে অথবা ডাইনে-বামে ঝুঁকবে না। দণ্ডের মতো সরল-সোজা হয়ে বসবে।

সিদ্ধাসন, পদ্মাসন ইত্যাদি যতপ্রকারের আসন আছে, আরোগ্যের দৃষ্টিতে সেগুলি সবই ধ্যানযোগের পক্ষে সহায়ক। কিন্তু ভগবান এই স্থানে সমস্ত আসনের সার কথা জানিয়েছেন—তা হল শরীর, মস্তক ও গ্রীবাকে সোজা স্থিরভাবে রাখা। তাই ভগবান বসার জন্য সিদ্ধাসন, পদ্মাসন ইত্যাদি কোনো আসনেরই নাম করেননি বা কোনো আসনের প্রতি আগ্রহও দেখাননি। তাৎপর্য হল যে, যে আসনেই বসা হোক না কেন, তাতে শরীর, মস্তক ও গ্রীবা যেন সমসূত্রে থাকে। কারণ এগুলি এক সূত্রে থাকলে মন খুব শীঘ্রই শান্ত এবং স্থির হয়।

আসনে বসলে যদি ঘুম আসতে থাকে, তবে উঠে কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক পায়চারি করতে হয়। আবার স্থির হয়ে বসে চিন্তা করতে হয় যে এবার আমি আর উঠব না বা এদিক-ওদিক করব না। এখন কেবল স্থির এবং সোজা হয়ে বসে ধ্যান করব।

'দিশশ্চানবলোকয়ন্'—দশ দিকের কোনো দিকেই দেখবে না ; কারণ এদিক-ওদিক দেখার জন্য গলা ঘোরালে ধ্যান হয় না, বিক্ষেপ হয়। তাই গ্রীবা (গলা) স্থির রাখবে।

'সম্প্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বম্'—নিজ নাসিকার অগ্রভাগ দেখতে থাকবে অর্থাৎ চোখ দুটিকে অর্ধনিমীলিত করে রাখবে। কারণ চোখ একেবারে বন্ধ করলে ঘুম আসবার সম্ভাবনা থাকে এবং চোখ খোলা থাকলে সামনের দৃশ্যাবলী চোখে পড়ে, তার প্রভাবে ধ্যানে বিক্ষেপ হবার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং নাকের অগ্রভাগ দেখার তাৎপর্য হল নেত্র অর্ধনিমীলিত করে রাখা।

'স্থিরঃ'—আসনে বসার পর শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন ইত্যাদিতে কোনোপ্রকার ক্রিয়া যেন না হয়। কেবল পাথরের মূর্তির মতো বসে থাকতে হয়। এইভাবে একটি আসনে কমপক্ষে তিন ঘন্টা স্থিরভাবে বসে থাকার অভ্যাস হলে ওই আসন সে জয় করবে অর্থাৎ সে 'জিতাসন' হবে।

পরিশিষ্ট-ভাব—এখানে নাসিকার অগ্রভাগকে দেখা মুখ্য নয়, বরং মনকে একাগ্র করাই হল মুখ্য।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—আসন স্থাপনা এবং আসনে বসার বিধি-নিয়ম জানিয়ে পরবর্তী দুটি শ্লোকে ফলসহ সগুণ-সাকার ধ্যানের প্রকার জানাচ্ছেন।

প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥ ১৪ ॥

[প্রশান্তাত্মা (যার অন্তঃকরণ) ; বিগতভীঃ (ভ্রমশূন্য) ; ব্রহ্মচারিব্রতে (যে ব্রহ্মচারিব্রতে) ; যুক্তঃ (ধ্যানযোগী) ; মনঃ (মনকে) ; সংযম্য (সংযত করে) ; মচ্চিত্তঃ (আমাতে চিত্ত) ; মৎপরঃ (আমার শরণাগত হয়ে) ; আসীত (উপবেশন করবে।)]

যিনি প্রশান্ত-চিত্ত, ভয়রহিত এবং ব্রহ্মচর্যশীল—এরূপ সতর্ক যোগী মনকে সংযত করে, আমাতে চিত্ত নিবিষ্ট করে, মৎপরায়ণ হয়ে স্থিত হবে ॥ ১৪ ॥

ব্যাখ্যা—**'প্রশান্তাত্মা'**—যার অন্তঃকরণ রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ বর্জিত, তিনিই **'প্রশান্তাত্মা'**। যাঁর সাংসারিক মান্যতা প্রাপ্ত করার, ঋদ্ধি বা সিদ্ধি প্রাপ্ত করা উদ্দেশ্য না হয়ে কেবল পরমাত্মপ্রাপ্তি করাই দৃঢ় উদ্দেশ্য হয়, তাঁর রাগ-দ্বেষ শিথিল হয়ে লয় হয়ে যায়। রাগ-দ্বেষ মিটে গেলে শান্তি স্বতঃই আসে, যা স্বতঃসিদ্ধ। তাৎপর্য হল এই যে, জগতের সঙ্গে সম্পর্ক হলেই সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি দ্বন্দ্ব উদ্ভূত হয় এবং এই দ্বন্দ্বের জন্যই মানসিক শান্তি ভঙ্গ হয়। এই দ্বন্দ্ব যখন দূর হয়ে যায় তখনই স্বতঃসিদ্ধ শান্তি প্রকটিত হয়। সেই স্বতঃসিদ্ধ শান্তি যিনি প্রাপ্ত হন, তাঁকেই বলা হয় **'প্রশান্তাত্মা'**।

'বিগতভীঃ'—শরীরকে 'আমি' বা 'আমার' বলে মনে করলেই রোগ-নিন্দা-অপমান-মৃত্যু ইত্যাদির ভয় উৎপন্ন হয়। কিন্তু যখন মানুষ শরীরের সঙ্গে এই 'আমি' ও 'আমার' ভাবটি ত্যাগ করে, তখন আর তার কোনো ভয় থাকে না। কারণ তার অন্তঃকরণে এই ভাব দৃঢ় হয়ে যায় যে, যদি এই শরীর বাঁচবার হয়, তাহলে তা বাঁচবেই—কেউ তাকে মারতে পারবে না, আর যদি এই শরীর গত হবার হয়, তাহলে তা হবেই—কেউ একে বাঁচাতে পারবে না। যদি মৃত্যু হয় তাহলে অত্যন্ত আনন্দের কথা ; কারণ

আমার চিত্তবৃত্তি পরমাত্মমুখী থাকায় আমার কল্যাণ হবেই! যখন কল্যাণে কোনো সন্দেহ নেই, তাহলে ভয় কীসের? এইভাবে সে সর্বপ্রকারে ভয় রহিত হয়ে যায়।

'ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ'—এখানে ব্রহ্মচারিব্রত বলতে কেবলমাত্র বীর্যরক্ষার কথা বলা হয়নি, বরং ব্রহ্মচর্য ব্রতের কথা বলা হয়েছে। তাৎপর্য হল এই যে, ব্রহ্মচারীদের জীবন যেমন গুরু আজ্ঞা অনুযায়ী সংযত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়, ধ্যানযোগীদের জীবনও তেমনি সংযত ও নিয়ন্ত্রিত রাখা উচিত। ব্রহ্মচারী যেমন, রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ—এই পাঁচটি বিষয় থেকে এবং নাম-যশ, মান ও শারীরিক সুখ আরাম থেকে দূরে থাকেন, তেমনি ধ্যানযোগীরও উপরিউক্ত আটটি বিষয়ের কোনোটিই ভোগবুদ্ধি বা রসবুদ্ধিতে উপভোগ করা উচিত নয়, নির্বাহবুদ্ধিতেই সব গ্রহণ করা উচিত। কারণ ভোগবুদ্ধি সহকারে উপভোগ করলে ধ্যানযোগে সিদ্ধিলাভ হয় না। তাই ধ্যানযোগীর ব্রহ্মচর্য ব্রতে স্থিত হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন।

ব্রতে স্থির থাকার অর্থ হল যে, অবস্থা পরিস্থিতি প্রভৃতি কোনো কারণেই কখনো বিন্দুমাত্র সুখবুদ্ধি সহকারে পদার্থগুলির উপভোগ যেন না হয়, তা সে ধ্যানের সময়েই হোক বা ব্যবহারিক সময়েই হোক। এতে সকল ইন্দ্রিয়েরই ব্রহ্মচর্য হয়।

'মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তঃ'—মনকে সংযত করে আমাতে নিবিষ্ট করো অর্থাৎ চিত্তকে জগতের দিক থেকে সর্বতোভাবে সরিয়ে কেবল আমার স্বরূপ চিন্তায়, আমার লীলা-গুণ-প্রভাব-মহিমা ইত্যাদির চিন্তায় ব্যাপৃত করো। তাৎপর্য এই যে, জাগতিক বস্তু-ব্যক্তি-পরিস্থিতি-ঘটনা ইত্যাদি নিয়ে মনে যা কিছু সংকল্প-বিকল্পরূপ চিন্তা আসে, তার থেকে মনকে সরিয়ে আমাতে নিবিষ্ট করো।

মনে যে সব চিন্তা হয়, তা প্রায়শঃই অতীত নিয়ে হয় এবং কিছু হয় ভবিষ্যৎ নিয়েও। কিন্তু সাধক বর্তমানে পরমাত্মাতে মন নিবিষ্ট করতে চান। যখন অতীতের কথা মনে আসবে, তখন মনে করবে যে ওই ঘটনা এখনকার নয় এবং ভবিষ্যতের কথা মনে এলে, ভাববে সেটিও এখনকার নয়। বস্তু-ব্যক্তি-পদার্থ-ঘটনা-পরিস্থিতি ইত্যাদি নিয়ে যেসব সংকল্প-বিকল্প হয়ে থাকে তা সবই ওই বস্তু-ব্যক্তি ইত্যাদির হয়, যা এখন নেই। আমার লক্ষ্য পরমাত্মাকে চিন্তা করা, সংসারের চিন্তা করা নয়। সুতরাং যে সংসারের চিন্তা হচ্ছে, তা আগে ছিল না, পরেও থাকবে না এবং এখনও নেই। কিন্তু যে পরমাত্মার চিন্তা করা উচিত, সেই পরমাত্মা আগেও ছিলেন, এখনও আছেন এবং পরেও থাকবেন। এইভাবে জাগতিক বস্তু ইত্যাদির চিন্তা থেকে মনকে সরিয়ে পরমাত্মাতে নিবিষ্ট করা উচিত। কারণ অতীতের যতই চিন্তা আসুক না কেন তাতে লাভ কিছু হয় না এবং ভবিষ্যতের যাই চিন্তা করা হোক সে কাজ বর্তমানে করা সম্ভব নয়, এরূপে অতীত-ভবিষ্যতের চিন্তা হতে থাকলে এখন যে ধ্যান করা হচ্ছে, সেটিও সম্ভবপর হয় না, কাজেই বৃথা চিন্তায় সবদিক থেকেই নিঃস্ব হব।

'যুক্তঃ'—ধ্যান করবার সময় সতর্ক থাকবে অর্থাৎ মনকে সংসার থেকে সরিয়ে ভগবানে নিবিষ্ট করার জন্য সর্বদা সাবধান এবং জাগ্রত থাকবে। ধ্যানে কখন প্রমাদ বা আলস্য আসতে দেবে না। তাৎপর্য হল যে একান্তে বা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ভগবানে মন নিবিষ্ট রাখার সচেতনা সবসময় বজায় রাখবে। কারণ চলা-ফেরায়, কাজে-কর্মে সজাগ এবং একাগ্র থাকলে মন প্রফুল্ল থাকে এবং মন প্রফুল্ল থাকলে ব্যবহারিক সময়েও মনসংযোগ করতে সুবিধা হয়। তাই এই দুটি একে অপরের সহায়ক অর্থাৎ ব্যবহারকালের সাবধানতা একান্তে এবং একান্তের সাবধানতা ব্যবহারকালে সহায়ক হয়।

'আসীত মৎপরঃ'—কেবলমাত্র ভগবদ্পরায়ণ হয়ে আসন গ্রহণ করবে অর্থাৎ উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, ধ্যেয় যেন শুধু ভগবানই হন। ভগবান-ব্যতীত কোনো জাগতিক কামনা-বাসনা-স্পৃহা-মমতা যেন না থাকে।

এই অধ্যায়ের দশম শ্লোকে **'যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ'** পদটির দ্বারা ধ্যানযোগের যে উপক্রম করেছিলেন, সেটিই এইস্থানে **'যুক্ত আসীত মৎপরঃ'** পদের দ্বারা বলা হয়েছে।

পরিশিষ্ট-ভাব— নিজ বৈশিষ্ট্য মানলে আসুরী সম্পদ আসে। তাই ভগবান **'মৎপরঃ'** পদের দ্বারা ধ্যানযোগীদেরও তাঁর শরণাগত হওয়ার কথা বলেছেন। ভগবদ্পরায়ণ হলে ভগবানের শক্তির সাহায্যে বিকার শীঘ্র দূর হয় এবং অহংভাবও থাকে না। ভক্তির এটিই হল বৈশিষ্ট্য।

এই শ্লোকে **'মন'** এবং **'চিত্ত'** এই দুটি সমানার্থক পদ ব্যবহৃত হয়েছে। **'মন'** দ্বারা কোনো বস্তুর বারংবার মনন করা যায় এবং **'চিত্তের'** সাহায্যে কোনো একটি বস্তুরই চিন্তা করা সম্ভব হয়। সুতরাং এখানে উদ্ধৃত **'মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তঃ'** পদটির তাৎপর্য হল যে, জ্ঞাত সংসার নিয়ে মনন করা উচিত নয় অর্থাৎ মনকে জাগতিক বিষয় থেকে সরিয়ে একাগ্রচিত্ত হয়ে শুধুমাত্র ভগবানের কথা চিন্তা করা উচিত অর্থাৎ চিত্তকে ভগবানে নিয়োজিত করতে হবে।

***

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি॥ ১৫ ॥

[**নিয়তমানসঃ** (মন নিয়ন্ত্রণকারী) ; **যোগী** (যোগী) ; **আত্মানম্** (মনকে) ; **এবম্** (এইভাবে) ; **সদা** (সর্বদা) ; **যুঞ্জন্** (স্থিত করে) ; **মৎসংস্থানম্** (আমাতে) ; **নির্বাণপরমাম্** (যে নির্বাণরূপ পরম) ; **শান্তিম্** (শান্তি আছে) ; **অধিগচ্ছতি** (প্রাপ্ত হন।)]

মন নিয়ন্ত্রণকারী যোগী মনকে এইভাবে সর্বদা পরমাত্মায় স্থিত করে আমাতে যে নির্বাণরূপ পরম শান্তি আছে, তা প্রাপ্ত হন ॥ ১৫ ॥

ব্যাখ্যা—**'যোগী নিয়তমানসঃ'**—যাঁর মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ (জোর) থাকে, সে হল **'নিয়তমানসঃ'**। সাধকের যখন শুধু পরমাত্মাই উদ্দেশ্য হয়, তখনই তিনি 'নিয়তমানস' হতে পারেন। পরমাত্মা ভিন্ন তাঁর আর কারো সঙ্গে সম্পর্ক থাকে না। কারণ যতক্ষণ জগৎ-সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে, ততক্ষণ তাঁর মন নিয়ন্ত্রিত হতে পারে না।

সাধকের একটি বড় ভুল হল যে তিনি নিজেকে কোনো উপাধিযুক্ত বলে মনে করেন এবং সাধন করতে থাকেন ধ্যানযোগের, যার ফলে ধ্যানযোগের সিদ্ধি শীঘ্র হয় না। সুতরাং সাধকের উচিত যে তিনি যেন নিজেকে গৃহস্থ, সাধু, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ইত্যাদি কোনো বর্ণ বা আশ্রমের উপাধিযুক্ত মনে না করে কেবল মনে করেন যে 'আমি তো শুধু ধ্যান করতে চাই। ধ্যানের সাহায্যে পরমাত্মাকে লাভ করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। জাগতিক সিদ্ধি প্রাপ্ত করা আমার উদ্দেশ্য নয়।' এইভাবে অহংভাব পরিবর্তিত হলে মন স্বাভাবিকভাবে স্থির হয়। কারণ অহংভাব যেখানে থাকে সেখানেই অন্তঃকরণ ও বহিঃকরণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি স্ফূর্ত হয়।

'যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানম্'—দশম শ্লোকের **'যোগী যুঞ্জিত সততম্'** পদ থেকে চতুর্দশ শ্লোকের **'যুক্ত আসীত মৎপরঃ'** পদ পর্যন্ত ধ্যানের অর্থাৎ মন নিবিষ্ট করার যে বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলি সব এখানে **'এবম্'** পদের অন্তর্ভূক্ত ধরতে হবে।

'যুঞ্জন্ আত্মানম্'-এর তাৎপর্য হল মনকে সংসার থেকে সরিয়ে পরমাত্মায় স্থিত করা উচিত।

'সদা'র তাৎপর্য হল এই যে, প্রত্যহ নিয়মিতভাবে ধ্যানযোগের অভ্যাস করা উচিত। কখনো যোগের অভ্যাস করা হল আবার কখনো করা হল না—এরূপ হলে ধ্যানযোগে শীঘ্র সিদ্ধি হয় না। অন্য অর্থ হল এই যে, পরমাত্মাকে প্রাপ্তির লক্ষ্য ব্যবহারিক জীবনে অথবা একান্তে—সর্বক্ষণ ধরে রাখা উচিত।

'শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি'—ভগবানে যে প্রকৃত স্থিতি হয়, যা প্রাপ্ত হলে আর কিছুই পাবার বাকি থাকে না, তাকেই এখানে **'নির্বাণপরমা শান্তি'** নামে উল্লেখ করা হয়েছে। ধ্যানযোগী এরূপ নির্বাণরূপ পরম শান্তি প্রাপ্ত হন।

একটি হল **'নির্বিকল্প স্থিতি'** অন্যটি হল **'নির্বিকল্প বোধ'**। ধ্যানযোগের দ্বারা প্রথমে **'নির্বিকল্প স্থিতি'** হয়, তারপরে **'নির্বিকল্প বোধ'** আসে। এই নির্বিকল্প বোধকে এইস্থানে **'নির্বাণপরমা শান্তি'** নামে অভিহিত করা হয়েছে।

শান্তি দুই প্রকারের—শান্তি এবং পরম শান্তি। সংসার ত্যাগে (সম্পর্ক বিচ্ছেদে) **'শান্তি'** হয় এবং পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তি হলে **'পরম শান্তি'** লাভ হয়। এই পরম শান্তিকেই গীতায় **'নৈষ্ঠিকী শান্তি'** (৫।১২), **'শশ্বচ্ছান্তি'** (৯।৩১) ইত্যাদি নামে এবং এইখানে নির্বাণপরমা শান্তি নামে বলা হয়েছে।

***

সম্বন্ধ—এবার পরবর্তী দুটি শ্লোকে ধ্যানযোগের উপযোগী নিয়মগুলি ক্রমশ ব্যতিরেক এবং অন্বয়-রীতি সহযোগে বর্ণনা করেছেন।

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতি স্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জুন॥ ১৬ ॥

[অর্জুন (হে অর্জুন !) ; যোগঃ (যোগ) ; অতি (অধিক) ; অশ্নতঃ (ভোজনকারী) ; চ (অথবা) ; একান্তম্ (একেবারে) ; অনশ্নতঃ (অনাহারী) ; চ (কিংবা) ; অতি (অধিক) ; স্বপ্নশীলস্য (নিদ্রালু) ; চ (বা) ; জাগ্রতঃ (জাগরণশীল) ; ন, অস্তি (সিদ্ধ হয় না।)]

হে অর্জুন ! এই যোগ যারা অত্যধিক ভোজন করেন বা যারা একান্ত অনাহারী কিংবা যারা অতিশয় নিদ্রালু বা অতি জাগরণশীল তাদের দ্বারা সিদ্ধ হয় না ॥ ১৬ ॥

ব্যাখ্যা—**'নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি'**—অধিকভোজনকারীর যোগ সিদ্ধ হয় না[১]। কারণ অধিক খাদ্য গ্রহণ করলে, অর্থাৎ ক্ষুধা ব্যতিরেকে আহার গ্রহণ করলে অথবা ক্ষুধার জন্য যা প্রয়োজন তার বেশি আহার্য গ্রহণ করলে বেশি জলতৃষ্ণা পায় এবং জল বেশি পান করতে হয়। বেশি আহার্য ও জল গ্রহণে পেট ভার হয়, পেট ভার হলে শরীরে আলস্য আসে ও বারংবার পেটের কথাই চিন্তা হতে থাকে। কোনো কাজ অথবা সাধন-ভজন-জপ-ধ্যান ইত্যাদিতে মন লাগে না। ভালোভাবে শোওয়া-বসা যায় না বা চলাফেরা করতেও ইচ্ছা হয় না। উপরন্তু অজীর্ণ ইত্যাদি অসুখ শরীরে আশ্রয় নেয়। সুতরাং অধিক ভোজনকারী ব্যক্তির যোগ সিদ্ধ কীভাবে হবে ? হওয়া সম্ভব নয়।

'ন চৈকান্তমনশ্নতঃ'—তেমনই একেবারেই যারা ভোজন করে না তাদেরও যোগ সিদ্ধ হয় না। কারণ আহার না করলে বারংবার সে কথাই মনে আসতে থাকে। শরীরের ক্ষমতা কমে যায়, দেহ শুকিয়ে যায়, অঙ্গ শিথিল হয়ে আসে, চলাফেরা কষ্টকর হয়, শুয়ে থাকতে মন চায়, জীবন কষ্টকর হয়। বসে যোগ অভ্যাস করাও তখন কঠিন মনে হয়। চিত্ত পরমাত্মাতে আকৃষ্ট হয় না। অতএব এইরূপ ব্যক্তির যোগ কীভাবে সিদ্ধ হবে ?

'ন চাতি স্বপ্নশীলস্য'—যার অতি ঘুমের স্বভাব থাকে, তার দ্বারাও যোগ সিদ্ধ হয় না। কারণ বেশি ঘুমালে অভ্যাস খারাপ হয়ে যায়, বারবার নিদ্রা এসে পীড়া দেয়। শোওয়াতে আরাম আর উঠলেই পরিশ্রম মনে হয়। অতিরিক্ত ঘুমের জন্য ঘুম তেমন গভীরও হয় না। নিদ্রা গভীর না হলে স্বপ্ন আসে, মনে নানাপ্রকার সংকল্প বিকল্প হতে থাকে। শরীর আলস্যে ভরা থাকে, আলস্যের জন্য বসতেও কষ্ট হয়। অতএব সে যোগের অভ্যাস করতেই অপারগ, তাহলে সে সিদ্ধিলাভ করবে কী ভাবে ?

'জাগ্রতো নৈব চার্জুন'—হে অর্জুন ! অতি নিদ্রায় যেমন যোগসিদ্ধি হওয়া সম্ভব হয় না তেমনই নিদ্রাহীনতায় যোগের সিদ্ধি কী করে হবে ? শরীরের প্রয়োজনীয় ঘুম না হলে, অনিদ্র শরীর নিয়ে আসনে বসলে নিদ্রা এসে যায়, যার ফলে সে যোগঅভ্যাস করতে সক্ষম হয় না।

সাত্ত্বিক ব্যক্তিদেরও কখনো কখনো সৎসঙ্গের, গভীর সাত্ত্বিক তত্ত্বকথা, ভগবদ্ আলোচনা অথবা ভক্ত চরিত্রের কথা বলতে বলতে বা শুনতে শুনতে রস এবং আনন্দের অনুভব হয়, তাহলেও নিদ্রা দূর হয়ে থাকে। কিন্তু তাঁদের এই জাগরণ অন্য প্রকারের হয় অর্থাৎ রাজসিক-তামসিক বৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির যেরূপ জাগরণ, সাত্ত্বিক ব্যক্তির জাগরণ সেরূপ নয়। এই জাগরণে সাত্ত্বিক ব্যক্তিরা যে আনন্দ পান, তাতে তাঁদের বিশ্রামের কাজ হয়ে যায়। সুতরাং সারারাত জেগে থাকলেও ঘুম তাঁদের কষ্টদায়ক হয় না। শুধু তাই নয়, এই জাগরণ তাঁদের গুণাতীত হতে সাহায্য করে। কিন্তু রাজসিক-তামসিক ব্যক্তিদের নিদ্রা না হলে অন্য সময়ে তাদের নিদ্রা উত্যক্ত করে এবং শরীর রোগগ্রস্ত করে।

এইভাবেই ভক্তজন ভগবানের নাম-জপে, কীর্তনে,

[১]অপরের খাবার থেকে নিজের খাবারের মাত্রা কম হলেও যদি নিজের ক্ষুধার তুলনায় খাদ্য বেশি গ্রহণ করা হয় তবে তাকে অতিভোজন বলা হয়।

ভগবদ্ বিরহে স্নান-খাওয়া বিস্মৃত হন, তাঁদের ক্ষুধা অনুভব হয় না, কিন্তু তাঁরা 'অনশ্নতঃ' নন। কারণ ভগবদ্মুখী হওয়ায় তাঁদের দ্বারা যে কাজই হয়, সেগুলি সবই 'সৎ' হয়।

*** *** ***

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥ ১৭ ॥

[দুঃখহা (দুঃখনাশক) ; যোগঃ (যোগ) ; যুক্তাহার বিহারস্য (পরিমিত আহার-বিহারকারী) ; কর্মসু (কর্মে) ; যুক্তচেষ্টস্য (যথাযথ চেষ্টা করেন) ; যুক্ত স্বপ্নাববোধস্য (যথাযথ নিদ্রিত ও জাগরিত থাকেন) ; ভবতি (হয়ে থাকে।)]

যাঁরা পরিমিত রূপ আহার ও বিহার করেন, কর্মে পরিমিতরূপ চেষ্টা করেন এবং পরিমিতরূপ নিদ্রিত ও জাগরিত থাকেন তাঁদেরই দুঃখনাশক যোগ সিদ্ধ হয়॥ ১৭ ॥

ব্যাখ্যা—**'যুক্তাহারবিহারস্য'**—আহার হবে সত্য এবং ন্যায়সঙ্গত উপায়ে উপার্জিত অর্থে এবং তা হবে সাত্ত্বিক ও পবিত্র। স্বাদবুদ্ধিতে বা পুষ্টিবুদ্ধিতে ভোজন যেন না হয়, তা হবে শুধু সাধনবুদ্ধি সহকারে। আহার ধর্মসঙ্গত এবং আয়ুর্বেদের দৃষ্টিতে করা উচিত এবং ততটাই করা উচিত যা সহজে হজম হবে। আহার শরীরের অনুকূল হবে এবং তা হাল্কা এবং পরিমিতরূপ (যতটা খাওয়া সম্ভব তার চেয়ে একটু কম) হবে—এরূপ আহারকারীকেই যুক্ত (যথোচিত) পরিমিত আহারী বলা হয়।

বিহার বা ঘোরাফেরাও পরিমিত হওয়া উচিত, অর্থাৎ বেশি ঘোরাফেরা করা উচিত নয়। স্বাস্থ্যের পক্ষে যতটা হিতকর তাই করা উচিত। ব্যায়াম-যোগাসন ইত্যাদি যেন অধিকমাত্রায় না হয় বা প্রয়োজনের তুলনায় কমও না হয়, সবই যেন পরিমিতরূপ হয়। এরূপ যাঁরা করেন তাঁদের যুক্তবিহারী বলা হয়।

'যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু'—নিজ বর্ণ-আশ্রম অনুযায়ী যেমন দেশ, কাল, পরিস্থিতি ইত্যাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই অনুসারে শরীর-নির্বাহের জন্য কর্ম করা এবং নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী আত্মীয়-স্বজনাদির এবং সমাজের হিতবুদ্ধিতে সেবা করা, পরিস্থিতি অনুযায়ী যেসব শাস্ত্রসম্মত কর্তব্য-কর্ম উপস্থিত হয় সেগুলি প্রসন্নভাবে করা। এইরূপ কর্মতে যার যথাযোগ্য চেষ্টা থাকে, তাকে এখানে 'যুক্তচেষ্ট' বলা হয়েছে।

'যুক্তস্বপ্নাববোধস্য'—ঘুম এমন হওয়া উচিত যাতে জাগরিত হলে নিদ্রা বা আলস্য কষ্ট না দেয়। দিনের বেলা জাগবে এবং রাত্রের প্রারম্ভে ও শেষভাগে জেগে থাকবে। রাত্রের মধ্যবর্তী সময়টুকু ঘুমাবে। আবার রাত্রে অনেকক্ষণ জেগে থাকলে ভোরে ঘুম ভাঙতে চায় না। সুতরাং তাড়াতাড়ি শোবে এবং তাড়াতাড়ি জাগবে। অর্থাৎ যে শয়ন এবং জাগরণে স্বাস্থ্যের হানি হয় না, যোগসাধনার বিঘ্ন ঘটে না, সেইরূপ পরিমিতরূপ শয়ন ও জাগরণ করা উচিত।

এখানে **'যুক্তস্বপ্নস্য'** বলে নিদ্রাবস্থাকেই যথোচিত বলা হলে যোগসিদ্ধিতে অন্তরায় হত না এবং পূর্বশ্লোকে কথিত 'অত্যধিক নিদ্রা এবং একেবারেই নিদ্রা না যাওয়া'—এর নিষেধ এইস্থানে 'যথোচিত নিদ্রা' বললেই হয়ে যেত, তাহলে এইস্থানে 'অববোধ' শব্দটি ব্যবহারের তাৎপর্য কী ? এখানে 'অববোধ' শব্দটি ব্যবহারের তাৎপর্য হল এই যে যার জন্য এই মনুষ্যজন্ম প্রাপ্তি হয়েছে, সেই কাজে লেগে যাওয়া, ভগবানে মনোনিবেশ করা অর্থাৎ জাগতিক সম্পর্কের ঊর্ধ্বে থেকে সাধনায় যথাসাধ্য সময় যাপন করা। এরই নাম জাগরণ।

এখানে ধ্যানযোগীর আহার, বিহার, প্রয়াস, শয়ন, জাগরণ—এই পাঁচটিকে 'যুক্ত' (পরিমিত) বলার তাৎপর্য হল এই যে বর্ণ, আশ্রম, দেশ, কাল, পরিস্থিতি, জীবিকা ইত্যাদি বিষয়ে সকলের একরকম নিয়ম হয় না। সুতরাং যার পক্ষে যেটি উচিত সে তেমন করলে দুঃখনাশক যোগ সিদ্ধ হয়।

'যোগো ভবতি দুঃখহা'—এইভাবে যথোচিত আহার, বিহার ইত্যাদি করলে ধ্যানযোগীর দুঃখ দূরকারী যোগ সিদ্ধ হয়।

যোগে এবং ভোগে বিশেষ পার্থক্য থাকে। যোগে ভোগের অত্যন্ত অভাব থাকে, কিন্তু ভোগে যোগের অত্যন্ত অভাব থাকে না। কারণ ভোগে যে সুখ হয়, সেই

সুখানুভূতিও অসতের সংযোগ দূর হলেই হয়। কিন্তু মানুষের দৃষ্টি সেই বিয়োগের দিকে না গিয়ে অসৎ-এর সংযোগের ওপরেই থাকে। তাই মানুষ ভোগকে বা সুখকে সংযোগজনিত বলে মনে করে এবং এরূপ মানার ফলেই তার ভোগাসক্তি উৎপন্ন হয়। সেইজন্য তার দুঃখনাশক যোগের সিদ্ধি হয় না। দুঃখনাশকারী যোগ সেটিই হয়, যেটিতে ভোগের একান্ত অভাব থাকে।

বিশেষ কথা

এই শ্লোকটি যদিও ধ্যানযোগীর উদ্দেশ্যে কথিত, তবুও সকল সাধকই এই শ্লোকটিকে নিজেদের কাজে লাগাতে পারেন এবং সেই অনুসারে নিজেদের জীবন গঠন করে উদ্ধার লাভ করতে পারেন। এই শ্লোকটিতে প্রধানতঃ চারটি বিষয় বলা হয়েছে—যুক্ত আহার-বিহার, যুক্ত কর্ম, যুক্ত নিদ্রা এবং যুক্ত জাগরণ। এই চারটি বিষয় সাধক কীভাবে কার্যকরী করবেন—এখন তা বিচার করা দরকার।

আমরা চব্বিশ ঘন্টা সময় পেয়েছি এবং আমাদের করার চারটি কাজ আছে। চব্বিশ ঘন্টাকে চার ভাগে ভাগ করলে প্রত্যেক কাজের জন্য আমরা ছ'ঘন্টা করে সময় পাই ; যেমন—১) আহার-বিহার অর্থাৎ খাওয়া, বেড়ানো এবং শারীরিক অত্যাবশ্যক কাজের জন্য ছয় ঘন্টা। ২) কর্ম অর্থাৎ চাষবাস, ব্যবসায়, চাকরি ইত্যাদি জীবিকা সম্বন্ধীয় কাজের জন্য ছয় ঘন্টা। ৩) ঘুমের জন্য ছয় ঘন্টা এবং ৪) জাগরণের জন্য অর্থাৎ ভগবদ্-প্রাপ্তির জন্য জপ-ধ্যান-সাধন-ভজন-কথকতা-কীর্তন ইত্যাদির জন্য ছয় ঘন্টা।

এই চারটি বিষয়েরও দুটি বিষয়ের দুটি বিভাগ আছে—এক বিভাগ হল 'উপার্জন' অর্থাৎ রোজগার করা এবং দ্বিতীয় বিভাগ হল ব্যয় অর্থাৎ খরচ করা। যুক্ত কর্ম এবং যুক্ত জাগরণ—এই দুটিই হল উপার্জনের বিষয়। যুক্ত আহার-বিহার ও যুক্ত নিদ্রা—এই দুটিই হল ব্যয়ের বিষয়। উপার্জন এবং ব্যয়—এই দু'টি ভাগের জন্য আমাদের কাছে দুই প্রকারের পুঁজি থাকে—(১) সাংসারিক ধন-ধান্য ও (২) পরমায়ু (জীবন)।

মানুষের পুঁজি

- (অর্থ ও সম্পদ) ধন-ধান্য
  - ব্যয়
    - আহার-বিহার
  - উপার্জন
    - জীবিকা সম্বন্ধীয় কর্ম
- (জীবন) পরমায়ু
  - ব্যয়
    - শয়ন (নিদ্রা)
  - উপার্জন
    - জাগরণ (সাধন-ভজন)

প্রথম পুঁজি—অর্থ-সম্পদের সম্পর্কে যদি বিচার করা হয় তাহলে দেখা যায় উপার্জন বেশি করলে চলে, কিন্তু উপার্জনের থেকে খরচ বেশি হলে চলে না। তাই আহার-বিহার ছয় ঘন্টার পরিবর্তে চার ঘন্টায় কাজ সেরে চাষ-বাস, ব্যবসা ইত্যাদিতে আট ঘন্টা ব্যয় করা উচিত। অর্থাৎ আহার-বিহারের সময় কম করে জীবিকা সম্বন্ধীয় কার্যে অধিক সময় ব্যয় করা উচিত।

দ্বিতীয় পুঁজি—আয়ুর সম্পর্কে বিচার করলে দেখা যায় যে নিদ্রায় আয়ুষ্কাল বৃথাই ব্যয়িত হয়। সুতরাং নিদ্রায় ছয় ঘন্টা ব্যয় না করে চার ঘন্টায় কার্য সম্পন্ন করতে হয় এবং জপ-তপ-ভজনে আট ঘন্টা সময় দেওয়া উচিত। অর্থাৎ নিদ্রাতে যত কম সময় দিলে শরীর ঠিক থাকে সেটুকু সময় দিয়ে, বাকি সময়কে ভগবৎ চিন্তায় লাগাতে হয়। এই উপার্জনের (সাধন-ভজনের) মাত্রা দিনে দিনে বাড়ানো উচিত । কারণ আমরা এখানে সাংসারিক অর্থ-সম্পদ উপার্জন করতে আসিনি, আমরা এসেছি ভগবদ্‌প্রাপ্তির জন্য। তাই অন্য কাজের থেকে যতটা সময় আমরা বাঁচাতে পারি, তা দিয়ে আমাদের বেশিক্ষণ সাধন-ভজন করা কর্তব্য।

দ্বিতীয়তঃ জীবিকা সম্পর্কীয় কাজ করার সময়েও ভগবানকে স্মরণে রাখা উচিত এবং শয়নের সময়ও ভগবদ্ স্মরণ করা উচিত। শয়নের সময় ভাবতে হবে যে

এতক্ষণ চলাফেরা ও বসার সময় ভজন করেছি এবার শুয়ে ভজন করব। শুয়ে শুয়ে ভজন করার সময় ঘুম আসে তো আসুক, কিন্তু শুধুমাত্র ঘুমোবার জন্য ঘুমানোর চেষ্টার দরকার নেই। এইভাবে শুয়ে ভগবদ্ স্মরণ করার সময় পূর্ণ হলে আবার উঠে ভজন-ধ্যান, সৎসঙ্গ-স্বাধ্যায় করবে, তাহলে সমস্ত কাজই ভজন হয়ে উঠবে।

পরিশিষ্ট-ভাব—ষোড়শ এবং সপ্তদশ শ্লোক ধ্যানযোগীর পক্ষে উপযোগী তো বটেই, অন্যান্য যোগীদের (সাধকদের) পক্ষেও এটি অত্যন্ত উপযোগী।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—আগের দুটি শ্লোকে ধ্যানযোগের জন্য অন্বয়-ব্যতিরেক রীতিতে প্রধান নিয়ম জানিয়েছেন। এখন এরূপ নিয়ম পালনকালে স্বরূপধ্যানকারী সাধকের কীরূপ স্থিতি হয়, পরের শ্লোকে তাই জানাচ্ছেন।

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিঃস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা॥ ১৮ ॥

[বিনিয়তম্ (বশীভূত) ; চিত্তম্ (চিত্ত) ; যদা (যখন) ; আত্মনি, এব (নিজ স্বরূপেই) ; অবতিষ্ঠতে (অবস্থিত হয়ে যায়) ; সর্বকামেভ্যঃ (সব পদার্থে) ; নিঃস্পৃহঃ (নিঃস্পৃহ) ; তদা (তখন) ; যুক্তঃ (তাঁকে) ; ইতি (এইরূপ) ; উচ্যতে (বলা হয়।)]

বশীভূত চিত্ত যখন নিজ স্বরূপে অবস্থান করে এবং সকল পদার্থে যোগী কামনাশূন্য হন তখন তাঁকে যোগসিদ্ধ বলা হয় ॥ ১৮ ॥

ব্যাখ্যা—[এই অধ্যায়ের দশম থেকে ত্রয়োদশ শ্লোক পর্যন্ত সকল ধ্যানযোগী সাধকদের আসন পাতার এবং তাতে বসার বিধিনিয়মগুলি জানানো হয়েছে। চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ শ্লোকে সগুণ-সাকারের ধ্যানের ফল সহযোগে বর্ণনা করা হয়েছে। আবার ষোড়শ-সপ্তদশ শ্লোকে সমস্ত সাধকের পক্ষে উপযোগী নিয়মগুলি জানানো হয়েছে। এবার এই শ্লোকটি (অষ্টাদশ) থেকে তেইশতম শ্লোক পর্যন্ত স্বরূপের ধ্যানের ফলসহ বর্ণনা করা হয়েছে।]

'যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে'—বিশেষভাবে বশীভূত চিত্ত[১] অর্থাৎ সংসারের চিন্তন থেকে রহিতচিত্ত যখন নিজ স্বরূপে স্থিত হয়ে যায়। তাৎপর্য হল যে, যখন এই সব কিছু ছিল না, তখনও যা ছিল আবার যখন এসব কিছু থাকবে না, তখনও যা থাকবে এবং সবকিছু সৃষ্টি হওয়ার আগে যা ছিল, সবকিছু ধ্বংস হবার পরেও যা থাকবে এবং এখনও যেমনকার তেমনই রয়েছে, সেই নিজ স্বরূপে চিত্ত স্থিতি লাভ করে। নিজ স্বরূপে যে রস ও আনন্দ আছে তা এই মন কখনও কোথাও প্রাপ্ত হয়নি। অতএব সেই রস ও আনন্দ প্রাপ্ত হলে মন তাতেই লীন হয়ে যায়।

'নিঃস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা'—আবার যখন সে প্রাপ্ত-অপ্রাপ্ত, দৃষ্ট-অদৃষ্ট, ইহলৌকিক-পারলৌকিক, শ্রুত-অশ্রুত ইত্যাদি সমস্ত পদার্থ ও ভোগে নিঃস্পৃহ হয় অর্থাৎ তার কোনো পদার্থ বা ভোগের জন্য কোনো আকাঙ্ক্ষা থাকে না, তখন তাকে 'যোগী' বলা হয়।

এখানে 'যদা' এবং 'তদা' পদ ব্যবহারের তাৎপর্য হল এই যে, তিনি এতদিন ধরে, এত মাস ধরে বা এত বছর ধরে যে যোগী হবেন—এমন কোনো নিয়ম নেই, বরং যে মুহূর্তে বশীভূত চিত্ত স্বরূপে স্থিতিলাভ করে এবং সমস্ত বিষয়ে নিঃস্পৃহ হয়ে যায়, সেই মুহূর্তে তিনি যোগী হয়ে যান।

---

[১]ক) চিত্তের পাঁচটি অবস্থা বা বৃত্তি আছে মনে করা হয়—মূঢ়, ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র এবং নিরুদ্ধ। এর মধ্যে 'মূঢ়' এবং 'ক্ষিপ্ত' চিত্তবৃত্তির ব্যক্তি যোগের অধিকারী হতে পারে না। চিত্ত কখনও স্বরূপে স্থিত হয় আবার কখনো হয় না—এরূপ বিক্ষিপ্ত চিত্তবৃত্তির মানুষ যোগের অধিকারী হয়। চিত্তবৃত্তি যখন 'একাগ্র' হয় তখনই সবিকল্প সমাধি হয়। একাগ্রবৃত্তির পরে যখন চিত্ত 'নিরুদ্ধ' অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন নির্বিকল্প সমাধি হয়। এই নির্বিকল্প সমাধিকেই 'যোগ' বলা হয়েছে। এইস্থানে ভগবান 'বিনিয়তং চিত্তম্' পদের দ্বারা একাগ্রবৃত্তি অর্থাৎ সবিকল্প সমাধির সঙ্কেত দিয়েছেন।

খ) এই অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে যাকে 'নিয়তমানসঃ' বলা হয়েছে, তাঁর সেই অবস্থার বর্ণনা এখানে করা হয়েছে।

বিশেষ কথা

এই শ্লোকে দুটি বিশেষ কথা বলা হয়েছে—এক, চিত্তের স্বরূপে স্থিতিলাভ করা এবং দুই, সকল বস্তুতে নিঃস্পৃহ হওয়া। তাৎপর্য হল এই যে, চিত্ত স্বরূপে মগ্ন হতে হতে যখন স্বরূপেই স্থিতিলাভ করে, তখন মনে কোনো বস্তু, ব্যক্তি, পরিস্থিতি ইত্যাদির চিন্তা আসে না, মন তখন স্বরূপেই লীন হয়ে যায়। এই প্রকার স্বরূপে মন লীন হয়ে থাকলে ধ্যানযোগীর বাসনা, কামনা, আশা, তৃষ্ণা ইত্যাদি সর্বতোভাবে রহিত হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, তিনি জীবন-নির্বাহের উপযোগী বস্তুর প্রয়োজনবোধ থেকেও নিঃস্পৃহ হয়ে যান। তাঁর মনে কোনো বস্তু ইত্যাদির বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষা থাকে না, তখনই তিনি প্রকৃত যোগী হন।

এই অবস্থার সঙ্কেত দেওয়া হয়েছে প্রথমে চতুর্থ শ্লোকে কর্মযোগীর জন্য যে, যখন ইন্দ্রিয়াদির ভোগে এবং ক্রিয়াতে কোনো আসক্তি থাকে না বরং সমস্ত সংকল্প পরিত্যক্ত হয়, তখন তাঁকে বলা হয় যোগারূঢ় (৬।৪)। ওই স্থানের এবং এই স্থানের প্রসঙ্গের পার্থক্য হল এই যে, ওই স্থানে কর্মযোগী অপরের সেবার জন্য কর্ম করেন, তাই তাঁর ক্রিয়া ও পদার্থ থেকে আসক্তি দূর হয়ে যায় এবং তিনি যোগারূঢ় হন। আর এইস্থানে ধ্যানযোগী চিত্তকে স্বরূপে স্থিত করেন, তাই তাঁর চিত্ত শুধু স্বরূপেই স্থিত হয় এবং তিনি ক্রিয়া ও পদার্থে নিঃস্পৃহ হন। তাৎপর্য হচ্ছে যে, কর্মযোগীর কামনা প্রথমে দূর হয় এবং তারপর তিনি যোগারূঢ় হন আর ধ্যানযোগীর চিত্ত প্রথমে স্বরূপে স্থিতিলাভ করে, তারপর তাঁর কামনা দূর হয়। কর্মযোগীর মন জগতের সেবায় ব্যাপৃত হয় আর চিত্ত স্বরূপে স্থিত হয় আর ধ্যানযোগীর চিত্ত মনের সহযোগে স্বরূপে স্থিতি হয়।

* * *

সম্বন্ধ—স্বরূপস্থিত চিত্তের স্থিতি কিরূপ হয়—পরবর্তী শ্লোকে আলোর দৃষ্টান্ত দিয়ে স্পষ্ট জানাচ্ছেন।

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ॥ ১৯ ॥

[যথা (যেমন) ; নিবাতস্থঃ (বায়ুর স্পন্দনহীন স্থানে) ; দীপঃ (আলোর শিখা) ; ন, ইঙ্গতে (চাঞ্চল্যরহিত থাকে) ; যোগম্, যুঞ্জতঃ (যোগাভ্যাসকারী) ; যতচিত্তস্য (সংযতচিত্ত) ; যোগিনঃ (যোগীর) ; আত্মনঃ (চিত্তেরও) ; সা (সেইরূপই) ; উপমা (উপমা) ; স্মৃতা (দেওয়া হয়ে থাকে।)]

নিষ্কম্প বায়ুর স্থানে যেমন আলোর শিখা চাঞ্চল্যরহিত থাকে, যোগাভ্যাসকারী সংযত চিত্ত যোগীর চিত্তেরও সেইরূপই উপমা দেওয়া হয়॥ ১৯ ॥

ব্যাখ্যা—**'যথা দীপো ...... যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ'**—যেমন সম্পূর্ণভাবে বায়ুর স্পন্দনহীন স্থানে রক্ষিত প্রদীপের শিখা আন্দোলিত হয় না, তেমনই যিনি যোগাভ্যাস করেন, যাঁর মন স্বরূপের চিন্তায় ব্যাপৃত এবং যাঁর চিত্ত নিজ বশীভূত, সেই ধ্যানযোগীর চিত্তের সঙ্গে প্রদীপের শিখার উপমা দেওয়া হয়েছে। তাৎপর্য হল এই যে, এই যোগীর চিত্ত স্বরূপে এমনভাবে স্থিত হয়েছে যে স্বরূপ ভিন্ন অন্য কিছু তাঁর চিন্তার বিষয় হয় না।

আগের শ্লোকে যোগীর যে চিত্তকে বিনিয়ত (সংযত) বলা হয়েছে সেই বশীভূত-চিত্ত যোগীর উদ্দেশ্যে এখানে **'যতচিত্তস্য'** পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

কোনো স্থানই সর্বতোভাবে বায়ুশূন্য হয় না। বায়ু সর্বত্র থাকে। এই বায়ু কোথাও স্পন্দনরূপে থাকে কোথাও বা নিঃস্পন্দভাবে থাকে। সেইজন্য এখানে **'নিবাতস্থঃ'** পদটি বায়ু না থাকার বাচক নয়, এটি বায়ুর নিষ্কম্প অবস্থার বাচক।

এইস্থানে উপমেয় চিত্তকে পর্বত ইত্যাদি স্থির, অচল বস্তুর সঙ্গে উপমা না দিয়ে প্রদীপের শিখার উদাহরণ কেন দেওয়া হয়েছে ? প্রদীপের শিখা স্পন্দিত বায়ুতে আন্দোলিত হতে পারে, কিন্তু পর্বত কখনো নড়ে না। অতএব পর্বতের উদাহরণই দেওয়া উচিত ছিল ! এর উত্তরে বলা যায় যে, পর্বত স্বভাবতঃই স্থির, অচল এবং

প্রকাশহীন আর প্রদীপের শিখার স্বভাবই চঞ্চল এবং প্রকাশমান। চঞ্চল বস্তুকে স্থির রাখা বিশেষ কঠিন ব্যাপার। চিত্তও প্রদীপের শিখার ন্যায় স্বভাবে চঞ্চল, তাই চিত্তের সঙ্গে প্রদীপের শিখার উপমা দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ, প্রদীপের শিখা যেমন দীপ্যমান হয়, তেমনি যোগীর চিত্তে পরমাত্মতত্ত্ব জাগ্রত হয়। এই জাগৃতি সুষুপ্তি থেকেও বিশেষরূপ। যদিও সুষুপ্তি এবং সমাধি—জগৎ-সংসার সম্বন্ধে নিবৃত্তি এই দুটিতেই সমান মনে হয়, কিন্তু সুষুপ্তিতে চিত্তবৃত্তি অবিদ্যায় লীন হয়ে যায়। অতএব সেই অবস্থায় স্বরূপের প্রকাশ হয় না। অপরপক্ষে সমাধিতে চিত্তবৃত্তি জাগ্রত থাকে। তাই এখানে প্রদীপের শিখার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। এই কথাটি চতুর্থ অধ্যায়ের সাতাশতম শ্লোকে 'জ্ঞানদীপিতে' পদ দ্বারা বলা হয়েছে।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—যে অবস্থা হলে পূর্ণত্ব প্রাপ্তি হয়, পরবর্তী শ্লোকে সেটি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি।। ২০ ॥

[**যোগসেবয়া** (যোগাভ্যাস করলে) ; **যত্র** (যে অবস্থায়) ; **নিরুদ্ধম্, চিত্তম্** (নিরুদ্ধ চিত্ত) ; **উপরমতে** (উপরত হয়) ; **চ, যত্র** (এবং যে অবস্থায়) ; **আত্মনা** (নিজ স্বরূপ দ্বারা) ; **আত্মানম্** (নিজের আমিকে) ; **পশ্যন্** (দেখে) ; **আত্মনি, এব** (নিজ স্বরূপ মধ্যেই) ; **তুষ্যতি** (পরিতুষ্টি লাভ করে।)]

যোগাভ্যাস করলে যে অবস্থায় নিরুদ্ধ-চিত্ত নিবৃত্ত হয় এবং যে অবস্থায় নিজের স্বরূপে নিজের 'আমি'কে দেখে নিজেই নিজেতে পরিতুষ্টি লাভ করে ॥ ২০ ॥

ব্যাখ্যা—'যত্রোপরমতে চিত্তং...........পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি'—ধ্যানযোগে আগে ধারণা হয় যে, মনকে শুধুমাত্র স্বরূপেই স্থিত করতে হবে। এরূপ ধারণা হলে স্বরূপ ছাড়া অন্য কোনো বৃত্তি যদি উৎপন্ন হয়েও যায়, তবে সেটি উপেক্ষা করে চিত্তকে কেবলমাত্র স্বরূপেই স্থিত করলে যখন মনের গতি কেবল স্বরূপেই স্থিত হয়, তখন তাকে ধ্যান বলা হয়। ধ্যানের সময় ধ্যাতা, ধ্যান এবং ধ্যেয়—এই ত্রিপুটি থাকে অর্থাৎ সাধক ধ্যান করার সময় নিজেকে ধ্যাতা (ধ্যানকারী) বলে মনে করে, স্বরূপে তন্ময় বৃত্তিকে ধ্যান বলে মনে করে এবং সাধ্যরূপ স্বরূপকে ধ্যেয় বলে মনে করে। তাৎপর্য হল এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত এই তিনটির পৃথক পৃথক জ্ঞান থাকে, ততক্ষণ তাকে 'ধ্যান' বলা হয়। ধ্যানে ধ্যেয়ের প্রাধান্য থাকায় প্রথমাবস্থায় সাধক নিজের ধ্যাতা ভাবটি ভুলে যান। পরে ধ্যানের বৃত্তিও ভুলে যান। শেষে শুধুমাত্র ধ্যেয়ই জেগে থাকে। একে বলা হয় 'সমাধি'। চিত্তের এটি হল সংপ্রজ্ঞাতসমাধি—যা একাগ্র অবস্থায় হয়। এই সমাধি দীর্ঘকাল অভ্যাস করলে পরে **'অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি'** হয়। এই দুটি সমাধির মধ্যে পার্থক্য হল এই যে, যতক্ষণ ধ্যেয়, ধ্যেয়ের নাম এবং নাম-নামী সম্বন্ধ—এই তিনটি বীজ থাকে, ততক্ষণ একে **'সংপ্রজ্ঞাত সমাধি'** বলা হয়। একে বলা হয় চিত্তের 'একাগ্র' অবস্থা। কিন্তু যখন নামের স্মৃতি না থেকে কেবল নামী (ধ্যেয়) থেকে যায়, তখন তা **'অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি'** হয়। একেই বলা হয় চিত্তের 'নিরুদ্ধ' অবস্থা।

নিরুদ্ধ অবস্থায় দু'প্রকার সমাধি হয়—সবীজ এবং নির্বীজ। যাতে সংসারের বাসনা সূক্ষ্মভাবে থাকে, তাকে বলা হয় 'সবীজ সমাধি'। সূক্ষ্ম বাসনা থাকায় সবীজ সমাধিতে সিদ্ধি প্রকটিত হয়। সাংসারিক দৃষ্টিতে এই তথাকথিত সিদ্ধিকে ঐশ্বর্য বলা হলেও, পারমার্থিক দৃষ্টিতে (চেতন-তত্ত্বের প্রাপ্তিতে) এগুলি বিঘ্নস্বরূপ। ধ্যানযোগী যখন এই সিদ্ধি নিস্তত্ত্ব বলে জেনে এর থেকে বিরত হন, তখন তাঁর 'নির্বীজ সমাধি' হয়। এখানে (এই শ্লোকটিতে) **'নিরুদ্ধম্'** পদের দ্বারা এটিতে লক্ষ্য করানো হয়েছে।

ধ্যানে সংসারের সম্পর্ক থেকে বিমুখ হওয়ায় অপার শান্তি ও সুখ অনুভূত হয়, যা সাংসারিক সম্বন্ধ থেকে কখনো পাওয়া সম্ভব নয়। সংপ্রজ্ঞাত সমাধিতে তার থেকেও বিশেষ সুখ অনুভূত হয়। এই সংপ্রজ্ঞাত সমাধি থেকেও অসংপ্রজ্ঞাত সমাধিতে আরও বেশি সুখ অনুভূত

হয়। সাধক যখন নির্বীজ সমাধি অবস্থায় পৌঁছান তখন তিনি বিশেষভাবে সুখ ও আনন্দ অনুভব করেন। যোগাভ্যাস করতে করতে চিত্ত নিরুদ্ধ অবস্থা—নির্বীজ সমাধি থেকেও বিরত হয় অর্থাৎ যোগী ঐ নির্বীজ সমাধির সুখও ভোগ করেন না, ওই সুখের ভোক্তা হন না। সেই সময় তিনি নিজ স্বরূপে নিজেকেই অনুভব করে নিজে নিজেই সন্তুষ্ট হন।

'উপরমতে' পদটির অর্থ হল এই যে, সংসারে চিত্তের কোনো প্রয়োজন থাকে না আবার স্বরূপকেও তা ধারণ করতে পারে না। কারণ চিত্ত প্রকৃতির কার্য হওয়ায় সেটি হল জড়পদার্থ আর স্বরূপ হল চেতন। সুতরাং জড় চিত্ত, চেতন স্বরূপকে কীভাবে ধারণ করতে পারবে ? তা কখনই সম্ভব নয়। তাই সেটি বিরত হয়। চিত্ত বিরত হলে চিত্তের সঙ্গে সর্বতোভাবে যোগীর সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

'তুষ্যতি' বলার তাৎপর্য হল এই যে, তাঁর সন্তুষ্টির আর অন্য কোনো কারণ থাকে না। একমাত্র স্বরূপই তাঁর সন্তোষের কারণ হয়।

এই শ্লোকটির সার হল এই যে, নিজের সাহায্যে নিজের ভিতরেই নিজ স্বরূপের অনুভব হয়। এই তত্ত্ব নিজের ভিতর একইভাবে থাকে। কেবল সংসারের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মানার জন্য চিত্তবৃত্তিগুলি সংসারে লেগে থাকে, যার জন্য এই তত্ত্বের অনুভব হয় না। ধ্যানযোগের সাহায্যে যখন চিত্ত সংসার হতে বিচ্ছিন্ন হয়, তখন যোগীর চিত্ত হতে এবং সংসার হতে সর্বতোভাবে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। সর্বতোভাবে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হলেই তাঁর স্বতঃই নিজ স্বরূপের অনুভব হয়।

বিশেষ কথা

ধ্যানযোগে যে তত্ত্বপ্রাপ্তি হয়, সেই তত্ত্ব কর্মযোগেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু এই দুই সাধনায় কিছু পার্থক্য আছে। ধ্যানযোগে সাধকের চিত্ত যখন সমাধি সুখ থেকেও বিরত হয়, তখন তিনি নিজের মধ্যেই নিজে সন্তুষ্ট থাকেন। কর্মযোগে সাধক যখন নিজ মনোগত বাসনা সর্বতোভাবে ত্যাগ করেন, তখন তিনি আপনাতে আপনি তুষ্ট থাকেন (গীতা ২।৫৫)।

ধ্যানযোগে মন স্বরূপে স্থিত হলে মন তদাকার এবং সমাধি হয়। মন যখন সেই সমাধি থেকেও বিরত হয়, তখন যোগীর চিত্তের সঙ্গে সম্পর্কছেদ হয় এবং তিনি আপনাতে আপনি সন্তুষ্ট হন।

কর্মযোগে মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি, শরীর ইত্যাদি পদার্থ এবং সমস্ত ক্রিয়ার প্রবাহ কেবল অন্যের হিতের চিন্তায় থাকে, ফলে সমস্ত মনোবাসনা দূর হয়। কামনা ত্যাগ হলেই মন থেকে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয় এবং তিনি আপনাতে আপনি সন্তুষ্ট হন।

পরিশিষ্ট-ভাব—মন আত্মায় স্থিত হয় না বরং উপরাম হয়। কারণ মন ও আত্মা এক শ্রেণীর নয়, দুটি সম্পূর্ণ পৃথক শ্রেণীর। মন হল অপরা (জড়) প্রকৃতি আর আত্মা হল পরা (চেতন) প্রকৃতি। তাই আত্মাই আত্মাতে স্থিত হয়—**'আত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি।'**

নিজের মধ্যে নিজেকে দেখার তাৎপর্য হল এই যে আত্মতত্ত্ব পরসংবেদ্য নয়, এটি স্বসংবেদ্য। মনের দ্বারা যা চিন্তা করা হয়, তাতে মনের বিষয়ই (অনাত্মা) চিন্তায় আসে, পরমাত্মার নয়। বুদ্ধির দ্বারা যা স্থির করা হয়, তা বুদ্ধির বিষয়ই হয়, পরমাত্মার নয়। বাক্যদ্বারা যা বর্ণনা করা হয়, তা বাক্যের অন্তর্গত বিষয়ই হয়, পরমাত্মার নয়। অর্থাৎ মন-বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা প্রকৃতির (অনাত্মার) চিন্তন হয়ে থাকে, পরমাত্মার নয়। তাৎপর্য হল, মন-বুদ্ধি-বাক্য দ্বারা প্রকৃতির কার্য অর্থাৎ অনাত্মার চিন্তান, নিশ্চয় তথা বর্ণনা করা হয়। কিন্তু পরমাত্মার প্রাপ্তি এগুলি থেকে সর্বতোভাবে বিমুখ হলে অর্থাৎ সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হলে তবেই হয়।

এখানে ধ্যানযোগের সাহায্যে যে তত্ত্বপ্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে, দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চান্নতম শ্লোকে কর্মযোগের সাহায্যে সেই একই তত্ত্বপ্রাপ্তির কথা জানানো হয়েছে। এই দুই যোগের মধ্যে শুধু এই পার্থক্য বিদ্যমান যে ধ্যানযোগ হল করণ সাপেক্ষ আর কর্মযোগ করণ নিরপেক্ষ সাধন। করণ সাপেক্ষ সাধনে জড়ত্ব থেকে সম্পর্ক ছিন্ন হতে বিলম্ব হয় এবং এতে যোগভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে।

*** *** ***

---

[১]যদি শুধুমাত্র পরমাত্মপ্রাপ্তি করাই উদ্দেশ্য হয় তাহলে মন-বুদ্ধি-বাক্য দ্বারা চিন্তা, নিশ্চয় করা বা বর্ণনা করার দ্বারা অন্তরায়ের সৃষ্টি হয় না, উপরন্তু তা সাধনরূপেই পরিগণিত হয়। কিন্তু সাধক যদি তাতেই সন্তুষ্ট থাকেন এবং পূর্ণতা মেনে নেন, তাহলে তিনি তাতেই বাঁধা পড়েন।

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকটিতে বলা হয়েছে যে ধ্যানযোগী আপনাতে আপনি তুষ্টি অনুভব করেন। তারপর কী হয়—পরের শ্লোকটিতে তাই জানানো হচ্ছে।

সুখমাত্যন্তিকং　যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥ ২১ ॥

[**যৎ, সুখম্** (যে সুখ) ; **আত্যন্তিকম্** (অত্যন্ত) ; **অতীন্দ্রিয়ম্** (অতীন্দ্রিয়) ; **বুদ্ধিগ্রাহ্যম্** (বুদ্ধিগ্রাহ্য) ; **তৎ** (ওই সুখকে) ; **যত্র** (যে অবস্থায়) ; **বেত্তি** (অনুভব করায়) ; **চ, স্থিতঃ** (এবং স্থিতিলাভকারী) ; **অয়ম্** (ওই ধ্যানযোগী) ; **তত্ত্বতঃ** (তত্ত্ব হতে) ; **এব** (কখনো) ; **ন, চলতি** (বিচলিত হয় না।)]

যে সুখ আত্যন্তিক, অতীন্দ্রিয় এবং বুদ্ধিগ্রাহ্য এবং যে অবস্থায় ওই সুখ অনুভূত হয় তথা যে সুখে স্থিতিলাভকারী ধ্যানযোগী সেই তত্ত্ব হতে কখনো বিচলিত হন না ॥ ২১ ॥

ব্যাখ্যা—**'সুখমাত্যন্তিকংযৎ'**—ধ্যানযোগী আপনাতে আপনি যে সুখ অনুভব করেন, প্রাকৃত জগতে সেই সুখের থেকে বেশি আর কোনো সুখ হতে পারে না। হওয়া সম্ভবও নয়। কারণ এই সুখ ত্রিগুণাতীত এবং স্বতঃসিদ্ধ। এই হল সম্পূর্ণ সুখের শেষ কথা—**'সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ'**। এই সুখকেই অক্ষয় সুখ (৫।২১), অত্যন্ত সুখ (৬।২৮) এবং ঐকান্তিক সুখ (১৪।২৭) বলা হয়েছে।

এই সুখকে এখানে 'আত্যন্তিক' বলার তাৎপর্য হল এই যে, এই সুখ সাত্ত্বিক সুখের থেকেও বিশেষ প্রকারের। কারণ সাত্ত্বিক সুখ উৎপন্ন হয় পরমাত্ম-বিষয়ক বুদ্ধির প্রশান্তি থেকে (গীতা ১৮।৩৭), কিন্তু আত্যন্তিক সুখ উৎপন্ন হয় না, এটি স্বতঃসিদ্ধ, উৎপন্ন না-হওয়া সুখ।

'অতীন্দ্রিয়ম্'—এই সুখকে ইন্দ্রিয়াতীত বলার তাৎপর্য হল এই যে, এটি রাজসিক সুখেরও অতীত, বিশেষ সুখ। রাজসিক সুখ উৎপন্ন হয় জাগতিক বস্তু-ব্যক্তি-পদার্থ-পরিস্থিতির সম্পর্ক থেকে এবং সেটি ইন্দ্রিয় দ্বারা ভোগ করা হয়। বস্তু-ব্যক্তি ইত্যাদি প্রাপ্তি হওয়া আমাদের আয়ত্তে নেই এবং সেগুলির প্রাপ্তি হলে এই সুখভোগ ওই বিষয়ের (বস্তু-ব্যক্তি ইত্যাদির) আয়ত্তাধীন হয়। সুতরাং রাজসিক সুখে পরাধীনতা থাকে। কিন্তু আত্যন্তিক সুখ ইন্দ্রিয়াদির বিষয় নয়। এটি মন পর্যন্তও পৌঁছায় না, কাজেই ইন্দ্রিয়ের কথাই ওঠে না। এটি স্বয়ংই একমাত্র অনুভব করতে পারে। তাই এই সুখকে অতীন্দ্রিয় সুখ বলা হয়।

'বুদ্ধিগ্রাহ্যম্'—এই সুখকে বুদ্ধিগ্রাহ্য বলা হয়েছে এইজন্য যে এটি তামস সুখেরও অতীত। তামসিক সুখ নিদ্রা, আলস্য এবং প্রমাদ থেকে উৎপন্ন হয়। গভীর নিদ্রায় (সুষুপ্তিতে) সুখ পাওয়া গেলেও তাতে বুদ্ধি লীন হয়ে যায়। আলস্য এবং প্রমাদে সুখ অনুভব হলেও এতে বুদ্ধি ঠিকমতো জাগ্রত না থাকায় বিবেকশক্তিও লুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু এই আত্যন্তিক সুখে বুদ্ধি লীন হয় না এবং বিবেকশক্তিও জাগরিত থাকে। এই আত্যন্তিক সুখকে বুদ্ধিও গ্রহণ করতে পারে না ; কারণ বুদ্ধি হল প্রকৃতির কার্য, অতএব তা প্রকৃতির অতীত স্বরূপভূত সুখকে কীভাবে গ্রহণ করবে ?

এখানে সুখকে আত্যন্তিক, অতীন্দ্রিয় এবং বুদ্ধিগ্রাহ্য বলার তাৎপর্য হল এই যে, এই সুখ সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক সুখের অতীত অর্থাৎ গুণাতীত স্বরূপভূত।

'বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ'—ধ্যানযোগী আপনাতেই আপনি সুখ অনুভব করেন এবং এই সুখে অবস্থান করে তিনি কখনো কিছুমাত্র বিচলিত হন না অর্থাৎ এই সুখের অখণ্ডতা স্বতঃই সর্বদা বিরাজ করে। যেমন, মোঘল শাসক ধাপ্পাবাজি করে শিবাজীর পুত্র শম্ভাজীকে বন্দি করেছিল এবং তাঁকে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করতে বলেছিল, কিন্তু শম্ভাজী তাতে রাজি হননি। তখন মুসলমানেরা তাঁর চোখ উপড়ে নেয়, চামড়া তুলে দেয়—তা সত্ত্বেও শম্ভাজী হিন্দুধর্ম ত্যাগ করেননি। তাৎপর্য হল এই যে, মানুষ যতক্ষণ তার মেনে নেওয়া সম্বন্ধকে নিজে ত্যাগ না করে, ততক্ষণ অপর কেউ তার মান্যতাকেও ছাড়াতে পারে না। যখন নিজ মান্যতাকে অপর কেউ ছাড়াতে পারে না, তখন যার প্রকৃত সুখ লাভ হয়েছে সেই সুখকে কীকরে ছাড়াতে পারবে ? সে নিজেও এই সুখ থেকে কেন বিচলিত হবে ? হতে পারে না।

মানুষ সেই প্রকৃত সুখ হতে, জ্ঞান হতে, আনন্দ হতে কখনো সরে আসে না—এতেই প্রমাণিত হয় যে, মানুষ সাত্ত্বিক সুখ থেকে সরে আসতে পারেন, সমাধি হতেও ব্যুত্থিত হতে পারেন, কিন্তু আত্যন্তিক সুখ হতে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান হতে কখনো বিচলিত বা ব্যুত্থিত হন না। কারণ এতে তাঁর দূরত্ব, পার্থক্য এবং ভিন্নতা লুপ্ত হয়ে একমাত্র আত্মস্বরূপই থেকে যায়। অতএব সে আর কী থেকে বিচলিত হবে এবং কোথা থেকেই বা ব্যুত্থান করবে ? জড়ত্বের সঙ্গে সম্পর্ক থাকলেই বিচলিত বা ব্যুত্থিত হওয়ার কথা আসে। যতক্ষণ জড়ের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে ততক্ষণ সে একরস হতে পারে না ; কেন-না প্রকৃতি সর্বদা ক্রিয়াশীল থাকে।

পরিশিষ্ট-ভাব—স্বরূপের অনুভূতি হলে ধ্যানযোগীর সেই অবিনাশী, অখণ্ড সুখের অনুভূতি হয়, যা 'আত্যন্তিক' অর্থাৎ সাত্ত্বিক সুখের থেকেও বিশিষ্ট, 'অতীন্দ্রিয়' অর্থাৎ রাজসিক সুখের থেকেও বিশিষ্ট এবং 'বুদ্ধিগ্রাহ্য' অর্থাৎ তামসিক সুখের থেকেও বিশিষ্ট।

অবিনাশী সুখকে 'বুদ্ধিগ্রাহ্য' বলার অর্থ এই নয় যে, তা বুদ্ধির অন্তর্গত হবে। কারণ বুদ্ধি হল প্রকৃতির কার্য, তাহলে তা প্রকৃতির অতীত সুখ পর্যন্ত কী করে পৌঁছবে ? তাই অবিনাশী সুখকে বুদ্ধিগ্রাহ্য বলার অর্থ ওই সুখকে তামসিক সুখের থেকে বিশিষ্ট বলে অভিহিত করা। নিদ্রা, আলস্য এবং প্রমাদ হতে উৎপন্ন সুখই তামসিক সুখ (গীতা ১৮।৩৯)। গভীর নিদ্রায় (সুষুপ্তিতে) বুদ্ধি অবিদ্যায় লীন হয়ে যায়।

আলস্য এবং প্রমাদে বুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে জাগরিত থাকে না। কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ অবিনাশী সুখে বুদ্ধি অবিদ্যায় লীন হয় না, তা সম্পূর্ণভাবে জাগ্রত থাকে—**'জ্ঞানদীপিতে'** (গীতা ৪।২৭)। তাই বুদ্ধির সচেতন অবস্থাকেই **'বুদ্ধিগ্রাহ্য'** বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধি ওই পর্যন্ত পৌঁছায়ই না।

যেমন আয়নাতে সূর্য ধরা পড়ে না, প্রকৃতপক্ষে তাঁর প্রতিবিম্ব পাওয়া যায়, তেমনই বুদ্ধিতে সেই অবিনাশী সুখ পৌঁছায় না, সেই সুখের আভাস মাত্র পাওয়া যায়। তাই একে **'বুদ্ধিগ্রাহ্য'** বলা হয়েছে।

তাৎপর্য হল যে স্ব-স্বরূপের অখণ্ড সুখ সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক সুখের থেকেও অতি বিশিষ্ট অর্থাৎ তা গুণাতীত। একে বুদ্ধিগ্রাহ্য বলা হলেও তা প্রকৃতপক্ষে সর্বতোভাবে বুদ্ধির অতীত।

বুদ্ধিযুক্ত (প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত) চেতনই বুদ্ধিগ্রাহ্য, শুদ্ধ চেতন নয়। স্ব-স্বরূপ বাস্তবে কখনোই প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হতে পারে না, কিন্তু তিনি নিজেকে মিলিত বলে মেনে থাকেন—**'যয়েদং ধার্যতে জগৎ'** (গীতা ৭।৫)।

* * *

সম্বন্ধ—ধ্যানযোগী কেন তত্ত্ব থেকে সরেন না—পরবর্তী শ্লোকে তার কারণ জানানো হয়েছে।

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥ ২২ ॥

[**যম্** (যে অবস্থা) ; **লাভম্** (লাভ) ; **লব্ধ্বা** (হলে পর) ; **ততঃ** (তার) ; **অধিকম্** (অধিক) ; **অপরম্** (কোনো লাভকে) ; **ন, মন্যতে** (মানাই যায় না) ; **চ, যস্মিন** (এবং যে অবস্থায়) ; **স্থিতঃ** (স্থিতি হলে) ; **গুরুণা** (ভীষণ) ; **দুঃখেন, অপি** (দুঃখেও) ; **ন, বিচাল্যতে** (বিচলিত হন না।)]

যে অবস্থা প্রাপ্ত হলে তিনি অন্য কোনো লাভকে তার অধিক বলে মানতেই পারেন না এবং যে অবস্থায় স্থিতি হলে তিনি মহাদুঃখেও বিচলিত হন না ॥ ২২ ॥

ব্যাখ্যা—'যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ'—মানুষ যে সুখ প্রাপ্ত হয়, তার অধিক সুখ দেখলে, সে তাতে লোভবশতঃ আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। যেমন, কেউ ঘণ্টায় একশ টাকা পায়, সেই একই সময়ে যদি অন্যত্র হাজার টাকা পাওয়া যায়, তবে সে ঐ একশ টাকার স্থিতি থেকে 'বিচলিত' হয়ে পড়ে এবং হাজার টাকার কাজে

চলে যায়। নিদ্রা, আলস্য এবং প্রমাদজনিত তামসিক সুখ প্রাপ্ত হলেও মানুষের যখন বিষয়জনিত সুখ বেশি ভালো লাগে, তাতে বেশি সুখ বলে মনে হয়, তখন সে তামসিক সুখ ত্যাগ করে বিষয়জনিত সুখের দিকে লুব্ধ হয়। এইরূপই যখন সে বিষয়জনিত সুখকে ছাড়িয়ে ওঠে, তখন সাত্ত্বিক সুখের জন্য ব্যাকুল হয় এবং যখন সাত্ত্বিক সুখকে ছাড়িয়ে যায়, তখন সে আত্যন্তিক সুখের জন্য আর্ত হয়। কিন্তু সে একবার আত্যন্তিক সুখ প্রাপ্ত হলে আর কখনো তা থেকে বিচলিত হয় না। কারণ আত্যন্তিক সুখের থেকে বড়ো আর কোনো সুখ বা লাভ হতেই পারে না। আত্যন্তিক সুখই সুখের সর্বোচ্চ প্রাপ্তি। ধ্যানযোগী যখন এই সুখ প্রাপ্ত হন, তখন তিনি এর থেকে আর কী করে বিচলিত হবেন?

'যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে'— বিচলিত হওয়ার আর একটি কারণ হল যে, লাভ বেশি হলেও যদি তার সঙ্গে মহাদুঃখের সম্ভাবনা থাকে, তাহলেও মানুষ সেই লাভ থেকে বিচলিত হয়। যেমন, হাজার টাকা পেলেও যদি সেখানে বিপদের আশঙ্কা থাকে, তাহলে মানুষ হাজার টাকার লোভও সংবরণ করে। এইরূপই মানুষ কোনো স্থানে অবস্থান করলে, সেখানে যদি কোনো বিপদ আসে, তাহলে মানুষ সেই স্থান ত্যাগ করে। কিন্তু ভগবান বলেছেন যে আত্যন্তিক সুখে অবস্থানকারী যোগী মহাদুঃখ এলেও তাতে বিচলিত হন না। যেমন, কোনো কারণে যদি তাঁর শরীর ফাঁসিতে চড়ানো হয়, শরীরকে খণ্ড খণ্ড করা হয়, দুটি পাহাড়ের মধ্যে শরীর পিষে যায়, তাঁর জীবিত অবস্থাতেই শরীর থেকে চামড়া খুলে নেওয়া হয়, শরীরে ছোট ছোট গর্ত করে দেওয়া হয়, ফুটন্ত তেলে শরীরকে ডোবানো হয়—এইরূপ গুরুতর, মহা-দুঃখদায়ক ঘটনা একসাথে ঘটলেও তিনি লক্ষ্যচ্যুত হন না।

তাঁকে কেন বিচালিত করা যায় না? কারণ দুঃখ যা আসে তা সবই প্রকৃতির রাজ্যে অর্থাৎ শরীর-ইন্দ্রিয়াদি-মন-বুদ্ধিতেই হয়, আর আত্যন্তিক সুখ, স্বরূপবোধ হচ্ছে প্রকৃতির অতীত তত্ত্ব। কিন্তু পুরুষ যখন প্রকৃতির অধীন হয় অর্থাৎ শরীরের সঙ্গে তাদাত্ম্য করে, তখন সে প্রকৃতিজনিত অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নিজেকে সুখী বা দুঃখী মনে করে (গীতা ১৩।২১)। যখন সে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিজ স্বরূপভূত সুখ অনুভব করে, তাতে স্থিত হয়, তখন প্রাকৃতিক বিকার সেখানে পৌঁছাতেই পারে না, তাকে স্পর্শ করতে পারে না। তাই শরীরে যত দুঃখই আসুক তিনি নিজ স্থিতি থেকে বিচ্যুত হন না।

পরিশিষ্ট- ভাব— এই শ্লোকটি সকল সাধনার কষ্টিপাথর। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ, ভক্তিযোগ ইত্যাদি যে কোনো সাধনার সাহায্যেই এই স্থিতি লাভ করা উচিত। নিজ অবস্থিতি বোঝার জন্য এই শ্লোকটি সাধকদের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। জীবমাত্রেরই আকাঙ্ক্ষা থাকে যাতে তার দুঃখ দূর হয়ে সুখ হয়। তাই এই শ্লোকে বর্ণিত স্থিতি সাধকমাত্রেরই প্রাপ্ত করা উচিত। না হলে তাঁর সাধনা পূর্ণ হবে না। সাধক যাতে মধ্যপথে থেমে না যান, অর্ধসমাপ্ত সাধনাকে যাতে পূর্ণ না মনে করেন, সেইজন্য এই শ্লোক অনুসারে নিজের স্থিতির বিচার করা উচিত।

যাতে লাভের অন্ত থাকে না এবং দুঃখের লেশমাত্র থাকে না সেই দুর্লভ অবস্থা মানুষ মাত্রেই লাভ করতে পারে। কিন্তু তারা ভোগ এবং সম্পদ-সংগ্রহে ব্যস্ত থেকে নিজের যে পরিমাণ ক্ষতি করে তার কোনো সীমা নেই।

❀ ❀ ❀

সম্বন্ধ—যে সুখ প্রাপ্ত হলে তার থেকে আর অধিক লাভের সম্ভাবনা থাকে না এবং যাতে স্থিত হলে মহাদুঃখও বিচলিত করতে পারে না, সেই সুখ লাভের জন্য পরবর্তী শ্লোকে প্রেরণা দেওয়া হয়েছে।

তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিণ্ণচেতসা॥ ২৩ ॥

[দুঃখসংযোগবিয়োগম্ (যে অবস্থায় দুঃখের সংযোগই বিয়োগ) ; তম্, যোগসজ্ঞিতম্ (তাকে যোগ বলে) ; বিদ্যাৎ

(জানবে) ; সঃ (সেই) ; যোগঃ (ধ্যানযোগ) ; অনির্বিণ্ণ, চেতসা (নির্বেদশূন্য চিত্তে) ; নিশ্চয়েন (অধ্যাবসায় সহকারে) ; যোক্তব্য (অভ্যাস করা কর্তব্য।)]

যে অবস্থায় দুঃখের সংযোগের-ই বিয়োগ হয়েছে তাকেই 'যোগ' বলে জানবে। (এই যোগ যে ধ্যানযোগের লক্ষ্য), সেই ধ্যানযোগ অনির্বিঘ্ন চিত্তে অধ্যাবসায় সহকারে অভ্যাস করা কর্তব্য ॥ ২৩ ॥

ব্যাখ্যা—**'তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্'**—যার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই, হয়নি, হবে না এবং হওয়া সম্ভবই নয়, সেই দুঃখরূপ জগৎ-সংসার এবং শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক মেনে নেওয়াই হল 'দুঃখসংযোগ'। এই দুঃখ সংযোগ 'যোগ' নয়। এটি যদি যোগ হত অর্থাৎ জগৎ-সংসারের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নিত্য হত তাহলে এই দুঃখসংযোগের সম্পর্ক কখনো ছিন্ন হত না। কিন্তু যোগ হলে এই দুঃখ-সংযোগের বিয়োগ (লয়) হয়। এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, দুঃখ-সংযোগ কেবল আমাদের মেনে নেওয়াতে, আমাদের তৈরি করার থেকেই হয়, এটি স্বাভাবিক নয়। যত দৃঢ়তার সঙ্গেই এর সংযোগকে মেনে নেওয়া হোক না কেন এবং যত দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই সংযোগ মানা হোক না কেন, এটি কখনো প্রকৃত সংযোগ হয় না। সুতরাং আমরা এই মেনে নেওয়া আগন্তুক দুঃখ-সংযোগকে দূর করতে সক্ষম। এই দুঃখ-সংযোগের (শরীর-সংসার) বিচ্ছেদ হলেই স্বাভাবিকভাবে 'যোগ' প্রাপ্তি হয় অর্থাৎ স্বরূপের সঙ্গে আমাদের যে নিত্যযোগ রয়েছে, আমাদের সেটি অনুভব হয়। স্বরূপের সঙ্গে নিত্যযোগকেই এখানে 'যোগ' বলে বুঝতে হবে।

দুঃখরূপ সংসার হতে সর্বতোভাবে বিচ্ছেদ হওয়াকেই এখানে 'যোগ' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এতে মনে করা যেতে পারে যে, স্বরূপের সঙ্গে আগে আমাদের বিচ্ছেদ ছিল, এখন যোগ হয়েছে ; কিন্তু তা নয়। স্বরূপের সঙ্গে আমাদের নিত্যযোগ বর্তমান। দুঃখরূপ জগতের সংযোগের আরম্ভ এবং শেষ থাকে, কিন্তু নিত্যযোগের কখনো আরম্ভ এবং শেষ থাকে না। কারণ এই যোগ মন, বুদ্ধি ইত্যাদি প্রাকৃত পদার্থ সহযোগে হয় না, এটি মন-বুদ্ধি ইত্যাদির সম্পর্ক-ছিন্ন হলে তবেই হয়। এই নিত্যযোগ স্বতঃসিদ্ধ। সকলেরই এতে স্বাভাবিক স্থিতি। কিন্তু অনিত্য জগতের সঙ্গে সম্পর্ক মেনে নেওয়ায় এই নিত্যযোগের বিস্মৃতি হয় । সংসার থেকে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হলেই নিত্যযোগের স্মৃতি জাগ্রত হয়। এই কথাই অর্জুন অষ্টাদশ অধ্যায়ের তিয়াত্তরতম শ্লোকে **'নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা'** পদে জানিয়েছেন। অতএব এই যোগ নতুন কিছু নয়, এটি নিত্যযোগেরই অনুভূতি।

ভগবান এখানে **'যোগসংজ্ঞিতম্'** পদটি ব্যবহার করে দুঃখ-সংযোগের বিচ্ছেদের নাম 'যোগ' বলে জানিয়েছেন এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে **'সমত্বং যোগ উচ্যতে'** বলে সমত্বকেই 'যোগ' বলে জানিয়েছেন। এখানে সাধ্যরূপ সমত্বের বর্ণনা করা হয়েছে এবং পূর্বে (২।৪৮-এ) সাধনরূপ সমত্বের বর্ণনা করা হয়েছে। এই দুটি বিষয় তত্ত্বতঃ একই। কারণ সাধনরূপ সমত্বই শেষে সাধ্যরূপ সমতায় পরিণত হয়।

পতঞ্জলি চিত্তবৃত্তি নিরোধকেই 'যোগ' নামে অভিহিত করেছেন—**'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ'** (যোগদর্শন ১।২) এবং চিত্তবৃত্তির নিরোধ হলে দ্রষ্টার স্বরূপে স্থিতি হয় বলে জানিয়েছেন—**'তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্'** (১।৩)। কিন্তু ভগবান এইস্থানে **'তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্'** পদের দ্বারা দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থানকেই 'যোগ' বলেছেন, যা স্বতঃসিদ্ধ ।

এখানে 'তম্' বলার তাৎপর্য কী ? অষ্টাদশ শ্লোকে যোগীর লক্ষণ জানিয়ে উনিশতম শ্লোকে আলোর শিখার দৃষ্টান্তের দ্বারা তাঁর চিত্তের স্থিতি বর্ণনা করেছেন। যে অবস্থায় এই ধ্যানযোগীর চিত্ত বিরত হয়, বিশতম শ্লোকের পূর্বার্ধে 'যত্র'—পদ দ্বারা তার ইঙ্গিত দিয়েছেন এবং এই যোগীর স্থিতি কখন পরমাত্মায় হয়, তার ইঙ্গিত শ্লোকটির উত্তরার্ধে **'যত্র'** পদ দ্বারা দিয়েছেন। একুশতম শ্লোকের পূর্বার্ধে **'যৎ'** পদ দ্বারা এই যোগীর আত্যন্তিক সুখের মাহাত্ম্য বলেছেন এবং শেষার্ধে **'যত্র'** পদ দ্বারা সেই অবস্থার সঙ্কেত জানিয়েছেন। বাইশতম শ্লোকের পূর্বার্ধে **'যম্'** পদ দ্বারা এই যোগীর লাভের বর্ণনা করেছেন এবং শেষার্ধে সেই লাভকে **'যস্মিন্'** পদে জানিয়েছেন। এইভাবে বিশতম শ্লোক থেকে বাইশতম শ্লোক পর্যন্ত

ছয়বার 'যৎ'[১] শব্দের প্রয়োগ করে যোগীর যে বিশেষ স্থিতির কথা বলা হয়েছে, তাকেই এখানে 'তম্' পদ দ্বারা চিহ্নিত করে তার মহিমা জানানো হয়েছে।

'স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিণ্ণচেতসা'— যাতে দুঃখ-সংযোগেরই বিচ্ছেদ হয়, এরূপ (সাধ্যরূপ সমত্বের) উদ্দেশ্য নিয়ে সাধকের অনির্বিঘ্ন চিত্তে অধ্যবসায়পূর্বক ধ্যানযোগের অভ্যাস করা উচিত, যার বর্ণনা এই অধ্যায়ের অষ্টাদশ থেকে কুড়িতম শ্লোক পর্যন্ত করা হয়েছে।

যোগ অনুভব করার জন্য সর্বপ্রথম সাধকের বুদ্ধি অবিচল হওয়া উচিত অর্থাৎ 'আমাকে যোগ প্রাপ্ত করতে হবে' এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয় হতে হয়। এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হলে জগতের যতই প্রলোভন আসুক, যত বড় কষ্টই উপস্থিত হোক তবুও সেই প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করা উচিত নয়।

'অনির্বিণ্ণচেতসা'—এর তাৎপর্য হল এই যে, অনেক সময় লেগে গেল, অনেক উদ্যম করা হল—তবুও সিদ্ধিলাভ হল না! সিদ্ধি কবে প্রাপ্তি হবে? কীভাবে প্রাপ্তি হবে?—এইপ্রকারে কখনো ব্যাকুল হবে না। সাধকের এই ভাব থাকা উচিত যে, যত বছরই লাগুক, যত জন্মই হোক, যত ভয়ানক দুঃখই সহ্য করতে হোক, আমাকে তত্ত্বলাভ করতেই হবে। সাধকের মনে এই ভাব থাকা উচিত যে আমার অনেকবার জন্ম হয়েছে, কিন্তু সবই নিরর্থক নষ্ট হয়েছে, কোনো লাভ হয়নি। বহুবার নরক ভোগ করেছি, কিন্তু তাতে কিছুই লাভ হয়নি অর্থাৎ তাতে শুধু পূর্বকৃত পাপ নাশ হয়েছে, কিন্তু ভগবান লাভ করতে পারিনি। এখন এই জন্মে যদি সম্পূর্ণ সময়, জীবন এবং উদ্যম পরমাত্মা প্রাপ্তিতে ব্যয়িত হয়, তাহলে তা অত্যন্ত আনন্দের কথা।

পরিশিষ্ট-ভাব—জাগতিক সংযোগের বিভাগ আর যোগের বিভাগ—এদুটি সম্পূর্ণ পৃথক। সংযোগ তার সঙ্গেই হয় যার সঙ্গে আমরা সর্বদা থাকি না এবং যে আমাদের সঙ্গে সর্বদা থাকতে পারে না। 'যোগ' তার সঙ্গে হয়, যার সঙ্গে আমরা সর্বদা থাকতে পারি এবং যে আমাদের সঙ্গে সর্বদা থাকতে পারে। তাই জগতে একের অন্যের সঙ্গে সংযোগ হয় আর পরমাত্মার সঙ্গে হয় যোগ। জগতের সঙ্গে যোগ হয় না আর পরমাত্মার সঙ্গে বিয়োগ হয় না অর্থাৎ জগৎ আমাদের সঙ্গে যুক্ত নয় আর পরমাত্মা আমাদের থেকে পৃথক নয়। মানুষের সব থেকে বড় ভুল, সব থেকে বড় ভ্রান্তি এই যে তারা মনে করে জগৎ তার আপন আর পরমাত্মা পর। জগৎ-সংসারে সংযোগ-বিয়োগ হয় কিন্তু পরমাত্মার সঙ্গে যে যোগ তার কখনো বিচ্ছেদ হয় না।

মানুষ সংযোগ চায়, কিন্তু তার হয়ে যায় বিয়োগ, তাই জগৎ-সংসার হয়ে ওঠে দুঃখরূপ—**'দুঃখালয়মশাশ্বতম্'** (গীতা ৮।১৫)। কোনো কিছুর আকাঙ্ক্ষা থাকলেই দুঃখের সংযোগ হয়। কোনো আকাঙ্ক্ষা না থাকলে দুঃখ প্রাপ্তি হয় না, তখন পরমাত্মার সঙ্গে যোগ হয়।

পরমাত্মার সঙ্গে জীবের যোগ বা সম্পর্ক নিত্য। এই স্বতঃসিদ্ধ নিত্যযোগকে বলা হয় **'যোগ'**। এই নিত্যযোগ সর্ব দেশে, সর্ব কালে, সর্ব ক্রিয়ায়, সর্ব বস্তুতে, সর্ব ব্যক্তির মধ্যে, সর্ব অবস্থায়, সর্ব পরিস্থিতিতে, সর্ব ঘটনায় বিদ্যমান। তাৎপর্য হল এই যে এই নিত্যযোগের কখনো বিয়োগ হয় না, হবে না এবং হওয়া সম্ভবও নয়। কিন্তু অসতের (শরীরের) সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নেওয়ায় এই নিত্যযোগ অনুভব হয় না। দুঃখরূপ অসতের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক রহিত হলেই এই নিত্যযোগ অনুভব হয়। এটিই হল গীতার প্রধান যোগ আর এই যোগ অনুভব করার জন্য গীতায় কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ, ভক্তিযোগ ইত্যাদির সাধনগুলি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এই সাধনগুলিকে তখনই **'যোগ'** বলা যাবে, যখন অসৎ হতে সর্বতোভাবে সম্পর্ক বিচ্ছেদ এবং পরমাত্মার সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ অনুভব হবে।

ভগবান দুভাবে যোগের পরিভাষার কথা বলেছেন—

১) সমত্বকে যোগ বলা হয়—**'সমত্বং যোগ উচ্যতে'** (২।৪৮)।

২) দুঃখরূপ জগৎ সংসারের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়াকেই বলা হয় যোগ—**'তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং**

[১]যত্র, যম্, যস্মিন্—এই তিনটিই 'যৎ' শব্দ থেকে সৃষ্ট।

যোগসঞ্জিতম্' (৬।২৩)।

সমতা হোক বা সংসারের সংযোগের বিয়োগ হোক, দুইই এক। অর্থাৎ সমত্বে স্থিত হলে জগৎ সংসারের সঙ্গে যে যোগ তার বিয়োগ হয় এবং জগৎ সংসারের সঙ্গে বিয়োগ হলেই সমত্বে স্থিতিলাভ হয়। দুটির মধ্যে যে কোনো একটি হলেই নিত্যযোগ প্রাপ্তি হয়। কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখলে দেখা যায় **'তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসঞ্জিতম্'** হল প্রথম স্থিতি আর **'সমত্বং যোগ উচ্যতে'** হল তার পরবর্তী স্থিতি, যার মধ্যে নৈষ্ঠিক শান্তি, পরম শান্তি অথবা আত্যন্তিক সুখের প্রাপ্তি আছে।

সমত্ব প্রাপ্তিও স্বতঃ হয় এবং দুঃখ নিবৃত্তিও স্বতঃ হয়। যা নিত্যপ্রাপ্ত তারই প্রাপ্তি হয় আর যা নিত্যনিবৃত্ত, নিবৃত্তি তারই হয়। নিত্যপ্রাপ্তের প্রাপ্তিকেই যোগ বলা হয় এবং নিত্যনিবৃত্তের নিবৃত্তিকেও যোগ বলা হয়। বস্তু, ব্যক্তি এবং ক্রিয়ার সংযোগজনিত যত সুখ আছে, সেগুলি সবই দুঃখের কারণ অর্থাৎ দুঃখ উৎপাদনকারক (গীতা ৫।২২)। সুতরাং সংযোগেই দুঃখ আসে, বিচ্ছেদে নয়। বিচ্ছেদে (জগৎ সংসার থেকে বিচ্ছেদে) যে সুখ, সেই সুখের বিয়োগ হয় না, কারণ তা নিত্য। যখন সংযোগেও বিয়োগ হয় এবং বিয়োগেও বিয়োগ হয়, তখন বুঝতে হবে বিয়োগই নিত্য। গীতায় এই নিত্য বিয়োগকেই **'যোগ'** বলা হয়।

পরমাত্মতত্ত্ব হচ্ছে **'অস্তি'** রূপ এবং জগৎ-সংসার হল **'নাস্তি'** রূপ। একটি মর্ম কথা হল 'অস্তি'-কে দেখলে তা শুদ্ধ 'অস্তি' রূপে প্রতিভাত হয় না, কিন্তু 'নাস্তি'-কে 'নাস্তি' রূপে দেখলে শুদ্ধ অস্তি 'অস্তি'রূপে প্রতিভাত হয় ! কারণ 'অস্তি'-কে প্রত্যক্ষ করতে মন-বুদ্ধি-বৃত্তি লাগালে তার সঙ্গে বৃত্তিরূপ 'নাস্তি'ও মিলিতভাবে থাকে। কিন্তু 'নাস্তি'-কে 'নাস্তি'রূপে দেখলে বৃত্তিও 'নাস্তি'-তে পরিণত হয়ে শুদ্ধ 'অস্তি'ই শেষ পর্যন্ত থাকে, যেমন ময়লা পরিষ্কার করার পর তার সঙ্গে ঝাঁটাটিও দূর করা হয় তখন শুধু পরিচ্ছন্ন বাড়িটিই থাকে। তাৎপর্য হল যে 'পরমাত্মা সর্বত্র পরিপূর্ণ হয়ে আছেন'—এটি মনে মনে চিন্তা করলে, বুদ্ধি দ্বারা স্থির বিশ্বাস করলে বৃত্তির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বজায় থাকে। কিন্তু 'জগৎ-সংসার প্রতিমুহূর্তে ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে'—এইভাবে জগৎ-সংসারকে নাস্তিরূপে দেখলে জগৎ-সংসার ও বৃত্তি—দুটি থেকেই সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত ভাবরূপ শুদ্ধ পরমাত্মতত্ত্বই থাকে।

* * *

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকের পূর্বার্ধে ভগবান যে যোগের (সাধ্যরূপ সমত্বের) বর্ণনা করেছেন, পরবর্তী শ্লোক থেকে সেই যোগ প্রাপ্তির জন্য নির্গুণ-নিরাকারের ধ্যানের প্রকরণ আরম্ভ করেছেন।

সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥ ২৪ ॥

[**সংকল্পপ্রভবান্** (সংকল্পজাত) ; **সর্বান্ কামান্** (সমস্ত কামনাকে) ; **অশেষতঃ** (সর্বতোভাবে) ; **ত্যক্ত্বা** (পরিত্যাগ করে) ; **মনসা, এব** (মনের দ্বারাই) ; **ইন্দ্রিয়গ্রামম্** (ইন্দ্রিয়গুলিকে) ; **সমন্ততঃ** (বিষয়সমূহ হতে) ; **বিনিয়ম্য** (নিবৃত্ত করে।)]

সংকল্পজাত সমস্ত কামনাকে সর্বতোভাবে ত্যাগ করে এবং মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয়সমূহ হতে নিবৃত্ত করে—॥ ২৪ ॥

ব্যাখ্যা—[কর্মফল ত্যাগকারী কর্মযোগীর যে স্থিতি হয় (৬।১-৯), সগুণ-সাকার ভগবানের ধ্যানকারী (৬।১৪-১৫) এবং নিজ স্বরূপের ধ্যানকারী ধ্যান-যোগীরও সেই স্থিতি হয় (৬।১৮-২৩)। নির্গুণ-নিরাকার ধ্যানকারীরও যে একই স্থিতি হয়—সে কথা জানাবার জন্যই ভগবান পরবর্তী প্রকরণ শুরু করেছেন।]

'সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্বানশেষতঃ'—জাগতিক বস্তু, ব্যক্তি, পদার্থ, দেশ, কাল, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদিতে মনে যে নানাপ্রকার স্ফুরণ হয়, ওই স্ফুরণগুলির মধ্যে যে স্ফুরণে প্রিয়ভাব, সৌন্দর্য এবং

প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়, সেটি সংকল্পের রূপ ধারণ করে। তেমনি যে স্ফুরণে 'এই বস্তু-ব্যক্তি হল বড় খারাপ, আমার উপযুক্ত নয়'—এইরূপ বিপরীত ভাব উৎপন্ন হয়, সেই স্ফুরণগুলিও সঙ্কল্প হয়ে যায়। সংকল্প থেকেই 'এরূপ হওয়া উচিত আর এরূপ হওয়া উচিত নয়'—এই কামনার (আকাঙ্ক্ষার) উৎপত্তি হয়। এইরূপ সংকল্প হতে উৎপন্ন কামনাগুলি সর্বতোভাবে ত্যাগ করা উচিত।

এখানে **'কামান্'** পদটি বহুবচনে ব্যবহৃত হয়েছে, তবুও এর সঙ্গে **'সর্বান্'** পদটি ব্যবহারের তাৎপর্য হল এই যে, কোনোপ্রকার কামনা একেবারে যেন না থাকে।

'অশেষতঃ' পদটির তাৎপর্য হল এই যে, কামনার বীজও (সূক্ষ্ম সংস্কার) যেন না থাকে। কারণ বৃক্ষের একটিমাত্র বীজ হতে মাইলের পর মাইল জঙ্গল সৃষ্টি হতে পারে। অতএব বীজরূপ কামনাও ত্যাগ করা উচিত।

'মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ'—যে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ—এই বিষয়গুলি অনুভূত হয়, ভোগ হয়, ওই ইন্দ্রিয়গুলিকে মনের দ্বারা ঠিকমতো চিহ্নিত করে নিতে হয় অর্থাৎ মনের সাহায্যে ইন্দ্রিয়গুলিকে তার বিষয় থেকে সরিয়ে নিতে হবে।

'সমন্ততঃ'—বলার তাৎপর্য হল এই যে, মনের দ্বারা শব্দ স্পর্শাদি বিষয়গুলির চিন্তা করবে না এবং জাগতিক মান-মর্যাদা-আরাম ইত্যাদির দিকে যেন কোনো আকর্ষণ না থাকে।

এর তাৎপর্য হল এই যে, ধ্যানযোগীর ইন্দ্রিয়াদিকে অন্তঃকরণের দ্বারা প্রাকৃত পদার্থগুলি থেকে সর্বতোভাবে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া কর্তব্য।

পরিশিষ্ট-ভাব—প্রথমে স্ফুরণ হয়, পরে সংকল্প আসে ; স্ফুরণে সত্তা, আসক্তি এবং আগ্রহ থাকায় সেটি সংকল্পে পরিণত হয়, যা বন্ধন-কারক হয়। সংকল্প থেকে পুনরায় কামনা উৎপন্ন হয়। 'স্ফুরণ' হল দর্পণের কাঁচের মতো, যাতে প্রতিবিম্ব স্থায়ী হয় না। কিন্তু 'সংকল্প' হল ক্যামেরার লেন্সের মতো, যাতে প্রতিবিম্ব স্থায়ীভাবে থাকে। সাধকের তাই সতর্ক থাকতে হয় যে স্ফুরণ যদি থাকেও তা যেন সংকল্পে পরিণত না হয়।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে ভগবান সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করার এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করার দৃঢ় সঙ্কল্পের কথা বলেছেন। এই শ্লোকে তিনি জানাচ্ছেন কী করে কামনা পরিত্যাগ করা যায় এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করা যায়।

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥ ২৫ ॥

[**ধৃতিগৃহীতয়া** (ধৈর্যযুক্ত) ; **বুদ্ধ্যা** (বুদ্ধির দ্বারা) ; **শনৈঃ, শনৈঃ** (ধীরে ধীরে) ; **উপরমেৎ** (বিরত হবে) ; **মনঃ, আত্মসংস্থম্** (পরমাত্ম স্বরূপে মনকে সম্যক্‌ভাবে স্থাপন করে) ; **কিঞ্চিৎ, অপি** (আর কোনো কিছুই) ; **ন, চিন্তয়েৎ** (চিন্তা করবে না।)]

ধৈর্যযুক্ত বুদ্ধির দ্বারা জগৎ হতে ধীরে ধীরে বিরত হবে এবং পরমাত্মস্বরূপে মন (বুদ্ধি)-কে সম্যক্‌ভাবে স্থাপন করে তারপর আর কোনো কিছুই চিন্তা করবে না ॥ ২৫ ॥

ব্যাখ্যা—'বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া'—সাধন করতে করতে সাধক প্রায়শঃ অধৈর্য হয়ে যান, নিরাশ হয়ে পড়েন যে ধ্যান-ধারণাদিতে, বিচার-বিবেচনায় এতো সময় লেগে যাচ্ছে, তবুও তত্ত্ব-লাভ হচ্ছে না, কী করা যায় ? কেমন করে তত্ত্ব লাভ হবে ? এইজন্যই ভগবান ধ্যানযোগী সাধককে সতর্ক করে বলেছেন যে, ধ্যানযোগের অভ্যাস করতে করতে সিদ্ধি প্রাপ্তি না হলেও তাঁর অধৈর্য হওয়া উচিত নয়, তাঁর ধৈর্য ধারণ করা উচিত। সিদ্ধিপ্রাপ্তি হলে, সাফল্য পেলে ধৈর্য যেমন থাকে, বিফল হলেও সেইরকম ধৈর্য রক্ষা করতে হয় যে বছরের পর বছর কাটুক, শরীর

নষ্ট হয় হোক তাতেও পরোয়া করি না, কিন্তু তত্ত্বপ্রাপ্তি করতেই হবে[১]। কারণ এর চেয়ে বড় কোনো কাজ নেই। তাই এটি সম্পূর্ণ করার আগে আর কী কাজ করার আছে ? এর থেকেও মহৎ কোনো কাজ যদি থাকে, তবে এটিকে বাদ দিয়ে সেটিকেই আগে করি ; এইভাবে বুদ্ধিকে বশীভূত করতে হয় অর্থাৎ বুদ্ধিতে মান-মর্যাদা, আরাম-আয়েসের জন্য জগতের যে সব গুরুত্ব রয়েছে, সেগুলিকে সরাতে হবে। তাৎপর্য হল এই যে, আগের শ্লোকে যে বিষয়গুলি ত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে, ধৈর্য সহকারে, বুদ্ধির দ্বারা সেই বিষয় থেকে বিরত হতে হবে।

'শনৈঃ শনৈরুপরমেৎ'—বিরত হবার জন্য তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই ; ধীরে ধীরে উপেক্ষা করতে করতে বিষয় হতে উদাসীন হবে এবং তাতে একেবারে বিমুখ হয়ে যাবে।

কামনা ত্যাগ এবং বিষয়সমূহ থেকে মনকে সংযত করার পরেও এখানে যে বিরত হওয়ার কথা বলা হয়েছে, তার তাৎপর্য হল এই যে, কোনো বস্তু ত্যাগ করলেও সেই ত্যাজ্য বস্তুতে অংশত দ্বেষভাব থাকতে পারে। সেই দ্বেষভাব সম্পূর্ণরূপে দূর করার জন্যই এখানে বিরত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। তাৎপর্য হল এই যে, সংকল্পের সঙ্গে অনুরাগ যেন না হয়, দ্বেষ ভাবও যেন না আসে ; অর্থাৎ এগুলি থেকে একেবারে বিমুখ হয়ে যাবে।

এখানে বিমুখ হতে বলার কারণ হল এই যে, পরমাত্মতত্ত্ব মনে ধারণ করা যায় না ; কারণ মন প্রকৃতির অংশ। প্রকৃতিকেই যখন মন ধারণ করতে সক্ষম নয়, তাহলে প্রকৃতির অতীত এই পরমাত্মতত্ত্ব কীভাবে ধারণ করবে ?—**'যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্'** (কেনোপনিষদ্, ১।৫)। যেমন—মূলতঃ সূর্যের কারণেই প্রদীপ এবং বিদ্যুৎ প্রকাশিত হয়, অতএব সেই প্রদীপ ইত্যাদি সূর্যকে কী করে প্রকাশ করবে ? এদের আলো তো সূর্য থেকেই আসে ! তেমনই মন-বুদ্ধি ইত্যাদিতে যা কিছু শক্তি থাকে, তা পরমাত্মা থেকেই আসে। সুতরাং সেই মন-বুদ্ধি ইত্যাদি কী করে পরমাত্মাকে ধারণ করবে ? ধারণ করতে সক্ষম নয়।

দ্বিতীয়তঃ, জগতের অভিমুখী হলে কারোরই সুখ হয় না, কেবল দুঃখই-দুঃখ হয়। অতএব জগৎ-সংসার নিয়ে চিন্তার প্রয়োজনই নেই। তাহলে এখন কী করা উচিত ? তার থেকে বিরত (বিমুখ) থাকাই ভাল।

'আত্মসংস্থং মনঃ[২] কৃত্বা'—সর্বত্র এক সচ্চিদানন্দ পরমাত্মাই পরিপূর্ণ হয়ে আছেন। সংকল্পগুলির আদিতে এবং অন্তে সেই পরমাত্মাই বিদ্যমান। সংকল্পেও আধার এবং প্রকাশকরূপে এক পরমাত্মাই পরিপূর্ণ হয়ে আছেন। ওই সংকল্পে আর কোনো অস্তিত্ব উৎপন্ন হয়নি ; এতে সত্তারূপে সেই পরমাত্মাই বিদ্যমান। বুদ্ধিতে এটি দৃঢ়রূপে ধারণ করবে, কখনো দ্বিধাগ্রস্ত হবে না। মনে যদি কোনো তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, সেটিকেও পরমাত্মার স্বরূপ বলে মনে করবে।

অপর একটি ভাব হল এই যে, পরমাত্মা দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদি সর্বত্র পরিপূর্ণরূপে আছেন। এই দেশ-কাল ইত্যাদি উৎপন্ন হয় এবং লয় হয় কিন্তু পরমাত্মতত্ত্ব কখনো সৃষ্টি হয় না বা নষ্টও হয় না। এটি সর্বদা একইরূপে বিরাজমান। এই পরমাত্মায় মন স্থিত করে অর্থাৎ সর্বস্থানে এক পরমাত্মাই বিদ্যমান, তিনি ছাড়া অন্য কোনো অস্তিত্বই নেই—এইরূপ দৃঢ়নিশ্চিত হয়ে অন্য কোনো ভাবনা রাখবে না।

'ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ'—জগতের চিন্তা করবে না—একথা আগেই বলা হয়েছে। 'পরমাত্মা সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে আছেন' এই চিন্তাও করবে না। কারণ মনকে যখন পরমাত্মাতে স্থিত করা হয়েছে, তখন অন্য চিন্তা আনলে সবিকল্প বৃত্তি হবে অর্থাৎ মনের সঙ্গে সম্পর্ক হবে, যার ফলে জগৎ-সংসার হতে সম্পর্ক-বিচ্ছিন্ন হবে না। যদি 'আমার এইরূপ স্থিতি যেন বজায় থাকে'—এরূপ চিন্তা হয়, তাহলে পরিচ্ছিন্নতাও বজায় থাকে অর্থাৎ চিত্তের এবং চিন্তাকারীর অস্তিত্ব বজায় থাকে। অতএব 'সর্বত্র এক পরমাত্মাই পরিপূর্ণ'—এটি দৃঢ়নিশ্চয় করে পরে আর কোনোপ্রকার চিন্তা করবে না। এইভাবে বিরত হলে

---

[১]ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়শ্চ যাতু। অপ্রাপ্য বোধং বহুকল্পদুর্লভং নৈবাসনাৎ কায়মিদং চলিষ্যতি॥

'এই আসনে বসে আমার শরীর শুষ্ক হয়ে যাক, চর্ম, মাংস, এবং হাড় পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যাক ; কিন্তু বহুকল্পদুর্লভ বোধ প্রাপ্ত না করে এই আসন থেকে এ শরীর নড়বে না।'

[২]এখানে 'মনঃ' শব্দটি অন্তঃকরণের বাচক।

স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপের অনুভূতি হয়, যেটি প্রথমে বাইশতম শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে।

ধ্যান সম্পর্কিত মর্মকথা

সর্বপ্রধান কথা হল যে, পরমাত্মা সর্বত্র পরিপূর্ণ। সর্বদেশে, সর্বকালে, সকল বস্তুতে, সকল ব্যক্তিতে, সমস্ত ঘটনাতে এবং সমস্ত ক্রিয়াতে পরমাত্মা সাকার-নিরাকার ইত্যাদি সর্বরূপে সর্বদা একইভাবে বিরাজমান। পরমাত্মা ছাড়া প্রকৃতির মধ্যে যতপ্রকার যা কিছু আছে, তা সবই পরিবর্তনশীল। কিন্তু পরমাত্মতত্ত্বে কখনো কিছুমাত্র পরিবর্তন হয়নি, হবে না এবং হওয়া সম্ভবও নয়। সেই পরমাত্মার ধ্যান এমনভাবে করতে হবে যেন কোনো ব্যক্তি সমুদ্রের গভীরে ডুব দিয়েছে, যেখানে যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল জলই নজরে আসে। নীচের দিকে তাকালে জল, ওপরে জল, চারিদিক জলেই পরিপূর্ণ। এইভাবে যেখানে কেউ নিজেকে কোনো এক স্থানে নিমজ্জিত মনে করেন, বস্তুতঃ তাঁর মধ্যে পরমাত্মা, বাইরেও পরমাত্মা, ওপরে পরমাত্মা, নীচেও পরমাত্মা—চারিদিক কেবল পরমাত্মাই পরিপূর্ণভাবে বিরাজমান। দেহের প্রতিটি কণায়-কণায় তিনি বিদ্যমান। মানুষের ধ্যেয় হল সেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করা এবং তিনি নিত্য-নিরন্তরই প্রাপ্ত। কেউ কখনোই পরমাত্মতত্ত্ব থেকে দূরে যেতে পারে না। কোনো অবস্থাতেই তাঁর থেকে কেউ আলাদা হয়ে থাকতে পারে না। শুধু মানুষের দৃষ্টি বিনাশশীল বস্তুর দিকে থাকে বলে সর্বদা পরিপূর্ণ, নির্বিকার, সম, শান্ত পরমাত্মতত্ত্ব তাদের নজরে আসে না।

সেই পরমাত্মতত্ত্বে যদি তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় তবে তিনি লক্ষ্য করেন যে, তিনি সর্বত্র সমভাবে পরিপূর্ণ, তখন স্বাভাবিকভাবে ধ্যান হয়, ধ্যান করার প্রয়োজন হয় না। যেমন, আমরা পৃথিবীতে বাস করি এবং আমাদের ভিতরে-বাইরে, উপর-নীচে, চতুর্দিকেই আকাশ বিদ্যমান, চারিদিক শূন্যতায় ব্যাপ্ত, কিন্তু সেদিকে আমরা খেয়াল করি না। খেয়াল করলে দেখতে পাই যে, আমরা আকাশেই আছি, আকাশেই চলা-ফেরা করি, খাওয়া-দাওয়া আকাশে এবং শয়ন-জাগরণও আকাশে করি। আকাশেই (শূন্য স্থানে) আমরা সব কাজকর্ম করি, কিন্তু সেদিকে লক্ষ না থাকায়—এটি আমাদের নজরে আসে না। যদি সেদিকে মনোযোগ দিই যে, এটি আকাশ, এতে মেঘ জন্মায়, তাতে বৃষ্টি হয়, আকাশে সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্র বিরাজ করে তবেই আকাশ লক্ষ্যে আসে, নচেৎ নয়। আকাশকে খেয়াল না করলেও আমরা সব কাজই আকাশে করে থাকি। তেমনই পরমাত্মতত্ত্বের দিকে খেয়াল না থাকলেও আমাদের সমস্ত ক্রিয়াই এই পরমাত্মতত্ত্বের মধ্যেই হয়ে থাকে। তাই গীতায় বলা হয়েছে যে—'**শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া**' অর্থাৎ ধৈর্যযুক্ত বুদ্ধি সহকারে ধীরে ধীরে বিরত হবে। জগতের কোনো কথা মনে উদয় হলে, তার থেকে বিরত হবে। সাধকের এই ভুল হয় যে, যখন তিনি পরমাত্মার ধ্যানে বসেন, তখন জাগতিক বস্তু স্মরণে এলে তিনি তার বিরোধিতা করেন। বিরোধিতা করলে সেই বস্তুটির সঙ্গে সম্পর্কও বজায় থাকে আবার আসক্তি করলেও তার সম্পর্ক বজায় থাকে। সুতরাং এগুলির বিরোধিতাও করা উচিত নয় আবার আসক্তি আনাও উচিত নয়। সেগুলিকে উপেক্ষা করে, তাদের সম্পর্কে উদাসীন, নির্লিপ্ত হতে হয়। জগৎ-সংসারের কথা স্মরণ হয় তো ভালো আর না হয় তাও ভালো—এইরূপ বেপরোয়া ভাব হলে জগতের সঙ্গে আর সম্পর্ক স্থাপন হয় না। সেকারণেই ভগবান বলছেন যে, সেগুলিতে শুধু উদাসীন হওয়াই নয়, বিরত হতে হয়—'**শনৈঃ শনৈঃ উপরমেৎ**'।

যে জিনিস উৎপন্ন হয়, সেগুলি নষ্ট হয়—এই হল নিয়ম। অতএব জগতে যতই সংকল্প-বিকল্প হোক, সবই নষ্ট হয়ে যায়। তাই এগুলিকে ধরে রাখার চেষ্টা করাই ভুল এবং নষ্ট করার চেষ্টা করাও ভুল। জগতে অনেক জিনিসেরই উৎপত্তি হয় এবং বিনাশ হয়, কিন্তু তার ভালো বা মন্দ কোনো প্রভাবই আমাদের দায়ী করে না। কারণ তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। এইরূপ মনে যদি কোনো সংকল্প উদয় হয়, জগৎ-সংসার নিয়ে কোনো চিন্তা জাগে তাহলেও আমাদের তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। যে সকল বস্তু প্রভৃতির সংকল্প জাগে তাদের সঙ্গে যেমন সম্পর্ক নেই, তেমনি যে মনের মধ্যে এগুলির উদয় হয় সেই মনের সঙ্গেও সম্বন্ধ নেই। আমাদের সম্পর্ক থাকে সর্বত্র পরিপূর্ণ যে পরমাত্মা, একমাত্র তাঁরই সঙ্গে। অতএব যে সমস্ত বস্তু উৎপন্ন হয় এবং নষ্ট হয়ে যায় তাতে আসক্তি বা কীসের আর দ্বেষই বা কীসের ? এটি উৎপত্তি ও বিনাশের এক প্রবাহমাত্র। এর থেকে বিরত হয়ে যাও, বিমুখ হয়ে যাও, এর পরোয়া করো না।

সর্বত্র এক পরমাত্মাই পরিপূর্ণ। আমরা যখন আপনাতে

ব্যক্তিত্ব আরোপ করি, তখন 'আমি আছি' এরূপ বোধ হয়। এই ব্যক্তিত্ব, 'আমিত্ব' ভাব যাঁর অন্তর্গত, সেই তিনি হলেন অপার, অসীম, সম, শান্ত, সদ্ঘন, চিদ্ঘন, আনন্দঘন পরমাত্মা ; যেমন, সমস্ত পদার্থ, ক্রিয়া ইত্যাদি একই অস্তিত্বের অন্তর্গত। সেই অস্তিত্বের যদি সম্পর্ক থাকে তবে তা বস্তু, ব্যক্তি এবং সমস্ত ক্রিয়ার সঙ্গে আছে আর যদি সম্পর্ক না থাকে তাহলে কারো সঙ্গেই নেই। অস্তিত্ব নিজ স্থানে একইভাবে অবস্থান করে। তাতে নানা বস্তু আসে যায়, নানাপ্রকার ক্রিয়া হয়ে থাকে ; কিন্তু সেই অস্তিত্বের তাতে কোনো পরিবর্তন হয় না। তেমনই অস্তিত্বরূপ পরমাত্মার সঙ্গে কোনো বস্তু, ক্রিয়া, ইত্যাদির কোনোপ্রকার সম্পর্কই নেই। সম্পর্ক থাকলে সম্পূর্ণের সঙ্গেই সম্পর্ক থাকে আর নাহলে কোনো কিছুর সঙ্গে থাকে না। এই বস্তু, ক্রিয়া ইত্যাদি সব উৎপত্তি ও বিনাশশীল এবং পরমাত্মা অনুৎপন্ন তত্ত্ব। সেই পরমাত্মাতে স্থিত হয়ে কোনো কিছু চিন্তা করবে না।

এক হল চিন্তা 'করা' আর অপরটি হল চিন্তা 'হওয়া'। চিন্তা করবে না কিন্তু চিন্তা আপনি যদি হয়ে যায়, তার সঙ্গে কখনো সম্পর্ক স্থাপন করবে না, সতর্ক থাকবে। প্রকৃতপক্ষে আমরা অসঙ্গই থাকি । কারণ সংকল্প এবং বিকল্প উৎপন্ন হয় ও নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু আমি বিদ্যমান থাকি। তাই যে বিদ্যমান সে স্বরূপেই স্থিত থাকবে এবং সংকল্প ও বিকল্পকে উপেক্ষা করবে, তাহলে এগুলি (সংকল্প-বিকল্প) আর আমাদের ওপর ক্রিয়াশীল হবে না। সাধক একটি ভুল করে ফেলে—যখন তার জগৎ-সংসারের কথা মনে পড়ে তখন সে আগ্রহে তাকে দূর করার চেষ্টা করে। এরূপ করলে তার জগতের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সেইজন্য সেগুলি দূর করার জন্য উদ্যম করবে না, বরং মনে ভাববে যে এই সংকল্প-বিকল্প যা মনে উঠছে, এতেও পরমাত্ম-তত্ত্ব ওতপ্রোত হয়ে আছে। যেমন জলে বরফ ফেললে, বরফ নিজেও জল আবার তার বাইরেও জল। তেমনি সংকল্প-বিকল্প যা কিছু মনে উঠুক, তা সবই পরমাত্মার অন্তর্গত এবং সংকল্প-বিকল্পের মধ্যেও সেই পরমাত্মাই পরিপূর্ণ হয়ে আছেন। যেমন সমুদ্রে বড় বড় ঢেউ ওঠে, একটি ঢেউ-এর পর আর একটি ঢেউ আসে—সেই ঢেউগুলি জলেই পরিপূর্ণ—পৃথক পৃথক দেখালেও সেগুলি জলময় এবং একই জল থেকে সৃষ্ট ঢেউ ছাড়া আর কিছুই নয়। তেমনি সংকল্প-বিকল্পে পরমাত্মতত্ত্ব ছাড়া আর কোনো তত্ত্ব নেই, কোনো বস্তু নেই।

এখন কোনো পুরানো ঘটনা স্মরণে এল—যেটি পূর্বে ঘটেছিল, কিন্তু এখন তা নেই। মানুষ জোর করে সেটিকে চিন্তা করে এই ভেবে শঙ্কিত হয় যে, এবার কী করব, মন বসছে না। প্রকৃতপক্ষে মানুষ যখন পরমাত্মার ধ্যান করতে থাকে, সেই সময় অনেক পুরানো ঘটনার স্মৃতি ও সংস্কার নাশ হবার জন্যই প্রকটিত হয় । কিন্তু সাধক সেটি বুঝতে না পেরে তাতে গুরুত্ব দিয়ে সেগুলি আরো মজবুত করে ফেলে। এইজন্য তাকে উপেক্ষা করবে। সেগুলির ভালো বা মন্দ কিছুই ভাববে না, তাহলে সেগুলির যেমন উদয় হয়েছে, তেমনই লয় হয়ে যাবে। আমাদের সম্বন্ধ একমাত্র পরমাত্মার সঙ্গে, আমরা পরমাত্মার এবং পরমাত্মা আমাদের। সর্বত্র পরিপূর্ণ এই পরমাত্মাতে আমাদের স্থিতি চিরন্তন—এরূপ মনে করে শান্ত হয়ে বসবে। নিজে থেকে কোনো চিন্তা করবে না। কোনো চিন্তা আপনিই উদয় হলেও তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করবে না। তখন সমস্ত বৃত্তি স্বতঃই শান্ত হয়ে যাবে ও পরমাত্মার ধ্যান স্বাভাবিকভাবে হবে। কারণ বৃত্তিগুলি আসে আর যায় কিন্তু পরমাত্মা সদা বিরাজমান। যা স্বতঃসিদ্ধ, তা নিয়ে কী করার আছে ? কিছু করারই নেই। সাধক মনে করে যে, আমি ধ্যান করছি, চিন্তা করছি—এটি ভুল। সর্বত্রই যখন এক পরমাত্মাই বিরাজমান, তখন কী চিন্তা করবে, কী ধ্যান করবে ? সমুদ্রে ঢেউ ওঠে, কিন্তু জল-তত্ত্বে ঢেউও নেই, সমুদ্রও নেই। তেমনই পরমাত্মতত্ত্বে জগৎ-সংসারও নেই, বস্তুও নেই আর আসা-যাওয়াও নেই। এই পরমাত্মতত্ত্ব হল পরিপূর্ণ, সম, শান্ত, নির্বিকার এবং স্বতঃসিদ্ধ। তাঁর চিন্তা করতে হয় না। তাঁর কি চিন্তা করবে ? তাঁতে আমাদের স্থিতি তো স্বতঃ এবং সব সময়ই আছে। কার্যাদির সময়ও সেই পরমাত্মার থেকে আমরা পৃথক হই না, নিরন্তর তাঁর মধ্যেই আমরা অবস্থিত। ব্যবহার্য বিষয়গুলিকে যখন আমরা সমাদর করি, গুরুত্ব দিই, তখনই মনের মধ্যে বিক্ষেপ আসে। একান্তে বসে কোনো বিষয়ে চিন্তা করতে থাকলে মনে বিক্ষেপ উপস্থিত হয়। প্রকৃতপক্ষে বিক্ষেপ ওই বিষয়টির জন্য হয় না। ওগুলিকে গুরুত্ব দিলে, ওগুলির অস্তিত্ব মেনে নিলেই বিক্ষেপ হয়।

যেমন আকাশে মেঘ উৎপন্ন হয় এবং বিলীনও হয়, তেমনি মনে নানা স্ফুরণ উৎপন্ন হয় আবার শান্ত হয়ে যায়।

আকাশে কত মেঘ উৎপন্ন হয় আবার মিলিয়ে যায়, কিন্তু তাতে আকাশের কোনো পরিবর্তন হয় না ; সেটি একই প্রকার থাকে। তেমনই ধ্যানের সময় কোনো চিন্তা আসুক বা না আসুক, পরমাত্মা একইভাবে পরিপূর্ণ হয়ে বিরাজ করেন। কোনো কিছু স্মরণে এলে তাতেও পরমাত্মা বিরাজমান থাকেন, আর কিছু স্মরণে না এলে তাতেও পরমাত্মা বিরাজ করেন। দেখা, শোনা, বোঝার যা কিছু আছে, তার বাইরেও পরমাত্মা এবং সে সবের মধ্যেও পরমাত্মা বিরাজ করেন। স্থাবর-অস্থাবর যা কিছু আছে, তাও পরমাত্মা। দূর থেকে দূরেও যে পরমাত্মা এবং নিকট থেকে নিকটেও সেই পরমাত্মা। কিন্তু অতি সূক্ষ্ম হওয়ায় তিনি বুদ্ধির গম্য হন না (গীতা ১৩।১৫)। পরমাত্মা এইরূপ সদ্‌ঘন, চিদ্‌ঘন এবং আনন্দঘন। সর্বত্র পূর্ণ আনন্দ, অপার আনন্দ, সম আনন্দ, শান্ত আনন্দ, ঘন আনন্দ, অচল আনন্দ, অটল আনন্দ, সর্বস্থানে শুধু আনন্দেই পরিপূর্ণ।

একান্তে বসে ধ্যান করার সময় ছাড়া অন্য কাজ করার সময়েও মনে করতে হবে যে পরমাত্মা সর্বত্র পরিপূর্ণভাবে আছেন। কাজ করার সময় সাবধান হয়ে পরমাত্মার অস্তিত্ব চিন্তা করলে, ধ্যানের সময় খুব উপকার হয় আর ধ্যান করার সময় সংকল্প-বিকল্পকে উপেক্ষা করলে সাংসারিক ব্যবহারের সময় স্বতঃ পরমাত্মার চিন্তা বজায় থাকে। যিনি সাধক হন তিনি দু-এক ঘণ্টার জন্য তা হন না, অষ্টপ্রহরই সাধক থাকেন। যেমন ব্রাহ্মণ তাঁর ব্রাহ্মণত্বে সর্বদা অবস্থান করেন, তেমনই জীবমাত্রেই পরমাত্মাতে সর্বদা অবস্থান করে। ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করে কিন্তু পরমাত্মা অজ, তিনি জন্মান না। কিন্তু কাজ কর্ম করাকালে বিষয়বস্তু, ক্রিয়াদি এবং ব্যক্তিদের দিকে মনোবৃত্তি থাকায় সে সবেও যে পরমাত্মা পরিপূর্ণ রয়েছেন সেদিকে লক্ষ্য থাকে না। তাই একান্তে ধ্যান করার সময় এবং ব্যবহারাদির সময় সাধকের দৃষ্টি এইদিকে থাকা উচিত যে সমস্ত দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা, ক্রিয়া ইত্যাদিতে এক পরমাত্মতত্ত্বই একভাবে পরিপূর্ণ হয়ে আছেন। তাতে অবস্থিত হয়ে আর কোনো চিন্তাকে মনে স্থান দিতে নেই।

পরিশিষ্ট-ভাব—ধ্যানযোগের দুটি পদ্ধতি আছে—১) মনকে একাগ্র করা এবং ২) বিচার বিবেচনাপূর্বক মনের দ্বারা সম্পর্ক ছিন্ন করা। বিচার সহকারে সম্পর্ক ছিন্ন হলে তখনই মুক্তিলাভ হয়। জগতে যত পাপ বা পুণ্য কর্ম হোক, তার সঙ্গে যেমন আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই, তেমনই শরীর-ইন্দ্রিয়াদি-মন ও বুদ্ধির সঙ্গেও আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। একেই 'উপরতি' বা বিরত হওয়া বলে। চিন্তা-বৃত্তির সঙ্গেও সম্পর্ক রাখা উচিত নয়। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—

সর্বং ব্রহ্মাত্মকং তস্য বিদ্যয়াঽঽত্মমনীষয়া। পরিপশ্যন্নুপরমেৎ সর্বতো মুক্তসংশয়ঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২৯।১৮)

'পূর্বোক্ত সাধনকারী (মন-বাক্য-শরীরের সমস্ত ক্রিয়া দ্বারা পরমাত্মার উপাসনা) ভক্তের 'সবকিছুই ভগবান'—এরূপ স্থির বিশ্বাস হয়। তারপর তিনি এই অধ্যাত্মবিদ্যার সাহায্যে সর্বপ্রকার সংশয় রহিত হয়ে পরমাত্মাকে সর্বত্র অনুভব করে বিরত হন অর্থাৎ 'সবই ভগবান'—এই চিন্তাতেও না থেকে, সর্বত্র সাক্ষাৎ পরমাত্মাই পরিলক্ষিত হতে থাকেন।'

সমস্ত দেশ-কাল-ক্রিয়া-বস্তু-ব্যক্তি-অবস্থা-পরিস্থিতি-ঘটনা ইত্যাদিতে এক পরমাত্মতত্ত্বই অস্তিত্বরূপে পরিপূর্ণ হয়ে বিরাজমান। দেশ-কাল ইত্যাদি স্থায়ী নয়। কিন্তু পরমাত্মতত্ত্ব নিত্য বিরাজমান। সাধক এইভাবে প্রথমে মন ও বুদ্ধির দ্বারা দৃঢ় নিশ্চিত হবেন যে 'পরমাত্মতত্ত্ব চির বিরাজমান'। পরে এই মনোভাবও ত্যাগ করে শান্ত হবেন অর্থাৎ চিন্তা ত্যাগ করবেন। আত্মা, অনাত্মা, পরমাত্মা, জগৎ-সংসার, সংযোগ-বিয়োগ ইত্যাদি কোনো কিছু নিয়েই যেন চিন্তা না করেন। কোনো কিছু নিয়ে চিন্তা করলেই জগৎ-সংসার এসে হাজির হবে। কেন-না চিন্তা করলেই চিত্ত (করণ) সঙ্গে থাকবে। করণ সঙ্গে থাকলে জগৎ ত্যাগ হবে না, কারণ করণও জগৎ। তাই **'ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ'** কথাটিতে করণ থেকেই সম্পর্ক ছিন্ন হয়, কেন-না করণ সঙ্গে না থাকলে তবেই প্রকৃত ধ্যান হয়। সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর চিন্তাতেও বৃত্তি জেগে থাকে, তা দূর হয় না। অপরপক্ষে কোনো কিছু চিন্তা করার ভাব না থাকলে বৃত্তি স্বতঃই শান্ত হয়ে যায়। তাই সাধককে সর্বতোভাবে চিন্তাকে উপেক্ষা করতে হবে। যেমন জল স্থির (শান্ত) হলে জলে মিশ্রিত মাটিও ধীরে ধীরে আপনিই শান্ত হয়ে যায়, তেমনই অহম্ বিলীন হয়ে প্রকৃত তত্ত্ব (অহংরহিত সত্তা) অনুভূত হয়।

এখানে বৃত্তির অভাব বুঝাতেই **'শনৈঃ শনৈঃ'** পদটি ব্যবহৃত হয়েছে, এটি বলার তাৎপর্য হল যে জোর করে নয় বা

তাড়াহুড়ো করেও নয়। কারণ জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার তাড়াহুড়ো করলে দূর হয় না। অতি ব্যস্ততা চাঞ্চল্যকে ধরে রাখে, স্থায়ী করে, কিন্তু **'শনৈঃ শনৈঃ'** চাঞ্চল্য নাশ করে।

প্রকৃতির সম্পর্ক ছাড়া তত্ত্বের চিন্তা বা মনন হতে পারে না। অতএব সাধক যদি চিন্তা করেন তাহলে চিত্ত সঙ্গে থাকে, মনন করলে মন সঙ্গে থাকে, নিশ্চয় করা কালে বুদ্ধি সঙ্গে থাকে, দর্শন করলে দৃষ্টি সঙ্গে থাকে, শ্রবণ করলে শ্রবণেন্দ্রিয় সঙ্গে থাকে, কথা বললে বাণী সঙ্গে থাকে। তেমনই 'আছে'-কে মেনে নিলে মেনে নেওয়া এবং মান্যকারী থেকে যাবেন আর 'না'-কে বারণ করলে যিনি বারণ করবেন তিনি থেকে যাবেন। কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করলে 'আমি কর্তা নই'—এই সূক্ষ্ম অহংভাব থেকে যায় অর্থাৎ ত্যাগ করলে ত্যাজ্য বস্তু এবং ত্যাগী (ত্যাগকারী) থেকে যান। তাই সাধক এর থেকে যেন উদাসীন হন অর্থাৎ মেনেও যেন না নেন, বারণও যেন না করেন, গ্রহণও না করেন, ত্যাগও না করেন, অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ স্বাভাবিক তত্ত্বকে স্বীকার করে অন্তরে-বাহিরে যেন শান্ত হন। আমাকে শান্ত থাকতে হবে—এই আগ্রহ বা সংকল্পও যেন না থাকে, না হলে এতেই কর্তৃত্ববোধ এসে যাবে, কারণ শান্ত থাকা হল স্বতঃসিদ্ধ।

সাধক আমি, তুমি, ও, সে—এই চারটিকে বাদ দিলে পরিণামে এক অস্তিত্ব মাত্র থাকে। সেই স্বতঃসিদ্ধ অস্তিত্বকে স্বীকার করে স্বেচ্ছায় আর কোনো চিন্তা করবে না। যদি কোনো চিন্তার উদয় হয়, তাহলে তাতে রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ করবে না, খুশি-অখুশি হবে না, তাকে ভালো বা মন্দ বলে মনে করবে না। চিন্তা করা উচিত নয়, কিন্তু চিন্তা এসে গেলে তাতে কোনো দোষ নেই। হাওয়া আপনিই প্রবাহিত হয়, শীত-গ্রীষ্ম আসে, বর্ষা হয়, তাতে আমাদের কোনো পাপ বা পুণ্য হয় না, কেন-না তার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্কই নেই। জড়ত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেই দোষ স্পর্শ করে। অতএব চিন্তা এলে তাকে উপেক্ষা করতে হবে, তার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করা উচিত নয় অর্থাৎ এমন মনে করা উচিত নয় যে আমি চিন্তা করছি বা চিন্তা আমার মধ্যে হচ্ছে। চিন্তা মনে হয় এবং মনের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

'আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা' কথাটিতে 'মন' শব্দটি বুদ্ধির বাচক, কারণ চাঞ্চল্য মনে এবং স্থৈর্য বুদ্ধিতে হয়। সুতরাং **'আত্মসংস্থম্'** কথাটির তাৎপর্য হল এই, যেন চাঞ্চল্য না থাকে, যেন স্থৈর্য থাকে। যেমন 'এটি অমুক গ্রাম'—এটি দৃঢ়নিশ্চিতরূপে জানা থাকলে তা নিয়ে আর কোনো চিন্তা থাকে না, তেমনই 'পরমাত্মা আছেন' এরূপ কথা দৃঢ়ভাবে জানা থাকলে, তা নিয়ে আর চিন্তা হয় না। যা স্বতঃসিদ্ধ, তার জন্য চিন্তা কিসের ? তাই আত্মচিন্তা করলে আত্মবোধ হয় না, কারণ আত্মচিন্তা করলে চিন্তাকারী থাকে এবং অনাত্মার অস্তিত্ব থাকে। অনাত্মার অস্তিত্ব মানলে তবেই তো অনাত্মার ত্যাগ এবং আত্মার চিন্তা করবে !

'ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ'— একে 'চুপ সাধন', 'মূক সৎসঙ্গ' এবং 'অচিন্ত্যের ধ্যান'ও বলা হয়। এতে স্থূল শারীরিক ক্রিয়া নেই, সূক্ষ্মশরীরের চিন্তা নেই অথবা কারণ শরীরের স্থিরতা নেই। এতে ইন্দ্রিয়াদি নিস্তেজ থাকে, মনও শান্ত থাকে, বুদ্ধিও নিষ্কম্প থাকে অর্থাৎ শরীর-ইন্দ্রিয়াদি-মন-বুদ্ধির কোনো ক্রিয়া থাকে না। সকলেই চুপ, কেউ কিছু বলে না। যা দেখার ছিল—তা দেখা হয়েছে, শোনার ছিল—শোনা হয়েছে, বলার ছিল—বলা হয়েছে, করার ছিল— করে নিয়েছি। এখন আর কিছুই দেখা-শোনা- বলা-করাতে রুচি নেই, আগ্রহ নেই—এরূপ অবস্থা হলেই তখন 'চুপ সাধন' হয়। এই 'চুপ সাধন' সমাধির থেকেও উচ্চাবস্থা, কারণ এতে বুদ্ধি এবং অহং কর্তৃত্ববোধ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন হয়। সমাধিতে লয়, বিক্ষেপ, কষায় এবং রসাস্বাদ—এই চার দোষ বা বিঘ্ন থাকে, কিন্তু চুপ সাধনে এইসব দোষ থাকে না। চুপ সাধন বৃত্তিরহিত।

* * *

সম্বন্ধ—পূর্বোক্ত প্রকারে নির্বিকল্প স্থিতি না হলে কী করা উচিত তারজন্য পরবর্তী শ্লোকে অভ্যাস করার কথা জানাচ্ছেন।

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥ ২৬ ॥

[অস্থিরম্ (অস্থির) ; চঞ্চলম্ (চঞ্চল) ; মনঃ (মন) ; যতঃ, যতঃ (যে যে বিষয়ে) ; নিশ্চরতি (বিচরণ করে) ; ততঃ, ততঃ (সেই সেই স্থান হতে) ; নিয়ম্য (প্রত্যাহার করে) ; এতৎ (একে) ; আত্মনি, এব (এক পরমাত্মাতেই) ; বশং, নয়েৎ (নিবিষ্ট করে রাখবো)]

এই অস্থির ও চঞ্চল মন যে যে বিষয়ে বিচরণ করে, সেই সেই বিষয় হতে প্রত্যাহার করে এক পরমাত্মাতেই নিবিষ্ট করবে[১]॥ ২৬ ॥

ব্যাখ্যা—'যতো যতো নিশ্চরতি ..... আত্মন্যেব বশং নয়েৎ'—সাধক যাকে ধ্যেয় করেছেন, তাতে সহজে মন বসে না, স্থির হয় না। তাই তাকে 'অস্থির' বলা হয়েছে। এই মন নানাপ্রকার সাংসারিক ভোগ-সুখ ও পদার্থাদির চিন্তা করতে থাকে। সেইজন্য একে চঞ্চল বলে অভিহিত করা হয়েছে। তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, মন পরমাত্মাতেও স্থির হয়ে থাকে না এবং সংসারও ত্যাগ করতে পারে না, তাই সাধকদের উচিত যে, মন যে যে বিষয়ে ধাবিত হয়, তাকে সেই সেই বিষয় হতে তখনই প্রত্যাহার করে পরমাত্মাতে নিবিষ্ট করতে হবে। এই অস্থির এবং চঞ্চল মনকে সাবধানতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, কোনো আলগাভাব রাখতে নেই।

মনকে পরমাত্মায় নিবিষ্ট করার তাৎপর্য হল—যখন বোঝা যায় মন কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তা করছে, তখনই বিচার করতে হয় যে চিন্তাবৃত্তি ও তার বিষয়ের আধার ও প্রকাশক স্বয়ং পরমাত্মাই। একেই বলে পরমাত্মায় মনোনিবেশ করা।

পরমাত্মাতে মন নিবিষ্ট করার যুক্তি

১) মন যে যে ইন্দ্রিয়-বিষয়ে, যে যে ব্যক্তি, বস্তু, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদিতে ধাবিত হয় অর্থাৎ সেগুলির চিন্তা করতে থাকে, সেই সেই বিষয়াদি থেকে মন প্রত্যাহার করে নিজ ধ্যেয়—পরমাত্মাতে নিবিষ্ট করবে। পুনরায় মন ধাবিত হলে আবার পরমাত্মার দিকে ফিরিয়ে আনবে। এইভাবে বারংবার মনকে ধ্যেয়তে অভিনিবেশ করাবে।

২) মন যেখানে যাক, সেখানেই পরমাত্মাকে দেখবে। যেমন, গঙ্গা নদীর কথা স্মরণ হলে, ভাবতে হবে গঙ্গানদী রূপে পরমাত্মাই বিরাজমান। গাভীর কথা মনে পড়লে ভাবতে হবে গাভীরূপে পরমাত্মাই বিরাজ করছেন—এইভাবে মনকে পরমাত্মায় নিবিষ্ট করবে। অন্যভাবে দেখলে, গঙ্গানদী ইত্যাদিতে সত্তারূপে পরমাত্মাই বিরাজ করছেন। কারণ এগুলির আগেও পরমাত্মা ছিলেন, এগুলি নাশ হলেও পরমাত্মাই থাকবেন আর বর্তমান অবস্থাতেও এতে পরমাত্মাই আছেন—এইরূপে মনকে পরমাত্মাতে নিবিষ্ট করবে।

৩) সাধক যখন পরমাত্মাতে মনোনিবেশ করার অভ্যাস করেন, তখন জগতের নানা কথা তাঁর মনে পড়তে থাকে। এতে সাধক এই ভেবে শঙ্কিত হন যে, যখন আমি জগৎ-সংসারের কাজ করতাম, তখন এতো কথা মনে হত না, এত চিন্তা হত না ; কিন্তু যখন পরমাত্মায় মনোনিবেশ করার চেষ্টা করছি, তখনই নানারকম কথা মনে আসছে ! কিন্তু এতে সাধকের ভয় পাবার কোনো কারণ নেই ; কারণ সাধকের যখন উদ্দেশ্য হয় পরমাত্মাকে লাভ করা, তখন তাঁর মনের ভেতর থেকে সংসারের চিন্তারূপে নানা মলিনতা বের হয়ে আসে এবং চিত্ত পরিষ্কার হয়ে যায়। তাৎপর্য হল এই যে, সাংসারিক কাজের সময় অন্তরের পুঞ্জিত প্রাচীন সংস্কার বার হওয়ার সুযোগ পায় না। তাই সাংসারিক কাজ ত্যাগ করে একান্তে থাকলে সেগুলি বেরিয়ে আসার সুযোগ পেয়ে বার হতে থাকে।

৪) সাধকের ভগবৎ-চিন্তা কঠিন বোধ হয় এইজন্য যে, তিনি নিজেকে জগৎ-সংসারের ভেবে ভগবদ্ চিন্তা করেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁর জগতের চিন্তা হয় এবং ভগবানের চিন্তা করতে হয়। তবুও ভগবানের চিন্তা স্থির হয় না। তাই সাধকের উচিত ভগবানের হয়ে ভগবানের চিন্তা করা। অর্থাৎ 'আমি তো শুধু ভগবানেরই আর শুধু ভগবানই আমার ; আমি শরীর ও জগৎ-সংসারের নই এবং এই শরীর ও জগৎ-সংসার আমার নয়', এইরূপ ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত হলে ভগবানের চিন্তা স্বাভাবিকভাবে হয় চিন্তা করতে হয় না।

৫) ধ্যান করার সময় সাধকের এইদিকে দৃষ্টি রাখতে হয় যেন মনে কোনো কাজ জমা হয়ে না থাকে অর্থাৎ আমার

[১]সমগ্র গীতার মধ্যে অভ্যাসের মূল পরিচয় স্পষ্টরূপে এই শ্লোকেই দেখতে পাওয়া যায়।

অমুক কাজটা করতে হবে, অমুক স্থানে যেতে হবে, অমুক ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে হবে, অমুক ব্যক্তি দেখা করতে আসবে, তার সঙ্গে কথাও বলতে হবে ইত্যাদি কাজ জমা করে রাখবে না। এরূপ কাজের আকর্ষণ ধ্যান হতে দেয় না। সুতরাং ধ্যানে বসার সময় চিত্তকে শান্ত করে তবে ধ্যানে বসতে হয়।

৬) ধ্যান করার সময় মনে যখন কোনো সংকল্প বা বিকল্প এসে পড়ে, তখন **'অড়ংগ বড়ংগ স্বাহা'** (আবোল-তাবোল স্বাহা)—এরূপ বলে ওইসব দূর করতে হয় অর্থাৎ 'স্বাহা' বলে সংকল্প -বিকল্পকে (অড়ংগ-বড়ংগ) আহুতি দিতে হয়।

৭) সামনে দৃষ্টি রেখে কিছুক্ষণ পরপর চোখের পলক ফেলবে এবং চোখ বন্ধ করবে। চোখের পলক ফেলতে থাকলে, বাইরের দৃশ্য যেমন চোখের থেকে অদৃশ্য হয় চিত্তের সংকল্প ও বিকল্পও তেমনি কেটে যায়।

৮) নাক দিয়ে শ্বাসকে প্রথমে দু-তিন বার জোরে জোরে ফেলবে এবং শেষে জোর করে একবার সম্পূর্ণ নিঃশ্বাস বাইরে ফেলে নিঃশ্বাস বন্ধ করে থাকবে। যতক্ষণ সম্ভব শ্বাস বন্ধ রেখে তারপর ধীরে ধীরে নিয়ে স্বাভাবিক শ্বাসের স্থিতিতে ফিরে আসবে। এ ভাবেও সমস্ত সংকল্প-বিকল্প দূর হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব—আগের শ্লোক অনুযায়ী যদি চুপ-সাধন করা সম্ভব না হয়, তাহলে মন যে যে বিষয়ে ধাবিত হয়, সেখান থেকে সরিয়ে তা পরমাত্মাতে নিবিষ্ট করবে। মনকে পরমাত্মাতে নিবিষ্ট করার একটি শ্রেষ্ঠ সাধন হল এই যে মন যে যে বিষয়ে ধাবমান হয়, সেই সেই বিষয়ে পরমাত্মাকেই দর্শন করা অথবা মনে যা যা চিন্তার উদয় হয়, সেগুলিকে পরমাত্মারই স্বরূপ বলে জানা।

মর্ম কথা হল এই যে সাধক যতক্ষণ এক পরমাত্মার অস্তিত্ব ব্যতীত অন্য অস্তিত্ব মেনে নেন, ততক্ষণ তাঁর মন সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হতে পারে না। কারণ যতক্ষণ তাঁর মধ্যে ভিন্ন অস্তিত্ব মেনে নেওয়া থাকে, ততক্ষণ রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ সর্বতোভাবে দূর হতে পারে না এবং রাগ-দ্বেষ রহিত না হলে মনের যথার্থভাবে বিষয়রহিত হওয়া সম্ভব নয়। রাগ-দ্বেষ থাকলে মনের আংশিক নিরোধ হয়, এতে লৌকিক সিদ্ধি প্রাপ্তি হলেও প্রকৃত তত্ত্ব প্রাপ্তি হয় না। অপর সত্তা মেনে নেওয়ার ব্যাপারটি থাকলে মন যদি নিরুদ্ধ হয়, তাতে ব্যুত্থান হয় অর্থাৎ এতে সমাধি ও ব্যুত্থান দুটি অবস্থাই হয়। কারণ দ্বিতীয় অস্তিত্ব না মানলে দুই অবস্থা সম্ভব হতে পারে না। সুতরাং দ্বিতীয় অস্তিত্ব স্বীকার না করলে তবেই মন সর্বতোভাবে নিরুদ্ধ হয়।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—চব্বিশ-পঁচিশতম শ্লোকে যে ধ্যানযোগীদের উপরতির কথা বলা হয়েছে, পরবর্তী দুটি শ্লোকে সেই অবস্থার বর্ণনা করে সাধনার ফল জানাচ্ছেন।

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্॥ ২৭ ॥

[**অকল্মষম্** (যাঁর সমস্ত পাপ দূর হয়েছে) ; **শান্তরজসম্** (যাঁর রজোগুণ দূরীভূত হয়েছে) ; **প্রশান্তমনসম্** (যাঁর মন সর্বতোভাবে শান্ত হয়েছে) ; **এনম্, ব্রহ্মভূতম্** (এইরূপ ব্রহ্মভূত) ; **যোগিনম্, হি** (যোগীর নিশ্চিতভাবে) ; **উত্তমম্** (উত্তম) ; **সুখম্** (সুখ) ; **উপৈতি** (লাভ হয়।)]

যাঁর সমস্ত পাপ দূর হয়েছে, যাঁর রজোগুণ তথা মন সর্বতোভাবে শান্ত হয়েছে, এইরূপ ব্রহ্মস্বরূপ যোগীর নিশ্চিতভাবে উত্তম সাত্ত্বিক সুখ লাভ হয় ॥ ২৭ ॥

ব্যাখ্যা—'প্রশান্তমনসং হ্যেনং ...ব্রহ্মভূতমকল্মষম্'—যাঁর সমস্ত পাপ দূরীভূত হয়েছে অর্থাৎ তমোগুণ এবং তমোগুণগত অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ এবং মোহ (গীতা ১৪।১৩)—এইসব বৃত্তি নষ্ট হয়েছে, এরূপ যোগীকে এখানে **'অকল্মষম্'** বলে অভিহিত করা হয়েছে।

যাঁর রজোগুণ এবং রজোগুণগত লোভ, প্রবৃত্তি, নব-নব কর্মে উদ্যোগ, অশান্তি, স্পৃহা (গীতা ১৪।১২)—এইসব বৃত্তি সমাহিত হয়েছে, সেরূপ যোগীকে এখানে

'শান্তরাজসম্' বলে বলা হয়েছে।

তমোগুণ, রজোগুণ তথা ওগুলির বৃত্তিসমূহ শান্ত হওয়ায় যাঁর মন স্বাভাবিকভাবে শান্ত হয়েছে অর্থাৎ প্রাকৃত পদার্থমাত্রেই তথা সংকল্প বিকল্পে যাঁর উপরতি হয়েছে, এইরূপ স্বাভাবিক শান্ত মনের যোগীকে এখানে **'প্রশান্তমনসম্'** বলা হয়েছে।

'প্রশান্ত' বলার তাৎপর্য হল এই যে, ধ্যানযোগী যতক্ষণ মনকে নিজের বলে মনে করেন, ততক্ষণ অভ্যাস দ্বারা মন শান্ত হলেও প্রশান্ত অর্থাৎ সর্বতোভাবে শান্ত হয় না। কিন্তু ধ্যানযোগী যখন মন থেকে উপরাম (নিবৃত্তি) হন অর্থাৎ মনকে নিজের বলে মনে করেন না, তাঁর থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করেন, তখন মনে রাগ-দ্বেষ না থাকায় তাঁর মন স্বাভাবিকভাবে শান্ত হয়ে যায়।

পঁচিশতম শ্লোকে যাঁর উপরতির বর্ণনা করা হয়েছে, তিনিই (উপরত হওয়ায়) পাপরহিত, শান্ত রজোগুণসম্পন্ন এবং প্রশান্ত-মনা হয়েছেন। তাই ওই যোগীর উল্লেখে এখানে **'এনম্'** পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। এরূপ ব্রহ্মস্বরূপ ধ্যানযোগীর স্বভাবতঃই উত্তম সুখ অর্থাৎ সাত্ত্বিক সুখ লাভ হয়।

প্রথমে তেইশতম শ্লোকের উত্তরার্ধে যে যোগ অধ্যবসায় সহকারে অভ্যাস করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—**'স নিশ্চয়েন যোক্তব্যঃ'** সেই যোগ অভ্যাসকারীর নিশ্চিতরূপে উত্তম সুখ প্রাপ্তি হয়, এতে কিছুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। সেই নিঃসন্দিগ্ধতা জানাবার জন্যই এখানে **'হি'** পদটির প্রয়োগ হয়েছে।

'সুখমুপৈতি' বলার তাৎপর্য হল এই যে, যে যোগী সবকিছু থেকে উপরত হন, তাঁর উত্তম সুখের খোঁজ করতে হয় না, সেই সুখপ্রাপ্তির জন্য উদ্যোগ, পরিশ্রম ইত্যাদি করতে হয় না, বরং তিনি স্বতঃ স্বাভাবিক সেই উত্তম-সুখ লাভ করেন।

※ ※ ※

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥ ২৮ ॥

[এবম্ (এইভাবে) ; আত্মানম্ (নিজ মন) ; সদা, যুঞ্জন্ (সর্বদা সমাহিত হওয়ায়) ; বিগতকল্মষঃ (নিস্পাপ) ; যোগী (যোগী) ; সুখেন (সহজেই) ; ব্রহ্মসংস্পর্শম্ (ব্রহ্ম প্রাপ্তিরূপ) ; অত্যন্তম্, সুখম্, অশ্নুতে (নিরতিশয় সুখ প্রাপ্ত হন।)]

এইভাবে নিজ মন সর্বদা পরমাত্মায় সমাহিত হওয়ায় নিস্পাপ যোগী সহজেই ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ নিরতিশয় সুখ প্রাপ্ত হন ॥ ২৮ ॥

ব্যাখ্যা—**'যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ'**—নিজ স্থিতির জন্য যে (মনকে বারংবার স্থির করা ইত্যাদি) অভ্যাস করা হয়, সেই অভ্যাসের কথা এখানে বলা হয়নি। এখানে অনভ্যাসই হল অভ্যাস অর্থাৎ নিজের স্বরূপে নিজেকে দৃঢ়ভাবে স্থিত রাখাই হল অভ্যাস। এই অভ্যাসে কোনো চেষ্টা থাকে না। এরূপ অভ্যাস দ্বারা ওই যোগী অহংভাব ও মমত্বরহিত হন। অহংকার ও মমতারহিত হওয়াই হল পাপরহিত হওয়া। কারণ জগতের সঙ্গে অহংভাব ও মমত্বযুক্ত সম্বন্ধ রাখাই হল পাপ।

পঞ্চদশ শ্লোকে **'যুঞ্জন্নেবম্'** পদটি সগুণের ধ্যানের বিষয়ে বলা হয়েছে এবং এখানে **'যুঞ্জন্নেবম্'** পদটি নির্গুণের ধ্যানের বিষয়ে বলা হয়েছে। তেমনই পঞ্চদশ শ্লোকে **'নিয়তমানসঃ'** এসেছে এবং এখানে **'বিগতকল্মষঃ'** আছে, কারণ ওইস্থানে পরমাত্মায় মন সমাহিত করার প্রাধান্য ছিল এবং এখানে জড়ত্ব ত্যাগের প্রাধান্য রয়েছে। ওইস্থানে পরমাত্মাকে ধ্যান করতে করতে মন সগুণ পরমাত্মায় সমাহিত হলে জগৎ-সংসার স্বাভাবিকভাবেই পরিত্যক্ত হয় এবং এইস্থানে অহং-মমত্বরূপ কর্দম হতে অর্থাৎ সংসার হতে সর্বতোরূপে সম্পর্কছেদ করে নিজ ধ্যেয় পরমাত্মায় সমাহিত হয়। এইরূপে দুইয়েরই অর্থ একই দাঁড়ায় অর্থাৎ ওইস্থানে পরমাত্মায় মন নিবিষ্ট হওয়ায় জগৎ পরিত্যক্ত হয় আর এইখানে জগৎ-সংসার পরিত্যক্ত হওয়ায় পরমাত্মায় মন নিবিষ্ট হয়।

'সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে'—তাঁর ব্রহ্মের সঙ্গে যে অভিন্নতা হয়, তাতে **'আমি'** ভাবের

সংস্কারও থাকে না, সত্তাও থাকে না। এটিই হল সুখপূর্বক ব্রহ্মের সাযুজ্য করা। যে সুখে অনুভবকারী এবং অনুভবী বস্তু—কেউই থাকে না, সেটিই হল 'অত্যন্ত সুখ'। যোগী এই সুখ প্রাপ্ত হন। 'অত্যন্ত সুখ', 'অক্ষয় সুখ' (৫।২১) এবং 'আত্যন্তিক সুখ' (৬।২১)—এগুলি সব একই পরমাত্মতত্ত্বরূপ আনন্দের বাচক।

***

সম্বন্ধ—অষ্টাদশ থেকে তেইশতম শ্লোক পর্যন্ত স্বরূপের ধ্যানকারী যে সাংখ্যযোগীর বর্ণনা করা হয়েছে, তাঁর অনুভবের বর্ণনা পরবর্তী শ্লোকে করা হয়েছে।

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥ ২৯ ॥

[সর্বত্র (সর্বত্র) ; সমদর্শনঃ (নিজস্বরূপ দর্শনকারী এবং) ; যোগযুক্তাত্মা (ধ্যানযোগে যুক্তচিত্ত যোগী) ; আত্মানম্ (নিজস্বরূপকে) ; সর্বভূতস্থম্ (সর্বভূতে) ; ঈক্ষতে (দর্শন করেন) ; সর্বভূতানি (সর্বভূতকে) ; আত্মনি (নিজ স্বরূপে।)]

এইরূপ সর্বত্র নিজ-স্বরূপ দর্শনকারী এবং ধ্যানযোগে যুক্তচিত্ত সাংখ্যযোগী নিজ স্বরূপকে সর্বভূতে এবং সর্বভূতকে নিজ স্বরূপে দর্শন করেন ॥ ২৯ ॥

ব্যাখ্যা—**'ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ'**—সর্বত্র এক সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাই পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন। মানুষ যেমন চিনির তৈরি নানাপ্রকার খেলনার নাম, রূপ, আকৃতি ইত্যাদি বিভিন্ন হলেও সেগুলিতে একই চিনি দেখে বা লোহার তৈরি নানাপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্রে একই লোহা, মৃত্তিকা নির্মিত নানাপ্রকার বাসনে একই মৃত্তিকা এবং সোনায় নির্মিত নানাপ্রকার গহনাতে একই সোনা দেখতে পায়, তেমনি ধ্যানযোগী নানাপ্রকার বস্তু-ব্যক্তি ইত্যাদিতে সমরূপে সেই এক আপন স্বরূপকেই দেখেন।

'যোগযুক্তাত্মা'—এর তাৎপর্য হল এই যে, ধ্যানযোগের অভ্যাস করতে করতে এই যোগীর অন্তঃকরণ তাঁর স্বরূপে লীন হয়ে যায়। [লীন হয়ে গেলে তাঁর অন্তঃকরণ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়, যে কথা **'সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি'** পদে বলা হয়েছে।]

'সর্বভূতস্থমাত্মানম্'—তিনি সকল প্রাণীতে নিজ আত্মাকে—নিজ সত্যস্বরূপকে অবস্থিত দেখেন। যেমন সাধারণ প্রাণী সমস্ত শরীরে নিজেকে অনুভব করে অর্থাৎ শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে 'আমি'-কেই পূর্ণরূপে অনুভব করে, তেমনি সমদর্শী ব্যক্তি সকল প্রাণীতে নিজ স্বরূপকে স্থিত দেখেন।

কেউ ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলে, সে স্বপ্নে স্থাবর-জঙ্গম ইত্যাদি অনেক কিছুই দেখে কিন্তু ঘুম ভেঙে গেলে সে স্বপ্ন সৃষ্ট-জগৎ দেখতে পায় না। অতএব স্বপ্নে স্থাবর-জঙ্গম ইত্যাদি সবকিছু নিজে থেকেই সৃষ্ট হয়েছিল। জাগ্রত অবস্থায় যদি কোনো জড় বা চেতন প্রাণী বা পদার্থের কথা স্মরণে আসে, তাহলে সেটি মন দিয়ে দেখতে পায় এবং বিস্মরণ হলেই ওইসব দৃশ্য অদৃশ্য হয়ে যায়। সুতরাং স্মরণকালে যা কিছু দেখে তা সবই মনের দ্বারা সৃষ্ট। এইভাবেই ধ্যানযোগী সমস্ত প্রাণীতে নিজ স্বরূপকে স্থিত দেখেন। স্থিত দেখার তাৎপর্য হল এই যে, সমস্ত প্রাণীতে সত্তারূপে নিজের স্বরূপই আছে। স্বরূপ ভিন্ন অন্য কোনো অস্তিত্ব নেই-ই ; কারণ জগৎ কোনো সময়ই একরূপে থাকে না, এটি প্রতিক্ষণ পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। জগতের কোনো রূপ একবার দেখলে পুনর্বার দেখবার ইচ্ছা হলেও, দেখা সম্ভব নয়। কারণ আগের রূপটির পরিবর্তন হয়ে যায়। এরূপ পরিবর্তনশীল বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদিতে সত্তারূপে অপরিবর্তনশীল নিজ স্বরূপকেই যোগী দেখেন।

'সর্বভূতানি চাত্মনি'—তিনি সমস্ত প্রাণীকেই তাঁর অন্তর্গতরূপে দেখেন অর্থাৎ তাঁর সর্বগত, অসীম, সচ্চিদানন্দঘন স্বরূপেই সমস্ত প্রাণী এবং সমস্ত জগৎকে দেখেন। যেমন এক আলোর অন্তর্গত লাল, হলুদ, কালো, নীল ইত্যাদি যত রঙ দেখা যায়, তা সবই সেই আলোর প্রকাশের থেকেই সৃষ্ট এবং সেটি আলোর প্রকাশেই দেখা যায়। যেমন দৃশ্যমান সমস্ত বস্তুসমূহ সূর্য থেকেই উৎপন্ন

এবং সূর্যের প্রকাশেই দৃষ্ট হয়, তেমনই এই যোগী সমস্ত প্রাণীকে তাঁর স্বরূপ থেকে সৃষ্ট, স্বরূপেই লীন এবং স্বরূপেই স্থিত দেখেন। তাৎপর্য হল এই যে, তিনি যা কিছু দেখেন, সেগুলি সবই তাঁর নিজের স্বরূপ।

এই শ্লোকে প্রাণীদের মধ্যে নিজের স্থিতি জানিয়েছেন, কিন্তু নিজের মধ্যে প্রাণীদের স্থিতির কথা বলেননি। এই কথা বলার তাৎপর্য হল এই যে, প্রাণীদের মধ্যে তাঁর সত্তা থাকলেও, তাঁর মধ্যে প্রাণীদের সত্তা নেই, কারণ স্বরূপ সর্বদা একরূপে অবস্থান করে, কিন্তু প্রাণী জন্মায় এবং মরে।

এই শ্লোকের তাৎপর্য হল এই যে, ব্যবহারকালে প্রাণীদের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন আচরণ হয়, কিন্তু পৃথক পৃথক আচরণ হলেও সেই যোগীর সমদর্শনের স্থিতিতে কোনো পার্থক্য হয় না।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—ভগবান চতুর্দশ-পঞ্চদশ শ্লোকে সগুণ-সাকারের ধ্যানকারী যে ভক্তিযোগীর বর্ণনা করেছেন, তাঁর অনুভবের কথা পরবর্তী শ্লোকে জানিয়েছেন।

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥ ৩০ ॥

[যঃ (যিনি) ; সর্বত্র (সবার মধ্যে) ; মাম্ (আমাকে) ; পশ্যতি, চ (দেখেন এবং) ; ময়ি (আমার মধ্যে) ; সর্বম্, পশ্যতি (সব কিছু পরিদর্শন করেন) ; তস্য (তাঁর কাছে) ; অহম্ (আমি) ; ন, প্রণশ্যামি (অদৃশ্য হই না) ; চ, সঃ (এবং তিনিও) ; মে (আমার কাছে) ; ন, প্রণশ্যতি (অদৃশ্য হন না।)]

যে ভক্ত সবার মধ্যে আমাকে দেখেন এবং আমার মধ্যে সবকিছুকে দর্শন করেন, তাঁর কাছে আমি অদৃশ্য হই না এবং তিনিও আমার কাছে অদৃশ্য হন না ॥ ৩০ ॥

ব্যাখ্যা—'যো মাং পশ্যতি সর্বত্র'—যে ভক্ত সমস্ত দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, পশু-পক্ষী, দেবতা, যক্ষ, রাক্ষস, পদার্থ, পরিস্থিতি, ঘটনা প্রভৃতিতে আমাকেই দেখেন ; যেমন—ব্রহ্মা যখন গো-বৎস্য ও গোপ-বালকদের অপহরণ করেছিলেন, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেই গো-বৎস্য এবং গোপ-বালকরূপ ধারণ করেছিলেন। শুধু বাছুর আর গোপ-বালকই নয়, তিনি তাঁদের যত শিঙা, বাঁশি, পোষাক-পরিচ্ছদ, গহনা ইত্যাদির রূপও ধারণ করেছিলেন।[১] এই লীলা পুরো এক বছর চলেছিল, কিন্তু কেউ জানতে পারেনি। গো-বৎস্যের মধ্যে কয়েকটি বাছুর তো দুগ্ধপোষ্য ছিল, সেগুলি গৃহেই থাকত আর তাদের থেকে বড়গুলিকে শ্রীকৃষ্ণ বনে নিয়ে যেতেন। একদিন বড় ভাই বলরাম দেখলেন যে, দুগ্ধপোষ্য গো-বৎস্যগুলির গাভি-মায়েরা তাদের নিজের আগেকার (বড়) বৎস্যগুলিকে দেখে দুধ পান করাবার জন্য হুঙ্কার দিয়ে ছুটছে। বয়স্ক গোপগণ তাদের থামাতে চেষ্টা করলেও তারা থামেনি। তাই গোপদের সেই গাভিগুলির ওপর খুব রাগ হয়েছিল। কিন্তু যখন তারা নিজ বালকদের দেখল, তখন রাগ শান্ত হয়ে স্নেহে অভিভূত হয়ে পড়ল। তারা বালকদের জড়িয়ে ধরে মস্তকের ঘ্রাণ নিতে লাগল। এই

[১]যাবদ্‌বৎসপবৎসকাল্পকবপুর্যাবৎকরাঙ্ঘ্র্যাদিকং যাবদ্যষ্টিবিষাণবেণুদলশিপ্যাবদ্বিভূষাম্বরম্।
যাবচ্ছীলগুণাভিধাকৃতিবয়ো যাবদ্বিহারাদিকং সর্বং বিষ্ণুময়ং গিরোঽঙ্গবদজঃ সর্বস্বরূপো বভৌ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।১৩।১৯)

'বালকগণ এবং গো-বৎস্যগণ সংখ্যায় যত ছিল, ওদের ছোট ছোট শরীর যেমন ছিল, তাদের হাত-পা যেমন ছিল, তাদের কাছে যত এবং যে প্রকার ছড়ি, শিঙা, বাঁশী এবং বস্ত্র আভরণ ছিল এবং তারা যেরূপ স্বভাব-চরিত্র-গুণ নাম-রূপের ছিল, যে যে অবস্থার ছিল, যেমনভাবে তারা খাওয়া-শোওয়া চলা-ফেরা করত, ঠিক তেমন ভাবে, তেমন রূপে সর্বস্বরূপ ভগবান প্রকটিত হয়েছিলেন। সেইসময় 'এই সম্পূর্ণ জগৎ-সংসারই বিষ্ণুর রূপ'—এই বেদবাণী যেন মূর্তিমতী হয়ে প্রকটিত হয়েছিল।'

লীলা দেখে দাদা বলরাম ভাবতে লাগলেন—এসব কী ব্যাপার ! তিনি তখন ধ্যানস্থ হয়ে বুঝলেন যে, গো-বৎস্য এবং গো-বালকদের রূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই বিরাজিত। ভগবানের সিদ্ধ ভক্তেরাও এইরূপ সর্বত্র ভগবানকেই দেখে থাকেন। অর্থাৎ তাঁদের দৃষ্টিতে ভগবদ্ সত্তা ভিন্ন অন্য কোনো সত্তা থাকে না।

'সর্বং চ ময়ি পশ্যতি'—'আবার যে ভক্ত দেশ-কাল-বস্তু-ব্যক্তি-ঘটনা-পরিস্থিতি ইত্যাদিকে আমারই অন্তর্গত-রূপে দেখে'—যেমন, গীতার উপদেশ দেবার সময় অর্জুনের অনুরোধে ভগবান তাঁর বিশ্বরূপ দেখিয়ে বলেছিলেন যে, সমস্ত জগৎ চরাচর এবং সংসারকে আমার এক অংশে অবস্থিত আছে দেখ—**'ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্। মম দেহে.......'** (১১।৭), তখন অর্জুনও বলেছিলেন যে, আমি তোমার দেহে সকল প্রাণীকে দেখছি—**'পশ্যামি দেবাংস্তব দেবদেহে সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্'** (১১।১৫)। সঞ্জয়ও বলেছিলেন যে, অর্জুন ভগবানের দেহে সমস্ত জগৎ-সংসারকে দেখেছিলেন—**'তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা'** (১১।১৩)। এর তাৎপর্য হল এই যে, অর্জুন ভগবানের দেহে সব কিছু ভগবৎ স্বরূপই দেখেছিলেন। এইরূপই ভক্তের দেখা-শোনা এবং বোঝার মধ্যে যা কিছু আসে, তিনি সেগুলিকে ভগবানের মধ্যেই দেখেন এবং ভগবদ্ স্বরূপই দেখেন।

'তস্যাহং ন প্রণশ্যামি'—ভক্ত যখন সর্বত্র আমাকেই দেখে, তখন আমি তার কাছে কীভাবে লুক্কায়িত থাকব, কোন্ স্থানে লুক্কায়িত থাকব কিংবা কার আড়ালে লুক্কায়িত থাকব ? তাই আমি ওই ভক্তের কাছে অদৃশ্য হই না অর্থাৎ সর্বক্ষণ আমি তার সম্মুখেই থাকি।

'স চ মে ন প্রণশ্যতি'—ভক্ত যখন ভগবানকে সর্বত্র দেখতে পায়, ভগবানও তখন ভক্তকে সর্বস্থানে দেখেন ; কারণ ভগবানের রীতিই হল এই যে, 'যে যেভাবে আমার শরণ নেয়, আমিও সেইভাবেই তাকে আশ্রয় দিই'—**'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'** (গীতা ৪।১১)। তাৎপর্য হল এই যে, ভক্ত ভগবানের সঙ্গে মিলে-মিশে যায়, ভগবানের সঙ্গে তার একাত্মবোধ, ঐক্য হয়ে যায়। তাই ভগবান নিজ স্বরূপে ভক্তকে সর্বত্র দেখতে পান। এইভাবে দেখলে ভক্তও ভগবানের কাছে কখনো অদৃশ্য হন না।

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে ভগবানের কাছে তো কেউই অদৃশ্য হয় না—**'বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন। ভবিষ্যাণি চ ভূতানি ....'** (গীতা ৭।২৬), তাহলে এখানে কেবল ভক্তের জন্যই 'সে আমার কাছে অদৃশ্য হয় না'—এরকম কেন বলা হয়েছে ? এর উত্তর হল এই যে, যদিও ভগবানের কাছে কেউই অদৃশ্য হয় না, তবুও যে ভগবানকে সর্বত্র দেখে, তার ভাবের জন্য ভগবানও তাকে সর্বত্র দেখতে পান। কিন্তু যে ভগবানে বিমুখ হয়ে জগতের প্রতি আসক্ত থাকে, তার কাছে ভগবান অদৃশ্য হয়ে থাকেন—**'নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য'** (গীতা ৭।২৫)। অতএব (তার ভাবের জন্যই) সেও ভগবানের কাছে অদৃশ্য হয়ে থাকে। যতটুকু অংশে তার ভগবানের প্রতি ভাব নেই, ততটা অংশেই সে ভগবানের কাছে অদৃশ্য হয়ে থাকে। একথা ভগবান নবম অধ্যায়েও বলেছেন যে, 'আমি সব প্রাণীতেই সমভাবে অবস্থিত। কেউ আমার শত্রুও নয়, কেউ আমার প্রিয়ও নয়। কিন্তু ভক্তিপূর্বক যে আমাকে ভজনা করে, সে আমাতে এবং আমি তাতে অবস্থান করি' (গীতা ৯।২৯)।

পরিশিষ্ট-ভাব—আগের শ্লোকে আত্মজ্ঞানের কথা বলে ভগবান এবার পরমাত্মজ্ঞানের কথা বলছেন। ধ্যানযোগের কোনো কোনো সাধকের মনে জ্ঞানের সংস্কার থাকায় বিবেকের প্রাধান্য থাকে আর কোনো কোনো সাধকের মধ্যে ভক্তির সংস্কার থাকায় শ্রদ্ধা-বিশ্বাসের প্রাধান্য থাকে। তাই জ্ঞানের সংস্কারসম্পন্ন ধ্যানযোগী বিবেক-পূর্বক আত্মাকে অনুভব করেন—**'সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি'** (গীতা ৬।২৯) এবং ভক্তি সংস্কার-সম্পন্ন ধ্যানযোগী শ্রদ্ধাবিশ্বাস সহকারে পরমাত্মাকে অনুভব করেন—**'যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি'**।

'যো মাং পশ্যতি সর্বত্র' পদটির ভাব হল এই যে, যে আমাকে সবার মধ্যে দেখে এবং নিজের মধ্যেও অবলোকন করে। **'সর্বং চ ময়ি পশ্যতি'** পদটির ভাব হল—সে সবাইকে আমার মধ্যে দেখে এবং নিজেকেও আমার মধ্যে দেখে।

যেমন সর্বত্র বরফ পড়ে থাকলে সেই বরফ কীকরে অদৃশ্য থাকবে ? বরফের পিছনে বরফ রাখলেও বরফই দেখাবে। তেমনই সব রূপে যখন একমাত্র ভগবানই অবস্থিত তখন তিনি কেমন করে লুকাবেন, কোথায় লুকাবেন আর কার পিছনেই বা লুকাবেন ? কেন-না এক পরমাত্মা ব্যতীত আর কোনো অস্তিত্বই তো নেই। পরমাত্মাতে শরীর ও শরীরী, সৎ ও অসৎ, জড় ও চেতন, ঈশ্বর ও জগৎ, সগুণ ও নির্গুণ, সাকার ও নিরাকার ইত্যাদি কোনো ভেদাভেদ নেই। সেই একের মধ্যে বহু ভাগ এবং বহু ভাগের মধ্যেও সেই একই বিরাজমান। এটি বিচার বিবেচনার বিষয় নয়, এ হল শ্রদ্ধা-বিশ্বাসের বিষয়। অতএব 'সবই পরমাত্মা'—এই সত্য সাধকের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসপূর্বক মেনে নেওয়া এবং স্বীকার করা উচিত। দৃঢ়তার সঙ্গে মেনে নিলে পরে সেইমতো অনুভব হয়।

সাধক প্রথমে পরমাত্মাকে দূরে দেখে, পরে কাছে দেখে, তারপর নিজের মধ্যে দেখে, একেবারে শেষে শুধু পরমাত্মাকেই দেখে। কর্মযোগী পরমাত্মাকে কাছে দেখতে পান, জ্ঞানযোগী পরমাত্মাকে নিজের মধ্যে দেখেন, আর ভক্তিযোগী সর্বত্রই পরমাত্মাকে দর্শন করেন।

✲ ✲ ✲

সম্বন্ধ—ভগবান এখন ধ্যানে নিযুক্ত সিদ্ধ ভক্তিযোগীর লক্ষণ জানাচ্ছেন।

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে॥ ৩১ ॥

[**একত্বম্** (একাত্মভাবে) ; **আস্থিতঃ** (স্থিত) ; **যঃ, যোগী** (যে ভক্তযোগী) ; **সর্বভূতস্থিতম্** (সমস্ত প্রাণীতে স্থিত) ; **মাম্** (আমার) ; **ভজতি** (ভজনা করেন) ; **সঃ, সর্বথা** (তিনি সর্বপ্রকার) ; **বর্তমানঃ, অপি** (আচরণ করলেও) ; **ময়ি** (আমার মধ্যে) ; **বর্ততে** (অনুবর্তন করেন।)]

আমার মধ্যে একত্বভাবে স্থিত যে ভক্তযোগী সমস্ত প্রাণীতে স্থিত আমার ভজনা করেন, তিনি সর্বপ্রকার আচরণ করলেও, আমার মধ্যেই প্রবৃত্ত থাকেন অর্থাৎ সর্বদা আমাতেই অবস্থান করেন ॥ ৩১ ॥

ব্যাখ্যা—**'একত্বমাস্থিতঃ'**—আগের শ্লোকে ভগবান জানিয়েছিলেন যে, যে আমাকে সবার মধ্যে এবং সবার মধ্যে আমাকে দেখে, তার কাছে আমি অদৃশ্য হই না এবং সেও আমার কাছে অদৃশ্য হয় না। কেন অদৃশ্য হয় না ? হয় না এইজন্য যে সমস্ত প্রাণীতে অবস্থিত আমার সঙ্গে তার একাত্মতা হয়েছে অর্থাৎ আমার সঙ্গে তার প্রেম ঘনীভূত হয়েছে।

অদ্বৈত-সিদ্ধান্তে তো স্বরূপের সঙ্গে ঐক্য হয়, কিন্তু এখানে সেই ঐক্যের কথা বলা হয়নি। এখানে দ্বৈত হয়েও অভিন্নতা হয়েছে অর্থাৎ ভগবান এবং ভক্তকে দুইরূপে দেখালেও, বাস্তবে দুজনে একই[1]। যেমন পতি ও পত্নী দুই দেহ হলেও নিজেদের অভিন্ন বলে মনে করে, দুই বন্ধু তাদের নিজেদের এক বলে মনে করে ; কারণ ভালোবাসার আধিক্য থাকায় সেখানে দ্বৈতভাব থাকে না। তেমনই যে ভক্তিযোগের সাধক ভগবানকে প্রাপ্ত হন, ভগবানে অত্যন্ত ভালোবাসা থাকায় তাঁর ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন সম্পর্ক স্থাপন হয়। এই অভিন্ন সম্পর্ককে এখানে **'একত্বমাস্থিতঃ'** পদের দ্বারা বলা হয়েছে।

'সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজতি'—সকল দেশ-কাল-বস্তু-ব্যক্তি-ঘটনা-পরিস্থিতি ইত্যাদিতে ভগবানই পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন অর্থাৎ সমস্ত চরাচর জগৎই হল ভগবদ্ স্বরূপ—**'বাসুদেবঃ সর্বম্'** (৭।১৯)—এই হল তাঁর ভজন।

'সর্বভূতস্থিতম্' পদটির দ্বারা মনে হয় যে ভগবান যেন শুধুমাত্র প্রাণীদেহেই স্থিত, আসলে তা নয়। ভগবান কেবল প্রাণীদেহেই অবস্থিত নন, তিনি জগতের প্রতিটি কণায় পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান। যেমন, স্বর্ণালঙ্কার সোনার থেকেই নির্মিত হয়, সোনাতেই অবস্থান করে এবং

[1]জ্ঞানে দুই হয়ে এক হয়ে যায়, কিন্তু ভক্তিতে প্রেমের বিশেষভাবে আস্বাদন করার জন্য, প্রেমের বৃদ্ধির জন্য এক হয়েও দুইরূপ হয়ে যায় ; যেমন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধা— এক হয়েও দুইরূপে আছেন।

সোনাতেই তার অবসান হয় অর্থাৎ তাতে সবসময় সোনা-ই থাকে। কিন্তু সাধারণের চোখে অলঙ্কারের আকৃতি পৃথক প্রতীত হওয়ায় তাদের বোঝাবার জন্য বলা হয় যে অলঙ্কারে সোনা আছে। ঠিক সেইরূপই সৃষ্টির আগে, সৃষ্টির সময় এবং সৃষ্টির অবসানে এক পরমাত্মাই বিরাজ করেন। কিন্তু সাধারণের দৃষ্টিতে প্রাণী এবং পদার্থের অস্তিত্ব পৃথকরূপে প্রতীত হয়। তাই তাদের বোঝাবার জন্য বলা হয় যে, সব প্রাণীতেই এক পরমাত্মা বিরাজমান, আর কেউ নয়। সেই বাস্তব সত্যকেই এখানে **'সর্বভূতস্থিতং মাম্'** পদের দ্বারা বলা হয়েছে।

'সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে'—তিনি শাস্ত্র এবং বর্ণ-আশ্রমের মর্যাদা অনুযায়ী খাওয়া-দাওয়া, শোওয়া-জাগা, ওঠা-বসা ইত্যাদি সমস্ত ক্রিয়া আদি করেন তা আমাতেই প্রবৃত্ত হয় এবং আমাতেই থাকে। কারণ তাঁর দৃষ্টিতে যখন আমি ছাড়া অন্য কোনো অস্তিত্ব নেই, তখন তিনি যা কিছু করেন, তা কোথায় করবেন ? অতএব আমার মধ্যেই সবকিছু করেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে জ্ঞানযোগের প্রকরণে ভগবান জানিয়েছেন যে সর্বপ্রকার আচরণ করলেও তাঁর আর জন্ম হয় না—**'সর্বথা বর্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে'** (১৩।২৩) ; এবং এখানে ভগবান জানিয়েছেন যে সর্বপ্রকার ব্যবহার করলেও তিনি আমাতেই অবস্থান করেন। এর তাৎপর্য হল এই যে, ঐস্থানে জগৎ-সংসার থেকে সম্পর্ক-বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা বলা হয়েছিল এবং এখানে ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন হওয়ার কথা বলা হয়েছে। সংসার থেকে সম্পর্ক বিচ্ছেদ হলে জ্ঞানযোগী মুক্ত হয়ে যান এবং ভগবানের সঙ্গে অভিন্নতা হলে ভক্ত প্রেমের এক বিশেষ রস আস্বাদন করেন, যা হল অনন্ত এবং সর্বক্ষণ বর্ধমান।

এখানে ভগবান বলেছেন যে সেই যোগী আমার মধ্যেই আচরণ করেন এবং আমাতেই অবস্থান করেন। এতে প্রশ্ন হতে পারে যে, তাহলে কি অন্যান্য প্রাণী ভগবানে অবস্থান করে না ? এর উত্তর হল এই যে, সকল প্রাণীই আসলে ভগবানেই প্রবৃত্ত হচ্ছে, ভগবানেই অবস্থান করছে ; কিন্তু তাদের অন্তঃকরণে জগতের অস্তিত্ব ও গুরুত্ব থাকায় তারা নিজ স্থিতি জানতে সক্ষম হয় না, স্বীকারও করে না। অতএব ভগবানে অবস্থান এবং আচরণ করেও তারা জগতের সঙ্গেই আচরণ করে অর্থাৎ তারা জগতের সঙ্গে অহং-মমত্বভাব রেখে জগৎকেই ধারণ করে রাখে—**'যয়েদং ধার্যতে জগৎ'** (গীতা ৭।৫)। তারা জগৎকে ভগবানের স্বরূপ বলে মনে না করে শুধু জগৎ মনে করেই আচরণ করে। তারা বলেও থাকে আমরা সংসারী মানুষ, সংসারেই বসবাসকারী। কিন্তু ভগবানের ভক্ত এই কথা জানেন যে সমস্ত জগৎই বাসুদেবের রূপ। তাই সেই ভক্ত সর্বক্ষণ ভগবানেই বিরাজ করেন এবং ভগবানের সঙ্গেই আচরণাদি করেন।

পরিশিষ্ট-ভাব—ভক্ত সমগ্র জগৎকে পরমাত্মার স্বরূপ বলেই দেখেন। তাঁর কাছে এক পরমাত্মা ব্যতীত আর কোনো কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না। তাঁর কাছে দ্রষ্টা, দৃশ্য এবং দর্শন—এই তিনই পরমাত্মস্বরূপ হয়ে যান—**'বাসুদেবঃ সর্বম্'** (গীতা ৭।১৯)। তাই গঙ্গাজলে যেমন গঙ্গাপূজা হয়, তেমনই ঐ ভক্তের সমস্ত ব্যবহারও পরমাত্মাতেই হয়। যেমন শরীরের সঙ্গে একাত্ম হওয়া ব্যক্তি সকল ক্রিয়া করেও শরীরেই অবস্থান করে, তেমনই ভক্তিযোগী সকল ক্রিয়া করেও পরমাত্মাতেই অবস্থান করেন।

পরবর্তী ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভগবান জ্ঞানযোগীকে বলেছেন—**'সর্বথা বর্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে'** (১৩।২৩) আর এখানে ভক্তিযোগীকে বলেছেন—**'সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে।'** তাৎপর্য হল যে, জ্ঞানমার্গে জন্ম-মরণ চক্র দূর হয়, মুক্তিলাভ হয় কিন্তু ভক্তিমার্গে জন্ম-মৃত্যু দূর হয়ে ভগবানের সঙ্গে অভিন্নতা আসে, একাত্মতার-সম্পর্ক স্থাপিত হয়। গীতায় এই ভাবটিকে এভাবে বলা হয়েছে—**'তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি'** (৬।৩০), **'প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ'**(৭।১৭) **'জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্'** (৭।১৮), **'যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্'**(৯।২৯)। জ্ঞানমার্গে সূক্ষ্ম অহং-ভাব থাকায় দার্শনিক মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু ভক্তিমার্গে ভগবানের সঙ্গে একাত্মতার সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় সূক্ষ্ম অহং-ভাব এবং তার থেকে উদ্ভূত দার্শনিক মতভেদ থাকে না। **'ন স ভূয়োঽভিজায়তে'**-তে স্বরূপের স্থিতি অনুভূত হলে শুধুমাত্র স্ব-স্বরূপই থাকেন এবং **'স যোগী ময়ি**

বর্ততে'-তে শুধুমাত্র ভগবানই থাকেন, যোগী থাকেন না অর্থাৎ স্বয়ং যোগীরূপ থাকেন না, তখন শুধু ভগবৎস্বরূপই অবস্থান করে।

সম্বন্ধ—ভক্ত সকলপ্রকার লৌকিক আচরণ পালন করলেও সেগুলি কীকরে আমার (পরমাত্মার) প্রতি নির্দিষ্ট হয়, পরবর্তী শ্লোকে তা জানাচ্ছেন।

আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥ ৩২ ॥

[অর্জুন (হে অর্জুন !) ; যঃ (যে মহাপুরুষ) ; আত্মৌপম্যেন (নিজ দেহে সাদৃশ্যে) ; সর্বত্র (সর্বত্র) ; সমম্, পশ্যতি (সমদর্শী) ; বা (এবং) ; সুখম, যদি, বা, দুঃখম্ (সুখ ও দুঃখকেও) ; সঃ (তাঁকেই) ; পরমঃ (পরম) ; যোগী (যোগী) ; মতঃ (মনে করা হয়।)]

হে অর্জুন ! যে ভক্ত আত্মসাদৃশ্যে সর্বত্র সমদর্শী এবং সুখ ও দুঃখকে সমরূপে দেখেন, তাঁকেই পরম যোগী বলে মনে করা হয়॥ ৩২ ॥

ব্যাখ্যা—'আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন'—সাধারণ মানুষ যেমন নিজের শরীরে নিজেরই অবস্থান দেখে এবং তার শরীরে কোনো অঙ্গে কোনো রকম ব্যাধি হোক তা যেমন চায় না, বরং সর্ব অঙ্গে সমান আরাম চায়, তেমনি সমস্ত প্রাণীতে নিজ স্থিতি সমানভাবে অনুভবকারী মহাপুরুষ সকল প্রাণীরই সমভাবে আরাম চান। তাঁর কাছে কোনো দুঃখী প্রাণী এলে, তিনি নিজ পীড়িত অঙ্গের কষ্ট দূর করার ন্যায়, সেই প্রাণীরও দুঃখ নিবারণের স্বাভাবিকভাবে চেষ্টা করেন। তাৎপর্য হল এই যে, সাধারণ প্রাণীদের যেমন নিজ শরীরের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের স্বাভাবিক প্রচেষ্টা থাকে, জ্ঞানী মহাপুরুষ তেমনি অন্যের শরীরের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য স্বাভাবিকভাবে যত্নবান হন।

'সর্বত্র' বলার তাৎপর্য হল এই যে, তাঁর দ্বারা বর্ণ-আশ্রম-দেশ-বেশভূষা-সম্প্রদায় ইত্যাদির ভিন্নতা না রেখে সকলকেই সমানভাবে সুখী করার স্বাভাবিক প্রচেষ্টা থাকে তেমনই তাঁর দ্বারা পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-লতা ইত্যাদি স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত কিছুকেই সমভাবে সুখী করার চেষ্টা থাকে এবং তাদের দুঃখ দূর করার স্বাভাবিক উদ্যোগও হয়।

নিজ শরীরের অঙ্গের কষ্ট দূর করার সমান চেষ্টা থাকলেও অঙ্গ নিয়ে ভেদদৃষ্টি থাকে এবং থাকা উচিতও। যেমন, হাতের কাজ পায়ের দ্বারা হয় না। হাতের দ্বারা হাত স্পর্শ করলে তা ধোওয়ার প্রশ্ন আসে না ; কিন্তু হাত দিয়ে পা ছুঁয়ে ফেললে হাত ধুতে হয়। হাত দিয়ে মল-মূত্র পরিষ্কার করলে, হাতটি বিশেষভাবে ধোওয়ার প্রয়োজন হয়। তেমনি শাস্ত্র এবং বর্ণ-আশ্রমের মর্যাদা অনুযায়ী সকলের সুখ-দুঃখে সমভাব রেখেও স্পর্শ-অস্পর্শের দিকে লক্ষ্য রেখে ব্যবহার করা উচিত কিন্তু কারো প্রতি বিন্দুমাত্র ঘৃণার ভাব রাখা উচিত নয়। যেমন নিজ পবিত্র-অপবিত্র শরীরের অঙ্গগুলিকে রক্ষায় ও সেগুলি ঠিকভাবে আরামে রাখলেও শুদ্ধতার দৃষ্টিতে তার স্পর্শ-অস্পর্শের ভেদ রাখা হয়, তেমনি শাস্ত্র-মর্যাদা অনুযায়ী জগতের সকল প্রাণীতে স্পর্শ-অস্পর্শের ভেদ মেনেও জ্ঞানী মহাপুরুষ তাদের দুঃখ দূর করার বা সুখী করার চেষ্টা কখনো বিন্দুমাত্র কম করেন না। তাৎপর্য হল এই যে, নিজ কোনো অঙ্গ অস্পৃশ্য হলেও যেমন তা অপ্রিয় হয় না, তেমনই শাস্ত্রমর্যাদা অনুযায়ী কোনো প্রাণী অস্পৃশ্য হলেও তাতে প্রিয়তা এবং হিতৈষীতার কখনো ন্যূনতা হয় না।

'সুখং বা যদি বা দুঃখম্'—নিজ শরীরের সাপেক্ষে অপরের সুখ-দুঃখে সমান ভাব থাকার অর্থ এই নয় যে অন্যের শরীরের কোনো অংশ পীড়িত হলে, সেটি নিজের শরীরেও হবে, নিজেরও সেই পীড়া অনুভব হবে। যদি এরূপ অর্থ ধরা হয় তাহলে তো নিজের দেহে সর্বদাই দুঃখের অনুভব হবে, দুঃখ কখনও দূর হবে না ; কেননা জগতে বেশিরভাগ লোকই হল দুঃখী।

অপরপক্ষে উদাসীন ত্যাগী মহাত্মাগণ যেমন নিজ শরীরের এবং নিজ শরীরের অঙ্গে হওয়া পীড়াগুলিকে

উপেক্ষা করেন, তেমনি অপরের শরীর এবং শরীরের অঙ্গের পীড়াগুলি উপেক্ষিত হয় অর্থাৎ যেমন তাঁর শরীরের সুখ দুঃখের পরোয়া নেই, তেমনি অন্যের সুখ-দুঃখেরও তিনি পরোয়া করেন না—উপরিউক্ত পদের এরূপ অর্থও করা যায় না।

উপরোক্ত পদের অর্থ হল এই যে, যেমন দেহাসক্ত অজ্ঞানী ব্যক্তির দেহে পীড়া হলে সেটি দূর করতে এবং সুস্থ হতে তার চেষ্টা ও তৎপরতা থাকে, অপরের দুঃখ দূর করতে এবং তাদের সুখী করতে জ্ঞানী মহাপুরুষেরও তেমন স্বাভাবিক প্রচেষ্টা ও তৎপরতা থাকে।

যেমন কারো হাতে ব্যথা লাগল এবং সে কোনো জনবহুল স্থানে গেল। তখন সে পীড়িত হাতটিতে যাতে পুনরায় চোট না লাগে তার জন্য অন্য হাতটির দ্বারা আঘাত সামলায়। কিন্তু হাতটির মধ্যে এই বোধ কখনো আসে না যে 'আমি জখম হাতটিকে রক্ষা করছি, তাকে সুখ দিচ্ছি'। সেই হাতটি অন্য হাতটিকে একথাও জানায় না যে, 'ওরে হাত ! আমি তোর দুঃখ দূর করার জন্য কত চেষ্টা করেছি!' অসুখ দূর করার জন্য সে নিজের কোনো ভূমিকা আছে বলে মনে করে না। এরূপই জ্ঞানী মহাপুরুষদের দ্বারা দুঃখী প্রাণীদের সুখী করার চেষ্টাও স্বাভাবিকভাবেই হয়ে থাকে। তাঁদের মনে এই অভিমান আসে না যে আমি প্রাণীদের দুঃখ দূর করছি, অপরকে সুখী করছি। অপরের দুঃখ দূরীকরণের চেষ্টাতে তিনি নিজের কোনো বিশেষত্ব খুঁজে পান না। তাঁর স্বভাবই হয় অপরের দুঃখ দূর করে তাদের সুখী করা।

জ্ঞানী ব্যক্তির দেহ পীড়িত হলে তিনি তা সহ্য করতে পারেন বা তিনি তাঁর পীড়া উপেক্ষাও করতে পারেন। কিন্তু অপরের পীড়া হলে তা তিনি সহ্য করতে পারেন না। কারণ দুটি হাতে যেমন নিজের ব্যাপ্তি সমানভাবে থাকে, তেমনি সব শরীরে তাঁর স্থিতি সমান থাকে। কিন্তু যে অন্তঃকরণে বোধের উদয় হয়েছে, তাতে পীড়া সহ্য করার শক্তি থাকে কিন্তু অপরের অন্তঃকরণে পীড়া সহ্য করার শক্তি সেইরূপ থাকে না। অতএব তাঁর দ্বারা অপরের শরীরের ব্যাধি দূর করার বিশেষ তৎপরতা থাকে। যেমন, ইন্দ্র কোনো অপরাধ ছাড়াই দধীচি মুনির মাথা কেটে ফেলেছিলেন, পরে অশ্বিনীকুমারদ্বয় সেটি আবার যথাস্থানে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ইন্দ্রের যখন প্রয়োজন হল, তখন দধীচি তাঁর শরীর ত্যাগ করে তাঁকে (বজ্র তৈরির জন্য) নিজ অস্থি প্রদান করেন।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, নিজ শরীরের দুঃখ তো উপেক্ষা করা সম্ভব আর অপরের দুঃখ উপেক্ষা করা যায় না—এতো বিষমভাব হল ! এখানে সমতা কোথায় ? এর উত্তর হল যে প্রকৃতপক্ষে এই বিষম অনুভবই হল সমতার জন্মদাতা, সমতা লাভের উপায়। এই বৈষম্য সমতার থেকে অনেক উচ্চের বস্তু। সাধক সাধন অবস্থায় এরূপ বৈষম্য করে থাকেন, সিদ্ধ-অবস্থাতে এটিই তাঁর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয়, কিন্তু তাঁর চিত্তে কোনোপ্রকার বৈষম্য আসে না।

'স যোগী পরমো মতঃ'—তাঁর দৃষ্টিতে পরমাত্মা ছাড়া আর কিছু থাকে না। তিনি নিত্যযোগ (পরমাত্মার সঙ্গে নিত্য সম্পর্ক) এবং নিত্য সমত্বে স্থিত থাকেন। কারণ শরীর-সংসার হতে সর্বতোভাবে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ায় তাঁর পরমাত্মার সঙ্গে কখনো বিচ্ছেদ হয়-ই না এবং তিনি সমস্ত অবস্থা এবং পরিস্থিতিতেই একইভাবে বিরাজ করেন। অতএব আমি তাঁকে পরম যোগী বলে মনে করি।

পরিশিষ্ট-ভাব— সাধারণ মানুষ যেমন শরীরকেই নিজের বলে মনে করে, শরীরের কোনো অংশে ব্যাধি না চেয়ে, কোনো অঙ্গে রাগ-দ্বেষ না করে সমস্ত অঙ্গকেই সমানভাবে নিজের বলে মনে করে, তেমনই ভক্ত সমস্ত প্রাণীর মধ্যে নিজ অংশী পরমাত্মাকেই অবলোকন করেন এবং সবার দুঃখ দূর করার এবং সকলকে সুখী করার জন্য সমানভাবে স্বাভাবিকরূপে চেষ্টা করেন। তিনি বস্তু, যোগ্যতা এবং সামর্থ্য—এই সবগুলি নিজের মনে না করে সবই ভগবানের বলে মনে করেন। গঙ্গাজল দ্বারা যেমন গঙ্গাকে পূজা করা হয়, প্রদীপ দিয়ে যেমন সূর্যপূজা করা হয়, তেমনই ভক্ত ভগবানের বস্তু সমূহ ভগবানেই অর্পণ করেন— **'ত্বদীয়ং বস্তু গোবিন্দ তুভ্যমেব সমর্পয়ে'**।

শরীরের সমস্ত অঙ্গগুলির যথাযোগ্য ব্যবহার করেও যেমন তাতে আত্মবুদ্ধি একপ্রকারই থাকে এবং এসব অঙ্গের পীড়া দূর করার ও সেগুলিকে যত্নে রাখার চেষ্টা সমানই থাকে, তেমনই 'যেমন দেবতা, তাঁর তেমন পূজা' এই বাক্য অনুসারে ব্রাহ্মণ এবং চণ্ডাল, সাধু ও কসাই, গরু এবং কুকুর ইত্যাদি সবার সঙ্গে শাস্ত্রমর্যাদা অনুসারে যথাযোগ্য ব্যবহার করেও ভক্তের ভগবদ্‌বুদ্ধিতে এবং তাদের দুঃখ দূর করার, তাদের সুখী করার চেষ্টায় কোনো পার্থক্য থাকে না।

ভক্ত যেমন সকল প্রাণীর আত্মার সঙ্গে ভগবানের ঐক্য মেনে নেন (৬।৩১), তেমনই তিনি সবার শরীরের সঙ্গে নিজ শরীরের ঐক্য মেনে নেন। তাই তিনি অন্যের দুঃখে দুঃখী এবং অন্যের সুখে সুখীবোধ করেন— **'পর দুখ দুখ সুখ সুখ দেখে পর'** (রামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড, ৩৮।১)। তিনি নিজ শরীরের সুখ-দুঃখের ন্যায় সবার সুখ-দুঃখকে নিজের বলে মনে করেন। অন্যের দুঃখে দুঃখিত হওয়ার অর্থ নিজে দুঃখী হওয়া নয়, বরং অপরের দুঃখ দূর করার চেষ্টা করা। তেমনই নিজে সুখী হওয়ার জন্য অপরের দুঃখ দূর করা নয়, তাকে করুণা করে সুখী করার চেষ্টা করতে হবে। তাৎপর্য হল নিজে সুখ ভোগ করা নয়, বরং 'অন্যের দুঃখ দূর হওয়ায় সে সুখী হয়েছে'— এইভেবে প্রসন্ন থাকা।

চোখ এবং পায়ের প্রভেদ হল এই যে চোখ দিয়ে দেখা হয় আর পা দিয়ে চলা হয়। চোখ হল জ্ঞানেন্দ্রিয় আর পা হল কর্মেন্দ্রিয়। এত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও অভিন্নতা হল এই যে পায়ে কাঁটা ফুটলে চোখে জল আসে আর চোখে বালি পড়লে পা টল্‌মল্ করে ওঠে ! তাৎপর্য হল যে আমরা শরীরকে জগৎ-সংসার থেকে এবং জগৎ-সংসারকে শরীর থেকে পৃথক করতে পারি না। তাই আমরা যদি শরীরের জন্য পরোয়া করি তাহলে তেমনভাবে জগতের জন্যও পরোয়া করতে হয় আর যদি জগৎ-সংসারকে গ্রাহ্য না করি তবে নিজের শরীরকেও গ্রাহ্যের মধ্যে আনা উচিত নয়। এই দুটি কথার একটিও যদি মেনে নেওয়া হয় তাহলে সেইটিই হবে যথার্থ পুরুষার্থ।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগ দ্বারা যে সমত্ব প্রাপ্তি হয়, সেই সমত্ব ধ্যানযোগের সাহায্যেও প্রাপ্ত করা যায়—এই কথা ভগবান দশম শ্লোক থেকে বত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত জানিয়েছেন। অর্জুন এবার ধ্যানযোগে প্রাপ্ত সমত্ব নিয়ে পরবর্তী দুটি শ্লোকে নিজের ধারণা প্রকাশ করছেন।

অর্জুন উবাচ

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্॥ ৩৩ ॥

[**মধুসূদন** (হে মধুসূদন !) ; **ত্বয়া** (আপনি) ; **সাম্যেন, যঃ** (সমত্বপূর্বক যে) ; **অয়ম, যোগঃ** (এই যোগের কথা) ; **প্রোক্তঃ** (জানালেন) ; **চঞ্চলত্বাৎ** (চাঞ্চল্যের জন্য) ; **অহম্** (আমি) ; **এতস্য** (এই যোগে) ; **স্থিরাম্** (স্থির) ; **স্থিতিম্** (স্থিতিলাভ করা) ; **ন** (সহজ নয়) ; **পশ্যামি** (মনে করি।)]

অর্জুন বললেন—হে মধুসূদন ! আপনি সমত্বরূপ যে যোগের কথা বললেন, মন চঞ্চল হওয়ায় এই যোগে স্থির স্থিতিলাভ করা খুব কঠিন বলে আমার মনে হয় ॥ ৩৩ ॥

ব্যাখ্যা—[মানুষের কল্যাণের জন্য ভগবান গীতায় প্রধান কথা জানিয়েছেন এই যে, জাগতিক বস্তুর প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি সব সময়েই চিত্তে সমত্ব রাখা উচিত। এই সমত্বের দ্বারাই মানুষের কল্যাণ হয়। অর্জুন পাপকে ভয় পেতেন তাই ভগবান তাঁকে বলেছিলেন যে, জয়-পরাজয়, লাভ-ক্ষতি এবং সুখ-দুঃখকে সমান জেনে তুমি যুদ্ধ করো, তাহলে তোমার পাপ হবে না (গীতা ২।৩৮)। দেখো, জগতে অনেক প্রকার পাপকার্য হচ্ছে, কিন্তু সেই সব পাপ আমাদের স্পর্শ করে না। কারণ সেই সকল পাপে আমাদের কোনো বিষম-বুদ্ধি আসে না, সম-বুদ্ধি থাকে। এইরূপ সমবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে সাংসারিক কাজ করলে কর্মে আবদ্ধ হতে হয় না। এই ভাব নিয়ে ভগবান এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে বলেছিলেন যে, যে কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা না করে কর্তব্য-কর্ম করে, সেই সন্ন্যাসী, সেই যোগী। এই কর্মফল ত্যাগের সিদ্ধিকেই ভগবান 'সমতা' বলেছেন (৬।৯)। এই সমতা প্রাপ্তির জন্য ভগবান দশম শ্লোক থেকে বত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত ধ্যানযোগের বর্ণনা করেছেন। এই ধ্যানযোগের বর্ণনা লক্ষ্য করে অর্জুন এখানে নিজের মত প্রকাশ করেছেন।]

'যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন'—এখানে অর্জুন

তাঁর যে মত প্রকাশ করেছেন, সেটি আগের শ্লোকের জন্য নয়, আসলে সেটি ধ্যানের সাধন বিষয়ে। কারণ বত্রিশতম শ্লোকটি ধ্যানযোগে সিদ্ধ পুরুষের জন্য কথিত এবং সিদ্ধ পুরুষে স্বতঃই সমতা থাকে। তাই এখানে 'যঃ' পদ দ্বারা এই প্রকরণের প্রথমে কথিত যোগের (সমত্বের) ইঙ্গিত এবং 'অয়ম্' পদ দ্বারা দশম শ্লোক হতে আটাশতম শ্লোক পর্যন্ত কথিত ধ্যানযোগ সাধনের রহস্য প্রকাশ করা হয়েছে।

'এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্'— এই পদটিতে অর্জুনের এই অভিপ্রায় ব্যক্ত হয় যে, কর্মযোগ দ্বারা সমত্ব-প্রাপ্তি সহজ হলেও এখানে যে ধ্যানযোগ দ্বারা সমত্ব প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে, মনের চাঞ্চল্যের জন্য সেই ধ্যানে স্থির হয়ে থাকা তাঁর পক্ষে কঠিন বলে মনে হয়েছে। তাৎপর্য হল এই যে, যতক্ষণ মানসিক চাঞ্চল্য দূর না হয়, ততক্ষণ ধ্যানযোগ সিদ্ধ হয় না এবং ধ্যানযোগে সিদ্ধি না হলে সমত্ব প্রাপ্তিও হয় না।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—যে চঞ্চলতার জন্য মনকে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করানো কঠিন বলে অর্জুনের মনে হয়েছে উদাহরণসহ সেই চঞ্চলতার স্পষ্ট বর্ণনা তিনি পরের শ্লোকটিতে করেছেন।

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥ ৩৪ ॥

[**হি, কৃষ্ণ** (কেননা হে কৃষ্ণ !) ; **মনঃ, চঞ্চলম্** (মন চঞ্চল) ; **প্রমাথি** (ইন্দ্রিয় বিক্ষোভকারী) ; **দৃঢ়ম্, বলবৎ** (দৃঢ় এবং বলবান) ; **তস্য, নিগ্রহম্** (তাকে নিরুদ্ধ করা) ; **অহম্** (আমি) ; **বায়োঃ, ইব** (বায়ুর ন্যায়) ; **সুদুষ্করম্** (খুবই কঠিন) ; **মন্যে** (বলে মনে করি।)]

কেন-না হে কৃষ্ণ ! মন অত্যন্ত চঞ্চল, ইন্দ্রিয় বিক্ষোভকারী, দৃঢ় (জেদী) এবং বলবান। আমি তাকে নিরোধ করা বায়ুকে আবদ্ধ রাখার মতোই দুষ্কর বলে মনে করি ॥ ৩৪ ॥

ব্যাখ্যা—**'চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্'**— এখানে ভগবানকে 'কৃষ্ণ' নামে সম্বোধন করে অর্জুন যেন বলছেন যে, 'হে প্রভু ! আপনিই কৃপা করে এই মনকে আকর্ষিত করে আপনাতে মগ্ন করুন, তবেই এটি যুক্ত হবে। আমার পক্ষে এটি বশীভূত করা খুবই কঠিন, কারণ এই মন বড়ই চঞ্চল এবং ইন্দ্রিয়ের বিক্ষোভকারীও অর্থাৎ এটি সাধককে তার স্থিতি থেকে বিচ্যুত করে। মন যেমন দৃঢ় তেমনি বলবান।'

ভগবান কাম অর্থাৎ কামনা থাকার পাঁচটি স্থানের উল্লেখ করেছেন—ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, বিষয় এবং স্বয়ং (গীতা ৩।৪০ ; ৩।৩৪ ; ২।৫৯)। আসলে কাম বাস করে স্বয়ং-এ অর্থাৎ চিৎ-জড় গ্রন্থিতে এবং ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ও বিষয়াদিতে এটির প্রতীতি হয়। যতক্ষণ স্বয়ং থেকে কামনা নিবৃত্ত না হয়, ততক্ষণ এটি সময়-অসময়ে ইন্দ্রিয়াদিতে প্রতীত হয়। কিন্তু কামনা যখন স্বয়ং থেকে নিবৃত্ত হয়ে যায়, তখন ইন্দ্রিয়াদিতেও আর থাকে না। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যতক্ষণ স্বয়ং-এ কামনা থাকে ততক্ষণ এটি সাধকের মনকে পীড়িত করতে থাকে। তাই এখানে মনকে **'প্রমাথি'** বলা হয়েছে। তেমনই স্বয়ং-এ কাম থাকলে ইন্দ্রিয়াদি সাধকের মনকে ব্যথিত করতে থাকে। তাই দ্বিতীয় অধ্যায়ের ষাটতম শ্লোকে ইন্দ্রিয়াদিকেও বিক্ষোভকারী বলা হয়েছে—**'ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ'**। তাৎপর্য হল এই যে, যখন মনে এবং ইন্দ্রিয়াদিতে কামনা আসে তখন তা সাধককে গভীরভাবে ক্লেশ দেয়, তাতে সাধক নিজ স্থিতিতে স্থির থাকতে পারে না।

সেই কামনা স্বয়ং-এ থাকায় পদার্থগুলির উপর মনের গভীর আকর্ষণ হয়। তাই মন কিছুতেই তাকে ছাড়ে না, দৃঢ়ভাবে ধরে থাকে, তাই মনকে দৃঢ় বলা হয়েছে। মনের এই দৃঢ়তা অত্যন্ত বলশালী ; তাই মনকে বলবান বলা হয়েছে। তাৎপর্য হল এই যে, মন এমনই বলবান যে সে সাধককে জোর করে বিষয়ের দিকে টেনে নেয়। শাস্ত্রে এতদূর পর্যন্ত বলা আছে যে, মনই মানুষের মোক্ষ বা বন্ধনের কারণ—**'মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধ-মোক্ষয়ো !'** কিন্তু মনের এই প্রমথনশীলতা, দৃঢ়তা এবং শক্তিমত্তা ততক্ষণই থাকে, যতক্ষণ সাধক নিজের মধ্যে থেকে কামনাকে সম্পূর্ণভাবে দূর না করেন। সাধক নিজে যখন

কামনা রহিত হন, তখন বিষয়াদির যতই সংসর্গ হোক না কেন সাধকের ওপর তার কোনো প্রভাবই পড়ে না। তখন মনের প্রমথনশীলতা (আলোড়ন) বৃত্তি নষ্ট হয়ে যায়।

মনের চাঞ্চল্যও ততক্ষণ বাধা সৃষ্টি করে, যতক্ষণ স্বয়ং-এ কিছুমাত্র কামনার অংশ থাকে। কামনা সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হলে মনের চাঞ্চল্য কিছুমাত্র বাধা হতে পারে না। শাস্ত্রকারেরা বলেছেন যে—

দেহাভিমানে গলিতে বিজ্ঞাতে পরমাত্মনি।
যত্র যত্র মনো যাতি তত্র তত্র পরামৃতম্॥
(সরস্বতীরহস্যোপনিষদ্ ৩১)

অর্থাৎ দেহাভিমান (জড়ের সঙ্গে আমিত্ব-ভাব) সম্পূর্ণ দূর হলে যখন পরমাত্মতত্ত্বের বোধ হয়, তখন মন যে যে স্থানে যায় সেই সেই স্থানেই পরমাত্মতত্ত্ব অনুভূত হয় অর্থাৎ তার অখণ্ড সমাধি (সহজ সমাধি) হয়।

'তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্'—এই চঞ্চল, প্রমাথি, দৃঢ় এবং বলশালী মনের নিগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন। আকাশে বিচরণশীল বায়ুকে যেমন কেউ হাত দিয়ে ধরতে পারে না, তেমনই এই মনকেও কেউ ধরতে পারে না। অতএব একে নিগ্রহ (দমন) করা আমি (অর্জুন) মহাদুষ্কর কাজ বলে মনে করি।

পরিশিষ্ট-ভাব—ভগবান উনত্রিশতম শ্লোকে স্বরূপের ধ্যানকারী সাধকের অনুভবের কথা জানিয়েছেন এবং ত্রিশ থেকে বত্রিশতম শ্লোকে সগুণ-সাকার ভগবানের ধ্যানকারী সাধকের অনুভবের কথা জানিয়েছেন। এই শ্লোকগুলিতে ভগবানের কথার তাৎপর্য হল এই যে সবার মধ্যে আত্মদর্শন অথবা সবের মধ্যে ভগবদ্দর্শন করাই হল ধ্যানযোগের অন্তিম ফল। জ্ঞানের সংস্কারসম্পন্ন ধ্যানযোগী সবার মধ্যে আত্মাকে এবং ভক্তির সংস্কারসম্পন্ন ধ্যানযোগী সবার মধ্যে ভগবানকে দেখেন। সবার মধ্যে আত্মাকে দেখা **'আত্মজ্ঞান'** এবং সবার মধ্যে ভগবানকে দেখাকে বলা হয় **'পরমাত্মজ্ঞান'**। আত্মজ্ঞানে বিবেক-বুদ্ধি এবং পরমাত্মজ্ঞানে শ্রদ্ধা-বিশ্বাসের প্রাধান্য থাকে, মনের স্থিরতার প্রাধান্য নেই। কিন্তু অর্জুনের মনে দশম থেকে আঠাশতম শ্লোক পর্যন্ত কথিত ধ্যানযোগের সংস্কার গাঁথা ছিল, সেইজন্য তিনি আত্মজ্ঞান বা পরমাত্মজ্ঞান না হওয়ার জন্য মনের চাঞ্চল্যকে কারণ বলে মনে করেছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ধ্যানযোগীর অন্তরের জ্ঞান বা ভক্তির সংস্কারের দিকে যায়নি, মনের চাঞ্চল্যের দিকে ছিল। তাই তিনি মনের চঞ্চলতাকেই প্রতিবন্ধক বলে মনে করেছিলেন।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—পরবর্তী শ্লোকে ভগবান অর্জুনের মত অনুমোদন করে মনকে নিগ্রহ করার উপায় জানাচ্ছেন।

শ্রীভগবানুবাচ

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥ ৩৫ ॥

[**মহাবাহো** (হে মহাবাহো!) ; **মনঃ** (এই মন) ; **চলম্** (অত্যন্ত চঞ্চল) ; **দুর্নিগ্রহম্** (একে নিরোধ করাও কঠিন) ; **অসংশয়ম্** (তোমার একথা একদম ঠিক) ; **তু, কৌন্তেয়** (কিন্তু হে কুন্তিনন্দন!) ; **অভ্যাসেন, চ** (অভ্যাস এবং) ; **বৈরাগ্যেণ** (বৈরাগ্যের দ্বারা) ; **গৃহ্যতে** (বশ করা সম্ভব হয়।)]

ভগবান বললেন—হে মহাবাহো ! এই মন অত্যন্ত চঞ্চল, একে নিরোধ করাও অত্যন্ত কঠিন—তোমার এই কথাটি একেবারে সত্য। কিন্তু হে কৌন্তেয় ! অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা একে বশ করা যায়॥ ৩৫ ॥

ব্যাখ্যা—'অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্'—এখানে **'মহাবাহো'** সম্বোধনের তাৎপর্য শৌর্যকে নিয়ে অর্থাৎ অভ্যাস করার সময় কখনো হতোদ্যম হতে নেই। নিজের মধ্যে দৃঢ়রূপে শৌর্য ধারণ করা উচিত।

অর্জুন প্রথমে বলেছেন চাঞ্চল্যের জন্য মনকে নিরোধ করা অত্যন্ত কঠিন। তাতেই ভগবান বললেন, তোমার কথা একেবারেই ঠিক, এতে কোনো সংশয় নেই। কারণ মন অত্যন্ত চঞ্চল এবং একে নিরোধ করা অতি কঠিন কাজ।

'অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে'— অর্জুনের মাতা কুন্তী অত্যন্ত বিবেকবোধসম্পন্না তথা সংসারবিরাগী নারী ছিলেন। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে বিপত্তির বর প্রার্থনা করেছিলেন[১]। ইতিহাসে এইরূপ বর প্রার্থনাকারী খুব কমই দেখা যায়। তাই এখানে **'কৌন্তেয়'** নামে সম্বোধন করে ভগবান অর্জুনকে তাঁর মা কুন্তীর কথা স্মরণ করাচ্ছেন যে, তোমার মা কুন্তী যেমন সংসারবিরাগী, তুমিও তেমন সংসারে উপরত (নিবৃত্ত) হয়ে পরমাত্মার শরণাগত হও অর্থাৎ মনকে জগৎ থেকে সরিয়ে পরমাত্মায় নিবিষ্ট করো।

মনকে বারংবার ধ্যেয়তে নিবিষ্ট করাকেই 'অভ্যাস' বলা হয়। যথেষ্ট সময় দিয়ে এই অভ্যাসের ফলে সিদ্ধি হয়। নিরন্তর সময় দিতে হয়, রোজই অভ্যাস করতে হয়। কখনো অভ্যাস করলে, কখনো নয়—এটি যেন না হয়। তাৎপর্য হল নিরন্তর অভ্যাস করা উচিত এবং নিজ ধ্যেয়ের প্রতি গুরুত্ব এবং শ্রদ্ধা-সম্পন্ন হওয়া উচিত। এইভাবে অভ্যাস করতে থাকলে অভ্যাস দৃঢ় হয়।

অভ্যাসের দুটি ভাগ আছে—১) নিজের যা লক্ষ্য, ধ্যেয়, তাতে মন স্থির করা এবং দ্বিতীয় কোনো বৃত্তি বা অন্য চিন্তা এলে তাকে উপেক্ষা করা, তাতে উদাসীন হওয়া।

২) মন যেখানেই যাক্, সেখানেই যেন নিজ লক্ষ্য, ইষ্টকে দেখা।

উপরিউক্ত দুটি সাধন ব্যতীত মনোনিবেশ করার আরও কয়েকটি উপায় আছে; যেমন—

১) সাধক যখন ধ্যানে বসবেন তখন সর্বপ্রথম কয়েকটি শ্বাস জোরে ছেড়ে দিয়ে ভাববেন যে, আমি মন থেকে সংসারের চিন্তা দূর করলাম, আমার মন এখন আর সাংসারিক চিন্তা করবে না, শুধু ভগবদ্-চিন্তা করবে এবং চিন্তায় যা আসবে সেগুলি ভগবানেরই স্বরূপ হবে। ভগবান ভিন্ন আমার মনে অন্য কোনো চিন্তা আসতেই পারে না। সুতরাং ভগবানের স্বরূপ সেই, যা মনে আসে এবং মনে যা আসে তা ভগবানেরই স্বরূপ—এই হল **'বাসুদেবঃ সর্বম্'**-এর তাৎপর্য। এরূপ হলে মন আর কোথাও না গিয়ে ভগবানেই নিবিষ্ট হবে।

২) ভগবদ্ নাম জপ করবে, কিন্তু জপকালে দুটি ব্যাপারে খেয়াল রাখবে—এক হল নামোচ্চারণের সময় তাতে ফাঁক দেবে না অর্থাৎ রা....ম......রা......ম এইভাবে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলেও মধ্যবর্তী সময়ে ফাঁক রাখবে না এবং দ্বিতীয়তঃ নাম কানে না শুনে জপ করবে না অর্থাৎ জপের সময় নাম নিজ কানে শুনবে।

৩) যত সংখ্যক নাম উচ্চারণ করবে, মনে মনে সেটি খেয়াল করে রাখবে অর্থাৎ নামটি মালার দ্বারা বা আঙুলে গণনা না করে মনের দ্বারা নাম উচ্চারণ করে মনে মনেই সেটি গণনা করবে।

৪) একটি নাম শব্দ করে উচ্চারণ করবে এবং অন্যটি মনে মনে জপ করবে ; যেমন—মুখে 'রাম-রাম-রাম' উচ্চারণ করবে আর মনে মনে 'কৃষ্ণ-কৃষ্ণ-কৃষ্ণ' জপ করবে।

৫) রাগ-রাগিণীর সাহায্যে যেমন নামকীর্তন করা হয়, তেমনি রাগ-রাগিণীর সাহায্যে মনে মনে নাম-কীর্তন করবে।

৬) চরণ থেকে মাথার মুকুট এবং মুকুট থেকে চরণ পর্যন্ত ভগবানের স্বরূপ চিন্তা করবে।

৭) ভগবান আমার সামনেই দণ্ডায়মান—এইভাবে ভগবানের স্বরূপ চিন্তা করবে। ভগবানের দক্ষিণ পদের পাঁচটি আঙুলের ওপর মনে মনে পাঁচটি নাম লিখবে। আঙুলের উপরের ভাগে লম্বালম্বিভাবে তিনটি নাম লিখবে। চরণের যেখান থেকে শুরু, সেই সন্ধির ওপর দুটি নামের শিকল করবে। তার ওপর লম্বা করে তিনটি নাম লিখবে। হাঁটুর নীচে এবং উপরে এক-একটি নামের গোল শিকল করবে। উরুর ওপর লম্বা করে তিনটি নাম লিখবে। ডানদিকের কোমরের অর্ধেক অংশে দুটি নামের

---

[১]বিপদঃ সন্তু নঃ শশ্বত্তত্র জগদ্‌গুরো। ভবতো দর্শনং যৎস্যাদপুনর্ভবদর্শনম্॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১।৮।২৫)

'হে জগদ্‌গুরু ! আমার জীবনে যেন সর্বদা এইরূপ বিপদ পদে পদে আসতে থাকে, যাতে আমার পুনঃ সংসার-বন্ধন মোচনকারী আপনার দুর্লভ দর্শন হতে থাকে।'

কোমরবন্ধ করবে। তিনটি নাম লিখবে পাঁজরে, দুটি নাম কাঁধের ওপর আর তিনটি নাম লিখবে হাতের উপরিভাগে। কনুই-এর ওপর ও নীচে দুটি করে নামের শিকল করবে। পরে তিনটি নাম কনুই-এর নীচে হাতের উপরিভাগে লিখবে। হাতে দুটি নামের শিকল করবে এবং পাঁচ আঙুলে পাঁচটি নাম লিখবে। গলায় চারটি নামের দ্বারা অর্ধেক মালা এবং কানে দুই নামের কুণ্ডল করবে। মুকুটের দক্ষিণাংশে ছয়টি নাম লিখবে অর্থাৎ নীচের ভাগে দুটি, মধ্যভাগে দুটি এবং উপরিভাগে দুটি নামের শিকল করবে।

তাৎপর্য হল এই যে, ভগবানের দক্ষিণ অঙ্গে চরণ থেকে মুকুট পর্যন্ত চুয়ান্নটি নাম বা মন্ত্র লিখতে হবে (মনে মনে) এবং বাম অঙ্গেও মুকুট থেকে চরণ পর্যন্ত চুয়ান্নটি নাম বা মন্ত্র লিখতে হবে। এর দ্বারা ভগবানের একটি পরিক্রমা হয়, ভগবানের সর্ব অঙ্গের চিন্তা করা হয় এবং একশত আট নামের মালাও হয়। প্রতিদিন এইরূপ কমপক্ষে একটি মালা জপ করা উচিত। এর থেকে বেশি করতে চাইলে, করতে পার।

এইরূপ চিন্তা করার অনেক রূপ এবং অনেক উপায় আছে। সাধক এইভাবে নিজেও নানাপ্রকার উপায় বার করতে পারেন।

অভ্যাসের সহায়তার জন্য 'বৈরাগ্যে'-র প্রয়োজন আছে। কারণ জাগতিক ভোগসুখ থেকে অনুরাগ যত কমবে, মন ততই পরমাত্মায় নিবিষ্ট হবে। সাংসারিক আকর্ষণ সম্পূর্ণ দূর হলে মনে সংসারের জন্য আর আসক্তিপূর্ণ চিন্তা থাকে না। তাই পুরানো সংস্কারবশত কখনো কোনো স্ফুরণ হলেও, তাকে উপেক্ষা করবে অর্থাৎ তাতে রাগ-দ্বেষ করবে না। তাহলেই সেই স্ফুরণ আপনা হতে মিটে যাবে। এইভাবে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মন নিরোধ করা যায়, মনকে বশীভূত করা যায়।

বৈরাগ্য লাভের কয়েকটি উপায় হল—

(১) জগৎ প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তিত হচ্ছে এবং স্বরূপ কখনো কোনো ক্ষণেই পরিবর্তিত হয় না। সুতরাং জগৎ আমাদের সঙ্গে নেই এবং আমরাও জগতের সঙ্গে নেই। যেমন বাল্যাবস্থা, যুবাবস্থা আমাদের সঙ্গে থাকে না, পরিস্থিতিও চিরকাল আমাদের সঙ্গে থাকে না, ইত্যাদি। এরূপ চিন্তা দ্বারা জগতে বৈরাগ্য আসে।

(২) নিজের বলে যে সকল আত্মীয়-কুটুম্ব আছে, তারা যদি আমাদের কাছ থেকে অনুকূলতার ইচ্ছা রাখে তাহলে নিজ শক্তি, সামর্থ্য, যোগ্যতা অনুযায়ী তাদের ন্যায়সম্পন্ন ইচ্ছা পূর্ণ করবে এবং পরিশ্রমপূর্বক তাদের সেবা করবে। কিন্তু তাদের থেকে কোনোপ্রকার আনুকূল্য অর্থাৎ কিছু পাবার আশা সর্বতোভাবে ত্যাগ করবে। এইভাবে নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী বস্তু দান করলে এবং নিজ পরিশ্রম দ্বারা অন্যের সেবা করলে পুরানো আসক্তি দূর হয় এবং কোনো চাহিদা না থাকায় নতুন আসক্তি তৈরি হয় না। এতে স্বাভাবিকভাবে সংসারে বৈরাগ্য আসে।

৩) যত দোষ, পাপ, দুঃখ উৎপন্ন হয়, সেগুলি সবই জগতের আকর্ষণ বা অনুরাগ থেকেই সৃষ্ট হয়ে থাকে আর যত সুখ-শান্তি পাওয়া যায়, সে-সব রাগ (আসক্তি) -দ্বেষ রহিত হলেই পাওয়া যায়। এরূপ চিন্তা করলে বৈরাগ্য হবেই।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের সাহায্যে মনকে নিরোধ করার কথা বলা হয়েছে, পরবর্তী শ্লোকে ভগবান ধ্যানযোগ প্রাপ্তিতে অন্বয়-ব্যতিরেকের দ্বারা নিজের মত জানাচ্ছেন।

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ॥ ৩৬ ॥

[অসংযতাত্মনা (যার মন সম্পূর্ণ বশীভূত নয়, তার পক্ষে) ; যোগঃ, দুষ্প্রাপ (যোগ দুষ্প্রাপ্য) ; তু (কিন্তু) ; উপায়তঃ (বিহিতভাবে) ; যততা (যত্ন করলে) ; বশ্যাত্মনা (বশীভূত চিত্ত সাধকের) ; অবাপ্তুম্ (প্রাপ্ত হওয়া) ; শক্যঃ (সম্ভব) ; ইতি (এই হল) ; মে (আমার) ; মতিঃ (মত।)]

যার মন সম্পূর্ণরূপে বশীভূত নয়, তার পক্ষে যোগ দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু বিহিতভাবে যত্ন করলে বশীভূত চিত্ত যোগীর যোগ প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব, এই আমার মত ॥ ৩৬ ॥

ব্যাখ্যা—**'অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপঃ'**—আমার মতে যার মন বশীভূত নয়, তার দ্বারা যোগসিদ্ধ হওয়া কঠিন। কারণ যোগসিদ্ধির পথে মন বশীভূত না হওয়া যতটা বাধা, মনের চাঞ্চল্য তত বাধা নয়। যেমন পতিব্রতা স্ত্রী মনকে বশে তো রাখেই কিন্তু তাকে একাগ্র করে না। সুতরাং ধ্যানযোগীর মন বশে রাখা উচিত। মন বশীভূত হলে তাকে যেখানে স্থাপন করতে চাইবে সেখানেই স্থাপন করতে পারবে। যতক্ষণ ধরে রাখতে চাইবে ততক্ষণ তা পারবে এবং যেখান থেকে যখন উঠিয়ে নিতে চাইবে, সেখান থেকে মন উঠিয়ে নিতে পারবে।

প্রায়শঃ দেখা যায় যে, সাধকগণ শ্রদ্ধা সহকারে সাধন-ভজন করলেও তাঁদের চেষ্টায় শৈথিল্য থেকে যায়। তাঁরা যথাযথভাবে সংযত থাকেন না অর্থাৎ মন-ইন্দ্রিয়াদি অন্তঃকরণ পূর্ণভাবে সংযত করেন না। সেইজন্য যোগ প্রাপ্তিতে বাধা আসে অর্থাৎ পরমাত্মা সদা-সর্বত্র বিদ্যমান হলেও শীঘ্র অনুভূত হন না।

ভগবৎ-অভিমুখী, বৈষ্ণব সংস্কারসম্পন্ন সাধকদের মাংসাহারে যে অরুচি দেখা দেয়, বিষয় ভোগে তাঁদের সে অরুচি আসে না অর্থাৎ বিষয় ভোগকে তাঁরা তত নিষিদ্ধ এবং পতনকারক বলে মনে করেন না। কারণ বিষয় ভোগে অধিক অভ্যাস থাকায় এতে আমিষাহারের গ্লানি থাকে না। মাংস ইত্যাদি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বস্তু হওয়ায় এগুলি গ্রহণ করলে পতন তো হয়ই, উপরন্তু আসক্তি সহকারে বিষয় ভোগ করলে তার থেকেও বেশি পতন হয়। কারণ মাংস ইত্যাদিতে 'এটি নিষিদ্ধ বস্তু' এরূপ চিন্তা থাকে। কিন্তু বিষয় ভোগে 'এটি নিষিদ্ধ' এই ভাবনা থাকে না। তাই ভোগের সংস্কার—যেটি অন্তরে গাঁথা হয় সেটি অতি ভয়ানক হয়ে ওঠে। তাৎপর্য হল এই যে, মাংসাহারে যে পাপ হয়, সেটি দণ্ডভোগের দ্বারা ক্ষয় হয়ে যায়, সেটি আর পরে নতুন পাপের সঙ্গে যুক্ত হয় না। কিন্তু আসক্তি সহকারে বিষয় ভোগ করলে যে সংস্কার তৈরি হয় সেটি জন্ম-জন্মান্তরেও বিষয়ভোগ এবং তার রুচির পরিণামস্বরূপ পাপে প্রবৃত্ত করাতে থাকে।

তাৎপর্য হল এই যে, সাধকের অন্তঃকরণে বিষয় ভোগের প্রতি আকর্ষণ থাকার জন্যই তিনি সংযতাত্মা হতে পারেন না, মন-ইন্দ্রিয়াদিকে বশীভূত করতে পারেন না। তাই তাঁর যোগপ্রাপ্তিতে অর্থাৎ ধ্যানযোগের সিদ্ধিতে বাধা আসে।

'বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ'—'কিন্তু যিনি তৎপরতা সহকারে সাধনায় ব্যাপৃত থাকেন অর্থাৎ যিনি ধ্যানযোগে সিদ্ধ হওয়ার জন্য ধ্যানযোগের উপযুক্ত আহার-বিহার, শয়ন-জাগরণ ইত্যাদি নিয়মগুলি নিয়মিতভাবে দৃঢ়তা সহকারে পালন করেন এবং যাঁর মন সম্পূর্ণ বশীভূত হয়েছে, এরূপ অন্তঃকরণ বশীভূতকারী সাধক যোগপ্রাপ্ত হন অর্থাৎ তিনি ধ্যানযোগে সিদ্ধিলাভ করতে পারেন, এই হল আমার মত'—**'ইতি মে মতিঃ'**।

বশীভূত অন্তঃকরণ হওয়ার উপায় হল—সর্বপ্রথম নিজেকে জানতে হবে যে 'আমি ভোগী নই। আমি একজন জিজ্ঞাসু, শুধু তত্ত্ব জানাই আমার কাজ ; আমি ভগবানের, অতএব ভগবানে অর্পিত হওয়াই আমার কাজ ; আমি সেবক, কাজেই শুধু সেবা করাই আমার কাজ। কারো থেকে কিছু প্রত্যাশা করা আমার কাজ নয়'। এইভাবে নিজের অহংভাব পরিবর্তন করলে মন অতি শীঘ্র বশীভূত হয়।

মন যখন শুদ্ধ হয়, তখন তা স্বাভাবিকভাবে বশীভূত হয়। মনে উৎপত্তি-বিনাশশীল বস্তুর আসক্তি থাকাই হল মনের অশুদ্ধি। যখন সাধকের দৃঢ় উদ্দেশ্য হয় একমাত্র পরমাত্মপ্রাপ্তি করা, তখন তাঁর মন থেকে উৎপত্তি-বিনাশশীল বস্তুর আকর্ষণ দূর হয় এবং মন শুদ্ধ হয়।

ব্যবহারকালে সাধক এই সাবধানতা যেন অবলম্বন করেন যে, কখনো কোনোভাবে পরের স্বত্ব যেন না এসে পড়ে। কারণ পরের জিনিস গ্রহণ করলে মন অশুদ্ধ হয়। কোথাও চাকুরি বা কোনো কাজ করলে, যত পয়সা পাওয়া যায়, তার থেকে বেশি কাজ করবে। ব্যবসা করলে বস্তুর ওজন, মাপ বা গুণতিতে হিসাবের চেয়ে বেশি দিয়ে ফেললেও যেন কম না দেওয়া হয়। মজুরদের মজুরি দেবার সময় তাদের কাজ হিসাবে যতটা হয়, তার থেকে কিছু বেশিই দেবে। এই প্রকারের আচরণে মন শুদ্ধ হয়।

মর্মকথা

অর্জুন মনে করেছিলেন ধ্যানযোগে মানসিক চাঞ্চল্যই বাধাস্বরূপ। তিনি আরো বলেছিলেন চাঞ্চল্য নিরোধ করা বায়ুকে নিরুদ্ধ করার মতই অসম্ভব। সেইজন্য ভগবান মন নিরোধ করার জন্য অভ্যাস এবং বৈরাগ্য—এই দুটি উপায় জানিয়েছেন। এই দুটির মধ্যেও ধ্যানযোগের জন্য

'অভ্যাস'-ই হল প্রধান (গীতা ৬।২৬)। জ্ঞানযোগের জন্য 'বৈরাগ্য' বিশেষ উপযোগী। যদিও বৈরাগ্য ধ্যানযোগেও সহায়ক, তবুও অনুরাগ থাকলেও ধ্যানযোগে মনকে রুদ্ধ করা সম্ভব। যদি বলা হয় যে, অনুরাগ থাকলে মনকে রুদ্ধ করা যায় না, তাতে একটি আপত্তি ওঠে। পাতঞ্জলযোগদর্শন অনুযায়ী চিত্তবৃত্তির নিরোধ অভ্যাসের দ্বারাই হতে পারে। তাতে যদি বৈরাগ্যই কারণ হয়, তাহলে সিদ্ধি প্রাপ্তি কীকরে হবে ? (যার বর্ণনা পাতঞ্জলযোগদর্শনের বিভূতিপাদে করা হয়েছে।) তাৎপর্য হল এই যে, মনে অনুরাগ থাকলেও যদি চিত্ত একাগ্র ও নিরুদ্ধ হয়, তাহলে অনুরাগের জন্যই সিদ্ধাই প্রকটিত হয়। কারণ সংযম (ধ্যান-ধারণা-সমাধি) কোনো একটি সিদ্ধি (সিদ্ধাই) প্রাপ্তির জন্যই করা হয় এবং যেখানে সিদ্ধাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে সেখানে আসক্তির অভাব হবে কেন ? কিন্তু যেখানে কেবলমাত্র পরমাত্মতত্ত্ব লাভ করাই উদ্দেশ্য থাকে সেখানে এই ধ্যান-ধারণা এবং সমাধি পরমাত্মপ্রাপ্তির সহায়ক হয়ে ওঠে।

একাগ্রতার পর চিত্ত যখন নিরুদ্ধ অবস্থায় আসে, তখন সমাধি হয়। সমাধি হয় কারণ-শরীরে এবং সমাধি থেকেও ব্যুত্থান হয়। যতক্ষণ সমাধি এবং ব্যুত্থান—এই দুটি অবস্থা থাকে, ততক্ষণ প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে। প্রকৃতির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হলে সহজাবস্থা হয়, যার থেকে ব্যুত্থান হয় না। তাই চিত্ত-চাঞ্চল্য রোধ করার ব্যাপারে ভগবান বেশি কিছু বলেননি। কারণ চিত্তকে নিরুদ্ধ করা ভগবানের ধ্যেয় নয় অর্থাৎ ভগবান যে ধ্যানের বর্ণনা করেছেন, সেই ধ্যান হল সাধন, ধ্যেয় নয়। ভগবানের মতে সংসারের প্রতি যে আসক্তি, তাই হল আসল বাধা, ভগবানের উদ্দেশ্যই হল সেগুলি দূর করা। ধ্যান হল এক বিশেষ শক্তি বা পুঁজি, যাকে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সিদ্ধিতে ঠিকমতো ব্যবহার করা সম্ভব।

স্বয়ং কেবলমাত্র পরমাত্মতত্ত্বকেই চায়, তাই তাঁর মনকে একাগ্র করার তত প্রয়োজন নেই, যত প্রয়োজন থাকে প্রাকৃতিক কার্য—মনের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার, মনের সঙ্গে আপন ভাব দূর করার। তাই সমাধি থেকেও যখন বিরতি হয় তখনই সর্বাতীত তত্ত্ব প্রাপ্তি হয়। তাৎপর্য হল এই যে, যতক্ষণ সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত না হওয়া যায়, ততক্ষণ তাতে একপ্রকার আকর্ষণ থাকে। যখন ওই অবস্থা প্রাপ্তি হয়, তখন তাতে আকর্ষণ না থেকে সত্যকার জিজ্ঞাসুর তা থেকে উপরতি হয়ে যায়। উপরতি হলে অর্থাৎ অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কছেদ হলে অবস্থাতীত চিন্ময়-তত্ত্বের অনুভূতি স্বাভাবিকভাবে হয়ে যায়। এই হল যোগসিদ্ধি। চিন্ময় তত্ত্বের সঙ্গে স্বয়ং-এর নিত্যযোগ অর্থাৎ নিত্যসম্বন্ধ-বিদ্যমান।

পরিশিষ্ট-ভাব— ধ্যানযোগের সিদ্ধির জন্য প্রকৃতপক্ষে মনকে তত নিরুদ্ধ করার প্রয়োজন হয় না, যত তাকে বশ করা অর্থাৎ শুদ্ধ করার দরকার। শুদ্ধ করার অর্থ হল মনে বিষয় সম্পর্কে অনুরাগ না থাকা। যিনি নিজ মনকে শুদ্ধ করেছেন, তিনি চেষ্টা করলে ধ্যানযোগে সিদ্ধিলাভ হয়।

ভগবান একত্রিশতম শ্লোকে **'সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ'** পদটিতে যে কথা বলেছেন, তাতে প্রধান বাধা হল—ভগবদ্বুদ্ধি না হওয়া এবং বত্রিশতম শ্লোকে **'আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন'** পদটিতে যে কথা বলেছেন, তাতে প্রধান বাধা—রাগ (আসক্তি) ও দ্বেষ। কিন্তু অর্জুন ভুল করে মনে করেছেন যে মানসিক চাঞ্চল্যই এর প্রতিবন্ধক। প্রকৃতপক্ষে মানসিক চাঞ্চল্য নয়, সমস্ত কিছুতে ভগবদ্বুদ্ধি না হওয়া এবং রাগ-দ্বেষ থাকাই হল প্রকৃত বাধা। যতক্ষণ রাগ-দ্বেষ থাকে, ততক্ষণ সবের মধ্যে ভগবদ্বুদ্ধি আসে না এবং যতক্ষণ ভগবান ব্যতীত অন্য সত্তাকে গুরুত্ব দেওয়া হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সর্বতোভাবে মন নিরুদ্ধ হয় না।

বৃত্তিকে নিরুদ্ধ করলে বৃত্তির সত্তাকে মেনে নেওয়া হয়, কেন-না বৃত্তির সত্তাকে মেনে নেওয়া হয়েছে, তাই তাকে নিরুদ্ধ করা হচ্ছে। স্বরূপতঃ কোনো বৃত্তি নেই। সুতরাং বৃত্তিকে নিরুদ্ধ করলে কিছুদিনের জন্য মন নিরুদ্ধ হলেও, আবার ব্যুত্থান হওয়ার আশঙ্কা থাকে। যদি অন্য কোনো অস্তিত্বকে স্বীকার করে না নেওয়া হয়, তাহলে ব্যুত্থানের প্রশ্নই ওঠে না। কেন-না অন্য কোনো কিছুর অস্তিত্ব না থাকলে মনও থাকে না।

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকটিতে ভগবান বলেছেন যে, যার অন্তঃকরণ সম্পূর্ণভাবে বশীভূত নয় অর্থাৎ যে ব্যক্তির প্রচেষ্টায় শৈথিল্য থাকে তার পক্ষে যোগের প্রাপ্তি কঠিন। সেইজন্য অর্জুন পরবর্তী শ্লোকে দুটি প্রশ্ন করেছেন।

অর্জুন উবাচ

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি॥ ৩৭ ॥

[কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ !) ; শ্রদ্ধয়া, উপেতঃ (যাঁর সাধনায় শ্রদ্ধা আছে) ; অযতি (কিন্তু যত্নের শৈথিল্যবশতঃ) ; যোগাৎ (যোগ হতে) ; চলিতমানসঃ (ভ্রষ্ট হয়ে যান) ; যোগসংসিদ্ধিম্ (যোগসিদ্ধি) ; অপ্রাপ্য (প্রাপ্তির পরিবর্তে) ; কাম্, গতিম্ (কী গতি) ; গচ্ছতি (লাভ করবেন ?)]

অর্জুন বললেন—হে কৃষ্ণ ! যাঁর সাধনে শ্রদ্ধা রয়েছে কিন্তু যত্নের শৈথিল্যতাবশতঃ যদি তিনি শেষকালে যোগভ্রষ্ট হন তাহলে তিনি যোগপ্রাপ্তির পরিবর্তে কী গতি লাভ করবেন ? ॥ ৩৭ ॥

ব্যাখ্যা—'অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ' —যাঁর সাধনভজনে অর্থাৎ জপ-ধ্যান-সৎসঙ্গ-স্বাধ্যায় ইত্যাদিতে আগ্রহ আছে, শ্রদ্ধা আছে এবং সেগুলি অভ্যাসও করেন, কিন্তু অন্তঃকরণ ও বহিঃকরণ[১] বশে না থাকায় সাধনে শৈথিল্য থাকে, তৎপরতা থাকে না, এরূপ সাধক অন্তিমকালে জগৎ-সংসারের প্রতি অনুরাগ থাকায়, বিষয়াদির চিন্তা হওয়ায় নিজ সাধন থেকে যদি বিচ্যুত হন, ধ্যেয়র উপর যদি স্থির না থাকেন, তবে তাঁর কী গতি হয় ?

'অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি'—বিষয়াসক্তি, অসতর্কতার জন্য অন্তিমকালে যাঁর চিত্ত বিচলিত হয় অর্থাৎ সাধন থেকে চ্যুত হন এবং সেইজন্য তাঁর যোগের সংসিদ্ধি—পরমাত্মা প্রাপ্তি হয়নি, তবে তিনি কোন্ গতি প্রাপ্ত হবেন ?

তাৎপর্য হল এই যে, তিনি পাপকাজ সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করেছেন, তাই তিনি তো নরকে যাবেন না এবং স্বর্গকামনা না করায় স্বর্গেও যেতে পারেন না। আবার শ্রদ্ধাপূর্বক সাধন-ভজনে ব্যাপৃত থাকায় তাঁর পুনর্জন্মও হবে না। কিন্তু অন্তিমকালে পরমাত্মার স্মৃতি জাগরূক না থাকায়, অপর চিন্তা মনে থাকায় তাঁর পরমাত্মপ্রাপ্তিও হয়নি, তবে তাঁর কী গতি হবে ? তিনি কোথায় আশ্রয় পাবেন ?

'কৃষ্ণ' সম্বোধন করার অর্থ হল এই যে, আপনি তো সকল প্রাণীকে আকর্ষণ করেন এবং তাদের গতি-অগতি জানেন এবং সেই গতির বিধায়ক। অতএব আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি যে যোগভ্রষ্ট সাধকদের আপনি কোন্ দিকে আকর্ষণ করবেন ? তাদের আপনি কী গতি প্রদান করবেন ?

পরিশিষ্ট-ভাব— করণ-সাপেক্ষ সাধনে মন-সহ স্বরূপে স্থিতিলাভ হয়—**'যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে'** (গীতা ৬।১৮)। তাই মনের সঙ্গে সম্পর্ক থাকায় মন বিচলিত হয়ে যোগভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। করণকে আপন মনে করলেই করণ-সাপেক্ষ সাধন হয়। ধ্যানযোগী তাঁর মনকে (করণকে) নিজের মনে করে তা পরমাত্মাতে নিয়োজিত করেন। মন সংযুক্ত করার ফলেই তিনি যোগভ্রষ্ট হন। তাই যোগভ্রষ্ট হওয়ার জন্য করণ সাপেক্ষও হল কারণ। এই করণ সাপেক্ষতা কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ—তিন সাধনেই নেই।

ধ্যানযোগীর পুনর্জন্ম হয় মন বিচলিত হলে অর্থাৎ নিজ সাধন থেকে ভ্রষ্ট হলে। কিন্তু কর্মযোগী বা জ্ঞানযোগীর পুনর্জন্ম হয় তখন যখন জাগতিক আসক্তি থাকে। ভক্তিযোগে ভগবদ্ আশ্রয়ে থাকায় ভগবান তাঁর ভক্তকে বিশেষভাবে রক্ষা করেন—**'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্'** (গীতা ৯।২২), **'মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎ প্রৎপ্রসাদাৎতরিষ্যসি'** (গীতা ১৮।৫৮)।

***

[১]মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকারকে অন্তঃকরণ এবং পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়কে বহিঃকরণ বলা হয়।

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি॥ ৩৮ ॥

[**মহাবাহো** (হে মহাবাহো !) ; **অপ্রতিষ্ঠঃ** (সংসার আশ্রয় বর্জিত) ; **ব্রহ্মণঃ** (পরমাত্মপ্রাপ্তির) ; **পথি** (পথে) ; **বিমূঢ়ঃ** (মোহগ্রস্ত অর্থাৎ বিচ্যুত) ; **উভয়বিভ্রষ্টঃ** (উভয় পথে ভ্রষ্ট সাধক) ; **কচ্চিৎ, ছিন্নাভ্রম্** (কি ছিন্নভিন্ন মেঘরাশির) ; **ইব** (ন্যায়) ; **ন, নশ্যতি** (নষ্ট হয়ে যান না ?)]

হে মহাবাহো ! সংসার আশ্রয়বর্জিত এবং পরমাত্মপ্রাপ্তির পথে মোহগ্রস্ত অর্থাৎ বিচ্যুত—এইরূপ উভয় পথে ভ্রষ্ট সাধক কি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন মেঘরাশির ন্যায় নষ্ট হয়ে যান না ? ॥ ৩৮ ॥

ব্যাখ্যা—[অর্জুন আগের শ্লোকটিতে **'কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি'** বলে যে কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সেটিই এখানে খোলাখুলিভাবে জিজ্ঞাসা করছেন।]

'অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি'—সেই ব্যক্তি সাংসারিক প্রতিষ্ঠা (স্থিতি) জেনেশুনেই ত্যাগ করেছেন অর্থাৎ তিনি জাগতিক সুখ-আরাম, আদর-অভ্যর্থনা, যশ-প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির কামনা ত্যাগ করেছেন, এগুলি প্রাপ্ত করার কোনো উদ্দেশ্যই তাঁর নেই। এইভাবে সাংসারিক আশ্রয় ত্যাগ করে তিনি পরমাত্মপ্রাপ্তির পথ নিয়েছিলেন। কিন্তু জীবিতাবস্থায় তাঁর পরমাত্মাপ্রাপ্তি হয়নি এবং অন্তিমকালে তিনি সাধন-ভ্রষ্ট হয়েছেন অর্থাৎ পরমাত্মার কথা তাঁর স্মরণে নেই।

'কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি'—যে সাধক এরূপ দুদিক থেকেই ভ্রষ্ট হয়েছেন অর্থাৎ জাগতিক ও পারমার্থিক দুটির উন্নতি থেকেই বঞ্চিত হয়েছেন, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন মেঘখণ্ডের ন্যায় কী বিনষ্ট হয়ে যান ? তাৎপর্য হল এই যে, মেঘখণ্ড যেমন একটি মেঘরাশিকে ছেড়ে অন্য মেঘরাশিতে পৌঁছাবার আগেই হাওয়ার আঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে অপর মেঘ খণ্ডে পৌঁছাতে পারে না, তেমনই সাধক সংসারের আশ্রয় তো ছেড়েছেন এবং অন্তিমকালে পরমাত্মার কথা স্মৃতিতে না থাকে, তবে তিনি কি নষ্ট হন ? তাঁর কি পতন হয় ?

মেঘের উদাহরণ এখানে ঠিকমতো খাটে না। কারণ ওই মেঘখণ্ডটি যে মেঘরাশি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং যে মেঘরাশির দিকে যাচ্ছে—এই তিনটি একই জাতির অর্থাৎ তিনটিই জড় পদার্থ। কিন্তু যে সাধক সংসারকে ত্যাগ করেছেন, সেই সংসার এবং যাঁকে প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে চলছেন, সেই পরমাত্মা এবং তিনি নিজে (সাধক)— এই তিনটি এক জাতির নয়।.এই তিনটির মধ্যে সংসার হল জড় এবং পরমাত্মা এবং সাধক হলেন চেতন। তাই 'প্রথম আশ্রয় ত্যাগ করেছেন এবং অন্যটি প্রাপ্ত হয়নি'—এই বিষয়ে উপরিউক্ত দৃষ্টান্ত ঠিকমতো খাটে।

এই শ্লোকে অর্জুনের প্রশ্নের তাৎপর্য হল এই যে, সাক্ষাৎ পরমাত্মার অংশ হওয়ায় জীবের কখনো অনস্তিত্ব (অভাব) হতেই পারে না। যদি তার মধ্যে সংসারের উদ্দেশ্য হয়, সংসারই আশ্রয় হয়, তবে সে স্বর্গাদিলোকে বা নরকে এবং পশু-পক্ষী ইত্যাদি আসুরীযোনিতে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু বাস করে এই জগতের গণ্ডির মধ্যেই। কিন্তু এখানে উল্লিখিত সাধক সাংসারিক আশ্রয় ত্যাগ করেছেন এবং পরমাত্মাপ্রাপ্তিই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য, তবুও জীবদ্দশায় তাঁর পরমাত্মাপ্রাপ্তি হয়নি এবং অন্তিমকালে কোনো কারণবশতঃ তাঁর উদ্দেশ্য অনুযায়ী সাধন-ভজনে স্থিতি যদি না থাকে, পরমাত্মচিন্তাও যদি না থাকে, তবে তিনি ওই স্থান হতে ভ্রষ্ট হয়ে কী গতি প্রাপ্ত হন ?

বিশেষ কথা

এই শ্লোকে 'পরমাত্মাপ্রাপ্তি থেকে এবং সাধন থেকে ভ্রষ্ট (চ্যুত) হওয়া'—যদি এরূপ অর্থ নেওয়া হয়, তবে এই কথা এখানে ঠিকভাবে খাটে না। কারণ আগে মেঘের যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, সেটি উপরের অর্থের সঙ্গে ঠিকমতো খাটে না। মেঘের একটি খণ্ড মেঘরাশিকে ছেড়ে অন্য মেঘরাশির দিকে যায়, কিন্তু সেই মেঘরাশিতে পৌঁছাবার আগেই সেটি বায়ুর আঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই দৃষ্টান্তে দেখা যায় মেঘখণ্ডটি নিজেই মেঘরাশি ত্যাগ করে অর্থাৎ আগের স্থিতিকে ত্যাগ করেছে এবং অন্য মেঘরাশিতে পৌঁছাতে সক্ষম হয়নি, তাই সেটি উভয়কুল থেকে বিচ্যুত হয়েছে। কিন্তু সাধক তো এখনো

পরমাত্মাকে লাভই করেননি, তবে আর তাঁর পরমাত্মা প্রাপ্তি থেকে ভ্রষ্ট (চ্যুত) হওয়া বলা কী করে সম্ভব ?

দ্বিতীয়তঃ, সাধ্য প্রাপ্তি হলে সাধক কখনো সাধ্য থেকে চ্যুত হতে পারেন না অর্থাৎ কোনো পরিস্থিতিতেই তিনি সাধ্য থেকে পৃথক হন না, তাকে ত্যাগ করতে পারেন না। সুতরাং তাঁকে সাধ্য থেকে চ্যুত বলা যায় না। তবে অন্তিমকালে স্থিতি না থাকায়, পরমাত্মার কথা স্মরণ না থাকায় তাঁকে **'সাধনভ্রষ্ট'** বলা গেলেও **'উভয়ভ্রষ্ট'** বলা যায় না। সুতরাং এখানে মেঘের দৃষ্টান্ত অনুসারে তাঁকেই উভয়ভ্রষ্ট বলা যায়, যে ব্যক্তি সাংসারিক আশ্রয় জেনেশুনে নিজেই ত্যাগ করে পরমাত্মাপ্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করেন, কিন্তু অন্তিমকালে কোনো কারণবশতঃ পরমাত্মাকে বিস্মরণ হয়ে সাধনায় বিচলিত হয়েছেন। এইভাবে সংসার এবং সাধন—উভয়তেই তাঁর স্থিতি না থাকায় তাঁকেই উভয়ভ্রষ্ট বলা হয়। অর্জুনও সাঁইত্রিশতম শ্লোকে **'যোগাচ্চলিতমানসঃ'** বলেছেন এবং এই (আটত্রিশতম) শ্লোকে **'অপ্রতিষ্ঠঃ'**, **'বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি'** এবং **'ছিন্নাভ্রমিব'** বলেছেন। এর তাৎপর্য হল এই যে, সেই ব্যক্তি সংসার ত্যাগ করেছেন এবং পরমাত্মার প্রাপ্তির সাধনেও বিচলিত হয়েছেন, মোহগ্রস্ত হয়েছেন।

* * *

সম্বন্ধ—পূর্বোক্ত সন্দেহ দূর করার জন্য অর্জুন পরবর্তী শ্লোকে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন।

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে॥ ৩৯ ॥

[**কৃষ্ণ** (হে কৃষ্ণ !) ; **মে** (আমার) ; **এতৎ, সংশয়ম্** (এই সংশয়) ; **অশেষতঃ** (নিঃশেষরূপে) ; **ছেত্তুম** (ছেদ করার জন্য) ; **অর্হসি** (আপনিই যোগ্য) ; **হি, অস্য** (কারণ) ; **ত্বদন্যঃ** (আপনি ছাড়া আর কেউ) ; **সংশয়স্য** (সংশয়) ; **ছেত্তা, ন, উপপদ্যতে** (দূর করতে সক্ষম নয়।)]

হে কৃষ্ণ ! আমার এই সংশয় নিঃশেষরূপে আপনিই ছেদ করতে পারেন, কারণ আপনি ছাড়া আর কেউ আমার এই সংশয় দূর করতে সক্ষম নয় ॥ ৩৯ ॥

ব্যাখ্যা—**'এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ'**—পরমাত্মপ্রাপ্তি উদ্দেশ্য হওয়ায় সাধক পাপকর্ম থেকে সম্পূর্ণভাবে রহিত হয়েছেন, অতএব তিনি নরকে যেতে পারেন না এবং স্বর্গ তাঁর ধ্যেয় না হওয়ায় স্বর্গেও যেতে পারেন না। মনুষ্যজন্ম লাভের উদ্দেশ্য তাঁর নেই, অতএব তিনি মনুষ্যজন্মও লাভ করবেন না এবং পরমাত্মপ্রাপ্তির সাধনেও বিচলিত হয়েছেন। আমার আশঙ্কা হল যে, এঁরা কি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন মেঘের ন্যায় বিনষ্ট হয়ে যান ?

'ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে'—অন্য কেউই এই সংশয় দূর করতে সক্ষম নয়। এর তাৎপর্য হল এই যে, শাস্ত্রের যদি কোনো গূঢ় কথা থাকে, বা কোনো গভীর বিষয় থাকে কিংবা কোনো কঠিন পংক্তি থাকে—যার অর্থ অনুধাবন করা মুশকিল, তবে তার অর্থোদ্ধার করতে পারেন একমাত্র শাস্ত্রজ্ঞ কোনো বিদ্বান ব্যক্তি। কিন্তু যোগভ্রষ্টের কী গতি হয় এই উত্তর তাঁরা দিতে সক্ষম নন। অবশ্য যোগী কিছুদূর পর্যন্ত বলতে পারেন, কিন্তু তিনি সমস্ত প্রাণীর গতি-অগতি অর্থাৎ আসা-যাওয়ার কথা জানতে পারেন না। কারণ তিনি হলেন **'যুঞ্জান্ যোগী'** অর্থাৎ অভ্যাসের দ্বারা যোগ প্রাপ্ত যোগী। সুতরাং তিনি সেই পর্যন্তই জানতে পারেন—যতটা তাঁর জানার সীমা, কিন্তু আপনি হলেন **'যুক্ত যোগী'** অর্থাৎ আপনি অভ্যাস ও চেষ্টা ছাড়াই সর্বত্র সবকিছু জানেন। আপনার সমান জ্ঞানী কেউ হতে পারে না। আপনি স্বয়ং ভগবান এবং সকল প্রাণীর গতি-অগতির সম্বন্ধে জানেন[১]। সুতরাং এই যোগভ্রষ্টের গতির সম্বন্ধে একমাত্র আপনিই সঠিকভাবে জানাতে পারেন। আপনিই পারেন আমার এই সংশয় দূর করতে।

---

[১]উৎপত্তিং প্রলয়ং চৈব ভূতানামাগতিং গতিম্। বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাং চ স বাচ্যো ভগবানিতি॥

(বিষ্ণুপুরাণ ৬।৫।৭৮ ; নারদপুরাণ, পূর্ব. ৪৬।২১)

'যিনি সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি ও লয়, গতি এবং অগতি, বিদ্যা এবং অবিদ্যাকে জানেন, তিনিই ভগবান নামের উপযুক্ত।'

পরিশিষ্ট-ভাব—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভগবদ্‌শক্তির উপর অর্জুনের অগাধ আস্থা ছিল। সেইজন্যই অর্জুন এখানে যোগভ্রষ্টের গতির বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন এবং বলেছেন যে এই বিষয়ে তিনি (ভগবান) ছাড়া আর কেউ জানাতে সক্ষম নন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভগবদ্‌শক্তির ওপর এত বিশ্বাস থাকার জন্যই তিনি এক অক্ষৌহিণী নারায়ণী সেনার পরিবর্তে অস্ত্রহীন শ্রীকৃষ্ণকেই তাঁর পক্ষে যোগদান করতে অনুরোধ করেছিলেন।

***

সম্বন্ধ—আটত্রিশতম শ্লোকে অর্জুন প্রশ্ন করেছিলেন সংসার ও সাধনচ্যুত সাধকদের পতন হয় কি না ? তার উত্তর ভগবান পরের শ্লোকটিতে দিয়েছেন।

শ্রীভগবানুবাচ

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি॥ ৪০ ॥

[**পার্থ** (হে পার্থ!) ; **তস্য, ইহ** (তাঁর ইহলোকে) ; **অমূত্র** (পরলোকে) ; **এব, বিনাশঃ** (কোথাও-ই বিনাশ) ; **ন, বিদ্যতে** (হয় না) ; **হি, তাত** (কারণ, হে বৎস !) ; **কল্যাণকৃৎ** (কল্যাণ কর্মকারী) ; **কশ্চিৎ** (কোনো ব্যক্তিই) ; **দুর্গতিম্** (দুর্গতি) ; **ন, গচ্ছতি** (প্রাপ্ত হন না।)]

শ্রীভগবান বললেন—হে পার্থ ! তাঁর ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও বিনাশ হয় না ; কারণ, হে তাত (বৎস), কল্যাণ-কর্মকারী কোনো ব্যক্তিই কখনো দুর্গতি প্রাপ্ত হন না।

ব্যাখ্যা—[যাঁর অন্তিমকালে স্মরণে পরমাত্মা আসেন না, তাঁর পতন হয় কি না—এই বিষয়ে অর্জুন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছিলেন। এই ব্যাকুলতা ভগবানের কাছে লুক্কায়িত থাকেনি। তাই ভগবান অর্জুনের **'কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি'**—এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগেই অর্জুনের চিত্তচাঞ্চল্য দূর করছেন।]

'পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে'—হে পার্থ ! যে সাধক অন্তিমকালে কোনো কারণবশতঃ যোগ থেকে, সাধন-ভজন থেকে বিচ্যুত হয়ে যান, সেই যোগভ্রষ্ট সাধক মৃত্যুর পর ইহলোক বা পরলোক যেখানেই জন্ম নিন না কেন, তাঁর পতন হয় না (গীতা ৬।৪১-৪৫)। তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, যোগসাধনার দ্বারা তিনি যে স্থিতি লাভ করেছেন, তার থেকে (নীচে) তাঁর পতন হয় না। তাঁর সাধন-সামগ্রী নষ্ট হয় না ; তাঁর পারমার্থিক উদ্দেশ্য পরিবর্তিত হয় না। অনাদিকাল হতে তাঁর যে জন্ম-মৃত্যু চক্রে যাতায়াত ছিল, এর পরে তাঁকে সেই জন্ম-মৃত্যুর চক্রে বাঁধা থাকতে হয় না।

ভরতমুনি যেমন ভারতবর্ষের রাজ্য ত্যাগ করে একান্তে তপস্যা করতেন। সেখানে দয়াপরবশ হয়ে তিনি একটি হরিণ-শিশুর মায়ায় আসক্ত হলেন, যার জন্য পরজন্মে তাঁকে হরিণ হয়ে জন্মগ্রহণ করতে হয়। কিন্তু তিনি যে ত্যাগ-তপস্যা করেছিলেন, যে সাধন-সামগ্রী পুঞ্জীভূত করেছিলেন, তা এই হরিণ-জন্মেও বিনষ্ট হয়নি। হরিণ-জন্মেও তাঁর পূর্বজন্মের কথা স্মরণে ছিল, যা অনেক মানুষেরও থাকে না। তাই তিনি (হরিণ-জন্মে) শিশুকাল থেকেই মায়ের সঙ্গে থাকতেন না, সবুজ পাতার পরিবর্তে শুকনো পাতা খেতেন। অর্থাৎ নিজ স্থিতি থেকে পতন না হওয়ায়, হরিণ-জন্মেও তাঁর পতন হয়নি (শ্রীমদ্ভাগবত স্কন্ধ ৫, অধ্যায় ৭-৮)। এইভাবে প্রথমে মনুষ্য-জন্মে যাঁর স্বভাব থাকে সেবা করার, জপ-ধ্যান করার এবং চিন্তা থাকে নিজের উদ্ধার করার, তিনি কোনো কারণবশতঃ অন্তিমকালে যোগভ্রষ্ট হলে এবং ইহলোকে পশু-পক্ষীরূপে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর সেই উত্তম স্বভাব এবং সৎ-সংস্কার নষ্ট হয় না। এইরূপ অনেক উদাহরণ আছে যে, কেউ অন্য জন্মে হাতি বা উট ইত্যাদি হয়ে জন্মেছিলেন, কিন্তু সেই জন্মেও তাঁরা ভগবানের কথা শুনতেন। কোনো এক স্থানে ভগবদ্‌কথা আলোচনা হত, একটি কালো কুকুর এসে সেই কথা শুনত। কীর্তন করার সময় যখন কীর্তন-মণ্ডলী পরিভ্রমণ করত, সেই কুকুরটিও তখন মণ্ডলীর সঙ্গে সঙ্গে পরিভ্রমণ করত। এটি আমার

নিজের দেখা ঘটনা।

'ন হি কল্যাণকৃৎকশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি'—ভগবান এই শ্লোকের পূর্বার্ধে অর্জুনকে 'পার্থ' নামে সম্বোধন করেছেন, এটি হল গভীর আপন-ভাবের দ্যোতক। অর্জুনের সমস্ত নামের মধ্যে এই 'পার্থ' নামটি ছিল ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। এবার উত্তরার্ধে তার থেকে অধিক প্রেমপূর্ণ শব্দে ভগবান বলেছেন, 'হে তাত (বৎস)! কল্যাণময় কর্ম যাঁরা করেন তাঁদের দুর্গতি হয় না।' এই 'তাত' সম্বোধন সমগ্র গীতায় মাত্র একবারই উল্লিখিত হয়েছে। এটি অত্যধিক বাৎসল্যের নিদর্শন।

এই শ্লোকে ভগবান সাধকমাত্রের জন্যই অত্যন্ত আশ্বাস বাণী দিয়েছেন যে, যাঁরা কল্যাণ কর্ম করেন, যাঁরা যে কোনো সাধনার দ্বারা নির্মল হৃদয়ে পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত করতে চান, এরূপ কোনো সাধক কখনোও দুর্গতিগ্রস্ত হন না।

তাঁর দুর্গতি হয় না—এটি বলার অর্থ হল যে, যে ব্যক্তি কল্যাণকারী কাজে ব্যাপৃত থাকে অর্থাৎ মনুষ্য-দেহ যে জন্য প্রাপ্ত হয়েছে, সেই আসল কাজে ব্যাপৃত এবং জাগতিক ভোগ বা সম্পদ-সংগ্রহে আসক্ত নয়, এরূপ ব্যক্তি যে পথই (সাধনমার্গ) অনুসরণ করুন না কেন—তাঁর কখনো দুর্গতি হয় না। কারণ তাঁর ধ্যেয় চিন্ময় তত্ত্ব হল আমি অর্থাৎ পরমাত্মা, তাই তাঁর পতন হয় না। আমিই তাঁকে রক্ষা করি, সুতরাং তাঁর পতন হবে কীভাবে?

আমার দৃষ্টি স্বাভাবিকভাবে প্রাণীদের মঙ্গলের প্রতি থাকে। যে ব্যক্তি আমার পথ অনুসরণ করে, নিজ পরম মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করে, সে আমার অত্যন্ত প্রিয়; কারণ প্রকৃতপক্ষে সে আমারই অংশ, জগতের নয়। তাঁর সম্পর্ক বাস্তবিকই আমার সঙ্গে থাকে, সংসারের (জগতের) সঙ্গে নয়। সে আমার সঙ্গের এই প্রকৃত সম্পর্ক, প্রকৃত লক্ষ্য জেনে গেছে, তাহলে তাঁর দুর্গতি হবে কী প্রকারে? যদিও কখনো কখনো তাকে মোহগ্রস্ত বা সাধন পরিত্যাগী মনে হতে পারে; কিন্তু এই পরিস্থিতি সাধারণতঃ তাঁর অহংকারের জন্যই পরিলক্ষিত হয়। আমিও তাঁকে উদ্দীপ্ত করার জন্য, তাঁর অহংকার দূর করার নিমিত্ত এমন ঘটনা ঘটিয়ে দিই, যাতে তিনি ব্যাকুল হয়ে আরও উৎসাহভরে আমার শরণাগত হন। যেমন, গোপিনীদের অভিমান (অহংকার) দেখে আমি রাসের সময়ই অন্তর্হিত হয়েছিলাম, ফলে গোপিনীরা হতচকিত হয়েছিল। যখন তারা অত্যন্ত ব্যাকুল হল, তখন আমি গোপিনীদের মধ্যে প্রকটিত হয়েছিলাম এবং তাদের জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেছিলাম—**'ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতম্'** (শ্রীমদ্ভা. ১০।৩২।২১) অর্থাৎ তোমাদের ভজনা করতে করতেই আমি অন্তর্ধান হয়েছিলাম। তোমাদের কথা এবং তোমাদের মঙ্গলের ইচ্ছা আমার মন থেকে যায়নি। এইরূপ আমার চিত্তে সাধনকারীদের স্থান অত্যন্ত উচ্চে। তার কারণ হল এই যে, অনন্ত জন্ম ধরে আমাকে ভুলে থাকা এই প্রাণীরা যখন আমার শরণাগত হয়, তখন তারা আমার অত্যন্ত প্রিয় হয়। কারণ তারা বহু জন্মে বহু দুঃখ ভোগ করেছে এবং এখন ঠিক পথ ধরেছে। মা যেমন তাঁর শিশুসন্তানের রক্ষা-পালন ও মঙ্গল করেন, আমিও সেইভাবে এই সাধকদের সাধন এবং তাঁদের হিতের রক্ষা করে তাঁদের সাধনের বৃদ্ধি করি।

তাৎপর্য হল এই যে, যাঁর একবার সাধন-সংস্কার গড়ে উঠেছে, সেই সংস্কার আর কখনো নষ্ট হয় না। কারণ পরমাত্মার জন্য যা কিছু করা হয়, তা সবই 'সৎ' রূপে পরিণত হয়—**'কর্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে'** (গীতা ১৭।২৭) অর্থাৎ সাধনের অনস্তিত্ব (অভাব) হয় না—**'নাভাবো বিদ্যতে সতঃ'** (গীতা ২।১৬)। ভগবান এই কথাই এখানে বলেছেন যে, কল্যাণকর কাজ যাঁরা করেন সেই সব মানুষের দুর্গতি হয় না। তাঁদের যে সদ্ভাব তৈরি হয়েছে, স্বভাব যেভাবে গড়ে উঠেছে, তাতে তাঁদের যে জন্মই হোক (পশু বা পাখি) অথবা যে কোনো পরিস্থিতিই আসুক, তবুও এই সদ্ভাবের দ্বারা তাঁরা কল্যাণকর কাজই করবেন। কোনো কারণবশতঃ তাঁদের নীচজন্ম হলেও, সেখানে স্বজাতীয় প্রাণীদের সঙ্গে তাঁদের স্বভাবের পার্থক্য থাকবেই।[১]

এখানে এই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, অজামিলের মতো শুদ্ধ ব্রাহ্মণও গণিকাগামী হয়েছিলেন, বিল্বমঙ্গলও চিন্তামণি নামে এক গণিকার বশীভূত হয়েছিলেন, তাহলে তাঁদের এই জীবনেই এরূপ পতন কী করে হল? উত্তর

[১]যাঁর স্বভাব শুদ্ধ হয়েছে, যাঁর মধ্যে সদ্ভাব আছে, তাঁর কোনো নীচ যোনিতে সাপ, বিছে ইত্যাদিতে জন্ম হতে পারে না। কারণ তাঁর স্বভাব ওই প্রাণীগুলির মতো হয় না এবং তিনি ওইসব প্রাণীদের অনুরূপ কাজ করতে সক্ষম হন না।

হচ্ছে এই যে, সাধারণ লোকের চোখে তাঁদের পতন দেখালেও, প্রকৃতপক্ষে তাঁদের পতন হয়নি। কারণ অন্তিমকালে তাঁরা উদ্ধার পেয়েছিলেন। অজামিলকে নিতে এসেছিলেন ভগবানের পার্ষদ আর বিল্বমঙ্গল ভগবানের ভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। এইভাবে তাঁরা আগেও সদাচারী ছিলেন এবং অন্তিমকালেও উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, কেবল মধ্যবর্তী সময়েই তাঁরা পতিতদশা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অর্থাৎ কুসঙ্গের দ্বারা, বাধা-বিঘ্নের জন্য বা অসাবধানতার জন্য তাঁর ভাব এবং আচরণের পরিবর্তন হতে পারে এবং 'আমি কে, কী করছি, আমার কী করা উচিত'—এই সমস্ত কথা বিস্মৃত হয়ে তিনি সংসারের প্রবাহে ভেসে যেতে পারেন, কিন্তু আগে সাধনাবস্থায় তিনি যে সাধন-ভজন করেছেন, তাতে সংসারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যতটা ছিন্ন হয়েছে, সেই স্থিতি তাঁর পুরোটাই থাকে অর্থাৎ সেটি কখনো কোনো অবস্থাতেই নষ্ট হয় না, সেটি তাঁর মধ্যে সুরক্ষিতই থাকে। যখনই তাঁর কোনো সৎসঙ্গ লাভ হয় বা কোনো বড় বিপদ আসে তখনই ভিতরের এই ভাবটি প্রকটিত হয় এবং তিনি তীব্রভাবে ভগবদ্ শরণ নেন[১]। তবে সাধনে বাধা আসা, ভাব ও আচরণাদি খারাপ হয়ে যাওয়া এবং পরমাত্ম-প্রাপ্তিতে বিলম্ব ঘটা—সেদিক দিয়ে দেখলে, তাঁর পতনই হয় বলা যায়। সুতরাং উপরিউক্ত উদাহরণগুলি থেকে সাধকদের এই শিক্ষা নেওয়া উচিত যে, আমাদের সবসময় সাবধান থাকতে হবে, যাতে আমরা কুসঙ্গে না পড়ি, বিষয়ের বশীভূত না হই এবং নিজ সাধন-ভজন ছেড়ে কোনো বিপরীত কাজে না লিপ্ত হয়ে পড়ি।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, কোনো সাধকেরই পতন হয় না এবং তাঁর দুর্গতিও হয় না। ভগবান এখন অর্জুনের জিজ্ঞাসিত সাঁইত্রিশতম শ্লোকের প্রশ্নের উত্তরে যোগভ্রষ্ট সাধকের গতির বিষয়ে বর্ণনা করছেন।

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥ ৪১ ॥

[**যোগভ্রষ্টঃ** (সেই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি) ; **পুণ্যকৃতাম্** (পুণ্যকর্মকারীদের) ; **প্রাপ্য, লোকান্** (প্রাপ্য লোক লাভ করে) ; **শাশ্বতী, সমাঃ** (বহু, বৎসর) ; **উষিত্বা** (বাস করেন) ; **শুচীনাম্** (শুদ্ধ) ; **শ্রীমতাম্, গেহে** (শ্রীসম্পন্নের গৃহে) ; **অভিজায়তে** (জন্ম নেন।)]

এই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যকর্মকারীদের প্রাপ্যলোক লাভ করেন এবং সেখানে বহু বৎসর বাস করে আবার ইহলোকে, শুদ্ধ শ্রীসম্পন্নের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৪১ ॥

ব্যাখ্যা—'প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকান্'—যাঁরা শাস্ত্রীয় বিধি-বিধান সহকারে যজ্ঞাদি কর্ম যথাযথ পালন করেন, তাঁদের স্বর্গলোকের ওপর অধিকার জন্মায়, তাই সেই লোককে (স্বর্গাদি) এখানে 'পুণ্যকর্মকারীদের প্রাপ্য লোক' বলা হয়েছে। তাৎপর্য হল এই যে, ওই (স্বর্গাদি) লোকে পুণ্যকর্মকারী ব্যক্তিগণই যেতে পারেন, পাপকর্মকারীগণ নয়। কিন্তু যে সব সাধকের পুণ্যকর্মের ফলস্বরূপ সুখভোগ করার ইচ্ছা থাকে না, তাঁদের এই স্বর্গালোক বিঘ্নরূপে এবং অনায়াসে জুটে যায়। অর্থাৎ যজ্ঞাদি শুভকর্মকারী ব্যক্তিদের পরিশ্রম করতে হয়, ওই (স্বর্গ) লোক প্রার্থনা করতে হয়, যজ্ঞাদি কর্ম বিধি সহকারে যথাযথভাবে করতে হয়, তবে তাঁরা স্বর্গলোক লাভ করতে সক্ষম হন। সেখানেও তাঁদের ভোগেচ্ছা বজায় থাকে ; কারণ তাঁদের উদ্দেশ্যই হল ভোগ করা। কিন্তু যে ব্যক্তি কোনো কারণবশতঃ অন্তঃকালে সাধন থেকে বিচ্যুত হয়েছেন, তাঁকে স্বর্গলোকের জন্য পরিশ্রম করতেও হয় না, আকাঙ্ক্ষা করতেও হয় না বা তাঁর যজ্ঞাদি শুভ-কর্ম করারও প্রয়োজন হয় না। তবুও তাঁর স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। সেখানে থাকলেও তাঁর ভোগে অরুচি জন্মায়, কারণ তাঁর ভোগবাসনার উদ্দেশ্য থাকে না। তাঁরা শুধুমাত্র

[১]বিধি বস সুজন কুসঙ্গত পরহীঁ। ফনি মনি সম নিজ গুণ অনুসরহীঁ॥ (শ্রীরামচরিতমানস ১।৩।৫)

জাগতিক সূক্ষ্ম বাসনার জন্য ওই স্বর্গলোকে যান। কিন্তু তাঁর এই বাসনা বাসনাভোগী পুরুষের বাসনার মতো হয় না।

যিনি কেবল ভোগবাসনার জন্য স্বর্গে যান, তিনি যেমন ভোগে লীন হন, যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি তেমন ভোগবাসনায় লীন হন না। কারণ ভোগের আকাঙ্ক্ষাযুক্ত ব্যক্তি ভোগবুদ্ধিতেই ভোগকে স্বীকার করেন এবং যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির ভোগ প্রাপ্ত হয় বিঘ্নরূপে।

'উষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ'—স্বর্গাদি উচ্চলোকে যজ্ঞ ইত্যাদি শুভ-কর্মকারীগণও গমন করেন (ভোগ করার উদ্দেশ্যে) এবং যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিগণও গমন করেন। যাঁরা ভোগ করার উদ্দেশ্যে যান, তাঁদের পুণ্য ক্ষয় হতে থাকে এবং পুণ্য ক্ষয় হলে তাঁদের পুনরায় ইহলোকে জন্ম নিতে হয়। তাই তাঁরা কিছু সময়ের জন্যই সেখানে থাকতে পারেন। কিন্তু যাঁর উদ্দেশ্য ভোগ করা নয়, বরং পরমাত্মপ্রাপ্তি করাই উদ্দেশ্য, সেই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি কোনো সূক্ষ্ম বাসনার জন্য যদি স্বর্গে যান, তবে তাঁর সাধন-সম্পদের কোনো ক্ষীণতা হয় না। তাই তিনি সেখানে বহুকাল থাকতে পারেন অর্থাৎ তাঁর সেখানে থাকার কোনো তথাকথিত সময় সীমা থাকে না।

যিনি ভোগ করার উদ্দেশ্যে উচ্চলোকে গমন করেন, তাঁর সেই লোকে গমন হয় কর্মজনিত কারণে। কিন্তু যোগভ্রষ্ট সাধক উচ্চলোকে কর্মের জন্য গমন করেন না, তা হয় যোগের প্রভাবে, তাঁর সাধন সম্পদের প্রভাবে এবং তাঁর সৎ-উদ্দেশ্যের প্রভাবে।

স্বর্গাদি সুখভোগের উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি ওই লোকে গমন করেন, তাঁর সেখানে থাকারও স্বাধীনতা থাকে না এবং যাওয়ারও স্বাধীনতা থাকে না। তিনি ভোগ করার জন্যই যজ্ঞাদি কর্ম করেছেন, সেই শুভকর্মের ফল যতক্ষণ শেষ না হয়, ততক্ষণ তিনি সেই স্থান থেকে নীচে আসতে পারেন না আবার শুভকর্মের ফল শেষ হলে তিনি সেখানে থাকতেও পারেন না। কিন্তু যে ব্যক্তি পরমাত্মার প্রাপ্তির জন্যই সাধন করেন এবং শুধুমাত্র অন্তিমকালে যোগ হতে বিচ্যুত হওয়ায় স্বর্গে যান, তাঁর বাসনার তারতম্য অনুযায়ী সেখানে অবস্থানের সময় কম-বেশি হতে পারে, কিন্তু তিনি সেই ভোগে আবদ্ধ হন না। কারণ যোগ-জিজ্ঞাসু ব্যক্তিও যখন শব্দব্রহ্ম অতিক্রম করেন (৬।৪৪), তখন যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি সেখানে আবদ্ধ হবেন কীভাবে ?

'শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে'—স্বর্গলোকের ভোগ বাসনায় যখন অরুচি আসে, তখন সেই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি আবার ইহলোকে ফিরে আসেন এবং শুদ্ধ শ্রীসম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে জন্ম নেন। তাঁর ফিরে আসার কারণ কী ? তাঁর ফিরে আসার কারণ প্রকৃতপক্ষে ভগবানই জানেন ; কিন্তু গীতার আলোচনাতে মনে হয় যে, সেই ব্যক্তি সাধন করার জন্যই পুনরায় আসেন। তিনি সাধন ত্যাগ করতে চাননি, কিন্তু অন্তিমকালে সাধন হতে বিচ্যুত হয়েছিলেন। তাই সেই সাধনার যে মহৎ উদ্দেশ্য তাঁর চিত্তে অঙ্কিত থাকে, তা স্বর্গলোকেও তাঁকে অর্থাৎ সেই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিকে অজ্ঞাতভাবে পুনরায় সাধন-ভজন করার নিমিত্ত প্রেরণা দিতে থাকে, আকর্ষিত করতে থাকে। এতে তাঁর মনে পুনর্বার সাধন-ভজনের আগ্রহ জন্মায়। মনে কেন এরূপ হয়—তা তিনি নিজেও বুঝতে পারেন না। সদাচারী শ্রীসম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে ভোগে নিমগ্ন হলেও পূর্বজন্মের অভ্যাস তাঁকে যখন জোর করে যোগের দিকে নিয়ে যায় (৬।৪৪), তখন এই সাধন তাঁকে স্বর্গলোকে সাধনবিহীন অবস্থায় শান্তিতে থাকতে দেবে কী করে ? তাই ভগবান তাঁকে সাধন করার সুযোগ দেবার জন্যই শুদ্ধ সদাচারী শ্রীসম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে জন্ম দিয়ে পাঠান।

যাঁর অর্থ-সম্পদ শুদ্ধ উপার্জন দ্বারা সংগৃহীত, যিনি কখনো পরের ধন নেন না, যাঁর আচরণ ও ভাব শুদ্ধ, যাঁর হৃদয়ে ভোগ এবং পদার্থের গুরুত্ব বা মমত্ববোধ নেই, যিনি সমস্ত পদার্থ, ঘর, পরিবার ইত্যাদিকে সাধন-সামগ্রী বলে মনে করেন, যিনি ভোগ বুদ্ধির দ্বারা কারো ওপর নিজের ব্যক্তিগত আধিপত্য দেখান না, তাঁকেই বলা হয় **'শুদ্ধ শ্রীমান্'** ব্যক্তি। যে অর্থ এবং ভোগাদিতে নিজ অধিকার কায়েম করে, নিজেকেই সমস্ত ধন-সম্পত্তির মালিক বলে মনে করে অথচ নিজে সেগুলির দাস হয়ে থাকে, তাকে শুদ্ধ শ্রীমান্ বলা যায় না।

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকটিতে ভগবান অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে যোগভ্রষ্টের কী গতি হয় তাই জানিয়েছেন। এবার পরবর্তী শ্লোকে 'অথবা' শব্দটি দ্বারা নিজে থেকেই অন্য যোগভ্রষ্টদের কথা জানাচ্ছেন।

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্॥ ৪২ ॥

[**অথবা** (অথবা) ; **ধীমতাম্** (জ্ঞানবান) ; **যোগিনাম্, কুলে, এব** (যোগীকুলে) ; **ভবতি** (জন্মগ্রহণ করেন) ; **যৎ, ঈদৃশম্, এতৎ, জন্ম** (এইরূপ যে জন্ম) ; **লোকে** (এই জগতে) ; **হি** (নিঃসন্দেহে) ; **দুর্লভতরম্** (তা খুবই দুর্লভ।)]

অথবা (বৈরাগ্যবান) যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি জ্ঞানবান যোগীকুলে জন্মগ্রহণ করেন। এইরূপ যে জন্ম, এই জগতে তা খুবই দুর্লভ ॥ ৪২ ॥

ব্যাখ্যা—[সাধক দুই শ্রেণীর হয়—বাসনাযুক্ত এবং বাসনারহিত। যাঁর সাধন করতে ভালো লাগে, যাঁর সাধনে মন থাকে এবং যিনি পরমাত্মপ্রাপ্তিকেই উদ্দেশ্য করে সাধনে ব্যাপৃত হন, কিন্তু ভোগের বাসনা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত না হওয়ায় অন্তিমকালে সাধনে বিচলিত হয়ে যোগভ্রষ্ট হন তিনি স্বর্গলোকে বহু বছর যাপন করে শুদ্ধ শ্রীসম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। (এই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির কথাই আগের শ্লোকে বলা হয়েছে)। অপর সাধক, যাঁর চিত্তে বাসনার পরিবর্তে তীব্র বৈরাগ্য থাকে এবং পরমাত্মাকে উদ্দেশ্য রেখে তীব্রভাবে সাধন-ভজন করেন অথচ এখনও পূর্ণত্ব প্রাপ্তি হয়নি, সেই সাধক যদি কোনো কারণবশতঃ যোগভ্রষ্ট হন, তবে তাঁকে স্বর্গাদি লোকে যেতে হয় না, তিনি সরাসরি যোগীকুলেই জন্মগ্রহণ করেন (সেই যোগভ্রষ্টের কথাই এই শ্লোকে বলা হয়েছে)।]

'অথবা'—তুমি যে যোগভ্রষ্টের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলে, তা আমি জানিয়েছি। কিন্তু যিনি সংসারে বিরাগী হয়ে, সংসার থেকে সম্পূর্ণভাবে বিমুখ হয়ে সাধন-ভজনে ব্যাপৃত হয়েছেন, তাঁর যদি কোনো কারণে, কোনো পরিস্থিতিতে হঠাৎ মৃত্যু হয় এবং অন্তিমকালে মনোবৃত্তি যদি সাধনায় না থাকে, তবে তিনিও যোগভ্রষ্ট হন। এরূপ যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিদের গতির কথাই আমি এখানে বলছি।

'যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্'—যে ব্যক্তি পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত করেছেন, যাঁর বুদ্ধি পরমাত্মতত্ত্বে স্থির হয়েছে, এরূপ তত্ত্বজ্ঞ জীবন্মুক্ত ধীমান যোগীদের কুলে এই বৈরাগ্যবান যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন।

'কুলে'—বলার অর্থ হল এই যে, তাঁর জন্ম সাক্ষাৎ জীবন্মুক্ত যোগী মহাপুরুষের কুলেই হয়। কারণ শ্রুতি বলেছেন যে ওই ব্রহ্মজ্ঞানীদের কুলে কেউই ব্রহ্মজ্ঞানবর্জিত হন না অর্থাৎ সকলেই ব্রহ্মজ্ঞানী হন—**'নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি'** (মুণ্ডকোপনিষদ্ ৩।২।৯)।

'এতদ্ধি দুর্লভতরং[১] লোকে জন্ম যদীদৃশম্'—তাঁর যোগীদের কুলে জন্মলাভ করা ইহলোকে অত্যন্ত দুর্লভ। অর্থাৎ শুদ্ধ সাত্ত্বিক নৃপতিগৃহে, ধনবানের গৃহে এবং বিখ্যাত গুণীদের গৃহে জন্মলাভ করাও দুর্লভ এবং তা পুণ্যের ফল বলে মনে করা হয়। তাছাড়া তত্ত্বজ্ঞ জীবন্মুক্ত যোগী মহাপুরুষদের কুলে জন্মগ্রহণ করা দুর্লভতর—অত্যন্তই দুর্লভ ! কারণ ওই যোগীদেরকুলে, গৃহে স্বাভাবিকভাবে পারমার্থিক পরিমণ্ডল থাকে। সেইসব স্থানে সাংসারিক ভোগাদির চর্চা হয়-ই না। সুতরাং ওই পরিমণ্ডলে, স্থানে, তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষের সুসঙ্গে, সুশিক্ষায় ওই ব্যক্তির সাধনে তৎপর হওয়ায় অত্যন্ত সহজ হয় এবং সে শিশুকাল থেকেই সাধনে ব্যাপৃত হয়। সেইজন্য এরূপ যোগীকুলে জন্মগ্রহণ করা দুর্লভতর বলা হয়েছে।

বিশেষ কথা

এখানে **'এতৎ'** এবং **'ঈদৃশম্'**—এই দু'টি পদ ব্যবহৃত হয়েছে। **'এতৎ'** পদ দ্বারা তত্ত্বজ্ঞ যোগিকুলে জন্মগ্রহণকারী যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিদের কথা বুঝতে হবে (এই শ্লোকে যার বর্ণনা করা হয়েছে) এবং **ঈদৃশম্** পদ দ্বারা সেসকল সাধককে লক্ষ্য করা হয়েছে যাঁরা তত্ত্বজ্ঞ যোগী

[১]এখানে 'দুর্লভতর' শব্দে 'তরপ্' প্রত্যয় ব্যবহারের তাৎপর্য হল এই যে, শ্রীসম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণকারী এবং যোগীকুলে জন্মগ্রহণকারী—এই দুইপ্রকার যোগভ্রষ্টকারীদের মধ্যে যোগীকুলে জন্মগ্রহণকারীর জন্ম অত্যন্ত দুর্লভ।

মহাপুরুষগণের সঙ্গ লাভ করেছেন। জগতে দু'প্রকারের প্রজা বা মনুষ্য আছে বলে মনে করা হয়—বিন্দুজ এবং নাদজ। যারা মাতাপিতার রজবীর্যে জন্মায় তাদের বলা হয় 'বিন্দুজ প্রজা' ; আর যাঁরা মহাপুরুষের নাদ হতে অর্থাৎ শব্দ হতে, উপদেশ হতে পারমার্থিক পথে যুক্ত হন তাঁদের বলা হয় 'নাদজ প্রজা'। এখানে যোগীকুলে জন্মগ্রহণকারী যোগভ্রষ্ট হল 'বিন্দুজ' এবং তত্ত্বজ্ঞ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদের সঙ্গপ্রাপ্ত সাধক হল 'নাদজ'। এই দু'প্রকার সাধকেরই এরূপ জন্ম ও সঙ্গ পাওয়া অত্যন্ত দুর্লভ।

শাস্ত্রাদিতে মনুষ্যজন্মকে দুর্লভ বলা হয়েছে ; কিন্তু মনুষ্যজন্মে মহাপুরুষদের সঙ্গলাভ দুর্লভতর[১]। দেবর্ষি নারদ তাঁর ভক্তিসূত্রে বলেছেন **'মহৎসঙ্গস্তু দুর্লভোঽগম্যোঽমোঘশ্চ'** অর্থাৎ মহাপুরুষদের সঙ্গ দুর্লভ, অগম্য এবং অমোঘ। কারণ একে তো তাঁদের সঙ্গলাভ করাই কঠিন আর ভগবদ্ কৃপায় এরূপ সঙ্গ যদি পাওয়া যায়ও[২] তাহলেও মহাপুরুষকে চেনা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু তাঁর সঙ্গ যদি কোনো মতে পাওয়া সম্ভব হয়, তবে তা কখনো নিষ্ফল হয় না। তাৎপর্য হল এই যে, মহাপুরুষদের সঙ্গ প্রাপ্তির দৃষ্টিতেই উপরিউক্ত উভয় সাধকদের জন্মকে 'দুর্লভতর' বলা হয়েছে।

*** *** ***

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে ভগবান বৈরাগ্যবান যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিদের তত্ত্বজ্ঞ যোগীকুলে জন্ম হবার কথা বলেছিলেন। এবার তিনি সেখানে জন্ম হলে কী হয়—পরবর্তী শ্লোকে তাই জানাচ্ছেন।

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন॥ ৪৩ ॥

[**কুরুনন্দন** (হে কুরুনন্দন !) ; **তত্র, তম্** (সেখানে তাঁর) ; **পৌর্বদেহিকম্** (পূর্বজন্মের) ; **বুদ্ধিসংযোগম্** (সাধন সামগ্রী) ; **লভতে** (প্রাপ্তি হয়) ; **চ, ততঃ** (তার দ্বারা) ; **সংসিদ্ধৌ** (সাধনার সিদ্ধির জন্য) ; **ভূয়ঃ, যততে** (তিনি পুনরায় চেষ্টা করেন।)]

হে কুরুনন্দন ! সেখানে সেই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি তাঁর পূর্বজন্মের সুকৃতি সহজেই প্রাপ্ত হন। তার দ্বারা তিনি সাধনার সিদ্ধির জন্য পুনরায় বিশেষভাবে চেষ্টা করেন ॥ ৪৩ ॥

ব্যাখ্যা—**'তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্'**—তত্ত্বজ্ঞ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদের কুলে জন্মগ্রহণ করলে সেই বৈরাগ্যবান সাধকের স্থিতি কিরূপ হয় ? সেই কথা জানাবার জন্য এখানে 'তত্র' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

'পৌর্বদেহিকম্' এবং **'বুদ্ধিসংযোগম্'**—পদগুলির তাৎপর্য হল এই যে, সংসারে অনাসক্ত ওই সাধকের স্বর্গাদি লোকে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না, তাঁর সরাসরি যোগীকুলেই জন্ম হয়। সেখানে তিনি সহজেই পূর্বজন্মের সাধনসামগ্রী লাভ করেন। যেমন, কেউ রাস্তায় চলতে চলতে নিদ্রা এলে রাস্তার ধারেই কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেয়। যখন পুনর্বার চলা শুরু করে তখন আগের রাস্তাটি তার চলা হয়েই আছে। অথবা কেউ ব্যাকরণের প্রকরণগুলি পাঠ করেছিল এবং কোনো কারণবশতঃ তার পড়া বন্ধ হয়ে গেছে—সে যখন পুনরায় পড়া শুরু করে তখন আগেকার পড়া প্রকরণগুলি তার অতি সহজেই কণ্ঠস্থ হয়ে যায়। তেমনই পূর্বজন্মে সাধক যতটা সাধনা করেছিলেন, যাতে তাঁর উত্তম সংস্কার লাভ হয়েছে, তা সবই এই জন্মে তাঁর মধ্যে জাগ্রত হয়।

'যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ'—প্রথমতঃ এখানে তাঁর পূর্বজন্মকৃত বুদ্ধিসংযোগ প্রাপ্তি হয় এবং এখানকার সঙ্গ ভালো হওয়ায় সাধন-ভজনের উত্তম কথা এবং সাধনের যুক্তি প্রাপ্তি হয়। নতুন নতুন যুক্তি যতই তিনি লাভ করতে থাকেন, তাঁর সাধনের উৎসাহও ততই বৃদ্ধি পেতে

[১]দুর্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ। তত্রাপি দুর্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২।২৯)

[২]জব দ্রবৈ দীনদয়ালু রাঘব সাধুসঙ্গতি পাইয়ে। (বিনয়পত্রিকা ১৩৬।১০)

থাকে। এইভাবে বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে তিনি সিদ্ধি লাভের জন্য সচেষ্ট হন।

এই প্রকরণের অর্থ যদি এরূপ নেওয়া হয় যে, এই দু'প্রকারের যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিই প্রথমে স্বর্গালোকে গমন করেন—এর মধ্যে যাঁর ভোগের বাসনা থাকে তিনি শুদ্ধ শ্রীসম্পন্নের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন এবং যাঁর ভোগবাসনা থাকে না, তিনি যোগীকুলে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু প্রকরণের পদটির ওপর বিচার করলে এই কথা যথাযথ মনে হয় না। কারণ এরূপ অর্থ গ্রহণ করলে 'যোগীকুলে জন্মগ্রহণকারীর পৌর্বদেহিক বুদ্ধিসংযোগ অর্থাৎ পূর্বজন্মকৃত সাধনসামগ্রী প্রাপ্তি হয়'—এ কথাটি ঠিক হয় না। এখানে **'পৌর্বদেহিক'** বলা তখনি ঠিক হয় যখন মাঝখানে অন্য শরীরের ব্যবধান থাকবে না। যদি মনে করা হয় যে স্বর্গলোকে গিয়ে তারপর তিনি যোগীকুলে জন্ম নেন, তাহলে তাকে **'পূর্বাভ্যাস'** বলা যায় (যে কথা শ্রীসম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে জন্ম নেওয়া যোগভ্রষ্ট সাধকের জন্য আগের শ্লোকে বলা হয়েছে), **'পৌর্বদেহিক'** বলা যায় না। কারণ এতে স্বর্গাদির ব্যবধান থাকে এবং স্বর্গাদি লোকের দেহকে পৌর্বদেহিক বুদ্ধিসংযোগ বলা যায় না। কারণ স্বর্গাদি লোকে ভোগ-সামগ্রীর বাহুল্য থাকায়, সেখানে সাধন-ভজনের প্রশ্নই আসে না। অতএব দুই যোগভ্রষ্টই স্বর্গাদি ঘুরে আসেন—এ কথা প্রকরণ অনুসারে ঠিক খাটে না।

দ্বিতীয়তঃ যাঁর ভোগের বাসনা থাকে, তাঁর পক্ষে স্বর্গে যাওয়া ঠিক হলেও যাঁর ভোগবাসনা থাকে না এবং অন্তিমকালে কোনো কারণে সাধনায় বিচলিত হন—এরূপ সাধককে স্বর্গাদিতে প্রেরণ করা তাঁকে দণ্ড দেওয়ার সামিল—যেটি সর্বতোভাবে অনুচিত।

পরিশিষ্ট-ভাব—পারমার্থিক উন্নতি হল **'স্ব'** এবং জাগতিক উন্নতি হল **'পর'**-এর। তাই জাগতিক পুঁজি নষ্ট হলেও, পারমার্থিক পুঁজি (সাধন) যোগভ্রষ্ট হওয়া সত্ত্বেও নষ্ট হয় না। পারমার্থিক উন্নতি অবরুদ্ধ হতে পারে, কিন্তু নষ্ট হয় না এবং উপযুক্ত সময়ে তা প্রকটিত হয়।

পূর্বজন্মকৃত সাধনের যে সংস্কার বুদ্ধিতে থাকে, তাকেই এখানে বলা হয়েছে **'বুদ্ধিসংযোগ'**।

***

সম্বন্ধ—এর আগের শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে তত্ত্বজ্ঞ যোগীপুরুষের গৃহে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তি পূর্বজন্মের কৃত বুদ্ধিসংযোগ প্রাপ্ত হন এবং তৎপরতার সঙ্গে সাধন-ভজনে ব্যাপৃত হন। শুদ্ধ সদাচারী ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণকারী যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির কী গতি হয়—এবার পরবর্তী শ্লোকে তাই জানাচ্ছেন।

পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে॥ ৪৪ ॥

[**সঃ** (সেই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি) ; **অবশঃ, অপি** (পরবশ হলেও) ; **তেন, পূর্বাভ্যাসেন** (পূর্বজন্মকৃত অভ্যাসের ফলে) ; **এব, হ্রিয়তে** (পরমাত্মার প্রতিই আকৃষ্ট হন) ; **হি** (কারণ) ; **যোগস্য** (যোগ) ; **জিজ্ঞাসুঃ, অপি** (জিজ্ঞাসুও) ; **শব্দব্রহ্ম** (বেদোক্ত সকাম কর্ম) ; **অতিবর্ততে** (অতিক্রম করে যান।)]

সেই (শ্রীসম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণকারী) যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি ভোগের পরবশ হলেও পূর্বজন্মের অভ্যাসের (সাধনের) ফলে পরমাত্মার প্রতিই আকৃষ্ট হন ; কারণ যোগ (সমত্ব) জিজ্ঞাসু ব্যক্তিও বেদোক্ত সকাম কর্মের ফল অতিক্রম করে যান ॥ ৪৪ ॥

ব্যাখ্যা—**'পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ'**—যোগীকুলে জন্মগ্রহণকারী যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি সাধন-ভজনে যে সুবিধা প্রাপ্ত হন, যে পরিবেশ-পরিমণ্ডল লাভ করেন, যেরূপ সঙ্গ পান, যেমন শিক্ষালাভ করেন, তেমন সাধন-ভজনের উদ্দীপক পরিবেশ শ্রীসম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে পাওয়া যায় না। কিন্তু স্বর্গলোকে যাওয়ার আগে মনুষ্য-জন্মে যে যোগসাধন করা হয়েছে, সাংসারিক ভোগাদি ত্যাগ করা হয়েছে, তাঁর অন্তঃকরণে যেরূপ শুদ্ধ সংস্কারের ছাপ পড়েছে, সেই জন্মে করা অভ্যাসের ফলে ভোগে আসক্তি থাকলেও তিনি জোরপূর্বক ভগবানে

আকৃষ্ট হন।

'অবশোঽপি' বলার তাৎপর্য হল এই যে, তিনি সদাচারী ব্যক্তির গৃহে জন্ম নেওয়ার আগে বহু বছর স্বর্গলোকে বাস করেছেন। সেখানে ভোগের বাহুল্য ছিল এবং এখানে (সাধারণ গৃহের তুলনায়) শ্রীসম্পন্ন ব্যক্তির গৃহেও ভোগের বাহুল্য আছে। তাঁর মনে ভোগের যে আসক্তি ছিল তা এখনও সম্পূর্ণভাবে মেটেনি, তাই এখানে তাঁর মন-ইন্দ্রিয়াদি ভোগে আসক্ত হলেও পূর্বেকার অভ্যাসের প্রাবল্যে তিনি ভগবানে আকর্ষিত হতে বাধ্য হন। কারণ ভোগবাসনা যতই প্রবল হোক, আসলে তা 'অসৎ'-ই। জীবের সৎ-স্বরূপের সঙ্গে তার কোনোই সম্পর্ক নেই। ধ্যানযোগ ইত্যাদির যা সাধন করা হোক, সাধনের যত সংস্কার থাকে, তা যতই সাধারণ হোক না কেন, তা হল 'সৎ'। এগুলি সবই জীবের সৎ স্বরূপের অনুকূল। সেইজন্য এই সংস্কার ভোগে আসক্ত যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির ভেতর থেকে তাকে আকর্ষণ করে ভগবানের প্রতি পরিচালিত করে।

'জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে'—এই প্রকরণে অর্জুন প্রশ্ন করেছিলেন যে, সাধনে ব্যাপৃত অথচ যত্নে শিথিল সাধক অন্তিমকালে যদি যোগ থেকে বিচলিত হন তবে তিনি যোগের সিদ্ধিলাভ না করে কোন্ গতি প্রাপ্ত হন অর্থাৎ তাঁর পতন তো হয় না ? এর উত্তরে ভগবান ইহলোকে এবং পরলোকে যোগভ্রষ্টের যে পতন হয় না, এই শ্লোকের পূর্বার্ধে সে কথা জানিয়েছেন। এখন এই শ্লোকের শেষার্ধে যোগসাধনায় ব্যাপৃত যোগীর প্রকৃত মহিমা জানাতে গিয়ে যোগজিজ্ঞাসু ব্যক্তির মহিমা ব্যক্ত করেছেন।

যোগজিজ্ঞাসু ব্যক্তিও যখন বেদোক্ত সকাম কর্ম এবং তার ফলকে অতিক্রম করেন অর্থাৎ তার ঊর্ধ্বে চলে যান, তখন যোগভ্রষ্টদের আর কথা কি ? অর্থাৎ তাঁদের পতনের কোনো সম্ভাবনাই নেই। যিনি যোগে প্রবৃত্ত হয়েছেন, তিনি তো অবশ্যই উদ্ধার লাভ করবেন।

এখানে **'জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য'** পদের অর্থ হল যে ব্যক্তি এখনও যোগভ্রষ্টও হয়নি এবং যোগে প্রবৃত্তও হয়নি ; কিন্তু যোগে (সমত্বতে) গুরুত্ব দেয় এবং তা প্রাপ্ত করতে চায়—এরূপ যোগ-জিজ্ঞাসুও শব্দব্রহ্ম[1] অর্থাৎ বেদাদির সকাম কর্মের ফল অতিক্রম করেন।

যোগ-জিজ্ঞাসু তাঁকেই বলা হয়, যিনি ভোগ এবং সম্পদ-সংগ্রহকে সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় গুরুত্ব দেন না, বরং সেগুলি উপেক্ষা করে যোগকেই বেশি প্রাধান্য দেন। তাঁর ভোগ এবং সংগ্রহের আকাঙ্ক্ষা দূর হয়নি বটে, কিন্তু সিদ্ধান্তরূপে তিনি যোগকে গুরুত্ব দেন। সেইজন্য তিনি যোগারূঢ় না হলেও তাঁকে যোগজিজ্ঞাসু বলা হয়, যিনি যোগ প্রাপ্ত করতে উৎসুক। এই জিজ্ঞাসামাত্রেরই এতো মাহাত্ম্য যে এর দ্বারাই তিনি বেদোক্ত সকাম কর্ম এবং তার ফল থেকে ঊর্ধ্বাবস্থা লাভ করেন। এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, যে ব্যক্তি ইহলোকের ভোগ এবং সংগ্রহের আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণরূপে মেটাতে সক্ষম হয়নি এবং তৎপরতার সঙ্গে যোগে ব্যাপৃত হয়নি, তাঁরও যদি এতো মহত্ত্ব থাকে, তবে যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিদের বিষয়ে আর কথা কি ? এই কথাই ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ের চল্লিশতম শ্লোকে বলেছেন যে যোগের (সমত্বের) আরম্ভ ও নষ্ট হয় না এবং তার অল্পতম অনুষ্ঠানও মহৎ ভয় হতে রক্ষা করে অর্থাৎ কল্যাণকারী হয়। তবে যিনি যোগে প্রবৃত্ত হয়েছেন, তাঁর পতন হবে কী করে ? তাঁর যে কল্যাণ হবেই, এতে কোনো সন্দেহই নেই।

বিশেষ কথা

১) বহু বিশিষ্টতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে বলা হয় 'যোগভ্রষ্ট'। কীরূপ বিশিষ্ট্য ? তা হল শত-সহস্র মানুষের মধ্যে কোনো একজন হয়ত সিদ্ধিপ্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করেন (গীতা ৭।৩) এবং এরূপ সিদ্ধির জন্য যিনি চেষ্টা করেন তাঁকেই বলা হয় যোগভ্রষ্ট।

যোগাভ্যাসকারী ব্যক্তির অত্যন্ত মহিমা রয়েছে। যোগজিজ্ঞাসু ব্যক্তিও শব্দব্রহ্ম অতিক্রম করেন অর্থাৎ ঊর্ধ্ব হতে ঊর্ধ্বতর ব্রহ্মলোকাদিতেও তাঁর অনীহা আসে। কারণ ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত লোকই পুনরাবর্তনকারী, কিন্তু যোগী পুনরাগমন চান না। যোগজিজ্ঞাসু হওয়ারই যখন এতো মহিমা, তখন যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির মহিমা আর কি বলার আছে ! তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যোগপ্রাপ্তির, তবেই তিনি যোগভ্রষ্ট হয়েছেন।

এখানে যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির যে মাহাত্ম্য তা হল যোগের,

[1]বেদাদিতে যে সাধনসামগ্রী থাকে, তাকে এই 'শব্দব্রহ্মের' অন্তর্গত বলে ধরা উচিত নয়।

যোগ থেকে ভ্রষ্ট হওয়ার নয়। যেমন কোনো ব্যক্তি 'আচার্য' হওয়ার পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হলেন, তাহলে তিনি কি 'শাস্ত্রী' বা 'মধ্যমা' পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের থেকে নীচে বলে গণ্য হবেন ? তা হবেন না। তেমনই যে ব্যক্তি যোগভ্রষ্ট হয়েছেন, সকামভাবে যাঁরা বড় বড় যজ্ঞ-দান-তপস্যা ইত্যাদি করেন, তাঁদের থেকে তিনি নীচে বলে গণ্য হবেন না, বরং ততধিক শ্রেষ্ঠ বলেই বিবেচিত হবেন। কারণ তাঁর উদ্দেশ্য হল সমতা বা যোগ। বড় বড় যজ্ঞ-দান-তপস্যা ইত্যাদি যাঁরা করেন তাঁদের সাধারণ লোক বড় মনে করলেও, প্রকৃতপক্ষে বড় তিনিই, যাঁর উদ্দেশ্য হল সমতা। সমতার উদ্দেশ্য যাঁর থাকে তিনি শব্দব্রহ্মকেও অতিক্রম করে যান।

এই যোগভ্রষ্টের প্রসঙ্গে সাধকদের উৎসাহিত হবার মতো একটি বড় বিচিত্র কথা জানা যায়। সাধক যদি 'আমাকে পরমাত্মা (যোগ) প্রাপ্তি করতেই হবে'—বলে দৃঢ়নিশ্চয় হন, তাহলেই তিনি শব্দব্রহ্ম অতিক্রম করে যাবেন।

২) সাধক যদি প্রারম্ভে 'সমতা' প্রাপ্ত করতে সক্ষম না হন, তাহলেও তাঁর ইচ্ছা এবং উদ্দেশ্য থাকা উচিত যোগপ্রাপ্তি করারই। শ্রীতুলসীদাস গোস্বামী বলেছেন—

মতি অতি নীচ ঊঁচি রুচি আছী।
চহিয় অমিয় জগ জুরই ন ছাছী॥
(শ্রীরামচরিতমানস ১।৮।৪)

অর্থাৎ সাধক যেমনই হোন না কেন, তাঁর রুচি বা উদ্দেশ্য সর্বদা উচ্চ থাকা উচিত। সাধকের ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য পূর্তির আগ্রহ যত প্রখর এবং ঐকান্তিক হবে, তত শীঘ্র তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। ভগবানের স্বভাব হচ্ছে যে, তিনি দেখেন না সাধক কী করছে, তিনি শুধু দেখেন সাধক কী চায়—

..................................।
রীঝত রাম জানি জন জী কী ॥
রহতি ন প্রভু চিত চূক কিয়েকী।
করত সুরতি সয় বার হিয়ে কী॥
(শ্রীরামচরিতমানস ১।২৯।২-৩)

কোনো এক প্রজ্ঞাচক্ষু সাধু প্রত্যহ মন্দিরে দেবদর্শনে যেতেন। একদিন তিনি মন্দিরে গেলে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেন 'আপনি এখানে কেন আসেন ?' সাধু উত্তর দিলেন 'দর্শন করতে আসি'। সেই ব্যক্তি বলেন, 'আপনি তো (অন্ধ) দেখতে পান না'। সাধু উত্তর দিলেন আমি দেখতে পাই না বলে ভগবানও কি দেখতে পান না ? আমি তাঁকে দেখতে না পেলেও তিনি তো আমাকে দেখেন ! তাতেই আমার কাজ হবে।

এইরূপ আমরা যোগ প্রাপ্ত করতে পারি বা না পারি, তবুও আমাদের রুচি বা উদ্দেশ্য সমতার জন্য থাকা উচিত যা ভগবান দেখতে পান। তাহলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

পরিশিষ্ট-ভাব—জাগতিক পুণ্য তো পাপের তুলনায় হয় (দ্বন্দ্বমূলক), কিন্তু ভগবানের সম্পর্ক (সৎসঙ্গ, ভজন ইত্যাদি) থেকে যে পুণ্য (যোগ্যতা, সামর্থ্য), তা খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়। তাই জাগতিক পুণ্য মানুষকে ভগবানে আকৃষ্ট করে না, কিন্তু ভগবদ্ সম্বন্ধীয় পুণ্য মানুষকে ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট করে। এই পুণ্য ফল প্রদানের পর বিনষ্ট হয় না (গীতা ২।৪০)। জাগতিক কামনা ত্যাগ করা এবং ভগবানে আকৃষ্ট হওয়া— উভয়ই ভগবৎ সম্বন্ধীয় পুণ্য।

'পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব' পদটির অর্থ হল এই যে বর্তমান জন্মে সৎসঙ্গ, সৎচর্চা ইত্যাদি না হলেও শুধু পূর্বাভ্যাসের কারণেই তিনি পরমাত্মাতে আকৃষ্ট হন। এই পূর্বাভ্যাসে ক্রিয়া (প্রবৃত্তি) নেই, শুধু গতি আছে[১]। **'জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে'** কথাটিতেও ক্রিয়াসম্পন্ন অভ্যাস না থেকে গতিসম্পন্ন অভ্যাস আছে। তাৎপর্য হল এই যে এই অভ্যাসে চেষ্টাও নেই, কর্তৃত্বও নেই, শুধু গতি আছে। গতিতে স্বাভাবিক ভাবে পরমাত্মার দিকে আকর্ষণ করার শক্তি থাকে। ক্রিয়াসম্পন্ন অভ্যাস চেষ্টা দ্বারা সাধিত হয় আর গতিসম্পন্ন অভ্যাস স্বাভাবিকভাবেই হয়।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—শ্রীসম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণ করলে যখন সেই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পরমাত্মার দিকে আকর্ষিত হন, তখন তাঁর অবস্থা কী হয় ? পরবর্তী শ্লোকে তাই জানানো হয়েছে।

[১]গতি এবং প্রবৃত্তির পার্থক্য জানতে হলে পঞ্চদশ অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকের পরিশিষ্ট ভাব দেখে নিতে হবে।

প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্॥ ৪৫ ॥

[তু (কিন্তু) ; যোগী (যে যোগী) ; প্রযত্নাৎ (প্রযত্নপূর্বক) ; যতমানঃ (চেষ্টা করেন) ; সংশুদ্ধকিল্বিষঃ (যাঁর পাপ নষ্ট হয়েছে) ; অনেকজন্মসংসিদ্ধ (বহুজন্মের ফলে সিদ্ধ) ; ততঃ (সেই যোগী) ; পরাম্, গতিম্ (পরম্ গতি) ; যাতি (লাভ করেন।)]

যে যোগী অধ্যবসায় সহকারে চেষ্টা করেন, যাঁর পাপ নষ্ট হয়েছে এবং যিনি বহুজন্মের ফলে সিদ্ধ— সেই যোগী পরমগতি লাভ করেন ॥ ৪৫ ॥

ব্যাখ্যা—[বৈরাগ্যবান যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞ জীবন্মুক্ত যোগীকুলে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানে বিশেষ চেষ্টার দ্বারা সহজেই পরমাত্মাকে লাভ করেন। কিন্তু শ্রীসম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে জন্ম নিয়ে যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি কীভাবে পরমাত্মপ্রাপ্ত হন, এই শ্লোকে তারই বর্ণনা করা হয়েছে।]

'তু'—এই পদটির তাৎপর্য হল এই যে, যোগজিজ্ঞাসু ব্যক্তিও যখন বেদোক্ত সকাম কর্মের ফল অতিক্রম করেন, তার ঊর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হন, তখন যে ব্যক্তি যোগের জন্য চেষ্টা করছেন এবং তৎপরতার সঙ্গে যত্নশীল হয়েছেন, তিনি যে বেদের ঊর্ধ্বে আরোহণ করবেন এবং পরমগতি লাভ করবেন, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

'যোগী'—যে ব্যক্তি পরমাত্মতত্ত্ব এবং সমত্ব (যোগ) প্রাপ্ত করতে চান এবং রাগ-দ্বেষ, হর্ষ-শোক ইত্যাদি দ্বন্দ্বে আবদ্ধ হন না, তিনিই যোগী।

'প্রযত্নাদ্ যতমানঃ'—যত্নপূর্বক চেষ্টা করার অর্থ হল যে, সেই যোগীর মধ্যে পরমাত্মার দিকে অগ্রসর হবার যে উৎকণ্ঠা, আগ্রহ, ইচ্ছা ও তৎপরতা থাকে তা দিন দিন বেড়েই চলে। সাধনায় তিনি সদাই জাগরূক থাকেন।

শ্রীসম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণকারী যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পূর্বাভ্যাসের জন্য পরমাত্মার দিকে আকর্ষিত হন এবং বর্তমান সময়ে ভোগাদির সঙ্গে সংযুক্ত থাকায় জগতের দিকে আকর্ষিত হন। যদি তিনি বিশেষ প্রচেষ্টার দ্বারা শৌর্যের সহিত ভোগের পথ পরিহার করেন, তাহলেই তিনি পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করতে সক্ষম হন। কারণ যোগজিজ্ঞাসু ব্যক্তিও যখন শব্দব্রহ্ম অতিক্রম করতে পারেন, তখন এঁদের আর কথা কি ! নিষিদ্ধ কার্যে ব্যাপৃত ব্যক্তি যেমন জীবনে গুরুতর দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগের পর পরমাত্মার সান্নিধ্যে আসে, তেমনই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিও শ্রীসম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণ করে বিশেষ তৎপরতার সঙ্গেই পরমাত্মাতে মগ্ন হন।

'সংশুদ্ধকিল্বিষঃ'—যাঁর অন্তঃকরণের সমস্ত দোষ, সমস্ত পাপ নাশ হয়েছে অর্থাৎ পরমাত্মার প্রতি আগ্রহ জন্মানোয় তাঁর চিত্ত থেকে ভোগ, সংগ্রহ, মান-যশ ইত্যাদির ইচ্ছা সর্বতোভাবে দূর হয়েছে।

সেই ব্যক্তি বিশেষভাবে চেষ্টা করেন, তাঁর এই বিশেষ চেষ্টাতে মনে হয় যে, তাঁর সমস্ত পাপ নাশ হয়েছে।

'অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ'[১]—প্রথমে মনুষ্যজন্মে যোগের জন্য চেষ্টা করাতে শুদ্ধতা লাভ হয়েছিল, পরে অন্তিমকালে যোগে বিচ্যুত হওয়ায় স্বর্গাদি লোকে তিনি গমন করেছেন এবং সেখানে ভোগে অনীহা হয়েছে এবং পুনরায় এখানে শ্রীসম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণ করে পরমাত্মপ্রাপ্তির জন্য তৎপর হয়ে চেষ্টা করার শুদ্ধ সুযোগ পেয়েছেন। এইভাবে তিন জন্মে শুদ্ধ হওয়াকেই 'অনেকজন্মসংসিদ্ধ' বলা হয়[২]।

'ততো যাতি পরাং গতিম্'—সেইজন্য তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ যাঁকে প্রাপ্ত হলে তার থেকে বেশি কোনো লাভ পাবার থাকে না এবং যাতে স্থিত হলে অতি বড় দুঃখও বিচলিত করতে পারে না (গীতা ৬।২২) এরূপ

[১]'অনেকজন্মের' অর্থ হল—'ন একজন্ম ইতি অনেকজন্ম' অর্থাৎ একের অধিক জন্ম। উপরিউক্ত যোগীর অনেক জন্মই হয়েছে। 'সংসিদ্ধ' পদে অতীতকালের 'ক্ত' প্রত্যয় হওয়ায় এর অর্থ হল—এই যোগী অনেক জন্মে শুদ্ধ হয়েছেন।

[২]এরূপ বৈরাগ্যবান যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির আগে মনুষ্যজন্মে সংসারে অনাসক্ত হওয়াতে শুদ্ধি হয়েছে এবং পরে যোগীকুলে জন্মগ্রহণ করে পরমাত্মপ্রাপ্তির জন্য তৎপরতার সঙ্গে চেষ্টা করায় শুদ্ধি হয়েছে। এইভাবে দুই জন্মে শুদ্ধ হওয়াকেই 'অনেক-জন্মসংসিদ্ধ' বলা হয়।

আত্যন্তিক সুখ তিনি প্রাপ্ত হন।

মর্মকথা

প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় মানুষমাত্রই অনেক-জন্ম-সংসিদ্ধ হয়। কারণ মনুষ্যজন্মের আগে যদি তিনি স্বর্গাদিলোকে গিয়ে থাকেন, তবে সেখানে শুভকর্মের ফল ভোগ করায় তাঁর স্বর্গপ্রাপ্তির পুণ্য সমাপ্ত হয়েছে এবং সেই পুণ্য থেকে তিনি শুদ্ধ হয়েছেন। যদি তিনি নরকে গিয়ে থাকেন, তাহলে সেখানে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করায় তাঁর নরকভোগের পাপ ক্ষয় হয়েছে এবং তিনি পাপ থেকে শুদ্ধ হয়েছেন। যদি তিনি চুরাশী লক্ষ জন্ম পরিগ্রহণ করে থাকেন তবে ওই সমস্ত জন্মে অশুভ কর্মের, পাপের ফল ভোগ করায় তাঁর মনুষ্যেতর জন্ম প্রাপ্তির পাপ নাশ হয়ে তিনি শুদ্ধ হয়েছেন[১]। এইভাবে জীব নানা জন্মে পুণ্য এবং পাপ থেকে মুক্ত অর্থাৎ শুদ্ধ হয়েছে। এই শুদ্ধ হওয়াকেই বলা হয় **'সংসিদ্ধ'** হওয়া।

দ্বিতীয়তঃ, মানুষমাত্রেই ঐকান্তিকভাবে চেষ্টা করলে পরমগতি লাভ করতে সক্ষম হয়, নিজ কল্যাণ করতে পারে। কারণ ভগবান এই অন্তিম জন্ম মানুষকে কেবলমাত্র তার নিজ কল্যাণের নিমিত্তই দিয়েছেন। মানুষ যদি নিজের কল্যাণ করার অধিকারী না হোত, তাহলে ভগবান কি তাকে এই মনুষ্যজন্ম দিতেন ? তাই মনুষ্যজন্ম যখন তিনি দিয়েছেন, তখন মুক্তি লাভের পাত্র হিসাবেই দিয়েছেন। তাই মানুষমাত্রেরই নিজ উদ্ধারের জন্য তৎপর হয়ে চেষ্টা করা উচিত।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির ইহলোক বা পরলোকে পতন হয় না ; যোগজিজ্ঞাসুও শব্দব্রহ্ম অতিক্রম করেন—এই যে মাহাত্ম্য ভগবান জানিয়েছেন, সেই মহিমা ভ্রষ্ট হওয়া নিয়ে নয়, প্রকৃতপক্ষে যোগ নিয়ে। সুতরাং পরবর্তী শ্লোকে সেই যোগের মহিমা জানানো হয়েছে।

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্যোগী ভবার্জুন॥ ৪৬ ॥

[তপস্বিভ্যঃ (তপস্বিগণ অপেক্ষা) ; যোগী (যোগী) ; অধিকঃ (শ্রেষ্ঠ) ; জ্ঞানিভ্যঃ, অপি (জ্ঞানীগণের থেকেও) ; অধিকঃ, চ (যোগী শ্রেষ্ঠ এবং) ; কর্মিভ্যঃ (কর্মিগণের থেকেও) ; যোগী, অধিকঃ (যোগী শ্রেষ্ঠ) ; মতঃ (এই-ই আমার মত) ; তস্মাৎ (অতএব) ; অর্জুন (হে অর্জুন !) ; যোগী (যোগী) ; ভব (হও।)]

(সকামভাবসম্পন্ন) তপস্বিগণ অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানীগণের থেকেও যোগী শ্রেষ্ঠ এবং কর্মিগণের থেকেও যোগী শ্রেষ্ঠ—এই-ই আমার মত। অতএব হে অর্জুন ! তুমি যোগী হও ॥ ৪৬ ॥

ব্যাখ্যা—**'তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী'**—ঋদ্ধি-সিদ্ধি ইত্যাদি লাভ করার জন্য যিনি ক্ষুধা-তৃষ্ণা এবং শীতগ্রীষ্মাদি কষ্ট সহ্য করেন, তিনিই তপস্বী। এই সকাম তপস্বীদের থেকে পারমার্থিক রুচিসম্পন্ন, ধ্যেয়মনস্ক যোগী শ্রেষ্ঠ।

'জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ'—শাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বান ব্যক্তিদের এখানে 'জ্ঞানী' বলে বুঝতে হবে। যাঁরা শাস্ত্রের আলোচনা করেন, জ্ঞানযোগ কী ? কর্মযোগ কী ? ভক্তিযোগ কী ? লয়যোগ কী ? ইত্যাদি অনেক কিছু জানেন এবং বলেনও কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য থাকে শুধু সাংসারিক ভোগ এবং ঐশ্বর্য, সেই সকাম শব্দজ্ঞানীদের থেকেও যোগীকে শ্রেষ্ঠ মানা হয়েছে।

'কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী'—ইহলোকে রাজ্যলাভ হয়, ধন-সম্পত্তি, সুখ-আরাম, ভোগ ইত্যাদির প্রাপ্তি হয় এবং মৃত্যুর পর পরলোকে উচ্চলোক প্রাপ্তি হয় এবং যাতে সেই উচ্চলোকের সুখ প্রাপ্তি হয়—এরূপ উদ্দেশ্য রেখে যিনি কর্ম করেন অর্থাৎ সকামভাবে যজ্ঞ, দান, তীর্থাদি ও শাস্ত্রীয় কর্মসকল করেন, সেই কর্মীদের থেকেও যোগী শ্রেষ্ঠ।

যিনি সংসারে বিমুখ হয়ে পরমাত্মার শরণাগত হন

[১]জীব মনুষ্যজন্মেই তার উদ্ধারের জন্য প্রাপ্ত বস্তুর অসদ্ ব্যবহার করে অর্থাৎ পাপ, অন্যায় করে অশুদ্ধ হয়। স্বর্গ-নরক অথবা অন্যান্য জন্মে জীবের কেবল শুদ্ধিকরণই হয়, অশুদ্ধি হয় না।

তিনিই হলেন প্রকৃত যোগী। এরূপ যোগী বড় বড় তপস্বী, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এবং কর্মীর থেকেও ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন। কারণ তপস্বীদের উদ্দেশ্য হল সংসার বা সকামভাব প্রাপ্তি এবং যোগীর উদ্দেশ্য পরমাত্মা লাভ বা নিষ্কামভাব প্রাপ্তি।

তপস্বী, জ্ঞানী ও কর্মী—এই তিনেরই ক্রিয়াধারা পৃথক পৃথক অর্থাৎ তপস্বীদের সহিষ্ণুতার, জ্ঞানীদের শাস্ত্রীয় জ্ঞানের অর্থাৎ বুদ্ধিজাত জ্ঞানের এবং কর্মীদের শাস্ত্রীয় ক্রিয়ার প্রাধান্য থাকে। এই তিনেরই সকামভাব থাকায় এঁরা যোগী পদবাচ্য নন, বরং ভোগী হন। যদি এঁরা তিনজনই নিষ্কামভাবসম্পন্ন যোগী হতেন, তাহলে ভগবান এঁদের সঙ্গে যোগীর তুলনা করতেন না ; এই তিনজনের থেকে যোগীকে শ্রেষ্ঠ বলে জানাতেন না।

'তস্মাৎ যোগী ভবার্জুন'—ভগবান এতক্ষণ যাঁর মহিমা জানালেন ; তার জন্যই অর্জুনকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, 'হে অর্জুন ! তুমি যোগী হও, আসক্তি ও দ্বেষ রহিত হও অর্থাৎ সমস্ত কাজ করেও জলে পদ্মপাতা যেমন জলমুক্ত থাকে তেমনি নির্লিপ্তভাবে থাকো।' এই কথা ভগবান পরবর্তী অষ্টম অধ্যায়েও বলেছেন—**'যোগযুক্তো ভবার্জুন'** (৮।২৭)।

পঞ্চম অধ্যায়ের প্রারম্ভে অর্জুন প্রার্থনা করেছিলেন যে, 'আপনি আমার পক্ষে নিশ্চিতরূপে যেটি শ্রেয় তা বলুন'। সেইজন্য ভগবান সাংখ্যযোগ, কর্মযোগ, ধ্যানযোগের সম্বন্ধে জানিয়েছিলেন। কিন্তু এই শ্লোকটির আগে কোথাও তিনি অর্জুনকে এরকম নির্দেশ দেননি যে, 'তুমি এরূপ হও, এই পথে চলো'। এখন ভগবান এখানে অর্জুনের প্রার্থনার উত্তরে নির্দেশ দিয়েছেন যে, 'তুমি যোগী হও ; কারণ এটিই তোমার পক্ষে নিশ্চিতরূপে শ্রেয়স্কর পথ।'

পরিশিষ্ট-ভাব—ভোগী এবং যোগীদের আলাদা আলাদা বিভাগ। ভোগী কখনো যোগী হন না আর যোগী কখনো ভোগী হন না। যাঁর ভেতরে সকামভাব থাকে, তিনি ভোগী হন আর যাঁর মধ্যে নিষ্কামভাব থাকে, তিনি যোগী হন। তাই সকামভাবসম্পন্ন তপস্বী, জ্ঞানী এবং কর্মীগণের থেকেও নিষ্কামভাবসম্পন্ন যোগীই শ্রেষ্ঠ।

* * *

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকটিতে ভগবান যোগীদের প্রশংসা করে অর্জুনকে যোগী হবার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু কর্মযোগী, জ্ঞানযোগী, ধ্যানযোগী, ভক্তিযোগী ইত্যাদির মধ্যে কোন্ যোগী হওয়া উচিত—তা তিনি স্পষ্টভাবে অর্জুনকে জানাননি। সেইজন্য ভগবান পরবর্তী শ্লোকে 'অর্জুন ভক্তিযোগী হোক'—এই উদ্দেশ্যে ভক্তিযোগীর বিশেষ মাহাত্ম্য জানাচ্ছেন।

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥ ৪৭ ॥

[**সর্বেষাম্** (সকল) ; **যোগিনাম্, অপি** (যোগীর মধ্যে) ; **যঃ, শ্রদ্ধাবান্** (যে শ্রদ্ধাবান ভক্ত) ; **মদ্‌গতেন** (আমাতে তদ্গত) ; **অন্তরাত্মনা** (চিত্ত হয়ে) ; **মাম্, ভজতে** (আমাকে ভজনা করেন) ; **মে** (আমার) ; **মতঃ** (মতে) ; **সঃ** (তিনিই) ; **যুক্ততমঃ** (সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী।)]

সকল যোগীর মধ্যে যে শ্রদ্ধাবান ভক্ত আমাকে তদ্গত চিত্তে ভজনা করেন, আমার মতে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী ॥ ৪৭ ॥

ব্যাখ্যা—'যোগিনামপি সর্বেষাম্'—যাঁর মধ্যে জড়ত্ব থেকে সম্পর্ক-বিচ্ছেদ করার প্রাধান্য থাকে, যিনি কর্মযোগ, সাংখ্যযোগ, হঠযোগ, মন্ত্রযোগ, লয়যোগ ইত্যাদি সাধনগুলির দ্বারা নিজ স্বরূপ প্রাপ্তিতে (অনুভবে) ব্যাপৃত, সেই যোগী সকাম তপস্বী, জ্ঞানী এবং কর্মীদের থেকেও শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এসকল যোগীদের মধ্যেও যাঁরা শুধুমাত্র আমার সঙ্গেই সম্পর্ক স্থাপন করতে চান, সেই ভক্তিযোগীরা সর্বশ্রেষ্ঠ।

'যঃ শ্রদ্ধাবান্'—যিনি আমাকে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করেন অর্থাৎ যাঁর ভিতর আমারই অস্তিত্বেরই গুরুত্ব, এরূপ সেই

শ্রদ্ধাবান ভক্ত তদ্গত চিত্তে আমারই ভজনা করেন।

'মদ্গতেনান্তরাত্মনা মাং ভজতে'—আমি ভগবানের এবং ভগবান আমার—যোগী যখন এইভাবে ভগবানকে আপন করে নেন, তখন তাঁর মন স্বাভাবিকভাবে ভগবানে একাত্ম হয়, তল্লীন হয়। বিবাহের পর কন্যার মন যেমন স্বাভাবিকভাবে শ্বশুরবাড়িতে বসে যায়, তেমনি ভগবানে আপন-ভাব জন্মালে ভক্তের মন স্বাভাবিকভাবে ভগবানের সঙ্গে একাত্ম হয়, চেষ্টা করে মনকে আর বসাতে হয় না। তখন খাওয়া-দাওয়া, ওঠা-বসা, চলা-ফেরা, শোওয়া-জাগা সমস্ত কাজেই মন ভগবদ্-চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে, ভগবানেই মগ্ন থাকে।

যিনি কেবল ভগবানেরই হয়ে যান, তাঁর ব্যক্তিগত বলে আর কিছু থাকে না। তাঁর সাধন-ভজন, জপ-কীর্তন, শ্রবণ-মনন ইত্যাদি পারমার্থিক ক্রিয়া, খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরা, শোওয়া-জাগা ইত্যাদি সকল শারীরিক ক্রিয়া এবং চাষ-বাস, ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকুরি ইত্যাদি জীবিকা সম্পর্কীয় সমস্ত ক্রিয়াতেই ভগবানের ভজন হয়ে যায়।

অনন্যভক্তের ভজনের স্বরূপ ভগবান একাদশ অধ্যায়ের পঞ্চান্নতম শ্লোকে জানিয়েছেন যে, সেই ভক্ত আমার প্রসন্নতার জন্য সমস্ত কর্ম করেন, সর্বদা মৎপরায়ণ হয়ে থাকেন। তিনি শুধুমাত্র আমারই ভক্ত, সংসারের নন, তিনি সংসারের সমস্ত আসক্তি ত্যাগ করেন এবং সমস্ত প্রাণীতে বৈরীভাব রহিত হন।

'স মে যুক্ততমো মতঃ'—সংসারে অনাসক্ত হয়ে নিজের উদ্ধারে ব্যাপৃত যত যোগী (সাধক) আছেন, তাঁরা সকলেই **'যুক্ত'**। যিনি সগুণ-নিরাকার অর্থাৎ সর্বব্যাপী পরিপূর্ণ পরমাত্মার শরণাগত হন, তাঁকে বলা হয় **'যুক্ততর'**। কিন্তু যিনি কেবল আমার সগুণ রূপের শরণাগত হন, আমার মতে তিনি **'যুক্ততম'**।

সেই ভক্ত তখনই যুক্ততম বলে বিবেচিত হন, যখন কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ইত্যাদি সমস্ত যোগই তাঁর মধ্যে প্রকটিত হয়। শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসপূর্বক ভগবানে একাত্ম হয়ে একচিত্তে তাঁর ভজনা করলে সব যোগ-ই সাধকের মধ্যে স্বতঃই এসে যায়। কারণ ভগবান হলেন মহাযোগেশ্বর, সম্পূর্ণ যোগের মহৎ ঈশ্বর, অতএব মহাযোগেশ্বরের শরণাগত হলে তাঁর আর কোন্ যোগ বাকি থাকে? তিনি সকল যোগে-ই যুক্ত হন। তাই ভগবান তাঁকে যুক্ততম বলেছেন।

যুক্ততম ভক্ত কখনো যোগভ্রষ্ট হতে পারেন না। কারণ তাঁর মন কখনো ভগবানকে ত্যাগ করে না, তাই ভগবানও তাঁকে ত্যাগ করতে পারেন না। যদি অন্তিমকালে তিনি অসুখ বা অজ্ঞান অবস্থার জন্য ভগবানকে স্মরণ করতে সক্ষম না হন তবে ভগবান নিজেই তাঁকে স্মরণ করেন[১]। সুতরাং তিনি যোগভ্রষ্ট হবেন কী করে?

তাৎপর্য হল এই যে, যে ব্যক্তি সংসার হতে সম্পূর্ণ বিমুখ হয়েছেন এবং ভগবদ্পরায়ণ হয়েছেন, যাঁর নিজের বল-উদ্যোগ-সাধনার নির্ভরতা-বিশ্বাস এবং অভিমান নেই, এরূপ ভক্তকে ভগবান যোগভ্রষ্ট করেন না ; কারণ তিনি ভগবদ্ নির্ভর হন। যাঁর অন্তঃকরণে সাংসারিক মহত্ত্ব তথা নিজ পুরুষার্থের অহংকার, বিশ্বাস ও অভিমান থাকে, তাঁরই যোগভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে। কারণ তাঁর অন্তঃকরণে ভোগের প্রাধান্য থাকায় পরমাত্মার ধ্যান করার সময়েও মন সংসারে চলে যায়। এইরূপ প্রাণত্যাগের সময় যদি মন সংসারে থাকে, তবে তিনি যোগভ্রষ্ট হন। যদি নিজ বলের আস্থা, বিশ্বাস এবং অভিমান না থাকে, তবে মন সংসারে গেলেও তিনি যোগভ্রষ্ট হন না। কারণ ওইরূপ অবস্থায় (মন সংসারে গেলে) তিনি ভগবানকে ডাকেন। সুতরাং ভগবানে এরূপ নির্ভরশীল ভক্তের চিন্তা স্বয়ং ভগবানই করেন, যাতে সেই ভক্ত যোগভ্রষ্ট না হয়ে ভগবানকেই প্রাপ্ত হন।

এখানে ভক্তিযোগীকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলায় মনে হতে পারে যে অন্য যত যোগী আছেন, তাঁদের পূর্ণতায় কিছু না কিছু

---

[১]ভগবান বলেছেন—

ততস্তং ম্রিয়মাণং তু কাষ্ঠপাষাণসন্নিভম্। অহং স্মরামি মদ্ভক্তং নয়ামি পরমাং গতিম্॥

'কাঠ এবং পাষাণতুল্য ম্রিয়মাণ সেই ভক্তকে আমি স্বয়ং স্মরণ করি এবং তাঁকে পরমগতি প্রদান করি'।

'কফবাতাদিদোষেণ মদ্ভক্তো ন চ মাং স্মরেৎ। তস্য স্মরাম্যহং নো চেৎ কৃতঘ্নো নাস্তি মৎপরঃ'॥

'কফ, বাত ইত্যাদির জন্য আমার ভক্ত যদি মৃত্যুকালে আমাকে স্মরণ করতে না পারে, তবে আমি স্বয়ং তাঁকে স্মরণ করি। যদি আমি তা না করি, তবে আমার চেয়ে বেশি কৃতঘ্ন আর কেউ হতে পারে না।'

ঘাটতি আছে ? সংসারের বন্ধন ছিন্ন হলে সমস্ত যোগী সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হন, নির্বিকার হন এবং পরমসুখ, পরম শান্তি, পরম আনন্দ অনুভব করেন—এই দৃষ্টিতে দেখলে কারোরই পূর্ণতায় কোনো ঘাটতি থাকে না। কিন্তু যিনি অন্তর থেকে ভগবানে লগ্ন থাকেন, ভগবানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান, তাঁর মধ্যে ভগবদ্-প্রেম পরিস্ফুট হয়। সেই প্রেম প্রতিমুহূর্তে বিকশিত হয় তথা ঘাটতি, ক্ষতি বা অপূর্তি রহিত হয়। এরূপ প্রেমের জন্যই ভগবান তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করেন।

পঞ্চম অধ্যায়ের প্রারম্ভে অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছিলেন সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগ—এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ ? ভগবান অর্জুনের প্রশ্ন অনুযায়ী সেখানে কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ বলে জানিয়েছিলেন। কিন্তু অর্জুনের পক্ষে কোন্ যোগটি শ্রেষ্ঠ তা জানাননি। তারপরে সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগের সাধনা কীভাবে চলে—তার আলোচনা করে ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রারম্ভে কর্মযোগের বিশেষ মাহাত্ম্য জানিয়েছেন। যে তত্ত্ব (সমত্ব বা যোগ) কর্মযোগ দ্বারা প্রাপ্ত হয়, তা ধ্যানযোগ দ্বারাও লাভ করা যায়— এই বলে তিনি ধ্যানযোগের বর্ণনা করেছেন। ধ্যানযোগে মানসিক চঞ্চলতাই হল বাধাস্বরূপ—এই সম্বন্ধে অর্জুন মনের বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন। ভগবান সংক্ষেপে তার উত্তর দিয়েছেন। অর্জুন আবার প্রশ্ন করেছেন যে, যোগ সাধনকারী ব্যক্তি যদি অন্তিমকালে যোগ থেকে বিচ্যুত হন, তবে তাঁর কী গতি হবে ? তার উত্তরে ভগবান যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির গতির বর্ণনা করেছেন এবং ছেচল্লিশতম শ্লোকে যোগীর বিশেষ মাহাত্ম্য বলে অর্জুনকে যোগী হবার জন্য স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর নিজের কোনো যোগ শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয় তা স্পষ্টভাবে তখনও পর্যন্ত জানাননি। এখন এই শেষ শ্লোকটিতে ভগবান নিজে থেকেই (অর্জুন জিজ্ঞাসা না করলেও) তাঁর মত জানিয়েছেন যে, 'আমি ভক্তিযোগীদেরই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি'—**'স মে যুক্ততমো মতঃ'**। কিন্তু এটি স্পষ্টভাষায় জানালেও অর্জুন ভগবানের কথা ঠিকমতো অনুধাবন করতে পারেননি। তাই অর্জুন পরবর্তী দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে পুনরায় প্রশ্ন করেন যে, 'আপনার ভক্ত এবং অবিনাশী নিরাকার উপাসক—এই দুইপ্রকার ভক্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ?' তার উত্তরে ভগবান তাঁর ভক্তকেই শ্রেষ্ঠ বলে জানিয়েছেন, যা এখানেও বলেছেন[১]।

বিশেষ কথা

কর্মযোগী, জ্ঞানযোগী প্রভৃতি সকল যোগীই যুক্ত অর্থাৎ সকলেই সংসার-বিমুখ এবং সমত্বের (চেতন-তত্ত্বের) অনুসারী। এঁদের মধ্যে ভক্তিযোগীকে (ভক্তকে) সর্বশ্রেষ্ঠ বলার অর্থ হল এই যে, জীব পরমাত্মার অংশ, কিন্তু সংসারের সঙ্গে নিজ সম্বন্ধ স্থাপন করে আবদ্ধ হয়ে আছে। যখন জীব শরীর এবং সংসারের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক ত্যাগ করে, তখন সে স্বাধীন ও সুখী হয়। এই স্বাধীনতাও একপ্রকার ভোগ, যদিও তাতে পদার্থ-ব্যক্তি-ক্রিয়া-পরিস্থিতি ইত্যাদির কোনোরূপ প্রভাব থাকে না, তবুও এই স্বাধীনতায় যে সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায় অর্থাৎ 'আমার দুঃখ নেই, শোক নেই, ইচ্ছার লেশমাত্র নেই'—এই বোধে যে সুখানুভব হয়, সেই স্বাধীনতাও একপ্রকার পরিচ্ছিন্নতা (পরাধীনতা), এতেও জগতের সঙ্গে সূক্ষ্ম-সম্পর্ক বজায় থাকে। সেইজন্য একে **'ব্রহ্মভূত অবস্থা'** বলা হয় (গীতা ১৮।৫৪)।

সুখানুভূতিতে যতক্ষণ স্বাধীনতার স্পর্শ থাকে, ততক্ষণ সেটিতে সূক্ষ্ম অহংকার থাকে। কিন্তু এই স্থিতিতে (ব্রহ্মভূত অবস্থায়) বিরাজ করলেও সেই অহংকারও নাশ হয়। কারণ প্রকৃতি ও তার কার্যাদির সঙ্গে সম্পর্ক না রাখলে প্রকৃতির অংশ **'অহং'** স্বতঃই শান্ত হয়ে যায়। তাৎপর্য হল এই যে, কর্মযোগী, জ্ঞানযোগীও পরিণামে অহংবর্জিত হয়ে যান। কিন্তু ভক্তিযোগী প্রথম থেকেই ভগবানের হয়ে যান। তাই তাঁর অহংকার শুরুতেই বিনষ্ট হয়ে যায়। গীতাতেও এরূপ কথা দেখা যায় যে, যেখানে সিদ্ধ কর্মযোগী, জ্ঞানযোগী এবং ভক্তিযোগীর লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে কর্মযোগী এবং জ্ঞানযোগীর লক্ষণগুলির মধ্যে করুণা এবং কোমলতা দেখা যায় না, কিন্তু ভক্তদের লক্ষণে দেখা যায়। সেইজন্য সিদ্ধ ভক্তদের লক্ষণের

[১]এখানে ভগবান বলেছেন **'স মে যুক্ততমো মতঃ'** এবং দ্বাদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে বলেছেন, **'তে মে যুক্ততমো মতাঃ'**। দুই স্থানেই ভগবান একই শব্দ ব্যবহার করেছেন, শুধু বচনে পার্থক্য আছে অর্থাৎ এইস্থানে একবচনে কথাটি জানিয়েছেন আর দ্বাদশ অধ্যায়ে বলেছেন বহুবচনে।

উল্লেখে **'অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ'** (১২।১৩) এরূপ পদ উদ্ধৃত হয়েছে, কিন্তু সিদ্ধ কর্মযোগী বা জ্ঞানযোগীর লক্ষণে এরূপ পদ ব্যবহৃত হয়নি। অর্থ হল এই যে, ভক্ত প্রথম থেকেই বিনত হয়ে থাকে[১]। সুতরাং তাঁর মধ্যে নম্রতা, কোমলতা, ভগবানের বিধানে প্রসন্নভাব ইত্যাদি বিশেষ বিষয় সাধনাবস্থায়ই এসে যায় এবং সিদ্ধাবস্থায় তো এগুলি বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়। তাই ভক্তের মধ্যে সূক্ষ্ম অহংকারও থাকে না। সেইজন্যই ভগবান ভক্তকে সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী বলে জানিয়েছেন।

শান্তি এবং স্বাধীনতা ইত্যাদির রস চিন্ময় হলেও 'অখণ্ড'। কিন্তু ভক্তিরস চিন্ময় হলেও 'প্রতিমুহূর্তে বৃদ্ধিশীল' অর্থাৎ নিত্য নতুনভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কখনো কমে না, নাশ হয় না আবার পরিপূর্ণও হয় না। এই রসের, প্রেমানন্দের আকাঙ্ক্ষা ভগবানেরও থাকে। তাঁর প্রেমের আকাঙ্ক্ষা একমাত্র ভক্তই পূরণ করতে পারেন। তাই ভগবান ভক্তকে শ্রেষ্ঠ বলে মান্য করেন।

আরো একটি বিষয় বোঝার আছে, তা হল কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ—এই দুইয়েতে সাধকের নিজস্ব নিষ্ঠা (স্থিতি) থাকে, কিন্তু ভক্তের নিজের কোনো পৃথক সত্তাই থাকে না। ভক্ত সর্বদা ভগবানেরই আশ্রিত হয়ে থাকেন, ভগবানের ওপরই নির্ভর করেন, ভগবানের প্রসন্নতাতেই প্রসন্ন হন—**'তৎ সুখে সুখিত্বম্'**। তাঁর নিজের উদ্ধারেরও চিন্তা থাকে না। 'আমার কী হবে'—তা নিয়ে তাঁর কোনো ভাবনা থাকে না। এরূপ ভগবন্নিষ্ঠ ভক্তের সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব ভগবানের ওপরই বর্তায়—**'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্'**।

পরিশিষ্ট-ভাব—মানুষের মন ও বুদ্ধি যেমন হয়, তার আচরণও সেই মত হয় (গীতা ১২।৮)। এই স্থানে **'মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা'**-তে ভক্তের মন ভগবানে আকৃষ্ট হয়েছে এবং **'শ্রদ্ধাবান্'**-তে তাঁর বুদ্ধি ভগবানে আকৃষ্ট হয়েছে। সুতরাং ভগবানের সঙ্গে গভীর আত্মীয়তাবোধ জন্মানোয় এরূপ ভক্ত ভগবানের অবিচল ভক্ত হয়ে ওঠেন।

কর্মযোগী, জ্ঞানযোগী, ধ্যানযোগী, হঠযোগী, লয়যোগী, রাজযোগী ইত্যাদি যত প্রকার যোগী হওয়া সম্ভব, তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন তিনি, যিনি ভগবানের ভক্ত। প্রিয় ভক্তের বিষয়ে ভগবান এমন উক্তি আরো নানাস্থানে করেছেন, যেমন—**'তে মে যুক্ততমা মতাঃ'** (১২।২), **'ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ'** (১২।২০), **'স যোগী পরমো মতঃ'** (৬।৩২)।

পরমাত্মপ্রাপ্তির সর্বপ্রকার সাধনাতে ভক্তিই প্রধান। শুধু তাই নয় সকল সাধনার শেষ হয় এই ভক্তিতে এসেই। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এগুলি হল সাধন আর ভক্তি হল সাধ্য। ভক্তি এত ব্যাপক যে তা প্রত্যেক সাধনের আদিতেও থাকে আবার অন্ততেও থাকে। প্রত্যেক সাধনের আরম্ভে ভক্তি পারমার্থিক আকর্ষণের রূপে থাকে, কেন-না পরমাত্মাতে আকর্ষিত না হলে কোনো ব্যক্তি সাধনায় নিয়োজিত হতে পারে না। সাধনার শেষে ভক্তি প্রতিমুহূর্তে বর্ধিত প্রেমের রূপে থাকে—**'মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্'** (গীতা ১৮।৪৫)। তাই ব্রহ্মসূত্রে অন্য সমস্ত ধর্মের থেকে ভগবদ্‌ভক্তি-বিষয়ক ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে—**'অতস্ত্বিরজ্যায়ো লিঙ্গাচ্চ'** (৩।৪।৩৯)।

এই শ্লোকটির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হলেন সমগ্র এবং তাঁর ভক্তি হল অলৌকিক। সেই ভক্তির প্রাপ্তি হলেই মানবজীবনে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

❋ ❋ ❋

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে আত্মসংযমযোগো নামক ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ সমাপ্ত॥ ৬ ॥

---

[১]'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥' (শিক্ষাষ্টক)

'নিজেকে তৃণের থেকে নীচু মনে করে, বৃক্ষের থেকেও সহনশীল হয়ে, অপরকে সম্মান করে আর নিজে মানরহিত হয়ে সর্বদা শ্রীহরির নাম-সঙ্কীর্তন করবে।'

এইপ্রকার ওঁ, তৎ, সৎ—এই ভগবদ্নাম উচ্চারণপূর্বক ব্রহ্মবিদ্যা এবং যোগশাস্ত্রময় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদরূপ শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে 'আত্মসংযমযোগ' নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সম্পূর্ণ হল।। ৬ ॥

আত্মসংযম অর্থাৎ মন সংযম করলে ধ্যানযোগীর যোগ (সমত্ব) অনুভূত হয়। সেইজন্য এই অধ্যায়ের নাম হয়েছে 'আত্মসংযমযোগ'।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের পদ, অক্ষর এবং উবাচ

১) এই অধ্যায়ে **'অথ ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ'**-এর তিন, **'অর্জুন উবাচ'** ইত্যাদি পদের দশ, শ্লোকগুলির পাঁচশত তিয়াত্তর এবং পুষ্পিকার তেরটি পদ আছে। এইভাবে সমস্ত পদের যোগসংখ্যা পাঁচশত নিরানব্বই।

২) **'অথ ষষ্ঠোঽধ্যায়'**-এর ছয়, **'অর্জুন উবাচ'** ইত্যাদি পদের তেত্রিশ, শ্লোকগুলির এক হাজার পাঁচশত চার এবং পুষ্পিকাতে সাতচল্লিশ অক্ষর আছে। এইপ্রকারে সমস্ত অক্ষরগুলির যোগসংখ্যা হল এক হাজার পাঁচশত নব্বই। এই অধ্যায়ের সমস্ত শ্লোকই বত্রিশ অক্ষরের।

৩) এই অধ্যায়ে পাঁচটি **'উবাচ'** আছে—তিনটি **'শ্রীভগবানুবাচ'** এবং দুটি **'অর্জুন উবাচ'**।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রযুক্ত ছন্দ

এই অধ্যায়ের সাতচল্লিশ শ্লোকের মধ্যে প্রথম এবং ছাব্বিশতম শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে 'ভগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় **'ভ-বিপুলা'** ; দশম, চতুর্দশ এবং পঁচিশতম শ্লোকের প্রথম পংক্তি এবং পঞ্চদশ, সাতাশ, ছত্রিশ এবং বিয়াল্লিশতম শ্লোকের তৃতীয় পংক্তিতে 'নগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় **'ন-বিপুলা'** এবং একাদশ শ্লোকের তৃতীয় চরণে 'রগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় **'র-বিপুলা'** সংজ্ঞাযুক্ত ছন্দ হয়েছে। বাকি সাঁইত্রিশটি শ্লোক 'পথ্যাবক্ত্র' অনুষ্টুপ ছন্দের লক্ষণযুক্ত।

॥ ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

অথ সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

সপ্তম অধ্যায়

অবতরণিকা

শ্রীভগবান ষষ্ঠ অধ্যায়ের ছেচল্লিশতম শ্লোকে যোগের মহিমা বলেছেন এবং সাতচল্লিশতম শ্লোকে বলেছেন যে, যোগীদের মধ্যেও যাঁরা শ্রদ্ধা ও প্রেমসহ আমাকে ভজনা করেন, এরূপ ভক্ত সর্বশ্রেষ্ঠ। ভক্তদের যেমন ভগবদ্ স্মরণ হলে তাঁরা তাঁতে মগ্ন হয়ে পড়েন—মত্ত হয়ে ওঠেন, তেমনি ভগবানের কাছে ভক্তদের বিশেষ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে ভগবানও তাতে নিমগ্ন হন। এইভাবে মগ্নচিত্তে ভগবান অর্জুনের বিনা জিজ্ঞাসাতেই নিজে থেকে সপ্তম অধ্যায়ের বিষয়বস্তু উত্থাপন করছেন।

শ্রীভগবানুবাচ

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্ মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥ ১ ॥

[**পার্থ** (হে পৃথানন্দন !) ; **ময়ি** (আমাতে) ; **আসক্তমনাঃ** (আসক্তচিত্ত) ; **মদাশ্রয়ঃ** (আমার আশ্রিত হয়ে) ; **যোগম্** (যোগের) ; **যুঞ্জন্** (অভ্যাস দ্বারা) ; **মাম্** (আমার) ; **সমগ্রম্** (সমগ্ররূপকে) ; **অসংশয়ম্** (নিঃসন্দেহে) ; **যথা** (যেভাবে) ; **জ্ঞাস্যসি** (জানতে পারবে) ; **তৎ** (তা) ; **শৃণু** (শোন।)]

শ্রীভগবান বললেন—হে পার্থ ! আমাতে আসক্তচিত্ত, আমার শরণাগত হয়ে যোগাভ্যাস দ্বারা তুমি আমার সমগ্র রূপ যে-প্রকারে নিঃসন্দিগ্ধভাবে জানতে পারবে—তা শোনো ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা—**'ময্যাসক্তমনাঃ'**—যার মন আমাতে আসক্ত হয়েছে অর্থাৎ অত্যন্ত প্রীতিবশতঃ যার মন স্বাভাবিকভাবে আমাতে নিবিষ্ট হয়েছে, তাকে আর পৃথকভাবে আমাকে স্মরণ করার প্রয়োজন হয় না, বরং স্বাভাবিকভাবেই তার স্মরণে আমি থাকি এবং কখনো তাতে বিস্মৃতি হয়-ই না—তুমিও এইরূপ আমাতে নিবিষ্ট-চিত্ত হও।

যাঁর উৎপত্তি-বিনাশশীল বস্তু এবং শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের প্রতি আকর্ষণ দূর হয়েছে, যাঁর ইহলোকে শারীরিক আরাম, শ্রদ্ধা-সম্মান নাম-যশের এবং স্বর্গাদি পারলৌকিক ভোগের প্রতি বিন্দুমাত্র আকর্ষণ, আসক্তি বা ভালোবাসা নেই, শুধু আমার প্রতিই আকর্ষণ আছে, সেইরূপ ব্যক্তিকে **'ময্যাসক্তমনাঃ'** বলা হয়েছে।

সাধক ভগবানে মন কীভাবে নিবিষ্ট করবেন, যাতে তিনি **'ময্যাসক্তমনাঃ'** হতে পারেন ? তার জন্য দুটি উপায় বলা হয়েছে—

১) সাধক যখন আন্তরিকভাবে ভগবানের জন্যই জপ-ধ্যান করতে বসেন, তখন ভগবান সেটিকে তাঁর নিজেরই অর্চনা বলে মেনে নেন। যেমন, কোনো ধনী ব্যক্তি যখন তাঁর ভৃত্যকে বলেন যে—'তুমি এখানে বসে থাকো, কোনো কাজ থাকলে বলব,' তখন কোনো একদিন হয়তো মালিক তাকে কোনো কাজের কথা বললেন না। সেই চাকরটি সারাদিন অপেক্ষার পর সন্ধ্যার সময় মালিককে বলে— 'বাবু ! আমার মজুরি দিন !' মালিক বলেন—'তুমি তো সারাদিন বসেই ছিলে, কোনো কাজই করনি, টাকা কীজন্য ?' সেই চাকরটি উত্তর দিল—'বাবু ! সারাদিন বসেছিলাম, তার জন্য।' এইভাবে মানুষ যখন একজনের কথায় সারাদিন বসেও মজুরি পায়, তখন যে ব্যক্তি শুধুমাত্র ভগবানে মনোনিবেশ করার জন্য সময় ব্যয় করেন ভগবান কি তা নিরর্থক করতে পারেন ? এর তাৎপর্য হল এই যে, যে ব্যক্তি ভগবানে চিত্ত নিবেশ করার জন্য,

ভগবানের আশ্রয় নিয়ে ভগবানের জন্য সময় ব্যয় করেন, ভগবদ্ কৃপায় সেই ব্যক্তি ভগবানে মগ্নচিত্ত হয়ে যান।

২) ভগবান সর্বত্র থাকলে এখানেও আছেন। কারণ যদি তিনি এখানে না থাকেন তবে তিনি সর্বত্র রয়েছেন—একথা বলা যায় না। ভগবান সর্বক্ষণ বিরাজমান হলে, এখনও বিরাজমান। কারণ যদি এই সময়ে তিনি বিরাজ না করেন, তবে ভগবান সর্বক্ষণ বিরাজমান—এই কথা বলা ঠিক হয় না। ভগবান সবকিছুতে যদি থাকেন, তাহলে আমার মধ্যেও আছেন। কারণ আমার মধ্যে তিনি যদি না থাকেন, তাহলে তিনি সবকিছুতে আছেন—একথা বলা ঠিক হয় না। ভগবান যদি সকলের আপনজন হন তবে তিনি আমারও আপনজন, কেন-না যদি তিনি আমার আপনজন না হন তাহলে তিনি সকলের—একথা বলা ঠিক হয় না। অতএব ভগবান এখানে আছেন, এখন আছেন, আমার মধ্যে আছেন এবং তিনিই আপনজন। কোনো স্থান, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, পরিস্থিতি, ঘটনা এবং ক্রিয়া তাঁর থেকে বর্জিত নয়। তাঁর থেকে বর্জিত থাকা সম্ভবই নয়। এই কথাটি দৃঢ়ভাবে মেনে, ভগবদ্ নামে, প্রাণে, মনে, বুদ্ধিতে, শরীরে, শরীরের প্রতি কণায় পরমাত্মা বিরাজমান—এই ভাব জাগরিত রেখে নাম-জপ করলে সাধক অতি শীঘ্রই ভগবানে মনোনিবেশ করতে পারবে।

'মদাশ্রয়ঃ'—যে ব্যক্তি কেবল আমার আশাতেই থাকে, আমাতেই ভরসা রাখে, আমাকেই সহায়ক বলে মনে করে, আমার ওপরই বিশ্বাস রাখে এবং যে আমাকেই আশ্রয় করে (শরণাগত হয়), তাকে **'মদাশ্রয়ঃ'** বলা হয়।

জীবের স্বভাবই হল কাউকে আশ্রয় করা। পরমাত্মার অংশোদ্ভূত হওয়ায় জীব তার নিজের অংশীকে খুঁজতে থাকে। কিন্তু যতক্ষণ তার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য পরমাত্মা না হয়, ততক্ষণ তার শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় থাকে এবং শরীর যার (জগতের) অংশ, সেই জগতের দিকে আকর্ষিত হতে থাকে। সে মনে করতে থাকে যে এ থেকেই আমি কিছু পাব, এর দ্বারাই আমি সুখী হয়ে যাব, যা কিছু হবে, তা এই জগৎ-দ্বারাই হবে। কিন্তু যখন সে ভগবানকে সবার ওপরে বলে মেনে নেয়, তখন সে ভগবানে আকৃষ্ট হয় এবং ভগবানেরই আশ্রয় গ্রহণ করে।

জগৎ-সংসারের অর্থাৎ ধন-সম্পত্তি-বৈভব-বিদ্যা-বুদ্ধি-যোগ্যতা-আত্মীয়-স্বজন ইত্যাদির যে আশ্রয়, তা বিনাশশীল, তা নষ্ট হয়ে যায়, চিরকাল থাকে না। এই সবের আশ্রয় চিরস্থায়ী নয় তাই চিরকাল থাকে না। অর্থাৎ তা চিরকালের মতো পূর্ণতা বা তৃপ্তি দিতে সক্ষম নয়। কিন্তু ভগবানের আশ্রয় কখনো বিন্দুমাত্রও কম হবার নয়। কারণ ভগবানের আশ্রয় আগেও ছিল, এখনও আছে এবং পরেও থাকবে। সুতরাং কেবলমাত্র ভগবানেই আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। কেবল ভগবানেরই আশ্রয়, অবলম্বন, আধার এবং ভরসা যেন থাকে। এখানে **'মদাশ্রয়ঃ'** পদের দ্বারা এই কথাই বলা হয়েছে।

ভগবান বলেছেন, মনও আমাতে আসক্ত হোক এবং আশ্রয়ও আমার হোক। মন আসক্ত হয় ভালোবাসার দ্বারা এবং ভালোবাসা হয় আপন-বোধের দ্বারা। আশ্রয় নেওয়া হয় তার কাছে যে বড় অর্থাৎ শক্তিমান। আর সর্বশক্তিমান তো আমাদের প্রভুই। তাই তাঁরই আশ্রয় নিতে হয় এবং তাঁর প্রত্যেক বিধানে প্রসন্ন হতে হয়, কেন-না, আমার মনের বিরুদ্ধে বিধান করতে হলেও তিনি আমার প্রতি কী সতর্ক নজরদারী রাখেন! আমার প্রতি তাঁর কত আপন-ভাব যে আমার সম্মতি না নিয়েই তিনি আমার জন্য পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন। অতএব আমার কখনো কোনো বস্তু, ব্যক্তি, পরিস্থিতি ইত্যাদি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র চিন্তার প্রয়োজন নেই। এইরূপ ভগবানে আশ্রিত থাকাকেই **'মদাশ্রয়ঃ'** বলা হয়।

'যোগং যুঞ্জন্'—ভগবানের সঙ্গে যে স্বাভাবিক অখণ্ড সম্বন্ধ থাকে সেই সম্বন্ধকে মেনে নিয়ে এবং সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমভাবে থেকে সাধক জপ-ধ্যান-কীর্তনে, ভগবানের লীলা এবং স্বরূপ চিন্তায় স্বতঃই অবিচল থাকেন। তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টাই স্বাভাবিকভাবে ভগবানের অনুকূল হয়ে থাকে। এই হল **'যোগং যুঞ্জন্'** কথাটির তাৎপর্য।

সাধক যখন ভগবানে আসক্ত-চিত্ত এবং তাঁর আশ্রিত হন তখন সাধকের আলাদাভাবে আর কী অভ্যাস করার থাকে ? কোন্ যোগটি তিনি করবেন ? তিনি ভগবদ্ সম্বন্ধীয় বা সংসার সম্পর্কীয় যে কাজই করুন, তাতে সব যোগেরই অভ্যাস হয়। তাৎপর্য হল এই যে, যে কাজের দ্বারা পরমাত্মার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, সেই (লৌকিক বা পারলৌকিক) কাজই সাধক করেন, আর যে কাজের দ্বারা পরমাত্মা থেকে বিমুখতা ঘটে, সেই কাজ তিনি করেন না।

'অসংশয়ংসমগ্রং মাম্'—যে ব্যক্তি ভগবানে আসক্ত

চিত্ত, যে সর্বতোভাবে ভগবানের আশ্রিত এবং যিনি ভগবানের সম্বন্ধকে স্বীকার করে নিয়েছেন—এরূপ ব্যক্তি ভগবানের সমগ্ররূপ জানতে পারেন অর্থাৎ সগুণ-নির্গুণ, সাকার-নিরাকার, অবতার-অবতারী, শিব, গণেশ, সূর্য, বিষ্ণু, ইত্যাদি তাঁর যত রূপ আছে, সবই তিনি জেনে থাকেন।

ভগবান তাঁর ভক্তের কথা বলতে শ্রান্ত হন না এবং বলেন যে জ্ঞানমার্গী ব্যক্তি কেবল আমাকে জানতে পারে এবং প্রাপ্ত করতে সক্ষম হয় । কিন্তু ভক্তির দ্বারা ভক্ত আমার সমগ্ররূপ জানতে পারে এবং ইষ্টের অর্থাৎ যে রূপে সে আমার উপাসনা করে, সেই রূপের দর্শনও করতে পারে।

'যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু'—এখানে **'যথা'**[1] পদ দ্বারা প্রকার সম্পর্কে জানানো হয়েছে যে, তুমি যে প্রকারে জানতে পারবে, সেই প্রকারও আমি জানাব এবং **'তৎ'**[2] পদের দ্বারা বলা হয়েছে যে, যে তত্ত্ব তুমি জানতে সক্ষম, সেটিরও বর্ণনা করব, তুমি শ্রবণ করো।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের সাতচল্লিশতম শ্লোকে **'শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ'** পদে প্রথম পুরুষ (সে) প্রয়োগ করে সাধারণভাবে বলেছিলেন এবং এখানে সপ্তম অধ্যায়ের আরম্ভে **'যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু'** পদে মধ্যম পুরুষ (তুমি) প্রয়োগ করে অর্জুনকে বিশেষভাবে বলেছেন যে, তুমি যে উপায়ে আমার সমগ্ররূপ জানতে পারবে, তা আমার কাছে শোনো।

এর আগে ছ'টি অধ্যায়ে ভগবানের জন্য **'সমগ্র'** শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি। চতুর্থ অধ্যায়ের তেইশতম শ্লোকে **'যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে'** পদের দ্বারা কর্মের বিশেষণের রূপে **'সমগ্র'** শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিল কিন্তু এখানে **'সমগ্র'** শব্দটি ভগবানের বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। **'সমগ্র'** শব্দটিতে ভগবানের তাত্ত্বিক স্বরূপ সবই ব্যক্ত হয়, কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

বিশেষ কথা

১) এই শ্লোকে 'আসক্তি যেন কেবল আমাতেই হয়, কেবল আমাকেই যেন আশ্রয় করে থাকে, তারপরে যোগাভ্যাস করলে সে আমার সমগ্ররূপ জানতে পারবে'—ভগবানের এই কথা বলার তাৎপর্য হল এই যে, যদি মানুষের ভোগে আসক্তি থাকে এবং টাকা-পয়সা ও আত্মীয়-স্বজনকেই সে আশ্রয় করে থাকে তাহলে সে যতই কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ ইত্যাদির অভ্যাস করুক না কেন, সে আমাকে জানতে সক্ষম হয় না। আমার সমগ্ররূপ জানতে গেলে আমাতে অনুরক্ত হতে হবে এবং আমাকে আশ্রয় করতে হবে। আমার মাধ্যমে ইচ্ছা পূরণের ইচ্ছাও যেন তার না হয়। এরূপ হওয়া উচিত এবং এরূপ হওয়া উচিত নয়—এই কামনা ত্যাগ করে, ভগবান যা করেন, তা-ই হওয়া উচিত আর ভগবান যা করতে না চান, তা হওয়া উচিত নয়—এইভাবে যে কেবল আমারই আশ্রয় গ্রহণ করে, সে আমার সমগ্ররূপ জানতে পারে। তাই ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে, তুমি **'ময্যাসক্তমনাঃ'** এবং **'মদাশ্রয়ঃ'** হও।

২) পরমাত্মার সঙ্গে প্রকৃত সম্বন্ধের নাম **'যোগম্'** এবং ওই সম্বন্ধকে অখণ্ডভাবে মেনে নেওয়ার নাম হল **'যুঞ্জন্'**। তাৎপর্য হল এই যে মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়গুলির সঙ্গে সম্পর্ক মেনে নিজের মধ্যে 'আমি' রূপে যে এক ব্যক্তিত্ব ধরে রাখা হয়েছে, তাকে না মেনে পরমাত্মার সঙ্গে যে যথার্থই অভিন্নতা আছে, সেটি অনুভব করা।

বাস্তবে **'যোগং যুঞ্জন্'**-এর তত প্রয়োজনীয়তা নেই, যত আবশ্যকতা থাকে সংসারের আসক্তি এবং আশ্রয় পরিত্যাগ করার। সংসারের আসক্তি এবং আশ্রয় ত্যাগ করলে পরমাত্মার চিন্তা স্বাভাবিকভাবে হয় এবং সমস্ত ক্রিয়াই নিষ্কামভাবে সম্পন্ন হতে থাকে। তখন ভগবানকে জানার জন্য আর কোনো অভ্যাস করার প্রয়োজন হয় না। এর তাৎপর্য হল এই যে, যার সংসারে আসক্তি থাকে এবং যার অন্তঃকরণে উৎপত্তি-বিনাশশীল বস্তুর প্রতি আকর্ষণ রয়েছে, সে পরমাত্মার প্রকৃত স্বরূপ জানতে সক্ষম হয় না। কারণ তার আসক্তি, কামনা এবং গুরুত্ববোধ সংসারের প্রতি থাকে, যার ফলে সংসারে পরমাত্মা

---

[1]স্থূল থেকে সূক্ষ্মতর বর্ণনা করা (যেমন—মাটি থেকে জল সূক্ষ্ম, জল হতে অগ্নি সূক্ষ্ম, অগ্নি থেকে বায়ু সূক্ষ্ম ইত্যাদি)—এই হল 'যথা' বলার তাৎপর্য। এই 'যথা' অর্থাৎ প্রকারের বর্ণনা এই অধ্যায়ের চতুর্থ থেকে সপ্তম শ্লোক পর্যন্ত করা হয়েছে।

[2]যে কোনো কার্য (জগতে) দেখা যায়, তাতে কারণরূপে ভগবানই বিদ্যমান—'তৎ' বলার তাৎপর্য হল তাই। এর বর্ণনা এই অধ্যায়ের অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্লোক পর্যন্ত করা হয়েছে।

পরিপূর্ণভাবে থাকলেও, সে তাঁকে জানতে পারে না।

মানুষের যখন সমাজের কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় তখন সে খুব খুশি হয়। তেমনি যিনি আমাদের সর্ব সময়ের হিতৈষী এবং আমাদের প্রধান অংশী, সেই ভগবানে যখন আত্মীয়তাবোধ জেগে ওঠে, তখন সর্বদা প্রসন্নতা এবং এক অলৌকিক, দুর্লভ প্রেম প্রকটিত হয়। অতঃপর সাধক স্বাভাবিকভাবেই ভগবানে তদ্গত চিত্ত এবং তাঁরই আশ্রিত হয়ে থাকেন।

শরণাগতির পর্যায়

আশ্রয়, অবলম্বন, অধীনতা, প্রপত্তি এবং সাহায্য—এই শব্দগুলি 'শরণাগতির' পর্যায়বাচক হলেও এগুলির নিজস্ব পৃথক অর্থ আছে; যেমন—

১) **আশ্রয়**—যেমন আমরা পৃথিবীর আধার ব্যতিরেকে বাঁচতেই পারি না এবং ওঠা-বসা ইত্যাদি কোনো কাজই করতে সক্ষম হই না, তেমনি প্রভুর আধার ব্যতিরেকে আমরা বাঁচতে বা অন্য কোনো কিছু করতে সক্ষম নই। বাঁচা এবং কোনো কিছু করা প্রভুর আশ্রয়েই হয়ে থাকে। এরই নাম হল '**আশ্রয়**'।

২) **অবলম্বন**—কারো হাত ভেঙে গেলে যেমন চিকিৎসক হাতটিতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে গলার সঙ্গে ঝুলিয়ে দেন এবং হাতটি গলা অবলম্বন করে থাকে, তেমনই সংসারে বিমুখ এবং নিরাশ্রয় হয়ে ভগবানের ভরসা করা অর্থাৎ ভগবানকে ধরে থাকাকেই বলা হয় '**অবলম্বন**'।

৩) **অধীনতা**—অধীনতা দু'প্রকারের হয়—(১) কেউ যদি জোর করে আমাদের অধীন করে রাখে বা ধরে রাখে এবং (২) আমরা যদি নিজে থেকে কারো অধীনতা স্বীকার করি বা তার দাস হই। এরূপই নিজের কোনো প্রয়োজন না রেখে অর্থাৎ শুধু ভগবানের জন্যই অনন্য-মনে সর্বতোভাবে ভগবানের দাস হয়ে যাওয়া এবং কেবল ভগবানকেই নিজ প্রভু মনে করা হল তাঁর '**অধীনতা**'।

৪) **প্রপত্তি**—যেমন কোনো সক্ষম ব্যক্তির চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করা—তেমনই সংসার থেকে সর্বতোভাবে বিমুখ হয়ে ভগবানের চরণে পতিত হওয়াকেই বলা হয় '**প্রপত্তি**' (প্রপন্নতা)।

৫) **সাহায্য**—জলে ডুবন্ত মানুষ যেমন কোনো গাছ, লতা, দড়ি ইত্যাদির সাহায্য গ্রহণ করে, তেমনই সংসারে বারংবার জন্ম-মৃত্যুর ভয় থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য ভগবানের সহায়তা লাভই হল '**সাহায্য**'।

এইভাবে উপরিউক্ত সমস্ত শব্দগুলিতেই কেবলমাত্র শরণাগতির ভাব প্রকট হয়। যখন ভগবানেই আসক্তি আসে এবং ভগবানকেই আশ্রয় করা হয় অর্থাৎ ভগবানেই মন ও বুদ্ধি আকৃষ্ট থাকে, তখনই শরণাগতি আসে। মানুষ যদি মন-বুদ্ধিসহ স্বয়ং ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করে তখন শরণাগতির উপরিউক্ত সমস্ত ভাবই তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়।

মন ও বুদ্ধিকে নিজের বলে মনে না করে, 'এ সবই ভগবানের'—দৃঢ়তাপূর্বক এটি মেনে নিলে সাধক '**ময্যাসক্তমনাঃ**' এবং '**মদাশ্রয়ঃ**' হয়ে যান। জাগতিক বস্তুমাত্রই প্রতিমুহূর্তে বিনাশের দিকে অগ্রসর হয় এবং কোনো বস্তুতে কারোরই নিত্য সম্পর্ক থাকে না—সকলেরই এটি অনুভবে থাকে। এই অনুভবকে যদি গুরুত্ব দেওয়া হয় অর্থাৎ যা নাশপ্রাপ্ত হয়, তার সঙ্গে নিজের সম্পর্ক স্থাপন না করা হয়, অর্থাৎ নিজের কল্যাণই উদ্দেশ্য হলে ভগবানে শরণাগতি স্বাভাবিকভাবে এসে থাকে। কারণ জীব স্বরূপতঃ ভগবানেরই। জগতের সঙ্গে সম্পর্ক কেবল মেনে নেওয়া হয়েছে (প্রকৃতপক্ষে সম্পর্ক নেই-ই) এবং ভগবানের সঙ্গে শুধু বিমুখতা হয়েছে (বাস্তবে এই বিমুখতা নেই)। এইজন্য মেনে নেওয়া সম্পর্ক পরিত্যাগ করলে ভগবানের সঙ্গে যে স্বাভাবিক সম্পর্ক রয়েছে, তা প্রকটিত হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব—যাঁর মন সামগ্রিক ভাবেই ভগবানের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে, যিনি সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হয়েছেন এবং যিনি ভগবানের সঙ্গে তাঁর স্বতঃসিদ্ধভাবে নিত্যযোগের (আত্মীয়তার) সম্পর্ককে স্বীকার করেছেন সেই ভক্ত ভগবানের সমগ্ররূপকে জানতে পারেন। সমস্তই ভগবান—ভগবানের সমগ্ররূপই হল তাই।

'**ময্যাসক্তমনাঃ**'-তে প্রেমকে এবং '**মদাশ্রয়ঃ**'-তে শ্রদ্ধাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

'**সমগ্রং মাম্**'— এতে '**সমগ্রম্**' (সমগ্ররূপ) হল বিশেষণ আর '**মাম্**' (ভগবান) হল বিশেষ্য। ভক্তের সম্পর্ক বিশেষণের সঙ্গে না হয়ে বিশেষ্যের (ভগবানের) সঙ্গে হয়ে থাকে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে '**শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাম্**' পদটিতে উদ্ধৃত '**মাম্**'-এর স্বরূপ কী—ভগবান সেটি জানাতে গিয়ে

এখানে বলেছেন যে 'মাম্'-ই আমার সমগ্ররূপ।

'যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু'— এই সমগ্ররূপের বর্ণনা আমি এমনই স্বচ্ছন্দভাবে, যুক্তিপূর্বক এবং বৈশিষ্ট পূর্ণ শৈলীতে করব, যাতে তুমি অনায়াসে যথার্থরূপে আমাকে জানতে পারো।

অর্জুন পূর্ব অধ্যায়ে তাঁর সংশয় প্রকাশ করেছিলেন—**'এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ'** (৬।৩৯), তাই ভগবান বলছেন যে, এবার আমি সেই সব কথাই বলব, যাতে তোমার সংশয়ের কোনো অবশেষ আর না থাকে।

সম্বন্ধ—প্রথম শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে বলেছিলেন যে, তুমি আমার সমগ্ররূপটি যেমনভাবে জানতে পারবে তা শোনো। পরবর্তী শ্লোকে ভগবান তা জানাতে মনস্থ করেছেন।

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্ জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে॥ ২ ॥

[তে (তোমার জন্য) ; **অহম্** (আমি) ; **ইদম্** (এই) ; **সবিজ্ঞানমিদম্** (বিজ্ঞানসহ) ; **জ্ঞানম্** (জ্ঞানের কথা) ; **অশেষতঃ** (সম্পূর্ণরূপে) ; **বক্ষ্যামি** (বলছি) ; **যৎ** (যেটি) ; **জ্ঞাত্বা** (জানলে) ; **ভূয়ঃ** (আর) ; **ইহ** (এই বিষয়ে) ; **জ্ঞাতব্যম** (জানার যোগ্য) ; **অন্যৎ** (অন্য কিছু) ; **ন, অবশিষ্যতে** (অবশিষ্ট থাকে না।)]

তোমার জন্য আমি বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের কথা সম্পূর্ণরূপে বলছি, যেটি জানলে এ বিষয়ে কিছুই আর জানবার অবশিষ্ট থাকবে না ॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা—'জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ'—ভগবান বলেছেন যে, ভাই অর্জুন ! আমি এখন তোমাকে বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের কথা বলব,[1] তোমাকে আমি স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে এটি জানাব। সাধারণতঃ মানুষেরা নিজেদের গুরুর নিকট থেকে আমার স্বরূপ সম্বন্ধে শোনে এবং তাদের লাভও হয়ে থাকে। কিন্তু তোমাকে আমি নিজে জানাব, স্বরূপে আমি কে ? যিনি পরমাত্মাস্বরূপ, আমি নিজেই সেই ! আমি নিজে আমার স্বরূপ যেমন করে বর্ণনা করব, তেমন আর কেউ করতে সক্ষম নয়। কারণ অন্যেরা তা কারও কাছ থেকে জেনে এবং নিজ বুদ্ধি অনুযায়ী বিচার করে বলেন।[2] তাঁদের বুদ্ধি-সমষ্টি বুদ্ধির একটি ছোট্ট অংশমাত্র, তা কতটুকু আর জানতে সক্ষম। তাঁরা প্রথমে অজ্ঞান ছিলেন পরে জ্ঞানী হয়েছেন, কিন্তু আমি সর্বদা অলুপ্তজ্ঞান[3]। আমার মধ্যে অজ্ঞানতা নেই, কখনো ছিল না, হবে না এবং হওয়া সম্ভবও নয়। তাই আমি তোমার জন্য সেই তত্ত্বের বর্ণনা করব, যা জানলে তোমার আর কিছু জানার অবশিষ্ট থাকবে না।

গীতার দশম অধ্যায়ের ষোড়শ শ্লোকে অর্জুন বলেছেন যে, আপনি আপনার সমগ্র বিভূতি (ঐশ্বর্য) জানাতে

[1]'বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের কথা সম্পূর্ণরূপে জানাব'—এতে বিজ্ঞান হল জ্ঞানের বিশেষণ। বিশেষণ বিশেষ্যের বিশেষতা জানায়। এই দৃষ্টিতে বিশেষ্য হল ব্যাপক এবং বিশেষণ ব্যাপ্য অর্থাৎ জ্ঞান (বিশেষ্য) বড় আর বিজ্ঞান (বিশেষণ) ছোট। কিন্তু বিজ্ঞান জ্ঞানের বিশেষতা জানায়—এই দৃষ্টিতে বিজ্ঞান বড় বা শ্রেষ্ঠ। সংসার ভগবান থেকেই উদ্ভূত এবং তাঁতেই বিলীন হয়—এখানে এই মনে করাই জ্ঞান এবং সবই ভগবান, ভগবানই সব হয়ে আছেন, ভগবান ছাড়া আর কিছুই নেই—এটি জানাই হল বিজ্ঞান। এতে জ্ঞান হল সাধারণ এবং বিশিষ্ট হল বিজ্ঞান।

[2]যেমন, কেউ যখন বর্ণনা করেন, তখন তিনি তাঁর অনুভব অনুসারে বর্ণনা করেন, কিন্তু সেটি বুদ্ধি পুরো গ্রহণ করে না। বুদ্ধি যতটা নেয় মন ততটা গ্রহণ করে না আবার মন যতটা গ্রহণ করে, বাক্যে তা প্রকাশ করা যায় না। এইভাবে যখন বক্তা তাঁর অনুভবই পুরোপুরি ব্যক্ত করতে পারেন না অর্থাৎ তিনি তাঁর অনুভবকেই সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে সক্ষম হন না, তখন তিনি ভগবানের মতো কী করে বলবেন ?

[3]যার জ্ঞান কখনো লোপ পায় না।

সক্ষম—**'বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যাহ্যাত্মবিভূতয়ঃ'** তখন তার উত্তরে ভগবান বলেছেন যে, আমার বিভূতির অন্ত নেই, তাই প্রধানতমগুলির কয়েকটি জানাচ্ছি—**'প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে'** (১০।১৯)। আবার অধ্যায়ের শেষে বলেছেন যে, আমার বিভূতির কোনো অন্ত নেই—**'নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ'** (১০।৪০)। এখানে (৭।২) ভগবান বলেছেন যে, আমি বিজ্ঞানসহ জ্ঞানকে সম্পূর্ণভাবে বলছি, বাকি কিছু রাখব না—**'অশেষতঃ'**। এর তাৎপর্য এই বুঝতে হবে যে, আমি তত্ত্বতঃ জানাব। তত্ত্বতঃ জানলে আর কিছু বলার বা জানার বাকি থাকে না।

দশম অধ্যায়ে বিভূতি এবং যোগের কথায় বলা হয়েছে যে, ভগবানের বিভূতির (ঐশ্বর্যের) ও যোগের (সামর্থ্যের) অন্ত নেই। তাৎপর্য হল এই যে, বিভূতির অর্থাৎ ভগবানের যে পৃথক পৃথক শক্তি সেই শক্তির ও যোগের অর্থাৎ সামর্থ্য বা ঐশ্বর্যের অন্ত নেই। রামচরিতমানসে বলা হয়েছে—

নির্গুন রূপ সুলভ অতি সগুন জান নহিঁ কোই।
সুগম অগম নানা চরিত সুনি মুনি মন ভ্রম হোই॥
(শ্রীরামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড, ৭৩খ)

এর তাৎপর্য হল এই যে, সগুণ ভগবানের যে প্রভাব ও ঐশ্বর্য, তার কোনো অন্ত হয় না। যার অন্ত নেই, তাকে জানা মানব-বুদ্ধির অগম্য। কিন্তু যেটি প্রকৃত তত্ত্ব, সেটি মানুষ সহজে বুঝতে সক্ষম হয়। যেমন সোনার গহনা কত আছে মানুষ তা জানতে পারে না। কারণ গহনার কোনো অন্ত নেই। কিন্তু ওইসব গহনায় তত্ত্বতঃ এক সোনা-ই আছে, তা জানা সম্ভব। তেমনই পরমাত্মার সমস্ত বিভূতি এবং সামর্থ্য কেউ জানতে পারে না, কিন্তু সেসবগুলিতে তত্ত্বতঃ এক পরমাত্মাই বিরাজমান, তা মানুষ তাত্ত্বিকভাবে জানতে সক্ষম। পরমাত্মাকে তত্ত্বতঃ জানলে সেই তত্ত্ব দ্বারাই অনুভূতি সম্পূর্ণ হয়, জানার আর কিছু অবশেষ থাকে না। যেমন কেউ যদি বলে 'আমি জল পান করেছি', তার মানে এই নয় যে, জগতে আর জল অবশিষ্ট নেই। অতএব জল পান করায় জল শেষ হয়ে যায়নি, আমার জলের তৃষ্ণা দূর হয়েছে মাত্র। এইভাবে পরমাত্মতত্ত্ব বোধে জানা হলে পরমাত্মতত্ত্ব-জ্ঞানের শেষ হয় না, বরং আমাদের জিজ্ঞাসা পূর্ণ হয়, জিজ্ঞাসার অন্ত হয়, অর্থাৎ একমাত্র (পরমাত্ম) তত্ত্বই বিদ্যমান থাকে।

দশম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, আমার উৎপত্তির বিষয় দেবতা ও মহর্ষিগণও জানেন না এবং তৃতীয় শ্লোকে বলেছেন যে, যিনি আমাকে অজ এবং অনাদি বলে জানেন তিনি মানুষের মধ্যে মোহশূন্য এবং তিনি সর্বপাপ থেকে মুক্ত হয়ে থাকেন। তাহলে যাঁকে দেবতা ও মহর্ষিগণও জানেন না, তাঁকে সাধারণ মানুষ জানতে সক্ষম হবে—তা কী করে সম্ভব ? ভগবান অজ (জন্মরহিত) এবং অনাদি, এটি দৃঢ়ভাবে মানাই হল তাকে জানা। মানুষ ভগবানকে অজ ও অনাদি বলে মেনে নিতে পারে। কিন্তু যেমন কোনো বালক তার মায়ের বিবাহের বরযাত্রী দেখতে সক্ষম নয়, তেমনই সকল প্রাণীর আদি এবং স্বয়ং অনাদি ভগবানকে দেবতা, ঋষি, মহর্ষি, তত্ত্বজ্ঞ, জীবন্মুক্ত প্রভৃতি কেউই জানতে পারেন না। এইরূপ ভগবানের অবতাররূপ গ্রহণের, লীলার, ঐশ্বর্যের বিষয়ও কেউ জানতে পারে না। কারণ তিনি অপার, অগাধ, অনন্ত। কিন্তু তত্ত্বতঃ তাঁকে জানা সম্ভব।

পরমাত্মতত্ত্ব জানার জন্য 'জ্ঞানযোগে' জানবার প্রাধান্য থাকে এবং 'ভক্তিযোগে' মেনে নেবার প্রাধান্য থাকে। বাস্তবিক মেনে নেওয়া অত্যন্ত সুদৃঢ় হয়। সেটিকে কেউ টলাতে পারে না অর্থাৎ মান্যকারী যতক্ষণ তার মেনে নেওয়া বিষয় থেকে নিজে না সরে আসে, ততক্ষণ কারো সাধ্য নেই তাকে সেই বিষয় থেকে সরায়। যেমন, মানুষ জগৎ এবং জাগতিক বস্তুসমূহকে নিজেদের প্রয়োজনীয় বলে মনে করে থাকে । এই মেনে নেওয়া ব্যাপার সে নিজে ত্যাগ না করলে অন্য কেউ তা ছাড়াতে পারে না। কিন্তু যখন সে নিজে জানতে পারে যে, এইসব পদার্থ উৎপন্ন হয় আর নষ্ট হয়ে যায়, তখন সে তার ধারণা বদলাতে পারে। কারণ সে বুঝতে পারে তার ধারণা হল অসত্য, মিথ্যা। যখন অসত্য ধারণাকেই কেউ ত্যাগ করাতে সক্ষম হয় না তখন যে প্রকৃত পরমাত্মা সকলের মূল, এসত্য যখন কেউ মেনে নেয় অর্থাৎ এতে ধারণা দৃঢ় হয়, তখন তার এই মেনে নেওয়াকে কে বদলাতে পারে ? কারণ এটি যে প্রকৃত সত্য। এই মান্যতা জ্ঞানের থেকে কোনো অংশে কম নয়, তা জ্ঞানের সমানই দৃঢ় হয়ে থাকে।

ভক্তিমার্গে মেনে নেওয়াই হল প্রধান। যেমন দশম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে অর্জুনকে বলেছেন যে, 'হে

মহাবাহো অর্জুন ! আমি তোমার হিতের জন্য পরম (সর্বোৎকৃষ্ট) কথা বলছি, শোনো অর্থাৎ তুমি এই কথা মেনে নাও।' সেটি হল ভক্তির প্রকরণ। তাই সেখানে মেনে নেওয়ার কথা বলেছেন। জ্ঞানমার্গে জানাই হল প্রধান। যেমন, চতুর্দশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, 'আমি আবার জ্ঞানসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম জ্ঞানের কথা বলছি, যা জেনে সমস্ত মুনি পরম মোক্ষ লাভ করেছেন।' সেটি জ্ঞানের প্রকরণ, তাই সেখানে জানার কথা বলেছেন। ভক্তিমার্গে মানুষ মেনে নিয়ে জানতে পারে এবং জ্ঞানমার্গে জেনে নিয়ে তার পর মানে। সুতরাং পূর্ণতা প্রাপ্ত হলে দুটিই এক হয়ে যায়।

জ্ঞান এবং বিজ্ঞান সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা

জগৎ ভগবান হতেই সৃষ্ট এবং তাঁতেই বিলীন হয়, অতএব ভগবান হচ্ছেন এই জগতের মহাকারণ—এটি মেনে নেওয়াকে বলা হয় 'জ্ঞান'। ভগবান ছাড়া আর কিছুই নেই, সবই তিনি, ভগবান স্বয়ং সবকিছু হয়ে আছেন—এটি অনুভব করাকে বলা হয় 'বিজ্ঞান'।

পরা ও অপরা প্রকৃতি আমার ; এরই সংযোগে সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি হয়ে থাকে এবং আমি এই সম্পূর্ণ জগতের মহাকারণ (৭।৪-৬)—এইভাবে ভগবান 'জ্ঞানের' কথা বলেছেন। আবার, আমার থেকে ভিন্ন আর কিছুই নেই, সুতো দিয়ে তৈরি এবং তাতেই গ্রথিত মণিমালার মতো সমস্ত কিছু আমাতেই ওতঃপ্রোত হয়ে আছে (৭।৭)—এইভাবে ভগবান 'বিজ্ঞানের' কথা জানিয়েছেন।

জলে রস, চন্দ্র-সূর্যে প্রভা আমিই, সমস্ত প্রাণীর আদি (সনাতন) বীজও আমি ; সাত্ত্বিক-রাজসিক-তামসিক ভাব আমা হতেই উৎপন্ন হয় (৭।৮-১২)—এইভাবে 'জ্ঞান' সম্বন্ধে জানিয়েছেন। পুনরায় এগুলি সব আমাতে নেই এবং আমিও এগুলিতে নেই, অর্থাৎ সবকিছুই আমি, কারণ এগুলির পৃথক সত্তা নেই (৭।১২)—এইভাবে 'বিজ্ঞান' সম্বন্ধে বলেছেন।

যে ব্যক্তি আমার থেকে গুণগুলিকে পৃথক বলে মনে করে, সে মোহগ্রস্ত জানবে। কিন্তু যে ব্যক্তি গুণে মোহিত না হয়ে অর্থাৎ এই সমস্ত গুণ ভগবান থেকে উৎপন্ন হয়ে ভগবানেই লীন হয়ে যায়—এইরূপ মেনে আমার শরণ নেয়, সে এই গুণময়ী মায়া অতিক্রম করে। আমার শরণাগত এরূপ ভক্ত চার প্রকারের হয়ে থাকে—অর্থার্থী, আর্ত, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী (প্রেমিক)। এরা সকলেই উদার কিন্তু জ্ঞানী অর্থাৎ প্রেমিক ভক্ত আমার অত্যন্ত প্রিয়, আমার আত্মস্বরূপ (৭।১৩-১৮)—এইভাবে 'জ্ঞানের' কথা বলেছেন। 'সবকিছু বাসুদেবই' এরূপ যাঁর অনুভূতি সেই মহাত্মা সুদুর্লভ (৭।১৯)—এইভাবে 'বিজ্ঞানের' কথা জানিয়েছেন।

আমাকে না মেনে যারা কামনাবশতঃ দেবতাদের শরণাগত হয়, তাদের অন্তবিশিষ্ট ফল (জন্ম-মৃত্যু) প্রাপ্তি ঘটে এবং যাঁরা আমার শরণাগত হয়, তাঁরা আমাকেই প্রাপ্ত হয়। যারা আমাকে জন্মরহিত এবং অবিনাশী বলে জানে না, আমি তাদের নিকট প্রকটিত হই না। আমি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান—এই তিন কাল এবং তাতে অবস্থিত সমস্ত প্রাণীকে জানি, কিন্তু আমাকে কেউ জানে না। যে ব্যক্তি দ্বন্দ্ব-মোহে[১] মোহগ্রস্ত হয়, সে বারংবার জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হয়। যে ব্যক্তি দৃঢ়নিশ্চয় হয়ে আমার শরণাগত হয় তার সমস্ত পাপ দূরীভূত হয় এবং সে নির্দ্বন্দ্ব হয়ে থাকে (৭।২০-২৮)। এইরূপে ভগবান 'জ্ঞানের' কথা বলেছেন। আবার যে আমাকে আশ্রয় করে, সে ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম, অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞ সম্বন্ধে জেনে থাকে অর্থাৎ চর-অচর সমস্ত আমি-ই, এটি সে অনুভব করে (৭।২৯-৩০)। এইরূপে তিনি 'বিজ্ঞান' সম্বন্ধে জানিয়েছেন।

'যজ্ জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে'—বিজ্ঞানসহ জ্ঞানকে জানার পর আর কিছু জানার অবশিষ্ট থাকে না। তাৎপর্য হল এই যে, আমি ভিন্ন জগতের মূল আর কেউ-ই নেই, কেবল আমিই আছি—**'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়'** (গীতা ৭।৭) এবং তত্ত্বতঃ সবকিছু বাসুদেবই—**'বাসুদেবঃ সর্বম্'** (৭।১৯), আর কেউই নেই—এটি জেনে নিলে আর কী বাকি থাকে জানবার ? কারণ এটি ছাড়া আর কিছুই জানবার যোগ্য নেই। যদি সেই এক পরমাত্মাকে না জেনে জগতের অন্যান্য বিদ্যাকে জানা হয়, তবে প্রকৃতপক্ষে কিছুই জানা হয় না, শুধু পণ্ডশ্রমই করা হয়।

'জানার কিছু বাকি থাকে না'—এর অর্থ হল এই যে

[১]দুই বিপরীত ভাব-সমন্বয়কে দ্বন্দ্ব বলা হয়, যেমন—সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, ছোট-বড় প্রভৃতি।

ইন্দ্রিয় দ্বারা, মন দ্বারা, বুদ্ধির দ্বারা যে পরমাত্মাকে জানা, তা প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ জানা নয়। কারণ এই ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি সবই প্রাকৃত, তাই এগুলি প্রকৃতির অতীত তত্ত্ব জানতে সক্ষম নয়। স্বয়ং যখন পরমাত্মার শরণাগত হয়, তখন স্বয়ং-ই পরমাত্মাকে জানে। কেন-না পরমাত্মাকে স্বয়ং-এর দ্বারাই জানা সম্ভব, মন-বুদ্ধি ইত্যাদির সাহায্যে নয়।

পরিশিষ্ট-ভাব—পরা ও অপরা প্রকৃতির অস্তিত্ব পৃথক নয়, এটি হল 'জ্ঞান' এবং পরা-অপরা সমস্ত হল ভগবান, এটি হল 'বিজ্ঞান'। সুতরাং অহম্ সহ সব কিছুই ভগবান—এটিই হল বিজ্ঞান সহ জ্ঞান।

'জ্ঞাতব্যম্'—যা অবশ্যই জানা উচিত এবং যা জানা সম্ভব, তাকেই বলা হয় 'জ্ঞাতব্য'।

বিজ্ঞানসহ জ্ঞানকে অর্থাৎ ভগবানের সমগ্ররূপ জানার পর জানার আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না অর্থাৎ যিনি প্রকৃত তত্ত্ব জানতে আগ্রহী, তাঁর আর কোনো কিছু জানতে বাকি থাকে না। কারণ একমাত্র ভগবান ব্যতীত যখন আর কোনো কিছুই নেই (গীতা ৭।৭), তখন জানবার আর কী বাকি থাকে?

এখানে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে 'বিজ্ঞান সহ জ্ঞান' বলায় জ্ঞানের প্রাধান্য এবং বিজ্ঞানের গৌণত্ব দেখা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। কেবলমাত্র 'জ্ঞানের' সাহায্যে মুক্তিলাভ হতে পারে। কিন্তু প্রেমের অনন্ত আনন্দ তখনই পাওয়া যায়, যখন জ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞানও যোগ হয়। 'জ্ঞান' হচ্ছে অর্থের মতো আর 'বিজ্ঞান' হল আকর্ষণ। যেমন অর্থের আকর্ষণে যে সুখ থাকে, তা অর্থে নেই, তেমনই 'বিজ্ঞানে' (ভক্তিতে) যে আনন্দ আছে, তা 'জ্ঞানে' নেই। 'জ্ঞানে' আছে অখণ্ডরস, কিন্তু 'বিজ্ঞানে' রস প্রতিমুহূর্তে বর্ধমান। তাই 'বিজ্ঞানসহ জ্ঞান' বলায় ভগবানের লক্ষ্য প্রধানতঃ 'বিজ্ঞানে'রই দিকে এবং সেটিকেই ভগবান শ্রেষ্ঠ বলে জানাতে চান, কারণ 'বিজ্ঞান' হল সমগ্রতার বাচক।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—ভগবান দ্বিতীয় শ্লোকে বলেছিলেন যে, তিনি সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের কথা বলবেন, যাতে আর কিছুই জানার বাকি না থাকে। যদি জানার কিছুই আর অবশিষ্ট না থাকে, তাহলে সব মানুষই কেন ওই তত্ত্ব জানতে চায় না? পরবর্তী শ্লোকে তার উত্তর দিয়েছেন।

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥ ৩ ॥

[**সহস্রেষু** (সহস্র সহস্র) ; **মনুষ্যাণাম্** (মানুষের মধ্যে) ; **কশ্চিদ্** (কোনো একজন) ; **সিদ্ধয়ে** (প্রকৃত সিদ্ধির জন্য) ; **যততি** (চেষ্টা করে) ; **যততাম্** (সেই যত্নশীল) ; **সিদ্ধানাম্** (সিদ্ধ ব্যক্তিগণের মধ্যে) ; **কশ্চিৎ** (কোনো একজন) ; **অপি** (ই) ; **মাম্** (আমাকে) ; **তত্ত্বতঃ** (যথার্থরূপে) ; **বেত্তি** (জানতে পারেন।)]

সহস্র সহস্র মানুষের মধ্যে কোনো একজন প্রকৃত সিদ্ধিলাভের জন্য চেষ্টা করেন এবং ওই যত্নশীল সিদ্ধ ব্যক্তিগণের মধ্যে কোনো একজন আমাকে যথার্থভাবে জানতে পারেন ॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা—**'মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে'**[1]—হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কোনো একজন আমার প্রাপ্তি লাভের জন্য চেষ্টা করে। তাৎপর্য হল এই যে, যার মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে অর্থাৎ যার পশুদের মতো কেবল খাওয়া-পরা, আরাম-বিলাসই উদ্দেশ্য নয়, সে-ই বাস্তবে মনুষ্য পদবাচ্য। সেইসব মানুষদের মধ্যেও নীতি ও ধর্মপথে চলা ব্যক্তি কয়েক হাজার আছে। সেই কয়েক হাজার মানুষের মধ্যে কোনো একজনই হয়ত

[1]সংখ্যাবাচক শব্দকে যদি কারোর বিশেষণ বলা হয়, তবে সে শব্দে একবচনই হয়ে থাকে। যদি তার যোগে ষষ্ঠী করা হয়, তাহলে সংখ্যাবাচক শব্দে তিনটি বচনই হয়। এখানে 'মনুষ্যাণাম্' পদে সহস্র সংখ্যার যোগে ষষ্ঠী হয়েছে এবং 'সহস্রাণি' পদে নির্ধারণ অর্থে সপ্তমীর বহুবচন হয়েছে। অতএব 'মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে' পদটির অর্থ হল—'মনুষ্যাণাং সহস্রাণি ভগবতি রুচিং কুর্বন্তি সহস্রেষু কশ্চিৎ সিদ্ধয়ে যততি চ' হাজার হাজার মানুষ ভগবানে রুচি রাখেন, কিন্তু তাদের মধ্যে কোনো একজন সিদ্ধির জন্য যত্ন করে থাকেন।

সিদ্ধিপ্রাপ্তির জন্য[১] চেষ্টা করে অর্থাৎ যার থেকে বড় আর কোনো লাভ নেই, যাতে দুঃখের লেশমাত্র থাকে না এবং আনন্দের বিন্দুমাত্রও ঘাটতি নেই, কোনো সম্ভাবনাই নেই—এরূপ স্বতঃসিদ্ধ নিত্যতত্ত্ব প্রাপ্তির জন্য যত্নশীল হয়।

যিনি পরলোকে স্বর্গাদি প্রাপ্তি চান না এবং ইহলোকে ধন, মান, ভোগ, কীর্তি ইত্যাদিও আশা করেন না অর্থাৎ উৎপত্তি ও বিনাশশীল বস্তুতে আগ্রহী হন না এবং ভোগ বিলাস ও মান-মর্যাদা, আদর-আপ্যায়ন ইত্যাদির সংস্কারবশতঃ, বিষয়গুলির সংস্পর্শে এলেও এবং সেই বিষয়ে রুচি থাকলেও যে ব্যক্তি নিজ ধারণা, উদ্দেশ্য, সিদ্ধান্ত থেকে বিচলিত হন না—এরূপ ব্যক্তিই সিদ্ধিলাভ করার জন্য যত্নশীল হন। এতেই প্রমাণিত হয় যে, পরমাত্মপ্রাপ্তিরূপ সিদ্ধির জন্য যত্নশীল ব্যক্তি অর্থাৎ দৃঢ়তা সহকারে সিদ্ধির জন্য যত্নশীল ব্যক্তি খুবই কম হয়ে থাকে।

পরমাত্মপ্রাপ্তির জন্য চেষ্টা না করার কারণ হল— ভোগ ও সম্পদ সংগ্রহে আসক্ত থাকা। জাগতিক ভোগ্য-পদার্থগুলিতে কেবল প্রারম্ভেই সুখ অনুভূত হয়। মানুষ প্রায়শই তৎক্ষণাৎ সুখদায়ক কর্মেই ব্যাপৃত হয়। তার পরিণাম যে কী হবে—তা আর তারা চিন্তা করে না। যদি তারা ভোগ এবং ঐশ্বর্যের পরিণামের ওপর এইভাবে চিন্তা করে যে, 'ভোগ এবং সম্পদ সংগ্রহের পরিণামে কিছুই পাওয়া যায় না, রিক্ত হতে হয় আর ওগুলি প্রাপ্তির জন্য কৃত পাপকর্মের ফলস্বরূপ চুরাশী লক্ষ জন্ম এবং নরকের রূপে শুধু দুঃখই মেলে' তাহলে তারা পরমাত্মার সাধনায় তৎপর হয়। অপর কারণ হল এই যে, লোকেরা প্রায়শঃ জাগতিক ভোগেই ব্যাপৃত থাকে। এদের মধ্যে কিছু ব্যক্তির জাগতিক ভোগ থেকে উত্তরণ ঘটলেও পরলোকে স্বর্গাদি ভোগ পাবার জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু যাতে নিজের কল্যাণ হয়, পরমাত্মা লাভ হয়—এরূপ দৃঢ়নিশ্চয় করে পরমাত্মার শরণাগত খুব কম লোকই হয়ে থাকে। ইতিহাসেও সকামভাবে তপস্যাদি সাধনকারী ব্যক্তির চরিত্র বিশেষভাবে উল্লিখিত দেখা যায়। কল্যাণের জন্য তৎপরতার সঙ্গে সাধনকারী ব্যক্তির জীবন-প্রসঙ্গ খুব কমই পাওয়া যায়।

প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মতত্ত্ব লাভ করা কঠিন বা দুর্লভ নয়, বরং সত্যকার ইচ্ছা নিয়ে তৎপরতার সঙ্গে সাধন করা ব্যক্তিরই অভাব রয়েছে। এইদিকে দৃঢ়তার সঙ্গে না লেগে সংযোগজনিত সুখে আকৃষ্ট হওয়া এবং পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তির জন্য ভবিষ্যতের আশা[২] রাখাই হল ভগবদ্মুখী না হবার আসল কারণ।

লোকে প্রায়শঃ এই (তৃতীয়) শ্লোকটিকে তত্ত্বের কাঠিন্য প্রকাশক বলে মনে করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই শ্লোকটি তত্ত্বের কাঠিন্যের বিষয়ে নয়। কারণ পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তি কঠিন নয়, বরং তত্ত্ব প্রাপ্তির তীব্র আগ্রহ হওয়া এবং অভিলাষ পূরণের জন্য তত্ত্বজ্ঞ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ লাভ করাই দুর্লভ, কঠিন। ভগবান এখানে অর্জুনকে বলছেন যে, 'আমি বর্ণনা করছি যাতে তুমি জানতে পারো',

---

[১]স্বর্গাদি লোক এবং অণিমা, মহিমা, গরিমা ইত্যাদি সিদ্ধির প্রাপ্তি প্রকৃতপক্ষে সিদ্ধি নয়, বরং এগুলি সবই অসিদ্ধি ; কারণ এগুলি পতনকারক অর্থাৎ বারংবার জন্ম-মৃত্যু প্রদানকারী (৯।১২)। তাই এইস্থানে পরমাত্মার প্রাপ্তিকেই সিদ্ধিরূপে বলা হয়েছে।

[২]পরমাত্মা সর্বদেশে, সর্বকালে, সকল ব্যক্তিতে, সকল বস্তুতে, সর্ব ঘটনায়, সকল পরিস্থিতিতে এবং সমস্ত ক্রিয়াতে স্বতঃ পরিপূর্ণরূপে রয়েছেন ; সুতরাং তাঁর প্রাপ্তিতে ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। পরমাত্মতত্ত্ব কর্মজনিত নয়। যে বস্তু কর্মজনিত হয়, তা ভবিষ্যতে পাওয়া যায়। কারণ যে বস্তু কর্মজনিত হয় তা উৎপত্তি ও বিনাশশীল হয়ে থাকে এবং তাতে দেশ ও কালের ব্যবধান থাকে। তাই তার প্রাপ্তিতে ভবিষ্যৎ আছে। মানুষের এটি বিচার করা উচিত যে, পরমাত্মা সর্বদেশে থাকলে এখানেও আছেন, এখানেই যখন আছেন তখন কোথাও যাবার আর প্রয়োজন নেই। পরমাত্মা সবসময়ে থাকলে এখনও আছেন, তবে ভবিষ্যৎ কীসের ? পরমাত্মা সবের মধ্যে থাকলে আমার মধ্যেও আছেন, যখন আমার মধ্যেই তিনি আছেন, তখন অন্যত্র খোঁজার পরতন্ত্রতা নেই। পরমাত্মা সকলের হলে, তিনি আমারও ; তিনি যখন আমার তখন আমার অত্যন্ত প্রিয় হওয়া উচিত ; কারণ নিজের জিনিস সকলেরই প্রিয় হয়। আবার, ভগবান হলেন সর্বোত্তম অর্থাৎ তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই—এরূপ বিশ্বাস হলে স্বভাবতঃই মন ভগবানে আকৃষ্ট হয়।

উপরিউক্ত বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস হলে পরমাত্মপ্রাপ্তির ইচ্ছা ভবিষ্যতের ওপর নির্ভরশীল হয় না ; অধিকন্তু পরমাত্মাকে তৎক্ষণাৎ প্রাপ্ত করার ব্যাকুলতা জেগে ওঠে।

অতএব অর্জুনের মতো নিজ শ্রেয় সম্পর্কে প্রশ্নকারী এবং ভগবানের মতো সর্বজ্ঞ বক্তা লাভ করা অত্যন্ত দুর্লভ। প্রকৃতপক্ষে কেবল তীব্র অভিলাষ হওয়াই দুর্লভ। কারণ অভিলাষ হলে সেটি জানানোর দায়িত্ব হল ভগবানের।

এখানে 'তত্ত্বতঃ' বলার অর্থ হল এই যে, সেই ব্যক্তি আমার সগুণ-নির্গুণ, সাকার-নিরাকার, শিব-শক্তি, গণেশ, সূর্য, বিষ্ণু ইত্যাদি রূপে প্রকাশিত এবং কখনো কখনো নানাপ্রকার অবতাররূপ গ্রহণকারী আমাকে তত্ত্বতঃ জেনে থাকে অর্থাৎ তাঁর এই জানায় কোনপ্রকার সন্দেহের অবকাশ থাকে না এবং তাঁর অনুভূতিতে এক পরমাত্মতত্ত্ব ব্যতিরেকে জগতের আর কোনো সত্তা বিন্দুমাত্র থাকে না।

পরিশিষ্ট-ভাব—কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগাদি যতপ্রকার সাধন প্রণালী আছে, তার মধ্যে (যত্নশীল হয়ে) যিনি সিদ্ধিলাভ করেছেন সেই জীবন্মুক্ত জ্ঞানী মহাপুরুষদের মধ্যেও 'সমস্ত কিছু ভগবান'—এইভাবে ভগবানের সমগ্ররূপটি সম্যক্‌ভাবে অনুভবকারী প্রেমিক ভক্ত অত্যন্ত দুর্লভ[১] (গীতা ৭।১৯)

'যততামপি সিদ্ধানাম্'— এইসকল সিদ্ধ অর্থাৎ জীবন্মুক্ত ব্যক্তি তাঁদের অবস্থানে (মুক্ত অবস্থাতে) সন্তুষ্ট হন না এবং তাঁদের মধ্যে পরমপ্রেম (অনন্তরস) লাভ করার আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা থাকে। তাই ব্রহ্মসূত্রে বলা হয়েছে যে — **'মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ'** (১।৩।২)। 'সেই প্রেমস্বরূপ ভগবানকে মুক্ত পুরুষদের পক্ষেও প্রাপ্তব্য বলে জানানো হয়েছে'। কারণ মুক্তিলাভ করলে বিনাশশীল রসের আকাঙ্ক্ষা দূর হয় কিন্তু অন্তররসের ক্ষুধা দূর হয় না। সেই ক্ষুধা ভগবানের কৃপাতেই জাগ্রত হয়। তাৎপর্য হল যাঁরা ভগবানে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস অটুট রেখে সাধন-ভজন করেন, যাঁদের মধ্যে ভক্তির সংস্কার আছে, ভগবান তাঁদের শুধুমাত্র জ্ঞানলাভের দ্বারা সন্তুষ্ট হতে দেন না, তাতে স্থায়ী হয়ে থাকতে দেন না এবং তাঁদের মুক্তিরসকে নীরস করে দেন।

কর্মযোগী, জ্ঞানযোগী, ধ্যানযোগী সকলেই সিদ্ধি (মুক্তি) লাভ করতে পারেন, কিন্তু সকলেই ভগবানের সমগ্ররূপ জানতে সক্ষম হন না। সুতরাং **'যততামপি সিদ্ধানাম্'** পদটির অর্থ হল এই যে এঁরা যত্নশীল হয়ে নিজ নিজ পদ্ধতির সাহায্যে সিদ্ধিলাভ করলেও আমার সমগ্ররূপ জানতে সক্ষম হন না ! কারণ শুধুমাত্র পরাভক্তির সাহায্যেই আমার সমগ্ররূপকে জানা সম্ভব — **'ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ'** (গীতা ১৮।৫৫)।

'কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ'— এখানে **'মাম্'** পদটি সমগ্র পরমাত্মার বাচক। ভগবানের সমগ্ররূপ শুধুমাত্র ভগবানের কৃপাদ্বারাই জানা সম্ভব, বিচার দ্বারা নয় (গীতা ১০।১১)। অর্জুনও গীতা শ্রবণ করার পর ভগবানকে বলেছেন যে, আপনার কৃপায় আমার মোহ দূরীভূত হয়েছে এবং আমি স্মৃতিলাভ করেছি—**'নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদাৎ ময়াচ্যুত'** (১৮।৭৩)। আপন বৎসকে দুধ পান করাবার সময় যেমন গাভী স্নেহপূর্বক তার গাত্র লেহন করে, তাতে গো-বৎস যেমন পুষ্টিলাভ করে, শুধুমাত্র দুধ পান করলে সেই পুষ্টি সম্ভব হয় না। তেমনই ভগবানের কৃপায় যে জ্ঞান হয়, তা নিজ বিচার-বিবেচনাতে হয় না। কেন-না বিচার বিবেচনাতে বিবেচনাকারীর নিজের প্রাধান্য থাকে।

যাঁরা শুধু নির্গুণকে জানেন তাঁরা পরমাত্মাকে তত্ত্বতঃ জানতে পারেন না, যাঁরা সগুণ-নির্গুণ উভয়কেই (সমগ্ররূপকেই) জানেন, তাঁরাই পরমাত্মাকে তত্ত্বতঃ জানতে সক্ষম হন।

কর্মযোগের দ্বারা 'শান্ত-আনন্দ' (শান্তি) প্রাপ্তি হয়, কারণ সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক হলেই অশান্তি হয়। কর্মযোগের সাহায্যে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়াতে শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়—**'ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্'** (গীতা ১২।১২)। জ্ঞানযোগের সাহায্যে 'অখণ্ড আনন্দ' লাভ হয়। অখণ্ড আনন্দকে 'নিজানন্দ'ও বলা হয়, কারণ এটি হল নিজ স্বরূপের আনন্দ। নিজানন্দে জীবের ব্রহ্মের সঙ্গে সাধর্ম্য হয় অর্থাৎ ব্রহ্ম যেমন সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ, জীবও তেমনই সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ হয়ে ওঠে—**'মম সাধর্ম্যমাগতাঃ'** (গীতা ১৪।২)। যদিও নিজানন্দ প্রাপ্তি হলে সাধকের কোনো কিছুরই কামনা থাকে না, তবুও যাঁদের মধ্যে ভক্তির সংস্কার থাকে এবং ভগবানের কৃপার আশ্রয় থাকে, তাঁরা নিজানন্দে সন্তোষলাভ

---

[১]ধর্মশীল বিরক্ত অরু গ্যানী। জীবন্মুক্ত ব্রহ্মপর প্রানী। সব তে সো দুর্লভ সুররায়া। রাম ভগতি রত গত মদ মায়া॥
(শ্রীরামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ৫৪।৩-৪)

করেন না[১]। এঁদের মধ্যে 'অনন্ত আনন্দের' আকাঙ্ক্ষা থাকে। সুতরাং ভক্তিযোগ দ্বারা 'অনন্ত আনন্দ' লাভ করা যায়। নিজানন্দে কেবল অংশের (স্বরূপের) আনন্দ হয়। কিন্তু অনন্ত আনন্দ হল অংশীর (ভগবানের) আনন্দ। সিদ্ধান্ত হল এই যে বস্তুর আকর্ষণে যে সুখ হয় সেই সুখ বস্তুর জ্ঞানে হয় না। যেমন টাকার লোভে যে সুখ পাওয়া যায়, তা টাকার জ্ঞান হলে পাওয়া যায় না। টাকার জ্ঞান হলে তার ব্যবহার করার বুদ্ধি আসে কিন্তু বিশেষ আকর্ষণ হয় না। 'আরো আসুক, আরো পাই'—লোভ হলে তবেই তো এই আকর্ষণ হয়। লোভরূপ দোষের জন্যই টাকায় সুখ পাওয়া যায়, যদিও বাস্তবে তা নেই। কিন্তু ভগবানে আনন্দ নির্দোষ প্রেমের জন্য হয়ে থাকে, যা বাস্তব সত্য। কারণ ভগবানের অংশ হওয়ার জন্যই জীবের মধ্যে অংশীর (ভগবানের) প্রতি আকর্ষণ স্বতঃ ও স্বাভাবিক। সিদ্ধান্ত এই যে, অংশ অংশীর দিকে স্বাভাবিক ভাবেই আকর্ষণ বোধ করে, যেমন পৃথিবীর অংশ হওয়ায় পাথরকে উপরে ছুঁড়ে দিলে তা স্বতঃই পৃথিবীতে ফিরে আসে,আগুন স্বতঃই সূর্যের দিকে (উপরে) উঠে থাকে[২]। নদীগুলি স্বতঃই সমুদ্রের দিকে ধাবমান হয়, ইত্যাদি।

আমাদের ভগবানকে প্রয়োজন হয় কেন ?—এই প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, আমাদের এমন কিছু প্রয়োজন আছে, যেগুলি আমরা নিজেরাও পূরণ করতে পারি না এবং জগৎ সংসারের দ্বারাও পূরণ হওয়া সম্ভব নয়। দুঃখ দূর করার জন্য এবং পরমশান্তি লাভ করার জন্য আমাদের ভগবানের প্রয়োজন নেই। কারণ আমরা যদি কামনাগুলি সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করি তাহলে স্বতঃই আমাদের দুঃখ দূর হয়ে পরমশান্তি প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব হয় '**ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্**' অর্থাৎ আমরা মুক্ত হয়ে যাই। পরম প্রেম প্রাপ্তির জন্যই আমাদের ভগবানকে প্রয়োজন, কেন-না আমরা ভগবানেরই অংশ।

যে সব ব্যক্তি জাগতিক দুঃখ থেকে মুক্তি চায়, পরাধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন হতে চায়, তারা মুক্ত হয়ে যায় । কিন্তু যারা জগৎ সংসারে দুঃখ পেয়ে মনে করতে থাকে যে, আমার যদি কেউ আপন-জন হতেন, যিনি আমাকে তাঁর শরণাগত করে, বুকে টেনে নিয়ে আমার দুঃখ, শোক, পাপ, অভাব, ভয়, নীরসতা ইত্যাদি দূর করবেন, তারা ভক্তি লাভ করে। তাৎপর্য হল এই যে, মুক্তি প্রাপ্ত হবার জন্য ঈশ্বরের প্রয়োজন নেই, কিন্তু ভক্তিলাভ করার জন্য ঈশ্বরের প্রয়োজন হয়। মানুষ যখন জানতে পারে যে, এই বিরাট জগৎ-সংসারে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কোনো বস্তুই নিজস্ব নয়, কিন্তু যাঁর একাংশে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত, তিনিই একমাত্র আপন, তখন তার মধ্যে ভগবানের প্রয়োজন অনুভূত হয়। কারণ নিজস্ব বস্তু একমাত্র তাই হতে পারে যা সর্বদা আমাদের সঙ্গে থাকে এবং আমরাও সর্বদা তারই সঙ্গে থাকি, যা কখনো আমাদের থেকে আলাদা হয় না এবং আমরাও কখনো তার থেকে পৃথক হই না। ভগবানই একমাত্র সেই বস্তু হতে সক্ষম।

এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে, যখন মানুষের ভগবানকে প্রয়োজন, তখন ভগবানকে কেন পাওয়া যায় না ? এর উত্তর হল যে মানুষ ভগবান-প্রাপ্তি ছাড়াই সুখ ও আরামে থাকে, তাই সে এই প্রয়োজনকে ভুলে যায়। সে প্রাপ্ত বস্তু, যোগ্যতা, এবং সামর্থ্যতেই সন্তুষ্ট থাকে। যদি সে ভগবানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে সক্ষম হয়, তাঁকে ছাড়া শান্তিতে থাকতে না পারে, তাহলে তার ভগবান প্রাপ্তিতে বিলম্ব হয় না। কারণ যা নিত্যপ্রাপ্ত, তাকে পেতে দেরী হবে কেন ? ভগবান তো গাছ নয়, যে আজ গাছ পুঁতলাম আর কয়েক বছর পরে ফল পাওয়া যাবে ! তিনি তো সর্বদেশে, সর্বসময়ে, সর্ববস্তুতে, সর্বাবস্থায়, সর্বপরিস্থিতিতে একই ভাবে বিদ্যমান। আমরাই তাঁর থেকে বিমুখ হয়ে থাকি, তিনি কখনো আমাদের প্রতি বিমুখ হন না।

❋ ❋ ❋

[১]যাঁরা মুক্ত হয়ে যান, তাঁরা তো স্বাভাবিকভাবেই সন্তোষ লাভ করেন, কিন্তু যাঁদের ভক্তির সংস্কার থাকে, তাঁরা সন্তোষ লাভ করেন না। কারণ ভক্তি-সংস্কার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভগবান বিশেষভাবে কৃপা করেন এবং তাঁদের কোথাও আটকে থাকতে দেন না।

[২]এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে রাত্রে তো সূর্য থাকে না, তবুও আগুন রাত্রিবেলা কেন উপর দিকে যায় ? তার উত্তর হল, রাত হোক বা দিন, সূর্য যেখানেই থাকুক, তা সর্বদা পৃথিবীর উপরেই থাকে। তাই ভারতের লোক যেমন সূর্যকে পৃথিবীর উপরে দেখতে পায়, তেমনই (পৃথিবী মণ্ডলে ভারতের প্রায় বিপরীতে অবস্থিত) আমেরিকার লোকেরাও সূর্যকে উপরেই দেখে।

সম্বন্ধ—দ্বিতীয় শ্লোকে ভগবান জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে জানাতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ভগবান এবার জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে জানাবার উপক্রম করছেন।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ ৪ ॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ॥ ৫ ॥

[**ভূমিঃ** (ক্ষিতি) ; **আপঃ** (জল) ; **অনলঃ** (অগ্নি) ; **বায়ুঃ** (বায়ু) ; **খম্‌** (আকাশ) ; **চ** (এবং) ; **মনঃ** (মন) ; **বুদ্ধিঃ** (বুদ্ধি) ; **এব** (এবং) ; **অহংকারঃ** (অহংকার) ; **ইতি** (এভাবে) ; **ইয়ম্‌** (এই) ; **অষ্টধা** (আটপ্রকার) ; **ভিন্না** (ভেদসম্পন্ন) ; **মে** (আমার) ; **ইয়ম্‌** (এই) ; **অপরা** (অপরা) ; **প্রকৃতিঃ** (প্রকৃতি) ; **তু** (এবং) ; **মহাবাহো** (হে মহাবাহো !) ; **ইতঃ** (এই অপরা প্রকৃতি থেকে) ; **অন্যাম্‌** (ভিন্ন) ; **জীবভূতাম্‌** (জীবরূপা) ; **মে** (আমার) ; **পরাম্‌** (পরা) ; **প্রকৃতিম্‌** (প্রকৃতিকে) ; **বিদ্ধি** (জানবে) ; **যয়া** (যার দ্বারা) ; **ইদম্‌** (এই) ; **জগৎ** (জগৎ) ; **ধার্যতে** (ধৃত হয়ে আছে।)]

ক্ষিতি (পৃথিবী), জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ—এই পঞ্চমহাভূত এবং মন, বুদ্ধি, অহংকার—এই আটপ্রকার ভেদসম্পন্ন হল আমার 'অপরা' প্রকৃতি। হে মহাবাহো ! এই অপরা প্রকৃতি থেকে ভিন্ন হল আমার জীবরূপা 'পরা' প্রকৃতি, যার দ্বারা এই জগৎ ধৃত হয়ে আছে জানবে ॥ ৪-৫ ॥

ব্যাখ্যা—যা পরিবর্তিত হয় তা কখনো একরূপে থাকে না, সেই জড়কেই ভগবান অতি সূক্ষ্মভাবে 'ক্ষর' নামে বর্ণনা করেছেন—'**ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি**' (১৫।১৬), আবার '**ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ .....প্রকৃতিরষ্টধা**' (৭।৮) —এই শ্লোকে তাকেই আট ভাগে বিভক্ত করে 'অপরা প্রকৃতি' নামে বলেছেন এবং '**মহাভূতান্যহংকারঃ..... পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ**' (১৩।৫) —এই শ্লোকে এরই বিস্তারিতরূপে চব্বিশটি ভাগ জানিয়েছেন।

'ভূমিরাপোঽনলো বায়ু ....বিদ্ধি মে পরাম্‌'—পরমাত্মা সকলের কারণস্বরূপ। তিনি প্রকৃতি সহযোগে সৃষ্টি তৈরি করে থাকেন[১]। যে প্রকৃতির সহযোগে তিনি সৃষ্টি রচনা করেন, তাকে বলা হয় 'অপরা প্রকৃতি'।

নিজের অংশরূপ যে জীব তাকে ভগবান 'পরা প্রকৃতি' নামে অভিহিত করেছেন। অপরা প্রকৃতি নিকৃষ্ট, জড় ও পরিবর্তনশীল এবং পরা প্রকৃতি শ্রেষ্ঠ, চেতনসম্পন্ন ও অপরিবর্তনীয়।

প্রত্যেক মানুষের ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব হয়ে থাকে। স্বভাবকে যেমন মানুষের থেকে পৃথক করা যায় না, তেমনই পরমাত্মার প্রকৃতিকে পরমাত্মার থেকে পৃথক বা স্বতন্ত্র করা যায় না। প্রকৃতি ভগবানেরই স্বভাব ; তাই একে 'প্রকৃতি' বলা হয়। এইরূপ পরমাত্মার অংশ হওয়ায় জীবকে পরমাত্মা হতে পৃথক করা সম্ভব নয়। কারণ তা স্বরূপতঃ পরমাত্মাই। পরমাত্মার স্বরূপ হলেও অপরা প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কান্বিত হওয়ায় এই জীবাত্মাকেও প্রকৃতি বলা হয়। অপরা প্রকৃতির সম্পর্কে নিজের মধ্যে কৃতি (করা) মেনে নেওয়ার জন্যই এটি জীবরূপ। যদি সে নিজের মধ্যে কৃতি (করা) না মানে, তবে সে পরমাত্মারই স্বরূপ। তখন এর জীব বা প্রকৃতি নামের সংজ্ঞা থাকে না অর্থাৎ বন্ধনকারী কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব তখন এর থাকে না (গীতা ১৮।১৭)।

এখানে অপরা প্রকৃতির বর্ণনায় পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহংকার—এই আটটি শব্দ উল্লিখিত হয়েছে। এর মধ্যে যদি পাঁচটিকে স্থূল সৃষ্টি বলে মেনে নেওয়া হয় এবং মন, বুদ্ধি ও অহংকার এই তিনটিকে সূক্ষ্ম সৃষ্টি বলে ধরা হয়, তাহলে কারণরূপ প্রকৃতির বর্ণনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই শ্রদ্ধেয় টীকা-ব্যাখ্যাকারীগণ পাঁচটি স্থূল পদার্থের দ্বারা সূক্ষ্ম পঞ্চ-তন্মাত্রাকে (রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ) ধরেছেন। এগুলি

[১]কোথাও প্রকৃতি সহযোগে ভগবান সৃষ্টি তৈরি করেন (গীতা ৯।৮) আবার কোথাও ভগবানের অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি সৃষ্টি করে (গীতা ৯।১০)—এই দুই রীতিতেই গীতায় জগৎ সৃষ্টি সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

হল পাঁচটি স্থূল পদার্থের কারণ। 'মন' শব্দের দ্বারা অহংকার যা হল মনের কারণ, 'বুদ্ধি' শব্দের দ্বারা মহত্ত্বত্ত্ব (সমষ্টি বুদ্ধি) এবং 'অহংকার' শব্দ দ্বারা প্রকৃতিকে লক্ষ্য করানো হয়েছে। এইভাবে আটটি শব্দের এইরূপ অর্থ গ্রহণ করলে তবেই সমষ্টিগত অপরা প্রকৃতির পূর্ণ বর্ণনা করা সম্ভব। কারণ এতে স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ—ওই তিনেরও কথা বলা হয়ে যায়। শাস্ত্রে এই সমষ্টি প্রকৃতিকে 'প্রকৃতি-বিকৃতি' নামে বর্ণনা করা হয়েছে[১]।

কিন্তু এখানে একটি লক্ষণীয় বিষয় হল এই যে, ভগবান এইখানে অপরা ও পরা প্রকৃতির বর্ণনা 'প্রকৃতি-বিকৃতি'র দৃষ্টিতে করেননি। তিনি যদি তা করতেন তাহলে চেতনকে (প্রকৃতি নামে) বলতেন না। কারণ চেতন প্রকৃতিও নয় এবং বিকৃতিও নয়। এতেই প্রমাণিত হয় যে ভগবান এখানে জড় ও চেতনের পার্থক্য বোঝাবার জন্যই অপরা প্রকৃতির নামে জড়ের এবং পরা প্রকৃতির নামে চেতনের বর্ণনা করেছেন।

এখানে এই তাৎপর্য মনে হয় যে পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ—এই পাঁচটি তত্ত্বের স্থূলরূপের দ্বারা স্থূল সৃষ্টিকে ধরা হয়েছে এবং এর সূক্ষ্মরূপ—যেগুলিকে পঞ্চতন্মাত্রা বলা হয়, তার দ্বারা সূক্ষ্মসৃষ্টি ধরা হয়েছে। সূক্ষ্মসৃষ্টির অন্যরূপ হল মন, বুদ্ধি ও অহংকার।

অহংকার দু'প্রকারের হয়—(১) অহং-অহংরূপ অন্তরের বৃত্তিকেও অহংকার বলা হয়, যেটি হল কারণস্বরূপ। এটি 'অপরা প্রকৃতি', চতুর্থ শ্লোকে এর বর্ণনা করা হয়েছে এবং (২) অহং-রূপে ব্যক্তিত্ব, একদেশীয়তাকেও অহংকার বলা হয়, যেটি হল কর্তারূপ অর্থাৎ নিজেকে ক্রিয়াগুলির কর্তা বলে মনে করা। এটি হল 'পরা প্রকৃতি', পঞ্চম শ্লোকে যেটি বর্ণিত হয়েছে। এই অহংকার কারণ-শরীরে তাদাত্ম্যরূপে থাকে। এই তাদাত্ম্যতে একটি হল জড়-অংশ এবং অপরটি হল চেতন-অংশ। এর জড়-অংশটি হল কারণ-শরীর এবং এতে যে অহংবোধ করে সে হল 'চেতন-অংশ'। যতক্ষণ বোধ না হয়, ততক্ষণ এই জড়-চেতনের তাদাত্ম্যসম্পন্ন কারণ শরীরের 'অহং'-বোধ কর্তারূপে সদা বজায় থাকে। সুষুপ্তির সময় এটি সুপ্ত থাকে অর্থাৎ প্রকটিত হয় না। নিদ্রা থেকে জেগে উঠলে যেমন বলা হয়, 'আমি ঘুমোচ্ছিলাম, এখন জাগরিত হলাম', এইভাবে 'অহং'এর জাগরণ হয়। তারপরে মন ও বুদ্ধি জাগরিত হয়, যেমন—'আমি কোথায়', 'কেমনভাবে আছি'—এই হল মনের জাগরণ এবং 'আমি এই দেশে, এই সময়ে আছি'—এটি নিশ্চিতভাবে জানা হল বুদ্ধির জাগরণ। এইভাবে ঘুম ভাঙলে যেটি অনুভূত হয় তা হল 'অহং', পরা প্রকৃতি এবং বৃত্তিরূপে যে অহংবোধ থাকে, তা হল অপরা প্রকৃতি। অপরা প্রকৃতির প্রকাশকারী এবং আশ্রয়-প্রদানকারী চেতন যখন অপরা প্রকৃতিকে নিজের বলে মনে করে, তখন সে হয় জীবরূপ পরা প্রকৃতি—**'যয়েদং ধার্যতে জগৎ'**।

পরা প্রকৃতি যদি অপরা প্রকৃতি থেকে বিমুখ হয়ে পরমাত্মার সম্মুখীন হয়, পরমাত্মাকে নিজের বলে মনে করে ও অপরা প্রকৃতি হতে সর্বতোভাবে সম্পর্কবর্জিত হয়ে নির্লিপ্ততা অনুভব করে, তবে তার স্বরূপবোধ হয়ে থাকে। স্বরূপবোধ হলে পরমাত্মার প্রেম প্রকটিত হয়[২], যা পূর্বে অপরা প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত থাকায় আসক্তি ও কামনারূপে ছিল। এই প্রেম অনন্ত, অগাধ, অসীম,

---

[১]মূল প্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত। ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ॥ (সাংখ্যকারিকা ৩)

এর অর্থ হল যে মূল প্রকৃতি কিছু থেকে উৎপন্ন হয় না ; তাই এটি কোনো কিছুরই বিকৃতি (কার্য) নয়। মূল প্রকৃতি হতে উৎপন্ন হওয়ার কারণ মহত্ত্বত্ত্ব অহংকার এবং পঞ্চতন্মাত্রা—এই সাতটি পদার্থকে 'বিকৃতি' এবং শব্দাদি পাঁচ বিষয় এবং দশ ইন্দ্রিয়ের উৎপন্ন করার হেতু হওয়ায় এটিকে প্রকৃতিও বলা হয় অর্থাৎ এই সাতটি পদার্থই হল 'প্রকৃতি-বিকৃতি'। শব্দাদি পাঁচটি বিষয়, দশ ইন্দ্রিয়, মন—এই ষোলটি পদার্থ হল 'বিকৃতি'। কারণ এগুলি কারুরই প্রকৃতি (কারণ) নয় অর্থাৎ এর থেকে কোনো কিছু উৎপন্ন হয় না। চেতন প্রকৃতিও নয় বিকৃতিও নয় অর্থাৎ তা কারোরই কারণ বা কার্য নয়।

[২]যে সাধকের জ্ঞানমার্গে বিশেষ আগ্রহ থাকে, তাঁর মধ্যে পরমাত্মার প্রেম নিজ স্বরূপের আকর্ষণের রূপে প্রকটিত হয় এবং যে সাধকের ভক্তির সংস্কার থাকে, তাঁর মধ্যে সেটি প্রভু-প্রেমের রূপে প্রকটিত হয়। জ্ঞানমার্গী সাধকের যদি আগ্রহ না হয় তবে তাঁরও প্রভু-প্রেম প্রকটিত হয়। প্রকৃতপক্ষে স্বরূপ-বোধ হলে জ্ঞানমার্গীর আগ্রহ থাকে না, তাই তাঁর মধ্যে প্রভু-প্রেম প্রকটিত হয়। এইভাবে দেখলে শেষকালে দুজনেই (ভক্তিযোগী ও জ্ঞানযোগী) অভিন্ন হয়ে যান।

আনন্দরূপ এবং প্রতিমুহূর্তে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তাঁর প্রাপ্তি হলে পরা প্রকৃতি প্রাপ্ত-প্রাপ্তব্য হয়ে যায়, আপন অসঙ্গরূপ অনুভূত হলে জ্ঞাত-জ্ঞাতব্য হয়ে যায় এবং অপরা প্রকৃতিকে জগতের সেবায় নিয়োজিত করে জগৎ হতে সম্পূর্ণ বিমুখ হওয়ায় কৃতকৃত্য হয়ে যায়। এই হল মানবজীবনের পূর্ণতা ও সফলতা।

'প্রকৃতিরষ্টধা অপরেয়ম্' পদটির দ্বারা মনে হয় যে এখানে যে আট প্রকারের অপরা প্রকৃতির কথা বলা হয়েছে, তা 'ব্যষ্টি অপরা প্রকৃতি'। এর কারণ হল মানুষের ব্যষ্টি প্রকৃতি অর্থাৎ দেহ দ্বারাই বন্ধন হয়, সমষ্টি প্রকৃতি দ্বারা নয়। কারণ মানুষ ব্যষ্টি শরীরের সঙ্গেই সম্পর্ক পাতায়, ফলে সে আবদ্ধ হয়।

ব্যষ্টি কোনো পৃথক তত্ত্ব নয়, এটি সমষ্টিরই এক ক্ষুদ্র অংশ। সমষ্টির মেনে নেওয়া সম্বন্ধকেই ব্যষ্টি বলা হয় অর্থাৎ সমষ্টির অংশ যখন শরীরের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নেয়, তখন সেই সমষ্টির অংশ শরীরকেই 'ব্যষ্টি' বলা হয়। ব্যষ্টির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করাই হল বন্ধন। এই বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্য ভগবান আটপ্রকার অপরা প্রকৃতির বর্ণনা করে বলেছেন যে জীবরূপ পরা-প্রকৃতিই এই অপরা প্রকৃতিকে ধারণ করে আছে। ধারণ না করলে বন্ধনের প্রশ্নই নেই।

পঞ্চদশ অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে ভগবান জীবাত্মাকে তাঁর অংশ বলে জানিয়েছেন—**'মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ'**। কিন্তু জীবাত্মা প্রকৃতিতে স্থিত মন ও পঞ্চেন্দ্রিয়কে নিজের দিকে আকর্ষণ করে এবং তাকেই আপন বলে মনে করে—**'মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি'**। এইভাবে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে ভগবান ক্ষেত্ররূপে সমষ্টির বর্ণনা করে ষষ্ঠ শ্লোকে ব্যষ্টির বিকারের বর্ণনা করেছেন। কারণ এই বিকার ব্যষ্টিতেই হয়, সমষ্টিতে নয়। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে ব্যষ্টির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করাই হল আসল বাধা। ব্যষ্টির থেকে সম্পর্ক ছেদ করার জন্যই এখানে ব্যষ্টি—অপরা প্রকৃতির বর্ণনা করা হয়েছে, যা প্রকৃতপক্ষে সমষ্টিরই অংশ। ব্যষ্টি প্রকৃতি অর্থাৎ শরীর সমষ্টি সৃষ্টির সঙ্গে সদা অভিন্ন, এর থেকে কখনো ভিন্ন হতে পারে না।

প্রকৃতপক্ষে মূল প্রকৃতি কারোর বন্ধনকারী বা সহায়ক হয় না। সাধক যতক্ষণ তার সঙ্গে সম্পর্ক স্বীকার না করেন, ততক্ষণ এটি সহায়ক হয়, আর যখন তার সঙ্গে সম্বন্ধ স্বীকার করেন তখনই এটি বাধক হয়ে ওঠে, কারণ প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলে ব্যষ্টি অহংকার (অহংভাব) উৎপন্ন হয়। এই অহংবোধই বন্ধনের কারণ হয়।

এখানে **'ইতীয়ং মে'** পদটির দ্বারা ভগবান সতর্ক করে বলেছেন যে এই অপরা প্রকৃতি তাঁর। ভ্রমক্রমে একে আপন মনে করলেই বারংবার জন্ম-মৃত্যু বরণ করতে হয় এবং ভুল যে করে, সেই ভুল শোধরাবার দায়িত্বও তারই। সুতরাং জীব অপরা প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক যেন না পাতায়।

অহংবোধে ভোগের ইচ্ছা এবং জিজ্ঞাসা—এই দুটি থাকে। এর মধ্যে ভোগের ইচ্ছা কর্মযোগের সহায়তায় দূর করা সম্ভব এবং জিজ্ঞাসার (জানার ইচ্ছা) সমাধান জ্ঞানযোগের সাহায্যে করা যায়। কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ—এই দুটির মধ্যে একটি সম্যক্ভাবে অনুষ্ঠিত হলে অপরটি স্বতঃই সম্পন্ন হয়ে থাকে (গীতা ৫।৪-৫) অর্থাৎ ভোগের ইচ্ছা নিবৃত্ত হলে জিজ্ঞাসার পরিপূরণ হয় এবং জিজ্ঞাসা দূর হলে ভোগের আকাঙ্ক্ষা দূর হয়। কর্মযোগে ভোগের ইচ্ছা দূর হলে এবং জ্ঞানযোগে জ্ঞানের তৃষ্ণা মিটলে আসক্তি স্বাভাবিকভাবেই দূর হয়। সেই অনাসক্তিকেও উপভোগ না করলে প্রকৃত বোধের উদয় হয় এবং মনুষ্যজন্ম সর্বতোভাবে সার্থক হয়।

'জীবভূতাম্'—প্রকৃতপক্ষে এটি জীবরূপ নয়, জীব হয়ে রয়েছে। কারণ এটি সাক্ষাৎ পরমাত্মার অংশ। স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ শরীররূপ প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার জন্যই এটি জীব হয়ে আছে। নিজ সুখের আশাতেই এটি সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে। এই সুখই হল এর জন্ম-মরণরূপ দুঃখের একমাত্র কারণ।

'মহাবাহো'—হে অর্জুন ! তুমি অত্যন্ত শক্তিশালী, তাই তুমি এই পরা ও অপরা প্রকৃতির প্রভেদ বুঝতে সক্ষম। অতএব তুমি এটি বোঝার চেষ্টা করো—**'বিদ্ধি'**।

'যয়েদং ধার্যতে জগৎ'[১]—এই জগৎ প্রকৃতপক্ষে জগৎ-রূপ নয়, এটি ভগবানেরই স্বরূপ—**'বাসুদেবঃ সর্বম্'** (৭।১৯), **'সদসচ্চাহম্'** (৯।১৯)। কেবল এই

[১]গীতায় 'জগৎ' শব্দটি কোথাও 'পরা' প্রকৃতির (৭।১৩), কোথাও 'অপরা' প্রকৃতির (৭।৫) আবার কোনো স্থানে 'পরা-অপরা' দুই প্রকৃতিরই বাচকরূপে উল্লিখিত হয়েছে (৬-৭)।

পরা প্রকৃতি—জীব একে জগৎ-রূপে ধারণ করে আছে অর্থাৎ জীব এই জগৎকে পৃথক সত্তাসম্পন্ন মনে করে নিজের সুখের জন্য এটিকে ব্যবহার করে। এতেই জীব আবদ্ধ হয়। জীব যদি জগৎকে পৃথক সত্তা বলে না মেনে একে ভগবৎস্বরূপ বলে মনে করে তাহলেই তার জন্ম-মৃত্যুরূপ বন্ধন দূর হয়।

ভগবানের পরা প্রকৃতি হয়েও জীবাত্মা এই দৃশ্যমান জগৎকে—যা আসলে অপরা প্রকৃতি—ধারণ করে আছে অর্থাৎ এই পরিবর্তনশীল, বিকারসম্পন্ন জগৎকে স্থায়ী, সুন্দর এবং সুখপ্রদ মনে করে 'আমি' এবং 'আমার' রূপে ধারণ করে আছে। যার ভোগ এবং পদার্থসমূহে যত আসক্তি থাকে, আকর্ষণ থাকে, সংসারকে (জগৎকে) এবং শরীরকে সে ততই স্থায়ী, সুন্দর এবং সুখপ্রদ বলে মনে করে। পদার্থ সংগ্রহ এবং সেগুলির উপভোগ করার বাসনাই হল প্রধান বাধাস্বরূপ। সম্পদ সংগ্রহ থেকে অহং অভিমানজনিত সুখ হয় এবং ভোগবিলাসে সংযোগ-জনিত সুখ হয়। সেই সুখাসক্তির জন্যই জীব জগৎকে জগৎরূপে ধারণ করে আছে। এই সুখাসক্তিবশতঃই জীব এই জগৎকে ভগবৎ-স্বরূপে দেখতে সক্ষম হয় না। যেমন স্ত্রীলোক প্রকৃতপক্ষে জনন-শক্তিরূপ হলেও আসক্তিবশতঃ পুরুষ তাকে মাতৃরূপে দেখতে সক্ষম হয় না তেমনি জগৎও আসলে ভগবৎস্বরূপ, একে ভোগ্যবস্তু মানার জন্যই ভোগাসক্ত জীব জগৎকে ভগবৎস্বরূপ দেখতে সক্ষম নয়। এই ভোগাসক্তি অর্থাৎ ভোগের প্রতি আসক্তিই জগৎকে ধারণ করানোতে হেতু হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ মানুষমাত্রেরই শরীরের উৎপত্তি হয় রজঃ ও বীর্যের সম্মিলনে, যা স্বতঃই স্বরূপতঃ মলিন। কিন্তু ভোগাসক্ত ব্যক্তির শরীরের প্রতি মলিনবুদ্ধি হয় না, রমণীয় বুদ্ধিই হয়ে থাকে। এই রমণীয় বুদ্ধিই জগৎকে ধারণ করায়।

নদীপারে দণ্ডায়মান একজন সাধুকে এক ব্যক্তি বলল, 'দেখুন মহারাজ ! নদীর জল বহমান এবং সেতুর ওপর মানুষও বহমান'। সাধু বললেন, 'দেখ ভাই ! শুধু নদীর জলই নয়, নদী নিজেও বয়ে যাচ্ছে ; আর সেতুর ওপরের মানুষই নয়, সেতুও বয়ে যাচ্ছে।' অর্থাৎ এই নদী, সেতু এবং মানুষ অত্যন্ত বেগের সঙ্গে বিনাশের দিকে ধেয়ে চলেছে। একদিন নদীও থাকবে না, সেতুও থাকবে না এবং মানুষও থাকবে না। পৃথিবীও এইরূপে প্রলয়ের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এইপ্রকার স্থায়ীরূপে প্রতীয়মান সমগ্র জগৎ প্রতিমুহূর্তে বিনাশের দিকে যাচ্ছে। কিন্তু জীব একে ভাব-রূপে অর্থাৎ 'আছে' রূপে স্বীকৃতি দিয়েছে। পরা প্রকৃতির (স্বরূপতঃ) উৎপত্তি হয় না, কিন্তু অপরা প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার জন্যই জীব শরীরের উৎপত্তিকে নিজ উৎপত্তি বলে মেনে নেয় এবং শরীরের বিনাশকে নিজ বিনাশ মনে করে, যার জন্য তার জন্ম-মরণ হতে থাকে। যদি সে অপরা প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন না করে, এর থেকে বিমুখ হয় অর্থাৎ ভাবরূপে এর অস্তিত্ব স্বীকার না করে, তাহলে সে জগৎকে সৎ-রূপে দেখতে পারে না।

'ইদম্' পদটির দ্বারা শরীর এবং সংসার (জগৎ)—দুটিই বোঝায়। কারণ শরীর ও সংসার পৃথক নয়, তত্ত্বতঃ (ধাতুগতভাবে) একই। শরীর এবং সংসারের পার্থক্য কেবল মেনে নেওয়া হয়েছে, বাস্তবে তা অভেদ। তাই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভগবান **'ইদং শরীরম্'** পদটির দ্বারা শরীরকে ক্ষেত্র বলে জানিয়েছেন (১৩।১)। কিন্তু যেখানে ক্ষেত্রের বর্ণনা করেছেন, সেখানে সমষ্টির বর্ণনাই করা হয়েছে (১৩।৫) এবং ইচ্ছা-দ্বেষ ইত্যাদি বিকার ব্যষ্টির বলেই উদ্ধৃত হয়েছে (১৩।৬)। কারণ এই সমস্ত বিকার ব্যষ্টি প্রাণীরই হয়ে থাকে। তাৎপর্য হল এই যে, সমষ্টি এবং ব্যষ্টি তত্ত্বতঃ একই। কিন্তু এক হলেও নিজেকে শরীর বলে মনে করাতেই 'অহং'-বোধ এবং শরীরকে নিজের বলে মনে করাতে 'মমত্ব'-বোধ উৎপন্ন হয়, যার ফলে জীব আবদ্ধ হয়ে পড়ে। যদি শরীর ও সংসারের অভিন্নতা বা নিজের ও ভগবানের অভিন্নতা অনুভূত হয় তাহলে অহং ও মমত্ববোধ স্বতঃই দূর হয়। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ এই তিন যোগের সাহায্যেই অহং ও মমত্ববোধ দূর হয়। যেমন, কর্মযোগের—**'নির্মমো নিরহংকারঃ'** (গীতা ২।৭১) জ্ঞানযোগের—**'অহংকারং .... বিমুচ্য নির্মমঃ'** (গীতা ১৮।৫৩) এবং ভক্তিযোগের **'নির্মমো নিরহংকারঃ'** (গীতা ১২।১৩) দ্বারা। তাৎপর্য হল এই যে, জড়ের সঙ্গে সম্পর্ক-ছেদ হওয়া চাই, যা শুধুমাত্র মেনে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং বিবেক-বুদ্ধির সাহায্যে এটি মেনে না নিলে অর্থাৎ বাস্তবিকতাকে স্বীকার করলে এই মেনে নেওয়া সম্পর্ক দূর হয়।

বিশেষ কথা

যেমন গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক হয়ে থাকে, এতে গুরু যখন কাউকে নিজের শিষ্য বলে মনে করেন, শিষ্যও তাঁকে তার গুরু বলে মেনে নেয়। এইভাবে গুরু পৃথক এবং শিষ্যও পৃথক অর্থাৎ দুজনের অস্তিত্ব ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এই দুজনের সম্পর্ক দ্বারা একটি তৃতীয় অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়, যাকে 'সম্পর্কের অস্তিত্ব' বলা হয়[১]। এরূপে সাক্ষাৎ পরমাত্মার অংশ জীব শরীর এবং সংসারের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নিয়েছে। এই সম্পর্কের জন্য এক তৃতীয় সত্তা স্বীকৃত হয়ে থাকে, যাকে 'আমি'-ভাব বলা হয়। সম্পর্কের এই অস্তিত্ব ('আমি'-ভাব) কেবলমাত্র মেনে নেওয়া হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে এটি নেই। জীব ভ্রমবশতঃ এই মেনে-নেওয়া সম্পর্ককে সত্য বলে মেনে নেয় এবং তাতেই আবদ্ধ হয়ে যায়। এইভাবে জীব সংসারের দ্বারা নয়, সংসারের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্কের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

গুরু এবং শিষ্যের মধ্যে দুটি পৃথক সত্তা থাকে এবং উভয়ে উভয়ের সঙ্গে সম্পর্ক মেনে থাকে । কিন্তু জীব (চেতন) এবং সংসার (জড়)—এই দুইয়ের মধ্যে শুধুমাত্র এক জীবেরই প্রকৃত অস্তিত্ব থাকে এবং সেই ভ্রমবশতঃ জগতের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নেয়। সংসার প্রতিমুহূর্তে বিনাশ হয়ে চলেছে, সুতরাং তার সঙ্গে মেনে-নেওয়া সম্পর্ক প্রতিক্ষণ স্বতঃই বিনাশ হচ্ছে। এরূপ হলেও যতক্ষণ সংসারে সুখ প্রতীয়মান হয় ততক্ষণ তার দ্বারা মেনে-নেওয়া সম্পর্কও স্থায়ী বলে প্রতীয়মান হয়। তাৎপর্য হল এই যে, সংসারের এই মেনে-নেওয়া সম্পর্ক সুখাসক্তির ওপরই টিকে থাকে এবং এই সুখাসক্তির জন্যই সংসার অপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও প্রাপ্ত এবং পরমাত্মা প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও অপ্রাপ্তরূপে প্রতীয়মান হয়। এই মেনে নেওয়া সম্পর্ক দূর হলেই পরমাত্মার প্রকৃত স্বরূপ অথবা জগতের অপ্রাপ্তি এবং পরমাত্মার প্রাপ্তি অনুভূত হয়।

'অহং'-ভাব দূর করার উদ্দেশ্যে সাধক যেন প্রকৃতি এবং প্রকৃতির কার্যকে নিজের স্বরূপ বলে ভেবে না বসেন বা তার দ্বারা কিছু পাবার ইচ্ছা না রাখেন এবং নিজের জন্য কিছুই যেন না করেন। যা কিছু তিনি করবেন তা শুধুমাত্র যেন সংসারের সেবার উদ্দেশ্যেই করেন। তাৎপর্য হল এই যে, প্রকৃতিজনিত যে সমস্ত বস্তু আছে, সেগুলির সঙ্গে জগতের ঐক্য থাকে, সুতরাং সেগুলি শুধুমাত্র জগতের বলে মনে করে জগতেরই সেবায় লাগানো উচিত। এতে ক্রিয়া এবং পদার্থের গতি সংসার অভিমুখে যায় এবং নিজ স্বরূপ অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ এর দ্বারা নিজ স্বরূপ বোধ হয়ে থাকে। একেই বলা হয় কর্মযোগ। জ্ঞানযোগে বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে প্রকৃতির কার্যাদি পদার্থ এবং ক্রিয়ার সঙ্গে সর্বতোভাবে সম্পর্ক-বিচ্ছিন্ন হলে স্বরূপ-বোধ হয়। এইভাবে জড়ের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়াতে যে অহংবোধ উৎপন্ন হয়ে থাকে, তার নিবৃত্তি ঘটে।

ভক্তিযোগে 'আমি' কেবলমাত্র ভগবানের এবং ভগবানই শুধুমাত্র আমার এবং 'আমি শরীর-সংসার নই' এবং 'শরীর-সংসারও আমার নয়'—এরূপ দৃঢ়নিশ্চিত হয়ে ভক্ত সংসারে বিমুখ হয়ে কেবল ভগবদ্‌ পরায়ণ হয়ে যায়, যার ফলে জগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্বতঃই দূর হয় এবং অহং-অভিমানের নিবৃত্তি হয়।

এইভাবে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ—তিনটির মধ্যে যে কোনো একটি সঠিকভাবে পালন করলে জড়ত্বের থেকে সর্বতোভাবে সম্পর্ক-ছেদ হয়ে পরমাত্মতত্ত্বের প্রাপ্তি হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব—যখন চেতন অপরা প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা করে নেয় অর্থাৎ 'অহং'-এর সঙ্গে মিলে নিজেকে 'আমি' বলে মনে করে, তখন তাকে জীবরূপে উদ্ভূত 'পরা প্রকৃতি' বলা হয়। 'অহম্‌' (আমি)-এর এক দিকে আছে জগৎ (অপরা প্রকৃতি) আর অন্যদিকে আছেন পরমাত্মা। কিন্তু জীব সেই পরমাত্মাকে স্বীকার না করে, তার অপরা প্রকৃতিকে স্বীকার করে জগৎ-রূপের স্বীকৃতি জানিয়ে জন্ম-মৃত্যুরূপ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

'অপরেয়মিতস্ত্বন্যাম্‌'—অপরা থেকে ভিন্ন হল পরা এবং পরা থেকে ভিন্ন হল অপরা। অপরা হল 'ভিন্ন' অর্থাৎ বিজাতীয়। অন্যকে অবলম্বন করার ফলেই পরা 'জীব' হয়েছে—**'জীবভূতাম্‌'**।

---

[১]গুরু-শিষ্যের সম্পর্কে গুরুর কাজ হল শিষ্যের হিতসাধন করা এবং শিষ্যের কাজ হল গুরুর সেবা করা। এইভাবে জগতে যতপ্রকার মেনে নেওয়া সম্পর্ক আছে, সবই একে অপরের মঙ্গল সাধনের বা সেবা করার জন্য, নিজের জন্য নয়।

অপরা (পরিবর্তনশীল) এবং পরা (অপরিবর্তনশীল) উভয়ই হল ভগবানের প্রকৃতি অর্থাৎ শক্তি, স্বভাব। ভগবানের শক্তি হওয়ায় উভয়েই ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন, কেন-না শক্তিমান ছাড়া শক্তির কোনো পৃথক অস্তিত্ব হয় না। নখ এবং চুল যেমন নিষ্প্রাণ হলেও আমাদের প্রাণপূর্ণ শরীর থেকে পৃথক নয়, তেমনই অপরা প্রকৃতি জড় হলেও চেতন ভগবানের থেকে পৃথক নয়—**'সদসচ্চাহমর্জুন'** (গীতা ৯।১৯)। অপরা ও পরা উভয় প্রকৃতিকে যখন ভগবানের স্বরূপ বলে জানা যায়, তখন ভগবান ব্যতীত আর কী থাকে ? কিছুই থাকে না— **'বাসুদেবঃ সর্বম্'** (গীতা ৭।১৯)। অর্থাৎ অপরা এবং পরা—উভয় প্রকৃতিসহ স্বরূপ হল 'সমগ্র', অর্থাৎ পরা-অপরা, সৎ-অসৎ, জড়-চেতন সব কিছুই হলেন ভগবান।

'যয়েদং ধার্যতে জগৎ' কথাটির অর্থ হল যে, জগৎ-এর অস্তিত্ব ভগবানের দৃষ্টিতেও নেই, মহাপুরুষের দৃষ্টিতেও নেই, এটি আছে শুধু জীবেরই দৃষ্টিতে (মেনে নেওয়াতে)। ভগবানের দৃষ্টিতে সমস্তই তিনি—**'সদসচ্চাহমর্জুন'** (গীতা ৯।১৯) আর মহাত্মার দৃষ্টিতেও সবই ভগবান—**'বাসুদেবঃ সর্বম্'** (গীতা ৭।১৯)। জীবই রাগদ্বেষাদির বশীভূত হয়ে নিজ বুদ্ধিতে জগতের অস্তিত্ব ধারণ করে আছে। এই কথাটি পরবর্তী পঞ্চদশ অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে **'মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি'** পদটিতে বলা হয়েছে। জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করলেই রাগ (আসক্তি)-দ্বেষাদি উৎপন্ন হয়।

জীব জগতের অস্তিত্ব মেনে নিয়ে তাকে গুরুত্ব দিয়েছে, তার ফলে তার মধ্যে কামনা অর্থাৎ সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা জেগেছে, এই জন্যই সে জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। অর্থাৎ একমাত্র ভগবান ব্যতীত অন্য কোনো অস্তিত্বকে স্বীকার করার ফলেই জীব সংসারের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। অতএব জীবের উপরেই অন্য অস্তিত্বকে স্বীকার না করার দায়িত্ব রয়েছে। যদি জগতের ভিন্ন অস্তিত্ব মেনে না নেওয়া হয় তাহলে কোথায় জগৎ ?

ভগবান পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহং—এই আটটি বস্তুকে অপরা (জড়) প্রকৃতি বলে অভিহিত করেছেন[1]। তাই পৃথিবী যেমন জড় পদার্থ এবং তাকে জানা যায়, তেমনই অহং-ও জড় পদার্থ, তাকেও জানা যায়। তাৎপর্য হল এই যে পৃথিবী, জল ইত্যাদি আটটি বস্তু হল স্বজাতীয়[2]। অতএব পৃথিবী যে জাতির, অহংও সেই জাতির অর্থাৎ অহংও মাটির ডেলার মতো জড় এবং দৃশ্য বস্তু। তাই ভগবান অহংকে 'এই'—এভাবে অঙ্গুলি নির্দিষ্ট করে বলেছেন, যেমন— **'এতদ্ যো বেত্তি'** (গীতা ১৩।১)। 'এতৎ' ('এই') কখনো **'অহম্'** (আমি) হয় না, সুতরাং অহম্‌কে 'এই' রূপে বলার অর্থ হল এই যে এটি নিজ স্বরূপ নয়। কিন্তু যখন চেতন (জীব) এই অহং-এর সঙ্গে নিজেকে একাত্ম বলে মেনে নেয়, তখন সে আবদ্ধ হয়ে পড়ে—**'অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে'** (গীতা ৩।২৭)। একেই চিজ্জড়গ্রন্থি বলা হয়।

'অহংকার ইতীয়ং মে'— এই ধাতুরূপ হল অপরা প্রকৃতি (জড়), কিন্তু 'আমি আছি' —এই গ্রন্থিরূপ অহংকার শুধু অপরা প্রকৃতি নয়, বরং এতে পরা প্রকৃতিও (চেতনও) মিশে থাকে। তত্ত্বজ্ঞান হলে এই জন্ম-মৃত্যু প্রদানকারী গ্রন্থিরূপ অহংকার থাকে না কিন্তু অপরা প্রকৃতির ধাতুরূপ অহংকার থাকে।

ক্রিয়া এবং পদার্থ পরা প্রকৃতিতেও নেই পরমাত্মাতেও নেই, এগুলি আছে অপরা প্রকৃতিতে। অপরা প্রকৃতি হল ক্রিয়ারূপ এবং পদার্থরূপ। পরমাত্মা প্রকৃতির সাহায্যেই সৃষ্টিকার্য করেন। পরা প্রকৃতি অর্থাৎ জীব ক্রিয়া এবং পদার্থরূপ অপরা প্রকৃতিতে আসক্ত হয়ে এবং তাকে আশ্রয় করে আবদ্ধ হয়। অপরাতে আসক্তি এবং তার আশ্রয় নেওয়াকেই জগৎকে ধারণ করা বলে। তাই ভগবান সপ্তম অধ্যায়ের প্রারম্ভেই **'ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ'** পদটির দ্বারা তাঁতে (ভগবানে) আসক্ত (প্রেম) হওয়া এবং তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করার কথা বলেছেন। জীব যদি অপরা প্রকৃতিতে আসক্ত না হয় এবং তার আশ্রয় না নেয়, তাহলেই সে 'মুক্ত' হয়ে থাকে। যদি জীব ভগবানে আসক্ত হয় (প্রেম করে)

---

[1]পৃথিবী স্থূল, পৃথিবীর থেকে সূক্ষ্ম জল। জল থেকে সূক্ষ্ম তেজ। তেজের থেকে সূক্ষ্ম বায়ু। বায়ুর থেকে সূক্ষ্ম আকাশ। আকাশের থেকে সূক্ষ্ম মন। মনের থেকে সূক্ষ্ম বুদ্ধি এবং বুদ্ধির থেকে সূক্ষ্ম অহং। অপরা প্রকৃতিতে অহং হল সব থেকে সূক্ষ্ম। ভগবান এইভাবে স্থূল থেকে সূক্ষ্ম পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে অপরা প্রকৃতির বর্ণনা করেছেন।

[2]এক অনেকে অনুগত হলে তাকে 'জাতি' বলা হয়। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহম্—এই আটটিতে স্বজাতীয় ঐক্য থাকলেও স্বরূপের ঐক্য নেই অর্থাৎ জাতি এক হলেও এদের স্বরূপ পৃথক্ পৃথক্। তাই এগুলিকে 'অষ্টধা' বলা হয়েছে। অপরা প্রকৃতির কার্য হওয়ায় এখানে পৃথিবী, জল ইত্যাদিকেও অপরা প্রকৃতি বলা হয়েছে।

এবং তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করে তাহলে সে 'ভক্ত' বলে পরিগণিত হয়।

জগতের পৃথক্ কোনো অস্তিত্ব নেই। জীবই জগৎকে বন্ধনকারক করে রেখেছে। জীব জগৎকে ধারণ করে, এতেই সুখ-দুঃখ হয়, বদ্ধ হয়, চুরাশী লক্ষ যোনি প্রাপ্তি, ভূত-প্রেত-পিশাচ, দেবতা ইত্যাদি এবং নরক প্রাপ্তি হয়। সত্ত্ব, রজ এবং তম—এই তিনটি গুণ কোনো বাধা দান করে না, কিন্তু এর সংসর্গে জীব ঊর্ধ্বগতি, মধ্যগতি বা অধোগতি প্রাপ্ত হয়—**'কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু'** (গীতা ১৩।২১)। জীব নিজেই গুণের সংসর্গ করে। অপরা প্রকৃতি কারো সঙ্গে কোনোপ্রকার সম্পর্ক পাতায় না। সম্পর্ক কেউই করে না, প্রকৃতিও করে না, গুণাদিও করে না, ইন্দ্রিয়াদিও করে না, মনও করে না, বুদ্ধিও করে না। জীব নিজেই সম্পর্ক করে, তাই সে সুখ ও দুঃখ পায় এবং জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হয়। জীব স্বাধীন, কারণ সে 'পরা' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ প্রকৃতি। অপরা প্রকৃতি তো কিছুই করে না, কেন-না তার মধ্যে চেতনা এবং কামনা নেই। তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে জীব উচ্চ বা নিম্ন যোনিতে গমন করে, পথভ্রষ্ট হয়। অর্থাৎ অপরিবর্তনশীল হয়েও জীব বিজাতীয় জগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে পরিবর্তনশীল জগৎ-স্বরূপ হয়[১] (গীতা ৭।১৩)। তার দৃষ্টি তখন শরীরের দিকেই থাকে, তার নিজ স্বরূপের স্ফুরণ আর হয় না।

যা আমার থেকে সর্বতোভাবে পৃথক্ সেই জগৎ অর্থাৎ শরীর ইন্দ্রিয়াদি-মন-বুদ্ধি-অহং-এর সঙ্গে নিজের যে ঐক্য মেনে নেওয়া তাকেই বলা হয় জগৎকে ধারণ করা। আসলে জগৎ আমার নয়, কেন-না যদি আমার জিনিস আমি পেয়ে যাই তাহলে আমার কামনাগুলি চিরকালের মতো দূরীভূত হয়ে যায় আর আমি মমত্বহীন, নির্ভয়, নিশ্চিন্ত ও নিষ্কাম হয়ে উঠি। কিন্তু জগৎ আমায় এমন কোনো জিনিস দিতে সক্ষম নয়, যা একান্তভাবেই আমার, অর্থাৎ যেটি কখনো আমাকে পরিত্যাগ করবে না। বাস্তবতঃ যা আমার, তা কখনো জগৎ থেকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, বরং জগতের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হলেই তা লাভ করা সম্ভব। আমার বস্তু হল পরমাত্মা। আমি সেই পরমাত্মারই অংশ—**'মমৈবাংশো জীবলোকে'** (গীতা ১৫।৭)। (কর্মযোগের দৃষ্টিতে) তা প্রাপ্তির উপায় হল এই যে, জগৎ থেকে পাওয়া বস্তুসমূহ (শরীর ইত্যাদি) জগতের কাজেই উৎসর্গ করা এবং তার পরিবর্তে কোনো কিছু আশা না করা (ফলেচ্ছা না রাখা), ক্রিয়া এবং পদার্থ কোনো কিছুর সঙ্গেই সম্পর্ক না রাখা। সেবা করা থেকেও কাউকে দুঃখ না দেওয়া শ্রেষ্ঠ। কাউকে দুঃখ না দিলে, কারো অহিত না করলে সেবা স্বতঃই সাধিত হয়, পৃথক্‌ভাবে কিছু করার প্রয়োজন হয় না[২]। যে কাজ স্বতঃ হয়ে যায়, তার জন্য অহং অভিমান আসে না এবং তার জন্য ফলেচ্ছাও জাগে না। অহং, অভিমান ও ফলেচ্ছা দূর হলে আমরা তাকে লাভ করে থাকি, যা প্রকৃতপক্ষেই আমাদের।

প্রকৃতপক্ষে অপরা প্রকৃতির পরমাত্মা ভিন্ন পৃথক্ কোনো অস্তিত্ব নেই—**'নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ'**। জীবই তাকে বিশেষ অস্তিত্বসম্পন্ন বলে মেনে নিয়েছে। যেমন টাকার নিজস্ব কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, আমরাই লোভবশতঃ তাকে গুরুত্ব দিয়ে থাকি। আমরা যাকে গুরুত্ব দিই, তাতেই আমরা আকর্ষিত হই। দোষগুলিকে স্বীকার করলেই তাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়[৩]। কামাদির জন্যই স্ত্রীজাতিতে আকর্ষণ হয়ে থাকে, লোভ ইত্যাদির জন্য অর্থে আকর্ষণ হয়, মোহাদির জন্য আত্মীয়-পরিজনে আকর্ষণ হয়। কিন্তু দোষগুলির সঙ্গে একাত্মতা করাতে দোষগুলি আর দোষরূপে প্রতিভাত হয় না এবং আমরা বুঝতে পারি না যে আমরা দোষরূপ অপরা প্রকৃতিকে কত গুরুত্ব দিচ্ছি ! একাত্মতা দূর হলে দোষ থাকে না এবং গুণের দিকে দৃষ্টি যায় না।

অনন্তব্রহ্মাণ্ডে ত্রিলোক, চতুর্দশ ভুবন, জড়-চেতন, স্থাবর-জঙ্গম, স্থলচর, জলচর, খেচর, জরায়ুজ-অণ্ডজ- স্বেদজ-

---

[১] এখানে 'জগৎ' শব্দটি পরিবর্তনশীলতার বাচক—'গচ্ছতীতি জগৎ'।

[২] কারো অহিত না করলে দুটি বিষয় সাধিত হয়—এক, আমরা কিছুই করি না, আর যদি কিছু করি তাহলে সেটা সেবার কাজই হয়। কোনো কিছু না করা অথবা সেবা করা—এই উভয় কাজেই জগৎ সংসার থেকে সম্পর্ক-বিচ্ছিন্ন হয়। কেন-না কোনো কিছু না করলে কোনো দোষ হয় না এবং সেবা স্বতঃ হলে সব দোষই স্খালন হয়। যেমন খাবার সময় 'আমি খাচ্ছি'—এর জন্য যে অহংবোধ হয়, খাদ্য হজম করার সময় তা হয় না, কেন-না হজম কার্য স্বাভাবিক নিয়মেই হয়ে যায়। তেমনই সেবা স্বাভাবিকভাবে হলে কর্তৃত্বাভিমান ও ফলাসক্তি স্বতঃই পরিত্যক্ত হয়।

[৩] জগতের সুখসমূহ দোষজনিত। দোষগুলিকে স্বীকার করলে সুখ অনুভূত হয়। কামাদির জন্যই মানুষ নারী ব্যতীত থাকতে পারে না। লোভের জন্য মানুষ অর্থ ব্যতীত থাকতে পারে না, মোহের জন্যই মানুষ পরিবার-পরিজন ছাড়া থাকতে পারে না। দোষের জন্যই মানুষ ত্যাগের গুরুত্ব বোঝে না।

উদ্ভিজ্জ, সাত্ত্বিক-রাজসিক-তামসিক, মানুষ, দেবগণ, পিতৃপুরুষ, গন্ধর্ব, পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ, ভূত-প্রেত-পিশাচ, ব্রহ্ম-রাক্ষস ইত্যাদি যা কিছু দেখা শোনা এবং পড়া ও কল্পনা করা যায়, তাতে 'পরা' ও 'অপরা'— এই দুই প্রকার প্রকৃতি ভিন্ন আর কিছুই নেই। যা কিছু দেখা-শোনা-পড়া ও কল্পনা করা যায় এবং যে শরীর-ইন্দ্রিয়াদি-মন-বুদ্ধি-অহং দ্বারা দেখা-শোনা-পড়া-চিন্তা করা যায়, তা সবই 'অপরা'। কিন্তু যে এই সব দেখে-শোনে-পড়ে-চিন্তা করে, সে হল 'পরা'। পরা এবং অপরা উভয়ই ভগবানের শক্তি হওয়ায় ভগবানের থেকে অভিন্ন অর্থাৎ তা ভগবদ্ স্বরূপই। অতএব অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে এবং বাইরে আর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের রূপে একমাত্র পরমাত্মা ব্যতীত কণামাত্রও অন্য কিছু নেই— **'বাসুদেবঃ সর্বম্'** (৭।১৯), **'সদসচ্চাহমর্জুন'** (৯।১৯)। জগতের সকল দর্শন, মত-মতান্তর আচার্যদের দ্বারা হয়, কিন্তু **'বাসুদেবঃ সর্বম্'** কোনো আচার্যের দর্শন বা মত নয়, এটি হল স্বয়ং ভগবানের অটল সিদ্ধান্ত, এর মধ্যেই সমস্ত দর্শন, মত-মতান্তর নিহিত আছে।

জীবই 'অপরা'-কে (জগৎ) পৃথক্ অস্তিত্বসম্পন্ন বলে মেনে নিয়েছে **'যয়েদং ধার্যতে জগৎ'**। 'অপরা' ভগবানেরই, কিন্তু তাকে অর্থাৎ শরীর-ইন্দ্রিয়াদি-মন-বুদ্ধি-অহংকে নিজের এবং নিজের বলে মেনে নিলেই জীব বদ্ধ হয়ে পড়ে। সুতরাং জগৎ যদি সাধকের নিকট জগৎরূপে মনে হয় তবে এটি তার ব্যক্তিগত দৃষ্টি। ব্যক্তিগত দৃষ্টির সিদ্ধান্ত সঠিক সিদ্ধান্ত হয় না। ব্যক্তিগত দৃষ্টি সীমাবদ্ধ হয়, কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ব অসীম। যেমন সূর্যকে আমরা ছোট্ট থালার মতো দেখি, কিন্তু তা সঠিক নয়, সূর্য প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর থেকেও বহুগুণ বড়।

সাধকের যদি জগৎকে সত্য বলে মনে হয়, তাহলে তাঁর জগতের নিষ্কামভাবে সেবা করা উচিত। জগৎকে নিজের বলে মনে করা এবং তার থেকে সুখ গ্রহণ করাই হল অ-সাধনা, বন্ধন। কেন-না আমাদের এই শরীর ইন্দ্রিয়াদি-মন-বুদ্ধি সবই জগতের এবং জগতের জন্য। অতএব জগতের বস্তুসমূহ জগতের সেবায় নিয়োগ করলে জগৎ আর জগৎ রূপে প্রতিভাত হয় না, তা ভগবদ্ স্বরূপ হয়ে যায়, যা স্বতঃসিদ্ধ। অর্থাৎ সাধক জগৎকে মেনে নিন বা আত্মাকে মেনে নিন অথবা পরমাত্মাকে মেনে নিন, যাকে মেনেই তিনি সাধনা করুন না কেন, সর্বশেষে তিনি **'বাসুদেবঃ সর্বম্'** এই সত্য অনুভব করতে পারেন।

❊ ❊ ❊

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, পরা প্রকৃতি অপরা প্রকৃতিকে ধারণ করে আছে। সেটিকেই পরবর্তী শ্লোকে স্পষ্টভাবে জানাচ্ছেন।

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥ ৬ ॥

[**সর্বাণি** (সমস্ত) ; **ভূতানি** (প্রাণীদের) ; **এতদ্‌যোনীনি** (পরা এবং অপরা উভয় প্রকৃতির সংযোগই কারণ) ; **ইতি** (এরূপ) ; **উপধারয়** (তুমি জানবে) ; **অহম্** (আমি) ; **কৃৎস্নস্য** (সমস্ত) ; **জগতঃ** (জগতের) ; **প্রভবঃ** (উৎপত্তি) ; **তথা** (এবং) ; **প্রলয়ঃ** (প্রলয়।)]

অপরা এবং পরা—এই দুই প্রকৃতির সংযোগেই সমস্ত প্রাণী উৎপন্ন হয় বলে জানবে। আমি সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয় অর্থাৎ সৃষ্টির মূল কারণ ॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা—**'এতদ্‌যোনীনি ভূতানি'**[১]—যতপ্রকার দেবতা, মানুষ, পশু-পক্ষী ইত্যাদি জঙ্গম এবং বৃক্ষ, লতা ইত্যাদি স্থাবর প্রাণী আছে, সেগুলি সমস্তই আমার পরা ও অপরা প্রকৃতির সংযোগের থেকেই উৎপন্ন হয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ছাব্বিশতম শ্লোকেও ভগবান ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের সম্বন্ধ হতেই সকল স্থাবর-জঙ্গম প্রাণীর উৎপত্তির কথা বলেছেন। এই কথাই চতুর্দশ অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকেও সাধারণভাবে বলা হয়েছে যে স্থাবর-জঙ্গম

[১]'এতদ্‌যোনীনি ভূতানি' পদের অর্থ হল—এতে অপরা-পরে যোনী কারণে যেষাং তানি অর্থাৎ অপরা ও পরা—এই দুই প্রকৃতি যার কারণ, এরূপ সকল প্রাণী।

যোনিতে উদ্ভূত যতপ্রকার দেহ আছে, তা সবই প্রকৃতিগত এবং ওই সমস্ত দেহে যে বীজ বা জীবাত্মা আছে, সে সবই আমার অংশ। ওই বীজ বা জীবাত্মাকে ভগবান 'পরা প্রকৃতি' (৭।৫) এবং 'নিজের অংশ' (১৫।৭) বলেছেন।

'সর্বাণীত্যুপধারয়'—স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ইত্যাদি সমস্ত স্থানে যেসব স্থাবর-জঙ্গম প্রাণী আছে, তা সবই পরা ও অপরা প্রকৃতির সংযোগজাত। তাৎপর্য হল এই যে, পরা প্রকৃতি অপরাকে আপন বলে মেনে নিয়েছে[১], তার সঙ্গী হয়েছে, তার জন্যই সমস্ত প্রাণী উৎপন্ন হয়—এটি তুমি ধারণ করো অর্থাৎ ঠিকভাবে বুঝে নাও অথবা মেনে নাও।

'অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা'—বস্তুমাত্রেরই অস্তিত্ব এবং চৈতন্য পরমাত্মা হতেই লাভ হয়, তাই ভগবান বলেছেন যে, আমি সমস্ত জগতের প্রভব (সৃষ্টিকর্তা) এবং প্রলয় (প্রলয়কারী)।

'প্রভবঃ'-এর তাৎপর্য হল এই যে, আমিই এই জগতের নিমিত্তকারণ। কারণ সমস্ত সৃষ্টি আমার সংকল্প[২] থেকে জাত—**'সদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি'** (ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৬।২।৩)।

যেমন মাটির কলস তৈরির জন্য কুমোর এবং সোনার গহনা তৈরির জন্য স্বর্ণকার নিমিত্তকারণ হয়ে থাকে, তেমনি জগৎমাত্রেরই উৎপত্তিতে ভগবানই নিমিত্তকারণ হন।

'প্রলয়ঃ'—এটি বলার তাৎপর্য হল এই যে, এই জগতের উপাদান-কারণও আমিই। কারণ কার্যমাত্রেই উপাদান কারণ থেকে জাত হয়, উপাদান-কারণরূপেই থাকে এবং পরিণামে উপাদান-কারণেই লীন হয়।

যেমন কলস তৈরিতে মাটি উপাদান-কারণ তেমনি জগৎ সৃষ্টিতে ভগবানই উপাদান-কারণ। কলস যেমন মাটি থেকে সৃষ্ট হয়ে, মাটিরূপেই থাকে এবং শেষকালে ভেঙে গিয়ে মাটিই হয়ে যায়। যেমন সোনার যাবতীয় গহনা সোনা দ্বারাই তৈরি হয়ে সোনারূপেই থাকে এবং শেষ পর্যন্ত সোনাই থাকে, তেমনি এই জগৎ ভগবান হতে উৎপন্ন হয়, ভগবানেই থাকে এবং শেষে ভগবানেই লীন হয়ে যায়। এরূপ জানাকেই বলা হয় 'জ্ঞান'। সবই ভগবৎস্বরূপ, ভগবান ছাড়া অন্য আর কিছুই নেই—এটি অনুভব করাকে বলা হয় 'বিজ্ঞান'।

'কৃৎস্নস্য জগতঃ'—পদটির দ্বারা ভগবান নিজেকে জড়-চেতনাত্মক সমস্ত জগতের প্রভব এবং প্রলয়ের আধার বলে জানিয়েছেন। এতে জড় বা অপরা প্রকৃতির প্রভব ও প্রলয়ের কথা বলা যুক্তিযুক্ত হলেও চেতন বা পরা প্রকৃতি, যাকে জীবাত্মা বলা হয়, তার উৎপত্তি ও বিনাশ কীভাবে হয় ? কারণ এটি হল নিত্যতত্ত্ব—**'নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ'** (গীতা ২।২৪) যা পরিবর্তনশীল তাকেই জগৎ বলা হয়—**'গচ্ছতীতি জগৎ'**। কিন্তু এখানে জগৎ শব্দটি জড়-চেতনাত্মক সমস্ত সংসারের বাচক। এতে জড় অংশ সদা পরিবর্তনশীল এবং চেতন অংশ সর্বতোভাবে পরিবর্তন রহিত এবং নির্বিকার। এই নির্বিকার-তত্ত্ব যখন জড়ের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করে তাদাত্ম্য করে তখন সে জড়ের (শরীরের) উৎপত্তি ও বিনাশকে নিজের উৎপত্তি ও বিনাশ বলে মনে করে। এটিকেই তার জন্ম-মৃত্যু বলা হয়। তাই ভগবান নিজেকে সমস্ত জগৎ অর্থাৎ অপরা এবং পরা প্রকৃতির প্রভব এবং প্রলয়ের মূল কারণরূপে বলেছেন।

যদি 'জগৎ' শব্দ দ্বারা এখানে শুধুমাত্র বিনাশশীল, পরিবর্তনশীল বিকারী জগৎকে ধরা হয়, চেতনকে না ধরা হয় তাহলে সংশয়ের যথাযথ সমাধান হয় না। কেন-না ভগবান **'কৃৎস্নস্য জগতঃ'** পদটির দ্বারা নিজেকে সমস্ত জগতের কারণ বলে জানিয়েছেন[৩]। সুতরাং স্থাবর-জঙ্গম, জড়-চেতন সমস্তকেই জগতের অন্তর্ভূত বলে ধরা

---

[১]এতে একটি বিচিত্র ব্যাপার হল এই যে সম্পর্ক শুধু ক্ষেত্রজ্ঞই মেনে নিয়েছে, ক্ষেত্র নয়। যদি সে নিজের সম্পর্ক না মানে তবে তার পুনর্জন্ম হতেই পারে না। কারণ পুনর্জন্মের কারণ হল গুণাদির সঙ্গ করা—**'কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু।'** (গীতা ১৩।২১)

[২]জীবের দ্বারা কৃত অনাদিকালের কর্ম জীবগণের প্রলয়কালে লীন হয়ে গিয়ে তা যখন পরিপক্ব হয় অর্থাৎ ফল প্রদানের জন্য উন্মুখ হয়, তখন তার থেকে (প্রলয়কালের সময় শেষ হলে এবং নতুন সৃষ্টির আদিতে) ভগবানের সংকল্প হয় এবং সেই সংকল্প থেকেই দেহাদির উৎপত্তি হয়।

[৩]অপরা প্রকৃতি এবং ভগবানের মধ্যে কার্য-কারণের সম্পর্ক থাকে। কারণ অপরা প্রকৃতি ভগবানের কার্য। কিন্তু পরা প্রকৃতি এবং ভগবানের কার্য-কারণের সম্পর্ক নেই। কারণ পরা-প্রকৃতি (জীব) ভগবানের অংশ, কার্য নয়। তাই অংশ-অংশীর দৃষ্টিতেই ভগবানকে জীবের কারণ বলা হয়েছে, কার্য-কারণের দৃষ্টিতে নয়।

যায়। যদি শুধুমাত্র জড়কে ধরা হয় তাহলে চেতন অংশ বাদ যায়, যার ফলে 'আমি সমস্ত জগতের কারণ' এ-কথা বলা যায় না, পরেও এতে বাধা আসে। কারণ এই অধ্যায়েরই ত্রয়োদশ শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, ত্রিগুণের দ্বারা মোহগ্রস্ত এই জগৎ আমাকে জানে না, কিন্তু জানা বা না-জানা তো চেতনের দ্বারাই সম্ভব, জড়ের দ্বারা নয়। সেইজন্য 'জগৎ' শব্দে কেবল জড় নয়, চেতনকেও যুক্ত করতে হবে।

এইভাবে ষোড়শ অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকেও আসুরী প্রকৃতিসম্পন্নদের ধারণা অনুযায়ী 'জগৎ' শব্দের দ্বারা জড় ও চেতন—দুই-ই ধরতে হবে। কারণ আসুরী প্রকৃতির ব্যক্তিরা কেবল জড়কে নয় দেহধারী প্রত্যেক জীবকেই অসত্য বলে মনে করে। তাই ওই স্থানে 'জগৎ' শব্দের অর্থে যদি শুধু জড় সংসার ধরা হয় তবে জগৎকে (জড় সংসারকে) অসত্য, মিথ্যা এবং অপ্রতিষ্ঠিত রূপে বলা অদ্বৈত-সিদ্ধান্তী ব্যক্তিগণও আসুরী-প্রকৃতিদের মধ্যে গণ্য হবে, যেটি একেবারেই অসঙ্গত। এরূপই অষ্টম অধ্যায়ের ছাব্বিশতম শ্লোকে উল্লিখিত **'শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ'** পদটিতে 'জগৎ' শব্দটি যদি শুধু জড়ের বাচক বলেই মানা হয় তাহলে জড়ের শুক্ল ও কৃষ্ণ গতির তাৎপর্য কী? কেন-না গতি কেবল চেতনেরই হয়ে থাকে। জড়ের সঙ্গে তাদাত্ম্য করার জন্যই চেতনকে 'জগৎ' বলা হয়েছে।

এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা থেকে এটি বোঝা যায় যে, জড়ের সঙ্গে একাত্মতা করার জন্যই জীবকে 'জগৎ' বলা হয়েছে। কিন্তু যখন জীব জড় হতে বিমুখ হয়ে চিন্ময়-তত্ত্বের সঙ্গে নিজ একত্ব অনুভব করে, তখন তাকে 'যোগী' বলা হয়, যার বর্ণনা গীতার নানাস্থানে আছে।

পরিশিষ্ট-ভাব—যা নিজেকে জানতে সক্ষম নয় এবং অপরকেও জানতে পারে না, তা হল 'অপরা প্রকৃতি'। যে নিজেকে জানতে সক্ষম এবং অপরকেও জানতে পারে, তাকে বলা হয় 'পরা প্রকৃতি'। এই পরা এবং অপরা— উভয়ের মেনে নেওয়া সংযোগেই সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম প্রাণী উৎপন্ন হয় (গীতা ১৩।২৬)।

প্রধান দোষ একটিই, যা স্থান বিশেষে নানারূপে পরিলক্ষিত হয়, তা হল অপরার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন। এই একটি দোষ থেকেই সমস্ত দোষ উৎপন্ন হয়। এই দোষ থেকেই সমস্ত দোষ আসে আবার এই দোষটি দূরীভূত হলেই সমস্ত দোষ দূর হয়। এইরূপ প্রকৃত গুণও একটি, যার দ্বারা সকল গুণ প্রকটিত হয়— তা হল ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন।

অপরাকে নিত্যই বলা হোক বা অনিত্য, তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সম্পূর্ণতই অনিত্য— এটিই হচ্ছে চিরকালীন সত্য। এই সম্পর্কই জন্ম-মৃত্যুর কারণ **'কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু'** (গীতা ১৩।২১) অর্থাৎ জগতের বীজ।

আমি সকল জগতের উৎপত্তি এবং প্রলয়—একথার অর্থ হল যে, এই স্থাবর-জঙ্গমরূপ জগতের উৎপন্নকারী আমি এবং আমিই উৎপন্ন হই, আমি বিনাশকারী এবং আমিই বিনষ্ট হই। কারণ আমি ছাড়া জগতের অন্য কোনো কারণ বা কার্য নেই (গীতা ৭।৭) অর্থাৎ আমিই এর নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ। সুতরাং জগৎ রূপে আমিই বিদ্যমান। নবম অধ্যায়ের উনিশতম শ্লোকেও ভগবান বলেছেন, **'অমৃতং চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন'** অর্থাৎ 'অমৃত এবং মৃত্যু এবং সৎ ও অসৎও আমিই।' শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান বলেছেন—

'আত্মৈব তদিদং বিশ্বং সৃজ্যতে সৃজতি প্রভুঃ। ত্রায়তে ত্রাতি বিশ্বাত্মা হ্রিয়তে হরতীশ্বরঃ॥' (১১।২৮।৬)

'যেসব প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ বস্তু আছে, তা সবই সর্বশক্তিমান পরমাত্মা। যে সৃষ্টিসমূহ প্রতিভাত হয়, তার নিমিত্ত-কারণও তিনি এবং উপাদান কারণও তিনিই অর্থাৎ তিনি বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেন আবার তিনিই বিশ্বজগৎ-রূপে সৃষ্ট হন। তিনিই রক্ষক আবার তিনিই রক্ষিত। এই সর্বাত্মা ভগবান সংহার করেন আবার যাকে সংহার করেন তিনিও সেই ভগবানই।'

তৈত্তিরীয়োপনিষদে আছে যে অন্নও আমি আবার অন্ন গ্রহণও করি আমি—**'অহমন্নমহমন্নমহমন্নম্। অহমন্নাদোঽহমন্নাদোঽহমন্নাদঃ'** (৩।১০।৬)

অর্থাৎ অপরা ও পরা প্রকৃতি এবং তার সংযোগে উৎপন্ন হওয়া সমস্ত প্রাণী—সবই একমাত্র ভগবান। কারণও তিনি, কার্যও তিনিই।

* * *

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে ভগবান নিজেকে পরা ও অপরা প্রকৃতিরূপ সমস্ত জগতের মূল কারণ বলে জানিয়েছেন। ভগবান ছাড়া জগতের যে আর কোনো কারণ নেই—পরবর্তী শ্লোকে তাই জানাচ্ছেন।

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥ ৭ ॥

[**ধনঞ্জয়** (হে ধনঞ্জয় !) ; **মত্তঃ** (আমি) ; **পরতরম্** (ব্যতীত) ; **অন্যৎ** (অন্য কোনো) ; **কিঞ্চিৎ** (কিছুই) ; **ন অস্তি** (নেই) ; **মণিগণাঃ** (সুতোর গুটিকা) ; **সূত্রে** (সুতোর মধ্যে গাঁথা থাকে) ; **ইব** (তেমনই) ; **ইদম্** (এই) ; **সর্বম্** (সমস্ত) ; **ময়ি** (আমাতে) ; **প্রোতম্** (ওতঃপ্রোত হয়ে আছে।)]

হে ধনঞ্জয় ! আমি ভিন্ন এই জগতের অন্য কোনো কারণ বা কার্য নেই। যেমন সুতোর দ্বারা তৈরি গুটিকাগুলি (মণিসমূহ) সুতোতে গাঁথা থাকে, তেমনি সমস্ত জগৎ আমাতেই অনুস্যূত (ওতঃপ্রোত) হয়ে আছে ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা—'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়'— হে অর্জুন ! আমি সমস্ত জগতের মহাকারণ, আমি ভিন্ন অন্য কোনও কারণ নেই। বায়ু যেমন আকাশ হতে উৎপন্ন হয়ে আকাশেই থাকে এবং আকাশেই লীন হয় অর্থাৎ আকাশ ছাড়া বায়ুর কোনো পৃথক স্বতন্ত্র সত্তা থাকে না, তেমনই জগৎ ভগবান হতে উৎপন্ন হয়ে ভগবানেই বিরাজ করে এবং তাঁতেই লীন হয়ে যায় অর্থাৎ ভগবান ছাড়া জগতের কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নেই।

এখানে **'পরতরম্'** পদটির দ্বারা সমস্ত কিছুর মূল কারণ জানানো হয়েছে। মূল কারণের পর আর কোনো কারণ নেই অর্থাৎ মূল কারণের কোনো উৎপাদক কারণ থাকে না। অর্থাৎ ভগবানই সকলের মূল কারণ। এই সংসার অর্থাৎ দেশ-কাল-ব্যক্তি-বস্তু-ঘটনা-পরিস্থিতি ইত্যাদি সবই পরিবর্তনশীল। কিন্তু যার সত্তার দ্বারা এই সমস্ত বস্তু সত্তাবান বলে দৃষ্টিগোচর হয় বা অনুভবে আসে, সেই পরমাত্মা-ই এইসবের মধ্যে পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান।

ভগবান এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে বলেছেন যে, আমি বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের কথা জানাচ্ছি, যা জানলে আর কিছু জানার বাকি থাকে না—**'যজ্জ্ঞাত্বা নেহভূয়োঽন্যজ্ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে'** এবং এখানে বলেছেন যে, আমি ছাড়া অন্য কোনো কারণ নেই—**'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি'**। দুই স্থানেই **'ন অন্যৎ'** বলার তাৎপর্য হল যে যখন আমি ছাড়া কিছু নেই-ই তখন আমাকে (ভগবানকে) জানার পর আর জানার কী বাকি থাকে ? সুতরাং ভগবান এইস্থানে **'ময়ি সর্বমিদং প্রোতম্'** এবং পরে **'বাসুদেবঃ সর্বম্'** (৭।১৯) এবং **'সদসচ্চাহম্'** (৯।১৯) কথাগুলি বলেছেন।

কার্যের কারণ ছাড়া নিজস্ব কোনো পৃথক সত্তা থাকে না, কারণই প্রকৃতপক্ষে কার্যরূপে প্রতিভাত হয়। এইভাবে যখন কারণের জ্ঞান হয়, তখন কার্য, কারণে লীন হয়ে যায় অর্থাৎ কার্যের আর পৃথক্ কোনো সত্তা থাকে না এবং 'পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কোনো কারণ নেই'—স্বতঃই এই অনুভব হয়।

'ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব'—এই সমস্ত জগৎ সূত্রে গুটিকার ন্যায় আমাতে গাঁথা অর্থাৎ আমি সমস্ত জগতে অনুস্যূত (ব্যাপ্ত) হয়ে আছি। যেমন সূত্র দ্বারা প্রস্তুত গুটিকাগুলিতেও সুতো ভিন্ন অন্য কিছুই নেই, তেমনই জগতে আমি ছাড়া আর কোনো তত্ত্ব নেই। তাৎপর্য হল এই যে সূত্রে গাঁথা গুটিকাগুলি যেমন ভিন্ন ভিন্ন হলেও তা সূত্রের দ্বারা যুক্ত থাকে তেমনই জগতে যত প্রাণী আছে, তাদের নাম-রূপ-আকৃতি পৃথক হলেও, বাস্তবে তাতে একই চেতন-তত্ত্ব পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। সেই চেতন-তত্ত্ব হলাম আমি—**'ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত'** (গীতা ১৩।২) অর্থাৎ গুটিকারূপ অপরা প্রকৃতিও আমার স্বরূপ এবং সুতোরূপ পরা-প্রকৃতিও আমি। দুই স্থানেই আমি পরিপূর্ণ, ওতঃপ্রোত হয়ে আছি। সাধক যখন জগৎকে সংসার-বুদ্ধি দিয়ে দেখেন, তখন তাঁর জগতে পরিপূর্ণরূপে ব্যাপ্ত পরমাত্মা অনুভবে আসে না। যখন তাঁর পরমাত্মতত্ত্বের প্রকৃত বোধ হয়, তখন ব্যাপ্য-ব্যাপক ভাব দূর হয়ে এক পরমাত্মতত্ত্বই অনুভবে আসে। এই তত্ত্ব জানানোর জন্য ভগবান এইস্থানে কারণরূপে নিজের ব্যাপকতার বর্ণনা করেছেন।

পরিশিষ্ট-ভাব—সুতোয় যেমন (সুতোয় তৈরি) মণিগুলি (সুতোর গুটিকা) পরানো থাকে এবং তার মধ্যে সুতো ছাড়া আর কিছুই থাকে না, তেমনই জগতে ভগবান ব্যতীত আর কিছুই নেই। তাৎপর্য হল যে মণিরূপে অপরা প্রকৃতি এবং সুতোরূপে পরা প্রকৃতি—দুইয়েতেই ভগবানই পূর্ণরূপে বিরাজমান। মণিতে অপরা প্রকৃতির প্রাধান্য থাকে আর সুতোয় পরা প্রকৃতিরই প্রাধান্য। **'মণিগণাঃ'** পদটিতে বহুবচন ব্যবহারের অর্থ হল যে অপরা প্রকৃতি স্থাবর-জঙ্গম, জলচর-নভচর-খেচর, চতুর্দশ-ভুবন, চুরাশী লক্ষ প্রাণী, ইত্যাদি অনন্ত রূপ সমুদায়ে বিভক্ত।

অপরা ও পরা প্রকৃতির বিভেদ 'অপরা' প্রকৃতির জন্যই হয়ে থাকে। কারণ অপরাকে সত্তা ও গুরুত্ব দিয়ে তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার জন্যই জীব হয়েছে (গীতা ৭।৫)। অতএব অপরা প্রকৃতি বিশ্বজগতে যেমন আছে, জীবের মধ্যেও তেমনই রয়েছে। কিন্তু পরমাত্মাতে অপরাও নেই, পরাও নেই, জগৎও নেই, জীবও নেই। তাৎপর্য হল যে প্রকৃতপক্ষে সুতোও নেই, গুটিকাও নেই, শুধুমাত্র তুলোই বর্তমান। তেমনই অপরাও নেই, পরাও নেই, শুধু একমাত্র পরমাত্মাই আছেন। ভগবান পরবর্তী দ্বাদশ শ্লোক পর্যন্ত এটি বর্ণনা করেছেন। এই শ্লোকে উদ্ধৃত **'মত্তঃ'** পদটির দ্বারা আরম্ভ করে দ্বাদশ শ্লোকের **'মত্ত এব'** শ্লোক পর্যন্ত ভগবান এই কথাই বলেছেন যে আমা ব্যতীত আর কিছুই নেই। এখানে **'মত্তঃ'** পদটির ব্যাপকার্থ পরমাত্মার বাচক, যিনি পরা ও অপরা উভয় প্রকৃতির প্রভু।

কারণই কার্যে পরিণত হয়, যেমন তুলো থেকেই সুতো প্রস্তুত হয়, বীজ থেকেই বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। অতএব সবার পরম কারণ ভগবান হওয়ায় সর্বরূপে ভগবানই বিরাজমান—**'বাসুদেবঃ সর্বম্'**। তাই ভগবান ব্যতীত অন্য সত্তা দেখাই হল ভ্রান্তি।

'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি'—দুইয়ের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ তাকে 'পরতর' বলা হয়। ভগবান অদ্বিতীয়, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো বস্তুই ('পর') আর নেই, তাহলে তাঁকে 'পরতর' বলা হয় কেন ? তাঁতে 'পরতর' শব্দ প্রযোজ্য হয় না। এখানে ভগবানকে অদ্বিতীয় বলার জন্যই 'পরতর' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ ভগবান ভিন্ন অন্য আর কিছুই নেই, শ্রেষ্ঠও আর কিছু নেই। উপনিষদে উদ্ধৃত আছে যে—**'পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥'** (কঠোপনিষদ্ ১।৩।১১)।

'পুরুষের পর আর কিছু নেই। তিনিই সবার পরম অবধি বা শেষ এবং সবার পরম গতি।'

অর্জুনও বলেছেন—

'ন ত্বৎ সমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব।' (গীতা ১১।৪৩)

※ ※ ※

সম্বন্ধ—যেসব কার্য পরিলক্ষিত হয়ে থাকে, তার মূলে আছেন পরমাত্মা—এটি জানাবার জন্য ভগবান অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্লোকের প্রকরণটির অবতারণা করছেন—

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু॥ ৮ ॥

[**কৌন্তেয়** (হে কৌন্তেয় !) ; **অপ্সু** (জলে) ; **রসঃ** (রস) ; **অহম্** (আমি) ; **শশিসূর্যয়োঃ** (চন্দ্র ও সূর্যে) ; **প্রভা** (প্রভা) ; **অস্মি** (আমি) ; **সর্ববেদেষু** (বেদসমূহে) ; **প্রণবঃ** (প্রণব) ; **খে** (আকাশে) ; **শব্দঃ** (শব্দ) ; **নৃষু** (মানুষের মধ্যে) ; **পৌরুষম্** (পুরুষার্থ।)]

হে কৌন্তেয় ! জলে আমি রস, চন্দ্র ও সূর্যে আমি প্রভা, বেদে আমি প্রণব (ওঁকার), আকাশে আমি শব্দ এবং মানুষের মধ্যে আমি পুরুষার্থরূপে বিরাজমান ॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা—[যেমন সাধারণভাবে মানুষ অর্থকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করেছে বলে অর্থ রোজগারে এবং তার সংগ্রহে লোভী ব্যক্তির স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয়। এরূপই দেখা-শোনা-মনে করা এবং বোঝার যা কিছু জগতে আছে, ভগবানই তার কারণ (৭।৬), ভগবান ব্যতিরেকে তার কোনো পৃথক অস্তিত্ব নেই—এরূপ মনে করলে

ভগবানে স্বাভাবিকভাবে ভক্তি আসে এবং তখন স্বাভাবিকভাবেই তাঁর ভজনা হয়। এই কথাই তিনি দশম অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে বলেছেন যে 'আমি সমস্ত জগতের কারণ, আমা হতেই জগৎ উৎপন্ন হয়'—এরূপ জেনে বুদ্ধিমান মানুষ আমার ভজনা করেন। অষ্টাদশ অধ্যায়ের ছেচল্লিশতম শ্লোকেও এই কথাই বলেছেন যে, 'যে পরমাত্মা থেকে সমস্ত জগৎ প্রবৃত্ত হয় এবং যাঁর দ্বারা সমস্ত সংসার পরিব্যাপ্ত, মানুষ তাঁকে নিজ কর্মের দ্বারা পূজা করে সিদ্ধিলাভ করে'। এই সিদ্ধান্তটি জানানোই এই প্রকরণের উদ্দেশ্য।]

'রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয়'—হে কৌন্তেয় ! জলে আমি রস। জল রস-তন্মাত্রা[১] হতে উৎপন্ন হয়। রস-তন্মাত্রাতে থাকে এবং তাতেই লীন হয়। জল থেকে যদি রস নিয়ে নেওয়া যায় তাহলে জলতত্ত্ব থাকে না। সুতরাং রসই জলরূপে বিরাজিত। আমি সেই রস।

'প্রভাস্মি শশিসূর্যয়োঃ'—চন্দ্র এবং সূর্যের মধ্যে আলোকিত করার যে বিশেষ শক্তি 'প্রভা'[২], তা হল আমারই স্বরূপ। প্রভা উৎপন্ন হয় রূপ-তন্মাত্রা থেকে, এটি রূপ-তন্মাত্রাতেই থাকে এবং অন্তকালে তাতেই লীন হয়। চন্দ্র এবং সূর্য থেকে যদি 'প্রভা'-কে আলাদা করা সম্ভব হয়, তাহলে চন্দ্র ও সূর্য নিস্তত্ত্ব হয়ে যাবে। অর্থাৎ কেবলমাত্র প্রভাই চন্দ্র এবং সূর্যরূপে প্রকটিত হচ্ছে এবং ভগবান বলেছেন যে, সেই প্রভাও তিনিই।

'প্রণবঃ সর্ববেদেষু'—সমস্ত বেদের সার প্রণব (ওঁকার) আমারই স্বরূপ। কারণ সর্বপ্রথম প্রণবই প্রকটিত হয়েছে। প্রণব হতে ত্রিপদ গায়ত্রী এবং ত্রিপদ গায়ত্রী থেকে বেদত্রয়ী প্রকাশিত হয়েছে। সেইজন্য বেদের সার হল 'প্রণব'। বেদ হতে যদি প্রণব সরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে বেদ আর বেদরূপে থাকে না। প্রণবই বেদ এবং গায়ত্রীরূপে প্রকটিত হয়েছে। আমিই সেই প্রণব।

'শব্দঃ খে'—সর্বত্র যে শূন্যতা দেখা যাচ্ছে, তাই আকাশ। শব্দ-তন্মাত্রা থেকে আকাশের উৎপত্তি, এটি শব্দ-তন্মাত্রাতেই থাকে এবং অন্তিমে তাতেই লীন হয়ে যায়। অতএব শব্দ-তন্মাত্রাই আকাশ-রূপে প্রকটিত হচ্ছে। শব্দ-তন্মাত্রা ছাড়া আকাশ হতে পারে না। সেই শব্দ (-তন্মাত্রা) আমিই।

'পৌরুষং নৃষু'—মানুষের সার পদার্থ হল পুরুষার্থ, তা আমারই স্বরূপ। নিত্যপ্রাপ্ত পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব করাই হল মানুষের প্রকৃত পুরুষার্থ। কিন্তু মানুষ অপ্রাপ্ত বস্তু লাভ করাকেই নিজ পুরুষার্থ বলে মনে করে—যেমন নির্ধন ব্যক্তি ধনপ্রাপ্তিকে তার পুরুষার্থ বলে ভাবে, নিরক্ষর ব্যক্তি পড়াশোনা জানাকেই পুরুষার্থ বলে মনে করে, স্বল্প-পরিচিত ব্যক্তি নিজেকে বিখ্যাত করাকেই পুরুষার্থ বলে ভাবে ইত্যাদি। তাৎপর্য হল যে, যেটি আপাতত নেই, সেটি লাভ করাকেই মানুষ তার পুরুষার্থ মনে করে কিন্তু এ সব পুরুষার্থ নয়। কারণ যা আগে ছিল না, প্রাপ্তির সময় থেকেই যেটি নিত্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে এবং বাস্তবত যেটি 'নেই' হয়ে যাবে—সেগুলির প্রাপ্তিকে পুরুষার্থ বলে না। পরমাত্মা আগেও ছিলেন, এখনও আছেন এবং পরে সর্বদাই থাকবেন, কারণ তাঁর কখনো অবলুপ্তি হয় না। সেই পরমাত্মাকে আন্তরিকভাবে প্রাপ্ত করার যে প্রচেষ্টা, তাই হল বাস্তবিক পুরুষার্থ। সেটি প্রাপ্তি করাই মানুষের মনুষ্যত্ব। তাঁকে লাভ না করলে মানুষের মনুষ্যত্ব থাকে না অর্থাৎ সে নিরর্থক।

---

[১]পৃথিবী-জল-তেজ-বায়ু এবং আকাশ—এই স্থূল পঞ্চ মহাভূতের কারণগুলির নাম হল রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ, এগুলিকে বলা হয় 'পঞ্চতন্মাত্রা'। পঞ্চতন্মাত্রা ইন্দ্রিয়াদিও অন্তঃকরণের বিষয় নয় এবং শাস্ত্রের মাধ্যমে শুনে মানা হয়ে থাকে। পঞ্চ মহাভূতাদির কার্যের নামও রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ, যা হল ইন্দ্রিয়াদি ও এগুলি ইন্দ্রিয়াদি ও অন্তঃকরণের বিষয়।

[২]রূপ-তন্মাত্রার দুটি শক্তি থাকে—এক 'প্রকাশিকা' বা প্রকাশকারী এবং অপরটি হল 'দাহিকা' বা দহনকারী। প্রকাশিকা শক্তিকে বলা হয় 'প্রভা' এবং দাহিকা শক্তিকে বলে 'তেজ'। দাহিকা শক্তি ছাড়াও 'প্রকাশিকা শক্তি' থাকতে পারে (যেমন—মণি, চন্দ্র ইত্যাদি)। কিন্তু 'দাহিকা শক্তি' প্রকাশিকা শক্তি ব্যতিরেকে থাকতে পারে না। এখানে 'প্রভাস্মি শশিসূর্যয়োঃ' পদে চন্দ্র ও সূর্যের 'প্রকাশিকা শক্তির' প্রাধান্য স্বীকার করেই 'প্রভা' শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে এবং এই অধ্যায়ের নবম শ্লোকে 'তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ' পদটিতে অগ্নির 'দাহিকা শক্তি'র প্রাধান্য মেনেই 'তেজ' শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে।

সূর্য ও অগ্নিতে প্রকাশিকা ও দাহিকা—দুই শক্তিই আছে। চন্দ্রে প্রকাশিকা শক্তি থাকলেও তা দাহিকা শক্তির বদলে 'সৌম্য শক্তি' রূপে প্রকটিত হয়েছে, যা শীতলতা প্রদান করে।

পরিশিষ্ট-ভাব— ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্লোক দুটিতে ভগবান নিজেকে সমস্ত জগতের কারণ বলে জানিয়েছেন। তাই ভগবান অষ্টম শ্লোক থেকে দ্বাদশ শ্লোক পর্যন্ত 'কারণ' রূপে নিজ বিভূতিগুলির বর্ণনা করেছেন। কারণের চেয়ে যদিও কার্যের বিশেষ প্রকাশ থাকে, কিন্তু কারণের পৃথক অস্তিত্ব হয় অর্থাৎ কারণ ব্যতীত কার্যের পৃথক অস্তিত্ব হয় না। যেমন মাটি হচ্ছে কারণ আর কলসী হল তার কার্য। কলসীতে জলভরা হয় কিন্তু মাটিতে তা সম্ভব নয়। কিন্তু মাটি ছাড়া কলসীর অস্তিত্ব অসম্ভব। অর্থাৎ কারণই কার্যরূপে প্রতিভাত হয়। কলসীর সৃষ্টিতে কর্তা, কারণ ও কার্য—তিনটি এক হয় না অর্থাৎ কারণ (মাটি) এবং কার্য (কলসী) এক হলেও কর্তা অর্থাৎ কুমোর পৃথক থাকে। কিন্তু জগৎ সৃষ্টিতে কর্তা, কারণ ও কার্য—তিনটিই একমাত্র ভগবানই হন। সুতরাং রসও ভগবান, জলও ভগবান। প্রভাও ভগবান এবং চন্দ্র-সূর্যও ভগবান। ওঁকারও ভগবান, বেদও ভগবান। শব্দও ভগবান, আকাশও ভগবান। পুরুষার্থও ভগবান, মানুষও ভগবান।

[মাটি কলসীর রূপ গ্রহণ করলেও পরমাত্মা জগৎ সংসারে রূপান্তরিত হন না। কেন-না যে বস্তু অন্য বস্তুতে রূপান্তরিত হয়, সেগুলি বিকারশীল বস্তু। কিন্তু পরমাত্মা নির্বিকার। অতএব অন্ধকারে যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হয় অথবা সাপকে কুণ্ডলীরূপে ভ্রম হয় তেমনই পরমাত্মাকে বিশ্বরূপে দেখা যায়। তাৎপর্য হল এই যে পরমাত্মাতে কার্য-কারণ রূপ পার্থক্য নেই, কারণ পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই। কার্য-কারণের ভেদ শুধু মানুষেরই দৃষ্টিতে। মানুষকে বোঝাবার জন্যই অন্যান্য বস্তুতে অস্তিত্ব প্রদান করে পরমাত্মার বর্ণনা, বিচার-বিবেচনা, চিন্তা, প্রশ্ন-উত্তর ইত্যাদি করা হয়ে থাকে—**'নোদ্যং বা পরিহারো বা ক্রিয়তাং দ্বৈতভাষয়া।'**]

※ ※ ※

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাং চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু॥ ৯ ॥

[পৃথিব্যাম্ (পৃথিবীতে) ; পুণ্যঃ (পবিত্র) ; গন্ধঃ (গন্ধ) ; চ (এবং) ; বিভাবসৌ (অগ্নিতে) ; তেজঃ (তেজ) ; অস্মি (আমি) ; চ (তথা) ; সর্বভূতেষু (সকল প্রাণীর) ; জীবনম্ (জীবনীশক্তি) ; চ (এবং) ; তপস্বিষু (তপস্বীদের মধ্যে) ; তপঃ (তপস্যা) ; অস্মি (আমি।)]

আমিই পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধ, অগ্নিতে তেজ, সমস্ত প্রাণীর জীবনীশক্তি এবং তপস্বীদের তপস্যা ॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা—**'পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাম্'**—গন্ধ-তন্মাত্রা হতে পৃথিবী উৎপন্ন হয়েছে, গন্ধ-তন্মাত্রাতেই বিরাজ করছে এবং তাতেই লীন হয়ে থাকে। তাৎপর্য হল এই যে গন্ধ ব্যতিরেকে পৃথিবী কিছুই নয়। ভগবান বলেছেন পৃথিবীতে তিনিই পবিত্র গন্ধরূপে বিরাজমান।

এখানে গন্ধের সঙ্গে **'পুণ্য'** বিশেষণ দেওয়ার তাৎপর্য হল এই যে, পৃথিবীতে গন্ধ থাকেই। পুণ্য অর্থাৎ পবিত্র গন্ধও স্বাভাবিকভাবেই পৃথিবীতে থাকে, আর দুর্গন্ধ প্রকটিত হয় বিকৃতি থেকে।

'তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ'—তেজ প্রকটিত হয় রূপ-তন্মাত্রা থেকে, তেজ তাতেই বিরাজ করে এবং অন্তকালে তাতেই লীন হয়ে যায়। অগ্নিতে তেজই তত্ত্ব। তেজ ব্যতিরেকে অগ্নি নিস্তত্ত্ব হয়ে যায়, তার আর কিছুই থাকে না। ভগবানই হলেন সেই তেজ।

'জীবনং সর্বভূতেষু'—সব প্রাণীতেই এক জীবনীশক্তি, প্রাণশক্তি বিদ্যমান, যার জন্য সবাই প্রাণসম্পন্ন। সেই প্রাণশক্তির জন্যই এদের প্রাণী বলা হয়। প্রাণশক্তি না থাকলে এদের প্রাণীত্ব বলে কিছু থাকে না। এই প্রাণশক্তির জন্যই গভীর নিদ্রামগ্ন ব্যক্তিকে মৃতব্যক্তির থেকে পৃথক্ দেখায়। ভগবানই হলেন সেই প্রাণশক্তি।

'তপশ্চাস্মি তপস্বিষু'—দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতাকে তপস্যা বলা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তির সাধনায় যে কোনো ক্লেশে নির্বিকার থাকাই হল প্রকৃত তপস্যা। তপস্বীদের এই হল তপস্যা, এর জন্যই তাঁদের তপস্বী বলা হয় এবং ভগবান এই তপস্যাকেই তাঁর নিজের স্বরূপ বলে জানিয়েছেন। তপস্বীদের এই তপস্যা না থাকলে তাঁরা আর তপস্বী থাকেন না।

পরিশিষ্ট-ভাব—জগৎ সৃষ্টিতে ভগবানই কর্তা, তিনিই কারণ এবং কার্য। অতএব গন্ধ এবং পৃথিবী, তেজ ও অগ্নি জীবনীশক্তি ও প্রাণী, তপস্যা ও তপস্বী— এসবেরই উৎস (কারণ ও কার্য) একমাত্র ভগবান। কারণ পরা ও অপরা— উভয়ই ভগবানের শক্তি, তাই সেগুলি ভগবান হতে অভিন্ন। সুতরাং পরা-অপরার সংযোগে উৎপন্ন সমস্ত সৃষ্টিই ভগবৎস্বরূপ।

'পুণ্যোগন্ধঃ'—গন্ধ-তন্মাত্রা কারণ এবং পৃথিবী তার কার্য। গন্ধকে পবিত্র বলার অর্থ হল যে কারণ (তন্মাত্রা) সর্বদাই পবিত্র। কার্যে বিকৃতি এলেই অপবিত্রতা আসে। অতএব গন্ধ-তন্মাত্রা যেমন পবিত্র, তেমনই শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস আদি সমস্ত তন্মাত্রাও পবিত্র বলে বুঝতে হবে।

❋ ❋ ❋

বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্॥ ১০ ॥

[**পার্থ** (হে পার্থ !) ; **সর্বভূতানাম্** (সকল প্রাণীর) ; **সনাতনম্** (অনাদি) ; **বীজম্** (বীজ) ; **মাম্** (আমাকে) ; **বিদ্ধি** (জানবে) ; **অহম্, অস্মি** (আমি হচ্ছি) ; **বুদ্ধিমতাম্** (বুদ্ধিমানদের মধ্যে) ; **বুদ্ধিঃ** (বুদ্ধি) ; **তেজস্বিনাম্** (তেজস্বীদের মধ্যে) ; **তেজঃ** (তেজ স্বরূপ।)]

হে পার্থ ! আমাকে সর্ব প্রাণীর অনাদি বীজ বলে জানবে। আমি বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি এবং তেজস্বিগণের তেজ ॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা—**'বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি**[1] **পার্থ সনাতনম্'**—হে পার্থ ! সমস্ত প্রাণীর সনাতন (অনাদি) বীজ আমিই তাই সবকিছুর কারণও আমি। সমস্ত প্রাণী আমা হতে উৎপন্ন হয়, আমাতে থাকে এবং শেষে আমাতেই লীন হয়ে যায়। আমাকে ছাড়া প্রাণীর পৃথক্ কোনো স্বাধীন অস্তিত্ব নেই।

যতপ্রকার বীজ আছে, সে সবই বৃক্ষ হতে উৎপন্ন হয় এবং বৃক্ষ এদের জন্ম দিয়েই নিজে নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু এখানে যে বীজের বর্ণনা করা হয়েছে, সেই বীজ হচ্ছে 'সনাতন' অর্থাৎ আদি-অন্তরহিত (অনাদি এবং অন্তহীন)। একেই নবম অধ্যায়ের আঠারোতম শ্লোকে 'অব্যয় বীজ' বলা হয়েছে। এই চেতন-তত্ত্ব অব্যয় বা অবিনাশী। এটি স্বয়ং বিকার-রহিত হয়েও সমস্ত জগতের উৎপাদক, প্রকাশক, আশ্রয় অর্থাৎ সমস্ত জগতের কারণ।

গীতায় 'বীজ' শব্দটি কোথাও ভগবান আবার কোথাও জীবাত্মা—এই দুইয়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে 'বীজ' শব্দটি ভগবানের বাচক, কারণ এখানে কারণরূপে বিভূতিগুলির বর্ণনা আছে। দশম অধ্যায়ের উনচল্লিশতম শ্লোকে বিভূতিরূপে উদ্ধৃত 'বীজ' শব্দটিও ভগবানের বাচক। কেন-না ওই স্থানে তাঁকে সম্পূর্ণ প্রাণীদের কারণ বলা হয়েছে। নবম অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকে 'বীজ' শব্দটি ভগবানের বাচকরূপে উদ্ধৃত, কারণ ওই অধ্যায়ের উনিশতম শ্লোকে **'সদসচ্চাহমর্জুন'** পদটিতে বলা হয়েছে যে কার্য এবং কারণ সবই আমি। সমস্তই ভগবান হওয়াতে 'বীজ' শব্দটি ভগবানের বাচক। চতুর্দশ অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে **'অহং বীজপ্রদঃ পিতা'** 'আমি বীজপ্রদানকারী পিতা'—এরূপ বলাতে ওইস্থানে 'বীজ' শব্দটি জীবাত্মার বাচক। 'বীজ' শব্দ জীবাত্মার বাচক তখনই হয়, যখন সেটি জড়ের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নেয়, না হলে সেটি ভগবানেরই স্বরূপ।

'বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি'—আমিই বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি। বুদ্ধির জন্যই এদের বুদ্ধিমান বলা হয়। তাদের বুদ্ধি যদি না থাকে তাহলে বুদ্ধিমান সংজ্ঞাও তাদের থাকে না।

'তেজস্তেজস্বিনামহম্'—তেজস্বীদের তেজও আমি। দৈবসম্পদের একটি গুণ হল এই তেজ। তত্ত্বজ্ঞ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদের মধ্যে এক বিশেষ তেজ-শক্তি থাকে, যার প্রভাবে দুর্গুণ-দুরাচারী ব্যক্তিও তাঁদের সংসর্গে সদ্গুণ-সদাচারী হয়ে ওঠে। সেই তেজ ভগবানেরই স্বরূপ।

[1]ভগবান এই অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে 'উপধারয়' বলেছেন এবং এখানে বলেছেন 'বিদ্ধি'। এর তাৎপর্য এই যে, সমস্ত জগতে সাররূপে 'আমিই আছি', এটি ভালোভাবে বুঝে ধারণ করো। এভাবে বুঝে ধারণ করলে তাঁর প্রতি অনুরাগ হবে।

বিশেষ কথা

ভগবানই সমস্ত জগতের কারণ, জগতে তিনিই সর্বত্র পরিপূর্ণ এবং জগৎ না থাকলেও তিনি বিরাজ করেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সবকিছুই হলেন ভগবান। সেইজন্য উপনিষদে সোনা, মাটি এবং লোহার দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। যেমন, সোনা দিয়ে তৈরি গহনাতে সোনাই থাকে, মাটির তৈরি বাসনে মাটিই বিদ্যমান এবং লোহার তৈরি অস্ত্র-শস্ত্রে লোহাই থাকে, তেমনই ভগবান হতে উৎপন্ন এই সমস্ত জগৎই ভগবানময়। কিন্তু গীতায় ভগবান বীজের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন যে, সমস্ত জগতের বীজ আমিই। বীজ বৃক্ষ থেকে উৎপন্ন হয় এবং বৃক্ষকে জন্ম দিয়ে বীজটি নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ বীজ থেকে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় এবং অঙ্কুর থেকে গাছ জন্মায় এবং বীজ নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ভগবান নিজেকে সংসারমাত্রেরই বীজ বলে একটি কথা বিশেষভাবে জানিয়েছেন যে 'আমি অনাদি বীজ, উৎপন্ন হওয়া বীজ নই'—**'বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্'** (৭।১০) এবং 'আমি অবিনাশী বীজ'—**'বীজমব্যয়ম্'** (৯।১৮)। অবিনাশী বীজ বলার অর্থ হল যে, 'সংসার আমা হতে উৎপন্ন হলেও, আমি নাশ হই না, যেমন তেমনই থাকি।'

সোনা, মাটি এবং লোহার উদাহরণে গহনাতে সোনা, বাসনে মাটি এবং অস্ত্র-শস্ত্রে লোহা দেখা গেলেও সংসারে পরমাত্মাকে সেভাবে দেখতে পাওয়া যায় না। যদি বীজের উদাহরণ দেওয়া যায় তবে বৃক্ষে বীজ দেখতে পাওয়া যায় না। বৃক্ষে যখন বীজ হয়, তখন বুঝতে পারা যায় যে, এই বৃক্ষের এরূপ বীজ, যার থেকে এই বৃক্ষটির উৎপত্তি হয়েছে। সমস্ত গাছ বীজ থেকেই উৎপন্ন হয় এবং বীজেই তার সমাপ্তি ঘটে। বৃক্ষের উৎপত্তি বীজ থেকে হয়ে বীজেই তার অন্ত হয় অর্থাৎ গাছটি শত শত বৎসর বেঁচে থাকলেও তার শেষ পরিণতি বীজেই হয়, বীজ ছাড়া আর কিসে হবে ? ভগবানও এইরকম সংসারের (জগতের) বীজস্বরূপ অর্থাৎ তাঁর থেকেই জগৎ উৎপন্ন হয় এবং তাঁতেই বিলীন হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত এক ভগবানই অবশিষ্ট থাকেন—**'শিষ্যতে শেষসংজ্ঞঃ'** (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩।২৫)।

বৃক্ষ দেখেও 'এটি আসলে বীজই'—যিনি এইরূপ জানেন, তিনিই বৃক্ষকে ঠিক ঠিক জানেন আর যারা বীজ না দেখে শুধু বৃক্ষটিকেই দেখতে পায়, তারা বৃক্ষতত্ত্ব জানে না। ভগবান এখানে **'বীজং মাং সর্বভূতানাম্'** বলে এই কথা জানাচ্ছেন যে, 'তোমরা এই যে জগৎ-সংসার দেখতে পাচ্ছ, এর আগে আমিই ছিলাম, এক প্রজারূপ থেকেই বহুরূপে আমি প্রকটিত হয়েছি'—**'বহু স্যাং প্রজায়েয়'** (ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৬।২।৩) এবং 'এগুলির শেষেও আমিই থাকব'। অর্থাৎ 'প্রথমে আমিই ছিলাম, পরেও আমি থাকব তাই মধ্যাবস্থাতেও আমিই আছি।'

চিন্তা করে দেখলে তবেই এই জগৎ 'পাঞ্চভৌতিক' বলে জানা যায়। কিন্তু সাধারণভাবে এটি 'পাঞ্চভৌতিক' বলে মনে হয় না। যেমন কেউ যদি বলে যে আমাদের সমস্ত শরীরই পার্থিব (পৃথিবী হতে উৎপন্ন), তাই এতে মাটির প্রাধান্য আছে ; তাহলে অন্যেরা বলবে, এটি মাটির কীভাবে হল ? মাটি দিয়ে হাত ধোওয়া হয়, মাটি তো কাদা-কালি অতএব এই দেহ মাটির নয়। এইরূপ শরীর মাটির হলেও তাকে মাটিরূপে দেখায় না। কিন্তু এই জগৎ সংসার, যা দৃশ্যমান, তাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিলে শেষপর্যন্ত মাটিই হয়ে যায়।

চিন্তা করতে হয় যে, এই দেহের মূলে কী আছে ? মা-বাবার রজ-বীর্যের যে অংশ, যার থেকে দেহ সৃষ্টি হয়, সেই অংশটি অন্ন থেকে উৎপন্ন হয়। অন্ন উৎপন্ন হয় মাটি থেকে। সুতরাং এই দেহ মাটি থেকেই উৎপন্ন হয় এবং অন্তকালে শরীর তিনটি গতি প্রাপ্ত হয়—হয় মাটিতে কবর দেওয়া হয়, না হয় পুড়িয়ে ভস্ম করা হয় অথবা পশু-পক্ষী খেয়ে নেয়। এই তিনভাবেই দেহ অন্তকালে মাটি হয়ে যায়। এইভাবে প্রথমে এবং শেষে মাটি হওয়ায় মধ্যবর্তীকালেও দেহ বা জগৎ মাটি-ই থাকে। কিন্তু মধ্যবর্তীকালে এগুলি মাটি বলে প্রতীত হয় না। আলোচনা করলেই মাটি বলে মনে হয়, চোখে ধরা পড়ে না। এইরূপই এই জগৎও চিন্তা করলে পরমাত্মস্বরূপ বলে প্রতীত হয়। বিচার করতে হয় যে, সৃষ্টি রচনাকালে ভগবান কোথা থেকেও কিছু আনয়ন করেননি এবং সৃষ্টি রচনাকারীও তিনি ভিন্ন আর কেউ ছিলেন না। ভগবান নিজেই জগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি নিজেই তাতে প্রবিষ্ট হয়েছেন—**'তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ'** (তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ২।৬)। এই দেহে জীবরূপেও পরমাত্মাই বিরাজমান। অতএব এই জগৎ পরমাত্মারই স্বরূপ।

পরিশিষ্ট-ভাব—নিজেকে সমস্ত প্রাণীর বীজ বলার অর্থ এই যে, সমগ্র প্রাণীর রূপে এক তিনিই অবস্থিত। সৃষ্টি অনন্ত। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে জীবও অনন্ত। কিন্তু সেই জীবসমূহের বীজ (পরমাত্মা) একটিই। অনন্ত সৃষ্টি সংসার উৎপন্ন হলেও সেই বীজের কোনো ক্ষয় হয় না, কারণ তিনি অব্যয়—'বীজমব্যয়ম্' (গীতা ৯।১৮)। সেই এক বীজ হতেই নানা প্রকার জীবসমূহ উৎপন্ন হয় (গীতা ১০।৩৯)। বীজকে যত সূক্ষ্মরূপেই দেখা যাক না কেন, তাতে ফল-ফুলাদি দেখা যায় না, কারণ সেগুলি ওই বীজে কারণ রূপে অবস্থান করে। ওই বীজ থেকে উৎপন্ন হওয়া বৃক্ষের দুটি পাতাও একরকম থাকে না—ওই একটি বীজের মধ্যেই এই আশ্চর্য পার্থক্যও থাকে।

জগতের সৃষ্টির এক একটি বস্তুতে নানা পার্থক্য থাকে। বিভিন্ন দেশে নানা জাতির মানুষ বসবাস করে। তার মধ্যেও এত পার্থক্য থাকে যে দুটি মানুষের হাতের রেখাও কখনো এক হয় না। তাদের আকার-আকৃতি-প্রকৃতি-রুচি-ভাব ইত্যাদিও একের সঙ্গে অপরের মেলে না। গরু, মোষ, ভেড়া, ছাগল, ঘোড়া, উট, কুকুর ইত্যাদি নানাপ্রকার জীবজন্তু আছে এবং তাদের মধ্যেও নানা বিভেদ আছে। বৃক্ষের মধ্যেও নানাপ্রকার আছে। এক একটি বিদ্যাতেও এত পার্থক্য থাকে যে তার অন্ত পাওয়া যায় না। রং আসলে তিনটি, কিন্তু এই তিনটিই মিলেমিশে বহু রঙে পরিণত হয়। তার মধ্যে আবার এক একটি রঙে এত পার্থক্য যে দুজন ব্যক্তির দেহও সমান রং-এর হয় না। এরূপই জগতে দুটি জিনিস দেখতে একপ্রকার হলেও প্রকৃতপক্ষে একপ্রকার নয়। এরকম পার্থক্য থাকলেও জগতের মূল বীজ একটিই। অর্থাৎ এক ভগবানই নানারূপে প্রকটিত হন এবং নানারূপে প্রকটিত হয়েও তিনি একই থাকেন[১]।

দেশ-কাল ইত্যাদি সকল দৃষ্টিতেই ভগবান অনন্ত। ভগবানের সৃষ্টি করা এই বিশ্বজগতেরই কোনো অন্ত নেই, তাহলে ভগবানের অন্ত হয় কী করে ? আজ পর্যন্ত ভগবান সম্বন্ধে যত কিছু বলা, শোনা, লেখা, বা ভাবা হয়েছে তা সব মিলেও অপূর্ণ। শুধু তাই নয়, ভগবানও নিজের পূর্ণ বর্ণনা করতে পারেন না। কেন-না সম্পূর্ণ বর্ণনা সম্ভব হলে তিনি অনন্ত থাকবেন কী করে ?

❋ ❋ ❋

বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জিতম্।
ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ॥ ১১ ॥

[ভরতর্ষভ (হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন !) ; **বলবতাম্** (বলবানদের) ; **কামরাগবিবর্জিতম্** (কাম-রাগ বর্জিত) ; **বলম্** (বল) ; **অহম্** (আমি) ; **চ** (এবং) ; **ভূতেষু** (প্রাণীদের মধ্যে) ; **ধর্মাবিরুদ্ধঃ** (ধর্মের অবিরুদ্ধ) ; **কামঃ** (কাম) ; **অস্মি** (আমি।)]

হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন ! বলবানদিগের কাম ও রাগ (আসক্তি) বর্জিত বল আমি। মানুষের মধ্যে ধর্মের অবিরুদ্ধ (ধর্মযুক্ত) কামও আমি ॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা—**'বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জিতম্'**—কঠিন হতে কঠিনতর কাজেও নিজের অন্তরে একটি কামনা-লালসাবর্জিত শুদ্ধ, নির্মল উৎসাহ থাকে। কাজ শেষ হয়ে যাবার পরেও 'আমার কাজটি শাস্ত্র ও ধর্মের অনুকূল এবং লোকমর্যাদা অনুসারে সাধুজন অনুমোদিত'—এই চিন্তায় মনে একপ্রকার উৎসাহ থাকে। একেই বলা হয় 'বল'। এই বল ভগবানেরই স্বরূপ, অতএব এই বল গ্রহণীয়।

গীতায় ভগবান নিজেই বলের ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। সপ্তদশ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে **'কামরাগবলান্বিতাঃ'** পদে উল্লিখিত বল কামনা এবং আসক্তিযুক্ত হওয়ায় দুরাগ্রহ এবং জেদের বাচক। সুতরাং এই বল ভগবানের স্বরূপ নয়,

[১]প্রাণীদের মধ্যে নানাপ্রকার পার্থক্য থাকলেও, তাদের পরস্পরের মধ্যে প্রেমের ঐক্য থাকা উচিত। যেমন কাঁটা পায়ে ফোটে, কিন্তু জল চোখে আসে। তেমনই ভাব সমস্ত প্রাণীর মধ্যেই থাকা উচিত—'সর্বভূতহিতে রতাঃ' (গীতা ৫।২৫, ১২।৪)। প্রেমই একমাত্র বস্তু, যাতে কোনো প্রকার বিভেদ থাকে না। প্রেমকে আলাদা করা যায় না। প্রেমে সব এক হয়ে যায়। জ্ঞানে তত্ত্বভেদ না থাকলেও মতভেদ থাকে। কিন্তু প্রেমে মতভেদও থাকে না। সুতরাং প্রেমের থেকে উত্তম আর কিছুই নেই। প্রেমের দ্বারা ত্রিলোকেশ্বর ভগবানও বশীভূত হন।

প্রত্যুত এটি আসুরী-সম্পদ্ হওয়ায় ত্যাজ্য। এরূপ **'সিদ্ধোঽহং বলবান সুখী'** (গীতা ১৬।১৪) এবং **'অহংকারং বলং দর্পম্'** (গীতা ১৬।১৮ ; ১৮।৫৩) পদগুলিতে উদ্ধৃত বলও ত্যাজ্য। ষষ্ঠ অধ্যায়ের চৌত্রিশতম শ্লোকে **'বলবদদৃঢ়ম্'** পদে উদ্ধৃত বল শব্দটি মনের বিশেষণ। এই বলও আসুরী-সম্পদের অন্তর্গত। কারণ এতেও কামনা ও আসক্তি আছে। কিন্তু এইস্থানে (৭।১১) যে বলের কথা বলা হয়েছে, তা কামনা ও আসক্তি বর্জিত, সেইজন্য এটি সাত্ত্বিক উৎসাহের বাচক এবং গ্রাহ্য। সপ্তদশ অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে **'আয়ুঃ সত্ত্ববলারোগ্য ......'** পদটিতে উদ্ধৃত বল শব্দটি এই সাত্ত্বিক বলের বাচক।

'ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ'—হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন ! মানুষের মধ্যে[১] ধর্মের অবিরোধী অর্থাৎ ধর্মযুক্ত যে 'কাম'[২] তা আমারই স্বরূপ। কারণ শাস্ত্র এবং লোকমর্যাদা অনুসারে শুভ-ভাব দ্বারা শুধুমাত্র সন্তান-উৎপাদনের জন্য যে কাম, তা মানুষের অধীন। কিন্তু আসক্তি, কামনা এবং সুখভোগের জন্য যে কাম অনুভূত হয়, তাতে মানুষ পরাধীন হয় এবং কামের বশীভূত হয়ে সে অসমীচীন শাস্ত্রবিরুদ্ধ কাজে প্রবৃত্ত হয়। শাস্ত্রবিরুদ্ধ কাজ পতনের এবং সমস্ত পাপ ও দুঃখের হেতু হয়ে ওঠে।

কৃত্রিমভাবে সন্তান-রোধ করে কেবলমাত্র ভোগের জন্য কামে প্রবৃত্ত হওয়া নরকের পথ। যিনি সন্তান উৎপাদনে সক্ষম, তাঁকে 'পুরুষ' বলা হয় এবং যিনি গর্ভধারণের উপযুক্ত তাঁকে 'স্ত্রী' বলা হয়[৩]। পুরুষ ও স্ত্রী যদি অস্ত্রোপচারের সহায়তায় সন্তান উৎপাদনের যোগ্যতা (পুরুষত্ব ও স্ত্রীত্ব) নষ্ট করে দেয়, তাহলে এরা নপুংসক নামে অভিহিত হবার যোগ্য হয়ে ওঠে। নপুংসক হয়ে যাওয়ায় তাদের দেবপূজা (যজ্ঞ, অর্চনা ইত্যাদি) এবং পিতৃকার্যে (শ্রাদ্ধ-তর্পণাদিতে) অধিকার থাকে না[৪]। নারীদের মাতৃত্ব-শক্তি নষ্ট হওয়াতে তাঁদের প্রতি প্রযুক্ত শ্রদ্ধাযুক্ত এবং প্রিয় 'মা' সম্বোধনটি প্রয়োগ করা যায় না। তাই মানুষের উচিত হল হয় সে শাস্ত্র এবং লোকমর্যাদা অনুসারে সন্তান উৎপাদনের জন্য কাম প্রয়োগ করবে, নয়তো ব্রহ্মচর্য পালন করবে।

পরিশিষ্ট-ভাব— জঙ্গম সৃষ্টি উৎপন্ন হয় কাম থেকে। অতএব যে কাম মানুষের ধর্মের বিরুদ্ধ নয় ও মর্যাদা অনুসারে হয়ে থাকে, সেই কাম হল ভগবানের স্বরূপ। ভগবান আগেই বলেছেন যে— **'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি'** (৭।৭) এবং পরেও বলেছেন—**'যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা'** (৭।১২), **'বাসুদেবঃ সর্বম্'** (৭।১৯)। অতএব ধর্মযুক্ত কাম যেমন ভগবানের স্বরূপ, তেমনই ধর্মবিরুদ্ধ কামও ভগবানের থেকে আলাদা নয়। যাঁরা ধর্মবিরুদ্ধ কাজ করেন, তাঁরা ভগবানকে নরক রূপে প্রাপ্ত হন, কেন-না নরকও ভগবানই। কিন্তু মানুষকে নরকগামী করা অথবা জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত করা ভগবানের উদ্দেশ্য নয়, তাঁর উদ্দেশ্য মানুষের কল্যাণ করা। উদ্দেশ্য সর্বদা কল্যাণের এবং আনন্দ প্রদানেরই হয়, দুঃখ দেওয়ার নয়। কেউই দুঃখ চায় না। অর্জুনও কল্যাণের কথাই জিজ্ঞাসা করেছেন[৫]। উদাহরণ রূপে বলা যায় যে শব্দ ভালোও হয়, মন্দও হয়, কিন্তু ব্যাকরণে ভালো শব্দগুলি নিয়েই আলোচনা হয়, কেন-না ব্যাকরণাদিও মানুষের উদ্ধারের জন্য হয়।

❋ ❋ ❋

[১]ধর্মের বিধান কেবলমাত্র মানুষের জন্য ; কারণ মনুষ্যেতর প্রাণীদের মধ্যে ধর্মের মর্যাদা প্রযোজ্য নয়।

[২]তৃতীয় অধ্যায়ের সাঁইত্রিশতম শ্লোকে ভগবান যে কামকে সমস্ত পাপের হেতু বলেছেন, এই 'কাম' শব্দটি সেই কামের (কামনার) বাচক নয়। এখানে 'কাম' শব্দটি গৃহস্থধর্ম পালনের বাচক।

[৩]'স্ত্যৈ শব্দসংঘাতয়োঃ'। স্ত্যায়তঃ—সংগতে ভবতঃ অস্যাং শুক্রশোণিতে ইতি স্ত্রী। (সিদ্ধান্তকৌমুদী, বালমনোরমা)।

[৪]অঙ্গহীনাশ্রোত্রিয়ষণ্ডশূদ্রবর্জম্। (কাত্যায়নশ্রৌতসূত্র ১।১।৫)।

[৫]'যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে' (গীতা ২।৭)
'তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্' (গীতা ৩।২)
'যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্' (গীতা ৫।১)

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥ ১২ ॥

[যে (যতপ্রকার) ; এব (ও) ; সাত্ত্বিকাঃ (সাত্ত্বিক) ; ভাবাঃ (ভাব আছে) ; যে (যতপ্রকার) ; চ (ও) ; রাজসাঃ (রাজসিক) ; চ (এবং) ; তামসাঃ (তামসিক) ; মত্তঃ, এব (আমা হতেই উৎপন্ন) ; ইতি (এইরূপ) ; তান্ (তাদের) ; বিদ্ধি (বুঝে নিও) ; তু (কিন্তু) ; অহম্ (আমি) ; তেষু (তাদের মধ্যে) ; তে (এবং তারা) ; ময়ি (আমার মধ্যে) ; ন (নেই ।)]

যতপ্রকার সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভাব আছে, সে-সব আমা হতে উৎপন্ন বলে জানবে। কিন্তু আমি সেই সবে নেই এবং সেগুলিও আমাতে নেই ॥ ১২ ॥

ব্যাখ্যা—'যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে' —যতপ্রকার সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভাব (গুণ, পদার্থ এবং ক্রিয়া) রয়েছে, সেগুলিও আমা হতেই উৎপন্ন। এর তাৎপর্য হল সৃষ্টিতে যা কিছু হচ্ছে তার মূলে রয়েছেন সকলের আশ্রয়-আধার ও প্রকাশক একমাত্র ভগবান অর্থাৎ এগুলি ভগবান হতেই অস্তিত্ব লাভ করে।

সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভাব ভগবানের থেকেই হয়ে থাকে, তাই এতে যা কিছু বিশেষত্ব দেখা যায়, তা সবই ভগবানের। তাই মানুষের দৃষ্টি ভগবানের দিকেই থাকা উচিত, সাত্ত্বিকাদি ভাবের দিকে নয়। যদি তার দৃষ্টি ভগবানের দিকে থাকে, তবে সে মুক্তিলাভ করে আর যদি তার দৃষ্টি সাত্ত্বিকাদি ভাবের দিকে যায় তবে সে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক—এই ভাবগুলি (গুণ, পদার্থ এবং ক্রিয়া) ব্যতীত আর কোনো ভাব থাকেই না। এগুলি সবই ভগবদ্স্বরূপ।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, এগুলি সবই যদি ভগবদ্স্বরূপ হয়, তাহলে আমরা যা কিছু করি, তা সব ভগবদ্স্বরূপই হবে। তবে এরূপ করা উচিত, এরূপ করা উচিত নয়—এই বিধি-নিষেধ কেন থাকে ? তার উত্তর হল যে, মানুষমাত্রেই সুখ চায়—কেউ দুঃখ চায় না। অনুকূল পরিস্থিতি বিহিত কর্মের ফল এবং প্রতিকূল পরিস্থিতি নিষিদ্ধ কর্মের ফল। তাই বলা হয় যে, বিহিত-(শাস্ত্রসম্মত) কর্ম করো এবং নিষিদ্ধ কর্ম পরিত্যাগ করো। নিষিদ্ধ কর্মগুলি ভগবদ্স্বরূপ মনে করে যদি করো, তবে ভগবান দুঃখ ও নরকের রূপে প্রকটিত হবেন। যে অশুভ কর্ম করে, ভগবান তার কাছে অশুভরূপে প্রকটিত হন ; কারণ দুঃখ ও নরকও ভগবানেরই স্বরূপ।

যেখানে করা এবং না-করার কথা বলা হয়, সেখানেই নিয়ম-নিষেধ জারি করা হয়। সুতরাং সেই স্থানে বিহিত কর্মই করা উচিত, নিষিদ্ধ কর্ম নয়। কিন্তু যেখানে মেনে নেওয়া বা জেনে নেওয়ার কথা বলা হয়, সেখানে পরমাত্মাকে 'মেনে নেওয়া' আর নিজেকে বা জগৎকে জেনে নেওয়া কর্তব্য।

যেখানে মেনে নেওয়ার কথা, সেখানে পরমাত্মাকে মেনে তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা বাড়াতে হয়। তাঁকে প্রাপ্ত এবং প্রসন্ন করার জন্য তাঁর আদেশ পালন করা উচিত এবং তাঁর নির্দেশ ও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কাজ করা উচিত নয়। ভগবানের নির্দেশ-বিরুদ্ধ কাজ করলে তাঁর প্রসন্নতা প্রাপ্ত হবে কীভাবে ? এবং বিরুদ্ধাচরণ-কারীরা তাঁকে কীভাবে লাভ করবে ? যেমন কোনো মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করলে সে কী করে প্রসন্ন হবে এবং তার ভালোবাসা পাওয়া যাবে কী করে ?

যেখানে জেনে নেওয়ার ব্যাপার সেখানে জগৎকে জানা উচিত। যা উৎপত্তি ও বিনাশশীল, চিরস্থায়ী নয়, নিজস্ব নয় এবং নিজের জন্যও নয়—এরূপ জেনে তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা কর্তব্য। এতে কামনা-মমতা-আসক্তি রাখা উচিত নয়। অন্তর থেকে তার গুরুত্ব সরিয়ে দিতে হয়। এতে সৎ তত্ত্ব প্রত্যক্ষ হয় এবং জানা পূর্ণ হয়। অ-সৎ বা বিনাশশীল বস্তু আমাদের সঙ্গে চিরকাল থাকে না—এটি বুঝেও যদি সময়-অসময়ে তাকে গুরুত্ব দেওয়া হয় তবে প্রকৃত (সৎতত্ত্ব) প্রাপ্তি হয় না।

'মত্ত এবেতি তান্‌বিদ্ধি'—এইসব আমা হতেই উৎপন্ন বলে তুমি জানবে অর্থাৎ আমিই সব। কার্য এবং কারণ—এই দুটি পৃথক্‌রূপে প্রতিভাত হলেও কার্য কারণ থেকে ভিন্ন ও নিজস্ব স্বতন্ত্র সত্তা রাখে না। সুতরাং কার্য, কারণরূপই হয়। যেমন সোনা দিয়ে যে গহনা তৈরি করা হয় তা সোনার থেকে আলাদা হয় না অর্থাৎ সেগুলিতে সোনাই থাকে।

তেমনই পরমাত্মা হতে সৃষ্ট অনন্ত সৃষ্টি, পরমাত্মা থেকে পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম নয়।

'মত্ত এব' বলার অর্থ হল এই যে, অপরা ও পরা প্রকৃতি আমার স্বভাব, সুতরাং কেউ এগুলিকে আমা হতে পৃথক্ বলে প্রমাণ করতে পারবে না। সপ্তম অধ্যায়ের পরিশিষ্টরূপ নবম অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন যে 'কল্পের প্রারম্ভে প্রকৃতিকে বশীভূত করে আমি বারংবার সৃষ্টি রচনা করি' (৯।৮) এবং পরে বলেছেন যে, 'আমার পরিচালনায় প্রকৃতি বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করে' (৯।১০)—এই দুটি কথার একই অর্থ। প্রকৃতিকে নিয়ে ভগবানই রচনা করুন অথবা ভগবানের অধ্যক্ষতায় প্রকৃতিই সৃষ্টি করুক—দুটির অর্থ একই। ভগবান সৃষ্টি করলে প্রকৃতিকে নিয়েই করে থাকেন, এতে প্রাধান্য ভগবানেরই থাকে এবং প্রকৃতি ভগবানের পরিচালনায় সৃষ্টি করলে তাতেও প্রাধান্য ভগবানেরই থাকে। এই কথাই এখানে বলেছেন যে 'আমি সমস্ত জগতের প্রভব ও প্রলয়' (৭।৬) এবং এর উপসংহারে বলেছেন যে, 'সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক—এই ভাব আমা হতেই উৎপন্ন হয়।'

ভগবান বিজ্ঞানসহ জ্ঞান জানাবার প্রসঙ্গে জ্ঞানী ব্যক্তি যে অতি দুর্লভ তা জানিয়ে যে প্রকরণের সূচনা করেছেন, তাতে তিনি পরা ও অপরা প্রকৃতির কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন সমস্ত প্রাণীরই কারণ হল পরা ও অপরা প্রকৃতি ; এদের সংযোগেই সমস্ত প্রাণী উৎপন্ন হয়। পরে তিনি নিজেকে এই পরা ও অপরার কারণ বলে জানিয়েছেন—**'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ'** (৭।৭)। বিভূতিগুলির বর্ণনার উপসংহার করতে গিয়ে তিনি এই কথাই এখানে বলেছেন যে, সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভাবগুলিকেও আমা হতে উৎপন্ন বলে জানবে।

'ন ত্বহং তেষু তে ময়ি'—আমি সেগুলিতে নেই এবং সেগুলিও আমাতে নেই। অর্থাৎ ওই গুণগুলির আমা ভিন্ন কোনো পৃথক অস্তিত্ব নেই, কেবল আমিই আছি, আমি ছাড়া আর কিছুই নেই। সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক যতপ্রকার প্রাকৃত পদার্থ আর ক্রিয়া আছে, তা সবই উৎপন্ন হয় এবং বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু আমার উৎপত্তিও নেই, বিনাশও নেই। আমি যদি ওগুলিতে থাকতাম তবে ওগুলির বিনাশ হলে আমিও বিনষ্ট হতাম। কিন্তু আমার বিনাশ হয় না। অতএব আমি ওগুলিতে নেই। ওগুলি যদি আমাতে থাকত তবে আমি যেমন অবিনাশী ওগুলিও তেমনই হত। কিন্তু ওগুলি বিনষ্ট হয় আর আমি চিরবিরাজমান। অতএব ওগুলি আমাতে নেই।

যেমন, বীজ থেকে বৃক্ষ-শাখাপ্রশাখা-পাতা-ফুল ইত্যাদি হয়ে থাকে ; কিন্তু বীজকে যদি বৃক্ষ-শাখাপ্রশাখা-পাতা ইত্যাদির মধ্যে খোঁজা হয় তাহলে তাকে পাওয়া যায় না। কারণ বীজ ওগুলির মধ্যে তত্ত্বরূপে বিরাজ করে। তেমনই সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভাব আমা হতে উৎপন্ন হলেও সেই ভাবগুলির মধ্যে অন্বেষণ করলে আমাকে পাওয়া যাবে না (গীতা ৭।১৩)। কারণ আমি সেগুলিতে কারণরূপে বা তত্ত্বরূপে বিরাজ করি। অতএব আমি ওগুলিতে এবং ওগুলি আমাতে নেই, অর্থাৎ সমস্তই আমি।

যেমন, মেঘ আকাশ হতে উৎপন্ন হয়ে আকাশেই বিরাজ করে এবং আকাশেই লীন হয় ; কিন্তু আকাশ একই প্রকার নির্বিকারভাবে থাকে। আকাশেও মেঘ থাকে না, মেঘেও আকাশ থাকে না। তেমনি অষ্টম শ্লোক থেকে এই পর্যন্ত যত (সতেরোটি) বিভূতি বর্ণনা করা হয়েছে, তা সব আমা হতেই উৎপন্ন হয়, আমাতেই অবস্থান করে এবং আমাতেই লীন হয়ে যায়। কিন্তু এগুলি আমাতে থাকে না এবং আমিও এগুলিতে থাকি না। আমি ছাড়া এগুলির পৃথক্ অস্তিত্ব নেই। সেই দৃষ্টিতে সবকিছুই আমি। এর অর্থ হল এই যে, ভগবান ছাড়া যতপ্রকার সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভাব অর্থাৎ প্রাকৃত পদার্থ এবং ক্রিয়া দেখা যায়, মানুষ তাতে গুরুত্ব দিয়ে এবং তার অস্তিত্ব মেনে নিয়ে তাতে আবদ্ধ হয়। তাই ভগবান মানুষের বোধ ফেরাবার জন্য বলেছেন যে ওইসব পদার্থ এবং ক্রিয়াতে যে অস্তিত্ব ও গুরুত্ব থাকে তা আমারই।

বিশেষ কথা

সত্ত্বগুণ, রজগুণ এবং তমোগুণ থেকে যতপ্রকার ভাব (প্রাকৃত পদার্থ এবং ক্রিয়া) উৎপন্ন হয়, তা সবই ভগবানের শক্তি অর্থাৎ প্রকৃতি থেকেই উৎপন্ন হয়। কিন্তু প্রকৃতি ভগবানের থেকে অভিন্ন হওয়ায় এই গুণগুলিকে ভগবান **'মত্ত এব'** আমা হতেই উৎপন্ন বলেছেন। তাৎপর্য হল এই যে, প্রকৃতি ও ভগবান অভিন্ন হওয়ায় এই সমস্ত ভাবই ভগবান হতে উৎপন্ন হয় এবং ভগবানেই লীন হয়ে যায়। কিন্তু পরা প্রকৃতি (জীবাত্মা) এর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন

করে এগুলিকে নিজের এবং নিজের জন্য বলে মেনে নেয়—এটিই হল পরা প্রকৃতির দ্বারা জগৎ ধারণ করা। এই জন্যই তার জন্ম-মৃত্যু হতে থাকে। সেই বন্ধন দূর করার উদ্দেশ্যে এখানে বলা হয়েছে যে সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক—এই সমস্ত ভাবই তাঁর হতে উৎপন্ন হয়। এইভাবেই দশম অধ্যায়ে বলা হয়েছে—**'ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্‌বিধা'** (১০।৫) অর্থাৎ প্রাণিসমূহের এই বিভিন্ন প্রকারের ভাব আমা হতেই উৎপন্ন হয়, এবং **'অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে'** (১০।৮) অর্থাৎ সকলের উৎপত্তির হেতু আমি এবং আমা হতেই সবকিছু প্রবর্তিত হয়। পঞ্চদশ অধ্যায়েও বলেছেন যে স্মৃতি, জ্ঞান ইত্যাদি সমস্তই আমা হতে উৎপন্ন হয়—**'মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ'** (১৫।১৫)। সমস্তই যখন পরমাত্মা হতে উৎপন্ন হয়, তখন মানুষের সঙ্গে গুণগুলির কোনো সম্পর্ক নেই। মানুষ যদি তার নিজের সঙ্গে এই গুণগুলির সম্পর্ক মেনে না নেয়, তাহলে সে আর আবদ্ধ হয় না অর্থাৎ এই গুণ তার জন্ম-মৃত্যুর কারণ হয় না।

গীতায় ভক্তির বর্ণনায় ভগবান বলেছেন যে, সবই তিনি—**'সদসচ্চাহমর্জুন'** (৯।১৯) এবং অর্জুনও ভগবানকে বলেছেন যে, 'আপনি সৎ, অসৎ এবং সদসতেরও অতীত'—**'সদসৎতৎপরং যৎ'** (১১।৩৭)। জ্ঞানী (প্রেমিক) ভক্তদের সম্পর্কেও ভগবান জানিয়েছেন যে জ্ঞানীর দৃষ্টিতে সবই বাসুদেব—**'বাসুদেবঃ সর্বম্‌'** (৭।১৯)। কারণ ভক্তিতে শ্রদ্ধা এবং মেনে নেওয়ার প্রাধান্য থাকে আর ভগবানে অনন্য দৃঢ়তা থাকে, ভক্তিতে (ভগবান ভিন্ন) অন্য কোনো বস্তু থাকে না। যেমন পতিব্রতা রমণী সংসারে পতি ভিন্ন অন্য কোনো পুরুষ দেখে না, তেমনই ভক্ত এক ভগবান ব্যতীত অন্য কাউকে দেখতে পায় না, শুধু ভগবানকেই দেখে।

গীতায় যে স্থানে জ্ঞানের বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে ভগবান বলেছেন যে, সৎ এবং অ-সৎ—দুটি পৃথক্‌ পৃথক্‌—**'নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ'** (২।১৬)। তেমনই জ্ঞানমার্গে শরীর-শরীরী, দেহ-দেহী, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ, প্রকৃতি-পুরুষ—প্রভৃতিকে পৃথক্‌ভাবে জানার কথা বহুবার উল্লিখিত হয়েছে; যেমন—**'প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি'** (১৩।১৯) ; **'ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানম্‌'**(১৩।২) ; **'ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগাৎ'** (১৩।২৬) ; **'ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নম্‌'** (১৩।৩৩) ; **'ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা'** (১৩।৩৪)। কারণ জ্ঞানমার্গে বিবেকের প্রাধান্য থাকে। সুতরাং সেখানে নিত্য-অনিত্য, অবিনাশী-বিনাশী, ইত্যাদির বিচার করা হয়ে থাকে এবং পরিণামে স্বরূপ যে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত—এরূপ বোধ হয়।

শ্রদ্ধা ও বিবেক—সাধকের এই দুটিই থাকা উচিত। ভক্তিমার্গে শ্রদ্ধার প্রাধান্য থাকে আর জ্ঞানমার্গে থাকে বিবেকের প্রাধান্য। তাহলেও ভক্তিমার্গে বিবেকের এবং জ্ঞানমার্গে শ্রদ্ধার অভাব হয় না। ভক্তিমার্গে মনে করা হয় যে সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভাবসমূহ ভগবান হতে উৎপন্ন হয় (৭।১২) এবং জ্ঞানমার্গে মনে করা হয় যে সত্ত্ব-রজ-তম গুণগুলি প্রকৃতি থেকে জাত—**'সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ'** (১৪।৫)। উভয় সাধকই নিজেদের নির্বিকারত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত যে, এই সমস্ত গুণ তাঁদের নয়, আর উভয়েই সেই একই তত্ত্বই প্রাপ্ত হন, সেখানে দ্বৈত বা অদ্বৈত কিছুই বলা যায় না। সৎ-অ-সৎও বলা যায় না।

ভক্তিমার্গী সাধকগণ অনন্য প্রেমে ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে প্রকৃতি থেকে সর্বতোভাবে নিবৃত্ত হয়ে যান এবং জ্ঞানমার্গী সাধকগণ প্রকৃতি ও পুরুষের বিচার করে প্রকৃতি হতে সম্পূর্ণ অসম্বন্ধ নিজ স্বরূপকে অনুভব করে প্রকৃতি থেকে সর্বতোভাবে সম্পর্ক রহিত হয়ে থাকেন।

পরিশিষ্ট-ভাব—'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি' (৭।৭) এর বিবরণ দিতে গিয়ে ভগবান আগের চারটি শ্লোকে যে কথা বলেছেন এবং যা বলেননি, তা সমস্তই উপসংহাররূপে এই শ্লোকে বলে দিয়েছেন। ভগবান বলেছেন যে, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—এসব ভাব আমা হতেই উৎপন্ন এবং আমা থেকেই অস্তিত্ব লাভ করলেও আমি এগুলিতে নেই এবং এগুলিও আমাতে নেই অর্থাৎ সবই কেবল আমিই। অতএব যেসব সাধক আমাকে লাভ করতে চান, তাঁদের দৃষ্টি এই সব ভাবের দিকে না গিয়ে আমার দিকে থাকা উচিত। তাঁরা যদি এসব ভাবেতেই বদ্ধ হয়ে পড়েন তবে কখনোই তাঁরা আর মুক্ত বা ভক্ত হতে পারবেন না।

দেখা, শোনা, বোঝা ইত্যাদিতে যেসব ভাব উদিত হয় এবং যেসব ভাব উদিত হয় না, সেগুলি সবই **'যে'** পদের

অন্তর্গত বলে জানতে হবে।

ভগবান হতে উৎপন্ন হওয়ায় এখানে সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক গুণগুলিকে **'ভাব'** নামে বলা হয়েছে। তাৎপর্য হল এই যে ভগবান হচ্ছেন ভাব (সত্তা) রূপ[১], সুতরাং তাঁর থেকে ভাবই উৎপন্ন হবে, অ-ভাব উৎপন্ন হবে কী করে? ভগবানের থেকে উৎপন্ন হওয়ায় সব ভাবই ভগবানের স্বরূপ—**'ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ'** (গীতা ১০।৫)। তাৎপর্য হল এই যে শরীর-ইন্দ্রিয়াদি-মন-বুদ্ধি দ্বারা যে সব সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভাব, ক্রিয়া, পদার্থ ইত্যাদি গ্রহণ করা হয়, তা সবই ভগবান[২]। মনের যে কোনো স্ফুরণ, তা ভালোই হোক বা মন্দ, সবই ভগবান।

নিজের কিছু স্বার্থ থাকলে, নেবার ইচ্ছা থাকলে তখনই সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক—এই তিনটির পার্থক্য হয়। যদি নিজের কোনো স্বার্থ না থাকে এবং অপরের হিতের দিকে দৃষ্টি রাখা যায় তাহলে এ সমস্ত কিছু ভগবানেরই স্বরূপ বলে অনুভব হবে। এগুলিকে নিজের বলে মনে করা এবং তার থেকে সুখ গ্রহণ করাই হল পতনের কারণ (গীতা ৩।৩৭)।

'তিনটি গুণই আমা হতে প্রকটিত হয়'—এই কথায় ভগবান এই ভাব প্রকটিত করছেন যে, সাধকদের দৃষ্টি গুণগুলির দিকে না গিয়ে যেন সেই গুণাতীত ভগবানের দিকেই থাকে, অর্থাৎ তাঁর অস্তিত্ব ও গুরুত্ব মেনে নিয়ে তাঁর সঙ্গেই সম্পর্ক স্থাপন করেন, যাতে তাঁরা তাঁকে প্রাপ্ত হয়ে চিরকালের জন্য দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হয়ে পরম আনন্দ লাভ করেন। **'আমি এদের মধ্যে নেই এবং এরা আমার মধ্যে নেই'**—কথাটিতে ভগবান এই ভাব প্রকট করেছেন যে, যদি কোনো মানুষ আমার সত্তা ও গুরুত্বকে স্বীকার না করে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক গুণ, পদার্থ এবং ক্রিয়াগুলির অস্তিত্ব মেনে সেগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে তাহলে সে আমাকে প্রাপ্ত না হয়ে জন্ম-মৃত্যু চক্রে পতিত হয়ে থাকে—**'কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু'** (গীতা ১৩।২১)।

'মত্ত এব' পদটির প্রয়োগের দ্বারা ভগবান বলতে চাইছেন যে, তিনটি গুণ আমার থেকেই উৎপন্ন হলেও তুমি আমার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে গুণাদিতে কেন বদ্ধ হও? যারা গুণাদিতে বদ্ধ হয়ে পড়ে তারা আমার ভজনা করতে সক্ষম হয় না (গীতা ৭।১৩)। কিন্তু যারা গুণাদিতে আবদ্ধ হয় না, সেই সব ভক্তগণই আমার ভজনা করে (গীতা ৭।১৬, ১০।৮)। গুণগুলি চিরস্থায়ী নয়, কেন-না, কার্য-কারণের দৃষ্টিতে কারণ চিরস্থায়ী হলেও, কার্যের স্থায়িত্ব নেই। যেমন সোনার স্থায়িত্ব থাকলেও গহনার স্থায়িত্ব নেই, মাটির স্থায়িত্ব আছে কিন্তু কলসীর নেই। তেমনই ভগবানের স্থায়িত্ব আছে, গুণাদির নেই। গুণ পরিবর্তনশীল এবং অস্থায়ী, কিন্তু ভগবান নিত্য এবং সর্বদা একইভাবে বিরাজমান। তাঁর কোনো পরিবর্তন নেই এবং বিনাশও নেই। তাঁর প্রাপ্তি তাই তাঁর গুণাদির সাহায্যে হয় না, তাঁর প্রাপ্তি হয় গুণাদির সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করলে তবেই। অতএব তমোগুণকে রজোগুণের দ্বারা এবং রজোগুণকে সত্ত্বগুণের দ্বারা পরাভূত করে গুণাদির অতীত হতে হবে।

একটি বিশেষ বিষয় এখানে বোঝার আছে যে, সগুণ-সাকার ভগবানও বাস্তবে নির্গুণ, কেন-না তিনি সত্ত্বঃ, রজ অথবা তমোগুণযুক্ত নন, তিনি প্রকৃতপক্ষে ঐশ্বর্য, মাধুর্য, সৌন্দর্য, ঔদার্য গুণাবলীযুক্ত। তাই সগুণ-সাকার ভগবানের ভক্তিকেও নির্গুণ (সত্ত্বাদিগুণরহিত) বলা হয়েছে, যেমন **'মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতম্'**, **'মন্নিকেতং তু নির্গুণম্'**, **'নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ'**, **'মৎ সেবায়াং তু নির্গুণা'** (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২৫।২৪-২৭)।

প্রশ্ন—সব কিছুই যখন ভগবান, তবে সাত্ত্বিক-রাজসিক ও তামসিক ভাব পরিত্যাজ্য কেন?

উত্তর—যেমন জমিতে সর্বত্র জল থাকলেও, কুয়াই হল জলপ্রাপ্তির প্রকৃষ্ট স্থান, তেমনই ভগবান সর্বত্র পরিব্যাপ্ত থাকলেও, তাঁকে লাভ করার প্রকৃষ্ট স্থান হল যজ্ঞ (কর্তব্য-কর্ম)। কিন্তু সাত্ত্বিক-রাজসিক-তামসিক ভাব ভগবানকে লাভ

---

[১]'নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।' (গীতা ২।১৬), 'মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি' (গীতা ১৪।১৯), 'সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।' (গীতা ১৮।২০)

[২]মনসা বচসা দৃষ্ট্যা গৃহ্যতেঽন্যৈরপীন্দ্রিয়ৈঃ। অহমেব ন মত্তোঽন্যদিতি বুধ্যধ্বমঞ্জসা॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৩।২৪)

'মন, বাণী, দৃষ্টি দ্বারা এবং অন্য ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা যা কিছু (শব্দাদি বিষয়) গ্রহণ করা হয়, তা সব আমিই। আমি ছাড়া অন্য কিছুই নেই— এই সিদ্ধান্ত বিচার বিবেচনাপূর্বক গ্রহণ করো অর্থাৎ স্বীকার করে নাও।'

করার স্থান নয় অর্থাৎ এগুলির সাহায্যে ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না (গীতা ৭।১৩)। অতএব এগুলি সাধকের পক্ষে প্রয়োজনীয় নয়। তাই ভগবান বলেছেন যে, এইসব ভাব আমা হতে উৎপন্ন হলেও, আমি এগুলিতে নেই এবং এগুলিও আমাতে নেই।

ধানের চাষে ধানই প্রধান, তার খড় বা ডাঁটা নয়। কৃষকের লক্ষ্য থাকে চাষের দ্বারা ধান উৎপন্ন করা। তাই সে খেতে জল ও সার দেয় বেশি ধান উৎপন্ন করার আশায়। তেমনই সাধকের লক্ষ্যও শুধু ভগবানকে প্রাপ্ত করার জন্যই থাকা উচিত, সংসারের জন্য নয়। ভগবানকে লাভ করার জন্যই সাধকের সংসারের সেবা করা উচিত। সেবা ব্যতীত জগতে আর কোনো কিছুর আশা রাখা উচিত নয়। কৃষকের কাছে যেমন ধানই গুরুত্বপূর্ণ, খড় বা ডাঁটা নয়, প্রারম্ভে ধান থাকে এবং চাষের শেষেও সেই ধানই পাওয়া যায়। ধান পাওয়ার পরে যা বাকি থাকে, খড় ও ডাঁটা, তা ধান থেকে ভিন্ন না হলেও মানুষের খাওয়ার উপযুক্ত নয়, তা হল পশুখাদ্য। তেমনই সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ভাব মূঢ় (বিবেকহীন) মানুষেরই উপযুক্ত। এই তিনটি ভাব মানুষকে আবদ্ধ করে (গীতা ১৪।৫)। তাই এই ভাব ভগবানের রূপ হলেও স্ব-স্বরূপের নয়, এগুলি বরং বিচার বিবেচনা সহকারে জাগতিক ব্যবহারের জন্য হয়। যেমন বিষ ভগবানেরই এক রূপ, কিন্তু তা খাওয়ার জন্য নয়।

ধানের সঙ্গে খড়-ডাঁটা উৎপন্ন হলেও খড় ও ডাঁটাতে যেমন ধান থাকে না এবং ধানেও খড়-ডাঁটা ইত্যাদি নেই, তেমনই ভগবানের থেকে উৎপন্ন হলেও সাত্ত্বিক-রাজসিক-তামসিক ভাবগুলিতে ভগবান নেই এবং এগুলিও ভগবানে নেই।

❊ ❊ ❊

সম্বন্ধ—ভগবান দ্বাদশ শ্লোকে বলেছেন যে, এই সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভাব আমা হতেই হয়ে থাকে, কিন্তু আমি সেগুলিতে এবং সেগুলি আমাতে অবস্থিত নয়। এই কথায় প্রমাণিত হয় যে, ভগবান প্রকৃতি এবং প্রকৃতির কার্য থেকে সর্বতোভাবে নির্লিপ্ত। ভগবানের শুদ্ধ অংশ এই জীবও এরূপ নির্লিপ্ত। তাহলে প্রশ্ন হতে পারে যে, জীব নির্লিপ্ত হলে আবদ্ধ হয় কীভাবে ? সেই কথা পরের শ্লোকটিতে জানানো হয়েছে।

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥ ১৩ ॥

[**এভিঃ** (এই) ; **ত্রিভিঃ** (তিন) ; **গুণময়ৈঃ** (গুণরূপ) ; **ভাবৈঃ** (ভাবের দ্বারা) ; **মোহিতম্** (মোহিত) ; **ইদম্** (এই) ; **সর্বম্** (সমস্ত) ; **জগৎ** (জগৎ) ; **এভ্যঃ** (এইসব গুণের) ; **পরম্** (অতীত) ; **অব্যয়ম্** (অবিনাশী) ; **মাম্** (আমাকে) ; **অভিজানাতি** (জানতে পারে) ; **ন** (না।)]

এই তিনটি গুণরূপ ভাবের দ্বারা মোহিত সমগ্র জগৎ এইসব গুণের অতীত অবিনাশী ঈশ্বররূপে আমাকে জানতে পারে না ॥ ১৩ ॥

ব্যাখ্যা—'ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ ..... পরমব্যয়ম্' —সত্ত্ব, রজ এবং তম—এই তিনটি গুণের বৃত্তিগুলি উৎপন্ন হয় এবং লীন হয়ে যায়। তার সঙ্গে তাদাত্ম্য করে মানুষ নিজেকে সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক বলে মনে করে অর্থাৎ এগুলিকে নিজের ওপর আরোপ করে ভেবে নেয় যে 'আমি সাত্ত্বিক বা রাজসিক বা তামসিক হয়েছি'। এইভাবে ত্রিগুণে মোহগ্রস্ত হয়ে মানুষ নিজেকে পরমাত্মার অংশ বলে মনে করতে পারে না। সে তার অংশী পরমাত্মার সম্মুখীন না হয়ে উৎপত্তি ও বিনাশশীল বৃত্তিসমূহের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নেয়—একেই বলে মোহগ্রস্ত হওয়া। এইপ্রকারে মোহগ্রস্ত হওয়ায় জীব পরমাত্মার সঙ্গে তার যে নিত্যসম্বন্ধ বিদ্যমান তা বুঝতে অপারগ হয়।

'জগৎ' শব্দটি এখানে জীবাত্মার বাচক। নিত্য পরিবর্তনশীল শরীরের সঙ্গে তাদাত্ম্য হওয়াতেই জীবকে এখানে 'জগৎ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এর তাৎপর্য হল যে, শরীরের জন্ম হওয়াতে নিজের জন্ম হওয়া, শরীরের মৃত্যুতে নিজের মৃত্যু হওয়া, শরীরের অসুখে নিজের অসুখ মনে করা, শরীরের সুস্থতায় নিজের সুস্থতা মেনে নেওয়া—এইসব কারণেই জীবকে 'জগৎ' বলা

হয়। যতক্ষণ জীব শরীরের সঙ্গে নিজের তাদাত্ম্য মেনে নেবে, ততক্ষণ সে জগৎ-ই হয়ে থাকবে অর্থাৎ তার জন্ম-মৃত্যু হতে থাকবে, কোথাও স্থিতি হবে না।

গুণগুলিকে ভগবানের থেকে পৃথক্ মানার ফলে প্রাণী মোহগ্রস্ত হয়ে থাকে। যদি তারা গুণগুলিকে ভগবৎস্বরূপ বলে মনে করে, তবে তারা কখনই মোহগ্রস্ত হতে পারে না।

ত্রিগুণের কার্যরূপ এই যে শরীর, যদি এই শরীরকে নিজের বলে মনে করা হয় অথবা নিজেকে শরীর বলে মনে করা হয় তাহলে এই মান্যতায় মোহ উৎপন্ন হয়। শরীরকে নিজের বলে মনে করলে 'মমত্ববোধ' জন্মায় এবং নিজেকে শরীর বলে মনে করলে 'অহং-বোধ' জন্মায়। শরীরের সঙ্গে অহং-মমত্ব বোধ করাই হল মোহগ্রস্ত হওয়া। মোহগ্রস্ত হলে ত্রিগুণের অতীত যে ভগবৎ-তত্ত্ব, তা জানা যায় না। জীব ভগবৎ-তত্ত্ব জানতে তখনই সক্ষম হয় যখন তার ত্রিগুণাত্মক শরীর সম্পর্কে অহং ও মমত্ববোধ দূর হয়। এটি একটি সিদ্ধান্ত যে, মানুষ সংসার থেকে সর্বতোভাবে আলাদা হলেই সংসারকে জানতে পারে এবং পরমাত্মার সঙ্গে সর্বতোভাবে অভিন্ন বোধ জাগলে তবেই পরমাত্মাকে জানতে সক্ষম হয়। কারণ সে স্বয়ং এই ত্রিগুণাত্মক শরীর হতে পৃথক্ এবং পরমাত্মার সঙ্গে সর্বতোভাবে অভিন্ন।

অস্বাভাবিক বিষয়ে স্বাভাবিক ভাব হওয়াই হল মোহ। যা প্রতিমুহূর্তে বিনাশশীল, ত্রিগুণের অতীত, অতিশয় নির্লিপ্ত এবং নিত্য-নিরন্তর একরূপে বিরাজমান, এরূপ পরমাত্মা হলেন 'স্বাভাবিক'। পরমাত্মার এই স্বাভাবিক ভাব তৈরি করা নয়, কৃত্রিম নয়, অভ্যাসসাধ্য নয়, এটি স্বতঃসিদ্ধ। অপরপক্ষে শরীর এবং সংসারে অহং ও মমত্ববোধ অর্থাৎ 'আমি' ও 'আমার' ভাব উৎপন্ন হওয়া এবং এটি বিনাশশীল, এটিকে কেবল মেনে নেওয়া হয়েছে, অতএব এটি অস্বাভাবিক। এই অস্বাভাবিকতাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়াই হল মোহ হওয়া, যার জন্য মানুষ স্বাভাবিকতাকে বুঝতে পারে না।

জীব আগে পরমাত্মা থেকে বিমুখ হয়েছিল, না আগে সংসারের অভিমুখ (গুণাবলীতে মুগ্ধ) হয়েছিল ?—দার্শনিকদের মত হল যে, পরমাত্মা হতে বিমুখ হওয়া এবং সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা—এই দুটিই অনাদি, এর কোনো আদি নেই। এদের সম্পর্কে আগের বা পরের প্রশ্ন অবান্তর। কিন্তু মানুষ যদি তার প্রাপ্ত স্বাধীনতার অপব্যবহার না করে, প্রাপ্ত স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করে নিজেকে যদি ভগবৎ-পথে চালিত করে, তবে সে এই সংসারের বন্ধনমুক্ত হতে পারে অর্থাৎ তার জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন দূর হয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষ ভগবদ্ প্রদত্ত স্বাধীনতার অপব্যবহার করেই আবদ্ধ হয়। প্রাপ্ত স্বাধীনতার অপব্যবহার করে বিনাশশীল পদার্থে আকৃষ্ট হওয়াতে সে পরমাত্মতত্ত্ব জানতে সক্ষম হয় না।

'পরমব্যয়ম্' পদের দ্বারা ভগবান বলেছেন যে 'আমি এই গুণসমূহের অতীত অর্থাৎ এই গুণগুলি থেকে সর্বতোভাবে রহিত, অসম্বদ্ধ, নির্লিপ্ত। আমি কখনো কোনো গুণের দ্বারা আবদ্ধ নই এবং গুণগুলির পরিবর্তনে আমার কোনো পরিবর্তন হয় না। ত্রিগুণে মোহিত প্রাণীগণ আমার এই বাস্তবিক স্বরূপ জানতে)পারে না।'

পরিশিষ্ট-ভাব—যেসব ব্যক্তি ভগবানের দিকে লক্ষ্য না রেখে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাবের দিকে আকৃষ্ট হয়, সেগুলি উপভোগ করে, সেই সব থেকে সুখ আস্বাদন করে, তারা ওইসব ভাবেই মোহগ্রস্ত হয়ে থাকে অর্থাৎ ভগবানের অনতিক্রম্য গুণময়ী মায়াতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং তার ফলস্বরূপ বারংবার জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হয়। এর তাৎপর্য এই যে, সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভাব (কর্ম, পদার্থ, কাল, স্বভাব, গুণাদি) হল অনিত্য আর ভগবান নিত্য। যারা অনিত্যকে উপভোগ করে, তারা আবদ্ধ হয়, কিন্তু যারা অনিত্যকে পরিত্যাগ করে নিত্যস্বরূপ ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করে, তারা মুক্ত হয় (গীতা ৭।১৪)।

এই শ্লোকে জীবাত্মাকে 'জগৎ' নামে বলা হয়েছে। তার অর্থ এই যে, যার কোনো অস্তিত্ব নেই, তাকে অস্তিত্ব ও গুরুত্ব প্রদান করে, সেগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে জীবজগৎ নামে অভিহিত হয়। চেতনও (চেতনার যথাযথ ব্যবহার না করায়) জড় রূপে পরিণত হয়। শ্রেষ্ঠ পরাপ্রকৃতিও নিকৃষ্ট অপরা প্রকৃতিতে পর্যবসিত হয়। জীব জগতের উৎপত্তি ও বিনাশকে নিজের উৎপত্তি ও বিনাশ এবং জগতের লাভ ও ক্ষতিকে নিজের লাভ-ক্ষতি বলে মনে করে। মানুষ যেমন কামনার সঙ্গে অভিন্ন হলে **'কামাত্মানঃ'** অর্থাৎ কামনা রূপে পরিণত হয় (গীতা ২।৪৩) এবং ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন হলে **'মন্ময়াঃ'** অর্থাৎ ভগবদ্-রূপে পরিণত হয় (গীতা ৪।১০), তেমনই জীব জগতের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে জগৎরূপ হয়ে

ওঠে। পার্থক্য একটাই, ভগবদ্রূপে সে নিত্য আর কামনারূপে বা জগৎ রূপে সে অনিত্য হয়ে থাকে।

জীব ভগবান ব্যতীত অন্য অস্তিত্বকে মেনে নিয়ে, তাকে গুরুত্ব দিয়ে তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে যখন নিজের পৃথক্ অস্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য ভুলে যায় তখন সে 'জগৎ' হয়ে ওঠে! যারা শুধুমাত্র জগতের অস্তিত্বকে মেনে নেয়, তারা নিজ অস্তিত্বে বিমুখ হয়ে জগৎ হয়ে যায়, যা বাস্তব নয় কিন্তু যারা শুধুমাত্র ভগবানের অস্তিত্বকেই স্বীকার করে নিজেদের পৃথক্ অস্তিত্ব বলে কিছু রাখে না, তারা ভগবদ্-রূপে পরিণত হয়— **'মম সাধর্ম্যমাগতাঃ'** (গীতা ১৪।২), যা বাস্তব সত্য।

জীবকে 'জগৎ' বলার অর্থ হল যে তাদের চেতনা থাকে আবিষ্ট, তারা জড় শরীরকেই 'আমি' (নিজ স্বরূপ) এবং 'আমার' বলে মনে করতে থাকে। জীব স্বরূপতঃ নির্গুণ ও অব্যয় হয়েও 'জগৎ' হয়ে যাওয়ায় সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক গুণাদিতে আবদ্ধ হয়ে থাকে—**'নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্'** (গীতা ১৪।৫)। প্রকৃতপক্ষে অ-লৌকিক পরমাত্মার অংশ হওয়ায় জীব অ-লৌকিক হয়ে থাকে (গীতা ১৩।২১)। কিন্তু লৌকিক জগৎকে আঁকড়ে থাকায় সে-ও লৌকিক হয়ে যায়। অহং থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সবই অপরা প্রকৃতি (গীতা ৭।৪)। সুতরাং পৃথিবী যেমন জড়, অহংও তেমনই জড়। জীব যখন দৃঢ়তা সহকারে অহং-কে ধরে **'অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা'** হয়ে ওঠে অর্থাৎ অহং-কে নিজ স্বরূপ বলে মেনে নেয়, তখন তার ক্রমশঃ পতন হয়ে, সেও জড় জগতের অংশ হয়ে পড়ে অর্থাৎ তার চেতনা লুপ্ত হয়ে যায়, তার চেতনার কোনো অনুভব থাকে না।

যাঁরা গুণাদিতে আবদ্ধ হন না তাঁদের কাছে কোনো জড়ত্ব থাকে না, তাই তাঁরা সর্বত্রই ভগবানকে অনুভব করে থাকেন—**'বাসুদেবঃ সর্বম্'** (গীতা ৭।১৯)। কিন্তু যারা গুণাদিতে আসক্ত হয়, তারা ভগবানকে অনুভব করতে পারে না, জগৎ-সংসারই তাদের কাছে সত্য প্রতীয়মান হয়, তারা তাই ভগবানকেও সংসারের অংশ রূপে দেখে। তারা ত্রিগুণাতীত ভগবানকে গুণাদিতে আবদ্ধ দেখে এবং অবিনাশী ভগবানকেও জন্ম-মৃত্যু যুক্ত মনে করে (গীতা ৭।২৪)। ভক্তের দৃষ্টি ভগবান ছাড়া অন্য কোনো দিকে যায় না। তাই ভক্ত পরমানন্দ প্রাপ্ত হন আর সংসারী মানুষ পায় শুধুমাত্রই দুঃখ—**দুঃখালয়ম্** (গীতা ৮।১৫)।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—পরবর্তী শ্লোকে ভগবান তাঁকে জানতে না পারার কারণ জানাচ্ছেন।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ ১৪ ॥

[**হি** (কারণ) ; **মম** (আমার) ; **এষা** (এই) ; **গুণময়ী** (গুণময়ী) ; **দৈবী** (দৈবী) ; **মায়া** (মায়া) ; **দুরত্যয়া** (দুস্তরা) ; **যে** (যাঁরা) ; **মাম্** (শুধুমাত্র আমার) ; **এব** (ই) ; **প্রপদ্যন্তে** (শরণাগত হয়) ; **তে** (তাঁরা) ; **এতাম্** (এই) ; **মায়াম্** (মায়াকে) ; **তরন্তি** (অতিক্রম করে থাকেন।)]

কারণ আমার এই গুণময়ী দৈবী মায়া অত্যন্ত দুরত্যয় অর্থাৎ পার হওয়া কঠিন। যাঁরা শুধুমাত্র আমার শরণাগত হন, তাঁরা এই মায়া অতিক্রম করতে পারেন ॥ ১৪ ॥

ব্যাখ্যা—'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী[১] মম মায়া দুরত্যয়া'— সত্ত্ব, রজ এবং তম—এই তিন গুণসম্পন্ন দৈবী (দৈব অর্থাৎ পরমাত্মার) মায়া দূরতিক্রমণীয়। ভোগ এবং সম্পদ সংগ্রহের ইচ্ছাসম্পন্ন মানুষ এই মায়া থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে না।

'দুরত্যয়' বলার অর্থ এই যে, মানুষ নিজেকে কখনো

[১] ভগবান আগে দ্বাদশ শ্লোকে বলেছেন যে, এই সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব আমা হতেই উৎপন্ন। সেই কথার সূত্রে ভগবান এখানে গুণময়ী মায়াকে তাঁর দৈবী (অলৌকিক) মায়া বলেছেন।

আগের ত্রয়োদশ শ্লোকে জগৎ যে ত্রিগুণময়ী ভাবের দ্বারা মোহিত বলে জানিয়েছিলেন, 'এষা' পদের দ্বারা এখানে সেগুলিকেই বুঝিয়েছেন। মায়াকে 'গুণময়ী' বলার অর্থ মায়া হল কার্যরূপ। কারণ গুণ প্রকৃতির এবং এই গুণই জীবকে আবদ্ধ করে, প্রকৃতি স্বয়ং নয়।

সুখী, কখনো দুঃখী, কখনো বোদ্ধা, কখনো অবুঝ, কখনো হীনবল, কখনো বলশালী ইত্যাদি ভেবে সেইভাবে তদগত হয়ে থাকে। এই উৎপত্তি-বিনাশশীল প্রাকৃত ভাব এবং পদার্থে তাদাত্ম্য, মমত্ববোধ ও আসক্তি যুক্ত হয়ে এগুলিতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং নিজেকে এগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন বলে অনুভব করতে পারে না। মায়ার এই হল দুরত্যয় ভাব।

গুণময়ী মায়া তখনই দুরত্যয় হয়, যখন ভগবানকে ছেড়ে এই গুণগুলিকেই পৃথক্ সত্তা ও গুরুত্ব দেওয়া হয়। মানুষ যদি ভগবানকে ভুলে গুণগুলির পৃথক্ অস্তিত্ব ও গুরুত্ব মেনে না নেয়, তাহলে সে এই গুণময়ী মায়া অতিক্রম করতে পারে।

'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে'— মানুষের মধ্যে যাঁরা কেবল আমার শরণাগত হন, তাঁরা এই মায়া অতিক্রম করেন । কারণ তাঁদের লক্ষ্য শুধু আমার দিকে থাকে, ত্রিগুণের দিকে নয়। যেমন, আগেই বর্ণিত হয়েছে যে, সত্ত্ব-রজ-তম—এই তিন গুণ আমাতে অবস্থিত নয় এবং আমিও এগুলিতে অবস্থান করি না। আমি নির্লিপ্ত থেকে সকল কর্ম করি। যাঁরা আমার এই স্বরূপ জানেন, তাঁরা গুণাদিতে আবদ্ধ হন না এবং মায়া অতিক্রম করতে পারেন। তাঁরা গুণাদির কার্য মন-বুদ্ধির বিন্দুমাত্র সাহায্য নেন না। কেন নেন না ? কারণ তাঁরা একথা জানেন যে প্রকৃতির কার্যরূপ হওয়ায় মন-বুদ্ধিও প্রকৃতিই। প্রকৃতির ক্রিয়াশীলতা প্রকৃতিতেই বিদ্যমান। যেমন প্রকৃতি নিরন্তর লয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, এই মন-বুদ্ধিও সেইরূপ লয়ের পথে এগোচ্ছে। অতএব এগুলির সাহায্য নেওয়া পরাধীনতাই। এই পরাধীনতা যেন না থাকে এবং পরা-প্রকৃতি (যা পরমাত্মার অংশ) শুধু পরমাত্মার দিকে আকৃষ্ট হয়ে অপরা থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত থাকে—সামগ্রিকভাবে ভগবানের শরণাগত হওয়ার এই হল অর্থ।

এখানে **'মামেব'** বলার অর্থ হল, তাঁরা অনন্যভাবে কেবল আমারই শরণাগত হন ; কারণ আমি ছাড়া যে আর কোনো সত্তাই নেই, তাঁরা তা জানেন।

কিছু সাধক আমার শরণ নিলেও **'কেবলমাত্র আমারই'** শরণাগত হয় না। তাই বলেছেন **'মামেব'**— যাঁরা শুধু আমারই শরণ নেন, তাঁরা পার হয়ে যান। মায়ার আশ্রয় নিও না অর্থাৎ টাকা-পয়সা, জিনিস-পত্র ইত্যাদি সবই থাক, কিন্তু এগুলিকে নিজের আধার বলে যেন না মনে করি, এদের আশ্রয় না গ্রহণ করি, এদের বিশ্বাস না করি আর এদের গুরুত্ব যেন না দিই। এগুলি ব্যবহারের অধিকার আমাদের আছে। কিন্তু এগুলির ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য যেন না থাকে। এগুলির উপর আধিপত্য করাই হল এদের আশ্রিত হওয়া। আশ্রিত হলে এগুলির প্রভাব থেকে পৃথক্ হওয়া শক্ত হয়ে পড়ে—এটিই হল প্রকৃত দুরত্যয় ভাব। এই দুরত্যয় ভাব থেকে মুক্তি পাবার উপায় জানিয়েছেন—**'মামেব যে প্রপদ্যন্তে'**।

শরীর, ইন্দ্রিয় ইত্যাদিকে নিজের এবং নিজের জন্য না ভেবে সেগুলিকে ভগবানের এবং ভগবানের মনে করে তাঁর ভজনে, তাঁর নির্দেশ পালনে নিযুক্ত করতে হয়। এর থেকে নিজের কিছু নেবার দরকার নেই। এগুলিকে ভগবানে সঁপে দেবার ফলও নিজে নিতে নেই । কারণ ভগবানের বস্তু যখন সর্বতোভাবে ভগবানেই অর্পণ করে দিয়েছি অর্থাৎ ভ্রমক্রমে তাতে যে আপন-ভাব আরোপ করা হয়েছিল তা সরিয়ে দিয়েছি তখন সেই সমর্পণের ফল আমাদের কেন হবে ? এইসব বস্তু ভগবানের সেবার জন্যই ভগবানের কাছ থেকে পাওয়া। অতএব এগুলি তাঁর সেবায় নিয়োগ করা আমাদের কর্তব্য, অপরিহার্য কর্ম। এই কাজে ভগবান সন্তুষ্ট হন এবং তাঁর কৃপায় মানুষ মায়ার বন্ধনমুক্ত হয়।

নিজের বলে আমাদের কোনো বস্তু-ই নেই। ভগবানের প্রদত্ত বস্তুগুলিকে নিজের বলে মনে করে মনে অহংকার এসেছিল—এই ছিল ভুল। ভগবানের স্বভাব অত্যন্ত উদার ও প্রেমপূর্ণ, তিনি যাকে যা কিছু দেন তাকে জানতে দেন না যে সেগুলি ভগবানের প্রদত্ত। তাই মানুষ যা কিছু পায়, সেগুলিকে নিজের বলে মনে করে। ভগবানের প্রদান করার এ একটি বিশেষ রীতি। শুধু তাঁর ভক্তরাই এটি জানতে সক্ষম। কিন্তু যারা ভগবানের শরণাগত নয় তারা ভাবতেও পারে না যে, তারা কী এই বস্তুগুলি সর্বদা নিজের করে রাখতে পারবে ? অথবা এই বস্তুগুলি উপভোগের জন্য তারা কী সর্বদা থাকবে ? বস্তুগুলির ওপর আমাদের আধিপত্য কী চিরকাল চলবে ? তাই তারা অনন্যভাবে ভগবানের শরণ নিতে পারে না।

এই শ্লোকটির তাৎপর্য হল এই যে, যাঁরা শুধুমাত্র

ভগবানের শরণাগত হন অর্থাৎ যাঁরা কেবল দৈবী সম্পদসম্পন্ন হন, তাঁরা ভগবানের গুণময়ী মায়া অতিক্রম করেন। কিন্তু যারা ভগবানের শরণাগত না হয়ে দেবতাদির শরণ নেয় অর্থাৎ যারা শুধুমাত্র আসুরী সম্পদসম্পন্ন (প্রাণ-পিণ্ড-পোষণপরায়ণ, সুখভোগ পরায়ণ) হয়, তারা ভগবানের গুণময়ী মায়া অতিক্রম করতে সক্ষম হয় না। এরূপ অসুর-স্বভাববিশিষ্ট মানুষ ব্রহ্মলোক পর্যন্ত গেলেও, সেখান থেকেও (গুণময়ী মায়া ব্রহ্মলোক পর্যন্ত থাকায়) তাদের ফিরে আসতে হয় এবং জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হতে হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব— মানুষ যখন জগৎ-সংসারে বিমুখ হয়ে ভগবানের শরণাগত হয়, তখন সে মায়াকে (অপরা প্রকৃতির কার্যাদি) অতিক্রম করে অর্থাৎ তার অহং সর্বতোভাবে নাশ হয়ে যায়। ভগবানের শরণাগত হওয়ার অর্থ হল— ভগবানের অস্তিত্বের মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে মিশিয়ে দেওয়া অর্থাৎ শুধুমাত্র ভগবানের অস্তিত্বকেই স্বীকার করে নেওয়া। নিজের পৃথক্ অস্তিত্বকে না মানা, মায়ার পৃথক্ অস্তিত্বও না মানা, অহং-এর আশ্রয়ও গ্রহণ না করা এবং মায়ার (গুণাদির) আশ্রয়ও না নেওয়া—এতে কোনো পরিশ্রম বা উদ্যোগ নেই।

মানুষই মায়াকে অস্তিত্ব প্রদান করেছে—**'যয়েদং ধার্যতে জগৎ'** (গীতা ৭।৫), **'মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি'** (গীতা ১৫।৭)। যদি মানুষ মায়াকে অস্তিত্ব প্রদান না করে শুধুমাত্র ভগবানেরই শরণাগত হয় তাহলে সে মায়াকে অতিক্রম করে অর্থাৎ তার কাছে মায়ার কোনো অস্তিত্বই থাকে না।

জীব জড়পদার্থের শরণাগত হলে অর্থাৎ তাকে নিজের এবং নিজের জন্য মনে করলে জড়ত্ব প্রাপ্ত হয় এবং জগৎ রূপে পরিগণিত হয় (গীতা ৭।১৩)। কিন্তু ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করলে জীব স্বতঃই চিন্ময়ত্ব লাভ করে এবং ভক্ত হয়ে ওঠে। ভক্ত হলে জগৎ লুপ্ত হয়ে যায় অর্থাৎ তার কাছে জগৎ আর জগৎ-রূপে থাকে না, সেটি তখন ভগবৎ স্বরূপ হয়, যা প্রকৃতই বাস্তব সত্য।

'মামেব' পদটিতে ভগবানের কথার তাৎপর্য হল এই যে, জীব আমারই (**মম এব**) অংশ **'মমৈবাংশো জীবলোকে'** (গীতা ১৫।৭), অতএব আমারই (**মাম্ এব**) শরণাগত হলে সে মায়াকে অতিক্রম করে। তাই আমার শরণ গ্রহণকারী ভক্তদের আমি ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে সম্পর্ক হয়ই না, হওয়া সম্ভবও নয়, কেন-না তাঁদের দৃষ্টিতে আমি (ভগবান) ছাড়া আর কেউ থাকেই না। তাঁদের লক্ষ্যও অন্যদিকে যায় না এবং অন্যকিছু তাঁদের দৃষ্টিতে আসে না। তাঁদের দৃষ্টিতে অপরা প্রকৃতির অস্তিত্বও থাকে না, গুরুত্বও থাকে না এবং আপনভাবও থাকে না। তাঁদের শুধুমাত্র ভগবদ্‌বুদ্ধি হয়, যা প্রকৃতই ভগবদ্-স্বরূপ।

যার মধ্যে বিবেকের প্রাধান্য থাকে, সেই ভক্ত অহং-এর আশ্রয় পরিত্যাগ করে অর্থাৎ সংসারের আশ্রয় ত্যাগ করে ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু যার বিবেক অত প্রাধান্য পায়নি, কিন্তু ভগবানে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস প্রাধান্য পেয়েছে, সেই সহজ-সরল ভক্ত অহং-এর সঙ্গেই (যেমন আছে, তেমন ভাবেই) ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করে। এরূপ ভক্তদের অহং-কে স্বয়ং ভগবানই নাশ করে থাকেন (গীতা ১০।১১)।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে ভগবান জানিয়েছেন যে, 'আমার শরণাগত সকলেই মায়া অতিক্রম করে।' তাহলে সকল প্রাণী কেন তাঁর শরণ নেয় না—পরবর্তী শ্লোকে তার কারণ জানাচ্ছেন।

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥ ১৫ ॥

[**মায়য়া** (মায়া দ্বারা) ; **অপহৃত জ্ঞানাঃ** (হতজ্ঞানী) ; **আসুরম্** (আসুরী) ; **ভাবম্** (ভাবের) ; **আশ্রিতাঃ** (আশ্রয়গ্রহণকারী) ; **নরাধমাঃ** (মানুষদের মধ্যে অতিশয় নীচ) ; **দুষ্কৃতিনঃ** (পাপাচারী) ; **মূঢ়াঃ** (মূঢ়ঃ) ; **মাম্** (আমার) ; **ন, প্রপদ্যন্তে** (শরণ নেয় না।)]

মায়া দ্বারা হতজ্ঞানী, আসুরীভাবের আশ্রয়গ্রহণকারী, মনুষ্যকুলে অতিশয় নীচ এবং পাপাচরণকারী মূঢ় ব্যক্তি আমার শরণ নেয় না ॥ ১৫ ॥

ব্যাখ্যা—**'ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমা'**—যারা দুষ্কৃতী ও মূঢ়, তারা ভগবানের শরণ নেয় না। দুষ্কৃতী তাদের বলা হয় যারা বিনাশশীল, পরিবর্তনশীল প্রাপ্ত পদার্থে 'মমত্ববোধ' রাখে এবং অপ্রাপ্ত-পদার্থের 'কামনা' করে। কামনা পূর্ণ হলে 'লোভ' এবং কামনা পূরণে বাধাপ্রাপ্ত হলে 'ক্রোধ' জন্মায়। এইভাবে যারা 'কামনা'র বশবর্তী হয়ে ব্যভিচার ইত্যাদি শাস্ত্র-নিষিদ্ধ বিষয় উপভোগ করে, 'লোভে'র বশবর্তী হয়ে মিথ্যা-কপটাচার-বিশ্বাসঘাতকতা-প্রবঞ্চনা ইত্যাদি পাপ করে এবং 'ক্রোধে'র বশীভূত হয়ে ঈর্ষা-শত্রুতা ইত্যাদি হিংসামূলক পাপ করে, তারা হল দুষ্কৃতকারী।

মানুষ যখন ভগবান ব্যতীত অন্য সত্তাকে গুরুত্ব দেয়, তখনই কামনা উৎপন্ন হয়। কামনা উৎপন্ন হলে মানুষ মায়াতে মোহিত হয় এবং 'আমি বেঁচে থাকব এবং ভোগবিলাস করব'—এই ইচ্ছা তার হৃদয়ে প্রবল হয়। তাই সে ভগবানের শরণ না নিয়ে বিনাশশীল বস্তু-পদার্থ ইত্যাদির আশ্রয় নেয়।

তমোগুণের আধিক্যবশতঃ সার-অসার, নিত্য-অনিত্য, সৎ-অসৎ, গ্রহণীয়-ত্যজনীয়, কর্তব্য-অকর্তব্য ইত্যাদির দিকে যেসব ভগবদ্‌বিমুখ মানুষ নজর না করে তাদের মূঢ় বলা হয়। দুষ্কৃতী এবং মূঢ় ব্যক্তিরা ভগবদ্‌মুখী হওয়ার স্থির নিশ্চয় করতে পারে না, ভগবানের শরণাগত হওয়া তো দূরের কথা !

'নরাধমাঃ' বলার অর্থ হল এই যে, এই দুষ্কৃতী এবং মূঢ় ব্যক্তিগণ পশু থেকেও হীন। পশুরা তবু তাদের আপন মর্যাদার সীমায় থাকে, কিন্তু এরা মানুষ হয়েও নিজের আয়ত্তের মধ্যে থাকে না। পশু নিজ জন্ম ভোগ করে মনুষ্যজন্মের দিকে অগ্রসর হয় আর এরা মানুষ হয়েও পরমাত্মা প্রাপ্তির জন্য প্রাপ্ত মনুষ্যশরীরের দ্বারা পাপ-অন্যায় কর্ম করে নরক এবং পশু-জন্ম লাভের পথে অগ্রসর হয়। মূঢ়তাযুক্ত এরূপ পাপাচরণকারী মানুষের নরক প্রাপ্তি ঘটে। এরূপ প্রাণীদের জন্যই ভগবান (গীতা ১৬।১৯-২০) বলেছেন যে, 'দ্বেষকারী, মূঢ়, ক্রূর এবং জগতে নরাধম ব্যক্তিদের আমি বারংবার আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করি। এরা আসুরী যোনি প্রাপ্ত হয়ে ক্রমে ঘোর নরক প্রাপ্ত হয়।'

'মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ'—ভগবানের ত্রিগুণাত্মিকা মায়াতে (গীতা ৭।১৪) বিবেক আবৃত হওয়ায় যারা আসুরীভাব প্রাপ্ত হয়েছে অর্থাৎ শরীর-ইন্দ্রিয়াদি, মন-প্রাণ ইত্যাদির পোষণ করাতেই যারা তৎপর এরূপ মানুষ সর্বতোভাবে আমা হতে বিমুখ হয়ে থাকে। সেইজন্য তারা আমার শরণাগত হয় না।

অপর ভাবটি হল যাদের জ্ঞান মায়া দ্বারা অপহৃত, তাদের দৃষ্টি পদার্থগুলির আদি ও অন্তের দিকে যায় না। উৎপত্তি ও বিনাশশীল পদার্থগুলিকে প্রত্যক্ষভাবে নশ্বর দেখলেও তারা অর্থ-সম্পদ ইত্যাদি সংগ্রহ এবং মান-মর্যাদা-যোগ্যতা-প্রতিষ্ঠা-কীর্তি ইত্যাদিতেই আসক্ত থাকে, আর এগুলির প্রাপ্তিতেই নিজ নিজ যোগ্যতা, উদ্যোগের সাফল্য ইত্যাদি মনে করে থাকে। সেইজন্য এরা বুঝতেই পারে না যে যেটি এখন প্রাপ্ত নয়, তা প্রাপ্ত হলেও চিরকাল থাকবে না এবং আমাদের সঙ্গেও তার কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

'অসু' বলা হয় প্রাণকে। প্রত্যক্ষভাবে প্রাণকে ক্রিয়াশীল এবং বিনাশশীল দেখেও তারা প্রাণের পোষণ করাতেই ব্যাপৃত থাকে। তাই জীবন নির্বাহকারী সাংসারিক বস্তুসমূহকেই তারা গুরুত্ব দেয়। তার থেকেও বেশি করে অর্থ সম্পদকে গুরুত্ব দেয়, যা স্বয়ং কোনো কাজে আসে না, বরং বস্তুগুলির দ্বারা কাজে লাগে। তারা যে শুধু টাকাকে সম্মান করে তাই নয়, তারা টাকার সংখ্যাকেও খুব সম্মান করে। টাকার আধিক্য অহংকার বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। অহংকার হল সমস্ত আসুরী সম্পদের আধার আর সমস্ত দুঃখ এবং পাপের কারণ[১]। এই অহংকারবশতঃ যারা নিজেকে প্রতাপবান বলে মনে করে, তারা আসুর-ভাব প্রাপ্ত হয়।

বিশেষ কথা

ভগবান এখানে বলেছেন যে, দুষ্কৃতিপরায়ণ মানুষ

[১]সংসৃত মূল সুলপ্রদ নানা। সকল সোক দায়ক অভিমানা॥ (শ্রীরামচরিতমানস ৭।৭৪।৩)

আমার শরণাগত হতে পারে না আর নবম অধ্যায়ের ত্রিশতম শ্লোকে বলেছেন যে, অতিশয় দুরাচারী মানুষও যদি অনন্যভাবে আমার ভজনা করে, তবে সে খুব শীঘ্রই ধর্মাত্মা হয়ে থাকে এবং চিরশান্তি লাভ করে—তা কীভাবে সম্ভব ? এর উত্তর হল সেখানে (৯।৩০) 'অপি চেৎ' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ হল—দুরাচারী ব্যক্তিদের প্রবৃত্তি স্বাভাবিকভাবে পরমাত্মার দিকে থাকে না। কিন্তু যদি তারা ভগবানের শরণাগত হয়, তাহলে ভগবানের দিক থেকে কোনো বাধা থাকে না। ভগবানের দিক থেকে কোনো জীবের জন্যই বিন্দুমাত্র প্রতিবন্ধকতা নেই। কারণ ভগবান প্রাণীমাত্রেরই কাছে সমভাবে অবস্থিত। কোনো প্রাণীর ওপরই তাঁর রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ নেই (গীতা ৯।২৯)। অতি দুরাচারী ব্যক্তিও ভগবানের কাছে দ্বেষ্য নয়। সকল প্রাণীর ওপরই তাঁর প্রেম ও কৃপা সমানভাবে থাকে।

প্রকৃতপক্ষে দুরাচারী ব্যক্তিই বেশি দয়ার পাত্র হয়। কারণ সে নিজেই নিজের মহা অনিষ্ট করে থাকে, ভগবানের তাতে কোনোই ক্ষতি হয় না। তাই যদি কোনো কারণবশতঃ তার কোনো বিপদ এসে পড়ে, বড় সঙ্কটমুহূর্ত উপস্থিত হয় আর তখন যদি কেউ তাকে সাহায্য না করে তখন সে ভগবানকেই ডেকে থাকে। এরূপই কোনো সাধু যদি তার দুঃখ দেখে দুঃখিত হয় এবং সেই সাধুর হৃদয়ে কৃপার উদয় হয়, তাহলে সেই সাধুর কৃপায় সে ভগবানে মনোনিবেশ করে অথবা সে যদি এমন কোনো স্থানে চলে যায় যেখানে অনেক উদার, দয়ালু ও মহৎ ব্যক্তি অবস্থান করছেন এবং তাঁদের প্রভাবে তার হৃদয়ের ভাব পরিবর্তন হয় অথবা কোনো কারণবশতঃ তার আগেকার কোনো বিশেষ পুণ্য জেগে ওঠে, তবে সে হঠাৎ চেতনা লাভ করে এবং ভগবানের শরণ নেয়। এরূপ পাপী ব্যক্তি যদি ভগবানের শরণাগত হয় তবে সে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে তা করে থাকে। কারণ তার মধ্যে কোনো ভালোত্ব থাকে না বলে তার ভালোত্বের কোনো অহংকার থাকে না।

তাৎপর্য হল এই যে, সকল প্রাণীতেই ভগবানের অবস্থিতি এবং কৃপা সমানভাবে বিরাজমান। সদাচার এবং দুরাচার ওই প্রাণীদের করা কার্য মাত্র। এই প্রাণীরা মূলে তো সর্বব্যাপী ভগবানের শুদ্ধ অংশ। দুষ্কর্মের জন্য শুধু তাদের ভগবানে রুচি থাকে না। কোনো কারণবশতঃ যদি তাদের রুচি হয় তাহলে ভগবান তাদের দুষ্কর্মের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে তাদের স্বীকার করে নেন—

রহতি ন প্রভু চিত চূক কিএ কী।
করত সুরতি সয় বার হিএ কী॥

(শ্রীরামচরিতমানস ১।২৯।৩)

যেমন মায়ের হৃদয় নিজ সন্তানদের প্রতি সমানভাবে থাকে, তাদের সুব্যবহার এবং দুর্ব্যবহারে মায়ের ব্যবহারে তারতম্য হলেও হৃদয় কখনো বিষম হয় না—**'কুপুত্রো জায়েত ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি'**। মা তো কেবলমাত্র একটি মাত্র জন্মের জন্মদাত্রী হয়ে থাকেন ; আর প্রভু হলেন সকল জন্মের চিরস্থায়ী মাতা। প্রভুর হৃদয় সর্বদা প্রাণীদের জন্য দ্রবীভূত হয়ে থাকে। প্রাণী নামেমাত্র তাঁর শরণাগত হলেই তিনি বিশেষভাবে দ্রবীভূত হন। ভগবান বলেছেন—

জৌঁ নর হোই চরাচর দ্রোহী।
আবৈ সভয় সরন তকি মোহী।
তজি মদ মোহ কপট ছল নানা।
করউঁ সদ্য তেহি সাধু সমানা॥

(শ্রীরামচরিতমানস ৫।৪৮।১-২)

এর অর্থ হল যে, যারা বিশ্ব চরাচরের প্রাণীদের দ্বেষ করে, তারা যদি কোথাও আশ্রয় না পেয়ে ভীত হয়ে সর্বতোভাবে আমার আশ্রয় নিয়ে আমার শরণাগত হয়, তাহলে আমি তাদের মদ, মোহ, কপট, নানারূপ ছল ইত্যাদি দোষ না দেখে শুধু হৃদয়ের ভাব দেখে তাদের খুব শীঘ্রই সাধুতে পরিণত করি।

ধর্মের আশ্রয় থাকায় ধর্মাত্মা ব্যক্তিদের মধ্যে অনন্যভাব হওয়া অপেক্ষাকৃত শক্ত। কিন্তু দুরাত্মা ব্যক্তি যখন কোনো কারণে ভগবানের শরণাগত হয়, তখন তার কোনোরূপ শুভকর্মের আশ্রয় না থাকায় শুধু ভগবদ্‌পরায়ণতাই তার একমাত্র বল হয়ে থাকে। এই বল তাকে অতি শীঘ্র পবিত্র করে তোলে। কারণ এটি তার নিজস্ব বল বা শক্তি অর্থাৎ অন্য কোনো আশ্রয় না থাকায় এটি তার নিজস্ব আর্তি হয়ে থাকে। এই আর্তিতে ভগবান খুব শীঘ্রই দ্রবীভূত হন। এ আর্তিতে পুণ্যাত্মা-পাপাত্মা, বিদ্বান-মূর্খ, সুজাতি-কুজাতি ইত্যাদির কোনো বাধা থাকে না। এটি হওয়ার আসল কারণ হল জগতের দিক থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ হওয়া। এই নিরাশা প্রত্যেক মানুষেরই হতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, ভগবানের বলার তাৎপর্য হল এই যে, দুষ্কৃতকারী ব্যক্তিরা তাঁর শরণাপন্ন হয় না, কারণ তাদের স্বভাব তাঁর বিপরীত। এদের মধ্যে কেউ যদি তাঁর শরণাগত হয়, তবে তিনি সর্বদাই তাদের ভালোবাসার জন্য প্রস্তুত। ভগবানের কৃপা এত বিশেষ যে, তিনি নিজে কৃপার বশ হয়ে জীবের অতি শীঘ্র কল্যাণ করেন। অতএব এখানকার ও ওখানকার প্রসঙ্গের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। বরং এর দ্বারা ভগবানের অপার কৃপালুতাই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

সুকৃতি এবং দুষ্কৃতকারী[1] হওয়া ক্রিয়ানির্ভর নয়, এটি নির্ভর করে ভগবানের শরণাগত অথবা বিমুখ হওয়ার ওপর। যারা ভগবানের শরণাগত হয়, তারা হল সুকৃতী আর যারা ভগবানে বিমুখ তারা দুষ্কৃতকারী। ভগবানে শরণাগত হওয়ার যে ফল, সেই ফল সকামভাবে করা যজ্ঞ-দান-তপ-তীর্থ-ব্রত ইত্যাদি শুভকর্মেও থাকে না। যদিও যজ্ঞ-দান-তপাদি ক্রিয়াও পবিত্র, কিন্তু যে নিজেকে সর্বতোভাবে দীন ভেবে আর্তভাবে ভগবানের শরণাপন্ন হয়, ভগবৎকৃপায় সে অতি শীঘ্রই পবিত্র হয়। ভগবৎকৃপায় যে পবিত্রতা লাভ হয় তা বহু জন্মের কৃত শুভকর্মের থেকেও উত্তম। এরূপ সুকর্মকারী যদি শুভকর্মের আশ্রয় পরিত্যাগ করে ভগবানকে আর্তি জানায়, তবে সেও শুভকর্মের আশ্রয়ে না থেকে ভগবানের আশ্রিত হয়ে থাকে। ভগবানের আশ্রিত হয়ে সেও ভগবানের প্রিয় ভক্ত হয়ে ওঠে।

এক হল কৃতি আর অপরটি হল ভাব। কৃতি হল বাহ্যিক ক্রিয়া এবং ভাব হল অন্তরের। ভাবের পেছনে থাকে উদ্দেশ্য আর সে উদ্দেশ্য হল ভগবানের প্রতি অনন্যতা। এই অনন্যতা কৃতি এবং ভাবের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা কারণ এটি হয় নিজস্ব। এই অনন্যতার কাছে কোনো দুরাচারই টিকতে পারে না। অত্যন্ত দুরাচারী ব্যক্তিও এই অনন্যভাব দ্বারা অতি শীঘ্র পবিত্র হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মার অংশ হওয়ায় জীব তো পবিত্রই, শুধু অসৎ চিন্তা এবং দুরাচারের জন্যই এদের মধ্যে অপবিত্রতার উদয় হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব— যে ব্যক্তি ভগবানের শরণ নেয় না, সে আসুরী, রাক্ষসী ও মোহিনী প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণকারী হয় (গীতা ৯।১২)। তার দৃষ্টি সংসার (পদার্থ এবং ক্রিয়া) ব্যতীত অন্যদিকে যায় না। তার কাছে ভগবানের কোনো অস্তিত্বই থাকে না, তাই তার ভগবানের শরণ নেওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না ! ভোগবিলাস এবং সম্পদ সংগ্রহ করাই এমন মানুষের চরম লক্ষ্য হয় —**'কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ'** (গীতা ১৬।১১)। তাদের জ্ঞান মায়া দ্বারা আবৃত থাকায় তারা মায়ার বশে থাকে। মায়ার বশীভূত হওয়ায় তারা মায়াকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয় না।

'মায়য়াপহৃতজ্ঞানা' পদটির অর্থ হল মায়ার জন্য ওই ব্যক্তিদের বিবেক-শক্তি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তাই এইসব ব্যক্তি মায়াতেই নিমগ্ন হয়ে থাকে অর্থাৎ ভোগ-বিলাসে, সম্পদ সংগ্রহ করতে, শরীরকে সুন্দর করে তুলতে, গৃহকে সাজাতে ইত্যাদি কাজেই ব্যাপৃত থাকে। তারা শরীরের সুখ আরামের জন্য নতুন নতুন বস্তুর আবিষ্কারে ব্যস্ত থাকে এবং সেগুলিকেই গুরুত্ব দেয়। যেসব ব্যক্তি এরূপ অনিত্য, পরিবর্তনশীল বস্তুকেই জানে, গুরুত্ব দেয় তারা নিত্য, অব্যয় তত্ত্ব জানবে কী করে ? কেন-না তাদের দৃষ্টি ওইদিকে যায় না, যেতে পারেই না।

❖ ❖ ❖

[1]এখানে (৭।১৫-তে) 'দুষ্কৃতিনঃ' বলে বহুবচন দিয়েছেন এবং 'সুদুরাচারঃ' (৯।৩০) একবচন ব্যবহার করেছেন। এর তাৎপর্য হল এই যে বহুবচন ব্যবহার সাধারণ বাচক এবং একবচন ব্যবহার বিশেষ বাচক। যেখানে সাধারণ ও বিশেষ শাস্ত্রের তুলনা হয়, সেখানে সাধারণ শাস্ত্র থেকে বিশেষ শাস্ত্র বলবান—'সামান্যশাস্ত্রো নূনং বিশেষো বলবান্ ভবেৎ'। সেইজন্য একবচন বলবান।

দ্বিতীয়তঃ, যার অবকাশ নেই, সেই বিধি বলবান হয়ে থাকে—'নিরবকাশো বিধিরপবাদঃ'। অর্থ হল যে দুষ্কৃতিকারী ভগবানের শরণাগত হয় না—এটি হল তার সাধারণ স্বভাব। কিন্তু এদের মধ্যে কেউ কোনো বিশেষ কারণে ভগবানের শরণাগত হলে ভগবান তার দিকে কৃপার দ্বার উন্মুক্ত করে দেন—

সম্মুখ হোই জীব মোহি জবহীঁ। জন্ম কোটি অঘ নাসহিঁ তবহীঁ। (শ্রীরামচরিতমানস ৫।৪৪।১)

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে দুষ্কৃতকারী ব্যক্তিরা আমার শরণ নেয় না। তবে কারা শরণ নেয় ? পরবর্তী শ্লোকে সে কথা জানাচ্ছেন।

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ।। ১৬ ।।

[**ভরতর্ষভ, অর্জুন** (হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন !) ; **সুকৃতিনঃ** (সুকৃতিশালী) ; **অর্থার্থী** (অর্থার্থী) ; **আর্তঃ** (আর্ত) ; **জিজ্ঞাসু** (জিজ্ঞাসু) ; **চ** (এবং) ; **জ্ঞানী** (জ্ঞানী) ; **চতুর্বিধা** (চার প্রকারের) ; **জনাঃ** (মানুষ) ; **মাম্** (আমার) ; **ভজন্তে** (ভজনা করে।)]

হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন ! অর্থার্থী, আর্ত, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী অর্থাৎ প্রেমিক—এই চার-প্রকারের সুকৃতিশালী মানুষ আমার ভজনা করে অর্থাৎ আমার শরণাগত হয় ॥ ১৬ ॥

ব্যাখ্যা—**'চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন'**—সুকৃতিশালী পবিত্রাত্মা ব্যক্তি অর্থাৎ ভগবৎসম্বন্ধীয় কর্মসম্পন্নকারী মানুষ চার-প্রকারের হয়। এই চার-প্রকারের মানুষ আমার ভজনা করে অর্থাৎ আমার শরণাগত হয়।

আগের শ্লোকে **'দুষ্কৃতিনঃ'** পদের দ্বারা ভগবানে যারা মনোনিবেশ করে না, সেই ব্যক্তিদের কথা বলা হয়েছে। এখন এখানে **'সুকৃতিনঃ'** পদের দ্বারা ভগবানে অনুরক্ত ব্যক্তিদের কথা বলেছেন। এই সুকৃতিশালী ব্যক্তিগণ শাস্ত্রসম্মত সকাম পুণ্যকর্মকারী নন, এঁরা হলেন ভগবানের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করে ভগবদ্সম্বন্ধীয় কর্ম সম্পাদনকারী। সুকৃতিকারী মানুষ দুই প্রকারের হয়—এক, যাঁরা যজ্ঞ-দান-তপস্যা ইত্যাদি এবং বর্ণ-আশ্রম অনুসারে শাস্ত্রীয় কর্ম ভগবানের উদ্দেশ্যে করে থাকেন অথবা সেগুলি ভগবানে অর্পণ করেন। আর অন্যেরা যাঁরা ভগবানের নাম জপ, কীর্তন, ভগবানের লীলা শোনা বা বলা ইত্যাদি কেবলমাত্র ভগবদ্সম্বন্ধীয় কর্ম করেন।

ভগবানে যাঁর মতি হয়েছে, তিনিই ভাগ্যশালী শ্রেষ্ঠ মনুষ্য নামের উপযুক্ত। পূর্বজন্মের কোনো পুণ্যফলে হোক বা বিপদকালে অন্যের সহায়তা না পাবার জন্য হোক অথবা কোনো বিষম দুঃখে বিহ্বলতার জন্য হোক বা সৎসঙ্গ-স্বাধ্যায় বা বিচার ইত্যাদির দ্বারা হোক—যে কোনো কারণই হোক না কেন, ভগবানে মতি হলে তারা সকলেই সুকৃতিকারী পদবাচ্য।

ভগবানে যখন মতি হয়, সেটিই হয় পবিত্র দিন, নির্মল সময় এবং তাই হল সম্পদ। ভগবানে মতি না হলে তা হল অত্যন্ত অশুভ জীবন এবং বিপত্তি—

কহ হনুমন্ত বিপতি প্রভু সোঈ।
জব তব সুমিরন ভজন ন হোঈ॥
(শ্রীরামচরিতমানস ৫।৩২।২)

ভগবান কৃপা করে ভগবদ্প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে যাদের মনুষ্য দেহ দিয়েছেন, তাদের **'জনাঃ'** (জন বা ব্যক্তি) বলা হয়। ভগবানের সঙ্কল্প হল যাতে মনুষ্যসকল উদ্ধার লাভ করে ! তাই মানুষমাত্রই ভগবানকে লাভ করার অধিকারী। তাৎপর্য হল এই যে করুণাময় ভগবান মানুষকে তার উদ্ধার লাভের জন্য স্বাধীনতা দিয়েছেন, যা অন্য প্রাণীদের নেই। কারণ সেগুলি হল ভোগযোনি আর এই মনুষ্যদেহ হল কর্মযোনি। প্রকৃতপক্ষে শুধু ভগবদ্প্রাপ্তির জন্য হওয়ায় মনুষ্য দেহকে সাধনযোনি বলা উচিত। তাই এই স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করে মানুষ যদি শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কর্ম-ত্যাগ করে একমাত্র ভগবদ্প্রাপ্তির জন্যই চেষ্টা করে তবে ভগবদ্-কৃপায় অনায়াসে সে ভগবানকে লাভ করতে পারে। কিন্তু যারা এই প্রাপ্ত স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার না করে বিপরীত পথে চলে তারা নরক এবং চুরাশী লক্ষ যোনি (জন্ম) প্রাপ্ত হয়। এইভাবে সকলের উদ্ধারের ইচ্ছায় ভগবান কৃপা পরবশ হয়ে যে মনুষ্যদেহ দিয়েছেন, সেই দেহ প্রাপ্ত হয়ে ভগবানের ভজনাকারী সুকৃতি মানুষই **'জনাঃ'** অর্থাৎ মানুষ নামের যোগ্য।

'আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ'—অর্থার্থী, আর্ত, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী অর্থাৎ প্রেমিক—এই চার-প্রকারের ভক্ত ভগবানের ভজনা করেন বা ভগবানের শরণাগত হন।

১) **অর্থার্থী ভক্ত**—যাদের ন্যায়সঙ্গতভাবে সুখ-সুবিধার ইচ্ছা হয় অর্থাৎ ধন-সম্পত্তি ইত্যাদির আকাঙ্ক্ষা হয়, কিন্তু তারা কেবল ভগবানের কাছ থেকেই তা চায়, অন্য কারো থেকে নয়—তাদেরই অর্থার্থী ভক্ত বলা হয়।

চার-প্রকার ভক্তের মধ্যে অর্থার্থী ভক্তকে মুখপাত বা প্রারম্ভিক ভক্ত বলা হয়। পূর্বজন্মের সংস্কারে তাদের ধনের আকাঙ্ক্ষা থাকে এবং তার জন্য তারা চেষ্টাও করে এবং

তারা মনে করে যে ভগবান ছাড়া অন্য কেউ তাদের কামনা পূরণ করতে পারবে না। তাই মনে করে তারা অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে ধন প্রাপ্তির আশায় ভগবৎ-নাম জপ ও ভগবৎ-স্বরূপ ধ্যান করে থাকে। ধন প্রাপ্তির জন্য তাদের ভগবানের উপরেই নিষ্ঠা ও বিশ্বাস থাকে।

যাদের ধনলাভের ইচ্ছা থাকে এবং তা প্রাপ্তির জন্য তারা সাংসারিক উপায়ের সাহায্য নেয় আবার কখনো কখনো ধনলাভের আশায় ভগবানকে স্মরণ করে, তাদের কেবল অর্থার্থী অর্থাৎ অর্থের ভক্ত বলা হয়, ভগবানের ভক্ত নয়। কারণ তাদের ধনের ইচ্ছাই প্রবল থাকে। কিন্তু যাদের মধ্যে ভগবানের সম্বন্ধই মুখ্যভাবে থাকে, তারা ক্রমশঃ ভগবানের দিকেই অগ্রসর হতে থাকে। ভগবানে মনোনিবেশ করায় তাদের ধনের আকাঙ্ক্ষা কমে যায় এবং ক্রমে তা দূর হয়ে যায়। এরাই হল ভগবানের অর্থার্থী ভক্ত। এর মধ্যে প্রধানতঃ ধ্রুবের নাম করা যায়।

বালক ধ্রুবের একদিন পিতার কোলে বসার ইচ্ছা হয়, কিন্তু ছোট-মা তাঁকে বসতে দেননি। তিনি বলেছিলেন যে, 'তুমি ভজন-পূজন করনি, তুমি অভাগিনীর গর্ভে জন্মেছ, তুমি অভাগা, তাই তুমি রাজার কোলে বসার অধিকারী নও।' ধ্রুব তাঁর ছোট-মায়ের বলা কথাগুলি মাকে জানিয়েছিলেন। তাঁর মা তাঁকে জানালেন যে, 'তোমার ছোট-মা তোমাকে ঠিক কথাই বলেছেন। কারণ তুমি বা আমি কেউই উপাসনা করিনি।' তখন ধ্রুব তাঁর মাকে বললেন, 'মা! এবার আমি উপাসনা করব।' এই বলে তিনি ভগবদ্-উপাসনার জন্য ঘরের বার হলেন, তাঁর মাও সোৎসাহে তাঁকে বনে যাবার অনুমতি দিলেন। পথে তাঁর সঙ্গে নারদের দেখা হল। তিনি ধ্রুবকে বললেন, 'ওহে খোকা! তুমি একাকী কোথায় যাচ্ছ? এত শীঘ্র ভগবানকে মোটেই পাওয়া যায় না। বনে তুমি কোথায় থাকবে? সেখানে হিংস্র জংলি জানোয়ার আছে, তারা তোমাকে খেয়ে ফেলবে। সেখানে কি তোমার মা আছেন? তুমি আমার সঙ্গে চল। রাজা আমাকে জানেন, আমি তোমার এবং তোমার মায়ের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।' নারদের কথায় ধ্রুবের ভগবদ্-ভজনের আগ্রহ আরো দৃঢ় হল। তিনি ভাবলেন, 'ভগবানের উপাসনার জন্য প্রস্তুত হওয়া মাত্রই নারদও এত কথা বলছেন। এখন উনি আমাকে ফিরে যেতে বলছেন, কিন্তু এর আগে উনি কোথায় ছিলেন?' ধ্রুব নারদকে বললেন, 'হে মহারাজ! আমি এখন ভগবানের উপাসনাই করব!' ধ্রুবের এইরূপ দৃঢ় ইচ্ছা দেখে নারদ তাঁকে দ্বাদশ অক্ষরযুক্ত মন্ত্র (**ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়**) প্রদান করলেন এবং চতুর্ভুজ ভগবান বিষ্ণুর ধ্যান মন্ত্র জানিয়ে মধুবনে গিয়ে আরাধনা করার নির্দেশ দিলেন।

ধ্রুব মধুবনে গিয়ে এরূপ নিষ্ঠার সঙ্গে আরাধনা করলেন যে তাঁর নিষ্ঠায় ছয় মাসের মধ্যেই ভগবান ধ্রুবের সামনে প্রকটিত হলেন। ভগবান ধ্রুবকে রাজসিংহাসনের বরপ্রদান করলেন কিন্তু তাতে ধ্রুব সন্তুষ্ট হলেন না। সাধনার দ্বারা চিত্তশুদ্ধ হওয়ায় তাঁর অর্থের (রাজ্যের) জন্য ভগবানের শরণাগত হওয়াতে এমনই লজ্জাবোধ হয়েছিল যে, 'আমি বড় ভুল করেছি।'

তাৎপর্য হল এই যে, ধ্রুবের আগে রাজার কোলে বসার বাসনা হয়েছিল এবং এই ইচ্ছাপূরণের জন্য তিনি ভগবানের আরাধনা করলেন। আরাধনার ফলে তিনি রাজ্যলাভ করেন এবং কামনাও দূরীভূত হয়। এইরূপ অর্থার্থী ভক্ত কেবল ভগবানেরই শরণাগত হয়।

আজকাল ধনলাভের আশায় যারা মিথ্যা-কপটাচার-বিশ্বাসভঙ্গ ইত্যাদি করে তারাও ধনলাভের আশায় সময়-অসময়ে ভগবানকে ডাকে। তারা অর্থার্থী হলেও ভক্ত নয়। এরা মিথ্যা-কপটাচার ইত্যাদি দুষ্কর্মের ভক্ত। কারণ তাদের 'বিনা পাপকার্যে, মিথ্যা-কপটাচারে কাজ হয় না'—এই মনোভাব থেকে মিথ্যা কপটতা প্রভৃতিতে যত বিশ্বাস থাকে, ভগবানে তত বিশ্বাস থাকে না।

যারা শুধু ভগবদ্‌পরায়ণ হয়ে এবং ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে ভগবানের ভজনা করে, কিন্তু পূর্বসংস্কারবশতঃ কখনো কখনো অথবা অন্যান্য কারণে যাদের নিজ শরীর ইত্যাদির জন্য সুখ-সুবিধার ইচ্ছা জাগে, তাদেরও অর্থার্থী ভক্ত বলা হয়। তাদের এই সুখ ভোগের ইচ্ছাই অর্থার্থীর লক্ষণ।

২) আর্ত ভক্ত—প্রাণ-সংকট হলে, বিপদ এলে, ইচ্ছার বিপরীত ঘটনা ঘটলে যারা দুঃখিত হয়ে নিজ দুঃখ দূর করার জন্য ভগবানকে ডাকে এবং দুঃখে প্রতিকার কেবল ভগবানেরই কাছ থেকে আশা করে, অন্যের সাহায্য নেয় না, তাদের 'আর্ত ভক্ত' বলা হয়। আর্ত

ভক্তদের মধ্যে উত্তরার দৃষ্টান্তই উপযুক্ত[১]। কারণ তাঁর যখন বিপদ হয়েছিল, তিনি তখন ভগবান ছাড়া অন্য কারো সাহায্য গ্রহণ করেননি। অন্য কোনো উপায়ের কথা মনে স্থান দেননি। তিনি কেবলমাত্র ভগবানের সাহায্যই নিয়েছিলেন[২]। তাৎপর্য হল এই যে, সকামভাবে হলেও আর্ত ভক্ত তার কামনা কেবল ভগবানের কাছ থেকেই পূরণ করতে চায়।

যারা ভগবানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ভগবদ্‌পরায়ণ হয়েছে এবং অনুকূলতার তত কামনা রাখে না, শুধু প্রতিকূল পরিস্থিতি হলে মনে করে যে 'ভগবান এরকম কেন করলেন ? এই প্রতিকূলতা দূর হলে ভালো হয়।' প্রতিকূলতা দূর করার জন্য মনে এরূপ ভাব উৎপন্ন হলে তাদেরও আর্ত ভক্ত বলা হয়।

৩) **জিজ্ঞাসু ভক্ত**—যাদের নিজ স্বরূপ, ভগবদ্‌তত্ত্ব জানার এই তীব্র ইচ্ছা জাগে যে 'আমার স্বরূপ প্রকৃতপক্ষে কী। ভগবদ্‌তত্ত্ব কাকে বলে ?' এইরূপ তত্ত্ব জানার জন্য শাস্ত্র, গুরু বা পুরুষার্থের (শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ইত্যাদি উপায়ের) সাহায্য না নিয়ে কেবল ভগবানের আশ্রিত হয়ে তাঁর কাছ থেকেই যারা সেই তত্ত্ব জানতে চায়, তাদেরই বলা হয় 'জিজ্ঞাসু ভক্ত'।

জিজ্ঞাসু ভক্ত তাকেই বলে যার জিজ্ঞাস্য শুধু ভগবদ্‌-তত্ত্ব এবং উপায় শুধু ভগবদ্‌ভক্তি হয়ে থাকে অর্থাৎ যার উপেয় এবং উপায়ে অনন্যতা থাকে।

জিজ্ঞাসু ভক্তদের মধ্যে উদ্ধবের নাম করা যায়। ভগবান উদ্ধবকে দিব্যজ্ঞানের উপদেশ দিয়েছিলেন, যা 'উদ্ধবগীতা' (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৭-৩০) নামে প্রসিদ্ধ।

যাঁরা ভগবানের সঙ্গে আত্মীয়তা সম্পর্ক করে তাঁর আরাধনায় লীন হয়ে থাকেন এবং কখনো কখনো সঙ্গ-প্রভাবে বা সংস্কারবশতঃ মনে আসে যে 'আমার প্রকৃতস্বরূপ কী ? ভগবৎতত্ত্ব কাকে বলে ?'—তাঁদেরও 'জিজ্ঞাসু ভক্ত' বলা হয়।

৪) **জ্ঞানী (প্রেমিক) ভক্ত**—অর্থার্থী, আর্ত ও জিজ্ঞাসু—তিন-প্রকার ভক্তদের থেকে জ্ঞানী ভক্তকে বিশেষরূপে জানাবার জন্য এখানে '**চ**' অব্যয় ব্যবহৃত হয়েছে।

জ্ঞানী ভক্তরা অনুকূল ও প্রতিকূল সমস্ত পরিস্থিতি, ঘটনা, ব্যক্তি, বস্তু ইত্যাদি সবই ভগবদ্‌স্বরূপ বলে দেখেন অর্থাৎ অনুকূল-প্রতিকূল সব ঘটনাকেই ভগবদ্‌লীলা হিসাবে দেখে থাকেন। যেমন ভগবানের—তাঁর নিজের জন্য অনুকূলতা প্রাপ্ত করার, প্রতিকূল অবস্থা দূর করার, বোধ-প্রাপ্তি ইত্যাদিতে কোনোরূপ ইচ্ছা হয় না, তিনি শুধু ভক্তদের প্রেমে বিভোর হয়ে থাকেন ; জ্ঞানী ভক্তদেরও তেমনই কোনো কিছুর ইচ্ছা হয় না, তাঁরা কেবল ভগবদ্‌-প্রেমেই বিভোর হয়ে থাকেন।

জ্ঞানী অর্থাৎ প্রেমিক ভক্তদের মধ্যে গোপিনীরা প্রসিদ্ধ। দেবর্ষি নারদও '**যথা ব্রজগোপিকানাম্**' (নারদ ভক্তিসূত্র ২১) কথাটি বলে গোপিনীদের প্রেমিক ভক্তদের আদর্শ বলে জানিয়েছেন। কারণ গোপিনীরা তাঁদের নিজ সুখ

---

[১]আর্ত ভক্তদের মধ্যে দ্রৌপদী এবং গজেন্দ্রের উদাহরণ সঠিক হয় না ; কারণ তাঁরা নিজেদের রক্ষার জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করেছিলেন, শুধু ভগবানের নয়। নিজেদের দুঃখ দূর করার জন্য যতক্ষণ অন্য উপায় থাকে, অন্য উপায়ের দিকে লক্ষ্য থাকে, ততক্ষণ তারা অনন্যভক্ত হতে পারে না এবং ততক্ষণই তাদের কষ্ট পেতে হয়। যখন এই অন্যের দিকের প্রত্যাশা দূর হয়, তখন তাদের ভক্ত বলা হয় এবং তখন কষ্ট হয় না। যেমন, বস্ত্র হরণের সময় দ্রৌপদীর দৃষ্টি যতক্ষণ অন্যের দিকে ছিল, অন্যের ওপর ভরসা ছিল, নিজ শক্তির সাহায্য ছিল, ততক্ষণ তিনি কষ্ট পাচ্ছিলেন। কিন্তু যখন অন্যের সাহায্য দূর অস্ত, নিজ হাতেরও ভরসা ছিল না অর্থাৎ নিজ শক্তিরও সাহায্য নেননি, তখন তিনি অনন্যভাব হয়েছিলেন এবং তখন আর তাকে দুঃখ পেতে হয়নি।

এইরূপ গজেন্দ্র যতক্ষণ হস্তী এবং হস্তিনীদের সহায়তা নিয়েছিলেন, নিজের শক্তির সহায়তা নিয়েছিলেন, ততক্ষণ তিনি বহুকাল ধরে দুঃখ পাচ্ছিলেন। যখন সমস্ত সাহায্য দূরীভূত হল এবং শুধু ভগবানেরই সহায়তা চাইলেন, তখন আর তাঁকে দুঃখ পেতে হয়নি।

[২]পাহি পাহি মহাযোগিন্ দেবদেব জগৎপতে। নান্যং ত্বদভয়ং পশ্যে যত্র মৃত্যুঃ পরস্পরম্॥

অভিদ্রবতি মামীশ শরস্তপ্তায়সো বিভো। কামং দহতু মাং নাথ মা মে গর্ভো নিপাত্যতাম্॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ১।৮।৯-১০)

'দেবাদিদেব ! জগদীশ্বর ! মহাযোগিন্ ! আপনি আমাকে রক্ষা করুন ! আপনি ছাড়া ইহলোকে আমাকে অভয় প্রদানকারী আর কেউ নেই। কারণ এখানে সকলেই নিজেদের মধ্যে একে অপরের মৃত্যুর কারণ হচ্ছে। প্রভু ! সর্বশক্তিমান্। এই জ্বলন্ত লৌহ শর আমার প্রতি ধাবিত হচ্ছে ! স্বামিন্ ! এটি আমাকে দহন করুক কিন্তু যেন আমার গর্ভকে নষ্ট না করে।'

সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করেছিলেন। প্রিয়তম ভগবানের সুখই ছিল তাঁদের সুখ।

এখানে একটি বিষয় বোঝার আছে যে অর্থের আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ দূর করার বাসনা এবং ঈশ্বর জিজ্ঞাসা পূরণের ইচ্ছা নিয়ে যাঁরা ভগবানের দিকে অগ্রসর হন, তাঁদেরও ভগবানের প্রতি প্রেম জাগ্রত হয় এবং তাঁদের ভক্ত বলা হয়। কিন্তু যাঁদের মনে হয় যে, অন্যভাবে অর্থ সংগ্রহ হতে পারে কিংবা অন্য উপায়ে দুঃখ দূর হতে পারে, জিজ্ঞাসা পূরণ হতে পারে, এভাবে ভগবানের সঙ্গে তাঁরা সম্পর্কিত না হওয়ায় তাদের মধ্যে ভগবদ্-প্রেম জাগ্রত হয় না এবং তাঁদের ভক্ত সংজ্ঞা হয় না।

সন্ত-বাণীতে আছে যে, প্রেম তো কেবল ভগবানই করে থাকেন, ভক্ত তো তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তা করে। কারণ সেই প্রেম করে যার কখনো কারো কাছ থেকে কিছু নেবার নেই। ভগবান জীবমাত্রকেই তাঁর সর্বস্ব অর্পণ করে দিয়েছেন আর জীবের কাছ থেকে তাঁর কোনো কিছু প্রাপ্ত করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও হতে পারে না। তাই ভগবানই প্রকৃতপক্ষে প্রেম করেন। জীবের ভগবানে প্রয়োজন থাকে। তাই জীব ভগবানের সঙ্গে আত্মীয়তা পাতায়। নিজেকে সর্বতোভাবে ভগবানের শ্রীচরণে অর্পণ করে ভক্তের যখন আর কোনো কিছু পাবার আকাঙ্ক্ষা থাকে না, তখন তাঁকে জ্ঞানী অর্থাৎ প্রেমিক ভক্ত বলা হয়। নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ভগবানে অর্পণ করলে সেই ভক্তের সত্তা ভগবানের থেকে কখনো পৃথক হয় না বরং সেই অবস্থায় একমাত্র ভগবানের সত্তাই বিরাজ করে।

বিশেষ কথা

(১)

চারটি বালক খেলা করছিল। এর মধ্যে তাদের পিতা গোটা চারেক আম নিয়ে এলেন। পিতার হাতে আম দেখেই একটি বালক আম চাইতে লাগল আর অপর একজন আম নেবার জন্য কাঁদতে আরম্ভ করল। তাদের পিতা ওই দুজনকে একটি করে আম দিলেন। তৃতীয় বালকটি কাঁদলও না বা আম চাইলও না, কেবল আমের দিকে তাকিয়ে দেখল আর চতুর্থ বালকটি আমের দিকে নজর না দিয়ে যেমন খেলছিল তেমনি খেলাতেই মগ্ন হয়ে রইল। বাবা তাদের ডেকে একটি করে আম দিয়ে দিলেন। এইভাবে চারটি বালকই আম পেল। এখানে আম নিতে চাওয়া বালকটি অর্থার্থী, কাঁদতে থাকা বালকটি আর্ত, যে বালকটি আমের দিকে তাকিয়ে দেখেছিল সে জিজ্ঞাসু আর যে বালকটি আমের দিকে গ্রাহ্য না করে খেলাতে মগ্ন ছিল, সে হল জ্ঞানী। এইভাবেই অর্থার্থী ভক্ত ভগবানের কাছে আনুকূল্য প্রার্থনা করে, আর্তভক্ত ভগবানের কাছে প্রতিকূলতা দূর করার ব্যাকুলতা জানায়, জিজ্ঞাসু ভক্ত ভগবানের স্বরূপ জানতে চায় এবং জ্ঞানী অর্থাৎ প্রেমিক ভক্ত ভগবানের কাছে কিছুই চায় না।

অর্থার্থী, আর্ত, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী—এই চার-প্রকার ভক্তই ভগবদ্‌নিষ্ঠ। সুতরাং এঁদের যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিদের (গীতা ৬।৪১-৪২-এর) মধ্যে ধরা হয় না। এরূপই অর্থার্থী এবং আর্ত—এরা দুজনেই সকাম পুরুষ থেকে আলাদা, কারণ এই দুই ভক্তের মধ্যে ভগবানের আশ্রয়ই প্রধান। সকাম ব্যক্তিরা কামনা পূরণের জন্য অস্থির থাকায় **'হৃতজ্ঞানাঃ'** হয় (গীতা ৭।২০)। তাই তাদের আসুরী-সম্পদসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে ধরা হয়। যদিও অর্থার্থী প্রভৃতি ভক্তদের মধ্যে যা কিছু তারতম্য থাকে, তা কামনার জন্যই, কিন্তু কামনা থাকলেও তাঁদের **'হৃতজ্ঞানাঃ'** বলা যায় না। ভগবান এঁদের **'সুকৃতিনঃ'** এবং **'উদারাঃ'** (৭।১৮) নামে অভিহিত করেছেন।

যাঁরা ভগবানের শরণাগত হন, তাঁদের মধ্যে সকাম ভাবও থাকতে পারে। কিন্তু তাঁদের মধ্যে মুখ্যতঃ ভগবদ্‌নিষ্ঠাই থাকে। তাই তাঁদের ভগবানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা যত বৃদ্ধি পেতে থাকে, তাঁদের অন্তরের সকাম ভাবও ততই দূর হয়ে বিশেষ ভাব জেগে ওঠে। তাই ভগবান এঁদের **'উদারাঃ'** বলেছেন এবং জ্ঞানী ভক্তদের নিজের স্বরূপ বলে জানিয়েছেন—**'জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্'** (৭।১৮)।

(২)

ভগবানের সঙ্গে আপনজনের সম্পর্ক স্থাপন করার মতো আর কোনো সাধন নেই, কোনো যোগ্যতা নেই, কোনো বল নেই, কোনো সামর্থ্য নেই। সমস্ত প্রাণীর সঙ্গে ভগবানের আপন-ভাব চিরকাল ধরে আছে এবং থাকবে। সেই আপনত্ব বিস্মৃত হয়ে প্রাণীরা সংসারের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে। অতএব ভ্রমক্রমে পাতানো এই একাত্মভাব দূর করে প্রভুর সঙ্গে যে স্বতঃসিদ্ধ আত্মীয়তা থাকে তাকে মেনে নিতে হয়। প্রভুকে আপন ভাবতে গেলে মন-বুদ্ধি ইত্যাদি

কোনোকিছুর সাহায্যের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু অন্য সাধনে মন-বুদ্ধি ইত্যাদির সাহায্যের প্রয়োজন হয়।

ভগবানের সঙ্গে একাত্ম হলে অর্থাৎ 'আমি শুধু ভগবানের এবং ভগবানই কেবলমাত্র আমার'—দৃঢ়তার সঙ্গে এটি মেনে নিলে সাধক ভক্তের তথাকথিত অন্তঃকরণের ভাব এবং গুণে অল্প-বিস্তর ন্যূনতা পরিলক্ষিত হলেও ভগবানের সঙ্গে আপনজনের সম্পর্ক পাতানোর ফলে তা টিকে থাকতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, সাধক ভক্তে কোনো গুণ যদি কিছু কমও থাকে তাহলেও ভগবানের দৃষ্টি থাকে একাত্ম-ভাবের দিকে, গুণের ঘাটতির দিকে নয়। কারণ ভগবানের সঙ্গে আমাদের যে আপনজনের সম্পর্কবোধ, তা হল অতিশয় বাস্তবিক।

অতিদুষ্ট মানুষের সঙ্গেও ভগবানের একাত্মতা একই প্রকার থাকে। তাই ষোড়শ অধ্যায়ে আসুরী প্রকৃতির লোকের বর্ণনা করতে গিয়ে ভগবান বলেছেন যে, 'ক্রূর, দ্বেষ ভাবসম্পন্ন, নরাধম, দুষ্ট ব্যক্তিদের আমি আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করি'। এইভাবে আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করে তিনি তাদের শুদ্ধ করে তোলেন। মা যেমন তাঁর সন্তানকে স্নান করাবার জন্য সন্তানের সম্মতি নেন না, তেমনই মানুষকে শুদ্ধ করাবার জন্য ভগবান তাদের সম্মতি নেন না ; কারণ তাদের তিনি আপন বলে মনে করেন।

ভগবানের সঙ্গে এই আপনত্ব সম্পর্ক প্রথম থেকেই বিদ্যমান। তা সত্ত্বেও যখন কোনো কামনা উৎপন্ন হয় তখন ভক্তের ভগবানের সঙ্গে আপনত্বভাবের সম্পর্কই প্রধান হয়ে ওঠে, কামনার সম্পর্ক গৌণ হয়ে যায়। এই শ্রেণীর ভক্ত প্রথম সারিতে থাকেন।

ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক প্রথম হতেই থাকে, তবুও বিভিন্ন সময়ে কামনা উৎপন্ন হলে মানুষ তা অন্যের থেকে পূরণ করতে চায়। অপরের কাছ থেকে যখন পূরণ হয় না, তখন শেষকালে ভগবানের কাছেই চায়। এইরূপ অনন্যতার অভাব থাকায় এদের দ্বিতীয় সারির ভক্ত বলা যায়।

যদি কেবল কামনা পূরণের উদ্দেশ্যেই ভগবানের সঙ্গে আপনত্ব-ভাবের সম্পর্ক পাতানো হয়, যেখানে কামনাই মুখ্যরূপে থাকে আর ভগবানের সম্পর্ক হয় গৌণ, তাহলে সেরূপ ভক্তদের তৃতীয় সারির অন্তর্গত করা হয়।

মর্মার্থ

কামনা দু'প্রকারের হয়—পারমার্থিক এবং লৌকিক।

১) **পারমার্থিক কামনা**—পারমার্থিক কামনাও দু'প্রকারের হয়—মুক্তির (কল্যাণের) এবং ভক্তির (ভগবদ্-প্রেমের)।

যেটি মুক্তির কামনা, তাতে তত্ত্ব জানার আগ্রহ থাকে, যাকে বলে জিজ্ঞাসা। যাঁর মধ্যে এই জিজ্ঞাসার উদয় হয়, তাঁকে বলা হয় জিজ্ঞাসু। গভীরভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে জিজ্ঞাসা কামনা নয়। কারণ তিনি নিজ স্বরূপ অর্থাৎ তত্ত্বকে জানতে চান, যা প্রকৃতই তাঁর জানা প্রয়োজন। প্রয়োজন তাকে বলা হয় যেটি অবশ্যই পূর্ণ হয় এবং পূর্ণ হলে আর অন্য প্রয়োজন সৃষ্টি হয় না।[১] এই প্রয়োজন সৎ বিষয়ের জন্য হয়।

অপর কামনা প্রভু-প্রেম-প্রাপ্তির জন্য হয়। একে প্রাপ্তি বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে এই প্রাপ্তি নিজের জন্য নয়, তা প্রভুর জন্যই হয়। এতে নিজের কোনো প্রয়োজন থাকে না, প্রভুর কাছে সমর্পিত হবারই প্রয়োজন থাকে। প্রেমিক ভক্ত নিজেকে প্রভুর চরণে সমর্পণ করেন, কেন-না প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁরই অংশ।[২]

উপরোক্ত দুটি পারমার্থিক কামনা প্রকৃতপক্ষে

---

[১]কামনা তাকে বলে, যা কখনো পূর্ণ হয় না। একটি পূর্ণ হলে অপর কামনার সৃষ্টি হয়। যেমন অর্থের কামনা হল ; যত অর্থের আশা ছিল, তা প্রাপ্তি হলে আরো বেশি অর্থের কামনা উৎপন্ন হয়। অর্থের মতোই মান-মর্যাদা, বাঁচার, ভোগকরার, নীরোগ থাকার, যশ-কীর্তির, স্ত্রী-পুত্রাদি উৎপত্তি ও বিনাশশীল বস্তুসমূহের কামনা উৎপন্ন হতে থাকে। এই ধন-সম্পদ ইত্যাদি কোনো বস্তুই নিজের নয় অর্থাৎ এগুলির কোনটিই স্বয়ং-এর কাছে পৌঁছাতে সক্ষম নয়। এসব কামনা কেবল দেহ ও উপাধি পূর্তির জন্যই হয়। তাই এসব কামনা অসৎ-বিষয়েরই হয়। কামনাপূর্তি হলেই আর একটি কামনা উৎপন্ন হয়, এইভাবে অপূর্তিই অবশিষ্ট থেকে যায়। সুতরাং কামনা পরিত্যাজ্য। কারণ এই বস্তুগুলি থাকে না আর সেগুলি পূরণের জন্য কামনা এবং প্রচেষ্টা—উভয়ই নিষ্ফল হয়ে থাকে।

[২]মুক্তির থেকে ভক্তি শ্রেষ্ঠ। কারণ মুক্তিতে শুধু নিজে মুক্ত হতে চায় আর ভক্তিতে ভগবানে সমর্পিত হতে চায়। তাৎপর্য হল এই যে, মুক্তিতে নেওয়ার ইচ্ছা এবং ভক্তিতে দেবার ইচ্ছা থাকে। সেইজন্য মুক্তিতে সূক্ষ্ম অহং-ভাব থাকে, কিন্তু ভক্তিতে অহং একেবারেই থাকে না।

'কামনা'ই নয়।

২) **লৌকিক কামনা**—লৌকিক কামনাও দু'প্রকারের—সুখ-প্রাপ্তি করা এবং দুঃখ দূর করা।

শরীর যেন আরাম পায়, জীবৎকালেই আমার আদর-আপ্যায়ন হয় এবং মৃত্যুর পর আমার নাম অমর হয়, স্মারক তৈরি হয়, কেউ আমার নামে বই লিখুক, যা লোকে পড়ে জানতে পারবে যে ইনি একজন বিশেষ ব্যক্তি ছিলেন, মৃত্যুর পর স্বর্গে গিয়ে ভোগ আরাম করব ইত্যাদি লৌকিক সুখ-প্রাপ্তির কামনা হয়ে থাকে। এরূপ কামনা দ্বারা বাসনা বৃদ্ধি পেতে থাকে, তাতে বন্ধন হয় এবং পতন ঘটে, উদ্ধার লাভ হয় না। এই কামনা হল আসুরী-সম্পদ। তাই এটি পরিত্যাজ্য।

অপর কামনা হল দুঃখ দূর করার। দুঃখ তিন প্রকারের—আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক।

অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শীত-গ্রীষ্ম, ঝড়-বৃষ্টি ইত্যাদিতে যে দুঃখ হয়ে থাকে, তাকে বলা হয় 'আধিদৈবিক'। দেবতাগণের অধিকারগত ক্ষমতা থেকে এই দুঃখ-কষ্ট হয়ে থাকে।

হিংস্র জন্তু বা নিষ্ঠুর মানুষ হতে যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাকে বলা হয় 'আধিভৌতিক'।

শরীর এবং অন্তঃকরণের দ্বারা যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, তা হল 'আধ্যাত্মিক'।[১]

এই দুঃখগুলি দূর করে সুখ প্রাপ্ত করার যে কামনা হয়ে থাকে তা একেবারেই নিরর্থক। কারণ ওই কামনা পূরণ হয় না। পূরণ যদি হয়ও তবে আবার অন্য নতুন কামনা উৎপন্ন হয়, এভাবে কামনা থেকে যায়। সেইজন্য এই দুই কামনা কোনো মানুষের কখনই পূরণ হয়নি, হয় না এবং ভবিষ্যতে কখনো পূরণ হবার নয়।

পরিশিষ্ট-ভাব— চতুর্দশতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে আমার শরণ গ্রহণকারী ভক্তগণ গুণময়ী মায়া অতিক্রম করেন। এই শরণাগত ভক্ত কারা সেটি তিনি এই শ্লোকে জানাচ্ছেন।

আগের শ্লোকে 'দুষ্কৃতী' মানুষদের এবং এই শ্লোকে 'সুকৃতী' মানুষদের কথা বলা হয়েছে। যা আমাদের থেকে আলাদা, সেই জগৎ-সংসারকে নিজের বলে মনে করা সবথেকে বড় দুষ্কৃত অর্থাৎ পাপ আর যা আমাদের থেকে অভিন্ন, সেই ভগবানকে আপন বলে মনে করা হল সব থেকে বড় সুকৃতী অর্থাৎ পুণ্য। অতএব যারা জগৎ-সংসারকে আপন ভাবে, তারা দুষ্কৃতী আর যারা ভগবানকে আপন ভাবে, তারা হল সুকৃতী।

ভোগী ব্যক্তি ভগবানের ভক্ত হতে পারে না, তাই 'অর্থার্থী' ভগবদ্-ভক্ত হলেও ভোগার্থী ভগবদ্-ভক্ত হয় না। কেন-না ভোগার্থীর মধ্যে জাগতিক লিপ্ততা বেশি থাকে, সেই তুলনায় অর্থার্থীর লিপ্ততা কম থাকে। অর্থার্থীর মধ্যে ভগবানের প্রাধান্য থাকে।

কিছু অংশে ভগবান ভিন্ন অন্য অস্তিত্বকে প্রাধান্য দেওয়াতেই ভক্ত অর্থার্থী, আর্ত বা জিজ্ঞাসু হয়। যদি অন্য অস্তিত্বের প্রাধান্য না থাকে তাহলে তিনি হন জ্ঞানী (প্রেমিক)। অর্থাৎ ভগবান ব্যতীত দ্বিতীয় অস্তিত্বকে মেনে নিলেই এই চার প্রকার পার্থক্য দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে একমাত্র ভগবান ব্যতিরেকে অন্য অস্তিত্ব থাকা সম্ভবই নয়।

যে ব্যক্তি বিজ্ঞানসহ জ্ঞানকে অর্থাৎ পরমাত্মার সমগ্ররূপটি জানতে চান, তাঁকে বলা হয় 'জিজ্ঞাসু'। জিজ্ঞাসুগণ ভগবানের ঐশ্বর্য, প্রভাব এবং সামর্থ্যকে জানতে চান, সেইজন্য ভগবানের লীলাকথায় তাঁরা বিশেষ আনন্দ পান। ভগবান 'মুমুক্ষু' পদ ব্যবহার না করে 'জিজ্ঞাসু' পদ ব্যবহার করেছেন, কারণ শুধুমাত্র তত্ত্বজ্ঞান প্রার্থীই 'মুমুক্ষু' হতে পারেন। কিন্তু 'জিজ্ঞাসু' জ্ঞানপ্রার্থীও হতে পারেন আবার ভক্তিপ্রার্থীও হতে পারেন। মুমুক্ষুদের কাছে প্রধান হয়ে থাকে তাদের নিজেদের কল্যাণ আর জিজ্ঞাসু ভক্তদের প্রধান লক্ষ্য নিজেকে ভগবানের কাছে সমর্পণ করা। মুমুক্ষুদের ব্রহ্মজ্ঞান হয় আর জিজ্ঞাসু ভক্তদের হয় **'বাসুদেবঃ সর্বম্'** এই জ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞানীর তো শুধু ব্রহ্মজ্ঞান হয় কিন্তু ভক্তের হয় সমগ্রের জ্ঞান (গীতা ৭।২৯-৩০)।

অর্থার্থী, আর্ত ও জিজ্ঞাসুদের ক্রমশঃ জগৎ-সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক হ্রাস পেতে থাকে এবং পরমাত্মার সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধি পেতে থাকে। জীব যতক্ষণ জগৎকে ধারণ করে থাকে, ততক্ষণ অর্থার্থী, আর্ত ও জিজ্ঞাসু থাকে। যখন সে জগৎকে

---

[১]আধ্যাত্মিক দুঃখ দু'প্রকারের—আধি এবং ব্যাধি। মনের চিন্তাকে বলা হয় 'আধি' এবং শরীরের অসুখকে বলা হয় 'ব্যাধি'। আধিও দু'প্রকারের—১) উন্মত্ততা, ২) চিন্তা-শোক-ভয়-উদ্বেগ ইত্যাদি। উন্মত্ততা আসে ভাগ্যের দোষে আর চিন্তা-শোক ইত্যাদি হয় অজ্ঞান থেকে। জ্ঞান হলে চিন্তা-শোক ইত্যাদি দূর হয়, কিন্তু উন্মত্ততা ভাগ্যবশতঃ হতে পারে।

763 Sadhak Sanjivani (Bangla)_Section_21_1_Front

ধারণ করে না, তখন শুধু 'জ্ঞানী' অবশিষ্ট থাকে।

যে ভক্তের 'সব কিছুই ভগবান বাসুদেব'— এইরূপ পরমাত্মার সমগ্ররূপের জ্ঞান হয়েছে, এখানে তাঁকে 'জ্ঞানী' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই জ্ঞানী ভক্তকেই পরবর্তী উনিশতম শ্লোকে বলা হয়েছে 'জ্ঞানবান্'।

'অর্থার্থী' প্রাপ্ত পরিস্থিতিতে সন্তুষ্ট না হয়ে অর্থ প্রার্থনা করে। 'আর্ত' প্রাপ্ত পরিস্থিতিতে সন্তুষ্ট হলেও দুঃখ পেলে, সহ্য করতে পারে না। 'অর্থার্থী'র মধ্যে অর্থের প্রাধান্য থাকে না, ভগবানের প্রাধান্য থাকে। তার প্রার্থনায় অর্থের আকাঙ্ক্ষা থাকলেও তা সে শুধুমাত্র ভগবানের কাছ থেকেই পূর্ণ করতে চায়। কারণ ভগবানে কোনো কিছুরই অভাব নেই। অপরা প্রকৃতিও তো ভগবানেরই ! 'আর্ত'-ও তার দুঃখ কেবল ভগবানের কাছ থেকেই পূরণ করতে চায়। 'জিজ্ঞাসু'ও একমাত্র ভগবানের কাছ থেকেই নিজ জিজ্ঞাসার সমাধান চায়। কিন্তু যখন ভক্তদের মধ্যে এরূপ আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয় যে 'আমার শুধু যেন ভগবানকেই প্রিয় বলে মনে হয়', তখন তাদের মধ্যে অর্থার্থীভাব, আর্তভাব ও জিজ্ঞাসুভাব আর থাকে না, তারা তখন জ্ঞানী অর্থাৎ প্রেমিক ভক্ত হন।

'অর্থার্থী'র অর্থের সঙ্গে নিত্য সম্পর্ক থাকে, কেন-না তার অর্থের বাসনা সব সময় থাকে। কিন্তু 'আর্তে'র সবসময় দুঃখের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে না, কারণ দুঃখ সব সময় থাকে না। 'জিজ্ঞাসু'র সুখদুঃখের পরোয়া থাকে না, সুতরাং সে সুখ পাবার কথাও ভাবে না, দুঃখ দূর হবার কথাও চিন্তা করে না। অর্থার্থী ও আর্ত দুজনে জিজ্ঞাসু হয়ে জ্ঞানী হয়ে ওঠে।

'অর্থার্থী' ভক্ত যখন অর্থ লাভ করে, তখন তার নিজের ভুলের জন্য অনুতাপ হয়। যেমন— ধ্রুবর হয়েছিল রাজ্য-লাভ করার পর। কিন্তু 'আর্ত' ভক্তের তেমন অনুতাপ হয় না, বরং তার মধ্যে এই ভাব থাকে যে ভগবান তো দুঃখ নিবারণকারী। যেমন—দ্রৌপদী এবং গজেন্দ্র, রক্ষা পেলেও অনুতপ্ত হননি কিন্তু তাঁদের ভগবানের দিকেই চিত্তবৃত্তি নিবিষ্ট ছিল। 'আর্ত' ভক্তদের দুর্বলতা হল এই যে তারা দুঃখ সহ্য করতে পারে না।

'জিজ্ঞাসু' ভক্তের ভগবানের সমগ্ররূপ পূর্ণভাবে জানার আকাঙ্ক্ষা থাকে। তার মুক্তি, তত্ত্বজ্ঞান হলেও সন্তুষ্টি আসে না, প্রেম লাভ করার আকাঙ্ক্ষা থেকে যায়। কিন্তু 'জ্ঞানী' ভক্তদের কাছে একমাত্র বাসুদেব ভিন্ন অন্য কোনো কিছুর অস্তিত্ব লেশমাত্রও থাকে না, তাই তাদের কোনো অভাবও থাকে না। এইজন্য ভগবান জ্ঞানী ভক্তদের তাঁর স্বরূপ বলে অভিহিত করেছেন—'**জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্**' (গীতা ৭।১৮)।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—পূর্বশ্লোকে বর্ণিত চার-প্রকার ভক্তের মধ্যে জ্ঞানী ভক্তের বিশেষত্বের বিশদ্ বর্ণনা পরবর্তী শ্লোকে করছেন—

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥ ১৭ ॥

[**তেষাম্** (ওই চার-প্রকার ভক্তের মধ্যে) ; **নিত্যযুক্তঃ** (সতত আমাতে সমাহিত চিত্ত) ; **একভক্তিঃ** (অনন্য ভক্তিসম্পন্ন) ; **জ্ঞানী** (জ্ঞানী বা প্রেমিক ভক্ত) ; **বিশিষ্যতে** (অতিশয় শ্রেষ্ঠ) ; **হি** (কারণ) ; **জ্ঞানিনঃ** (জ্ঞানী ভক্তের) ; **অহম্** (আমি) ; **অত্যর্থম্** (অতি) ; **প্রিয়ঃ** (প্রিয়) ; **চ** (এবং) ; **সঃ** (সে) ; **মম** (আমার) ; **প্রিয়ঃ** (প্রিয়।)]

ওই চার-প্রকার ভক্তের মধ্যে সতত আমাতে সমাহিতচিত্ত অনন্য ভক্তিসম্পন্ন জ্ঞানী অর্থাৎ প্রেমিক ভক্ত অতিশয় শ্রেষ্ঠ। কারণ জ্ঞানী ভক্তের নিকট আমি অতি প্রিয় এবং সেও আমার অতিশয় প্রিয়॥ ১৭ ॥

ব্যাখ্যা—'**তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্তঃ**'—ওই (অর্থার্থী, আর্ত, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী) ভক্তদের মধ্যে জ্ঞানী অর্থাৎ প্রেমিকই শ্রেষ্ঠ। কারণ তিনি সদা-সমাহিত অর্থাৎ সর্বদাই ভগবানে মনোনিবেশ করে থাকেন। ভগবান ব্যতীত অন্য কিছুতে তিনি চিত্ত নিবিষ্ট করেন না। যেমন, গোপিনীগণ গাভী দোহন করা, দধি মন্থন করা, ধান কোটা ইত্যাদি লৌকিক কাজে ব্যস্ত থাকলেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণে তদ্‌গত-চিত্ত থাকতেন।[১] তেমনই জ্ঞানী ভক্তগণ লৌকিক ও

[১]যা দোহনেঽবহননে মথনোপলেপপ্রেঙ্খেঙ্খনার্ভরুদিতোক্ষণমার্জনাদৌ।
গায়ন্তি চৈনমনুরক্তধিয়োঽশ্রুকণ্ঠ্যো ধন্যা ব্রজস্ত্রিয় উরুক্রমচিত্তযানাঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৪৪।১৫)

পারমার্থিক সব ক্রিয়া করতে থাকলেও সদা-সর্বদা ভগবানে যুক্ত হয়ে থাকেন। ভগবানের সঙ্গে সংযুক্ত থেকেই তাঁদের সমস্ত ক্রিয়া সাধিত হয়।

'একভক্তিবিশিষ্যতেঃ'—জ্ঞানী অর্থাৎ প্রেমিক ভক্তের আকর্ষণ থাকে একমাত্র ভগবানেই। তাঁর নিজের ব্যক্তিগত কোনো ইচ্ছা থাকে না সেইজন্যই তিনি শ্রেষ্ঠ।

অর্থার্থী ভক্তদের মধ্যে পূর্বসংস্কারবশতঃ যতক্ষণ ব্যক্তিগত কামনা উৎপন্ন হতে থাকে, ততক্ষণ তাঁদের একনিষ্ঠ ভক্তি থাকে না অর্থাৎ প্রেম একমাত্র ভগবানে থাকে না। কিন্তু সেই ভক্তদের মধ্যে এই ইচ্ছাগুলি দূর করার প্রবণতা দেখা যায় এবং ক্রমে ইচ্ছা সর্বতোভাবে দূর হলে এই ভক্তগণও ভগবানের প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ হয়ে ওঠেন। সেক্ষেত্রে ভক্ত আর ভগবানে দ্বৈতের ভাব না হয়ে প্রেমাদ্বৈত (প্রেমে অদ্বৈত) হয়ে ওঠে।

চার প্রকারের ভক্তই ভগবানে নিত্য সমাহিত থাকেন। এদের মধ্যে প্রথম তিন প্রকারের ভক্তের মনে কিছু না কিছু ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা থাকে, যেমন—অর্থার্থী ভক্ত আনুকূল্য চান, আর্ত ভক্ত প্রতিকূলতা দূর হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন এবং জিজ্ঞাসু ভক্ত তার স্বরূপ বা ভগবদ্ তত্ত্ব জানার আগ্রহ পোষণ করেন। কিন্তু জ্ঞানী অর্থাৎ প্রেমিক ভক্ত নিজের কোনো ইচ্ছা পোষণ করেন না। তাই তিনি একক ভক্তি যুক্ত।

'প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ'—আমি সেই জ্ঞানী (প্রেমিক) ভক্তের অত্যন্ত প্রিয়। তাঁর নিজের জন্য কিছুই আকাঙ্ক্ষা থাকে না, শুধু আমার জন্য ভালোবাসা থাকে। সেইজন্যই তিনি আমার অত্যন্ত প্রিয়।

ভগবানের অংশ হওয়ায় সকল জীবই বাস্তবে তাঁর প্রিয়। ভগবানের ভালোবাসায় তাঁর নিজের কোনো স্বার্থ থাকে না। মা যেমন তাঁর শিশুকে পালন করেন, ভগবানও তেমনই কোনো কারণ ব্যতিরেকেই সকলের পালন-পোষণ ও বিধিব্যবস্থা করেন। কিন্তু যে ব্যক্তি কোনো কারণবশতঃ ভগবানের অভিমুখী হয়, তার সেই শরণাগতির জন্য তার প্রতি ভগবানের বিশেষ ভালোবাসা জন্মে।

ভক্ত যখন সর্বতোভাবে নিষ্কাম হয়ে যায় অর্থাৎ তার মধ্যে লৌকিক-পারলৌকিক কোনোরূপ আকাঙ্ক্ষা থাকে না, তখন তার মধ্যে পূর্ণরূপে প্রেম জাগরিত হয়। পূর্ণরূপে প্রেম জাগ্রত হওয়ার অর্থ হল, প্রেমে কোনো ঘাটতি থাকে না। প্রেম কখনো সমাপ্ত হয় না, কারণ তা অনন্ত এবং প্রতিমুহূর্তে বর্ধমান। প্রতিক্ষণ বর্ধমান একথার তাৎপর্য হল, প্রেমে প্রতিক্ষণই এক অলৌকিক বিশেষত্ব অনুভূত হয় অর্থাৎ 'এদিকে আগে খেয়াল করিনি—এদিকে আমার নজর ছিল না, এখন বুঝতে পারছি'—প্রতিমুহূর্তে এই অতৃপ্তির অনুভূতি হতে থাকে। সেইজন্য প্রেমকে অনন্ত বলা হয়েছে।

পরিশিষ্ট-ভাব— ভগবান তাঁর প্রেমিক ভক্তদের 'জ্ঞানী' বলে অভিহিত করেছেন। কারণ 'সব কিছুই পরমাত্মা'—এটিই প্রকৃত ও চরম জ্ঞান, এর পরে আর কিছুই নেই—এরূপ অনুভবকারী প্রেমিক ভক্তই প্রকৃত জ্ঞানী (গীতা ৭।১৯)। এরূপ ভক্তের কাছে একমাত্র পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। কিন্তু বিবেকশীল ব্যক্তির দৃষ্টিতে সৎ ও অসৎ—দুটি সত্তা থাকে। তাৎপর্য হল এই যে এখানে 'জ্ঞানী' শব্দটি জীবন্মুক্ত তত্ত্বজ্ঞানীর উদ্দেশ্যে উদ্ধৃত হয়নি, এটি **'বাসুদেবঃ সর্বম্'** অনুভবকারী জ্ঞানী বা প্রেমিক ভক্তদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে। গীতায় ভগবান প্রধানতঃ ভক্তকেই 'জ্ঞানী' বলেছেন (৭।১৬-১৮), কেন-না এটিই হল চরম এবং প্রকৃত জ্ঞান। ভক্তের শুধু ভগবানের সঙ্গেই প্রেম হয়, তাই সে শ্রেষ্ঠ **'একভক্তিবিশিষ্যতে'**।

ভগবানের অর্থার্থী ভক্ত অনিত্যযুক্ত (অর্থাৎ ভগবানে নিরন্তর ব্যাপৃত হয়ে না থাকা) হন। অর্থার্থীর থেকে আর্ত কম অনিত্যযুক্ত হন। আর্তের অপেক্ষা জিজ্ঞাসু কম অনিত্যযুক্ত হন। আর জ্ঞানী সর্বতোভাবে নিত্যযুক্ত হয়ে থাকেন।

'প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ' পদটির অর্থ হল যে **'বাসুদেবঃ সর্বম্'** অনুভূত হলে ভক্ত ও ভগবান— উভয়ের মধ্যে শুধু প্রেমই থাকে। শাস্ত্রে একেই প্রতিক্ষণ বর্ধমান প্রেম, অনন্তরস ইত্যাদি নামে বলা হয়েছে।

※ ※ ※

'যাঁরা দুগ্ধ দোহন কালে, ধান্যাদি কোটার কালে, দধি মন্থনের সময়, অঙ্গন লেপন কালে, শিশুদের দোলনায় শোয়াবার সময়, ক্রন্দনোন্মুখ শিশুদের গান শোনাবার সময়, তুলসী ইত্যাদি গাছে জল সেচের সময় এবং ঝাঁট-পাট ইত্যাদি কাজের মধ্যেও প্রেমপূর্ণ চিত্তে অশ্রুপূর্ণ নয়নে গদ্‌গদ কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের দিব্যলীলা গীত করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণে সদা-চিত্তযুক্ত ব্রজবাসিনী গোপিনীগণ ধন্যা।'

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকটিতে ভগবান জানিয়েছেন জ্ঞানী ভক্ত তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। এতে মনে হতে পারে যে, ভগবান অন্যান্য ভক্তদের মর্যাদা দেননি। সেইজন্য ভগবান পরবর্তী শ্লোকে জানাচ্ছেন—

উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্॥ ১৮ ॥

[এতে (পূর্বে কথিত) ; সর্বে, এব (সকল ভক্তই) ; উদারাঃ (অত্যন্ত মহান) ; তু (কিন্তু) ; জ্ঞানী (জ্ঞানী) ; মে (আমার) ; আত্মাএব (আত্মস্বরূপই) ; মতম্ (মত) ; হি (কারণ) ; সঃ (সে) ; যুক্তাত্মা (মদ্গতচিত্ত) ; অনুত্তমাম্ গতিম্ (যার থেকে শ্রেষ্ঠ আর কোনো গতি নেই) ; মাম্ (আমাতে) ; এব (ই) ; আস্থিতঃ (দৃঢ় আস্থাবান।)]

পূর্বে কথিত সকল ভক্তই অত্যন্ত মহান (শ্রেষ্ঠ ভাবসম্পন্ন)। কিন্তু জ্ঞানী (প্রেমিক) তো আমার আত্মস্বরূপ—এই হল আমার মত। কারণ সে মদ্গতচিত্ত এবং যার থেকে শ্রেষ্ঠ আর কোনো গতি নেই, সেই আমাতেই সে দৃঢ় আস্থাবান ॥ ১৮ ॥

ব্যাখ্যা—'**উদারাঃ সর্ব এবৈতে**'—এইসকল ভক্তই মহান এবং শ্রেষ্ঠ ভাবসম্পন্ন। ভগবান এখানে যে '**উদারাঃ**' শব্দটি প্রয়োগ করেছেন ; তাতে কয়েক প্রকার ভাব অন্তর্নিহিত রয়েছে ; যেমন—

১) চতুর্থ অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, 'যে ভক্ত যে ভাবে আমার শরণাগত হয়, আমি সেইভাবেই তাকে ভজনা করি।' ভক্ত ভগবানকে চান আর ভগবানও ভক্তকে চান। কিন্তু এই দুজনের মধ্যে ভক্তই প্রথম তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন আর যিনি প্রথমে সম্পর্ক স্থাপন করেন তিনিই উৎকৃষ্ট হয়ে থাকেন। তাৎপর্য হল এই যে ভগবান সম্পর্ক স্থাপন করুন বা না করুন, তাতে ভক্ত পরোয়া করেন না। তিনি নিজে থেকেই সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং নিজেকে সমর্পণ করেন তাই তিনি মহান।

২) দেবতাদের ভক্তগণ সকামভাব নিয়ে বিধিপূর্বক যজ্ঞ-দান-তপস্যা ইত্যাদি করলে দেবতাগণকে ভক্তদের কামনা অনুযায়ী সেই সব বস্তু প্রদান করতে হয়। কারণ দেবতাগণ তাদের ভক্তের হিত-অহিতের বিবেচনা করেন না। কিন্তু ভগবানের ভক্ত ভগবানের কাছে কোনো বস্তু প্রার্থনা করলে সেটি যদি উচিত মনে হয় তবেই ভগবান সেটি তাঁর ভক্তকে প্রদান করেন। অর্থাৎ সেটি দিলে যদি ভক্তের ভক্তি বৃদ্ধি পায়, তবেই দেন। যদি তাতে তার সংসারের বন্ধন বর্ধিত হয়, তাহলে দেন না। কারণ ভগবান হলেন পরম পিতা ও পরম হিতৈষী। তাৎপর্য হল এই যে তাঁর কামনা পূরণ হোক বা না হোক, ভক্ত ভগবানেরই উপাসনা করে থাকেন—ভগবানের উপাসনা করা থেকে সরে যান না—এই হল তাঁদের মহত্ত্ব ।

৩) সংসারের ভোগ এবং অর্থ প্রত্যক্ষ সুখদায়ী বলে প্রতীত হয় এবং ভগবানের উপাসনায় প্রত্যক্ষ এবং শীঘ্র সুখ পরিলক্ষিত হয় না, তা সত্ত্বেও সংসারের প্রত্যক্ষ সুখ পরিত্যাগ করে ভক্ত ভগবানের উপাসনা করে থাকেন, এই হল তাঁর মহানুভবতা।

৪) ভগবানের দরবারে যাঁরা প্রার্থনাকারী, তাঁদেরও মহানুভব বলা হয়—'**যহি দরবার দীনকো আদর রীতি সদা চলি আঈ।**' (বিনয়পত্রিকা ১৬৫।৫) অর্থাৎ কেউ কিছু প্রার্থনা করছে, কেউ ধন চাইছে, কেউ দুঃখ দূর করতে চাইছে—এরূপ প্রার্থনাকারী ভক্তদেরও যে ভগবান মহান বলেছেন, এটি ভগবানের বিশেষ ঔদার্য।

৫) ভক্তদের লৌকিক-পারলৌকিক কামনাপূর্তির জন্য অন্যদিকে বিন্দুমাত্রও মন যায় না। তাঁরা কেবল ভগবানের কাছেই কামনাপূর্তির জন্য প্রার্থনা করেন। ভক্তদের এই অনন্যভাবই হল তাদের মহানুভবতা।

'**জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্**'—এখানে '**তু**' পদটির দ্বারা জ্ঞানী বা প্রেমী ভক্তদের বিশেষত্ব জানিয়ে বলেছেন যে, অন্য ভক্তেরা তো নিশ্চয়ই, কিন্তু জ্ঞানীদের মহানুভব কি বলব তারা তো আমারই আত্মস্বরূপ। স্বরূপে কোনো নিমিত্ত বা কোনো কারণের জন্য প্রিয়ভাব হয় না, বরং নিজ আত্মস্বরূপ হওয়ায় তাতে স্বাভাবিক ভাবে প্রিয়তা থাকে।

প্রেমে প্রেমিক নিজেকে প্রেমাস্পদের কাছে সমর্পণ করে থাকেন অর্থাৎ প্রেমিক তাঁর অস্তিত্ব পৃথক্ বলে মনে করেন না। একইভাবে প্রেমাস্পদও স্বয়ং প্রেমিকের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেন। এই প্রেমাদ্বৈতের অবস্থা তাঁরা

বিশেষভাবে অনুভব করেন। জ্ঞানমার্গে যে অদ্বৈতভাব আছে, তা সদা-সর্বদা অখণ্ডরূপে শান্ত ও সমভাবে বিরাজমান। কিন্তু প্রেমের যে অদ্বৈতভাব, তা পরস্পরের অভিন্নতা অনুভব করিয়ে প্রতিমুহূর্তে বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রেমের অদ্বৈতভাব এক হয়েও দুই থাকে আর দুই হয়েও এক। তাই প্রেম-তত্ত্ব হল অনির্বচনীয়। শরীরের সঙ্গে যেমন সর্বতোভাবে অভিন্নতা (একত্ব) মেনেও নিরন্তর ভিন্নতা বজায় থাকে এবং ভিন্নতার অনুভব হলেও ভিন্নতা বজায় থাকে, এইরূপ প্রেমতত্ত্বে ভিন্নতা থাকলেও অভিন্নতা থাকে এবং অভিন্নতার অনুভব হলেও অভিন্নতা বজায় থাকে।

যেমন, নদী সমুদ্রে প্রবিষ্ট হওয়া মাত্রই সমুদ্রের জলে একাকার হয়ে যায় কিন্তু একাকার হওয়া সত্ত্বেও দুদিকেই জলের প্রবাহ বহমান থাকে অর্থাৎ কখনো নদীর জল সমুদ্রের দিকে, কখনো সমুদ্রের জল নদীর দিকে বিশেষভাবে প্রবহমান থাকে। এরূপই প্রেমিকের প্রেমাস্পদের দিকে এবং প্রেমাস্পদের প্রেমিকের দিকে প্রেমের প্রবাহ চলতে থাকে। তাঁদের নিত্যযোগে বিয়োগ এবং বিয়োগে নিত্যযোগ—এইরূপ প্রেমের এক বিশেষ লীলা অনন্তরূপে অনন্তকাল ধরে চলতে থাকে। এতে কে যে প্রেমাস্পদ আর কেই বা প্রেমিক—তার কোনো খেয়াল থাকে না। সেখানে উভয়েই প্রেমাস্পদ এবং উভয়েই প্রেমিক। **'জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্'**—পদটির এই হল তাৎপর্য।

'আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্'—কারণ এর থেকে উত্তম আর কোনো গতিই নেই—এরূপ একান্তভাবে আমার ওপরই তাদের শ্রদ্ধা-ভক্তি এবং দৃঢ় আস্থা থাকে। তাৎপর্য হল এই যে কোনো অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তাদের চিত্ত (আমার থেকে) সরে যায় না বরং এক আমাতেই অবিচল থাকে।

'ভগবানই শুধু আমার'—এইপ্রকার আমাতে তাদের যে আপনভাব থাকে, তাতে অনুকূলতা ও প্রতিকূলতার বিন্দুমাত্র অস্তিত্ব থাকে না, বরং এই আপনভাব দৃঢ় হতে থাকে এবং বৃদ্ধি পেতে থাকে।

তাঁরা যুক্তাত্মা অর্থাৎ কোনো অবস্থাতেই আমা হতে তাঁরা পৃথক্ হন না, তাঁরা সর্বদাই আমার সঙ্গে অভিন্নভাবে থাকেন।

পরিশিষ্ট-ভাব—সাংসারিক অর্থার্থী ব্যক্তিগণ ভগবানকে বাদ দিয়ে শুধু অর্থই কামনা করে। সুতরাং তাদের মিথ্যা, কপটতা, বেইমানি ইত্যাদির আশ্রয় গ্রহণ করে চলতে হয়। তাদের মধ্যে অর্থের গুরুত্ব বেশি হওয়ায় তারা উদার না হয়ে মহাকৃপণ হয়ে ওঠে। সুতরাং তাদের জন্য 'উদার' শব্দটি প্রযোজ্য নয়। কিন্তু যে অর্থার্থী ব্যক্তিরা ভগবানের ভক্ত হন, তাঁদের মধ্যে অর্থের গুরুত্ব না থেকে ভগবানের গুরুত্বই থাকে। তাই তার মধ্যে কৃপণতা না থেকে উদার ভাব থাকে। তাই ভগবান এইস্থানে তাদের উদার বলে উল্লেখ করেছেন। এখানে উদারভাবের লক্ষ্য হল ত্যাগ। অর্থার্থী, আর্ত, জিজ্ঞাসু ভক্তগণ সংসারকে (ভোগ ও সংগ্রহ) ছেড়ে ভগবানে মনোনিবেশ করেন—এগুলিই তাঁদের ত্যাগ। তাই এঁরা সকলেই উদার—**'উদারাঃ সর্ব এবৈতে'**। শুধুমাত্র ভগবানের সম্বন্ধ প্রধান হওয়ায় অর্থার্থী, আর্ত এবং জিজ্ঞাসুও পরে স্বতঃই 'জ্ঞানী' হয়ে ওঠে।

এখানে একটি গূঢ় কথা হল এই যে, ভগবানকে মান্য না-করা কামনার থেকেও বেশি দোষাবহ। কামনা-বাসনা নিয়ে যারা ভগবানকে ছেড়ে অন্য দেবতার আরাধনা করে, তাদের জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হতে হয়—**'গতাগতং কামকামা লভন্তে'** (গীতা ৯।২১)। কিন্তু যাঁরা শুধু ভগবানেরই ভজনা করেন, তাদের মধ্যে যদি কামনা-বাসনা থেকেও থাকে তাহলেও ভগবানের কৃপা এবং আরাধনার প্রভাবে তাঁরা ভগবানকেই লাভ করেন। কারণ মানুষের কোনো প্রকারে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন হলে সে ভগবানকেই প্রাপ্ত হয়[১], কারণ জীব মূলতঃ ভগবানেরই অংশ।

অর্থার্থী, আর্ত এবং জিজ্ঞাসু—এই তিনজনকে ভগবান 'উদার' বলেছেন। কিন্তু যাঁরা ভগবান ব্যতীত অন্য দেবতার ভজনা করেন, তাঁদের ভগবান উদার না বলে 'অল্পমেধা' বলে অভিহিত করেছেন (গীতা ৭।২৩) এবং তাঁদের ভজনাও অবিধিযুক্ত বলে জানিয়েছেন (গীতা ৯।২৩)। দেবতাদের ভগবানের থেকে পৃথক্ বলে গণ্য করায় অর্থাৎ দেবতাতে

---

[১]কামাদ্ দ্বেষাদ্ ভয়াৎ স্নেহাদ্ যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ। আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্গতিং গতাঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ৭।১।২৯)

'দু-একজন নয় ; বহু মানুষ কামের দ্বারা, দ্বেষের দ্বারা, ভয়ের দ্বারা এবং স্নেহের দ্বারা তাদের মনকে ভগবানে সমর্পণ করে এবং তাদের সমস্ত পাপ ধুয়ে সেইভাবেই ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েছেন, যেভাবে ভক্ত প্রাপ্ত হয়ে থাকেন ভক্তির দ্বারা।'

ভগবদ্‌বুদ্ধি না হওয়ায় এবং কামনা থাকার ফলে তাঁদের উপাসনা বিধিযুক্ত নয়। তাৎপর্য হল যে, সকলের প্রতি ভগবদ্‌বুদ্ধি না হওয়া সকামভাবের থেকেও অপকৃষ্ট, কেন-না তাতে চেতন (পরমাত্মা)-এর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন হয় না।

তত্ত্বজ্ঞানীর ব্রহ্মের সঙ্গে 'তাত্ত্বিক ঐক্য' অর্থাৎ সাধর্ম্য হয়ে থাকে, কিন্তু ভক্তের ভগবানের সঙ্গে 'আত্মীয়তা' হয়— **'জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্'**। তত্ত্বজ্ঞানীর তাত্ত্বিক ঐক্যে (সাধর্ম্যে) জীব এবং ব্রহ্মে অভেদ হয়ে যায় অর্থাৎ ব্রহ্ম যেমন সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ, তেমনই জীবও সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ হয়ে ওঠে এবং এক তত্ত্ব ভিন্ন আর কিছুই থাকে না। কিন্তু ভক্তের আত্মীয়-ঐক্যে জীব এবং ভগবান অভিন্ন হয়ে যান। অভিন্নবোধে ভক্ত এবং ভগবান এক হলেও প্রেমের জন্য দুই হয়ে থাকেন। তাঁদের দুজনেই প্রেমিক আবার দুজনেই প্রেমাস্পদ হন। তাই তাঁরা দুই হয়েও এক হয়েই থাকেন।

জীব পরমাত্মার অংশ। তাই সে যতই পরমাত্মা থেকে বিমুখ হতে থাকে ততই তার মধ্যে অহংকার দৃঢ় হতে থাকে এবং যত পরমাত্মমুখী হতে থাকে ততই অহংকার দূর হতে থাকে। স্বরূপে স্থিত হলেও 'অহং'-এর সূক্ষ্মতম লেশ অবশিষ্ট থাকতে পারে। কিন্তু পরমাত্মার সঙ্গে প্রেমের অভিন্নতা (আত্মভাব) হলে অপরা প্রকৃতি হতে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় এবং অহংকার সর্বতোভাবে দূর হয়, কারণ অহংকার হল প্রকৃতিরই কার্য তাই ভগবান বলেছেন— **'জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্'**।

অর্থাথী, আর্ত এবং জিজ্ঞাসুর মধ্যে ক্রমশঃ তাদের নিজস্ব সত্তা (অহংবোধ) হ্রাস পেতে থাকে আর জ্ঞানীর মধ্যে স্বতন্ত্র সত্তা একেবারেই থাকে না। তাই **'ত্বাত্মৈব'** পদটির তাৎপর্য হল যে প্রেমিক ভক্তের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না, শুধু ভগবানই থাকেন অর্থাৎ প্রেমিক রূপে সাক্ষাৎ ভগবানই থাকেন—**'তস্মিংস্তজ্জনে ভেদাভাবাৎ'** (নারদীয় ভক্তিসূত্র ৪১)। ভক্তির জন্য এই আত্মীয়তা স্বীকৃত দ্বৈত, যা জ্ঞানযোগের অদ্বৈতভাবের থেকেও সুন্দর—**'ভক্ত্যর্থং কল্পিতং (স্বীকৃতং) দ্বৈতমদ্বৈতাদপি সুন্দরম্**[১]**'** (বোধসার, ভক্তি. ৪২)।

'মামেবানুত্তমাং গতিম্'—ভগবানের থেকে বেশি আর কোনো উত্তম গতি নেই। 'গতি' শব্দটির তিনপ্রকার অর্থ হয়—জ্ঞান, গমন এবং প্রাপ্তি। এখানে 'গতি' শব্দটি প্রাপ্তির অর্থে ব্যবহৃত। অন্তিম প্রাপণীয় তত্ত্ব হওয়ায় ভগবানই সর্বোত্তমগতি।

'আস্থিতঃ'—দৃঢ়তা দু প্রকারের হয়। (এক) অভ্যাসের সাহায্যে আর (দুই) স্বতঃসিদ্ধভাবে। যেমন প্রাণী মাত্রেরই 'আমি আছি' এইরূপ নিজের মধ্যে স্বতঃসিদ্ধ দৃঢ় স্থিতি থাকে, তেমনই জ্ঞানী ভক্তের ভগবানে স্বতঃসিদ্ধ দৃঢ় স্থিতি থাকে।

* * *

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে কথিত জ্ঞানী অর্থাৎ প্রেমিক ভক্তের বাস্তবিক স্থিতি এবং তাদের উপাসনার প্রকার পরবর্তী শ্লোকে জানাচ্ছেন।

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥ ১৯ ॥

[**বহূনাম্** (অনেক) ; **জন্মনাম্** (জন্মের) ; **অন্তে** (শেষে অর্থাৎ মনুষ্যজন্মে) ; **বাসুদেবঃ** (পরমাত্মাই) ; **সর্বম্** (সব কিছু) ; **ইতি** (এইভাবে) ; **জ্ঞানবান্** (জ্ঞানী ব্যক্তিরা) ; **মাম্** (আমার) ; **প্রপদ্যতে** (শরণাগত হন) ; **সঃ** (সেইরূপ) ; **মহাত্মা** (মহাত্মা) ; **সুদুর্লভঃ** (অত্যন্ত দুর্লভ।)]

অনেক জন্মের পরে অন্তিম জন্মে অর্থাৎ মনুষ্যজন্মে 'পরমাত্মাই সবকিছু', এইভাবে যে জ্ঞানী ব্যক্তি আমার শরণাগত হন, সেইরূপ মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ ॥ ১৯ ॥

ব্যাখ্যা—**'বহূনাং জন্মনামন্তে'**—সব জন্মের অন্তিম জন্ম হল মনুষ্যজন্ম। ভগবান জীবকে মনুষ্য-শরীর দিয়ে তাকে জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ থেকে মুক্ত হয়ে নিজের কল্যাণসাধনের পূর্ণ অধিকার দিয়েছেন। কিন্তু মানুষ

[১]ভক্তির এই অদ্বৈতভাব কল্পনা নয়, এটি হল স্বীকৃতি। কল্পিত অদ্বৈত তো অসত্য হয়, তাতে প্রেম হয় না।

ভগবানকে লাভ করার চেষ্টা না করে আসক্তিবশতঃ আবার সেই পুরানো প্রবাহ অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু চক্রে ফিরে যায়। তাই ভগবান বলছেন—**'অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি'** (গীতা ৯।৩)। ভগবান যেস্থানে আসুরী যোনি এবং নরকের অধিকারীদের বর্ণনা করেছেন, সেক্ষেত্রে দুর্গুণ-দুরাচারের জন্য ভগবদ্-প্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকলেও ভগবান বলেছেন—**'মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্'** (গীতা ১৬।২০) অর্থাৎ আমাকে প্রাপ্ত না করার ফলেই প্রাণীরা অধম গতি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তারা যদি মৃত্যুর পর ন্যূনপক্ষে মনুষ্যযোনি পায় তবে অন্তত মানুষ হয়ে জন্মাতে পারে। কিন্তু তারা আমাকে প্রাপ্তিলাভের পূর্ণ অধিকার লাভ করেও অধমযোনিতে গতি পায়।

সাধুদের বচনে এবং শাস্ত্রে আছে যে মনুষ্যজন্ম কেবলমাত্র নিজ কল্যাণের জন্যই লাভ হয়েছে, বিষয় সুখ ভোগ বা স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য নয়।[১] সেইজন্য গীতায় স্বর্গকামীদের মূঢ় এবং তুচ্ছ বুদ্ধিসম্পন্ন বলা হয়েছে—**'অবিপশ্চিতঃ'** (২।৪২) এবং **'অল্পমেধসাম্'** (৭।২৩)।

এই মনুষ্যজন্ম সর্বজন্মের আদি জন্ম আবার সর্বজন্মের অন্তিম জন্মও। সব জন্মের আরম্ভ মনুষ্যজন্ম থেকেই হয় অর্থাৎ মনুষ্যজন্মে করা কর্মের পাপ চুরাশী লক্ষ জন্ম এবং নরক ভোগ করলেও শেষ হয় না, অবশিষ্টই থাকে, তাই এটি হল সমস্ত জন্মের আদি জন্ম। মানুষ এই জন্মে সমস্ত পাপ নাশ করে, সকল বাসনা দূর করে নিজ কল্যাণ করতে পারে, ভগবানকে লাভ করতে সমর্থ হয়, তাই এটি হল সর্বজন্মের অন্তিম জন্ম।

ভগবান অষ্টম অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে বলেছেন যে, 'মানুষ অন্তিমকালে যে ভাব স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করে, সেই ভাবই সে প্রাপ্ত হয়।' এইভাবে মানুষকে যে কোনো ভাব স্মরণ করার যে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, তাতে মনে হয় যে ভগবান মানুষকে পূর্ণ ক্ষমতা দিয়েছেন অর্থাৎ মানুষের উদ্ধারের জন্য ভগবান নিজের দিক থেকে তাকে এই অন্তিম জন্ম দিয়েছেন। এখন পরবর্তীকালে সে নতুন কোনো জন্ম লাভ করবে, না নিজের উদ্ধার করবে—তাতে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন[২]। এই কথায় গীতা মানুষমাত্রকেই পরমাত্মপ্রাপ্তির অধিকারী বলে মনে করে এবং স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করে যে অত্যন্ত দুরাচারী, পূর্বজন্মের পাপের জন্য নীচযোনিতে জন্মগ্রহণকারী, চতুর্বর্ণবিশিষ্ট নারী-পুরুষ—সকলেই ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করে পরমগতি লাভ করতে পারে, (গীতা ৯।৩০-৩৩)। গীতায় (৯।৩২) 'পাপযোনি' নামক একটি বিশেষ শব্দ কথিত হয়েছে যাতে শূদ্র থেকেও নীচ বলে কথিত যে চণ্ডাল, যবন ইত্যাদি এবং পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ-লতা ইত্যাদি সকলকেই ধরা যেতে পারে। তবে এটা ঠিক যে পশু-পক্ষী ইত্যাদি মনুষ্যেতর প্রাণীদের পরমাত্মার শরণ নেওয়ার যোগ্যতা থাকে না। কিন্তু পরমাত্মার অংশভূত হওয়ায় ভগবানের দিক থেকে কোনো বাধা নেই। এদের মধ্যে অনেক প্রাণী, ভগবান এবং সাধু-মহাপুরুষদের কৃপায় ও তীর্থ-ভগবৎধামের প্রভাবে পরমগতি লাভ করে থাকে। দেবতারা ভোগযোনি ; তাঁরা ভোগেই ব্যাপৃত থাকেন, সেইজন্য তাঁদের 'আমাদের উদ্ধার প্রাপ্তি করতে হবে' এমন চিন্তা আসে না। কিন্তু যদি কোনো কারণবশতঃ তাঁরা ভগবানের শরণাগত হন, তাহলে তাঁরাও উদ্ধার লাভ করেন। ইন্দ্র জ্ঞান লাভ করেছিলেন—শাস্ত্রে এরূপ বর্ণিত আছে।

ভগবানের দিক থেকে মানুষমাত্রেরই জন্ম অন্তিম জন্ম হয়ে থাকে। কারণ ভগবানের সংকল্প হল এই যে, তাঁর প্রদত্ত শরীর দ্বারা যেন মানুষ তার নিজ কল্যাণ সাধন করতে পারে। সুতরাং মানুষ যদি নিজের কোনো ইচ্ছা না রেখে কেবল নিমিত্তমাত্র হয় তাহলেও ভগবানের সংকল্পের ফলে তার কল্যাণ হবে। যেমন একাদশ অধ্যায়ের চৌত্রিশতম শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে—'আমা কর্তৃক নিহতদেরই তুমি বধ কর'—**'ময়া হতাংস্ত্বং জহি'**। 'তুমি চিন্তা কোরো না'—**'মা ব্যথিষ্ঠাঃ'**। 'তুমি যুদ্ধ করো, তোমার জয় হবে'—**'যুধ্যস্ব জেতাসি'**। এইরূপ

[১]এহি তন কর ফল বিষয় ন ভাঈ। স্বর্গও স্বল্প অন্ত দুখদাঈ॥ (শ্রীরামচরিতমানস ৭।৪৪।১)

[২]নর তন সম নহিঁ কবনিউ দেহী। জীব চরাচর জাচত তেহী॥ নরক স্বর্গ অপবর্গ নিসেনী। গ্যান বিরাগ ভগতি সুভ দেনী॥ (শ্রীরামচরিতমানস ৭।১২১।৫)

কৃপা করে ভগবান মনুষ্যদেহ দিয়েছেন। মানুষ যদি ভগবানের থেকে বিমুখ হয়ে সংসারের আসক্তিতে আবদ্ধ না হয়, তবে ভগবানের ওই সংকল্প দ্বারা তারা অনায়াসেই মুক্তি লাভ করবে।

ভগবানের সংকল্প এই নয় যে, সাধকের আগ্রহ ছাড়াই তার কল্যাণ হবে অর্থাৎ অভিশাপ ও বরপ্রদান করার মতো এই সংকল্প নয়। তবে এই সংকল্প কেমন ? ভগবান মানুষের নিজ কল্যাণের স্বাধীনতা এই মনুষ্যজন্মেই দিয়েছেন। এই প্রাণী যদি সেই স্বাধীনতার অপব্যবহার না করে অর্থাৎ ভগবান এবং শাস্ত্রবিধির বিপরীতে না যায়, অন্তত নিজ বিবেকের বিরুদ্ধে না যায় তবে তার দ্বারা ভগবান এবং শাস্ত্রানুকূল আচরণ স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন হয়। কারণ ভগবান এবং শাস্ত্রাদির বিপরীত পথে না চললে দুটি অবস্থার মধ্যে একটি অবস্থা সম্পন্ন হয়—হয় সে শরীর ইন্দ্রিয়াদি-মন-বুদ্ধির সাহায্যে কোনো কিছুই করে না অথবা শুধু ভগবান এবং শাস্ত্রের অনুকূল কার্য করে।

কিছু না করার অবস্থায় অর্থাৎ কোনো কিছু করার রুচি না থাকার অবস্থায় মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয় ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্ক-ছেদ হয়ে যায়। কারণ কিছু না কিছু করার ইচ্ছাতেই কর্তৃত্বাভিমান জাগ্রত হয়ে চিত্ত এবং ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং সেইসঙ্গে নিজের কৃত কর্মফলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কিছুই না করলে কর্তৃত্বাভিমানও হয় না আর ফলাকাঙ্ক্ষাও থাকে না, তখন আত্মস্বরূপে স্বতঃই স্থিতিলাভ হয়।

শাস্ত্র-নির্দেশ অনুসারে নিষ্কামভাবে কর্ম করলে কর্মবেগ দূর হয় এবং ক্রিয়া ও পদার্থ থেকে সম্বন্ধ ছেদ হয়। ক্রিয়া এবং পদার্থ হতে সম্বন্ধ ছেদ হলে নতুন কামনা উৎপন্ন হয় না এবং পুরানো আসক্তিও দূর হয় এবং স্বতঃই বোধ জেগে ওঠে—**'তৎস্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি'** (গীতা ৪।৩৮)।

গীতায় আছে—নিষ্কামভাবে বিধিপূর্বক নিজ কর্তব্যকর্ম পালন করলে অনাদিকালের সমস্ত কর্ম নষ্ট হয়ে যায় (৪।২৩)। জ্ঞানযোগের সাহায্যে মানুষ সমস্ত পাপ অতিক্রম করে (৪।৩৬)। ভগবান ভক্তকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করেন (১৮।৬৬)। যাঁরা ভগবানকে অজ-অনাদি বলে জানেন, তাঁরা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন (১০।৩)। এইভাবে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ—তিন যোগের দ্বারাই পাপ দূরীভূত হয়। এর তাৎপর্য হল এই যে, অন্তিম মনুষ্য-জন্ম শুধু নিজ কল্যাণের জন্যই পাওয়া গিয়েছে।

মনুষ্যজন্মে যদি সৎসঙ্গ লাভ হয়, গীতার মতো ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে পরিচয় হয়, ভগবৎ-নামের সঙ্গে পরিচিতি ঘটে, তাহলে সাধকের বুঝতে হবে যে ভগবান অতি বিশেষভাবে কৃপা করেছেন। অতএব আমি এবার উদ্ধার লাভ করবই, আমার আর জন্ম-মৃত্যু হবে না। কারণ আমার উদ্ধার না হবার হলে এরূপ সুযোগ আমি পেতাম না। কিন্তু 'ভগবদ্ কৃপায় উদ্ধার হবেই' এই ভরসায় সাধন-ভজন পরিত্যাগ করতে নেই, বরং উৎসাহ এবং তৎপরতার সঙ্গে সাধনায় লেগে থাকা উচিত। সময় যেন সার্থক হয়, কোনো সময় যেন নিরর্থক না ব্যয় হয়—সবসময় এই সাবধানতা বজায় রাখতে হয়। কিন্তু নিজ কল্যাণের জন্য চিন্তা করা উচিত নয়, কারণ এ পর্যন্ত যিনি এত কিছুর ব্যবস্থা করলেন তিনি পরেও সবকিছু করবেন। যেমন, কেউ যখন খাবার জন্য নিমন্ত্রণ করে, আসন পেতে দেয়, আসনে বসায়, পাতা সাজিয়ে দেয়, গ্লাসে জল ভরে দেয়, তখন যদি কেউ চিন্তা করে যে, এই ব্যক্তি খেতে দেবে কি না, সেই চিন্তা নিরর্থকই বলতে হবে। কারণ সে যদি খেতে না দেয়, তবে নিমন্ত্রণ কেন করল ? রান্না কেন করল ? সে যখন নিমন্ত্রণ করেছে, ডেকে এনেছে, খাবার প্রস্তুত করেছে, তখন তাকে খেতে দিতেই হবে। আমরা কেন খাবার কথা ভাবব ? এবার ব্যাস্, খাবার পরিবেশন করা হলে তা শুধু গ্রহণ করা। এইরূপ ভগবানও আমাদের মনুষ্যদেহ দিয়েছেন এবং উদ্ধারের সমস্ত সামগ্রীর (সৎসঙ্গ, ভগবদ্-নাম ইত্যাদির) পরিচিতি ঘটিয়েছেন, অতএব আমাদের উদ্ধার তো হবেই, এখন আমরা সংসার-সমুদ্রের পারে এসেছি—এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস রেখে নিমিত্তমাত্র হয়ে সাধন করা উচিত।

যার পূর্বজন্মের পুণ্য থাকে সেই ভগবানের দিকে যেতে সক্ষম হয়—যদি এরূপ মনে করা যায় তাহলে পূর্বজন্মের পাপ-পুণ্যাদির ফল পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গাদি প্রাণীরাও তো ভোগ করে থাকে, তাহলে আর মানুষ এবং ওই সমস্ত প্রাণীতে তফাৎ কী থাকে ? ভগবানের কৃপা করে দেওয়া এই মনুষ্যদেহ সার্থক হবে কী করে ? আর মনুষ্যজন্মের বিশেষত্ব, মহিমাই বা কী ? মানুষ জন্মের বিশেষত্ব তো

এতেই যে, মানুষ ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করে নিজেকে কল্যাণের পথে নিয়ে যেতে পারে[১]।

'বাসুদেবঃ সর্বম্'[২]—মহাসর্গের আদিতে এক ভগবানই অনেক রূপ ধারণ করেন—**'সদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি'** (ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৬।২।৩) আর অন্তকালে অর্থাৎ মহাপ্রলয়ে এক ভগবানই অবশিষ্ট থাকেন—**'শিষ্যতে শেষসংজ্ঞঃ'** (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩। ২৫)। এইপ্রকার যখন আদি ও অন্তে এক ভগবানই বিরাজ করেন, তখন মাঝখানে অন্য কিছু কী করে আসবে? কারণ জগৎ রচনা কালে ভগবানের সঙ্গে তিনি নিজে ছাড়া আর কোনো বস্তু ছিল না, তিনি স্বয়ং-ই জগৎ-রূপে প্রকটিত হলেন। তাই বাসুদেবই সব।

যে বস্তু আদি ও অন্তে থাকে, তা মধ্যাবস্থায়ও থাকে। যেমন সোনার গহনা আদিতে সোনা ছিল এবং শেষেও সোনা থাকবে, তাহলে গহনাতে অন্য জিনিস আসে কী করে? অর্থাৎ শুধু সোনাই থাকে। মাটি থেকে তৈরি বাসন আগে মাটি ছিল, শেষেও মাটি হয়ে যাবে, তবে মধ্যকালে মাটি ছাড়া আর কী থাকে? শুধু মাটিই থাকে। চিনির তৈরি খেলনা আগেও যা ছিল পরেও তাই, তাহলে মধ্যকালে চিনি ব্যতীত কী হবে? কেবল চিনিই থাকে। এইরূপই সৃষ্টির আগে ভগবান ছিলেন, শেষকালেও ভগবান থাকবেন ; তাহলে মধ্যবর্তীকালে ভগবান ছাড়া কী আছে? শুধু ভগবানই আছেন। সোনাকে গহনার রূপেই দেখা হোক বা অন্য কিছুর রূপেই দেখা হোক তাতে যেমন সোনা-ই থাকে, তেমনই জগতে নানারূপে, নানা আকৃতিতে একমাত্র ভগবান-ই বিরাজমান।

মানুষের দৃষ্টি যতক্ষণ গহনার দিকে, তার আকৃতির দিকে থাকে, সেগুলিকেই গুরুত্ব দেয়, ততক্ষণ 'এটি সোনা-ই' এই দিকে লক্ষ্য থাকে না। এইরূপই মানুষের দৃষ্টি যতক্ষণ জগতের দিকে থাকে, তাকেই গুরুত্ব দেয়, ততক্ষণ 'সমস্ত কিছু ভগবান-ই' এদিকে দৃষ্টি যায় না। কিন্তু যখন গহনার দিকে দৃষ্টি থাকে না তখন গহনায় সোনার চিন্তা থাকে না, তখন 'এটি সোনা-ই' এরূপ নিশ্চিত ধারণা হয়। তেমনই যখন জগতের দিকে দৃষ্টি থাকে না, তখন জগতে ভগবানের চিন্তা করতে হয় না, বরং 'সবকিছু ভগবান-ই, ভগবান ব্যতীত অন্য কিছু নেই' এইরূপ নিশ্চিত ধারণা হয়। কারণ হল জগতে ভগবানের কথা ভাবলে জগতের অস্তিত্ব সঙ্গে থাকে অর্থাৎ জগতের ভাবনা যুক্ত হয়ে, তার অস্তিত্ব মেনে নিয়ে, তাতে ভগবানের চিন্তা হয়ে থাকে। সুতরাং যতক্ষণ জগতের অস্তিত্ব মানা হয়, জগৎকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, ততক্ষণ জগতে ভগবানের চিন্তা করলেও **'বাসুদেবঃ সর্বম্'**—এটি অনুভূত হয় না।

ব্রহ্মভূত ব্যক্তি নির্বাণ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন (৫।২৪) ; ব্রহ্মভূত যোগী উত্তম সুখ লাভ করেন (৬।২৭) ; ব্রহ্মভূত সাধক ভগবানের পরাভক্তি লাভ করেন এবং সেই ভক্তির দ্বারা তত্ত্ব জেনে তাতে প্রবেশ করেন (১৮।৫৪-৫৫)—গীতার

---

[১] ক) লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যুয়াবন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্যাৎ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৯।২৯)

'বহু জন্মের পর এই পরম পুরুষার্থের সাধনরূপ মনুষ্যদেহ, যা অনিত্য হলেও অতি দুর্লভ, তা লাভ করে বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত যেন সে অতি শীঘ্র, মৃত্যুর পূর্বেই নিজ কল্যাণের প্রচেষ্টা করে। সকল যোনিতেই বিষয় ভোগ করা সম্ভব, তার জন্য এই অমূল্য জীবন নষ্ট করা উচিত নয়।'

খ) নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২০।১৭)

'এই মনুষ্যদেহ সমস্ত শুভ ফল প্রাপ্তির মূল এবং অত্যন্ত দুর্লভ হলেও অনায়াস সুলভ হয়েছে। এটি সংসার-সমুদ্র থেকে পার হবার এক সুদৃঢ় নৌকাস্বরূপ, যেটি গুরুরূপ নাবিক চালিয়ে থাকেন এবং আমি (ভগবান) বায়ুরূপ ধারণ করে সেটিকে লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যেতে সাহায্য করি। এত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি এই সংসার-সমুদ্র পার হয় না, সে নিজ আত্মার হত্যাকারী অর্থাৎ নিজেরই পতনকারী হয়।'

[২] এখানে 'বাসুদেবঃ' শব্দটি পুংলিঙ্গে এবং 'সর্বম্' শব্দটি ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। এইস্থানে 'বাসুদেবঃ সর্বঃ'ও বলা যেত ; কিন্তু তা না বলে 'বাসুদেবঃ সর্বম্' বলা হয়েছে। এর অর্থ হল এই যে, 'সর্বম্' শব্দটির দ্বারা স্ত্রী-পুরুষ-নপুংসক (ক্লীব)-স্থাবর-জঙ্গম ইত্যাদি সবকিছু বোঝানো হয়ে থাকে।

দৃষ্টিতে এই তিনটিই হল অবস্থাবিশেষ। অবস্থার পরিবর্তন হয়। কিন্তু **'বাসুদেবঃ সর্বম্'**—এটি কোনো অবস্থাবিশেষ নয়, এটি হল প্রকৃত তত্ত্ব। এতে কখনো পরিবর্তন হয় না।

জগতে যা কিছু পরিলক্ষিত হয়, সবই ভগবানের স্বরূপ। ভগবান ব্যতিরেকে এই জগতের পৃথক্ কোনো অস্তিত্ব ছিল না ; নেই এবং কখনো হবে না। সুতরাং দেখা, শোনা এবং বোঝার মধ্যে যা কিছু এই সংসারে আছে, তা সবই ভগবদ্ স্বরূপ। ভগবানের নির্দেশ হল—

মনসা বচসা দৃষ্ট্যা গৃহ্যতেঽন্যৈরপীন্দ্রিয়ৈঃ।
অহমেব ন মত্তোঽন্যদিতি বুধ্যধ্বমঞ্জসা॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৩।২৪)

'মন, বাণী, দৃষ্টি বা অন্য ইন্দ্রিয়াদির দ্বারাও যা কিছু গ্রহণ করা হয়, তা সব আমিই। আমা ভিন্ন আর কিছুই নেই। এই সিদ্ধান্ত আপনারা বিচার-বিবেচনা দ্বারা বুঝে নিন।'

এই বর্ণনার অনুরূপই হয় সেই জ্ঞানী অর্থাৎ প্রেমিকের জীবন। তিনি সর্বত্র ভগবানকেই দর্শন করে থাকেন—**'যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি'** (গীতা ৬।৩০)। তিনি সবকিছু করতে থেকেও ভগবানেই অবস্থান করেন—**'সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে'** (গীতা ৬।৩১)।

কারো একটি স্থানে নিজ প্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হলে তার অত্যন্ত আনন্দ হয়, তাহলে যার সর্বত্র নিজ প্রিয় ইষ্টদেব অনুভূত হয়[১] তার কতই-না প্রসন্নতা বা আনন্দ হবে ! সেই আনন্দে বিভোর হয়ে ভগবানের প্রেমিক ভক্ত কখনো হাসেন, কখনো কাঁদেন, কখনো নৃত্য করেন আবার কখনো শান্ত থাকেন[২]। এইভাবে তাঁর জীবন অলৌকিক আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তখন তাঁর আর কোনো কিছু করার, জানার এবং পাওয়ার অবশেষ থাকে না। তিনি সর্বতোভাবে পূর্ণত্ব লাভ করেন অর্থাৎ তাঁর আর কোনো অবস্থাতে, কোনো পরিস্থিতিতেই কিছু প্রাপ্ত করার বাকি থাকে না।

যারা ভক্তিমার্গে চলে, তারা 'এটি সৎ এবং এটি অসৎ' এই চিন্তা নিয়ে চলে না, তাদের মধ্যে চিন্তার প্রাধান্য থাকে না। তাদের কেবল ভগবদ্ভাবেরই প্রাধান্য থাকে। শুধু ভগবদ্ভাবের প্রাধান্য থাকায় তাদের কাছে সমস্ত জগৎ চিন্ময়। তাদের দৃষ্টিতে জড়ত্ব থাকে না। ভগবানে তল্লীনতা থাকায় ভক্তদের নিজ শরীরও জড় থাকে না, বরং চিন্ময় হয়ে যায়—যেমন ভক্তিমতি মীরার দেহ (চিন্ময় হয়ে) ভগবানের বিগ্রহে লীন হয়ে গিয়েছিল।

জ্ঞানমার্গে যেখানে সৎ-অসতের চিন্তা আসে, সেখানে পরিণামে সৎ-অসৎ দুটির অস্তিত্ব থাকে না, কেবলমাত্র সৎ-স্বরূপই থাকে। কিন্তু ভক্তিমার্গে সৎ-অসৎ সবই ভগবৎ স্বরূপ হয়। পরে ভক্ত ভগবৎ-স্বরূপ সংসারের সেবা করতে থাকে। সেবার প্রথমদিকে সেবা, সেবক এবং সেব্য—এই তিনটি থাকে। কিন্তু যখন ভগবৎভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, তখন সেবক-ভাব আর থাকে না। পরে ভক্ত স্বয়ং সেবারূপ হয়ে সেব্যের মধ্যে লীন হয়ে যায়। তখন শুধুমাত্র ভগবদ্-তত্ত্বই অবশিষ্ট থাকে। এইভাবে ভগবদ্-ভাবে তদ্গত হয়ে ভগবানের প্রেমিক ভক্ত

---

[১]জিত দেখৌঁ তিত স্যামময়ী হ্যায়।
স্যাম কুঞ্জ বন যমুনা স্যামা, স্যাম গগন ঘন ঘটা ছঈ হ্যায়॥
সব রঙ্গনমেঁ স্যাম ভরো হ্যায়, লোগ কহত যহ বাত নঈ হ্যায়।
হোঁ বৌরী, কৈ লোগন হী কী, স্যাম পুতরিয়া বদল গঈ হ্যায়॥
চন্দ্রসার রবিসার স্যাম হ্যায়, মৃগমদ সার কাম বিজঈ হ্যায়।
নীলকন্ঠকো কন্ঠ স্যাম হ্যায়, মনহুঁ স্যামতা বেল বঈ হ্যায়॥
শ্রুতিকো অচ্ছর স্যাম দেখিয়ত, দীপ সিখাপর স্যামতঈ হ্যায়।
নর দেবনকী কৌন কথা হ্যায়, অলখ ব্রহ্মছবি স্যামময়ী হ্যায়॥

[২]বাগ্ গদ্গদা দ্রবতে যস্য চিত্তং রুদত্যভীক্ষ্ণং হসতি ক্বচিৎ।
বিলজ্জ উদ্গায়তি নৃত্যতে চ মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৪।২৪)

'যার বাণী আমার নাম, গুণ এবং লীলাকথা বর্ণনা করতে করতে গদ্গদ হয়ে যায়, যার চিত্ত আমার রূপ, গুণ, প্রভাব এবং লীলাকথা স্মরণ করতে করতে দ্রবীভূত হয়ে যায়, যারা বারংবার কাঁদে, কখনো কখনো হাসে, কখনো নির্লজ্জভাবে উচ্চৈঃস্বরে গান গায় এবং নাচতে থাকে, আমার এইসব ভক্ত সমস্ত জগৎ পবিত্র করে দেয়।'

যেখানেই বিচরণ করেন, তাঁর দর্শন, স্পর্শ, ভাষণ ইত্যাদির অতিশয় প্রভাব সেখানকার প্রাণীদের ওপর পড়ে।

যতক্ষণ মানুষের পদার্থের প্রতি ভোগবুদ্ধি থাকে, ততক্ষণ তার ওই পদার্থগুলির বাস্তবিক স্বরূপ বুদ্ধির অগোচর থাকে। কিন্তু যখন ভোগবুদ্ধি দূর হয়, তখনই সে ভগবৎ-স্বরূপ দেখতে পায়।

মর্মার্থ

'বাসুদেবঃ সর্বম্'—এই তত্ত্বটি দু'প্রকারে বোঝা যায়—(১) সংসারের সত্তা লোপ করে পরমাত্মার অস্তিত্ব রাখা অর্থাৎ জগৎ-সংসার বলে কিছু নেই শুধু পরমাত্মাই আছেন, (২) যা কিছু আছে সবই ভগবান। এতে যে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, তা ভগবানেরই স্বরূপ। কারণ ভগবান ছাড়া এগুলির কোনো স্বাধীন সত্তা নেই।

উপরিউক্ত দুটি প্রকারই হল সাধকদের জন্য। যে সাধকের সাংসারিক পদার্থে আকর্ষণ বা আসক্তি থাকে, তার পক্ষে 'এসব কিছু নেই, শুধু পরমাত্মাই আছেন'—এই প্রণালীটি গ্রহণ করতে হয়। যে সাধকের সাংসারিক পদার্থে বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই এবং যিনি কেবল ভগবানের স্মরণ-মনন-জপ-কীর্তন ইত্যাদিতে ব্যাপৃত থাকেন, তাঁর পক্ষে 'সংসাররূপে সবকিছুই ভগবান'—এই প্রণালীটি গ্রহণ করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে এই দুটি প্রণালী তত্ত্বতঃ একই। এই দুটিতে তফাৎ শুধু এইটুকুই, যেমন সোনার গহনা এবং গহনার নাম-রূপ-আকৃতি ইত্যাদি পৃথক্ পৃথক্ হয়েও সবকিছু যে সোনা তা জানা। যেখানে জগৎ-সংসারকে পরিত্যাগ করে পরমাত্মাকে তত্ত্বতঃ জানা হয়, সেখানে 'বিবেকের' প্রাধান্য থাকে, আর যেখানে জগৎকে ভগবৎ-স্বরূপ মানা হয়, সেখানে 'ভাবের' প্রাধান্য থাকে। নির্গুণের উপাসকদের বিবেকের প্রাধান্য থাকে এবং সগুণের উপাসকদের মধ্যে ভাবের প্রাধান্য দেখা যায়।

জগৎকে ভুলে গিয়ে পরমাত্মতত্ত্ব জানাও তত্ত্বতঃ জানা এবং জগৎকে ভগবদ্স্বরূপ মানাও তত্ত্বত জানা। কারণ তত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে একটাই। শুধু পার্থক্য হল এই যে, জ্ঞানমার্গে জানার প্রাধান্য থাকে আর ভক্তিমার্গে মেনে নেওয়ার প্রাধান্য থাকে। এইজন্য ভগবান জ্ঞানমার্গে মেনে নেওয়াকেও জেনে নেওয়ার অর্থে নিয়েছেন—**'ইতি মত্বা ন সজ্জতে'** (৩।২৮), এবং ভক্তিমার্গে জেনে নেওয়াকে মেনে নেওয়ার অর্থে নেওয়া হয়েছে (৫।২৯ ; ৯।১৩ ; ১০।৩ ; ৭, ২৪, ২৭, ৪১)। এতে আর একটি প্রধান বিষয় বোঝার হল এই যে, পরমাত্মাকে জানা ও মানা—দুই-ই হল জ্ঞান এবং জগৎকে সত্তারূপ ধরে তাকে জানা ও মানা—দুই-ই হল অজ্ঞান।

জগৎকে তত্ত্বতঃ জানলে জগতের পৃথক সত্তার অস্তিত্ব থাকে না, আর পরমাত্মাকে তত্ত্বতঃ জানলে পরমাত্মার অনুভূতি হয়। জগৎ তো ভগবৎস্বরূপই—দৃঢ়তার সঙ্গে এটি মানলে জগতের পৃথক সত্তা দূর হয়ে যায় এবং তখন জগৎ জগৎরূপে প্রতিভাত না হয়ে ভগবৎ-স্বরূপে দৃষ্ট হয়। তাৎপর্য হল এই যে, পরমাত্মতত্ত্ব অনুভূত হলে জানা এবং মানা—দুই-ই এক হয়ে যায়।

'ইতি জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে'—যারা প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তনশীল এই জগৎকে অস্তিত্বসম্পন্ন বলে মেনে নেয়, তারা অজ্ঞানী, মূঢ়। কিন্তু যাঁদের দৃষ্টি চির অপরিবর্তনীয় ভগবদ্-তত্ত্বের দিকে থাকে, তারা জ্ঞানী এবং অসম্মূঢ়।

'জ্ঞানবান্' বলার তাৎপর্য হল এই যে তাঁরা তত্ত্বতঃ বুঝতে পারেন যে সর্বত্র, সবের মধ্যে এবং সর্বরূপে প্রকৃতপক্ষে এক ভগবানই বিরাজমান। এরূপ জ্ঞানবান ব্যক্তিদের পরবর্তী পঞ্চদশ অধ্যায়ের উনিশতম শ্লোকে 'সর্ববিৎ' বলা হয়েছে।

জ্ঞানবান ব্যক্তির শরণাগতি অর্থার্থী, আর্ত এবং জিজ্ঞাসু ভক্তদের মতো নয়। ভগবান বলেছেন জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাঁর আত্মাস্বরূপ—**'জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্'** (৭।১৮)। জ্ঞানী ব্যক্তি যদি ভগবানের আত্মা হয় তবে জ্ঞানী ব্যক্তির আত্মা হলেন ভগবান। সুতরাং একমাত্র ভগবদতত্ত্ব ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব নেই। তাই জ্ঞানী ব্যক্তির শরণাগতি ওই তিন ভক্তদের থেকে বিশেষরূপ হয়। তাঁদের অনুভবে একমাত্র ভগবদতত্ত্ব ছাড়া অন্য কোনো সত্তা থাকে না—এই হল তাঁদের শরণাগতি।

ভগবানের দৃষ্টিতে তিনি ছাড়া আর কোনো তত্ত্ব নেই—**'ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব'** (৭।৭)। যেমন, সুতোর দ্বারা তৈরি বোতামগুলিকে (মনিসমূহকে) সুতোর গিঁট দিয়ে গেঁথে রাখলে তাতে সুতো ছাড়া আর কী থাকে? হ্যাঁ, দেখতে গিঁট এবং সুতোকে আলাদা বলে মনে হয়। কিন্তু তত্ত্বগতভাবে তারা একটিই জিনিস অর্থাৎ সুতো। তেমনই পরমাত্মা জগতে ব্যাপকরূপে প্রতিভাত হলেও, তত্ত্বতঃ পরমাত্মা এবং জগৎ একই। এতে ব্যাপ্য-ব্যাপকের

ভাব নেই। সুতরাং সবই একমাত্র বাসুদেব—এটি যার অনুভব হয়, সেও ভগবদস্বরূপই হয়ে যায়। ভগবদস্বরূপ হওয়াই হল তার শরণাগতি।

'স মহাত্মা সুদুর্লভঃ'—বহু মানুষই 'আমাকে পরমাত্মাকে লাভ করতে হবে' একথা চিন্তা করে না এবং তা চায়ও না। যারা এদিকে নজর দেয়, তারাও আগ্রহী হয়ে অনন্যভাবে নিজ নিজ জীবন সফল করার জন্য ব্যাগ্র হয় না। যারা নিজেদের কল্যাণ করতে চায়, তারাও মূঢ়তাবশতঃ পরমাত্মপ্রাপ্তিতে নিরাশ হয়ে আসল উদ্দেশ্য বিসর্জন দিয়ে পরম লাভ থেকে বঞ্চিত রয়ে যায়।

এই অধ্যায়েরই তৃতীয় শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, সকল মানুষের মধ্যে সহস্র এবং সহস্রের মধ্যে কয়েকজন মাত্র মানুষ প্রকৃত সিদ্ধির জন্য যত্নবান হয়। সেইসব যত্নশীল সিদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে কোনো একজন 'সবই বাসুদেব'—এটি তত্ত্বতঃ জানতে পারে। এরূপ তত্ত্বতঃ জ্ঞানী মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ। তার অর্থ এই নয় যে পরমাত্মা অতি দুর্লভ। দুর্লভ হল সত্যকার হৃদয় দিয়ে পরমাত্মপ্রাপ্তির জন্য চেষ্টায় নিরত হয় এমন ব্যক্তির। আন্তরিকভাবে পরমাত্মপ্রাপ্তির চেষ্টা করলে মানুষমাত্রেই পরমাত্মপ্রাপ্তি করতে সক্ষম হয়। কারণ এই মনুষ্যদেহ সেই জন্যই পাওয়া।

জগতের সকল মানুষ ধনী হতে পারে না। জাগতিক ভোগ্য-সামগ্রী সকলে সমানভাবে পায় না। কিন্তু যে পরমাত্ম-তত্ত্ব ভগবান শঙ্কর লাভ করেছেন, সনকাদি লাভ করেছেন, নারদ-বশিষ্ঠ প্রভৃতি দেবর্ষি ও মহর্ষিগণ লাভ করেছেন, সেই তত্ত্ব সকল মানুষই সমভাবে লাভ করতে সক্ষম। তাই মানুষের এরূপ দুর্লভ সুযোগ নষ্ট করা উচিত নয়।

ভগবানের অলৌকিক মহিমা হল এই যে তিনি ক্ষুধার্তের জন্য অন্নরূপে, পিপাসার্তের জন্য জলরূপে এবং বিষয়ীর জন্য রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শরূপ বিষয় রূপে উপস্থিত হন। তিনিই আবার মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদি-রূপে আসেন, সংকল্প-বিকল্প হয়ে আসেন। আবার সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ-রূপ নিয়ে মানুষকে সচেতন করতে আসেন যে, তুমি যদি এই ভোগ্যবস্তুর ভোক্তা হও তবে তার ফলস্বরূপ তোমাকে নানাপ্রকার দুঃখভোগ করতে হবে। তাই মানুষের লজ্জা পাওয়া উচিত এই ভেবে যে, আমি ভগবানকে ভোগ্য-সামগ্রীরূপে দেখছি, আমার সুখের জন্য তিনি সুখ-সামগ্রী হয়ে রয়েছেন। ভগবান এত দয়ালু যে প্রাণী যা চায়, তিনি সেইরূপেই বিরাজ করেন।

দেখা, শোনা এবং বোঝায় যে সব বস্তু আসে এবং যা মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর তা সবই ভগবান ও ভগবানের—এরূপ যদি মেনে নেওয়া যায়, প্রকৃতভাবে যদি তা অনুভব করে নেওয়া যায় তাহলে মানুষ বিশিষ্ট হয়ে ওঠে,—**'স মহাত্মা সুদুর্লভঃ'**।

একজন বৈরাগী বাবাজী ছিলেন। তিনি গণেশ পূজা করতেন। তাঁর স্বর্ণনির্মিত গণেশ ও ইঁদুরের দুটি মূর্তি ছিল। দুটি মূর্তি সমান ওজনের ছিল। বাবাজী একবার তীর্থে যাবার মনস্থ করে স্বর্ণকারের কাছে গেলেন ওই মূর্তিগুলি বিক্রি করার জন্য। স্বর্ণকার দুটি মূর্তি ওজন করে দুটির একই দাম বলায় বাবাজী স্বর্ণকারের ওপরে বিরক্ত হয়ে বললেন, তুমি কী বলছ ? গণেশ হলেন দেবতা আর ইঁদুর তার বাহন, আর তুমি বলছ দুটিরই এক দাম ! তা কী করে হয় ? স্বর্ণকার বলল, বাবাজী ! আমি গণেশ বা ইঁদুর কিনছি না, আমি সোনা কিনছি, সোনার ওজন যা হবে, সেই অনুযায়ীই তো ওগুলির মূল্য হবে ! স্বর্ণকার যদি গণেশ ও ইঁদুর লক্ষ্য করে, তাহলে সে সোনা দেখতে পাবে না আর যদি সোনার দিকে নজর দেয়, তাহলে গণেশ বা ইঁদুর তার লক্ষ্যে আসে না। সেইজন্য স্বর্ণকার গণেশও দেখেনি, ইঁদুরও নয়—সে কেবল সোনাই দেখেছে। ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন মহাত্মাগণও তেমনি জগৎকে দেখেন না তাঁরা কেবল ভগবানকেই দর্শন করে থাকেন।

কোনো এক সাধু পথে চলতে চলতে পার্শ্ববর্তী এক ক্ষেতে মূত্রত্যাগ করতে বসলেন। ক্ষেত-মালিক দূর থেকে তাঁকে তরমুজ-চোর মনে করে পেছন থেকে তাঁর মাথায় লাঠির বাড়ি মারল। তারপর বুঝতে পারল যে ইনি একজন সাধু, তখন হাত জোড় করে বলল, মহারাজ ! আমি বুঝতে না পেরে আপনাকে লাঠি দিয়ে মেরে অন্যায় করে ফেলছি ! আমাকে ক্ষমা করুন। সাধু বললেন, 'ক্ষমা করার কী আছে ? তুমি তো আমাকে মারনি, তুমি চোরকে মেরেছ।' লোকটি বলল, 'আমি এখন কী করব ?' সাধু বললেন, 'তোমার যা খুশি তাই কর'। লোকটি তখন সাধুকে গাড়িতে করে হাসপাতালে নিয়ে গেল। সেখানে ওষুধপত্র লাগাবার পর একজন দুধ নিয়ে এলো এবং বলল 'মহারাজ ! দুধ

খেয়ে নিন।' সাধু বললেন, 'তুমি অত্যন্ত চালাক এবং হুঁশিয়ার। তোমার নানাপ্রকার বিচিত্র রূপ আর তুমি বিচিত্র লীলা করে থাক। আগে তো লাঠি দিয়ে মারলে আর এখন বলছো দুধ খেয়ে নিন।' সেই লোকটি ভয় পেয়ে বলল—'বাবাজী! আমি মারিনি!' সাধু বললেন, 'মিথ্যা কথা, আমি জানি তুমিই মেরেছ। তুমি ছাড়া আর কে, কোথা থেকে আসবে? কী করেই বা আসবে? আগে তো লাঠি দিয়ে মারলে এখন আবার দুধ খাওয়াতে এসেছ! দুধ আমি খাচ্ছি, কিন্তু সেই লোক তুমিই ছিলে।' বাবাজী তো এইভাবে নিজস্ব 'বাসুদেবঃ সর্বম্' ভাব ভাষাতে বলতে লাগলেন আর সেই লোকটি ভাবতে লাগল যে 'বাবাজী না আমাকে ফাঁসিয়ে দেন!' তাৎপর্য এই যে সাধু কেবলমাত্র ভগবানকেই দেখেন, লাঠি দিয়ে আঘাতকারী, ওষুধ প্রদানকারী এবং দুধ প্রদানকারী—তাঁর দৃষ্টিতে সবই ভগবান।

মহাত্মাদের মহিমা

যেখানে সাধু-মহাত্মাদের বর্ণনা আছে, সেখানে বলা হয়েছে যে—

১) যাঁরা উচ্চ কোটির তত্ত্বজ্ঞ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ, তাঁরা সর্বদা অভিন্নভাবে এবং অখণ্ডরূপে কেবল নিজ স্বরূপে বা ভগবদ-তত্ত্বে স্থিত থাকেন। তাঁদের জীবন, দর্শন, চিন্তাধারা, শরীরের স্পর্শের বায়ু ইত্যাদি দ্বারা জীবের কল্যাণ হয়ে থাকে।

২) যেসব ব্যক্তি ওইসব মহাপুরুষদের মহিমা জানেন না, তাদের কাছে এই মহাপুরুষেরা তাঁদের উচ্চ ভাব থেকে নীচে অবতরণ করেন কিছু বলার জন্য ; যেমন সাধু-মহাত্মাগণ এরূপ করেছেন, তাঁদের আচরণ এবং কথিত বচন থেকেই শাস্ত্র তৈরি হয় ইত্যাদি, ইত্যাদি।

৩) এঁরা যখন আরো নীচে অবতরণ করেন তখন তাঁরা বলে থাকেন যে, সাধু-মহাত্মাদের আদেশ পালন করা উচিত।

৪) যাঁরা এরূপ আদেশ পালন করতে পারেন না, সেই সাধকদের কাছে এঁরা বিধান দিয়ে থাকেন কোন্‌টি করা উচিত, কোন্‌টি করা উচিত নয়।

৫) যখন এর থেকেও নীচে অবতরণ করেন, তখন 'এরূপ করো, ওরূপ কোরো না' এরকম স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে থাকেন।

[সাধুদের নির্দেশে যে আদর্শ থাকে, তা আজ্ঞাপালকের জীবনে নেমে আসে। তাঁদের আজ্ঞা-পালন ছাড়াও তাঁদের সিদ্ধান্ত পালনকারীদের কল্যাণ হয়, কেন-না এই মহাত্মাগণ নির্দেশের রূপে যাকে যা কিছু বলেন, তাতে এক বিশেষ শক্তি থাকে। আজ্ঞাপালনকারীদের পরিশ্রম অনুভূত হয় না এবং তাদের দ্বারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্দেশগুলি আচরিত হয়ে থাকে।]

৬) যারা তাঁদের নির্দেশ পালন করেন না, সেই নিম্ন কোটির সাধকদের এঁরা কোথাও কোথাও, কখনো কখনো অভিশাপ বা বর প্রদান করে থাকেন।

এইভাবে দেখলে বোঝা যায় যে (১) যাঁরা কিছু করেন না, নিত্য আপন স্বরূপে স্থিত থাকেন—সেই সাধু-মহাত্মাদের স্থিতি উচ্চে, (২) শাস্ত্রে এরূপ বলা হয়েছে, সাধু-মহাত্মাগণ এরূপ করেছেন—এরূপ নির্দেশকারীদের স্থিতি দ্বিতীয় স্থানে, (৩) সাধু-মহাত্মাদের নির্দেশ পালন করা উচিত—এরূপ নির্দেশদানকারীর স্থিতি তৃতীয় স্থানে, (৪) এরূপ করা উচিত, আর এরূপ করা উচিত নয়— এই বিধানকারী সাধু চতুর্থ স্থানে (৫) তুমি এই করো, আর ওইসব কোরো না—এরূপ নির্দেশকারীদের স্থিতি পঞ্চম স্থানে, (৬) শাপ বা বর প্রদানকারী সাধুগণ হলেন ষষ্ঠ স্থানে। এইভাবে সাধু-মহাপুরুষদের যে নিম্নে অবতরণ তাতে ক্রমশঃ তাঁদের দয়াভাবই পরিস্ফুট হয়। এঁরা শাপ দিন বা বরপ্রদান করুন, বকুনি দিন, এতে এই সাধুদের নিম্নে অবতরণ হলেও তা তাঁদের অত্যধিক ত্যাগেরই পরিচয় বহন করে। কারণ তাঁরা জীবের উদ্ধারের জন্যই ক্রমশঃ নীচে নামতে থাকেন। এতে তাঁদের নিজেদের বিন্দুমাত্রও কোনো স্বার্থ থাকে না।

তেমনি ভগবানও তাঁর নিজ স্বরূপে সদা অবস্থান করেন। এটি অত্যন্ত উচ্চকোটির বিষয় ; কিন্তু এই ভগবানই অত্যধিক কৃপা-পরবশ হয়ে জীবের উদ্ধারের নিমিত্ত অবতাররূপ গ্রহণ করে আদর্শ লীলা করেন। তাঁর লীলা দেখে এবং শুনেই লোকে উদ্ধার লাভ করে। ভগবান আরও নীচে অবতরণ করেন উপদেশ দেবার জন্য। তার থেকে নীচে আসেন নির্দেশ দিতে, তার থেকেও নীচে আসেন শাসন করে লোককে সঠিক পথে নিয়ে যাবার জন্য, তারও নীচে এসে অভিশাপ বা বরপ্রদান করেন অথবা তার এবং জগতের হিতার্থে তার মৃত্যু পর্যন্ত ঘটান।

পরিশিষ্ট-ভাব—ষোড়শ শ্লোকে ভগবান অর্থার্থী, আর্ত, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী এই চারপ্রকার ভক্তের দ্বারা তাঁকে ভজনা করার কথা বলেছেন—'**চতুর্বিধা ভজন্তে মাম্**'। এই ভক্তদের মধ্যে জ্ঞানীর উপাসনার স্বরূপ কী—এই শ্লোকে তা জানিয়েছেন যে 'সবই বাসুদেব' এরূপ অনুভব করাই জ্ঞানীর উপাসনা, শরণাগতি। প্রকৃত শরণাগতি তাকেই বলে, যাতে শরণাগতের কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না, থাকে শুধুই শরণ্য অর্থাৎ যার শরণ গ্রহণ করা হয় তিনি।

'সবই ভগবান'—এটিই হল প্রকৃত জ্ঞান। এরূপ প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মা ভক্তই ভগবানের শরণাগত হন এবং নিজের অস্তিত্ব (আমি ভাব) দূর করে ভগবানে লীন হয়ে যান। তখন আর আমিত্ব থাকে না অর্থাৎ প্রেমভাব থাকে না, থাকেন শুধু প্রেমস্বরূপ ভগবান, যাতে তুমি-আমি-ও-সে এই চার ভাব থাকে না। শরণাগতির প্রকৃত স্বরূপই হল তাই।

'মহাত্মা' শব্দটির অর্থ হল—মহান আত্মা অর্থাৎ অহংভাব, ব্যক্তিত্ব, একদেশীয়ত্ব থেকে সর্বতোভাবে রহিত আত্মা[১]। যার মধ্যে অহং ভাব, ব্যক্তিত্ব, একদেশীয়তা থাকে, তাকে 'অল্পাত্মা' বলা হয়।

এখানে '**বাসুদেবঃ**' পদটি পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে, অতএব এইস্থানে '**বাসুদেবঃ সর্বঃ**' পদ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এখানে '**সর্বঃ**' পদ ব্যবহার না করে '**সর্বম্**' পদ ব্যবহৃত হয়েছে, যা ক্লীবলিঙ্গ হয়। যদি তিনটি লিঙ্গেরই (সর্বঃ, সর্বা ও সর্বম্) সমাহার করা হয় তাহলে ক্লীবলিঙ্গই (সর্বম-ই) শেষ পর্যন্ত থাকে। তিনটি লিঙ্গই ক্লীবলিঙ্গের অন্তর্গত হয়। অতএব '**সর্বম্**' পদে স্ত্রী, পুরুষ এবং ক্লীব— সবেরই সমাহার হয়। গীতায় জগৎ,জীব এবং পরমাত্মা— এই তিনের জন্য পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ এবং ক্লীবলিঙ্গ তিন লিঙ্গই ব্যবহৃত হয়েছে[২]। এতে এই অর্থই হয় যে জগৎ, জীব এবং পরমাত্মা এই তিনটিই '**সর্বম্**' শব্দের অন্তর্গত। অতএব তিন লিঙ্গে উদ্ধৃত সকল বস্তু, ব্যক্তি, পরিস্থিতি সবই পরমাত্মা।

'**বাসুদেবঃ সর্বম্**'—এর মধ্যে '**সর্বম্**' অসৎ আর '**বাসুদেবঃ**' হলেন সৎ। অসতের ভাব বিদ্যমান নয় এবং সৎ এর অ-ভাব বিদ্যমান নয়—'**নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ**' (গীতা ২।১৬)। অর্থাৎ শুধুমাত্র সৎ-ই আছে, অসৎ বলে কিছুই নেই। বাসুদেবই শুধু আছেন, '**সর্বম্**' নেই-ই। কিন্তু বলা, শোনা এবং অধ্যয়নের দৃষ্টিতে সাধকের কাছে '**সর্বম্**' (জগৎ-সংসার) দৃষ্ট হয়, তাই ভগবান '**সর্বম্**'-এর ধারণা দূর করার জন্যই '**বাসুদেবঃ সর্বম্**' বলেছেন।

কর্মযোগী, জ্ঞানযোগী, ধ্যানযোগী, লয়যোগী, হঠযোগী, রাজযোগী, মন্ত্রযোগী, অনাসক্তযোগী ইত্যাদি নানাপ্রকার যোগী আছেন, শাস্ত্রে যাঁদের বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু ভগবান তাঁদের অতি দুর্লভ বলেননি, বরং 'সবই ভগবান বাসুদেব'—যাঁরা এরূপ অনুভব করেন সেই সব মহাত্মাই অত্যন্ত দুর্লভ বলে জানিয়েছেন।

ভগবান সমস্ত জগৎ সংসারের বীজ—'**যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন**' (গীতা ১০।৩৯), '**বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্**' (গীতা ৭।১০)। বীজ হতে যা কিছু উৎপন্ন হয়, সেগুলি সব বীজরূপই। যেমন, গম থেকে উপজাত কৃষিকে গমই বলা হয়। কৃষকেরা বলেন 'গমের চাষ খুব ভালো হয়েছে'। 'দেখো খেতে গম রয়েছে, গমে খেত ভরে আছে'! কিন্তু শহরবাসী ব্যবসায়ী এগুলিকে গম বলে কেন মেনে নেবেন? তিনি বলবেন 'আমি থলে ভর্তি করে গম কিনেছি আর বিক্রী করেছি, আমি কি জানি না গম কীরকম হয়? এগুলি তো ঘাস, ডাঁটা আর পাতা, এগুলি গম নয়'। কিন্তু খেত বপনকারী কৃষক বলবেন 'এতো সেই ঘাস নয়, যা পশু খায়, এগুলি গমই'। সেই খেত গোরুতে খেলে অনুযোগ করবেন, 'তোমার গোরু আমার গম খেয়ে গেল', কিন্তু গোরু হয়তো এক দানাও গম খায়নি। খেতে যদি

---

[১]ভগবান গীতায় 'মহাত্মা' শব্দটি শুধুমাত্র ভক্তদের জন্যই ব্যবহার করেছেন। যাঁরা ভক্তিমার্গে থাকেন, সেই সাধকদেরও মহাত্মা বলে উল্লেখ করেছেন—'মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ' (৯।১৩), যাঁরা ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন হয়েছেন, তাঁদেরও মহাত্মা বলা হয়েছে—'বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ' (৭।১৯), এবং যাঁরা পরমাসিদ্ধি (পরমপ্রেম) লাভ করেছেন, তাঁদেরও মহাত্মা বলেছেন— 'নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ' (৮।১৫)। এইভাবে ভগবান গীতায় 'সুকৃতিনঃ' (৭।১৬), 'উদারাঃ' (৭।১৮), 'সুদুর্লভঃ' (৭।১৯), 'যুক্ততমঃ' (৬।৪৭, ১২।২), 'অদ্বেষ্টা', 'মৈত্রঃ', 'করুণঃ' (১২।১৩), 'অতীব মে প্রিয়াঃ' (১২।২০) ইত্যাদি পদের প্রয়োগও কেবল ভক্তদের জন্যই করেছেন।

[২]দ্রষ্টব্য— 'গীতা-দর্পণ' গ্রন্থে ৯৯সংখ্যক প্রবন্ধ—'গীতায় ঈশ্বর, জীবাত্মা এবং প্রকৃতির অলিঙ্গ ভাব'।

একদানা গমও দেখা না যায়, তবুও তা গমই—তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ এটি আগেও গম ছিল, পরেও গমই থাকবে, সুতরাং মধ্যবর্তীকালে খেতে অন্যরূপ দেখালেও, এগুলি গমই। এখন এগুলি সবুজ ঘাস বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু পরে পেকে গেলে এর থেকে গমই পাওয়া যাবে। এইরূপ জগতে আগেও পরমাত্মাই ছিলেন—**'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্'** (ছান্দোগ্য ৬।২।১), অন্তকালেও পরমাত্মাই বিরাজ করবেন—**'শিষ্যতে শেষসংজ্ঞঃ'** (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩।২৫)। সুতরাং মধ্যবর্তী সময়েও সব পরমাত্মাই—**'বাসুদেবঃ সর্বম্'**।

সাধকদের যতক্ষণ অহংভাব থাকে, ততক্ষণ তিনি ভোগী থাকেন। 'আমি যোগী'—এ হল যোগের ভোগ, 'আমি জ্ঞানী'—এ হল জ্ঞানের ভোগ, 'আমি প্রেমিক'—এ হল প্রেমের ভোগ। সাধকের মধ্যে যতক্ষণ এরূপ ভোগ থাকে, ততক্ষণ তার পতনের সম্ভাবনা থাকে। যিনি যোগের ভোগী, তিনি কখনো বিষয় ভোগীও হয়ে উঠতে পারেন, যিনি জ্ঞানের ভোগী, তিনি কখনো অ-জ্ঞানের ভোগীও হতে পারেন আর যিনি প্রেমের ভোগী তিনি কখনো অনুরাগভোগী হয়ে উঠতে পারেন। কেন-না তাঁর মধ্যে আগে থেকেই ভোগের প্রবৃত্তি, সংস্কার থেকে গেছে। ভোগ যখন থাকে না, তখন শুধু যোগ থাকে। যোগ থাকলে মানুষ মুক্ত হতে পারে। কিন্তু মুক্ত হলেও মহাপুরুষ যে সাধনার সাহায্যে মুক্তিপ্রাপ্ত হন, সেই সাধনার এক সংস্কার (অহং-এর সূক্ষ্ম রেশ) থেকে যায়, যা অন্য দার্শনিকদের সঙ্গে ঐকমত হতে দেয় না। এই সংস্কারের জন্যই দার্শনিকদের এবং তাঁদের দর্শনের মধ্যে মতভেদ থাকে। নিজ মতের সংস্কার অন্য দার্শনিকদের মতগুলিকে সমানভাবে শ্রদ্ধা করতে দেয় না। কিন্তু সর্বক্ষণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্রেম প্রাপ্তি হলে নিজ মতের সংস্কার থাকে না এবং সবার সঙ্গে একতা হয় অর্থাৎ সমস্ত মতভেদ দূর হয় ও **'বাসুদেবঃ সর্বম্'** অনুভূত হয়। প্রকৃতপক্ষে **'বাসুদেবঃ সর্বম্'**-এর অনুভবকারী, এরূপ যিনি জানেন ও বলেন তিনিও থাকেন না, একমাত্র বাসুদেবই থাকেন, যিনি অনাদিকাল হতে একইভাবে বিরাজমান। সবার মধ্যে পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করলে সকল মতাদিতে সমান শ্রদ্ধা জাগে, কেননা নিজ ইষ্ট পরমাত্মার সঙ্গে বিরোধ কখনোই সম্ভব নয়—**'নিজ প্রভুময় দেখহিঁ জগত কেহি সন করহিঁ বিরোধ'**। (শ্রীরামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ১১২খ)।

ঈশ্বর এবং জীবের সম্পর্কে দু'প্রকারের বর্ণনা আছে (১) ঈশ্বর হলেন সমুদ্র আর জীব হল তার তরঙ্গ বা ঢেউ, আর (২) জীব (স্বরূপ) সমুদ্র আর ঈশ্বর তার তরঙ্গ অর্থাৎ সমুদ্র হল তরঙ্গের। এই দুইয়ের মধ্যে তরঙ্গ সমুদ্রেরই এটি মেনে নেওয়াই ঠিক মনে হয়। সমুদ্র তরঙ্গের এটিকে ঠিক বলে মেনে নেওয়া যায় না। কেন-না সমুদ্র তরঙ্গের থেকে অপেক্ষাকৃতভাবে নিত্য আর তরঙ্গ অনিত্য বা ক্ষণভঙ্গুর। অতএব তরঙ্গ সমুদ্রেরই হয়, সমুদ্র তরঙ্গের হয় না। যদি নিজেকে সমুদ্র ও ঈশ্বরকে তরঙ্গ বলে মনে করা হয় তা হলে তাতে অনর্থ হবে, কেন-না এরূপ মেনে নিলে অহং-অভিমান জন্মাবে এবং অহং (চিজ্জড়গ্রন্থি) নিত্য থাকবে আর ঈশ্বর অনিত্য হয়ে পড়েন। কারণ জীবের অনাদিকাল থেকে এই অহং (ব্যক্তিত্বে)-এর অভ্যাস হয়ে আছে। তাই যদি স্বরূপকে অহং বলা হয় তাহলে সেখানে ওই অহং বজায় থাকবে, যা অনাদিকাল হতে আছে এবং এই অহং দূর হলে তবেই মুক্তি হয়। উপরিউক্ত দুটি ব্যাপার ছাড়া আরো একটি বিশেষ ব্যাপার হল এই যে, জল-তত্ত্বে সমুদ্রও নেই, তরঙ্গ বা ঢেউও নেই অর্থাৎ সমুদ্র ও ঢেউয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এটিই হল বাস্তব সত্য। সমুদ্র ও তরঙ্গ তো সাপেক্ষ আর জল-তত্ত্ব হল নিরপেক্ষ।

জল-তত্ত্বে যেমন সমুদ্র, নদী, বর্ষা, শিশির, কুয়াশা, বাষ্প, মেঘ সব মিলেমিশে এক হয়ে যায়, তেমনই **'বাসুদেবঃ সর্বম্'**-এ সকল সাধনা, যোগমার্গ মিলেমিশে বাসুদেবরূপে এক হয়ে যায়। জল-তত্ত্বে যেমন কোনো পার্থক্য নেই, তেমনই **'বাসুদেবঃ সর্বম্'** এতেও কোনো পার্থক্য নেই। মতভেদের দ্বারা অসন্তোষ হয়ে থাকে। কিন্তু **'বাসুদেবঃ সর্বম্'**-এ কোনো মতভেদ না থাকায় সকলেই সর্বতোভাবে সন্তুষ্টি লাভ করে। **'বাসুদেবঃ সর্বম্'** কথাটির মধ্যে যোগীও নেই, জ্ঞানীও নেই, প্রেমিকও নেই, সেই জন্য এটি অনুভবকারী মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ হয়ে থাকেন।

এক জলই বরফ, কুয়াশা, মেঘ, শিল, বর্ষা, নদী, পুকুর, সমুদ্র ইত্যাদি নানারূপে প্রতিভাত হয়। পাত্রে বরফ রেখে সেটি আগুনের ওপর রাখলে, বরফ গলে জল হয়, ক্রমশঃ তা বাষ্পে পরিণত হয় এবং বাষ্প পরমাণু হয়ে নিরাকার হয়ে যায়। জলই কুয়াশারূপ ধারণ করে, সেটিই মেঘরূপ নেয় আবার নিরাকাররূপ ধারণ করে, সেটিই আবার বরফ হয়,

সম্বন্ধ—যারা ভগবানের মহত্ত্ব বুঝে তাঁর শরণাগত হয়, এরূপ ভক্তদের বর্ণনা ষোড়শ থেকে উনিশতম শ্লোকে করার পর এখন ভগবান পরবর্তী তিনটি শ্লোকে দেবতাদের শরণ গ্রহণকারী মানুষদের বর্ণনা করছেন।

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥ ২০ ॥

[তৈঃ, তৈঃ (সেইসব) ; কামৈঃ (কামনা দ্বারা) ; হৃতজ্ঞানাঃ (যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে) ; স্বয়া (নিজ নিজ) ; প্রকৃত্যা (প্রকৃতির) ; নিয়তাঃ (বশীভূত হয়ে) ; তম্, তম্ (সেই সেই) ; নিয়মম্ (নিয়মগুলি) ; আস্থায় (পালন করে) ; অন্য দেবতাঃ (ওই সকল দেবতাদের) ; প্রপদ্যন্তে (শরণাগত হয়ে থাকেন।)]

ওইসব কামনা দ্বারা যাদের বিবেক অপহৃত হয়েছে তারা নিজ নিজ প্রকৃতির (স্বভাবের) বশীভূত হয়ে অন্য দেবতাদের শরণাগত হয়ে তাদের (আরাধনার) নিয়মগুলি পালন করে থাকে[১]॥ ২০ ॥

ব্যাখ্যা—**'কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ'**—ওইসকল অর্থাৎ ইহলোক এবং পরলোকের ভোগকামনা দ্বারা যাদের জ্ঞান আবৃত হয়েছে, আচ্ছাদিত হয়েছে। তাৎপর্য হল পরমাত্মা প্রাপ্তির জন্য যে বিবেকযুক্ত মনুষ্যদেহ লাভ হয়েছে, তার দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত না করে তারা নিজ নিজ কামনাপূর্তি করাতে ব্যস্ত থাকে।

সংযোগজনিত সুখের ইচ্ছাকে কামনা বলা হয়। কামনা দু'প্রকারের—ইহলোকের ভোগসুখের জন্য ধন-সম্পদ সংগ্রহের কামনা এবং স্বর্গাদি পরলোকে ভোগের জন্য পুণ্য সংগ্রহের কামনা।

ধন-সংগ্রহের কামনা দু'প্রকারের হয়—এক, ইহলোকে ইচ্ছামতো ভোগসুখের জন্য, যখন খুশি, যেখানে ইচ্ছা এবং যত ইচ্ছা অর্থ ব্যয় করার জন্য, সুখ-আরামে কাটানোর জন্য অর্থাৎ সংযোগজনিত সুখাদির জন্য ধন-সংগ্রহের কামনা হয়। আর দ্বিতীয়, আমি ধনী হব, অর্থের জোরে অনেক বড় হব ইত্যাদির জন্য অর্থাৎ অহংকারজনিত সুখের জন্য ধন-সংগ্রহের কামনা জন্মায়। তেমনই পুণ্য সংগ্রহের কামনাও দু'প্রকারের হয়—এক, এই জগতে আমাকে পুণ্যাত্মা বলা হোক এবং দ্বিতীয়, পরলোকে যেন আমার ভোগসুখ প্রাপ্তি হয়। এইসব কামনা দ্বারা সৎ-অসৎ, নিত্য-অনিত্য, সার-অসার, বন্ধন-মোক্ষ ইত্যাদি বিবেক আচ্ছাদিত হয়। বিবেক আচ্ছাদিত হলে এইসব ব্যক্তি বুঝতে পারে না যে তারা যেসব পদার্থ কামনা করছে, সেগুলি কতদিন স্থায়ী হবে এবং তারা-ই বা কতদিন সেগুলি ভোগ করতে সক্ষম হবে ?

'প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া'[২]—কামনাগুলি দ্বারা বিবেক আচ্ছাদিত হলে এইসব ব্যক্তি নিজ প্রকৃতির দ্বারা চালিত হয় অর্থাৎ নিজ স্বভাবের বশীভূত হয়ে পড়ে। এখানে 'প্রকৃতি' শব্দটি ব্যক্তিগত স্বভাবের বাচক, সমষ্টিগত প্রকৃতির বাচক নয়। এই ব্যক্তিগত স্বভাব সকলের মধ্যেই প্রধান হয়—**'স্বভাবো মূর্ধ্নি বর্ততে'**। তাই ব্যক্তিগত স্বভাব কেউ পরিত্যাগ করতে পারে না—**'যা যস্য প্রকৃতিঃ স্বভাবজনিতা কেনাপি ন ত্যজ্যতে'**। কিন্তু এই স্বভাবে যে দোষ থাকে, সেগুলি মানুষ অবশ্যই ত্যাগ করতে পারে। মানুষ যদি ওই দোষগুলি পরিত্যাগ করতে সক্ষম না হয়, তাহলে মনুষ্য-জন্মের সার্থকতা কী ? মানুষ তার স্বভাবকে নির্দোষ, শুদ্ধ করতে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন। কিন্তু তার মধ্যে যতক্ষণ কামনাপূর্তির উদ্দেশ্য থাকে, ততক্ষণ সে তার স্বভাব শোধরাতে পারে না এবং ততদিন পর্যন্ত তার মধ্যে স্বভাবের প্রাবল্য এবং নিজের দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু যার কামনা দূর করার উদ্দেশ্য থাকে, সে তার স্বভাব শোধরাতে সক্ষম হয় অর্থাৎ তার আর প্রকৃতির

[১]এই অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে বর্ণিত পুরুষদের জ্ঞান মায়া দ্বারা আবৃত থাকে আর এখানে বর্ণিত পুরুষদের জ্ঞান কামনা দ্বারা আবৃত থাকে। ওই স্থানে বর্ণিত ব্যক্তিগণ কামনাপূর্তির জন্য জড়-পদার্থের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং এইস্থানে বর্ণিত ব্যক্তিগণ কামনাপূর্তির নিমিত্ত দেবতাদের আশ্রয় গ্রহণ করে। ওই স্থানের ব্যক্তিগণ দুষ্ট স্বভাবের জন্য নরকে গমন করে এবং এই স্থানের ব্যক্তিগণ কামনাবশতঃ বারংবার জন্ম-মরণ প্রাপ্ত হয়।

[২]এখানে যে 'প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া' বলা হয়েছে, এটিই সপ্তদশ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে 'যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ' বলা হয়েছে। 'স্বয়া' বলার অর্থ হল যে, নিজ প্রকৃতি অনুসারে মানুষের কামনাও পৃথক্ পৃথক্ হয়।

বৃষ্টিরূপ ধারণ করে পৃথিবীতে ঝরে পড়ে নদীরূপে বয়ে গিয়ে সমুদ্ররূপ ধারণ করে। নানারূপ হলেও তত্ত্বতঃ জল একই থাকে। এইভাবেই এক ভগবান নানারূপ ধারণ করেন। জল যেমন ঠাণ্ডাতে জমে বরফ হয়ে যায় আবার গরমে গলে জল ও বাষ্প হয়ে পরমাণুরূপ হয়, তেমনই অজ্ঞানরূপ ঠাণ্ডায় ভগবান স্থূল ও জড় জগৎ-সংসাররূপে প্রতিভাত হন এবং জ্ঞানরূপী অগ্নির দ্বারা সূক্ষ্ম ও চেতন বাসুদেবরূপে প্রতিভাত হন। জলকে বরফরূপেই দেখা যাক বা বাষ্প কিংবা মেঘরূপে তা আসলে জলই। জল ছাড়া আর কিছুই নয়। তেমনই ভগবানকে জগৎ রূপেই দেখা যাক বা অন্য কোনো রূপে, তা ভগবানই। ভগবান ছাড়া আর কিছুই নেই।

সাধকের একটি ভুল হয় এই যে, তিনি নিজেকে পৃথক্ ভেবে জগৎকে ভগবৎ স্বরূপ বলে দেখার চেষ্টা করেন অর্থাৎ **'বাসুদেবঃ সর্বম্'**-কে নিজের বুদ্ধির বিষয় করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে প্রতিভাত জগৎ-সংসারই শুধু ভগবদ্ স্বরূপ নয়, যারা দেখছেন তাঁরাও ভগবদ্-স্বরূপ **'সকলমিদমহং চ বাসুদেবঃ'** (বিষ্ণুপুরাণ ৩।৭।৩২)। সুতরাং সাধকের এইরূপ মনে করা উচিত যে, তাঁর দেহ সহ সবই ভগবান অর্থাৎ শরীরও ভগবদ্‌স্বরূপ, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, প্রাণ এবং অহং (আমিত্ব)ও ভগবদ্-স্বরূপ। সবই ভগবান একথা হৃদয়ঙ্গম করার জন্য সাধকের বুদ্ধির ওপর জোর করা উচিত নয় বরং সহজভাবে সেটি স্বীকার করা উচিত। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—

সর্বং ব্রহ্মাত্মকং তস্য বিদ্যয়াঽঽত্মমনীষয়া। পরিপশ্যন্নুপরমেৎ সর্বতো মুক্তসংশয়ঃ॥ (১১।২৯।১৮)

যখন 'সবই ভগবান'— এরূপ নিশ্চিত হয়ে যায়, তখন সাধক এই অধ্যাত্মবিদ্যার (ব্রহ্মবিদ্যার) সাহায্যে সর্বপ্রকার সংশয়রহিত হয়ে সর্বত্র ভগবানকে অনুভব করে জগৎ সংসার হতে আসক্তিবিহীন হয়ে থাকেন অর্থাৎ 'সবই ভগবান'— এই ভাবনা আর থাকে না, শুধু ভগবানকেই তিনি প্রত্যক্ষ করতে থাকেন।

তাৎপর্য হল এই যে 'সবই ভগবান'—এই ভাবেও আসক্তিবিহীন হয়ে যাওয়া অর্থাৎ দ্রষ্টাও (প্রত্যক্ষকারী) থাকবে না, দৃশ্যও (দেখার জিনিস) থাকবে না আর দর্শনও (দেখার বৃত্তি) থাকবে না, শুধুমাত্র ভগবানই থাকেন।

'বাসুদেবঃ সর্বম্' অনুভবটি নানাভাবে হতে পারে, যেমন—

(১) ক্রিয়া, পদার্থ এবং ব্যক্তির আদি ও অন্ত থাকে, কিন্তু (ভগবদ্) সত্তা সর্বদাই একভাবে বিরাজমান। তাই মনুষ্যমাত্রেই ক্রিয়া, পদার্থ এবং ব্যক্তির অ-ভাব অনুভব করে থাকেন, কিন্তু কেউ কখনো নিজ সত্তার (অস্তিত্বের) অ-ভাব অনুভব করেন না। নিত্য বিরাজমান এই অস্তিত্বকে অনুভব করাই হল বিবেকের দৃষ্টিতে **'বাসুদেবঃ সর্বম্'**।

(২) জগৎ-সৃষ্টির আগেও শুধুমাত্র ভগবান ছিলেন, ভবিষ্যতেও শুধু ভগবান থাকবেন, তাহলে বর্তমান সময়ে (মধ্যবর্তীকালে) ভগবান ব্যতীত অন্য সত্তা কী করে থাকবেন ?—এই যুক্তিতেও **'বাসুদেবঃ সর্বম্'** সত্য।

(৩) আমার তো শুধু ভগবানই আছেন, ভগবান ব্যতীত আমার আর কেউই নেই, আর যদি কেউ থাকে তো থাক না, তাতে আমার কী ? এই সহজ-সরল বিশ্বাসী ভক্তদের কাছে **'বাসুদেবঃ সর্বম্'** সত্য। যেমন, ব্রজধামে এক সাধু কুয়ার কাছে দাঁড়িয়ে কারো সঙ্গে কথা বলছিলেন যে, ব্রহ্ম এইরূপ, জীবের রূপ এরূপ ইত্যাদি ইত্যাদি। সেখানে একজন গোপিনী জল নিতে এলো, সে এই সব শুনে অন্য গোপিনীকে জিজ্ঞাসা করল, আরে ভাই ! এই ব্রহ্ম, জীব ইত্যাদি কী ? অন্য গোপিনী উত্তর দিল, তারা আমাদের নন্দদুলালেরই কোনো আত্মীয় স্বজন হবে, তাই সাধুরা তাদের কথা বলছেন, না হলে সাধুদের নন্দদুলাল ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে কী সম্পর্ক ?

(৪) যাঁর ভিতর ভগবদ্ তত্ত্ব জানার ব্যাকুলতা জাগে এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণার রুচি থাকে না, রাত্রে ঘুম আসে না, তিনি কোনো সাধুর কাছে শুনে বা বই পড়ে দৃঢ় নিশ্চিত হন যে, সবই ভগবান। ভগবান কেমন—তা জানেন না, কিন্তু ভগবান ব্যতীত কিছুই যে নেই— সাধুর এই কথায় বিশ্বাস রেখে **'বাসুদেবঃ সর্বম্'** মেনে নেন। সাধুর বাক্যে প্রত্যক্ষের থেকে বেশি বিশ্বাস থাকায়, তিনি সেইরূপই দেখতে থাকেন অর্থাৎ উপলব্ধি করেন।

দার্শনিক ভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় একটিমাত্র অস্তিত্বই হওয়া সম্ভব, দ্বিতীয় নয়। শ্রদ্ধা-বিশ্বাসের (ভক্তির) দৃষ্টিতে দেখলে সবই ভগবান, ভগবান ব্যতীত কিছুই নেই। ভক্তের দৃষ্টি ভগবান ছাড়া অন্য কোনো দিকে যায় না এবং ভগবান ছাড়া আর কিছুই তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—যারা ভগবানের মহত্ত্ব বুঝে তাঁর শরণাগত হয়, এরূপ ভক্তদের বর্ণনা ষোড়শ থেকে উনিশতম শ্লোকে করার পর এখন ভগবান পরবর্তী তিনটি শ্লোকে দেবতাদের শরণ গ্রহণকারী মানুষদের বর্ণনা করছেন।

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥ ২০ ॥

[তৈঃ, তৈঃ (সেইসব) ; কামৈঃ (কামনা দ্বারা) ; হৃতজ্ঞানাঃ (যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে) ; স্বয়া (নিজ নিজ) ; প্রকৃত্যা (প্রকৃতির) ; নিয়তাঃ (বশীভূত হয়ে) ; তম্, তম্ (সেই সেই) ; নিয়মম্ (নিয়মগুলি) ; আস্থায় (পালন করে) ; অন্য দেবতাঃ (ওই সকল দেবতাদের) ; প্রপদ্যন্তে (শরণাগত হয়ে থাকেন।)]

ওইসব কামনা দ্বারা যাদের বিবেক অপহৃত হয়েছে তারা নিজ নিজ প্রকৃতির (স্বভাবের) বশীভূত হয়ে অন্য দেবতাদের শরণাগত হয়ে তাদের (আরাধনার) নিয়মগুলি পালন করে থাকে[১]॥ ২০ ॥

ব্যাখ্যা—**'কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ'**—ওইসকল অর্থাৎ ইহলোক এবং পরলোকের ভোগকামনা দ্বারা যাদের জ্ঞান আবৃত হয়েছে, আচ্ছাদিত হয়েছে। তাৎপর্য হল পরমাত্মা প্রাপ্তির জন্য যে বিবেকযুক্ত মনুষ্যদেহ লাভ হয়েছে, তার দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত না করে তারা নিজ নিজ কামনাপূর্তি করাতে ব্যস্ত থাকে।

সংযোগজনিত সুখের ইচ্ছাকে কামনা বলা হয়। কামনা দু'প্রকারের—ইহলোকের ভোগসুখের জন্য ধন-সম্পদ সংগ্রহের কামনা এবং স্বর্গাদি পরলোকে ভোগের জন্য পুণ্য সংগ্রহের কামনা।

ধন-সংগ্রহের কামনা দু'প্রকারের হয়—এক, ইহলোকে ইচ্ছামতো ভোগসুখের জন্য, যখন খুশি, যেখানে ইচ্ছা এবং যত ইচ্ছা অর্থ ব্যয় করার জন্য, সুখ-আরামে কাটানোর জন্য অর্থাৎ সংযোগজনিত সুখাদির জন্য ধন-সংগ্রহের কামনা হয়। আর দ্বিতীয়, আমি ধনী হব, অর্থের জোরে অনেক বড় হব ইত্যাদির জন্য অর্থাৎ অহংকারজনিত সুখের জন্য ধন-সংগ্রহের কামনা জন্মায়। তেমনই পুণ্য সংগ্রহের কামনাও দু'প্রকারের হয়—এক, এই জগতে আমাকে পুণ্যাত্মা বলা হোক এবং দ্বিতীয়, পরলোকে যেন আমার ভোগসুখ প্রাপ্তি হয়। এইসব কামনা দ্বারা সৎ-অসৎ, নিত্য-অনিত্য, সার-অসার, বন্ধন-মোক্ষ ইত্যাদি বিবেক আচ্ছাদিত হয়। বিবেক আচ্ছাদিত হলে এইসব ব্যক্তি বুঝতে পারে না যে তারা যেসব পদার্থ কামনা করছে, সেগুলি কতদিন স্থায়ী হবে এবং তারা-ই বা কতদিন সেগুলি ভোগ করতে সক্ষম হবে ?

'প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া'[২]—কামনাগুলি দ্বারা বিবেক আচ্ছাদিত হলে এইসব ব্যক্তি নিজ প্রকৃতির দ্বারা চালিত হয় অর্থাৎ নিজ স্বভাবের বশীভূত হয়ে পড়ে। এখানে **'প্রকৃতি'** শব্দটি ব্যক্তিগত স্বভাবের বাচক, সমষ্টিগত প্রকৃতির বাচক নয়। এই ব্যক্তিগত স্বভাব সকলের মধ্যেই প্রধান হয়—**'স্বভাবো মূর্ধ্নি বর্ততে'**। তাই ব্যক্তিগত স্বভাব কেউ পরিত্যাগ করতে পারে না—**'যা যস্য প্রকৃতিঃ স্বভাবজনিতা কেনাপি ন ত্যজ্যতে'**। কিন্তু এই স্বভাবে যে দোষ থাকে, সেগুলি মানুষ অবশ্যই ত্যাগ করতে পারে। মানুষ যদি ওই দোষগুলি পরিত্যাগ করতে সক্ষম না হয়, তাহলে মনুষ্য-জন্মের সার্থকতা কী ? মানুষ তার স্বভাবকে নির্দোষ, শুদ্ধ করতে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন। কিন্তু তার মধ্যে যতক্ষণ কামনাপূর্তির উদ্দেশ্য থাকে, ততক্ষণ সে তার স্বভাব শোধরাতে পারে না এবং ততদিন পর্যন্ত তার মধ্যে স্বভাবের প্রাবল্য এবং নিজের দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু যার কামনা দূর করার উদ্দেশ্য থাকে, সে তার স্বভাব শোধরাতে সক্ষম হয় অর্থাৎ তার আর প্রকৃতির

[১]এই অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে বর্ণিত পুরুষদের জ্ঞান মায়া দ্বারা আবৃত থাকে আর এখানে বর্ণিত পুরুষদের জ্ঞান কামনা দ্বারা আবৃত থাকে। ওই স্থানে বর্ণিত ব্যক্তিগণ কামনাপূর্তির জন্য জড়-পদার্থের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং এইস্থানে বর্ণিত ব্যক্তিগণ কামনাপূর্তির নিমিত্ত দেবতাদের আশ্রয় গ্রহণ করে। ওই স্থানের ব্যক্তিগণ দুষ্ট স্বভাবের জন্য নরকে গমন করে এবং এই স্থানের ব্যক্তিগণ কামনাবশতঃ বারংবার জন্ম-মরণ প্রাপ্ত হয়।

[২]এখানে যে 'প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া' বলা হয়েছে, এটিই সপ্তদশ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে 'যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ' বলা হয়েছে। 'স্বয়া' বলার অর্থ হল যে, নিজ প্রকৃতি অনুসারে মানুষের কামনাও পৃথক্ পৃথক্ হয়।

বশ্যতা থাকে না।

'তং তং নিয়মমাস্থায়'—কামনাসক্ত মানুষ প্রকৃতির বশ হওয়ায় কামনাপূর্তির জন্য নানা উপায় এবং নিয়ম খুঁজতে থাকে—যজ্ঞ করলে কামনা পূরণ হবে, না কি তপ করলে ? দান করলে কামনা পূর্তি হবে, না কি কোনো মন্ত্র জপ করলে হবে ? ইত্যাদি নানা উপায় সে খুঁজতে থাকে। ওইসব উপায় এবং বিধি অর্থাৎ নিয়মও পৃথক্ পৃথক্ হয়ে থাকে। যেমন—এই কামনাপূর্তির জন্য এই বিধিতে যজ্ঞ করতে হবে এবং কোনো নির্দিষ্ট স্থানে করতে হবে ইত্যাদি। এইভাবে মানুষ তার কামনা পূরণের জন্য নানা উপায় এবং নিয়ম পালন করতে থাকে।

'প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ'—কামনাপূর্তির জন্য নানা উপায় এবং ব্রতাদি পালন দ্বারা মানুষ বিবিধ দেবতাদের শরণ গ্রহণ করে থাকে ; ভগবানের শরণাগত হয় না। এখানে **'অন্যদেবতাঃ'** বলার তাৎপর্য হল যে তারা দেবতাদের ভগবদ্স্বরূপ মনে করে না, তাঁদের পৃথক্ অস্তিত্বসম্পন্ন বলে মনে করে, তাই তাদের অন্তযুক্ত অর্থাৎ বিনাশশীল ফল প্রাপ্তি হয়—**'অন্তবত্তু ফলং তেষাম্'** (গীতা ৭।২৩)। তারা যদি দেবতাদের পৃথক্ অস্তিত্ব না ভেবে ভগবদ্স্বরূপ বলে মনে করে তবে আর তাদের বিনাশশীল ফল প্রাপ্তি হয় না, বরং অবিনাশী ফল লাভ হয়।

এখানে দেবতাদের শরণ নেওয়াতে দুটি কারণ প্রধান হয়েছে—প্রথমটি হল, কামনা আর দ্বিতীয়টি হল নিজ স্বভাবের বশ্যতা।

পরিশিষ্ট-ভাব—ভগবানের অর্থার্থী এবং আর্ত ভক্তদের যা কামনা থাকে, সেইসব কামনা এই শ্লোকে বর্ণিত মানুষদের মধ্যেও থাকে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হল এই যে অর্থার্থী এবং আর্ত ভক্তদের মধ্যে কামনার প্রাধান্য থাকে না, ভগবানেরই প্রাধান্য থাকে, তাই তাঁরা **'হৃতজ্ঞানাঃ'** নন। অপরপক্ষে এইস্থানে বর্ণিত মানুষদের মধ্যে কামনার প্রাধান্য থাকে, সেইজন্য এঁরা **'হৃতজ্ঞানাঃ'**।

অর্থার্থী এবং আর্ত ভক্ত শুধুমাত্র ভগবানের শরণাগত হন, কিন্তু এইসব ব্যক্তি ভগবানকে ছেড়ে অন্য দেবতাদের শরণ নেয়। কামনা, দেবতা, মানুষ এবং নিয়ম এগুলি সব বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। কামনা যদি বিভিন্ন প্রকারেরও হয় কিন্তু উপাস্য যদি একমাত্র পরমাত্মা হন তাহলে সেই উপাস্যদেব উপাসককে উদ্ধার করে থাকেন। কিন্তু কামনাও বিভিন্ন প্রকারের আবার উপাস্যদেবতাও বিভিন্ন হলে উপাসককে কে উদ্ধার করবেন ?

একমাত্র ভগবান ব্যতীত অন্য কোনো বস্তু নেই—সুখের কামনার জন্য এই জ্ঞান আবৃত হয়ে যায়। এই কামনা প্রকৃতিরও সৃষ্ট নয়, পরমাত্মাও সৃষ্টি করেননি, এটি মানুষেরই নিজের সৃষ্টি করা। তাই এটি দূর করার দায়িত্বও মানুষের উপরই ন্যস্ত। **'হৃতজ্ঞানাঃ'** বলার অর্থ হল এই যে, এই জ্ঞান নষ্ট হয়নি, কামনার জন্য এই জ্ঞান আবৃত হয়ে রয়েছে। এই কথাগুলি গীতায় **'মায়য়াপহৃতজ্ঞানাঃ'** (৭।১৫), **'অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানম্'** (৫।১৫) ইত্যাদি পদগুলিতেও বলা হয়েছে।

এই অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে উদ্ধৃত **'মায়য়াপহৃতজ্ঞানাঃ'** পদটিতে তমোগুণের প্রাধান্য ও রজোগুণের গৌণতা থাকে, কিন্তু এখানে উদ্ধৃত **'কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ'** পদটিতে রজোগুণের প্রাধান্য এবং তমোগুণের গৌণতা আছে। **'মায়য়াপহৃতজ্ঞানাঃ'** পদটিতে অর্থের আকাঙ্ক্ষা মুখ্য থাকে আর **'কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ'** পদটিতে ভোগের ইচ্ছাই মুখ্য হয়ে থাকে। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হল এই যে মায়াদ্বারা অপহৃত-জ্ঞান ব্যক্তি দেবপূজা করেন না, কিন্তু কামনা দ্বারা অপহৃত-জ্ঞান মানুষ দেবপূজা করতে পারেন। কেন-না অর্থে অরুচি হয় না—**'জিমি প্রতিলাভ লোভ অধিকাঈ'**, কিন্তু ভোগে অরুচি হয়ে থাকে। **'মায়য়াপহৃতজ্ঞানাঃ'** হওয়ায় আসুরীভাব, মিথ্যাচার, কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদির আশ্রয় নেওয়া হয়, কিন্তু **'কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ'**-র ক্ষেত্রে দেবতাদের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। তাই **'মায়য়াপহৃতজ্ঞানাঃ'**-তে বিশেষভাবে জড়ত্ব থাকে, কিন্তু **'কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ'**- তে সেই তুলনায় বেশি চৈতন্য থাকে[১]।

* * *

[১]যিনি নিজেকে এবং অপরকেও জানেন, তিনি 'চেতন' আর যিনি নিজেকে বা অপরকে জানেন না, তিনি 'জড়'।

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥ ২১ ॥

[যঃ, যঃ (যে যে) ; ভক্তঃ (ভক্ত) ; যাম্, যাম্[১] (যে যে) ; তনুম্ (দেবতার) ; শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধার সঙ্গে) ; অর্চিতুম্ (পূজা করতে) ; ইচ্ছতি (ইচ্ছুক) ; তস্য, তস্য (সেই সেই দেবতাদের) ; এব (প্রতিই) ; অহম্ (আমি) ; তাম্ (তার) ; শ্রদ্ধাম্ (শ্রদ্ধা) ; অচলাম্ (অচলা) ; বিদধামি (করে দিই।)]

ভক্ত যে যে দেবতার পূজা করতে ইচ্ছুক, আমি সেই সেই দেবতার প্রতি তার ভক্তি অচলা করে দিই॥ ২১॥

ব্যাখ্যা—**'যো যো যাং যাং তনুং ভক্ত......তামেব বিদধাম্যহম্'**—মানুষ যে যে দেবতার ভক্ত হয়ে শ্রদ্ধা সহকারে ভজন-পূজন করতে চায়, সেই সেই মানুষের শ্রদ্ধা সেইসব দেবতার প্রতি আমি অচলা (দৃঢ়) করে দিই। তারা অন্যতে আসক্ত না হয়ে আমাতেই আসক্ত হোক—এরূপ আমি করি না। যদিও দেবতার শরণাগত হওয়ায় তাদের কল্যাণ হয় না, তবুও আমি তাদের চিত্ত ওই দেবতাদের প্রতি নিবিষ্ট করি। আর আমার প্রতি যাদের শ্রদ্ধা প্রেম থাকে, যারা নিজ কল্যাণ চায়, তাদের শ্রদ্ধা আমি আমাতেই দৃঢ় করে রাখি। কারণ আমি প্রাণিমাত্রেরই সুহৃদ্—**'সুহৃদং সর্বভূতানাম্'** (গীতা ৫।২৯)।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, আপনি সকলের শ্রদ্ধা আপনাতে কেন দৃঢ় করে দেন না ? তাতে যেন ভগবান বলছেন যে, যদি আমি সবার শ্রদ্ধা আমার প্রতি দৃঢ় করি তাহলে মনুষ্য-জন্মের স্বাধীনতা, সার্থকতা কোথায় থাকে ? আর এতে আমার স্বার্থপরতাই প্রমাণিত হয়। মানুষকে আমার প্রতি আসক্ত করার যদি আমার আগ্রহ হয়, তবে সেটা কোনো বড় কিছু নয়। কারণ এই পৃথিবীর সমস্ত স্বার্থপর জীবের এটাই হল স্বাভাবিক ব্যবহার। কাজেই এই স্বার্থভাব না রেখে স্বভাব শোধরানোর এই প্রেরণা আমি প্রদান করি যাতে কেউ যেন পক্ষপাতিত্ব করে অন্যের কাছ থেকে নিজের পূজা-প্রতিষ্ঠা করাতে ব্যস্ত না থাকে এবং কাউকে যেন পরাধীন না করে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হল এই যে, আপনি ওইসব মানুষের শ্রদ্ধা ওইসব দেবতাতে দৃঢ় করে দেন, এর দ্বারা আপনার সাধুত্ব তো প্রমাণিত হল, কিন্তু ওইসব মানুষদের আপনার প্রতি বিমুখ হওয়ায় তো তাদের অকল্যাণই হয় ? এর উত্তর হল যে, যদি আমি তাদের শ্রদ্ধা অন্য দেবতা থেকে সরিয়ে আমার দিকে আনি তাহলে তাদের আমার প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মাবে। কিন্তু তা না করে যদি আমি তাদের স্বাধীনতা দিই, তবে তাদের মধ্যে যারা কিছুটা বিবেক-বোধসম্পন্ন তারা আমার এই ব্যবহারে আমার প্রতিই আকৃষ্ট হবে। অতএব তাদের উদ্ধারের এই উপায়ই হল সর্বাপেক্ষা উত্তম।

এবার তৃতীয় প্রশ্ন হল যে, আপনি যখন নিজেই এদের শ্রদ্ধা অন্যদের প্রতি দৃঢ় করে দেন, তখন সেই শ্রদ্ধা তো দূর হবার নয়। তাহলে তাদের পতন তো হতেই থাকবে। তার উত্তর হল যে, আমি তাদের শ্রদ্ধা কেবল দেবতাদের প্রতিই দৃঢ় করি, অন্যদের প্রতি করি না—তা নয় ; আমি তাদের ইচ্ছানুযায়ীই তাদের শ্রদ্ধা দৃঢ় করে থাকি। মানুষ তার ইচ্ছা পরিবর্তন করতে সম্পূর্ণ স্বাধীন, সমর্থ। ইচ্ছা পরিবর্তন করায় তারা অবশ, হীনবল বা অযোগ্য নয়। ইচ্ছা পরিবর্তন করাতে তারা যদি অশক্ত হবে তবে আর মনুষ্য-জন্মের সার্থকতা কী ? আর আমার দ্বারা তাদের ইচ্ছা (কামনা) পরিত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া সঙ্গত হয় না **'জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দূরাসদম্'** (গীতা ৩।৪৩) ?

পরিশিষ্ট-ভাব— প্রায়শঃ মানুষ অন্য ব্যক্তিদের নিজের দিকে টানতে চায়, নিজের শিষ্য বা দাস করতে চায়, নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে আনতে চায়, নিজেকে অন্যের কাছে শ্রদ্ধার্হ করে তুলতে চায়, যাতে তাকে সকলে পূজা করে, শ্রদ্ধা ও সম্মান করে, তার কথা শোনে। কিন্তু ভগবান সবার নিয়ন্তা হয়েও, তিনি কাউকেও তাঁর অধীন করে রাখেন না।

---

[১]এখানে যেমন 'যো যঃ, যাং যাম্' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তেমনি অষ্টম অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে 'যং যং বাপি স্মরন্ ভাবম্' উদ্ধৃত হয়েছে। দু'বার 'যৎ' শব্দের অর্থাৎ 'যো যো' 'যাং যাম্' এবং 'যং যম্' শব্দগুলির প্রয়োগ করার তাৎপর্য হল যে, মানুষ যেমন উপাসনা করতে স্বাধীন অর্থাৎ দেবতাদের ভজনা করুক বা আমার ভজনা করুক—এতে সে স্বাধীন, তেমনি মৃত্যুকালেও স্মরণ করাতে মানুষ পুরোপুরি স্বাধীন অর্থাৎ আমাকে স্মরণ করুক বা অন্য কাকেও—এতেও সে স্বাধীন।

অপরপক্ষে যার যেখানে শ্রদ্ধাভক্তি, সেখানেই তা দৃঢ় করে দেন—এ যে ভগবানের কত উদারতা ও নিরপেক্ষতা তা বলার নয়!

ভগবানের দৃষ্টিতে সবই তাঁর স্বরূপ—**'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি'**। তাই ভগবানের কারো প্রতি বিন্দুমাত্রও পক্ষপাতিত্ব নেই। কিন্তু ভগবানের এই পক্ষপাতশূন্য স্বভাব সহজে বোঝা যায় না, গভীরভাবে বিচার করলে তবেই বোঝা যায়। কেউ যদি তাঁর এই স্বভাব বুঝতে পারে, তাহলে সে ভগবানের অনুরক্ত হয়—

উমা রাম সুভাউ জেহিঁ জানা। তাহি ভজনু তজি ভাব ন আনা॥ (শ্রীরামচরিতমানস, সুন্দরকাণ্ড. ৩৪।২)

স সর্ববিদ্ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত॥ (গীতা ১৫।১৯)

তিনিই অপরকে দাস বানান, যার মধ্যে কোনো কিছুর অভাব থাকে। ভগবানের কোনো কিছুরই অভাব নেই, তাহলে তিনি কেন কাউকে তাঁর দাস বা অধীন করবেন ? কিন্তু যদি কেউ তাঁর দাস হতে চায় তাহলে তিনি তাকে বারণ করেন না এবং দয়াপরবশ হয়ে তার দাস ভাব গ্রহণ করেন। ভগবানের এ এক বিশেষ উদারতা ! যেমন কোনো শিশুকে দেখে যদি কোনো ব্যক্তি আনন্দিত হন তবে তার মানে এই নয় যে সেই শিশুটির প্রতি তাঁর কোনো স্বার্থভাব আছে। তেমনই যিনি ভগবানের দাস হন, ভগবান তার প্রতি প্রসন্ন হন, আনন্দিত হন—**'মোরেঁ অধিক দাস পর প্রীতি'** (শ্রীরামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ১৬।৪)। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে অর্জুন যখন ভগবানের বলা **'যথেচ্ছসি তথা কুরু'** শুনে হতভম্ব হয়ে গেলেন, তখন ভগবান দয়াপরবশ হয়ে অর্জুনকে বলেন—তুমি আমার শরণাগত হও—**'মামেকং শরণং ব্রজ'** (১৮।৬৬)। কিন্তু একথা বলার আগে ভগবান বলেছিলেন যে, এটি সব থেকে গোপনীয় কথা (১৮।৬৪), আবার পরেও বলেছেন যে, এই কথা সবাইকে বলবে না (১৮।৬৭)। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অপরকে তাঁর দাস বানাবার ইচ্ছা না থাকলেও, মানুষ যদি অন্য কোনো সহায়তা না পেয়ে বিহ্বল হয়ে তাঁর দাসত্ব স্বীকার করতে চায়, তাহলে ভগবান দয়াপরবশ হয়ে তাকে গ্রহণ করেন। অর্থাৎ যদি কেউ অন্য কোনো দেবতাকে শ্রদ্ধা করে, ভগবান সেই ব্যক্তির শ্রদ্ধা ওই দেবতাতেই দৃঢ় করে দেন তাহলে যিনি ভগবানে শ্রদ্ধা রাখেন, তাঁর শ্রদ্ধা যে ভগবান নিজেতেই দৃঢ় করে রাখবেন—এতে আর সন্দেহের কি আছে! কেন-না ভগবানের দৃষ্টি সর্বদাই ভক্তের হিতের দিকে থাকে, নিজের স্বার্থের প্রতি নয়।

※ ※ ※

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥ ২২ ॥

[**তয়া** (সেই) ; **শ্রদ্ধয়া** (শ্রদ্ধা) ; **যুক্তঃ** (যুক্ত হয়ে) ; **সঃ** (ওই ব্যক্তি) ; **তস্য** (ওই দেবতার) ; **আরাধনম্** (উপাসনা) ; **ঈহতে** (করে) ; **ততঃ** (তার) ; **কামান্** (কামনা) ; **লভতে** (পূরণও হয়) ; **হি** (কিন্তু) ; **তান্** (সেই কামনা পূর্তি) ; **এব** (আমা কর্তৃকই) ; **বিহিতান্** (বিহিত হয়ে থাকে।)]

ওই (আমা দ্বারা দৃঢ়ীকৃত) শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে ওই ব্যক্তি (সকামভাবে) ওই দেবতার উপাসনা করে এবং তার কামনার পূরণও হয়। কিন্তু সেই কামনা-পূর্তি আমা কর্তৃকই বিহিত হয়ে থাকে॥ ২২ ॥

ব্যাখ্যা—**'স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ......ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্'**—আমার দ্বারা দৃঢ়ীকৃত শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তি সেইসব দেবতার আরাধনায় সচেষ্ট হয় এবং তাঁর থেকে যে কামনা পূরণের আশা করে, সেই কামনার পূর্তি যদিও প্রকৃতপক্ষে আমার বিধান অনুসারেই হয়, কিন্তু ওই ব্যক্তি মনে করে এগুলি ওই দেবতা দ্বারা পূরণ হয়েছে। দেবতাদের মধ্যে আসলে আমার শক্তিই নিহিত থাকে এবং আমার বিধানেই তাঁরা সেবকের কামনা পূরণ করেন।

যেমন, সরকারি অফিসারদের এক সীমিত অধিকার দেওয়া হয় যে, তোমরা অমুক বিভাগে, অমুক ব্যাপারে এতটা খরচ করতে পার, এত বকশিশ দিতে পার তেমনই দেবতাদেরও দেবার ক্ষমতার একটি সীমা আছে, তাঁরা ততটাই দিতে পারেন, তার বেশি নয়। দেবতাদের সব

থেকে অধিক এই শক্তি আছে যে, তাঁরা তাঁদের ভক্তকে নিজ নিজ লোকে নিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু উপাসনার ফল-ভোগ শেষ হলে তাদের সেখান থেকে ফিরে আসতেই হয় (গীতা ৮।১৬)।

এখানে **'ময়ৈব'** বলার অর্থ হল জগতে স্বাভাবিকভাবে যা কিছু সঞ্চালিত হচ্ছে, তা সবই আমার দ্বারা বিহিত। সুতরাং যার যা কিছু প্রাপ্তি হয়, তা আমার বিধান দ্বারাই হয়। কারণ আমি ছাড়া বিধানকারী আর কেউ নেই। কোনো মানুষ যদি এটি ঠিকভাবে জানতে সক্ষম হয় তাহলে সে আমার দিকেই আকৃষ্ট হয়ে থাকে।

পরিশিষ্ট-ভাব—ভগবান সকল দেবতাকে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে সীমাবদ্ধ অধিকার দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু ভগবানের অধিকার বা ক্ষমতা অসীম। তাঁর বিশেষত্ব হল যে তিনি কাউকে শাসন করেন না, কাউকে তাঁর দাস বা শিষ্য করেন না, বরং তিনি সকলকেই তাঁর মিত্র বলে থাকেন এবং তাঁর সমান মনে করে থাকেন। যেমন, নিষাদরাজ ছিলেন এক সিদ্ধভক্ত, বিভীষণ ছিলেন সাধক, সুগ্রীব ছিলেন বিষয়ী, কিন্তু ভগবান শ্রীরাম এই তিন জনকেই তাঁর বন্ধুর স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। কোনো দেবতার মধ্যেই এই বিশেষত্ব নেই। তাই বেদাদি গ্রন্থেও ভগবানকে জীবগণের বন্ধু বলা হয়েছে—

'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।'

(মুণ্ডকোপনিষদ্ ৩।১।১, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ৪।৬)

গীতাতেও ভগবান অর্জুনকে বলেছেন—**'ভক্তোঽসি মে সখা চেতি'** (৪।৩)। ভগবান এখানে অর্জুনের দৃষ্টিতে **'ভক্ত'**[১] বললেও, তাঁর দৃষ্টিতে **'সখা'** বলেই উল্লেখ করেছেন। **'মমৈবাংশো জীবলোকে'** (১৫।৭) এই পদটিতেও ভগবান **'এব'** পদটির দ্বারা জীব তাঁর সাক্ষাৎ স্বরূপ বলে জানিয়েছেন। এরা আমারই অংশ—একথা বলার অর্থ হল যে এর মধ্যে প্রকৃতির কোনো অংশ নেই।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—এবার ভগবান উপাসনা অনুসারে ফলের বর্ণনা করছেন।

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥ ২৩ ॥

[তু (কিন্তু) ; তেষাম্ (সেই) ; অল্পমেধসাম্ (অল্পবুদ্ধি মানুষদের) ; তৎ (ওইসব দেবতাদের আরাধনার) ; ফলম্ (ফল) ; অন্তবৎ (বিনাশশীল) ; ভবতি (হয়ে থাকে) ; দেবযজঃ (যাঁরা দেবতাদের পূজা করেন) ; দেবান্ (দেবতাদের) ; যান্তি (লাভ করেন) ; মদ্ভক্তা (আমার ভক্তগণ) ; মাম্ অপি (আমাকেই) ; যান্তি (লাভ করেন।)]

কিন্তু সেই অল্পবুদ্ধি মানুষদের ওইসকল দেবতাদের আরাধনার ফল বিনাশশীল হয়ে থাকে। দেবতাদের পূজা করেন যাঁরা, তাঁরা দেবতাদের লাভ করেন আর আমার ভক্তগণ আমাকেই লাভ করেন ॥ ২৩ ॥

ব্যাখ্যা—'অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্'—দেবতাদের পূজক অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিরা অন্তযুক্ত অর্থাৎ সীমিত ও বিনাশশীল ফল লাভ করে। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, ভগবানের বিধান করা ফল তো নিত্য হওয়া উচিত, তাহলে তাদের অনিত্য ফল কেন লাভ হয় ? এর উত্তর হল যে—প্রথমতঃ তাদের বিনাশশীল পদার্থের কামনাই থাকে এবং দ্বিতীয়তঃ তারা দেবতাদের ভগবানের থেকে আলাদা বলে মনে করে। সেইজন্যই তাদের বিনাশশীল ফল লাভ হয়। দুটি উপায়ে তারা অবিনাশী ফল লাভ করতে পারে—এক, যদি তারা কামনা না রেখে (নিষ্কামভাবে) দেবগণের উপাসনা করে তাহলে তাদের অবিনাশী ফল প্রাপ্ত হয়। আর দ্বিতীয়, তারা দেবগণকে ভগবান হতে পৃথক্ মনে না করে অর্থাৎ ভগবৎ-স্বরূপই মনে করে যদি তাঁদের আরাধনা করে তাহলে কামনা থাকলেও, তা ক্রমশঃ দূর হয়ে তারা অবিনাশী ফল লাভ করতে সক্ষম হয় অর্থাৎ ভগবানকে লাভ করতে পারে।

[১]ভগবান অর্জুনের দৃষ্টিতে তাকে 'ভক্ত' কথাটি এই জন্য বলেছেন যে, অর্জুন ভগবানের শরণাগতি স্বীকার করে নিয়েছিলেন—'শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্' (গীতা ২।৭)।

এখানে 'তৎ' বলার অর্থ এই যে, আমার দ্বারা বিহিত ফলই লাভ হয়, কিন্তু কামনা থাকায় সেটি বিনাশশীল হয়ে থাকে।

'অল্পমেধসাম্' বলার অর্থ হল যে ওইসব ব্যক্তিকে অনেক বিধি-নিয়ম পালন করতে হয়, কিন্তু তাতে সীমিত ও বিনাশশীল ফল প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আমাকে আরাধনা করতে গেলে এত বিধি-নিয়মের প্রয়োজনীয়তা থাকে না আর তাতে অসীম, অনন্ত ফল লাভ হয়। এইরূপ দেবতাদের উপাসনার নিয়ম বেশি, ফল অল্প এবং তাতে জন্ম-মৃত্যুরূপ বন্ধন দশা ঘটে। আর আমার আরাধনাতে নিয়ম কম, ফল বেশি এবং কল্যাণ লাভ হয়। তা সত্ত্বেও মানুষ ওইসব দেবতার উপাসনায় ব্যাপৃত হয়, আমার উপাসনাতে নয়। তাই তাদের বুদ্ধি অল্প এবং তুচ্ছ।

'দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি'—দেবতাদের পূজকগণ দেবতাদের প্রাপ্ত হয় আর আমাকে যারা পূজা করে, তারা আমাকেই প্রাপ্ত হয়। 'অপি' পদটির দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, আমার উপাসনাকারীদেরও কামনা পূরণ হতে পারে এবং আমাকে তো তারা প্রাপ্ত করেই অর্থাৎ আমার ভক্ত সকাম হোক বা নিষ্কাম, তারা সকলেই আমাকে প্রাপ্ত হয়। তবে ভগবানের উপাসনাকারীদের সমস্ত কামনাই যে পূরণ হবে, এমন কোনো নিয়ম নেই। ভগবান উচিত মনে করলে কামনা পূর্ণ করতেও পারেন আর না-ও করতে পারেন অর্থাৎ তাদের মঙ্গল হলে কামনা পূর্ণ করেন আর যদি মঙ্গল না মনে করেন তাহলে অনেক ডাকলে বা কাঁদলেও তা পূরণ করেন না।

নিয়ম হল ভগবদ্-ভজন করলে ভগবানের নিত্য-সম্বন্ধের স্মৃতি জেগে ওঠে। কারণ ভগবানের সম্বন্ধ চির বিরাজমান। তাই ভগবদ্-প্রাপ্তি হলে আর সংসারে ফিরে আসতে হয় না—**'যদ্‌গত্বা ন নিবর্তন্তে'** (১৫।৬)। কিন্তু দেবতাদের সম্বন্ধ চিরস্থায়ী নয়। কারণ এটি কর্মজনিত। সুতরাং দেবলোক প্রাপ্তি হলেও জগতে ফিরে আসতে হয়—**'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি'** (৯।২১)।

আমার উপাসনাকারিগণ আমাকেই প্রাপ্ত হয়—এই ভাব নিয়েই ভগবান অর্থার্থী, আর্ত, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী—এই চার-প্রকারের ভক্তদের মহান এবং উদার বলেছেন (৭।১৬, ১৮)।

'মদ্ভক্তা যান্তি মামপি'র অর্থ হল যে, জীব যেমন আচরণ-ই করুক অর্থাৎ যতই দুরাচারী হোক, কিন্তু তারা তো আমারই অংশ। তারা কেবল আসক্তি এবং আগ্রহবশে সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে। যদি তাদের সংসারে আসক্তি এবং আগ্রহ না থাকে, তবে তারা আমাকেই লাভ করবে।

বিশেষ কথা

সবই ভগবদ্-স্বরূপ আর ভগবানের বিধানও ভগবদ্-স্বরূপ। তা সত্ত্বেও ভগবান ভিন্ন জগতের অস্তিত্ব মানা এবং তাতে কামনা রাখা—এই দুটিই হল পতনের কারণ। এর মধ্যে কামনা যদি সর্বতোভাবে নাশ হয়, তাহলে জগৎ-সংসার ভগবদ্-স্বরূপ বলে প্রতীয়মান হয় আর যদি সংসারকে ভগবদ্-স্বরূপ বলে মনে হয় তাহলে কামনা দূর হয়। তখন সকল ক্রিয়ার দ্বারাই ভগবানের সেবা হতে থাকবে। যদি জগৎ-সংসারকে ভগবদ্-স্বরূপ বলে দেখা এবং কামনা দূর হওয়া—দুটিই একসঙ্গে হয়—তাহলে আর বলার কী আছে!

পরিশিষ্ট-ভাব—দেবতাদের উপাসনাকারী ব্যক্তিগণ খুব বেশি হলে দেবতাদের পুনরাবর্তীলোকেই গমন করতে পারে। কিন্তু ভগবানের উপাসনাকারী ব্যক্তিগণ ভগবানকেই লাভ করেন। তবে সাধকের যদি দেবতাতে ভগবদ্-বুদ্ধি থাকে অথবা তার মধ্যে নিষ্কামভাব থাকে তবে সে উদ্ধার লাভ করে অর্থাৎ ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যদি দেবতাতে ভগবদ্-বুদ্ধি না থাকে এবং তার মধ্যে নিষ্কামভাব না থাকে তাহলে উদ্ধার লাভ করে না।

দেবতাকে উপাসনার দোষ হল এই যে, তার ফল অন্তযুক্ত অর্থাৎ বিনাশশীল হয়। কারণ দেবতা নিজেও সীমিত ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে থাকেন। সুতরাং যাঁরা ভগবানকে বাদ দিয়ে দেবতাদের উপাসনা করে, তারা অল্পবুদ্ধির মানুষ। এঁরা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন না হলে কি বিনাশশীল ফলপ্রদানকারী দেবতাদের আরাধনা করতেন? তাঁরা তাহলে ভগবানের আরাধনাই করতেন অথবা দেবতাতে ভগবদ্-বুদ্ধি রাখতেন। ভগবানের আরাধনা করাও অত্যন্ত সহজ, এতে কোনো বিধি, নিয়ম বা পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না। তাঁর আরাধনায় শুধু ভাবের প্রাধান্য থাকে। দেবতার উপাসনাতে কিন্তু ক্রিয়া, বিধি এবং পদার্থের প্রাধান্য থাকে।

জগতে মানুষের বিদ্যা-কলা-কৌশল ইত্যাদি যত প্রকার জ্ঞানই হোক না কেন তবুও সে **'অল্পমেধা'**ই (তুচ্ছবুদ্ধিসম্পন্ন) থাকে। সেই বুদ্ধি প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞানভাবকেই দৃঢ় করে তোলে। কিন্তু যিনি ভগবানকে জেনেছেন, তাঁর

কোনোরূপ জাগতিক বিদ্যা-কলা-কৌশল ইত্যাদির জ্ঞান না থাকলেও তিনি **'সর্ববিৎ'** (সকল জ্ঞানসম্পন্ন) হয়ে থাকেন (গীতা ১৫।১৯)।

সম্বন্ধ—যদিও দেবতাগণের উপাসনার ফল সীমিত ও বিনাশশীল, তবুও মানুষ সেই পথে যায়, ভগবানের দিকে কেন নয়—পরবর্তী শ্লোকে তারই উত্তর দিয়েছেন।

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥ ২৪ ॥

[**অবুদ্ধয়** (অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ) ; **মম** (আমার) ; **পরম** (পরম) ; **অব্যয়ম্** (অবিনাশী) ; **অনুত্তমম্** (সর্বোৎকৃষ্ট) ; **ভাবম্** (ভাব) ; **অজানন্তঃ** (না জেনে) ; **অব্যক্তম্** (অব্যক্ত) ; **মাম্** (আমাকে) ; **ব্যক্তিম্** (মানুষের ন্যায় শরীর) ; **আপন্নম্** (ধারণকারী) ; **মন্যতে** (মনে করে।)]

অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ আমার সর্বোৎকৃষ্ট পরমভাব না জেনে অব্যক্ত (মন-ইন্দ্রিয়াদির অতীত) আমাকে, —সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মাকে, মানুষের ন্যায় শরীর ধারণকারী বলে মনে করে থাকে ॥ ২৪ ॥

ব্যাখ্যা—**'অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং.................. মমাব্যয়মনুত্তমম্'**—যেসব মানুষ নির্বুদ্ধি এবং আমাতে যাদের শ্রদ্ধা ভক্তি নেই, তারা স্বল্পবুদ্ধিবশতঃ অর্থাৎ বুঝতে না পারায় আমাকে সাধারণ মানুষের মতো জন্ম-মৃত্যু পরিগ্রহকারী বলে মনে করে থাকে। আমার অবিনাশী অব্যয়ভাব অর্থাৎ যার থেকে বড় কেউ হতেই পারে না এবং যা দেশ-কাল-বস্তু-ব্যক্তি ইত্যাদিতে পরিপূর্ণভাবে থেকেও সেগুলির অতীত, সর্বদা একইরূপে বিরাজিত, নির্মল এবং অসম্বন্ধ—আমার এই অবিনাশী ভাবটি তারা জানতে পারে না আর আমার অবতাররূপ গ্রহণের যে তত্ত্ব, তা-ও জানতে পারে না। তাই তারা আমাকে সাধারণ মানুষ মনে করে আমার উপাসনা করে না, দেবতাগণের উপাসনা করে থাকে।

'অবুদ্ধয়ঃ' পদের অর্থ এই নয় যে তাদের বুদ্ধির অভাব। প্রত্যুত তাদের বুদ্ধিতে বিবেক-বোধ থাকা সত্ত্বেও অর্থাৎ জগৎকে উৎপত্তি ও বিনাশশীল জেনেও তারা এটা মানে না—এটাই তাদের নির্বুদ্ধিতা বা মূঢ়তা।

অন্য একটি ভাব হল এই যে, কামনাকে কেউ ধরে রাখতে পারে না, কামনা টিকে থাকতে পারে না ; কারণ কামনা আগে ছিল না এবং পূরণ হয়ে গেলেও আর থাকবে না। কামনার অস্তিত্ব বাস্তবে নেই, তবুও তারা তাকে বর্জন করতে পারে না—এটিই হল তাদের নির্বুদ্ধিতা।

আমার স্বরূপ না জেনে তারা অন্যান্য দেবতাদের উপাসনায় ব্যাপৃত হয় এবং উৎপত্তি ও বিনাশশীল পদার্থের কামনায় আসক্ত হওয়ায় এই অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ আমা হতে বিমুখ হয়ে পড়ে। যদিও এরা আমার থেকে পৃথক্ হতে পারে না বা আমিও এদের থেকে আলাদা হতে পারি না, তাহলেও কামনাবশতঃ জ্ঞান আবৃত হওয়ায় এরা দেবতাতে আকর্ষিত হয়। যদি এরা আমাকে জানত, তাহলে আমারই ভজনা করত।

১) তারাই বুদ্ধিমান যারা ভগবানের শরণাগত হয়। তারা ভগবানকে সবার ওপরে বলে মনে করে।

২) অল্পবুদ্ধি মানুষেরা দেবতাদের শরণ গ্রহণ করে। তারা দেবতাদের নিজেদের থেকে বড় বলে মনে করে, তার জন্য তাদের মধ্যে কিছু নম্রতা ও সরলতা থাকে।

৩) নির্বুদ্ধি ব্যক্তিরা ভগবানকে দেবতাদের মতোও মানে না ; সাধারণ মানুষ বলে মনে করে। তারা নিজেদের সবার ওপরে এবং সব থেকে বড় বলে মনে করে (গীতা১৬।১৪-১৫), তিনটির মধ্যে এই হল পার্থক্য।

'পরং ভাবমজানন্তঃ'—এর তাৎপর্য হল এই যে, আমি অজ, অবিনাশী এবং সমস্ত লোকের ঈশ্বর হয়েও নিজ প্রকৃতিকে বশীভূত করে যোগমায়া দ্বারা প্রকটিত হই— অল্পবুদ্ধি মানুষেরা আমার এই পরম ভাবকে জানে না।

'অনুত্তমম্' বলার তাৎপর্য হল এই যে, পঞ্চদশ অধ্যায়ে যাকে ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর থেকে উত্তম বলেছেন অর্থাৎ যার থেকে উত্তম কেউ হতে পারে না,

তাঁর এই অনুত্তম ভাবকে তারা জানে না।

বিশেষ কথা

এই (চব্বিশতম) শ্লোকের অর্থ কেউ কেউ এরূপ করে থাকেন যে, '(যে) অব্যক্তং মাং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে (তে) অবুদ্ধয়ঃ' অর্থাৎ যারা সদা নিরাকারভাবে স্থিত আমাকে কেবল সাকার বলে মনে করে তারা নির্বুদ্ধি, কেন-না তারা আমার অব্যক্ত, নির্বিকার এবং নিরাকার স্বরূপকে জানে না। অন্য কেউ কেউ আবার এরূপ অর্থ করেন যে '(যে) ব্যক্তিমাপন্নং মাম্ অব্যক্তং মন্যন্তে (তে) অবুদ্ধয়ঃ' অর্থাৎ আমি অবতার হয়ে তোমার সারথি হয়েছি—এরূপ আমাকে যারা শুধু নিরাকার বলে মনে করে তারা নির্বুদ্ধি, কারণ তারা আমার সর্বোৎকৃষ্ট অবিনাশী ভাব জানে না।

উপরিউক্ত দুটি অর্থের মধ্যে কোনোটিই ঠিক নয়। কারণ এরূপ অর্থ মেনে নিলে যারা কেবল নিরাকারকে মানে তারা সাকাররূপের এবং সাকার উপাসকদের নিন্দা করবে এবং যারা কেবল সাকাররূপকে মানে তারা নিরাকাররূপকে এবং নিরাকাররূপের উপাসকদের নিন্দা করবে। এই দুটিই হল একদেশীয় (পরিচ্ছিন্ন) ভাব।

পৃথিবী, জল, তেজ ইত্যাদি যে মহাভূত, যা বিনাশশীল ও বিকারশীল, সেগুলিও দুপ্রকারের—স্থূল এবং সূক্ষ্ম। যেমন, স্থূলরূপে পৃথিবী সাকার এবং পরমাণুরূপে নিরাকার ; জল বরফ, জলের বিন্দু, বৃষ্টি এবং মেঘরূপে সাকার এবং পরমাণুরূপে নিরাকার ; তেজ (অগ্নিতত্ত্ব) কাঠ এবং দেশলাইতে থাকলেও তা নিরাকার এবং প্রজ্বলিত হলে সাকার ইত্যাদি। এইরূপ ভৌতিক সৃষ্টিরও দুটি রূপ হয় আর দুটি রূপ হলেও বাস্তবে তা দুই হয় না। সাকার হলে নিরাকারে কোনো বাধা হয় না আর নিরাকার হলেও সাকারে কোনো বাধার সৃষ্টি হয় না। তাহলে পরমাত্মার সাকার বা নিরাকার—এই দুইয়েতে পার্থক্য কীসের ? কোনোই পার্থক্য নেই। তিনি সাকারও আবার নিরাকারও, সগুণ এবং নির্গুণও।

গীতা সাকার-নিরাকার, সগুণ-নির্গুণ—উভয়ই মানে। নবম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে ভগবান নিজেকে 'অব্যক্তমূর্তি' বলেছেন। চতুর্থ অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, আমি অজ হয়েও প্রকটিত হই, অবিনাশী হয়েও বিনাশপ্রাপ্ত হই এবং সকলের ঈশ্বর হয়েও আদেশ পালনকারী (পুত্র বা শিষ্য) হয়ে থাকি। অতএব নিরাকার হয়েও সাকার হওয়ায় এবং সাকার হয়েও নিরাকার হওয়াতে ভগবানের বিন্দুমাত্র পার্থক্য হয় না। ভগবানের এই স্বরূপ না জানায় লোকে তাঁর সম্বন্ধে নানাপ্রকার কল্পনা করে থাকে।

পরিশিষ্ট-ভাব—ভগবান ব্যক্ত আবার অব্যক্তও, তিনি লৌকিক আবার অলৌকিকও **'বাসুদেবঃ সর্বম্'** (গীতা ৭।১৯), **'সদসচ্চাহমর্জুন'** (গীতা ৯।১৯)। কিন্তু নির্বুদ্ধি ব্যক্তিরা ভগবানকে সাধারণ প্রাণীর মতো অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত অর্থাৎ লৌকিক (জন্ম-মৃত্যু সম্পন্ন) বলে মনে করে, যার জন্য ভগবান বলেছেন যে—

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥ (গীতা ২।২৮)

'হে ভারত ! সকল প্রাণী জন্মের আগে অপ্রকটিত ছিল এবং মৃত্যুর পরও অপ্রকটিত হয়ে যাবে, শুধু মধ্যবর্তী কালেই প্রকটিত দেখায়, সুতরাং এতে শোকগ্রস্ত হওয়ার কারণ নেই।'

ভগবান মানুষের মতো অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত হন না, তিনি অব্যক্ত হয়েই ব্যক্ত হন এবং ব্যক্ত হয়েও অব্যক্ত থাকেন।

'পরম্'—যাঁরা দেবতাদের উপাসনা করেন, ভগবান তাঁদের শ্রদ্ধাও দেন আর তাঁদের উপাসনার ফলও প্রদান করেন—এ তাঁর পরম পক্ষপাতরহিত ভাব।

'অব্যয়ম্'—দেবতা সাপেক্ষ অবিনাশী (অমর) অর্থাৎ সর্বতোভাবে অবিনাশী নয়। কিন্তু ভগবান নিরপেক্ষ অবিনাশী। তাঁর সমকক্ষ অবিনাশী আর কেউ নেই, আর হতেও পারে না।

'অনুত্তমম্'—ভগবান সকল প্রাণীরই হিতাকাঙ্ক্ষী—এ তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ভাব। এর থেকে শ্রেষ্ঠ অন্য কোনো ভাব আর হতেই পারে না।

*** *** ***

সম্বন্ধ—ভগবানকে সাধারণ মানুষ মনে করার কারণ কী ? পরবর্তী শ্লোকে তা জানানো হচ্ছে।

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥ ২৫ ॥

[অয়ম্ (যেসব) ; মূঢ়ঃ (মূঢ়) ; লোকঃ (ব্যক্তি) ; মাম্ (আমাকে) ; অজম্ (অজ) ; অব্যয়ম্ (অবিনাশী) ; ন, অভিজানাতি (জানে না) ; যোগমায়া সমাবৃতঃ (যোগমায়া সমাবৃত থেকে) ; অহম্ (আমি) ; সর্বস্য (তাদের সামনে) ; প্রকাশঃ (প্রকাশিত) ; ন (হই না।)]

যেসব মূঢ় ব্যক্তি আমাকে অজ এবং অবিনাশীরূপে যথার্থভাবে জানে না (মানে না), যোগমায়ায় সমাবৃত থেকে আমি তাদের সামনে প্রকাশিত হই না ॥ ২৫ ॥

ব্যাখ্যা—'মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্'—আমি অজ এবং অবিনাশী অর্থাৎ জন্মমরণরহিত। তা সত্ত্বেও আমি জন্ম-মৃত্যুর লীলা করে থাকি অর্থাৎ যখন আমি অবতাররূপে আসি, তখন অজ (জন্মরহিত) হয়েও জন্ম পরিগ্রহ করি এবং অব্যয়াত্মা হয়েও অন্তর্হিত হই (মৃত্যুবরণ করি)। সূর্য যেমন উদয় হলে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় এবং অস্ত গেলে আমাদের দৃষ্টির বাইরে চলে যায়, তেমনই আমি প্রকাশিত ও অন্তর্হিত হওয়ার লীলা করে থাকি। যারা আমাকে এরূপ জন্ম-মৃত্যুরহিত বলে জানে, তারা অসম্মূঢ় বা মোহমুক্ত হয়ে থাকে (গীতা ১০।৩, ১৫।১৯)। কিন্তু যারা আমাকে সাধারণ প্রাণীর ন্যায় জন্ম-মৃত্যু গ্রহণকারী বলে মনে করে, তারা মূঢ় (গীতা ৯।১১)।

ভগবানকে অজ, অবিনাশী না মানার কারণ হল মানুষের ভগবানের সঙ্গে যে স্বতঃ অস্মিতা, তা ভুলে শরীরকে 'এই শরীরই আমি এবং এই শরীরই আমার' —এরূপ মেনে নেওয়া। তাই তাদের সামনে এমন পর্দার আবরণ এসে যায়, যাতে তারা ভগবানকেও নিজের মতো জন্ম-মৃত্যুর অধীন বলে মনে করে।

মূঢ় ব্যক্তিরা আমাকে অজ এবং অবিনাশী বলে জানে না। তাদের না জানার দুটি কারণ—এক, আমার যোগমায়া দ্বারা সমাবৃত থাকা আর অপরটি তাদের মূঢ়তা। যেমন, কোনো শহরে কারো একটি ঘর আছে এবং সে নিজ ঘরে আটক আছে এবং সমগ্র শহরটি প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। এক্ষেত্রে সে ইচ্ছা করলে নিজ ঘর থেকে বেরোতে পারলেও শহরের প্রাচীরের বাইরে যাওয়া তার ক্ষমতার মধ্যে নয়। তবে যদি সেই শহরের অধিপতি ইচ্ছা করেন তাহলে তিনি সেই শহরের প্রাচীরের দরজা খুলতে পারেন এবং তার ঘরের দরজাও খুলে দিতে পারেন। যদি সেই লোকটি তার নিজের ঘরের দরজা খুলতে না পারে তাহলে রাজা সেই দরজাটি ভেঙে দিতে পারেন। তেমনই মানুষ তাদের মূঢ়তা পরিত্যাগ করে নিজের নিত্যস্বরূপ জানতে পারে। কিন্তু পূর্ণ ভগবদ্-তত্ত্ববোধ ভগবানের কৃপাতেই হতে পারে। ভগবান যাকে জানাতে চান সে-ই একমাত্র তাঁকে জানতে সক্ষম হয়—**'সোই জানই জেহি দেহু জনাঈ'** (শ্রীরামচরিতমানস ২।১২৭।২)। মানুষ যদি সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হয় তাহলে ভগবান তার অজ্ঞানতা দূর করেন এবং নিজ মায়াও অপসারিত করেন।

'নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ'—সবার কাছে অর্থাৎ ওই মূর্খ ব্যক্তিদের কাছে আমি ভগবদ্-রূপে প্রকাশিত হই না। কারণ তারা আমাকে অজ-অবিনাশী ভগবদ্-রূপে জানতে অথবা মানতে চায় না, তারা আমাকে সাধারণ মানুষ মনে করে অবহেলা করে। সুতরাং তাদের সামনে আমি ভগবদ্-স্বরূপে কেমন করে প্রকটিত হব ? তাৎপর্য হল এই যে, যারা আমাকে অজ ও অবিনাশী বলে মনে করে না, জন্ম-মরণশীল বলে মনে করে থাকে, তাদের কাছে আমি নিজ যোগমায়াতে সমাবৃত হয়ে সাধারণ মানুষের মতো থাকি। কিন্তু যারা আমাকে অজ, অবিনাশী এবং সমস্ত প্রাণীর ঈশ্বর বলে মনে করে, আমাতে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রাখে, তাদের ভাব অনুযায়ী আমি তাদের সামনে প্রকটিত হয়ে থাকি।

ভগবানের যোগমায়া অনুপম, বিশিষ্ট এবং অলৌকিক। মানুষের ভগবানের প্রতি যেরূপ ভাব থাকে, সেই অনুসারেই তারা যোগমায়া-সমাবৃত ভগবানকে দেখে থাকে।[১]

[১] ক) মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্তিমান্ গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।

ভগবান এই স্থানে বলেছেন যে, যারা আমাকে অজ-অবিনাশীরূপে জানে না, তারা মূঢ় এবং দশম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে বলেছেন যে, দেবতা এবং মহর্ষিগণ কেউই তাঁর প্রভব (উৎপত্তি) জানেন না। এতে প্রশ্ন জাগে যে, ভগবানকে অজ ও অবিনাশীরূপে না জানা এবং তাঁর প্রভব না জানা—দুটিই এক কথা, কিন্তু এখানে যারা জানে না তাদের মূঢ় বলা হয়নি কেন ? তার উত্তর হল যে, ভগবানের প্রভবকে অর্থাৎ প্রকাশিত হওয়াকে না জানায় দোষ নেই ; কারণ ওইস্থানে ভগবান নিজেই বলেছেন যে, আমি সর্বভাবে দেবগণ ও মহর্ষিগণের আদিপুরুষ। যেমন, বালক তার পিতার জন্ম দেখতে সক্ষম হয় না, কারণ সেইসময় সে জন্মায়ইনি। সে তার পিতার থেকেই জন্মলাভ করেছে। অতএব তার পিতার জন্ম না জানায় সে দোষী হয় না। তেমনই ভগবানের প্রকটিত হওয়ার হেতু সম্পূর্ণভাবে না জানায় দেবগণ বা মহর্ষিগণের পক্ষে দোষের কিছু নেই, ভগবানের প্রকাশিত হওয়ার ব্যাপার কেউ সম্পূর্ণভাবে জানতেই পারে না। সেইজন্য ওই স্থানে দেবগণ ও মহর্ষিগণকে মূঢ় বলা হয়নি। মানুষ ভগবানকে অজ-অবিনাশী বলে জানতে পারে অর্থাৎ মেনে নিতে পারে। তারা যদি ভগবানকে অজ ও অবিনাশীরূপে না মানে, তবে সেটি হল তাদের দোষ, সেইজন্যই এখানে তাদের মূঢ় বলা হয়েছে।

পরিশিষ্ট-ভাব— যেসব বুদ্ধিহীন ব্যক্তি ভগবানকে মানে না, ভগবান অবতাররূপে সবার সামনে প্রকটিত হলেও তাদের সামনে প্রকটিত হন না—**'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'** (গীতা ৪।১১)। ভগবান প্রকৃতপক্ষে অপ্রকট হয়ে থাকতে চান না, কিন্তু যারা তাঁকে মানে না, তাদের কাছে তিনি প্রকটিত হবেন কেন ?

অবতাররূপে যখন ভগবান আসেন, তখন তাঁকে লৌকিক মনে হলেও তিনি প্রকৃতপক্ষে সর্বদাই অলৌকিক ভাবে থাকেন। কিন্তু রাগ (আসক্তি)-দ্বেষাদির জন্য অজ্ঞান ব্যক্তিগণ ভগবানকে লৌকিকরূপে দেখে অর্থাৎ তাঁকে ভগবানরূপে না দেখে মনুষ্যরূপে দেখে থাকে।

* * *

সম্বন্ধ—যারা ভগবানকে অজ-অবিনাশী বলে মানে না, তাদের সম্মুখেই ভগবানের মায়ার আবরণ থাকে, কিন্তু ভগবানের সম্মুখে সেই আবরণ থাকে না—পরবর্তী শ্লোকে সেটি বর্ণনা করা হয়েছে।

বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন॥ ২৬ ॥

[অর্জুন (হে অর্জুন !) ; ভূতানি (যারা) ; সমতীতানি (অতীতে হয়েছে) ; চ (এবং) ; বর্তমানানি (বর্তমানে হয়েছে) ; চ (এবং) ; ভবিষ্যাণি (ভবিষ্যতে হবে) ; অহম্ (আমি) ; বেদ (জানি) ; তু (কিন্তু) ; মাম্ (আমাকে) ; কশ্চন (কেউই) ; বেদ (জানে) ; ন (না।)]

হে অর্জুন ! যারা অতীতে হয়েছে, বর্তমানে হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে হবে, সেই সকল প্রাণীকে আমি জানি। কিন্তু আমাকে (ভক্ত ব্যতীত) কেউই জানে না ॥ ২৬ ॥

মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৪৩।১৭)

'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন বলরামের সঙ্গে রণাঙ্গনে উপস্থিত হলেন, সেইসময় তিনি পালোয়ানদের নিকট বজ্রকঠিন-দেহ, সাধারণ মানুষদের কাছে নর-রত্ন, স্ত্রীলোকদের নিকট মূর্তিমান কাম, গোপদের স্বজন, দুষ্ট নৃপতিদের নিকট দণ্ডদানকারী শাসক, মা-বাবার নিকট শিশু, কংসের কাছে মৃত্যু, অজ্ঞানীদের নিকট ভয়ঙ্কর, যোগীদের নিকট পরমতত্ত্ব এবং ভক্তশিরোমণি বৃষ্ণীবংশীয়দের নিকট ইষ্টদেবরূপে প্রকাশিত হলেন।'

খ) জিন্‌হ কেঁ রহী ভাবনা জৈসী। প্রভু মূরতি তিন্‌হ দেখী তৈসী॥ (শ্রীরামচরিতমানস ১।২৪১।২)

ব্যাখ্যা—**'বেদাহং সমতীতানি .... মাং তু বেদ ন কশ্চন'**—এখানে ভগবান প্রাণীদের পক্ষে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ — তিনটি বিশেষণ দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে **'অহং বেদ'** পদের দ্বারা শুধুমাত্র বর্তমান কালের প্রয়োগই করেছেন। তার অর্থ ভগবানের কাছে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ—তিনই বর্তমানকাল। সুতরাং অতীতকালের প্রাণী হোক বা ভবিষ্যতের হোক অথবা বর্তমানের—সবই ভগবানের কাছে বর্তমান হওয়ায় ভগবান সকলকেই জানেন। অতীত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান—এই তিনকাল হয় কেবল প্রাণীদের কাছে, ভগবানের কাছে নয়। যেমন সিনেমা দর্শনকারীদের কাছে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালের পার্থক্য থাকে কিন্তু সিনেমার ফিল্মে সবকিছুই বর্তমানকাল, তেমনই প্রাণীদের দৃষ্টিতে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত-কালে প্রভেদ থাকে, কিন্তু ভগবানের দৃষ্টিতে সবকিছুই বর্তমান থাকে। কারণ সকল প্রাণীই কালের অন্তর্গত এবং ভগবান কালাতীত। দেশ-কাল-বস্তু-ব্যক্তি-ঘটনা-পরিস্থিতি ইত্যাদি পরিবর্তনশীল আর ভগবান চিরকাল একইভাবে বিরাজ করেন। কালের অন্তর্গত সমস্ত প্রাণীর জ্ঞান সীমিত হয় আর ভগবানের জ্ঞান অসীম। এইসব প্রাণীর মধ্যে কেউ যদি যোগাভ্যাস দ্বারা জ্ঞান বৃদ্ধি করেন তাহলে তিনি 'যুঞ্জান্ যোগী' হন এবং যখন যা জানতে চান, তখনই সেটি জানতে পারেন। কিন্তু ভগবান হলেন 'যুক্ত যোগী' অর্থাৎ কোনো যোগ অভ্যাস না করেই তিনি জীবমাত্রের এবং জগৎ মাত্রের সবকিছু সর্বদা স্বতঃই জেনে থাকেন।

অতীত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানের সকল জীব সর্বদা ভগবানেই অবস্থান করে। ভগবান থেকে কখনোই তারা পৃথক্ হতে সক্ষম নয়। ভগবানও এই জীবসকলকে পৃথক্ করে দিতে পারেন না। সুতরাং প্রাণীরা যেস্থানেই থাকুক, তারা কখনো ভগবানের চোখের আড়ালে যেতে পারে না।

'মাং তু বেদ ন কশ্চন' বলার তাৎপর্য হল যে, পূর্বশ্লোকে কথিত মূঢ় ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ আমাকে জানে না অর্থাৎ যারা আমাকে অজ এবং অবিনাশী বলে মানে না বরং সাধারণ মানুষের ন্যায় জন্ম-মরণশীল বলে মনে করে, সেই মূঢ়দের কেউই আমাকে জানে না। কিন্তু আমি সকলকে জানি।

যেমন, বাঁশের চিক দরজায় লাগালে ভিতর থেকে বাইরে স্পষ্টভাবে দেখা যায়, কিন্তু বাইরের লোক শুধু ওই ঝোলানো চিককেই দেখতে পায়, ভিতরের লোকেদের নয়। তেমনই যোগমায়া রূপ চিকের দ্বারা ভালোভাবে আবৃত থাকায় ভগবানকে মূর্খ ব্যক্তিরা দেখতে পায় না, কিন্তু ভগবান সকলকেই দেখে থাকেন।

এখানে একটি প্রশ্ন আসে যে, ভগবান যখন ভবিষ্যৎ কালের সব প্রাণীকেই জানেন, তাহলে কার মুক্তি হবে আর কে আবদ্ধ হয়ে থাকবে—তাও জানেন ; কারণ ভগবান সর্বজ্ঞ। অতএব তিনি যার মুক্তির কথা জানেন, সে মুক্ত হবে আর যার বন্ধনের কথা জানেন, সে আবদ্ধ হয়েই থাকবে। ভগবানের এই সর্বজ্ঞতায় মানুষের মুক্তি তো পরাধীন হয়ে যায়, আর চেষ্টা-সাধ্য থাকে না ?

এর উত্তর হল যে, ভগবান নিজে অনুগ্রহ করে মানুষকে অন্তিম জন্ম দিয়েছেন। এখন এই জন্মে সে তার উদ্ধার সাধন করবে, না পতনের দিকে যাবে—তা তার ওপরই নির্ভর করে (গীতা ৭।২৭ ; ৮।৬)। তার উদ্ধার বা পতনের ব্যবস্থা ভগবান করেন না।

এই অধ্যায়ের উনিশতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, বহু জন্মের পর যে মানুষ এই অন্তিম জন্মে 'বাসুদেবই সব' এইভাবে আমার শরণাগত হয়, সেই মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ। এর তাৎপর্য হল এই যে, মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত সমস্ত প্রাণীরই এই স্বাধীনতা থাকে যে তারা তাদের অনন্ত জন্মের সঞ্চিত কর্মগুলি ক্ষয় করে ভগবানকে প্রাপ্ত করতে পারে, তারা নিজেদের মুক্তি লাভ করতে সক্ষম। যদি মেনে নেওয়া হয় যে কোন্ প্রাণী কী গতি পাবে—ভগবানের সেইরূপ সংকল্প আছে, তাহলে মানুষের নিজ উদ্ধারলাভের আর কোনো স্বাধীনতা থাকে না এবং 'এরূপ করো', 'ওরূপ কোরো না'—ভগবান, সাধু, শাস্ত্র, গুরু প্রভৃতির এরূপ উপদেশেরও কোনো অর্থে থাকে না। তাছাড়াও 'যে যে ব্যক্তি যে যে দেবতার উপাসনা করতে চায় আমি তাদের শ্রদ্ধা সেই সেই দেবতার প্রতি অচলা করে দিই' (৭।২১) এবং 'মৃত্যুকালে মানুষ যে যে ভাব স্মরন করে দেহ পরিত্যাগ করে, সে সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়' (৮।৬)—এইভাবে আরাধনা এবং অন্তিমকালের স্মরণ করার স্বাধীনতাও থাকে না, যা ভগবান মনুষ্যমাত্রকেই দিয়েছেন।

অহেতুকী কৃপা প্রদানকারী প্রভু জীবকে মনুষ্যদেহ প্রদান করেন,[১] যাতে জীব মনুষ্যদেহ লাভ করে স্বাধীনভাবে নিজের কল্যাণ করতে পারে। গীতায় একাদশ অধ্যায়ের তেত্রিশতম শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে যেমন বলেছেন—**'ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্‌'** অর্থাৎ আমা কর্তৃক এরা আগেই বধ হয়েছে, তুমি শুধু নিমিত্ত হও। এইভাবেই প্রতিটি মানুষকেই বিবেক এবং উদ্ধারের পূর্ণ সামগ্রী দিয়ে ভগবান জানিয়েছেন যে, তুমি নিজের উদ্ধার করো অর্থাৎ নিজের উদ্ধারের জন্য তুমি নিজেই নিমিত্ত হও, তোমার ওপরে আমার কৃপা আছে। এই মনুষ্যদেহ-রূপ নৌকা প্রাপ্ত হয়ে কৃপারূপী অনুকূল বাতাসে যে ভব-সাগর পার না হয় অর্থাৎ উদ্ধার লাভ না করে, সে ব্যক্তি আত্মঘাতী হয়—**'ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্‌ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা'** (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২০।১৭)। গীতাতেও ভগবান বলেছেন যে, যে ব্যক্তি পরমাত্মাকে সর্বত্র সমভাবে পরিপূর্ণরূপে দেখে, সে নিজেকে হত্যা করে না, তাই সে পরমগতি লাভ করে (১৩।২৮)। এতেও প্রমাণিত হয় যে মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হলে নিজেকে উদ্ধার করার অধিকার, সামর্থ্য, বুদ্ধি ইত্যাদি সমস্ত সামগ্রীই পাওয়া যায়। এরূপ অমূল্য সুযোগ পেয়েও যারা নিজেদের উদ্ধার না করে, তারা নিজেদের হত্যা করে এবং এতেই তাদের জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হতে হয়। জীব যদি এই মনুষ্যদেহ লাভ করে শাস্ত্র ও ভগবানের বিরুদ্ধ পথে না যায় এবং প্রাপ্ত সামগ্রীর সদুপযোগ করে, তবে তার মুক্তি স্বতঃসিদ্ধ। এতে কোনো বাধাই আসতে পারে না।

মানুষকে খুবই সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য রাখতে হয় যে, ভগবান কৃপাপরবশ হয়ে যে সামর্থ্য, বুদ্ধি ইত্যাদি সামগ্রী তাকে প্রদান করেছেন, সে যেন তার অসদ্‌ব্যবহার না করে, ভগবানের বিরুদ্ধ পথে না চলে—এই অটল সিদ্ধান্ত নিয়ে তাকে চলতে হবে। যদি নিজের অসাবধানতায় কখনো ভুল-ত্রুটি হয়েও যায়, এবং মনে তার জন্য যদি অনুশোচনা জন্মায় এবং ভগবানের কাছে সে প্রার্থনা করে, 'হে প্রভু! আমার ভুল হয়েছে, আর কখনো এরূপ ভুল করব না। হে প্রভু! বল দাও, যেন আর কখনো তোমার সিদ্ধান্তের প্রতিকূল কাজ না করি'—তাহলেই এর প্রায়শ্চিত্ত হয় এবং ভগবানের কৃপা লাভ হয়।

মানুষের অসামর্থ্য দু'ভাবে হয়—একটি অসামর্থ্য হল তার অক্ষমতা; যেমন—কোনো ব্যক্তি তার ভৃত্যকে যদি বলে যে এই বাড়িটি তুলে নিয়ে এক মাইল দূরে রেখে এসো, সে সেটি করতে সক্ষম হয় না। অপর অসামর্থ্য হল সামর্থ্য বা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও প্রমাদবশতঃ না করা। এই অসামর্থ্য সাধকদের মধ্যে হয়। এটি দূর করার জন্য সাধকের ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাতে হয়—'হে প্রভু! আমি এমন প্রমাদ যাতে আর কখনো না করি, আমাকে সেই শক্তি দাও'।

ভগবানেরই প্রদত্ত স্বাধীনতার জন্য ভগবান কখনো এমন সংকল্প করতে পারেন না যে, এই জীবের এতবার জন্ম হবে। কেবল তাই নয়, চর-অচর অনন্ত জীবের জন্যও ভগবান এমন সংকল্প করেন না যে তাদের অনেক জন্ম হবে। তবে একটি কথা ঠিক যে মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীদের পরম্পরাগতভাবে কর্মফলের প্রবাহ লেগে থাকে, যার জন্য এরা বারংবার জন্ম-মৃত্যু বরণ করে। এই কর্মফল ভোগের প্রবাহের মধ্যে থেকে কোনো জীব কোনো কারণবশতঃ মনুষ্যদেহে বা অন্য কোনো যোনিতেও যদি প্রভুর চরণাশ্রিত হতে পারে, তাহলে ভগবান তার অনন্ত জন্মের পাপ দূর করে দেন—

> **কোটি বিপ্র বধ লাগহিঁ জাহূ।**
> **আএঁ সরন তজউঁ নহিঁ তাহূ॥**
> **সনমুখ হোই জীব মোহি জবহীঁ।**
> **জন্ম কোটি অঘ নাসহিঁ তবহীঁ॥**
>
> (শ্রীরামচরিতমানস ৫।৪৪।১)

পরিশিষ্ট-ভাব—এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, ভগবান যখন সব জীবকেই জানেন তখন তিনি যাকে বদ্ধ বলে জানেন, সে বদ্ধই থাকবে, আর যাকে মুক্ত বলে জানেন, সে মুক্ত হবে, কেন-না ভগবানের জ্ঞান নিত্য। এই প্রশ্নে (আমাদের দৃষ্টিতে) আসলে জাগতিক অস্তিত্ব ও গুরুত্বই প্রকাশ পায়। প্রকৃতপক্ষে ভগবান এবং মহাত্মা—উভয়ের দৃষ্টিতেই জগৎ-সংসার নয় শুধু ভগবানই বিরাজমান—**'বাসুদেবঃ সর্বম্‌'**। আমরাই অহংবশতঃ জগৎ সংসারকে অস্তিত্ব ও গুরুত্ব প্রদান করে থাকি। তাই ভগবান আমাদের ভাষাতে অতীত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের কথা বলেছেন। তিনি আমাদের ভাষাতে

---

[১]কবহুঁক করি করুনা নর দেহী। দেত ঈস বিনু হেতু সনেহী।। (শ্রীরামচরিতমানস ৭।৪৪।৩)

যদি কথা না বলেন, তাহলে আমরা তা বুঝব কী করে ? যেমন আমাদের ইংরাজী ভাষা শেখানোর মাস্টার মহাশয় যদি ইংরাজীতেই কথা বলেন, তাহলে আমরা ইংরাজী শিখতেই পারব না।

ভগবানের জ্ঞান নিত্য। সব কিছুই ভগবানের অন্তর্গত। তাঁর জ্ঞানের বাইরে কিছুই নেই। ভগবানের জ্ঞানে তিনি ছাড়া আর কিছুই নেই—**'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি'** (গীতা ৭।৭)। জীবই অহংবশতঃ (অজ্ঞানের দ্বারা) জগৎ ধারণ করে আছে—**'যয়েদং ধার্যতে জগৎ'** (গীতা ৭।৫)। সুতরাং বন্ধন ও মোক্ষ, দুটিই জীবের দ্বারা সৃষ্ট। তত্ত্বতঃ বন্ধনও নেই, মোক্ষও নেই, শুধুমাত্র পরমাত্মাই আছেন।[১]

দুবার **'চ'** ব্যবহারের তাৎপর্য হল যে, কোনো কালই স্থায়ী নয়। অতীতও সর্বদা থাকে না, বর্তমানও সর্বদা থাকে না আর ভবিষ্যৎও সর্বদা থাকে না, থাকেন কেবল ভগবান। যেমন অতীত-ভবিষ্যৎ এখন নেই, তেমনই বর্তমানকালও নেই। অতীত ও ভবিষ্যতের সন্ধিক্ষণকেই বলা হয় বর্তমান। পাণিনি-ব্যাকরণের একটি সূত্র হল—**'বর্তমানসামীপ্যে বর্তমানবদ্বা'** (৩।৩।১৩১) অর্থাৎ বর্তমান সামীপ্যকেই বর্তমানের মতো মনে হয়। যেমন, অতীত ধরে বলা হয়, 'আমি এখনই এসেছি' আর ভবিষ্যতের কাজ ধরে বলা হয় 'আমি এখনই যাচ্ছি'—একে বলা হয় বর্তমানসামীপ্য। প্রকৃতপক্ষে বর্তমানসামীপ্যকেই বর্তমানকাল বলা হয়। বাস্তবে বর্তমানকাল বলে যদি কিছু থাকত তাহলে তা কখনই অতীতে পরিণত হত না। প্রকৃতপক্ষে কাল বর্তমান নয়, ভগবানই বর্তমান। তাৎপর্য হল এই যে, যা প্রতি মুহূর্তে বদলায়, তা বর্তমান নয়, কিন্তু যা কখনো বদলায় না, তাই হল বর্তমান। তাই ভগবান শ্লোকটির প্রারম্ভে বর্তমান ক্রিয়া ব্যবহার করেছেন **'বেদাহম্'** (আমি জানি)। ভগবান অতীত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানে সর্বদাই বর্তমান। ভগবানের এই বর্তমানতা কালের অধীন নয়, কেন-না তিনি কালাতীত। কাল ভগবানের দৃষ্টিতেও নেই, মহাত্মার দৃষ্টিতেও নেই।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে ভগবান বলেছেন, আমাকে কেউই জানে না, তাহলে ভগবানকে না জানার প্রধান কারণ কী ? পরবর্তী শ্লোকে তা জানাচ্ছেন।

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ॥ ২৭ ॥

[ভারত (হে ভরতবংশোদ্ভব) ; **পরন্তপ** (পরন্তপ !) ; **ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন** (ইচ্ছা এবং দ্বেষ হতে উৎপন্ন) ; **দ্বন্দ্বমোহেন** (দ্বন্দ্ব-মোহ দ্বারা) ; **সর্বভূতানি** (সমস্ত প্রাণী) ; **সর্গে** (জগতে) ; **সম্মোহম্** (হতজ্ঞান) ; **যান্তি** (হয়ে থাকে।)]

হে ভরতবংশোদ্ভব পরন্তপ ! ইচ্ছা (আকাঙ্ক্ষা) এবং দ্বেষ হতে উৎপন্ন দ্বন্দ্ব-মোহ দ্বারা মোহিত সমস্ত প্রাণী অনাদিকাল থেকে জগতে হতজ্ঞান অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু প্রাপ্ত হয়ে থাকে ॥ ২৭ ॥

ব্যাখ্যা—'ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন................সর্গে যান্তি পরন্তপ'—ইচ্ছা এবং দ্বেষ থেকে দ্বন্দ্ব-মোহ উৎপন্ন হয়, যার দ্বারা মোহিত প্রাণীগণ ভগবানে বিমুখ হয়ে বারংবার জন্মাতে থাকে।

মানুষের সংসার থেকে বিমুখ হয়ে শুধুমাত্র ভগবানে মনোনিবেশ করা প্রয়োজন। ভগবানে মনোনিবেশ না করার প্রধান বাধা কী ? মনুষ্যজীবন বিবেকপ্রধান ; তাই মানুষের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি পশুদের মতো না হয়ে তাদের বিবেক অনুযায়ী হওয়া উচিত। কিন্তু মানুষ তার বিবেককে প্রাধান্য না দিয়ে রাগ ও দ্বেষবশতঃ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি করে, তাতে তাদের পতন হয়।

মানুষের দুই প্রকারের মনোবৃত্তি থাকে—অনুকূল বিষয়ে মন নিবিষ্ট করা আর প্রতিকূল বিষয় থেকে মন সরিয়ে নেওয়া। মানুষের উচিত পরমাত্মাতে নিজ বৃত্তি

[১] ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ। ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা॥ (আত্মোপনিষদ্ ৩১)

'প্রলয়ও নেই, উৎপত্তিও নেই, বদ্ধও নেই, সাধকও নেই, মুমুক্ষুও নেই, মুক্তও নেই—এই হল পরমার্থতা অর্থাৎ প্রকৃত তত্ত্ব।'

(চিত্ত) নিবিষ্ট করা এবং সংসার থেকে বৃত্তি সরিয়ে আনা অর্থাৎ পরমাত্মাতে প্রেম এবং সংসারে বৈরাগ্য আনা। কিন্তু মানুষ যখন এই দুটি বৃত্তিই সংসারের দিকে নিয়োগ করে তখন সেই প্রেম ও বৈরাগ্য ক্রমশঃ রাগ-দ্বেষের রূপ ধারণ করে, যার ফলে মানুষ সংসারে আবদ্ধ হয় এবং সর্বতোভাবে ভগবানে বিমুখ হয়ে পড়ে। তখন আর ভগবানে মন দেওয়ার সময় পায় না। কখনো কখনো সে সৎসঙ্গ শোনে, শাস্ত্র পাঠ করে, ভালো কথার আলোচনা করে, মনে ভালো ভালো চিন্তার উদয় হয় এবং সেগুলি ঠিকমতো বুঝতেও পারে, তা সত্ত্বেও মনে আকাঙ্ক্ষা থাকায় তার গভীর বিশ্বাস থাকে যে আমাকে সাংসারিক আনুকূল্য প্রাপ্ত করতে হবে এবং প্রতিকূলতা দূর করতে হবে, এটিই আমার প্রধান কাজ, এ ছাড়া আমার জীবন-নির্বাহ হবে না। এইভাবে সে হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে রাগ-দ্বেষের দ্বন্দ্ব আঁকড়ে থাকে ; যার ফলে পড়াশোনা এবং আলোচনা করলেও তার বৃত্তি রাগ-দ্বেষ রূপ দ্বন্দ্ব পরিত্যাগ করে না। সেইজন্যই সে পরমাত্মা প্রাপ্তির দিকে অগ্রসর হতে পারে না।

দ্বন্দ্বের মধ্যেও যদি তার ইচ্ছা প্রধানতঃ এক বিষয়েই থাকে, তাহলেও ঠিক। যেমন, ভক্ত বিল্বমঙ্গলের বৃত্তি বারবণিতা চিন্তামণিতেই আকৃষ্ট হয়েছিল, এতে তাঁর চিন্তা সংসার থেকে সরে গিয়েছিল। যখন সেই বারবণিতা তাঁকে ভর্ৎসনা করে বলেছিল যে—'তুমি এই হাড়-মাংসের দেহে যেমন আকৃষ্ট হয়েছ, এরূপ যদি ভগবানে আকৃষ্ট হতে তবে যোগী হয়ে যেতে', তখন তাঁর চিন্তা বারবণিতা থেকে ভগবানের দিকে সরে গিয়েছিল এবং তিনি উদ্ধার প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এইরূপ গোপিনীদের ভগবানে অনুরাগ হয়েছিল, সেই অনুরাগও কল্যাণকারী হয়েছিল। শিশুপালের ভগবানের সঙ্গে শত্রুতা (দ্বেষ) ছিল এবং শত্রুভাবেও তিনি ভগবানকে চিন্তা করায় উদ্ধার প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কংসের ভগবান হতে ভয় উৎপন্ন হয়েছিল এবং সেই ভীতি নিয়ে তিনি ভগবানকে চিন্তা করায় তারও কল্যাণ হয়েছিল। তবে একথা ঠিক যে শত্রুতা এবং ভীতি ভাব থাকায় ভগবদ্-চিন্তায় শিশুপাল এবং কংস ভক্তির আনন্দ লাভ করতে পারেননি। তাৎপর্য হল এই যে, যে কোনোপ্রকারে ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হলে মানুষ উদ্ধার লাভ করে। কিন্তু সংসারে রাগ-দ্বেষ, কাম-ক্রোধ, উচিত-অনুচিত, অনুকূল-প্রতিকূল ইত্যাদি দ্বন্দ্ব থাকলে মূঢ়তা বৃদ্ধি পায় এবং এতে মানুষের পতন ঘটে।

অপর রীতিতে বুঝতে হবে যে সংসারের সম্বন্ধ দ্বন্দ্ব দ্বারাই দৃঢ় হয়। যখন কামনার জন্য মনোবৃত্তির প্রবাহ সংসারের দিকে যায়, তখন সাংসারিক আনুকূল্য ও প্রতিকূলতার জন্য রাগ-দ্বেষ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ একই জিনিস কখনো ঠিক বলে মনে হয়, কখনো বেঠিক ; ফলে কখনো অনুরাগ হয়, কখনো দ্বেষ, যার ফলে সংসারে সম্বন্ধ দৃঢ় হতে থাকে। তাই ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ে **'নির্দ্বন্দ্বঃ'** (২।৪৫) পদ দ্বারা দ্বন্দ্বরহিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। নির্দ্বন্দ্ব ব্যক্তি অনায়াসে মুক্ত হন—**'নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে'** (৫।৩)। সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বরহিত হয়ে ভক্তগণ অবিনাশী পদ প্রাপ্ত হন—**'দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈর্গচ্ছন্ত্যমূঢ়া পদমব্যয়ং তৎ'** (১৫।৫)। ভগবান দ্বন্দ্বকে মানুষের প্রধান শত্রু বলে জানিয়েছেন (৩।৩৪)। যারা দ্বন্দ্ব-মোহরহিত হয়, তারা দৃঢ়ব্রতী হয়ে ভগবানের ভজনা করে (৭।২৮)—এইভাবে গীতায় দ্বন্দ্বরহিত হওয়ার কথা অনেকবার উল্লিখিত হয়েছে।

জন্ম-মরণ চক্রে আবর্তিত হওয়ার কী কারণ ? শাস্ত্রের দৃষ্টিতে অজ্ঞানতাই হল জন্ম-মৃত্যুর কারণ। কিন্তু সাধুগণের বাণী অনুযায়ী জন্ম-মৃত্যুতে আবদ্ধ হওয়ার প্রধান কারণ হল কামনাবশতঃ প্রাপ্ত পরিস্থিতির অপব্যবহার। শাস্ত্র-বিহিত কর্ম ফলেচ্ছাপূর্বক করলে এবং প্রাপ্ত পরিস্থিতির অপব্যবহার করলে অর্থাৎ ভগবদ্-নির্দেশ-বিরুদ্ধ কর্ম করলে সৎ-অসৎ যোনি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ দেব-যোনি, চুরাশীলক্ষ যোনি এবং নরক প্রাপ্তি হয়।

প্রাপ্ত পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করলে সম্মোহ অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু চক্র দূর হয়। সদ্ব্যবহার কী ভাবে হয় ? আমাদের যে অবস্থা, পরিস্থিতি প্রাপ্ত হয়েছে, সেগুলি অপব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত নিতে হয়—'আমি শাস্ত্র ও লোকমর্যাদার বিরুদ্ধ কাজ করব না।' এইভাবে আকাঙ্ক্ষা-রহিত হয়ে অপব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত নিলে সদ্ব্যবহার আপনিই হতে থাকবে অর্থাৎ শাস্ত্র ও লোকমর্যাদা অনুযায়ী কাজ হতে থাকবে। যখন সঠিক ব্যবহার হবে তখন তার জন্য অহং-অভিমান হবে না। কারণ আমরা অপব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সদ্-ব্যবহারের সিদ্ধান্ত তো

আমরা নিইনি, তবে আর অহংকার কীসের ? এতে অহং-কর্তৃত্বের অভিমান দূর হয়। আর আমরা যখন সদুপযোগ করিনি, তখন তার ফল আমরা কীকরে চাইব ? কারণ সদুপযোগ হয়েছে, করা হয়নি। সুতরাং এতেই ফলেচ্ছা ত্যাগ হয়ে যাবে। এভাবে কর্তৃত্ব-অভিমান এবং ফলেচ্ছা ত্যাগ হলে অর্থাৎ বন্ধন দূর হলে মুক্তি স্বতঃসিদ্ধ হয়।

সাধকদের মধ্যে এই ব্যাপারটি প্রায়শঃই গভীরভাবে থাকে যে, সাধন-ভজন, জপ-ধ্যান ইত্যাদির ভাগ পৃথক্ এবং সাংসারিক কাজকর্ম করার ভাগ পৃথক্। এই কারণে সাধক ভজন-ধ্যান ইত্যাদি বাড়িয়ে দেন, কিন্তু সাংসারিক কাজকর্ম করতে গিয়ে রাগ-দ্বেষ, কাম-ক্রোধ ইত্যাদির দিকে বিশেষ নজর দেন না। তাঁরা মনে এই ধারণা দৃঢ় করে রাখেন যে, কাজ-কর্ম করতে গেলে তো রাগ-দ্বেষ হবেই, এগুলি মেটবার নয়। এই চিন্তায় চরম ক্ষতি এই হয় যে, সাধকের মধ্যে রাগ-দ্বেষ বজায় থাকে, যার ফলে তাঁর সাধনে শীঘ্র উন্নতি দেখা যায় না। প্রকৃতপক্ষে সাধক পারমার্থিক কাজই করুন বা সাংসারিক কাজ, তাঁর চিত্তে রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ থাকা উচিত নয়।

পারমার্থিক এবং সাংসারিক ক্রিয়াদিতে পার্থক্য থাকলেও সাধকের মনোভাবে পার্থক্য থাকা উচিত নয় অর্থাৎ পারমার্থিক এবং সাংসারিক উভয় ক্রিয়ার সময়ই সাধকের মনোভাব এরূপ থাকা উচিত যে, 'আমি সাধক, আমাকে ভগবদ্প্রাপ্তি করতে হবে।' এইভাবে ক্রিয়াভেদ তো থাকবেই আর তা থাকাও উচিত, কিন্তু মনোভাবের ভেদ থাকা উচিত নয়। ভাবের ভেদ না থাকলে অর্থাৎ একমাত্র ভগবদ্প্রাপ্তির ভাব (উদ্দেশ্য) থাকলে পারমার্থিক এবং সাংসারিক—উভয় ক্রিয়াই সাধন রূপে পরিণত হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব—যদিও অজ্ঞানতাই হল সংসার-বন্ধনের প্রধান কারণ, কিন্তু অজ্ঞানতার থেকেও মানুষ বেশি করে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হয় অনুরাগ-দ্বেষ রূপ দ্বন্দ্বের দ্বারা। কোনো দেশ,কাল, বস্তু, ব্যক্তি, পরিস্থিতি ইত্যাদিকে নিজের সুখ-দুঃখের কারণ বলে মনে করলে রাগ-দ্বেষ উৎপন্ন হয়। যাকে নিজের সুখের কারণ বলে মনে হয়, তাতে 'অনুরাগ' জন্মায়, আর যাকে নিজের দুঃখের কারণ বলে মনে করা হয়, তার প্রতি 'দ্বেষ-ভাব' জন্ম নেয়। এই রাগ- দ্বেষ দূর হলে মানুষ অনায়াসে সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়—**'নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে'** (গীতা ৫।৩)।

এর আগে ত্রয়োদশ শ্লোকেও ভগবান বলেছেন যে গুণত্রয়ে (সত্ত্ব,রজ,তম) মোহগ্রস্ত প্রাণীরা আমাকে জানে না। এইরূপ মোহগ্রস্ত প্রাণীরা সংসারকেও জানে না আর ভগবানকেও জানে না। সংসারে আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ থাকায় মানুষ সংসারকে জানতে সক্ষম হয় না এবং ভগবানের থেকে দূরে থাকায় তার পক্ষে ভগবানকেও জানা সম্ভব হয় না। প্রকৃতপক্ষে সংসার থেকে অনাসক্ত হলেই সাংসারিক জ্ঞান হওয়া সম্ভব আর ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন হলে তবেই ভগবদ্জ্ঞান হতে পারে। সংসার নেই— এটিই হল সংসারের জ্ঞান। যা প্রকৃতই নেই, থাকে না, তার আবার কিসের জ্ঞান ? সংসার আছে একথা মেনে নেওয়াই হল অজ্ঞানতা।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে ভগবান দ্বন্দ্বে মোহগ্রস্ত হওয়ার কথা বলেছেন, এবার পরবর্তী শ্লোকে দ্বন্দ্বে মোহরহিত ব্যক্তির অবস্থার বর্ণনা করছেন।

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥ ২৮ ॥

[তু (কিন্তু) ; যেষাম্ (যেসব) ; পুণ্যকর্মণাম্ (পুণ্যকর্মা) ; জনানাম্ (ব্যক্তিদের) ; পাপম্ (পাপ) ; অন্তগতম্ (বিনষ্ট হয়েছে) ; তে (সেই) ; দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তাঃ (দ্বন্দ্বমোহরহিত) ; দৃঢ়ব্রতাঃ (দৃঢ়ব্রতগণ) ; মাম্ (আমার) ; ভজন্তে (ভজনা করেন।)]

কিন্তু যে পুণ্যকর্মা ব্যক্তিদের পাপ বিনষ্ট হয়েছে, সেই দ্বন্দ্ব-মোহরহিত দৃঢ়ব্রত ব্যক্তিগণ আমার ভজনা করেন ॥ ২৮ ॥

ব্যাখ্যা—'যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্'—দ্বন্দ্ব-মোহে বিমুগ্ধ মানুষ সাধন-ভজন করে না, আর যাঁরা দ্বন্দ্ব-মোহ বর্জিত তাঁরা ভজনা করেন, তাই ভজনা না-করা ব্যক্তিদের থেকে ভজনাকারীদের বিশেষত্ব জানাতে 'তু' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

যাঁরা 'আমাকে ভগবদ্‌প্রাপ্তি করতেই হবে'—এই উদ্দেশ্যটি দৃঢ় করেছেন অর্থাৎ যাঁদের এই স্মৃতি জাগরূক হয়েছে যে এই মনুষ্যদেহ ভোগ সুখের জন্য নয়, ভগবদ্‌কৃপায় শুধুমাত্র তাঁর প্রাপ্তির উদ্দেশ্যেই লাভ হয়েছে—তাঁরাই পুণ্যকর্মা। তাৎপর্য হল এই যে, এই লক্ষ্যে স্থির থাকলে যে শুদ্ধতা, পবিত্রতা আসে তা যজ্ঞ-দান-তপ ইত্যাদি ক্রিয়া দ্বারা আসে না। কারণ 'আমাকে ভগবদ্-অভিমুখী হতেই হবে' এই স্থির নিশ্চয়তা স্বয়ং-এ হয় আর যজ্ঞ-দান ইত্যাদি ক্রিয়া বাহ্যতঃ হয়।

'অন্তগতং পাপম্' বলার ভাব হল যে, যখনই এই নিশ্চয়তা আসে যে 'আমাকে ভগবদ্-অভিমুখী হতেই হবে', তখনই ভগবানের সম্মুখীন হওয়ায় তাঁর থেকে বিমুখতা দূর হয়, ফলে পাপের শিকড় কেটে যায়। কারণ ভগবানে বিমুখতাই হল সমস্ত পাপের মূল কারণ। সাধুরা বলেন দেড়টি হল পাপ আর দেড়টিই পুণ্য। ভগবানে বিমুখ হওয়া পুরো পাপ এবং দুর্গুণ-দুরাচারী হওয়া অর্ধেক পাপ। তেমনই ভগবানের সম্মুখীন হওয়া পুরো পুণ্য এবং সদ্‌গুণ-সদাচারী হওয়া অর্ধেক পুণ্য। তাৎপর্য হল এই যে যখন মানুষ সর্বতোভাবে ভগবানের হয়, তখন তার পাপের অন্ত হয়।

অন্য ভাবটি হল, যাঁর লক্ষ্য শুধু ভগবান, তিনি পুণ্যকর্মা ; কারণ ভগবানই উদ্দেশ্য হলে সমস্ত পাপ দূর হয়। উদ্দেশ্য ভগবান হলে পুরাতন কোনো সংস্কারবশতঃ পাপ হলেও তা স্থায়ী হয় না ; কারণ হৃদয়ে বিরাজমান ভগবান ওই পাপ দূর করে দেন—**'বিকর্ম যচ্চোৎ পতিতং কথঞ্চিদ্ ধুনোতি সর্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ'** (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৫।৪২)।

তৃতীয় ভাবটি হল মানুষ যদি আন্তরিকভাবে দৃঢ়নিশ্চয় করে যে 'আমি আর কখনো পাপ করবো না', তবে আর তার পাপ থাকে না।

'তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ'—পুণ্যকর্মা ব্যক্তি দ্বন্দ্বরূপ মোহ বর্জন করে এবং দৃঢ়ব্রতী হয়ে ভগবানের ভজনা করেন। দ্বন্দ্ব কয়েক প্রকারের হয় ; যেমন—

১) ভগবানে মনোনিবেশ করব, না সংসারে ? কারণ পরলোকের জন্য ভগবানের ভজনা করা প্রয়োজন আর ইহলোকের জন্য সংসারের কাজ করা প্রয়োজন।

২) বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, গাণপত্য এবং সৌর—এইসব সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত হব এবং কোন্টার হব না ?

৩) পরমাত্মার স্বরূপের বিষয়ে দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত, অচিন্ত্যভেদাভেদ ইত্যাদি অনেক প্রকার সিদ্ধান্ত আছে। এর মধ্যে কোন্‌টি স্বীকার করব এবং কোন্‌টি করব না ?

৪) পরমাত্মাপ্রাপ্তির জন্য ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ধ্যানযোগ, হঠযোগ, লয়যোগ, মন্ত্রযোগ ইত্যাদি কয়েক প্রকার পথ আছে। এর মধ্যে কোন্ পথে চলব ?

৫) সংসারে অনুকূল-প্রতিকূল, হর্ষ-বিষাদ, ঠিক-বেঠিক, সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি সমস্ত বিপরীতমুখী ভাবকেই বলা হয় দ্বন্দ্ব।

উপরিউক্ত সমস্ত পারমার্থিক এবং সাংসারিক দ্বন্দ্বরূপ মোহ বিমুক্ত হয়ে দৃঢ়ব্রত মানুষ ভগবানের ভজনা করেন।

মানুষ পারমার্থিক উদ্দেশ্যে যদি একনিষ্ঠ থাকে তবে পারমার্থিক এবং সাংসারিক সমস্ত দ্বন্দ্ব দূর হয়। পারমার্থিক উদ্দেশ্যসম্পন্ন সাধকেরা তাঁদের নিজ নিজ রুচি-যোগ্যতা ও শ্রদ্ধা-বিশ্বাস অনুসারে নিজ নিজ ইষ্টকে সগুণ-নির্গুণ, সাকার-নিরাকার, দ্বিভুজ-চতুর্ভুজ বা সহস্রভুজ যা-ই মানুন না কেন, সংসারের বিমুখতায় এবং পরমাত্মার শরণাগতিতে তাঁরা সকলেই সমান। উপাসনার পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন হলেও লক্ষ্য সকলেরই এক হওয়ায় কোনো পদ্ধতিই ছোট বা বড় নয়। যে সাধকের যে পদ্ধতিতে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকে, তাঁর পক্ষে সেই পদ্ধতিই শ্রেষ্ঠ এবং তাঁর সেটিই অনুসরণ করা উচিত। কিন্তু অপরের পদ্ধতি বা নিষ্ঠার নিন্দা করা বা তার আরাধনাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর মনে করা অন্যায়। যতক্ষণ এই সাধন-বিষয়ে দ্বন্দ্ব থাকে ; সাধকের নিজের পক্ষে আগ্রহ এবং অপরের সাধনায় অশ্রদ্ধা থাকে, ততক্ষণ সাধক ভগবানের সমগ্ররূপ অনুভব করতে পারেন না। তাই সমস্ত পদ্ধতির এবং নিষ্ঠার সম্মান করতে হয়, কিন্তু অনুসরণ করতে হয় নিজ পদ্ধতির এবং নিষ্ঠার, তাহলে তার সাধন বিষয়ে দ্বন্দ্ব দূর হয়।

মানুষমাত্রেরই প্রকৃতি বা স্বভাব হল যে, যখন সে

পারমার্থিক কথা শোনে, তখন সে মনে করে সাধন দ্বারা নিজের কল্যাণ করতে হবে, কারণ মনুষ্যজন্মের সফলতা এতেই। কিন্তু যখন সে আবার ব্যবহারিক জীবনে ফিরে আসে তখন সে মনে করে 'সাধন-ভজন' করে কী হবে? সাংসারিক কাজ তো করতেই হবে। কারণ সংসারে যখন রয়েছি তখন জিনিসপত্রের প্রয়োজন তো হবেই, সেগুলি ছাড়া চলবে কী করে? অতএব সংসারের কাজ প্রধানভাবে থাকবেই আর ভজন-স্মরণ-নিয়ম ইত্যাদি সময়মতো করলেই হবে। কারণ সাংসারিক কাজ করা যতটা প্রয়োজন প্রতিদিন নিয়মমতো ভজন-স্মরণ-জপ-ধ্যানের তত প্রয়োজন নেই। এইরকম ধারণা নিয়ে ভগবানে যুক্ত থাকা মানুষ অনেক আছে।

ভগবদ্ অভিমুখী মানুষের মধ্যেও যারা এরূপ দৃঢ়নিশ্চয় করছে যে 'আমাকে নিজের কল্যাণ করতেই হবে, সাংসারিক লাভ-ক্ষতি যাই হোক না কেন, কোনো পরোয়া নেই, কারণ সাংসারিক যত প্রকার সিদ্ধিই থাকুক না কেন চোখ বুজে গেলে আর কিছুই থাকে না'—**'সম্মীলনে নয়নয়োর্নহি কিঞ্চিদস্তি'** এবং এই সাংসারিক বস্তুগুলি লাভ করলেও কতদিন আমার সঙ্গে থাকবে? এইরূপ বিচার-বিবেচনা করে যে ব্যক্তি শুধু ভগবদ্-অভিমুখী হয় এবং সাংসারিক মান-অপমান প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি দেয় না, সেইরূপ ব্যক্তিই দ্বন্দ্ব-মোহ থেকে বিমুক্ত হয়।

'দৃঢ়ব্রতাঃ' বলার অর্থ হল যে আমাকে শুধু ভগবানের অভিমুখেই যেতে হবে, আর কোনো উদ্দেশ্যই নেই। সেই পরমাত্মা দ্বৈত না অদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত না বিশিষ্টাদ্বৈত, সগুণ না নির্গুণ, দ্বিভুজ না চতুর্ভুজ—তাতে আমার কোনো প্রয়োজন নেই[১]। তিনি আমার জন্য যে পরিস্থিতিই সৃষ্টি করুন; আমাকে যেখানেই রাখুন আর যেভাবেই রাখুন—তাতে আমার কোনো চিন্তা নেই। আমার শুধু ভগবদ্ অভিমুখে যেতে হবে—এইরূপ উদ্দেশ্য দৃঢ় হলে 'দৃঢ়ব্রতী' হওয়া যায়।

পরমাত্মা অভিমুখী সাধকের সামনে তিনটি প্রশ্ন উদিত হয়—পরমাত্মা কেমন? জীব কেমন? আর জগৎ কেমন? তখন তার চিত্তে এর সোজা উত্তর এই আসে যে 'পরমাত্মা আছেন'। তিনি কোথায় থাকেন, কী করেন ইত্যাদিতে আমার কোনো প্রয়োজন নেই, আমার কেবল পরমাত্মাতে প্রয়োজন। জীব কী, তার স্বরূপ কেমন, সে কোথায় থাকে, এতে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। আমার পক্ষে এইটি জানাই যথেষ্ট যে 'আমি আছি!' জগৎ কেমন, ঠিক না বেঠিক, তাতে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। আমার পক্ষে এটি বোঝাই যথেষ্ট যে, 'জগৎ ত্যাজ্য' এবং আমাদের তা ত্যাগ করা উচিত। তাৎপর্য হল এই যে, পরমাত্মার অভিমুখে যেতে হবে, সংসারকে ত্যাগ করতে হবে এবং আমাদের অগ্রসর হতে হবে অর্থাৎ 'আমাদের সংসার হতে বিমুখ হয়ে ভগবানের সম্মুখীন হতে হবে'—এটিই হল সমস্ত দর্শনের সার আর এই হল দৃঢ়ব্রতী হওয়া। দৃঢ়ব্রতী হলে দ্বন্দ্ব দূর হয়, আর স্থির নিশ্চয় না হলে দ্বন্দ্ব থেকে যায়।

দ্বিতীয় ভাব হল তাঁদের নির্গুণ জ্ঞান হয়নি এবং সগুণ দর্শনও হয়নি; কিন্তু তাঁদের এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে জগৎ সর্বক্ষণ ধ্বংসের পথে যাচ্ছে এবং সব দেশ, কাল, বস্তু ইত্যাদিতে ভাবরূপে একমাত্র পরমাত্মাই বিরাজমান—এরূপ মেনে নিয়ে তাঁরা দৃঢ়ব্রতী হয়ে সাধন-ভজন করেন। পতিব্রতা রমণী যেমন পতিপরায়ণা হয়, তেমনি ভগবানের পরায়ণ থাকাই হল তাঁকে ভজনা করা।

বিশেষ কথা

শাস্ত্রে, সন্তবাণীতে এবং গীতাতেও বলা হয়েছে যে, পাপী ব্যক্তিরা ভগবানের শরণাগত হয় না। কিন্তু এটি হল এক স্বাভাবিক সাধারণ নিয়ম। প্রকৃতপক্ষে যতই পাপ করুক না কেন, জীব কখনো ভগবানের থেকে বিমুখ হতে পারে না। কারণ জীব সাক্ষাৎ ভগবানের অংশ। অতএব তার স্বাভাবিক শুদ্ধতা পাপের দ্বারা আচ্ছাদিত হয় মাত্র, লুপ্ত হয় না। তাই অত্যন্ত দুরাচারী ব্যক্তিও যদি দুরাচার পরিত্যাগ

---

[১]গজেন্দ্র যেমন বলেছেন—

যঃ কশ্চনেশো বলিনোঽন্তকোরগাৎ প্রচণ্ডবেগাদভিধাবতো ভৃশম্।

ভীতং প্রপন্নং পরিপাতি যদ্ভয়াম্মৃত্যুঃ প্রধাবত্যরণং তমীমহি॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ৮।২।৩৩)

'যে ঈশ্বর প্রচণ্ড বেগে (সকলকে গলাধঃকরণ করার জন্য) ধাবিত কালরূপী বলবান সর্পের থেকে ভীত শরণার্থীকে রক্ষা করেন, আর যাঁর ভয়ে ভীত হয়ে মৃত্যুও পলায়ন করেন, আমি তাঁরই শরণ গ্রহণ করছি।'

করে ভগবানের ভজনা আরম্ভ করে, তবে সে অতি শীঘ্রই ধর্মাত্মা (ভক্ত) হতে পারে—**'ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা'**[১] (গীতা ৯।৩১)। তাই মানুষকে কখনোই এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, পুরাতন পাপের জন্য তার পক্ষে ভগবানের ভজনা করা সম্ভব নয়। কারণ পুরাতন পাপ শুধুমাত্র প্রতিকূল পরিস্থিতি প্রদান করে, সাধন-ভজনে বাধা দেয় না। প্রতিকূল পরিস্থিতি লাভ করায় পাপ ক্ষয় হয়ে যায়। যদি মেনে নেওয়া হয় যে, পাপের জন্যই ভজন-সাধন হয় না, তাহলে **'অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্'** (গীতা ৯।৩০) 'অত্যন্ত দুরাচারী ব্যক্তিও অনন্যভাবে আমার ভজনা করে'—এই কথা বলা খাটে না। পাপবশতঃ যদি ধ্যান ও ভজনে বাধাপ্রাপ্তি হয়, তাহলে সামঞ্জস্য হয় না ; কারণ কোনো প্রাণীই পাপহীন নয়। পাপ-পুণ্যের জন্যই এই মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হয়েছে। এতেই প্রমাণিত হয় যে পুরাতন পাপ সাধন-ভজনে বাধা হতে পারে না। তাই যেসব দৃঢ়ব্রতী মানুষ ভগবানের শরণাগত হয়ে বর্তমান সময়ে ভগবানের সাধন-ভজনে ব্যাপৃত হয় তাদের পুরাতন পাপ দূর হয়। সাধন-ভজনের জন্যই মনুষ্যদেহ লাভ হয়েছে। পরিস্থিতিগত অবস্থা বাহ্যিক রূপে থাকে ; তা সাধন-ভজনে বাধা প্রদান করবে—এটি কখনো সম্ভব নয়।

সকাম পুণ্যকর্মের প্রাধান্যে জীব স্বর্গে গমন করে আর পাপকর্মের প্রাধান্য হলে নরক গমন হয়। কিন্তু ভগবান বিশেষভাবে কৃপা করে পাপ এবং পুণ্যের সম্পূর্ণ ফল ভোগের আগেই অর্থাৎ চুরাশী লক্ষ জন্মের মধ্যেই জীবকে মনুষ্যদেহ প্রদান করেন। ভগবদ্-ভজন করার সুযোগ বিশেষভাবে মনুষ্যদেহেই পাওয়া যায়। তাই মানুষের ভগবদ্-প্রাপ্তির লক্ষ্যে কখনো নিরাশ হওয়া উচিত নয় ; কারণ এই দেহ ভগবদ্-প্রাপ্তির জন্যই লাভ হয়েছে।

মনুষ্যদেহ ভোগযোনি নয়। একে সাধারণভাবে কর্মযোনি বলা হয়। কিন্তু সাধুদের বাণী এবং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মনুষ্যদেহ শুধুমাত্র ভগবদ্-প্রাপ্তির জন্যই লাভ হয়েছে। এতে পুরাতন পুণ্য অনুযায়ী যেসব অনুকূল পরিস্থিতি আসে এবং পুরাতন পাপ অনুযায়ী যেসব প্রতিকূল পরিস্থিতি তা সবই সাধন-বস্তু। এই দুইয়ের মধ্যে অনুকূল পরিস্থিতি এলে সকলের সেবা করতে হয় এবং প্রতিকূল পরিস্থিতি এলে আনুকূল্যের ইচ্ছা পরিত্যাগ করতে হয়—সাধকের এই হল মুখ্য কাজ। এরূপ করলেই পরিস্থিতিগুলি সাধন সামগ্রী হয়ে ওঠে। এতেও আবার দেখা যায় যে অনুকূল পরিস্থিতিতে পুরাতন পুণ্য নাশ হয় এবং বর্তমানে ভোগে আবদ্ধ হবার সম্ভাবনাও থেকে যায়। কিন্তু প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পুরাতন পাপের ক্ষয় হয় এবং বর্তমানে বেশি সতর্কতা এবং সাবধানতা থাকে, যার ফলে সাধন অনায়াসে হয়। সেইজন্য সাধুব্যক্তিগণ সাংসারিক প্রতিকূল পরিস্থিতিকে অনাদর করেন না।

পরিশিষ্ট-ভাব—ভগবানের অভিমুখী হওয়া বা তাঁর শরণাগত হওয়া সব থেকে বড় পুণ্য, কারণ এটি সব পুণ্যের মূল[২]। আর ভগবানে বিমুখ হওয়া সব থেকে বড় পাপ, কারণ এ হল সমস্ত পাপের মূল। যে ব্যক্তির পাপ বিনষ্ট হয়েছে অর্থাৎ যিনি সংসারে বিমুখ হয়ে ভগবানের সম্মুখীন হয়েছেন তিনি রাগ-দ্বেষ, হর্ষ-শোক, সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব রহিত হয়ে ভগবানের ভজনা করেন। ভজনাকারীদের শ্রেণীবিভাগ ভগবান ষোড়শ শ্লোকে **'চতুর্বিধা ভজন্তে মাম্'** পদটির দ্বারা বিন্যাস করেছেন।

অনুরাগ ও দ্বেষ মানুষকে সংসারে আবদ্ধ করে রাখে। যতক্ষণ কোনো এক বস্তুতে অনুরাগ থাকে, ততক্ষণ অপর কোনো বস্তুতে দ্বেষভাবও থেকেই যায়। কেন-না মানুষ কোনো একটি বস্তুর সম্মুখীন হলে অন্য আর একটিতে বিমুখ হবেই। মানুষের মধ্যে যতক্ষণ রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ থাকে, ততক্ষণ সে সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হতে পারে না, কেন-না তার সম্পর্ক সংসারের সঙ্গে জড়িত রয়েছে। তার যতটুকু অংশে সাংসারিক অনুরাগ থাকে, ততটুকু

[১]অন্য জন্মে পাপ নাশ হলেও স্বভাব যে শোধ্‌রাবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই ; যেমন চুরাশী লক্ষ জন্ম এবং নরক ভোগ করলে পাপ নাশ হয়ে যায়, কিন্তু স্বভাব বদ্‌লায় না। কিন্তু মনুষ্যজন্মে পাপ থাকলেও সাধকের স্বভাব পরিবর্তিত হতে পারে, যেমন—পাপ অবশিষ্ট থাকলে তার ফলরূপে প্রতিকূল পরিস্থিতি (অসুখ ইত্যাদি) আসে, কিন্তু সৎসঙ্গের দ্বারা, সাধনপরায়ণতার দ্বারা, অহং-ভাব পরিবর্তনের দ্বারা সাধকের স্বভাব পরিবর্তিত হয়।

[২]সনমুখ হোই জীব মোহি জবহীঁ। জন্ম কোটি অঘ নাসহিঁ তবহীঁ॥ (শ্রীরামচরিতমানস, সুন্দরকাণ্ড ৪৪।১)

অংশেই ভগবানে দ্বেষ বা বিরাগ (বিমুখতা) থাকে।

দৃঢ়ব্রতাঃ—শিথিল স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তি অসৎকে তত সহজে ত্যাগ করতে সক্ষম হয় না। একবার চিন্তা করা তারপর তা ছেড়ে দেওয়া, আবার চিন্তা করা পরে আবার ছেড়ে দেওয়া—এইভাবে বারবার চিন্তা করা ও ছেড়ে দেওয়া, এরূপ করতে থাকলে স্বভাবে শিথিলতা আসে। এই শিথিল স্বভাবের জন্যই ওই ব্যক্তি অসৎকে ত্যাগের কথা জানলেও ত্যাগ করতে সক্ষম হয় না। যদি সে অসৎকে পরিত্যাগ করেও তবু তার স্বভাবের শৈথিল্যের জন্য আবার তাতে যুক্ত হয়ে পড়ে। স্বভাবের এই অব্যবস্থার জন্য সাধকই দায়ী। তাই সাধকের উচিত তিনি যেন তাঁর স্বভাব দৃঢ়ভাবে তৈরি করেন। একবার তিনি যেটি বিচার করে স্থির করবেন, তাতেই দৃঢ়ভাবে থাকতে হবে। ছোট ছোট ব্যাপারেও যদি তিনি সিদ্ধান্তে স্থির থাকেন তাহলে তাঁর স্বভাবে অসৎকে ত্যাগ করার, জগৎ-সংসারের থেকে বিমুখ থাকার শক্তি আসে।

❋ ❋ ❋

*সম্বন্ধ—সপ্তম অধ্যায়ের প্রারম্ভে ভগবান সাধকদের তিনটি কথা বলেছেন—**'ময্যাসক্তমনাঃ'**—আমাকে ভালোবেসে এবং **'মদাশ্রয়ঃ'**—আমার আশ্রয় গ্রহণ করে **'যোগং যুঞ্জন্'**—যোগের সাধনা করে, তারা আমার সমগ্ররূপকে জেনে থাকে। সেই তিনটি কথার উপসংহার পরবর্তী দুটি শ্লোকে করছেন।*

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম চাখিলম্॥ ২৯ ॥

[**জরামরণমোক্ষায়** (জরা এবং মরণ থেকে মুক্তি পাবার জন্য) ; **যে** (যাঁরা) ; **মাম্** (আমার) ; **আশ্রিত্য** (শরণাগত হয়ে) ; **যতন্তি** (প্রযত্ন করেন) ; **তে** (তাঁরা) ; **তৎ** (সেই) ; **ব্রহ্ম** (সনাতন ব্রহ্ম) ; **কৃৎস্নম্** (সমগ্র) ; **অধ্যাত্মম্** (অধ্যাত্ম) ; **চ** (এবং) ; **অখিলম্** (সম্পূর্ণ) ; **কর্ম** (কর্মতত্ত্ব) ; **বিদুঃ** (অবগত হন।)]

বৃদ্ধাবস্থা এবং মরণ থেকে মুক্তি পাবার জন্য যাঁরা আমার শরণাগত হয়ে প্রযত্ন করেন, তাঁরা সেই সনাতন ব্রহ্ম, সমগ্র অধ্যাত্ম বিষয় এবং সম্পূর্ণ কর্মতত্ত্ব অবগত হন ॥ ২৯ ॥

ব্যাখ্যা—[এই উনত্রিশ-ত্রিশতম শ্লোকে ব্যবহৃত **'মামাশ্রিত্য'** পদে **'মদাশ্রয়ঃ'**র, **'যতন্তি'** পদে **'যোগং যুঞ্জন্'** এবং **'যুক্তচেতসঃ'** পদে **'ময্যাসক্তমনাঃ'**র উপসংহার করা হয়েছে। এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে যে **'সমগ্রম্'** পদ এসেছে, তাকে এখানে ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম, অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞ নামে বলা হয়েছে।]

'জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে'—এখানে জরা (বৃদ্ধাবস্থা) এবং মরণ থেকে মুক্তি পাওয়ার অর্থ এই নয় যে ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম বিষয় এবং কর্মের জ্ঞান হলে বৃদ্ধাবস্থা হয় না বা দেহের মৃত্যু হয় না। এর তাৎপর্য হল এই যে, বোধ হয়ে গেলেও শরীরে বৃদ্ধাবস্থা এবং মৃত্যু তো অবশ্যই আসবে, কিন্তু এগুলি তাঁকে অন্তর থেকে দুঃখী করতে পারে না। যেমন ত্রয়োদশ অধ্যায়ের চৌত্রিশতম শ্লোকে **'ভূতপ্রকৃতিমোক্ষম্'** বলার তাৎপর্য ভূত এবং প্রকৃতি অর্থাৎ কার্য এবং কারণ থেকে সম্পর্ক-বিচ্ছেদ হওয়া, তেমনই এখানে **'জরামরণমোক্ষায়'** বলার তাৎপর্য হল জরা, মৃত্যু ইত্যাদি শরীরের বিকার থেকে সম্পর্ক-বিচ্ছেদ হওয়া।

যেমন, কোনো একজন যুবক, যার এখনও বৃদ্ধাবস্থা বা মৃত্যু হয়নি, সে জরামরণ থেকে মুক্ত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে জরামরণ থেকে মুক্ত নয়। কারণ জরামরণের মূল কারণ এই শরীরের সঙ্গে যতক্ষণ সম্বন্ধ থাকে, ততক্ষণ জরা-মরণরহিত হলেও সে ওগুলির থেকে বাস্তবে মুক্ত নয়। কিন্তু জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের শরীরে জরা এবং মৃত্যু এলেও, তিনি এগুলি থেকে মুক্ত। সুতরাং জরামরণ থেকে মুক্ত হওয়ার তাৎপর্য হল—যাতে জরা ও মরণ হয়, সেই প্রকৃতিজাত কার্য শরীরের সঙ্গে সর্বতোভাবে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ হওয়া। মানুষ যখন শরীরের সঙ্গে তাদাত্ম্য (এই-ই আমি) মেনে নেয়, তখন শরীর বৃদ্ধ হলে 'আমি বৃদ্ধ হয়েছি' আর দেহের মৃত্যু নিয়ে 'আমি মরে যাব'—এরূপ মনে করে। এই যে মেনে নেওয়া এটি 'শরীরই আমি এবং শরীর আমার' এই ভাবের ওপরই বজায় থাকে। তাই

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে উদ্ধৃত— **'জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি-দুঃখদোষানুদর্শনম্'** অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যধিতে দুঃখরূপ দোষ দর্শন—এর অর্থ হল শরীরের সঙ্গে 'আমি' এবং 'আমার' সম্পর্ক যেন না থাকে। মানুষ যখন 'আমি' ও 'আমার' ভাব থেকে মুক্ত হয়, তখন সে জরামরণাদি থেকেও মুক্ত হয়ে থাকে। কেন-না শরীরের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্কই বাস্তবে জন্মের কারণ— **'কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু'** (গীতা ১৩।২১)। প্রকৃতপক্ষে শরীরের সঙ্গে এর কোনো সম্বন্ধই নেই, সেইজন্যই সম্বন্ধ দূর হয়। সেটাই মিটে যা আসলে নেই।

এখানে **'মামাশ্রিত্য যতন্তি যে'** পদটিতে আশ্রয় গ্রহণ করা এবং প্রযত্ন করা—এই দুটি কথা বলার তাৎপর্য এই যে মানুষ যদি নিজেকে কর্তা মনে করে, তবে এই অহংভাব আসে যে 'আমি এই করেছি, যার ফলে এটি হয়েছে' আর যদি নিজে চেষ্টা না করে 'ভগবানের কৃপায় সবকিছু হয়ে যাবে' এরূপ যদি মনে করে, তবে সে আলস্য ও ভ্রান্তিতে এবং সংগ্রহ ও ভোগবিলাসে ব্যাপৃত হয়। সেইজন্য এখানে দুটি কথা বলা হয়েছে যে শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে নিজে তৎপর হয়ে চেষ্টা করবে এবং সেই উদ্যোগের সাফল্যে ভগবানকে কারণ বলে মানবে।

যেটি সর্বদা বিযুক্ত হচ্ছে অর্থাৎ ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে, সেই শরীর-সংসারকে মানুষ একান্ত নিজের এবং স্থায়ী বলে মনে করে। যতক্ষণ এই শরীর ও সংসারকে স্থায়ী মনে করে তাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, ততক্ষণ সাধনা করলেও তার ভগবদ্প্রাপ্তি হয় না। যদি সে শরীর-সংসার স্থায়ী বলে মনে না করে এবং সেগুলিকে গুরুত্ব না দেয়, তবে তার ভগবদ্প্রাপ্তিতে বিলম্ব ঘটে না। সুতরাং এই দুটি বাধাকে অর্থাৎ শরীর-সংসারের পৃথক্ অস্তিত্ব এবং গুরুত্ব বিচার-বিবেচনার দ্বারা দূর করাই হল প্রযত্ন করা। কিন্তু যাঁরা ভগবানের শরণ নিয়ে প্রচেষ্টা করেন, তাঁরা শ্রেষ্ঠ। তাঁদের তো এই ভাব থাকে যে সেই প্রভুর কৃপাতেই সাধন-ভজন হচ্ছে। ভগবানের কৃপার আশ্রয় নেওয়ায় এবং নিজ ক্ষমতার অহংকার না করায় তাঁরা ভগবানের সমগ্ররূপ জানতে সক্ষম হন।

যারা ভগবানের শরণাগত না হয়ে নিজ কল্যাণের জন্য উদ্যোগ করে, তাদের নিজ নিজ সাধন অনুযায়ী ভগবৎ-স্বরূপের বোধ হলেও ভগবানের সমগ্ররূপের বোধ হয় না। যেমন, কেউ যদি প্রাণায়াম ইত্যাদির দ্বারা যোগাভ্যাস করে, তবে তার অণিমা, মহিমা ইত্যাদি সিদ্ধি প্রাপ্তি হয় এবং তার থেকে উচ্চে আরোহণ করে পরমাত্মার নিরাকার-স্বরূপ বোধ হয় অথবা নিজ স্বরূপে স্থিতিলাভ ঘটে। এইরূপ বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি সম্প্রদায়ের সাধকগণ যাঁরা ঈশ্বর মানেন না, তাঁরাও নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত অনুসারে সাধনা দ্বারা অসৎ-জড়রূপ সংসার থেকে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ করে মুক্ত হয়ে থাকেন। কিন্তু যাঁরা সংসার-বিমুখ হয়ে ভগবানের শরণাগত হয়ে প্রযত্ন করেন, তাঁদের ভগবানের সমগ্ররূপ বোধ হয়ে ভগবদ্-প্রেম প্রাপ্তি হয়—এই বৈশিষ্ট্য জানাবার জন্যই ভগবান এখানে **'মামাশ্রিত্য যতন্তি যে'** কথাটি বলেছেন।

'তে ব্রহ্ম তৎ (বিদুঃ)'—এইভাবে চেষ্টা (সাধনা) করলে এরা আমার স্বরূপ[১] অর্থাৎ যা নির্গুণ-নিরাকার, যা মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদির অগোচর, যা সামনে নেই, শাস্ত্র যার পরোক্ষভাবে বর্ণনা করে থাকে, সেই সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মকে জানতে সক্ষম হয়।

'ব্রহ্মে'র সঙ্গে 'তৎ' শব্দটি প্রয়োগ করার তাৎপর্য হল যে প্রায়ই সমস্ত 'তৎ' শব্দ দ্বারা যে পরমাত্মাকে পরোক্ষরূপে বর্ণনা করা হয়, সেই পরমাত্মাকে তাঁরা সাক্ষাৎ অপরোক্ষরূপে অনুভব করেন।

সেই পরমাত্মার সত্তা প্রাণীমাত্রেই স্বতঃসিদ্ধ। কারণ এই পরমাত্মা কোনো দেশে নেই, কোনো সময়ে নেই বা কোনো বস্তুতে নেই বা কোনো ব্যক্তি বিশেষে নেই— এমন নয়, বরং তিনি সর্ব দেশে, সর্ব সময়ে, সর্ব বস্তুতে এবং সর্ব ব্যক্তিতে বিরাজমান। এরূপ হওয়া সত্ত্বেও তিনি অপ্রাপ্তরূপে প্রতিভাত হন কেন ? যা আগে ছিল না, পরে থাকবে না এবং বিদ্যমান হওয়া সত্ত্বেও প্রতিক্ষণ অবলুপ্ত হচ্ছে, লয়ের দিকে যাচ্ছে—সেইরূপ শরীর-সংসারের অস্তিত্ব মেনে নিলে এবং গুরুত্ব স্বীকার করে নিলেই নিত্যপ্রাপ্ত পরমাত্মতত্ত্ব অপ্রাপ্তরূপে প্রতিভাত হয়।

---

[১] এই আটাশ, উনত্রিশ এবং ত্রিশতম শ্লোকে ভগবান অস্মৎ শব্দ 'মাম্' প্রয়োগ করেছেন, তাই এখানে ব্যাখ্যাতে 'আমার স্বরূপ'-এই অর্থ ধরা হয়েছে।

'কৃৎস্নমধ্যাত্মম্ (বিদুঃ)'—এঁরা সম্পূর্ণ অধ্যাত্ম জ্ঞাত হন অর্থাৎ সমগ্র জীব তত্ত্বতঃ কী, তা তাঁরা জেনে যান। পঞ্চদশ অধ্যায়ের দশম শ্লোকে বলা হয়েছে যে 'জীব একটি দেহ পরিত্যাগ করে অন্য একটি শরীর প্রাপ্ত করে তা বিমূঢ় ব্যক্তিগণ জানতে পারে না, জ্ঞানচক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তা জানেন।' তাঁদের জানার অর্থ এই নয় যে তাঁরা কত জীব আছে, তারা কী কী করে, তাদের গতি কী—এইসব জানেন, বরং আত্মা শরীর হতে পৃথক্—তত্ত্বতঃ এটি জেনে থাকেন অর্থাৎ অনুভব করেন।

ভগবানের আশ্রয়ে থেকে সাধকের যখন ক্রিয়া ও পদার্থ থেকে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ হয়, তখন তিনি অধ্যাত্মতত্ত্ব—নিজ স্বরূপ অবগত হন। শুধু নিজের স্বরূপই নয়, প্রত্যুত ত্রিলোক এবং চতুর্দশ ভুবনের যত স্থাবর-জঙ্গম প্রাণী আছে তাদের সকলের স্বরূপ শুদ্ধ, নির্মল, প্রকৃতি হতে অসম্বন্ধ এটি জানতে পারেন। অনন্ত জন্মে অনন্ত ক্রিয়া এবং শরীরের সঙ্গে একতা করলেও ঐক্য কখনো হতে পারে না এবং অনন্ত জন্ম পর্যন্ত নিজ স্বরূপ বোধ না হলেও এঁরা নিজ-স্বরূপ হতে কখনো পৃথক্ হতে পারেন না—এটি জানাই হল সমস্ত অধ্যাত্ম-তত্ত্ব জানা।

'কর্ম চাখিলং বিদুঃ'—এঁরা সমস্ত কর্মের প্রকৃত তত্ত্ব জানেন অর্থাৎ জগৎ সৃষ্টি কেন হয়, কেমন করে হয় এবং ভগবান কীভাবে তা সম্পাদন করেন—তাও তাঁরা অবগত হন।

যেমন, ভগবান চতুর্বর্ণ সৃষ্টি করেছেন। এই রচনাতে জীবের যে গুণ ও কর্ম অর্থাৎ তাদের যেমন ভাব এবং তারা যেমন কর্ম করেছেন, সেই অনুযায়ী তাদের জন্ম হয়েছে। বিভিন্ন বর্ণে জন্মগ্রহণ করায় স্বয়ং ভগবানের দিক থেকে কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই, অতএব ভগবানে কর্তৃত্ব নেই এবং ফলেচ্ছাও নেই (গীতা ৪।১৩-১৪)। তাৎপর্য হল ভগবান সৃষ্টি করার সময়ও কর্তৃত্ব ও ফলাসক্তিতে নির্লিপ্ত থাকেন। এইরূপ মনুষ্যমাত্রেই দেশ, কাল পরিস্থিতি অনুযায়ী যে কর্তব্য-কর্ম প্রাপ্ত হয়, তা কর্তৃত্ব ও ফলাসক্তিরহিত হয়ে করলে সেই কর্ম মানুষের বন্ধনকারক হয় না অর্থাৎ ওইসব কর্ম ফলজনক হয় না। তাৎপর্য হল এই যে, কর্মের সঙ্গে নিজের কোনো সম্পর্ক নেই, এইভাবে সেগুলিকে নির্লিপ্তভাবে অনুভব করাই হল অখিল কর্মকে জানা।

যাঁরা অনন্যভাবে কেবল ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁদের প্রাকৃত ক্রিয়া এবং পদার্থের সঙ্গে সম্পর্ক দূর হয়। এতে তাঁরা সম্যক্‌রূপে জানতে পারেন যে এই সমস্ত ক্রিয়া এবং পদার্থ পরিবর্তনশীল এবং বিনাশশীল অর্থাৎ ক্রিয়াগুলির আদি ও অন্ত আছে এবং পদার্থেরও উৎপত্তি ও বিনাশ, সংযোগ ও বিয়োগ হয়। ব্রহ্মলোক পর্যন্ত কোনো ক্রিয়া এবং পদার্থ চিরস্থায়ী নয়। অতএব কর্মের সঙ্গে আমার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই—এটিই হল অখিল কর্মকে অবগত হওয়া।

তাৎপর্য হল এই যে, যাঁরা ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করেন তাঁরা ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম বিষয় এবং কর্মের প্রকৃত তত্ত্ব জানেন অর্থাৎ ভগবান যেমন বলেছেন যে, 'এই সমস্ত জগৎ আমাতেই ওতঃপ্রোত হয়ে আছে' (৭।৭) এবং 'সমস্তই বাসুদেব' (৭।১৯), তদনুরূপ তাঁরা ভগবানের সমগ্ররূপ অবগত হন অর্থাৎ ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম বিষয় এবং কর্ম—এ সবই ভগবৎস্বরূপ ; ভগবান ভিন্ন এতে আর কোনো দ্বিতীয় অস্তিত্ব নেই।

*** *** ***

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞং চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ॥ ৩০ ॥

[যে (যেসব মানুষ) ; সাধিভূতাধিদৈবম্ (অধিভূত, অধিদৈব) ; চ (এবং) ; সাধিযজ্ঞম্ (অধিযজ্ঞের সঙ্গে) ; মাম্ (আমাকে) ; বিদুঃ (জানেন) ; তে (তাঁরা) ; যুক্তচেতসঃ (যুক্তচিত্ত হওয়ায়) ; প্রয়াণকালে, অপি (মৃত্যুকালেও) ; মাম্, চ (আমাকেই) ; বিদুঃ (জানতে পারেন।)]

যেসব মানুষ অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞসহ আমাকে জানেন, তাঁরা যুক্তচিত্ত হওয়ায় মৃত্যুকালেও আমাকে জানতে পারেন অর্থাৎ আমাকেই প্রাপ্ত হন ॥ ৩০ ॥

ব্যাখ্যা—'সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞং চ যে বিদুঃ'—[আগের শ্লোকে নির্গুণ-নিরাকারের বর্ণনা করে এবার সগুণ-সাকারের বর্ণনা করছেন।]

এখানে ভৌতিক স্থূল সৃষ্টিকে বলা হয়েছে **'অধিভূত'**, যাতে তমোগুণের প্রাধান্য থাকে। যত ভৌতিক পদার্থ আছে, সেগুলির কোনো পৃথক্ অস্তিত্ব নেই, ক্ষণমাত্রও কোনো স্থায়িত্ব নেই। তা সত্ত্বেও এই ভৌতিক সৃষ্টি সত্য বলে প্রতিভাত হয় অর্থাৎ এতে সত্যতা, স্থিরতা, সুখ, শ্রেষ্ঠতা এবং আকর্ষণ রয়েছে বলে মনে হয়। এই সত্যতা ইত্যাদি সবই প্রকৃতপক্ষে ভগবানের, ক্ষণভঙ্গুর জগতের নয়। তাৎপর্য এই যে বরফের অস্তিত্ব যেমন জল ছাড়া হতে পারে না, তেমনই ভৌতিক স্থূল সৃষ্টি বা অধিভূতের অস্তিত্ব ভগবান ব্যতিরেকে হওয়া সম্ভবপর নয়। এইভাবে তত্ত্বতঃ এই জগৎ-সংসার যে ভগবৎ-স্বরূপই—এটি জানাই অধিভূত-সহ ভগবানকে জানা।

'অধিদৈব' জগৎ-সৃজনকারী হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাকে বলা হয়, যাঁতে রজোগুণের প্রাধান্য থাকে। ভগবানই ব্রহ্মার রূপে প্রকটিত হন। অর্থাৎ তত্ত্বতঃ ব্রহ্মা হলেন ভগবৎ-স্বরূপই—এটি জানাই অধিদৈব-সহ ভগবানকে জানা।

ভগবান বিষ্ণুকে বলা হয় **'অধিযজ্ঞ'**, যিনি অন্তর্যামীরূপে সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে আছেন এবং যাঁতে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য থাকে। তত্ত্বতঃ ভগবানই অন্তর্যামীরূপে সর্বত্র পরিপূর্ণ—এটি জানা অধিযজ্ঞ-সহ ভগবানকে জানা।

অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞ-সহ ভগবানকে জানার অর্থ হল যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরীরের কোনো একটিমাত্র অংশে বিরাটরূপ বিদ্যমান (গীতা ১০।৪২ ; ১১।৭) এবং সেই বিরাটরূপে অধিভূত (অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড), অধিদৈব (ব্রহ্মা) এবং অধিযজ্ঞ (বিষ্ণু) ইত্যাদি সবই বিদ্যমান। যেমন অর্জুন বলেছিলেন যে—হে দেব ! আমি আপনার শরীরে সকল প্রাণীকে, যাঁর নাভি হতে কমল বহির্গত হয়েছে সেই বিষ্ণুকে, কমলের ওপর বিরাজিত ব্রহ্মাকে এবং শঙ্কর প্রভৃতিকে দেখতে পাচ্ছি (গীতা ১১।৩৫)। অতএব তত্ত্বতঃ অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞ ভগবান শ্রীকৃষ্ণই। শ্রীকৃষ্ণই সমগ্র ভগবান।

'প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ'—যাঁরা সাংসারিক ভোগ এবং সংগ্রহের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিতে সম থাকেন এবং সংসারে সর্বতোভাবে নিবৃত্ত হয়ে ভগবানে মনোনিবেশ করেন, তাঁদের যুক্তচেতা ব্যক্তি বলা হয়। এরূপ যুক্তচেতা মানুষ অন্ত সময়েও আমাকে জানতে পারেন অর্থাৎ মৃত্যুকালে ভয়ংকর পীড়া ইত্যাদিতেও তাঁরা আমাতেই অটলভাবে বিরাজ করেন। তাঁদের এই অবস্থান এত দৃঢ় হয় যে স্থূল বা সূক্ষ্মদেহে যতই বিপদ আসুক আমা হতে তাঁরা কখনোই বিচ্যুত হন না।

ভগবানের সমগ্র-রূপ সম্পর্কে বিশেষ কথা

(১)

প্রকৃতি এবং প্রকৃতির কার্য—ক্রিয়া, পদার্থ ইত্যাদির সঙ্গে নিজের সম্পর্ক স্থাপন করলেই সমস্ত বিকার উৎপন্ন হয় এবং ওইসব ক্রিয়া, পদার্থ ইত্যাদির অস্তিত্ব প্রকটভাবে প্রতিভাত হয়। কিন্তু প্রকৃতি এবং তার কার্যগুলি থেকে সর্বতোভাবে সম্পর্ক-ছিন্ন করে ভগবৎ-স্বরূপে স্থিত হলে এগুলির পৃথক্ সত্তা ওই ভগবৎ-তত্ত্বে লীন হয়ে যায়। তখন এগুলির পৃথক্ সত্তা আর অনুভূত হয় না।

যেমন কোনো ব্যক্তির সম্বন্ধে আমাদের যে ভালো-মন্দ বলে ধারণা থাকে, তা আমাদেরই করে নেওয়া। তত্ত্বতঃ ওই ব্যক্তি ভগবানের স্বরূপ অর্থাৎ ওই ব্যক্তির মধ্যে তত্ত্ব ছাড়া অন্য কোনো স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব নেই। তেমনই জগতে 'এটি ঠিক, এটি বেঠিক' এই ঠিক-বেঠিকের ধারণা আমাদেরই তৈরি করা। তত্ত্বতঃ জগৎ-সংসার ভগবানেরই স্বরূপ। তবে জগতে যে বর্ণ-আশ্রমের মর্যাদাবোধ, 'এই কাজ করা উচিত আর এই কাজ করা উচিত নয়'—এইসকল বিধি-নিষেধের নিয়ম ব্যবহারিক-জীবনে মহাত্মাগণ জীবের কল্যাণের জন্য মান্য করতে বলেছেন।

যখন এই জগৎ (ভৌতিক সৃষ্টি) ছিল না, তখনও ভগবান ছিলেন এবং জগৎ লয় হয়ে গেলেও ভগবান থাকবেন—এইভাবে যখন প্রকৃত ভগবদ্‌তত্ত্বের বোধ হয়ে যায়, তখন এই জাগতিক সৃষ্টির সত্তা ভগবানেই লীন হয়ে যায় অর্থাৎ তখন আর জগতের পৃথক্ সত্তা থাকে না। এর অর্থ এই নয় যে, জগতের পৃথক্ সত্তা না থাকায় জগৎ লয় হয়ে যায়, সেটি থাকে না, বরং চিত্তে সত্য বলে জগতের যে অস্তিত্ব এবং মহত্ত্ব স্থান করে নিয়েছে, যা জীবের কল্যাণের বাধক, তা আর থাকে না। সোনার গহনার যেমন নানা আকৃতি এবং ভিন্ন ভিন্ন উপযোগিতা সত্ত্বেও সেগুলিতে এক সোনা-ই থাকে, তেমনই ভগবদ্ভক্ত নানাপ্রকার যথোপযুক্ত ব্যবহারাদি করলেও তাঁর এই বুদ্ধি

অচল থাকে যে সবেতেই এক ভগবদ্-তত্ত্ব বিদ্যমান। এই তত্ত্ব বোঝার জন্যই উনত্রিশ এবং ত্রিশতম শ্লোকে সমগ্ররূপের বর্ণনা করা হয়েছে।

(২)

উপাসনার দৃষ্টিতে দেখলে ভগবানের দুটি রূপেরই বিশেষ বর্ণনা পাওয়া যায়—এক হল সগুণ আর অপরটি নির্গুণ। সগুণের দুটি ভাগ—এক সগুণ-সাকার, অন্যটি সগুণ-নিরাকার। কিন্তু নির্গুণের কোনো ভাগ হয় না, নির্গুণ নিরাকারই শুধু হয়। তবে নিরাকারের দুটি ভাগ হয়—সগুণ-নিরাকার এবং নির্গুণ-নিরাকার।

উপাসনাকারীও দু'প্রকারের হয়ে থাকে—এক সগুণ বিষয়ে রুচিসম্পন্ন এবং অপরটি হল নির্গুণ বিষয়ে রুচিসম্পন্ন। কিন্তু এই দু'পক্ষের উপাসনাই ভগবানের 'সগুণ-নিরাকার' দিয়েই শুরু হয়। যেমন—ভগবান লাভের জন্য কোনো সাধক যখন যত্নবান হন তখন তিনি প্রথমে 'ভগবান আছেন'—এইভাবে পরমাত্মার অস্তিত্ব মেনে নেন এবং 'ভগবান সব থেকে শ্রেষ্ঠ, সব থেকে দয়ালু, তাঁর থেকে বড় আর কেউ নেই'—এরূপ বিশ্বাস তাঁর মধ্যে থাকে, তাই তাঁর উপাসনা প্রকৃতপক্ষে সগুণ-নিরাকার থেকেই আরম্ভ হয়। এর কারণ হল যে বুদ্ধি প্রাকৃতিক (সগুণ) হওয়ায় নির্গুণ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। তাই নির্গুণ উপাসকের লক্ষ্য নির্গুণ-নিরাকারের হলেও, বুদ্ধির দ্বারা তিনি সগুণ-নিরাকারের চিন্তনই করেন[১]।

সগুণের উপাসনাকারীরা প্রথমে সগুণ-সাকার মেনে নিয়ে পূজা করেন। কিন্তু মনে যতক্ষণ সাকাররূপ দৃঢ় না হয়, ততক্ষণ 'প্রভু আছেন এবং তিনি আমার সম্মুখে বিরাজমান'—এই ধারণাই প্রধান হয়। এই মেনে নেওয়াতে সগুণ ভগবানের অভিব্যক্তি যত বেশি হয়, উপাসনাও তত উচ্চ হয়। অবশেষে যখন তিনি সগুণ-সাকাররূপে ভগবানের দর্শন, ভাষণ, স্পর্শ এবং প্রসাদ প্রাপ্ত হন, তখন তাঁর উপাসনা পূর্ণতা লাভ করে।

নির্গুণের উপাসনাকারীরা পরমাত্মাকে সমস্ত জগতে ব্যাপকরূপে ভেবে চিন্তা করেন। যাঁর বৃত্তি যত সূক্ষ্ম হয়, তাঁর উপাসনাও তত উচ্চ হয়। পরিশেষে জাগতিক আসক্তি এবং গুণসমূহের পরিত্যাগ হয়ে যখন 'আমি', 'তুমি' ইত্যাদি বিভেদ আর থাকে না, চিন্ময় তত্ত্বই যখন শুধু অবশিষ্ট থাকে, তখন তাঁর উপাসনা পূর্ণতা লাভ করে।

এইভাবে উভয়েরই নিজ নিজ উপাসনা পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হলে দুইয়ের মধ্যে ঐক্য হয়ে যায় অর্থাৎ উভয়ে একই তত্ত্ব প্রাপ্ত হয়[২]। সগুণ-সাকারের উপাসকদের ভগবৎকৃপায় নির্গুণ-নিরাকারের বোধও হয়ে যায়—**মম দরসন ফল পরম অনূপা। জীব পাব নিজ সহজ স্বরূপ।** (শ্রীরামচরিতমানস ৩।৩৬।৫)। নির্গুণ-নিরাকারের উপাসকের যদি ভক্তির সংস্কার থাকে এবং ভগবানকে দর্শন করার আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে তাঁরও ভগবদ্-দর্শন হয় অথবা ভগবানের যদি সেই ভক্তের দ্বারা কোনো বিশেষ কার্য সম্পন্ন করাবার হয়, তাহলে ভগবান নিজে থেকেই তাকে দর্শন দিয়ে থাকেন। যেমন নির্গুণ-নিরাকারের উপাসক শ্রীমধুসূদনাচার্যকে ভগবান নিজে থেকেই দর্শন দিয়েছিলেন[৩]।

---

[১]উপাসনা সগুণ-নিরাকারের থেকে আরম্ভ হয়—তাই ভগবান এই (সপ্তম) অধ্যায়ের আটাশতম শ্লোকে 'সগুণ-নিরাকারের' বর্ণনা করেছেন এবং উনত্রিশতম শ্লোকে 'নির্গুণ-নিরাকার' তথা ত্রিশতম শ্লোকে 'সগুণ-সাকার'-এর বর্ণনা করেছেন। এইভাবে এখানে তিনটি স্বরূপের এক-একটি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু পরে অষ্টম অধ্যায়ে এই তিনটির তিনটি করে শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, যেমন—অষ্টম অধ্যায়ের অষ্টম, নবম, দশম শ্লোকে 'সগুণ-নিরাকার'-এর উপাসনা ; একাদশ, দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শ্লোকে 'নির্গুণ-নিরাকারে'র উপাসনা এবং চতুর্দশ, পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শ্লোকে 'সগুণ-সাকার'-এর উপাসনার বিশদ্ বর্ণনা করা হয়েছে।

[২]সগুণ-নির্গুণের প্রভেদ উপাসনার দৃষ্টিতেই কেবল হয়, বাস্তবে এই উভয় উপাসনার মধ্যে উপাস্য-তত্ত্ব একই থাকে। সাধকের রুচি, বিশ্বাস এবং যোগ্যতা অনুসারেই উপাসনা হয়। অতএব সাধকদের ভিন্ন ভিন্ন রুচি, বিশ্বাস, যোগ্যতা হওয়ায় উপাসনাও বিভিন্ন প্রকারের হয়। কিন্তু সব উপাসনারই শেষে একই উপাস্য-তত্ত্ব লাভ হয়। সেই উপাস্য-তত্ত্বকেই বলা হয় 'সমগ্র ব্রহ্ম'।

[৩]অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ স্বারাজ্যাসিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ। শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন॥

'অদ্বৈতমার্গের অনুগামীদের দ্বারা পূজনীয় এবং স্বারাজ্যরূপ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অধিকার প্রাপ্ত আমাকে গোপিনীদের অনুসরণকারী কোনো এক ধূর্ত জোর করে তাঁর শ্রীচরণের দাস করে রেখেছেন!'

(৩)

প্রকৃতপক্ষে ভগবান সগুণ-নির্গুণ, সাকার-নিরাকার সবই। সগুণ-নির্গুণ হল তাঁর বিশেষণ, নাম। যে সাধক পরমাত্মাকে গুণযুক্তভাবে মেনে থাকেন, তাঁর জন্য ভগবান সগুণ আর যে সাধক ভগবানকে গুণরহিত বলে মানেন, তাঁর কাছে ভগবান নির্গুণ। বাস্তবে পরমাত্মা সগুণ এবং নির্গুণ দুই-ই, আবার এ দুইয়ের অতীতও। কিন্তু এই বাস্তবিকতা তখনই জানা যায়, যখন প্রকৃত বোধ হয়।

ভগবানের সৌন্দর্য, মাধুর্য, ঐশ্বর্য, ঔদার্য ইত্যাদি যে সকল দিব্যগুণ আছে, সেই গুণগুলিসহ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত পরমাত্মাকে 'সগুণ' বলা হয়। এই সগুণের দুটি ভাগ—

১) **সগুণ-নিরাকার**—যেমন, আকাশের গুণ হল 'শব্দ', কিন্তু আকাশের কোনো আকার (আকৃতি) নেই, তাই, আকাশ হল সগুণ-নিরাকার। সেইরূপই প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক কার্যরূপে জগতে পরিপূর্ণ পরমাত্মাকে বলা হয় সগুণ-নিরাকার।

২) **সগুণ-সাকার**—এই সগুণ-নিরাকার পরমাত্মাই যখন তাঁর দিব্য প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে নিজ যোগমায়ার দ্বারা লোক-চক্ষে প্রকটিত হন, ইন্দ্রিয়াদির গোচরীভূত হন, তখন তাঁকে সগুণ-সাকার বলা হয়। সগুণ তিনি তো ছিলেনই, আকৃতিযুক্ত হয়ে প্রকটিত হওয়াতেই তাঁকে সাকার বলা হয়।

সাধক যখন পরমাত্মাকে দিব্য অলৌকিক গুণেরও রহিত বলে মনে করেন অর্থাৎ সাধকের দৃষ্টি শুধুমাত্র নির্গুণ-পরমাত্মার দিকে থাকে, তখন পরমাত্মার সেই স্বরূপকে—'নির্গুণ-নিরাকার' বলা হয়।

গুণগুলিকেও দু'ভাগে ভাগ করা হয়—(১) পরমাত্মার স্বরূপভূত সৌন্দর্য, মাধুর্য, ঐশ্বর্য ইত্যাদি দিব্য, অলৌকিক, অপ্রাকৃত গুণ ; এবং (২) প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ ও তমগুণ। পরমাত্মা সগুণ-নিরাকার হোন বা সগুণ-সাকার হোন, তিনি প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ, তম—ত্রিগুণের সর্বতোভাবে রহিত, অতীত। যদিও তিনি প্রকৃতির গুণগুলি স্বীকার করে সৃষ্টির উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের লীলা করেন, তা সত্ত্বেও তিনি প্রকৃতির গুণগুলির থেকে সর্বতোভাবে রহিত থাকেন (গীতা ৭।১৩)।

যিনি গুণের দ্বারা কখনো আবদ্ধ হন না, গুণসমূহের ওপর যাঁর পূর্ণ আধিপত্য থাকে, সেই পরমাত্মাকেই নির্গুণ বলা হয়। পরমাত্মা যদি গুণগুলির দ্বারা আবদ্ধ হন এবং গুণগুলির অধীন হন, তাহলে তিনি কখনো নির্গুণ হতে পারেন না। নির্গুণ তিনিই হতে পারেন, যিনি সমস্ত গুণের অতীত, সেই পরমাত্মাই সর্বগুণান্বিত হন। তাই ভগবানকে সগুণ-নির্গুণ, সাকার-নিরাকার ইত্যাদি সবই বলা যায়। এই পরমাত্মাকেই উনত্রিশ-ত্রিশতম শ্লোকে সমগ্ররূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

অধ্যায় সম্পর্কিত বিশেষ কথা

ভগবান এই অধ্যায়ে প্রথমে পরিবর্তনশীলকে 'অপরা' এবং অপরিবর্তনশীলকে 'পরা' নামে উল্লেখ করেছেন (৭।৪-৫)। আবার এই উভয়ের সংযোগে সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তির কথা বলেছেন এবং নিজেকে এই সমগ্র জগতের প্রভব এবং প্রলয় বলে জানিয়েছেন অর্থাৎ জগৎ সংসারের আদি ও অন্তে 'কেবল আমিই থাকি' বলে জানিয়েছেন (৭।৬-৭)। সেই প্রসঙ্গেই ভগবান সতেরোটি বিভূতির রূপে কারণস্বরূপ নিজের ব্যাপকতা জানিয়েছেন (৭।৮-১২)। এরপর ভগবান বলেছেন যে যারা তিনটি গুণে মুগ্ধ অর্থাৎ যারা নিরন্তর পরিবর্তনশীল প্রকৃতির সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নিয়েছে, তারা সেই গুণগুলির অতীত আমাকে জানে না (৭।১৩)। এই গুণময়ী মায়া অতিক্রম করা অত্যন্ত দুষ্কর। যারা আমার শরণাগত হয় তারা এই মায়া অতিক্রম করে (৭।১৪) ; কিন্তু যারা আমা হতে বিমুখ হয়ে নিষিদ্ধ আচরণে ব্যাপৃত হয়, সেই দুষ্কৃতকারিগণ আমার শরণ গ্রহণ করে না (৭।১৫)। এবার চতুর্দশ শ্লোকের পরই ষোড়শ শ্লোকটি বলা হলে প্রকরণ অনুযায়ী ঠিক হত। কারণ চতুর্দশ শ্লোকে শরণ নেওয়ার কথা বলেছেন এবং শরণাগত চার প্রকারের হয়—এরূপ বললে পূর্বানুক্রম ঠিক থাকত। কিন্তু পঞ্চদশ শ্লোকটি মধ্যে এসে পড়ায় প্রকরণটি ঠিক মনে হয় না। তাই এই শ্লোকটিকে প্রকরণের বিরুদ্ধ বা বাধা-প্রদানকারী বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি প্রকরণের বিরুদ্ধ নয়। এই শ্লোকটি না থাকলে 'পাপীরা আমার শরণ নেয় না'—এই কথাটি বলা বাকি থাকত। তাই পঞ্চদশ শ্লোকে ওই কথাটি জানিয়ে ষোড়শ শ্লোকে শরণাগতদের চারটি প্রকারের কথা বলেছেন।

যাঁরা শরণ গ্রহণ করেন, তাঁদেরও দুভাগে ভাগ করা

হয়েছে—ভগবানকে ভগবান ভেবে অর্থাৎ তাঁর মহত্ত্ব জেনে শরণাগত হওয়া (৭।১৬-১৯), আর ভগবানকে সাধারণ মানুষ ভেবে দেবতাদেরই সব থেকে বড় বলে মনে করে ভগবানের আশ্রয় না নিয়ে কামনা পূরণের জন্য দেবতাদের শরণাগত হওয়া (৭।২০-২৩)।

দেবতাদের শরণাগত হওয়ারও দুটি কারণ থাকে—কামনা বৃদ্ধি হওয়া এবং ভগবানের মহত্ত্ব না জানা। এর মধ্যে প্রথমটির বর্ণনা বিশ থেকে তেইশতম শ্লোক পর্যন্ত করা হয়েছে আর দ্বিতীয় হেতুটি চব্বিশতম শ্লোকে বর্ণনা করেছেন। যারা ভগবানকে সাধারণ মানুষ বলে মনে করে, তাদের কাছে ভগবান প্রকটিত হন না—পঁচিশতম শ্লোকে এই কথা বলা হয়েছে।

এরূপ মনে হতে পারে যে ভগবানও মায়া দ্বারা আবৃত। তাই ভগবান বলেছেন যে, 'আমার জ্ঞান আবৃত নয়' (৭।২৬)। 'আমাকে না জানার প্রধান কারণ হল রাগ (আসক্তি) ও দ্বেষ (৭।২৭)।' যাঁরা এই দ্বন্দ্বরূপ মোহ থেকে মুক্ত, তাঁরা দৃঢ়ব্রতী হয়ে আমার ভজনা করেন' (৭।২৮) ; 'যাঁরা আমার শরণ গ্রহণ করে প্রচেষ্টা করেন, তাঁরা আমার সমগ্ররূপ অবগত হন এবং অন্তকালে আমাকেই প্রাপ্ত হন' (৭।২৯-৩০)।

এই অধ্যায়ের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিচার করলে দেখা যায় এখানে ভগবানে বিমুখ ও সম্মুখ হওয়ার বর্ণনাই আছে। তাৎপর্য হল যে, জড়ত্বের দিকে বৃত্তি থাকলেই মানুষকে বারংবার জন্মগ্রহণ করতে হয়। যদি তারা জড়ত্ব হতে বিমুখ হয়ে ভগবানের শরণাগত হয়, তাহলে তারা সগুণ-নিরাকার, নির্গুণ-নিরাকার এবং সগুণ-সাকার—এভাবে ভগবানের সমগ্র রূপ অবগত হয়ে অন্তকালে তাঁকেই প্রাপ্ত হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব—এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন, আমি বিজ্ঞানসহ সেই জ্ঞানের কথা বলব, যাতে তুমি আমার সমগ্র রূপটি জানতে পারবে যা জানার পরে আর কিছুই জানা অবশিষ্ট থাকে না। আবার উনিশতম শ্লোকে ভগবান **'বাসুদেবঃ সর্বম্'** কথাটি বলে তাঁর সমগ্ররূপের সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন। অধ্যায়ের শেষে এবার ভগবান তা বিস্তারিত ভাবে জানাচ্ছেন।

সাধকের জন্ম সম্পন্ন হয়েছে এবং ব্যাধি অবশ্যম্ভাবী না হলেও বৃদ্ধাবস্থা এবং মৃত্যু এই দুটিই অবশ্যম্ভাবী এবং এর থেকেই মানুষ অধিক দুঃখ পায়। তাই এখানে **'জরামরণমোক্ষায়'** কথাটি বলার অর্থ হল যে ভগবানের আশ্রয় গ্রহণকারী ভক্ত জরা ও মৃত্যু— এই দুই থেকে মুক্ত হয়ে থাকে অর্থাৎ তাঁর শরীরধারণ কালে জরাও দুঃখদায়ক হয় না এবং এই চিন্তায়ও দুঃখিত হন না যে মৃত্যুর পর তাঁর কী গতি হবে ? তিনি ভগবানের শরণ নিয়ে সাধনরত, তাই তিনি পরা-অপরাসহ ভগবানের সমগ্ররূপটি জানতে পারেন অর্থাৎ বিজ্ঞান-সহ জ্ঞানকে জেনে থাকেন।

কর্মযোগী এবং জ্ঞানযোগী যদিও জন্ম-মরণ থেকে মুক্ত হয়ে যান, কিন্তু শুধুমাত্র ভক্তই মুক্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের সমগ্ররূপটি অবগত হন। কারণ কর্মযোগী ও জ্ঞানযোগীর নিজ নিজ সাধনের ওপরই নিষ্ঠা থাকে (গীতা৩।৩), কিন্তু ভক্ত প্রথম থেকেই ভগবদ্‌নিষ্ঠ অর্থাৎ ভগবদ্‌পরায়ণ হয়ে থাকেন। তাই ভগবদ্‌নিষ্ঠ হওয়ায় ভগবান কৃপা করে তাঁদের নিজের সমগ্ররূপ সম্বন্ধে অবহিত করেন।

এই অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, কদাচিৎ কেউ আমার সমগ্ররূপকে জানতে পারেন—**'কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ'**। এখানে বলেছেন যাঁরা আমার শরণাগত হন, তাঁরা আমার সমগ্ররূপ জানতে পারেন। অতএব ভগবানের সমগ্ররূপ (বিজ্ঞানসহ জ্ঞান) জানার মুখ্য সাধন হল শরণাগতি (**মামাশ্রিত্য**)। কেন-না বিচার বিবেচনার দ্বারা সমগ্রের জ্ঞান হয় না, শ্রদ্ধা বিশ্বাসপূর্বক শরণাগত হলে তবেই ভগবৎকৃপায় সমগ্রের জ্ঞান হয়। তাই ভগবান সপ্তম অধ্যায়ের প্রারম্ভে **'মদাশ্রয়ঃ'** বলে শেষকালে **'মামাশ্রিত্য'** পদটির সাহায্যে এর উপসংহার করেছেন।

ব্রহ্ম (নির্গুণ-নিরাকার), **কৃৎস্ন অধ্যাত্ম** (অনন্ত যোনির অনন্ত জীব) এবং **অখিল কর্ম** (উৎপত্তি-স্থিতি-লয়ের সকল ক্রিয়া)—এগুলি 'জ্ঞানে'র বিভাগ। এই বিভাগে নির্গুণের প্রাধান্য থাকে।

অধিভূত (নিজ শরীরসহ সম্পূর্ণ পাঞ্চভৌতিক জগৎ), **অধিদৈব** (মন ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাসহ ব্রহ্মা ইত্যাদি সমগ্র দেবতা) এবং **অধিযজ্ঞ** (অন্তর্যামী বিষ্ণু এবং তাঁর সমগ্র রূপ)—এগুলি হল 'বিজ্ঞানের' বিভাগ। এই বিভাগে সগুণের প্রাধান্য থাকে।

অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞে **'সহ'** কথাটি বলার অর্থ হল এই যে, সৎ-অসৎ, পরা-অপরা সবই ভগবান। ভগবান ছাড়া আর কোনো কিছুই নেই। সৎ-অসৎকে পৃথক্ পৃথক্ করলে জ্ঞানমার্গ হয়— **'নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ'**। উভয়োরপি.....(গীতা ২।১৬) আর এক করলে ভক্তিমার্গ হয়— **'সদসচ্চাহমর্জুন'** (গীতা ৯।১৯)।

আগে পঞ্চম অধ্যায়ে ত্রয়োদশ থেকে ছাব্বিশতম শ্লোক পর্যন্ত **'ব্রহ্ম'** সম্বন্ধে বলা হয়েছে। **'কৃৎস্ন অধ্যাত্ম'**র কথা আগে ষষ্ঠ অধ্যায়ের উনত্রিশতম শ্লোকে **'সর্বভূতস্থমাত্মানম্'** পদে বলা হয়েছে। 'অখিল কর্মে'র কথা আগে চতুর্থ অধ্যায়ের আঠারোতম, তেইশতম এবং তেত্রিশতম শ্লোকে ক্রমানুসারে **'কৃৎস্নকর্মকৃৎ'**, **'কর্ম সমগ্রম্'** এবং **'সর্বং কর্মাখিলম্'** পদগুলির দ্বারা বলা হয়েছে।

অ-ভাব কর্মেরই হয়, আত্মা বা ব্রহ্মের নয়। ন্যায়শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে কোনো বাস্তব ভাবের জ্ঞান যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হয়, সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই তার অ-ভাব এবং সেই শ্রেণীর জ্ঞানও হয়। অতএব মানুষ যে জ্ঞানের দ্বারা কর্মকে জানে (**কর্ম চাখিলম্**), সেই জ্ঞানের দ্বারা কর্মের অ-ভাবকে এবং অকর্মকেও জানে— **'কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেৎ'** (গীতা ৪।১৮)। ব্রহ্ম, আত্মা এবং অকর্ম—এই তিনটি একই, এ রূপ জানাই **'তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম চাখিলম্'** পদের তাৎপর্য।

'কর্ম' সীমিত, কর্মের থেকে ব্যাপক হল **'অধ্যাত্ম'**, অধ্যাত্মর থেকে ব্যাপক হল **'ব্রহ্ম'**। কিন্তু **'মাম্'** (সমগ্র) এটি ব্রহ্ম থেকেও শ্রেষ্ঠ, কারণ সমগ্র ব্রহ্মের অন্তর্গত নয়, কিন্তু ব্রহ্ম সমগ্রের অন্তর্গত।

'অধ্যাত্ম'র সঙ্গে **'কৃৎস্ন'** শব্দটি প্রয়োগ করার অর্থ হল, ভগবান যাদের তাঁর পরা প্রকৃতিরূপে সৃষ্টি করেছেন, তারা নানারূপে প্রতিভাত সম্পূর্ণ জীব। কর্মের সঙ্গে **'অখিল'** শব্দটি ব্যবহারের তাৎপর্য হল এই যে, যার ফলস্বরূপ জীব বহু যোনি এবং বহু লোকে গমন করে, তা হল শুভ-অশুভ সমস্ত কর্ম, কিন্তু **'ব্রহ্ম'**র সঙ্গে **'কৃৎস্ন'** বা **'অখিল'** শব্দ ব্যবহার না করার তাৎপর্য হল যে ব্রহ্ম অনেক নয়, তা একই।

গীতায় ভগবান দুটি নিষ্ঠার কথা জানিয়েছেন—কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ। এই উভয় নিষ্ঠাই লৌকিক— **'লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা'** (গীতা ৩।৩), কিন্তু ভক্তিযোগ হল অলৌকিক নিষ্ঠা। কেন-না কর্মযোগে থাকে **'ক্ষর'** (জগৎ-সংসার)-এর প্রাধান্য আর জ্ঞানযোগে থাকে **'অক্ষর'** (জীবাত্মা)-এর প্রাধান্য। ক্ষর ও অক্ষর উভয়ই জগতে বিদ্যমান— **'দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ'** (গীতা ১৫।১৬)। তাই কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ—এই দুটি হল লৌকিক নিষ্ঠা। কিন্তু ভক্তিযোগে 'পরমাত্মার' প্রাধান্য থাকে, যা ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর হতে উত্তম (গীতা ১৫-১৭।১৮), সেইজন্য ভক্তিযোগ হল অলৌকিক নিষ্ঠা। ভগবানের সমগ্ররূপে ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম কর্ম—এইগুলিতে লৌকিক (কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ)-এর কথা এসেছে[১] এবং অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞ এগুলিতে অলৌকিক নিষ্ঠার (ভক্তিযোগের) কথা উদ্ধৃত হয়েছে। **'জ্ঞান'** লৌকিক— **'ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ[২] বিদ্যতে'** (গীতা ৪।৩৮) এবং বিজ্ঞান অলৌকিক। লৌকিক ও অলৌকিক— দুই-ই সমগ্র ভগবানেরই রূপ— **'বাসুদেবঃ সর্বম্'**।

'লোক' কথাটিতে জড় ও চেতন উভয়কেই বোঝায়। 'লোক' শব্দটি শুধুমাত্র জড় অথবা চেতনের বাচক হতে পারে না। অতএব 'লৌকিক' শব্দে জড় এবং চেতন উভয়ই অন্তর্গত হয়ে থাকে, কিন্তু 'অলৌকিক' শব্দটি শুধু চেতনেই ব্যবহৃত হয়, কেন-না অলৌকিক সর্বদাই চিন্ময়। কিন্তু লৌকিক ও অলৌকিক উভয়ই 'সমগ্র'র মধ্যে আসে।

এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার ব্যাপার হল যে নির্গুণ-নিরাকার 'ব্রহ্মের' নামও ভগবানের সমগ্ররূপের অন্তর্গত। জগতে প্রায়শঃই এই ব্যাপারে প্রসিদ্ধি আছে যে সগুণ ঈশ্বর নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের অন্তর্গত। ব্রহ্ম মায়ারহিত আর ঈশ্বর

---

[১]'অধ্যাত্ম' শব্দটির দ্বারা জ্ঞানযোগ এবং কর্ম শব্দে কর্মযোগ বুঝতে হবে। জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগ—উভয়ের দ্বারাই 'ব্রহ্মের' প্রাপ্তি হয়ে থাকে (গীতা ৫।৪-৫)।

ভক্তিযোগের প্রসঙ্গ হওয়ায় ভগবান এখানে জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগের বিস্তারিত বর্ণনা করেননি। এর বিস্তারিত বর্ণনা আগের (দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ) অধ্যায়গুলিতে করা হয়েছে।

[২]এখানে 'পবিত্রমিহ'র অন্তর্গত 'ইহ' শব্দটি লোকের বাচক।

মায়াযুক্ত। অতএব ব্রহ্মের এক অংশে ঈশ্বর অবস্থিত। যদিও বাস্তবে এরূপ মনে করা শাস্ত্রসম্মত এবং যুক্তিসঙ্গত নয়, কারণ ব্রহ্মে যখন মায়া নেই-ই, তখন মায়াযুক্ত ঈশ্বর ব্রহ্মের অন্তর্গত হন কীভাবে ? ব্রহ্মে মায়া কোথা থেকে এল ? কিন্তু ভগবান গীতায় বলেছেন যে, আমার সমগ্র রূপের একাংশে ব্রহ্ম বিরাজিত। তাই ভগবান নিজেকে ব্রহ্মার আধার বলে জানিয়েছেন—**'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্'** (গীতা ১৪।২৭)। 'আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা' এবং **'ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা'** (গীতা ৯।৪) 'এই সমগ্র জগৎ আমার অব্যক্ত স্বরূপদ্বারা পরিব্যাপ্ত'। ভগবানের এই উক্তির তাৎপর্য হল যে আমি ব্রহ্মের অংশ নই, বরং ব্রহ্মই আমার অংশ। সুতরাং নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে এরূপ দেখা যায় যে গীতায় ব্রহ্মের প্রাধান্য নেই, ঈশ্বরেরই প্রাধান্য আছে। সমগ্রই হল পূর্ণ তত্ত্ব। কারণ সমগ্রতে সগুণ-নির্গুণ, সাকার-নিরাকার সবই এসে যায়।

আসলে সমগ্ররূপ সগুণেরই হওয়া সম্ভব, কেন-না সগুণ শব্দের মধ্যে নির্গুণ কথাটি আসতে পারে, কিন্তু নির্গুণ শব্দটির মধ্যে সগুণ শব্দটি আসতে পারে না। কারণ সগুণে নির্গুণের কোনো বাধা নেই, কিন্তু নির্গুণে গুণাদির বাধা আছে। অতএব নির্গুণে সমগ্র শব্দটি ব্যবহৃত হতেই পারে না। তাই এই স্থানে 'অধ্যাত্ম' এবং 'কর্মে'র সঙ্গে ক্রমশঃ 'কৃৎস্ন' এবং 'অখিল' শব্দটি উদ্ধৃত হয়েছে, যা সমগ্রতার বাচক ; কিন্তু 'ব্রহ্মে'র সঙ্গে সমগ্রতার বাচক কোনো শব্দ কোথাওই ব্যবহৃত হয়নি। সুতরাং সমগ্রতা সগুণেই থাকে, নির্গুণে নয়।

প্রশ্ন—ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম এবং কর্ম—এই তিনটি লৌকিক কী করে ?

উত্তর— ভগবান ব্রহ্মকে 'অক্ষর' বলেছেন—**'অক্ষরং ব্রহ্ম পরমম্'** (গীতা ৮।৩) এবং জীবকেও 'অক্ষর' বলেছেন—**'দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ'** (গীতা ১৫।১৬)। জীব এবং ব্রহ্ম—উভয়ই এক—**'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'** (মাণ্ডুক্য. ১) প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক হওয়ায় যারা 'জীব' (অধ্যাত্ম)[১], তারাই প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত না হওয়ায় 'ব্রহ্ম' হয়ে থাকে। সুতরাং গীতা অনুযায়ী যেমন জীবও জগতে আছে, তেমনই ব্রহ্মও জগতে আছেন অর্থাৎ ব্রহ্ম লৌকিক নিষ্ঠা (কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ) দ্বারা প্রাপণীয় তত্ত্ব।

'অধ্যাত্ম' অর্থাৎ জীব জগৎকে ধারণ করেছে—**'যয়েদং ধার্যতে জগৎ'** (গীতা ৭।৫)। জীবের নিজস্ব কোনো অস্তিত্ব নেই। তাই জগতের সঙ্গ দ্বারা জীবও জগৎ অর্থাৎ লৌকিক হয়ে থাকে (গীতা ৭।১৬)। জগতে হওয়ার জন্যও জীব জাগতিক (লৌকিক) হয়—**'মমৈবাংশো জীবলোকে'** (গীতা ১৫।৭), **'দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ'** (গীতা ১৫।১৬)।

'কর্ম' দু'প্রকারে হয়—সকামভাবের দ্বারা ও নিষ্কামভাবের দ্বারা। দু'প্রকারের কর্মই জগতে হওয়ায় দুই-ই জাগতিক[২]।

প্রশ্ন— অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞ— এই তিনটি অলৌকিক কেন ?

উত্তর— 'অধিভূত' অর্থাৎ সমগ্র পাঞ্চভৌতিক জগৎ তত্ত্বতঃ ভগবানেরই স্বরূপ হওয়ায় তা হল অলৌকিক—**'অমৃতং চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন'** (গীতা ৯।১৯)। অমৃত এবং মৃত্যু অর্থাৎ সৎ এবং অসৎও আমিই[৩]। ভগবান

---

[১]বঁধ্যো বিষয় সনেহ তে, তাতে কহিয়ৈ জীব। অলখ অজোণী আপ হৈ, হরিয়া ন্যারৌ থীব॥

[২]জগতে অনুষ্ঠিত সকাম কর্ম—**'যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।'** (গীতা ৩।৯), 'ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা॥' (গীতা ৪।১২), 'কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে' (গীতা ১৫।২)

জগতে অনুষ্ঠিত নিষ্কাম কর্ম—'লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা ..... যোগিনাম্'॥ (গীতা ৩।৩)

প্রকৃতপক্ষে কর্ম সকাম বা নিষ্কাম হয় না। বরং কর্তা সকাম বা নিষ্কাম হয়ে থাকে। সুতরাং সকাম-নিষ্কামভাব কর্তার মধ্যেই বিদ্যমান থাকে।

[৩]**মনসা বচসা দৃষ্ট্যা গৃহ্যতেঽন্যৈরপীন্দ্রিয়ৈঃ। অহমেব ন মত্তোঽন্যদিতি বুধ্যধ্বমঞ্জসা॥** (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৩।২৪)

'মন, বাণী, দৃষ্টি এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়দ্বারা যা কিছু গ্রহণ করা হয়, সেসব আমিই। সুতরাং আমি ব্যতীত আর কিছুই নেই—এই সিদ্ধান্ত তোমরা বিচার বিবেচনা করে শীঘ্রই বুঝে নাও ও স্বীকার করো।'

অর্জুনকে যে বিরাটরূপ দেখিয়েছিলেন সেটিও দিব্য অর্থাৎ অলৌকিক ছিল [১]। সেই দিব্য বিরাটরূপ ভগবান তাঁর দিব্য দেহেরই এক অংশে দেখিয়েছিলেন[২]। তাই ভগবানেরই বিশালরূপ হওয়ায় এই পাঞ্চভৌতিক জগৎও অলৌকিক[৩]। ভগবান জগতে তাঁর বিভূতিগুলিকেও দিব্য অর্থাৎ অলৌকিক বলে জানিয়েছেন—**'দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ'** (গীতা ১০।১৯), **'মম দিব্যানাং বিভূতীনাম্'** (১০।৪০)[৪]। কিন্তু জীবেরা অজ্ঞানতাবশতঃ নিজ নিজ বুদ্ধিতে (রাগ-দ্বেষাদির জন্য) এই জগৎকে লৌকিক বলে দেখে থাকে। তাই অজ্ঞান দূরীভূত হলে জড়ত্ব থাকে না, চিন্ময় তত্ত্বই শুধু থাকে।

'অধিদৈব' অর্থাৎ ব্রহ্মাদি সকল দেবতাই অলৌকিক[৫]।

'অধিযজ্ঞ' অর্থাৎ অন্তর্যামী ভগবান সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠান করেও নির্লিপ্ত হওয়ায় তিনিও অলৌকিক।

ভগবান **'সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞম্'** পদটিতে তাঁকে অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞ-সহ জানার কথা বলেছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে পরমাত্মা-সহ হওয়ার জন্যই এই তিনটি অলৌকিক, না হলে এগুলি লৌকিকই। ভগবানের সঙ্গে যতক্ষণ সম্পর্ক না হয় ততক্ষণ সব লৌকিকই থাকে, ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক হলেই সব অলৌকিক জ্ঞান হয়। তাই নিজ প্রচেষ্টার প্রাধান্য হওয়ায় কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ হল 'লৌকিক নিষ্ঠা' আর ভগবানের শরণ মুখ্য হওয়ায় ভক্তিযোগ হল 'অলৌকিক নিষ্ঠা'।

প্রকৃতপক্ষে লৌকিকে কোনো তত্ত্ব নেই। প্রকৃত তত্ত্বই হল অলৌকিক। কিন্তু সাধকদের দৃষ্টিতে লৌকিক এবং অলৌকিক—এই দুটি বিভাগ আছে। তাৎপর্য হল, এই লৌকিক অলৌকিক বিভাগগুলি অজ্ঞানতাবশতঃ রাগ (আসক্তি) ও দ্বেষের জন্য হয়ে থাকে। রাগ দ্বেষ না থাকলে সব কিছুই অলৌকিক, চিন্ময় এবং দিব্য **'বাসুদেবঃ সর্বম্'**। কেন-না

---

[১]'নানাবিধানি দিব্যানি' (গীতা ১১।৫), 'অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্' (১১।১০), 'দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্' (১১।১১), 'পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে ...... সর্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্' (১১।১৫)।

[২]ভগবান বলেছেন— 'ইহৈকস্থং জগৎকৃৎস্নং.....মম দেহে' (১১।৭)।

সঞ্জয় বলেছেন— 'তত্রৈকস্থং জগৎকৃৎস্নং......অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে' (১১।১৩)।

অর্জুন বলেছেন— 'পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে' (১১।১৫)।

[৩]খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীং চ
জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্।
সরিৎসমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং
যৎ কিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২।৪১)

'আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, গ্রহ-নক্ষত্র, জীব-জন্তু, বিভিন্ন দিক, বৃক্ষ, নদীসমূহ, সমুদ্র—এ সবই ভগবানের শরীর—এরূপ মনে করে ভক্ত সকলকেই অনন্যভাবে প্রণাম করেন।'

ভূদ্বীপবর্ষসরিদদ্রিনভঃসমুদ্রপাতালদিঙ্নরকভাগণলোকসংস্থা।
গীতা ময়া তব নৃপাদ্ভুতমীশ্বরস্য স্থূলং বপুঃ সকলজীবনিকায়ধাম॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ৫।২৬।৪০)

'হে পরীক্ষিৎ! আমি তোমার কাছে পৃথিবী, তার অন্তর্গত দ্বীপ, বর্ষ, নদী, পর্বত, আকাশ, সমুদ্র, পাতাল, দিক্ সমূহ, নরক, জ্যোতির্গণ এবং বিভিন্ন লোকের স্থিতি বর্ণনা করেছি। ভগবানের এ হল অতি অদ্ভুত স্থূল রূপ, যা জীবসমুদয়ের আশ্রয়।'

[৪]অর্জুনও বিভূতিগুলিকে দিব্য বলে জানিয়েছেন—'বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ' (১০।১৬)।

[৫]দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি॥ (মুণ্ডকোপনিষদ্ ৩।১।১, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ৪।৬)

'একসঙ্গে বসবাসকারী এবং পরস্পর বন্ধুভাবে থাকা দুটি পাখি—জীবাত্মা ও পরমাত্মা একই বৃক্ষ—শরীরে আশ্রয় করে থাকে। এদের দু'জনের মধ্যে একজন (জীবাত্মা) ওই বৃক্ষের কর্মফলের স্বাদ উপভোগ করে, কিন্তু অপরজন (পরমাত্মা) উপভোগ না করে শুধু নিজেকে প্রকাশিত করে থাকে।'

লৌকিকের পৃথক্ কোনো অস্তিত্বই নেই। রাগ-দ্বেষাদির জন্য লৌকিকের অস্তিত্ব ও গুরুত্ব দেখা যায়। এই রাগ-দ্বেষের জন্যই জীব ভগবদ্স্বরূপ জগৎ-সংসারকে লৌকিক করে তুলেছে এবং নিজেরাও লৌকিক হয়ে উঠেছে।

বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের অর্থাৎ ভগবানের সমগ্ররূপের বর্ণনা করার তাৎপর্য হল যে, জড়, চেতন, সৎ-অসৎ, পরা-অপরা, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ ইত্যাদি যা কিছু আছে, সে সবই ভগবানের স্বরূপ। তাই ভগবান এখানে সমগ্ররূপ বর্ণনার পূর্বে ও পরে **'মাম্'** পদটি ব্যবহার করেছেন, যা হল সমগ্রের বাচক—**'মামাশ্রিত্য'** (৭।২৯) এবং **'মাং তে বিদুঃ'** (৭।৩০)।

ভগবান বলেছেন কর্মের গতি (তত্ত্ব) গভীর—**'গহনা কর্মণো গতিঃ'** (গীতা ৪।১৭), কিন্তু ভক্ত সেটিও জানতে পারেন। কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম (৪।১৮)—উভয়ই ভক্ত অবগত হয়ে থাকেন। অর্থাৎ ভক্ত কর্মকেও জেনে থাকেন এবং কর্মযোগকেও জানেন। কর্মযোগী শুধু কর্মযোগকে জানেন আর জ্ঞানযোগী জানেন জ্ঞানযোগ, কিন্তু ভক্ত ভগবদ্কৃপায় কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ—দুটিই জেনে থাকেন।

এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে উদ্ধৃত **'যোগং যুঞ্জন্ মদাশ্রয়ঃ'**-কে এইস্থানে **'মামাশ্রিত্য যতন্তি যে'** পদ দ্বারা এবং **'ময্যাসক্তমনাঃ'**-কে এই স্থানে **'যুক্তচেতসঃ'** পদে বলা হয়েছে। অর্থাৎ আমার আশ্রয় গ্রহণ করলে ভক্তের কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগেও সিদ্ধিলাভ হয়, অর্থাৎ তিনি উভয়ের ফল (লক্ষ্য) রূপ ব্রহ্মকেও জানতে পারেন—**'তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ'** এবং আমার সমগ্ররূপও জানেন—**'মাং তে বিদুঃ'**।

'প্রয়াণকালেঽপি' বাক্যে **'অপি'** পদটি ব্যবহারের তাৎপর্য হল যে এইসব ভক্ত আমাকে আগেও জানতেন এবং অন্তকালে অর্থাৎ মৃত্যুর সময়েও জানেন অর্থাৎ এঁদের জ্ঞান কখনো লুপ্ত হয় না। এরূপ ভক্ত **'যুক্তচেতা'** হন অর্থাৎ তাঁদের মনের কোনো পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না, শুধু ভগবানই থাকেন। ভগবানের সঙ্গে তাঁদের অভিন্ন সম্পর্ক (নিত্যযোগ) হওয়ায় তাঁরাও কখনো ভগবানের থেকে বিযুক্ত হন না আর ভগবানও তাঁদের থেকে বিযুক্ত হন না। এইরূপ যুক্তচেতা ভক্ত প্রয়াণকালে অর্থাৎ মৃত্যুকালে ভগবদ্ চিন্তা না এলেও যোগভ্রষ্ট হন না, তাঁরা ভগবানকেই লাভ করেন—**'প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তো বিদুর্যুক্তচেতসঃ'**। কেন-না ওইসব ভক্তদের দৃষ্টিতে যখন ভগবান ব্যতীত আর কোনো কিছুই নেই, তখন তাঁদের মন ভগবানকে ছেড়ে কোথায় যাবে ? কেন যাবে ? কী করে যাবে ? তাঁদের মনে কোনো চিন্তার উদয় হলে তা ভগবানের কথাই হবে, তাহলে তাঁদের মন আর কেন বিচলিত হবে ? আর মন যদি বিচলিত না হয়, তাহলে তাঁরা যোগভ্রষ্ট হবেন কীকরে ? কারণ করণসাপেক্ষ সাধনায় যোগ হতে মন বিচলিত হলে তবেই মানুষ যোগভ্রষ্ট হয়—**'যোগাচ্চলিতমানসঃ'** (গীতা ৬।৩৭), কিন্তু যেসব ভক্ত সর্বত্র ভগবানকে দর্শন করেন তাঁদের ভগবানের সঙ্গে নিত্যযোগ থাকে।

ভগবানের কিছু কিছু ভক্ত মুক্তি কামনা করেন—**'জরামরণমোক্ষায়'** আর কিছু কিছু ভক্ত প্রেম চেয়ে থাকেন—**'মাং তে বিদুর্যুক্তচেতস'**। মুক্তি কামনাকারী ভক্তগণ কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ (ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম ও কর্ম) সম্বন্ধে জেনে থাকেন, কিন্তু প্রেমাকাঙ্ক্ষী ভক্তগণ স্বয়ং সমগ্র ভগবানকে জেনে থাকেন—**'মাং বিদুঃ'**। ভগবান তাঁর প্রেমিক ভক্তদের কর্মযোগ (বুদ্ধিযোগ) এবং জ্ঞানযোগ—উভয়ই প্রদান করেন (গীতা ১০।১০-১১)। জরা-মরণরূপ বন্ধন ও মুক্তি দুইই লৌকিক, কিন্তু প্রেম হল অলৌকিক। যদিও সাধন-ভক্তি লৌকিক, কিন্তু উদ্দেশ্য অলৌকিক হওয়ায় সেটি অলৌকিক সাধ্য-ভক্তিতে গণ্য হয়—**'ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা'** (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৩।৩১)।

❖ ❖ ❖

ওঁ তৎ সৎ ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে জ্ঞানবিজ্ঞানযোগো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

এইভাবে ওঁ, তৎ, সৎ—ভগবানের এই নাম উচ্চারণপূর্বক ব্রহ্মবিদ্যা ও যোগশাস্ত্রময় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদরূপ শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন সংবাদে 'জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ' নামক সপ্তম অধ্যায় সম্পূর্ণ হল॥ ৭ ॥

এই সপ্তম অধ্যায়ে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবান সমস্ত জগতের মহাকারণ—এটি দৃঢ়ভাবে জানাকেই বলা হয় 'জ্ঞান'। তেমনই ভগবান ব্যতীত আর কিছু নেই—এটি অনুভব করাকে বলা হয় 'বিজ্ঞান'। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দ্বারা ভগবানের সঙ্গে নিত্যযোগ অনুভূত হয় অর্থাৎ 'আমি ভগবানের আর ভগবান আমার' এইরূপ পরম প্রেম ও নিত্যসম্পর্ক জাগরিত হয়। সেইজন্যই এই অধ্যায়কে 'জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ' বলা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ের পদ, অক্ষর এবং উবাচ

১) এই অধ্যায়ে **'অথ সপ্তমোঽধ্যায়ঃ'**-এর তিন, **'শ্রীভগবানুবাচ'**-এর দুই, শ্লোকগুলির চারশত ছয় এবং পুষ্পিকাতে তেরটি পদ আছে। এই প্রকার সমস্ত পদগুলির যোগসংখ্যা চারশত চব্বিশ।

২) **'অথ সপ্তমোঽধ্যায়ঃ'**-এর সাত, **'শ্রীভগবানুবাচ'**-এর সাত, শ্লোকগুলির নয়শত যাট এবং পুষ্পিকাতে আটচল্লিশ অক্ষর আছে। এইভাবে সমস্ত অক্ষরের যোগসংখ্যা এক হাজার বাইশ। এই অধ্যায়ের সমস্ত শ্লোকই বত্রিশ অক্ষরের।

৩) এই অধ্যায়ে একটিমাত্র উবাচ হল **'শ্রীভগবানুবাচ'**।

সপ্তম অধ্যায়ের প্রযুক্ত ছন্দ

এই অধ্যায়ের ত্রিশটি শ্লোকের মধ্যে ষষ্ঠ শ্লোকের তৃতীয় চরণে এবং চতুর্দশ শ্লোকের প্রথম চরণে **'নগণ'** প্রযুক্ত হওয়ায় **'ন-বিপুলা'**, একাদশ শ্লোকের তৃতীয় চরণে এবং পঁচিশতম শ্লোকের প্রথম চরণে **'মগণ'** প্রযুক্ত হওয়ায় **'ম-বিপুলা'**, সপ্তদশ শ্লোকের প্রথম চরণে **'রগণ'** প্রযুক্ত হওয়ায় **'র-বিপুলা'**, এবং উনিশতম এবং বিশতম শ্লোকের তৃতীয় চরণে **'ভগণ'** প্রযুক্ত হওয়ায় **'ভ-বিপুলা'** সংজ্ঞাপ্রযুক্ত ছন্দ আছে। বাকি তেইশটি শ্লোক ঠিক **'পথ্যাবক্ত্র'** অনুষ্টুপ ছন্দের লক্ষণযুক্ত।

❋ ❋ ❋

সপ্তম অধ্যায়ের সার

ভগবানের প্রকৃতি দু'প্রকার—অপরা এবং পরা। জগৎ সংসার হল 'অপরা' প্রকৃতি আর জীব হল 'পরা' প্রকৃতি। অপরা প্রকৃতি জড় এবং নিত্য পরিবর্তনশীল আর পরা প্রকৃতি চেতন এবং চিরকাল অপরিবর্তনশীল। ভগবান অপরা ও পরা দুই-ই তাঁর নিজের প্রকৃতি অর্থাৎ স্বভাব বলে জানিয়েছেন—**'ইতীয়ং মে'** (৭।৪), **'মে পরাম্'** (৭।৫)। ভগবানের স্বভাব হওয়ায় অপরা প্রকৃতির পৃথক্ (ভগবানের থেকে আলাদা) কোনো অস্তিত্ব নেই, কিন্তু জীব (পরা প্রকৃতি) অপরাকে অস্তিত্ব ও গুরুত্ব প্রদান করে তার সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক স্থাপন করে রাখে। এই সম্পর্ক জীব দু'ভাবে মেনে থাকে—(১) অহং বশতঃ যেমন—আমি শরীর এবং (২) মমতাবশতঃ, যেমন—আমার শরীর। এই মেনে নেওয়া সম্পর্কই সকল প্রাণীর উৎপত্তির কারণ—**'কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু'** (গীতা ১৩।২১)।

প্রকৃতপক্ষে সমস্ত জগতের কর্তা, কারণ এবং কার্য একমাত্র ভগবান। ভগবান ব্যতীত দ্বিতীয় আর কেউ নেই—**'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি'** (৭।৭)। সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, একটি মাত্রই অস্তিত্ব আছে, দুটি নয়। অতএব এক ভগবানই নানারূপে প্রকটিত হয়ে আছেন। আকাশ, বায়ু, তেজ, জল এবং পৃথিবী—এই পাঁচ মহাভূত এবং এর কার্য রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ ও শব্দ, এই পাঁচটি বিষয়—এই গুলির মূল কারণই হলেন ভগবান। ভগবানই সমগ্র প্রাণীর অনাদি ও অবিনাশী বীজ। অর্থাৎ জগতে যা কিছু ক্রিয়া, পদার্থ, ভাব ইত্যাদি দেখা-শোনা বা বোঝা যায়, সেসবের বীজ (মূল কারণ)

একমাত্র ভগবান। কারণই কার্যরূপে পরিণত হয়[১]। সুতরাং কারণের পৃথক্ অস্তিত্ব হলেও কার্যের কোনো পৃথক্ অস্তিত্ব হয় না। তাই কোনো সাধক যদি কাজের দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত হতে চান, তিনি ভগবানকে লাভ করেন না—**'ন ত্বহং তেষু তে ময়ি'** (৭।১২)। যিনি সবকিছুর কারণরূপ ভগবানের শরণাগত হন, তিনিই ভগবানকে প্রাপ্ত হন। কিন্তু যিনি কারণরূপ ভগবানের শরণাগত না হয়ে কার্যরূপ সত্ত্বাদি গুণে জড়িয়ে পড়েন, তিনি জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবদ্ধ হন। এইসব ব্যক্তি শরীর ও সংসারের সম্পর্কঘটিত কার্যগুলির কামনাপূর্তির উদ্দেশ্যে দেবতাদের শরণাগত হয়ে থাকেন। কারণ তাঁরা অলৌকিক ভগবানকে সাধারণ মানুষের মতো লৌকিক বলে মনে করেন। কিন্তু যে সব ব্যক্তি এই তিনটি গুণে মোহগ্রস্ত হন না, তাঁরা ভগবানের শরণ গ্রহণ করেন। এরূপ ভক্ত চার প্রকারের হন—অর্থার্থী, আর্ত, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী। এইসব শরণাগত ভক্তদের মধ্যেও যাঁরা—'সবকিছুই ভগবান' এইরূপ মনে করে ভগবানের শরণ গ্রহণ করেন, সেরূপ মহাত্মা মুক্ত পুরুষদের থেকেও শ্রেষ্ঠ হওয়ায় অত্যন্ত দুর্লভ। সেই মহাত্মা ভক্ত ভগবানের কৃপায় পরা-অপরাসহ ভগবানের সমগ্ররূপ অবগত হন, যা জানলে আর কোনো কিছুই জানার বাকি থাকে না। কেন-না তিনি ছাড়া অন্য আর কোনো বস্তু নেই-ই। ভগবানের সঙ্গে তাঁর আত্ম-ভাব হয়ে যায়, যার ফলে প্রতি মুহূর্তে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্রেমের জাগৃতি হয়। এই প্রেমের জাগরণেই মনুষ্য জন্মের পূর্ণতা হয়।

❀ ❀ ❀

এক অপরা প্রকৃতি আছে, আর এক আছে পরা প্রকৃতি, এছাড়া আছেন পরা-অপরার মালিক পরমাত্মা। সম্পূর্ণ শরীর-জগৎ-সংসার (অধিভূত) হল অপরা প্রকৃতির অন্তর্গত আর সম্পূর্ণ শরীরী (কৃৎস্ন অধ্যাত্ম) হল পরা প্রকৃতির অন্তর্গত। এর তাৎপর্য হল যে শরীর (জগৎ-সংসার) মাত্রই এক আর শরীরী (জীব) মাত্রই এক এবং অপরা ও পরা—এই দুটি যাঁর শক্তি, সেই পরামাত্মাও এক। অতএব শরীরগুলির দৃষ্টিতে, আত্মার দৃষ্টিতে এবং পরমাত্মার দৃষ্টিতে— তিন দৃষ্টিতেই আমরা সব এক, অভিন্ন—অনেক নয় **'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন'** (কঠ. ২।১।১১, বৃহদা. ৪।৪।১৯)।

সকল শরীরের সঙ্গে ঐক্য মেনে নিলে কোনো প্রাণীতেই আর অনুরাগ বা দ্বেষ থাকে না এবং সমস্ত প্রাণীর প্রতি হিতের ভাব হয়। এরূপ হলে সহজেই 'কর্মযোগ' স্বতঃসিদ্ধ হয়ে যায়। কারণ যখন নিজে ছাড়া অন্য কেউ নেই-ই এবং ব্যক্তিগত বা নিজের বলেও কিছু নেই তখন নিজের কাছে যে সব বস্তু আছে তাতে মমত্ববোধ থাকে না আর যেসব বস্তু নেই, তার জন্যও কোনো কামনাবোধ হয় না। মমতা এবং কামনার বোধ না থাকলে নিজের যা কিছু আছে, তা স্বতঃই অন্যের সেবায় ব্যবহৃত হয়।

সকল জীবে ঐক্য স্বীকার করে নিলে সর্বত্র আত্মভাব বা ব্রহ্মভাব জাগরিত হয়—**'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'** (ছান্দোগ্য. ৩।১৪।১), **'আত্মৈবেদং সর্বম্'** (ছান্দোগ্য. ৭।২৫।২)। এরূপ ভাব হলে 'জ্ঞানযোগ' অতি সহজে স্বতঃসিদ্ধ হয়। কারণ নানারূপে যত জীব বিরাজমান, তা সবই একরূপে ব্রহ্ম অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্ম এক, অভেদ—**'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'** (মাণ্ডুক্য. ১)।

অপরা ও পরা—এই দুটি প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, কারণ এই দুটি ভগবানের শক্তি ও স্বভাব হওয়ায় এগুলি ভগবদ্স্বরূপই। এটি স্বীকার করে নিলে সর্বত্র ভগবদ্ভাব হয়ে থাকে— **'বাসুদেবঃ সর্বম্'** (৭।১৯)। এরূপ হলে 'ভক্তিযোগ' সহজেই স্বতঃসিদ্ধ হয়। কারণ 'সব কিছুই ভগবান'—এটিই হচ্ছে প্রকৃত শরণাগতি।

তাৎপর্য হল এই যে জগৎ, জীব এবং পরমাত্মা—তিনটি দৃষ্টিতেই আমরা সব এক, অভিন্ন। এই সমতাকেই গীতায় 'যোগ' বলা হয়েছে— **'সমত্বং যোগ উচ্যতে'** (গীতা ২।৪৮)। ভেদ (বৈষম্য) কেবলমাত্র আচরণের জন্য, যা অনিবার্য,

[১]ভগবান কার্যরূপে পরিণত হন না, তিনি কার্যরূপে প্রকটিত হন।

কেন-না আচরণে সমতা রাখা সম্ভব নয়। অতএব সাধকের দৃষ্টি (ভাবনা) সম হওয়া উচিত **'সর্বত্র সমদর্শনঃ'** (গীতা ৬।২৯), **'পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ'** (গীতা ৫।১৮), **'সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে'** (গীতা ৬।৯), **'সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ'** (গীতা ১২।৪)। আচরণে পার্থক্য তো স্বাভাবিক ব্যাপার, কিন্তু ভাবের পার্থক্য আসে মানুষের নিজের অনুরাগ ও দ্বেষ থেকে। এই রাগ-দ্বেষের জন্যই মানুষ জগৎ, জীব এবং পরমাত্মা— এই তিনটির মধ্যে নানাপ্রকার পার্থক্যের সৃষ্টি করেছে, যা তাদের জন্ম-মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়—**'মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি'** (কঠোপনিষদ্ ২।১।১১)। যে ব্যক্তি অন্যকে পর বলে মনে করে, কারোর মন্দ কামনা করে, দেখে বা করে এবং জগতে কোনোকিছু আকাঙ্ক্ষা করে, সেই ব্যক্তি কখনো কর্মযোগী বা জ্ঞানযোগী অথবা ভক্তিযোগী হতে পারে না।

জগৎ, জীব এবং পরমাত্মা—এই তিনটি নিয়ে চিন্তা করলে দেখা যায় যে এদের মধ্যে পৃথক্ অস্তিত্ব একমাত্র পরমাত্মারই আছে। জগৎ ও জীবের কোনো পৃথক্ অস্তিত্ব নেই। জীবই জগৎকে ধারণ করে আছে—**'যয়েদং ধার্যতে জগৎ'** (৭।৫) অর্থাৎ জীবই জগৎকে অস্তিত্ব প্রদান করেছে, তাই জগতের কোনো পৃথক্ অস্তিত্ব নেই। জীব পরমাত্মারই অংশ—**'মমৈবাংশো জীবলোকে'** (গীতা ১৫।৭), তাই জীবের নিজেরও কোনো পৃথক্ সত্তা নেই। অর্থাৎ জগতের অস্তিত্ব জীবের অধীন আর জীবের অস্তিত্ব পরমাত্মার অধীন, তাই এক পরমাত্মা ব্যতীত অন্য আর কিছুই নেই—**'সদসচ্চাহমর্জুন'** (গীতা ৯।১৯)। জগৎ এবং জীব—উভয়ই পরমাত্মাতেই উদ্ভাসিত হয়।

❋ ❋ ❋

॥ ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

অথ অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

অষ্টম অধ্যায়

অবতরণিকা

শ্রীভগবান সপ্তম অধ্যায়ের অন্তিমভাগে নিজের সমগ্ররূপ বর্ণনা করতে গিয়ে ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম, অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞ—এই ছটি শব্দ প্রয়োগ করেছেন এবং তাঁর সমগ্ররূপ যাঁরা জানেন এরূপ যোগিগণ অন্তকালে যে তাঁকেই প্রাপ্ত হন, তা জানিয়েছেন। এই কথা শুনে এই ছয়টি শব্দের অর্থ স্পষ্টভাবে জানার জন্য অর্জুন অষ্টম অধ্যায়ের প্রারম্ভেই সাতটি প্রশ্ন করেছেন।

অর্জুন উবাচ

কিং তদ্ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে॥ ১ ॥
অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ॥ ২ ॥

[**পুরুষোত্তম্** (হে পুরুষোত্তম !) ; **তৎ** (সেই) ; **ব্রহ্ম** (ব্রহ্ম) ; **কিম্** (কী ?) ; **অধ্যাত্মম্** (অধ্যাত্ম) ; **কিম্** (কী ?) ; **কর্ম** (কর্ম) ; **কিম্** (কী ?) ; **অধিভূতম্** (অধিভূত) ; **কিম্** (কাকে) ; **প্রোক্তম্** (বলে) ; **চ** (আর) ; **অধিদৈবম্** (অধিদৈব) ; **কিম্** (কাকে) ; **উচ্যতে** (বলা হয় ?) ; **অত্র** (এখানে) ; **অধিযজ্ঞঃ** (অধিযজ্ঞ) ; **কঃ** (কে ?) ; **চ** (এবং) ; **অস্মিন্** (এই) ; **দেহে** (দেহে) ; **কথম্** (কীভাবে অবস্থিত ?) ; **মধুসূদন** (হে মধুসূদন !) ; **নিয়তাত্মভিঃ** (সংযতচিত্ত ব্যক্তি) ; **প্রয়াণকালে** (মৃত্যুকালে) ; **কথম্** (কী করে) ; **জ্ঞেয়ঃ** (জানতে) ; **অসি** (পারেন ?)]

অর্জুন বললেন—হে পুরুষোত্তম ! সেই ব্রহ্ম কী ? অধ্যাত্ম কী ? কর্ম কী ? অধিভূত কাকে বলে আর অধিদৈবই বা কাকে বলা হয় ? এখানে অধিযজ্ঞ কী এবং এই দেহে কীভাবে অবস্থিত ? হে মধুসূদন ! সংযতচিত্ত ব্যক্তি মৃত্যুকালে আপনাকে কী করে জানতে পারেন ? ॥ ১-২ ॥

ব্যাখ্যা—**'পুরুষোত্তম কিং তদ্ব্রহ্ম'**—হে পুরুষোত্তম্ ! সেই ব্রহ্ম কী অর্থাৎ 'ব্রহ্ম' শব্দের দ্বারা কী বোঝা উচিত ?

'কিমধ্যাত্মম্'—'অধ্যাত্ম' শব্দটির দ্বারা আপনি কী বলেছেন ?

'কিং কর্ম'—কর্ম কী অর্থাৎ কর্ম বলতে আপনার কী তাৎপর্য ?

'অধিভূতং চ কিং প্রোক্তম্'—আপনি যে 'অধিভূত' শব্দটি বলেছেন তার অর্থ কী ?

'অধিদৈবং কিমুচ্যতে'—'অধিদৈব' কাকে বলা হয় ?

'অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্'—এই প্রকরণে 'অধিযজ্ঞ' শব্দে কাকে বুঝতে হবে ? এই দেহে 'অধিযজ্ঞ' কীভাবে অবস্থিত।

'মধুসূদন প্রয়ানকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ'—হে মধুসূদন ! যাঁরা সংযতচিত্ত অর্থাৎ সংসার থেকে সর্বতোভাবে নিবৃত্ত হয়ে অনন্যভাবে শুধু আপনাতেই অনুরক্ত, তাঁরা মৃত্যুকালে আপনাকে কীভাবে জানতে পারেন ? অর্থাৎ তাঁরা আপনার কোন্ রূপ জানতে পারেন এবং কীভাবে জানেন ?

সম্বন্ধ—ভগবান পরবর্তী দুটি শ্লোকে অর্জুনের ছয়টি প্রশ্নের ক্রমানুসারে উত্তর দিচ্ছেন।

শ্রীভগবানুবাচ

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ॥ ৩ ॥

[**পরমম্** (পরম) ; **অক্ষরম্** (অক্ষর) ; **ব্রহ্ম** (ব্রহ্ম) ; **স্বভাবঃ** (পরা প্রকৃতিকে) ; **অধ্যাত্মম্** (অধ্যাত্ম) ; **উচ্যতে** (বলা হয়) ; **ভূতভাবোদ্ভবকরঃ বিসর্গঃ** (প্রাণীর সত্তা প্রকটকারী ত্যাগকে) ; **কর্মসংজ্ঞিতঃ** (কর্ম বলা হয়।)]

শ্রীভগবান বললেন—পরম অক্ষরই ব্রহ্ম আর পরা প্রকৃতিকে (জীব) অধ্যাত্ম বলা হয়। প্রাণীদের সত্তা প্রকটকারী যে ত্যাগ, তাকেই কর্ম বলা হয় ॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা—**'অক্ষরং ব্রহ্ম পরমম্'**—পরম অক্ষরেরই নাম হল ব্রহ্ম। যদিও গীতায় 'ব্রহ্ম' শব্দটি প্রণব, বেদ, প্রকৃতি ইত্যাদির বাচক হিসাবেও উদ্ধৃত হয়েছে, তাহলেও এইস্থানে 'ব্রহ্ম' শব্দটির সঙ্গে 'পরম্' এবং 'অক্ষর' বিশেষণ ব্যবহার করায় এই শব্দটি হল সর্বোপরি, সচ্চিদানন্দঘন, অবিনাশী, নির্গুণ-নিরাকার পরমাত্মার বাচক।

'স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে'—এমনিতে আত্মাকে ধরে যে বর্ণনা করা হয় তাকেও অধ্যাত্ম বলা হয় ; অধ্যাত্মমার্গের বর্ণনা যাতে থাকে, তাকেও অধ্যাত্ম বলা হয় আর আত্ম-বিদ্যাকেও অধ্যাত্ম বলা হয় (গীতা ১০।৩২)। কিন্তু এইস্থানে 'স্বভাব' বিশেষণের সঙ্গে 'অধ্যাত্ম' শব্দটি আত্মার অর্থাৎ জীবের স্ব-সত্তার (স্বরূপেরই) বাচক।

'ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ'—স্থাবর-জঙ্গম যত প্রকার প্রাণী দেখা যায়, তাদের যে ভাব বা স্বরূপ অর্থাৎ সত্তা সেই স্বরূপ প্রকটিত করার জন্য যে ত্যাগ, তাকেই বলা হয় 'কর্ম'।

মহাপ্রলয়ের সময় প্রকৃতি ক্রিয়াহীন বলে মনে করা হয় এবং মহাসর্গের সময় প্রকৃতি সক্রিয় বলে ধরা হয়। এই সক্রিয়-অবস্থার কারণ হিসাবে ভগবানের সংকল্প অর্থাৎ, 'এক আমিই বহুরূপে প্রকাশিত হব—মনে করা হয়।' এই সংকল্প থেকে জগৎ সৃষ্ট হয়। তাৎপর্য হল যে মহাপ্রলয়ের সময় অহংভাব এবং সঞ্চিত কর্মের সঙ্গে প্রাণী প্রকৃতিতে লীন হয়ে যায় এবং সেই প্রাণীদের সঙ্গে প্রকৃতিও পরমাত্মাতে লীন হয়ে যায়। সেই লীন হয়ে যাওয়া প্রকৃতিকে বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল করার জন্য ভগবানের পূর্বোক্ত সংকল্পই হল বিসর্গ অর্থাৎ ত্যাগ। ভগবানের এই সংকল্প হল কর্মের আরম্ভ, যার থেকে প্রাণীদের কর্ম-পরম্পরা শুরু হয়। কারণ মহাপ্রলয়ে প্রাণীদের দ্বারা কর্ম হয় না, সেইসময় প্রাণীরা সুষুপ্ত অবস্থায় থাকে। মহাসর্গের আদিতে আবার কর্ম আরম্ভ হয়।

চতুর্দশ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে—পরমাত্মার মূল প্রকৃতির নাম **'মহদ্ব্রহ্ম'**। সেই প্রকৃতিতে লীন জীবের প্রকৃতির সঙ্গে বিশেষভাবে সংযোগ ঘটানো অর্থাৎ জীবদের নিজ নিজ কর্মের ফল অনুযায়ী বিভিন্ন শরীরের সঙ্গে সংযুক্তি করে দেওয়াই হল পরমাত্মার দ্বারা প্রকৃতিতে গর্ভ-স্থাপনা করা (গীতা ১৪।৩-৪)। এভাবে পৃথক্ পৃথক্ যোনিতে নানাপ্রকারের যত দেহ সৃষ্টি হয়, সেই শরীরগুলির উৎপত্তির হেতু হল প্রকৃতি আর তাতে জীবরূপে থাকে ভগবানের অংশ—**'মমৈবাংশো জীবলোকে'** (গীতা ১৫।৭)। এইভাবে প্রকৃতি ও পুরুষের অংশে সমস্ত প্রাণীর সৃষ্টি হয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ছাব্বিশতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, স্থাবর-জঙ্গম—যতপ্রকারের প্রাণীর উৎপত্তি হয়, তা সবই ক্ষেত্র (প্রকৃতি) এবং ক্ষেত্রজ্ঞের (পুরুষের) সংযোগেই হয়। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের বিশেষভাবে সংযোগ অর্থাৎ স্থূলদেহ ধারণ করাবার জন্য ভগবানের সংকল্প-রূপ বিশেষ সম্বন্ধই হল স্থাবর-জঙ্গম প্রাণীদের স্থূলদেহ উৎপন্ন হওয়ার কারণ। সেই সংকল্প হওয়াতে ভগবানের কোনো অহং-ভাব নেই, বরং জীবের জন্ম-জন্মান্তরের যে

কর্মসংস্কার, মহাপ্রলয়ের সময় তা পরিপক্ক হয়ে যখন ফল-প্রদানের জন্য উন্মুখ হয়, তখনই ভগবানের এরূপ সংকল্প হয়[১]। জীবগণের কর্মের প্রেরণাতেই ভগবানের, 'আমি এক হয়ে বহুরূপ ধারণ করব'—এরূপ সংকল্প জাগে।

মানুষ মাত্রের দ্বারা বিহিত ও নিষিদ্ধ যত ক্রিয়া হয়, সেইসব ক্রিয়াকেই 'কর্ম' বলা হয়। তাৎপর্য হল যে, প্রধান কর্ম হল ভগবানের সংকল্প ; তারপরে কর্ম-পরম্পরা চলতে থাকে।

পরিশিষ্ট-ভাব— স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে 'পরা প্রকৃতি' হল ভগবানের স্বভাব— **'প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্'** (গীতা ৭।৫)। প্রকৃতি বলা হোক বা স্বভাব, একই কথা। এই পরা প্রকৃতি অর্থাৎ জীবকেই 'অধ্যাত্ম' নামে অভিহিত করা হয়েছে। একেই ভগবান নিজের অংশ বলে জানিয়েছেন—**'মমৈবাংশো জীবলোকে'** (গীতা ১৫।৭)।

'স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে' কথাটির অন্য অর্থ হল যে বালক, যুবা এবং বৃদ্ধাবস্থায়, জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তিতে, চুরাশী লক্ষ যোনিতে, সর্গ এবং প্রলয়ে, মহাসর্গ এবং মহাপ্রলয়েও জীবের কখনো অনস্তিত্ব হয় না—**'না ভাবো বিদ্যতে সতঃ'** (গীতা ২।১৬) অর্থাৎ এদের নিজের ভাব (অস্তিত্ব বা সত্তা) সর্বদা বিদ্যমান থাকে।

জগৎ সৃষ্টিরূপ কর্মাদিকে 'ত্যাগ' বলার অর্থ হল নিজ স্থিরতার ত্যাগ। কারণ তত্ত্ব স্থির, অচল আর সেই স্থিরতাকে ত্যাগ করাই হল কর্ম।

ভগবানের জগৎ-সৃষ্টি রূপ কর্মই হল আদি কর্ম[২], যার দ্বারা কর্মের পরম্পরা চলতে থাকে। অতএব 'কর্মে'র অন্তর্গত তিন প্রকারের কর্ম আছে— (১) জগৎ সৃষ্টি, (২) শুধুমাত্র ক্রিয়া, যা ফলদায়ক নয়, এবং (৩) পাপ-পুণ্য (শুভাশুভ কর্ম), যা ফলদায়ক হয়ে থাকে।

ভগবানের জগৎ সৃষ্টি রূপ কর্মও বাস্তবে 'অকর্ম'ই। ভগবানও বলেছেন—**'তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্'** (গীতা ৪।১৩) 'এই জগৎ সৃষ্টির কর্তা হলেও অব্যয় পরমেশ্বর আমাকে তুমি অকর্তা বলে জানবে।'

* * *

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর॥ ৪ ॥

[**দেহভৃতাম্, বর** (হে দেহধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্জুন!) ; **ক্ষরঃ** (ক্ষর) ; **ভাবঃ** (ভাব অর্থাৎ নশ্বর পদার্থকে) ; **অধিভূতম্** (অধিভূত বলা হয়) ; **পুরুষঃ** (পুরুষ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা) ; **অধিদৈবতম্** (অধিদৈব) ; **চ** (এবং) ; **অত্র** (এই) ; **দেহে** (দেহে) ; **অহম্ এব** (আমিই) ; **অধিযজ্ঞঃ** (অধিযজ্ঞ।)]

হে দেহধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্জুন! ক্ষর ভাব অর্থাৎ নশ্বর পদার্থকেই অধিভূত বলা হয়, পুরুষ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাই অধিদৈব এবং এই দেহে অন্তর্যামীরূপে আমিই অধিযজ্ঞ ॥ ৪ ॥

---

[১]কর্ম করতে করতে ক্লান্তি এসে গেলে প্রাণী যেমন তার কর্তৃত্বাভিমান, কর্মফলাসক্তি এবং সঞ্চিত কর্ম সঙ্গে রেখেই ঘুমিয়ে পড়ে এবং ঘুমে বিশ্রাম হওয়ায় তার নিদ্রা হয় ও কর্ম করার জন্য তার শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধিতে সতেজ ভাব আসে, শক্তি আসে—তেমনই প্রাণী কর্তৃত্বাভিমান, কর্মফলাসক্তি এবং সঞ্চিত কর্ম-সহ প্রলয়কালে সূক্ষ্ম প্রকৃতিতে এবং মহাপ্রলয়ে কারণ প্রকৃতিতে লীন হয়ে যায়। সেই লীন হওয়া প্রাণীদের সঞ্চিত কর্ম বিশ্রাম লাভ করে ক্রমে পরিপক্ক হয় অর্থাৎ প্রারব্ধরূপ হয়ে ফল প্রদানের জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে। তখন ভগবানের সংকল্প হয় এবং সেই সংকল্প থেকে প্রাণীদের জন্মারম্ভের যে কর্ম তার সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্ক হওয়াকে বলা হয় 'কর্ম'।

[২]'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টম্' (গীতা ৪।১৩), 'কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্' (৯।৭), 'বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ' (৯।৮), 'অহং বীজপ্রদঃ পিতা' (১৪।৪)।

ব্যাখ্যা—**'অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ'**—ক্ষিতি-অপ্‌-তেজ-মরুৎ-ব্যোম্‌—অর্থাৎ পঞ্চমহাভূতের দ্বারা সৃষ্ট প্রতিক্ষণ পরিবর্তনশীল ও বিনাশশীল নশ্বর জগৎকে অধিভূত বলা হয়।

'পুরুষশ্চাধিদৈবতম্‌'—এখানে **'অধিদৈবত'** (অধিদৈব) হল আদি পুরুষ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার বাচক। মহাসর্গের আদিতে ভগবানের ইচ্ছায় সর্বপ্রথম ব্রহ্মা প্রকটিত হন এবং তিনিই সর্গের আদিতে জগৎ সৃষ্টি করেন।

'অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর'—হে প্রাণীকুলের শ্রেষ্ঠ অর্জুন! এই দেহে আমিই অধিযজ্ঞ অর্থাৎ মনুষ্যদেহে অন্তর্যামীরূপে আমিই অবস্থিত[১]। ভগবান গীতায় **'হৃদি সর্বস্য বিষ্ঠিতম্‌'** (১৩।১৭), **'সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ'** (১৫।১৫), **'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি'** (১৮।৬১) ইত্যাদি শ্লোকে নিজেকে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান বলে জানিয়েছেন।

'অহমেব অত্র[২] দেহে' বলার অর্থ হল যে, অন্যান্য জন্মে পূর্বকৃত কর্মের ভোগ হয়, নতুন কর্ম তৈরি হয় না, কিন্তু মনুষ্যদেহে নতুন কর্ম সৃষ্ট হয়। ওইসব কর্মের প্রেরক হলেন অন্তর্যামী ভগবান।[৩] যেখানে মানুষ রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ করে না, সেখানে তার সব কর্ম ভগবানের প্রেরণা অনুযায়ী শুদ্ধ পরিশুদ্ধ হয় অর্থাৎ তা আর বন্ধনকারক হয় না। আর যেখানে মানুষ রাগ-দ্বেষের বশে ভগবানের প্রেরণা অনুসারে কর্ম করে না, সেখানে তার কর্ম বন্ধনকারক হয়ে দাঁড়ায়। কারণ রাগ ও দ্বেষ মানুষের মহাশত্রু (গীতা ৩।৩৪)। অর্থাৎ ভগবানের প্রেরণায় কখনো নিষিদ্ধ কর্ম হতে পারে না। শ্রুতি এবং স্মৃতিই হল ভগবানের নির্দেশ—**'শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে'**। সুতরাং শ্রুতি এবং স্মৃতির বিরুদ্ধে ভগবান কী করে প্রেরণা দিতে পারেন? তা তিনি পারেন না। মানুষ কামনার বশবর্তী হয়েই নিষিদ্ধ কর্ম করে থাকে (গীতা ৩।৩৭)। মানুষ যদি কামনার বশীভূত না হয়, তবে তার দ্বারা স্বাভাবিকভাবেই বিহিত কর্ম হয়। অষ্টাদশ অধ্যায়ে এগুলিকে সহজ এবং স্বভাবনির্দিষ্ট কর্ম নামে বলা হয়েছে।

এখানে অর্জুনকে **'দেহভৃতাং বর'** বলার তাৎপর্য হল যে দেহধারীদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ, যিনি 'এই দেহে ভগবান বিরাজমান'—এই তত্ত্ব জানেন। এরূপ জ্ঞান যদি নাও হয় তাহলেও মেনে নিতে হয় যে, স্থূল-সূক্ষ্ম এবং কারণ-শরীরের প্রতিটি কণায় পরমাত্মা বিরাজমান এবং তাঁকে অনুভব করাই হল মনুষ্য-জন্মের প্রধান কাজ। এর সিদ্ধির জন্য পরমাত্মার নির্দেশানুযায়ী কাজ করতে হয়।

তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্লোকে যে ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম, অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞের বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলি বোঝার জন্য জলের উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে। যেমন, আকাশ যখন স্বচ্ছ থাকে তখন সূর্য ও আমাদের মধ্যে কোনো কিছু পরিলক্ষিত না হলেও সেখানে প্রকৃতপক্ষে পরমাণুরূপে জল-তত্ত্ব থাকে। এই জল-তত্ত্বই বাষ্পে পরিণত হয় এবং বাষ্পের ঘনীভূত রূপই হল মেঘ। মেঘেতে যে জলের কণা থাকে তাদের মিলনে জলবিন্দু সৃষ্টি হয়, এই জলবিন্দু যখন ঠাণ্ডার সংস্পর্শে এসে ঘনীভূত হয় তখনই ওই বিন্দুগুলি বরফে পরিণত হয়ে যায়—জল-তত্ত্বের এই হল স্থূলরূপ। নির্গুণ-নিরাকার 'ব্রহ্ম'ও সেইরূপ পরমাণুরূপে জল-তত্ত্ব; অধিযজ্ঞ (সর্বব্যাপী বিষ্ণু) বাষ্পরূপে জল; অধিদৈব (হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা) মেঘরূপে জল; অধ্যাত্ম (অনন্তজীব) হল জলবিন্দু; কর্ম (জগৎ সৃষ্টিরূপ কর্ম) বর্ষার ক্রিয়া এবং 'অধিভূত' (জাগতিক সৃষ্টি) হল বরফরূপে জল।

---

[১]এই মনুষ্যদেহে বলার অর্থ এই যে, শুধুমাত্র মানুষেরই ভগবানের প্রেরণা বোঝার, স্বীকার করার এবং সেই অনুযায়ী আচরণ করে তত্ত্বলাভ করার সামর্থ্য থাকে। অন্যান্য দেহে অন্তর্যামীরূপে ভগবান বিরাজিত হলেও ওইসব প্রাণীদের ওই তত্ত্বের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার ক্ষমতা থাকে না আর মনুষ্যদেহে যে বিবেক থাকে তা-ও ওই শরীরে জাগ্রত থাকে না। তাই মানুষের উচিত এই দেহ থাকতেই অর্থাৎ জীবিত অবস্থাতেই ওই তত্ত্বলাভ করা। এই সুযোগ বৃথা নষ্ট না করা।

[২]দ্বিতীয় শ্লোকে 'অত্র' পদটি প্রকরণ অনুসারে ব্যবহৃত হয়েছে এবং 'অস্মিন্‌' দেহের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু এখানে 'অত্র' পদ দেহের জন্যই ব্যবহৃত। কারণ অর্জুন তাঁর প্রশ্নে 'অত্র' পদে প্রকরণের ইঙ্গিত করেছেন, তাই এর উত্তর দিতে গিয়ে পুনরায় প্রকরণের জন্য 'অত্র' পদ দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

[৩]মানুষের স্বভাব অনুসারেই ভগবান তার কর্মের প্রেরণা দেন। স্বভাবে রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ থাকলে তার বশীভূত হওয়া বা না-হওয়া মানুষের হাতে। মানুষ শাস্ত্র, সাধু-মহাত্মা এবং ভগবানের আশ্রয় নিয়ে নিজ স্বভাব পরিবর্তন করতে সক্ষম।

এই বর্ণনার তাৎপর্য হল এই যে, যেমন এক জলই পরমাণু, বাষ্প, মেঘ, বর্ষারূপী ক্রিয়া, জলবিন্দু এবং বরফের রূপে ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রতীয়মান হয়, কিন্তু বাস্তবে তা একই, তেমনি, একই পরমাত্মতত্ত্ব ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম, অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞের রূপে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতীয়মান হলেও তত্ত্বতঃ একই। একেই সপ্তম অধ্যায়ে **'সমগ্রম্'** (৭।১) এবং **'বাসুদেবঃ সর্বম্'** (৭।১৯) বলা হয়েছে।

তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে সবকিছুই বাসুদেব (৭।১৯)। এতেও যখন বিবেক-বিচার দ্বারা দেখা যায়, তখন দেহ-দেহী, প্রকৃতি-পুরুষ—এরূপ দুটি ভেদ হয়। উপাসনার দৃষ্টিতে দেখলে উপাস্য (ভগবান), উপাসক (জীব) এবং ত্যাজ্য (প্রকৃতির কার্য—সংসার)—এই তিনটি ভেদ হয়। এই তিনটিকে বোঝার জন্য এখানে ছটি ভেদ করা হয়েছে—

পরমাত্মার দুটি ভেদ—ব্রহ্ম (নির্গুণ) এবং অধিযজ্ঞ (সগুণ)।

জীবের দুটি ভেদ—অধ্যাত্ম (সাধারণ জীব, যারা বদ্ধ) এবং অধিদৈব (কারকপুরুষ, যাঁরা মুক্ত)।

জগতের দুটি ভেদ—কর্ম (যা পরিবর্তনের সমূহ) এবং অধিভূত (যা হল পদার্থ)।

(১) ব্রহ্ম → ← **(৬) অধিযজ্ঞ**
(২) অধ্যাত্ম → ← **(৫) অধিদৈব**
(৩) কর্ম → ← **(৪) অধিভূত**

বিশেষ কথা

পরমাত্মা সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত—**'ময়া ততমিদং সর্বম্'** (৯।৪), **'যেন সর্বমিদং ততম্'** (১৮।৪৬) ; পরমাত্মা সর্বত্রই আছেন—**'ময়ি সর্বমিদং প্রোতম্'** (৭।৭) ; সবকিছু পরমাত্মাই—**'বাসুদেবঃ সর্বম্'** (৭।১৯) ; সমস্ত জগৎই পরমাত্মার—**'অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ'** (৯।২৪) ; **'ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব লোকমহেশ্বরম্'** (৫।২৯)—এইভাবে গীতায় ভগবানের বিভিন্ন বচন উদ্ধৃত হয়েছে। এইসবের সামঞ্জস্য কীভাবে হয় ? সবগুলির কী করে সংগতি হয় ? এই বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

জগতে ভগবদ্প্রাপ্তির জন্য, নিজ কল্যাণ সাধনের জন্য যত সাধক[১] আছেন, তাঁরা সকলেই সংসার থেকে মুক্ত হতে চান এবং ভগবানকে লাভ করতে চান। কারণ জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে চিরশান্তি ও সুখ পাওয়া যায় না বরং সর্বদা অশান্তি ও দুঃখই পেতে হয়—মানুষের এটি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। পরমাত্মা অনন্ত আনন্দ-স্বরূপ, সেখানে দুঃখের লেশ থাকে না, শাস্ত্রে এরূপ বলা আছে এবং সন্তগণ তা অনুভব করেছেন।

এখন এটি বিচার করতে হবে যে সাধক সংসারকে তো প্রত্যক্ষভাবে দেখে থাকেন আর পরমাত্মাকে কেবল মানেন ; কেন-না পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায় না। শাস্ত্র এবং সাধুরা বলে থাকেন যে 'সংসারে পরমাত্মা এবং পরমাত্মাতে সংসার বিদ্যমান' এটি মেনেই সাধক সাধনা করেন। সেই সাধনায় যতক্ষণ সংসার প্রধানভাবে থাকে ততক্ষণ পরমাত্মাকে মেনে নেওয়া গৌণভাবে থাকে। সাধনা করতে করতে পরমাত্মার সম্বন্ধে ধারণা (মেনে নেওয়া) যেমন যেমন প্রাধান্য লাভ করে, ততই সংসারের মান্যতা গৌণ হতে থাকে। পরমাত্মার ধারণা সর্বতোভাবে প্রাধান্য পেলে সাধক স্পষ্টভাবে অনুভব করেন যে জগৎ আগে ছিল না এবং পরেও থাকবে না এবং বর্তমানেও যেটি আছে তা-ও প্রতিক্ষণ লয়ের দিকেই এগোচ্ছে। কিন্তু যখন এই জগৎ-সংসার ছিল না, তখনও ভগবান ছিলেন ; যখন জগৎ থাকবে না, তখনও ভগবান থাকবেন এবং বর্তমানের জগৎ বিনাশের পথে গেলেও ভগবান যেমন তেমনি ভাবেই বিদ্যমান। তাৎপর্য হল যে সংসার প্রতিমুহূর্তে বিনাশশীল এবং পরমাত্মা সদাই বিদ্যমান। এইভাবে জগতের জগৎরূপী সত্তা যখন সর্বতোভাবে লয় হয়ে যায়, তখন সত্যস্বরূপে 'সবকিছু পরমাত্মা'—এই বাস্তবিক অনুভূতি হয়, যার ফলে সাধককে 'সিদ্ধ' বলা হয়। কারণ 'জগতে ভগবান এবং ভগবানে জগৎ বিরাজমান' এই ধারণা হৃদয়ে জগতের সত্তা বদ্ধমূল হয়ে থাকার ফলেই হয়ে থাকে এবং জগতের

[১]যাতে শাশ্বত শান্তি ও অনন্ত সুখ লাভ হয়, অশান্তি বা দুঃখের লেশ না থাকে—এরূপ চিন্তাধারা নিয়ে যাঁরা অগ্রসর হন তাঁরা হলেন 'সাধক'। কিন্তু যাঁরা জগতেই (সংসারে) থাকতে চান এবং সংসারে থেকেই সুখভোগ করতে চান, জাগতিক বস্তু এবং ভোগেই ব্যাপৃত থাকতে চান এবং সাংসারিক সুখ-দুঃখ ভোগ করতে থাকেন, তাঁরা সাধক নন, তাঁরা হলেন সংসারী লোক। তাঁরা জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হতে থাকবেন।

সত্তা সাধকের আসক্তির জন্যই প্রতীত হয়। তত্ত্বতঃ সবই পরমাত্মা।

(২)

সৎ এবং অসৎ সবই পরমাত্মা—**'সদসচ্চাহম্'** (৯।১৯), পরমাত্মাকে সৎও বলা যায় না অসৎও বলা যায় না—**'ন সত্তন্নাসদুচ্যতে'** (১৩।১২) ; পরমাত্মা সৎও এবং অসৎও ; আবার সৎ-অসৎ দুই-এর অতীতও—**'সদসত্তৎপরং যৎ'** (১১।৩৭)। গীতায় এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন বচন আছে। এখন এইসকল বিষয়ের সঙ্গতি নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

পরমাত্মতত্ত্ব অত্যন্ত অলৌকিক এবং সবিশেষ। এই তত্ত্ব কেউই বর্ণনা করতে সক্ষম নয় এবং ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধিও এটি ধারণ করতে সক্ষম নয় অর্থাৎ এই তত্ত্ব ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির পরিধিতে আসে না। তবে ইন্দ্রিয়াদি, মন ও বুদ্ধি এতে বিলীন হতে পারে। সাধক স্বয়ং ওই তত্ত্বে লীন হতে পারেন, তাকে প্রাপ্ত করতে পারেন, কিন্তু ওই তত্ত্ব তিনি নিজের দখলে, নিজের অধিকারে, নিজের সীমার মধ্যে আনতে পারেন না।

পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত করতে চান যেসব সাধক, তাঁরা দুই শ্রেণীর হয়ে থাকেন—এক, বিবেকপ্রধান আর দুই, শ্রদ্ধাপ্রধান অর্থাৎ প্রথমটি হল মস্তিষ্ক বা বুদ্ধিপ্রধান আর অন্যটি হৃদয়প্রধান। বিবেকপ্রধান সাধকের মধ্যে বিবেকের অর্থাৎ জানার প্রাধান্য থাকে এবং শ্রদ্ধাপ্রধান সাধকের মধ্যে মেনে নেওয়ার প্রাধান্য থাকে। এর অর্থ এই নয় যে বিবেকপ্রধান সাধকদের মধ্যে শ্রদ্ধা থাকে না আর শ্রদ্ধাপ্রধান সাধকদের মধ্যে বিবেক থাকে না, বরং এর তাৎপর্য হল যে বিবেকপ্রধান সাধকে বিবেকের প্রাধান্য এবং তৎসহ শ্রদ্ধা থাকে এবং শ্রদ্ধাপ্রধান সাধকে শ্রদ্ধার প্রাধান্যের সঙ্গে বিবেকও থাকে। অন্যভাবে বলতে গেলে যাঁরা জ্ঞানী তাঁদের মধ্যে মানার ভাবও থাকে এবং যাঁরা মানেন তাঁদের মধ্যে জানার ভাবও থাকে। সুতরাং কোনো প্রকারের সাধকের মধ্যেই বিন্দুমাত্র ঘাটতি থাকে না।

সাধক বিবেকপ্রধানই হোন বা শ্রদ্ধাপ্রধানই হোন, তাঁর সাধনায় নিজস্ব রুচি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও যোগ্যতার প্রাধান্য থাকে। কোনো এক সাধন পথে রুচি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস এবং যোগ্যতা থাকলে সাধক সেই পথে শীঘ্রই সিদ্ধিলাভ করতে পারেন। কিন্তু রুচি, শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস থাকলেও যদি যোগ্যতা না থাকে অথবা যোগ্যতা থাকলেও সেরূপ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস যদি না থাকে তাহলে সাধকের সাধনায় ব্যাঘাত ঘটে। রুচি হলে স্বাভাবিকভাবে মন লাগে এবং শ্রদ্ধা বিশ্বাস হলে স্বাভাবিকভাবে বুদ্ধি স্থির হয় এবং যোগ্যতা থাকলে সবকিছু ঠিকভাবে বোধগম্য হয়।

বিবেকপ্রধান সাধক নির্গুণ-নিরাকার পছন্দ করেন অর্থাৎ তাঁর রুচি নির্গুণ-নিরাকারে হয়। শ্রদ্ধাপ্রধান সাধক সগুণ-সাকার পছন্দ করেন অর্থাৎ তাঁর রুচি থাকে সগুণ-সাকারে। যিনি নির্গুণ-নিরাকার পছন্দ করেন, তিনি বলেন পরমাত্মতত্ত্বকে সৎও বলা যায় না, অসৎও বলা যায় না। যিনি সগুণ-সাকার পছন্দ করেন তিনি বলেন পরমাত্মা সৎ এবং অসৎ দুই-ই, আবার সৎ-অসতের অতীতও।

তাৎপর্য হল এই যে চিন্ময়তত্ত্ব সর্বদা একইভাবে বিরাজমান এবং জড়, অসৎ-রূপে ভাসিত জগৎ-সংসার নিত্য পরিবর্তনশীল। চেতন জীব যখন এই পরিবর্তনশীল সংসারকে গুরুত্ব দেয়, তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, তখন সে জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হয়। কিন্তু যখন সে জড়ত্বের সঙ্গে সর্বতোভাবে সম্পর্ক ছেদ করে, তখন তার স্বাভাবিকভাবে চিন্ময়তত্ত্ব অনুভূত হয়। বিবেকপ্রধান সাধক বিচার-বিবেচনার দ্বারা জড়ত্ব ত্যাগ করেন। জড়ত্ব পরিত্যাগ করলে চিন্ময়-তত্ত্ব অবশেষ থাকে অর্থাৎ নিত্যপ্রাপ্ত তত্ত্ব অনুভূত হয়। শ্রদ্ধাসম্পন্ন সাধক ভগবানের সম্মুখীন হন, যার ফলে তিনি জড়ত্ব থেকে বিমুখ হয়ে ভগবানকে প্রেমানন্দে লাভ করেন। বিবেকপ্রধান সাধক সম, শান্ত, সৎ, চিৎ, আনন্দ তত্ত্বে অটলভাবে স্থিতিলাভ করে অখণ্ড আনন্দ প্রাপ্ত হন। কিন্তু শ্রদ্ধাপ্রধান সাধক ভগবানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে প্রেমের অনন্ত ও প্রতিমুহূর্তে বর্ধমান আনন্দ লাভ করেন।

এইভাবে দুই শ্রেণীর সাধকের জড়ত্ব হতে সর্বতোভাবে সম্বন্ধ ছেদ হয়ে চিন্ময়-তত্ত্ব লাভ হয় এবং 'সৎ-অসৎ অর্থাৎ সবই পরমাত্মা'—এরূপ অনুভূতি লাভ হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব—পরিবর্তনশীল এবং বিনাশশীল ক্রিয়া এবং পদার্থ মাত্রই হল 'ক্ষরভাব' যাকে ভগবানের অপরা প্রকৃতি বলা হয়।

জ্ঞানে ব্রহ্মের সঙ্গে ঐক্য হয় আর প্রেমে অন্তর্যামী ভগবানের সঙ্গে অভিন্নতা হয়। ভগবান এখানে অন্তর্যামী

(অধিযজ্ঞ)-কে তাঁর স্বরূপ বলেছেন। অতএব ব্রহ্ম হলেন বিশেষণ আর অন্তর্যামী বিশেষ্য—**'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্'** (গীতা ১৪।২৭)। তাৎপর্য হল এই যে গীতায় যাকে 'সমগ্র' বলা হয়েছে, সেই সবের রচয়িতা এবং নিয়ন্তা অন্তর্যামী আমিই। এই অন্তর্যামীকেই চতুর্দশ অধ্যায়ের তৃতীয়-চতুর্থ শ্লোকে **'মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিনগর্ভং দধাম্যহম্'** এবং **'অহং বীজপ্রদঃ পিতা'** পদটিতে **'অহম্'** শব্দটির দ্বারা বলা হয়েছে। গীতায় ব্রহ্মকে বলা হয়েছে **'ন সত্তন্নাসদুচ্যতে'** (১৩।১২) এবং সমগ্র ভগবানকে বলা হয়েছে **'সদসচ্চাহম্'** (৯।১৯), **'সদসৎ তৎপরং যৎ'** (১১।৩৭)।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—দ্বিতীয় শ্লোকে অর্জুনের সপ্তম প্রশ্ন ছিল যে অন্তকালে আপনাকে কী করে জানা যায় ? পরবর্তী শ্লোকে ভগবান তার উত্তর দিচ্ছেন।

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥ ৫ ॥

[**যঃ** (যে ব্যক্তি) ; **অন্তকালে** (অন্তকালে) ; **চ** (ও) ; **মাম্** (আমাকে) ; **স্মরন্** (স্মরণ করতে করতে) ; **কলেবরম্** (দেহ) ; **মুক্ত্বা** (পরিত্যাগ) ; **প্রয়াতি** (করে যান) ; **সঃ** (তিনি) ; **মদ্ভাবম্** (আমাকে) ; **এব** (ই) ; **যাতি** (প্রাপ্ত হন) ; **অত্র** (এতে) ; **সংশয়ঃ** (সন্দেহ) ; **ন, অস্তি** (নেই।)]

যে ব্যক্তি অন্তকালেও আমাকে স্মরণ করতে করতে দেহ পরিত্যাগ করেন, তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হন—এতে কোনো সন্দেহ নেই ॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা—**'অন্তকালে চ[১] মামেব......যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়'**—'অন্তকালেও যাঁরা আমাকে স্মরণ করতে করতে দেহ পরিত্যাগ করেন'—এর অর্থ হল যে, মানুষকে তাঁর জীবনে সাধন-ভজন করে নিজ উদ্ধার লাভের অধিকার দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তাঁরা তা করেননি। এইসকল ব্যক্তি অন্তিম সময়ে অন্য কোনো সাধনা করতে অসমর্থ, তাই তাঁরা যদি অন্তিমকালে শুধুমাত্র আমাকেই যদি স্মরণ করেন তাহলেও তাঁরা আমাকে প্রাপ্ত হবেন।

'মামেব স্মরন্'—এর তাৎপর্য হল শোনা, বোঝা এবং মেনে নেওয়াতে যা কিছু প্রকাশিত হয়, তা সব আমারই সমগ্ররূপ। তাই যাঁরা ওগুলিকে আমার স্বরূপ বলে মনে করবেন, অন্তকালেও তাঁদের আমার কথাই মনে পড়বে অর্থাৎ তাঁরা সবকিছু আমারই স্বরূপ বলে মেনে নেওয়ায় অন্তকালেও তাঁদের যা কিছু স্মরণে আসবে সেগুলি সব আমারই স্বরূপ হবে, ফলে তাঁদের আমাকেই স্মরণ করা হবে। আমাকে স্মরণ করায়, তাঁরা আমাকেই লাভ করবেন।

'মদ্ভাবম্' কথার অর্থ হল যে সাধকেরা আমাকে ভিন্ন-অভিন্ন ভাবে অর্থাৎ সগুণ-নির্গুণ, সাকার-নিরাকার, দ্বিভুজ-চতুর্ভুজ এবং নাম, লীলা, ধাম, রূপ ইত্যাদিতে যেভাবে মেনে নিয়েছেন, আমাকে পূজা করেছেন, অন্তকালের স্মরণ অনুযায়ী তাঁরা আমার সেই ভাবই প্রাপ্ত হন।

যাঁরা ভগবানের উপাসনা করেন, তাঁরা অন্তকালে উপাস্যকে স্মরণে আসায় সেই উপাস্যকে অর্থাৎ ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত হন। কিন্তু যাঁরা উপাসনা করেন না, তাঁদেরও যদি মৃত্যুকালে কোনো কারণবশতঃ ভগবানের যে কোনো নাম, রূপ, লীলা, ধাম ইত্যাদির স্মরণ হয় তবে তাঁরাও ভগবদ্-উপাসকদের ন্যায় সেই ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত হন। তাৎপর্য হল যে, গুণাদিতে (সত্ত্ব, রজ, তম) স্থিত ব্যক্তি (১৪।১৮) যে গতি লাভ করে সেইরূপ গতিই সেই ব্যক্তিও লাভ করে যার মৃত্যুকালে যেরূপ গুণের বৃদ্ধি (গীতা ১৪।১৪-১৫) হয়। তেমনই যাঁদের অন্তকালে ভগবানের স্মরণ হয়, তাঁদেরও উপাসকদের ন্যায় গতি লাভ হয় অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপ্তি হয়।

সাধকদের দৃষ্টিতে ভগবানের সগুণ-নির্গুণ, সাকার-

[১]এখানে 'চ' অব্যয়ের অর্থ 'অপি' অর্থাৎ 'ও' হয়।

নিরাকার প্রভৃতি নানা রূপ, নাম, লীলা, ধাম ইত্যাদির প্রভেদ থাকলেও, পরিণামে সব এক অর্থাৎ সব **'মদ্ভাবঃ'**—ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত হয় ; কারণ ভগবানের সমগ্র স্বরূপ একই। কিন্তু গুণ অনুসারে গতি প্রাপ্তকারীদের এক গতি হয় না ; কারণ তিনটি গুণই (সত্ত্ব, রজ, তম) ভিন্ন ভিন্ন। তাই গুণ অনুযায়ী তাঁদের গতিও ভিন্ন ভিন্ন হয়।

ভগবানকে স্মরণ করতঃ যাঁরা দেহত্যাগ করেন তাঁদের ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে আর গুণাদি অনুযায়ী যাঁরা দেহত্যাগ করেন তাঁদের গুণের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে। তাই অন্তকালে যাঁরা ভগবানকে স্মরণ করেন তাঁরা ভগবানের সম্মুখীন হন অর্থাৎ ভগবানকে লাভ করেন আর যাঁরা গুণাদির সঙ্গে সম্পর্কিত তাঁরা গুণাবলীর সম্মুখীন হন অর্থাৎ গুণগুলির কার্যরূপে জন্ম-মৃত্যু প্রাপ্ত হন।

ভগবান এই একটি বিশেষ সুযোগ দিয়েছেন যে, ব্যক্তির জীবন যেমনই হোক, তার ভাব যেমনই থাকুক না কেন, যেভাবেই তিনি জীবন কাটিয়ে থাকুন না কেন, যদি তিনি মৃত্যুকালে ভগবানকে স্মরণ করেন, তাহলে তার কল্যাণ হয়। কারণ ভগবান জীবের কল্যাণের জন্যই মনুষ্যদেহ প্রদান করেছেন আর জীবও সেইজন্যই মনুষ্যদেহ ধারণ করেছে। সুতরাং জীবের যদি কল্যাণ হয়, তবেই ভগবানের জীবকে মনুষ্যদেহ প্রদানের এবং জীবের মনুষ্যদেহ ধারণের সার্থকতা হয়। কিন্তু তারা নিজ উদ্ধার ব্যতিরেকেই আজ জগৎ থেকে বিদায় গ্রহণ করছে! তাই ভগবান বলেছেন, 'ওহে ভাই! তোমার আর আমার দুজনের সম্মানই যাতে থাকে, তাই যাবার সময়েও (মৃত্যুকালেও) যদি তুমি আমাকে স্মরণ করো, তাহলেই তোমার কল্যাণ হবে।' সুতরাং প্রত্যেক মানুষেরই সাবধান হওয়ার প্রয়োজন আছে, যেন তারা সবসময় ভগবদ্ স্মরণ করে, কোনো সময় যেন বৃথাভাবে নষ্ট না করে, কারণ কার যে কখন মৃত্যু-সময় আসবে কেউ জানে না। প্রকৃতপক্ষে সবসময়ই অন্ত-সময়। কারণ এ-কথা তো বলা সম্ভব নয় যে এত বছর, এত মাস বা এতদিন পরে মৃত্যু আসবে। এ-ও দেখা যায় যে গর্ভেই কত সন্তান মারা যায়, আবার কত শিশু জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে, কেউ বা কয়েক দিন পরে, কেউ কয়েকমাস পরে, কেউ দু-এক বছরের হয়ে মারা যায়। এইভাবে মৃত্যুর ব্যাপার সবসময়ই চলছে। তাই সবসময় ভগবানকে স্মরণ করতে হয় এবং ভাবতে হয় যে, এটিই অন্তিম কাল। নীতিতে এই কথা আছে যে যদি ধর্মাচরণ করতে হয়, কল্যাণের পথে চলতে হয় তাহলে মৃত্যু আমার চুল ধরে আছে, টান দিলেই শেষ, এই চিন্তা সবসময় মনে রাখা উচিত—**'গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্মমাচরেৎ'**।

ভগবানের দেওয়া উপরিউক্ত সুযোগটিকে প্রতিটি মানুষেরই বিশেষভাবে সদ্ব্যবহার করা উচিত। কোথাও কোনো ব্যধিগ্রস্ত, মরণাপন্ন ব্যক্তি থাকলে ; তাকে তার ইষ্টের চিত্র বা মূর্তি দেখানো উচিত ; যেরকম তার সাধন-ভজন এবং যে ভগবদ্ নামে তার রুচি, যাঁর নাম সে জপ করে, সেই ভগবদ্নাম তাকে শোনানো উচিত ; যে রূপে তার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস, তাকে সেই রূপই স্মরণ করানো উচিত, ভগবদ্মহিমা বর্ণনা করা উচিত, গীতার শ্লোক শোনানো উচিত। যদি সে বেহুঁশ থাকে, তাহলে তার কাছে ভগবদ্নাম জপ ও কীর্তন করতে হয়, যাতে সেখানকার পরিমণ্ডল ভগবদ্নামে পূর্ণ থাকে। ভগবদ্-সম্বন্ধীয় পরিমণ্ডলে যমদূত আসতে পারে না। মৃত্যুর সময় অজামিল 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণ করায় সেখানে ভগবানের পার্ষদ হাজির হয়েছিলেন এবং যমদূত পালিয়ে যমের কাছে চলে গিয়েছিলেন। তখন যমরাজ তাঁর দূতকে বলেছিলেন, যেখানে ভগবদ্নাম জপ-কীর্তন, কথা-মাহাত্ম্য ইত্যাদি হয়, সেখানে তোমরা কখনো যেও না ; কারণ সেখানে আমাদের কোনো অধিকার নেই[১]। এই বলে যমরাজ ভগবানকে স্মরণ করে তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন যে, 'আমার দূতের যে অপরাধ হয়েছে তার জন্য ক্ষমা করুন'।[২]

অন্তকালে স্মরণের তাৎপর্য হল এই যে, সে ভগবানের যে স্বরূপ মনে করে রেখেছে, তা যেন স্মরণে আসে অর্থাৎ সে আগে রাম, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, শিব, শক্তি, গণেশ,

---

[১]এবং বিমৃশ্য সুধিয়ো ভগবত্যনন্তে সর্বাত্মনা বিদধতে খলু ভাবযোগম্।
তে মে ন দণ্ডমর্হন্ত্যথ যদ্যমীষাং স্যাৎ পাতকং তদপি হন্ত্যুরুগায়বাদঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ৬।৩।২৬)

[২]তৎক্ষম্যতাং স ভগবান্ পুরুষঃ পুরাণো নারায়ণঃ স্বপুরুষৈর্যদসৎকৃতং নঃ।
স্বানামহো ন বিদুষাং রচিতাঞ্জলীনাং ক্ষান্তিগরীয়সি নমঃ পুরুষায় ভূম্নে॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ৬।৩।৩০)

সূর্য, ব্যাপ্তিস্বরূপ, বিশ্বরূপ পরমাত্মা প্রভৃতি যে স্বরূপে তার বিশ্বাস, সেই স্বরূপের নাম, রূপ, লীলা, ধাম, গুণ, প্রভাব ইত্যাদি যেন তার স্মরণে আসে। সেই স্মরণ নিয়ে শরীর ত্যাগ করলে সে ভগবানকেই প্রাপ্ত হয়। কারণ ভগবানের কথা স্মরণ হলে 'আমি এই শরীর' এবং 'শরীর আমার'—এ কথা আর স্মরণে থাকে না, ভগবানকে স্মরণ করতে করতেই শরীর ত্যাগ হয়। তাই ভগবানকে লাভ করার অতিরিক্ত তার আর কোনো গতি হতে পারে না।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, যে ব্যক্তি সারাজীবন ধরে সাধন-ভজন করেনি, সর্বদা ভগবানে বিমুখ থেকেছে, তার জীবনের অন্তকালে কীভাবে ভগবদ্স্মরণ হবে এবং কী করে তার কল্যাণ লাভ হবে? তার উত্তর হল যে অন্তিমকালে তার ওপর যদি ভগবানের কোনো বিশেষ কৃপা হয় বা কোনো সাধু-মহাত্মার দর্শন লাভ হয় তাহলে ভগবদ্স্মরণ হয়ে তার কল্যাণ হয়। তার কল্যাণের উদ্দেশ্যে কোনো সাধক তাকে ভগবদ্নাম, লীলাচরিত, ইত্যাদি শোনালে বা পদ-কীর্তন করলে, এর দ্বারা ভগবদ্স্মরণ হওয়ায় তার কল্যাণ সাধিত হয়। মরণাপন্ন ব্যক্তির যদি গীতায় আগ্রহ থাকে, তাহলে তাকে গীতার অষ্টম অধ্যায় শোনানো উচিত। কারণ এই অধ্যায়ে জীবের সদ্গতির বর্ণনা বিশেষভাবে করা হয়েছে। এটি শুনলে তার ভগবানে স্মৃতি ফিরে আসে। কারণ প্রকৃতপক্ষে ভগবানের অংশ হওয়ায় জীবের পরমাত্মার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে সম্পর্ক থাকেই। অযোধ্যা, মথুরা, হরিদ্বার, কাশী ইত্যাদি কোনো তীর্থস্থানে যদি কারও মৃত্যু ঘটে তাহলে সেই তীর্থস্থানের প্রভাবে তার ভগবানের স্মৃতি জাগ্রত হয়[১]। এইরূপ যে স্থানে ভগবদ্নাম জপ, কীর্তন, কথা, সৎসঙ্গ ইত্যাদি হয়, সেইস্থানে কারও মৃত্যু হলে, সেখানকার পবিত্র বায়ুমণ্ডলের প্রভাবে তার ভগবানের স্মরণ হতে পারে। মৃত্যুকালে কোনো ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির উদ্ভব হলে ভীত হয়েও ভগবানের স্মরণ আসতে পারে। দেহত্যাগের সময় দেহ, আত্মীয়-স্বজন, অর্থ ইত্যাদির মায়া-মমতা-মুক্ত হয়ে এই ভাব যদি জাগরিত হয় যে, 'হে প্রভু! তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই, শুধু তুমিই আমার' তাতেও ভগবানের স্মৃতি হওয়ায় কল্যাণ সাধিত হয়। তেমনই কোনো কারণে কারও যদি হঠাৎ নিজ কল্যাণের ইচ্ছা জাগ্রত হয়, তাহলেও তাঁর কল্যাণ হয়ে থাকে[২]। এইরূপই কোনো সাধক যদি কোনো প্রাণী বা জীব-জন্তুর মৃত্যুকালে 'এর কল্যাণ হোক' এই ভাব নিয়ে তাকে ভগবদ্নাম শোনান, তবে সেই ভগবদ্নামের প্রভাবে সেই প্রাণীটির কল্যাণ সাধিত হয়। শাস্ত্রাদিতে সাধু-মহাপুরুষদের প্রভাবের নানা চমৎকারী কথা শোনা যায় যে, যদি কোনো সাধু-মহাত্মা কোনো মরণাপন্ন ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন অথবা তার মৃতদেহ দেখেন বা তার চিতার ধোঁয়া বা ভস্ম দেখেন—তাহলেও ওই ব্যক্তির কল্যাণ হয়[৩]।

মর্মার্থ

এই অধ্যায়ের তৃতীয়-চতুর্থ শ্লোকে ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম ইত্যাদি যে ছটি বিষয়ের বর্ণনা করা হয়েছে, তার তাৎপর্য হল সমগ্ররূপে এবং সমগ্ররূপের তাৎপর্য হল—**'বাসুদেবঃ সর্বম্'** অর্থাৎ সবই বাসুদেব। যাঁদের সমগ্ররূপের জ্ঞান হয়েছে, তাঁদের জন্য মৃত্যুকালে স্মরণের

---

[১]অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা। পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ।।

[২]একবার কোনো এক ভদ্রলোক গঙ্গা থেকে ফিরে এসে সকলকে আচমনের জন্য গঙ্গাজল দিচ্ছিলেন। এক ব্যক্তি সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে গঙ্গাজল দিতে গেলে সে বলল—আমি অনেক পাপ করেছি, এতো সামান্য গঙ্গাজলে আমার পাপ কী করে দূর হবে? আমার কল্যাণ কী করে হবে? তখন আগের ব্যক্তিটি জিজ্ঞাসা করলেন—কতটা চাই? সে বলল—ঘটি ভরে দাও। সেই ব্যক্তি তাকে এক ঘটি গঙ্গাজল দিলেন। সেই ব্যক্তি এক ঘটি গঙ্গাজল পান করে বলল—আমার আর কোনো পাপ থাকবে না! এই ঘটনা সেখানকার এক ব্যক্তি শুনেছিল। পরে সেই ব্যক্তি জানায় যে ওই পাপী ব্যক্তিটির যখন মৃত্যু হয়, তখন তার প্রাণ দশম দ্বার ভেদ করে বার হয়ে যায় অর্থাৎ তার কল্যাণ সাধিত হয়েছিল।

[৩]মহাপাতকযুক্তা বা যুক্তা বা চোপপাতকৈঃ। পরং পদং প্রয়ান্ত্যেব মহদ্ভিরবলোকিতাঃ।।
কলেবরং বা তদ্ভস্ম তদ্ধূমং বাপি সত্তম। যদি পশ্যতি পুণ্যাত্মা স প্রয়াতি পরাং গতিম্।।
(নারদপুরাণ, পূর্ব. ১।৭।৭৪-৭৫)

প্রশ্ন থাকে না। কারণ যাঁদের কাছে জগতের পৃথক্ অস্তিত্ব না থেকে সবকিছু বাসুদেবই, তাঁদের কাছে 'মৃত্যুকালে ভগবদ্চিন্তা করবে'—এ কথা বলাই বাহুল্য। সাধারণ মানুষদের যেমন 'আমি আছি' এই আপনভাবের জন্য কিছু করতে হয় না, তেমনি এই মহাপুরুষদেরও চেষ্টা করে ভগবানকে স্মরণ করতে হয় না। তাঁদের জাগরণ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ইত্যাদি সব অবস্থাতেই ভগবানের বিদ্যমানতার অটল জ্ঞান স্বাভাবিকভাবেই থাকে।

অত্যন্ত পবিত্র বা অতি অপবিত্র কোনো স্থানে, উত্তরায়ণে বা দক্ষিণায়নে শুক্লপক্ষে অথবা কৃষ্ণপক্ষে, দিবসে বা রাত্রে, প্রাতঃকালে বা সন্ধ্যাকালে, জাগ্রত, স্বপ্ন বা সুষুপ্তিতে, মূর্চ্ছা, রুগ্নতা বা নীরোগ অবস্থায় ; পবিত্র বা অপবিত্র কোনো বস্তু, ব্যক্তি, পদার্থ ইত্যাদি সম্মুখে থাকলেও সেই মহাপুরুষের কল্যাণে কোনো সন্দেহ থাকে না।

উপরিউক্ত মহাপুরুষ ছাড়াও ভগবানের উপাসক যত সাধক আছেন, তাঁরা সাকারের উপাসক হোন বা নিরাকারের ; সগুণের উপাসক হোন অথবা নির্গুণের ; রাম, কৃষ্ণ বা যে কোনো অবতারের উপাসক হোন না কেন, ভগবানের যে কোনো নাম, রূপ, লীলা বা ধাম প্রভৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রেম সহকারে উপাসনাকারী হোন না কেন, তাঁদের নিজ নিজ রুচি অনুসারে মৃত্যুকালে ভগবানের কোনো একটি রূপ বা নাম স্মরণ হলে সেটিও হল ভগবদ্-স্মরণ।

সাধক ছাড়াও যে-সব মানুষের মধ্যে 'ভগবান আছেন' এরূপ আস্তিক্য-ভাব সাধারণভাবে থাকে আর তাঁরা যদি কোনো বিশেষ উপাসনায় ব্যাপৃত নাও হন, তাঁদেরও কয়েকটি কারণে ভগবদ্স্মরণ হওয়া সম্ভব। যেমন, তাঁরা তাঁদের জীবনে শুনেছেন যে দুঃখীর দুঃখ ভগবান দূর করেন, এই সংস্কারবশতঃ মৃত্যুকালে কষ্টের সময় ভগবদ্স্মরণ হতে পারে। মৃত্যুকালে যমদূতকে দেখে ভয়বশতঃ ভগবান স্মরণে আসতে পারেন। কোনো ভদ্রলোক তাঁর সামনে ভগবানের ছবি রেখে তাঁকে দেখালে, তাঁকে ভগবদ্নাম শোনালে, ভগবদ্লীলাকথা শোনালে, ভক্তদের চরিতকথা শোনালে, তাঁর সামনে নাম-কীর্তন করতে থাকলে—তাঁর ভগবানের কথা স্মরণে আসে। এইভাবে কোনো কারণবশতঃ ভগবানের নাম স্মরণ হলে সেই স্মরণকেও ভগবদ্স্মরণ বলা হয়।

এরূপ সাধক ও সাধারণ ব্যক্তিদের জন্যই মৃত্যু (অন্ত) কালে ভগবদ্স্মরণের কথা বলা হয়েছে, তত্ত্বজ্ঞ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদের জন্য নয়।

পরিশিষ্ট-ভাব—যে ব্যক্তি দেহ থাকতে থাকতে নিজের উদ্ধার করতে সক্ষম হননি, তিনি যদি অন্তকালে অর্থাৎ দেহত্যাগের সময়েও ভগবানকে স্মরণ করতে পারেন, তাহলেও তিনি ভগবানকেই প্রাপ্ত হন—এতে কোনো সন্দেহ নেই। আর যাঁরা সবসময় ভগবানকে স্মরণ করেন, তাঁরা যে অন্তকালে ভগবানকে স্মরণ করে ভগবানকে প্রাপ্ত হবেন— তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ভগবান মানুষকে (নিজের উদ্ধার করার) অনেক স্বাধীনতা প্রদান করেছেন, সুযোগ দিয়েছেন যাতে তারা যে কোনও উপায়ে কল্যাণ লাভ করতে পারে! ভগবানের মানুষের ওপর এ এক বিশেষ কৃপা!

* * *

সম্বন্ধ—মৃত্যুকালে যাঁরা আমাকে স্মরণ করেন, তাঁরা তো আমাকেই প্রাপ্ত হন, কিন্তু যারা আমাকে স্মরণ না করে অন্য কাউকে স্মরণ করে থাকে—তারা কাকে লাভ করে, পরবর্তী শ্লোকে ভগবান তাই জানাচ্ছেন।

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥ ৬ ॥

[**কৌন্তেয়** (হে কুন্তীপুত্র অর্জুন!) ; **অন্তে** (মৃত্যুকালে) ; **যম্, যম্ বা, অপি** (যেই যেই) ; **ভাবম্** (ভাব) ; **স্মরন্** (স্মরণ করতে করতে) ; **কলেবরম্** (দেহ) ; **ত্যজতি** (ত্যাগ করে) ; **সদা, তদ্ভাবভাবিতঃ** (সে ওইভাবে সদা ভাবিত হওয়ায়) ; **তম্, তম্, এব** (ওইরূপই) ; **এতি** (গতি প্রাপ্ত হয়।)]

হে কুন্তীপুত্র অর্জুন! মানুষ মৃত্যুকালে যে যে ভাব স্মরণ করতঃ দেহত্যাগ করে, সে ওই (অন্তিম) ভাবে সদা ভাবিত হয়ে ওইরূপ গতি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সেই সেই যোনিতে জন্ম নেয় ॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা—'**যং যং বাপি স্মরন ভাবং ..... সদা তদ্ভাবভাবিতঃ**'—ভগবান এই নিয়মে দয়ায় পূর্ণ এক বিশেষ কথা বলেছেন যে, অন্তিম চিন্তা অনুসারে মানুষ যখন ওইসব যোনি প্রাপ্ত হয় তখন ওই নিয়ম অনুসারে মৃত্যুকালে আমাকে স্মরণ করলে আমাকে প্রাপ্ত হবেই ! পরম দয়ালু ভগবান তাঁর প্রাপ্তির জন্য কোনো বিশেষ নিয়মের কথা বলেননি, বরং সাধারণ একটি নিয়মেই নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ভগবানের এ এক অপার করুণা যে—যার দ্বারা (অর্থাৎ মৃত্যুকালীন স্মরণে) কুকুরের যোনি প্রাপ্ত হয় সেই মূল্যেই ভগবদ্প্রাপ্তি হতে পারে।

'**সদা তদ্ভাবভাবিতঃ**' এর তাৎপর্য হল যে, মৃত্যুসময়ে যা কিছুর চিন্তা হয়, শরীর ত্যাগ করার পর সেই জীব যতক্ষণ অন্য দেহ ধারণ না করে, ততক্ষণ সে সেইভাবেই ভাবিত থাকে অর্থাৎ মৃত্যুকালের চিন্তাধারা (স্মরণ) তেমন ভাবেই স্থায়ী হয়ে থাকে। মৃত্যুকালের সেই চিন্তা অনুসারেই তার মানসিক শরীর গড়ে ওঠে এবং মানসিক শরীর অনুযায়ী সে অন্য দেহ ধারণ করে। কারণ মৃত্যুকালীন চিন্তা পরিবর্তনের কোনো সুযোগই সেখানে থাকে না, শক্তি বা স্বাধীনতাও থাকে না এবং নতুন চিন্তা করার অধিকারও থাকে না। অতএব সেই চিন্তাতেই সে মগ্ন হয়ে থাকে। তখন তার সঙ্গে কর্মের বিন্দুমাত্রও সম্পর্ক যার সঙ্গে থাকে, বায়ু, জল, খাদ্য ইত্যাদির মাধ্যমে সে সেই যোনির পুরুষ জাতির মধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং পুরুষ হতে স্ত্রী জাতিতে প্রবেশ করে সময়মতো জন্ম পরিগ্রহ করে। যেমন, কুকুর পালনকারী কোনো ব্যক্তি যদি মৃত্যুকালে কুকুরকে স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করে, তাহলে তার মানসিক শরীর কুকুরের মতো হয়। যার ফলে সে ক্রমশঃ কুকুরই হয়ে যায় অর্থাৎ কুকুরের গর্ভে জন্ম নেয়। এইভাবে মৃত্যুকালে যা কিছুর স্মরণ হয়, সেই অনুসারে জন্মগ্রহণ করতে হয়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, বাড়ির কথা ভেবে দেহত্যাগ করলে বাড়ি হয়ে জন্মাবে, অর্থের কথা ভেবে মারা গেলে অর্থ হয়ে জন্মাবে। বাড়ির কথা ভেবে মৃত্যু হলে সে ওই বাড়িতে ইঁদুর বা টিকটিকি হয়ে থাকবে এবং অর্থ চিন্তা করলে সাপ হয়ে জন্মাবে, প্রভৃতি।

তাৎপর্য হল এই যে, মৃত্যুকালীন চিন্তার নিয়ম সজীব প্রাণীতেই প্রযোজ্য, নির্জীব বস্তুতে নয়। অতএব জড়পদার্থের চিন্তা হলে সে ওই সম্বন্ধিত কোনো সজীব প্রাণী হয়ে জন্মাবে।

মনুষ্যেতর (পশু-পক্ষী ইত্যাদি) প্রাণীর নিজ নিজ কর্ম অনুসারেই মৃত্যুকালে স্মরণ হয়ে থাকে এবং সেই অনুসারে তাদের পরবর্তী জন্ম হয়। এইভাবে মৃত্যুকালীন স্মরণের নিয়মটি সর্বত্রই প্রযোজ্য হয়। কিন্তু মনুষ্যদেহে এই বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে তার মৃত্যুকালের স্মরণ কর্মের অধীন নয়, তা পুরুষার্থের অধীন। পুরুষার্থে মানুষ সর্বতোভাবে স্বাধীন। সেইজন্যই তো অন্যান্য জন্মের তুলনায় এই জন্মের মহিমা বেশি।

মানুষ এই দেহে স্বাধীনভাবে যার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, সেই সম্পর্ক অনুসারেই সে অন্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করতে পারে। কিন্তু মৃত্যুকালে যদি সে ভগবদ্স্মরণ করে, তাহলে তার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। কারণ ওইসব সম্পর্ক প্রকৃত নয়, বরং বর্তমানের সৃষ্ট—কৃত্রিম সম্পর্ক। আর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্বতঃসিদ্ধ ; সৃষ্ট নয়। তাই ভগবানের চিন্তা এলে সমস্ত কৃত্রিম সম্পর্ক ছিন্ন হয়।

বিশেষ কথা

(১)

পরবর্তী জন্মের প্রাপ্তি অন্তিমকালের চিন্তা অনুযায়ী হয়। যার যেমন স্বভাব, মৃত্যুকালে প্রায়শঃই সে সেই চিন্তাই করে থাকে। যেমন, যার কুকুর পালনের খুব সখ আছে, মৃত্যুকালে তার সেই কুকুরের চিন্তা হয়। সেই চিন্তা আকাশবাণী কেন্দ্রের প্রসারিত (বিশেষ শক্তিসম্পন্ন) ধ্বনির মতো সর্বত্র ছড়িয়ে যায়। যেমন, আকাশবাণী-কেন্দ্র প্রসারিত ধ্বনি রেডিওতে (কোনো বিশেষ নম্বরে) ধরা যায়, তেমনই মৃত্যুকালীন কুকুরের চিন্তার সম্বন্ধ কুকুরের সঙ্গে (যার সঙ্গে কোনো ভাবে ঋণানুবন্ধ বা কর্মাদির সঙ্গে কোনো না কোনো সম্পর্ক থাকে) সম্পর্কিত হয়। তারপর সেই জীব সূক্ষ্ম এবং কারণ-শরীরসহ অন্ন, জল, বায়ু (শ্বাস) ইত্যাদির দ্বারা সেই কুকুরে প্রবিষ্ট হয় এবং ক্রমে মাদী কুকুরে প্রবিষ্ট হয়ে নির্দিষ্ট সময়ে কুকুররূপে জন্ম নেয়।

অন্তকালীন চিন্তা এবং সেই অনুসারে গতি কীভাবে হয়, তা একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা সহজে বোঝা যায়। এক ব্যক্তি ছবি তোলাতে গিয়েছিল। ফোটোগ্র্যাফারটি তাকে বলল যে, ছবি তোলার সময় সে যেন নড়াচড়া না করে এবং হাসিমুখে থাকে। ঠিক ছবি তোলার মুহূর্তে সেই লোকটির নাকের

ওপর একটি মাছি এসে বসল। হাত দিয়ে মাছিকে তাড়ানো উচিত হবে না মনে করে (কেন-না সেটি ছবিতে উঠে যেতে পারে), সে তার নাকটি কুঞ্চিত করল আর তখনই ছবি তোলা হয়ে হল। সেই লোকটি ফোটো চাইলে ফোটোগ্র্যাফার জানাল যে ফোটো তৈরি হতে কিছু সময় লাগবে, পরে এসে সে যেন ছবিটি নিয়ে যায়। নির্দিষ্ট সময়ে ফোটোগ্র্যাফার তাকে ফোটো দেখালে সে (কুঞ্চিত নাক) কুরূপ দেখে ভীষণ বিরক্ত হল। সে বলল—তুমি আমার ফোটো খারাপ করে দিয়েছ ! ফোটোগ্র্যাফার বলল—এতে আমার কী দোষ ? ফোটো তোলার সময় তুমি যেমনভাবে ছিলে, ছবিতে ঠিক তেমনই ছবি এসেছে ; এখন তো আর ফোটোতে কোনো পরিবর্তন করা সম্ভব নয় ! ঠিক এইরূপই মৃত্যুকালে মানুষ যেমন চিন্তা করবে, তেমন জন্মই সে লাভ করবে।

ফোটো তোলার সময়টি তো আগে থেকেই জানা থাকে, কিন্তু মৃত্যু যে কখন এসে যায়—তার কোনো ঠিক নেই। সেইজন্য নিজ স্বভাব, চিন্তা নির্মল রেখে সবসময় সাবধান থাকা উচিত ও ভগবানকে নিত্য-নিরন্তর স্মরণে রাখা কর্তব্য (গীতা ৮।৫, ৭)।

(২)

মৃত্যুকালীন গতির বিষয়ে ভগবানের ন্যায়পরায়ণতা এবং দয়া—দু'টিই অসীম। সাধারণের দৃষ্টিতে ন্যায় এবং দয়া—দু'টি পরস্পর বিরুদ্ধ বলে মনে হয় । ন্যায় করতে গেলে দয়া করা হয় না, আবার দয়া করলে ন্যায় সিদ্ধ হয় না। কারণ ন্যায় বিচারে যথাযথ নির্ণয় করা হয়, কোনো ছাড় দেওয়া হয় না আর দয়াতে ছাড় থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই বিরোধ সাধারণ এবং স্বার্থপরায়ণ ব্যক্তিদের তৈরি ন্যায়েই থাকে ভগবান-সৃষ্ট ন্যায়ে নয়। কারণ ভগবান অত্যন্ত দয়ালু এবং সকল প্রাণীরই সুহৃদ্— **'সুহৃদং সর্বভূতানাম্'** (গীতা ৫।২৯)। ভগবানের সকল নিয়ম ন্যায় ও দয়াতে পরিপূর্ণ।

মানুষ মৃত্যুর সময়ে যে চিন্তা করে, সেই অনুসারে তার গতি হয়। যদি কেহ কুকুরের চিন্তা নিয়ে মারা যায়, সে ক্রমশঃ কুকুর হয়ে যায়। মানুষের প্রতি ভগবানের এটি একটি ন্যায়বিচার ; কারণ ভগবান প্রত্যেক মানুষকেই স্বাধীনতা দিয়েছেন যাতে সে ইচ্ছা করলে ভগবানকে স্মরণ করতে পারে বা অন্য কিছু স্মরণ করতে পারে। এটি হল ভগবানের 'ন্যায়বিচার'। যে মূল্যে কুকুর-জন্ম প্রাপ্তি হয়—সেই মূল্যেই ভগবানকেও লাভ করা যায়—মানুষের প্রতি ভগবানের এই হল দয়া। মানুষ যদি ভগবানের এই ন্যায়বিচার এবং দয়ার দিকে দৃষ্টি দেয়, তাহলে তার ভগবানের প্রতি আকর্ষণ হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব— সপ্তম অধ্যায়ের একুশতম শ্লোকে ভগবান **'যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ'** পদটির দ্বারা উপাসনার বিষয়ে মানুষের স্বাধীনতার কথা বলেছিলেন, এখন এই শ্লোকে গতির বিষয়ে মানুষের স্বাধীনতার কথা জানাচ্ছেন। অর্থাৎ নিজ নিজ আরাধ্য এবং গতির ক্ষেত্রে মানুষ স্বাধীন[১] এবং ভগবান তাঁর সহৃদয় স্বভাবের জন্য এতে বাধক হন না, বরং এতে তিনি সহায়ক হয়ে থাকেন। মানুষই প্রাপ্ত স্বাধীনতার অব্যবহার করে দুর্গতি প্রাপ্ত হয়।

মনুষ্যদেহের এক বিশেষত্ব হল যে সে যা চায়, তাই পেতে সক্ষম হয়। এমন কোনো দুর্লভ পদ নেই, যা মানুষ পেতে সক্ষম নয়। যাতে লাভের (সুখের) কোনো অন্ত থাকে না এবং দুঃখেরও লেশমাত্র থাকে না, মানুষ এরূপ পদও প্রাপ্ত করতে সক্ষম হয়[২]। কিন্তু ভোগ ও সংগ্রহে ব্যাপৃত থাকায় মানুষ চুরাশী লক্ষ যোনী প্রাপ্ত হয়। তাই ভগবান দুঃখ করে বলেছেন—**'অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি'** (৯।৩), **'মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্'** (১৬।২০)।

---

[১] নর তন সম নহিঁ কবনিউ দেহী। জীব চরাচর জাচত তেহী॥
নরক স্বর্গ অপবর্গ নিসেনী। গ্যান বিরাগ ভগতি সুভ দেনী॥ (শ্রীরামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ১২১।৫)

[২] যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥ (গীতা ৬।২২)
'যে লাভ প্রাপ্ত হলে তার বেশি অন্য কোনো লাভে মন মানে না এবং যাতে স্থিত হলে ভীষণ দুঃখেও মানুষকে বিচলিত করা যায় না।'

মানুষ মৃত্যুকালে যেমন চিন্তা করে, তেমনই গতি সে প্রাপ্ত হয়। এই বিষয়ে একটি শ্লোক আছে—

বাসনা যস্য যত্র স্যাৎ স তং স্বপ্নেষু পশ্যতি।
স্বপ্নবন্মরণে জ্ঞেয়ং বাসনা তু বপুর্নৃণাম্॥

'যে ব্যক্তির যেমন বাসনা থাকে, সে সেই বাসনা অনুযায়ী স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নের মতোই মৃত্যু হয় অর্থাৎ বাসনা অনুযায়ীই মৃত্যুসময়ে চিন্তার উন্মেষ ঘটে এবং সেই চিন্তা অনুযায়ীই তার গতি হয়ে থাকে।'

অর্থাৎ মৃত্যুকালে আমরা যেমন আকাঙ্ক্ষা করব, তেমন চিন্তা করতে সক্ষম নই ; বরং আমাদের মধ্যে যেমন বাসনা থাকে, স্বতঃই সেইরূপ চিন্তার উন্মেষ হয় এবং সেই অনুযায়ীই গতি হয়ে থাকে। যে বস্তুকে আমরা অস্তিত্ব ও গুরুত্ব দিয়ে থাকি, যার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করি, যার থেকে সুখ গ্রহণ করি—তারই বাসনা অন্তরে স্থায়ী হয়। যদি সংসারে সুখবুদ্ধি না হয় তাহলে সংসারের বাসনা সৃষ্টি হয় না। আকাঙ্ক্ষা (বাসনা) সৃষ্টি না হলে মৃত্যুকালে যে চিন্তার উদয় হবে, তা ভগবানের চিন্তাই হবে, কেন-না সিদ্ধান্ত হল সব কিছুই ভগবান—**'বাসুদেবঃ সর্বম্'**।

'তং তমেবৈতি'—যেমন সূঁচের পিছনে (সেই পথেই) সুতো যায়, মানুষও সেইরূপ অন্তকালের ভাব (চিন্তা) অনুসারে গতি লাভ করে।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—মৃত্যুকালের স্মরণ অনুযায়ীই যখন গতিলাভ হয়, তাহলে সেইসময় ভগবানকে স্মরণ করার জন্য মানুষের কী করা উচিত—পরবর্তী শ্লোকে সেই উপায় নির্ধারণ করেছেন।

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্ ॥ ৭ ॥

[তস্মাৎ (অতএব) ; সর্বেষু (সকল) ; কালেষু (সময়) ; মাম্ (আমাকে) ; অনুস্মর (স্মরণ করো) ; যুধ্য, চ (যুদ্ধও করো) ; ময়ি (আমাতে) ; অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ (মন ও বুদ্ধি সমর্পণ করলে) ; অসংশয়ম্ (নিঃসন্দেহে) ; মাম্, এব (আমাকেই) ; এষ্যসি (লাভ করবে।)]

অতএব তুমি সকল সময় আমাকে স্মরণ করো আর যুদ্ধও করো। আমাতে মন ও বুদ্ধি সমর্পণ করলে তুমি নিঃসন্দেহে আমাকেই লাভ করবে ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা—**'তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ'**—এইস্থানে **'সর্বেষু কালেষু'** পদটির সম্বন্ধ কেবলমাত্র স্মরণ করাতেই বোঝায়, যুদ্ধে নয়। কারণ যুদ্ধ সর্বক্ষণ হতে পারে না। কোনো ক্রিয়াই নিরন্তর হয় না, নির্দিষ্ট সময়ানুসারে হয়। কারণ সমস্ত ক্রিয়ারই আরম্ভ এবং শেষ থাকে—এ কথা সকলেরই অভিজ্ঞতালব্ধ। কিন্তু উদ্দেশ্য ভগবদ্প্রাপ্তি হলে ভগবদ্স্মরণ সবসময়েই হয়ে থাকে ; কারণ উদ্দেশ্য সবসময়ে জাগরূক থাকে।

সবসময় স্মরণ করার কথা বলার তাৎপর্য হল যে, প্রতিটি কাজের জন্য সময় ভাগ করা থাকে, যেমন—কোনো সময় হল শোবার, কোনোটি জেগে থাকার, কোনোটি নিত্যকর্ম করার, কোনোটি জীবিকা সংক্রান্ত কাজের, কোনোটি খাবার সময় ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু ভগবদ্স্মরণের সময় ভাগ করা উচিত নয়। তাঁকে সর্বক্ষণই স্মরণে রাখা উচিত।

'যুধ্য চ' বলার তাৎপর্য হল, এখানে অর্জুনের কাছে যুদ্ধরূপ কর্তব্য-কর্ম উপস্থিত, যা তিনি স্বতঃই প্রাপ্ত হয়েছেন—**'যদৃচ্ছয়া চোপপন্নম্'**। (গীতা ২।৩২)। এইভাবে মানুষের সামনে যে কর্তব্য-কর্ম উপস্থিত হয়, তা ভগবানকে স্মরণে রেখে পালন করা উচিত। কিন্তু এতে ভগবদ্স্মরণ মুখ্যরূপে এবং কর্তব্য-কর্ম গৌণরূপে থাকা উচিত।

'অনুস্মর' কথাটির তাৎপর্য হল স্মরণের পর স্মরণ হতে থাকা অর্থাৎ নিরন্তর স্মরণ হওয়া। অন্য অর্থ হল যে ভগবান কোনো জীবকেই ভোলেন না। ভগবান সপ্তম অধ্যায়ে **'বেদাহম্'** (৭।২৬) কথাটির দ্বারা বর্তমানে সকল

জীবকে স্বতঃ জানার কথা বলেছেন। ভগবান যখন বর্তমানে সকলকে জানেন, তখন ভগবানের পক্ষে সমস্ত জীবকে স্মরণ করা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এবার জীব যদি ভগবানকে স্মরণ করে তাহলে সে বাধা পার হয়ে যায়।

ভগবদ্‌স্মরণ জাগরূক করতে ভগবানের সঙ্গে আপনত্ব থাকা চাই। এই আপনভাব যত দৃঢ় হয়, ভগবদ্-স্মৃতি ততই বারবার মনের মধ্যে আসতে থাকবে।

'ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ'—আমাকে মন-বুদ্ধি অর্পিত করার সাধারণ অর্থ হল যে মনে মনে ভগবানের চিন্তা করা এবং বুদ্ধির দ্বারা পরমাত্মাতে দৃঢ় নিশ্চয় হওয়া। কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ হল—মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, শরীর ইত্যাদিকে ভগবানের বলে জানা, কখনো ভুল ক্রমেও নিজের বলে মনে না করা। কারণ যত প্রাকৃত পদার্থ আছে তা সবই ভগবানের। সেই প্রাকৃত পদার্থগুলিকে নিজের বলে মনে করাই ভুল। সাধক যতক্ষণ সেগুলিকে নিজের বলে মনে করবেন, ততক্ষণ তিনি শুদ্ধ হবেন না। কারণ সেগুলিকে নিজের মনে করাই হল আসল অশুদ্ধি এবং এর থেকেই নানাপ্রকার অশুদ্ধ-ভাব আসে।

মানুষের সম্বন্ধ প্রকৃতপক্ষে প্রভুর সঙ্গেই থাকে। প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক ক্রিয়াদির সঙ্গে মানুষের কখনো সম্বন্ধ ছিল না, বর্তমানেও নেই এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না। কারণ মানুষ সাক্ষাৎ পরমাত্মার সনাতন অংশ ; অতএব প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্পর্ক কী করে থাকবে ? তাই সাধকের মন ও বুদ্ধিকে ভগবানের বলে মনে করে ভগবানেই অর্পণ করা উচিত। তাহলে তাঁর স্বাভাবিকভাবেই ভগবদ্প্রাপ্তি হয়। কারণ প্রকৃতির কার্যাদি শরীর, মন, বুদ্ধি ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়াতেই মানুষ ভগবানে বিমুখ হয়।

এইসব প্রাকৃতিক পদার্থ কী—এ নিয়ে দার্শনিক মতভেদ থাকলেও 'এগুলি আমাদের নয়' এবং 'আমরাও ওগুলির নই'—এই বাস্তব বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই অর্থাৎ সব দার্শনিকই এতে একমত। এই দার্শনিকদের মধ্যে যাঁরা ঈশ্বরবাদী, তাঁরা সবাই এ-সব প্রাকৃতিক পদার্থকে ঈশ্বরের বলেই মনে করেন আর অন্যান্য যত দার্শনিক আছেন তাঁরা এই পদার্থগুলিকে প্রাকৃতিক বলেই মনে করুন অথবা পরমাত্মার বলেই মনে করুন, দার্শনিক দৃষ্টিতে সেগুলিকে তাঁরা নিজেদের বলে মনে করতে পারেন না। তাই সাধক যদি ওইসব পদার্থ ঈশ্বরের বলে মনে করে তাঁকেই অর্পণ করেন তাহলে তাঁর 'আমি ভগবানেরই ছিলাম এবং তাঁরই থাকব' এইরূপে ভগবানের সঙ্গে নিত্য সম্পর্ক জাগ্রত হয়।

'মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্'—আমাতে মন-বুদ্ধি সমর্পণ করায় তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হবে—এতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ আমি তোমার কাছে নিত্য-প্রাপ্ত। অপ্রাপ্তি তখনই মনে হয় যখন সর্বক্ষণ অপ্রাপ্ত শরীর এবং জগৎ-সংসারকে নিজের বলে মনে করা হয় এবং তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। নিত্যপ্রাপ্ত তত্ত্বের কখনো অনস্তিত্ব হয় না, হতে পারে না। যদি তুমি মন-বুদ্ধিসহ নিজেকে আমাতে সমর্পণ করে দাও তাহলে আমার সঙ্গে তোমার যে নিত্য সম্বন্ধ, তা প্রকটিত হবে—এতে কোনো সন্দেহ নেই।

স্মরণ সম্পর্কে বিশেষ কথা

স্মরণ তিন প্রকারের—বোধজনিত, সম্বন্ধজনিত এবং ক্রিয়াজনিত। বোধজনিত স্মরণের কখনো বিস্মরণ হয় না। যতক্ষণ সম্বন্ধ-ত্যাগ না হয়, ততক্ষণ সম্বন্ধজনিত স্মরণ বজায় থাকে। ক্রিয়াজনিত স্মরণ সবসময় থাকে না। এই তিনপ্রকার স্মরণের বিস্তার এইরকম—

১) **বোধজনিত স্মরণ**—নিজের যে স্ব-ভাব তা স্মরণ করতে হয় না। কিন্তু শরীরের সঙ্গে যে একত্ব মেনে নেওয়া হয়েছে সেইটিই হল ভুল। বোধ হলে এই ভ্রম দূর হয়, তখন স্ব-ভাব স্বতঃসিদ্ধ হয়। গীতায় ভগবান বলেছেন যে, 'তুমি, আমি বা এই রাজাগণ আগে ছিলাম না, একথা ঠিক নয় আর ভবিষ্যতেও যে থাকব না, তা-ও ঠিক নয়' (গীতা ২।১২)। অর্থাৎ আগেও নিশ্চিতভাবে ছিলাম এবং ভবিষ্যতেও নিশ্চিতভাবে থাকব। 'যারা প্রথমে সর্গ-মহাসর্গে এবং প্রলয়-মহাপ্রলয়ে ছিল, তারাই (এই প্রাণীসমূহ হয়ে) জন্মায় এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়' (৮।১৯)। এখানে 'এই প্রাণীসকল' হচ্ছে পরমাত্মার অংশ এবং যা 'উৎপন্ন হয়ে নাশপ্রাপ্ত হয়' তা হল শরীর। যদি বিনাশপ্রাপ্তির অংশটুকু বিচার দ্বারা পরিত্যাগ করা যায়, তবে তার নিজস্বতার স্পষ্ট বোধ হয়। এই বোধজনিত স্মরণ নিত্য-নিরন্তর বজায় থাকে, কখনো নষ্ট হয় না ; কারণ এটি হল নিজের নিত্য-স্বরূপের স্মরণ।

২) **সম্বন্ধজনিত স্মরণ**—যা আমরা নিজের বলে মেনে নিই, তা হল সম্বন্ধজনিত স্মরণ, যেমন 'আমার শরীর',

'আমার সংসার' ইত্যাদি। যতক্ষণ আমরা 'এগুলি আমাদের নয়' বলে না মেনে নেই ততক্ষণ এই সম্পর্ক বজায় থাকে। কিন্তু ভগবান বাস্তবিকই আমাদের, আমরা মানলেও আমাদের, না মানলেও আমাদের, জানলে আমাদের এবং না জানলেও আমাদের। তাঁকে দেখি বা না দেখি তিনি আমাদেরই। আমরা সকলে তাঁর অংশ আর তিনি আমাদের অংশী। আমরা তাঁর থেকে পৃথক্ হতে পারি না এবং তিনিও আমাদের থেকে পৃথক্ থাকতে পারেন না। আমরা যতক্ষণ শরীর ও সংসারের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে থাকি, ততক্ষণ ভগবানের এই বাস্তবিক সম্বন্ধ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় না। যখন আমরা এই সম্পর্ক অস্বীকার করি তখন ভগবানের নিত্য-সম্বন্ধ স্বতঃই জাগ্রত হয় এবং ভগবানের স্মরণ সর্বদা বজায় থাকে।

৩) **ক্রিয়াজনিত স্মরণ**—ক্রিয়াজনিত স্মরণ অভ্যাসের দ্বারা হয়। যেমন স্ত্রীলোকেরা মাথায় জলভর্তি কলস নিয়ে পথ চলে, সেটি হাত দিয়ে ধরে না, আবার অন্যের সঙ্গে গল্পও করতে থাকে ; তা সত্ত্বেও মাথার ওপর কলসটির প্রতি সবসময় সতর্ক খেয়াল থাকে। বাজিকর দড়ির ওপর চলতে চলতে গান গায়, কথাও বলে, কিন্তু তার চিন্তা সবসময় দড়ির দিকে থাকে। ড্রাইভার মোটর গাড়ি চালায়, হাত দিয়ে গীয়ার বদল করে, স্টীয়ারিং ঘোরায় আবার মালিকের সঙ্গে কথাও বলে, কিন্তু তার মন থাকে রাস্তার দিকে। এইরূপ সমস্ত কাজে ভগবানকে নিরন্তর স্মরণে রাখাকে অভ্যাসজনিত স্মরণ বলা হয়।

অভ্যাসজনিত স্মরণও তিনপ্রকার—

ক) সংসারের কর্ম করার সময় ভগবানকে স্মরণে রাখা—এতে সাংসারিক কাজের মুখ্যতা এবং ভগবদ্-স্মরণে গৌণতা থাকে। এতে এই ভাব থাকে যে সাংসারিক কাজ যেন খারাপ না হয় এবং এর সঙ্গে ভগবদ্স্মরণও যেন হতে থাকে।

খ) ভগবানকে স্মরণে রেখে, সাংসারিক কাজ করা—এতে ভগবদ্স্মরণ মুখ্যভাবে থাকে এবং সাংসারিক কাজ গৌণভাবে হয়। এতে সাবধানতা থাকে যাতে ভগবদ্-স্মরণে ভুল না হয় আর সাংসারিক কাজে ভুল হলেও কোনো ক্ষতি নেই। কারণ সাধকের মনে এই ভাব থাকে যে সাংসারিক কাজ ঠিক হোক বা বেঠিক হোক, তা শেষ পর্যন্ত থাকে না। তাই তাঁর ভগবদ্স্মরণে ভুল হয় না।

গ) কাজগুলিকে ভগবানেরই বলে মনে করা—এতে কাজকর্ম করলেও মনে এক বিশেষ আনন্দ থাকে যে 'আমার কী সৌভাগ্য যে আমি ভগবানের কাজই করছি। তাঁরই সেবা করছি !' সুতরাং এই কাজে ভগবদ্স্মৃতি বিশেষভাবে জাগরূক থাকে। যেমন, কোনো ভদ্রলোক তাঁর কন্যার বিবাহের সময় মেয়েকে দেবার জন্য নানাপ্রকার সামগ্রী ক্রয় করেন, নানা কার্য করেন, আত্মীয়-স্বজনদের নিমন্ত্রণ করতে থাকেন ; কিন্তু যা-ই করুন না কেন 'কন্যার বিবাহ দিতে হবে'—এই কথাটি তাঁর সবসময় স্মরণে থাকে। কন্যার ক্ষেত্রে ভগবানের ন্যায় পূজ্যভাব না থাকলেও তার বিবাহের জোগাড়-যন্ত্র করার সময়েও মেয়ের কথা স্মরণে থাকে। অতএব ভগবানের জন্য কার্যাদি করার সময় ভগবানের সঙ্গে পূজ্যভাবের সঙ্গে নিজস্ব যে মধুর স্মৃতি তা যে বজায় থাকবে—এতে বলার কী আছে ?

ভগবদ্সম্বন্ধীয় কাজ দুপ্রকারের হয়—১) **স্বরূপতঃ**—ভগবানের নাম জপ ও কীর্তন, ভগবদ্লীলা শ্রবণ, চিন্তন, পঠন-পাঠন ইত্যাদি—এগুলি স্বরূপতঃ ভগবদ্সম্বন্ধীয় কাজ।

২) **ভাবের দ্বারা**—সংসারের কাজ করতে থাকলেও 'সমস্ত জগৎ-ই যখন ভগবানের, তখন জগতের কাজও ভগবানের। এগুলি ভগবানের জন্যই, তাঁর প্রসন্নতার জন্যই করা। এ থেকে আমার কিছু নেবার নেই। ভগবান আমাকে যে বর্ণে জন্ম দিয়েছেন, যে আশ্রমে স্থান দিয়েছেন, তাতে ভগবানের নির্দেশ অনুসারে কাজ করছি—এরূপ ভাব থাকলে সাংসারিক কাজগুলিও ভগবানের কাজে পরিণত হয়।

(সপ্তম অধ্যায়ের শেষে ভগবান সাতটি কথা বলেছেন ; সেই সাতটি কথায় অর্জুন অষ্টম অধ্যায়ের প্রারম্ভে সাতটি প্রশ্ন করেছিলেন এবং এই প্রকরণটিও সাতটি শ্লোকে সমাপ্ত হয়েছে।)

পরিশিষ্ট-ভাব—ভগবান সপ্তম অধ্যায়ের ত্রিশতম শ্লোকে বলেছেন—**'প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ'**, তাই অর্জুন অষ্টম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে প্রশ্ন করেছেন—**'প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ'**। তার উত্তরে ভগবান বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্তকালে (মৃত্যুর সময়ে) আমাকে স্মরণ করতে করতে

দেহত্যাগ করে সে আমাকেই প্রাপ্ত হয় (৮।৫)। কিন্তু এই নিয়ম শুধু মাত্র আমাকে প্রাপ্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। মানুষ যাকেই স্মরণ করে দেহ পরিত্যাগ করে, তাকেই সে প্রাপ্ত হয়—এই সাধারণ নিয়ম সকলের জন্যই প্রযোজ্য (৮।৫-৬)। মৃত্যু যে কোনো সময় হতে পারে। এমন কোনো বছর, মাস, দিন, ঘণ্টা, মিনিট, ক্ষণ নেই, যে সময় মৃত্যু না হতে পারে! তাই মানুষের নিত্য-নিরন্তর, সর্ব সময় আমাকে স্মরণ করা উচিত—**'তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর'**। যে ব্যক্তি নিত্য-নিরন্তর আমাকে স্মরণ করে, তার পক্ষে আমাকে পাওয়া খুব সহজ (৮।১৪), কারণ সে যখনই দেহত্যাগ করুক, আমাকে স্মরণ করতে করতেই দেহ পরিত্যাগ করবে এবং আমাকেই প্রাপ্ত হবে।

'মর্য্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ'— সবসময় ভগবানকে স্মরণ করলে সাধকের মন-বুদ্ধি ভগবানে সমর্পিত থাকে। মন-বুদ্ধি নিজের নয়, এগুলির সঙ্গে নিজের কোনোই সম্পর্ক নেই— এরূপ মন-বুদ্ধি থেকে আপন-ভাব ত্যাগ করলে মন-বুদ্ধি স্বতঃই ভগবানে সমর্পিত হয়, কেন-না এসব ভগবানেরই অপরা প্রকৃতি। যদিও পরা এবং অপরা—উভয় প্রকৃতিই ভগবানের, তাহলেও পরা প্রকৃতির সঙ্গে অপরা প্রকৃতির সম্বন্ধ নেই, সম্বন্ধ থাকে শুধু ভগবানের সঙ্গে, কারণ তা ভগবানের অংশ—**'মমৈবাংশো জীবলোকে'** (১৫।৭)। তাই সাধক **'মর্য্যর্পিতমনোবুদ্ধি'** তখনই হতে পারেন, যখন তিনি অপরার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন না করেন, অপরাকে তার প্রভু ভগবানে অর্পণ করেন। অর্থাৎ অপরাকে নিজের এবং নিজের জন্য যেন কখনো না মনে করা হয়।

এখানে 'মন'-এর অন্তর্গত চিত্তকে এবং 'বুদ্ধি'-এর অন্তর্গত অহংকারকেও ধরে নিতে হবে। মন-বুদ্ধি অর্পিত হলে ভক্ত মমত্ববোধহীন এবং নিরহঙ্কার হয়ে ওঠেন। প্রকৃতপক্ষে ভক্ত নিজেই ভগবানে সমর্পিত হয়ে যান। স্বয়ং অর্পিত হলে মন-বুদ্ধি ইত্যাদি সবই স্বতঃ অর্পিত হয়ে যায়। সর্বস্ব ভগবানে অর্পিত হলে সর্বস্ব বলে আর কিছু থাকে না, তখন শুধুমাত্র ভগবানই থাকেন—**'বাসুদেবঃ সর্বম্'**।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে কথিত অভ্যাসজনিত স্মৃতির কথা পরবর্তী শ্লোকে বর্ণনা করছেন।

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্॥ ৮ ॥

[পার্থ (হে পার্থ!); অভ্যাসযোগযুক্তেন (অভ্যাসযোগদ্বারা যুক্ত); নান্যগামিনা (অনন্য চিন্তাকারী); চেতসা (চিত্তে); পরমম্ (পরম); দিব্যম্ (দিব্য); পুরুষম্ (পুরুষের); অনুচিন্তয়ন্ (ধ্যান করতে করতে); যাতি (প্রাপ্ত হন।)]

হে পার্থ! অভ্যাসযোগে যুক্ত এবং অনন্য চিত্তে পরমপুরুষের চিন্তন করতে করতে (শরীর ত্যাগকারী ব্যক্তি) তাঁকেই প্রাপ্ত হন ॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা—[সপ্তম অধ্যায়ের আটাশতম শ্লোকে যে সগুণ-নিরাকার পরমাত্মার বর্ণনা করা হয়েছে, সেটিই অষ্টম, নবম ও দশম শ্লোকে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।]

'অভ্যাসযোগযুক্তেন'—এই পদটিতে 'অভ্যাস' এবং 'যোগ'—এই দু'টি শব্দ আছে। সংসার থেকে তুলে নিয়ে পরমাত্মাতে বারংবার মন নিয়োজিত করাকে বলা হয় 'অভ্যাস' এবং সমতাকে বলা হয় 'যোগ'—**'সমত্বং যোগ উচ্যতে'** (গীতা ২।৪৮)। অভ্যাসে মন নিবিষ্ট করলে প্রসন্নতা আসে আর মন না লাগলে বিষণ্ণতা আসে। এটি অভ্যাস হলেও, অভ্যাসযোগ নয়। অভ্যাসযোগ তখনই হয়, যখন প্রসন্নতা বা বিষণ্ণতা কোনোটিই থাকে না। চিত্তে যদি প্রসন্নতা বা বিষণ্ণতা আসে, তাহলে তাকে গুরুত্ব না দিয়ে নিজের লক্ষ্যে স্থির থাকতে হয়, দৃঢ় থাকতে হয়। নিজের লক্ষ্যে দৃঢ় থাকাকেও যোগ বলা হয়। চিত্ত যেন এরূপ যোগযুক্ত হয়।

'চেতসা নান্যগামিনা'—চিত্ত যেন অন্যগামী না হয় অর্থাৎ এক পরমাত্মা ব্যতিরেকে অন্য কোনো লক্ষ্য যেন না থাকে।

'পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্'—এইরূপ চিত্তের দ্বারা পরম দিব্য পুরুষের অর্থাৎ সগুণ-নিরাকার পরমাত্মার ধ্যান করতে করতে দেহ-ত্যাগকারী ব্যক্তি সেই পরমাত্মাকে লাভ করে।

পরিশিষ্ট-ভাব—অর্জুন প্রশ্ন করেছিলেন—**'প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ'** (৮।২)। সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে এবার ভগবান অষ্টম, নবম এবং দশম শ্লোকে মৃত্যুকালে স্মরণকারীদের প্রকার বর্ণনা করছেন।

***

সম্বন্ধ—ভগবান এবার ধ্যানের পক্ষে অতিশয় উপযোগী সগুণ-নিরাকার পরমাত্মার স্বরূপ বর্ণনা করছেন।

কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥ ৯ ॥

[যঃ (যিনি) ; কবিম্ (সর্বজ্ঞ) ; পুরাণম্ (অনাদি) ; অনুশাসিতারম্ (সকলের শাসনকর্তা) ; অণোঃ (সূক্ষ্ম হতে) ; অণীয়াংসম্ (সূক্ষ্ম) ; সর্বস্য (সবপ্রাণীর) ; ধাতারম্ (পালন পোষণকারী) ; তমসঃ (অজ্ঞানতা থেকে) ; পরস্তাৎ (সর্বতোভাবে অতীত) ; আদিত্যবর্ণম্ (সূর্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ) ; অচিন্ত্যরূপম্ (এইরূপ অচিন্ত্য-স্বরূপের) ; অনুস্মরেৎ (চিন্তন করেন।)]

যিনি সর্বজ্ঞ, অনাদি, সকলের শাসনকর্তা, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম, সর্বপ্রাণীর পালন-পোষণকারী, সর্বতোভাবে অজ্ঞানের অতীত, সূর্যের ন্যায় স্ব-প্রকাশ অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ—এইরূপ অচিন্ত্য-স্বরূপের চিন্তন করেন ॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা—**'কবিম্'**—সকল প্রাণী এবং তাদের শুভাশুভ কর্মগুলি জানেন বলে পরমাত্মাকে বলা হয় 'কবি' অর্থাৎ সর্বজ্ঞ।

'পুরাণম্'—পরমাত্মা সমস্ত কিছুর আদি হওয়ায় তাঁকে 'পুরাণ' বলা হয়।

'অনুশাসিতারম্'—আমরা চক্ষু দ্বারা দেখে থাকি। চোখের ওপর 'মন' শাসন করে, মনের ওপরে শাসন করে 'বুদ্ধি', বুদ্ধির ওপর থাকে 'অহং কর্তৃত্ব বোধ' আর তার ওপর যিনি শাসন করেন, যিনি সকলের আশ্রয়, প্রকাশক, প্রেরক ; তিনি (পরমাত্মা) হলেন 'অনুশাসিতা'।

অপর ভাবটি হল যে, জীবের কর্ম করার যেমন যেমন স্বভাব হয়, সেই অনুযায়ী ভগবান (বেদ, শাস্ত্র, গুরু, সাধু-মহাত্মা প্রভৃতি দ্বারা) কর্তব্য-কর্ম করার নির্দেশ দেন এবং মানুষের পাপ-পুণ্য অনুযায়ী অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতি দিয়ে তাকে শুদ্ধ ও নির্মল করে তোলেন। এইরূপে মানুষের কর্তব্য-অকর্তব্যের বিধানকারী এবং তাদের পাপ-পুণ্যের প্রাক্তন কর্মগুলির (ফলপ্রদান করে) বিনাশকারী হওয়ায় ভগবানকে 'অনুশাসিতা' বলা হয়।

'অণোরণীয়াংসম্'—পরমাত্মা পরমাণু থেকেও অতিশয় সূক্ষ্ম। তাৎপর্য হল পরমাত্মা মন বা বুদ্ধির বিষয় নয় ; মন-বুদ্ধি ইত্যাদি তাঁকে ধরতে পারে না। মন-বুদ্ধি প্রাকৃতিক কার্য হওয়ায় প্রকৃতিকেই ধারণ করতে পারে না আর পরমাত্মা তো সেই প্রকৃতিরও অতীত ! অতএব পরমাত্মা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অর্থাৎ সূক্ষ্মতার অন্তিম সীমা।

'সর্বস্য ধাতারম্'—পরমাত্মা অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের বিধাতা। এই সবই পরমাত্মা থেকে সত্তা লাভ করে। তাই পরমাত্মাকে সকলের ধারক ও পোষক বলা হয়।

'তমসঃ পরস্তাৎ'—পরমাত্মা সর্বতোভাবে অজ্ঞানের অতীত, সর্বতোভাবে অজ্ঞানতা-বর্জিত। বিন্দুমাত্র অজ্ঞানতা তাঁর মধ্যে থাকে না, তিনি হলেন জ্ঞানেরও প্রকাশক।

'আদিত্যবর্ণম্'—ভগবান হলেন সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল অর্থাৎ তিনি সূর্যের ন্যায় সবকিছুর—মন-বুদ্ধি ইত্যাদিরও প্রকাশক। তাঁর থেকেই সব প্রভাসিত হয়।

'অচিন্ত্যরূপম্'—সেই পরমাত্মা হলেন অচিন্ত্য-স্বরূপ অর্থাৎ তিনি মন-বুদ্ধি ইত্যাদির চিন্তার অগোচর।

'অনুস্মরেৎ'—সর্বজ্ঞ, অনাদি, সকলের শাসনকর্তা, পরমাণু থেকেও অতিশয় সূক্ষ্ম, সকলের ধারক ও পোষক, অজ্ঞানের অতীত এবং সব কিছুর প্রকাশকারী সগুণ-নিরাকার পরমাত্মার চিন্তার জন্য এখানে **'অনুস্মরেৎ'** পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

এখানে **'অনুস্মরেৎ'** বলার তাৎপর্য হল যে প্রাণীমাত্রেরই সবকিছু তিনি জানেন ; তাঁর জানার বাইরে কিছুই নেই অর্থাৎ পরমাত্মার স্মরণে সকলেই রয়েছে ; মানুষের কর্তব্য কেবল সেই পরমাত্মাকে স্মরণ করা।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে যিনি অচিন্ত্য তাঁকে কীভাবে স্মরণ করা যায় ? তার উত্তর হল যে 'এই পরমাত্মতত্ত্ব চিন্তনের অন্তর্গত নয়, এইরূপ ধারণায় দৃঢ় থাকাই হল অচিন্ত্য পরমাত্মাকে চিন্তা করা।'

পরিশিষ্ট-ভাব—পরমাত্মাকে **'কবিম্'** বলার অর্থ হল যে, তাঁর জ্ঞানের বাইরে কিছু নেই। **'পুরাণম্'** বলার অর্থ যে তিনি অনাদি কালেরও অতীত অর্থাৎ তিনি কালেরও প্রকাশক। **'অনুশাসিতারম্'** কথাটির অর্থ হল স্বাভাবিকভাবেই সব কিছু তাঁর শাসনাধীন। তিনি জীব ও জগৎ— উভয়েরই শাসক—

ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ। (শ্বেতাশ্বতর. ১।১০)

'প্রকৃতি বিনাশশীল আর তাকে যে ভোগ করে সেই জীবাত্মা অমৃতস্বরূপ অবিনাশী। উভয়কেই (বিনাশশীল এবং অবিনাশী) এক ঈশ্বর তাঁর শাসনে রাখেন।'

'ধাতারম্' কথাটির অর্থ হল যে এই পরমাত্মা সকলের পালন-পোষণকারী (গীতা ১৫।১৭)। **'আদিত্যবর্ণম্'** কথাটির তাৎপর্য হল, সূর্যে যেমন স্বতঃ স্বাভাবিক নিত্য প্রকাশ থাকে, তেমনই পরমাত্মাতে স্বতঃ স্বাভাবিক নিত্য জ্ঞান, বোধ বর্তমান। এই পরমাত্মা জ্ঞানস্বরূপ এবং সবকিছুর প্রকাশক (গীতা ১৩।৩৩)। **'তমসঃ পরস্তাৎ'** কথাটির তাৎপর্য হল এই পরমাত্মা অজ্ঞান অথবা অপরার অতীত **'যস্মাৎক্ষরমতীতোঽহম্'** (গীতা ১৫।১৮)।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—এবার অন্তকালীন চিন্তা অনুযায়ী কী গতি হয় তাই জানাচ্ছেন।

প্রয়াণকালে মনসাচলেন ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্ স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥ ১০ ॥

[**সঃ** (সেই) ; **ভক্ত্যা, যুক্তঃ** (ভক্তিযুক্ত মানুষ) ; **প্রয়াণকালে** (মৃত্যুকালে) ; **অচলেন** (একাগ্র) ; **মনসা** (মনে) ; **চ** (এবং) ; **যোগবলেন** (যোগবলের দ্বারা) ; **ভ্রুবোঃ** (ভ্রূযুগলের) ; **মধ্যে** (মধ্যে) ; **প্রাণম্** (প্রাণকে) ; **সম্যক্** (সম্যক্-ভাবে) ; **আবেশ্য** (ধারণ করে) ; **তম্** (সেই) ; **পরম্** (পরম) ; **দিব্যম্** (দিব্য) ; **পুরুষম্, এব** (পুরুষকেই) ; **উপৈতি** (প্রাপ্ত হন।)]

সেই ভক্তিযুক্ত মানুষ মৃত্যুকালে একাগ্র মনে এবং যোগবলের দ্বারা ভ্রূযুগলের মধ্যে প্রাণকে সম্যক্‌ভাবে ধারণ করে (শরীর ত্যাগ করে), সেই পরম দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হন ॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা—'প্রয়াণকালে মনসাচলেন .... স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্'—এখানে ভক্তির তাৎপর্য হল প্রিয়তা ; কারণ ওই তত্ত্বে প্রিয়তা (আকর্ষণ) থাকলে তবেই মন তাতে অচল হয়। সেই ভক্তি অর্থাৎ প্রিয়ভাব স্বাভাবিক হতে হয়, মন-বুদ্ধি ইত্যাদির চেষ্টায় নয়।

মৃত্যুকালে কবি, পুরাণ, অনুশাসিতা ইত্যাদি বিশেষণাদির দ্বারা (আগের শ্লোকে) উদ্ধৃত সগুণ-নিরাকার পরমাত্মাতে ভক্তিযুক্ত মানুষের চিত্ত স্থির হওয়া অর্থাৎ সগুণ-নিরাকার-স্বরূপে শ্রদ্ধাসহ চিত্তের দৃঢ় হওয়াকেই বলা হয় মন অচল হওয়া।

পূর্বে প্রাণায়ামের অভ্যাস দ্বারা প্রাণের গতি রুদ্ধ করার যে অধিকার প্রাপ্ত হয়েছে, তাকে বলা হয় 'যোগবল'। সেই যোগবলের সাহায্যে দুই ভ্রূর মধ্যে যে দ্বিদল চক্র আছে, তাতে স্থিত সুষুম্না নাড়িতে প্রাণকে সম্যক্‌ভাবে ধারণ করে সে (দশম দ্বার দিয়ে শরীর ত্যাগ করে) দিব্য পরম-পুরুষকে লাভ করে।

'তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্' পদটির অর্থ হল যে পরমাত্মতত্ত্ব পূর্ববর্তী (নবম) শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে, সেই দিব্য পরম সগুণ-নিরাকার পরমাত্মাকে সে প্রাপ্ত হয়।

অষ্টম শ্লোকে যে কথা বলা হয়েছে, সেটিই নবম এবং দশম শ্লোকে বিস্তারিতভাবে বলে এই তিনটি শ্লোকে প্রকরণের উপসংহার করা হয়েছে।

এই প্রকরণে সগুণ-নিরাকার পরমাত্মার উপাসনার কথা বর্ণিত হয়েছে। এতে অভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা থাকে। প্রাণায়াম সহকারে মনকে পরমাত্মায় নিবিষ্ট করাকে অভ্যাস বলা হয়। এই অভ্যাস অণিমা, মহিমা ইত্যাদি সিদ্ধিলাভ করার জন্য নয়, বরং কেবলমাত্র পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত করার জন্য। এই অভ্যাসের দ্বারা প্রাণ ও মনের ওপর এমন অধিকার প্রাপ্ত করতে হয় যাতে যখন ইচ্ছা প্রাণকে রোধ

করা যায় এবং মনকে ইচ্ছামতো সেখানে লাগানো যায়। যে এই অধিকার প্রাপ্ত করেছে, সেই মৃত্যুকালে প্রাণকে সুষুম্না নাড়িতে প্রবিষ্ট করাতে সক্ষম হয়। কারণ অভ্যাসকালেই যখন মনকে সংসার থেকে সরিয়ে পরমাত্মাতে নিয়োজিত করতে সাধককে কঠিন অবস্থা ও অসমর্থতার সম্মুখীন হতে হয়, তখন মৃত্যুর মতো কঠিন সময়ে মন নিবিষ্ট করা সাধারণ লোকের কাজ নয়। যার আগে থেকে যোগবল থাকে, সে-ই মৃত্যুকালে মন পরমাত্মাতে নিয়োজিত করতে এবং প্রাণকে সুষুম্না-নাড়িতে প্রবেশ করাতে সক্ষম হয়।

সাধকের প্রথমে এটি নিশ্চিত করতে হয় যে অজ্ঞানের অত্যন্ত পর এবং সকলের অতীত যে পরমাত্মতত্ত্ব ; তিনি সকলের প্রকাশক, সবার আধার, নির্বিকার এবং সকলের সত্তা স্ফূর্তি প্রদানকারী। সেই তত্ত্বে প্রিয়তা থাকা চাই, মন আকর্ষিত হওয়া প্রয়োজন, তবেই তাতে মন স্বাভাবিকভাবে নিবিষ্ট হবে।

পরিশিষ্ট-ভাব—**'ভক্ত্যা যুক্তঃ'** কথাটির অর্থ হল সংসারের আসক্তি দূর হলে সাধকের একমাত্র পরমাত্মাতেই আকর্ষণ থেকে যায়, অন্যকিছুতে আর আকর্ষণ থাকে না। সংসারী ব্যক্তি অপরা বস্তুতে আকৃষ্ট থাকে, কিন্তু যে ব্যক্তি অপরাকে পরিত্যাগ করে ভগবানে আকৃষ্ট হন, তিনি ভক্তরূপে পরিগণিত হন। সংসারী ব্যক্তি শরীর ও সংসারে আসক্ত হওয়ায় 'বিভক্ত' অর্থাৎ ভগবান হতে পৃথক্ হয়ে যায়, কিন্তু ভগবানে আকৃষ্ট সাধক বিভক্ত হয়ে থাকেন না, তিনি 'ভক্ত' অর্থাৎ ভগবানের সঙ্গে এক (অভিন্ন) হয়ে যান।

'যোগবলেন' বলার অর্থ হল যে আগে যে যোগাভ্যাস করা হয়েছে তার জন্য মৃত্যুকালের অশক্ত অবস্থা তার বাধার কারণ হয়ে দাঁড়াবে না, কোনো বিকার উপস্থিত হবে না। প্রাণায়াম ইত্যাদির বলই হল যোগবল।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—ভগবান এবার পরবর্তী শ্লোকে নির্গুণ-নিরাকার প্রাপ্তির উপায় জানাচ্ছেন।

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে॥ ১১ ॥

[**বেদবিদঃ** (বেদবিদ্‌গণ) ; **যৎ** (যাকে) ; **অক্ষরম্** (অক্ষর) ; **বদন্তি** (বলেন) ; **বীতরাগাঃ** (বীতরাগ) ; **যতয়ঃ** (যোগিগণ) ; **যৎ** (যাকে) ; **বিশন্তি** (প্রাপ্ত করেন) ; **যৎ** (যা প্রাপ্ত করার) ; **ইচ্ছন্তঃ** (আকাঙ্ক্ষা করে) ; **ব্রহ্মচর্যম্** (ব্রহ্মচর্য) ; **চরন্তি** (পালন করেন) ; **তৎ** (সেই) ; **পদম্** (পদ) ; **তে** (তোমাকে) ; **সংগ্রহেণ** (সংক্ষেপে) ; **প্রবক্ষ্যে** (জানাচ্ছি।)]

বেদবিদ্‌গণ যাকে অক্ষর বলেন, বীতরাগ যোগিগণ যাকে প্রাপ্ত করেন এবং যাকে প্রাপ্ত করার আকাঙ্ক্ষা করে ব্রহ্মচর্য পালন করেন, সেই পদ-প্রাপ্তির কথা আমি তোমাকে সংক্ষেপে জানাচ্ছি ॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা—[সপ্তম অধ্যায়ের উনত্রিশতম শ্লোকে যে নির্গুণ-নিরাকার পরমাত্মার বর্ণনা করা হয়েছে, সেটিই এখানে একাদশ-দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শ্লোকে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে।]

'যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি'—বেদবিদ্ ব্যক্তিগণ যাকে অক্ষর-নির্গুণ-নিরাকার বলেন, যার কখনো বিনাশ হয় না, যা সর্বদা একইভাবে বিরাজমান, একরস এবং যাকে এই অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে **'অক্ষরং ব্রহ্ম পরমম্'** বলা হয়েছে, সেই নির্গুণ-নিরাকার তত্ত্বকে **'অক্ষর'** নামে বর্ণনা করা হয়েছে।

'বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ'—যাঁর চিত্তে আকাঙ্ক্ষার অবসান হয়েছে, আর সেইজন্য যাঁর চিত্ত অতি নির্মল এবং হৃদয়ে সর্বোপরি অদ্বিতীয় পরম তত্ত্ব লাভের তীব্র ইচ্ছা থাকে, এরূপ প্রযত্নশীল যোগী মহাপুরুষগণ ওই তত্ত্বে প্রবেশ করেন—সেটি প্রাপ্ত করেন।

'যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি'—যাঁর কেবল পরমাত্ম-প্রাপ্তির উদ্দেশ্য থাকে, পরমাত্মপ্রাপ্তি ছাড়া যাঁর আর কিছুই ধ্যেয় নয় এবং যিনি পরমাত্মপ্রাপ্তির আশায় ব্রহ্মচর্য পালন করেন, ইন্দ্রিয় সংযম করেন অর্থাৎ কোনো বিষয়ই ভোগবুদ্ধি সহকারে সেবন করেন না।

'তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে'—সমস্ত সাধনার যা অন্তিম ফল, সেই পদটিকে অর্থাৎ তত্ত্ব আমি

সংক্ষেপে এবং নির্দিষ্টরূপে জানাচ্ছি। সংক্ষেপে বলার অর্থ হল এই যে শাস্ত্রে যে তত্ত্বকে সবার থেকে বিশেষ বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে, সকল ব্যক্তি তা প্রাপ্ত করতে সক্ষম হয় না—এইভাবে যার মহিমা জানানো হয়েছে ; সেই পদ (তত্ত্ব) কীভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়—তা আমি জানাচ্ছি। নির্দিষ্টরূপে বলার অর্থ হল ব্রহ্মের উপাসক যেভাবে ব্রহ্মলাভ করেন, তা আমি জানাব।

পরিশিষ্ট-ভাব—এই শ্লোকে গৌণভাবে চার আশ্রমের কথা ধরা যায়, যেমন—**'যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি'** পদটির দ্বারা গৃহস্থাশ্রমের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। কারণ বেদ অধ্যয়ন করা ব্রাহ্মণদের প্রধান কাজ। **'বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ'** পদটিতে সন্ন্যাস এবং বাণপ্রস্থের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। **'যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি'** পদটিতে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সকল বর্ণ এবং আশ্রমেই মুক্তিলাভ হওয়া সম্ভব। ভগবান তাই স্পষ্টভাবে আশ্রমগুলির কোনো বর্ণনা করেননি বরং বর্ণাদির স্পষ্ট বর্ণনাও করেছেন কর্তব্যপালনের দিকে দৃষ্টি রেখে। অর্জুন ছিলেন ক্ষত্রিয় এবং তিনি তাঁর যুদ্ধরূপ কর্তব্য পরিত্যাগ করতে চাইছিলেন। ভগবান তাই তাঁকে তাঁর কর্তব্যে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে বর্ণধর্মের বর্ণনা করেছিলেন। যুদ্ধ করা বর্ণধর্ম, আশ্রমধর্ম নয়।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—মৃত্যুকালে সেই নির্গুণ-নিরাকার তত্ত্ব প্রাপ্তির ফলসহ বিধি-বিধান পরবর্তী দুটি শ্লোকে জানিয়েছেন।

সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্॥ ১২ ॥
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥ ১৩ ॥

[সর্বদ্বারাণি (সমস্ত দ্বার) ; সংযম্য (রুদ্ধ করে) ; মনঃ (মনকে) ; হৃদি (হৃদয়ে) ; নিরুধ্য (নিরোধ করে) ; চ (এবং) ; আত্মনঃ (নিজের) ; প্রাণম্ (প্রাণকে) ; মূর্ধ্নি (মস্তকে) ; আধায় (স্থাপনা করে) ; যোগধারণাম্ (যোগধারণায়) ; আস্থিতঃ (সম্যক্‌রূপে স্থিত হয়ে) ; যঃ (যিনি) ; ওম্ (ওঁ) ; ইতি (এই) ; একাক্ষরম্ (এক অক্ষর) ; ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) ; ব্যাহরণ্ (মানসিক উচ্চারণপূর্বক) ; মাম্ (আমাকে) ; অনুস্মরন্ (স্মরণ করতে করতে) ; দেহম্ (শরীর) ; ত্যজন্ (পরিত্যাগ) ; প্রয়াতি (করেন) ; সঃ (তিনি) ; পরাম্ (পরম) ; গতিম্ (গতি) ; যাতি (প্রাপ্ত হন।)]

সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ (সংযত) করে, মনকে হৃদয়ে নিরোধ করে এবং নিজের প্রাণকে মস্তকে স্থাপনা করে যোগধারণে সম্যক্‌রূপে স্থিত হয়ে যিনি 'ওঁ' এই এক-অক্ষর ব্রহ্ম মনে মনে উচ্চারণপূর্বক আমাকে স্মরণ করতে করতে শরীর পরিত্যাগ করেন, তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন ॥ ১২-১৩ ॥

ব্যাখ্যা—**'সর্বদ্বারাণি সংযম্য'**—(মৃত্যুকালে) সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার সংযত করবে অর্থাৎ রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ—এই পাঁচটি বিষয় থেকে চক্ষু-জিহ্বা-নাসিকা-কর্ণ-ত্বক্—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের এবং কথা বলা, গ্রহণ করা, গমন করা, মল, মূত্রাদি ত্যাগ—এই পাঁচটি ক্রিয়া থেকে বাণী-হস্ত-পদ-উপস্থ-গুহ্য—এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়কে সর্বতোভাবে সরিয়ে আনবে। এর ফলে ইন্দ্রিয়গুলি নিজস্থানেই অবস্থান করবে।

'মনো হৃদি নিরুধ্য চ'—মনকে হৃদয়ে নিরোধ করবে অর্থাৎ তাকে বিষয়াভিমুখে যেতে দেবে না। তাতে মন নিজস্থানে (হৃদয়ে) থাকবে।

'মূর্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণম্'—প্রাণকে মস্তকে ধারণ করবে অর্থাৎ প্রাণের ওপর নিজ অধিকার প্রাপ্ত করে দশম দ্বার—ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রাণকে নিরুদ্ধ করবে।

'আস্থিতো যোগধারণাম্'—এইভাবে যোগধারণে স্থিত হবে। ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা কোনো কিছু চেষ্টা না করা, মনেও কোনো সংকল্প-বিকল্প না করা এবং প্রাণের ওপর সম্পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত করাই হল যোগধারণে

স্থিত হওয়া।

'ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্'—তারপর এক অক্ষর ব্রহ্ম ওঁ (প্রণব) মনে মনে উচ্চারণ করবে এবং আমার অর্থাৎ নির্গুণ-নিরাকার পরম অক্ষর ব্রহ্মকে (যার বর্ণনা এই অধ্যায়েরই তৃতীয় শ্লোকে করা হয়েছে) স্মরণ করবে[১]। সমস্ত দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদিতে একমাত্র সচ্চিদানন্দ পরমাত্মাই সত্তারূপে পরিপূর্ণ রয়েছেন—এরূপ ধারণা করাই হল আমাকে স্মরণ করা।

'যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্'—উপরিউক্ত ভাবে নির্গুণ-নিরাকারকে স্মরণ করতে করতে যিনি দেহত্যাগ করেন অর্থাৎ দশম দ্বার দিয়ে প্রাণ ত্যাগ করেন, তিনি পরমগতি অর্থাৎ নির্গুণ-নিরাকার পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন।

পরিশিষ্ট-ভাব—এই শ্লোকগুলিতে যোগাভ্যাসকারী অদ্বৈতবাদীর বর্ণনা করা হয়েছে। 'ব্যাহরন্' পদটিতে মনে মনে উচ্চারণ করা বুঝতে হবে, কেন-না মনকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করলে, প্রাণকে মস্তকে স্থাপন করলে বাক্য দ্বারা উচ্চারণ করা সম্ভব হয় না।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—যাঁর যোগবল থাকে এবং প্রাণের ওপর নিজস্ব অধিকার থাকে তিনি নির্গুণ-নিরাকারকে লাভ করেন ; কিন্তু দীর্ঘকালের অভ্যাস-সাধ্য হওয়ায় সাধারণের পক্ষে এটি কষ্টসাধ্য। তাই ভগবান পরবর্তী শ্লোকে তাঁর অর্থাৎ সগুণ-সাকারের প্রাপ্তি সহজে কীভাবে করা যায়, তা জানিয়েছেন।

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥ ১৪ ॥

[পার্থ (হে পার্থ !) ; অনন্যচেতাঃ (অনন্য চিত্ত) ; যঃ (যে ব্যক্তি) ; নিত্যশঃ (নিত্য) ; সততম্ (নিরন্তর) ; মাম্ (আমাকে) ; স্মরতি (স্মরণ করেন) ; তস্য (সেই) ; নিত্যযুক্তস্য (নিত্য নিরন্তর আমাতে সংযুক্ত) ; যোগিনঃ (যোগীর কাছে) ; অহম্ (আমি) ; সুলভঃ (সহজলভ্য।)]

হে পার্থ ! অনন্যচিত্ত যে ব্যক্তি নিত্য-নিরন্তর আমাকে স্মরণ করেন, সেই নিত্যযুক্ত যোগীর কাছে আমি সহজলভ্য অর্থাৎ তিনি আমাকে সহজেই প্রাপ্ত হন ॥ ১৪ ॥

ব্যাখ্যা—[সপ্তম অধ্যায়ের ত্রিশতম শ্লোকে যে সগুণ-সাকার পরমাত্মার কথা বর্ণিত হয়েছে, সেটিই এখানে চতুর্দশ, পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শ্লোকে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।]

'অনন্যচেতাঃ'—যাঁর চিত্ত ভগবান ব্যতীত কোনো ভোগভূমি বা কোনো ঐশ্বর্যের দিকে একেবারেই যায় না ; যাঁর হৃদয়ে ভগবান ব্যতিরেকে আর কারও স্থান নেই, গুরুত্ব নেই, তাঁকে বলা হয় অনন্যচিত্ত। যেমন, পতিব্রতা রমণীর পতিই ব্রত ও ধর্ম হয়ে থাকে। স্বামী ছাড়া তার মনে অন্য কোনো পুরুষের কথা আসক্তিবশতঃ মনেই আসে না। শিষ্য যেমন গুরুর এবং সুপুত্র যেমন মা-বাবার অনুগত থাকে, তাদের অন্য কোনো ইষ্ট থাকে না ; ভক্তও তেমনই ভগবদ্‌পরায়ণ হয়ে থাকে।

'অনন্যচেতাঃ' পদটি এই স্থানে সগুণ উপাসনাকারীদের বাচক। সগুণ-উপাসনাতে বিষ্ণু, রাম, কৃষ্ণ, শিব, শক্তি, গণেশ, সূর্য প্রভৃতি ভগবানের যে বিভিন্ন রূপ, তার মধ্যে যে ব্যক্তি যে রূপের উপাসনা করেন তার সেই রূপেরই চিন্তা করা উচিত। কিন্তু অন্যান্য রূপকে যেন নিজ ইষ্টের থেকে পৃথক্ না মনে করা হয় এবং নিজেকেও নিজ ইষ্ট ছাড়া অন্য কারোর বলে মনে করা উচিত নয়, তাহলে তার আর অন্যদিকে মন যায় না। অর্থাৎ 'আমি শুধু একমাত্র ভগবানের আর একমাত্র ভগবানই আমার ; আমার আর কেউ নেই এবং আমিও আর কারও নই' এই ভাব হলেই তিনি 'অনন্যচেতাঃ' হন।

'সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ'—'সততম্'-এর অর্থ হল নিরন্তর অর্থাৎ ঘুম ভেঙে ওঠা থেকে ঘুমোতে

[১]সমগ্র রূপের প্রকরণ হওয়ায় এখানে 'মাম্' শব্দ দ্বারা নির্গুণ-নিরাকারের চিন্তন—এরূপ অর্থ করা হয়েছে।

যাওয়া পর্যন্ত সবসময় যে আমাকে স্মরণ করে ; 'নিত্যশঃ' মানে সর্বদা অর্থাৎ এই কথাটি যখন থেকে ধারণা করেছে তখন থেকে আমৃত্যু আমাকে স্মরণ করে!

'তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ'—এরূপ নিত্যযুক্ত যোগীর কাছে আমি সহজলভ্য। 'নিত্যযুক্ত' পদটি এখানে যাঁরা অন্তরে ভগবানকে নিরন্তর চিন্তা করেন, তাঁদের বাচক নয়, বরং শ্রদ্ধা ও প্রেমপূর্বক নিষ্কামভাবে স্বয়ং ভগবানে মনোনিবেশকারীদের বাচক। যেমন, কোনো ব্রাহ্মণ তাঁর ব্রাহ্মণত্বে স্থিত থেকে ভাবেন যে আমি হলাম ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য ইত্যাদি নই। এরূপ তিনি তাঁর ব্রাহ্মণত্বকে স্মরণ করুন বা না করুন তাঁর ব্রাহ্মণত্বে কোনো তফাৎ হয় না। তেমনই 'আমি ভগবানের এবং ভগবান আমার'—এই নিত্য সম্বন্ধ দৃঢ়ভাবে থাকাই হল নিত্যযুক্ত হওয়া। এরূপ নিত্যযুক্ত যোগী সহজেই ভগবানকে লাভ করেন।

একমাত্র ভগবানই আমার আপন, তিনি ছাড়া এই শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, প্রাণ, মন, বুদ্ধি কিছুই আপন নয়—দৃঢ়তার সঙ্গে এটি মেনে নিলে ভগবান সহজলভ্য হন। শরীরাদিকে আপন বলে মনে করলে ভগবানকে সহজে পাওয়া যায় না।

ভগবানের সঙ্গে ভিন্নতা এবং জগৎ-সংসারের সঙ্গে নিজের একত্ব কখনো হয়নি, কখনো হবে না, হওয়া সম্ভবও নয়। এই নিয়মেই মানুষের ভগবানের সঙ্গে স্বতঃ স্বাভাবিকভাবে অভিন্নতা থাকে এবং জগৎ-সংসারের সঙ্গে ভিন্নতা থাকে। কিন্তু মানুষ ভ্রমবশতঃ নিজেকে ভগবানের থেকে এবং ভগবানকে নিজের থেকে পৃথক বলে মনে করে এবং নিজেকে শরীর এবং শরীরের জন্য বলে ভেবে থাকে। এই বিপরীত ধারণার জন্যই মানুষ জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হয়। এই বিপরীত ধারণা সর্বতোভাবে দূর হলে ভগবানকে লাভ করা সহজ হয়।

অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শ্লোক পর্যন্ত সগুণ-নিরাকার এবং নির্গুণ-নিরাকারের স্মরণের কথা বলা হয়েছে। এই দুটিতে প্রাণায়ামের প্রাধান্য থাকে, যেটি সিদ্ধ করা কষ্টকর। মৃত্যুকালের মতো বিকল অবস্থাতেও প্রাণায়ামের দ্বারা প্রাণকে ভ্রূযুগলের মধ্যে স্থাপন করতে সক্ষম হওয়া অথবা মূর্ধাতে (দশম দ্বারে) স্থাপন করা—প্রাণের ওপর এরূপ অধিকার থাকার ক্ষমতা থাকা চাই। কিন্তু ভগবদ্-স্মরণ তত কঠিন কাজ নয়, কারণ এখানে প্রাণের উপর অধিকার প্রয়োগের ব্যাপার নেই। এখানে তো সাধকের ভগবানের সঙ্গে অনাদিকাল থেকে যে স্বতঃসিদ্ধ সম্পর্ক সেই সম্পর্কের জাগৃতি হওয়া বোঝায়। এই সম্পর্কের জাগৃতিতে ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, বুদ্ধি কোনো কিছুরই প্রয়োজন হয় না। তাই মৃত্যুকালে এতে প্রাণাদি রুদ্ধ করার মতো কোনো কাজ থাকে না। যেমন কোনো জিনিস বীমা করানো থাকলে সেটি খারাপ হওয়ার বা ভাঙাচোরার কোনো চিন্তা থাকে না, তেমনই শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধিসহ নিজেকে ভগবানের শ্রীচরণে সমর্পণ করলে সাধকের নিজ উদ্ধারের বিষয়ে আর কোনো চিন্তা থাকে না। কারণ এই সাধন ক্রিয়াজনিত অথবা অভ্যাসজনিত নয়, এটি প্রকৃতপক্ষে সম্পর্কের জাগৃতি। তাই এতে কাঠিন্যের লেশমাত্র নেই। এজন্যই ভগবান নিজেকে সহজলভ্য বলে জানিয়েছেন।

পরিশিষ্ট-ভাব—'অনন্যচেতাঃ'— ভক্তের দৃষ্টিতে একমাত্র পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কোনো অস্তিত্ব না থাকায় তার মন অন্যত্র যাবে কী ভাবে ? কেন যাবে ? কোথায় যাবে ? সেইজন্য তা স্বাভাবিকভাবেই অনন্যচিত্ত সম্পন্ন হয়ে উঠবে।

'সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ' —একটি হল 'করা' আর অন্যটি হল 'হওয়া'। যা করা হয়, সেটি হল ক্রিয়া, আর যা আপনিই হয় তাকে বলে স্মরণ। যেমন, গীতার শেষে অর্জুন বলেছেন—**'স্মৃতির্লব্ধা'** (১৮।৭৩) কিন্তু স্মৃতি ক্রিয়া নয়, বরং ভগবানের সঙ্গে নিজ নিত্য সম্বন্ধের স্বতঃ স্বাভাবিক স্মৃতি। ভগবানকে স্মরণ করার প্রধান হেতু হল তাঁকে আপন ভাবা। ভগবান আমারই এবং আমারই জন্য— এইরূপ ভগবানে আপনভাব হলে স্বতঃই ভগবানে প্রেম জন্মায় এবং যার সঙ্গে প্রেম হয় তাকে সর্বক্ষণই স্মরণ হয়ে থাকে। তাই ভগবান সপ্তম অধ্যায়ের প্রারম্ভে **'ময্যাসক্তমনাঃ'** পদটির দ্বারা নিজের মধ্যে আসক্তি অর্থাৎ প্রেম হওয়ার কথা বলেছেন। অর্থাৎ শুধুমাত্র ভগবানকেই নিজের এবং নিজের জন্য বলে মনে করলে সাধকের ভগবানের প্রতি প্রিয়ভাব জন্মে। ভগবানে প্রিয়ভাব জন্মালে ভগবানের স্মরণ স্বতঃই হয়ে থাকে।

'নিত্যযুক্তস্য'— নিত্য-নিরন্তর ভগবানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকায় ভক্তকে **'নিত্যযুক্ত'** বলা হয়। সপ্তম অধ্যায়ের

সপ্তদশ শ্লোকে **'তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্তঃ'** পদটিতেও এই কথাই বলা হয়েছে। **'নিত্যযুক্তস্য'** পদটির দ্বারা শ্লোকের পূর্বার্ধে উল্লিখিত সকল সমাহার হয়েছে।

'তস্যাহং সুলভঃ পার্থ'—ভগবান মহাত্মাকে দুর্লভ বলে জানালেও—**'স মহাত্মা সুদুর্লভঃ'** (গীতা ৭।১৯), এখানে তিনি নিজেকে সুলভ বলেছেন। এর অর্থ হল যে ভগবান জগতে দুর্লভ নন, বরং তাঁর তত্ত্ব জেনে তাঁর শরণাগত হওয়া ভক্ত দুর্লভ। কেন-না ভগবানকে খুঁজলে সর্বত্র পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁর প্রিয় ভক্ত ক্বচিৎ কখনো পাওয়া যায়—

হরি দুরলভ নহিঁ জগতমেঁ, হরিজন দুরলভ হোয়। হরি হের্‌যাঁ সব জগ মিলৈ, হরিজন কহিঁ এক হোয়॥

ভগবান কৃপা করে যে মনুষ্য শরীর প্রদান করেছেন, সেই শরীরের সাহায্যে জীব নানা যোনি এবং নরকেও যেতে পারে। কিন্তু ভক্ত কৃপা করে ভগবানকে পাইয়ে দেয়—

হরি সে তু জনি হেত কর, কর হরিজন সে হেত। হরি রীঝৈ জগ দেত হ্যায়, হরিজন হরি হী দেত॥

প্রকৃতপক্ষে যা নিত্যপ্রাপ্ত তাকে সুলভ-দুর্লভ বলা অর্থহীন। কিন্তু লোকে একে দুর্লভ (কঠিন) বলে মনে করে রেখেছে, তার সেই চিন্তা দূর করার জন্যই ভগবান নিজেকে সুলভ বলে জানিয়েছেন। যার নিজের কোনো অস্তিত্বই নেই, সেই অসৎ (জগৎ-সংসার)-কে অস্তিত্ব ও গুরুত্ব দিলে এবং তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলেই নিত্যপ্রাপ্ত পরমাত্মা দুর্লভ হয়ে পড়েন। অসৎকে অস্তিত্ব ও মহত্ত্ব না দিলে স্বতঃ পরমাত্মার প্রাপ্তি লাভ হয়। অসৎ-এর অস্তিত্ব আছে এবং তা নিজের এবং নিজের জন্য আছে—এরূপ মনে করাই হল অসৎকে অস্তিত্ব ও গুরুত্ব দিয়ে তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—পরবর্তী দুটি শ্লোকে ভগবান তাঁকে লাভ করার মাহাত্ম্য জানাচ্ছেন।

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥ ১৫ ॥

[মহাত্মানঃ (মহাত্মাগণ) ; মাম্ (আমাকে) ; উপেত্য (প্রাপ্ত হয়ে) ; দুঃখালয়ম্ (দুঃখের আলয়) ; অশাশ্বতম্ (অনিত্য) ; পুনর্জন্ম (পুনর্জন্ম) ; ন, অপ্নুবন্তি (প্রাপ্ত হন না) ; পরমাম্ (পরম) ; সংসিদ্ধিম্ (সিদ্ধি) ; গতাঃ (প্রাপ্ত হয়েছেন।)]

মহাত্মাগণ আমাকে প্রাপ্ত হয়ে দুঃখের আলয় এবং অশাশ্বত অর্থাৎ নিত্য পরিবর্তনশীল পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না ; কারণ তাঁরা পরমসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছেন অর্থাৎ তাঁদের পরমপ্রেম-প্রাপ্তি হয়েছে ॥ ১৫ ॥

ব্যাখ্যা—**'মামুপেত্য পুনর্জন্ম.............সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ'**—**'মামুপেত্য'**র তাৎপর্য হল যে ভগবানের দর্শন লাভ করো, তাঁকে তত্ত্বতঃ জেনে নাও অথবা তাঁতে প্রবিষ্ট হও ; তাহলে আর পুনর্জন্ম হবে না। পুনর্জন্মের অর্থ—পুনরায় দেহ ধারণ করা। তা সে মনুষ্যদেহ হোক অথবা পশু-পক্ষী বা অন্য কোনো দেহ, কিন্তু দেহ ধারণে দুঃখই পেতে হয়। তাই পুনর্জন্মকে দুঃখালয় অর্থাৎ দুঃখের স্থান বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

মৃত্যুর পর প্রাণী আপন আপন কর্ম অনুযায়ী যে যে যোনিতে জন্ম নেয়, সেখানে জন্মের সময় গর্ভ থেকে বেরোবার জন্য তাকে যে কষ্ট সহ্য করতে হয়, তা জীবন্ত মানুষের দেহের চামড়া তোলার কষ্টেরই অনুরূপ। কিন্তু সেইসময় সে তার দুঃখের বর্ণনা কাউকে দিতে পারে না কারণ সে সেটি জানাতে সম্পূর্ণ অক্ষম থাকে। জন্মের পরে শিশু অন্যের অধীন হয়ে থাকে, কোনো কষ্ট হলে সে কেবল কাঁদতেই থাকে—কিন্তু বলতে পারে না। একটু বড় হলে তার নানা প্রকার খাদ্য-খেলনার ইচ্ছা হয় আর সেটি না পেলে দুঃখিত হয়। লেখাপড়ার সময় শাসনে থাকতে হয়। রাত্রে জেগে পড়াশুনা করতে কষ্ট হয়, পাঠ্যবস্তু ভুলে গেলে বা ঠিকমতো উত্তর দিতে না পারলে দুঃখ হয়। নিজেদের মধ্যে ঈর্ষা-দ্বেষ, অভিমানাদির জন্য চিত্তে জ্বালা ধরে। পরীক্ষায় অসফল হলে মূঢ়তার জন্য এত দুঃখ পায় যে কেউ কেউ আত্মহত্যাও করে বসে।

যৌবন প্রাপ্ত হলে নিজ রুচি অনুযায়ী বিবাহ না হলে দুঃখ হয়। বিবাহ হলে স্বামী বা বউ পছন্দ মতো না হলে দুঃখ হয়। সন্তানের জন্ম হলে তাদের পালন করতে কষ্ট হয়।

কন্যাসন্তান যখন বড় হয় তার বিবাহ দিতে না পারলে মা-বাবার ঘুম নষ্ট হয়, খাওয়া-দাওয়ায় মন থাকে না। চিত্ত সর্বদা অশান্ত থাকে।

বৃদ্ধ হলে শরীরে অসমর্থতা আসে, নানাপ্রকার রোগ আক্রমণ করে। সহজে ওঠা-বসা, চলা-ফেরা, খাওয়া-দাওয়াও শক্ত হয়ে পড়ে। বাড়ির অন্য লোকেরা কটু-কথা বলতে থাকে, রাত্রে কাশিতে কষ্ট হয়, ঘুম আসে না, মৃত্যুর সময়ও অত্যন্ত কষ্ট হয়। এইভাবে দুঃখের কথা আর কত বলা যায় ? এর কোনো শেষ নেই।

পশু-পক্ষীও মানুষের মতো কষ্ট সহ্য করে। এদের শীত-গ্রীষ্ম ও ঝড়-বৃষ্টিতে খুব কষ্ট হয়। নানাপ্রকার বুনো জানোয়ার ছোট ছোট বাচ্চাদের খেয়ে ফেলে, এতে তাদের খুবই দুঃখ হয়। এইরূপ সমস্ত যোনিতে এবং নরক ও চুরাশী লক্ষ জন্ম ধরে দুঃখ ভোগ করতে হয়। সেইজন্যই পুনর্জন্মকে 'দুঃখালয়' বলা হয়েছে।

পুনর্জন্মকে 'অশাশ্বত' বলার অর্থ হল যে কোনো জন্মই (শরীরই) নিত্য নয়। এতে নিরন্তর পরিবর্তন হয়ে চলেছে। কোনো জন্মেই কখনো স্থায়ীভাবে থাকা যায় না। একটু সুখ প্রাপ্ত হলেও তা স্থায়ী হয় না এবং শরীরেরও অন্ত হয়। নবম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে তাই পুনর্জন্মকে মৃত্যুর পথ বলে বর্ণনা করা হয়েছে 'মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি'।

এইস্থানে ভগবানের 'আমাকে লাভ করলে পুনর্জন্ম হয় না'—বলাই পর্যাপ্ত হত, তা সত্ত্বেও পুনর্জন্মের সঙ্গে 'দুঃখালয়' এবং 'অশাশ্বত'—এই দু'টি বিশেষণ কেন ব্যবহৃত হল ? এই দু'টি বিশেষণে এমন একটি ভাব প্রকাশ পায় যে, ভগবান যেমন ভক্তদের রক্ষা, দুষ্টের বিনাশ এবং ধর্ম স্থাপনার জন্য পৃথিবীতে অবতার হয়ে আসেন, তেমনি ভগবদ্‌প্রাপ্ত ভক্তগণও সাধুগণের রক্ষা, দুষ্টের সেবা এবং ধর্ম ভালোভাবে পালন করাবার উদ্দেশ্যে কারকপুরুষ রূপে, সাধুদের রূপে এই পৃথিবীতে জন্ম নিতে পারেন[১] অথবা ভগবান যখন অবতাররূপে আসেন, তখন তাঁর পার্ষদরূপে (গোপবালকদের ন্যায়) পৃথিবীতে জন্মাতে পারেন। কিন্তু তাঁদের পক্ষে সেই জন্ম 'দুঃখালয়' বা 'অশাশ্বত' হয় না। কারণ তাঁদের জন্ম কর্মজনিত নয়, তাঁদের জন্ম হয় ভগবদ্‌প্রেরণা থেকে।

যাঁরা প্রথম থেকেই ভক্তিমার্গের পথিক, সেই সাধকদেরও ভগবান 'মহাত্মা' বলেছেন (৯।১৩), যাঁরা ভগবদ্‌তত্ত্বে অভিন্ন হন, তাঁদেরও 'মহাত্মা' বলেছেন (৭।১৯) আর যাঁরা প্রকৃত প্রেম লাভ করেছেন, তাঁদেরও 'মহাত্মা' বলে জানিয়েছেন (৮।১৫)। তাৎপর্য হল, অসৎ শরীর-সংসারের সঙ্গে সম্পর্কিত হলে মানুষ 'অল্পাত্মা' হয় ; কারণ তারা শরীর ও সংসারের আশ্রিত হয়ে থাকে। নিজ স্বরূপে স্থিত হলে তাঁরা 'আত্মা' বলে কথিত হন। কারণ তাঁদের মধ্যে অনুরূপে (সূক্ষ্মতমরূপে) 'অহং'-এর থাকার সম্ভাবনা থাকে। ভগবানের সঙ্গে অভিন্নতা হলে এঁরা মহাত্মা নামে পরিচিত হন। কারণ এঁরা ভগবদ্‌নিষ্ঠ হন, এঁদের নিজের আর কোনো স্বতন্ত্র সত্তা থাকে না।

ভগবান গীতায় কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ইত্যাদি যোগে 'মহাত্মা' শব্দটি প্রয়োগ করেননি। শুধু ভক্তিযোগেই 'মহাত্মা' শব্দটির প্রয়োগ করেছেন। এতেই প্রমাণিত হয় যে গীতায় ভগবান ভক্তিকেই সবার ওপরে বলে মনে করেন।

মহাত্মাদের পুনর্জন্ম প্রাপ্ত না হবার কারণ হল এই যে তাঁরা পরম সিদ্ধি অর্থাৎ পরম প্রেম প্রাপ্ত হয়েছেন—**'সংসিদ্ধিং[২] পরমাং গতাঃ'**। লোভী ব্যক্তি যেমন যত ধন প্রাপ্ত হয় ততই তার সেটি অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয় এবং তার ধনের লালসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, তেমনই নিজ অংশী ভগবানকে জানতে পারলে ভক্তের প্রেমের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাঁর প্রতিক্ষণ বর্ধমান, অসীম, অগাধ, অনন্ত প্রেম লাভ হয়। এই প্রেম প্রাপ্তিই ভক্তির চরম সিদ্ধি। অন্য কোনো সিদ্ধি এর সমকক্ষ নয়।

---

[১]সাধুগণ বলেছেন—

পরিত্রাণায় সাধূনাং সেবাং কর্তুং চ দুষ্কৃতাম্। ধর্মসম্পালনার্থায় সম্ভবন্তি কলৌ যুগে।

[২]এখানে 'সিদ্ধি' শব্দটির সঙ্গে 'সম্' উপসর্গ এবং 'পরমাম্' বিশেষণ ব্যবহারের অর্থ হল যে আর কোনো সিদ্ধিই এর চেয়ে বড় নয়। কারণ জীব ভগবানের অংশ এবং সে যখন সর্বতোভাবে ভগবানে সমর্পিত হয়, তখন তার আর কোনো সিদ্ধি বাকি থাকে না।

বিশেষ কথা

গীতা অধ্যয়ন করলে মনে হয় যে, ভগবান গীতায় তাঁর ভক্তির কথা অত্যন্ত বিশেষভাবে বলেছেন। ভগবান ভক্তকে সমস্ত যোগীদের মধ্যে যুক্ততম (সর্বশ্রেষ্ঠ) বলে জানিয়েছেন (গীতা ৬।৪৭) এবং ভক্তদের কাছে নিজেকে সহজলভ্য বলে জানিয়েছেন (৮।১৪)। কিন্তু নিজ আগ্রহ ত্যাগ করে যেকোনো সাধকই যদি শুধুমাত্র কর্মযোগ বা জ্ঞানযোগ অথবা ভক্তিযোগ অবলম্বন করেন তাহলেও শেষকালে একই তত্ত্ব লাভ করেন। তার কারণ হল যে, সাধকদের দৃষ্টিতে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ—এই তিনটির পার্থক্য থাকলেও, সাধ্যতত্ত্ব একই, সাধ্যতত্ত্বে কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু এতে একটি বিষয় অনুধাবন করার হল যে ; যে দর্শনশাস্ত্রে ঈশ্বর, ভগবান বা পরমাত্মাকে সবার ওপরে বলে মানা হয় না, সেই দর্শনশাস্ত্র অনুযায়ী সাধনকারী অসৎ হতে সর্বতোভাবে সম্পর্ক-ছিন্ন করে মুক্ত হয়ে গেলেও, নিজ অংশীর স্বীকৃতি ছাড়া সে পরমপ্রেম প্রাপ্ত হয় না এবং পরমপ্রেম প্রাপ্ত না হলে প্রতিক্ষণ বর্ধমান আনন্দ লাভ হয় না। সেই প্রতিক্ষণ বর্ধমান আনন্দ, প্রেম-প্রাপ্তিকেই এখানে পরমসিদ্ধির প্রাপ্তি বলে জানানো হয়েছে।

পরিশিষ্ট-ভাব—গীতার সপ্তম অধ্যায়ে জগৎ-সংসারকে পরমাত্মার স্বরূপ বলে জানানো হয়েছে—**'বাসুদেবঃ সর্বম্'** (৭।১৯), কিন্তু এখানে তাকে দুঃখালয় অর্থাৎ দুঃখের ঘর বলে জানানো হয়েছে—**'দুঃখালয়ম্'**। এর অর্থ হল, যে ব্যক্তি জাগতিক বস্তু, ব্যক্তি এবং ক্রিয়া থেকে সুখ গ্রহণ করে, তার পক্ষে সংসার ভয়ানক দুঃখপ্রদানকারী হয় কিন্তু যিনি বস্তু এবং ক্রিয়ার দ্বারা মানুষের সেবা করেন, তাঁর কাছে সংসার পরমাত্মাস্বরূপ। সুখের আশা, কামনা এবং ভোগ মহাদুঃখের কারণ হয়ে থাকে। সুখভোগকারী মানুষ কখনো দুঃখ হতে পরিত্রাণ পায় না—এ এক অকাট্য নিয়ম। তাই বস্তু, ব্যক্তি এবং ক্রিয়া থেকে কখনো সুখ আস্বাদন করা উচিত নয়। যে মুহূর্তে সর্বতোভাবে সুখবুদ্ধি ত্যাগ করা হয়, সেই মুহূর্তেই পরমাত্মাপ্রাপ্তি হয়—**'ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্'** (গীতা ১২।১২)।

জীব সেই সমগ্র পরমাত্মার অংশ, যাঁর প্রতি লোমকূপে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত। কিন্তু জীব অপরা প্রকৃতির তুচ্ছ থেকে তুচ্ছতম অংশ একটি শরীরে বদ্ধ হয়ে আছে ! তাই যেখানে শুধুই বিশুদ্ধ আনন্দ পাবার কথা, জীব সেখানে বিশুদ্ধ দুঃখ পেয়ে থাকে ! যেমন—গাভীর দুগ্ধস্থানে—যেখানে শুধুমাত্র দুধ থাকে, সেখানেই বাস করে পোকা কেবল রক্তই পান করে যায় ! সন্ত তুলসীদাস গোস্বামী বলেছেন—

আনন্দ-সিন্ধু-মধ্য তব বাসা। বিনু জানে কস মরসি পিয়াসা॥ (বিনয়পত্রিকা ১৩৬।২)।

※ ※ ※

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ১৬ ॥

[অর্জুন (হে অর্জুন !) ; আব্রহ্মভুবনাৎ (ব্রহ্মালোক পর্যন্ত) ; লোকাঃ (সমস্ত লোক) ; পুনরাবর্তনঃ (পুনরাবর্তনশীল) ; তু (কিন্তু) ; কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয় !) ; মাম্ (আমাকে) ; উপেত্য (প্রাপ্ত হলে) ; পুনর্জন্ম (পুনর্জন্ম) ; বিদ্যতে (হয়) ; ন (না।)]

হে অর্জুন ! ব্রহ্মালোক পর্যন্ত সমস্ত লোকই আবর্তনশীল (অর্থাৎ সেখান থেকে ফিরে আসতে হয়), কিন্তু হে কৌন্তেয় ! আমাকে প্রাপ্ত হলে আর পুনর্জন্ম হয় না ॥ ১৬ ॥

ব্যাখ্যা—[১]**'আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন'**—হে অর্জুন ! ব্রহ্মার লোকসহ সমস্ত লোকই পুনরাবর্তী, অর্থাৎ ব্রহ্মালোক এবং তার নিম্নে যত লোক (সুখভোগের স্থান) আছে সেগুলিতে বসবাসকারী সকল প্রাণীকে এসব

[১]'আব্রহ্মভুবনাৎ' পদে যে 'আ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তার দুটি অর্থ—১) অভিবিধি—যেমন, ব্রহ্মালোক ধরে সমস্ত লোক অর্থাৎ ব্রহ্মালোক এবং তার নিম্নের সর্বলোক। ২) মর্যাদা—যেমন, ব্রহ্মালোককে বাদ দিয়ে নিম্নের সমস্ত লোক অর্থাৎ ব্রহ্মালোক থেকে নীচের সমস্ত লোক। এখানে 'আ' শব্দটি 'অভিবিধি' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

লোকের প্রাপ্য পুণ্য ভোগ হবার পর ফিরে আসতেই হয়।

যতপ্রকার ভোগের স্থান আছে, তার মধ্যে ব্রহ্মলোককেই শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। সসাগরা ধরিত্রীর রাজা, ধন-ধান্যপূর্ণ রাজ্য, স্ত্রী-পুরুষ এবং পরিবারাদির সকল ব্যক্তি অনুকূল, যুবক বয়স এবং নীরোগ দেহ—এমন অবস্থাকে মৃত্যুলোকের পূর্ণ সুখ বলা হয়। মৃত্যুলোকের সুখের থেকে শতগুণ অধিক সুখে থাকেন মর্ত্যের দেবতাগণ। মর্ত্যের দেবতা তাঁদের বলা হয়, যাঁরা পুণ্যকর্ম করে দেবলোক প্রাপ্ত হন এবং সেখানকার প্রাপ্য পুণ্য ক্ষীণ হলে আবার মৃত্যুলোকে ফিরে আসেন (গীতা ৯।২১)। মর্ত্যের দেবতাদের থেকেও শতগুণ অধিক সুখী হলেন আজান দেবতাগণ। আজান দেবতা তাঁদের বলা হয় যাঁরা কল্পের আদি থেকে কল্পের অন্ত পর্যন্ত দেবতা হয়ে থাকেন। আজান দেবতাদের থেকে শতগুণ বেশি সুখ ইন্দ্রের বলে মনে করা হয়। ইন্দ্রের সুখ থেকে শতগুণ অধিক সুখ ব্রহ্মলোকের বলে মনে করা হয় আর ব্রহ্মলোকের সুখ থেকে অনন্তগুণ সুখ হয় ভগবদ্‌প্রাপ্ত, তত্ত্বজ্ঞ, জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণের। তাৎপর্য হল পৃথিবীমণ্ডল থেকে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত সুখই সীমিত, পরিবর্তনশীল ও বিনাশশীল। আর ভগবদ্‌প্রাপ্তির সুখ হল অনন্ত, অপার, অগাধ। এই সুখ কখনো নষ্ট হয় না। অনন্ত ব্রহ্মা ও অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যদি শেষ হয়ে যায়, তাহলেও এই পরমাত্মপ্রাপ্তির সুখ কখনো নষ্ট হয় না, সর্বদা বজায় থাকে।

'পুনরাবর্তিনঃ' কথাটির অপর তাৎপর্য হল এই যে, প্রাণীগণ সাক্ষাৎ পরমাত্মার অংশ হওয়ায় নিত্য। সুতরাং তারা যতক্ষণ সেই নিত্য তত্ত্ব পরমাত্মাকে না লাভ করছে, ততক্ষণ যত উচ্চলোকেই গমন করুক, তাদের ফিরে আসতেই হয়। তাই ব্রহ্মলোকাদি উচ্চলোকে যাঁরা যান তাঁদেরও আবার পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয়।

এখানে একটি সংশয় আসতে পারে যে, সাধু, ভক্ত, জীবন্মুক্ত এবং কারকপুরুষদের দর্শনমাত্রেই জীবের কল্যাণ সাধিত হয় এবং ব্রহ্মা হলেন স্বয়ং কারকপুরুষ ও ভগবদ্‌ভক্তও। ব্রহ্মলোকে যাঁরা গমন করেন তাঁরা অবশ্যই ব্রহ্মার দর্শন লাভ করেন, তবে কেন তাঁদের মুক্তি হয় না? কেন আবার তাঁরা ফিরে আসেন? এর উত্তর হল যে সাধু, ভক্ত—এঁদের দর্শন, সম্ভাষণ, চিন্তা ইত্যাদির মাহাত্ম্য এই মৃত্যুলোকের মানুষদেরই জন্য। কারণ মনুষ্যদেহ কেবল ভগবদ্‌প্রাপ্তির জন্যই লাভ হয়েছে। তাই এই জন্মে মানুষের ভগবদ্‌প্রাপ্তির যদি কোনো সামান্যতম সুযোগও লাভ হয়, তাহলেই সে মুক্ত হয়ে যায়। এইরূপ মুক্তির অধিকার আর কোনো লোকে নেই, তাই তারা মুক্ত হয় না। তবে ওই লোকে বসবাসকারী কারোর যদি মুক্তি লাভের জন্য তীব্র বাসনা হয় তাহলে তিনিও মুক্তি লাভ করেন। তেমনই পশু-পক্ষীর মধ্যেও ভক্ত হয়েছে, তবে এটি ব্যতিক্রম, সাধারণভাবে এরূপ হয় না। যদি সেখানকার লোকেদেরও অধিকারী বলে মনে করা হয়, তাহলে নরক-গমনকারীদেরও মুক্তি হওয়া উচিত। কারণ ওইসব প্রাণীও পরম ভাগবত, কারকপুরুষ যমরাজকে দর্শন করে। কিন্তু শাস্ত্রে সেরূপ দেখা বা শোনা যায় না। এতেই প্রমাণিত হয় যে ওইসব লোকে অবস্থিত প্রাণীদের ভক্ত ইত্যাদির দর্শন দ্বারা কল্যাণ লাভ হয় না।

বিশেষ কথা

এই জীব সাক্ষাৎ পরমাত্মার অংশ—**'মমৈবাংশঃ'** এবং যেখানে গেলে আর ফিরে আসতে হয় না তা হল পরমাত্মার ধাম—**'যদ্‌গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম'**। কেউ যেমন নিজ ঘরে ফিরে যায়, তেমনি পরমাত্মার অংশ হওয়ায় জীবের সেখানেই (পরম ধামে) ফিরে যাওয়া উচিত ! তাহলে মৃত্যুর পর জীব কেন ফিরে আসে ?

যেমন কোনো ব্যক্তি সৎসঙ্গ করতে গেল এবং সময় শেষ হলে ওখান থেকে চলে আসে। কিন্তু আসার সময় যদি তার কোনো জিনিস (চাদর ইত্যাদি) ভুলে সেখানে পড়ে থাকে, তাহলে সেটি নেবার জন্য তাকে আবার ফিরে আসতে হয়। তেমনি জীব ঘর-সংসার-সম্পত্তি-অর্থ ইত্যাদি বস্তুতে যখন মমতায় জড়িয়ে পড়ে, সেই মমত্ববশতঃ মৃত্যুর পরেও তাকে ফিরে আসতে হয়। কারণ যে শরীরে থেকে সে সংসারে মমতা-আসক্তিবোধ করেছিল, সেই শরীর থাকে না, না চাইলেও তা চলে যায়। কিন্তু সেই মমত্ব(বাসনা)বশতঃ অন্য দেহ ধারণ করে তাকে এখানে আসতে হয়। সে মানুষ হয়েও আসতে পারে কিংবা পশু-পক্ষী প্রভৃতির দেহ ধারণ করেও আসতে পারে। তবে আসতে যে হয়ই তা নিশ্চিত। ভগবান বলেছেন, গুণাদির সঙ্গদোষেই উচ্চ-নীচ যোনিতে জন্ম হয়—**'কারণং গুণসঙ্গোঽস্য

সদসদ্‌যোনিজন্মসু' (১৩।২১) অর্থাৎ সংসারে যে ব্যক্তি মমতা, বাসনা, কামনা করবে, তাকেই আবার এই জগতে ফিরে আসতেই হবে।

'মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে'— ব্রহ্মলোক পর্যন্ত গমনকারী সকলকেই পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয় ; কিন্তু হে কৌন্তেয় ! আমাকে প্রাপ্ত হলে পুনর্জন্ম হয় না, অর্থাৎ আমাকে লাভ করলে আর সংসারে, জন্ম-মৃত্যু চক্রে পড়তে হয় না। কারণ আমি কালাতীত ; তাই আমাকে প্রাপ্ত হলে জীবও কালাতীত হয়ে যায়। এইস্থানে **'মামুপেত্য'**র অর্থ হল আমার দর্শন লাভ করা, আমার স্বরূপ সম্পর্কে বোধ হওয়া এবং আমাতে প্রবিষ্ট হওয়া (গীতা ১১।৫৪)।

আমাকে প্রাপ্ত হলে পুনর্জন্ম কেন হয় না অর্থাৎ জীব কেন আর জগতে ফিরে আসে না ? কারণ জীব আমারই অংশ এবং আমার পরমধামই হল তার প্রকৃত বাসস্থান। ব্রহ্মলোকাদি জীবের বাসস্থান নয়, তাই তাকে সেখান থেকে ফিরে আসতে হয়। যেমন ট্রেনে যাবার জন্য মানুষ যে দূরত্বের টিকিট কাটে সেই পর্যন্তই সে যেতে পারে তারপর তাকে নেমে পড়তে হয়, কিন্তু সে যদি নিজের গৃহে অবস্থান করে তাহলে তাকে ঘর খালি করতে হয় না। তেমনই যে দেবলোকে যায়, সে যেন রেলগাড়ির কামরায় রয়েছে। তাই তাকে একদিন নীচে নামতেই হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি আমাকে প্রাপ্ত হয়েছে, সে নিজগৃহে স্থান পেয়েছে, অতএব তাকে আর নীচে নামতে হবে না। তাৎপর্য হল যে ভগবানকে প্রাপ্ত না হলে যত উচ্চলোকেই যাওয়া যাক না কেন, তাতে কল্যাণ হয় না। তাই সাধকদের উচ্চলোকের ভোগবাসনার বিন্দুমাত্র আশা কখনো রাখতে নেই।

ব্রহ্মলোক পর্যন্ত গিয়ে যারা আবার ফিরে আসে অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হয়, তারা আসুরী-সম্পদ-সম্পন্ন পুরুষ। কারণ আসুরী-সম্পদ থেকেই বন্ধন হয়— **'নিবন্ধায়াসুরী মতা'** (১৬।৫)। তাই ব্রহ্মলোক পর্যন্ত শুধুই বন্ধন। কিন্তু আমার যারা শরণ নেয়, আমাকে যারা প্রাপ্ত হয়, সেইসব পুরুষ হল দৈবী-সম্পদসম্পন্ন। তাদের পুনর্বার জন্ম-মৃত্যু হয় না ; কারণ দৈবী-সম্পদ থেকেই মোক্ষ লাভ হয়—**'দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায়'** (গীতা ১৬।৫)।

বিশেষ কথা

ব্রহ্মলোকে গমনকারী ব্যক্তি দুপ্রকারের হয়—এক, যারা ব্রহ্মলোকের সুখের উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার পুণ্যকর্ম করে এবং তার ফলস্বরূপ ব্রহ্মলোকের সুখভোগ করার জন্য ব্রহ্মলোকে গমন করে। আর দ্বিতীয়, যারা পরমাত্মপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যেই সাধনায় তৎপর হয়েছে ; কিন্তু জীবিতকালে পরমাত্মপ্রাপ্তি হয়নি এবং মৃত্যুকালেও কোনো কারণবশতঃ সাধনে বিচলিত হয়ে গিয়েছে—তারাও ব্রহ্মলোকে যায় এবং সেখানে থেকে মহাপ্রলয়ের সময় ব্রহ্মার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিলাভ করে। এই সাধকদের ব্রহ্মলোকের সুখভোগ করার উদ্দেশ্য থাকে না ; কিন্তু মৃত্যুকালে সাধনে বিচ্যুতি আসায় এবং চিত্তে সুখ- ভোগের সামান্যতম আকাঙ্ক্ষা থাকার জন্যই তাদের ব্রহ্মলোকে যেতে হয়। এইভাবে ব্রহ্মলোকের সুখ ভোগ করে ব্রহ্মার সঙ্গে মুক্ত হওয়াকে বলা হয় 'ক্রম-মুক্তি'। কিন্তু যে সাধকদের এখানেই বোধ লাভ হয়, তাঁরা এখানেই মুক্তি লাভ করেন। একে বলা হয় 'সদ্যোমুক্তি'।

এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে অর্জুনের প্রশ্ন ছিল যে মৃত্যুকালে আপনাকে কীরূপে জানা যায় ? পঞ্চম শ্লোকে ভগবান তার উত্তর দিয়েছেন। পরে ষষ্ঠ শ্লোকে মৃত্যুকালীন গতির সাধারণ নিয়ম বলেছেন ও সপ্তম শ্লোকে অর্জুনকে নির্দেশ দিয়েছেন তাঁকে সর্বক্ষণ স্মরণ করতে। এই সপ্তম শ্লোকের সঙ্গে চতুর্দশ শ্লোকের সম্পর্ক আছে। মাঝখানে প্রসঙ্গতঃ (অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শ্লোক পর্যন্ত) সগুণ-নিরাকার ও নির্গুণ-নিরাকারের কথা বর্ণিত হয়েছে।

অষ্টম থেকে ষোড়শ শ্লোক পর্যন্ত নয়টি শ্লোকে এটি প্রমাণিত হয় যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সর্বোপরি পূর্ণ পরমাত্মা। তিনিই সমগ্র পরমাত্মা। সগুণ-নিরাকার বা নির্গুণ-নিরাকার সবই তাঁর অন্তর্গত। অতএব তাঁর প্রেম লাভ করাই হল মানুষের পরম পুরুষার্থ।

পরিশিষ্ট-ভাব—এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত লোকই যখন ভগবানের স্বরূপ—**'বাসুদেবঃ সর্বম্'**, তাহলে সেই লোকে যারা যায় তাদের কেন জগতে পুনর্জন্ম হয় ? তার উত্তর হল যে সেই লোকে যারা যায় তারা সেই লোককে ভগবানের স্বরূপ রূপে মানে না, তারা সেটিকে ভোগ-সামগ্রী রূপে মনে করে (গীতা ৯।২৩)। তারা সুখভোগের উদ্দেশ্য নিয়েই ব্রহ্মলোকাদিতে গমন করে। তাই তাদের কর্মফলের জন্যই ব্রহ্মলোক পর্যন্ত লোকাদির

প্রাপ্তিলাভ হয় এবং তাদের পুনর্জন্ম হয়।

সুখাসক্তির জন্যই পুনর্জন্ম হয়। তাই এই স্থানে '**আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ**' বলার অর্থ হল জাগতিক সুখের অন্তিমসীমা, যাকে ব্রহ্মলোক বলে, সেখানে গেলেও জীবকে ফিরতে হয়। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সুখ একত্রিত হয়েও জীবকে সুখী করতে পারে না, তার দুঃখ, জন্ম-মরণ দূর করতে পারে না। অতএব জগৎ সংসার থেকে যারা সুখ আশা করে, তারা শুধু আশার ছলনায় ভুলে থাকে।

ব্রহ্মলোকে দুপ্রকারের মানুষ যায়—এক, যারা সুখভোগের আশায় ব্রহ্মলোকে যায় এবং জগৎ-সংসারে পুনর্জন্ম হয় আর দ্বিতীয়, ক্রম মুক্তিপ্রাপ্ত মানুষ যাঁরা ব্রহ্মলোকে গিয়ে ব্রহ্মার সঙ্গে মুক্তি লাভ করেন (গীতা ৮।২৪)। এঁরা (ক্রমমুক্তিপ্রাপ্তব্যক্তি) জগতে যে ফিরে আসেন না, তা তাঁদের উদ্দেশ্যের মহিমার গুণেই, ব্রহ্মলোকের মহিমার জন্য নয়। ব্রহ্মলোকও পুনরাবর্তী। কেন-না এখানে কেউই চিরকাল থাকতে পারে না, ভোগীও নয়, যোগী (ক্রমমুক্তিপ্রাপ্ত)ও নয়। ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সবই কর্মফলে বাঁধা। কর্মমাত্রেরই যখন আদি ও অন্ত থাকে (বিনাশশীল হয়), তখন তার ফল অবিনাশী হবে কি করে?

'**মামুপেত্য**'-তে '**মাম্**' পদটি সমগ্র পরমাত্মার বাচক, যা পরা ও অপরা উভয়েরই প্রভু। তাঁকে প্রাপ্ত করলে আর এই দুঃখালয় স্বরূপ জগতে জন্ম হয় না। তবে ভগবদ্‌প্রাপ্ত মানুষ ভগবদ্ ইচ্ছায় কারক মহাপুরুষের রূপে অথবা ভগবানের অবতার গ্রহণের সময় জগতে আসতে পারেন। কিন্তু তাঁদের সেই জন্ম কর্মের অধীন থাকে না, তা ভগবানের ইচ্ছাতেই হয়ে থাকে।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—ব্রহ্মলোকে গমনকারী ব্যক্তিরাও কেন ফিরে আসেন—পরের শ্লোকে তার কারণ জানানো হয়েছে।

সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ্‌ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ॥ ১৭ ॥

[যৎ (যাঁরা) ; **ব্রহ্মণঃ** (ব্রহ্মার) ; **সহস্রযুগ পর্যন্তম্** (চতুর্যুগ সহস্রব্যাপী) ; **অহঃ যুগ** (একদিন) ; **সহস্রান্তাম্** (চতুর্যুগ সহস্রব্যাপী) ; **রাত্রিম্** (এক রাত্রি) ; **বিদুঃ** (জানেন) ; **তে** (সেই) ; **জনাঃ** (মনুষ্যগণই) ; **অহোরাত্রবিদঃ** (দিন ও রাতের তত্ত্ব জানেন।)]

যাঁরা ব্রহ্মার চতুর্যুগসহস্র ব্যাপী একটি দিন এবং চতুর্যুগসহস্র ব্যাপী একটি রাত্রিকে জানেন, তাঁরাই ব্রহ্মার দিন ও রাতের প্রকৃত তত্ত্ব জানেন ॥ ১৭ ॥

ব্যাখ্যা—'**সহস্রযুগপর্যন্তম্.......তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ**'—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—মৃত্যুলোকের এই চার যুগকে এক চতুর্যুগ বলা হয়। এরূপ এক হাজার চতুর্যুগ অতিক্রান্ত হলে ব্রহ্মার একদিন হয় এবং এক হাজার চতুর্যুগ অতিক্রান্ত হলে এক রাত হয়[1]। দিন রাতের এই গণনা অনুসারে ব্রহ্মার আয়ু হয় একশ বছর। ব্রহ্মার একশ বছর

[1]পরমাণু হল অত্যন্ত সূক্ষ্ম কাল। দুটি পরমাণুর এক অণু ও তিন অণুর একটি ত্রসরেণু হয়। জানলার ফাঁকে আসা সূর্যের কিরণে ত্রসরেণু উড়তে দেখা যায়। এরূপ তিনটি ত্রসরেণু অতিক্রম করতে সূর্যরশ্মি যে সময় নেয়, তাকে ক্রুটি বলে। শত ক্রুটিতে একটি লব, তিন লবে এক নিমেষ, তিন নিমেষে এক ক্ষণ হয়। পাঁচ ক্ষণে এক কাষ্ঠা, পনোরো কাষ্ঠাতে এক লঘু, পনেরো লঘুতে এক নাড়ি, ছয় নাড়িতে এক প্রহর আর অষ্টপ্রহরে একদিন-রাত হয়। পনেরো দিন-রাতে এক পক্ষ, দুই পক্ষে এক মাস, ছয় মাসে এক অয়ন আর দুই অয়নে হয় এক বছর।

এইভাবে মানুষের এক বছর দেবতাদের একটি দিন-রাতের সমান অর্থাৎ মানুষের উত্তরায়ণের ছয়মাস দেবতাদের একটি দিন ও দক্ষিণায়নের ছয়মাস দেবতাদের একটি রাত। এইরূপে দেবতাদের সময় মানুষের সময়ের থেকে তিনশো ষাট গুণ বেশি। সেইভাবে মানুষের এক বছর দেবতাদের একটি দিন-রাত, মানুষের ত্রিশ বছর দেবতাদের এক মাস আর মানুষের তিনশো ষাট বছর দেবতাদের এক দিব্য বর্ষ হয়। এইভাবে মানুষের সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চার যুগ অতিক্রান্ত হলে দেবগণের এক

বয়স অতিক্রান্ত হলে তিনি পরমাত্মায় লীন হয়ে যান এবং তাঁর ব্রহ্মলোকও প্রকৃতিতে লীন হয়ে যায় এবং প্রকৃতি পরমাত্মাতে লীন হয়।

যত বড় আয়ুষ্মানই হোক না কেন তারা কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ। উচ্চ থেকে উচ্চতর যে ভোগ, তা সংযোগজনিত হওয়ায় দুঃখের কারণ—'**যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে**' (গীতা ৫।২২) এবং কালের দ্বারা সীমিত। একমাত্র ভগবানই হলেন কালাতীত। এইরূপ কালতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মলোক পর্যন্ত দিব্য ভোগাদিকে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দেন না।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—ব্রহ্মার দিন ও রাত নিয়ে যে সর্গ ও প্রলয় হয়, পরবর্তী শ্লোকে তার বর্ণনা করছেন।

অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥ ১৮ ॥

[অহরাগমে (ব্রহ্মার দিবসের প্রারম্ভে) ; অব্যক্তাৎ (অব্যক্ত থেকে) ; সর্বাঃ (সকল) ; ব্যক্তয়ঃ (শরীর) ; প্রভবন্তি (উদ্ভূত হয়) ; রাত্র্যাগমে (ব্রহ্মার রাত্রের প্রারম্ভে) ; তত্র (সেই) ; অব্যক্তসংজ্ঞক এব (অব্যক্তেই) ; প্রলীয়ন্তে (লীন হয়ে যায়।)]

ব্রহ্মার দিবসের প্রারম্ভে অব্যক্ত (ব্রহ্মার সূক্ষ্মশরীর) থেকে সকল প্রাণী উদ্ভূত হয় এবং ব্রহ্মার রাত্রের প্রারম্ভে সেই অব্যক্তেই অর্থাৎ ব্রহ্মার সূক্ষ্মশরীরে সমস্ত প্রাণী লীন হয়ে যায় ॥ ১৮ ॥

ব্যাখ্যা—'**অব্যক্তাদব্যক্তয়ঃ...তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে**'—প্রাণীমাত্রেরই শরীরকে এখানে '**ব্যক্তয়ঃ**' বলা হয়েছে আর চতুর্দশ অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে বলা হয়েছে '**মূর্তয়ঃ**'। যেমন জীবকৃত সৃষ্টি অর্থাৎ 'আমি' এবং 'আমার'-কে নিয়ে জীবের যে সৃষ্টি, জীবের নিদ্রাভঙ্গ হলে সেই সৃষ্টি জীব হতেই উদ্ভূত হয় আর ঘুমের সময় সেই সৃষ্টি জীবেই লীন হয়ে যায়। তেমনই এই যে স্থূল সমষ্টিগত সৃষ্টি পরিলক্ষিত হয়, তা সবই ব্রহ্মার জাগরণের পর তাঁর সূক্ষ্মশরীর হতে অর্থাৎ প্রকৃতি হতে উৎপন্ন হয় এবং ব্রহ্মার নিদ্রার সময় তাঁর সূক্ষ্মশরীরে লীন হয়ে যায়। তাৎপর্য হল, ব্রহ্মার জাগরণে হয় 'সর্গ' আর নিদ্রাতে হয় 'প্রলয়'। যখন ব্রহ্মার বয়স শত বৎসর পার হয় তখন 'মহাপ্রলয়' হয়, এতে ব্রহ্মা ভগবানে লীন হয়ে যান। ব্রহ্মার আয়ু যত বছর হয় মহাপ্রলয়ও তত বছর থাকে। মহাপ্রলয়ের সময় পার হলে ব্রহ্মা ভগবান হতে আবার প্রকটিত হন এবং 'মহাসর্গ' আরম্ভ হয় (গীতা ৯।৭-৮)।

পরিশিষ্ট-ভাব—ষোড়শ শ্লোকে ভগবান বলেছিলেন যে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত লোকই পুনরাবর্তীসম্পন্ন। কেন পুনরাবর্তী হয় ? তার উত্তরে ভগবান সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শ্লোকে জানিয়েছেন যে উচ্চ থেকে উচ্চতর যে ব্রহ্মলোক, তা-ও কালের অন্তর্গত। কিন্তু ভগবান কালের অন্তর্গত নন।

যেমন আমরা রাত্রে ঘুমালে জগৎ-সংসারকে ভুলে যাই এবং প্রাতঃকালে ঘুম থেকে ওঠার পর আবার জগৎ সংসারের কথা মনে পড়ে, তেমনই ব্রহ্মার রাত্রিকালে সম্পূর্ণ জগৎ লীন হয়ে যায় এবং দিবসকালে তা পুনরায় উৎপন্ন হয়। রাত আর দিনের এই হল চূড়ান্ত অবধি।

ব্রহ্মার দিবস ও রাত্রির পরিমাপ সূর্যের দ্বারা হয় না, তা প্রকৃতির দ্বারা হয়ে থাকে।

❋ ❋ ❋

দিব্যযুগ হয় অর্থাৎ মানুষের সত্যযুগের সতেরো লাখ আটাশ হাজার, ত্রেতার বারো লাখ ছিয়ানব্বই হাজার, দ্বাপরের আট লাখ চৌষট্টি হাজার ও কলির চার লাখ বত্রিশ হাজার—মোট তেতাল্লিশ লাখ কুড়ি হাজার বছর পার হলে দেবতাদের এক দিব্যযুগ হয়। একে 'মহাযুগ' বা 'চতুর্যুগ' বলা হয়।

মানুষ এবং দেবগণের সময়ের হিসাব সূর্য থেকে হয়, কিন্তু ব্রহ্মার দিন-রাতের হিসাব দেবগণের দিব্যযুগ থেকে হয় অর্থাৎ দেবতাদের এক হাজার দিব্যযুগে (মানুষের চারশত বত্রিশ কোটি বছরে) ব্রহ্মার একটি দিন হয় আর সেইরূপেই একটি রাত হয়। ব্রহ্মার এই দিনকেই 'কল্প' বা 'সর্গ' বলা হয় আর রাতকে বলা হয় 'প্রলয়'।

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে॥ ১৯ ॥

[পার্থ (হে পার্থ!) ; সঃ, এব (সেই) ; অয়ম্ (এই) ; ভূতগ্রামঃ (প্রাণীসকল) ; অবশঃ (প্রকৃতির বশীভূত থেকে) ; ভূত্বা, ভূত্বা (পুনঃ পুনঃ) ; অহরাগমে (ব্রহ্মার দিবসের প্রারম্ভে) ; প্রভবতি (উৎপন্ন হয়) ; রাত্র্যাগমে (রাত্রির প্রারম্ভে) ; প্রলীয়তে (লীন হয়ে যায়।)]

হে পার্থ ! এই সেই প্রাণীসকলই প্রকৃতির বশীভূত থেকে পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মার দিবসের প্রারম্ভে উৎপন্ন হয় এবং রাত্রির প্রারম্ভে লীন হয়ে যায় ॥ ১৯ ॥

ব্যাখ্যা—'ভূতগ্রামঃ স এবায়ম্'—অনাদিকাল হতে জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত এই প্রাণীসমুদায় সাক্ষাৎ আমার অংশ, আমারই স্বরূপ। আমার সনাতন অংশ হওয়ায় এরা নিত্য। সর্গ এবং প্রলয় ও মহাসর্গ এবং মহাপ্রলয়েও এরা ছিল, পরেও থাকবে। এর কখনো অন্যথা হয়নি, পরেও হবে না। তাৎপর্য হল এই যে এরা অবিনাশী, এদের কখনো বিনাশ হয় না, কিন্তু ভ্রমবশতঃ এরা প্রকৃতির সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করে বসে। প্রাকৃত পদার্থ (শরীরাদি) পরিবর্তিত হয়, উৎপন্ন হয় এবং বিনাশপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু তারা সেই সম্পর্ককে ধরে রাখে। বড়ই আশ্চর্যের কথা যে, সম্পর্কীয় (সাংসারিক) পদার্থ থাকে না, কিন্তু তার সম্পর্ক থেকে যায় ; কারণ সেই সম্পর্ক স্বয়ং-ই ধরে রেখেছে। সুতরাং স্বয়ং যতক্ষণ না ওই সম্পর্ক পরিত্যাগ করে, ততক্ষণ অন্য কেউ তা ত্যাগ করাতে সক্ষম হয় না। সেই সম্বন্ধ পরিত্যাগ করতে সে স্বাধীন এবং সক্ষম। প্রকৃতপক্ষে সে ওই সম্বন্ধ বজায় রাখতে পরাধীন, কারণ এইসব পদার্থ সদা পরিবর্তনশীল, কিন্তু সে নতুন নতুন সম্পর্ক স্থাপন করতে থাকে। যেমন, সে বালক-ভাব পরিত্যাগ করেনি বা করতে চায়ও নি, কিন্তু তা পরিত্যক্ত হয়েছে। সে শরীরকেও ছাড়তে চায় না তবু শরীর ত্যাগ করতে হয়। তাৎপর্য হল এই যে, প্রাকৃত পদার্থ পরিত্যক্ত হতে থাকে, কিন্তু জীব ওইসব পদার্থগুলিতে নিজ সম্পর্ক বজায় রাখে, যার জন্য একে বারংবার শরীর ধারণ করতে হয়, বার বার জন্মাতে ও মরতে হয়। যতক্ষণ সে এই মেনে নেওয়া সম্পর্ক পরিত্যাগ না করে, ততক্ষণ তার এই জন্ম-মৃত্যুর পরম্পরা চলতে থাকে, কখনো মেটে না।

ভগবান একাকী খেলা করতে পারেন না ('একাকী ন রমতে')। তাই খেলাধুলোর জন্য অর্থাৎ প্রেমের আদান-প্রদানের জন্য ভগবান এই প্রাণীসকলকে শরীররূপ খেলনা সহ প্রকটিত করেছেন। খেলার নিয়ম হল যে খেলার বস্তু শুধু খেলার জন্যই, কারও ব্যক্তিগত নয়। কিন্তু এই প্রাণীসমুদায় খেলাধুলো ভুলে গিয়ে খেলার বস্তুগুলি অর্থাৎ শরীরগুলিকে ব্যক্তিগত বলে মনে করতে থাকে। ফলে তারা এতে আবদ্ধ হয়ে ভগবানে সর্বতোভাবে বিমুখ হয়ে পড়েছে।

'ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে'—এই পদটি শরীরের উপলক্ষ্যে বলা হয়েছে, যা উৎপন্ন ও নষ্ট হতে থাকে অর্থাৎ যার প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তন হয়। কিন্তু জীব ওই শরীরের পরিবর্তনকে নিজের পরিবর্তন এবং তার জন্ম-মৃত্যুকে নিজের জন্ম-মৃত্যু বলে মেনে নেয়। এই মেনে নেওয়ার কারণেই তার জন্ম-মৃত্যু বলা হয়।

এটি স্বয়ং সত্যস্বরূপ—'ভূতগ্রামঃ স এবায়ম্' এবং শরীর উৎপত্তি-বিনাশশীল—'ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে', তাই শরীর ধারণ করা অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু হওয়া পরধর্ম আর মুক্ত হওয়া হল স্বধর্ম।

'রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে'—এখানে 'অবশঃ' বলার অর্থ এই যে, যদি জীব প্রকৃতির পদার্থগুলির অন্তর্গত কোনো পদার্থকে আপন বলে মেনে নেয় তাহলে যদিও আপাতত মনে হবে যে সে এই বস্তুর মালিক কিন্তু বাস্তবে সে ওই বস্তু বা বস্তুগুলির বশ বা অধীন হয়ে যায়। যতই সে এইসব প্রাকৃত পদার্থগুলির উপর নির্ভর করবে, ততই সে এগুলির অধীন হতে থাকে। এই অধীনতা থেকে সে আর মুক্ত হতে পারে না। ব্রহ্মার জাগরণ ও নিদ্রার সময় অর্থাৎ সর্গ ও প্রলয় হলে (৮।১৮), ব্রহ্মার প্রকট ও লীন হবার কালে অর্থাৎ মহাসর্গ ও মহাপ্রলয়ে (৯।৭-৮) এবং বর্তমান সময়ে প্রকৃতির পরবশ হয়ে কর্ম করতে থাকলেও (৩।৫) এই জীবের 'জন্ম ও মৃত্যু এবং কর্ম করা ও তার ফল ভোগা'—এই

ঝঞ্ঝাট থেকে কখনো মুক্তি নেই। এতে প্রমাণিত হয় যে যতক্ষণ পরমাত্মাপ্রাপ্তি না হয়, বোধ না হয় এবং এই প্রকৃতির সম্পর্ক ত্যাগ না হয় ততক্ষণ পরাধীন হওয়ায় এই দুঃখরূপ জন্ম-মৃত্যু চক্র থেকে সে পরিত্রাণ পেতে পারে না। কিন্তু যখন এই প্রকৃতি এবং প্রকৃতি-জনিত পদার্থের পরাধীনতা দূর হয় অর্থাৎ তার প্রকৃতির সম্বন্ধ সর্বতোভাবে রহিত নিজ শুদ্ধ-স্বরূপের বোধ হয় তখন সে আর মহাসর্গেও উৎপন্ন হয় না এবং মহাপ্রলয়েও ব্যথিত হয় না—**'সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ'** (গীতা ১৪।২)।

এই পরবশতা মূলতঃ প্রকৃতিজনিত পদার্থগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া এবং সেগুলিকে স্বীকার করার জন্যই হয়। একেই কোথাও কালের, কোথাও স্বভাবের, কোথাও কর্মের এবং কোথাও গুণের বশ্যতার নামে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই প্রাণীদের পরবশতা ততক্ষণই থাকে, যতক্ষণ তারা প্রাকৃত পদার্থে সংযোগের দ্বারা সুখাস্বাদন করতে চায়। এই সংযোগজনিত সুখের ইচ্ছাতেই এরা পরাধীন হয়ে থাকে আর মনে করে যে এই পরাধীনতা দূর হবার নয়, এটি ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু আসলে এই পরাধীনতা তাদের নিজেদেরই সৃষ্ট, স্বতঃ নয়। তাই এগুলি ত্যাগ করার দায়িত্ব তাদেরই। যখনই চাইবে, তখনই তারা এটি ত্যাগ করতে পারে।

পরিশিষ্ট-ভাব— একটি ভাগ হল পরিবর্তন হওয়ার, সেটি হচ্ছে জগৎ-সংসার, আর একটি ভাগ হল পরিবর্তন না হওয়া, সেটি হল চিন্ময় সত্তার। অনাদিকাল থেকে যে জন্ম-মরণ চক্রে প্রবাহিত হচ্ছে, সেই জীব সমুদয় বারংবার উৎপন্ন হয় আর বিলীন হয়ে যায়। ব্রহ্মার দিবস এবং রাত্রের মধ্যেও জীব নিরন্তর জন্ম গ্রহণ করে আর মৃত্যু বরণ করে। অর্থাৎ যা বারংবার উৎপন্ন হয় আর বিলীন হয়ে যায়, সেটি হল জগৎ-সংসার আর যা অপরিবর্তিত থাকে (যা আগে সর্গাবস্থায় ছিল), তাই হল জীবের প্রকৃত স্বরূপ অর্থাৎ চিন্ময় সত্তা, যা সাক্ষাৎ পরমাত্মার অংশ। ব্রহ্মার যতই দিন ও রাত অতিক্রান্ত হোক না কেন জীব স্বয়ং (স্বস্বরূপে) একই থাকে।

চিন্ময় সত্তা (চিৎ শক্তি) অর্থাৎ স্বস্বরূপের স্বীকার বা অস্বীকার করার সামর্থ্য থাকে। এই সামর্থ্যের অপব্যবহার করলে অর্থাৎ জড়ত্বকে স্বীকার করলেই জন্ম ও মৃত্যু চক্রে আবদ্ধ হতে হয়—**'কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু'** (গীতা ১৩।২১)। যদি জীব এই শক্তির অপব্যবহার না করে তাহলে তাকে জন্ম-মরণ চক্রে পড়তে হয় না। সুতরাং জীবের যথার্থ উদ্যম হওয়া উচিত জড়ত্বকে স্বীকার না করা অর্থাৎ স্বস্বরূপে স্থিত হওয়া অথবা নিজ অংশী ভগবানের শরণাগত হওয়া। জড়ত্বে অর্থাৎ দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, ক্রিয়া, অবস্থা, পরিস্থিতিতে পরিবর্তন হয়, নিজের মধ্যে কখনো পরিবর্তন হয় না—মানুষমাত্রেই তা অনুভব করে। কিন্তু এরূপ অনুভূত হলেও মানুষ সুখাসক্তিবশতঃ জড়ত্বে আবদ্ধ থাকে। এর ফলে জীব নিজের সহজ স্বরূপ অনুভব করতে পারে না, সে পশুপক্ষীর ন্যায় নিজ স্বরূপকে ভুলে থাকে।

'অবশঃ'—অপরা প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলে জীব পরবশ ও পরাধীন হয়ে যায়—**'ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ'** (গীতা ৯।৮)[১]। অতএব প্রকৃতির সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক দূর হলেই সে স্বাধীন অর্থাৎ মুক্ত হয়ে যায়।

আমাদের সত্তা অপরা প্রকৃতির অর্থাৎ বস্তু, ব্যক্তি এবং ক্রিয়ার অধীন নয়। প্রত্যেক বস্তুর উৎপত্তি এবং বিনাশ হয়, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্ম (সংযোগ) এবং মৃত্যু (বিয়োগ) হয় এবং প্রত্যেক ক্রিয়ার আরম্ভ এবং শেষ হয়। কিন্তু এই তিনটি সত্তা—(বস্তু, ব্যক্তি এবং ক্রিয়া)-কে যিনি জানেন, আমাদের সেই চিন্ময় সত্তার কখনো উৎপত্তি-বিনাশ, জন্ম-মৃত্যু (সংযোগ-বিয়োগ) এবং আরম্ভ ও শেষ নেই। এই সত্তা নিত্য-নিরন্তর একইভাবে বিরাজমান—**'ভূতগ্রামঃ স এবায়ম্'**। এই সত্তার কখনো অনস্তিত্ব হয় না— **'নাভাবো বিদ্যতে সতঃ'** (গীতা ২।১৬)। এই সত্তায় স্বতঃ-স্বাভাবিক স্থিতি অনুভব করাকেই বলা হয় মুক্তি (স্বাধীনতা)।

মানুষ ভ্রমবশতঃ মনে করে যে অমুক জিনিসটি পেলে, অমুক ব্যক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হলে কিংবা অমুক ক্রিয়াকর্ম করলে আমি স্বাধীন (মুক্ত) হব। কিন্তু এমন কোনো বস্তু, ব্যক্তি বা ক্রিয়াকর্ম নেই, যার দ্বারা মানুষ স্বাধীন হতে পারে।

---

[১]এখানে (৮।১৯) এবং নবম অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে—দুই স্থানে 'ভূতগ্রাম' এবং 'অবশ' শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়েছে। পার্থক্য শুধু এই যে এখানে সর্গ এবং প্রলয়ের বর্ণনা আছে, ওই স্থানে (৯।৮) মহাসর্গ এবং মহাপ্রলয়ের বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রকৃতিজাত বস্তু, ব্যক্তি এবং ক্রিয়া মানুষকে পরাধীন করে তোলে। তার থেকে অনাসক্ত থাকলেই মানুষ স্বাধীন হতে সক্ষম হয়। অতএব সাধকের উচিত যেন তিনি বস্তু, ব্যক্তি এবং ক্রিয়াকর্ম ছাড়া নিজেকে অসঙ্গ অনুভব করার মতো স্বভাব সৃষ্টি করেন, সেই অনুভূতিকে গুরুত্ব দেন এবং তাতেই যত বেশি সময় পারেন, স্থিত থাকেন। মানুষ মাত্রেরই এই অনুভূতি আছে যে সে গাঢ়নিদ্রা বা সুষুপ্তির সময় কোনো বস্তু, ব্যক্তি এবং ক্রিয়া ব্যতীতই থাকতে সক্ষম , কিন্তু কোনো বস্তু, ব্যক্তি এবং ক্রিয়াই আমা-ব্যতীত থাকে না। যখন জাগ্রত অবস্থায় আমরা এগুলি ব্যতিরেকে থাকার স্বভাব সৃষ্টি করে নেব, তখনই আমরা স্বাধীন (মুক্ত) হয়ে যাব। প্রকৃতিজনিত বস্তু, ব্যক্তি এবং ক্রিয়াকর্মকে মানার জন্যই আমরা স্বাধীন হতে পারি না, তাই আমরা না চাইলেও এগুলি আমাদের পরাধীন করে রাখে।

যিনি চিৎস্বরূপ সেই পরমাত্মাতে অনন্ত শক্তি বিরাজমান। মায়া (প্রকৃতি)-তেও অনন্ত শক্তি বিরাজ করে, কিন্তু তা জড় স্বরূপ এবং পরিবর্তনশীল **'ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্'** (৯।১০)। ভগবদ্ প্রেমেই আছে সব থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শক্তি। কিন্তু মুক্তিতে (স্বাধীনতায়) সন্তুষ্ট হলে সেই প্রেম প্রকটিত হয় না। জড়ের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেই পরাধীনতা আসে, এর থেকে মুক্ত হলে সেই পরাধীনতা সর্বতোভাবে দূর হয় এবং জীব স্বাধীন হয়ে যায়। কিন্তু এই স্বাধীনতার থেকেও প্রেম অতি বিশিষ্ট। স্বাধীনতা বা মুক্তিতে যে আনন্দ থাকে তা হল অখণ্ড আনন্দ, কিন্তু প্রেমের আনন্দ হল অনন্ত।

জ্ঞানযোগী হন স্বাধীন আর ভক্ত হন প্রেমিক। ভক্তিযোগে ভক্ত ভগবানের পরাধীন হন না, কারণ ভগবান পরকীয় নন, তিনি স্বকীয় (আপনার জন)। স্বকীয়ের অধীনতায় বিশেষ স্বাধীনতা থাকে।

ভগবান নিজে স্বাধীনের চেয়েও স্বাধীন। জীবই শুধু জড়ত্বের অধীন হয়। সেই অধীনতা দূর করলেই সে স্বাধীন হয়ে ওঠে। কিন্তু ভগবানের শরণাগত হলে সে স্বাধীনেরও স্বাধীন অর্থাৎ পরম স্বাধীন হয়ে ওঠে। ভগবানের অধীন হওয়াই পরম স্বাধীনতা, যাতে ভগবানও ভক্তের অধীন হয়ে থাকেন—**'অহং ভক্তপরাধীনঃ'** (শ্রীমদ্ভাগবত ৯।৪।৬৩)।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—অনিত্য জগতের বর্ণনা করে এবার পরবর্তী শ্লোকে জীবের প্রাপ্তযোগ্য বস্তু—পরমাত্মার মহিমা বিশেষভাবে বর্ণনা করছেন।

পরস্তস্মাৎ তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি।। ২০ ।।

[তু (কিন্তু) ; তস্মাৎ (সেই) ; অব্যক্তাৎ (অব্যক্তের) ; অন্যঃ (অতীত) ; সনাতনঃ (অনাদি) ; পরঃ (সর্বশ্রেষ্ঠ) ; ভাবঃ (ভাবরূপ) ; যঃ (যে) ; অব্যক্তঃ (অব্যক্ত আছেন) ; সর্বেষু (সমস্ত) ; ভূতেষু (প্রাণীর) ; নশ্যৎসু (নাশ হলেও) ; সঃ (তাঁর) ; ন, বিনশ্যতি (বিনাশ নেই ।)]

কিন্তু সেই অব্যক্তের (ব্রহ্মার সূক্ষ্মশরীরের) অতীত, অনাদি, সর্বশ্রেষ্ঠ ভাবরূপ যে অব্যক্ত (ঈশ্বর) আছেন, সমস্ত প্রাণীর নাশ হলেও তাঁর বিনাশ নেই ।। ২০ ।।

ব্যাখ্যা—**'পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ'**—ষোড়শ থেকে উনিশতম শ্লোক পর্যন্ত ব্রহ্মালোক এবং তার নিম্নস্থ লোকগুলিকে পুনরাবর্তী বলা হয়েছে। কিন্তু পরমাত্মতত্ত্ব এগুলি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা—এটি জানাবার জন্যই এখানে **'তু'** পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

এখানে **'অব্যক্তাৎ'** পদটি ব্রহ্মার সূক্ষ্মশরীরেরই বাচক। কারণ এর আগে আঠারো এবং উনিশতম শ্লোকে সর্গের আদিতে ব্রহ্মার সূক্ষ্ম-শরীর থেকে প্রাণীদের উৎপন্ন হওয়ার কথা এবং প্রলয়ে ব্রহ্মার সূক্ষ্ম-শরীরে প্রাণীদের লীন হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই শ্লোকে উদ্ধৃত **'তস্মাৎ'** পদটিও ব্রহ্মার সেই সূক্ষ্মশরীরেরই দ্যোতক। তা সত্ত্বেও এখানে ব্রহ্মার সূক্ষ্মশরীরের (সমষ্টিগত মন, বুদ্ধি ও অহংকারের)ও অতীত অর্থাৎ অত্যন্ত বিশেষ যে ভাবরূপ অব্যক্তের কথা বলা হয়েছে, তা ব্রহ্মার সূক্ষ্ম-শরীর এবং

ব্রহ্মার কারণশরীর (মূল প্রকৃতি) থেকেও অতি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

ব্রহ্মার সূক্ষ্ম-শরীরের অতীত হল দুটি তত্ত্ব—মূল প্রকৃতি এবং পরমাত্মা। এখানে প্রসঙ্গ মূল প্রকৃতির নয়, প্রসঙ্গ পরমাত্মার। তাই এই শ্লোকে পরমাত্মাকেই সবার অতীত ও শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে, যিনি সমস্ত প্রাণীর বিনাশ হলেও বিনষ্ট হন না। পরবর্তী শ্লোকেও **'অব্যক্তোঽক্ষর'** ইত্যাদি পদের দ্বারা সেই পরমাত্মাকেই বর্ণনা করা হয়েছে।

গীতায় প্রাণীদের অপ্রকট হওয়াকে অব্যক্ত বলা হয়েছে **'অব্যক্তাদীনি ভূতানি'** (২।২৮) ; ব্রহ্মার সূক্ষ্ম শরীরকেও অব্যক্ত বলা হয়েছে (৮।১৮) ; প্রকৃতিকেও অব্যক্ত বলা হয়েছে—**'অব্যক্তমেব চ'** (১৩।৫) ইত্যাদি। সেইসব থেকে পরমাত্মার স্বরূপ অতি বিশেষ, শ্রেষ্ঠ, তা সেই স্বরূপ ব্যক্ত হোক অথবা অব্যক্ত। তিনি ভাবরূপ অর্থাৎ কোনো কালেই তাঁর নাস্তি নেই, হওয়া সম্ভবও নয়। কারণ তিনি সনাতন অর্থাৎ সর্বদা বিরাজমান আছেন এবং থাকবেন। সেইজন্য তিনি সবার অতীত অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ কেউ হতে পারে না এবং হওয়া সম্ভবও নয়।

'যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি'—এবার উত্তরার্ধে তাঁর এই বিশেষত্ব জানাচ্ছেন যে, সমস্ত প্রাণীর বিনাশ হলেও অর্থাৎ ওইসব দেহের বিনাশ হলেও সেই পরমাত্মতত্ত্বের কখনো অভাব হয় না—এইরকমই হল পরমাত্মার অব্যক্ত স্বরূপ !

'ন বিনশ্যতি' বলার তাৎপর্য হল এই যে, জগতে কার্যরূপে নানাপ্রকার পরিবর্তন হলেও এই পরমাত্মতত্ত্ব যেমনকার তেমনি অপরিবর্তনশীলই থাকে। তাতে কখনো বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয় না।

পরিশিষ্ট-ভাব—অপরিবর্তনশীল (স্থায়ী) এক তত্ত্ব আছে, তাকে বলা হয় 'পরা' আর অন্য একটি পরিবর্তনশীল (অস্থায়ী) তত্ত্ব আছে, তাকে বলা হয় 'অপরা'। পরাতে কখনো কোনো পরিবর্তন হয় না, অপরদিকে অপরা নিত্য-নিরন্তর পরিবর্তনশীল। অপরা কখনো পরিবর্তন ছাড়া থাকে না, থাকা সম্ভবও নয়। সর্গ এবং প্রলয়ে পরিবর্তন হতেই থাকে, মহাসর্গ এবং মহাপ্রলয়েও পরিবর্তন হয়।

পরা ও অপরা—এই দুটি তত্ত্বই যদি অপরিবর্তনশীল হয় তাহলে জন্ম-মৃত্যু দূর হয় অথবা এই দুটি যদি পরিবর্তনশীল হয় তাহলেও জন্ম-মৃত্যু দূর হয়। কিন্তু স্বস্বরূপ অপরিবর্তনশীল হয়েও জীব (পরা) পরিবর্তনশীল অপরার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করায় জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হয়। জগতের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করে সে-ও জগৎ হয়ে পড়েছে (গীতা ৭।১৩)। চলন্ত গাড়িতে বসে থাকলেও মানুষ যেমন চলতে থাকে, তেমনই পরিবর্তনশীল জগৎকে আঁকড়ে ধরায় জীবও পরিবর্তনশীল হয়ে পড়ে—বিভিন্ন যোনীতে তাকে জন্ম পরিগ্রহ করতে হয়।

পরমাত্মাকে 'পর' অর্থাৎ অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ বলার অর্থ হল যে ব্রহ্মার সূক্ষ্মশরীরের থেকেও শ্রেষ্ঠ হল মূল প্রকৃতি (কারণ-শরীর), আর মূল প্রকৃতির থেকেও শ্রেষ্ঠ হলেন পরমাত্মা।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—এ পর্যন্ত পরমাত্মবিষয়ক যে-সব বর্ণনা করা হয়েছে, সে-সবের সমন্বয় করে অনন্য ভক্তির বিশেষ মহত্ত্বের বর্ণনা পরবর্তী দুটি শ্লোকে করেছেন।

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ ২১ ॥

[তম্ (তাঁকেই) ; অব্যক্তঃ (অব্যক্ত) ; অক্ষরঃ (অক্ষর) ; ইতি (এরূপ) ; উক্তঃ (বলা হয়েছে) ; পরমাম্ (পরম) ; গতিম্ (গতি) ; আহুঃ (বলা হয়েছে) ; যম্ (যাকে) ; প্রাপ্য (প্রাপ্ত হলে) ; ন, নিবর্তন্তে (ফিরে আসতে হয় না) ; তৎ (সেটিই) ; মম (আমার) ; পরমম্ (পরম) ; ধাম (ধাম।)]

তাঁকেই অব্যক্ত অক্ষর বলা হয়েছে, তাঁকেই পরমগতি বলা হয়েছে এবং যাঁকে প্রাপ্ত হলে আর জগতে ফিরে আসতে হয় না, সেটিই হল আমার পরম ধাম ॥ ২১ ॥

ব্যাখ্যা—**'অব্যক্তোঽক্ষর.....তদ্ধাম পরমং মম'**—ভগবান সপ্তম অধ্যায়ের আটাশ, উনত্রিশ এবং ত্রিশতম শ্লোকে যাকে **'মাম্'** বলেছেন, এবং অষ্টম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে **'অক্ষরং ব্রহ্ম'**, চতুর্থ শ্লোকে **'অধিযজ্ঞঃ'**, পঞ্চম এবং সপ্তম শ্লোকে **'মাম্'**, অষ্টম শ্লোকে **'পরমং পুরুষং দিব্যম্'**, নবম শ্লোকে **'কবিং পুরাণমনুশাসিতারম্'** ইত্যাদি, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শ্লোকে **'মাম্'**, বিংশতি শ্লোকে **'অব্যক্তঃ'** এবং **'সনাতনঃ'** বলেছেন, সেইসবগুলির সমন্বয় করে ভগবান বলেছেন যে তাকেই অব্যক্ত এবং অক্ষর বলা হয় আর তাকেই পরমগতি অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ গতি বলা হয় ; এবং যা প্রাপ্ত হলে জীব আর ফিরে আসে না তাই হল আমার পরমধাম অর্থাৎ আমার সর্বোৎকৃষ্ট স্বরূপ। এইভাবে যে প্রাপণীয় বস্তুকে অনেক রূপে বর্ণনা করা হয়েছে এখানে সেগুলির সমন্বয় করা হয়েছে। এইভাবেই চতুর্দশ অধ্যায়ের সাতাশতম শ্লোকেও, 'ব্রহ্ম, অবিনাশী অমৃত, শাশ্বত ধর্ম এবং ঐকান্তিক সুখের আশ্রয় আমিই' এরূপ বলে ভগবান প্রাপণীয় বস্তুর সমন্বয় সাধন করেছেন।

মানুষের এমন ধারণা থাকে যে সগুণ-উপাসনার ফল একরকম আর নির্গুণ-উপাসনার ফল অন্যরকম। এই ধারণা দূর করার জন্য এই শ্লোকে সব কিছুর সমন্বয় করা হয়েছে। মানুষের রুচি, বিশ্বাস এবং যোগ্যতা অনুযায়ী উপাসনা বিভিন্ন প্রকারের হলেও অন্তিম ফলে কোনো পার্থক্য হয় না। প্রাপণীয় তত্ত্ব সকলের একই হয়। যেমন—খাদ্য না পেলে তার অভাব এবং প্রাপ্ত হলে তার তৃপ্তিতে সমানভাব থাকলেও খাদ্যবস্তুতে বিভিন্নতা থাকে, তেমনই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত না হলে তার অভাব এবং প্রাপ্ত হলে তার পূর্ণতার ফল এক হলেও উপাসনাতে বিভিন্নতা থাকে। তাৎপর্য হল এই যে পরমাত্মাকে সগুণ-নিরাকার মনে করে উপাসনা করা হোক অথবা নির্গুণ-নিরাকার মনে করে উপাসনা করা হোক বা সগুণ-সাকার মনে করে উপাসনা করা হোক, পরিশেষে সকলের একই পরমাত্মা লাভ হয়।

ব্রহ্মলোকাদি যতলোক আছে, তা সবই পুনরাবর্তী অর্থাৎ সেখানে গেলে প্রাণীদের পুনরায় জন্ম-মৃত্যু চক্রে ফিরে আসতে হয় ; কারণ ওইসব লোক প্রকৃতির রাজ্যে অবস্থিত হওয়ায় বিনাশশীল। কিন্তু ভগবদ্ধাম প্রকৃতির অতীত এবং অবিনাশী। সেখানে গেলে প্রাণীদের গুণাদির পরবশ হয়ে আর ফিরে আসতে হয় না, জন্মগ্রহণ করতে হয় না। তবে ভগবান যেমন স্বেচ্ছায় অবতার হয়ে আসেন, এঁরাও তেমনি ভগবদেচ্ছায় মানুষের উদ্ধারের জন্য কারক-পুরুষের রূপে পৃথিবীতে আসতে পারেন।

পরিশিষ্ট-ভাব—অব্যক্ত, অক্ষর ইত্যাদি নামগুলি সেই প্রাপণীয় তত্ত্ব পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। কারণ তিনি সেই অব্যক্ত-ব্যক্ত, অক্ষর-ক্ষর, গতি-স্থিতি এ সবেরই রহিত নিরপেক্ষ তত্ত্ব। তাঁকে প্রাপ্ত হলে জীব আর ফিরে আসে না, কারণ সেটি অবধি-রহিত।

※ ※ ※

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্॥ ২২ ॥

[**পার্থ** (হে পৃথানন্দন!) ; **ভূতানি** (সমস্ত প্রাণী) ; **যস্য** (যাঁর) ; **অন্তঃস্থানি** (অন্তর্গত) ; **যেন** (যাঁর দ্বারা) ; **ইদম্** (এই) ; **সর্বম্** (সমস্ত জগৎ) ; **ততম্** (পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে) ; **সঃ** (সেই) ; **পরঃ** (পরম) ; **পুরুষঃ** (পুরুষ পরমাত্মা) ; **তু** (কেবল) ; **অনন্যয়া, ভক্ত্যা** (অনন্য ভক্তি দ্বারা) ; **লভ্যঃ** (লাভ করা যায়।)]

হে পৃথানন্দন ! সমস্ত প্রাণী যাঁর অন্তর্গত এবং যাঁর দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে, সেই পরমপুরুষ পরমাত্মাকে কেবল অনন্য ভক্তি দ্বারা লাভ করা যায় ॥ ২২ ॥

ব্যাখ্যা—**'যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্'**—সপ্তম অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে ভগবান নিষেধ-বাক্যে বলেছেন যে, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব আমা হতেই উৎপন্ন হয়, কিন্তু আমি ওইগুলিতে এবং ওইগুলি আমাতে অবস্থিত নয়। এখানে ভগবান বিধিরূপে বলেছেন যে সমস্ত প্রাণীই পরমাত্মার অন্তর্গত এবং

পরমাত্মা সমস্ত জগতে ব্যাপ্তিস্বরূপ হয়ে আছেন। এই কথাই ভগবান নবম অধ্যায়ের চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শ্লোকে বিধি ও নিষেধ—এই দুই রূপে জানিয়েছেন। তাৎপর্য হল এই যে তিনি ছাড়া অন্য কারোরই পৃথক্ কোনো অস্তিত্ব নেই। 'সব আমা হতেই উৎপন্ন হয়, আমাতেই অবস্থান করে এবং আমাতেই লীন হয়ে যায়, অতএব সবকিছু আমিই'।

পরমাত্মা সর্বোপরি হওয়ায় সবেতে পরিব্যাপ্ত অর্থাৎ তিনি সর্বত্র আছেন ; সর্বসময়ে, সর্ববস্তুতে, সমস্ত ক্রিয়ায় এবং সম্পূর্ণ প্রাণীতে তিনি অবস্থিত। যেমন, স্বর্ণনির্মিত গহনাতে আগেও সোনা ছিল, গহনা রূপেও সোনা আর গহনা নষ্ট হলেও সোনাই থাকে। কিন্তু স্বর্ণ নির্মিত গহনাগুলির নাম-রূপ-আকৃতি-উপযোগিতা-ওজন-দাম ইত্যাদির ওপর দৃষ্টি থাকায় সোনার দিকে নজর যায় না। তেমনই জগতে আগেও পরমাত্মা ছিলেন, জগৎ-সংসাররূপেও তিনিই আছেন এবং জগৎ-সংসার না থাকলেও তিনিই থাকবেন। কিন্তু জগৎকে যদি পঞ্চভৌতিক, উচ্চ-নীচ, ছোট-বড়, অনুকূল-প্রতিকূল ইত্যাদি বলে মেনে নেওয়া হয় তাহলে পরমাত্মার দিকে দৃষ্টি যায় না।

'পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া'—আগের শ্লোকে যাকে অব্যক্ত, অক্ষর, পরমগতি ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়েছে, তাকেই এখানে **'পুরুষঃ স পরঃ'** বলা হয়েছে। সেই পরম পুরুষ পরমাত্মাকে অনন্য ভক্তি দ্বারা লাভ করা যায়।

পরমাত্মা ছাড়া প্রকৃতির সমস্ত কার্যকে বলা হয় 'অন্য'। যে ব্যক্তি সেই 'অন্য'-কে পৃথক্ সত্তা মনে করে তাকে গুরুত্ব দেয়, তাতে আসক্ত হয়, তার অনন্যভক্তি হয় না। ফলে পরমাত্মপ্রাপ্তিতে বিলম্ব হয়। যদি সে পরমাত্মা ব্যতিরেকে অন্য কোনো কিছুরই সত্তা এবং বিশেষত্বকে মেনে না নেয় এবং ভগবানের সম্পর্ক, ভগবানের প্রসন্নতা লাভের আশায় প্রতিটি ক্রিয়া করে, তবে এটিকে অনন্যভক্তি বলা হয়। এই অনন্যভক্তি দ্বারাই সে পরমপুরুষ পরমাত্মাকে লাভ করে।

পরমাত্মা ব্যতিরেকে আর কারোরই অস্তিত্ব বা গুরুত্ব মানা উচিত নয়—প্রকৃতি এবং প্রকৃতির কার্যাদি জগৎ-সংসারকে অস্তিত্ব দিয়েই এ-কথা বলা হয়ে থাকে। কারণ মানুষের হৃদয়ে 'পরমাত্মা আছেন আর জগৎ-সংসার আছে' এই দুটি কথা বদ্ধমূল হয়ে আছে। কিন্তু এক পরমাত্মতত্ত্বই বাস্তবে সমস্ত দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা ইত্যাদি রূপে বিরাজমান। বরফ, তুষার, বৃষ্টি, কুয়াশা, হিম, নদী, পুকুর, সমুদ্র ইত্যাদি রূপে যেমন এক জলই বিরাজিত, তেমনই জগতেও স্থূল-সূক্ষ্ম ও কারণ রূপে যা কিছু পরিলক্ষিত হয়, তা-সবই কেবল পরমাত্মতত্ত্ব। ভক্তদের কাছে এক পরমাত্মা ব্যতিরেকে অন্য কিছুই থাকে না, তাই তাঁদের খাওয়া-দাওয়া, ওঠা-বসা, শোওয়া-ঘুমানো ইত্যাদি সমস্ত ক্রিয়াই শুধু সেই পরমাত্মার পূজারূপে হয়ে থাকে (গীতা ১৮।৪৬)।

বিশেষ কথা

আপনাকে অন্তিম সময়ে কী করে জানা যায় ? (৮।২)—অর্জুনের এই প্রশ্নটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়। কারণ ভগবানকে সামনে দেখেও অর্জুনের মনে ভগবানের বিশেষত্ব জানার জন্য উৎকণ্ঠা হয়েছিল। উত্তরে ভগবান অন্তিমকালে তাঁকে চিন্তা করার এবং সাধারণ নিয়মের কথা জানিয়ে অর্জুনকে সর্বসময় ভগবদ্-চিন্তনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এর পর অষ্টম শ্লোক থেকে ষোড়শ শ্লোক পর্যন্ত সগুণ-নিরাকার, নির্গুণ-নিরাকার এবং সগুণ-সাকার প্রাপ্তির জন্য তিনটি করে শ্লোক ক্রমানুসারে বলেছিলেন। তার মধ্যেও সগুণ-নিরাকার এবং নির্গুণ-নিরাকারের প্রাপ্তিতে বিশেষ (প্রাণরুদ্ধ করার কথা হওয়ায়) আয়াসের কথা বলেছেন এবং সগুণ-সাকারের উপাসনায় ভগবানের আশ্রয়ে তাঁকে চিন্তন করার কথা উল্লিখিত থাকায় সগুণ-সাকার প্রাপ্তি যে অত্যন্ত সহজ তাও জানিয়েছেন।

ষোড়শ শ্লোকের পর সগুণ-সাকার স্বরূপের বিশেষ মহিমা জানাতে ভগবান ছটি শ্লোক বলেছেন। তার মধ্যে প্রথম তিনটি শ্লোকে ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মলোকের অবধি জানিয়েছেন এবং পরবর্তী তিনটি শ্লোকে ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মলোক থেকে তাঁর এবং তাঁর লোকের বিশেষত্বের কথা জানিয়েছেন। তাৎপর্য হল ব্রহ্মার সূক্ষ্ম-শরীরের (প্রকৃতির) থেকেও আমার স্বরূপে বিশেষত্ব থাকে। উপাসনাতে যতপ্রকার গতি আছে, তা সবই আমার অন্তর্গত। এইভাবে সাধক আমার পরায়ণ হলে আমার সর্বোচ্চ স্বরূপ জানতে পারে অর্থাৎ অনন্য ভক্তি দ্বারা আমাকে লাভ করতে পারে।

আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হলে সাধকের আর অন্য কোনো স্বরূপের দিকে চিন্তা যায় না বা তার প্রয়োজনও থাকে না। তার সমস্ত বৃত্তি তখন আমার স্বরূপের দিকেই থাকে।

এইভাবে ব্রহ্মলোক থেকে আমার ধাম বিশেষ হয়ে থাকে, ব্রহ্মার স্বরূপ থেকে আমার স্বরূপ এবং ব্রহ্মলোকের গতি থেকে আমার লোকের (ধামের) গতিও বিশেষ হয়ে থাকে। তাৎপর্য হল এই যে, সকল প্রাণীরই আমিই হলাম অন্তিম ধ্যেয় এবং সবকিছু আমারই অন্তর্গত।

পরিশিষ্ট-ভাব—ভক্তিকে 'অনন্য' বলার তাৎপর্য এই যে ভক্তির সঙ্গে যেন একটুও জড়ত্বের ভাব, অহংয়ের সংস্কার, নিজ মতের সংস্কার না থাকে অর্থাৎ কোনো দিকেই যেন কিছুমাত্র আকর্ষণ না থাকে। সবই ভগবান—এরূপ অনুভব করাই হল অনন্য ভক্তি।

সুখের বাসনা একপ্রকারই হয়, কিন্তু নানা লোকে সুখ-সামগ্রীর তারতম্য থাকে। যদি ব্রহ্মলোকের সুখ আকৃষ্ট না করে এবং নিজের স্বাধীনতা (মুক্তির) সুখও সন্তুষ্ট করতে সক্ষম না হয়, তখন ভক্তি লাভ হয়।

সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান বলেছিলেন যে—**'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি'** (৭।৭), সেই কথাটিই এখানে **'যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্'** পদে বলা হয়েছে। এটিই পরে নবম অধ্যায়ের চতুর্থ-পঞ্চম শ্লোকে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। এই সবেরই অর্থ হল এক ভগবান ব্যতীত আর কিছুই নেই অর্থাৎ সব কিছুই ভগবান।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—ষোড়শ শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তকারীদেরও ফিরে আসতে হয় অথচ তাঁকে যারা প্রাপ্ত হয় তাদের ফিরে আসতে হয় না। কিন্তু কোন্ পথের যাত্রীরা ফিরে আসে না এবং কোন্ পথের যাত্রীরা ফিরে আসে? —এটি বলা হয়নি। অতঃপর পরবর্তী শ্লোকে ভগবান এই দুটি পথের কথা বলছেন।

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ॥ ২৩ ॥

[তু (কিন্তু) ; ভরতর্ষভ (হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন !) ; যত্র (যে) ; কালে (কালে অর্থাৎ পথে) ; প্রয়াতা (শরীর ত্যাগ করার পর) ; যোগিনঃ (যোগিগণ) ; অনাবৃত্তিম্ (অনাবৃত্তি) ; যান্তি (প্রাপ্ত হন) ; চ, এব (এবং) ; আবৃত্তিম্ (আবৃত্তি প্রাপ্ত হন) ; তম্ (সেই) ; কালম্ (কাল অর্থাৎ পথের কথা) ; বক্ষ্যামি (আমি বলছি।)]

হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন ! যে কালে অর্থাৎ পথে শরীর ত্যাগ করার পর যোগীগণ অনাবৃত্তি অর্থাৎ পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না এবং যে পথে গমন করে আবৃত্তি অর্থাৎ পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন, সেই কাল অর্থাৎ উভয় পথের কথাই আমি বলছি ॥ ২৩ ॥

ব্যাখ্যা—[জীবিতাবস্থাতেই বন্ধন-মুক্তি হলে তাকে 'সদ্যোমুক্তি' বলা হয় অর্থাৎ যাঁদের এখানেই ভগবদ্প্রাপ্তি হয়েছে, ভগবানে অনন্যভক্তি লাভ হয়েছে, তাঁরা এখানেই পরমসিদ্ধি প্রাপ্ত হন। অন্যান্য যে-সব সাধক কোনো সূক্ষ্ম কামনাবশতঃ ব্রহ্মলোকে গিয়ে ব্রহ্মার সঙ্গে ক্রমশঃ মুক্তিলাভ করেন তাঁদের মুক্তিকে 'ক্রমমুক্তি' বলা হয়। যাঁরা কেবল সুখভোগের জন্যই ব্রহ্মলোকাদিতে যান, তাঁদের আবার ফিরে আসতে হয়, এই পথকে 'পুনরাবৃত্তি' বলা হয়। সদ্যোমুক্তির বর্ণনা তো করা হয়েছে পঞ্চদশ শ্লোকে, কিন্তু ক্রমমুক্তি এবং পুনরাবৃত্তির বর্ণনা করা হয়নি। তাই এই দুটির বর্ণনা করার জন্য ভগবান পরবর্তী প্রকরণ আরম্ভ করেছেন।]

'যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিং........বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ'—আগের অসম্পূর্ণ বক্তব্য বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করাবার জন্য এখানে 'তু' অব্যয় প্রযুক্ত হয়েছে।

ঊর্ধ্বগতি প্রাপ্তদের কালাভিমানী দেবতা যে পথে নিয়ে যান, সেই পথকে এখানে 'কাল' বলা হয়েছে। কারণ পরবর্তী ছাব্বিশ এবং সাতাশতম শ্লোকে এই 'কাল' শব্দকে পথের পর্যায়বাচী 'গতি' এবং 'সৃতি' শব্দের দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে।

'অনাবৃত্তিমাবৃত্তিম্'—বলার তাৎপর্য এই যে, অনাবৃত জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিই অনাবৃত্তিতে গমন করেন এবং আবৃত

জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি আবৃততে গমন করেন। যাঁরা সাংসারিক পদার্থ এবং ভোগাদিতে বিমুখ হয়ে পরমাত্মার শরণাগত হয়েছেন, তাঁরা অনাবৃত জ্ঞানসম্পন্ন অর্থাৎ তাঁদের জ্ঞান (বিবেক) আবৃত নয়, বরং তা জাগ্রত। তাই তাঁরা অনাবৃত পথে গমন করেন, যে স্থান থেকে আর ফিরতে হয় না। নিষ্কামভাব থাকায় তাঁদের পথে প্রকাশ বা বিবেকের প্রাধান্য থাকে।

জাগতিক পদার্থ এবং ভোগে আসক্তি, কামনা ও মমতাসম্পন্ন যে-সব ব্যক্তি নিজেদের স্বরূপের প্রতি এবং ভগবানে বিমুখ হয়েছেন, তাঁরা আবৃত জ্ঞানসম্পন্ন অর্থাৎ তাঁদের জ্ঞান (বিবেক) আবৃত। সেইজন্য তাঁরা আবৃত্তি-মার্গে গমন করেন, যেখান থেকে আবার জন্ম-মৃত্যু চক্রে ফিরে আসতে হয়। সকামভাব থাকায় তাঁদের পথে অন্ধকার বা অবিবেকী ভাবের প্রাধান্য থাকে।

পরমাত্মপ্রাপ্তি করা যাঁদের উদ্দেশ্য থাকে, অথচ অন্তরে আংশিক বাসনা থাকায় যাঁরা অন্তিমকালে বিচলিত হয়ে পুণ্যকারক লোক (ভোগ-স্থান) ভোগের পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন, এরূপ যোগভ্রষ্টকারীদেরও আবৃত-সম্পন্নদের অন্তর্গত করার জন্য এখানে **'চৈব'** পদ ব্যবহৃত হয়েছে।

এখানে **'যোগিনঃ'** পদটি নিষ্কাম ও সকাম—উভয় পুরুষদের উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়েছে।

পরিশিষ্ট-ভাব— যিনি এই পরিবর্তনশীল প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন তাঁকে পুনরায় ফিরে আসতে হয় অর্থাৎ তাঁর পুনর্জন্ম হয়। কিন্তু যিনি এই পরিবর্তনশীল প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন না, তাঁকে আর ফিরে আসতে হয় না অর্থাৎ তাঁর আর পুনর্জন্ম হয় না।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—এখন উভয়ের মধ্যে প্রথমে শুক্লমার্গ অর্থাৎ পুনর্জন্ম প্রাপ্ত না হওয়া ব্যক্তিদের পথের বর্ণনা করা হচ্ছে।

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥ ২৪ ॥

[জ্যোতিঃ (জ্যোতির্ময়) ; অগ্নিঃ (অগ্নির অধিপতি দেবতা) ; অহঃ (দিনের অধিপতি দেবতা) ; শুক্লঃ (শুক্লপক্ষের অধিপতি দেবতা) ; ষণ্মাসা (ছয় মাসব্যাপী) ; উত্তরায়ণম্ (উত্তরায়ণের অধিপতি দেবতা থাকেন) ; ব্রহ্মবিদঃ (ব্রহ্মবেত্তা) ; জনাঃ (পুরুষগণ) ; প্রয়াতাঃ (শরীর ত্যাগ করে) ; তত্র (সেই মার্গে গমন করে) ; ব্রহ্ম (ব্রহ্মকে) ; গচ্ছন্তি (প্রাপ্ত হন।)]

যে মার্গে জ্যোতির্ময় অগ্নির অধিপতি দেবতা, দিনের অধিপতি দেবতা, শুক্লপক্ষের অধিপতি দেবতা এবং ছয় মাসব্যাপী উত্তরায়ণের অধিপতি দেবতা থাকেন, ব্রহ্মবেত্তা পুরুষগণ দেহত্যাগ করে সেই মার্গে গমন করে (প্রথমে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়ে পরে ব্রহ্মার সঙ্গে) ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন ॥ ২৪ ॥

ব্যাখ্যা—'অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্'—এই পৃথিবীতে শুক্লমার্গে সর্বপ্রথম অধিকার হল অগ্নি দেবতার। অগ্নি রাত্রিতে প্রকাশিত হয়, দিনে নয়। কারণ দিনের প্রকাশের তুলনায় অগ্নির প্রকাশ সীমিত। তাই অগ্নির প্রকাশ কিছুদূর পর্যন্ত এবং কিছু সময় পর্যন্ত থাকে, আর দিনের প্রকাশ বহু দূর পর্যন্ত বহুক্ষণ থাকে।

শুক্লপক্ষ পনেরো দিন ধরে হয়, যা পিতৃপুরুষের এক রাতের সমান। শুক্লপক্ষের প্রকাশ আকাশে বহুদূর পর্যন্ত এবং বহুদিন ধরে থাকে। এইভাবে যখন সূর্য উত্তরের দিকে চলতে থাকে তখন তাকে উত্তরায়ণ বলা হয়, তখন দিনের সময় বাড়ে। উত্তরায়ণ ছয় মাসব্যাপী হয়, যেটি দেবতাদের একদিন। ওই উত্তরায়ণের প্রকাশ বহুদূর এবং বহুসময় ধরে অবস্থান করে।

'তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ'—যিনি শুক্লমার্গে অর্থাৎ উজ্জ্বল প্রকাশময় মার্গে গমন করেন, তিনি সর্বপ্রথম জ্যোতিঃস্বরূপ অগ্নিদেবতার অধিকারে আসেন। যতদূর পর্যন্ত অগ্নিদেবতার অধিকার, সেইস্থান অতিক্রম করে অগ্নিদেবতা তাঁকে দিনের অধিপতি দেবতার কাছে সমর্পণ করেন। দিনের অধিপতি তাঁকে নিজ অধিকারে এনে শুক্লপক্ষের অধিপতিদেবের কাছে সমর্পণ করেন, শুক্লপক্ষের দেবতা নিজ সীমা পার করে সেই জীবকে উত্তরায়ণের অধিপতি দেবতার নিকট সমর্পণ

করেন। পরে উত্তরায়ণের অধিপতি দেবতা তাঁকে ব্রহ্মলোকের অধিকারী দেবতার নিকট সমর্পণ করেন। এইভাবে ক্রমান্বয়ে তিনি ব্রহ্মলোকে পৌঁছে যান। ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল অবধি তিনি সেখানে বাস করে মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মার সঙ্গেই মুক্তি লাভ করেন—সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন।

এখানে **'ব্রহ্মবিদঃ'** পদটি পরমাত্মাকে পরোক্ষরূপে জানতে চাওয়া মানুষদের বাচক, অপরোক্ষরূপে অনুভবকারী ব্রহ্মজ্ঞানীদের নয়। কারণ যদি তাঁরা অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানী হতেন, তাহলে এখানেই মুক্ত (সদ্যোমুক্ত অথবা জীবন্মুক্ত) হতেন এবং তাঁদের আর ব্রহ্মলোকে যেতে হত না।

পরিশিষ্ট-ভাব— সাধনাবস্থায় যাঁর মধ্যে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হবার বাসনা অথবা নিজের মতের প্রতি আগ্রহ থাকে, তিনি ক্রমমুক্তির পূর্বে ব্রহ্মলোকে গমন করেন এবং পরে মহাপ্রলয়কালে ব্রহ্মার সঙ্গে মুক্তিলাভ করেন—

ব্রহ্মণা সহ তে সর্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্॥ (কূর্মপুরাণ, পূর্ব. ১১।২৮৪)

'ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হলে যখন মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়, তখন এই সব শুদ্ধ অন্তঃকরণসম্পন্ন ব্যক্তি ব্রহ্মার সঙ্গেই পরমপদে প্রবিষ্ট হন।'

ক্রমমুক্তিতে ব্রহ্মলোক হল মার্গের একটি স্টেশনের মতো। যাঁরা সুখের বাসনা করেন, সেই সব ব্যক্তি এখানে আসেন। কিন্তু যাঁদের মধ্যে সুখের বাসনা নেই, তাঁরা এখানে আসেন না, যেমন—আমাদের প্রয়োজন যদি না থাকে তাহলে রাস্তায় স্টেশনই আসুক বা জঙ্গল, তাতে কী আসে যায় ?

উপনিষদে শুক্লমার্গের বর্ণনাক্রম বিভিন্নরূপে করা হয়েছে, যেমন—

ছান্দোগ্যউপনিষদ্ অনুসারে—অগ্নির দেবতা, দিনের দেবতা, শুক্লপক্ষের দেবতা, উত্তরায়ণের দেবতা, সংবৎসর, আদিত্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ এবং পরে অমানব পুরুষের দ্বারা ব্রহ্মলোক (ব্রহ্মের কাছে) নিয়ে যাওয়া (৪।১৫।৫, ৫।১০।১-২)।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ অনুসারে—জ্যোতির দেবতা, দিনের দেবতা, শুক্লপক্ষের দেবতা, উত্তরায়ণের দেবতা, দেবলোক, আদিত্য, বিদ্যুৎ (বৈদ্যুৎদেব) এবং পরে মানসপুরুষ দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি (৬।২।১৫)।

কৌষীতকিব্রাহ্মণ উপনিষদ্ অনুসারে—অগ্নিলোক, বায়ুলোক, সূর্যলোক, বরুণলোক, ইন্দ্রলোক, প্রজাপতিলোক এবং ব্রহ্মলোক (১।৩)।

ব্রহ্মসূত্র (৪।৩।২-৩)-তেও এই নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উপনিষদগুলিতে শুক্লমার্গকে দেবযান, অর্চিমার্গ, উত্তরমার্গ, দেবপথ এবং ব্রহ্মপথ নামেও বলা হয়েছে।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—পরবর্তী শ্লোকে কৃষ্ণমার্গ অর্থাৎ পুনর্জন্ম গ্রহণকারীদের মার্গের বর্ণনা করেছেন।

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে॥ ২৫ ॥

[**ধূমঃ** (ধূমের অধিপতি দেবতা) ; **রাত্রিঃ** (রাত্রির অধিপতি দেবতা) ; **কৃষ্ণঃ** (কৃষ্ণপক্ষের অধিপতি দেবতা) ; **তথা** (এবং) ; **ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্** (দক্ষিণায়নের ছয়মাসের অধিপতি দেবতা থাকেন) ; **তত্র** (সেই মার্গে) ; **যোগী** (যোগী অর্থাৎ সকাম ব্যক্তি) ; **চান্দ্রমসম্** (চন্দ্রলোকের) ; **জ্যোতিঃ প্রাপ্য** (জ্যোতি প্রাপ্ত হয়ে) ; **নিবর্ততে** (ফিরে আসেন।)]

যে মার্গে ধূমের অধিপতি দেবতা, রাত্রির অধিপতি দেবতা, কৃষ্ণপক্ষের অধিপতি দেবতা এবং দক্ষিণায়নের ছয় মাসের অধিপতি দেবতা থাকেন, দেহত্যাগ করে যে-সব যোগী (সকাম ব্যক্তি) সেই মার্গে গমন করেন, তাঁরা চন্দ্রলোকের জ্যোতিপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে আসেন অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু প্রাপ্ত হন ॥ ২৫ ॥

ব্যাখ্যা—'ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ..........প্রাপ্য নিবর্ততে'— দেশ ও কালের দৃষ্টিতে অগ্নি বা প্রকাশের দেবতার যত অধিকার থাকে, ততটাই থাকে ধূম বা অন্ধকারের দেবতার। সেই ধূমাধিপতি দেবতা কৃষ্ণমার্গে গমনকারী জীবকে নিজ সীমা পার করিয়ে রাত্রির অধিপতি দেবতার কাছে সমর্পণ করেন, রাত্রির অধিপতি দেবতা তাঁকে নিজ সীমা পার করিয়ে দেশ-কাল পর্যন্ত অধিকার বিস্তৃত কৃষ্ণপক্ষের অধিপতি দেবতার অধীনে পাঠান। সেই দেবতা ওই জীবকে নিজ সীমানা অতিক্রমপূর্বক দেশ ও কালের দৃষ্টিতে বহুদূর পর্যন্ত অধিকারসম্পন্ন দক্ষিণায়নের অধিপতি দেবতার কাছে সমর্পণ করেন। সেই দেবতা তাঁকে তখন চন্দ্রালোকাধিপতি দেবতার কাছে সমর্পণ করেন। এইভাবে কৃষ্ণমার্গে গমনকারী ওই জীব ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ এবং দক্ষিণায়নের দেশ অতিক্রম করে ক্রমশঃ চন্দ্রের জ্যোতি অর্থাৎ যেখানে অমৃত পান করা হয়, সেইরূপ স্বর্গাদি দিব্যলোক প্রাপ্ত হন। তারপর নিজ পুণ্য অনুযায়ী সেখানে বাস করে অর্থাৎ সুখাদি ভোগ করে পরে ফিরে আসেন।

একটি বিষয় এখানে লক্ষ্য করার আছে, চন্দ্রমণ্ডলরূপে যেটি পরিলক্ষিত হয়, তা চন্দ্রলোক নয়। কারণ এই চন্দ্রমণ্ডল পৃথিবীর অত্যন্ত নিকটে, কিন্তু চন্দ্রলোক সূর্যেরও ওপরে অবস্থিত। সেই চন্দ্রলোক থেকেই চন্দ্রমণ্ডল অমৃত লাভ করে, যাতে শুক্লপক্ষে ঔষধিগুলি রসপুষ্ট হয়।

আর একটি বোঝার বিষয় হল যে, এখানে যে কৃষ্ণমার্গের বর্ণনা করা হয়েছে, তা শুক্লমার্গের তুলনায় কৃষ্ণমার্গ। এই মার্গ (পথ) আসলে উচ্চলোকসমূহে যাবার জন্য। সাধারণ মানুষ মৃত্যুর পর মৃত্যুলোকে যায়, যারা পাপী, তাদের আসুরীযোনি লাভ হয়, তাদের থেকেও যারা বেশি পাপী, তারা নরককুণ্ডে যায়—এইসব মানুষের থেকে কৃষ্ণমার্গে গমনকারী ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ। তারা চন্দ্রের জ্যোতিপ্রাপ্ত হয়—এটি বলার অর্থ হল যে জগতে জন্ম-মৃত্যুর যতপ্রকার পথ আছে, তার মধ্যে এই কৃষ্ণমার্গ (ঊর্ধ্বগতি হওয়ায়) শ্রেষ্ঠ এবং ওইগুলির থেকে বেশি জ্যোতির্ময়।

কৃষ্ণমার্গ থেকে ফেরার সময় ওই জীব প্রথমে আকাশে গমন করে, পরে বায়ুর অধীন হয়ে মেঘে অবস্থান করে, মেঘ থেকে বর্ষার সঙ্গে পৃথিবীতে এসে অন্নে প্রবেশ করে। তারপর কর্ম অনুসারে যে যোনিতে জন্মাবার হয় সেই যোনির পুরুষ প্রাণীর মধ্যে অন্নের মাধ্যমে প্রবেশ করে এবং ক্রমে পুরুষের থেকে স্ত্রীদেহে গমন করে ও শরীর ধারণ করে জন্মগ্রহণ করে। এইভাবে সে জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হয়।

সকাম ব্যক্তিদেরও কেন এখানে যোগী বলা হয়েছে ? তার অনেক কারণ থাকতে পারে ; যেমন—

(১) গীতায় ভগবান মৃত প্রাণীদের তিনটি গতির কথা বলেছেন—ঊর্ধ্বগতি, মধ্যগতি এবং অধোগতি (গীতা ১৪।১৮)। এর মধ্যে এই প্রকরণে ঊর্ধ্বগতির বর্ণনা করা হয়েছে। মধ্যগতি এবং অধোগতির থেকে ঊর্ধ্বগতি শ্রেষ্ঠ হওয়ায় এখানে সকাম ব্যক্তিদেরও যোগী বলা হয়েছে।

(২) যাঁরা কেবল ভোগ-বাসনার কারণেই উচ্চলোকে যান, তাঁরা সংযম রক্ষা করে ইহলোকে ভোগবর্জন করেছেন। সেই ত্যাগের জন্যই তাঁদের এখানকার ভোগাদি পাওয়া বা না-পাওয়াতে সমতা হয়েছে। সেই আংশিক সমতার জন্যই তাঁদের এখানে যোগী বলা হয়েছে।

(৩) যাঁদের পরমাত্মপ্রাপ্তি করার উদ্দেশ্য থাকে, অথচ অন্তিমকালে কোনো সূক্ষ্ম ভোগ-বাসনার জন্য যোগে বিচলিত হওয়ায় ব্রহ্মলোকাদি উচ্চলোকে গমন করতে হয়, তারা সেখানে দীর্ঘকাল থাকার পর পৃথিবীতে এসে শুদ্ধ শ্রীমানের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। এরূপ যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিদেরও যাবার এই পথ (কৃষ্ণমার্গ) হওয়ায় এখানে সকাম ব্যক্তিদেরও যোগী বলা হয়েছে।

ভগবান চব্বিশতম শ্লোকে ব্রহ্মপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের **'ব্রহ্মবিদো জনাঃ'** বলে বহুবচন প্রয়োগ করেছেন এবং এখানে চন্দ্রজ্যোতি প্রাপ্তকারীদের 'যোগী' বলে একবচন প্রয়োগ করেছেন। তাতে অনুমান করা যায় যে সকল ব্যক্তিই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করার অধিকারী এবং পরমাত্মাকে লাভ করা সহজ। কারণ পরমাত্মা স্বতঃই সকলের প্রাপ্ত। স্বতঃপ্রাপ্ত তত্ত্ব অনুভব করা অত্যন্ত সহজ। এতে কিছুই করতে হয় না, তাই বহুবচনের প্রয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু স্বর্গাদি প্রাপ্তির জন্য বিশেষ ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়, বিবিধ পদার্থ সংগ্রহ করতে হয়, বিধি-নিয়ম পালন করতে হয়। এইভাবে স্বর্গাদি প্রাপ্ত করা কঠিন এবং প্রাপ্ত করলেও আবার সেখান থেকে ফিরে আসতে হয়। তাই এখানে একবচন ব্যবহৃত হয়েছে।

বিশেষ কথা

(১)

যাঁদের উদ্দেশ্য হল পরমাত্মপ্রাপ্তি করা, অথচ সুখভোগের সূক্ষ্ম বাসনা সর্বতোভাবে দূর হয়নি, তাঁরা শরীর ত্যাগের পর ব্রহ্মলোকে গমন করেন। ব্রহ্মলোকের সুখ ভোগের পর তাঁদের কামনা দূর হয় এবং তাঁরা মুক্ত হন। এখানে চব্বিশতম শ্লোকে তাঁদের বর্ণনা করা হয়েছে।

যাঁদের উদ্দেশ্য শুধু পরমাত্মপ্রাপ্তি করা এবং যাঁদের ইহলোক বা ব্রহ্মলোক কোনো লোকেরই ভোগের বাসনা থাকে না ; কিন্তু অন্তিমকালে নির্গুণের ধ্যান থেকে বিচ্যুত হয়েছেন, তাঁরা ব্রহ্মলোকাদিতে যান না, তাঁরা সোজা যোগীকুলে জন্মগ্রহণ করেন। অর্থাৎ এমন যোগীদের কুলে তাঁদের জন্ম হয় যেখানে গেলে তাঁদের পূর্বজন্মকৃত ধ্যানরূপ সাধন নির্বিঘ্নে হওয়া সম্ভব। সেখানে তাঁরা সাধন করে মুক্তিলাভ করেন (গীতা ৬।৪২-৪৩)।

উপরিউক্ত উভয় সাধকেরই উদ্দেশ্য একই থাকে, কিন্তু বাসনাতে তারতম্য হওয়ায় একজন ব্রহ্মলোকে গিয়ে তবে মুক্তিলাভ করেন আর অপরজন সরাসরি যোগীকুলে জন্ম নেন এবং সাধন-ভজন করে মুক্ত হন।

যাঁদের উদ্দেশ্য থাকে স্বর্গাদি উচ্চলোকে গিয়ে সুখভোগ করার, তাঁরা যজ্ঞাদি শুভকর্ম করে উচ্চলোকে গমন করেন এবং সেখানকার দিব্যভোগ ভোগ করে পুণ্যক্ষীণ হলে আবার মৃত্যুলোকে ফিরে আসেন অর্থাৎ পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন (গীতা ৭।২০-২৩ ; ৮।২৫ ; ৯।২০-২১)।

যাঁর উদ্দেশ্য থাকে পরমাত্মপ্রাপ্তির ; কিন্তু জাগতিক সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা পূর্তি না হওয়ায় অন্তিমকালে যোগে বিচলিত হয়ে তিনি স্বর্গাদিলোকে গিয়ে সেখানকার সুখভোগ করেন এবং পরে শুদ্ধ শ্রীমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে পূর্বজন্মকৃত সংস্কারে তিনি আরও তৎপরতার সঙ্গে সাধনায় ব্যাপৃত হন এবং মুক্তিলাভ করেন (গীতা ৬।৪১ ; ৪৪-৪৫)।

উপরিউক্ত দুইপ্রকার সাধকদের মধ্যে একপ্রকারের সাধকদের উদ্দেশ্য হল স্বর্গাদি সুখভোগ করা, তাই তাঁরা পুণ্যকর্ম অনুসারে স্বর্গাদিলোকে গিয়ে সুখভোগ করে মনুষ্যলোকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু যাঁদের উদ্দেশ্য থাকে পরমাত্মাকে লাভ করা এবং তাঁরা বিচার-বিবেচনার দ্বারা জাগতিক ভোগও পরিত্যাগ করেন, তবুও যদি ভোগাকাঙ্ক্ষা দূর না হয় ; তাহলে অন্তকালে ভোগের কথা স্মরণে আসায় তাঁদেরও স্বর্গলোকে যেতে হয়। তাঁরা যে জাগতিক ভোগের গুরুত্ব পরিত্যাগ করেছেন তারও কম মাহাত্ম্য নেই। তাই তাঁরা ওই লোকে বহুকাল ধরে ভোগ-উপভোগ করে পর পুনরায় শুদ্ধ শ্রীমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন।

(২)

সাধারণ মানুষের এমন ধারণা থাকে যে, যে ব্যক্তি দিনেরবেলা, শুক্লপক্ষে এবং উত্তরায়ণে মৃত্যু বরণ করে, সে মুক্তি লাভ করে এবং যে রাত্রিকালে, কৃষ্ণপক্ষে দক্ষিণায়নে মারা যায়, তার মুক্তি হয় না। এই ধারণা ঠিক নয়। কারণ এখানে যে শুক্লমার্গ এবং কৃষ্ণমার্গের বর্ণনা আছে, তা ঊর্ধ্বগতি প্রাপ্তকারীদের জন্য বলা হয়েছে। তাই যদি এরূপ মেনে নেওয়া হয় যে দিবাকালে মৃত্যু হলে মুক্তিলাভ হয় এবং রাত্রিকালে মৃত্যু হলে মুক্তি হয় না, তাহলে অধোগতি যাদের হয় তারা কখন মারা যায় ? কারণ দিন-রাত, শুক্লপক্ষ-কৃষ্ণপক্ষ এবং উত্তরায়ণ-দক্ষিণায়ন ছাড়া আর তো অন্য কোনো সময়ই নেই ! আসলে মৃত্যুর পর মানুষ নিজ নিজ কর্ম অনুসারেই উচ্চ-নীচ গতিতে যায়, তা সে দিনই হোক বা রাত ; শুক্লপক্ষই হোক বা কৃষ্ণপক্ষ ; উত্তরায়ণ হোক বা দক্ষিণায়ন।

যাঁরা ভগবদ্ভক্ত, যাঁরা অনন্যভাবে শুধু ভগবানেরই আশ্রিত, যাঁদের মনে কেবল ভগবদ্ দর্শনেরই আকাঙ্ক্ষা থাকে, এরূপ ভক্তেরা দিনে বা রাতে, শুক্লপক্ষে বা কৃষ্ণপক্ষে, উত্তরায়ণে বা দক্ষিণায়নে, যখনই শরীর ত্যাগ করেন, তাঁদের নেবার জন্য ভগবানের পার্ষদ আসেন। পার্ষদের সঙ্গে এই ভক্তেরা সরাসরি ভগবদ্ধামে পৌঁছে যান।

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে, মানুষ যখন তার কর্মানুযায়ীই গতি প্রাপ্ত হয়, তাহলে ভীষ্ম—যিনি তত্ত্বজ্ঞ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ ছিলেন, তিনি দক্ষিণায়নে শরীর ত্যাগ না করে উত্তরায়ণের জন্য কেন প্রতীক্ষা করেছিলেন ?

তার সমাধান হল এই যে ভীষ্ম ভগবদ্ধামে যাননি। তিনি ছিলেন 'দ্যৌ' নামক বসু (আজান দেবতা), যিনি

শাপগ্রস্ত হয়ে ইহলোকে জন্ম নিয়েছিলেন। তাই তাঁর পুনরায় দেবলোকেই যাবার কথা। দক্ষিণায়নের সময় দেবলোকে রাত্রি, সেইসময় সেখানকার দরজা বন্ধ থাকে। ভীষ্ম যদি দক্ষিণায়নে দেহত্যাগ করতেন, তবে তাঁকে তাঁর লোকে প্রবেশ করার জন্য বাইরে প্রতীক্ষা করতে হত। তিনি ছিলেন ইচ্ছামৃত্যুর অধিকারী ; তাই তিনি ভাবলেন সেখানে গিয়ে বাইরে প্রতীক্ষা করার চেয়ে এখানে প্রতীক্ষা করাই ভালো। কারণ এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ হবে এবং সৎসঙ্গ হতে থাকবে, যার ফলে সকলেরই মঙ্গল হবে। দেবলোকে একলা প্রতীক্ষা করে কী হবে ? এই ভেবে তিনি দক্ষিণায়নে শরীর ত্যাগ না করে, উত্তরায়ণে শরীর ত্যাগ করেছিলেন।

পরিশিষ্ট-ভাব— নিষ্কাম ভাব হল জ্যোতি আর সকামভাব হল অন্ধকার। উপনিষদগুলিতে কৃষ্ণমার্গের ক্রম বিভিন্ন প্রকারে বর্ণিত হয়েছে, যেমন ছান্দোগ্য উপনিষদ অনুসারে—ধূমের দেবতা, রাত্রির দেবতা, কৃষ্ণপক্ষের দেবতা, দক্ষিণায়নের দেবতা, পিতৃলোক, আকাশ, চন্দ্র (সোম) এবং পরে পুনরাগমন প্রাপ্তি হওয়া (৫।১০।৩-৪)।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ অনুসারে ধূমের দেবতা, রাত্রির দেবতা, কৃষ্ণপক্ষের দেবতা, দক্ষিণায়নের দেবতা, পিতৃলোক, চন্দ্র এবং তারপর পুনরাগমনের প্রাপ্তি (৬।২।১৬)।

কৃষ্ণমার্গকে উপনিষদগুলিতে পিতৃযান, ধূমমার্গ এবং দক্ষিণমার্গ নামেও বলা হয়েছে।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—তেইশতম শ্লোক থেকে শুক্ল ও কৃষ্ণ গতির যে প্রকরণ আরম্ভ করেছিলেন, পরবর্তী শ্লোকে তার উপসংহার করছেন।

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ততে পুনঃ॥ ২৬ ॥

[হি (কারণ) ; শুক্লকৃষ্ণে (শুক্ল এবং কৃষ্ণ) ; এতে (এই দুটি) ; গতী (গতিই) ; শাশ্বতে (অনাদিকাল হতে) ; জগতঃ (জগতের প্রাণীকুলের সঙ্গে) ; মতে (সম্পর্কিত) ; একয়া (একটির দ্বারা) ; অনাবৃত্তিম, যাতি (মোক্ষলাভ হয়) ; অন্যয়া (অপরটিতে) ; পুনঃ আবর্ততে (পুনর্জন্ম হয়।)]

কারণ শুক্ল এবং কৃষ্ণ—এই দুটি গতিই অনাদিকাল হতে জগতের (প্রাণীকুলের) সঙ্গে সম্পর্কিত। এর মধ্যে একটির দ্বারা মোক্ষলাভ হয় (অর্থাৎ পুনর্জন্ম হয় না) আর অপরটিতে পুনর্জন্ম হয় (অর্থাৎ ফিরে আসতে হয়) ॥ ২৬ ॥

ব্যাখ্যা—'**শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে**'—শুক্ল এবং কৃষ্ণ—এই দুটি পথের সঙ্গেই জগতের সমস্ত চর-অচর প্রাণীর সম্পর্ক রয়েছে। তাৎপর্য এই যে ঊর্ধ্বগতির সঙ্গে মানুষের সোজাসুজি সম্পর্ক আছে এবং চর ও অচর প্রাণীর সঙ্গে পরম্পরাগতভাবে সম্পর্ক আছে। কারণ চর ও অচর প্রাণী ক্রমানুযায়ী অথবা ভগবদ্‌কৃপায় কখনো না কখনো মনুষ্যজন্ম লাভ করবেই এবং মনুষ্যজন্মে কৃত কর্মের ফল অনুসারে ঊর্ধ্বগতি, মধ্যগতি বা অধোগতি প্রাপ্ত হবে। অতএব তারা ঊর্ধ্বগতি প্রাপ্ত হোক বা না হোক, তাদের সকলেরই ঊর্ধ্বগতি অর্থাৎ শুক্ল ও কৃষ্ণগতির সঙ্গে সম্পর্ক থাকে।

মানুষের মধ্যে যতক্ষণ অসৎ (বিনাশশীল) বস্তুর গুরুত্ব থাকে, আকাঙ্ক্ষা থাকে, ততক্ষণ সে যতই উচ্চভূমিতে আরোহণ করুক না কেন, তার মনে অসৎ বস্তুর গুরুত্ব থাকায়, সে যে কোনো সময়ে অধোগতি প্রাপ্ত হতে পারে ! তাই সাধকের সর্বক্ষণ সতর্ক থাকা উচিত এবং চিত্তে কখনো-ই বিনাশশীল বস্তুকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়। তাৎপর্য হল এই যে, পরমাত্মপ্রাপ্তির জন্য কোনো লোকে বা যোনিতে কোনো বাধা নেই। এর কারণ হল যে কোনো প্রাণীরই পরমাত্মার সঙ্গে কখনো-ই সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ হয় না। অতএব না জানি কবে এবং কোন্ জন্মে জীব পরমাত্মমুখী হয়ে যায়—এই ভেবে সাধকের কোনো প্রাণীকে অবহেলা করতে নেই।

চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে ভগবান 'যোগ'-কে

অব্যয় বলেছেন। যোগ যেমন অব্যয়, তেমনি শুক্ল ও কৃষ্ণ—দুই গতিও অব্যয়, শাশ্বত অর্থাৎ এই উভয় গতিই অনাদিকাল হতে নিত্য বিরাজিত এবং জগতের মঙ্গলের জন্য অনন্তকাল ধরে থাকবে।

'একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ততে পুনঃ'—একটি মার্গে অর্থাৎ শুক্লমার্গে গমনকারী সাধনপরায়ণ ভক্ত অনাবৃত্তি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে গিয়ে ব্রহ্মার সঙ্গে মুক্তিলাভ করেন, তাঁকে বারংবার জন্মাতে হয় না ; আর অন্য মার্গে অর্থাৎ কৃষ্ণমার্গে গমনকারী মানুষকে বারংবার জন্মগ্রহণ করতে হয়।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—ভগবান এবার উভয় মার্গের মাহাত্ম্য জানাতে পরবর্তী শ্লোকটি বলছেন।

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জুন॥ ২৭ ॥

[**পার্থ** (হে পার্থ!) ; **এতে** (এই উভয়) ; **সৃতী** (মার্গ সম্পর্কে) ; **জানন্** (অবগত) ; **কশ্চন** (কোনো) ; **যোগী** (যোগী) ; **ন, মুহ্যতি** (মোহগ্রস্ত হন না) ; **তস্মাৎ** (অতএব) ; **অর্জুন** (হে অর্জুন !) ; **সর্বেষু, কালেষু** (সদাসর্বদা) ; **যোগযুক্তঃ** (যোগযুক্ত) ; **ভব** (হও।)]

হে পার্থ ! এই উভয় মার্গ সম্পর্কে অবগত কোনো যোগীই মোহগ্রস্ত হন না। অতএব হে অর্জুন ! তুমি সর্বদা যোগযুক্ত (সমত্বে স্থিত) হও ॥ ২৭ ॥

ব্যাখ্যা—**'নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন'**—শুক্লমার্গ প্রকাশময় আর কৃষ্ণমার্গ অন্ধকারময়। যাঁদের অন্তঃকরণে উৎপত্তি বিনাশশীল বস্তুর কোনো গুরুত্ব নেই এবং যাঁদের উদ্দেশ্য অর্থাৎ ধ্যেয়তে একমাত্র প্রকাশ(জ্ঞান)স্বরূপ পরমাত্মাই বিদ্যমান, এইরূপ পরমাত্মার শরণাগত সাধকগণ হলেন শুক্লমার্গী অর্থাৎ তাঁদের মার্গ প্রকাশময়। কিন্তু যারা সংসারে জড়িয়ে থাকে এবং যাদের উদ্দেশ্য হল জাগতিক পদার্থ সংগ্রহ করা এবং সুখভোগ করা, এরূপ মানুষ তমসাচ্ছন্ন। তবে যারা ভোগের উদ্দেশ্যে জাগতিক ভোগ-সংযম করে, যজ্ঞ-দান-তপাদি শাস্ত্রবিহিত শুভকর্ম করে এবং মৃত্যুর পর স্বর্গাদি উচ্চলোকে গমন করে, তারা যদিও ইহলোকের ভোগাসক্ত মানুষের থেকে উন্নততর, তা সত্ত্বেও জন্ম-মৃত্যু চক্রে পড়ে থাকায় তারাও মোহাচ্ছন্ন। তাৎপর্য হল যে কৃষ্ণমার্গগামীরা উচ্চলোকে গেলেও জন্ম-মৃত্যুচক্রেই আবদ্ধ থাকে। কোথাও জন্মালে মরতে হয় এবং মৃত্যু হলে জন্মাতে হয়—এইভাবে জন্ম-মৃত্যুচক্রে এরা কলুর বলদের ন্যায় অনন্তকাল ধরে বিচরণ করতে থাকে।

এইভাবে শুক্ল ও কৃষ্ণ—উভয় মার্গের পরিণাম যাঁরা জানেন তাঁরা যোগী অর্থাৎ নিষ্কাম হয়ে থাকেন, তাঁরা ভোগী নয়। কারণ তাঁরা ইহলোক ও পরলোকের ভোগের আকর্ষণ রহিত হয়েছেন। তাঁরা মোহগ্রস্ত হন না।

জাগতিক ভোগাদি প্রাপ্ত হওয়া বা না হওয়ায় যিনি নির্বিকার থাকেন তিনিই যোগী।

'তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জুন'—যিনি দৃঢ় নিশ্চয় করেছেন যে, 'আমাকে শুধু পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তিই করতে হবে', তিনি যেমনই দেশ-কাল-পরিস্থিতিই প্রাপ্ত হন না কেন, বিচলিত হন না অর্থাৎ তাঁর যে সাধনা তা কোনো দেশ, কাল, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদির অধীন নয়। তাঁর লক্ষ্য পরমাত্মাতে অটল থাকায় দেশ, কাল ইত্যাদি তাঁর ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। অনুকূল-প্রতিকূল দেশ, কাল, পরিস্থিতি ইত্যাদিতে তাঁর স্বাভাবিক সমতা থাকে। তাই ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে, 'তুমি সর্বসময় অর্থাৎ অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতিতে প্রভাবিত না হয়ে তার সদ্ব্যবহার করে (অনুকূল পরিস্থিতিতে জগতের সেবা করে এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে চিত্তে অনুকূলতার ইচ্ছা পরিত্যাগ করে) যোগযুক্ত হও অর্থাৎ নিত্য সমতাতে স্থিরভাবে বিরাজ করো।'

পরিশিষ্ট-ভাব— কামনা সম্পন্ন মানুষই মোহগ্রস্ত হয় অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুচক্রে আবর্তিত হয়। যেসব ব্যক্তি শুক্ল ও

কৃষ্ণমার্গকে জানেন, তাঁরা নিষ্কাম হন, তাই তাঁরা পুনর্জন্মে আবর্তিত হন না অর্থাৎ কৃষ্ণমার্গ প্রাপ্ত হন না।

এই অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে বলেছেন—**'তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ'** এবং এখানে বলেছেন—**'তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জুন'**। তাৎপর্য হল যে ভগবদ্স্মরণ করা অর্থাৎ ভগবানে মন নিবিষ্ট করাও হল 'যোগ' এবং সমত্বে স্থিত হওয়া অর্থাৎ সংসারে অনাসক্ত থাকাও হল 'যোগ'। উভয়েরই পরিণাম এক।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—ভগবান এবার এই অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয়টির সম্যক্ অবগতির মাহাত্ম্য জানাচ্ছেন।

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্বমিদং বিদিত্বা যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্॥ ২৮ ॥

[যোগী (যোগী) ; ইদম্ (এই তত্ত্ব) ; বিদিত্বা (জেনে) ; বেদেষু (বেদ) ; যজ্ঞেষু (যজ্ঞ) ; তপঃসু (তপ) ; চ, এবং (এবং) ; দানেষু (দানে) ; যৎ (যেসব) ; পুণ্যফলম্ (পুণ্যফলের) ; প্রদিষ্টম্ (কথা বলা হয়েছে) ; তৎ (সেই) ; সর্বম্ (সব পুণ্যফল) ; অত্যেতি (অতিক্রম করেন) ; আদ্যম, স্থানম্ (আদি স্থান) ; পরম, উপৈতি (পরমাত্মাকে লাভ করেন।)]

যোগী (ভক্ত) এই অধ্যায়ে বর্ণিত তত্ত্ব অনুধাবন করে বেদ, যজ্ঞ, তপ ও দানে যেসব পুণ্যফলের কথা বলা হয়েছে, সেসব পুণ্যফল অতিক্রম করেন এবং আদ্যস্থান পরমাত্মাকে লাভ করেন ॥ ২৮ ॥

ব্যাখ্যা—**'বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু.......স্থানমুপৈতি চাদ্যম্'**—যজ্ঞ, দান, তপ, তীর্থ, ব্রত ইত্যাদি যতপ্রকার সর্বোত্তম শাস্ত্রীয় কর্ম আছে এবং তার যে ফল, তা সবই বিনাশশীল। কারণ সর্বোত্তম কর্মেরও যখন আরম্ভ ও সমাপ্তি আছে তখন সেই কর্ম থেকে উৎপন্ন হওয়া ফল অবিনাশী হয় কীভাবে ? সেই ফল ইহলোকেরই হোক বা স্বর্গাদির হোক তার নশ্বরতায় কোনো ব্যতিক্রম হয় না। জীব স্বয়ং পরমাত্মার অবিনাশী অংশ হয়েও বিনাশশীল পদার্থে আবদ্ধ হয়ে থাকে, তারজন্য তার অজ্ঞতাই হল প্রধান কারণ। অতএব যে ব্যক্তি তেইশতম শ্লোক থেকে ছাব্বিশতম শ্লোক পর্যন্ত বর্ণিত শুক্ল ও কৃষ্ণমার্গের রহস্য বুঝতে সক্ষম হয়, সে যজ্ঞ, তপ, দান ইত্যাদি সমস্ত পুণ্যফলকে অতিক্রম করে। কারণ সে বোঝে যে ভোগ-ভূমির অন্তিম স্থান যে ব্রহ্মলোক সেখানে গেলেও এই পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয়। কিন্তু ভগবানকে প্রাপ্ত হলে আর ফিরে আসতে হয় না (৮।১৬)। সে এও জানে যে, আমি সাক্ষাৎ পরমাত্মার অংশ এবং এই প্রাকৃত পদার্থ নিত্য বিনাশের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তাই এই বিনাশশীল পদার্থ এবং ভোগে আবদ্ধ না হয়ে সে ভগবানের আশ্রিত হয় এবং সেই আদিস্থান[1] পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়, যাকে এই অধ্যায়ের একুশতম শ্লোকে 'পরমগতি' এবং 'পরমধাম' নামে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিনাশশীল পদার্থের সংগ্রহ ও ভোগে আসক্ত মানুষ সেই আদিস্থান পরমাত্মতত্ত্ব জানতে পারে না। না জানার এই অসামর্থ্য ভগবানের প্রদত্ত নয় বা প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত নয় বা কোনো কর্মেরও ফল নয় অর্থাৎ এই অসামর্থ্য কারোরই প্রদান করা নয়, জীব স্বয়ংই পরমাত্মতত্ত্ব হতে বিমুখ হয়ে এটি উৎপন্ন করেছে। তাই সে নিজেই এটি দূর করতে সক্ষম। কারণ নিজকৃত ভুল নিজেই সংশোধন করতে পারা যায় আর তা করার দায়িত্বও তারই। এই ভুল দূর করতে জীব অসমর্থও নয়, নির্বলও নয় আর অপাত্র তো নয়ই। শুধুমাত্র সংযোগজনিত সুখের লালসায় জীব নিজেই এই অসামর্থ্য তৈরি করে এবং তাতেই মনুষ্যজন্মের মহৎ লাভ হতে বঞ্চিত হয়। তাই তার এই সুখের লালসা পরিত্যাগ করে মনুষ্যজন্ম সার্থক করার জন্য নিত্য সতর্ক থাকা কর্তব্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে ভগবান প্রথমে যোগীর মহিমা

[1]অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্বশঃ। (গীতা ১০।২)
'তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে' (গীতা ১৫।৪)

জানিয়েছেন তারপরে অর্জুনকে যোগী হবার নির্দেশ দিয়েছেন (৬।৪৬)। আর এখানে ভগবান আগে অর্জুনকে যোগী হবার নির্দেশ দিয়েছেন তারপরে যোগীর মহিমা বলেছেন। এর তাৎপর্য হল যে, ষষ্ঠ অধ্যায়ে যোগভ্রষ্টের প্রসঙ্গ ছিল, তাই সেই বিষয়ে অর্জুনের মনে এই সন্দেহ ছিল যে যোগভ্রষ্টের পতন হয় কি না ? সেই সন্দেহ দূর করার জন্য ভগবান বলেছেন যে 'কেউ যদি কোনোভাবে যোগসাধনে ব্যাপৃত হয় তাহলে তার আর পতন হয় না। শুধু তাই নয়, এই যোগের জিজ্ঞাসু ব্যক্তিও শব্দব্রহ্ম অতিক্রম করে থাকে।' সেইজন্য প্রথমে যোগীর মহিমা বলেছেন তারপরে অর্জুনকে যোগী হবার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু এখানে অর্জুনের প্রশ্ন হল, 'নিয়তাত্মা পুরুষেরা আপনাকে কীভাবে জানতে পারেন ?' এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ভগবান বলেছেন যে, 'যে ব্যক্তি জাগতিক পদার্থ থেকে সর্বতোভাবে বিমুখ হয়ে কেবল মৎপরায়ণ হয়, সেই যোগীদের কাছে আমি সহজলভ্য', তাই 'তুমি যোগী হও' এই নির্দেশ প্রথমে দিয়ে পরে যোগীর মহিমা জানিয়েছেন।

❋ ❋ ❋

ওঁ তৎসৎ ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে অক্ষরব্রহ্মযোগো নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ।

এইভাবে ওঁ, তৎ, সৎ, ভগবদ্‌নাম উচ্চারণপূর্বক ব্রহ্মবিদ্যা এবং যোগশাস্ত্রময় শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা উপনিষদ্‌রূপ শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে 'অক্ষরব্রহ্মযোগ' নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত হল॥ ৮ ॥

'অক্ষর' এবং 'ব্রহ্ম' শব্দ পরমাত্মার নির্গুণ-নিরাকার, সগুণ-নিরাকার ও সগুণ-সাকার—এই তিনটি স্বরূপের বাচক। এই তিনটির মধ্যে কোনো একটি স্বরূপের চিন্তা করলে পরমাত্মার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তাই এই অধ্যায়ের নাম হল 'অক্ষরব্রহ্মযোগ'।

অষ্টম অধ্যায়ের পদ, অক্ষর এবং উবাচ

১) এই অধ্যায়ে 'অথাষ্টমোঽধ্যায়'-এর তিনটি 'অর্জুন উবাচ' ইত্যাদি পদের চার, শ্লোকগুলির তিনশত সাতাত্তর এবং পুষ্পিকার তেরটি পদ আছে। এইভাবে সমস্ত পদের যোগসংখ্যা তিনশত সাতানব্বই।

২) 'অথাষ্টমোঽধ্যায়'-এর ছটি 'অর্জুন উবাচ' ইত্যাদি পদের তেরটি, শ্লোকগুলির নয়শত পঁয়তাল্লিশ এবং পুষ্পিকার সাতচল্লিশটি অক্ষর আছে। এইভাবে সমস্ত অক্ষরগুলির যোগসংখ্যা এক হাজার এগার। এই অধ্যায়ের আটাশটি শ্লোকের মধ্যে নবম, একাদশ এবং আটাশতম—এই তিনটি শ্লোক চুয়াল্লিশ অক্ষরের এবং দশম শ্লোকটি পঁয়তাল্লিশ অক্ষরের। বাকি চব্বিশটি শ্লোক বত্রিশ অক্ষরের।

৩) এই অধ্যায়ের দুটি উবাচ—'অর্জুন উবাচ' এবং 'শ্রীভগবানুবাচ'।

অষ্টম অধ্যায়ের প্রযুক্ত ছন্দ

এই অধ্যায়ের আটাশটি শ্লোকের মধ্যে নবম, দশম ও একাদশ—এই তিনটি শ্লোক 'উপজাতি' ছন্দযুক্ত এবং আটাশতম শ্লোকটি 'ইন্দ্রবজ্রা' ছন্দযুক্ত। অন্য চব্বিশটি শ্লোকের মধ্যে—দ্বিতীয় শ্লোকের তৃতীয় পংক্তিতে এবং চতুর্দশ শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে 'ভগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় 'ভ-বিপুলা' ; চব্বিশতম শ্লোকের তৃতীয় পংক্তিতে 'মগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় 'ম-বিপুলা', সাতাশতম শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে 'রগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় 'র-বিপুলা' এবং তৃতীয় শ্লোকের প্রথম এবং তৃতীয় পংক্তিতে 'নগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় 'জাতিপক্ষ-বিপুলা' সংজ্ঞাযুক্ত ছন্দ আছে। বাকি উনিশটি শ্লোক ঠিক 'পথ্যাবক্ত্র' অনুষ্টুপ ছন্দের লক্ষণগুলির দ্বারা যুক্ত।

❋ ❋ ❋

॥ ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

অথ নবমোঽধ্যায়ঃ

নবম অধ্যায়

অবতরণিকা

সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের যে প্রসঙ্গের বর্ণনা করেছিলেন, সেই প্রসঙ্গের মাঝখানেই অর্জুন অষ্টম অধ্যায়ের প্রারম্ভে সাতটি প্রশ্ন করেন। এগুলির মধ্যে ছটি প্রশ্নের উত্তর ভগবান সংক্ষেপে দিয়ে অন্তকালীন গতির বিষয়ে সপ্তম প্রশ্নের উত্তরটি সবিস্তারে জানিয়েছেন।

সপ্তম অধ্যায়ে যে কথাগুলি বলা হয়নি বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের সেই বিষয়গুলিকে বিশেষভাবে বলার জন্য ভগবান নবম অধ্যায় আরম্ভ করছেন।

শ্রীভগবানুবাচ

ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্ জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥ ১ ॥

[ইদম্ (এই) ; গুহ্যতমম্ (অতিগুহ্য) ; বিজ্ঞানসহিতম্ (বিজ্ঞানসহ) ; জ্ঞানম্ (জ্ঞান) ; অনসূয়বে (দোষদৃষ্টিবর্জিত) ; তে (তোমাকে) ; তু (পুনরায়) ; প্রবক্ষ্যামি (ভালোভাবে জানাচ্ছি) ; যৎ (যা) ; জ্ঞাত্বা (জ্ঞাত হলে) ; অশুভাৎ (অশুভ হতে) ; মোক্ষ্যসে (মুক্তিলাভ করবে।)]

শ্রীভগবান বললেন—এই অতি গুহ্য বিজ্ঞানসহ জ্ঞান দোষদৃষ্টিবর্জিত তোমাকে আমি পুনরায় জানাচ্ছি, যা জ্ঞাত হলে তুমি অশুভ থেকে অর্থাৎ জন্ম-মরণরূপ সংসার থেকে মুক্তিলাভ করবে ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা—**'ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে'**—ভগবানের মনে যে তত্ত্ব, বিষয়টি বিশেষভাবে বলার আছে সেদিকে লক্ষ্য করাবার জন্যই ভগবান এখানে সর্বপ্রথম **'ইদম্'** এই শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। সেই (ভগবানের মন বুদ্ধিতে স্থিত) তত্ত্বের মহিমা জানাতেই একে **'গুহ্যতমম্'** বলা হয়েছে অর্থাৎ এটি অত্যন্ত গোপনীয় তত্ত্ব। এটিকেই পরবর্তী শ্লোকে **'রাজগুহ্যম্'** এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের চৌষট্টিতম শ্লোকে **'সর্বগুহ্যতমম্'** বলা হয়েছে।

এখানে প্রথমে **'গুহ্যতমম্'** বলে পরে (৯।৩৪) **'মন্মনা ভব ....'** বলা হয়েছে এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ে প্রথমে **'সর্বগুহ্যতমম্'** বলে পরে (১৮।৬৫) **'মন্মনা ভব .....'** বলেছেন। তাৎপর্য হল এই যে এখানের এবং সেখানের দুটি বিষয় একই, ভিন্ন নয়।

এই অতিগুহ্য তত্ত্ব সকলের কাছে বলা যায় না, কারণ ভগবান এতে স্বয়ংই নিজের মহিমা বর্ণনা করেছেন। যার চিত্তে ভগবানের প্রতি সামান্যও দোষদৃষ্টি থাকে তাকে এই গুহ্যতত্ত্ব জানালে, সে 'ভগবান আত্মশ্লাঘী—নিজ প্রশংসাকারী' এরূপ বিপরীত অর্থ করতে পারে। সেইজন্যই ভগবান অর্জুনকে **'অনসূয়বে'** বিশেষণে সম্বোধন করে বলেছেন, হে অর্জুন ! তুমি দোষ-দৃষ্টিরহিত, তাই তোমাকেই এই অতি গুহ্যতম বিষয়টি ভালোভাবে জানাচ্ছি অর্থাৎ এই তত্ত্ব সম্বন্ধে জানাচ্ছি এবং তার উপায়ও জানাচ্ছি—**'প্রবক্ষ্যামি'**।

'প্রবক্ষ্যামি' পদটির অপর ভাব হল যে আমি এই তত্ত্বটি বিশেষ রীতিতে এবং সোজাসুজিভাবে জানাচ্ছি অর্থাৎ যে কোনো মানুষই আমার শরণ নেবার অধিকারী। কোনো ব্যক্তি যতই দুরাচারী হোক বা পাপী হোক, সে যে কোনো বর্ণ-আশ্রম বা সম্প্রদায়ের হোক, কোনো দেশের বা কোনো বেশের, সে যেই হোক না কেন, যদি বা আমার শরণ নেয় তবে সে আমাকেই লাভ করে—এ কথা আমি

অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে জানাচ্ছি।

সপ্তম অধ্যায়ে ভগবানের মনে যত কথা বলার ছিল তা তিনি বলতে পারেননি। তাই ভগবান এখানে 'তু' পদটি প্রয়োগ করে বলেছেন যে আমি সেই বিষয়টিই আবার জানাচ্ছি।

'জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতম্'—ভগবান এই সমস্ত জগতের মহাকরণ—এটি দৃঢ়তার সঙ্গে মেনে নেওয়াকেই বলা হয় 'জ্ঞান' এবং ভগবান ব্যতিরেকে অন্য কোনো (কার্য-কারণ) তত্ত্ব নেই—এটি অনুভব করাই হল 'বিজ্ঞান'। এই বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের জন্যই এই শ্লোকের পূর্বার্ধে **'ইদম্'** এবং **'গুহ্যতমম্'**—এই দুটি বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিশেষ কথা

এই জ্ঞান-বিজ্ঞান জেনে তুমি এই অশুভ সংসার হতে মুক্তিলাভ করবে। এই জ্ঞান-বিজ্ঞানকেই রাজবিদ্যা, রাজগুহ্য ইত্যাদি নামে বলা হয়েছে। এই ধর্মের ওপর যে শ্রদ্ধা রাখে না, বিশ্বাস করে না, মানে না, সে মৃত্যুরূপী সংসারেই থাকে অর্থাৎ বারংবার জন্মায় ও মৃত্যুবরণ করে (৯।১-৩)—এইভাবে ভগবান 'জ্ঞানের' কথা জানিয়েছেন। অব্যক্ত মূর্তিরূপে আমার দ্বারাই এই সমস্ত সংসার পরিব্যাপ্ত অর্থাৎ সবই আমি ; অন্য কিছুই নেই (৯।৪-৬)—এইভাবে বলে ভগবান 'বিজ্ঞান' জানিয়েছেন।

প্রকৃতির পরবশ হয়ে সমস্ত প্রাণী মহাপ্রলয়ে প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হয় আর মহাসর্গের আদিতে আমি আবার তাদের সৃষ্টি করি। কিন্তু এই কর্ম আমাকে আবদ্ধ করে না। কেন-না, আমি তাতে উদাসীনের ন্যায় অনাসক্ত থাকি। আমার অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করে। আমার এই পরমভাব না জেনে মূঢ় ব্যক্তিগণ আমাকে অবহেলা করে। রাক্ষসী, আসুরী এবং মোহিনী প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণকারীদের আশা, কর্ম, জ্ঞান সমস্তই বৃথা। মহাত্মা ব্যক্তিগণ দৈবী প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সমস্ত প্রাণীর আদি পুরুষ জেনে আমাকে ভজনা করেন, আমাকে নমস্কার করেন। কেউ কেউ জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা অভিন্নজ্ঞানে আমার উপাসনা করেন ইত্যাদি (৯।৭-১৫)—এইভাবে ভগবান 'জ্ঞান' সম্বন্ধে জানিয়েছেন। আমি ক্রতু, যজ্ঞ, স্বধা, ওষধি ইত্যাদি এবং সৎ-অসৎও আমিই অর্থাৎ কার্য-কারণরূপে যা কিছু, তা সবই আমি (৯।১৬-১৯)—এইরূপে ভগবান 'বিজ্ঞান' সম্বন্ধে জানিয়েছেন।

যাঁরা যজ্ঞ করে স্বর্গে গমন করেন তাঁরা সেখানে সুখ ভোগ করেন এবং পুণ্য সমাপ্ত হলে আবার ইহলোকে ফিরে আসেন। যাঁরা অনন্যভাবে আমাকে চিন্তা করেন তাঁদের যোগক্ষেম আমি স্বয়ং বহন করি। শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে যাঁরা অন্যান্য দেবতাদের পূজা করেন তাঁরাও প্রকৃতপক্ষে আমারই পূজা করেন কিন্তু তা হয় অবিধিপূর্বক। যাঁরা আমাকে সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু বলে মনে করেন না, তাঁদের পতন হয়। যাঁরা শ্রদ্ধা সহকারে পত্র-পুষ্প ইত্যাদি এবং সামগ্রিকভাবে সমস্ত ক্রিয়া আমাকে সমর্পণ করেন, তাঁরা শুভ-অশুভ কর্ম হতে মুক্ত হন (৯।২০-২৮)—এই বলে ভগবান 'জ্ঞানের' কথা বলেছেন। আমি সকল প্রাণীতেই সমভাবে অবস্থিত। কেউই আমার প্রিয় বা দ্বেষের কারণ হয় না। কিন্তু যাঁরা আমার ভজনা করেন, তাঁরা আমাতে এবং আমি তাঁদের মধ্যে অবস্থিত (৯।২৯)—এইভাবে 'বিজ্ঞানের' কথা জানিয়েছেন এবং পরের পাঁচটি শ্লোকে (৯।৩০-৩৪) এই বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা করা হয়েছে[১]।

'যজ্ জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ'—অসতের সঙ্গে সম্বন্ধিত হওয়াই 'অশুভ', যার জন্য উচ্চ-নীচ যোনিতে জন্ম হয়ে থাকে। অসৎ (সংসার)-এর সঙ্গে নিজের যে সম্পর্ক তা কেবল মেনে নেওয়া সম্পর্ক, তা প্রকৃত সম্পর্ক নয়। যার সঙ্গে বাস্তবিক কোনো সম্পর্ক থাকে না, তার থেকেই মুক্ত হওয়া যায়। নিজ স্বরূপ থেকে কখনো কারও বিচ্ছেদ হয় না। অতএব বিচ্ছিন্ন তার থেকেই হওয়া যায়, যা নিজস্ব নয়, কেবল ভ্রমবশতঃ আপন বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। এই ভ্রান্তির থেকেই মুক্তি হয়ে থাকে। ভ্রমজনিত মান্যতাকে স্বীকার না করলেই তা থেকে মুক্তি লাভ হয়। যেমন কাপড়ে ময়লা লাগলে সেটি পরিষ্কার করলেই ময়লা দূর হয়। কারণ ময়লা বহিরাগত এবং কাপড় আর ময়লা দুটি পৃথক্ বস্তু, এক নয়। তেমনই ভগবানের অবিনাশী অংশ এই জীব ভগবান হতে বিমুখ হয়ে যখন যে যোনিতে

[১]এখানে জ্ঞানের বর্ণনায় বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানের বর্ণনায় জ্ঞানের কথা যে বলা হয়নি—তা নয়।

জন্মগ্রহণ করে, সেখানেই সে 'আমি' ও 'আমার' সম্পর্ক স্থাপন করে শরীর ও সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে বসে অর্থাৎ অসতের সঙ্গে সম্পর্কিত হয় এবং জন্মাতে ও মৃত্যুবরণ করতে থাকে। যখন সে নিজ স্বরূপকে চিনতে পারে অথবা ভগবানের শরণাগত হয়, তখন এই অশুভ সম্বন্ধ থেকে সে মুক্ত হয়ে থাকে অর্থাৎ তার সংসার হতে সম্পর্ক-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই ভাব নিয়েই ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে, সেই তত্ত্ব অবগত হয়ে তুমি অশুভের থেকে মুক্তি লাভ করবে।

পরিশিষ্ট-ভাব—জগৎ-সংসার 'প্রকট' অর্থাৎ দৃশ্যমান। কর্মযোগ (নিষ্কামভাব) প্রকটিত না হওয়াও 'গুহ্য'। তার থেকেও গোপনীয় হওয়ায় জ্ঞানযোগ (আত্মজ্ঞান) হল 'গুহ্যতর'। জ্ঞানযোগের থেকেও গোপনীয় হওয়ায় ভক্তিযোগ (পরমাত্মজ্ঞান) হল 'গুহ্যতম'। গুহ্য এবং গুহ্যতর হল লৌকিক, কিন্তু গুহ্যতম অলৌকিক।

ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত লোকই পুনরাবর্তী হওয়ায় 'অশুভ' (গীতা ৮।১৬)। গুহ্যতম বিষয়কে জেনে নিলে মানুষ সর্বতোভাবে অশুভ থেকে মুক্তিলাভ করে। কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগের সাহায্যেও মানুষ অশুভ হতে মুক্তি পেতে পারে, কিন্তু এই স্থানে মুক্তিলাভের তাৎপর্য হল—একমাত্র পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কিছুর কোনোরূপ অস্তিত্ব না থাকা, অহং-এর সূক্ষ্ম রেশও না থাকা—যার দ্বারা দার্শনিক মত-পার্থক্য উৎপন্ন হতে পারে।

নিজ স্বরূপকে জানার নাম হল 'জ্ঞান' আর 'সমগ্র' ভগবানকে জানার নাম 'বিজ্ঞান'। সগুণ (সমগ্র) কখনো নির্গুণের অন্তর্গত হতে পারে না, কিন্তু নির্গুণের সগুণের অন্তর্গত হওয়া সম্ভব, তাই সগুণের জ্ঞানকে বলা হয় 'বিজ্ঞান' অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞান।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের কথা জানাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে তার পরিণাম যে অশুভ হতে মুক্তিলাভ হবে—সেকথা জানিয়েছেন। পরবর্তী শ্লোকে সেই বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের মহিমা বর্ণনা করেছেন।

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্॥ ২ ॥

[**ইদম্** (এটি) ; **রাজবিদ্যা** (সমস্ত বিদ্যার রাজা) ; **রাজগুহ্যম্** (সমস্ত গোপনীয়তার রাজা) ; **পবিত্রম্** (এটি অত্যন্ত পবিত্র) ; **উত্তমম্** (সর্বোৎকৃষ্ট) ; **প্রত্যক্ষাবগমম্** (এর ফলও প্রত্যক্ষ) ; **ধর্ম্যম্** (এটি ধর্মময়) ; **অব্যয়ম্** (অবিনাশী) ; **কর্তুম্** (পালন করা) ; **সুসুখম্** (সহজ।)]

এই জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্থাৎ সমগ্ররূপ সমস্ত বিদ্যা এবং সমস্ত গোপনীয়তার রাজা অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ। এটি অত্যন্ত পবিত্র ও সর্বোৎকৃষ্ট এবং এর ফলও প্রত্যক্ষ। এটি ধর্মময়, অবিনাশী এবং সুলভ্য অর্থাৎ এটি লাভ করা অত্যন্ত সহজ ॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা—**'রাজবিদ্যা'**—এই বিজ্ঞানসহ জ্ঞান সমস্ত বিদ্যার রাজা ; কারণ এটি যথাযথভাবে অবগত হলে আর কিছুই জানার বাকি থাকে না।

ভগবান সপ্তম অধ্যায়ের প্রারম্ভে বলেছেন, 'আমাকে সম্পূর্ণরূপে জানার পর আর কিছু জানার বাকি থাকে না'। পঞ্চদশ অধ্যায়ের শেষে বলেছেন, 'যে অসম্মূঢ় ব্যক্তি আমাকে ক্ষরের অতীত এবং অক্ষরের থেকে উত্তম বলে জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ হয়ে থাকেন অর্থাৎ তাঁর কিছু জানতে বাকি থাকে না। এতে মনে হয় যে, ভগবানের সগুণ-নির্গুণ, সাকার-নিরাকার, ব্যক্ত-অব্যক্ত ইত্যাদি যত স্বরূপ আছে, সেইসব স্বরূপের মধ্যে ভগবানের সগুণ-সাকার স্বরূপ খুবই বিশিষ্ট মহিমাযুক্ত।'

'রাজগুহ্যম্'—জগতে রহস্যের যতপ্রকার গুপ্ত বিষয় আছে, তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ (রাজা) হল এইটি ; কারণ জগতে এর থেকে শ্রেষ্ঠ আর কোনো রহস্য নেই।

যেমন, নাটকে সবার সামনে অভিনয় করতে করতে কেউ হয়ত তার নিজের আসল পরিচয় দিয়ে ফেলল কিন্তু সেইসময় তার আসল পরিচয় গোপন রাখারই কথা। কারণ

নাটকে নিজ পরিচয় গোপন রেখেই শিল্পীকে চরিত্রাভিনয় করতে হয়। ভগবানও তেমনি যখন মানুষরূপে লীলা করেন তখন ভক্তিহীন মানুষেরা তাঁকে সাধারণ মানুষ মনে করে অবজ্ঞা করে। তাই ভগবান তাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন না (গীতা ৭।২৫)। কিন্তু যাঁরা ভগবানের একান্ত প্রিয় ভক্ত, তাঁদের কাছে ভগবান নিজেকে প্রকাশিত করেন—এইভাবে নিজেকে প্রকাশিত করাই হল অত্যন্ত গোপনীয় ব্যাপার।

'পবিত্রমিদম্'—এই বিদ্যার ন্যায় পবিত্রকারী আর কোনো বিদ্যা নেই অর্থাৎ এই বিদ্যা পবিত্রতার শেষসীমা। অত্যন্ত পাপী এবং দুরাচারীও এই বিদ্যার সাহায্যে অতি শীঘ্রই ধর্মাত্মা হয়ে ওঠে অর্থাৎ পবিত্র হয় এবং শাশ্বত শান্তি লাভ করে (৯।৩১)।

দশম অধ্যায়ে অর্জুন ভগবানকে পরম পবিত্র বলেছেন—**'পবিত্রং পরমং ভবান্'** (১০।১২) ; চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান জ্ঞানকে পবিত্র বলেছেন—**'ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে'** (৪।৩৮) এবং এখানে রাজবিদ্যা ইত্যাদি আটটি বিশেষণের দ্বারা বিজ্ঞানসহ জ্ঞানকে পবিত্র বলে জানিয়েছেন। এর তাৎপর্য হল এই যে পবিত্র পরমাত্মার নাম-রূপ-লীলা-ধাম-স্মরণ-কীর্তন-জপ-ধ্যান-জ্ঞান ইত্যাদি সবই পবিত্র অর্থাৎ ভগবদ্ সম্বন্ধীয় যা কিছু, তা সবই অতিশয় পবিত্র এবং প্রাণী-মাত্রেরই পবিত্রকারক[১]।

'উত্তমম্'—এটি সর্বশ্রেষ্ঠ, এর সমকক্ষ আর কোনো বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদি নেই। এটি শ্রেষ্ঠত্বের শেষসীমা, কারণ এই বিদ্যার দ্বারা ভক্ত সর্বশ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠে। এত শ্রেষ্ঠ হয় যে আমিও তার আদেশ পালন করে থাকি।

বিজ্ঞানসহ এই জ্ঞানকে জেনে যেসব ব্যক্তি এটি অনুভব করে, তাদের উদ্দেশ্য করে ভগবান বলেছেন যে 'তারা আমাতে অবস্থিত এবং আমি তাদের মধ্যে অবস্থিত'—**'ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্'** (৯।২৯) অর্থাৎ তারা আমাতে তদ্গত হয়ে আমারই স্বরূপ লাভ করে থাকে।

'প্রত্যক্ষাবগমম্'—এর ফল প্রত্যক্ষ। যে ব্যক্তি এটিকে যত জানবে, সে ততই নিজের মধ্যে বিশিষ্টতা অনুভব করবে। এটি সম্পূর্ণভাবে অবগত হলেই পরমগতি লাভ হয়—এই হল এর প্রত্যক্ষ ফল।

'ধর্ম্যম্'—এটি ধর্মময়। পরমাত্মা প্রাপ্তির লক্ষ্য রেখে নিষ্কামভাবে যত কর্তব্য-কর্ম করা হয়, তা সবই ধর্মের অন্তর্গত। অতএব এই বিজ্ঞানসহ জ্ঞান সকল ধর্মের দ্বারা পরিপূর্ণ অর্থাৎ ধর্মময়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান অর্জুনকে বলেছিলেন যে, এই ধর্মময় যুদ্ধ ব্যতীত ক্ষত্রিয়ের কাছে অন্য কোনো সাধনই শ্রেয়স্কর নয়—**'ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে'** (২।৩১)। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে নিজ নিজ বর্ণ, আশ্রম ইত্যাদি অনুযায়ী শাস্ত্রবিহিত যত কর্তব্য-কর্ম আছে, তা সবই ধর্মময়। তাছাড়া ভগবদ্প্রাপ্তির যতগুলি সাধন আছে এবং ভক্তদের যত লক্ষণ আছে, ভগবান সেসবগুলিকেও **'ধর্ম্যামৃত'** নামে অভিহিত করেছেন (গীতা ১২।২০) অর্থাৎ এগুলির দ্বারা ভগবদ্প্রাপ্তি হয় বলে এগুলিও ধর্মময়।

'অব্যয়ম্'—কখনো বিন্দুমাত্রও ক্ষয় এর হয় না, তাই এটি অবিনাশী। ভগবান তাঁর ভক্তদের সম্বন্ধেও বলেছেন যে 'আমার ভক্তের কখনো বিনাশ (পতন) হয় না'—**'ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি'** (৯।৩১)।

'কর্তুং সুসুখম্'—এটি করা অত্যন্ত সহজ। পত্র-পুষ্প-ফল-জল ইত্যাদি বস্তুসমূহ ভগবানের বলে মনে করে তাঁকেই প্রদান করা কত সহজ (৯।২৬)! বস্তুগুলি নিজের বলে মনে করে ভগবানকে প্রদান করলে ভগবান তা অনন্ত গুণ করে ফিরিয়ে দেন, আর সেগুলি যদি ভগবানেরই মনে করে ভগবানকে অর্পণ করা হয় তাহলে ভগবান নিজেকেই বিলিয়ে দেন। এতে পরিশ্রমের কী আছে ? এতে তো শুধু নিজের ভুল শোধরানো হয়।

আমাকে লাভ করা সহজ ও সরল ; কারণ আমি সব স্থানে থাকায় এখানেও অবস্থিত আছি, সর্বকালীন হওয়ায় এখনও আছি। যা কিছু দেখা, শোনা ও বোঝা যায়, সে সবে আমিই অবস্থিত। যত মানুষ আছে, আমি তাদের এবং তারা আমার। কিন্তু আমার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে প্রকৃতির

---

[১]অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতোঽপি বা। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ।।

(ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ব্রহ্ম. ১৭।১৭)

দিকে দৃষ্টি রাখলে, তারা আমাকে লাভ না করে বারংবার জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হয়। এরা যদি আমার প্রতি সামান্যতম দৃষ্টি ফেরায় তাহলে তারা আমার অলৌকিকত্ব ও বিশেষত্ব দেখতে পায় এবং তাদের যে প্রকৃতির সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই, আমার সঙ্গেই তাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, সেটি অনুভব করে থাকে।

পরিশিষ্ট-ভাব—কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ হল 'রাজবিদ্যা' আর ভক্তিযোগ হল 'রাজগুহ্য'। এই অধ্যায়ের চতুর্থ-পঞ্চম শ্লোকে রাজবিদ্যার এবং চৌত্রিশতম শ্লোকে প্রধানতঃ রাজগুহ্যের কথা বলা হয়েছে।

'প্রত্যক্ষাবগমম্'—এর ফল হয়ে থাকে প্রত্যক্ষ (অপরোক্ষ)। কর্মযোগের দ্বারা শান্তি, জ্ঞানযোগের দ্বারা মুক্তি এবং ভক্তিযোগের দ্বারা প্রেম প্রত্যক্ষভাবে প্রাপ্ত হয়ে থাকে। ভগবানের শরণাগত হলে নির্ভয়তা, নিঃশোকতা, নিশ্চিন্ততা, নিঃশঙ্কতা প্রত্যক্ষরূপে প্রাপ্ত হয়ে থাকে। স্ব-স্বরূপের সত্তা-স্ফূর্তি (সৎ-চিৎ), নিজ অনুভবের জ্ঞানও প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে।

'ধর্ম্যম্'—এটি ধর্মরহিত নয়, বরং ধর্মময়, ধর্মের দ্বারা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই সত্য জানলে মনুষ্যজীবন সফল হয়ে যায় অর্থাৎ মানুষ কৃত-কৃত্য, জ্ঞাত-জ্ঞাতব্য এবং প্রাপ্ত-প্রাপ্তব্য হয়।

'সুসুখং কর্তুম্'—এটি করা অত্যন্ত সহজ, কারণ এটি স্বতঃ প্রাপ্ত। সব কিছুই পরমাত্মা—এটিতে কোনো পরিশ্রম নেই, এটি কেবল স্বীকৃতি মাত্র। কর্মযোগের দৃষ্টিতে বস্তু নিজের নয়, বরং অন্যের। তাই সেটি অন্যের সেবায় লাগাতে দ্বিধা কিসের ! জ্ঞানযোগের দৃষ্টিতে স্ব-স্বরূপে স্থিত হতে বাধা কোথায় ! ভক্তিযোগের দৃষ্টিতে যা নিজের, তার দিকে অগ্রসর হতে কী শক্তির প্রয়োজন হয় ! এইসব অতি সহজেই হয়।

'অব্যয়ম্'—প্রকৃতপক্ষে এটিই হল অবিনাশী এবং চরম তত্ত্ব, এর পরে আর কিছু নেই।

***

সম্বন্ধ—এরূপ সহজ ও সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় থাকা সত্ত্বেও মানুষ তার দ্বারা উপকৃত কেন হয় না ? সে সম্পর্কে বলেছেন—

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি॥ ৩ ॥

[**পরন্তপ** (হে পরন্তপ !) ; **অস্য** (এই) ; **ধর্মস্য** (ধর্মের মহিমার প্রতি) ; **অশ্রদ্দধানাঃ** (শ্রদ্ধাহীন) ; **পুরুষাঃ** (ব্যক্তিগণ) ; **মাম্** (আমাকে) ; **অপ্রাপ্য** (না পেয়ে) ; **মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি** (মৃত্যুরূপ সংসারপথে) ; **নিবর্তন্তে** (চলতে থাকে।)]

হে পরন্তপ ! এই ধর্মের মহিমার প্রতি শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিরা আমাকে প্রাপ্ত না হয়ে মৃত্যুরূপ সংসারপথে আসা-যাওয়া করে অর্থাৎ বারংবার জন্মায় ও মৃত্যুবরণ করে ॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা—**'অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য[১] পরন্তপ'**—ধর্ম দু'প্রকারের—স্বধর্ম এবং পরধর্ম। মানুষের যেটি নিজের স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপ, তা তার স্বধর্ম এবং প্রকৃতি এবং প্রকৃতির কার্যমাত্রই তার কাছে পরধর্ম—**'সংসারধর্মৈরবিমুহ্যমানঃ'** (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২।৪৯)। আগের দুটি শ্লোকে ভগবান যে বিজ্ঞানসহ জ্ঞান জানাতে অঙ্গীকার করেছিলেন এবং আটটি বিশেষণ দিয়ে যার মাহাত্ম্যের কথা বলেছিলেন, এখানে তাকেই 'ধর্ম' বলা হয়েছে। এই ধর্মের মাহাত্ম্যে যাঁরা শ্রদ্ধাহীন অর্থাৎ উৎপত্তি ও বিনাশশীল পদার্থকে সত্য মনে করে যাঁরা তার মধ্যেই আবিষ্ট হয়ে থাকেন, সেই সব মানুষকে এখানে **'অশ্রদ্দধানাঃ'** বলা হয়েছে।

এটি খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার যে মানুষ তার শরীর, আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পত্তি-প্রাচুর্যকে নিঃসন্দেহ-রূপে উৎপত্তি-বিনাশশীল এবং প্রতিক্ষণ পরিবর্তনশীল জেনেও সেগুলিকে বিশ্বাস করে, শ্রদ্ধা করে, সেগুলির আশ্রয়

[১]এখানে 'অশ্রদ্দধানাঃ' পদে ব্যবহৃত 'শানচ্ কৃৎ' প্রত্যয়ের যোগে 'ন লোকাব্যয়নিষ্ঠাখলর্থতৃনাম্' (পাণিনি. অষ্টা. ২।৩।৬৯)—এই সূত্রের নিয়ম অনুযায়ী দ্বিতীয়া বিভক্তি হওয়া উচিত ; কিন্তু এই সূত্র কারক ষষ্ঠীকেই নিষেধ করে। তাই এখানে 'ষষ্ঠী শেষে' দ্বারা 'ধর্ম' পদে ষষ্ঠী বিভক্তি করা হয়েছে।

গ্রহণ করে। তারা বিচার করে দেখে না যে এইসব শরীর প্রভৃতির সঙ্গে আমরা কতদিন থাকব অথবা এগুলিই বা কতদিন আমাদের সঙ্গে থাকবে। শ্রদ্ধা স্বধর্মেই হওয়া উচিত কিন্তু তা না হয়ে, হয়েছে পরধর্মের প্রতি।

'অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি'—পরধর্মে শ্রদ্ধাযুক্তদের প্রতি ভগবান বলেছেন যে, সর্বদেশে, সর্বকালে, সমস্ত পদার্থে, সকল ব্যক্তিতে সর্বদা বিদ্যমান, সকলের নিত্যপ্রাপ্ত আমাকে প্রাপ্ত না হয়ে মানুষ মৃত্যুরূপ জগৎ-সংসারে পরিভ্রমণ করে থাকে। কোথাও জন্ম হলে মরতে যেটুকু দেরি আবার মারা গেলে জন্ম নিতেও সেটুকু দেরি ! সে যে যোনিতে যায়, সেই যোনিতেই নিজ অবস্থিতি মেনে নেয় অর্থাৎ 'আমি এই শরীর' এই অহংভাব এবং 'এই দেহ আমার' এরূপ মমত্ববোধ করে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই যোনিগুলি থেকেও তাদের নিরন্তর সম্বন্ধ-ছেদ হতে থাকে। কোনো জন্মের সঙ্গেই কারও সম্পর্ক স্থায়ী হয় না। দেশ-কাল-বস্তু-ব্যক্তি-ঘটনা-পরিস্থিতি ইত্যাদি থেকে এদের সবসময় সম্বন্ধ- ছেদ হতে থাকে অর্থাৎ সেখান থেকেও এরা সর্বক্ষণ নিবৃত্ত হতে থাকে। তারা কারও সঙ্গেই চিরকাল থাকতে সক্ষম নয়। এইভাবেই তারা ঊর্ধ্বগতিতে অর্থাৎ উচ্চ থেকে উচ্চতর ভোগভূমিতে আরোহণ করলেও, সেখান থেকে তাদের ফিরে আসতে হয় (গীতা ৮।১৬, ২৫, ৯।২১)। তাৎপর্য হল এই যে ভগবানকে প্রাপ্ত না হয়ে এই সব মানুষ যেখানেই যাক, সেখান থেকে তাকে ফিরে আসতেই হয় এবং বারংবার জন্ম-মৃত্যু গ্রহণ করতে হয়।

'মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি' বলার উদ্দেশ্য হল এই যে সংসার পথে শুধু মৃত্যুই আছে, আছে বিনাশ, কেবল অভাব আর অভাব অর্থাৎ যেখানেই যাবে, সেখান থেকে ফিরতেই হবে। এই কথাই ভগবান দ্বাদশ অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে **'মৃত্যুসংসারসাগরাৎ'** পদে বলেছেন অর্থাৎ এই জগৎ হল মৃত্যুর পারাবার। এতে কোথাও স্থির হয়ে থাকা যায় না।

মনুষ্যদেহ কেবলমাত্র পরমাত্মাকে প্রাপ্তির জন্যই পাওয়া। ভগবান কৃপা করে সমস্ত কর্মফল (যা সৎ ও অসৎ জন্মের কারণ) স্থগিত করে মুক্তির অবকাশ করে দিয়েছেন। এরূপ অবকাশ প্রাপ্ত হয়েও যে-সব জীব জন্ম-মৃত্যুর পরম্পরাতে আবর্তিত হয়, তাদের জন্য ভগবানও এইরূপ অনুতাপ করেন যে, আমি নিজে থেকে এদের জন্ম-মৃত্যু চক্র হতে মুক্ত হবার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলাম, কিন্তু তারা সেই স্বাধীনতা পেয়েও জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হয়ে চলেছে ! শুধুমাত্র সাধারণ মানুষদের জন্য নয়, ঘোর আসুরী যোনিতে পতিত জীবের জন্যও ভগবান এই বলে অনুতাপ করেন যে আমাকে প্রাপ্ত না হয়ে এরা নিম্নগতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে—**'মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্'** (গীতা ১৬।২০)।

'অপ্রাপ্য মাম্' (আমাকে প্রাপ্ত না হয়ে) পদের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে মানুষমাত্রেরই ভগবৎপ্রাপ্তির অধিকার আছে। তাই মানুষমাত্রই ভগবানের দিকে অগ্রসর হতে পারে, ভগবানকে প্রাপ্ত করতে পারে। ষোড়শ অধ্যায়ের বিংশতম শ্লোকে **'মামপ্রাপ্যৈব'** পদটির দ্বারাও এটি সমর্থিত হয় যে আসুরী প্রকৃতির ব্যক্তিরাও ভগবানের দিকে অগ্রসর হতে সক্ষম, ভগবানকে প্রাপ্ত করতে সক্ষম। তাই গীতাতে বলা হয়েছে যে, অত্যন্ত দুরাচারী ব্যক্তিও ভক্ত হতে পারে, ধর্মাত্মা হতে পারে এবং ভগবানকে লাভ করতে পারে (৯।৩০-৩১) আর অত্যন্ত পাপী ব্যক্তিও জ্ঞানের সাহায্যে সকল পাপ অতিক্রম করতে সক্ষম হয় (৪।৩৬)।

একটি শহর ছিল, যার চারদিকে ছিল উচ্চ প্রাচীর। শহর থেকে বার হবার একটিমাত্র দরজা ছিল। একজন অন্ধ ব্যক্তি শহর থেকে বাইরে বেরোতে চাইছিল। সে এক হাতে লাঠি ও অন্য হাতে প্রাচীরের সাহায্য নিয়ে চলছিল। চলতে চলতে যখন বাইরে যাবার দরজাটি এল, ঠিক তখনই তার মাথা চুলকাল। সে তখন এক হাতে মাথা চুলকাতে লাগল আর অন্য হাতে লাঠির সাহায্য নিয়ে হাঁটতে লাগল, এইভাবে দরজাটি পেরিয়ে গেল। তারপর সে আবার প্রাচীরে হাত দিয়ে চলতে লাগল। এইভাবে চলতে চলতে যখনই দরজা আসার সময় হয়, তখনই তার মাথায় চুলকানি হয়, সে মাথা চুলকাতে থাকলে দরজাটি সেই ফাঁকে পেরিয়ে যায়। ফলে সে ঘুরতেই থাকে। জীবও এইভাবে স্বর্গ-নরক এবং চুরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করতে থাকে। সেই সমস্ত কর্মফল ভোগের যোনি থেকে সে নিজে মুক্তি পেতে সক্ষম হয় না। তাই ভগবান কৃপা করে এই জন্মমৃত্যু চক্র থেকে মুক্ত হবার জন্য মনুষ্যদেহ প্রদান করেন। কিন্তু মনুষ্যদেহ লাভ করে তার মনে ভোগ-বাসনার কামনা (মাথা চুলকানি) সৃষ্টি হয়, যার ফলে মানুষ পরমাত্মার শরণ

না নিয়ে সাংসারিক পদার্থ সংগ্রহ এবং তার সুখ আস্বাদনে ব্যাপৃত হয়। এইভাবে সাংসারিক ভোগের মধ্যেই তার মৃত্যু হয় এবং সে স্বর্গ-নরকাদি যোনিগুলির চক্রে আবর্তিত হয়। এইরূপে বারংবার সে জন্মাতে থাকে—এই হল মৃত্যুরূপ সংসার-পথে ফেরা।

জীব স্বয়ং সাক্ষাৎ পরমাত্মার অংশ ; সুতরাং পরমাত্মাই হলেন এই জীবের প্রকৃত গৃহ। জীব যখন পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করে, তখনই সে তার প্রকৃত স্থান (ঘর) প্রাপ্ত হয়। তার আর সেখান থেকে ফিরতে হয় না অর্থাৎ গুণাদির পরবশ হয়ে আর জন্ম পরিগ্রহ করতে হয় না—গীতায় নানাস্থানে এ-কথা বলা আছে ; যেমন—**'ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন'** (৪।৯) ; **'গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিম্'** (৫।১৭) ; **'যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে'** (৮।২১) ; **'যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ'** (১৫।৪) ; **'যদ্গত্বা ন নিবর্তন্তে'** (১৫।৬) ইত্যাদি। শ্রুতিও বলেছেন—**'ন চ পুনরাবর্ততে ন চ পুনরাবর্ততে'** (ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৪।১৫।১)।

বিশেষ কথা

মানুষের মনে প্রায়ই এ-কথা গভীরভাবে গেঁথে রয়েছে যে আমরা সংসারী মানুষ, আমাদের জন্মাতে এবং মরতে হবে, এখানেই থাকতে হবে ইত্যাদি। কিন্তু এ-কথা একেবারেই ভুল। কারণ আমরা সকলেই পরমাত্মার অংশ, পরমাত্মার স্বজাতীয়, তাঁর সাথী এবং পরমাত্মার ধামেরই বাসিন্দা। আমরা সকলে এই জগতে এসেছি বটে কিন্তু আমরা এই জগৎ-সংসারের নই। কারণ জগতের সবকিছুই জড়, পরিবর্তনশীল, কিন্তু আমরা স্বয়ং চেতন এবং আমাদের (স্বয়ং-এ) কখনো কোনো পরিবর্তন হয় না। অনেক জন্ম পার হলেও আমরা স্বয়ং নিত্য-নিরন্তর একই থাকি—**'ভূতগ্রামঃ স এবায়ম্'** (৮।১৯) এবং যেমনকার তেমনই থাকি।

সংসারের সঙ্গে আমাদের সংযোগ এবং পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের বিয়োগ হওয়া কখনো সম্ভব নয়। আমরা যদি স্বর্গে যাই বা নরকে যাই অথবা চুরাশী লক্ষ যোনিতে যাই বা মনুষ্য যোনিতে যাই, তবুও আমাদের কখনো পরমাত্মার সঙ্গে বিচ্ছেদ হয় না বা তাঁর সঙ্গচ্যুতি হয় না। ভগবান সর্বযোনিতেই আমাদের সঙ্গে থাকেন। কিন্তু মনুষ্যেতর জন্মে বিবেক জাগ্রত না থাকায় আমরা পরমাত্মাকে চিনতে পারি না। পরমাত্মাকে জানার সুযোগ এই মনুষ্যদেহেই পাওয়া যায়। কারণ ভগবান কৃপা করে মানুষকে এমন শক্তি ও যোগ্যতা প্রদান করেছেন যে সে সৎসঙ্গ, বিচার, স্বাধ্যায় ইত্যাদির সাহায্যে বিবেককে জাগ্রত করে পরমাত্মাকে জানতে সক্ষম হয়, তাঁকে লাভ করতে পারে। তাই ভগবান এখানে বলেছেন যে, এই প্রাণীরা যখন মনুষ্যদেহ লাভ করেছে, তখন তাদের উচিত আমাকে প্রাপ্ত হওয়া এবং 'আমরা ভগবানের ও ভগবানই আমাদের' এই সত্যটিও তাদের উপলব্ধ হওয়া উচিত। কিন্তু তারা এসব না করে, আমার প্রতি শ্রদ্ধা-বিশ্বাস না রেখে, আমাকে প্রাপ্ত না হয়ে সংসাররূপ মৃত্যুর পথে পড়ে থাকে—এটি অত্যন্ত দুঃখের ও আশ্চর্যের কথা।

সংসারে আসা এবং চুরাশী লক্ষ যোনিতে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ানো আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এই দেশ, গ্রাম, আত্মীয়, অর্থ, পদার্থ, শরীর ইত্যাদি কোনো কিছুই আমাদের নয় এবং আমরাও এগুলির নই। এই সমস্ত কিছুই অপরা প্রকৃতি আর আমরা হলাম পরা প্রকৃতি। কিন্তু ভ্রমবশতঃ আমরা নিজেদের এখানকার নিবাসী বলে মনে করি। এটি দূর করতে হবে। কারণ আমরা ভগবানের অংশ এবং তাঁর ধামের অধিবাসী। যেখানে গেলে আর ফিরে আসতে হয় না, সেখানে যাওয়াই আমাদের একমাত্র কর্তব্য। জন্ম-মৃত্যুরহিত হওয়াই আমাদের আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু আমরা নিজেদের ঘরে ফেরা, নিজেদের জিনিসকেই লাভ করা, কষ্টসাধ্য বলে মনে করে রেখেছি। প্রকৃতপক্ষে এটি কঠিন নয়। কঠিন তো সংসারের পথ, যাকে নতুন করে ধরতে হয়, যার জন্য নতুন দেহধারণ করতে হয়, নতুন-নতুন কর্ম করতে হয় আর সেইসব কর্মের ফল ভোগ করার জন্য নতুন নতুন লোকে, নতুন নতুন যোনিতে জন্ম নিতে হয়। ভগবানকে লাভ করা তো সহজ ; কারণ তিনি সর্বদেশে, সর্বকালে, সকল বস্তুতে, সব ব্যক্তিতে, সব ঘটনায় সকল পরিস্থিতিতে বিরাজিত এবং সকলই তাঁতে অবস্থিত। আমরা সর্বক্ষণই ভগবানের সঙ্গে আছি এবং তিনিও সর্বক্ষণ আমাদের সঙ্গে অবস্থান করছেন। আমরা তাঁর থেকে এবং তিনি আমাদের থেকে কখনো পৃথক্ হতে পারেন না।

তাৎপর্য হল এই যে, আমরা এই জন্ম-মৃত্যু জর্জরিত জগৎ-সংসারের নই। এটি আমাদের স্বস্থান নয়, আমরাও এই স্থানের নই। এস্থানের বস্তুসামগ্রী কিছুই আমাদের নয়, আমরাও এই বস্তুসামগ্রীর নই। এই সব আত্মীয়-বান্ধব আমাদের নয়, আমরাও এদের কেউ নই। আমরা তো কেবল ভগবানের আর ভগবানই আমাদের।

পরিশিষ্ট-ভাব—আগের শ্লোকে কথিত বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের মহিমাতে যাঁরা শ্রদ্ধাযুক্ত নন, তাঁরা এর থেকে লাভবান হতে পারেন না, তাঁরা বিনাশশীল ভোগাদিতে গুরুত্ব দিয়ে তাতেই ব্যাপৃত থাকেন। তাই তাঁরা ভগবানকে প্রাপ্ত না করে বারংবার জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হতে থাকেন, স্বতঃপ্রাপ্ত অমরত্বের পথ পরিত্যাগ করে মৃত্যুর পথে চলতে থাকেন।

'অপ্রাপ্য মাম্' কথাটি বলার অর্থ হল মনুষ্যদেহই ভগবদ্প্রাপ্তির পক্ষে উপযুক্ত, ভগবদ্প্রাপ্তির সে খুবই সন্নিকট, কিন্তু শ্রদ্ধাযুক্ত না হওয়ায় মানুষ ভগবদ্প্রাপ্তি না করে জগতের আবর্তে আবর্তিত হয়। যা নিত্য বর্তমান, তাকে না মেনে, যা একমুহূর্তও স্থায়ী হয় না, তাকেই আপন মনে করে। তাদের অন্তর এতটাই অশুদ্ধ যে ভগবানের প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখেও তারা তাঁকে শ্রদ্ধা করে না। যেমন—সৎসঙ্গ, কীর্তন ইত্যাদিতে প্রত্যক্ষভাবে বৈশিষ্ট্য অনুভব করলেও তারা তাতে বিশেষভাবে মন দেয় না। প্রিয় ব্যক্তির মৃত্যু হলে বা কোনো অপ্রিয় ঘটনা ঘটলে তাদের সংসারে বৈরাগ্য আসে বটে, কিন্তু সে সেই বৈরাগ্য ধরে রাখে না। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশীতে বিক্রম সম্বৎ ২০৫২ (ইংরাজি ২১.৯.৯৫) বর্ষে সারা বিশ্বে ভগবান শ্রীগণেশ প্রতিমার দুধ পান করার ঘটনা লোকে প্রত্যক্ষ দর্শন করেছিল। কিন্তু নিজেদের বুদ্ধিমান বলে মনে করা কিছু ব্যক্তি এই প্রত্যক্ষ বাস্তব ঘটনাতেও শ্রদ্ধাবান হয়নি বরং খবরের কাগজ, টেলিভিশন ইত্যাদির মাধ্যমে এই ঘটনারও গুরুত্ব খণ্ডন করেছিল। কৌরব সভাতেও যখন দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণের চেষ্টা চলছিল, তখন শাড়ির স্তূপ জমেছিল তবুও দুঃশাসন তাঁর সমস্ত শাড়ি খুলে নিতে পারেনি। এতো বড়ো আশ্চর্যজনক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেও কৌরবদের চেতনা হয়নি! তাই যাদের বুদ্ধি তামসিক, অশুদ্ধ (১৮।৩২), তাদের ওপর এরূপ বিশেষ ঘটনার কোনো প্রভাব পড়ে না, শ্রদ্ধা আসে না। তারা সবকিছুতেই বিপরীত দেখে। এরূপ শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি অমরত্বের পথ পরিত্যাগ করে মৃত্যুর পথে চলতে থাকে, যে পথে শুধুই মৃত্যু বিরাজ করে। তারা সেই পথেই চলে, যে পথে কখনোই ভগবদ্প্রাপ্তি করা সম্ভব নয়।

অপরাকে ধরে থাকলেই মানুষ মৃত্যুর পথে চলতে থাকে। যদি সে অপরাকে না ধরে, যিনি অপরার প্রভু—সেই ভগবানকেই ধরে থাকে তাহলে সে চিরকালের মতো জন্ম-মৃত্যু চক্র থেকে মুক্তিলাভ করে। মানুষ ইহ-জন্মেই মুক্ত হতে সক্ষম হয় এবং মুক্তিরও শ্রেষ্ঠ ভগবানের প্রেম (ভক্তি) প্রাপ্ত করতে সক্ষম হয়। কিন্তু ভগবানের থেকে এমন যোগ্যতা, অধিকার পাওয়া সত্ত্বেও মানুষ মৃত্যুর পথে চলতে থাকে। তাই ভগবান দুঃখের সঙ্গে বলেছেন—**'অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি'** এবং **'মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্'** (১৬।২০)। এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে মনুষ্যজন্মই কল্যাণ লাভ করার প্রকৃষ্ট সময়। মানুষ যদি নিজের কল্যাণ করতে চায় তাহলে ধর্মগ্রন্থ, মহাত্মা, জগৎ-সংসার, ভগবান—সকলেই তাকে সাহায্য করে থাকেন।

* * *

সম্বন্ধ—এই অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে যে রাজবিদ্যার মহিমা বলা হয়েছে, পরবর্তী দুটি শ্লোকে তার বর্ণনা করা হয়েছে।

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেম্ববস্থিতঃ॥ ৪ ॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥ ৫ ॥

[**ইদম্** (এই) ; **সর্বম্** (সমগ্র) ; **জগৎ** (জগতে) ; **ময়া** (আমি) ; **অব্যক্তমূর্তিনা** (অব্যক্ত স্বরূপে) ; **ততম্** (পরিব্যাপ্ত) ; **সর্বভূতানি** (সমস্ত প্রাণী) ; **মৎস্থানি** (আমাতে অবস্থিত) ; **চ** (কিন্তু) ; **অহম্** (আমি) ; **তেষু** (সেসবে) ; **ন, অবস্থিত** (অবস্থিত নই) ; **চ** (এবং) ; **ভূতানি** (প্রাণীরাও) ; **মৎস্থানি** (আমাতে অবস্থিত) ; **ন** (নয়) ; **মে** (আমার) ; **ঐশ্বরম্ যোগম্** (ঐশ্বরিক যোগ) ; **পশ্য** (দর্শন করো) ; **ভূতভাবনঃ** (সকল প্রাণীর উৎপাদক) ; **চ** (এবং) ; **ভূতভৃৎ** (তাদের ধারক ও পোষক) ; **মম** (আমার) ; **আত্মা** (স্বরূপ) ; **ভূতস্থঃ** (ওই সকল প্রাণীতে) ; **ন** (নয়।)]

সমস্ত জগতে আমি অব্যক্তস্বরূপে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছি। সমস্ত প্রাণী আমাতে অবস্থিত। কিন্তু আমি সে সবে অবস্থিত নই এবং ওই প্রাণীরাও আমাতে অবস্থান করে না—আমার এই ঐশ্বরিক যোগ (সামর্থ্য) দর্শন করো। সকল প্রাণীর উৎপাদক এবং তাদের ধারক ও পোষক হলেও আমার স্বরূপ ওইসব প্রাণীতে অবস্থিত নয় ॥ ৪-৫ ॥

ব্যাখ্যা—**'ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা'**—মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে জ্ঞান হয়, তা হল ভগবানের ব্যক্তরূপ আর যা মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়ের গোচর নয় অর্থাৎ মন ইত্যাদি যাকে জানতে পারে না, তা হল ভগবানের অব্যক্ত-রূপ। ভগবান এখানে **'ময়া'** পদের দ্বারা ব্যক্ত (সাকার) স্বরূপ এবং **'অব্যক্তমূর্তিনা'** পদ দ্বারা অব্যক্ত (নিরাকার) স্বরূপ সম্বন্ধে বলেছেন। এর তাৎপর্য হল যে ভগবান ব্যক্ত এবং অব্যক্ত—উভয় রূপেই বিরাজিত। এইভাবে এখানে ভগবানের ব্যক্ত-অব্যক্ত (সাকার-নিরাকার) বলার গূঢ় তাৎপর্য হল সমগ্ররূপের বর্ণনায় অর্থাৎ সগুণ-নির্গুণ, সাকার-নিরাকার ইত্যাদির প্রভেদ তো সম্প্রদায়গুলিকে ধরে হয়, পরমাত্মা প্রকৃতপক্ষে এক। সগুণ-নির্গুণ ইত্যাদি একই পরমাত্মার পৃথক্ পৃথক্ বিশেষণ, ভিন্ন ভিন্ন নাম।

গীতায় যেখানে সৎ-অসৎ, দেহ-দেহীর বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে জীবের প্রকৃত স্বরূপের জন্য বলা হয়েছে—**'যেন সর্বমিদং ততম্'** (২।১৭)। কারণ জীব সাক্ষাৎ পরমাত্মার অংশ হওয়ায় পরমাত্মাবৎ সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত অর্থাৎ পরমাত্মার সঙ্গে সে অভেদ। যেখানে সগুণ-নিরাকারের উপাসনা বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে বলেছেন—**'যেন সর্বমিদং ততম্'** (৮।২২)। যেখানে কর্মের দ্বারা ভগবানের পূজনের কথা বলেছেন সেখানেও বলেছেন—**'যেন সর্বমিদং ততম্'** (গীতা ১৮।৪৬)। এইগুলির সমন্বয় করার জন্যই ভগবান এখানে বলেছেন—**'ময়া ততমিদং সর্বম্'**।

'মৎস্থানি সর্বভূতানি'—সকল প্রাণীই আমাতে অবস্থিত অর্থাৎ পরা-অপরা প্রকৃতিরূপ সমস্ত জগৎই আমাতে অবস্থিত। এরা আমাকে ভিন্ন থাকতে পারে না। কারণ সমস্ত প্রাণীই আমা হতে উৎপন্ন হয়, আমাতেই অবস্থান করে আবার আমাতেই লীন হয়ে যায়, অর্থাৎ তাদের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়রূপে যা কিছু ঘটে থাকে, তা সব আমা হতেই হয়। অতএব এইসব প্রাণী আমাতেই স্থিত।

'ন চাহং তেম্ববস্থিতঃ'—ভগবান প্রথমে দুটি কথা বলেছিলেন—এক, **'ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্ত-মূর্তিনা'** এবং দ্বিতীয়, **'মৎস্থানি সর্বভূতানি'**। ভগবান এবার এই দুটি কথার বিপরীত দুটি কথা বলেছেন।

প্রথম কথার (আমি সমস্ত জগতে অবস্থিত) বিরুদ্ধে এখানে বলেছেন যে আমি ওইগুলিতে অবস্থিত নই। কারণ আমি যদি ওইগুলিতে অবস্থান করতাম, তাহলে ওইগুলিতে যে পরিবর্তন হয়, সেগুলি আমাতেও হত। সেগুলি নাশ হলে আমারও নাশ হত এবং ওইগুলির অভাব হলে আমাতেও অভাব হত। তাৎপর্য হল এই যে ওইগুলির পরিবর্তন, নাশ এবং অভাব হয়, কিন্তু আমাতে কখনো বিন্দুমাত্র বিকৃতি হয় না। আমি ওইগুলিতে সর্বভাবে ব্যাপ্ত হয়েও নির্লিপ্ত থাকি, সেগুলির থেকে আমি সর্বতোভাবে সম্পর্করহিত। আমি নির্বিকার অবস্থায় নিজের মধ্যে নিজেই অবস্থান করি।

প্রকৃতপক্ষে 'আমি ওইগুলিতে অবস্থিত'—এরূপ বলার তাৎপর্য হল যে আমার সত্তা থেকেই এদের সত্তা হয়। আমি যদি এদের মধ্যে না থাকতাম, তবে জগতের অস্তিত্বই হত না। জগতের অস্তিত্ব আমার সত্তাতেই বিধৃত। তাই বলা হয়েছে আমি ওইগুলিতে অবস্থিত।

'ন চ মৎস্থানি ভূতানি'[১]—ভগবান এবার দ্বিতীয় কথাটির (সমস্ত প্রাণী আমাতে অবস্থিত) বিরুদ্ধ কথা এখানে বলেছেন যে এই প্রাণীরা আমাতে অবস্থিত নয়। কারণ এরা যদি আমাতে অবস্থান করত তাহলে আমি যেমন নিরন্তর নির্বিকাররূপে একইভাবে অবস্থান করি, জগৎও তেমনি একইভাবে নির্বিকাররূপে বিরাজ করত। আমার কোনো উৎপত্তি ও বিনাশ নেই, তাই জগতেরও উৎপত্তি বা বিনাশ হবার কথা নয়। একটি স্থানে আছি, অন্য স্থানে নেই, এক কালে আছি, অন্য কালে নেই, একটি ব্যক্তির মধ্যে আছি, আরেক জনের মধ্যে নেই—আমার মধ্যে এইরকম পরিচ্ছিন্নতা (বিভাগ) নেই, অতএব জগতেও এরূপ পরিচ্ছিন্নতা হবার কথা নয়। তাৎপর্য হল যে আমার মধ্যে যেমন নির্বিকারত্ব, নিত্যত্ব, ব্যাপকত্ব, অবিনাশীভাব ইত্যাদি আছে, সেইরকম ওইসব প্রাণীরও হত। কিন্তু এরূপ হয় না। আমার স্থিতি নিরন্তর থাকে আর তাদের স্থিতি নিরন্তর থাকে না। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে তারা আমাতে অবস্থিত নয়।

এখন উপরিউক্ত বিধিপূরক ও নিষেধপূরক চারপ্রকার কথা অন্য রীতিতে এইভাবে বুঝতে হবে। জগতে পরমাত্মা আছেন এবং পরমাত্মাতে জগৎ অবস্থিত । আবার পরমাত্মা জগতে নেই আর জগৎ পরমাত্মাতে অবস্থিত নয়। যেমন ঢেউকে যদি অস্তিত্বসম্পন্ন বলে মনে করা হয় তবে ঢেউয়ে জল আছে এবং জলে ঢেউ আছে। কারণ জল ছাড়া ঢেউ থাকতে পারে না। ঢেউ জল থেকেই উৎপন্ন, জলেই থাকে আর জলেই লীন হয়ে যায়। সুতরাং ঢেউয়ের আধার ও আশ্রয়ই হল জল। জল ছাড়া তার কোনো পৃথক্ অস্তিত্ব নেই। তাই ঢেউয়ে জল এবং জলে ঢেউ থাকে। তেমনই জগৎকে অস্তিত্বসম্পন্ন বলে মানলে জগতে পরমাত্মা আছেন এবং পরমাত্মায় জগৎ অবস্থিত। কারণ পরমাত্মা বিনা জগৎ হতেই পারে না। জগৎ পরমাত্মা হতে উৎপন্ন, পরমাত্মাতেই অবস্থিত আর পরমাত্মাতেই লীন হয়ে যায়। পরমাত্মা ব্যতিরেকে জগতের কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্বই নেই। তাই জগতে পরমাত্মা আছেন অর্থাৎ পরমাত্মাতেই জগতের অবস্থান।

ঢেউ উৎপত্তি ও বিনাশশীল হওয়ায় এবং জল ছাড়া তার অন্য পৃথক্ অস্তিত্ব না থাকায় যদি ঢেউয়ের অস্তিত্ব না মানা হয়, তাহলে ঢেউয়েও জল নেই বা জলেও ঢেউ নেই বলতে হবে অর্থাৎ শুধু জলই আছে এবং জলই ঢেউরূপে প্রতিভাত হচ্ছে। তেমনই জগৎ উৎপন্ন ও বিনাশশীল হওয়ায় এবং পরমাত্মা ছাড়া তার পৃথক্ অস্তিত্ব না থাকায় যদি জগতের অস্তিত্ব না মানা হয়, তাহলে জগতে পরমাত্মা নেই এবং পরমাত্মাতেও জগৎ নেই অর্থাৎ শুধু পরমাত্মাই আছেন এবং তিনিই জগৎরূপে প্রতিভাত হচ্ছেন। তাৎপর্য হল এই যে তত্ত্বতঃ যেমন এক জলই আছে, ঢেউ নেই তেমনই তত্ত্বতঃ একমাত্র পরমাত্মাই বিরাজিত, জগৎ-সংসার কিছুই নেই—**'বাসুদেবঃ সর্বম্'** (৭।১৯)।

কার্য-কারণের দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যায় যে মাটির তৈরি যত বাসন আছে সেই সবগুলিতেই মাটি আছে, কেন-না সেগুলি মাটির দ্বারা তৈরি, সেগুলি মাটিতে থাকে এবং মাটিতেই লয় হয়ে যায়। অর্থাৎ মাটির বাসনের আধারই হল মাটি। তাই বাসনে মাটি এবং মাটিতে বাসন থাকে। কিন্তু প্রকৃতভাবে দেখলে বাসনে মাটি বা মাটিতে বাসন নেই। যদি বাসনে মাটি থাকত তাহলে বাসন নষ্ট হলে মাটিও নষ্ট হত। কিন্তু মাটি নষ্ট হয় না। অতএব মাটি মাটিতেই থাকে অর্থাৎ তা নিজেতেই স্থিত থাকে। এইভাবে যদি মাটিতে বাসন থাকে তবে মাটি থাকলে বাসনের সবসময় স্থায়ী থাকা উচিত। কিন্তু বাসন তো চিরকাল থাকে না। তাই মাটিতে বাসন নেই। তেমনই সংসারে পরমাত্মা এবং পরমাত্মাতে সংসার অবস্থিত হলেও সংসারে পরমাত্মা এবং পরমাত্মাতে সংসার নেই। কারণ সংসারে যদি পরমাত্মা থাকেন তাহলে সংসার লয় পেলে পরমাত্মাও লয় পাবেন। কিন্তু পরমাত্মার লয় হয় না, অতএব সংসারে পরমাত্মা নেই। পরমাত্মা আপনাতেই অবস্থিত। এইভাবে পরমাত্মাতেও সংসার নেই। যদি পরমাত্মাতে সংসার থাকত তবে পরমাত্মার সঙ্গে জগৎ-সংসারও চিরস্থায়ী

---

[১]'ন চ মৎস্থানি ভূতানি' কথাটির অপর ভাব হল যে, এইসব প্রাণী নিজেরা আমাতে অবস্থিত বলে মনে করে না বরং তারা মনে করে যে, তারা প্রকৃতিতে অবস্থিত। তাই তারা আমাতে অবস্থিত নয়।

হত। কিন্তু সংসার চিরস্থায়ী নয়। অতএব পরমাত্মাতে জগৎ-সংসার অবস্থিত নয়।

যেমন, কেউ যদি হরিদ্বারের কথা স্মরণ করে তাহলে সে মনে মনে 'হর কি পৌড়ি' দেখতে থাকে—মধ্যস্থলে ঘণ্টাঘর—দু'পাশ দিয়ে গঙ্গা বহমান—সিঁড়িতে লোকেরা স্নান করছে—জলে মাছ লাফালাফি করছে, হরিদ্বারের এইসব কথাই তার মনে উদয় হয়। তাই হরিদ্বারের সবকিছুই (পাথর, জল, মানুষ, মাছ ইত্যাদি) হল মন। কিন্তু যেই চিন্তা পরিত্যাগ করা হয়, তখনই মনে আর হরিদ্বার থাকে না, শুধু মন-ই অবস্থান করে। এইরূপই পরমাত্মা **'বহু স্যাং প্রজায়েয়'** সংকল্প করেছেন আর জগৎ-সংসার প্রকটিত হয়ে গিয়েছে। এই জগৎ-সংসারের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে পরমাত্মাই বিরাজমান এবং জগৎ পরমাত্মাতেই অবস্থিত । কারণ পরমাত্মাই জগৎরূপে প্রকটিত হয়েছেন। কিন্তু পরমাত্মা যখন সংকল্প পরিত্যাগ করেন, তখন আর জগৎ থাকে না, কেবল পরমাত্মাই বিরাজ করেন।

তাৎপর্য হল এই যে, পরমাত্মা আছেন এবং সংসার আছে—এই দৃষ্টিতে দেখলে সংসারে পরমাত্মা আছে এবং পরমাত্মায় সংসার আছে। কিন্তু তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে দেখলে সংসারে পরমাত্মা নেই এবং পরমাত্মাতে সংসার নেই; কেন-না সেখানে জগৎ-সংসারের স্বতন্ত্র কোনো অস্তিত্বই নেই কেবল পরমাত্মাই বিরাজিত— **'বাসুদেবঃ সর্বম্'**। এই হল জীবন্মুক্তদের, ভক্তদের অনুভূতি।

'পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্'[১]—আমি সমস্ত জগতে এবং সমস্ত জগৎ আমাতে থেকেও, সমস্ত জগৎ আমাতে নেই এবং আমিও জগতে নেই অর্থাৎ আমি জগৎ-সংসারে সর্বতোভাবে নির্লিপ্ত, নিজেই নিজের মধ্যে স্থিত—আমার এই ঈশ্বরীয় যোগকে অর্থাৎ প্রভাবকে (সামর্থ্য) অনুধাবন করো। তাৎপর্য হল এই যে আমি এক হয়েও বহুরূপে প্রতিভাত হই এবং বহুরূপে দৃষ্ট হলেও আমি একই থাকি অর্থাৎ শুধু আমি—আমিই রয়েছি।

'পশ্য' ক্রিয়াটির দুটি অর্থ হয়—জানা এবং দেখা। বুদ্ধির দ্বারা জানা যায় এবং দেখা যায় চক্ষুর সাহায্যে। ভগবানের যোগ (প্রভাব) জানবার কথা এখানে উল্লিখিত হয়েছে এবং সেটি দেখার কথা একাদশ অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে উদ্ধৃত হয়েছে।

'ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ'—আমার যে স্বরূপ, তা সমস্ত প্রাণীর উৎপাদক, সবকিছুর ধারক এবং তাদের ভরণ ও পোষণকারক। কিন্তু আমি ওই সমস্ত প্রাণীতে অবস্থিত নই অর্থাৎ আমি তাদের আশ্রিত নই এবং সেগুলিতে লিপ্ত নই। এই কথাই ভগবান পঞ্চদশ অধ্যায়ের সপ্তদশ শ্লোকে জানিয়ে বলেছেন যে ক্ষর (জগৎ) এবং অক্ষর (জীবাত্মা)—উত্তম পুরুষ এই উভয় হতেই ভিন্ন, তাঁকে পরমাত্মা বলা হয় এবং তিনি সর্ব চরাচরে ব্যাপ্তিস্বরূপ হয়ে সকলের ভরণ-পোষণ করেন এবং সকলকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

তাৎপর্য এই যে আমি যেমন সকলের উৎপাদক হয়ে এবং সকলের ভরণ-পোষণকারী হয়েও অহং-মমত্ববোধ বর্জিত, সকলের মধ্যে অবস্থান করেও তাদের আশ্রিত নই, সেগুলির থেকে সর্বতোভাবে নির্লিপ্ত ; তেমনই মানুষ যেন আত্মীয়-স্বজনের ভরণ-পোষণ করে এবং সকলের সবকিছু ঠিকমতো সংরক্ষণ করেও তাদের প্রতি অহং-মমত্ববোধ না রাখে এবং যে কোনো দেশ, কাল, পরিস্থিতিতে অবস্থান করেও নিজেকে তাদের আশ্রিত বলে মনে না করে অর্থাৎ যেন সর্বতোভাবে নির্লিপ্ত থাকে।

ভক্তের কাছে যে কোনো পরিস্থিতি আসুক, ঘটনা ঘটুক, মনে যে কোনো সঙ্কল্প-বিকল্প আসুক—সবকিছুকে তার ভগবানের লীলা বলে মনে করা উচিত। ভগবান স্বয়ং কখনো উৎপত্তির লীলা, কখনো স্থিতির লীলা আবার কখনো সংহারের লীলা করে থাকেন। এই জগৎ-সংসারের সবই স্বরূপতঃ ভগবানেরই স্বরূপ এবং এতে যা পরিবর্তন ঘটে, তা সবই ভগবানের লীলা—এইভাবে সর্বত্র এবং সবকিছুতে ভগবান এবং তার লীলা দেখে ভক্তকে সবসময় প্রসন্ন থাকতে হয়।

---

[১]এখানে 'যোগ' শব্দটি 'যুজ্ সংযমনে' ধাতু থেকে তৈরি হয়েছে । কারণ সমস্ত জগৎকে ভগবানই সংযত (নিয়মন) করেন। এমনিতে যমও পাপ-পুণ্য অনুসারে প্রাণীদের সংযত করেন, কিন্তু তিনি শুধু ইহলোকের প্রাণীদেরই সংযত করে থাকেন। কিন্তু ভগবান অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে এবং তাতে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে নিযুক্ত যমরাজাদেরও সংযত করে থাকেন। এই সংযত করার শক্তির নামই এখানে হল যোগ, সামর্থ্য, প্রভাব। এই যোগ, সামর্থ্য, প্রভাব পূর্ণভাবে শুধুমাত্র ভগবানেই থাকে।

মর্মার্থ

'সবকিছুই পরমাত্মা'—এই কথাটি খুব গভীরভাবে চিন্তা করলে সাধকের এটি যথার্থভাবে অনুভূত হয়। যথার্থভাবে অনুভব হওয়ার মাপকাঠি হল যে যদি কেউ তার প্রশংসা করে বলে যে 'আপনার সিদ্ধান্ত যথাযথ' ইত্যাদি, তবে তাতে তার নিজের শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব হবে না। সংসারে কেউ শ্রদ্ধা বা অবহেলা করুক— সাধকের উপর তার কোনো প্রভাব পড়বে না। যদি কেউ বলে যে 'জগৎ নেই শুধু পরমাত্মা আছেন—এ হল আপনার নিছক কল্পনা, আর কিছু নয়' ইত্যাদি, তাহলে এইসব সমালোচনায় সাধকের অপ্রীতি আসবে না। পরমাত্মাকে প্রমাণ করার জন্য উদাহরণ দেবার বা প্রমাণ খোঁজার কোনো ইচ্ছাই তাঁর হওয়া উচিত নয় বা কখনো এমন ভাবও হওয়া উচিত নয় যে 'এটি আমার সিদ্ধান্ত, আমার মত, এটি আমি ঠিক বুঝেছি' ইত্যাদি। নিজ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে লোকে যা-ই প্রমাণিত করুক, তাহলেও নিজের সিদ্ধান্তের কোনো ন্যূনতা যেন অনুভূত না হয় বা নিজের মধ্যে কোনো বিকার যেন না আসে। নিজের প্রকৃত অনুভূতি স্বাভাবিকরূপে যেন সদা-সর্বদা অটল ও অখণ্ডরূপে বজায় থাকে। এই বিষয়ে পর্যালোচনার চিন্তা যেন তার মনেই না জাগে।

পরিশিষ্ট-ভাব—'ময়া ততমিদং সর্বম্' কথাটির অর্থ হল বরফে জলের ন্যায় জগতে অস্তিত্ব ('আছে') রূপে এক সম, শান্ত, সদ্‌ঘন, চিদ্‌ঘন, আনন্দঘন পরমাত্মতত্ত্ব পরিপূর্ণ হয়ে আছে। যা প্রতিমুহূর্তে ক্ষয় হচ্ছে, সেই জগৎ-সংসারের পৃথক্ কোনোই অস্তিত্ব নেই। অজ্ঞানতার জন্য জগতের যে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রতিভাত হয়, তাও পরমাত্মতত্ত্বের অস্তিত্বের জন্যই হয়ে থাকে। যখন সবেতেই এক অখণ্ড সত্তাই পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান তখন তাতে আমি, তুমি, সে, ও—এই চারটি বিভাগ কী করে হয় ? অহংবোধ ও মমত্ববোধ কী নিয়ে হবে ? রাগ-দ্বেষ কীভাবে আসে ? যার কোনো অস্তিত্বই নেই, সেগুলি দূর করার অভ্যাসই বা কেমন করে হবে ?

ভগবান **'মৎস্থানি সর্বভূতানি'**র জন্য **'ন চ মৎস্থানি ভূতানি'** পদটি বলেছেন এবং **'ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা'**র জন্য **'ন চাহং তেম্ববস্থিতঃ'** পদটি বলেছেন। সাধকগণ যদি পরমাত্মা এবং জগৎ সংসারকে দুটি রূপে মনে করেন তাহলে তাদের পরমাত্মাতে জগৎ-সংসার এবং জগৎ-সংসারে পরমাত্মা অবস্থিত—এরূপ মনে করা উচিত (গীতা ৬।৩০)। কিন্তু যদি এই দুই ভাব না থাকে তাহলে পরমাত্মাতেও জগৎ নেই জগতেও পরমাত্মা নেই বরং সর্বত্রই একই পরমাত্মা বিরাজমান থাকেন।

জীবই জগৎকে পৃথক্ অস্তিত্ব প্রদান করেছে—**'যয়েদং ধার্যতে জগৎ'** (গীতা ৭।৫)। অহংভাব, মমত্ববোধ এবং কামনার জন্যই জগতের পৃথক্ অস্তিত্ব ভাসিত হয়। তাই যতক্ষণ অহংভাব, মমত্ববোধ এবং কামনা থাকে, ততক্ষণ (সাধকের দৃষ্টিতে) পরমাত্মাতে জগৎ এবং জগতে পরমাত্মা অবস্থিত বলে বোধ হয়। কিন্তু অহংবোধ, মমতা ও কামনা দূর হলে (সিদ্ধের দৃষ্টিতে) পরমাত্মাতেও জগৎ অবস্থিত নয় এবং জগতেও পরমাত্মা অবস্থিত নয় অর্থাৎ শুধু পরমাত্মাই থাকেন—**'বাসুদেবঃ সর্বম্'**।

পরমাত্মাতে জগৎ, জগতে পরমাত্মা—এ হল 'জ্ঞান' আর পরমাত্মাতে জগৎ নেই আর জগতে পরমাত্মা নেই অর্থাৎ পরমাত্মা ব্যতীত আর কিছু নেই—এ হল 'বিজ্ঞান'।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে যে যতক্ষণ সাধকের দৃষ্টিতে জগতের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে, ততক্ষণ তিনি যেন নিজের ব্যবহারের দ্বারা ভগবদ্‌বুদ্ধিতে প্রাণীদের উপাসনা করেন[১]। কিন্তু যখন তাঁর দৃষ্টিতে জগতের কোনো অস্তিত্ব থাকে না অর্থাৎ শুধুমাত্র ভগবানই থাকেন, তখন 'সবই ভগবান'—এই চিন্তা থেকেও নিবৃত্ত হতে হয়[২]।

---

[১]যাবৎ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভাবো নোপজায়তে। তাবদেবমুপাসীত বাঙ্‌মনঃকায়বৃত্তিভিঃ।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২৯।১৭)

'যতক্ষণ সমস্ত প্রাণীতে আমার ভাব অর্থাৎ 'সব কিছুই ভগবান' এরূপ প্রকৃতভাব না জাগে, ততক্ষণ মন, বাক্য এবং দেহের সমস্ত বৃত্তির দ্বারা আমার উপাসনা করতে থাকা উচিত।'

[২]সর্বং ব্রহ্মাত্মকং তস্য বিদ্যয়াঽঽত্মমনীষয়া। পরিপশ্যন্নুপরমেৎ সর্বতো মুক্তসংশয়ঃ।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২৯।১৮)

'ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ'—ভগবান সকল প্রাণীকে সৃষ্টি করেন **'অহং সর্বস্য প্রভবঃ'** (গীতা ১০।৮), **'অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ'** (গীতা ৭।৬)। সেইসব প্রাণীর ভরণ-পোষণও ভগবানই করে থাকেন— **'যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ'** (গীতা ১৫।১৭)। সকল প্রাণীকে সৃষ্টি এবং তাদের ভরণ-পোষণ করলেও ভগবান তাতে লিপ্ত বা আসক্ত হন না এবং তাদের আশ্রয়ও গ্রহণ করেন না সেইসব প্রাণীতে অবস্থানও করেন না। তাই ওই সকল প্রাণী এবং পদার্থতে আসক্ত হলে ভগবানের প্রাপ্তি হয় না।

প্রকৃতপক্ষে এক চিন্ময় সত্তা ব্যতীত জড়ত্বের কোনো অস্তিত্বই নেই—**'নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ'** (গীতা ২।১৬)। জড়ত্বের (জগৎ-সংসারের) অস্তিত্ব, গুরুত্ব এবং সম্বন্ধ কেবলমাত্র কামনার (ভোগেচ্ছার) কারণেই হয়ে থাকে। সুতরাং যতক্ষণ সুখের ইচ্ছা থাকে ততক্ষণ এই জগৎ-সংসার বিদ্যমান থাকে।

যাঁরা পরমাত্মাতে জগৎ-সংসারকে দেখেন অর্থাৎ জগৎকে পরমাত্মারূপে না দেখে জগৎ-সংসাররূপে (জড়) দেখেন, তাঁরা নাস্তিক। কিন্তু যাঁরা জগৎ-সংসারে পরমাত্মাকে দেখেন অর্থাৎ জগৎ-সংসারকে সংসাররূপে না দেখে পরমাত্মারূপে (চিন্ময়) দেখেন, তাঁরা আস্তিক।

*** *** ***

সম্বন্ধ—ভগবান এবার আগের দুটি শ্লোকে কথিত বিষয়টি দৃষ্টান্ত সহযোগে স্পষ্ট করে বলছেন।

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্।
তথা সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়॥ ৬ ॥

[**সর্বত্রগঃ** (সর্বত্র বিচরণশীল) ; **মহান্** (মহা) ; **বায়ুঃ** (বায়ু) ; **যথা** (যেমন) ; **নিত্যম্** (নিত্য) ; **আকাশ-স্থিতঃ** (আকাশেই অবস্থিত) ; **তথা** (তেমনই) ; **সর্বাণি** (সমস্ত) ; **ভূতানি** (প্রাণী) ; **মৎস্থানি** (আমাতে অবস্থিত) ; **ইতি উপধারয়** (তুমি এটি মেনে নাও।)]

সর্বত্র বিচরণশীল মহাবায়ু যেমন নিত্য আকাশেই অবস্থিত, তেমনই সমস্ত প্রাণী আমাতে অবস্থিত— তুমি এটি মেনে নাও ॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা—**'যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্'**—যেমন সর্বত্র বিচরণশীল বায়ু নিত্য আকাশেই অবস্থান করে অর্থাৎ কোথাও নিঃস্পন্দভাবে, কোথাও সামান্য ক্রিয়াশীলভাবে, কোথাও বা বেগের সঙ্গে প্রবাহিত হয়। কিন্তু যে কোনো ভাবেই হোক, বায়ু আকাশ থেকে কখনো পৃথক্ হতে পারে না। বায়ু কখনো থেমে গেছে বা কখনো বহমান আছে মনে হলেও তা আকাশেই অবস্থান করে, আকাশ ব্যতিরেকে তা কোথাও অবস্থান করতে পারে না। এইরূপই ত্রিলোক এবং চতুর্দশ ভুবনে অবস্থানকারী সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম প্রাণী ও পদার্থ আমাতেই অবস্থান করে—**'তথা সর্বাণী ভূতানি মৎস্থানি'**।

ভগবান চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শ্লোকের মধ্যে তিনবার **'মৎস্থানি'** শব্দটির প্রয়োগ করেছেন। এর তাৎপর্য হল যে, এইসব প্রাণী আমাতেই অবস্থিত। আমাকে পরিত্যাগ করে এরা কোথাও যেতে সমর্থ নয়। এই প্রাণীগন প্রকৃতি বা তার কার্যাদির সঙ্গে যতই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক করুক, তবুও তারা প্রকৃতি ও তার কার্যাদির সঙ্গে এক হয়ে যেতে পারে না ; আর নিজেকে আমার থেকে যতই পৃথক্ বলে মনে করুক, আমার থেকে কখনো পৃথক্ হতে পারে না।

বায়ুকে আকাশে নিত্যস্থিত বলার তাৎপর্য হল যে, বায়ু আকাশ হতে কখনো পৃথক্ হতে পারে না, বায়ুর এমন কোনো শক্তি নেই যে সেটি আকাশকে পরিত্যাগ করবে ;

'পূর্বোক্ত সাধনাকারী ভক্তের 'সবই পরমাত্মস্বরূপ' এরূপ স্থির বিশ্বাস হয়। তখন তিনি এই অধ্যাত্মবিদ্যার (ব্রহ্মবিদ্যার) সাহায্যে সর্বপ্রকার সংশয়রহিত হয়ে সর্বত্র পরমাত্মাকে বিশেষভাবে অনুভব করে মুক্ত হন অর্থাৎ 'সবই পরমাত্মা' এই চিন্তাও আর থাকে না, সাক্ষাৎ পরমাত্মাকেই দর্শন করতে থাকেন।'

কারণ আকাশের সঙ্গে তার সর্বদা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অর্থাৎ অভিন্নতা বর্তমান। বায়ু আকাশের কার্য এবং কার্য সর্বদা কারণের সঙ্গে অভিন্ন হয়। কার্যটিকে শুধুমাত্র কার্যের দৃষ্টিতে দেখলে কারণ হতে ভিন্ন বলে প্রতীয়মান হয় ; কিন্তু কারণের থেকে কার্যের পৃথক্ অস্তিত্ব হয় না। যখন কার্য কারণে লীন হয় , তখন কার্য কারণে প্রাগভাবরূপে অর্থাৎ অপ্রকটরূপে থাকে, উৎপন্ন হলে কার্য ভাবরূপে অর্থাৎ প্রকটরূপে থাকে এবং লীন হয়ে গেলে কার্য প্রধ্বংসাভাবে অর্থাৎ কারণরূপে থাকে। কার্যের প্রধ্বংসাভাব সর্বদা থাকে, এর কখনো নাস্তি হয় না ; কারণ সেটিই কারণরূপ হয়ে যায়। এই রীতিতে বায়ু আকাশ থেকেই উৎপন্ন হয়, আকাশেই অবস্থান করে এবং আকাশেই লীন হয়ে যায় অর্থাৎ বায়ুর পৃথক্ সত্তা না থেকে শুধু আকাশই থেকে যায়। জীবাত্মাও এইরূপ পরমাত্মা থেকে প্রকটিত হয়, পরমাত্মাতেই স্থিত থাকে এবং পরমাত্মাতেই লীন হয়ে যায় অর্থাৎ জীবাত্মার স্বতন্ত্র সত্তা না থেকে কেবল পরমাত্মা-ই থেকে যান।

বায়ু যেমন গতিশীল অর্থাৎ সব জায়গায় বিচরণ করে, এই জীবাত্মা তেমন গতিশীল নয়। কিন্তু যখন সে গতিশীল প্রকৃতির কার্য শরীরের সঙ্গে একাত্ম (আমিত্ব) করে নেয়, তখন শরীরের গতি তার নিজের গতি বলে প্রতীয়মান হয়। গতিশীলতা প্রতীয়মান হলেও সে সর্বদা পরমাত্মাতেই অবস্থান করে। তাই দ্বিতীয় অধ্যায়ের চব্বিশতম শ্লোকে ভগবান জীবাত্মাকে নিত্য, সর্বগত, অচল, স্থাণু এবং সনাতন বলে জানিয়েছেন। শরীরগুলির গতিশীলতার জন্যই এখানে জীবাত্মাকে 'সর্বগত' বলা হয়েছে। অর্থাৎ এটি সর্বত্র বিচরণশীল বলে দেখালেও এটি অচল এবং স্থাণু। এটি স্থির স্বভাবসম্পন্ন, এতে নড়াচড়া করার কোনো ক্রিয়া নেই। তাই ভগবান এখানে বলেছেন যে, সমস্ত প্রাণীই অটলরূপে সর্বদা আমাতে অবস্থিত।

তাৎপর্য হল এই যে ত্রিলোক ও চতুর্দশ ভুবনে বিচরণশীল জীবদের পরমাত্মা থেকে ভিন্ন লেশমাত্র পৃথক্ অস্তিত্ব নেই এবং তা হতেও পারে না অর্থাৎ নানা যোনি পরিভ্রমণ করলেও এগুলি নিত্য-নিরন্তর পরমাত্মার সচ্চিদানন্দ-স্বরূপেই অবস্থান করে। কিন্তু প্রকৃতির কার্যাদির সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করায় জীব এটি অনুভব করতে পারে না। মানুষ যদি এই শরীরের সঙ্গে একাত্মতা না করে, আমিত্ব বোধ না করে তবে সে অসীম আনন্দ অনুভব করতে সক্ষম হয়। তাই ভগবান মানুষকে সজাগ করে বলেছেন যে তুমি সর্বদাই আমাতে অবস্থিত, তাহলে আমার প্রাপ্তি লাভের জন্য পরিশ্রম বা বিলম্ব কেন হবে? আমাতে নিজস্থিতি না মানায় এবং যথার্থতত্ত্ব অনুভব না হওয়াতেই আমার থেকে দূরত্ব প্রতীত হয়।

'ইতি উপধারয়'—এই কথা তুমি বিশেষভাবে জেনে রাখ, মেনে নাও যে, সর্গের (সৃষ্টির) সময় হোক বা প্রলয়ের সময় হোক, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত প্রাণী সর্বদা আমাতেই অবস্থিত ; তাদের স্থিতি আমা হতে পৃথক্ হওয়া কখনো সম্ভব নয়। এটি দৃঢ়ভাবে মেনে নিলে প্রকৃতির কার্যে বিমুখতা আসবে এবং প্রকৃত তত্ত্ব অনুভূত হবে।

এই প্রকৃত তত্ত্ব অনুভব করার জন্য সাধকের দৃঢ়তার সঙ্গে মেনে নিতে হয় যে, যিনি সব দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদিতে সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ, সেই পরমাত্মাই আমার স্বরূপ। দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি কেউই আমার নয়, আমিও তাদের নই।

বিশেষ কথা

সকল জীব ভগবানেই অবস্থিত। ভগবানে অবস্থান করলেও জীবের দেহে উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের ক্রম চলতে থাকে। কারণ সব দেহই পরিবর্তনশীল আর এই জীব স্বয়ং অপরিবর্তনশীল। এই জীবের পরমাত্মার সঙ্গে তাত্ত্বিক ঐক্য স্বতঃসিদ্ধ । কিন্তু জীব যখন পরমাত্মা হতে বিমুখ হয়ে শরীরের সঙ্গে তার ঐক্য মেনে নেয় তখন তার 'আমি' ভাবের এই স্বতন্ত্র অস্তিত্বের ধারণা হয় যে 'আমি শরীর'। এই 'আমি'-ভাবে একটি পরমাত্মার অংশ ও অপরটি প্রকৃতির অংশ—এই হল জীবের স্বরূপ। জীব তো পরমাত্মার অংশ কিন্তু সে প্রকৃতির অংশকে আঁকড়ে ধরে থাকে।

'আমি' ভাবের মধ্যে যেটি প্রকৃতির অংশ তা স্বতঃই প্রকৃতির দিকে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু প্রকৃতির অংশের সঙ্গে তাদাত্ম্য হওয়ায় পরমাত্মার অংশ জীব সেই আকর্ষণকে নিজের আকর্ষণ বলে মনে করে আর 'আমার সুখ লাভ হোক, অর্থ লাভ হোক, ভোগ-বাসনা চরিতার্থ হোক'—এইরূপ ভাব পোষণ করে। এরূপ ভাব পোষণ করায় সে পরমাত্মা হতে বিশেষভাবে বিমুখ হয়। তার মনে 'সর্বদা সাংসারিক সুখ লাভ হোক, পদার্থাদির প্রাপ্তি হোক, শরীর চিরকাল যেন থাকে'—এরূপ যে ইচ্ছা থাকে তা

প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মার সঙ্গে থাকার আকাঙ্ক্ষা ; কারণ তার নিত্য সম্পর্ক তো পরমাত্মার সঙ্গেই।

জীব দেহের সঙ্গে যতই ওতপ্রোত হোক না কেন, পরমাত্মার প্রতি তার আকর্ষণ কখনো দূর হয় না আর তা হবার সম্ভাবনাও নেই। 'আমি সর্বদা থাকব, সর্বদা সুখী হব এবং সর্বোৎকৃষ্ট সুখ লাভ হবে'—এরূপ যে আকর্ষণ, তা বাস্তবে পরমাত্মার প্রতিই আকর্ষণ, কিন্তু তার এই ভুল হয় যে, সে (জড়-অংশের প্রাধান্যবশতঃ) এই সর্বোচ্চ সুখ জড় হতেই প্রাপ্ত করার বাসনা করে। সে ভ্রমক্রমে সেই সুখের আকাঙ্ক্ষা করে, যার ওপর তার অধিকার নেই। যদি সে সজাগ ও সতর্ক হয় এবং 'ভোগে কোনো সুখ নেই, কোনো ভোগই আজ পর্যন্ত টিকে থাকেনি, বা থাকা সম্ভবও নয়'—এরূপ বুঝে নেয় তাহলে তার সাংসারিক সংযোগজনিত সুখের ইচ্ছা দূর হয় এবং প্রকৃত, সর্বোত্তম, নিত্যস্থিত সুখের ইচ্ছা, (যেটি তার প্রকৃত আবশ্যকতা) জাগ্রত হয়। এই আবশ্যকতা যেমন যেমন জাগ্রত হতে থাকে বিনাশশীল পদার্থে বিমুখতাও তেমনি সৃষ্ট হতে থাকে। বিনাশশীল পদার্থগুলি থেকে সর্বতোভাবে বিমুখ হলে 'আমার স্থিতি অনাদিকাল হতে পরমাত্মাতেই'—এই তত্ত্ব অনুভূত হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব—বায়ু যেমন আকাশে উৎপন্ন হয়ে আকাশেই অবস্থান করে এবং আকাশেই লীন হয়ে যায় অর্থাৎ আকাশ ছাড়া বায়ুর কোনো পৃথক্ অবস্থান বা অস্তিত্ব নেই, তেমনই সমস্ত প্রাণী ভগবান হতেই উৎপন্ন হয়, ভগবানেই অবস্থান করে এবং ভগবানেই লীন হয়ে থাকে অর্থাৎ ভগবান ছাড়া প্রাণীদের কোনো পৃথক্ অস্তিত্ব নেই—এই কথাটি যদি সাধক দৃঢ়তার সঙ্গে স্বীকার করে নেন, তাহলে তাঁর 'সব কিছু ভগবান' এই প্রকৃত তত্ত্বটি অনুভূত হয়।

এই শ্লোকটিকে বোঝার জন্য কার্য-কারণভাব যেমন উপযুক্ত, বিবর্তবাদ সেরূপ নয়। 'বিবর্ত' কথাটির অর্থ হল—বিরুদ্ধ ব্যবহার অর্থাৎ যা নেই অথচ আছে বলে মনে হয়, যেমন দড়িতে সাপ বলে ভ্রম হওয়া—একে বলে বিবর্তবাদ। বিবর্তবাদে দুটি অস্তিত্ব থাকা প্রয়োজন, যেমন দড়ি আর তা দেখার চোখ—এই দুইয়ের পৃথক্ পৃথক্ (ব্যবহারিক এবং প্রতিভাসিক) অস্তিত্ব হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু গীতার এই শ্লোকটিতে আকাশ এবং বায়ুর দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, যে দুটির অস্তিত্ব (ব্যবহারিক) একই। অর্থাৎ দড়িতে সাপের ন্যায় আকাশে বায়ু অধ্যস্ত নয় অথবা আকাশে বায়ু প্রতীতিমাত্র নয়, বায়ু আকাশেরই কার্য। প্রকৃতপক্ষে কার্য কারণের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে থাকে অর্থাৎ কার্য ও কারণের একই সত্তা হয়, যেমন সোনা এবং তার গহনা—দুইয়ের একই সত্তা। অতএব যেমন সোনা ও গহনা—দুইয়েতেই তত্ত্বতঃ একই সোনা থাকে, তেমনই পরমাত্মা এবং সকল প্রাণী—দুইয়েতেই তত্ত্বতঃ একই পরমাত্মা বিরাজমান। এই কথাটি ভগবান গীতায় **'বাসুদেবঃ সর্বম্'** (৭।১৯) এবং **'সদসচ্চাহম্'** (৯।১৯) পদগুলির দ্বারা বলেছেন, যা গীতার প্রকৃত সিদ্ধান্ত। বিবর্তবাদ কোনো সিদ্ধান্ত নয়, এটি হল জগতের সত্যত্ববুদ্ধি দূর করার এক প্রকার সাধন।

যদি বায়ু স্পন্দিত হয় তাহলে বায়ুতে আকাশ আছে এবং আকাশে বায়ু আছে। আর যদি বায়ু স্পন্দনশীল না হয় তাহলে বায়ুতে আকাশ নেই আর আকাশেও বায়ু নেই অর্থাৎ তখন শুধুমাত্র আকাশই বিরাজ করে। বিপরীতক্রমে, যতক্ষণ বায়ুর পৃথক্ সত্তাকে মানা হয়, ততক্ষণ আকাশে বায়ু আর বায়ুতে আকাশ থাকে। কিন্তু তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে দেখলে আকাশেও বায়ু নেই আর বায়ুতেও আকাশ নেই অর্থাৎ শুধু আকাশই আছে। এইরূপ তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে পরমাত্মাতে প্রাণী নেই আর প্রাণীতেও পরমাত্মা নেই, শুধুমাত্র পরমাত্মাই বিরাজমান (গীতা ৯।৪-৫)।

এই শ্লোকে বায়ুকে বোঝাতে দুটি পদ ব্যবহৃত হয়েছে—**'সর্বত্রগঃ'** এবং **'মহান্'**। এর দ্বারা বুঝতে হবে যে জীবাত্মাও জাগতিক দৃষ্টিতে (প্রকৃতির সম্বন্ধে) চুরাশী লক্ষ জন্ম, ত্রিলোক, চতুর্দশ ভুবন ইত্যাদিতে পরিভ্রমণ করায় **'সর্বত্রগঃ'** হয়। **'মহান্'** পদটির দ্বারা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবকে (জীব সমুদায়) বুঝতে হবে। বায়ু যেমন নিত্য আকাশেই অবস্থান করে অর্থাৎ বায়ুর যেমন আকাশের সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ, তেমনই জীবমাত্রেরই পরমাত্মার সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ (নিত্যযোগ) রয়েছে।

*** *** ***

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে সমস্ত প্রাণীই তাঁতে অবস্থিত, কিন্তু মহাসর্গ এবং মহাপ্রলয়ে প্রাণীদের অবস্থিতির বর্ণনা করা বাকি ছিল। অতএব পরবর্তী দুটি শ্লোকে তার বর্ণনা করছেন।

সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্॥ ৭ ॥

[কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয় !) ; কল্পক্ষয়ে (কল্পগুলি সমাপ্ত হলে) ; সর্বভূতানি (সকল প্রাণী) ; মামিকাম্ (আমার) ; **প্রকৃতিম্** (প্রকৃতিকে) ; যান্তি (প্রাপ্ত হয়) ; কল্পাদৌ (কল্পগুলির প্রারম্ভে) ; অহম্ (আমি) ; পুনঃ (আবার) ; তানি (তাদের) ; বিসৃজামি (সৃষ্টি করি।)]

হে কৌন্তেয় ! কল্পগুলি সমাপ্ত হলে মহাপ্রলয়ের সময় সমস্ত প্রাণী আমার প্রকৃতিতে এসে লয় হয়ে যায় এবং কল্পগুলির প্রারম্ভে মহাসর্গের সময় আমি আবার তাদের সৃষ্টি করি ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা—'সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্ কল্পক্ষয়ে'—সমস্ত প্রাণী আমারই অংশ এবং সর্বদা আমাতেই অবস্থিত থাকে। কিন্তু এরা প্রকৃতির সঙ্গে এবং প্রকৃতির কার্য শরীর ইত্যাদির সঙ্গে একাত্মতা (আমি-আমার সম্পর্ক) করে যে কর্মই করে, সেই কর্ম এবং তার ফলের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক যুক্ত হয়ে যায়। সেইজন্য তারা বারংবার জন্মায় ও মৃত্যুবরণ করতে থাকে। যখন মহাপ্রলয়ের সময় আসে (ব্রহ্মার শত বছর আয়ু পূর্ণ হলে যখন তিনি লীন হয়ে যান) তখন প্রকৃতির বশীভূত এই সমস্ত প্রাণী প্রকৃতিজনিত সম্পর্কগুলি নিয়ে অর্থাৎ নিজ নিজ কর্মসহ আমার প্রকৃতিতে লীন হয়ে যায়।

মহাসর্গের সময় প্রাণীদের যে স্বভাব থাকে, সেই স্বভাব নিয়েই তারা মহাপ্রলয়ে লীন হয়ে যায়।

'পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্'—মহাপ্রলয়ে নিজ নিজ কর্মসহ প্রকৃতিতে লীন হওয়া প্রাণীগণের কর্ম যখন পরিপক্ক হয়ে ফল প্রদানের জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে, তখন প্রভুর মনে **'বহু স্যাং প্রজায়েয়'** এই সংকল্পের উদয় হয়। মহাসর্গ এভাবেই আরম্ভ হয়। অষ্টম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে তাই বলা হয়েছে—**'ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসজ্ঞিতঃ'** অর্থাৎ সমস্ত প্রাণীর যে স্ব-অস্তিত্ব অর্থাৎ প্রকট করার জন্য ভগবানের যে সংকল্প, তাকেই বিসর্গ (ত্যাগ) বলা হয় এবং সেটিই হল আদিকর্ম। চতুর্দশ অধ্যায়ে একেই **'গর্ভং দধাম্যহম্'** (১৪।৩) এবং **'অহং বীজপ্রদঃ পিতা'** (১৪।৪) বলা হয়েছে।

তাৎপর্য হল এই যে, কল্পের আদিতে অর্থাৎ মহাসর্গের আরম্ভে ব্রহ্মা প্রকটিত হলে আমি (ভগবান) পুনরায় প্রকৃতিতে লীন, প্রকৃতির বশীভূত ওইসব জীবের তাদের কর্ম অনুসারে নির্দিষ্ট যোনিতে সম্পর্ক স্থাপন করে দিই—এই হল আমার দ্বারা তাদের সৃষ্টি করা। একথাই ভগবান চতুর্থ অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে বলেছেন—**'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ'** অর্থাৎ আমা দ্বারাই গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুযায়ী চারটি বর্ণ সৃষ্ট হয়েছে।

ব্রহ্মার একদিনকে বলা হয় 'কল্প', যা মানুষের এক হাজার চতুর্যুগের সমান হয়ে থাকে, ব্রহ্মার একটি রাতও এই একই সময়ের অবধিযুক্ত হয়। এই হিসাবে ব্রহ্মার আয়ু একশ বছর হয়। ব্রহ্মার আয়ু শেষ হলে তিনি যখন লীন হন, সেই মহাপ্রলয়ের সময়কে এখানে **'কল্পক্ষয়ে'** পদের দ্বারা বলা হয়েছে। ব্রহ্মা যখন পুনরায় প্রকটিত হন, সেই মহাসর্গের সময়কে **'কল্পাদৌ'** পদে বলা হয়েছে।

'সর্বভূতানি প্রকৃতিং যান্তি'—মহাপ্রলয়ে জীব স্বয়ং প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হয় এবং **'তানি কল্পাদৌ বিসৃজামি'** মহাসর্গের আরম্ভে আমি তাদের রচনা করি—এখানে এই দুই প্রকারের ক্রিয়া ব্যবহারের তাৎপর্য হল যে প্রকৃতি ক্রিয়াশীল হওয়ায় সেটি স্বতঃই লয়ের দিকে অগ্রসর হয় অর্থাৎ ক্রিয়া করতে করতে ক্লান্তি হলে প্রকৃতি পরমাত্মাতে লয় পায়। এরূপ প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় প্রাণীগণও মহাপ্রলয়ের সময় প্রকৃতিতে লীন হয় এবং প্রকৃতি পরমাত্মাতে লীন হয়। মহাসর্গের আরম্ভে তাদের পরিপক্ক কর্মের ফল প্রদান করে তাদের পবিত্র করার জন্য আমি তাদের শরীর সৃষ্টি করি, তবে সেই প্রাণীদেরই সৃষ্টি করি যারা প্রকৃতির বশীভূত। যেমন বাড়ি তৈরি করলেও, তা কালক্রমে ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়ে যায়, তেমনই ভগবান জগৎ রচনা করলেও ধীরে ধীরে তা প্রলয়ের দিকে যেতে থাকে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে প্রকৃতির কার্য (জগৎ-সংসার ও শরীর) সৃষ্টিতে ভগবানের হাত থাকলেও, প্রকৃতির কার্যাদি ধ্বংসের দিকে স্বতঃই অগ্রসর হয়।

তেমনই ভগবানের অংশ হওয়ায় জীব স্বতঃ ভগবানের দিকে, উত্থান-পথে যায়। কিন্তু যখন সে কামনা-বাসনা-মমতা করে স্বতঃ পতনের দিকে গমনকারী বিনাশশীল শরীর ও সংসারের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নেয়, তখন সে পতনের পথে চলে যায়। তাই মানুষের নিজ বিবেককে প্রাধান্য দিয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজ উদ্ধার করা উচিত অর্থাৎ কামনা-বাসনা-মমতা পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র ভগবানের শরণাগত হওয়া উচিত।

পরিশিষ্ট-ভাব—জগৎ সৃষ্টিতে তিনটি ব্যাপার হল প্রধান—উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয়। সাধকের দৃষ্টি জগতের স্থিতির দিকে থাকে, তাই প্রথমে আগের শ্লোকে স্থিতির কথা বলে ভগবান এবার এই শ্লোকে উৎপত্তি এবং প্রলয়ের কথা বলছেন। অর্থাৎ উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয়—এই তিনটিই সমগ্র পরমাত্মাতে হয়ে থাকে।

প্রকৃতপক্ষে জগতের কোনো স্থিতিই নেই, আসলে উৎপত্তি আর প্রলয়ের প্রবাহকেই স্থিতি বলা হয়। তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যায় যে জগতের উৎপত্তিও নেই, শুধু প্রলয়ই প্রলয় অর্থাৎ কিছুই নেই। অতএব জগতে প্রলয়, অ-ভাব অর্থাৎ বিয়োগই প্রধান—**'নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ'** (গীতা ২।১৬)।

※ ※ ※

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥ ৮ ॥

[**প্রকৃতেঃ** (প্রকৃতির) ; **বশাৎ** (অধীন) ; **অবশম্** (পরাভূত) ; **ইমম্** (এই) ; **কৃৎস্নম্** (সমগ্র) ; **ভূতগ্রামম্** (প্রাণীসমূহকে) ; **স্বাম্** (নিজের) ; **প্রকৃতিম্** (প্রকৃতিকে) ; **অবষ্টভ্য** (বশীভূত করে) ; **পুনঃ, পুনঃ** (বারংবার) ; **বিসৃজামি** (সৃষ্টি করি।)]

প্রকৃতির পরবশ এই সমগ্র প্রাণীগণকে আমি (কল্পগুলির আদিতে) নিজ প্রকৃতিকে বশীভূত করে বারংবার সৃষ্টি করি ॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা—**'ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ'**—'প্রকৃতি' শব্দটি এখানে ব্যষ্টি প্রকৃতির বাচক। মহাপ্রলয়ের সময় সকল প্রাণীই নিজ ব্যষ্টি প্রকৃতিতে (কারণ শরীরে) লীন হয়ে যায়, ব্যষ্টি প্রকৃতি সমষ্টি প্রকৃতিতে এবং সমষ্টি প্রকৃতি পরমাত্মাতে লীন হয়ে যায়। কিন্তু যখন মহাসর্গের সময় আসে তখন জীবগণের কর্মসমূহ ফল প্রদানের জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে। সেই উন্মুখতার জন্যই ভগবানে **'বহু স্যাং প্রজায়েয়'** (ছান্দোগ্য. ৬।২।৩)—এই সংকল্প হয়, যার ফলে সমষ্টি প্রকৃতিতে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। যেমন, দইকে মন্থন করলে তার থেকে মাখন ও ঘোল দুটি জিনিস উৎপন্ন হয়, মাখন ওপরে ভেসে ওঠে আর ঘোল নীচে থেকে যায়। এখানে মাখন হল সাত্ত্বিক, ঘোল তামসিক এবং মন্থনরূপ ক্রিয়া হল রাজসিক। এইরূপই ভগবানের সংকল্পে প্রকৃতি আলোড়িত হলে, প্রকৃতিতে সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক—তিনটি গুণ উৎপন্ন হয়। এই তিনটি গুণে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল—তিন লোক উৎপন্ন হয়, তিনলোকেও নিজ নিজ গুণ, কর্ম ও স্বভাব অনুযায়ী সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক জীব উৎপন্ন হয় অর্থাৎ এদের মধ্যে কেউ সত্ত্ব-প্রধান, কেউ রজঃ-প্রধান আবার কেউ তমঃ-প্রধান হয়।

চতুর্দশ অধ্যায়ের তৃতীয়-চতুর্থ শ্লোকেও এই মহাসর্গের বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে পরমাত্মার প্রকৃতিকে 'মহদ্‌ব্রহ্ম' বলা হয়েছে এবং পরমাত্মার অংশ জীবগণের নিজ নিজ গুণ, কর্ম ও স্বভাব অনুযায়ী প্রকৃতির সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ করানোকে 'বীজ স্থাপন করা' বলা হয়েছে।

এই জীবগণ মহাপ্রলয়ের সময় প্রকৃতিতে লীন হয়, অর্থাৎ তত্ত্বতঃ প্রকৃতির কার্য প্রকৃতিতেই লীন হয় এবং পরমাত্মার অংশ—চেতন সমুদায়, পরমাত্মাতে লীন হয়। কিন্তু সেই চেতন সমুদায় নিজ নিজ গুণ এবং কর্মের সংস্কারসহ পরমাত্মাতে লীন হয়, তাই পরমাত্মাতে লীন হলেও তারা মুক্ত হয় না। যদি লীন হওয়ার আগে তারা গুণাদি পরিত্যাগ করত, তাহলে পরমাত্মাতে লীন হলে তারা চিরতরে মুক্তিলাভ করত, জন্ম-মৃত্যু বন্ধন থেকে মুক্ত হত। সেই গুণগুলি পরিত্যাগ না করার

জন্যই তাদের মহাসর্গের আদিতে পৃথক্ পৃথক্ শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন হয় অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ যোনিতে জন্ম হয়।

পৃথক্ পৃথক্ যোনিতে জন্ম নেওয়ার কারণই হল এই চেতন সমুদায়ের ব্যষ্টি প্রকৃতি অর্থাৎ গুণ, কর্ম ইত্যাদিতে মেনে নেওয়া স্বভাবের পরবশতা। অষ্টম অধ্যায়ের উনিশতম শ্লোকে যে পরবশতার কথা বলা হয়েছে, তাও ব্যষ্টিপ্রকৃতির পরবশতা। তৃতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে যে অবশতার কথা বলা হয়েছে, তা জীবিতকালের পরবশতা। তিনলোকেই এই পরবশতা বিদ্যমান। চতুর্দশ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে এই পরবশতাকেই গুণাদির পরবশতার রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

'প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য'—প্রকৃতি পরমাত্মার এক অনির্বচনীয় অলৌকিক বিশেষ শক্তি। এটিকে পরমাত্মার থেকে পৃথক্‌ও বলা যায় না আবার পরমাত্মার থেকে অভিন্নও বলা যায় না। এইরূপ নিজ প্রকৃতিকে অঙ্গীকার করে মহাসর্গের প্রারম্ভে পরমাত্মা প্রকৃতির পরবশ থাকা জীবদের সৃষ্টি করেন।

পরমাত্মা প্রকৃতির সহযোগেই সৃষ্টি রচনা করেন, প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে নয়। কারণ সৃষ্টিতে যা কিছু পরিবর্তন হয়, উৎপত্তি ও বিনাশ হতে দেখা যায়, তা সবই প্রকৃতিতে হয়, ভগবানে নয়। তাই ভগবান এই ক্রিয়াশীল প্রকৃতির দ্বারাই সৃষ্টি রচনা করেন। এতে ভগবানের কোনো অসামর্থ্য, পরাধীনতা, অভাব, শক্তিহীনতা বা অন্য কোনো কিছুই কারণ নয়।

মানুষ যখন কোনো কাজ করে, সেগুলি সে নানা করণ, উপকরণ, ইন্দ্রিয় এবং বৃত্তির সাহায্যে করে, এটি মানুষের দুর্বলতা নয়, বরং এটি তার এই সব করণ, উপকরণ ইত্যাদির উপর আধিপত্য থাকা বোঝায়। সে এগুলির দ্বারা কর্ম সম্পন্ন করে। (তবে মানুষের এই দুর্বলতা রয়েছে যে সে ওই কর্মগুলি নিজের এবং নিজের জন্য মনে করে, যার ফলে সে ওই কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে অর্থাৎ অধিপতি হয়েও সেগুলির বশ হয়ে যায়)। তেমনই ভগবানের দ্বারা প্রকৃতি সহযোগে সৃষ্টি রচনাদি কর্মে প্রকৃতির ওপর তাঁর আধিপত্যই প্রমাণিত হয়। কিন্তু আধিপত্য থাকলেও ভগবান এতে লিপ্ত হন না।

'বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ[১]'—এইস্থানে **'বি'** উপসর্গসহ **'সৃজামি'** ক্রিয়া ব্যবহারের তাৎপর্য হল এই যে ভগবান যে জীবসকল সৃষ্টি করেন, তারা নানাপ্রকারের কর্ম সম্পন্নকারী হয়। তাই ভগবান তাদের নানাভাবে তৈরি করেন অর্থাৎ স্থাবর-জঙ্গম, স্থূল-সূক্ষ্ম ইত্যাদি ভৌতিক শরীরের মধ্যেও কেউ মৃত্তিকাপ্রধান, কেউ তেজপ্রধান, কেউ বায়ুপ্রধান ইত্যাদি নানাপ্রকারের শরীরবিশিষ্ট হয়, এ-সবই ভগবান সৃষ্টি করেন।

এখানে একটি কথা বোঝবার হল যে, ভগবান সেইসব জীবদের সৃষ্টি করেন, যারা ব্যষ্টি প্রকৃতির সঙ্গে 'আমি' ও 'আমার' সম্পর্ক স্থাপন করে প্রকৃতির বশীভূত হয়েছে। ব্যষ্টি প্রকৃতির বশীভূত হওয়াতেই জীবগণ সমষ্টি প্রকৃতির পরবশ হয়। প্রকৃতির পরবশ না হলে তাদের মহাসর্গে আর জন্ম হয় না।

পরিশিষ্ট-ভাব—তত্ত্বতঃ প্রকৃতি ও ভগবান অভিন্ন। সুতরাং ভগবানের সমগ্র স্বরূপ হল প্রকৃতি-সহ। ভগবানকে প্রকৃতি-বর্জিত বলে মনে করা হল তাঁকে পরিচ্ছিন্ন করা, যা কখনো সম্ভব নয়।

'অবশং প্রকৃতের্বশাৎ'—পরা প্রকৃতি অর্থাৎ স্বস্বরূপ সর্বতোভাবে স্বতন্ত্র (স্বস্থ)। বিজাতীয় অপরা প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করাতেই তা পরতন্ত্রে (প্রকৃতিস্থ) পরিণত হয়েছে, নতুবা তা কখনোই পরতন্ত্র হত না। গুণাদির সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়াই পরাধীনতা—**'কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু'** (গীতা ১৩।২১)।

যা প্রকৃতির বশীভূত (অবশ), সেই প্রাণীদেরই ভগবান বারংবার সৃষ্টি করেন। যাঁরা প্রকৃতির বশে (অবশ হয়ে) নেই, তাঁদের সৃষ্টি হয় না—**'সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ'** (গীতা ১৪।২)।

❋ ❋ ❋

[১]এখানে (ষষ্ঠ, সপ্তম এবং অষ্টম শ্লোকে) 'বিসৃজামি' পদের দ্বারা উৎপত্তির, 'মৎস্থানি' পদের দ্বারা স্থিতির এবং 'প্রকৃতিং যান্তি মামিকাং কল্পক্ষয়ে' পদের দ্বারা প্রলয়ের বর্ণনা করা হয়েছে।

সম্বন্ধ—আসক্তি ও কর্তৃত্বাভিমানসহ কর্ম করলে মানুষ কর্মে আবদ্ধ হয়। ভগবান বারংবার সৃষ্টি রচনারূপ কর্ম করলেও কেন আবদ্ধ হন না ? পরবর্তী শ্লোকে ভগবান তার উত্তর দিচ্ছেন।

ন চ মাং তানি কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্মসু॥ ৯ ॥

[**ধনঞ্জয়** (হে ধনঞ্জয় !) ; **তেষু** (এই) ; **কর্মসু** (কর্মে) ; **অসক্তম্** (অনাসক্ত) ; **চ** (এবং) ; **উদাসীনবৎ** (উদাসীনের মতো) ; **আসীনম্** (থাকায়) ; **তানি** (এই) ; **কর্মাণি** (কর্মসকল) ; **মাম্** (আমাকে) ; **ন, নিবধ্নন্তি** (আবদ্ধ করে না।)]

হে ধনঞ্জয় ! এই সৃষ্টি রচনাদি কর্মে আমি অনাসক্ত এবং উদাসীনের মতো থাকায় এই কর্মসকল আমাকে আবদ্ধ করে না ॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা—'উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্মসু'—মহাসর্গের আরম্ভে প্রকৃতির বশীভূত প্রাণীদের কর্ম অনুযায়ী নানাপ্রকার সৃষ্টিরূপ যে কর্ম, তাতে আমার আসক্তি নেই। কারণ আমি তাতে উদাসীনের ন্যায় বিরাজ করি অর্থাৎ প্রাণীদের উৎপত্তিতে আমি আনন্দিত হই না এবং তারা প্রকৃতিতে লীন হলেও আমি বিষণ্ন হই না।

এখানে **'উদাসীনবৎ'** পদে যে **'বৎ'** (বতি) প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়েছে, তার অর্থ হল **'মতো'**। তাই এই পদটির অর্থ হল উদাসীনের মতো। ভগবান কেন নিজেকে উদাসীনের মতো বলেছেন ? কারণ মানুষ সেই বস্তুর প্রতিই উদাসীন হয়, যে বস্তুর সত্তা সে মেনে থাকে। কিন্তু যে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয় হয়, তার ভগবান ছাড়া আর কোনো পৃথক্ অস্তিত্বই নেই। তাই ভগবান সেই জগতের সৃষ্টিরূপ কর্মে উদাসীন কী করে থাকবেন ? তিনি তাই উদাসীন নয়, উদাসীনের মতো থাকেন। কারণ তাঁর দৃষ্টিতে জগতের কোনো অস্তিত্ব নেই। তাৎপর্য হল এই যে প্রকৃতপক্ষে এ-সবই ভগবানের স্বরূপ, এর কোনো পৃথক্ অস্তিত্বই নেই, তাই ভগবান নিজ স্বরূপের প্রতি কীভাবে উদাসীন থাকবেন ? তাই ভগবান উদাসীনের মতো থাকেন।

'ন চ মাং তানি কর্মাণি নিবধ্নন্তি'—আগের শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে আমি প্রাণীসকলকে বারংবার সৃষ্টি করি, সেই সৃষ্টিরূপ কর্মকেই এখানে **'তানি'** বলা হয়েছে। এই কর্মসকল আমাকে আবদ্ধ করে না। কারণ ওই সকল কর্ম এবং তাদের ফলের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই—এই বলে ভগবান প্রত্যেক মানুষকেই শিক্ষা দিচ্ছেন অর্থাৎ কর্ম-বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার যুক্তি দেখিয়ে বলছেন যে, আমি যেমন কর্মে আসক্ত না হওয়ায় আবদ্ধ হই না, তেমনই তোমরাও কর্মে ও তার ফলে আসক্তি রেখো না, তাহলে সমস্ত কর্ম করলেও তোমরা তাতে আবদ্ধ হবে না। যদি তোমরা কর্মে এবং তার ফলে আসক্ত হও, তাহলে তোমাদের দুঃখ পেতে হবে এবং বারংবার জন্মাতে ও মরতে হবে। কারণ কর্মের আরম্ভ ও শেষ থাকে এবং ফলও উৎপন্ন হয়ে বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তাই কর্মফলে আকাঙ্ক্ষা থাকায় মানুষ তাতে আবদ্ধ হয়। অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা হল এই যে কর্ম এবং তার ফল চিরস্থায়ী থাকে না, কিন্তু (ফলাকাঙ্ক্ষার জন্য) বন্ধন থেকে যায় ! এইরূপই বস্তু থাকে না, কিন্তু বস্তুর সম্বন্ধ (বন্ধন) থেকে যায়। সম্বন্ধী থাকে না কিন্তু তার সম্পর্ক থেকে যায়। এই মূর্খতাকে বলিহারী !!

পরিশিষ্ট-ভাব—কর্মের দ্বারা মানুষ আবদ্ধ হয় (**কর্মণা বধ্যতে জন্তুঃ**)—জাগতিক দৃষ্টি থেকেই ভগবান বলেছেন যে আমি কর্মের দ্বারা আবদ্ধ হই না (৪।১৪), কারণ আমার মধ্যে কর্মে কোনোরূপ আসক্তিও নেই, ফলাসক্তিও নেই এবং কর্তৃত্বের ভাবও নেই। কিন্তু তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যায় যে, কর্মের কোনো পৃথক্ সত্তাই নেই ! জগৎ-সৃষ্টি-রূপ কর্ম ভগবানেরই স্বরূপ—**'তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম চাখিলম্'** (গীতা ৭।২৯), **'ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসঞ্জিতঃ'** (গীতা ৮।৩)। তাৎপর্য হল যে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় ইত্যাদি যা কিছু হয়ে চলেছে সেগুলি সবই ভগবানের দ্বারাই হচ্ছে এবং তা ভগবানেরই স্বরূপ। উৎপন্নকারী এবং যিনি উৎপন্ন হন, পালনকারী এবং যিনি পালিত হন, বিনাশকারী এবং যিনি বিনষ্ট হন এ সমস্তই এক সমগ্র ভগবানেরই অঙ্গ (স্বরূপ)—**'অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা'** (গীতা ৭।৬)।

সবকিছুই ভগবান, দ্বিতীয় আর কিছুই নেই, তাহলে ভগবান কার থেকে উদাসীন হবেন ? সেজন্য ভগবান নিজেকে 'উদাসীনের মতো' বলেছেন।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে ভগবান আসক্তি নিষেধের কথা জানিয়ে এবার কর্তৃত্বাভিমানের নিষেধ জানাচ্ছেন।

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে॥ ১০ ॥

[**প্রকৃতিঃ** (প্রকৃতি) ; **ময়া** (আমার) ; **অধ্যক্ষেণ** (অধ্যক্ষতায়) ; **সচরাচরম্** (সমস্ত চরাচর জগৎ) ; **সূয়তে** (সৃষ্টি করে) ; **কৌন্তেয়** (হে কৌন্তেয় !) ; **অনেন** (সেই) ; **হেতুনা** (জন্যই) ; **জগৎ** (জগৎ) ; **বিপরিবর্ততে** (পরিবর্তিত হয়।)]

প্রকৃতি আমার অধ্যক্ষতায় সমস্ত চরাচর জগৎ সৃষ্টি করে। হে কৌন্তেয় ! সেইজন্যই জগৎ বিবিধ প্রকারে পরিবর্তিত হয় ॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা—**'ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্'**—আমা হতেই সত্তা-স্ফূর্তি লাভ করে প্রকৃতি এই চর-অচর, জড়-চেতন প্রভৃতি ভৌতিক সৃষ্টি রচনা করে। যেমন, বরফ জমা, হীটার জ্বলা, ট্রাম ও ট্রেনের আনাগোনা, লিফ্‌ট উপর-নীচ করা, হাজার হাজার মাইল দূরের কথা শোনা, চলচ্চিত্র দেখা, শরীরের ভিতরের ছবি নেওয়া, খুব অল্প সময়ে বড় বড় হিসাব কষা ইত্যাদি কাজ নানাপ্রকার যন্ত্রাদির সাহায্যে হয়। কিন্তু সেসমস্ত যন্ত্র বিদ্যুতের সংযোগে কার্যকরী হয়ে ওঠে, বিদ্যুৎশক্তি ব্যতীত এইসব যন্ত্র কোনো কাজ করতে সক্ষম হয় না। কারণ সেগুলির নিজস্ব কোনো শক্তি নেই, বিদ্যুতের শক্তিতেই সেগুলি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তেমনই জগতে যা কিছু পরিবর্তন হয় অর্থাৎ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, পালন ও সংহার, স্বর্গলোক এবং নরকে পাপ-পুণ্যাদি ফলের ভোগ, নানাপ্রকার বিচিত্র পরিস্থিতি এবং ঘটনা, নানাবিধ আকৃতি, বেশ-ভূষা, স্বভাব ইত্যাদি যা কিছু সংঘটিত হয়ে চলেছে, তা সবই প্রকৃতির দ্বারাই হয়ে চলেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সবই হচ্ছে ভগবানের অধ্যক্ষতার অধিষ্ঠানবশতঃ অর্থাৎ তাঁরই সত্তা-স্ফূর্তির দ্বারা। ভগবানের সত্তা-স্ফূর্তি ব্যতীত প্রকৃতি কোনো কাজই করতে পারে না। কারণ ভগবানকে বাদ দিয়ে প্রকৃতিতে এমন পৃথক্ কোনো সামর্থ্য নেই যার দ্বারা সে এরূপ কাজ করতে পারে। তাৎপর্য হল এই যে বিদ্যুতে যেমন বিভিন্ন প্রকারের শক্তি অন্তর্হিত থাকলেও তা পরিস্ফুট হয় কোনো মেশিনের সাহায্যে, তেমনই ভগবানের যে অনন্ত শক্তি তা প্রকটিত হয় প্রকৃতির সাহায্যে।

ভগবান প্রকৃতির দ্বারা এই জগৎ-সংসার সৃষ্টি করেন এবং প্রকৃতি ভগবানের অধ্যক্ষতায় এই জগৎ সৃষ্টি করে। 'ভগবানই অধ্যক্ষ'—সেই হেতুই জগতের নানাপ্রকার পরিবর্তন হয়—**'হেতুনানেন জগদ্বিপরিবর্ততে'**। সেই নানাপ্রকার পরিবর্তনগুলি কী ? যতক্ষণ প্রাণীদের প্রকৃতি এবং প্রকৃতির কার্য শরীরের সঙ্গে 'আমি' এবং 'আমার' ভাব বজায় থাকে, ততক্ষণ তাদের নানাপ্রকার পরিবর্তনও হতে থাকে অর্থাৎ কখনো ইহলোকে কখনো পরলোকে, কখনো এই দেহে কখনো বা অন্য দেহে,—এরূপ পরিবর্তন হতেই থাকে। তাৎপর্য হল এই যে ভগবদ্‌প্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত এই সব প্রাণীদের কোথাও স্থায়ী স্থিতি হয় না। তারা জন্ম-মৃত্যু চক্রে বারংবার আবর্তিত হতেই থাকে (গীতা ৯।৩)।

সকল প্রাণী ভগবানে স্থিত হওয়ায় তারা ভগবদ্‌প্রাপ্ত, কিন্তু তারা নিজেদের স্থিতি ভগবানে না মেনে প্রকৃতিতে মেনে নেয় অর্থাৎ প্রাকৃতিক কার্যাদির সঙ্গে 'আমি' ও 'আমার' সম্পর্ক করে নেয়, তাই তারা প্রকৃতিকেই প্রাপ্ত হয়। তখন ভগবানের অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি তাদের দেহ সৃষ্টি ও বিনাশ (লীন) করতে থাকে। বাস্তবে ওইসব প্রাণীদের সৃষ্টি এবং বিনাশের শক্তি প্রকৃতির নেই ; কারণ প্রকৃতি হল জড়। জীব স্বয়ং জন্মায় না বা মরে না, কারণ পরমাত্মার

অংশ হওয়ায় স্বয়ং অবিনাশী, চেতন এবং নির্বিকার। কিন্তু প্রকৃতিজনিত পদার্থগুলির সঙ্গে 'আমি-আমার' সম্পর্ক স্থাপন করার ফলে প্রকৃতির বশীভূত হয়ে তাকে জন্মাতে ও মরতে হয় অর্থাৎ নতুন নতুন দেহ ধারণ ও পরিত্যাগ করতে হয়।

জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয়ের যা কিছু ক্রিয়া তা সবই প্রকৃতির দ্বারা, প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতিরই হয়ে থাকে। কিন্তু সেই প্রকৃতি সত্তা-স্ফূর্তি লাভ করে পরমাত্মা থেকে। পরমাত্মা থেকে সত্তা-স্ফূর্তি লাভ করলেও পরমাত্মার মধ্যে কোনো কর্তৃত্ববোধ আসে না। যেমন, সূর্যের প্রকাশে সকল প্রাণী কর্ম করে এবং সেই সব কর্ম বৈধ ও নিষিদ্ধ—দুই প্রকারেরই হয়ে থাকে। সেই কর্ম অনুসারেই প্রাণী অনুকূল বা প্রতিকূল পরিস্থিতি লাভ করে অর্থাৎ কেউ সুখী হয় বা কেউ দুঃখী, কেউ ক্রমোন্নতি পায়, কেউ অধোগামী হয়, কেউ কোনো এক লোকে যায় কেউ বা অন্য লোকে, কেউ কোনো এক বর্ণ-আশ্রমে থাকে তো কেউ অন্য বর্ণ-আশ্রমে—ইত্যাদি নানাপ্রকার পরিবর্তন হয়। কিন্তু সূর্য এবং তার প্রকাশ একই থাকে, তাতে কখনো বিন্দুমাত্র পার্থক্য হয় না। তেমনই জগতে নানাপ্রকার পরিবর্তন হয়, কিন্তু পরমাত্মা এবং তাঁর অংশ জীবাত্মা একইভাবে বিরাজ করে। প্রকৃতপক্ষে স্বরূপের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয় না, হতে পারে না এবং হওয়া সম্ভবও নয়। এই পরিবর্তনশীল জগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলে অর্থাৎ তাদাত্ম্য, মমত্ববোধ ও কামনা করলেই জগতের পরিবর্তনগুলিকে নিজের বলে প্রতীত হয়। যদি প্রাণীগণ, যে ভগবানের অধ্যক্ষতায় এই পরিবর্তন হচ্ছে তাঁর সঙ্গে নিজেদের প্রকৃত ঐক্য মেনে নেয় (যা স্বতঃসিদ্ধ), তাহলে ভগবানের প্রতি তাদের সত্যকার প্রেম স্বতঃই প্রকটিত হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব—ভগবানের থেকে সত্তা-স্ফূর্তি (শক্তি) লাভ করেই প্রকৃতি চরাচরসহ সকল প্রাণীর সৃষ্টি করে অর্থাৎ সমস্ত পরিবর্তনই প্রকৃতিতে হয়, ভগবানে নয়। প্রাণীদের যতক্ষণ প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক থাকে ততক্ষণ প্রকৃতির পরাধীনতার জন্য তাদের মধ্যে নানারূপ পরিবর্তন হতে থাকে অর্থাৎ তাদের কোথাও স্থিতি হয় না এবং তারা জন্ম-মরণ চক্রে আবর্তিত হতে থাকে।

প্রকৃতি পরমাত্মার অধীনে থেকে সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করে থাকে। আর জীব প্রকৃতির অধীন হয়ে জন্ম-মৃত্যু চক্রে ঘুরতে থাকে। অর্থাৎ পরমাত্মা স্বতন্ত্র হলেও তাঁর অংশ জীবাত্মা সুখলাভের ইচ্ছা থাকার জন্য পরাধীন হয়ে পড়ে।

তত্ত্বতঃ ভগবান (শক্তিমান) এবং প্রকৃতি (শক্তি) এক হলেও মানুষকে বোঝাবার জন্য ভগবান বলেন যে জগৎ সৃষ্টিতে প্রকৃতির মুখ্য অবদান আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতিরও কোনো পৃথক্ অস্তিত্ব নেই, কর্মেরও নয়।

ভগবান এবং তাঁর প্রকৃতিকে পৃথক্‌ভাবে দেখলে বোঝা যায় যে, জগতের উপাদানকারণ হল প্রকৃতি এবং নিমিত্তকারণ হলেন ভগবান, কেন-না ভগবান জগৎরূপে পরিণত হন না, প্রত্যুত প্রকৃতিরই পরিণতি হতে থাকে। কিন্তু ভগবান এবং তাঁর প্রকৃতিকে এক করে দেখলে (যা প্রকৃতই এক) বোঝা যায় ভগবান জগতের অভিন্ন নিমিত্তোপাদান-কারণ।

সপ্তম অধ্যায়ের প্রারম্ভে ভগবান পরা এবং অপরা প্রকৃতির স্বরূপ বর্ণনা করেছেন এবং এখানে (নবম অধ্যায়ের প্রারম্ভে) তাঁর কার্যাদির (উৎপত্তি-স্থিতি-প্রলয়ের) বর্ণনা করেছেন, যা ভগবানের লীলাকার্য। তাৎপর্য হল যে সপ্তম অধ্যায়ের বর্ণনা মুখ্যতঃ পরা ও অপরার আর এখানে মুখ্য বর্ণনা হল পরা-অপরার প্রভুর (পরমাত্মা)। এই অধ্যায়ে ভগবানের লীলা, প্রভাব, ঐশ্বর্যের বিশদ বর্ণনা আছে, যাতে সাধকের ভগবানে প্রেম হয় অর্থাৎ তিনি শুধুমাত্র মুক্তিতেই সন্তুষ্টি লাভ না করেন।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—যিনি নিত্য-নিরন্তর নিজের মধ্যে নিজে অবস্থিত রয়েছেন, যাঁর আশ্রয়ে প্রকৃতি গতিশীল এবং জগৎ পরিবর্তিত হচ্ছে, সেই পরমাত্মাকে লক্ষ্য না করে যারা বিপরীতমুখী হয়, তাদের বর্ণনা পরবর্তী দুটি শ্লোকে করা হয়েছে।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ ১১ ॥

[**মূঢ়াঃ** (অবিবেকী ব্যক্তিগণ) ; **ভূতমহেশ্বরম্** (সর্বপ্রাণীর মহেশ্বর-স্বরূপ) ; **মম** (আমার) ; **পরম্, ভাবম্** (পরমভাব) ; **অজানন্তঃ** (না জেনে) ; **মাম্** (আমাকে) ; **মানুষীম্, তনুম্** (মনুষ্যদেহ) ; **আশ্রিতম্** (ধারণকারী সাধারণ মানুষ মনে করে) ; **অবজানন্তি** (অবজ্ঞা করে থাকে।)]

অবিবেকী (মূর্খ) ব্যক্তিগণ সর্বপ্রাণীর মহেশ্বর-স্বরূপ আমার পরমভাব না জেনে আমাকে মনুষ্যদেহধারী (সাধারণ মানুষ) মনে করে আমাকে অবজ্ঞা করে থাকে ॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা—**'পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্'**—যাঁর সত্তা-স্ফূর্তির দ্বারা প্রকৃতি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রচনা করে, চর-অচর, স্থাবর-জঙ্গম প্রাণীর জন্ম দেয়, যিনি প্রকৃতি এবং তার প্রতিটি কাজের সঞ্চালক, প্রবর্তক, শাসক এবং সংরক্ষক, যাঁর ইচ্ছা ব্যতীত একটি পাতাও কম্পিত হয় না ; প্রাণীগণ নিজ নিজ কর্মানুসারে যে যে লোকে গমন করে, সেই সেই লোকের প্রাণীদের শাসনকারী যত দেবতা আছেন তাঁদেরও যিনি ঈশ্বর (প্রভু) এবং যিনি সবাইকে জানেন—সেইসব প্রাণীর মহেশ্বররূপ সর্বোৎকৃষ্ট ভাবই হল আমার স্বরূপ।

'পরং ভাবম্' বলার অর্থ এই যে আমার সর্বোৎকৃষ্ট প্রভাবকে অর্থাৎ করা-না-করায় এবং নানাপ্রকার পরিবর্তন করায় যিনি সর্বতোভাবে স্বাধীন, যিনি কর্ম, ক্লেশ, বিপাক ইত্যাদি কোনোপ্রকার বিকারে কখনো আবদ্ধ নন, যিনি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর হতেও উত্তম, বেদ এবং শাস্ত্রাদিতে যিনি পুরুষোত্তম নামে প্রসিদ্ধ (গীতা ১৫।১৮)—আমার সেই পরমভাব মূর্খ ব্যক্তিরা জানে না, সেইজন্যই তারা সাধারণ মানুষ ভেবে আমাকে অবজ্ঞা করে।

'মানুষীং তনুমাশ্রিতম্'—ভগবানকে সাধারণ মানুষ বলে মনে করার তাৎপর্য কী ? যেমন, সাধারণ মানুষ নিজেকে শরীর, আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পত্তি, পদ-মর্যাদা এই সবের আশ্রিত বলে মনে করে অর্থাৎ শরীর ও আত্মীয়-স্বজনদের মান-সম্মানকে নিজের মান-সম্মান বলে মনে করে ; সেইগুলির প্রাপ্তিতে নিজেকে বড় বলে মনে করে এবং অপ্রাপ্তিতে নিজেকে ছোট বলে ধারণা করে। আবার যেমন সাধারণ মানুষেরা আগে প্রকটিত ছিল না, মাঝখানে প্রকটিত হয়েছে এবং শেষে আবার অপ্রকট হবে (গীতা ২।২৮) ; তারা আমাকেও সেইরকম সাধারণ মানুষ মনে করে। আমাকে মনুষ্যদেহের বশীভূত বলে মনে করে অর্থাৎ সাধারণ মানুষ যেমন হয়ে থাকে কৃষ্ণও তেমনই একজন মানুষ, এইরকম মনে করে।

ভগবান দেহাশ্রিত নন। তারাই দেহাশ্রিত হয়, যাদের পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে কর্মফল ভোগের জন্য দেহধারণ করতে হয়। কিন্তু ভগবানের মানবদেহ ধারণ কর্মজনিত নয়। তিনি স্ব-ইচ্ছায় প্রকটিত হন—**'ইচ্ছয়াহহত্তবপুষঃ'** (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩৩।৩৫) এবং স্বাধীনভাবেই তিনি মৎস্য, কূর্ম, বরাহ ইত্যাদি অবতাররূপ গ্রহণ করেন। তাই তাঁর কর্মবন্ধন হয় না এবং তিনি দেহাশ্রিত হন না, দেহ-ই তাঁকে আশ্রয় করে—**'প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবামি'** (গীতা ৪।৬) অর্থাৎ তিনি প্রকৃতিকে অধিকৃত করে প্রকটিত হন। তাৎপর্য হল এই যে সাধারণ প্রাণী প্রকৃতির পরবশ হয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং প্রকৃতিকে আশ্রয় করেই কর্ম করে, কিন্তু ভগবান স্বেচ্ছায়, স্বাধীনভাবে অবতার হয়ে আসেন এবং প্রকৃতি তাঁর নির্দেশানুযায়ী কর্ম করে।

অবিবেচক মূঢ় ব্যক্তিগণ আমার অবতারতত্ত্ব না জেনে আমাকে মনুষ্যদেহ আশ্রিত বলে মনে করে অর্থাৎ তাদের হওয়া উচিত আমার আশ্রিত কিন্তু তারা আমাকেই মনুষ্যদেহের আশ্রিত বলে মনে করে। এই অবস্থায় তারা কীকরে আমার শরণাগত হবে ? অর্থাৎ তারা আমার শরণাগত হয় না। এই কথাই ভগবান সপ্তম অধ্যায়ে বলেছেন যে নির্বুদ্ধি ব্যক্তিগণ আমার এই অজ-অবিনাশী পরম ভাবকে না জেনে আমাকে সাধারণ মানুষ বলে মনে করে (৭।২৪-২৫)। তাই তারা আমার শরণাগত না হয়ে দেবতাদের শরণ গ্রহণ করে (৭।২০)।

'অবজানন্তি মাং[১] মূঢ়াঃ'—যাঁর অধ্যক্ষতায় (নির্দেশে) প্রকৃতি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে উৎপন্ন ও লীন করে, যাঁর সত্তা-স্ফূর্তির দ্বারা জগতে সবকিছু সংঘটিত হচ্ছে, যিনি কৃপা করে তাঁকে লাভ করার জন্য জীবকে এই মনুষ্যদেহ দিয়েছেন—মূর্খ ব্যক্তিগণ আমার এই রূপ সত্য-তত্ত্বকে অবহেলা করে। তারা আমাকে না মেনে উৎপত্তি ও বিনাশশীল পদার্থগুলিকে সত্য বলে মনে করে সেগুলির সংগ্রহ এবং ভোগবিলাসে ব্যাপৃত হয়—এই হল আমার প্রতি অবজ্ঞা এবং আমাকে অবহেলা করা।

পরিশিষ্ট-ভাব—এই শ্লোকটিতে ভগবানের প্রভাবের বর্ণনা বিশেষভাবে করা হয়েছে। ভগবানের থেকে বড়ো কোনো ঈশ্বর নেই। তিনি সবার উপরে। কিন্তু অজ্ঞান ব্যক্তিগণ তাঁর স্বরূপ জানে না। তারা অলৌকিক ভগবানকেও নিজেদের ন্যায় লৌকিক বলে মনে করে।

কিছু ব্যক্তি মনে করে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একজন যোগী ছিলেন, ঈশ্বর নয়। যোগের আটটি অঙ্গ— যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি (যোগদর্শন ২।২৯)। সর্বপ্রথমে 'যম'-কে ধরা হয়। যম পাঁচপ্রকার—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ (যোগদর্শন ২।৩০)। সুতরাং যিনি যোগী, তিনি অবশ্যই 'যম' পালন করবেন অর্থাৎ সত্য কথা বলবেন। যদি তিনি অসত্য (মিথ্যা) কথা বলেন, তাহলে তিনি যোগী হতে পারেন না, কেন-না তিনি যোগের প্রথম অঙ্গ (যম)ই পালন করেননি। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কয়েক স্থানে নিজেকে ঈশ্বর[২] বলে জানিয়েছেন। অতএব যদি তিনি যোগী হয়ে থাকেন তাহলে সত্য কথা বলেছেন এবং যদি তিনি সত্য কথাই বলে থাকেন, তাহলে তিনি যে ঈশ্বর—সে কথা মানতেই হবে।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—ভগবান এবার পরবর্তী শ্লোকে তাঁকে অবজ্ঞা করার ফল জানাচ্ছেন।

মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥ ১২ ॥

[**মোঘাশাঃ** (সব আশা ব্যর্থ) ; **মোঘকর্মাণঃ** (সমস্ত শুভকর্ম ব্যর্থ) ; **মোঘজ্ঞানাঃ** (সমস্ত জ্ঞান ব্যর্থ) ; **বিচেতসঃ** (বিবেকহীন ব্যক্তি) ; **আসুরীম্** (আসুরী) ; **রাক্ষসীম্** (রাক্ষসী) ; **চ** (এবং) ; **মোহিনীম্** (মোহিনী) ; **প্রকৃতিম্, এব** (প্রকৃতিরই) ; **শ্রিতাঃ** (আশ্রয় গ্রহণ করে।)]

যেসকল বিবেকহীন ব্যক্তি আসুরী, রাক্ষসী (হিংসা) এবং মোহিনী (বুদ্ধিভ্রংশকারী) প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করে তাদের সব আশা ব্যর্থ, সমস্ত শুভকর্ম এবং সমস্ত জ্ঞান ব্যর্থ অর্থাৎ তাদের আশা, কর্ম এবং জ্ঞান শুভ-ফল প্রদান করে না ॥ ১২ ॥

ব্যাখ্যা—'মোঘাশাঃ'—যারা ভগবানে বিমুখ, তারা জাগতিক সুখ ভোগ করতে চায় ; স্বর্গ লাভ করতে চায়, কিন্তু তাদের এইসব কামনা ব্যর্থ হয়। কারণ বিনাশশীল এবং পরিবর্তনশীল বস্তুর কামনা যে পূর্ণ হবেই এমন কথা নেই। যদি কখনো পূর্ণ হয়ও তবে তা স্থায়ী হয় না, অর্থাৎ ফল প্রদান করে নষ্ট হয়ে যায়। যতক্ষণ পরমাত্মা লাভ না হয়, ততক্ষণ যত জাগতিক বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করা হোক অথবা তার প্রাপ্তি ঘটুক না কেন, তা সবই ব্যর্থতায়

---

[১]এই অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোক থেকে দশম শ্লোক পর্যন্ত যে পরমাত্মার কথা বর্ণিত হয়েছে সেটিকে এই স্থানে 'মাম্' পদের দ্বারা বলা হয়েছে।

[২]'ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্' (৪।৬), 'সর্বলোকমহেশ্বরম্' (৫।২৯), 'মত্তঃ পরতরং নান্যৎকিঞ্চিদস্তি' (৭।৭), 'ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা' (৯।৪), 'যো মামজমনাদিঞ্চবেত্তি লোকমহেশ্বরম্' (১০।৩), 'সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ' (১৫।১৫) ইত্যাদি।

পর্যবসিত হয় (গীতা ৭।২৩)।

'মোঘকর্মাণঃ'—ভগবানে বিমুখ হয়ে মানুষ শাস্ত্রবিহিত যত শুভকর্মই করুক না কেন, পরিণামে তা সবই ব্যর্থ হয়ে যায়। কারণ মানুষ কামনা নিয়ে শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞ, দান ইত্যাদি যে সকল কর্ম করে সেই কর্মের আদি ও অন্ত থাকে এবং তাদের ফলেরও আদি-অন্ত থাকে। সেই কর্মের ফলস্বরূপে মানুষ যদি ঊর্ধ্বলোকে যায়ও তবুও তাকে এই মর্ত্যলোকে ফিরে আসতে হয়। তাই সেরূপ কর্ম করে শুধু নিজের সময় নষ্ট করা হয়, বুদ্ধির অপব্যবহার করা হয়, লাভ কিছুই হয় না। শেষকালে সে রিক্তই থেকে যায় অর্থাৎ যে জন্য এই মনুষ্যদেহ পেয়েছিল তার থেকে সে রিক্তই থাকে। তাই তার সকল কর্ম ব্যর্থ এবং নিষ্ফল হয়।

তাৎপর্য হল এই যে, মানুষ স্বরূপতঃ সাক্ষাৎ পরমাত্মার অংশ, চিরস্থায়ী আর কর্ম ও তার ফল হল আদি-অন্তবিশিষ্ট। সুতরাং যতক্ষণ পরমাত্মা প্রাপ্তি না হয়, ততক্ষণ সে সকামভাবে যে কাজই করুক এবং তার ফল ভোগ করুক না কেন, শেষ পর্যন্ত দুঃখ এবং অশান্তি ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় না।

অনুকূল পরিস্থিতি লাভ করার ইচ্ছায় সকামভাবে যে সমস্ত শাস্ত্রবিহিত কর্ম করা হয়, সেগুলি বৃথা হয়ে যায় অর্থাৎ সেগুলি সৎফল প্রদান করে না। কিন্তু যে কর্ম ভগবানের জন্য, তাঁর প্রসন্নতা লাভের উদ্দেশ্যে করা হয় এবং তাঁকেই অর্পণ করা হয় সেই কর্ম নিষ্ফল হয় না অর্থাৎ তা বিনাশশীল ফল প্রদান করে না বরং সৎফল প্রদান করে—**'কর্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে'** (গীতা ১৭।২৭)।

সপ্তদশ অধ্যায়ের আঠাশতম শ্লোকেও ভগবান বলেছেন যে, যাদের আমাতে শ্রদ্ধা নেই অর্থাৎ যারা আমা হতে বিমুখ, তাদের করা যজ্ঞ-দান-তপ ইত্যাদি সমস্ত কর্মই অসৎ হয় অর্থাৎ তা দ্বারা আমাকে প্রাপ্তিলাভ করা যায় না। ওইসব কর্ম ইহজন্মে অথবা মৃত্যুর পর পরলোকেও স্থায়ী ফল প্রদান করে না অর্থাৎ যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় তা বিনাশশীল হয়। তাই তার সব কর্মই ব্যর্থ হয়।

'মোঘজ্ঞানাঃ'—তাদের সব জ্ঞান ব্যর্থ। ভগবানে বিমুখ হয়ে কোনো ব্যক্তি যদি জগতের সমস্ত ভাষা শিখে নেয়, সমস্ত লিপি জেনে যায়, নানাপ্রকার বিদ্যা-জ্ঞান অর্জন করে, বহু কিছু আবিষ্কার করে, অনন্তপ্রকার জ্ঞান লাভ করে, তাহলেও তাতে তার কল্যাণ হয় না, জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন কাটে না। তাই এ সমস্ত জ্ঞানই নিষ্ফল। যেমন হিসাব করার সময় প্রারম্ভে যদি একটি ভুল থেকে যায় তাহলে হিসাব কিছুতেই মেলে না, সবটাই ভুল হয়ে যায়, তেমনই যে ব্যক্তি ভগবানে বিমুখ হয় সে যা কিছু জ্ঞান লাভ করে, তা সবই ভুল হয়, সেগুলি তাকে পতনের দিকে নিয়ে যায়।

'বিচেতসঃ'—তার সার-অসার, নিত্য-অনিত্য, লাভ-ক্ষতি, কর্তব্য-অকর্তব্য, মুক্তি-বন্ধন ইত্যাদি বিষয়ে কোনো জ্ঞান থাকে না।

'রাক্ষসীমাসুরীং চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ'—এরূপ বিবেকহীন এবং ভগবদ্‌বিমুখ মানুষ আসুরী, রাক্ষসী এবং মোহিনী প্রকৃতির হয় অর্থাৎ ওই স্বভাবের আশ্রয় নেয়।

যে-সব ব্যক্তি নিজ স্বার্থ-সিদ্ধিতে, নিজেদের কামনা-পূর্তিতে, নিজেদের প্রাণের পোষণেই ব্যস্ত থাকে, অপরে যতই দুঃখ থাক, অন্যের যতই ক্ষতি হোক—তাতে যারা পরোয়া করে না, তারা 'আসুরী' স্বভাববিশিষ্ট মানুষ।

যারা স্বার্থে, কামনা পূরণে প্রতিবন্ধকতা এলে ক্রোধান্বিত হয় এবং ক্রোধান্বিত হয়ে নিজ স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে অন্যের ক্ষতি করে, সর্বনাশ করে বা অপরকে হত্যাও করে তারা 'রাক্ষসী' স্বভাববিশিষ্ট মানুষ।

যারা নিজেদের কোনো লৌকিক বা পারলৌকিক উদ্দেশ্য বা শত্রুতা ব্যতিরেকেই অন্যের ক্ষতিসাধন করে, অপরকে কষ্ট দেয় (যেমন, উড়ন্ত পাখিকে গুলি করে মারা, ঘুমন্ত কুকুরকে লাঠি দিয়ে মেরে আনন্দিত হওয়া), তারা 'মোহিনী' স্বভাববিশিষ্ট মানুষ।

ভগবদ্‌বিমুখ হয়ে কেবলমাত্র জীবনধারণ করা অর্থাৎ সুখে বাঁচার যে আকাঙ্ক্ষা, সেটি হল আসুরী প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য। ওপরে যে তিনপ্রকার প্রকৃতির (আসুরী, রাক্ষসী এবং মোহিনী) কথা বলা হয়েছে, তার মূলে আছে আসুরী প্রকৃতি অর্থাৎ আসুরী সম্পদই হল সমস্ত কিছুর মূল। আসুরী সম্পদের আশ্রিত হলে রাক্ষসী ও মোহিনী প্রকৃতি স্বতঃই এসে যায়। কারণ উৎপত্তি ও বিনাশশীল পদার্থগুলি ধ্যেয় (কাম্য) হওয়ায় অনর্থ-পরম্পরা স্বাভাবিকভাবেই এসে যায়। সেই আসুরী সম্পদের তিনটি ভাগের কথা বলা হয়েছে—যাদের কামনার প্রাধান্য থাকে তারা হল 'আসুরী', ক্রোধের প্রাধান্য যাদের থাকে তারা হল 'রাক্ষসী' এবং মোহের (মূঢ়তার) প্রাধান্য যাদের থাকে তারা হল 'মোহিনী' প্রকৃতির লোক। তাৎপর্য হল এই যে

কামনার প্রাধান্য হলে মানুষ আসুরী প্রকৃতির হয়। যেখানে কামনার প্রাধান্য থাকে সেখানে রাক্ষসী প্রকৃতি —ক্রোধ আসবেই— **'কামাৎক্রোধোঽভিজায়তে'** (গীতা ২।৬২) এবং যেখানে ক্রোধ থাকে, সেখানে মোহিনী প্রকৃতি (মোহ) আসবেই— **'ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ'** (২।৬৩)। সম্মোহ লোভ থেকেও হয় এবং মূর্খতা থেকেও হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব—ষোড়শ অধ্যায়ে ভগবান বিস্তারিতভাবে যা বর্ণনা করেছেন এই শ্লোকে সেই আসুরী সম্পদের কথা বলা হয়েছে। আসুরী সম্পদের ফল হল—চুরাশী লক্ষ জন্ম এবং নরক প্রাপ্তি (গীতা ১৬।১৯-২০)। আসুরী প্রকৃতির মানুষ যে ফল আশা করে, তা তারা পায় না (**মোঘাশাঃ**), কিন্তু অনিষ্ট ফল বা দণ্ড তাদের ভোগ করতেই হয়। তারা সুখভোগের উদ্দেশ্যে পাপকর্ম করে, সুখ তো তারা পায়ই না, বরং দুঃখ তাদের অবশ্যই ভোগ করতে হয়। তারা ভগবানকে অবজ্ঞা করে পরিণামে নিজেদের অনিষ্ট ডেকে আনে, তাতে ভগবানের কী বা যায় আসে ?

***

সম্বন্ধ—চতুর্থ শ্লোক থেকে দশম শ্লোক পর্যন্ত ভগবান তাঁর প্রভাব, সামর্থ্য ইত্যাদির বর্ণনা করেছেন। সেই প্রভাব যারা না মানে তাদের বর্ণনা একাদশ ও দ্বাদশ শ্লোকে করেছেন। সেই প্রভাব জেনে যাঁরা তাঁর ভজনা করেন পরবর্তী শ্লোকে তাঁদের সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন।

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্॥ ১৩ ॥

[**তু** (কিন্তু) ; **পার্থ** (হে পার্থ !) ; **দৈবীম্** (দৈবী) ; **প্রকৃতিম্** (প্রকৃতির) ; **আশ্রিতাঃ** (আশ্রিত) ; **অনন্যমনসঃ** (অনন্য-চিত্ত) ; **মহাত্মানঃ** (মহাত্মাগণ) ; **মাম্** (আমাকে) ; **ভূতাদিম্** (সর্বভূতের আদি) ; **অব্যয়ম্** (অবিনাশী) ; **জ্ঞাত্বা** (জেনে) ; **ভজন্তি** (ভজনা করেন।)]

কিন্তু হে পার্থ ! দৈবী প্রকৃতির আশ্রিত অনন্যচিত্ত মহাত্মাগণ আমাকে সর্বভূতের আদি ও অবিনাশী জেনে আমার ভজনা করে থাকেন ॥ ১৩ ॥

ব্যাখ্যা—**'মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ'** —আগের শ্লোকে যে আসুরী, রাক্ষসী এবং মোহিনী স্বভাবপ্রাপ্ত মূঢ় ব্যক্তিদের বর্ণনা করেছিলেন, তাদের থেকে দৈবীসম্পদবিশিষ্ট মহাত্মাদের বিশেষত্ব জানাতে এখানে **'তু'** পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

'দৈবীং প্রকৃতিম্' অর্থাৎ এখানে পরমাত্মাকে **'দেব'** বলা হয়েছে আর পরমাত্মার সম্পদকে বলা হয় দৈবী সম্পদ। পরমাত্মা হচ্ছেন **'সৎ'** ; সুতরাং পরমাত্মাকে লাভ করার যে-সব গুণ ও আচরণ আছে, সেগুলির সঙ্গে **'সৎ'** শব্দ ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ সেগুলিকে সদ্‌গুণ, সদাচার বলা হয়। যত সদ্‌গুণ এবং সদাচার আছে, তা সবই ভগবদ্স্বরূপ অর্থাৎ তা সবই ভগবানের স্বভাব এবং স্বভাব হওয়ায় সেগুলিকে তাঁর 'প্রকৃতি' বলা হয়। তাই দৈবী প্রকৃতির আশ্রয় নেওয়াকে ভগবদ্ আশ্রয় গ্রহণ করাই বোঝায়।

দৈবীসম্পদের যত গুণ (গীতা ১৬।১-৩), তা সবই স্বাভাবিক গুণ এবং স্বতঃসিদ্ধ অর্থাৎ সকল মানুষেরই এর ওপর পূর্ণ অধিকার থাকে। কেউ এর আশ্রয় গ্রহণ করুক বা না করুক তা নির্ভর করে মানুষের ওপর। কিন্তু যারা এইসবের আশ্রয় নিয়ে ভগবদ্মুখী হয়, তারা নিজেদের কল্যাণ সাধন করে।

এক হল অনুসন্ধান আর অপরটি হল উৎপত্তি। অনুসন্ধান করা হয় নিত্যতত্ত্বের, যা আগে থেকেই রয়েছে। যে জিনিসের উৎপত্তি হয়, তার বিনাশও হয়। দৈবীসম্পদের যা কিছু সদ্‌গুণ ও সদাচার আছে, সেগুলি ভগবানের এবং ভগবদ্স্বরূপ মনে করে সেগুলিকে লাভ করা, তার আশ্রয় গ্রহণ করাকে বলা হয় 'অনুসন্ধান'। কারণ এগুলি কারও দ্বারা তৈরি করা বা কারও পৈতৃক সম্পত্তি নয়। যারা এ সবকে নিজের পুরুষার্থের দ্বারা উপার্জিত বলে মনে করে অর্থাৎ স্বাভাবিক বলে না মনে

করে নিজের দ্বারা সৃষ্ট বলে ভাবে, তাদের এই গুণের অহংকার জন্মায়। এই অহংকার প্রকৃতপক্ষে প্রাণীর নিজেরই সৃষ্ট, যা বিনাশশীল।

মানুষ যখন দৈবী গুণগুলিকে নিজের দ্বারা উপার্জিত বলে মনে করে, আর 'আমি সত্য বলি, অন্যেরা সত্য কথা বলে না'—এইভাবে অপরের থেকে নিজেকে বিশেষ বলে মনে করে, তখন তার মধ্যে এই গুণগুলির অহংকার উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই গুণগুলিকে ভগবানের গুণ বলে মনে করলে এবং ভগবদ্‌স্বরূপ বলে মনে করে এগুলির আশ্রয় নিলে অহংকার উৎপন্ন হয় না।

দৈবীসম্পদের পূর্ণতা না হলেই অহংকার সৃষ্ট হয়। নিজের মধ্যে দৈবীসম্পদ পূর্ণ থাকলে অহংকার আসে না,—যেমন, কারোর 'আমি সত্যবাদী' এই অহংকার এলে বুঝতে হবে তার সত্যভাষণের মধ্যে কিছু অসত্যভাষণও রয়েছে, কেন-না সে যদি সর্বতোভাবে সত্যবাদী হয় তাহলে 'আমি সত্যবাদী'—এই অহংকার আসতে পারে না, বরং তার এরূপ ভাব হয় যে, 'আমি যখন সত্যবাদী তখন অসত্য বলব কী করে?'

মানুষের মধ্যে দৈবীপ্রকৃতি তখনই প্রকটিত হয় যখন তার উদ্দেশ্য থাকে একমাত্র ভগবদ্‌প্রাপ্তি করা। ভগবদ্‌প্রাপ্তির জন্য দৈবী গুণের আশ্রয়েই মানুষ ভগবদ্‌মুখী হয়। দৈবীগুণের আশ্রয় নিলে তার মধ্যে অভিমান (অহং কর্তৃত্ববোধ) আসে না ; তার বদলে নম্রতা, সরলতা, নিরহঙ্কারবোধ আসে এবং সাধন-ভজনে নিত্য নতুন উৎসাহ দেখা যায়।

যেসব মানুষ ভগবানে বিমুখ হয়ে উৎপত্তি ও বিনাশশীল পদার্থের ভোগ ও সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়, তারা **'অল্পাত্মা'** অর্থাৎ মূঢ় । কিন্তু যারা ভগবদ্ আশ্রয় গ্রহণ করেছে, যাদের মোহ দূর হয়েছে এবং যারা কেবল প্রভুর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক স্থাপন করেছে, মহানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করাতে, সত্য-তত্ত্বের দিকেই লক্ষ্য হওয়ার জন্য তাদের বলা হয় **'মহাত্মা'**।

'ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্'—আমি সকল প্রাণীর আদি এবং অবিনাশী। তাৎপর্য হল এই যে, যখন জগৎ সৃষ্টি হয়নি তখন আমি ছিলাম আর যখন সমস্ত জগৎ লীন হয়ে যাবে, তখনও আমি থাকব—আমি এরূপ অনাদি-অনন্ত। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, অনন্ত সৃষ্টি, অনন্ত স্থাবর-জঙ্গম প্রাণী আমা হতে উৎপন্ন হয়, আমাতেই অবস্থান করে আমার দ্বারা পালিত হয় আবার আমাতে লীন হয়ে যায় । কিন্তু আমি একভাবেই নির্বিকার থাকি অর্থাৎ আমার সামর্থ্য, প্রভাব ইত্যাদি কখনো বিন্দুমাত্র কমে না।

জাগতিক বস্তুর একটি নিয়ম হল যে কোনো বস্তু দ্বারা কিছু তৈরি হলে, সেই বস্তুটি কমে যায়, যেমন—মাটি দিয়ে কলসী তৈরি করলে মাটি কমে যায়, সোনা দিয়ে গহনা তৈরি করলে, সোনা কমে যায়। কিন্তু আমা হতে এই অনন্ত বিশ্ব সৃষ্ট হলেও আমাতে কিছুমাত্র ঘাটতি আসে না। কারণ আমি সকলের অব্যয় বীজ (গীতা ৯।১৮)। যাঁরা আমাকে অনাদি ও অব্যয়রূপে জেনেছে, তাঁরা অনন্যচিত্তে আমারই ভজনা করে।

মানুষ যাকে যত বেশি গুরত্বপূর্ণ বলে মনে করে সে তার প্রতি ততই আকৃষ্ট হয়। যাঁরা ভগবানকেই সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে জেনেছেন, তাঁরা ভগবানের প্রতিই আকৃষ্ট হন। তাঁদের লক্ষণ জানাতে এখানে **'অনন্যমনসঃ'** পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁদের চিত্ত ভগবানেই লীন হয়ে যাওয়ায় তাঁদের মনোবৃত্তি ইহলোক বা পরলোকের ভোগের দিকে যায় না। ভোগের প্রতি তাঁদের চিত্তে কোনো আকর্ষণই থাকে না।

'অনন্য চিত্তসম্পন্ন' হওয়ার তাৎপর্য হল তাঁদের মনে অন্য কিছুর আশ্রয় নেই, ভরসা নেই, বিশ্বাস নেই, অন্য কোনো কিছুতে আকর্ষণ নেই, শুধু ভগবানের সঙ্গেই তাঁদের আত্মীয়তা। এইরূপ অনন্য চিত্তে তাঁরা ভগবানের ভজনা করেন।

ভগবানকে যেভাবেই ভজনা করা হোক, তাতে লাভই হয়। কিন্তু অনন্য চিত্তে 'আমি ভগবানের এবং একমাত্র ভগবানই আমার' এইরূপ সম্পর্ক স্থাপন করে, যদি তাঁর স্বল্প ভজনাও করা হয়, তাহলে তাতেও অনেক বেশি লাভ হয়। কারণ এই আপনত্বের সম্পর্ক (ভাবরূপ হওয়ায়) নিত্য-নিরন্তর হয়, কিন্তু ক্রিয়াদির সম্পর্ক নিত্য-নিরন্তর হয় না, কেন-না ক্রিয়া শেষ হলেই সেই সম্বন্ধ আর বজায় থাকে না। তাই সবকিছুর আদি এবং অবিনাশী পরমাত্মা আমার এবং আমি তাঁর—যে এরূপ মেনে নিয়েছে এবং যে ভগবানের পাদপদ্মে নিজেকে সমর্পণ করে দেহ-মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা সমস্ত শারীরিক, ব্যবহারিক,

লৌকিক, বৈদিক, পারমার্থিক কার্য করে, তা সবই ভগবানের প্রসন্নতার জন্যই হয়ে থাকে—এটিই হল অনন্য চিত্তে ভজনা করা। গীতায় নানাস্থানে এর বর্ণনা আছে (৮।১৪; ৯।২২; ১২।৬; ১৪।২৬)।

পরিশিষ্ট-ভাব—আগের শ্লোকে পতনোন্মুখ সংসারী মানুষদের বর্ণনা করে এবার তাদের থেকে স্বতন্ত্র ভগবানের অভিমুখে গমনকারী মানুষদের (ভক্ত) কথা বর্ণনা করেছেন। **'দৈবী প্রকৃতি'**র অর্থ হল—ভগবদ্স্বভাব।

আসুরী প্রকৃতির আশ্রিত মানুষ ভগবানকেও মানে না এবং তাঁর আদেশও মানে না (গীতা ৩।৩২)। কিন্তু দৈবী প্রকৃতির আশ্রিত মানুষ ভগবানকেও মানেন এবং তাঁর আদেশও মেনে থাকেন (গীতা ৩।৩১)।

'জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্'—ভগবানই হলেন অনন্তব্রহ্মাণ্ডের অবিনাশী বীজ (গীতা ৭।১০, ৯।১৮)—এইভাবে দৃঢ়তা সহকারে মানাই হল ভগবানকে আদি ও অবিনাশী রূপে জানা। দৃঢ়ভাবে মানা জানারই সমান হয়ে থাকে। ভগবান সবকিছুর আদি ও অবিনাশী—এই অধ্যায়ের চতুর্থ থেকে একাদশ শ্লোক পর্যন্ত তাঁরই বর্ণনা করা হয়েছে।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকটিতে ভজনাকারীদের বর্ণনা করে ভগবান এবার পরবর্তী শ্লোকে তাঁদের ভজন-সাধনের প্রণালী জানাচ্ছেন।

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥ ১৪ ॥

[**নিত্যযুক্তাঃ** (নিত্যযুক্ত ব্যক্তি); **দৃঢ়ব্রতাঃ** (দৃঢ়ব্রত হয়ে); **যতন্তঃ** (যত্নপূর্বক সাধন-ভজন); **চ** (এবং); **ভক্ত্যা** (ভক্তিপূর্বক); **কীর্তয়ন্তঃ** (কীর্তন করেন); **চ** (এবং); **মাম্** (আমাকে); **নমস্যন্তঃ** (নমস্কার করতঃ); **সততম্** (নিরন্তর); **মাম্** (আমার); **উপাসতে** (উপাসনা করেন।)]

নিত্য-(আমাতে) যুক্ত ব্যক্তি দৃঢ়ব্রত হয়ে যত্নপূর্বক সাধন-ভজন এবং ভক্তিপূর্বক কীর্তন করেন এবং আমাকে নমস্কার করতঃ নিরন্তর আমার উপাসনা করেন ॥ ১৪ ॥

ব্যাখ্যা—'নিত্যযুক্তাঃ'—মানুষমাত্রেই ভগবানে নিত্যযুক্ত হতে পারে, সর্বক্ষণ তাঁতে নিমগ্ন হয়ে থাকতে পারে, জাগতিক ভোগ বা সংগ্রহে নয়। কারণ কখনো কখনো ভোগেও গ্লানি আসে এবং সংগ্রহেও অরুচি আসে। কিন্তু ভগবদ্প্রাপ্তি করার, ভগবদ্ অভিমুখে চলার যে এক উদ্দেশ্য থাকে, এক দৃঢ় ইচ্ছা থাকে, তাতে কোনো শিথিলতা আসে না।

ভগবানের অংশ হওয়ায় জীবের সঙ্গে ভগবানের অখণ্ড সম্বন্ধ থাকে। মানুষ যতক্ষণ এই সম্বন্ধটিকে চিনতে না পারে, ততক্ষণ সে ভগবদ্বিমুখ হয়ে থাকে, নিজেকে তাঁর থেকে পৃথক্ বলে মনে করে। কিন্তু যখনই সে ভগবানের সঙ্গে নিজের নিত্য-সম্বন্ধ জানতে পারে, তখন সে ভগবানের আশ্রিত হয় এবং আর কখনো সে ভগবানের থেকে পৃথক্ থাকতে পারে না এবং এই সম্বন্ধও কখনো বিস্মৃত হয় না—এই হল তার 'নিত্যযুক্ত' থাকা।

ভগবানের সঙ্গে মানুষের 'আমি ভগবানের এবং ভগবানই আমার' এই যে নিত্য সম্পর্ক, তা জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—সকল অবস্থাতে, একান্তে ধ্যান-ভজন কালে অথবা সেবারূপে সমস্ত সাংসারিক কাজ করার সময়ও কখনো ছিন্ন হয় না, তা অটলভাবে সর্বদাই বজায় থাকে। যেমন মানুষ নিজেকে যে মা-বাপের সন্তান বলে মনে করে, সকল কাজের মধ্যেও তার 'আমি অমুকের সন্তান' এই ভাব সর্বদাই বজায় থাকে। তার স্মরণে থাক বা না থাক, সে মনে রাখুক বা না রাখুক, তবুও এই ভাব তার সর্বদা থেকে যায়। কারণ 'আমি অমুকের সন্তান' এই ভাবটি তার নিজস্বতা বোধের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। তেমনই যে ব্যক্তি অনাদি, অবিনাশী, সর্বোপরি 'ভগবানই আমার এবং আমি তাঁরই'—এই বাস্তব সত্য জানে এবং মানে, তার এই ভাব সদাই বজায় থাকে। এইভাবে ভগবানের সঙ্গে নিজের প্রকৃত সম্বন্ধ মেনে নেওয়াকেই 'নিত্যযুক্ত' হওয়া বলে।

'দৃঢ়ব্রতাঃ'—যারা জাগতিক ভোগ ও সংগ্রহাদিতে ব্যাপৃত থাকে, তারা পারমার্থিক বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হতে পারে না (গীতা ২।৪৪)। কিন্তু যারা অন্তর থেকেই নিজেদের আমিত্বকে এইভাবে পরিবর্তিত করেছে—'আমি ভগবানের আর ভগবান আমার', তারা দৃঢ়নিশ্চিত হয় যে, 'আমি সংসারের নই এবং সংসার আমার নয়'। অতএব জাগতিক ভোগ ও সংগ্রহ-মুখী কখনও হব না, বরং ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় সকলের শুধু সেবা করে যাব। এভাবে তাঁদের লক্ষ্য খুব দৃঢ় থাকে এবং তাঁরা কখনো নিজ লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হন না। কারণ তাঁদের লক্ষ্য থাকে শুধু ভগবানে এবং তাঁরা নিজেরাও ভগবানেরই অংশ। তাঁদের লক্ষ্যে অদৃঢ়ভাব আসার প্রশ্নই ওঠে না। অদৃঢ়ভাব আসতে পারে সাংসারিক লক্ষ্যে অর্থাৎ যা টেকে না।

'যতন্তশ্চ'—সাংসারিক মানুষ যেমন মমত্ব সহকারে আত্মীয় প্রতিপালন করে, লোভ সহকারে অর্থ উপার্জন করে, তেমনই ভগবদ্ভক্ত ভগবদ্প্রাপ্তির জন্য যখন সাধনা করেন, তা ঐকান্তিক ভাবে করেন। তাঁর প্রচেষ্টা সাংসারিক বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা সাংসারিক নয়। কারণ ভগবানই হলেন তাঁর প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য।

'ভক্ত্যা কীর্তয়ন্তো মাম্'—এই ভক্তগণ কখনো প্রেমসহ ভগবদ্ নামকীর্তন করেন, কখনো নাম-জপ করেন, পাঠ করেন, কখনো নিত্যকর্ম করেন, কখনো আবার ভগবদ্ সম্বন্ধীয় আলোচনা করেন। বাণী সম্বন্ধীয় যা কিছু করেন, তা সব ভগবানের স্তোত্রই হয়ে থাকে—**'স্তোত্রাণি সর্বা গিরঃ'**।

'নমস্যন্তশ্চ'—তাঁরা ভক্তি সহকারে ভগবানকে প্রণিপাত করেন। তাঁদের মধ্যে নানা সদ্গুণ-সদাচার উদ্ভাসিত হলে, তাঁদের দ্বারা ভগবদ্ অনুকূল কোনো চেষ্টা হলে তাঁদের মনে এই ভাব জাগে এবং তাঁরা অবনত মস্তকে ভগবানকে বলেন, 'হে প্রভু ! এ সবই আপনার কৃপায় হচ্ছে। আপনার জন্য এত চেষ্টা ও তৎপরতা আমার উদ্যমে হয়নি। সুতরাং এই সদ্গুণ ও সদাচারসমূহ, এই সাধন-ভজন আপনার কৃপাতেই হওয়া সম্ভব মনে করে আমি কেবল আপনাকে প্রণিপাতই করতে পারি।'

'সততং মাং উপাসতে'—আমার অনন্য ভক্ত এইভাবে সর্বদা আমার উপাসনা করে থাকেন। সর্বদা উপাসনা করার অর্থ হল যে এঁরা কীর্তন, প্রণিপাত ইত্যাদি ব্যতিরেকে যে খাওয়া-দাওয়া, শয়ন-জাগরণ, ব্যবসায়াদি, চাষবাস ইত্যাদি ক্রিয়া করে থাকেন, তা সবই আমার জন্যই করে থাকেন। এঁদের সমস্ত লৌকিক, পারমার্থিক ক্রিয়াদি শুধুমাত্র আমারই উদ্দেশ্যে, আমার প্রসন্নতা লাভের জন্যই হয়ে থাকে।

পরিশিষ্ট-ভাব—ভক্ত যা কিছু বলেন, তা সবই ভগবানের গুণকীর্তন। তিনি যেসব ক্রিয়া-কর্ম করেন, তা সবই ভগবানের সেবা[১]। (গীতা ৯।২৭)।

অনিত্য জগৎ-সংসার হতে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ হওয়ায় ভক্ত ভগবানে নিত্যযুক্ত হন।

* * *

---

[১]কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা বুদ্ধ্যাহহত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ।
করোতি যদ্ যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পযেত্তৎ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২।৩৬)

'শরীর, মন, বাণী, ইন্দ্রিয়াদি, অহংকার অথবা অনুগত স্বভাবের সাহায্যে মানুষ যা কিছু করে, তা সব পরমপুরুষ নারায়ণেরই জন্য, এইভাবে সবই তাঁকে সমর্পিত করা উচিত।'

সঞ্চারঃ পদয়োঃ প্রদক্ষিণবিধিঃ স্তোত্রাণি সর্বা গিরো।
যদ্যৎকর্ম করোমি তত্তদখিলং শম্ভো তবারাধনম্॥ (শিবমানসপূজা)

'হে শম্ভো ! আমার চলাফেরা, আপনাকেই পরিক্রমা করা এবং সমস্ত শব্দ উচ্চারণ আপনারই স্তব। আমি যেসব কর্ম করি, সেগুলি সবই আপনারই আরাধনা।'

সম্বন্ধ—অনিত্য সংসার থেকে সম্পর্কবিচ্ছিন্ন করে নিত্য-তত্ত্ব অভিমুখী সাধকেরা নানাপ্রকারের হয়ে থাকেন। তাঁদের মধ্যে ভক্ত সাধকদের বর্ণনা আগের দুটি শ্লোকে করা হয়েছে, এবার অন্য সাধকদের বর্ণনা পরবর্তী শ্লোকে করেছেন।

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্॥ ১৫ ॥

[**অন্যে** (অন্য সাধক) ; **জ্ঞানযজ্ঞেন** (জ্ঞানযজ্ঞের সাহায্যে) ; **একত্বেন** (একইভাবে) ; **মাম্** (আমার) ; **যজন্তঃ** (পূজা দ্বারা) ; **উপাসতে** (আমার উপাসনা করেন) ; **চ** (আবার) ; **অপি** (অন্য কোনো সাধক) ; **পৃথক্ত্বেন** (পৃথক্ মনে করে) ; **বিশ্বতোমুখম্** (চারদিকে মুখবিশিষ্ট আমার বিরাট রূপের) ; **বহুধা** (নানাপ্রকারে উপাসনা করেন।)]

কোনো কোনো সাধক জ্ঞানযজ্ঞের সাহায্যে একীভাবে (অভেদ-ভাবে) আমার পূজা দ্বারা আমাকে উপাসনা করেন, আবার অন্য কোনো সাধক নিজেকে পৃথক্ বলে মনে করে চারদিকে মুখবিশিষ্ট আমার বিরাট রূপের অর্থাৎ সংসারকে আমার বিরাট রূপ মনে করে (সেব্য-সেবক ভাবের দ্বারা) নানাপ্রকারে আমার উপাসনা করেন ॥ ১৫ ॥

ব্যাখ্যা—[ক্ষুধার্ত ব্যক্তিদের ক্ষুধা এক-রকমেরই হয় এবং তারা আহার করলে তৃপ্তিও এক রকমের হয় ; যদিও তাদের ভোজ্য পদার্থের মধ্যে বিভিন্নতা থাকে। তেমনই পরিবর্তনশীল অনিত্য জগতে আকৃষ্ট ব্যক্তিগণ যে কাজই করুক, তাতে তাদের তৃপ্তি হয় না, তারা অভাবগ্রস্তই থাকে। যখন তারা সংসারে বিমুখ হয়ে কেবল ঈশ্বরাভিমুখী হয় তখন ঈশ্বরলাভ হলে তারা সম্পূর্ণ তৃপ্ত হয় অর্থাৎ তখন তারা কৃতকৃত্য, জ্ঞাত-জ্ঞাতব্য এবং প্রাপ্ত-প্রাপ্তব্য হয়ে যায়। কিন্তু তাদের রুচি, যোগ্যতা, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ভিন্ন ভিন্ন হয়। তাই তাদের উপাসনাও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।]

'জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে একত্বেন'—কোনো কোনো জ্ঞানযোগী সাধক জ্ঞানযজ্ঞের সাহায্যে অর্থাৎ বিবেক-বিচারের সাহায্যে অসৎ পরিত্যাগ করে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত-স্বরূপ সৎ পরমাত্মতত্ত্বকে এবং নিজ প্রকৃত স্বরূপকে এক বলে মেনে নিয়ে আমার নির্গুণ-নিরাকার স্বরূপের উপাসনা করে থাকেন।

এই পরিবর্তনশীল জগতের কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই ; কারণ এই জগৎ-সংসার আগে নাস্তিরূপে ছিল এবং এখনও নাস্তিতেই যাচ্ছে। সুতরাং এটি নাস্তিরূপই (না থাকাই)। যা হতে এই জগৎ-সংসার উৎপন্ন হয়েছে, যার আশ্রিত এবং যার দ্বারা প্রকাশিত, সেই পরমাত্মার সত্তাতেই এর সত্তা প্রতীত হয়। সেই পরমাত্মার সঙ্গেই আমার একত্ব—এইভাবে সেই পরমাত্মার প্রতি নিত্য-নিরন্তর লক্ষ্য রাখাই হল একইভাবে তাঁর উপাসনা করা।

এখানে **'যজন্তঃ'** পদটির তাৎপর্য হল যে তাদের শুধু পরমাত্মতত্ত্বের প্রতিই শ্রদ্ধা থাকে—এটিই তাদের পূজা।

'পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্'—এইভাবেই কোনো কোনো কর্মযোগী সাধক নিজেকে সেবক বলে মনে করেন এবং সংসারমাত্রকেই ভগবানের বিরাটরূপ মনে করে নিজ শরীর-মন-বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির সমস্ত ক্রিয়া ও পদার্থগুলিকে সংসারের সেবায় নিয়োজিত করেন। এদের কী করে সুখ হবে, সকলের দুঃখ কীভাবে দূর হবে, এদের সেবা কী করে হবে—এই চিন্তায় তাঁরা নিজেদের শরীর, অর্থ, মন ইত্যাদির দ্বারা জন-জনার্দনের সেবায় নিয়োজিত থাকেন এবং ভগবদ্‌কৃপায় তাঁদের পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটে।

পরিশিষ্ট-ভাব—সাধকগণ তাঁদের নিজস্ব রুচি, যোগ্যতা এবং শ্রদ্ধা-বিশ্বাস অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ সাধনা দ্বারা যাঁরই উপাসনা করুন না কেন, তাতে ভগবানের সমগ্ররূপেরই উপাসনা করা হয়। পরবর্তী ষোড়শ থেকে উনিশতম শ্লোক পর্যন্ত সেই সমগ্ররূপেরই বর্ণনা করা হয়েছে।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—সমস্ত উপাসনাই যখন পৃথক্ -পৃথক্, তাহলে সব উপাসনাই আপনার উপাসনা—কী করে ? পরবর্তী চারটি শ্লোকে তারই উত্তর দিয়েছেন।

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্॥ ১৬ ॥
পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ॥ ১৭ ॥
গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥ ১৮ ॥

[**অহম্** (আমি) ; **ক্রতুঃ** (ক্রতু) ; **অহম্** (আমি) ; **যজ্ঞঃ** (যজ্ঞ) ; **অহম্** (আমি) ; **স্বধা** (স্বধা) ; **অহম্** (আমি) ; **ঔষধম্** (ঔষধ) ; **অহম্** (আমি) ; **মন্ত্রঃ** (মন্ত্র) ; **অহম্** (আমি) ; **আজ্যম্** (ঘৃত) ; **অহম্** (আমি) ; **অগ্নিঃ** (অগ্নি) ; **হুতম্** (যজ্ঞরূপ ক্রিয়া) ; **এব** (ও) ; **অহম্** (আমি) ; **বেদ্যম্** (জ্ঞেয়) ; **পবিত্রম্** (পবিত্র) ; **ওঁকারঃ** (ওঁকার) ; **ঋক্** (ঋক্) ; **সাম** (সাম) ; **চ** (এবং) ; **যজুঃ** (যজুর্বেদ) ; **এব** (ও) ; **অহম্** (আমি) ; **অস্য** (এই) ; **জগতঃ** (সমগ্র জগতের) ; **পিতা** (পিতা) ; **ধাতা** (ধাতা) ; **মাতা** (মাতা) ; **পিতামহঃ** (পিতামহ) ; **গতিঃ** (গতি) ; **ভর্তা** (ভর্তা) ; **প্রভুঃ** (প্রভু) ; **সাক্ষী** (সাক্ষী) ; **নিবাসঃ** (নিবাস) ; **শরণম্** (আশ্রয়) ; **সুহৃৎ** (সুহৃদ্) ; **প্রভবঃ** (উৎপত্তি) ; **প্রলয়ঃ** (প্রলয়) ; **স্থানম্** (স্থান) ; **নিধানম্** (নিধান) ; **অব্যয়ম্** (অবিনাশী) ; **বীজম্** (বীজ।)]

আমি ক্রতু, আমি যজ্ঞ, আমি স্বধা, আমি ঔষধ, মন্ত্র আমি, আমিই ঘৃত, আমি অগ্নি এবং যজ্ঞরূপ ক্রিয়াও আমি। জ্ঞেয় (যা অবশ্যই জানার যোগ্য) পবিত্র ওঁকার, ঋক-সাম-যজুঃ বেদও আমি। এই সমগ্র জগতের পিতা, ধাতা, মাতা, পিতামহ, গতি, ভর্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, আশ্রয়, সুহৃদ্, উৎপত্তি, প্রলয়, স্থান, নিধান এবং অবিনাশী বীজও আমি ॥ ১৬-১৮ ॥

ব্যাখ্যা—[সপ্তম অধ্যায় থেকে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত এই মধ্যম ষট্‌কে ভগবান তাঁর ভক্তির (উপাসনার) বর্ণনা করেছেন এবং এতে **'অস্মৎ'** অর্থাৎ **'অহম্'**, **'মম'** **'ময়া'**, **'মৎ'** ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন। এখানে ষোড়শ শ্লোকে **'অস্মৎ'** অর্থাৎ **'অহং'** শব্দটি আটবার ব্যবহৃত হয়েছে। **'অহম্'** শব্দটির এত অধিক প্রয়োগ এই ষট্‌কের অন্য কোনো শ্লোকে করা হয়নি।

নিজস্ব রুচি, শ্রদ্ধা-বিশ্বাস অনুযায়ী কাউকে সাক্ষাৎ পরমাত্মাস্বরূপ মনে করে তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলে, বাস্তবে সেই সম্পর্ক সাক্ষাৎ সৎ-স্বরূপের সঙ্গেই হয়ে থাকে। এ বিষয়ে নিজের মনে বা বুদ্ধিতে যেন কোনোপ্রকার সন্দেহ (দ্বিধা) না থাকে। যেমন, জ্ঞানের সাহায্যে মানুষ সমস্ত দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি প্রভৃতিতে এক পরমাত্মতত্ত্বকেই জানতে পারে, পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কোনো বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা, পরিস্থিতি, ক্রিয়া ইত্যাদির যে কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই—এতে তার বিন্দুমাত্র সংশয় থাকে না। সেইরূপে ভগবানই বিশ্বরূপে প্রকটিত হয়ে আছেন ; সুতরাং সবকিছুই ভগবান—এ তত্ত্বে কোনো সংশয় থাকা উচিত নয়। কারণ 'সব কী করে ভগবান হতে পারে ?'—এরূপ সন্দেহ সাধকদের প্রকৃত তত্ত্ব থেকে, মুক্তি থেকে বঞ্চিত করে এবং তাকে সাংসারিক চক্রে আবদ্ধ রাখে। অতএব দৃঢ়তার সঙ্গে মেনে নাও যে কার্য-কারণরূপে যা কিছু দেখা-শোনা-বোঝা অথবা মেনে নেওয়ার বিষয় আছে, তা সবই ভগবান। এই কার্য-কারণ রূপে ভগবানের সর্বত্রব্যাপ্ত স্বরূপের বর্ণনা ষোড়শ থেকে উনিশতম শ্লোক পর্যন্ত করা হয়েছে।]

'অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্'—বৈদিক রীতিতে যা করা হয়, তা হল 'ক্রতু'। আমিই সেই ক্রতু। স্মার্তরীতিতে (পৌরাণিক রীতিতে) যেটি করা হয় তাকে বলা হয় 'যজ্ঞ', যেগুলিকে পঞ্চমহাযজ্ঞ ইত্যাদি স্মার্ত-কর্ম বলা হয়, সেই যজ্ঞ আমিই। পিতৃপুরুষদের জন্য যে অন্ন-জল অর্পণ করা হয়, তাকে বলা হয় 'স্বধা', সেই স্বধাও

আমি। এই ক্রতু, যজ্ঞ এবং স্বধার জন্য প্রয়োজনীয় যে শাকল্য অর্থাৎ ফল-ফুল, যব, তিল ইত্যাদি বস্তু, সেসকল বস্তুও আমি।

'মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্'—যে মন্ত্রের দ্বারা ক্রতু, যজ্ঞ এবং স্বধা করা হয়, সেই মন্ত্রও আমি। যজ্ঞাদির জন্য যে গব্য ঘৃতের প্রয়োজন হয়—তাও আমি। যে অগ্নির দ্বারা হোম করা হয় ; সেই অগ্নি এবং হবন ক্রিয়াও আমি।

'বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্‌সাম যজুরেব চ'—বেদে বর্ণিত যে বিধি, তা ঠিকমতো জানাকে বলা হয় 'বেদ্য'। তাৎপর্য হল যে, কামনা পূরণ বা নিবৃত্তির জন্য বৈদিক ও শাস্ত্রীয় যে সমস্ত ক্রতু, যজ্ঞ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয় তা বিধি-বিধানসহ সর্বাঙ্গীণভাবে হওয়া উচিত। সুতরাং বিধি-নিয়ম জানার সমস্ত ব্যাপারটিই 'বেদ্য' নামে অভিহিত হয়। এই বেদ্যও আমারই স্বরূপ।

যজ্ঞ, দান ও তপ—এই তিনটিই নিষ্কাম ব্যক্তিদের মহাপবিত্র করে তোলে **'যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্'** (গীতা ১৮।৫)। এতে নিষ্কামভাবে যে হব্য ইত্যাদি বস্তু ব্যয় হয় তাও পবিত্র হয়ে যায় এবং এতে নিষ্কামভাব রেখে যে ক্রিয়া করা হয় তাও পবিত্র হয়ে ওঠে। এই পবিত্রতা আমারই স্বরূপ।

ক্রতু, যজ্ঞ ইত্যাদি অনুষ্ঠানের জন্য যে সমস্ত বেদমন্ত্র উচ্চারিত হয়, সেই সবের আগে 'ওঁ' উচ্চারণ করা হয়। এটি উচ্চারণ করলেই বেদমন্ত্রের অভীষ্ট ফল লাভ হয়। বেদজ্ঞগণের যজ্ঞ, দান, তপ ইত্যাদি সকল ক্রিয়াই 'ওঁ' উচ্চারণ করে আরম্ভ হয় (গীতা ১৭।২৪)। বৈদিকগণের কাছে প্রণবের উচ্চারণ অতিশয় মুখ্য। তাই ভগবান প্রণবকে তাঁর স্বরূপ বলেছেন।

এই ক্রতু, যজ্ঞ ইত্যাদির বিধি জানা যায় ঋগ্বেদ, সামবেদ ও যজুর্বেদ—এই তিনটি বেদ থেকে। যাতে নিয়তাঅক্ষরসম্পন্ন মন্ত্র উচ্চারিত হয় সেই মন্ত্র সমুদয়কে 'ঋক্‌বেদ' বলা হয়। যাতে স্বরের সহিত গীতের মাধ্যমে মন্ত্র উচ্চারিত হয় সেই মন্ত্রগুলিকে বলা হয় 'সামবেদ'। যাতে অনিয়তাক্ষরসম্পন্ন মন্ত্র থাকে, সেই মন্ত্রগুলিকে 'যজুর্বেদ' বলা হয়[১]। এই তিনটি বেদই ভগবানের স্বরূপ।

'পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ'—এই জড়-চেতন, স্থাবর-জঙ্গম ইত্যাদি সমস্ত জগৎ আমিই সৃষ্টি করি—**'অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ'** (গীতা ৭।৬) এবং বারংবার অবতাররূপ গ্রহণ করে আমিই এদের রক্ষা করি। তাই আমি এদের **'পিতা'**। একাদশ অধ্যায়ের তেতাল্লিশতম শ্লোকে অর্জুনও বলেছেন যে 'আপনিই এই জগৎ চরাচরের পিতা'—**'পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য'**।

এই জগৎ-সংসারকে সর্বভাবে আমিই ধারণ করে আছি এবং সংসারের যা কিছু বিধান তা আমিই করে থাকি। তাই আমি জগতের **'ধাতা'**।

জীবগণের নিজ কর্ম অনুসারে যে যে যোনিতে এবং যেমন শরীরের প্রয়োজন হয় সেইসব যোনিতে সেইরূপ দেহ উৎপাদনকারী **'মাতা'** আমিই অর্থাৎ আমি সমস্ত জগতের মাতা।

লোকমুখে প্রসিদ্ধ আছে যে ব্রহ্মা সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করেন, এই দৃষ্টিতে ব্রহ্মা সকল প্রজার পিতা। ব্রহ্মাও আমা হতে প্রকটিত—সেইভাবে দেখলে আমি ব্রহ্মার পিতা এবং প্রজাদের **'পিতামহ'**। অর্জুনও ভগবানকে ব্রহ্মার আদিকর্তা বলে জানিয়েছেন—**'ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে'** (১১।৩৭)।

'গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ'—প্রাণীদের যা সর্বাপেক্ষা প্রাপণীয় তত্ত্ব, সেই **'গতি'**-স্বরূপ আমিই। সংসারমাত্রেরই ভরণ-পোষণকারী **'ভর্তা'** এবং জগৎ-সংসারের মালিক **'প্রভু'**ও আমি। সবসময়ে সকলকে ঠিকমতো জানার **'সাক্ষী'** আমি। আমার অংশ হওয়ায় সমস্ত জীব স্বরূপতঃ সর্বদা আমাতেই অবস্থান করে, তাই এই সকলের **'নিবাস'**-স্থানও আমি। যার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়, সেই **'শরণ'** অর্থাৎ শরণাগত বৎসলও আমি। কোনো কারণ ব্যতীতই প্রাণীমাত্রের হিতকারী **'সুহৃদ্'** অর্থাৎ হিতৈষীও আমি।

'প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্'—সমস্ত

---

[১] যে মন্ত্রে অস্ত্র-শস্ত্র, গৃহ-নির্মাণ ইত্যাদি লৌকিক বিদ্যার বর্ণনা করা হয় তাকে 'অথর্ববেদ' বলা হয়। যদিও অনুসমুচ্চয়ার্থ 'চ' অব্যয় দ্বারা অথর্ববেদকে গ্রহণ করা যায়, তবুও এতে লৌকিক বিদ্যার বর্ণনা থাকায় ক্রতু, যজ্ঞ ইত্যাদির অনুষ্ঠানে এটি উল্লিখিত হয়নি। সেজন্যই পরে কুড়ি এবং একুশতম শ্লোকে উল্লিখিত 'ত্রৈবিদ্যাঃ' এবং 'ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্নাঃ' পদেও ঋক্, সাম্, যজুঃ—এই তিন বেদেরই সংকেত করা হয়েছে।

জগৎ আমা হতে উৎপন্ন হয়ে আমাতেই লীন হয়ে যায়, তাই আমি **'প্রভব'** এবং **'প্রলয়'** অর্থাৎ আমিই জগতের নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ (গীতা ৭।৬)।

মহাপ্রলয়ে প্রকৃতিসহ সমস্ত জগৎ আমাতেই অবস্থান করে, তাই আমি জগতের **'স্থান'**[১]।

জগতের সর্গের সময় বা প্রলয়ের সময়—সব অবস্থাতেই প্রকৃতি, সংসার, জীব এবং যা কিছু দেখা-শোনা ও বোঝা যায় তা সবই আমাতে অবস্থান করে, তাই আমি এদের **'নিধান'**।

জাগতিক বীজ তো উৎপন্ন হয় বৃক্ষ থেকে এবং বৃক্ষ উৎপন্ন করে সেটি নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আমি এরূপ নই। আমি অনাদি এবং আমার জন্ম হয় না এবং অনন্ত বিশ্ব রচনা করেও আমি একইভাবে অবস্থান করি। তাই আমি হলাম **'অব্যয় বীজ'**।

পরিশিষ্ট-ভাব—জ্ঞানের দৃষ্টিতে যেমন গুণই গুণে আবর্তিত হচ্ছে—**'গুণা গুণেষু বর্তন্তে'** (গীতা ৩।২৮), তেমনই ভক্তির দৃষ্টিতে ভগবানের বস্তুই ভগবানে অর্পণ করা হচ্ছে। যেমন লোকে গঙ্গাজল দিয়েই গঙ্গাপূজা করে, তেমনই ভগবানের বস্তুর দ্বারা ভগবানেরই পূজা হয়ে থাকে ! প্রকৃতপক্ষে পূজ্যও ভগবান, পূজার সামগ্রীও ভগবান, পূজাও ভগবান এবং পূজকও ভগবান।

লৌকিক বীজ খেতে উৎপন্ন হয়, কিন্তু ভগবানরূপ অলৌকিক বীজ উৎপন্ন হয় না, তাই ভগবান সপ্তম অধ্যায়ে নিজেকে 'সনাতন বীজ' বলে জানিয়েছেন—**'বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্'** (৭।১০)। এখন ভগবান নিজেকে এখানে 'অব্যয় বীজ' বলে জানাচ্ছেন—**'বীজমব্যয়ম্'**। কারণ লৌকিক বীজ অঙ্কুর উৎপন্ন করে বিনষ্ট প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ভগবানরূপী অলৌকিক বীজ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন করেও একইভাবে বিরাজ করে, তাতে বিন্দুমাত্র বিকার হয় না। তাৎপর্য হল যে ভগবান সমস্ত জগতের আদিতেও বিরাজমান আবার অন্তেও বিরাজমান। সিদ্ধান্ত হল যে যিনি আদি এবং অন্তে বিরাজ করেন, তিনি মধ্যেও (বর্তমানেও) বিরাজমান থাকেন। যেমন নানা প্রকারের জিনিস মাটিতে উৎপন্ন হয়, মাটিতেই থাকে আবার শেষে মাটিতেই মিশে যায়। তেমনই জগতে যত প্রকার বীজ আছে, তা সবই ভগবান থেকে উৎপন্ন হয়, ভগবানেই অবস্থিত থাকে এবং শেষকালে ভগবানেই লীন হয়ে যায় (গীতা ১০।৩৯)। তাৎপর্য হল যে, জাগতিক বীজ উৎপন্ন হয় আবার নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু ভগবানরূপী অবিনাশী বীজ আদি, মধ্য ও অন্তে একই প্রকার থাকে। অতএব বর্তমানে জগৎ সংসাররূপে একমাত্র ভগবানই বিরাজমান। ভগবান ব্যতীত আর কিছুই নেই।

*** *** ***

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতং চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন॥ ১৯ ॥

[**অর্জুন** (হে অর্জুন !) ; **অহম্** (আমি) ; **তপামি** (সূর্যরূপে তাপিত করি) ; **অহম্** (আমি) ; **নিগৃহ্ণামি** (জলকে আকর্ষণ করি) ; চ (এবং) ; **বর্ষম্** (বৃষ্টিরূপে) ; **উৎসৃজামি** (বর্ষণ করি) ; **অমৃতম্** (অমৃত) ; চ (ও) ; **মৃত্যুঃ** (মৃত্যু) ; চ (এবং) ; **সৎ** (সৎ) ; চ (ও) ; **অসৎ** (অসৎ) ; **অহম্, এব** (আমিই ।)]

হে অর্জুন ! (জগতের হিতার্থে) আমি সূর্যরূপে তাপিত করি, জলকে আকর্ষণ করি এবং পুনরায় সেই জলকে বৃষ্টিরূপে বর্ষণ করি। (অধিক আর কী বলব) আমিই অমৃত ও মৃত্যু এবং সৎ এবং অসৎও আমি ॥ ১৯ ॥

---

[১]মহাসর্গের সময় সমস্ত প্রাণী যাতে অবস্থান করে, তাকে বলে 'নিবাস' আর মহাপ্রলয়ে প্রকৃতিসহ সমস্ত জগৎ যাতে অবস্থান করে, তাকে বলা হয় 'স্থান'। নিবাস এবং স্থানের মধ্যে এই হল তফাৎ।

ব্যাখ্যা—'তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্নাম্যুৎসৃজামি চ'—পৃথিবীতে যা কিছু অশুদ্ধ, দূষিত জিনিস আছে, যা থেকে রোগের সৃষ্টি হয়, সেগুলিকে শোষণ করে প্রাণীদের নীরোগ করার জন্য[১] অর্থাৎ ঔষধি ও শিকড়-বাকড়াদিতে যে ক্ষতিকর অংশ আছে তা শোষণ করার জন্য এবং পৃথিবীতে যে জলীয় ভাগ আছে, যাতে অপবিত্রতা আসে—সেগুলিকে শুষ্ক করার জন্য আমি সূর্যের রূপে তাপপ্রদান করি। সূর্যরূপে ওই সমস্ত জলীয় ভাগ শোষণ করে পরে সেই জল শুদ্ধ ও মিষ্ট করে সময়মতো বর্ষারূপে প্রাণীদের হিতার্থে বর্ষণ করি, যাতে প্রাণীদের জীবন নির্বাহ হয়।

'অমৃতং চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন'—আমিই অমৃত এবং মৃত্যু অর্থাৎ জীবমাত্রেরই প্রাণ ধারণ করে জীবিত থাকা (মৃত্যু না হওয়া) এবং সমস্ত জীবের পিণ্ড অর্থাৎ প্রাণবিয়োগ হওয়াও (মৃত্যু হওয়া) আমি।

আর কী বলব, সৎ-অসৎ, নিত্য-অনিত্য, কার্যকারণরূপে সবই আমি। তাৎপর্য হল এই যে, মহাপুরুষদের দৃষ্টিতে যেমন সবই বাসুদেব (ভগবৎ স্বরূপ)—**'বাসুদেবঃ সর্বম্'** তেমনই ভগবানের দৃষ্টিতে সৎ-অসৎ, কার্য-কারণ সবই ভগবান। কিন্তু সাংসারিক ব্যক্তিদের দৃষ্টিতে একটি অপরের বিপরীত বলে প্রতীয়মান হয়। যেমন—বাঁচা ও মরা পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রতিভাত হয়, উৎপত্তি ও বিনাশ পৃথক্ বলে মনে হয়, স্থূল ও সূক্ষ্ম পৃথক্‌রূপে দেখায়, সত্ত্ব-রজ-তম এই তিনটিকে পৃথক্ বলে মনে হয়, কার্য ও কারণ পৃথক্‌রূপে প্রতীয়মান হয়, জল ও বরফ পৃথক্ বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে (সংসার) জগৎরূপে ভগবানই প্রকটিত হওয়ায়, ভগবানই সবকিছু হয়ে থাকায়, সবই ভগবদ্‌স্বরূপ, ভগবান ভিন্ন এদের কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্বই নেই। যেমন সুতোর তৈরি কাপড়ে কেবলমাত্র সুতোই থাকে, তেমনই বস্তু, ব্যক্তি, ক্রিয়া, পদার্থ ইত্যাদি সবকিছুতে একমাত্র ভগবানই বিরাজিত।

পরিশিষ্ট-ভাব—জগৎ সৃষ্টির পূর্বেও ভগবান ছিলেন এবং পরেও থাকবেন, তাহলে মধ্যবর্তীকালে অন্য কেউ কী করে আসবেন ? অতএব অমৃত যেমন ভগবদ্‌স্বরূপ, মৃত্যুও তেমনই ভগবদ্‌স্বরূপ। সৎ (পরাপ্রকৃতি)ও ভগবানের স্বরূপ আর অসৎ (অপরা প্রকৃতি)ও ভগবানের স্বরূপ। অন্নকূটের প্রসাদে যেমন রসগোল্লা, পান্তুয়া ইত্যাদিও থাকে আবার মেথি, করলা ইত্যাদির শাকও থাকে অর্থাৎ মিষ্টান্নও ভগবদ্ প্রসাদ হয় আবার তিক্ত জিনিসও ভগবদ্ প্রসাদ হয়। তেমনই যা কিছুতে আমাদের মনে প্রিয়তা হয়, তাও যেমন ভগবানের স্বরূপ, তেমনই যা কিছুতে আমাদের মনে বিষণ্ণতা আসে তাও ভগবানের স্বরূপ। সূর্যরূপে জলকে আকর্ষণ করা এবং বৃষ্টিরূপে জল বর্ষণ করা—এই দুই বিপরীত কার্যও (গ্রহণ ও ত্যাগ) ভগবান করে থাকেন। শুধু তাই নয় জল আকর্ষণ করেন যিনি তিনিও ভগবান, বর্ষণকারীও ভগবান আবার বর্ষারূপ ক্রিয়াও ভগবান।

'সদসচ্চাহমর্জুন'— জগতে সৎ (পরা) এবং অসৎ (অপরা) ব্যতীত অন্য আর কিছুই নেই। জগৎ অসৎ আর এতে যে পরমাত্মতত্ত্ব বিদ্যমান তা হল সৎ। শরীর অসৎ আর তাতে বসবাসকারী জীবাত্মা সৎ। শরীর এবং জগৎ পরিবর্তনশীল, জীবাত্মা এবং পরমাত্মা অপরিবর্তনশীল। শরীর ও জগৎ বিনাশশীল, জীবাত্মা ও পরমাত্মা অবিনাশী (গীতা ২।১২)। ভগবান বলেছেন পরিবর্তনশীল যা তাও আমি আর অপরিবর্তনশীল যা, তাও আমি, বিনাশশীলও আমি। অবিনাশীও আমি। অর্থাৎ সবকিছুই ভগবান। ভগবান ব্যতীত আর কিছুই নেই (গীতা ৭।৭)।

'নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ'—এতে বিবেক-বিচার প্রযোজ্য, কিন্তু **'সদসচ্চাহম্'**—এতে বিবেক-বুদ্ধি নয়, বিশ্বাস থাকে। সব কিছুই ভগবান—এই বিশ্বাস বিবেক-বিচার থেকেও শক্তিশালী। কারণ বিবেক কাজ করে সেখানেই, যেখানে সৎ ও অসৎ উভয়ের বিচারের প্রশ্ন থাকে। যখন অসৎ নেই-ই তখন বিবেক-বিচারের আর কী প্রয়োজন ? অসৎকে মানলে বিবেক আর অসৎকে না মানলে বিশ্বাস থাকে। বিবেকের সৎ-অসৎ দুটি ভাগ থাকে, কিন্তু বিশ্বাসের কোনো ভাগ থাকে না। সেখানে শুধু সৎ-ই থাকে অর্থাৎ পরমাত্মাই বিদ্যমান থাকেন।

জ্ঞানমার্গে বিবেক আর ভক্তিমার্গে বিশ্বাস এবং প্রেমের প্রাধান্য থাকে। জ্ঞানমার্গে সৎ-অসৎ, জড়-চেতন, নিত্য-

[১]সূর্য থেকেই আরোগ্য হয়—'আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেৎ'। (লৌগাক্ষিস্মৃতি)

অনিত্য ইত্যাদির বিচার-বিবেচনা প্রধান হওয়ায় এর মধ্যে 'দ্বৈত' ভাব থাকে, কিন্তু ভক্তিমার্গে শুধুমাত্র ভগবদ্ বিশ্বাসই প্রধান হওয়ায় এটি 'অদ্বৈত' হয়। অর্থাৎ দুটি সত্তা না হওয়ায় ভক্তিতেই বাস্তবিক অদ্বৈত থাকে।

জ্ঞানমার্গের সাধক অসৎকে অস্বীকার করেন। অস্বীকার করলেও অসতের অস্তিত্ব থাকতে পারে। সাধক অসৎকে যত বেশি অস্বীকার করার চেষ্টা করেন, ততই অসতের অস্তিত্ব দৃঢ় হয়। সুতরাং অসৎকে অস্বীকার করে দূরে সরানোর থেকে তাকে উপেক্ষা করা সব থেকে ভালো। উপেক্ষা করার থেকেও 'সব কিছু পরমাত্মা'—এই ভাব আরও ভালো। অতএব ভক্ত অসৎকে অস্বীকারও করেন না বা উপেক্ষাও করেন না, তিনি সৎ-অসৎ সবেতেই পরমাত্মাকে দর্শন করে থাকেন, কারণ প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মাই সব।

ভগবান বলেছেন—**অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্। পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥** (শ্রীমদ্ভাগবত ২।৯।৩২)

'জগৎ-সৃষ্টির আগেও আমি বিদ্যমান ছিলাম, আমি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না এবং জগৎ উৎপন্ন হওয়ার পরেও যা কিছু ইহজগতে দেখা যায়, সে সবই আমি। জগৎ ছাড়াও আর যা কিছু আছে, সে-সবও আমি এবং জগৎ ধ্বংস হওয়ার পরে যা বাকি থাকে, তা-ও আমিই।'

দেহ-মন-বুদ্ধি-প্রাণ-ইন্দ্রিয়াদি-অহং ইত্যাদি সবই ভগবান। যেমন আমরা মনে মনে হরিদ্বারের কথা চিন্তা করলে হর-কি-পৈড়ী, ঘণ্টাঘর ইত্যাদি স্থাবর পদার্থগুলি মনেই সৃষ্টি হয় এবং গঙ্গা, জলে সঞ্চরমান মাছ, স্নান করতে থাকা নর-নারী ইত্যাদি সপ্রাণ বস্তুও মনেই সৃষ্ট হয় অর্থাৎ সবই মনের মধ্যে সৃষ্টি হয়। তেমনই সৎও ভগবান, অসৎও ভগবান।

আমাদের দৃষ্টিতে দুটি বিভাগ হয়ে থাকে সৎ ও অসৎ, তাই ভগবান আমাদের বোঝাবার জন্য বলেছেন—**'সদসচ্চাহম্'**। ভগবানের দৃষ্টিতে একমাত্র তিনি ছাড়া আর কিছুই নেই। উচ্চতম দার্শনিক দৃষ্টিতে দেখলেও দেখা যায় যে সত্তা মাত্র একটিই আছে। অন্য কোনো সত্তা নেই। অন্য কোনো সত্তার কথা মেনে নিলে মোহ উপস্থিত হয় (গীতা ৭।১৩)। দ্বিতীয় সত্তাকে মানলেই রাগ-দ্বেষ উৎপন্ন হয়।

* * *

সম্বন্ধ—জগৎ সৃষ্টি তথা নানাবিধ পরিবর্তন আমারই অধ্যক্ষতায় (পরিচালনায়) হয়ে থাকে; কিন্তু আমার এই প্রভাব না জেনে মূর্খ ব্যক্তিরা আসুরী, রাক্ষসী, মোহিনী প্রকৃতির আশ্রয় নিয়ে আমাকে অবহেলা করে, সেইজন্য তারা পতনের দিকে যেতে থাকে। যে-সব ভক্ত আমার প্রভাব জানেন, তাঁরা আমার দৈবী গুণগুলির আশ্রয় নিয়ে অনন্য চিত্তে নানাপ্রকারে আমার ভজনা করে থাকেন, সেইজন্য একমাত্র পরমাত্মাই সৎ-অসৎ সবকিছু, এটি তাঁদের সঠিক অনুভব হয়ে যায়। কিন্তু যাদের চিত্তে সাংসারিক ভোগ ও সংগ্রহের কামনা থাকে, তারা প্রকৃত তত্ত্ব না জেনে ভগবদ্‌বিমুখ হয়ে স্বর্গলোক প্রাপ্তির জন্য সকামভাবে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করে, সেইজন্য তারা জন্ম-মৃত্যুতে (পুনর্জন্ম) প্রাপ্ত হয়—পরবর্তী দুটি শ্লোকে ভগবান তারই বর্ণনা করেছেন।

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা-
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥ ২০ ॥

[**ত্রৈবিদ্যা** (তিন বেদে কথিত সকাম অনুষ্ঠানকারী) ; **সোমপাঃ** (সোমরসপানকারী) ; **পূতপাপাঃ** (নিষ্পাপব্যক্তি) ; **যজ্ঞৈঃ** (যজ্ঞের দ্বারা) ; **মাম্** (আমার) ; **ইষ্ট্বা** (পূজা করে) ; **স্বর্গতিম্** (স্বর্গ প্রাপ্তি) ; **প্রার্থয়ন্তে** (কামনা করেন) ; **তে** (তাঁরা) ; **পুণ্যম্** (পবিত্র) ; **সুরেন্দ্রলোকম্** (স্বর্গলোক) ; **আসাদ্য** (লাভ করে) ; **দিবি** (স্বর্গের) ; **দিব্যান্, দেবভোগান্** (দেবতাদের দিব্য ভোগসমূহ) ; **অশ্নন্তি** (উপভোগ করে থাকেন।)]

তিন বেদে কথিত সকাম অনুষ্ঠানকারী এবং সোমরসপানকারী যে-সব নিষ্পাপ ব্যক্তি যজ্ঞ দ্বারা (ইন্দ্রের রূপে) আমার পূজা করে স্বর্গপ্রাপ্তি কামনা করেন, তাঁরা পুণ্যফলস্বরূপ ইন্দ্রলোক লাভ করে সেখানে দেবতাদের দিব্যভোগসমূহ উপভোগ করে থাকেন ॥ ২০ ॥

ব্যাখ্যা—**'ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ......দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্'**—সাংসারিক মানুষেরা প্রায়শঃই ইহ-জগতের ভোগে ব্যাপৃত থাকে। এদের মধ্যে যাদের বিশেষ বুদ্ধিমান বলা হয়, তাদের চিত্তেও উৎপত্তি ও বিনাশশীল বস্তুর গুরুত্ব থাকায়, তারা যখন ঋক্-সাম-যজুঃ—এই ত্রিবেদোক্ত সকাম কর্মের এবং তার ফলের বর্ণনা শোনে, তখন তারা (বেদে আস্তিক্যভাব থাকায়) এখানকার ভোগের জন্য তেমন পরোয়া না করে স্বর্গের ভোগগুলির জন্য লালায়িত হয়ে ওঠে এবং স্বর্গলাভের জন্য বেদোক্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত হয়। ওইসব ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যেই এখানে **'ত্রৈবিদ্যাঃ'** পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

সোমলতা বা সোমবল্লী নামে একপ্রকারের লতা আছে। তার বিষয়ে শাস্ত্রে আছে যে, শুক্লপক্ষে যেমন চন্দ্র প্রতিদিন এক এক কলায় বৃদ্ধি পেতে পেতে পূর্ণিমাতে পূর্ণরূপ প্রাপ্ত হয় এবং কৃষ্ণপক্ষে প্রতিদিন এক কলা ক্ষীণ হতে হতে অমাবস্যাতে একেবারে কলাহীন হয়ে যায়, তেমনই এই সোমলতায় শুক্লপক্ষে প্রতিদিন একটি করে পাতা বেরিয়ে পূর্ণিমাতে পনেরটি পাতা বেরোয় আবার কৃষ্ণপক্ষে একটি করে পাতা প্রতিদিন ঝরতে ঝরতে অমাবস্যায় সমস্ত পাতা ঝরে যায়[১]। এই সোমলতার রসকে বলা হয় সোমরস। যজ্ঞকারী ব্যক্তিগণ এই সোমরসকেই বৈদিক মন্ত্রাদির সাহায্যে অভিমন্ত্রিত করে পান করেন, **'সোমপাঃ'** শব্দে তাঁদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

বেদাদি বর্ণিত যজ্ঞানুষ্ঠানকারী এবং বেদমন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত সোমরস পানকারীদের স্বর্গের প্রতিবন্ধকরূপ পাপ দূর হয়, তাই তাঁদের বলা হয় **'পূতপাপাঃ'**।

ভগবান আগের শ্লোকে বলেছেন যে সৎ-অসৎ সবই আমি, তাহলে ইন্দ্রও ভগবদ্স্বরূপ। অতএব এখানে **'মাম্'** পদটিতে ইন্দ্রকেই ধরা উচিত । কারণ সকাম যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তি স্বর্গলাভের আশায় স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রের পূজাই করে থাকেন এবং ইন্দ্রের কাছেই স্বর্গলাভের জন্য প্রার্থনা করেন।

স্বর্গপ্রাপ্তির আশায় স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রের স্তুতি করা এবং সেই ইন্দ্রের কাছে স্বর্গলোক আকাঙ্ক্ষা করা—এই দুটিকে বলা হয় **'প্রার্থনা'**। বৈদিক এবং পৌরাণিক বিধি-বিধান দ্বারা অনুষ্ঠিত সকাম যজ্ঞের সাহায্যে ইন্দ্রের পূজা করার এবং প্রার্থনা করার ফলস্বরূপ এরা স্বর্গে গমন করে দিব্য দেবভোগ উপভোগ করেন। এই দিব্য ভোগ ইহলোকের ভোগের থেকে খুবই বিশেষ রূপের। সেখানে তারা দিব্য

---

[১]পঞ্চাঙ্গযুক্পঞ্চদশচ্ছদাঢ্যা সর্পাকৃতিঃ শোণিতপর্বদেশা। সা সোমবল্লী রসবন্ধকর্ম করোতি একাদিবসোপনীতা॥
করোতি সোমবৃক্ষোঽপি রসবন্ধবধাদিকম্। পূর্ণিমাদিবসানীতস্তযোর্বল্লী গুণাধিকা॥
কৃষ্ণে পক্ষে প্রগলতি দলং প্রত্যহং চৈকমেকং। শুক্লেঽপ্যেকং প্রভবতি পুনর্লম্বমানা লতাঃ স্যুঃ॥
তস্যাঃ কন্দঃ কলয়তিতরাং পূর্ণিমায়াং গৃহীতো। বদ্ধা সূতং কনকসহিতং দেহলোহং বিধত্তে॥
ইয়ং সোমকলা নাম বল্লী পরমদুর্লভা। অনয়া বদ্ধসূতেন্দ্রো লক্ষবেধী প্রজায়তে॥
(রসেন্দ্রচূড়ামণি ৬।৬-৯)

'সর্পের আকৃতির ন্যায় যার পনেরোটি পাতা, পাতা বেরোবার স্থানটি যার লালবর্ণ, পূর্ণিমার দিন সংগ্রহ করা এরই পঞ্চাঙ্গ (মূল, শাখা, পাতা, ফুল ও ফল) দ্বারা যুক্ত সোমবল্লী পারদকে বদ্ধ করে। পূর্ণিমার দিনে সংগ্রহ করা পঞ্চাঙ্গ (মূল, বল্কল, পাতা, ফুল ও ফল) যুক্ত সোমবৃক্ষও পারদকে সংযুক্ত করা, পারদকে ভস্মে পরিণত করা ইত্যাদি কাজ করে দেয়। কিন্তু সোমবল্লী এবং সোমবৃক্ষ—এই দুটির মধ্যে সোমবল্লী অধিক গুণসম্পন্ন। কৃষ্ণপক্ষে প্রতিদিন এই সোমবল্লীর একটি করে পাতা খসে যায় এবং শুক্লপক্ষে প্রতিদিন একটি করে নতুন পাতা গজায়। এইভাবে এই লতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। পূর্ণিমার দিন যদি এই লতার কন্দ বার হয়, তবে সেটি খুব ভালো হয়। ধুতরার সঙ্গে এই কন্দে আবদ্ধ পারদ শরীরকে লোহার মতো মজবুত করে এবং এর দ্বারা আবদ্ধ পারদ লক্ষবেধী হয় অর্থাৎ একগুণ বদ্ধ পারদ লক্ষগুণ লোহাকে সোনায় পরিণত করে। সোম নামক এই লতা অত্যন্ত দুর্লভ।'

শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস এবং গন্ধ—এই পাঁচটি বিষয় উপভোগ (অনুভব) করে থাকে। তা ছাড়াও দিব্য নন্দনকাননে ভ্রমণ, সুখ-আরাম আহরণ, আদর-আপ্যায়ন লাভ, মহিমা ইত্যাদিও ভোগ করেন।

পরিশিষ্ট-ভাব—এখানে সেইসব মানুষদের কথা বলা হয়েছে, যাঁদের মধ্যে সংসার-জগতের অস্তিত্ব ও মহত্ত্ব দৃঢ় হয়ে রয়েছে এবং যাঁরা ভগবানকে বিধিপূর্বক উপাসনা করেন না (গীতা ৯।২৩)। এরূপ মানুষের উপাসনার ফল বিনাশশীল হয়ে থাকে (গীতা ৭।২৩)।

সমগ্ররূপের অন্তর্গত হওয়ায় সবই ভগবান, সেইজন্য এখানে ইন্দ্রের উদ্দেশ্যেও **'মাম্'** পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। মনুষ্যজগতের তুলনায় পবিত্র হওয়ায় ইন্দ্রলোককে **'পুণ্যম্'** বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

※ ※ ※

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং-
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না-
গতাগতং কামকামা লভন্তে॥ ২১ ॥

[**তে** (তাঁরা) ; **তম্** (সেই) ; **বিশালম্** (বিশাল) ; **স্বর্গলোকম্** (স্বর্গলোক) ; **ভুক্ত্বা** (ভোগ করে) ; **পুণ্যে** (পুণ্য) ; **ক্ষীণে** (ক্ষীণ হলে) ; **মর্ত্যলোকম্** (মৃত্যুলোকে) ; **বিশন্তি** (ফিরে আসেন) ; **এবম্** (এইভাবে) ; **ত্রয়ীধর্মম্** (তিনটি বেদে কথিত সকাম ধর্মের) ; **অনুপ্রপন্না** (আশ্রয় গ্রহণকারী) ; **কামকামাঃ** (কামনাপরবশ ব্যক্তিগণ) ; **গতাগতম্** (জন্ম-মৃত্যু) ; **লভন্তে** (প্রাপ্ত হন।)]

তাঁরা সেই বিশাল স্বর্গসুখ ভোগ করে পুণ্যক্ষয় হলে মৃত্যুলোকে ফিরে আসেন। এইভাবে তিন বেদে কথিত সকাম ধর্মের আশ্রয় গ্রহণকারী কামনা-পরবশ ব্যক্তিরা জন্ম-মৃত্যু প্রাপ্ত হন ॥ ২১ ॥

ব্যাখ্যা—**'তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং .... কামকামা লভন্তে'**—স্বর্গলোকও বিশাল (বিস্তৃত) স্থান, সেখানকার আয়ুও বিশাল (দীর্ঘ) এবং সেখানকার ভোগ-বিলাসের উপকরণও বিশাল (প্রচুর) ; তাই ইন্দ্রলোকের বর্ণনা করা হয়েছে 'বিশাল' বলে।

যাঁরা স্বর্গ কামনা করেন তাঁরা ভগবানের আশ্রয়ও নেন না এবং ভগবদ্‌প্রাপ্তির কোনো সাধনের সাহায্যও গ্রহণ করেন না। তাঁরা শুধুমাত্র ত্রিবেদোক্ত সকাম ধর্ম (অনুষ্ঠান)-এর আশ্রয় নেন। সেইজন্য তাঁদের বর্ণনা করা হয়েছে ত্রয়ীধর্মের শরণাগত বলে।

'গতাগতম্' এর অর্থ হল—যাওয়া আর আসা। সকাম অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তির যে পুণ্য কর্মের দ্বারা স্বর্গলাভ হয় সেটির অনুষ্ঠান করে স্বর্গে গমন করেন এবং সেই পুণ্যফল ভোগ করে, পুণ্য সমাপ্ত (ক্ষয়) হলে পুনরায় এই মৃত্যুলোকে ফিরে আসেন। এইভাবে ঘড়ির যন্ত্রের মতো তাঁর শুভকর্মের জন্য স্বর্গলোকে যাওয়া ও পুণ্য ক্ষয় হলে মর্ত্যলোকে আসার চক্র অবিরত চলতে থাকে। এই চক্রজাল থেকে এঁরা মুক্ত হতে পারেন না।

পূর্বশ্লোকে উদ্ধৃত **'পূতপাপাঃ'** পদের দ্বারা যাঁদের সম্পূর্ণ পাপ নাশ হয়েছে এবং এখানে উদ্ধৃত **'ক্ষীণে পুণ্যে'** পদের দ্বারা যাঁদের সমস্ত পুণ্য ক্ষয় হয়ে গিয়েছে, এরূপ অর্থ যদি ধরা হয়, তাহলে তাঁদের (পাপ-পুণ্য দুটিই ক্ষীণ হওয়ায়) মুক্তিলাভ করা উচিত। কিন্তু তাঁরা মুক্তিলাভ করেন না, বরং জন্ম-মৃত্যু প্রাপ্ত হন। তাই **'পূতপাপাঃ'** পদের দ্বারা এখানে তাঁদের বোঝানো হয়েছে, যাঁদের স্বর্গের প্রতিবন্ধক পাপগুলি যজ্ঞের দ্বারা দূর হয়ে গেছে এবং **'ক্ষীণে পুণ্যে'** পদের দ্বারা তাঁদের বোঝানো হয়েছে, যাঁদের স্বর্গের প্রাপক পুণ্য সেখানকার সুখভোগ করাতে সমাপ্ত হয়েছে। সুতরাং সম্পূর্ণ পাপ বা পুণ্য নাশের কথা এখানে বলা হয়নি।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—যাঁরা ত্রয়ীধর্মকে আশ্রয় করেন, তাঁদের দেবতার কাছে প্রার্থনা ও কামনা করতে হয় ; কিন্তু যাঁরা শুধু আমার শরণ নেন, তাঁদের নিজ যোগক্ষেমের জন্য মনে চিন্তা, সংকল্প অথবা কামনা করতে হয় না—পরবর্তী শ্লোকে ভগবান এ-কথাই জানাচ্ছেন।

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ ২২ ॥

[যে (যেসব) ; অনন্যাঃ (অনন্যচিত্ত) ; জনাঃ (ভক্তঃ) ; মাম্ (আমার) ; চিন্তয়ন্তঃ (চিন্তা করে) ; পর্যুপাসতে (উপাসনা করে) ; নিত্যাভিযুক্তানাম্ (আমাতে নিত্যযুক্ত) ; তেষাম্ (সেইসব ভক্তের) ; যোগক্ষেমম্ (যোগক্ষেম) ; অহম্ (আমি) ; বহামি (বহন করি।)]

যেসব অনন্যচিত্ত ভক্ত আমার চিন্তা করতঃ উপাসনা করে, আমাতে নিত্যযুক্ত সেই সব ভক্তের যোগক্ষেম (অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি এবং প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষা) আমি বহন করি ॥ ২২ ॥

ব্যাখ্যা—**'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে'**—যা কিছু দেখা, শোনা ও বোঝা যায়, সেগুলি সবই ভগবানেরই স্বরূপ আর তাতে যা কিছু পরিবর্তন হচ্ছে, সেগুলি সবই ভগবানের লীলা—একথা যাঁরা দৃঢ়ভাবে মেনে নেন বা বুঝে নেন তাঁদের ভগবান ছাড়া আর কিছুতে মহৎ বুদ্ধি হয় না। তাঁরা ভগবানে নিত্যযুক্ত হয়ে থাকেন। তাই তাঁদের 'অনন্য' বলা হয়। কেবল ভগবানকেই মহত্ত্ব দেওয়ায়, তাঁকেই প্রিয় ভাবায় তাঁদের দ্বারা স্বতঃ ভগবদ্‌চিন্তাই হয়ে থাকে।

'অনন্যাঃ' বলার অপর ভাবটি হল যে তাঁদের সাধন ও সাধ্য একমাত্র ভগবান অর্থাৎ শুধু ভগবানের শরণাগত হওয়া, তাঁকেই চিন্তা করা, তাঁরই উপাসনা করা এবং তাঁকেই প্রাপ্ত করা—এইরূপ তাঁদের দৃঢ় ভাব হয়। ভগবান ব্যতিরেকে তাঁদের অন্য কোনো ভাব থাকে না। কারণ ভগবান ব্যতীত আর সবই বিনাশশীল। সুতরাং ভগবান ছাড়া তাঁদের মনে আর কোনো ইচ্ছা জাগে না, নিজ জীবন-নির্বাহের ইচ্ছাও হয় না। তাই তাঁদের 'অনন্য' বলা হয়।

তাঁরা খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরা, কথা-বার্তা ইত্যাদি যা কিছু করেন, তা সবই ভগবানের উপাসনা হয়ে থাকে ; কারণ তাঁরা সমস্ত কাজই করেন ভগবানের প্রসন্নতার জন্য।

'তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাম্'—যাঁরা অনন্যচিত্তে ভগবানের চিন্তা করেন এবং তাঁর প্রসন্নতার জন্যই সব কাজ করেন, এখানে তাঁদেরই **'নিত্যাভিযুক্তানাম্'** বলা হয়েছে।

অন্যভাবে এটি বুঝতে হবে যে তাঁরা সংসার থেকে সর্বতোভাবে বিমুখ হয়েছেন—এই হল তাঁদের 'অনন্যতা', তাঁরা ভগবানের শরণাগত হয়েছেন—এই হল তাঁদের 'চিন্তা' এবং সক্রিয় ও অক্রিয় সর্বাবস্থায় ভগবদ্-সেবাপরায়ণ হওয়া—এই হল তাঁদের 'উপাসনা'। এই তিনটি ব্যাপারই যাঁদের মধ্যে থাকে, তাঁরাই হলেন 'নিত্যাভিযুক্ত'।

'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্'—অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি করানোকে বলা হয় 'যোগ' এবং প্রাপ্ত সামগ্রী রক্ষা করাকে বলা হয় 'ক্ষেম'। ভগবান বলেছেন যেসব ভক্ত আমাতে নিত্য যুক্ত হয়ে থাকেন, তাঁদের যোগক্ষেম আমি বহন করে থাকি।

ঠিকভাবে দেখলে বোঝা যায় যে অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি করানোও 'যোগে'র বহন করা এবং প্রাপ্ত না করানোও 'যোগে'র বহন করা। কারণ ভগবান তাঁর ভক্তদের হিতাকাঙ্ক্ষী এবং তিনি সেই কাজই করেন যাতে ভক্তদের মঙ্গল হয়। অনুরূপভাবেই প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষা করাও 'ক্ষেমের' বহন হয় আর রক্ষা না করাও 'ক্ষেমের' বহন হয়। যদি ভক্তের ভক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাঁর কল্যাণ হতে থাকে তাহলে ভগবান ভক্তের প্রাপ্ত সামগ্রী রক্ষা করেন। কারণ এতেই ভক্তের 'ক্ষেম' হয়। প্রাপ্ত বস্তু রক্ষা করলে যদি ভক্তের ভক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হয়, তার কল্যাণ না হয়, তাহলে ভগবান সেই প্রাপ্তবস্তু বিনাশ করে দেন ; কারণ সেটির বিনাশ করাতেই ভক্তের 'ক্ষেম' হয়। তাই ভগবানের ভক্তগণ অনুকূল ও প্রতিকূল—উভয় পরিস্থিতিতেই পরম প্রসন্ন থাকেন। ভগবানের নির্ভরতা থাকায় তাঁদের এই দৃঢ়বিশ্বাস থাকে যে, যে কোনো

পরিস্থিতিই আসুক তা সবই ভগবদ্- প্রেরিত। অতএব 'অনুকূল পরিস্থিতি ভালো আর প্রতিকূল পরিস্থিতি ভালো নয়'—তাঁদের এই মনোভাব দূর হয়। তাঁদের কেবল এই ভাব থাকে যে, 'ভগবান যা করেছেন, তাই ঠিক আর যা করেননি, তাও ঠিক। ভগবানের যা বিধান—তাতেই আমাদের মঙ্গল নিহিত।'

'এই হওয়া উচিত আর এরূপ হওয়া উচিত নয়'—আমাদের এইসব ভাবার কোনো প্রয়োজনই নেই। কারণ আমরা তাঁর হাতেরই পুতুল এবং তিনি সর্বদা আমাদের মঙ্গলই করে থাকেন। তাই আমাদের অমঙ্গল কখনো হতেই পারে না। অর্থাৎ ভক্তদের মনোমতো কাজ হলেও তাতে কল্যাণ হয় আবার মনোমতো কাজ না হলেও তাতে কল্যাণ হয়। ভক্তের চাওয়া না চাওয়ার কোনো মূল্য নেই, দামী হল ভগবানের বিধান। অতএব কেউ যদি অনুকূলতায় প্রসন্ন এবং প্রতিকূলতায় বিষণ্ণ হয়, তবে সে ভগবানের দাস নয়, সে নিজের মনের দাস।

আসলে 'যোগ' নাম হল ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক হওয়ার এবং 'ক্ষেম' নাম হল জীবের কল্যাণের। সেই দৃষ্টিতে ভগবান ভক্তের সম্বন্ধকে নিজের সঙ্গে দৃঢ় করেন—এটি হল ভক্তের যোগ আর ভক্তের কল্যাণের চেষ্টা করেন—এটি হল 'ক্ষেম'। এই ব্যাপারেই দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঁয়তাল্লিশতম শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে 'তুমি নির্যোগক্ষেম হও' অর্থাৎ তুমি যোগ এবং ক্ষেম নিয়ে কোনো প্রকার চিন্তা কোরো না।

'বহাম্যহম্'—কথাটির তাৎপর্য হল যে, মা যেমন ছোট শিশুর জন্য কোনো বস্তুর প্রয়োজন মনে করলে সেটি অত্যন্ত খুশি মনে নিজে নিয়ে আসেন, তেমনই আমাতে নিত্যযুক্ত ভক্তদের যদি কোনো বস্তু আমি প্রয়োজনীয় বলে মনে করি, সেটি আমি নিজে এনে দিই অর্থাৎ ভক্তদের সব কাজ আমি নিজে করি।

পরিশিষ্ট-ভাব—এখানে ভগবান আগের শ্লোকে বর্ণিত বৈদিক সকাম মানুষদের এবং পরবর্তী শ্লোকে বর্ণিত অন্য দেবতাদের উপাসনাকারীর থেকে নিজ ভক্তদের বৈশিষ্ট্যের কথা জানাচ্ছেন। ভগবানের অনন্য ভক্তেরা আগের শ্লোকে বর্ণিত ইন্দ্রকেও গুরুত্ব দেন না এবং পরবর্তী শ্লোকে বর্ণিত অন্য দেবতাদেরও গুরুত্ব দেন না। ইন্দ্রাদি দেবতাদের উপাসনাকারীদের কামনা অনুসারে সীমিত ফল প্রাপ্তি হয়। কিন্তু ভগবানকে যাঁরা উপাসনা করেন তাঁরা অসীম ফল লাভ করেন। দেবতাদের উপাসকগণ বেতনভোগীদের মতো হন আর ভগবানের উপাসনাকারীরা হন ঘরের সদস্য, নিজের লোকের মতো। বেতনভোগী তার কাজ অনুযায়ী সীমিত বেতন পায়, কিন্তু ঘরের সদস্যের সব কিছুই তার নিজস্ব।

তিনিই অনন্যভক্ত, যাঁর দৃষ্টিতে একমাত্র ভগবান ব্যতীত অন্য কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই— **'উত্তম কে অস বস মন মাহীঁ। সপনেহুঁ আন পুরুষ জগ নাহীঁ।।'** (শ্রীরামচরিতমানস, অরণ্যকাণ্ড ৫।৬)

'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্'—ভগবান সাধককে তার অত্যাবশ্যক সাধন-সামগ্রী প্রাপ্ত করান এবং প্রাপ্ত সাধন সামগ্রী রক্ষাও করেন—একেই বলা হয় ভগবানের যোগক্ষেম বহন করা। যদিও ভগবান সকল সাধকের যোগক্ষেমই বহন করেন, তবুও তিনি তাঁর অনন্য ভক্তের যোগক্ষেম বিশেষভাবে বহন করেন, যেমন—আদরের সন্তানের প্রতিপালন মা নিজেই করে থাকেন, দাসীর সাহায্যে নয়।

ভক্তদের যেমন ভগবানের সেবা করে আনন্দ হয়, তেমনই ভগবানেরও ভক্তদের সেবা করে আনন্দ হয়—**'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'** (গীতা ৪।১১)।

* * *

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে নিজের উপাসনার কথা বলে ভগবান এবার অন্যান্য দেবতাদের উপাসনার কথা বলছেন।

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্।। ২৩ ।।

[**কৌন্তেয়** (হে কুন্তীনন্দন !) ; **যে** (যে) ; **অপি** (কোনো) ; **ভক্তাঃ** (ভক্ত) ; **শ্রদ্ধয়া, অন্বিতাঃ** (শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে) ; **অন্যদেবতাঃ** (অন্য দেবতাদের) ; **যজন্তে** (পূজা করলেও) ; **তে** (তিনি) ; **অপি** (ও) ; **মাম্** (আমার) ; **এব** (ই) ; **যজন্তি** (পূজা

করেন) ; অবিধিপূর্বকম্ (অবিধিপূর্বক।)]

হে কুন্তীনন্দন ! যে কোনো ভক্ত (মানুষ) শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে অন্য দেবতাদের পূজা করলেও তিনি প্রকৃতপক্ষে আমারই পূজা করেন কিন্তু তা করেন অবিধিপূর্বক অর্থাৎ দেবতাগণকে আমার থেকে পৃথক্ মনে করেন ॥ ২৩ ॥

ব্যাখ্যা—**'যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ'**—দেবতাদের আরাধনাকারী যেসব ভক্ত 'আমিই সব' ('সদসচ্চাহম্' ৯।১৯)—এই কথা বুঝতে পারেননি, এবং যাঁদের অন্য দেবতাদের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে, তাঁরা সেই দেবতাদেরই শ্রদ্ধা সহকারে পূজা করে থাকেন। তাঁরা দেবতাদের আমার থেকে পৃথক্ এবং শ্রেষ্ঠ মনে করে নিজ-নিজ শ্রদ্ধাভক্তি অনুসারে নিজ নিজ ইষ্ট দেবতাদের বিধি-বিধান পালন করে থাকেন। এই দেবতাদের কৃপাতেই আমাদের সব প্রাপ্তি লাভ হবে—এই ভেবে তাঁরা সর্বদা ওই দেবতাদের সেবা-পূজাতে ব্যাপৃত থাকেন।

'তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্'—দেবতাদের পূজা যারা করে, তারা প্রকৃতপক্ষে আমারই পূজা করে। কারণ তত্ত্বতঃ আমি ছাড়া আর কিছুই নেই। আমার ভিন্ন এইসব দেবতাদের পৃথক্ কোনো অস্তিত্বই নেই, এঁরা আমারই স্বরূপ। তাই তারা দেবতাদের যে পূজা করে তা আসলে আমারই পূজা, কিন্তু সেই পূজা বিধিবহির্ভূত। বিধিবহির্ভূত বলার অর্থ এই নয় যে পূজার সামগ্রী কেমন হবে, তার মন্ত্র কীরূপ হবে, পূজা কেমন করে করা হবে, ইত্যাদি নিয়মকানুন সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান নেই, বরং এর অর্থ হল—আমাকে ওই দেবতাদের থেকে পৃথক্ বলে মনে করা। কামনাপরবশ হয়ে জ্ঞান হরণ হলে যেমন তাদের দেবতাদের শরণাগত বলা হয়েছে (গীতা ৭।২০), তেমনই এখানে আমা হতে দেবতাদের পৃথক সত্তা (স্বতন্ত্র অস্তিত্ব) মনে করে দেবতাদের যে পূজা করা হয়েছে, তাকেই বলা হয় অবিধিপূর্বক পূজা করা।

এই শ্লোকটির সারমর্ম হল এই যে (১) মনে যদি কোনো কামনা না থাকে এবং উপাস্যের প্রতি যদি ভগবদ্‌বুদ্ধি থাকে, তাহলে নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী যে কোনো প্রাণী, মানুষ বা কোনো দেবতাকে উপাস্য মনে করে তাঁর পূজা করলে, তাতে ভগবানেরই পূজা হয় এবং তার ফল হিসাবে ভগবানেরই প্রাপ্তি হয় ; এবং (২) নিজের মনে যদি কোনো কামনা না থাকে এবং সাক্ষাৎ ভগবানই যদি উপাস্যরূপে থাকেন তবে তারা অর্থার্থী, আর্ত ইত্যাদি ভক্তের শ্রেণীভুক্ত হয়, ভগবান যাদের উদার বলে জানিয়েছেন (৭।১৮)।

ভগবানই প্রকৃতপক্ষে সব। অতএব যাঁরই উপাসনা করা হয়, সেবা করা হয়, মঙ্গল কাজ করা হয়, তাতে প্রকারান্তরে ভগবানেরই উপাসনা করা হয়। যেমন, আকাশ থেকে বৃষ্টিপাত হলে সেই জল নদী, নালা, ঝরণা হয়ে শেষ পর্যন্ত সমুদ্রকেই প্রাপ্ত হয় (কারণ সেই জল সমুদ্রেরই), তেমনই মানুষ যাঁরই পূজা করুক, তাতে তত্ত্বতঃ ভগবানেরই পূজা হয়[১]। কিন্তু পূজকের লাভ হয়ে থাকে নিজ নিজ ভাব অনুযায়ী।

পরিশিষ্ট-ভাব—'ত্রৈবিদ্যা মাম্' (৯।২০), **'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাম্'** (৯।২২) এবং **'তেঽপি মামেব'** (৯।২৩)—তিনটি স্থানে ভগবানের উল্লেখে **'মাম্'** শব্দটি ব্যবহারের তাৎপর্য হল সবই ভগবান, তাই ভগবান সবকিছুকেই নিজেরই স্বরূপ বলে জানেন। যদি মানুষের মধ্যে কামনা না থাকে এবং সবকিছুতে ভগবদ্‌বুদ্ধি হয় তাহলে তিনি যাঁরই উপাসনা করুন না কেন, তাতে প্রকৃতপক্ষে ভগবানেরই উপাসনা করা হয়। অর্থাৎ যদি নিষ্কামভাব এবং ভগবদ্‌বুদ্ধি হয় তবে তাঁর পূজা আর অবিধিপূর্বক থাকে না, তা ভগবানেরই পূজা হয়ে ওঠে।

সপ্তম অধ্যায়ে **'দেবযজ্ঞঃ'** পদটি ব্যবহৃত হয়েছে (৭।২৩), সেটি এইস্থানে **'যজন্তে'** পদ দ্বারা বলা হয়েছে।

❋ ❋ ❋

[১]আকাশাৎ পতিতং তোয়ং যথা গচ্ছতি সাগরম্। সর্বদেবনমস্কারঃ কেশবং প্রতিগচ্ছতি॥ (লৌগাক্ষিস্মৃতি)

সম্বন্ধ—দেবতাদের পূজনকারীদের পূজন বিধিবহির্ভূত বলার কী তাৎপর্য ? পরের শ্লোকে তা জানাচ্ছেন—

অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥ ২৪ ॥

[হি (কারণ) ; অহং (আমি) ; এব (ই) ; সর্বযজ্ঞানাম্ (সমস্ত যজ্ঞের) ; ভোক্তা (ভোক্তা) ; চ (এবং) ; প্রভুঃ, চ (প্রভুও) ; তু (কিন্তু) ; তে (এরা) ; তত্ত্বেন (তত্ত্বতঃ) ; মাম্ (আমাকে) ; ন, অভিজানন্তি (জানে না) ; অতঃ (তাতেই) ; চ্যবন্তি (তাদের পতন হয়।)]

কারণ আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু, কিন্তু এরা তত্ত্বতঃ আমাকে জানে না, তাতেই তাদের পতন হয় ॥ ২৪ ॥

ব্যাখ্যা—[দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন যে, যারা ভোগ ও সম্পদ আহরণে অত্যন্ত আসক্ত তারা, 'আমাদের কেবল ভগবদ্ অভিমুখেই যেতে হবে'—এরূপ নিশ্চয় করতে পারে না (২।৪৪)। তাই ভগবদ্ অভিমুখে চলার পথে দুটি বাধা প্রধান হয়ে থাকে—(১) নিজেকে ভোগের ভোক্তা বলে মনে করা এবং (২) নিজেকে সম্পদের মালিক বলে মানা। এই দুটি বিষয়ে মানুষের বিপরীত ধারণার ফলে সে পরমাত্মা হতে সর্বতোভাবে বিমুখ হয়ে যায়। যেমন, শিশুকালে মাকে ছাড়া বালক থাকতে পারে না ; কিন্তু বড় হলে যখন তার বিবাহ হয়, তখন স্ত্রীর সঙ্গে 'এই আমার স্ত্রী' এরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করে সে তার ভোক্তা এবং মালিক হয়ে বসে। তখন আর তার মাকে তত ভালো লাগে না, সহ্য হয় না। তেমনই এই জীব যখন ভোগ ও ঐশ্বর্যে ব্যাপৃত হয় অর্থাৎ নিজেকে ভোগগুলির ভোক্তা ও সম্পদের মালিক বলে মনে করে তাদের দাস হয়ে পড়ে এবং ভগবান হতে সর্বতোভাবে বিমুখ হয়, তখন আর তার একথা স্মরণে থাকে না যে ভগবানই সবকিছুর ভোক্তা এবং মালিক। এজন্যই তাদের পতন হয়। কিন্তু যখন জীবের চেতনা (জ্ঞান) হয় যে, আসলে সমস্ত ভোগ এবং সম্পদের (ঐশ্বর্যের) ভোক্তা ও মালিক ভগবানই, তখন তারা ভগবানে আকৃষ্ট হয়ে ঠিক পথে চলতে থাকে। তখন আর তাদের পতন হয় না।]

'অহং হি সর্বযজ্ঞানাং[১] ভোক্তা চ প্রভুরেব চ'—শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে মানুষ যজ্ঞ-দান-তপ-তীর্থ-ব্রত ইত্যাদি যত শুভকর্ম করে এবং নিজ নিজ বর্ণ-আশ্রমের পরিধির মধ্যে যেসব ব্যবহারিক এবং শারীরিক কর্তব্য-কর্ম করে, সেইসব কর্মের ভোক্তা অর্থাৎ ফলভাগী আমিই। কারণ বেদ, শাস্ত্র, পুরাণ, স্মৃতি, গ্রন্থাদিতে প্রাণীদের শুভকর্ম করার জন্য যে বিধান প্রদান করা হয়েছে, তা সবই আমা দ্বারা সৃষ্ট এবং আমাকে অর্পণ করার জন্যই নির্দিষ্ট হয়েছে, যাতে এই প্রাণীগণ সমস্ত কর্তব্য-কর্ম থেকে এবং সেগুলির ফল থেকে সর্বতোভাবে নির্লিপ্ত থাকে, নিজ স্বরূপ থেকে কখনো বিচ্যুত না হয় এবং অনন্যভাবে কেবল আমাতেই চিত্ত নিবিষ্ট করে রাখে। অতএব ওইসব শুভকর্মাদির এবং ব্যবহারিক ও শারীরিক কর্তব্য-কর্মের ভোক্তা আমিই।

যেমন সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা (ফলভাগী) আমিই, তেমনই সমস্ত জগতের অর্থাৎ সমস্ত লোক, পদার্থ, ব্যক্তি, ঘটনা, পরিস্থিতি, ক্রিয়া এবং প্রাণীদের শরীর, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদির মালিকও আমিই। কারণ নিজ প্রসন্নতার জন্যই আমি আমা হতেই এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করেছি। সেইজন্য এই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা হওয়ায় আমিই এই সবের মালিক।

বিশেষ কথা

ভগবান কীভাবে ভোক্তা হন ?

ভগবান বলেছেন যে মহাত্মাদের চোখে ভগবান বাসুদেবই সবকিছু (৭।১৯) আর আমার দৃষ্টিতেও সদসৎ সবকিছু আমিই (৯।১৯)। আমিই যখন সবকিছু, তখন যে কেউ যে কোনো দেবতারই তুষ্টি বিধানের জন্য যজ্ঞ করুন না কেন সেই যজ্ঞ দ্বারা দেবতারূপে আমারই তুষ্টি সাধিত

[১]এখানে বহুবচন 'যজ্ঞানাম্' শব্দের অন্তর্গত সমস্ত কর্তব্য-কর্মকেই ধরা হয়েছে। তা সত্ত্বেও এর সঙ্গে 'সর্ব' শব্দ ব্যবহার করার তাৎপর্য হল এই যে, শাস্ত্রীয়, শারীরিক, ব্যবহারিক ইত্যাদি কোনো কর্তব্য-কর্ম যেন অবশিষ্ট না থাকে।

হয়। কেউ যদি কাউকে দান করেন, সেই দানগ্রহীতারূপে আমারই অভাব দূর হয়, তাতে আমাকেই সাহায্য করা হয়। কেউ তপস্যা করলে, সেই তপের দ্বারা তপস্বীরূপে আমিই সুখ-শান্তি পাই। কেউ কাউকে ভোজন করালে, সেই ভোজনের দ্বারা প্রাণরূপে আমারই তৃপ্তি হয়ে থাকে। কেউ শৌচ-স্নানাদি করলে, তার দ্বারা সেই মানুষের রূপে আমিই প্রসন্নতা লাভ করি। কেউ গাছপালাকে সার দেয় বা জলসেচন করে, সেই সার এবং জল, গাছ ও লতার রূপে আমিই পেয়ে থাকি এবং তার দ্বারা আমারই পোষণ হয়। কেউ কোনো দীন-দুঃখী বা পঙ্গু ব্যক্তিকে হৃদয় ও মন দিয়ে অর্থ সাহায্য করলে সেই সেবা আমাকেই করা হয়। কোনো চিকিৎসক রোগীর চিকিৎসা করলে, তা আমার চিকিৎসাই হয়। কেউ কুকুরকে রুটি দেয়, পায়রাকে শস্যদানা দেয়, গরুর সেবা করে, ক্ষুধার্তকে অন্ন দেয় ; পিপাসার্তকে জল পান করায় ; এই জীবসেবা রূপে আমার সেবা হয়। ওইসব বস্তু আমিই গ্রহণ করি[১]। যেমন কেউ কোনো মানুষের সেবা করলে, তার কোনো অঙ্গের সেবা করলে, তার কোনো আত্মীয়ের সেবা করলে, সেই সেবা ওই ব্যক্তিরই হয়ে থাকে, তেমনই মানুষ যারই সেবা করুক, যাকেই সাহায্য করুক, সেইসব সেবা এবং সাহায্য আমিই প্রাপ্ত হই। কারণ আমি ছাড়া আর কেউ নেই। আমিই বহুরূপে প্রকাশিত—**'বহু স্যাং প্রজায়েয়'** (তৈত্তিরীয়. ২।৬)। তাৎপর্য হল এই যে, নানারূপে সবকিছু গ্রহণ করাই হল ভগবানের ভোক্তা হওয়া।

ভগবান মালিক হন কীভাবে ?

ভগবদ্‌তত্ত্ব যাঁরা জ্ঞাত আছেন তাঁদের কাছে অপরা এবং পরাপ্রকৃতিরূপ সংসারমাত্রেরই প্রভু হলেন ভগবান। সংসারের ওপর তাঁরই অধিকার। জগৎ সৃষ্টি করুন বা না করুন, জগৎ-সংসারের স্থিতি রাখুন বা না রাখুন, প্রাণীদের যেমন খুশি সঞ্চালন করুন, যেভাবে ইচ্ছা উপভোগ করুন, নিজের ইচ্ছানুসারে যেমন খুশি পরিবর্তন ঘটান ইত্যাদি—যেমন খুশি পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করাতে ভগবান সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাৎপর্য হল এই যে, ভোগী মানুষ ভোগ ও সংগ্রহ করে যেমন খুশি, উপভোগ করাতে যেমন স্বাধীন (তাদের স্বাধীনতা শুধু মেনে নেওয়া হয়, প্রকৃতপক্ষে তারা স্বাধীন নয়), তেমনই ভগবান জগৎ-সংসারমাত্রেরই যেমন খুশি পরিবর্তন ও পরিবর্ধনে স্বাধীন। ভগবানের এই স্বাধীনতা প্রকৃত। এই হল তাঁর মালিক হওয়া।

'ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে'—সৎ-অসৎ, জড়-চেতন সবই প্রকৃতপক্ষে আমি। অতএব যে কর্তব্য-কর্মই করা হোক না কেন সেইসব কর্ম এবং তার ফলের ভোক্তা আমিই এবং সমস্ত সামগ্রীর মালিকও আমি। কিন্তু যারা এই তত্ত্ব জানে না, তারা মনে করে যে আমরা যাকে যা প্রদান করি, খাওয়াই-পরাই সেগুলি সেই প্রাণীরাই পেয়ে থাকে ; যেমন—আমরা যজ্ঞ করলে যজ্ঞের ভোক্তা হন দেবতা, দান করলে দানগ্রহীতা সেই দানের ভোক্তা হয়। কুকুরকে রুটি এবং গরুকে ঘাস দিলে, রুটি এবং ঘাসের ভোক্তা হয় কুকুর এবং গরু ; আমরা যখন আহার গ্রহণ করি তখন আমরাই হই সেই খাদ্যের ভোক্তা ইত্যাদি। তাৎপর্য হল এই যে, এরা সর্বরূপে আমাকে না মেনে অন্যকে মেনে নেয়, সেইজন্যই তাদের পতন হয়। তাই মানুষের উচিত তারা অন্য কাউকে ভোক্তা এবং মালিক বলে না ভেবে কেবল আমাকেই যেন ভোক্তা ও মালিক বলে মনে করে অর্থাৎ যা কিছু সামগ্রী সে অর্পণ করে সেগুলি আমারই মনে করে আমাকেই যেন অর্পণ করে—**'ত্বদীয়ং বস্তু গোবিন্দ তুভ্যমেব সমর্পয়ে'**।

অন্য ভাবটি হল এই যে মানুষের যা কিছু ভোগ এবং ঐশ্বর্য থাকে, তা সবই আমার এবং আমার বিরাটরূপ-জগতেরই সেবার জন্য। কিন্তু ভোগৈশ্বর্যে আসক্ত মানুষ

[১]একটি ঘটনা শুনেছি। শ্রীনামদেব একবার তীর্থযাত্রায় গিয়েছিলেন। যাত্রাপথে কোথাও এক বৃক্ষের নীচে বসে তিনি রুটি তৈরি করেন এবং যেমনই জিনিসপত্রের মধ্য থেকে ঘি বার করার জন্য পিছন ফিরেছেন তখনই একটি কুকুর এসে রুটিটি মুখে করে পালিয়ে যায়। শ্রীনামদেব ফিরে দেখেন কুকুর রুটি নিয়ে পালাচ্ছে। তখন তিনি ঘিয়ের পাত্র নিয়ে তার পেছনে দৌড়াতে দৌড়াতে বলতে লাগলেন—'হে প্রভু ! আপনাকেই ভোগ দেবার কথা, তাহলে এই শুকনো রুটি নিয়ে যাচ্ছেন কেন ? একটু ঘি রুটিতে মাখাতে দিন ?' শ্রীনামদেব একথা বলতেই কুকুরের মধ্যে থেকে ভগবান প্রকটিত হলেন। কুকুরের মধ্যে ভগবান ছাড়া আর কে থাকতে পারে ? শ্রীনামদেব জেনে গিয়েছিলেন বলেই ভগবান প্রকটিত হন। এইরূপ প্রাণীমাত্রেই তত্ত্বতঃ ভগবানই বিরাজিত। তাই যাকে যা-ই দেওয়া হোক তা ভগবানই পেয়ে থাকেন।

সেই তত্ত্ব না জানায় সে সেই ভোগৈশ্বর্যগুলি নিজের বলে মনে করে এবং ভাবে যে এইসব সামগ্রী আমাদের উপভোগের জন্য এবং আমরাই এর অধিপতি, মালিক। ফলে সে প্রকৃতপক্ষে এগুলির দাস হয়ে পড়ে। সে এই সামগ্রীগুলিকে যত বেশি নিজের বলে মনে করে, ততই তার অধীন হয়ে যায়। তখন সে এগুলির ভালো-মন্দকে নিজের ভালো-মন্দ ভেবে বসে এবং তার তাতেই পতন হয়। তাৎপর্য হল এই যে, আমাকে সকল যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু বলে জানলে মুক্তি হয় আর না জানলে পতন হয়।

'চ্যবন্তি' পদটির তাৎপর্য হল যে ভগবানকে লাভ না করায় তাদের পতন হয়। তারা শুভকর্ম করে উচ্চলোকে গেলেও সেটিকে পতনই বলতে হবে, কারণ সেখান থেকে তাদের ফিরে আসতে হয় (গীতা ৯।২১)। তারা জন্ম-মৃত্যু প্রাপ্ত হয়েই থাকে, মুক্ত হতে পারে না।

পরিশিষ্ট-ভাব—পঞ্চম অধ্যায়ের শেষেও ভগবান নিজেকে সমস্ত যজ্ঞের এবং তপের ভোক্তা বলে জানিয়েছেন—**'ভোক্তারং যজ্ঞতপসাম্'** (৫।২৯)। ওইস্থানে ভগবান অন্বয় রীতির দ্বারা যাঁরা তাঁকে সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা বলে জানেন, তাঁদের শান্তি লাভ করার কথা বলেছেন আর এখানে ব্যতিরেক রীতির দ্বারা যাঁরা তা জানেন না তাঁদের পতন হওয়ার কথা বলেছেন। স্বয়ং ভোক্তা হলেই পতন হয়। ভগবানকে সমস্ত শুভ কর্মের ভোক্তা বলে মনে করলে নিজের মধ্যে ভোক্তাভাব আসে না বা ভোগেচ্ছা থাকে না। ভোগেচ্ছা না থাকলে শান্তি প্রাপ্ত হয়।

ভগবানই প্রকৃতপক্ষে সকল কর্মের মহাকর্তা ও মহাভোক্তা। কিন্তু কর্তা-ভোক্তা হয়েও ভগবান বাস্তবে নির্লিপ্তভাবে থাকেন অর্থাৎ তাঁর মধ্যে কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব নেই—**'তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্'** (গীতা ৪।১৩), **'ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা'** (গীতা ৪।১৪)।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—যারা ভগবানকে সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু না মেনে সকামভাবে দেবতাদের পূজা-অর্চনা করে, পরবর্তী শ্লোকে ভগবান তাদের গতির কথা বর্ণনা করছেন।

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥ ২৫ ॥

[**দেবব্রতাঃ** (যারা দেবতাদের পূজা করে) ; **দেবান্** (দেবতাদের) ; **যান্তি** (প্রাপ্ত হয়) ; **পিতৃব্রতাঃ** (পিতৃগণের পূজকেরা) ; **পিতৄন্** (পিতৃলোক) ; **যান্তি** (প্রাপ্ত হয়) ; **ভূতেজ্যা** (ভূত-প্রেতাদির পূজকেরা) ; **ভূতানি যান্তি** (ভূত-প্রেতলোক প্রাপ্ত হয়) ; **মদ্‌যাজিনঃ** (যাঁরা আমার পূজা করেন) ; **মাম্, অপি** (আমাকেই) ; **যান্তি** (প্রাপ্ত হন।)]

যারা সকামভাবে দেবতাদের পূজা করে (শরীর ত্যাগ করার পর) তারা দেবতাদের (দেবলোক) প্রাপ্ত হয়। পিতৃগণের পূজকেরা পিতৃলোক প্রাপ্ত হয়। ভূত-প্রেতাদির পূজকেরা ভূত-প্রেতলোক প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যাঁরা আমার পূজা করেন, তাঁরা আমাকেই প্রাপ্ত হন ॥ ২৫ ॥

ব্যাখ্যা—[আগের শ্লোকে ভগবান জানিয়েছেন যে আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা এবং সমস্ত জগৎ-সংসারের প্রভু । কিন্তু যারা আমাকে ভোক্তা ও প্রভু বলে না মেনে নিজেরাই ভোক্তা ও প্রভু হয়ে ওঠে, তাদের পতন হয়। এবার এই শ্লোকে তাদের পতন সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে।]

'যান্তি দেবব্রতা দেবান্'—ভগবানকে ঠিকমতো না জানায়, ভোগ ও ঐশ্বর্য কামনাকারী ব্যক্তি বেদ-শাস্ত্রাদি বর্ণিত নিয়ম, ব্রত, মন্ত্র, পূজাবিধি ইত্যাদি অনুসারে নিজ নিজ উপাস্য দেবতাকে বিধি-বিধান দ্বারা যথাযথভাবে পূজা করে, অনুষ্ঠানাদি করে এবং সদা সেই দেবতারই শরণাগত হয় (গীতা ৭।২০)। সেইসব উপাস্য দেবতা তাঁদের এই ভক্তদের অত্যধিক এবং অত্যুচ্চ ফল যা প্রদান করেন তা হল এই যে তাদের নিজ নিজ লোকে নিয়ে যাবেন, যে লোকগুলিকে ভগবান পুনরাবর্তী বলে চিহ্নিত করেছেন (গীতা ৮।১৬)।

তেইশতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে দেবতাদের পূজা করলে তাঁকেই পূজা করা হয় ; কিন্তু তা হয়

অবিধিপূর্বক। সেই পূজার অবৈধতা হল এই যে, তারা জানে না যে 'ভগবানই সবকিছু'। তারা একথা না মেনে দেবতাদের পূজা করে শুধু ভোগ ও ঐশ্বর্য কামনা করে। তাতেই তাদের পতন হয়। যদি এরা দেবতাদি রূপে আমাকেই মানে এবং ওইসব ভগবদ্- স্বরূপ দেবতাদের কাছ থেকে কোনো কিছু আকাঙ্ক্ষা না করে, এইসব দেবতা ও আমি স্বয়ং যদি তাদের কিছু দিতে চাই, তবুও, 'হে প্রভু! আপনি আমার আর আমি আপনার—আপনার সঙ্গে এই একাত্মতার চেয়ে বেশি যদি আর কিছু (ভোগ ঐশ্বর্য) থাকে, তবে আমি তা আপনার কাছ থেকে চেয়ে নিতাম! এখন আপনিই বলুন যে, আপনার চেয়ে বড় আর কী আছে ?'—এইরূপ চিন্তায় ওই ভাবসম্পন্ন ব্যক্তিগণ আমারও আনন্দবর্ধক হয়ে থাকে। তাই তারা আর তুচ্ছ, ক্ষণভঙ্গুর দেবলোক প্রাপ্ত হয় না।

'পিতৃন্যান্তি পিতৃব্রতাঃ'—যারা সকামভাবে পিতৃগণের পূজা করে, তারা পিতৃপুরুষের কাছ থেকে কয়েক প্রকার সাহায্য পায়। তাই লৌকিক সিদ্ধি আকাঙ্ক্ষাকারী মানুষ পিতৃব্রত-নিয়ম-পূজা বিধি যথাবিহিত পালন করে এবং পিতৃগণকে নিজেদের ইষ্ট বলে মেনে থাকে। এই মানুষদের সর্বাধিক এবং সর্বোচ্চ ফল এই প্রাপ্তি হতে পারে যে পিতৃগণ তাদের পিতৃলোকে নিয়ে যেতে পারেন। তাই এখানে বলা হয়েছে যে পিতৃগণের পূজক পিতৃলোক প্রাপ্ত হয়।

'ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যাঃ'—তামসিক স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তি সকামভাবে ভূত-প্রেতাদির পূজা করে এবং তাদের নিয়মাদি ধারণ করে। যেমন, মন্ত্র-জপের জন্য গাধার লেজের লোম থেকে সুতো তৈরি করে তাতে উটের দাঁতের বোতাম গাঁথা, রাত্রে শ্মশানে গিয়ে শবদেহের ওপর আসীন হয়ে ভূত-প্রেতের মন্ত্রাদি জপ, মাংস-মদ্য ইত্যাদি মহাঅপবিত্র বস্তু দ্বারা ভূত-প্রেতাদির পূজা করা ইত্যাদি। এর দ্বারা তাদের বড়জোর জাগতিক-কামনাগুলি সিদ্ধ হতে পারে। মৃত্যুর পর তো তাদের দুর্গতি হবেই অর্থাৎ তারা ভূত-প্রেত যোনি প্রাপ্ত হবে। তাই এখানে বলা হয়েছে যে ভূতদের পূজক ভূত-প্রেতই প্রাপ্ত হয়।

'যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্'—যে ব্যক্তি অনন্যভাবে যে কোনো প্রকারে আমার ভজন-পূজন ও চিন্তনে ব্যাপৃত থাকে, সে নিশ্চিতভাবে আমাকেই প্রাপ্ত হয়।

বিশেষ কথা

জাগতিক ভোগ এবং ঐশ্বর্য কামনাকারী ব্যক্তিরা নিজ নিজ ইষ্টের পূজাদিতে তৎপর থাকে এবং ইষ্টের প্রসন্নতার জন্য সব কাজ করে থাকে। কিন্তু যে তত্ত্ব ভগবানের ভজন ও ধ্যানে ব্যাপৃত ব্যক্তিগণ প্রাপ্ত হয়, তা তারা লাভ না করে বারংবার জাগতিক তুচ্ছ ভোগ ও নরক এবং চুরাশী লক্ষ যোনি প্রাপ্ত হয়। এইভাবে যারা মনুষ্যজন্ম লাভ করে ভগবানের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করে তাঁকে আনন্দ প্রদান করতে সক্ষম হতে পারত, তারাই জাগতিক তুচ্ছ কামনায় বদ্ধ হয়ে এবং তুচ্ছ দেবতা ও পিতৃগণের চক্রে আবদ্ধ হয়ে কত না অনর্থ ভোগ করে থাকে! সেইজন্য মানুষকে সচেতন হয়ে ভগবানেই নিবিষ্ট হতে হয়।

দেবতা, পিতৃপুরুষ, ঋষি, মুনি, মানুষ ইত্যাদিতে ভগবদ্‌বুদ্ধি হলে এবং নিষ্কামভাবে কেবল তাঁদের পুষ্টি-সাধনের জন্য, তাঁদের হিতের জন্যই তাঁদের সেবা-পূজা করা হলে ঈশ্বর-লাভ হয়। এই দেবতাদের ভগবানের থেকে পৃথক্ বলে মনে করা এবং নিজের মধ্যে সকাম ভাব বজায় রাখা হল পতনের কারণ।

ভূত, প্রেত, পিশাচাদির যোনিই অশুদ্ধ এবং তাদের পূজার নিয়ম-বিধি, সামগ্রী, আরাধনা ইত্যাদিও অপবিত্র। এদের পূজকেরা এদের প্রতি ভগবদ্‌বুদ্ধিও করতে পারে না[1] এবং নিষ্কামভাবও রাখতে পারে না। তাই তাদের

[1]ভক্তের যদি কোনো ভূত-প্রেতে ভগবদ্‌ভাব হয় তবে সেই ভূত বা প্রেত উদ্ধার লাভ করে এবং ভক্তের ভগবদ্দর্শন হয়। যেমন, ভক্ত শ্রীনামদেব একবার লম্বামতো এক ভয়ঙ্কর প্রেতের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন, তাতে শ্রীনামদেব তাকে ভগবদ্‌স্বরূপ মনে করে আনন্দের সঙ্গে বলে ওঠেন—

ভলে পধারে লম্বকনাথ!
ধরণী পাঁও, স্বর্গ লোঁ মাথা, জোজন ভরকে লাম্বে হাথ ॥
সিব সনকাদিক পার ন পাবেঁ, অনগিন সাজ সজায়ে সাথ।
নামদেবকে তুম্ হী স্বামী, কীজৈ মোকোঁ আজ সনাথ॥

—এর ফলে সেই প্রেতটি উদ্ধার লাভ করে এবং সেইস্থানে ভগবান প্রকটিত হন।

পতন হয়। কয়েক বছর আগে এই ব্যাপারে একটি সত্য ঘটনা শুনেছি। একজন ব্যক্তি 'কর্ণপিশাচিনী'র উপাসক ছিল। তাকে কেউ কোনো প্রশ্ন করতে এলে, সে আগেই তার প্রশ্নটি বলে তার উত্তরটিও জানিয়ে দিত। এইভাবে সে অনেক টাকা রোজগার করেছিল।

তার বিদ্যার চমৎকারিতায় মুগ্ধ হয়ে এক ভদ্রলোক তাকে ধরে বসে সেই বিদ্যাটি শেখাবার জন্য। সেই ব্যক্তিটি তখন সরলভাবে জানায় যে, এই বিদ্যায় চমৎকারিত্ব থাকলেও তা প্রকৃত হিতকর বা কল্যাণকর নয়। তাতে অপর ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে যে, 'আপনি অন্যের বিনা উচ্চারিত প্রশ্ন এবং তার উত্তর কীভাবে জানতে পারেন?' তাতে সেই ব্যক্তি জানায় যে, 'আমি কানে বিষ্ঠা মাখিয়ে রাখি। যখন কেউ কোনো প্রশ্ন নিয়ে আসে তখন কর্ণপিশাচিনী এসে আমার কানে ওই ব্যক্তির প্রশ্ন ও উত্তরটি শুনিয়ে যায় আর আমি সেটি বলে দিই'। তখন লোকটি জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার মৃত্যু কীভাবে হবে—তা নিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করেছেন কি?' প্রথম ব্যক্তি জানাল যে, 'আমার মৃত্যু হবে নর্মদার ধারে।' তার মৃত্যুর পর জানা যায় যে, যখন সে (নিজের মৃত্যু-উপস্থিত জেনে) নর্মদা নদীর দিকে যাচ্ছিল, তখন কর্ণপিশাচিনী শূকরীর রূপে তার সামনে উপস্থিত হয়। শূকরীকে দেখে ওই ব্যক্তি নর্মদার দিকে যখন ছুটে যাচ্ছিল তখন রাস্তাতেই কর্ণপিশাচিনী তাকে হত্যা করে। কারণ ওই ব্যক্তি যদি নর্মদা নদীতে গিয়ে মারা যেত তবে সে সদ্গতি প্রাপ্ত হত, কিন্তু কর্ণপিশাচিনী তার সদ্গতি হতে দেয়নি, নর্মদার ধারে হত্যা করে তাকে নিজের সঙ্গে নিয়ে যায়।

এর অর্থ হল যে দেবতা, পিতৃগণ ইত্যাদির উপাসনা স্বরূপত অর্থাৎ আনুষ্ঠানিকভাবে ত্যাজ্য নয় ; কিন্তু ভূত-প্রেত-পিশাচ ইত্যাদির উপাসনা স্বরূপত পরিত্যাজ্য। কারণ দেবতায় ভগবদ্ভাব ও নিষ্কামভাব হলে, এঁদের উপাসনাতে কল্যাণ হয়। কিন্তু ভূত-প্রেত ইত্যাদির উপাসনাকারীদের কখনো সদ্গতি হয় না, দুর্গতিই হয়ে থাকে।

তবে পারমার্থিক সাধকগণ ভূত-প্রেতাদির উদ্ধারের জন্য তাদের শ্রাদ্ধ-তর্পণ করতে পারেন। কারণ এইসব ভূত-প্রেতাদিকে নিজ ইষ্ট মনে করে উপাসনা করাই হল পতনের কারণ। তাদের উদ্ধারের জন্য শ্রাদ্ধ-তর্পণ করা বা পিণ্ড-জল প্রদান করা দূষণীয় নয়। সাধু মহাত্মাগণের দ্বারা অনেক ভূত-প্রেত উদ্ধার লাভ করেছে।

পরিশিষ্ট-ভাব—'ব্রত' কথার অর্থ হল নিয়ম। সুতরাং 'দেবব্রত' কথাটির অর্থ—দেবতাদের উপাসনার নিয়ম ধারণ করা (গীতা ৭।২০)। ভগবানের শরণাগত হয়ে তাঁর জন্য কর্ম করাই হল ভগবানের পূজা—**'স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ'** (গীতা ১৮।৪৬)।

ক্রিয়ামাত্রই ভগবানকে অর্পণ করলে সবকিছুই ভগবানের পূজা হয় (গীতা ৯।২৭)। নিষ্কাম ভাব এবং ভগবদ্বুদ্ধি থাকলে কোনো নিষিদ্ধ ক্রিয়া হওয়া সম্ভবই নয়, কারণ নিষিদ্ধ ক্রিয়া কামনাবশতঃ করা হয় (গীতা ৩।৩৬-৩৭)।

সবকিছুই প্রকৃতপক্ষে ভগবানের রূপ। কিন্তু যারা ভগবান ব্যতীত অন্য কোনো সত্তাকে মেনে থাকে, তারা উদ্ধারলাভ করে না। তারা যদি কোনো উচ্চতর লোকেও আরোহণ করে, তাহলেও তাদের এই সংসার চক্রে ফিরে আসতে হয় (গীতা ৮।১৬)।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—দেবতাদের পূজায় নানাপ্রকার সামগ্রী ও বিধি-নিয়ম পালনের আবশ্যকতা থাকে, তাহলে আপনার পূজা তো আরও বেশি শক্ত হবে? পরের শ্লোকে ভগবান তার উত্তর দিচ্ছেন।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ ২৬ ॥

[**যঃ** (যে ভক্ত) ; **পত্রম্** (পত্র) ; **পুষ্পম্** (পুষ্প) ; **ফলম্** (ফল) ; **তোয়ম্** (জল ইত্যাদি) ; **ভক্ত্যা** (ভক্তিপূর্বক) ; **মে** (আমাকে) ; **প্রযচ্ছতি** (সমর্পণ করে) ; **তৎ** (আমাতে) ; **প্রযতাত্মনঃ** (তল্লীনচিত্ত সেই ভক্তের) ; **ভক্ত্যুপহৃতম্** (ভক্তিপূর্বক প্রদত্ত উপহার) ; **অহম্** (আমি) ; **অশ্নামি** (গ্রহণ করি।)]

যে ভক্ত পত্র, পুষ্প, ফল, জল ইত্যাদি (সাধ্যমত বস্তু) ভক্তিপূর্বক আমাকে সমর্পণ করে, আমাতে তল্লীন চিত্ত, সেই ভক্তের ভক্তিপূর্বক প্রদত্ত উপহার আমি খেয়ে নিই (গ্রহণ করি) ॥ ২৬ ॥

ব্যাখ্যা—[ভগবানের অপরা প্রকৃতির কার্য দুটি—পদার্থ ও ক্রিয়া। এই দুটির সঙ্গে নিজের ঐক্য মেনেই জীবসকল নিজেকে সেগুলির ভোক্তা বা মালিক বলে মনে করতে থাকে এবং ভগবানই যে সেসবের মালিক তা ভুলে যায়। এই ভুল দূর করার জন্যই ভগবান এখানে বলেছেন যে পত্র, পুষ্প, ফল ইত্যাদি যেসব সামগ্রী এবং ক্রিয়া (৯।২৭), তা সমস্তই আমাকে সমর্পণ করো, তাহলেই তুমি চিরকালের মতো জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্ত হয়ে যাবে (৯।২৮)।

দ্বিতীয়তঃ, দেবতাদের পূজায় বিধি-নিয়ম এবং মন্ত্রাদির আবশ্যকতা হয়। কিন্তু জীবের সঙ্গে আমার তো স্বতঃই স্বাভাবিকভাবে আপনত্বের সম্পর্ক আছে, তাই আমাকে প্রাপ্তির জন্য কোনো বিধি-নিয়মের প্রাধান্য নেই। যেমন, বালকের মাতৃক্রোড়ে যাবার জন্য কোনো বিধি-বিধানের প্রয়োজন নেই, সে নিজের আপনত্বের সম্পর্কেই মায়ের কাছে যায়। তেমনই আমার প্রাপ্তির জন্য বিধি, মন্ত্রাদির আবশ্যকতা নেই, শুধু আপনত্বের দৃঢ়-ভাবের প্রয়োজন।]

'পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি'—যে ভক্ত যথাসাধ্য সংগৃহীত পত্রাদি (তুলসীপাতা ইত্যাদি), পুষ্প, ফল, জল আদি প্রীতি সহকারে ভগবানকে সমর্পণ করে, ভগবান সেগুলি গ্রহণ করেন। যেমন, দ্রৌপদীর কাছ থেকে শাকপাতা নিয়ে ভগবান গ্রহণ করায় ত্রিলোক তৃপ্ত হয়েছিল। গজেন্দ্র সরোবর হতে একটি ফুল ভগবানকে সমর্পণ করে প্রণাম করলে ভগবান গজেন্দ্রকে উদ্ধার করেন। শবরীর সমর্পিত ফলে ভগবান এত প্রসন্ন হয়েছিলেন যে যখনই কোথাও খাদ্যগ্রহণের অবকাশ হত, সেখানেই তিনি শবরীর ফলের প্রশংসা করতেন[১]। রন্তিদেব অন্ত্যজ-রূপে উপস্থিত ভগবানকে জল পান করানোতে তিনি সাক্ষাৎ ভগবানের দর্শন লাভ করেছিলেন।

ভক্তের যখন ভগবানকে কিছু দেবার আগ্রহ বৃদ্ধি পায় তখন সে নিজেকে ভুলে যায়। ভগবানও ভক্তের প্রেমে এত মত্ত হন যে তিনিও নিজেকে ভুলে যান। প্রেমের আধিক্যে ভক্তের এই খেয়ালও থাকে না যে আমি কী খাওয়াচ্ছি, তখন ভগবানেরও খেয়াল থাকে যে আমি কী খাচ্ছি ! যেমন, বিদুরের স্ত্রী প্রেমের আবেশে ভগবানকে কলা না দিয়ে তার খোসাটা দিয়েছিলেন এবং ভগবানও খোসাটিকে কলার মতোই গ্রহণ করেছিলেন[২]।

'তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ'—ভক্তের প্রীতিপূর্বক সমর্পিত উপহার ভগবান যে শুধু স্বীকারই করেন তা নয়, তিনি সেগুলি ভোজন করেন—**'অশ্নামি'**। যেমন, ফুল হল গন্ধ নেবার বস্তু, কিন্তু ভগবান সেটি খাবার বস্তু কি না, তা না দেখেই সেটি খেয়ে নেন। সেটি আত্মসাৎ করেন ; নিজের মধ্যে মিলিত করেন। এতেই প্রমাণিত হয় যে, ভক্তের দেবার আগ্রহ থাকলে ভগবানেরও গ্রহণ করার আগ্রহ হয়। ভক্তের ভগবানকে খাওয়াবার ইচ্ছা হলে ভগবানেরও ক্ষুধার উদ্রেক হয়।

'প্রযতাত্মনঃ'—এর তাৎপর্য হল যার চিত্ত ভগবানে তন্ময় হয়ে গেছে, যে কেবল ভগবদ্‌পরায়ণ, এরূপ ভক্তের প্রদত্ত উপহার ভগবান নিজে গ্রহণ করেন।

এখানে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল—এই চারটি নাম দেওয়ার অর্থ হল যে পত্র-পুষ্প-ফল—এই তিনটি জল থেকে উৎপন্ন হওয়ায় এগুলি জলের কার্য এবং জল এগুলির কারণ। তাই এই পত্র-পুষ্প ইত্যাদি কার্য-কারণরূপ সমগ্র পদার্থগুলির বাচক। কারণ সৃষ্টিমাত্রই জলের কার্য এবং জল হল তার কারণ। অতএব পদার্থমাত্রই ভগবানকে সমর্পণ করা কর্তব্য।

এই শ্লোকে **'ভক্ত্যা'** এবং **'ভক্ত্যুপহৃতম্‌'**—এইভাবে 'ভক্তি' শব্দটি দুবার উদ্ধৃত হয়েছে। এর মধ্যে **'ভক্ত্যা'**

[১]ঘর গুরু গৃহ প্রিয়সদন সাসুরে, ভই জব জহঁ পহুনাঈ। তব তহঁ কহি সবরীকে ফলনিকী, রুচি মাধুরী ন পাঈ॥ (বিনয়পত্রিকা ১৬৪।৪)

[২]'ততবেতা' তিহুঁ লোকমেঁ, ভোজন কিয়ো অপার। ইক শবরী ইক বিদুরঘর, রুচ পায়ো দো বার॥

পদের দ্বারা ভক্তের ভক্তিপূর্বক দেবার ভাব এবং **'ভক্ত্যুপহৃতম্'** পদটি ভক্তিপূর্বক সমর্পিত বস্তুর বিশেষণ। তাৎপর্য হল এই যে ভক্তিপূর্বক দিলে সেই বস্তু ভক্তিরূপে, প্রেমরূপে পরিণত হয় এবং ভগবান সেটি আত্মসাৎ করেন, নিজের মধ্যে মিশিয়ে নেন ; কারণ তিনি প্রেমপিয়াসী।

বিশেষ কথা

এই শ্লোকে পদার্থের মুখ্যতা নেই, আছে শুধু ভক্তের ভাবের মুখ্যতা, কারণ ভগবান ভাবের পিয়াসী, পদার্থের নয়। সুতরাং সমর্পণকারীদের ভাবই প্রধান (ভক্তিপূর্ণ) হওয়া উচিত। যেমন, কেউ যদি অত্যন্ত গুরুভক্ত শিষ্য হয় তাহলে গুরুর সেবায় তার যত সময়, বস্তু ও ক্রিয়া লাগে ততই সে আনন্দ পায়, প্রসন্ন হয়। তেমনই পতিব্রতা স্ত্রীও সময়, বস্তু ও ক্রিয়া দ্বারা পতির সেবা করে অত্যন্ত আনন্দিত হয়। কারণ পতির সেবাতেই সে তার জীবন এবং বস্তুগুলির সফলতা অনুভব করে। তেমনই ভক্তের যখন ভগবানে প্রেমভাব হয়, তখন বস্তুগুলি ছোটই হোক বা বড়, সাধারণ হোক বা দামি, তা ভগবানে অর্পণ করে ভক্ত অত্যন্ত আনন্দিত হয়। তার মনে এই ভাব থাকে যে বস্তুমাত্রই তো ভগবানের। আমাকে যে ভগবান সেবা, পূজার অবকাশ দিয়েছেন—আমার ওপর এটি ভগবানের অশেষ কৃপা। এই কৃপা দেখেই সে প্রসন্ন হতে থাকে !

ভাবপূর্বক সমর্পিত ভোগ ভগবান নিশ্চয়ই স্বীকার করেন, তা আমরা দেখতে পাই বা না পাই। এ বিষয়ে একজন আচার্য জানিয়েছেন যে, তাঁদের মন্দিরে দেওয়ালী থেকে দোল পর্যন্ত অর্থাৎ ঠাণ্ডার সময় ঠাকুরকে পেস্তা, বাদাম, আখরোট, কাজু, কিসমিস ইত্যাদির দ্বারা ভোগ দেওয়া হত, কিন্তু যখন এই জিনিসগুলির দাম অত্যন্ত বেড়ে গেল তখন চিনেবাদাম দিয়ে ভোগ দেওয়া আরম্ভ হল। একদিন রাত্রে ঠাকুর স্বপ্নে বললেন, 'আরে ভাই ! তুমি আমাকে শুধু চিনেবাদামই খাওয়াবে নাকি ?' পরদিন থেকে আবার পেস্তা, কাজু, কিসমিস দিয়ে ভোগ দেওয়া শুরু হল। তাঁর এই বিশ্বাস হল যে ঠাকুরকে ভোগ দিলে, তিনি অবশ্যই তা গ্রহণ করেন।

ভোগ দেবার পর ভগবান যে বস্তুগুলি গ্রহণ করেন, তাতে একপ্রকার বিশেষত্ব দেখা যায়, তার স্বাদ বেড়ে যায়, সুগন্ধ পাওয়া যায় । সেটি খেলে বিশেষ তৃপ্তি হয়, কয়েকদিন থাকলেও তা নষ্ট হয় না ইত্যাদি। কিন্তু এটি কোনো পরীক্ষা নয় যে এটি হবেই। ভক্তের যদি সেরূপ ভাব হয় তাহলে ভোগ দেওয়া বস্তুতে এরূপ বিশেষত্ব আসে—সাধু-মহাত্মাদের কাছে এরূপ শুনেছি।

মানুষ যখন কোনো পদার্থকে আহুতি দেয়, তখন সেটি যজ্ঞে পরিণত হয়। কোনো বস্তু কাউকে দিলে, সেটি দান করা হয়, সংযমপূর্বক নিজ কাজে ব্যবহার না করলে তাকে তপ বলা হয় এবং ভগবানে সমর্পণ করলে ভগবানের সঙ্গে যোগ (সম্বন্ধ) স্থাপিত হয়—এ সমস্তই এক 'ত্যাগেরই' ভিন্ন ভিন্ন নাম।

পরিশিষ্ট-ভাব—দেবতাদের উপাসনাতে নানাপ্রকার নিয়ম পালন করতে হয় (গীতা ৭।২০), কিন্তু একমাত্র ভগবানের উপাসনায় কোনো নিয়ম নেই। ভগবানের উপাসনাতে ভক্তির, আপনভাবেরই প্রাধান্য থাকে, বিধির নয়— **'ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি', 'ভক্ত্যুপহৃতম্'**।

সরল শিশু যেমন যা কিছু তার হাতে আসে তাই-ই মুখে পুরে দেয়, তেমনই সরল ভক্ত ভগবানকে যা কিছু অর্পণ করেন, ভগবানও সরলতার সঙ্গে তা গ্রহণ করেন—**'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'** (গীতা ৪।১১), যেমন—বিদুরের স্ত্রী কলার খোসা শ্রীকৃষ্ণকে খেতে দিলে, তিনি তাই খেয়ে নিয়েছিলেন !

'ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি' কথাটির অর্থ হল ভক্ত ভগবানকে ভক্তি সহকারে বস্তু অর্পণ করেন, কামনা সহকারে নয়। দেবতাগণের উপাসনায় বিশেষ বিশেষ বস্তুর প্রয়োজন হয়, কিন্তু ভগবানের উপাসনায় কোনো বিশেষ বস্তুর প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন হয় শুধুমাত্র ভক্তির।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—সংসারমাত্রেরই দুটি রূপ—পদার্থ ও ক্রিয়া। এতে আসক্তি হলে এই দুটিই পতনকারক হয়ে ওঠে। তাই আগের শ্লোকে 'পদার্থ' সমর্পণের কথা বলা হয়েছে আর পরবর্তী শ্লোকে 'ক্রিয়া' সমর্পণের কথা বলা হচ্ছে।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ ২৭ ॥

[**কৌন্তেয়** (হে কৌন্তেয় !) ; **যৎ** (যা কিছু) ; **করোষি** (কর) ; **যৎ** (যা কিছু) ; **অশ্নাসি** (খাও) ; **যৎ** (যা) ; **জুহোষি** (হোম কর) ; **যৎ** (যা) ; **দদাসি** (দান কর) ; **যৎ** (যে) ; **তপস্যাসি** (তপস্যা কর) ; **তৎ** (তা) ; **মদর্পণম্** (আমাকে সমর্পণ) ; **কুরুষ্ব** (করে দাও।)]

হে কৌন্তেয় ! তুমি যা কিছু কর, যা কিছু খাও, যা হোম কর, যা দান কর আর যে তপস্যা কর, তা সমস্তই আমাকে সমর্পণ করে দাও ॥ ২৭ ॥

ব্যাখ্যা—[ভগবানের নিয়ম হল যে, ভক্ত যেভাবে আমার শরণ গ্রহণ করে, আমি সেভাবেই তাকে আশ্রয় প্রদান করি (গীতা ৪।১১)। যে ভক্ত তার নিজের বস্তু আমাকে সমর্পণ করে, আমি তাকে আমার বস্তু প্রদান করি। ভক্ত তো আমাকে সীমিত বস্তু প্রদান করে কিন্তু আমি অনন্ত গুণ বাড়িয়ে তা প্রত্যর্পণ করি। কিন্তু যে নিজেকে আমায় সমর্পণ করে, তাকে আমি নিজেকেই প্রদান করি। প্রকৃতপক্ষে আমি সংসারে নিজেকে দিয়ে রেখেছি (গীতা ৯।৪) এবং সকলকে সবকিছু করার স্বাধীনতা দিয়েছি। মানুষ যদি আমার প্রদত্ত স্বাধীনতা আমাকেই সমর্পণ করে, তাহলে আমিও আমার স্বাধীনতা তাকেই প্রদান করি অর্থাৎ তার অধীন হয়ে থাকি। তাই ভগবান এখানে সেই স্বাধীনতা তাঁকে অর্পণ করার জন্য অর্জুনকে বলছেন।]

'যৎ করোষি'—এটি একটি এমন বিশিষ্ট পদ যে এর মধ্যে শাস্ত্রীয়, শারীরিক, ব্যবহারিক, সামাজিক, পারমার্থিক ইত্যাদি যাবতীয় ক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত হয়। ভগবান বলেছেন, তুমি আমাকে এই সমস্ত ক্রিয়াগুলি অর্পণ করো অর্থাৎ তুমি নিজেই আমার প্রতি সমর্পিত হও, তবেই তোমার সমস্ত ক্রিয়া স্বাভাবিকভাবে আমাতে অর্পিত হবে। এবারে ভগবান ওই ক্রিয়াগুলিরই বিভাগ করেছেন—

'যদশ্নাসি'—এই পদটির অন্তর্গত সমস্ত শারীরিক ক্রিয়াকে গ্রহণ করতে হবে অর্থাৎ শরীরের জন্য তুমি যে আহার গ্রহণ কর, জল পান কর, কুপথ্য পরিত্যাগ এবং পথ্য সেবন কর, ঔষধ সেবন কর, বস্ত্র পরিধান কর, শীত-গ্রীষ্মে শরীর রক্ষা কর, স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সময়মতো শয়ন কর ও নিদ্রা ত্যাগ কর, ঘুরে বেড়াও, স্নানাদি কর—এই সমস্ত ক্রিয়াই তুমি আমাকে সমর্পণ করে দাও। এটি শারীরিক ক্রিয়ার প্রথম বিভাগ।

'যজ্জুহোষি'—যজ্ঞ-সম্বন্ধীয় সমস্ত ক্রিয়া এই পদের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ যজ্ঞ-সামগ্রী একত্র করা, অগ্নি প্রজ্বলিত করা, মন্ত্রপাঠ করা, আহুতি প্রদান করা ইত্যাদি সকল শাস্ত্রীয় ক্রিয়া আমাকে অর্পণ করো।

'দদাসি যৎ'—তুমি যা দান কর অর্থাৎ অন্যের সেবা কর, অপরকে সাহায্য কর, অপরের প্রয়োজন মেটাও, ইত্যাদি যেসব শাস্ত্রীয় ক্রিয়া কর, তা সব আমাকে অর্পণ কর।

'যৎ তপস্যসি'—তুমি যে তপস্যা কর অর্থাৎ বিষয়াদি থেকে নিজ ইন্দ্রিয় সংযম কর, কর্তব্য পালনকালে যে সব অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতিগুলি প্রসন্নভাবে সহ্য কর এবং তীর্থ, ব্রত-উপবাস, ভজন-ধ্যান, জপ-কীর্তন, শ্রবণ-মনন, সমাধি ইত্যাদি পারমার্থিক ক্রিয়া কর, তা সমস্ত আমাকে সমর্পণ কর।

উপরিউক্ত তিনটি পদ শাস্ত্রীয় ও পারমার্থিক ক্রিয়াগুলির অপর বিভাগ।

'তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্'—ভগবান এইস্থানে পরস্মৈপদী **'কুরু'** ক্রিয়াপদ ব্যবহার না করে **'কুরুষ্ব'** এই আত্মনেপদী ক্রিয়াপদটি ব্যবহার করেছেন। এর অর্থ হল যে, তুমি তোমার সবকিছু আমাকে সমর্পণ করলে যে আমার অভাব পূর্ণ হয়ে যাবে তা নয় ; আমাকে সবকিছু অর্পণ করলে তোমার আর কিছুতে আসক্তি থাকবে না অর্থাৎ তোমার মধ্য থেকে 'আমি' ও 'আমার' ভাব দূর হবে, যা বন্ধনকারক। আমাকে সবকিছু সমর্পণ করার ফল হিসাবে তুমি পূর্ণতা লাভ করবে অর্থাৎ যার থেকে বেশি আর কোনো কিছু লাভ সম্ভব নয় এবং যে লাভে স্থিতিলাভ

করলে চরম দুঃখও বিচলিত করতে পারে না অর্থাৎ যেখানে দুঃখ সংযোগই সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়। (গীতা ৬।২২-২৩)—তুমি সেইরূপ লাভ প্রাপ্ত হবে।

এই শ্লোকটিতে পাঁচবার '**যৎ**' পদটি বলার তাৎপর্য হল এই যে এক-একটি ক্রিয়া সমর্পণেরও অপার মাহাত্ম্য আছে। সমস্ত ক্রিয়া যদি অর্পণ করা হয়, তবে আর কথা কী!

বিশেষ কথা

ছাব্বিশতম শ্লোকে ভগবান পত্র, পুষ্প ইত্যাদি সমর্পণ করার কথা বলেছেন, যেগুলি অনায়াসে অর্থাৎ বিনা পরিশ্রমে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু একটু উদ্যোগ করতেই হয় অর্থাৎ অত্যন্ত সুগম বস্তুও ভগবানকে সমর্পণ করার জন্য নতুনভাবে উদ্যোগ করতে হয়। কিন্তু এই সাতাশতম শ্লোকে ভগবান তার থেকেও একটি বিশেষ কথা জানিয়েছেন যে, নতুন কোনো বস্তু দিতে হবে না, নতুন ভাবে কোনো কাজ করতে হবে না এবং কোনো নতুন উদ্যমেরও প্রয়োজন নেই, বরং আমাদের দ্বারা যেসব লৌকিক, পারমার্থিক ইত্যাদি স্বাভাবিক ক্রিয়া হয়ে থাকে তা সবই ভগবানকে অর্পণ করে দিতে হয়। এর তাৎপর্য হল এই যে, ভগবানের জন্য কোনো বিশেষ বস্তু বা ক্রিয়া অর্পণ করার প্রয়োজন নেই, নিজেকে অর্পণ করাই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। নিজেকে সমর্পণ করলেই সব ক্রিয়া স্বভাবতঃই ভগবানে অর্পিত হয় এবং ভগবানের প্রসন্নতার হেতু হয়ে ওঠে। যেমন বালক তার মার সামনে খেলা করে, কখনো দূরে চলে যায় আবার দৌড়ে মায়ের কোলে চলে আসে, কখনো পিঠের ওপর চড়ে বসে, এইসব ক্রিয়াতে মা প্রসন্নই হন। বালকের আপনভাবই হল মায়ের এই প্রসন্নতার কারণ। তেমনই শরণাগত ভক্তের ভগবানের প্রতি আপনভাব হলে ভক্তের প্রতিটি ক্রিয়াতেই ভগবান প্রসন্ন হন।

'**করোষি**' ক্রিয়ার সঙ্গে এখানে সাধারণ '**যৎ**' পদটি থাকায় অর্থাৎ 'তুমি যা কিছু করো'—এরূপ বললে নিষিদ্ধ কর্মও এর অন্তর্গত হতে পারে। কিন্তু শেষে '**তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্**' 'সেগুলি আমাকে সমর্পণ করো'—এরূপ বলা হয়েছে। সুতরাং যেসব সামগ্রী বা ক্রিয়া ভগবানকে অর্পণ করা হবে, সেগুলি ভগবানের নির্দেশ অনুযায়ী অনুকূলই হবে। যেমন কোনো ত্যাগী-পুরুষকে কোনো বস্তু দিতে গেলে, তাঁর অনুকূল জিনিসই দিতে হয়, নিষিদ্ধ বস্তু দেওয়া যায় না ; তেমনই ভগবানকে কোনো বস্তু বা ক্রিয়া অর্পণ করতে হলে তাঁর অনুকূল, বিহিত বস্তু বা ক্রিয়াই অর্পণ করতে হবে, নিষিদ্ধ বস্তু বা ক্রিয়া নয়। কারণ যার ভগবানকে অর্পণ করার ভাব থাকে, তার দ্বারা কোনো নিষিদ্ধ ক্রিয়া হবার সম্ভাবনাও থাকে না এবং অর্পণ করার সম্ভাবনাও থাকে না।

যদি কেউ বলে যে, 'আমি তো চুরি ইত্যাদি নিষিদ্ধ কর্মও ভগবানকে সমর্পণ করব' তাহলে নিয়ম হল এই যে ভগবানকে সমর্পণ করা জিনিস অনন্তগুণ হয়ে ফেরৎ পাওয়া যায়। তাই চুরি ইত্যাদি নিষিদ্ধ কর্ম যদি ভগবানকে সমর্পণ করা হয়, তবে তার অনন্তগুণ বর্ধিত ফলও ফেরৎ পাওয়া যায় অর্থাৎ তার যথাযোগ্য কঠোর দণ্ডও ভোগ করতে হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব—সম্মান সহকারে প্রদান করা এবং যার বস্তু তাকেই প্রদান করাকে বলা হয় '**অর্পণ**'। ভগবান পদার্থসমূহ প্রদান করার কথা বলেছেন—'**প্রযচ্ছতি**' আর ক্রিয়াসমূহকে '**অর্পণ**' করার কথা বলেছেন—'**তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্**', কারণ ক্রিয়া প্রদান করা যায় না।

জ্ঞানযোগী জগৎ-সংসারের সঙ্গে মেনে নেওয়া যে সম্পর্ক তা পরিত্যাগ করেন, কিন্তু ভক্ত একমাত্র ভগবান ব্যতীত অন্য কোনো সত্তা মানেন না। অন্যভাবে বলা যায় যে, জ্ঞানযোগী 'আমি' এবং 'আমার' ভাব পরিত্যাগ করেন আর ভক্ত 'তুমি' ও 'তোমার' কথাটি স্বীকার করে নেন। তাই জ্ঞানযোগী পদার্থ ও ক্রিয়াসমূহ 'পরিত্যাগ' করেন আর ভক্ত পদার্থ এবং ক্রিয়াসমূহ ভগবানকে 'অর্পণ' করেন অর্থাৎ সেগুলিকে নিজের বলে না মেনে ভগবৎস্বরূপ বলে মনে করেন।

যে বস্তুকে মানুষ ভালো ও গুরুত্বপূর্ণ ভেবে আকর্ষিত হয়, সেগুলিকে মিথ্যা মনে করে পরিত্যাগ করার চাইতে কোনো ব্যক্তিকে সমর্পণ করা, তার সেবায় নিয়োগ করা সহজ হয়। তাহলে যিনি পরম শ্রদ্ধাস্পদ, পরম প্রেমাস্পদ ভগবান, তাঁকে সমর্পণ করা যে আরোও সহজ সে কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। দ্বিতীয়তঃ, ত্যাগীর ত্যাগের অহঙ্কার থাকতে পারে, কিন্তু অর্পণকারীর অহঙ্কার হতে পারে না, কেন-না যার জিনিস তাকেই অর্পণ করাতে অহংকার আসতে পারে না। '**ত্বদীয়ং বস্তু গোবিন্দ তুভ্যমেব সমর্পয়ে**'। সমস্ত জিনিস (সংসারমাত্র) সর্বদাই ভগবানের। সেসব

ভগবানকে সমর্পণ করা শুধু নিজের ভ্রম (সেগুলিকে নিজের বলে মনে করার ভ্রম) দূর করা। ভ্রম দূর হলে অহংকার আসে না, বরং প্রসন্নভাব উদয় হয়।

জগৎ-সংসারকে ভগবানের বলে মনে করলেই জগতের থেকে সম্পর্ক-ছেদ হয় অর্থাৎ জগৎ লুপ্ত হয়ে যায়, জগতের আর কোনো পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না (যা বাস্তবে নেই-ই), ভগবানই থেকে যান (যা বাস্তব-সত্য)। সুতরাং জগৎ-সংসার থেকে সম্পর্ক-বিচ্ছিন্ন করার জন্য ভক্তের বিবেকের প্রয়োজন হয় না। তিনি জগতের থেকে সম্পর্ক ছেদ করেন না। তিনি সেগুলিকে ভগবানের এবং ভগবদ্স্বরূপ বলে মানেন, কেন-না অপরা প্রকৃতি আসলে ভগবানেরই (গীতা ৭।৪)।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—আগের দুটি শ্লোকে পদার্থ এবং ক্রিয়াসমূহ ভগবানকে সমর্পণ করার বর্ণনা করে এবার পরবর্তী শ্লোকে অর্পণ করার ফল কী, তাই জানাচ্ছেন।

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥ ২৮ ॥

[এবম্ (এইভাবে) ; **কর্মবন্ধনৈঃ** (কর্মবন্ধন থেকে) ; **শুভাশুভফলৈঃ** (শুভ এবং অশুভ সমস্ত কর্মফল থেকে) ; **মোক্ষ্যসে** (মুক্ত হবে) ; **সন্ন্যাসযোগ** (এইভাবে নিজেকে সহ) ; **যুক্তাত্মা** (সবকিছু আমাকে অর্পণ করে) ; **বিমুক্ত** (সমস্ত কিছু থেকে মুক্ত হয়ে) ; **মাম্ উপৈষ্যসি** (আমাকেই প্রাপ্ত হবে।)]

এইভাবে আমাকে সর্বকর্ম সমর্পণ করলে, কর্মবন্ধন থেকে এবং শুভ (বিহিত) ও অশুভ (নিষিদ্ধ) সমস্ত কর্মের ফল থেকে তুমি মুক্ত হবে। এইভাবে নিজেকে-সহ সবকিছু আমাকে অর্পণ করে, সমস্ত কিছু থেকে মুক্ত হয়ে তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হবে ॥ ২৮ ॥

ব্যাখ্যা—**'শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ'** পূর্বোক্ত প্রকারে সমস্ত পদার্থ ও ক্রিয়া আমাকে অর্পণ করলে অর্থাৎ স্বয়ং আমাতে অর্পিত হলে অনন্ত জন্মের যে শুভ-অশুভ কর্মের ফল, তা থেকে তুমি মুক্ত হয়ে যাবে। এই কর্মফল তোমাকে জন্ম-মৃত্যু প্রদান করবে না।

এখানে শুভ ও অশুভ কর্মের দ্বারা অনন্ত জন্মের সঞ্চিত শুভ-অশুভ কর্মকে ধরা উচিত। কারণ ভক্ত বর্তমানে ভগবদাজ্ঞা অনুযায়ী কৃত কর্মগুলিই ভগবানকে অর্পণ করে। ভগবদ্ নির্দেশানুযায়ী কৃত কর্মগুলি শুভই হয়ে থাকে , অশুভ হতেই পারে না। তবে যদি কোনোভাবে, কোনো পরিস্থিতিতে বা পূর্বাভ্যাসের প্রবাহে ভক্তের দ্বারা কখনো বিন্দুমাত্রও কোনো আনুষঙ্গিক অশুভকর্ম হয়েও যায়, তাহলে তার হৃদয়ে অবস্থিত ভগবান সেই অশুভকর্ম নষ্ট করে দেন[১]।

যত কর্ম করা হয়, তা সবই বাহ্যিক কর্ম অর্থাৎ শরীর, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা হয়ে থাকে। তাই সেই শুভ ও অশুভ কর্মগুলির অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতি রূপে যে ফলগুলি আসে তাও বাহ্যিকই হয়ে থাকে। মানুষ ভ্রমবশতঃ ওইসব পরিস্থিতির সঙ্গে নিজের সম্পর্ক স্থাপন করে এবং সুখী-দুঃখী হতে থাকে। এই সুখী বা দুঃখী হওয়াই হল কর্মবন্ধন আর এতেই মানুষের জন্ম-মৃত্যু হয়ে থাকে। কিন্তু ভক্তের দৃষ্টি এই অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতির ওপর না থেকে ভগবানের কৃপার ওপর থাকে অর্থাৎ সেগুলিকে সে ভগবানের বিধান বলে মনে করে, কর্মের ফল বলে মনে করে না। সেইজন্য সে অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতিরূপ কর্মবন্ধন হতে মুক্ত হয় ।

'সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা'—সকল কর্ম ভগবানে অর্পণ করাকেই বলা হয় **'সন্ন্যাসযোগ'**। এই সন্ন্যাসযোগ

[১]বিকর্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্ ধুনোতি সর্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৫।৪২)।

অর্থাৎ সমর্পণযোগে যুক্ত ব্যক্তিদেরই এখানে **'সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা'** বলা হয়েছে। গীতায় বহুস্থানে 'সন্ন্যাস' শব্দটি সাংখ্যযোগের বাচক হিসাবে ব্যবহৃত হলেও এর প্রয়োগ ভক্তিতেও করা হয়, যেমন—**'ময়ি সন্ন্যস্য'** (১৮।৫৭)।

সাংখ্যযোগী যেমন সমস্ত কর্ম মনে মনে নবদ্বারযুক্ত শরীরে সমর্পণ করে স্বয়ং সুখপূর্বক নিজ স্বরূপে অবস্থান করেন (গীতা ৫।১৩), তেমনই ভক্ত কর্মের সঙ্গে নিজের মেনে নেওয়া সম্পর্ক ভগবানে সমর্পণ করেন। তাৎপর্য হল এই যে, যেমন কোনো ব্যক্তি তার গচ্ছিত বস্তু কোথাও রেখে দেয়, তেমনই ভক্ত স্বয়ং এবং তাঁর অনন্ত জন্মের সঞ্চিত কর্ম, তার ফল এবং সেগুলির সম্পর্ক ভগবানে সমর্পণ করেন। তাই একে বলা হয় **'সন্ন্যাসযোগ'**।

'বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি'—আগের শ্লোকে **'তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্'** বলে সমর্পণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখানে বলেছেন যে 'এইপ্রকারে সমর্পণ করলে তুমি শুভ-অশুভ কর্মফল থেকে মুক্ত হবে এবং কর্মফল থেকে মুক্ত হলে আমাকে প্রাপ্ত হবে। তাৎপর্য হল এই যে, সমস্ত কর্মফল থেকে মুক্ত হওয়া প্রেমপ্রাপ্তির সাধন এবং ভগবানকে প্রাপ্তি হওয়া হল প্রেমপ্রাপ্তি।'

বিশেষ কথা

শুভ[১] ও অশুভ কর্মের বন্ধান কী ?

শুভ বা অশুভ যে কোনো কর্মই করা হোক তার আরম্ভ ও শেষ থাকে। তেমনই ওই কর্মগুলির ফলরূপে যে পরিস্থিতি আসে, তারও সংযুক্তি ও বিযুক্তি হয়। তাৎপর্য হল এই যে, যখন কর্ম ও তার ফল নিত্য নয় (চিরস্থায়ী হয় না), তখন তার সঙ্গে নিত্য-সম্পর্ক কীভাবে বজায় থাকে ? কিন্তু যখন কর্তা (যে কর্ম করে) কর্মের সঙ্গে একাত্মভাব করে, তখন ফলের সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। যদিও কর্ম ও ফলের সঙ্গে তার সম্পর্ক চিরস্থায়ী থাকতে পারে না, তবুও কর্তা সেই সম্পর্ককে নিজের মধ্যে মেনে নেয়। কর্তা স্বয়ং (স্বরূপতঃ) নিত্য, তাই ওই সম্পর্কগুলি নিজের বলে স্বীকার করায় ওই সম্বন্ধগুলিও নিত্য বলে প্রতীত হয়।

কর্তা শুভকর্মের ফল আকাঙ্ক্ষা করে, যা অনুকূল পরিস্থিতির রূপে প্রকটিত হয়। সেই পরিস্থিতিতে সে সুখ মনে করে। যতক্ষণ এই সুখের আকাঙ্ক্ষা থাকে, ততক্ষণ সে দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পায় না। কারণ সুখের আদি ও অন্তে দুঃখই বিরাজ করে এবং সুখ থেকে প্রতিক্ষণ বিচ্যুতি হতে থাকে। জীব যার বিযুক্তি চায় না, তাকে একদিন না একদিন হারাতেই হয়—এই হল নিয়ম। তাৎপর্য হল এই যে সুখের ইচ্ছাকে সে ছাড়তে চায় না ফলে দুঃখ তাকে ছাড়ে না।

জীব যখন প্রভুর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে, তখন (সাক্ষাৎ পরমাত্মার অংশ হওয়ায়) পরমাত্মার সঙ্গে তার স্বতঃই অভিন্নতা হয় এবং শরীরের সঙ্গে ভ্রমবশতঃ মেনে নেওয়া সম্পর্ক দূর হয়ে যায়। সে তো প্রথম থেকেই পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্ন ছিল। শুধু নিজের জন্য কর্ম করার জন্যই এই অভিন্নতা অনুভূত হচ্ছিল না। এবার নিজের সঙ্গে কর্মও ভগবানে সমর্পণ করায় তার নিজের জন্য কর্ম করার প্রবণতা দূর হয় এবং স্বাভাবিকভাবে তার প্রেমপ্রাপ্তি হয়। ভগবান এটিকেই এখানে **'বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি'** বলে জানিয়েছেন।

জীব যখন নিজেকে ভগবানে সমর্পিত করে দেয় তখন তার কাছে যেসব অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতি আসে, তা সব দয়া এবং কৃপারূপে পর্যবসিত হয়ে যায়। তাৎপর্য হল এই যে তার সামনে যখন অনুকূল অবস্থা আসে তখন সে তাকে ভগবানের 'দয়া' বলে মনে করে আর যখন প্রতিকূল অবস্থা আসে তখন তার মধ্যে ভগবানের 'কৃপা' দেখতে পায়। দয়া এবং কৃপার মধ্যে পার্থক্য হল এই যে, ভগবান যখন ভালোবেসে, স্নেহ করে জীবকে কর্মবন্ধন হতে মুক্ত করেন তখন তাকে বলা হয় 'দয়া', আর যখন শাসন করে, তর্জন করে তাকে পাপ মুক্ত করেন, তখন তাকে বলা হয় 'কৃপা'। এইরূপে দয়া ও কৃপা করে ভগবান ভক্তকে সবল ও সহিষ্ণু করে তোলেন। ভক্ত কিন্তু দুই ব্যাপারেই প্রসন্ন থাকে। কারণ তার লক্ষ্য সেই অনুকূলতা বা প্রতিকূলতার দিকে থাকে না, থাকে ভগবানেরই দিকে। তাই তার কাছে ভগবানের দয়া ও কৃপা দুই রূপে দেখা দেয় না, তা একই রূপে প্রভাসিত হয়। যেমন বলা হয়—

[১]অশুভ কর্ম যেমন বন্ধনকারক, শুভকর্মও তেমনই বন্ধনকারক। যেমন শিকল লোহারই হোক বা সোনার, বন্ধন উভয়ের সাহায্যেই হয়ে থাকে। শুভকর্মও জন্মগ্রহণের কারণ হওয়ায় বন্ধনকারক হয়, আর অশুভ কর্মের দ্বারা তো বন্ধন হয়-ই।

লালনে তাড়নে মাতুর্নাকারুণ্যং যথার্ভকে।
তদ্বদেব মহেশস্য নিয়ন্তুর্গুণদোষয়োঃ ॥

'বালককে যেমন পালন করায় বা তাড়না করায় মায়ের কখনো অকৃপা হয় না, সেইরূপ জীবগণের দোষগুণ নিয়ন্ত্রণকারী পরমেশ্বরেরও কখনো কারও উপর অ-কৃপা হন না।'

পরিশিষ্ট-ভাব— ভগবান **'যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্'** (৯।২৫) দ্বারা যে কথা বলতে আরম্ভ করেছিলেন, তারই উপসংহার করতে গিয়ে বলেছেন যে, সমস্ত ক্রিয়া সহ নিজেকে আমাতে অর্পণ করলে তুমি কর্মবন্ধন থেকে এবং শুভ-অশুভ—উভয় কর্মের ফল হতে মুক্ত হয়ে আমাকেই লাভ করবে।

'কর্ম'ও শুভ-অশুভ হয় এবং তার 'ফল'ও শুভ-অশুভ হয়। অন্যের হিতের জন্য করা কর্ম 'শুভ' আর নিজের জন্য করা কর্ম 'অশুভ' হয়। অনুকূল পরিস্থিতি 'শুভ ফল' আর প্রতিকূল পরিস্থিতি হল 'অশুভ ফল'। ভগবানের ভক্ত শুভ কর্মাদি ভগবানকে সমর্পণ করেন এবং অশুভ কর্ম করেনই না। শুভ-অশুভ ফলে অর্থাৎ অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তাঁরা সুখী বা দুঃখী হন না। আগুনে ঘাসের টুকরো ফেললে যেভাবে সব ঘাস জ্বলে যায়, তেমনই তাঁদের অনন্ত জন্মের সঞ্চিত শুভাশুভ কর্ম ভস্মসাৎ হয়।

ভগবানকে সমর্পণ করলে সংসারের (গুণাদিসঙ্গ) সম্পর্ক থাকে না, শুধুমাত্র ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে, যা স্বতঃই আদি থেকে রয়েছে—**'মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ'** (গীতা ১৫।৭)। যা নিজের নয়, তাকে নিজের বলে মনে করলে বন্ধন ছাড়া আর কিছুই লাভ হয় না। নিজের বলে মনে করলেও বস্তু তো থাকে না, শুধু বন্ধনই থেকে যায়। ভক্তের কোনো বস্তু, ব্যক্তি এবং ক্রিয়াতে আপনভাব না থাকায় তিনি 'বিমুক্ত' হয়ে থাকেন।

এখানে সমর্পণযোগকে **'সন্ন্যাসযোগ'** নামে বলা হয়েছে।

'মামুপৈষ্যসি' পদের তাৎপর্য হল যে ভক্ত ভগবানের সঙ্গে অভিন্নতা লাভ করেন, তার আর নিজস্ব কোনো সত্তা থাকে না—**'জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্'** (গীতা ৭।১৮)। একে বলা হয় প্রেমাদ্বৈত।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে, যে ব্যক্তি ভগবানে সমর্পিত, তাকে তো ভগবান মুক্ত করে দেন আর যে সমর্পিত নয়, তাকে ভগবান মুক্ত করেন না—এতে ভগবানের দয়ালু ভাব এবং সাম্যভাব প্রকাশ পায় না, বরং বৈষম্য-দৃষ্টি এবং পক্ষপাতই বোঝায়। এই বিষয়ে ভগবান বলছেন—

সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥ ২৯ ॥

[**সর্বভূতেষু** (সকল প্রাণীতেই) ; **অহম্** (আমি) ; **সমঃ** (সমান) ; **ন** (কেউ) ; **মে** (আমার) ; **দ্বেষ্যঃ** (অপ্রিয়) ; **অস্তি ন প্রিয়ঃ** (কেউ প্রিয়ও নয়) ; **তু** (কিন্তু) ; **যে** (যাঁরা) ; **ভক্ত্যা** (ভক্তিপূর্বক) ; **মাম্** (আমার) ; **ভজন্তি** (ভজনা করেন) ; **তে** (তাঁরা) ; **ময়ি** (আমাতে) ; **চ** (এবং) ; **অহম্** (আমি) ; **অপি** (ও) ; **তেষু** (তাঁদের মধ্যে অবস্থান করি।[১])]

সকল প্রাণীতেই আমি সমান। তাদের মধ্যে কেউ আমার অপ্রিয়ও নয়, আবার কেউ আমার প্রিয়ও নয়। কিন্তু যাঁরা ভক্তিপূর্বক আমার ভজনা করেন, তাঁরা আমাতে এবং আমি তাঁদের মধ্যে অবস্থান করি ॥ ২৯ ॥

ব্যাখ্যা—'সমোঽহং সর্বভূতেষু'—স্থাবর-জঙ্গম ইত্যাদি সকল প্রাণীতে সমানভাবে ব্যাপ্ত এবং কৃপাদৃষ্টি-বর্ষণে আমি চিরনিরপেক্ষ। তাৎপর্য হল এই যে আমি সবেতে সমানরূপে ব্যাপ্ত ও পরিপূর্ণ—**'ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা'** (গীতা ৯।৪), এবং সবার প্রতি আমার সমান কৃপাদৃষ্টি থাকে **'সুহৃদং**

[১]এই শ্লোকটির দুটি ভাগ আছে—পূর্বার্ধে যারা সাধন-ভজন করে না তাদের বর্ণনা করা হয়েছে এবং উত্তরার্ধে যারা সাধন-ভজন করে তাদের বর্ণনা করা হয়েছে।

সর্বভূতানাম্' (গীতা ৫।২৯)।

আমি কোথাও কম আর কোথাও বেশি অর্থাৎ পিঁপড়ে ছোট হওয়ায় তাতে কম আর হাতি বড় বলে তাতে বেশি ; অন্ত্যজদের মধ্যে কম এবং ব্রাহ্মণদের মধ্যে বেশি ; যারা আমার প্রতিকূল আচরণ করে তাদের মধ্যে কম আর অনুকূল আচরণকারীদের মধ্যে অধিকভাবে প্রকাশিত— তা কখনই নয়। কারণ সকল প্রাণীই আমার অংশ, আমার স্বরূপ। আমার স্বরূপ হওয়ায় এরা কখনো আমার থেকে পৃথক্ হতে পারে না এবং আমিও কখনো এদের থেকে আলাদা হতে পারি না। তাই আমি সকলের মধ্যে সমানভাবে অবস্থিত, আমার কোথাও কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই। তাৎপর্য হল এই যে, প্রাণীদের জন্ম, কর্ম, পরিস্থিতি, ঘটনা. সংযোগ, বিয়োগ ইত্যাদিতে নানাপ্রকার বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও আমি সবসময় সবকিছুতে সমানভাবে ব্যাপ্ত, কোথাও কম বা কোথাও বেশি নই।

'ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ'[১]—ভগবান প্রথমে বলেছেন যে, সমস্ত প্রাণীতে আমি সম, এবার সেটি আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, কোনো প্রাণীই আমার রাগ (আসক্তি)-দ্বেষের পাত্র নয়। তাৎপর্য হল এই যে, আমাতে বিমুখ হয়ে প্রাণীরা যতই শাস্ত্রীয় যজ্ঞ, দান ইত্যাদি শুভ-কর্ম করুক, তা সত্ত্বেও তাঁরা আমার 'রাগ (আসক্তি)'-র পাত্র নয় এবং অন্য কেউ শাস্ত্রনিষিদ্ধ অন্যায়-অত্যাচার ইত্যাদি যতই অশুভ কর্ম করুক, তবুও কোনো প্রাণী আমার 'দ্বেষ'-এর পাত্র নয়। কারণ সকল প্রাণীতে আমি সমানরূপে ব্যাপ্ত, সবার ওপর আমার সমান কৃপা এবং সমস্ত প্রাণী আমার অংশ হওয়ায় সমানভাবে আমার প্রিয়। তবে একথা সত্য যে, যে ব্যক্তি সকামভাবে শুভকর্ম করবে, সে উচ্চগতি প্রাপ্ত হবে আর যে ব্যক্তি অশুভ কর্ম করবে, সে নিম্নগতি অর্থাৎ নরক বা চুরাশী লক্ষ যোনি প্রাপ্ত হবে। কিন্তু এরা পুণ্যাত্মা ও পাপাত্মা যাই হোক, আমার রাগ (আসক্তি) বা দ্বেষের পাত্র নয়।

আমার রচিত পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু এবং আকাশ—এই ভৌতিক পদার্থগুলিও প্রাণীদের ভালো-মন্দ আচরণ এবং ভাব বিচার করে তাদের স্থান দিতে, তাদের পিপাসা মেটাতে, তাদের আলো-বাতাস দিতে এবং তাদের চলাফেরায় রাগ (আসক্তি) বা দ্বেষপূর্বক কোনো বৈষম্য করে না, তারা সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন। তাহলে প্রাণীরা তাদের ভালো-মন্দ আচরণের জন্য আমার রাগ-দ্বেষের বিষয় কীভাবে হতে পারে ? অর্থাৎ তা হতে পারে না। কারণ এরা সকলে সাক্ষাৎ আমারই অংশ, আমারই স্বরূপ।

যেমন, কোনো ব্যক্তির একটি হাত পীড়িত হলে, সেটি শরীরের কোনো কাজে আসে না, ব্যথা হলে রাত্রে ঘুম হয় না, কাজ করতে অসুবিধা হয় আর অপর হাতটি সর্বপ্রকারে শরীরের কাজে আসে। কিন্তু ওই ব্যক্তির কোনো হাতের প্রতিই এমন রাগ বা দ্বেষ হয় না যে এটি ভালো আর অন্যটি মন্দ। কারণ দুটি হাতই তার অঙ্গ এবং নিজ অঙ্গের প্রতি কারও রাগ বা দ্বেষ হয় না। তেমনই কেউ যদি আমার কথা, সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলে, অত্যন্ত পুণ্যাত্মা হয় আর অন্য কেউ যদি আমার বাক্য-সিদ্ধান্ত খণ্ডন করে, আমার বিরুদ্ধে যায়, অত্যন্ত পাপী হয় তবুও এই দুই-এর কারও প্রতি আমার কোনো রাগ বা দ্বেষ থাকে না। তবে তাদের নিজ নিজ আচরণে, ব্যবহারে পার্থক্য থাকায় তার পরিণামেও (ফলেও) পার্থক্য হয়, কিন্তু আমার কারও ওপর রাগ (আসক্তি) বা দ্বেষ থাকে না। যদি কারও ওপর রাগ বা দ্বেষ থাকত তাহলে **'সমোঽহং সর্বভূতেষু'** এই কথা বলা সঙ্গত হত না ; কারণ বৈষম্য থাকলেই রাগ-দ্বেষ হয়।

'যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্'—কিন্তু যাঁরা ভক্তিপূর্বক আমার ভজনা করেন অর্থাৎ যাঁদের সংসারে আসক্তি, অনুরাগ এবং আকর্ষণ নেই, যাঁরা কেবল আমাকেই আপন বলে মনে করেন, কেবল আমারই শরণাগত হন, কেবল আমার প্রসন্নতার জন্যই রাত-দিন কাজ করেন এবং যাঁরা শরীর-ইন্দ্রিয়াদি-মন-বাক্য (কায়-মনো-বাক্যে) দ্বারা আমারই পথে চালিত হন (গীতা ৯।১৪ ; ১০।৯), তারা আমাতে এবং আমি তাদের মধ্যে অবস্থান করি।

---

[১]'প্রিয়' শব্দকে এখানে আসক্তি অর্থে নেওয়া উচিত, কেন-না সকল প্রাণীর প্রতিই ভগবানের সমানভাবে প্রিয়তা রয়েছে—'সব মম প্রিয় সব মম উপজায়ে' (শ্রীরামচরিতমানস ৭।৮৬।২)। অতএব ভগবান এর বিরুদ্ধ কথা বলতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ 'দ্বেষ্য' শব্দের বিপরীত 'রাগ' (অর্থাৎ আসক্তি) শব্দ যুক্তিযুক্ত। যেহেতু রাগ এবং দ্বেষ্য এ দুটি বিপরীতধর্মী অর্থাৎ দ্বন্দ্বমূলক। এখানে এই দ্বন্দ্বের নিষেধ করা হয়েছে।

প্রীতিপূর্বক আমার ভজনাকারীগণ আমাতে অবস্থিত এবং আমি তাদের মধ্যে অবস্থিত—এর তাৎপর্য এই নয় যে, যারা ভক্তিহীন জীব এবং আমার নির্দেশের বিরুদ্ধে চলে, তারা আমাতে নেই এবং তাদের মধ্যে আমি নেই। তারা নিজেরাই নিজেদের আমাতে অবস্থিত বলে মনেই করে না। তারা বলে থাকে আমরা সংসারী জীব, সংসারেই থাকতে হবে। তারা বোঝে না যে শরীর-সংসার কখনো একরূপ ও একরস হয়ে থাকে না। তাহলে এই সংসারে, শরীরে স্থায়ীরূপে কীভাবে থাকা সম্ভব ? এটি যথাযথভাবে উপলব্ধি না করার ফলেই তারা নিজেদের সংসারে, শরীরে স্থিত বলে মনে করে। তাদের থেকে ভিন্ন যাঁরা দিন-রাত আমার ভজন-স্মরণে ব্যাপৃত থাকেন, ভিতর-বাহির, উপর-নীচ, সর্বদেশে, সর্বকালে, সর্ববস্তুতে, ব্যক্তি, ঘটনা, পরিস্থিতি, ক্রিয়া ইত্যাদিতে এবং নিজেদের মধ্যেও যাঁরা আমাকেই দর্শন করেন, তাঁরা আমাতে বিশেষভাবে এবং আমি তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে অবস্থান করি।

অন্য ভাবটি হল যাঁরা আমার সঙ্গে 'আমি ভগবানের এবং ভগবান আমার' এই সম্পর্ক স্থাপন করেন, তাঁদের আমার সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা হয় যে, আমি এবং তাঁরা অভিন্ন হয়ে যাই—**'তস্মিংস্তজ্জনে ভেদাভাবাৎ'** (নারদভক্তিসূত্র ৪১)। সেইজন্য তাঁরা আমাতে এবং আমি তাঁদের মধ্যে অবস্থিত বলা হয়েছে।

তৃতীয় ভাব হল যে তাঁদের মধ্যে 'আমি' ভাব থাকে না ; কারণ 'আমি' ভাব হল একপ্রকার পরিচ্ছিন্নতা (একদেশীয়তা), এটি দূর হওয়ায় তাঁরা আমাতেই অবস্থান করেন।

এখন কেউ যদি বলে যে, প্রভু ! আপনি ভক্তদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রকটিত হন আর অন্যের মধ্যে সাধারণভাবে প্রকটিত হন—আপনার এই বৈষম্য কেন ? এর উত্তরে ভগবান জানাচ্ছেন—ভাই ! আমার এই বৈষম্য ভক্তদের জন্যই হয়ে থাকে। যদি কেউ আমার ভজনা করে, আমার পরায়ণ হয়, আমার শরণাগত হয় আর আমি তাকে বিশেষভাবে প্রেম না করি, তাহলে সেটিই হবে আমার বৈষম্য। কারণ ভজনাকারী এবং ভজনবিমুখ ব্যক্তিদের কাছে আমি যদি সমানভাবে থাকি, তবে সেটা ন্যায়বিচার হয় না ; বরং এটি বৈষম্যমূলক কাজ হয়। সেক্ষেত্রে ভক্তদের সাধন-ভজনের এবং আমার অনুগামী হওয়ার কোনো মূল্যই থাকে না। এই বৈষম্য যাতে আমাতে না আসে সেইজন্য যে যেভাবে আমার শরণ নেয়, আমি তাকে সেভাবেই আশ্রয় প্রদান করি—**'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'** (গীতা ৪।১১)। তাই আমার এই বৈষম্য আমার ভক্তদের ভাবগুলি নিয়েই হয়।[১]

যেমন, কোনো পুত্র ভালো কাজ করলে তাকে 'সুপুত্র' বলা হয় আর খারাপ কাজ করলে 'কুপুত্র' বলা হয়—তাদের আচরণের জন্যই সুপুত্র-কুপুত্র বিভেদ হয়ে থাকে। মা-বাবার পুত্রভাবে কোনো পার্থক্য হয় না। গাভীর স্তনে পোকা বাস করে, সেগুলি গাভীর দুধ পান না করে রক্ত পান করে, এটি গাভীর বৈষম্য নয়, এই বৈষম্য পোকাদেরই সৃষ্ট। ইলেকট্রিকের সাহায্যে কোথাও বরফ জমে কোথাও আবার আগুন জ্বলে, এই বৈষম্য ইলেকট্রিকের নয়, এটি যন্ত্র দ্বারা সৃষ্ট। তেমনই যারা ভগবানে অবস্থান করেও ভগবানকে মানে না, তাঁর ভজনা করে না, এই বৈষম্য তাদেরই সৃষ্টি, ভগবানের নয়। যেমন কাঠের টুকরো, কাঁচের টুকরো এবং আতশ কাঁচের মধ্যে সূর্যের কোনো বৈষম্য থাকে না। কিন্তু সূর্যের আলোতে রাখলে কাঠের টুকরো সূর্যরশ্মি অবরোধ করে, কাঁচের টুকরো তা করে না এবং আতশ কাঁচ সূর্যের কিরণ একস্থানে কেন্দ্রীভূত করে অগ্নি প্রকটিত করে। তাৎপর্য হল এই যে, এই বৈষম্য পদার্থগুলিরই সৃষ্ট, সূর্যের নয়। সূর্যের কিরণ সর্বত্রই সমানভাবে পড়ে। সেই পদার্থগুলি সূর্যের কিরণকে যেভাবে গ্রহণ করে, সূর্যকিরণ সেরূপই তার মধ্যে প্রকটিত হয়। তেমনই ভগবান সমস্ত প্রাণীতেই সমানভাবে ব্যাপক ও পরিপূর্ণ। কিন্তু যে প্রাণী ভগবানের শরণাগত হয়, ভগবানের এবং ভগবানের কৃপার তার

---

[১]তদপি করহিঁ সম বিষম বিহারা। ভগত অভগত হৃদয় অনুসারা॥ (শ্রীরামচরিতমানস ২।২১৯।৩)

শুধু ভগবানেই নয়, জীবন্মুক্ত শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষদেরও তাঁদের সমীপবর্তীদের মধ্যে গুণ-ভাব-আচরণ ইত্যাদি নিয়ে পক্ষপাতিত্ব হয়ে থাকে—

বীতস্পৃহাণামপি মুক্তিভাজাং ভবন্তি ভব্যেষু হি পক্ষপাতাঃ ॥ (কিরাতা. ৩।১২)

মধ্যে বিশেষভাবে প্রাকাট্য হয়। তার ভগবানে যত বেশি প্রিয়ভাব হয়, ভগবানেরও তার প্রতি ততটাই প্রিয়ভাব প্রাকট্য হয়। সে স্বয়ং নিজেকে ভগবানে সমর্পণ করে বলে ভগবানও স্বয়ং নিজেকে তার মধ্যে বিলিয়ে দেন। এইরূপ ভক্তদের ভাব অনুসারেই ভগবানের বিশেষ কৃপা, প্রিয়তা প্রকটিত হয়।

তাৎপর্য হল এই যে মানুষ সাংসারিক অনুরাগবশতঃই নিজেকে সংসারের বলে মনে করে। যখন সে প্রেমপূর্বক ভগবানের ভজনা করতে থাকে তখন তার সাংসারিক অনুরাগ দূর হয় এবং সে নিজেকে ভগবানের বলে মেনে নেয়, ভগবানও তার মধ্যে প্রকাশিত হন। ভগবানের দৃষ্টিতে সে প্রকৃতপক্ষে ভগবানেরই ছিল এবং ভগবানও তার। শুধু আসক্তির জন্যই সে নিজেকে ভগবানের এবং ভগবানকে নিজের বলে মানতে পারেনি।

ভগবান এখানে **'যে ভজন্তি'** পদটিতে **'যে'** সর্বনাম ব্যবহার করেছেন, তার তাৎপর্য হল এই যে, মানুষ যে কোনো দেশের হোক, যে কোনো বেশের হোক, যে কোনো অবস্থার হোক, যে কোনো সম্প্রদায়ের, যে কোনো বর্ণের, যে কোনো আশ্রমের বা যেমনই যোগ্যতাসম্পন্ন হোক না কেন, সে যদি ভক্তি সহকারে আমার ভজনা করে, তাহলে সে আমাতে অবস্থান করে এবং আমি তাতে অবস্থান করি। ভগবান যদি এখানে নির্দিষ্ট কোনো বর্ণ, আশ্রম, সম্প্রদায়, জাতি ইত্যাদি নিয়ে বলতেন, তাহলে ভগবানের বৈষম্য ও পক্ষপাত প্রমাণ হত। কিন্তু ভগবান **'যে'** পদের দ্বারা সকলকেই তাঁর ভজনা করার এবং 'আমি ভগবানে অবস্থিত এবং ভগবান আমাতে অবস্থিত'—এই কথাটি অনুভব করার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন।

পরিশিষ্ট-ভাব—'সমোঽহং সর্বভূতেষু' জীব ভগবানকে তার ক্রিয়াসমূহ অর্পণ করুক বা না করুক, তাতে ভগবানের কিছু যায়-আসে না। তিনি সর্বদা একইভাবে বিরাজ করেন। বর্ণ, আশ্রম, জাতি, কর্ম, যোগ্যতা ইত্যাদি কোনো কিছুরই ভগবানের ওপর কোনো প্রভাব পড়ে না। সুতরাং প্রত্যেক বর্ণ, আশ্রম, জাতি ইত্যাদির মানুষই তাঁর শরণাগত হতে সক্ষম, তাঁর ভক্ত হতে পারেন এবং তাঁকে লাভ করতে পারেন।

'ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ'—ভগবানের দৃষ্টিতে ভগবান ব্যতীত অন্য আর কেউ নেই, সুতরাং অন্য কে আর তাঁর দ্বেষ্য বা ভক্ত হবেন ? জীবই শুভাশুভ কর্মের এবং কর্মফলের দ্বারা রাগ-দ্বেষবশতঃ সংসারে আবদ্ধ হয় আবার রাগ-দ্বেষ পরিত্যাগ করে মুক্ত হতে পারে। তাই বন্ধন ও মুক্তি জীবেরই হয়, ভগবানের নয়। জীবই বৈষম্য করে, ভগবান নয়। ভগবান একই ভাবে বিরাজমান।

চতুর্থ অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকে ভগবান বলেছিলেন **'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্'**। সেই কথাই ভগবান এইস্থানে **'যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্'** পদের দ্বারা বলেছেন। ভগবান সকল প্রাণীতে সমভাবে পূর্ণরূপে বিরাজমান, তাঁতে কোনো বৈষম্য নেই। কিন্তু যাঁরা ভক্তিপূর্বক ভগবানের আরাধনা করেন, তাঁরা ভগবানে এবং ভগবান তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রকটিত। অর্থাৎ পৃথিবীতে যেমন সর্বত্র জল থাকলেও কূপের মধ্যে বিশেষ (আবরণরহিত)ভাবে প্রকটিত, তেমনই ভগবান জগতে সর্বত্র পরিপূর্ণভাবে থাকলেও, ভক্তের মধ্যে বিশেষভাবে প্রকটিত হন। ভগবানকে ভক্তিপূর্বক আরাধনা করার জন্য ভগবৎ কৃপাতেই ভক্তের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য আসে। গাভীর দুগ্ধস্থিত ঘি যেমন গাভীর কোনো কাজে লাগে না, বরং তাকে দোহন করে সেই দুধ থেকে ঘি বের করে সেটি খাওয়ালে যেমন গোরুর উপকার হয় তেমনই জগতে ভগবান পরিপূর্ণভাবে থাকলেও মানুষের পাপ দূর হয় না, বরং যাঁরা ভগবানের শরণাগত হন, ভক্তিভাবে তাঁর ভজনা করেন, তাঁদের পাপ দূর হয়[১]। সাধারণ প্রাণী ভগবানের অন্তর্গত হয়েও ভগবনাকে দেখতে পায় না, কিন্তু ভক্ত সর্বত্র তাঁকে দর্শন করেন (গীতা ৬।৩০)। ভক্ত ভগবানকে ভক্তি করেন আর ভগবান ভক্তকে প্রেমদান করেন—**'প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ'** (গীতা ৭।১৭)। তাই ভক্ত ভগবানে এবং ভগবান ভক্তের মধ্যে বিরাজ করেন—**'ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্'**। এর তাৎপর্য হল যে ভগবানে কোনো বৈষম্য

[১]সনমুখ হোই জীব মোহি জবহীঁ। জন্ম কোটি অঘ নাসহিঁ তবহীঁ।। (শ্রীরামচরিতমানস, সুন্দরকাণ্ড ৪৪।১)

নেই, প্রাণীদের মধ্যেই বৈষম্য দেখা যায়, যার জন্য তারা ভগবানে বিমুখ হয়ে থাকে।

ভগবান তত্ত্বতঃ **'সমোঽহং সর্বভূতেষু'**, কিন্তু অনুভবে তিনি **'ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্'**। অর্থাৎ সকল প্রাণীতে সমভাবে বিরাজমান হলেও, ভক্তই শুধু ভগবানকে অনুভব করেন, অন্য কোনো প্রাণী নয়। আসলে অনুভব করার শক্তিও ভগবান থেকেই পাওয়া যায়, মানুষের কাজ শুধু তাঁর শরণাগত হওয়া।

রামায়ণে উদ্ধৃত আছে—

সাতবঁ সম মোহি ময় জগ দেখা। মোতেঁ সন্ত অধিক করি লেখা॥ (শ্রীরামচরিতমানস, অরণ্যকাণ্ড ৩৬।২)

তাৎপর্য হল যে ভগবানের সকল প্রাণীতেই সমান প্রকাশ, ভালোবাসা, কৃপা ও একাত্মতা থাকে, কিন্তু ভক্তদের মধ্যেই তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়। ভক্তদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য আসে তখনই, যখন তাঁদের ভগবানে প্রেম হয় আর তা ভগবদ্ কৃপাতেই হয়ে থাকে। ভক্তের ভগবানের সঙ্গে যে একাত্মভাব, প্রিয়ত্ব জন্মায়, সেরূপ অন্য কারোর হয় না। তাই ভগবানেরও ভক্তের প্রতি ভালোবাসাবোধ আসে। ভক্ত আর ভগবানের মধ্যে এই ভালোবাসাকে **'ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্'** পদের দ্বারা বলা হয়েছে।

※　※　※

*সম্বন্ধ—পূর্বশ্লোকে ভগবান **'যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা'** পদটিতে ভক্তিপূর্বক তাঁর ভজনা করার কথা বলেছেন। এবার পরবর্তী শ্লোকে ভজনাকারীদের নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করছেন।*

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥ ৩০ ॥

[**চেৎ** (যদি) ; **সুদুরাচারো** (অত্যন্ত দুরাচারী) ; **অপি** (ও) ; **অনন্যভাক্** (অনন্য ভক্ত হয়ে) ; **মাম্** (আমার) ; **ভজতে** (ভজনা করে) ; **সঃ** (তাকে) ; **সাধুঃ, এব** (সাধুই) ; **মন্তব্যঃ** (মনে করবে।) ; **হি** (কেন-না) ; **সঃ** (সে) ; **সম্যক্, ব্যবসিতঃ** (খুব ভালোভাবেই তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।)]

যদি অত্যন্ত দুরাচারী কোনো ব্যক্তিও অনন্য ভক্ত হয়ে আমার ভজনা করে, তাহলে তাকে সাধু বলেই মনে করবে। কারণ সে খুব ভালোভাবেই তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ॥ ৩০ ॥

ব্যাখ্যা—[কোনো কোটিপতি যদি বলে যে, আমার কাছে যে আসবে তাকেই আমি লক্ষ টাকা দেব, তাহলে তার কথার পরীক্ষা তখনই করা যাবে, যখন তার বিরুদ্ধবাদী, শত্রুভাবাপন্ন, অনিষ্টকারী ব্যক্তি এসে তার কাছে লক্ষ টাকা চায় আর ওই ব্যক্তি তা দিয়ে দেয়। তখনই সেই ব্যক্তির কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে। এই ভাব নিয়েই ভগবান সর্বপ্রথম দুরাচারীর কথা বলেছেন।]

'অপি চেৎ'—সপ্তম অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, যে পাপী হয়, সে আমার শরণ নেয় না (৭।১৫) আর এখানে বলেছেন যে অত্যন্ত দুরাচারী ব্যক্তিও যদি অনন্যভাবে আমার ভজনা করে—এই দুটি কথায় আপাত বিরোধ লক্ষ করা যায়। এই বিরোধ দূর করার জন্য এখানে **'অপি'** এবং **'চেৎ'** এই দুটি পদ ব্যবহৃত হয়েছে। তাৎপর্য হল যে, সপ্তম অধ্যায়ে 'দুষ্কৃতকারী ব্যক্তি আমার শরণাগত হয় না' এই কথা বলে তাদের স্বভাবের বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু তারাও কোনো কারণে যদি আমার ভজন-সাধনে ব্যাপৃত হতে চায়, তবে তা হতে পারে। আমার দিক থেকে কোনো বাধা নেই[১] ; কারণ কোনো প্রাণীর প্রতিই আমার দ্বেষ ভাব নেই। এই ভাবটি প্রকটিত করতেই এখানে **'অপি'** এবং **'চেৎ'** পদ দুটি প্রযুক্ত হয়েছে।

'সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্'—যে ব্যক্তি চরম দুরাচারী, সামগ্রিকভাবে দুরাচারী অর্থাৎ দুরাচার করায় যার কোনো ঘাটতি নেই, দুরাচারের কোনো প্রক্রিয়া যার বাকি থাকে না—এরূপ দুরাচারীও যদি অনন্যচিত্তে আমার

[১]কোটি বিপ্র বধ লাগহিঁ জাহূ। আএঁ সরন তজউঁ নহিঁ তাহূ॥
সনমুখ হোই জীব মোহি জবহীঁ। জন্ম কোটি অঘ নাসহিঁ তবহীঁ॥ (শ্রীরামচরিতমানস ৫।৪৪।১)

ভজনায় নিরত হয় তাহলে সে উদ্ধার প্রাপ্ত হয়।

এখানে 'ভজতে' ক্রিয়াটি বর্তমান কালের, যার কর্তা হল সামগ্রিকভাবে দুরাচারী। এর তাৎপর্য হল আগেও সে দুরাচার করে চলছিল এবং এখন বর্তমান সময়ে সে অনন্যভাবে ঈশ্বরের ভজনা করলেও তার দুরাচার সম্পূর্ণ দূর হয়নি, অর্থাৎ এখনো কোনো কোনো পরিস্থিতিতে পূর্বসংস্কারবশতঃ তার দ্বারা পাপ কার্য হয়ে যাওয়া সম্ভব। কিন্তু এরূপ অবস্থাতেও সে আমাকে ভজনা করে। এর কারণ তার ধ্যেয় (লক্ষ্য) অন্য দিকে নেই অর্থাৎ তার লক্ষ্য এখন ধন-সম্পত্তি-মান-মর্যাদা-সুখ-আরাম ইত্যাদির দিকে থাকে না। তার একমাত্র লক্ষ্য থাকে অনন্যভাবে আমাতে যুক্ত হওয়ার।

প্রশ্ন হতে পারে যে, এরূপ দুরাচারী ব্যক্তি কী করে অনন্যচিত্তে ভগবানের ভজনে ব্যাপৃত হবে ? বিভিন্ন কারণে সে অনন্যচিত্তে ভজনায় ব্যাপৃত হতে পারে ; যেমন—

(১) সে যদি কোনো বিপদে পড়ে এবং কোথাও তার সাহায্যের আশা না থাকে। এরূপ অবস্থায় হঠাৎ তার শোনা কথা মনে পড়তে পারে যে 'ভগবান সকলের সাহায্যকর্তা এবং তাঁর শরণাগত হলে সব কাজ ঠিকভাবে হয়ে যায়' ইত্যাদি।

(২) সে যদি এমন কোনো স্থানে যায় যেখানে বড় বড় সাধু-মহাপুরুষ জন্মেছিলেন বা বর্তমানে সেখানে কোনো মহাপুরুষ রয়েছেন তাহলে তাঁদের পবিত্র প্রভাবে তার ভগবানে আগ্রহ হতে পারে।

(৩) বাল্মীকি, অজামিল, সদন কসাই প্রমুখ পাপীরাও ভগবানের ভক্ত হয়েছিলেন এবং সাধন-ভজনের দ্বারা তাঁদের মধ্যে বিশেষ মহিমা প্রকাশ পেয়েছিল—এরূপ শুনে যদি তার মধ্যে পূর্বের সুসংস্কার জাগরিত হয়—যা সকল প্রাণীর মধ্যেই থাকে।[১]

(৪) কোনো প্রাণী যদি কোনো বিপদে পড়ে এবং সেখানে তার বাঁচার কোনো সম্ভাবনা নেই, কিন্তু সে বেঁচে গেল! এমন ঘটনাবিশেষ প্রত্যক্ষ করে তার মধ্যে এরূপভাব জন্মাতে পারে যে এমন কোনো এক বিশেষ শক্তি নিশ্চয়ই আছে যা এরকম বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দেয়। এই বিশেষ শক্তি ভগবানেরই হতে পারে, তাই আমারও তাঁর শরণাগত হওয়া উচিত।

(৫) যদি কোনো সাধুর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয় এবং তার দুষ্কৃতি দেখে সেই সাধুর তার ওপর কৃপা হয় ; যেমন—বাল্মীকি, অজামিল প্রমুখ পাপী ব্যক্তিদের ওপর সাধুদের কৃপা হয়েছিল।

এরূপ নানা কারণে যদি দুরাচারীদের ভাব পরিবর্তিত হয়, তবে তারা ভগবানের শরণ নিতে পারে। চোর-ডাকাত-লম্পট-খুনী প্রভৃতি অনেকে হঠাৎ ভাব পরিবর্তিত হওয়ায় ভগবানের অতি বিশিষ্ট ভক্ত ও প্রিয়পাত্র হয়েছেন—এরূপ অনেক কাহিনী পুরাণ ও ভক্তচরিত্র গ্রন্থাদিতে বর্ণিত আছে।

প্রশ্ন হতে পারে যে, যে-সব ভক্ত বহু বছর ধরে ধ্যান-ভজন করে আসছে, তাদের মনও তৎপরতার সঙ্গে ভগবানে আকৃষ্ট হয় না, তাহলে যারা অত্যন্ত দুরাচারী তাদের মন তৈলধারাবৎ ভগবানে কীভাবে আকৃষ্ট হবে? এখানে 'অনন্যভাক্'-এর অর্থ 'সে তৈলধারাবৎ স্মরণ করে'—তা নয়, এর অর্থ হল 'ন অন্যং ভজতি' অর্থাৎ সে অন্য কারও ভজনা করে না। তার ভগবান ব্যতীত অন্য কোনো সহায় বা আশ্রয় নেই, কেবলমাত্র ভগবানই তার আশ্রয়। যেমন পতিব্রতা স্ত্রী, পতির কথাই কেবল চিন্তা করে— এমন নয়। সে তো সর্বক্ষণ পতিরই হয়ে থাকে, স্বপ্নেও অন্যের হয় না। তাৎপর্য হল এই যে তার একমাত্র পতির সঙ্গেই আপনত্ববোধ থাকে। তেমনই এই দুরাচারী ব্যক্তিরও শুধু ভগবানের সঙ্গেই একাত্মতা হয়ে যায় এবং একমাত্র ভগবানেরই আশ্রয় থাকে।

'অনন্যভাক্' হওয়ার প্রধান কথা হল 'আমি ভগবানের এবং ভগবান আমার' এইরকম আমিত্বের পরিবর্তন করা। আমিত্ব পরিবর্তনে যত শীঘ্র শুদ্ধিলাভ হয়, জপ-তপ-যজ্ঞ-দানাদি ক্রিয়াতে তত শীঘ্র শুদ্ধিলাভ করা যায় না। এই আমিত্ব পরিবর্তনের বিষয়ে তিনটি কথা আছে—

(১) **আমিত্ব দূর করা**—জ্ঞানযোগের সাহায্যে আমিত্ব দূর হয়। যে প্রকাশে 'অহম্' (আমি-ভাব)-এর জ্ঞান হয়, সেই প্রকাশ আমার স্বরূপ এবং পরিচ্ছিন্ন রূপে প্রতীত হওয়া 'আমিত্ব' আমার স্বরূপ নয়। কারণ হল 'আমিত্ব' দৃশ্যমান, তা নিজের স্বরূপ নয়। এইভাবে দুটিকে বিভক্ত করে অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপে স্থিত হলে 'আমিত্ব' দূর হয়।

---

[১]সুমতি কুমতি সব কেঁ উর রহহীঁ। নাথ পুরান নিগম অস কহহীঁ ॥ (শ্রীরামচরিতমানস ৫।৪০।৩)

(২) **অহং ভাবের শুদ্ধিকরণ**—কর্মযোগের দ্বারা অহং ভাব শুদ্ধ হয়। যেমন, পুত্র বলে 'আমি পুত্র আর ইনি আমার পিতা', এর তাৎপর্য হল যে পিতার সেবা করাই পুত্রের কর্তব্য। কারণ পিতাপুত্রের সম্বন্ধ কর্তব্যপালনের ক্ষেত্র। পিতা যদি আমাকে পুত্র বলে না মানেন, আমাকে দুঃখ দেন, আমার অহিত কাজ করেন, তাহলেও আমার কর্তব্য তাঁর সেবা করা, তাঁকে সুখী করা। তেমনই মা, ভাই, ভ্রাতৃবধূ, স্ত্রী, পুত্র, পরিবারের প্রতিও আমার নিজ কর্তব্য পালন করা উচিত। তাঁদের কর্তব্যের প্রতি অর্থাৎ আমার প্রতি, জগতের প্রতি তাঁরা কী কর্তব্য করছেন সেদিকে আমার দৃষ্টি দেওয়া উচিত নয়। তাঁদের কর্তব্য বিচার করা আমার কর্তব্য নয় কারণ অপরের কর্তব্য যারা বিচার করতে বসে, তারা নিজ কর্তব্য হতে চ্যুত হয়। সুতরাং আমার এরূপ অধিকার নেই। এইভাবে অন্যের কর্তব্য না দেখে কেবলমাত্র নিজ কর্তব্য পালন করলে অহং-ভাব শুদ্ধ হয়। কারণ নিজের সুখ ও আরাম কামনা করলেই অহং অশুদ্ধ হয়।

(৩) **আমিত্ব-ভাবের পরিবর্তন**—ভক্তিযোগের দ্বারা আমিত্ব-বোধ পরিবর্তিত হয়। যেমন বিবাহ দ্বারা পতির সঙ্গে সম্পর্ক হলেই কন্যার আমিত্ব-ভাবের পরিবর্তন হয় এবং সে পতির গৃহকেই নিজ-গৃহ, পতির ধর্মকে নিজ-ধর্ম বলে মানতে থাকে। সে হল পতিব্রতা অর্থাৎ একমাত্র পতিরই আপন হয়ে থাকে । তখন সে আর মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ি কারোরই হয় না। শুধু তাই নয়, সে তখন তার পুত্র-কন্যারও আপন হয় না। কারণ যখন সে সতী হয়, তখন পুত্র-কন্যা, বাবা-মা কারোর স্নেহেরই পরোয়া করে না। তবে পতির জন্য সকলেরই সেবা করে, কিন্তু তার আমিত্ব শুধু পতিকে নিয়েই হয়ে থাকে। তেমনই মানুষের অহং-ভাব যদি 'আমি ভগবানের এবং ভগবান আমার' এইভাবে ভগবানকে নিয়ে হয়, তখন তার অহং-ভাবের পরিবর্তন হয়। এই অহং-ভাব পরিবর্তিত হওয়াকেই বলা হয় **'অনন্যভাক্'**।

'সাধুরেব স মন্তব্যঃ'—এখানে এখন এই প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, যে আগেও দুরাচারী ছিল এবং বর্তমানেও যখন তার আচরণ সম্পূর্ণভাবে শুদ্ধ হয়নি তখন তার দুরাচার-গুলিকে নিয়ে তাকে দুরাচারী বলে মনে করা হবে, নাকি তার অনন্যভাবকে নিয়ে তাকে সাধু মনে করা হবে ? উত্তরে ভগবান এই কথা বলছেন যে তাকে সাধু মনে করা উচিত। এখানে **'মন্তব্য'** (মানা উচিত) হল বিধিবচন অর্থাৎ এটি হল ভগবানের বিশেষ আজ্ঞা।

মেনে নেবার কথা সেখানেই বলা হয়, যেখানে (সাধুত্ব) পরিলক্ষিত হয় না। তার মধ্যে যদি বিন্দুমাত্রও দুরাচার না থাকত, তাহলে ভগবান তাকে সাধু বলেই মনে করা উচিত এরূপ কেন বলবেন ? তাই ভগবানের কথায় প্রমাণিত হয় যে তার মধ্যে এখনও দুরাচার বিদ্যমান, সে এখনও সর্বতোভাবে দুরাচার-রহিত হয়নি। তাই ভগবান বলেছেন যে, সে যদিও এখনও যথার্থরূপে সাধু হয়ে ওঠেনি, তাহলেও তাকে সাধু বলে মনে করা উচিত অর্থাৎ বাহ্যতঃ তার ক্রিয়া এবং আচরণাদিতে কোনো ঘাটতি থাকলেও, সে অসাধু নয়। তার কারণ সে **'অনন্যভাক্'** হয়েছে অর্থাৎ 'আমি শুধু ভগবানেরই এবং ভগবানই কেবলমাত্র আমার ; আমি সংসারের নই এবং সংসারও আমার নয়' এইভাবে অন্তর থেকে সে ভগবানের হয়ে গেছে এবং তার আমিত্বের পরিবর্তন করেছে। তাই এর পর তার আচরণ শোধরাতে দেরি হয় না ; কারণ অহংভাব অনুসারেই সমস্ত আচরণ হয়।

তাকে সাধু বলেই মনে করা উচিত—ভগবানকে কেন এ-কথা বলতে হল ? কারণ মানুষ প্রায়ই কারও অন্তরের ভাব না দেখে বাহ্যিক আচরণ দেখে তার বিচার করে। যেমন, বহু বছরের পরিচিত কোনো এক ব্যক্তি, যাঁকে লোকে কুড়ি-পঁচিশ বছর ধরে ভদ্র আচরণসম্পন্ন বলে জানে কিন্তু তাঁকে একরাত্রে একটি বারনারীর গৃহ হতে বেরোতে দেখা গেল। তাই দেখে লোকের মনে হল, আরে! একে তো ভালো লোক বলে মনে করতাম, কিন্তু এ তো তা নয়, এ তো বারনারী আসক্ত! এরূপ তার যে ভদ্র পরিচিতি ছিল তা উবে যায়। যার প্রতি বহুদিনের শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল, তা নষ্ট হয়ে যায়। এইভাবেই ধরা যাক লোকে অনেকদিন ধরে কোনো ব্যক্তিকে জানে যে সে অন্যায়কারী, পাপী, দুরাচারী। আর তাকেই গঙ্গাতীরে একদিন দেখা যায় যে সে স্নান করে, প্রসন্ন মুখে, হাতে মালা নিয়ে জপ করছে। তাকে দেখে কেউ হয়ত বলে ওঠে, দেখো ! ইনি ভগবানের ভজনা করছেন, খুব বড় সাধু ব্যক্তি হবেন। তখন অন্য কেউ বলে, আরে ! তুমি একে জানো না, আমি জানি ; এ তো খুবই খারাপ ব্যক্তি, পাষণ্ড। এইরূপ সাধন-ভজনে ব্যাপৃত থাকলেও লোকেরা তাকে

আগের মতোই পাপী বলে মনে করে ; তেমনি অপরদিকে সাধন-ভজনকারী ব্যক্তিকেও বারনারীর ঘর থেকে বেরোতে দেখে খারাপ বলে মেনে নেয়। তারা জানে না কোনো কারণে সেই লোককে বারনারী ডেকেছিল কিনা, সেই ব্যক্তি দয়াপরবশ হয়ে তাকে শিক্ষা দিতে গিয়েছিল কিনা ! তাকে শোধরাবার জন্য গিয়েছিল কিনা। সেদিকে লোকের দৃষ্টি যায় না। যার চিত্ত অশুদ্ধ, সে অশুদ্ধ বিষয়গুলিই গ্রহণ করে। সে মন্দভাবনা পোষণ করে নিজ চিত্তকে আরও খারাপ করে তোলে। কিন্তু উপরিউক্ত দুটি ব্যাপারেই ভগবানের দৃষ্টি থাকে মানুষের ভাবের ওপর, আচরণের ওপর নয়—

'রহতি ন প্রভু চিত চূক কিএ কী।
করত সুরতি সয় বার হিএ কী॥'

(শ্রীরামচরিতমানস ১।২৯।৩)

কারণ ভগবান ভাবগ্রাহী—**'ভাবগ্রাহী জনার্দনঃ।'**

'সম্যগ্‌ ব্যবসিতো হি সঃ'—দ্বিতীয় অধ্যায়ে কর্মযোগের প্রকরণে 'ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি'র কথা বলা হয়েছে (২।৪১) অর্থাৎ সেখানে প্রথমে বুদ্ধিতে এটি নিশ্চয় করা হয় যে, 'আমার রাগ-দ্বেষ করা উচিত নয়, কর্তব্য-কর্ম করার সময় সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সম থাকতে হবে।' তাই কর্মযোগীর বুদ্ধি ব্যবসায়াত্মিকা (একনিষ্ঠ) হয় এবং এখানে কর্তা স্বয়ং ব্যবসিত—**'সম্যগ্‌ ব্যবসিতঃ'**। কারণ 'আমি শুধু ভগবানেরই, এখন সাধন-ভজন করাই আমার কাজ'—এই নিশ্চয়তা নিজস্ব, বুদ্ধির নয়, সুতরাং সম্যক্‌ নিশ্চয়সম্পন্ন ব্যক্তির স্থিতি ভগবানেই থাকে। তাৎপর্য হল এই যে, সেখানে নিশ্চয়তা ছিল 'করণে' (বুদ্ধিতে) আর এখানে নিশ্চয়তা হয়েছে 'কর্তায়' (স্বয়ং-এ)। করণে নিশ্চয়তা হলেও যখন কর্তা পরমাত্মতত্ত্বে অভিন্ন হয়ে যায়, তাহলে কর্তাতে নিশ্চয়তা হলে করণেও নিশ্চয়তা এসে যাবে—এতে আর বলার কী আছে ?

যেখানে বুদ্ধির নিশ্চয় হয়, সেখানে এই নিশ্চয় ততক্ষণ একরূপ থাকে না যতক্ষণ স্বয়ং কর্তা এই নিশ্চয়ের সঙ্গে অভিন্ন না হন। যেমন, সৎসঙ্গ-স্বাধ্যায়ের সময় মানুষ স্থির করে যে, এখন থেকে আমি কেবল ভজন-স্মরণ করব। কিন্তু এই নিশ্চয়তা সৎসঙ্গ-স্বাধ্যায়ের পরে আর থাকে না। তার কারণ হল যে, তার নিজের স্বাভাবিক রুচি শুধুমাত্র পরমাত্মার শরণাগত হওয়ার দিকে থাকে না, সঙ্গে সাংসারিক সুখ-আরাম আস্বাদনের ইচ্ছাও থাকে। কিন্তু যখন সে স্থিরনিশ্চিত হয় যে আমাকে এখন কেবল ঈশ্বরের পথে এগোতে হবে তখন তার এই স্থির সিদ্ধান্ত কখনও পরিবর্তিত হয় না ; কারণ এই সিদ্ধান্ত স্বয়ং-এর।

যেমন, কন্যা বিবাহের পরে 'এখন আমি স্বামীর, কাজেই আমাকে স্বামীর ঘরের সব কাজ করতে হবে' এরূপ স্থির নিশ্চিত হওয়াতে সেটি আর কখনও দূর হয় না। এই কথা তাকে আর নতুন করে মনে করতে হয় না, সর্বক্ষণ তার স্মরণে থাকে। তার কারণ হল যে, সে নিজেই নিজেকে তার পতির বলে মেনে নিয়েছে। তেমনই কেউ যখন সিদ্ধান্ত করে যে, 'আমি ভগবানের এবং এখন থেকে ভগবানের কাজই (ভজনা) করব, সাধন-ভজন ব্যতিরেকে আর কিছুই করব না' এই সিদ্ধান্ত স্বয়ং-এর হওয়ায় এটি সর্বদার জন্য স্থায়ী হয়, কখনও দূর হয় না। এই কারণেই ভগবান বলেছেন যে তাকে সাধু বলে মনে করা উচিত। কেবল মানাই নয়, স্বয়ং (নিজে) স্থির নিশ্চয় করায় সে খুব শীঘ্রই ধর্মাত্মা হয়ে ওঠে—**'ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা'** (৯।৩১)।

ভক্তিযোগের দৃষ্টিতে সমস্ত দুর্গুণ ও দুরাচার টিকে থাকে ভগবান বিমুখতায়। প্রাণী যখন অনন্যভাবে ভগবানের শরণাগত হয়, তখন সমস্ত দুর্গুণ-দুরাচার দূর হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব—জ্ঞানযোগে ও কর্মযোগে বুদ্ধির প্রাধান্য থাকে—**'এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু'** (গীতা ২।৩৯)। তাই জ্ঞানযোগী ও কর্মযোগীর বুদ্ধি ব্যবসিত হয়ে থাকে—**'ব্যসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ'** (গীতা ২।৪১), **'ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ'** (গীতা ২।৪৪)। কিন্তু ভক্তিযোগে স্বস্বরূপের প্রাধান্য থাকায় ভক্ত নিজেই ব্যবসিত হয়ে থাকেন—**'সম্যগ্‌ব্যবসিতো হি সঃ'**।

মন ও বুদ্ধিতে যা থাকে তা বিস্মরণ হওয়া সম্ভব কিন্তু স্বস্বরূপে যা থাকে, তার বিস্মৃতি হয় না। কারণ মন ও বুদ্ধি সর্বক্ষণ নিজের সঙ্গে থাকে না, গভীর নিদ্রার সময়ে আমরা তার অভাব অনুভব করে থাকি, কিন্তু কেউ কখনই স্বস্বরূপের অভাব অনুভব করে না। স্বস্বরূপে যা থাকে তা অখণ্ড হয়। সেইজন্যই 'আমি ভগবানের এবং ভগবান আমার'—এই

স্বীকৃতি স্বস্বরূপেরই হয়, মন বুদ্ধিতে নয়। একবার এই স্বীকৃতি হলে পরে আর কখনো অস্বীকৃতি হয় না, কেন-না স্বস্বরূপ মূলতঃ ভগবানের অংশ হওয়ায় ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন। কিন্তু ভ্রমবশতঃ সে প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্পর্ক স্বীকার করে নেয় (গীতা ১৫।৭)। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে শুধুমাত্র নিজের ভ্রমঃ দূর হয়। ভ্রম দূর হলে ভগবানের সঙ্গে নিত্য সম্পর্ক স্বতঃই জাগরিত হয়—**'নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা'** (গীতা ১৮।৭৩)। অন্যের সঙ্গে যে সম্পর্ক মেনে নেওয়া হয়েছিল, তা ছিল ভুল, মোহ।

※　※　※

সম্বন্ধ—পরবর্তী শ্লোকে সম্যক্ নিশ্চয়তার ফল জানাচ্ছেন।

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥ ৩১ ॥

[**ক্ষিপ্রম্** (তৎক্ষণাৎ) ; **ধর্মাত্মা** (ধর্মাত্মা) ; **ভবতি** (হয়ে যান) ; **শশ্বৎ** (চিরন্তন) ; **শান্তিম্** (শান্তি) ; **নিগচ্ছতি** (লাভ করেন) ; **কৌন্তেয়** (হে কৌন্তেয় !) ; **প্রতিজানীহি** (শপথ নাও) ; **মে, ভক্তঃ** (আমার ভক্তের) ; **প্রণশ্যতি, ন** (বিনাশ হয় না।)]

সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ ধর্মাত্মা হয়ে যান এবং চির-শান্তি লাভ করেন। হে কৌন্তেয় ! আমার ভক্তের কখনই বিনাশ (পতন) হয় না, তুমি এরূপ শপথ নাও ॥ ৩১ ॥

ব্যাখ্যা—**'ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা'**—সে তৎক্ষণাৎ ধর্মাত্মা হয়ে যায় অর্থাৎ মহাপবিত্র হয়ে যায়। কারণ এই জীব স্বয়ং পরমাত্মার অংশ এবং যখন তার উদ্দেশ্যও পরমাত্মপ্রাপ্তি করার তখন আর তার ধর্মাত্মা হওয়ায় বাধা কোথায় ? সে আর পাপাত্মা থাকতে পারে না। কারণ সে তো ধর্মাত্মা ছিলই, শুধুমাত্র সংসারের সংস্পর্শেই তার পাপাত্মা-ভাব এসেছিল, যেটি ছিল আগন্তুক । এখন যখন তার অহং-ভাব পরিবর্তিত হওয়ায় সংসারের সংসর্গ কেটে গেছে, তখন সে যেমনকার তেমনই (ধর্মাত্মা) থেকে গেছে।

এই জীব যখন পাপাত্মা হয়নি তখনও যেমন পবিত্র ছিল পাপাত্মা হওয়ায় পরেও তেমনই পবিত্র। কারণ পরমাত্মার অংশ হওয়ায় জীব সর্বদাই পবিত্র। শুধু সাংসারিক সম্পর্কে সে পাপাত্মা-রূপ ধারণ করেছে। সাংসারিক সম্পর্ক দূর হতেই সে যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেল।

পাপ কাজের চিন্তা থাকলে মানুষ 'আমাকে শুধু ভগবানের দিকে চলতে হবে'—এই সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, এ-কথা সত্য, কিন্তু পাপী ব্যক্তি এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না—তার কোনো নিয়ম নেই। কারণ জীবমাত্রই পরমাত্মার অংশ হওয়ায় তত্ত্বতঃ সে নির্দোষ। সাংসারিক আসক্তিবশতঃ তাতে এইসব আগন্তুক দোষ উপস্থিত হয়। যদি তার মধ্যে পাপের প্রতি ঘৃণাবোধ জন্মায় এবং সে নিশ্চিত হয় যে এবার ভগবানেরই ভজনা করা উচিত তাহলে সে শীঘ্রই ধর্মাত্মা হয়ে ওঠে। কারণ যেখানে সংসারের কামনা থাকে, সেখানে ভগবানের দিকে অগ্রসর হবার ইচ্ছাও থাকে। যদি ভগবানের প্রতি চলার ব্যাপারে স্থির নিশ্চয় হয় তাহলে কামনা, আসক্তি সব দূর হয়। তখন আর ভগবদ্প্রাপ্তিতে বিলম্ব হয় না।

সে অতি শীঘ্রই ধর্মাত্মা হয়ে যায়—এর অর্থ হল যে তার মধ্যে বিন্দুমাত্র দুরাচার থাকলেও, তা স্থায়ী হয় না। কারণ সমস্ত দুরাচার স্থায়িত্ব পায় সংসারকে গুরুত্ব দিলে। কিন্তু যখন সে জাগতিক কামনা-রহিত হয়ে কেবল ভগবানকেই চায়, তখন তার মধ্যে সংসারের গুরুত্ব না থেকে শুধুমাত্র ভগবানের গুরুত্ব থাকে। ভগবানের গুরুত্ব থাকায় সে ধর্মাত্মা হয়ে যায়।

মর্মার্থ

সিদ্ধান্ত হল, কর্তায় পরিবর্তন হলে ক্রিয়াগুলি স্বতঃই পরিবর্তিত হয়। যেমন, কেউ যদি ধর্মীয় ক্রিয়া দ্বারা ধর্মাত্মা হতে চায়, তবে তার ধর্মাত্মা হতে বিলম্ব ঘটে। কিন্তু সে যদি কর্তাকেই পরিবর্তন করে দেয় অর্থাৎ 'আমি ধর্মাত্মা' এইভাবে নিজের অহং-ভাব পরিবর্তন করে, তাহলে সে অতি শীঘ্রই ধর্মাত্মা হয়ে থাকে। এইরূপে অতি পাপিষ্ঠ ব্যক্তিও যদি নিজের অহং-ভাব এই ভেবে পরিবর্তন করে

যে 'আমি ভগবানের এবং ভগবান আমার', তাহলে সে অতি শীঘ্রই ধর্মাত্মা হয়ে যায়, সাধু হয়ে যায়, ভক্ত হয়ে যায়। তাৎপর্য হল এই যে, মানুষ যখন সংসার ও শরীরের সঙ্গে 'আমি' ও 'আমার' ভাব করে সংযোগজনিত সুখ আকাঙ্ক্ষা করে, তখন তাকে 'কামাত্মা' (গীতা ২।৪৩) বলা হয় আর যখন সে সংসার থেকে সর্বতোভাবে বিমুখ হয়ে ভগবানের সঙ্গে অনন্য সম্পর্ক স্থাপন করে, যা বাস্তব সত্য, তখন সে 'ধর্মাত্মা' হয়ে ওঠে।

সাধারণভাবে লোকে মনে করে যে সত্যকথা বললে মানুষ সত্যবাদী হয় এবং চুরি করলে চোর হয়। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তা নয়। যখন সে নিজে সত্যবাদী হয় অর্থাৎ 'আমি সত্য কথা বলি' এরূপ আমিত্ব-ভাবে সত্যকে ধারণ করে, তখনই তার দ্বারা সত্যভাষণ হয় এবং সত্য কথা বলায় তার সত্যবাদিতা দৃঢ় হয়। তেমনই যে চোর, সে 'আমি চোর', 'আমিত্বে' এই ভাব ধারণ করে চুরি করে এবং চুরির দ্বারা তার চৌর্যবৃত্তি দৃঢ় হয়। কিন্তু যার আমিত্বে 'আমি চোর নই' এরূপ দৃঢ়ভাব থাকে, সে চুরি করতে পারে না। তাৎপর্য হল এই যে, অহং-ভাবের পরিবর্তনে ক্রিয়াগুলির স্বতঃ পরিবর্তন হয়।

এই দুটি দৃষ্টান্ত থেকে প্রমাণিত হয় যে কর্তা যেরূপ হয়, তার দ্বারা সেইরূপ কর্মই হয়ে থাকে আর কর্ম যেমন হয়, কর্তৃত্বও সেইরূপ দৃঢ় হয়ে থাকে। তেমনই এইস্থানে দুরাচারীও **'অনন্যভাক্'** হয়ে অর্থাৎ 'আমি শুধু ভগবানের এবং ভগবান আমারই' এরূপ অনন্যভাবে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, তাহলে তার অহং-এ 'আমি ভগবানের, সংসারের নই' এই ভাব দৃঢ় হয়ে যায়—যা বাস্তবিক সত্য। এইভাবে অহং পরিবর্তিত হলে ক্রিয়াতে যদি যৎকিঞ্চিৎ ত্রুটিও ঘটে তবুও সে অতিশীঘ্র ধর্মাত্মা হয়ে যায়।

এখানে এই সংশয় আসতে পারে যে আগের শ্লোকে ভগবান যাকে **'সুদুরাচারঃ'** বলেছেন এখানে তাকেই 'ধর্মাত্মা' বলেছেন কেন ? এর উত্তর হল যে, দুরাচারীর দুরাচার দূর হলেই সে ব্যক্তি সদাচারী বা ধর্মাত্মাই হয়। তাই তাকে সদাচারীই বলা হোক বা ধর্মাত্মা—একই কথা।

'শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি'—শুধুমাত্র ধর্মযুক্ত কর্ম সম্পাদন করে যারা ধার্মিক হন, তাদের ভোগ ও ঐশ্বর্যের কামনা থাকায় ভোগ ও ঐশ্বর্য প্রাপ্তি হলেও, শাশ্বত শান্তি প্রাপ্তি হয় না। দুরাচারীর অহং-ভাব পরিবর্তিত হলে যখন সে অন্তর থেকে ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যায়, তখন তার ভেতর আর কামনা থাকতে পারে না, অসতের গুরুত্ব থাকতে পারে না। তাই তার অন্তরে নিত্য শান্তি বিরাজ করে।

অপর ভাবটি হল এই যে স্বয়ং পরমাত্মার অংশ হওয়ায় **'চেতন অমল সহজ সুখরাসী'**। তাই তার মধ্যে নিজ স্বরূপের যে স্বতঃসিদ্ধ অনাদি অনন্ত শান্তি থাকে, ধর্মাত্মা হলে অর্থাৎ ভগবানের সঙ্গে অনন্যভাবের সম্বন্ধ হলে সে সেই শাশ্বতী শান্তি লাভ করে। কেবলমাত্র সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ মানার ফলে এটির অনুভব হয়নি।

'কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি'—ভগবান এখানে 'আমার ভক্তের পতন হয় না'—এই প্রতিজ্ঞা নিজে করেননি, অর্জুনকে দিয়ে করিয়েছেন। এটির অভিপ্রায় হল যে, এখন যুদ্ধ শুরু হবে আর ভগবান আগেই প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, তিনি অস্ত্র গ্রহণ করবেন না। কিন্তু পরে ভীষ্ম যখন প্রতিজ্ঞা করেন যে **'আজু জৌ হরিহিঁ ন সস্ত্র গহাউঁ। তৌ লাজৌঁ গঙ্গা-জননীকোঁ শান্তনু সুত ন কহাউঁ**।।' (অর্থাৎ আজ যদি শ্রীকৃষ্ণকে অস্ত্র তুলতে বাধ্য করতে না পারি তাহলে আমি গঙ্গাপুত্র শান্তনু নই) তখন ভগবানের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়, কিন্তু ভক্তের (ভীষ্মের) প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়নি। ভগবান চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে **'ভক্তোঽসি মে সখা চেতি'** বলে অর্জুনকে নিজের ভক্ত স্বীকার করেছেন। তাই ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে, হে ভাই ! তুমি প্রতিজ্ঞা করো, কারণ তুমি প্রতিজ্ঞা করলে আমিও যদি তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করাতে চাই, তাহলেও তা ভাঙতে পারব না, অন্যের কথা আর কী বলব ! তাৎপর্য হল এই যে, ভক্ত যদি প্রতিজ্ঞা করে, তবে তার বিরুদ্ধে আমার প্রতিজ্ঞাও থাকে না।

আমার ভক্তের বিনাশ বা পতন হয় না—এ-কথা বলার তাৎপর্য হল, যখন সে সম্পূর্ণভাবে আমার শরণাগত হয়েছে, তখন তার পতন হওয়ার আর কোনো সম্ভাবনা নেই। পতনের কারণ ছিল শরীরের সঙ্গে নিজসম্পর্ক স্থাপন করা। সেই মেনে-নেওয়া সম্বন্ধ থেকে সর্বতোভাবে বিমুখ হয়ে সে যখন অনন্যভাবে আমার শরণাগত হয়েছে, তবে তার পতনের সম্ভাবনা থাকে কী করে ?

ন্যায় এরূপ বলে যে, দুরাচারীও যদি ভক্ত হয় তাহলে ভক্ত হওয়ার পর সে পুনরায় দুরাচারী হতে পারে। এই ন্যায়ের কথা খণ্ডন করার জন্য ভগবান বলেছেন যে, এই ন্যায় এখানে প্রযোজ্য নয়। অতি দুরাচারী ব্যক্তিও আমার ভক্ত হতে পারে, কিন্তু ভক্ত হলে তার আর পতন

হয় না অর্থাৎ সে দুরাচারী হতে পারে না। এইভাবে ভগবানের ন্যায়েতেও দয়া পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান। অতএব ভগবান ন্যায়কারী এবং দয়ালু—দুই-ই প্রমাণ হয়ে যায়।

পরিশিষ্ট-ভাব—রোগীর যেমন বৈদ্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন হয়, তেমনই মানুষ নিজের অসহায় অবস্থা জেনে যখন ভগবানের সামর্থ্যের ওপর আস্থাবান হয় তখন সে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়। অর্থাৎ মানুষ যখন জাগতিক দুঃখে হতচকিত হয়ে সেই দুঃখ দূর করতে নিজের অসমর্থতা অনুভব করে এবং সঙ্গে সঙ্গে সে বিশ্বাস করে যে সর্বশক্তিমান ভগবানের কৃপায় তার সেই দুর্বলতা দূর হতে পারে, জাগতিক দুঃখ থেকে বাঁচতে পারে, তখন সে তৎক্ষণাৎ 'ভক্ত' হয়ে ওঠে—**'ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা'**। ক্ষুধার্ত মানুষ অন্ন পেলে কি খেতে দেরি করে ?

মানুষ যতক্ষণ নিজের মধ্যে কোনো বল, যোগ্যতা, বিশিষ্টতা দেখতে পায় ততক্ষণ সে **'অনন্যভাক্'** হয় না। সে তখনই **'অনন্যভাক্'** হয়, যখন সে দেখে অন্য কেউই তার দুঃখ দূর করতে সক্ষম নয়। **'অনন্যভাক্'** হলেই সে ধর্মাত্মা অর্থাৎ ভগবানের ভক্ত হয়ে যায় ।

ভক্তের কখনো পতন হয় না, কারণ সে ভগবদ্‌নিষ্ঠ হয় অর্থাৎ তার সাধন ও সাধ্য ভগবানই হয়ে থাকেন, তার নিজের কোনো শক্তি থাকে না, ভগবানের বলই তার শক্তি হয়। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, ভক্তের যদি পতন না হয় তাহলে ভগবান অষ্টাদশ অধ্যায়ে অর্জুনকে **'অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি'** (১৮।৫৮) 'তুমি যদি অহঙ্কারবশতঃ আমার কথা না শোন তাহলে তোমার পতন হবে'—একথা কেন বলেছিলেন ? কেন-না ভগবান অর্জুনকে তাঁর ভক্ত বলে স্বীকার করেছেন—**'ভক্তোঽসি মে সখা চেতি'** (গীতা ৪।৩)। এর উত্তর হল ভক্তের পতন তখনই হওয়া সম্ভব যখন সে ভগবানে শরণাগতি ত্যাগ করে অহঙ্কারের আশ্রয় গ্রহণ করে—**'অহঙ্কারান্ ন শ্রোষ্যসি'**। ভগবানের আশ্রয়ে থাকলে তার কখনো পতন হয় না।

ভক্ত ভগবানের কাছে অল্পবয়স্ক শিশুর মতো, আর জ্ঞানী হচ্ছে বয়স্ক বালকের মতো। মার কাছে ছোট বড় সকল পুত্র সমান হলেও, মাকে ছোট সন্তানকে যত দেখাশোনা করতে হয়, বড়কে তত নয়। কেন-না ছোট পুত্র সর্বদা মায়ের আশ্রয়েই থাকে, তাই তাকে দেখাশোনা করার যত প্রয়োজন হয়, বড়র জন্য তত প্রয়োজন হয় না। তেমনই ভগবান তাঁর আশ্রিত ভক্তকে সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করেন এবং স্বয়ং তার যোগক্ষেম বহন করেন (গীতা ৯।২২)। কিন্তু জ্ঞানীর যোগক্ষেম কে বহন করবে ? তাই জ্ঞানের সাধক যোগভ্রষ্ট হলেও ভক্ত কখনো যোগভ্রষ্ট হন না।

ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতা ভগবানকে বলেছেন—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।২।৩২)

'হে কমলনয়ন ! যারা আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করে না এবং আপনার ভক্তিবর্জিত হওয়ার জন্য যাদের বুদ্ধিও শুদ্ধ নয়, তারা নিজেদের যতই মুক্ত মনে করুক, আসলে তারা বদ্ধই হয়ে থাকে।'

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্ ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপমূর্ধসু প্রভো॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।২।৩৩)

'কিন্তু ভগবান ! যাঁরা আপনার ভক্ত, যাঁরা আপনার শ্রীচরণে সত্যকার প্রীতি উজাড় করে দিয়েছেন, তাঁরা কখনো জ্ঞানাভিমানীদের মতো নিজ সাধন থেকে বিচ্যুত হন না। আপনি এঁদের সুরক্ষা দেওয়ায় এঁরা বড় বড় বিঘ্ন প্রদানকারী সৈনিকদের সর্দারের মাথায় পা দিয়ে নির্ভয়ে বিচরণ করতে পারেন, কোনো বিঘ্নই তাঁদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না।'

ভগবানের স্তুতি করে বেদ জানাচ্ছেন—

জে জ্ঞান মান বিমত্ত তব ভব হরনি ভক্তি ন আদরী।
তে পাই সুর দুর্লভ পদাদপি পরত হম দেখত হরী॥
বিশ্বাস করি সব আস পরিহরি দাস তব জে হোই রহে।
জপি নাম তব বিনু শ্রম তরহিঁ ভব নাথ সো সমরামহে॥ (শ্রীরামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ১৩।৩)

জ্ঞানযোগের সাধকদের মধ্যে কিছু ন্যূনতা থাকলে তাদের পতন হতে পারে, কিন্তু ভক্তিযোগের সাধকদের মধ্যে কোনো কিছুর ন্যূনতা থাকলেও তাঁদের পতন হয় না। তাই ভগবান বলেছেন—

বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ। প্রায়ঃ প্রগল্‌ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৪।১৮)

'হে উদ্ধব ! আমার যেসব ভক্ত এখনও জিতেন্দ্রিয় হতে পারেনি এবং সাংসারিক বিষয়ে বারংবার বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং সেদিকেই আকৃষ্ট হয়, তা সত্ত্বেও তারা প্রতিমুহূর্তে বর্ধনশীল আমার ভক্তির প্রভাবে প্রায়শঃই বিষয়াদির কাছে পরাজিত হয় না।'

'ন বাসুদেবভক্তানামশুভং বিদ্যতে ক্বচিৎ।' (মহাভারত, অনুশাসনপর্ব ১৪৯।১৩১)

'ভগবদ্‌ভক্তের কোথাও কখনো অশুভ হতে পারে না।'

'সীম কি চাঁপি সকই কোউ তাসু। বড় রখবার রমাপতি জাসু॥' (শ্রীরামচরিতমানস, বালকাণ্ড ১২৬।৪)

'কৌন্তেয় প্রতিজানীহি'—ভগবান অর্জুনকে প্রতিজ্ঞা করতে বলছেন, কারণ ভক্তের প্রতিজ্ঞা ভগবানও এড়াতে পারেন না। ভক্তি হল ভগবানের দুর্বলতা। তাই ভগবান দুর্বাসাকে বলেছেন—

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ। সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ৯।৪।৬৩)

'হে দ্বিজ ! আমি সর্বতোভাবে ভক্তের অধীন, স্বাধীন নই। ভক্তগণ আমার অত্যন্ত প্রিয়। আমার হৃদয়ের ওপর ওদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে।'

'কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি'— সাধকদের এই পদে উধৃত কথায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিত যে তাঁদের কখনো পতন হতে পারে না, কারণ তাঁরা ভগবানেরই।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—এই প্রকরণে ভগবান তাঁর ভক্তির সাত প্রকার অধিকারীর কথা জানিয়েছেন। তার মধ্যে দুটি শ্লোকে দুরাচারীর বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী শ্লোকে চারপ্রকার ভক্তির অধিকারীর কথা জানাচ্ছেন।

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥ ৩২ ॥

[**পার্থ** (হে পার্থ!) ; **যে** (যারা) ; **অপি** (ও) ; **পাপযোনয়ঃ** (পাপযোনিসম্ভূত) ; **স্যুঃ** (অথবা) ; **স্ত্রিয়ঃ** (স্ত্রীজাতি) ; **বৈশ্যাঃ** (বৈশ্য) ; **তথা** (এবং) ; **শূদ্রাঃ** (শূদ্র) ; **তে, অপি** (তাঁরাও) ; **মামব্যপাশ্রিত্য** (সর্বতোভাবে আমার শরণ গ্রহণ করে) ; **হি** (নিঃসন্দেহে) ; **পরাম্** (পরম) ; **গতিম্** (গতি) ; **যান্তি** (প্রাপ্ত হন।)]

হে পৃথানন্দন ! যারা পাপযোনিসম্ভূত অথবা স্ত্রীজাতি, বৈশ্য ও শূদ্র, তারাও সর্বতোভাবে আমার শরণ গ্রহণ করে নিঃসন্দেহে পরমগতি প্রাপ্ত হয় ॥ ৩২ ॥

ব্যাখ্যা—**'মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য......যান্তি পরাং গতিম্'**—এই জন্মে যার আচরণ মন্দ অর্থাৎ যে এই জন্মে পাপী, তাকে ভগবান ত্রিশতম শ্লোকে 'দুরাচারী' বলে চিহ্নিত করেছেন। যাদের পূর্বজন্মের আচরণ খারাপ অর্থাৎ যারা পূর্বজন্মের পাপী এবং সেই পুরাতন পাপের ফল ভোগ করার জন্যই নীচ বংশে জন্মগ্রহণ করে, তাদের ভগবান এখানে 'পাপযোনি' বলে জানিয়েছেন।

'পাপযোনি' শব্দটি এখানে এত ব্যাপক যে, অসুর-রাক্ষস-পশু-পাখি ইত্যাদি সবকিছুকেই এর অন্তর্গত বলে ধরা সম্ভব[১] এবং এদের সকলকেই ভগবদ্‌ভক্তির

[১] কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যো গাবো নগা মৃগাঃ। যেঽন্যে মূঢ়ধিয়ো নাগাঃ সিদ্ধা মামীয়ুরঞ্জসা॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১২।৮)
'গোপিনীগণ, গাভী, বৃক্ষ, পশু, নাগ এবং এইপ্রকার আরও মূঢ়বুদ্ধি প্রাণীরা অনন্যভাবে সিদ্ধ হয়ে অনায়াসে আমাকে লাভ করেছে।'

অধিকারী বলে মানা হয়। মহর্ষি শাণ্ডিল্য বলেছেন— **'আনিন্দ্যয়োন্যধিক্রিয়তে পারম্পর্যাৎ সামান্যবৎ'**। (শাণ্ডিল্য ভক্তিসূত্র ৭৮) অর্থাৎ মানুষ যেমন দয়া, ক্ষমা, উদারতা ইত্যাদি সাধারণ ধর্মের অধিকারী হয়, তেমনই, নীচ হতে নীচ এবং উচ্চ থেকে উচ্চতর যোনিসম্ভূত সমস্ত প্রাণীই ভগবদ্‌ভক্তির অধিকারী। তার কারণ হল, জীবমাত্রই ভগবানের অংশ হওয়ায় ভগবানের পথে অগ্রসর হওয়ার, ভগবানকে ভক্তি করার ও ভগবানের শরণাগত হওয়ার অনধিকারী নয়। প্রাণীদের সাংসারিক কাজে যোগ্যতা-অযোগ্যতা থাকে, কেন-না এই যোগ্যতাসমূহ বাহ্য এবং তা প্রাপ্ত করা হয়েছে, এবং এগুলি ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করায় যোগ্যতা বা অযোগ্যতা কোনো বাধক নয় অর্থাৎ যার যোগ্যতা নেই সে ভগবানে আকৃষ্ট হবে না—তেমন কোনো নিয়ম নেই। প্রাণী স্বয়ং ভগবানেরই ; সুতরাং সকলেই ভগবানের শরণাগত হতে পারে। এর তাৎপর্য হল এই যে, যারা হৃদয় থেকে ভগবানকে চায়, তারা সকলেই ভগবদ্‌ভক্তির অধিকারী। এইভাবে পাপযোনিসম্ভূত ব্যক্তিরাও ভগবানের শরণাগত হয়ে পরমগতি প্রাপ্ত হয়, পরম পবিত্র হয়।

লৌকিক দৃষ্টিতে আচরণভ্রষ্ট হলে অপবিত্রতা আসে বলে মনে করা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যা কিছু অপবিত্রতা আসে, তা ভগবান থেকে বিমুখ হওয়াতেই হয়। যেমন কয়লা অগ্নিতে রাখলে তা উদ্ভাসিত হয় কিন্তু সেখান থেকে সরালে তা পুনরায় কালো হয়ে যায়। এবার যতই সাবান লাগানো হোক, তার কালো-ভাব কিছুতেই দূর হয় না। কিন্তু তাকে পুনরায় আগুনে সমর্পণ করলে তার কালো রং দূর হয়ে যায় এবং তাতে ঔজ্জ্বল্য দেখা দেয়। তেমনই ভগবানের অংশ এই জীব যখনই ভগবানে বিমুখ হয় তখনই তার মধ্যে কালোত্ব অর্থাৎ অপবিত্রতা দেখা দেয়, কিন্তু যখনই সে ভগবানের সম্মুখীন হয়, তখনই তার অপবিত্রতা চিরতরে দূর হয় এবং সে মহাপবিত্র হয়ে ওঠে অর্থাৎ দুনিয়াতে তাঁর বৈশিষ্ট্য ছড়িয়ে পড়ে। তার মধ্যে এমন পবিত্রতা আসে যে ভগবানও তাকে নিজের মুকুটের মণি করে নেন।

আর্ত হয়ে প্রভুকে যখন ডাকা হয়, সেই ডাকে ভগবানকে দ্রবীভূত করার যে শক্তি, তা শুদ্ধ আচরণের জোরে হয় না। যেমন, মায়ের একটি ছেলে ভালো কাজ করে, মা তাকে ভালোবাসেন, আর একটি ছেলে কোনো কাজ করে না, আর্ত হয়ে মাকে ডাকে, কাঁদে ; তখন মা এই চিন্তা করেন না যে, এতো কোনো কাজ করে না, একে কেন কোলে নেব ? তিনি তার কান্না সহ্য করতে না পেরে চট্ করে তাকে কোলে তুলে নেন। এরূপ অত্যন্ত বদ্ আচরণযুক্ত পাপী ব্যক্তিও যদি আর্ত হয়ে ভগবানকে ডাকে, কাঁদে, তাহলে ভগবান তাকে নিজ ক্রোড়ে স্থান দেন, ভালোবাসেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ভগবানের শরণাগত হওয়ায় ইহজন্মের পাপ যখন অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে না তখন পুরানো পাপ কী করে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে ? পুরানো পাপের ফল-জন্ম এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিরূপেই থাকে ; ভগবানের শরণাগতির পথে তা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না।

এখানে **'স্ত্রিয়ঃ'** পদটি ব্যবহারের তাৎপর্য হল যে, যে কোনো বর্ণ, আশ্রম, দেশ বা বেশ-ভূষার নারীই হন না কেন, তাঁরা সকলেই আমার শরণাগত হয়ে পরম পবিত্র হয়ে ওঠেন এবং পরম গতি প্রাপ্ত হন। যেমন, প্রাচীন-কালের দেবহূতি, শবরী, কুন্তী, দ্রৌপদী, ব্রজগোপিনীগণ এবং এখনকার সময়ের মীরা, করমাবাঈ, ফুলীবাঈ প্রমুখ নারী ভগবানের ভক্ত হয়েছেন। তেমনই বৈশ্যদের মধ্যে সমাধি, তুলাধার আদি ও শূদ্রদের মধ্যে বিদুর, সঞ্জয়, নিষাদরাজ গুহক প্রমুখ অনেকেই ভগবানের ভক্ত হয়েছেন। তাৎপর্য হল এই যে পাপজন্ম, নারী, বৈশ্য এবং শূদ্র—এঁরা সকলেই ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করে পরমগতি প্রাপ্ত হন।

বিশেষ কথা

এই শ্লোকে **'পাপযোনয়ঃ'** পদটি স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত হয়েছে। এই পদটিকে নারীজাতি, বৈশ্যজাতি বা শূদ্রজাতির বিশেষণ রূপে মানা যায় না। কেন-না এরূপ ধরা হলে অসংগতি দেখা দেয়। নারীজাতিও চার বর্ণের হয়। তার মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য জাতির নারীরা তাঁদের স্বামীর সঙ্গে যজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম করার অধিকারী। তাহলে নারীদের পাপযোনি কী করে বলা যায় ? অর্থাৎ তা বলা যায় না। চতুর্বর্ণের অন্তর্গত হলেও ভগবান পৃথক্‌ভাবে নারীদের কথা উল্লেখ করেছেন। তার অর্থ হল নারীগণ যে স্বামীর সঙ্গেই আমার শরণ গ্রহণ করবেন বা আমার পথে অগ্রসর হবেন—তেমন কোনো নিয়ম নেই। নারীগণ স্বাধীনভাবে আমার আশ্রয় গ্রহণ করে পরমগতি প্রাপ্ত হতে সক্ষম। তাই নারীগণের কোনো ব্যক্তির কিছুমাত্র আশ্রয় না রেখে অন্তর

থেকে কেবল আমারই আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত।

এই **'পাপযোনয়ঃ'** পদটিকে যদি বৈশ্যদের বিশেষণ বলে মনে করা হয় তবে সেটিও যুক্তিসঙ্গত হয় না। কারণ শ্রুতি অনুসারে বৈশ্যদের পাপযোনিসম্ভূত বলে মনে করা হয় না[১]। বৈশ্যদের বেদপাঠের এবং যজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম করার পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়েছে।

'পাপযোনয়ঃ' পদটিকে শূদ্রদের বিশেষণ বলে মনে করাও যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ শূদ্রগণ চারবর্ণের অন্তর্গত। সুতরাং চতুর্বর্ণের অতিরিক্ত অর্থাৎ শূদ্রাদির থেকে যে হীন জাতি—যবন, হূণ, খস প্রভৃতিরা আছে, এখানে **'পাপযোনয়ঃ'** পদের দ্বারা তাদেরই ধরতে হবে।

মাতৃক্রোড়ে যেতে যেমন কোনো শিশুরই বাধা নেই, কারণ শিশুরা মায়েরই সন্তান, তেমনই ভগবানের অংশসম্ভূত হওয়ায় প্রাণীমাত্রেরই ভগবানের দিকে অগ্রসর হওয়াতে (ভগবানের দিক থেকে) কোনো বাধা নেই। পশু-পক্ষী-বৃক্ষ-লতা ইত্যাদিতে ভগবানের দিকে অগ্রসর হওয়ার বুদ্ধি বা যোগ্যতা নেই, তা সত্ত্বেও পূর্বজন্মের সংস্কারবশতঃ বা অন্য কোনো কারণে তারা ভগবানের শরণাগত হতে পারে। তাই এখানে **'পাপযোনয়ঃ'** পদে পশু-পক্ষী ইত্যাদিকেও ব্যতিক্রম রূপে ধরা যেতে পারে। পশু-পক্ষীদের মধ্যে গজেন্দ্র, জটায়ু প্রভৃতি ভগবদ্‌ভক্ত হয়েছেন।

মর্মার্থ

ভগবানের পথে অগ্রসর হওয়াতে ভাবেরই প্রাধান্য থাকে, বংশের নয়। যার চিত্তে বংশের প্রাধান্য থাকে, তার ভাবের প্রাধান্য থাকে না এবং তার মধ্যে ভগবদ্‌ভক্তিও থাকে না। কারণ যারা বংশকে প্রাধান্য দেয় তাদের **'অহম্'**-এ শরীরের সম্বন্ধই প্রধানভাবে থাকে, যা ভগবানে আকৃষ্ট হতে দেয় না অর্থাৎ শরীর ভগবানের ভক্ত হয় না এবং ভক্ত শরীর হয় না, আসলে স্বয়ং-ই ভক্ত হয়। এইভাবে জীব ব্রহ্মকে লাভ করতে পারে না। কিন্তু ব্রহ্মই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ব্রহ্মে জীবভাব হয় না এবং জীবভাবে ব্রহ্মভাব হয় না। প্রাণের জন্য জীব সংজ্ঞা হয় আর ব্রহ্মে প্রাণ হয় না। তাই ব্রহ্মই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ জীবভাব দূর হয়েই ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়—**'ব্রহ্মৈব সন ব্রহ্মাপ্যেতি'** (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৪।৪।৬)।

স্বয়ং-এ দেহাভিমান থাকে না। স্বয়ং-এ যেখানে শরীরের অভিমান থাকে, সেখানে 'আমি দেহ থেকে পৃথক্' এই বিবেক থাকে না, সে তখন অস্থি-মজ্জা, মল-মূত্র সৃষ্টিকারী এক যন্ত্রের দাস (চাকর) হয়ে থাকে। একেই বলা হয় অবিবেক, অজ্ঞান। এই অবিবেকের প্রাধান্য হলে মানুষ ভক্তিমার্গেও যেতে পারে না, জ্ঞানমার্গেও যেতে পারে না। সুতরাং শরীরকে নিয়ে যে আচার-ব্যবহার, তা লৌকিক মর্যাদা রক্ষার জন্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং ওই মর্যাদা অনুসারেই চলা উচিত। কিন্তু ভগবানের দিকে অগ্রসর হতে গেলে স্বয়ং-এর প্রাধান্য থাকে, শরীরের নয়।

এর তাৎপর্য হল যে, ভক্তি বা মুক্তি চায় সে স্বয়ং, শরীর নয়, যদিও তাদাত্ম্যর জন্য স্বয়ং দেহ ধারণ করে থাকে। কিন্তু স্বয়ং কখনো শরীর হতে পারে না এবং শরীর কখনো স্বয়ং হতে পারে না। স্বয়ং স্বয়ং-ই আর শরীর শরীর-ই। পরমাত্মার সঙ্গে স্বয়ং-এর ঐক্য থাকে আর শরীরের ঐক্য থাকে সংসারের সঙ্গে। যতক্ষণ শরীরের সঙ্গে তাদাত্ম্য থাকে, ততক্ষণ সে না হয় ভক্তির অধিকারী, না হয় জ্ঞানের অধিকারী এবং সে সমস্ত সংশয়ের সমাধানও করতে পারে না। এই শরীরের তাদাত্ম্য দূর হয়—ভাবের সাহায্যে। মানুষের ভাব যখন ভগবানের প্রতি হয়, তখন শরীর ইত্যাদির দিকে তার বৃত্তি যায় না। তখন সে ভগবানে একাগ্র হয় এবং তার শরীরের তাদাত্ম্য দূর হয়। তাই তাকে আর চিন্তা-ভাবনা করতে হয় না এবং তার মনে বর্ণ-আশ্রম ইত্যাদির কোনো প্রকার প্রশ্ন জাগে না। এইরূপ বিবেক দ্বারাও তাদাত্ম্য দূর হয়। তাদাত্ম্য দূর হলে তার মধ্যেও বর্ণ বা আশ্রম নিয়ে কোনো অভিমান থাকে না। কারণ স্বয়ং-এ কোনো বর্ণ-আশ্রম নেই, স্বয়ং বর্ণ, আশ্রমের অতীত।

---

[১]তদ্য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বাথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরঞ্শ্বযোনিং বা সূকরযোনিং বা চাণ্ডালযোনিং বা॥
(ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৫।১০।৭)

অর্থাৎ যাঁরা সুআচরণ করে থাকেন তাঁরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকুলে জন্ম নেন ; আর নীচ আচরণ যারা করে তারা কুকুর, শূকর বা চণ্ডাল যোনিতে জন্ম নেয়।

পরিশিষ্ট-ভাব—যার মধ্যে অন্যের আশ্রয় নেই, সেরূপ অনন্য আশ্রয়কে এখানে **'ব্যাপাশ্রয়'** বা বিশেষ আশ্রয় বলা হয়েছে।

পূর্বজন্মের পাপীদের থেকে বর্তমানের পাপীরা বিশেষভাবে দোষী, তাই প্রথমে (৯।৩০-৩১এ) বর্তমান (ইহ জন্মের) পাপীদের কথা বলে এবার এই শ্লোকে পূর্বজন্মের পাপীদের কথা বলেছেন—**'যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ'**।

***

সম্বন্ধ—পরবর্তী শ্লোকে ভক্তির বাকি দুই অধিকারীর বর্ণনা করেছেন।

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥ ৩৩ ॥

[**পুণ্যাঃ** (পবিত্র আচরণকারী) ; **ব্রাহ্মণাঃ** (ব্রাহ্মণ) ; **তথা** (এবং) ; **রাজর্ষয়ঃ** (ঋষিকল্প ক্ষত্রিয়) ; **ভক্তাঃ** (ভগবানের ভক্ত) ; **কিম্, পুনঃ** (তাতে আর বলার কী আছে ?) ; **ইমম্** (অতএব) ; **অনিত্যম্** (অনিত্য) ; **অসুখম্** (সুখশূন্য) ; **লোকম্** (দেহকে) ; **প্রাপ্য** (লাভ করে) ; **মাম্** (আমাকে) ; **ভজস্ব** (ভজনা করো।)]

পবিত্র আচরণকারী ব্রাহ্মণ এবং ঋষিকল্প ক্ষত্রিয় ভগবানের ভক্ত হলে পরমগতি প্রাপ্ত হবেন, তাতে আর বলার কী আছে ? অতএব তুমি এই অনিত্য ও সুখশূন্য দেহ লাভ করে আমাকে ভজনা করো ॥ ৩৩ ॥

ব্যাখ্যা—'কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা[১] **রাজর্ষয়স্তথা'**—যখন বর্তমানে পাপাচরণকারী সর্বতোভাবে দুরাচারী এবং পূর্বজন্মের পাপের কারণে নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণকারী প্রাণী তথা নারী, বৈশ্য, শূদ্রগণ আমার শরণাগত হয়ে আমার আশ্রয় গ্রহণ করে পরমগতি প্রাপ্ত হয়, পরম পবিত্র হয়ে যায় ; তখন যাদের পূর্বজন্মের আচরণ ভালো ছিল এবং ইহজন্মে উত্তম কুলে জন্ম হয়েছে, এরূপ পবিত্র ব্রাহ্মণ ও পবিত্র ক্ষত্রিয় যদি আমার শরণাগত হয়, আমার ভক্ত হয়—তবে তারা যে পরমগতি প্রাপ্ত হবে, তাতে আর বলার কী থাকে ? অর্থাৎ নিঃসন্দেহে তারা পরমগতি প্রাপ্ত হবে।

আগে ত্রিশতম শ্লোকে যাদের দুরাচারী বলা হয়েছে, তাদের বিপরীতে **'পুণ্যাঃ'** পদটি ব্যবহৃত হয়েছে আর বত্রিশতম শ্লোকে যাদের **'পাপাযোনয়ঃ'** বলা হয়েছে, তাদের বিপরীতে **'ব্রাহ্মণাঃ'** পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর তাৎপর্য হল এই যে, ব্রাহ্মণেরা সদাচারী এবং বংশেও শুদ্ধ। তেমনই ইহজন্মে যারা শুদ্ধ আচরণকারী ক্ষত্রিয়, তাদের বর্তমানের শুদ্ধতা জ্ঞাপন করতে **'ঋষি'** শব্দ উল্লিখিত হয়েছে এবং তাদের জন্মারম্ভক কর্মও শুদ্ধ—তা জানাতে **'রাজন্'** শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

পবিত্র ব্রাহ্মণ এবং ঋষিকল্প ক্ষত্রিয়—এই দুইয়ের মাঝে **'ভক্তাঃ'** পদ ব্যবহারের তাৎপর্য এই যে, তাদের পূর্বজন্মের আচরণও শুদ্ধ এবং ইহজন্মেও সর্বভাবে পবিত্র, তারা (ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়) যদি ভগবানকে ভক্তি করে, তাহলে তাদের উদ্ধারে আর সন্দেহের কী আছে ?

'পুণ্যা ব্রাহ্মণাঃ', 'রাজর্ষয়ঃ' এবং **'ভক্তাঃ'**—এই তিনটি কথা বলার অর্থ হল এই যে, ইহজন্মের আচরণে পবিত্র এবং পূর্বজন্মের শুদ্ধ আচরণের জন্য ইহজন্মে উচ্চকুলে জন্ম হওয়াতে পবিত্র—এই দুটিই বাহ্যবস্তু। কারণ কর্মমাত্রই বাইরে থেকে (মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদি এবং শরীরের সংযোগে) হয়ে থাকে। তাই সেগুলি থেকে যে পবিত্রতা হয়, তা বাহ্যই হয়। এই বাহ্য শুদ্ধির বাচক হিসাবেই এখানে **'পুণ্যা ব্রাহ্মণাঃ'** এবং **'রাজর্ষয়'**—পদ দুটি ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু যারা অন্তর থেকে স্বয়ং ভগবানের শরণাগত হয়, তাদের জন্যই অর্থাৎ স্বয়ং-এর জন্য এখানে **'ভক্তাঃ'** পদটি উদ্ধৃত হয়েছে।

'অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্'— এই মনুষ্যজন্ম অনন্ত জন্মের অবসানকারী হওয়ায় এটি হল অন্তিম জন্ম। এই জন্মে মানুষ ভগবানের শরণাগত হয়ে ভগবানকেও সুখ প্রদান করতে সক্ষম হয়। সুতরাং মনুষ্যজন্ম অবশ্যই পবিত্র তবে অনিত্য—**'অনিত্যম্'** অর্থাৎ নিত্যস্থায়ী নয়। কখন যে দেহত্যাগ হবে, তার

[১]এখানে 'ভক্তাঃ' পদটি দেহলী-দীপক-ন্যায় অনুসারে ব্রাহ্মণ এবং রাজর্ষি (ক্ষত্রিয়)—দুই-এর জন্য উদ্ধৃত হয়েছে।

ঠিক নেই। সেইজন্য যতশীঘ্র সম্ভব নিজের উদ্ধারের চেষ্টা করা উচিত।

মনুষ্যদেহে সুখও নেই—**'অসুখম্'**। অষ্টম অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে ভগবান মনুষ্যজন্মকে দুঃখালয় বলে জানিয়েছেন। তাই মনুষ্যদেহ লাভ করে সুখভোগ করার আকাঙ্ক্ষা করা উচিত নয়। এই আশা-আকাঙ্ক্ষায় এবং সুখভোগে নিজের ভাব ও সময় নষ্ট করা উচিত নয়।

এখানে **'ইমং লোকম্'** পদটি মনুষ্যশরীরের বাচক, যা কেবল ভগবদ্প্রাপ্তির জন্যই লাভ হয়েছে। মনুষ্যদেহ পাবার পর কোনো পূর্বকর্মের জন্য ভবিষ্যতে এই জীবের আবার জন্ম হবে—ভগবান এমন কোনো নিয়ম সৃষ্টি করেননি, তাঁকে প্রাপ্তির জন্যই তিনি কেবল এই অন্তিম জন্ম প্রদান করেছেন। ইহজন্মে যদি ভগবদ্প্রাপ্তি, নিজ উদ্ধার করা না হয়, তাহলে অন্য দেহে এই সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। তাই ভগবান বলেছেন, মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হয়ে কেবল আমারই ভজনা করো। মানুষের মধ্যে যা কিছু বিশেষত্ব আসে, তা সবই আমার ভজনা করলে হয়।

'মাং ভজস্ব' পদটিতে ভগবানের তাৎপর্য এই নয় যে ভগবানকে ভজনা করলে তাঁর কিছু লাভ হবে, বরং তোমারই মহালাভ হবে[১]। অতএব তুমি তৎপরতার সঙ্গে আমারই ভজনা করো, আমাকেই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য করে থাক। আমার বিধানে সাংসারিক বস্তুর আনাগোনা স্বতঃই হতে থাকবে, কিন্তু তুমি নিজে উৎপত্তি-বিনাশশীল পদার্থের দিকে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য রেখো না, সেগুলির দিকে দৃষ্টি দিয়ো না, গুরুত্ব দিয়ো না। সেগুলি থেকে বিমুখ হয়ে তুমি শুধু আমার শরণাগত হও।

মর্মার্থ

মায়ের দৃষ্টি যেমন সন্তানের শরীরের দিকে থাকে, তেমনই ভগবান এবং তাঁর ভক্তদের দৃষ্টি প্রাণীদের স্বরূপের দিকে থাকে। সেই স্বরূপ ভগবানের অংশোদ্ভূত হওয়ায় শুদ্ধ, চেতন এবং অবিনাশী। কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে মানুষ নানারূপ আচরণসম্পন্ন হয়। উনত্রিশতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে আমি সকল প্রাণীতে সমভাবাপন্ন, কোনো প্রাণীতেই আমার কোনো অনুরাগ বা দ্বেষ নেই। আমার সিদ্ধান্ত থেকে, আমার নিয়ম এবং রীতি থেকে সর্বতোভাবে বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন অত্যন্ত দুরাচারী ব্যক্তিও যখন আমাকে আপন ভেবে আমার ভজনা করে, তখন তার প্রকৃত স্বরূপের দিকে দৃষ্টি রেখে আমি তাকে কীভাবে পাপী বলে মনে করব ? তা মনে করতে পারি না। তাহলে তার পবিত্র হওয়াতেই বা কীসের বিলম্ব ? কোনো বিলম্ব হতে পারে না, কারণ আমার অংশোদ্ভূত হওয়ায় সে সর্বতোভাবে পবিত্র। শুধুমাত্র উৎপন্ন এবং বিনাশশীল আগন্তুক দোষের জন্য তার স্ব-স্বরূপ দোষী হতে পারে না। আর আমি তাকে দোষী বলে কী করে মনে করব ? সে শুধুমাত্র উৎপত্তি ও বিনাশশীল শরীরাদির সঙ্গে 'আমি' ও 'আমার' ভাব করার জন্য মায়ার পরবশ হয়ে দুরাচারী ও পাপাচারী হয়ে উঠলেও, কিন্তু আসলে সে তো আমারই অংশ। তেমনই যারা পাপযোনিসম্ভূত অর্থাৎ পূর্ব পাপবশতঃ যাদের চণ্ডাল ইত্যাদি নীচযোনিতে এবং পশু-পক্ষী ইত্যাদি তির্যক যোনিতে জন্ম হয়েছে, তারা নিজেদের পূর্ব পাপের ফল ভোগ করে তা থেকে মুক্ত হতে থাকে। সুতরাং এরূপ পাপযোনিসম্ভূত প্রাণীও আমার শরণাগত হয়ে যদি আমাকে স্মরণ করে, তাহলে তারাও উদ্ধার প্রাপ্ত হয়। এইভাবে ভগবান বর্তমানের পাপী এবং পূর্বজন্মের পাপী—এই উভয় শ্রেণীর পাপীদের বর্ণনা করেছেন।

এর পরে ভগবান মধ্যম শ্রেণীর মানুষদের কথা বর্ণনা করেছেন। প্রথমে **'স্ত্রিয়ঃ'** পদটির দ্বারা নারীজাতির কথা বলছেন। এর মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় জাতির নারীদের কথাও বলা হয়েছে, যাঁরা বৈশ্যদেরও বন্দনীয়া। তাই তাঁদের কথা প্রথমে বলা হয়েছে। যারা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের ন্যায় পুণ্যাত্মা না হলেও দ্বিজাতিভুক্ত, তাঁদের 'বৈশ্য' বলা হয়। যারা দ্বিজাতি নয় অর্থাৎ বৈশ্যদের ন্যায় পবিত্র নয়, তাদের 'শূদ্র' বলা হয়। এই নারী, বৈশ্য এবং শূদ্রগণও আমার আশ্রয় গ্রহণ করে পরমগতি প্রাপ্ত হয়। যারা উচ্চশ্রেণীর মানুষ অর্থাৎ পূর্বজন্মে সুআচরণ করায় এবং এই জন্মে উচ্চবংশে জন্ম নেওয়ায় পবিত্র, সেরূপ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ও আমার শরণ গ্রহণ করে পরম গতি প্রাপ্ত হবে, এতে আর সন্দেহ কীসের ?

ভগবান এখানে (৯।৩০-৩৩-এ) ভক্তিপথের সাত

[১]এই ভাব নিয়ে ভগবান এখানে আত্মনেপদী 'ভজস্ব' ক্রিয়াটি ব্যবহার করেছেন।

অধিকারীর নাম করেছেন—দুরাচারী, পাপযোনি, নারীজাতি, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়। এই সাত অধিকারীর মধ্যে সর্বপ্রথম ভগবানের শ্রেষ্ঠ অধিকারীর অর্থাৎ পবিত্র ভক্ত ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের কথা বলা উচিত ছিল। কিন্তু ভগবান সর্বপ্রথম দুরাচারীদের কথা বলেছেন। তার কারণ এই যে, ভক্তিতে যে যত ছোট এবং অহংভাব বর্জিত হয়, ভগবানের সে ততই প্রিয় হয়। দুরাচারীদের ভালোত্বের, সদ্‌গুণ-সদাচারের অহংকার থাকে না, তাই তাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুদ্রভাব ও দীনভাব থাকে। তাই ভগবান প্রথমেই তাদের কথা বলেছেন। এইজন্যই দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবান সিদ্ধ ভক্তদের প্রিয় এবং সাধক ভক্তদের অত্যন্ত প্রিয় বলেছেন (১২।১৩-২০)।

এখন এই ব্যাপারে একটি লক্ষ্য করার বিষয় হল এই যে, ভগবান এখানে ভক্তির যে সাত প্রকারের অধিকারীর কথা জানিয়েছেন, তাদের বিভাগ বর্ণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র), আচরণ (দুরাচারী ও পাপযোনি), এবং ব্যক্তিত্ব (নারীজাতি) নিয়েই করেছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বর্ণ (জন্ম), আচরণ ও ব্যক্তিত্বের জন্য ভগবানের ভক্তিতে কোনো অন্তরায়ের সৃষ্টি হয় না, কারণ এই তিনটিই শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত । কিন্তু ভগবানের সম্পর্ক স্বরূপের সঙ্গে, শরীরের সঙ্গে নয়। স্বরূপতঃ সকলেই ভগবানের অংশ। তাই তারা যখন ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, তাঁর সম্মুখীন হয়ে তাঁকে ভজনা করে, তখন তাদের উদ্ধারে কোথাও কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। ভগবানের অংশ হওয়ায় তারা পবিত্র ও উদ্ধারপ্রাপ্ত স্বরূপই থাকে। তাৎপর্য এই যে ভক্তির সাত অধিকারীর মধ্যে যা কিছু বিশেষত্ব আছে, তা কোনো বর্ণ, আশ্রম, ভাব, আচরণ ইত্যাদি ধরে আসে না, তা আসে ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ থেকে, ভগবদ্‌ভক্তি থেকে।

সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান ভাব অনুযায়ী চারপ্রকার ভক্তের কথা জানিয়েছেন (৭।১৬)। আর এখানে বর্ণ, আচরণ এবং ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী সাতপ্রকার ভক্তির অধিকারীর কথা জানিয়েছেন। এর তাৎপর্য হল যে ভাব অনুযায়ী ভক্তদের মধ্যে বিভিন্নতা থাকে, কিন্তু বর্ণ, আচরণ ইত্যাদির জন্য কোনো বিভিন্নতা থাকে না অর্থাৎ সকলেই ভক্তির অধিকারী। তবে কেউ যদি ভগবানকে না চায় বা না মানে—সে কথা আলাদা, কিন্তু ভগবানের দিক থেকে কেউই ভক্তির অনধিকারী নয়।

মানুষমাত্রেই ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে, কেন-না মানুষই ভগবানের প্রতি বিমুখ হয়েছে, ভগবান কখনো কোনো মানুষের প্রতি বিমুখ নন। তাই ভগবদ্‌বিমুখ সকল মানুষই ভগবানের সম্মুখীন হওয়াতে, ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে, ভগবানে শরণাগত হওয়াতে সম্পূর্ণ স্বাধীন, সমর্থ, যোগ্য এবং অধিকারী। অতএব ভগবানের দিকে অগ্রসর হতে কারও বিন্দুমাত্র নিরাশ হতে নেই।

পরিশিষ্ট-ভাব—ত্রিশ থেকে তেত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত ভগবান ভক্তির এবং ভগবদ্‌প্রাপ্তির সাত প্রকারের অধিকারীর কথা বলেছেন— দুরাচারী, পাপযোনি, স্ত্রীজাতি, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়। কোনো প্রাণী এর বাইরে নয়, অর্থাৎ যে কোনো জাতিই হোক এবং পূর্বজন্মের যত পাপই সঞ্চিত থাকুক না কেন, প্রত্যেক ব্যক্তিই ভগবান এবং তাঁর ভক্তির অধিকারী হতে পারে। এই শ্লোকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র— এই চার বর্ণের কথা বলা হয়েছে। কেউ যাতে চারবর্ণ বলতে পুরুষই শুধু মনে না করেন, তার জন্য পৃথক্‌ভাবে স্ত্রীজাতির কথা বলা হয়েছে। এই চারবর্ণের নিম্নে যারা, তাদের (যবন, হূন প্রভৃতি) পাপযোনিভুক্ত করা হয়েছে। মনুষ্য ব্যতীত অন্যান্য জীবকেও (পশু, পক্ষী ইত্যাদি) পাপযোনির অন্তর্ভুক্ত করা যায়, কেন-না জীবমাত্রেই ভগবদ্ অংশ হওয়ায় ভগবানের শরণাগত হওয়াতে কারো পক্ষে কোনো বাধা বা নিষেধ নেই।

যারা বর্তমানে পাপ করে তারা 'দুরাচারী' আর পূর্বজন্মের পাপের জন্য যাদের নীচকুলে জন্ম হয়েছে, তারা 'পাপযোনি'। তাৎপর্য হল এই যে অত্যন্ত দুরাচারী এবং অত্যন্ত নীচ যোনি প্রাপ্ত জীবও ঈশ্বরলাভের অধিকারী। অতএব জাতি বা আচরণের জন্য মানুষের ভগবদ্‌প্রাপ্তিতে নিরাশ হওয়া উচিত নয়। জাতি এবং আচরণ অনিত্য এবং সেগুলি জীবের তৈরি করা, কিন্তু ভগবানের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ নিত্য এবং অবিচ্ছেদ্য। তাই ভগবান শুধু ভক্তির সম্পর্কই মানেন, জাতি বা আচরণের নয়—

কহ রঘুপতি সুনু ভামিনি বাতা। মানউঁ এক ভগতি কর নাতা॥
জাতি পাঁতি কুল ধর্ম বড়াঈ। ধন বল পরিজন গুন চতুরাঈ॥
ভগতি হীন নর সোহই কৈসা। বিনু জল বারিদ দেখিঅ জৈসা॥

(শ্রীরামচরিতমানস, অরণ্যকাণ্ড ৩৫।২-৩)

সাংসারিক লোকেরা জাতিবিচার, আচরণ ইত্যাদি বাহ্যিক বিষয় দেখে থাকে, ভিতরের তত্ত্ব (বাস্তবিকতা) দেখে না ; ভগবান তত্ত্বকে দেখেন যে এরা সর্বতোভাবে আমারই।

ভগবান সপ্তম অধ্যায়ের ষোড়শ শ্লোকে অন্তরের ভাবগুলি ধরে ভক্তদের অর্থার্থী, আর্ত, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী—এই চারপ্রকার পার্থক্যের কথা বলেছিলেন আর এখানে বাহ্যিক (জাতি ও আচরণকে ধরে) লৌকিক দৃষ্টিতে ভক্তদের সাতপ্রকার পার্থক্যের কথা জানিয়েছেন। সপ্তম অধ্যায়ে সেইসব ভক্তের কথা বলা হয়েছে, যাঁরা ভগবানের শরণাগত আর এখানে তাঁদের কথা বলা হয়েছে, যাঁরা ভগবানের শরণাগত হতে পারেন। তাৎপর্য হল এই যে, বর্ণ, আশ্রম, পরিধান, জাতি, সম্প্রদায় ইত্যাদি পৃথক্ পৃথক্ হলেও সকলেই অর্থার্থী, আর্ত, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী—এই চারপ্রকারের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন এবং ভগবানকে লাভ করতে সক্ষম হন। ভগবানকে লাভ করার বিষয়ে সকলেই সমকক্ষ, কেউ ছোট নয়, কেউ বড় নয়। ভগবদ্প্রাপ্তির বিষয়ে কেউই অনধিকারী নয়, হয়ওনি, হবেও না।

'কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা'—এই শ্লোকার্ধের মধ্যে **'ভক্তাঃ'** পদটি ব্যবহারের তাৎপর্য হল যে পবিত্র আচরণকারী ব্রাহ্মণ এবং ঋষিস্বরূপ ক্ষত্রিয়ের কোনো মহত্ত্ব নেই, মহত্ত্ব যা কিছু সব তাঁদের ভক্তির। অর্থাৎ ভগবান দুরাচারী ও পাপযোনিতে জন্মগ্রহণকারীদের দ্বেষ করেন না এবং পুণ্যাত্মা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের প্রতি কোনোরূপ পক্ষপাতিত্বও দেখান না। তিনি সকল প্রাণীতেই সমান (গীতা ৯।২৯)। কিন্তু যাঁরা প্রেম ও ভক্তি সহকারে তাঁর ভজনা করেন, তাঁরা যে কোনো দেশ, বেশ, বর্ণ, আশ্রম, জাতি, সম্প্রদায়ের হোন না কেন, ভগবানের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে—**'ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্'** (গীতা ৯।২৯)। অতএব দুরাচারী, পাপযোনি, স্ত্রীজাতি, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়—এই সাতশ্রেণীর ব্যক্তিই ভক্তির প্রভাবে সমকক্ষ হতে পারেন, তাঁদের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। তাই ভগবান ভজনা করার নির্দেশ দিয়েছেন—**'ভজস্ব মাম্'**। ভজন করার অর্থ হল ভগবানের সম্মুখীন হওয়া, তাঁকে প্রিয় (আপন) ভাবা, ভগবদ্প্রাপ্তিই উদ্দেশ্য হওয়া। ভগবদ্বুদ্ধিতে অপরের সেবা করা, অপরকে কিছু দেওয়ার ইচ্ছা থাকা, অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করা—একেও ভজন বলা হয়।

'অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্'—অনিত্য এবং সুখবর্জিত এই দেহ লাভ করে অর্থাৎ আমি বেঁচে থাকব এবং সুখ ভোগ করব—এই কামনা পরিত্যাগ করে ভগবানের ভজনা করা উচিত। কেন-না জগতে সুখ বলে কিছু নেই, কেবল সুখের ভ্রম আছে। তেমনই বাঁচারও ভ্রম আছে। আমরা বেঁচে থাকি না, প্রতিক্ষণই মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছি।

আগে উনত্রিশতম শ্লোকে ভগবান বলেছিলেন যে যাঁরা ভক্তি সহকারে আমার ভজনা করেন তাঁরা আমাতে অবস্থিত এবং আমি তাঁদের মধ্যে অবস্থিত। তাই এখানে ভগবান ভজনা করার নির্দেশ দিয়েছেন—**'ভজস্ব মাম্'**।

* * *

সম্বন্ধ—উনত্রিশতম শ্লোক থেকে তেত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত ভগবানের ভজনার কথাই প্রধানতঃ বলা হয়েছে, পরবর্তী শ্লোকে সেই ভজনের প্রকার জানাচ্ছেন।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥ ৩৪ ॥

[**মদ্‌ভক্তঃ** (আমার ভক্ত) ; **ভব** (হও) ; **মন্মনাঃ** (মদ্গতচিত্ত হও) ; **মদ্‌যাজী** (আমার পূজনকারী হও) ; **মাম্** (আমাকে) ; **নমস্কুরু** (নমস্কার করো) ; **এবম্** (এইভাবে) ; **যুক্ত্বা** (যুক্ত করলে) ; **আত্মানম্** (নিজেকে) ; **মৎপরায়ণঃ** (মৎপরায়ণশীল) ; **মাম্ এব** (আমাকেই) ; **এষ্যসি** (লাভ করবে।)]

তুমি আমার ভক্ত হও, মদ্‌গতচিত্ত হও, আমার পূজনকারী হও এবং আমাকে নমস্কার করো। এইভাবে আমার সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করলে, মৎপরায়ণ হলে তুমি আমাকেই লাভ করবে ॥ ৩৪ ॥

ব্যাখ্যা—[নিজের হৃদয়ের কথা সেখানেই বলা যায়, যেখানে শ্রোতার বক্তার প্রতি দোষদৃষ্টি না থাকে, বরং শ্রদ্ধাভাব থাকে। অর্জুন দোষদৃষ্টিবর্জিত, তাই ভগবান তাঁকে **'অনসূয়বে'** (৯।১) বলেছেন। এইজন্য ভগবান এখানে অর্জুনের কাছে নিজ হৃদয়ের গোপন কথা জানাচ্ছেন।]

'মদ্ভক্তঃ'—'আমার ভক্ত হও' বলার অর্থ হল, তুমি শুধু আমার সঙ্গে আত্মীয়তা করো ; শুধু আমার সঙ্গেই সম্পর্ক স্থাপন করো—যা অনাদিকাল হতে স্বতঃসিদ্ধ রয়েছে। কেবল ভ্রমবশতঃ শরীর এবং সংসারের সঙ্গে তুমি সম্পর্ক স্থাপন করেছ অর্থাৎ 'আমি অমুক বর্ণের', 'আমি অমুক আশ্রমের', 'আমি অমুক সম্প্রদায়ের', 'অমুক নামধারী'—এইরূপ বর্ণ, আশ্রম ইত্যাদিকে নিজের আমিত্ব বলে মনে করে রেখেছ। তাই এবার অসৎ-রূপে সৃষ্ট এই অ-প্রকৃত আমিত্বকে প্রকৃত সৎ-রূপে পরিবর্তিত করো যে, 'আমি তোমার এবং তুমি আমার।' তাহলে তোমার আমার সঙ্গে স্বভাবতঃই আত্মীয়তা হবে, এটিই হল প্রকৃত ভাব।

'মন্মনা ভব'—মন সেখানেই আকৃষ্ট হয়, যেখানে আপনভাব থাকে, প্রিয়ভাব থাকে। আমার সঙ্গে তোমার যে অখণ্ড সম্বন্ধ, তা আমি কখনো ভুলতে পারি না, কিন্তু তুমি ভুলে যেতে পার। সুতরাং 'তুমি মদ্‌গতচিত্ত হও'—একথা বলতে হচ্ছে।

'মদ্‌যাজী'—'আমার পূজনকারী হও' অর্থাৎ খাওয়া-দাওয়া, শোওয়া-জাগা, আসা-যাওয়া, কাজ-কর্ম যা কিছু ক্রিয়া তুমি কর না কেন, তা সবই আমার পূজারূপে করো ; সেগুলিকে আমারই পূজা বলে মনে করো।

'মাং নমস্কুরু'—'আমাকে প্রণাম করো' বলার তাৎপর্য হল যে আমার কৃত যা কিছু অনুকূল, প্রতিকূল বা সাধারণ বিধান আছে, তাতে তুমি নিত্য প্রসন্ন থাকো। আমি যদি তোমার মন এবং মর্যাদার সম্পূর্ণরূপে বিরুদ্ধ কোনো পরিস্থিতির সৃষ্টি করি, তাতেও তুমি প্রসন্ন থাকবে। যারা ক্ষতি এবং পরলোকের ভয়ে আমার চরণে পতিত হয়, আমার শরণাগত হয়, তারা প্রকৃতপক্ষে সেই সুখ-সুবিধারই শরণাপন্ন হয়, আমার নয়। আমার শরণাগত হয়ে যদি অন্য কারও থেকে কোনো সুখ-সুবিধা পাবার আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহলে সে আর সর্বতোভাবে আমার শরণাগত কী করে হল ? কারণ যতক্ষণ সে কোনোপ্রকার সুখ-সুবিধা আশা করে, ততক্ষণ সে নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে মেনে থাকে।

প্রকৃতপক্ষে তাকেই আমার চরণাশ্রিত বলা যায়, যে কোনো কিছুই নিজের বলে না মনে করে আমার ইচ্ছায় নিজেকে সমর্পণ করে। তারা শুধু আমার কাছ থেকেই নয়, উপরন্তু সংসার থেকেও সুখ-সুবিধা, সম্মান ইত্যাদি লাভের প্রত্যাশা রাখে না। অনুকূল-প্রতিকূল সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলেও তার ওপর এ-সবের কোনো প্রভাব পড়ে না অর্থাৎ আমা হতে কোনো অনুকূল-প্রতিকূল ঘটনা ঘটলেও, আমার পরায়ণ ভক্তের সেই ঘটনায় কোনো বৈষম্য আসে না। অনুকূল-প্রতিকূলতার জ্ঞান থাকলেও সে ওই ঘটনায় সুখ-দুঃখ না দেখে সবকিছুকে আমারই কৃপারূপ বলে মনে করে।

আমার সৃষ্ট বিধান শরীরের পক্ষে অনুকূল হোক বা প্রতিকূল, আমার বিধানে যে ঘটনাই ঘটুক—তা আমারই সৃষ্ট মনে করে পরম প্রসন্ন থাকা উচিত। যদি মনের অত্যন্ত প্রতিকূল ঘটনা ঘটতে থাকে, তাহলে সেগুলিতে আমার বিশেষ কৃপা বলে মনে করা উচিত। কারণ সেইসব ঘটনায় তার কোনো হাত নেই। অনুকূল ঘটনার যতটুকু অংশে তার সম্মতি থাকে, ততটুকু অংশে সেই ঘটনা তার নিকট অপবিত্র হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রতিকূল ঘটনায় কেবল আমারই করা মঙ্গল বিধান থাকে—সেই কথা ভেবে তার পরম প্রসন্ন থাকা উচিত।

মানুষ প্রতিকূল ঘটনা কামনা করে না, সেটির জন্য চেষ্টাও করে না এবং এতে তার সম্মতিও থাকে না, তবুও এরূপ ঘটনা ঘটে। এই ঘটনাগুলি সংঘটিত হওয়ার পেছনে যে-ই নিমিত্ত হোক আর যাকেই নিমিত্ত বলে মনে করা হোক না কেন, প্রকৃতপক্ষে ওই ঘটনাগুলি সংঘটিত হওয়ার পিছনে আমারই হাত থাকে, আমার ইচ্ছাই কাজ করে[১]। তাই মানুষের সেইসব ঘটনায় দুঃখিত না হয়ে, চিন্তিত না হয়ে অধিকতর প্রসন্ন হওয়া উচিত। তার এই

[১]রাম কীন্‌হ চাহহিঁ সোই হোঈ। করৈ অন্যথা অস নহিঁ কোঈ ॥ (শ্রীরামচরিতমানস ১।১২৮।১)

প্রসন্নতা আমার বিধানের জন্য হওয়া উচিত নয়, তা আমাকে (বিধানকারীকে) নিয়ে হওয়া উচিত। কারণ এতে যদি তাদের মঙ্গল না হবে, তাহলে প্রাণীমাত্রের পরম সুহৃদ হিসাবে আমি এই ঘটনা কেন সংঘটিত করব ? তাই হে অর্জুন ! তুমি সর্বদা আমার চরণে থাক অর্থাৎ আমার সমস্ত বিধানে প্রসন্ন থাকো।

যেমন কেউ যদি অন্যের প্রতি অপরাধ করে, তার সামনে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করে বলে যে আপনি আমাকে শাস্তি দিন বা পুরস্কার দিন, তিরস্কার করুন বা যা-ই করুন না কেন তাতেই আমি খুশি। সে তখন মনে ভাবে না যে তিনি তাকে নিজের ইচ্ছানুরূপ ক্ষমা করবেন ! তেমনই ভক্ত সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হয়ে ভগবানকে বলেন, 'হে প্রভু ! কোন্ কোন্ জন্মে আপনার প্রতি কী কী অন্যায় আচরণ করেছি জানি না। তার জন্য আপনি এ-জন্মে আমাকে যে শাস্তি দেবেন, তা আমার পক্ষে কল্যাণকারীই হবে। আমি সেইসব পরিস্থিতিতে কখনো অসন্তুষ্ট না হয়ে প্রসন্নভাবেই থাকব।'

'হে প্রভু ! আপনি আমার কর্মের দিকে কতই না লক্ষ্য রাখেন, কোন্ কোন্ জন্মে কী কী পরিস্থিতিতে না জানি কত ঘোর কর্মই আমি করেছি, সেইসব কর্ম থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত করতে আপনি নানা অদ্ভুত বিধান করে থাকেন। আপনার এই বিধানগুলি আমি কিছুই বুঝতে পারি না আর বোঝার ক্ষমতাও আমার নেই। তাই হে প্রভু ! আমি নিজের বুদ্ধি প্রয়োগ করবই বা কেন ? শুধু আপনার উপরই যেন আমার দৃষ্টি থাকে, কারণ আপনি যে বিধানগুলি করেন, তাতে আপনারই হাত থাকে অর্থাৎ সে-সব আপনারই করা, যা আমার পক্ষে পরম কল্যাণপ্রদ।' **'মাং নমস্কুরু'**-র এই হল তাৎপর্য।

'মামৈবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ'—এখানে **'এবম্'** কথাটির তাৎপর্য হল যে **'মদ্ভক্তঃ'** দ্বারা তুমি স্বয়ং আমাতে অর্পিত হয়েছ, **'মন্মনাঃ'** দ্বারা তোমার চিত্ত আমার পরায়ণ হয়েছে, **'মদ্‌যাজী'** দ্বারা তোমার সমস্ত ক্রিয়া এবং পদার্থ আমার পূজার-সামগ্রী হয়ে উঠেছে এবং **'মাং নমস্কুরু'** সাহায্যে তোমার দেহ আমার পদপ্রান্তে অর্পিত হয়েছে। এইভাবে আমার পরায়ণ হলে তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হবে।

'যুক্ত্বৈবমাত্মানং' (নিজেকে আমাতে যুক্ত করে) বলার অর্থ এই যে, 'আমি ভগবানেরই' এইভাবে নিজের অহং-অভিমান পরিবর্তিত হলে দেহ-মন-ইন্দ্রিয়-বুদ্ধি-পদার্থ-ক্রিয়া—সবই আমাতে সমর্পিত হবে। একেই বলা হয় শরণাগতি। এরূপ শরণাগতি হলে আমাকেই যে প্রাপ্ত হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমার প্রাপ্তিলাভে সন্দেহ সেখানেই থাকে, যেখানে আমাকে ছাড়াও অন্য কিছুর কামনা থাকে, শ্রদ্ধা থাকে, মহত্ত্ববুদ্ধি থাকে, আসক্তি ইত্যাদি থাকে। কারণ কামনা, মহত্ত্ববুদ্ধি, আসক্তি ইত্যাদি থাকলে আমি সর্বত্র পরিপূর্ণ থাকলেও আমার প্রাপ্তি হয় না।

'মৎপরায়ণঃ' কথাটির অর্থ হল আমার ইচ্ছা ব্যতিরেকে নিজের কিছু করার বা করানোর বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা যেন না থাকে। আমার অভিন্ন হয়ে আমার ক্রীড়নক হয়ে যেন থাকে।

বিশেষ কথা

(১)

ভগবানের ভক্ত হলে, তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তা গড়ে তুললে, 'আমি ভগবানের' এই অহং-অভিমান পরিবর্তন করলে মানুষের খুব শীঘ্রই পরিবর্তন ঘটে। সেই পরিবর্তনে সে ভগবানের মনোমতো হয়ে ওঠে, ভগবানের পূজক হয় ও ভগবানের সমস্ত বিধানে প্রসন্ন থাকে। এইভাবে এই চারটির দ্বারা শরণাগতির পূর্ণতা হয়। কিন্তু উপরিউক্ত চার প্রকারের মধ্যে ভগবানের ভক্ত হওয়াই হল প্রধান। কারণ যে ব্যক্তি স্বয়ং ভগবানের হয়ে যায় তার মন-বুদ্ধি, পদার্থ-ক্রিয়া, শরীর কোনোটিই আর নিজের বলে থাকে না। অর্থাৎ লৌকিক দৃষ্টিতে নিজের বলে যে জিনিসগুলি থাকে, যেগুলি বিনাশশীল, তার কোনোটিই নিজের থাকে না। স্বয়ং অর্পিত হলে প্রাকৃত বস্তুমাত্রেই ভগবানের হয়ে যায়। সেগুলি থেকে মমত্ববোধ দূর হয়। সেগুলিতে মমত্ব রেখে ভুল কাজ করা হয়েছিল, সেই ভুল চিরকালের মতো সর্বতোভাবে দূর হয়।

(২)

মানুষ জগৎ-সংসারের সঙ্গে যতই একতা মেনে নিক না কেন, তবুও সংসারকে জানতে সক্ষম হয় না। তেমনই শরীরের সঙ্গে যতই অভিন্নতা মেনে নিক, তবুও তারা শরীরের সঙ্গে এক হয়ে যেতে পারে না এবং তাকে জানতেও পারে না। বাস্তবে সংসার ও শরীর থেকে পৃথক্ হয়েই সেগুলিকে জানতে পারা যায়। কিন্তু পরমাত্মা হতে পৃথক্ থেকে পরমাত্মাকে যথার্থভাবে জানা যায় না। পরমাত্মাকে তাঁরাই জানতে পারেন, যাঁরা পরমাত্মার সঙ্গে

763 Sadhak Sanjivani (Bangla) Section 26 1 Back

এক হয়ে গেছেন অর্থাৎ যাঁদের 'আমি' ও 'আমার' ভাব তো দূরের কথা, এ সবের লেশমাত্র যেন না থাকে যে আমিও কিছু হয়েছি, আমারও কোনো সিদ্ধান্ত আছে বা কোনো প্রতিষ্ঠা আছে ইত্যাদি।

যেমন, প্রাণীরা শরীরের সঙ্গে নিজেদের একত্ব মেনে নেয় এবং স্বাভাবিকভাবেই শরীরের সুখ-দুঃখকে নিজেদের সুখ-দুঃখ বলে দেখে, শরীর থেকে পৃথক্‌ভাবে আর নিজ অস্তিত্বের কথা মনে হয় না। তেমনই ভগবানের সঙ্গে ভক্ত তার নিজ স্বাভাবিক ঐক্য অনুভব করলে তার বিন্দুমাত্র পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না। তখন জগতে ভগবানের ইচ্ছায় যা কিছু রূপান্তর ঘটে, ভক্তের ওপর তার কোনো প্রভাব পড়ে না। তার স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরে যা কিছু পরিবর্তন হয়, সেগুলির কোনো প্রভাব তার ওপর পড়ে না। ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে সকল ক্রিয়া ভক্তের শরীর দ্বারা সংঘটিত হয়। এই-ই হল প্রকৃত ভগবদ্‌পরায়ণতা।

ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়ার অর্থ হল ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যাওয়া, যা বাস্তব সত্য। এই অভিন্নতা ভেদ-ভাব থেকেও হয় আবার অভেদ-ভাব থেকেও হয়। যেমন, শ্রীরাধার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অভিন্নতা থাকে। মূলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ—এই দুই রূপে প্রকটিত হয়েছেন। দুই রূপ হলেও শ্রীরাধা ভগবানের থেকে ভিন্ন নন এবং ভগবানও শ্রীরাধা থেকে ভিন্ন নন। তাঁরা পরস্পরে প্রেমের আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে যোগ-বিয়োগের লীলা করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের যোগেও বিয়োগ এবং বিয়োগেও যোগ অর্থাৎ যোগের দ্বারা বিয়োগ এবং বিয়োগের দ্বারা যোগের পুষ্টি হয়, যার ফলে অনির্বচনীয় প্রেম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই অনির্বচনীয় এবং প্রতিমুহূর্তে বর্ধমান প্রেম লাভ করাই হল ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া।

সপ্তম ও নবম অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য

সপ্তম অধ্যায়ের প্রারম্ভে ভগবান বিজ্ঞানসহ জ্ঞান অর্থাৎ রাজবিদ্যা পূর্ণভাবে জানাতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন— **'জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ'** (৭।২)। সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান যেভাবে বলতে আরম্ভ করেছিলেন, অষ্টম অধ্যায়ের প্রারম্ভে অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তা আর বলা হয়নি। তাই অষ্টম অধ্যায়ে প্রশ্নের উত্তর শেষ হতেই ভগবান অর্জুনের জিজ্ঞাসা ব্যতিরেকেই **'ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে। জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং ....'** (৯।১) বলে নিজে থেকে পুনরায় বিজ্ঞানসহিত জ্ঞানের কথা বলতে শুরু করেছেন। যে বিষয়টি ভগবান সপ্তম অধ্যায়ে ত্রিশটি শ্লোক ধরে বলেছিলেন, সেটিই নবম অধ্যায়ের শুরু থেকে দশম অধ্যায়ের একাদশ শ্লোক পর্যন্ত ক্রমাগত বলে গেছেন। এই শ্লোকগুলিতে যে কথা বলা হয়েছে, অর্জুনের ওপর তার এমনই প্রভাব পড়েছে, যে তিনি দশম অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোক থেকে অষ্টাদশ শ্লোক পর্যন্ত ভগবানের স্তুতি ও প্রার্থনা করেছেন। তাৎপর্য হল এই যে সপ্তম অধ্যায়ের কথাগুলি ভগবান নবম অধ্যায়ে সংক্ষেপে, বিস্তারিতভাবে অথবা প্রকারান্তরে বলেছেন।

সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে **'ময্যাসক্তমনাঃ'** ইত্যাদি পদে যে বিষয় সংক্ষেপে বলেছিলেন, সেটিই নবম অধ্যায়ের চৌত্রিশতম শ্লোকে **'মন্মনাঃ'** ইত্যাদি পদ দ্বারা একটু বিস্তারিতভাবে জানিয়েছেন।

সপ্তম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে আমি বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের কথা জানাব ; যা জানলে আর কিছুই জানার বাকি থাকে না। এই কথাই ভগবান নবম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে জানিয়েছেন যে আমি বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের কথা বলছি, যা জেনে তুমি এই অশুভ (জগৎ) হতে মুক্তিলাভ করবে। মুক্তিলাভ হলে আর জানার কিছুই বাকি থাকে না। ভগবান এইভাবে সপ্তম এবং নবম—দুটি অধ্যায়ের শুরুতেই প্রতিজ্ঞামতো বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের কথা জানাতে গিয়ে দুটিরই এক ফল বলে জানিয়েছেন।

সপ্তম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে সহস্র মানুষের মধ্যে হয়ত কোনো একজন বাস্তবিক সিদ্ধির জন্য সচেষ্ট হয় এবং নিষ্ঠাবানদের মধ্যে কোনো একজন আমাকে তত্ত্বতঃ জানতে পারে। এর কারণ হিসাবে তিনি নবম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে জানিয়েছেন যে, এই বিজ্ঞানসহ জ্ঞানে শ্রদ্ধা না করায় মানুষ আমাকে প্রাপ্ত না হয়ে মৃত্যুর পথে চলতে থাকে অর্থাৎ বারবার জন্মাতে ও মরতে থাকে।

সপ্তম অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে ভগবান নিজেকে সম্পূর্ণ জগতের প্রভব ও প্রলয় বলে জানিয়েছেন। এই কথাই নবম অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকে **'প্রভবঃ প্রলয়ঃ'** পদের দ্বারা জানিয়েছেন।

সপ্তম অধ্যায়ের দশম শ্লোকে ভগবান জানিয়েছেন যে তিনিই সনাতন বীজ এবং নবম অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকে

বলেছেন তিনিই অব্যয় বীজ।

সপ্তম অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে **'ন ত্বহং তেষু তে ময়ি'** বলে যে রাজবিদ্যা সংক্ষেপে বর্ণনা করেছিলেন, সেটিই নবম অধ্যায়ের চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

সপ্তম অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে ভগবান বলেছেন সমস্ত প্রাণী তিনটি গুণে মোহগ্রস্ত আর নবম অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে সমস্ত প্রাণী প্রকৃতির গুণে অবশ বলে জানিয়েছেন।

সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্দশ শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে যেসব মানুষ আমার শরণাগত হয় তারা মায়া অতিক্রম করে এবং নবম অধ্যায়ের বাইশতম শ্লোকে বলেছেন, যেসব ভক্ত আমাকে অনন্যভাবে চিন্তা করে আমার উপাসনা করে, আমি তাদের যোগক্ষেম বহন করে থাকি।

সপ্তম অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে ভগবান **'ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ'** কথাটি বলেছেন, সেই কথাই নবম অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকে বলেছেন **'অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ'** রূপে।

সপ্তম অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে ভগবান **'আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ'** পদে যে কথা বলেছেন, সেই কথাই বলেছেন নবম অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে **'রাক্ষসীমাসুরীং চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ'** পদটিতে।

সপ্তম অধ্যায়ের ষোড়শ শ্লোকে যাঁদের **'সুকৃতিনঃ'** বলেছেন, নবম অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে তাঁদেরই **'মহাত্মানঃ'** বলেছেন।

সপ্তম অধ্যায়ের ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শ্লোক পর্যন্ত সকাম ও নিষ্কামভাব ভেদে ভক্ত চার প্রকারের বলা হয়েছে ; নবম অধ্যায়ের ত্রিশ থেকে তেত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত বর্ণ, আচরণ ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে ভক্তদের সাত প্রকার ভেদের কথা জানানো হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ের উনিশতম শ্লোকে ভগবান মহাত্মাদের দৃষ্টিতে **'বাসুদেবঃ সর্বম্‌'** বলে জানিয়েছেন এবং নবম অধ্যায়ের উনিশতম শ্লোকে ভগবান নিজের দৃষ্টিতে **'সদসচ্চাহম্‌'** কথাটি বলেছেন।

ভগবান হতে বিমুখ হয়ে অন্য দেবতায় আকৃষ্ট হবার মুখ্যতঃ দুটি কারণই থাকে—প্রথমটি হল কামনা এবং দ্বিতীয়টি হল ভগবানকে না জানা (চিনতে না পারা)। সপ্তম অধ্যায়ের বিশতম শ্লোকে কামনাবশতঃ দেবতাদের শরণাগত হওয়ার কথা বলেছেন এবং নবম অধ্যায়ের তেইশতম শ্লোকে ভগবানকে না-জানার ফলে দেবতাদের পূজা করার কথা বলেছেন।

সপ্তম অধ্যায়ের তেইশতম শ্লোকে সকাম ব্যক্তিদের বিনাশশীল ফল প্রাপ্তির কথা বলেছেন এবং নবম অধ্যায়ের একুশতম শ্লোকে সকাম ব্যক্তিদের পুনরাগমন প্রাপ্ত হওয়ার কথা বলেছেন।

সপ্তম অধ্যায়ের তেইশতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে দেবতাদের ভক্তেরা দেবতাদের আর আমার ভক্তেরা আমাকেই প্রাপ্ত হন। এই কথা ভগবান নবম অধ্যায়ের পঁচিশতম শ্লোকেও বলেছেন।

সপ্তম অধ্যায়ের চব্বিশতম শ্লোকের পূর্বার্ধে ভগবান যে **'অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ'** বলেছেন, সেই কথাই নবম অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকের পূর্বার্ধে **'অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্‌'** রূপে বলেছেন। তেমনই সপ্তম অধ্যায়ের চব্বিশতম শ্লোকের উত্তরার্ধে যে **'পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্‌'** কথাটি বলেছেন, সেই কথাই নবম অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকের উত্তরার্ধে বলেছেন **'পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্‌'**।

সপ্তম অধ্যায়ের সাতাশতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন **'সর্গে যান্তি'**, সেটিই নবম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে বলেছেন **'মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি'** পদের দ্বারা।

সপ্তম অধ্যায়ের ত্রিশতম শ্লোকে ভগবান তাঁকে জানার কথা মুখ্যরূপে বলেছেন এবং নবম অধ্যায়ের চৌত্রিশতম শ্লোকে ভগবানে অর্পণ করাকেই মুখ্য বলে জানিয়েছেন।

পরিশিষ্ট-ভাব—এই শ্লোকে অহংবোধ পরিবর্তনের কথাই প্রধান। ভক্ত 'আমি ভগবানের'— এইরূপে নিজ অহংবোধ পরিবর্তন করে এবং ভগবানের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করে। সে সাধননিষ্ঠ না হয়ে ভগবদ্‌নিষ্ঠ হয়। তাই তার জগৎ-সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে হয় না, বরং তা স্বতঃই পরিত্যক্ত হয়। কেন-না বর্ণ, আশ্রম, জাতি, যোগ্যতা, অধিকার, কর্ম, গুণ ইত্যাদির পার্থক্য থাকলেও এগুলি সবই আগন্তুক, কিন্তু স্বস্বরূপের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক আগন্তুক নয়, বরং তা অনাদি, নিত্য এবং স্বতঃসিদ্ধ।

❋ ❋ ❋

ওঁ তৎসৎ ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ।

এইভাবে ওঁ, তৎ, সৎ, ভগবদ্ নাম উচ্চারণপূর্বক ব্রহ্মবিদ্যা এবং যোগশাস্ত্রময় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণার্জুন -সংবাদে 'রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগ' নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত হল॥ ৯ ॥

এই অধ্যায়ে ভগবান যে **'ময়া ততমিদং সর্বম্'** উপদেশ দিয়েছেন, সেটি হল সমস্ত বিদ্যার রাজা ; আর ভগবান যে নিজেকে প্রকটিত করে অর্জুনকে তাঁর শরণাগত হওয়ার এবং তাঁতে মন নিবিষ্ট করার কথা বলেছিলেন, তা হল সমস্ত গোপনীয় ভাবের সেরা। এই দুটি ভাব (রাজবিদ্যা ও রাজগুহ্যযোগ) তত্ত্বতঃ বুঝতে পারলে 'যোগ' (নিত্যযোগ) অনুভূত হয়। তাই এই অধ্যায়টির নাম **'রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগ'** রাখা হয়েছে।

নবম অধ্যায়ের পদ, অক্ষর ও উবাচ

১) এই অধ্যায়ে **'অথ নবমোঽধ্যায়ঃ'**-এর তিন, **'শ্রীভগবানুবাচ'**-এর দুই, শ্লোকগুলির চারশত ছেচল্লিশ এবং পুষ্পিকাতে তেরটি পদ আছে। এইভাবে সর্বমোট পদের সংখ্যা চারশত চৌষট্টি।

২) **'অথ নবমোঽধ্যায়ঃ'**-এর সাত, **'শ্রীভগবানুবাচ'**-এর সাত, শ্লোকগুলির এক হাজার একশত বারো ও পুষ্পিকাতে একান্ন অক্ষর আছে। এইভাবে সম্পূর্ণ অক্ষরের যোগসংখ্যা হল একহাজার একশত সাতাত্তর। এই অধ্যায়ের চৌত্রিশটি শ্লোকের মধ্যে বিশ ও একুশতম—দুটি শ্লোক চুয়াল্লিশ অক্ষর সংবলিত এবং বাকি বত্রিশটি শ্লোক বত্রিশ অক্ষরের।

৩) এই অধ্যায়ে একটিই উবাচ—**'শ্রীভগবানুবাচ'**।

নবম অধ্যায়ের প্রযুক্ত ছন্দ

এই অধ্যায়ের চৌত্রিশটি শ্লোকের মধ্যে কুড়ি ও একুশ—এই দুটি শ্লোক **'উপজাতি'** ছন্দযুক্ত। বাকি বত্রিশটি শ্লোকের মধ্যে—প্রথম শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে 'ভগণ' এবং তৃতীয় পংক্তিতে 'নগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় **'সংকীর্ণ-বিপুলা'** ; দ্বিতীয় শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে 'রগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় **'র-বিপুলা'** ; তৃতীয় এবং দশম শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে 'ভগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় **'ভ-বিপুলা'** ; সপ্তদশ শ্লোকের প্রথম পংক্তি এবং ত্রয়োদশ ও ছাব্বিশতম শ্লোকের তৃতীয় পংক্তিতে 'নগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় **'ন-বিপুলা'** সংজ্ঞাযুক্ত ছন্দ আছে। বাকি পাঁচিশটি শ্লোক ঠিক **'পথ্যাবক্ত্র'** অনুষ্টুপ ছন্দের লক্ষণ দ্বারা যুক্ত।

নবম অধ্যায়ের সার

ভগবান সপ্তম অধ্যায় থেকে 'জ্ঞান' ও 'বিজ্ঞানের' বিষয় নিয়ে বলতে আরম্ভ করেছেন। 'জ্ঞান'-এর দ্বারা জগৎ-সংসার থেকে মুক্তি হয় আর 'বিজ্ঞান' থেকে ভগবানে প্রেম জন্মায়। বর্ণনার মাঝে অর্জুন প্রশ্ন করায় অষ্টম অধ্যায়ে বিষয়ান্তরে আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু নবম অধ্যায় থেকে ভগবান পুনরায় ওই বিষয় নিয়েই আলোচনা শুরু করেছেন।

সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান জগতের উৎপত্তির কারণ জানাতে গিয়ে বলেছেন পরা ও অপরা—আমার এই দুটি প্রকৃতির সংযোগেই সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি হয় (৭।৬)। কিন্তু নবম অধ্যায়ে জগতের স্থিতির কথা বলে জানিয়েছেন যে যাদের কাছে জগতের অস্তিত্ব আছে, সেই সাধকদের জন্য জগৎ আমাতে এবং আমি জগতে অবস্থিত (৯।৪-৬)। এটিই ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলেছেন—**'যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি'** (৬।৩০)। কিন্তু যেসব সিদ্ধ মহাপুরুষদের দৃষ্টিতে জগতের পৃথক্ কোনো অস্তিত্ব নেই, তাঁদের কাছে শুধু আমিই আছি—**'বাসুদেবঃ সর্বম্'**।

ভগবান বলেছেন যদিও সকল প্রাণীর উৎপাদক এবং ধারক আমিই, তা সত্ত্বেও আমি ওই সকল প্রাণীর আশ্রিত নই, ওইসব প্রাণীই আমার আশ্রিত (৯।৫)। আকাশে স্থিত বায়ু যেমন আকাশের আশ্রিত হয়ে থাকে, কিন্তু আকাশ বায়ুর আশ্রিত হয় না, তেমনই পরা ও অপরা প্রকৃতি ভগবানের স্বভাব হওয়ায় ভগবানের আশ্রিত বা অধীন, কিন্তু ভগবান পরা ও অপরা প্রকৃতির আশ্রিত নয়। তাই বায়ু যেমন আকাশ হতে উৎপন্ন হয়ে আকাশেই স্থিতিলাভ করে ও আকাশেই লীন হয়ে

যায়, তেমনই সমস্ত প্রাণী মহাসর্গে ভগবান থেকে উৎপন্ন হয়ে, ভগবানেই স্থিত হয় এবং মহাপ্রলয়ে ভগবানেই লীন হয়ে যায় (৯।৭)। তাৎপর্য হল যে, সকল প্রাণী প্রকৃতির আশ্রিত আর প্রকৃতি ভগবানের আশ্রিত (৯।৮)। অন্যভাবে বলা যায়, ভগবানের এক অংশে প্রকৃতি এবং প্রকৃতির এক অংশে প্রাণী বিদ্যমান। তাই জগৎ সৃষ্টি করলেও ভগবান এই সৃষ্টিরূপ কর্ম দ্বারা আবদ্ধ হন না (৯।৯)। কেন-না জগৎ-সৃষ্টিরূপ কাজ ভগবানের আশ্রিত প্রকৃতিই করে থাকে (৯।১০)। এই রহস্য না জানায় নির্বোধ ব্যক্তিরা ভগবানকেও নিজেদের মতো দেহাশ্রিত বলে মনে করে যে, আমরা যেমন দেহাশ্রয় ব্যতীত থাকতে পারি না, তেমনই ভগবানও দেহাশ্রয় বিনা থাকতে পারেন না (৯।১১)। এরূপ ব্যক্তিরা আসুরী, রাক্ষসী এবং মোহিনী প্রকৃতির আশ্রিত হয়ে থাকেন (৯।১২)। প্রকৃতপক্ষে মানুষের যেমন শরীর ও শরীরীর পার্থক্য থাকে, তেমন ভগবানের শরীর ও শরীরীর পার্থক্য থাকে না—**'সদসচ্চাহমর্জুন'** (৯।১৯)। তাই যাঁরা ভগবানকে প্রকৃতির আশ্রিত বলে ভাবেন না, তাঁরা দৈবী প্রকৃতির আশ্রিত হয়ে থাকেন অর্থাৎ তাঁরা প্রকৃতির আশ্রিত না হয়ে ভগবানের আশ্রিত হন (৯।১৩)। ভগবানের আশ্রিত হওয়ায় এঁদের 'মহাত্মা' বলা হয়।

কর্মযোগ 'শরীর' (অপরা)-এর প্রাধান্যে আর জ্ঞানযোগ 'শরীরী' (পরা)-এর প্রাধান্যে সাধিত হয় । এক দেশকে (পরিচ্ছিন্নতা) (শরীর বা শরীরী) নিয়ে চলায় কর্মযোগী এবং জ্ঞানযোগী একদেশীয় হয়ে থাকে। কিন্তু ভক্তিযোগে থাকে ভগবানের প্রাধান্য। তাই ভক্তকে ভগবান 'মহাত্মা' অর্থাৎ মহান্ আত্মা বলেছেন। তাঁরা অনন্যমনে ভগবানের ভজনা করেন। কেন-না তাঁদের দৃষ্টিতে যখন একমাত্র ভগবান ব্যতীত অন্য কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, তখন তাঁদের মন ভগবান ব্যতীত অন্য কোথায় যাবে ? তাই তাঁরা ভগবানে নিত্যযুক্ত থাকেন, কখনো ভগবানের থেকে আলাদা হন না— **'নিত্যযুক্তাঃ'** (৯।১৪), **'নিত্যাভিযুক্তানাম্'** (৯।২২)।

সাধক নানাপ্রকারের হয়ে থাকেন এবং ভিন্ন ভিন্ন সাধনা দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন উপাস্যদেবতার উপাসনা করে থাকেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ওই সব সাধকের দ্বারা এক সমগ্র ভগবানেরই উপাসনা হয়ে থাকে—**'মামুপাসতে'** (৯।১৫), **'ত্রৈবিদ্যা মাম্'** (৯।২০) **'তেঽপি মামেব'** (৯।২৩), **'অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ'** (৯।২৪)। কারণ একই ভগবান বিভিন্নরূপে প্রকটিত (৯।১৬-১৯)। এই রহস্য না বুঝে যাঁরা নিজ উপাস্য দেবতাকে ভগবান থেকে আলাদা বলে মনে করে সকামভাবে উপাসনা করেন, তাদের উপাসনা ভগবানের হলেও তা অবিধিপূর্বক হয়। তাই তাদের পতন হয় অর্থাৎ তারা জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হয় (৯।২৩-২৪)। কিন্তু ভগবানের উপাসনাকারী সাধক ভগবানকেই প্রাপ্ত হন।

যারা ভগবানকে ছেড়ে অন্য দেব-দেবীর উপাসনা করে, তাদের নানাবিধ নিয়ম ইত্যাদির প্রয়োজন হয়, যা মানা অনেক সময়ে কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু ভগবানের উপাসনাতে প্রয়োজন থাকে ভাবের, ক্রিয়ার (নিয়ম ও বিধির) প্রয়োজন থাকে না (৯।২৬-২৭)। ভগবান ক্রিয়াগ্রাহী নন, তিনি ভাবগ্রাহী—**'ভাবগ্রাহী জনার্দনঃ'**। তাই ভক্তগণ সহজেই ভগবানকে প্রাপ্ত হন। শুধু তাই নয়, মানুষ যে কোনো আচরণ, বর্ণ, আশ্রম, জাতি ইত্যাদির হোক না কেন, সে ভগবানের ভক্ত হয়ে সহজেই ভগবানকে প্রাপ্ত করতে সক্ষম হয় (৯।৩০-৩৩)।

নবম অধ্যায়ের শেষে ভগবান বলেছেন—**'মন্মনা ভবঃ'** (৯।৩৪)। এর অর্থ হল যা কিছু আছে, সে সবই আমি, আমি ছাড়া আর কিছুই নেই (৭।২৯-৩০)। এই কথাটিই দৃঢ়তার সঙ্গে স্বীকার করাই হল **'মন্মনা ভবঃ'** ইত্যাদি পদের তাৎপর্য।

⁂ ⁂ ⁂

॥ ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

অথ দশমোঽধ্যায়ঃ

দশম অধ্যায়

অবতরণিকা

শ্রীভগবান সপ্তম অধ্যায়ে তাঁর অন্তরের কথা—বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের কথা বলছিলেন। অষ্টম অধ্যায়ের প্রারম্ভে অর্জুনের প্রশ্নে তাঁর কথায় প্রসঙ্গান্তর ঘটেছিল এবং পুনরায় তিনি বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের কথা বলার জন্য নবম অধ্যায়ের বিষয় আরম্ভ করেন আর তার সমাপ্তি করেন ভগবদ্‌পরায়ণতা দিয়ে। কিন্তু ভগবানের মনে আরও কিছু বলার ইচ্ছা থেকে গিয়েছিল, নিজের বক্তব্যে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। ভক্তের যেমন ভগবানের কথা শুনে শুনেও তৃপ্তি হয় না (গীতা ১০।১৮), তেমনই প্রিয়ভক্ত অর্জুনের কাছে তাঁর অন্তরের কথা বলে ভগবানের তৃপ্তি হচ্ছিল না। কারণ ভগবানের অন্তরের গোপন কথা ভক্ত ছাড়া জগতে আর কেউই শোনার নেই। তাই ভগবান অর্জুনের জিজ্ঞাসা ব্যতিরেকেই কৃপাপরবশ হয়ে দশম অধ্যায়ের বিষয় বলতে আরম্ভ করেন।

শ্রীভগবানুবাচ

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া॥ ১ ॥

[**মহাবাহো** (হে মহাবাহো অর্জুন !) ; **মে** (আমার) ; **পরমম্, বচঃ** (শ্রেষ্ঠ বাক্যগুলি) ; **ভূয়ঃ, এব** (পুনর্বার) ; **শৃণু** (শোনো) ; **অহম্** (আমি) ; **তে** (তোমার) ; **হিতকাম্যয়া** (হিতকামনায়) ; **যৎ** (এগুলি) ; **বক্ষ্যামি** (জানাচ্ছি) ; **প্রীয়মাণায়** (আমার প্রতি অতিশয় প্রেমসম্পন্ন।)]

শ্রীভগবান বললেন—হে মহাবাহো অর্জুন ! আমার এই শ্রেষ্ঠ বাক্যগুলি তুমি পুনরায় শোনো, আমি তোমার হিতার্থে এগুলি জানাচ্ছি ; কারণ তুমি আমার প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধা-প্রেমসম্পন্ন॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা—'ভূয় এব'—ভগবানের বিভূতিগুলির তত্ত্ব জানতে পারলে ভগবানে ভক্তি হয়, প্রেম হয়। তাই কৃপাপরবশ হয়ে ভগবান সপ্তম অধ্যায়ের (অষ্টম শ্লোক থেকে দ্বাদশ শ্লোক পর্যন্ত) কারণরূপে সতেরোটি বিভূতি এবং নবম অধ্যায়ে (ষোড়শ থেকে উনিশতম শ্লোক পর্যন্ত) কার্য-কারণরূপে সাঁইত্রিশটি বিভূতির কথা জানিয়েছেন। এখন এখানে আরও বিভূতি জানাবার জন্য[১] এবং (গীতা ৮।১৪ এবং ৯।২২, ৯।৩৪ শ্লোকে কথিত) ভক্তির কথা আরও বিশেষভাবে বলার জন্য ভগবান **'ভূয় এব'** বলেছেন।

'শৃণু মে পরমং বচঃ'—ভগবানের মনে তাঁর মহিমার কথা, তাঁর হৃদয়ের কথা, নিজের প্রভাবের কথা বলার বিশেষ আগ্রহ এসেছিল[২]। তাই তিনি অর্জুনকে বলেছেন যে, 'তুমি আবার আমার পরম বচন পুনরায় শোনো'।

অন্য ভাবটি হল যে ভগবান যে যে স্থানে তাঁর মহত্ত্ব, প্রভাব, ঐশ্বর্য ইত্যাদির কথা বলেছেন অর্থাৎ নিজেকে উন্মোচিত করেছেন, সেখানেই তিনি পরম বাক্য, রহস্য ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ করেছেন ; যেমন—চতুর্থ অধ্যায়ের

---

[১]এই (দশম) অধ্যায়ে ভগবান চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শ্লোক পর্যন্ত তাঁর পঁয়তাল্লিশ প্রকার বিভূতির কথা জানিয়েছেন।

[২]ভগবান বলেছেন যে আমি ভক্তদের কৃপা করে তাদের জ্ঞান প্রদান করি—'তেষামেবানুকম্পার্থম্' (গীতা ১০।১১)—এটি হল ভগবানের পরম বচন।

তৃতীয় শ্লোকে **'রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্'** পদটির দ্বারা বলেছেন যে, যিনি সূর্যকে উপদেশ দিয়েছিলেন, সেই আমিই তোমার রথের চালক হিসাবে তোমার ঘোড়াগুলিকে সঞ্চালন করার জন্য উপবিষ্ট রয়েছি। অষ্টাদশ অধ্যায়ের চৌষট্টিতম শ্লোকে **'শৃণু মে পরমং বচঃ'** পদের দ্বারা এই পরম বাক্য বলেছেন যে তুমি সকল ধর্মের তত্ত্ববিচার করার এত পরিশ্রম না করে একমাত্র আমারই শরণাগত হও, আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হতে মুক্ত করবো, তুমি চিন্তা কোরো না (১৮।৬৬)। এখানে **'শৃণু মে পরমং বচঃ'** পদে ভগবানের বক্তব্য হল যে, প্রাণীদের নানাপ্রকার ভাব আমা হতে উৎপন্ন হয় এবং আমাতে ভক্তিভাব রক্ষাকারী সাত মহর্ষি, চার সনকাদি এবং চতুর্দশ মনু— এরা সকলেই আমার মন থেকে উৎপন্ন হয়। তাৎপর্য হল এই যে, সকলের মূলে আমিই অবস্থিত।

যেমন পরবর্তী ত্রয়োদশ অধ্যায়ে জ্ঞানের কথা বলে চতুর্দশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে ভগবান পুনরায় জ্ঞানের বর্ণনা করেছেন, তেমনই সপ্তম এবং নবম অধ্যায়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা বলেও দশম অধ্যায়ের প্রারম্ভে ভগবান পুনরায় সেই বিষয়টিই জানাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। চতুর্দশ অধ্যায়ের শুরুতে ভগবান **'পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্'** কথাটি বলেছেন, আর এখানে (দশম অধ্যায়ের প্রারম্ভে) **'শৃণু মে পরমং বচঃ'** কথাটি বলেছেন। এর তাৎপর্য হল জ্ঞানমার্গে বুদ্ধির এবং বিচার-বিবেচনার প্রাধান্য থাকে। অতএব সাধক বচনগুলি শুনে বিচার-বিবেচনার সাহায্যে তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করেন। সেইজন্য সেখানে **'জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্'** কথাটি বলেছেন। ভক্তিমার্গে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের প্রাধান্য থাকে। তাই সাধক বচনগুলি শুনে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সহকারে সেগুলি মেনে নেন। সেইজন্য এখানে **'পরমং বচঃ'** কথাটি বলেছেন।

'যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া'— শ্রবণকারীর যদি বক্তার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রেম থাকে এবং বক্তার যদি শ্রোতার প্রতি কৃপা ও হিতকামনা থাকে তবে বক্তার উপদেশ, তাঁর কথিত বিষয় শ্রোতার হৃদয়ে অটলরূপে বিরাজ করে। এর দ্বারা শ্রোতার ভগবানের প্রতি স্বাভাবিকভাবে রুচি উৎপন্ন হয়, তার হৃদয়ে ভক্তি ও প্রেম-জন্মায়।

এখানে **'হিতকাম্যয়া'** পদের দ্বারা একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে ভগবান গীতার স্থানে স্থানে কামনার নিষেধ করেছেন, তবে তিনি স্বয়ং নিজের মধ্যে কামনা কেন রেখেছেন ? তার উত্তর হল যে প্রকৃতপক্ষে নিজের জন্য ভোগ, সুখ, আরাম, আকাঙ্ক্ষা করাকেই 'কামনা' বলা হয়। অন্যের হিত কামনাকে 'কামনা' বলা হয় না। অন্যের হিতের কামনা হল ত্যাগ এবং সেটি নিজ কামনা দূর করার মুখ্য সাধন। তাই ভগবান সকলের শিক্ষার জন্য আদর্শরূপে বলেছেন যে আমি যেমন হিতের কামনা নিয়ে বলছি, তেমনই, মানুষমাত্রেরই উচিত তারা যেন প্রাণীমাত্রেরই হিত কামনায় সকলের সঙ্গে যথাযোগ্য ব্যবহার করে। এতে নিজের কামনা দূর হয় এবং কামনা দূর হলে আমাকে পাওয়া সহজ হয়ে যায়। যারা প্রাণীমাত্রেরই হিতের কামনা করে, তারা আমার সগুণ স্বরূপ লাভ করে—**'তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ'** (গীতা ১২।৪) এবং নির্গুণ স্বরূপও প্রাপ্ত হয়—**'লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণং....সর্বভূতহিতে রতাঃ'** (৫।২৫)।

পরিশিষ্ট-ভাব—অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে এসে বিজয় আকাঙ্ক্ষা না করে নিজের কল্যাণ কামনা করেছিলেন, তাই এইস্থানে তাঁকে **'মহাবাহো'** সম্বোধন করা হয়েছে। এই সম্বোধন অর্জুনের শ্রেষ্ঠত্বের, উপদেশ ধারণ করার সামর্থ্যের এবং অধিকারের সূচক।

'পরমং বচঃ'— জীবমাত্রের কল্যাণকারী হওয়ায় ভগবানের বাক্যগুলি 'পরম্' অর্থাৎ অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ। জীবমাত্রেরই কল্যাণকারী হওয়ায় গীতাও বিশ্বের সকলের নিকট প্রিয়, বন্দনীয়।

'বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া'—অর্জুন সকল জীবেরই প্রতিনিধি এবং তিনি নিজের হিতাকাঙ্ক্ষী[১]। তাই ভগবান তাঁর অর্থাৎ জীবমাত্রেরই হিতের উদ্দেশ্যে এই শ্রেষ্ঠ বাক্যগুলি বলেছেন। নিজেকে উদ্ধার করা ব্যতীত জীবের অন্য

---

[১] 'যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে' (গীতা ২।৭)
'তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্'॥ (গীতা ৩।২)
'যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্'॥ (গীতা ৫।১)

কোনো কিছুতে মঙ্গল নেই। ভগবানের বাক্যও কল্যাণকারী এবং তাঁর উদ্দেশ্যও কল্যাণ করার, তাই ভগবানের বাণীতে জীবের বিশেষ কল্যাণ (পরম-হিত) নিহিত আছে। ভগবান জীবের যত মঙ্গল করতে সক্ষম, তত আর কেউ করতে সক্ষম নন—

উমা রাম সম হিত জগ মাহীঁ। গুরু পিতু মাতু বন্ধু প্রভু নাহীঁ॥ (শ্রীরামচরিতমানস, কিষ্কিন্ধাকাণ্ড ১২।১)

অন্য সকলের বাক্য নিয়ে মতভেদ থাকে কিন্তু ভগবানের বাণী সর্বসম্মত। ভগবান যোগস্থ হয়ে গীতার বাণী বলেছেন,[১] তাই তাঁর বাণী বিশেষভাবে কল্যাণ করে থাকে। ভগবানের যোগস্থ হওয়া মানে কী ? ভগবান সাধারণভাবে প্রাণীমাত্রেরই পরম সুহৃদ্, কিন্তু কেউ যখন ব্যাকুল হয়ে তাঁর শরণাগত হয়, তখন ভগবানের অন্তরে তার হিতার্থে বিশেষ ভাব জাগরিত হয় । একেই বলা হয় ভগবানের যোগস্থ হওয়া[২], যেমন— গোবৎস তার মা -গাভীর কাছে এলেই মায়ের দুধ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বৎসের জন্য উৎসারিত হয়।

'যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া' পদটিতে ভগবান বলেছেন যে, আমার প্রতি তোমার প্রেমভাব আছে আর তোমার জন্য আমার হিতের ভাব আছে, তাই আমি এই বিজ্ঞানসহ জ্ঞান তোমাকে আবার বলছি, যা আমি সপ্তম ও নবম অধ্যায়ে বলেছি। এতে প্রমাণিত হয় যে সপ্তম, নবম এবং দশম—এই তিন অধ্যায়েই ভগবান প্রাণীদের হিত কামনায় তাঁর অন্তরের কথা ব্যক্ত করেছেন।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—পরম বচনের বিষয়টি —আমি পরে যা বলব, আমি ব্যতীত সেটি সম্পূর্ণভাবে আর কেউই বলতে সক্ষম নয়। তার কারণ কী ? পরের শ্লোকে ভগবান তা জানাচ্ছেন।

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্বশঃ॥ ২ ॥

[**মে** (আমার) ; **প্রভবম্** (উৎপত্তির বিষয়) ; **সুরগণাঃ** (দেবতাগণ) ; **ন**, **বিদুঃ** (জানেন না) ; **মহর্ষয়ঃ** (মহর্ষিগণ) ; **ন** (জানেন না) ; **হি** (কেন-না) ; **সর্বশঃ** (সর্বপ্রকারেই) ; **অহম্** (আমি) ; **দেবানাম্** (দেবতাদের) ; **চ** (এবং) ; **মহর্ষীণাম্** (মহর্ষিদের) ; **আদিঃ** (আদি কারণ।)]

আমার উৎপত্তির বিষয়টি দেবগণ বা মহর্ষিগণ কেউই জানেন না, কারণ সর্বপ্রকারেই আমি দেবতা ও মহর্ষিদের আদি কারণ ॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা—'ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ'— যদিও দেবগণের শরীর, বুদ্ধি, আবাসলোক, সামগ্রী সবকিছুই দিব্য, তবুও এঁরা আমার প্রকট হওয়ার বিষয়টি জানেন না। তাৎপর্য হল যে আমার বিশ্বরূপে প্রকটিত হওয়া ; মৎস্য, কচ্ছপ ইত্যাদি অবতার-রূপে প্রকটিত হওয়া, সৃষ্টিতে ক্রিয়া, ভাব এবং বিভূতিরূপে প্রকটিত হওয়া, এই সব কিছুর উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, হেতু দেবতাগণও সম্পূর্ণভাবে জানেন না। আমার প্রকটিত হওয়ার বিষয় পুরোপুরি জানা তো দূরের কথা, তাঁদের পক্ষে আমার দর্শনলাভও অত্যন্ত কঠিন। সেইজন্য তাঁরা আমার দর্শনলাভের জন্য উৎসুক হয়ে থাকেন (গীতা ১১।৫২)।

এইরূপই যেসব মহর্ষি নানা বৈদিক শ্লোকাদি, মন্ত্রাদি বিদ্যা, নানারূপ বিশেষ শক্তি প্রকাশ করেছেন, যাঁরা সংসার থেকে উচ্চে আরোহণ করেছেন, যাঁরা দিব্য

---

[১]ন শক্যং তন্ময়া ভূয়স্তথা বক্তুমশেষতঃ। পরং হি ব্রহ্ম কথিতং যোগযুক্তেন তন্ময়া॥ (মহাভারত, আশ্ব. ১৬।১২-১৩)
'ভগবান অর্জুনকে বললেন, 'সেই সব বাক্য এখন ওইভাবে দ্বিতীয়বার বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ওই সময় আমি যোগযুক্ত হয়ে পরমাত্মতত্ত্ব বর্ণনা করেছিলাম।'

[২](ক) ব্রূয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুত। (শ্রীমদ্ভাগবত ১।১।৮, ১০।১৩।৩)
'গুরুজন নিজের প্রিয়তম শিষ্যকে অতিশয় গুপ্ত কথাও জানিয়ে দেন।'

(খ) গূঢ়উ তত্ত্ব ন সাধু দুরাবহিঁ। আরত অধিকারী জহঁ পাবহিঁ॥ (শ্রীরামচরিতমানস, বালকাণ্ড ১১০।১)

অনুভবযুক্ত, যাঁদের আর কিছু করা, জানা এবং পাওয়া বাকি নেই—এরূপ তত্ত্বজ্ঞ জীবন্মুক্ত মহর্ষিগণও আমার প্রকটিত হওয়ার অর্থাৎ আমার অবতারতত্ত্বের, নানাপ্রকার লীলা ও মহত্ত্বের কথা সম্পূর্ণভাবে জানেন না।

ভগবান এখানে দেবতা ও মহর্ষি—এই দুইয়ের কথা বলেছেন। তাতে মনে হয় যে উচ্চপদের দৃষ্টিতে দেবতা এবং জ্ঞানের দৃষ্টিতে মহর্ষির নাম করা হয়েছে। এই দুই পক্ষেরই আমার প্রকটিত হওয়ার বিষয় না জানার কারণ হল যে, আমি সর্বপ্রকারে দেবতাগণ ও মহর্ষিগণের আদিপুরুষ—**'অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্বশঃ'**। তাদের মধ্যে যা কিছু বুদ্ধি, শক্তি, সামর্থ্য, পদ, প্রভাব, মহত্ত্ব আছে, সেসবই তারা আমা হতেই প্রাপ্ত হয়েছে। অতএব আমা হতে প্রাপ্ত প্রভাব-শক্তি-সামর্থ্যের সাহায্যে এরা আমাকে সম্পূর্ণভাবে কী করে জানতে পারবে ? অর্থাৎ তা সম্ভব নয়। বালক যেমন যে মা হতে জন্মলাভ করে সেই মায়ের বিবাহ এবং নিজ শরীরের উৎপত্তির রহস্য জানতে সক্ষম হয় না, তেমনই দেবতা ও মহর্ষিগণ আমা হতেই প্রকটিত, অতএব তারা আমার প্রকটিত হওয়া এবং তাদের নিজের কারণকে জানেন না। কার্য নিজের কারণের মধ্যে লীন হলেও তাকে জানতে সক্ষম হয় না। তেমনই দেবতা এবং মহর্ষিগণ আমা হতে উৎপন্ন হওয়ায়, আমার কার্য হওয়ায়, কারণরূপ আমাকে জানতে সক্ষম হন না, বরং তাঁরা আমাতে লীন হতে পারেন।

তাৎপর্য হল যে দেবতা এবং মহর্ষিগণ ভগবানের আদি, অন্ত এবং বর্তমান সীমাকে অর্থাৎ এটিই হল ভগবানের স্বরূপ কিংবা এতগুলিই হল তাঁর অবতার—এভাবে ভগবানের অবধি জানতে পারেন না। কারণ এইসব দেবতা এবং মহর্ষিদের প্রকটিত হওয়ার আগেও ভগবান যেভাবে যেমনকার তেমন ছিলেন এবং তাঁদের লীন হওয়ার পরেও তিনি সেইভাবেই বিরাজ করবেন। সুতরাং যাঁদের শরীরের আদি ও অন্ত থাকে, সেই দেবতা ও মহর্ষিগণ অনাদি-অনন্তকে অর্থাৎ অসীম পরমাত্মাকে তাঁদের সীমিত বুদ্ধি, যোগ্যতা, সামর্থ্য ইত্যাদির সাহায্যে কীভাবে জানতে পারবেন ? অসীমকে নিজেদের সীমিত বুদ্ধির অন্তর্গত করবেন কী করে ? তা কখনো সম্ভব নয়।

এই অধ্যায়ের চতুর্দশ শ্লোকে অর্জুনও ভগবানকে বলেছেন যে আপনাকে দেবতা বা দানব কেউই জানেন না, কারণ দেবতাদের কাছে ভোগ্যসামগ্রী এবং দানবদের কাছে মায়া শক্তির আধিক্য থাকে। তাৎপর্য হল ভোগে ব্যস্ত থাকায় দেবতাদের (আমাকে জানার জন্য) সময়ই থাকে না আর মায়া শক্তির প্রভাবে ছলচাতুরীর দ্বারা দানবেরা আমাকে জানতে পারে না।

পরিশিষ্ট-ভাব—সপ্তম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে ভগবান **'মনুষ্যাণাং সহস্রেষু'** পদটিতে যা বলেছিলেন, সেই কথাই এইস্থানে **'ন মে বিদুঃ'** পদটিতে বলেছেন। তাঁরা ভগবানকে জানেন না কেন, তার কারণ জানাতে গিয়ে ভগবান বলেছেন—'আমি সর্বপ্রকারেই দেবতা এবং মহর্ষিদের আদি'। সপ্তম অধ্যায়ের ছাব্বিশতম শ্লোকেও ভগবান বলেছেন যে, অতীত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানের সকল প্রাণীদেরই আমি জানি কিন্তু আমাকে কেউই জানে না। তাই অর্জুনও পরে চর্তুদশ-পঞ্চদশ শ্লোকে বলেছেন যে—'আপনাকে দেবতা বা দানব কেউই জানেন না, আপনি স্বয়ংই নিজেকে জানেন।'

এই শ্লোকে ভগবান 'রাজগুহ্য' বিষয়ে বলেছেন। বিদ্যা, বুদ্ধি, যোগ্যতা ও সামর্থ্য ইত্যাদি দ্বারা ভগবানকে জানা যায় না, তাঁকে জানা যায় জিজ্ঞাসুর শ্রদ্ধা বিশ্বাস এবং ভগবৎকৃপা দ্বারা।

***

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে বলা হয়েছে যে দেবতা এবং মহর্ষিগণও ভগবানের প্রকটিত হওয়ার বিষয় সম্পূর্ণভাবে জানেন না, তাহলে মানুষ ভগবানকে কীভাবে জানবে এবং তাদের কল্যাণ কী করে হবে ? পরবর্তী শ্লোকে তার উপায় জানিয়েছেন।

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসম্মূঢ়ঃ স মর্ত্যেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ৩ ॥

[**যঃ** (যারা) ; **মাম্** (আমাকে) ; **অজম্** (অজ) ; **অনাদিম্, চ** (অনাদি এবং) ; **লোকমহেশ্বরম্** (সর্বলোকের মহেশ্বর) ;

বেত্তি (জানে) ; সঃ, মর্ত্যেষু (মানুষের মধ্যে তারা) ; অসম্মূঢ় (জ্ঞাতা এবং) ; সর্বপাপৈঃ (সমস্ত পাপ হতে) ; প্রমুচ্যতে (মুক্ত হন।)]

যাঁরা আমাকে অজ, অনাদি এবং সর্বলোকের মহেশ্বর বলে জানেন অর্থাৎ দৃঢ়তার সঙ্গে (নিঃসন্দেহে) মেনে নেন, মানুষের মধ্যে তাঁরাই জ্ঞানী এবং সমস্ত পাপ হতে তাঁরা মুক্ত হন॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা—'যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্'—আগের শ্লোকে ভগবানের প্রকটিত হওয়াকে জানার বিষয় বলে বলা হয়নি। এটি মানুষও জানে না, কিন্তু যতটুকু জানলে মানুষ তার নিজের কল্যাণ করতে সক্ষম হয়, ততটা সে জানতেই পারে। সেই জানা অর্থাৎ মানা হল এই যে, ভগবান অজ অর্থাৎ তিনি হলেন জন্মরহিত। তিনি অনাদি অর্থাৎ এই যে কাল, যাতে আদি-অনাদি শব্দ প্রযুক্ত হয়, ভগবান সেই কালেরও কাল। সেই কালাতীত ভগবানে কালেরও আদি ও অন্ত হয়। ভগবান সর্বলোকের মহেশ্বর অর্থাৎ স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতালরূপ যে ত্রিলোক এবং সেই ত্রিলোকে যত প্রাণী এবং সেই প্রাণীদের অধিদেবতা (পৃথক্ পৃথক্ অধিকার প্রাপ্ত প্রভু) আছেন তাঁদেরও মহেশ্বর হলেন ভগবান স্বয়ং। এইভাবে জানলে অর্থাৎ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সহকারে দৃঢ়ভাবে মেনে নিলে ভগবান যে অজ, অবিনাশী এবং লোক মহেশ্বর—তাতে তার কোনোরূপ সন্দেহ আসে না।

'অসম্মূঢ় স মর্ত্যেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে'—ভগবানকে অজ, অবিনাশী এবং মহেশ্বর জানলে মানুষ পাপাদি থেকে কীভাবে মুক্ত হবে ? ভগবান জন্মরহিত এবং নাশরহিত অর্থাৎ তাঁতে কখনো বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয় না। তিনি অজ এবং অবিনাশী হয়েও সকলের মহেশ্বর। তিনি সর্বদেশব্যাপী হওয়ায় এখানেও অবস্থিত, সর্বসময় বিরাজমান হওয়ায় এখনও উপস্থিত, সকলের হওয়ায় তিনি আমারও এবং সকলের প্রভু হওয়ায় তিনি আমারও প্রভু—দৃঢ়তার সঙ্গে এটি মেনে নিতে হয়। এতে যেন কোনোপ্রকার সন্দেহ না থাকে। সেই সঙ্গে এই যে ক্ষণভঙ্গুর জগৎ, প্রতিমুহূর্তে এর পরিবর্তন হচ্ছে এবং একে যেক্ষণে যেরূপে দেখা হয় পরমুহূর্তে আর দ্বিতীয়বার সেইরূপে দেখা যায় না ; কারণ তা পরমুহূর্তে আর সেইরূপ থাকে না—এইভাবে জগৎকে যথার্থরূপে জানতে হয়। যিনি নিজেকে সহ সমস্ত জগতের প্রভুরূপে ভগবানকে দৃঢ়ভাবে মেনে নিয়েছেন এবং জগতের ক্ষণভঙ্গুরতাকে তত্ত্বতঃ জেনেছেন, তাঁর জগতে 'আমি' এবং 'আমার' ভাব থাকতে পারে না ; একমাত্র ভগবানেই তাঁর আত্মীয়তাবোধ জন্মায়। তাহলে তিনি পাপ থেকে মুক্ত হবেন না তো কে হবে ? এরূপ মোহশূন্য ব্যক্তিই ভগবানকে তত্ত্বতঃ অজ, অবিনাশী এবং মহেশ্বর রূপে জানতে পারে এবং সর্বপাপ হতে মুক্ত হয়। তার ক্রিয়মাণ এবং সঞ্চিত সমস্ত কর্ম নাশ হয়। মানুষের এটি বাস্তবিক-ভাবে অনুভব করা প্রয়োজন, কেবল তোতাপাখির মতো শিখলে হবে না, কারণ শেখা জ্ঞানের দ্বারা বিশেষ কোনো লাভ হয় না।

অসম্মূঢ়তা কী ? জগৎ-সংসার (শরীর) কারও সঙ্গে চিরকাল থাকে না এবং কেউই জগৎ-সংসারে চিরকাল থাকে না, পরমাত্মা কখনো কারও থেকে পৃথক্ হতে পারেন না বা কেউই কখনো পরমাত্মা থেকে পৃথক্ হতে পারে না—এই হল প্রকৃত সত্য। এই বাস্তবিক তথ্য না জানাই হল অসম্মূঢ়তা। যার মধ্যে এই অসম্মূঢ়তা থাকে তাকে বলা হয় অসম্মূঢ়। এইরূপ অসম্মূঢ় ব্যক্তিরাই আমার সগুণ-নির্গুণ সাকার-নিরাকার রূপ তত্ত্বতঃ জানতে পারেন, তাই তাঁরা আমার লীলা, রহস্য, প্রভাব, ঐশ্বর্য ইত্যাদিতে কখনো সন্দিহান হন না।

পরিশিষ্ট-ভাব—নবম অধ্যায়ের চব্বিশতম শ্লোকে ভগবান ব্যতিরেক রীতিতে বলেছেন যে, যারা আমাকে জানে না, তাদের পতন হয় আর এখানে অন্বয় রীতিতে বলেছেন যাঁরা আমাকে জানেন, তাঁরা সমস্ত পাপ হতে মুক্ত হন।

'বেত্তি' কথাটির অর্থ এখানে হল—দৃঢ়তাপূর্বক, সন্দেহ রহিত হয়ে স্বীকার করে নেওয়া। কারণ ভগবানকে ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি দ্বারা জানা সম্ভব নয় (গীতা ১০।২)। সুতরাং ভগবান জানার বিষয় নয়, তিনি হলেন মানার ও উপলব্ধি করার বিষয়। প্রকৃতিকেই যখন জানা সম্ভব হয় না, তাহলে প্রকৃতির অতীত ভগবান কী করে জ্ঞানগম্য হতে পারেন ? অনুভব করার অর্থ হল—নিজেকে ভগবানে লীন করে দেওয়া, ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যাওয়া। ভগবানের সঙ্গে

অভিন্ন হলেই ভগবানকে জানা সম্ভব, কারণ প্রকৃতপক্ষে জীব অভিন্নই। (এইরূপ সংসার থেকে পৃথক্ হয়েই সংসারকে জানা সম্ভব হয় ; কারণ প্রকৃতপক্ষে জীব সংসার থেকে পৃথক্‌ই।)

মহর্ষিগণ ভগবানের আদি জানতে সক্ষম না হলেও ভগবান যে অজ এবং অনাদি তা তাঁরা সম্যক্‌ভাবে জানেন। ভগবানের অংশ হওয়ায় জীবও অজ এবং অনাদি। সুতরাং তাঁরা ভগবানকে অজ ও অনাদিরূপে জানলে নিজেদেরও সেইভাবে (অজ-অনাদিরূপে) জানতে পারেন ; কেন-না জীব ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন হয়েই ভগবানকে জানতে সক্ষম হয়। নিজেকে অজ-অনাদি জানলে জীব মূঢ়ত্ব-রহিত হতে পারে, তখন আর তাদের পাপ বলে কিছু থাকে না। কারণ জীব বস্তুতঃ অজ-অনাদি, পাপে সে পরে আবদ্ধ হয়। **'সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে'** কথাটির অর্থ হল—গুণাদি সঙ্গ বর্জিত হওয়া। গুণাদির সঙ্গ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ মানুষ পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে না, কারণ পাপের মূল কারণই হল গুণাদির সঙ্গ।

পরবর্তী চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শ্লোক পর্যন্ত অসম্মূঢ়তা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যেখানে ভগবান নিজেকে সকলের 'আদি' বলে জানিয়েছেন। ভগবান নিজে 'অনাদি' এবং ভাবের ও মহর্ষিদের তিনি 'আদি'।

***

সম্বন্ধ—ভগবান প্রথম শ্লোকে যে পরম বচন শোনার নির্দেশ দিয়েছিলেন, পরবর্তী তিনটি শ্লোকে সেইকথা জানাচ্ছেন।

বুদ্ধির্জ্ঞানমসম্মোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ং চাভয়মেব চ॥ ৪ ॥
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ॥ ৫ ॥

[**বুদ্ধিঃ** (বুদ্ধি) ; **জ্ঞানম্** (জ্ঞান) ; **অসম্মোহঃ** (অসম্মোহ) ; **ক্ষমা** (ক্ষমা) ; **সত্যম্** (সত্য) ; **দমঃ, শমঃ** (দম, শম) ; **এব, সুখম্** (সুখ) ; **দুঃখম্** (দুঃখ) ; **ভবঃ** (উৎপত্তি) ; **অভাবঃ** (অভাব) ; **ভয়ম্, অভয়ম্** (ভয়, অভয়) ; **চ, অহিংসা** (অহিংসা) ; **সমতা** (সমতা) ; **তুষ্টিঃ** (তুষ্টি) ; **তপঃ, দানম্** (তপ, দান) ; **যশঃ, চ** (যশ এবং) ; **অযশঃ** (অপযশ) ; **ভূতানাম্** (প্রাণীদের) ; **পৃথগ্‌বিধাঃ** (নানাপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন) ; **ভাবাঃ** (ভাব) ; **মত্তঃ, এব** (আমা হতেই) ; **ভবন্তি** (উৎপন্ন হয়।)]

বুদ্ধি, জ্ঞান, অসম্মোহ, ক্ষমা, সত্য, দম, শম, সুখ, দুঃখ, ভব (উৎপত্তি), অভাব (লয়), ভয়, অভয়, অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপ, দান, যশ এবং অপযশ—প্রাণীদের এইপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন (কুড়ি প্রকারের) ভাব আমার থেকেই উৎপন্ন হয়॥ ৪-৫ ॥

ব্যাখ্যা—**'বুদ্ধিঃ'**—কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে নিশ্চয়কারী বৃত্তিকে বলা হয় 'বুদ্ধি'।

'জ্ঞানম্'—সার-অসার, গ্রাহ্য-অগ্রাহ্য, নিত্য-অনিত্য, সৎ-অসৎ, উচিত-অনুচিত, কর্তব্য-অকর্তব্য—এই বিবেক অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন রূপে জানা, একেই বলা হয় 'জ্ঞান'। মানুষমাত্রেই ভগবানের থেকে এই জ্ঞান (বিবেক) লাভ করেছে।

'অসম্মোহঃ'—শরীর এবং জগৎ-সংসারকে উৎপত্তি-বিনাশশীল জেনেও তাতে 'আমি' এবং 'আমার' এই ভাব করাকেই বলা হয় সম্মোহ আর এই ভাব না করাকে বলা হয় 'অসম্মোহ'।

'ক্ষমা'—কেউ আমার প্রতি যত বড় অপরাধই করুক, প্রতিকারের সামর্থ্য থাকলেও সেটিকে সহ্য করা এবং সেই অপরাধী আমার কাছ থেকে বা ভগবানের কাছে ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও যেন শাস্তি না পায়— এই রকম মনোভাবকে বলা হয় 'ক্ষমা'।

'সত্যম্'—সত্যস্বরূপ পরমাত্মাকে লাভের উদ্দেশ্যে সত্য বাক্য বলা অর্থাৎ যেমন শোনা হয়েছে, দেখা হয়েছে এবং বোঝা হয়েছে, সেই অনুযায়ী স্বার্থ এবং অভিমান পরিত্যাগপূর্বক অন্যের হিতের জন্য বেশি বা কম না করে যেমন আছে তেমনই বাক্য বলাকে বলা হয় 'সত্য'।

'দমঃ শমঃ'—পরমাত্মাপ্রাপ্তির উদ্দেশ্য নিয়ে ইন্দ্রিয়গুলিকে তাদের নিজ নিজ বিষয় থেকে সরিয়ে নিজের বশে রাখাকে বলা হয় 'দম' এবং মনকে জাগতিক

ভোগের চিন্তা থেকে সরিয়ে রাখাকে বলা হয় 'শম'।

'সুখং দুঃখম্'—শরীর, মন, ইন্দ্রিয়াদির অনুকূল পরিস্থিতি প্রাপ্ত হলে হৃদয়ে যে প্রসন্নতা আসে, তাকে বলা হয় 'সুখ' এবং প্রতিকূল পরিস্থিতি প্রাপ্ত হলে হৃদয়ে যে অপ্রসন্নতা আসে তাকে বলা হয় 'দুঃখ'।

'ভবোঽভাবঃ'—সাংসারিক বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা, পরিস্থিতি, ভাব ইত্যাদি উৎপন্ন হওয়াকে বলা হয় 'ভব' আর এগুলি সব লীন হওয়াকে বলা হয় 'অভাব'।

'ভয়ং চাভয়মেব চ'—নিজের আচরণ, ভাব ইত্যাদি শাস্ত্র ও লোকমর্যাদার বিরুদ্ধ হলে চিত্তে অনিষ্ট হওয়ার যে এক আশঙ্কা উৎপন্ন হয়, তাকে বলা হয় 'ভয়'। মানুষের আচরণ, ভাব যদি ভালো হয়, যদি সে কাউকে দুঃখ না দেয়, শাস্ত্র এবং সন্তদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনো কাজ না করে, তাহলে তার চিত্তে নিজের অনিষ্ট হওয়ার কোনো আশঙ্কা থাকে না অর্থাৎ তার কারো থেকে ভয় হয় না, একে বলা হয় 'অভয়'।

'অহিংসা'—কায়-মন-বাক্যে কোথাও, কখনো যে কোনো পরিস্থিতি ইত্যাদিতে কোনো প্রাণীকে বিন্দুমাত্র দুঃখ না দেওয়াকে বলা হয় 'অহিংসা'।

'সমতা'—নানাপ্রকার অনুকূল এবং প্রতিকূল বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদি প্রাপ্ত হলেও চিত্তে কোনো বিষম ভাব না আসাকেই বলা হয় 'সমতা'।

'তুষ্টিঃ'—বেশি প্রয়োজন থাকলেও অল্প প্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট থাকা এবং আরও প্রাপ্তি ঘটুক—এরূপ ইচ্ছা না থাকাকে বলা হয় 'তুষ্টি'। তাৎপর্য হল যে প্রাপ্তি হোক বা না হোক, কম অথবা বেশি যাই প্রাপ্তি হোক—এইরকম সব অবস্থাতেই প্রসন্ন থাকাকে বলা হয় 'তুষ্টি'।

'তপঃ'—নিজের কর্তব্য পালন করতে গিয়ে যে কষ্ট আসে, প্রতিকূল পরিস্থিতি আসে, সেইসবগুলিকে প্রসন্নতা সহকারে সহ্য করাকে বলা হয় 'তপ'। একাদশী ব্রত ইত্যাদি পালনকেও বলা হয় 'তপ'।

'দানম্'—প্রত্যুপকার এবং ফলের কোনো আকাঙ্ক্ষা না রেখে প্রসন্নভাবে নিজের সৎ উপার্জন কোনো সৎপাত্রকে দেওয়াকে বলা হয় 'দান' (গীতা ১৭।২০)।

'যশোঽযশঃ'—মানুষের ভালো ব্যবহার, ভাব এবং গুণাদি নিয়ে জগতে যে খ্যাতি, গৌরব, প্রশংসা ইত্যাদি হয়, তাকে বলা হয় 'যশ'। মানুষের দুর্ব্যবহার, কুভাব এবং দুর্গুণাদি নিয়ে জগতে যে নিন্দা ইত্যাদি হয়, তাকে বলা হয় 'অযশ' (অপযশ)।

'ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্‌বিধাঃ'—প্রাণীদের এই নানাপ্রকার ভাব আমা হতেই উৎপন্ন হয় অর্থাৎ তাদের সত্তা, স্ফূর্তি, শক্তি, আধার এবং প্রকাশ আমা হতেই প্রাপ্ত হয়ে থাকে। তাৎপর্য হল এই যে তত্ত্বতঃ সবেরই মূলে আমি।

এখানে **'মত্তঃ'** পদটির দ্বারা ভগবানের যোগ, সামর্থ্য, প্রভাব এবং **'পৃথগ্‌বিধাঃ'** পদটির দ্বারা নানাপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন বিভূতির কথা বুঝতে হবে।

জগতে যা কিছু বিহিত এবং নিষিদ্ধ কর্ম হচ্ছে, শুভাশুভ কার্যাদি হচ্ছে এবং জগতে যত সদ্ভাব এবং দুর্ভাব রয়েছে, তা সবই ভগবানের লীলা—ভক্ত এইভাবে ভগবানকে তত্ত্বতঃ জেনে নিলে তাঁর ভগবানে অকম্পিত (অবিচল) যোগ স্থাপিত হয় (গীতা ১০।৭)।

এখানে প্রাণীগণের যে কুড়ি প্রকার ভাব বলা হয়েছে, সেগুলির মধ্যে বারোটি ভাব এক এক প্রকারের (একক) এবং সেগুলি সবই চিত্তে উৎপন্ন হয়। আবার ভয়ের সঙ্গে আসা অভয়ও চিত্তে উৎপাদিত ভাব। অবশিষ্ট সাতটি ভাব পরস্পরবিরোধী। তার মধ্যে ভব (উৎপত্তি) অভাব (লয়), যশ এবং অযশ—এই চারটি হল প্রাণীদের পূর্বকৃত কর্মের ফল। সুখ, দুঃখ ও ভয়—এই তিনটি মূর্খতার ফল। এই মূর্খতাকে মানুষ নিজেই দূর করতে সক্ষম।

এখানে প্রাণীদের উক্ত কুড়িটি ভাব ভগবানের থেকে উৎপন্ন এবং তাঁরই বিভূতিরূপে জানানোর তাৎপর্য হল এই যে, এই কুড়িটি ভাব ভিন্ন ভিন্ন হলেও এই ভাবগুলির আধার একমাত্র আমিই। এইসবের মূলে আমিই অবস্থিত, এগুলি আমা হতেই উৎপন্ন এবং আমা হতেই অস্তিত্ব ও স্ফূর্তি লাভ করে। সপ্তম অধ্যায়ের দ্বাদশতম শ্লোকেও ভগবান **'মত্ত এব'** পদের দ্বারা জানিয়েছেন যে সাত্ত্বিক, রাজস এবং তামস ভাব আমা থেকেই হয় অর্থাৎ সেগুলির মূলে আমিই রয়েছি। সেগুলি আমার থেকেই হয় এবং আমার থেকেই সত্তা-স্ফূর্তি লাভ করে। সুতরাং এখানেও ভগবানের অভিপ্রায় হল সাধকের দৃষ্টি বিভূতির মূলতত্ত্বের দিকে ফেরানো।

বিশেষ কথা

সাধক জগৎ-সংসারকে কীভাবে দেখবেন ? তিনি দেখবেন যে জগতের যা কিছু ক্রিয়া, পদার্থ, ঘটনা ইত্যাদি

আছে, তা সবই ভগবানের রূপ ! উৎপত্তি হোক বা লয়, অনুকূলতা হোক বা প্রতিকূল অবস্থা, মৃত্যু হোক বা জীবন, স্বর্গ হোক বা নরক, সবই ভগবানের লীলা। ভগবানের লীলায় বালকাণ্ডও যেমন আছে, তেমনি অযোধ্যাকাণ্ডও আছে, অরণ্যকাণ্ডও আছে, লঙ্কাকাণ্ডও আছে। নগরের মধ্যে লক্ষ্য করলে দেখা যায় অযোধ্যা নগরীতে ভগবান সশরীরে আছেন, রাজা, রানী এবং প্রজাদের মধ্যে থাকে বাৎসল্য ভাব। জনকপুরীতে শ্রীরামের প্রতি রাজা জনক, মহারানী সুনয়না এবং প্রজাদের বিশেষ বিশেষ ভাব। তাঁরা শ্রীরামকে জামাতা-রূপে আদর-আপ্যায়ন করেন। বনে (অরণ্য-কাণ্ডে) ভক্তদের সঙ্গে মিলন হয় আবার রাক্ষসদের সঙ্গেও মিলন হয়। লঙ্কানগরীতে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, হানাহানি হয়, রক্তের নদী প্রবাহিত হয়। এইভাবে ভিন্ন ভিন্ন নগরীতে ভিন্ন ভিন্ন কাণ্ডে ভগবানের বিভিন্ন প্রকার লীলা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু নানাপ্রকার লীলা অনুষ্ঠিত হলেও এ সবই রামায়ণের অঙ্গ এবং এইসব বিষয়ের সাহায্যেই রামায়ণ সর্বাঙ্গীণভাবে সুন্দর হয়ে উঠেছে। জগতেও এইরকম প্রাণীদের বিভিন্ন প্রকার ভাব থাকে। কোথাও কেউ হয়ত আনন্দে হাস্য করছে, আবার কোথাও কেউ দুঃখে ক্রন্দন করছে, কোথাও বিদ্বদ্‌সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, কোথাও কারও জন্ম হচ্ছে, আবার কোথাও কেউ মারা যাচ্ছে ইত্যাদি। এই যে নানাপ্রকার কার্য হয়ে চলেছে, এ সবই ভগবানের লীলা। লীলাকারীগণ সকলেই ভগবানের রূপ। ভক্তদের দৃষ্টি এইভাবে সর্বদা ভগবানের ওপরই থাকা উচিত। কারণ এই সবেরই মূলে এক পরমাত্মতত্ত্বই বিরাজমান।

পরিশিষ্ট-ভাব—জ্ঞান-দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যায় যে সকল ভাবই প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন হয়, কিন্তু ভক্তি-দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যায় সকল ভাব উৎপন্ন হয় ভগবান থেকে। যদি এই ভাবগুলিকে জীবের বলে মনে করা হয় তাহলে, জীবও ভগবানের পরাপ্রকৃতি হওয়ায় ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন ; সুতরাং এই ভাবও ভগবানেরই। এই ভাব ভগবানের মধ্যে নিত্য-নিরন্তর বিদ্যমান, কিন্তু অপরার সঙ্গ করায় জীবে এই ভাব আসা-যাওয়া করে। ভগবান থেকে উৎপন্ন হওয়ায় এই সব ভাবই ভগবৎস্বরূপ।

'পৃথগ্‌বিধাঃ' কথাটির তাৎপর্য হল এই যে, যেমন হস্ত একটি হলেও তাতে আঙুল পৃথক্‌ পৃথক্‌ হয়, তেমনই ভগবানও এক, শুধু তাঁতে ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রকটিত হয়ে থাকে। এক ভগবানেই নানাপ্রকার পরস্পরবিরুদ্ধ ভাব একই সঙ্গে বিদ্যমান থাকে।

※ ※ ※

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ॥ ৬ ॥

[**সপ্ত** (সপ্ত) ; **মহর্ষয়ঃ** (মহর্ষি) ; **পূর্বে** (তাঁদের পূর্ববর্তী) ; **চত্বারঃ, তথা** (চার সনকাদি এবং) ; **মনবঃ** (চতুর্দশ মনু) ; **মানসাঃ** (মন হতে) ; **জাতাঃ** (উৎপন্ন) ; **মদ্‌ভাবাঃ** (আমার প্রতি ভাব সম্পন্ন) ; **যেষাম্‌** (যাঁদের থেকে) ; **লোকে** (জগতের) ; **ইমাঃ, প্রজাঃ** (এই সমস্ত প্রজা উৎপন্ন হয়েছে।)]

সপ্তমহর্ষি এবং তাঁদের পূর্ববর্তী চার সনকাদি এবং চতুর্দশ মনু—এঁরা সকলেই আমার মন হতে উৎপন্ন এবং আমার প্রতি ভাব (শ্রদ্ধা-ভক্তি) সম্পন্ন, যাঁদের থেকে জগতের এই সমস্ত প্রজা উৎপন্ন হয়েছে॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা—[পূর্ববর্তী দুটি শ্লোকে ভগবান প্রাণীদের ভাবরূপের কুড়িটি বিভূতির কথা জানিয়েছেন। এই শ্লোকে এবার ব্যক্তিরূপের পঁচিশটি বিভূতির কথা জানাচ্ছেন—যাঁরা প্রাণীদের মধ্যে বিশেষ প্রভাবসম্পন্ন এবং জগতের কারণ।]

'মহর্ষয়ঃ সপ্ত'—যাঁরা দীর্ঘায়ু, মন্ত্র প্রকাশকারী, ঐশ্বর্যশালী, দিব্য-দৃষ্টিসম্পন্ন, গুণ, বিদ্যা ইত্যাদিতে প্রাজ্ঞ ; ধর্মদ্রষ্টা এবং গোত্র প্রবর্তনকারী—এরূপ সপ্তগুণ-সম্পন্ন ঋষিদের সপ্তর্ষি বলা হয়[১]। মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি,

[১]সপ্তৈতে সপ্তভিশ্চৈব গুণৈঃ সপ্তর্ষয়ঃ স্মৃতাঃ॥
দীর্ঘায়ুষো মন্ত্রকৃত ঈশ্বরো দিব্যচক্ষুষঃ। বৃদ্ধাঃ প্রত্যক্ষধর্মাণো গোত্রপ্রবর্তকাশ্চ যে॥ (বায়ুপুরাণ ৬১।৯৩-৯৪)

পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ—এই সপ্ত ঋষি উপরিউক্ত সপ্তগুণ বিশিষ্ট। এই সাতজনই বেদবেত্তা, এঁদের বেদের আচার্য বলে মানা হয়। এই সপ্তর্ষিগণ প্রবৃত্তি-ধর্মের সঞ্চালনকারী এবং প্রজাপতির কার্যে নিযুক্ত[১]। এই সাত ঋষিকেই এখানে 'মহর্ষি' বলা হয়েছে।

'পূর্বে চত্বারঃ'—সনক, সনন্দন, সনাতন এবং সনৎকুমার—ব্রহ্মার তপস্যার ফলে এই চারজনই সর্বপ্রথম প্রকটিত হন। এঁরা প্রত্যেকেই ভগবদ্স্বরূপ। সবার আগে প্রকটিত হলেও এঁরা সর্বদা পাঁচ বৎসরের বালকের মতো অবস্থান করেন। এঁরা ত্রিলোকে জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্য প্রচার করেন। এঁরা সর্বক্ষণ **'হরিঃ শরণম্'** উচ্চারণ করেন[২]। এঁরা ভগবৎ-কথার খুবই প্রেমিক। তাই এই চারজনের একজন বক্তা এবং অপর তিনজন শ্রোতা হয়ে ভগবৎপ্রসঙ্গ আলোচনা করে থাকেন।

'মনবস্তথা'—ব্রহ্মার একদিনে (কল্পে) চতুর্দশ মনু উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মার বর্তমান কল্পে স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি এবং ইন্দ্রসাবর্ণি নামধেয় চতুর্দশ মনু আছেন,[৩] এঁরা সবাই ব্রহ্মার নির্দেশে সৃষ্টির উৎপাদক এবং প্রবর্তক।

'মানসা জাতাঃ'—সৃষ্টিমাত্রেই ভগবানের সংকল্প থেকে উৎপন্ন। কিন্তু এখানে সপ্তর্ষিকে বলা হয়েছে তাঁরা ভগবানের মানসজাত। তার কারণ হল সৃষ্টি বিস্তারকারী হওয়ায় সৃষ্টিতে এঁদের প্রাধান্য থাকে। অপর কারণ এঁরা সকলেই ব্রহ্মার মানসজাত অর্থাৎ ব্রহ্মার সংকল্প থেকে উদ্ভূত। স্বয়ং ভগবানই জগৎ-সৃষ্টির জন্য ব্রহ্মারূপে প্রকটিত হয়ে থাকেন। সুতরাং সাত মহর্ষি, চার সনকাদি এবং চতুর্দশ মনু—এই পঁচিশজনকে ব্রহ্মার মানসপুত্রই বলা হোক বা ভগবানের মানসপুত্র বলা হোক, একই কথা।

'মদ্ভাবাঃ'—এঁরা সকলেই আমার প্রতি ভাব অর্থাৎ শ্রদ্ধা-প্রেমসম্পন্ন।

'যেষাং লোকমিমাং প্রজাঃ'—জগতে দুই প্রকারের প্রজা (প্রাণী) আছে (১) স্ত্রী-পুরুষের সংযোগে উৎপন্ন এবং (২) শব্দ (দীক্ষা, মন্ত্র, উপদেশ) হতে উৎপন্ন। সংযোগ হতে উদ্ভূত প্রজাদের বলা হয় 'বিন্দুজ' আর শব্দ হতে উৎপন্ন প্রজাদের বলা হয় 'নাদজ'। বিন্দুজ প্রজা পুত্র (বংশ) পরম্পরা থেকে এবং নাদজ প্রজা শিষ্য পরম্পরা থেকে চলে আসছে।

সপ্ত ঋষি এবং চতুর্দশ মনু বিবাহিত ছিলেন তাই তাঁদের থেকে উদ্ভূত প্রজারা হল 'বিন্দুজ প্রজা'। কিন্তু সনকাদি বিবাহ করেননি, তাই তাঁদের উপদেশ প্রাপ্ত হয়ে পারমার্থিক পথে অগ্রসর হওয়া ব্যক্তিদের বলা হয় 'নাদজ প্রজা'। নিবৃত্তিপরায়ণ যত সাধু মহাপুরুষ পূর্বে ছিলেন, বর্তমানে আছেন এবং ভবিষ্যতে হবেন, তাঁরা সকলকেই উপলক্ষণ দ্বারা তাঁদেরই নাদজ প্রজা বলা হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব—সপ্ত মহর্ষি, চার সনকাদি ও চতুর্দশ মনু—এঁরা সকলেই ভগবানের মন হতে উৎপন্ন হওয়ায়, ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন।

***

সম্বন্ধ—চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শ্লোক পর্যন্ত প্রাণীদের ভাব এবং ব্যক্তিদের রূপে তাঁর বিভূতি এবং যোগের (প্রভাবের) বর্ণনা করে এবার পরবর্তী শ্লোকে সেগুলিকে তত্ত্বতঃ জানলে কী ফল হয় তাই জানাচ্ছেন।

---

[১]মরীচিরঙ্গিরাশ্চাত্রিঃ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ। বশিষ্ঠ ইতি সপ্তৈতে মানসা নির্মিতা হি তে॥
এতে বেদবিদো মুখ্যা বেদাচার্যাশ্চ কল্পিতাঃ। প্রবৃত্তিধর্মিণশ্চৈব প্রাজাপত্যে চ কল্পিতাঃ॥

(মহাভারত, শান্তিপর্ব. ৩৪৭।৬৯।৭০)

[২]হরিঃ শরণমেবং হি নিত্যং যেষাং মুখে বচঃ।

(পদ্মপুরাণোক্ত শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য ২।৪৮)

[৩]শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের প্রথমে, পঞ্চমে এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এঁদের বিস্তারিত বর্ণনা আছে।)

ব্রহ্মার একদিন হয় এক হাজার চতুর্যুগে। তার মধ্যে প্রতিটি মনুর রাজ্যকাল একাত্তর চতুর্যুগের কিছু বেশি সময় বলে মনে করা হয়। এখন ব্রহ্মার একান্ন বছর আয়ুষ্কাল চলছে এবং সপ্তম মনু 'বৈবস্বতের' রাজ্যকাল চলছে।

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৭ ॥

[**যঃ, মম** (যে ব্যক্তি আমার) ; **এতাম্, বিভূতিম্, চ** (এই বিভূতি এবং) ; **যোগম্** (যোগৈশ্বর্য) ; **তত্ত্বতঃ** (তত্ত্বতঃ) ; **বেত্তি** (জানেন) ; **সঃ** (তিনি) ; **অবিকম্পেন** (অবিচল) ; **যোগেন** (ভক্তিযোগে) ; **যুজ্যতে** (যুক্ত হন) ; **অত্র** (এতে) ; **ন, সংশয়ঃ** (সংশয় নেই।)]

যে ব্যক্তি আমার এই বিভূতি এবং যোগৈশ্বর্য তত্ত্বতঃ জানেন অর্থাৎ দৃঢ়ভাবে মেনে নেন, তিনি অবিচলিত ভক্তিযোগে যুক্ত হন ; এতে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা—'এতাং বিভূতিং যোগং চ মম'—অত্যন্ত নিকটের কথাটি জানাবার জন্য **'এতাম্'** সর্বনাম ব্যবহৃত হয়। এখানে এই শব্দটি চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শ্লোক পর্যন্ত কথিত বিভূতি ও যোগকে নির্দিষ্ট করে।

ভগবানের ঐশ্বর্যকে 'বিভূতি' বলে এবং ভগবানের অলৌকিক বিশেষ শক্তি ও সামর্থ্যকে বলা হয় 'যোগ'। তাৎপর্য হল যে ভগবানের শক্তিকে বলা হয় 'যোগ' এবং সেই যোগ দ্বারা প্রকটিত ব্যক্তি, বস্তু, পদার্থ আদিকে বলা হয় 'বিভূতি'। চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শ্লোক পর্যন্ত কথিত ভাব এবং ব্যক্তির রূপে যত বিভূতি আছে, তা সবই ভগবানের সামর্থ্য এবং প্রভাব থেকে প্রকটিত বিশেষত্ব এবং 'আমা হতেই উৎপন্ন হয়' (**'মত্তঃ'** ; **'মানসা জাতাঃ'**)— এই হল ভগবানের যোগ বা প্রভাব। একেই নবম অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে **'পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্'** (আমার এই ঈশ্বরীয় যোগ দেখো) পদের দ্বারা বলা হয়েছে। এইরূপেই পরবর্তী একাদশ অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখানোর সময় ভগবান **'পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্'** পদটির দ্বারা তাঁর ঐশ্বর্যপূর্ণ যোগ অবলোকন করতে বলেছিলেন।

বিশেষ কথা

মানুষ যখন ভোগবুদ্ধি সহকারে ভোগাস্বাদন করে, তার থেকে সুখ আস্বাদন করে, তখন তার শক্তির হ্রাস হয় এবং ভোগ্যবস্তুর বিনাশ হয়। এইভাবে উভয়দিকেই ক্ষতি হয়। কিন্তু যখন সে ভোগবুদ্ধির সাহায্যে ভোগাস্বাদন করে না অর্থাৎ তার মধ্যে ভোগবাসনার লেশমাত্র থাকে না, তখন তার শক্তি হ্রাস পায় না। তার শক্তি, সামর্থ্য সবসময় বজায় থাকে।

প্রকৃতপক্ষে ভোগে সুখ নেই, ভোগের সংযমেই সুখ। সংযম দুই প্রকারের—১) অন্যের ওপর শাসনরূপ সংযম এবং ২) নিজের ওপর শাসনরূপ সংযম। অন্যের ওপর শাসনরূপ সংযম হল—অপরের দুঃখ যেন দূর হয় এবং তারা সুখে থাকে—এই ভাব নিয়ে তাদের কুপথ থেকে সরিয়ে সৎপথে নিয়ে আসা। নিজের ওপর শাসনরূপ সংযম হল—'নিজ স্বার্থ এবং অহংকার পরিত্যাগ করা এবং নিজে কোনোরূপ সুখভোগ না করা।' এই দুটি সংযমের নামই হল 'যোগ' বা 'প্রভাব'। এরূপ যোগ বা প্রভাব সামগ্রিকভাবে পরমাত্মাতে স্বতঃ স্বাভাবিকভাবে হয়। অন্যের কাছে এটি সাধন-সাধ্য হয়ে থাকে।

স্বার্থ এবং অহংকারপূর্বক কাউকে শাসন করলে, তার ওপর হুকুম চালালে সে যদি বশীভূত হয় তাহলে শাসনকর্তার একপ্রকার সুখ হয়। এই সুখে শাসকের শক্তি ও সামর্থ্য ক্ষীণ হয়ে আসে এবং যাকে শাসন করে সে পরাধীন হয়ে পড়ে। তাই স্বার্থ ও অভিমান সহকারে অপরকে শাসন করার থেকে স্বার্থ ও অহং-অভিমান সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করে 'সকলের মঙ্গল হোক, তারা যেন নশ্বর ভোগাদিতে আবদ্ধ না হয়, অনাদিকাল থেকে মানুষ যে অনন্ত দুঃখ ভোগ করে এসেছে, তারা সেই দুঃখ থেকে যেন মুক্তি পায় এবং মহৎ আনন্দ লাভ করে'— এইরূপ মনোভাব রেখে অপরকে শাসন করাই হল শ্রেষ্ঠ এবং বিশেষ শাসন (সংযম)। এই শাসনের শেষ কথা হল—ভগবানের শাসন অর্থাৎ সংযম। এরই নাম যোগ।

সমতা, সম্বন্ধ এবং সামর্থ্যকে বলা হয় 'যোগ'। স্থির যে পরমাত্মতত্ত্ব, তা থেকেই অসীম সামর্থ্যের উদ্ভব হয়। কারণ এই নির্বিকার পরমাত্মতত্ত্বই হল মহাসামর্থ্যশালী। এর সমান সামর্থ্য কিছুতে হয়নি, হবে না এবং হওয়া সম্ভবপর নয়। মানুষ যদি নিষ্কাম হয়, তবে আংশিক রূপে এই সামর্থ্য লাভ করে থাকে। কারণ কামনা দ্বারা শক্তি ক্ষয় হয় আর নিষ্কাম হলে শক্তি সঞ্চিত হয়।

মানুষ কাজ করতে করতে যখন পরিশ্রান্ত হয় তখন বিশ্রাম করলে আবার কাজ করার শক্তি ফিরে পায়। কথা বলতে বলতে যদি ক্লান্ত হয় তাহলে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলে পুনরায় কথা বলার শক্তি অর্জন করে, বেঁচে থাকায় প্রাণশক্তি ফুরিয়ে গেলে মৃত্যু হয় এবং আবার বাঁচার শক্তি ফিরে আসে। সর্গে শক্তি ক্ষীণ হয় এবং প্রলয়কালে শক্তি সঞ্চিত হয়। তাৎপর্য এই যে, প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক থেকে শক্তি ক্ষীণ হয় এবং তার থেকে সম্পর্ক-বিচ্ছিন্ন হলে মহান শক্তি অর্জিত হয়।

'যো বেত্তি তত্ত্বতঃ'—বিভূতি এবং যোগ তত্ত্বতঃ জানার অর্থ হল যে জগতে কারণরূপে আমার যা কিছু প্রভাব, সামর্থ্য আছে এবং তাতে কার্যরূপে প্রকটিত যত বিশেষত্ব আছে অর্থাৎ বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদিতে যা কিছু বিশেষত্ব দেখা যায়, প্রাণীদের চিত্তে যতপ্রকার ভাব প্রকটিত হয় এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে জ্ঞান, বিবেক প্রভৃতি যা কিছু বিশেষত্ব দেখা যায়, সে সবেরই মূলে আমিই বিরাজিত এবং আমিই সকলের আদি। আমাকে যারা এইরূপে জানতে পারে, তত্ত্বতঃ যথার্থভাবে মেনে নেয়, তারা ওইসব বিশেষত্বের মূলে শুধুমাত্র আমাকেই দেখতে পায়। তাদের শুধু আমার প্রতিই বিশেষ ভাব (শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা) জন্মায়, ব্যক্তি বা বস্তুর বিশেষত্বের ওপরে নয়। যেমন, স্বর্ণকারের দৃষ্টি গহনার প্রতি অর্থাৎ গহনার ওজন, আকৃতি, উপযোগিতার দিকে থাকলেও তার মনে এই ভাব থাকে যে তত্ত্বতঃ এ সবই সোনা। তেমনই যেখানে যেখানে যে কোনো বিশেষ ভাবই লক্ষ্য করা যাক না কেন মানুষের দৃষ্টি ভগবানের দিকেই যাওয়া উচিত। কেন-না তাতে যে বিশেষত্ব তা সবই ভগবানের ; বস্তু, ব্যক্তি, ক্রিয়াদির নয়।

জগৎ-সংসারে ক্রিয়া ও পদার্থ নিত্য পরিবর্তনশীল। এতে যেসব বিশেষ প্রকাশ দেখা যায়, তা স্থায়ীরূপে ব্যাপ্ত পরমাত্মারই প্রকাশ। মানুষ যেসব স্থানে কোনো বিশেষত্ব, অলৌকিকত্ব ইত্যাদি দেখতে পায়, যদি সে এই বিশেষত্ব সেইসব বস্তু ও ব্যক্তিরই বলে মেনে নেয়, তাহলে মানুষ তাতেই জড়িয়ে পড়ে এবং সে রিক্ত থেকে যায়। কারণ ওইসব বস্তুতে যে বিশেষত্ব দেখা যায়, তা সবই সেই অপরিবর্তনশীল পরমাত্মতত্ত্বের প্রকাশ, পরিবর্তনশীল বস্তুর নয়। এইভাবে সেই মূলতত্ত্বের দিকে লক্ষ্য করাই হল তাকে তত্ত্বতঃ জানা অর্থাৎ সশ্রদ্ধভাবে দৃঢ়তা সহকারে মেনে নেওয়া।

এখানে যে বিভূতিগুলির বর্ণনা করা হয়েছে, তার তাৎপর্য এই যে, এটি হল সর্বত্র ব্যাপ্তরূপে বিরাজিত সেই পরমাত্মার ঐশ্বর্যের প্রকাশ। বিভূতিরূপে প্রকটিত সকল ঐশ্বর্যই ভগবানের। পরমাত্মার যোগশক্তির সাহায্যেই এইসব ঐশ্বর্য প্রকটিত হয়েছে, তাই যা কিছুতে এবং যেখানে যেখানে বিশেষ ভাব দেখা যাবে, তা সবই ভগবানের যোগশক্তির দ্বারা প্রকটিত ঐশ্বর্যেরই (বিভূতিরই) বুঝতে হবে, ওই বস্তুগুলির নয়। এই যোগ ও বিভূতি হল পরমাত্মারই। যোগ ও বিভূতি তত্ত্বতঃ জানার তাৎপর্য হল এই যে, সেগুলির যেসকল বিশেষত্ব সেগুলি সবই পরমাত্মার। অতএব দ্রষ্টার লক্ষ্য শুধুমাত্র সেই পরমাত্মার দিকেই যাওয়া উচিত। একেই বলা হয় তত্ত্ব দ্বারা জানা অর্থাৎ মেনে নেওয়া[১]।

'সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে'—আমাতে তার ভক্তি দৃঢ় হয়। দৃঢ় বলার অর্থ হল যে তার আমা ছাড়া অন্য কারোতে বা অন্য কিছুতে মহত্ত্ব বুদ্ধি হয় না। সুতরাং তার আকর্ষণ অন্য কিছুতে না হয়ে একমাত্র আমাতেই হয়ে থাকে।

'নাত্র সংশয়ঃ'—এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ

---

[১]ভক্তির প্রকরণ হওয়ায় এখানে 'তত্ত্বতঃ বেত্তির' (তত্ত্বতঃ জানা) অর্থ হিসাবে 'তত্ত্বতঃ মানা'-ই ধরতে হবে। কারণ ভগবান এখানে 'তত্ত্বতঃ বেত্তি'র ফল হিসাবে তাঁতে দৃঢ় ভক্তি হওয়া বলেছেন এবং পরবর্তী শ্লোকেও 'সংসারমাত্রেরই মূল কারণ আমি এবং সমস্ত জগৎ আমা হতেই সৃষ্ট হয়' এটি মেনে নিয়ে (ইতি মত্বা) ভজনা করার কথা বলা হয়েছে।

যেমন জেনে নেওয়া দৃঢ় হয়, তেমনই মেনে নেওয়াও দৃঢ় হয় অর্থাৎ দৃঢ়ভাবে মেনে নেওয়া তত্ত্বজ্ঞানের মতোই ফল প্রদান করে। যেমন, 'আমি হিন্দু', 'আমি অমুক বর্ণভুক্ত' ইত্যাদি মানার ব্যাপার যতক্ষণ স্বয়ং পরিত্যাগ না করে, ততক্ষণ এটি দূর হয় না। এইভাবে 'এইসব বিভূতির মূলে ভগবানই বিরাজমান', এই মেনে নেওয়া কখনো দূর হয় না। বর্ণ, সম্প্রদায় ইত্যাদির ব্যাপার সত্য নয়, বরং এগুলি শরীরকে নিয়ে হওয়ায় প্রাকৃত এবং বিনাশশীল। কিন্তু 'সবকিছুরই মূলে পরমাত্মা' এইটি ধ্রুব সত্য এবং বাস্তবিক। সুতরাং তা কখনো দূর হয় না, সেটি জ্ঞানে (তত্ত্বতঃ জানায়) পরিণত হয়ে জ্ঞানস্বরূপ হয়ে ওঠে।

নেই—বলার অর্থ হল যে যদি তার বিন্দুমাত্র সংশয় থাকে, তাহলে সে আমাকে তত্ত্বতঃ মেনে নেয়নি; কারণ সে আমার যোগকে অর্থাৎ বিশেষ প্রভাবকে এবং তার থেকে উৎপন্ন বিভূতিগুলিকে (ঐশ্বর্যকে) আমা হতে পৃথক্ ভেবে গুরুত্ব দিয়েছে।

আমাকে তত্ত্বতঃ জানার পর কোনো বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদির লৌকিক দৃষ্টিতে কোনো বিশেষত্ব দেখা দিলে, সেটি তার ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তার দৃষ্টি সেই বিশেষত্বের দিকে না গিয়ে আমার প্রতিই থাকে। সুতরাং আমার প্রতি স্বাভাবিকভাবেই তার ভক্তি দৃঢ় হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব—জগতে যা কিছু বিশেষ ভাব দেখা যায়, তা সবই ভগবানের 'যোগ' অর্থাৎ বিশেষ প্রভাব, সামর্থ্য। এই বিশেষ প্রভাব থেকে প্রকটিত হওয়া বিশেষ ভাবই হল 'বিভূতি'—এইভাবে যে ব্যক্তি ভগবানের বিভূতি এবং যোগকে তত্ত্বতঃ জানেন, তাঁর ভগবানে (শ্রদ্ধা) ভক্তি দৃঢ় হয়। ভগবান ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো অস্তিত্ব নেই—নিঃসন্দেহ হয়ে দৃঢ়তা সহকারে এটি স্বীকার করাই হল তাকে তত্ত্বতঃ জানা। এইভাবে যাঁরা তত্ত্বতঃ ভগবানকে জানেন, ভগবান তাঁদেরই বলেছেন জ্ঞানবান (গীতা ৭।১৯)।

'অবিকম্প (অবিচল) যোগ' বলার তাৎপর্য হল যে, এই ভক্তিযোগ নিজে থেকে কোনোভাবেই অপসৃত হয় না এবং কেউ একে টলাতেও পারে না, কারণ এতে একমাত্র ভগবান ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো বস্তুই নেই।

যেমন টাকাতেই সব কিছু পাওয়া যায়—এই কথা ভেবে সাধারণ মানুষ টাকাকে গুরুত্ব দেয় এবং তাতেই আকৃষ্ট হয়, তেমনই যা কিছু প্রভাব বা মহত্ত্ব দেখা যায়, তা সবই ভগবানের—এরূপ জানলে মানুষের ভগবানে ভক্তি দৃঢ় হয়।

'নাত্র সংশয়ঃ' কথাটির অর্থ হল এই যে যখন ভগবান ব্যতীত অন্য কোনো অস্তিত্ব নেই-ই, তখন তাতে আর সংশয় কীসের ? এতে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই, কারণ যেখানে দুটি সত্তা থাকে, সেখানেই সংশয়ের উদ্ভব হয়। একমাত্র ভগবান ব্যতীত আর কোনো সত্তা যখন নেই তখন মনোবৃত্তি কোথায় যাবে, কেন যাবে আর কীভাবে যাবে ? তাই ভগবানেই ভক্তি অবিচলিত হয়—এতে কোনো সন্দেহ নেই।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, যে ব্যক্তি আমার বিভূতি ও যোগ তত্ত্বতঃ জানতে পারে সে অবিচল ভক্তিযুক্ত হয়। সুতরাং বিভূতি ও যোগ তত্ত্বতঃ জানা কাকে বলে ? পরবর্তী শ্লোকে তার আলোচনা করা হচ্ছে।

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥ ৮ ॥

[**অহম্** (আমি) ; **সর্বস্য** (জগৎমাত্রেরই) ; **প্রভবঃ** (প্রভব) ; **মত্তঃ** (আমা হতেই) ; **সর্বম্** (এই জগৎ-সংসার) ; **প্রবর্ততে** (প্রবৃত্ত হচ্ছে) ; **বুধাঃ** (বুদ্ধিমান ভক্তগণ) ; **ইতি** (আমাকে এইরূপ) ; **মত্বা** (জেনে) ; **ভাবসমন্বিতাঃ** (শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে) ; **মাম্** (আমাকেই) ; **ভজন্তে** (ভজনা করে থাকে।)]

আমি জগৎ মাত্রেরই প্রভব (মূল কারণ), আমা হতেই এই জগৎ-সংসার প্রবৃত্ত হচ্ছে—বুদ্ধিমান ভক্তগণ আমাকে এইরূপ জেনে শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে আমাকেই ভজনা করে থাকে— সর্বভাবে আমারই শরণ গ্রহণ করে॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা—[এই শ্লোকে আগের শ্লোকের কথাই বলা হয়েছে। **'অহং সর্বস্য প্রভবঃ'**-তে **'সর্বস্য'** হল ভগবানের বিভূতি। **'মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে'** কথাটিতে **'মত্তঃ'** হল ভগবানের যোগ (প্রভাব), যার দ্বারা সমস্ত বিভূতি প্রকটিত হয়। সপ্তম, অষ্টম এবং নবম অধ্যায়ে যা কিছু বলা হয়েছে, সেই সবই এই শ্লোকের পূর্বার্ধে উল্লিখিত হয়েছে।]

'অহং সর্বস্য প্রভবঃ'—মানস, নাদজ, বিন্দুজ, উদ্ভিজ্জ, জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ অর্থাৎ জড়-চেতন, স্থাবর-জঙ্গম ইত্যাদি, যতপ্রকার প্রাণী পৃথিবীতে উৎপন্ন

হয়, সে সবেরই উৎপত্তির মূলে পরমপিতা পরমেশ্বরের রূপে আমিই অবস্থিত।

'প্রভবঃ' কথাটির এখানে তাৎপর্য হল যে আমি সবকিছুর **'অভিন্ন-নিমিত্তোপাদানকারণ'** অর্থাৎ স্বয়ং-ই সৃষ্টিরূপে প্রকট হয়েছি।

'মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে'—জগতে উৎপত্তি, স্থিতি, প্রলয়, পালন, সংরক্ষণ ইত্যাদি যা কিছু হয় এবং যত কার্য সাধিত হয়, সে-সব আমা হতেই হয়ে থাকে। সে সবের অস্তিত্ব ও স্ফূর্তি যা কিছু সব আমার থেকেই লাভ হয়। বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে যেমন সব কাজ হয়, তেমনই জগতে যত ক্রিয়া হয়, সে সবের মূলে আমিই রয়েছি[১]।

'অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে'—কথাটির তাৎপর্য হল যে সাধকের দৃষ্টি প্রাণীদের ভাব, আচরণ, ক্রিয়াদির দিকে না গিয়ে, সেই সবের মূলে যিনি অবস্থিত সেই ভগবানের দিকে যাওয়া উচিত। কার্য, কারণ, ভাব, ক্রিয়া, বস্তু, পদার্থ, ব্যক্তি ইত্যাদির মূলে যে তত্ত্ব, ভক্তের সেদিকেই লক্ষ্য থাকা উচিত।

সপ্তম অধ্যায়ের সপ্তম এবং দ্বাদশ শ্লোকে এবং দশম অধ্যায়ের পঞ্চম এবং এই (অষ্টম) শ্লোকে **'মত্তঃ'** পদটি বারংবার বলার তাৎপর্য হল এই ভাব, ক্রিয়া, ব্যক্তি ইত্যাদি সমস্তই ভগবান হতে উৎপন্ন, ভগবানেই অবস্থিত থাকে এবং তাঁতেই লীন হয়ে যায়। অতএব তত্ত্বতঃ সমস্তই ভগবদ্স্বরূপ—এটি জানলে বা মেনে নিলে ভগবানের সঙ্গে অবিচলিত যোগ অর্থাৎ সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

এখানে **'সর্বস্ব'** এবং **'সর্বম্'**—দু'বার 'সর্ব' পদটি ব্যবহারের অর্থ হল যে ভগবান ব্যতীত এই জগতের কোনো উৎপাদকও নেই, সঞ্চালকও (পরিচালক) নেই। এই জগতের উৎপাদক ও পরিচালক হলেন একমাত্র ভগবান।

'ইতি মত্বা ভাবসমন্বিতাঃ'—ভগবান হতেই জগৎ-সংসারের উৎপত্তি এবং সমস্ত জগৎ ভগবান থেকে অস্তিত্ব ও স্ফূর্তি লাভ করে অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ রূপে সবকিছুই হলেন ভগবান—যে ব্যক্তি দৃঢ়তা সহকারে এটি মেনে নেন তিনি, 'সবার ওপরে ভগবানই আছেন, আর কেউ ভগবানের সমকক্ষ হয়নি, হবে না এবং হওয়া সম্ভবপরও নয়'—এই সর্বোচ্চ ভাবের সঙ্গে যুক্ত হন। এইভাবে যখন তাঁর বুদ্ধিতে গুরুত্ব কেবল ভগবানেরই হয়, তখন তাঁর আকর্ষণ, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, প্রেম ইত্যাদি সব ভগবানেই হয়ে থাকে। একমাত্র ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করায় তাঁর মধ্যে সমত্ববোধ, নির্বিকারত্ব, শোকহীনতা, নিশ্চিন্ততা, নির্ভয়তা ইত্যাদি স্বতঃই স্বাভাবিকভাবে জাগরিত হয়। কারণ যেখানে দেব (পরমাত্মা) বিরাজ করেন, সেখানে দৈবী-সম্পদ স্বাভাবিকভাবেই মূর্ত হয়।

'বুধাঃ'—ভগবান ব্যতিরেকে অন্য কারও অস্তিত্ব স্বীকার না করা, সবের মূলে ভগবানকে মানা, ভগবানেরই আশ্রয় গ্রহণ করে তাঁকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করা—এই হল মানুষের বুদ্ধিমত্তা। এইজন্যই তাঁকে বুদ্ধিমান বলা হয়। এই কথাই পরে পঞ্চদশ অধ্যায়ে বলেছেন যে, যে ব্যক্তি আমাকে ক্ষরের (জগতের) অতীত এবং অক্ষর (জীবাত্মা) হতে উত্তম বলে জানে, সে সর্ববিৎ এবং সর্বভাবে আমারই ভজনা করে (১৫।১৮-১৯)।

'মাম্ ভজন্তে'—ভগবানের নাম জপ ও কীর্তন করা, ভগবদ্রূপ চিন্তা ও ধ্যান করা, ভগবদ্-কথা শোনা, ভগবৎ সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি (গীতা, রামায়ণ, ভাগবত ইত্যাদি) পাঠ করা—এগুলি সবই ভগবদ্ভজনা। কিন্তু আসল ভজনা হল তাই, যাতে হৃদয় ভগবানে আকৃষ্ট হয়, কেবলমাত্র ভগবানকেই প্রিয় বলে মনে হয়, ভগবানের বিস্মৃতি কাঁটার মতো বেঁধে, খারাপ লাগে। ভগবানে এইরূপ তল্লীন হওয়াই হল প্রকৃত ভজনা।

বিশেষ কথা

পরমাত্মাই সবের মূল এবং তাঁর থেকেই সমস্ত বস্তু, ব্যক্তি, পদার্থ, ঘটনা ইত্যাদি অস্তিত্ব ও স্ফূর্তি লাভ করে—এরূপ জ্ঞান হওয়া পরমাত্মপ্রাপ্তিতে ইচ্ছুক সকল সাধকের জন্যই অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ সবকিছুর মূলেই যখন পরমাত্মা, তখন সাধকের লক্ষ্যও পরমাত্মার দিকে থাকা উচিত। বিভূতি ও যোগ-জ্ঞানের বর্ণনার তাৎপর্য হল পরমাত্মার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা। গীতায় এই কথা স্থানে স্থানে বলা হয়েছে ; যেমন—যাঁর থেকে সমস্ত প্রাণী প্রবৃত্ত হয় এবং যাঁর দ্বারা সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত, সেই পরমাত্মাকে নিজ নিজ কর্তব্য-কর্মের দ্বারা পূজন করা উচিত

[১]সপ্তম অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে যেমন ভগবান নিজেকে অপরা ও পরা প্রকৃতির কারণ বলে জানিয়েছেন এবং চতুর্দশ অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে বলেছেন তিনিই বীজ প্রদানকারী পিতা। তেমনই এখানে ভগবান বলেছেন তিনিই সবকিছুর উৎপাদক।

(১৮।৪৬) ; যিনি সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে বিরাজমান এবং সকল প্রাণীর প্রেরণাদাতা, সেই পরমাত্মার সর্বভাবে শরণাগত হওয়া উচিত (১৮।৬১-৬২) ইত্যাদি। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ—এইসব সাধন ভিন্ন ভিন্ন সাধকের রুচি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু উপরিউক্ত জ্ঞান সকল সাধকের পক্ষেই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

পরিশিষ্ট-ভাব—সাধারণ লোক অর্থকে (টাকাকে) বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে, কারণ অর্থমূল্যে সব কিছুই পাওয়া যেতে পারে। অর্থের দ্বারা সব কিছু পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কোনো কিছু উপজাত করানো সম্ভব নয়। অপরপক্ষে ভগবান হতে সমস্ত কিছু উপজাত হয় এবং পাওয়াও যায় ! এইভাবে যাঁরা ভগবানের মহত্ত্ব সম্বন্ধে অবহিত, তাঁরা তুচ্ছ অর্থের মোহে আবদ্ধ না হয়ে ভগবানের সাধন-ভজনে ব্যাপৃত হন—**'স সর্ববিত্তজতি মাং সর্বভাবেন ভারত'** (গীতা ১৫।১৯)।

ভগবান বলেছেন যে, সমস্ত পদার্থ এবং ব্যক্তি —সবই আমা হতে জাত (**অহং সর্বস্য প্রভবঃ**) এবং ক্রিয়াগুলিও আমা হতে উৎপন্ন (**মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে**)। কিন্তু জীব পদার্থ এবং ক্রিয়াগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, সেগুলি নিজের বলে মনে করে তার ভোক্তা এবং কর্তা হয়ে আবদ্ধ হয়ে যায়। ভোক্তা হলে পদার্থগুলি বন্ধনকারক হয় আর কর্তা হয়ে বসলে ক্রিয়াগুলি বন্ধনকারক হয়ে ওঠে। জীব যদি কর্তা ও ভোক্তা না হয় তাহলে তার কোনো বন্ধন হয় না।

জগতে যা কিছু বিশেষ প্রভাব দেখা যায়, সেগুলি সবই ভগবানের—একথা ভগবান গীতায় **'মত্তঃ'** পদ দ্বারা কয়েকটি স্থানে বলেছেন, যেমন—

'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি' (৭।৭)

'আমা ব্যতীত এই জগতের অন্য কোনো কারণ ও কার্য নেই।'

'মত্ত এবেতি তান্‌বিদ্ধি' (৭।১২)

'এইসব (সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক) ভাব আমা হতে উৎপন্ন এই কথা মনে রেখো।'

'ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্‌বিধাঃ' (১০।৫)।

'প্রাণীগণের এই নানাপ্রকার (বুদ্ধি, জ্ঞান, অসম্মোহ ইত্যাদি) ভাব আমা হতেই উদ্ভূত।'

'মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ' (১৫।১৫)।

'আমা হতেই স্মৃতি, জ্ঞান এবং অপোহন (সংশয়াদি দোষ নাশ) হয়।'

※ ※ ※

সম্বন্ধ—পরবর্তী শ্লোকে সেই ভক্তদের ভজন কোন্ রীতিতে হয়ে থাকে সেটি জানাচ্ছেন।

মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥ ৯ ॥

[**মচ্চিত্তাঃ** (মদ্‌গতচিত্ত) ; **মদ্‌গতপ্রাণাঃ** (মদ্‌গতপ্রাণা) ; **পরস্পরম্** (নিজেদের মধ্যে) ; **বোধয়ন্তঃ** (গুণ, প্রভাব ইত্যাদি জেনে) ; **চ** (এবং) ; **কথয়ন্তঃ** (সেগুলি আলোচনা করে) ; **নিত্যম্** (নিত্য নিরন্তর) ; **তুষ্যন্তি** (সন্তুষ্ট থাকেন) ; **চ** (এবং) ; **মাম্, চ** (আমার সঙ্গেই) ; **রমন্তি** (প্রেম করেন।)]

মদ্‌গতচিত্ত, মদ্‌গতপ্রাণ ভক্তগণ নিজেদের মধ্যে আমার গুণ, প্রভাব আলোচনা করে সর্বদা সন্তুষ্ট থাকেন এবং আমার সঙ্গে প্রেমবন্ধনে যুক্ত হয়ে থাকেন॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা—[এই শ্লোকটিতে ছটি কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে **'মচ্চিত্তাঃ'** এবং **'মদ্‌গতপ্রাণাঃ'** এই দুটি স্বয়ং-এর করার অর্থাৎ ভক্ত স্বয়ং স্বাধীনভাবে এরূপ হয়ে থাকে, **'বোধয়ন্তঃ'** ও **'কথয়ন্তঃ'**—এই কথা দুটি পরস্পর মেলামেশার ফলে হয় এবং **'তুষ্যন্তি এবং রমন্তি'**—এই দুটি ফলস্বরূপ হয়ে থাকে।

ভগবান হতেই সবকিছু উৎপন্ন হয়েছে এবং তাঁর থেকেই সবকিছু আবর্তিত হয় অর্থাৎ সবার মূলেই পরমাত্মা

বিরাজিত—যিনি এই কথাটি দৃঢ়তার সঙ্গে নিঃসন্দেহে মেনে নিয়েছেন তাঁর আর কোনো কিছু করার, জানার বা পাওয়ার বাকি থাকে না। তাঁর কেবল একটিই কাজ থাকে, তা হল সর্বভাবে ভগবানে সংলগ্ন থাকা। এই শ্লোকে সেই কথাই বলা হয়েছে।]

'মচ্চিত্তাঃ'—এঁরা মদ্‌গতচিত্ত। একটি হল স্বয়ং-এর ভগবানে আকৃষ্ট হওয়া আর অপরটি হল চিত্তকে ভগবানে নিবিষ্ট করা। যেখানে 'আমি ভগবানের' এইভাবে স্বয়ং ভগবানে আকৃষ্ট হয়, সেখানে চিত্ত, বুদ্ধি ইত্যাদি স্বাভাবিকভাবে ভগবানে আকৃষ্ট হয়। কারণ কর্তা স্বয়ং আকৃষ্ট হলে করণ (মন, বুদ্ধি) পৃথক্ থাকতে পারে না। করণাদি আকৃষ্ট হলে কর্তা পৃথক্ থাকতে পারে, কিন্তু কর্তা আকৃষ্ট হলে করণ পৃথক্ থাকতে পারে না। যেখানে কর্তা থাকে, সেখানে করণও থাকে। কারণ কর্তার অধীনেই করণ থাকে। কর্তা স্বয়ং যেখানে আকৃষ্ট হয়, করণও সেখানে আকৃষ্ট হয়। যেমন, কোনো ব্যক্তি যদি সত্যকার হৃদয় দিয়ে সাধক হয়, তবে সাধনে স্বভাবতঃই তার মন আকৃষ্ট হয়। তার মন সাধন ছাড়া অন্য কোথাও লাগে না আর তা যে কাজে লাগে, সে কাজই সাধন হয়ে ওঠে। স্বয়ং কর্তার যেদিকে রুচি থাকে সেই রুচির প্রতিকূলে মন-বুদ্ধি ইত্যাদি যায় না। কিন্তু যেখানে স্বয়ং ভগবানে আকৃষ্ট হয় না, বরং 'আমি সংসারী মানুষ, গৃহস্থ'—এইভাবে নিজেকে সংসারে ব্যাপৃত করে এবং শুধু চিত্তকে যারা ভগবানে লাগাতে চায়, তাদের চিত্ত ভগবানে সর্বদা লাগে না। তাৎপর্য হল এই যে স্বয়ং সংসারে থেকে যদি কেউ চিত্তকে ভগবানে নিমগ্ন করতে চায়, তবে তা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়তঃ চিত্ত সেখানেই আকৃষ্ট হয়, যেখানে প্রিয়ভাব থাকে। প্রিয়ভাব সেখানেই হয় যেখানে আপনভাব থাকে, আমার নিজের, এই ভাব থাকে। ভগবানের সঙ্গে স্বয়ং সম্বন্ধ স্থাপন করলে আত্ম-ভাব হয়। 'আমি শুধু ভগবানের এবং ভগবানই শুধু আমার, শরীর-সংসার কিছুই আমার নয়। আমার ওপর প্রভুর সম্পূর্ণ অধিকার আছে, অতএব তিনি যেমন খুশি ব্যবহার আমার সঙ্গে করতে পারেন এবং যা কিছু বিধান দিতে পারেন। কিন্তু প্রভুর ওপর আমার কোনো কর্তৃত্ব নেই অর্থাৎ তিনি আমার বলে আমি যেমন চাইব, তিনি তেমনই করবেন—এমন কোনো কথা নেই—এইভাবে যে নিজেকে সম্পূর্ণতঃ ভগবানের বলে মেনে নেয়, নিজেকে ভগবানের কাছে অর্পণ করে, তার চিত্ত স্বাভাবিকভাবে ভগবানে আকৃষ্ট হয়। এরূপ ভক্তদেরই এখানে **'মচ্চিত্তাঃ'** বলা হয়েছে।

এখানে **'মচ্চিত্তাঃ'** পদে চিত্তের অন্তর্গত হল মন অর্থাৎ মনোবৃত্তি পৃথক্ নয়। গীতায় চিত্ত ও মনকে এক করেও বলা হয়েছে আবার পৃথক্ পৃথক্ করেও বলা হয়েছে ; যেমন **'ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ'** (৭।৪)—এখানে বলা হয়েছে চিত্ত মনেরই অন্তর্গত এবং **'মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তঃ'** (৬।১৪)—এখানে মন ও চিত্তকে পৃথক্ পৃথক্ বলা হয়েছে। কিন্তু এই শ্লোকে উদ্ধৃত **'মচ্চিত্তাঃ'** পদটিতে মন ও চিত্ত একই, পৃথক্ নয়।

'মদ্‌গতপ্রাণাঃ'—তাঁর প্রাণ আমাতেই অর্পিত। প্রাণে দুটি ব্যাপার থাকে—বাঁচা এবং প্রয়াস। ওইসব ভক্তের বেঁচে থাকাও ভগবানের জন্য এবং শরীরের সমস্ত ক্রিয়াদিও ভগবানের জন্য হয়ে থাকে। শরীরের যেসব ক্রিয়াদি হয়, তার মধ্যে প্রাণেরই প্রাধান্য থাকে। অতএব ওইসব ভক্তদের যজ্ঞ, অনুষ্ঠান ইত্যাদি শাস্ত্রীয় ; ভজন-ধ্যান, কথা-কীর্তন ইত্যাদি ভগবৎ-সম্বন্ধীয় ; খাওয়া-পরা ইত্যাদি শারীরিক ; চাষবাস, চাকরি, ব্যবসায় ইত্যাদি জীবিকা সম্পর্কীয় ; সেবা প্রভৃতি যেসব সামাজিক ক্রিয়া হয়ে থাকে—তা সবই ভগবানের জন্য হয়। তাদের কাজে ক্রিয়াভেদ হলেও উদ্দেশ্যভেদ হয় না। তাঁদের ক্রিয়ামাত্রেই ভগবৎ উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। তাই তাঁরা 'ভগবদ্‌গতপ্রাণ' হন।

গোপিনীরা 'গোপীগীত'-এ যেমন ভগবানকে বলেছিলেন যে, 'আমরা আমাদের প্রাণ আপনাকে সমর্পণ করে দিয়েছি'—**'ত্বয়ি ধৃতাসবঃ'** (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩১।১), তেমনই ভক্তদের প্রাণ শুধু ভগবানেতেই থাকে। তাঁদের ভগবানের সঙ্গে যত আত্মীয়তা থাকে, নিজের প্রাণের সঙ্গে তত থাকে না। সকল প্রাণীর মধ্যে 'কোনো অবস্থাতেই যেন আমার প্রাণ না যায়' এরূপ বাঁচার আকাঙ্ক্ষা থাকে। এ হল প্রাণের প্রতি মোহ, আসক্তি। কিন্তু ভগবানের যাঁরা ভক্ত তাঁদের প্রাণের মোহ থাকে না। তাঁদের মনে 'আমি বেঁচে থাকব' এমন ইচ্ছা থাকে না আবার মৃত্যু ভয়ও থাকে না। তাঁদের বেঁচে থাকায় বা মরায় নিজস্ব কোনো প্রয়োজন থাকে না। তাঁদের আগ্রহ থাকে শুধু

ভগবানে। কারণ তাঁরা খুব ভালো করেই জানেন যে মরলে কেবল প্রাণেরই বিয়োগ হয়, ভগবান থেকে কখনো বিয়োগ হতে পারে না। প্রাণের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, কিন্তু ভগবানের সঙ্গে আমার স্বতঃসিদ্ধ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। প্রাণ প্রকৃতির কার্য আর আমি স্বয়ং ভগবানের অংশ।

এরূপ **'মদ্গতপ্রাণাঃ'** হবার জন্য সাধকের সর্বপ্রথম এই উদ্দেশ্য থাকা চাই যে, আমাকে ভগবদ্প্রাপ্তি করতেই হবে। সাংসারিক বস্তু লাভ হোক বা না হোক, সুস্থ থাকি বা রোগাক্রান্ত, সম্মান হোক বা অসম্মান, সুখ হোক বা দুঃখ—এতে কী যায় আসে ! আমার তো প্রয়োজন শুধু ভগবানে। এরূপ দৃঢ় উদ্দেশ্য হলে সাধক 'ভগবদ্গতপ্রাণ' হন।

'বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্'—ওইসব ভক্ত ভগবদ্-ভাব-সম্পন্ন, ভগবদ্ রুচিসম্পন্ন লোকের সংস্পর্শে এলে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে ভগবদ্-প্রসঙ্গ হতে থাকে। তখন তাঁরা পরস্পর একে অপরকে ভগবানের তত্ত্ব, রহস্য, গুণ, প্রভাব ইত্যাদি জানায় এবং সেখানে এক বিশিষ্ট সৎসঙ্গের আসর হয়ে ওঠে[১]। যখন তাঁরা পরস্পর ভাবপূর্বক কথাবার্তা বলেন, তখন তাঁদের মধ্যে ভগবদ্-সম্বন্ধীয় বিশেষ বিশেষ কথা জাগরিত হয়। যেমন প্রদীপের নীচে অন্ধকার থাকলেও দুটি প্রদীপ কাছাকাছি থাকলে, দুটিরই একটির অপরটির দ্বারা নীচেকার অন্ধকার দূর হয়। তেমনই যখন দু'জন ভগবদ্ভক্ত একসঙ্গে পরস্পরে ভগবদ্-সম্বন্ধীয় কথা বলেন, তখন কারও মনে যদি কোনো ভগবদ্ সম্বন্ধীয় বিশেষ ভাব উৎপন্ন হয়, তিনি তা প্রকাশ করে থাকেন এবং অন্যের মনেও যদি আর একপ্রকার ভাব উৎপন্ন হয়, তবে তিনিও তা ব্যক্ত করেন। এইভাবে আদান-প্রদানের সাহায্যে তাঁদের মধ্যে নতুন-নতুন ভাব প্রকটিত হয়। কিন্তু একাকী ভগবানের চিন্তা করলে ভাব তত প্রকটিত হয় না। যদি কোনো নতুন ভাব প্রকটিত হয় তাহলে সেটির আদান-প্রদান না হওয়াতে তা একজনের মধ্যেই থেকে যায়।

'কথয়ন্তশ্চ মাম্'—ভগবদ্-লীলাকথা শোনার মতো যদি কোনো ভগবদ্ভক্ত জুটে যায়, তাহলে তিনি ভগবদ্-লীলাকথা বলতে শুরু করেন। যেমন, সনকাদি চারজনে মিলে ভগবদ্কথা আলোচনা করেন। তাঁদেরই মধ্যে একজন হন বক্তা আর অপর তিনজন শ্রোতা। এইভাবে ভগবদ্প্রেমী ভক্তের যদি কোনো শ্রোতা জুটে যায়, তাহলে তিনি তাকে ভগবানের কথা, গুণ, প্রভাব, রহস্য ইত্যাদি শোনান ; আর যদি কোনো ভক্ত বক্তা উপস্থিত হন তবে তাঁর কাছ থেকে নিজেই শুনতে বসেন। কিন্তু বলার সময় তাঁর যেমন 'বক্তা' হওয়ার কোনো অহংভাব থাকে না, তেমনই শোনার সময় 'শ্রোতা' হতে তাঁর কোনোরূপ সঙ্কোচ হয় না।

'নিত্যং তুষ্যন্তি চ'—এইভাবে ভগবানের কথা, গুণ, প্রভাব, রহস্যাদি একে অপরে আলোচনা, চিন্তা ইত্যাদির দ্বারা তাঁরা সর্বদা সন্তুষ্ট থাকেন। তাৎপর্য হল এই যে, তাঁদের সন্তুষ্টির বিষয় একমাত্র ভগবান, তিনি ছাড়া সন্তুষ্টির আর কোনো কারণ থাকে না।

'রমন্তি চ'—এই ভক্তেরা ভগবানেই রমণ বা প্রেম করেন। এই প্রেমলীলায় ভগবান ও ভক্তের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না—**'তস্মিংস্তজ্জনে ভেদাভাবাৎ'** (নারদ ভক্তিসূত্র ৪১)। ভক্ত কখনো ভগবানের ভক্ত হন, আবার ভগবান কখনো নিজ ভক্তের ভক্ত হন[২]। ভগবান ও ভক্তের মধ্যে এইভাবে পরস্পর প্রেমলীলা অনন্তকাল ধরে চলতে থাকে, আর তা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

এর তাৎপর্য এই যে সাধকের এই ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হয় যে, যেন তার প্রত্যেকটি ক্রিয়া, ভাব ইত্যাদির প্রবাহ শুধুমাত্র ভগবানের দিকেই প্রবাহিত হয়।

---

[১]সতাময়ং সারভৃতাং নিসর্গো যদর্থবাণীশ্রুতিচেতসামপি। প্রতিক্ষণং নব্যবদচ্যুতস্য যৎ স্ত্রিয়া বিটানামিব সাধুবার্তা॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।১৩।২)

'সার-তত্ত্ব ধারণকারী পুরুষদের স্বভাব হল যে তাঁদের বাণী, কান এবং চিত্ত ভগবানের লীলাগান করার, শোনার এবং চিন্তা করার জন্যই হয়। লম্পট ব্যক্তিদের যেমন স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে আলোচনাকে নতুন বলেই মনে হয়, তেমনই ভক্তদের ভগবানের লীলা-কথা নিত্য নতুন বলে মনে হয়।'

[২]'এবং স্বভক্তয়ো রাজন্ ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্।' (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৮৬।৫৯)

পরিশিষ্ট-ভাব—ভগবান এই স্থানে সপ্তম শ্লোকে বর্ণিত অবিচল ভক্তিযোগ বর্ণনা করেছেন। ভগবদ্ ভক্তের চিত্ত ভগবানকে কখনো বিস্মৃত হয় না। তাঁদের দৃষ্টিতে ভগবান ব্যতীত আর কিছুই থাকে না, তাহলে তাঁদের চিত্ত আর কোথায় যাবে, কেন যাবে আর কেমন করে যাবে ? তাঁরা ভগবানের জন্যই বেঁচে থাকেন এবং তাঁদের সকল কর্মপ্রচেষ্টা ভগবানকে ঘিরেই হয়ে থাকে। কোনো শ্রোতা পেলে তাঁরা ভগবানের গুণ, প্রভাব ইত্যাদি কীর্তন করেন, ভগবানের লীলাকথা বর্ণনা করেন এবং যদি কোনো ভগবদ্‌বক্তা আসেন তাহলে প্রেমভরে তাঁর কাছ থেকে ভগবদ্‌কথা শ্রবণ করেন। এতে বক্তা বলে বলেও যেমন পরিতৃপ্ত হন না, তিনিও শুনে শুনে পরিতৃপ্ত হন না ! এই যে অতৃপ্তিভাব— এটি হল বিয়োগ আর যে নিত্য নতুন রসের আস্বাদ হয়—এ হল যোগ। এই যোগ-বিয়োগের জন্যই প্রেম প্রতিমুহূর্তে বর্ধমান। নারদভক্তিসূত্রে উদ্ধৃত আছে—

'কণ্ঠাবরোধরোমাঞ্চাশ্রুভিঃ পরস্পরং লপমানাঃ পাবয়ন্তি কুলানি পৃথিবীং চ' ॥৬৮॥

'এরূপ অনন্যচিত্ত ভক্ত কণ্ঠাবরোধ, রোমাঞ্চ এবং সাশ্রুপূর্ণ নয়নে পরস্পরকে সম্ভাষণ করে নিজ কুল ও পৃথিবীকে পবিত্র করে থাকেন।'

※ ※ ※

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে ভগবান ভক্তের দ্বারা ভজনের প্রকার জানিয়ে পরবর্তী দুটি শ্লোকে তাদের ওপর বিশেষ কৃপা করার কথা জানাচ্ছেন।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপয়ান্তি তে॥ ১০ ॥

[**তেষাম্, সতত যুক্তানাম্** (আমাতে সতত আসক্ত) ; **প্রীতিপূর্বকম্** (প্রেমপূর্বক) ; **ভজতাম্** (ভজনাকারী ভক্তদের) ; **তম্, বুদ্ধিযোগং** (সেই বুদ্ধিযোগ) ; **দদামি** (প্রদান করি) ; **যেন** (যার দ্বারা) ; **তে** (তাঁরা) ; **মাম্** (আমাকে) ; **উপযান্তি** (প্রাপ্ত হন।)]

আমাতে সতত আসক্ত, প্রেমপূর্বক আমার ভজনাকারী ভক্তদের আমি সেই বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যার দ্বারা তাঁরা আমাকে প্রাপ্ত হন॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা—[ভগবদ্‌নিষ্ঠ ভক্তগণ ভগবান ছাড়া সমত্ব বা তত্ত্বজ্ঞান বা অন্য কোনো কিছুই চান না[১]। তাঁদের একমাত্র কাজ হল ভগবানে যুক্ত থাকা। ভগবানে একাত্ম হওয়া ছাড়া তাঁদের আর কোনো কাজ নেই। তাই তাদের সমস্ত দায়িত্ব ভগবান বহন করেন অর্থাৎ সেই ভক্তদের দিয়ে যা কিছু করানো, তাঁদের যা কিছু দেওয়ার—সবই ভগবানকে করতে হয়। তাই ভগবান এখানে (এই শ্লোক দুটিতে) ওইসব ভক্তদের সমত্ব ও তত্ত্বজ্ঞান প্রদানের কথা বলছেন।]

'তেষাং সততযুক্তানাম্'—নবম শ্লোক অনুযায়ী যাঁরা ভগবানে আসক্তচিত্ত তদ্‌গত প্রাণ, ভগবানের গুণ, প্রভাব, লীলা, রহস্যাদি পরস্পরে আলোচনা করেন এবং ভগবানের নাম, গুণগান করে সর্বদা ভগবানেই সন্তুষ্টি অনুভব করেন এবং তাঁকেই ভালোবাসেন, এইরূপ সতত ভগবানে আসক্ত ভক্তদেরই এখানে **'সততযুক্তানাম্'** পদটির দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে।

'ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্'—এই ভক্তেরা জ্ঞান বা বৈরাগ্যও চান না। এঁরা পারমার্থিক জ্ঞান ও বৈরাগ্যও যখন আকাঙ্ক্ষা করেন না, তখন সাংসারিক ভোগ, অষ্টসিদ্ধি এবং নবনিধি কী করে চাইতে পারেন ? তাঁদের দৃষ্টি

[১]ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্। ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৪।১৪)

'স্বয়ং আমাতে অর্পিত ভক্ত আমি ব্যতীত ব্রহ্মপদ, ইন্দ্রপদ, সসাগরা পৃথিবী, পাতাল রাজ্য, সমস্ত যোগসিদ্ধি বা মোক্ষও চায় না।'

সেইসব দিকে যায়ই না। তাঁদের কাছে সিদ্ধি ইত্যাদিরও কোনো গুরুত্ব থাকে না। তাঁরা শুধু ভগবানকে নিজের বলে মেনে নিয়ে প্রেমপূর্বক স্বাভাবিকভাবে ভগবানের ভজন-সাধনে ব্যাপৃত থাকেন। কোনো বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদির সঙ্গে তাঁদের কোনোপ্রকার স্বার্থের সম্পর্ক থাকে না। তাঁদের সাধন-ভজন ও ভক্তি হল সর্বক্ষণ ভগবানে আবিষ্ট হয়ে থাকা। ভগবদ্-প্রেমে তাঁরা এত বিভোর হয়ে থাকেন যে স্বপ্নেও তাঁদের ভগবান ছাড়া অন্য কিছু থাকে না।

'দদামি বুদ্ধিযোগং তম্'—কোনো বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদির সংযোগ বা বিয়োগে চিত্তে যেন কোনো চাঞ্চল্য না আসে অর্থাৎ সাংসারিক বস্তু প্রাপ্তি হোক বা না হোক, লাভ হোক বা লোকসান, লোকে সম্মান করুক বা অপমান, স্তুতি হোক বা নিন্দা, স্বাস্থ্য ঠিক থাক বা না থাক ইত্যাদি নানাপ্রকার এবং পরস্পর-বিরোধী বিভিন্ন প্রকার পরিস্থিতি এলেও তাতে তাঁরা যাতে সমভাবে থাকতে পারেন এইরূপ বুদ্ধিযোগ অর্থাৎ সমভাবে থাকার সামর্থ্য আমি এসব ভক্তদের প্রদান করি।

'দদামি'র অর্থ হল এই যে তারা বুদ্ধিযোগকে নিজের বলে মনে করে না, ভগবদ্প্রদত্ত বলে মনে করে। তাই বুদ্ধিযোগের জন্য তারা নিজেদের মধ্যে কোনো বিশেষত্ব অনুভব করে না।

'যেন'—আমি তাদের সেই বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যাতে তারা আমাকে লাভ করে।

'মামুপয়ান্তি তে'—এঁরা যখন ভগবানেই চিত্ত ও প্রাণ সমর্পণ করেছেন এবং ভগবানেই সন্তুষ্ট থাকেন ও প্রেম করেন, তখন তাঁদের আর ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়ার বাকি কী থাকে ? তাই ভগবান জানাচ্ছেন যে এঁরা আমাকে লাভ করেন। আমাকে প্রাপ্ত হওয়ার অর্থ হল যে এই প্রেমিক ভক্তগণের মধ্যে অপূর্ণতা বলে আর কিছু থাকে না অর্থাৎ তাঁরা পূর্ণতা লাভ করেন।

পরিশিষ্ট-ভাব—যতক্ষণ রাগ-দ্বেষ (বৈষম্য) থাকে, ততক্ষণ চোখের সামনে জগৎ-সংসার বিদ্যমান থাকে, ভগবানকে দেখা যায় না। ভগবান দ্বন্দ্বাতীত। রাগ-দ্বেষরূপ দ্বন্দ্ব যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ বস্তু দু'প্রকারের বলে প্রতিভাত হয়, একপ্রকার নয়। যখন রাগ-দ্বেষ দূর হয়, তখন একমাত্র ভগবান ব্যতীত আর কিছুই পরিলক্ষিত হয় না ! তাৎপর্য হল রাগ-দ্বেষ দূর হলে অর্থাৎ সমত্ব-ভাব হলে 'সব কিছু ভগবানই'—এই তত্ত্ব অনুভূত হয়। ভগবান তাই তাঁর ভক্তদের সমত্ব-ভাব প্রদান করেন। সমতা-ই 'বুদ্ধিযোগ' অর্থাৎ কর্মযোগ—**'সমত্বং যোগ উচ্যতে'** (গীতা ২।৪৮)। গীতায় কর্মযোগকে 'বুদ্ধিযোগ' নামে অভিহিত করা হয়েছে, যেমন—**'দূরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়'** (২।৪৯), **'বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব'** (১৮।৫৭)। বুদ্ধিযোগ প্রাপ্ত হলে ভক্ত অপরের দুঃখে দুঃখিত হয়ে তাকে সুখী করার জন্য চেষ্টা করেন।

একটি হল চিন্তন 'করা' অপরটি হল চিন্তন 'হওয়া'। যা চিন্তন ও ভজনা করা হয়, তা হল কৃত্রিম আর যা স্বতঃই হয়, তাই প্রকৃত। যে চিন্তন 'করা' হয়, তা হল কৃত্রিম আর যা স্বতঃই হয়, সেটিই হল আসল। যে চিন্তন 'করা' হয় তা নিরন্তর হয় না, কিন্তু যেটি স্বতঃ হয় তা শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো সর্বক্ষণ হতে থাকে, তাতে ছেদ পড়ে না—**'সততযুক্তানাম্'**। শরীরে প্রিয়ভাব এবং আসক্তি থাকার জন্য ভগবানের চিন্তন চেষ্টা করে 'করতে' হয় এবং শরীরের চিন্তন স্বতঃই হয়। কিন্তু ভগবানে আপনভাব হলে ভজন 'করতে' হয় না, তা স্বতঃই হয়ে থাকে এবং তাতে কোনো ছেদ পড়ে না। সেইজন্যই এই স্থানে প্রেমপূর্বক ভজনা করার কথা বলা হয়েছে—**'ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্'**।

※ ※ ※

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥ ১১ ॥

[**তেষাম্** (সেই ভক্তগণের প্রতি) ; **অনুকম্পার্থম্**, এব (কৃপা করার জন্যই) ; **আত্মভাবস্থঃ** (তাদের স্বরূপতার মধ্যে অবস্থিত) ; **অহম্** (আমি) ; **অজ্ঞানজম্**, **তমঃ** (অজ্ঞানজনিত অন্ধকার) ; **ভাস্বতা** (দেদীপ্যমান) ; **জ্ঞানদীপেন** (জ্ঞানরূপ প্রদীপের দ্বারা) ; **নাশয়ামি** (নাশ করে থাকি।)]

সেই ভক্তগণের প্রতি কৃপা করার জন্যই তাদের স্বরূপতার (স্ব-ভাবের) মধ্যে অবস্থিত আমি, তাদের অজ্ঞানজনিত অন্ধকার দেদীপ্যমান জ্ঞানরূপ প্রদীপের দ্বারা সর্বতোভাবে নাশ করে থাকি॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা—**'তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ'**—ওই ভক্তগণের চিত্তে কোনোরূপ সাংসারিক বাসনা থাকে না। শুধু তাই নয়, তাঁরা আমাকে ছাড়া মুক্তিও আকাঙ্ক্ষা করেন না[১]। তাঁরা সাংসারিক বস্তুও চান না এবং পারমার্থিক বস্তু (মুক্তি, তত্ত্ববোধ ইত্যাদি)ও চান না। তাঁরা প্রেমানন্দে কেবল আমার ভজনাই করে থাকেন। তাঁদের ওই নিষ্কামভাব এবং প্রেমপূর্বক সাধন দেখে আমার অন্তর দ্রবীভূত হয়। আমার ইচ্ছা হয় যে আমার দ্বারা তাঁদের যেন কিছু সেবা হয়, তাঁরা যেন আমার কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করেন কিন্তু তাঁরা কিছুই না নেওয়ায় আমি দ্রবীভূত চিত্তে কৃপাপরবশ হয়ে তাঁদের কৃপা করার জন্য তাঁদের অজ্ঞানজনিত অন্ধকার দূর করে থাকি। আমার হৃদয় দ্রবিত হওয়ার কারণ হল এই যে, যেন আমার ভক্তদের পূর্ণতায় সামান্যতমও ঘাটতি না থাকে।

'আত্মভাবস্থঃ'—মানুষ নিজের যে স্থিতিকে মেনে থাকে যে 'আমি আছি', এই স্থিতি প্রায়শঃই প্রকৃতির (শরীরের) সঙ্গে সম্পর্ক করেই মেনে থাকে অর্থাৎ তাদাত্ম্যতার জন্য শরীরের পরিবর্তনকে নিজের পরিবর্তন বলে মেনে নেয়, যেমন—আমি বালক, আমি যুবক, আমি শক্তিশালী, আমি বলহীন ইত্যাদি। কিন্তু এই বিশেষণ বাদ দিলে তত্ত্বের দৃষ্টিতে এই প্রাণীদের নিজেদের যে স্থিতি, তা প্রকৃতিবর্জিত। এই স্ব-স্থিতিতে সর্বদা বিরাজমান প্রভুর জন্যই **'আত্মভাবস্থঃ'** পদটি এখানে উদ্ধৃত হয়েছে।

'ভাস্বতা জ্ঞানদীপেন নাশয়ামি'—প্রজ্বলিত জ্ঞান-দীপের সাহায্যে আমি ওইসব প্রাণীর অজ্ঞানান্ধকার নাশ করি। তাৎপর্য হল যে অজ্ঞানতার কারণে 'আমি কে এবং কী আমার স্বরূপ' —এরূপ যে অজ্ঞতা থাকে, সেই অজ্ঞতা আমি দূর করি অর্থাৎ তত্ত্ববোধ করিয়ে দিই। শাস্ত্রাদিতে যে তত্ত্ববোধের **মহিমা** গীত হয়েছে, তা জানার জন্য তাঁদের শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ইত্যাদি কোনো সাধনের প্রয়োজন হয় না, কোনো পরিশ্রম করতে হয় না, আমি স্বয়ং তাঁদের সেই তত্ত্ববোধ করিয়ে থাকি।

বিশেষ কথা

ভক্ত যখন অনন্যভাবে ভগবানে চিত্ত নিবিষ্ট করে থাকেন তখন সাংসারিক সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সম থাকার সামর্থ্য (সমত্ব) ভগবান তাদের প্রদান করেন এবং পবিত্রতম সেই 'তত্ত্ববোধ' (স্বরূপ জ্ঞান)ও ভগবান স্বয়ং প্রদান করেন। ভগবানের স্বয়ং দেওয়ার অর্থ হল যে ভক্তদের এর জন্য কোনো ইচ্ছা বা প্রচেষ্টা করতে হয় না; ভগবৎ-কৃপায় সমতা স্বয়ং তাঁদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। তত্ত্ববোধও স্বতঃই হয়। কারণ ভক্তিরূপী মা যেখানে থাকেন সেখানেই তাঁর বৈরাগ্য ও জ্ঞানরূপী পুত্রও অবস্থান করে। তাই ভক্তি হলে সমতা—সংসারে বৈরাগ্য এবং নিজ স্বরূপ বোধ—স্বতঃই এই দুটি জাগরিত হয়। এর তাৎপর্য হল সাধনজনিত পূর্ণতার থেকে ভগবদ্কৃত পূর্ণতা অত্যন্ত বিশিষ্ট। এতে অপূর্ণতার চিহ্নমাত্র থাকে না।

ভগবান যেমন অনন্যচিত্ত ভক্তদের যোগক্ষেম বহন করে থাকেন (গীতা ৯।২২), তেমনই যাঁরা শুধুমাত্র ভগবদ্‌পরায়ণ, সেই প্রেমিক ভক্তগণকে (তাঁরা না চাইলেও এবং তাঁদের কিছু পাওয়ার বাকি না থাকলেও) ভগবান সমতা ও তত্ত্ববোধ প্রদান করেন। এসব দেওয়া সত্ত্বেও ভগবান ওই ভক্তদের কাছে ঋণী হয়ে থাকেন। ভাগবতে ভগবান গোপিনীদের কথায় বলেছেন যে, আমার সঙ্গে সর্বভাবে নির্দোষ (অনিন্দ্য) সম্পর্ক স্থাপনকারী গোপিনীগণের উপর আমার যে কৃতজ্ঞতা ও ঋণ আছে, দেবতাদের ন্যায় দীর্ঘায়ু হয়েও আমি তা শোধ করতে পারব না। কারণ বড় বড় ঋষি-মুনি ও ত্যাগী ব্যক্তিগণ যে আত্মীয়তারূপ গৃহ-গণ্ডী সহজে পার হতে পারেন না,

[১](ক) সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২৯।১৩)

'আমার প্রেমিক ভক্তগণ আমার সেবা পরিত্যাগ করে সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য (এই পাঁচ প্রকারের) মুক্তিলাভ করলেও তা গ্রহণ করেন না।'

(খ) অস বিচারি হরি ভগত সয়ানে। মুক্তি নিরাদর ভগতি লুভানে॥ (শ্রীরামচরিতমানস ৭।১১৯।৪)

গোপিনীগণ তা অতি সহজেই অতিক্রম করেছিল[১]।

ভক্ত ভগবদ্‌ভজনে এমন লীন হয়ে থাকেন যে তিনি জানতেই পারেন না যে তাঁর মধ্যে সমতা এসেছে কি না, স্বরূপ বোধ হয়েছে কিনা। যদি কখনো খেয়াল হয়, তখন আশ্চর্য হয়ে মনে করেন, এই সমতা এবং বোধ কোথা থেকে এল ? নিজের মধ্যে যাতে কোনো বিশেষত্ব না মনে হয় তাই ভক্ত ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন, 'হে প্রভু! শুধু সমতা, তত্ত্ববোধই নয়, আমাকে যদি সমগ্র পৃথিবী উদ্ধার করারও অধিকার প্রদান করা হয় তাহলেও আমি যেন বুঝতে না পারি যে আমার মধ্যে এই বিশেষ ক্ষমতা আছে। আমি যেন শুধু আপনার ভজন-চিন্তনেই ব্যাপৃত থাকি'।

পরিশিষ্ট-ভাব—যদিও কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ—দুটিই সাধন এবং ভক্তিযোগ হল সাধ্য, তা সত্ত্বেও ভগবান তাঁর ভক্তদের কর্মযোগও প্রদান করেন—**দদামি বুদ্ধিযোগং তম্‌** এবং জ্ঞানযোগও প্রদান করেন—**'জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা'**। অপরা ও পরা—উভয় প্রকৃতিই ভগবানের। তাই ভগবান কৃপা করে তাঁর ভক্তদের অপরার প্রাধান্যে হওয়া কর্মযোগ আর পরার প্রাধান্যে হওয়া জ্ঞানযোগ—দুই-ই প্রদান করেন। তাই ভক্তগণ কর্মযোগের প্রাপণীয় তত্ত্ব **'নিষ্কামভাব'** এবং জ্ঞানযোগের প্রাপণীয় তত্ত্ব **'স্বরূপবোধ'**— উভয়ই অনায়াসে প্রাপ্ত হন। কর্মযোগ প্রাপ্ত হলে ভক্তের দ্বারা জগৎ-সংসারের উপকার হয় আর জ্ঞানযোগ প্রাপ্ত হলে ভক্তের দেহাভিমান দূর হয়।

ভক্ত ভগবানের চিন্তায়, প্রেমে সন্তুষ্ট ও মগ্ন হয়ে থাকেন। তিনি নিজের মধ্যে কোনো ন্যূনতার বোধ করেন না এবং কিছু পাবার প্রয়োজনীয়তাও মনে করেন না। বালক যেমন সর্বতোভাবে মায়ের আশ্রয়ে থাকায় নিজের অভাবের কথা জানতেই পারে না! মা-ই তার দিকে দৃষ্টি রাখেন, তাকে স্নান করান, ময়লা কাপড় ছাড়িয়ে পরিষ্কার কাপড় পরান। এইভাবেই ভক্ত সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হন যে 'আমি যেমনই হই, আমি ভগবানের আর ভগবান আমার', ভক্ত নিজের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। তাই ভগবানই ভক্তের মধ্যে যে অজ্ঞানতা থাকে তা তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা দূর করে থাকেন । বালকের মধ্যে তো মূঢ়তা থাকে কিন্তু ভক্তের মধ্যে বিবেকবোধ বিশেষভাবে জাগ্রত থাকে।

ভক্তের প্রধান কর্তব্য হল—ভগবানকে নিজের বলে মনে করা। ভক্ত তাঁর নিজের কর্তব্য পালন করেন, অতএব ভগবানও তাঁর নিজের কর্তব্য পালন করে থাকেন এবং ভক্ত না চাইলেও নিজে থেকে কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ—দুয়ের সামর্থ্যই প্রদান করেন, যাতে ভক্তের কোনো কিছুর ঘাটতি না থাকে।

কর্মযোগে শান্তরস, জ্ঞানযোগে অখণ্ডরস এবং ভক্তিযোগে অনন্তরস আছে। শান্তরস এবং অখণ্ডরসে অনন্তরস না থাকলেও অনন্তরসে শান্তরসও থাকে আর অখণ্ডরসও থাকে।

কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ হল লৌকিক সাধন আর ভক্তিযোগ হল অলৌকিক সাধন। অলৌকিকের প্রাপ্তি হলে লৌকিক প্রাপ্তি ভগবৎ কৃপায় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে হয়, কিন্তু লৌকিক প্রাপ্তি হলে অলৌকিক প্রাপ্তি হয় না। কেন-না অলৌকিকের মধ্যে লৌকিক থাকে, কিন্তু লৌকিকের মধ্যে অলৌকিক আসে না।

জ্ঞানী ভক্তিরহিত হতে পারেন, কিন্তু ভক্ত জ্ঞানরহিত হতে পারেন না[২]। গোপিনীরা শ্রুতি অধ্যয়ন করেননি, জ্ঞানী মহাপুরুষদের সঙ্গলাভও করেননি বা ব্রত, তপাদিও করেননি[৩], তা সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে বিশেষ জ্ঞান

---

[১]ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্ বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩২।২২)

[২]মম দরসন ফল পরম অনুপা। জীব পাব নিজ সহজ স্বরূপা॥ (শ্রীরামচরিতমানস, অরণ্যকাণ্ড ৩৬।৫)

[৩]তে নাধীতশ্রুতিগণা নোপাসিতমহত্তমাঃ। অব্রতাতপ্ততপসঃ সৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১২।৭)

'তাঁরা বেদাধ্যয়নও করেননি আর বিধিপূর্বক মহাপুরুষদের উপাসনাও করেননি। তদনুরূপ তাঁরা কোনো কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ ব্রত বা তপস্যাও করেননি। শুধুমাত্র সৎসঙ্গের (প্রেমের) প্রভাবেই তাঁরা আমাকে প্রাপ্ত হয়েছেন।'

ছিল[১]! তাৎপর্য হল এই যে, ভক্তের স্বরূপবোধও হয়ে যায়। **'বাসুদেবঃ সর্বম্'** এই বোধ তাঁদের থাকেই।

'আত্মভাবস্থ'—জীবের মধ্যে ভগবান বিরাজ করেন, কেন-না জীব ভগবানেরই অংশ। প্রকৃতপক্ষে ভগবানই জীবরূপে প্রকটিত হয়েছেন, কারণ ভগবানের পরা প্রকৃতি হওয়ায় জীব ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন। উপনিষদে বলা হয়েছে যে ভগবান জীবদেহ সৃষ্টি করে নিজেই তাতে প্রবিষ্ট হয়েছেন—**'তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ'** (তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ২।৬)।

* * *

সম্বন্ধ—ভক্তের ওপর ভগবানের অলৌকিক, বিশেষ কৃপার কথা শুনে অর্জুনের লক্ষ্য ভগবানের কৃপার ওপর যায় এবং সেই কৃপায় প্রভাবিত হয়ে তিনি পরবর্তী চারটি শ্লোকে ভগবানের স্তুতি করেন।

অর্জুন উবাচ

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্॥ ১২ ॥
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে॥ ১৩ ॥

[**পরম ব্রহ্ম** (পরম ব্রহ্ম) ; **পরম ধাম** (পরম ধাম) ; **পরমম্ পবিত্রম্ ভবান্** (মহাপবিত্র আপনিই) ; **শাশ্বতম্** (শাশ্বত) ; **দিব্যম্, পুরুষম্** (দিব্য পুরুষ) ; **আদিদেবম্** (আদিদেব) ; **অজম্** (জন্মরহিত) ; **বিভুম্** (সর্বব্যাপী বিভু) ; **ত্বাম্, সর্বে, ঋষয়ঃ** (এইরূপে সকল ঋষি) ; **দেবর্ষিঃ, নারদঃ** (দেবর্ষি, নারদ) ; **অসিতঃ, দেবলঃ** (অসিত, দেবল) ; **তথা ব্যাসঃ** (এবং ব্যাসদেব) ; **আহুঃ, চ** (বলে থাকেন এবং) ; **স্বয়ম্, এব** (আপনিও) ; **মে** (আমাকে) ; **ব্রবীষি** (বলেছেন।)]

অর্জুন বললেন—পরমব্রহ্ম, পরমধাম এবং মহাপবিত্র আপনিই। আপনি শাশ্বত, দিব্যপুরুষ, আদিদেব, জন্মরহিত এবং সর্বব্যাপী বিভু—এইরূপ সকল ঋষি, দেবর্ষি, নারদ, অসিত, দেবল এবং ব্যাসদেব বলে থাকেন এবং আপনি নিজেও আমাকে বলেছেন॥ ১২-১৩ ॥

ব্যাখ্যা—'পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্'—নিকটে উপবিষ্ট ভগবানের স্তুতি করে অর্জুন বলছেন যে, আমা দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে আপনি যাকে পরমব্রহ্ম (গীতা ৮।৩) বলেছেন, আপনিই সেই পরম ব্রহ্ম। সমস্ত জগৎ-সংসার যাতে অবস্থান করে, আপনিই সেই পরমধাম বা পরমস্থান (গীতা ৯।১৮)। যাকে পবিত্রের থেকেও পবিত্র বলা হয়—**'পবিত্রাণাং পবিত্রং যঃ'**, সেই মহা পবিত্রও আপনিই।

'পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং..........স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে'—গ্রন্থাদিতে ঋষিগণ[২], দেবর্ষি

[১]ন খলু গোপিকানন্দনো ভবানখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্। বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে সখ উদেয়িবান্ সাত্বতাং কুলে॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩১।৪)

(গোপিনীরা বলেছেন যে)—'হে সখে! আপনি শুধুমাত্র যশোদার পুত্র নন, বরং সমস্ত প্রাণীদের অন্তরাত্মার সাক্ষী। ব্রহ্মার প্রার্থনা শুনে বিশ্ব রক্ষার নিমিত্তই আপনি যদুকুলে অবতীর্ণ হয়েছেন।'

[২]মার্কণ্ডেয় ঋষি বলেছেন যে—'শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞাদির যজ্ঞ, তপাদির তপ এবং ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানরূপ'।
(মহাভারত, ভীষ্মপর্ব ৬৮।৩)

ঋষি ভৃগু বলেছেন যে, 'ইনি দেবাদিদেব এবং পরম প্রাচীন বিষ্ণু'। (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব, ৬৮।৪)

ঋষি অঙ্গিরা বলেছেন যে, 'ইনি সকল প্রাণীর স্রষ্টা'। (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব, ৬৮।৬)

সনৎকুমারগণ বলেছেন যে, 'এঁর মস্তক দ্বারা আকাশ এবং বাহু দ্বারা পৃথিবী পরিব্যাপ্ত। এঁর উদরে ত্রিলোক অবস্থিত, ইনি সনাতন পুরুষ। তপের দ্বারা চিত্তশুদ্ধ হলেই সাধক এঁকে জানতে সক্ষম হন। আত্মসাক্ষাৎকার দ্বারা তৃপ্ত ঋষিদের থেকেও ইনি

নারদ[১], অসিত এবং তাঁর পুত্র দেবল ঋষি[২] এবং মহর্ষি বেদব্যাস[৩] আপনাকে শাশ্বত, দিব্যপুরুষ, আদিদেব, জন্মরহিত এবং সর্বব্যাপী বিভু বলেছেন।

আত্মার রূপে **'শাশ্বত'** (গীতা ২।২০), সগুণ-নিরাকারের রূপে **'দিব্যপুরুষ'** (গীতা ৮।১০), দেবগণ ও মহর্ষিগণের আদিরূপে **'আদিদেব'** (গীতা ১০।২), মূঢ় ব্যক্তিগণ আমাকে জন্মরহিত রূপে জানে না (গীতা ৭।২৫), এবং মোহশূন্য ব্যক্তিগণ আমাকে জন্মরহিত বলে জানেন (১০।৩)—এইভাবে জন্মরহিত এবং অব্যক্তরূপে আমি সমস্ত সংসারে পরিব্যাপ্ত (গীতা ৯।৪)—এইভাবে স্বয়ং আপনিই আমার উদ্দেশ্যে **'বিভু'** বলে জানিয়েছেন।

পরিশিষ্ট-ভাব— নির্গুণ নিরাকারের জন্য **'পরং ব্রহ্ম'**, সগুণ নিরাকারের জন্য **'পরং ধাম'** এবং সগুণ সাকারের জন্য **'পবিত্রং পরমং ভবান্'** পদগুলির প্রয়োগ করে অর্জুন যেন ভগবানকে বলেছেন যে সমগ্র পরমাত্মা একমাত্র আপনিই (৭।২৯-৩০ এবং ৮।১-৪)।

যিনি নিজে শুদ্ধ এবং অপরকেও শুদ্ধ করেন, তিনি 'পরম পবিত্র'। ভগবান পরম পবিত্র এবং তাঁর নাম, রূপ ইত্যাদি সবই পবিত্র। চতুর্থ অধ্যায়ের আটত্রিশতম শ্লোকে ইহলোকে জ্ঞানকেই সবথেকে পবিত্র বলে জানানো হয়েছে— **'ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে'**। কিন্তু এই জ্ঞানও সমগ্র ভগবানের অন্তর্গত। সুতরাং জ্ঞানের থেকেও ভগবান পবিত্রতম।

❋ ❋ ❋

সর্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ॥ ১৪ ॥

[**কেশব** (হে কেশব!) ; **মাম্** (আমাকে) ; **যৎ** (যা) ; **বদসি** (বলেছেন) ; **এতৎ, সর্বম্** (তা সব) ; **ঋতম্, মন্যে** (সত্য বলে মানি) ; **ভগবন্** (হে ভগবন্!) ; **দেবাঃ** (দেবতা) ; **ন, দানবাঃ, হি** (দানব) ; **তে, ব্যক্তিম্** (আপনার প্রকট হওয়া) ; **ন, বিদুঃ** (জানে না।)]

হে কেশব ! আপনি আমাকে যা বলেছেন তা সব আমি সত্য বলে মনে করি। হে ভগবন্ ! দেবতা বা দানব কেউই আপনার প্রকট হওয়ার তাৎপর্য জানে না॥ ১৪ ॥

ব্যাখ্যা— 'সর্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব'— **'ক্'** হল ব্রহ্মার নাম, **'অ'** হল বিষ্ণুর, **'ঈশ'** হল শঙ্করের নাম এবং **'ব'** হল বপু অর্থাৎ স্বরূপ। এইভাবে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শঙ্কর যাঁর স্বরূপ, তাঁকে **'কেশব'** বলা হয়। এখানে অর্জুনের **'কেশব'** বলার অর্থ হল যে, আপনিই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকারী।

সপ্তম থেকে নবম অধ্যায় পর্যন্ত আপনি আমাকে **'যৎ'**—যা কিছু বলেছেন, সে সবই আমি সত্য বলে মনে করি এবং **'এতৎ'**—এই দশম অধ্যায়ে আপনি যে বিভূতি এবং যোগের বর্ণনা করেছেন, সেসবও আমি সত্য বলে মানি। অর্থাৎ আপনিই সবকিছুর স্রষ্টা ও পরিচালক। আপনি ছাড়া আর কেউ এরূপ

পরমোৎকৃষ্ট। যেসব উদার রাজর্ষি যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন না, ইনি তাঁদের পরম গতি'। (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব, ৬৮।৮-১০)

[১]দেবর্ষি নারদ বলেছেন, 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকল লোকের স্রষ্টা ও সমস্ত ভাবের প্রকাশক। ইনি সাধ্যগণ এবং দেবগণের ঈশ্বরেরও ঈশ্বর।' (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব ৬৮।২)

[২]অসিত ও দেবল ঋষি বলেছেন, 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণই প্রজা সৃষ্টিকারী প্রজাপতি এবং সকল লোকের একমাত্র রচয়িতা।' (মহাভারত, বনপর্ব, ১২।৫০)

[৩]মহর্ষি বেদব্যাস বলেছেন, 'আপনি বসুদের বাসুদেব, ইন্দ্রকে ইন্দ্রত্ব প্রদানকারী এবং দেবগণেরও পরম দেবতা'। (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব, ৬৮।৫)

হতে পারে না। আপনিই সবার ওপরে বিরাজিত। আপনিই যে এইভাবে সবকিছুর মূলে—তাতে আমার কোনোই সন্দেহ নেই।

ভক্তিমার্গে বিশ্বাসের প্রাধান্য থাকে। ভগবান প্রথম শ্লোকে অর্জুনকে পরম বচন শোনার নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেই পরম বচনকেই অর্জুন এইস্থানে '**ঋতম্**' অর্থাৎ সত্য বলে তাতে বিশ্বাস প্রকটিত করেছেন।

'ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ'—আপনি (গীতা ৪।৫) বলেছেন যে আমার ও আপনার অনেক জন্ম পার হয়েছে, সে-সব আপনি জানেন, আমি জানি না। এইরূপ আপনি (১০।২) বলেছেন যে আপনার প্রকট হওয়ার কথা দেবতা এবং মহর্ষিগণও জানেন না। আপনার প্রকটিত হওয়ার ব্যাপারে আপনি যা বলেছেন, তা সবই ঠিক। কারণ মানুষের চেয়ে দেবতাদের মধ্যে অধিক দিব্যতা থাকে, সেই দিব্যতার দ্বারা ভগবদ্‌তত্ত্ব জানা যায় না। কারণ তা প্রাকৃত—সেটি উৎপন্ন হয় ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তাই তাঁরা আপনার প্রকটিত হওয়ার তত্ত্ব বা হেতু পুরোপুরি জানতে পারেন না। দেবতারাই যখন জানতে পারেন না, তখন দানবেরা কী করে জানবে ? তবুও এখানে '**দানবাঃ**' পদটি ব্যবহারের অর্থ হল যে দানবেরা নানা বিশেষ প্রকারের মায়া জানে, যার দ্বারা তারা নানাপ্রকার বিচিত্র প্রভাব দেখাতে পারে। কিন্তু সেই মায়া-শক্তির সাহায্যে ভগবানকে জানা যায় না। তাঁর কাছে দানবদের মায়া কুণ্ঠিত হয়ে যায়। কারণ প্রকৃতি এবং তার যত শক্তি, ভগবান সেসবের অতীত। ভগবান অনন্ত, অসীম আর দানবদের মায়া-শক্তি যতই বিশেষ হোক, তা প্রাকৃত, সীমিত এবং উৎপত্তি ও বিনাশশীল। সীমিত ও বিনাশশীল বস্তুর সাহায্যে অসীম ও অবিনাশী তত্ত্বকে কী প্রকারে জানা সম্ভব ?

তাৎপর্য হল যে মানুষ, দেবতা, দানব প্রভৃতি কেউই নিজ শক্তির দ্বারা, সামর্থ্য দ্বারা, যোগ্যতার দ্বারা বা বুদ্ধির জোরে ভগবানকে জানতে সক্ষম হয় না। কারণ মানুষের জানার যে যোগ্যতা, সামর্থ্য ও বিশেষত্ব থাকে তা সবই প্রাকৃত আর ভগবান প্রকৃতির অতীত। ত্যাগ, বৈরাগ্য, তপ, স্বাধ্যায় ইত্যাদি চিত্তকে নির্মল করে, কিন্তু এই শক্তির দ্বারাও ভগবানকে জানা যায় না। অনন্যভাবে তাঁর শরণ গ্রহণ করলে তাঁর কৃপাতেই তাঁকে জানা সম্ভব। (গীতা ১০।১১ ; ১১।৫৪)

পরিশিষ্ট-ভাব—নিজ শক্তির দ্বারা কেউই ভগবানকে জানতে সক্ষম হয় না—

সোই জানই জেহি দেহু জনাঈ। জানত তুম্হহি তুম্হই হোই জাঈ॥

তুম্হরিহি কৃপাঁ তুম্হহি রঘুনন্দন। জানহিঁ ভগত ভগত উর চন্দন॥ (শ্রীরামচরিতমানস ২।১২৭।২)

ভগবানের কাছে বুদ্ধির চমৎকারিত্ব, সিদ্ধি ইত্যাদি কার্যকরী হয় না। নানা প্রকার বৃহৎ জাগতিক আবিষ্কারাদির সাহায্যে কেউ ভগবানকে জানতে সক্ষম হয় না।

❋ ❋ ❋

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে॥ ১৫ ॥

[**ভূতভাবন** (হে ভূতভাবন !) ; **ভূতেশ** (হে ভূতেশ !) ; **দেবদেব** (হে দেবদেব !) ; **জগৎপতে** (হে জগৎপতে) ; **পুরুষোত্তম** (হে পুরুষোত্তম্ !) ; **ত্বম্** (আপনি) ; **স্বয়ম্, এব** (স্বয়ংই) ; **আত্মনা** (নিজের দ্বারা) ; **আত্মানাম্** (নিজেকে) ; **বেত্থ** (জানেন।)]

হে ভূতভাবন ! হে ভূতেশ ! হে দেবদেব ! হে জগৎপতে ! হে পুরুষোত্তম্ ! আপনি স্বয়ংই নিজের দ্বারা নিজেকে জানেন॥ ১৫ ॥

ব্যাখ্যা—'ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে পুরুষোত্তম্'—শুধুমাত্র সংকল্প দ্বারা সমস্ত প্রাণীর উৎপন্নকারী হওয়ায় আপনি 'ভূতভাবন', সকল প্রাণী ও দেবতাগণের অধীশ্বর হওয়ায় আপনি 'ভূতেশ' এবং 'দেবদেব' ; জড়-চেতন, স্থাবর-জঙ্গম ইত্যাদি সমস্ত জগতের পালন-পোষণকারী হওয়ায় আপনি 'জগৎপতি',

এবং সকল পুরুষের উত্তম হওয়ায়, ত্রিলোকে এবং বেদে আপনাকে 'পুরুষোত্তম' নামে উল্লেখ করা হয় (গীতা ১৫।১৮)।[১]

এই শ্লোকে পাঁচটি সম্বোধন আছে। সমগ্র গীতাতে এত সম্বোধন অন্য কোনো শ্লোকে নেই। কারণ হল এই যে ভগবানের বিভূতি এবং ভক্তদের প্রতি কৃপা করার কথা শুনে অর্জুনের ভগবানের প্রতি এক বিশেষভাব উৎপন্ন হয়, সেই ভাবে বিভোর হয়ে তিনি ভগবানের প্রতি একসঙ্গে পাঁচটি সম্বোধনের প্রয়োগ করেছেন[২]।

'স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বম্'—ভগবান নিজেই নিজেকে নিজের দ্বারা জানেন। নিজেই নিজেকে জানার জন্য তাঁর কোনো প্রাকৃত সাধনের প্রয়োজন হয় না, নিজেকে জানতে তাঁর কোনো বৃত্তির প্রয়োজন নেই, কোনো সন্দেহও হয় না, কোনো করণের (অন্তঃকরণ এবং বহিঃকরণের) প্রয়োজন হয় না। তাঁর কোনো শরীর বা শরীরী ভাবও নেই। তিনি স্বতঃ স্বাভাবিকভাবে নিজেই নিজেকে নিজের থেকে জানেন। তার এই জ্ঞান করণ-নিরপেক্ষ, করণ-সাপেক্ষ নয়।

এই শ্লোকটির ভাব হল এই যে, ভগবান যেমন নিজেই নিজের দ্বারা নিজেকে জানেন, তেমনই ভগবানের অংশ জীবেরও নিজের দ্বারা নিজেকে অর্থাৎ নিজেই নিজের স্বরূপ জানা উচিত। নিজের দ্বারা নিজ স্বরূপের যে জ্ঞান হয়, তা সম্পূর্ণভাবে করণ-নিরপেক্ষ। তাই ইন্দ্রিয়াদি, মন ও বুদ্ধির সাহায্যে নিজ স্বরূপ জানা যায় না। ভগবানের অংশোদ্ভূত হওয়ায় ভগবানের মতোই জীবের স্বরূপ-জ্ঞানও করণ-নিরপেক্ষ হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব—আপনি নিজেই নিজেকে জানেন—এর অর্থ হল যে জ্ঞাতাও আপনি, জ্ঞানও আপনি এবং জ্ঞেয়ও আপনি অর্থাৎ সবকিছু আপনিই। আপনি ছাড়া যখন আর কিছুই নেই তখন কে কাকে জানবে ?

তত্ত্বকে জানার চেষ্টা করলে তত্ত্ব থেকে দূরে সরে যাবে কারণ তত্ত্বকে জ্ঞেয় (জানার বিষয়) করলে, তাহলেই তো তাকে জানতে চাইবে ! তত্ত্ব সকলের জ্ঞাতা, জ্ঞেয় নয়। সকলের জ্ঞাতার জ্ঞাতা আর কেউ হতে পারে না[৩]। যেমন, চোখের দ্বারা সব কিছু দেখা যায়, কিন্তু চোখ দিয়ে চোখকে দেখা সম্ভব নয়, কেন-না চোখকে দেখার শক্তি ইন্দ্রিয়ের বিষয় নয়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি নিজেই অতীন্দ্রিয়[৪]। অতএব এই পরমাত্মতত্ত্ব নিজেই নিজের জ্ঞাতা।

***

সম্বন্ধ—বিভূতিগুলির জ্ঞান ভগবানে ভক্তি দৃঢ়তর করে (গীতা ১০।৭)। তাই পরবর্তী তিনটি শ্লোকে অর্জুন ভগবানের কাছে বিস্তারিতভাবে বিভূতিসমূহ বর্ণনা করার জন্য অনুরোধ করেছেন।

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি॥ ১৬ ॥

---

[১]কাব্যেও ভগবানকে 'পুরুষোত্তম' বলা হয়েছে—
'হরির্যথৈকঃ পুরুষোত্তমঃ স্মৃতঃ' (রঘুবংশ. ৩।৪৯)

[২]এখানে ভূতভাবন, ভূতেশ, দেবদেব, জগৎপতে ও পুরুষোত্তম—এই পাঁচটি সম্বোধন ক্রমশঃ সূর্য, শিব, গণেশ, শক্তি ও বিষ্ণু—ঈশ্বরকোটির এই পঞ্চ দেবতার বাচক বলেও মানা যেতে পারে। এই সম্বোধনগুলি প্রয়োগ করে অর্জুন যেন ভগবানকে বলেছেন যে, এই পঞ্চ দেবতা মূলতঃ আপনিই।

[৩]'নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা' (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৩।৭।২৩)
'ইনি ছাড়া দ্রষ্টা আর কেউ নেই।'
'বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ' (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ২।৪।১৪)
'সকলের বিজ্ঞাতাকে কেমন করে জানা যায় ?'

[৪]ইন্দ্রিয়াদিকে ইন্দ্রিয়গুলি দেখে না, দেখে মন। মনকে যে দেখে সে হল বুদ্ধি, মন নয়। বুদ্ধিকে বুদ্ধি দ্বারা দেখা যায় না, যে দেখে সে হল অহং। অহংকেও অহং দেখে না, দেখেন সেই স্বয়ং স্ব-স্বরূপ। কিন্তু স্ব-স্বরূপ নিজেই নিজেকে দেখেন।

[হি, যাভিঃ, বিভূতিভিঃ (যেসব বিভূতি দ্বারা) ; ত্বম্ (আপনি) ; ইমান্, লোকান্ (সর্বলোকে) ; ব্যাপ্য, তিষ্ঠসি (ব্যাপ্তিস্বরূপ হয়ে অবস্থান করছেন) ; দিব্যাঃ, আত্মবিভূতয়ঃ (সেই বিভূতিগুলি) ; অশেষেণ (সম্পূর্ণভাবে) ; বক্তুম্ (বর্ণনা করতে) ; অর্হসি (সক্ষম।)]

অতএব যেসব বিভূতি দ্বারা আপনি সর্বলোকে ব্যাপ্তিস্বরূপ হয়ে অবস্থান করছেন, সেইসকল দিব্য বিভূতি সম্পূর্ণভাবে আপনিই বর্ণনা করতে সক্ষম॥ ১৬ ॥

ব্যাখ্যা—'যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি'—ভগবান আগে (সপ্তম শ্লোকে) বলেছেন যে, যে ব্যক্তি আমার বিভূতি ও যোগ তত্ত্বতঃ জানেন তাঁর আমাতে অচলা ভক্তি হয়। সেটি শুনে অর্জুনের মনে হয়েছে যে ভগবানে দৃঢ় ভক্তি হওয়ার এটি অতি সহজ ও শ্রেষ্ঠ উপায়। কারণ ভগবানের বিভূতি ও যোগ তত্ত্বতঃ জানলে মানুষের মন স্বাভাবিকভাবেই ভগবানের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং তখন স্বতই তার ভগবানে ভক্তি উৎপন্ন হয়। অর্জুন নিজের কল্যাণ কামনা করেন এবং কল্যাণের জন্য ভক্তি তাঁর শ্রেষ্ঠ উপায় বলে মনে হয়েছে। তাই অর্জুন বলেছেন যে, যে বিভূতিগুলির দ্বারা আপনি সমগ্র লোকে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন, সেই অলৌকিক, বিশেষ বিশেষ বিভূতিগুলি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করুন। কারণ আপনিই একমাত্র সেগুলি বলতে সক্ষম ; আপনি ছাড়া এই বিভূতিগুলি আর কেউই বলতে সক্ষম নয়।

'বক্তুমর্হস্যশেষেণ'—আপনি প্রথমে (সপ্তম, নবম এবং এখানে দশম অধ্যায়ের প্রারম্ভে) আপনার বিভূতির কথা বলেছেন এবং জানিয়েছেন যে সেগুলি জানার ফল হল দৃঢ়ভাবে ভক্তিযোগ হওয়া। অতএব আমিও আপনার সমস্ত বিভূতি জানতে চাই যাতে আপনাতে আমার ভক্তি দৃঢ়তর হয়। সুতরাং আপনি আপনার বিভূতিগুলি সম্পূর্ণভাবে বলুন, কিছু যেন বাকি না থাকে।

'দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ'—বিভূতিগুলিকে দিব্য বলার অর্থ এই যে, জগতে যা কিছু বিশেষত্ব দেখা যায় তা বাস্তবে দিব্য পরমাত্মারই প্রকাশ, জগতের নয়। তাই সংসারের বিশেষত্ব দেখাকে ভোগ বলা হয় আর পরমাত্মাতে বিশেষত্ব দেখাকে বলা হয় বিভূতি, বলা হয় যোগ।

পরিশিষ্ট-ভাব—অর্জুন ভগবানকে বলেছেন যে, আপনার সমস্ত বিভূতি আপনিই বর্ণনা করতে পারেন, কারণ আপনি নিজেই নিজেকে জানেন (গীতা ১০।১৫)। অন্যদের পক্ষে আপনাকে জানা কখনোই সম্ভব নয় (১০।২, ১৪)। অতএব আপনি নিজেই আপনার সম্পূর্ণ বিভূতিগুলি বলুন, যাতে আমার অবিচল ভক্তিযোগ লাভ হয়।

※ ※ ※

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ ময়া॥ ১৭ ॥

[যোগিন্ (হে যোগীন্!) ; সদা, পরিচিন্তয়ন্ (সদা সর্বতোভাবে চিন্তারতঃ) ; অহম্, ত্বাম্ (আমি আপনাকে) ; কথম্, বিদ্যাম্ (কেমন করে জানব ?) ; চ, ভগবন্ (এবং হে ভগবন্) ; কেষু, কেষু (কোন্ কোন্) ; ভাবেষু (ভাবের মাধ্যমে) ; ময়া (আমার দ্বারা) ; চিন্ত্যঃ, অসি (চিন্তনীয় হতে পারেন ?)]

হে যোগীন্ ! সর্বদা সর্বতোভাবে চিন্তারত থেকে আমি আপনাকে কেমন করে জানব ? এবং হে ভগবন্ ! আপনি কোন্ কোন্ ভাবের মাধ্যমে আমার দ্বারা চিন্তনীয় হতে পারেন ? অর্থাৎ সর্বাঙ্গীণ কোন্ কোন্ ভাবের সাহায্যে আপনাকে আমি চিন্তা করব ? ॥ ১৭ ॥

ব্যাখ্যা—'কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্'—ভগবান সপ্তম শ্লোকে জানিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি আমার বিভূতি এবং যোগ তত্ত্বতঃ জানেন তিনি অটল ভক্তি প্রাপ্ত হন। তাই অর্জুন ভগবানকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে, সর্বদা আমি কীভাবে আপনাকে চিন্তা করব ?

'কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া'—অষ্টম অধ্যায়ের চতুর্দশ শ্লোকে ভগবান বলেছেন, যে ব্যক্তি অনন্যচিত্তে নিত্য-নিরন্তর আমার স্মরণ করেন, সেই

যোগী অনায়াসে আমাকে প্রাপ্ত হন। আবার নবম অধ্যায়ের বাইশতম শ্লোকে বলেছেন, যে অনন্যচিত্ত ভক্ত নিরন্তর আমাকে চিন্তা করেন তাঁর যোগক্ষেম আমি বহন করি। ভগবানের এইপ্রকার চিন্তার মহিমা শুনে অর্জুন বলেছেন, যে চিন্তনের সাহায্যে আমি আপনাকে তত্ত্বতঃ জানতে পারি সেই চিন্তন আমি কোথায় করব ? কোন্ বস্তু, ব্যক্তি, দেশ, কাল, ঘটনা, পরিস্থিতিতে আমি আপনাকে চিন্তা করব ? [এখানে চিন্তন করা হল সাধন আর ভগবানকে তত্ত্বতঃ জানা হল তার ফল অর্থাৎ সাধ্য।]

অর্জুন এখানে জিজ্ঞাসা করেছেন যে, আমি কোন্ কোন্ স্থানে, কী কী বস্তু, ব্যক্তি, স্থান ইত্যাদিতে আপনার কথা চিন্তা করব ? ভগবান পরে তার উত্তরে বলেছেন যে, তোমার চিন্তনে যা যা আসে সেখানেই তুমি আমাকে চিন্তা কর ; কারণ সকল বস্তু, ব্যক্তি, দেশ, কাল ইত্যাদিতে আমি পরিপূর্ণরূপে আছি। তাই কোনো বিশেষত্ব, মহত্ত্ব, সৌন্দর্য ইত্যাদির জন্য যে যে স্থানে তোমার মন যায়, সেই সেই স্থানেই তুমি আমাকে চিন্তা করবে অর্থাৎ সেই বিশেষত্বগুলি আমারই বলে জানবে। কারণ বিশেষত্ব সংসারের বলে মনে করলে সংসারের চিন্তা হবে আর আমার বলে মনে করলে আমারই চিন্তা হবে। এইভাবে সাংসারিক চিন্তন আমার চিন্তনে পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

পরিশিষ্ট-ভাব—অর্জুনের প্রশ্নের তাৎপর্য হল এই যে, হে ভগবন্ ! আপনি কোন্ কোন্ রূপে প্রকটিত হয়েছেন ? কোন্ রূপে আমি আপনার ধ্যান করব ? যাতে সহজে ভগবানকে লাভ করা যায়, সেই উদ্দেশ্যেই অর্জুন এই প্রশ্ন করেছেন। অর্জুন সকল সাধকদের প্রতিনিধি, তাই তাঁর এই প্রশ্ন সাধকদেরই জন্য।

অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানলেও তাঁর সমগ্ররূপ সম্বন্ধে অর্জুনের তেমন ধারণা ছিল না। তাই তাঁর মনে ভগবানের সমগ্ররূপ জানার আকাঙ্ক্ষা জাগে। অতএব তিনি প্রশ্ন করেছিলেন যে, আমি আপনার সমগ্ররূপ কী করে জানব ? কোন্ রূপে আমি আপনার ধ্যান করব ? এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে বিভূতিগুলি গৌণ নয় বরং এগুলি ভগবদ্‌প্রাপ্তির মাধ্যম হওয়ায় মুখ্য বা প্রধান। বিভূতিরূপে সাক্ষাৎ ভগবানই বিরাজমান। মানুষ যতক্ষণ ভগবানকে জানতে না পারে, ততক্ষণ তার মধ্যে গৌণ বা মুখ্য সম্বন্ধে চিন্তা থাকে। ভগবানকে জানলে গৌণ বা মুখ্য সম্বন্ধে আর কোনো চিন্তা থাকে না, কেন-না ভগবান ব্যতীত যখন আর কিছুই নেই, তখন তার মধ্যে আর গৌণই বা কী আর মুখ্যই বা কী ? তাৎপর্য হল যে গৌণ বা মুখ্য শুধু সাধকের দৃষ্টিতে হয়, ভগবান বা সিদ্ধের দৃষ্টিতে নয়।

* * *

বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্॥ ১৮ ॥

[**জনার্দন** (হে জনার্দন !) ; **আত্মনঃ** (আপনার) ; **যোগম্, চ** (যোগ এবং) ; **বিভূতিম্** (বিভূতিগুলি) ; **বিস্তরেণ** (বিস্তারিতভাবে) ; **ভূয়ঃ, কথয়** (পুনরায় বলুন) ; **হি** (কারণ) ; **অমৃতম্** (অমৃতময় বচন) ; **শৃণ্বতঃ** (শুনে) ; **মে** (আমার) ; **তৃপ্তিঃ** (তৃপ্তি) ; **ন, অস্তি** (হচ্ছে না।)]

হে জনার্দন ! আপনি আপনার যোগ (সামর্থ্য) এবং বিভূতিগুলি বিস্তারিতভাবে পুনরায় বলুন ; কারণ আপনার এই অমৃতময় বচন শুনে আমার তৃপ্তি হচ্ছে না॥ ১৮ ॥

ব্যাখ্যা—'বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিং চ জনার্দন'—ভগবান সপ্তম ও নবম অধ্যায়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন কিন্তু এত বলেও তাঁর তৃপ্তি হয়নি, তাই নিজে থেকেই দশম অধ্যায় বলতে শুরু করেন। দশম অধ্যায়ের আরম্ভে তিনি বলেছেন, 'তুমি এখন আমার পরম বচন শ্রবণ করো।' এই কথায় অর্জুনের লক্ষ্য বিশেষভাবে ভগবানের কৃপা ও মহত্ত্বের দিকে পড়ে এবং তিনিও ভগবানের কাছে পুনর্বার শোনাবার জন্য প্রার্থনা জানান। অর্জুন বলেছেন, 'আপনি আপনার যোগ এবং বিভূতিগুলি বিশদভাবে আবার বলুন ; কারণ আপনার এই অমৃতময় বচন শুনে আমার তৃপ্তি হচ্ছে না। মনে হচ্ছে শুধু শুনতেই থাকি।'

ভগবানের বিভূতির কথা শুনলে ভগবানে প্রত্যক্ষভাবে আকর্ষণ বৃদ্ধি পায় ভেবে অর্জুনের মনে হয়েছে যে, এই বিভূতির জ্ঞান হলে আমার ভগবানের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ হবে এবং অতি সহজেই ভগবানে ভক্তি অবিচলিত হবে। তাই অর্জুন পুনরায় বিস্তারিতভাবে বলার জন্য অনুরোধ করেছেন।

'ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্'—অর্জুন নিজের কল্যাণের সাধন জানতে আগ্রহী (গীতা ২।৭ ; ৩।২ ; ৫।১) এবং ভগবান বলেছেন বিভূতি এবং যোগ তত্ত্বতঃ জানলে আমাতে দৃঢ় ভক্তি হয় (গীতা ১০।৭)। তাই অর্জুনের এই বিভূতির বিষয় অত্যন্ত সহজ বলে মনে হয়। তিনি মনে করেন যে, তাঁকে নতুন করে কিছু করতে হবে না, নতুনভাবে চিন্তা করতে হবে না, কেবল যে যে স্থানে কোনো বিশেষভাবে মন আকৃষ্ট হবে, সেই বিশেষত্বকে শুধু ভগবানের বলে মনে করতে হবে। এর ফলে মনের গতি সংসারের দিকে প্রবাহিত না হয়ে ভগবদ্মুখী হবে, যার ফলে ভগবানে দৃঢ় ভক্তি হবে এবং অনায়াসে কল্যাণ লাভ হবে। কী সহজ, সরল এবং সুগম কাজ ! সেইজন্য অর্জুন বিভূতিগুলি আবার বলার জন্য অনুরোধ করেছেন।

যেমন, কেউ আহারে বসলে এবং কোনো খাদ্য তার ভাল লাগলে সেটিতে তার রুচি বৃদ্ধি পায় এবং সে বারংবার সেই প্রিয় খাদ্যটি চাইতে থাকে। কিন্তু তার রুচিতে দু'প্রকার প্রতিবন্ধকতা দেখা দিতে পারে। প্রথমটি হল সেই খাদ্যবস্তুটি পরিমাণে কম থাকলে সে তার চাহিদা মতো পাবে না আর দ্বিতীয়তঃ সেই খাদ্যটি অধিক পরিমাণে গ্রহণ করলে তার পেট ভরে যাবে, আর খেতে পারবে না। কিন্তু ভগবানের দ্বারা বিভূতি বর্ণনা করার এবং অর্জুনের শ্রবণ করার অন্ত নেই অর্থাৎ এতে কোনো পক্ষেরই ক্লান্তি আসে না। দু'কান ভরে অমৃতময় বচন ক্রমাগত শুনে গেলেও সেই বচনের অন্ত হয় না, তাতে তৃপ্তি হয় না। তাই অর্জুন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন, 'আপনি এরূপ অমৃতময় বচন বলতেই থাকুন।'

পরিশিষ্ট-ভাব— ক্ষুধার্তের যেমন খাদ্য এবং পিপাসার্তের যেমন জল ভালো লাগে, তেমনই জিজ্ঞাসু অর্জুনের কাছে ভগবানের বাণী খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মনে হচ্ছে। ভগবানের বাণী তাঁর যেমন যেমন বিশিষ্ট বলে মনে হচ্ছে, তেমনই তাঁর ভগবানের প্রতি বিশেষ ভাব (ভক্তি-শ্রদ্ধা) জাগরিত হচ্ছে[১]।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—অর্জুনের প্রার্থনায় পরবর্তী শ্লোক থেকে ভগবান তাঁর বিভূতি এবং যোগ সম্বন্ধীয় কথা বলতে শুরু করেন।

শ্রীভগবানুবাচ

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে॥ ১৯ ॥

[**হন্ত** (আচ্ছা, ঠিক আছে) ; **দিব্যাঃ, আত্মবিভূতয়ঃ** (আমি আমার প্রধান দিব্য বিভূতিগুলি) ; **তে** (তোমার জন্য) ; **প্রাধান্যতঃ** (সংক্ষেপে) ; **কথয়িষ্যামি** (বলছি) ; **হি, কুরুশ্রেষ্ঠ** (কারণ, হে কুরুশ্রেষ্ঠ !) ; **মে, বিস্তরস্য** (আমার বিস্তারিত বিভূতির) ; **অন্তঃ, ন, অস্তি** (কোনো অন্ত নেই।)]

শ্রীভগবান বললেন—আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি আমার প্রধান দিব্য বিভূতিগুলি তোমার জন্য সংক্ষেপে বলছি। কারণ হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! আমার বিস্তারিত বিভূতির কোনো অন্ত নেই॥ ১৯ ॥

ব্যাখ্যা—'হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ'—যোগ ও বিভূতির কথা বলার জন্য অর্জুনের যে অনুরোধ **'হন্ত'** অব্যয়ে তা স্বীকার করে ভগবান বলেছেন যে আমি আমার দিব্য, অলৌকিক, বিশিষ্ট বিভূতিগুলি তোমাকে জানাব (যোগের কথা ভগবান জানিয়েছেন পরবর্তী একচল্লিশতম শ্লোকে)।

'দিব্যাঃ' বলার অর্থ হল যে, যে যে বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনাদিতে যা কিছু বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয় তা সবই

[১]দ্রষ্টব্য 'গীতা দর্পণ' পুস্তকের দ্বাদশতম প্রবন্ধ—'গীতায় ভগবানের বিবিধরূপে প্রকটিত হওয়া।'

প্রকৃতপক্ষে ভগবানের। তাই সেগুলি ভগবানেরই বলে মনে করা হল দিব্যতা এবং সেই বস্তু, ব্যক্তি প্রভৃতির মনে করা হল অদিব্যতা অর্থাৎ জাগতিক দৃষ্টি।

'প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে'—অর্জুন যখন বললেন যে, ভগবান! আপনি আপনার বিভূতিসমূহ বিস্তারিতভাবে সম্পূর্ণরূপে বলুন, তখন ভগবান বললেন আমি আমার বিভূতিগুলি সংক্ষেপে তোমাকে বলব, কারণ আমার বিভূতির কোনো অন্ত নেই। কিন্তু পরে একাদশ অধ্যায়ে অর্জুন যখন সঙ্কোচভরে বললেন যে, 'আমি আপনার বিশ্বরূপ দর্শন করতে চাই; যদি আমার দ্বারা তা দেখা সম্ভব হয়, তবে আমাকে সেটি দর্শন করান!' তখন ভগবান বললেন, **'পশ্য মে পার্থ রূপাণি'** (১১।৫) অর্থাৎ তুমি আমার রূপগুলি দর্শন করো। এই রূপগুলির মধ্যে কটি রূপ? দুই কি চার? না, তা নয়, শত-শত, হাজার-হাজার রূপ দর্শন করো। এইভাবে এখানে অর্জুনের দ্বারা বিস্তারিতভাবে বিভূতিগুলি বলার প্রার্থনা শুনে ভগবান তাঁকে সংক্ষেপে শুনতে বলেছেন আর একাদশ অধ্যায়ে অর্জুনের একটি রূপ দেখাবার প্রার্থনায় ভগবান তাঁর শত-সহস্ররূপ দর্শন করতে বলেছেন!

এটি বড়ই আশ্চর্যের কথা যে মানুষ কান দিয়ে অনেক কথাই শুনতে সক্ষম হয়, কিন্তু চক্ষুর সাহায্যে অত কিছু দেখতে সে সক্ষম হয় না। কারণ দেখার শক্তি শ্রবণ করার শক্তির চাইতে সীমিত হয়[১]। তা সত্ত্বেও অর্জুন যখন সমস্ত বিভূতি শুনতে সক্ষম বলে জানালেন তখন ভগবান তাঁকে সংক্ষেপে শুনতে বললেন। আবার যখন অর্জুন একটি রূপ অবলোকনে বিনম্রতাপূর্বক নিজ অসামর্থ্য প্রকাশ করলেন, তখন ভগবান অনেক রূপ দেখতে বললেন। তার কারণ হল গীতায় অর্জুনের ভগবদ্‌বিষয়ে জ্ঞান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। দশম অধ্যায়ে যখন ভগবান বলেন যে, আমার বিভূতি-সমূহের কোনো অন্ত নেই, তখন অর্জুনের দৃষ্টি ভগবানের অনন্ততার দিকে যায়। তিনি মনে করলেন যে, ভগবানের বিষয়ে আমি তো কিছুই জানি না; কারণ

---

[১]কানের বিষয় হল শব্দ। শব্দ দু'প্রকারের—বর্ণাত্মক ও ধ্বন্যাত্মক। কানের সাহায্যে শব্দ শুনে আমাদের প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ (স্বর্গ, নরকাদির) জ্ঞান হয়। সেইজন্য বেদান্ত প্রক্রিয়াতে (শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন আদিতে) 'শ্রবণ' কথাটি সর্বপ্রথম এসেছে। এইভাবে ভক্তিতেও (শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন আদিতে) 'শ্রবণ' প্রথমে এসেছে। শাস্ত্রে যে পরমাত্মতত্ত্বের বর্ণনা করা হয়েছে, তার (পরোক্ষ) জ্ঞান আমাদের কান দিয়েই হয় অর্থাৎ কানে শুনেই সেই অনুযায়ী করা (কর্মযোগ), মানা (ভক্তিযোগ) বা জানা (জ্ঞানযোগ) দ্বারা আমরা সেই পরমাত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎ লাভ করি।

শব্দে অচিন্ত্য শক্তি থাকে—

শব্দশক্তেরচিন্ত্যত্বাৎ শব্দাদেবাপরোক্ষধীঃ। প্রসুপ্তঃ পুরুষো যদ্বচ্ছব্দেনৈবাববুধ্যতে। (সদাচারানুসন্ধানম্ ১৯)

মানুষ যখন ঘুমোয়, তখন ইন্দ্রিয়গুলি সঙ্কুচিত হয়ে মনে, মন সঙ্কুচিত হয়ে বুদ্ধিতে, বুদ্ধি সঙ্কুচিত হয়ে অজ্ঞানে (অবিদ্যায়) লীন হয়। এইভাবে যদিও নিদ্রায় ইন্দ্রিয় সুপ্ত থাকে, তা সত্ত্বেও নিদ্রিত মানুষকে তার নাম ধরে ডাকলে, সে জেগে ওঠে। শব্দে এত শক্তি যে, তা অবিদ্যায় লীন হওয়া ব্যক্তিকেও জাগিয়ে দেয়। অতএব শব্দে অনন্ত শক্তি। দৃষ্টি (দেখার শক্তি) তো পদার্থ পর্যন্ত গিয়ে থেমে যায় কিন্তু শব্দ কর্ণভেদ করে স্বয়ং-এ গিয়ে পৌঁছায়।

চক্ষুর দ্বারা রূপ ধরা পড়ে, যেমন দর্পণে মুখ দেখলে কাঁচের ওপর রূপের ছায়া পড়ে এবং তাতে মুখ দেখা যায়। চক্ষুর এক বিশেষ শক্তি হল যে, তা প্রথম রূপটি ধরেই দ্বিতীয় রূপটি দেখে থাকে, সেইজন্যই যখন বিদ্যুতের দ্বারা পাখা চলে তখন তিনটি ব্লেড পৃথক্‌ভাবে ঘুরলেও চোখে (পৃথক্‌ভাবে ঘুরতে দেখে না) একটি চাকার মতো দেখায়। তা সত্ত্বেও কানে যে শক্তি আছে, চোখে তা থাকে না।

ইন্দ্রিয়গুলি কেবল নিজ নিজ বিষয়কেই ধরতে সক্ষম, পরমাত্মতত্ত্বকে ধরতে পারে না। কারণ পরমাত্মতত্ত্ব ইন্দ্রিয়ের বিষয় নয়। পরমাত্মতত্ত্ব স্বয়ং-এর বিষয় অর্থাৎ তার জ্ঞান হয় স্বয়ং-এর থেকেই। তাই অর্জুন এই অধ্যায়ে বলেছেন যে আপনি নিজেই নিজেকে (স্বয়ং-কে) জানেন—'স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বম্' (গীতা ১০।১৫)। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন যে, সকল কামনা মন থেকে পরিত্যাগ করলে মানুষ স্বতঃই নিজেতে সন্তুষ্ট হয়—'প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্। আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্ট............' (২।৫৫)। তাৎপর্য হল এই যে, পরমাত্মতত্ত্বের জ্ঞান করণ-নিরপেক্ষ, তাকে চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না, কিন্তু কান শব্দের সাহায্যে তাকে স্বয়ং পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

তিনি অনন্ত, অসীম ও অপার। কিন্তু অর্জুন সহসা বলে ফেলেছিলেন যে, আপনি আপনার সমস্ত বিভূতি আমাকে বলুন। অর্জুন তাই পরে সাবধান হয়েছিলেন এবং বিনম্রতাপূর্বক একটি রূপ দর্শন করাবার জন্য ভগবানের কাছে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। চক্ষুর ক্ষমতা সীমিত হলেও ভগবান তাঁকে দিব্যচক্ষু প্রদান করে অর্থাৎ চর্মচক্ষুতে বিশেষ শক্তি প্রদান করে তাঁর বহুরূপ দর্শন করার নির্দেশ দেন।

দ্বিতীয়তঃ বক্তার ব্যক্তিগত কথা জিজ্ঞাসা করা আর নিজেকে অযোগ্য বা অসমর্থ মনে করে কৃপাপূর্বক জানাবার জন্য প্রার্থনা জানানো—এই দুটিতে পার্থক্য থাকে। অর্জুন এখানে বিভূতিগুলি বিস্তারিতভাবে জানতে চেয়ে যেন ভগবানকে তাঁর বুদ্ধির গণ্ডির মধ্যে আনতে চেয়েছিলেন। তাই ভগবান বললেন, আমি সংক্ষেপে জানাচ্ছি, কারণ আমার বিভূতির বিস্তারের শেষ নেই। একাদশ অধ্যায়ে অর্জুন তাঁর অজ্ঞতা ও অযোগ্যতা প্রকটিত করে ভগবানের কাছে তাঁর অব্যয়রূপ দেখাবার জন্য অনুরোধ করেন। তখন ভগবান তাঁকে অনন্তরূপ দর্শন করার অনুমতি প্রদান করেন এবং দেখার শক্তিও (দিব্যদৃষ্টি) প্রদান করেন! তাই সাধকের বিন্দুমাত্রও আগ্রহ বা অহংকার না রেখে এবং নিজস্ব সামর্থ্য, বুদ্ধির দীনতা স্বীকার করে শুধুমাত্র ভগবানের ওপরই সর্বতোভাবে নির্ভর করা উচিত, কারণ ভগবানের ওপর নির্ভর করলে যা পাওয়া যায়, তা অপার, অসীম।

পরিশিষ্ট-ভাব—ভগবান অনন্ত। সুতরাং তাঁর বিভূতিও অনন্ত। সেইজন্য ভগবানের বিভূতিগুলি কেউই বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে সক্ষম হন না এবং কেউ তা শুনতেও সক্ষম হন না। যদি কেউ শুনে শেষ করতে পারেন তাহলে ভগবান আর অনন্ত থাকবেন কীভাবে? তাই ভগবান বলেছেন যে, আমি আমার বিভূতিগুলি সংক্ষেপে জানাব।

অর্জুনকে 'কুরুশ্রেষ্ঠ' বলে ভগবানের সম্বোধন করার অর্থ হল যে, তোমার মনে আমাকে জানার জন্য যে ইচ্ছা জাগ্রত হয়েছে, তার জন্যই তুমি শ্রেষ্ঠ!

※ ※ ※

সম্বন্ধ—বিভূতি এবং যোগ—উভয়ের মধ্যে ভগবান প্রথমে কুড়িতম শ্লোক থেকে উনচল্লিশতম শ্লোক পর্যন্ত তাঁর বিরাশীটি বিভূতি বর্ণনা করেছেন।

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥ ২০ ॥

[**গুড়াকেশ** (হে নিদ্রাজয়ী অর্জুন!) ; **ভূতানাম্** (সকল প্রাণীর) ; **আদিঃ, মধ্যম্, চ** (আদি, মধ্য এবং) ; **অন্তঃ** (অন্তে) ; **অহম্, এব** (আমিই অবস্থিত) ; **চ, সর্বভূতাশয়স্থিতঃ** (এবং তাদের হৃদয়ে) ; **আত্মা** (আত্মারূপেও) ; **অহম্** (আমিই অবস্থান করছি।)]

হে নিদ্রাজয়ী অর্জুন! সকল প্রাণীর আদি, মধ্য এবং অন্তে আমিই অবস্থিত এবং তাদের হৃদয়ে (অন্তঃকরণে) আত্মারূপেও আমিই অবস্থান করি॥ ২০ ॥

ব্যাখ্যা—[দু'ভাবে ভগবানের চিন্তন করা হয়—(১) সাধক যাঁকে তাঁর ইষ্ট বলে মনে করেন, তাঁকে ছাড়া আর কারও চিন্তা না করা। যদি তা কখনো হয়ও তাহলে মনকে সেখান থেকে সরিয়ে নিজ ইষ্টদেবের ধ্যানে ব্যাপৃত করা, এবং ২) মনে সাংসারিক কোনো বিশেষ ব্যাপার নিয়ে চিন্তার উদয় হলে, সেটি ভগবানের বিশেষত্ব বলে ভাবা। এই দ্বিতীয় চিন্তা বা ধ্যানের জন্যই এখানে বিভূতিগুলির বর্ণনা করা হয়েছে। তাৎপর্য হল এই যে কোনো বিশেষত্বের জন্য যে যে স্থানে চিন্তা যায়, সেখানে ভগবানেরই চিন্তন করা উচিত, কোনো বস্তু বা ব্যক্তির নয়। সেইজন্যই ভগবান তাঁর বিভূতি বর্ণনা করেছেন।]

'অহমাদিশ্চ মধ্যং চ ভূতানামন্ত এব চ'[১]—ভগবান এখানে তাঁর সমস্ত বিভূতির সার কথা জানিয়েছেন যে সমস্ত প্রাণীর আদি, মধ্য এবং অন্তে তিনিই অবস্থিত। নিয়ম হল যে, যেসব বস্তু উৎপত্তি ও বিনাশশীল, তার আরম্ভ এবং শেষে যে তত্ত্ব থাকে, সেই তত্ত্ব তার মধ্যভাগেও থাকে (তা দেখা যাক বা না যাক) অর্থাৎ যে বস্তু যে তত্ত্ব থেকে উৎপন্ন হয় এবং যাতে লীন হয়, সেই বস্তুটির আদি, মধ্য ও অন্তে (সব সময়েই) সেই একই তত্ত্ব থাকে। যেমন স্বর্ণনির্মিত গহনায় প্রথমে সোনা থাকে এবং শেষে সোনা গহনায় পরিবর্তিত হলেও সোনা থাকে আর মধ্যবর্তীকালেও সোনা-ই থাকে। মধ্যবর্তীকালে শুধু নাম, আকৃতি, ব্যবহার, মাপ, ওজন ইত্যাদিই ভিন্ন ভিন্ন হয় ; কিন্তু এগুলি বিভিন্ন হলেও গহনারূপে এক সোনা-ই থাকে। এইরূপ সমস্ত প্রাণীও আদিতে পরমাত্মস্বরূপ ছিলেন এবং অন্তে লীন হলেও পরমাত্মস্বরূপ থাকবেন এবং মধ্যবর্তী সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নাম, রূপ, আকৃতি, ক্রিয়া, স্বভাব হলেও তত্ত্বতঃ পরমাত্মস্বরূপই বিরাজিত—এই কথা জানাবার জন্যই ভগবান নিজেকে সমস্ত প্রাণীর আদি, মধ্য ও অন্তে বিরাজমান বলে জানিয়েছেন।

ভগবান এই বিভূতি বর্ণনার প্রকরণে প্রারম্ভে, মধ্যে ও শেষে—সাররূপে তাঁর বিভূতির বর্ণনা করেছেন। প্রারম্ভের এই কুড়িতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন সমস্ত প্রাণীর আদি, মধ্য ও অন্তে আমিই বিরাজিত ; মধ্যভাগে বত্রিশতম শ্লোকে বলেছেন যে সমস্ত সর্গের (সৃষ্ট পদার্থসমূহের) আদি, মধ্য ও অন্তেও আমিই বিরাজমান ; আমি ছাড়া আর কোনো চর বা অচর প্রাণী নেই এবং শেষের উনচল্লিশতম শ্লোকে বলেছেন সকল প্রাণীর যে বীজ তা আমিই। চিন্তা করার জন্য এটি হল বিভূতির সার কথা। তাৎপর্য হল এই যে কোনো বিশেষ কিছু নিয়ে যে বিভূতির কথা বলা হয়েছে, সেগুলি ছাড়াও যা কিছু দেখা যায় সেগুলি সবই ভগবানের বিভূতি—এটি জানাবার জন্যই ভগবান নিজেকে সমস্ত চরাচর প্রাণীর আদি, মধ্য ও অন্তে বিদ্যমান বলেছেন। তত্ত্বতঃ সবকিছুই পরমাত্মা— **'বাসুদেবঃ সর্বম্'**—এটির দিকে লক্ষ্য করানোর জন্যই বিভূতির বর্ণনা করা হয়েছে।

এই বিংশতিতম শ্লোকে প্রাণীদের মধ্যে যে আত্মা আছে, জীবেদের যা স্বরূপ, ভগবান সেগুলি তাঁরই বিভূতি বলে জানিয়েছেন। আবার বত্রিশতম শ্লোকে ভগবান সৃষ্টিরূপে তাঁর বিভূতির কথা বলেছেন, জড়-চেতন, স্থাবর-জঙ্গম সৃষ্টির আদিতে 'আমি একাই বহুরূপ ধারণ করব' (**'বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি'**—ছান্দোগ্য. ৬।২।৩)—এই সংকল্প করি এবং শেষকালে আমিই অবশিষ্ট থাকি—**'শিষ্যতে শেষসংজ্ঞঃ'** (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩।২৫)। অতএব মধ্যেও সবকিছু আমিই— **'বাসুদেবঃ সর্বম্'** (গীতা ৭।১৯) **'সদসচ্চাহমর্জুন'** (গীতা ৯।১৯)। কারণ যে তত্ত্ব আদি ও অন্তে থাকে, সেটি মধ্যেও থাকে। শেষে উনচল্লিশতম শ্লোকে ভগবান বীজ (কারণ) রূপে তাঁর বিভূতির কথা জানিয়ে বলেছেন যে তিনিই সবকিছুর বীজ, তিনি ছাড়া কোনো প্রাণীর অস্তিত্ব নেই। এইভাবে এই তিন স্থানে—তিনটি শ্লোকে প্রধান বিভূতির কথা বলেছেন। অন্য শ্লোকাদিতে যেগুলি সমূহের মধ্যে প্রধান, সমূহের মধ্যে যেগুলির প্রাধান্য আছে, যেগুলিতে কোনো বিশেষত্ব আছে, সেগুলিকে নিয়ে বিভূতির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সাধকদের উচিত এইসব বিভূতির মহত্ত্ব, বিশেষত্ব, সৌন্দর্য, প্রাধান্য—এই সবের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে, এই বিভূতিগুলি যে ভগবান হতে প্রকটিত, এতে যে মহত্ত্ব ইত্যাদি আছে, তা সবই ভগবানের এবং এই বিভূতিগুলি ভগবদ্‌স্বরূপই—এইদিকে দৃষ্টি দেওয়া। কারণ অর্জুনের প্রশ্ন ভগবানের চিন্তার বিষয় নিয়ে করা হয়েছিল (১০।১৭), কোনো বস্তু বা ব্যক্তির চিন্তার বিষয়ে নয়।

'অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ'—সাধক এই বিভূতিগুলিকে কী চোখে দেখবেন ? এই পরিপ্রেক্ষিতে জানাচ্ছেন যে সাধকের দৃষ্টি যখন প্রাণীদের দিকে যাবে তখন সাধক যেন 'সমস্ত প্রাণীতেই ভগবান আত্মারূপে বিরাজিত'—এইভাবে চিন্তা করেন। যখন কোনো

[১]এখানে 'আদিঃ' এবং 'অন্তঃ' শব্দের প্রয়োগ পুংলিঙ্গে এবং 'মধ্যম্' শব্দের প্রয়োগ ক্লীবলিঙ্গে করা হয়েছে। এর তাৎপর্য হল যে আদিতে একমাত্র পরমপুরুষ ভগবান আছেন—'অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্বশঃ' (গীতা ১০।২) এবং শেষেও একমাত্র পরমপুরুষ ভগবানই থাকেন—'শিষ্যতে শেষসংজ্ঞঃ' (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩।২৫)। তাই 'আদি' ও 'অন্ত' শব্দের প্রয়োগ ভগবান পুংলিঙ্গে করেছেন। কিন্তু মধ্যবর্তীকালে অর্থাৎ সৃষ্টির সময় পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ এবং ক্লীবলিঙ্গ—তিন লিঙ্গধারী ব্যক্তি, বস্তু, পদার্থ, ক্রিয়া, ভাব ইত্যাদি থাকে। তাই এই তিন লিঙ্গে ক্লীবলিঙ্গই অবশেষ থাকে অর্থাৎ ক্লীবলিঙ্গের মধ্যেই তিনটি লিঙ্গ এসে যায়। তাই ভগবান এখানে এবং পরে বত্রিশতম শ্লোকেও 'মধ্য' শব্দটির প্রয়োগ ক্লীবলিঙ্গে করেছেন।

বিচারশীল সাধকের দৃষ্টি সৃষ্টির দিকে যাবে, তখন তিনি যেন 'উৎপত্তি-বিনাশশীল এবং সর্বদা পরিবর্তনশীল সৃষ্টির আদি, মধ্য এবং অন্তে এক ভগবানই বিরাজমান'—এইরূপ চিন্তা করেন। যদি কখনো প্রাণীদের মূল কারণের দিকে তাঁর দৃষ্টি চলে যায় তাহলে তিনি যেন 'বীজরূপে ভগবানই বর্তমান, ভগবান ভিন্ন কোনো চর-অচর প্রাণী নেই এবং হওয়া সম্ভবও নয়'—এইভাবে চিন্তা করবেন।

পরিশিষ্ট-ভাব—সমস্ত প্রাণীর আদি, মধ্য ও অন্তে ভগবানই বিরাজমান—এই কথার তাৎপর্য হল যে একমাত্র ভগবান ছাড়া আর কিছুই নেই অর্থাৎ সবই ভগবান।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হলেন সমগ্র আর আত্মা হল তাঁর বিভূতি। আত্মা ভগবানের 'পরা প্রকৃতি' আর অন্তঃকরণ হল 'অপরা প্রকৃতি' (গীতা ৭।৪-৫)। পরা এবং অপরা— দুই-ই ভগবান হতে অভিন্ন।

※　※　※

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্মরুতামস্মি　　নক্ষত্রাণামহং　　শশী॥ ২১ ॥

[**অহম্** (আমি) ; **আদিত্যানাম্** (অদিতির পুত্রদের মধ্যে) ; **বিষ্ণু** (বিষ্ণু) ; **জ্যোতিষাম্** (জ্যোতিষ্মান বস্তুর মধ্যে) ; **অংশুমান, রবিঃ** (আমি কিরণমালী সূর্য) ; **অহম্, মরুতাম্** (আমিই মরুৎদের মধ্যে) ; **মরীচিঃ** (তেজ এবং) ; **নক্ষত্রাণাম্** (নক্ষত্রদের মধ্যে) ; **শশী, অস্মি** (চন্দ্র।)]

আমি অদিতির পুত্রদের মধ্যে বিষ্ণু (বামন), জ্যোতিষ্মান বস্তুর মধ্যে আমি কিরণমালী সূর্য। আমিই মরুৎদের মধ্যে তেজ এবং নক্ষত্রদের মধ্যে চন্দ্র॥ ২১ ॥

ব্যাখ্যা—[এই বিভূতিগুলিতে ষষ্ঠী প্রযুক্ত হয়েছে। ষষ্ঠীর প্রয়োগ নির্ধারণে অর্থাৎ মুখ্যতার অর্থেও হয় আবার সম্বন্ধের অর্থেও হয়। এই শ্লোকের পূর্বার্ধে নির্ধারণ অর্থে এবং উত্তরার্ধে সম্বন্ধ অর্থে ষষ্ঠীর প্রয়োগ হয়েছে।]

'আদিত্যানামাহং বিষ্ণুঃ'—অদিতির ধাতা, মিত্র ইত্যাদি যত পুত্র আছেন, তার মধ্যে 'বিষ্ণু' বা বামনই প্রধান। ভগবান বিষ্ণুই বামনরূপে অবতার হয়ে দানরূপে দৈত্যদের সম্পত্তি গ্রহণ করেছিলেন এবং সেটি অদিতির পুত্রদের (দেবতা) দিয়েছিলেন[১]।

'জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্'—চন্দ্র, নক্ষত্র, তারা, অগ্নি ইত্যাদি যত প্রকার জ্যোতিষ্মান্ বস্তু আছে তাদের মধ্যে কিরণমালী সূর্য আমার বিভূতি ; কারণ প্রকাশকারী বস্তুর মধ্যে সূর্যের প্রাধান্য আছে। সূর্যের কিরণেই সবকিছু প্রকাশিত হয়।

'মরীচির্মরুতামস্মি'—সত্ত্বজ্যোতি, আদিত্য, হরিৎ ইত্যাদি নামে যে উনপঞ্চাশজন মরুৎ আছেন, তাঁদের প্রধান তেজ আমি। সেই তেজের প্রভাবেই ইন্দ্র দিতির গর্ভ সাত খণ্ড করলেও এবং সেই সাত খণ্ডকে আবার সাতটি করে টুকরো করলেও সেগুলি মরেনি, বরং এক থেকে উনপঞ্চাশ হয়েছে।

'নক্ষত্রাণামহং শশী'—অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা ইত্যাদি যে সাতাশটি নক্ষত্র আছে, তাদের অধিপতি চন্দ্র আমিই।

এই বিভূতিগুলির যে বিশেষত্ব—মহত্ত্ব, তা বাস্তবে ভগবানেরই।

[এই প্রকরণে যে বিভূতিগুলি বর্ণিত হয়েছে, ভগবান সেগুলিকে বিভূতিরূপেই বলেছেন, অবতাররূপে নয় ; যেমন অদিতির পুত্রদের মধ্যে আমি 'বামন' (১০।২১), শস্ত্রধারীদের মধ্যে আমি 'রাম' (১০।৩১), বৃষ্ণিবংশীয়দের মধ্যে 'বাসুদেব' (কৃষ্ণ) এবং পাণ্ডবদের মধ্যে ধনঞ্জয় (অর্জুন) আমিই (১০।৩৭) ইত্যাদি। কারণ এখানে প্রসঙ্গ হল বিভূতির।]

※　※　※

[১]বার মাসে যে বারো আদিত্য আছেন তার মধ্যে কার্তিক মাসের সূর্যকেও 'বিষ্ণু' বলা হয়।

বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥ ২২ ॥

[বেদানাম্ (বেদসমূহের মধ্যে) ; সামবেদঃ, অস্মি (সামবেদ) ; দেবানাম্ (দেবতাদের মধ্যে) ; বাসবঃ, অস্মি (ইন্দ্র) ; ইন্দ্রিয়াণাম্ (ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে) ; মনঃ, অস্মি (মন) ; চ (এবং) ; ভূতানাম্ (প্রাণীদের মধ্যে) ; চেতনা, অস্মি (চেতনা।)]

বেদসমূহের মধ্যে আমি সামবেদ, দেবতাদের মধ্যে আমি ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে আমি মন এবং প্রাণীদের মধ্যে আমি চেতনা ॥ ২২ ॥

ব্যাখ্যা—**'বেদানাং সামবেদোঽস্মি'**—বেদের যে শ্লোকগুলি স্বরসহিত গীত হয় সেগুলিকে বলা হয় 'সামবেদ'। সামবেদে ইন্দ্ররূপে ভগবানের স্তুতির বর্ণনা আছে। তাই সামবেদ ভগবানের বিভূতি।

'দেবানামস্মি বাসবঃ'—সূর্য, চন্দ্র আদি যত দেবতা আছেন, তাঁদের মধ্যে ইন্দ্র হলেন প্রধান এবং সকলের অধিপতি। তাই ভগবান তাঁকে নিজ বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

'ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি'—চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মনই হল প্রধান। সমস্ত ইন্দ্রিয়ই মনের সাহায্যে কাজ করে থাকে। মন সঙ্গে না থাকলে ইন্দ্রিয়গুলি কাজ করে না। যদি মন সঙ্গে না থাকে তবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোনো জিনিস সম্মুখে থাকলেও সেই জিনিসের জ্ঞান হয় না। মনের এই বিশেষত্ব ভগবান থেকেই এসেছে। তাই ভগবান মনকে তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

'ভূতানামস্মি চেতনা'—সমস্ত প্রাণীর যে চেতনা-শক্তি, প্রাণশক্তি, যার দ্বারা মৃত ব্যক্তি ও শায়িত ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য হয়, তাকেই ভগবান তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

এই বিভূতিগুলিতে যে বিশেষত্ব, তা ভগবান থেকেই এসেছে। এদের নিজস্ব কোনো বিশেষত্ব নেই।

※ ※ ※

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥ ২৩ ॥

[রুদ্রাণাম্ (একাদশ রুদ্রের মধ্যে) ; শঙ্করঃ, চ (শঙ্কর এবং) ; যক্ষরক্ষসাম্ (যক্ষ-রাক্ষসদের মধ্যে) ; বিত্তেশঃ, অস্মি (কুবের) ; বসূনাম্ (অষ্ট বসুর মধ্যে) ; পাবকঃ, চ (পাবক বা অগ্নি এবং) ; শিখরিণাম্ (চূড়াযুক্ত পর্বতগণের মধ্যে) ; মেরুঃ (সুমেরু পর্বত) ; অহম্, অস্মি (আমি।)]

একাদশ রুদ্রের মধ্যে আমি শঙ্কর ও যক্ষ-রাক্ষসদের মধ্যে কুবের, অষ্ট বসুর মধ্যে আমি পাবক বা অগ্নি এবং চূড়াযুক্ত পর্বতের মধ্যে আমি সুমেরু পর্বত ॥ ২৩ ॥

ব্যাখ্যা—**'রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি'**—হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক প্রভৃতি একাদশ রুদ্রের মধ্যে শম্ভু অর্থাৎ শঙ্কর সকলের অধিপতি। তিনি কল্যাণপ্রদানকারী এবং কল্যাণস্বরূপ। তাই ভগবান তাঁকে তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

'বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্'—যক্ষ এবং রাক্ষসগণের অধিপতি হলেন কুবের এবং এঁকে ধনাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করা হয়েছে। সমস্ত যক্ষ ও রাক্ষসগণের প্রধান হওয়ায় ইনি হলেন ভগবানের বিভূতি।

'বসূনাং পাবকশ্চাস্মি'—ধর, ধ্রুব, সোম ইত্যাদি অষ্ট বসুর মধ্যে অনল অর্থাৎ অগ্নি হলেন সবার অধিপতি। তিনি সকল দেবতার মধ্যে যজ্ঞের আহুতি বিতরণকারী এবং ভগবানের মুখস্বরূপ। সেইজন্য ভগবান এঁকে তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

'মেরুঃ শিখরিণামহম্'—সোনা, রূপা, তামা প্রভৃতির চূড়াযুক্ত যত পর্বত আছে তার মধ্যে সুমেরু পর্বত প্রধান। এটি সোনা ও রূপার ভাণ্ডার। সেইজন্য ভগবান এটিকে নিজের বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

এই শ্লোকে যে চার প্রকার বিভূতি কথিত হয়েছে, তাতে যা কিছু বিশেষত্ব, মহত্ত্ব পরিলক্ষিত হয়, তা সবই মূলরূপ পরমাত্মা থেকে আসা। অতএব এইসব বিভূতিতে পরমাত্মার চিন্তাই করা উচিত।

❋ ❋ ❋

পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ॥ ২৪ ॥

[পার্থ (হে পার্থ!) ; পুরোধসাম্ (পুরোহিতগণের মধ্যে) ; মুখ্যম্ (প্রধানরূপে) ; বৃহস্পতিম্, মাম্, বিদ্ধি (বৃহস্পতি বলে আমাকে জেনো) ; সেনানীনাম্ (সেনানায়কদের মধ্যে) ; অহং, স্কন্দঃ (আমি স্কন্দ) ; চ, সরসাম্ (এবং জলাশয়সমূহের মধ্যে) ; সাগরঃ (সমুদ্র) ; অস্মি (আমি।)]

হে পার্থ ! আমাকে পুরোহিতগণের মধ্যে প্রধান বৃহস্পতি বলে জেনো, সেনানায়কদের মধ্যে আমি স্কন্দ (কার্তিক) এবং জলাশয়সমূহের মধ্যে আমি সাগর॥ ২৪ ॥

ব্যাখ্যা—**'পুরোধসাং চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্'** জগতে যত পুরোহিত আছেন, বৃহস্পতি বিদ্যা-বুদ্ধিতে তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনি ইন্দ্রের এবং দেবতাদের কুলপুরোহিত। তাই ভগবান অর্জুনকে বলেছেন বৃহস্পতিকে তাঁর বিভূতি বলে জানতে।

'সেনানীনামহং স্কন্দঃ'—স্কন্দ (কার্তিক) শঙ্করের পুত্র। এঁর ছ'টি মুখ এবং বারোটি হাত। ইনি দেবগণের সেনাপতি এবং জগতের সকল সেনাপতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাই ভগবান এঁকে তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

'সরসামস্মি সাগরঃ'—পৃথিবীতে যত জলাশয় আছে তার মধ্যে সব থেকে বিরাট হল সমুদ্র, সমুদ্র সমস্ত জলাশয়ের অধিপতি এবং স্বমহিমায় স্থিত অর্থাৎ প্রশান্ত। তাই সমুদ্রকে ভগবান তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

এখানে এই বিভূতিগুলির মধ্যে যে অলৌকিকত্ব দেখা যায় তা এদের নিজস্ব নয়, এগুলি ভগবানেরই এবং তাঁর থেকেই আহরিত। সুতরাং এগুলিকে দেখলে ভগবানের স্মৃতি জাগা উচিত।

❋ ❋ ❋

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ॥ ২৫ ॥

[মহর্ষীণাম্ (মহর্ষীদের মধ্যে) ; ভৃগুঃ (আমি ভৃগু) ; গিরাম্ (বাণীর মধ্যে) ; একম্, অক্ষরম্ (একাক্ষর ওঁকার) ; অহম্, অস্মি (আমি) ; যজ্ঞানাম্ (সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে) ; জপযজ্ঞঃ (আমি জপযজ্ঞ) ; স্থাবরাণাম্ (স্থাবর পদার্থের মধ্যে) ; হিমালয়ঃ, অস্মি (আমি হিমালয়।)]

মহর্ষিদের মধ্যে আমি ভৃগু, বাণীর (শব্দের) মধ্যে আমি একাক্ষর ওঁকার অর্থাৎ প্রণব। সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ এবং স্থাবর পদার্থের মধ্যে আমি হিমালয়॥ ২৫ ॥

ব্যাখ্যা—**'মহর্ষীণাং ভৃগুরহং'**—ভৃগু, অত্রি, মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিদের মধ্যে ভৃগু মস্ত বড় ভক্ত, জ্ঞানী এবং তেজস্বী। তিনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর—এই তিনজনকে পরীক্ষা করে ভগবান বিষ্ণুকেই শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণ করেছিলেন। ভগবান বিষ্ণুও নিজ বক্ষস্থলে ভৃগুর পদচিহ্ন 'ভৃগুলতা' নামে ধারণ করে রেখেছেন। তাই ভগবান এঁকে তাঁর বিভূতি বলেছেন।

'গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্'—সর্বপ্রথম তিন অক্ষরবিশিষ্ট প্রণব প্রকটিত হয়েছে। প্রণব থেকে ত্রিপদা গায়ত্রী, ত্রিপদা গায়ত্রী হতে বেদ এবং বেদসমূহ হতে শাস্ত্র, পুরাণ ইত্যাদি সমস্ত বাঙ্ময় জগৎ প্রকটিত হয়েছে। সুতরাং এই সবের কারণ হওয়ায় এবং এই সবের থেকে শ্রেষ্ঠ হওয়ায় ভগবান এক-অক্ষর প্রণবকে নিজ বিভূতি বলে জানিয়েছেন। গীতার আরও কয়েক স্থানে এর বর্ণনা

আছে ; যেমন—**'প্রণবঃ সর্ববেদেষু'** (৭।৮) 'বেদ-সমূহের মধ্যে আমি প্রণব' ; **'ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্। যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্'** ॥ (৮।১৩) 'যে ব্যক্তি 'ওঁ'— এই এক অক্ষর প্রণব উচ্চারণ করে এবং ভগবানকে স্মরণ করে দেহ পরিত্যাগ করেন, তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন' ; **'তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃ ক্রিয়াঃ। প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্'** (১৭।২৪) 'বৈদিক ব্যক্তিদের শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞ, দান এবং তপস্যারূপ ক্রিয়াগুলি প্রণব উচ্চারণ করেই আরম্ভ হয়।'

'যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি'—মন্ত্রের সাহায্যে যত যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, সেগুলিতে নানাপ্রকার বস্তু-পদার্থ, বিধি-নিয়মের প্রয়োজনীয়তা হয়ে থাকে এবং তাতে কিছু না কিছু ত্রুটি থেকেই যায়। কিন্তু জপযজ্ঞ অর্থাৎ ভগবদ্‌নাম জপ করায় কোনো পদার্থ বা বিধি-নিয়মের প্রয়োজন নেই। এতে কোনো ত্রুটি হওয়া তো দূরের কথা বরং এর দ্বারা অপর সমস্ত দোষ নাশ হয়। জপ করতে সকলেই সক্ষম। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভগবদ্‌নামের পার্থক্য থাকলেও, নামজপের দ্বারা যে কল্যাণ হয়—তা হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন সকলেই মানেন। তাই ভগবান জপযজ্ঞকে তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

'স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ'—যত পর্বত আছে তার মধ্যে তপস্যার স্থল হওয়ায় হিমালয় মহাপবিত্র এবং সব পর্বতের অধিপতি স্বরূপ। গঙ্গা, যমুনা ইত্যাদি তীর্থস্বরূপ পবিত্র নদীগুলি হিমালয় থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। ভগবদ্-প্রাপ্তিতে হিমালয় অত্যন্ত সহায়ক স্থল। এখনও দীর্ঘায়ু মহাযোগী ঋষিগণ হিমালয়ের গুহায় সাধন-ভজন করে থাকেন। নর-নারায়ণ ঋষিও জগতের কল্যাণের জন্য হিমালয়ে আজও তপস্যারত। ভগবান শঙ্করের শ্বশুরবাড়ি হল এই হিমালয় এবং তিনি এরই এক শিখর কৈলাস শৃঙ্গে বসবাস করেন। সেইজন্য ভগবান হিমালয়কে তাঁর বিভূতি বলে উল্লেখ করেছেন।

জগতে যা কিছু বিশেষরূপে দেখা যায়, সেগুলি জাগতিক বলে মনে করলে মানুষ তাতে বদ্ধ হয়, যার ফলে তার পতন ঘটে। কিন্তু ভগবান অত্যন্ত সরল সাধন প্রণালী জানিয়ে দিয়েছেন যে, তোমার মন যে যে স্থানে যে যে বিশেষত্বের দিকে আকৃষ্ট হবে, সেখানেই সেই বিশেষত্বগুলি তুমি আমার বলে জানবে। এইসব বিশেষত্ব ভগবানের এবং তাঁর থেকেই আহরিত, এই পরিবর্তনশীল, বিনাশশীল জগতের নয়। এরূপ জানলে এবং মানলে তোমার মন আমাতে আকৃষ্ট হবে, তোমার মনে আমারই মহত্ত্ব জেগে উঠবে। এর ফলে জাগতিক চিন্তা দূর হয়ে আমার চিন্তা হবে, তাতে আমাতে তোমার অনুরাগ হবে।

* * *

অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ॥ ২৬ ॥

[**সর্ববৃক্ষাণাং** (সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে) ; **অশ্বত্থঃ** (আমি অশ্বত্থ) ; **দেবর্ষীণাম্, নারদঃ** (দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ) ; **গন্ধর্বাণাম্** (গন্ধর্বগণের মধ্যে) ; **চিত্ররথঃ** (চিত্ররথ) ; **চ, সিদ্ধানাম্** (এবং সিদ্ধ ব্যক্তিগণের মধ্যে) ; **কপিলঃ, মুনিঃ** (আমি কপিলমুনি।)]

সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে আমি অশ্বত্থ, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, গন্ধর্বগণের মধ্যে চিত্ররথ এবং সিদ্ধ ব্যক্তিগণের মধ্যে আমি কপিলমুনি ॥ ২৬ ॥

ব্যাখ্যা—'অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাং'—অশ্বত্থ একটি সৌম্য বৃক্ষ। এর নীচে অন্যান্য নানাপ্রকারের গাছপালাও জীবন পায়, এটি পর্বত বা বাড়ির প্রাচীর, ছাদ ইত্যাদি কঠিন স্থানেও জন্মাতে পারে। অশ্বত্থ গাছকে পূজা করার অনেক মহিমা আছে। আয়ুর্বেদে অশ্বত্থ গাছের ঔষধে নানা রোগ নাশের কথা বলা হয়েছে এইজন্য ভগবান অশ্বত্থকে তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

'দেবর্ষীণাং চ নারদঃ'—দেবর্ষিও অনেক আছেন এবং নারদও অনেক আছেন, কিন্তু 'দেবর্ষি নারদ' একজনই। তিনি ভগবানের ইচ্ছানুসারে চলেন এবং

ভগবানের লীলার ভূমিকা তিনিই তৈরি করেন। তাই নারদকে বলা হয় ভগবানের মন। ইনি সদাই বীণা হাতে ভগবানের গুণকীর্তন করে পরিভ্রমণ করেন। বাল্মীকি এবং বেদব্যাসকে নারদই নির্দেশ দিয়েছিলেন রামায়ণ এবং ভাগবতের ন্যায় মহান্ গ্রন্থ লেখার জন্য। নারদের কথায় মানুষ, দেবতা, অসুর, নাগ ইত্যাদি সকলেই বিশ্বাস করে থাকে। সকলেই এঁকে মান্য করে এবং এঁর পরামর্শ গ্রহণ করে। মহাভারত গ্রন্থে এঁর নানা গুণাবলীর বর্ণনা করা হয়েছে। তাই ভগবান এঁকে তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

'গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ'—স্বর্গের গায়কদের বলা হয় গন্ধর্ব, তাঁদের মধ্যে চিত্ররথ হলেন প্রধান। অর্জুনের সঙ্গে এঁর বন্ধুত্ব ছিল এবং এঁর কাছ থেকেই অর্জুন গীতবিদ্যা আহরণ করেছিলেন। সঙ্গীতপারদর্শী এবং গন্ধর্বদের প্রধান হওয়ায় ভগবান তাঁকে তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

'সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ'—সিদ্ধ দু'প্রকারের হয়ে থাকেন—এক হল সাধন-ভজন করে সিদ্ধ হওয়া আর দ্বিতীয়, জন্মসিদ্ধ । কপিল ছিলেন জন্মসিদ্ধ এবং তাঁকে আদিসিদ্ধও বলা হয়। ইনি ঋষি কর্দমের ঔরসে দেবহুতির গর্ভে জন্ম নেন। ইনি ছিলেন সাংখ্যের আচার্য এবং সকল সিদ্ধগণের গণাধীশ। তাই ভগবান তাঁকে তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

এইসকল বিভূতিতে যে বিশেষত্ব দেখা যায় তা তত্ত্বতঃ ভগবানেরই। সুতরাং সাধকের দৃষ্টি ভগবানের দিকেই থাকা উচিত।

※　※　※

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্॥ ২৭ ॥

[**অশ্বানাম্** (অশ্বগণের মধ্যে) ; **অমৃতোদ্ভবম্** (সমুদ্র থেকে অমৃতমন্থনকালে প্রকটিত হওয়া) ; **উচ্চৈঃশ্রবসম্** (উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্ব) ; **গজেন্দ্রাণাম** (শ্রেষ্ঠ হাতিদের মধ্যে) ; **ঐরাবতম্, চ** (ঐরাবত নামক হাতি এবং) ; **নরাণাম্** (মানুষদের মধ্যে) ; **নরাধিপম্** (রাজাকে) ; **মাম্, বিদ্ধি** (আমারই বিভূতি বলে জানবে।)]

অশ্বগণের মধ্যে অমৃতমন্থনকালে প্রকটিত হওয়া উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্ব, শ্রেষ্ঠ হাতিদের মধ্যে ঐরাবত নামক হাতি এবং মানুষদের মধ্যে রাজাকে আমারই বিভূতি বলে জানবে॥ ২৭ ॥

ব্যাখ্যা—'উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্'—সমুদ্র-মন্থনকালে প্রকটিত চৌদ্দটি রত্নের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা নামক ঘোড়াও একটি রত্নবিশেষ। এটি ইন্দ্রের বাহন এবং সমস্ত অশ্বের রাজা, ভগবান তাই একে তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

'ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাম্'—হাতির মধ্যে যেটি শ্রেষ্ঠ, তাকে বলা হয় গজেন্দ্র। এরূপ গজেন্দ্রের মধ্যে ঐরাবত শ্রেষ্ঠ। উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের ন্যায় ঐরাবত হাতির উৎপত্তিও সমুদ্র থেকে হয় এবং এটিও ইন্দ্রের বাহন। সেইজন্য ভগবান একে তাঁর বিভূতি বলেছেন।

'নরাণাং চ নরাধিপম্'—সমস্ত প্রজাকুলের পালন, সংরক্ষণ ও শাসনকারী হওয়ায় রাজা সমস্ত মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সাধারণ মানুষদের থেকে রাজার মধ্যে ভগবানের শক্তি বেশি থাকে। তাই ভগবান রাজাকে তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন[১]।

এই বিভূতিগুলিতে যে শক্তি ও সামর্থ্য আছে তা ভগবান হতেই আহরিত, তাই সেগুলিকে ভগবানেরই মনে করে তাঁরই চিন্তা করা উচিত।

※　※　※

[১]এইস্থানে বর্তমান মন্বন্তরের মনুকেও রাজা বলে মানা যেতে পারে।

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ॥ ২৮ ॥

[**আয়ুধানাম্, অহম্** (অস্ত্রসমূহের মধ্যে আমি) ; **বজ্রম্** (বজ্র) ; **ধেনূনাম্** (ধেনুগণের মধ্যে) ; **কামধুক, অস্মি** (আমিই কামধেনু) ; **প্রজনঃ** (আমি সন্তান উৎপাদনের হেতু) ; **কন্দর্পঃ, অস্মি** (কন্দর্প) ; **চ, সর্পাণাম্** (এবং সর্পগণের মধ্যে) ; **বাসুকিঃ** (বাসুকি) ; **অস্মি** (আমিই।)]

অস্ত্রসমূহের মধ্যে আমি বজ্র এবং ধেনুগণের মধ্যে আমিই কামধেনু। আমি সন্তান উৎপত্তির হেতু কন্দর্প এবং সর্পগণের মধ্যে বাসুকি॥ ২৮ ॥

ব্যাখ্যা—'আয়ুধানামহং বজ্রং'—যার সাহায্যে যুদ্ধ করা হয় তাকে বলা হয় আয়ুধ বা অস্ত্র। সেইসব অস্ত্রের মধ্যে বজ্র হল শ্রেষ্ঠ, যা ইন্দ্রের প্রধান অস্ত্র। এটি দধিচী ঋষির অস্থি হতে নির্মিত এবং এতে তাঁর তপস্যার তেজ নিহিত। তাই ভগবান বজ্রকে তাঁর বিভূতি বলেছেন।

'ধেনুনামস্মি কামধুক্'—সদ্যপ্রসূতা গাভীকে ধেনু বলা হয়। সকল ধেনুর মধ্যে কামধেনু শ্রেষ্ঠ, এটি সমুদ্র-মন্থনে প্রকটিত হয়েছিল। সকল দেবতা ও মনুষ্যের কামনা পূরণকারী বলে একে কামধেনু বলা হয়। তাই এটি ভগবানের বিভূতি।

'প্রজনশ্চামি কন্দর্পঃ'—সংসারের উৎপত্তি হয় প্রজননশক্তি (কামের) দ্বারা। ধর্মের অনুকূলে শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদনের জন্য সুখবুদ্ধি পরিত্যাগ করে যে কাম প্রযুক্ত হয়, সেই কামই হল ভগবানের বিভূতি। সপ্তম অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকেও ভগবান কামকে তাঁর বিভূতি বলেছেন—**'ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ'** অর্থাৎ সকল প্রাণীতে ধর্মের অনুকূল কাম আমিই।

'সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ'—বাসুকি সকল সর্পের অধিপতি এবং ভগবদ্ভক্ত। সমুদ্র মন্থনের সময় এঁকেই মন্থন-রজ্জু হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। তাই ভগবান এঁকে তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

এইসব বিভূতিতে যে বিশেষত্ব দেখা যায়, তা প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তনশীল জগতের কী করে হতে পারে! এসব তো পরমাত্মারই।

***

অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৃণামর্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্॥ ২৯ ॥

[**নাগানাম্, অনন্তঃ** (নাগগণের মধ্যে অনন্ত) ; **চ, যাদসাম্** (এবং জলচর প্রাণীদের মধ্যে) ; **অহম্, বরুণঃ, অস্মি** (আমি জলাধিপতি বরুণ) ; **পিতৃণাম** (পিতৃগণের মধ্যে) ; **অর্যমা** (আমি অর্যমা) ; **চ** (এবং) ; **সংযমতাম্** (শাসনকারীদের মধ্যে) ; **যমঃ** (যমরাজ) ; **অহম্, অস্মি** (আমিই।)]

নাগগণের মধ্যে অনন্ত (শেষনাগ) এবং জলচর প্রাণীদের মধ্যে আমি জলাধিপতি বরুণ। পিতৃগণের মধ্যে আমি অর্যমা এবং শাসনকারীদের মধ্যে আমি যমরাজ॥ ২৯ ॥

ব্যাখ্যা—'অনন্তশ্চাস্মি নাগানাম্'—শেষনাগ সমস্ত নাগেদের রাজা[১]। এঁর একসহস্র ফণা আছে। ক্ষীরসমুদ্রে ভগবানের শয্যা হয়ে ইনি বিরাজমান যাতে ভগবান সুখী হন। ইনি বহুবার ভগবানের সঙ্গী হয়ে অবতাররূপ গ্রহণ করে ভগবানের লীলায় সহচর হয়েছিলেন। তাই ভগবান এঁকে তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

'বরুণো যাদসামহম্'—বরুণ সকল জলচর প্রাণীর

[১]সর্প স্থলে থাকে আর নাগ থাকে জলে—সর্প আর নাগে এই হল প্রভেদ।

এবং জলদেবতাগণের অধিপতি এবং ভগবদ্ ভক্ত। তাই ভগবান এঁকে তাঁর বিভূতি বলেছেন।

'পিতৃণামর্যমা চাস্মি'—কব্যবাহ, অনল, সোম প্রভৃতি সাত পিতৃপুরুষ বিরাজিত। এঁদের মধ্যে অর্যমা নামধারী পিতৃপুরুষ প্রধান। তাই ভগবান এঁকে তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

'যমঃ সংযমতামহম্'—প্রাণীদের ওপর শাসনকারী রাজা প্রভৃতি যত অধিকারী পুরুষ আছেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন যমরাজ। ইনি প্রাণীদের পাপ-পুণ্যের ফল ভোগ করিয়ে শুদ্ধ করেন। এঁর শাসন ন্যায় ও ধর্মসঙ্গত। ইনি ভগবদ্ভক্ত ও লোকপাল, তাই ভগবান এঁকে তাঁর বিভূতি বলেছেন।

এইসব বিভূতিতে যে বিশেষত্ব দেখা যায় সেগুলি এঁদের ব্যক্তিগত নয়। সে সবই ভগবানের এবং তাঁর থেকে আহরিত। সুতরাং এগুলিতে ভগবানেরই চিন্তা হওয়া উচিত।

※ ※ ※

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্॥ ৩০ ॥

[**দৈত্যানাম্** (দৈত্যগণের মধ্যে) ; **প্রহ্লাদঃ, চ** (আমি প্রহ্লাদ এবং) ; **কলয়তাম্, কালঃ** (গণনাকারীদের মধ্যে কাল) ; **অহম্, অস্মি** (আমিই) ; **চ** (এবং) ; **মৃগাণাম্** (পশুগণের মধ্যে) ; **মৃগেন্দ্রঃ, চ** (আমি সিংহ ও) ; **পক্ষিণাম্** (পক্ষিগণের মধ্যে) ; **বৈনতেয়ঃ** (গরুড়) ; **অহম্** (আমিই।)]

দৈত্যগণের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ এবং গণনাকারীদের মধ্যে কাল। পশুগণের মধ্যে আমি সিংহ ও পক্ষীগণের মধ্যে গরুড়॥ ৩০ ॥

ব্যাখ্যা—**'প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যনাম্'**—দিতির গর্ভজাত সন্তানদের বলা হয় দৈত্য, এঁদের মধ্যে প্রধান এবং শ্রেষ্ঠ হলেন প্রহ্লাদ। তিনি পরম ভগবদ্‌বিশ্বাসী এবং নিষ্কাম ভক্ত ছিলেন। তাই ভগবান তাঁকে নিজ বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

প্রহ্লাদ অনেক আগেই জন্মেছিলেন, কিন্তু ভগবান 'দৈত্যদের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ' বলে বর্তমান কালের প্রয়োগ করেছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে ভগবদ্ভক্তগণ নিত্য বিরাজ করেন এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তি অনুসারে দর্শন-দানেও সক্ষম। তাঁরা ভগবানে লীন হওয়ার পর যদি কেউ তাঁদের স্মরণ করে এবং তাঁদের দর্শন চায় তাহলে ভগবানই তাঁদের রূপ ধারণ করে ভক্তদের দর্শন দিয়ে থাকেন।

'কালঃ কলয়তামহম্'—জ্যোতিষশাস্ত্রে কাল (সময়) ধরেই আয়ু গণনা করা হয়। তাই ক্ষণ, সময়, দিন, পক্ষ, মাস, বৎসর ইত্যাদি গণনা করার মাধ্যম কাল হল ভগবানের বিভূতি।

'মৃগাণাং চ মৃগেন্দ্রোঽহম্'—বাঘ, হাতি, চিতা প্রভৃতি যতপ্রকার পশু আছে, তাদের মধ্যে সিংহ বলবান, তেজস্বী, প্রভাবশালী, শূরবীর এবং সাহসী। সিংহ সব পশুদের রাজা। তাই ভগবান একে তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

'বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্'—বিনতার পুত্র গরুড় সমস্ত পক্ষীকুলের রাজা এবং ভগবদ্ভক্ত। গরুড় ভগবান বিষ্ণুর বাহন, তাঁর ওড়ার সময় পাখা থেকে স্বতঃই সামবেদের মন্ত্র ধ্বনিত হয়। তাই ভগবান গরুড়কে তাঁর বিভূতি বলেছেন।

এইসব বিভূতিতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে যে প্রাধান্যের কথা বলা হয়েছে, তা তত্ত্বতঃ ভগবানেরই। তাই সেইদিকে দৃষ্টি গেলে স্বভাবতই ভগবদ্‌চিন্তার উদ্রেক হওয়া উচিত।

※ ※ ※

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী॥ ৩১ ॥

[**পবনঃ, পবতাম্** (পবিত্রকারীদের মধ্যে বায়ু) ; **শস্ত্রভৃতাম্** (শস্ত্রধারীগণের মধ্যে) ; **অহম্, অস্মি** (আমি) ; **রামঃ** (রাম); **ঝষাণাম্** (জলচর জীবের মধ্যে) ; **মকরঃ, অস্মি** (মকর আমি) ; **চ, স্রোতসাম্** (এবং স্রোতস্বতী নদীসমূহের মধ্যে) ; **জাহ্নবী, অস্মি** (গঙ্গা আমিই।)]

পবিত্রকারীদের মধ্যে আমি বায়ু এবং শস্ত্রধারীগণের মধ্যে আমি রাম, জলচর জীবের মধ্যে আমি মকর এবং স্রোতস্বতী নদীসমূহের মধ্যে আমি গঙ্গা॥ ৩১ ॥

ব্যাখ্যা—**'পবনঃ পবতামস্মি'**—বায়ু হতেই সব-কিছু পবিত্র হয় এবং বায়ুই নীরোগতা বহন করে। তাই ভগবান পবিত্রকারীদের মধ্যে বায়ুকে তাঁর বিভূতি বলেছেন।

'রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্'—ভগবান রাম সাক্ষাৎ অবতার, কিন্তু শস্ত্রধারীদের মধ্যে গণনা করলে, সব থেকে শ্রেষ্ঠ শস্ত্রধারী তিনিই। তাই ভগবান তাঁকে নিজ বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

'ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি'—জলচর প্রাণীদের মধ্যে মকর (কুমীর) সব থেকে শক্তিশালী, ভগবান তাই মকরকে তাঁর বিভূতি বলেছেন।

'স্রোতসামস্মি জাহ্নবী'—প্রবাহরূপে বহমান যত নদ, নদী, নালা, ঝরণা আছে—গঙ্গা তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। পবিত্র গঙ্গার জল সাক্ষাৎ ভগবানের চরণামৃত । গঙ্গার দর্শন ও স্পর্শে উদ্ধার পাওয়া যায়। মৃত মানুষের অস্থি গঙ্গায় সমর্পণ করলে তার সদ্‌গতি লাভ হয়। তাই ভগবান গঙ্গাকে তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

বাস্তবে এই বিভূতিগুলিকে প্রধান বলে মনে না করে ভগবানকেই প্রধান বলে মনে করা উচিত। কারণ এগুলিতে যে বিশেষত্ব—মহত্ত্ব দেখা যায়, তা সবই ভগবানের।

সপ্তম শ্লোকে অর্জুনের দুটি প্রশ্ন ছিল—প্রথম, ভগবানকে জানার (আমি আপনাকে কীরূপে জানব) ও দ্বিতীয়, জানার উপায় (কোন্ কোন্ ভাবে যুক্ত হয়ে আমি আপনাকে চিন্তা করব)। এদের মধ্যে উপায় হল বিভূতিগুলিতে ভগবানের চিন্তা করা এবং এই চিন্তার ফল (পরিণাম) হবে—সকল বিভূতির মূলে ভগবানকে তত্ত্বতঃ জানা। যেমন, শস্ত্রধারীদের মধ্যে শ্রীরাম এবং বৃষ্ণিদের মধ্যে বাসুদেব (নিজে)কে ভগবান তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন। এটির তাৎপর্য হল যে, এই সমস্তে বিভূতিরূপে শ্রীরাম এবং বাসুদেবকে চিন্তা করার জন্য বলেছেন এবং এই চিন্তার ফল হল—শ্রীরাম এবং বাসুদেবকে তত্ত্বতঃ ভগবান বলে জানা। এইভাবে চিন্তা করা এবং ভগবানকে তত্ত্বতঃ জানা সমস্ত বিভূতির ক্ষেত্রে ধরতে হবে।

জগতে যেখানেই যা কিছু বিশেষত্ব, বিলক্ষণতা, সৌন্দর্য দেখা যায়, সেগুলিকে বস্তু বা ব্যক্তির বলে মনে করলে ফাঁদ হয়ে দাঁড়ায়, অর্থাৎ মানুষ ওই বিশেষত্বগুলিকে জগতের বলে মেনে নিলে তাতে আবদ্ধ হয়ে যায়। ভগবান তাই এখানে মানুষ- মাত্রকেই জানিয়েছেন যে, তোমরা ওই বিশেষত্ব বা সৌন্দর্যকে বস্তু বা ব্যক্তির বলে মনে কোরো না, মনে কোরো যে সেগুলি আমার এবং আমা হতেই আহরিত। এই ভেবে যদি আমার চিন্তা করো তাহলে তোমার সাংসারিক চিন্তা দূর হবে এবং আমি সেখানে বিরাজ করব। এর পরিণামে তোমরা আমাকে তত্ত্বতঃ জানতে পারবে, আমাকে তত্ত্বতঃ জানলে তোমাদের ভক্তি আমাতে দৃঢ়তর হবে (গীতা ১০।৭)।

***

সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যং চৈবাহমর্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্॥ ৩২ ॥

[**অর্জুন** (হে অর্জুন !) ; **সর্গাণাম্** (সমস্ত সর্গের) ; **আদিঃ, মধ্যম্** (আদি, মধ্য) ; **চ, অন্তঃ** (এবং অন্তে) ; **অহম্, এব**

(আমিই বিরাজমান) ; বিদ্যানাম্ (বিদ্যাসমূহের মধ্যে) ; অধ্যাত্মবিদ্যা (অধ্যাত্মবিদ্যা) ; চ, প্রবদতাম্ (এবং পরস্পর শাস্ত্রার্থকারীদের) ; বাদঃ (মধ্যে বাদ) ; অহম্ (আমি।)]

হে অর্জুন ! সমস্ত সর্গের আদি, মধ্য এবং অন্তে আমিই বিরাজমান। বিদ্যাসমূহের মধ্যে আমি অধ্যাত্ম-(ব্রহ্ম) বিদ্যা এবং পরস্পর শাস্ত্রার্থকারীর (তার্কিকগণের) মধ্যে আমি হলাম বাদ॥ ৩২ ॥

ব্যাখ্যা—**'সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যং চৈবাহম্'**—যত সর্গ এবং মহাসর্গ হয় অর্থাৎ যত প্রাণীর উৎপত্তি হয়, তাদের আদিতে আমি বিরাজ করি, মধ্যেও আমি বিরাজ করি এবং অন্তেও (তারা লীন হলেও) আমি বিরাজ করি। তাৎপর্য এই যে সবকিছুই বাসুদেব। সুতরাং জগৎকে, প্রাণীদের দেখলেই ভগবানের কথা স্মরণে আসা উচিত।

'অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাম্'—যে বিদ্যায় মানুষের কল্যাণ হয়, তাকে বলা হয় অধ্যাত্মবিদ্যা[১]। অন্যান্য জাগতিক বিদ্যা যতই শিক্ষা করা হোক না কেন, তাতে জানা বাকিই থেকে যায়। কিন্তু অধ্যাত্মবিদ্যা প্রাপ্ত হলে কোনো পড়া অর্থাৎ জানা আর বাকি থাকে না। তাই ভগবান অধ্যাত্মবিদ্যাকে তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

'বাদঃ প্রবদতামহম্'—তার্কিকগণের মধ্যে শাস্ত্রার্থ আলোচনা করা হয়, তা তিন প্রকারের হয়ে থাকে—

(১) **জল্প**—যুক্তি-প্রযুক্তির দ্বারা নিজের পক্ষকে সমর্থন এবং অপর পক্ষকে খণ্ডন করে নিজ পক্ষের জয় ও অপর পক্ষকে পরাজিত করার চিন্তায় যে শাস্ত্র আলোচনা করা হয়, তাকে বলা হয় 'জল্প'।

(২) **বিতণ্ডা**—নিজে কোনো পক্ষে না থেকে, অপর পক্ষের মতকে যুক্তিজালে খণ্ডন করার জন্য যে শাস্ত্রার্থ করা হয়, তাকে বলা হয় 'বিতণ্ডা'।

(৩) বাদ—কোনো পক্ষপাতিত্ব না করে শুধু তত্ত্ব-নির্ণয়ের জন্য নিজেদের মধ্যে যে শাস্ত্রার্থ (বিচার-বিনিময়) করা হয়, তাকে বলা হয় 'বাদ'।

উপরিউক্ত তিনপ্রকার শাস্ত্রার্থের মধ্যে 'বাদ' হল শ্রেষ্ঠ, তাই ভগবান বাদকে নিজ বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

পরিশিষ্ট-ভাব—লৌকিক বিদ্যাসমূহের মধ্যে 'অধ্যাত্মবিদ্যা' অর্থাৎ আত্মজ্ঞান শ্রেষ্ঠ। একেই গীতাতে অধ্যায়ের পুষ্পিকাতে 'ব্রহ্মবিদ্যা' বলা হয়েছে।

অধ্যাত্মবিদ্যা অর্থাৎ আত্মজ্ঞানকে নিজ বিভূতি বলার কারণ হল এটি সব থেকে সরল, সুগম এবং সকলের প্রত্যক্ষ অনুভবের কথা। এটি করা, বুঝতে পারা কিংবা লাভ করাতে কোনও কাঠিন্য নেই। এতে করা, বোঝা এবং পাওয়ার কোনো ব্যাপার প্রযোজ্য হয় না। কারণ এ হল নিত্যপ্রাপ্ত এবং জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি ইত্যাদি সমস্ত অবস্থাতেই এ একইভাবে বিরাজমান। আত্মজ্ঞান যত প্রত্যক্ষ এই জগৎ-সংসারও তত প্রত্যক্ষ নয়। তাৎপর্য হল এই যে আমাদের অনুভূতিতে আত্মজ্ঞান যত স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়, জগৎ সংসারও তত স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় না। এই ব্যাপারটি এভাবে বুঝতে হয়। আমরা আমাদের বাল্যাবস্থাকে যদি দেখি আর বর্তমান অবস্থাকে যদি দেখি তবে দেখতে পাব যে—শরীর সেরকম নেই, অভ্যাস আগের মতো নেই, ভাষা আগের মতো বলি না, ব্যবহার আগের মতো করি না, স্থান সেরকম নেই, চিন্তা-ভাবনা আগের মতো নেই, সবই পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু অস্তিত্বরূপে আমার সত্তার পরিবর্তন হয়নি, তাই আমরা বলে থাকি যে আমি তো সে-ই, যে বাল্যাবস্থাতেও ছিলাম। তাৎপর্য হল এই যে, যা পরিবর্তিত হয়েছে, তা ছিল পৃথক্ স্বভাবসম্পন্ন আর যার পরিবর্তন হয়নি, সেটি হল আমাদের আসল স্বরূপ অর্থাৎ শরীরী আর যার পরিবর্তন ঘটেছে, সেটি হল শরীর। একেই বলা হয় আত্মজ্ঞান।

※ ※ ※

---

[১]অধ্যাত্মবিদ্যা এবং রাজবিদ্যা—এই দুই-এ পার্থক্য আছে। অধ্যাত্মবিদ্যায় নির্গুণ স্বরূপের প্রাধান্য থাকে আর রাজবিদ্যায় থাকে সগুণ-স্বরূপের প্রাধান্য। জগতের কথা ভুলে নির্গুণ পরমাত্মাকে জানা হল অধ্যাত্ম (ব্রহ্ম) বিদ্যা। সমস্ত দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, পরিস্থিতি, ঘটনা ইত্যাদিতে ব্যাপকরূপে নিত্য বিরাজমান সগুণ পরমাত্মাকে জানা হল রাজবিদ্যা।

অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ।। ৩৩ ।।

[**অক্ষরাণাম্** (অক্ষর সমূহের মধ্যে আমি) ; **অকারঃ, চ** (অকার এবং) ; **সামাসিকস্য** (সমাস সমূহের মধ্যে) ; **দ্বন্দ্বঃ, অহম্, অস্মি** (দ্বন্দ্ব সমাস আমি) ; **অক্ষয়ঃ, কালঃ** (আমি অক্ষয় কাল) ; **বিশ্বতোমুখঃ** (সর্বদিকে মুখবিশিষ্ট) ; **ধাতা** (ধাতা) ; **অহম্, এব** (আমি।)]

অক্ষর সমূহের মধ্যে আমি অকার এবং সমাস সমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব সমাস আমি। আমিই অক্ষয় কাল অর্থাৎ কালের মহাকাল এবং সবদিকে মুখবিশিষ্ট ধাতা (পালন-পোষণকারী)ও আমি।। ৩৩ ।।

ব্যাখ্যা—**'অক্ষরাণামকারোঽস্মি'**—বর্ণমালার প্রথম অক্ষর হল অ-কার। স্বর ও ব্যঞ্জন—দুয়েতেই অ-কার হল প্রধান। অ-কার ছাড়া ব্যঞ্জনের উচ্চারণ করা যায় না। তাই ভগবান অকারকে তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

'দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ'—যার সাহায্যে দুই বা ততোধিক শব্দ মিলে একটি শব্দ তৈরি হয় তাকে বলা হয় সমাস। সমাস কয়েক প্রকারের হয়, তার মধ্যে অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি এবং দ্বন্দ্ব—এই চারটিই প্রধান। দুটি শব্দের সমাসে যদি প্রথম শব্দটির প্রাধান্য থাকে, তাহলে সেটি হয় 'অব্যয়ীভাব সমাস'। যদি পরের শব্দটির প্রাধান্য থাকে, তাকে বলে 'তৎপুরুষ সমাস'। দুটি শব্দ যোগ হয়ে যদি অন্য কাউকে বোঝায় তাকে বলে 'বহুব্রীহি সমাস'। যদি দুটি শব্দেরই প্রাধান্য থাকে, তাকে বলা হয় 'দ্বন্দ্ব সমাস'।

দ্বন্দ্ব সমাসে দুটি শব্দের অর্থই প্রধান বলে ভগবান এটিকে তাঁর বিভূতি বলেছেন।

'অহমেবাক্ষয়ঃ কালঃ'—যে কাল কখনো ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ যা কালাতীত এবং অনাদি অনন্তরূপ সেই কালই হলেন ভগবান।

সূর্য থেকেই সর্গ ও প্রলয়কে গণনা করা হয়, কিন্তু মহাপ্রলয়ে যখন সূর্যও লীন হয়ে যায় তখন পরমাত্মা থেকেই গণনা করা হয়[১]। তাই পরমাত্মা হলেন অক্ষয়কাল।

ত্রিশতম শ্লোকে **'কালঃ কলয়তামহম্'** পদটিতে উদ্ধৃত 'কাল' এবং এখানে বর্ণিত 'অক্ষয় কাল'-এ কী পার্থক্য ? ওইস্থানে যে 'কাল'-এর কথা বলা হয়েছে, তা কখনো স্থির থাকে না, প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তিত হয়। সেই কাল জ্যোতিষশাস্ত্রের আধার এবং সংসারমাত্রেরই সময় সেখান থেকেই গণনা করা হয়। কিন্তু এখানে যে 'অক্ষয়কাল'-এর কথা বলা হয়েছে, সেটি পরমাত্মস্বরূপ হওয়ায় কখনো পরিবর্তিত হয় না। সেই অক্ষয় কাল সবকিছু গ্রাস করেও নিজে একইভাবে বিরাজ করে অর্থাৎ এতে কখনো কোনোরূপ বিকার হয় না। সেই অক্ষয় কালকেই ভগবান এখানে তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন। পরে একাদশ অধ্যায়েও ভগবান **'কালোঽস্মি'** (১১।৩২) পদের দ্বারা অক্ষয় কালকে তাঁর স্বরূপ বলে জানিয়েছেন।

'ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ'—সর্বদিকে মুখবিশিষ্ট হওয়ায় ভগবানের দৃষ্টি সমস্ত প্রাণীর ওপর থাকে। তাই সকলের ধারণ ও পোষণে ভগবান অত্যন্ত সতর্ক থাকেন। কোন্‌ প্রাণীর কখন কী প্রয়োজন, ভগবান তার খেয়াল রাখেন এবং সময়মতো তা জুগিয়ে থাকেন। তাই ভগবান নিজ বিভূতিরূপে এর বর্ণনা করেছেন।

*** *** ***

[১]মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মা লীন হয়ে যান। মহাসর্গ অর্থাৎ ব্রহ্মার যত আয়ু ততটাই হল মহাপ্রলয়ের সময় অর্থাৎ কাল। সুতরাং এত দীর্ঘ (মহাপ্রলয়ের) সময়ের গণনা অক্ষয় কালরূপ পরমাত্মা থেকেই হয়ে থাকে।

মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা॥ ৩৪ ॥

[**সর্বহরঃ** (সর্বসংহারকারী) ; **মৃত্যুঃ, চ** (মৃত্যু এবং) ; **ভবিষ্যতাম্, উদ্ভবঃ** (উৎপন্ন হওয়া) ; **অহম্, চ** (আমিই) ; **নারীণাম্** (নারীজাতির মধ্যে) ; **কীর্তিঃ** (কীর্তি) ; **শ্রীঃ** (শ্রী) ; **বাক্** (বাক্) ; **স্মৃতিঃ** (স্মৃতি) ; **মেধা** (মেধা) ; **ধৃতিঃ** (ধৃতিঃ) ; **চ** (ও) ; **ক্ষমা** (ক্ষমা।)]

সর্বসংহারকারী মৃত্যু এবং উৎপন্ন হওয়া প্রাণীদের উদ্ভবস্বরূপ আমিই ; নারীজাতির মধ্যে আমিই কীর্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা॥ ৩৪ ॥

ব্যাখ্যা—**'মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহম্'**—মৃত্যুর মধ্যে হরণ করবার এমন এক বিশেষ সামর্থ্য আছে যে মৃত্যুর পর এখানকার স্মৃতিও থাকে না, সবকিছু অপহৃত হয়ে যায়। বাস্তবে এই সামর্থ্য পরমাত্মারই, মৃত্যুর নয়।

যদি সমস্ত কিছু হরণ করার, বিস্মৃত করার ভগবৎপ্রদত্ত সামর্থ্য মৃত্যুর না থাকতো তবে আত্মীয়তার সম্পর্ক ধরে যে চিন্তা মানুষের ইহজন্মে হয়ে থাকে, তেমনই বিগত জন্মের সম্পর্ক ধরেও হতো। কেউ জানে না একজন মানুষের কত জন্ম পার হয়েছে ! যদি সেইসব জন্মের কথা তার স্মরণে থাকতো, তাহলে মানুষের দুঃখ, মোহ আর চিন্তার কখনো অন্ত হত না। তাই মৃত্যুতে বিস্মৃত হওয়ায় পূর্বজন্মের আত্মীয়-স্বজন বা সম্পত্তির চিন্তা মনে থাকে না। এইভাবে মৃত্যুতে চিন্তা, মোহ ইত্যাদি দূর করার যে সামর্থ্য, তা ভগবানেরই।

'উদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্'—আগের শ্লোকে ভগবান বলেছিলেন যে তিনিই সকলের ধারক ও পোষক, সেইরূপ এখানে ভগবান বলেছেন উৎপন্ন হওয়া সকল প্রাণীর উৎপত্তির হেতুও তিনি। অর্থাৎ জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়কারীও তিনি।

'কীর্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা'—কীর্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি এবং ক্ষমা—জগতের নারীদের মধ্যে এই সাতজনকে শ্রেষ্ঠ বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে কীর্তি, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, এবং ক্ষমা—এই পাঁচজন হলেন প্রজাপতি দক্ষের কন্যা, 'শ্রী' মহর্ষি ভৃগুর কন্যা এবং 'বাক্' ব্রহ্মার কন্যা।

কীর্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি এবং ক্ষমা—এই সাতটি স্ত্রীনামযুক্ত গুণও সংসারে প্রসিদ্ধ।

সদ্‌গুণ নিয়ে সংসারে যে প্রসিদ্ধি, প্রতিষ্ঠা, তাকে বলা হয় 'কীর্তি'।

ঐশ্বর্য দু'প্রকারের—স্থাবর এবং জঙ্গম। জমি, বাড়ি, ধন, সম্পত্তি ইত্যাদি স্থাবর ঐশ্বর্য এবং গোরু, মহিষ, ঘোড়া, উট, হাতি ইত্যাদি হল জঙ্গম ঐশ্বর্য। এই উভয় ঐশ্বর্যকে বলা হয় 'শ্রী'।

যে বাণী ধারণ করলে জগতে যশ-প্রতিষ্ঠা হয় এবং যার ফলে মানুষকে পণ্ডিত, বিদ্বান বলা হয়, তাকে বলা হয় 'বাক্'।

আগেকার শোনা, জানা ব্যাপার পুনরায় স্মরণে আনাকে বলা হয় 'স্মৃতি'।

বুদ্ধিকে স্থায়ীরূপে ধারণ করার যে শক্তি অর্থাৎ যে শক্তির সাহায্যে বিদ্যা ঠিকমতো স্মরণ থাকে, সেই শক্তির নাম 'মেধা'।

মানুষের নিজস্ব সিদ্ধান্ত, স্বীকৃতি ইত্যাদিতে স্থির থাকা এবং তার থেকে বিচলিত হতে না দেওয়ার শক্তিকে বলে 'ধৃতি'।

অপর ব্যক্তি অকারণে কোনো অপরাধ করলে, শাস্তি দেবার ক্ষমতা থাকলেও তাকে শাস্তি না দেওয়া এবং তার ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও যেন শাস্তি না হয়— এই মনোভাব নিয়ে তাকে মার্জনা করাকে বলা হয় 'ক্ষমা'।

কীর্তি, শ্রী এবং বাক্—এই তিনটি হল প্রাণীদের বহিরঙ্গে প্রকাশিতব্য বিশেষ লক্ষণ এবং স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা—এই চারটি প্রাণীদের অন্তরে প্রকাশিতব্য বিশেষ লক্ষণ। এই সাতটি বিশেষত্বকে ভগবান তাঁর বিভূতি বলেছেন।

এখানে যে বিশেষ গুণগুলিকে বিভূতিরূপে বলা হয়েছে, তার অর্থ ভগবানের দিকে লক্ষ্য করানো। কোনো ব্যক্তির মধ্যে এই গুণ দেখা গেলে, সেটি ওই ব্যক্তির বিশেষত্ব মনে না করে ভগবানেরই বিশেষত্ব বলে মনে করতে হবে এবং তাঁকেই স্মরণ করতে হবে। যদি এই গুণ

নিজের মধ্যে প্রকটিত হয়, তাহলে সেটি ভগবানের বলে মনে করতে হবে, নিজের নয়। কারণ এগুলি দৈবী-সম্পদ, যা ভগবান হতেই প্রকটিত হয়। এই গুণগুলিকে নিজের বলে মনে করলে অহংকার উৎপন্ন হয়, যার ফলে পতন হয় ; কারণ অহংকার হল সমস্ত আসুরী-সম্পদের জনক।

সাধকগণ যেসব বস্তুতে যা কিছু বিশেষত্ব, সামর্থ্য দেখেন সেগুলিকে ওইসব বস্তু বা ব্যক্তির মনে না করে ভগবানের বলেই মনে করা উচিত। যেমন, লোমশ মুনির অভিশাপে কাকভূশণ্ডি ব্রাহ্মণ থেকে চণ্ডাল-পক্ষী (কাক) হয়ে গেল, কিন্তু এতে তার ভয়ও হয়নি বা কোনো দীনতাও আসেনি এবং কোনো সংশয়ও হয়নি, বরং সে প্রসন্নই হয়েছিল, কারণ সে এতে মুনির দোষ না দেখে ভগবানেরই প্রেরণা বলে মনে করেছিল—**'সুনু খগেস নহিঁ কছু রিষি দূষন। উর প্রেরক রঘুবংস বিভূষন'** (শ্রীরামচরিতমানস ৭।১১৩।১)। মানুষও যদি এইভাবে সকল বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা, পরিস্থিতির মূলে ভগবানকে দেখে তবে সর্বসময় সে আনন্দে থাকে।

*** *** ***

বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ॥ ৩৫ ॥

[**সাম্নাং** (গীত হয় এমন শ্রুতিগুলির মধ্যে) ; **বৃহৎসাম্, তথা** (বৃহৎসাম এবং) ; **ছন্দসাম্** (বৈদিক ছন্দগুলির মধ্যে) ; **গায়ত্রী, অহম্** (গায়ত্রী ছন্দ আমিই) ; **মাসানাম্** (বৎসরের দ্বাদশ মাসের মধ্যে) ; **মার্গশীর্ষ** (মার্গশীর্ষ ও) ; **ঋতুনাম্** (ছটি ঋতুর মধ্যে) ; **কুসুমাকরঃ, অহম্** (বসন্ত ঋতুও আমিই ।)]

সুরধর্মী শ্রুতিগুলির মধ্যে বৃহৎসাম এবং বৈদিক ছন্দগুলির মধ্যে গায়ত্রী ছন্দ আমিই। বৎসরের দ্বাদশ মাসের মধ্যে মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ) এবং ছটি ঋতুর মধ্যে বসন্ত ঋতুও আমি॥ ৩৫ ॥

ব্যাখ্যা—**'বৃহৎসাম তথা সাম্নাম্'**—সামবেদে বৃহৎসাম নামে একটি গীতি আছে, এর দ্বারা ইন্দ্ররূপ পরমেশ্বরের স্তুতি করা হয়। অতিরাত্রযোগে এটি এক পৃষ্ঠস্তোত্র। সামবেদ সব থেকে শ্রেষ্ঠ হওয়ায় ভগবান একে তাঁর বিভূতি বলেছেন[১]।

'গায়ত্রী ছন্দসামহম্'—বেদে যত ছন্দোবদ্ধ মন্ত্র আছে সেগুলির মধ্যে গায়ত্রীর প্রাধান্য আছে, এঁকে বলা হয় বেদজননী ; কারণ ইনি হতেই বেদ প্রকটিত হয়েছে। স্মৃতি এবং শাস্ত্রে গায়ত্রীর খুবই মহিমা গীত হয়েছে। গায়ত্রী মন্ত্রে স্বরূপ, প্রার্থনা ও ধ্যান—তিনটিই পরমাত্মার উদ্দেশ্যে হওয়ায় এটির সাহায্যে পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তি হয়। ভগবান সেইজন্য গায়ত্রীকে তাঁর বিভূতি বলেছেন।

'মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহম্'—যে অন্নের সাহায্যে সমস্ত প্রাণী জীবিত থাকে, সেই (বর্ষা থেকে উদ্ভূত) অন্নের উৎপত্তি মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ) মাসেই হয়। এই মাসে নতুন ধানের দ্বারা যজ্ঞ করা হয়। মহাভারতের সময়ে অগ্রহায়ণ মাস থেকেই নতুন বছর শুরু হত। এই বিলক্ষণতার জন্য ভগবান মার্গশীর্ষ অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসকে তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

'ঋতুনাং কুসুমাকরঃ'—বসন্ত ঋতুতে বর্ষা ছাড়াই বৃক্ষ, লতা ইত্যাদি পত্রপুষ্পশোভিত হয়ে ওঠে। এই ঋতুতে অধিক গরমও থাকে না, অধিক শীতও থাকে না। তাই ভগবান বসন্ত ঋতুকে তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

এইসব বিভূতিতে যে মহত্ত্ব, বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়, তা সবই ভগবানের। সুতরাং ভগবানকেই শুধু চিন্তা করা উচিত।

*** *** ***

[১]এই (দশম) অধ্যায়ের বাইশতম শ্লোকে ভগবান বেদগুলির মধ্যে 'সামবেদ'-কে তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন এবং এখানে (পঁয়ত্রিশতম শ্লোকে) ভগবান সামবেদেও 'বৃহৎসাম'-কে তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্॥ ৩৬ ॥

[**ছলয়তাম্** (ছলনাকারীগণের মধ্যে) ; **দ্যূতম্** (জুয়া) ; **তেজস্বিনাম্** (তেজস্বিগণের মধ্যে) ; **তেজঃ, অহম্, অস্মি** (তেজ আমি) ; **জয়ঃ, অস্মি** (বিজয়ী পুরুষদের জয়) ; **ব্যবসায়ঃ** (উদ্যোগকারীদের উদ্যম) ; **সত্ত্ববতাম্** (সাত্ত্বিক ব্যক্তিদের) ; **সত্ত্বম্** (সাত্ত্বিক ভাবও) ; **অহম্, অস্মি** (আমি।)]

ছলনাকারীগণের মধ্যে জুয়া এবং তেজস্বীগণের মধ্যে তেজ আমি, বিজয়ী পুরুষদের জয়, উদ্যোগকারীদের উদ্যম এবং সাত্ত্বিক ভাবও আমি॥ ৩৬ ॥

ব্যাখ্যা—'দ্যূতং ছলয়তামস্মি'—ছলনা করে অপরের রাজ্য, ঐশ্বর্য, ধন, সম্পত্তি ইত্যাদি সর্বস্ব হরণ করার যে বিশেষ কৌশল, তাকে বলা হয় জুয়া। ভগবান জুয়াকে তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

প্রশ্ন—ভগবান যদি ছলযুক্ত কৌশল অর্থাৎ জুয়াকে তাঁর বিভূতি বলেন, তবে এটি খেলায় দোষ কীসের ? যদি দোষ না হয়, তবে শাস্ত্রে এটি খেলতে নিষেধ করা হয়েছে কেন ?

উত্তর—'এটি কোরো এবং ওটি কোরো না'—এগুলি শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ। এরূপ বিধি-নিষেধের বর্ণনা এখানে নেই। এখানে শুধু বিভূতিগুলির বর্ণনা আছে। 'আমি কোন্ কোন্ স্থানে আপনাকে চিন্তা করব ?'—অর্জুনের এই প্রশ্ন অনুসারে ভগবান বিভূতি-রূপে তাঁকে চিন্তা করার কথা জানিয়েছেন অর্থাৎ কীভাবে অনায়াসে তাঁর চিন্তা করা যায়, বিভূতি রূপে তার উপায় জানিয়েছেন। তাই যে স্থানে মানুষ থাকে, সেখানে যে যে স্থানে দৃষ্টি পড়ে, সেইসব স্থানে জগৎ-সংসারকে না দেখে ভগবানকেই দেখা উচিত । কারণ ভগবান বলেছেন যে এই সমস্ত জগতে তিনি ব্যাপ্তিস্বরূপে বিরাজমান অর্থাৎ তিনিই এখানে পরিপূর্ণ হয়ে আছেন (৯।৪)।

যেমন, পূর্বে কোনো সাধকের যদি জুয়া খেলার নেশা থেকে থাকে এবং এখন তিনি ভগবানের ভজনায় ব্যাপৃত , যদি কখনো তার সেই জুয়াখেলার কথা মনে পড়ে যায় তখন তিনি তা থেকে মন সরানোর জন্য যেন এভাবে ভগবানের চিন্তা করেন যে, এই জুয়া খেলাতে যে হার-জিতের বিশেষত্ব থাকে, তা ভগবানেরই। এইভাবে জুয়াতে ভগবানের চিন্তা এলে, জুয়ার চিন্তা চলে গিয়ে ভগবানের চিন্তাই মনে স্থায়ী হয়। তেমনই অন্য কাউকে জুয়া খেলতে দেখলে এবং তাতে হার-জিত লক্ষ্য করলে, সেই হার এবং জিতের শক্তি জুয়ার বলে মনে না করে ভগবানেরই বলে যেন মানে। কারণ খেলা ক্রমশঃ সমাপ্তির দিকে এগোচ্ছে এবং এটির শেষও হবে। কিন্তু ভগবান তাতে নিত্য রয়েছেন এবং থাকবেন। এইভাবে জুয়াকে তাঁর বিভূতি বলার তাৎপর্য ভগবানের চিন্তাতে থাকে[১]।

জীব স্বয়ং সাক্ষাৎ পরমাত্মার অংশ, কিন্তু সে ভ্রমক্রমে অসৎ শরীর-সংসারের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ মেনে নিয়েছে। এই জগতের যা কিছু মহত্ত্ব, বিশেষত্ব, শোভা প্রভৃতিকে কেউ যদি পরমাত্মার মনে করে পরমাত্মাকে চিন্তা করে তাহলে সে পরমাত্মার দিকেই যায় অর্থাৎ তার উদ্ধার লাভ হয় (গীতা ৮।১৪) ; আর যদি ওইসব বিশেষত্বকে জগতের বলে ভেবে নেওয়া হয় তবে সে জগতের দিকেই যাত্রা করে অর্থাৎ তার পতন হয় (গীতা ২।৬২-৬৩)। তাই পরমাত্মার চিন্তা করে তাঁকে তত্ত্বতঃ জানার জন্যই এই বিভূতিগুলি বর্ণনা করা হয়েছে।

'তেজস্তেজস্বিনামহম্'[২]—মহাপুরুষদের সেই দৈব-সম্পদসম্পন্ন প্রভাবকে বলা হয় তেজ, যার প্রভাবে পাপী ব্যক্তিরাও পাপকার্য করতে থমকে যায়। এই তেজকে ভগবান তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

---

[১]কোনো গ্রন্থের কোনো অংশে যদি কোনো সংশয় জাগে, তবে সেই গ্রন্থের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অধ্যয়ন করে তাতে বক্তার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং বিষয়টি বুঝলে সেই সংশয়ের সমাধান পাওয়া যায়।

[২]সপ্তম অধ্যায়ে যেখানে ভগবান কারণরূপে বিভূতিগুলির বর্ণনা করেছেন, সেখানেও এই পদটি উদ্ধৃত হয়েছে—'তেজস্তেজস্বিনামহম্' (৭।১০)।

'জয়োঽস্মি'—প্রত্যেক প্রাণীর কাছেই বিজয় অত্যন্ত প্রিয়। বিজয়ের এই বিশেষত্ব ভগবানেরই। তাই বিজয়কে ভগবান তাঁর বিভূতি বলেছেন।

মন মতো বিজয়লাভ হলে যে সুখ হয়, তা উপভোগ না করে তাতে ভগবদ্‌বুদ্ধি আনা উচিত যে বিজয়রূপে ভগবানই উপস্থিত।

'ব্যবসায়োঽস্মি'—ব্যবসায় বলা হয় এক নিশ্চয়তাকে। ভগবান গীতায় এই এক নিশ্চয়ের অনেক মহিমা গীত করেছেন ; যেমন—কর্মযোগীর নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি এক হয়ে থাকে (২।৪১) ; ভোগ ও ঐশ্বর্যে আসক্ত ব্যক্তির নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হয় না (২।৪৪)। 'এখন থেকে আমি ভগবদ্‌ভজনাই করব'—এই এক নিশ্চয়ের দ্বারা অত্যন্ত দুরাচারী ব্যক্তিও সাধুতে পরিণত হয় (৯।৩০)। এইভাবে ভগবানের উদ্দেশ্যে চলার যে একনিষ্ঠতা, তাকে ভগবান তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

এই একনিষ্ঠতাকে ভগবানের তাঁর বিভূতি বলার অর্থ এই যে, সাধকের এরূপ নিশ্চয়তা অবশ্যই রাখা উচিত, কিন্তু একে তার নিজের গুণ বলে যেন মনে না করা হয়। তাঁর মনে করা উচিত যে এটি ভগবানের বিভূতি এবং তাঁরই কৃপায় আমি প্রাপ্ত হয়েছি।

'সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্'—সাত্ত্বিক মানুষের মধ্যে যে সত্ত্বগুণ এবং সাত্ত্বিক ভাব ও আচরণ দেখা যায়, তা ভগবানেরই বিভূতি। অর্থাৎ রজোগুণ এবং তমোগুণকে অবদমিত করে যে সাত্ত্বিকভাব বৃদ্ধি পায় তাকে সাধক নিজের গুণ বলে যেন না মনে করেন, তাকে যেন ভগবানের বিভূতি বলে মনে করেন। তেজ, এক প্রত্যয়, সাত্ত্বিক ভাব আদি যদি নিজের মধ্যে অথবা অপরের মধ্যে দেখা যায় তাহলে সাধক সেইগুলিকে নিজের অথবা অপর বস্তু বা ব্যক্তির না মেনে বরং সেগুলিকে ভগবানের গুণ বলেই মনে করবেন। সেই গুণাবলীর দিকে দৃষ্টি গেলে তাতে তত্ত্বতঃ ভগবান বিরাজমান এরূপ অনুভব করে ভগবানেরই যেন স্মরণ হয়।

❋ ❋ ❋

বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনা কবিঃ॥ ৩৭ ॥

[**বৃষ্ণীনাম্** (বৃষ্ণি বংশীয়দের মধ্যে) ; **বাসুদেবঃ** (আমি বাসুদেব) ; **পাণ্ডবানাম্** (পাণ্ডবগণের মধ্যে) ; **ধনঞ্জয়ঃ, অস্মি** (আমি ধনঞ্জয়) ; **মুনীনাম্** (মুনিগণের মধ্যে) ; **ব্যাসঃ** (বেদব্যাস) ; **কবীনাম্** (কবিদের মধ্যে) ; **উশনা, কবিঃ** (কবি শুক্রাচার্য) ; **অপি, অহম্** (আমিই।)]

বৃষ্ণি বংশীয়দের মধ্যে আমি বাসুদেব, পাণ্ডবগণের মধ্যে আমি ধনঞ্জয়, মুনিগণের মধ্যে বেদব্যাস এবং কবিদের মধ্যে শুক্রাচার্যও আমি॥ ৩৭ ॥

ব্যাখ্যা—'বৃষ্ণীনাংবাসুদেবোঽস্মি'—এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতার-রূপ বর্ণনা করা হয়নি, বৃষ্ণি বংশীয়দের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য, সেই বৈশিষ্ট্য নিয়ে ভগবান তাঁর বিভূতিরূপের বর্ণনা করেছেন।

এখানে ভগবান নিজেকে জাগতিক দৃষ্টিতে বিভূতিরূপের দ্বারা বর্ণনা করেছেন, স্বরূপতঃ তিনি তো সাক্ষাৎ ভগবান। এই অধ্যায়ে যেসব বিভূতির কথা বলা হয়েছে, তা সবই জাগতিক দৃষ্টিতে, তত্ত্বতঃ এগুলি সবই পরমাত্মস্বরূপ।

'পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ'—পাণ্ডবগণের মধ্যে অর্জুনের যে বৈশিষ্ট্য, তা ভগবানেরই। তাই ভগবান অর্জুনকে তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

'মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ'—বেদকে চারটি ভাগে বিভক্ত করা, পুরাণ, উপপুরাণ, মহাভারত ইত্যাদি যা কিছু সংস্কৃত বাঙ্ময় আছে, তা সবই শ্রীবেদব্যাসের কৃপার ফল। আজও কেউ নতুন কিছু রচনা করলে তা শ্রীব্যাসদেবের উচ্ছিষ্ট বলে মনে করা হয়। বলাও আছে—**'ব্যাসোচ্ছিষ্টং জগৎ সর্বম্'**। সেইজন্য সমস্ত মুনির মধ্যে ব্যাসদেব শ্রেষ্ঠ। তাই ভগবান তাঁকে নিজের বিভূতি বলেছেন। অর্থাৎ শ্রীব্যাসদেবের মধ্যে বৈশিষ্ট্য দেখেই ভগবদ্‌স্মরণ হওয়া উচিত যে এইসব বৈশিষ্ট্য ভগবানেরই এবং তার থেকেই প্রাপ্ত।

'কবীনামুশনা কবিঃ'—শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তগুলি যাঁরা যথার্থভাবে জানেন সেইসব পণ্ডিতদের বলা হয় 'কবি', তাঁদের মধ্যে শুক্রাচার্য হলেন প্রধান। শ্রীশুক্রাচার্য সঞ্জীবনী বিদ্যার জ্ঞাতা এবং তাঁর শুক্রনীতি প্রসিদ্ধ। এইরূপ নানা গুণাবলীর জন্য ভগবান তাঁকে নিজ বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

এইসব বিভূতির মহত্ত্ব দেখে কোথাও যদি বুদ্ধি তাতে আকর্ষিত হয়, তাহলে সেই মহত্ত্বগুলিকে ভগবানের বলে মনে করা উচিত। কারণ এই মহত্ত্ব—যা একক্ষণও স্থায়ী নয়, জগতের হওয়া সম্ভব নয়।

※ ※ ※

দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মী গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্॥ ৩৮ ॥

[**দময়তাম্** (দমনকারীদের মধ্যে) ; **দণ্ডঃ** (দণ্ডনীতি) ; **জিগীষতাম্** (জয়েচ্ছু ব্যক্তিগণের) ; **নীতি, অস্মি** (নীতি আমি) ; **গুহ্যানাম্** (গোপনীয় ভাবসকলের মধ্যে) ; **মৌনম্, অস্মি** (মৌন আমি) ; **চ, জ্ঞানবতাম্** (এবং জ্ঞানীদিগের) ; **জ্ঞানম্** (জ্ঞান) ; **অহম্, এব, অস্মি** (আমিই।)]

দমনকারীদের মধ্যে দণ্ডনীতি এবং জয়েচ্ছু ব্যক্তিগণের মধ্যে নীতি আমি। আমি গোপনীয় অর্থাৎ গুপ্ত রাখার যোগ্য ভাবসকলের মধ্যে মৌন এবং জ্ঞানীদিগের জ্ঞান॥ ৩৮ ॥

ব্যাখ্যা—'দণ্ডো দময়তামস্মি'—দুষ্টগণের দুষ্টতা দমন করে তাদের সঠিক রাস্তায় আনার জন্য দণ্ডনীতিই হল প্রধান। ভগবান তাই দণ্ডকে তাঁর বিভূতি বলেছেন।

'নীতিরস্মি জিগীষতাম্'—নীতির আশ্রয় নিলেই মানুষ বিজয় প্রাপ্ত হয় এবং নীতিতেই বিজয় স্থায়ী হয়। তাই নীতিকে ভগবান বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

'মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাম্'—গুপ্ত রাখার যত ভাব থাকে সেগুলির মধ্যে মৌনই (বাক্-সংযম বা নির্বাক থাকা) প্রধান। কারণ যারা চুপ করে থাকে, তাদের ভাব সাধারণ লোকে জানতে পারে না। তাই গোপনীয় ভাবের মধ্যে ভগবান মৌন থাকাকেই তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

'জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্'—জগতে কলা-কৌশল ইত্যাদি জ্ঞাতাদের মধ্যে যে জ্ঞান তাদের এই জ্ঞান ভগবানেরই বিভূতি। এই জ্ঞান নিজের বা অন্যের মধ্যে দেখলে, তা ভগবানেরই বিভূতি বলে মানা উচিত।

সাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান থেকে তত্ত্বজ্ঞান পর্যন্ত—সমস্ত জ্ঞানকেই এখানে **'জ্ঞানং জ্ঞানবতাহম্'**-এর অন্তর্গত ধরা যেতে পারে।

এইসব বিভূতির যে বিশেষত্ব, তা এঁদের ব্যক্তিগত নয়, সবই পরমাত্মার। তাই ভগবানের দিকেই দৃষ্টি রাখা উচিত।

※ ※ ※

যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্॥ ৩৯ ॥

[**চ, অর্জুন** (এবং হে অর্জুন !) ; **সর্বভূতানাম্** (সর্বপ্রাণীর) ; **যৎ, বীজম্** (যে বীজ মূল কারণ) ; **তৎ, অপি, অহম্** (সেই বীজ আমিই) ; **ময়া** (আমা) ; **বিনা** (ব্যতীত) ; **তৎ, চরাচরম্** (সেই চরাচরে) ; **যৎ, ভূতম্** (কোনো প্রাণী) ; **ন, অস্তি** (নেই) ; **স্যাৎ** (অর্থাৎ চরাচরে সবই আমি।)]

হে অর্জুন ! সর্বপ্রাণীর যা বীজ, সেই বীজ আমিই ; কারণ আমা ব্যতীত চরাচরে কোনো প্রাণী নেই অর্থাৎ চরাচরে সবই আমি॥ ৩৯ ॥

ব্যাখ্যা—[ভগবান কুড়ি থেকে উনচল্লিশতম শ্লোক পর্যন্ত মোট বিরাশীটি বিভূতির বর্ণনা করেছেন ; যেমন—বিশতম শ্লোকে চার, একুশতম শ্লোকে চার, বাইশতম ও তেইশতম শ্লোকেও চার করে, চব্বিশতম শ্লোকে তিন,

পঁচিশ ও ছাব্বিশতম শ্লোকে চার করে, সাতাশতমে তিন, আটাশ, উনত্রিশ, ত্রিশ ও একত্রিশ শ্লোকগুলিতে চার করে, বত্রিশতম শ্লোকে পাঁচ, তেত্রিশতম শ্লোকে চার, চৌত্রিশতম শ্লোকে নয়, পঁয়ত্রিশতম শ্লোকে চার, ছত্রিশতম শ্লোকে পাঁচ, সাঁইত্রিশ, আটত্রিশতম শ্লোকে চার করে এবং উনচল্লিশতম শ্লোকে একটি বিভূতির বর্ণনা করেছেন।]

'যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন'—ভগবান এখানে সমস্ত বিভূতির সার জানাতে গিয়ে বলেছেন যে তিনিই সবকিছুর বীজ বা কারণ। বীজ বলার অর্থ হল যে এই সংসারের নিমিত্ত কারণও আমি এবং উপাদান কারণও আমি অর্থাৎ জগতের সৃষ্টিকর্তাও আমি আবার জগৎরূপে সৃষ্টও আমিই হয়ে আছি।

ভগবান সপ্তম অধ্যায়ের দশম শ্লোকে নিজেকে 'সনাতন বীজ', নবম অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকে 'অব্যয় বীজ' এবং এখানে শুধুমাত্র 'বীজ' বলেছেন। এর তাৎপর্য হল এই যে আমি যেমনকার তেমনভাবে থেকেই জগৎ-সংসাররূপে প্রকটিত হই এবং জগৎ-সংসাররূপে প্রকটিত থেকেও ওইসব বস্তুতে যেমনকার তেমনভাবে পরিব্যাপ্ত থাকি।

'ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্'— জগতে জড়-চেতন, স্থাবর-জঙ্গম, চর-অচর যা কিছু দেখা যায়, তার কিছুই আমা ব্যতীত হওয়া সম্ভব নয়। সব আমা হতেই উৎপন্ন হয় অর্থাৎ সবকিছুই আমি। এই প্রকৃত মূলতত্ত্বটি জেনে সাধকের ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি যে কোনো স্থানেই গমন করুক অথবা মন-বুদ্ধিতে সংসারের যা কিছু কথা স্মরণে আসুক, সেগুলি সবই ভগবানের স্বরূপ বলে মানা উচিত। এরূপ মনে করলে সাধকের ভগবদ্‌চিন্তা হয়, অন্য চিন্তা হয় না, কারণ তত্ত্বতঃ ভগবান ছাড়া আর কিছুই নেই।

ভগবান এখানে বলেছেন যে চরাচরে আমি ছাড়া আর কিছুই নেই অর্থাৎ সবকিছুই আমি এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের চল্লিশতম শ্লোকে বলেছেন যে, সত্ত্ব, রজ, তম—এই তিনটি গুণ ছাড়া আর কিছুই নেই অর্থাৎ সবই গুণগুলির কাজ। এই বিভেদের অর্থ হল এখানে (দশম অধ্যায়ে) প্রকরণটি ভক্তিযোগের। এই প্রকরণে অর্জুনের প্রশ্ন ছিল যে, আপনাকে কোন্ কোন্ স্থানে চিন্তা করব ? তার উত্তরে ভগবান জানিয়েছেন যে, তোমার মনে যা কিছু চিন্তার উদয় হবে, তা সবই আমি। কিন্তু সেখানে (১৮।৪০) সাংখ্যযোগের প্রকরণ রয়েছে। সাংখ্যযোগে প্রকৃতি ও পুরুষ দুইয়ের বিবেকের এবং প্রকৃতি থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার প্রাধান্য থাকে। প্রকৃতির কার্য হওয়ায় সৃষ্টিমাত্রেই ত্রিগুণময়ী হয়[১]। সেইজন্য সেখানকার বর্ণনায় কেউই ত্রিগুণরহিত নয় এরূপ বলা হয়েছে।

বিশেষ কথা

ভগবান **'অহমাত্মা গুড়াকেশ'** (১০।২০) থেকে **'বীজং তদহমর্জুন'** (১০।৩৯) পর্যন্ত যে বিরাশীটি বিভূতির কথা বলেছেন, তার তাৎপর্য ছোট-বড়, উত্তম-মধ্যম বা অধম সম্বন্ধে জানানো নয় বরং তা বলার তাৎপর্য এই যে, যে কোনো বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা, পরিস্থিতি সামনে উপস্থিত হোক তাতেই ভগবদ্‌চিন্তন হওয়া উচিত[২]। কারণ অর্জুনের প্রশ্ন আসলে এই ছিল যে আপনার চিন্তা করে আমি আপনাকে কীভাবে জানবো এবং কোন্ কোন্ ভাবে আমি আপনার চিন্তা করবো (গীতা ১০।১৭)। সেই প্রশ্নের উত্তরে তাঁকে চিন্তা করার জন্যই ভগবান তাঁর বিভূতিগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন।

গীতায় যেমন ভগবান অর্জুনকে তাঁর বিভূতিগুলি জানিয়েছেন, তেমনই শ্রীমদ্ভাগবতে (এগারো স্কন্ধের ষোড়শ অধ্যায়ে) ভগবান উদ্ধবকে তাঁর বিভূতিগুলি জানিয়েছেন। গীতায় কথিত কয়েকটি বিভূতির কথা ভাগবতে নেই আবার ভাগবতে বলা কিছু বিভূতির বর্ণনা গীতায় নেই। গীতা ও ভাগবতে কথিত কিছু কিছু বিভূতির মধ্যে সাযুজ্য থাকলেও কোনো কোনো বিভূতির ক্ষেত্রে দুই স্থানে পৃথক্ পৃথক্ কথা বলা হয়েছে। যেমন— গীতায় ভগবান বৃহস্পতিকে পুরোহিতদের মধ্যে প্রধান বলে তাঁকে তাঁর বিভূতি বলেছেন—**'পুরোধসাং চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্'** (১০।২৪) আর ভাগবতে ভগবান পুরোহিতদের মধ্যে বশিষ্ঠকে তাঁর

---

[১]ইদং গুণময়ং বিদ্ধি ত্রিবিধং মায়য়া কৃতম্।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২৮।৭)

[২]যচ্চ কিঞ্চিজ্জগৎসর্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা। অন্তর্বহিশ্চ তৎসর্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ।। (মহানারায়ণোপনিষদ্ ১১।৬)
এই জগতে যা কিছু দেখা বা শোনা যায়, তার সবকিছুর বাইরে এবং ভেতরে ব্যাপ্তস্বরূপ হয়ে ভগবান নারায়ণ স্থিত আছেন।

বিভূতি বলে জানিয়েছেন—**'পুরোধসাং বসিষ্ঠোঽহম্'** (১১।১৬।২২)। এখন প্রশ্ন হল গীতা ও ভাগবতের বিভূতিগুলির বক্তা এক হলেও দুজনের কথায় কেন মিল নেই ? তার উত্তর হল এই যে বাস্তবে ভগবানের বিভূতি বলার তাৎপর্য কোনো বস্তু বা ব্যক্তি বিশেষের মহত্ত্ব জানানো নয়, তাৎপর্য হল তাঁর সম্পর্কে চিন্তা করানোতে। তাই গীতা ও ভাগবতের প্রধান উদ্দেশ্য হল দুই স্থানে কথিত বিভূতিগুলিতে তাঁর সম্পর্কে চিন্তা করানো। এই দৃষ্টিতে যে যে স্থানে বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়, সেই সেই বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদিতে বৈশিষ্ট্য না দেখে কেবল ভগবানকেই বিশেষভাবে দেখা উচিত এবং তাঁরই দিকে বৃত্তি (দৃষ্টি) যাওয়া উচিত।

পরিশিষ্ট-ভাব— উৎপত্তি ভেদে প্রাণী চার শ্রেণীর হয়— ১) জরায়ুজ— জরায়ু থেকে উৎপন্ন হয় যারা, যেমন— মানুষ, গোরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি, ২) অণ্ডজ— অণ্ড থেকে উৎপন্ন হয় যারা, যেমন পক্ষী, সর্প, টিকটিকি, গিরগিটি ইত্যাদি, ৩) উদ্ভিজ্জ—পৃথিবীর মাটি ভেদ করে উপরে যেগুলি ওঠে, যেমন বৃক্ষ, লতা, দূর্বা ইত্যাদি, এবং ৪) স্বেদজ—স্বেদ হতে উদ্ভূত হয় যেগুলি, যেমন উকুন ইত্যাদি এবং বর্ষায় মাটি হতে জন্মানো কেঁচো ইত্যাদি জীব। এই চারটি স্থান হতে চুরাশী লক্ষ জীব উৎপন্ন হয়। এগুলি হতে দু'প্রকার জীব জন্মায়— স্থাবর ও জঙ্গম। বৃক্ষ, লতা, দূর্বা ইত্যাদি একই স্থানে থাকায় এগুলিকে বলা হয় 'স্থাবর' জীব আর মানুষ, পশু, পাখি ইত্যাদি চলাফেরা করে যেসব জীব তাদের বলা হয় 'জঙ্গম' জীব। এই সব জীবের মধ্যে কেউ থাকে জলে, কেউ আকাশে আর কেউ থাকে মাটিতে। এই চুরাশী লক্ষ জীব ব্যতীত দেবতা, পিতৃগণ, গন্ধর্ব, ভূত, প্রেত, পিশাচ, ব্রহ্ম-রাক্ষস ইত্যাদি নানাপ্রকার জীব আছে। এই সমস্ত জীবেরই বীজ অর্থাৎ মূল কারণ হলেন একমাত্র ভগবান। তাৎপর্য হল এই যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত জীব আছে কিন্তু সবেরই বীজ সেই এক ! তাই সর্বভূতে একমাত্র ভগবানই বিরাজমান—**'বাসুদেবঃ সর্বম্'**।

বীজ হতে যেমন চাষ হয়, তেমনই, এক ভগবান থেকে এই সম্পূর্ণ জগৎ-সংসার সৃষ্ট হয়েছে। যেমন গম থেকে গম, পশু থেকে পশু, মানুষ হতে মানুষই উৎপন্ন হয়, তেমনই ভগবান থেকে ভগবানই হয় অর্থাৎ জগৎ-সংসাররূপে ভগবানই প্রকটিত। স্বর্ণনির্মিত গহনা যেমন স্বর্ণময়ই হয়, লৌহনির্মিত দ্রব্যাদি যেমন লৌহময়ই হয়ে থাকে, মৃত্তিকা থেকে নির্মাণ করা তৈজস যেমন মৃত্তিকারূপ হয়, তুলো থেকে তৈরি বস্ত্র যেমন তুলোরূপ হয়ে থাকে, তেমনই ভগবান হতে সৃষ্ট এই জগৎও ভগবৎস্বরূপই হয়।

লৌকিক বীজের একটি প্রকার থেকে একই প্রকারের চাষ হয়, যেমন গমবীজ থেকে গমই উৎপন্ন হয়, এমন নয় যে এক গমবীজ থেকেই গম, বাজরা, মুগ সর্বপ্রকার শস্যই উৎপন্ন হবে ! বীজই পৃথক্ পৃথক্ হয়ে থাকে। কিন্তু ভগবৎরূপ বীজের বিশেষত্ব হল এই যে, সেই এক ভগবৎবীজ হতে নানা প্রকার জগৎ-সংসার সৃষ্টি হয় (গীতা ১৪।৪) এবং এতো কিছু সৃষ্ট হলেও তাতে কোনোপ্রকার বিকৃতি আসে না, তা একইভাবে বিরাজ করে, কারণ এই বীজ হল 'অব্যয়' (গীতা ৯।১৮) এবং 'সনাতন' (গীতা ৭।১০)।

※ ※ ※

নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া॥ ৪০ ॥

[**পরন্তপ** (হে পরন্তপ !) ; **মম** (আমার) ; **দিব্যানাম্, বিভূতিনাম্** (দিব্য বিভূতিসমূহের) ; **ন, অন্তঃ, অস্তি** (কোনো অন্ত নেই) ; **ময়া** (আমি) ; **বিভূতেঃ** (বিভূতির যে) ; **বিস্তরঃ** (বিস্তারের) ; **প্রোক্তঃ** (কথা বলছি) ; **এষঃ, তু** (তা তো) ; **উদ্দেশতঃ** (সংক্ষেপেই বলেছি।)]

হে পরন্তপ ! আমার দিব্য বিভূতিসমূহের কোনো অন্ত নেই। আমি তোমাকে আমার যা কিছু বিভূতির বিস্তার বর্ণনা করেছি, তা তো শুধু বিভূতিগুলির সংক্ষেপ অর্থাৎ নামমাত্র বলা ॥ ৪০ ॥

ব্যাখ্যা—'মম দিব্যানাং[১] বিভূতীনাম্'—'দিব্য' শব্দটি অলৌকিকতা ও বিলক্ষণতার দ্যোতক। সাধকের মন যেখানেই যাক্ সেখানেই ভগবদ্‌চিন্তা হলে, দিব্যতা স্বতঃই প্রকটিত হয় ; কারণ ভগবানের ন্যায় দিব্য আর কেউই নেই। দেবতাদের যে দিব্য বলে অভিহিত করা হয়, তাঁরাও নিত্য ভগবদ্দর্শনের ইচ্ছা পোষণ করেন—**'নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ'** (গীতা ১১।৫২)। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে দিব্যাতিদিব্য তো একমাত্র ভগবানই। তাই ভগবানের যতপ্রকার বিভূতি আছে, তত্ত্বতঃ সেগুলি সবই দিব্য। কিন্তু সাধকদের কাছে সেই বিভূতিগুলির দিব্যতা তখনই প্রকট হয় যখন কেবল ভগবদপ্রাপ্তিই তার উদ্দেশ্য হয় এবং ভগবদতত্ত্ব জানার জন্য রাগ-দ্বেষ রহিত হয়ে সেই বিভূতিগুলিতে ভগবানের চিন্তন করা হয়।

'নান্তোঽস্তি'—ভগবানের দিব্য বিভূতিগুলির কোনো অন্ত নেই। কারণ ভগবান অনন্ত এবং তাঁর বিভূতি, গুণ, লীলা সবই অনন্ত—**'হরি অনন্ত হরি কথা অনন্তা'** (শ্রীরামচরিতমানস ১।১৪০।৫)। তাই ভগবান বিভূতিগুলির উপক্রম এবং উপসংহার—এই দুই স্থানেই বলেছেন, আমার বিভূতিগুলির কোনো অন্ত নেই। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান তাঁর বিভূতিগুলির বিষয়ে বলেছেন যে, 'আমার দ্বারা পরমাণুর সংখ্যার গণনা কখনো শেষ করা গেলেও, কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা হিসাবে আমার বিভূতিগুলির কোনো অন্ত পাওয়া সম্ভব নয়[২]।'

ভগবান অনন্ত, অসীম এবং অগাধ। সংখ্যার দৃষ্টিতে তিনি 'অনন্ত' অর্থাৎ তাঁকে গণনা করা যায় না, সীমার দৃষ্টিতে তিনি 'অসীম'। সীমা দুই প্রকারের—কালকৃত এবং দেশকৃত। অমুক সময়ে জন্মেছে এবং অমুক সময় পর্যন্ত থাকবে—এটি হল কালকৃত সীমা, আর এখান থেকে সেখান পর্যন্ত হল দেশকৃত সীমা। ভগবান এরূপ কোনো সীমায় আবদ্ধ নন। তলের দৃষ্টিতে তিনি হলেন 'অগাধ'। অগাধ শব্দে 'গাধ' হল 'তল', জলের নীচের তল। অগাধের অর্থ হল—যার তলই নেই, এরূপ গভীর।

'এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া'—অষ্টাদশ শ্লোকে অর্জুন বলেছেন যে, আপনি আপনার দিব্যবিভূতিসমূহ বিস্তারিতভাবে বলুন। তার উত্তরে ভগবান বলেছেন যে, আমার বিভূতি বিস্তারের কোনো অন্ত নেই। এ-কথা বলা সত্ত্বেও ভগবান অর্জুনের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে কৃপাপূর্বক তাঁর বিভূতিগুলির বিস্তারিত বর্ণনা দেন। কিন্তু এই বিস্তার শুধুমাত্র লৌকিক দৃষ্টিতে। তাই ভগবান এখানে বলেছেন যে আমি এখানে যে বিভূতি-বিস্তার করেছি, তা শুধু তোমার জন্য। আমার কাছে এই বিস্তারও প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত (নামমাত্র) ; কারণ আমার বিভূতির কোনো অন্ত নেই।

[এই অধ্যায়ে বর্ণিত সমস্ত বিভূতি সকলের কাজে লাগে না। বরং আমাদের সম্পর্কে আসে এমন অনেক অন্য বিভূতি আছে কিন্তু সেগুলির বর্ণনা এখানে করা হয়নি। সুতরাং সাধকদের উচিত যে, যে স্থানে কোনো বৈশিষ্ট্যবশতঃ তাঁদের মন আকর্ষিত হবে, সেখানেই তাঁরা সেগুলি ভগবানের বলে মনে করবেন এবং তাঁকেই চিন্তা করবেন ; সেইসব বিভূতি ভগবান এখানে বলে থাকুন, বা নাই বলে থাকুন।]

পরিশিষ্ট-ভাব—গীতায় ভগবান কারণরূপে সতেরটি বিভূতি (গীতা ৭।৮-১২), কার্য-কারণ রূপে সাঁইত্রিশটি বিভূতি (৯।১৬-১৯), ভাবরূপে কুড়িটি বিভূতি (১০।৪-৫), ব্যক্তিরূপে পঁচিশটি বিভূতি (১০।৬), মুখ্যরূপে এবং অধিপতিরূপে একাশিটি বিভূতি (১০।২০-৩৮), সাররূপে একটি বিভূতি (১০।৩৯) এবং প্রভাবরূপে তেরটি বিভূতির (১৫।১২-১৫) কথা বলেছেন। এই সকল বিভূতি বর্ণনার তাৎপর্য এই যে, একমাত্র ভগবান ব্যতীত আর কিছুই নেই। সমস্তরূপেই একমাত্র ভগবানই বিরাজমান। সবই ভগবানের সমগ্ররূপ। অসৎ পরিবর্তনশীল আর সৎ হল

---

[১]অর্জুন প্রারম্ভে প্রার্থনারূপে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ' (১০।১৬) ; ভগবান বিভূতির বর্ণনার প্রারম্ভে বলেছেন—'হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ' (১০।১৯) ; এবং এখানে উপসংহারে বলেছেন যে—'নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ' (১০।৪০)। এইরূপ প্রার্থনাতে (প্রশ্নে), উপক্রমে এবং উপসংহারে—তিনটি স্থানে 'দিব্য' পদটি উল্লিখিত রয়েছে।

[২]সংখ্যানং পরমাণূনাং কালেন ক্রিয়তে ময়া। ন তথা মে বিভূতীনাং সৃজতোঽণ্ডানি কোটিশঃ।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।

অপরিবর্তনশীল। এই সৎ (পরা) এবং অসৎ (অপরা) উভয়ই ভগবানের বিভূতি—**'সদসদ্দাহমর্জুন'** (গীতা ৯।১৯)। তাৎপর্য হল যে বিভূতিরূপে সাক্ষাৎ ভগবানই বিরাজমান। অতএব যেসব জিনিসের প্রতি আমাদের আকর্ষণ জন্মে, বাস্তবে তা ভগবানের প্রতিই আকর্ষণ। কিন্তু ভোগবুদ্ধিবশতঃ সেই আকর্ষণ ভগবৎপ্রেমে পরিণত না হয়ে কামনা-বাসনা-আসক্তিতে পরিণত হয়, যা হল জগৎ-সংসারে বন্ধনের কারণ।

গীতায় ভগবান ব্রহ্মকেও **'মাম্'** (নিজ স্বরূপ) বলেছেন (৮।১৩), দেবতাদেরও **'মাম্'** বলেছেন (৯।২৩), ইন্দ্রকেও **'মাম্'** বলেছেন (৯।২০), উত্তম গতিকেও **'মাম্'** বলেছেন (৭।১৮), ক্ষেত্রজ্ঞ (জীবাত্মা)-কেও **'মাম্'** বলেছেন (১৩।২), সকলের শরীরে অবস্থিত অন্তর্যামীকেও **'মাম্'** বলেছেন (১৬।১৮), সমস্ত প্রাণীর বীজকেও **'মাম্'** বলেছেন (৭।১০) ইত্যাদি। তাৎপর্য হল যে সগুণ-নির্গুণ, সাকার-নিরাকার এবং মনুষ্য, দেবতা, পশু, পক্ষী, ভূত, প্রেত, পিশাচ ইত্যাদি যা কিছু আছে, তা সবই ভগবানেরই সমগ্ররূপের অন্তর্গত অর্থাৎ ভগবানেরই বিভূতি, তাঁরই ঐশ্বর্য[১]। এই সব বিভূতিই অব্যয় এবং অবিনাশী।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, সম্পূর্ণ জগৎ-সংসারই যখন ভগবৎস্বরূপ, তখন বিভূতি বর্ণনা করার কী প্রয়োজন ? তার উত্তরে বলা যায় যে— অর্জুন প্রশ্ন করেছিলেন যে, আমি আপনাকে কোন্ কোন্ জায়গায় চিন্তা করব (১০।১৭) ? প্রকৃতপক্ষে সবই ভগবানের সমগ্র রূপ হলেও মানুষ যেসব বস্তুতে বিশেষ প্রকাশ দেখে, সেই বস্তুতে ভগবানকে দেখা এবং চিন্তা করা সহজ হয়, কারণ মনে তার বৈশিষ্ট্য মুদ্রিত হওয়ায় মন স্বতঃই সেই দিকে যায়। সেই জন্যই ভগবান তাঁর বিভূতিসমূহ বর্ণনা করেছেন। প্রধান প্রধান বিভূতিগুলি বর্ণনা করে ভগবান বলেছেন যে, সমস্ত প্রাণীরই এবং সৃষ্টি মাত্রেরই আদি, মধ্য এবং অন্ত তিনিই (১০।২০, ৩২), সকল প্রাণীর বীজও তিনি, তিনি ছাড়া জগতে চর-অচর কোনো প্রাণী নেই (১০।৩৯) এবং সমস্ত জগৎ তাঁরই একাংশে স্থিত (১০।৪২), তাহলে ভগবান ব্যতীত আর কী থাকে ? কিছুই বাকি থাকে না ! সব কিছুই ভগবান—**'বাসুদেবঃ সর্বম্'** (গীতা ৭।১৯)।

গীতায় যে বিভূতিগুলি বর্ণনা করা হয়েছে তা গৌণ (অপ্রধান) নয়, বরং এগুলি হল ভগবৎপ্রাপ্তির প্রধান সাধন, যার পরিণাম হল **'বাসুদেবঃ সর্বম্'**। কারণ জগতে আমরা যেখানেই বিশেষ কিছু দেখতে পাই, সেগুলি ভগবানের বৈশিষ্ট্য বলে মেনে নিলে আমাদের আকর্ষণ সেই বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদিতে না হয়ে ভগবানের প্রতি হয়। জড় বস্তুর আকর্ষণ, প্রিয়ভাবই মানুষের বন্ধনের কারণ—**'কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু'** (গীতা ১৩।২১)। সুতরাং বিভূতি-বর্ণনা করার তাৎপর্য হল যে— জাগতিক অস্তিত্ব, মহত্ত্ব এবং প্রিয়ভাব দূর করে মানুষকে **'বাসুদেবঃ সর্বম্'**—এই কথাটি অনুভব করানো, এটিই হল গীতার প্রধান ধ্যেয় বিষয়।

জগতের অস্তিত্ব, মহত্ত্ব এবং সম্বন্ধই মানুষকে আবদ্ধ করে। তাই জগতে মানুষের যেখানে আকর্ষণ বেশি থাকে, সেখানে তার ভোগবুদ্ধি না হয়ে যদি ভগবৎবুদ্ধি হয় তাহলে তার হৃদয়ে জগতের অস্তিত্ব, মহত্ত্ব ও সম্বন্ধ না হয়ে ভগবানের অস্তিত্ব, মহত্ত্ব ও সম্বন্ধ হবে[২]।

* * *

---

[১]সর্বে চ দেবা মনবস্‌সমস্তাস্‌সপ্তর্ষয়ো যে মনুসূনবশ্চ। ইন্দ্রশ্চ যোঽয়ং ত্রিদশেশভূতো বিষ্ণোরশেষাস্তু বিভূতয়স্তাঃ॥ (বিষ্ণুপুরাণ ৩।১।৪৬)

'সকল দেবতা, মনু, সপ্তর্ষি এবং মনুপুত্র ও দেবতাদের অধিপতি ইন্দ্রগণ আর এদের ছাড়াও যা কিছু আছে তা সবই বিষ্ণুর বিভূতি।'

[২]নরেষ্বভীক্ষ্ণং মদ্ভাবং পুংসো ভাবয়তোঽচিরাৎ। স্পর্ধাসূয়াতিরস্কারাঃ সাহঙ্কারা বিয়ন্তি হি॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২৯।১৫)

'ভক্তের যখন সকল স্ত্রী ও পুরুষে নিরন্তর আমার ভাব হয় অর্থাৎ তাঁদের মধ্যে আমাকেই দেখতে পান, তখন শীঘ্রই তাঁর হৃদয় থেকে ঈর্ষা, দোষদৃষ্টি, তিরস্কার ইত্যাদি দোষ অহংকার সহ চিরকালের মতো দূরীভূত হয়।'

সম্বন্ধ—অষ্টাদশ শ্লোকে অর্জুন ভগবানের কাছে তাঁর বিভূতি ও যোগ বলার জন্য প্রার্থনা করেন। তাতে ভগবান প্রথমে তাঁর বিভূতিগুলি বলেছেন, এখন পরবর্তী শ্লোকে যোগ সম্বন্ধে জানাচ্ছেন।

যদ্‌ যদ্‌ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্‌॥ ৪১ ॥

[**যৎ, যৎ, সত্ত্বম্‌** (যে যে বস্তু) ; **বিভূতিমৎ** (ঐশ্বর্যযুক্ত) ; **শ্রীমৎ, বা** (শোভাযুক্ত এবং) ; **ঊর্জিতম্‌** (বলসম্পন্ন) ; **তৎ, তৎ, ত্বম্‌** (সেসবই তুমি) ; **মম, এব** (আমারই) ; **তেজঃ** (তেজ) ; **অংশসম্ভবম্‌** (অংশ হতে উৎপন্ন বলে) ; **অবগচ্ছ** (জানবে।)]

যে যে বস্তু (প্রাণী, পদার্থ প্রভৃতি) ঐশ্বর্যযুক্ত, শোভাযুক্ত এবং বল-সম্পন্ন, সেসবই তুমি আমারই তেজ (যোগ অর্থাৎ সামর্থ্যের) অংশ হতে উৎপন্ন বলে জানবে॥ ৪১ ॥

ব্যাখ্যা—'যদ্‌ যদ্‌ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা'—এই জগৎ-সংসারে যে কোনো সজীব-নির্জীব বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা, পরিস্থিতি, গুণ, ভাব, ক্রিয়া প্রভৃতিতে যা কিছু ঐশ্বর্য, শোভা বা সৌন্দর্য দেখবে, বলবত্তা দেখবে এবং যা কিছু বিশেষতা, বিলক্ষণতা, যোগ্যতা দেখবে সে সবই আমার শক্তির কোনো একটি অংশ থেকে উৎপন্ন বলে জানবে। তাৎপর্য হল এই যে, তাদের এই বিলক্ষণতা আমার যোগ থেকে, সামর্থ্য থেকে এবং প্রভাব থেকেই প্রাপ্ত—তুমি এরূপ জানবে—**'তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্‌'**। আমা ব্যতীত কোথাও কোনো বিশেষত্ব নেই।

মানুষ যে যে বিষয়ে বৈশিষ্ট্য অনুভব করবে সেই সেই বিষয়ে ভগবানেরই বিশেষত্ব মনে করে তাঁরই চিন্তা করা উচিত। ভগবান ছাড়া অন্য কোনো বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদিতে বৈশিষ্ট্য দেখলে তা পতনের কারণ হয়। যেমন পতিব্রতা স্ত্রী মনে মনে যদি নিজ স্বামীর বদলে অন্য কোনো পুরুষকে চিন্তা করেন, তবে তাঁর পতিব্রতা ধর্ম ভঙ্গ হয়, তেমনই ভগবান ছাড়া অন্য কোনো বস্তুর বৈশিষ্ট্যে যদি মন আকর্ষিত হয়, তাহলে ব্যভিচার দোষ হয় অর্থাৎ ভগবানে অনন্য ভাবের ব্রত ভঙ্গ হয়।

জগতে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বা বৃহৎ থেকে বৃহত্তর বস্তু, ব্যক্তি, ক্রিয়া ইত্যাদিতে যে মহত্ত্ব, সৌন্দর্য ইত্যাদি দেখা যায় এবং যা কিছু মূল্যবান ও হিতকর কিছু দেখা যায়, সেগুলি আসলে জাগতিক বস্তুর নয়। যদি তা বস্তুটির হতো তবে তা সবসময় থাকত এবং সকলের দৃষ্টিতে একইরকম মনে হত। কিন্তু সেগুলি সর্বক্ষণ থাকেও না বা সকলের দৃষ্টিতে একই রকমের মনে হয় না। এতে প্রমাণিত হয় যে সেটি ওই বস্তুর নয়। তাহলে কার ? সেই বস্তুটির যিনি আধার, সেই পরমাত্মার। সেই পরমাত্মার ছোঁয়াতেই এইসব বস্তুতে সৌন্দর্য, সুখ, আকর্ষণ ইত্যাদি প্রতিভাত হয়। কিন্তু মানুষের বৃত্তি যখন পরমাত্মার মহিমা উপলব্ধি না করে সেই বস্তুটির দিকে যায়, তখন সে সংসারে আবদ্ধ হয়। সংসারে আবদ্ধ হলে তার কোনো লাভও হয় না এবং তৃপ্তিও মেলে না। এতে যে সুখ বা তৃপ্তি হয় না, এটি জেনেও মানুষ বস্তু ইত্যাদিতে সুখের আশা করে থাকে। তার ভ্রম দূর হয় না। সতর্কতার সঙ্গে বিচার করে তার দেখা উচিত যে প্রতিক্ষণ বিনাশশীল এই বস্তুতে যে সুখ অনুভূত হয়, সেগুলি ওই বস্তুটির কীভাবে হওয়া সম্ভব ? যা প্রতিমুহূর্তে নষ্ট হচ্ছে তাতে যে মহত্ত্ব, সৌন্দর্য দেখা যায়, তা এই বস্তুগুলির কী করে হতে পারে !

যেমন বিদ্যুৎ সংস্পর্শে রেডিও বেজে উঠলে সকলে বলে, দেখো এই যন্ত্র থেকে কেমন আওয়াজ আসছে! কিন্তু সেই রেডিওর যে শক্তি তা আসলে বিদ্যুতেরই শক্তি। বিদ্যুতের সংস্পর্শে না এলে ওই যন্ত্র থেকে কোনো শব্দই বেরোবে না। অশিক্ষিত মানুষ ওই ধ্বনি যন্ত্রটির বলেই মনে করে থাকে, কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তি জানে যে ওই ধ্বনির পেছনে যে শক্তি তা বিদ্যুতেরই। এইরূপই কোনো বস্তু, ব্যক্তি, পদার্থ, ক্রিয়া ইত্যাদিতে যা কিছু বিশেষত্ব দেখা যায়, মূঢ় ব্যক্তি সেগুলিকে ওই বস্তুর বা ব্যক্তির বলে মনে করলেও সজ্জন ব্যক্তি সেগুলিকে ভগবানেরই বলে মেনে থাকেন।

এই অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে

সবকিছু আমা হতেই উৎপন্ন হয় এবং সবেতে আমারই শক্তি বিরাজমান। ভগবানের একথা বলার অর্থ হল যে, তুমি যে যে স্থানে এবং যেসব বিষয়ে কোনো বৈশিষ্ট্য, মহত্ত্ব, সৌন্দর্য, শক্তি ইত্যাদি দেখবে, তা সবই আমার—সেগুলির নয়। এক পতিতা অতি সুন্দর সুরে গান গাইছিল, তাই শুনে একজন সাধু অত্যন্ত আনন্দিত হলেন—দেখো! ঠাকুর একে কী সুন্দর গলা দিয়েছেন, কী মধুর আওয়াজ! সাধুর দৃষ্টি সেই পতিতার দিকে যায়নি, তাঁর দৃষ্টি ছিল ভগবানের দিকে, —এই সুরের যে আকর্ষণ ও মিষ্টতা তা প্রকৃতপক্ষে ভগবানের। তেমনই সুন্দর ফুল দেখলে মনে হওয়া উচিত, বাহ ! ভগবান এই ফুলে কী সৌন্দর্য দিয়েছেন ! কাউকে ভালোভাবে পড়াতে দেখলে মনে করবে সেই পড়াবার শক্তি ভগবানেরই, যে পড়াচ্ছে তার নয়। দেবতাগণের কাছে বৃহস্পতি প্রিয়, রঘুবংশীয়দের কাছে বশিষ্ঠ প্রিয়, কেউ সিংহের মধ্যে বৈশিষ্ট্য দেখতে পান, কারও কাছে অর্থই প্রিয়। ও সবের মধ্যে যে শক্তি, মহত্ত্ব, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির জন্য আকর্ষণ হয়, প্রিয়ভাব হয়, সে সবই ভগবানের, ওই বস্তুগুলির নয়। এইভাবে কোনো স্থানে কোনো বৈশিষ্ট্য দেখলে, তা ভগবানের বৈশিষ্ট্য রূপেই দেখা উচিত। ভগবানও তাঁর নানা বিভূতির কথা বলেছেন। এর তাৎপর্য হল যে ওই সব বিভূতিতে শ্রদ্ধা, রুচির পার্থক্যের জন্য আকর্ষণ প্রত্যেক মানুষের ভিন্ন ভিন্ন হয়, সব বিভূতি সকলের একরকম ভালো লাগে না, কিন্তু ওই সবগুলিতেই ভগবানের শক্তি বিরাজমান।

যদিও যা কিছু বিশেষত্ব দেখা যায়, তা সবই পরমাত্মার, তা সত্ত্বেও যা থেকে আমরা উপকৃত হই, তার প্রতি অবশ্যই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, তার সেবা করা উচিত। কিন্তু সেই বৈশিষ্ট্যকে কারও ব্যক্তিগত মনে করে তাতে যেন আবদ্ধ না হই—এই বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত।

বিশেষ কথা

ভগবান বিশতম শ্লোক থেকে উনচল্লিশতম শ্লোক পর্যন্ত যত বিভূতি জানিয়েছেন, তাতে প্রায়শই **'অস্মি'** (আমি আছি) পদটি প্রযুক্ত হয়েছে। কেবল তিনটি স্থানে—চব্বিশ এবং সাতাশতম শ্লোকে **'বিদ্ধি'** এবং এখানে (একচল্লিশতম শ্লোকে) **'অবগচ্ছ'** পদ প্রয়োগ করে 'জানার' কথা বলেছেন।

'অস্মি' (আমি আছি) পদটি প্রয়োগের তাৎপর্য হল বিভূতিগুলির মূল তত্ত্বের দিকে লক্ষ্য করানো, অর্থাৎ এইসব বিভূতির মূলে আমিই অবস্থিত তা বোঝানো। কারণ সপ্তদশ শ্লোকে অর্জুন জিজ্ঞেস করেছিলেন যে আমি আপনাকে কীভাবে জানব ? তখন ভগবান **'অস্মি'** প্রয়োগ করে সকল বিভূতিতে তাঁকে জানার কথা বলেছিলেন।

দুই স্থানে **'বিদ্ধি'** পদটি প্রয়োগ করার তাৎপর্য মানুষকে সাবধান ও সজাগ করা। মানুষ সজাগ হয় দু-ভাবে—জ্ঞানের (শিক্ষার) দ্বারা ও শাসনের দ্বারা। জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় গুরুর সাহায্যে আর শাসন করেন রাজা। সুতরাং চব্বিশতম শ্লোকে যেখানে দেবগুরু বৃহস্পতির কথা বর্ণিত হয়েছে, সেখানে **'বিদ্ধি'** কথাটির অর্থ হল যে, তোমরা গুরুর সাহায্যে আমার বিভূতির তত্ত্বগুলিকে যথার্থরূপে জানো। বিভূতির তত্ত্বকে জানার ফল হল আমাতে দৃঢ় ভক্তি হওয়া (গীতা ১০।৭)। সাতাশতম শ্লোকে রাজার বর্ণনার স্থানে **'বিদ্ধি'** বলার অর্থ হল যে, তোমরা রাজার শাসনে উন্মার্গ (কুপথ) থেকে সরে এসে সন্মার্গে (সু-পথে) যুক্ত হও অর্থাৎ নিজ জীবনকে শুদ্ধ করো। গুরু স্নেহ দিয়ে বোঝান আর রাজা বোঝান শক্তি দিয়ে, ভয় দেখিয়ে। গুরুর বোঝানোতে উদ্ধারের কথা প্রধান থাকে আর রাজার বোঝানোতে লৌকিক কর্তব্য পালন করার লক্ষ্যই প্রধান।

সাতাশতম শ্লোকে যে **'উচ্চৈঃশ্রবা'** এবং **'ঐরাবতে'**র বর্ণনা আছে, সেই দুটিই রাজার ঐশ্বর্যের প্রতীক । কারণ ঘোড়া, হাতি ইত্যাদি রাজারই ঐশ্বর্য এবং ঐশ্বর্যশালী রাজাই শাসন করেন। তাই ওই শ্লোকে **'বিদ্ধি'** পদটির প্রয়োগ প্রধানতঃ রাজার জন্য হয়েছে বলে মনে হয়।

এখানে একচল্লিশতম শ্লোকে যে **'অবগচ্ছ'** পদটি ব্যবহৃত হয়েছে, তার অর্থ হল—বাস্তবিকভাবে বোঝা যে, যা কিছু বিশেষ বস্তু দেখা যায় তা সবই প্রকৃতপক্ষে ভগবানের।

এইভাবে দুবার **'বিদ্ধি'** এবং একবার **'অবগচ্ছ'** পদ ব্যবহারের তাৎপর্য হল যে গুরু ও রাজা কর্তৃক বোঝানো হলেও মানুষ যতক্ষণ নিজে সেগুলি না বোঝে বা মেনে নেয়, ততক্ষণ গুরুর জ্ঞানে এবং রাজার শাসনে তার কোনো কাজ হয় না। শেষ পর্যন্ত স্বয়ংকে মানতেই হয় এবং সেটিই তার কাজে লাগে।

পরিশিষ্ট-ভাব— পূর্বে কথিত বিভূতিগুলি ব্যতীত সাধকের স্বতঃই যেসব বস্তুতে ব্যক্তিগত আকর্ষণ দেখা যায়, সেই সব স্থলে ভগবানকেই দেখা উচিত অর্থাৎ সেই সব বৈশিষ্ট্য ভগবানেরই—এটিই দৃঢ়ভাবে মনে ধারণ করতে হয়। ভগবদ্বুদ্ধি দৃঢ়তর হলে জগৎ-সংসার লুপ্ত হয়ে যায়, যেমন—স্বর্ণালঙ্কারকে কেবল স্বর্ণরূপে দেখলে অলঙ্কার লুপ্ত হয়ে যায়। চিনির তৈরি খেলনাকে চিনি রূপে দেখলে খেলনা লুপ্ত হয়ে যায়, কারণ জগৎ প্রকৃতপক্ষে নেই-ই। জীবই শুধুমাত্র তার রাগ-দ্বেষাদির জন্য জগৎ-সংসারকে মেনে নিয়েছে—**'যয়েদং ধার্যতে জগৎ'** (গীতা ৭।৫)। সার কথা হল এই যে, যে কোনো প্রকারে সাধককে শেষ পর্যন্ত **'বাসুদেবঃ সর্বম্'** (সব কিছু ভগবানই) এই কথাটি জানতে হবে। সেইজন্য ভগবান অরুন্ধতী ন্যায়ের দ্বারা **'বাসুদেবঃ সর্বম্'**—এটি অনুভব করাবার জন্যই বিভূতি-যোগ বর্ণনা করেছেন, কারণ বিভূতিগুলির মধ্যে ভগবানকে দেখলে তখন সর্বত্রই ভগবানের দর্শন হতে থাকবে অর্থাৎ বস্তুরূপে আকর্ষিত না হয়ে ভগবৎরূপে আকর্ষিত হবে।

মানুষের যে সব বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র্য দেখা যায়, সে সবই ভগবানের থেকে আসে। যদি এই বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্যভাব ভগবানের না থাকত তবে তা মানুষের মধ্যে কী করে আসবে ? যা অংশীর মধ্যে নেই, তা অংশে আসবে কী করে ? মানুষ ওইসব বৈশিষ্ট্য নিজের বলে মনে করে অহংকার করে থাকে, এই হল তার মস্ত ভুল এবং যেখান হতে সে এই বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে, সেদিকে সে খেয়ালই করে না।

জগতের প্রত্যেক বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদি ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে। অতএব যেসব বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদিতে যে সৌন্দর্য, বল ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তা সবই একদিন নষ্ট হয়ে যাবে। জগতের প্রত্যেক বস্তুই যেন এই ক্রিয়াত্মক উপদেশ প্রদান করছে যে, আমাকে দেখো না, আমি চিরদিন থাকব না, আমাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, তাঁকে দেখো। আমাতে যে সৌন্দর্য, সামর্থ্য, বৈশিষ্ট্য দেখছ, সেগুলি সবই তাঁর, আমার নয় ! এটি জানলে তখন আর বস্তু ও ব্যক্তি ইত্যাদিতে আমাদের আর আকর্ষণ থাকে না এবং প্রতিটি বস্তু ও ব্যক্তিতে ভগবদ্দর্শন হয়। এরূপ হলে আর ভোগ হয় না, বরং স্বতঃই যোগ (ভগবানের সঙ্গে নিত্য-সম্পর্ক স্থাপিত) হয়।

পরমাত্মা সমস্ত শক্তি, কলা, বিদ্যা ইত্যাদির বিশেষ ভাণ্ডার। জড় প্রকৃতিতে শক্তি থাকতে পারে না, তা থাকে চিন্ময় পরমাত্মতত্ত্বে। যে জ্ঞানের দ্বারা ক্রিয়া সংঘটিত হয়, সেই জ্ঞান জড়ে থাকা সম্ভবপর হয় কীভাবে ? যদি এটি মেনে নেওয়া যায়ও যে, প্রকৃতিতে সব শক্তি অন্তর্নিহিত থাকে, তাহলেও মানতে হবে যে, ওইসব শক্তির অভিব্যক্তি এবং উপযোগ (জগৎ-সৃষ্টি ইত্যাদি) করার যোগ্যতা প্রকৃতির নেই। যেমন, কম্পূটার জড় হলেও নানা চমৎকার কার্যকলাপ করে, কিন্তু তার নির্মাণকারী ও সঞ্চালক হল চেতন জীব (মানুষ)। মানুষ একে নির্মাণ, শিক্ষাদান ও সঞ্চালন না করলে এটির দ্বারা কোনো কার্য করা সম্ভব হত না। কম্পূটার স্বতঃসিদ্ধ নয়, এটি কৃত্রিম (নির্মিত), কিন্তু পরমাত্মা স্বতঃসিদ্ধ।

পরমাত্মাতে যদি বিশেষত্ব না থাকত, তাহলে তা জগতে আসত কী করে ? যে বৈশিষ্ট্য বীজে থাকে, তা গাছেও দেখা যায়। যে বৈশিষ্ট্য বীজে নেই, তা বৃক্ষে আসবে কীভাবে ? সেই পরমাত্মার কবিত্ব-শক্তিই কবিতে বর্তায়, তাঁর বাগ্মীতায় ক্ষমতাই বক্তাতে আসে, তাঁর লেখার শক্তিই লেখকের মধ্যে আসে, তাঁর দান করার আগ্রহ দাতার মধ্যে দেখা যায়। মুক্তি, জ্ঞান, প্রেম ইত্যাদি সবই সেই পরমাত্মারই দেওয়া। এগুলি প্রকৃতির কার্য নয়। যদি 'আমি মুক্তস্বরূপ'—এই কথা সত্য হয়, তাহলে বন্ধন কোথা হতে হল, কেমন করে এল, কবে এল, কেন এল ? যদি 'আমি জ্ঞানস্বরূপ'—একথা সত্য হয়, তাহলে অজ্ঞান কোথা থেকে এল, কেমন করে এল, কবে এল এবং কেন এল ? সূর্যতে অমাবস্যার অন্ধকার কী করে আসবে ? আসলে জ্ঞান হল পরমাত্মার, কিন্তু একে যখন নিজের বলে মনে করা হয়, তখনই অজ্ঞানতা আসে[১]। আমি জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞান আমার—এই 'আমি' এবং 'আমার' (অহং-মমত্ববোধ)-ই হল

---

[১]জ্ঞান অথবা জানার শক্তি প্রকৃতিতে নেই। প্রকৃতি একভাবে থাকে না, তা প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তিত হয়। যদি প্রকৃতিতে জ্ঞান থেকেও থাকে, তাহলে সেটিও একভাবে না থেকে তা পরিবর্তিত হত। যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তা সর্বদা থাকে না ; তা অনিত্য হয়। যদি কেউ মনে করে যে জ্ঞান প্রকৃতিতেই হয় তাহলে সেই প্রকৃতিকেই পরমাত্মা বলা যায়, কেবল শব্দগুলি আলাদা। তাৎপর্য হল যে জ্ঞান প্রকৃতিতে নেই, যদি তাই হয় তাহলে সেটিই পরমাত্মা।

অজ্ঞানতা[১]। যার দ্বারা মুক্তি, জ্ঞান প্রেম ইত্যাদি পাওয়া যায়, সেদিকে দৃষ্টি না দিলেই এমন মনে হয় যে মুক্তি আমার, জ্ঞান আমার, প্রেম আমার। এতো যিনি দান করেন তাঁর (পরমাত্মার) এরূপ বৈশিষ্ট্য যে, যাঁকে তিনি প্রদান করেন তাঁর এইসব জিনিস নিজেরই বলে মনে হয়। পরমাত্মার এই বৈশিষ্ট্য মহান আদর্শ, সাধকের এটি অনুসরণ করা উচিত। মানুষের এই মস্ত ভ্রম যে, এইসব প্রাপ্ত বস্তুকে নিজের বলে মনে করে, কিন্তু যেখান থেকে সে এই বস্তুসমূহ লাভ করেছে, সেই দাতার দিকে তার দৃষ্টি যায় না ! সে প্রাপ্ত বস্তুগুলি দেখলেও দাতাকে লক্ষ্য করে না ! কার্যগুলি দেখে, কিন্তু যাঁর শক্তিতে কার্য সাধিত হয়েছে, সেই কারণকে দেখে না ! প্রকৃতপক্ষে বস্তুগুলি নিজের নয়, কিন্তু যিনি দাতা তিনি আমাদের আপন।

ভগবদ্‌প্রদত্ত সামর্থ্যেই মানুষ কর্মযোগী হতে পারে, তাঁর প্রদান করা জ্ঞানের সাহায্যেই মানুষ জ্ঞানযোগী হয় এবং তাঁর দেওয়া প্রেমেই মানুষ প্রেমযোগী হয়। মানুষের মধ্যে যে বিশেষ লক্ষণ, বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তা সবই তাঁর দেওয়া। সব কিছু দিয়েও তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন না—এই হল তাঁর স্বভাব।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ভগবান এবার নিজে থেকে বিশেষ কথাটি জানাচ্ছেন।

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥ ৪২ ॥

[**অথবা, অর্জুন** (অথবা হে অর্জুন !) ; **তব, এতেন** (তোমার এত) ; **বহুনা** (বহুবিধ কথা) ; **জ্ঞাতেন** (জানবার) ; **কিম্** (প্রয়োজন কীসের ?) ; **অহম্** (আমি) ; **একাংশেন** (একটি অংশে) ; **ইদম্, কৃৎস্নম্, জগৎ** (সমস্ত জগৎকে) ; **বিষ্টভ্যঃ** (পরিব্যাপ্ত করে) ; **স্থিতঃ** (স্থিত হয়ে আছি।)]

অথবা হে অর্জুন ! তোমার এত বহুবিধ কথা জানবার প্রয়োজন কী ? আমি নিজের একাংশ মাত্র দিয়ে জগৎকে পরিব্যাপ্ত করে অবস্থিত আছি অর্থাৎ আমার মাত্র কোনো একাংশেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত রয়েছে॥ ৪২ ॥

ব্যাখ্যা—'অথবা' এই অব্যয় পদ ব্যবহার করে ভগবান অর্জুনকে যেন এ কথাই বলছেন যে, তুমি যে প্রশ্ন করেছ, আমি সেই অনুযায়ী উত্তর দিয়েছি ; এবার আমি নিজে থেকে এক বিশেষ মহত্ত্বপূর্ণ কথা জানাচ্ছি।

'বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন'—হে অর্জুন ! তোমার এতসব কথা জানার প্রয়োজন কী ? আমি ঘোড়ার লাগাম এবং চাবুকসহ তোমার সারথীরূপে সামনে রয়েছি। আমাকে এখন অতি সাধারণ বলে মনে হলেও আমার শরীরেরই মাত্র এক অংশে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড, মহাসর্গ ও মহাপ্রলয়—দুটি অবস্থাতেই আমার মধ্যে অবস্থিত। সেইসব নিয়েই আমি তোমার সামনে রয়েছি এবং তোমার আদেশ পালন করছি ! সুতরাং আমি স্বয়ং যখন তোমার সামনে উপস্থিত রয়েছি তখন তোমার আর এত কথা জানার কী প্রয়োজন ?

'বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ'—সমগ্র জগৎকে আমি আমার একাংশের দ্বারা পরিব্যাপ্ত করে অবস্থিত আছি—এই কথার অর্থ হল যে ভগবানের যে কোনো একটি অংশেই অনন্ত জগৎ বিদ্যমান—**'রোম রোম প্রতি লাগে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড'** (শ্রীরামচরিতমানস ১।২০১)। কিন্তু সেই সৃষ্টি দ্বারা ভগবানের কোনো অংশ ভাগ আবদ্ধ হয়ে নেই অর্থাৎ ভগবানের কোনো অংশে ওইসব সৃষ্টি থাকলেও সেটির দ্বারা সেই অংশ ভরে যায়নি, সেখানেও খালি জায়গা পড়ে আছে। যেমন আমাদের বুদ্ধি প্রকৃতির একটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র অংশ। বুদ্ধিতে নানা ভাষা, বিদ্যা, কলা ইত্যাদির জ্ঞান আহরিত হলেও আমরা বলতে পারি না যে আমাদের বুদ্ধি-ভাণ্ডার তার দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, আর কিছু নতুন শেখার স্থান নেই ! তাৎপর্য হল বুদ্ধিতে নানা ভাষা

[১] মৈঁ অরু মোর তোর তৈঁ মায়া। জেহিঁ বস কীন্‌হে জীব নিকায়া॥ (শ্রীরামচরিতমানস, অরণ্যকাণ্ড ১৫।১)

ইত্যাদির জ্ঞান হলেও সেখানে খালি জায়গা থাকে এবং অনেক ভাষা ইত্যাদি শিখলেও বুদ্ধি-ভাণ্ডার ভরে যেতে পারে না। এইরূপ প্রকৃতির অতীত, অনন্ত, অসীম এবং অগাধ ভগবানের এক অংশ অনন্ত সৃষ্টি দ্বারা কী করে ভরে যেতে পারে ? তা তো বুদ্ধির থেকেও বিশেষ রকমে খালি থাকে।

পরিশিষ্ট-ভাব— এই শ্লোকটির অর্থ হল এই যে ভগবানই জগৎ-রূপে স্থিত। কারণ ব্যাপ্য এবং ব্যাপ্ত, সূক্ষ্ম এবং মহান, সৎ ও অসৎ—দুই-ই ভগবান। ভগবান অনন্ত, তাই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর কোনো এক অংশমাত্রে স্থিত **'একাংশেন স্থিতো জগৎ'**।

ভগবানের কথার উদ্দেশ্য হল তাঁর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যে—সবই তো আমিই ! আমার দিকে দৃষ্টি রাখলে আর কোনো বিভূতিই বাকি থাকে না। যখন সমস্ত বিভূতির আধার, আশ্রয়, প্রকাশক, বীজ (মূল কারণ) আমি তোমার সামনে উপস্থিত, তখন বিভূতিগুলি নিয়ে চিন্তা করার দরকার কী ?

※ ※ ※

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে বিভূতিযোগো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

এইরকম ওঁ, তৎ সৎ—এই ভগবানের নাম উচ্চারণের দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা এবং যোগশাস্ত্রময় শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতোপনিষদরূপ শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে 'বিভূতিযোগ' নামক দশম অধ্যায় সমাপ্ত হল ॥ ১০ ॥

যে যে স্থানে কোনো বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, সে সবই ভগবানের বিভূতি—এটি মেনে নিলে ভগবানের সঙ্গে যোগ (সম্বন্ধ) অনুভূত হয়। তাই দশম অধ্যায়ের নাম **'বিভূতিযোগ'**।

দশম অধ্যায়ের পদ, অক্ষর এবং উবাচ

১) এই অধ্যায়ের **'অথ দশমোঽধ্যায়ঃ'**-এর তিন, **'অর্জুন উবাচ'** ইত্যাদি পদগুলির ছয়, শ্লোকগুলির পাঁচশত ছাপ্পান্ন এবং পুষ্পিকার তেরোটি পদ আছে। এইভাবে সমস্ত পদের যোগসংখ্যা হল পাঁচশত আটাত্তর।

২) **'অথ দশমোঽধ্যায়ঃ'**-এর সাত, **'অর্জুন উবাচ'** ইত্যাদি পদগুলির কুড়িটি, শ্লোকগুলির এক হাজার তিনশত চুয়াল্লিশ এবং পুষ্পিকার ছেচল্লিশটি অক্ষর আছে। এইভাবে সমস্ত অক্ষরগুলির যোগসংখ্যা এক হাজার চারশত সতেরো। এই অধ্যায়ের সমস্ত শ্লোক বত্রিশ অক্ষর সংবলিত।

৩) এই অধ্যায়ে তিনটি উবাচ আছে—দুটি **'শ্রীভগবানুবাচ'** এবং একটি **'অর্জুন উবাচ'**।

দশম অধ্যায়ে প্রযুক্ত ছন্দ

এই অধ্যায়ের বিয়াল্লিশটি শ্লোকের মধ্যে দ্বিতীয় এবং পঁচিশতম শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে **'নগণ'** প্রযুক্ত হওয়ায় **'ন-বিপুলা'**, সপ্তম শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে এবং পঞ্চম ও বত্রিশতম শ্লোকের তৃতীয় পংক্তিতে **'মগণ'** প্রযুক্ত হওয়ায় **'ম-বিপুলা'** ; অষ্টম শ্লোকের প্রথম পংক্তি এবং ছাব্বিশতম শ্লোকের তৃতীয় পংক্তিতে **'ভগণ'** প্রযুক্ত হওয়ায় **'ভ-বিপুলা'** এবং ষষ্ঠ শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে **'রগণ'** প্রযুক্ত হওয়ায় **'র-বিপুলা'** সংজ্ঞাযুক্ত ছন্দ হয়েছে। বাকি ছত্রিশটি শ্লোক **'পথ্যাবক্ত্র'** অনুষ্টুপ ছন্দের লক্ষণ দ্বারা যুক্ত।

※ ※ ※

॥ ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

অথৈকাদশোঽধ্যায়ঃ

একাদশ অধ্যায়

অবতরণিকা

দশম অধ্যায়ের শেষে ভগবান অর্জুনকে বিশেষ কৃপা করে বলেছিলেন যে সমস্ত জগৎ অর্থাৎ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আমার এক অংশে মাত্র স্থিত আর সেই আমি তোমার সারথি হয়ে তোমার ঘোড়ার লাগাম ও চাবুক হাতে করে তোমারই আদেশ পালন করছি। সমস্ত বিভূতি এবং যোগের (প্রভাবের) মহান আধার আমিই তোমার সামনে বসে আছি, তাহলে তোমার আর এইসব বিভূতি পৃথক্‌ভাবে জানার কী প্রয়োজন ? এই কথা শুনে যখন অর্জুনের লক্ষ্য ভগবানের মহতী কৃপার দিকে গেল, তখন তিনি অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলে উঠলেন—

অর্জুন উবাচ

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যৎ ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম॥ ১ ॥

[মদনুগ্রহায় (আমার প্রতি কৃপাবশতঃ) ; ত্বয়া (আপনি) ; যৎ, পরমম্ (যে পরম) ; গুহ্যম্ (গোপনীয়) ; অধ্যাত্মসজ্ঞিতম্ (অধ্যাত্ম-তত্ত্ব) ; বচঃ, উক্তম্ (আমাকে জানালেন) ; তেন, মম (তাতে আমার) ; অয়ম্, মোহঃ (এই মোহ) ; বিগতঃ (দূরীভূত হয়েছে।)]

অর্জুন বললেন—আমার প্রতি কৃপাবশতঃ আপনি যে পরম গোপনীয় অধ্যাত্ম-তত্ত্ব আমাকে জানালেন, তাতে আমার মোহ বিদূরিত হয়েছে॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা—[ভগবানের কৃপা অনুভব করে অর্জুন ভাববিহ্বল হয়ে উঠেছিলেন এবং অত্যন্ত কৃতজ্ঞ চিত্তে বিহ্বল অবস্থায় নিয়মের খেয়াল না থাকায় তাঁর এই শ্লোকটি তেত্রিশ অক্ষরের হয়ে যায়, কিন্তু সমগ্র গীতায় অনুষ্টুপ ছন্দবিশিষ্ট সমস্ত শ্লোকগুলিই বত্রিশ অক্ষরবিশিষ্ট। তাৎপর্য এই যে, অত্যধিক প্রসন্নতায় নিয়মের কথা খেয়াল থাকে না।]

'মদনুগ্রহায়'—আমার ভজনাকারীদের আমি কৃপা করে স্বয়ং তাদের অজ্ঞানজনিত তমোনাশ করি (গীতা ১০।১১)—ভগবান কেবল কৃপাবশতঃ এই কথা বলছেন। অর্জুনের ওপর এই কথাটির খুব প্রভাব পড়েছিল, যার জন্য অর্জুন ভগবানের স্তুতি আরম্ভ করেন (১০।১২-১৫)। এইরকম স্তুতি তিনি এর আগে গীতায় কোনো স্থানে করেননি। তাঁকেই লক্ষ্য করে অর্জুন এখানে বলেছেন যে, কেবল আমাকে কৃপা করার জন্যই আপনি এই কথাগুলি বলেছেন[১]।

'পরমং গুহ্যম্'—ভগবান তাঁর প্রধান প্রধান বিভূতিগুলি বলার পর দশম অধ্যায়ের শেষে নিজে থেকেই

---

[১]প্রথম অধ্যায় থেকে এ পর্যন্ত ভগবান সবকিছুই কৃপাপরবশ হয়ে বলেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ভগবানের সকল ক্রিয়াই কৃপাপূর্ণ কিন্তু মানুষ তা বুঝতে পারে না। ভগবানের কৃপা বুঝতে পারলে ভগবদ্‌তত্ত্ব অনুভব করা অত্যন্ত সহজ এবং শীঘ্রই হয়ে থাকে। অর্জুনও যখন ভগবদ্‌কৃপা লক্ষ্য করেন, তখন তিনিও ভাববিহ্বল হয়ে বলে ওঠেন যে আপনার কৃপায় আমার মোহ দূর হয়েছে।

বলেছেন যে, আমি আমার একাংশে সমস্ত জগৎ, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডকে পরিব্যাপ্ত করে অবস্থিত আছি (১০।৪২)। অর্থাৎ ভগবান স্বয়ং নিজের পরিচয় দিয়ে জানাচ্ছেন যে তিনি কেমন। এই কথাটি অর্জুন পরম গোপনীয় বলে মনে করেন।

'অধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্'—দশম অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, যাঁরা আমার বিভূতি এবং যোগ তত্ত্বতঃ জানেন অর্থাৎ যাঁরা জানেন যে সমস্ত বিভূতির মূলে ভগবানই অবস্থিত এবং সেগুলি তাঁরই সামর্থ্য দ্বারা প্রকটিত হয় ও অন্তে তাঁতেই লীন হয়ে যায়, তাঁরা অবিচল ভক্তিযোগে যুক্ত হয়। অর্জুন এই কথাটি অধ্যাত্মসংজ্ঞিত বলে মনে করেন[১]।

'যৎ ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম'—সমস্ত জগৎ ভগবানের একাংশে স্থিত—অর্জুনের এই দিকে আগে খেয়াল ছিল না এবং তিনি এ কথাটি জানতেনও না, এটিই ছিল তাঁর মোহ। কিন্তু ভগবান যখন তাঁকে জানালেন যে সমস্ত জগৎ আমার একাংশে ব্যাপ্ত করে আমি তোমার সামনে উপস্থিত, তখন অর্জুনের চোখ খুলে গেল যে, ভগবান কি মহান ! তাঁর দেহের কোনো একটি অংশে অনন্ত বিশ্ব উৎপন্ন হয়, তাঁতে অবস্থান করে এবং তাঁর মধ্যেই লীন হয়ে যায় অথচ তিনি একইরূপে বিরাজ করেন। এই মোহান্ধতা দূর হতেই অর্জুনের মনে হল যে, আগে যে তিনি এটি জানতেন না—এ ছিল তাঁর মোহ[২]। তাই অর্জুন নিজের দৃষ্টিতে বলেছেন যে, ভগবান ! আমার এই মোহ সর্বতোভাবে দূর হল। কিন্তু অর্জুনের এরূপ বলা সত্ত্বেও ভগবান এটি (অর্জুনের মোহনাশ) মেনে নেননি। কারণ ভগবান পরে উনপঞ্চাশতম শ্লোকে বলেছেন যে, অর্জুন তোমার মধ্যে এই ব্যথা এবং মূঢ়ভাব (মোহ) থাকা উচিত নয়—**'মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবঃ'**।

পরিশিষ্ট-ভাব—অর্জুন বললেন যে, আপনি যে কথা আমাকে জানালেন, তা শুধু আমার প্রতি কৃপাবশতঃই বলেছেন, আপনার জ্ঞান প্রকাশ করার জন্য নয়। এতে কৃপা ভিন্ন অন্য কোনো কারণই থাকতে পারে না।

সকল প্রাণীর আদি, মধ্য এবং অন্তে আমিই বিরাজমান (১০।২০), আমি সকল প্রাণীর বীজস্বরূপ (১০।৩৯), ঐশ্বর্য, শোভা এবং বলযুক্ত প্রত্যেক বস্তুকে আমারই যোগের অংশ থেকে উৎপন্ন বলে জানবে (১০।৪০), আমি আমার একাংশে সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত করে আছি (১০।৪২)— এই সব কথা শুনে অর্জুনের মনে হল যে তাঁর মোহ দূরীভূত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর মোহ আংশিকভাবে দূরীভূত হয়েছে, সম্পূর্ণ নয়।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—মোহনাশ হল কীভাবে—পরবর্তী শ্লোকে সেটি বিস্তারিতভাবে জানাচ্ছেন।

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্॥ ২ ॥

[**হি, কমলপত্রাক্ষ** (কারণ, হে কমললোচন !) ; **ভূতানাম্** (সমস্ত প্রাণীর) ; **ভবাপ্যয়ৌ** (উৎপত্তি ও লয়) ; **ময়া, ত্বত্তঃ** (আমি আপনার কাছেই) ; **বিস্তরশঃ, শ্রুতৌ** (সবিস্তারে শুনেছি) ; **চ** (এবং) ; **অব্যয়ম্** (অবিনাশী) ; **মাহাত্ম্যম্, অপি** (মাহাত্ম্যও।)]

হে কমললোচন ! সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি ও লয় সম্পর্কে আমি আপনার কাছ থেকেই সবিস্তারে শুনেছি এবং অবিনাশী মাহাত্ম্যও জেনেছি॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা—'ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া'—ভগবান আগে বলেছিলেন যে—আমিই সমস্ত জগতের প্রভব এবং প্রলয়, আমি ছাড়া অন্য কোনো কারণ নেই (৭।৬-৭) ; সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব আমা হতেই উৎপন্ন হয় (৭।১২) ; প্রাণীদের নানাপ্রকার ভাব আমা হতেই হয়ে থাকে (১০।৪-৫) ; সকল প্রাণী আমা হতে উৎপন্ন এবং আমা হতেই প্রযত্নশীল হয় (১০।৮) ; প্রাণীদের আদি, মধ্য এবং অন্তে আমিই

[১]ভগবান এই পর্যন্ত ভক্তির যত কথা বলেছেন, তা সবই গোপনীয় অধ্যাত্ম উপদেশ।

[২]মোহ থাকাকালীন মোহ সম্বন্ধে জ্ঞান হয় না, মোহ নাশ হলেই মোহের জ্ঞান হয়, জ্ঞান হলে মোহ আর থাকে না।

বিরাজিত (১০।২০) ; এবং সবকিছু সৃষ্টিরই আদি, মধ্য ও অন্তে আমিই থাকি (১০।৩২)। সেইজন্যই অর্জুন এখানে বলেছেন যে, আমি আপনার কাছ থেকে সবিস্তারে প্রাণীদের উৎপত্তি ও লয়ের বর্ণনা শুনেছি। এর তাৎপর্য প্রাণীদের উৎপত্তি ও বিনাশের কথা শোনা নয়, এর তাৎপর্য হল এটি জানা যে সকল প্রাণীই আপনার থেকে উৎপন্ন হয়, আপনাতে অবস্থান করে এবং আপনাতেই লীন হয়ে যায়, অর্থাৎ সবকিছুই আপনি।

'মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্'—আপনি দশম অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে বলেছেন যে, যাঁরা আমার বিভূতি ও যোগ তত্ত্বতঃ জানেন, তাঁরা অবিচল ভক্তিযুক্ত হয়ে থাকেন। এইভাবে আপনার বিভূতি ও যোগকে তত্ত্বতঃ জানার মাহাত্ম্যও শুনেছি।

মাহাত্ম্যকে 'অব্যয়' বলার অর্থ হল এই যে, ভগবানের বিভূতি এবং যোগ তত্ত্বতঃ জানলে ভগবানে যে ভক্তি ও প্রেম হয়, ভগবানে যে অভিন্নতা হয়, তা সবই অব্যয়। কারণ ভগবান অব্যয়, নিত্য বলে তাঁর ভক্তি এবং প্রেমও অব্যয়।

পরিশিষ্ট-ভাব—এই শ্লোকে অর্জুন নিজের দৃষ্টিতে মোহ নষ্ট হওয়ার কারণ জানাচ্ছেন।

'মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্'—এইস্থানে 'অপি' পদটিতে এই অর্থ প্রকটিত যে অর্জুন ভগবানের বিনাশী ও অবিনাশী উভয় মাহাত্ম্যই শুনেছেন।

'ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্'—এ হল ভগবানের বিনাশী অর্থাৎ পরিবর্তনশীল মাহাত্ম্য। মানুষ ভগবানের সঙ্গে যে কোনো ভাবে সম্পর্ক স্থাপন করলে তা তার কল্যাণই করবে—এই হল ভগবানের অবিনাশী অর্থাৎ অপরিবর্তনশীল মাহাত্ম্য। তাৎপর্য হল যে সৎ-অসৎ সবই ভগবান—**'সদসচ্চাহম্'** (গীতা ৯।১৯)।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—পরবর্তী দুটি শ্লোকে অর্জুন বিরাটরূপ দর্শন করাবার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাচ্ছেন।

এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম॥ ৩ ॥

[**পুরুষোত্তম্** (হে পুরুষোত্তম !) ; **ত্বম্, আত্মানম্** (আপনি নিজেই নিজেকে) ; **যথা, আত্থ** (যেমন বললেন) ; **এতৎ, এবম্** (তা বাস্তবেও তেমনই) ; **পরমেশ্বর** (হে পরমেশ্বর !) ; **তে** (আপনার) ; **ঐশ্বরম্, রূপম্** (ঐশ্বরিক রূপ) ; **দ্রষ্টুম্, ইচ্ছামি** (দেখতে চাই।)]

হে পুরুষোত্তম ! আপনি নিজেই নিজেকে যেমন বললেন বাস্তবেও তা তেমনই। হে পরমেশ্বর ! আপনার ঐশ্বরিক রূপ আমি দেখতে চাই॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা—'পুরুষোত্তম'—এই সম্বোধনটি ব্যবহার করার অর্থ হল এই যে, হে ভগবন্ ! আমার দৃষ্টিতে এই জগতে আপনার চেয়ে কেউ উত্তম বা শ্রেষ্ঠ নেই অর্থাৎ আপনিই সর্বোত্তম। পরবর্তী পঞ্চদশ অধ্যায়েও ভগবান এই কথাই বলেছেন যে, আমি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর হতেও উত্তম ; তাই আমি শাস্ত্র ও বেদে পুরুষোত্তম নামে প্রসিদ্ধ (১৫।১৮)।

'এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং'—হে পুরুষোত্তম ! আপনি (সপ্তম অধ্যায় থেকে দশম অধ্যায় পর্যন্ত) আমাকে আপনার অলৌকিক প্রভাব, সামর্থ্য সম্বন্ধে যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা প্রকৃতই তদ্রূপ।

এই জগৎ আমা হতে উৎপন্ন হয়ে আমাতেই লীন হয় (৭।৬), আমা ভিন্ন এর কোনো কারণ নেই (৭।৭), সবকিছুই বাসুদেব (৭।১৯), ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম, অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞরূপে আমিই অবস্থিত (৭-২৯-৩০), অনন্যভক্তি দ্বারা প্রাপ্ত যে পরম তত্ত্ব, তা আমিই (৮।২২), আমা দ্বারাই এই সম্পূর্ণ চরাচর ব্যাপ্ত, কিন্তু আমি এই জগতে এবং জগৎ আমাতে নেই (৯।৪-৫), সৎ ও অসৎ-রূপে সবই আমি (৯।১৯), আমিই জগতের মূল কারণ এবং সমস্ত জগৎ আমা হতেই সত্তা লাভ করে (১০।৮), এই সমস্ত জগৎ আমার একাংশে অবস্থিত (১০।৪২) ইত্যাদি নিজের সম্বন্ধে আপনি যা কিছু

বলেছেন তা সবই যথার্থ।

'পরমেশ্বর'—ভগবানের কাছেই অর্জুন প্রথম শোনেন যে, 'আমিই সকল প্রাণীর এবং সমস্ত লোকের মহেশ্বর'—**'ভূতানামীশ্বরোঽপি'** (৪।৬) ; **'সর্বলোকমহেশ্বরম্'** (৫।২৯)। তাই অর্জুন ভগবানের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে এখানে তাঁকে 'পরমেশ্বর' বলে সম্বোধন করেছেন, যার অর্থ হল, হে ভগবন্! প্রকৃতপক্ষে আপনিই পরম ঈশ্বর এবং আপনিই সকল ঐশ্বর্যের হোতা।

'দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরম্'—অর্জুন বলেছেন যে, আমি আপনার কাছ থেকে আপনার মাহাত্ম্যসহ প্রভাবগুলি শুনেছি এবং সেগুলি সম্পর্কে আমার হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে। 'সমস্ত জগৎ আমার শরীরের একাংশে অবস্থিত'—একথা শুনে আমার মনে সেই রূপ দর্শন করার প্রবল বাসনা জেগেছে।

দ্বিতীয়তঃ আপনি এত বিশিষ্ট এবং মহৎ হয়েও আমাকে এত স্নেহ করেন এবং এত আত্মীয়তা রাখেন যে, আমি যেমন অনুরোধ করি, আপনি তা-ই রক্ষা করে থাকেন এবং যা-ই জিজ্ঞাসা করি, তারই উত্তর দেন। তাই আপনাকে কিছু বলতে বা জিজ্ঞাসা করতে কোনো দ্বিধা-বোধ না হওয়ায় আমার মনে আপনার ওই রূপ দর্শন করার ব্যাকুলতা জাগরিত হয়েছে, যে রূপের এক অংশে সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত !

দশম অধ্যায়ের ষোড়শ শ্লোকে অর্জুন বলেছিলেন যে, আপনার সমস্ত বিভূতি আমাকে বলুন, কিছু বাদ দেবেন না—**'বক্তুমর্হস্যশেষেণ'**, তখন ভগবান বিভূতিগুলির বর্ণনা করে উপক্রমে ও উপসংহারে বলেছেন যে, আমার বিভূতির কোনো অন্ত নেই (১০।১৯, ৪০)। সেইজন্য তিনি সংক্ষেপেই বিভূতিগুলির বর্ণনা করেছেন। কিন্তু অর্জুন এখানে যখন বললেন যে, আমি আপনার সেই একটি রূপ দেখবার ইচ্ছা করি **'দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপম্'**, তখন ভগবান জানিয়েছেন যে, 'তুমি আমার শত-সহস্র রূপ দর্শন করো' (১১।৫)। যেমন, জগতে যদি কেউ লোভবশতঃ বেশি চায়, তাহলে দাতার দেওয়ার ইচ্ছা কমে যায় এবং সে কম দেয়। তার উল্টো হল যে, যদি কেউ সঙ্কোচভরে অল্প কিছু চায়, তবে দাতা উদারভাবে তাকে বেশি কিছু প্রদান করে থাকে। তেমনই অর্জুন যখন বললেন যে আপনি আপনার সমস্ত বিভূতি আমাকে বলুন, তখন ভগবান জানালেন যে আমি 'আমার বিভূতিগুলি সংক্ষেপে জানাচ্ছি'। এই কথায় অর্জুন সতর্ক হলেন যে কী জানি আমার কথায় না আবার কোনো অনুচিত বাক্য এসে পড়ে। তাই অর্জুন এখানে সসঙ্কোচে বলেছেন যে, যদি আমাকে আপনার বিরাট-রূপ দর্শন করার যোগ্য মনে করেন, তাহলে দর্শন করিয়ে দিন। তাঁর এই সঙ্কোচ লক্ষ্য করে ভগবান উদারতার সঙ্গে বললেন যে, তুমি আমার শতসহস্র রূপ পরিদর্শন করো।

দ্বিতীয় ভাবটি এই যে অর্জুনের রথে অবস্থিত হয়ে ভগবান বলেছেন যে, 'তুমি আমার এই যে দেহ দেখছ, এর কোনো একটি অংশে সমস্ত জগৎ (যার অন্তর্গত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড) পরিব্যাপ্ত'। অর্থাৎ ভগবানের এই দেহেরই কোনো এক অংশে জগৎ অবস্থিত ! তাই সেই এক অংশে স্থিত রূপটিকে আমি দেখতে চাই—অর্জুনের **'রূপম্'** (রূপ বিশেষ) বলার এইটি অভিপ্রায় বলে মনে হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব—অর্জুনের কথার অর্থ হল যে, আমি আপনার কথা শুনে সব কিছু বুঝতে পেরেছি, আমার এখন আর কোনো সন্দেহ নেই। সব কিছুই যে আপনি—তা তো ঠিকই। এখন শুধুমাত্র আপনার ঐশ্বরিক রূপটি দেখার সাধ।

উপদেশ দু'প্রকারের হয়—এক, বলা আর দুই হল করে দেখানো। আগে দশম অধ্যায়ে ভগবান তাঁর সমগ্র রূপের বর্ণনা করে বলেছেন যে, আমি আমার একাংশে সমগ্র জগৎকে পরিব্যাপ্ত করে আছি। এখন এই অধ্যায়ে অর্জুন সেই রূপই তাঁকে প্রত্যক্ষ করাবার জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছেন।

* * *

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্॥ ৪ ॥

[**প্রভো, যদি, মন্যসে, ইতি** (হে প্রভু ! যদি মনে করেন) ; **ময়া, তৎ** (আমি, সেইরূপ) ; **দ্রষ্টুম্, শক্যম্** (দর্শনের

যোগ্য) ; ততঃ, যোগেশ্বরঃ (তাহলে হে যোগেশ্বর !) ; ত্বম্ (আপনি) ; আত্মানম্ (আপনার) ; অব্যয়ম্ (অক্ষয় অবিনাশী রূপ) ; মে, দর্শয় (আমাকে দেখান।)]

হে প্রভু ! আপনি যদি মনে করেন যে আমি সেই রূপ দর্শনের যোগ্য, তাহলে হে যোগেশ্বর ! আপনি আপনার সেই অক্ষয় অবিনাশী রূপ আমাকে দর্শন করান॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা—'প্রভো'—সর্বসমর্থকে বলা হয় 'প্রভু'। সেইজন্য মনে হয় এই সম্বোধনের ভাব হল এই যে, আপনি যদি আপনার বিরাটরূপ দর্শন করার যোগ্য বলে আমাকে মনে করেন তবে তাই করান ; নাহলে আপনি আমাকে আপনার সেই ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করার সামর্থ্য প্রদান করুন।

'মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি'—এর তাৎপর্য হল যদি আপনি সেই রূপ না দেখান, তবুও আমি মনে করব যে আপনি যেমন বলছেন আপনার সেই রূপ অবশ্যই আছে। কিন্তু আমি তা দেখার অধিকারী নই, পাত্র নই। এইরূপ অর্জুনের ভগবানের কথায় বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না, বরং দৃঢ়বিশ্বাস ছিল। সেইজন্যই তিনি বলেছিলেন যে আমাকে আপনার বিরাটরূপ দেখান।

'যোগেশ্বর'—'যোগেশ্বর' সম্বোধনের ভাব হল যে ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ধ্যানযোগ, হঠযোগ, রাজযোগ, লয়যোগ, মন্ত্রযোগ ইত্যাদি যতপ্রকার যোগ থাকা সম্ভব, আপনি সেসব যোগেরই অধীশ্বর, অতএব আপনি আপনার অলৌকিক যোগশক্তির দ্বারা সেই বিরাটরূপটি আমাকে দেখান।

অর্জুন দশম অধ্যায়ের সপ্তদশ শ্লোকে ভগবানকে **'যোগিন্'** বলে সম্বোধন করেছিলেন অর্থাৎ তিনি ভগবানকে যোগী বলেছিলেন। কিন্তু এখন তিনি ভগবানকে **'যোগেশ্বর'** বলেছেন অর্থাৎ তাঁকে সমস্ত যোগের অধীশ্বর বলেছেন। কারণ দশম অধ্যায়ের প্রারম্ভে ভগবানের সম্পর্কে অর্জুনের যে ধারণা ছিল, সেই ধারণার এখন অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

'ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্'—আপনার সেই স্বরূপ অক্ষয় ও অবিনাশী, যাতে অনন্ত জগৎ উৎপন্ন হয়, তাতেই অবস্থান করে এবং লীন হয়ে যায়। আপনি আপনার সেই অক্ষয় অবিনাশী রূপ আমাকে দেখান।

পরিশিষ্ট-ভাব—ভগবানের বিশ্বরূপকে **'অব্যয়'** (অবিনাশী) বলাতে প্রমাণিত হয় যে, সমগ্র জগৎ-সংসার ভগবানেরই স্বরূপ। অব্যয় হওয়ায় এটি নষ্ট হয় না (গীতা ১৫।১)। প্রকৃতপক্ষে পরিবর্তনশীল (অসৎ) এবং অপরিবর্তনশীল (সৎ)—এই দুইয়ে মিলেই হয় ভগবানের সমগ্ররূপ—**'সদসচ্চাহমর্জুন'**। নিজের আসক্তি এবং অজ্ঞতার জন্যই জড়ত্ব প্রতীত হয়ে থাকে।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে অর্জুনের বিনীত অনুরোধ শুনে ভগবান অর্জুনকে তাঁর বিশ্বরূপ দর্শন করবার জন্য আদেশ দিলেন।

শ্রীভগবানুবাচ

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ॥ ৫ ॥

[পার্থ (হে পার্থ !) ; অথ, মে (এবার আমার) ; নানাবিধানি, চ, নানাবর্ণাকৃতীনি (নানাপ্রকার বর্ণ ও নানা আকৃতি বিশিষ্ট) ; শতশঃ, সহস্রশঃ (শত সহস্র) ; দিব্যানি, রূপাণি (দিব্য রূপ) ; পশ্য (দর্শন করো।)]

ভগবান বললেন—হে পার্থ ! তুমি এবার আমার নানাপ্রকার বর্ণ ও আকৃতিবিশিষ্ট শত-সহস্র দিব্যরূপ দর্শন করো॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা—'পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ'—অর্জুনের সসঙ্কোচ প্রার্থনা শুনে ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং অর্জুনকে 'পার্থ' সম্বোধনে ভূষিত করে বললেন, তুমি আমার রূপগুলি দর্শন করো। রূপগুলিও

তিন-চারটি নয়, শত শত, হাজার-হাজার অর্থাৎ অগুণ্‌তি রূপ দর্শন করো। বিভূতির বিষয়ে ভগবান যেমন বলেছিলেন যে, আমার বিভূতির কোনো অন্ত নেই, তেমনই এখানে তাঁর অনন্ত রূপের কথা বলেছেন।

'নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ'—ভগবান সেই রূপগুলির বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা করে বলেছেন যে, সেগুলির সাজ নানা রকমের। তার রংও নানা প্রকার অর্থাৎ এক একজন এক এক রংয়ের, কেউ হলদে, কেউ বা লাল ইত্যাদি। তার মধ্যেও এক একটি রূপে বিভিন্ন প্রকারের রং। রূপগুলি নানা আকৃতিবিশিষ্ট অর্থাৎ কোনোটি ছোট, কোনোটি মোটা, কেউ লম্বা, কেউ চওড়া ইত্যাদি।

পৃথিবীর ছোট্ট একটি কণাও যেমন পৃথিবী, তেমনই ভগবানের অনন্ত, অপার বিশ্বরূপের একটি ক্ষুদ্র অংশ এই জগৎও সেই বিশ্বরূপ-ই। কিন্তু তা সকলের কাছে দিব্য বিশ্বরূপে প্রকটিত নয়, তা জগৎ-রূপে প্রকাশিত। কারণ মানুষের লক্ষ্য ভগবানের দিকে না গিয়ে বিনাশশীল জগতের দিকেই থাকে। যেমন অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করলেও ভগবান সকলের কাছে ভগবদ্রূপে প্রকটিত হন না (গীতা ৭।২৫) বরং মনুষ্যরূপেই প্রকটিত হয়ে থাকেন, তেমনই বিশ্বরূপভগবান সকলের কাছে জগৎসংসার-রূপেই প্রকটিত থাকেন অর্থাৎ সকলে এই বিশ্বরূপকে জগৎ রূপেই দেখে থাকে। কিন্তু এখানে ভগবান তাঁর দিব্য অবিনাশী বিশ্বরূপে প্রত্যক্ষ প্রকটিত হয়ে অর্জুনকে বলছেন যে তুমি আমার এই দিব্যরূপগুলি দর্শন করো।

পরিশিষ্ট-ভাব—অর্জুন নিজেকে অযোগ্য মেনে নিয়ে ভগবানের কাছে তাঁর ঐশ্বরিক রূপ দেখাবার জন্য প্রার্থনা জানান এবং তা ভগবানের ইচ্ছার ওপরই ছেড়ে দেন। কিন্তু ভগবান অর্জুনকে তাঁর শত-সহস্র প্রকার রূপ দেখবার কথা বলেছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, ভগবানের ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিলে সাধকের যে লাভ হয়, তা নিজের ইচ্ছা বা বুদ্ধিকে প্রাধান্য দিলে হওয়া সম্ভব নয়। কারণ মানুষ যত বিদ্যাই অর্জন করুক, কলাকৌশল শিখুক, যত শাস্ত্রবিদ্যা লাভ করুক না কেন তবুও তার বুদ্ধি তুচ্ছ ও সীমাবদ্ধই থেকে যায়। সাধকের মধ্যে যত সারল্য, কাতরতা, নিরভিমান থাকবে, ততই সে ভগবানকে জানতে সক্ষম হবে। নিজে অহংকার করলে সাধকের ভগবানকে জানায় বাধা আসে। সে নিজেকে যত বুদ্ধিমান মনে করবে, ততই সে নির্বোধ থাকবে। নিজেকে বুদ্ধিমান বলে মনে করলে সে বুদ্ধিরই দাস হয়ে যায়। সে যত নিরহঙ্কার হয়, বুদ্ধির বড়াই না রাখে, ততই সে বুদ্ধিমান হয়ে ওঠে।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকটিতে ভগবান তাঁর বিশ্বরূপে নানাপ্রকার বর্ণ এবং আকৃতি দেখার কথা বলেছেন। পরবর্তী শ্লোকে তিনি দেবতাদের দেখতে বলছেন।

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্বাণি পশ্যাশ্চর্যাণি ভারত॥ ৬ ॥

[ভারত (হে ভরতবংশোদ্ভব অর্জুন !) ; আদিত্যান্, বসূন্ (দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু) ; রুদ্রান্, অশ্বিনৌ (একাদশ রুদ্র, দুই অশ্বিনীকুমার) ; তথা, মরুতঃ (এবং উনপঞ্চাশজন মরুৎকে) ; পশ্য (এই দেহে অবলোকন করো) ; অদৃষ্টপূর্বাণি (এবং যা তুমি আগে কখনো দেখোনি) ; বহূনি, আশ্চর্যাণি (তেমন নানাবিধ আশ্চর্যজনক রূপও) ; পশ্য (দর্শন করো।)]

হে ভরতবংশোদ্ভব ! দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দুই অশ্বিনীকুমার এবং উনপঞ্চাশজন মরুৎকে অবলোকন করো এবং যা তুমি আগে কখনো দেখোনি, তেমন নানাবিধ আশ্চর্যজনক রূপও দর্শন করো॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা—'পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা'—দ্বাদশ আদিত্য হলেন—অদিতির পুত্র ধাতা, মিত্র, অর্যমা, শক্র, বরুণ, অংশ, ভগ, বিবস্বান, পূষা, সবিতা, ত্বষ্টা এবং বিষ্ণু (মহাভারত, আদিপর্ব ৬৫।১৫-১৬)।

আটজন বসু হলেন—ধর, ধ্রুব, সোম, অহঃ, অনিল, অনল, প্রত্যুষ এবং প্রভাস (মহাভারত, আদিপর্ব ৬৬।১৮)

একাদশ রুদ্র হলেন—হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক,

অপরাজিত, বৃষাকপি, শম্ভু, কপর্দী, রৈবত, মৃগব্যাধ, শর্ব এবং কপালী (হরিবংশ ১।৩।৫১-৫২)।

অশ্বিনীকুমার দু'ভাই হলেন দেবগণের চিকিৎসক।

উনপঞ্চাশ জন মরুৎ হলেন—সত্ত্বজ্যোতি, আদিত্য, সত্যজ্যোতি, তির্যগজ্যোতি, সজ্যোতি, জ্যোতিষ্মান্, হরিৎ, ঋৎজিৎ, সত্যজিৎ, সুষেণ, সেনজিৎ, সত্যমিত্র, অভিমিত্র, হরিমিত্র, কৃত, সত্য, ধ্রুব, ধর্তা, বিধর্তা, বিধারয়, ধ্বান্ত, ধুনি, উগ্র, ভীম, অভিযু, সাক্ষিপ, ঈদৃক্, অন্যাদৃক্, যাদৃক্, প্রতিকৃৎ, ঋক্, সমিতি, সংরম্ভ, ঈদৃক্ষ, পুরুষ, অন্যাদৃক্ষ, চেতস, সমিতা, সমিদৃক্ষ, প্রতিদৃক্ষ, মরুতি, সরত, দেব, দিশ, যজুঃ, অনুদৃক্, সাম, মানুষ এবং বিশ্ (বায়ুপুরাণ ৬৭।১২৩-১৩০)।—আমার বিরাটরূপের মধ্যে এদের সবাইকে অবলোকন করো।

দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র এবং দুজন অশ্বিনীকুমার—এই তেত্রিশ কোটি (তেত্রিশ প্রকারের) দেবতা হলেন সমস্ত দেবতাদের মধ্যে প্রধান। দেবতাগণের মধ্যে মরুদ্গণকেও ধরা হয়, কিন্তু উনপঞ্চাশ মরুদ্গণকে এই তেত্রিশ কোটি দেবতাদের থেকে আলাদা বলে মনে করা হয় ; কারণ এঁরা সকলেই দৈত্য থেকে দেবতায় পরিণত হয়েছেন। তাই ভগবানও এঁদের 'তথা' পদ দ্বারা পৃথক্ করে বলেছেন।

'বহূন্যদৃষ্টপূর্বাণি পশ্যাশ্চর্যাণি ভারত'—এই রূপগুলি তুমি আগে কখনো দেখনি, শোননি, চিন্তা করোনি এবং বুদ্ধি দ্বারা কল্পনাও করোনি। এই রূপগুলির দিকে তোমার কখনো লক্ষ্যও হয়নি। এরূপ বহুপ্রকার অদৃষ্টপূর্ব রূপ তুমি এখন প্রত্যক্ষ করো।

যে রূপ দর্শন করলেই আশ্চর্যান্বিত হতে হয়, আহা ! ভগবানের রূপ এমন ! সেই অদ্ভুত রূপ তুমি অবলোকন করো।

পরিশিষ্ট-ভাব—আগের শ্লোকটিতে ভগবান তাঁর বিরাট রূপের মধ্যে নানা প্রকারের নানা বর্ণের এবং নানা আকৃতিবিশিষ্ট রূপ দেখতে বলেছিলেন, এখন সেই কথাটিই এই শ্লোকে বিস্তারিতভাবে বলেছেন।

ভগবানের কথার অর্থ হল যে, সকল দেবতা আমারই স্বরূপ অর্থাৎ ওইসব দেবতা রূপে আমিই বিরাজমান। (গীতা ৯।২৩)।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—ভগবান বিশ্বরূপ দর্শন করার অনুমতি দেওয়ায় অর্জুনের প্রশ্ন হতে পারত যে, আমি এই রূপ কোথায় দেখব ? তাই ভগবান বলছেন—

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি॥ ৭ ॥

[**গুড়াকেশ** (হে নিদ্রাজয়ী অর্জুন !) ; **মম, ইহ, দেহে** (আমার এই দেহের) ; **একস্থম্** (একাংশে) ; **সচরাচরম্** (চরাচর-সহ) ; **কৃৎস্নম্, জগৎ** (সমগ্র জগৎ) ; **অদ্য, পশ্য** (এখনই পরিদর্শন করো) ; **অন্যৎ** (এছাড়া) ; **চ, যৎ** (যা কিছু) ; **দ্রষ্টুম্** (দেখতে) ; **ইচ্ছসি** (চাও ।)]

হে নিদ্রাজয়ী অর্জুন ! আমার এই দেহের একাংশে চরাচরসহ সমগ্র জগৎ এখনই পরিদর্শন করো। এছাড়া তুমি আর যা কিছু দেখতে চাও, তা-ও দেখে নাও॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা—'গুড়াকেশ'—নিদ্রাকে জয় করার জন্য অর্জুনকে বলা হয় 'গুড়াকেশ'। এখানে এই সম্বোধনের অর্থ হল যে, তুমি সজাগ থেকে সতর্কতাপূর্বক আমার বিশ্বরূপ অবলোকন করো।

'ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্, মম দেহে'—দশম অধ্যায়ের শেষে ভগবান বলেছেন যে, আমি সমস্ত জগৎ আমার একাংশে ব্যাপ্ত করে অবস্থান করছি। সেই কথা শুনেই অর্জুনের বিশ্বরূপ দেখার আগ্রহ হয়েছিল। তাই ভগবান বলেছেন যে, হাতে ঘোড়ার লাগাম এবং চাবুক নিয়ে বসে থাকা সত্ত্বেও আমার এই শরীরের এক অংশে চরাচরসহ সমগ্র জগৎকে অবলোকন করো। এক স্থানে দেখার অর্থ, তুমি যেখানেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে, সেখানেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড দেখতে পাবে। তুমি মানুষ-দেবতা-যক্ষ-রক্ষ-ভূত-পশু-পক্ষী ইত্যাদি জঙ্গম এবং বৃক্ষ-লতা-ঘাস-গুল্ম ইত্যাদি স্থাবর ও পৃথিবী, পর্বত, বালি ইত্যাদি জড়-সহ সমগ্র জগৎকে 'অদ্য'—

এখনই, এই মুহূর্তে দেখে নাও, এতে বিলম্ব কেন !

'যচ্চান্যদ্‌দ্রষ্টুমিচ্ছসি'—ভগবানের দেহে সবই বর্তমান অর্থাৎ যেগুলি অতীত হয়ে গেছে এবং যা ভবিষ্যতে হবে, সে সবই ভগবানের শরীরে বর্তমান। সেইজন্য ভগবান বলেছেন, তুমি আর যা কিছু দেখতে চাও, তা-ও দেখে নাও। অর্জুন আর কী দেখতে চাইছিলেন ? তাঁর মনে সন্দেহ ছিল যে যুদ্ধে তাঁদের জয় হবে, নাকি কৌরবদের (গীতা ২।৬) ? তাই ভগবান বলেছেন যে তা-ও তুমি আমার শরীরের কোনো এক অংশে দেখে নাও।

বিশেষ কথা

দশম অধ্যায়ে ভগবানের কাছ থেকে 'যে আমার বিভূতি ও যোগ তত্ত্বতঃ জানে, আমাতে তার ভক্তি দৃঢ়তর হয়' এই কথা শুনেই যেমন অর্জুন ভগবানের স্তুতি ও প্রার্থনা করে বিভূতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন, তেমনই ভগবানের কাছে 'আমার একাংশে সমগ্র জগৎ অবস্থিত' এই কথা শুনে অর্জুন বিশ্বরূপ দেখাবার জন্য অনুরোধ করলেন। ভগবান যদি **'অথবা'** বলে নিজে থেকে 'আমার কোনো একটি অংশে সমগ্র জগৎ অবস্থিত' এই কথা না জানাতেন তাহলে অর্জুন বিশ্বরূপ দেখার জন্য প্রার্থনাও জানাতেন না, আর প্রার্থনা না জানালে ভগবান বিশ্বরূপ দেখাতেনও না। এতেই প্রমাণিত হয় যে, ভগবান কৃপা করে নিজে থেকেই অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাতে চেয়েছিলেন।

গীতার প্রারম্ভেও এরূপ দেখা যায় যে, অর্জুন যখন ভগবানকে উভয়পক্ষের সেনার মধ্যে রথ স্থাপন করতে অনুরোধ করেছিলেন, তখন ভগবান রথটিকে পিতামহ ভীষ্ম এবং দ্রোণাচার্যের সামনে স্থাপন করে বলেছিলেন —'এই কুরুবংশীয়দের দেখো'—**'কুরূন্ পশ্য'** (১।২৫)। এতেই মনে হয় যে ভগবান কৃপা করে গীতা প্রকটিত করতে চাইছিলেন। কারণ তিনি এরূপ না করলে অর্জুন শোকমগ্ন হতেন না এবং গীতার উপদেশও আরম্ভ হত না। অর্থাৎ ভগবান নিজেই কৃপা করে গীতা প্রকট করার সুযোগ তৈরি করেছেন অর্থাৎ গীতার উপদেশ দিয়েছেন।

পরিশিষ্ট-ভাব—ভগবান তাঁর শরীরের একাংশে সমগ্র জগৎ দেখার নির্দেশ দিয়েছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হলেন সমগ্র এবং তাঁর এক অংশে সমগ্র জগৎ-সংসার অবস্থিত। **'রোম রোম প্রতি লাগে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড'** (শ্রীরামচরিতমানস, বালকাণ্ড ২০১)—এটি ভগবান প্রত্যক্ষ দেখাচ্ছেন ! সম্পূর্ণ জগৎ-সংসার যখন ভগবানের কোনো এক অংশে স্থিত, তখন ভগবান ছাড়া আর কী থাকে ? সব কিছু ভগবানই হন ! তাই ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে, তুমি যা কিছু দেখতে চাও, তা সবই তুমি আমার বিরাটরূপে দেখতে পাবে। অর্জুন যুদ্ধের পরিণাম দেখতে চাইছিলেন, যা তিনি বিরাটরূপেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন (গীতা ১১।২৬-২৭)।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—ভগবান তিনটি শ্লোকে চারবার 'পশ্য' পদ দ্বারা তাঁর রূপ দর্শনের জন্য বলেছেন। সেই অনুযায়ী অর্জুন চক্ষু বিস্ফারিত করে দেখতে চেয়েছিলেন ; কিন্তু অর্জুন কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না। তাই ভগবান এবার পরবর্তী শ্লোকে অর্জুনের দেখতে না পাওয়ার কারণ জানিয়ে তাঁকে দিব্যচক্ষু প্রদান করে বিশ্বরূপ দর্শন করার নির্দেশ দিচ্ছেন।

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥ ৮ ॥

[**তু, অনেন** (কিন্তু, তোমার) ; **স্বচক্ষুষা** (এই চক্ষুর সাহায্যে) ; **মাম্, দ্রষ্টুম্** (আমাকে দেখতে) ; **এব, ন, শক্যসে** (পাবে না) ; **তে** (তাই তোমাকে) ; **দিব্যম্, চক্ষুঃ** (দিব্য চক্ষু) ; **দদামি** (প্রদান করছি) ; **মে** (আমার) ; **ঐশ্বরম্** (ঐশ্বরিক) ; **যোগম্, পশ্য** (সামর্থ্য অবলোকন করো।)]

কিন্তু তুমি তোমার এই চক্ষুর সাহায্যে অর্থাৎ চর্মচক্ষু দ্বারা আমাকে দেখতে পাবে না। তাই তোমাকে আমি দিব্যচক্ষু প্রদান করছি, যার সাহায্যে তুমি আমার ঐশ্বরিক সামর্থ্য অবলোকন করো॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা—**'ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টমনেনৈব স্বচক্ষুষা'**—তোমার এই চর্মচক্ষুর শক্তি অতি স্বল্প এবং সীমিত। এই চর্মচক্ষু প্রাকৃত হওয়ায় কেবলমাত্র প্রাকৃতিক তুচ্ছ কার্যগুলিই দেখতে সক্ষম অর্থাৎ প্রাকৃত মানুষ-পশু-পাখি ইত্যাদির রূপ, তাদের বিভিন্নতা এবং রৌদ্র-ছায়া ইত্যাদি দেখতে সক্ষম। কিন্তু মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়ের অতীত আমার রূপ দেখতে সক্ষম নয়।

'দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্'—আমি তোমাকে এই অতীন্দ্রিয়, অলৌকিক রূপ দেখার জন্য দিব্যচক্ষু দিচ্ছি অর্থাৎ তোমার এই চর্মচক্ষুতেই দিব্যশক্তি প্রদান করছি, যার সাহায্যে তুমি অতীন্দ্রিয়, অলৌকিক পদার্থও দেখতে পাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার দিব্যতাও বুঝতে পারবে।

যদিও দিব্যতা বোঝা চোখের কাজ নয়, তা বুদ্ধির বিষয়, তবুও ভগবান বলেছেন যে, আমার প্রদত্ত দিব্যচক্ষু দ্বারা তুমি দিব্যতা অর্থাৎ আমার ঐশ্বরিক অলৌকিক প্রভাবও দেখতে পাবে। অর্থাৎ আমার বিরাটরূপ দেখার জন্য দিব্যচক্ষুর প্রয়োজন হয়।

'পশ্য' ক্রিয়াটির দুটি অর্থ হয়—বুদ্ধির (বিবেকের) সাহায্যে দেখা এবং চক্ষু দ্বারা দেখা। নবম অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে ভগবান **'পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্'** বলে বুদ্ধির সাহায্যে দেখার (জানার) কথা বলেছেন। এবার এখানে **'পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্'** বলে চক্ষুর দ্বারা দেখার কথা বলেছেন।

বিশেষ কথা

যেমন কোথাও 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা'—এমন লেখা আছে। যার বর্ণমালার সম্বন্ধে কোনোরূপ জ্ঞান নেই, সে এতে কয়েকটি কালো কালো দাগ দেখতে পাবে, যার অক্ষর পরিচয় আছে, সে কতগুলি অক্ষর দেখবে, কিন্তু যে লেখাপড়া জানে এবং যার গীতায় গভীর অধ্যবসায় আছে, সে 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা'—লেখা দেখলেই গীতার অধ্যায়, শ্লোক, ভাব ইত্যাদি দেখতে পায়। তেমনই ভগবান যখন অর্জুনকে দিব্যচক্ষু দিয়েছিলেন তখন তিনি ভগবানের সেই অলৌকিক বিশ্বরূপ এবং দিব্যতাও দেখতে পেয়েছিলেন—যা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। এ সবই হল ভগবদ্‌প্রদত্ত দিব্যচক্ষুর শক্তি।

এখন এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে, অর্জুন যখন চতুর্থ শ্লোকে বলেছিলেন যে, আমি যদি আপনার বিশ্বরূপ দেখার উপযুক্ত হই, তবে আপনি আপনার বিশ্বরূপ আমাকে দেখান, তখন তার উত্তরে ভগবানের এই অষ্টম শ্লোকটি বলা উচিত ছিল যে, তুমি তোমার চর্মচক্ষুর দ্বারা আমার বিশ্বরূপ দেখতে সক্ষম নও, তাই আমি তোমাকে দিব্যচক্ষু প্রদান করছি। কিন্তু তিনি ওইস্থানে একথা বলেননি, দিব্যচক্ষু প্রদান করার আগেই **'পশ্য'-'পশ্য'** বলে বারংবার দেখার জন্য বলছিলেন। অর্জুন যখন দেখতে পেলেন না, তখন না দেখার কারণ জানালেন এবং তারপর ভগবান অর্জুনকে দিব্যচক্ষু প্রদান করে তার সমাধান করলেন। ভগবান এত সব কেন করলেন?

ভগবানের কৃপা সাধকের ওপর কীভাবে ক্রমশঃ বিস্তারিত হয়, তা জানাবার জন্যই ভগবান এরূপ করেছিলেন। কারণ এই হল তাঁর স্বভাব। ভগবান অত্যন্ত কৃপালু, সেই কৃপাসাগরের কৃপার কোনো অন্ত নেই। নানারূপে বিভিন্নভাবে তিনি ভক্তদের কৃপা করে থাকেন। যেমন, প্রথমে তিনি অর্জুনকে উপদেশ দিলেন। উপদেশের সাহায্যে অর্জুনের অন্তরের ভাব পরিবর্তন করিয়ে তাঁকে নিজ বিভূতির জ্ঞান করালেন। সেই বিভূতিগুলি জানার ফলে অর্জুনের মধ্যে এক বিশেষ ভাব আসে যার ফলে তিনি ভগবানকে বলেন যে আপনার অমৃতময় বচন শুনে আমার তৃপ্তি হয়নি। বিভূতিগুলির বর্ণনা করে শেষকালে ভগবান বললেন যে এরূপ (নানাপ্রকার বিভূতিসম্পন্ন) অনন্তব্রহ্মাণ্ড আমার একাংশে অবস্থিত। যাঁর একাংশে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিরাজিত সেই বিরাটরূপ দর্শন করার ইচ্ছা তখন অর্জুনের মনে জাগ্রত হয় এবং ভগবানকে সেটি দেখাবার জন্য তিনি প্রার্থনা করেন। তখন ভগবান তাঁর বিরাটরূপ প্রদর্শন করে অর্জুনকে তা দেখার জন্য বারংবার নির্দেশ দিতে থাকেন। কিন্তু অর্জুন সেই বিরাটরূপ দেখতে সক্ষম হননি, তাই ভগবান তখন তাঁকে দিব্যচক্ষু প্রদান করলেন। এর সারকথা হল যে, ভগবানই বিরাটরূপ দেখার আকাঙ্ক্ষা অর্জুনের মধ্যে প্রকটিত করেন এবং আকাঙ্ক্ষা প্রকটিত করেই দেখার আগ্রহও জাগরিত করেন। অর্জুন তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করলে ভগবান বিরাটরূপ প্রদর্শন করেন, অর্জুন দেখতে সক্ষম না হওয়ায় তাঁকে দিব্যচক্ষু প্রদান করে তাঁর মনের ইচ্ছা পূরণ করেন। এর তাৎপর্য হল যে ভগবানের শরণ গ্রহণ করলে ভগবান শরণাগতের সমস্ত কাজ নিষ্পন্ন করার দায়িত্ব নিজের উপর নিয়ে থাকেন।

পরিশিষ্ট-ভাব—**'পশ্য'** ক্রিয়া পদটির দুটি অর্থ হয়—জানা এবং দেখা। নবম অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে **'পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্'** পদটির দ্বারা ভগবানকে জানার কথা হয়েছিল আর এখানে **'পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্'** পদটির দ্বারা ভগবানের বিরাট রূপ অবলোকন করার কথা বলা হয়েছে। তাৎপর্য হল যে, জানার বিষয়ও ভগবান আর দেখার বিষয়ও ভগবান। ভগবান ছাড়া কিছুই নেই। এই একাদশ অধ্যায়ে ভগবানের অলৌকিক রূপ দর্শনের বৈশিষ্ট্য আছে, বিচারের বৈশিষ্ট্য নেই। তাই গীতার উপসংহারে সঞ্জয় প্রথমতঃ 'কথোপকথনের' বৈশিষ্ট্য এবং দ্বিতীয়তঃ 'রূপের' বৈশিষ্ট্য জানিয়েছেন (১৮।৭৬-৭৭)।

ভগবানের বিরাটরূপ ছিল 'অলৌকিক', তাই তা দেখার জন্য ভগবান অর্জুনকে অলৌকিক চক্ষু প্রদান করেছিলেন।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—দিব্যচক্ষু লাভ করে অর্জুন ভগবানের কী রূপ দেখলেন, পরবর্তী শ্লোকে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে তাই জানাচ্ছেন।

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্॥ ৯ ॥

[**রাজন্** (হে রাজন্ !) ; **এবম্, উক্ত্বা** (এই কথা বলে) ; **ততঃ, মহাযোগেশ্বরঃ** (তখন মহাযোগেশ্বর) ; **হরিঃ** (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) ; **পার্থায়** (অর্জুনকে) ; **পরমম্** (পরম) ; **ঐশ্বরম্** (ঐশ্বরিক) ; **রূপম্** (রূপ) ; **দর্শয়ামাস** (দেখালেন।)[১]]

সঞ্জয় বললেন—হে রাজন্ ! এই কথা বলে মহাযোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ (হরি) অর্জুনকে তাঁর পরম ঐশ্বরিক রূপ দেখালেন[১]॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা—'এবমুক্ত্বা ততো........পরমং রূপমৈশ্বরম্'—আগের শ্লোকে ভগবান বলেছিলেন যে 'তুমি তোমার চর্মচক্ষুর দ্বারা আমাকে দেখতে পাবে না, তাই আমি তোমাকে দিব্যচক্ষু প্রদান করছি, তার সাহায্যে তুমি আমার ঐশ্বরিক যোগ দেখো,' সঞ্জয় এখানে সে কথারই ইঙ্গিত দিয়েছেন **'এবমুক্ত্বা'** পদটির সাহায্যে।

চতুর্থ শ্লোকে অর্জুন ভগবানকে **'যোগেশ্বর'** বলে উল্লেখ করেছিলেন, এখানে সঞ্জয় ভগবানকে **'মহাযোগেশ্বর'** নামে অভিহিত করেছেন। এর অর্থ হল ভগবান অর্জুনের অনুরোধে তাঁর বিশ্বরূপ অত্যন্ত বেশি করে প্রকটিত করেছিলেন। ভগবানের প্রতি ভক্তের যদি সামান্যতমও আসল রুচি বা আগ্রহ থাকে তাহলে ভগবান তাঁর নিজের অপার শক্তির সাহায্যে তাকে পূর্ণ করে দেন।

তৃতীয় শ্লোকে অর্জুন যে রূপের জন্য **'রূপমৈশ্বরম্'** পদটি ব্যবহার করেছিলেন, সঞ্জয় সেই রূপকেই এখানে **'পরমং রূপমৈশ্বরম্'** বলে অভিহিত করেছেন। এর অর্থ হল যে ভগবানের বিশ্বরূপ অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সমস্ত যোগের মহেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এমন বিলক্ষণ, অলৌকিক, অদ্ভুত, বিশ্বরূপ প্রদর্শন করেন যা দেখে ধৈর্যশীল, জিতেন্দ্রিয়, শূরবীর এবং ভগবানের থেকে প্রাপ্ত দিব্যচক্ষুসম্পন্ন অর্জুনকেও দুর্নিরীক্ষ্য বলতে হয়েছিল (১১।১৭) ও ভীত-সন্ত্রস্ত হতে হয়েছিল (১১।৪৫) এবং ভগবানকেও **'ব্যপেতভীঃ'** বলে অর্জুনকে আশ্বস্ত করতে হয়েছিল (১১।৪৯)।

পরিশিষ্ট-ভাব—ভগবানকে **'মহাযোগেশ্বর'** বলার অর্থ হল, ভগবান সমস্ত যোগের ঈশ্বর। এমন কোনো যোগ নেই, যার অধিপতি (প্রভু) ভগবান নন, অর্থাৎ সমস্ত যোগই ভগবানের অন্তর্গত।

অর্জুন তো ভগবানকে **'যোগেশ্বর'** বলেছেন (১১।৪), কিন্তু সঞ্জয় ভগবানকে **'মহাযোগেশ্বর'** বলে আখ্যাত করেছেন। কারণ সঞ্জয় আগে থেকেই ভগবানকে অর্জুনের থেকে বেশি জানতেন। সঞ্জয়ের থেকেও বেদব্যাস ভগবানকে আরো বেশি জানতেন। ব্যাসদেবের কৃপাতেই সঞ্জয় ভগবান কৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথন শুনেছিলেন—

[১]সঞ্জয়ও বেদব্যাসের কাছ থেকে দিব্যদৃষ্টি লাভ করেছিলেন, তাই অর্জুনের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করেছিলেন (গীতা ১৮।৭৭)। সঞ্জয় সেই বিশ্বরূপই এখন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে বর্ণনা করছেন।

'ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবানেতদ্গুহ্যমহং পরম্' (গীতা ১৮।৭৫)। বেদব্যাসের থেকেও ভগবানকে বেশি জানেন স্বয়ং ভগবানই (গীতা ১০।২, ১৫)।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—সঞ্জয় এখন পরবর্তী দুটি শ্লোকে ভগবানের পরম ঐশ্বরিক-রূপ বর্ণনা করছেন।

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্॥ ১০ ॥
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্বাশ্চর্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্॥ ১১ ॥

[**অনেকবক্ত্রনয়নম্** (যাঁর অনেক মুখ ও অসংখ্য চোখ) ; **অনেকাদ্ভুতদর্শনম্** (নানাপ্রকার অদ্ভুতদর্শন) ; **অনেকদিব্যাভরণম্** (নানা দিব্যালঙ্কার ভূষিত) ; **দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্** (হাতে উত্তোলিত অনেক দিব্য আয়ুধ) ; **দিব্যমাল্যাম্বরধরম্** (দিব্য মালা ও দিব্য বস্ত্র পরিহিত) ; **দিব্যগন্ধানুলেপনম্** (যাঁর ললাট ও দেহ চন্দনচর্চিত) ; **সর্বাশ্চর্যময়ম্** (এরূপ আশ্চর্যময়) ; **অনন্তম্** (অনন্ত রূপশালী) ; **বিশ্বতোমুখম্** (চতুর্মুখবিশিষ্ট) ; **দেবম্** (দেব।)]

যাঁর অনেক মুখ ও অসংখ্য চোখ, নানাপ্রকার অদ্ভুতদর্শন, নানা দিব্য অলংকার-বিশিষ্ট, হাতে উত্তোলিত অনেক দিব্য আয়ুধ এবং যাঁর গলায় অনেক দিব্য মালা, যিনি দিব্য বস্ত্র পরিহিত, যাঁর ললাট এবং দেহ চন্দনচর্চিত—এরূপ আশ্চর্যময়, অনন্তরূপশালী, চতুর্মুখবিশিষ্ট (নিজ দিব্যস্বরূপ) রূপ ভগবান প্রদর্শন করালেন॥ ১০-১১ ॥

ব্যাখ্যা—**'অনেকবক্ত্রনয়নম্'**—বিরাটরূপে প্রকাশিত ভগবানে যতগুলি মুখ ও চক্ষু দেখা যাচ্ছিল তা সবই দিব্য। বিরাটরূপে যত প্রাণী দেখা যাচ্ছিল তাদের মুখ, চক্ষু, নেত্র, হস্ত, পদ ইত্যাদি সর্বঅঙ্গই বিরাটরূপ ভগবানের। কারণ তিনিই বিরাটরূপে প্রকটিত হয়েছেন।

'অনেকাদ্ভুতদর্শনম্'—ভগবানের বিরাটরূপে যত রূপ, আকৃতি এবং বর্ণ দেখা যাচ্ছিল, তাদের যত প্রকার বিচিত্র সাজ-সজ্জা দেখা যাচ্ছিল, তা সবই অতি অদ্ভুত দেখাচ্ছিল।

'অনেকদিব্যাভরণম্'—বিরাটরূপে দেখতে পাওয়া নানারূপের হস্ত-পদ-কর্ণ এবং নাসিকা ও গলদেশে যত গহনাদি আভরণ ছিল তা সবই দিব্য, কারণ ভগবান স্বয়ংই গহনারূপে প্রকটিত হয়েছিলেন।

'দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্'—বিরাটরূপ ভগবান তাঁর হাতে চক্র-গদা-ধনুক-বাণ ইত্যাদি যে নানাপ্রকার আয়ুধ (অস্ত্র-শস্ত্র) ধারণ করেছিলেন, তা সবই দিব্য।

'দিব্যমাল্যাম্বরধরম্'—বিরাটরূপ ভগবান তাঁর গলায় ফুলের, সোনার, রূপোর, মুক্তোর, রত্নাদির যেসব মালা ধারণ করেছিলেন, সেগুলিও সব দিব্য। তিনি লাল-নীল-সাদা-সবুজ ইত্যাদি যে নানা রঙের বস্ত্রাদি পরিধান করেছিলেন, সেগুলিও দিব্য বস্ত্র।

'দিব্যগন্ধানুলেপনম্'—বিরাটরূপ ভগবান তাঁর ললাটে যে কস্তুরী, চন্দন, কুম্‌কুম ইত্যাদির তিলক ধারণ করেছিলেন এবং শরীরে যত সুগন্ধ লেপন করেছিলেন, তা সবই দিব্য।

'সর্বাশ্চর্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্'—এইপ্রকার আশ্চর্যময় অনন্তরূপশালী এবং চতুষ্পার্শে মুখবিশিষ্ট পরম ঐশ্বর্যময় নিজরূপ ভগবান অর্জুনকে দেখালেন।

যেমন, কোনো ব্যক্তি দূরে অবস্থান করেও মনে মনে যখন চিন্তা করে যে, 'আমি হরিদ্বারে আছি, গঙ্গায় স্নান করছি', তখন সে যেমন গঙ্গা-পুল, গঙ্গার ঘাটে দণ্ডায়মান নারী-পুরুষ ইত্যাদি দেখতে পায় এবং 'আমি গঙ্গায় স্নান করছি' এরূপ অনুভব করে। কিন্তু বাস্তবে সেখানে হরিদ্বারও নেই বা গঙ্গাও নেই, তার মনই সেইসব রূপ সৃষ্টি করে দেখে। তেমনই ভগবান নানারূপে, সেইসব রূপে পরিহিত গহনার রূপে, অনেক প্রকারের আয়ুধের রূপে, অনেক প্রকারের মালার রূপে, অনেক প্রকারের বস্ত্রের রূপে প্রকটিত হয়েছিলেন। তাই ভগবানের

বিরাটরূপেও সবকিছুই ছিল দিব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে যে, ব্রহ্মা যখন গোপবালক এবং গো-বৎস্যগুলিকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন তখন শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং গোপবালক ও গোবৎস্যগুলির রূপ ধারণ করে অবস্থান করছিলেন। গোপবালক এবং গো-বৎসই কেবল নয়, এমনকি তাদের হাতের পাচনবাড়ি, শিং, বস্ত্র, বাঁশি, ভূষণাদির রূপও ভগবান স্বয়ং ধারণ করেছিলেন (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।১৩।১৯)।

পরিশিষ্ট-ভাব—দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবানের অংশ জীবের সব কিছু আশ্চর্যময় বলে বলা হয়েছে (গীতা ২।২৯), এখানে ভগবানের সব কিছু আশ্চর্যময় বলে জানানো হয়েছে। ভগবানকে যতই দেখা যাক ততই তাঁর বৈশিষ্ট্য নজরে পড়তে থাকে, কেন-না তাঁর বৈশিষ্ট্য অপার, অনন্ত।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—সঞ্জয় এবার বিশ্বরূপের প্রকাশের বর্ণনা করছেন।

দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥ ১২ ॥

[**দিবি** (আকাশে) ; **যুগপৎ** (একই সঙ্গে) ; **সূর্যসহস্রস্য** (সহস্রাধিক সূর্য) ; **উত্থিতা, ভবেৎ** (উদিত হয়) ; **সা, ভাঃ** (সেইসবের প্রভা) ; **তস্য, মহাত্মনঃ** (এই মহাত্মার) ; **ভাসঃ** (প্রভার) ; **সদৃশী** (সমকক্ষ) ; **যদি, স্যাৎ** (হতে পারে না।)]

আকাশে যদি একই সঙ্গে সহস্র সূর্য উদিত হয়, তাহলেও সেই সবগুলির প্রভা একত্রে এই মহাত্মার (বিরাটরূপ পরমাত্মার) প্রভার সমকক্ষ হতে পারে না॥ ১২ ॥

ব্যাখ্যা—'দিবি সূর্যসহস্রস্য..........তস্য মহাত্মনঃ'—আকাশে উদিত সহস্র তারকারাজি মিলিত হয়েও যেমন এক চন্দ্রের প্রভার সমান হয় না এবং সহস্র চন্দ্র মিলিত হয়েও যেমন এক সূর্যের সমকক্ষ হয় না, তেমনই আকাশে সহস্র সূর্য উদিত হলেও তাদের সকলের মিলিত প্রভা বিশ্বরূপ ভগবানের প্রভার সমান হতে পারে না। তাৎপর্য হল যে সহস্র সূর্যের প্রভাও বিরাটরূপ ভগবানের প্রভার সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে না। এইরূপ সহস্র সূর্যের প্রভার সঙ্গে তুলনা করতেও যখন দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন সঞ্জয় দ্বিধা বোধ করছেন, তাহলে সেই প্রভা বিশ্বরূপ ভগবানের প্রভার উদাহরণ কীভাবে হতে পারে। কারণ সূর্যের প্রভা হল ভৌতিক আর বিশ্বরূপ ভগবানের প্রভা দিব্য। ভৌতিক প্রভা যত উজ্জ্বলই হোক তা দিব্য প্রভার তুলনায় তুচ্ছই হয়ে থাকে। ভৌতিক প্রভা ও দিব্য প্রভা ভিন্ন শ্রেণীর হওয়ায় এ দুটির মধ্যে কোনো তুলনাই চলে না। অঙ্গুলি-নির্দিষ্ট নির্দেশের ন্যায় ভৌতিক প্রকাশ দ্বারা দিব্য প্রকাশকে চিহ্নিত করা যেতে পারে, যেমন এইস্থানে সঞ্জয় সহস্র সূর্যের ভৌতিক প্রভা কল্পনা করে বিশ্বরূপ ভগবানের প্রভাকে (তেজকে) লক্ষ্য করিয়েছেন।

পরিশিষ্ট-ভাব—সহস্রাধিক সূর্যের প্রভা একত্র মিলিত হয়েও ভগবানের প্রভার সমকক্ষ হতে পারে না, কারণ সূর্যের প্রভা ভগবানের প্রভা থেকেই উৎসারিত (গীতা ১৫।১২)। সহস্র সহস্র সূর্যের প্রভাও যদি একত্র হয়, তবুও তা হল প্রাকৃতিক, কিন্তু ভগবানের প্রভা প্রাকৃতিক নয়, তা হল দিব্য।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকগুলিতে বিশ্বরূপ ভগবানের দিব্যরূপ, অবয়ব এবং প্রভার বর্ণনা করে সঞ্জয় এবার অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন করার কথা বলছেন।

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা॥ ১৩ ॥

[**তদা, পাণ্ডবঃ** (তখন অর্জুন) ; **দেবদেবস্য** (দেবাদিদেবের) ; **তত্র, শরীরে** (সেই দেহে) ; **একস্থম্** (একটি জায়গায়

স্থিত) ; অনেকধা (নানা ভাগে) ; প্রবিভক্তম্ (বিভক্ত) ; কৃৎস্নং, জগৎ (সমস্ত জগৎ) ; অপশ্যৎ (অবলোকন করলেন।)]

তখন অর্জুন দেবাদিদেবের দেহের কোনো একটি স্থানে স্থিত নানাভাগে বিভক্ত সমস্ত জগৎ অবলোকন করলেন॥ ১৩ ॥

ব্যাখ্যা—**'তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা'**—নানাভাগে বিভক্ত অর্থাৎ দেবতা, মানুষ, পশু-পক্ষী, পৃথিবী, সমুদ্র, আকাশ, নক্ষত্র ইত্যাদি বিভাগগুলির সঙ্গে (সংক্ষিপ্তভাবে নয়, বিস্তৃতভাবে) সমস্ত চরাচর জগৎ অর্জুন ভগবানের শরীরের একাংশে ভগবদ্প্রদত্ত দিব্যচক্ষুর সাহায্যে প্রত্যক্ষ করলেন। তাৎপর্য হল এই যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই মনুষ্যদেহের একাংশে চরাচর, স্থাবর-জঙ্গমসহ সমস্ত জগৎ অবস্থিত। সেই জগৎও নানা ব্রহ্মাণ্ডের রূপে, নানা দেবলোকের রূপে, নানা ব্যক্তি ও পদার্থের রূপে বিভক্ত ও বিস্তৃত—অর্জুন এইরূপ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করলেন[১]।

'অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা'—'তদা'র তাৎপর্য হল যখন ভগবান অর্জুনকে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করেন তাঁর বিশ্বরূপ দেখার জন্য, তখনই অর্জুন দেখতে পান। **'অপশ্য'** কথাটির অর্থ হল, ভগবান যেমন রূপ দেখান, অর্জুন ঠিক তেমনই দেখেন। সঞ্জয় প্রথমে যেমন ভগবানের রূপ বর্ণনা করেছিলেন, অর্জুনও সেই রূপই দেখেছিলেন।

মনুষ্যলোকের অপেক্ষা দেবলোক যেমন অতি বিশিষ্ট, তেমনই দেবলোকের থেকেও ভগবান অনন্ত গুণ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কারণ দেবলোকাদি সবই প্রাকৃত আর ভগবান প্রকৃতির অতীত। তাই ভগবানকে বলা হয়েছে **'দেবদেব'** অর্থাৎ দেবগণের দেবতা (প্রভু)।

পরিশিষ্ট-ভাব—অর্জুন ভগবানের শরীরের একাংশে জরায়ুজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, স্থাবর-জঙ্গম, নভচর-জলচর-স্থলচর, চুরাশী লক্ষ যোনি, চতুর্দশ ভুবন ইত্যাদি নানা বিভাগে বিভক্ত জগৎ অবলোকন করলেন। জগৎ অনন্ত হলেও তা ভগবানের দেহেরই একাংশে স্থিত (গীতা ১০।৪২)। অর্জুন ভগবানের দেহে যেখানেই দৃষ্টিপাত করেন, সেখানেই তিনি অনন্ত জগৎ দর্শন করেন।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—ভগবানের অলৌকিক বিশ্বরূপ দেখে অর্জুনের কী অবস্থা হল—পরবর্তী শ্লোকে সঞ্জয় তার বর্ণনা করছেন।

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত॥ ১৪ ॥

[ততঃ (ভগবানের বিশ্বরূপ দেখে) ; সঃ, ধনঞ্জয়ঃ (সেই অর্জুন) ; বিস্ময়াবিষ্টঃ (বিস্ময়াবিষ্ট হলেন) ; হৃষ্টরোমাঃ (সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হল) ; কৃতাঞ্জলিঃ (করজোড়ে) ; দেবম্ (বিশ্বরূপ-দেবকে) ; শিরসা (অবনত মস্তকে) ; প্রণম্য, অভাষত (প্রণাম করে বললেন।)]

ভগবানের বিশ্বরূপ দেখে ধনঞ্জয় বিস্ময়াবিষ্ট হলেন এবং তাঁর সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হল। তিনি করজোড়ে বিশ্বরূপ-দেবকে অবনত মস্তকে প্রণাম করে বললেন॥ ১৪ ॥

---

[১]শ্রীমদ্ভাগবতে আছে যে, মা যশোদা একবার কানাইয়ের ছোট্ট মুখবিবরে বিশ্বরূপ দর্শন করেন। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের একটি ব্রহ্মাণ্ড হল এই ভূমণ্ডল। সেই ভূমণ্ডলে ভারতবর্ষ, তাতে এক মথুরামণ্ডল, মথুরামণ্ডলে ব্রজমণ্ডল, ব্রজমণ্ডলে নন্দগাঁ, নন্দগাঁতে নন্দভবন আর সেই নন্দভবনে এক ছোট্ট শিশু কানাই দাঁড়িয়ে আছে। সেই কানাইকে তাঁর মা যশোদা ছড়ি নিয়ে তর্জন করছেন 'তুমি কেন মাটি খেয়েছ? তোমার হাঁ মুখ দেখাও!' কানাই তাঁর মুখ হাঁ-করে দেখালেন, যশোদা তখন তাঁর সেই ছোট্ট মুখবিবরে সম্পূর্ণ জগৎ—নন্দগাঁ, নন্দভবন নিজেকেও দেখতে পেলেন—'সহাত্মানম্' (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৮।৩৯)। অর্জুনও এইভাবে ভগবানের শরীরের একাংশে সম্পূর্ণ জগৎ অবলোকন করলেন।

ব্যাখ্যা—**'ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ'**—অর্জুন যা কখনো কল্পনাও করতে পারেননি, ভগবানের সেই অত্যাশ্চর্য বিশ্বরূপ দেখে বিস্ময়াবিষ্ট হলেন। ভগবান তাঁর ওপর কৃপাপরবশ হয়ে নিজে থেকেই আধ্যাত্মিক উপদেশ দিয়েছেন এবং এখন তাঁকে আবার তাঁর বিশ্বরূপ দেখাচ্ছেন—এই কথা ভেবে অর্জুন রোমাঞ্চিত হলেন।

'প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত'—ভগবানের এই বিশেষ কৃপার অনুভব করে অর্জুনের মনে হল যে, এর জন্য আমি কীভাবে কৃতজ্ঞতা জানাব ? আমার এমন কোনো বস্তু নেই, যা আমি এঁকে সমর্পণ করতে পারি। আমি কেবল অবনত মস্তকে প্রণামই করতে পারি অর্থাৎ নিজেকে সমর্পণ করতে পারি। তাই অর্জুন করজোড়ে অবনত মস্তকে ভগবানের সেই বিশ্বরূপের স্তুতি করতে লাগলেন।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—অর্জুন ভগবানের যে বিশ্বরূপ দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন, পরবর্তী তিনটি শ্লোকে তার বর্ণনা করে ভগবানের স্তুতি করছেন।

অর্জুন উবাচ

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমৃষীংশ্চ সর্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥ ১৫ ॥

[**দেব** (হে দেব !) ; **তব, দেহে** (আপনার দেহে) ; **সর্বান্, দেবান্, তথা** (সকল দেবতাকে এবং) ; **ভূতবিশেষসঙ্ঘান্** (প্রাণীদের বিশেষ সম্প্রদায়কে) ; **চ** (এবং) ; **কমলাসনস্থম্** (কমলাসনস্থ) ; **ব্রহ্মাণম্** (ব্রহ্মা) ; **ঈশম্** (মহাদেব) ; **সর্বান্, ঋষীন্** (সমস্ত ঋষিকুল) ; **চ** (এবং) ; **দিব্যান্, উরগান্** (সমস্ত দিব্য সর্পগুলিকে) ; **পশ্যামি** (দেখছি।)]

অর্জুন বললেন—হে দেব ! আমি আপনার দেহে সকল দেবতাকে, প্রাণীদের বিশেষ সম্প্রদায়গুলিকে, কমলাসনস্থ ব্রহ্মা, মহাদেব, সমস্ত ঋষিকুল এবং সমস্ত দিব্য সর্পগুলিকে দেখছি॥ ১৫ ॥

ব্যাখ্যা—**'পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্'**—ঈশ্বরপ্রদত্ত অর্জুনের দিব্যদৃষ্টি এত অনুপম ছিল যে, তিনি দেবলোক পর্যন্ত তো বটেই, পরিষ্কারভাবে ত্রিলোকও দেখতে পাচ্ছিলেন। ত্রিলোক ছাড়া তিনি আরও দেখতে পাচ্ছিলেন, ত্রিলোকের স্রষ্টা ব্রহ্মা, প্রতিপালক বিষ্ণু এবং সংহারক মহাদেবকে। তাই অর্জুন বর্ণনা করেছেন যে তিনি সকল দেবতাকে, প্রাণী-সমুদায়কে এবং ব্রহ্মা ও মহাদেবকেও দেখতে পাচ্ছেন।

'ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থম্'—অর্জুন বলেছেন যে, আমি কমলাসনে অবস্থিত ব্রহ্মাকে দেখতে পাচ্ছি—এতে প্রমাণিত হয় যে অর্জুন কমলের ডাঁটি এবং তার উদ্‌গম স্থান অর্থাৎ মূল আধার ভগবান বিষ্ণুকে (যিনি অনন্তশয্যায় শায়িত) দেখতে পাচ্ছেন। তাছাড়া মহাদেব, কৈলাস পর্বত এবং সেই পর্বতের ওপর তাঁর আবাসস্থ বটবৃক্ষও দেখতে পাচ্ছেন।

'ঋষীংশ্চ সর্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্'—পৃথিবীতে যত ঋষি আছেন তাঁদের এবং পাতালে স্থিত দিব্য সর্পাদিও তিনি দেখতে পাচ্ছেন।

এই শ্লোকে অর্জুনের কথায় প্রমাণিত হয় যে স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতাল—এই ত্রিলোক পৃথক্‌ভাবে নয়, বিভাগসহ একসঙ্গে একই স্থানে তিনি দেখছিলেন—**'প্রবিভক্তমনেকধা'** (গীতা ১১।১৩)। সেই ত্রিলোক থেকে তিনি ক্রমে ব্রহ্মলোক, কৈলাস এবং বৈকুণ্ঠলোক এবং সেইসব লোকের অধিকর্তাদেরও (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরকেও) দেখলেন। এ সবই দিব্যদৃষ্টির প্রভাব !

বিশেষ কথা

ভগবান যখন বলছিলেন যে, এই সম্পূর্ণ জগৎ আমার কোনো একাংশে অবস্থিত, অর্জুন তখন সেটি দেখবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। অর্জুনের অনুরোধে ভগবান বলেছেন যে, তুমি আমার শরীরে একাংশে স্থিত চরাচর জগৎ অবলোকন করো—**'ইহ একস্থং.......মম দেহে'** (১১।৭)। বেদব্যাসের দ্বারা দিব্যদৃষ্টিপ্রাপ্ত সঞ্জয়ও তাই বলেছেন যে, অর্জুন ভগবানের শরীরের একাংশে স্থিত সম্পূর্ণ জগৎ দেখেছিলেন—**'তত্র একস্থং........**

দেবদেবস্য শরীরে' (১১।১৩)। অর্জুন এখানে বলেছেন যে, আমি আপনার দেহে প্রাণী সমুদায়কে দেখছি **'তব দেব দেহে'**। এইরূপ ভগবান এবং সঞ্জয়ের বাক্যে **'একস্থম্'** (একস্থানে) পদটি উদ্ধৃত হয়েছে, কিন্তু অর্জুনের বাক্যে এই পদটি ব্যবহৃত হয়নি। তার কারণ হল যে অর্জুনের দৃষ্টি ভগবানের দেহের যে স্থানে পড়েছে, সেখানেই তিনি ভগবানের বিশ্বরূপ দেখছিলেন। তখন তাঁর দৃষ্টি সারথিরূপে উপবিষ্ট ভগবানের দিকে যায়নি। যে স্থানে অর্জুনের দৃষ্টি গিয়েছিল, সেখানেই তিনি অনন্ত জগৎ দেখতে পাচ্ছিলেন। সুতরাং তাঁর দৃষ্টি সেখানেই থমকে যায়। সেইজন্যই তিনি **'একস্থম্'** বলতে পারেননি। তাঁর পক্ষে **'একস্থম্'** বলা তখনই সম্ভব হত, যদি বিশ্বরূপ দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সারথিরূপে উপবিষ্ট ভগবানকেও দেখতে পেতেন। অর্জুন শুধু বিশ্বরূপই দেখেছিলেন, তাই তিনি বিশ্বরূপের বর্ণনাই করেছিলেন। এই বিশ্বরূপ তাঁর এত অপার মনে হয়েছিল যে, তার দেশ এবং কালের কোনো সীমা তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন না। তাৎপর্য হল এই যে, অর্জুনের দৃষ্টিতে বিশ্বরূপের যখন কোনো অন্ত ছিল না, তখন তাঁর দৃষ্টি সারথিরূপী ভগবানের দিকে কীভাবে যাবে ?

ভগবান তাঁর শরীরের একাংশে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন, সেইজন্য তিনি **'একস্থম্'** বলেছেন। সঞ্জয় সারথিরূপে অবস্থিত ভগবানকে এবং ভগবানের শরীরের একাংশে স্থিত বিশ্বরূপ দর্শন করছিলেন। তাই সঞ্জয় এখানে **'একস্থম্'** পদটি ব্যবহার করেছেন[১]।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, ভগবান এবং সঞ্জয়ের দৃষ্টিতে সেই একস্থান বলতে ঠিক কোন্ জায়গাটি বোঝাচ্ছে, যেখানে অর্জুন বিশ্বরূপ দর্শন করছিলেন ? তার উত্তর হল যে, ভগবানের শরীরের ঠিক কোন্ স্থানে অর্জুন বিশ্বরূপ দর্শন করেছিলেন তা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। কারণ তাঁর দেহের এক একটি রোমকূপে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিরাজমান[২]। ভগবানও সেই কথাই বলেছেন যে, আমার দেহের এক অংশে তুমি চর-অচর সমেত জগৎ অবলোকন করো (গীতা ১১।৭)। তাই অর্জুনের দৃষ্টি ভগবানের শরীরের যেখানে পড়েছিল, সেখানেই তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বরূপ দেখতে পাচ্ছিলেন।

পরিশিষ্ট-ভাব—অর্জুন ভগবানের বিরাটরূপের মধ্যে দেবতা, প্রাণী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ঋষি, নাগ—এইসব সমূহভাবে দেখলেন। তাৎপর্য হল এই যে, অর্জুন এই মরজগতে থেকেই দেবলোক, ব্রহ্মলোক, বৈকুণ্ঠ, কৈলাস, নাগলোক ইত্যাদি লোকগুলি অবলোকন করলেন। সুতরাং যা কিছু দেখা বা শোনা যায় তা সবই ভগবানের দেহের একাংশে স্থিত। ভগবান সাকার হন বা নিরাকার, অতিবৃহৎ হন বা অতিক্ষুদ্র, তাঁর অনন্তভাবের কোনো সীমা নেই। সমগ্র জগৎ-সংসার তাঁর থেকেই উৎপন্ন হয়, তাঁতেই অবস্থান করে আবার তাঁতেই লীন হয়ে যায়। কিন্তু ভগবান একইভাবে বিরাজ করেন।

※ ※ ※

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ॥ ১৬ ॥

[**বিশ্বেশ্বর** (হে বিশ্বেশ্বর !) ; **বিশ্বরূপ** (হে বিশ্বরূপ !) ; **ত্বাম্** (আপনাকে) ; **অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রম্** (বহু হাত, উদর, মুখ এবং নেত্রবিশিষ্ট) ; **সর্বতঃ** (সর্বদিকে) ; **অনন্তরূপম্, পশ্যামি** (অনন্ত রূপসম্পন্ন দেখছি) ; **তব** (আপনার) ; **আদিম্, মধ্যম্**

[১]ভগবান এবং সঞ্জয়ের বাক্যে 'একস্থম্' পদ ব্যবহার করায় মনে করা উচিত যে অর্জুনও ভগবানের দেহের এক স্থানেই সম্পূর্ণ বিশ্বরূপ দেখেছিলেন।

[২]ক) 'রোম রোম প্রতি লাগে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড' (শ্রীরামচরিতমানস ১।২০১)

খ) ক্বেদৃগ্বিধাবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্যাবাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বম্॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।১৪।১১)

আপনার এক একটি রোমকূপে অগুণতি ব্রহ্মাণ্ড সেইরূপ ওঠানামা করে যেরূপ জানালার ছিদ্রপথে প্রবেশকারী সূর্যের কিরণে ধুলোর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণাকে ওঠানামা করতে দেখা যায়।

(আদি বা মধ্য) ; পুনঃ, অন্তম্ (এবং অন্তও) ; ন, পশ্যামি (দেখতে পাচ্ছি না।)]

হে বিশ্বেশ্বর ! হে বিশ্বরূপ ! আপনাকে আমি বহু হাত, উদর, মুখ এবং নেত্রবিশিষ্ট ও সর্বদিকে অনন্ত রূপসম্পন্ন দেখছি। আমি আপনার আদি, মধ্য বা অন্ত কোথাও দেখতে পাচ্ছি না॥ ১৬ ॥

ব্যাখ্যা—**'বিশ্বেশ্বর', 'বিশ্বরূপ'**—এই দুটি সম্বোধনের অর্থ হল যে আমি যা কিছু দেখছি, তা সবই আপনি এবং বিশ্বের প্রভু ও অধীশ্বরও আপনি। জাগতিক মানুষের শরীর জড় হয়ে থাকে, তাতে থাকে চেতন শরীরী ; কিন্তু আপনার বিশ্বরূপে শরীর এবং শরীরী— এই দুটি ভাগ বর্জিত। বিশ্বরূপে দেহ এবং দেহী দুই-ই আপনি। তাই বিশ্বরূপের সবই চিন্ময় (চিৎময়)। তাৎপর্য হল যে, অর্জুন 'বিশ্বরূপ' সম্বোধন দ্বারা বলেছেন যে আপনিই দেহ এবং 'বিশ্বেশ্বর' সম্বোধন দ্বারা বলেছেন আপনিই দেহী (শরীরের মালিক)।

'অনেক বাহূদরবক্ত্রনেত্রম্'—আমি আপনার হাতের দিকে তাকিয়ে দেখলাম অনেক হাত, আপনার উদরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম অনেক উদর, আপনার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম অনেক মুখ এবং আপনার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম অনেক চোখ। তাৎপর্য হল আপনার হাত, পেট, মুখ এবং চোখের কোনো অন্ত নেই, এগুলি সবই অনন্ত।

'পশ্যামি ত্বাং সর্বতোঽনন্তরূপম্'—আপনি দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, পদার্থ ইত্যাদির রূপে চতুর্দিকে অনন্ত রূপে প্রতিভাত হচ্ছেন।

'নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিম্'—আপনার অন্ত কোথায়, তাও জানা নেই ; কোথায় আপনার মধ্য তারও ঠিকানা নেই আর আদি যে কোথায় তাও জানা নেই।

সর্বপ্রথম **'নান্তম্'** বলার অর্থ এই মনে হয় যে, যখন কেউ কিছু দেখে, তখন সর্বপ্রথম তার দৃষ্টি সেই বস্তুটির সীমার দিকে থাকে যে এটি কতদূর পর্যন্ত আছে ? যেমন, কোনো বই দেখলে সর্বপ্রথম নজর যায় তার আয়তনের দিকে, তেমনই ভগবানের বিশ্বরূপ দেখে অর্জুনের দৃষ্টি সর্বপ্রথম তার সীমার (অন্তের) দিকে গিয়েছিল। অর্জুন যখন তাঁর অন্ত খুঁজে পেলেন না, তখন তাঁর দৃষ্টি গেল মধ্যভাগে। পরে আদির (আরম্ভের) দিকে দৃষ্টি গেল, কিন্তু কোথাও তিনি সেই বিশ্বরূপের অন্ত, মধ্য এবং আদির খোঁজ পেলেন না। তাই এই শ্লোকে **'নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিম্'**—এই ক্রম দেওয়া হয়েছে।

পরিশিষ্ট-ভাব—এই শ্লোকে ভগবানের বিরাটরূপের অনন্তময়তার বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবানের একাংশেও অনন্তময়তা বিদ্যমান। যেমন কালিতে বিশ্বের সব লিপিই লেখা যায়, স্বর্ণ দ্বারা যে কোনো গহনাই তৈরি সম্ভব হয়। তেমনি ভগবানেও সব কিছুই বিদ্যমান। তাঁতে নেই, এমন কিছুই জগতে নেই।

❋ ❋ ❋

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্ দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্॥ ১৭ ॥

[**ত্বাম্** (আপনাকে) ; **কিরীটিনম্** (কিরীটি) ; **গদিনম্, চক্রিণম্** (গদা, চক্রধারী রূপে) ; **পশ্যামি** (দেখছি) ; **তেজোরাশিম্** (তেজঃপুঞ্জস্বরূপ) ; **সর্বতঃদীপ্তিমন্তম্** (সর্বদিক প্রকাশকারী) ; **দীপ্তানলার্কদ্যুতিম্** (দেদীপ্যমান অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় দীপ্তি সম্পন্ন) ; **দুর্নিরীক্ষ্যম্** (দুর্নিরীক্ষ্য) ; **চ, সমন্তাৎ, অপ্রমেয়ম্** (এবং সবদিক হতে অপ্রমেয় স্বরূপে দেখছি।)]

আমি আপনাকে কিরীটি (মুকুট), গদা, চক্র (এবং শঙ্খ ও পদ্ম)-ধারী রূপে দেখছি। আপনাকে তেজোরাশিযুক্ত সর্বদিক প্রকাশকারী, দেদীপ্যমান অগ্নি এবং সূর্যের ন্যায় দীপ্তিসম্পন্ন, দুর্নিরীক্ষ্য এবং সর্বদিক থেকে অপ্রমেয় স্বরূপে দেখছি॥ ১৭ ॥

ব্যাখ্যা—**'কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ'**—আপনাকে আমি কিরীটি, গদা, চক্রধারীরূপে দেখছি। এখানে **'চ'** পদটির দ্বারা শঙ্খ এবং পদ্মও ধরা উচিত। এতে মনে হয় অর্জুন বিশ্বরূপে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চতুর্ভুজ রূপও দেখেছিলেন।

'তেজোরাশিম্'—আপনি তেজঃপুঞ্জস্বরূপ, যেন সমস্ত

তেজ (অনন্ত তেজ) একত্রীকৃত হয়েছে! এর আগে সঞ্জয় বর্ণনা করেছেন যে, আকাশে যদি একই সঙ্গে হাজার হাজার সূর্য উদিত হয় তাহলেও তার তেজ (প্রভা) ভগবানের প্রভার সমকক্ষ হতে পারে না (১১।১২)। আপনি এমনই প্রভাসম্পন্ন।

'সর্বতো দীপ্তিমন্তম্'—আপনি স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ হওয়ায় চতুর্দিক প্রকাশিত করছেন।

'পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্ দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্'—অত্যন্ত প্রদীপ্ত অগ্নি এবং সূর্যের ন্যায় আপনার দেহকান্তি। যেমন সূর্যের সামনে চোখ ধাঁধিয়ে যায়, তেমনই আপনাকে দেখে আমার চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। তাই আপনাকে নিরীক্ষণ করা অত্যন্ত কঠিন। আপনাকে ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছি না।

[অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা হল যে, ভগবান অর্জুনকে দিব্যদৃষ্টি দেওয়া সত্ত্বেও ভগবানের দেদীপ্যমান রূপের জন্য অর্জুনও সম্পূর্ণরূপে বিশ্বরূপ দেখতে যেন সমর্থ নন।]

আপনি সর্বভাবেই অপ্রমেয় (অপরিমিত) অর্থাৎ আপনি কোনো সময়েই প্রমার (মাপের) মধ্যে সীমাবদ্ধ নন। তাই প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি ইত্যাদি কোনো প্রমাণই আপনার বিষয়ে জানাতে পারে না; কারণ 'প্রমা'-র যে শক্তি তা তো আপনারই।

পরিশিষ্ট-ভাব—'অপ্রয়েম্'—পরমাত্মার সগুণ-নির্গুণ, সাকার-নিরাকার সমগ্র রূপই অপ্রমেয় (অপরিমিত) এবং তাঁর অংশ জীবাত্মাও অপ্রমেয়—**'অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য'** (গীতা ২।১৮)। পরমাত্মা জ্ঞানের বিষয় নয়, কারণ তিনি জ্ঞানেরও জ্ঞাতা—**'বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্'** (গীতা ১৫।১৫)।

'দুর্নিরীক্ষ্যম্'— ভগবদপ্রদত্ত দিব্যদৃষ্টির সাহায্যেও অর্জুন ভগবানের সম্পূর্ণ বিরাটরূপ দর্শন করতে সক্ষম হননি। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ভগবদ্প্রদত্ত শক্তিতেও ভগবানকে সম্পূর্ণরূপে জানা সম্ভব হয় না। ভগবানও নিজেকে সম্পূর্ণভাবে জানেন না, যদি জানতেন, তাহলে আর অনন্ত হন কী করে?

※ ※ ※

সম্বন্ধ—পরবর্তী শ্লোকে অর্জুন এবার ভগবানের নির্গুণ-নিরাকার, সগুণ-নিরাকার এবং সগুণ-সাকার রূপ অবলোকন করে ভগবানের স্তুতি করছেন।

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে॥ ১৮ ॥

[**ত্বম্, বেদিতব্যম্** (আপনিই জ্ঞাতব্য); **পরমম্, অক্ষরম্** (পরম অক্ষর ব্রহ্ম); **ত্বম্, অস্য, বিশ্বস্য** (আপনি সমগ্র বিশ্বের); **পরম, নিধানম্** (পরম আশ্রয়); **ত্বম্** (আপনি); **শাশ্বতধর্মগোপ্তা** (সনাতন ধর্মের রক্ষক); **ত্বম্, অব্যয়ঃ** (আপনিই অবিনাশী); **সনাতনঃ** (সনাতন); **পুরুষঃ** (পুরুষ); **মে** (আমি); **মতঃ** (মনে করি।)]

আপনিই জ্ঞাতব্য পরম অক্ষর ব্রহ্ম, আপনি সমগ্র বিশ্বের পরম আশ্রয়, সনাতন ধর্মের রক্ষকও আপনি এবং আপনিই অবিনাশী সনাতন পুরুষ—এরূপ আমি মনে করি॥ ১৮ ॥

ব্যাখ্যা—'ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যম্'—বেদ, শাস্ত্র, পুরাণ, স্মৃতি, মহাপুরুষদের বাণী এবং তত্ত্বজ্ঞ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদের দ্বারা জ্ঞাতব্য যে পরমানন্দস্বরূপ অক্ষর ব্রহ্ম, যাকে নির্গুণ-নিরাকার বলা হয়, তা আপনিই।

'ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্'—যে জগৎ-সংসার দেখাশোনা এবং অনুভূতির মধ্যে আসে, সে সবেরই পরম আশ্রয় ও আধার আপনি। মহাপ্রলয়ে সমস্ত জগৎ কারণসহ আপনাতেই লীন হয় এবং মহাসর্গের সময় আপনার থেকেই তা আবার প্রকটিত হয়। এইরূপে আপনিই এই জগতের পরম নিধান। [এই পদটিতে অর্জুন ভগবানের সগুণ-নিরাকার রূপের বর্ণনা করে তাঁর স্তুতি করছেন।]

'ত্বং শাশ্বতধর্মগোপ্তা'—যখন ধর্মের হানি ও অধর্ম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তখন আপনিই অবতাররূপে এসে অধর্ম নাশ করে সনাতন ধর্মকে রক্ষা করেন। [এই পদটির দ্বারা অর্জুন সগুণ-সাকারের বর্ণনা করে

ভগবানের স্তুতি করছেন।]

'অব্যয়ঃ সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে'—অব্যয় অর্থাৎ অবিনাশী, সনাতন, অনাদি, চিরস্থায়ী উত্তম পুরুষ আপনিই—এরূপ আমি মনে করি।

পরিশিষ্ট-ভাব—এখানে **'ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যম্'** পদটিতে নির্গুণ-নিরাকারের কথা বলা হয়েছে, **'ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্'**এই পদটিতে সগুণ-নিরাকারের কথা বলা হয়েছে এবং **'ত্বং শাশ্বতধর্মগোপ্তা'** পদটিতে সগুণ-সাকারের কথা বলা হয়েছে। তাৎপর্য হল যে নির্গুণ-নিরাকার, সগুণ-নিরাকার এবং সগুণ-সাকার এই সব মিলিত হয়েই ভগবানের সমগ্ররূপ হয়ে থাকে, যা জানা হলে পরে আর কিছুই জানার বাকি থাকে না (গীতা ৭।২)। কেন-না তিনি ছাড়া দ্বিতীয় আর কোনো বস্তুই নেই।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শ্লোক পর্যন্ত বিস্ময়উদ্রেককারী দেবরূপের বর্ণনা করে পরবর্তী দুটি শ্লোকে অর্জুন সেই বিশ্বরূপের উগ্রতা, প্রভাব এবং সামর্থ্যের বর্ণনা করছেন।

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্যমনন্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্॥ ১৯ ॥

[**ত্বাম্** (আপনাকে) ; **অনাদিমধ্যান্তম্** (আদি, মধ্য এবং অন্তরহিত) ; **অনন্তবীর্যম্** (অনন্ত প্রভাবশালী) ; **অনন্তবাহুম্** (অসংখ্য বাহু) ; **শশিসূর্যনেত্রম্** (চন্দ্র, সূর্য নেত্র স্বরূপ) ; **দীপ্তহুতাশবক্ত্রম্** (জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় মুখবিশিষ্ট) ; **স্বতেজসা** (নিজের তেজে); **ইদম্, বিশ্বম্** (এই জগৎকে) ; **তপন্তম্, পশ্যামি** (সন্তপ্তকারীরূপে দেখছি।)]

আপনাকে আমি আদি, মধ্য ও অন্ত রহিত, অনন্ত প্রভাবশালী, অসংখ্য বাহু, চন্দ্র-সূর্য নেত্রস্বরূপ, প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় মুখমণ্ডলবিশিষ্ট এবং নিজের তেজে জগৎকে সন্তপ্তকারী রূপে দেখছি॥ ১৯ ॥

ব্যাখ্যা—'অনাদিমধ্যান্তম্'—আপনি আদি-মধ্য-অন্ত রহিত অর্থাৎ আপনার কোনো সীমা নেই।

ষোড়শ শ্লোকেও অর্জুন বলেছিলেন যে, আমি আপনার আদি, মধ্য ও অন্ত দেখতে পাচ্ছি না। ওইস্থানে **'দেশকৃত'** অনন্তের বর্ণনা করা হয়েছে, এখানে **'কালকৃত'** অনন্তের বর্ণনা করা হয়েছে। তাৎপর্য হল যে দেশকৃত, কালকৃত বা বস্তুকৃত, কোনো কিছুতেই আপনার কোনো সীমা নেই। দেশ-কাল ইত্যাদি সবই আপনার অন্তর্গত, তাহলে আপনি সেগুলির অন্তর্গত হবেন কী করে ? অর্থাৎ দেশ-কাল ইত্যাদি কোনো কিছুরই আধারে আপনাকে মাপা সম্ভব নয়।

'অনন্তবীর্যম্'—আপনাতে অপার পরাক্রম, সামর্থ্য, বল ও তেজ আছে। আপনি অনন্ত ও অসীম শক্তিসম্পন্ন।

'অনন্তবাহুম'[১]—আপনার অসংখ্য বাহু, যা গুণে শেষ করা যায় না, তাই আপনি অনন্তবাহু।

'শশিসূর্যনেত্রম্'—জগৎকে প্রকাশিত করে যে সূর্য এবং চন্দ্র, তা আপনার নেত্র-স্বরূপ, তাই জগৎমাত্রই আপনার থেকে প্রভা-প্রাপ্ত হয়েছে।

'দীপ্তহুতাশবক্ত্রম্'—যজ্ঞ বা হোম প্রভৃতিতে যা কিছু অগ্নিতে হবি করা হয়, সেসব গ্রহণকারী দেদীপ্যমান অগ্নি রূপ মুখগহ্বর আপনিই।

'স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্'—যে তেজের দ্বারা বিশ্ব সন্তপ্ত হয়, সেই তেজও আপনি। তাৎপর্য হল এই যে, যেসব ব্যক্তি, বস্তু, পরিস্থিতি প্রভৃতি থেকে প্রতিকূলতা সৃষ্টি হয়, সে সবের দ্বারা প্রাণীকুল সন্তপ্ত হচ্ছে। সন্তপ্তকারী এবং যারা সন্তাপিত হয়—উভয়ই সেই এক বিশ্বরূপেরই অঙ্গ।

[১]ষোড়শ শ্লোকে অর্জুন বলেছিলেন 'অনেকবাহুদরবক্ত্রনেত্রম্' এবং এখানেও বলেছেন 'অনন্তবাহুম্', এখানে তাই এটি পুনরুক্তির মতো মনে হয়। কিন্তু বাস্তবে তা নয় ; কারণ ওই স্থানে বিরাটরূপ ভগবানের দেবরূপ বর্ণিত হয়েছে এবং এখানে উগ্ররূপের বর্ণনা করা হয়েছে। উগ্ররূপের বর্ণনা হওয়াতেই এখানে 'বিশ্বমিদং তপন্তম্' এবং পরে (বিশতম) শ্লোকে 'দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতম্' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

পরিশিষ্ট-ভাব—এই শ্লোকের তাৎপর্য হল যে, ভগবান সর্বভাবেই অনন্ত। তাঁর প্রজ্বলন্ত তেজে তাপিত বিশ্ব ভগবানের থেকে পৃথক্ নয়। সুতরাং তপ্তকারী এবং তাপিত— উভয়ই ভগবানের স্বরূপ।

※ ※ ※

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্॥ ২০ ॥

[**মহাত্মন্** (হে মহাত্মন্!) ; **ইদম্, দ্যাবাপৃথিব্যোঃ** (এই স্বর্গ ও পৃথিবীর) ; **অন্তরম্, চ** (মধ্যবর্তী অন্তরীক্ষ এবং) ; **সর্বাঃ** (সকল) ; **দিশঃ** (দিক) ; **একেন, ত্বয়া, হি** (এক আপনার দ্বারাই) ; **ব্যাপ্তম্** (পরিপূর্ণ) ; **তব** (আপনার) ; **ইদম্** (এই) ; **অদ্ভুতম্** (অদ্ভুত) ; **উগ্রম্** (উগ্র) ; **রূপম্** (মূর্তি) ; **দৃষ্ট্বা** (দর্শন করে) ; **লোকত্রয়ম্** (ত্রিলোক) ; **প্রব্যথিতম্** (ব্যথিত হচ্ছে।)]

হে মহাত্মন্ ! এই স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী অন্তরীক্ষ এবং সকল দিক আপনার দ্বারাই পরিপূর্ণ। আপনার এই অদ্ভুত ও উগ্রমূর্তি দর্শন করে ত্রিলোক ব্যথিত (ব্যাকুল) হচ্ছে॥ ২০ ॥

ব্যাখ্যা—**'মহাত্মন্'**—এই সম্বোধনটির অর্থ হল যে, আপনার স্বরূপের ন্যায় আর কারও স্বরূপ হয়নি এবং কখনো হওয়া সম্ভব নয়। তাই আপনি 'মহাত্মা' বা মহৎ স্বরূপসম্পন্ন।

'দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ'—স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তীস্থানে যতটা শূন্যস্থান আছে তা সবই আপনার দ্বারা পরিপূর্ণ।

পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ ; পূর্ব ও উত্তরের মধ্যস্থলে 'ঈশান', উত্তর ও পশ্চিমের মধ্যস্থলে 'বায়ু' ; পশ্চিম-দক্ষিণের মধ্যস্থলে 'নৈর্ঋত' ; দক্ষিণ ও পূর্বের মধ্যস্থলে 'অগ্নি' কোণ এবং ঊর্ধ্ব ও অধ—এই দশদিক্ আপনার দ্বারাই পরিব্যাপ্ত অর্থাৎ এই সমস্ত দিক্‌গুলিতে একমাত্র আপনিই বিরাজমান।

'দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতম্'—উনিশ ও বিশতম শ্লোকের পূর্বার্ধে উগ্ররূপের বর্ণনা করে এবার বিশতম শ্লোকের উত্তরার্ধের থেকে বাইশতম শ্লোক পর্যন্ত অর্জুন উগ্ররূপের পরিণাম বর্ণনা করেছেন—আপনার এই অদ্ভুত, বিলক্ষণ, অলৌকিক, আশ্চর্যজনক, মহাদেদীপ্যমান এবং ভয়ংকর উগ্ররূপ দেখে স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতালে অবস্থিত সকল প্রাণী ব্যথিত হচ্ছে, ভয়ার্ত হচ্ছে।

এই শ্লোকটিতে যদিও স্বর্গ এবং পৃথিবীর কথাই বলা হয়েছে (দ্যাবাপৃথিব্যোঃ), তবুও অর্জুনের **'লোকত্রয়ম্'** কথা অনুসারে এখানে পাতালকেও ধরা যেতে পারে। কারণ অর্জুনের দৃষ্টি ভগবানের শরীরের কোনো একটি অংশের দিকে পড়েছিল আর সেখানে তিনি যা দেখেছিলেন, তা কখনো পাতালের দৃশ্য, কখনো ইহলোকের আবার কখনো বা স্বর্গলোকের। এইভাবে অর্জুনের সামনে সমস্ত দৃশ্যই একই সময়ে দৃশ্যমান হয়েছিল[১]।

এখানে একটি সংশয় দেখা দিতে পারে যে, বিরাটরূপ দেখে ত্রিলোক ব্যথিত হচ্ছে বলা হয়েছে, কিন্তু দিব্যদৃষ্টি ব্যতীত ত্রিলোকের প্রাণীর কীভাবে বিরাটরূপের দর্শন সম্ভব ? ভগবান তো শুধু অর্জুনকেই দিব্যদৃষ্টি প্রদান করেছিলেন, তাহলে ত্রিলোকের প্রাণী বিরাটরূপ দর্শন করার উপযুক্ত দিব্যদৃষ্টি কোথায় পেল ? প্রাকৃত চর্মচক্ষু দ্বারা বিরাটরূপের দর্শন সম্ভব নয়। তাহলে **'বিশ্বমিদং তপন্তম্'** (১১।১৯) এবং **'লোকত্রয়ংপ্রব্যথিতম্'** পদের দ্বারা

---

[১]অর্জুন যে স্বর্গ থেকে পাতাল এবং পাতাল থেকে স্বর্গ এই ক্রমে বিশ্বরূপ দর্শন করেছিলেন, তা নয়। তিনি ভগবদ্প্রদত্ত দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল সবই একসঙ্গে দেখেছিলেন এবং যেমন দেখেছিলেন, তেমনই বলেছিলেন—'হে দেব ! আমি আপনার দেহে দেবতাদের দেখতে পাচ্ছি, প্রাণীদের পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দেখতে পাচ্ছি, কমলাসনে ব্রহ্মাকে দেখছি, কৈলাসে বিরাজিত শঙ্করকে দেখছি, সমস্ত ঋষিকুলকে দেখছি, দিব্য সর্পকুলকে দেখছি' (১১।১৫), ইত্যাদি। অর্জুনের একথা বলতে সময় লাগলেও, এই সামগ্রিক দর্শনে পৃথক্ সময় লাগেনি। তাই তাঁর বলায় স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ইত্যাদির কোনো ক্রম নেই।

ত্রিলোকের প্রাণীদের বিরাটরূপ দেখে সন্তপ্ত ও ব্যথিত হওয়ার কথা অর্জুন কেন বললেন ?

তার উত্তর এই যে, সন্তপ্ত এবং ব্যথিত হওয়া ত্রিলোকের প্রাণী সেই বিরাটরূপেরই অন্তর্গত অর্থাৎ বিশ্বরূপেরই অঙ্গ। সঞ্জয় এবং ভগবান বিরাটরূপ একস্থানে দর্শন করার কথা (**'একস্থম্'**) বলেছেন, কিন্তু অর্জুন একস্থানে দেখার কথা বলেননি। কারণ বিরাটরূপ দেখার সময় ভগবানের শরীরের প্রতি অর্জুনের লক্ষ্য ছিল না, তাঁর দৃষ্টি সেই বিরাটরূপের দিকেই প্রসারিত ছিল। সারথীরূপী ভগবানের দেহের প্রতিই যখন অর্জুনের লক্ষ্য ছিল না, তখন সন্তপ্ত ও ব্যথিত এই লৌকিক জগতের দিকে অর্জুনের দৃষ্টি কীভাবে যেতে পারে ? এতে প্রমাণিত হয় যে, সন্তাপিত ও সন্তপ্তক এবং ব্যথিত হওয়া ও ব্যথা প্রদানকারী—এই চারটিই ওই বিরাটরূপের অঙ্গ। যদিও অর্জুনের মনে হয়েছিল যে বিরাটরূপ দেখে ত্রিলোক ব্যথিত ও ভয়ভীত, কিন্তু আসলে (বিরাটরূপের অন্তর্গত) ভীষণ সিংহ, বাঘ, সাপ ইত্যাদি জন্তু এবং সেই বিরাটরূপের অন্তর্গত ত্রিলোকের প্রাণী মৃত্যুর ভয়েই ভীত ও সন্ত্রস্ত হচ্ছিল।

মর্মার্থ

দেখা, শোনা ও বোঝার এই জগৎ ভগবানের দিব্য বিরাটরূপেরই এক ছোট্ট সংস্করণ। জগতে যে জড়ত্ব, পরিবর্তনশীলতা, অদিব্যতা দেখা যায়, তা প্রকৃতপক্ষে সেই দিব্য বিশ্বরূপেরই একটি ঝলক, এক লীলা। বিশ্বরূপের দিব্যতার স্বতন্ত্র সত্তা থাকে, কিন্তু জগতের যে অদিব্যতা তার পৃথক্ সত্তা থাকে না। অর্জুন দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে ভগবানের বিশ্বরূপ দেখেছিলেন, আর ভক্তগণ ভাবদৃষ্টিতে এই জগৎকে ভগবদ্স্বরূপ দেখে থাকেন—**'বাসুদেবঃ সর্বম্'**। তাৎপর্য হল এই যে বালকদের ছোটবেলায় কাঁকর, পাথরের প্রতি যে ভাব থাকে বড় হলে তাদের সেই ভাব থাকে না। বড় হলে কাঁকর-পাথর আর তাদের আকৃষ্ট করে না। তেমনই জগতে ভোগদৃষ্টি থাকলে জগতের প্রতি যে ভাব বিদ্যমান থাকে, ভোগদৃষ্টি দূর হলে আর সেই ভাব থাকে না।

যাদের ভোগদৃষ্টি থাকে, তাদের কাছে জগৎ সত্য বলে প্রতিভাত হয়। কিন্তু যাঁদের ভোগদৃষ্টি থাকে না, সেইরূপ মহাপুরুষদের কাছে জগৎ ভগবদ্স্বরূপে প্রতিভাত হয়; যেমন একজন নারীকেই বালক মা-রূপে, পিতা কন্যা-রূপে, পতি পত্নী-রূপে এবং ক্ষুধার্ত জন্তু খাদ্যরূপে দেখে, তেমনই এই জগৎকে চর্মচক্ষুতে সত্য, বিবেক-দৃষ্টিতে পরিবর্তনশীল, ভাব-দৃষ্টিতে ভগবদ্স্বরূপ এবং দিব্য-দৃষ্টিতে বিরাটরূপেরই একটি ক্ষুদ্র অংশ রূপে প্রতিভাত হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব—এই শ্লোকে উদ্ধৃত **'ত্বয়ৈকেন'** পদটির তাৎপর্য হল যে, অসংখ্য রূপের মধ্যে এক আপনিই বিরাজিত—**'বাসুদেবঃ সর্বম্'**। আপনার অগণন রূপ কেউ নির্ণয় করতে পারে না, কিন্তু তাতে একমাত্র আপনিই আছেন।

ভগবানের নানাপ্রকার অদ্ভুতভাব থাকে। তিনি দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, রূপ, জ্ঞান, যোগ ইত্যাদি সর্বভাবেই অনন্ত। আমরা যা দেখতে পাই না, শুনতে পারি না, জানতে পারি না, বুঝতে পারি না এবং যা আমাদের কল্পনাতেও আসে না, সেই সবই বিরাটরূপের অন্তর্গত।

* * *

সম্বন্ধ—এবার অর্জুনের দৃষ্টির সম্মুখে (বিরাটরূপে) স্বর্গাদি লোকের দৃশ্য উপস্থিত হওয়ায় তিনি পরবর্তী দুটি শ্লোকে তারই বর্ণনা করছেন।

অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ॥ ২১ ॥

[**অমী, হি, সুরসঙ্ঘাঃ** (ওই দেবসমুদায়) ; **ত্বাম্** (আপনাতেই) ; **বিশন্তি** (প্রবেশ করছেন) ; **কেচিৎ** (কেউ কেউ) ; **ভীতাঃ** (ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে) ; **প্রাঞ্জলয়ঃ** (কৃতাঞ্জলি হয়ে) ; **গৃণন্তি** (গুণকীর্তন করছেন) ; **মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ** (মহর্ষি ও সিদ্ধ মহাপুরুষগণ) ; **স্বস্তি** (কল্যাণ হোক ! মঙ্গল হোক !) ; **ইতি** (এরূপ) ; **পুষ্কলাভিঃ, স্তুতিভিঃ** (উত্তম স্তোত্র ও স্বস্তিবাক্য) ;

উক্ত্বা (বলে) ; ত্বাম্, স্তুবন্তি (আপনার স্তব করছেন।)]

ওই দেবসমুদায় আপনাতেই প্রবেশ করছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় কৃতাঞ্জলি হয়ে আপনার নাম ও গুণকীর্তন করছেন। মহর্ষি ও সিদ্ধমহাপুরুষগণ 'কল্যাণ হোক!' 'মঙ্গল হোক!' এইরূপ স্বস্তিবাক্য ও উত্তম স্তোত্রের দ্বারা আপনার স্তুতি করছেন॥ ২১ ॥

ব্যাখ্যা—'অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি'—অর্জুন যখন স্বর্গে গিয়েছিলেন সেইসময় তাঁর সঙ্গে যেসব দেবতার পরিচয় হয়েছিল, তাঁদের কথাই অর্জুন এখানে বলেছেন যে সেই দেবতাদেরই আপনার স্বরূপের মধ্যে প্রবিষ্ট হতে দেখছি। এঁরা আপনার থেকে উদ্ভূত হয়ে আপনাতেই অবস্থিত ছিলেন এবং আপনাতেই প্রবিষ্ট হচ্ছেন।

'কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি'—কিন্তু ওই দেবতাগণের মধ্যে যাঁদের আয়ু ফুরিয়ে যায়নি, এরূপ অজান দেবতা (অর্থাৎ কল্পের আরম্ভ থেকে কল্পের অন্ত পর্যন্ত যাঁরা দেবরূপে থাকেন—যাঁরা বিশ্বরূপের অন্তর্গত) নরসিংহ আদি ভীষণ রূপ দর্শন করে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে কৃতাঞ্জলি পুটে আপনার নাম-রূপ-লীলা-গুণকীর্তন করছেন।

যদিও দেবতারা নৃসিংহাদি অবতার দেখে এবং কালরূপ মৃত্যুতে ভীত হয়েই ভগবানের গুণকীর্তন করছেন (যা সমস্ত বিশ্বরূপেরই অঙ্গ) ; কিন্তু অর্জুনের মনে হয়েছিল যে এঁরা ভগবানের বিশ্বরূপ দেখেই যেন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে তাঁর স্তুতি করছেন।

'স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ'—সপ্তঋষি, মহর্ষিগণ, সনকাদি এবং দেবগণের দ্বারা স্বস্তি বচন (কল্যাণ হোক! মঙ্গল হোক!) উচ্চারিত হচ্ছিল এবং নানারূপ উত্তম স্তোত্রাদির দ্বারা আপনার স্তুতি করা হচ্ছিল।

পরিশিষ্ট-ভাব—দেবগণ, মহর্ষিগণ, সিদ্ধগণ সকলেই ভগবানের বিরাট রূপের অংশ। সুতরাং প্রবিষ্টকারী, ভীত, ভগবানের নামগুণ কীর্তনকারী ও স্তুতিকারক সবই ভগবান এবং যাতে প্রবিষ্ট হচ্ছেন, যাঁর থেকে ভীত সন্ত্রস্ত হচ্ছেন, যাঁর নাম এবং গুণাদি কীর্তন করছেন, যাঁর স্তুতি করছেন, তিনিও সেই ভগবান। ভগবানের সগুণ রূপের এই হল বৈশিষ্ট্য।

❋ ❋ ❋

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্বে॥ ২২ ॥

[**যে, রুদ্রাদিত্যাঃ** (যে একাদশরুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য) ; **বসবঃ, সাধ্যাঃ** (অষ্টবসু, দ্বাদশ সাধ্যগণ) ; **বিশ্বে, চ** (দশ বিশ্বদেব এবং) ; **অশ্বিনৌ, চ** (দুই অশ্বিনীকুমার ও) ; **মরুতঃ, চ** (উনপঞ্চাশ মরুৎ এবং) ; **উষ্মপাঃ, চ** (সপ্ত উষ্মপায়ী পিতৃ-দেবগণ) ; **গন্ধর্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘাঃ** (গন্ধর্ব, যক্ষ অসুর ও সিদ্ধগণ আছেন) ; **সর্বে, এব** (সকলেই) ; **বিস্মিতাঃ** (বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে) ; **ত্বাম্** (আপনাকে) ; **বীক্ষন্তে** (দর্শন করছেন।)]

যে একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, দ্বাদশ সাধ্যগণ, দশ বিশ্বদেব, দুই অশ্বিনীকুমার, উনপঞ্চাশ মরুৎ, সপ্ত উষ্মপায়ী পিতৃদেব এবং গন্ধর্ব, যক্ষ, অসুর ও সিদ্ধগণ আছেন, তাঁরা সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে আপনাকে দর্শন করছেন॥ ২২ ॥

ব্যাখ্যা—'রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ' একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, উনপঞ্চাশ মরুৎ—এঁদের সম্পর্কে এই অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকের ব্যাখ্যায় উল্লিখিত হয়েছে, অতএব এগুলিকে সেখানে দেখে নিতে হবে।

দ্বাদশ 'সাধ্য' হলেন মন, অনুমন্তা, প্রাণ, নর, যান, চিত্তি, হয়, নয়, হংস, নারায়ণ, প্রভব এবং বিভু (বায়ুপুরাণ ৬৬।১৫-১৬)।

ক্রতু, দক্ষ, শ্রব, সত্য, কাল, কাম, ধুনি, কুরুবান্, প্রভবান্ ও রোচমান—এই দশজন 'বিশ্বদেব' (বায়ুপুরাণ

৬৬।৩১-৩২)।

উষ্ণ অন্ন গ্রহণ করেন বলে পিতৃপুরুষগণকে বলা হয় 'উষ্মপা', এই সাত উষ্মপা হলেন কব্যবাহ, অনল, সোম, যম, অর্যমা, অগ্নিষ্বাত্ত এবং বর্হিষৎ (শিবপুরাণ, ধর্ম ৬৩।২)।

'গন্ধর্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘাঃ'—কশ্যপ-পত্নী মুনি ও প্রাধা এবং অরিষ্টা থেকে গন্ধর্বদের উৎপত্তি হয়েছে। রাগ-রাগনীতে এই গন্ধর্বেরা অত্যন্ত পারদর্শী। এঁরা সকলেই স্বর্গলোকের গায়ক।

কশ্যপ-পত্নী খসা থেকে যক্ষদের উৎপত্তি হয়েছে।

দেবগণের বিরোধী[১] দৈত্য, দানব, রাক্ষসদের অসুর বলা হয়। কপিল ইত্যাদিকে বলা হয় সিদ্ধ।

'বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্বে'—উপরিউক্ত দেবতা, পিতৃপুরুষ, গন্ধর্ব, যক্ষ প্রভৃতি সকলে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে আপনাকে দর্শন করছেন। এইসব দেবতাই আপনার বিরাটরূপের অঙ্গস্বরূপ।

পরিশিষ্ট-ভাব— রুদ্র, আদিত্য, বসু, সাধ্যগণ, বিশ্বদেব প্রভৃতি সকলেই এক ভগবানেরই অংশ বিশেষ। সুতরাং যিনি দর্শন করেন এবং যিনি দর্শন দেন সকলেই হলেন সেই এক পরমাত্মা।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—অর্জুন এবার পরবর্তী তিনটি শ্লোকে বিশ্বরূপের মহাবিকটরূপের বর্ণনা করে তার পরিণাম জানাচ্ছেন।

রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্॥ ২৩ ॥

[**মহাবাহো, তে** (হে মহাবাহো ! আপনার) ; **বহুবক্ত্রনেত্রম্** (বহু মুখ, চক্ষু) ; **বহুবাহূরুপাদম্** (বহু বাহু, ঊরু, পদ) ; **বহূদরম্** (বহু উদর) ; **বহুদংষ্ট্রাকরালম্** (বহু বিকট দন্ত মুখাকৃতিসম্পন্ন) ; **মহৎ, রূপম্** (বিশাল রূপ) ; **দৃষ্ট্বা** (দর্শন করে) ; **লোকাঃ** (সকল প্রাণী) ; **প্রব্যথিতাঃ** (ব্যথিত হচ্ছে) ; **তথা, অহম্** (এবং আমিও।)]

হে মহাবাহো ! আপনার বহু মুখ, চক্ষু, বাহু, উরু, পদ, উদর ও বহু বিকট দন্তমুখাকৃতিসম্পন্ন এই বিশাল রূপ দর্শন করে সকল প্রাণী ব্যথিত হচ্ছে এবং আমিও ব্যথিত হচ্ছি॥ ২৩ ॥

ব্যাখ্যা—[পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শ্লোক পর্যন্ত বিশ্বরূপে 'দেব' রূপের, উনিশ থেকে বাইশতম শ্লোক পর্যন্ত 'উগ্র'রূপের এবং তেইশ থেকে ত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত 'অত্যন্ত উগ্র' রূপের বর্ণনা করা হয়েছে।]

'বহুবক্ত্রনেত্রম্'—আপনার একটি মুখ অপরটির সঙ্গে মেলে না। কোনো মুখ সৌম্য, কোনোটি বিকট, কোনোটি ক্ষুদ্র, কোনোটি বিরাট। তেমনই আপনার চক্ষুগুলিও এক রকম নয়, কোনোটি সৌম্য, কোনোটি বিকট, কোনোটি ছোট, কোনোটি বড়, কোনোটি লম্বা, কোনোটি চওড়া, কোনোটি গোল, কোনোটি তির্যক ইত্যাদি।

'বহুবাহূরুপাদম্'—হাতগুলির গড়ন, বর্ণ, আকৃতি এবং তার কার্যাদিও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। উরুগুলি বিচিত্র প্রকারের এবং চরণও ভিন্ন ভিন্ন মাপের।

'বহূদরম্'—উদরগুলিও সব সমান নয়। কোনোটি বড়, কোনোটি ছোট, কোনোটি ভয়ানক ইত্যাদি।

'বহুদংষ্ট্রাকরালং দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্'—মুখগহ্বর বহু বিকট দন্তবিশিষ্ট। এরূপ ভয়ানক, বিকটরূপ দর্শন করে সকল প্রাণী ভীত ব্যাকুল হচ্ছে আর আমিও ব্যাকুল হচ্ছি।

এই শ্লোকের পূর্বে কথিত শ্লোকগুলিতেও বহু মুখ নেত্র ইত্যাদি এবং সমস্ত প্রাণীর ভীত ব্যাকুল হওয়ার কথা বলা হয়েছে। তাহলে অর্জুন একই কথা বারংবার কেন বলেছেন ? তার কারণ হল যে—

(১) বিশ্বরূপে অর্জুনের দৃষ্টিতে যে যে রূপ প্রতিভাত হয়েছিল, সেইগুলিতে তিনি নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য এবং দিব্যতা দেখছিলেন।

[১]এইস্থানে ব্যবহৃত 'অসুর' শব্দে 'নঞ্' সমাস উদ্ধৃত হয়েছে—'ন সুরা অসুরাঃ'। অতএব এখানে 'অসুর' শব্দটি দেবগণের বিরোধীর বাচক।

(২) বিশ্বরূপ দেখে অর্জুন এত হতবাক হয়েছিলেন, চমকিত হয়েছিলেন, ব্যথিত হয়েছিলেন যে তাঁর খেয়ালই ছিল না যে তিনি কী বলেছিলেন আর কী বলছেন।

(৩) অর্জুন তো প্রথমে তিন লোকের ব্যথিত হওয়ার কথা বলেছিলেন কিন্তু এখানে সমস্ত প্রাণীর সঙ্গে তাঁর নিজের ব্যথিত হওয়ার কথাও বলেছেন।

(৪) একটি কথার পুনরাবৃত্তিতে অর্জুনের ভীতসন্ত্রস্ত ও বিস্ময়চকিত হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়। জগতে দেখা যায় যে, যাদের ভীতি, হর্ষ, শোক ও বিস্ময় হয়ে থাকে তারা সাধারণতঃ একটি কথা বারংবার উচ্চারণ করতে থাকে ; যেমন কেউ সাপ দেখে ভীত-চকিত হয়ে বারবার 'সাপ ! সাপ' ! বলতে থাকে, অথবা অভ্যাগত বাড়ি এলে, লোকে 'আরে আসুন ! আসুন !' বলে থাকে, আবার কোনো প্রিয় ব্যক্তির মৃত্যু হলে শোকান্বিত হয়ে, 'আমি মরে গেলাম ! মরে গেলাম ! আমার সর্বনাশ হয়ে গেল। সর্বনাশ হয়ে গেল !' বলে থাকে। তেমনই এখানে বিশ্বরূপ দর্শন করে অর্জুন ভীত ও হর্ষিত হওয়ায় কিছু শব্দ ও বাক্য বারংবার উচ্চারণ করছিলেন। তিনি তা স্বীকারও করেছেন—**'অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে'** (১১।৪৫) । তাৎপর্য হল যে ভয়, হর্ষ, শোকাদিতে এক কথা বারবার বললে পুনরুক্তি দোষ হয় না।

পরিশিষ্ট-ভাব—দর্শন যিনি করেন এবং দর্শন যিনি করান, যিনি ব্যথা দেন এবং যিনি ব্যথিত হন এরূপ সকল প্রাণী এবং স্বয়ং অর্জুনও ভগবানের বিরাটরূপের অন্তর্গত।

※ ※ ※

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো॥ ২৪ ॥

[**হি, বিষ্ণো** (কারণ হে বিষ্ণু !) ; **দীপ্তম্, অনেকবর্ণম্** (দেদীপ্যমান বিচিত্রবর্ণ) ; **নভঃস্পৃশম্** (আকাশকে স্পর্শ করেছেন) ; **ব্যাত্তাননম্** (মুখ বিস্তারিত) ; **দীপ্তবিশালনেত্রম্** (চোখ প্রদীপ্ত ও বিশাল) ; **ত্বাম্** (আপনাকে) ; **দৃষ্ট্বা** (দেখে) ; **প্রব্যথিতান্তরাত্মা** (ভয়ভীত অন্তরে) ; **ধৃতিম্, চ** (ধৈর্য এবং) ; **শমম্, ন, বিন্দামি** (শান্তি পাচ্ছি না।)]

কেন-না হে বিষ্ণু ! আপনার দেদীপ্যমান বিচিত্রবর্ণ, আপনি আকাশকে স্পর্শ করছেন অর্থাৎ সর্বদিকেই বিস্তারিত আকৃতি, আপনার মুখ বিস্তারিত, আপনার চোখ প্রদীপ্ত এবং বিশাল। আপনার এই রূপ দেখে ভয়ভীত আমি ধৈর্য এবং শান্তি পাচ্ছি না॥ ২৪ ॥

ব্যাখ্যা—[কুড়িতম শ্লোকে অর্জুন বিশ্বরূপের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের বর্ণনা করছিলেন, এখানে শুধু দৈর্ঘ্যের বর্ণনা করেছেন।]

'বিষ্ণো'—আপনি সাক্ষাৎ ব্যাপ্তিস্বরূপ বিষ্ণু, যিনি পৃথিবীর ভার মোচন করার জন্য কৃষ্ণরূপে অবতরণ করেছেন।

'দীপ্তমনেকবর্ণম্'—আপনি সাদা, কালো, সবুজ, নীল, হলুদ ইত্যাদি নানা উজ্জ্বল বর্ণবিশিষ্ট।

'নভঃস্পৃশম্'—আপনার দীর্ঘ অবয়ব আকাশ স্পর্শ করছে।

বায়ুর গুণ হওয়ায় স্পর্শ বায়ুরই হয়ে থাকে, আকাশের নয়। তাহলে আকাশ স্পর্শ করার অর্থ কী ? যতদূর মানুষের দৃষ্টি প্রসারিত হয়, ততদূর সে আকাশই দেখতে পায়, তারপরে শুধুই অন্ধকার। কারণ দৃষ্টি যখন আর যেতে পারে না, ক্লান্ত হয়ে যেখান থেকে ফিরে আসে সেখানে অন্ধকার দেখায়। এই দৃষ্টিই হল আকাশকে স্পর্শ করা। এইভাবে অর্জুনের দৃষ্টি যতদূর যায় ততদূর তিনি ভগবানের বিরাটরূপ দেখতে পাচ্ছিলেন। এর তাৎপর্য হল যে, ভগবানের বিশ্বরূপ অসীম, যার কাছে দিব্যদৃষ্টির শক্তিও সীমিত।

'ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্'—ভয়ঙ্কর জন্তু যেমন কোনো জন্তুকে খাবার জন্য মুখব্যাদান করে, তেমনই যেন বিশ্বকে গ্রাস করার জন্য আপনি মুখব্যাদান করেছেন বলে মনে হচ্ছে।

আপনার চক্ষুও বিশাল ও উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হচ্ছে।

'দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা ধৃতিং ন বিন্দামি শমং চ

বিষ্ণো'—এইরূপে আপনাকে দেখে আমার অন্তর ব্যথিত হচ্ছে। আমি কোথাও ধৈর্য ও শান্তি পাচ্ছি না।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, অর্জুনের এক তো নিজস্ব ক্ষমতা আছে আর দ্বিতীয়তঃ, ভগবদ্প্রদত্ত সামর্থ্যও (দিব্যদৃষ্টি) আছে। তা সত্ত্বেও অর্জুন বিশ্বরূপ দেখে ভীত হয়েছিলেন, কিন্তু সঞ্জয় তা হননি। এর কারণ কী ? সন্ত মহাপুরুষদের কাছ থেকে জানা যায় যে, ভীষ্ম, বিদুর, সঞ্জয় এবং কুন্তী—এই চারজন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব বিশেষভাবে জানতেন। তাই সঞ্জয় প্রথম থেকেই ভগবানের তত্ত্ব, তাঁর প্রভাব জানতেন, কিন্তু অর্জুন ভগবানের তত্ত্ব ততটা জানতেন না। অর্জুনের বিমূঢ়ভাব (মোহ) তখনও সর্বতোভাবে দূরীভূত হয়নি (গীতা ১১।৪৯)। সেই বিমূঢ় ভাবের জন্যই অর্জুন সন্ত্রস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু সঞ্জয় ভগবানের তত্ত্ব বিশেষভাবে জানতেন বলেই তাঁর মধ্যে বিমূঢ়ভাব আসেনি ; তাই তিনি ভয়ভীত হননি।

উপরিউক্ত আলোচনায় এটি প্রমাণিত হয় যে, ভগবান এবং মহাপুরুষদের কৃপা বিশেষভাবে অযোগ্য ব্যক্তিদের ওপরই বর্ষিত হয়ে থাকে, কিন্তু বিশেষরূপে যোগ্য ব্যক্তিগণই এই কৃপাকে জানতে পারেন। যেমন, ছোট শিশুর প্রতি মায়ের স্নেহ অধিক পরিমাণে হয়ে থাকে, কিন্তু বয়োজ্যেষ্ঠ সন্তান মাকে যতটা জানে, ছোট শিশু ততটা জানতে সক্ষম হয় না। তেমনই ভালোমানুষ, সহজ-সরল ব্রজবাসী, গোপবালক, গোপ-গোপিনী এবং গাভী—এদের প্রতি ভগবান যত স্নেহশীল, জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদের প্রতি তাঁর তত স্নেহ থাকে না। কিন্তু এইসব জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ ভগবানকে গোপবালক প্রভৃতির চেয়ে বেশি জানেন। সঞ্জয় বিশ্বরূপ দর্শন করার জন্য প্রার্থনাও করেননি, তবুও তিনি বিশ্বরূপ দর্শন করলেন। কিন্তু বিশ্বরূপ দেখার জন্য ভগবানই অর্জুনকে অনুপ্রেরিত করেছিলেন এবং নিজের বিশ্বরূপও দেখিয়েছিলেন। কারণ অর্জুন ভগবদ্‌তত্ত্ব সঞ্জয়ের থেকে কম জানতেন এবং ভগবানের সঙ্গে তাঁর বন্ধুভাব ছিল। তাই তাঁর ওপর ভগবানের বিশেষ কৃপা ছিল, সেই কৃপাতেই শেষ পর্যন্ত অর্জুনের মোহ দূর হয়—**'নষ্টো মোহঃ ..... ত্বৎ প্রসাদাৎ'** (গীতা ১৮।৭৩)। এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে কৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তির মোহ শেষাবধি দূরীভূত হয়েই থাকে।

পরিশিষ্ট-ভাব— এখানে উদ্ধৃত **'নভস্পৃশম্'** পদটি বিরাটরূপের অনন্তের পরিচায়ক। অর্জুনের দৃষ্টি যতদূর প্রসারিত হয়, ততদূরই তিনি বিরাটরূপ দেখতে পান—**'সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ'** (কঠোপনিষদ্ ১।৩।১১) অর্থাৎ এই পরমাত্মা সকলের পরমগতি এবং পরমঅবধি।

※ ※ ※

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥ ২৫ ॥

[তে (আপনার) ; **কালানলসন্নিভানি** (প্রলয়াগ্নি সদৃশ প্রজ্বলিত) ; **চ, দংষ্ট্রাকরালানি** (এবং বিকট দন্ত সমন্বিত) ; **মুখানি, দৃষ্ট্বা** (মুখসকল দর্শন করে) ; **ন, দিশঃ** (না দিশার) ; **জানে, চ** (জ্ঞান হচ্ছে আর) ; **ন, শর্ম, এব** (না স্বস্তি) ; **লভে** (লাভ করছি) ; **দেবেশ** (হে দেবেশ !) ; **জগন্নিবাস** (হে জগন্নিবাস !) ; **প্রসীদ** (আপনি প্রসন্ন হন।)]

আপনার প্রলয়াগ্নি সদৃশ প্রজ্বলিত এবং বিকট দন্তসমন্বিত ভীষণ মুখ সকল দর্শন করে আমি দিশাহারা হয়েছি, আমি স্বস্তি লাভ করছি না। সেইজন্য হে দেবেশ ! হে জগন্নিবাস ! আপনি প্রসন্ন হন॥ ২৫ ॥

ব্যাখ্যা—'দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি'—মহাপ্রলয়ের কালে সমগ্র ত্রিভুবন ভস্মকারী যে অগ্নি প্রকটিত হয়, তাকে সংবর্তক বা কালাগ্নি বলা হয়। আপনার মুখ সেই কালাগ্নি-সদৃশ, যা ভীষণ দন্তসজ্জিত হওয়ায় অত্যন্ত বিকটরূপে প্রতিভাত হচ্ছে। সেটি দেখামাত্রই আমি ভীতসন্ত্রস্ত হয়েছি। তার কার্য দেখলে তো তার সামনে কেউ দাঁড়াতেই পারবে না, অর্থাৎ টিঁকে থাকা অসম্ভব ব্যাপার !

'দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম'—এই বিকট মুখ দর্শন করে আমি দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়েছি। এর তাৎপর্য হল দিশার জ্ঞান হয় সূর্যের উদয় ও অস্ত থেকে। কিন্তু সেই সূর্য এখন আপনার নেত্র-স্থানে বিরাজিত অর্থাৎ তা এখন আপনার বিরাটরূপের অন্তর্গত হয়ে রয়েছে। তাছাড়া আপনার চতুর্দিকে মহাপ্রজ্বলিত অগ্নিশিখা দেখা যাচ্ছে (১১।১২), যার আদি-অন্ত নেই। তাই আমার দিশার জ্ঞান হচ্ছে না আর ওই বিকট মুখ দর্শন করে ভীত হওয়ায় আমি কোনোরকমেই ধৈর্য ও স্বস্তি পাচ্ছি না।

'প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস'—আপনি সমস্ত দেবতার অধীশ্বর এবং সমগ্র জগৎ আপনাতেই অবস্থান করছে। তাই যে কোনো দেবতা, মানুষ ভীত হলে আপনাকেই তো ডাকে। আপনি ছাড়া আর কাকেই বা ডাকবে ? আর শুনবেই বা কে ? তাই আমিও আপনাকে ডেকে বলছি, হে দেবেশ ! হে জগন্নিবাস ! আপনি প্রসন্ন হোন।

ভগবানের বিকটরূপ দর্শন করে অর্জুনের মনে হয়েছিল যে ভগবান যেন অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়েছেন। সেইজন্যই ভীতসন্ত্রস্ত অর্জুন ভগবানের কাছে তাঁকে প্রসন্ন হবার জন্য প্রার্থনা জানিয়েছেন।

পরিশিষ্ট-ভাব— ভগবান প্রসন্ন হয়েই অর্জুনকে তাঁর বিরাটরূপ দর্শন করিয়েছিলেন (গীতা ১১।৪৭), কিন্তু তাঁর রূপের উগ্রভাব দর্শন করে অর্জুনের ভ্রম হয়েছিল যে, ভগবান বোধহয় তাঁর ওপরে প্রসন্ন নন। তাই তিনি ভগবানকে প্রসন্ন হতে অনুরোধ জানাচ্ছেন।

* * *

সম্বন্ধ—পরবর্তী দুটি শ্লোকে অর্জুন প্রধান প্রধান যোদ্ধাদের বিরাটরূপের মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ার বর্ণনা করছেন।

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ সর্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ॥ ২৬ ॥
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ॥ ২৭ ॥

[**অস্মদীয়ৈঃ** (আমাদের পক্ষের) ; **যোধমুখ্যৈঃ, সহ** (প্রধান যোদ্ধাগণ সহ) ; **ভীষ্মঃ, দ্রোণঃ, তথা** (ভীষ্ম, দ্রোণ এবং) ; **অসৌ, সূতপুত্রঃ, অপি** (কর্ণও) ; **ত্বাম্** (আপনার মধ্যে) ; **অবনিপালসঙ্ঘৈঃ, সহ** (রাজন্যবর্গ সহ) ; **ধৃতরাষ্ট্রস্য** (ধৃতরাষ্ট্রের) ; **অমী, এব, সর্বে** (সকল) ; **পুত্রাঃ, তে** (পুত্রগণও আপনার) ; **দংষ্ট্রাকরালানি, ভয়ানকানি** (দন্তবিশিষ্ট ভয়ঙ্কর) ; **বক্ত্রানি** (মুখবিবরে) ; **ত্বরমাণাঃ, বিশন্তি** (সবেগে প্রবেশ করছেন) ; **কেচিৎ, চূর্ণিতৈঃ, উত্তমাঙ্গৈঃ** (কেউ কেউ চূর্ণ-বিচূর্ণ মস্তকসহ) ; **দশনান্তরেষু** (আপনার দন্তের মধ্যে) ; **বিলগ্নাঃ, সন্দৃশ্যন্তে** (সংলগ্ন রয়েছে।)]

আমাদের পক্ষের প্রধান যোদ্ধাগণসহ ভীষ্ম, দ্রোণ এবং কর্ণও আপনার মধ্যে প্রবেশ করছেন। রাজন্যবর্গসহ ধৃতরাষ্ট্রের সকল পুত্রগণও আপনার বিকট দন্তবিশিষ্ট ভয়ঙ্কর মুখবিবরে সবেগে প্রবেশ করছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ চূর্ণবিচূর্ণ মস্তকসহ আপনার দন্তসন্ধির মধ্যে সংলগ্ন রয়েছে॥ ২৬-২৭ ॥

ব্যাখ্যা—**'ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ'**—আমাদের পক্ষের ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, দ্রুপদ প্রভৃতি প্রধান প্রধান যোদ্ধা সকলেই ধর্মের সপক্ষে আছেন এবং শুধুমাত্র কর্তব্য মনে করেই যুদ্ধে যোগদান করেছেন। আমাদের এই সেনাপতিগণসহ পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ এবং বিখ্যাত সূতপুত্র কর্ণও আপনাতে প্রবিষ্ট হচ্ছেন।

এখানে ভীষ্ম, দ্রোণ এবং কর্ণের নাম করার অর্থ হল যে, এই তিনজনই নিজ নিজ কর্তব্য পালনের নিমিত্ত যুদ্ধে

যোগদান করেছেন[১]।

'অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ সর্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈ'—দুর্যোধনের পক্ষে যত রাজা আছেন, যাঁরা দুর্যোধনের হিতার্থে যুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন (গীতা ১।২৩) অর্থাৎ দুর্যোধনকে হিতের পরামর্শ দেননি, সেই রাজন্যবর্গসহ দুর্যোধন, দুঃশাসন ইত্যাদি ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্র বিকট দন্তবিশিষ্ট অত্যন্ত ভয়ঙ্কর আপনার মুখবিবরে তীব্র বেগে প্রবিষ্ট হচ্ছে—**'বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি'**।

বিরাটরূপেতে তারা ভগবানেই প্রবিষ্ট হোক বা ভগবানের মুখ গহ্বরে, তা একই লীলা। শুধু ভাব অনুযায়ী তাদের গতিবিধি পৃথক্ বলে প্রতিভাত হয়। তাই ভগবানেই প্রবিষ্ট হোক বা মুখগুলিতে, তারা সবই বিরাটরূপেতেই থাকে।

'কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ'—যেমন, খাদ্যপদার্থগুলির মধ্যে এমন কিছু পদার্থ থাকে যেগুলি সোজা উদরে চলে যায়, আবার কিছু পদার্থ এমন থাকে যেগুলি চিবানোর সময় দাঁত ও মাড়ির মধ্যে আটকে যায়। তেমনই আপনার মুখে প্রবিষ্টকারী কোনো কোনোটি সোজা ভিতরে যাচ্ছে, আবার কোনো কোনোটি চূর্ণ-বিচূর্ণ মস্তকসহ আপনার দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে আটকে রয়েছে দেখা যাচ্ছে।

এখানে একটি সংশয় আসে যে, যোদ্ধাগণ এখনও যুদ্ধক্ষেত্রে দণ্ডায়মান, তাহলে অর্জুন কী করে তাদের ভগবানের মুখে প্রবিষ্ট হতে দেখলেন ? উত্তর হল যে ভগবান তাঁর বিরাটরূপে আসন্ন ভবিষ্যৎ দেখাচ্ছিলেন। ভগবান বিশ্বরূপ প্রদর্শনের সময় বলেছিলেন, তুমি যা কিছু দেখতে চাও, তা-ও আমার এই বিশ্বরূপে দর্শন কর (১১।৭)। অর্জুনের সন্দেহ ছিল যুদ্ধে তাঁদের জয় হবে, না কৌরবদের (২।৬) ? তাই সেই সন্দেহ দূর করার জন্য ভগবান তাঁকে আসন্ন ভবিষ্যতের দৃশ্য দেখিয়ে যেন বলতে চাইছেন যে, যুদ্ধে তোমারই জয় হবে। পরে অর্জুনের প্রশ্নেও ভগবান এই কথাই বলেছেন (১১।৩২-৩৪)।

পরিশিষ্ট-ভাব—অর্জুন ভগবানের বিরাটরূপে আসন্ন ভবিষ্যৎকে দেখতে পাচ্ছিলেন। কালাতীত হওয়ায় ভগবানের ভেতরে অতীত-ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান—এই তিন কালই বর্তমানে উপস্থিত, বিরাজমান (গীতা ৭।২৬)।

※ ※ ※

---

[১]**ভীষ্ম**—ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা পৃথিবীতে বিখ্যাত এইজন্য যে তিনি পিতার সুখের জন্য বিবাহ না করার পণ করেছিলেন এবং আবাল্য ব্রহ্মচারী ছিলেন। এই প্রতিজ্ঞায় তিনি এমন অটল ছিলেন যে, নিজ গুরু পরশুরামের সঙ্গেও যুদ্ধ করেছিলেন, তবুও প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গেননি। ভগবান প্রথমে অস্ত্র ধারণ না করার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। কিন্তু ভীষ্ম যখন (ভগবানের শপথের বিরুদ্ধে) প্রতিজ্ঞা করলেন যে, 'আজু জো হরিহিঁ ন শস্ত্র গহাউঁ। তৌ লাজৌঁ গঙ্গা জননীকো শান্তনু-সুত ন কহাউঁ।।' তখন ভগবান প্রতিজ্ঞা ভেঙে একবার চাবুক ও অন্যবার রথের চাকা তুলে নিয়ে ভীষ্মের দিকে ছুটে যান। এইভাবে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা বজায় থাকে ও ভগবানের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়।

দ্রোণ—অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য দুর্যোধনের বৃত্তিভোগী ছিলেন। তাই তিনি যুদ্ধকে নিজ কর্তব্য মনে করে যোগদান করেছিলেন। শেষে দেবতাদের কথা শুনে এবং নিজ ব্রাহ্মণোচিত ধর্ম বুঝে যুদ্ধে উপরত হন।

দ্রোণাচার্যের মধ্যে এমন নিরপেক্ষতা ছিল যে গুরুভক্ত এবং শস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী অর্জুনকে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ এবং তা ফিরিয়ে নেওয়া দুই-ই শিখিয়েছিলেন, কিন্তু নিজপুত্র অশ্বত্থামাকে শুধু ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগই শিখিয়েছিলেন, প্রত্যাহার কৌশল শেখাননি।

কর্ণ—দুর্যোধনের সঙ্গে কর্ণের বন্ধুত্ব ছিল, সেই বন্ধুত্বের কর্তব্যের জন্য তিনি যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে, 'তুমি কুন্তীপুত্র !' বললেও তিনি দুর্যোধনের পক্ষ ত্যাগ করেননি, আর ভগবানকে এ-কথা যুধিষ্ঠিরকে বলতে নিষেধ করেছিলেন, কারণ তিনি জানতেন যুধিষ্ঠির এ-কথা জানলে বড় ভাই হিসাবে কর্ণকে রাজা করবেন আর কর্ণ দুর্যোধনকে রাজ্য সমর্পণ করবেন। তাতে পাণ্ডবরা চিরকাল দুঃখী হয়েই কাটাবেন !

কর্ণ অত্যন্ত দৃঢ়চেতা ও অতিশয় দানবীর ছিলেন। ইন্দ্রের প্রার্থনায় তিনি সহজাত কবচ-কুণ্ডল তাঁকে প্রদান করেন। কুন্তীর প্রার্থনায় তিনি তাঁকে পাঁচ-সন্তান জীবিত থাকার আশ্বাস দেন। তিনি বলেন যে, যুধিষ্ঠির-ভীম-নকুল সহদেবকে তিনি মারবেন না, তবে অর্জুনের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হবে, তাতে অর্জুন মারা গেলেও কুন্তীর (কর্ণ-সহ) পাঁচ সন্তান বর্তমান থাকবেন এবং কর্ণ মারা গেলেও পাঁচ সন্তান জীবিত থাকবেন।

সম্বন্ধ—যাঁরা নিজেদের কর্তব্য মনে করে ধর্মের দৃষ্টিতে যুদ্ধে যোগদান করেছেন এবং যাঁরা পরমাত্মাকে লাভ করাতে আগ্রহী—এরূপ ব্যক্তিদের বিশ্বরূপে নদীর দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রবেশ করার বর্ণনা অর্জুন পরবর্তী শ্লোকে করছেন।

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি॥ ২৮ ॥

[**যথা, নদীনাং** (যেমন নদীসমূহের) ; **বহবঃ, অম্বুবেগাঃ** (বহু জলপ্রবাহ) ; **এব, সমুদ্রম্, অভিমুখাঃ** (সমুদ্র অভিমুখেই) ; **দ্রবন্তি, তথা** (ধাবিত হয়, তেমনই) ; **অমী, নরলোকবীরাঃ** (এই জগতের মহাশূরবীরগণ) ; **তব** (আপনার) ; **অভিবিজ্বলন্তি** (প্রজ্বলিত) ; **বক্ত্রাণি** (মুখগহ্বরে) ; **বিশন্তি** (প্রবিষ্ট হচ্ছেন।)]

যেমন নদীসমূহের বহু জলপ্রবাহ স্বাভাবিকভাবে সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়, তেমনই এই জগতের মহাশূরবীরগণ আপনার সর্বদিকে প্রজ্বলিত মুখগহ্বরে প্রবিষ্ট হচ্ছেন॥ ২৮ ॥

ব্যাখ্যা—**'যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি'**—জলমাত্রেরই মূল হল সমুদ্র। সেই জলই মেঘ হয়ে বৃষ্টি রূপে পৃথিবীতে বর্ষিত হয়ে ঝরণা, নালা ইত্যাদিকে নিয়ে নদীর রূপ ধারণ করে। সেইসব নদীর প্রবাহগুলি স্বাভাবিকভাবে সমুদ্র-অভিমুখে ধাবিত হয়। কারণ তাদের উৎপত্তি স্থান হল সমুদ্র। এইসব জলপ্রবাহ সমুদ্রে পড়ে নিজ নাম ও রূপ পরিত্যাগ করে অর্থাৎ গঙ্গা, যমুনা বা সরস্বতী নাম ও প্রবাহ ছেড়ে সমুদ্ররূপ ধারণ করে। তখন তাদের সমুদ্র ছাড়া আর কোনো পৃথক্ সত্তা থাকে না। প্রকৃত পক্ষে আগেও তাদের কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না, কেবলমাত্র নদীগুলির প্রবাহরূপ হওয়ায় তারা পৃথক্‌রূপে প্রতিভাত হচ্ছিল।

'তথা তবামি নরলোকবীরা বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি'—নদীর মতোই জীবমাত্রই সুখের আকাঙ্ক্ষায় পরমাত্মার দিকেই ধাবিত হয়। কিন্তু ভ্রমবশতঃ সত্তাহীন বিনাশশীল এই দেহের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে তারা জাগতিক পদার্থ সংগ্রহ এবং সংযোগজনিত সুখে ব্যাপৃত হয় এবং নিজেকে পৃথক্ অস্তিত্বসম্পন্ন বলে মনে করে। জীবের মধ্যে তিনিই প্রকৃত বীরপুরুষ যিনি জাগতিক পদার্থ সংগ্রহ এবং সুখভোগে ব্যাপৃত না হয়ে, যে জন্য দেহ প্রাপ্তি, সেই পরমার্থ প্রাপ্তির পথে তৎপর থাকেন। এইরূপে যুদ্ধে উপস্থিত ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি বীরগণ আপনার প্রদীপ্ত (জ্ঞানস্বরূপ) মুখবিবরে প্রবিষ্ট হচ্ছেন।

উপস্থিত দৃশ্যমান ব্যক্তিদের মধ্যে পরমাত্মলাভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি অত্যন্ত বিরল। তাই তাঁদের উপলক্ষ্যে পরোক্ষ-বাচক **'অমী'** (তারা) পদ ব্যবহৃত হয়েছে।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—যাঁরা প্রশংসা ও লোভের বশবর্তী হয়ে যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন এবং যাঁরা জাগতিক সংগ্রহ ও ভোগাদি প্রাপ্তিতে ব্যাপৃত—এরূপ ব্যক্তিদের বিশ্বরূপে পতঙ্গের দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রবেশ করার বর্ণনা অর্জুন পরের শ্লোকটিতে করেছেন।

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকাস্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ॥ ২৯ ॥

[**যথা, পতঙ্গাঃ** (যেমন পতঙ্গকুল) ; **নাশায়, সমৃদ্ধবেগাঃ** (নিজেদের নাশের জন্য অতি বেগে ধাবিত হয়ে) ; **প্রদীপ্তম্, জ্বলনম্** (জ্বলন্ত অগ্নিতে) ; **বিশন্তি, তথা, এব,** (প্রবেশ করে, তেমনই) ; **লোকাঃ** (এইসব লোকেরা) ; **অপি, নাশায়** (নিজেদের বিনাশের জন্যই) ; **সমৃদ্ধবেগাঃ** (অতি বেগে ধাবিত হয়ে) ; **তব** (আপনার) ; **বক্ত্রাণি** (মুখগহ্বরে) ; **বিশন্তি** (প্রবেশ করছে।)]

যেমন পতঙ্গকুল মোহবশত মরণের জন্য অতি বেগে ধাবিত হয়ে জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে, তেমনই এইসব লোকেরা মোহবশতঃ নিজেদের ধ্বংস করার জন্য অতি বেগে ধাবিত হয়ে আপনার মুখগহ্বরে প্রবেশ করছে॥ ২৯ ॥

ব্যাখ্যা—'যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ'—সবুজ ঘাসের পতঙ্গকুল অন্ধকার রাত্রে কোথাও প্রজ্বলিত অগ্নি দেখলে তাতে মুগ্ধ হয়ে (কী সুন্দর আলো পাওয়া গেছে, এর থেকে আমাদের সুখ হবে, আমাদের অন্ধকার দূরীভূত হবে) তার দিকে অতি বেগে ধাবিত হয়। তাদের মধ্যে কিছু পতঙ্গ আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুবরণ করে ; আর কিছু পতঙ্গের আগুনের ছোঁয়া লেগে যায় তখন তাদের ওড়া বন্ধ হয়ে যায় আর ছট্‌ফট্ করতে থাকে। তবুও তাদের লালসা সেই অগ্নির দিকেই থাকে ! যদি কেউ সেই অগ্নিটি নিভিয়ে দেয়, তাহলে সেই পতঙ্গগুলি অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে মনে করে যে আমরা একটি অতি বড় সুখ থেকে বঞ্চিত হলাম !

'তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকাস্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ'— ভোগ ও সংগ্রহে তৎপর থাকা এবং মনে মনে সেইগুলিরই চিন্তা করা—একেই বলা হয় বর্ধিত সাংসারিক বেগ। এই বেগসম্পন্ন হয়েই দুর্যোধন প্রভৃতি রাজন্যবর্গ পতঙ্গের ন্যায় অত্যন্ত বেগে কালচক্ররূপ আপনার মুখগহ্বরে প্রবেশ করছে অর্থাৎ পতনের দিকে চলেছে—চুরাশী লক্ষ যোনি ও নরকের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তাৎপর্য হল এই যে, মানুষ প্রায়শঃই জাগতিক ভোগ-সুখ-মান-যশ ইত্যাদির জন্য দিন রাত কাজ করে থাকে। তা প্রাপ্ত করতে তারা অপমানিত হয়, নিন্দা প্রাপ্ত হয়, চিন্তায় ক্লিষ্ট হয়, চিত্তে জ্বালা হয় এবং জীবনের আধার যে আয়ু তাও ক্রমশঃ ফুরোতে থাকে, তবুও তারা এই বিনাশশীল ভোগ ও সংগ্রহের জন্য অন্তরে লালায়িত হয়ে থাকে[১]।

পরিশিষ্ট-ভাব—আগের শ্লোকটিতে নদীসমূহ এবং এই শ্লোকে পতঙ্গাদির দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। পতঙ্গাদি মোহবশতঃ কিছু পাওয়ার আশায় স্বেচ্ছায়ই অগ্নিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কিন্তু নদী নিজেকে সমর্পণের জন্যই সমুদ্র অভিমুখে যায়। সুতরাং যে ব্যক্তি 'পাওয়ার' আশা রাখেন, তিনি পতঙ্গের ন্যায় হন এবং যে ব্যক্তি সমর্পণের আর্তি রাখেন, তিনি নদীর মতো হন। নেওয়ার ভাব হলে জড়ত্ব আসে আর দেওয়ার ভাব হলে চেতন ভাব জন্মায়। নেওয়ার ভাবে অশুভকর্ম আর দেওয়ার ভাবে শুভ কর্ম হয়। নেওয়ার আকাঙ্ক্ষাকারীদের স্বর্গ প্রাপ্তি হয় আর দেওয়ায় উদগ্রীবদের মোক্ষ লাভ হয়। কারণ নেওয়ার ভাব বন্ধনকারক হয় আর দেওয়ার ভাব হয় মুক্তিকারক।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—পূর্ববর্তী দুটি শ্লোকে দুটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে দুটি বর্গের বর্ণনা করে এবার সমগ্র ভুবনগ্রাসকারী ভগবানের বিশ্বরূপের ভীষণ রূপের বর্ণনা করছেন।

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য জগৎ সমগ্রং ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো॥ ৩০ ॥

[**সমগ্রান্, লোকান্** (সকল লোককে) ; **জ্বলদ্ভিঃ** (জ্বলন্ত) ; **বদনৈঃ** (মুখসমূহের দ্বারা) ; **গ্রসমানঃ** (গ্রাস করে) ; **সমন্তাৎ** (চতুর্দিক থেকে) ; **লেলিহ্যসে** (বারংবার লেহন করছেন) ; **বিষ্ণু** (হে বিষ্ণু !) ; **তব, উগ্রাঃ, ভাসঃ** (আপনার তীব্র প্রভা) ; **তেজোভিঃ** (তার নিজস্ব তেজের দ্বারা) ; **সমগ্রম্** (সমগ্র) ; **জগৎ** (জগৎকে) ; **আপূর্য** (পরিপূর্ণ করে) ; **প্রতপন্তি** (তাপিত করছে।)]

আপনি সকল লোককে জ্বলন্তমুখসমূহের দ্বারা গ্রাস করে চতুর্দিক থেকে বারংবার লেহন করছেন এবং

---

[১]অজানন্ দাহাত্ম্যং পততি শলভো দীপদহনে স মীনোঽপ্যজ্ঞানাদ্বড়িশযুতমশ্নাতি পিশিতম্।
বিজানন্তোঽপ্যেতে বয়মিহ বিপজ্জালজটিলান্ ন মুঞ্চামঃ কামানহহ গহনো মোহমহিমা॥
(ভর্তৃহরিবৈরাগ্যশতক)

'পতঙ্গ প্রদীপের দাহিকাশক্তি না জানায় তাতে ঝাঁপ দেয়, মাছও অজ্ঞানবশতঃই বঁড়শীতে লেগে থাকা মাংসের টুকরো খেয়ে ফেলে ; আর আমরা জেনেশুনেও বিপত্তির জটিল জালে আবদ্ধকারী কামনাগুলিকে ত্যাগ করি না ; অহো ! মোহের মহিমা কত গভীর !'

হে বিষ্ণু ! আপনার তীব্র প্রভা, তার নিজস্ব তেজের দ্বারা সমগ্র জগৎকে পরিপূর্ণ করে সকলকে তাপিত করছে॥ ৩০ ॥

ব্যাখ্যা—**'লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ'**—আপনি প্রাণীসমূহকে সংহার করছেন এবং যাতে কেউ এদিক-ওদিক চলে না যায়, তাই বারংবার নিজের জিভ দিয়ে লেহন করে প্রজ্বলিত মুখগহ্বরে সবকিছু ঢুকিয়ে নিচ্ছেন। অর্থাৎ কালরূপী ভগবানের জিহ্বার লেহন থেকে কোনো প্রাণীই বাঁচতে পারে না।

'তেজোভিরাপূর্য জগৎ সমগ্রং ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো'—বিশ্বরূপ ভগবানের তেজ বা প্রভা অত্যন্ত উগ্র। সেই উগ্র তেজ সমস্ত জগতে পরিপূর্ণ হয়ে সকলকে সন্তাপিত, ব্যথিত করছে।

পরিশিষ্ট-ভাব—এখানে **'লোকান্ সমগ্রান্'** (লোকমাত্রেই) এবং **'জগৎ সমগ্রম্'** (জড়-চেতন, স্থাবর-জঙ্গমরূপ জগৎ মাত্রই) বলার অর্থ হল যে, এই সবই ভগবানের সমগ্ররূপেরই অন্তর্গত।

গীতায় ভগবানও নিজেকে সমগ্র বলেছেন—**'অসংশয়ং সমগ্রং মাম্'** (৭।১), কর্মকেও সমগ্র বলেছেন—**'যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রম্'** (৪।২৩) এবং উপস্থিত শ্লোকে জগৎকেও সমগ্র বলেছেন। এর অর্থ হল সবই ভগবানের রূপ।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—ভগবান তাঁর বিশ্বরূপের বিশেষ রূপগুলি দর্শন করাতে থাকলেন। তাঁর ভীষণ এবং অত্যন্ত উগ্ররূপের মুখগহ্বরে সমস্ত প্রাণী এবং উভয়পক্ষের যোদ্ধাদের প্রবেশ করতে দেখে অর্জুন হতচকিত হলেন। তাই অতি উগ্ররূপধারী ভগবানের প্রকৃত পরিচয় জানার জন্য অর্জুন প্রশ্ন করলেন।

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্॥ ৩১ ॥

[**মে, আখ্যাহি** (আমাকে বলুন) ; **উগ্ররূপঃ** (উগ্ররূপধারী) ; **ভবান্, কঃ** (আপনি কে ?) ; **দেববর, তে** (হে দেবশ্রেষ্ঠ ! আপনাকে) ; **নমঃ, অস্তু** (প্রণাম করি !) ; **প্রসীদ** (প্রসন্ন হোন) ; **আদ্যম্, ভবন্তম্** (আদিপুরুষ আপনাকে) ; **বিজ্ঞাতুম্, ইচ্ছামি** (তত্ত্বতঃ জানতে চাই) ; **হি, তব** (কারণ আপনার) ; **প্রবৃত্তিম্** (প্রবৃত্তি কি) ; **ন, প্রজানামি** (তা জানি না।)]

আমাকে বলুন এই উগ্ররূপধারী আপনি কে ? হে দেবশ্রেষ্ঠ ! আপনাকে প্রণাম করি ! আপনি প্রসন্ন হোন। আদিপুরুষ আপনাকে আমি তত্ত্বতঃ জানতে চাই, কারণ আমি আপনার উদ্দেশ্য কী তা জানি না॥ ৩১ ॥

ব্যাখ্যা—**'আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ'**—আপনাকে দেবরূপেও দেখছি আবার উগ্ররূপেও দেখছি, তাহলে প্রকৃতপক্ষে এইসব রূপ ধারণকারী আপনি কে ?

অতি উগ্র বিশ্বরূপ দর্শন করে ভীতসন্ত্রস্ত অর্জুন প্রণাম ছাড়া আর কীই বা করবেন ? অর্জুন যখন ভগবানের এই বিরাট বিশ্বরূপ অনুধাবন করতে সর্বতোভাবে অক্ষম হলেন, তখন তিনি বললেন, হে দেবশ্রেষ্ঠ ! আপনাকে প্রণাম।

ভগবান তাঁর জিহ্বা দিয়ে সমস্ত প্রাণীকে বারংবার মুখের মধ্যে নিয়ে লেহন করছিলেন, তাঁর এই ভয়ঙ্কর ব্যবহার দেখে অর্জুন প্রার্থনা করলেন যে, আপনি প্রসন্ন হোন।

'বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্'—ভগবানের প্রথম অবতার বিশ্ব (জগৎ)রূপেই হয়েছিল। তাই অর্জুন বলেছেন যে, আদি নারায়ণ ! আমি আপনাকে যথার্থরূপে জানি না। আমি আপনার এই কার্যও জানি না যে আপনি কেন এখানে প্রকটিত হয়েছেন ? আমাদের উভয়পক্ষের যোদ্ধারা আপনার মুখবিবরে প্রবেশ করছে ; তাহলে প্রকৃতপক্ষে আপনার উদ্দেশ্য কী ? অর্থাৎ আপনি কে এবং কী করতে চান—এই কথাই আমি জানতে চাই—সেটি আপনি আমাকে স্পষ্ট করে বলুন।

একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, ভগবানের প্রথম অবতার হয়েছে বিশ্ব (জগৎ)রূপে আর এখন অর্জুন ভগবানের

কোনো এক অংশে বিশ্বরূপ দেখছেন—এই দুই বিশ্বরূপই কি এক, না ভিন্ন ভিন্ন ? এর উত্তর হল যে প্রকৃত তথ্য তো ভগবানই জানেন, তবে বিচার করলে মনে হয় যে, অর্জুন যে বিশ্বরূপ দেখেছিলেন, এই জগৎরূপী বিশ্বরূপ তারই অন্তর্গত । যেমন বলা হয়ে থাকে যে ভগবান সর্বব্যাপী, তার অর্থ এই নয় যে, ভগবান শুধু এই জগতেই পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন, তিনি এই জগতের বাইরেও সর্বত্র ব্যাপ্তস্বরূপে বিরাজমান। জগৎ ভগবানের কোনো এক অংশে অবস্থিত এবং এইরূপ অনন্ত বিশ্ব ভগবানের কোনো এক অংশে অবস্থান করছে। এইরূপেই অর্জুন যে বিশ্বরূপ দর্শন করেছিলেন তাতে এই জগৎও ছিল এবং এটি ছাড়া আরও অনেক কিছু ছিল।

পরিশিষ্ট-ভাব—ভগবানের ঐশ্বর্যময় উগ্ররূপ দেখে অর্জুন এত ভয় পেলেন যে, তিনি তাঁর সখা শ্রীকৃষ্ণকেই জিজ্ঞাসা করে বসেন যে তিনি কে ?

※ ※ ※

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে অর্জুন যে প্রার্থনা করেন, তার যথার্থ উত্তর ভগবান পরবর্তী শ্লোকে দিচ্ছেন।

শ্রীভগবানুবাচ

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ।। ৩২ ।।

[**লোকক্ষয়কৃৎ** (সমগ্র লোকক্ষয়কারী) ; **প্রবৃদ্ধঃ, কালঃ, অস্মি** (অতি ভীষণ কাল) ; **ইহ, লোকান্** (এখন এইসব লোকেদের) ; **সমাহর্তুম্, প্রবৃত্তঃ** (সংহার করতে এসেছি) ; **প্রত্যনীকেষু** (বিপক্ষে) ; **যে, যোধাঃ** (যেসব যোদ্ধা) ; **অবস্থিতাঃ** (উপস্থিত হয়েছেন) ; **সর্বে** (কেউই) ; **ত্বাম্** (তুমি) ; **ন, ঋতে, অপি** (যুদ্ধ না করলেও) ; **ভবিষ্যন্তি** (বাঁচবেন না।)]

শ্রীভগবান বললেন—আমি সমগ্র লোকক্ষয়কারী প্রবৃদ্ধ কাল এবং এখন এইসব লোকেদের সংহার করতে এসেছি। তোমার বিপক্ষে যেসব যোদ্ধা উপস্থিত হয়েছেন, তুমি যুদ্ধ না করলেও তাঁরা কেউই বাঁচবেন না।। ৩২ ।।

ব্যাখ্যা—['ভগবানের বিশ্বরূপকে আলোচনা করলে এর বিশেষত্ব বোঝা যায় ; কারণ দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন অর্জুনও তা সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন করতে পারছিলেন না। তিনি বিশ্বরূপ দর্শন করা যে অত্যন্ত কঠিন তা বলছিলেন—**'দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাৎ'** (১১।১৭)। এখানেও তিনি ভগবানকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, 'উগ্ররূপসম্পন্ন আপনি কে ?' তাতে মনে হয় যে, অর্জুন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে যদি একথা জিজ্ঞাসা না করতেন তাহলে ভগবান আরও বিশেষরূপে প্রকটিত হতেন। কিন্তু অর্জুন মধ্যপথে প্রশ্ন করায় ভগবান তাঁর রূপ প্রদর্শন স্থগিত রেখে অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিতে শুরু করলেন।]

'কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ'—আগের শ্লোকে অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছিলেন এই উগ্ররূপসম্পন্ন আপনি কে—**'আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপঃ'**। তার উত্তরে বিরাটরূপ ভগবান বলেছেন যে, আমি সমগ্র লোকক্ষয়কারী অতি ভীষণ রূপে বর্ধিত অক্ষয় কাল।

'লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ'—অর্জুন প্রশ্ন করেছিলেন যে আমি আপনার প্রবৃত্তি জানি না—**'ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্'** অর্থাৎ আপনি এখানে কী করতে এসেছেন ? তার উত্তরে ভগবান বলেছেন, এখন আমি উভয়পক্ষের সেনানীদের সংহার করতেই আবির্ভূত হয়েছি।

'ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ'—তুমি প্রথমে বলেছিলে যে তুমি যুদ্ধ করবে না—**'ন যোৎস্যে'** (২।৯), তাহলে কি তুমি যুদ্ধ না করলে বিপক্ষীয় লোকেরা মৃত্যু বরণ করবে না ? অর্থাৎ তোমার যুদ্ধ করা বা না-করায় কোনো ব্যতিক্রম হবে না। কারণ আমি সকলকে সংহার করার জন্য প্রবৃত্ত হয়েছি। তুমি বিশ্বরূপেও দেখেছো যে তোমার পক্ষের এবং বিপক্ষের উভয় সেনাই আমার করাল মুখগহ্বরে প্রবিষ্ট হচ্ছে।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে অর্জুন নিজ পক্ষের ও কৌরবপক্ষের সকলকেই ভগবানের মুখে প্রবেশ করে নাশ

হতে দেখেছেন, তাহলে ভগবান কেন এখানে শুধুমাত্র প্রতিপক্ষের কথাই বলছেন যে, তুমি যুদ্ধ না করলেও এই বিপক্ষীয় ব্যক্তিরা থাকবে না ? তার উত্তর হল যে যদি অর্জুন যুদ্ধ করেন, তবে তিনি শুধু বিপক্ষের লোকদেরই মারবেন এবং যুদ্ধ না করলে বিপক্ষের লোকদের মারবেন না। তাই ভগবান বলেছেন যে, তুমি না মারলেও এরা বাঁচবে না ; কারণ কালরূপে আমি সকলকেই গ্রাস করব। অর্থাৎ এদের সকলেরই সংহার হবে, তুমি শুধু তোমার যুদ্ধরূপ কর্তব্য পালন করো।

আর একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে এখানে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে, বিপক্ষের যোদ্ধারা তুমি যুদ্ধ না করলেও বাঁচবে না, তাহলে এই যুদ্ধে অশ্বত্থামা ইত্যাদি যোদ্ধারা কী করে বেঁচে রইলেন ? তার উত্তর হল যে ভগবান এখানে সেইসব যোদ্ধার কথা বলেছেন যাঁরা অর্জুনের হাতে মৃত্যুবরণ করবেন অর্থাৎ অর্জুন যাদের বধ করবেন। তাই ভগবানের কথার অর্থ হল যে, যাঁদের তুমি বধ করবে তাঁরা সকলেই তুমি না মারলেও মৃত্যুমুখে পতিত হবেন। যাঁদের তুমি বধ করবে তাঁদের আমি আগে থেকেই বধ করে রেখেছি—**'ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব'** (১১।৩৩)।

* * *

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, তুমি বধ না করলেও এই প্রতিপক্ষের যোদ্ধাগণ বাঁচবেন না। এই পরিস্থিতিতে অর্জুনের কী করা উচিত—পরবর্তী দুটি শ্লোকে ভগবান তা জানাচ্ছেন।

তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্॥ ৩৩ ॥

[**তস্মাৎ, ত্বম্** (সুতরাং তুমি) ; **উত্তিষ্ঠ** (উত্থিত হও) ; **যশঃ** (যশ) ; **লভস্ব** (লাভ করো) ; **শত্রূন্, জিত্বা** (শত্রুদের জয় করে) ; **সমৃদ্ধম্** (ধন-ধান্য সমন্বিত) ; **রাজ্যম, ভুঙ্‌ক্ষ্ব** (রাজ্য ভোগ করো) ; **এতে, এব** (এদের) ; **ময়া** (আমি) ; **পূর্বম্, এব** (পূর্বেই) ; **নিহতাঃ** (বধ করে রেখেছি) ; **সব্যসাচিন্** (হে সব্যসাচী অর্জুন) ; **নিমিত্তমাত্রম্** (নিমিত্তমাত্র) ; **ভব** (হও ।)]

সুতরাং তুমি যুদ্ধের জন্য উত্থিত হও, যশ লাভ করো এবং শত্রুদের জয় করে ধন-ধান্য সমন্বিত রাজ্য ভোগ করো। এদের আমি পূর্বেই বধ করে রেখেছি। হে সব্যসাচী অর্জুন (উভয় হস্ত দ্বারা বাণ নিক্ষেপে পারঙ্গম) ! তুমি এদের নিধনে নিমিত্তমাত্র হও॥ ৩৩ ॥

ব্যাখ্যা—**'তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব'**—'হে অর্জুন ! তুমি যখন বুঝতে পেরেছ যে তুমি বধ না করলেও তোমার প্রতিপক্ষের সৈন্যেরা বাঁচবে না, তখন তুমি কোমর বেঁধে যুদ্ধের জন্য উঠে দাঁড়াও আর বিনা-আয়াসে যশ প্রাপ্ত হও। এর তাৎপর্য হল যে এরূপ হবেই এবং তা আমি তোমাকে প্রত্যক্ষ করিয়েছি। অতএব তুমি যুদ্ধ করলে বিনা আয়াসেই যশ পাবে এবং লোকেও বলবে যে অর্জুন বিজয় লাভ করেছেন।

'যশো লভস্ব' বলার অর্থ এই নয় যে, যশোপ্রাপ্তিতে তুমি আনন্দিত হয়ে ভাববে যে, 'বাঃ ! আমি বিজয় লাভ করেছি', বরং তুমি এ-কথাই মনে করবে যে, যেমন এই প্রতিপক্ষের লোকেরা আমার দ্বারা নিহত হয়েই বিনষ্ট হবে, তেমনই যশও যা হবার, তা হবেই। যশকে যদি তুমি তোমার পুরুষার্থ দ্বারা অর্জিত মনে করে সন্তুষ্ট হও, তাহলে তুমি ফলে আবদ্ধ হবে—**'ফলে সক্তো নিবধ্যতে'** (গীতা ৫।১২)। তাৎপর্য হল এই যে লাভ-ক্ষতি, যশ-অপযশ সবই প্রভুর হাতে। সুতরাং মানুষ যেন এর সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন না করে ; কারণ এগুলি তো হবেই।

'জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্'—সমৃদ্ধশালী রাজ্যের দুটি ব্যাপার হয়—(১) রাজ্য নিষ্কণ্টক হয় অর্থাৎ তাতে বাধা প্রদানকারী কোনো শত্রু বা প্রতিপক্ষ না থাকা এবং (২) রাজ্য সমৃদ্ধিপূর্ণ হয় অর্থাৎ প্রজাদের অনেক ধন-সম্পত্তি থাকে ; হাতি-ঘোড়া-গোরু-বাড়ি-জমি-পুষ্করিণী ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বস্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে, প্রজাদের যথেষ্ট খাদ্য-সামগ্রী থাকে। এই দুটি বিষয়েরই প্রাচুর্য থাকলে তবেই সেই রাজ্যকে সমৃদ্ধশালী বলা হয়। ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে, শত্রু জয় করে তুমি এইরূপ নিষ্কণ্টক ধন-ধান্যসম্পন্ন রাজ্য ভোগ করো।

এখানে যে রাজ্য ভোগ করার কথা বলা হয়েছে তার অর্থ অনুকূল সুখভোগ করা নয়, তার অর্থ হল যে সাধারণ

মানুষ যাকে ভোগ বলে মনে করে, সেই রাজ্য তুমি অনায়াসে প্রাপ্ত করো।

'ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব'—অর্জুন কী করে অনায়াসে যশ এবং রাজ্য প্রাপ্ত করবেন, তার বিষয় জানাচ্ছেন যে, এখানে যারা এসেছে তাদের সকলেরই আয়ু শেষ হয়ে গেছে অর্থাৎ আমার কালরূপ দ্বারা এরা আগেই নিহত হয়েছে।

'নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্'—অর্জুন বাম হাতেও বাণ চালাতে পারতেন অর্থাৎ ডান ও বাম—দুই হাতেই সমানভাবে বাণ চালনায় দক্ষ বলে অর্জুনকে 'সব্যসাচী' বলা হত[১]। এইভাবে সম্বোধন করে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে, তুমি দুই হাতে বাণ নিক্ষেপ করো অর্থাৎ যুদ্ধে নিজের পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করো, কিন্তু হতে হবে নিমিত্তমাত্র। নিমিত্তমাত্র হওয়ার তাৎপর্য হল যে বল-বুদ্ধি-পরাক্রম কোনোটিরই কম ব্যবহার করা নয়, বরং সতর্কতার সঙ্গে সম্পূর্ণ ব্যবহার করা। কিন্তু আমি বধ করেছি, আমি বিজয় লাভ করেছি—এরূপ অহংকার না থাকা ; কারণ এরা সকলেই আমা কর্তৃক পূর্বেই নিহত হয়েছে তাই তুমি কেবল নিমিত্তমাত্র হও, নতুন কিছু করতে হবে না।

নিমিত্তমাত্র হয়ে কার্য করায় নিজের দিক থেকে কোনো অংশেই কোনো ঘাটতি রাখা উচিত নয় বরং পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করে সতর্কতার সঙ্গে সেটি করা উচিত। কার্যের সিদ্ধিতে নিজের অহংকার একেবারেই রাখতে নেই। যেমন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন গোবর্ধন পর্বত উত্তোলন করেন সেইসময় তিনি গোপবালকদেরও পর্বতের নীচে লাঠি লাগাতে বলেছিলেন, তাঁরা সকলেই লাঠি লাগিয়েছিলেন এবং মনে করেছিলেন যে, আমরা সকলেই লাঠি ধরেছি বলে পর্বত ওপরে উত্তোলিত হয়েছে। আসলে পর্বত শুধুমাত্র ভগবানের কনিষ্ঠ আঙুলের নখের ওপরই ন্যস্ত ছিল ! গোপবালকদের মনে যখন এইরকম অহংকার হল তখন ভগবান তাঁর আঙুলটি একটু নীচে করলেন আর অমনি পর্বত নীচের দিকে পড়তে লাগল। তখন গোপবালকগণ চিৎকার করে ভগবানকে বলতে লাগলেন, 'আরে দাদা, মরলাম ! মরলাম !' ভগবান বললেন 'আরও করে বেশি শক্তি লাগাও।' কিন্তু তারা সকলে মিলে পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করেও পর্বতকে একটুও তুলতে পারল না, তখন ভগবান তাঁর আঙুল দিয়ে আবার পর্বতকে ওপরে তুললেন। তেমনি সাধকদেরও পরমাত্মপ্রাপ্তির জন্য নিজ বল-বুদ্ধি-যোগ্যতা সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করতে হয়, তাতে কখনো বিন্দুমাত্র ন্যূনতা রাখা উচিত নয়। কিন্তু পরমাত্মার প্রাপ্তিতে উদ্যোগ-যোগ্যতা-তৎপরতা-জিতেন্দ্রিয়তা-পরিশ্রম ইত্যাদিকে কারণ মেনে নিয়ে অহংকার করা উচিত নয়, ভগবানেরই কৃপা বলে মনে করা উচিত। ভগবান গীতায় বলেছেন যে, শাশ্বত অবিনাশী পদ আমারই কৃপায় প্রাপ্তিলাভ হয়—**'মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্'** (১৮।৫৬) এবং সমস্ত বিঘ্ন আমার কৃপায় অতিক্রম করবে—**'মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি'** (১৮।৫৮)। এতেই প্রমাণ হয় যে শুধু নিমিত্তমাত্র হলেই সাধকদের পরমাত্মপ্রাপ্তি ঘটে।

যখন সাধক নিজশক্তির ভরসায় সাধনা করেন, তখন আত্মঅহংকারদোষে তাঁর বারংবার বিফলতা আসে এবং তত্ত্বপ্রাপ্তিতে বিলম্ব ঘটে। কিন্তু সাধক যদি নিজের শক্তির অহংকার না করেন তবে তাঁর তৎক্ষণাৎ সিদ্ধিলাভ হয়। কারণ পরমাত্মা নিত্য-প্রাপ্ত, শুধু নিজের পুরুষার্থের অহংকার থাকার জন্যই সেটি অনুভূত হতে বিলম্ব হয়। সেই পুরুষার্থের অহংকার না করাই হল **'নিমিত্তমাত্রং ভব'** পদটির তাৎপর্য।

কর্মে যে অহংকার হয় অর্থাৎ—'আমি করলে তবে হয়, আমি যদি না করি তাহলে, হবে না' এটি কেবল অজ্ঞতাবশতঃ নিজের ওপর আরোপিত করা। মানুষ যদি অহংকার ও ফলেচ্ছা পরিত্যাগ করে প্রাপ্ত পরিস্থিতি অনুসারে কর্তব্য-কর্ম করায় নিমিত্ত হয় তাহলে তার উদ্ধার স্বতঃসিদ্ধ। কারণ হল যা হবার, তা হবেই, তাকে কেউ নিজের শক্তি দিয়ে আটকাতে পারে না এবং যা না হবার, তা হবে না, নিজ শক্তি বা বুদ্ধির দ্বারা তা কেউ করতে পারবে না। সুতরাং সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমভাবে থেকে কর্তব্য-কর্ম পালন করলে মুক্তি স্বতঃসিদ্ধ হয়। বন্ধন, নরক-প্রাপ্তি, চুরাশী লক্ষ যোনি প্রাপ্তি—এ সবই কৃতিসাধ্য আর মুক্তি, কল্যাণ, ভগবদ্প্রাপ্তি, ভগবদপ্রেম এগুলি সব স্বতঃসিদ্ধ।

[১]উভৌ মে দক্ষিণৌ পাণী গাণ্ডীবস্য বিকর্ষণে। তেন দেবমনুষ্যেষু সব্যসাচীতি মাং বিদুঃ॥ (মহাভারত, বিরাটপর্ব ৪৪।১৯)

পরিশিষ্ট-ভাব—'নিমিত্ত মাত্রং ভব সব্যসাচিন্'—নিমিত্তমাত্র হওয়ার অর্থ এই নয় যে, শুধু নামমাত্রে কাজ করে যাওয়া। এর প্রকৃত অর্থ হল নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে কাজ করা, কিন্তু কোনোমতেই নিজেকে এর কারণ বলে মনে না করা অর্থাৎ কখনো মনে করতে নেই বা অহংকার করতে নেই যে, আমি এই কাজের কর্তা। ভগবান যা কিছু সামর্থ্য, বিদ্যা, যোগ্যতা ইত্যাদি দিয়েছেন, তা সব ব্যবহার করার জন্যই দিয়েছেন, কিন্তু আমরা সমস্ত শক্তি সামর্থ্য দিয়েও তাঁকে প্রাপ্ত করতে সক্ষম নই। তাঁর কৃপা হলে তবেই আমরা তাঁকে প্রাপ্ত করতে সক্ষম হই।

ভগবান তাঁর দিক থেকে আমাদের কৃপা করতে কোনো ন্যূনতা রাখেননি। যেমন গো-বৎস্য তার মায়ের একটি স্তন থেকে দুধ পান করলেও ভগবান গাভীকে চারটি স্তন দিয়েছেন ! ভগবান এই ভাবেই চারদিক দিয়ে আমাদের ওপর কৃপাবর্ষণ করে থাকেন ! আমাদের শুধুমাত্র নিমিত্ত হতে হবে। অর্জুনের তখন যুদ্ধ করার প্রয়োজন ছিল, তাই ভগবান তাঁকে বলেছেন যে, তুমি নিমিত্তমাত্র হয়ে যুদ্ধ করে যাও, তুমি অবশ্যই বিজয়ী হবে। এইরূপ আমাদের সামনেও জগৎ-সংসার বিদ্যমান, তাই আমরাও যদি নিমিত্তমাত্র হয়ে সাধনা করে যাই তাহলে জগতে আমাদের বিজয় লাভ অবশ্যম্ভাবী।

※ ※ ※

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্॥ ৩৪ ॥

[**দ্রোণম্, চ** (দ্রোণ এবং) ; **ভীষ্মম্, চ** (ভীষ্ম এবং) ; **জয়দ্রথম্, চ** (জয়দ্রথ ও) ; **কর্ণম্, তথা** (কর্ণ এবং) ; **অন্যান্, অপি** (অন্যান্য) ; **যোধবীরান্** (শূরবীরগণ সকলকেই) ; **ময়া, হতান্** (আমি বধ করে রেখেছি) ; **ত্বম্, জহি** (তুমি নিহত করো) ; **মা, ব্যথিষ্ঠাঃ** (ব্যথিত হয়ো না) ; **যুধ্যস্ব, রণে** (যুদ্ধ করো, যুদ্ধে) ; **সপত্নান্, জেতাসি** (জয় করবে।)]

দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ এবং অন্যান্য শূরবীরগণ সকলকেই আমি পূর্বেই বধ করে রেখেছি, তুমি নিহতদেরই বধ কর। ব্যথিত হয়ো না, যুদ্ধ করো ; নিঃসন্দেহে তুমি যুদ্ধে জয়ী হবে॥ ৩৪ ॥

ব্যাখ্যা—**'দ্রোণং চ ভীষ্মং চ জয়দ্রথং চ কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্ ময়া হতাংস্ত্বং জহি'**—তোমার দৃষ্টিতে গুরু দ্রোণাচার্য, পিতামহ ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ এবং প্রতিপক্ষের অন্য যত শূরবীর আছেন, তাঁদের জয় করা অত্যন্ত কঠিন [১]। কিন্তু তাঁদের আয়ু শেষ হয়ে গেছে অর্থাৎ এঁরা সকলেই কালরূপী আমা কর্তৃক হত হয়ে আছেন, অতএব হে অর্জুন ! আমা কর্তৃক হত এই যোদ্ধাদের তুমি বধ করো।

আগের শ্লোকে ভগবান কথিত **'ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব'** এবং এইস্থানে **'ময়া হতাংস্ত্বং জহি'** বলার অর্থ এই যে, তুমি এদের জয় করো, কিন্তু বিজয়লাভ করে অহংকার কোরো না ; কারণ এঁরা সকলেই আমা কর্তৃক হত হয়েছেন।

'মা ব্যথিষ্ঠা যুধ্যস্ব'—অর্জুন, পিতামহ ভীষ্ম এবং গুরু দ্রোণাচার্যকে হত্যা করা পাপ বলে মনে করেছিলেন, তাঁর মনে এটাই ছিল দুঃখ (ব্যথা)। তাই ভগবান বলেছেন তুমি দুঃখও পেয়ো না অর্থাৎ ভীষ্ম-দ্রোণাদিকে হত্যা করায় হিংসা প্রভৃতি দোষের বিচার করার তোমার কোনো প্রয়োজন নেই। তুমি নিজ ক্ষাত্রধর্ম পালন করো অর্থাৎ যুদ্ধ করো, এটি ত্যাগ কোরো না।

'জেতাসি রণে সপত্নান্'—এই যুদ্ধে তুমি শত্রু জয় করবে। একথা বলার অর্থ হল এই যে, আগে (গীতা ২।৬) অর্জুন বলেছিলেন যে, আমি ওঁদের জয় করব, না ওঁরা আমাদের জয় করবেন—তা আমি জানি না। অর্জুনের মনে তাই নিয়ে সন্দেহ ছিল। এই একাদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে ভগবান অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখার নির্দেশ দিলেন এবং বললেন যে তুমি আরও কিছু যদি দেখতে চাও, তাও দেখো (১১।৭) অর্থাৎ কার জয় হবে, কে পরাজিত হবে—তাও

---

[১] ভীষ্ম, দ্রোণ এবং কর্ণ তাঁদের শৌর্যবীর্যের জন্য জগতে প্রসিদ্ধ ছিলেন ; তাই এঁদের জয় করা কঠিন ছিল। জয়দ্রথ তেমন কোনো নামি যোদ্ধা ছিলেন না, কিন্তু তিনি একটি বর পেয়েছিলেন যে, তাঁর মস্তক ছিন্ন করে যে মাটিতে ফেলবে, তার মস্তক শত খণ্ড হয়ে যাবে। সেই বরের জন্য জয়দ্রথকে বধ করা শক্ত ছিল।

তুমি দেখে নাও। তারপর ভগবান বিশ্বরূপের অন্তর্গত ভীষ্ম, দ্রোণ এবং কর্ণের বিনাশ দেখিয়ে দিলেন এবং এই শ্লোকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে, যুদ্ধে তুমি নিঃসন্দেহে জয়ী হবে।

বিশেষ কথা

সাধকদের সাধনায় বাধারূপে বিনাশশীল পদার্থ, ব্যক্তি ইত্যাদির যে আকর্ষণ দেখা যায়, তাতে তাঁরা এই ভেবে শঙ্কিত থাকেন যে আমার চেষ্টাতে কোনো কাজ হচ্ছে না। তাহলে এই আকর্ষণ কী করে মিটবে ? ভগবান **'ময়ৈবেতে নিহতাঃ পূর্বমেব'** এবং **'ময়া হতাংস্ত্বং জহি'** পদগুলির দ্বারা ধৈর্য ধরতে আশ্বাস দিয়ে যেন বলছেন যে, তোমার সাধনাতে বিঘ্নবাধা রূপে যেসব বস্তুর আকর্ষণ দেখা যাচ্ছে এবং বৃত্তিগুলি খারাপ বলে মনে হচ্ছে, সে সমস্ত বিঘ্ন বিনাশশীল এবং আমা কর্তৃক বিনষ্টিকৃত। অতএব সাধকরা যেন এ বিষয়ে গুরুত্ব না দেন।

'দুর্গুণ-দুরাচার দূর হচ্ছে না, কী করব ?'—সাধকের অহংকারই হল এরূপ চিন্তার কারণ এবং **'এগুলি দূর হওয়া উচিত এবং শীঘ্রই হওয়া উচিত'**—ভগবানের প্রতি বিশ্বাস, ভরসা এবং আশ্রয় কম হওয়ায় এরূপ হয়। দুর্গুণ-দুরাচার ভালো লাগে না, সহ্য হয় না, এতে দোষ নেই। দোষ হল চিন্তা করায়। তাই সাধকদের কখনো চিন্তা করা উচিত নয়।

'আমা কর্তৃক নিহতদের তুমি বধ করো'—এই কথায় এমন আশঙ্কা হয় যে কালরূপী ভগবান দ্বারা যখন সকলে নিহত, তাহলে জগতে কেউ কাউকে মারলে তা ভগবানের দ্বারা নিহতকেই মেরে থাকে। অতএব হত্যাকারীর পাপ হওয়া উচিত নয়। এর উত্তর হল, কাউকে মারার বা দুঃখ দেবার অধিকার মানুষের নেই। তার সকলকে সেবা করার বা সুখী করার অধিকারই শুধু আছে। মারার অধিকার যদি থাকত, তবে নানা বিধি-নিষেধ অর্থাৎ সুকর্ম করো, অশুভ কর্ম কোরো না—এইসব শাস্ত্রের, গুরুজনদের এবং সাধুদের কথা ব্যর্থ হয়ে যাবে। এই বিধি-নিষেধ কার ওপর প্রাযোজ্য হবে ? তাই মানুষ কাউকে মারলে বা দুঃখ দিলে পাপ হবেই ; কারণ এটি তার রাগ-দ্বেষ পূর্ণ অনধিকার কর্ম। কিন্তু ক্ষত্রিয়েরা যদি শাস্ত্রবিহিত যুদ্ধ প্রাপ্ত হন, তাহলে স্বার্থ ও অহংকার পরিত্যাগ করে কর্তব্য পালন রূপে যুদ্ধ করলে পাপ হয় না ; কারণ যুদ্ধ হল ক্ষত্রিয়দের স্বধর্ম।

পরিশিষ্ট-ভাব—ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে, এই সব শূরবীরগণকে আমি আগেই হত্যা করে রেখেছি। এর দ্বারা বুঝতে হবে যে সাধকের রাগ-দ্বেষ, কাম-ক্রোধ ইত্যাদি আগে থেকেই মারা হয়েছে অর্থাৎ এগুলির অস্তিত্ব লুপ্ত হয়েছে। আমরাই এগুলিকে অস্তিত্ব ও গুরুত্ব দিয়ে স্বীকার করে নিয়েছি। প্রকৃত পক্ষে এগুলির কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্বই নেই—**'নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ'** (গীতা ২।১৬)।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—ভগবানের অত্যন্ত উগ্র বিশ্বরূপ দেখে একত্রিশতম শ্লোকে অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কে এবং এখানে কেন এসেছেন ?' বত্রিশতম শ্লোকে ভগবান তার উত্তরে জানালেন যে, আমি বর্ধিতকাল এবং সকলকে সংহার করতেই এখানে এসেছি। আবার তেত্রিশ-চৌত্রিশতম শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে আশ্বাস দিয়ে বলছেন, 'আমার দ্বারা নিহতদের তুমি বধ করো, তোমার জয় হবে।' তখন অর্জুন কী করলেন—পরবর্তী শ্লোকে সঞ্জয় তাই জানাচ্ছেন।

সঞ্জয় উবাচ

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য॥ ৩৫ ॥

[**কেশবস্য** (ভগবান কেশবের) ; **এতৎ, বচনম্** (সেই কথা) ; **শ্রুত্বা, বেপমানঃ** (শুনে ভীতকম্পিত) ; **কিরীটী** (কিরীটীধারী অর্জুন) ; **কৃতাঞ্জলিঃ** (কৃতাঞ্জলিপুটে) ; **নমস্কৃত্বা** (নমস্কার করে) ; **ভীতভীতঃ, এব** (ভীতসন্ত্রস্ত ভাবে) ; **ভূয়ঃ, প্রণম্য** (পুনরায় প্রণাম করে) ; **সগদ্গদম্** (গদগদস্বরে) ; **কৃষ্ণম্** (ভগবান কৃষ্ণকে) ; **আহ** (বললেন।)]

সঞ্জয় বললেন—ভগবান কেশবের সেই কথা শুনে ভীতকম্পিত কিরীটী (অর্জুন) কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার করে এবং ভীতসন্ত্রস্তভাবে পুনরায় প্রণাম করে গদ্গদ স্বরে ভগবানকে বললেন॥ ৩৫ ॥

ব্যাখ্যা—**'এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী'**—অর্জুন তো প্রথম থেকেই ভীতসন্ত্রস্ত ছিলেন, আবার ভগবান 'আমি কাল, সবকিছু সংহার করব'—এইসব বলে তিনি যেন ভীত অর্জুনকে আরও সন্ত্রস্ত করতে চাইলেন। তাৎপর্য হল এই যে, **'কালোঽস্মি'** এখান থেকে **'ময়া হতাংস্ত্বং জহি'**—এই পর্যন্ত ভগবান শুধু বিনাশের কথাই বলেছেন। তাই শুনে অর্জুন ভীতকম্পিত হয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে বারংবার প্রণাম করতে লাগলেন।

ইন্দ্রকে সাহায্য করার জন্য অর্জুন যখন কাল, খঞ্জ ইত্যাদি রাক্ষসদের বধ করেছিলেন, তখন ইন্দ্র প্রসন্ন হয়ে তাঁকে সূর্যের ন্যায় দীপ্তিসম্পন্ন এক দিব্য 'কিরীট' (মুকুট) প্রদান করেন। তাতে অর্জুনের আর এক নাম হয়েছিল **কিরীটী**[১]। এখানে 'কিরীটী' বলার তাৎপর্য হল যে, যিনি বড় বড় রাক্ষসদের মেরে ইন্দ্রকে সাহায্য করেছিলেন, সেই অর্জুন-ই ভগবানের বিশ্বরূপ দেখে ভীতকম্পিত হচ্ছেন।

'নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং সগদগদং ভীতভীতঃ প্রণম্য'—কাল সবকিছু সংহার করে ; কাউকেই ছাড়ে না। কারণ এটি হল ভগবানের সংহারশক্তি যা সর্বক্ষণ সংহার করে চলেছে। এদিকে অর্জুন যখন ভগবানের অত্যুগ্র বিরাটরূপ দেখলেন তখন তাঁর যেন মনে হল ভগবান কালেরও কাল—মহাকাল। তিনি ছাড়া আর কেউই কাল থেকে রক্ষা করার নেই। তাই অর্জুন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বারংবার ভগবানকে প্রণাম করতে লাগলেন।

'ভূয়ঃ' বলার অর্থ হল যে আগে পঞ্চদশ থেকে একত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত অর্জুন ভগবানের স্তুতি করেছিলেন ও তাঁকে প্রণাম জানিয়েছিলেন, এখন পুনরায় তিনি ভগবানের স্তুতি করে তাঁকে প্রণাম জানাচ্ছেন।

আনন্দে কণ্ঠ রুদ্ধ (গদ্‌গদ) হয়, আবার ভয়েও হয়। এখানে যদিও ভয়ের বিষয়ে বলা হয়েছে, কিন্তু অর্জুন যদি অত্যন্ত ভীত হতেন, তাহলে তিনি কথা বলতেই পারতেন না। কিন্তু এখানে তিনি অভিভূত কণ্ঠে বলেছেন, এতে বোঝা যায় যে তিনি তত ভীত হননি।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—এবারে পরবর্তী শ্লোক থেকে অর্জুন ভগবানের স্তুতি করছেন।

অর্জুন উবাচ

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ॥ ৩৬ ॥

[**হৃষীকেশ** (হে অন্তর্যামী ভগবান!) ; **তব, প্রকীর্ত্যা** (আপনার নাম, গুণ, লীলা কীর্তনে) ; **জগৎ** (সমস্ত জগৎ) ; **প্রহৃষ্যতি, চ** (হর্ষিত হচ্ছে এবং) ; **অনুরজ্যতে** (আপনার প্রতি অনুরক্ত হচ্ছে) ; **ভীতানি** (ভীত হয়ে) ; **রক্ষাংসি** (রাক্ষসেরা) ; **দিশঃ, দ্রবন্তি** (চতুর্দিকে পলায়ন করছে) ; **চ, সর্বে, সিদ্ধসঙ্ঘাঃ** (এবং সিদ্ধগণ) ; **নমস্যন্তি** (নমস্কার করছে) ; **স্থানে** (এ সবই যথোচিত।)]

অর্জুন বললেন—হে অন্তর্যামী ভগবান! আপনার নাম, গুণ, লীলা, কীর্তনে সমস্ত জগৎ হর্ষিত হচ্ছে এবং আপনার প্রতি অনুরক্ত হচ্ছে। আপনার নাম, গুণ ইত্যাদির কীর্তন-মাহাত্ম্যে ভীত হয়ে রাক্ষসেরা চতুর্দিকে পলায়ন করছে এবং সিদ্ধগণ আপনাকে প্রণাম করছেন। এসবই যথোচিত॥ ৩৬ ॥

ব্যাখ্যা—[জগতে দেখা যায় যে, কোনো ব্যক্তি অত্যন্ত ভীত হলে, তার বাক্‌রোধ হয়। অর্জুন ভগবানের অত্যন্ত উগ্ররূপ দেখে খুবই ভীত হয়েছিলেন। তাহলে তিনি কী করে এই ছত্রিশতম শ্লোক থেকে ছেচল্লিশতম শ্লোক পর্যন্ত ভগবানের স্তুতি করলেন? তার উত্তর হল যে, ভগবানের অতি ভয়ানক বিশ্বরূপ দেখে অর্জুন ভীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দিতও হয়েছিলেন, কেন-না তিনি পরে বলেছেন যে **'অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে'** (১১।৪৫)। এতে প্রমাণিত হয় যে অর্জুন এত ভীত হননি যে তিনি ভগবানের স্তুতিও করতে পারবেন না।]

[১]পুরা শক্রেণ মে দত্তং যুধ্যতো দানবর্ষভৈঃ। কিরীটং মূর্ধ্নি সূর্যাভং তেনাহুর্মাং কিরীটিনম্॥ (মহাভারত, বিরাটপর্ব ৪৪।১৭)

'হৃষীকেশ'—ইন্দ্রিয়গুলিকে বলা হয় 'হৃষীক' এবং সেগুলির 'ঈশ' বা অধীশ্বর হলেন ভগবান। এখানে এই সম্বোধন করার অর্থ হল এই যে, আপনি সকলের হৃদয়ে বিরাজ করে ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ প্রভৃতিকে সত্তা-স্ফূর্তি দেন।

'তব প্রকীর্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ'—সংসারে বীতরাগ হয়ে অপার প্রসন্নতার জন্য ভক্তেরা আপনার নাম-গুণ এবং লীলা-কীর্তন করেন, আপনার চরিত্র আলোচনা করে থাকেন, সমস্ত জগৎ এতে আহ্লাদিত হয়। অর্থাৎ মন সংসার-অভিমুখী হলে অশান্তি আসে, পরস্পরের মধ্যে রাগ-দ্বেষাদির সৃষ্টি হয়, কিন্তু যাঁরা আপনার শরণাগত হয়ে আপনার সাধন-ভজন করেন, জীবমাত্রই তাঁদের কাছ থেকে শান্তি লাভ করে থাকে, প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয় ; সেই জীবেরা তা বুঝতে পারুক বা না পারুক, এরূপ হয়েই থাকে।

ভগবান অবতাররূপে জন্মালে যেমন সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম, জড়-চেতন পৃথিবী আনন্দিত হয়ে ওঠে অর্থাৎ বৃক্ষ-লতা ইত্যাদি স্থাবর ; দেবতা, মানুষ, ঋষি, মুনি, কিন্নর, গন্ধর্ব, পশু, পক্ষী ইত্যাদি জঙ্গম ; নদী, দীঘি ইত্যাদি জড়—সবকিছুই প্রসন্ন হয়, তেমনই ভগবানের নাম, লীলা, গুণ ইত্যাদি কীর্তন করলে তার প্রভাব সকলের ওপর পড়ে এবং সকলেই আহ্লাদিত হয়।

ভগবানের নাম ও গুণাবলী কীর্তন করলে মানুষ যখন হর্ষিত হয় অর্থাৎ মন ভগবানে আকৃষ্ট হয়, তখন (ভগবানের প্রতি অভিনিবেশ হলে) তার ভগবানে অনুরাগ হয়, প্রেম হয়।

'রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি'—আপনার নাম-গুণ কীর্তন করলে, চরিত্রের মহিমা আলোচনা করলে, যেখানে যত রাক্ষস, ভূত, প্রেত, পিশাচ থাকে সব ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পলায়ন করে[১]।

রাক্ষস, ভূত, প্রেতাদির ভীত হয়ে পলায়ন করার কারণ শুধু ভগবানের নাম, গুণ কীর্তন নয় ; আসল কারণ হল তাদের নিজেদের পাপ। নিজ নিজ পাপের জন্যই তারা পবিত্র থেকে পবিত্রতর এবং মঙ্গল থেকে মহামঙ্গলস্বরূপ ভগবানের গুণগান সহ্য করতে পারে না। এদের মধ্যে যে সহ্য করতে পারে, সে-ই সংশোধিত হয়ে থাকে, দুষ্ট-যোনি পরিত্যক্ত হয়ে তার কল্যাণ প্রাপ্তি হয়।

'সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ'—সিদ্ধ, সন্ত-মহাত্মা এবং ভগবদ্-শরণাগত যত সাধক আছেন, তাঁরা সকলেই আপনার নাম, গুণ কীর্তন এবং আপনার লীলা-কথা শুনে আপনাকে নমস্কার করে থাকেন।

মনে রাখতে হবে যে এই সমস্ত দৃশ্যই ভগবানের নিত্য, দিব্য, অলৌকিক রূপের অন্তর্গত। তাতেই এক-একটি বিচিত্র লীলা সংঘটিত হচ্ছে।

'স্থানে'—এসবই যথোচিত। এইরূপই হওয়া উচিত এবং সেইরূপই হয়ে চলেছে। কারণ আপনার পথে চললে শান্তি, আনন্দ এবং প্রসন্নতা লাভ করা যায় এবং বিঘ্ন নাশ হয়। আপনাতে বিমুখ হলে শুধু দুঃখ এবং অশান্তিই হয়ে থাকে। অর্থাৎ আপনার অংশোদ্ভূত জীব আপনার শরণাগত হলে সুখ প্রাপ্ত হয় এবং তার মধ্যে শান্তি, ক্ষমা, বিনয় ইত্যাদি গুণ প্রকটিত হয়। আর আপনাতে বিমুখ হলে দুঃখ পায়—এ অনিবার্য।

জীবাত্মার স্থিতি হল পরমাত্মা ও জগতের মধ্যস্থানে। স্বরূপতঃ এটি সাক্ষাৎ পরমাত্মার অংশ। কিন্তু ধরে আছে প্রকৃতির অংশকে। জীব যত বেশি করে প্রকৃতির অর্থাৎ সংসারের প্রতি আকর্ষিত হতে থাকে, তার ভিতর ততই সঞ্চয় এবং ভোগের আগ্রহ বাড়তে থাকে। সেই সঞ্চয় ও ভোগাদির জন্য যত বেশি সে চেষ্টা করে, ততই তার মধ্যে অভাব, অশান্তি, দুঃখ, জ্বালা, সন্তাপ ইত্যাদি বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু এই জীবাত্মা যতই সংসারে বিমুখ হয়ে ভগবানের পথে চলে ততই তার মধ্যে আনন্দের প্রাপ্তি হতে থাকে এবং দুঃখও ক্রমশঃ দূর হতে থাকে।

---

[১]ন যত্র শ্রবণাদীনি রক্ষোঘ্নানি স্বকর্মসু। কুর্বন্তি সাত্বতাং ভর্তুর্যাতুধান্যশ্চ তত্র হি॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৬।৩)

'যেখানে সাধারণ মানুষেরা প্রতিদিনের কাজ-কর্মের মধ্যে রাক্ষসদের ভয় বিতাড়নকারী ভগবদ্‌নাম-গুণ লীলা শ্রবণ-কীর্তন করে না সেখানে রাক্ষসদের শক্তি কাজ করে।'

পরিশিষ্ট-ভাব—এখানে **'স্থানে'** পদটি পিছনে এবং সামনে—উভয় স্থানে আগত শ্লোকটির জন্য বুঝতে হবে। ভগবান বত্রিশ, তেত্রিশ এবং চৌত্রিশতম শ্লোকগুলিতে যে কথা বলেছেন আর এই শ্লোকে যে কথা বলেছেন, তারই পরিপ্রেক্ষিতে অর্জুন বলেছেন, 'আপনি যে বলছেন প্রতিপক্ষের সমস্ত যোদ্ধাকেই আপনি বধ করেছেন, আমাকে শুধুমাত্র নিমিত্ত হতে হবে, তা আপনার পক্ষে ঠিকই বলা হয়েছে।' 'আপনার নাম-গুণাদির কীর্তন করলে জগৎ আনন্দিত হয় এবং রাক্ষসেরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পলায়ন করে একথাও ঠিক। আপনার দ্বারাই এই সব লীলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, আমার দ্বারা নয়।'

* * *

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে 'স্থানে' পদটির দ্বারা যে ঔচিত্যের কথা বলা হয়েছে সেটির সমর্থনে পরবর্তী চারটি শ্লোকে বলছেন।

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্ গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎ পরং যৎ॥ ৩৭ ॥

[**মহাত্মন্** (হে মহাত্মন্ !) ; **গরীয়সে, চ** (গুরুর এবং) ; **ব্রহ্মণঃ, অপি** (ব্রহ্মারও) ; **আদিকর্ত্রে, তে** (আদিকর্তা আপনাকে) ; **কস্মাৎ, ন, নমেরন্** (প্রণাম কেন করবেন না ?) ; **অনন্ত** (হে অনন্ত !) ; **দেবেশ** (হে দেবেশ !) ; **জগন্নিবাস** (হে জগন্নিবাস !) ; **ত্বম্, অক্ষরম্** (আপনি অক্ষরস্বরূপ ব্রহ্ম) ; **সৎ** (সৎ) ; **অসৎ** (অসৎও আপনি) ; **তৎপরম্** (তারপরে) ; **যৎ** (যা আছে, তাও আপনি।)]

হে মহাত্মন্ ! গুরুর এবং ব্রহ্মারও আদিকর্তা আপনাকে (এই সিদ্ধগণ) প্রণাম কেন করবেন না ? কারণ হে অনন্ত ! হে দেবেশ ! হে জগন্নিবাস ! আপনি অক্ষরস্বরূপ ব্রহ্ম ; আপনিই সৎ, অসৎও আপনি এবং সদসতের অতীত যা কিছু আছে, সে সবও আপনি॥ ৩৭ ॥

ব্যাখ্যা—**'কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্ গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে'**—আদিরূপে প্রকটিত মহাস্বরূপ আপনাকে (পূর্বোক্ত সিদ্ধগণ) কেন প্রণাম করবেন না ? দুজনকে প্রণাম করা হয়—(১) যাঁর থেকে শিক্ষা লাভ করা হয় সেই আচার্য গুরুজনদের এবং (২) যাঁদের থেকে আমাদের জন্ম হয়েছে, সেই মাতা-পিতা এবং বয়সে, বিদ্যায় যারা আমাদের থেকে বড়, সেইসকল ব্যক্তিদের। অর্জুন বলেছেন যে, আপনি গুরুরও গুরু—**'গরীয়সে'**[১] এবং জগৎ রচনাকারী পিতামহ ব্রহ্মারও সৃজনকর্তা আপনি—**'ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে'**। সুতরাং মহাপুরুষগণের আপনাকে প্রণাম করাই যথোচিত।

'অনন্ত'—দেশ (স্থান), কাল, বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদি যেভাবেই আপনাকে দেখা হোক আপনার কোনো অন্ত পাওয়া যায় না। অর্থাৎ আপনাকে দেশের (স্থানের) দিক দিয়ে দেখলে আপনার কোথায় যে আরম্ভ হয়েছে এবং কোথায় অন্ত হয়েছে—কিছুই বোঝা যায় না। কালের দৃষ্টিতে দেখলে—আপনি কবে থেকে আছেন আর কতদিন পর্যন্ত থাকবেন—তার কোনো হিসেব নেই। বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদির দৃষ্টিতে দেখলে—আপনি বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদি কতরূপে যে প্রকটিত তার কোনো সীমাসংখ্যা নেই। সর্বদিক থেকেই আপনি অনন্ত। বুদ্ধি ইত্যাদির দ্বারা আপনাকে দেখতে গেলে, সেই দৃষ্টি শেষ হয়ে যায়, তবু আপনার অন্ত পাওয়া যায় না। সব দিক থেকেই আপনি অসীম, অপার, অগাধ।

'দেবেশ'—ইন্দ্র, বরুণ ইত্যাদি যত দেবতার বর্ণনা শাস্ত্রে পাওয়া যায়, সেইসব দেবতাদের আপনি প্রভু, নিয়ন্তা, শাসক। তাই আপনি **'দেবেশ'**।

'জগন্নিবাস'—অনন্ত বিশ্ব আপনার একাংশে অবস্থিত হলেও আপনার সেই অংশ তাতে পূর্ণ হয় না, খালিই থেকে যায়। তাই আপনাকে বলা হয়

[১]মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন যে, পূর্বের পূর্বকালে যত ব্রহ্মা প্রকটিত হয়েছেন এই পরমাত্মা তাঁদের সকলেরই গুরু—'পূর্বেষামপি গুরুঃ'। (যোগদর্শন ১।২৬)

অসীম—**'জগন্নিবাস'**।

'ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎ পরং যৎ'—আপনি অক্ষর (ব্রহ্ম) স্বরূপ[১]। স্বতঃসিদ্ধ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব যার থাকে সেই **'সৎ'** আপনিই। যার পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না, সতের আশ্রিত হওয়াতেই যার অস্তিত্ব প্রতীয়মান হয় সেই **'অসৎ'**ও আপনিই। যিনি সৎ এবং অসতের অতীত, যাঁর কোনোভাবেই নির্বচন হওয়া সম্ভব নয়, মন-বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি কোনো কিছুর দ্বারা যাঁকে কল্পনাও করা যায় না অর্থাৎ যা সমস্ত কল্পনার সর্বতোভাবে অতীত, তা আপনিই।

তাৎপর্য এই যে, আপনার থেকে বড় আর কেউ নেই, হতে পারে না এবং হওয়া সম্ভবও নয়—তাই আপনি সকলেরই প্রণম্য।

পরিশিষ্ট-ভাব—নবম অধ্যায়ে উদ্ধৃত **'সদসচ্চাহম্'** (৯।১৯) পদটির দ্বারা এবং এখানে উদ্ধৃত **'সদসৎ তৎ পরং যৎ'** পদটিতে পরমাত্মার সগুণ রূপের অনন্তভাব, সর্বব্যাপিতা প্রমাণিত হয়।

সৎ ও অসৎ—উভয়ই সাপেক্ষ হওয়ায় লৌকিক আর যেগুলি এর অতীত, সেগুলি নিরপেক্ষ, তাই অলৌকিক। লৌকিক ও অলৌকিক—সবই সমগ্র পরমাত্মার রূপ। পরমাত্মার পরা ও অপরা প্রকৃতি সৎ-অসতের অতীত নয়, কিন্তু পরমাত্মা সৎ-অসতের অতীত। **'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়'** (গীতা ৭।৭)।

নির্গুণ সগুণের (সমগ্রের) অন্তর্গত হতে পারে, কিন্তু সগুণ নির্গুণের অন্তর্গত হতে পারে না। কারণ সগুণে নির্গুণের বাধা নেই, কিন্তু নির্গুণে গুণাদির বাধা আছে। সুতরাং নির্গুণ একদেশীয় অর্থাৎ সব কিছু নির্গুণের মধ্যে আসে না। কিন্তু সগুণের (সমগ্রের) মধ্যে সব কিছু আসে, কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। তাই অর্জুন এই **'সদসৎ তৎ পরং যৎ'** পদটির দ্বারা যেন বলতে চেয়েছেন যে সৎও আপনি, অসৎও আপনি এবং সৎ-অসৎ ব্যতীত যা কিছু আমরা কল্পনা করতে পারি, তা-ও আপনি। জ্ঞানদৃষ্টিতে যাকে সৎ বলা যায় না এবং অসৎও বলা যায় না, সেই অনির্বচনীয় তত্ত্বও আপনিই—**'ন সত্তন্নাসদুচ্যতে'** (গীতা ১৩।১২)। অর্থাৎ আপনি ব্যতীত কিছু হয়নি, হবে না এবং হওয়া সম্ভবও নয় অর্থাৎ একমাত্র আপনিই সব।

❋ ❋ ❋

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥ ৩৮ ॥

[**ত্বম্, আদিদেবঃ, চ** (আপনি আদিদেব ও) ; **পুরাণঃ, পুরুষঃ** (অনাদি পুরুষ) ; **ত্বম্, অস্য** (আপনিই এই) ; **বিশ্বস্য** (জগতের) ; **পরম্, নিধানম্** (পরম আশ্রয়) ; **বেত্তা** (সকলের জ্ঞাতা এবং) ; **বেদ্যম্, চ, পরম্, ধাম** (জ্ঞাতব্য ও পরম ধাম) ; **অনন্তরূপ** (হে অনন্তরূপ !) ; **ত্বয়া, বিশ্বম্** (আপনিই এই জগতের) ; **ততম্** (ব্যাপ্তিস্বরূপ হয়ে বিরাজিত।)]

আপনি আদিদেব এবং অনাদি পুরুষ আর আপনিই এই জগতের পরম আশ্রয়। আপনিই সকলের জ্ঞাতা এবং জ্ঞাতব্য, পরমধাম। হে অনন্তরূপ ! আপনিই এই জগতে ব্যাপ্তিস্বরূপ হয়ে বিরাজিত ॥ ৩৮ ॥

ব্যাখ্যা—**'ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণঃ'**—আপনি সমস্ত দেবতার আদিদেব ; কারণ আপনিই সর্বপ্রথম প্রকটিত হয়েছেন। আপনিই অনাদিপুরুষ ; কারণ আপনি সর্বদা ছিলেন এবং সর্বদাই থাকবেন।

'ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্'—যা কিছু দেখা, শোনা, বোঝা এবং জানার জগৎ এবং জগতের উৎপত্তি-স্থিতি-প্রলয় ইত্যাদি যা কিছু হয়—সে সবেরই পরম আধার হলেন আপনি।

'বেত্তাসি'—আপনি সমস্ত জগতের জ্ঞাতব্য অর্থাৎ ভূত-ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কাল এবং দেশ, বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদি যা কিছু আছে, সে সবের জ্ঞাতা (সর্বজ্ঞ) আপনিই।

'বেদ্যম্'—বেদ, শাস্ত্রাদি, সাধু-মহাপুরুষদের দ্বারা জ্ঞাতব্য বিষয় আপনিই।

'পরং ধাম'—যাঁকে মুক্তি, পরমপদ ইত্যাদি নামে বলা

[১]এই অক্ষর ব্রহ্মকে অর্জুন আগে **'ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যম্'** (১১।১৮) পদের দ্বারা এবং এখানে **'ত্বমক্ষরম্'** পদের দ্বারা বলেছেন।

হয়, যেখানে গেলে আর ফিরে আসতে হয় না এবং যাঁকে লাভ করলে আর কিছু জানার এবং পাওয়ার অবশিষ্ট থাকে না, সেই পরমধাম আপনিই।

'অনন্তরূপ'—বিরাটরূপে প্রকটিত আপনার রূপের কোনো তুলনা নেই। সবদিক থেকেই আপনি অনন্তরূপ।

'ত্বয়া ততং বিশ্বম্'—সমস্ত জগৎ-সংসার আপনার দ্বারাই পরিব্যাপ্ত অর্থাৎ জগতের প্রতিটি কণায় আপনিই ব্যাপ্তিস্বরূপ হয়ে বিরাজমান।

পরিশিষ্ট-ভাব—অর্জুন ভগবানের কথিত বচনই আবার বলেছেন—**'আদিদেবঃ'**—এটিই ভগবান **'অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্বশঃ'** (১০।২) পদ দ্বারা বলেছেন। প্রকৃতি যদিও অনাদি—**'প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি'** (১৩।১৯), অনাদি হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃতি পরমাত্মার অধীন, আশ্রিত। কেন-না প্রকৃতি হল পরমাত্মার পরিবর্তনশীল শক্তি, কিন্তু পরমাত্মা কারও শক্তি নন, তিনি নিজেই শক্তিমান।

'পুরাণঃ'—এই বাক্যটি ভগবান **'পুরাণম্'** (৮।৯) পদে বলেছিলেন। ভগবানের থেকে পুরাতন (অনাদি) কেউই নেই, কারণ তিনি কালাতীত।

'পরং নিধানম্'—এটি ভগবান **'নিধানম্'** (৯।১৮) পদে বলেছিলেন। সৃষ্টি (জগৎ) অনন্ত হলেও তা ভগবানের একাংশে অবস্থিত।

'বেত্তা'—এটি ভগবান **'বেদাহং সমতীতানি'** (৭।২৬) ইত্যাদি পদে বলেছেন।

'বেদ্যম্'—ভগবান এটি **'বেদ্যম্'** (৯।১৭) পদে বলেছেন।

'পরং ধাম'—এটি ভগবান **'যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম'** (৮।২১) পদে বলেছেন।

'ত্বয়া ততং বিশ্বম্'—ভগবান একথা **'যেন সর্বমিদং ততম্'** (৮।২২) এবং **'ময়া ততমিদং সর্বম্'** (৯।৪) পদগুলিতে বলেছেন।

※ ※ ※

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥ ৩৯ ॥

[**ত্বম, বায়ুঃ** (আপনিই বায়ু) ; **যমঃ, অগ্নিঃ** (যম, অগ্নি) ; **বরুণঃ, শশাঙ্কঃ** (বরুণ, চন্দ্র) ; **প্রজাপতিঃ, চ** (দক্ষাদি প্রজাপতি এবং) ; **প্রপিতামহঃ** (প্রপিতামহ) ; **তে, সহস্রকৃত্বঃ** (আপনাকে সহস্রবার) ; **নমঃ, অস্তু** (প্রণাম করি !) ; **নমঃ, চ, পুনঃ, অপি** (প্রণাম এবং পুনরায়) ; **তে, ভূয়ঃ** (আপনাকে বারংবার) ; **নমঃ, নমঃ** (প্রণাম করি ! প্রণাম !!)]

আপনিই বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, দক্ষাদি প্রজাপতি এবং প্রপিতামহ (ব্রহ্মার জনক)ও আপনি। আপনাকে সহস্রবার প্রণাম করি ! প্রণাম !! এবং আপনাকে বারে বারে প্রণাম করি ! প্রণাম !! ॥ ৩৯ ॥

ব্যাখ্যা—'বায়ু'—যার থেকে সকলে প্রাণ লাভ করে, প্রাণীমাত্রই বেঁচে থাকে, সকলে সামর্থ্য পায় আপনিই সেই বায়ু।

'যমঃ'—যিনি সংযমনীপুরীর অধিকর্তা এবং সমস্ত জগতে যাঁর শাসন চলে, সেই যমও আপনি।

'অগ্নিঃ'—যা সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত থেকে শক্তি প্রদান করে, প্রকটিত হয়ে দীপ্তি প্রদান করে এবং জঠরাগ্নি রূপে অন্ন পরিপাক করে, সেই অগ্নি আপনিই।

'বরুণঃ'—যার সাহায্যে সকলেই জীবন প্রাপ্ত হয়, সেই জলের অধিপতি বরুণও আপনি।

'শশাঙ্কঃ'—যে চন্দ্রের সাহায্যে ঔষধি এবং বনস্পতি পুষ্টিলাভ করে, তা-ও আপনি।

'প্রজাপতিঃ'—প্রজা উৎপাদনকারী দক্ষাদি প্রজাপতি-গণও আপনি।

'প্রপিতামহঃ'—পিতামহ ব্রহ্মারও প্রকাশক হওয়ায় আপনি আমাদের প্রপিতামহ।

'নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে'—ইন্দ্রাদি যত দেবতা আছেন, সে সবই আপনি। আপনি অনন্তস্বরূপ। আপনার স্তুতি আমি কীভাবে করব ? কী মহিমাই বা গাইব ? আমি শুধু আপনাকে শত সহস্রবার

নমস্কারই করতে পারি, তাছাড়া আর কী-ই বা করব ?

কিছু করার দায়িত্ব মানুষের ততক্ষণই থাকে, যতক্ষণ তার নিজের কাজ করার শক্তি অর্থাৎ ক্ষমতা থাকে। যখন তার কিছু করার ক্ষমতা থাকে না, তখন দায়িত্বও থাকে না। তখন সে শুধু নিজেকে সমর্পণই করে থাকে, অর্থাৎ নিজেকে সর্বতোভাবে ভগবানে সমর্পিত করে দেয়। তখন করা এবং করানো সমস্ত কাজের ভার শরণ্যের (ভগবানের) ওপর থাকে, শরণাগতের ওপর নয়।

※ ※ ※

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্বত এব সর্ব।
অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ।। ৪০ ।।

[**সর্ব** (হে সর্বস্বরূপ !) ; **তে, পুরস্তাৎ** (আপনাকে সম্মুখে) ; **নমঃ, অথ** (নমস্কার করি) ; **পৃষ্ঠতঃ** (পশ্চাতে) ; **তে, সর্বতঃ, এব** (আপনাকে সর্বদিক থেকেই) ; **নমঃ, অস্তু** (নমস্কার করি) ; **অনন্তবীর্য** (হে অনন্তবীর্য !) ; **অমিতবিক্রমঃ** (অমিত বিক্রমশালী) ; **ত্বম্** (আপনি) ; **সর্বম্** (সকলকে) ; **সমাপ্নোষি** (সমাবৃত করে রেখেছেন) ; **ততঃ** (সুতরাং) ; **সর্বঃ** (সব কিছু) ; **অসি** (আপনিই ।)]

হে সর্বস্বরূপ ! আপনাকে সম্মুখে নমস্কার করি, পশ্চাতে নমস্কার করি ! সর্বদিক থেকেই নমস্কার করি ! হে অনন্তবীর্য ! অমিত বিক্রমশালী আপনি সকলকে সমাবৃত করে রেখেছেন ; সুতরাং সবকিছু আপনিই ॥ ৪০ ॥

ব্যাখ্যা—**'নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্বত এব সর্ব'**—অর্জুন ভীত হয়েছিলেন। আমি কী বলব—সে-কথা তিনি বুঝতে পারছিলেন না। তাই তিনি সম্মুখে, পশ্চাতে, সর্বদিক থেকে অর্থাৎ দশ দিক থেকে শুধু নমস্কারই জানাচ্ছিলেন।

'অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বম্'—'অনন্তবীর্য' বলার অর্থ হল যে আপনি তেজ, বল ইত্যাদিতেও অনন্ত ; আর 'অমিতবিক্রম' বলার অর্থ হল যে আপনার পরাক্রমশালী সংরক্ষণ ইত্যাদি কার্যও অপরিমেয়। এইরূপ আপনার শক্তিও অনন্ত এবং পরাক্রমও অনন্ত।

'সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ'—আপনি সবকিছু সমাবৃত করে রেখেছেন অর্থাৎ সমস্ত সংসার আপনারই অন্তর্গত। জগতে এমন কোনো অংশ নেই যা আপনার অন্তর্গত নয়।

অর্জুন একটি বিশেষ অলৌকিক ব্যাপার দর্শন করছিলেন যে ভগবান অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে পরিপূর্ণরূপে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন এবং এই অনন্ত সৃষ্টি ভগবানের একাংশেমাত্র অবস্থিত।

পরিশিষ্ট-ভাব—ভগবানের দিব্য বিরাটরূপ দর্শন করে অর্জুন বললেন, আপনি নিজ তেজে এই জগৎ-সংসারকে সন্তপ্ত করছেন—**'স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্'** (১১।১৯) অতএব সন্তপ্তকারী এবং সন্তাপিত হওয়া উভয়ই সেই এক বিরাট রূপেরই অঙ্গ। ভগবানের উগ্র রূপ দেখে তিনলোক ব্যথিত ও ব্যাকুল হচ্ছে—**'লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্'** (১১।২০) সুতরাং ব্যথিত হওয়া ত্রিলোকও ভগবানের বিরাট রূপেরই অঙ্গ। ভগবানকে দেখে দেবগণ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে তাঁর গুণগান করছেন—**'কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি'** (১১।২১) এবং রাক্ষসগণ ভয়ভীত হয়ে চতুর্দিকে পালাচ্ছে—**'রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি'** (১১।৩৬)। অতএব ভীতসন্ত্রস্ত এই সব দেবগণ ও রাক্ষসগণও ভগবানের সেই বিরাটরূপেরই অঙ্গ। কারণ এই সব দেবতা ও রাক্ষসেরা কেউই কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন না, অর্জুন তাঁদের সকলকে ভগবানের বিরাট রূপের মধ্যেই দর্শন করেছিলেন।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর, রুদ্র, আদিত্য, বসু, সাধ্য, বিশ্বদেব, অশ্বিনীকুমার, মরুদ্‌গণ, পিতৃকুল, সর্প, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, অসুর, ঋষি-মহর্ষি, সিদ্ধ, বায়ু, যমরাজ, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি, এছাড়াও ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথ প্রমুখ রাজন্যবর্গ— এরা সকলেই এই দিব্য বিরাটরূপেরই অঙ্গ। শুধু তাই নয়, অর্জুন, সঞ্জয়, ধৃতরাষ্ট্র এবং কৌরব ও পাণ্ডবসেনাও সেই বিরাটরূপেরই অঙ্গ—**'সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ'**।

তাৎপর্য হল এই যে—জড়-চেতন, স্থাবর-জঙ্গমরূপে দেখা-শোনা বা যা চিন্তায় আসে সে সবই অবিনাশী ভগবান। এই তত্ত্ব অনুভব করার জন্য সাধককে দৃঢ়তার সঙ্গে মেনে নিতে হয় যে এগুলি আমার বুদ্ধিতে আসুক বা না আসুক অনুভবে আসুক বা না আসুক, স্বীকার করি বা না করি, কিন্তু এ কথা সত্য। যেমন জলের একটি কণা বা সমুদ্রে একই জল-তত্ত্ব বিদ্যমান, তেমনই ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম এবং বৃহৎ হতে বৃহত্তম প্রত্যেক বস্তুতে একই পরমাত্মতত্ত্ব পরিপূর্ণ —এই কথা মেনে নিয়ে সাধক সর্বক্ষণ যেন মনে মনে সকলকে নমস্কার করে থাকেন। তিনি বৃক্ষ, নদী, পাহাড়, প্রাচীর, প্রস্তর ইত্যাদি যা কিছুই দর্শন করুন না কেন, তার মধ্যে নিজ ইষ্টকে দর্শন করে প্রার্থনা করবেন—'হে নাথ! আমাকে আপনার প্রেম প্রদান করুন, হে প্রভু! আপনাকে আমি নমস্কার জানাই!' এরূপ করলে তিনি সর্বত্র ভগবানকে দেখতে থাকবেন, কেন-না আসলে সবই তো ভগবান।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—পরবর্তী দুটি শ্লোকে অর্জুন ভগবানের কাছে ক্ষমা চেয়ে প্রার্থনা করছেন।

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি॥ ৪১ ॥
যচ্চাবহাসার্থমসৎ কৃতোঽসি বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎ সমক্ষং তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্॥ ৪২ ॥

[**তব, ইদম্, মহিমানম্** (আপনার মহিমা) ; **অজানতা** (না জেনে) ; **সখা, ইতি, মত্বা** (আমার সখা বলে মনে করে) ; **ময়া, প্রমাদাৎ** (আমি ভুলবশতঃ) ; **বা, প্রণয়েন, অপি** (বা প্রণয়বশতঃ) ; **প্রসভম্** (হঠকারী হয়ে) ; **হে, কৃষ্ণ** (হে কৃষ্ণ!) ; **হে, যাদব** (হে যাদব!) ; **হে সখে** (হে সখা!) ; **ইতি, যৎ, উক্তম্** (এইরূপ যা কিছু বলেছি) ; **চ, অচ্যুত** (এবং হে অচ্যুত!) ; **অবহাসার্থম্** (হাস্য-পরিহাসছলে) ; **বিহারশয্যাসন, ভোজনেষু** (চলতে ফিরতে, শয়নে-জাগরণে, উঠতে-বসতে খাওয়ার সময়) ; **একঃ, অথবা** (একা অথবা) ; **তৎ, সমক্ষম্** (সকলের সামনে) ; **যৎ** (যা কিছু) ; **অসৎকৃতঃ, অসি** (অনাদর করেছি) ; **অপ্রমেয়ম্** (হে অপ্রমেয় স্বরূপ) ; **তৎ** (ওইসব) ; **ত্বাম্** (আপনার কাছে) ; **অহম্** (আমি) ; **ক্ষাময়ে** (ক্ষমা প্রার্থনা করছি।)]

আপনার মহিমা এবং স্বরূপ না জেনে 'আমার সখা' বলে মনে করে ভুলবশতঃ বা প্রণয়বশতঃ হঠকারী হয়ে (অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবে) 'হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখা!' এইরূপ যা কিছু বলেছি ; হে অচ্যুত! হাস্যপরিহাসছলে, চলতে-ফিরতে, শয়নে-জাগরণে, উঠতে-বসতে, খাওয়ার সময় একা অথবা ওই সব আত্মীয়-বন্ধু প্রভৃতির সমক্ষে আমি আপনার যত অনাদর করেছি, তার জন্য অপ্রমেয়স্বরূপ, আপনার কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি॥ ৪১-৪২ ॥

ব্যাখ্যা—[অর্জুন যখন বিরাট-দর্শন ভগবানের অতি ভয়ানক রূপ দেখে ভীত হলেন তখন তিনি ভগবানের কৃষ্ণরূপ বিস্মৃত হলেন এবং জিজ্ঞাসা করে ফেললেন যে, হে উগ্ররূপধারী আপনি কে? পরে যখন তাঁর শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে পড়ল যে ইনিই তিনি, তখন তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখে অর্জুনের বন্ধুত্ব সম্পর্কের কথা স্মরণে আসায় তিনি তাঁর পূর্ব ব্যবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।]

'সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি'—যিনি বড় মানুষ, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তাঁকে নাম ধরে ডাকা যায় না। তাঁর জন্য 'আপনি', 'মহারাজ' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করতে হয়। কিন্তু আপনাকে কখনো 'হে কৃষ্ণ', কখনো 'হে যাদব' আবার কখনো 'হে সখা' বলে ডেকেছি। এর হেতু কী? **'অজানতা মহিমানং**

তবেদম্'[১]—এর কারণ হল যে আমি আপনার এই অতি বিশেষ মহিমা এবং স্বরূপ কিছুই জানতাম না। আপনার একাংশে যে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করছে—একথা আমি আগে জানতাম না। আপনার প্রভাব-প্রতিপত্তির দিকে আমার দৃষ্টি ছিল না। আমি কখনো ভেবেই দেখিনি যে আপনি কে এবং কেমন ?

অবশ্যই অর্জুন ভগবানের স্বরূপ, মহিমা, প্রভাব আগেও কিছু জানতেন, সেইজন্যই তিনি এক অক্ষৌহিণী সেনার পরিবর্তে নিরস্ত্র ভগবানকে বরণ করেছিলেন। কিন্তু ভগবানের শরীরের একাংশে যে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত—এইরূপ প্রভাব, স্বরূপ, মহিমা অর্জুন আগে জানতেন না। ভগবান কৃপাপরবশ হয়ে বিশ্বরূপ দেখালে অর্জুনের দৃষ্টি ভগবানের প্রভাবের দিকে পড়ে এবং তিনি ভগবানকে কিছু কিছু জানতে পারেন । তখন তাঁর এরূপ বিচিত্র অনুভূতি হয় যে, 'কোথায় আমি আর কোথায় এই দেবাদিদেব ? কিন্তু আমি ভ্রমবশতঃ বা প্রণয়বশতঃ হঠকারী হয়ে, না জেনে, না বুঝে, যা মনে এসেছে, তাই বলেছি— **'ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি'** ; এরূপ ব্যবহারের সময় আমি কখনো সাবধানতা অবলম্বন করিনি !'

প্রকৃতপক্ষে ভগবানের মহিমা সর্বতোভাবে জানা কারও পক্ষে সম্ভব নয় কারণ তাঁর মহিমা অনন্ত। যদি তাঁকে জানা সম্ভব হয় তাহলে তাঁর অনন্ত ভাব আর কোথায় থাকে, সেটি তো সীমিত হয়ে যাবে ! ভগবানের সামর্থ্য থেকে উদ্ভূত বিভূতিগুলিরই যখন অন্ত পাওয়া যায় না, তখন তাঁর এবং তাঁর মহিমার অন্ত কী করে ধারণায় আসতে পারে ? অর্থাৎ তা আসতেই পারে না।

'যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি বিহারশয্যাসনভোজনেষু' —আমি আপনাকে আমার সমকক্ষ সাধারণ বন্ধু মনে করে হাস্য-পরিহাস করার সময়, পথে চলা-ফেরায়, শয়নে, জাগরণে, ওঠা-বসায় বা ভোজনকালে যা কিছু বাক্য ব্যবহার করেছি, তাতে আপনার অমর্যাদা হয়েছে অথবা হে অচ্যুত ! আপনাকে একাকী বা আত্মীয়-বন্ধু সমক্ষে যা কিছু অনাদর সূচক বাক্য বলেছি, তার জন্য আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি **'একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎ সমক্ষং তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্'**।

অর্জুন এবং ভগবানের বন্ধুত্বের এমন বর্ণনা পাওয়া যায় যেন সাধারণ দুই বন্ধু নিজেদের মধ্যে হাসি-তামাসা করছেন। স্নান করার সময় কখনো অর্জুন ভগবানের গায়ে জল ছুঁড়তেন কখনো বা ভগবান অর্জুনের গায়ে। আবার কখনো অর্জুন ভগবানের পিছনে দৌড়তেন কখনো ভগবান অর্জুনের পিছনে। কখনো দুজনে হাস্য-পরিহাসে ব্যাপৃত হতেন । কখনো নিজ নিজ বিশেষ কলা-চাতুরি প্রদর্শন করতেন। কখনো ভগবান শুয়ে পড়লে অর্জুন অনুযোগ করতেন—'তুমি এত ছড়িয়ে শুয়েছ, আর কেউ শোবে না নাকি ? তুমি একলাই নাকি ?' কখনো ভগবান আসনে বসে পড়লে অর্জুন বলে উঠতেন—'আসনে তুমি একাই বসবে নাকি ? আর কাউকে বসতে দেবে না ? একলাই আধিপত্য করবে, একটু পাশ ঘেঁষে বসো তো ?' এইভাবে অর্জুন ভগবানের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ব্যবহার করতেন[২]। অর্জুন এখন সেইসব কথা স্মরণ করে বলছেন যে, 'হে ভগবন্! না জানি আমি আপনাকে কত রকমভাবে অনাদর অপমান করেছি, আমার তো সবকিছু মনেও নেই ! যদিও আমার করা অনাদর অবহেলার প্রতি আপনি নজর দেননি, তবুও আমার দ্বারা আপনার যা কিছু অমর্যাদা হয়েছে তার জন্য আমি ক্ষমা চাইছি।' ভগবানকে **'অপ্রমেয়'** বলার অর্থ হল যে, দিব্যদৃষ্টি থাকলেও, আপনি দিব্যদৃষ্টির অন্তর্গত নন।

---

[১]'মহিমানং তব ইদম্'—এতে ব্যবহৃত 'ইদম্' পদটি 'মহিমানম্'-এর বিশেষণ নয় ; কারণ 'মহিমানম্' পদটি পুংলিঙ্গ এবং 'ইদম্' পদটি ক্লীবলিঙ্গ। অতএব এইস্থানে 'ইদম্'-এর অর্থ 'স্বরূপ' ধরা হয়েছে। সেই দৃষ্টিতে 'মহিমানং তব ইদম্'-এর অর্থ—আপনার মহিমা ও স্বরূপ।

[২]শয্যাসনাটনবিকত্থনভোজনাদিষ্বৈক্যাদ্ বয়স্য ঋতবানিতি বিপ্রলব্ধঃ।
সখ্যুঃ সখেব পিতৃবত্তনয়স্য সর্বং সেহে মহান্ মহিতয়া কুমতেরঘং মে॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ১।১৫।১৯)

অর্জুন বলছেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শোওয়া-বসা-ঘুমানো-কথা বলা এবং আহারাদি করায় আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এমন সহজ হয়ে গিয়েছিল যে, আমি কখনো কখনো কটাক্ষ করে বলতাম 'ওহে তুমি বড় সত্যবাদী !' কিন্তু এই মহাপুরুষ তাঁর মহিমা অনুযায়ী আমার কুবুদ্ধিজাত সমস্ত অনাদর এমনভাবে সহ্য করতেন, যেমন কোনো বন্ধু তার বন্ধুর অথবা কোনো পিতা তাঁর পুত্রের অনাদর সহ্য করেন।

পরিশিষ্ট-ভাব—ভগবানের সঙ্গে অর্জুনের সখা-সম্পর্ক ছিল, কিন্তু ভগবানের ঐশ্বর্য দেখে অর্জুন তাঁর সখ্য সম্পর্ক বিস্মৃত হচ্ছেন এবং ভগবানকে দেখে আশ্চর্য হচ্ছেন, ভীতসন্ত্রস্ত হচ্ছেন। তিনি কখনো কল্পনাও করেননি যে ভগবান এইরূপ !

* * *

সম্বন্ধ—পরবর্তী দুটি শ্লোকে অর্জুন ভগবানের মহত্ত্ব ও প্রভাবের বর্ণনা করে পুনরায় ক্ষমা প্রার্থনা করছেন।

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব॥ ৪৩ ॥

[ত্বম্ (আপনিই) ; অস্য, চরাচরস্য, লোকস্য (সকল চরাচরের) ; পিতা, অসি (পিতা) ; পূজ্যঃ (পরম পূজনীয়) ; চ, গরীয়ান্, গুরুঃ (এবং গুরুরও গুরু) ; অপ্রতিমপ্রভাব (হে অনন্ত প্রভাবশালী ভগবন্!) ; লোকত্রয়ে (ত্রিলোকে) ; ত্বৎসমঃ, অপি (আপনার সমানও) ; অন্যঃ, ন, অস্তি (কেউ নেই) ; অভ্যধিকঃ (শ্রেষ্ঠ) ; কুতঃ (হবে কীভাবে ?)]

আপনিই সকল চরাচরের পিতা, আপনি পরম পূজ্য, গুরুরও মহাগুরু। হে অনন্ত প্রভাবশালী ভগবান ! ত্রিলোকে যখন আপনার সমানও কেউ নেই, তখন আপনার থেকে শ্রেষ্ঠ বা বড় কেউ হবেই বা কীভাবে ? ॥ ৪৩ ॥

ব্যাখ্যা—**'পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য'**—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে মানুষ-পশু-পক্ষী যতপ্রকার জঙ্গম প্রাণী আছে এবং বৃক্ষ-লতাদি যত স্থাবর প্রাণী আছে, সেইসবের উৎপন্নকারী এবং পালনকারী পিতা আপনিই, আপনিই তাদের পরম পূজ্য এবং শিক্ষা প্রদানকারী মহাগুরুও আপনি—**'ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুগরীয়ান্'**।

'গুরুগরীয়ান্'-এর তাৎপর্য হল যে, মানুষমাত্রেরই জাগতিক বা পারমার্থিক শিক্ষা যে ব্যক্তি বা গুরুর কাছ থেকে লাভ হয়, সেই শিক্ষা প্রদানকারী গুরুদেবেরও মহাগুরু আপনিই অর্থাৎ শিক্ষামাত্রেরই ও জ্ঞানমাত্রেরই উদ্‌গম স্থান হলেন আপনি।

'ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব'—সমগ্র ত্রিলোকে যখন আপনার সমকক্ষ কেউ নেই, তখন আপনার থেকে শ্রেষ্ঠতর আর কে হতে পারে ? তাই আপনার প্রভাব অতুলনীয়, কারও সঙ্গেই তার তুলনা করা চলে না।

পরিশিষ্ট-ভাব—অর্জুন লৌকিক দৃষ্টিতে, জাগতিক অস্তিত্ব নিয়ে বলেছেন যে, ত্রিলোকে আপনার সমান আর কেউই নেই, তাহলে আপনার থেকে শ্রেষ্ঠ বা বড় থাকবে কীভাবে ? অপরপক্ষে বাস্তব দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যায় যখন ভগবান ব্যতীত অন্য আর কিছুই নেই, তখন এতে সমান বা শ্রেষ্ঠ বলার কোনো কারণই নেই।

* * *

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢুম্॥ ৪৪ ॥

[তস্মাৎ (তাই) ; ত্বাম্, ঈড্যম্ (সকলের বন্দনীয়) ; ঈশম্, অহম্ (ঈশ্বর, আপনাকে আমি) ; কায়ম্, প্রণিধায়, প্রণম্য (শারীরিকভাবে দণ্ডবৎ প্রণাম করে) ; প্রসাদয়ে (প্রসন্ন করছি) ; পিতা, ইব (পিতা যেমন) ; পুত্রস্য (পুত্রের) ; সখা, ইব, সখ্যুঃ (মিত্র যেমন মিত্রের) ; প্রিয়ঃ, প্রিয়ায় (পতি যেমন পত্নীর অপমান সহ্য করেন) ; দেব (হে দেব !) ; সোঢুম (সহ্য করতে) ; অর্হসি (সমর্থ।)]

তাই হে সকলের বন্দনীয় ঈশ্বর, আমি দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্বক আপনার স্তুতি করে, আপনাকে প্রসন্ন করার জন্য প্রার্থনা করছি। পিতা যেমন পুত্রের, মিত্র যেমন মিত্রের, পতি যেমন পত্নীর অপমান সহ্য করেন, তেমনই আপনিও আমার দ্বারা হওয়া অপমান সহ্য করতে সমর্থ॥ ৪৪ ॥

ব্যাখ্যা—**'তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্'**—আপনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর। অতএব সকলেরই স্তুতিযোগ্য একমাত্র আপনিই। আপনার গুণ, প্রভাব, মহত্ত্ব সবই অনন্ত ; তাই ঋষি, মহর্ষি, দেবতা, মহাপুরুষ আপনার সর্বক্ষণ স্তুতি করে থাকেন, তবুও মহিমার শেষ হয় না। অতএব আপনার স্তুতি আমি কীভাবে করব ? আপনাকে স্তুতি করার আমার শক্তি ও সামর্থ্য কিছুই নেই। তাই আমি শুধু আপনার শ্রীচরণে দণ্ডবৎ প্রণামই করতে পারি এবং তার দ্বারাই আপনাকে প্রসন্ন করতে চাই।

'পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াহসি দেব সোঢুম্'—কারও অপমানের পিছনে প্রধানতঃ তিনটি কারণ থাকে (১) প্রমাদ (অসাবধানতা), (২) হাস্য-পরিহাসকালে এবং (৩) কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হলে নৈকট্যজনিত কারণে মর্যাদা গুরুত্ব বিস্মৃত হলে। যেমন, ছোট শিশু পিতার কোলে বসে দাড়ি-গোঁফ টানতে থাকে, মুখে চাপড় মারে, কখনো লাথি মারে, শিশুর এইরূপ খেলাধুলো দেখে পিতা খুশি হন, প্রসন্নই হন। তাঁর মধ্যে এমন ভাব আসেই না যে পুত্র আমাকে অপমান করছে। বন্ধু বন্ধুর সঙ্গে চলা-ফেরা, ওঠা-বসার সময় যেমন খুশি ব্যবহার করে, যা খুশি বলে, যেমন 'তুমি তো খুব সত্য কথা বলো ভাই! তুমি তো খুব সত্য প্রতিজ্ঞ! আরে! তুমি তো এখন খুব বড় মানুষ হয়ে গেছ! তুমি তো খুব অভিমানী হয়েছ! তুমি যেন আজ রাজাই হয়ে গেছ ইত্যাদি।' কিন্তু তার বন্ধু এইসব কথায় দৃক্‌পাত করে না। সে মনে করে আমরা সমকক্ষ বন্ধু, এরূপ হাস্য-পরিহাস তো হয়েই থাকে! পরস্পরের প্রতি প্রেমবশতঃ পত্নীর দ্বারা পতির প্রতি একসঙ্গে ওঠা-বসা, কথাবার্তায় যা কিছু অবহেলা হয়, পতি তা সহ্য করে থাকে। যেমন, স্বামী হয়ত নীচে বসে আছে আর স্ত্রী উচ্চাসনে বসেছে, কখনো কোনো কথা নিয়ে অপমানও করে বসে, কিন্তু স্বামী তা স্বাভাবিক বলেই মনে করে নেয়। অর্জুন বলেছেন যে, যেমন পিতা পুত্রের, বন্ধু বন্ধুর এবং পতি পত্নীর অমর্যাদার প্রতি সহনশীল থাকে, তেমনই হে ভগবন্! আপনি আমার অপরাধ সহ্য করতে সক্ষম অর্থাৎ তার জন্য আমি আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

একচল্লিশ-বিয়াল্লিশতম শ্লোকে অর্জুন তিনটি কথা বলেছেন—**'প্রমাদাৎ'** (ভ্রমবশতঃ), **'অবহাসার্থম্'** (হাস্য-পরিহাসে) এবং **'প্রণয়েন'** (প্রণয়ে)। সেই তিনটি কথার ইঙ্গিত অর্জুন এখানে তিনটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে দিয়েছেন অর্থাৎ প্রমাদের জন্য পিতা-পুত্রের, হাস্য-পরিহাসের জন্য বন্ধু-বন্ধুর এবং প্রণয়ের জন্য পতি-পত্নীর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।

একাদশ অধ্যায়ে একাদশ রসের বর্ণনা

একাদশ অধ্যায়ে একাদশ রসের বর্ণনা এইভাবে দেওয়া হয়েছে—দেবরূপের বর্ণনা হওয়ায় **'শান্তরস'** (১১।১৫-১৮) ; স্বর্গ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত এবং সর্বদিকে পরিব্যাপ্ত বিশ্বরূপের বর্ণনা হওয়ায় **'অদ্ভুতরস'** (১১।২০) ; নিজ জিহ্বা দ্বারা লেহন করছেন এবং সকলের সংহারের জন্য কালরূপে প্রবৃত্ত হয়েছেন—এরূপ মূর্তি ধারণ করায়—**'রৌদ্ররস'** (১১।৩০, ৩২); ভয়ঙ্কর করালদন্তবিশিষ্ট মুখ রূপে **'বীভৎসরস'** (১১।২৩-২৫) ; তুমি দণ্ডায়মান হও—এইরূপে **'বীররস'** (১১।৩৩) ; দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করা **'দাস্যরস'** (১১।৪৪-এর পূর্বার্ধ) ; প্রধান যোদ্ধাগণ এবং অন্য রাজন্যবর্গকে ভগবানের মুখে প্রবেশ করতে দেখে **'করুণরস'** (১১।২৮-২৯) ; দৃষ্টান্ত দ্বারা বন্ধু-বন্ধুর, পিতা-পুত্রের এবং পতি-পত্নীর অপমান সহ্য করে—এইরূপে যথাক্রমে **'সখ্যরস'**, **'বাৎসল্যরস'**, **'মাধুর্যরসের'** বর্ণনা করা হয়েছে (১১।৪৪) এবং হাস্যাদির স্মৃতিরূপে **'হাস্যরস'** বর্ণিত হয়েছে (১১।৪২-এর পূর্বার্ধে)।

*** *** ***

সম্বন্ধ—পরবর্তী দুটি শ্লোকে অর্জুন ভগবানকে চতুর্ভুজরূপ দেখাবার জন্য প্রার্থনা করছেন।

অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেবরূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥ ৪৫ ॥

[**অদৃষ্টপূর্বম্, দৃষ্ট্বা** (এইরকম পূর্বে না দেখা রূপ দেখে) ; **হৃষিতঃ, অস্মি, চ** (হর্ষিত হচ্ছি এবং) ; **ভয়েন, মে, মনঃ** (ভয়ে আমার মন) ; **প্রব্যথিতম্** (ব্যথিত হচ্ছে) ; **মে, তৎ, এব** (আপনার সেই) ; **দেবরূপম্, দর্শয়** (দেবরূপ ধারণ করে দেখান) ; **দেবেশ, জগন্নিবাস** (হে দেবেশ ! হে জগন্নিবাস !) ; **প্রসীদ** (প্রসন্ন হোন।)]

আমি এইরকম রূপ পূর্বে কখনো দেখিনি। এই রূপ দেখে আমি হর্ষিত হচ্ছি এবং (সেই সঙ্গে) ভয়ে আমার মন অত্যন্ত ব্যথিত হচ্ছে। সুতরাং আপনি আপনার সেই দেবরূপ (সৌম্য বিষ্ণুমূর্তি) ধারণ করুন। হে দেবেশ ! হে জগন্নিবাস ! আপনি প্রসন্ন হোন॥ ৪৫ ॥

ব্যাখ্যা—[বিশ্বরূপ দেখাবার জন্য আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করায় ভগবান যেমন আমাকে বিশ্বরূপ দেখালেন, তেমনই দেবরূপ দেখাবার জন্য প্রার্থনা করলে ভগবান দেবরূপ দেখাবেনই—অর্জুনের এই বিশ্বাস থাকায় তিনি দেবরূপ দেখাবার জন্য প্রার্থনা করলেন।]

'অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে'—আপনার এইরকম অলৌকিক আশ্চর্যময় বিশালরূপ আমি আগে কখনো দেখিনি। আপনার যে এমন রূপও আছে—আমার তা জানা ছিল না। এই রূপ দর্শন করার কোনো যোগ্যতাই আমার নেই, শুধু আপনার কৃপাতেই আমি এই রূপ দেখতে সক্ষম হয়েছি। এতে আমি নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী মনে করে আহ্লাদিত হচ্ছি এবং আপনার কৃপা অনুভব করে অভিভূত হচ্ছি। কিন্তু সেইসঙ্গেই আপনার স্বরূপের উগ্রতা দেখে আমার মন ভয়ে অত্যন্ত ব্যথিত হচ্ছে, ব্যাকুল হচ্ছে এবং বিচলিত হচ্ছে।

'তদেব মে দর্শয় দেবরূপম্'—'তৎ' (সে) শব্দটি পরোক্ষবাচক ; সুতরাং 'তদেব' (তৎ এব) বলায় মনে হয় যে অর্জুন দেবরূপ (বিষ্ণুমূর্তি) আগে কখনো দেখেছেন, যা এখন সামনে নেই। বিশ্বরূপে অর্জুন কমলাসনে বিরাজমান ব্রহ্মাকে দেখেছিলেন—**'পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে......ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থম্'** (১১।১৫)। এতে প্রমাণিত হয় যে কমল যাঁর নাভি হতে উৎপন্ন হয়েছে, সেই অনন্তশায়ী চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপও অর্জুন দেখেছিলেন। আবার সপ্তদশ শ্লোকে অর্জুন বলেছেন যে, আমি আপনার কিরীট (মুকুট), গদা, চক্র (এবং **'চ'** পদের দ্বারা শঙ্খ ও পদ্ম)ধারী রূপ দর্শন করছি—**'কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ'**—এই কথা দুটিতে প্রমাণিত হয় যে অর্জুন বিশ্বরূপের অন্তর্গত ভগবানের যে বিষ্ণুরূপ দেখেছিলেন, সেই রূপই দেখার জন্য অর্জুন এখানে **'ওই দেবরূপ আমাকে দেখান'** বলেছেন[১]।

'দেবরূপম্' বলার অর্থ হল আমি বিশ্বরূপে আপনার বিষ্ণুরূপও দর্শন করেছি, আপনি এখন আমাকে শুধু বিষ্ণুরূপই দেখান। দ্বিতীয়তঃ, পঞ্চদশ শ্লোকেও অর্জুন ভগবানকে 'দেব' সম্বোধন করেছেন—**'পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে'** এবং এখানেও দেবরূপ দেখাবার জন্য বলেছেন। অর্থাৎ বিশ্বরূপও নয় এবং মনুষ্যরূপও নয়, শুধু দেবরূপ দেখান। পরবর্তী (ছেচল্লিশতম) শ্লোকেও **'তেনৈব'** পদ দ্বারা বিশ্বরূপ এবং মনুষ্যরূপের নিষেধ করে ভগবানের কাছে চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপ ধারণ করতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

'প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস' এখানে **'জগন্নিবাস'** সম্বোধন বিশ্বরূপের এবং **'দেবেশ'** সম্বোধনটি চতুর্ভুজরূপের ইঙ্গিত প্রদান করে। অর্জুন এই দুটি সম্বোধনের দ্বারা যেন বলতে চাইছেন যে সকল ব্রহ্মাণ্ড যে আপনাতেই অধিষ্ঠিত—সেই বিশ্বরূপ আমি দেখেছি এবং দেখছি। এবার আপনি **'দেবেশ'**—দেবতাদের অধীশ্বর বিষ্ণুরূপ ধারণ করুন।

বিশেষ কথা

ভগবানের বিশ্বরূপ দিব্য, অবিনাশী এবং অক্ষয়। এই বিশ্বরূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত এবং সেই ব্রহ্মাণ্ডের

---

[১]পরবর্তী উনপঞ্চাশতম শ্লোকে 'পুনঃ' ও 'তদেব' পদ দ্বারা ভগবান এবং পঞ্চাশতম শ্লোকে 'ভূয়ঃ' পদটির দ্বারা সঞ্জয়ও সেই (বিশ্বরূপে দর্শন করা) চতুর্ভুজ রূপ দেখাবার কথা বলেছেন।

উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়কারী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবও অনন্ত। এই নিত্য বিশ্বরূপের থেকে অনন্ত বিশ্ব (ব্রহ্মাণ্ড) উৎপন্ন ও লীন হয়ে চলেছে, কিন্তু বিশ্বরূপ অব্যয় হওয়ায় একইভাবে বিরাজ করছে। বিশ্বরূপ এত দিব্য ও অলৌকিক যে সহস্র সূর্যের প্রভাও এর দীপ্তির সমান হতে পারে না (১১।১২)। তাই এই বিশ্বরূপ 'দিব্যচক্ষু' ব্যতীত কেউই দেখতে পায় না। 'জ্ঞানচক্ষু'র সাহায্যে জগতের মূলে সত্তারূপে যে পরমাত্মতত্ত্ব অবস্থিত, তার বোধ হয় এবং 'ভাবচক্ষুর সাহায্যে জগৎ ভগবদ্‌স্বরূপ' দেখায়, কিন্তু এই দুই চক্ষুর কোনোটির দ্বারাই বিশ্বরূপ দর্শন করা যায় না। 'চর্মচক্ষু'র সাহায্যে তত্ত্ববোধও হয় না এবং জগৎও ভগবদ্‌স্বরূপ বলে প্রতিভাত হয় না। কারণ চর্মচক্ষু প্রকৃতির অঙ্গ। তাই চর্মচক্ষুর সাহায্যে প্রাকৃতিক স্থূল কার্যাদিই দেখা যায়।

প্রকৃতপক্ষে ভগবানের দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ, সহস্রভুজ প্রভৃতি যত রূপ আছে সেগুলি সবই দিব্য এবং অব্যয়। এইরূপ ভগবানের সগুণ-নিরাকার, নির্গুণ-নিরাকার, সগুণ-সাকার প্রভৃতি যত রূপ আছে, তা সবই দিব্য এবং অব্যয়।

মাধুর্য-লীলাতে ভগবান দ্বিভুজ-রূপেই বিরাজ করেন ; কিন্তু যেখানে তাঁর কোনো ঐশ্বর্য দেখাবার প্রয়োজন হয়, সেখানে তিনি পাত্র, অধিকার, ভাব ইত্যাদি ভেদে বিরাটরূপও দর্শন করান। যেমন, ভগবান অর্জুনকে মনুষ্যরূপে প্রকটিত তাঁর দ্বিভুজরূপ শরীরের একাংশে বিশ্বরূপ দেখালেন।

ভগবানের অনন্ত অসীম ঐশ্বর্য, মাধুর্য, সৌন্দর্য, ঔদার্য ইত্যাদি নানা দিব্যগুণ আছে। তাঁর বিশ্বরূপ সেই অনন্ত দিব্যগুণগুলিকে নিয়েই। ভগবান যাঁকেই এই বিশ্বরূপ দেখিয়েছেন, তাঁকেই প্রথমে দিব্যদৃষ্টি দিয়েছেন। দিব্যদৃষ্টি দিলেও সেই ব্যক্তির যোগ্যতা এবং রুচি অনুযায়ীই ভগবান তাঁর বিশ্বরূপ স্তরভেদ ক্রমে দেখিয়েছেন। একাদশ অধ্যায়ের পঞ্চদশ থেকে ত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত ভগবান বিশ্বরূপের নানা স্তর প্রকটিত করেছেন, যার প্রথমে দেবরূপ (১১।১৫-১৮), তারপর উগ্ররূপ (১১।১৯-২২) আর তারও পরে অত্যুগ্ররূপের (১১।২৩-৩০) প্রাধান্য ছিল। অত্যুগ্ররূপ দেখে যখন অর্জুন ভীতচকিত হলেন, তখন ভগবান তাঁর দিব্যাতিদিব্য বিশ্বরূপের স্তরগুলি দেখানো বন্ধ করে দেন অর্থাৎ অর্জুন ভীত হওয়ায় ভগবান পরবর্তী রূপগুলি আর দেখাননি। তাৎপর্য হল এই যে ভগবান তাঁর দিব্য বিশ্বরূপের অনন্ত স্তরগুলির থেকে মাত্র সেই স্তরগুলিই অর্জুনকে দেখিয়েছিলেন, যতগুলি স্তর দেখানোর প্রয়োজন ছিল এবং যতগুলি স্তর দেখার যোগ্যতা অর্জুনের ছিল।

※ ※ ※

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে॥ ৪৬ ॥

[**অহম্, ত্বাম্** (আমি আপনাকে) ; **তথা, এব, কিরীটিনম্** (সেই কিরীটধারী) ; **গদিনম্, চক্রহস্তম্** (গদা-চক্র হস্তে) ; **দ্রষ্টুম্, ইচ্ছামি** (দেখতে ইচ্ছা করি) ; **সহস্রবাহো** (হে সহস্রবাহো!) ; **বিশ্বমূর্তে** (হে বিশ্বমূর্তে!) ; **তেন, এব**[১] (সেই) ; **চতুর্ভুজেন, রূপেণ** (চতুর্ভুজ রূপ) ; **ভব** (ধারণ করুন।)]

---

[১]ইদমস্তু সন্নিকৃষ্টে সমীপতরবর্তি চৈতদো রূপম্। অদসস্তু বিপ্রকৃষ্টে তদিতি পরোক্ষে বিজানীয়াৎ॥

—এই উক্তি অনুসারে 'ইদম্' শব্দটি সমীপের, 'এতৎ' শব্দ অত্যন্ত সমীপের, 'অদস্' শব্দটি দূরের এবং 'তৎ' শব্দটি পরোক্ষ বাচক। বিশ্বরূপে এইগুলির প্রয়োগ করা হয়েছে ; যেমন বিশ্বরূপ নিকটে হওয়ায় অর্জুন আঠারো, উনিশতম শ্লোকগুলিতে 'ইদম্' শব্দের ; ভীষ্ম-দ্রোণ প্রভৃতি ভগবানের বিশ্বরূপে অত্যন্ত নিকটে হওয়ায় অর্থাৎ বিশ্বরূপেরই অঙ্গ হওয়ায় তেত্রিশতম শ্লোকে 'এতৎ' শব্দের ; ভগবান প্রদত্ত দিব্যদৃষ্টি দ্বারা বহুদূর পর্যন্ত বিশ্বরূপ দেখা সম্ভব হয়েছিল, তাই দেবগণকেও বহুদূর অবধি দেখা যাচ্ছিল, তাই অর্জুন একুশ, ছাব্বিশ এবং আটাশতম শ্লোকে 'অদস্' শব্দের এবং বিরাটরূপের আগের স্তরে দেখা চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপ (বিশ্বরূপের স্তর পরিবর্তনের জন্য) চক্ষুগোচর না হওয়ায় অর্থাৎ পরোক্ষ হওয়ায় অর্জুন 'তৎ' শব্দ প্রয়োগ করেছেন।

আমি আপনাকে সেইরূপ কিরীটিধারী ; গদা-চক্র হস্তে অর্থাৎ চতুর্ভুজরূপে দেখতে ইচ্ছা করি। তাই হে সহস্রবাহো ! হে বিশ্বমূর্তে ! আপনি সেই চতুর্ভুজ (শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী) মূর্তি ধারণ করুন॥ ৪৬ ॥

ব্যাখ্যা—**'কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব'**—যে রূপে আপনি মস্তকে দিব্য মুকুট এবং হস্তে গদা ও চক্র ধারণ করে থাকেন, আমি আপনার সেই রূপ দেখতে ইচ্ছুক।

'তথৈব' কথাটি বলার তাৎপর্য এই যে, আমার দ্বারা **'দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপম্'**(১১।৩) এরূপ ইচ্ছা প্রকটিত করায় আপনি বিশ্বরূপ প্রদর্শন করেছিলেন। এখন আমি আর আমার ইচ্ছা কেন অপূর্ণ রাখবো ? সুতরাং আমি আপনার বিশ্বরূপে যেমন সৌম্য চতুর্ভুজরূপ দেখেছি, সেইরকম রূপই আবার দর্শন করতে ইচ্ছা করি—**'ইচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব'**।

'তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে' —পঞ্চদশ এবং সপ্তদশ শ্লোকে যে বিশ্বরূপে চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপ দেখেছিলেন, সেই বিশ্বরূপের নিষেধ করার জন্য অর্জুন এখানে **'এব'** পদটি ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ **'তেন চতুর্ভুজেন রূপেণ'** এই পদটি চতুর্ভুজ রূপ দর্শন করাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে এবং **'এব'** পদটি 'বিশ্বরূপের সঙ্গে নয়'—এরূপ নিষেধ করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, **'ভব'** পদটি প্রকটিত হোন—এই প্রার্থনা রূপে ব্যবহার করা হয়েছে।

আগের শ্লোকে **'তদেব'** আর এখানে **'তথৈব'** ও **'তেনৈব'**—তিনটি পদের তাৎপর্য হল এই যে অর্জুন বিশ্বরূপ দেখে অত্যন্ত ভীত হয়েছিলেন, তাই **'এব'** পদটি তিনবার প্রয়োগ করে তিনি ভগবানকে বলেছেন যে, আমি শুধু আপনার বিষ্ণুরূপই দেখতে ইচ্ছা করি, বিষ্ণুরূপের সঙ্গে বিশ্বরূপ দেখতে চাই না। সুতরাং আপনি কেবল বিষ্ণুরূপেই প্রকটিত হোন।

'সহস্রবাহো' সম্বোধনটিতে এই ভাব প্রকাশ হয় যে, হে সহস্রবাহো ভগবন্ ! আপনি চতুর্ভুজবিশিষ্ট হোন ; আর **'বিশ্বমূর্তে'** সম্বোধনটিতে এই ভাব মনে হয় যে, হে অনন্তরূপসম্পন্ন ভগবন্ ! আপনি একরূপসম্পন্ন হোন। অর্থাৎ আপনি বিশ্বরূপ সংবরণ করে চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপে প্রকটিত হোন।

পরিশিষ্ট-ভাব—মূল শ্লোকে যদিও ভগবান গদা ও চক্র ধারণ করেছিলেন বলা হয়েছে, তা হলেও **'চতুর্ভুজেন'** পদ ব্যবহৃত হওয়ায় এই স্থানে চতুর্ভুজে গদা ও চক্রের সঙ্গে শঙ্খ ও পদ্ম আছে বলে বুঝতে হবে।

⁂ ⁂ ⁂

সম্বন্ধ—একত্রিশতম শ্লোকে অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হে উগ্ররূপধারী ! আপনি কে ? তখন ভগবান উত্তর দিয়েছিলেন যে, আমি কাল, সকলকে সংহার করার জন্যই আমি প্রবৃত্ত হয়েছি। একথা শুনে এবং অত্যন্ত ভয়ালরূপ দর্শন করে অর্জুন মনে করেছিলেন যে ভগবান অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন। তাই অর্জুন ভগবানকে বারংবার প্রসন্ন হবার জন্য প্রার্থনা করেছেন। অর্জুনের এই ভাবনা দূর করার নিমিত্ত ভগবান বলছেন—

শ্রীভগবানুবাচ

ময়া প্রসন্নেন তবার্জুনেদং রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্বম্॥ ৪৭ ॥

[অর্জুন (হে অর্জুন !) ; ময়া প্রসন্নেন (আমি প্রসন্ন হয়ে) ; মে (আমার) ; আত্মযোগাৎ (স্বীয় সামর্থ্যে) ; ইদম্, পরম (এই অত্যন্ত) ; তেজোময়ম্ (তেজঃপূর্ণ) ; আদ্যম্, অনন্তম্ (আদিভূত, অনন্ত) ; বিশ্বম্, রূপম্ (বিশ্বরূপ) ; তব (তোমাকে) ; দর্শিতম্ (দেখালাম) ; যৎ (যা) ; ত্বদন্যেন (তুমি ব্যতীত) ; ন, দৃষ্টপূর্বম্ (পূর্বে আর কেউ দেখেনি।)]

শ্রীভগবান বললেন—হে অর্জুন ! আমি প্রসন্ন হয়ে স্বীয় সামর্থ্যে (যোগপ্রভাবে) এই অত্যন্ত তেজঃপূর্ণ, সকলের আদি, অনন্ত বিশ্বরূপ তোমাকে দেখালাম, তুমি ব্যতীত এই রূপ পূর্বে আর কেউ দেখেনি॥ ৪৭ ॥

ব্যাখ্যা—'**ময়া প্রসন্নেন তবার্জুনেদং রূপং দর্শিতম্**'—হে অর্জুন ! তুমি বারবার বলছ যে, আপনি প্রসন্ন হন (১১।২৫, ৩১, ৪৫), কিন্তু প্রিয় ভাই আমার ! আমি যে বিশ্বরূপ তোমাকে দেখিয়েছি, যার ভীষণ বিকটরূপ দেখে তুমি ভীত হয়েছ, তা আমি ক্রোধান্বিত হয়ে বা তোমাকে ভয় দেখাবার জন্য দেখাইনি। আমি প্রসন্নচিত্তেই তোমাকে এই বিশ্বরূপ দেখিয়েছি। এতে তোমার কোনো যোগ্যতা, উপযুক্ততা বা ভক্তি কোনোটারই অবদান কিছু নেই। তুমি শুধুমাত্র বিভূতি ও যোগ সম্বন্ধেই জানতে চেয়েছিলে, আমিও বিভূতি এবং যোগ সম্বন্ধে বর্ণনা করে শেষকালে বলেছিলাম যে, তুমি যে যে স্থানে যা কিছু বিশেষত্ব দেখবে, সেখানেই আমার বিভূতির বিশেষ প্রভাব রয়েছে বলে মনে করবে। আমি তোমার সব প্রশ্নের উত্তর সম্যক্রূপে দিয়েছি। তবুও আমি ('অথবা' পদ দ্বারা) স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বলেছিলাম যে, তোমার এত বেশি জানার দরকার কী ? দেখা-শোনা-বোঝার সংসারে যা কিছু আছে সেই সমস্তই আমার একাংশে আমি ধারণ করে আছি। দ্বিতীয়তঃ আমার বিভূতি এবং যোগশক্তির প্রভাব জানার তোমার কী প্রয়োজন ? কারণ সকল বিভূতি আমার যোগশক্তিকে আশ্রয় করে আছে এবং সেইসব যোগশক্তিরই আশ্রয় আমি স্বয়ং তোমার সামনে উপস্থিত। বিশেষ কৃপাবশতঃই একথা আমি বলেছি। ওই কথাতেই তোমার বিশ্বরূপ দর্শনের ইচ্ছা জাগ্রত হয়েছিল আর আমি তোমাকে দিব্যচক্ষু দিয়ে সেই বিশ্বরূপ দেখিয়েছি। এসব আমি প্রসন্নতাপূর্বকই করেছি। অর্থাৎ এই বিশ্বরূপ প্রদর্শনের ব্যাপারে আমার কৃপা ভিন্ন অন্য কোনো হেতু নেই। তোমার দেখতে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তো নিমিত্তমাত্র।

'**আত্মযোগাৎ**'—কারও সাহায্যে আমি এই বিশ্বরূপ দেখাইনি, নিজের সামর্থ্যেই আমি তোমাকে এই রূপ দেখিয়েছি।

'**পরম্**'—আমার এই বিশ্বরূপ অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ।

'**তেজোময়ম্**'—আমার বিশ্বরূপ অত্যন্ত তেজঃপূর্ণ, তাই দিব্যদৃষ্টি লাভ করেও তুমি একে দুর্নিরীক্ষ্য বলে অভিহিত করেছ (১১।১৭)।

'**বিশ্বম্**'—তুমি স্বয়ং এই রূপকে বিশ্বরূপ, বিশ্বমূর্তে ইত্যাদি নামে সম্বোধন করেছ, আমার এই রূপ সর্বব্যাপী।

'**অনন্তমাদ্যম্**'—দেশ, কাল প্রভৃতির দৃষ্টিতে আমার বিশ্বরূপের আদিও নেই অন্তও নেই, এটি সকলের আদি এবং স্বয়ং অনাদি।

'**যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্বম্**'—আমার বিশ্বরূপ তুমি ব্যতীত আগে আর কেউ দেখেনি—ভগবান একথা কী করে বললেন ? কারণ রামাবতারে মাতা কৌশল্যা, কৃষ্ণাবতারে মাতা যশোদা এবং কৌরবসভায় ভীষ্ম, দ্রোণ, সঞ্জয়, বিদুর এবং মুনি ঋষিগণ ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করেছিলেন। তার উত্তর হল এই যে, ভগবান তাঁর বিশ্বরূপের কথায় '**এবংরূপঃ**' (১১।৪৮) পদ ব্যবহার করে বলেছেন যে, এইরূপ ভয়ঙ্কর বিশ্বরূপ, যাঁর মুখগহ্বরে বিরাট বিরাট যোদ্ধা, সেনাপতি প্রভৃতি প্রবিষ্ট হচ্ছেন, সেটি আগে আর কেউ দেখেনি।

দ্বিতীয়তঃ, সেইসময় অর্জুনের সম্মুখে যুদ্ধের পরিস্থিতি ছিল তাই এরূপ ভয়ঙ্কর বিশ্বরূপ দেখাবার প্রয়োজনীয়তা ছিল এবং অর্জুনেরই এমন বিকট রূপ দেখার সামর্থ্য ছিল। কিন্তু মাতা কৌশল্যা প্রমুখের এই বিকট রূপ দেখাবার প্রয়োজনও ছিল না এবং তাঁরা সেই রূপ দেখতেও পারতেন না অর্থাৎ তাঁদের ওই বিকট রূপ দেখবার সামর্থ্যও ছিল না।

ভগবান অবশ্য বলেছেন যে, আগে এই বিশ্বরূপ কেউ দেখেনি, কিন্তু বর্তমানে যে আর কেউ দেখছে না—তা তিনি বলেননি। কারণ অর্জুনের সঙ্গে সঞ্জয়ও ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করছিলেন। তিনি না দেখে থাকলে গীতার শেষে কী করে বলেছিলেন, ভগবানের অতি অদ্ভুত বিশ্বরূপ বারংবার স্মরণ করে আমি অত্যন্ত বিস্মিত হচ্ছি এবং আমার বারংবার হর্ষ অনুভূত হচ্ছে (১৮।৭৭)।

বিশেষ কথা

'আমি প্রসন্ন হয়ে কৃপাপূর্বক তোমাকে এই বিশ্বরূপ প্রদর্শন করেছি'—ভগবানের এই কথায় যে বিশেষ ভাবটি প্রকাশ পায় তা হল সাধক নিজের ওপর ভগবানের যতটা কৃপা আছে বলে মনে করেন, তার থেকে অনেক বেশি ভগবানের কৃপা হয়ে থাকে। ভগবানের যে কত কৃপা, তা জানার সামর্থ্য সাধকের থাকে না। কারণ তাঁর কৃপা অপার-অসীম এবং মানুষের জানার সামর্থ্য সীমিত।

সাধক প্রায়শঃ অনুকূল বস্তু, ব্যক্তি, পরিস্থিতি ইত্যাদিকেই ভগবানের কৃপা বলে মনে করে থাকেন অর্থাৎ

সৎসঙ্গ লাভ হয়েছে, সাধন-ভজন ঠিকমতো চলছে, কাজ-কর্ম ঠিক আছে, মনে ভগবানের প্রতি অনুরাগ আছে, ইত্যাদিকে তিনি ভগবানের কৃপা বলে মনে করেন। এইভাবে শুধুমাত্র অনুকূল পরিস্থিতিকে কৃপা বলে মনে করলে বস্তুতপক্ষে কৃপাকে সীমাবদ্ধ করা হয় যার ফলে অসীম কৃপা অনুভূত হয় না। সেই অনুকূল কৃপাতেই সন্তুষ্ট থাকা হল কৃপার ভোগ করা। সাধকের সেই কৃপাকে সীমাবদ্ধ করা উচিত নয় এবং কৃপার ভোগ করাও উচিত নয়।

সাধন ঠিকমতো হলে যে সুখ হয়, সেই সুখে সুখী হওয়া, সন্তুষ্ট হওয়াও ভোগ, যার দ্বারা বন্ধন হয়—**'সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ'** (গীতা ১৪।৬)। সুখ হওয়া বা সুখের সম্বন্ধে জ্ঞান হওয়া দূষণীয় নয়, কিন্তু তার সঙ্গ করা, তাতে সুখি হওয়া, প্রসন্ন হওয়াই দূষণীয়। এতে অর্থাৎ সাধনজনিত সাত্ত্বিক সুখভোগ করলে গুণাতীত হওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা আসে। অতএব সাধকের অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে এই সুখে আসক্তি বর্জিত হয়ে থাকা উচিত। যে সাধক এই সুখে আসক্তি-রহিত হন না অর্থাৎ প্রসন্নতা সহকারে এই সুখ গ্রহণ করেন, তিনি যদি নিজ সাধনায় তৎপরতার সঙ্গে ব্যাপৃত থাকেন, তাহলে সময়মতো তাঁরও এই সুখে স্বাভাবিকভাবে অরুচি এসে থাকে। কিন্তু যে সাধক সতর্কতাসহ অসক্তিবর্জিত হয়ে থাকেন, তিনি বাস্তব তত্ত্ব অতি শীঘ্রই অনুভব করতে সক্ষম হন।

*** *** ***

সম্বন্ধ—বিশ্বরূপ দর্শন করার জন্য ভগবানের কৃপা ব্যতীত অন্য আর কোনো উপায় নেই—পরবর্তী শ্লোকে এই কথাই বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন।

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈর্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর॥ ৪৮ ॥

[কুরুপ্রবীর (হে কুরুশ্রেষ্ঠ !) ; এবংরূপঃ (এই প্রকারের বিশ্বরূপবিশিষ্ট) ; অহম্‌, নৃলোকে (আমাকে মনুষ্যলোকে) ; ত্বদন্যেন, ন, বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ (আর কেউই বেদাধ্যয়ন দ্বারা, যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা) ; ন, দানৈঃ (দানাদির দ্বারা) ; ন, উগ্রৈঃ, তপোভিঃ (তীব্র তপস্যার দ্বারা) ; চ, ন, ক্রিয়াভিঃ (কিংবা অন্য কোনো ক্রিয়ার দ্বারা) ; দ্রষ্টুম্‌, শক্যঃ (দেখতে সক্ষম নয়।)]

হে কুরুপ্রবীর ! এই প্রকারের বিশ্বরূপবিশিষ্ট আমাকে মনুষ্যলোকে তুমি ছাড়া (কৃপাপাত্র ভিন্ন) আর কেউই বেদাধ্যয়ন দ্বারা, যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা, দানাদির দ্বারা, তীব্র তপস্যার দ্বারা কিংবা অন্য কোনো ক্রিয়ার দ্বারা দেখতে সক্ষম নয়॥ ৪৮ ॥

ব্যাখ্যা—**'কুরুপ্রবীর'**—এখানে অর্জুনকে 'কুরুপ্রবীর' বলে সম্বোধন করার অভিপ্রায় হল এই যে কুরুবংশীয়দের মধ্যে আমার উপদেশ শোনার, আমার রূপ দর্শন করার এবং সবকিছু জানার জিজ্ঞাসা তোমার মধ্যেই জাগ্রত হয়েছে, তাই কুরুবংশে তুমিই শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ ভগবানকে দেখার, জানার ইচ্ছা জাগ্রত হওয়াই প্রকৃতপক্ষে মানুষের শ্রেষ্ঠতা।

'ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈর্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ'—বেদাদি অধ্যয়ন করা হোক, বিধিনিয়ম অনুসারে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করা হোক, খুব দান করা হোক, কঠিন হতে কঠিনতম তপস্যাদি অনুষ্ঠিত হোক বা তীর্থ-ব্রতাদি শুভকর্মই করা হোক—এর কোনোটিই বিশ্বরূপ দর্শনের হেতু হতে পারে না। কারণ যে কর্মই করা হোক না কেন, সেই সবগুলিরই আরম্ভ ও শেষ আছে। অতএব সেইসব কর্ম থেকে যে ফল পাওয়া যায় তাও আদি ও অন্তবিশিষ্ট হয়ে থাকে। সুতরাং সেই কর্মের সাহায্যে ভগবানের অনন্ত, অসীম, দিব্য বিশ্বরূপ-দর্শন কীভাবে হতে পারে ? সেই দর্শন কেবলমাত্র ভগবদ্‌কৃপাতেই হওয়া সম্ভব। কারণ ভগবান নিত্য এবং তাঁর কৃপাও নিত্য। তাই নিত্য কৃপার ফলেই অর্জুন ভগবানের নিত্য, অব্যয়, দিব্য

বিশ্বরূপ দর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাৎপর্য হল যে ওইসব সাধনের কোনো একটি অথবা সমস্ত সাধন একত্র করেও এর দ্বারা এই বিশ্বরূপের দর্শন সম্ভব নয়। এইরূপ বিশ্বরূপ দর্শন লাভ তো শুধু তাঁর কৃপার দ্বারা, তাঁর প্রসন্নতার দ্বারাই সম্ভব।

গীতায় প্রায়শঃ যজ্ঞ-দান ও তপ—এই তিনটির বর্ণনা দেখা যায়। অষ্টম অধ্যায়ের আটাশতম শ্লোকে এবং এই অধ্যায়ের তিপ্পান্নতম শ্লোকে বেদ-যজ্ঞ-দান ও তপ— এই চারটির বর্ণনা করা হয়েছে এবং এইস্থানে বেদ-যজ্ঞ-দান-তপ-ক্রিয়া—এই পাঁচটির বর্ণনা করা হয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ের আটাশতম শ্লোকে সপ্তমী বিভক্তি এবং বহুবচন আর এই শ্লোকে তৃতীয়া বিভক্তি ও বহুবচনের প্রয়োগ হয়েছে, কিন্তু অন্যান্য স্থানে প্রায়ই প্রথমা বিভক্তি এবং একবচন ব্যবহৃত হয়েছে।

এখানে তৃতীয়া বিভক্তি এবং বহুবচন ব্যবহারের অর্থ হল এই যে, এই বেদ-যজ্ঞ-দান ইত্যাদি সাধনাগুলির এক একটি সাধন বিশেষভাবে বহুবার করা হোক বা সমস্ত সাধন বিশেষভাবে অনেকবারই করা হোক, তবুও এইসব সাধনার জোরে বিশ্বরূপ দর্শন করা সম্ভব নয়। কারণ বিশ্বরূপ দর্শন করা কোনো কর্মের ফল নয়।

এখানে যেমন বেদ, যজ্ঞাদি সাধনার দ্বারা বিশ্বরূপ দর্শন সম্ভব নয় বলে বিশ্বরূপ দর্শনের দুর্লভতার কথা বলা হয়েছে, তেমনই পরবর্তী তিপ্পান্নতম শ্লোকে বেদ-যজ্ঞাদি সাধনার দ্বারা চতুর্ভুজরূপও দেখা সম্ভব নয়—এই বলে চতুর্ভুজরূপ দর্শনের দুর্লভতার কথা বলেছেন। অনন্যভক্তির দ্বারাই চতুর্ভুজরূপ দর্শন করা যায় বলে জানিয়েছেন (১১।৫৪)। কারণ এই রূপ এত বিশেষ যে দেবগণও সেটির দর্শন আকাঙ্ক্ষা করেন। তাই সেই রূপে ভক্তি হতে পারে। কিন্তু বিশ্বরূপ-দর্শনে তো মনে ভয় আসে ; তাহলে সেই রূপে ভক্তি কী করে হবে, প্রেম কী করে হবে ? সেইজন্য এই দর্শনে ভক্তিকে সাধন হিসাবে বলা হয়নি, বিশ্বরূপ দর্শন কেবল ভগবানের প্রসন্নতা বা কৃপা দ্বারাই সম্ভব।

'এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন'— মনুষ্যলোকে তুমি ব্যতীত আর কেউ আমার বিশ্বরূপ দেখতে সমর্থ নয়—এর অর্থ এই যে এই সাধনাগুলির দ্বারা তুমি দেখতে সক্ষম। তোমাকে তো আমি প্রসন্ন হয়ে এই রূপ প্রদর্শন করেছি।

সঞ্জয়ও যে বিশ্বরূপ দর্শন করেছিলেন, তা ব্যাসদেবেরই কৃপায় প্রাপ্ত দিব্যদৃষ্টির সাহায্যেই সম্ভব হয়েছিল, অন্য কোনো সাধনার দ্বারা নয়। তাৎপর্য এই যে, ভগবান এবং তাঁর ভক্ত সাধুদের কৃপায় যে কাজ সম্ভব হয়, তা সাধনার দ্বারা হয় না। এঁদের কৃপা অহেতুকী হয়।

কিছু লোক বুঝতে না পেরে বলে থাকেন যে, ভগবান অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাননি, তিনি তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে তাঁর শরীরেরই একাংশে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিরাজমান। কিন্তু তা প্রকৃত সত্য নয়। ভগবান স্বয়ং বলেছেন যে 'আমার এই দেহের একাংশে চরাচরসহ সমস্ত জগৎ অবস্থিত, তা এখনই দেখে নাও' (১১।৭)। অর্জুন যখন দেখতে পেলেন না, তখন ভগবান বললেন যে, 'তুমি তোমার চর্মচক্ষু দ্বারা আমার বিশ্বরূপ দেখতে পাবে না, তাই আমি তোমাকে দিব্যচক্ষু প্রদান করছি' (১১।৮)। তারপর তিনি অর্জুনকে দিব্যচক্ষু প্রদান করে তাঁর বিশ্বরূপ দেখালেন। সঞ্জয়ও বলেছেন যে, 'ভগবানের শরীরের একাংশে স্থিত বিশ্বরূপটি অর্জুন দর্শন করলেন' (১১।১৩)। অর্জুনও বিশ্বরূপ দেখতে দেখতে বললেন যে, 'আমি আপনার শরীরে সমস্ত প্রাণীসমুদায়, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর প্রভৃতি সকলকেই দেখতে পাচ্ছি' (১১।১৫) ইত্যাদি। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ভগবান অর্জুনকে প্রত্যক্ষভাবেই তাঁর বিশ্বরূপ দর্শন করিয়েছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, বোঝাবার জন্য জ্ঞানচক্ষুর প্রয়োজন হয় (গীতা ১৩।৩৪ ; ১৫।১১), কিন্তু সাক্ষাৎ দর্শন হয় দিব্যচক্ষুর সাহায্যেই। তাই ভগবান শুধু যে কথা বলে বুঝিয়েছিলেন, তা নয়।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—অর্জুনের ভয় দূর করার জন্য ভগবান পরবর্তী শ্লোকে তাঁর 'দেবরূপ' দেখার নির্দেশ দিয়েছেন।

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য॥ ৪৯ ॥

[**মম, ইদম্** (আমার এই) ; **ঈদৃঙ্, ঘোরম্** (প্রকার ঘোর) ; **রূপম, দৃষ্ট্বা** (রূপ দেখে) ; **তে, ব্যথা, মা** (তোমার ব্যথিত হওয়া উচিত নয়) ; **চ, বিমূঢ়ভাবঃ, মা** (এবং বিমূঢ় হওয়াও উচিত নয়) ; **ব্যপেতভীঃ** (নির্ভয়) ; **প্রীতমনাঃ** (প্রসন্ন হৃদয়ে) ; **ত্বম্, পুনঃ** (তুমি পুনরায়) ; **তৎ, এব, মে** (আমার) ; **ইদম্, রূপম্** (এই রূপ) ; **প্রপশ্য** (দর্শন করো।)]

আমার এই ঘোর রূপ দেখে তোমার ব্যথিত হওয়া উচিত নয় এবং বিমূঢ় হওয়াও উচিত নয়। এখন নির্ভয় হয়ে প্রসন্ন চিত্তে তুমি পুনরায় আমার এই (চতুর্ভুজ) মূর্তি ভালো করে দর্শন করো॥ ৪৯ ॥

ব্যাখ্যা—**'মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদম্'**—বিকট দন্তযুক্ত ভীতি উদ্রেককারী আমার মুখবিবরে যোদ্ধাগণ অত্যন্ত বেগে প্রবিষ্ট হচ্ছে, তাঁদের মধ্যে কারও কারও বিচূর্ণিত মস্তক আমার দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে সংলগ্ন হয়ে রয়েছে আর আমি প্রলয়ঙ্কর অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত মুখে সকলকে জিহ্বা দ্বারা লেহন করে গ্রাস করছি—আমার এই ভীষণ রূপ দেখে তোমার ব্যথিত হওয়া উচিত নয়, প্রসন্ন হওয়াই উচিত। তাৎপর্য এই যে প্রথমে (১১।৪৫এ) তুমি আমার কৃপা অনুভব করে যে আনন্দিত হয়েছিলে, তা যথোচিত হয়েছিল অর্থাৎ আমার কৃপা অনুভব করে প্রসন্ন হওয়া সমর্থনযোগ্য কিন্তু ব্যথিত হওয়া ঠিক নয়।

অর্জুন আগে যে বলেছিলেন—**'প্রব্যথিতাস্তথাহম্'** (১১।২৩) এবং **'প্রব্যথিতান্তরাত্মা'** (১১।২৪), তার উত্তরে ভগবান এখানে বলেছেন **'মা তে ব্যথা'**।

আমি কৃপাপরবশ হয়েই এই রূপ দেখাচ্ছি। এটি দর্শন করে তোমার মোহগ্রস্ত হওয়া উচিত নয় **'মা চ বিমূঢ়ভাবঃ'**। দ্বিতীয়তঃ আমি তো প্রসন্নই রয়েছি এবং প্রসন্নতাপূর্বকই তোমাকে এই রূপ দেখাচ্ছি। কিন্তু তুমি যে বারংবার আমাকে অনুরোধ করছ 'প্রসন্ন হও', 'প্রসন্ন হও', এটি তোমার বিমূঢ়ভাব, এই ভাব তুমি পরিত্যাগ কর। তৃতীয়তঃ, আগে তুমি বলেছিলে যে তোমার মোহ দূর হয়েছে (১১।১), কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তোমার মোহ এখনও দূর হয়নি। তোমার মোহ পরিত্যাগ করে নির্ভয় ও প্রসন্ন মনে আমার এই দেবরূপ দর্শন করা উচিত।

তোমার আমার মধ্যে কথোপকথন তো প্রসন্নতার সঙ্গে সানন্দে এবং লীলারূপে হওয়া উচিত। এতে ভয় এবং মোহ একেবারেই থাকা উচিত নয়। তোমার কথা অনুযায়ী আমি অশ্ব-পরিচালন করছি, কথা বলছি, বিশ্বরূপ দেখাচ্ছি, এইসব করা সত্ত্বেও তুমি আমার কোনো বিকৃতি দেখছ কি ?[১] আমার মধ্যে কোনো পার্থক্য এসেছে ? এইরূপ আমার বিশ্বরূপ দেখে তোমারও কোনো বিকৃতি আসা উচিত নয়।

হে অর্জুন ! তোমার যে ভয় লাগছে, তা শরীরে অহং ও মমত্ববোধ (আমি-আমার ভাব) থাকার ফলেই হচ্ছে অর্থাৎ অহং-মমত্বসম্পন্ন বস্তু (দেহ) যাতে নষ্ট না হয়, তার জন্যই তুমি ভীত হচ্ছ—এ তোমার মূর্খতা, অজ্ঞতা। এগুলিকে তুমি পরিত্যাগ করো।

যদি কারোর কখনো কোনো কিছুতে ভয়ের উদ্রেক হয়, তবে তার কারণ হল শরীরে অহং-মমত্ববোধ থাকা। দেহে অহং-মমত্ববোধ থাকার ফলেই সে উৎপত্তি-বিনাশশীল বস্তু (প্রাণ)-কে ধরে রাখতে চায়। এই হল মানুষের মূর্খতা এবং এটি হল আসুরী-সম্পদের মূল। কিন্তু যারা ভগবানের শরণাগত হয় তাদের প্রাণে মোহ থাকে না, তাদের সর্বত্র ভগবদ্ভাব থাকে এবং ভগবানেই একমাত্র প্রেম থাকে। তাই তারা নির্ভীক হয়। ভগবদ্‌পথে চলাই হল দৈবী-সম্পদের মূল। ভগবানের ভয়ঙ্কর নৃসিংহ মূর্তি দেখে দেবগণও ভীত হয়েছিলেন, কিন্তু প্রহ্লাদ ভয় পাননি। কারণ তাঁর সর্বত্র ভগবদ্‌বুদ্ধি ছিল, তাই তিনি নৃসিংহ অবতারের কাছে গিয়ে তাঁর চরণে প্রণাম করলে ভগবান কোলে তুলে নিয়ে তাঁকে লেহন করতে লাগলেন।

'ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য'—পঁয়তাল্লিশতম শ্লোকে অর্জুন বলেছেন যে— **'ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে'** ; তাই ভগবান

[১]অর্জুন নিজের মধ্যে নানাপ্রকার পরিবর্তন অনুভব করলেও, সর্ব অবস্থাতে তিনি ভগবানকে নির্বিকার বলেই মনে করেন, তাই তিনি গীতার আদি, মধ্য ও অন্তভাগে (গীতা ১।২১, ১১।৪২, ১৮।৭৩) ভগবানকে 'অচ্যুৎ' বলে সম্বোধন করেছেন।

'ভয়েন'-এর জন্য বলেছেন—**'ব্যপেতভীঃ'** অর্থাৎ তুমি ভয়বর্জিত হও এবং **'প্রব্যথিতং মনঃ'**—এর জন্য বলেছেন যে— **'প্রীতমনাঃ'** অর্থাৎ তুমি প্রসন্নহৃদয় হও।

ভগবান তাঁর বিশ্বরূপে অর্জুনকে যে চতুর্ভুজ রূপ দেখিয়েছিলেন, তার জন্যই তিনি **'পুনঃ'** পদটির দ্বারা বলেছেন যে, এই রূপ তুমি আবার ভালো করে দেখে নাও।

'তদেব' বলার অর্থ হল যে, তুমি দেব (বিষ্ণু) রূপের সঙ্গে ব্রহ্মা, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ এবং ভয়ানক বিশ্বরূপ দেখতে চাও না, শুধু দেবরূপই দেখতে চাও অতএব সেইরূপই তুমি ভালোভাবে দেখ।

অর্জুনের প্রার্থনা অনুযায়ী ভগবান এখন যে রূপ দেখাতে চান, তার জন্য এইস্থানে ভগবান **'ইদম্'** শব্দটি প্রয়োগ করেছেন।

সঞ্জয় এবং অর্জুনের দিব্যদৃষ্টি কতক্ষণ স্থায়ী হয়েছিল ?

বেদব্যাস সঞ্জয়কে যুদ্ধের প্রারম্ভে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করেছিলেন[১] যার দ্বারা তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধের খবর শোনাতেন। কিন্তু শেষকালে দুর্যোধন মৃত্যুমুখে পতিত হলে যখন সঞ্জয় শোকে ব্যাকুল হলেন, তখন তাঁর এই দিব্যদৃষ্টি অপসারিত হয়ে যায়[২]।

অর্জুন বিশ্বরূপ দেখার জন্য প্রার্থনা করলে ভগবান তাঁকে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করেন—**'দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্'** (১১।৮) এবং অর্জুন ভগবানের বিশ্বরূপ, দেবরূপ, উগ্ররূপ ইত্যাদি রূপ দর্শন করতে থাকলেন। তিনি ভগবানের অত্যুগ্ররূপ দেখে ভীত হলেন এবং ভগবানের স্তব স্তুতি করে বলতে লাগলেন যে, 'আমার চিত্ত ভীত-ব্যাকুল হচ্ছে, আপনি আমাকে আপনার চতুর্ভুজ রূপ দেখান।' তখন ভগবান তাঁর চতুর্ভুজ রূপ দেখিয়ে পরে দ্বিভুজরূপ ধারণ করলেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এই (উনপঞ্চাশতম শ্লোক) পর্যন্তই অর্জুনের দিব্যদৃষ্টি ছিল। একান্নতম শ্লোকে অর্জুন স্বয়ং বলেছেন যে 'আমি আপনার এই সৌম্য মনুষ্যমূর্তি দেখে চেতনা ফিরে পেলাম এবং নিজ স্বাভাবিক অবস্থাও ফিরে পেলাম।'

এখানে প্রশ্ন আসে যে অর্জুন তো আগেও ব্যথিত হয়েছিলেন—**'দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্'** (১১।২৩), **'দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা'** (১১। ২৪)। সুতরাং সেখানেই তাঁর দিব্যদৃষ্টি অপসারিত হওয়া উচিত ছিল। তার উত্তর হল যে অর্জুন সেখানে তত ভীত হননি, যত এখানে হয়েছেন। এখানে তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বারংবার ভগবানকে নমস্কার করছিলেন এবং চতুর্ভুজ মূর্তি দেখাবার জন্য প্রার্থনা করছিলেন (১১।৪৫)। তাই এখানে অর্জুনের দিব্যদৃষ্টি অপসারিত হয়েছিল।

দ্বিতীয় কারণ এটিও মনে করা যেতে পারে যে, অর্জুনের আগে থেকেই বিশ্বরূপ দেখার বিশেষ আকাঙ্ক্ষা ছিল—**'দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপম্'** (১১।৩), তাই ভগবান তাঁকে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করেছিলেন। কিন্তু এখন আর তাঁর বিশ্বরূপ দেখার সেই আগ্রহ নেই এবং ভীতব্যাকুল হওয়ায় তিনি চতুর্ভুজরূপে ভগবানকে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, তাই (দিব্যদৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা না থাকায়) তাঁর দিব্যদৃষ্টি অপসারিত হয়।

সঞ্জয় এবং অর্জুন যদি শোকে এবং ভয়ে ব্যাকুল না হতেন, তাহলে তাঁদের দিব্যদৃষ্টি আরও স্থায়ী হত এবং তাঁরা অনেক কিছু দেখতে পেতেন। কিন্তু শোক এবং ভয়ের জন্য ব্যাকুল হওয়ায় তাঁদের দিব্যদৃষ্টি অপসারিত হয়। এইরূপ মানুষ যখন মোহ দ্বারা সংসারে আসক্ত হয়, তখন ভগবদ্প্রদত্ত বিবেকদৃষ্টি কাজ করে না। যেমন, মানুষের যদি টাকার প্রতি আসক্তি জন্মায় তাহলে সে চুরি করতে আরম্ভ করে। তারপর আসক্তি আরও বৃদ্ধি পেলে ডাকাতি

---

[১]এষ তে সঞ্জয়ো রাজন্ যুদ্ধমেতদ্ বদিষ্যতি। এতস্য সর্বসংগ্রামে ন পরোক্ষং ভবিষ্যতি॥

চক্ষুষা সঞ্জয়ো রাজন্ দিব্যেনৈব সমন্বিতঃ। কথয়িষ্যতি তে যুদ্ধং সর্বজ্ঞশ্চ ভবিষ্যতি॥ (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব ২।৯-১০)

'রাজন্! সঞ্জয় আপনাকে এই যুদ্ধের সমস্ত বার্তা জানাবে। সমগ্র রণভূমিতে এমন কোনো ঘটনা থাকবে না, যা ইনি প্রত্যক্ষ করবেন না। রাজন্! দিব্যদৃষ্টি লাভ করে সঞ্জয় সর্বজ্ঞ হয়ে আপনাকে যুদ্ধের সমস্ত ঘটনা জানাবেন।'

[২]তব পুত্রে গতে স্বর্গে শোকার্তস্য মমানঘ। ঋষিদত্তং প্রণষ্টে তদ্ দিব্যদর্শিত্বমদ্য বৈ। (মহাভারত, সৌপ্তিকপর্ব ৯।৬২)

'হে নিষ্পাপ নরেশ ! আপনার পুত্রের স্বর্গলাভ হওয়ায় আমি শোকাতুর হয়েছি, তাই মহর্ষি ব্যাসদেবের প্রদত্ত আমার দিব্যদৃষ্টিও এখন নষ্ট হয়ে গেছে।'

শুরু করে এবং আসক্তি অত্যধিক বৃদ্ধি পেলে সে টাকার জন্য নরহত্যা পর্যন্ত করে বসে। এইভাবে যেমনই তার মোহ বাড়তে থাকে, তেমনই তার বিবেকশক্তি আচ্ছাদিত হতে থাকে। মানুষ যদি মোহে আবদ্ধ না হয়ে নিজের বিবেককে প্রাধান্য দেয়, তবে সে নিজের উদ্ধার করে সংসারমাত্রেরই উদ্ধারকারী হয়ে উঠতে পারে।

পরিশিষ্ট-ভাব—অর্জুন ভীত হয়ে ভগবানকে বললেন—**'তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্'** (১১।৪২) তাই ভগবান এখানে বলেছেন যে আমি শান্ত বা উগ্র যে কোনো রূপই দেখাই না কেন, তুমি তো আসলে আমার সখাই! এতে তুমি যদি ভয় পাও, তবে সে তোমার মূর্খতা, তোমার বন্ধুত্বে তাহলে খাদ আছে! যা কিছু তুমি দেখছ এসব আমারই লীলা। এতে ভয় পাবার কী আছে? বন্ধুত্বে কেউই ছোট নয়, কেউই বড় নয়।

ভগবানই জগৎরূপে প্রকটিত হয়েছেন, তাই এই জগৎক ভগবানের আদি অবতার বলা হয়—**'আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য'** (শ্রীমদ্ভাগবত ২।৬।৪১)। ভগবান যেমন রাম, কৃষ্ণ ইত্যাদি রূপে অবতার গ্রহণ করেছিলেন, তেমনই জগৎ রূপেও অবতার হয়েছিলেন। একে অবতার এই জন্য বলা হয় যে, এরমধ্যে ভগবানকে দৃশ্যত অনুধাবন করা যায়। অবতার গ্রহণের সময় লৌকিক দৃষ্টিতে ধরা পড়লেও ভগবান সর্বদা অলৌকিকভাবেই বিরাজ করেন (গীতা ৭।২৪-২৫, ৯।১১)।

ভগবান শান্ত বা উগ্র যে রূপেই প্রকটিত হন, তা তাঁর ইচ্ছাধীন। সুন্দর দৃশ্য, প্রস্ফুটিত পুষ্প, বাতাসের সুগন্ধ যেমন ভগবানের রূপ; তেমনই মাংস, হাড়, ময়লা, বাতাসের দুর্গন্ধ তাও ভগবানেরই রূপ। ভগবান ব্যতীত আর কিছুই নেই। ভগবান রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি রূপ যেমন ধারণ করেছেন, তেমনই মৎস্য, কূর্ম, বরাহ ইত্যাদি রূপও ধারণ করেছেন। তিনি যেরূপই ধারণ করুন না কেন, আসলে তিনি ভগবানই! রূপ হল ভগবানের আর ক্রিয়া তাঁর লীলা। কোনো পাপ বা অন্যায় তাঁর দ্বারা করা হয়েছে মনে হলে বুঝতে হবে যে, ভগবান কলিযুগের লীলা করছেন। তিনি যেমন রূপ ধারণ করেন, সেই অনুযায়ী লীলা (ক্রিয়া)[১] করে থাকেন। মূর্তিরূপ পরিগ্রহ করলে তিনি মূর্তির মতোই অচল থাকার লীলা করেন। মূর্তিরূপ ধারণ করলে ক্রিয়া করা শোভন হয় না, ক্রিয়ারহিত থাকাই শোভনীয়। না হলে তিনি অর্চাবতার হবেন কী করে? বরাহ রূপ ধারণ করে তিনি বরাহের মতোই আচরণ করেন আবার মনুষ্যরূপ ধারণ করলে মানুষের মতোই আচার-আচরণ হয়[২]। তিনি যে রূপ ধারণ করে যেমনই ক্রিয়া করুন না কেন, তাতে ভক্তের মনে কোনোপ্রকার বিকার আসে না, কারণ তাঁর কাছে এক ভগবান ব্যতীত আর কিছু নেই, হয়নি, হবে না এবং হওয়া সম্ভবও নয়।

আমরা যে জগৎ-সংসার দেখি, তা ভগবানের বিরাটরূপ নয়, কারণ বিরাটরূপ দিব্য এবং অব্যয় আর দৃষ্টিগ্রাহ্য এই জগৎ সংসার ভৌতিক এবং বিনাশশীল। যেমন আমরা ভৌতিক বৃন্দাবনকে দেখলেও তার মধ্যে দিব্য বৃন্দাবনকে দেখতে পাই না, তেমনই আমরা ভৌতিক বিশ্বজগৎ দেখলেও তার অন্তর্নিহিত দিব্য বিশ্বজগৎ (বিরাটরূপ) দেখতে পাই না— এর কারণ হল সুখভোগ করার আকাঙ্ক্ষা। ভোগেচ্ছা থাকার জন্যই জড়ত্ব, ভৌতিকভাব, মালিন্য আসে। যদি ভোগেচ্ছার জন্য জগতের আকর্ষণ না হয় তাহলে সর্বত্র সবই চিন্ময় বিরাটরূপ।

তত্ত্ববোধ হলে জ্ঞানী জগৎ-সংসারকে চিন্ময়রূপে দেখে থাকেন, আর প্রেমিকভক্ত তাকে মাধুর্যরূপে দেখেন। মাধুর্যরূপে দেখলে, নিজ শরীরের প্রতি যেমন স্বাভাবিক প্রিয়ভাব থাকে, তেমনি প্রেমিক ভক্তের প্রাণীমাত্রেরই সঙ্গে স্বাভাবিক প্রিয়ভাব আসে। কিন্তু অর্জুন ভগবানের বিরাটরূপ, ঐশ্বর্যরূপই দেখেছিলেন, কারণ তিনি সেই রূপ দেখতে চেয়েছিলেন—**'দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম্'** (১১।৩)। মাধুর্যের বৈশিষ্ট্য হল প্রিয়ভাব আর ঐশ্বর্যের বৈশিষ্ট্য হল প্রভাব। তাৎপর্য হল যে, দিব্য বিরাটরূপ, এক হলেও ভাবনা অনুসারে তা অনেক রূপে প্রতিভাত হয় এবং অনেক রূপে দেখলেও তা একই থাকে। একে অনেক এবং অনেকের মধ্যে এক হল ভগবানের বৈশিষ্ট্য, অলৌকিকত্ব এবং বৈচিত্র্য।

⁂ ⁂ ⁂

---

[১]যথা অনেক বেশ ধরি নৃত্য করই নট কোই।
সোই সোই ভাব দেখাবই আপুন হোই ন সোই॥ (শ্রীরামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ৭২খ)

[২]চতুর্থ অধ্যায়ের নবম শ্লোকের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

সম্বন্ধ—ভগবান আগের শ্লোকে অর্জুনকে যে রূপ দেখার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন—সেই অনুযায়ী ভগবান তাঁকে বিষ্ণুরূপ দেখিয়েছেন—পরবর্তী শ্লোকে সঞ্জয় তারই বর্ণনা দিয়েছেন।

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যর্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা॥ ৫০ ॥

[**বাসুদেবঃ** (ভগবান বাসুদেব) ; **অর্জুনম্** (অর্জুনকে) ; **ইতি, উক্ত্বা** (এই কথা বলে) ; **ভূয়ঃ** (পুনর্বার) ; **তথা** (সেইভাবেই) ; **স্বকম্ রূপম্** (নিজ দেবরূপ) ; **দর্শয়ামাস, চ** (দেখালেন এবং) ; **মহাত্মা** (মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ) ; **পুনঃ** (আবার) ; **সৌম্যবপুঃ** (সৌম্যমূর্তি) ; **ভূত্বা** (ধারণ করে) ; **এনম্, ভীতম্** (ভীতসন্ত্রস্ত অর্জুনকে) ; **আশ্বাসয়ামাস** (আশ্বস্ত করলেন।)]

সঞ্জয় বললেন—ভগবান বাসুদেব অর্জুনকে এই কথা বলে পুনর্বার সেইভাবেই নিজ দেবরূপ দেখালেন এবং মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ আবার সৌম্যমূর্তি (দ্বিভুজরূপ) ধারণ করে ভীতসন্ত্রস্ত অর্জুনকে আশ্বস্ত করলেন॥ ৫০ ॥

ব্যাখ্যা—**'ইত্যর্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ'**—অর্জুন যখন ভগবানকে চতুর্ভুজরূপ ধারণ করার জন্য প্রার্থনা করলেন, তখন ভগবান বললেন যে, আমার এই বিশ্বরূপ দেখে তুমি ভীত ও ব্যাকুল হয়ো না। তুমি প্রসন্ন হৃদয়ে আমার এই রূপ দর্শন করো (১১।৪৯)। ভগবানের এই কথাটি সঞ্জয় এইস্থানে **'ইত্যর্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা'** পদটিতে বলেছেন।

'তথা' বলার অর্থ হল যেরূপ কৃপাপরবশ হয়ে ভগবান তাঁর বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন, সেইরূপ কৃপাপরবশ হয়েই ভগবান অর্জুনকে চতুর্ভুজরূপ দেখালেন। এই চতুর্ভুজরূপের দর্শনলাভে অর্জুনের কোনো সাধনা বা যোগ্যতা হেতু নয়, শুধু ভগবদ্কৃপাই হল তার কারণ।

'ভূয়ঃ' বলার অর্থ এই যে, যে দেবরূপ অর্জুন বিশ্বরূপের অন্তর্গত অবস্থায় দেখেছিলেন (১১।১৫, ১৭) এবং যা দেখানোর জন্য অর্জুন প্রার্থনা করেছিলেন (১১।৪৫-৪৬), সেইরূপই ভগবান পুনরায় দেখালেন।

'আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা'—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে অর্জুনকে চতুর্ভুজরূপ দেখিয়েছিলেন। পরে অর্জুনের প্রশান্তির জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় দ্বিভুজ (মনুষ্য) রূপে প্রকটিত হন এবং বিশ্বরূপ দেখে ভীত ব্যাকুল অর্জুনকে আশ্বস্ত করেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ, না চতুর্ভুজ ? তার উত্তর হল যে ভগবান সর্বক্ষণই দ্বিভুজরূপে অবস্থান করে থাকতেন, কিন্তু কখনো কখনো প্রয়োজনবোধে তিনি চতুর্ভুজরূপও ধারণ করতেন।

দশম এবং একাদশ অধ্যায়ে ভগবান তাঁর বিভূতিগুলি বর্ণনা করে তাঁর মহত্ত্ব, প্রভাব এবং সামর্থ্য জানিয়েছেন এবং তাঁর অত্যন্ত বিশিষ্ট বিশ্বরূপ দর্শন করানোতেও তাঁর প্রভাবের কথা বলেছেন। মানুষ যদি ভগবানের এই মহৎ প্রভাব জানতে পারে বা মেনে নেয়, তাহলে তার আর সংসারে কোনো আকর্ষণ থাকে না, সে চিরকালের মতো সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

অর্জুনের ওপর ভগবানের এত অদ্ভুত কৃপা যে তিনি প্রথমে অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখান, তারপর দেবরূপ (চতুর্ভুজরূপ) দেখান এবং পরে মনুষ্যরূপে (দ্বিভুজরূপে) ফিরে আসেন। এর সঙ্গে ভগবান আমাদেরও বিশেষ অলৌকিক কৃপা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, যেকোনো স্থানে, কোনো কিছুতে কিছু বিশেষত্ব দেখে যদি আমাদের মন আকৃষ্ট হয়, তবে সেখানেই আমরা ভগবানকে যেন চিন্তা করি এবং ভগবানের বিশ্বরূপ পঠন-পাঠন ও চিন্তন করি। এই ঘোর পতনের সময়েও আমরা ভগবানের বিভূতি ও বিশ্বরূপ চিন্তা করার যে সুযোগ পেয়েছি তার জন্য আমাদের উদ্যোগ বা যোগ্যতা কারণ নয়, বরং ভগবানের কৃপাই হল তার একমাত্র কারণ। তাঁর এই কৃপার পরিচয় পেয়ে আমাদের আনন্দিত হওয়া উচিত। এই বিভূতিগুলি শোনার এবং বিশ্বরূপের চিন্তন-স্মরণের সুযোগ তো সেই সময়েও সঞ্জয় প্রমুখ খুব কম লোকই পেয়েছিলেন। সেই সুযোগই আজ আমরা লাভ করেছি। সুতরাং এই সুযোগকে ব্যর্থ হতে দেওয়া উচিত নয়।

সম্বন্ধ—মনুষ্যরূপ ধারণ করে ভগবান যখন অর্জুনকে আশ্বস্ত করলেন, তখন অর্জুন বললেন—

অর্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ॥ ৫১ ॥

[জনার্দন (হে জনার্দন !) ; তব (আপনার) ; ইদম্, সৌম্যম্ (এই সৌম্য) ; মানুষম্, রূপম্ (মনুষ্যরূপ) ; দৃষ্ট্বা (দর্শন করে) ; ইদানীম্ (এখন) ; সচেতাঃ, সংবৃত্তঃ, অস্মি (প্রকৃতিস্থ হলাম) ; প্রকৃতিম্ (নিজ স্বাভাবিক স্থিতি) ; গতঃ (ফিরে পেলাম।)]

অর্জুন বললেন—হে জনার্দন ! আপনার এই সৌম্য মনুষ্যরূপ দর্শন করে আমি এখন প্রকৃতিস্থ হলাম এবং নিজ স্বাভাবিক স্থিতি ফিরে পেলাম॥ ৫১ ॥

ব্যাখ্যা—'দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন'—মনুষ্যরূপে প্রকটিত হয়ে আপনি যে লীলা করে থাকেন, তাই দেখে পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-লতা ইত্যাদিও পুলকিত হয়ে ওঠে[১], এখন আপনার এই সৌম্য দ্বিভুজরূপ দেখে আমি প্রকৃতিস্থ হলাম, হৃদয় স্থির হল—**'ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ'**। বিশ্বরূপ দেখে আমি যেরূপ ভীত হয়েছিলাম, তা এখন দূর হয়েছে, আমার ব্যাকুলতাও আর নেই। আমি আমার স্বাভাবিক স্থিতি প্রাপ্ত হয়েছি—**'প্রকৃতিং গতঃ'**।

এখানে **'সচেতাঃ'** বলার তাৎপর্য হল যে, যখন অর্জুনের দৃষ্টি ভগবানের কৃপার দিকে গেল, তখন তাঁর খেয়াল হল এবং তিনি ভাবতে লাগলেন, 'কোথায় আমি আর কোথায় ভগবানের এই বিস্ময়কর অসাধারণ বিশ্বরূপ ! এমন রূপ দর্শনের আমার কোনো যোগ্যতা বা অধিকার নেই। এতে আছে শুধুই ভগবানের কৃপা।'

পরিশিষ্ট-ভাব—ভগবানের সৌম্যরূপ দ্বিভুজ হওয়ায় অর্জুন তাকে মনুষ্যরূপ বলে অভিহিত করেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন দ্বিভুজ। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে উল্লেখ আছে

ত্বমেব ভগবানাদ্যো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। অর্ধাঙ্গো দ্বিভুজঃ কৃষ্ণোঽপ্যর্ধাঙ্গেন চতুর্ভুজঃ॥

(প্রকৃতি. ১২।১৫)

'আপনি সকলের আদি, নির্গুণ এবং প্রকৃতির অতীত ভগবানই, আপনার অর্ধ অঙ্গে দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্ধ অঙ্গে চতুর্ভুজ শ্রীবিষ্ণুরূপে প্রকটিত হয়েছেন।'

দ্বিভুজো রাধিকাকান্তো লক্ষ্মীকান্তশ্চতুর্ভুজঃ। গোলোকে দ্বিভুজস্তস্থৌ গোপৈর্গোপীভিরাবৃতঃ॥
চতুর্ভুজশ্চ বৈকুণ্ঠং প্রযযৌ পদ্ময়া সহ। সর্বাংশেন সমৌ তৌ দ্বৌ কৃষ্ণনারায়ণৌ পরৌ॥

(প্রকৃতি. ৩৫।১৪-১৫)

'দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণ হলেন রাধিকাপতি এবং চতুর্ভুজ শ্রীবিষ্ণু লক্ষ্মীপতি। শ্রীকৃষ্ণ গোপ-গোপিনী পরিবৃত হয়ে গোলোকে এবং শ্রীবিষ্ণু লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে (সপার্ষদ) বৈকুণ্ঠে অবস্থান করেন। শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীবিষ্ণু—এই দুজনেই সর্বপ্রকারে সমান অর্থাৎ দুজনেই এক।'

তাৎপর্য হল এই যে দ্বিভুজ (শ্রীকৃষ্ণ), চতুর্ভুজ (শ্রীবিষ্ণু) এবং সহস্রভুজ (বিরাটরূপ)—এই তিনটিই ভগবানের সমগ্ররূপ।

*** *** ***

---

[১]ত্রৈলোক্যসৌভগমিদং চ নিরীক্ষ্য রূপং যদ্‌গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।২৯।৪০)

সম্বন্ধ—অর্জুনের কৃতজ্ঞতা অনুমোদন করে ভগবান বলেছেন।

শ্রীভগবানুবাচ

সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ॥ ৫২ ॥

[**মম** (আমার) ; **ইদম্, যৎ, রূপম্** (যে রূপ) ; **দৃষ্টবান, অসি** (দেখলে) ; **সুদুর্দর্শম্** (তার দর্শন লাভ করা অত্যন্ত দুর্লভ) ; **অস্য, রূপস্য** (এই রূপ) ; **দেবাঃ, অপি** (দেবতাগণও) ; **নিত্যম্, দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ** (দর্শন করার জন্য নিত্য লালায়িত হয়ে থাকেন।)]

শ্রীভগবান বললেন—তুমি আমার যে রূপ দেখলে, তার দর্শন লাভ করা অত্যন্ত দুর্লভ। এই রূপ দর্শন করার জন্য দেবতাগণও নিত্য লালায়িত হন॥ ৫২ ॥

ব্যাখ্যা—**'সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম'**—**'সুদুর্দর্শমিদং'** পদটি এখানে চতুর্ভুজরূপের জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে, বিরাটরূপ বা দ্বিভুজরূপের জন্য নয়। কারণ বিরাটরূপের কল্পনা দেবগণই বা কেন করতে যাবেন ! আর মনুষ্যরূপ মানুষের কাছেই যখন সুলভ ছিল তখন তা দেবতাদের কাছে দুর্লভ হয় কীভাবে ! তাই **'সুদুর্দর্শম্'** পদটির দ্বারা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চতুর্ভুজরূপই ধরতে হবে, যার জন্য **'দেবরূপম্'** (১১।৪৫) এবং **'স্বকং রূপম্'** (১১।৫০) পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

'দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ'—ভগবান এখানে বলেছেন যে আমার চতুর্ভুজ রূপ দর্শন অত্যন্ত দুর্লভ। পরে তিপ্পান্নতম শ্লোকে বলেছেন যে, বেদ-যজ্ঞ-তপ-দান ইত্যাদি সাধনার দ্বারাও এই চতুর্ভুজ রূপ দর্শন করা সম্ভব হয় না ; একমাত্র অনন্যভক্তির দ্বারাই দর্শন হওয়া সম্ভব। এখানে প্রশ্ন আসে যে, দেবগণও যখন এই রূপ দর্শনের জন্য নিত্য আকাঙ্ক্ষা (লালসা) করেন তখন তাঁরা কেন তাঁর দর্শন পান না ? কেন-না ভগবানের দর্শনের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা (লালসা) থাকাকেই তো বলা হয় অনন্যভক্তি। তার উত্তর হল যে প্রকৃতপক্ষে দেবগণের এই নিত্য দর্শনের আকাঙ্ক্ষা অনন্যভক্তির পরিচায়ক নয়।

নিত্য লালসা থাকার তাৎপর্য হল একমাত্র ভগবানেই নিত্য-নিরন্তর লালসা থাকা, অন্য আর কোনো লালসা না থাকা। এরূপ লালসাযুক্ত অত্যন্ত দুরাচারী ব্যক্তিও ভগবানের প্রীতি লাভ করে এবং তার ভগবদ্প্রাপ্তি ঘটে। কিন্তু দেবতাদের এরূপ অনন্য লালসা হয় না ; কারণ এঁরা প্রায়শঃই ভোগ-বিলাসের জন্যই দেবযোনিতে জন্ম নেন এবং প্রায়শঃই ভোগ-বিলাসই তাঁদের উদ্দেশ্য হয়। তাহলে তাঁদের লালসা কেমন ? তা হল—অধিকাংশ আস্তিক মানুষের মধ্যেই যেমন লালসা (ইচ্ছা) থাকে যে আমাদের যেন ভগবদ্দর্শন হয়, আমাদের যেন কল্যাণ হয়, তাঁদেরও প্রায় সেরূপই ইচ্ছা থাকে। কিন্তু এরূপ ইচ্ছা পোষণ করেও তাঁদের মধ্যে ভোগ ও সম্পদ-সংগ্রহের আগ্রহও একইপ্রকার বজায় থাকে। তাৎপর্য হল পথে চলার সময় কেউ মুক্তো পেয়ে গেল, সেইরূপই (গৌণভাবে) যদি আমাদের মুক্তি হয়ে যায় তো ভালোকথা[১]। মানুষের মনে যেমন এইরূপ গৌণভাবে মুক্তির ইচ্ছা থাকে তেমনভাবেই ভগবান যদি দর্শন দেন তো দর্শন হয়ে যাবে, দেবতাদের মধ্যে এইভাবে ভগবদ্ দর্শনের ইচ্ছা গৌণভাবে থাকে।

আমরা অত্যন্ত উচ্চাসনে অবস্থিত, আমাদের পদ, শরীর এবং ভোগ দিব্য, আমরা অত্যন্ত পুণ্যবান, সুতরাং আমাদের ভগবদ্দর্শন কেন হবে না ?—দেবতারা এরূপ অসঙ্গত ইচ্ছা করেন, তাই তাঁদের দর্শন হয় না। কারণ তাঁদের দেবত্ব, পদ ইত্যাদির অহংকার থাকে। ক্ষমতা অথবা পদ ইত্যাদির দ্বারা ভগবানের দর্শন লাভ সম্ভব নয়। তাই অর্জুন দশম অধ্যায়ের চতুর্দশ শ্লোকে বলেছেন যে, 'হে ভগবন্ ! আপনার প্রকটিত হওয়ার তাৎপর্য দেবতা এবং দানবেরাও জানে না।' অর্জুন এইভাবে ভগবানকে না জানায় দেবতা ও দানবকে একই শ্রেণীতে ধরেছেন। তার অর্থ হল যে, দেবতাদের যেমন ঐশ্বর্য আছে তেমনই দানবদের আছে নানা বিচিত্র মায়া এবং অনেক মন্ত্রসিদ্ধি, কিন্তু সেই শক্তির সাহায্যে ভগবানকে জানা যায় না।

[১]মার্গে প্রয়াতে মণিলাভবন্মে লভেত মোক্ষো যদি তর্হি ধন্যঃ।

সেইরূপই দেবতারাও যদি ভগবদ্দর্শনের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন, তাহলে তাঁরাও তাঁদের দেবত্বশক্তির দ্বারা ভগবদ্দর্শন লাভ করতে সক্ষম হন না। কারণ দেবত্বের দ্বারা ভগবদ্দর্শন লাভ করা যায় না। অর্থাৎ ভগবানকে দেবত্বশক্তির জোরেও পাওয়া যায় না বা যজ্ঞ-তপ-দান ইত্যাদি শুভকর্মের দ্বারাও পাওয়া যায় না (১১।৫৩)। একমাত্র অনন্ত ভক্তির দ্বারাই তাঁর দর্শন পাওয়া সম্ভব (১১।৫৪)। দেবতা এবং মানুষ—উভয়েই তাঁকে অনন্যভক্তির সাহায্যে লাভ করতে সক্ষম।

'দেবা অপি' বলার অর্থ হল এই যে, যে পুণ্যের জন্য দেবগণ উচ্চপদ লাভ করেছেন, উচ্চ (দিব্য) ভোগ প্রাপ্ত হয়েছেন, সেই পুণ্যের ফলে, পদাদির সাহায্যে তাঁরা ভগবদ্দর্শন লাভে সক্ষম হন না। অর্থাৎ পুণ্যকর্মের দ্বারা উচ্চলোকে, উচ্চভোগ পাওয়া সম্ভব হলেও তা ভগবদ্-দর্শন করাতে সমর্থ নয়। ভগবদর্শনে এই প্রাকৃত গুরুত্বের কোনোই মূল্য নেই।

পরিশিষ্ট-ভাব—যদিও দেবতাদের শরীরও দিব্য হয়, তবে ভগবানের শরীর দেবগণের থেকেও বিশিষ্ট। দেবগণের শরীর ভৌতিক তেজোময় এবং ভগবানের শরীর চিন্ময় হয়। ভগবানের শরীর সৎ, চিৎ, আনন্দময়, নিত্য, অলৌকিক এবং অত্যন্ত দিব্য[১]। তাই দেবগণও ভগবানের দর্শনের জন্য লালায়িত হয়ে থাকেন। সাধারণ মানুষের যেমন নতুন নতুন স্থান দেখার আগ্রহ থাকে, তেমনই দেবগণের মধ্যেও ভগবানকে দেখার আগ্রহ থাকে, প্রেম নয়। তাৎপর্য হল যে ভক্ত যেমন প্রেমপূর্বক ভগবানকে দর্শন করতে চান, দেবতাগণ তেমন ভাবে দেখতে চান না। তাই ভগবান ভক্ত প্রেমিকদের অধীনস্থ হলেও দেবতাগণের অধীন নন।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে বলা কথাগুলিই ভগবান পরবর্তী শ্লোকে সুস্পষ্ট করে বলছেন।

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা॥ ৫৩ ॥

[মাম্ (আমাকে) ; যথা, দৃষ্টবান্, অসি (যে রূপে দেখলে) ; এবংবিধঃ (সেইরূপে) ; অহম্ (আমাকে) ; **বেদৈঃ** (বেদের দ্বারা) ; তপসা (তপস্যার দ্বারা) ; দানেন (দানের দ্বারা) ; চ, ইজ্যয়া (বা যজ্ঞের দ্বারা) ; দ্রষ্টুম্ (দেখা পাওয়া) ; ন, শক্যঃ (সম্ভব নয়।)]

আমাকে তুমি যে রূপে দেখলে, সেই রূপে (চতুর্ভুজসমন্বিত) আমাকে বেদের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, দানের দ্বারা বা যজ্ঞের দ্বারা দেখা সম্ভব নয়॥ ৫৩ ॥

ব্যাখ্যা—'দৃষ্টবানসি মাং যথা'—আমার কৃপাতেই তুমি আমার চতুর্ভুজ রূপ দর্শন করছ। তাৎপর্য হল আমার দর্শন একমাত্র আমার কৃপা দ্বারাই হওয়া সম্ভব, কোনো যোগ্যতার দ্বারা নয়।

'নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া শক্য এবং-বিধো দ্রষ্টুম্'—সিদ্ধান্ত হল এই যে, যে জিনিস যে দামে কেনা হয়, সেই জিনিসটির মূল্য তার থেকে কমই হয়ে থাকে। যেমন, একজন দোকানদার যদি একটি ঘড়ি একশো টাকায় বিক্রী করে, তাহলে সে সেই ঘড়িটি নিশ্চয়ই একশ টাকার চেয়ে কম দামে কিনেছে, তবেই তো সে সেটি একশো টাকায় দিতে পারে ! তেমনই নানা বেদ অধ্যয়ন করলে, অনেক বড় বড় তপস্যা করলে, নানাবিধ দান করলে বা মস্ত বড় যজ্ঞ-অনুষ্ঠান করলেই যে ভগবান লাভ হবে—এমন কোনো কথা নেই। যত মহৎ ক্রিয়াই হোক অথবা যত যোগ্যতাই অর্জন করা হোক না কেন, তার দ্বারা ভগবানকে পাওয়া (কেনা) যায় না। এগুলি সমস্ত একসঙ্গেও ভগবদ্প্রাপ্তির মূল্যের সমকক্ষ হতে পারে না। সেগুলির দ্বারা ভগবানের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায় না। অর্জুন এই অধ্যায়ের তেতাল্লিশতম শ্লোকে পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন যে, ত্রিলোকে আপনার সমকক্ষ আর কেউই নেই, তাহলে আপনার থেকে বেশি হওয়া কী করে সম্ভব ? অর্থাৎ আপনার থেকে অধিক না হলে আপনার

[১]চিদানন্দময় দেহ তুম্হারী। বিগত বিকার জান অধিকারী॥ (শ্রীরামচরিতমানস, অযোধ্যাকাণ্ড ১২৭।৩)

ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

সাংসারিক ক্ষেত্রে অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন লোকেরা কম যোগ্যতাসম্পন্ন লোকেদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়, বেশি বুদ্ধিমান লোক অল্পবুদ্ধি লোকের ওপর ক্ষমতা জাহির করতে পারে, অধিক ধনশালীরা নির্ধন ব্যক্তিদের ওপর নিজেদের জোর খাটাতে পারে কিন্তু ভগবানকে কোনো বল, বুদ্ধি, যোগ্যতা, ব্যক্তি, বস্তু ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবিত করা সম্ভব নয়। কারণ হল, যখন ভগবানের সংকল্পমাত্রেই তৎক্ষণাৎ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়, তখন সেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের কোনো একটি ব্রহ্মাণ্ডের কোনো একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশে স্থিত বস্তু বা ব্যক্তির দ্বারা তাঁকে হস্তগত করা কীভাবে সম্ভবপর ? তাৎপর্য হল যে ভগবানের প্রাপ্তি শুধুমাত্র ভগবদ্‌কৃপাতেই সম্ভব হয়। সেই কৃপা তখনই প্রাপ্ত হয়, যখন মানুষ তার সামর্থ্য, সময়, বুদ্ধি, সামগ্রী ইত্যাদি ভগবানকে সর্বতোভাবে সমর্পণ করে নিজের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে দুর্বলতা, অযোগ্যতা অনুভব করে অর্থাৎ নিজের বল, যোগ্যতা প্রভৃতির বিন্দুমাত্র অভিমান পোষণ না করে। এইভাবে যখন সে সর্বতোভাবে নির্বল হয়ে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ভগবানে সমর্পণ করে, অনন্যভাবে ভগবানকে ডাকে, তখন ভগবান তৎক্ষণাৎ প্রকটিত হন। কারণ যতক্ষণ মানুষের চিত্তে প্রাকৃত বস্তু, যোগ্যতা, বল, বুদ্ধি ইত্যাদির গুরুত্ব ও আশ্রয় থাকে, ততক্ষণ ভগবান অত্যন্ত নিকট হলেও দূর বলে প্রতিভাত হন।

এই শ্লোকে যে দুর্লভতার কথা বলা হয়েছে, তা চতুর্ভুজরূপ সম্বন্ধে, বিশ্বরূপ সম্বন্ধে নয়। একে বিশ্বরূপের সম্বন্ধে মনে করলে তাতে পুনরুক্তি দোষ এসে পড়ে। কারণ আগে আটচল্লিশতম শ্লোকে বিশ্বরূপের দুর্লভতার কথা জানানো হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ পরবর্তী শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, অনন্যভক্তির দ্বারা তাঁর দর্শন পাওয়া সম্ভব। বিশ্বরূপে অনন্যভক্তি আসতেই পারে না, কারণ অর্জুনের মতো বড় যোদ্ধাও ভগবানের কাছ থেকে দিব্যদৃষ্টি লাভ করেও বিশ্বরূপ দেখে ভীতচকিত হয়ে গিয়েছিলেন। তাহলে সেই রূপ দর্শনে অনন্যভক্তি, অনন্যপ্রেম, আকর্ষণ কীভাবে হতে পারে ? অর্থাৎ তা হতে পারে না।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—যখন কোনো সাধনার দ্বারা, যোগ্যতার দ্বারা, কোনো সামগ্রীর সাহায্যে আপনাকে লাভ করা যায় না, তাহলে আপনাকে কীভাবে লাভ করা যায়—পরবর্তী শ্লোকে ভগবান তার উত্তর দিচ্ছেন।

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ।। ৫৪ ।।

[তু, পরন্তপ (কিন্তু হে পরন্তপ !) ; অর্জুন (অর্জুন !) ; এবংবিধ (এইরকম) ; অহম্ (আমাকে) ; অনন্যয়া, ভক্ত্যা (অনন্যভক্তির দ্বারাই) ; তত্ত্বেন, জ্ঞাতুম্, চ (তত্ত্বতঃ জানা) ; দ্রষ্টুম্, চ (সগুণরূপে দর্শন এবং) ; প্রবেষ্টুম্, শক্যঃ (প্রাপ্ত করা সম্ভব হয়।)]

কিন্তু হে পরন্তপ অর্জুন ! এইরকম (চতুর্ভুজসম্পন্ন রূপ) আমাকে অনন্যভক্তি দ্বারাই তত্ত্বতঃ জানা, সাকাররূপে দর্শন এবং প্রাপ্ত করা অর্থাৎ আমাতে প্রবেশ করা সম্ভবপর হয়।। ৫৪ ।।

ব্যাখ্যা—'**ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন**'—এখানে 'তু' পদটি আগে বলা সাধনা-গুলির থেকে বিশেষ সাধনা জানাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। ভগবান বলেছেন, হে অর্জুন ! তুমি আমার যেমন শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজরূপ দেখলে, সেইরূপ-বিশিষ্ট আমাকে দান, তপ ইত্যাদির সাহায্যে দেখা সম্ভব নয়, একমাত্র অনন্যভক্তির সাহায্যেই আমার দর্শন সম্ভব।

অনন্যভক্তির অর্থ হল—শুধু ভগবানকেই আশ্রয় করা, তাঁর ওপর বিশ্বাস, আশা ও ভরসা রাখা[১]। ভগবানকে ছাড়া অন্য কোনো যোগ্যতা, বল, বুদ্ধি ইত্যাদির ওপর

[১](ক) এক ভরোসা এক বল এক আস বিশ্বাস। এক রাম ঘনস্যাম হিত চাতক তুলসীদাস।। (তুলসীকৃত দোহাবলী ২৭৭)
(খ) এক বানি করুণানিধান কী। সো প্রিয় জাকেঁ গতি ন আন কী।। (শ্রীরামচরিতমানস ৩।১০।৪)

যেন বিন্দুমাত্র ভরসা না থাকে। হৃদয়ে যেন আর কিছু গুরুত্ব না পায়। এই অনন্যভক্তি স্বয়ং থেকেই উৎপন্ন হয়, মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা নয়। তাৎপর্য হল, কেবল স্বয়ং-এরই যেন ব্যাকুলতাপূর্বক উৎকণ্ঠা থাকে। ভগবদ্দর্শন ব্যতীত একটি ক্ষণও যেন স্বস্তি না থাকে। স্বয়ং-এর এই যে অস্বস্তি এটিই হল ভগবদ্প্রাপ্তির প্রধান কারণ। এই অস্থিরতা এবং ব্যাকুলতাতেই অনন্ত জন্মের অনন্ত পাপরাশি ভস্ম হয়ে যায়। এরূপ অনন্যভক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্যই ভগবান বলেছেন—'যে অনন্যচিত্ত ভক্ত নিত্য-নিরন্তর আমার চিন্তা করেন, আমি তাঁর পক্ষে সুলভ' (গীতা ৮।১৪) এবং যে অনন্যমনা ভক্ত আমারই চিন্তায় রত থেকে আমার উপাসনা করেন, তাঁর যোগক্ষেম আমি বহন করি' (৯।২২)।

অনন্যভক্তির অপর তাৎপর্য হল যে, নিজের ভজন-স্মরণ করার, সাধনা করার, ব্যাকুলভাবে ডাকা ইত্যাদি সাধনার উপর যে ভরসা করা, তাও যেন একেবারেই না থাকে। তবে সাধনা কীসের জন্য ? শুধু নিজের অহং-বোধ দূর করার জন্য অর্থাৎ সাধনায় নিজের মধ্যে শক্তির যে আভাস দেখা যায় তা দূর করার জন্যই সাধনা করতে হয়। তাৎপর্য হল যে কোনো সাধনার দ্বারা ভগবদ্প্রাপ্তি হয় না, তা হয় সাধনার অহংকার বিগলিত হওয়ার ফলে। সাধনার অহংকার দূর হলে সাধকের ওপর ভগবানের পরিপূর্ণ কৃপা প্রভাব বিস্তার করে অর্থাৎ সেই কৃপার পথে কোনো কিছুই বাধা সৃষ্টি করতে পারে না এবং সেই কৃপা দ্বারাই ভগবদ্প্রাপ্তি হয়।

'জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুম্'—এরূপ অনন্যভক্তির সাহায্যেই আমাকে স্বরূপতঃ জানা সম্ভব, এরূপ অনন্যভক্তির দ্বারাই আমার দর্শন লাভ করা সম্ভব এবং তার দ্বারাই আমাকে প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব।

জ্ঞানের দ্বারাও ভগবানকে স্বরূপতঃ জানা যায় এবং প্রাপ্ত করাও সম্ভব হয় (গীতা ১৮।৫৫), কিন্তু দর্শন প্রদান করতে তিনি বাধ্য থাকেন না।

'জ্ঞাতুম্' কথাটির অর্থ হল যে, আমি যেমন, সেই রূপেই আমাকে জানা যায়। জানার অর্থ এই নয় যে, আমি তার বুদ্ধির অন্তর্গত হই, আসলে আমা হতে তার জানার শক্তি পরিপূর্ণ হয়। অর্থাৎ সে আমাকে **'বাসুদেবঃ সর্বম্'** (গীতা ৭।১৯) এবং **'সদসচ্চাহম্'** (গীতা ৯।১৯)—এইরূপে তত্ত্বতঃ জেনে থাকে।

'দ্রষ্টুম্' কথার তাৎপর্য হল যে সগুণরূপে অর্থাৎ বিষ্ণু, রাম, কৃষ্ণ ইত্যাদি যে কোনো রূপে সে দেখতে ইচ্ছা করে, সেই রূপে আমাকে দেখতে সক্ষম হয়।

'প্রবেষ্টুম্' বলার তাৎপর্য হল, সে ভগবানের সঙ্গে নিজের অভিন্নতা অনুভব করে অথবা ভগবানের নিত্যলীলায় তার প্রবেশ ঘটে। নিত্যলীলাতে প্রবেশ হওয়াতে ভক্তের ইচ্ছা এবং ভগবানের ইচ্ছা প্রধান হয়ে থাকে। যদিও সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হলে ভক্তের সমস্ত ইচ্ছা লীন হয়ে যায়, তবুও ভগবানের মহত্ত্ব হল এই যে, ভক্তের লীলাতে প্রবেশ করার যে আকাঙ্ক্ষা থাকে, তা তিনি পূর্ণ করেন। তিনি যে শুধু পারমার্থিক-ইচ্ছাই পূর্ণ করেন তা নয় ; ভক্তের যেসব সাংসারিক বস্তুর আকাঙ্ক্ষা পূর্বে ছিল তা-ও পূর্ণ করেন। যেমন ভগবদ্-দর্শনের আগে ধ্রুবের পূর্বইচ্ছা অনুযায়ী ভগবান তাকে ছত্রিশ হাজার বর্ষব্যাপী রাজত্ব প্রদান করেছিলেন এবং বিভীষণ লাভ করেছিলেন এক কল্পব্যাপী রাজত্ব। তাৎপর্য হল এই যে, ভগবান ভক্তের ইচ্ছা পূরণ করে তারপর নিজ ইচ্ছানুযায়ী তাকে পূর্ণত্ব প্রদান করেন যার ফলে ভক্তের আর কোনো কিছু করার, জানার বা পাওয়ার অবশিষ্ট থাকে না।

বিশেষ কথা

ভক্তের মধ্যে যে তীব্র অভিলাষ থাকে তার এমনই শক্তি যে ভগবানও ভক্তের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য উদ্গ্রীব হন। ভগবানের এই অভিলাষে বাধা প্রদানের সামর্থ্য কারোরই নেই। অনন্ত সামর্থ্যশালী ভগবানের কৃপা যখন ভক্তের ওপর বর্ষিত হয়, তখন সেই কৃপা ভক্তের সমস্ত বিঘ্ন দূর করে, ভক্তের যোগ্যতা-অযোগ্যতা বিচার না করে ভগবানকেও বশ করে ফেলে, যার ফলে ভগবান তখনই ভক্তের সম্মুখে প্রকটিত হন।

পরিশিষ্ট-ভাব—ভগবান যেস্থানে জ্ঞানের পরানিষ্ঠার কথা জানিয়েছেন, সেখানে জ্ঞানের দ্বারা কেবল জানা এবং প্রাপ্ত হওয়ার কথাই বলেছেন—**'ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্'** (গীতা ১৮।৫৫) কিন্তু এইস্থানে ভক্তির দ্বারা জানা, দেখা এবং প্রাপ্ত হওয়া এই তিনটির কথা বলা হয়েছে। ভক্তির দ্বারা ভগবানের দর্শন লাভও সম্ভব—ভক্তির এই হল বৈশিষ্ট্য। কিন্তু জ্ঞানের পরানিষ্ঠা হলেও ভগবানের দর্শন পাওয়া যায় না। সুতরাং ভক্তির এক বিশেষ মহিমা

আছে। ভক্তির দ্বারা সমগ্র-প্রাপ্তি লাভ হয়।

ব্রহ্মপ্রাপ্তিতে জানা ও প্রাপ্ত হওয়া—এই দুটি বিষয় হতে পারে কিন্তু সমগ্র-প্রাপ্তিতে জানা, প্রাপ্ত হওয়া ও দর্শন লাভ করা—এই তিনটিই হয়ে থাকে। কারণ একদেশীয়তে একদেশীয়তা (পরিচ্ছিন্নতা) হয় আর সমগ্রে সমগ্রলাভ হয়।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—ভগবান পরবর্তী শ্লোকে অনন্যভক্তি লাভের উপায় জানাচ্ছেন।

মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব।। ৫৫ ।।

[**পাণ্ডব** (হে পাণ্ডব) ; **যঃ, মৎকর্মকৃৎ** (যে আমার জন্য কর্ম করে) ; **মৎপরমঃ** (মৎপরায়ণ হয়) ; **মদ্ভক্তঃ** (আমার ভক্ত হয়) ; **সঙ্গবর্জিতঃ** (সর্বতোভাবে আসক্তিবর্জিত) ; **সর্বভূতেষু, নির্বৈরঃ** (সর্বপ্রাণীতে নির্বৈর হয়) ; **সঃ** (সেই ভক্ত) ; **মাম্, এতি** (আমাকে প্রাপ্ত হয়।)]

হে পাণ্ডব ! যে ব্যক্তি আমার জন্য কর্ম করে, মৎপরায়ণ হয়, আমার ভক্ত হয় ও সর্বতোভাবে আসক্তিবর্জিত এবং সমস্ত প্রাণীতে নির্বৈর (শত্রুতাবর্জিত) হয়, সেই ভক্ত আমাকে প্রাপ্ত হয়।। ৫৫ ।।

ব্যাখ্যা—[এই শ্লোকে পাঁচটি কথা বলা হয়েছে। এই পাঁচটিকে '**সাধনপঞ্চক**' ও বলা হয়। এই পাঁচটি বিষয়ের দুটি ভাগ আছে—(১) ভগবানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাব এবং (২) সংসারের সঙ্গে আসক্তি ছেদ। প্রথম বিভাগে '**মৎকর্মকৃৎ**', '**মৎপরমঃ**' এবং '**মদ্ভক্তঃ**'—এই তিনটি কথা আছে ; আর দ্বিতীয় বিভাগে '**সঙ্গবর্জিতঃ**' এবং '**নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু**'—এই দুটি কথা আছে।]

'**মৎকর্মকৃৎ**'—যে ব্যক্তি জপ, কীর্তন, ধ্যান, সৎসঙ্গ, স্বাধ্যায় ইত্যাদি ভগবদ্‌সম্বন্ধীয় কর্ম এবং বর্ণ, আশ্রম, দেশ, কাল, পরিস্থিতি ইত্যাদি অনুসারে প্রাপ্ত লৌকিক কর্মগুলি আমার জন্যই অর্থাৎ আমার প্রসন্নতার জন্যই করেন, তিনিই '**মৎকর্মকৃৎ**'।

বাস্তবিকভাবে দেখলে কর্মের পারমার্থিক ও লৌকিক—এই দুটি বাহ্যিক রূপ হয়, কিন্তু অন্তরে 'সব কর্ম শুধু ভগবানের জন্য করতে হবে'—এরূপ একটি ভাবই থাকে, একটি উদ্দেশ্যই থাকে। অর্থাৎ ভক্ত তার শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির সাহায্যে যা কিছু করেন, তা সব ভগবানের উদ্দেশ্যেই করে থাকেন। কারণ তাঁর শরীর, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, যোগ্যতা, কর্ম করার সামর্থ্য, বিচার ইত্যাদি যা কিছু থাকে, তা সবই ভগবদ্‌প্রদত্ত এবং ভগবানেরই এবং তিনি নিজেও ভগবানেরই। তিনি শুধুমাত্র ভগবানের প্রসন্নতার জন্য, ভগবানের আদেশ অনুযায়ী, ভগবদ্‌প্রদত্ত শক্তিতে নিমিত্তমাত্র হয়ে কর্ম করে থাকেন। এই হল তাঁর '**মৎকর্মকৃৎ**' হওয়া।

'**মৎপরমঃ**'—যে ব্যক্তি আমাকেই পরম ধ্যেয় মনে করে কেবল আমারই পরায়ণ হয়ে থাকেন অর্থাৎ যাঁর পরম প্রাপণীয়, পরম ধ্যেয়, পরম আশ্রয় শুধু আমি-ই, সেই ভক্তকে বলা হয় '**মৎপরমঃ**'।

'**মদ্‌ভক্তঃ**'—যে ব্যক্তি শুধু আমারই ভক্ত অর্থাৎ যিনি আমার সঙ্গে এরূপ অটল সম্পর্ক স্থাপন করেছেন যে, 'আমি শুধুমাত্র ভগবানেরই আর শুধু ভগবানই আমার, আমি অন্য কারও নই এবং কেউ আমার নয়।' এরূপ সম্পর্কের ফলে তাঁর ভগবানে অত্যন্ত প্রেম হয়। কারণ আপন জিনিস স্বতঃই প্রিয় হয়। প্রেম জাগ্রত হওয়ার মুখ্য কারণই হল আপনত্ব ভাব।

সেই ভক্ত সর্বদেশে, সর্বকালে, সমস্ত বস্তু-ব্যক্তিতে এবং নিজের মধ্যেও সদা সর্বদা প্রভুকে পরিপূর্ণরূপে দেখে থাকেন। এই দৃষ্টিতে দেখলে প্রভু সর্বত্র হওয়ায় এখানেও অবস্থিত, সর্বকালে হওয়ায় এখনও আছেন, সমস্ত বস্তু-ব্যক্তির মধ্যে হওয়ায় আমাতেও আছেন এবং সকলের হওয়ায় তিনি আমারও—এরূপ ভাব যিনি রাখেন তিনিই '**মদ্ভক্তঃ**'।

'**সঙ্গবর্জিতঃ নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ**'—শুধু ভগবানের জন্য কর্ম করলে এবং তাঁর শরণাগত হলে এবং ভগবানেরই ভক্ত হয়ে গেলে কী হয় ? উপরিউক্ত পদটির দ্বারা বর্ণনা করে বলেছেন যে, সে '**সঙ্গবর্জিতঃ**' হয়

অর্থাৎ তাঁর সংসারে আসক্তি, মমতা, কামনা থাকে না। ওইগুলি থাকলেই সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ভগবানে অনন্য প্রেম হলেই আসক্তি ইত্যাদি আর একেবারেই থাকে না।

দ্বিতীয়তঃ ভক্ত যখন 'আমি ভগবানেরই অংশ'— এই প্রকৃত সত্য অনুভব করে, তখন তার ভগবানে প্রেম জাগরিত হয়। প্রেম জাগ্রত হলে আসক্তি থাকে না। আসক্তি না থাকলে এবং সর্বত্র ভগবদ্‌ভাব হলে, তার সঙ্গে যতই দুর্ব্যবহার করা হোক, তাকে মার ধোর করুক বা তার অনিষ্ট করা হোক, তবুও তার মধ্যে অনিষ্টকারীর প্রতি বিন্দুমাত্র বৈরভাব উৎপন্ন হয় না। সে সেগুলি ভগবানেরই ইচ্ছা এবং কৃপা বলে মনে করে। এরূপ ভক্তকে ভগবান **'নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু'** বলেছেন।

'সঙ্গবর্জিতঃ' এবং **'নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু'**—এই দুটির বর্ণনা করার অর্থ হল এই যে 'এদের সংসার থেকে সর্বতোভাবে সম্পর্ক ছেদ হয়' এটি বলা। সংসার থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হলে স্বতঃই পরমাত্মাকে লাভ করা যায়।

'স মামেতি'—এরূপ আমার ভক্তগণ আমাকেই প্রাপ্ত হন। **'স মামেতি'**র দ্বারা স্বরূপতঃ জানা, দর্শন করা এবং প্রাপ্ত হওয়া—এই তিনটি বিষয়ই আসে, যেটি পূর্ববর্তী (চুয়ান্নতম) শ্লোকে বলা হয়েছে। অর্থাৎ মনুষ্যজন্ম যে উদ্দেশ্যে হয়েছে, সেই উদ্দেশ্য সর্বতোভাবে পূর্ণ হয়।

বিশেষ কথা

শ্রীভগবান নবম অধ্যায়ের শেষে বলেছেন যে—

মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈশ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥

(৯।৩৪)

একথা বলা সত্ত্বেও ভগবানের মনে হয়েছিল যে, 'আমি কী করে আমার রহস্যের কথা জানাব, বোঝাব ?' সেগুলি বোঝাবার জন্যই ভগবান দশম ও একাদশ অধ্যায়ের অবতারণা করেন।

জীবগণ উৎপত্তি-বিনাশশীল এবং নিত্য পরিবর্তনশীল প্রকৃতি ও প্রকৃতির কার্য শরীর-সংসারের আশ্রয় নিয়ে আছে, যার ফলে তারা অবিনাশী এবং অপরিবর্তনশীল ভগবানে বিমুখ হয়ে থাকে। এই বিমুখতা দূর করে জীবগণকে ভগবানের অভিমুখী করানোই এই দুটি—দশম ও একাদশ অধ্যায়ের তাৎপর্য।

মানুষমাত্রের মধ্যেই দুটি শক্তি থাকে—চিন্তা করার এবং দেখার। চিন্তা করার যে শক্তি, সেটি ভগবানের বিভূতিতে নিয়োজিত করা উচিত অর্থাৎ যে কোনো বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদিতে যা-কিছু বিশেষত্ব, মহত্ত্ব, অলৌকিকত্ব অনুভূত হয় ও তাতে মন নিবিষ্ট হয় সেগুলি ভগবানেরই মনে করে, সেইস্থানে ভগবানকেই চিন্তা করা উচিত। সেইজন্যই ভগবান দশম অধ্যায়টি বলেছেন।

অপরটি, যা দেখার শক্তি, সেটিও ভগবানে নিয়োজিত করা উচিত। অর্থাৎ ভগবানের দিব্য অবিনাশী বিশ্বরূপে যেমন অনেক রূপ আছে, নানা আকৃতি, নানাপ্রকার দৃশ্যাবলী আছে, এই জগৎ-সংসারও তেমন সেই বিশ্বরূপেরই এক অঙ্গ এবং এতে বিভিন্ন নাম, রূপ, আকৃতি ইত্যাদি রূপে একমাত্র পরমাত্মাই পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান। এই দৃষ্টিতেই সকলকে যেন পরমাত্মস্বরূপই দেখে। সেইজন্যই ভগবান একাদশ অধ্যায় বর্ণনা করছেন।

অর্জুনও এই দুটি ব্যাপারের জন্য দুবার প্রার্থনা করেছেন। দশম অধ্যায়ের সপ্তদশ শ্লোকে অর্জুন বলেছেন যে, 'হে ভগবন্! আমি কোন্ কোন্ ভাবে আপনার চিন্তা করব ?' তখন ভগবান চিন্তাশক্তি ব্যবহারের জন্য তাঁর বিভূতিগুলি বর্ণনা করেছেন। একাদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে অর্জুন বলেছেন যে, 'আমি আপনার রূপ দেখতে ইচ্ছা করি', তখন ভগবান তাঁর বিশ্বরূপ দেখালেন এবং সেটি দেখার জন্য অর্জুনকে দিব্যচক্ষু প্রদান করলেন।

এর তাৎপর্য এই যে সাধকের তার চিন্তা এবং দর্শন-শক্তি একমাত্র ভগবান ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে খরচ করা উচিত নয় অর্থাৎ সাধক চিন্তা করলে পরমাত্মারই চিন্তা করবে এবং কিছু অবলোকন করলে, পরমাত্মস্বরূপই অবলোকন করবে।

পরিশিষ্ট-ভাব—যে ভক্তির সাহায্যে ভগবানকে চতুর্ভুজরূপে দর্শন করা সম্ভব হয়, সেই ভক্তির স্বরূপ তিনি জানাচ্ছেন

যে মানুষ যেন জগৎ-সংসার থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে সর্বতোভাবে তাঁর পরায়ণ হয়ে ওঠে। **'মৎকর্মকৃৎ'**—এই স্থূলশরীর দ্বারা ভগবানের পরায়ণ হতে হয়, **'মৎপরমঃ'**—এই সূক্ষ্ম এবং কারণ শরীরের সাহায্যে ভগবানের পরায়ণ হতে হয়, এবং **'মদ্ভক্তঃ'**—এই স্ব-স্বরূপ দ্বারা ভগবানের পরায়ণ হতে হয়, কারণ 'আমি ভগবানের এবং ভগবান আমার'—এ হল স্ব-স্বরূপের স্বীকৃতি।

'স মামেতি' পদটির দ্বারা সমগ্র-প্রাপ্তি বোঝায়।

* * *

ওঁ তৎসৎ ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে বিশ্বরূপদর্শনযোগো নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

এইভাবে ওঁ, তৎ, সৎ—এই ভগবদ্নাম উচ্চারণ পূর্বক ব্রহ্মবিদ্যা এবং যোগশাস্ত্রময় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদরূপ শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে 'বিশ্বরূপদর্শনযোগ' নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত হল ॥ ১১ ॥

অর্জুন ভগবানের কাছ থেকে দিব্যদৃষ্টি লাভ করে যে বিশ্বরূপ দর্শন করেছিলেন, সেই বর্ণনা পড়ে বা শুনে ভগবানের প্রভাব মেনে নিলে ভগবানের সঙ্গে যোগ (সম্বন্ধ) অনুভূত হয়। তাই একাদশ অধ্যায়কে 'বিশ্বরূপদর্শনযোগ' নামে বলা হয়েছে।

একাদশ অধ্যায়ের পদ, অক্ষর এবং উবাচ

১) এই অধ্যায়ে **'অথৈকাদশোঽধ্যায়ঃ'**-এর তিন, **'অর্জুন উবাচ'** ইত্যাদি পদগুলির বাইশ, শ্লোকগুলির আটশত একান্ন এবং পুষ্পিকার তেরটি পদ আছে। এইভাবে সমস্ত পদগুলির যোগসংখ্যা আটশত উননব্বই।

২) **'অথৈকাদশোঽধ্যায়ঃ'**-এর সাত, **'অর্জুন উবাচ'** ইত্যাদি পদগুলির সত্তর, শ্লোকগুলির দু'হাজার একশত তিরানব্বই এবং পুষ্পিকার পঞ্চাশটি অক্ষর আছে। এইরূপে সমস্ত অক্ষরগুলির যোগসংখ্যা হল দু'হাজার তিনশত কুড়ি। এই অধ্যায়ের পঞ্চান্নটি শ্লোকের প্রথম শ্লোকটি তেত্রিশ অক্ষরের এবং পঞ্চদশ থেকে পঞ্চাশতম শ্লোক পর্যন্ত ছত্রিশটি শ্লোক চুয়াল্লিশ অক্ষর সংবলিত। বাকি আঠারোটি শ্লোক বত্রিশ অক্ষরের।

৩) এই অধ্যায়ে এগারোটি **'উবাচ'** আছে—চারটি **'অর্জুন উবাচ'**, চারটি **'শ্রীভগবানুবাচ'** এবং তিনটি **'সঞ্জয় উবাচ'**।

একাদশ অধ্যায়ে প্রযুক্ত ছন্দ

এই অধ্যায়ে পঞ্চান্নটি শ্লোক আছে, তার মধ্যে উনিশটি শ্লোক **'অনুষ্টুপ'** ছন্দের, তিনটি **'উপেন্দ্রবজ্রা'** এবং তেত্রিশটি **'উপজাতি'** ছন্দের।

'অনুষ্টুপ' ছন্দ সমন্বিত উনিশটি শ্লোকের মধ্যে প্রথম এবং পঞ্চান্নতম শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে **'ভগণ'** প্রযুক্ত হওয়ায় **'ভ-বিপুলা'**, একাদশ এবং তিপ্পান্নতম শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে **'নগণ'** প্রযুক্ত হওয়ায় **'ন-বিপুলা'**, এবং দশম শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে **'নগণ'** এবং তৃতীয় পংক্তিতে **'ভগণ'** প্রযুক্ত হওয়ায় **'সঙ্কীর্ণ-বিপুলা'** ছন্দ সমন্বিত শ্লোক আছে। বাকি চতুর্দশ (২-৯, ১২-১৪, ৫১-৫২, ৫৪) শ্লোক ঠিক **'পথ্যাবক্ত্র'** অনুষ্টুপ্ ছন্দের লক্ষণ দ্বারা যুক্ত।

বাকি ছত্রিশটি শ্লোকের মধ্যে আটাশতম, উনত্রিশতম এবং পঁয়তাল্লিশতম শ্লোক **'উপেন্দ্রবজ্রা'** এবং অবশেষ তেত্রিশটি (১৫-২৭, ৩০-৪৪, ৪৬-৫০) শ্লোক **'উপজাতি'** ছন্দের লক্ষণ দ্বারা যুক্ত।

* * *

॥ ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

অথ দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

দ্বাদশ অধ্যায়

অবতরণিকা

শ্রীভগবান চতুর্থ অধ্যায়ের তেত্রিশ ও চৌত্রিশতম শ্লোকে জ্ঞানযোগের শ্রেষ্ঠতা জানাতে গিয়ে জ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য প্রেরণা দিয়েছেন। পরে জ্ঞানের মহিমা বর্ণনা করেছেন। তারপরে পঞ্চম অধ্যায়ের ষোড়শ, সপ্তদশ এবং চব্বিশ থেকে ছাব্বিশ শ্লোক পর্যন্ত, ষষ্ঠ অধ্যায়ের চব্বিশ থেকে আটাশতম শ্লোক পর্যন্ত এবং অষ্টম অধ্যায়ের একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শ্লোক পর্যন্ত নির্গুণ-নিরাকারের উপাসনার মহত্ত্ব জানিয়েছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের সাতচল্লিশতম শ্লোকে সাধক ভক্তের মহিমা বলেছেন এবং সপ্তম অধ্যায় থেকে একাদশ অধ্যায় পর্যন্ত স্থানে স্থানে 'অহম্' 'মাম্' ইত্যাদি পদের দ্বারা বিশেষভাবে সগুণ-সাকার ও সগুণ-নিরাকার উপাসনার মহত্ত্ব বলেছেন ও শেষে একাদশ অধ্যায়ের চুয়ান্ন-পঞ্চান্নতম শ্লোকে অনন্যভক্তির মহিমা ও ফলসহ তার স্বরূপ বর্ণনা করেছেন[১]।

উপরিউক্ত বর্ণনায় অর্জুনের মনে প্রশ্ন আসে যে সগুণ ভগবানের উপাসনাকারী এবং নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনাকারী—দুজনের মধ্যে কোন্ উপাসক শ্রেষ্ঠ। সেইজন্যই অর্জুন প্রশ্ন করেছেন—

অর্জুন উবাচ

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ॥ ১ ॥

[যে ভক্তাঃ (যেসব ভক্ত) ; এবম্ (এইভাবে) ; সততযুক্তাঃ, ত্বাম্ (নিরন্তর আপনার) ; পর্যুপাসতে, চ (উপাসনা করেন এবং) ; যে, অক্ষরম্ (যাঁরা অবিনাশী) ; অব্যক্তম্, অপি (নির্গুণ নিরাকারের উপাসনা করেন) ; তেষাম্ (তাঁদের মধ্যে) ; যোগবিত্তমাঃ, কে (শ্রেষ্ঠ যোগবেত্তা কে ?)]

যেসকল ভক্ত (একাদশ অধ্যায়ের পঞ্চান্নতম শ্লোক অনুসারে) নিবিষ্ট চিত্তে নিরন্তর আপনার (সগুণ ভগবানের) উপাসনা করেন এবং যাঁরা অবিনাশী নিরাকারের উপাসনা করেন, তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোগবেত্তা কে ? ॥ ১ ॥

---

[১]এই অধ্যায়ের পূর্বে যে শ্লোকগুলিতে সাকার ভগবানের উপাসকদের বর্ণনা করা হয়েছে তার পরিচয় নীচে দেওয়া হল—

অধ্যায়	শ্লোক	পদ	অর্থ
৬	৪৭	'মদ্গতেনান্তরাত্মনা....শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাম্'	(যে শ্রদ্ধাবান ভক্ত আমাতে তল্লীন হয়ে আমার ভজনা করে)
৭	১	'ময্যাসক্তমনাঃ ... যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ'	(আমাতে অনন্যপ্রেমে আসক্ত ও আমার আশ্রিত হয়ে ভক্তিযোগে ব্যাপৃত)
৭	২৯-৩০	'মামাশ্রিত্য যতন্তি', 'যুক্ত চেতসঃ'	(যুক্তচিত্ত ব্যক্তি আমার শরণাগত হয়ে সাধনা করে)
৮	৭	'ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ'	(আমাতে অর্পিত মন-বুদ্ধিসম্পন্ন)
৮	১৪	'অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ'	(অনন্যচিত্ত হয়ে যে নিত্য-নিরন্তর আমাকে স্মরণ করে)

ব্যাখ্যা—'এবং সততযুক্তা যে ভক্তাঃ'—একাদশ অধ্যায়ের পঞ্চান্নতম শ্লোকে ভগবান **'যঃ'** এবং **'সঃ'** পদগুলি যে সাধকের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন, সেই সাধকের জন্যই অর্থাৎ সগুণ-সাকার ভগবানের উপাসনাকারী সমস্ত সাধকের জন্যই এখানে **'যে ভক্তাঃ'** পদ ব্যবহৃত হয়েছে।

এখানে **'এবম্'** পদটির দ্বারা একাদশ অধ্যায়ের পঞ্চান্নতম শ্লোককে নির্দেশ করা হয়েছে।

'আমি ভগবানেরই'—এইভাবে ভগবানের হয়ে থাকাকেই বলা হয় 'সততযুক্ত' হওয়া।

ভগবানে পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল সাধক-ভক্তদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল ভগবদ্‌প্রাপ্তি। তাই প্রত্যেকটি (পারমার্থিক—ভগবৎ-সম্বন্ধীয় জপ-ধ্যানাদি অথবা ব্যবহারিক—শারীরিক এবং জীবিকা-সম্বন্ধীয়) ক্রিয়াতে তাদের সম্বন্ধ নিত্য-নিরন্তর ভগবানে বজায় থাকে। **'সততযুক্তাঃ'** পদটি এরূপ সাধক-ভক্তদের বাচক।

সাধকেরা একটি বড় ভুল করে বসেন যে তাঁরা পারমার্থিক ক্রিয়া করার সময় নিজেদের সম্পর্ক ভগবানের

অধ্যায়	শ্লোক	পদ	অর্থ
৯	১৪	'সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ'	(দৃঢ় নিশ্চয়যুক্ত ভক্তগণ নিত্য আমার নাম-গুণকীর্তন করে আমার প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করে)
৯	২২	'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে'	(যে ভক্ত অনন্যভাবে আমাকে চিন্তা করে আমার উপাসনা করে)
৯	৩০	'ভজতে মামনন্যভাক্'	(অনন্যভাবে আমার ভজনা করে)
১০	৯	'মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্'	(আমাতে মননিবিষ্টকারী এবং আমাতে প্রাণ অর্পণকারী ভক্তগণ নিজেদের মধ্যে আমার প্রভাব আলোচনা করে)
১১	৫৫	'মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ'	(আমার জন্যই কর্তব্য-কর্মকারী, আমার পরায়ণ ও ভক্ত)

এই অধ্যায়ের আগে যে শ্লোকে ও পদে নিরাকার উপাসকদের বর্ণনা করা হয়েছে, তার পরিচয়।

অধ্যায়	শ্লোক	পদ	অর্থ
৪	৩৪	'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া'	(সেই জ্ঞান তুমি তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীদের কাছে গিয়ে তাঁদের সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে, সেবা করে এবং সরল চিত্তে প্রশ্ন দ্বারা জেনে নাও)
৪	৩৯	'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্'	(শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি জ্ঞান প্রাপ্ত হন)
৫	৮	'নৈব কিঞ্চিৎ করোমিতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ'	(তত্ত্বজ্ঞ সাংখ্যযোগীরা নিঃসন্দেহে মনে করেন যে তাঁরা কিছুই করেন না)
৫	১৩	'নৈব কুর্বন্ন কারয়ন্'	(কর্ম নিজে না করে, অপরের দ্বারা না করিয়ে)
৫	২৪-২৬	'ব্রহ্ম নির্বাণম্'	(নির্বাণ ব্রহ্মলাভ করে)
৬	২৫	'আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা'	(মনকে পরমাত্মায় স্থিত করে)
৮	১১	'যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি'	(বেদজ্ঞ পুরুষ যে পরমপদকে অক্ষর বলে থাকেন)
৮	১৩	'ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্'	(নির্গুণ ব্রহ্মরূপে আমাকে স্মরণ করতে করতে ওঁ—এই এক অক্ষররূপ ব্রহ্ম উচ্চারণ করে।)
৯	১৫	'জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে'	(জ্ঞানযোগী নির্গুণব্রহ্মরূপ আমাকে জ্ঞান-যজ্ঞের দ্বারা পূজা করে আমার উপাসনা করে থাকে)

সঙ্গে মনে করলেও, ব্যবহারিক ক্রিয়ার সময় নিজেদের সম্পর্ক জগতের সঙ্গে মেনে নেন। এই ভুলের কারণ হল সময়-অসময়ে সাধকের উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা। যতক্ষণ সাধকের বোধে অর্থ-প্রাপ্তি, মান-প্রাপ্তি, আত্মীয়-পোষণ ইত্যাদি বিভিন্ন উদ্দেশ্য থাকে, ততক্ষণ তাঁদের সম্পর্ক নিরন্তর ভগবানের সঙ্গে থাকে না। যদি তাঁরা তাঁদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ভগবদ্প্রাপ্তিকে নির্দিষ্ট করে নেন তাহলে তাঁদের প্রত্যেকটি ক্রিয়াই ভগবদ্প্রাপ্তির সাধন হয়ে ওঠে। ভগবদ্প্রাপ্তি একমাত্র উদ্দেশ্য হলে জপ-স্মরণ-ধ্যানাদির সময় তাঁদের সম্পর্ক ভগবানের সঙ্গে তো থাকেই, ব্যবহারিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন করার সময়েও তাঁরা সর্বক্ষণ ভগবানের সঙ্গেই নিজেদের যুক্ত রাখেন।

ক্রিয়ার প্রারম্ভে এবং অন্তে যদি সাধকদের ভগবদ্স্মৃতি থাকে, তাহলে ক্রিয়াকালীনও তাদের সবসময় সম্বন্ধাত্মক ভগবদ্স্মৃতি থাকে—তাই মনে করতে হবে। যেমন হিসাব করার সময় ব্যবসায়ী সেই কাজে এত মগ্ন থাকে যে, সে কে এবং কেন হিসাব করছে সে কথা তার মনেও থাকে না। শুধু সেই হিসাবের দিকেই তার মন পড়ে থাকে। কাজটি শুরু করার আগে তার মনে এই ভাব থাকে যে, 'আমি অমুক ব্যবসায়ী এবং অমুক কাজের জন্য হিসাব করছি' এবং কাজটি শেষ হলেও তার মনে জেগে ওঠে যে, 'আমি অমুক ব্যবসায়ী এবং ওই কাজটি করছিলাম।' অতএব যে সময়ে সে নিমগ্ন হয়ে কাজটি করছিল তখন তার নিজের এবং নিজের কাজের যে বিস্মৃতি এসেছিল সেটি বিস্মৃতির মতো দেখালেও বস্তুতঃ 'বিস্মৃতি' নয়।

এইরূপ প্রত্যেক কর্তব্য-কর্মের প্রারম্ভে এবং শেষে যদি সাধকের এই ভাব থাকে যে 'আমি ভগবানেরই এবং তাঁরই জন্য কর্তব্য-কর্ম করছি', আর তার মধ্যে অন্য কোনো চিন্তা-ভাবনা না থাকে, তাহলে কর্তব্য-কর্মে তন্ময় হয়ে থাকার সময় তার মধ্যে ভগবানের বিস্মৃতি মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তাকে বিস্মৃতি বলা যায় না।

'ত্বাম্ পর্যুপাসতে'—'ত্বাম্' পদটির দ্বারা এখানে সেইসব সগুণ-সাকার স্বরূপকে গ্রহণ করা উচিত যা ভগবান ভক্তদের ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন সময়ে ধারণ করেন অথবা যে স্বরূপ তিনি বিভিন্ন অবতাররূপে ধারণ করেন বা যে স্বরূপ নিয়ে তিনি দিব্যধামে বিরাজ করেন—ভক্তেরা যেগুলি নিজ নিজ ভাব অনুযায়ী নানা রূপ এবং নামে উল্লেখ করে থাকেন।

'পর্যুপাসতে' পদটির অর্থ হল **'পরিতঃ উপাসতে'** অর্থাৎ ভালোভাবে উপাসনা করেন। যেমন পতিব্রতা স্ত্রী কখনো স্বামীর সেবায় নিজেকে অর্পণ করে, কখনো স্বামীর অনুপস্থিতে তার চিন্তা করে, কখনো স্বামীর বাবা-মায়ের সেবা করে আবার কখনো স্বামীর জন্য রান্না ইত্যাদি গৃহকার্যের দ্বারা স্বামীর সেবা করে ; সাধক ভক্তও তেমনই কখনো ভগবানে লীন হয়ে, কখনো ভগবানের জপ-ধ্যান, স্মরণ-মনন করে, কখনো সাংসারিক প্রাণীকে ভগবানের মনে করে তাদের সেবা করেন। আবার কখনো ভগবানের নির্দেশিত রীতিতে সাংসারিক কর্ম করে সদা-সর্বদা ভগবানের উপাসনাতেই ব্যাপৃত থাকেন। এই রূপ উপাসনাই হল বিধিসম্মত উপাসনা। এরূপ উপাসকের চিত্তে উৎপন্ন ও বিনাশশীল পদার্থ বা ক্রিয়াসমূহের বিন্দুমাত্রও গুরুত্ব বা প্রাধান্য থাকে না।

'যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তম্'—'যে' পদটি নির্গুণ নিরাকারের উপাসক সাধকদের বাচক। অর্জুন শ্লোকটির পূর্বার্ধে যে শ্রেণীর সগুণ-সাকার উপাসকদের জন্য **'যে'** পদটি প্রয়োগ করেছিলেন, সেই শ্রেণীর নির্গুণ-নিরাকার উপাসকদের জন্যই এখানে **'যে'** পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

'অক্ষরম্' পদটি অবিনাশী সচ্চিদানন্দঘন পরব্রহ্মের বাচক (এর ব্যাখ্যা এই অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে করা হয়েছে)।

যেটি কোনো ইন্দ্রিয়ের বিষয় নয়, তাকে **'অব্যক্ত'** বলা হয়। **'অব্যক্তম্'**-এর সঙ্গে এখানে **'অক্ষরম্'** বিশেষণ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এই পদটি নির্গুণ-নিরাকার ব্রহ্মের বাচক (এর ব্যাখ্যাও এই অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে করা হয়েছে)।

'অপি' পদটিতে এমন ভাব প্রতীয়মান হয় যে, এখানে সাকার উপাসকদের সঙ্গে নিরাকার উপাসকদের তুলনা করা হয়েছে,—যাঁরা নিরাকার ব্রহ্মকেই শ্রেষ্ঠ মনে করে উপাসনা করেন।

'তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ'—এখানে **'তেষাম্'** পদটি সগুণ এবং নির্গুণ উভয় প্রকার সাধকদের উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়েছে। এই অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে **'তেষাম্'** পদটি নির্গুণ উপাসকদের জন্য প্রযুক্ত হয়েছে। আবার সপ্তম শ্লোকে এটি সগুণ উপাসকদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

এই পদটিতে অর্জুন বোঝাতে চেয়েছেন যে, এই উভয়

প্রকার উপাসকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ?

'সাকার ও নিরাকার উপাসকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ?' অর্জুনের এই প্রশ্নের ভগবান যে উত্তর দিয়েছেন, তা গভীরভাবে চিন্তা করলে অর্জুনের প্রশ্নের গুরুত্ব বোঝা যায় ; যেমন—

এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোক থেকে চতুর্দশ অধ্যায়ের বিশতম শ্লোক পর্যন্ত ভগবান অবিরাম ব্যাখ্যা করে চলেছেন। তিয়াত্তর শ্লোক সংবলিত এত দীর্ঘ প্রকরণ গীতার মধ্যে একমাত্র এটিই। এর দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায় যে এই প্রকরণে ভগবান কোনো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কথা জানাতে চাইছেন। সাধকদের সাকার ও নিরাকারের স্বরূপের তাৎপর্য বোধ হোক, তাদের চিত্তে এই উভয় স্বরূপ প্রাপ্তকারী সাধনার সর্বাঙ্গীণ রহস্য প্রকটিত হোক, সিদ্ধ ভক্ত (গীতা ১২।১৩-১৯) এবং জ্ঞানীগণের (গীতা ১৪।২২-২৫) আদর্শ লক্ষণ দ্বারা সাধকেরা পরিচিত হোন আর সংসার থেকে সম্পর্ক-বিচ্ছিন্নতার বিশেষ মহত্ত্ব তাঁদের বোধগম্য হোক—এদিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করাই ভগবানের বিশদ বর্ণনার তাৎপর্য বলে মনে হয়। অর্থাৎ ভগবানের হৃদয়ে জীবেদের জন্য যে পরম কল্যাণকারী, অত্যন্ত গোপনীয়, অতি উত্তম ভাব ছিল, সেটি প্রকটিত করার শ্রেয় হল অর্জুনের ভগবৎ-প্রেরিত এই প্রশ্নটি।

পরিশিষ্ট-ভাব—'যোগশাস্ত্র' হওয়ায় গীতায় 'যোগ'ই প্রধান। সুতরাং প্রকৃত 'যোগবেত্তা' কে ?—এই ছিল অর্জুনের প্রশ্ন। যোগবেত্তাদের শ্রেণী তিন প্রকার— ১) যোগবিৎ অর্থাৎ যোগী, (২) যোগবিত্তর অর্থাৎ দুই যোগীর মধ্যে যিনি শ্রেয়তর এবং (৩) যোগবিত্তম অর্থাৎ সমস্ত যোগীর মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ যোগী। অর্জুনের **'যোগবিৎ'** এবং **'যোগবিত্তর'**-এর ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু **'যোগবিত্তম'**-এর ব্যাপারে সন্দেহ আছে।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—অর্জুনের সগুণ এবং নির্গুণ উপাসকদের শ্রেষ্ঠতা-বিষয়ক প্রশ্নের উত্তরে ভগবান তাঁর সিদ্ধান্ত জানাচ্ছেন।

শ্রীভগবানুবাচ

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥ ২ ॥

[ময়ি (আমাতে) ; মনঃ, আবেশ্য (মন নিবিষ্ট করে) ; নিত্যযুক্তাঃ (নিত্য-নিরন্তর আমাতে যুক্ত হয়ে) ; যে (যে সকল ভক্ত) ; পরয়া শ্রদ্ধয়া, উপেতাঃ (পরম শ্রদ্ধাভরে) ; মাম্, উপাসতে (আমার উপাসনা করেন) ; তে (তাঁরাই) ; মে, মতাঃ (আমার মতে) ; যুক্ততমাঃ (সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী।)]

শ্রীভগবান বললেন—আমাতে মন নিবিষ্ট করে নিত্য-নিরন্তর আমাতে যুক্ত হয়ে যেসব ভক্ত পরম শ্রদ্ধা সহকারে আমার (সগুণ-সাকারের) উপাসনা করেন আমার মতে তাঁরাই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী ॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা—[অর্জুনের প্রশ্ন ছাড়াই ভগবান তাঁর এই সিদ্ধান্ত ষষ্ঠ অধ্যায়ের সাতচল্লিশতম শ্লোকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তখন অর্জুনের মনে প্রশ্ন না থাকায় সেই সিদ্ধান্তটি ধরতে পারেননি। কারণ নিজের প্রশ্ন না থাকলে শোনা কথায় সাধারণতঃ খেয়াল থাকে না। তাই অর্জুন এই অধ্যায়ের প্রথমেই এরূপ প্রশ্ন করেছেন।

সেইরূপই নিজের মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে জানার ইচ্ছা এবং আগ্রহ না থাকলে কিংবা নিজের প্রশ্ন না থাকলে সৎসঙ্গে শোনা আর শাস্ত্রে পড়া সাধন-সম্পর্কীয় মর্মের ও গুরুত্বপূর্ণ কথা প্রায়শঃই সাধকদের নজরে আসে না। সেই কথাই যদি তার প্রশ্নের উত্তরে বোঝানো হয় তাহলে সে সেটি তাকে বিশেষভাবে বলা হয়েছে মনে করে শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহণ করে। সাধারণতঃ লোকে শোনা এবং পড়া বিষয়গুলি, তাদের জন্য বলা নয় মনে করে উপেক্ষা করে। যদিও সেই কথার প্রভাব সাধারণভাবে থেকেই যায়, কিন্তু বিশেষ আগ্রহ থাকলে সেটি বিশেষ জাগ্রত হতে পারে। তাই সাধকদের উচিত হল তাঁরা যা পড়েন বা শোনেন, সেগুলি তাঁদেরকেই নির্দিষ্ট করে বলা মনে করে জীবনে তা গ্রহণ করার চেষ্টা করা।]

'ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে'— মন

সেখানেই আকৃষ্ট হয়, যেখানে অনুরাগ হয়। যার প্রতি অনুরাগ হয়, স্বভাবতঃই তার চিন্তন হয়।

'নিত্যযুক্তা' কথাটির অর্থ হল যে সাধক নিজের আগ্রহেই ভগবানে আকৃষ্ট হয়। 'ভগবানই আমার এবং আমি ভগবানেরই'—এই হল স্বয়ং-এর ভগবানে আকৃষ্ট হওয়া। স্বয়ং-এর ভগবদ্প্রাপ্তি করার দৃঢ় উদ্দেশ্য হলে মন-বুদ্ধি স্বতঃই ভগবানে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু স্বয়ং-এর উদ্দেশ্য ভগবদ্প্রাপ্তি না হলে মন-বুদ্ধি ভগবানে নিবিষ্ট করার চেষ্টা করলেও তা পুরোপুরি ভগবানে আকৃষ্ট হয় না। কিন্তু যখন নিজেকে ভগবানের বলে মেনে নেওয়া হয়, তখন মন-বুদ্ধি ভগবানে লীন হয়ে যায়। স্বয়ং হল কর্তা আর মন-বুদ্ধি হল করণ। করণ কর্তার আশ্রিত হয়ে থাকে। কর্তা যদি ভগবানের হয়ে যায়, তখন মন-বুদ্ধিরূপ করণ স্বতঃ ভগবানে আবিষ্ট হয়।

সাধক সাধারণতঃ এই ভুল করেন যে তিনি স্বয়ং ভগবানে আকৃষ্ট না হয়ে নিজের মন-বুদ্ধিকে ভগবানে নিবিষ্ট করার অভ্যাস করেন। স্বয়ং ভগবানে আকৃষ্ট না হলে মন-বুদ্ধি ভগবানে নিবিষ্ট করা কঠিন হয়। তাই সাধকগণ প্রায়শঃই এই সমস্যার সম্মুখীন হন যে, মন-বুদ্ধি ভগবানে নিবিষ্ট হয় না। মন-বুদ্ধি একাগ্র হলে সিদ্ধি ইত্যাদি লাভ হতে পারে বটে, কিন্তু প্রকৃত কল্যাণ স্বয়ং ভগবানে নিবিষ্ট হলে তবেই হয়।

উপাসনার তাৎপর্য হল নিজেকে ভগবানে অর্পণ করা অর্থাৎ আমি ভগবানেরই এবং কেবল ভগবানই আমার। নিজেকে ভগবানে অর্পণ করলে নাম-জপ, চিন্তন, ধ্যান, সেবা, পূজা ইত্যাদি শাস্ত্রবিহিত সমস্ত ক্রিয়া স্বতঃই ভগবানের জন্য হয়ে থাকে।

শরীর প্রকৃতির এবং জীব পরমাত্মার অংশ। প্রকৃতির কার্য শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এবং অহং-এর সঙ্গে তাদাত্ম্য, মমতা ও কামনা না রেখে যে শুধু ভগবানকেই আপন বলে মনে করে, সেই একথা বলার অধিকারী যে আমি ভগবানের, ভগবান আমার। যে একথা বলে বা মানে সে ভগবানের সঙ্গে কোনো নতুন সম্পর্ক যুক্ত করে না। চেতন এবং নিত্য হওয়াতে ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু সেই নিত্যসিদ্ধ বাস্তবিক সম্বন্ধকে ভুলে গিয়ে জীব নিজের সম্বন্ধ প্রকৃতি এবং প্রকৃতির কার্য শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, যা অবাস্তবিক। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃতির সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক বজায় থাকে, ততক্ষণ ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক মেনে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তাও থাকে। প্রকৃতির সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক দূর হলেই ভগবানের সঙ্গে নিজের প্রকৃত ও নিত্য-সম্পর্ক জাগ্রত হয় ; তাঁর স্মৃতি প্রাপ্ত হয়—**'নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা'** (গীতা ১৮।৭৩)।

জড়তত্ত্বের (প্রকৃতির) আশ্রয় নেওয়ায় অর্থাৎ সেগুলি থেকে সুখভোগ করতে থাকায় জীব শরীরের সঙ্গে 'আমি' ভাবের সম্পর্ক পাতিয়ে নেয় অর্থাৎ 'আমি শরীর' এটি মেনে নেয়। এইরূপে শরীরের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্কের জন্য সে বর্ণ, আশ্রম, জাতি, নাম, ব্যবসায় ও শৈশব, যৌবন ইত্যাদি অবস্থাগুলি স্বাভাবিকভাবে নিজের বলেই মেনে নেয় অর্থাৎ নিজেকে তার থেকে পৃথক্ বলে মনে করে না।

জীবের এই বিজাতীয় শরীর ও সংসারের সঙ্গে ভ্রমবশতঃ মেনে নেওয়া সম্পর্ক এত দৃঢ় হয় যে এটি স্মরণ না করলেও সর্বদা স্মরণে থাকে। তাহলে যদি সে নিজ সজাতীয় (চেতন ও নিত্য) পরমাত্মার সঙ্গে নিজের প্রকৃত সম্পর্ক বুঝতে পারে, তাহলে আর কোনো অবস্থাতেই সে পরমাত্মাকে বিস্মৃত হয় না। তখন ওঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া, শোওয়া-জাগা—সবসময় প্রত্যেক অবস্থাতেই ভগবনের স্মরণ-চিন্তন স্বাভাবিকভাবে হতে থাকে।

যে সাধকের জাগতিক ভোগ ও সংগ্রহ এবং তার থেকে সুখাস্বাদন করা উদ্দেশ্য না হয়ে ভগবানকে প্রাপ্ত করাই একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তার ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন শুরু হয়েছে—এরূপ মনে করা উচিত। এই সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে স্থাপিত হলে সাধকের মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়-শরীর ইত্যাদির দ্বারা সাংসারিক ভোগ এবং সেগুলি সংগ্রহ করার ইচ্ছা আর একেবারেই থাকে না।

একমাত্র ভগবানের হয়েও জীব যত বেশি প্রকৃতি হতে সুখভোগ করতে চায়, ততই সে ভগবদ্সম্পর্ককে দৃঢ়তা সহকারে মানতে পারে না অর্থাৎ তত অংশে প্রকৃতির সঙ্গেই তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তাই সাধকের উচিত যে তিনি প্রকৃতি থেকে বিমুখ হয়ে নিজেকে যেন ভগবানের বলে মনে করেন, তাঁরই সম্মুখীন হন।

'শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ'—সাধক যাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করবেন, তাঁকেই শ্রদ্ধা করবেন।

শ্রদ্ধা হলে অর্থাৎ বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারলে তিনি নিজে নিশ্চিত হয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত অনুসারে স্বাভাবিক জীবন তৈরি করবেন এবং কখনো সিদ্ধান্ত থেকে বিচলিত হবেন না।

যেখানে প্রেম হয়, সেখানে মন আকৃষ্ট হয় আর যেখানে শ্রদ্ধা হয় সেখানে বুদ্ধি আকৃষ্ট হয়। প্রেমে প্রেমাস্পদের সঙ্গ এবং শ্রদ্ধায় আনুগত্যের প্রাধান্য থাকে।

একমাত্র ভগবানে প্রেম হলে ভক্তের সঙ্গে ভগবানের সর্বদা অভিন্ন সম্পর্ক অনুভূত হয়, কখনো বিচ্ছেদ অনুভূত হয় না। তাই ভগবানের মতে এরূপ ভক্তই প্রকৃতপক্ষে উত্তম যোগবেত্তা।

এখানে **'তে মে যুক্ততমা মতাঃ'** বহুবচনান্ত পদ দ্বারা যে কথা বলা হয়েছে, সেই কথাই ষষ্ঠ অধ্যায়ের সাতচল্লিশতম শ্লোকে **'স মে যুক্ততমো মতঃ'** একবচনান্ত পদে বলা হয়েছে[১]।

পরিশিষ্ট-ভাব—'স যোগী পরমো মতঃ' (গীতা ৬।৩২), **'স মে যুক্ততমো মতঃ'** (গীতা ৬।৪৭), **'তে মে যুক্ততমা মতাঃ'** (গীতা ১২।২)—এইভাবে ভগবান যেসব শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলেছেন তার তাৎপর্য হল যে, মানুষ কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ইত্যাদি যে কোনো পথেই চলুক না কেন, বাস্তবে শ্রেষ্ঠ তিনিই, যিনি ভক্তিলাভ করেছেন। কর্মযোগী ও জ্ঞানযোগী পরবর্তীকালে ভক্তিলাভ করেন, কিন্তু ভক্তিযোগী প্রথম থেকেই ভক্তিতে আপ্লুত থাকেন (যা কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগের ফল), তাই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ।

জ্ঞান এবং ভক্তি— দুই-ই জাগতিক দুঃখ দূর করতে সমকক্ষ, কিন্তু দুইয়ের মধ্যে জ্ঞানের থেকে ভক্তির মাহাত্ম্যই বেশি। জ্ঞানে তো অখণ্ডরসের প্রাপ্তি হয় কিন্তু ভক্তিতে অনন্তরস প্রাপ্তি হয়। অনন্ত রসে প্রতিমুহূর্তে বর্ধমান তরঙ্গায়িত, উচ্ছলিত এক বিশেষ আনন্দ বর্তমান। জগতে যেমন কোনো বস্তুর সম্বন্ধে জ্ঞান হয় যে 'এটি হল টাকা অথবা এটি একটি ঘড়ি' ইত্যাদি, এই জ্ঞান বস্তুবিশেষের অজ্ঞানই দূর করে। তেমনই তত্ত্বজ্ঞান শুধুমাত্র অজ্ঞান দূর করে। অজ্ঞান দূর হলে দুঃখ, ভয়, জন্ম-মৃত্যুরূপ বন্ধন—এ সমস্তই দূর হয়। কিন্তু প্রেম (ভক্তি) জ্ঞানের থেকেও অতি বিশিষ্ট। ভগবানের জ্ঞানের ক্ষুধা নেই, কিন্তু প্রেমের ক্ষুধা রয়েছে। জ্ঞানকে অনুভব করেন স্ব-স্বরূপ, কিন্তু প্রেমকে অনুভব করেন স্বয়ং ভগবান! ভগবান জ্ঞানের পিয়াসী নন, তিনি শুধু প্রেমেরই পিয়াসী। মুক্ত হলে তো জ্ঞানযোগী সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত হন (গীতা ৩।১৭), প্রেম প্রাপ্ত হলে ভক্ত শুধু সন্তুষ্টই হন না, তাঁর আনন্দ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। অতএব অন্তিম তত্ত্ব হল প্রেম, মুক্তি নয়।

'এটি টাকা' এই জ্ঞান হলে তদ্বিষয়ে অজ্ঞতা দূর হয়ে বটে, কিন্তু সেটি হস্তগত করার লোভ জন্মায় এবং মনে হয় যেন আরো পাওয়া যায়, আর তাতে এক বিশেষ আনন্দ আসে। তেমনই ভক্তিতেও এক বিশেষ আনন্দ আসে। তাৎপর্য হল যে জগতে টাকার প্রতি আকৃষ্ট করার শক্তি যেমন লোভের আছে তেমনই প্রেমেরও শক্তি আছে ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট করার, জ্ঞানের তা নেই। অর্থের লোভ তো পতনের দিকে নিয়ে যায় কিন্তু প্রেম জ্ঞানের থেকেও বেশি উন্নতির দিকে নিয়ে যায়। বস্তুর আকর্ষণে যে রস থাকে তা বস্তুতে বা বস্তুর জ্ঞানে থাকে না।

বিবেকপথে (জ্ঞানযোগে) সৎ ও অসৎ— এই দুটির ধারণা একসঙ্গে থাকার ফলে অসতের অতি সূক্ষ্ম সংস্কার অর্থাৎ সূক্ষ্ম অহম্ সাধনের শেষ পর্যায়েও টিকে থাকে। এই সূক্ষ্ম অহম্ বা অহমের সংস্কার মুক্ত হলেও থেকে যায়। এই সূক্ষ্ম অহম্ জন্ম-মৃত্যু প্রদান কারক না হলেও ঈশ্বরের থেকে অভিন্ন হওয়ার পথে বাধা স্বরূপ হয়। তাই বিবেকের পথে জ্ঞানীরা এবং দার্শনিকেরা মুক্তিলাভ করলেও তাঁরা যে ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন হবেন বা প্রেমলাভ করবেন—তা নিশ্চিত নয়। এই

---

[১]একাদশ অধ্যায়ের চুয়ান্নতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে অনন্যভক্তি দ্বারা সাধক আমাকে প্রত্যক্ষ দেখতে পারেন, স্বরূপতঃ জানতে পারেন এবং আমাকে প্রাপ্ত হতে পারেন ; কিন্তু অষ্টাদশ অধ্যায়ের পঞ্চান্নতম শ্লোকে ভগবান নির্গুণ উপাসকদের তাঁকে তত্ত্বতঃ জানা ও প্রাপ্ত করার কথা বলেছেন, দর্শন দান করার কথা বলেননি। এতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে সগুণ উপাসক ভগবদ্ দর্শনও লাভ করেন। এই হল তাঁদের বিশেষত্ব।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের সাতচল্লিশতম শ্লোকে ভগবান তাঁর সগুণরূপে শ্রদ্ধা ও প্রেমকারী সাধকদের সমস্ত যোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে জানিয়েছেন। অর্থাৎ ভগবানকে নিজের বলে মনে করে তাঁর পরায়ণ হয় যে সাধক, তিনিই ভগবানের বিশেষ প্রিয়।

সূক্ষ্ম অহমের জন্যই দার্শনিকগণের মধ্যে তাঁদের দর্শন নিয়ে মতভেদ থাকে। কিন্তু বিশ্বাসমার্গে (ভক্তিযোগে) গোড়া থেকেই ভক্ত একমাত্র ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোনো পৃথক্ অস্তিত্বকে মেনে নেয় না। তাই ভক্ত ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্নতা বোধ করেন। ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন হলে অর্থাৎ প্রেমের উদয় হলে সূক্ষ্ম অহম্ এবং তার থেকে উৎপন্ন সমস্ত দার্শনিক মতভেদ দূর হয়[১]। অর্থাৎ দ্বৈত, অদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ইত্যাদি যতপ্রকার মতভেদ থাকে, সে-সবই বাসুদেবের স্বরূপ হয়ে ওঠে, যা বাস্তব সত্য। তাই **'বাসুদেবঃ সর্বম্'** অনুভবকারী প্রেমিক ভক্তের হৃদয়ে কোনো একটিমাত্র মতের প্রতি আগ্রহ না থেকে সব মতের প্রতি সমান আগ্রহ বা সম্মান থাকে। কোনো বিশেষ মতের প্রতি আগ্রহ না থাকায় কোনো মতের প্রতিই তাঁর অসম্মান দেখা যায় না। তাৎপর্য হল যে জ্ঞানের ঐক্য হতে প্রেমের ঐক্য শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানের দ্বারা পরমাত্মা থেকে দূরত্ব ও ভিন্নতা দূর হলেও অভিন্নতা বা মিলন হয় না। কিন্তু প্রেমের দ্বারা দূরত্ব, ভেদ-ভাব ও ভিন্নতা—এই তিনটি দূর হয়। তাই প্রকৃত অদ্বৈতভাব থাকে প্রেমেই। প্রেমের শক্তি এতই যে এতে ভক্তও ভগবানের ইষ্ট হয়ে ওঠেন। জ্ঞানযোগীরা মুক্তিকেই সব থেকে উচ্চস্থান দিয়ে থাকেন, অতএব তাঁরা মুক্তির থেকেও উচ্চাবস্থা যে প্রেম (প্রেমাভক্তি বা পরাভক্তি) তা জানবেন কেমন করে ? মুক্তিতে কেবল অখণ্ড রস থাকে, প্রেমে থাকে অনন্ত (প্রতিক্ষণ বর্ধমান) রস। মুক্তি, তত্ত্বজ্ঞান, স্বরূপবোধ, আত্মসাক্ষাৎকার, কৈবল্য-পদ—এই সকলের চাইতে প্রেমের স্থান খুবই উঁচু[২]।

কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ—এই দুটি হল লৌকিক নিষ্ঠা (গীতা ৩।৩), কিন্তু ভক্তিযোগ লৌকিক নিষ্ঠা অর্থাৎ প্রাণীর নিষ্ঠা নয়। যা ভগবানে যুক্ত করে তাকে বলা হয় ভগবৎনিষ্ঠা অর্থাৎ তার নিষ্ঠা অলৌকিক হয়। তার সাধন ও সাধ্য উভয়ই ভগবান হয়। তাই ভক্তিযোগ সাধন ও সাধ্য—দুই-ই। তাই বলা হয়েছে যে—**'ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা'** (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৩।৩১) অর্থাৎ ভক্তি থেকে ভক্তি উৎপন্ন হয়। শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য এবং আত্মনিবেদন—সাধন-ভক্তি হল এই নয় প্রকারের[৩] এবং তার থেকে শ্রেষ্ঠ প্রেমলক্ষণা ভক্তি হল 'সাধ্য ভক্তি', যা হল কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ সবেরই সাধ্য (ফল) (গীতা ১৮।৫৪)। এই সাধ্যভক্তিই হল সর্বোপরি প্রাপণীয় তত্ত্ব।

জ্ঞানযোগে সাধক সৎ-অসতের বিবেককে গুরুত্ব দিয়ে অসৎকে পরিত্যাগ করেন। অসৎকে ত্যাগ করলে ত্যাগীর এবং ত্যাজ্য বস্তুর অস্তিত্ব ভাবরূপে বহুদূর পর্যন্ত সঙ্গে থাকে, তাই জ্ঞানযোগে অসতের সর্বতোভাবে পরিত্যাগ খুবই বিলম্বে হয়। কর্মযোগে সাধক অসৎ বস্তুসমূহকে ত্যাজ্য বলে মনে না করে সেবা-সামগ্রী বলে ধরে নেয়। ত্যাগ দ্বারা নিকৃষ্ট বস্তু সহজেই পরিত্যক্ত হলেও, প্রিয় বস্তু পরিত্যাগ করা কঠিন হয়। সুতরাং প্রিয় বস্তুসমূহ ত্যাগ করার থেকে সেগুলি অন্যের সেবায় লাগানো সহজ। নিষ্কামভাবে অন্যের সেবায় লাগানোতে অতি সহজেই এবং শীঘ্রই অসৎ পরিত্যক্ত হয়। ভক্তিযোগে জগৎকে ভগবানের অথবা ভগবৎস্বরূপ বলে মানলে জগৎ (অসৎ) অতি শীঘ্রই লুপ্ত হয়ে শুধু ভগবানই বিরাজমান থাকেন। এইভাবে জ্ঞানযোগের থেকে কর্মযোগে অসৎ (জড়ত্ব) শীঘ্রই পরিত্যক্ত হয় এবং কর্মযোগের থেকে ভক্তিযোগে অসৎকে অতি শীঘ্র ত্যাগ করা যায়, কারণ ভক্তিতে অসৎ থাকেই না—**'সদসচ্চাহম্'** (গীতা ৯।১৯)। সুতরাং জ্ঞানযোগের থেকে কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ—**'তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎকর্মযোগো বিশিষ্যতে'** (গীতা ৫।২) এবং কর্মযোগের থেকে ভক্তিযোগ শ্রেষ্ঠ—**'যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥'** (গীতা ৬।৪৭)।

*** *** ***

---

[১] প্রেম ভগতি জল বিনু রঘুরাঈ। অভিঅন্তর মল কবহুঁ ন জাঈ॥ (শ্রীরামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ৪৯।৩)

[২] 'দ্বৈতং মোহায় বোধাৎ প্রাগ্জাতে মনীষয়া। ভক্ত্যর্থং কল্পিতং (স্বীকৃতং) দ্বৈতমদ্বৈতাদপি সুন্দরম্॥

(বোধসার, ভক্তি. ৪২)

'বোধ হওয়ার আগে দ্বৈত মোহের পর্যায়ে পড়ে, কিন্তু বোধ হবার পরে ভক্তির জন্য স্বীকৃত দ্বৈত অদ্বৈতের থেকে বেশি সুন্দর।'

[৩] শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৭।৫।২৩)

সম্বন্ধ—ভগবান আগের শ্লোকে সগুণ-উপাসকদের সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী বলেছেন। তাতে প্রশ্ন হতে পারে যে নির্গুণ-উপাসকেরা কি সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী নন ? তার উত্তরে ভগবান বলেছেন—

যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পর্যুপাসতে।
সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥ ৩ ॥
সন্নিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ॥ ৪ ॥

[তু, যে (যাঁরা নিজ) ; ইন্দ্রিয়গ্রামম্ (ইন্দ্রিয়গুলি) ; সন্নিয়ম্য (বশীভূত করে) ; অচিন্ত্যম্ (অচিন্ত্য) ; সর্বত্রগম্ (সর্বত্র পূর্ণভাবে অবস্থিত) ; অনির্দেশ্যম্, কূটস্থম্ (অনির্দেশ্য, কূটস্থ) ; অচলম্, ধ্রুবম্ (অচল, ধ্রুব) ; অক্ষরম্, চ, অব্যক্তম্ (অক্ষর এবং অব্যক্তের) ; পর্যুপাসতে (উপাসনা করেন) ; তে (সেই) ; সর্বভূতহিতে, রতাঃ (প্রাণীমাত্রের হিত পরায়ণ) ; সর্বত্র (সর্বত্র); সমবুদ্ধয়ঃ (সমবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ) ; মাম্, এব (আমাকেই) ; প্রাপ্নুবন্তি (প্রাপ্ত হন।)]

যাঁরা সম্পূর্ণরূপে নিজ ইন্দ্রিয় বশীভূত করে অচিন্ত্য, সর্বত্র পূর্ণভাবে অবস্থিত, অনির্দেশ্য, কূটস্থ, অচল, ধ্রুব, অক্ষর এবং অব্যক্তের একাগ্রের সঙ্গে উপাসনা করেন, সেই প্রাণীমাত্রেরই হিতপরায়ণ এবং সর্বত্র সমবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ আমাকেই প্রাপ্ত হন॥ ৩-৪ ॥

ব্যাখ্যা—'তু'—এই পদটি সাকার ও নিরাকার উপাসকদের মধ্যে পার্থক্য দেখাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

'সন্নিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামম্'—'সম্' এবং **'নি'**—এই দুটি উপসর্গযুক্ত **'সন্নিয়ম্য'** পদটির দ্বারা ভগবান বলেছেন যে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্যক্‌ভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে বশীভূত করা উচিত, যাতে এগুলি অন্য কোনো বিষয়ে না ধাবিত হয়। ইন্দ্রিয়গুলি সম্পূর্ণভাবে বশীভূত না হলে নির্গুণ-তত্ত্বের উপাসনা করা কঠিন হয়। সগুণ উপাসনাতে ধ্যানের বিষয় সগুণ-ভগবান হওয়ায় ইন্দ্রিয়গুলি ভগবানে আকৃষ্ট হতে পারে। কারণ ভগবানের সগুণ স্বরূপে ইন্দ্রিয়গুলি নিজ নিজ বিষয় প্রাপ্ত হয়। তাই সগুণ-উপাসনাতে ইন্দ্রিয়-সংযমের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও তত বেশি থাকে না, যত থাকে নির্গুণ উপাসনাতে। নির্গুণ-উপাসনাতে ধ্যান করার কোনো আধার না থাকায় ইন্দ্রিয়গুলির সম্পূর্ণ সংযম না হলে (অর্থাৎ আসক্তি থাকলে) বিষয়ের দিকে মন চলে যেতে পারে এবং বিষয়-চিন্তা হতে থাকলে পতনও হতে পারে (গীতা ২।৬২-৬৩)। সুতরাং নির্গুণ উপাসকদের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি সম্পূর্ণভাবে বিষয় থেকে প্রত্যাহার করে নিজের বশে রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। ইন্দ্রিয়গুলিকে শুধু বাহ্যতঃ বশ করলেই হবে না, প্রত্যুত বিষয়ের প্রতি সাধকের হৃদয়েও কোনোপ্রকার আসক্তি যেন না থাকে। কারণ যতক্ষণ বিষয়ে আসক্তি থাকে, ততক্ষণ ব্রহ্মপ্রাপ্তি করা কঠিন হয় (গীতা ১৫।১১)।

গীতায় ইন্দ্রিয়গুলিকে বশ করবার কথা, নির্গুণ উপাসনা এবং কর্মযোগে বিশেষরূপে যতটা এসেছে সগুণ উপাসনায় ততটা আসেনি।

'অচিন্ত্যম্'—মন-বুদ্ধির বিষয় না হওয়ায় **'অচিন্ত্যম্'** পদটি নির্গুণ-নিরাকার ব্রহ্মের বাচক। কারণ মন-বুদ্ধি প্রাকৃতিক কার্য হওয়ায় সমগ্র প্রকৃতিকেও যখন নিজের অন্তর্গত করতে পারেন না, তাহলে যিনি সমগ্র প্রকৃতিরও অতীত সেই পরমাত্মাকে নিজের অন্তর্গত কী করে করতে পারবেন ?

প্রাকৃতিক পদার্থমাত্রই **'চিন্ত্য'** অর্থাৎ মন, বুদ্ধি ইত্যাদির চিন্তনের বিষয়। কিন্তু পরমাত্মা প্রকৃতির অতীত হওয়ায় **'চিন্ত্য'** নয়। প্রাকৃতিক অর্থাৎ মন, বুদ্ধি ইত্যাদির সহায়তা ব্যতিরেকে তাঁর চিন্তন কিংবা বর্ণনাও করা যায় না। তাই পরমাত্মাকে স্বয়ং (করণ-নিরপেক্ষ জ্ঞান) দ্বারা জানা সম্ভব ; প্রকৃতির কার্য মন, বুদ্ধি ইত্যাদি (করণ-সাপেক্ষ জ্ঞান) দ্বারা নয়।

'সর্বত্রগম্'—সমস্ত দেশ, কাল, বস্তু এবং ব্যক্তিতে পরিপূর্ণরূপে থাকায় ব্রহ্ম **'সর্বত্রগম্'**। ব্যাপ্তিস্বরূপ হওয়ায় তাঁকে সীমিত মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা গ্রহণ করা যায় না।

'অনির্দেশ্যম্'—যাঁকে বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না অর্থাৎ যিনি ভাষা, বাণী ইত্যাদির বিষয় নন, তিনি

'অনির্দেশ্যম্'। নির্দেশ (ইঙ্গিত) তারই করা সম্ভব যা জাতি, গুণ, ক্রিয়া এবং সম্পর্কের দ্বারা যুক্ত এবং দেশ, কাল, বস্তু এবং ব্যক্তির দ্বারা পরিব্যাপ্ত। কিন্তু যে চিন্ময় তত্ত্ব সর্বত্র পরিপূর্ণ, তাঁর সংকেত জড় (অর্থাৎ প্রাকৃতিক গুণজাত) ভাষা বা বাক্যের দ্বারা কীভাবে করা সম্ভব হতে পারে ?

'কূটস্থম্'—এই পদটি নির্বিকার এবং সর্বদা একরসে অবস্থিত সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মের বাচক। সমস্ত দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদিতে অবস্থান করলেও যা স্বরূপতঃ সর্বদা নির্বিকার এবং নির্লিপ্তভাবে থাকে। এর কখনো বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয় না। তাই এটি 'কূটস্থ'। কূট-এর উপর রেখে বিভিন্ন প্রকার গহনা, অস্ত্র-শস্ত্র বা জিনিসপত্র তৈরি করা হলেও সেটি যেমন তেমনই থাকে। এইরূপ জগতের ভিন্ন ভিন্ন প্রাণী-পদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ হতে থাকলেও পরমাত্মা সর্বদা একইপ্রকার থাকেন।

'অচলম্'—এই পদটি সর্বতোভাবে ক্রিয়া-বর্জিত ব্রহ্মের বাচক। প্রকৃতি সচল এবং ব্রহ্ম অ-চলমান।

'ধ্রুবম্'—যাঁর অস্তিত্ব নিশ্চিত (সত্য) এবং নিত্য, তাঁকে বলা হয় 'ধ্রুব'। সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্ম সত্তারূপে সর্বত্র বিদ্যমান হওয়ায় তাঁকে 'ধ্রুবম্' বলা হয়।

নির্গুণ ব্রহ্মের আটটি বিশেষণের মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিশেষণ হল 'ধ্রুবম্'। ব্রহ্মকে অনির্দেশ্য, অচিন্ত্য ইত্যাদি নঞর্থক বিশেষণ দেওয়াতে কেউ না মনে করেন যে তিনি নেই-ই। তাই এখানে 'ধ্রুবম্' বিশেষণটি দিয়ে ওই তত্ত্বের নিশ্চিত অবস্থিতির কথা বলা হয়েছে। সেই তত্ত্বের কখনো কোথাও বিন্দুমাত্র অনস্তিত্ব হয় না। তাঁর অস্তিত্ব থেকেই অসৎ (সংসার) অস্তিত্ব প্রাপ্ত হয়—**'জাসু সত্যতা তেঁ জড় মায়া। ভাস সত্য ইব মোহ সহায়া॥'** (শ্রীরামচরিতমানস ১।১১৭।৪)।

'অক্ষরম্'—যাঁর কখনো ক্ষরণ অর্থাৎ বিনাশ হয় না এবং যাঁর মধ্যে কখনো কোনো অনস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় না, সেই সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্ম হলেন 'অক্ষরম্'।

'অব্যক্তম্'—যিনি ব্যক্ত নন অর্থাৎ মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়ের গম্য বিষয় নন এবং যাঁর কোনো রূপ বা আকার নেই, তাঁকেই 'অব্যক্তম্' বলা হয়েছে।

'পর্যুপাসতে'—এই পদটি এখানে নির্গুণ উপাসকদের সম্যক্ উপাসনার বোধক। শরীরসহ সমস্ত পদার্থ এবং কর্মে বাসনা ও অহংভাবের অভাব এবং ভাবরূপ সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাতে অভিন্নজ্ঞানে নিত্য-নিরন্তর দৃঢ়ভাবে অবস্থান করাই হল উপাসনা।

এই শ্লোকের আটটি বিশেষণ দ্বারা যে বিশেষ বস্তু-তত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য করানো হয়েছে এবং তার দ্বারা যে বিশেষ বিষয়টি বোধগম্য হয়, তা বুদ্ধিনির্দিষ্ট ব্রহ্মেরই স্বরূপ ; যা যথাযথ নয়। কারণ (লক্ষণ ও বিশেষণ দ্বারা অনির্ণেয়) নির্গুণ-নির্বিশেষ ব্রহ্মের স্বরূপ (যা বুদ্ধির অগোচর) কোনো প্রকারেই পূর্ণভাবে বুদ্ধি ইত্যাদির বিষয় হতে পারে না। তবে এই বিশেষণগুলির ওপর লক্ষ্য রেখে যে উপাসনা করা হয়, তা নির্গুণ ব্রহ্মেরই উপাসনা এবং এর পরিণামে যা প্রাপ্ত হয় তাও নির্গুণ ব্রহ্ম।

বিশেষ কথা

পরমাত্মাকে তত্ত্বতঃ বোঝাতে দু'প্রকার বিশেষণ ব্যবহার করা হয়—নঞাত্মক এবং বিধ্যাত্মক। পরমাত্মার অক্ষর, অনির্দেশ্য, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অচল, অব্যয়, অসীম, অপার, অবিনাশী ইত্যাদি বিশেষণগুলি হল 'নঞাত্মক' আর সর্বব্যাপী, কূটস্থ, ধ্রুব, সৎ, চিৎ, আনন্দ ইত্যাদি বিশেষণগুলি 'বিধ্যাত্মক'। পরমাত্মার নিষেধাত্মক বিশেষণগুলির তাৎপর্য প্রকৃতির সঙ্গে পরমাত্মার 'অসঙ্গতা' জানানো এবং বিধ্যাত্মক বিশেষণগুলির তাৎপর্য হল পরমাত্মার পৃথক্ স্বতন্ত্র 'সত্তা' জানানো।

পরমাত্মতত্ত্ব জাগতিক প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি—উভয়েরই অতীত (সহজ নিবৃত্ত) এবং উভয়কেই সমানভাবে প্রকাশিত করে। এই নিরপেক্ষ পরমাত্মতত্ত্বের দিকে লক্ষ্য করাবার জন্য এবং বুদ্ধিকে পরমাত্মার সমীপবর্তী করার জন্যই ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণের সাহায্যে পরমাত্মার বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

গীতার পরমাত্মা এবং জীবাত্মার স্বরূপের প্রায় একইপ্রকার বর্ণনা পাওয়া যায়। এখানে পরমাত্মার যে বিশেষণ দেওয়া হয়েছে, সেই বিশেষণই গীতায় জীবাত্মার উদ্দেশ্যেও ব্যবহৃত হয়েছে ; যেমন দ্বিতীয় অধ্যায়ের চব্বিশ-পঁচিশতম শ্লোকে **'সর্বগতঃ'**, **'অচলঃ'**, **'অব্যক্তঃ'**, **'অচিন্ত্যঃ'** ইত্যাদি এবং পঞ্চদশ অধ্যায়ের ষোড়শ শ্লোকে **'কূটস্থঃ'** এবং **'অক্ষরঃ'** বিশেষণ জীবাত্মার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এইরূপ সপ্তম অধ্যায়ের পঁচিশতম শ্লোকে **'অব্যয়ম্'** বিশেষণটি পরমাত্মার

উদ্দেশ্যে এবং চতুর্দশ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে **'অব্যয়ম্'** বিশেষণটি জীবাত্মার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

জগতে ব্যাপকভাবের বর্ণনাতেও পরমাত্মা এবং জীবাত্মাকে সমান বলে জানানো হয়েছে ; যেমন—অষ্টম অধ্যায়ের বাইশতম এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের ছেচল্লিশতম শ্লোকে **'যেন সর্বমিদং ততম্'** পদের দ্বারা এবং নবম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে **'ময়া ততমিদং সর্বম্'** পদের দ্বারা পরমাত্মাকে সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত বলা হয়েছে। এইরূপ দ্বিতীয় অধ্যায়ের সপ্তদশ শ্লোকে **'যেন সর্বমিদং ততম্'** পদের দ্বারা জীবাত্মাকেও সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত বলা হয়েছে।

যেমন, চক্ষুর দৃষ্টি একে অপরের সঙ্গে অবরোধের সৃষ্টি করে না বা ব্যাপক হলেও শব্দ যেমন অপর শব্দের সঙ্গে ধাক্কা খায় না তেমনই (দ্বৈতমত অনুযায়ী) সমস্ত জগতে সমানভাবে পরিব্যাপ্ত হলেও নিরবয়ব হওয়ায় পরমাত্মা এবং জীবাত্মার সর্বব্যাপকতায় পরস্পরে কোনো সংঘাত সৃষ্টি হয় না।

'সর্বভূতহিতে রতাঃ'—কর্মযোগের সাধনায় আসক্তি, মমত্ববোধ, কামনা এবং স্বার্থ ত্যাগের প্রাধান্য থাকে। মানুষ যখন শরীর, অর্থ, সম্পত্তি ইত্যাদি পদার্থগুলিকে 'নিজের' এবং 'নিজের জন্য' মনে না করে অপরের সেবায় নিয়োগ করে তখন তার আসক্তি, মমত্ববোধ, কামনা, স্বার্থভাব স্বতঃই দূর হয়। যাঁর উদ্দেশ্য থাকে প্রাণীমাত্রেরই সেবা করা, তিনি তাঁর শরীর ও বস্তুসমূহ প্রাণীদের (দীন-দুঃখী, অভাবগ্রস্ত) সেবাতেই নিয়োজিত করেন। শরীরকে অপরের সেবায় নিয়োগ করলে 'অহংবোধ' এবং পদার্থগুলি অন্যের সেবায় ব্যয় করলে 'মমত্ববোধ' দূর হয়। সাধকের প্রথম থেকেই লক্ষ্য রাখতে হয় যে, যে পদার্থ সেবায় নিয়োগ করা হয়, সেটা সেব্যরই। সুতরাং কর্মযোগের সাধনায় সমস্ত প্রাণীর হিতে নিরত থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। সেইজন্য **'সর্বভূতহিতে রতাঃ'** পদটির প্রয়োগ কর্মযোগের আচরণকারীদের সম্বন্ধে করাই বেশি যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু ভগবান এই পদটির প্রয়োগ এখানে এবং পঞ্চম অধ্যায়ের পঁচিশতম শ্লোকে —দুটি স্থানেই জ্ঞানযোগীদের সম্পর্কে করেছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কর্ম থেকে সর্বতোভাবে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ করার জন্য কর্মযোগের প্রণালী মেনে নেওয়ার প্রয়োজন জ্ঞানযোগেও থাকে।

একটি বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। শরীর-পদার্থ এবং ক্রিয়া দ্বারা যে সেবা করা হয়, তা সীমিত হয়। কারণ সমস্ত পদার্থ এবং ক্রিয়া একযোগেও সীমিতই হয়ে থাকে। কিন্তু সেবাতে প্রাণীমাত্রেরই হিত করার ভাবটি অসীম হওয়ায় সেবাও অসীম হয়। সুতরাং পদার্থগুলি নিজের আয়ত্বে থাকলেও (তাতে আসক্তি, মমত্ববোধ না করে) সেগুলিকে সকল প্রাণীর মনে করে তাদেরই সেবায় নিয়োজিত করা উচিত। কারণ সেই পদার্থগুলি সমষ্টিরই। এইরূপ অসীমভাব থাকলে জড়ত্ব থেকে সর্বতোভাবে সম্বন্ধ-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং সাধক অসীম তত্ত্ব (পরমাত্মা) প্রাপ্ত হয়। পদার্থগুলিকে ব্যক্তিগত বলে মনে করলেই মানুষের মধ্যে পরিচ্ছিন্নতা (একদেশীয়তা) ও বৈষম্য আসে আর পদার্থগুলিকে ব্যক্তিগত বলে মনে না করে সমস্ত প্রাণীর হিতের ভাবানুসারী রাখলে পরিচ্ছিন্নতা ও বৈষম্য দূর হয়। পক্ষান্তরে সাধারণ মানুষের মধ্যে মমতাসক্ত প্রাণীদের সেবা করার ভাব সীমিত থাকায় তারা যদি নিজেদের সর্বস্ব দিয়েও তার সেবা করে, তবু পদার্থতে ও যার সেবা করা হচ্ছে তাতে আসক্তি, মমত্ববোধ ইত্যাদি থাকায় (সীমিত ভাবের জন্য) তাদের অসীম পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তি হয় না। তাই অসীম পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তির জন্য প্রাণীমাত্রেরই হিতে ভালোবাসা অর্থাৎ প্রীতিরূপ অসীম ভাব থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। **'সর্বভূতহিতে রতাঃ'** পদটি সে ভাবকেই প্রকাশ করে।

জ্ঞানযোগের সাধকের লক্ষ্য থাকে জড়ত্ব থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করাতে, কিন্তু যতক্ষণ তাঁর চিত্তে বিনাশশীল পদার্থের প্রতি গুরুত্ব থাকে, ততক্ষণ পদার্থগুলিকে মায়া বা স্বপ্নবৎ মনে করে সেগুলি পরিত্যাগ করা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু কর্মযোগের সাধক পদার্থগুলি অন্যের সেবায় নিয়োজিত করে জ্ঞানযোগীর অপেক্ষা অনায়াসে সেগুলি ত্যাগ করতে পারেন। তীব্র বৈরাগ্য হলে তবেই জ্ঞানযোগী পদার্থগুলি ত্যাগ করতে সক্ষম হন। অপরপক্ষে কর্মযোগী অল্প বৈরাগ্য হলেই (পরহিতে) পদার্থ ত্যাগ করতে সক্ষম হন। প্রাণীগণের হিতের জন্য পদার্থের সদ্‌ব্যবহার করলে অতি সহজেই জড়ত্ব হতে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। ভগবান **'সর্বভূতহিতে রতাঃ'** পদটির দ্বারা তাই

বলেছেন যে প্রাণীমাত্রেরই হিতে রত হলে পদার্থের প্রতি আকর্ষণ থাকলেও অতি অনায়াসে জড়ত্বের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। কর্মযোগই প্রাণীমাত্রের হিত করার সহজ উপায়।

নির্গুণ উপাসকদের সাধনায় নানা অবান্তর ভেদ থাকলেও প্রধানতঃ দুটি পার্থক্য দেখা যায়—(১) জড়-চেতন এবং চর-অচর রূপে যা কিছু প্রতীয়মান হয়, তা সবই আত্মা বা ব্রহ্ম এবং (২) যা কিছু দৃশ্যমান, তা অনিত্য, ক্ষণভঙ্গুর এবং অসৎ—এইপ্রকারে জগতে নেতি নেতি করার পর যা অবশিষ্ট থাকে—তা-ই হল আত্মা বা ব্রহ্ম।

সাধনার প্রথমাবস্থায় 'সবকিছু ব্রহ্ম' এটুকু মাত্র শিখে নিলেই জ্ঞাননিষ্ঠা সিদ্ধ হয় না। চিত্তে যতক্ষণ আসক্তি অর্থাৎ কাম-ক্রোধাদি বিকার থাকে, ততক্ষণ জ্ঞাননিষ্ঠা সিদ্ধ হওয়া অত্যন্ত কঠিন। আসক্তি দূর করার জন্য যেমন কর্মযোগীর সমস্ত প্রাণীর হিতের প্রতি অনুরাগ থাকা প্রয়োজন, তেমনই নির্গুণের উপাসনাকারী সাধকদেরও প্রাণীদের হিতে ভালোবাসা থাকা প্রয়োজন—তাহলেই আসক্তি দূর হয়ে জ্ঞাননিষ্ঠা সিদ্ধ হতে পারে। সেদিকে লক্ষ্য করাবার জন্যই **'সর্বভূতহিতে রতাঃ'** পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

অন্য সাধনায়, যে সাধক সংসারে বৈরাগ্য অবলম্বন করে একান্তে তত্ত্ব চিন্তায় কালযাপন করেন, তাঁর পক্ষে কর্ম বাহ্যিকভাবে ত্যাগ করা সহজ হলেও শুধুমাত্র কর্মত্যাগ দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হয় না (গীতা ৩।৪), সিদ্ধি লাভ করার জন্য ভোগাদিতে বৈরাগ্য এবং শরীর-ইন্দ্রিয়-বুদ্ধিতে আপনভাব ত্যাগ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই বৈরাগ্য ও মমত্ব বর্জনের জন্য **'সর্বভূতহিতে রতাঃ'** হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন।

জ্ঞানযোগের সাধক প্রায়শঃ সমাজ থেকে দূরে একাকী বসবাস করেন। তাই তাঁর মধ্যে ব্যক্তিভাব (অহং) থেকে যায়, যা দূর করার জন্য সংসারের হিত কামনা রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন।

প্রকৃতপক্ষে শরীরের সঙ্গে আসক্তি-বর্জিত হতে হয়। সমাজে অসঙ্গ (আসক্তিবর্জিত) হলে অহংভাব দৃঢ় হয় অর্থাৎ তার লেশ থেকে যায়। সাধক যতক্ষণ না নিজেকে শরীর থেকে স্পষ্টরূপে পৃথক্ বলে অনুভব করেন, ততক্ষণ সংসার থেকে পৃথক্ হয়ে থাকলেও তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, কারণ শরীরও জগৎ-সংসারের একটি অঙ্গ। শরীরের প্রতি তাদাত্ম্য এবং মমত্ব না রাখাই হল প্রকৃতপক্ষে তার থেকে পৃথক্ হওয়া, তাদাত্ম্য ও মমত্ববোধ দূর করার জন্য সাধকের প্রাণীমাত্রেরই হিতে ব্যাপৃত হওয়া প্রয়োজন।

দ্বিতীয়তঃ সাধকের পক্ষে সর্বদা একান্তে থাকা সম্ভবপর নয়। কারণ শরীর-নির্বাহের জন্য তাঁকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আসতেই হয় এবং বৈরাগ্যের ঘাটতি থাকায় তাঁর ব্যবহারে অহংকারজনিত অভিব্যক্তি প্রকাশের সম্ভাবনা থাকে আর সেই ভাব থাকায় তাঁর ব্যক্তিত্ব (অহং-ভাব) দূর হয় না। তাই তাঁর তত্ত্ব-প্রাপ্তি কঠিন হয়ে পড়ে। ব্যবহারে যাতে কঠোরতা না আসে তার জন্য সাধকের সকল প্রাণীর হিতে রত হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। এরূপ জ্ঞানযোগের সাধকের দ্বারা সেবাকাজ ব্যাপকভাবে না হলেও, ভগবান বলেছেন, জ্ঞানযোগীও (সকল প্রাণীর হিতে আগ্রহ থাকায়) আমাকে লাভ করবেন।

সগুণ উপাসক এবং নির্গুণ উপাসক—এই দু'প্রকার সাধকেরই সমস্ত প্রাণীর প্রতি হিতের ভাব রাখা অত্যন্ত জরুরি। সকল প্রাণীর হিতের থেকে নিজের হিতকে পৃথক্‌ভাবে দেখলে 'অহং' বা ব্যক্তিত্ব বজায় থাকে, যা পরে তাঁর সাধনায় বাধার সৃষ্টি করে। 'অহং'-ভাব দূর হলে তবেই কল্যাণ হয়। নিজের কল্যাণের জন্য করা সাধনে 'অহং'-ভাব বজায় থাকে, তাই 'অহং'-কে সম্পূর্ণভাবে দূর করার জন্য সাধকের প্রতিটি ক্রিয়া (খাওয়া-দাওয়া-শোওয়া ইত্যাদি এবং জপ-ধ্যান-পূজা-পাঠ-স্বাধ্যায় ইত্যাদিও) জগতের হিতের জন্যই করা উচিত। জগতের হিতেই নিজের হিত নিহিত থাকে। ভগবানের সমস্ত শক্তিই পরহিতে নিয়োজিত থাকে। তাই যে সকলের হিতে ব্যাপৃত হয়, ভগবানের শক্তি তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়।

শুধুমাত্র অপরকে কিছু দেওয়া বা নিজ শরীর দ্বারা সেবা করাকেই সেবা বলে না, নিজের জন্য কিছু আশা না করে অন্যের মঙ্গল কিসে হবে, তারা কী করে সুখ পাবে—এই ভাব নিয়ে কর্ম করাকেই সেবা বলা হয়। 'আমি সেবক'—এই ভাবও মনে রাখা উচিত নয়। সেবা তখনই হয়, যখন সেবক যার সেবা করে, তার সঙ্গে নিজেকে (নিজের শরীরের মতোই) অভিন্ন বলে মনে করে এবং পরিবর্তে তার থেকে কিছুই আশা না করে।

মানুষ যেমন অন্য কারও উপদেশের অপেক্ষা না রেখেই স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে অত্যন্ত সাবধানতাপূর্বক নিজ দেহের পরিচর্যা করে অথচ তার জন্য কোনো অহংকার বোধ করে না তেমনি সর্বত্র আত্মবুদ্ধি হলে সিদ্ধ মহাপুরুষদের স্বতঃই সকলের হিতের প্রতি অনুরাগ থাকে (গীতা ৬।৩২)। তাঁদের দ্বারা প্রাণীমাত্রেরই হিতসাধন হয়, কিন্তু তাঁদের মনে কখনোই এমন ভাব থাকে না যে 'আমি কারোর কল্যাণ করছি।' তাঁর অহংভাব সর্বতোভাবে দূরীভূত হয়। তাই এরূপ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদের আদর্শ সামনে রেখে সাধকের সর্বত্র আত্মবুদ্ধিতে, জগতে কোনো প্রাণীকে বিন্দুমাত্র দুঃখ না দিয়ে, তাদের হিতে স্বাভাবিকভাবে তৎপর থাকা উচিত।

'সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ'—এর অর্থ হল যে নির্গুণ-নিরাকার ব্রহ্মের উপাসকদের দৃষ্টি সমস্ত প্রাণী ও পদার্থে পরিপূর্ণভাবে অবস্থিত পরমাত্মার ওপর থাকায় বৈষম্য হয় না, কারণ পরমাত্মা হলেন সম (গীতা ৫।১৯)।

এখানে ভগবান জ্ঞাননিষ্ঠাযুক্ত উপাসকদের জন্য এই পদটি প্রয়োগ করে এক বিশেষ ভাব প্রকটিত করেছেন যে, জ্ঞানমার্গী সাধকদের একান্তে থেকে তত্ত্ব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করাই একমাত্র সাধন নয়। কারণ **'সমবুদ্ধয়ঃ'** পদটির সার্থকতা হয় বিশেষভাবে ব্যবহারকালেই। দ্বিতীয়তঃ, সংসার থেকে সরে গিয়ে নির্জনে বাস করলেই সর্বভাবে একান্ত সেবন হয় না, কারণ শরীরও তো জগৎ-সংসারেরই অঙ্গ। শরীর এবং জগৎ-সংসারকে পৃথক্‌ভাবে দেখাই হল বিষমবুদ্ধি। তাই শরীর ও জগৎ-সংসারকে সমভাবে দেখলেই সমত্ববুদ্ধি হয়। বাস্তবে একান্তের সিদ্ধি এক পরমাত্মতত্ত্ব ছাড়া অন্য সমস্ত পদার্থ অর্থাৎ শরীর এবং জগৎ-সংসারের অস্তিত্বের অভাব হলেই হয়ে থাকে। সাধন করার জন্য একান্ত স্থান উপযোগী হলেও সর্বতোভাবে একান্তে বসবাসকারী সাধকের ব্যবহারকালীন নানা ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। শরীরের সঙ্গে একাত্মবোধ না থাকাই হল প্রকৃতপক্ষে একান্ত হওয়া। সুতরাং সাধকের উচিত হল প্রকৃত একান্তকে লক্ষ্য রেখে অর্থাৎ শরীর, ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধি দ্বারা নিজের অহং ও মমত্ববোধ দূর করে সর্বত্র পরিপূর্ণ ব্রহ্মে অভিন্নভাবে অবস্থান করা। এরূপ সাধকই হলেন বাস্তবে সম-বুদ্ধিসম্পন্ন।

গীতায় সমবুদ্ধির অর্থ 'সমদর্শন', 'সমবর্তন' নয়। পঞ্চম অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকে ভগবান বিদ্যা ও বিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণ এবং গাভি, হস্তী, কুকুর, চণ্ডাল—এই পাঁচটি প্রাণীর নাম বলেছিলেন, যাদের সঙ্গে সমান ব্যবহার হওয়া সম্ভব নয়। সেখানেও **'সমদর্শিনঃ'** পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হল যে সকলের সঙ্গে ব্যবহার কখনো সমান হতে পারে না। কেউ সমান ব্যবহার করতেও পারে না এবং তা হওয়া উচিতও নয়। ব্যবহারে পার্থক্য থাকা দরকার। ব্যবহারকালে সাধকদের নানা প্রাণী পদার্থের আকৃতি ও উপযোগিতার দিকে লক্ষ্য থাকলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁদের দৃষ্টি সেইসব প্রাণী ও পদার্থে পরিপূর্ণভাবে অবস্থিত পরমাত্মার দিকেই থাকে। যেমন বিভিন্ন প্রকার গহনাতে তত্ত্বতঃ (সোনাতে) কোনো পার্থক্য থাকে না তেমনই সাধকের ব্যবহারে তত্ত্বদৃষ্টিতে কোনো পার্থক্য থাকে না। সকল প্রাণীর প্রতিই সাধকের আন্তরিক সমতা থাকে। এখানে **'সমবুদ্ধয়ঃ'** পদ দ্বারা সেই আন্তরিক সমত্বের দিকেই লক্ষ্য করানো হয়েছে।

সিদ্ধ মহাপুরুষদের দৃষ্টিতে একমাত্র পরমাত্মা ছাড়া অন্য কোনো অস্তিত্ব না থাকায় তাঁরা সর্বদা এবং সর্বত্র 'সমবুদ্ধিসম্পন্ন' হয়ে থাকেন। সিদ্ধ মহাপুরুষদের এই স্বাভাবিক অবস্থিতি সাধকদের পক্ষে আদর্শ, তাঁরা এদিকে লক্ষ্য রেখেই অগ্রসর হন। সাধকদের দৃষ্টিতে পরমাত্মা ব্যতীত অন্যান্য পদার্থের প্রতি যতখানি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে, তাঁদের বুদ্ধিতে ততটুকু সমত্বের অভাব থাকে। তাই সাধকদের বুদ্ধিতে অন্যান্য পদার্থের পৃথক্ অস্তিত্ব যতই কম হতে থাকে, তাঁদের বুদ্ধিও সেই অনুপাতে সম হতে থাকে।

সাধক তাঁর বুদ্ধির দ্বারা সর্বত্র পরমাত্মাকে দেখার চেষ্টা করেন কিন্তু সিদ্ধ মহাপুরুষদের বুদ্ধিতে পরমাত্মা স্বাভাবিকভাবে এত নিবিড়ভাবে থাকেন যে তাঁদের কাছে পরমাত্মা ভিন্ন আর কিছুই থাকে না। তাই পরমাত্মা তাঁদের বুদ্ধির বিষয় নন, প্রত্যুত তাঁদের বুদ্ধি পরমাত্মা দ্বারাই তৎ-রূপ হয়ে আছে। তাই তাঁরা **'সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ'**।

'তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব'—নির্গুণ উপাসক যাতে মনে না করেন যে, নির্গুণ তত্ত্ব ও সগুণ তত্ত্ব এক নয়, পৃথক্ পৃথক্; তাই ভগবান স্পষ্টভাবে বলেছেন যে নির্গুণ ব্রহ্ম আমা হতে পৃথক্ নন (গীতা ৯।৪; ১৪।২৭)। সগুণ ও

নির্গুণ—উভয়ই আমার স্বরূপ।

এই শ্লোক দুটিতে ভগবান নির্গুণ উপাসকদের উপলক্ষে চারটি কথা বলেছেন (১) নির্গুণ তত্ত্বের স্বরূপ কী ? (২) সাধকদের স্থিতি কী ? (৩) উপাসনার স্বরূপ কী ? (৪) সাধক কী প্রাপ্ত করেন ?

(১) অর্জুন এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের উত্তরার্ধে যে নির্গুণ তত্ত্বের জন্য **'অক্ষরম্'** এবং **'অব্যক্তম্'** দুটি বিশেষণ যুক্ত প্রশ্ন করেছিলেন, সেই তত্ত্বটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার জন্য ভগবান আরও ছটি বিশেষণ (অর্থাৎ সর্বসমেত আটটি বিশেষণ) দিয়েছেন, যাতে পাঁচটি নিষেধাত্মক (**অক্ষরম্, অনির্দেশ্যম্, অব্যক্তম্, অচিন্ত্যম্** এবং **অচলম**)ও তিনটি বিধেয়াত্মক (**সর্বত্রগম্, কূটস্থম্, ধ্রুবম্**) বিশেষণ ব্যবহার করেছেন।

(২) সর্ব দেশ, কাল, বস্তু ও ব্যক্তিতে পরিপূর্ণ তত্ত্বের ওপর দৃষ্টি থাকলে নির্গুণ-উপাসকদের সর্বত্র সমবুদ্ধি হয়ে থাকে। দেহাভিমান ও ভোগাদির পৃথক্ সত্তা মানার জন্যই ভোগবাসনার আকাঙ্ক্ষা হয় এবং ভোগ করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই নির্গুণ-উপাসকদের দৃষ্টিতে একমাত্র পরমাত্মা ব্যতিরেকে অন্য কোনো বস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না থাকায় তাঁদের মধ্যে ভোগের কোনো গুরুত্ব থাকে না। তাই তাঁরা সহজেই ইন্দ্রিয় সংযম করতে পারেন। সর্বত্র সমবুদ্ধিসম্পন্ন হওয়ায় তাঁদের সকল প্রাণীর হিতে অনুরাগ থাকে তাই তাঁরা হলেন **'সর্বভূতহিতে রতাঃ'**।

(৩) সাধকের সর্বসময় সেই নির্গুণ-তত্ত্বের দিকে নজর রাখাই (তত্ত্বের সম্মুখীন হওয়াই) হল **'উপাসনা'**।

(৪) ভগবান বলেছেন এরূপ সাধকেরা যে নির্গুণ-ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন, তা আমিই। অর্থাৎ সগুণ এবং নির্গুণ উভয়ই এক তত্ত্ব।

পরিশিষ্ট-ভাব—ভগবান এখানে ব্রহ্মের যে লক্ষণগুলি (অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল, অক্ষর, অব্যয় ইত্যাদি) বলেছেন, সেইসব লক্ষণ জীবাত্মাদের সম্পর্কেও জানিয়েছেন। যেমন—**'অচিন্ত্য'** (২।২৫), **'কূটস্থ'** (১৫।১৬), **'অচল'** (২।২৪), **'অক্ষর'** (১৫।১৬, ১৮), **'অব্যক্ত'** (২।২৫) ইত্যাদি। উভয়েরই একপ্রকার লক্ষণ বলার কারণ হল এই যে জীব ও ব্রহ্ম—উভয়ই স্বরূপতঃ এক। দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় (নানারূপে) যাকে 'জীব' বলা হয়, তাকেই দেহের সঙ্গে সম্পর্কবর্জিত (একরূপে) 'ব্রহ্ম' বলা হয়। অর্থাৎ জীব শুধু দেহের উপাধিতে, দেহাভিমানের জন্যই পৃথক্, তা না হলে সে ব্রহ্মই। তাই ব্রহ্মপ্রাপ্তি হলে উপাসকের উপাস্যের সঙ্গে সাধর্ম্যপ্রাপ্তি হয়— **'ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ'** (গীতা ১৪।২)।

'তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব'—সগুণ (গুণসহ) এবং নির্গুণ (গুণরহিত) উভয় ক্ষেত্রেই বিশেষ্য (তত্ত্ব) একই, তাই ভগবান নির্গুণের উপাসকদেরও তাঁকেই প্রাপ্ত করার কথা বলেছেন। ভগবানের বলার তাৎপর্য হল যে, নির্গুণ নিরাকার রূপও আমারই। সেটি আমার সামগ্রিকরূপ থেকে পৃথক্ নয়।

'সর্বভূতহিতে রতাঃ'—জগৎ, জীব এবং পরমাত্মা—এই তিনের দৃষ্টিতেই আমরা সব এক। অর্থাৎ অপরা প্রকৃতির অন্তর্গত হওয়ায় সমস্ত শরীরই এক এবং পরা প্রকৃতির অন্তর্গত হওয়ায় সমস্ত জীবও এক। তাই সাধকের যখন সকল প্রাণীতে সমবুদ্ধি হয়—**'সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ'** এবং তিনি নিজ শরীরের ন্যায় যখন সমস্ত প্রাণীকেই আপন বলে মনে করেন—**'আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন'** (গীতা ৬।৩২), তখন তিনি সকল প্রাণীর হিতে প্রীতিলাভ করেন। কেন-না সমস্ত প্রাণীকে নিজ শরীর বলে মনে করায় তিনি কারও মন্দ দেখেন না, কারও মন্দ হোক তা কামনা করেন না এবং কারও ক্ষতি করেন না। এইরূপে মন্দভাব বর্জিত হলে তাঁর দ্বারা স্বতঃই অন্যের হিত হয়। শুধু তাই নয়, যেমন নিজ দাঁতের দ্বারা জিভে কামড় পড়লে কেউ ক্রোধবশতঃ দাঁতকে ভাঙে না, তেমনই যিনি সকল প্রাণীকে নিজের বলে মনে করেন, তাঁর কেউ কোনো ক্ষতি করলেও তাঁর মধ্যে অপরের ক্ষতি করার কোনো চিন্তা আসে না—**'উমা সন্ত কই ইহই বড়াঈ। মন্দ করত জো করই ভলাঈ॥'** (শ্রীরামচরিতমানস, সুন্দরকাণ্ড ৪১।৪)

মন্দভাব পরিত্যাগ করলে অপরের যে সেবা হয়, তা অনেক বড় বড় দান-পুণ্যের দ্বারাও হওয়া সম্ভব নয়। তাই মন্দভাব ত্যাগ করাই হল ভালোত্ব অর্জনের মূল। যিনি মন্দত্ব ত্যাগ করেছেন, তিনিই **'সর্বভূতহিতে রতাঃ'** হতে সক্ষম।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান দ্বিতীয় শ্লোকে সগুণ-উপাসকদের সর্বশ্রেষ্ঠ বলে জানিয়েছেন এবং তৃতীয়-চতুর্থ শ্লোকে নির্গুণ-উপাসকদের তাঁর প্রাপ্তির কথা বলেছিলেন। এবার উভয় উপাসনাতে অবান্তর পার্থক্য এবং কষ্টসাধ্য ও অনায়াসসাধ্যের বর্ণনা পরবর্তী তিনটি শ্লোকে করছেন।

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥ ৫ ॥

[অব্যক্তাসক্তচেতসাম্ (অব্যক্তে আসক্তচিত্ত) ; তেষাম্ (সেই সাধকদের) ; অধিকতরঃ, ক্লেশঃ (অধিক ক্লেশ হয়ে থাকে) ; হি (কারণ) ; দেহবদ্ভিঃ (দেহধারী ব্যক্তিদের) ; অব্যক্তা (অব্যক্তের) ; গতিঃ (প্রাপ্তি) ; দুঃখম্ (কষ্টে) ; অবাপ্যতে (লাভ হয়।)]

অব্যক্তে (নির্গুণ ব্রহ্মে) আসক্তচিত্ত সেই সাধকদের (নিজ নিজ সাধনে) অধিক ক্লেশ হয়ে থাকে, কারণ দেহধারী ব্যক্তিদের অব্যক্তের প্রাপ্তি কষ্টে লাভ হয়॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা—**'ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্'**— অবক্তো আসক্তচিত্ত—এই বিশেষণের সাহায্যে সেইসব সাধকদের কথা বলা হয়েছে, যাঁরা নির্গুণ উপাসনাকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন, কিন্তু যাঁদের চিত্ত এখনও নির্গুণ-তত্ত্বে নিবিষ্ট হয়নি। তত্ত্বে নিবিষ্ট হতে গেলে সাধকের তিনটি জিনিসের প্রয়োজন হয়—রুচি, বিশ্বাস এবং যোগ্যতা। শাস্ত্রাদি এবং গুরুজনদের কাছে নির্গুণ-তত্ত্বের মহিমা শুনে তাঁদের (নিরাকারে আকৃষ্ট হওয়ায় এবং নির্গুণ উপাসনাকে শ্রেষ্ঠ মানায়) তাতে রুচি জন্মায় এবং বিশ্বাসপূর্বক সাধন আরম্ভও করে দেন। কিন্তু বৈরাগ্যের ঘাটতি ও দেহাভিমানের জন্য তাঁদের চিত্ত তত্ত্বে প্রবিষ্ট হয় না—এমন সাধকদের জন্য এখানে **'অব্যক্তাসক্তচেতসাম্'**—পদটি প্রযুক্ত হয়েছে।

ভগবান ষষ্ঠ অধ্যায়ের সাতাশ-আটাশতম শ্লোকে বলেছেন যে, **'ব্রহ্মভূত'** অর্থাৎ ব্রহ্মে অভিন্নভাবে অবস্থিত সাধক সহজেই ব্রহ্মত্বলাভ করেন। কিন্তু এখানে এই শ্লোকে **'ক্লেশঃ অধিকতরঃ'** পদটিতে স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, এইসব সাধকের চিত্ত ব্রহ্মভূত সাধকদের ন্যায় সর্বতোভাবে নির্গুণ-তত্ত্বে লীন হয়নি। সুতরাং তাদের অব্যক্তে **'আবিষ্ট'** চিত্ত নয় বলে **'আসক্ত'** চিত্ত বলা হয়েছে। অর্থাৎ এই সাধকদের আসক্তি তো থাকে দেহের প্রতি আর অব্যক্তের মহিমা শুনে এঁরা নির্গুণ উপাসনাই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে তাতে আসক্ত হন। আসলে আসক্তি দেহের প্রতিই থাকে, অব্যক্তে নয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে **'অব্যক্তম্'** পদটি প্রকৃতির অর্থে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু এইস্থানে **'অব্যক্তাসক্তচেতসাম্'** পদে **'অব্যক্ত'**-এর অর্থ প্রকৃতি নয়, নির্গুণ-নিরাকার ব্রহ্মই হল এর অর্থ। কারণ এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে অর্জুন **'ত্বাম্'** পদ দ্বারা সগুণ-সাকার স্বরূপের এবং **'অব্যক্তম্'** পদ দ্বারা নির্গুণ-নিরাকার স্বরূপের বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন। উপাসনার বিষয়ও পরমাত্মাই হয়, প্রকৃতি নয়। কারণ প্রকৃতি ও প্রকৃতির কার্য পরিত্যাজ্য। তাই সেই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান **'অব্যক্ত'** পদটি (ব্যক্তরূপের বিপরীত) নির্গুণ-নিরাকার স্বরূপের অর্থেই প্রয়োগ করেছেন। তাই এখানে প্রকৃতির প্রসঙ্গ না হওয়ায় **'অব্যক্ত'** পদের অর্থ প্রকৃতিকে ধরা যায় না।

নবম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে **'অব্যক্তমূর্তিনা'** পদটি সগুণ-নিরাকার স্বরূপের জন্য প্রযুক্ত। এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে এখানেও **'অব্যক্তাসক্তচেতসাম্'** পদটির অর্থ 'সগুণ-নিরাকারে আসক্তচিত্ত ব্যক্তি'কেই কেন ধরা হবে না ? কিন্তু এরূপ অর্থ করাও সম্ভব নয়। কারণ এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে অর্জুনের প্রশ্নে **'ত্বাম্'** পদটি সগুণ-সাকারের জন্য এবং **'অব্যক্তম্'** পদটির সঙ্গে **'অক্ষরম্'** পদটি নির্গুণ-নিরাকারের জন্য প্রযুক্ত। ব্রহ্ম কী ?—অর্জুনের এই প্রশ্নের উত্তরে অষ্টম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে 'পরম অক্ষর ব্রহ্ম' অর্থাৎ সেখানেও **'অক্ষরম্'** পদটি নির্গুণ-নিরাকারের জন্য ব্যবহৃত। তাই অর্জুন **'অব্যক্তম্ অক্ষরম্'** পদের দ্বারা যে নির্গুণ ব্রহ্মের বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, তার উত্তরে এখানে (**'অক্ষর'** বিশেষণ থাকায়) **'অব্যক্ত'** পদ দ্বারা নির্গুণ-নিরাকার ব্রহ্মকেই মনে করা উচিত, সগুণ-নিরাকার নয়।

'ক্লেশোঽধিকতরঃ' পদটির ভাব হল যে যেসব

সাধকের চিত্ত নির্গুণ-তত্ত্বে লীন হয়নি, সেই সব নির্গুণ-উপাসকদের দেহাভিমানের জন্য তাদের সাধনায় বিশেষ ক্লেশ অর্থাৎ কষ্ট হয়[১]। গৌণরূপে এই পদটির ভাবার্থ হল যে সাধনার প্রারম্ভিক অবস্থা থেকে অন্তিম অবস্থা পর্যন্ত সকল নির্গুণ-উপাসকদের সগুণ-উপাসকদের থেকে বেশি ক্লেশ অর্থাৎ কষ্ট হয়।

বিশেষ কথা

এবার সগুণ-উপাসনার সুগমতা এবং নির্গুণ উপাসনার কাঠিন্যের পার্থক্য বিচার করা হচ্ছে—

সগুণ- উপাসনার সুগমতা

(১) সগুণ-উপাসনায় উপাস্যতত্ত্ব সগুণ-সাকার হওয়ায় সাধকের মন ও ইন্দ্রিয়ে ভগবানের স্বরূপ, নাম, লীলাকথা ইত্যাদির প্রতি নির্ভরতা থাকে। ভগবদ্‌পরায়ণ হওয়ার জন্য তার মন-ইন্দ্রিয়ভগবানের স্বরূপ এবং লীলার চিন্তন, কথা-শ্রবণ, ভগবদ্‌সেবা ও পূজাতে অপেক্ষাকৃত সহজভাবে লেগে থাকে (গীতা ৮।১৪)। তাই তার দ্বারা সাংসারিক বিষয়-চিন্তার সম্ভাবনা কম হয়।

(২) সাংসারিক আসক্তিই সাধনায় ক্লেশ আনে। কিন্তু সগুণ-উপাসক এটি দূর করার জন্য ভগবানেরই আশ্রয় নিয়ে থাকে। সে নিজের যা শক্তি-সামর্থ্য তা ভগবানেরই বলে মনে করে। বিড়ালের বাচ্চা যেমন তার মায়ের ওপর নির্ভর করে, তেমনই এই সাধক ভগবানের ওপরই নির্ভর করে থাকে। ভগবানই তাকে রক্ষা করেন (গীতা ৯।২২)।

সুনু মুনি তোহি কহউঁ সহরোসা।
ভজহিঁ জে মোহি তজি সকল ভরোসা॥
করউঁ সদা তিন কৈ রখবারী।
জিমি বালক রাখই মহতারী॥
(শ্রীরামচরিতমানস ৩।৪৩।২-৩)

তাই তাঁর সাংসারিক আসক্তি সহজেই দূর হয়।

নির্গুণ-উপাসনার ক্লেশ

(১) নির্গুণ-উপাসনাতে উপাস্যতত্ত্ব নির্গুণ-নিরাকার হওয়ায় সাধকের মন ও ইন্দ্রিয়ের কোনো ভিন্ন অবলম্বন থাকে না। আধার না থাকায় এবং বৈরাগ্যের ঘাটতি থাকায় ইন্দ্রিয়সকলের বেশি পরিমাণে বিষয় চিন্তার সম্ভাবনা থাকে।

(২) দেহে যত বেশি আসক্তি থাকে, সাধনে ততই ক্লেশ অনুভূত হয়, নির্গুণ-উপাসক সেটি বিবেকের সাহায্যে দূর করার চেষ্টা করে। বিবেকের সাহায্যে সাধন করার সময় সে নিজের সাধন-শক্তিকেই গুরুত্ব দেয়। বাঁদরের ছোট বাচ্চা যেমন (নিজের শক্তির ওপর ভরসা থাকায়) নিজেই মাকে আঁকড়ে থাকে এবং সেই ধরে রাখাকেই তার নিজের নিরাপত্তা বলে মনে করে, তেমনই এই সাধকেরা নিজের সাধন শক্তিকেই তার উন্নতির উপায় বলে মনে করে (গীতা ১৮।৫১-৫৩)। তাই শ্রীরামচরিত-মানসে ভগবান এটিকে তাঁর বিবেচক পুত্রের উপমা দিয়েছেন—

মোরেঁ প্রৌঢ় তনয় সম জ্ঞানী।
বালক সুত সম দাস অমানী॥
(শ্রীরামচরিতমানস ৩।৪৩।৪)

---

[১]সাধক প্রধানতঃ দু'প্রকারের হয়—

এক প্রকারের সাধক যাঁরা সৎসঙ্গ, শ্রবণ, শাস্ত্রাধ্যয়নের ফলস্বরূপ সাধনে প্রবৃত্ত হন। তাঁদের সাধনে অপেক্ষাকৃতভাবে অধিক ক্লেশ হয়। দ্বিতীয় প্রকার সাধক, যাঁদের সাধন-ভজনে স্বাভাবিক রুচি এবং সংসারে স্বাভাবিক বৈরাগ্য থাকে, তাঁদের সাধনায় অপেক্ষাকৃত কম ক্লেশ হয়। এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে সাধক কেন দু'প্রকারেরই হয় ? এর উত্তর এই যে, ভগবান গীতায় যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিদের গতি বর্ণনা করতে গিয়ে দুটি গতিরই বর্ণনা করেছেন—

(ক) কিছু যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যলোকে গমন করেন এবং সেখানে ভোগ উপভোগ করে শুদ্ধ আচারসম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে জন্ম নিয়ে পুনরায় সাধনায় রত হয়ে পরমাত্মাকে লাভ করেন (গীতা ৬।৪১, ৪৪-৪৫)।

(খ) আর কিছু যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি সরাসরি জ্ঞানী যোগীদের কুলে জন্ম নেন এবং সেখানে পুনরায় সাধনায় রত হয়ে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন। এরূপ জন্ম 'দুর্লভতর' হয়ে থাকে (গীতা ৬।৪২-৪৩)।

(৩) এইরকম উপাসকদের জন্য গীতায় ভগবান **'নচিরাৎ'** ইত্যাদি পদের দ্বারা শীঘ্রই তাঁর প্রাপ্তির কথা বলেছেন (গীতা ১২।৭)।

(৪) সগুণ-উপাসকদের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার ভগবানই দূর করে থাকেন।

(৫) তাঁদের উদ্ধার ভগবান করেন (গীতা ১২।৭)।

(৬) এরূপ উপাসকদের মধ্যে সূক্ষ্মভাবেও যদি কোনো দোষ থেকে যায়, তাহলে (ভগবানের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায়) সর্বজ্ঞ ভগবান কৃপা করে তা দূর করে দেন (গীতা ১৮।৫৮)।

(৭) এই উপাসকদের উপাসনা ভগবানেরই উপাসনা। ভগবান সর্বত্র সর্বদাই পরিপূর্ণ। ভগবানের পূর্ণতায় বিন্দুমাত্র সন্দেহ না থাকায় তাঁদের শ্রদ্ধা অতি অনায়াসে হয়ে থাকে। শ্রদ্ধা থাকায় তাঁরা নিত্য-নিরন্তর ভগবদ্‌পরায়ণ থাকেন, তাই ভগবানই সেই উপাসকদের বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন, যার দ্বারা তাঁদের ভগবদ্‌প্রাপ্তি হয় (গীতা ১০।১০)।

(৮) এই উপাসকেরা ভগবানকে পরম কৃপাময় বলে মনে করেন এবং তাঁর কৃপার আশ্রয়ে সমস্ত প্রতিকূলতা অতিক্রম করে যান। এইজন্যই তাঁদের সাধনা সহজ হয়ে যায় এবং ভগবদ্‌-কৃপায় তাঁরা অতি শীঘ্রই ভগবদ্‌প্রাপ্তি করেন (গীতা ১৮।৫৬-৫৮)।

(৯) মানুষের কর্ম করার অভ্যাস থাকেই (গীতা ৩।৫), তাই ভক্তদের নিজ কর্ম ভগবানের প্রতি করতে শুধু ভাবই পরিবর্তন করতে হয়, কর্ম তো একই থাকে। সুতরাং ভগবানের জন্য কর্ম করার ফলে ভক্ত কর্মবন্ধন থেকে সহজেই মুক্ত হয়ে থাকে (গীতা ১৮।৪৬)।

(১০) চিত্তে পদার্থগুলির প্রতি আসক্তি থাকলেও যদি সাধক পদার্থগুলিকে প্রাণীদের সেবায় ব্যয় করে তাহলে তার পদার্থগুলি ত্যাগ করতে কষ্ট হয় না। সৎ পাত্রের উদ্দেশ্যে পদার্থগুলি ত্যাগ করা আরও সহজ হয়ে যায়। অতএব ভগবানের জন্য পদার্থ ত্যাগ যে সহজেই হবে তা বলাই বাহুল্য।

(৩) জ্ঞানযোগীদের লক্ষ্যপ্রাপ্তির প্রসঙ্গে চতুর্থ অধ্যায়ের উনচল্লিশতম শ্লোকে **'অচিরেণ'** পদটি তত্ত্বজ্ঞানের অনন্তর শান্তি প্রাপ্তির জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তিকে লক্ষ্য করে নয়।

(৪) নির্গুণ-উপাসক তত্ত্বজ্ঞানের প্রাপ্তি স্বয়ং করে থাকে (গীতা ১৩।৩৪)।

(৫) তারা নিজেদের উদ্ধার (নির্গুণ-তত্ত্বপ্রাপ্তি) স্বয়ং করে থাকে (গীতা ৫।২৪)।

(৬) এরূপ উপাসকদের যদি কোনো ঘাটতি থাকে, তবে সেটি তাদের অনেক বিলম্বে অনুভূত হয় এবং সেই ঘাটতি বুঝে নিতেও তাদের অসুবিধা হয়। তবে ঘাটতিটা জানতে পারলে তারা সেটি দূর করতে সক্ষম হয়।

(৭) চতুর্থ অধ্যায়ের চৌত্রিশতম এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে ভগবান জ্ঞানযোগীদের জ্ঞানলাভের জন্য গুরুর উপাসনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং নির্গুণ-উপাসনাতে গুরুর প্রয়োজন থাকে। কিন্তু গুরুর পূর্ণতা সম্বন্ধে নিশ্চিত ধারণা না থাকায় অথবা গুরু পূর্ণ না হলে তাঁতে অবিচল শ্রদ্ধা হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে এবং সাধনার সাফল্যে বিলম্বের সম্ভাবনা থাকে।

(৮) এই উপাসকেরা উপাস্য-তত্ত্বকে নির্গুণ, নিরাকার এবং নির্বিকার বলে মনে করে। তাই তাদের সেরূপ ভগবদ্‌কৃপার অনুভব হয় না। তারা ভগবদ্‌প্রাপ্তিতে যে বাধা আসে, সেগুলি নিজ নিজ সাধন শক্তির দ্বারা দূর করতে চেষ্টা করে এবং কৃচ্ছ্রতা অনুভব করে। এর ফলস্বরূপ তত্ত্বপ্রাপ্তিতে তাদের বিলম্ব হয়ে থাকে।

(৯) জ্ঞানযোগী তার ক্রিয়াগুলিকে বাস্তবে প্রকৃতিকে অর্পণ করে ; কিন্তু বিবেক পূর্ণভাবে জাগ্রত হলে তবেই তার ক্রিয়াগুলি প্রকৃতিকে অর্পণ করা সম্ভব হয়। বিবেক যদি পূর্ণমাত্রায় না জাগে তাহলে ক্রিয়াগুলি প্রকৃতিকে অর্পণ করা যায় না এবং সাধকের কর্তৃত্বাভিমান থাকায় সে কর্মবন্ধনে আবদ্ধ থাকে।

(১০) সাধকের হৃদয়ে যতক্ষণ পদার্থের প্রতি বিন্দুমাত্র

(১১) এই সাধনে বিবেক এবং বৈরাগ্যের তত গুরুত্ব থাকে না, যত গুরুত্ব থাকে ভালোবাসা এবং বিশ্বাসের। যেমন কৌরবদের প্রতি দ্বেষ-ভাব থাকা সত্ত্বেও দ্রৌপদী স্মরণ করামাত্র ভগবান প্রকটিত হন[১]। কারণ দ্রৌপদী ভগবানকে একান্তই আপন বলে মনে করতেন। ভগবান শুধু ভক্তদের প্রেম ও বিশ্বাসই দেখেন, তাদের দোষগুলি নয়। ভগবানের সঙ্গে আত্মীয়তা করা তত শক্ত নয় (কারণ ভগবানের আত্মীয়তা স্বতঃসিদ্ধ), শক্ত হল নিজেকে তার উপযুক্ত করা।

আসক্তি ও নিজ শরীরের প্রতি অহং ও মমত্ববোধ থাকে, ততক্ষণ তার পক্ষে পদার্থগুলিকে মায়া মনে করে পরিত্যাগ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

(১১) সাধক যথার্থ অধিকারী হলে তবেই তত্ত্ব প্রাপ্ত করতে সক্ষম হয়। অধিকারী হবার জন্য বিবেক এবং তীব্র বৈরাগ্যের প্রয়োজন হয় কিন্তু আসক্তি থাকলে এরূপ বিবেকের জাগৃতি ও তীব্র বৈরাগ্য হওয়া কঠিন।

'অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে'—**'দেহী'**, **'দেহভৃৎ'** ইত্যাদি পদের অর্থ সাধারণভাবে 'দেহধারী পুরুষ' ধরা হয়। প্রসঙ্গ অনুযায়ী এর অর্থ 'জীব' এবং 'আত্মা'ও ধরা হয়। এখানে **'দেহবদ্ভিঃ'**[২] পদটির অর্থ 'দেহাভিমানী ব্যক্তি' মনে করা উচিত। কারণ নির্গুণ-উপাসকদের জন্য এই শ্লোকের পূর্বার্ধে **'অব্যক্তাসক্ত-চেতসাম্'** পদটি ব্যবহৃত হয়েছে, যার দ্বারা প্রতীত হয় যে তিনি নির্গুণ-উপাসনাকে শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নিলেও তাঁদের চিত্ত দেহাভিমানের জন্য নির্গুণ-তত্ত্বে নিবিষ্ট হয়নি। দেহাভিমানবশতঃই তাঁদের সাধনা ক্লেশসাধ্য হয়।

নির্গুণ-উপাসনাতে দেহাভিমানই প্রধান বাধা—**'দেহাভিমানিনি সর্বে দোষাঃ প্রাদুর্ভবন্তি'**—এই বাধার দিকে লক্ষ্য করাবার জন্যই ভগবান **'দেহবদ্ভিঃ'** পদটি ব্যবহার করেছেন। এই দেহাভিমান দূর করার জন্যই (অর্জুনের প্রশ্ন ছাড়াই) ভগবান ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ অধ্যায়ের অবতারণা করেছেন। তার মধ্যেও ত্রয়োদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটি দেহাভিমান দূর করার জন্যই বলা হয়েছে।

ব্রহ্মের নির্গুণ-নিরাকার স্বরূপ প্রাপ্তিকে এখানে **'অব্যক্তা গতিঃ'** বলা হয়েছে। সাধারণ মানুষের অবস্থিতি 'ব্যক্ত' অর্থাৎ দেহে হয়। তাই তাদের অব্যক্তে স্থিতি করা কঠিন বলে অনুভূত হয়। সাধক যদি নিজেকে দেহধারী (অর্থাৎ নিজেকে শরীর) বলে মনে না করে, তাহলে তার সহজেই এবং শীঘ্রই অব্যক্তে স্থিতি লাভ হতে পারে।

পরিশিষ্ট-ভাব—নির্গুণ-উপাসনায় যিনি দেহসহিত তিনি হলেন 'উপাসক' (জীব) আর যা দেহরহিত, তা হল 'উপাস্য' (ব্রহ্ম)। দেহের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্কই জীব এবং ব্রহ্মর সঙ্গে ঐক্যের প্রধান প্রতিবন্ধক। তাই দেহাভিমানীর পক্ষে নির্গুণ-উপাসনাতে সিদ্ধিলাভ অত্যন্ত কঠিন হয় এবং বিলম্বে প্রাপ্তি ঘটে। অপরপক্ষে সগুণ উপাসনাতে প্রধান বাধা হল ভগবানের প্রতি বিমুখভাব, দেহাভিমান নয়। তাই সগুণ-উপাসক জগৎ-সংসারে বিমুখ হয়ে

---

[১]এই কথাটি কেবল সেইরূপ ভক্তদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যাঁদের স্মরণমাত্রই ভগবান প্রকটিত হন ; সর্বসাধারণের ক্ষেত্রে নয়। যেসব ভক্ত সর্বতোভাবে ভগবানের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকেন এবং যাঁদের ভগবানের সঙ্গে এমন প্রগাঢ় আত্মীয়তা বোধ হয়, কেবলমাত্র তাঁরা স্মরণ করলেই ভগবান প্রকটিত হন। এরূপ ভক্তের দোষ দূর করার দায়িত্বও ভগবানের উপরই বর্তায়।

[২]এখানে 'দেহ' শব্দে 'ভূমনিন্দাপ্রশংসাসু নিত্যযোগেহতিশায়নে। সংসর্গেঽস্তি বিবক্ষায়াং ভবন্তি মতুবাদয়ঃ॥'—এই কারিকা অনুযায়ী সংসর্গের অর্থে 'তদস্যাস্ত্যস্মিন্নিতি মতুপ' (৫।২।৯৪), পাণিনির এই সূত্র দ্বারা 'মতুপ্' প্রত্যয় করা হয়েছে। দেহবদ্ভিঃ পদটির অর্থ হল—এইসব মানুষ, যাদের দেহের সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক বজায় আছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের সাতাশতম শ্লোকে 'ব্রহ্মভূত' হলে সহজে ব্রহ্মপ্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এইস্থানে 'দেহভৃত' হওয়ার জন্য কষ্টপূর্বক ব্রহ্মপ্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে।

ভগবানের শরণাগত হয়ে থাকেন, সাধনার আশ্রয় না নিয়ে ভগবানের আশ্রিত হয়ে ওঠেন। তাই ভগবান কৃপা করে শীঘ্রই তাকে উদ্ধার করে দেন (১২।৭ এবং ৮।১৪)। সগুণ-উপাসনার এই হল বৈশিষ্ট্য।

সগুণ উপাসনায় ভক্ত জগৎকে মিথ্যা বলে মনে করে তা পরিত্যাগ করার জন্য চেষ্টা করেন না, কারণ তাঁর দৃষ্টিতে জড়-চেতন, সৎ-অসৎ সবই ভগবান—**'সদসচ্চাহর্জুন'** (গীতা ৯।১৯)। তাই সগুণের উপাসনা হল সমগ্রের উপাসনা। গীতায় সগুণকে সমগ্র বলে মানা হয়েছে এবং ব্রহ্ম, জীব, কর্ম, অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞ এই সবগুলিকেই সমগ্র ভগবানের অন্তর্গত বলে মানা হয়েছে (গীতা ৭।২৯-৩০)। তাই গভীরভাবে চিন্তা করলে এরূপ মনে হয় যে গীতায় নির্গুণ-উপাসনা (ব্রহ্মের উপাসনা) হল সমগ্র ভগবানের এক অঙ্গের উপাসনা আর সগুণ-উপাসনা হল স্বয়ং সমগ্র ভগবানের উপাসনা—**'ত্বাং পর্যুপাসতে'** (গীতা ১২।১), **'মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে'** (১২।৬)।

যে ভগবানের সমগ্র রূপের এক অঙ্গের উপাসনা করে, সেও অন্তিম সময়ে সমগ্র প্রাপ্তিলাভ করে—**'তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব'** (গীতা ১২।৪), **'ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্‌'** (১৮।৫৫)। সুতরাং যাদের নির্গুণকে ভালো লাগে, তারা নির্গুণেরই উপাসনা করুক। কিন্তু নির্গুণের প্রতি আগ্রহের আতিশয্যে তারা যেন সগুণের নিন্দা না করে। সগুণের নিন্দা বা অপমান তাদের পক্ষে মারাত্মক হয়ে ওঠে অর্থাৎ তাদের সাধনায় সিদ্ধিলাভের পথে তা বাধা সৃষ্টি করে। কেন-না অপরা প্রকৃতিও ভগবানের, তাই তার নিন্দাতে ভগবানই নিন্দিত হন। গুণাদির খণ্ডন করলে গুণাদির সত্তা মানা হয়—যা বাধাস্বরূপ। কেন-না অস্তিত্ব স্বীকার না করলে সাধক কীভাবে তার নিরাকরণ করবেন ? অতএব সাধক যদি অন্যের নিন্দা না করে তৎপরতার সঙ্গে নিজ সাধনে ব্যাপৃত থাকেন তাহলে পরিণামে সব সাধকই এক হয়ে যান, কেন-না সবেরই তত্ত্ব একই[১]। সগুণকে উপেক্ষা করলে, সাধক মুক্ত হলেও মতভেদ দূর হয় না। অপরপক্ষে সগুণকে উপেক্ষা না করলে মতভেদও থাকে না এবং সাধকও 'সমগ্র' লাভ করেন।

※ ※ ※

যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥ ৬ ॥

[তু, যে (কিন্তু যাঁরা) ; সর্বাণি, কর্মাণি (সমস্ত কর্ম) ; ময়ি (আমাকে) ; সন্ন্যস্য (অর্পণ করেন) ; মৎপরাঃ (মৎপরায়ণ হয়ে) ; অনন্যেন, যোগেন (অনন্যভাবে) ; মাম্‌, এব, ধ্যায়ন্তঃ (আমারই ধ্যান করতে করতে) ; উপাসতে (উপাসনা করেন।)]

কিন্তু যাঁরা সমস্ত কর্ম আমাতে অর্পণ করে, মৎ-পরায়ণ হয়ে অনন্যভাবে আমারই ধ্যান করতে করতে উপাসনা করেন—॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা—[একাদশ অধ্যায়ের পঞ্চান্নতম শ্লোকে ভগবান অনন্য ভক্তের লক্ষণ উল্লেখ করতে গিয়ে তিনটি বিধেয়াত্মক (**'মৎকর্মকৃৎ, মৎপরমঃ এবং মদ্‌ভক্তঃ'**) এবং দুটি নিষেধাত্মক (**সঙ্গবর্জিতঃ এবং নির্বৈরঃ**) পদ ব্যবহার করেছেন। সেই পদগুলির আভাস এই শ্লোকে এইভাবে দেওয়া হয়েছে—

(১) **'সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য'** পদটির দ্বারা **'মৎকর্মকৃৎ'**-এর দিকে লক্ষ্য করা হয়।

(২) **'মৎপরাঃ'** পদটির দ্বারা **'মৎপরমঃ'**-এর ইঙ্গিত করা হয়েছে।

(৩) **'অনন্যেনৈব যোগেন'** পদগুলিতে **'মদ্ভক্তঃ'**-এর লক্ষ্য করা হয়েছে।

(৪) ভগবানে অনন্য আসক্তি থাকায় তাদের অন্য কিছুতে আসক্তি হয় না ; সুতরাং তারা **'সঙ্গবর্জিতঃ'** অর্থাৎ আসক্তিবর্জিত।

(৫) কোথাও কোনো আসক্তি না থাকায়, তাদের মনে

[১] 'বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্‌। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥' (শ্রীমদ্ভাগবত ১।২।১১) 'তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষ সেই জ্ঞানস্বরূপ এবং অদ্বিতীয় তত্ত্বকেই ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান—এই তিন নামে অভিহিত করে থাকেন।'

কারও প্রতি হিংসা, দ্বেষ, শত্রুতা, ক্রোধ ইত্যাদি থাকে না, তাই '**নির্বৈরঃ**' পদটির ভাবও এর অন্তর্গত হয়ে যায়। কিন্তু ভগবান এটিকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য পরে ত্রয়োদশ শ্লোকে সিদ্ধ ভক্তদের লক্ষণে সর্বপ্রথম '**অদ্বেষ্টা**' পদটি প্রয়োগ করেছেন। সুতরাং সাধকের কারও ওপর বিন্দুমাত্র দ্বেষভাব রাখা উচিত নয়।]

'**যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য**'—এখন এখান থেকে নির্গুণ-উপাসনার অপেক্ষা সগুণ-উপাসনার সুগমতা বলার জন্য '**তু**' পদটির দ্বারা প্রকরণ-ভেদ করেছেন।

যদিও '**কর্মাণি**' পদটি নিজেই বহুবচন হওয়ায় সকল কর্মের ইঙ্গিত করে, তবুও এটির সঙ্গে '**সর্বাণী**' বিশেষণ প্রয়োগ করে মন, বাক্য, শরীর দ্বারা কৃত সমস্ত লৌকিক (শরীর নির্বাহ এবং জীবিকা সম্পর্কীয়) এবং পারলৌকিক (জপ-ধ্যান সম্বন্ধীয়) শাস্ত্রবিহিত সমস্ত কর্মগুলিকে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে (গীতা ৯।২৭)।

এখানে '**ময়ি সন্ন্যস্য**' পদগুলিতে ক্রিয়াগুলিকে স্বরূপতঃ (বাহ্যভাবে) ত্যাগ করা ভগবানের অভিপ্রায় নয়। কারণ প্রথমতঃ স্বরূপতঃ কর্মত্যাগ করা সম্ভব নয় (গীতা ৩।৫ ; ১৮।১১), দ্বিতীয়তঃ সগুণ-উপাসক যদি মূঢ়তাপূর্বক শাস্ত্রবিহিত কর্ম স্বরূপতঃ ত্যাগ করে, তাহলে সেটি 'তামস' ত্যাগ হয় (গীতা ১৮।৭) এবং যদি দুঃখকর মনে করে শারীরিক কষ্টের জন্য সেগুলি সে ত্যাগ করে তাহলে তাকে বলা হয় 'রাজস' ত্যাগ (গীতা ১৮।৮)। অতএব এই রীতিতে কর্মত্যাগ করলেও কর্ম থেকে সম্বন্ধ পরিত্যাগ করা যায় না। কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সাধকের কর্মে মমত্ববোধ, আসক্তি এবং ফলেচ্ছা ত্যাগ করা প্রয়োজন। কারণ মমতা, আসক্তি ও ফলেচ্ছা রেখে কর্ম করলে, সেই কর্মই বন্ধনের কারণ হয়।

সাধকের যদি ভগবদ্প্রাপ্তি করা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তার বস্তুর আকাঙ্ক্ষা থাকে না এবং নিজেকে ভগবানের বলে মনে করায় তার মমতা দেহের থেকে দূর হয়ে একমাত্র ভগবানের ওপরই হয়। স্বয়ং ভগবানে অর্পিত হওয়ায় তার সকল কর্মই ভগবদর্পিত হয়।

ভগবানের জন্য কর্ম করার বিষয়ে কয়েকটি প্রকার আছে, গীতায় সেগুলিকে '**মদর্পণ কর্ম**', '**মদর্থ কর্ম**' এবং '**মৎকর্ম**' বলা হয়েছে।

(১) '**মদর্পণ কর্ম**' বলা হয় সেই কর্মগুলিকে, যেগুলির প্রথমে অন্য উদ্দেশ্য থাকলেও কর্ম করার সময় অথবা কর্ম করার পর সেগুলি ভগবানে অর্পণ করা হয়।

(২) '**মদর্থ কর্ম**' সেইগুলিকে বলা হয়, যেগুলি শুরু থেকেই ভগবানের জন্য করা হয় অথবা যেগুলি ভগবদ্-সেবারূপ হয়। ভগবদ্প্রাপ্তির জন্য কর্ম করা, ভগবানের নির্দেশ মনে করে কর্ম করা অথবা ভগবানের প্রসন্নতার জন্য কর্ম করা—এগুলি সবই ভগবদর্থ কর্ম।

(৩) কর্মকে ভগবানের মনে করে সমস্ত লৌকিক (ব্যবসায়, চাকুরী ইত্যাদি) এবং ভগবদ্সম্বন্ধীয় (জপ, ধ্যান ইত্যাদি) কর্ম করাই হল '**মৎকর্ম**'।

প্রকৃতপক্ষে কর্ম যেমন করেই করা হোক, তার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত একমাত্র ভগবদ্প্রাপ্তি করা।

উপরিউক্ত তিনটি প্রকারেই (মদর্পণ কর্ম, মদর্থ কর্ম, মৎকর্ম) সিদ্ধি প্রাপ্তকারী সাধকদের কর্মের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকে না। কারণ তাদের ফলেচ্ছা এবং কর্তৃত্বাভিমানও থাকে না আর পদার্থ বা শরীর-মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদিতে মমত্ববোধও থাকে না। কর্ম করার সাধন শরীর, মন, বুদ্ধি ইত্যাদিই যখন নিজস্ব নয়, তখন কর্মে মমত্ববোধ কী করে হবে ? এইভাবে কর্ম হতে সর্বতোভাবে মুক্ত হওয়াকেই বলা হয় প্রকৃত সমর্পণ। সিদ্ধ পুরুষদের ক্রিয়া স্বাভাবিকভাবেই সমর্পিত হয় এবং সাধক পূর্ণ সমর্পণের উদ্দেশ্য নিয়ে সেইভাবেই কর্ম করার চেষ্টা করেন।

ভক্তিযোগী যেমন তাঁর ক্রিয়াসমূহ ভগবানকে অর্পণ করে কর্মবন্ধন হতে মুক্ত হন, তেমনই জ্ঞানযোগী ক্রিয়াগুলি প্রকৃতি দ্বারা হচ্ছে মনে করে তার থেকে সর্বতোভাবে আসক্তিবর্জিত ও নির্লিপ্ত থেকে কর্মবন্ধন হতে মুক্ত হন।

'**মৎপরাঃ**'—পরায়ণ হওয়ার অর্থ—ভগবানকে পরমসাধ্য এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বলে জেনে তাঁর প্রতি সমর্পিতভাবে থাকা। সর্বতোভাবে ভগবদ্পরায়ণ হলে সগুণ-উপাসক নিজেকে ভগবানের যন্ত্র বলে মনে করেন। তাই শুভকর্মগুলি তিনি ভগবানের দ্বারা কৃত বলে মনে করেন ও সংসারের প্রতি উদ্দিষ্ট না হওয়ায় তাতে তাঁর ভোগাকাঙ্ক্ষা থাকে না, ভোগাকাঙ্ক্ষা না থাকায় তাঁর দ্বারা কোনো অশুভ ক্রিয়া হয়ই না।

'অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে'—এই পদে ইষ্ট সম্বন্ধীয় এবং উপায় সম্বন্ধীয়—দু'প্রকারেরই অনন্যতার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ ওই ভক্তদের ইষ্ট ভগবানই। তিনি ছাড়া আর কোনো সাধ্য (প্রাপ্তব্য) সেই ভক্তদের দৃষ্টিতে থাকে না এবং তাঁকে প্রাপ্তিলাভ করার জন্য তাঁকেই একমাত্র আশ্রয় করা হয়। তাঁরা ভগবদ্‌-কৃপাতেই তাঁদের সাধনা সিদ্ধ হয় বলে মনে করেন, নিজ পুরুষার্থ বা সাধনার শক্তির দ্বারা নয়। তাঁরা উপায় এবং উপেয় উভয়ই, ভগবান বলে মনে করেন। তাঁরা ভগবানকেই একমাত্র লক্ষ্য, ধ্যেয় মনে করে উপাসনা অর্থাৎ জপ, ধ্যান, কীর্তনাদি করে থাকেন।

'মেরে তো গিরধর গোপাল, দূসরো ন কোঈ'—এভাবে একমাত্র ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ স্বীকার করাই হল 'অনন্যযোগ'।

* * *

তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি নচিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্‌॥ ৭ ॥

[**পার্থ** (হে পার্থ !) ; **ময়ি** (আমাতে) ; **আবেশিতচেতসাম্‌** (সমর্পিত চিত্ত) ; **তেষাম্‌, অহম্‌** (সেই ভক্তদের আমি) ; **মৃত্যুসংসারসাগরাৎ** (মৃত্যুরূপ সংসারসাগর থেকে) ; **নচিরাৎ, সমুদ্ধর্তা, ভবামি** (শীঘ্রই উদ্ধার করে থাকি।)]

হে পার্থ ! আমাতে সমর্পিত চিত্ত সেই ভক্তদের আমি মৃত্যুরূপ সংসার-সমুদ্র থেকে শীঘ্রই উদ্ধার করে থাকি॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা—**'তেষামহং সমুদ্ধর্তা .... ময্যাবেশিতচেতসাম্‌'**—যে সাধকদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, ধ্যেয় একমাত্র ভগবান এবং যাঁরা ভগবানেই অনন্য প্রেমপূর্বক নিজ চিত্ত সমর্পণ করেছেন এবং যাঁরা নিজেরাই ভগবানে সমর্পিত হয়েছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যেই এখানে **'ময্যাবেশিতচেতসাম্‌'** পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

সমুদ্রে যেমন জল আর জল, তেমনই জগতে কেবল মৃত্যু আর মৃত্যু। জগতে উদ্ভূত এমন কোনো বস্তু নেই, যা ক্ষণকালের জন্যও মৃত্যুর আঘাত থেকে বেঁচে যায়। অর্থাৎ উৎপন্ন হওয়া প্রত্যেকটি বস্তুই প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তাই জগৎকে 'মৃত্যু-সংসারসাগর' বলা হয়েছে।

মানুষের মধ্যে অনুকূল এবং প্রতিকূল—দু'প্রকার বৃত্তি (মনোভাব) থাকে। সাংসারিক ঘটনা, পরিস্থিতি ও প্রাণী-পদার্থে অনুকূল-প্রতিকূল বৃত্তিগুলি রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ উৎপন্ন করে মানুষকে সংসারে আবদ্ধ করে (গীতা ৭।২৭)। এমনকি এটাও দেখা যায় যে সাধকও বিশেষ সম্প্রদায় ও বিশেষ সাধু-সন্তের প্রতি অনুকূল-প্রতিকূল মনোভাব পোষণ করে রাগ-দ্বেষের বশীভূত হন, যার জন্য তাঁরা সংসার-সমুদ্র থেকে শীঘ্র উদ্ধার হতে পারেন না। কারণ তত্ত্বজিজ্ঞাসু সাধকদের পক্ষে সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব অত্যন্ত বড় বাধা। সম্প্রদায়গত মোহ সাধককে আবদ্ধ করে। ভগবান তাই গীতায় এই দ্বন্দ্ব রাগ (আসক্তি) ও দ্বেষ থেকে মুক্তি পাওয়ার ওপর বিভিন্ন স্থানে বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন।[১]

সাধকভক্ত যদি তাঁর সমস্ত অনুকূলতা ভগবানে অর্পণ করেন অর্থাৎ একমাত্র ভগবানের সঙ্গেই অনন্য প্রেমসম্পর্ক স্থাপন করেন এবং সংসারের প্রতি প্রতিকূল মনোভাব রাখেন অর্থাৎ সংসারের সেবা করে এর থেকে অনুকূলতার আশা না রাখেন তাহলে জগৎ-সংসারের বন্ধন থেকে শীঘ্র মুক্ত হন। জগতের প্রতি অনুকূল-প্রতিকূল বৃত্তিগুলি (মনোভাব) থাকাই হল বন্ধনের মূল কারণ।

ভগবানের একটি সাধারণ নিয়ম হল যে, যে যেভাবে তাঁর শরণাগত হবে, তাকে তিনি সেইভাবেই আশ্রয় দেবেন—**'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব**

[১]উদাহরণ হল—'নির্দ্বন্দ্বঃ' (২।৪৫), 'নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো' (৫।৩) ; 'তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তাঃ' (৭।২৮) ; 'দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ' (১৫।৫) ; 'ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্মকুশলে নানুষজ্জতে' (১৮।১০) ; 'রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ' (১৮।৫১)।

ভজাম্যহম্' (গীতা ৪।১১)। তাই তিনি বলেছেন যে, যদিও আমি সবেতেই সমভাবে অবস্থিত—**'সমোঽহং সর্বভূতেষু'** (গীতা ৯।২৯), তবুও আমি যার একমাত্র প্রিয়, যে আমার জন্যই সমস্ত কর্ম করে এবং আমার পরায়ণ হয়ে নিত্য-নিরন্তর আমারই ধ্যান-জপ-চিন্তাতে ব্যাপৃত থাকে, সেইসকল ভক্তদের আমি নিজে মৃত্যু-সংসারসাগর থেকে খুব শীঘ্র এবং সম্যক্‌ভাবে উদ্ধার করি[১]।

পরিশিষ্ট-ভাব—ষষ্ঠ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে ভগবান সর্বপ্রকার সাধারণ সাধকদের নিজের সাহায্যে নিজেদের উদ্ধার করার কথা বলেছেন—**'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্'** আর এখানে বলেছেন যে ভক্তদের আমিই উদ্ধার করি—**'তেষামহং সমুদ্ধর্তা'**। এর তাৎপর্য হল যে প্রত্যেক সাধক আরম্ভে নিজ চেষ্টাতেই সাধনে ব্যাপৃত হন। সাধনকারীদের মধ্যে যে সাধক ভগবানের শরণাগত হন, ভগবান তাঁকে উদ্ধার করেন। কারণ সাধক ভগবানের ওপরই এই নির্ভরতা রাখেন যে ভগবানই আমাকে উদ্ধার করবেন। তিনি নিজের উদ্ধারের চিন্তা না করে ভগবানের সাধন-ভজনেই ব্যাপৃত থাকেন। তাঁর সাধন ও সাধ্য ভগবানই হয়ে থাকে। কিন্তু যাঁরা জ্ঞানমার্গের সাধক, তাঁরা নিজেদের উদ্ধার নিজেরাই করেন।

স্বরূপবোধ হলেই যে ভক্তিলাভ হবে তেমন কোনো নিয়ম নেই, কিন্তু ভক্তি লাভ হলে স্বরূপবোধ হয়, তাই ভগবান বলেছেন—

'মম দরসন ফল পরম অনুপা। জীব পাব নিজ সহজ সরূপা॥' (শ্রীরামচরিতমানস, অরণ্যকাণ্ড ৩৬।৫)

ভগবান তাঁর ভক্তদের কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ উভয়ই প্রদান করেন (গীতা ১০।১০-১১), কারণ ভগবানের স্বরূপ হল 'সমগ্র'।

দেহাভিমানবশতঃ জ্ঞানমার্গের সাধকগণের চিত্ত অব্যক্তে 'আসক্ত' হয়—**'অব্যক্তাসক্তচেতসাম্'** (গীতা ১২।৫)। কিন্তু ভক্তের চিত্ত ভগবানে 'আবিষ্ট' হয়—**'ময্যাবেশিতচেতসাম্'**। জ্ঞানে বিবেকই হল প্রধান, ভক্তিতে বিশ্বাস প্রধান। জ্ঞানে অপরা প্রকৃতি পরিত্যাজ্য, ভক্তিতে তা ভগবদ্‌স্বরূপ হয়ে ওঠে।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—ভগবান দ্বিতীয় শ্লোকে সগুণ উপাসকদের শ্রেষ্ঠ যোগী বলেছেন আর ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্লোকে বলেছেন যে এরূপ ভক্তদের আমি শীঘ্রই উদ্ধার করি। তাই ভগবান এখন অর্জুনকে এরূপ শ্রেষ্ঠ যোগী হওয়ার জন্য প্রথমে অষ্টম শ্লোকে সমর্পণ যোগরূপ সাধনের বর্ণনা করে পরে নবম, দশম ও একাদশ শ্লোকে ক্রমশঃ অভ্যাসযোগ, ভগবদর্থ কর্ম এবং সর্বকর্মফলত্যাগরূপ সাধনগুলির বর্ণনা করেছেন।

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্ধ্বং ন সংশয়ঃ॥ ৮ ॥

[**ময়ি** (আমাতে) ; **মনঃ** (মন) ; **আধৎস্ব** (নিবিষ্ট করো) ; **ময়ি, এব** (আমাতেই) ; **বুদ্ধিম্, নিবেশয়** (বুদ্ধি নিয়োগ করো) ; **অতঃ, ঊর্ধ্বম্** (তাহলে) ; **ময়ি, এব** (আমাতেই) ; **নিবসিষ্যসি** (বাস করবে) ; **সংশয়ঃ, ন** (এতে কোনো সন্দেহ নেই।)]

তুমি আমাতে মন নিবিষ্ট করো এবং আমাতেই বুদ্ধি নিয়োগ করো ; তাহলে তুমি আমাতেই বাস করবে (স্থিতিলাভ করবে) এতে কোনো সন্দেহ নেই ॥ ৮ ॥

---

[১]'সমুদ্ধর্তা ভবামি' পদে ভগবানের এই ভাব বুঝতে হবে যে, সেই সগুণ-উপাসক আমার কৃপায় সাধনার সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে আমারই কৃপায় আমাকে লাভ করে (গীতা ১৮।৫৬-৫৮) ; সাধনার অপূর্ণতা দূর করে আমি তাকে আমার প্রাপ্তি করিয়ে দিই (গীতা ৯।২২) ; তাদের অন্তঃকরণে অবস্থান করে তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে তাদের অজ্ঞানজনিত অন্ধকার নাশ করি (গীতা ১০।১১) এবং তাদের সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করে দিই (গীতা ১৮।৬৬)।

ব্যাখ্যা—'ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়'—ভগবানের মতে সেই ব্যক্তিই উত্তম যোগবেত্তা, যাঁর ভগবানের সঙ্গে নিত্যযোগ অনুভূত হয়েছে। সকল সাধককে উত্তম যোগবেত্তা করার উদ্দেশ্যে ভগবান অর্জুনকে নিমিত্ত করে নির্দেশ দিয়েছেন যে আমাকে অর্থাৎ পরমেশ্বরকেই পরম শ্রেষ্ঠ ও পরম প্রাপণীয় মনে করে বুদ্ধিকে আমাতে নিবিষ্ট করো এবং আমাকেই পরম প্রিয়তম মনে করে মনও আমাতে নিবিষ্ট করো।

ভগবানে আমাদের স্বতঃ স্বাভাবিক স্থিতি (নিত্যযোগ) থাকে। কিন্তু তাঁতে মন-বুদ্ধি নিবিষ্ট না হওয়ায় ভগবানের সঙ্গে আমাদের সেই স্বাভাবিক নিত্য সম্পর্কের অনুভব হয় না। তাই ভগবান বলেছেন যে, মন-বুদ্ধি আমাতে নিবিষ্ট করো, তাহলেই তুমি আমাতে স্থিতিলাভ করবে (যা প্রথম থেকেই আছে) অর্থাৎ তোমার আমাতে স্বতঃসিদ্ধ স্থিতি অনুভূত হবে।

মন-বুদ্ধি নিবিষ্ট করার অর্থ হল এই যে, আজ পর্যন্ত মানুষ যে মনের সাহায্যে জড়-সংসারে মমত্ববোধ, আসক্তি, সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা, আশা ইত্যাদির জন্য বারংবার সংসারের চিন্তা করতে থাকে এবং বুদ্ধির দ্বারা সংসারের ভালো-মন্দের চিন্তা করতে থাকে, সেই মনকে সংসার থেকে সরিয়ে ভগবানে নিবিষ্ট করতে হবে এবং বুদ্ধি দ্বারা দৃঢ়তার সঙ্গে চিন্তা করতে হবে যে, 'আমি শুধুমাত্র ভগবানেরই আর ভগবানই কেবল আমার এবং আমার জন্য সর্বোপরি, পরম শ্রেষ্ঠ এবং পরম প্রাপণীয় শুধু ভগবানই আছেন।' এরূপ দৃঢ়নিশ্চয় করলে সংসারের চিন্তা এবং গুরুত্ব দূর হয়ে যাবে এবং একমাত্র ভগবানের সঙ্গেই সম্পর্ক দৃঢ় হবে। এই হল মন-বুদ্ধি ভগবানে নিবিষ্ট করা।

মন-বুদ্ধি নিবিষ্ট করার মধ্যে বুদ্ধি নিবিষ্ট করাই মুখ্য ব্যাপার। কোনো ব্যাপারে আগে বুদ্ধিই স্থির হয়, পরে বুদ্ধির এই স্থিরতা মন মেনে নেয়। সাধন করার সময় আগে (উদ্দেশ্য প্রস্তুত করতে) বুদ্ধিরই প্রাধান্য থাকে, পরে মনের প্রাধান্য হয়। যেসব ব্যক্তির ভগবদ্‌প্রাপ্তি করা উদ্দেশ্য থাকে না, তাদের মন-বুদ্ধিও যে বিষয়ে তারা নিবিষ্ট করতে চায়, সে বিষয়ে নিবিষ্ট হতে পারে। মন-বুদ্ধি নিবিষ্ট হলে তারা সেইসব বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করলেও, (ভগবদ্‌প্রাপ্তি উদ্দেশ্য না থাকায়) ভগবদ্‌-প্রাপ্তি হয় না। তাই সাধকের উচিত বুদ্ধির দ্বারা দৃঢ়নিশ্চিত হওয়া যে, 'আমাকে ভগবদ্‌প্রাপ্তি করতেই হবে।' এইরূপ স্থিরনিশ্চয় করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি সহজে না হওয়ার আসল কারণ হল ভোগ ও সম্পদ-সংগ্রহের সুখ গ্রহণ করা। সুখের আশাতেই মানুষের মনোবৃত্তি ধন, মান, মর্যাদা ইত্যাদি প্রাপ্যকেই উদ্দেশ্য করে, তাই তাদের বুদ্ধিও বহুভেদ-সম্পন্ন তথা অনন্ত হয়ে যায় (গীতা ২।৪১)। কিন্তু যদি ভগবদ্‌প্রাপ্তি করাই একমাত্র লক্ষ্য হয় তাহলে এই লক্ষ্যে এত শুদ্ধি ও শক্তি থাকে যে অত্যন্ত দুরাচারী ব্যক্তিকেও ভগবান সাধু বলে স্বীকার করেন! এই দৃঢ় উদ্দেশ্যের ফলে সেই ব্যক্তি অতি শীঘ্রই ধর্মাত্মা হয়ে ওঠে এবং পরম শান্তি লাভ করে (গীতা ৯।৩০-৩১)।

'আমি ভগবানেরই এবং ভগবানই আমার'—এই দৃঢ়নিশ্চয় (সাধকের দৃষ্টিতে) বুদ্ধিতে হয় বলে প্রতীত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। বুদ্ধিতে এরূপ সিদ্ধান্ত (দৃঢ়নিশ্চয়) পরিলক্ষিত হলেও সাধকের জানা থাকে না যে তিনি 'স্বয়ং' আগে থেকেই ভগবানে অবস্থিত। কিন্তু তিনি একথা না জানলেও, এটিই হল বাস্তব সত্য। 'স্বয়ং' যে ভগবানে অবস্থিত তার প্রমাণ হল যে এই সম্বন্ধের কখনো বিস্মৃতি হয় না। এটি যদি শুধু বুদ্ধির ব্যাপার হত তাহলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু আমিত্বের কথা সাধক কখনো বিস্মৃত হন না। যেমন, 'আমি বিবাহিত' এটি 'আমি'-ভাবের সিদ্ধান্ত, বুদ্ধির নয়। তাই মানুষ এই কথা কখনো ভোলে না। যদি কেউ মেনে নেয় যে—'আমি অমুক গুরুর শিষ্য', তাহলে এই সম্পর্কটির জন্য কোনো অভ্যাস না করলেও এটি তার মনের মধ্যে অটলভাবে বিরাজ করে। স্মৃতির দ্বারা স্মৃতি তো থাকেই, বিস্মৃতির মধ্যেও সম্বন্ধের স্মৃতির অভাব হয় না। কারণ, সম্বন্ধের এই নিশ্চয় 'আমি' বা 'অহং'-ভাবেই থাকে। এইরূপ জগতে মেনে নেওয়া সম্বন্ধও যখন স্মৃতি ও বিস্মৃতি উভয় অবস্থাতেই অটল থাকে তাহলে ভগবানের সঙ্গে যে সর্বদা নিত্য-সম্বন্ধ রয়েছে, তার বিস্মৃতি কী করে সম্ভব? তাই 'আমি ভগবানেরই এবং ভগবানই আমার'—এইরূপ 'অহং'-ভাব (স্বয়ং-এর) ভগবানের সঙ্গে হলে মন-বুদ্ধিও ভগবানে নিবিষ্ট হয়।

মন-বুদ্ধিতে অন্তঃকরণ-চতুষ্টয়ের অন্তর্ভাব থাকে। মনের অন্তর্গত চিত্ত এবং বুদ্ধির অন্তর্গত অহংকারের

অন্তর্ভাব থাকে। মন-বুদ্ধি ভগবানে নিবিষ্ট হলে অহংকারের আধার 'স্বয়ং' ভগবানে নিবিষ্ট হয় এবং পরিণামে 'আমি ভগবানেরই এবং ভগবানই আমার' এই ভাব জাগ্রত হয়। এইভাবে নির্বিকল্প অবস্থান হলে 'অহং'-ভাব ভগবানে লীন হয়ে যায়।

বিশেষ কথা

সাধারণভাবে নিজ স্বরূপকে ('অহং'-ভাবের আধার 'স্বয়ং') মন, বুদ্ধি, শরীর ইত্যাদিসহ দেখা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। সাধারণভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি অনুভব করে থাকে যে শিশু বয়স থেকে এখন পর্যন্ত শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি সবই পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু আমি একই আছি। সুতরাং 'আমি অপরিবর্তনীয়' এই ভাবটি আজ থেকেই দৃঢ়তা সহকারে মেনে নেওয়া উচিত (মানুষ সাধারণতঃ বুদ্ধির দ্বারা জানার চেষ্টা করে, কিন্তু এখানে স্বয়ং-এর দ্বারা জানার কথা বলা হয়েছে)।

বিচার করতে হয় যে—নিজের স্বরূপ পরিবর্তিত হয়নি, এটি সকলের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং যাঁরা আস্তিক ও ভগবানে শ্রদ্ধাশীল তাঁদের দৃষ্টিতেও ভগবান পরিবর্তিত হননি। অন্যদিকে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে আর সংসারও পরিবর্তনশীল—এটি তো প্রত্যক্ষই রয়েছে। এতেই প্রমাণিত হয় যে অপরিবর্তনীয় 'স্বয়ং' এবং 'ভগবান' উভয়ই এক শ্রেণীর, আর সদা পরিবর্তনশীল 'শরীর' ও 'জগৎ-সংসার' এই দুটি এক শ্রেণীর। অপরিবর্তনীয় 'স্বয়ং' এবং 'ভগবান' উভয়কেই ব্যক্তরূপে দেখা যায় না, কিন্তু পরির্বতনশীল এই দেহ ও জগৎ-সংসার—দুই-ই ব্যক্তরূপে প্রত্যক্ষ। পরিবর্তনশীল মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, শরীরকে ধরেই 'স্বয়ং' নিজেকে পরিবর্তনশীল বলে মনে করে। প্রকৃতপক্ষে 'অহং'-এর অস্তিত্বরূপে যে আধার (স্বয়ং), তার কখনো পরিবর্তন হয় না। কারণ তা পরমাত্মার অংশস্বরূপ।

বাস্তবে 'আমি কে ?' তা তো জানা নেই, কিন্তু 'আমি আছি' এতে এতটুকুও সন্দেহ নেই। জগৎ-সংসার যেমন প্রত্যক্ষ দেখা যায়, তেমনই 'অহং'-ভাব- এরও আভাস হয়ে থাকে। তাই স্বরূপতঃ 'আমি' কে ? এটি অনুসন্ধান করা সাধকের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন।

'আমি' কে ? তা জানা না থাকলেও, সংসার (শরীর) কী সে সম্বন্ধে জানা আছে। জগৎ-সংসার উৎপত্তি ও বিনাশশীল, সর্বদা একভাবে থাকে না—তা সকলেই অনুভব করে। এই অনুভূতিকে সবসময় জাগ্রত রাখা উচিত। নিয়ম হল যে 'জগৎ-সংসার' এবং 'আমি'— এই দুইয়ের মধ্যে কোনো একটির ঠিক ঠিক ধারণা হলে অপরটির স্বরূপ-জ্ঞান আপনিই হয়।

'অহং'-ভাব এর প্রকাশক ও আধার (নিজস্বরূপ) চেতন ও নিত্য। তাই উৎপত্তি ও বিনাশশীল জড় সংসারের সঙ্গে স্বরূপের কোনো সম্পর্ক থাকে না। ভগবানের সঙ্গে স্বরূপের স্বতঃ ও স্বাভাবিক সম্পর্ক। একে জানাই হল 'অহং'-এর প্রকৃত সত্য অনুভব করা। এই সম্বন্ধটি জানা হলে মন-বুদ্ধি স্বতঃই ভগবানে নিবিষ্ট হয়[১]।

'নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্ধ্বং ন সংশয়ঃ'—এখানে **'অত ঊর্ধ্বম্'**—পদটির ভাব হল, যে মুহূর্তে মন-বুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে ভগবানে নিবিষ্ট হয়ে যাবে অর্থাৎ মন-বুদ্ধিতে বিন্দুমাত্র আপনত্ব থাকবে না, সেই মুহূর্তে ভগবদ্প্রাপ্তি হয়ে যাবে । এমন নয় যে মন-বুদ্ধি পূর্ণভাবে নিবিষ্ট হবার পরে ভগবদ্প্রাপ্তিতে কালের কোনো ব্যবধান থেকে যায়।

ভগবান বলেছেন, হে অর্জুন ! আমাতেই মন-বুদ্ধি নিবিষ্ট করলে আমাতেই তোমার স্থিতি হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এতে মনে হয় যে অর্জুন কিছুটা সংশয়ে ছিলেন, সেইজন্যই ভগবান 'ন সংশয়ঃ' পদটি ব্যবহার করেছেন। যদি সংশয়ের সম্ভাবনা না থাকত, তাহলে ভগবান এই পদটি কেন ব্যবহার করবেন ? সেই সংশয় কীসের ? মানুষের হৃদয়ে এই কথা প্রায় গাঁথা হয়ে আছে যে, যদি কর্ম ভালো হয়, আচরণ ভালো হয়, একান্তে জপ-ধ্যান করা যায়, তাহলেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করা যায়। আর যদি এইসব সাধনা না করা যায়, তাহলে পরমাত্মাপ্রাপ্তি করা অসম্ভব। এই ভ্রম দূর করার জন্য ভগবান বলেছেন যে, আমাকে লাভ করার উদ্দেশ্য নিয়ে মন-বুদ্ধি আমাতে নিবিষ্ট করা যত গুরুত্বপূর্ণ, এইসব জপ-ধ্যানাদি সমস্ত সাধনা একসঙ্গে মিলেও তার সমকক্ষ হতে পারে না। সুতরাং মন-বুদ্ধি আমাতে নিবিষ্ট করলে আমার প্রাপ্তি যে

---

[১]চেতন এবং অবিনাশী স্বরূপকেই (আত্মা) 'স্বয়ং', 'অহম্'-এর আধার, যথার্থ 'আমি', 'অহং'-এর প্রকাশক (আধার) প্রভৃতি নামে বলা হয়।

অবশ্যই হবে, এতে কোনো সংশয় নেই—

'ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈশ্যস্যসংশয়ম্॥' (গীতা ৮।৭)

যতক্ষণ পর্যন্ত বুদ্ধিতে সংসারের গুরুত্ব এবং মনে সংসারের চিন্তা থাকে, ততক্ষণ (পরমাত্মাতে স্বাভাবিক স্থিতি থাকলেও) নিজ অবস্থিতি সংসারেই আছে বলে বুঝতে হবে। সংসারে স্থিতি অর্থাৎ সংসারের সঙ্গ থাকলেই সংসারচক্রে ঘুরতে হয়।

উপরিউক্ত পদটির দ্বারা অর্জুনের সংশয় দূর করতে গিয়ে ভগবান বলেছেন যে, আমাতে মন-বুদ্ধি সর্বতোভাবে নিবিষ্ট করলে তোমার অবস্থিতি কোথায় হবে, তা তোমার চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। যে মুহূর্তে তোমার মন-বুদ্ধি একমাত্র আমাতে সর্বতোভাবে নিবিষ্ট হবে, সেই মুহূর্তেই তুমি আমাতে অবস্থান করবে।

মন-বুদ্ধি ভগবানে নিবিষ্ট করা ছাড়া সাধকের আর কোনো কর্তব্য থাকে না। মন ভগবানে স্থিত হলে সংসারের চিন্তা হয় না এবং বুদ্ধি ভগবানে নিবিষ্ট করলে সাধক সংসার-আশ্রয়রহিত হয়। সংসারের কোনো প্রকার চিন্তন ও আশ্রয় না থাকলে ভগবানেরই চিন্তন ও আশ্রয় হয়ে ওঠেন, যার ফলে ভগবদ্লাভ হয়।

এখানে মনের সঙ্গে 'চিত্ত' এবং বুদ্ধির সঙ্গে 'অহং'-কে ধরতে হবে। কারণ ভগবানে চিত্ত এবং অহম্ নিবিষ্ট না হলে 'তুমি আমাতেই নিবাস করবে' এটি বলার সার্থকতা থাকে না।

সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে একমাত্র ঈশ্বরের (পরমাত্মার)-ই সাক্ষাৎ অংশ হল জীবাত্মা। কিন্তু সে এই জগতের একটি তুচ্ছ অংশকে (শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদিকে) নিজের বলে মনে করে এগুলিকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে (গীতা ১৫।৭) অর্থাৎ এগুলির প্রভু হয়ে ওঠে। সে (জীবাত্মা) একেবারেই ভুলে যায় যে এই মন-বুদ্ধি ইত্যাদিও তো সেই পরমাত্মারই সমষ্টি সৃষ্টিরই অংশ। আমি সেই পরমাত্মারই অংশ এবং সর্বদা তাঁতেই অবস্থিত, একথা ভুলে গিয়ে সে নিজেকে পৃথক্ সত্তা বলে মনে করে। যেমন, এক কোটিপতি ব্যক্তির মূর্খ পুত্র পিতার থেকে পৃথক্ হয়ে নিজ বিশাল প্রাসাদের দু-চারটি ঘরে আপন অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে মনে করে, খুব উন্নতি হয়েছে। কিন্তু যখন তার ভুল ভাঙে, তখন তার সেই কোটিপতির উত্তরাধিকারী হতে কোনো কিছুই আর অন্তরায়ের সৃষ্টি করে না। এই দৃষ্টিতেই ভগবান বলছেন যে, যখন তুমি এই ব্যষ্টি মন-বুদ্ধি আমাকে অর্পণ করবে (যা স্বাভাবিকভাবেই আমার। কারণ আমিই সমষ্টি মন-বুদ্ধির প্রভু), তখন স্বয়ং এ থেকে মুক্ত হয়ে (বাস্তবে প্রথম থেকেই আমার অংশ এবং আমাতে স্থিত হওয়ায়) নিঃসন্দেহে আমাতেই অবস্থান করবে।

ভগবান সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে পঞ্চ মহাভূত, মন, বুদ্ধি এবং অহংকার—এই ভাবে আট ভাগে বিভক্ত তাঁর 'অপরা (জড়) প্রকৃতি'র বর্ণনা করেছেন এবং পঞ্চম শ্লোকে এগুলি থেকে ভিন্ন তাঁর জীবভূতা পরা (চেতন) প্রকৃতির বর্ণনা করেছেন। এই দুই প্রকৃতিকেই ভগবান তাঁর নিজের বলে জানিয়েছেন। অতএব উভয়েরই প্রভু তিনি। উভয়ের মধ্যে, জড় প্রকৃতির কাজ হওয়ায় 'অপরা প্রকৃতি' নিকৃষ্ট এবং চেতন পরমাত্মার অংশ হওয়ায় 'পরা-প্রকৃতি' শ্রেষ্ঠ (গীতা ১৫।৭)। কিন্তু পরা প্রকৃতি (জীব) ভ্রমক্রমে অপরা প্রকৃতিকে নিজের এবং নিজের জন্য মনে করে তাতে আবদ্ধ হয় এবং জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হয় (গীতা ১৩।২১)। তাই ভগবান এখানে বলেছেন যে মন-বুদ্ধি রূপ অপরা প্রকৃতি থেকে 'আপন-ভাব' সরিয়ে সেগুলি আমার বলে মনে করবে, কারণ সেগুলি প্রকৃতপক্ষে আমারই। এইভাবে মন-বুদ্ধি আমাতে অর্পণ করলে এগুলির সঙ্গে ভ্রমবশতঃ মেনে নেওয়া সম্পর্ক দূর হবে এবং আমার সঙ্গে তোমার যে স্বতঃসিদ্ধ নিত্য-সম্বন্ধ তা অনুভূত হবে।

ভগবদ্প্রাপ্তি সম্পর্কিত বিশেষ কথা

কোনো বিশেষ সাধনার জোরে ভগবদ্প্রাপ্তি হয় না। কারণ ধ্যান ইত্যাদির সাধনা শরীর, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হয়। শরীর-মন-বুদ্ধি ইত্যাদি প্রাকৃতিক হওয়ায়, সেগুলি জড় বস্তু। জড় পদার্থগুলির সাহায্যে চিন্ময় ভগবানকে জয় করা যায় না। কারণ প্রকৃতির সমস্ত পদার্থ একত্র হয়েও চিন্ময় পরমাত্মার সমান কখনো হতে পারে না।

সাংসারিক পদার্থ কর্ম (পুরুষার্থ) করার দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায় ; তাই সাধক মনে করে যে ভগবদ্প্রাপ্তিও কর্মের দ্বারাই হবে। সেইজন্য ভগবদ্প্রাপ্তির ব্যাপারেও সে মনে করে যে আমার করা সাধনার দ্বারাই ভগবদ্প্রাপ্তি হবে।

মনু-শতরূপা, পার্বতী প্রভৃতি তপস্যার সাহায্যেই ইষ্টলাভ করেছেন—ইতিহাস-পুরাণাদিতে এইপ্রকার কাহিনী পড়ে বা শুনে সাধকের হৃদয়ে এমন প্রভাব পড়ে এবং তার ধারণা দৃঢ় হতে থাকে যে সাধনার দ্বারাই ভগবানকে লাভ করা যায়। কিন্তু সাধনার দ্বারাই যে ভগবান লাভ হবে এমন কোনো কথা নেই। তপস্যা ইত্যাদি সাধনার দ্বারা যেখানে ভগবদ্‌প্রাপ্তি হয়েছে বলে মনে হয়, সেখানেও জড়-এর সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক সর্বতোভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়াতেই প্রাপ্তি-লাভ হয়ে থাকে, সাধনার দ্বারা নয়। সাধনার সার্থকতা হল অসাধন (জড়ের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক) পরিত্যাগ করা। ভগবান সর্বদা সকলের স্বতঃপ্রাপ্ত কিন্তু জড়ের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক পরিত্যাগ করলে তবেই তাঁর প্রত্যক্ষ অনুভূতি হওয়া সম্ভব। তাই ভগবদ্‌প্রাপ্তি জড়ত্বের সাহায্যে নয়, জড়ত্বের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হলে তবেই হয়ে থাকে। সুতরাং যে সাধকগণ মনে করেন নিজ সাধনার জোরে ভগবদ্‌প্রাপ্তি করব, তাঁরা খুব ভুল করেন। সাধনার সার্থকতা তো শুধুমাত্র জড়ত্বের আশ্রয় পরিত্যাগ করাতে থাকে—এই রহস্য না বুঝে সাধন-ভজনে মমত্ববোধ নিয়ে তার আশ্রয় ধরে থাকলে সাধকের জড়ের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় থেকে যায়। যতক্ষণ চিত্তে জড়ত্বের প্রতি বিন্দুমাত্রও মমত্ববোধ থাকে, ততক্ষণ ভগবদ্‌প্রাপ্তি হওয়া কঠিন। তাই সাধকদের উচিত তাঁরা যেন সাধনার দ্বারা জড়ত্বের সঙ্গে সর্বতোভাবে সম্পর্ক ছেদ করেন।

একমাত্র ভগবদ্‌প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে করা সাধনার দ্বারাই অতি সহজে জড়ত্বের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব—মন-বুদ্ধি ভগবানের অপরা প্রকৃতি (গীতা ৭।৪-৫)। ভগবানের প্রকৃতি অর্থাৎ স্বভাব হলেও অপরা প্রকৃতি ভগবানের থেকে পৃথক্ স্বভাবসম্পন্ন (জড় এবং পরিবর্তনশীল)। কিন্তু পরা প্রকৃতি (জীবাত্মা) ভগবানের থেকে পৃথক স্বভাবসম্পন্ন নয়। তাই ভগবানের সঙ্গে সাধর্ম্য প্রকৃতির নয় বরং তা জীবের-ই (স্বয়ং-এর)—**'মম সাধর্ম্যমাগতাঃ'** (গীতা ১৪।২)। মন-বুদ্ধি হল প্রকৃতির স্বজাতীয় অর্থাৎ এগুলি প্রকৃতির অংশ, কিন্তু আমরা স্বয়ং ভগবানের। সুতরাং স্ব-স্বরূপে এবং মন-বুদ্ধিতে জাতিগত ভিন্নতা আছে। আকর্ষণ এবং মিলন স্বজাতীয়তেই হয়, বিজাতীয়তে হয় না— এই হল নিয়ম। তাই মন-বুদ্ধি ভগবানে নিযুক্ত হতে পারে না, একমাত্র স্বয়ংই ভগবানে যুক্ত হতে সক্ষম। মন-বুদ্ধির স্বতন্ত্র সত্তা মেনে নিলে সাধকদের প্রায়ই এই ভুল হয় যে, তাঁরা স্বয়ং স্বতন্ত্র থেকে মন বুদ্ধিকে ভগবানে নিয়োগ করার চেষ্টা করেন। তবে প্রকৃত তথ্য হল যে স্বয়ংই ভগবানে নিয়োজিত হয়, মন-বুদ্ধি নয়। স্বয়ং যখন ভগবানে নিয়োজিত হয়, তখন মন-বুদ্ধি নিজে থেকেই বিদূরিত হয় অর্থাৎ তখন তাদের আর সত্তা (অস্তিত্ব) থাকে না, তখন একমাত্র ভগবানই বিরাজ করেন। কারণ বাস্তবে মন-বুদ্ধির কোনো অস্তিত্ব ছিলই না, জীবই এগুলিকে অস্তিত্ব প্রদান করে থাকে **'যয়েদং ধার্যতে জগৎ'** (গীতা ৭।৫), **'মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি'** (গীতা ১৫।৭)। সেইজন্য গীতায় **'ময্যাসক্তমনাঃ'** (৭।১) **'মন্মনা ভব'** (৯।৩৪, ১৮।৬৫), **'ময্যাবেশ্য মনো যে মাম্'** (১২।২), **'ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়'** (১২।৮), **'মচ্চিত্তঃ সততং ভব'** (১৮।৫৭) ইত্যাদি পদে যে মন নিবিষ্ট করার কথা বলা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তা হল স্বয়ংকে ভগবানে নিয়োগ করার উপায়। ভগবানে মন-বুদ্ধি নিয়োগ করলে প্রকৃতপক্ষে মন-বুদ্ধি যুক্ত হয় না কিন্তু স্বয়ং হয়—**'নিবসিষ্যসি ময্যেব'**, কেন-না জীবের স্বভাবই হল যে যেখানে মন-বুদ্ধি নিবিষ্ট হয় সেখানেই সে লিপ্ত থাকে। যেমন সূঁচ যেস্থানে যায়, পিছন পিছন সুতোও সেইস্থানে যায়, তেমনই মন-বুদ্ধি যেখানে যায়, স্বয়ংও সেইখানে যায়। সংসারকে অস্তিত্বসম্পন্ন মনে করে ও গুরুত্ব দিয়ে তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করায় মন-বুদ্ধি সংসারে নিবিষ্ট হয় এবং সংসারে মন-বুদ্ধি নিবিষ্ট হওয়ায় জীবও নিজে সংসারে ব্যস্ত হয়ে থাকে। তাই জীবকে সংসার থেকে মুক্ত করার জন্যই ভগবান মন-বুদ্ধি তাতে নিবিষ্ট করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। স্বর্ণকার যেমন সোনাকে বিশুদ্ধ করার জন্য অগ্নিতে নিক্ষেপ করে, যাতে সোনার সঙ্গে থাকা বিজাতীয় পদার্থ পৃথক্ হয়ে যায় ও শুদ্ধ সোনার অবশেষ থাকে, তেমনই ভগবানে মন বুদ্ধি নিবিষ্ট করার ফলে মন-বুদ্ধি প্রভৃতি পৃথক্ হয়ে স্বয়ং ভগবানে মিশে যায় অর্থাৎ শুধু ভগবানই থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান বলেছেন—

বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে। মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে॥ (১১।১৪।২৭)

'বিষয়ের চিন্তা করলে মন বিষয়ে আবদ্ধ হয় আর আমাকে স্মরণ করলে মন আমাতে বিলীন হয় অর্থাৎ মনের আর কোনো অস্তিত্ব থাকে না।'

অর্থাৎ মন-বুদ্ধি ভগবানে নিবিষ্ট করলে তা বিলীন হয়ে যায়, কারণ অপরা প্রকৃতি আসলে ভগবানেরই স্বভাব। ভগবানে বিলীন হওয়ায় মন-বুদ্ধির আর কোনো পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না, তখন শুধু ভগবানই বিরাজ করেন— **'বাসুদেবঃ সর্বম্'**। অন্য কথায়, মন-বুদ্ধি সংসার থেকে তো অপসারিত হল কিন্তু ভগবানকে নিজের অন্তর্গত করতে পারল না, তাই তার আর পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না, শুধু ভগবানই বিরাজ করেন।

জ্ঞানে স্বরূপ হল মুখ্য আর ভক্তিতে ভগবানই মুখ্য। তাই জ্ঞানী স্বরূপে স্থিত হন—**'সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ'** (গীতা ১৪।২৪) আর ভক্ত ভগবানে স্থিত হন—**'নিবাশিষ্যসি ময্যেব'**। স্বরূপে স্থিত হলে অখণ্ডরস অনুভব হয় আর ভগবানে স্থিত হলে প্রতিমুহূর্তে বর্ধমান অখণ্ডরসের অনুভব হয়। ভগবানে স্থিত হলে ভক্ত সর্বত্র ভগবানকেই দর্শন করতে থাকেন (গীতা ৬।৩০), কারণ তাঁর প্রথম থেকেই এই ভাব থাকে যে ভগবান সর্বব্যাপী।

এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে, ভগবানে ক্রমশঃ সাধকের মন, পরে বুদ্ধি এবং সবশেষে স্বয়ং নিজেই নিবিষ্ট হয়, স্বয়ং নিবিষ্ট হলে অহং দূর হয়।

মন প্রেমে মগ্ন হয় আর বুদ্ধি শ্রদ্ধাতে। ভগবানে মন-বুদ্ধি নিবিষ্ট হওয়ার তাৎপর্য হল—ভগবানে প্রেম ও শ্রদ্ধা হওয়া অর্থাৎ জগৎ-সংসারে প্রিয়ভাব ও গুরুত্ব না থাকা, শুধু ভগবানেই প্রিয়ভাব ও গুরুত্ববোধ হওয়া।

❋ ❋ ❋

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥ ৯ ॥

[**অথ** (যদি তুমি) ; **চিত্তম্, ময়ি** (চিত্ত আমাতে) ; **স্থিরম্** (অচলভাবে) ; **সমাধাতুম্** (স্থির করতে) ; **ন, শক্নোষি, ততঃ** (সক্ষম না হও, তাহলে) ; **ধনঞ্জয়** (হে ধনঞ্জয় !) ; **অভ্যাসযোগেন** (অভ্যাসযোগের সাহায্যে তুমি) ; **মাম্, আপ্তুম্, ইচ্ছ** (আমাকে পাবার চেষ্টা করো।)]

যদি তুমি আমাতে চিত্ত অচলভাবে স্থির (অর্পণ) করতে সক্ষম না হও, তাহলে হে ধনঞ্জয় ! অভ্যাসযোগের সাহায্যে তুমি আমাকে পাবার চেষ্টা করো॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা—**'অথ চিত্তং সমাধাতুং ...... মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়'**—'চিত্ত' পদটির অর্থ এখানে 'মন'। কিন্তু এই শ্লোকের আগের শ্লোকটিতে বর্ণিত সাধনার সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে, তাই এখানে **'চিত্তম্'** পদটির অর্থ হিসাবে 'মন' ও 'বুদ্ধি' উভয়কে ধরাই যুক্তিসঙ্গত।

ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে যদি তুমি তোমার মন ও বুদ্ধি আমাতে অচঞ্চলভাবে স্থাপন করতে অসমর্থ হও অর্থাৎ আমাতে অর্পণ করতে না পার, তাহলে অভ্যাসযোগের সাহায্যে আমাকে পাবার চেষ্টা করো।

'অভ্যাস' এবং 'অভ্যাসযোগ' দুটি আলাদা। কোনো উদ্দেশ্যে চিত্তকে বারংবার নিয়োগ করা হল 'অভ্যাস' এবং 'যোগ' বলা হয় সমত্বকে। সমতা রেখে অভ্যাস করাই হল 'অভ্যাসযোগ'। শুধুমাত্র ভগবদ্প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কৃত ভজন, নাম-জপ প্রভৃতিকে বলা হয় 'অভ্যাসযোগ'।

অভ্যাসের সঙ্গে যোগের সংযোগ না হলে সাধকের উদ্দেশ্য সংসারেই সীমাবদ্ধ থাকে । উদ্দেশ্য সংসারের থাকায় তাদের স্ত্রী-পুত্র, ধন-সম্পত্তি, মান-মর্যাদা, সুস্থতা, অনুকূলতা ইত্যাদি নানা কামনা উৎপন্ন হয়ে থাকে। কামনাযুক্ত ব্যক্তির কাজকর্মের লক্ষ্যও (কখনো পুত্র, কখনো অর্থ, কখনো মান-মর্যাদা ইত্যাদি) ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে (গীতা ২।৪১)। তাই এইরূপ ব্যক্তির ক্রিয়ার দ্বারা যোগ সিদ্ধ হয় না। যোগ তখনই হয় যখন ক্রিয়ামাত্রেরই উদ্দেশ্য (ধ্যেয়) একমাত্র পরমাত্মা হয়।

সাধক যখন ভগবদ্প্রাপ্তির উদ্দেশ্য নিয়ে বারবার নাম-জপ ইত্যাদি করার চেষ্টা করেন, তখন তাঁর মনে নানা

সংকল্প উৎপন্ন হতে থাকে। তাই সাধকের, ভগবদ্‌প্রাপ্তি আমার একমাত্র উদ্দেশ্য—এইরূপে দৃঢ়নিশ্চয় করে অন্য সমস্ত সংকল্প থেকে বিরত হতে হয়।

'মামিচ্ছাপ্তুং' পদটির দ্বারা ভগবান 'অভ্যাসযোগ'-কেই তাঁর প্রাপ্তির স্বতন্ত্র সাধন বলে জানিয়েছেন।

আগের শ্লোকে ভগবান তাঁকে মন-বুদ্ধি অর্পণ করার কথা বলেছেন। এখন এই শ্লোকে অভ্যাসযোগের কথা বলেছেন। এর দ্বারা এই ধারণা হতে পারে যে অভ্যাসযোগ হল ভগবানে মন-বুদ্ধি অর্পণ করার সাধনা ; প্রথমে অভ্যাসের সাহায্যে মন-বুদ্ধি ভগবানে অর্পণ করতে হবে, তারপর ভগবদ্‌প্রাপ্তি ঘটবে। কিন্তু মন-বুদ্ধি ভগবানে অর্পণ করলেই যে ভগবদ্‌প্রাপ্তি হবে, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। ভগবানের কথার তাৎপর্য হল এই যে, যদি ভগবদ্‌প্রাপ্তি করাই উদ্দেশ্য হয় এবং উদ্দেশ্যের সঙ্গে সাধক অভিন্ন হয় তাহলে কেবল 'অভ্যাস'-এর দ্বারাই তার ভগবদ্‌প্রাপ্তি হয়ে থাকে।

সাধক যখন ভগবদ্‌প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে বারংবার নাম-জপ, ভজন, কীর্তন, শ্রবণ ইত্যাদি করতে থাকেন, তখন তাঁর চিত্ত শুদ্ধ হতে থাকে এবং ভগবদ্‌প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা জাগে। জাগতিক সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমত্ব লাভ হলে ভগবদ্‌প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়ে ওঠে। ভগবদ্‌প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা তীব্র হলে ভগবানের সঙ্গে মিলনের ব্যাকুলতা জেগে ওঠে। এই ব্যাকুলতা তার অবশিষ্ট সাংসারিক আসক্তি এবং অনন্ত জন্মের পাপকে ভস্ম করে দেয়। সাংসারিক আসক্তি এবং পাপ নাশ হলে তাঁর একমাত্র ভগবানেই অনন্য প্রেম জন্মায় এবং তিনি তখন আর ভগবানের বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারেন না। যখন ভগবানের বিচ্ছেদ অসহনীয় হয়ে ওঠে তখন ভগবানও সেই ভক্তকে ছাড়া থাকতে পারেন না অর্থাৎ ভগবানও তাঁর বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারেন না এবং সেই ভক্তের ঈশ্বর লাভ হয়ে যায়।

সাধকের ভগবদ্‌প্রাপ্তিতে বিলম্ব হবার কারণ হল এই যে তিনি ভগবানের বিচ্ছেদ সহ্য করে থাকেন। যদি তাঁর ভগবানের বিচ্ছেদ অসহ্য বোধ হয়, তবে আর ভগবানের সঙ্গে মিলনের দেরি হবে না। ভগবানের দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদি থেকে কোনো দূরত্ব নেই। সাধন যেখানে, ভগবানও সেখানেই থাকেন। ভক্তের আকুলতা কম হওয়ায় ভগবদ্‌প্রাপ্তিতে বিলম্ব ঘটে। সাংসারিক সুখভোগের আকাঙ্ক্ষার জন্যই এমন ধারণা হয়ে থাকে যে ভগবদ্‌প্রাপ্তি ভবিষ্যতে হবে। ভগবদ্‌প্রাপ্তির জন্য যখনই তীব্র ব্যাকুলতা ও অধীরতা হয়, তখনই সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা স্বতঃই নাশ হয়ে যায় এবং অতি শীঘ্রই ভগবদ্ লাভ হয়।

গোড়া থেকেই যদি সাধক দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হন যে আমাকে ভগবদ্‌প্রাপ্তি করতেই হবে (তাতে লৌকিক দৃষ্টিতে কিছু হোক বা নাই হোক) তাহলে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ বা ভক্তিযোগ—যে কোনো উপায়েই অতি শীঘ্রই ঈশ্বরলাভ করা সম্ভব।

পরিশিষ্ট-ভাব—ষষ্ঠ অধ্যায়ের ছাব্বিশতম শ্লোকে শুধুমাত্র 'অভ্যাসের' কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এখানে বলা হয়েছে 'অভ্যাসযোগের' কথা, যার দ্বারা কল্যাণ হয়। যদি শুধু অভ্যাস হয় আর তাতে যোগের সম্পর্ক না থাকে, তা হলে তাতে এক বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু তাতে কল্যাণ হয় না।

বিক্ষিপ্ত মনকে নিরোধ করার চেষ্টা অথবা মনকে বারংবার ভগবানে নিবিষ্ট করার প্রয়াস হল অভ্যাস। অভ্যাসযোগে মনের নিরোধ হয় না, বরং মনের সঙ্গে সম্পর্ক-বিচ্ছেদ হয়—'সমত্বং যোগ উচ্যতে' (গীতা ২।৪৮)।

⁂ ⁂ ⁂

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥ ১০ ॥

[অভ্যাসে, অপি (অভ্যাসযোগেও) ; অসমর্থঃ, অসি (অসমর্থ হও) ; মৎকর্মপরমঃ, ভব (আমার জন্য কর্মপরায়ণ হও) ; মদর্থম্ (আমার জন্য) ; কর্মাণি (কর্ম) ; কুর্বণ, অপি (করতে থাকলেও) ; সিদ্ধিম্ (সিদ্ধি) ; অবাপ্স্যসি (লাভ করবে।)]

যদি তুমি অভ্যাসযোগেও অসমর্থ হও তবে আমার জন্য কর্মপরায়ণ হও। আমার জন্য কর্ম করতে থাকলেও তুমি সিদ্ধিলাভ করবে॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা—'অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্মপরমো ভব'—এখানে 'অভ্যাসে' পদটির অর্থ আগের (নবম) শ্লোকে বর্ণিত 'অভ্যাসযোগ'ই ধরতে হবে। গীতার একটি রীতি হল যে আগে কথিত বিষয়টি পরে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। অষ্টম শ্লোকে ভগবান মন-বুদ্ধি নিবিষ্ট করার সাধনাকে নবম শ্লোকে পুনরায় **'চিত্তং সমাধাতুম্'** পদটির দ্বারা বলেছেন অর্থাৎ মন-বুদ্ধি দুই-ই **'চিত্তম্'** পদটির অন্তর্গত করেছেন। এইরূপ নবম শ্লোকে উদ্ধৃত **'অভ্যাসযোগ'** পদটির জন্য এখানে (দশম শ্লোকে) **'অভ্যাসে'** পদ উদ্ধৃত হয়েছে।

ভগবান বলেছেন যে, যদি তুমি পূর্বশ্লোকে বর্ণিত অভ্যাসযোগেও অসমর্থ হও, তাহলে আমার জন্যই শুধু কর্ম করে যাও। অর্থাৎ সমস্ত কর্ম (বর্ণাশ্রম ধর্মানুসারে শরীর নির্বাহ এবং জীবিকা সম্পর্কীয় লৌকিক এবং ভজন, ধ্যান, নাম-জপ ইত্যাদি পারমার্থিক কর্ম) সাংসারিক ভোগ ও সংগ্রহের জন্য না করে একমাত্র ভগবদ্প্রাপ্তির জন্যই করা। যে কর্ম ভগবদ্প্রাপ্তির জন্য ভগবদ্নির্দেশানুযায়ী করা হয়, তাকে **'মৎকর্ম'** বলা হয়েছে। যেসব সাধক এইরূপ কর্মপরায়ণ, তাঁদের **'মৎকর্মপরম'** বলা হয়। যখন সাধকের নিজেরও ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে এবং কর্মগুলিও ভগবানের প্রীত্যর্থে করা হয় তখনই মৎকর্মপরায়ণতা সিদ্ধ হয়।

সাধকের ধ্যেয় যখন আর সংসার (ভোগ ও সংগ্রহ) থাকে না, তখন নিষিদ্ধ ক্রিয়াকর্ম স্বতঃই দূরীভূত হয়। কারণ নিষিদ্ধ কর্ম করাতে সাংসারিক 'কামনা'-ই হল হেতু (গীতা ৩।৩৭)। অতএব ভগবদ্প্রাপ্তি উদ্দেশ্য হওয়ায় সাধকের সমস্ত ক্রিয়াই শাস্ত্রবিহিত এবং ভগবদর্থে হয়ে থাকে।

'মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি'—ভগবান যে সাধনার কথা এই শ্লোকের পূর্বার্ধে **'মৎকর্মপরমো ভব'** পদটির দ্বারা বলেছেন, সেই কথাই পুনরায় এই পদটিতেও বলেছেন। পদটির ভাব হল যে, যদি পরমাত্মাই উদ্দেশ্য হয় তাহলে সাধকের স্থিতি আর অন্য কোনো স্থানে কী করে হতে পারে ?

ভগবান যেমন অষ্টম শ্লোকে মন-বুদ্ধি তাঁকে অর্পণ করার সাধনাকে ও নবম শ্লোকে অভ্যাসযোগের সাধনাকে তাঁকে প্রাপ্ত করার পৃথক্ সাধন বলে জানিয়েছেন, তেমনই ভগবান এইস্থানে **'মৎকর্মপরমো ভব'** (কেবলমাত্র আমারই জন্য কর্মপরায়ণ হও)—এই সাধনাটিও তাঁকে প্রাপ্তির পৃথক্ সাধন বলে জানিয়েছেন।

ব্যবসায়ী ব্যক্তি ব্যবসায় দ্বারা ধনলাভ করলে যেমন তার কর্মের উৎসাহ ও ধনলোভ বেড়ে চলে, তেমনই সাধক যখন ভগবানের জন্য সমস্ত কর্ম করেন, তখন তাঁর মনেও ভগবদ্প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা এবং সাধনা করার উৎসাহ বেড়ে যায়। আকাঙ্ক্ষা তীব্র হলে যখন সাধকের ভগবানের বিচ্ছেদ অসহ্য হয়ে ওঠে, তখন সর্বত্র পরিপূর্ণ-রূপ ভগবান তাঁর কাছে আর আত্মগোপন করে থাকতে পারেন না। ভগবান তখন কৃপা করে সাধককে তাঁর প্রাপ্তি করিয়ে দেন। সাধকের উদ্দেশ্য যদি ভগবদ্প্রাপ্তি হয় তাহলে সমস্ত ক্রিয়া তিনি ভগবানের জন্যই করে থাকেন, অর্থাৎ বুদ্ধি, সামগ্রী, সামর্থ্য এবং সময় পুরোপুরি তিনি ভগবদ্প্রাপ্তির উদ্দেশ্যেই নিয়োগ করেন। এ ছাড়া তাঁর আর কীই বা করার থাকতে পারে ? ভগবানও তাঁর কাছে এর থেকে বেশি কিছু আশা করেন না। তাই তাঁকে নিজের প্রাপ্তি করিয়ে দেন। এর কারণ হল যে ভগবানকে কোনো বিশেষ সাধনার জোরে পাওয়া যায় না। ভগবানের মহত্ত্বের সামনে সমগ্র সৃষ্টি যখন মূল্যহীন হয়ে পড়ে, তাহলে কোনো এক ব্যক্তির দ্বারা অর্পিত সীমিত বস্তু বা সাধনার দ্বারা ঈশ্বরের মূল্যায়ণ করা কীরূপে সম্ভব ? তাই তাঁর প্রাপ্তির জন্য ভগবান সাধকের কাছে মাত্র এইটুকু আশা করেন যে, সাধক তাঁর পূর্ণ যোগ্যতা, সামর্থ্য ইত্যাদি তাঁর প্রাপ্তিতে নিয়োজিত করুন, নিজের জন্য যেন কিছুই না রাখেন এবং এই সমস্ত যোগ্যতা, সামর্থ্যগুলি যেন নিজের বলেও মনে না করেন।

পরিশিষ্ট-ভাব—অভ্যাসের থেকে ক্রিয়াসমূহ ভগবানে অর্পণ করা সহজ। কেন-না অভ্যাস হল এমন ব্যাপার, যা বার বার চর্চা করতে হয়। কিন্তু কর্ম স্বতঃই হয়ে যায়, কারণ স্বভাবেই থাকে কর্মের প্রবণতা। নিজের জন্য কর্ম করলে মানুষ আবদ্ধ হয়—**'কর্মণা বধ্যতে জন্তুঃ'**। তাই কর্মগুলি ভগবানে অর্পণ করলে মানুষ সহজেই ভগবানকে লাভ করতে সক্ষম

হয় (গীতা ৯।২৭-২৮)।

'সদর্থমপি' পদটির তাৎপর্য হল, শুরু থেকেই ভগবানের জন্য কর্ম করে যাওয়া।

*** *** ***

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥ ১১ ॥

[অথ (যদি তুমি) ; মদ্‌যোগম্ (আমার যোগের) ; আশ্রিতঃ (আশ্রিত থেকে) ; এতৎ, অপি (এই সাধনগুলিও) ; কর্তুম্, অশক্তঃ, অসি (করতে অসমর্থ হও) ; ততঃ (তাহলে) ; যতাত্মবান্ (মন ও ইন্দ্রিয়কে সংযত করে) ; সর্বকর্মফলত্যাগম্ (সমস্ত কর্মের ফলের ইচ্ছা ত্যাগ) ; কুরু (করো।)]

যদি তুমি আমার যোগের (সমত্বের) আশ্রিত থেকে এইগুলিও (পূর্বশ্লোকে কথিত সাধনগুলি) করতে অসমর্থ হও তাহলে মন ও ইন্দ্রিয়কে সংযত করে সমস্ত কর্মফলের ইচ্ছা ত্যাগ করো ॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা—**'অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ'**—আগের শ্লোকে ভগবান তাঁর উদ্দেশ্যে সমস্ত কর্ম অর্পণ করে তাঁকে প্রাপ্ত করার কথা বলেছেন এবং এখন এই শ্লোকে তিনি সমস্ত কর্মের ফল ত্যাগরূপ সাধনার কথা বলেছেন। পূর্বস্থানে ভগবানের জন্য সমস্ত কর্ম করায় ভক্তির প্রাধান্যের জন্য ওটিকে 'ভক্তিযোগ' বলা হয় এবং এইস্থানে সর্বকর্মফলত্যাগে শুধুমাত্র ফলত্যাগের প্রাধান্য থাকায় এটিকে 'কর্মযোগ' বলা হয়। এইরূপ ভগবদ্‌প্রাপ্তির এই দুটিই স্বতন্ত্র (পৃথক্ পৃথক্) সাধন।

এই শ্লোকে **'মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ'** পদটির সম্বন্ধ **'অথৈতদপ্যশক্তোঽসি'** কথাটির সঙ্গে মনে করাই ঠিক বলে মনে হয়। কারণ যদি এটির সম্বন্ধ **'সর্বকর্মফলত্যাগং কুরু'** কথাটির সঙ্গে মনে করা হয়, তাহলে ভগবানের আশ্রয়ের প্রাধান্য থাকায় এটিও 'ভক্তিযোগ' হয়। এরূপ হলে দশম শ্লোকে কথিত ভক্তিযোগ-সাধন থেকে এর কোনো পার্থক্য থাকে না, কিন্তু ভগবান দশম ও একাদশ শ্লোকে ক্রমশঃ 'ভক্তিযোগ' এবং 'কর্মযোগ'—দুই ভিন্ন ভিন্ন সাধনার কথা জানাতে চেয়েছেন।

দ্বিতীয়তঃ ভগবান এই শ্লোকে **'যতাত্মবান্'** (মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদিসহ শরীর বশকারী) পদও ব্যবহার করেছেন। কর্মযোগেই আত্মসংযম করার বিশেষ প্রয়োজন। কারণ আত্মসংযম ব্যতিরেকে সর্বকর্মফল ত্যাগ করা অসম্ভব। সেইজন্যও **'মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ'** পদটির সম্বন্ধ **'অথৈতদপ্যশক্তোঽসি'**রই সঙ্গে বলে মনে করা উচিত, সর্বকর্মফলত্যাগ করার নির্দেশের সঙ্গে নয়।

যাঁদের ভগবানের ওপর তত বিশ্বাস নেই কিন্তু ভগবানের আজ্ঞায় অর্থাৎ দেশ বা সমাজের সেবা করার ওপরই বেশি বিশ্বাস, ভগবান তাঁদের জন্যই এই শ্লোকে সর্বকর্মফলত্যাগরূপ সাধনার কথা বলেছেন। তাৎপর্য হল তাঁরা যদি সমস্ত কর্ম আমাকে অর্পণ করতে না পারেন তাহলে ফলের ইচ্ছা (যেহেতু ফলের প্রাপ্তি ইচ্ছার অধীন নয়, অতএব ইচ্ছা পোষণ করা অযৌক্তিক) যেন পরিত্যাগ করেন—**'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'** (গীতা ২।৪৭)। ফলের ইচ্ছা ত্যাগ করে কর্তব্য-কর্ম করলে তাঁদের সংসার থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়।

'সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্'—কর্মযোগের সাধনে স্বভাবতঃই কর্মের আধিক্য থাকে। কারণ যোগপ্রাপ্তিতে অনাসক্তভাবে কর্ম করাই এর হেতু বলে বলা হয়েছে (গীতা ৬।৩)। অতএব কর্মে ফলাসক্তি থাকলে আবদ্ধ হবার ভয় থাকে। তাই **'যতাত্মবান্'** পদের দ্বারা ভগবান কর্মফলত্যাগের সাধনে মন ও ইন্দ্রিয়াদির সংযমের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। এটি লক্ষ্যণীয় যে মন ও ইন্দ্রিয় সংযত হলে তবেই অনায়াসে কর্মফলত্যাগ করা সম্ভব। সাধক যদি মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ইত্যাদির সংযম না করেন, তাহলে স্বতঃই তাঁর মনে বিষয়-চিন্তা হতে থাকে এবং তা থেকে তাঁর বিষয়াসক্তি জন্মায়। ফলে তাঁর পতন হবার খুবই সম্ভাবনা থাকে (গীতা ২।৬২-৬৩)। ত্যাগের উদ্দেশ্য থাকলে সাধক সহজেই মন ও ইন্দ্রিয় সংযম করতে পারেন।

এখানে **'সর্বকর্ম'** পদটি যজ্ঞ-দান-তপ-সেবা ও বর্ণাশ্রম অনুযায়ী জীবিকা এবং শরীর-নির্বাহের জন্য শাস্ত্রবিহিত সমস্ত কর্মগুলির বাচক। **সর্বকর্মফল ত্যাগের**

অভিপ্রায় স্বরূপতঃ **কর্মফল ত্যাগ না হয়ে কর্মফলে মমত্ববোধ, আসক্তি, কামনা, বাসনা ইত্যাদির ত্যাগ বোঝায়।**

কর্মফল ত্যাগের সাধনে কর্মগুলি স্বরূপতঃ (বাহ্যিকরূপে) পরিত্যাগ করার কথা বলা হয়নি ; কারণ কর্মযোগে কর্ম করা তো অত্যন্ত জরুরি (গীতা ৬।৩)। যেমন আগে বলা হয়েছে, প্রয়োজন হল কর্ম এবং তার ফলে মমত্ববোধ, আসক্তি, কামনা ইত্যাদি পরিত্যাগ করা।

কর্মযোগের সাধকদের কর্মহীন হওয়া উচিত নয়। কারণ কর্মফল ত্যাগের কথা শুনে সাধকগণ প্রায়ই মনে করে থাকেন যে, যখন আমার কিছুই পাবার নেই, তখন আর কাজ করার প্রয়োজনীয়তা কী ? সেইজন্য ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ের সাতচল্লিশতম শ্লোকে কর্মযোগের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে, **'মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি'** 'তোমার যেন কর্ম না-করার আসক্তি না হয়'—এবং সাধকদের কর্ম বিরহিত হতে (কর্ম ত্যাগ করতে) নিষেধ করেছেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়ের নবম শ্লোকে ভগবান সাত্ত্বিক ত্যাগের লক্ষণ জানাতে গিয়ে বলেছেন যে, স্বরূপতঃ কর্ম ত্যাগ নয়, কর্মের ফলাসক্তি ত্যাগই 'সাত্ত্বিক ত্যাগ'।

ফলাসক্তি ত্যাগ করে কর্ম করতে থাকলে কর্ম করার বেগ প্রশমিত হয় এবং পূর্বের আসক্তি দূর হয়। ফলের আকাঙ্ক্ষা না থাকায় কর্ম হতে সর্বতোভাবে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ হয় এবং নতুন করে আর কর্মাসক্তি জন্মায় না। তখন সাধক কৃতকৃত্য হন। পদার্থগুলিতে অনুরাগ, আসক্তি, কামনা, মমতা, ফলেচ্ছা ইত্যাদিই ক্রিয়ার বেগ সৃষ্টি করে। এগুলি থাকলে হঠকারী হয়ে কর্ম ত্যাগ করলেও কর্মের (ক্রিয়ার) বেগ প্রশমিত হয় না। রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ অন্তরে বজায় থাকায় সাধকের প্রকৃতি পুনর্বার তাঁকে কর্মে নিয়োজিত করে। তাই রাগ-দ্বেষ পরিত্যাগ করে নিষ্কামভাবে কর্ম করলেই ক্রিয়ার বেগ শান্ত হয়।

যে সাধকদের সগুণ-সাকার ভগবানে স্বাভাবিক শ্রদ্ধা বা ভক্তি নেই বরং ব্যবহারিক এবং লোকহিতকর কাজেই অধিক বিশ্বাস এবং আগ্রহ থাকে, তাঁদের পক্ষে এই (সর্বকর্মফলত্যাগ-রূপ) সাধন অত্যন্ত উপযোগী।

ভগবান যে যে স্থানে কর্মফল ত্যাগের কথা বলেছেন, সেইসব স্থানে আসক্তি এবং ফলেচ্ছা-ত্যাগের কথা ধরে নিতে হবে। কারণ তাঁর মতে আসক্তি এবং ফলেচ্ছা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করলেই কর্ম হতে সর্বতোভাবে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ হয় (গীতা ১৮।৬)।

সমস্ত কর্মের ফল (ফলেচ্ছা) ত্যাগ ভগবদ্‌প্রাপ্তির পৃথক্ সাধন। কর্মফল ত্যাগের দ্বারা বিষয়াসক্তি দূর হয়ে শান্তি (সাত্ত্বিক সুখ) প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই শান্তি উপভোগ না করলে (তাতে সুখবুদ্ধি করে আবদ্ধ না হলে), সেই শান্তি পরমতত্ত্ববোধ করিয়ে, তত্ত্বের সঙ্গে অভিন্ন করে দেয়।

একাদশ অধ্যায়ের পঞ্চান্নতম শ্লোকে ভগবান সাধক ভক্তদের পাঁচটি লক্ষণের মধ্যে একটি লক্ষণ **'সঙ্গ-বর্জিত'** (আসক্তিরহিত) বলে জানিয়েছেন। এই শ্লোকে ভগবান সমস্ত কর্মের ফল ত্যাগের কথা বলেছেন, যা সাংসারিক আসক্তি সর্বতোভাবে বর্জন করলে তবেই সম্ভব হয়। ভগবান এই সর্বকর্মফলত্যাগের ফল যে তৎকালেই পরমশান্তি লাভ, তা এই অধ্যায়েরই দ্বাদশ শ্লোকে বলেছেন। সুতরাং এটি বুঝতে হবে যে শুধুমাত্র আসক্তি সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করলেও পরমশান্তি বা ভগবদ্-প্রাপ্তি হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব—সাধক যদি সর্বতোভাবে ভগবানের জন্য কর্ম করতে সক্ষম না হন, তাহলে তার ফলেচ্ছা পরিত্যাগ করে কর্ম করা উচিত, কারণ ফলেচ্ছাই বন্ধনের কারণ—**'ফলে সক্তো নিবধ্যতে'** (গীতা ৫।১২)।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—ভগবান অষ্টম শ্লোক থেকে একাদশ শ্লোক পর্যন্ত একটি সাধনায় অসমর্থ হলে দ্বিতীয়, দ্বিতীয় সাধনায় অসমর্থ হলে তৃতীয় এবং তৃতীয় সাধনায় অসমর্থ হলে চতুর্থ সাধনার কথা বলেছেন। এতে সংশয় হতে পারে যে, সর্বশেষে উল্লিখিত 'সর্বকর্মফলত্যাগ'রূপ সাধন কি সব থেকে নিম্নশ্রেণীর সাধন ? কারণ এটি সর্বশেষে বলা হয়েছে এবং ভগবান এর (সর্বকর্মফল ত্যাগ করার) কোনো ফলের কথা জানাননি। এই সংশয় দূর করে ভগবান সর্ব কর্মফলত্যাগরূপ সাধনের শ্রেষ্ঠতা জানাচ্ছেন এবং তার ফলও জানিয়েছেন।

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ　　　　　　কর্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্॥ ১২ ॥

[অভ্যাসাৎ (অভ্যাসের থেকে) ; জ্ঞানম্, শ্রেয়ঃ (শাস্ত্রজ্ঞান শ্রেষ্ঠ) ; জ্ঞানাৎ (শাস্ত্রজ্ঞান থেকে) ; ধ্যানম্, বিশিষ্যতে (ধ্যান শ্রেষ্ঠ) ; ধ্যানাৎ (ধ্যান অপেক্ষা) ; কর্মফলত্যাগঃ (সমস্ত কর্মফল ত্যাগ শ্রেষ্ঠ) ; হি, ত্যাগাৎ (ত্যাগের দ্বারা) ; অনন্তরম্ (অচিরে) ; শান্তিঃ (পরম শান্তি লাভ হয়।)]

অভ্যাসের থেকে শাস্ত্রজ্ঞান শ্রেষ্ঠ, শাস্ত্রজ্ঞান থেকে ধ্যান শ্রেষ্ঠ, ধ্যানের থেকে সমস্ত কর্মফল ত্যাগ শ্রেষ্ঠ। কারণ কর্মফল ত্যাগের সাহায্যে অচিরাৎ পরম শান্তি লাভ হয়॥ ১২ ॥

ব্যাখ্যা—[ভগবান অষ্টম শ্লোক থেকে একাদশ শ্লোক পর্যন্ত এক একটি সাধনায় অসমর্থ হলে ক্রমশঃ সমর্পণযোগ, অভ্যাসযোগ, ভগবদর্থ কর্ম এবং কর্মফল ত্যাগ—এই চারপ্রকার সাধনার কথা জানিয়েছেন। এর দ্বারা মনে হতে পারে যে প্রথম সাধনটির থেকে পরবর্তী সাধনটি অপেক্ষাকৃত গৌণ এবং সর্বশেষে বর্ণিত কর্মফল ত্যাগের সাধনা সব থেকে নিম্নমানের। এইরূপ ধারণা জন্মাবার কারণ এই যে প্রথমোক্ত তিনটি সাধনায় ভগবদ্-প্রাপ্তিরূপ ফলের কথা ('নিবসিষ্যসি ময্যেব', 'মামিচ্ছাপ্তুং' ও সিদ্ধিমবাপ্স্যসি এই পদগুলির দ্বারা) একই সঙ্গে বলা হয়েছে। কিন্তু একাদশ শ্লোকে যেখানে কর্মফল ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে তার ফল হিসাবে ভগবদ্প্রাপ্তির কথা বলা হয়নি।

উপরিউক্ত ধারণাগুলি দূর করার জন্যই এই দ্বাদশ শ্লোকের অবতারণা করা হয়েছে। এতে ভগবান কর্মফল ত্যাগ করাকে শ্রেষ্ঠ ও অচিরেই পরম শান্তি প্রদানকারী বলে জানিয়েছেন, যাতে কেউ এই চতুর্থ সাধনকে নিম্ন শ্রেণীর না মনে করেন। কারণ এই সাধনায় আসক্তি, মমতা এবং ফলেচ্ছা ত্যাগ করার প্রাধান্য থাকায়, যে তত্ত্বের প্রাপ্তি সমর্পণযোগ, অভ্যাসযোগ এবং ভগবদর্থ কর্ম করলে হয় ঠিক সেই তত্ত্বই কর্মফল ত্যাগ দ্বারা প্রাপ্ত করা যায়।

উপরিউক্ত চারটি সাধনার দ্বারাই প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনভাবে ভগবদ্প্রাপ্তি করা সম্ভব। সাধকদের রুচি, বিশ্বাস এবং যোগ্যতায় পার্থক্য থাকার জন্যই ভগবান অষ্টম থেকে একাদশ শ্লোক পর্যন্ত পৃথক্ পৃথক্ সাধনার কথা বলেছেন।

কর্মফল ত্যাগের ফল (ভগবদ্প্রাপ্তি) পৃথক্‌ভাবে দ্বাদশ শ্লোকে বলার তাৎপর্য এই যে সমর্পণযোগ, অভ্যাসযোগ এবং ভগবদর্থে কর্ম করলে যে ভগবদ্প্রাপ্তি হয় এটি সুপ্রচলিত আছে। কিন্তু কর্মফল ত্যাগ দ্বারাও যে ভগবদ্-প্রাপ্তি হয়, তা তত প্রচলিত নয়। তাই প্রচলিত সাধনের থেকে এটির শ্রেষ্ঠত্ব জানাবার জন্যই দ্বাদশ শ্লোকটি বলা হয়েছে এবং এতে কর্মফলত্যাগের ফল চিহ্নিত করা যথাযথ হয়েছে বলে মনে হয়।]

'শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাৎ'—মহর্ষি পাতঞ্জলি বলেছেন যে—'তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ।' (যোগদর্শন ১।১৩) অর্থাৎ কোনো একটি বিষয়ে স্থিতি (স্থিরতা) প্রাপ্ত করার জন্য বারবার চেষ্টা করাকে বলা হয় 'অভ্যাস'।

এই শ্লোকে 'অভ্যাস' শব্দটি শুধু অভ্যাসরূপ ক্রিয়ার বাচক, অভ্যাসযোগের বাচক নয়। কারণ এই (প্রাণায়াম, মনোনিগ্রহ ইত্যাদি) অভ্যাসে শাস্ত্রজ্ঞান বা ধ্যানের উল্লেখ নেই এবং কর্মফলের ইচ্ছা ত্যাগের কথাও বলা হয়নি। জড়ত্বের থেকে সম্পর্ক-বিচ্ছিন্ন হলেই যোগ হয়, কিন্তু উপরিউক্ত অভ্যাসগুলিতে জড়ের (শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন ও বুদ্ধির) আশ্রয় নেওয়া হয়ে থাকে।

'জ্ঞান' শব্দের অর্থ এখানে শাস্ত্রজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান নয়। কারণ হল তত্ত্বজ্ঞান সকল সাধনার ফল। তাই এখানে যে জ্ঞানের অভ্যাসের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে, সেই জ্ঞানে অভ্যাসও নেই, ধ্যানও নেই বা কর্মফল ত্যাগও নেই। যে অভ্যাসে জ্ঞান নেই, ধ্যান নেই বা কর্মফল ত্যাগও নেই—সেইরূপ অভ্যাস অপেক্ষা উপরিউক্ত জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ।

শাস্ত্রাধ্যয়ন এবং সৎসঙ্গের সাহায্যে আধ্যাত্মিক বিষয় শুধু শেখা হল, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে তত্ত্ব অনুভব করার জন্য ধ্যান, অভ্যাস বা কর্মফল ত্যাগরূপ কোনো সাধনাই না করা—এরূপ শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যার জন্য এখানে 'জ্ঞানম্' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই জ্ঞান উপরিউক্ত অভ্যাসের থেকে শ্রেষ্ঠ বলার অর্থ হল যে, আধ্যাত্মিক জ্ঞানরহিত অভ্যাস ভগবদ্প্রাপ্তিতে তত সহায়ক হয় না, যত

অভ্যাসরহিত জ্ঞান সহায়ক হয়। কারণ জ্ঞানের সাহায্যে ভগবদ্প্রাপ্তির অভিলাষ জাগ্রত হতে পারে, যার দ্বারা সাংসারিক আকর্ষণ যতটা কাটানো সম্ভব হয় ততটা শুধু অভ্যাসের দ্বারা হয় না।

'জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে'—এখানে 'ধ্যান' শব্দটি শুধুমাত্র মনের একাগ্রতারূপ ক্রিয়ার বাচক, ধ্যানযোগের বাচক নয়। এই ধ্যানে শাস্ত্রজ্ঞান ও কর্মফল ত্যাগ নেই। এই ধ্যান সেই জ্ঞানের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যে-জ্ঞানে অভ্যাস, ধ্যান এবং কর্মফল ত্যাগ নেই। কারণ ধ্যানের সাহায্যে মন নিয়ন্ত্রিত হয়, কিন্তু শুধুমাত্র শাস্ত্র-জ্ঞানে মন নিয়ন্ত্রিত হয় না। তাই মন নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় ধ্যানের দ্বারা যে শক্তি সঞ্চিত হয়, তদ্রূপ শাস্ত্রজ্ঞানে হয় না। সাধক যদি সেই শক্তির সদ্ব্যবহার করে পরমাত্মার দিকে অগ্রসর হতে চান, তবে তাঁর যে সুবিধা হয়, শাস্ত্রজ্ঞানীদের তা হয় না। এর সঙ্গেই ধ্যানকারী সাধকদের (যদি তাঁরা শাস্ত্রাধ্যয়ন করেন, তাহলে) মন একাগ্র হওয়ায় প্রকৃত জ্ঞান অতি সহজেই প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু শুধু শাস্ত্র-অধ্যয়নকারী সাধকের (ইচ্ছা থাকলেও) মনের চঞ্চলতার জন্য ধ্যানে মগ্ন হতে আয়াস বোধ হয় (বর্তমান সময়েও শাস্ত্র অধ্যয়নকারী যত দেখা যায়, মনকে একাগ্র করার উদ্যোগকারী তত দেখা যায় না)।

'ধ্যানাৎকর্মফলত্যাগঃ'—জ্ঞান ও কর্মফল ত্যাগ-রহিত 'ধ্যানের' থেকে জ্ঞান ও ধ্যানবর্জিত 'কর্মফল ত্যাগ' শ্রেষ্ঠ। কর্মফল ত্যাগের অর্থ এখানে কর্ম এবং কর্মফল স্বরূপতঃ ত্যাগ করার কথা নয়, এখানে বলা হয়েছে কর্ম এবং তার ফলে মমত্ববোধ, আসক্তি ও কামনা ত্যাগ করার কথা।

উৎপত্তি ও বিনাশশীল সকল বস্তুই হল 'কর্মফল'। সেগুলির প্রতি আসক্তি ত্যাগ করাই হল সমস্ত কর্মের ফল ত্যাগ করা।

কর্মে আসক্তি এবং ফলেচ্ছাই সংসারের বন্ধনের মূল কারণ। আসক্তি এবং ফলেচ্ছা না থাকলে কর্মফলত্যাগী ব্যক্তি সহজেই সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হন।

শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, যোগ্যতা, সামর্থ্য, পদার্থ ইত্যাদি যা কিছু মানুষের থাকে, সে সব কোনো কিছুই তার ব্যক্তিগত নয়, সমস্তই প্রকৃতি থেকে আহরিত। তাই কর্মফলত্যাগী অর্থাৎ কর্মযোগী সেইসব সামগ্রী নিজস্ব বা নিজের জন্য মনে না করে জগতেরই সেবায় নিষ্কামভাবে নিয়োজিত করেন। এইভাবে প্রাপ্ত সামগ্রীগুলির (জড় বস্তুর) প্রবাহ সংসারের (জড়ের) দিকে করলে তার জড়ত্বের সঙ্গে সর্বতোভাবে সম্বন্ধ ছেদ হয়ে যায় এবং পরমাত্মার সঙ্গে তার স্বাভাবিক ও নিত্যসিদ্ধ সম্বন্ধ অনুভূত হয়। তাই কর্মযোগীর আর পৃথক্‌ভাবে ধ্যান করার প্রয়োজন হয় না। যদি তিনি ধ্যানস্থ হতে চান, কোনো সাংসারিক কামনা না থাকায় তিনি সহজেই ধ্যানস্থ হতে পারেন, কিন্তু সকামভাব থাকায় সাধারণ সাধকদের ধ্যানে মনোনিবেশ করতে অসুবিধা হয়।

গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে (ধ্যানযোগের প্রকরণে) ভগবান বলেছেন যে, ধ্যানের অভ্যাস করতে করতে শেষকালে সাধকের চিত্ত যখন একমাত্র পরমাত্মাতেই উত্তমরূপে স্থিত হয়, তখন তিনি সমস্ত কামনা রহিত হন এবং চিত্ত নিবৃত্ত হলে তিনি স্বয়ং পরমাত্মতত্ত্বে স্থিতিলাভ করেন (৬।১১৮-২০)। কিন্তু কর্মযোগী সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করে অচিরাৎ স্বয়ং পরমাত্মতত্ত্বে স্থিত হন (গীতা ২।৫৫)। কারণ ধ্যানে চিত্ত পরমাত্মাতে স্থাপন করা হয়, তাই এতে চিত্তের (জড় বস্তুর) আশ্রয় থাকায় চিত্তের (জড় বস্তুর) সঙ্গে বহুদূর পর্যন্ত সম্পর্ক বজায় থাকে। কিন্তু কর্মযোগে মমতা ও কামনা ত্যাগ করা হয়, এগুলি ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে চিত্তের (জড় বস্তুর) সম্পর্কও স্বতঃই বর্জন হয়। তাই পরিণামে সমভাবে পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তি হলেও ধ্যানাভ্যাসকারী সাধকদের ধ্যেয়তে চিত্ত নিবিষ্ট করতে অসুবিধা হয় এবং তাদের বিলম্বে পরমাত্মতত্ত্বের উপলব্ধি হয়। কিন্তু কর্মযোগীর সহজে ও শীঘ্র পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব হয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ধ্যানের থেকে কর্মযোগের সাধন শ্রেষ্ঠ।

কর্মযোগের মূল মন্ত্র হল—নিজের কিছুই নয়, নিজের জন্য কিছুই চাই না, নিজের জন্য কিছু না করা। যার জন্য সব সাধনের থেকে এই সাধনটি অতি বিশিষ্ট—**'কর্মযোগো বিশিষ্যতে'** (গীতা ৫।২)।

'ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্'—এখানে **'ত্যাগাৎ'** পদটি 'কর্মফলত্যাগে'র জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। ত্যাগের স্বরূপ বিশেষভাবে বোঝার প্রয়োজনীয়তা আছে। যা নিজ স্বরূপ, তা ত্যাগ করা যায় না এবং যার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, তাকেও ত্যাগ করা যায় না। যেমন, নিজ স্বরূপ হওয়ায় সূর্য থেকে তার দীপ্তি (প্রকাশমানতা) এবং তাপ পৃথক্ করা যায় না এবং যা পৃথক্ করা যায় না, তা ত্যাগ করা অসম্ভব। এর

বিপরীত হল যে, নিজ স্বরূপ না হওয়ায় এগুলির পৃথকীকরণ বা ত্যাগ নিত্য এবং স্বতঃসিদ্ধ। তাই প্রকৃতপক্ষে ত্যাগ তারই হয়, যা নিজের নয় অথচ ভ্রমবশতঃ নিজের বলে মনে করা হয়।

জীব স্বয়ং চেতন ও অবিনাশী এবং জগৎ-সংসার জড় ও বিনাশশীল। জীব ভ্রমবশতঃ (নিজ অংশী পরমাত্মাকে ভুলে) বিজাতীয় জগৎ-সংসারকে নিজের বলে মনে করে। সুতরাং জগতের সঙ্গে এই মনে করা সম্পর্ক ত্যাগ করা প্রয়োজন।

ত্যাগ অসীম। সংসারের সম্পর্কে সীমাবদ্ধতা থাকে, কিন্তু সংসারে ত্যাগের (সম্বন্ধ-বিচ্ছেদের) সীমা থাকে না। অর্থাৎ যেসব বস্তুর সঙ্গে আমরা সম্পর্ক স্থাপন করি, সেগুলি সীমিত কিন্তু যে ত্যাগ করা হয় তা অসীম। ত্যাগ দ্বারাই পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তি হয়। পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তিও অসীম হয়, কারণ পরমাত্মতত্ত্ব দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদির সীমারহিত (অসীম)। সীমিত বস্তুসমূহের মোহে এই অসীম পরমাত্মতত্ত্ব অনুভূত হয় না।

'কর্মফলত্যাগ' করলে সংসারের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্বন্ধের ত্যাগ হয়ে যায়। তাই এইস্থানে 'ত্যাগাৎ' পদটি কর্ম এবং তার ফলের (সংসারের) সঙ্গে ভ্রমবশতঃ মেনে নেওয়া সম্পর্ক ত্যাগ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এটিই ত্যাগের প্রকৃত স্বরূপ।

ত্যাগের অন্তর্গত জপ, ভজন, ধ্যান, সমাধি ইত্যাদির ফল ত্যাগও বুঝতে হবে। কারণ জপ, ভজন, ধ্যান, সমাধি যতক্ষণ নিজের জন্য করা হয় ততক্ষণ ব্যক্তিত্ব বজায় থাকায় বন্ধনদশা বজায় থাকে। তাই নিজের জন্য করা ধ্যান, জপ, সমাধি ইত্যাদিও বন্ধনকারী। অতএব কোনো ক্রিয়াতে নিজের কোনো আকাঙ্ক্ষা না রাখাই হল 'ত্যাগ'। প্রকৃত ত্যাগে ত্যাগ-বৃত্তি থেকেও সম্বন্ধ-বিচ্ছিন্ন হয়।

'শান্তিঃ' পদটির অর্থ হল পরমশান্তি প্রাপ্ত করা, একেই ভগবদ্প্রাপ্তি বলা হয়।

অভ্যাস, জ্ঞান এবং ধ্যান—এই তিনটি সাধনের মধ্যে বস্তুতঃ কর্মফলত্যাগ-রূপ সাধনই শ্রেষ্ঠ। সাধকের মনে যতক্ষণ ফলের আকাঙ্ক্ষা থাকে, ততক্ষণ তিনি (জড়বস্তুর আশ্রিত থাকায়) মুক্ত হন না (গীতা ৫।১২)। তাই ফলাসক্তি ত্যাগের প্রয়োজন অভ্যাস, জ্ঞান ও ধ্যান— এই তিনটি সাধনাতেই আছে। জড়বস্তু অর্থাৎ উৎপত্তি-বিনাশশীল বস্তুগুলির সম্পর্কই অশান্তির মূল কারণ। কর্মফলত্যাগ অর্থাৎ কর্মযোগের প্রারম্ভেই কর্ম এবং তার ফলে আসক্তি ত্যাগ করা হয় (গীতা ৫।১২)। তাই জড়বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকায় কর্মযোগী শীঘ্রই পরমশান্তি প্রাপ্ত হন (গীতা ৫।১২)।

কর্মফল ত্যাগ সম্পর্কিত বিশেষ কথা

'কর্মফলত্যাগ' কর্মযোগেরই অপর নাম, কারণ কর্মযোগে 'কর্মফলত্যাগ'ই মুখ্য। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতার হয়ে আসার অনেক আগেই এই কর্মযোগ লুপ্ত-প্রায় হয়ে গিয়েছিল (গীতা ৪।২)। অর্জুনকে নিমিত্ত করে ভগবান কৃপাপরবশ হয়ে পুনরায় এটি প্রকটিত করেছেন (গীতা ৪।৩)। ভগবান এটি প্রকটিত করে যে কোনো পরিস্থিতিতে প্রত্যেক মানুষকে কল্যাণের অধিকার প্রদান করেছেন, না হলে অধ্যাত্মপথের বিষয়ে কখনো একথা ভাবাই সম্ভব ছিল না যে একান্তে না থেকে, কর্মত্যাগ না করে, বস্তুসমূহ পরিত্যাগ না করে, আত্মীয়স্বজন ত্যাগ না করে মানুষ যে কোনো পরিস্থিতিতে নিজ কল্যাণ সাধন করতে সক্ষম!

কর্মযোগে ফলাসক্তি ত্যাগ করাই প্রধান কর্তব্য। সুস্থতা-অসুস্থতা, ধনবত্তা-নির্ধনতা, মান-অপমান, স্তুতি-নিন্দা ইত্যাদি সমস্ত অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতি কর্মের ফলরূপে উপস্থিত হয়। এগুলির প্রতি রাগ (আসক্তি) বা দ্বেষ থাকলে কখনো পরমাত্মাকে লাভ করা যায় না (গীতা ২।৪২-৪৪)।

উৎপন্ন-হওয়া বস্তুমাত্রই হল কর্মফল। ফল হিসাবে যা পাওয়া গেছে তা চিরস্থায়ী হয় না। কারণ যখন কর্মই চিরস্থায়ী নয়, তখন তার থেকে উদ্ভূত ফল চিরস্থায়ী হবে কীপ্রকারে ? সুতরাং সেগুলিতে আসক্তি ও মমত্ববোধ রাখাই হল ভুল। যে ফল কখনো প্রাপ্ত হয়নি, তা কামনা করাও ভুল। অতএব কর্মযোগের মূল হল ফলাসক্তি ত্যাগ।

কর্মযোগে ক্রিয়ার প্রাধান্য থাকে আর শরীরাদি জড়-পদার্থ ছাড়া ক্রিয়া সংঘটিত হওয়া সম্ভবপর নয়, তাই কর্ম এবং তার ফল হতে মুক্তি লাভ করা কঠিন বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রাপ্ত কর্মসামগ্রী (শরীরাদি জড়-পদার্থ)-গুলিকে নিজের ও নিজের জন্য মনে করলেই ফলাসক্তি ত্যাগ করা কঠিন হয়ে পড়ে। শরীরাদি প্রাপ্ত সামগ্রীতে কোনো আসক্তি না রেখে কর্তব্য-কর্ম করে গেলে পরমাত্মার প্রাপ্তি হয় (গীতা ৩।১৯)। প্রকৃতপক্ষে ক্রিয়াগুলি

বন্ধনকারক নয়, বন্ধনের মূল হেতু হল কামনা ও ফলাসক্তি। কামনা এবং ফলাসক্তি দূর হলে সমস্ত কর্মই অকর্ম হয়ে ওঠে (গীতা ৪।১৯-২৩)।

ভগবান কর্মযোগকে কর্মসন্ন্যাসের থেকেও শ্রেষ্ঠ বলে জানিয়েছেন (গীতা ৫।২)। ভগবানের মতে কর্ম স্বরূপতঃ (বাহ্যিকভাবে) ত্যাগ করেন যে ব্যক্তি, তিনি সন্ন্যাসী নন। বরং কর্মফলের প্রত্যাশা না রেখে কর্তব্য করেন যে কর্মযোগী, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী (গীতা ৬।১)। আসক্তি-বর্জিত কর্মযোগী সকল সংকল্পমুক্ত হয়ে অনায়াসে যোগারূঢ় হন (গীতা ৬।৪)। অপরপক্ষে যে ব্যক্তি কর্ম এবং তার ফলগুলিকে নিজের বা নিজের জন্য মনে করে সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে পাপভোগই করে থাকেন (গীতা ৩।১৩)। সুতরাং ফলাসক্তিই জগতে বন্ধনের প্রধান কারণ—**'ফলে সক্তো নিবধ্যতে'** (গীতা ৫।১২)। এটি ত্যাগ করাই হল প্রকৃত ত্যাগ (গীতা ১৮।১১)।

ফলাসক্তি ত্যাগের ওপর গীতা যত জোর দেয় তত আর কোনো সাধনার ওপর দেয় না। অন্যান্য সাধনার কথা বর্ণনা করার সময়ও কর্মফল ত্যাগের কথা তার সঙ্গে বলা হয়েছে। ভগবানের মত অনুযায়ী ত্যাগ তাকেই বলা হয়, যখন নিষ্কামভাবে নিজের কর্তব্য পালন করা হয় এবং ফলে কোনোপ্রকার আসক্তি না থাকে (গীতা ১৮।৬)। অতি উত্তম কর্মেও যেন আসক্তি না থাকে এবং অত্যন্ত সাধারণ কর্মেও যেন কখনো দ্বেষ না হয়। কারণ কর্ম উৎপন্ন হয়ে সমাপ্ত হয়ে যায়, কিন্তু তার থেকে যে আসক্তি এবং দ্বেষ উৎপন্ন হয়, তা বন্ধনের হেতু হয়। অপরপক্ষে অহং-ভাব ও রাগ-দ্বেষবর্জিত মানুষের সম্মুখে যদি সমস্ত প্রাণীর সংহাররূপ কর্তব্য-কর্মও এসে উপস্থিত হয়, তাহলেও তিনি তার দ্বারা আবদ্ধ হন না (গীতা ১৮।১৭)। সেইজন্য ভগবান এই 'কর্মফলত্যাগ'-কে তপ, জ্ঞান, কর্ম, অভ্যাস, ধ্যান ইত্যাদি সাধনগুলি থেকে শ্রেষ্ঠ বলে জানিয়েছেন। অন্যান্য সাধনায় ক্রিয়াগুলিকে উত্তম বলেই বোধ হয় কিন্তু তাতে বিশেষ লাভ দেখা যায় না এবং তা শ্রমসাধ্যও বটে। কিন্তু ফলাসক্তি ত্যাগ করতে পারলে কোনো নতুন কর্মও করতে হয় না বা আশ্রম, দেশ ইত্যাদি পরিবর্তন করার প্রয়োজনও হয় না। সাধক যেখানে থাকেন, যা কিছু করেন, যে পরিস্থিতিতে থাকেন, তাতেই (ফলাসক্তি ত্যাগের সাহায্যে) অতি সহজে নিজ কল্যাণ সাধন করতে পারেন।

নিত্যপ্রাপ্ত পরমাত্মার অনুভূতি হয়, প্রাপ্তি হয় না। যেখানে 'পরমাত্মার প্রাপ্তির' কথা বলা হয়েছে, সেখানে এর অর্থ নিত্যপ্রাপ্তের অনুভবই মনে করা উচিত। সেই প্রাপ্তি সাধনার দ্বারা হয় না, বরং জড়ত্ব ত্যাগের দ্বারাই হয়। মমত্ববোধ, কামনা এবং আসক্তিই হল জড়তা। শরীর, মন, ইন্দ্রিয়াদি পদার্থ ইত্যাদিতে 'আমি' বা 'আমার' মনোভাব পোষণ করাই হল জড়ত্ব। জ্ঞান, অভ্যাস, ধ্যান, তপ ইত্যাদি সাধনা করতে করতে যখন জড়ত্বের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হয়, তখনই নিত্যপ্রাপ্ত পরমাত্মার অনুভব হয়। কর্মফল ত্যাগের দ্বারা অর্থাৎ কর্মযোগে যত সহজে জড়ত্ব ত্যাগ করা সম্ভব হয়, জ্ঞান, অভ্যাস, ধ্যান, তপ ইত্যাদির সাহায্যে তত নয়। কারণ জ্ঞানাদি সাধনাতে শরীরাদির নিজের জড়ত্বের (শরীর, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের) সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক বজায় থাকে। এই সাধনগুলির লক্ষ্য পরমাত্মপ্রাপ্তি হওয়ায় একসময় সাফল্য আসে বটে কিন্তু তাতে বিলম্ব ঘটে এবং তা কষ্টসাধ্য হয়। কিন্তু কর্মযোগের প্রারম্ভেই লক্ষ্য থাকে জড়ত্ব ত্যাগ করার দিকে। জড়ত্বের সঙ্গে সম্পর্কই নিত্যপ্রাপ্ত পরমাত্মার অনুভূতিতে প্রধান বাধা—এই তত্ত্ব অন্য সাধনে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় না।

সাধক যখন দৃঢ়তার সঙ্গে স্থির করেন যে তিনি কখনো কোনো পরিস্থিতিতে মন, বাক্য অথবা ক্রিয়ার দ্বারা চুরি, মিথ্যা, ব্যভিচার, হিংসা, ছল, কপট, অভক্ষ্য-ভক্ষণ ইত্যাদি শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কর্ম করবেন না, তখন তাঁর দ্বারা স্বতঃই বিহিত কর্ম হয়ে থাকে।

সাধকের নিষিদ্ধ কর্ম ত্যাগ করাই লক্ষ্য হওয়া উচিত, বিহিত কর্ম করার নয়। কারণ সাধক যদি বিহিত কর্ম করা স্থির করে, তাহলে তাতে বিহিত কর্ম করার অহংকার জন্মায়, যাতে সাধকের 'অহং' স্থিত থাকে। বিহিত কর্ম করার অভিমান থাকলে নিষিদ্ধ কর্ম হয়ে থাকে। কিন্তু 'আমি নিষিদ্ধ কাজ করব না' এই নিষেধাত্মক স্থিরতায় কোনো যোগ্যতা, সামর্থ্যের অপেক্ষা না থাকায় সাধকের মনে কোনো অহংকার দেখা দেয় না। নিষিদ্ধ কর্ম ত্যাগেও মূর্খতাবশতঃ অহংকার হতে পারে। অহংকারের উদ্রেক হলে বিচার করতে হয় যে, যা করা উচিত নয়, তা না করায় বিশেষত্ব কিছু নেই। কিছু করলেই তার থেকে ফলের

সম্ভাবনা থাকে। যখন কোনো কিছু করা হয় না, শুধুমাত্র নিষিদ্ধ কর্ম ত্যাগ করা হয়েছে[১] তখন ফলের সম্ভাবনাও থাকে না। সুতরাং কোনো কিছু করার অহংকার না থাকলে ফলাসক্তি স্বতঃই পরিত্যক্ত হয়। আর ফলাসক্তি না থাকায় শান্তিলাভ স্বতঃসিদ্ধ হয়ে থাকে।

সাধন সম্পর্কিত বিশেষ কথা

ভগবান নবম, দশম এবং একাদশ শ্লোকে যে তিনটি সাধনার (অভ্যাসযোগ, ভগবদর্থ-কর্ম এবং কর্মফল ত্যাগ) কথা ক্রমশঃ জানিয়েছেন, বিচার করলে দেখা যায় যে সেগুলির মধ্যে (কর্মফল ত্যাগ বাদ দিয়ে) প্রত্যেক সাধনেই শেষ দুটি সাধন অন্তর্নিহিত রয়েছে, যেমন, (১) অভ্যাসযোগে ভগবানের জন্য ভজন, নাম-জপ ইত্যাদি ক্রিয়া করায় সেটি ভগবদর্থই হয় আর বিনাশশীল ফলের কামনা না থাকায় সেটি কর্মফল ত্যাগও হয়। (২) ভগবদর্থ কর্মে ভগবানের জন্য কর্ম করায় অভ্যাসযোগও হয় এবং বিনাশশীল ফলের কামনা না থাকায় কর্মফল ত্যাগও হয়।

সাধকের প্রকৃতপক্ষে সর্বপ্রথম নিজ লক্ষ্য, ধ্যেয় অথবা উদ্দেশ্যকে দৃঢ় করতে হয়। তারপর জানতে হয় যে কার সঙ্গে তার বাস্তবিক সম্পর্ক ? তারপর সে যে কোনো সাধনাই করুক—অভ্যাস করুক, ভগবদ্প্রীত্যর্থ কর্ম করুক বা কর্মফল ত্যাগ করুক, সেই সাধনই তার পক্ষে মুখ্য হয়ে ওঠে। যখন সাধকের লক্ষ্য হয় ভগবানকেই প্রাপ্ত করা এবং সে জানতে পারে যে অনাদিকাল হতে ভগবানের সঙ্গেই তার স্বতঃসিদ্ধ সম্পর্ক, তখন কোনো সাধনাই আর তার কাছে গৌণ মনে হয় না। কোনো সাধনার তারতম্য হওয়া শুধু লৌকিক দৃষ্টিতেই হয়ে থাকে। বাস্তবে প্রাধান্য হল উদ্দেশ্যের। তাই সাধকদের নিজ উদ্দেশ্যে কখনো বিন্দুমাত্র শৈথিল্য আসতে দেওয়া উচিত নয়।

কোনো সাধনের সুগমতা বা কঠিনতা সাধকের 'রুচি' ও 'উদ্দেশ্যে'র ওপর নির্ভর করে। রুচি ও উদ্দেশ্য কেবল ভগবানেরই হলে সাধন সুগম হয় আর রুচি সংসারের এবং উদ্দেশ্য ভগবানের হলে সাধন কঠিন হয়ে পড়ে।

যেমন ক্ষুধা সকলেরই এক প্রকারের হয় এবং খাদ্যগ্রহণ করলে তৃপ্তিও সকলে একইপ্রকার অনুভব করে, কিন্তু ভোক্তার রুচি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হওয়ায় ভোজ্য-পদার্থও বিভিন্ন হয়ে থাকে। তেমনি সাধকদের রুচি, বিশ্বাস এবং যোগ্যতা অনুযায়ী সাধনও বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে, কিন্তু ভগবানকে না পাওয়ার দুঃখ ও ভগবদ্প্রাপ্তির আগ্রহ সকল সাধকের এক প্রকারই থাকে। সাধক যেমনই হোন না কেন, সাধনের পূর্ণত্ব হলে ভগবদ্-প্রাপ্তিরূপ আনন্দের অনুভূতি (তৃপ্তি) সকল সাধকের একই হয়ে থাকে।

এই প্রকরণে অর্জুনকে নিমিত্ত করে ভগবান মানুষমাত্রেরই কল্যাণের জন্য চারপ্রকার সাধন প্রণালীর বর্ণনা করেছেন—(১) সমর্পণ যোগ, (২) অভ্যাসযোগ, (৩) ভগবানের প্রীত্যর্থে সমস্ত কর্ম অনুষ্ঠান এবং (৪) সর্বকর্মফল ত্যাগ। যদিও চারটি সাধনেরই ফল ভগবদ্-প্রাপ্তি, তবুও সাধকদের মধ্যে রুচি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস এবং যোগ্যতার বিভিন্নতার জন্য সাধনের বিভিন্নতার কথা বর্ণিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে চারটি সাধন প্রণালীর প্রত্যেকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং শ্রেষ্ঠ। তাই সাধক যেটিকেই গ্রহণ করবেন, সেই সাধনটিকেই তাঁর সর্বোত্তম বলে মেনে নেওয়া উচিত।

নিজের সাধনাকে কখনোই গৌণ বলে মনে করা উচিত নয় এবং সাধনার সাফল্যের (ভগবদ্প্রাপ্তির) বিষয়ে কখনো সংশয় থাকা উচিত নয়। কারণ কোনো সাধনাই গৌণ নয়। সাধকের যদি একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে ভগবদ্প্রাপ্তি, সাধনা যদি তাঁর রুচি, বিশ্বাস এবং যোগ্যতা অনুযায়ী হয়, সাধনা যদি পূর্ণ উদ্যমে তৎপরতার সঙ্গে করা হয় এবং ভগবদ্প্রাপ্তির আগ্রহও যদি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে, তাহলে সকল সাধনই এক সমান হয়ে থাকে। সাধকের উদ্দেশ্য, সামর্থ্য এবং তৎপরতার সম্পর্কে কখনো শিথিলতা থাকা উচিত নয়। ভগবান সাধকের কাছ থেকে এটুকুই আশা করেন যে সে যেন তার পূর্ণ সামর্থ্য এবং যোগ্যতা সাধনায় নিয়োজিত করে। সাধক ভগবদ্তত্ত্ব ঠিকমতো নাই জানুক, কিন্তু সর্বজ্ঞ ভগবান তাঁর উদ্দেশ্য, ভাব, সামর্থ্য, তৎপরতা ইত্যাদি খুব

---

[১]নিষিদ্ধ কর্ম না করা স্থির করলে দুটি অবস্থা হয়—হয় বিহিত কর্মে প্রবৃত্তি হবে নচেৎ নিবৃত্তি। বিহিত কর্মের প্রবৃত্তিতে চিত্ত নির্মল হয় এবং সর্বতোভাবে নিবৃত্তি হলে পরমাত্মায় স্থিতি হয়। সর্বতোভাবে নিবৃত্তির তাৎপর্য বাসনারহিত অবস্থা, অকর্মণ্যতা বা আলস্য নয় ; কারণ আলস্য ইত্যাদিও হল নিষিদ্ধ কর্ম।

ভালোভাবেই জানেন। সাধক যদি নিজ উদ্দেশ্য, ভাব, চেষ্টা, তৎপরতা, উৎকণ্ঠা ইত্যাদিতে কোনোপ্রকার ত্রুটি না রাখেন, তাহলে ভগবান স্বয়ং নিজেকে সাধকের সম্মুখে প্রকাশিত করেন। আসলে নিজ উদ্যোগ, বল, জ্ঞান ইত্যাদি কোনো কিছুর জোরে ভগবানকে প্রাপ্ত করা যায় না। যদি ভগবানের প্রদত্ত বল, জ্ঞান ইত্যাদি ভগবদ্-প্রাপ্তিতেই নিয়োজিত করা যায়, তাহলে তিনি কৃপাপূর্বক সাধককে তাঁর প্রাপ্তি করিয়ে দেন।

জগতে ভগবানকে লাভ করা সব থেকে সহজ এবং সকলেই তার অধিকারী। কারণ এই জন্যই মনুষ্যদেহ প্রাপ্তি হয়েছে। সকল প্রাণীর কর্ম ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় কোনো দুজন ব্যক্তিই জগতে এক সমান ফল পেতে পারে না, কিন্তু (ভগবান এক হওয়ায়) সকলেরই সমানভাবে ভগবদ্প্রাপ্তি হয়ে থাকে। কারণ ভগবদ্প্রাপ্তি কর্মজনিত নয়।

ভগবানের প্রাপ্তিতে সংসারে বৈরাগ্য এবং ভগবদ্-প্রাপ্তির আগ্রহ—দু'টিই প্রধান। এই দুটির মধ্যে কোনো একটি তীব্রতর হলে ভগবদ্প্রাপ্তি হয়ে থাকে । তাহলেও ভগবদ্প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাতে বিশেষ শক্তি আছে।

ওপরে যে চারটি সাধনের কথা বলা হয়েছে, সেগুলির মধ্যে প্রথম তিনটি সাধন প্রধানতঃ ভগবদ্প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা জাগ্রতকারী এবং চতুর্থ সাধনটি (কর্মফল ত্যাগ) প্রধানতঃ সংসার থেকে সম্বন্ধবিচ্ছেদকারী।

সাধনা যাই হোক ; সাংসারিক ভোগ যখন দুঃখদায়ক বলে মনে হয় ও অন্তর থেকে ভোগাদি পরিত্যাগ করা হয়, তখন (ভগবান লক্ষ্য হওয়ায়) ভগবানের দিকে স্বাভাবিকভাবে রতি বৃদ্ধি হয় এবং ভগবানের কৃপায় তাঁর প্রাপ্তিলাভ হয়।

এইভাবে যখন ভগবানকে পরমপ্রিয় বলে মনে হবে, তাঁকে ছাড়া থাকা অসম্ভব মনে হবে, তাঁর বিরহে ব্যাকুলতা আসবে, তখন শীঘ্রই ভগবদ্প্রাপ্তি হবে।

পরিশিষ্ট-ভাব—অভ্যাস, শাস্ত্রজ্ঞান এবং ধ্যান—এই তিনটি সাধন করণসাপেক্ষ হলেও কর্মফল ত্যাগ করণ-নিরপেক্ষ হয়ে থাকে। কর্মফল ত্যাগকে শ্রেষ্ঠ বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, সাধারণের মনে এটি নিকৃষ্ট বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, কর্মফল ত্যাগ প্রথম তিনটি সাধন থেকে শ্রেষ্ঠ। বাস্তবে চারটি সাধনই শ্রেষ্ঠ এবং এগুলি সেই সব সাধকদের জন্য, যাঁদের উদ্দেশ্য হল ত্যাগ।

এই শ্লোকে উদ্ধৃত চারটি সাধনের অন্তর্গত দশম শ্লোকে উল্লিখিত **'মদর্থমপি কর্মাণি'** (ভগবানের জন্য কর্ম করা) ধরা হয়নি। তার কারণ হল **'মদর্থমপি কর্মাণি'** অর্থাৎ ভক্তিদ্বারাই সাধন পূর্ণতা লাভ করে। সুতরাং ভক্তি এবং ত্যাগ—উভয় সাধনই সমান শ্রেষ্ঠ।

কর্মফল ত্যাগের দ্বারা কর্মফলের ইচ্ছাকে ত্যাগ করা বুঝতে হবে। ইচ্ছা মনে ওঠে আর ফলত্যাগ বাহ্যতঃ হয়। ফলত্যাগ করলেও অন্তরে তার কামনা থাকতে পারে। সুতরাং সাধকের উদ্দেশ্য থাকা উচিত কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করা। ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ হলে জন্ম-মরণের আর কোনো হেতুই থাকে না। মুক্তি বস্তু ত্যাগের দ্বারা হয় না, মুক্তি হয় কামনা ত্যাগের দ্বারা।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—নির্গুণ-নিরাকার ব্রহ্ম এবং সগুণ-সাকার ভগবানের উপাসকদের মধ্যে সগুণ-উপাসকদের শ্রেষ্ঠ বলে জানিয়ে ভগবান অর্জুনকে সগুণ-উপাসনা করার নির্দেশ দেন। ভগবান অষ্টম থেকে একাদশ শ্লোক পর্যন্ত তাঁর প্রাপ্তির সগুণ উপাসনার অন্তর্গত চারটি সাধন প্রণালীর কথা জানিয়েছেন। এবার ত্রয়োদশ থেকে ঊনবিংশ শ্লোক পর্যন্ত পাঁচটি প্রকরণে ভগবান চারটি সাধন দ্বারা সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত তাঁর প্রিয় ভক্তদের লক্ষণ বর্ণনা করছেন। প্রথম প্রকরণটি ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ দুটি শ্লোকে বিস্তৃত, যার মধ্যে সিদ্ধ ভক্তের বারোটি লক্ষণ বলা হয়েছে।

অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥ ১৩ ॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৪ ॥

[সর্বভূতানাম্ (সমস্ত প্রাণীতে) ; অদ্বেষ্টা, চ (দ্বেষভাববর্জিত এবং) ; মৈত্রঃ, করুণঃ (মৈত্রীভাবাপন্ন ও দয়ালু এবং) ; এব, নির্মমঃ (মমতারহিত) ; নিরহংকারঃ (অহংকারবর্জিত) ; সমদুঃখসুখঃ (সুখে দুঃখে সমভাবাপন্ন) ; ক্ষমী (ক্ষমাশীল) ; সততম্, সন্তুষ্টঃ, যোগী (সদা সন্তুষ্ট যোগী) ; যতাত্মা (সংযতদেহ) ; দৃঢ়নিশ্চয়ঃ (দৃঢ়চিত্ত) ; ময়ি (আমাতে) ; অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ (মন বুদ্ধি অর্পিত) ; যঃ, মদ্ভক্তঃ (যাঁরা আমার ভক্ত) ; সঃ (তাঁরা) ; মে প্রিয়ঃ (আমার প্রিয়।)]

সমস্ত প্রাণীতে দ্বেষভাব বর্জিত, সকলের মিত্র (প্রেমী) ও দয়ালু, মমতারহিত, অহংকারবর্জিত, সুখ-দুঃখে সমভাবাপন্ন, ক্ষমাশীল, সদা সন্তুষ্ট যোগী, সংযতদেহ, দৃঢ়চিত্ত ও আমাতে মনবুদ্ধি অর্পিত এরূপ যাঁরা আমার ভক্ত, তাঁরা আমার প্রিয়॥ ১৩-১৪ ॥

ব্যাখ্যা—**'অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাম্'**—অনিষ্টকারী দু'-প্রকারের হয়—(১) ইষ্ট প্রাপ্তিতে অর্থাৎ অর্থ, মান-মর্যাদা, প্রতিপত্তি ইত্যাদির প্রাপ্তিতে বাধা প্রদানকারী এবং (২) অনিষ্টকর পদার্থ, ক্রিয়া, ব্যক্তি, ঘটনা ইত্যাদির সঙ্গে সংযোগকারী। ভক্তের শরীর, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি এবং সিদ্ধান্তের প্রতিকূলে কেউ যতই খারাপ ব্যবহার করুক, ইষ্ট প্রাপ্তিতে বাধা দান করুক, যে কোনো ভাবে আর্থিক বা শারীরিক ক্ষতি করুক তাতে তার হৃদয়ে কখনো বিন্দুমাত্র দ্বেষভাব আসে না। কারণ তিনি সকল প্রাণীর মধ্যেই তাঁর প্রভুকেই পরিব্যাপ্ত দেখেন, এরূপ অবস্থায় তিনি যদি বিরোধ করতে চান তাহলে কার সঙ্গে করবেন—**'নিজ প্রভুময় দেখহিঁ জগৎ কেহি সন করহিঁ বিরোধ॥'** (শ্রীরামচরিতমানস ৭।১১২ খ)

শুধু তাই নয় ; ভক্ত অনিষ্টকারীদের সমস্ত ক্রিয়াকেই ভগবানের কৃপাপূর্ণ মঙ্গলময় বিধান বলে মনে করেন।

প্রাণীমাত্রই স্বরূপতঃ ভগবানেরই অংশ। সুতরাং কোনো প্রাণীর প্রতি বিন্দুমাত্র দ্বেষভাব রাখাই হল ভগবানের প্রতি দ্বেষ করা। তাই কোনো প্রাণীতে দ্বেষভাব রেখে ভগবানের সঙ্গে অভিন্নতা তথা অনন্যপ্রেম হওয়া সম্ভব নয়। সকল প্রাণীর প্রতি দ্বেষভাবরহিত হলেই ভগবানে পূর্ণ প্রেম হওয়া সম্ভব। তাই ভক্তের প্রাণীমাত্রেরই প্রতি বিন্দুমাত্র দ্বেষভাব থাকে না।

'মৈত্রঃ করুণ এব চ'[1]—ভক্তের চিত্তে শুধু প্রাণীদের প্রতি দ্বেষভাব যে থাকে না তা নয়, বরং সমস্ত প্রাণীতে ভগবদ্‌ভাব থাকায় তিনি সকলের সঙ্গে মৈত্রপূর্ণ এবং সদয় ব্যবহার করে থাকেন। ভগবান প্রাণীমাত্রেরই সুহৃদ—**'সুহৃদং সর্বভূতানাম্'** (গীতা ৫।২৯)। ভগবানের স্বভাব ভক্তের মধ্যে সঞ্চারিত হওয়ায় ভক্তও সকল প্রাণীর সুহৃদ হয়ে ওঠেন—**'সুহৃদঃ সর্বদেহিনাম্'** (শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২৫।২১)। তাই ভক্তেরও সমস্ত প্রাণীর প্রতি কোনো স্বার্থ ছাড়াই স্বাভাবিক মৈত্রী এবং দয়ার ভাব থাকে—

হেতু রহিত জগ জুগ উপকারী
তুম্হ তুম্হার সেবক অসুরারী॥
(শ্রীরামচরিতমানস ৭।৪৭।৩)

নিজ অনিষ্টকারীর প্রতিই ভক্তগণ মিত্রসুলভ ব্যবহার করে থাকেন। কারণ তাঁদের মধ্যে এই ভাব থাকে যে অনিষ্টকারী অনিষ্টরূপে ভগবানের বিধানই পালন করে থাকে। অতএব তারা আমার প্রতি যা করে তা ঠিকই করে। কারণ ভগবানের বিধান সদাই মঙ্গলময়। অনিষ্টকারীগণ (অনিষ্টের নিমিত্ত হয়ে) আমার পূর্বকৃত পাপকর্মগুলির নাশ করছে ; সুতরাং তারা বিশেষভাবে সৎকারের যোগ্য।

সাধকমাত্রেরই মনে এই ভাব থাকে এবং থাকা উচিতও যে, তার অনিষ্টকারী ব্যক্তি তার বিগত পাপের ফল ভোগ করিয়ে তাকে শুদ্ধ করে দিচ্ছে। সাধারণ ভক্তদেরও যখন অনিষ্টকারীদের প্রতি মৈত্রী এবং করুণার ভাব থাকে, তখন সিদ্ধ ভক্তদের সম্বন্ধে বলার কী আছে ? সিদ্ধ ভক্তদের শুধু তার প্রতি নয়, প্রাণীমাত্রেরই প্রতি মৈত্রী এবং দয়ার বিশেষ ভাব থাকে।

পাতঞ্জলযোগদর্শনে চিত্তশুদ্ধির চারটি বিষয় জানানো হয়েছে—

মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্য-বিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্। (১।৩৩)

'সুখীদের প্রতি মৈত্রী, দুঃখীদের প্রতি করুণা, পুণ্যাত্মাদের প্রতি মুদিতা (প্রসন্নতা) এবং পাপাত্মাদের প্রতি

---

[1]এখানে ভক্তদের যে লক্ষণ বলা হয়েছে, তা জ্ঞানী (গুণাতীত) পুরুষদের (গীতা ১৪।২২-২৫) লক্ষণের থেকেও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। 'মৈত্রঃ' এবং 'করুণঃ' পদও এখানে শুধু ভক্তদের লক্ষণেই উদ্ধৃত হয়েছে।

উপেক্ষার ভাব থেকে চিত্তে নির্মলতা আসে।'

কিন্তু ভগবান এই চারটি বিষয়কে দুইভাবে বিভক্ত করেছেন—**'মৈত্রঃ চ করুণঃ'** অর্থাৎ সিদ্ধ ভক্তদের সুখী এবং পুণ্যাত্মাদের প্রতি 'মৈত্রী'র ভাব এবং দুঃখী ও পাপাত্মাদের প্রতি 'করুণা'র ভাব থাকে।

দুঃখ ভোগকারীদের চাইতে দুঃখ প্রদানকারীদের ওপর (উপেক্ষার ভাব না হয়ে) দয়া থাকা উচিত। কারণ দুঃখ যারা ভোগ করে তারা তো (অতীত পাপের ফল ভোগ করে) পাপ হতে মুক্ত হচ্ছে, কিন্তু যারা দুঃখ প্রদান করে তারা নতুন করে পাপ সংগ্রহ করে। সুতরাং দুঃখ প্রদানকারী ব্যক্তি বিশেষভাবে দয়ার পাত্র।

'নির্মমঃ'—যদিও প্রাণীমাত্রেরই প্রতি ভক্তের স্বাভাবিক মৈত্রী ও করুণার ভাব থাকে, তবুও তার কারও প্রতি বিন্দুমাত্র মমত্ববোধ থাকে না। প্রাণী এবং পদার্থে মমত্ববোধই ('আমার'-ভাব) মানুষকে সংসারে আবদ্ধ করে। ভক্ত এই মমত্ববোধ-বর্জিত হন। তাঁর নিজের দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি—কিছুতেই তাঁর মমত্ববোধ থাকে না। সাধকরা এই ভুল করেন যে তাঁরা প্রাণী ও পদার্থে মমত্ববোধ দূর করার চেষ্টা করলেও নিজ দেহ, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি থেকে তা সরানোর দিকে বিশেষ নজর দেন না। সেইজন্য তাঁরা সর্বতোভাবে নির্মম হতে পারেন না।

'নিরহঙ্কারঃ'—শরীর, ইন্দ্রিয়াদি জড় পদার্থগুলিকে নিজ স্বরূপ বলে মনে করলে অহংকার উৎপন্ন হয়।

ভক্তের নিজ শরীরের প্রতি বিন্দুমাত্র অহংবুদ্ধি না থাকলে এবং ভগবানের সঙ্গে নিজ নিত্য সম্বন্ধ অনুভব হলে তাঁর চিত্তে স্বতঃই শ্রেষ্ঠ, অলৌকিক গুণাবলী প্রকটিত হতে থাকে। এই গুণগুলিকে তিনি নিজের গুণ বলে মনে করেন না, (দৈবী-সম্পদ হওয়ায়) ভগবানের বলে মনে করেন। 'সৎ'-এর (পরমাত্মা) হওয়াতে এগুলিকে 'সদ্‌গুণ' বলা হয়। সুতরাং ভক্ত সেগুলিকে নিজের বলতে পারেন না। তাই তিনি অহংভাব থেকে সর্বতোভাবে রহিত হন।

'সমদুঃখসুখঃ'—ভক্ত সুখদুঃখ প্রাপ্তিতে সমভাবে বিরাজ করেন অর্থাৎ অনুকূলতা-প্রতিকূলতা তাঁর চিত্তে রাগ-দ্বেষ, হর্ষ-শোক ইত্যাদি কোনো বিকার সৃষ্টি করতে পারে না।

গীতায় 'সুখ-দুঃখ' পদটি অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতির (যা সুখ-দুঃখ সৃষ্টি করার হেতু) জন্য এবং চিত্তে উদ্ভূত হর্ষ-শোকাদি বিকারের জন্যও উদ্ধৃত হয়েছে।

অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতিগুলি মানুষকে সুখী ও দুঃখী করে তাকে তাতেই আবদ্ধ করে রাখে। তাই সুখ-দুঃখে সম থাকার অর্থ হল—অনুকূল বা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মনের মধ্যে হর্ষ-শোকাদি বিকার না হওয়া।

ভক্তের শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, সিদ্ধান্ত ইত্যাদির অনুকূল বা প্রতিকূল প্রাণী, পদার্থ, পরিস্থিতি, ঘটনাদির সংযোগ বা বিয়োগ হলে, তাঁর অনুকূলতা বা প্রতিকূলতার জ্ঞান হলেও, তাঁর চিত্তে হর্ষ-শোকাদি কোনো বিকার উৎপন্ন হয় না। এখানে একটি কথা জানতে হবে যে, কোনো পরিস্থিতির জ্ঞান হওয়া দূষণীয় নয়, কিন্তু তার জন্য চিত্তে বিকার আসাই দোষের। ভক্ত রাগ-দ্বেষ, হর্ষ-শোক ইত্যাদি বিকার থেকে সর্বতোভাবে রহিত হন। যেমন প্রারব্ধ অনুসারে ভক্তের শরীরে কোনো ব্যাধি দেখা দিলে তার শারীরিক পীড়ার জ্ঞান (অনুভব) হবে ; কিন্তু তার জন্য তার চিত্তে কোনোপ্রকার বিকার আসবে না।

'ক্ষমী'—নিজের প্রতি কেউ যদি কোনো অপরাধ করে তবে তাকে শাস্তি দেবার কথা না ভেবে যারা ক্ষমা করে তাদের বলা হয় **'ক্ষমী'**।

সর্বপ্রথমে ভক্তের লক্ষণগুলির বর্ণনায় **'অদ্বেষ্টা'** পদটি দিয়ে ভগবান ভক্তদের নিজের অপরাধকারীদের প্রতি দ্বেষ না থাকার কথা বলেছেন, আর এখানে **'ক্ষমী'** পদটির দ্বারা জানিয়েছেন যে ভক্তদের মনে সেই অপরাধীদের জন্য এই ভাব থাকে যে তারা যেন ভগবান বা অন্য কারও দ্বারা কোনো শাস্তি না পায়। এই ক্ষমাভাব ভক্তের এক বৈশিষ্ট্য।

'সন্তুষ্টঃ সততম্‌'[১]—জীবের মনের অনুকূল প্রাণী, পদার্থ, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদির সংযোগে এবং মনের

---

[১]এরূপ সন্তুষ্ট ভক্তের কথা বলতে গিয়ে ভাগবতকার জানিয়েছেন—

সদা সন্তুষ্টমনসঃ সর্বাঃ সুখময়া দিশঃ। শর্করাকণ্টকাদিভ্যো যথোপানৎপদঃ শিবম্‌ ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ৭।১৫।১৭)

'যেমন জুতো পরে চললে পায়ে কাঁকর বা কাঁটা ফোটার ভয় থাকে না, তেমনই যার মনে সন্তুষ্টি আছে, তার সর্বত্রই সুখ ভরা, দুঃখ কোথাও নেই।'

প্রতিকূল প্রাণী, পদার্থ, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদির বিয়োগে সন্তুষ্টি আসে। এটি বিজাতীয় এবং অনিত্য পদার্থের জন্য হওয়ায় যে সন্তোষ বা বিষাদ হয় তা চিরস্থায়ী হয় না। স্বয়ং নিত্য হওয়ায় জীবের নিত্য পরমাত্মার অনুভূতিই বাস্তবিক এবং স্থায়ী সন্তুষ্টিদায়ক হয়।

ভগবানকে লাভ করলে ভক্ত নিত্য-নিরন্তর সন্তুষ্ট থাকেন। কারণ তাঁর ভগবানের সঙ্গে কখনো বিচ্ছেদ হয় না এবং তাঁর বিনাশশীল জগতে কোনো প্রয়োজনও থাকে না। তাই তাঁর অসন্তুষ্টির কোনো কারণই থাকে না। এই সন্তুষ্টির জন্যই তিনি জগতের কোনো প্রাণী বা পদার্থের প্রতি বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দেন না[১]।

'সন্তুষ্ট'-এর সঙ্গে **'সততম্'** পদটি ব্যবহার করে ভগবান ভক্তের সেই চিরস্থায়ী সন্তুষ্টির দিকেই লক্ষ্য করাচ্ছেন, যাতে কখনো কোনো তারতম্য হয় না এবং তারতম্য হবার কোনো সম্ভাবনাও থাকে না। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ—সব যোগমার্গে সিদ্ধিপ্রাপ্ত মহাপুরুষদেরই এই সন্তুষ্টি (যা প্রকৃতই) সর্বক্ষণ থাকে।

'যোগী'—ভক্তিযোগের সাহায্যে পরমাত্মাকে প্রাপ্তকারী (নিত্যপরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত) ব্যক্তিকে 'যোগী' বলা হয়েছে।

বাস্তবে কোনো ব্যক্তিরই পরমাত্মার সঙ্গে কখনো বিযুক্তি হয়নি, হতে পারে না এবং তা সম্ভবও নয়। কিন্তু এই সত্য যিনি অনুভব করেছেন, তিনিই 'যোগী'।

'যতাত্মা'—যাঁর মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়সহ শরীরের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে, তিনি 'যতাত্মা'। সিদ্ধ ভক্তদের মন, বুদ্ধি ইত্যাদি বশ করতে হয় না, বরং এগুলি স্বাভাবিকভাবে তাঁদের বশে থাকে। তাই তাঁদের দ্বারা কোনোপ্রকার ইন্দ্রিয়জনিত দুর্গুণ-দুরাচারের আচরণ ঘটা কখনোই সম্ভব নয়।

মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি বাস্তবে স্বাভাবিকভাবে ঠিক পথেই চলে, কিন্তু সংসারে আসক্তিযুক্ত হওয়াতে এগুলি পথভ্রষ্ট হয়। ভক্তের সংসারের সঙ্গে কোনো আসক্তিপূর্ণ সম্বন্ধ না থাকায় তাঁর মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সকল সর্বদাই তাঁর বশে থাকে। তাই তাঁর প্রত্যেক কাজই অন্যের কাছে আদর্শরূপে পরিগণিত হয়।

দেখা যায় যে, এমনকি যাঁরা ন্যায়ের পথে চলেন সেই সৎ ব্যক্তিদের ইন্দ্রিয়াদিও কখনো কুপথগামী হয় না। যেমন রাজা দুষ্মন্তের মন শকুন্তলার প্রতি আকৃষ্ট হলে তাঁর বিশ্বাস হয়েছিল যে শকুন্তলা ব্রাহ্মণ কন্যা নয়, ক্ষত্রিয় কন্যা। কবি কালিদাস বলেছেন যে, কোনো ক্ষেত্রে সন্দেহ জাগলে তাতে সৎপুরুষের চিত্তবৃত্তিই নির্ণায়ক হয়—

সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ॥
(অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ ১।২১)

ন্যায়শীল সৎ ব্যক্তির ইন্দ্রিয়বৃত্তিও যখন স্বাভাবিক-ভাবে কুপথে যায় না, তখন সিদ্ধ ভক্তদের (যাঁরা ন্যায়, ধর্ম হতে কখনো কোনো অবস্থাতে বিচ্যুত হন না) মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় কী করে কুপথে গমন করতে পারে ?

'দৃঢ়নিশ্চয়ঃ'—সিদ্ধ মহাপুরুষদের দৃষ্টিতে জগতের পৃথক্ সত্তার কোনো অস্তিত্ব থাকে না। তাঁদের বুদ্ধিতে একমাত্র পরমাত্মার অটল সত্তাই সর্বত্র বিরাজ করে। তাই তাঁদের বুদ্ধিতে বিপর্যয় দোষ (প্রতিক্ষণ পরিবর্তনশীল জগৎকে স্থায়ী বলে মনে করা) থাকে না। তাঁদের একমাত্র ভগবানের সঙ্গেই নিত্যসিদ্ধ সম্বন্ধ অনুভূত হতে থাকে। তাই তাঁরা ভগবানেই দৃঢ়নিশ্চয় হয়ে থাকেন। তাঁদের এই দৃঢ়তা বুদ্ধিতে নয়, 'স্বয়ং'-এ হয়, যার প্রতিফলন হয় বুদ্ধিতে।

সংসারকে পৃথক্‌রূপে অস্তিত্ব-সম্পন্ন বলে মনে করলে অথবা জগৎ-সংসারের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নিলে তবেই বুদ্ধিতে বিপর্যয় এবং সংশয় দোষ উৎপন্ন হয়। বিপর্যয় এবং সংশয়যুক্ত বুদ্ধি কখনো স্থির হয় না। জ্ঞানী এবং অজ্ঞানী ব্যক্তির বুদ্ধির স্থিরতাতেই পার্থক্য থাকে যদিও স্বরূপতঃ দুটিই এক। অজ্ঞানী ব্যক্তির বুদ্ধিতে জাগতিক সত্তা ও তার গুরুত্ব থাকে। কিন্তু সিদ্ধ ভক্তের বুদ্ধিতে কেবল ভগবান ব্যতিরেকে জগতের কোনো বস্তুরই পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না এবং কোনো গুরুত্বও থাকে না। তাই তিনি সর্বতোভাবে বুদ্ধি বিপর্যয় এবং সংশয়-দোষবর্জিত হন এবং পরমাত্মাতেই দৃঢ় বুদ্ধিসম্পন্ন হন।

'ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ'—সাধক যখন ভগবদ্‌প্রাপ্তিকেই নিজের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে স্থির করেন এবং স্বয়ং ভগবানে অর্পিত হন (যা বাস্তব সত্য) তখন তাঁর মন, বুদ্ধিও স্বতঃই ভগবানে নিয়োজিত হয়। অতএব সিদ্ধ ভক্তদের মন, বুদ্ধি যে ভগবানেই অর্পিত থাকবে—এতে

[১]সন্ত কবীর বলেছেন— গোধন গজধন বাজিধন, ঔর রতন ধন খান। জব আবৈ সন্তোষ ধন, সব ধন ধূরি সমান॥

আর বলার কী আছে ?

যেখানে প্রেম থাকে, সেখানেই স্বাভাবিকভাবে মানুষের মন আকৃষ্ট হয় আর যাকে মানুষ তার সিদ্ধান্ত দ্বারা শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে, সেখানেই স্বভাবতঃ তার বুদ্ধি নিয়োজিত হয়। ভক্তের কাছে ভগবানের থেকে বেশি প্রিয় বা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নেই। ভক্ত তাঁর মন বা বুদ্ধির ওপরও নিজের অধিকার মানেন না, তিনি সেগুলি সব ভগবানেরই বলে মনে করেন। তাই তাঁর মন, বুদ্ধি স্বাভাবিকভাবেই ভগবানে নিবিষ্ট থাকে।

'যঃ মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ'[১]—ভগবানের কাছে তো সকলেই প্রিয়, কিন্তু ভক্তের প্রেম ভগবান ছাড়া আর কোথাও হয় না। এই অবস্থায় **'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'** (গীতা ৪।১১)—অনুসারে ভগবানেরও ভক্তের প্রতি বিশেষ প্রেম হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব—গীতায় কর্মযোগীর লক্ষণও বলা হয়েছে (২।৫৫-৭২ এবং ৬।৭-৯ শ্লোক পর্যন্ত), জ্ঞানযোগীর লক্ষণও বলা হয়েছে (১৪।২২-২৫ শ্লোক পর্যন্ত) আবার ভক্তের লক্ষণও বলা হয়েছে (১২।১৩-১৯ শ্লোক পর্যন্ত)। কিন্তু শুধু ভক্তের লক্ষণেই ভগবান বলেছেন—**'অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ'**। এই লক্ষণগুলি (মিত্রতা ও করুণা) কর্মযোগীর ক্ষেত্রে বলা হয়নি এবং জ্ঞানযোগীর ক্ষেত্রেও বলা হয়নি। এটি শুধু ভক্তের লক্ষণেই উদ্ধৃত হয়েছে। কর্মযোগী এবং জ্ঞানযোগীর মধ্যে সম-ভাব থাকলেও মিত্রতা এবং করুণা আসে না। কিন্তু ভক্তের মধ্যে শুরু থেকেই মিত্রতা ও করুণা থাকে।

ভক্তের দৃষ্টিতে সমস্ত প্রাণী ভগবানের অংশ হওয়ায় সর্বক্ষেত্রে তিনি বর্তমান, তাহলে আর কে কার শত্রুতা করবে, কার সঙ্গে করবে এবং কেনই বা করবে ?—**'নিজ প্রভুময় দেখহিঁ জগত কেহি সন করহিঁ বিরোধ'** (শ্রীরামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ১১২খ)। উদাহরণরূপে বলা যায় যে কারও কাছে রাম প্রিয়, কারও কাছে প্রিয় কৃষ্ণ, কারও-বা শঙ্কর প্রিয়। এইভাবে ইষ্ট পৃথক্ পৃথক্ হলেও এইসব ভক্তদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঐক্য হতে পারে। কিন্তু জ্ঞানযোগীরা সকলে পরস্পর এক হতে পারেন না। ভক্ত এবং জ্ঞানযোগীরা যদি পরস্পর মিলিত হন, তাহলে ভক্ত জ্ঞানযোগীর যত সম্মান করবেন, জ্ঞানযোগী ভক্তকে তত সম্মান দেখাতে পারবেন না। তাই ভক্তের লক্ষণে বলা হয়েছে—**'সবহি মানপ্রদ আপু অমানী'** (শ্রীরামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ৩৮।২)।

শ্রীরামচরিতমানসের (রামায়ণের) প্রারম্ভে গোস্বামী তুলসীদাস সজ্জন ব্যক্তির সঙ্গে দুষ্টলোকেরও বন্দনা করেছেন এবং সত্য মনোভাব নিয়েই করেছেন—**'বহুরি বন্দি খল গন সতিভায়েঁ'** (শ্রীরামচরিতমানস, বালকাণ্ড ৪।১)। ভক্তই এরূপ করতে পারেন, জ্ঞানযোগী নয় ! যদিও জ্ঞানযোগীর কখনো কারো সঙ্গে বিন্দুমাত্র শত্রুতা হয় না, তবুও তাঁর মধ্যে স্বাভাবিকভাবে উদাসীনতা, তটস্থভাব থাকে। জ্ঞানমার্গে বৈরাগ্যের প্রাধান্য থাকে এবং বৈরাগ্যে শুষ্কভাব থাকে। তাই জ্ঞানযোগীর অন্তর কঠিন না হলেও বৈরাগ্য ও উদাসীনভাবের জন্য বাইরে থেকে কঠোর বলে মনে হয়।

সুখগ্রহণে কঠোরতা থাকে আর সুখপ্রদানে থাকে কোমলতা। জ্ঞানযোগীর মোক্ষসুখ গ্রহণেও কঠোরভাব থাকে। কিন্তু অপরকে সুখ প্রদানের ভাব হলে ভক্তের মধ্যে প্রথম থেকেই কোমলভাব থাকে। ভক্তের মনে শত্রুর জন্যও দ্বেষভাব আসে না। জ্ঞানযোগী হন বাবার মতো আর ভক্ত হলেন মায়ের মতো, তাই ভক্তের মধ্যে করুণাভাব বেশি থাকে।

'এব' পদটি ব্যবহারের তাৎপর্য হল যে ভক্ত দ্বেষভাবরহিত হন, শুধু তাই নয়, তিনি মিত্রতাভাবাপন্ন এবং দয়ালুও হয়ে থাকেন।

'নির্মমো নিরহঙ্কারঃ'—প্রত্যেক সাধকেরই নির্মম ও নিরহঙ্কার হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন, তাই ভগবান গীতায়

---

[১]ভগবান শ্রীরাম বলেছেন যে—

অখিল বিস্ব য়হ মোর উপায়া। সব পর মোহি বরাবরি দায়া॥
তিন্হ মহঁ জো পরিহরি মদ মায়া। ভজৈ মোহি মন বচ অরু কায়া ॥
পুরুষ নপুংসক নারি বা জীব চরাচর কোই। সর্ব ভাব ভজ কপট তজি মোহি পরম প্রিয় সোই॥

(শ্রীরামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ৮৭।৪, ৮৭ ক)

কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ—এই তিনটি যোগমার্গেই নির্মম এবং নিরহংকার হতে বলেছেন—কর্মযোগে **'নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি'** (২।৭১), জ্ঞানযোগে **'অহঙ্কারং .... বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে'** (১৮।৫৩) এবং ভক্তিযোগে **'নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী'** (১২।১৩)। এই বিষয়ে বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়ার কথা হল যে বাস্তবে আমাদের স্বরূপ অহংবোধ ও মমত্ববর্জিত। অহংবোধ (আমি-ভাব) এবং মমতা (আমার-ভাব) উভয়টিকেই স্বরূপ মেনে নেওয়া হয়েছে, যা বাস্তবিক নয়। যদি তা বাস্তব হত তাহলে আমরা কখনোই নির্মম এবং নিরহংকার হতে সক্ষম হতাম না এবং ভগবানও কখনো নির্মম, নিরহঙ্কার হতে বলতেন না। কিন্তু আমরা নির্মম, নিরহংকার হতে পারি বলেই ভগবান এই কথা বলেছেন।

কর্মযোগে প্রথমে 'কামনা' ত্যাগ হয়, পরে কর্মযোগী স্বতঃই নির্মম-নিরহংকার হন (গীতা ২।৭১)। জ্ঞানযোগে প্রথমে 'অহংকার' ত্যাগ হয়, পরে জ্ঞানযোগী স্বতঃই নির্মম হন (গীতা ১৮।৫৩)। ভক্তিযোগে ভক্ত নিজেকে ভগবানে সমর্পণ করেন এবং ভগবৎকৃপায় স্বতঃই নির্মম-নিরহংকার হয়ে ওঠেন।

'ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ'— এখানে **'ময্যর্পিতমনোবুদ্ধি'** পদ সেই সব মানুষদের বোঝায়, যাঁরা নিজেদের ভগবানে সমর্পণ করেছেন। নিজেকে সমর্পণ করায় মন, বুদ্ধিও স্বতঃই ভগবানে অর্পিত হয়। নিজেকে অর্পণ করলে আর কিছু বাকি থাকে না। কারণ আগে হল স্ব-স্বরূপ, পরে শরীর, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি। প্রথমে ভক্ত, মানুষ তারপরে। ভগবানে সমর্পিত হওয়ায় মন, বুদ্ধির পৃথক্ কোনো অস্তিত্ব থাকে না, শুধু ভগবানই থাকেন।

পরা ও অপরা দুই প্রকৃতির সঙ্গেই ভগবানের সমান সম্বন্ধ, কিন্তু জীবের (পরার) অপরার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই। কারণ জীব অপরা প্রকৃতির থেকে উৎকৃষ্ট এবং ভগবানের অংশ। তাই জীবের সম্পর্ক ভগবানের সঙ্গে। **'মর্য্যর্পিত-মনোবুদ্ধিঃ'** কথাটির তাৎপর্য হল যে, জীব অপরা প্রকৃতিকে (মন-বুদ্ধিকে) নিজের বলে মনে না করে ভগবানকেই যেন নিজের বলে মনে করে[১]।

ভগবান জ্ঞানস্বরূপ এবং নিত্য পরিপূর্ণ। সুতরাং তাঁর মধ্যে জ্ঞানপিপাসা থাকে না, কিন্তু প্রেমপিপাসা অবশ্যই থাকে। তাই ভগবান বলেছেন যে, 'যেসব ভক্ত আমাতে মন, বুদ্ধি অর্পণ করেছেন, তাঁরা আমার প্রিয়।' এরূপ ভক্তই ভগবানের প্রিয় হয়ে থাকেন, অন্য কেউ নয়।

কোনো রাজার ছেলে যদি অন্যের কাছে ভিক্ষা চায়, তা যেমন সেই রাজার ভালো লাগে না, তেমনই সৎ-চিৎ-আনন্দরূপ ভগবানের অংশ জীব যখন এই অসৎ জগৎ-সংসারে কোনো কিছু কামনা করে, তখন তা ভগবানের পছন্দ না হওয়ারই কথা, কারণ তাতে জীবের মহাক্ষতি হয়। যে অন্যের কাছে কিছু আশা করে না, ভগবানের কাছে সে-ই প্রিয়, কারণ এতে জীবের পরম হিত হয়—

এক বানি করুনানিধান কী। সো প্রিয় জাকেঁ গতি ন আন কী॥ (শ্রীরামচরিতমানস, অরণ্যকাণ্ড ১০।৪)

※ ※ ※

সম্বন্ধ—সিদ্ধ ভক্তদের লক্ষণের দ্বিতীয় প্রকরণ, যাতে ছটি লক্ষণের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, পরবর্তী শ্লোকে সেগুলি বলা হয়েছে।

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥ ১৫ ॥

[**যস্মাৎ** (যাঁর থেকে) ; **লোকঃ** (কোনো প্রাণী) ; **ন, উদ্বিজতে** (উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না) ; **চ, যঃ** (এবং যিনি নিজেও) ; **লোকাৎ, ন, উদ্বিজতে** (কোনো প্রাণী থেকে উদ্বিগ্ন হন না) ; **চ, যঃ, হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈঃ** (যিনি হর্ষ, অমর্ষ, ভয় ও উদ্বেগ থেকে) ; **মুক্তঃ** (মুক্ত) ; **সঃ** (তিনি) ; **মে** (আমার) ; **প্রিয়ঃ** (প্রিয়।)]

---

[১]এখানে মনের অন্তর্গত চিত্ত এবং বুদ্ধির অন্তর্গত অহংকেও ধরতে হবে।

যাঁর জন্য কোনো প্রাণী উদ্বিগ্ন হয় না এবং যিনি নিজেও কোনো প্রাণী থেকে উদ্বিগ্ন হন না, যিনি হর্ষ, অমর্ষ (ঈর্ষা), ভয় ও উদ্বেগ হতে মুক্ত ; তিনি আমার প্রিয়॥ ১৫ ॥

ব্যাখ্যা—**'যস্মান্নোদ্বিজতে লোকঃ'**—ভক্ত সর্বত্র এবং সর্বভূতে তাঁর পরমপ্রিয় প্রভুকে দেখে থাকেন। তাই তাঁর দৃষ্টিতে মন, বাক্য ও শরীর দ্বারা কৃত সমস্ত কর্মই একমাত্র ভগবানের প্রসন্নতার জন্য হয়ে থাকে (গীতা ৬।৩১)। এরূপ অবস্থায় ভক্ত কোনো প্রাণীকে কীভাবে উদ্বিগ্ন করতে পারেন ? তা সত্ত্বেও ভক্তদের জীবনেও দেখা যায় যে, তাঁদের মহিমা, আদর-আপ্যায়ন, তাঁদের কোনো কোনো ক্রিয়া, এমনকি তাঁদের সৌম্য চেহারা দেখেও কোনো কোনো ব্যক্তি ঈর্ষাবশতঃ উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে এবং ভক্তদের অকারণে হিংসা ও বিরোধিতা করতে থাকে।

ভক্তদের প্রতি কারও এরূপ বিদ্বেষযুক্ত আচরণের কারণ কী ? চিন্তা করে দেখলে জানা যাবে যে, ভক্তদের ক্রিয়া কখনো কারও উদ্বেগের কারণ হয় না। কারণ ভক্তরা প্রাণীদের মধ্যে ভগবানকেই প্রত্যক্ষ করেন— **'বাসুদেবঃ সর্বম্'** (গীতা ৭।১৯)। তাঁদের ক্রিয়ামাত্রই স্বভাবতঃ প্রাণীদের পরম হিতের জন্য হয়ে থাকে। ভ্রমবশতঃও তাঁদের দ্বারা কখনো কারো কোনো অহিত কাজ হয় না। ভক্তদের সম্পর্কে যারা বিদ্বেষ বোধ করে, আসলে তা তাদের নিজেদের রাগ-দ্বেষযুক্ত আসুরী স্বভাবের জন্যই করে থাকে । নিজেদেরই দোষযুক্ত স্বভাবের জন্য তাদের কাছে ভক্তদের হিতপূর্ণ ক্রিয়াও উদ্বেগজনক বলে মনে হয়। এতে ভক্তদের দোষ কোথায় ? ভর্তৃহরি বলেছেন—

মৃগমীনসজ্জনানাং তৃণজলসন্তোষবিহিতবৃত্তীনাম্।
লুব্ধকধীবরপিশুনা নিষ্কারণবৈরিণো জগতি॥

(ভর্তৃহরিনীতিশতক ৬১)

'হরিণ, মৎস্য এবং সজ্জন ব্যক্তি যথাক্রমে তৃণ, জল এবং সন্তোষের দ্বারা তাদের জীবন নির্বাহ করে (কাউকে কিছু বলে না) ; কিন্তু ব্যাধ, মৎস্যশিকারি এবং দুষ্ট ব্যক্তি অকারণে এদের সঙ্গে শত্রুতা করে থাকে।'

প্রকৃতপক্ষে ভক্তদের দ্বারা অন্য ব্যক্তিদের বিঘ্নিত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, বরং প্রায়শঃই এরূপ দেখা যায় যে, ভক্তদের প্রতি বিদ্বেষকারী ব্যক্তিরাও তাঁদের চিন্তা, সঙ্গ, দর্শন, স্পর্শ, বাক্যালাপের প্রভাবে নিজ আসুরী স্বভাব পরিত্যাগ করে ভক্ত হয়ে ওঠে । এর কারণ হল ভক্তদেরই ঔদার্যপূর্ণ স্বভাব।

উমা সন্ত কই ইহই বড়াঈ। মন্দ করত জো করই ভলাঈ॥

(শ্রীরামচরিতমানস ৫।৪১।৪)

অর্থাৎ রামায়ণে শিব পার্বতীকে জানাচ্ছেন যে, সন্তের লক্ষণই এরূপ যে যারা ক্ষতিকারক, সন্তপুরুষগণ তাদেরও মঙ্গল করে থাকেন। তবে ভক্তদের বিদ্বেষকারী ব্যক্তিদের সকলেরই যে পরিবর্তন হয়—তারও কোনো নিয়ম নেই।

যদি মেনে নেওয়া যায় যে ভক্তদের থেকে কারও কোনো উদ্বেগ হয় না বা অন্য লোকেরা ভক্তদের বিরুদ্ধে কিছু করে না বা ভক্তদের শত্রু-মিত্র হয় না, তাহলে ভক্তদের শত্রু-মিত্র, মান-অপমান, নিন্দা-স্তুতিতে সম থাকবার কথা (যা পরবর্তী অষ্টাদশ—ঊনবিংশ শ্লোকে বলা হয়েছে) বলা হত না। তাৎপর্য হল যে লোকেদের নিজ-আসুরী স্বভাবের জন্য ভক্তদের হিতকর ক্রিয়াতেও উদ্বেগ হতে পারে এবং তারা পরিবর্তে ভক্তদের বিরুদ্ধাচরণের চেষ্টাও করতে পারে বা নিজেদের তাদের শত্রু বলে মনে করতে পারে। কিন্তু ভক্তের দৃষ্টিতে কেউ শত্রুও নয় বা কাউকে উদ্বিগ্ন করার ভাবও তাঁর মধ্যে থাকে না।

'লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ'—ভগবান আগে বলেছেন যে, ভক্তের দ্বারা কোনো প্রাণী উদ্বেগপ্রাপ্ত হয় না, এবার উপরিউক্ত পদটির দ্বারা জানিয়েছেন যে, ভক্তরা নিজেরাও কোনো প্রাণী থেকে উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না। এর দুটি কারণ আছে—

(১) ভক্তের শরীর, মন, ইন্দ্রিয়াদি, সিদ্ধান্ত ইত্যাদির বিরুদ্ধেও অনিচ্ছায় বা পরেচ্ছায় ক্রিয়া বা ঘটনা সংঘটিত হতে পারে। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী হওয়ায় এবং ভগবানে আত্যন্তিক প্রেমে নিমগ্ন থাকায় ভক্ত সর্বত্র এবং সর্বভূতে ভগবদ্দর্শন করেন। তাই প্রাণীমাত্রেরই ক্রিয়াতে (তা যতই তাঁর ইচ্ছার প্রতিকূল হোক না কেন) তিনি ভগবানের লীলাই দর্শন করে থাকেন। তাই কোনো ক্রিয়ার দ্বারাই তাঁর বিন্দুমাত্র উদ্বেগ হয় না।

(২) মানুষের অপরের থেকে উদ্বেগ তখনই হয়, যখন তার কামনা, ধারণা, সাধনা, সিদ্ধান্ত ইত্যাদির সঙ্গে বিরোধ হয়। ভক্ত সর্বতোভাবে পূর্ণকাম হন। অতএব তাঁর অন্যের থেকে উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণই থাকে না।

'হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ'—এখানে

হর্ষমুক্ত হবার তাৎপর্য হল এই যে, সিদ্ধ ভক্ত সর্বপ্রকার হর্ষাদি, বিকার থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে সিদ্ধ ভক্ত সর্বতোভাবে হর্ষশূন্য (অপ্রসন্ন) হয়ে থাকেন, বরং তাঁর প্রসন্নতা নিত্য, একরস, বিশিষ্ট এবং অলৌকিক হয়। তাঁর প্রসন্নতা সাংসারিক পদার্থের সংযুক্তি-বিযুক্তিতে উৎপন্ন ক্ষণিক, বিনাশশীল এবং হ্রাস-বৃদ্ধিসম্পন্ন হয় না। সর্বত্র ভগবদ্‌বুদ্ধি হওয়ায় একমাত্র নিজ ইষ্টদেব ভগবান এবং তাঁর লীলাগুলি দর্শন করে তিনি সর্বদাই প্রসন্নভাবে অবস্থান করেন।

কারও উন্নতি সহ্য করতে না পারাকে বলা হয় 'অমর্ষ'। অন্য লোকেদের নিজের মতো অথবা নিজের থেকে বেশি সুখ-সুবিধা, অর্থ, বিদ্যা, সম্মান, যশ-প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি প্রাপ্ত হতে দেখলে সাধারণ মানুষের মনে পরশ্রীকাতরতা থাকে, কারণ অন্যের উন্নতি তাদের সহ্য হয় না।

কখনো কখনো কিছু সাধকের চিত্তেও অন্য সাধকদের আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং প্রসন্নতা দেখে বা শুনে কিঞ্চিৎ ঈর্ষাভাব উৎপন্ন হয়। কিন্তু ভক্তজন এই বিকার থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হয়ে থাকেন। কারণ তাঁর কাছে তাঁর প্রিয় প্রভু ব্যতীত অন্য কারও পৃথক্ অস্তিত্বই থাকে না। তাহলে তিনি কারও প্রতি অমর্ষভাব কেনই বা রাখবেন?

সাধকের অন্তরে যদি কারোর আধ্যাত্মিক উন্নতি দেখে মনে হয় যে আমারও এরূপ আধ্যাত্মিক উন্নতি হোক, তাহলে এই ভাবটি তার সাধনার পক্ষে সহায়ক হয়। কিন্তু সাধকের মনে যদি এমনভাব আসে যে অমুকের কেন উন্নতি হল আমার কেন হল না—তাহলে এই কুচিন্তার জন্য তার চিত্তে অমর্ষভাব উৎপন্ন হয়, যেটি তাকে পতনের দিকে নিয়ে যায়।

ইষ্টের বিয়োগ এবং অনিষ্টের সংযোগের আশঙ্কা থেকে 'ভয়' নামক বিকার উৎপন্ন হয়। দুটি কারণে ভয় হয়—(১) বাহ্য কারণবশতঃ, যেমন—বাঘ, সিংহ, সাপ, চোর, ডাকাত ইত্যাদি থেকে অনিষ্ট হওয়া বা কোনোপ্রকার সাংসারিক ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থেকে এবং (২) আভ্যন্তর কারণবশতঃ ; যেমন—চুরি, ছল, কপট, ব্যভিচার ইত্যাদি শাস্ত্রবিরুদ্ধ ভাব বা আচরণ থেকে।

সব থেকে বড় ভয় হল মৃত্যুর। বিবেকশীল ব্যক্তিদেরও প্রায়শঃই মৃত্যু ভয় থাকে।[১] সাধকদেরও প্রায়শঃ সৎসঙ্গ-ভজন-ধ্যান ইত্যাদির সাধনাতে শরীর কৃশ হওয়া ইত্যাদির ভয় থাকে। তাঁদের কখনো কখনো এমন ভয়ও হয় যে সংসারে বৈরাগ্য হলে আমার শরীর এবং পরিবারের পালন-পোষণ কীভাবে হবে। মনোমতো বস্তু প্রাপ্তিতে সাধারণ মানুষের ক্ষমতাশালী ব্যক্তি থেকে বাধা প্রদানের ভয় হয়ে থাকে। এই সমস্ত ভয়ই কেবল শরীরের (জড়ের) আশ্রয়েই উৎপন্ন হয়। ভক্ত সর্বক্ষণ ভগবদ্‌চরণের আশ্রিত থাকেন, তাই তিনি সদাই ভয়বর্জিত। সাধকেরও ততক্ষণ ভয় থাকে, যতক্ষণ তিনি সর্বতোভাবে ভগবদ্‌শ্রীচরণের আশ্রিত না হচ্ছেন।

সিদ্ধ ভক্ত সর্বদা সর্বত্র তাঁর প্রিয় প্রভুর লীলাই দর্শন করে থাকেন। তাই ভগবানের লীলা তাঁর মনে ভয় কীভাবে উৎপন্ন করবে?

মন একভাবে না থেকে বিক্ষিপ্ত হলে তাকে 'উদ্বেগ' বলা হয়। এই (পঞ্চদশ) শ্লোকে 'উদ্বেগ' শব্দটি তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমবার উদ্বেগের কথায় ভগবান জানিয়েছেন যে ভক্তের কোনো ক্রিয়াই ভক্তের দিক থেকে মানুষের উদ্বেগের কারণ হতে পারে না। দ্বিতীয়বার উদ্বেগের কথায় বলেছেন যে অপর ব্যক্তির কোনো ক্রিয়াতেই ভক্তের চিত্তে উদ্বেগ সৃষ্টি হয় না। এ ছাড়া অন্য নানা কারণেও মানুষের উদ্বেগ হতে পারে ; যেমন—বারংবার চেষ্টা সত্ত্বেও নিজের কোনো কাজ সফল না হওয়া, ইচ্ছানুযায়ী কার্যের ফল না পাওয়া, অনিচ্ছাকৃত প্রাকৃতিক বিপর্যয় ; ভূমিকম্প, বন্যা ইত্যাদি দুঃখদায়ক দুর্ঘটনা হওয়া ; নিজ কামনা, মান্যতা, সিদ্ধান্ত অথবা সাধনপথে বিঘ্ন আসা ইত্যাদি। ভক্ত এই সমস্ত উদ্বেগ থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হন—এটি জানাতেই তৃতীয়বার উদ্বেগের কথা বলেছেন। তাৎপর্য হল যে ভক্তের অন্তঃকরণে 'উদ্বেগ' বলে কোনো বস্তু থাকেই না।

উদ্বিগ্ন হওয়ার পেছনে কারণ হল অজ্ঞতাজনিত কামনা এবং আসুরী স্বভাব। ভক্তের অজ্ঞান সর্বতোভাবে দূরীভূত হওয়ায় তাদের কোনো স্বতন্ত্র অভিলাষ থাকে না, আর আসুরী স্বভাব তো সাধনাবস্থাতেই নষ্ট হয়ে যায়! ভগবদ্-ইচ্ছাই ভক্তের ইচ্ছা হয়ে থাকে। ভক্ত তাঁর ক্রিয়ার ফলরূপে

[১]'স্বরসবাহী বিদুষোঽপি তথারূঢ়োঽভিনিবেশঃ'॥ (পাতঞ্জলযোগদর্শন ২।৯)

অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রাপ্ত অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ভগবানের কৃপাপূর্ণ বিধানই দেখে থাকেন এবং নিরন্তর আনন্দে বিভোর হয়ে থাকেন। তাই ভক্তের উদ্বেগ সর্বতোভাবে দূর হয়ে যায়।

'মুক্তঃ' পদটির অর্থ হল—বিকার থেকে সর্বতোভাবে মুক্তি। চিত্তে সংসারের মোহ থাকলে অর্থাৎ পরমাত্মাতে পূর্ণভাবে মন-বুদ্ধি নিবিষ্ট না হলেই হর্ষ, অমর্ষ, ভয়, উদ্বেগ ইত্যাদি বিকার উৎপন্ন হয়। কিন্তু ভক্তের দৃষ্টিতে একমাত্র ভগবান ব্যতীত অন্য কারও পৃথক্ সত্তা ও গুরুত্ব না থাকায় তাঁর মধ্যে এইসব বিকার উৎপন্ন হয়ই না। তাঁর মধ্যে স্বাভাবিকভাবে সদ্‌গুণ-সদাচার থাকে।

এই শ্লোকে ভগবান 'ভক্তঃ' পদটি ব্যবহার না করে **'মুক্তঃ'** পদটি ব্যবহার করেছেন। এর তাৎপর্য হল যে ভক্ত সমস্ত দুর্গুণ ও দুরাচার থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হন।

গুণের অহংকার হলে দুর্গুণ নিজে থেকেই উৎপন্ন হয়। নিজের মধ্যে কোনো গুণের বিকাশ হলে তাতে অহংকার রূপ দুর্গুণ যদি উৎপন্ন হয় তাহলে তাকে আর গুণ বলা যায় না। দৈবীসম্পদ (সদ্‌গুণ) থেকে কখনো আসুরী সম্পদ (দুর্গুণ) উৎপন্ন হতে পারে না। দৈবী সম্পদ থেকে যদি আসুরী সম্পদ উৎপন্ন হত তাহলে **'দৈবী সম্পদ্ বিমোক্ষায়'** (গীতা ১৬।৫)—এই ভগবদ্-বাণী অনুযায়ী মানুষ কী করে মুক্তি লাভ করত ? প্রকৃতপক্ষে গুণাদির অহংকারে গুণ কম এবং দুর্গুণ (অহংকার) বেশি থাকে। অহংকার থেকেই দুর্গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, কারণ সমস্ত দুর্গুণ-দুরাচার অহংকারেরই আশ্রিত থাকে।

ভক্তের প্রায়শঃই এদিকে খেয়াল থাকে না যে তাঁর মধ্যে কোনো গুণ আছে ! যদি তিনি নিজের কোনো গুণ দেখেনও, তাহলেও তিনি সেটি ভগবানের বলেই মনে করেন, নিজের নয়। এইভাবে গুণের অহংকার না থাকায় ভক্ত সমস্ত দুর্গুণ-দুরাচার ও বিকার থেকে মুক্ত হয়ে থাকেন।

ভক্তের কাছে ভগবান প্রিয়, তাই ভগবানের কাছেও ভক্ত প্রিয় হয়ে থাকেন (গীতা ৭।১৭)।

পরিশিষ্ট-ভাব—অন্যকিছুতে অস্তিত্ব প্রদান করলেই উদ্বেগ, ঈর্ষা, ভয় ইত্যাদি আসে। ভক্তের দৃষ্টিতে একমাত্র ভগবান ব্যতীত অন্য কোনো অস্তিত্ব নেই, তাহলে তিনি আর কার জন্য উদ্বেগ, ঈর্ষা, ভয় ইত্যাদি করবেন আর কেনই-বা করবেন ? **'নিজ প্রভুময় দেখহিঁ জগত, কেহি সন করহিঁ বিরোধ'** (শ্রীরামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ১১২খ)।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—সিদ্ধ ভক্তের ছটি লক্ষণ বর্ণিত তৃতীয় প্রকরণটি পরের শ্লোকে উদ্ধৃত হয়েছে।

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৬ ॥

[**যঃ** (যিনি) ; **অনপেক্ষঃ** (আকাঙ্ক্ষারহিত) ; **শুচিঃ, দক্ষঃ** (বাহ্যান্তরে পবিত্র, দক্ষ) ; **উদাসীনঃ** (উদাসীন) ; **গতব্যথঃ** (ব্যথারহিত এবং) ; **সর্বারম্ভপরিত্যাগী** (নতুন নতুন কর্মানুষ্ঠান বর্জন করেছেন) ; **সঃ, মদ্ভক্তঃ** (সেরূপ ভক্ত) ; **মে, প্রিয়ঃ** (আমার প্রিয়।)]

যিনি আকাঙ্ক্ষারহিত (নিস্পৃহ), বাহ্যান্তরে পবিত্র, দক্ষ, উদাসীন, ব্যথারহিত এবং প্রারম্ভ অর্থাৎ নতুন নতুন কর্মারম্ভ সর্বতোভাবে বর্জন করেছেন, এরূপ ভক্ত আমার প্রিয়॥ ১৬ ॥

ব্যাখ্যা—'অনপেক্ষঃ'—ভক্ত ভগবানকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন। তাঁর কাছে ভগবদ্‌প্রাপ্তির থেকে বেশি আর কোনো কিছুই মূল্যবান হয় না। তাই সংসারের কোনো বস্তুতেই তাঁর কোনোপ্রকার আকর্ষণ থাকে না। শুধু তাই নয় নিজের বলে যে শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি তাতেও তাঁর আপনভাব থাকে না, বরং সেগুলিকেও তিনি ভগবানেরই বলে মনে করেন, আসলেও যা ভগবানেরই। তাই তাঁর জীবিকা-নির্বাহেরও কোনো চিন্তা থাকে না। অর্থাৎ তখন আর তাঁর কোনো জিনিসের ইচ্ছা-বাসনা বা স্পৃহা থাকে না।

ভক্তের যত বড় বিপদই আসুক, তা জানা সত্ত্বেও তার হৃদয়ে কোনো প্রতিকূল প্রভাব পড়ে না। অতি ভয়ঙ্কর

পরিস্থিতিকেও তিনি ভগবানের লীলা জ্ঞান করে আনন্দে থাকেন। তাই তাঁর কোনোরূপ অনুকূলতার কামনাও থাকে না।

বিনাশশীল পদার্থ স্থায়ী হয় না, তার বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী আর অবিনাশী পরমাত্মার সঙ্গে কখনোই বিচ্ছেদ হয় না—এই বাস্তব সত্য জানার ফলেই ভক্তের মনে স্বাভাবিকভাবেই বিনাশশীল পদার্থের জন্য কোনো কামনার সৃষ্টি হয় না।

এটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করার যে, কেবল ইচ্ছা করলেই জীবিকা-নির্বাহের পদার্থ পাওয়া যায় আর ইচ্ছা না করলে পাওয়া যায় না—এমন কোনো নিয়ম নেই। প্রকৃতপক্ষে শরীর-নির্বাহের প্রয়োজনীয় সামগ্রী স্বাভাবিকভাবেই পাওয়া যায়। কারণ জীবমাত্রেরই শরীর-নির্বাহের প্রয়োজনীয় বস্তু-সামগ্রীর ব্যবস্থা ভগবান প্রথম থেকেই করে রেখেছেন। কামনা করলে বরং আবশ্যক বস্তু প্রাপ্তিতে বাধাই আসে। মানুষ যদি কোনো বস্তুকে নিজের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে করে 'বস্তুটি কী করে পাওয়া যায় ? কোথায় পাওয়া যায় ? কখন পাওয়া যায় ?'—এই প্রবল আকাঙ্ক্ষাকে নিজের মনে চেপে রাখে তাহলে তার সেই আকাঙ্ক্ষার বিস্তার হতে পারে না অর্থাৎ তার সেই ইচ্ছা অন্য লোকে জানতে পারে না। তাই অন্য লোকেদের হৃদয়ে এই আবশ্যক জিনিস তাকে প্রদানের ইচ্ছা বা প্রেরণা জাগে না। প্রায়শঃই দেখা যায় যে, যাদের নেবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকে (চোর ইত্যাদির) তাদের কেউ কিছু দিতে চায় না। অপরপক্ষে ত্যাগী সাধু এবং বালকদের প্রয়োজনের কথা অপরে সহজেই অনুভব করে এবং প্রসন্নতা সহকারে তাদের শরীর-নির্বাহের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ব্যবস্থা করে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আকাঙ্ক্ষা না করলে জীবন-নির্বাহের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অযাচিতভাবে স্বতঃই প্রাপ্ত হয়। তাই দ্রব্যাদির আকাঙ্ক্ষা করা হল মূর্খতা এবং এতে অকারণে দুঃখ পেতে হয়। ভক্তের তো নিজের বলে প্রতীয়মান যে শরীর তার কাছেও কোনো প্রত্যাশা থাকে না, তাই তিনি সর্বতোভাবে নিরপেক্ষ (আকাঙ্ক্ষা রহিত) হন।

কোনো কোনো ভক্তের তো ভগবান দর্শন দেবেন এমন আকাঙ্ক্ষাও থাকে না। ভগবান যদি দর্শন দেন তাহলেও আনন্দ, না দিলেও আনন্দ ! তিনি তো সর্বদাই ভগবানের প্রসন্নতা ও কৃপা অনুভব করে আনন্দে বিভোর হয়ে থাকেন। এরূপ নিরপেক্ষ ভক্তের পিছু পিছু ভগবান অনুগমন করেন। ভগবান নিজে বলেছেন—

নিরপেক্ষং মুনিং শান্তং নির্বৈরং সমদর্শনম্।
অনুব্রজাম্যহং নিত্যং পূয়েয়েত্যঙ্ঘ্রিরেণুভিঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৪।১৬)

'যিনি নিরপেক্ষ (কারও সাহায্যের অপেক্ষা রাখেন না), সর্বদা আমার মনন করেন, শান্ত, দ্বেষবর্জিত এবং সবার প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন, সেই মহৎ ব্যক্তির পিছনে আমি সর্বদা এই কথা ভেবেই অনুগমন করি যে তাঁর পদধূলি আমার ওপর পতিত হোক এবং আমি পবিত্র হই।'

কোনো পদার্থের আকাঙ্ক্ষায় মানুষ যদি ভগবানে ভক্তি করে, তাহলে প্রকৃতপক্ষে সে সেই পদার্থটিরই ভক্ত হয়। কারণ (সেই বস্তুটির প্রতি লক্ষ্য থাকায়) সে সেই বস্তুটির জন্যই ভগবানে ভক্তি করে, ভগবানের জন্য নয়। কিন্তু ভগবানের উদারতা হল যে তিনি এদেরও তাঁর ভক্ত বলে স্বীকার করেন (গীতা ৭।১৬)। কারণ তারা ঈপ্সিত পদার্থের জন্য অন্য কারও ওপর নির্ভর না করে ভগবানের ওপরই নির্ভর করে তাঁর সাধন-ভজন করে। কেবল তাই নয়, ভগবান তাঁর ভক্ত ধ্রুবের ন্যায় সেই (অর্থার্থী) ভক্তের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে পরে তাকে সর্বতোভাবে নিঃস্পৃহ করে তোলেন।

'শুচিঃ'—শরীরে অহংভাব ও মমত্ববোধ (আমি ও আমার ভাব) না থাকায় ভক্তের দেহ অত্যন্ত পবিত্র হয়। অন্তঃকরণে (হৃদয়ে) রাগ-দ্বেষ, হর্ষ-শোক, কাম-ক্রোধাদি বিকার না থাকায় তার হৃদয়ও অত্যন্ত পবিত্র হয়। এরূপ (বাহ্যান্তরে অতি পবিত্র) ভক্তের দর্শন, স্পর্শ, বাক্য এবং চিন্তা দ্বারা অন্য ব্যক্তিরাও পবিত্র হয়ে থাকে । তীর্থ সকলকে পবিত্র করে, কিন্তু এরূপ ভক্ত তীর্থকেও তীর্থত্ব দান করেন অর্থাৎ তীর্থও তাঁর চরণ স্পর্শে পবিত্র হয় (কিন্তু ভক্তের মনে এমন অহংকার থাকে না)। এরূপ ভক্ত তাঁর অন্তরে বিরাজিত **'পবিত্রাণাং পবিত্রম্'** (পবিত্রকেও যিনি পবিত্র করে থাকেন) ভগবানের প্রভাবে তীর্থকেও মহাতীর্থে পরিণত করে বিচরণ করেন—**'তীর্থীকুর্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা'** (শ্রীমদ্ভাগবত ১।১৩।১০)

মহারাজ ভগীরথ গঙ্গাকে বলেছেন—

সাধবো ন্যাসিনঃ শান্তা ব্রহ্মিষ্ঠা লোকপাবনাঃ।
হরন্ত্যঘং তেঽঙ্গসঙ্গাৎ তেস্বাস্তে হ্যঘভিদ্ধরিঃ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ৯।৯।৬)

'মাতা ! যিনি ইহলোক-পরলোকের সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করে, সংসারে উপরত হয়ে নিজেতেই নিজে অবস্থিত ও ব্রহ্মনিষ্ঠ লোকপবিত্রকারী সাধু; তিনি তাঁর অঙ্গ স্পর্শ দ্বারা তোমার (পাপীদের অঙ্গ স্পর্শ থেকে আসা) সমস্ত পাপ দূর করে দেবেন। কারণ তাঁর হৃদয়ে পাপনাশন হরি সর্বদা নিবাস করেন।'

'দক্ষঃ'—যিনি করার উপযুক্ত কাজ করে নিয়েছেন, তিনিই দক্ষ। মানবজীবনের উদ্দেশ্যই হল ভগবদ্প্রাপ্তি। এজন্যই এই মনুষ্যদেহ পাওয়া। সুতরাং যিনি নিজ উদ্দেশ্য সম্পন্ন করেছেন অর্থাৎ ভগবানকে লাভ করেছেন তিনিই বাস্তবে দক্ষ অর্থাৎ বুদ্ধিমান। ভগবান বলেছেন—

এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধির্মনীষা চ মনীষিণাম্।
যৎ সত্যমনৃতেনেহ মর্ত্যেনাপ্নোতি মামৃতম্॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২৯।২২)

'যুক্তিশীল ব্যক্তিদের বিবেক এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা এতেই যে তারা এই বিনাশশীল, অসৎ (যা চিরস্থায়ী নয়) শরীরের সাহায্যে আমাকে অর্থাৎ অবিনাশী এবং সত্যতত্ত্বকে প্রাপ্ত করে।'

সাংসারিক দক্ষতা প্রকৃতপক্ষে দক্ষতা নয়। একভাবে দেখলে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অত্যধিক দক্ষতা আবদ্ধের কারণই হয়ে থাকে। কারণ এর ফলে চিত্তে জড় পদার্থের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়, যা মানুষের পতনের কারণ হয়।

সিদ্ধ ভক্তদের মধ্যে ব্যবহারিক (সাংসারিক) দক্ষতাও থাকে। কিন্তু ব্যবহারিক দক্ষতাকে পারমার্থিক অবস্থিতির কষ্টিপাথর মনে করা প্রকৃতপক্ষে সিদ্ধ ভক্তের অপমান করার তুল্য।

'উদাসীনঃ'—উদাসীনের অর্থ হল—উৎ + আসীন অর্থাৎ ওপরে বসা, তটস্থ, পক্ষপাতরহিত হওয়া।

বিবদমান দু'জন ব্যক্তির প্রতি যাঁর সর্বদা তটস্থ ভাব থাকে, তাঁকে উদাসীন বলা হয়। উদাসীন শব্দটি নির্লিপ্ততার দ্যোতক। যেমন উঁচু পর্বতে আসীন কোনো ব্যক্তির ওপর নীচে প্রজ্বলিত আগুন বা বন্যার কোনো প্রভাব পড়ে না, তেমনই কোনো অবস্থা বা ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদিরই প্রভাব ভক্তের ওপর পড়ে না, তিনি সর্বদা নির্লিপ্ত অবস্থানে থাকেন।

যে ব্যক্তি ভক্তদের হিত চান এবং তাঁদের অনুকূল আচরণ করেন, তাঁদের ভক্তদের মিত্র বলে বুঝতে হবে। আর যেসব ব্যক্তি ভক্তদের অহিত চায় এবং তাদের প্রতিকূল আচরণ করে, তাদের ভক্তদের শত্রু বলে বুঝতে হবে। এরূপ মিত্র এবং শত্রু বলে চিহ্নিত লোকেদের সঙ্গে ভক্তের বাহ্যিক ব্যবহারে পার্থক্য থাকতে পারে; কিন্তু তাঁর অন্তরে এই দু'প্রকার মানুষের প্রতি বিন্দুমাত্র ভিন্নভাব থাকে না। তিনি উভয় ক্ষেত্রেই সর্বতোভাবে উদাসীন বা নির্লিপ্ত থাকেন।

ভক্তের অন্তঃকরণে (চিত্তে) নিজের কোনো স্বাধীন সত্তা থাকে না। তিনি শরীরসহ সমস্ত জগৎই ভগবানের বলে মনে করেন। সেইজন্য তাঁর ব্যবহার পক্ষপাতিত্বহীন হয়।

'গতব্যথঃ'—কিছু পাওয়া যাক বা না যাক, কিছু আসুক বা চলে যাক, যাঁর চিত্তে দুঃখ-চিন্তা-শোকরূপ কোনো উদ্বেগ কখনো হয় না, সেই ভক্তকেই এখানে **'গতব্যথঃ'** বলা হয়।

এখানে 'ব্যথা' শব্দটি কেবলমাত্র দুঃখবাচক নয়। অনুকূলতা প্রাপ্তিতে চিত্তে যে প্রসন্নতা বা প্রতিকূল অবস্থা প্রাপ্তিতে চিত্তে বিষণ্ণতার যে আন্দোলন হয়, এই উভয়কেই 'ব্যথা' বলা হয়। সুতরাং অনুকূলতা বা প্রতিকূলতা থেকে চিত্তে উদ্ভূত রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ, হর্ষ-শোক ইত্যাদি বিকারের অভাবকেই এখানে **'গতব্যথঃ'** পদের দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে।

'সর্বারম্ভপরিত্যাগী'—ভোগ এবং সম্পদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নতুন নতুন কর্ম করাকে 'আরম্ভ' বলা হয়; যেমন—সুখভোগের উদ্দেশ্যে গৃহে নতুন নতুন জিনিস একত্র করা, কেনাকাটি করা, টাকা বাড়ানোর জন্য নতুন নতুন কাজ শুরু করা, ব্যবসাদি করা ইত্যাদি। যেসব কাজ ভোগ ও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে করা হয় ভক্ত তা সর্বপ্রকারে পরিত্যাগ করেন[১]।

যার উদ্দেশ্য হয় সংসার এবং যে বর্ণ, আশ্রম, বিদ্যা, বুদ্ধি, যোগ্যতা, পদ, অধিকার ইত্যাদির মধ্যে নিজ বিশেষত্ব দেখে, সে ভক্ত নয়। ভক্ত ভগবদ্নিষ্ঠ হন।

[১]অনারম্ভ অনিকেত অমানী। অনঘ অরোষ দচ্ছ বিগ্যানী॥ (শ্রীরামচরিতমানস ৭।৪৬।৩)

সুতরাং তাঁর নিজের বলে যে দেহ, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, ক্রিয়া, ফল ইত্যাদি তা সমস্তই ভগবানে অর্পিত হয়ে থাকে। ভগবানই এই দেহের প্রকৃত প্রভু। প্রকৃতি এবং তার কার্য সবই ভগবানের। তাই ভক্ত ভগবান ব্যতীত আর কাউকে নিজের বলে মনে করেন না। তিনি নিজের জন্য কখনো কিছুই করেন না। তাঁর সমস্তই কর্ম ভগবানের প্রসন্নতার নিমিত্ত করা হয়। ধন-সম্পত্তি, সুখ-আরাম, মান-মর্যাদা ইত্যাদির জন্য তাঁর দ্বারা কর্ম কখনোই করা হয় না।

যার মধ্যে পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তির জন্য সত্যকার আকাঙ্ক্ষা থাকে, সেই সাধক যে কোনো মার্গেরই হোন না কেন, ভোগবিলাস বা সম্পদ-সংগ্রহের লালসায় তিনি কখনো কোনো নতুন কর্ম আরম্ভ করেন না।

'যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ'—ভগবানের মধ্যে স্বভাবতঃই এমন এক মহা আকর্ষণ থাকে যে, ভক্ত স্বাভাবিকভাবে তাঁর প্রতি আকর্ষিত হয়, তাঁর প্রেমিক হয়ে ওঠে।

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত (১।৭।১০)

'যাঁদের চিৎ-জড়-গ্রন্থি জ্ঞানের সাহায্যে ছিন্ন হয়েছে, সেই আত্মারাম মুনিগণও ভগবানে অহেতুক (নিষ্কাম) ভক্তি করে থাকেন। কারণ ভগবানের এমনই গুণ যে তিনি সকল প্রাণীকেই তাঁর দিকে আকর্ষিত করেন।'

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে ভগবানের যদি এত আকর্ষণ, তাহলে সব মানুষ কেন তাঁর দিকে আকর্ষিত হয় না, সকলেই কেন তাঁর প্রেমিক হয় না ?

জীব প্রকৃতপক্ষে ভগবানেরই অংশ। তাই তার ভগবানের দিকে স্বাভাবিক এক আকর্ষণ থাকে। কিন্তু যে ভগবান প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত আপন, তাঁকে মানুষ নিজের বলে না মেনে, মন-বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়-শরীর, আত্মীয়-স্বজন, যেসব বস্তু নিজের নয় সেগুলিকে নিজের বলে মনে করে নেয়। তাই সে শরীর-নির্বাহ এবং সুখের আশায় সাংসারিক ভোগে আকৃষ্ট হয়ে যায় আর তার অংশী ভগবান থেকে দূরে সরে যায়, বিমুখ হয়ে পড়ে। তা সত্ত্বেও তাদের এই দূরত্ব বাস্তবিক বলে মনে করা উচিত নয়। কারণ বিনাশশীল ভোগাদিতে আকৃষ্ট হওয়ায়, মনে হয় তারা ভগবানের থেকে অনেক দূরে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। কারণ সেই ভোগ-বিলাসের মধ্যেও সর্বব্যাপী ভগবান পরিপূর্ণভাবে বিরাজমান। কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে অর্থাৎ ভোগাদিতে আসক্ত থাকায় তারা তার মধ্যে অবস্থিত ভগবানকে অনুভব করতে পারে না। যখন এই বিনাশশীল ভোগে তাদের আর আকর্ষণ থাকে না, তখন তারা স্বতঃই ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সংসারের প্রতি বিন্দুমাত্রও আসক্তি না থাকলে ভক্তের একমাত্র ভগবানের সঙ্গে স্বতঃই প্রেম হয়। এরূপ অনন্যপ্রেমী ভক্তকে ভগবান **'মদ্ভক্তঃ'** বলেছেন।

যে ভক্তের ভগবানে অনন্য প্রেম হয়, তিনি ভগবানের প্রিয় হন।

পরিশিষ্ট-ভাব—**'অনপেক্ষঃ'**— ঐ বস্তুটি না পেলে কী করে কাজ চলবে— এরূপ আকাঙ্ক্ষা ভক্তের থাকে না। ভক্তের দৃষ্টিতে সবই ভগবান, তাহলে তিনি আর কী আকাঙ্ক্ষা করবেন ? **'শুচিঃ'**— ভক্তের দর্শন, স্পর্শ, সম্ভাষণ অন্যকে শুদ্ধ করে থাকে। তাঁর স্পর্শযুক্ত বাতাসও পবিত্র হয়ে থাকে। যদিও জ্ঞানযোগী মহাপুরুষেরও এরূপ শুদ্ধি থাকে, তবুও ভক্তদের মধ্যে শুরু থেকেই সকলের প্রতি হিতৈষীভাব (**মৈত্রঃ করুণ এব চ**) বিশেষভাবে থাকায় পবিত্রতাও বিশেষভাবে থাকে। **'দক্ষঃ'**— ভক্ত তার করার উপযুক্ত কাজ করে নিয়েছেন অর্থাৎ তিনি কৃতকৃত্য, জ্ঞাত-জ্ঞাতব্য এবং প্রাপ্ত-প্রাপ্তব্য হয়েছেন, তাই তাঁকে 'দক্ষ' বলা হয়েছে।

'সর্বারম্ভপরিত্যাগী'—এই পদটি চতুর্দশ অধ্যায়ের পঁচিশতম শ্লোকে গুণাতীত মহাপুরুষদের জন্যও উদ্ধৃত হয়েছে— **'সর্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে'**। গুণাতীত মহাপুরুষদের মধ্যে কর্তৃত্ব না থাকায় তাঁরা সর্বারম্ভপরিত্যাগী হন এবং ভক্তের মধ্যে স্বার্থভাব এবং অহং-অভিমান না থাকায় তাঁরা সর্বারম্ভপরিত্যাগী হন। ভক্তের নিজের জন্য কিছু করার বাকি থাকে না, তাহলে আর তাঁরা কী করবেন ? তাঁদের দ্বারা কোনো কাজ আরম্ভ তো হতে পারে, কিন্তু এতে তাঁদের কোনো আসক্তি, প্রয়োজন বা আগ্রহ থাকে না, আরম্ভ হলেও ঠিক আছে, না হলেও ঠিক আছে ! তাঁরা এই দুয়েতেই সম থাকেন।

❖ ❖ ❖

সম্বন্ধ—সিদ্ধ ভক্তের পাঁচটি লক্ষণযুক্ত চতুর্থ প্রকরণ পরবর্তী শ্লোকে বিবৃত হয়েছে।

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৭ ॥

[**যঃ** (যিনি) ; **ন, হৃষ্যতি** (কখনো হৃষ্ট হন না) ; **ন, দ্বেষ্টি** (দ্বেষ করেন না) ; **ন, শোচতি** (শোক করেন না) ; **ন, কাঙ্ক্ষতি** (কোনো কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না) ; **যঃ** (যিনি) ; **শুভাশুভপরিত্যাগী** (শুভাশুভ কর্মে রাগ-দ্বেষ পরিত্যাগ করেছেন) ; **সঃ** (সেই) ; **ভক্তিমান্** (ভক্তিমান পুরুষ) ; **মে, প্রিয়ঃ** (আমার প্রিয়।)]

যিনি কখনো হৃষ্ট হন না, দ্বেষ করেন না, শোক করেন না, কোনো কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং যিনি শুভাশুভ কর্মে রাগ-দ্বেষ পরিত্যাগ করেছেন, সেইরূপ ভক্তিমান পুরুষ আমার প্রিয়॥ ১৭ ॥

ব্যাখ্যা—**'যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি'**—প্রধান বিকার চারপ্রকারের হয়—(১) রাগ (আসক্তি), (২) দ্বেষ, (৩) হর্ষ ও (৪) শোক[১]। সিদ্ধ ভক্তদের এই চারপ্রকার বিকার হয় না। তাঁদের এই অনুভব হয়ে থাকে যে, সংসার প্রতিমুহূর্তে বিনাশের দিকে যাচ্ছে এবং ভগবান হতে কখনো বিচ্ছেদ হয় না। জগতের সঙ্গে কখনো সংযোগ ছিল না, নেই, থাকবে না এবং থাকা সম্ভবও নয়। সুতরাং জগৎ-সংসারের কোনো পৃথক্ অস্তিত্ব নেই—এই বাস্তবিক সত্য জানা হলে (জড়ত্বের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ না থাকলে) ভক্তের শুধুমাত্র ভগবানের সঙ্গেই নিত্যসিদ্ধ সম্পর্ক অটলভাবে অনুভূত হতে থাকে। এইজন্যই হৃদয় সমস্ত রাগ-দ্বেষাদি বিকার থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হয়। ভগবানের দর্শন লাভ হলে এইসব বিকার সর্বতোভাবে দূর হয়।

সাধনাবস্থাতেও সাধক যেমন যেমন তাঁর সাধনাতে অগ্রগতি লাভ করেন, তেমনই তাঁর মধ্যে রাগ-দ্বেষাদি কম হতে থাকে। যেটি কম হয়, সেটি দূরও হয়ে যায়। তাই সাধনাবস্থাতেই যখন বিকার কম হতে থাকে, তখন সহজেই অনুমান করা যায় যে, সিদ্ধাবস্থায় ভক্তদের মধ্যে আর কোনো বিকার থাকে না, পূর্ণভাবে তা দূর হয়।

রাগ ও দ্বেষের দুটি পরিণাম—হর্ষ এবং শোক। যার প্রতি (অনু)-রাগ হয়, তার সংযোগে এবং যার প্রতি (বি)-দ্বেষ হয়, তার বিয়োগে 'হর্ষ' হয়ে থাকে, অপরপক্ষে যার প্রতি (অনু)-রাগ হয় তার বিয়োগে বা বিয়োগের আশঙ্কায় এবং যায় প্রতি (বি)-দ্বেষ হয় তার সংযোগে বা সংযোগের আশঙ্কায় 'শোক' হয়। সিদ্ধ ভক্তদের মধ্যে রাগ-দ্বেষের অত্যন্ত অভাব হওয়ায় তাঁদের এক স্বাভাবিক সাম্যাবস্থা নিরন্তর বজায় থাকে। তাই তাঁরা এইসব বিকার থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হন।

যেমন, রাত্রিকালে অন্ধকারে দীপ জ্বালাবার ইচ্ছা হয়, দীপ জ্বালালে আনন্দ হয়, যে ব্যক্তি দীপ নিভিয়ে দেয় তার ওপর দ্বেষ বা ক্রোধ আসে এবং পুনরায় দীপ কী করে জ্বালানো যায়—তার চিন্তা হয়। রাত্রিকালে এই চারটি কথা মনে হয়। কিন্তু মধ্যাহ্নে সূর্য তাপপ্রদান করে, তাই দীপ জ্বালাবার ইচ্ছা হয় না এবং দীপ জ্বালালে আনন্দ হয় না আর দীপ নিভিয়ে দিলেও দ্বেষ বা ক্রোধ হয় না, (অন্ধকার না থাকায়) আলোর অভাবের কথা মনেও আসে না। এইরূপ ভগবানে বিমুখ হয়ে সংসারের শরণ নিলে শরীর-নির্বাহ এবং সুখের জন্য অনুকূল পদার্থ, পরিস্থিতি ইত্যাদি পাবার আকাঙ্ক্ষা জন্মায় ও সেগুলি পেলে হর্ষ হয় ; এগুলির প্রাপ্তিতে বাধা প্রদানকারীর প্রতি দ্বেষ বা ক্রোধ জন্মায় আর না পেলে 'কী করে পাওয়া যায়' তাই চিন্তা হয়। কিন্তু যিনি (মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায়) ভগবদ্প্রাপ্তি লাভ করেছেন, তাঁর মধ্যে কখনো এই বিকার থাকে না। তিনি পূর্ণকাম হয়ে যান। সুতরাং তাঁর সংসারের কোনো প্রয়োজন থাকে না।

'শুভাশুভপরিত্যাগী'—মমত্ববোধ, আসক্তি ও ফলেচ্ছারহিত হয়ে শুভকর্ম করার জন্যই ভক্তের কর্মগুলি 'অকর্ম' হয়ে ওঠে। তাই ভক্তকে শুভকর্ম ত্যাগীও বলা হয়। সর্বতোভাবে রাগ-দ্বেষ বর্জিত হওয়ায় তাঁর দ্বারা

[১]প্রচলিত অর্থে কারও মৃত্যুতে মনে যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাকে 'শোক' নামে অভিহিত করা হয় ; কিন্তু এখানে 'শোক' শব্দের অর্থ হল অন্তরে দুঃখরূপ 'বিকার'।

কোনো অশুভ কর্ম হয়ই না। অশুভ কর্ম করার প্রধান কারণই হল কামনা, মমতা ও আসক্তি আর ভক্তের মধ্যে এগুলির সম্পূর্ণ অভাব থাকে। সেইজন্য তাঁকে অশুভ কর্মত্যাগীও বলা হয়।

ভক্তের শুভকর্মে অনুরাগ থাকে না এবং অশুভ কর্মেও দ্বেষ থাকে না। তাঁর দ্বারা স্বাভাবিকভাবেই শাস্ত্রবিহিত শুভকর্মের আচরণ এবং অশুভ (নিষিদ্ধ এবং কাম্য) কর্মগুলি পরিত্যক্ত হয়, রাগ-দ্বেষপূর্বক নয়। সর্বতোভাবে যিনি রাগ-দ্বেষ পরিত্যাগ করেন, তিনিই সত্যকার ত্যাগী।

কর্ম মানুষকে আবদ্ধ করে না, বরং কর্মে যে রাগ- দ্বেষ তাই আবদ্ধ করে। ভক্তের সকল কর্মই রাগ- দ্বেষরহিত হয়, তাই তিনি শুভাশুভ সমস্ত কর্মের পরিত্যাগী।

'শুভাশুভপরিত্যাগী' পদটির অর্থ শুভ ও অশুভ কর্মফলত্যাগীও ধরা যায়। কিন্তু এই শ্লোকের পূর্বার্ধে **'ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি'** পদটির সম্বন্ধও শুভ (অনুকূল) এবং অশুভ (প্রতিকূল) কর্মফল ত্যাগেই হয়। তাই এখানে **'শুভাশুভপরিত্যাগী'** পদের অর্থ শুভাশুভ কর্মফলের ত্যাগী মনে করলে পুনরুক্তি দোষ আসে। সেইজন্য এই পদটির অর্থ শুভ এবং অশুভ কর্মে রাগ-দ্বেষ পরিত্যাগী বলে মনে করতে হবে।

'ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ'—ভক্তের ভগবানের প্রতি অত্যন্ত প্রিয় ভাব থাকে। তাঁর দ্বারা স্বাভাবিকভাবে ভগবানের চিন্তন, স্মরণ, ভজন হয়ে থাকে। এইরূপ ভক্তদের এখানে 'ভক্তিমান্' বলা হয়েছে।

ভক্তের ভগবানের প্রতি অনন্যপ্রেম হয়, তাই তিনি ভগবানের প্রিয় হয়ে থাকেন।

পরিশিষ্ট-ভাব—হর্ষ (হৃষ্যতি) এবং শোক (শোচতি), রাগ (কাঙ্ক্ষতি) এবং দ্বেষ (দ্বেষ্টি)—এগুলি দ্বন্দ্ব। ভক্তের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব থাকে না, তিনি নির্দ্বন্দ্ব হন। নারদ ভক্তিসূত্রে আছে—

যৎপ্রাপ্য ন কিঞ্চিদ্ বাঞ্ছতি ন শোচতি ন দ্বেষ্টি ন রমতে নোৎসাহী ভবতি ॥ ৫॥

'যে ভক্তি লাভ করলে ভক্ত কোনো বস্তু কামনা করেন না, শোক করেন না, দ্বেষ করেন না, কোনো বস্তুতে আসক্ত হন না এবং তিনি কোনো বস্তুর জন্য উৎসাহী হন না।'

*** *** ***

সম্বন্ধ—এবার পরবর্তী দুটি শ্লোকে সিদ্ধ ভক্তদের দশটি লক্ষণসহ পঞ্চম এবং অন্তিম প্রকরণটি জানাচ্ছেন।

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ॥ ১৮ ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥ ১৯ ॥

[**শত্রৌ, চ, মিত্রে** (শত্রু ও মিত্রে) ; **তথা, মানাপমানয়োঃ** (মান-অপমানে) ; **শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু** (শীত উষ্ণ এবং সুখ ও দুঃখে) ; **সমঃ, চ** (সম, এবং) ; **সঙ্গবিবর্জিতঃ** (আসক্তিবর্জিত) ; **তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ** (যিনি নিন্দাস্তুতিকে সমান জ্ঞান করেন) ; **মৌনী** (মননশীল) ; **যেন, কেনচিৎ** (যে কোনো অবস্থাতেই) ; **সন্তুষ্টঃ** (সন্তুষ্ট) ; **অনিকেতঃ** (আবাসস্থল ও দেহাদিতে মমত্ব ও আসক্তি বর্জিত) ; **স্থিরমতিঃ** (স্থির বুদ্ধিসম্পন্ন) ; **ভক্তিমান্, নরঃ** (সেই ভক্তিমান মানুষ) ; **মে, প্রিয়ঃ** (আমার প্রিয়।)]

যিনি শত্রু ও মিত্রে, মানে অপমানে, শীত-উষ্ণে (অনুকূলতা ও প্রতিকূলতায়), সুখ-দুঃখে সম এবং আসক্তিবর্জিত এবং যিনি নিন্দাস্তুতিকে সমানরূপে জ্ঞান করেন, মননশীল, যেকোনো অবস্থাতেই (শরীর নির্বাহতে) সন্তুষ্ট, আবাসস্থল এবং দেহাদিতে মমত্ব ও আসক্তিবর্জিত, স্থির বুদ্ধিসম্পন্ন, সেই ভক্তিমান ব্যক্তি আমার প্রিয়॥ ১৮-১৯ ॥

ব্যাখ্যা—'সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ'—ভগবান এখানে ভক্তগণের হৃদয়ে মানুষের প্রতি যে সমত্ব ভাব থাকে তার বর্ণনা করেছেন। সর্বত্র ভগবদ্‌বুদ্ধি হওয়ায় ও রাগ-দ্বেষ বর্জিত হওয়ায় সিদ্ধ ভক্তদের কারও প্রতি শত্রু বা মিত্র ভাব

থাকে না। সাধারণ মানুষই তাঁদের ব্যবহারে নিজ স্বভাব অনুযায়ী অনুকূলতা বা প্রতিকূলতা আরোপ করে তার প্রতি মিত্রভাব বা শত্রুভাব পোষণ করে থাকে। সাধারণ লোকের কথা শুধু নয়, সতর্ক সাধকগণেরও ওইসব সিদ্ধ ভক্তের প্রতি মিত্রতা ও শত্রুতার ভাব থাকতে পারে। কিন্তু ভক্ত নিজের মধ্যে সদাই পূর্ণভাবে সম থাকেন। তাঁর চিত্তে কখনো কারও প্রতি শত্রু-মিত্রের ভাব উৎপন্ন হয় না।

মনে করা যাক যে, ভক্তের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন এবং মিত্রভাবাপন্ন দুই ব্যক্তির ধনবণ্টন সম্বন্ধিত কোনো বিবাদ উৎপন্ন হল এবং তারা উভয়ে এটি নিষ্পত্তির জন্য ভক্তের কাছে গেল। ভক্ত ধনবণ্টন করার সময় শত্রুভাবাপন্ন ব্যক্তিকে কিছু বেশি এবং মিত্রভাবাপন্ন ব্যক্তিকে কিছু কম অর্থ প্রদান করলেন। যদিও ভক্তের এই ব্যবহার বিষম দেখায়, কিন্তু শত্রুভাবাপন্ন ব্যক্তি এই নিষ্পত্তিতে সমতা দেখে যে, ইনি পক্ষপাত বর্জিতভাবে ধন ভাগ করেছেন। সুতরাং ভক্তের এই ব্যবহার বিষমতা (পক্ষপাতিত্ব) দেখালেও প্রকৃতপক্ষে একে (সমত্ব উৎপন্নকারী হওয়ায়) সমতা-ই বলা হয়।

উপরিউক্ত পদটি দ্বারা এই প্রমাণিত হয় যে সিদ্ধ ভক্তের সঙ্গে লোকেরা (নিজ নিজ ভাবানুযায়ী) শত্রুতা বা মিত্রতা করে থাকে এবং তাঁর ব্যবহারে নিজেদের তার শত্রু বা মিত্র ভেবে নেয়। তাই তাঁকে এখানে শত্রু-মিত্র রহিত না বলে 'শত্রু-মিত্রে সম' বলা হয়েছে।

'তথা মানাপমানয়োঃ'—মান-অপমান পরকৃত ক্রিয়া, যা শরীরের প্রতি হয়। ভক্তের নিজের বলে যে দেহ, তাতে অহংভাবও থাকে না এবং মমত্ববোধও থাকে না। তাই শরীরের মান-অপমান হলেও ভক্তের চিত্তে কোনো বিকার (হর্ষ বা শোক) উৎপন্ন হয় না। তিনি নিত্য-নিরন্তর সমতায় স্থির থাকেন।

'শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ'—এই পদটির দুই স্থানে সিদ্ধ ভক্তের সমতার কথা জানানো হয়েছে—

(১) শীত-উষ্ণে সমতা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলি নিজ নিজ বিষয়ে সংযুক্ত হলে চিত্তে কোনো বিকার উৎপন্ন না হওয়া।

(২) সুখ-দুঃখে সমতা অর্থাৎ ধনাদি পদার্থের প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তিতে চিত্তে কোনো বিকার না আসা।

'শীতোষ্ণ' কথাটির অর্থ হল 'ঠাণ্ডা-গরম', এটি ত্বক্-ইন্দ্রিয়ের বিষয়। ভক্ত শুধুমাত্র ত্বক্-ইন্দ্রিয়ের বিষয়েই সম থাকেন, তা নয়। তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয়েই সম থাকেন। তাই **'শীতোষ্ণ'** শব্দটি এখানে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয়েরই বাচক। প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় নিজ নিজ বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হলে ভক্তের ওইসব (অনুকূল বা প্রতিকূল) বিষয়গুলির জ্ঞান হলেও তাঁর চিত্তে হর্ষ-শোকাদি বিকার উৎপন্ন হয় না। তিনি সর্বদাই সমভাবে থাকেন।

সাধারণ মানুষেরা ধনাদি অনুকূল পদার্থের প্রাপ্তিতে সুখ ও প্রতিকূল পদার্থের প্রাপ্তিতে দুঃখ অনুভব করে। কিন্তু সেইসব পদার্থের প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তিতে সিদ্ধ ভক্তের চিত্তে কখনো বিন্দুমাত্র রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ, হর্ষ-শোকাদি বিকার উৎপন্ন হয় না। তিনি প্রত্যেক পরিস্থিতিতেই সমভাবে বিরাজ করেন।

'সুখ-দুঃখে সম' থাকা ও 'সুখ-দুঃখ রহিত' হওয়া—গীতায় দুটিই এক অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। সুখ-দুঃখের পরিস্থিতি অবশ্যম্ভাবী ; সুতরাং তার থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। তাই ভক্ত অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সমভাবে থাকেন। তবে অনুকূল ও প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য চিত্তে যে হর্ষ-শোক উৎপন্ন হয়, তা থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব। এই দৃষ্টিতে গীতায় যেখানে 'সুখ-দুঃখে সম' হওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেখানে সুখ-দুঃখের পরিস্থিতিতে সম বলে বুঝতে হবে আর যেখানে 'সুখ-দুঃখ রহিত' হওয়ার কথা এসেছে, সেখানে (অনুকূল ও প্রতিকূল পরিস্থিতির থেকে উদ্ভূত) হর্ষ-শোক রহিত বলে বুঝতে হবে।

'সঙ্গবিবর্জিতঃ'—**'সঙ্গ'** শব্দটির অর্থ সম্বন্ধ (সংযোগ) ও আসক্তি দুটিই হয়। মানুষের পক্ষে স্বরূপতঃ সমস্ত পদার্থের সঙ্গ বা সম্বন্ধ পরিত্যাগ করা সম্ভব নয়। কারণ মানুষ যে পর্যন্ত জীবিত থাকে, সেই পর্যন্ত শরীর-মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদি তার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। তবে শরীর থেকে পৃথক্ কিছু পদার্থ বাহ্যিকভাবে ত্যাগ করা সম্ভব। যেমন, কোনো ব্যক্তি স্বরূপতঃ প্রাণী ও পদার্থের সঙ্গ পরিত্যাগ করেছে কিন্তু তার চিত্তে যদি সেই প্রাণী ও পদার্থের প্রতি বিন্দুমাত্র আসক্তি থাকে, তবে সেই প্রাণী ও পদার্থ থেকে দূরে থাকলেও বাস্তবে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় থাকেই। অন্যদিকে, চিত্তে যদি প্রাণী বা পদার্থের জন্য বিন্দুমাত্র আসক্তি না থাকে, তাহলে কাছে থাকলেও প্রকৃতপক্ষে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে না। পদার্থগুলি বাহ্যতঃ ত্যাগ করলেই যদি মুক্তি হত, তাহলে মৃত্যুপথগামী

প্রত্যেক ব্যক্তিই মুক্তিলাভ করত। কারণ সে তো তার শরীরও ত্যাগ করেছে। কিন্তু ব্যাপার তা নয়। চিত্তে আসক্তি থাকলে শরীর ত্যাগ করলেও সংসার-বন্ধন থেকেই যায়। তাই সাংসারিক আসক্তিই মানুষকে বন্ধনে আবদ্ধ করে। তবে জাগতিক প্রাণী-পদার্থের সঙ্গে বাহ্যিক সম্বন্ধ থাকলেই তা যে বন্ধনকারী হবে, তা নয়।

আসক্তি দূর করার জন্য পদার্থগুলি বাহ্যিকভাবে ত্যাগ করাও একপ্রকার সাধনা হতে পারে ; কিন্তু আসল প্রয়োজন আসক্তি সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা। সংসারের প্রতি যদি বিন্দুমাত্রও আসক্তি থাকে, তবে তার জন্য চিন্তা অবশ্যই হবে এবং সেই আসক্তি ক্রমশঃ সাধককে কামনা, ক্রোধ, মূঢ়তা ইত্যাদির দ্বারা পতনের গর্তে ফেলার হেতু হয়ে দাঁড়াবে (গীতা ২।৬২-৬৩)।

ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ের উনষাটতম শ্লোকে **'পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে'** পদটির দ্বারা ভগবদ্প্রাপ্তি হলে আসক্তি সর্বতোভাবে নিবৃত্ত হয় বলে জানিয়েছেন। ভগবদ্প্রাপ্তি হওয়ার আগেও আসক্তির নিবৃত্তি হতে পারে, কিন্তু ভগবদ্প্রাপ্তির পর তো আসক্তি সর্বতোভাবে নিবৃত্ত হয়েই যায়। ভগবদ্প্রাপ্ত মহাপুরুষেরা আসক্তি হতে সর্বতোভাবে মুক্ত হয়ে থাকেন। কিন্তু ভগবদ্প্রাপ্তির আগে সাধনা-বস্থাতেও আসক্তির সর্বতোভাবে যে অভাব হবে না— এমন কোনো নিয়ম নেই। সাধনাবস্থায়ও আসক্তি সর্বতোভাবে দূর হয়ে সাধকের অচিরাৎ ভগবদ্প্রাপ্তি হতে পারে (গীতা ৫।২১, ১৬।২২)।

আসক্তি তো পরমাত্মার শুদ্ধ চেতন অংশে থাকে না, থাকে জড় (প্রকৃতি)-তে। সেটি জড় এবং চেতনের সম্বন্ধরূপ 'আমি' ভাবের মেনে নেওয়া সম্বন্ধতে থাকে। সেই আসক্তি বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়াদি এবং বিষয় (পদার্থ)গুলিতে প্রকাশ পায়। যদি সাধকের 'আমি' ভাবে অবস্থিত এই মেনে নেওয়া আসক্তি দূর হয় তবে অন্য স্থানে প্রতীত হওয়া আসক্তিও স্বাভাবিকভাবেই দূর হয়ে যায়। অবিবেকই হল আসক্তির কারণ। নিজ বিবেককে যথাযথভাবে গুরুত্ব না দিলে সাধকের মধ্যে আসক্তি থেকে যায়। ভক্তদের মধ্যে অবিবেক থাকে না। তাই তাঁরা সর্বতোভাবে আসক্তিবর্জিত হন।

নিজ অংশী ভগবান হতে বিমুখ হয়ে ভ্রমবশতঃ জগৎ-সংসারকে নিজের বলে মেনে নিলে সংসারে অনুরাগ আসে এবং অনুরাগ থেকে সংসারে আসক্তি জন্মায়। সংসারের প্রতি এই মেনে নেওয়া আত্মীয়তাবোধ সর্বতোভাবে দূর হলে বুদ্ধি সমত্বলাভ করে এবং বুদ্ধি সমত্বলাভ করলে স্বয়ং আসক্তিরহিত হয়।

মর্মার্থ

প্রকৃতপক্ষে জীবমাত্রেরই ভগবানের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ (প্রেম) থাকে। যতক্ষণ সংসারের সঙ্গে ভ্রমবশতঃ মেনে নেওয়া আপনভাবের সম্পর্ক থাকে, ততক্ষণ সেই অনুরাগ প্রকটিত হয় না, বরং সংসারের আসক্তিরূপে তা প্রতীত হয়। সংসারে আসক্তি থাকলেও ভগবানে অনুরাগ দূর হয় না। অনুরাগ প্রকটিত হলেই আসক্তি (সূর্যোদয়ে তমোনাশের ন্যায়) সর্বতোভাবে দূর হয়। সংসারের প্রতি যেমন যেমন বৈরাগ্য উৎপন্ন হতে থাকে, তেমন তেমনই ভগবানে অনুরাগ প্রকটিত হতে থাকে। নিয়ম হল যে, আসক্তি দূর হলে বৈরাগ্য স্বয়ংই শান্ত হয়ে যায়, যেরূপ আগুন কাঠকে পুড়িয়ে শান্ত হয়। তেমনই আসক্তি ও বৈরাগ্য না থাকলে অনুরাগের (ভগবদপ্রেমের) স্রোত স্বতঃই স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হতে থাকে। তার জন্য কোনোপ্রকার চেষ্টা করতে হয় না। তখন ভক্ত সর্বপ্রকারেই ভগবানে পূর্ণ সমর্পিত হয়ে থাকেন। তার সকল কর্মই তখন ভগবানের প্রীত্যর্থে হয়ে থাকে। ভগবান এতে প্রসন্ন হয়ে সেই ভক্তকে তাঁর প্রেম প্রদান করেন। সেই প্রেমও ভক্ত ভগবানেই অর্পণ করেন। তাতে ভগবান আরও আনন্দিত হয়ে তাঁকে পুনর্বার প্রেম প্রদান করলে, ভক্তও তা পুনরায় ভগবানকে প্রদান করেন। এইভাবে ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে প্রতিক্ষণ ক্রমবর্ধমান প্রেমের আদান-প্রদানের লীলা চলতেই থাকে।

'তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ'—নিন্দা-স্তুতি মুখ্যতঃ নামেরই হয়ে থাকে। এটিও পরকৃত ক্রিয়া। লোকেরা নিজ নিজ স্বভাবানুসারে ভক্তদের নিন্দা বা স্তুতি করে থাকে। ভক্তদের নিজের বলে যে নাম ও শরীর তাতে বিন্দুমাত্র অহংবোধ এবং মমতা থাকে না। তাই নিন্দা-স্তুতির কোনো প্রভাবই তাঁদের ওপর পড়ে না। ভক্তের তাঁর স্তুতি বা প্রশংসাকারীর প্রতি যেমন কোনো অনুরাগ হয় না তেমনি নিন্দাকারীর ওপরও কোনো বিদ্বেষ আসে না। তাঁর উভয়ের প্রতিই সমবুদ্ধি থাকে।

সাধারণ মানুষদের মধ্যে নিজ প্রশংসা শোনার আগ্রহ

থাকে, তাই তারা নিজ নিন্দা শুনে দুঃখ পায় এবং প্রশংসা শুনে খুশি হয়। অপরপক্ষে সাধক পুরুষেরা (যাঁরা প্রশংসা আশা করেন না) নিন্দা শুনে সতর্ক হন আর প্রশংসাতে লজ্জিত হন। কিন্তু নিজ নামের সঙ্গে বিন্দুমাত্র আত্মীয়তাবোধ না থাকায় সিদ্ধ ভক্তগণ এই উভয় ভাবই বর্জিত হন অর্থাৎ নিন্দা ও স্তুতিতে তাঁরা সমভাবে বিরাজ করেন। তবে তাঁরা কখনো কখনো লোকসংগ্রহের নিমিত্ত সাধকদের (নিন্দাতে সতর্ক ও স্তুতিতে লজ্জিত হওয়ার) মতো ব্যবহার করতে পারেন।

ভক্তের সর্বত্র ভগবদ্‌বুদ্ধি থাকার জন্যও তাঁর নিন্দা-স্তুতিকারীদের মধ্যে কোনো ভেদভাব থাকে না। এরূপ ভেদ-ভাব না থাকার জন্য মনে হয় যে তিনি নিন্দা ও স্তুতিতে সমবুদ্ধিসম্পন্ন।

ভক্তের দ্বারা অশুভ-কর্ম হয়ই না আর শুভ-কর্ম হওয়ার জন্য তিনি ভগবানকেই তার হেতু বলে মনে করেন। তা সত্ত্বেও যদি কেউ তাঁর নিন্দা বা স্তুতি করেন, তাহলেও তাঁর মনে এর জন্য কোনো বিকার উৎপন্ন হয় না।

'মৌনী'—সিদ্ধ ভক্তের দ্বারা স্বতঃ স্বাভাবিকভাবে ভগবদ্‌স্বরূপের মনন হতে থাকে, তাই তাঁকে 'মৌনী' বা মননশীল বলা হয়েছে। চিত্তে উদ্ভূত প্রত্যেক বৃত্তিতে তিনি **'বাসুদেবঃ সর্বম্'** (৭।১৯) 'সবকিছুই ভগবান'—এইভাবে দেখে থাকেন। সেইজন্য তাঁর দ্বারা নিরন্তর ভগবানের মনন হয়ে থাকে।

এখানে 'মৌনী' পদের অর্থ 'বাক্যে মৌন থাকা' কথাটি মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। কারণ এরূপ মনে করলে বাক্যের দ্বারা ভক্তি প্রচারকারী ভক্তপুরুষগণকে আর ভক্ত বলা যায় না। তাছাড়া বাক্যে মৌন থাকলেই যদি ভক্ত হওয়া সম্ভব হত, তাহলে ভক্ত হওয়া খুবই সোজা হয়ে যেত এবং অসংখ্য লোক ভক্ত হয়ে উঠত ; কিন্তু সংসারে ভক্ত বেশি দেখা যায় না। এতদ্‌ব্যতিরেকে আসুরী স্বভাবসম্পন্ন দাম্ভিক ব্যক্তিগণও হঠতাপূর্বক মৌন থাকতে পারে। কিন্তু এখানে ভগবদ্‌প্রাপ্ত সিদ্ধ ভক্তদের লক্ষণের কথাই বলা হচ্ছে। তাই এইস্থানে **'মৌনী'** পদটির অর্থ হিসাবে 'ভগবদ্‌স্বরূপ মননকারী' বলে মনে করাই যুক্তিসঙ্গত।

'সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ'—অন্যান্য ব্যক্তিদের কাছে ভক্তকে **'সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ'** অর্থাৎ প্রারব্ধ অনুসারে শরীরনির্বাহের জন্য যা কিছু পাওয়া যায়, তাতেই সন্তুষ্ট বলে প্রতীত হয় ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভক্তের সন্তুষ্টির কারণ কোনো সাংসারিক পদার্থ বা পরিস্থিতি নয়। ভগবানে অনুরাগ হওয়ার জন্য তিনি নিত্য-নিরন্তর ভগবানেই সন্তুষ্ট থাকেন। এই সন্তুষ্টিবশতঃই তিনি সংসারের সমস্ত অনুকূল বা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সমভাবে অবস্থান করেন। কারণ তিনি অনুভব করেন যে প্রত্যেক অনুকূল বা প্রতিকূল পরিস্থিতিই ভগবানের মঙ্গলময় বিধান। এইভাবে প্রত্যেক পরিস্থিতিতে সর্বদা সন্তুষ্ট থাকায় তাঁকে **'সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ'** বলা হয়েছে।

'অনিকেতঃ'—যাঁর কোনো নিকেতন অর্থাৎ বাসস্থান নেই, তিনিই যে 'অনিকেত' হবেন—এমন কোনো কথা নেই। গৃহস্থই হোন বা সাধু-সন্ন্যাসী, যাঁদের নিজ বাসস্থানের প্রতি কোনো 'আসক্তি বা মমত্ববোধ নেই, তাঁরা সকলেই অনিকেত।' ভক্তের বাসস্থানে এবং শরীরে (স্থূল-সূক্ষ্ম এবং কারণ শরীরে) বিন্দুমাত্রও আপনভাব ও আসক্তি হয় না। তাই তাঁকে **'অনিকেতঃ'** বলা হয়েছে।

'স্থিরমতিঃ'—ভক্তের বুদ্ধিতে ভগবত্ত্বের সত্তা ও স্বরূপের বিষয়ে কোনো সংশয় বা বিপর্যয় (বিপরীত জ্ঞান) হয় না। সুতরাং তাঁর বুদ্ধি ভগবদ্‌তত্ত্বজ্ঞান থেকে কখনো কোনো অবস্থাতেই বিচলিত হয় না। সেইজন্য তাঁকে **'স্থিরমতিঃ'** বলা হয়। ভগবদ্‌তত্ত্ব জানার জন্য তাঁর কখনো কোনো প্রমাণ বা শাস্ত্র-বিচার, স্বাধ্যায় ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা থাকে না। কারণ তিনি স্বাভাবিকভাবে ভগবত্ত্বে তল্লীন হয়ে থাকেন।

স্থিরবুদ্ধি না হওয়ার প্রধান কারণ হল কামনা (গীতা ২।৪৪)। তাই কামনাগুলি ত্যাগ করলেই স্থিরবুদ্ধি হওয়া সম্ভব (গীতা ২।৫৫)। চিত্তে সাংসারিক (সংযোগজনিত) সুখের কামনা থাকলে সংসারে আসক্তি হয়। জগৎ-সংসার অসত্য বা মিথ্যা বলে জানলেও এটি দূর হয় না ; যেমন—সিনেমার দৃশ্যাবলী মিথ্যা জানলেও তাতে আসক্তি হয় অথবা অতীতকালের কথা স্মরণ করার সময় মনে আসা দৃশ্যগুলি মিথ্যা জেনেও তাতে আসক্তি জন্মে। তাই যতক্ষণ অন্তরে জাগতিক সুখের কামনা থাকে, ততক্ষণ জগৎকে মিথ্যা বলে মেনে নিলেও জাগতিক আসক্তি দূর হয় না। আসক্তির দ্বারা জগতের পৃথক্ সত্তা দৃঢ় হয়। জাগতিক সুখের কামনা মিটলে আসক্তি স্বতঃই দূর হয়। আসক্তি দূর হলে জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অভাব

ঘটে এবং বুদ্ধি একমাত্র ভগবত্ত্বে স্থির হয়।

'ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ'—**'ভক্তিমান্'** পদটিতে 'ভক্তি' শব্দের সঙ্গে নিত্যযোগের অর্থে 'মতুপ্' প্রত্যয় হয়েছে। এর তাৎপর্য হল যে মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে 'ভক্তি' (ভগবদ্‌প্রেম) থাকে। কিন্তু তাদের ভুল এই হয় যে তারা ভগবানের পরিবর্তে সংসারে ভক্তি করতে থাকে। তাই তারা স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্ত যে ভগবদ্‌ভক্তির রস তা অনুভব করে না, নীরসভাবে জীবন কাটায়। সিদ্ধ-ভক্ত সর্বদা ভক্তিরসে তল্লীন থাকেন। তাই তাঁকে 'ভক্তিমান্' বলা হয়েছে। এরূপ ভক্তিমান মানুষই ভগবানের প্রিয় হয়ে থাকেন।

'নরঃ' পদটি ব্যবহারের অর্থ হল, ভগবানকে লাভ করে যিনি তাঁর মনুষ্যজীবন সার্থক করেছেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে নর (মানুষ) নামের উপযুক্ত। যিনি মনুষ্য- দেহ লাভ করে সাংসারিক ভোগ এবং সম্পদ-সংগ্রহে ব্যাপৃত থাকেন, তিনি নর (মানুষ) বলার যোগ্য নন।

[এই দুটি শ্লোকে ভক্তদের সর্বদা সমভাবে অবস্থিত থাকার কথা বলা হয়েছে। শত্রু-মিত্র, মান-অপমান, শীত-উষ্ণ (অনুকূলতা-প্রতিকূলতা), সুখ-দুঃখ এবং নিন্দা-স্তুতি—এই পাঁচপ্রকার দ্বন্দ্বে সমত্ব এলেই সাধক পূর্ণতঃ সমভাবে স্থিত বলা যায়।]

প্রকরণ-সম্পর্কিত বিশেষ কথা

ভগবান প্রথম প্রকরণের অন্তর্গত ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শ্লোকে সিদ্ধ ভক্তদের লক্ষণ বর্ণনা করে শেষে **'যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ'** কথাটি বলেছেন, দ্বিতীয় প্রকরণের অন্তর্গত পঞ্চদশ শ্লোকের শেষে **'যঃ স চ মে প্রিয়ঃ'** কথাটি বলেছেন, তৃতীয় প্রকরণের অন্তর্গত ষোড়শ শ্লোকের শেষে বলেছেন **'যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ'**, চতুর্থ প্রকরণের অন্তর্গত সপ্তদশ শ্লোকের শেষে **'ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়'** বলেছেন এবং অন্তিম ও পঞ্চম প্রকরণের অন্তর্গত অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শ্লোকের শেষে বলেছেন **'ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ'**। এইভাবে পাঁচবার ভগবান পৃথকভাবে **'মে প্রিয়ঃ'** পদটির দ্বারা সিদ্ধ ভক্তদের লক্ষণগুলিকে পাঁচভাগে ভাগ করেছেন। সুতরাং সাতটি শ্লোকে কথিত সিদ্ধ ভক্তদের লক্ষণগুলি একই প্রকরণের অন্তর্গত বলে মনে করা উচিত নয়। তার প্রধান কারণ হল যে, যদি এগুলি এক প্রকরণই হত, তবে এক লক্ষণই বারংবার না বলে একবারই বলা হত এবং **'মে প্রিয়'** পদটিও একবারই উল্লেখ করা হত।

পাঁচ প্রকরণের অন্তর্গত সিদ্ধ ভক্তদের লক্ষণে রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ এবং হর্ষ-শোক না থাকার কথা বলা হয়েছে। যেমন, প্রথম প্রকরণে **'নির্মমঃ'** পদ দ্বারা রাগ, **'অদ্বেষ্টা'** পদ দ্বারা দ্বেষ এবং **'সমদুঃখসুখঃ'** পদ দ্বারা হর্ষ-শোকের অনস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকরণে **'হর্ষামর্ষ-ভয়োদ্বেগৈঃ'** পদটির দ্বারা রাগ-দ্বেষ এবং হর্ষ-শোকের অনস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে। তৃতীয় প্রকরণে **'অনপেক্ষঃ'** পদে রাগ, **'উদাসীনঃ'** পদে দ্বেষ এবং **'গতব্যথঃ'** পদে হর্ষ-শোক না থাকার কথা বলা হয়েছে। চতুর্থ প্রকরণে **'ন কাঙ্ক্ষতি'** পদের দ্বারা রাগের, **'ন দ্বেষ্টি'** পদের দ্বারা দ্বেষের এবং **'ন হৃষ্যতি'** ও **'ন শোচতি'** পদের দ্বারা হর্ষ-শোক না থাকার কথা বলা হয়েছে। শেষ পঞ্চম প্রকরণে **'সঙ্গবিবর্জিতঃ'** পদে রাগের, **'সন্তুষ্টঃ'** পদে একমাত্র ভগবানেই সন্তুষ্ট থাকায় দ্বেষের এবং **'শীতোষ্ণসুখেদুঃখেষু সমঃ'** পদের দ্বারা হর্ষ-শোক না থাকার কথা বলা হয়েছে।

সিদ্ধ ভক্তদের লক্ষণ জানাবার উদ্দেশ্য যদি (সাতটি শ্লোকের) একই প্রকরণের হত, তাহলে সিদ্ধ ভক্তদের রাগ-দ্বেষ, হর্ষ-শোকাদি বিকারগুলির না থাকার কথা কোথাও শব্দের সাহায্যে এবং কোথাও ভাবের সাহায্যে বারংবার বলার প্রয়োজন ছিল না। এইরূপই চতুর্দশ ও ঊনবিংশতিতম শ্লোকে **'সন্তুষ্টঃ'** পদের এবং ত্রয়োদশ শ্লোকে **'সমদুঃখসুখঃ'** এবং অষ্টাদশ শ্লোকে **'শীতোষ্ণ-সুখদুঃখেষু সমঃ'** পদগুলিও সিদ্ধ ভক্তদের লক্ষণে দু'বার প্রযুক্ত হয়েছে, যার দ্বারা (সিদ্ধ ভক্তদের লক্ষণগুলিকে এক প্রকরণই মনে করলে) পুনরুক্তি দোষ আসে। ভগবানের বচনে পুনরুক্তি দোষ আসা সম্ভবই নয়। সুতরাং সাতটি শ্লোকের বিষয়গুলিকে একই প্রকরণ মনে না করে পৃথক্‌ভাবে পাঁচটি প্রকরণ মনে করাই যুক্তিসঙ্গত।

এইভাবে পাঁচটি প্রকরণ স্বতন্ত্র (ভিন্ন ভিন্ন) হওয়ায় কোনো একটি প্রকরণের সব লক্ষণই যাঁর মধ্যে থাকে, তিনিই ভগবানের প্রিয় ভক্ত। প্রত্যেক প্রকরণে সিদ্ধ ভক্তদের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ জানাবার কারণ হল যে সাধন-পদ্ধতি, প্রারব্ধ, বর্ণ, আশ্রম, দেশ, কাল, পরিস্থিতি

ইত্যাদি ভেদে ভক্তদের প্রকৃতিতে অল্প-বিস্তর পার্থক্য থাকে। তবে রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ, হর্ষ-শোকের অভাব এবং সমতায় স্থিতি ও সমস্ত প্রাণীর হিতে রতি সকলেরই সমানভাবে থাকে।

সাধকের নিজ রুচি, বিশ্বাস, যোগ্যতা, স্বভাব ইত্যাদি অনুসারে যে প্রকরণ তাঁর অনুকূল বলে মনে হবে, সেটিই আদর্শ মনে করে সেই অনুযায়ী নিজ নিজ জীবন তৈরি করা উচিত। কোনো একটি প্রকরণের সম্পূর্ণ লক্ষণগুলি যদি আয়ত্ত না করা যায়, তাহলেও সাধকের নিরাশ হওয়া উচিত নয়, কারণ তার সাফল্য অবশ্যম্ভাবী।

পরিশিষ্ট-ভাব—এই দুটি শ্লোকে ভগবান সেই বিশেষ স্থলের বর্ণনা করেছেন, যেখানে সম-ভাব রাখা খুবই কঠিন। যদি এতে সম-ভাব আসে তাহলে অন্যত্র সমতা আসতে কঠিন হয় না। নিজের ওপর কোনো প্রভাব না পড়াকেই 'সমতা' বলা হয়।

যদিও ভক্তের দৃষ্টিতে ভগবান ব্যতীত অন্য কিছুর অস্তিত্ব নেই, তা সত্ত্বেও অন্যের চোখে তিনি শত্রু ও মিত্রে সমভাবাপন্নরূপে পরিলক্ষিত হন। শত্রুতা ও মিত্রতার জ্ঞান থাকলেও তিনি সম থাকেন।

'শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু'— ভক্ত শরীরের অনুকূল ও প্রতিকূল পরিবেশেও সম থাকেন। তিনি মন-বুদ্ধির অনুকূলতা ও প্রতিকূলতাতেও সম থাকেন। অর্থাৎ শরীরের অনুকূলতা-প্রতিকূলতা, ইন্দ্রিয়াদির অনুকূলতা-প্রতিকূলতা, মনের অনুকূলতা-প্রতিকূলতা, বুদ্ধির অনুকূলতা-প্রতিকূলতা, সিদ্ধান্তের অনুকূলতা-প্রতিকূলতা ইত্যাদি সর্বপ্রকার অনুকূলতা ও প্রতিকূলতাতেই ভক্ত সম থাকেন। তাঁর অনুকূলতার প্রতি কোনো অনুরাগ নেই আবার প্রতিকূলতাতেও বিদ্বেষ নেই।

'যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ', **'ভক্তিমান মে প্রিয়ো নরঃ'** ইত্যাদি পদগুলির অর্থ হল এই যে, এরূপ ভক্তগণ ভক্তির জন্যই ভগবানের প্রিয়, গুণাদির (লক্ষণাদির) জন্য নয়। গুণ প্রধান নয়, প্রধান হল ভক্তি।

* * *

সম্বন্ধ—আগের সাতটি শ্লোকে ভগবান সিদ্ধ ভক্তদের মোট উনচল্লিশটি লক্ষণ জানিয়েছেন। এখন পরবর্তী শ্লোকে ভগবান স্পষ্ট ভাষায় অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

যে তু ধর্ম্যামৃতমিদং যথোক্তং পর্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ।। ২০ ।।

[**তু, যে** (কিন্তু যাঁরা) ; **শ্রদ্দধানাঃ** (শ্রদ্ধাশীল) ; **মৎপরমাঃ** (মৎপরায়ণ) ; **ভক্তাঃ** (ভক্ত হয়ে) ; **ইদম্** (এই) ; **ধর্ম্যামৃতম্** (অমৃতময় ধর্মাচরণ) ; **যথা, উক্তম্** (পূর্বোক্তরূপে) ; **পর্যুপাসতে** (করে থাকেন) ; **তে, মে** (তাঁরা সকলেই আমার) ; **অতীব, প্রিয়াঃ** (অত্যন্ত প্রিয়।)]

যে সকল ভক্ত আমার প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং মৎপরায়ণ হয়ে পূর্বোক্তরূপে এই অমৃততুল্য ধর্মাচরণ করে থাকেন, তাঁরা আমার অত্যন্ত প্রিয়।। ২০ ।।

ব্যাখ্যা—'যে তু'—এখানে **'যে'** পদটির দ্বারা ভগবান সেইসব সাধকদের ইঙ্গিত করেছেন, যাঁদের বিষয়ে অর্জুন প্রথম শ্লোকে প্রশ্ন করার সময় **'যে'** পদটি প্রয়োগ করেছিলেন। সেই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান দ্বিতীয় শ্লোকে সগুণ উপাসক সাধকদের (**'যে'** এবং **'তে'** পদের দ্বারা) **'যুক্ততমাঃ'** বলে জানিয়েছেন। আবার সেই সগুণ-উপাসনার সাধনগুলি বলেছেন এবং সিদ্ধ ভক্তদের লক্ষণ জানিয়ে সেই প্রসঙ্গের উপসংহার করেছেন।

এখানে **'যে'** পদটি সেইসব পরম শ্রদ্ধাসম্পন্ন ভগবদ্‌পরায়ণ সাধকদের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে, যাঁরা সিদ্ধ ভক্তদের লক্ষণগুলিকে আদর্শ বলে মেনে সাধন করে থাকেন।

'তু' পদটি প্রকরণকে পৃথক্ করার জন্য প্রয়োগ করা হয়। এখানে সিদ্ধ ভক্তদের প্রকরণের থেকে সাধক ভক্তদের প্রকরণকে পৃথক্ করার জন্য **'তু'** পদটি প্রযুক্ত হয়েছে। এই পদটিতে এরূপ প্রতীত হয় যে সিদ্ধ ভক্তদের

থেকে সাধক ভক্তই ভগবানের বিশেষ প্রিয়।

'শ্রদ্দধানাঃ'—ভগবদ্‌প্রাপ্তি হয়ে যাওয়াতে সিদ্ধ ভক্তদের লক্ষণে শ্রদ্ধার কথা বলা হয়নি। কারণ যতক্ষণ নিত্যপ্রাপ্ত ভগবান অনুভূত না হচ্ছেন, ততক্ষণ শ্রদ্ধার প্রয়োজন থাকে। তাই এই পদটি শ্রদ্ধাশীল সাধক ভক্তদের বাচক বলেই মনে করা উচিত। এরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত ভক্ত ভগবানের ধর্মময় অমৃতরূপ উপদেশ (যা ভগবান ত্রয়োদশ থেকে ঊনবিংশ শ্লোক পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন) ভগবদ্‌-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে নিজের জীবনে ধারণ করবার জন্য সচেষ্ট হন।

যদিও ভক্তির সাধনায় শ্রদ্ধা ও প্রেম এবং জ্ঞানের সাধনায় বিবেকের গুরুত্ব থাকে, তবু এতে এমন মনে করার কারণ নেই যে, ভক্তির সাধনায় বিবেকের এবং জ্ঞানের সাধনায় শ্রদ্ধার কোনো গুরুত্বই নেই। প্রকৃতপক্ষে সকল সাধনাতেই শ্রদ্ধা ও বিবেকের অত্যন্ত প্রয়োজন আছে। বিবেক থাকলে ভক্তি-সাধনাতে জোর আসে। এইরূপ শাস্ত্রাদিতে ও পরমাত্মতত্ত্বে শ্রদ্ধা থাকলে তবেই জ্ঞান-সাধন পালন করা সম্ভব হয়ে থাকে। তাই ভক্তি এবং জ্ঞান—উভয় সাধনাতেই শ্রদ্ধা ও বিবেক সহায়তা করে থাকে।

'মৎপরমাঃ'—সাধক ভক্তদের সিদ্ধ ভক্তে অত্যন্ত পূজ্যভাব থাকে। সিদ্ধ ভক্তদের গুণাদিকে তাঁরা শ্রেষ্ঠ মনে করেন। তাই তাঁরা ওই গুণগুলিকে আদর্শ বলে মনে করে সম্মান সহকারে সেগুলি অনুসরণ করার জন্য ভগবদ্‌-পরায়ণ হয়ে থাকেন। এইভাবে ভগবানের অনুধ্যান করলে এবং ভগবানের ওপর নির্ভরশীল হলে এই সমস্ত গুণ স্বতঃই তাঁদের মধ্যে বিকশিত হয়।

ভগবান একাদশ অধ্যায়ের পঞ্চান্নতম শ্লোকে **'মৎপরমঃ'** পদে এবং এই (দ্বাদশ) অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে **'মৎপরাঃ'** পদে তাঁর পরায়ণ হবার কথা বিশেষভাবে বলে শেষে পুনরায় সেই কথাটিই এই শ্লোকে **'মৎপরমাঃ'** পদে বলেছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ভক্তিযোগে ভগবদ্‌পরায়ণতাই প্রধান। ভগবদ্‌পরায়ণ হলে ভগবদ্‌-কৃপায় স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সাধন হয় এবং অসাধনের (সাধনের বিঘ্নগুলির) নাশ হয়।

'ধর্ম্যামৃতমিদং যথোক্তম্'—সিদ্ধ ভক্তদের উনচল্লিশ লক্ষণের পাঁচটি প্রকরণ ধর্মময় অর্থাৎ ধর্মে ওতপ্রোত। তাতে লেশমাত্র অপগুণের অংশ নেই। যে সাধনায় সাধন-বিরোধী অংশ থাকে না, সেটি অমৃততুল্য হয়ে থাকে। প্রথমে কথিত লক্ষণগুলি ধর্মময় হওয়াতে এবং তাতে সাধন-বিরোধী কোনো কথা না থাকার জন্যই সেগুলিকে **'ধর্ম্যামৃত'** সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

সাধনায় সাধন-বিরোধী কোনো ব্যাপার না হলেও আগে যেমন বলা হয়েছে, ঠিক তেমনই ধর্মময় অমৃত সেবন তখনই সম্ভব হয় যখন সাধকের উদ্দেশ্য অর্থ, মান, মর্যাদা, সম্মান, সম্পদ সংগ্রহ, সুখভোগ ইত্যাদির দিকে না থেকে একমাত্র ভগবদ্‌প্রাপ্তির দিকে থাকে।

প্রতিটি প্রকরণের সব লক্ষণই **'ধর্ম্যামৃত'**। তাই সাধক যে প্রকরণের লক্ষণগুলিকে আদর্শ মনে করে সাধনা করেন, তাঁর পক্ষে তা-ই **'ধর্ম্যামৃত'**।

'অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ.........' প্রভৃতি **'ধর্ম্যামৃতের'** যেসব লক্ষণ বলা হয়েছে, সেগুলি প্রত্যেক সাধকের মধ্যেই আংশিকরূপে থাকে এবং এগুলির সঙ্গে কিছু কিছু দুর্গুণ-দুরাচারও থাকে। প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যেই গুণ এবং অপগুণ দুটিই থাকে। এর মধ্যে অপগুণ তো সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা সম্ভব কিন্তু গুণ সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা যায় না। কারণ সাধন এবং স্বভাব অনুসারে সিদ্ধ পুরুষদের মধ্যেও গুণের তারতম্য হয়ে থাকে। কিন্তু তাঁদের মধ্যে গুণের বিপরীতরূপ অপগুণ একেবারেই থাকে না। গুণগুলির তারতম্য থাকায় সেগুলিকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। কিন্তু অপগুণ পরিত্যাজ্য বলে সেগুলির কোনো ভাগ করা যেতে পারে না।

সাধক সৎসঙ্গ করেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কুসঙ্গও হয়ে থাকে। তিনি সংযম তো করেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অসংযমও হয়ে থাকে। সাধনা করলেও তাঁর সঙ্গে অসাধনও হয়ে থাকে। যতক্ষণ সাধনার সঙ্গে অসাধন এবং গুণের সঙ্গে অপগুণ থাকে, ততক্ষণ সাধকের সাধনা পূর্ণ হয় না। কারণ অসাধনের সঙ্গে সাধন এবং অপগুণের সঙ্গে গুণ তাঁর মধ্যেও পাওয়া যায়, যিনি সাধক নন। তাছাড়াও যতক্ষণ সাধনার সঙ্গে অসাধন এবং গুণের সঙ্গে অপগুণ থাকে, ততক্ষণ সাধকের মনে নিজ সাধনার বা গুণের অহংকার থেকে যায়, যেটি আসুরী সম্পদের আধার। তাই **'ধর্ম্যামৃত'** যথোক্তভাবে অর্থাৎ যথাযথভাবে সেবন করার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ এগুলির যেমন বর্ণনা আছে ঠিক

তেমনভাবেই পালন করা উচিত। **'ধর্ম্যামৃত'** সেবনের সঙ্গে যদি দোষ (অসাধন) থাকে তাহলে ভগবদ্প্রাপ্তি হয় না। সুতরাং এই বিষয়ে সাধকের সতর্ক থাকা উচিত। কোনো কারণবশতঃ সাধনায় যদি আংশিকভাবে কোনো দোষময় বৃত্তি উৎপন্ন হয়, তাহলে অবহেলা না করে তৎপরতার সঙ্গে সেটি দূর করার চেষ্টা করা উচিত। চেষ্টা সত্ত্বেও যদি দূর না হয়, তাহলে ভগবানের কাছে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করতে হয়।

যতপ্রকার সদ্‌গুণ, সদাচার, সদ্‌ভাব ইত্যাদি আছে, সেগুলি সবই **'সৎ'**-এর (পরমাত্মার) সম্বন্ধ থেকেই হয়ে থাকে। এইভাবে দুর্গুণ, দুরাচার, দুর্ভাব ইত্যাদি সব **'অসৎ'**-এর সংস্পর্শ থেকে হয়। অত্যন্ত দুরাচারী ব্যক্তির মধ্যেও সদ্‌গুণ-সদাচার সম্পূর্ণভাবে লোপ পেতে পারে না, কারণ **'সৎ'**-এর (পরমাত্মার) অংশ হওয়ায় জীবমাত্রেরই **'সৎ'**-এর সঙ্গে নিত্যসিদ্ধ সম্পর্ক থাকে। পরমাত্মার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় কোনো না কোনো অংশে তার মধ্যে সদ্‌গুণ-সদাচার থাকবেই। পরমাত্মাপ্রাপ্তি হলে অসৎ হতে সর্বতোভাবে সম্পর্ক ছেদ হয়ে যায় এবং দুর্গুণ, দুরাচার, দুর্ভাব ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে নাশ হয়।

সদ্‌গুণ-সদাচার-সদ্‌ভাব ভগবানের সম্পদ। তাই সাধক যতই ভগবানের দিকে অগ্রসর হন বা ভগবদ্‌পরায়ণ হতে থাকেন ততই তাঁর মধ্যে স্বতঃই সদ্‌গুণ-সদাচার-সদ্ভাব প্রকটিত হতে থাকে এবং দুর্গুণ-দুরাচার-দুর্ভাব নষ্ট হতে থাকে।

রাগ-দ্বেষ, হর্ষ-শোক, কাম-ক্রোধ ইত্যাদি চিত্তের বিকার, ধর্ম নয় (গীতা ১৩।৬)। ধর্মীর সঙ্গে ধর্মের নিত্য-সম্পর্ক থাকে। যেমন সূর্য-রূপ ধর্মীর সঙ্গে উষ্ণতারূপ ধর্মের নিত্য-সম্পর্ক, যা কখনো দূর হয় না। সুতরাং ধর্মী ছাড়া ধর্ম ও ধর্ম ছাড়া ধর্মী থাকতে পারে না। কাম-ক্রোধ ইত্যাদি বিকার সাধারণ মানুষের মধ্যেও সবসময় থাকে না, সাধনকারীদের মধ্যে হ্রাস হতে থাকে আর সিদ্ধ পুরুষদের মধ্যে তো একেবারেই থাকে না। এই বিকার যদি চিত্তের ধর্ম হত, তাহলে সবসময় একই রূপে থাকত এবং চিত্ত (ধর্মী) থাকাকালীন কখনো নষ্ট হত না, কিন্তু এরূপ দেখা যায় না। সুতরাং এটি চিত্তের ধর্ম নয়, বরং আগন্তুক (অর্থাৎ এটির উদ্ভব হয় আবার উপশম হয়) বিকার। সাধক যেমন-যেমন তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ভগবানের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন তেমন-তেমনই তাঁর রাগ-দ্বেষাদি বিকার দূর হতে থাকে এবং ভগবানকে প্রাপ্ত হলে এইসব বিকার একেবারেই দূর হয়ে যায়।

গীতায় বিভিন্ন জায়গায় ভগবান **'তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ'** (৩।৩৪), **'রাগদ্বেষবিযুক্তৈঃ'** (২।৬৪), **'রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য'** (১৮।৫১) ইত্যাদি পদের দ্বারা সাধকদের এই রাগ-দ্বেষাদি বিকার সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করার কথা বলেছেন। যদি এই রাগ-দ্বেষাদি চিত্তের ধর্ম হত তাহলে চিত্ত (অন্তঃকরণ) থাকাকালীন এগুলির ত্যাগ করা সম্ভব হত না। আর অসম্ভবকে সম্ভব করার কথা ভগবানই বা কেন বলবেন!

গীতায় সিদ্ধ মহাপুরুষদের রাগ-দ্বেষাদি বিকার থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত বলা হয়েছে। যেমন, এই অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোক থেকে ঊনবিংশতম শ্লোক পর্যন্ত ভগবান স্থানে স্থানে বলেছেন যে, সিদ্ধ ভক্তগণ রাগ-দ্বেষাদি বিকার থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হন। সেইজন্যই এগুলিকে বিকার বলে ধরা হয়, চিত্তের ধর্ম বলে নয়। অসৎ থেকে সর্বতোভাবে বিমুখ হওয়ার ফলে এইসব সিদ্ধ মহাপুরুষদের মধ্যে এরূপ বিকারের লেশমাত্র থাকে না। চিত্তে যদি এই বিকার-ই বজায় থাকে, তাহলে তারা কী থেকে মুক্ত হলেন?

যেসব সিদ্ধ মহাপুরুষের মধ্যে বিকারের লেশমাত্র নেই তাঁদের চিত্তের (অন্তঃকরণের) লক্ষণগুলিকে আদর্শ বলে মেনে নিয়ে ভগবদ্প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে তাঁদের অনুসরণ করার জন্য ভগবান ওই লক্ষণগুলিকে এখানে **'ধর্ম্যামৃতম্'** নামে সম্বোধিত করেছেন।

'পর্যুপাসতে'—সাধক ভক্তদের দৃষ্টিতে ভগবানের প্রিয় সিদ্ধ ভক্ত অত্যন্ত শ্রদ্ধাস্পদ হন। ভগবানের দিকে স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকায় তাঁদের মধ্যে দৈবী সম্পদ্ অর্থাৎ সদ্‌গুণ (ভগবানের হওয়ায়) স্বাভাবিকভাবেই আসে। তা সত্ত্বেও সাধকদের ওইসব সিদ্ধ মহাপুরুষদের গুণের প্রতি স্বভাবতঃই শ্রদ্ধাভাব থাকে এবং তিনি সেই গুণগুলিকে নিজের মধ্যে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করেন—এটিই হল সাধক ভক্তদের দ্বারা যথার্থরূপে গুণ সেবন করা, সেগুলিকে আত্মগত করা।

এই অধ্যায়ের ত্রয়োদশ থেকে উনিশতম শ্লোক পর্যন্ত

সাতটি শ্লোকে '**ধর্ম্যামৃতে**'র যে রূপ বর্ণিত হয়েছে, সেটিকে ঠিক সেইমতো শ্রদ্ধাপূর্ণ হয়ে সেবন করার অর্থে এইস্থানে '**পর্যুপাসতে**' পদটি প্রযুক্ত হয়েছে। যথাযথ সেবন করার তাৎপর্য হল যে সাধকের মধ্যে বিন্দুমাত্র অপগুণ থাকা উচিত নয়। যেমন, সাধকদের সমস্ত প্রাণীর প্রতি পূর্ণরূপে করুণাভাব যদি নাও থাকে, তবু কারও প্রতি অকরুণ বা নির্দয়ভাব যেন একেবারেই না থাকে। সাধকদের মধ্যে যেহেতু এইসকল সদ্‌গুণ পূর্ণমাত্রায় থাকে না, তাই তাঁদের এটি সেবন করার জন্য বলা হয়েছে। সর্বাঙ্গীণভাবে এই লক্ষণগুলি জীবনে ধারণ হলে তাঁরা সিদ্ধ পুরুষের পর্যায়ে উন্নীত হন।

সাধকদের ভগবদ্‌প্রাপ্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুলতা হলে তাঁদের সমস্ত অপগুণ স্বতঃই নষ্ট হয়ে যায়। কারণ ভগবদাকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুলতা অপগুণকে নষ্ট করে দেয় এবং তার ফলে সাধনও স্বতঃই বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তাঁর ভগবদ্‌প্রাপ্তি অত্যন্ত শীঘ্রই এবং সহজে হয়ে থাকে।

'**ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ**'—ভক্তিমার্গে গমনকারী ভগবদাশ্রিত সাধকদের উদ্দেশ্যেই এখানে '**ভক্তাঃ**' পদটি প্রযুক্ত হয়েছে।

ভগবান একাদশ অধ্যায়ের তিপ্পান্নতম শ্লোকে বেদাধ্যয়ন, তপ, দান, যজ্ঞাদির দ্বারা তাঁর দর্শনের দুর্লভতার কথা জানিয়ে চুয়ান্নতম শ্লোকে অনন্যভক্তি দ্বারা তাঁর দর্শনের সুলভতার কথা ব্যক্ত করেছেন। আবার পঞ্চান্নতম শ্লোকে তাঁর ভক্তের লক্ষণের রূপে অনন্যভক্তির স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। তখন অর্জুন এই (দ্বাদশ) অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে প্রশ্ন করেছেন যে, সগুণ-সাকার উপাসক এবং নির্গুণ-নিরাকার উপাসক, উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ? ভগবান দ্বিতীয় শ্লোকে এই প্রশ্নের উত্তরে সেইসব (সগুণ-সাকার উপাসনাকারী) সাধকদেরই শ্রেষ্ঠ বলে জানিয়েছেন যাঁরা ভগবানে মন নিবিষ্ট করে অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে তাঁকে উপাসনা করেন। এখানে উপসংহারে সেই সাধকদের উদ্দেশ্যেই '**ভক্তাঃ**' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

সেই সাধক ভক্তদের ভগবান তাঁর অত্যন্ত প্রিয় বলে জানিয়েছেন।

সিদ্ধ ভক্তদের '**প্রিয়**' আর সাধকদের '**অত্যন্ত প্রিয়**' বলার কারণ হল—

(১) সিদ্ধ ভক্তদের তো তত্ত্বের অনুভূতি অর্থাৎ ভগবদ্-প্রাপ্তি হয়েছে ; কিন্তু সাধক ভক্তদের ভগবদ্‌প্রাপ্তি না হলেও তাঁরা শ্রদ্ধাপূর্বক ভগবদ্‌পরায়ণ হয়ে থাকেন। তাই তাঁরা ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়।

(২) সিদ্ধ ভক্ত ভগবানের জ্যেষ্ঠ পুত্রের ন্যায়—

'মোরেঁ প্রৌঢ় তনয় সম জ্ঞানী'।

আর সাধক ভক্তগণ ভগবানের কনিষ্ঠ, অবোধ বালক পুত্রের ন্যায়—

'বালক সুত সম দাস অমানী॥'

(শ্রীরামচরিতমানস ৩।৪৩।৪)

ছোট বালককে সকলেরই স্বাভাবিকভাবে প্রিয় বলে মনে হয়। তাই ভগবানেরও সাধক ভক্ত অত্যন্ত প্রিয় হয়ে থাকে।

(৩) সিদ্ধ ভক্তদের ভগবান প্রত্যক্ষভাবে দর্শন দিয়ে নিজেকে ঋণমুক্ত বলে মনে করেন, কিন্তু সাধকভক্ত (প্রত্যক্ষ দর্শন না পেলেও) সরল বিশ্বাসে একমাত্র ভগবানেরই আশ্রিত হয়ে তাঁকে ভক্তি করেন। তাই তখনও তাঁদের দর্শন দান না করায় ভগবান নিজেকে তাঁদের কাছে ঋণী বলে মনে করেন আর তাই তাঁদের অত্যন্ত প্রিয় বলে জানিয়েছেন।

পরিশিষ্ট-ভাব—কর্তব্যকে '**ধর্ম**' বলা হয়। যা ধর্ম হতে বিচলিত হয় না এবং অন্যদিকে যায় না, তাকে '**ধর্ম্য**' বলা হয়। সব কিছুই ভগবান—তাঁর সমকক্ষ অন্য কোনো সিদ্ধান্ত থাকতেই পারে না, তাই একে বলা হয় '**ধর্ম্য**' (গীতা ৯।২)।

সাধকদেরই শ্রদ্ধা হয়। সিদ্ধদের শ্রদ্ধা হয় না, তাঁদের হয় অনুভব, কেন-না তাঁদের অনুভবে একমাত্র পরমাত্মা ব্যতীত আর কিছুই নেই, তাহলে তিনি শ্রদ্ধা কাকে করবেন ! সাধকদের দৃষ্টিতে অন্য অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে, তাই তাঁরা উপাসনা করেন (**পর্যুপাসতে**) অর্থাৎ নিজেদের জীবন ওইভাবে তৈরি করেন, কিন্তু তাদের মধ্যে এই ভাব থাকে যে ভগবান ব্যতীত আর কিছু যদি থাকে তাহলে সেগুলিও ভগবানেরই লীলা।

অন্য অস্তিত্ব মেনে নিয়েও সাধক ভগবদ্‌পরায়ণ হয়ে থাকেন এবং ভগবান ব্যতীত অন্য কেউ তাঁর প্রেমাস্পদ হন না,

তাই তিনি ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় হন। যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর 'সবই ভগবান'— এই অনুভূতি না হয়, ততক্ষণ ভগবান তাঁর কাছে ঋণী থাকেন!

শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান বলেছেন—

যাবৎ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভাবো নোপজায়তে। তাবদেবমুপাসীত বাঙ্‌মনঃকায়বৃত্তিভিঃ॥ (১১।২৯।১৭)

'যতক্ষণ সমস্ত প্রাণীতে আমার ভাব অর্থাৎ 'সবই পরমাত্মা' এই বাস্তবিক ভাব না আসে, ততক্ষণ এই ভাবে মন, বাক্য এবং শরীরের সমস্ত বৃত্তি (ব্যবহার) দ্বারা আমার উপাসনা করা উচিত।'

সর্বং ব্রহ্মাত্মকং তস্য বিদ্যয়াঽঽত্মমনীষয়া। পরিপশ্যন্নুপরমেৎ সর্বতো মুক্তসংশয়ঃ॥ (১১।২৯।১৮)

'পূর্বোক্ত সাধনকারী ভক্তগণের 'সবই পরমাত্মস্বরূপ'— এই দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে থাকে। পরে তিনি এই অধ্যাত্মবিদ্যার (ব্রহ্মবিদ্যার) সাহায্যে সর্ব প্রকার সংশয়বর্জিত হয়ে সর্বত্র সম্যক্‌রূপে পরমাত্মাকে দর্শন করে জগতের ঊর্ধ্বে উঠে যান অর্থাৎ 'সবই পরমাত্মা'—এই চিন্তাও আর থাকে না, তখন সাক্ষাৎ পরমাত্মাই পরিলক্ষিত হতে থাকেন।'

※ ※ ※

ওঁ তৎ সৎ ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে ভক্তিযোগো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১২ ॥

এইভাবে ওঁ, তৎ, সৎ—ভগবানের এই নাম উচ্চারণপূর্বক ব্রহ্মবিদ্যা ও যোগশাস্ত্রময় শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা-উপনিষদ্রূপ 'শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে' 'ভক্তিযোগ' নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত হল॥ ১২ ॥

এই (দ্বাদশ) অধ্যায়ে নানাপ্রকার সাধনাসহ ভগবদ্‌-ভক্তির বর্ণনা করে ভক্তদের লক্ষণ জানানো হয়েছে এবং এর উপক্রম ও উপসংহারও ভগবদ্‌ভক্তিতেই হয়েছে। কেবল তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম—এই তিন শ্লোকে জ্ঞানের সাধন বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু তাও ভক্তি ও জ্ঞানের পরস্পর তুলনা করে ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ জানাবার জন্যই। তাই এই অধ্যায়ের নাম হল 'ভক্তিযোগ'।

দ্বাদশ অধ্যায়ের পদ, অক্ষর ও উবাচ

১) এই অধ্যায়ে **'অথ দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ'**-এর তিন, **'অর্জুন উবাচ'** ইত্যাদি পদের চার, শ্লোকাদির দুইশত চুয়াল্লিশ এবং পুষ্পিকার তেরটি পদ আছে। এইভাবে সমস্ত পদগুলির যোগসংখ্যা দুইশত চৌষট্টি।

২) **'অথ দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ'**-এর সাত, **'অর্জুন উবাচ'** ইত্যাদি পদের তেরো, শ্লোকাদির ছয়শত চল্লিশ এবং পুষ্পিকার পঁয়তাল্লিশটি অক্ষর আছে। এইভাবে সমস্ত অক্ষরের যোগসংখ্যা সাতশত পাঁচ। এই অধ্যায়ের সমস্ত শ্লোক বত্রিশ অক্ষর সংবলিত।

৩)এই অধ্যায়ে দুটি উবাচ আছে—**'অর্জুন উবাচ'** এবং **'শ্রীভগবানুবাচ'**।

দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রযুক্ত ছন্দ

এই অধ্যায়ের কুড়িটি শ্লোকের মধ্যে—নবম শ্লোকের তৃতীয় পংক্তিতে **'ভগণ'** প্রযুক্ত হওয়ায় **'ভ-বিপুলা'**, উনিশতম শ্লোকের তৃতীয় পংক্তিতে **'নগণ'** প্রযুক্ত হওয়ায় **'ন-বিপুলা'** এবং কুড়িতম শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে **'নগণ'** ও তৃতীয় পংক্তিতে **'ভগণ'** প্রযুক্ত হওয়ায় **'সংকীর্ণ-বিপুলা'** সংজ্ঞাসম্পন্ন ছন্দ হয়েছে। বাকি সতেরোটি শ্লোক ঠিক **'পথ্যাবক্ত্র'** অনুষ্টুপ ছন্দের লক্ষণযুক্ত।

※ ※ ※

॥ ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

অথ ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

ত্রয়োদশ অধ্যায়

অবতরণিকা

দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে আপনার (সগুণ-সাকারের) উপাসক এবং অব্যক্ত অক্ষরের (নির্গুণ-নিরাকারের) উপাসক এই দুজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ? তার উত্তরে ভগবান যাঁরা তাঁর উপাসনা করেন তাঁদের শ্রেষ্ঠ বলে জানিয়েছিলেন এবং পরে বলেছিলেন যে অব্যক্ত অক্ষরের উপাসকগণও তাঁকেই প্রাপ্ত হন তবে দেহাভিমান থাকায় তাঁদের উপাসনাতে অধিক ক্লেশ হয়। এই কথা বলে ভগবান সগুণ-সাকার উপাসনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। ভগবান এবার অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার জন্য এবং তাতে শরীরের প্রতি অহং-রূপ প্রধান বাধাকে দূর করার জন্য ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অবতারণা করেছেন।

সর্বপ্রথম ভগবান ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বিবেকের প্রকরণ আরম্ভ করছেন।

শ্রীভগবানুবাচ

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ॥ ১ ॥

[**কৌন্তেয়** (হে কৌন্তেয় !) ; **ইদম্** (এই রূপে কথিত) ; **শরীরম্** (শরীরকে) ; **ক্ষেত্রম্, ইতি, অভিধীয়তে** (ক্ষেত্র নামে অভিহিত করা হয়) ; **এতৎ** (এই ক্ষেত্রকে) ; **যঃ, বেত্তি** (যিনি জানেন) ; **তম্, তদ্বিদঃ** (জ্ঞানী পণ্ডিতগণ তাঁকে) ; **ক্ষেত্রজ্ঞঃ** (ক্ষেত্রজ্ঞ) ; **ইতি, প্রাহুঃ** (বলে থাকেন।)]

শ্রীভগবান বললেন—হে কৌন্তেয় ! 'ইদম্'রূপে কথিত শরীরকে 'ক্ষেত্র' বলা হয় এবং এই ক্ষেত্রকে যিনি জানেন, জ্ঞানী পণ্ডিতগণ তাঁকে 'ক্ষেত্রজ্ঞ' বলে থাকেন॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা—**'ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে'**—'এটি পশু', 'এটি পক্ষী', 'এটি বৃক্ষ' ইত্যাদি ভৌতিক জিনিসগুলিকে মানুষ ইদংতায় অর্থাৎ 'এই' রূপে বলে থাকে এবং শরীরকে কখনো 'আমি'রূপে আর কখনো বা 'আমার' রূপে চিহ্নিত করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিজের বলে যে শরীর সেটিও 'এই' সম্বোধনে বলারই যোগ্য। স্থূলশরীরই হোক বা সূক্ষ্মশরীর হোক অথবা কারণশরীর হোক, সেগুলি সবই 'এই' বলারই যোগ্য।

পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু এবং আকাশ—এই পাঁচ তত্ত্ব থেকে যা সৃষ্ট হয়েছে অর্থাৎ মাতা-পিতার রজ-বীর্য থেকে যা উৎপন্ন হয়েছে, তাকে বলা হয় স্থূলশরীর। এর অপর নাম 'অন্নময় কোষ'। কারণ এটি অন্নের বিকার থেকেই উদ্ভূত এবং অন্ন দ্বারাই জীবিত থাকে। তাই এটি অন্নময়, অন্নস্বরূপ। ইন্দ্রিয়াদির বিষয় হওয়ায় এই দেহকে 'ইদম্' (এই) বলা হয়।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পাঁচটি প্রাণ, মন ও বুদ্ধি—এই সতেরোটি তত্ত্ব দ্বারা যা গঠিত হয় তাকে বলা হয় সূক্ষ্মশরীর। এই সতেরোটি তত্ত্বের মধ্যে প্রাণের প্রাধান্য নিয়ে যে সূক্ষ্মশরীর তাকে বলা হয় 'প্রাণময় কোষ', মনের প্রাধান্য ধরে বলা হয় 'মনোময় কোষ' এবং বুদ্ধির প্রাধান্য নিয়ে বলা হয় 'বিজ্ঞানময় কোষ'। এইভাবে এই সূক্ষ্মশরীরও অন্তঃকরণের বিষয় হওয়ায় একে 'ইদম্' বলা হয়।

অজ্ঞানকে বলা হয় কারণশরীর। মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি

পর্যন্ত হয়, কিন্তু বুদ্ধির পরে আর জ্ঞান হয় না, তাই তাকে বলা হয় অ-জ্ঞান। এই অজ্ঞান সমস্ত শরীরের কারণ হওয়ায় তাকে কারণ-শরীর বলা হয়— **'অজ্ঞানমেবাস্য হি মূলকারণম্'** (অধ্যাত্মরামায়ণ, উত্তরকাণ্ড ৫।৯)। এই কারণ-শরীরকে স্বভাব, অভ্যাস এবং প্রকৃতিও বলা হয় এবং একে 'আনন্দময়কোষ'ও বলা হয়। জাগ্রত অবস্থাতে স্থূলশরীরের প্রাধান্য থাকে এবং সূক্ষ্ম ও কারণ-শরীরও তার সঙ্গে থাকে। স্বপ্ন অবস্থাতে সূক্ষ্মশরীরের প্রাধান্য থাকে আর কারণ-শরীর তার সঙ্গে থাকে। সুষুপ্তিতে স্থূলশরীর, যা অন্নময়কোষ, তার জ্ঞানও থাকে না এবং সূক্ষ্মশরীর, যা প্রাণময়, মনোময় এবং বিজ্ঞানময়কোষ, তার জ্ঞানও থাকে না অর্থাৎ বুদ্ধি অবিদ্যাতে (অজ্ঞানে) নিমজ্জিত অবস্থায় থাকে। অতএব সুষুপ্তি-অবস্থা কারণ-শরীরেরই হয়। জাগ্রত ও স্বপ্ন অবস্থায় সুখ-দুঃখের অনুভূতি হয়, কিন্তু সুষুপ্তি অবস্থায় দুঃখ অনুভূত হয় না, শুধু সুখ হয়। তাই কারণ-শরীরকে বলা হয় 'আনন্দময়কোষ'। কারণ-শরীরও স্বয়ং-এর বিষয়, তাই স্বয়ং-এর দ্বারা জ্ঞাত হওয়ায় একে **'ইদম্'** বলা হয়।

উপরিউক্ত তিনটি শরীরকে 'শরীর' বলার অর্থ হল যে এগুলি প্রতিমুহূর্তে বিনাশ প্রাপ্ত হচ্ছে[১]। এগুলিকে 'কোষ' বলার অর্থ হল যে, যেমন যে চর্মনির্মিত পেটিকাতে তরোয়াল রাখা হয় তার সংজ্ঞা হয় 'খাপ' তেমনই জীবাত্মা এই তিনটি শরীরকে নিজের বলে মনে করলে, নিজেকে এর মধ্যে স্থিত বলে মনে করলে এই তিনটি শরীরের 'কোষ' সংজ্ঞা হয়।

এই দেহকে 'ক্ষেত্র' বলার অর্থ হল যে এটি প্রতিক্ষণ নষ্ট হচ্ছে, প্রতিক্ষণ পরিবর্তিত হচ্ছে[২]। এটি এত দ্রুত পরিবর্তিত হয় যে একে দ্বিতীয়বার কেউ এক অবস্থায় দেখতে সক্ষম হয় না অর্থাৎ একবার দৃষ্টি পড়লে তাকে যেরূপে দেখা যায়, দ্বিতীয়বার তাকে সেরূপে দেখা যায় না। কারণ ইতিমধ্যে সেটি পরিবর্তিত হয়ে গেছে।

শরীরকে ক্ষেত্র বলার দ্বিতীয় তাৎপর্য হল, এটি ক্ষেত অর্থাৎ জমি। জমিতে যেমন নানাপ্রকার বীজ বপন করে চাষ করা হয়, তেমনই এই মনুষ্যদেহের প্রতি অহং ও মমত্ববোধ করে জীব নানাপ্রকার কর্ম করে থাকে। সেই কর্মগুলির সংস্কার পড়ে চিত্তে। এই সংস্কারগুলি যখন ফলরূপে প্রকটিত হয়, তখনই অন্য (দেবতা, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদি) শরীর প্রাপ্ত হয়। যেমন, ক্ষেতে যেরূপ বীজ বপন করা হয়, তেমনই শস্য উৎপন্ন হয়, সেইরূপ এই শরীর দ্বারা যেমন কর্ম করা হয়, সেই অনুযায়ী পরবর্তী কালে অন্য শরীর, পরিস্থিতি ইত্যাদি প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ এই শরীর দ্বারা করা কর্ম অনুযায়ীই জীব বারংবার জন্ম-মৃত্যুরূপ ফল ভোগ করে থাকে। সেইজন্যই একে ক্ষেত্র (ক্ষেত) বলা হয়েছে।

নিজের প্রকৃত স্বরূপ থেকে পৃথক্ বলে প্রতিভাত এই শরীর আসলে প্রাকৃত পদার্থ, ক্রিয়া, বর্ণ-আশ্রম প্রভৃতির মত 'ইদম্'ই (দৃশ্য) হয়ে থাকে। এটি 'ইদম্' হলেও জীব ভ্রমবশতঃ একে 'অহম্' বলে মেনে নেয় এবং আবদ্ধ হয়ে পড়ে। স্বয়ং হল পরমাত্মার অংশ এবং চেতন—সব থেকে মহান। কিন্তু যখন সে জড় (দৃশ্যমান) পদার্থের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক মেনে নিতে থাকে (যেমন 'আমি ধনবান', 'আমি বিদ্বান' ইত্যাদি) তখন প্রকৃতপক্ষে সে নিজের গুরুত্ব হ্রাস করে। শুধু তাই নয় নিজেকেও অত্যন্ত তুচ্ছ করে তোলে। কারণ যদি অর্থ, বিদ্যা ইত্যাদির দ্বারা সে নিজেকে বড় বলে মনে করে, তাহলে অর্থ বা বিদ্যাই গুরুত্ব পেয়ে থাকে ; তার নিজের মহত্ত্ব বলে আর কিছুই থাকে না। বাস্তবিকভাবে দেখতে গেলে যা কিছু মহত্ত্ব, তা স্বয়ং বিনাশশীল এবং জড়, অর্থ ইত্যাদি পদার্থের নয়। কারণ স্বয়ং যখন ওইসব পদার্থগুলিকে স্বীকার করে, তখন ওইগুলি মহত্ত্বপূর্ণ বলে প্রতিভাত হয়। তাই ভগবান **'ইদং শরীরং ক্ষেত্রম্'** পদটির দ্বারা শরীরাদি পদার্থগুলিকে নিজের থেকে পৃথক্ 'ইদম্' রূপে দেখার জন্য বলেছেন।

'এতদ্ যো বেত্তি'—জীবাত্মা এই শরীর সম্বন্ধে অবহিত থাকে অর্থাৎ এই শরীর আমার, ইন্দ্রিয়াদি আমার, মন আমার, বুদ্ধি আমার, প্রাণ আমার—এরূপ মনে করে। জীবাত্মা এই শরীরকে কখনো 'আমার' বলে থাকে আবার কখনো 'এটি' বলে থাকে অর্থাৎ কখনো 'আমি শরীর'

[১]'শৃ হিংসায়াম্' ধাতু সংযোগে 'শরীর' শব্দ তৈরি হয়েছে।

[২]'ক্ষি ক্ষয়ে' ধাতু সহযোগে 'ক্ষেত্র' শব্দটি তৈরি হয়েছে।

বলে মেনে নেয়। আবার কখনো 'এই শরীর আমার'— এরূপও মনে করে।

এই শ্লোকের পূর্বার্ধে শরীরকে **'ইদম্'** পদের দ্বারা বলা হয়েছে আর উত্তরার্ধে শরীরকে **'এতৎ'** পদের দ্বারা বলা হয়েছে। যদিও এই দুটি পদই প্রায় সমার্থক, তবুও **'ইদম্'**-এর থেকে **'এতৎ'** পদটি অত্যন্ত নিকটের বাচক। সুতরাং এখানে **'ইদম্'** পদটি অঙ্গুলী-নির্দিষ্ট শরীরগুলির দ্যোতক এবং **'এতৎ'** পদটি এই শরীরে যে 'আমিত্ব' ভাব থাকে, সেই আমিত্ব ভাবের দ্যোতন করে।

'তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ[১] ইতি তদ্বিদঃ'—দ্বিতীয় অধ্যায়ের ষোড়শ শ্লোকে সৎ-অসৎ-এর তত্ত্বজ্ঞদের যেমন তত্ত্বদর্শী বলা হয়েছে, তেমনই এইস্থানে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্বজ্ঞদের বলা হয়েছে **'তদ্বিদঃ'**। ক্ষেত্র কী এবং ক্ষেত্রজ্ঞ কে—যাঁর এই বোধ হয়েছে, সেই তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষ এই জীবাত্মাকে **'ক্ষেত্রজ্ঞ'** নামে অভিহিত করে থাকেন। তাৎপর্য হল যে ক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টি থাকায় বা ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার জন্যই জ্ঞানী মহাপুরুষগণ এই জীবাত্মাকে 'ক্ষেত্রজ্ঞ' বলে থাকেন। জীবাত্মা যদি ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত না হয়—তাহলে তার 'ক্ষেত্রজ্ঞ' সংজ্ঞা থাকে না, তা পরমাত্মাস্বরূপ হয়ে যায় (গীতা ১৩।১১)।

মর্মার্থ

নিয়মই হল যেখান থেকে বন্ধন হয়, সেখানে সেই গিঁট খুললে (বন্ধন থেকে) মুক্ত হওয়া সম্ভব। মনুষ্যদেহেই বন্ধন হয়, তাই মনুষ্যদেহতেই বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হয়। মানুষ যদি তার শরীরের সঙ্গে কোনোপ্রকার অহং ও মমত্বের সম্পর্ক না রাখে, তাহলে সংসারমাত্র থেকেই সে মুক্ত হতে পারে। সেইজন্য ভগবান শরীরের সঙ্গে এই মেনে নেওয়া অহং-মমত্বের সম্পর্ক ছেদ করার উদ্দেশ্যে শরীরকে 'ক্ষেত্র' বলে তাকে পৃথক্‌ভাবে বুঝিয়েছেন।

শরীরকে পৃথক্‌ভাবে দেখা শুধুমাত্র কল্যাণকামী সাধকদেরই নয়, প্রকৃতপক্ষে মানুষমাত্রেরই অত্যন্ত আবশ্যক। কারণ নিজের উদ্ধার করার অধিকার ও সুযোগ মনুষ্যদেহেই আছে। সেইজন্যই গীতার উপদেশ আরম্ভ করে ভগবান সর্বপ্রথম শরীর ও শরীরীর পার্থক্য বর্ণনা করেছেন।

'ইদম্'-এর অর্থ হল—'এটি' অর্থাৎ নিজের থেকে পৃথক্ বলে দেখা। সর্বপ্রথম দেখা যায়—পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু এবং আকাশ দ্বারা সৃষ্ট এই স্থূলদেহ। দেহ দৃশ্যমান এবং পরিবর্তনশীল, তাকে যে দেখে তা হল নেত্র। দৃশ্যমান বস্তুর আকৃতি, অবস্থা, প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি সবই পরিবর্তিত হতে থাকে, কিন্তু সেগুলি প্রত্যক্ষ করে যে নেত্র, তা একইরূপে থাকে। তেমনই শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধরূপ বিষয়ও পরিবর্তিত হতে থাকে, কিন্তু সেগুলির জ্ঞান যার দ্বারা হয় সেই কান, ত্বক, নেত্র, জিহ্বা এবং নাসিকা—তারা একইভাবে থাকে। চোখের সাহায্যে ঠিকভাবে দেখা, কম দেখা বা একেবারে না দেখতে পাওয়া—চোখের এইসব পরিবর্তন যেমন মনের সাহায্যে জানা যায়, তেমনই কান, ত্বক, জিহ্বা এবং নাকের যে পরিবর্তন ঘটে, তা-ও মনের সাহায্যেই জানা যায়। সুতরাং পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ও (চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বক) দৃশ্যমান। কখনো বিক্ষুব্ধ, কখনো শান্ত, কখনো স্থির আবার কখনো চঞ্চল—মনের এই যে পরিবর্তন—সেগুলি জানা যায় বুদ্ধির সাহায্যে। অতএব মনও দৃশ্য। কখনো ঠিকভাবে বোঝা, কখনো কম বোঝা আবার কখনো একেবারে না বোঝা—বুদ্ধির এইসব পরিবর্তন স্বয়ং-এর (জীবাত্মা) দ্বারা জানা যায়। সুতরাং বুদ্ধিও দৃশ্য। বুদ্ধি ইত্যাদির দ্রষ্টা স্বয়ং-এর (জীবাত্মার) কখনো পরিবর্তন হয়নি, হয় না, হবে না এবং হওয়া সম্ভবও নয়। তা সর্বদা একভাবে থাকে। অতএব তা কখনো কারও দৃশ্য হতে পারে না[২]।

---

[১]যদিও 'প্রাহুঃ' ক্রিয়ার কর্ম হওয়ায় 'ক্ষেত্রজ্ঞ' শব্দে দ্বিতীয়া বিভক্তি হওয়া উচিত ছিল, তা সত্ত্বেও পরে 'ইতি' পদটি ব্যবহৃত হওয়ায় অর্থাৎ 'ইতি' পদ দ্বারা উক্ত হওয়ায় 'ক্ষেত্রজ্ঞ' শব্দে প্রথমা বিভক্তি হয়েছে।

[২]রূপং দৃশ্যং লোচনং দৃক্ তদ্দৃশ্যং দৃক্ তু মানসম্। দৃশ্যা ধীবৃত্তয়ঃ সাক্ষী দৃগেব ন তু দৃশ্যতে॥ (বাক্যসুধা ১)

'সর্বপ্রথম নেত্র হল দ্রষ্টা আর রূপ দৃশ্য। এরপর মন হল দ্রষ্টা আর নেত্রাদি ইন্দ্রিয়গুলি দৃশ্য, তারপর বুদ্ধি হল দ্রষ্টা এবং মন হল দৃশ্য। শেষে বুদ্ধিবৃত্তিগুলিরও যে দ্রষ্টা, সেই সাক্ষী (স্বয়ংপ্রকাশ আত্মা) কারোরই দৃশ্য নয়।'

ইন্দ্রিয়গুলি নিজ নিজ বিষয় সম্বন্ধে জানলেও বিষয়গুলি তার অতীত (সূক্ষ্ম, শ্রেষ্ঠ এবং প্রকাশক) ইন্দ্রিয়গুলিকে জানতে সক্ষম হয় না। এইভাবে ইন্দ্রিয়গুলি এবং বিষয়বস্তু মনকে জানতে পারে না ; মন, ইন্দ্রিয়াদি এবং বিষয়বস্তু বুদ্ধিকে জানতে পারে না। আর বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়াদি এবং বিষয়বস্তু স্বয়ংকে জানতে সক্ষম হয় না। না জানার প্রধান কারণ হল এই যে ইন্দ্রিয়াদি, মন এবং বুদ্ধি হল সাপেক্ষ-দ্রষ্টা অর্থাৎ একে-অপরের সাহায্যে নিজের চেয়ে স্থূল বিষয়ের জ্ঞাতা ; কিন্তু স্বয়ং (জীবাত্মা) শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন এবং বুদ্ধির থেকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং শ্রেষ্ঠ হওয়ায় নিরপেক্ষ দ্রষ্টা অর্থাৎ অন্য কারও সাহায্য ছাড়া নিজেই স্বতন্ত্র জ্ঞাতা।

উপরিউক্ত বিচারে যদিও ইন্দ্রিয়গুলি এবং মন ও বুদ্ধিকে দ্রষ্টা বলা হয়েছে, তা সত্ত্বেও সেখানে এটি বুঝে নিতে হবে যে স্বয়ং (জীবাত্মা) এদের সঙ্গে থাকাতেই এদের দ্বারা জানা সম্ভব হয়ে থাকে। কারণ মন, বুদ্ধি এগুলি জড় প্রকৃতির কার্য হওয়ায় সেগুলি স্বতন্ত্র দ্রষ্টা হতে পারে না। সুতরাং স্বয়ংই প্রকৃত দ্রষ্টা। দৃশ্য পদার্থ (শরীর), দেখার শক্তি (চক্ষু, মন, বুদ্ধি) এবং দর্শনকারী (জীবাত্মা)—এই তিন পদার্থের মধ্যে গুণগত পার্থক্য থাকলেও তাত্ত্বিক ঐক্য থাকে। কারণ তাত্ত্বিক ঐক্য ছাড়া দেখার আকর্ষণ, দেখার সামর্থ্য এবং দেখবার প্রবৃত্তি সিদ্ধ হতেই পারে না। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে স্বয়ং (জীবাত্মা) তো চেতন, তবে সে জড় বুদ্ধি প্রভৃতিকে (যাতে তার তাত্ত্বিক ঐক্য নেই) কেমন করে দেখে ? তার উত্তর হল, যে স্বয়ং জড়ের সঙ্গে তাদাত্ম্য করে জড়ের সঙ্গে নিজেকে 'আমি' বলে মেনে নেয়। এই 'আমি' জড়ও নয় আবার চেতনও নয়। জড়ের বিশেষত্ব দেখে সে জড়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বলে থাকে, 'আমি ধনবান', 'আমি বিদ্বান' ইত্যাদি। আবার চেতনের বিশেষত্ব দেখে সে চেতনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বলে থাকে 'আমি আত্মা', 'আমি ব্রহ্ম' ইত্যাদি। এই প্রকৃতিস্থ পুরুষই প্রকৃতিজনিত গুণাদির সঙ্গ দ্বারা উচ্চ-নীচ যোনিতে বারংবার জন্ম নিতে থাকে (গীতা ১৩।২১)। তাৎপর্য হল এই যে প্রকৃতিস্থ পুরুষের মধ্যে জড় ও চেতন—দুই অংশই বিদ্যমান থাকে। চেতনের আকাঙ্ক্ষা থাকে পরমাত্মার দিকে যাওয়ার। কিন্তু ভ্রমবশতঃ সে জড়ের সঙ্গে তাদাত্ম্য করে বসে। তাদাত্ম্যে যে জড়-অংশ থাকে, তার আকর্ষণ (প্রবৃত্তি) জড়ত্বের দিকে হওয়ায়, সে-ই স্বজাতীয়ত্ব বোধে জড়-বুদ্ধি ইত্যাদির দ্রষ্টা হয়ে থাকে। এটিই নিয়ম যে স্বজাতীয়ের মধ্যেই দেখা সম্ভব হয় অর্থাৎ দৃশ্য, দর্শন এবং দ্রষ্টা একই জাতির হলে দেখা সম্ভব হয়, নচেৎ নয়। এই নিয়মে জানা যায় যে স্বয়ং (জীবাত্মা) যতক্ষণ বুদ্ধি ইত্যাদির দ্রষ্টা থাকে, ততক্ষণ তার মধ্যে বুদ্ধিরূপী জড় পদার্থ থাকে অর্থাৎ জড় প্রকৃতির সঙ্গে তার মেনে নেওয়া সম্বন্ধ থাকে। এই মেনে নেওয়া সম্পর্কই সমস্ত অনর্থের মূল। সেই কারণেই সে সমস্ত জড় প্রকৃতি অর্থাৎ বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়াদি, বিষয়, শরীর এবং পদার্থসমূহের দ্রষ্টা হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড এই **'ইদম্‌'** (ক্ষেত্রের)-এর অন্তর্গত। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত শরীর আছে, তাতে 'পরা' (জীব) হল ক্ষেত্রজ্ঞ এবং 'অপরা' (জগৎ) হল ক্ষেত্র। জীব জগৎকে জানে এবং পরমাত্মাকে মানে। জ্ঞাতা ব্যাপক হয়ে থাকেন। সুতরাং ক্ষেত্রজ্ঞের একাংশে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আছে—**'যেন সর্বমিদং ততম্‌'** (গীতা ২।১৭)। সাধকের জানা উচিত যে তিনি ক্ষেত্র নন, বরং ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞাতা অর্থাৎ তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ।

দৃশ্য দ্রষ্টার কোনো এক অংশে থাকে। যেমন চক্ষুদ্বারা সব কিছু দেখা গেলেও তার দ্বারা চোখ ভরে যায় না। সুতরাং বাস্তবে চোখ দৃশ্যের থেকে বড়। বুদ্ধির সাহায্যে যা কিছুই জানা যাক না কেন, বুদ্ধি কখনো ভরে যায় না, তা খালিই থাকে। যেমন ভরে, তেমনই খালি হয়ে যায়। সুতরাং বুদ্ধিও বড়। ব্রহ্মার উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয়ও আমাদের বুদ্ধির জানার অন্তর্গত। স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ সম্পূর্ণ শরীর দৃশ্য। তেমনই স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ সম্পূর্ণ সৃষ্টিও দৃশ্য। এই সম্পূর্ণ দৃশ্য দ্রষ্টার (ক্ষেত্রজ্ঞের) কোনো অংশে অবস্থিত।

যেমন ধনের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিকে 'ধনবান' বলা হয়, কিন্তু ধনের সম্পর্ক না থাকলে ধনবান (ব্যক্তি) হলেও তার 'ধনবান' সংজ্ঞা আর থাকে না। তেমনই ক্ষেত্রের সম্বন্ধের জন্যই স্ব-স্বরূপকে 'ক্ষেত্রজ্ঞ' বলা হয় ; কিন্তু ক্ষেত্রের সম্বন্ধ না থাকলে ক্ষেত্রজ্ঞ (স্ব-স্বরূপ) হলেও তার 'ক্ষেত্রজ্ঞ' সংজ্ঞা আর থাকে না। তাৎপর্য হল যে একই চিন্ময় তত্ত্ব (বোঝার দৃষ্টিতে) ক্ষেত্রের সম্পর্কে ক্ষেত্রজ্ঞ, ক্ষরের সম্পর্কে অক্ষর, শরীরের সম্পর্কে শরীরী, দৃশ্যের সম্পর্কে দ্রষ্টা, সাক্ষ্যের

সম্পর্কে সাক্ষী আবার করণের সম্পর্কে কর্তা বলে অভিহিত হন। প্রকৃতপক্ষে ওই তত্ত্বের কোনো নামই নেই। তা কেবল অনুভবরূপ।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—পরবর্তী শ্লোকে ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ জানানো হয়েছে।

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম॥ ২ ॥

[ভারত (হে ভরতবংশীয় অর্জুন !) ; **সর্বক্ষেত্রেষু** (এই সমস্ত ক্ষেত্রে) ; **ক্ষেত্রজ্ঞম্** (ক্ষেত্রজ্ঞ, হিসাবে) ; **মাম্, অপি** (আমাকেই) ; **বিদ্ধি, চ** (জেনো, আর) ; **ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ** (ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের) ; **যৎ, জ্ঞানম্** (যে জ্ঞান) ; **তৎ, মম** (তাই আমার) ; **মতম্, জ্ঞানম্** (মতে প্রকৃত জ্ঞান)]

হে ভরতবংশীয় অর্জুন ! তুমি এই সমস্ত ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ হিসাবে আমাকেই জেনো ; আর ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞান, তাই আমার মতে প্রকৃত জ্ঞান ॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা—**'ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত'**—সমস্ত ক্ষেত্রে (শরীরে) 'আমি আছি'—এরূপ যে অহংভাব, তাতে 'আমি' হল ক্ষেত্র (আগের শ্লোকে যাকে **'এতৎ'** বলা হয়েছে) এবং 'আছি' হল আমি ভাবের জ্ঞাতা ক্ষেত্রজ্ঞ (আগের শ্লোকে যাকে **'বেত্তি'** পদে জ্ঞাতব্যরূপে বলা হয়েছে)। 'আমি'র সম্পর্কেই 'আছি' হয়। যদি 'আমি'র সম্পর্ক না থাকে তাহলে 'আছি' থাকে না, তখন 'আছে' হয়। কারণ 'আছে'টিই 'আমি'র সঙ্গে সম্পর্কিত হলে 'আছি' হয়। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে ক্ষেত্রজ্ঞের ('আছি'র) পরমাত্মার ('আছে'র) সঙ্গে ঐক্যবোধ থাকে। ভগবান সেই কথাই এখানে বলেছেন যে, সমস্ত ক্ষেত্রতেই আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে জানবে।

মানুষ যখন কোনো বিষয় জ্ঞাত হয়, তখন সেই জ্ঞাত বিষয়কে 'জ্ঞেয়' বলা হয়। জ্ঞেয়কে মানুষ কোনো করণ দ্বারাই জানতে পারে। করণ দু'প্রকারের হয়—বহিঃকরণ ও অন্তঃকরণ। মানুষ বিষয়গুলিকে বহিঃকরণ দ্বারা (চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি) জানতে পারে এবং বহিঃকরণকে অন্তঃকরণের (মন, বুদ্ধি ইত্যাদি) সাহায্যে জানতে পারে। অন্তঃকরণের বৃত্তি চারপ্রকার—মন, বুদ্ধি, চিত্ত এবং অহংকার। এই চারটির মধ্যে অহংকার হল সব থেকে সূক্ষ্ম, যা একদেশীয়। এই অহংকারও যার দ্বারা প্রকাশিত হয়, জানা যায়, সেই ক্ষেত্রজ্ঞই হল জ্ঞাতা এবং প্রকাশস্বরূপ। সেই অহংভাবেরও জ্ঞাতা ক্ষেত্রজ্ঞকে সাক্ষাৎ আমার স্বরূপ বলেই জানবে।

এখানে **'বিদ্ধি'** পদটি বলার অর্থ হল, হে অর্জুন ! তুমি যেমন নিজের স্থিতি দেহে বলে মনে কর এবং দেহকে নিজের বলে মনে কর, তেমনই তুমি নিজেকে আমাতে স্থিত বলে জানবে এবং আমাকে নিজের বলে মনে করবে। কারণ তুমি শরীরের সঙ্গে যে ঐক্যবোধ মেনে রেখেছ, তা পরিত্যাগ করার জন্য আমার সঙ্গে ঐক্যবোধ করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

ভগবান যেমন এখানে **'ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি'** পদের দ্বারা তাঁর নিজের সঙ্গে ক্ষেত্রজ্ঞের ঐক্য দেখিয়েছেন, তেমনই গীতায় অন্য স্থানেও ঐক্যের কথা বলেছেন ; যেমন—দ্বিতীয় অধ্যায়ের সপ্তদশতম শ্লোকে ভগবান দেহীর (ক্ষেত্রজ্ঞের) উদ্দেশ্যে বলেছেন যে, যাঁর দ্বারা এই সমস্ত জগৎ বিধৃত রয়েছে, তাঁকে তুমি অবিনাশী বলে জেনো—**'অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্'** এবং নবম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে নিজের বিষয়ে বলেছেন যে 'আমা দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত' **'ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা'**। এইস্থানে ভগবান ক্ষেত্রজ্ঞকে (অংশকে) নিজের (অংশীর) সঙ্গে ঐক্যের কথা বলেছেন এবং পরে এই অধ্যায়ের চৌত্রিশতম শ্লোকে শরীর-সংসারের (কার্যের) সঙ্গে প্রকৃতির (কারণের) ঐক্য দেখিয়েছেন। এর তাৎপর্য এই যে শরীর প্রকৃতির অংশ অতএব তুমি এর থেকে সর্বতোভাবে বিমুখ হও আর

আমার অংশ হওয়ায় আমার সম্মুখীন হও।

সংসারের সঙ্গে শরীরের স্বাভাবিক ঐক্য থাকে। কিন্তু জীব শরীরকে জগৎ-সংসারের থেকে পৃথক্ মনে করে তার সঙ্গেই নিজ ঐক্য মেনে নেয়। পরমাত্মার সঙ্গে ক্ষেত্রজ্ঞের স্বাভাবিক ঐক্য থাকলেও শরীরের সঙ্গে একত্ব মেনে নেওয়ায় সে নিজেকে পরমাত্মার থেকে পৃথক্ বলে মনে করে। শরীরকে জগৎ-সংসার থেকে পৃথক্ বলে মনে করা এবং নিজেকে পরমাত্মা হতে পৃথক্ বলে মনে করা—এই দুই ধারণাই ভুল। তাই ভগবান এখানে 'বিদ্ধি' পদের দ্বারা নির্দেশ দিয়েছেন যে তোমরা জেনো ক্ষেত্রজ্ঞ এবং আমি একই। তাৎপর্য হল এই যে, তুমি যেখানে শরীরের সঙ্গে নিজ ঐক্য মেনে নিয়েছ সেখানে আমার সঙ্গে তোমার ঐক্য মেনে নাও, যা বাস্তব সত্য।

শাস্ত্রাদিতে প্রকৃতি, জীব এবং পরমাত্মা—এই তিনেরই ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা আছে, কিন্তু এখানে ভগবান 'অপি' পদ দ্বারা এক বিশেষ ভাবের দিকে লক্ষ্য করিয়ে বলেছেন যে শাস্ত্রে পরমাত্মার যে সর্বব্যাপক স্বরূপের বর্ণনা করা হয়েছে, তা আমি তো বটেই, তার সঙ্গে সমস্ত ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞরূপে পৃথক্‌ভাবে যা দেখা যায়, তা-ও আমিই। সুতরাং উল্লিখিত পদগুলির ভাব হল যে ক্ষেত্রজ্ঞরূপে পরমাত্মাই বিরাজমান—এরূপ জেনে সাধক যেন আমার সঙ্গে অভিন্নতা অনুভব করে।

স্বয়ং সংসার থেকে পৃথক্ এবং পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্ন। তাই সংসারের সঠিক জ্ঞান তখনই হওয়া সম্ভব, যখন সংসার থেকে সর্বতোভাবে ভিন্নতা অনুভব করা হয়।

তাৎপর্য হল এই যে, সংসারে আসক্তিবর্জিত হলে তবেই সংসারের প্রকৃত স্বরূপ জানা সম্ভব। কিন্তু পরমাত্মার জ্ঞান পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্ন হলে তবেই হয়। তাই পরমাত্মার যথার্থ জ্ঞান প্রাপ্ত করাবার জন্য ভগবান ক্ষেত্রজ্ঞের সঙ্গে তাঁর অভিন্নতার কথা জানাচ্ছেন। এই অভিন্নতা সঠিকভাবে জানলে পরমাত্মার প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয়।

'ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম'—'ক্ষেত্রের (শরীরের) সমস্ত জগতের সঙ্গে ঐক্য রয়েছে। আর ক্ষেত্রজ্ঞের (জীবাত্মার) আমার সঙ্গে ঐক্য বর্তমান—এরূপ যে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান—আমার মতে সেটিই প্রকৃত 'জ্ঞান'।'

'মতং মম'—বলার অর্থ হল যে জগতে নানা বিদ্যা, নানা ভাষা, নানা লিপি, নানাপ্রকার কলা, তিনলোক ও চতুর্দশ ভুবনের যে জ্ঞান, তা প্রকৃত জ্ঞান নয়। কারণ এই জ্ঞান ব্যবহারিক প্রয়োজনে লাগলেও সংসারে আবদ্ধকারী হওয়ায় তা অজ্ঞানই। প্রকৃত জ্ঞান হল সেটি, যার দ্বারা স্বয়ং-এর শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হয় এবং সংসারে আর পুনর্জন্ম হয় না, সংসারের পরাধীনতা হয় না। এই জ্ঞানই হল ভগবানের মতে যথার্থ জ্ঞান।

পরিশিষ্ট-ভাব—ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব) ও ব্রহ্ম একই। ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্বন্ধ হলে এটি 'ক্ষেত্রজ্ঞ' এবং সমস্ত ক্ষেত্রগুলির সঙ্গে সম্পর্করহিত হলে তিনিই 'ব্রহ্ম'।

'ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রম্' পদটির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে শরীরের (ক্ষেত্রের) অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এবং **'ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি'** পদটির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে স্ব-স্বরূপের (অনন্তের) অনন্ত-অপার-অসীম পরমাত্মার সঙ্গে ঐক্য আছে। সুতরাং আমাদের থেকে বহুদূরে যদি কোনো বস্তু থাকে তা হল এই শরীর, আর অতি নিকটে যদি কোনো বস্তু থাকে, তা হল পরমাত্মা। তাৎপর্য হল যে শরীর এবং জগৎ-সংসার এক আর স্ব-স্বরূপ এবং পরমাত্মা এক (গীতা ১৫।৭)। একেই জ্ঞান বলা হয়।

ব্রহ্মকে **'মাম্'** বলার অর্থ হল ব্রহ্ম এবং ঈশ্বর এই দুটি পৃথক্ নয়, বস্তুতঃ একই—**'ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা'** (গীতা ৯।৪) 'এই সমস্ত জগৎ আমার নিরাকার স্বরূপ দ্বারা পরিব্যাপ্ত।' অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে নির্লিপ্তরূপে সর্বত্র পরিপূর্ণ যে চেতন আছে, তা হল ব্রহ্ম এবং অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের যিনি মালিক, তিনি হলেন ঈশ্বর।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকটিতে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানকেই নিজের মতে জ্ঞান বলে জানিয়ে, ভগবান এবার ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বিভাগ শোনার নির্দেশ দিয়েছেন।

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু॥ ৩ ॥

[**তৎ, ক্ষেত্রম্** (সেই ক্ষেত্র) ; **যৎ, চ, যাদৃক** (কী, ও, কেমন) ; **চ, যদ্বিকারি** (ও কীপ্রকার বিকার বিশিষ্ট) ; **চ, যতঃ, যৎ** (এবং কার থেকে কী উৎপন্ন হয়) ; **চ, সঃ** (এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞও) ; **যঃ, চ** (কী এবং) ; **যৎ প্রভাবঃ** (কীরূপ প্রভাবসম্পন্ন) ; **তৎ** (সেইসব) ; **সমাসেন** (সংক্ষেপে) ; **মে** (আমার কাছে) ; **শৃণু** (শোনো।)]

সেই ক্ষেত্র কী, কেমন, কী প্রকার বিকারবিশিষ্ট এবং কার থেকে কী উৎপন্ন হয় এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞও কী এবং কীরূপ প্রভাবসম্পন্ন—এইসব সংক্ষিপ্তভাবে আমার কাছে শোনো॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা—**'তৎ ক্ষেত্রম্'**—'তৎ' শব্দের দুটি অর্থ হয়— আগে কথিত বিষয়ের এবং দূরত্বের। এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে যাকে **'ইদম্'** পদ দ্বারা বলা হয়েছে, সেটিই এখানে **'তৎ'** পদের সাহায্যে বলা হয়েছে। ক্ষেত্র সকল স্থানে নেই, সব সময়ে নেই এবং এখনও প্রতিমুহূর্তে নাশের দিকে ধাবিত হচ্ছে—এই হল ক্ষেত্রের (স্বয়ং থেকে) দূরত্ব।

'যচ্চ'—ওই ক্ষেত্রটির যা স্বরূপ, এই অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে যার বর্ণনা করা হয়েছে।

'যাদৃক্ চ'—সেই ক্ষেত্রটির স্বভাব যেরূপ, এই অধ্যায়ের ছাব্বিশ-সাতাশতম শ্লোকে তার উৎপত্তি ও নাশের কথায় সেটি বর্ণিত হয়েছে।

'যদ্বিকারি'—যদিও প্রাকৃতিক কার্য হওয়ায় এই অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে উদ্ধৃত তেইশটি তত্ত্বকেও বিকার বলা হয়েছে, তবুও এইস্থানে সম্পর্কের জন্য ক্ষেত্রে উৎপন্ন হওয়া ইচ্ছা-দ্বেষাদি বিকারগুলিকেই বিকার বলা হয়েছে। ষষ্ঠ শ্লোকে এগুলি বর্ণিত হয়েছে।

'যতশ্চ যৎ'—এই ক্ষেত্র যার থেকে উদ্ভূত হয়েছে অর্থাৎ প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত সাতটি বিকার এবং তিনটি গুণ, যার বর্ণনা এই অধ্যায়ের উনিশতম শ্লোকের উত্তরার্ধে করা হয়েছে।

'স চ'—প্রথম শ্লোকের উত্তরার্ধে যে ক্ষেত্রজ্ঞের বর্ণনা করা হয়েছে, **'সঃ'** পদটি সেই ক্ষেত্রজ্ঞের বাচক এবং তাঁরই বিষয়ে এখানে শোনার জন্য বলা হয়েছে।

'যঃ'—এই ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ যা, যার বর্ণনা এই অধ্যায়ের বিশতম শ্লোকের উত্তরার্ধে এবং বাইশতম শ্লোকে করা হয়েছে।

'যৎ প্রভাবশ্চ'—এই ক্ষেত্রজ্ঞ যেরূপ প্রভাবশালী, তার বর্ণনা এই অধ্যায়ের একত্রিশতম থেকে তেত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত করা হয়েছে।

'তৎ সমাসেন মে শৃণু'—এখানে **'তৎ'** পদের অন্তর্গত ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ—দুই-ই ধরতে হবে। অর্থাৎ এই ক্ষেত্র যা, যেমন এবং যেরূপ বিকারসম্পন্ন এবং যা হতে উদ্ভূত—এইরূপ ক্ষেত্রের বিষয়ে চারটি কথা এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞ যা এবং যেরূপ প্রভাবসম্পন্ন—এইরূপ ক্ষেত্রজ্ঞের বিষয়ে দুটি কথা তুমি আমার কাছ থেকে সংক্ষেপে শোনো।

যদিও এই অধ্যায়ের প্রারম্ভের দুটি শ্লোকে সূত্ররূপে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের বর্ণনা করা হয়েছে, যাকে ভগবান 'জ্ঞান' বলেও অভিহিত করেছেন, তথাপি ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের বিভাগের স্পষ্টভাবে আলোচনা (বিকারযুক্ত ক্ষেত্র এবং নির্বিকার ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপের প্রভাবসহ আলোচনা) এই তৃতীয় শ্লোকটি থেকেই আরম্ভ করা হয়েছে। সেইজন্য ভগবান এটি সতর্কতার সঙ্গে শোনার নির্দেশ দিয়েছেন।

এই শ্লোকে ভগবান ক্ষেত্রের বিষয়ে চারটি কথা শোনবার নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু ক্ষেত্রজ্ঞের বিষয়ে শুধুমাত্র দুটি কথা—স্বরূপ এবং প্রভাব সম্বন্ধেই শোনার নির্দেশ দিয়েছেন। এতে প্রশ্ন হতে পারে যে, ক্ষেত্রের প্রভাবের কথা কেন বলা হয়নি এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেত্রজ্ঞের স্বভাব, বিকার এবং যার থেকে তা উদ্ভূত হয়েছে সেই বিষয় নিয়েও কেন কিছু বলা হয়নি ? তার উত্তর হল যে, যে ক্ষেত্র একমুহূর্তও একরূপে স্থির থাকে না, তার আর প্রভাব কী হতে পারে ? প্রকৃতিতে স্থিত (সংসারী) ব্যক্তির চিত্তে

জড় পদার্থের গুরুত্ব থাকে, তাই তার সংসারে ক্ষেত্রের (অর্থাদি জড় পদার্থের) প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বাস্তবে পৃথক্‌ভাবে ক্ষেত্রের কোনো প্রভাব নেই। তাই তার প্রভাবের কোনো বর্ণনা করা হয়নি।

ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ উৎপত্তি ও বিনাশরহিত, তাই তার স্বভাবও উৎপত্তি ও বিনাশরহিত। সুতরাং ভগবান তার স্বভাব পৃথক্‌ভাবে বর্ণনা না করে স্বরূপেরই অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ক্ষেত্রের সঙ্গে নিজ সম্বন্ধ মেনে নেওয়ার জন্যই ক্ষেত্রজ্ঞের মধ্যে ইচ্ছা-দ্বেষাদি বিকারের প্রতীতি হয়, নতুবা ক্ষেত্রজ্ঞ (স্বরূপতঃ) সর্বদাই নির্বিকার। অতএব নির্বিকার ক্ষেত্রজ্ঞের বিকার সম্পর্কে বর্ণনা করা সম্ভবই নয়। ক্ষেত্রজ্ঞ অদ্বিতীয়, অনাদি এবং নিত্য। সুতরাং তার ব্যাপারে 'কে কার থেকে উদ্ভূত'—সে প্রশ্নই আসে না।

পরিশিষ্ট-ভাব—ভগবানের '**তৎসমাসেন মে শৃণু**' কথাটি বলার অর্থ হল যে সাধকের বেশি কিছু জানার প্রয়োজন নেই। বেশি জানতে গেলে সময় বেশি লাগবে আর সাধন করার সময় কমে যাবে।

* * *

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে যা সংক্ষেপে শুনতে বলা হয়েছিল, সেটি কোথায় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে—পরবর্তী শ্লোকে তাই বলেছেন।

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ॥ ৪ ॥

[**ঋষিভিঃ** (ঋষিগণ) ; **বহুধা** (বিস্তারিতভাবে) ; **গীতম্** (ব্যাখ্যা করেছেন ও) ; **ছন্দোভিঃ** (বেদের ছন্দগুলিও) ; **বিবিধৈঃ, পৃথক্, চ** (নানাভাবে বর্ণিত হয়েছে, এবং) ; **হেতুমদ্ভিঃ** (যুক্তিযুক্তভাবে ও) ; **বিনিশ্চিতৈঃ** (নিঃসন্দিগ্ধরূপে) ; **ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ, এব** (ব্রহ্মসূত্রের পদেও এটি আলোচিত হয়েছে।)]

(এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্ব) ঋষিগণ বিস্তারিতভাবে এটি ব্যাখ্যা করেছেন ও বেদের ছন্দগুলিতেও নানাভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং যুক্তিযুক্ত ও নিঃসন্দিগ্ধরূপে ব্রহ্মসূত্রের পদসমূহেও এটি আলোচিত হয়েছে॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা—'ঋষিভির্বহুধা গীতম্'—বৈদিক মন্ত্রের দ্রষ্টা ও শাস্ত্র, স্মৃতি এবং পুরাণ রচয়িতা ঋষিগণ তাঁদের (শাস্ত্র, স্মৃতি ইত্যাদি) গ্রন্থে জড়-চেতন, সৎ-অসৎ, শরীর-শরীরী, দেহ-দেহী, নিত্য-অনিত্য ইত্যাদি শব্দের দ্বারা বিস্তারিতভাবে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের বর্ণনা করেছেন।

'ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্'—এখানে 'বিবিধৈঃ' বিশেষণসহ 'ছন্দোভিঃ' পদটি ঋক্, যজুঃ, সাম এবং অথর্ব—এই চার বেদের 'সংহিতা' এবং 'ব্রাহ্মণ' ভাগের মন্ত্রগুলির বাচক। সমগ্র উপনিষদ্ এবং তার বিভিন্ন শাখাগুলিও এর অন্তর্গত বলে বুঝতে হবে। এর মধ্যে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের বর্ণনা পৃথকভাবে করা হয়েছে।

'ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ'—নানা যুক্তি বিচার দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধরূপে ব্রহ্মসূত্র পদের সাহায্যেও ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের বর্ণনা করা হয়েছে।

এই শ্লোকটিতে ভগবানের অভিপ্রায় এই মনে হয় যে, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের যে বর্ণনা আমি করছি, কেউ যদি তা বিস্তারিতভাবে জানতে চায়, তাহলে সে উপরিউক্ত গ্রন্থগুলিতে দেখতে পারে।

* * *

সম্বন্ধ—তৃতীয় শ্লোকে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের বিষয়ে ভগবান যে ছ'টি কথা সংক্ষেপে শোনার নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেগুলির মধ্যে ক্ষেত্রের দুটি বিষয় অর্থাৎ তার স্বরূপ এবং বিকারের বর্ণনা পরবর্তী দুটি শ্লোকে করেছেন।

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৫ ॥

[**অব্যক্তম্, চ** (মূলপ্রকৃতি, এবং) ; **বুদ্ধিঃ** (সমষ্টিগত বুদ্ধি, মহত্তত্ত্ব) ; **অহংকারঃ** (সমষ্টি অহংকার) ; **মহাভূতানি, চ** (পঞ্চমহাভূত ও) ; **দশ ইন্দ্রিয়াণি** (দশ ইন্দ্রিয়) ; **একম্, চ** (একটি মন ও) ; **পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচরাঃ** (পঞ্চেন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিষয়) ; **এব** (এই হল চব্বিশ তত্ত্ব সম্পন্ন ক্ষেত্র।)]

মূলপ্রকৃতি, সমষ্টিগত বুদ্ধি (মহত্তত্ত্ব), সমষ্টি অহংকার, পঞ্চ মহাভূত, দশ ইন্দ্রিয় ও মন এবং পঞ্চেন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিষয় (এই হল চব্বিশ তত্ত্বসম্পন্ন ক্ষেত্র)॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা—**'অব্যক্তমেব চ'**—মূল প্রকৃতিকে বলা হয় অব্যক্ত। মূলপ্রকৃতি সমষ্টি-বুদ্ধির কারণ হওয়ায় এবং স্বয়ং কারও কার্য না হওয়ায় এটি শুধু 'প্রকৃতি'ই।

'বুদ্ধিঃ'—এই পদটি সমষ্টি-বুদ্ধি অর্থাৎ মহত্তত্ত্বের বাচক। এই বুদ্ধির দ্বারা অহংকার উদ্ভূত হয়, তাই 'প্রকৃতি' এবং মূল প্রকৃতির কার্য হওয়ায় এটি 'বিকৃতি'। অর্থাৎ এই বুদ্ধি 'প্রকৃতি-বিকৃতি'।

'অহঙ্কারঃ'—এই পদটি সমষ্টি-অহংকারের বাচক, একে 'অহংভাব'ও বলা হয়। পঞ্চ মহাভূতের কারণ হওয়ায় এই অহংকার হল 'প্রকৃতি' এবং বুদ্ধির কার্য হওয়ায় এটি হল 'বিকৃতি'। অর্থাৎ এই অহংকারও হল 'প্রকৃতি-বিকৃতি'।

'মহাভূতানি'—পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ —এই হল পঞ্চ মহাভূত। মহাভূত দু'প্রকারের—পঞ্চীকৃত এবং অপঞ্চীকৃত। এক একটি মহাভূতের পাঁচটি বিভাগ হয়ে যে মিশ্রণ ঘটে, তাকেই বলা হয় পঞ্চীকৃত মহাভূত[1]। বিভাগ না হওয়া এই পাঁচটি মহাভূতকে বলা হয় 'অপঞ্চীকৃত মহাভূত'। এইস্থানে এই অপঞ্চীকৃত মহাভূতের বাচক হল 'মহাভূতানি' পদ। এই মহাভূতগুলিকে 'পঞ্চতন্মাত্র' বা 'সূক্ষ্মমহাভূত'ও বলা হয়।

দশটি ইন্দ্রিয়, এক মন এবং শব্দ ইত্যাদি পাঁচটি বিষয়ের কারণ হওয়ায় এই মহাভূত হল 'প্রকৃতি' এবং অহংকারের কার্য হওয়ায় এটি হল 'বিকৃতি'। তাৎপর্য হল এই পঞ্চমহাভূত 'প্রকৃতি-বিকৃতি'।

'ইন্দ্রিয়াণি দশ'—চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বক—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাক্, পাণি, পাদ, উপস্থ ও পায়ু—এই পাঁচটি হল কর্মেন্দ্রিয়। এই দশটি ইন্দ্রিয় অপঞ্চীকৃত মহাভূত হতে উৎপন্ন হওয়ায় এবং স্বয়ং কারও কারণ না হওয়াতে এগুলি শুধুই 'বিকৃতি'।

'একং চ'—অপঞ্চীকৃত মহাভূত হতে উৎপন্ন হওয়ায় এবং স্বয়ং কারও কারণ না হওয়ায় মন শুধু 'বিকৃতি'।

'পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ'—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ—এগুলি (পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের) পাঁচটি বিষয়। অপঞ্চীকৃত মহাভূত হতে উৎপন্ন হওয়ায় এবং স্বয়ং কারও কারণ না হওয়ায় এই পাঁচটি বিষয়ও শুধু 'বিকৃতি'।

এই সবকিছুর সার হল এই যে, পঞ্চ মহাভূত, অহংকার ও বুদ্ধি—এই সাতটি হল 'প্রকৃতি-বিকৃতি'। মূল প্রকৃতিই শুধু 'প্রকৃতি' আর দশ ইন্দ্রিয়, এক মন এবং পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়—এই ষোলটি হল 'বিকৃতি'। এইরূপে এই চব্বিশ তত্ত্ব সমুদায়কে বলা হয় 'ক্ষেত্র'। তারই এক তুচ্ছ অংশ এই মনুষ্যদেহ, প্রথম শ্লোকে যাকে ভগবান **'ইদং শরীরম্'** এবং তৃতীয় শ্লোকে **'তৎ ক্ষেত্রম্'** পদ দ্বারা বলেছেন।

---

[1]আকাশের দুটি ভাগ, এর অর্ধেক ভাগ নিজ স্বরূপে অবস্থিত এবং অপর অর্ধেক ভাগ চার ভাগে বিভক্ত ; তার এক ভাগ বায়ু, এক ভাগ তেজ, এক ভাগ জল আর অবশিষ্ট ভাগে পৃথিবী। বায়ুর দুটি ভাগ, যার একভাগ থাকে নিজের স্বরূপে অপর ভাগটি চার ভাগে বিভক্ত হয়ে আকাশ, তেজ, জল ও পৃথিবীতে রয়েছে। তেজেরও দুটি ভাগ, অর্ধেক নিজস্বরূপে থাকে এবং অপর অর্ধেক চার ভাগে বিভক্ত হয়ে এক একটি ভাগ আকাশ, বায়ু, জল ও পৃথিবীতে রয়েছে। জলেরও দুটি ভাগ। অর্ধেক ভাগ নিজস্বরূপে অবস্থিত আর অপর অর্ধেক চার ভাগে বিভক্ত হয়ে আকাশ, বায়ু, তেজ ও পৃথিবীতে রয়েছে। তেমনই পৃথিবীরও দুটি ভাগ। অর্ধভাগ নিজ স্বরূপে অবস্থিত এবং অপর অর্ধভাগ আকাশ, বায়ু, তেজ ও জলে বিভক্ত। এইভাবে পঞ্চমহাভূতের পঞ্চীকরণ অর্থাৎ মিশ্রণ হওয়ায় একে 'পঞ্চীকৃত মহাভূত' বলা হয়।

ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সঙ্ঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্॥ ৬ ॥

[**ইচ্ছা, দ্বেষঃ** (ইচ্ছা, দ্বেষ) ; **সুখম্, দুঃখম্** (সুখ, দুঃখ) ; **সঙ্ঘাত, চেতনা** (সংঘাত, চেতনা, প্রাণশক্তি) ; **ধৃতিঃ** (এবং ধৃতি) ; **সবিকারম্** (বিকারসহ) ; **এতৎ ক্ষেত্রম্** (এই ক্ষেত্র) ; **সমাসেন** (সংক্ষেপে) ; **উদাহৃতম্** (বলা হয়েছে।)]

ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত, চেতনা (প্রাণশক্তি) এবং ধৃতি—বিকারসহ এই ক্ষেত্র সংক্ষেপে বলা হয়েছে॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা—**'ইচ্ছা'**—মনে যে বাসনার উদয় হয়, যেমন অমুক বস্তু, ব্যক্তি, পরিস্থিতি ইত্যাদির প্রাপ্তি ঘটুক—তাকে বলা হয় ইচ্ছা। ক্ষেত্রের বিকারগুলির মধ্যে ভগবান সর্বপ্রথম ইচ্ছারূপ বিকারের কথা বলেছেন। এর অর্থ হল এই যে ইচ্ছা হল মূল বিকার। কারণ এমন কোনো পাপ বা দুঃখ নেই, যা সাংসারিক ইচ্ছা থেকে উৎপন্ন না হয়, অর্থাৎ সমস্ত পাপ এবং দুঃখ সাংসারিক ইচ্ছাগুলি হতেই উদ্ভূত হয়।

'দ্বেষঃ'—কামনা এবং অহং-অভিমানে প্রতিবন্ধকতা হলে ক্রোধ উৎপন্ন হয়, চিত্তে সেই ক্রোধের যে সূক্ষ্ম রেশ থাকে, তাকে বলা হয় 'দ্বেষ'। এখানে **'দ্বেষঃ'** পদটির দ্বারা ক্রোধও বুঝে নিতে হবে।

'সুখম্'—অনুকূল পরিস্থিতিতে মনে যে প্রসন্নতার উদয় হয়, তাকে বলা হয় 'সুখ'।

'দুঃখম্'—প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মনে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, তাকে বলে দুঃখ।

'সঙ্ঘাতঃ'—চব্বিশটি তত্ত্ব দ্বারা নির্মিত এই শরীর-সমূহকে বলা হয় 'সংঘাত'। শরীর উৎপন্ন হয়ে অস্তিত্বরূপে প্রতিভাত হওয়াও বিকার এবং তাতে প্রতিমুহূর্তে যে পরিবর্তন হতে থাকে তা-ও বিকার।

'চেতনা'—প্রাণশক্তিকে বলা হয় চেতনা অর্থাৎ শরীরে যে প্রাণ থাকে তাকে বলা হয় 'চেতনা'। চেতনা পরিবর্তিত হতে থাকে, যেমন—সাত্ত্বিক-বৃত্তিতে প্রাণশক্তি শান্ত থাকে এবং চিন্তা, শোক, ভয়, উদ্বেগাদিতে প্রাণশক্তি শান্ত না থেকে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। প্রাণশক্তি সর্বদাই নষ্ট হতে থাকে। সুতরাং এটিও বিকাররূপই।

সাধারণ মানুষ প্রাণশক্তিসম্পন্নদের 'চেতন' এবং নিষ্প্রাণকে 'অচেতন' বলে থাকে, সেই দৃষ্টিতে এখানে প্রাণশক্তিকে 'চেতনা' বলা হয়েছে।

'ধৃতিঃ'—ধারণশক্তিকে বলা হয় ধৃতি। ধৃতিরও পরিবর্তন হয়। মানুষ কখনো ধৈর্য ধারণ করতে সক্ষম হয় আবার কখনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ধৈর্য হারিয়ে ফেলে। ধৈর্য কখনো বেশি হয়, কখনো কম। মানুষ কখনো নীতিকথা অবলম্বন করে আবার কখনো বিপরীত নীতি অবলম্বন করে। সুতরাং ধৃতিও ক্ষেত্রের বিকার।

[অষ্টাদশ অধ্যায়ের তেত্রিশতম থেকে পঁয়ত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত ধৃতির সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক—এই তিন বিভাগের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। পরমাত্মার শরণাগত হতে হলে সাত্ত্বিক ধৃতির অত্যন্ত প্রয়োজন।]

'এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্'—প্রথম শ্লোকে যেমন 'ইদং শরীরম্' দ্বারা ব্যষ্টি-শরীর থেকে নিজেকে পৃথক্ভাবে দেখতে বলা হয়েছে, তেমনই দৃশ্য (ক্ষেত্র এবং তাতে সংঘটিত বিকার) থেকে দ্রষ্টাকে পৃথক্ভাবে দেখবার জন্য এখানে 'এতৎ' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

পঞ্চম শ্লোকে ভগবান সমষ্টি-জগতের বর্ণনা করেছেন এবং এই ষষ্ঠ শ্লোকে ব্যষ্টি-শরীরের বিকারগুলির বর্ণনা করেছেন। কারণ সমষ্টি-জগতে ইচ্ছা-দ্বেষ ইত্যাদি বিকার হয়ই না। এর তাৎপর্য হল যে ব্যষ্টি শরীর সমষ্টি জগৎ থেকে এবং সমষ্টি-জগৎ ব্যষ্টি-শরীর থেকে পৃথক্ নয় অর্থাৎ দুই-ই এক। এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে যেমন ভগবান ক্ষেত্রজ্ঞের সঙ্গে তাঁর ঐক্যের কথা জানিয়েছেন, তেমনই এইস্থানে ব্যষ্টি-শরীর এবং তাতে সংঘটিত বিকারগুলির সমষ্টি-জগতের সঙ্গে ঐক্যের কথা বলেছেন। পরে একুশতম শ্লোকে বলেছেন—**'পুরুষ প্রকৃতিস্থো হি'**। এর দ্বারা সিদ্ধ হয় যে পুরুষের স্থিতি (সম্বন্ধ) ব্যষ্টি শরীরে হলে তার স্থিতি সমষ্টি-প্রকৃতিতেই হয়। কারণ ব্যষ্টি-শরীর এবং সমষ্টি-প্রকৃতি—দুটি একই। বাস্তবে দেখলে ব্যষ্টি বলে কিছুই নেই, শুধু সমষ্টিই আছে। ভ্রমবশতঃই ব্যষ্টিকে মেনে নেওয়া হয়েছে। সমুদ্রের ঢেউগুলিকে যেমন সমুদ্রের থেকে পৃথক্ মনে করা ভুল, তেমনই ব্যষ্টি-শরীরকে সমষ্টি-জগৎ থেকে পৃথক্ মনে

করে নিজের বলে মনে করাও ভুল।

বিশেষ কথা

ক্ষেত্রজ্ঞ যখন নির্বিচারে ক্ষেত্রের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নেয়, তখন ক্ষেত্রে ইচ্ছা-দ্বেষ ইত্যাদি বিকার উৎপন্ন হয়। ক্ষেত্রজ্ঞের বাস্তব স্বরূপ সর্বদাই নির্বিকার। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হতে উদ্ভূত বিকার সর্বতোভাবে দূর করা যায়। কারণ ক্ষেত্রজ্ঞের ক্ষেত্রের সঙ্গে সংযোগ শুধু মেনে নেওয়া হয়েছে মাত্র। এই মেনে নেওয়া সংযোগ দূর করার জন্য ভগবান এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে শরীরকে নিজের থেকে পৃথক্ করে দেখার জন্য এবং পরে দ্বিতীয় শ্লোকে পরমাত্মার সঙ্গে নিজের নিত্য সংযোগ (ঐক্য) অনুভব করার জন্য বলেছেন। এরূপ অনুভব হলে ক্ষেত্রের সঙ্গে মেনে নেওয়া ঐক্যের সর্বতোভাবে অভাব হয় এবং আর কখনো বিকার উৎপন্ন হয় না।

বোধ জন্মালে অর্থাৎ ক্ষেত্র (শরীর) থেকে সর্বতোভাবে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হলে 'ইচ্ছা' এবং 'দ্বেষ' চিরকালের মতো দূর হয়। 'সুখ' ও 'দুঃখ' অর্থাৎ অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতির জ্ঞান হলেও চিত্তে তজ্জনিত কোনো বিকার উৎপন্ন হয় না অর্থাৎ অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতি প্রাপ্ত হলেও জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ তাতে সুখী বা দুঃখী হন না। সুখ-দুঃখের জ্ঞান থাকা দোষের নয়, কিন্তু তার দ্বারা প্রভাবিত হওয়া দোষের[১]।

জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের 'সংঘাত' অর্থাৎ শরীরের সঙ্গে বিন্দুমাত্রও 'আমি-আমার' সম্বন্ধ না থাকায় যদিও তাঁর শরীর মহাপবিত্র হয়ে ওঠে, তা সত্ত্বেও প্রারব্ধ অনুসারে তাঁর এই শরীর বেঁচে থাকে। শরীর যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ চেতনাও (প্রাণশক্তি) থাকে। পরিশ্রম করলে তাতে চাঞ্চল্য আসে, অন্য সময় শান্ত থাকে। সাধনাবস্থায় যে সাত্ত্বিক 'ধৃতি' থাকে, বোধ হলেও সেটি বজায় থাকে। কিন্তু চিত্তে তাদাত্ম্য না থাকায় তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষের 'চেতনা' এবং 'ধৃতি'-রূপ বিকারগুলির সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ থাকে না।

তাৎপর্য হল এই যে শরীরের সঙ্গে তাদাত্ম্য হওয়ায় যে বিকার হয়, তা বোধ হলে আর থাকে না। সংঘাত, চেতনা ও ধৃতিরূপ বিকার থাকলেও তাঁর স্বয়ং-এর ওপর এর কোনো প্রভাব পড়ে না।

পরিশিষ্ট-ভাব—ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলেই ক্ষেত্রজ্ঞের ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি বিকার উপস্থিত হয়—**'পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে'** (১৩।২০)। ইচ্ছা-দ্বেষাদি সমস্ত বিকার তাদাত্ম্যতেই (জড়-চেতন গ্রন্থিতেই) থাকে। তাদাত্ম্যতেও এই বিকার জড়-অংশে থাকে।

ভগবান এখানে চব্বিশ তত্ত্বসম্পন্ন শরীর এবং তার সাতটি বিকারকে **'এতৎ'** (য়হ) বলেছেন—**'এতৎ ক্ষেত্রম্'**। এরূপ বলার তাৎপর্য হল যে স্ব-স্বরূপ ক্ষেত্রের সঙ্গে মিলিতভাবে নেই, তিনি সর্বতোভাবে পৃথক। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ—এই তিন শরীরই **'এতৎ'** পদের অন্তর্গত হওয়ায় আমাদের স্বরূপ নয়। এখানে লক্ষ্যণীয় হল যে যখন অহঙ্কারবশতঃ 'মহত্তত্ত্ব' এবং 'মূল প্রকৃতি'-কেও **'এতৎ'** শব্দে বলা হয়েছে তখন অহংকারের **'এতৎ'** হওয়াতে বাধা কোথায়। অহং থেকে নিকটে মহত্তত্ত্ব এবং মহত্তত্ত্ব থেকে নিকটে প্রকৃতি। সেই প্রকৃতিও **'এতৎ ক্ষেত্রের'** অন্তর্গত অর্থাৎ অহং আমাদের শরীর নয়। যে ব্যক্তি স্ব-স্বরূপ ও অহংকে (ক্ষেত্রকে) পৃথক্‌রূপে জানতে পারে, তার আর জন্ম হয় না, সে পরমাত্মাকে লাভ করে (গীতা ১৩।২৩)।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—শরীরের সঙ্গে তাদাত্ম্য করে নিলেই ইচ্ছা, দ্বেষ ইত্যাদি বিকারসমূহ উৎপন্ন হয় এবং স্বয়ং-এর ওপর সেই বিকারের প্রভাব পড়ে। তাই ভগবান এই তাদাত্ম্য দূর করার জন্য পরবর্তী পাঁচটি শ্লোকে প্রয়োজনীয় কুড়িটি সাধনকে 'জ্ঞান' নামে বর্ণনা করেছেন।

---

[১]জ্ঞান কখনো কারও পক্ষে দোষের হয় না ; যেমন—আহার গ্রহণের সময় জিভে যে স্বাদের জ্ঞান হয়, তা দোষের নয়, কিন্তু খাদ্যবস্তুতে অনুরাগ বা তাচ্ছিল্য আসা দূষণীয়।

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্যমাত্মবিনিগ্রহঃ॥ ৭ ॥

[অমানিত্বম্-মানিত্ব (নিজের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান না থাকা) ; অদম্ভিত্বম্-দম্ভভাব (দম্ভ-রাহিত্য) ; অহিংসা, ক্ষান্তিঃ, আর্জবম্ (অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা) ; আচার্যোপাসনম্ (আচার্যের সেবা) ; শৌচম্ (বাহ্যান্তর শুচি) ; স্থৈর্যম্ (স্থৈর্য এবং) ; আত্মবিনিগ্রহঃ (আত্মসংযম।)]

মানিত্ব (নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ভাব) না থাকা, দম্ভভাব (আত্মপ্রচারণা) না থাকা, অহিংসা, ক্ষমা, সারল্য, আচার্য-সেবা, অন্তর-বাহিরের শুচিতা, স্থৈর্য এবং আত্মসংযম॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা—'অমানিত্বম্'—নিজের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বভাব না থাকাকে বলা হয় 'অমানিত্ব'। বর্ণ, আশ্রম, যোগ্যতা, বিদ্যা, গুণ, পদ ইত্যাদির জন্য নিজের মনে শ্রেষ্ঠত্বের ভাব উদয় হয় 'আমি মান্য ব্যক্তি, শ্রদ্ধেয়', কিন্তু এই ভাব উৎপত্তি ও বিনাশশীল, শরীরের সঙ্গে তাদাত্ম্য হলে তবেই উৎপন্ন হয়। তাই এর মধ্যে জড়ত্বের প্রাধান্যই থাকে। এইরূপ মানিত্ব অভিমান থাকলে সাধকের প্রকৃত জ্ঞান হয় না। সাধকের এই মানিত্বভাব যত কম থাকবে ততই জড়ত্বের গুরুত্ব কম হবে। জড়ত্বের গুরুত্ব যত কম হবে নিজের মধ্যে তা নিয়ে সেই অভিমান বা শ্লাঘা ততই কম হতে থাকবে এবং সাধক ততই চিন্ময়ের দিকে অতি দ্রুত অগ্রসর হতে থাকবেন।

উপায়—সাধক যখন নিজেকে অন্যের চেয়ে বড় মনে করেন, তখন তাঁর মধ্যে আত্মশ্লাঘা এসে পড়ে। তাই সাধকের উচিত যাঁরা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, সাধনায় তাঁর থেকে উচ্চ, তত্ত্বজ্ঞ (জীবন্মুক্ত) তাঁদের সঙ্গ করা, তাঁদের কাছে থাকা এবং তাঁদের অনুগত হওয়া। এতে অভিমান দূর হয় ; শুধু তাই নয়, তাঁদের সঙ্গগুণে বহু দোষ অতি সহজেই দূরীভূত হয়।

শ্রীতুলসীদাস গোস্বামী বলেছেন যে—**'সবহি মানপ্রদ আপু অমানী'** (শ্রীরামচরিতমানস ৭।৩৮।২) অর্থাৎ সাধুগণ সকলকেই মান প্রদান করেন এবং নিজেরা অমানী—মান পাওয়ার ইচ্ছাবর্জিত হন। সাধকেরও এইরূপ নিজের মানীত্বভাব দূর করার জন্য সর্বদা অপরকে অকাতরে মান, মর্যাদা, যশ, শ্রদ্ধা ইত্যাদি প্রদান করার স্বভাব তৈরি করতে হয়। এইরূপ স্বভাব তখনই হতে পারে, যখন সে অপরকে কোনো না কোনো ভাবে নিজের থেকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করবে।

নিয়ম হল এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হলেও তাদের প্রত্যেকের মধ্যে কোনো না কোনো বিশেষত্ব থাকেই। এই বিশেষত্ব বর্ণ, আশ্রম, গুণ, বিদ্যা, বুদ্ধি, যোগ্যতা, পদ, অধিকার ইত্যাদি যে কোনো কারণেই হতে পারে। তাই সাধকের উচিত তিনি যেন অপরের বিশেষত্বের দিকে দৃষ্টি রেখে সর্বদা তাঁকে সম্মান করেন। এইভাবে নিজের মধ্যে অন্যকে মর্যাদা প্রদান করার স্বভাব তৈরি হয়ে গেলে নিজের মর্যাদা লাভের ইচ্ছা স্বতঃই দূর হয়। তবে, অন্যকে মর্যাদা প্রদানের সময় সাধকের যেন নিজের মানিত্বভাব দূর করাই উদ্দেশ্য থাকে, পরিবর্তে মান পাবার আশা যেন না থাকে।

বিশেষ কথা

গীতায় ভগবান ভক্তিমার্গের সাধকদের সর্বপ্রথম নির্ভয়তার কথা বলেছেন—**'অভয়ম্'** (১৬।১) আর শেষে অমানিত্বের কথা জানিয়েছেন—**'নাতিমানিতা'** (১৬।৩)। কিন্তু জ্ঞানমার্গের সাধনায় সর্বপ্রথম অমানিত্বের কথা বলা হয়েছে—**'অমানিত্বম্'** (১৩।৭) আর নির্ভয়তার কথা এসেছে সর্বশেষে—**'তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্'** (১৩।১১)। এর অর্থ হল যে বালক যেমন তার মাকে দেখে নির্ভয় হয়, তেমনই ভক্তিমার্গের সাধক শ্রীপ্রহ্লাদের মতো প্রারম্ভেই সর্বত্র নিজ প্রভুকে অবলোকন করেন, তাই তিনি প্রারম্ভ থেকেই অভয় হয়ে থাকেন। ভক্তদের মধ্যে নিজে অমানী থেকে অন্যকে মান প্রদান করার প্রবণতা গোড়া থেকেই থাকে। পরিণামে তাঁদের দেহাধ্যাস অর্থাৎ শরীরের সঙ্গে মেনে নেওয়া ঐক্য নিজে থেকেই দূর হয় এবং তিনি সর্বতোভাবে অমানী হয়ে থাকেন। কিন্তু জ্ঞানমার্গের সাধক শুরু থেকেই শরীরের সঙ্গে তাঁদের ঐক্য স্বীকার করেন না (১৩।১), তাই তিনি প্রারম্ভ থেকেই অমানী হয়ে থাকেন। কারণ শরীরের সঙ্গে ঐক্য মেনে

নিলে তবেই মানীত্বভাব এসে থাকে। পরিশেষে তিনি তত্ত্বজ্ঞানের অর্থরূপ পরমাত্মাকে সর্বত্র পরিদর্শন করে ভয়মুক্ত হয়ে থাকেন।

'অদম্ভিত্বম্'—লোক দেখানোর ভাবকে বলা হয় দম্ভ। লোকে আমার মধ্যে ভালো গুণ দেখলে আমাকে সম্মান করবে, মালা পরাবে, আমার পূজা করবে, উচ্চাসনে বসাবে ইত্যাদিকে নিয়ে নিজের মধ্যে ওইরূপ গুণ না থাকা সত্ত্বেও তার ভান করা, নিজের মধ্যে তেমন গুণ কম হলেও বাহ্যতঃ তা বেশি করে প্রকট করা—এগুলিকেই দম্ভ বলা হয়।

নিজের মধ্যে সদাচার, শুদ্ধি, পবিত্রতা থাকা সত্ত্বেও, লোকে কী মনে করবে ভেবে নিজের শুচিতা আদি ত্যাগ করা এবং অন্য লোকের মতো আচরণ করাকেও বলা হয় দম্ভ। যেমন—আজকাল বিবাহাদির নিমন্ত্রণে, ক্লাব বা হোটেলের স্বাগত-সমারোহে বা বিমানে যাত্রার সময় শুদ্ধ আচরণকারী ব্যক্তিকেও মান-মর্যাদার জন্য অপবিত্র আহার্য গ্রহণ করতে দেখা যায়, এ-ও একপ্রকার দম্ভই। এইরূপ দুরাচারী ব্যক্তিও ভালো লোকেদের সংস্পর্শে এলে মান, মর্যাদা, কীর্তি, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি লাভের আশায় নিজেকে ধর্মাত্মা, ভক্ত, সেবক, দানী ইত্যাদি বলে আত্মপ্রচার করে থাকেন, এ-ও একরূপ দম্ভই।

কোনো সাধক যদি একান্তে, বন্ধ ঘরে জপ, ধ্যান, চিন্তা করতে থাকেন আর তার সঙ্গে আলস্যজড়িত নিদ্রাও গ্রহণ করেন, তখন বাইরে থেকে তাঁর ওপর শ্রদ্ধা ও পূজ্যভাব রাখা ব্যক্তিদের আওয়াজ পেয়ে যদি তিনি সতর্ক হয়ে নিদ্রা, আলস্য পরিত্যাগ করে উঠে জপ-ধ্যানই করতে থাকেন—তা-ও একপ্রকার দম্ভই, এগুলিকে বলা হয় সূক্ষ্ম দম্ভ ! আওয়াজ শুনে সতর্ক হওয়া কোনো দোষের ব্যাপার নয়, কিন্তু তাঁর মধ্যে যে জাহির করার ভাব থাকে যে এইসব মানুষেরা যেন তাঁকে অশ্রদ্ধা না করে, সেইটিই দোষের। সেইস্থানে এই ভাব আসা উচিত যে, ভগবান খুব ভালো করেছেন আমাকে সাবধান করে, এর ফলে আমি জপ-ধ্যানে মনোনিবেশ করতে পারছি। এইরূপে সমস্ত দম্ভ পরিত্যাগ করাকে বলা হয় 'অদম্ভিত্ব'।

উপায়—সাধকের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ভগবান লাভ করা, লোক দেখানো নয়। তাঁর মধ্যে লোকদেখানো ভাব থাকলে তাঁর সাধনায় শৈথিল্য আসে, যার ফলে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে বাধা পড়ে। তাই তাঁর ভালো-মন্দ, উচ্চ-নীচ যা কিছু অবস্থা আসে, সেদিকে কোনো লক্ষ্য না করে নিজের সাধনায় ব্যাপৃত থাকা উচিত। এইভাবে সতর্ক থাকলে দম্ভ দূর হয়।

'অহিংসা'—কায়মনোবাক্যে কখনো কাউকে দুঃখ না দেওয়াকে বলা হয় 'অহিংসা'। কর্তাভেদে হিংসা তিন প্রকারের হয়—কৃত (নিজে হিংসা করা), কারিত (কারো দ্বারা হিংসা করানো) এবং অনুমোদিত (হিংসাকে অনুমোদন বা সমর্থন করা)।

উপরিউক্ত তিন প্রকারের হিংসা তিনটি ভাব থেকে হয়ে থাকে—ক্রোধ হতে, লোভ হতে এবং মোহ হতে। তাৎপর্য হল এই যে ক্রোধ থেকেও কৃত, কারিত, অনুমোদিত হিংসা হয় । লোভ থেকেও কৃত, কারিত ও অনুমোদিত হিংসা হয় এবং মোহ থেকেও কৃত, কারিত ও অনুমোদিত হিংসা হয়। এইভাবে হিংসা নয় প্রকারের হয়।

উপরিউক্ত নয় প্রকারের হিংসা তিন মাত্রার হয়—মৃদুমাত্রা, মধ্যমাত্রা এবং অধিমাত্রা। কাউকে অল্পস্বল্প দুঃখ দেওয়াকে মৃদুমাত্রা হিংসা বলা হয়, মৃদুমাত্রার থেকে বেশি দুঃখ দেওয়াকে বলা হয় মধ্যমাত্রার হিংসা আর খুব বেশিভাবে আঘাত করা বা হত্যা করাকে বলা হয় অধিমাত্রার হিংসা। এইরূপ মৃদু, মধ্য এবং অধিমাত্রার ভেদে হিংসা সাতাশ প্রকারের হয়ে থাকে।

এই সাতাশ প্রকারের হিংসা তিনটি করণের সাহায্যে হয়—শরীর দ্বারা, বাক্য দ্বারা, মন দ্বারা। এইভাবে হিংসা একাশি প্রকারের হয়ে পড়ে। এইগুলির কোনোটিই না করাকে বলা হয় অহিংসা।

অহিংসাও চার প্রকারের—দেশগত, কালগত, সময়গত এবং ব্যক্তিগত। অমুক তীর্থে, অমুক মন্দিরে, অমুক স্থানে কাউকে দুঃখ না দেবার অভিপ্রায়কে বলা হয় 'দেশগত অহিংসা'। অমাবস্যা, পূর্ণিমা বা বিশেষ কোনো তিথিতে কাউকে দুঃখ না দেবার যে অভিপ্রায়, তাকে বলা হয় 'কালগত অহিংসা'। সাধুলাভ হলে, পুত্রের জন্মদিনে, পিতার মৃত্যুদিনে কাউকে দুঃখ না দেবার যে ইচ্ছা, তাকে বলা হয় 'সময়গত অহিংসা'। গোরু, হরিণ ইত্যাদি মনুষ্যেতর প্রাণীকে, গুরুজন, মা-বাবা, শিশু-বালক এদের দুঃখ না দেবার অভিপ্রায়কে বলা হয় 'ব্যক্তিগত অহিংসা'।

কোনো দেশ, কাল ইত্যাদিতে ক্রোধ-লোভ বা মোহবশতঃ কাউকেও কায়মনোবাক্যে কোনোপ্রকার দুঃখ

না দিলে, তাকে বলা হয় সার্বভৌম অহিংসা অর্থাৎ 'মহাব্রত'।

উপায়—সাধারণ প্রাণী যেমন নিজের শরীরের সুখ চায়, তেমনই সাধকের সবার সুখে নিজের সুখ, সকলের হিতে নিজের হিত আর সকলের সেবাতেই নিজের সেবা বলে মনে করা উচিত অর্থাৎ সকলের সুখ, হিত ও সেবার থেকে নিজের সুখ, হিত এবং সেবাকে পৃথক্ বলে মনে করা উচিত নয়। 'সবই নিজের স্বরূপ'—এই বিবেকবোধ জাগ্রত থাকলে তাঁর দ্বারা কাউকে দুঃখ প্রদান করা সম্ভব হয় না এবং তাঁর মধ্যে স্বতঃই অহিংসা-ভাব জাগরিত হয়।

'ক্ষান্তি'—সহনশীলতা অর্থাৎ ক্ষমাকে বলা হয় ক্ষান্তি। নিজের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অপরাধীর যেন কখনো কোনোভাবেই দণ্ডবিধান করা না হয়—এই ভাব রাখা এবং অন্যায়কারীর প্রতি প্রতিশোধ নেওয়া বা অন্য কারও দ্বারা তাকে শাস্তিবিধান করানোর ভাব না রাখাকেই বলা হয় 'ক্ষান্তি'।

উপায়—(১) সহনশীলতা নিজের স্বরূপে স্বতঃসিদ্ধ। কারণ নিজ স্বরূপে কখনো বিকৃতি আসে না। সুতরাং 'কেউ দুঃখ দিয়েছে, অন্যায় করেছে'—এমন কথা যদি কখনো মনে আসে তাহলে স্বতঃ চিন্তা করা উচিত যে, 'কেউ-ই আমার কোনো ক্ষতি করতে পারে না, আমার মধ্যে কোনো বিকৃতি (বিকার) ঘটা সম্ভব নয়, আমার স্বরূপ পর্যন্ত বিকার পৌঁছাতেই পারে না।' এইভাবে চিন্তা করলে ক্ষমার ভাব আপনিই আসে।

(২) আহার গ্রহণের সময় নিজের দাঁত দিয়ে নিজের জিভে কামড় দিলে আমরা দাঁতের ওপর রাগ করে কোনোরূপ দণ্ডবিধান করি না। তবে জিভ যেন তাড়াতাড়ি সেরে যায়, এইরূপ মনোভাব থাকলেও দাঁতগুলি ভেঙে ফেলব, একথা কখনো মনে আসে না। কারণ দাঁতগুলি ভেঙে ফেললে নিজেরই আরও অধিক কষ্ট হবে, যার ফলে আমরাই দুঃখ পাব, আমাদেরই অনিষ্ট হবে। ঠিক তেমনই অকারণে কেউ যদি কোনো অন্যায় আচরণ করে, আমাদের দুঃখ দেয়, আবার তাকেও যদি আমরা দুঃখ দিই, তবে প্রকৃতপক্ষে তাতে আমাদেরই ক্ষতি হবে। কারণ সেও তো আমাদের নিজেরই স্বরূপ (গীতা ৬।২৯)।

'আর্জবম্'—সরল-সহজ ভাবকে বলা হয় **'আর্জব'**। সাধকের কায়মনোবাক্যে সহজ-সরল হওয়া উচিত। শরীরকে সাজানোর চেষ্টা যেন না থাকে, চাল-চলনে সহজ অকপট ভাব, উদ্ধত-জেদী বা অহংকারী না হওয়া—এসবই 'শারীরিক সরলতা'। ছল-কপটতা-ঈর্ষা-দ্বেষ ইত্যাদি না থাকা অর্থাৎ নিষ্কপটতা, সৌম্য, হিতাকাঙ্ক্ষা, দয়া ইত্যাদি থাকা—এগুলি 'মানসিক সরলতা'। ব্যঙ্গ, নিন্দা, পরচর্চা, অপমানজনক বিদ্রূপ বাক্য বলা পরিত্যাগ করা এবং সরল, প্রিয়, হিতকারী বাক্য বলা—এসবই 'বাচনিক সরলতা'।

উপায়—নিজেকে একদেশীয় বলে মনে করলে অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে, অন্যের থেকে নিজেকে বিশেষ ব্যক্তি বলে মনে হয়। তার ফলে চলা-ফেরা, ওঠা-বসায় কিছু কিছু ঔদ্ধত্য, অহংকার জন্মে থাকে। অতএব শরীরের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক না মেনে শুধু স্বরূপের দিকে দৃষ্টি রাখলে এই ঔদ্ধত্য দূর হয় এবং সাধকের মধ্যে স্বতঃই সরলতা, নম্রতা আসে।

'আচার্যোপাসনম্'—বিদ্যা এবং সদুপদেশ প্রদানকারী গুরুকেও আচার্য বলা হয় এবং তাঁর সেবা করলে উন্নতি হয় কিন্তু এইস্থানে 'আচার্য' পদটি পরমাত্মতত্ত্ব-প্রাপ্ত জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের বাচক। আচার্যকে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করা, তাঁকে শ্রদ্ধা-সম্মান জানানো, তাঁর সেবা করার শাস্ত্রবিহিত চেষ্টাকেও তাঁর উপাসনা বলা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর সিদ্ধান্ত এবং আদর্শ অনুসারে নিজ জীবন গঠন করাকেই প্রকৃত উপাসনা বলা হয়। কারণ দেহাভিমানী ব্যক্তির সেবা তাঁর দেহ পরিচর্যা করলেই হয়, কিন্তু গুণাতীত মহাপুরুষের কেবলমাত্র দেহের পরিচর্যা করলে তাঁকে পূর্ণভাবে সেবা করা হয় না।

ভগবান দৈবী-সম্পদের লক্ষণে **'আচার্যোপাসনম্'** পদটি ব্যবহার না করে এখানে জ্ঞানের সাধনার স্থানে সেটি ব্যবহার করেছেন। এতে একটি বিশেষ তথ্য প্রকটিত হয়েছে যে, জ্ঞানমার্গে যত গুরুর প্রয়োজনীয়তা থাকে, ভক্তিমার্গে তত নয়। কারণ ভক্তিমার্গের সাধক সর্বদা ভগবানের আশ্রিত হয়েই সাধন-ভজন করেন, তাই ভগবান স্বয়ং তাঁকে কৃপা করে তাঁর যোগক্ষেম নিজেই বহন করে থাকেন (গীতা ৯।২২), সাধকের অভাব, বাধা-বিঘ্নগুলি দূর করে দেন (গীতা ১০।১১)। কিন্তু জ্ঞানমার্গের সাধক তাঁর সাধনার বলের ওপর নির্ভর করেন, তাই তাঁর মধ্যে কিছু কিছু সূক্ষ্ম ঘাটতি থাকা সম্ভব। যেমন—

(১) শাস্ত্রাদি ও সাধু মহাপুরুষের নিকট হতে জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়ে সাধক যখন (নিজ ধারণা অনুযায়ী) শরীরকে নিজের থেকে পৃথক্ বলে মনে করেন, তখন তিনি শান্তিলাভ করেন। এরূপ অবস্থায় তিনি মনে করেন তাঁর তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়েছে। কিন্তু যখনই মান-অপমানকর কোনো ঘটনা উপস্থিত হয় বা অনুকূল-প্রতিকূল ঘটনা ঘটতে থাকে, তখনই চিত্তে হর্ষ-শোক উৎপন্ন হয়, যাতে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর তখনো তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়নি।

(২) কোনো ব্যক্তি হঠাৎ নাম ধরে ডাকলে অন্তঃকরণে এই নামবিশিষ্ট শরীর তো আমিই—এই ভাব যদি উৎপন্ন হয় তাহলে বুঝতে হবে যে তখনও আমি শরীরেই আবদ্ধ রয়েছি।

(৩) সাধনার উচ্চ অবস্থা লাভ হলেও জাগ্রত অবস্থায় তো সাধকের জড় ও চেতনের বিবেক সজাগই থাকে, কিন্তু নিদ্রাকালে তার বিস্মৃতি ঘটে। তাই নিদ্রাভঙ্গে সাধক সেই বিবেকই ধরেন। কিন্তু সিদ্ধ মহাপুরুষদের বিবেক সদাসর্বদা স্বাভাবিকভাবে বিরাজ করে।

(৪) সাধকদের পূজনীয়দের কাছ থেকেও মান-সম্মান পাবার আকাঙ্ক্ষা থাকে ; যেমন—তিনি যখন সাধু বা গুরুজনদের সেবা করেন, সৎসঙ্গ ইত্যাদিতে মুখ্যভাবে অংশগ্রহণ করেন, তখন তাঁর মনে এই ভাব উদয় হয় যে, ওইসব সাধু অথবা গুরুজন আমাকে অন্যদের অপেক্ষা যেন শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন। এটি হল তাঁর সূক্ষ্ম পরিচ্ছিন্নতা।

সাধকের মধ্যে এইরূপ কিছু কিছু ঘাটতি থাকার সম্ভাবনা থাকে, সেদিকে লক্ষ্য না রাখলে তিনি তাঁর অপূর্ণ জ্ঞানকেই পূর্ণ বলে মনে করতে পারেন। ভগবান তাই **'আচার্যোপাসনম্'** পদ দ্বারা বলেছেন যে, জ্ঞানমার্গের সাধকদের আচার্যের কাছ থেকে তাঁদের অধীনেই সাধন করা উচিত। চতুর্থ অধ্যায়ের চৌত্রিশতম শ্লোকেও ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে, 'তুমি তত্ত্বজ্ঞ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদের কাছে গিয়ে তাঁদের দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করে, তাঁদের সেবা করে নিজ জিজ্ঞাসা পূরণের জন্য বিনয়পূর্বক প্রশ্ন করবে, তাহলেই সেই তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী মহাত্মাগণ তোমাকে জ্ঞানের উপদেশ দেবেন।' এইভাবে সাধনা করলে এইসব মহাপুরুষ তাঁদের সেই সূক্ষ্ম ঘাটতিগুলি, যেগুলি তাঁরা নিজেরা জানেন না, সেগুলি দূর করে তাঁদের সহজভাবে পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব করাতে পারেন।

সাধকের গোড়া থেকেই বিচার-বিবেচনা করে আচার্য, সাধু-মহাপুরুষদের কাছে যাওয়া উচিত। আচার্য (গুরু) কেমন হবেন ? এই ব্যাপারে এই কথা কয়টি মনে রাখতে হবে—

(১) নিজের দৃষ্টিতে যাঁকে প্রকৃত বোধসম্পন্ন এবং তত্ত্বজ্ঞ বলে প্রতিভাত হয়।

(২) যিনি কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ প্রভৃতি সাধন পথ যথাযথ জানেন।

(৩) যাঁর সাহচর্যে বা বাক্যে আমাদের অন্তরের প্রশ্নগুলির বিনা আয়াসেই মীমাংসা হয়ে যায়।

(৪) যাঁর সাহচর্যে প্রসন্নতা এবং শান্তি অনুভূত হয়।

(৫) যিনি শুধু আমাদের হিতের জন্যই আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন।

(৬) যিনি আমাদের থেকে কোনো কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না।

(৭) যাঁর সমস্ত চেষ্টাই শুধুমাত্র সাধকদের হিতের উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে।

(৮) যাঁর সান্নিধ্যে থাকলে আমাদের আগ্রহ স্বতঃই লক্ষ্যের দিকে যায় এবং বৃদ্ধি পেতে থাকে।

(৯) যাঁর সঙ্গ, দর্শন, ভাষণ, স্মরণ ইত্যাদির দ্বারা আমাদের দুর্গুণ-দুরাচার দূর হয়ে সদ্গুণ-সদাচাররূপ দৈবীসম্পদ প্রকটিত হয়ে ওঠে।

(১০) যিনি ভিন্ন আর কারও মধ্যে এরূপ অলৌকিকত্ব, বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না।

এরূপ আচার্য, সাধুমহাপুরুষদের কাছে নিজের উদ্ধারের জন্যই থাকা এবং সম্বন্ধ রাখা উচিত। ইনি কী করেন, কী করেন না, এরূপ কার্য কেন করেন, কার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেন ইত্যাদিতে বুদ্ধি প্রয়োগ করার প্রয়োজন নেই অর্থাৎ তাঁর ক্রিয়াগুলি নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। সাধককে তাঁর অধীন হয়ে থাকতে হয়, তাঁর আদেশ, নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা উচিত এবং শ্রদ্ধা সহকারে তাঁর সেবা করা উচিত। যদি এই মহাপুরুষ না চান তাহলে তাঁর সঙ্গে গুরু-শিষ্যের ব্যবহারিক সম্পর্ক স্থাপন করারও প্রয়োজন নেই। তবে হৃদয়ে তাঁকে গুরু বলে মনে করে শ্রদ্ধা করলে তাতে কোনো দোষ নেই।

যদি এরূপ মহাপুরুষ পাওয়া না যায় তাহলে সাধকের

উচিত শুধু ভগবদ্‌পরায়ণ হয়ে ভগবানের ধ্যান, চিন্তা ইত্যাদিতে ব্যাপৃত হওয়া এবং এই বিশ্বাস রাখা যে পরমাত্মা অবশ্যই তাঁকে গুরু পাইয়ে দেবেন। বাস্তবে দেখা যায় যে পূর্ণভাবে পরমাত্মার ওপর নির্ভর করার পর ভগবান স্বয়ংই গুরুর কাজ পূর্ণ করে দেন। কারণ গুরুর মাধ্যমে পরমাত্মাই প্রকৃতপক্ষে সাধককে পথ-নির্দেশ করেন।

উপায়—যে সাধকের পরমাত্মাকে লাভ করাই উদ্দেশ্য হয়, তাঁর এই ভাব রাখা উচিত যে আজ পর্যন্ত যারা যা কিছু লাভ করেছে, তা গুরু, সাধু-মহাপুরুষদের সেবা দ্বারা, তাঁদের প্রসন্নতায় এবং তাঁদের আনুকূল্যেই[১] ; সুতরাং আমারও সমস্ত হৃদয় দিয়ে সাধুদের সেবা করা উচিত।

বিশেষ কথা

শিষ্যের কর্তব্য হল গুরুর সেবা করা। শিষ্য যদি তৎপরতার সঙ্গে তার কর্তব্য পালন করে তাহলে জগৎ-সংসারের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছেদ হয় এবং সে গুরু-তত্ত্বের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যায় অর্থাৎ তার মধ্যে গুরু-ভাব সঞ্চারিত হয়। সংসার থেকে সম্পর্ক ছেদ হলে মুক্তি এবং গুরু-তত্ত্বে এক অভিন্ন হলে ভক্তি লাভ হয়। শিষ্যের গুরু-ভাব প্রাপ্তি হলে তার আর শিষ্যত্ব থাকে না। তার ওপর শাস্ত্রাদির শাসন আর থাকে না। তবে শিষ্য যদি তার কর্তব্য পালন না করে তাহলে তাকে শিষ্য বলা হলেও, তার শিষ্যত্ব আর থাকে না। শিষ্যত্ব না থাকায় জগৎ-সংসার হতে তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয় না এবং তার মধ্যে গুরুত্ব-ভাবও আসে না। তার মধ্যে সাংসারিক দাসত্বই বজায় থাকে ।

গুরু কেবল আমারই কল্যাণ করবেন—এমন ভাব পোষণ করাও শিষ্যের পক্ষে বন্ধন। তার উচিত নিজের জন্য কোনো কিছু আশা না করে সর্বতোভাবে গুরুপদে সমর্পিত হওয়া, তাঁর ইচ্ছায় নিজ ইচ্ছা সমর্পণ করা।

গুরুর কর্তব্য হল শিষ্যের কল্যাণ করা। গুরু যদি তাঁর কর্তব্য পালন না করেন, তাহলে নামে গুরু হলেও, তাঁর আর কোনো গুরুভাব থাকে না। গুরুভাব না থাকায় তাঁর শিষ্যের দাসত্ব থাকে। গুরু যতক্ষণ শিষ্যের থেকে কোনো কিছু (ধন, মান, মর্যাদা ইত্যাদি) আশা করেন, ততক্ষণ তাঁর গুরুভাব না থেকে, শিষ্যের দাসত্বই থেকে যায়।

'শৌচম্'—বাহ্যান্তর শুচিতাকে (শুদ্ধিকে) বলা হয় শৌচ। জল, মৃত্তিকা ইত্যাদির দ্বারা শারীরিক শুদ্ধি হয় এবং দয়া, ক্ষমা, ঔদার্য ইত্যাদির সাহায্যে চিত্তের শুদ্ধি হয়।

উপায়—শরীর এমন সব পদার্থ দ্বারা সৃষ্ট যে একে যতই শুদ্ধ করা হোক, অশুদ্ধই থেকে যায়। এর থেকে বারবার অশুদ্ধ পদার্থই নির্গত হয়। সুতরাং একে বারংবার শুদ্ধ করতে করতেই এর প্রকৃত অশুদ্ধি সম্বন্ধে জ্ঞান হয়, যার ফলে শরীরে অনাসক্তি (বৈরাগ্য) আসে।

বর্ণ-আশ্রম অনুযায়ী সততার সঙ্গে অর্থ উপার্জন করা, মিথ্যা কপটাচার না করা, পরের স্বত্ব ভোগ না করা, খাওয়া-দাওয়াতে শুদ্ধ দ্রব্য ব্যবহার করা ইত্যাদিতে অন্তঃকরণের শুদ্ধি আসে।

'স্থৈর্যম্'—একনিষ্ঠা, লক্ষ্য থেকে বিচলিত না হওয়াকে বলা হয় 'স্থৈর্য'। যা চিন্তা করা হয়েছে, যার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে, তার থেকে বিচলিত না হওয়াকে বলা হয় 'স্থৈর্য'। আমাকে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতেই হবে—এরূপ দৃঢ়নিশ্চয় হওয়া এবং বাধা-বিঘ্ন এলেও তাতে বিচলিত না হয়ে নিজের লক্ষ্য অনুযায়ী সাধনায় তৎপর থাকা—একেই এখানে 'স্থৈর্য' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

উপায়—(১) জাগতিক ভোগ ও সংগ্রহে আসক্ত ব্যক্তিদের বুদ্ধি কোনো এক লক্ষ্যে স্থির থাকে না (গীতা ২।৪৪)। তাই সাধকের ভোগ ও সংগ্রহের আসক্তি পরিত্যাগ করা উচিত।

(২) সাধক যদি কোনো ক্ষুদ্রতম কার্যও চিন্তা করে তবে সেটি সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তা থেকে সরে আসতে নেই অর্থাৎ তাতে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকতে হয়। এরূপ করলে একনিষ্ঠতা তৈরি হবে।

(৩) সাধু এবং শাস্ত্রাদির বচনে সাধকের যত বেশি বিশ্বাস জন্মাবে ততই তাঁর মধ্যে স্থিরতা আসবে।

'আত্মবিনিগ্রহঃ'—এখানে মনকে আত্মা বলা হয়েছে, এটিকে বশে রাখাকেই বলা হয় 'আত্মবিনিগ্রহ'। মনে দু'প্রকার ভাব উৎপন্ন হয়—স্ফুরণ এবং সংকল্প। স্ফুরণ নানাপ্রকারের হয় এবং এটি আসে ও যায়। যে স্ফুরণে মন আকৃষ্ট হয়, সেটিকে 'সংকল্প' বলা হয়। সংকল্পে দুটি জিনিস থাকে—রাগ (আসক্তি) ও দ্বেষ। এই দুটির জন্যই

---

[১]এই বিষয়ে কথিত আছে—

'ন কুছ হম হঁসকে সীখে হৈঁ, ন কুছ হম রোকে সীখে হৈঁ। জো কুছ থোড়া-সা সীখে হৈঁ, কিসীকে হোকে সীখে হৈঁ।'

অর্থাৎ আমরা হেসেও কিছু শিখিনি, কেঁদেও কিছু শিখিনি ; যা অল্প কিছু শিখেছি, তা কারও অধীনে থেকে শিখেছি।

মনে চিন্তা আসে। স্ফুরণ হল দর্পণে ভেসে ওঠা দৃশ্যের মতো। দর্পণে দৃশ্য তো দেখা যায় কিন্তু কোনোটিই তাতে আটকে থাকে না অর্থাৎ দর্পণ কোনো দৃশ্যকে আটকে রাখতে পারে না। আর সংকল্প হল ক্যামেরার ফিল্মের মতো, যা দৃশ্যকে ধরে রাখে। অভ্যাসের সাহায্যে অর্থাৎ মনকে বারংবার ধ্যেয়তে সন্নিবেশিত করলে স্ফুরণগুলি নষ্ট হয়ে যায় এবং বৈরাগ্যের দ্বারা অর্থাৎ কোনো বস্তু, ব্যক্তি, পদার্থ ইত্যাদিতে অনুরাগ, গুরুত্ব না থাকায় সংকল্প নষ্ট হয়ে যায়। এইভাবে অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের সাহায্যে মন বশীভূত হয় (গীতা ৬।৩৫)।

উপায়—(মনকে বশে রাখার উপায় ষষ্ঠ অধ্যায়ের ছাব্বিশতম শ্লোকের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য)।

পরিশিষ্ট-ভাব—ভগবান ক্ষেত্রের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্বন্ধ (তাদাত্ম্য) ছেদ করার জন্যই জ্ঞানের সাধনের কথা জানিয়েছেন। এই সাধনগুলির সাহায্যে তাদাত্ম্য ছেদ করা সহজ হয়।

✻ ✻ ✻

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্॥ ৮ ॥

[**ইন্দ্রিয়ার্থেষু** (ইন্দ্রিয়াদির বিষয়ে) ; **বৈরাগ্যম্** (বৈরাগ্য হওয়া) ; **অনহঙ্কারঃ, এব, চ** (নিরহংকারিতা এবং) ; **জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্** (জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধিতে দুঃখরূপ দোষগুলির বারংবার অবলোকন।)]

ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুতে বৈরাগ্য, নিরহংকারিতা, জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধিতে দুঃখরূপ দোষগুলির বারংবার অবলোকন॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা—**'ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যম্'**—ইহলোক-পরলোকাদির বিষয়-ভোগে ইন্দ্রিয়গুলির আকর্ষণ না থাকাই হল ইন্দ্রিয়াদির বিষয়ে আসক্তিবর্জিত হওয়া। ইন্দ্রিয়গুলির বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক থাকলেও এবং শাস্ত্রানুসারে জীবন-নির্বাহের জন্য ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে বিষয় সেবন করলেও সাধকের বিষয়াদিতে অনুরাগ, আসক্তি এবং প্রিয়ভাব থাকা উচিত নয়।

উপায়—(১) বিষয়াদিতে অনুরাগ হলেই বিষয়াদির প্রতি আসক্তি হয়, সংসারে আকর্ষণ জন্মায় এবং এর ফলেই পাপকার্য হতে থাকে। বিষয়াদির প্রতিই যদি আমাদের আসক্তি থাকে, তাহলে আর তত্ত্ববোধ হবে কীভাবে ? পরমাত্মতত্ত্বে কী করে স্থিতিলাভ ঘটবে ? যদি এই অনুরাগ পরিত্যাগ করা যায়, তাহলেই পরমাত্মাতে স্থিতিলাভ হয়—এইভাবে চিন্তা করলে বৈরাগ্য হয়।

(২) বড় বড় ধনী, যোদ্ধা, রাজা-মহারাজারা নানা-প্রকার ভোগবিলাস করেছেন, কিন্তু শেষে তাঁদের কী থাকল ? কিছুই নয়। তাঁদের দেহ ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে শেষকালে চলেই যেতে হল। এইভাবে বিচার করলে বৈরাগ্য আসে।

(৩) যাঁরা কোনোপ্রকার ভোগবিলাস করেননি, যাঁদের কোনো ভোগ্য-সামগ্রী নেই, সংসারে উদাসীন, অনাসক্ত, তাঁদের থেকে যাঁরা খুব ভোগ করেছেন এবং এখনও ভোগ করছেন, উভয়ের মধ্যে বিশেষ কী পার্থক্য দেখা গেছে ? কিছুই না, বরং ভোগ-ব্যসনকারীরা তো শোক চিন্তাতেই নিমজ্জিত ! এইভাবে বিচার করলে বৈরাগ্য হয়।

'অনহঙ্কার এব চ'—প্রত্যেক ব্যক্তিরই অনুভবে 'আমি আছি' এইপ্রকার বৃত্তি থাকে। এই বৃত্তি শরীরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে 'আমি শরীর' এইরূপ একদেশীয়তা বা অহং-অভিমান উৎপন্ন করে। এর ফলেই শরীর, নাম, ক্রিয়া, পদার্থ, ভাব, জ্ঞান, ত্যাগ, দেশ, কাল ইত্যাদির সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ মেনে নিয়ে জীব উচ্চ-নীচ যোনিতে জন্মাতে ও মৃত্যুবরণ করতে থাকে (গীতা ১৩।২১)। এই অহংকার সাধন-ভজন কালে বহুদূর পর্যন্ত প্রায়শঃই থেকে যায়। বাস্তবে এর কোনো অস্তিত্ব নেই, তা সত্ত্বেও স্বয়ং মেনে নেওয়ায় ব্যক্তিত্বের রূপে এর অস্তিত্ব টিকে থাকে। জ্ঞানের সাধনায় ভগবানের এই পদটি প্রয়োগ করার উদ্দেশ্য হল এই যে, শরীর ইত্যাদিতে মেনে নেওয়া অহংকার দূর করা। কেন-না জড় ও চেতনের যথার্থ বোধ

হলে এটি সর্বতোভাবে নাশ হয়। মানুষ মাত্রেই অহংকার-রহিত হতে সক্ষম, সেইজন্য ভগবান এখানে **'অনহঙ্কারঃ'** পদের দ্বারা অহংকার ত্যাগ করার কথা বলেছেন।

অহং-অভিমান এবং অহংকারের প্রয়োগ একসঙ্গে হলে এর পৃথক্ পৃথক্ অর্থ হয়। সাংসারিক বস্তুর সম্বন্ধ থেকে অহং-অভিমান উৎপন্ন হয় এবং ত্যাগ, বৈরাগ্য, শিক্ষা প্রভৃতির জন্য নিজের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য অনুভব হয় তার জন্যও অহং-অভিমান হয়। শরীরকে নিজের স্বরূপ বলে মনে করলে অহংকার উৎপন্ন হয়। এখানে **'অনহঙ্কারঃ'** পদের দ্বারা অহং-অভিমান ও অহংকার — দুইয়েরই সর্বতোভাবে নাশ হওয়া ধরতে হবে।

মানুষ নিদ্রা থেকে উত্থিত হলে সর্বপ্রথম তার 'অহম্' অর্থাৎ 'আমি আছি'—এই বৃত্তির জ্ঞান হয়। তারপর অমুক শরীর, নাম, জাতি, বর্ণ, আশ্রম ইত্যাদির অহংভাব আসে। এই একটি ক্রম। এইরূপ পারমার্থিক মার্গেও অহংকার নাশের এক ক্রম আছে। সর্বপ্রথম স্থূলশরীরের সঙ্গে সম্বন্ধিত ধনাদি পদার্থের অভিমান দূর হয়, পরে কর্মেন্দ্রিয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত কর্তৃত্বাভিমান নাশ হয়। তারপর বুদ্ধির প্রাধান্যে থাকা জ্ঞাতাভাবের অহংকার দূর হয়। শেষে 'অহম্' বৃত্তির প্রাধান্যে যে সাক্ষীভাবের অহংকার থাকে, তা-ও দূর হয়। তখন সর্বত্র পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দময় স্বরূপ স্বতঃই বিরাজ করে।

উপায়—(১) নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করাতেই অহং-অভিমান উৎপন্ন হয়। অহং-অভিমান তখনই হয়, যখন মানুষ অন্যদের দেখে মনে করে যে এরা আমার থেকে তুচ্ছ। যেমন, কোনো গ্রামে একজন মাত্র লক্ষপতি থাকলে অন্য ব্যক্তিদের দেখে তার অহংকার জন্মায় 'আমি লক্ষপতি' বলে। কিন্তু অন্য ব্যক্তিরা যদি কোটিপতি হয়, তখন আর সেই লক্ষপতির কোনো অহংকার হয় না। সুতরাং অহং-অভিমান দোষ দূর করতে সাধকের উচিত তিনি যেন অন্যের অবস্থা না দেখে নিজের ত্রুটির দিকে লক্ষ্য রেখে তা দূর করার চেষ্টা করেন[১]।

(২) এক আত্মাই যেমন এই শরীরে ব্যাপ্ত হয়ে আছে, তেমনি অন্য শরীরগুলিতেও পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে—**'সর্বগতঃ'** (গীতা ২।২৪)। কিন্তু মানুষ অজ্ঞানবশতঃ সর্বব্যাপী এই আত্মাকে একমাত্র নিজ শরীরেই সীমিত বলে মনে করে শরীরকে 'আমি' বলে মেনে নেয়। যেমন, মানুষ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অর্থের মধ্যে শুধু নিজের গচ্ছিত অর্থের প্রতি মমতা করে সেগুলির সঙ্গে নিজের সম্পর্ক মেনে নিয়ে নিজেকে ধনী বলে মনে করে ; তেমনই একটি শরীরে 'আমি শরীর'—এই অহংকার করে সে কালের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে 'আমি এই সময়ে আছি', দেশের সঙ্গে সম্পর্ক করে 'আমি এই দেশে আছি', বুদ্ধির সঙ্গে সম্পর্ক করে 'আমি বুদ্ধিমান', বাক্যের সঙ্গে সম্পর্ক করে 'আমি বক্তা' ইত্যাদি অহংকার করে থাকে। এই সম্পর্কগুলি মেনে না নেওয়াই হল অহংকাররহিত হওয়ার উপায়।

(৩) শাস্ত্রে পরমাত্মাকে 'সচ্চিদানন্দময়'রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। 'সৎ' (সত্তা বা অস্তিত্ব), 'চিৎ' (জ্ঞান) এবং 'আনন্দ' (অবিনাশী সুখ)—এই তিনটি পরমাত্মার ভিন্ন ভিন্ন রূপ নয়, এগুলি একই পরমাত্মতত্ত্বের তিনটি নাম। অতএব সাধক এই তিনটির মধ্যে কোনো এক বিশেষণে পরমাত্মাকে লক্ষ্য করে নির্বিকল্প[২] হতে সক্ষম। নির্বিকল্প হলে পরমাত্মতত্ত্বে তার স্বতঃসিদ্ধ স্থিতির অনুভব হয় এবং অহংকার সর্বতোভাবে নাশ হয়। এটি এরূপে বুঝতে হবে—

(ক) **'সৎ'**—পরমাত্মতত্ত্ব সর্বদাই ছিল, সর্বদাই আছে এবং সর্বদাই থাকবে। তার কখনো উৎপত্তি-বিনাশ হয় না, কম-বেশি হয় না, সর্বদা একই থাকে—বুদ্ধির দ্বারা এরূপ বিচার করে নির্বিকল্প হয়ে স্থির হলে, সাধকের বুদ্ধির সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয় এবং সেই সৎ-তত্ত্বে নিজ প্রকৃত স্থিতি অনুভূত হয়। এরূপ অনুভব হলে আর অহংকার থাকে না।

(খ) **'চিৎ'**—প্রত্যেক ব্যক্তির শরীরাদি যেমন 'অহম্'-এর অন্তর্গত দৃশ্য, তেমনই 'অহম্'ও (আমি, তুমি, সে,

---

[১]তেরে ভাবে জো করে, ভলৌ বুরৌ সংসার। 'নারায়ণ' তূ বৈঠিকে, অপনৌ ভবন বুহার।

[২]সংসারের চিন্তায় সাধকের আর প্রয়োজন থাকে না এবং অচিন্ত্য পরমাত্মতত্ত্বকে চিন্তা করা যায় না—একেই বলা হয় নির্বিকল্পতা।

ওই রূপে) এক জ্ঞানের অন্তর্গত দৃশ্য[১]। সেই জ্ঞানে (চেতনে) নির্বিকল্প হয়ে স্থির হলে পরমাত্মতত্ত্বে স্বতঃসিদ্ধ স্থিতি অনুভূত হয়, তখন আর অহংকার থাকে না।

(গ) **'আনন্দ'**—সাধকগণ সাধারণতঃ বুদ্ধি ও অহং প্রকাশকারী 'চেতন'-কে বুদ্ধি দ্বারা জানতে চেষ্টা করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধি দ্বারা জানা বা শেখা বিষয়কে 'জ্ঞানের' সংজ্ঞা দেওয়া এবং তাতে নিজেকে জ্ঞানী বলে মনে করা ভুল। বুদ্ধির প্রকাশক যে তত্ত্ব তাকে বুদ্ধির সাহায্যে কীভাবে জানা সম্ভব ? যদিও সাধকের কাছে বুদ্ধি ব্যতীত এমন আর কোনো পথ নেই, যার দ্বারা সেই তত্ত্ব জানতে পারা যায়, তবুও বুদ্ধির দ্বারা শুধুমাত্র জড় সংসারের বাস্তবতাই জানা সম্ভব হয়। যার দ্বারা বুদ্ধি প্রকাশিত হয়, সেই তত্ত্বকে বুদ্ধি জানতে পারে না। তাকে জানতে হলে বুদ্ধির সঙ্গেও সম্পর্ক-বিচ্ছেদ করা আবশ্যক হয়। বুদ্ধি প্রকাশকারী পরমাত্মতত্ত্বে নির্বিকল্পভাবে স্থিত হলে বুদ্ধি হতে সর্বতোভাবে সম্পর্ক ছেদ হয়। তখন এক 'আনন্দ স্বরূপ' (যেখানে দুঃখের লেশমাত্র থাকে না) পরমাত্মতত্ত্বই বিরাজ করে, যা স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ এবং সত্যস্বরূপ। এইভাবে তত্ত্বে নির্বিকল্প (স্থির) হলে তখন শুধুই 'আনন্দ' অনুভূত হয়। এইরূপ অনুভূত হলে আর অহংকার থাকে না।

'জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্'—জন্ম, মৃত্যু, বৃদ্ধাবস্থা এবং রোগাদির দুঃখরূপ দোষ বারংবার দেখার তাৎপর্য হল—যেমন কুমোরের ভাঁটিতে মাটির জালা পরিপক্ব হয়, সেইরূপই জন্মের আগে মাতৃ-উদরে সন্তান পরিপূর্ণতা লাভ করতে থাকে। মাতার খাদ্য থেকে নুন, ঝাল ইত্যাদি তীক্ষ্ণ পদার্থের দ্বারা শিশুর শরীরে পীড়া হয়। গর্ভাশয়ে থাকাকালীন সূক্ষ্ম জীবাণুও শিশুকে আক্রমণ করে। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় মা যে ক্লেশ অনুভব করেন তা কেউ অনুভব করতে সক্ষম হয় না। একইরূপ ক্লেশ ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় শিশুও অনুভব করে। এই-ভাবে জন্মের দুঃখরূপ দোষগুলিকে বারংবার চিন্তা করে দৃঢ়তার সঙ্গে বিচার করতে হয় যে এতে কেবল দুঃখই বিরাজমান।

নিয়মই হল যে জন্মায়, তাকে মরতেই হবে। এর থেকে কারোরই পরিত্রাণ নেই। মৃত্যুর সময়—যখন প্রাণ শরীর ত্যাগ করে, সেইসময় সহস্র বৃশ্চিক দংশনে যে জ্বালা, সেই জ্বালা অনুভূত হয়। সারাজীবনের অর্জিত অর্থ থেকে, সারাজীবনের বাসভূমি থেকে, নিজ প্রিয়জনের কাছ থেকে যখন বিচ্ছেদ ঘটে, যখন পুনর্মিলনের আর কোনো সম্ভাবনা থাকে না, তখন (মমত্ব ও আসক্তিবোধের জন্য) অত্যন্ত দুঃখ হয়। যে অর্থ কখনো কাউকে দেখানো হয়নি, যে অর্থ পরিবার-পরিজন থেকে লুকিয়ে সিন্দুকে জমা করা হয়েছিল, তা এখন পরিবারের হস্তগত হতে দেখে মনে ভীষণ কষ্ট হয়। এইভাবে মৃত্যুকালীন দুঃখরূপ দোষগুলি বারংবার ভেবে দেখতে হয়।

বৃদ্ধাবস্থায় শরীরের শক্তি ক্ষীণ হয়ে আসে, চলা-ফেরা, ওঠা-বসাতে কষ্ট হয়। ইচ্ছামতো খাবার খেলে হজম হয় না। পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়ায় সম্মান আশা করলেও পরিবারের লোকেরা আর প্রয়োজন না থাকায় অনাদর ও অসম্মান করে থাকে। তখন পুরানো স্মৃতি মনে আসে যে, 'আমি অর্থ উপার্জন করে এদের প্রতিপালন করেছি আর আজ এরা আমার অসম্মান করছে।' এইসব ভেবে দুঃখবোধ হয়। এইভাবে বৃদ্ধাবস্থার দুঃখরূপ দোষ বারংবার বিবেচনা করে দেখতে হয়।

এই দেহ ব্যাধি এবং রোগের আবাস—**'শরীরং ব্যাধিমন্দিরম্'**। দেহে কফ, বাত, পিত্ত ইত্যাদি হতে উদ্ভূত নানাপ্রকার রোগ হয়ে থাকে এবং তার জন্য দেহে অত্যন্ত কষ্ট হয়। এইভাবে রোগাদির দুঃখরূপ দোষ বারংবার বিচার করে দেখতে হয়।

এখানে বারংবার দেখার অর্থ বারংবার চিন্তা করা নয়, বরং বিচার করা। জন্ম, মৃত্যু, বৃদ্ধাবস্থা এবং রোগাদির দুঃখগুলি বারংবার ভেবে দেখলে অর্থাৎ বিচার করলে

---

[১]এক ধনী ব্যক্তি শুনলেন যে তার অমুক দোকানে লাভ হয়েছে আর সঙ্গে এ-ও শুনলেন যে তার অন্য এক দোকানে লোকসান হয়েছে। এইভাবে লাভ ও লোকসানে পার্থক্য থাকলেও, এই দুটির জ্ঞানে কোনো পার্থক্য নেই, জ্ঞান একই। জ্ঞান এক না হলে লাভ লোকসানের পার্থক্য কী করে বোঝা যেত ? এইরূপ 'আমি', 'তুমি', 'সে', 'ওই'—এগুলি পৃথক্ পৃথক্ হলেও এদের প্রকাশক জ্ঞান একই। যে সর্বব্যাপী প্রকাশে 'আমি'-তে ক্রিয়া সংঘটিত হয়, তাতেই 'তুমি' 'সে' বা 'ওই'— এসবেও ক্রিয়া সংঘটিত হয়। সেই সর্বব্যাপী প্রকাশে 'আমি', 'তুমি', 'সে' বা 'ওই'-এর কোনো পার্থক্য নেই। সেই সাধারণ প্রকাশের সম্পর্ক যদি থাকে তো তা সবার সঙ্গেই থাকে, না হলে কারও সঙ্গেই থাকে না।

তার মূল কারণ—উৎপত্তি-বিনাশশীল পদার্থতে আসক্তি স্বাভাবিকভাবে হ্রাস পেতে থাকে অর্থাৎ ভোগে বৈরাগ্য আসে। তাৎপর্য হল এই যে জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদিতে দুঃখরূপ দোষাদি দেখা হল ভোগের থেকে বৈরাগ্য হওয়ার হেতু। কেন-না ভোগাদির আসক্তি থেকে অর্থাৎ গুণাদির সঙ্গই হল জন্মগ্রহণের কারণ—**'কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু'** (গীতা ১৩।২১)। আর জন্মই হল সমস্ত দুঃখের কারণ। পুনর্জন্মকে ভগবান দুঃখালয়রূপ বলে জানিয়েছেন **'পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্'** (গীতা ৮।১৫)।

শরীরাদি জড় পদার্থের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলে, গুরুত্ব দিলে, তাদের আশ্রয় গ্রহণ করলেই সমস্ত দোষ উৎপন্ন হয়—**'দেহাভিমানিনি সর্বে দোষাঃ প্রাদুর্ভবন্তি'**। পরমাত্মার স্বরূপ অথবা তাঁরই অংশ হওয়ার জন্য জীবাত্মা স্বয়ং নির্দোষ **'চেতন অমল সহজ সুখরাসী'** (শ্রীরামচরিতমানস ৭।১১৭।১)। সেইজন্যই জীবাত্মার দুঃখ এবং দোষ ভালো লাগে না। কারণ এগুলি তার স্বজাতীয় নয়। জীব নিজ সৃষ্ট দোষের জন্যই সর্বদা দুঃখ পেয়ে থাকে। অতএব ভগবান জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদির দুঃখরূপ দোষের মূল কারণ দেহাভিমানকে বিচারপূর্বক দূর করার জন্য বলেছেন।

পরিশিষ্ট-ভাব—'দুঃখভোগ' এবং 'দুঃখের প্রভাব'—এ দুটি ভিন্ন বিষয়। দুঃখ পেয়ে দুঃখিত হওয়া এবং সুখের আশা করাকে বলা হয় 'দুঃখভোগ'। দুঃখের কারণ খুঁজে তা দূর করার চেষ্টাকে বলা হয় 'দুঃখের প্রভাব'।

দুঃখভোগ করলে অর্থাৎ দুঃখী হলে বিবেক লুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু দুঃখের প্রভাবে বিবেক লুপ্ত হয় না, উপরন্তু মানুষ বিবেকবুদ্ধি দ্বারা দুঃখের কারণ খুঁজে তা দূর করে। সুখের আকাঙ্ক্ষাই সমস্ত দুঃখের কারণ। কারণ মিটলে কার্য আপনিই দূর হয়, অতএব সুখের আকাঙ্ক্ষা দূর হলে সমস্ত দুঃখই নাশ হয়।

* * *

অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু॥ ৯ ॥

[**অসক্তিঃ** (বিষয়াদিতে আসক্তিরহিত হওয়া) ; **পুত্রদারগৃহাদিষু** (স্ত্রী-পুত্র-গৃহ ইত্যাদিতে) ; **অনভিষ্বঙ্গঃ, চ** (একাত্ম না হওয়া এবং) ; **ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু** (অনুকূল-প্রতিকূল অবস্থায়) ; **নিত্যম্, সমচিত্তত্বম্** (চিত্তের সর্বদা সমভাব থাকা।)]

বিষয়ে অনাসক্তি, স্ত্রী-পুত্র-গৃহাদিতে একাত্ম না হওয়া (ঘনিষ্ঠতা না থাকা) এবং অনুকূল-প্রতিকূল অবস্থায় চিত্তের সর্বদা সমভাব থাকা॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা—**'অসক্তিঃ'**—উৎপন্ন হওয়া (জাগতিক) বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদিতে যে প্রিয়ভাব তাকে বলা হয় 'সক্তি'। সেই 'সক্তি' রহিত হওয়াকে বলা হয় **'অসক্তি'**।

সাংসারিক (জাগতিক) বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদি থেকে সুখ গ্রহণের আশায় এবং সুখভোগের জন্যই মানুষের তাতে আসক্তি বা প্রিয়ভাব হয়। কারণ মানুষ সংযোগ ছাড়াও সুখ হতে পারে—ভাবতে পারে না, তাই সংযোগজনিত সুখ তার প্রিয় হয়। কিন্তু প্রকৃত সুখ হয় সংযোগের বিয়োগে (গীতা ৬।২৩), তাই সাধকের সাংসারিক আসক্তি ত্যাগ করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

উপায়—সংযোগজনিত সুখ প্রারম্ভে অমৃতের মতো মনে হলেও তার পরিণাম হয় বিষের মতো (১৮।৩৮)। সংযোগজনিত সুখভোগকারীদের পরিণামে দুঃখভোগ করতেই হয়—এটিই নিয়ম। তাই সংযোগজনিত সুখের পরিণামের দিকে দৃষ্টি থাকলে আর আসক্তি থাকে না।

'অনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু'—স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, অর্থ, বাড়ি, জমি ও বস্তু ইত্যাদির সঙ্গে মেনে নেওয়া যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, গভীর মোহ, তাদাত্ম্য, মেনে নেওয়া যে একাত্মতা, শরীরের ওপরও যার প্রভাব পড়ে, তাকে বলা

হয় 'অভিষ্বঙ্গ'[১]। যেমন—পুত্রের সঙ্গে মা একাত্ম হওয়ায়, পুত্র অসুস্থ হলে মাও দুর্বল হয়ে পড়ে। তেমনই স্ত্রী বা পুত্র গত হলে মানুষ বলে 'আমি মরে গেলাম', অর্থ নষ্ট হলে বলে 'আমি মারা পড়লাম' ইত্যাদি। এই একাত্মতা-বর্জিত হওয়ার জন্য এখানে '**অনভিষ্বঙ্গঃ**' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

উপায়—যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তাকে সেবা করবে, তাকে সুখী করবে, কিন্তু তার থেকে সুখ পাবার আশা রাখবে না। তার সঙ্গে যে অভিষ্বঙ্গ (তাদাত্ম্য) তা দূর করার উদ্দেশ্যই রাখবে। তার কাছ থেকে সেবা পাবার উদ্দেশ্য থাকলেই তাদাত্ম্য হয়ে যায়। তবে তার সন্তুষ্টির জন্য কখনো তার সেবা গ্রহণ করলেও তাতে সুখী বা সন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়, কারণ সন্তুষ্ট হলে অভিষ্বঙ্গতা জন্মাবে। অর্থাৎ কারও সঙ্গে নিজেকে লিপ্ত করা উচিত নয়, এই বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ থাকতে হয়।

'**নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু**'—'**ইষ্ট**' অর্থাৎ মনের অনুকূল বস্তু, ব্যক্তি, পরিস্থিতি, ঘটনা ইত্যাদির প্রাপ্তিতে চিত্তে আসক্তি, হর্ষ, সুখ ইত্যাদি বিকার না হওয়া এবং '**অনিষ্ট**' অর্থাৎ মনের প্রতিকূল বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদি প্রাপ্ত হলে চিত্তে দ্বেষ, শোক, দুঃখ, উদ্বেগ ইত্যাদি বিকার উৎপন্ন না হওয়া। তাৎপর্য এই যে, অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতি প্রাপ্ত হলেও চিত্তে যেন সর্বসময় সমতা থাকে, কোনো প্রভাব যেন না পড়ে। ভগবান '**সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা**' (২।৪৮) পদের দ্বারাও এই কথা বলেছেন।

উপায়—মানুষের সবচেয়ে বড় বাধা হল যে, যা কিছু অনুকূল সামগ্রী সে প্রাপ্ত হয়, সেগুলিকে সে নিজের বলে মনে করে সুখভোগ করতে থাকে। সংসারের দ্রব্যগুলি সংসারের কাজে লাগাবার জন্যই পাওয়া, নিজ শরীর-ইন্দ্রিয়াদির সুখের জন্য নয়। তেমনই মানুষের জীবনে যে প্রতিকূলতা আসে, তা দুঃখভোগ করার জন্য নয়, বরং সংযোগজনিত সুখের আশা পরিত্যাগ করার জন্য। প্রতিকূলতার তাৎপর্য মানুষকে জাগতিক অনুরাগ, আসক্তি, কামনা, মমতা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা। তাৎপর্য হল অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতি মানুষকে সুখ-দুঃখ থেকে ঊর্ধ্বে এনে (সেই দুয়ের অতীত) পরমাত্ম-তত্ত্ব লাভ করাবার জন্যই প্রাপ্ত হয়েছে—দৃঢ়তার সঙ্গে এটি মেনে নিলে সাধকের চিত্ত ইষ্ট ও অনিষ্ট প্রাপ্তিতে স্বতঃই সম থাকবে।

❋ ❋ ❋

ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি॥ ১০ ॥

[**অনন্যযোগেন** (অনন্যযোগের দ্বারা) ; **ময়ি** (আমাতে) ; **অব্যভিচারিণী** (অব্যভিচারিণী অচলা) ; **ভক্তিঃ** (ভক্তি হওয়া) ; **বিবিক্তদেশসেবিত্বম্** (একান্তে বাসের স্বভাব থাকা) ; **চ, জনসংসদি অরতিঃ** (এবং জনসমাগমে প্রীতি উৎপাদন না হওয়া।)]

অনন্যযোগের দ্বারা আমাতে অব্যভিচারিণী (অচলা) ভক্তি হওয়া, নির্জন স্থানে (একান্তে) বাসের স্বভাব থাকা এবং জনসমাগমে প্রীতি উৎপাদন না হওয়া॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা—'**ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী**'—সংসারের আশ্রয় ধরে থাকায় সাধকের দেহাভিমান বজায় থাকে। এটিই হল অব্যক্ত জ্ঞানের প্রধান বাধা। এটি দূর করার জন্যই ভগবান অনন্যযোগের দ্বারা তাঁর অব্যভিচারিণী ভক্তিকে তত্ত্বজ্ঞানের সাধনরূপে জানিয়েছেন। তাৎপর্য হল যে, ভক্তিরূপ সাধনেও দেহাভিমান অনায়াসে দূর করা যায়।

ভগবান ব্যতীত আর কারও থেকে কিছু পাওয়ার ইচ্ছা থাকবে না অর্থাৎ ভগবান ব্যতিরেকে মানুষ, গুরু, দেবতা, শাস্ত্র প্রভৃতি আমাকে এই তত্ত্ব অনুভব করাতে সক্ষম এবং নিজের বল, বুদ্ধি, যোগ্যতার দ্বারা আমি এই তত্ত্ব প্রাপ্ত হব—এইরূপ কোনো বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদির আশ্রয় থাকবে

[১]স্ত্রী-পুত্রাদির সঙ্গে যথাযোগ্য ব্যবহার করা, তাঁদের সঙ্গে আপনভাব না রেখে তাঁদের সেবা করা 'অভিষ্বঙ্গ' নয়, এগুলি হল নির্লিপ্ততা, অসঙ্গতা, যা অমরত্বের অনুভব করায়।

না, আর 'ভগবদ্‌কৃপাতেই তত্ত্ব অনুভূত হবে'—এইরূপ শুধু ভগবানেই আশ্রয় থাকবে—একেই বলে ভগবানে 'অনন্যযোগ' হওয়া।

শুধু ভগবানের সঙ্গেই সম্পর্কিত হওয়া, অন্য আর কারও সঙ্গে কোনোরূপ স্বতন্ত্র সম্পর্ক না রাখা—একেই বলা হয় ভগবানে 'অব্যভিচারিণী ভক্তি'।

তাৎপর্য হল যে তত্ত্বপ্রাপ্তির সাধনও (উপায়) ভগবান এবং সাধ্যও (উপেয়) ভগবান—একেই বলা হয় অনন্যযোগের সাহায্যে ভগবানে 'অব্যভিচারিণী ভক্তি'।

যে সাধকের মধ্যে জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির সংস্কারও থাকে, তার পক্ষে এই সাধন অত্যন্ত উপযোগী। ভক্তিপরায়ণ সাধক যদি তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দেশ্যে একমাত্র ভগবানেরই আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহলে শুধুমাত্র এই সাধনার সাহায্যেই তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তি করতে সক্ষম হয়। গুণাতীত হওয়ার উপায়গুলির মধ্যেও ভগবান অব্যভিচারিণী ভক্তির কথা বলেছেন (গীতা ১৪।২৬)।

প্রশ্ন—এখানে ভক্তির সাহায্যে তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে আর অষ্টাদশ অধ্যায়ের চুয়ান্ন / পঞ্চান্নতম শ্লোকে জ্ঞানের দ্বারা ভক্তিলাভের কথা বলা হয়েছে, এর কী তাৎপর্য?

উত্তর—ভক্তি যেমন দু'প্রকারের হয়—সাধন-ভক্তি এবং সাধ্য-ভক্তি ; তেমনই জ্ঞানও দু'প্রকারের হয়ে থাকে —সাধন-জ্ঞান ও সাধ্য-জ্ঞান। সাধ্য-ভক্তি এবং সাধ্য-জ্ঞান—এই দুটি তত্ত্বতঃ এক। সাধন ভক্তি এবং সাধন জ্ঞান —এই দুটিই হল সাধ্য-ভক্তি বা সাধ্য-জ্ঞান প্রাপ্তির সাধন। তাই যেখানে ভক্তির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান (সাধ্য-জ্ঞান) প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে, তা ঠিকই, আবার যেখানে জ্ঞানের দ্বারা পরাভক্তি (সাধ্য-ভক্তি) লাভের কথা বলা হয়েছে, তা-ও ঠিক। তাই সাধকের কর্ম, জ্ঞান অথবা ভক্তি—যে সংস্কারের প্রাধান্য থাকে, সেই অনুযায়ী সাধনায় ব্যাপৃত হওয়া উচিত। শুধু সতর্ক থাকতে হয় যে, উদ্দেশ্য যেন শুধু পরমাত্মা-ই থাকেন, প্রকৃতি বা তার কার্য নয়। এরূপ উদ্দেশ্য রেখে সাধনা করলে সাধক সেই সাধনার দ্বারাই পরমাত্মাকে লাভ করেন।

প্রশ্ন—ভগবান জ্ঞানের সাধনাতে তাঁর ভক্তির কথা কেন বলেছেন ? জ্ঞানযোগের সাধকগণ কী ভগবানকে ভক্তিও করে থাকেন ?

উত্তর—জ্ঞানযোগের সাধক (জিজ্ঞাসু) দু'প্রকারের হন—ভাব (ভক্তি) প্রধান এবং বিবেক (জ্ঞান) প্রধান।

(১) যাঁরা ভগবানকে আশ্রয় করে তত্ত্ব জানতে আগ্রহী, তাঁদের বলা হয় ভাব-প্রধান জিজ্ঞাসু (গীতা ৭।১৬ ; ১৩।১৮)। এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে 'মাম্‌', 'মম', তৃতীয় শ্লোকে 'মে', এই (দশম) শ্লোকে 'ময়ি' এবং অষ্টাদশ শ্লোকে 'মদ্ভক্তঃ' ও 'মদ্ভাবায়' পদগুলি আসায় প্রমাণিত হয় যে অষ্টাদশ শ্লোক পর্যন্ত ভাবপ্রধান জিজ্ঞাসুর প্রকরণ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু উনিশ থেকে চৌত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত একবারও 'অস্মদ্‌' (আমি বাচক) পদের প্রয়োগ হয়নি, তাই সেটি বিবেকপ্রধান জিজ্ঞাসুর প্রকরণ। অতএব এখানে ভাবপ্রধান জিজ্ঞাসুর প্রসঙ্গ হওয়ায় জ্ঞানের সাধনার অন্তর্গত ভক্তিরূপ সাধনের বর্ণনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ, সাত্ত্বিক আহারে যেমন পুষ্টির জন্য ঘি-দুধের প্রয়োজন হয় এবং সেই ঘি-দুধ সাত্ত্বিক খাদ্যের সঙ্গে অথবা পৃথক্‌ভাবে পুষ্টি সাধন করে থাকে তেমনই ভগবানের ভক্তি জ্ঞানের সাধনার সঙ্গে থেকে যেমন পরমাত্মপ্রাপ্তির সহায়ক হয় আবার স্বতন্ত্রভাবেও সাধককে গুণাতীত করে তোলে (গীতা ১৪।২৬)। পাতঞ্জল যোগদর্শনেও পরমাত্মপ্রাপ্তির জন্য অষ্টাঙ্গযোগের সাধনার সহায়করূপে 'ঈশ্বরপ্রণিধান' অর্থাৎ ভক্তি সাধনের কথা বলা হয়েছে[১] এবং ভক্তির কথা স্বতন্ত্ররূপেও বলা হয়েছে[২]। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ভক্তিরূপ সাধনার এক পৃথক্‌ বিশেষত্ব আছে। এই বিশেষত্বের জন্যই জ্ঞানের সাধনায় ভক্তির বর্ণনা করা হয়েছে।

(২) তাঁকেই বিবেকপ্রধান জিজ্ঞাসু ভক্ত বলা হয়, যিনি সৎ-অসৎ বিচার করে তীব্র বৈরাগ্য সহকারে তত্ত্বকে

[১] শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ। (যোগদর্শন ২।৩২)

[২] ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা (যোগদর্শন ১।২৩)

জানতে চান (গীতা ১৩।১৯-৩৪)।

চিন্তা করার এক বিষয় যে, আজকাল আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসার অভাব এবং ভোগাসক্তির বাহুল্যের জন্য বিবেকপ্রধান জিজ্ঞাসু অত্যন্ত কম দেখা যায়। কাজেই অধিকাংশ সাধকদের জন্য ভক্তিরূপ সাধন অত্যন্ত উপযোগী। তাই এইস্থানে ভক্তির বর্ণনা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়।

উপায়—কেবল ভগবানকেই আপন বলে মনে করা এবং ভগবানেরই আশ্রয় গ্রহণ করে শ্রদ্ধা-বিশ্বাসপূর্বক ভগবদ্‌নাম জপ, কীর্তন, স্মরণ, মনন ইত্যাদি করা হল ভক্তি লাভের সহজ উপায়।

'বিবিক্তদেশসেবিত্বম্'—'আমি একান্তে বাস করে পরমাত্মতত্ত্ব চিন্তা করব, ভজন-স্মরণ করব, সৎ-শাস্ত্রাদি স্বাধ্যায় করব, সেই তত্ত্বের গভীর অনুশাসনগুলি অনুধাবন করব, আমার বৃত্তি এবং আমার সাধনায় যেন কোনো বাধা-বিঘ্ন না আসে, আমার সঙ্গে যেন কেউ না থাকে আর আমিও কারও সঙ্গে থাকব না'—সাধকের এইরূপ স্বাভাবিক ইচ্ছাকে বলা হয় **'বিবিক্তদেশসেবিত্ব'**। তাৎপর্য হল এই যে সাধকের একান্তে বসবাস করার রুচি থাকলেও, সেটি যদি সম্ভব না হয়, তাহলে মনে তার জন্য বিন্দুমাত্র বিকার হওয়া উচিত নয়। তার মনে মনে এই বিচার করা উচিত যে, সংসারের সঙ্গ, সংযোগ তো স্বতঃই বিনাশের দিকে যাচ্ছে আর স্বরূপে অসঙ্গতা স্বতঃসিদ্ধ। এই স্বতঃসিদ্ধ অসঙ্গতাতে জগৎ-সংসারের সঙ্গ, সংযোগ, সম্বন্ধ কখনো হওয়া সম্ভবই নয়। সুতরাং সংসারের সঙ্গ কখনো বাধা হতে পারে না।

শুধুমাত্র নির্জন স্থানে গিয়ে একা বাস করে মনে করা যে 'আমি নির্জনে বসবাস করছি' এটি প্রকৃতপক্ষে ভ্রম ; কারণ সম্পূর্ণ জগতের বীজ এই দেহ তো সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। যতক্ষণ এই দেহের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে, ততক্ষণ সম্পূর্ণ জগতের সঙ্গেও সম্পর্ক বজায় থাকে। সুতরাং একান্ত স্থানে বাস করা তখনই সহায়ক হয়, যখন প্রধান উদ্দেশ্য থাকে দেহাভিমান নাশ করা।

তাঁকেই প্রকৃতপক্ষে একান্ত বলা হয়, যাঁর মধ্যে একটি তত্ত্ব ছাড়া অন্য কিছু উৎপন্ন হয় না, হয়নি এবং হবে না। যাতে ইন্দ্রিয়াদি নেই, প্রাণ নেই, মন নেই এবং চিত্তও নেই, যাতে স্থূল-সূক্ষ্ম এবং কারণ-শরীরও নেই, যাতে ব্যষ্টি-শরীরও নেই, সমষ্টি-সংসারও নেই, যাতে শুধুমাত্র একটি তত্ত্বই বিরাজিত অর্থাৎ এক তত্ত্ব ছাড়া আর দ্বিতীয় কিছুই নেই। কারণ একমাত্র পরমাত্মতত্ত্ব ছাড়া আগেও কিছু ছিল না, শেষেও কিছু থাকবে না। মধ্যকালে যা প্রতীয়মান হচ্ছে, তা-ও প্রতীতির দ্বারাই প্রতীত হচ্ছে অর্থাৎ যাতে জগৎ-সংসার প্রতীয়মান হচ্ছে, সেই ইন্দ্রিয়াদি অন্তঃকরণ ইত্যাদিও প্রতীতি-ই। সুতরাং প্রতীতির দ্বারাই প্রতীয়মান হচ্ছে। আমাদের (স্বরূপের) সম্বন্ধ শরীর ও অন্তঃকরণের সঙ্গে কখনো হয়নি। কারণ এগুলি প্রকৃতির কার্য আর স্বরূপ সর্বদাই প্রকৃতির অতীত এইরূপ অনুভব করাই হল প্রকৃতপক্ষে **'বিবিক্তদেশসেবিত্ব'**।

'অরতির্জনসংসদি'—সাধারণ মনুষ্য সমাগমে প্রীতি, রুচি না হওয়া অর্থাৎ কোথায় কী হচ্ছে, কবে কী হবে, কেমন করে হবে ইত্যাদি সাংসারিক আলোচনা শোনার আগ্রহ না থাকা এবং বিভিন্ন খবরাখবরের জন্য উৎসুক হয়ে থাকা প্রভৃতিতে বিন্দুমাত্র প্রীতি ও আকাঙ্ক্ষা না হওয়া। কিন্তু আমাদের থেকে কেউ তত্ত্ব বিষয়ে কিছু জানতে চাইলে, সাধন-ভজন নিয়ে আলোচনা করলে বা তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য মনে যে ইচ্ছা উদ্ভূত হয় সেগুলি 'অরতির্জনসংসদি' নয়। তেমনই যে স্থানে তত্ত্ব আলোচনা হয়, নিজেদের মধ্যে তত্ত্ব-বিচার হয় অথবা আমাদের দৃষ্টিতে কেউ পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞানী এলে তাঁর সঙ্গলাভের যে রুচি হয়, সেগুলিকে মনুষ্য-সমাগমে রুচি বলা হয় না, সেগুলিকে আবশ্যক কার্য বলা হয়েছে—

সঙ্গঃ সর্বাত্মনা ত্যাজ্যঃ সে চেত্ত্যক্তুং ন শক্যতে।
স সদ্ভিঃ সহ কর্তব্যঃ সতাং সঙ্গো হি ভেষজম্॥

(মার্কণ্ডেয়পুরাণ ৩৭।২৩)

অর্থাৎ আসক্তি সহকারে কারও সঙ্গ করা উচিত নয় ; কিন্তু যদি এরূপ অসঙ্গতা না হয়, তাহলে শ্রেষ্ঠ পুরুষদের সঙ্গ করা উচিত। কারণ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সঙ্গই অসঙ্গতা লাভের ঔষধ।

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা॥ ১১ ॥

[**অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বম্** (নিত্য-নিরন্তর অধ্যাত্মজ্ঞানের অনুশীলন) ; **তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্** (তত্ত্বজ্ঞানের অর্থ হিসাবে সর্বত্র পরমাত্মাকে দর্শন করা) ; **এতৎ, জ্ঞানম্** (এইগুলিকে জ্ঞান বলা হয়) ; **যৎ, অতঃ, অন্যথা** (যা এর বিপরীত) ; **অজ্ঞানম্** (সেগুলিকে অজ্ঞান) ; **ইতি প্রোক্তম্** (বলা হয়।)]

নিত্য-নিরন্তর অধ্যাত্মজ্ঞানের অনুশীলন, তত্ত্বজ্ঞানের অর্থ হিসাবে পরমাত্মাকে সর্বত্র পরিদর্শন করা— এইগুলিকে (পূর্বোক্ত কুড়িটি সাধনকে) জ্ঞান বলা হয় ; এর বিপরীত যা কিছু সেগুলিকে অজ্ঞান বলা হয়॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা—**'অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং'**—সমস্ত শাস্ত্রের উদ্দেশ্য মানুষকে পরমাত্মা অভিমুখে নিয়োজিত করা, পরমাত্মপ্রাপ্তি করা—একথা নিশ্চিত করার পর পরমাত্মতত্ত্ব যতদূর বোঝা গেছে, তা মনন করা। যুক্তি ও বিচার প্রয়োগে দেখা যায় যে পরমাত্মতত্ত্ব ভাবরূপে আগেও ছিল, এখনও আছে এবং পরেও থাকবে। কিন্তু জগৎ-সংসার আগে ছিল না এবং পরেও থাকবে না আর এখনও প্রতিমুহূর্তে বিনাশের দিকে যাচ্ছে। জগৎ উৎপত্তি ও বিনাশশীল, কিন্তু জগতের আধার এবং প্রকাশক যে পরমাত্মতত্ত্ব তা নিত্য বর্তমান। এই পরমাত্মতত্ত্ব ছাড়া জগৎ-সংসারের কোনো পৃথক্ সত্তাই নেই। পরমাত্মার সত্তা থেকেই জগৎ-সংসার অস্তিত্ব সম্পন্ন বলে মনে হয়। এইরূপ চিন্তা করে জগতের পৃথক্ অস্তিত্বের অভাব এবং পরমাত্মার অস্তিত্ব সর্বক্ষণ মনন করাই হল **'অধ্যাত্মজ্ঞান-নিত্যত্বং'**।

উপায়—আধ্যাত্মিক গ্রন্থাদির পঠন-পাঠন, তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষদের নিকট হতে তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে শ্রবণ এবং প্রতিপ্রশ্নের দ্বারা সংশয় নিবারণ করা।

'তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্'—তত্ত্বজ্ঞানের অর্থ পরমাত্মানুভব। সেই পরমাত্মাকে সর্বত্র দর্শন করা, তাঁকেই সর্বত্র অনুভব করা, একেই বলা হয় **'তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্'**। এই পরমাত্মা সর্বদেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদিতে সমভাবে পরিপূর্ণ। একান্তে অথবা ব্যবহারকালে, সব সময় সাধকের দৃষ্টি বা লক্ষ্য যেন পরমাত্মার দিকেই থাকে। পরমাত্মা ব্যতিরেকে আর কোনো অস্তিত্ব যেন তাঁর নজরে প্রতীয়মান না হয়। সর্বত্র, সর্বসময়, সমভাবে পরিপূর্ণ পরমাত্মাকেই দর্শন করা যেন তাঁর স্বভাবে পরিণত হয়— একেই বলা হয় **'তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্'**। এটি সিদ্ধ হলে সাধকের পরমাত্মতত্ত্ব অনুভূত হয়।

'এতজজ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা'— **'অমানিত্বম্'** থেকে **'তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্'** পর্যন্ত যে কুড়িটি সাধনের কথা বলা হয়েছে, এই সমস্ত সাধন দেহাভিমান বিদূরিত করার এবং পরমাত্মপ্রাপ্তিতে সহায়ক হওয়ার জন্য **'জ্ঞান'** নামে অভিহিত হয়। এই সাধনগুলির বিপরীত যে দোষগুলি আছে যেমন—মানিত্ব, দম্ভ, হিংসা ইত্যাদি সেগুলি সবই দেহাভিমান বৃদ্ধিকারী হওয়ায় এবং পরমাত্মতত্ত্ব থেকে বিমুখী করায় **'অজ্ঞান'** নামে অভিহিত হয়।

বিশেষ কথা

যদি সাধকের মধ্যে এমন তীব্র বৈরাগ্য জাগরিত হয় যাতে তিনি শরীরের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক ত্যাগ করতে সক্ষম হন, তাহলে তাঁর মধ্যে এইসব সাধন-সামগ্রী স্বতঃই প্রকটিত হয়। তখন তাঁর আর এই সাধনগুলির পৃথক্‌ভাবে অনুষ্ঠান করার প্রয়োজন হয় না। বিনাশশীল শরীরকে নিজ অবিনাশী স্বরূপ থেকে পৃথক্ করে দেখাই হল প্রধান সাধন। তাই সমস্ত সাধকেরই উচিত শরীরকে নিজের থেকে পৃথক্ বলে অনুভব করা, যা প্রকৃতই পৃথক্।

পূর্বোক্ত যে কোনো সাধন পথে অগ্রসর হতে গেলে প্রধানতঃ দুটি বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা থাকে—(১) সাধকের উদ্দেশ্য যেন হয় কেবল পরমাত্মপ্রাপ্তি করা এবং (২) শাস্ত্রাদি পঠন-শ্রবণের সময় যদি বিচারপূর্বক শরীরকে পৃথক্ বলে অনুভব হয় তাহলে অন্য সময়েও এই অনুভবকে মর্যাদা দেওয়া। এই দুটি ব্যাপার দৃঢ়ভাবে থাকলে সাধন সমুদায়ের সব কটি সাধনই সহজ হয়ে যায়।

শরীর তো পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু যে 'আমি' শিশুকালে, বাল্যকালে, যৌবনে ছিলাম 'সেই আমি' একই আছি—এইরকম অনুভব সকলের হয়ে থাকে। অতএব শরীরের সঙ্গে নিজের কোনো সম্পর্ক নেই, শুধু মনগড়া সম্পর্ক—এটি নিশ্চিতরূপে জানলে, তবেই প্রকৃত সাধন আরম্ভ হয়। সাধকের বুদ্ধি যতই পরমাত্মপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে পুষ্ট হয়, ততই তার বিবেক এবং সংসারে বৈরাগ্য জাগ্রত হতে থাকে। ভগবান বিবেক ও বৈরাগ্য দৃঢ়তর করার উদ্দেশ্যে জ্ঞানের প্রয়োজনীয় সাধনগুলির বর্ণনা করেছেন।

মানুষের যখন একমাত্র পরমাত্মপ্রাপ্তি করা উদ্দেশ্য হয়, তখন তার দুর্গুণ-দুরাচারের শিকড় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, সাধকের তা অনুভব হোক বা না হোক! যেমন বড় গাছের শিকড় কাটার পর উঁচু শাখায় অবস্থিত পাতাগুলি কিছুদিন পর্যন্ত সবুজ থাকলেও কয়েকদিন পরই সেই কেটে ফেলা গাছের সমস্ত পাতাই শুকিয়ে যায়, তেমনই পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তির দৃঢ় উদ্দেশ্য হলেই দুর্গুণ-দুরাচার দূর হয়। সাধক যদিও প্রথমে এটি অনুভব করতে পারেন না, নিজের মধ্যে তিনি দোষই দেখতে পান, তবুও কিছুদিন পরে তাঁর সমস্ত দুর্গুণেরই শেষ হয়ে যায়।

সাধনকালে কখনো কখনো সাধক নিজের মধ্যে দুর্গুণ দেখতে পান। আসলে সাধনায় ব্যাপৃত হবার আগে তাঁর মধ্যে যেসব দুর্গুণ ছিল, সেগুলিই অন্তর্হিত হওয়ার আগে একবার প্রকট হয়ে ওঠে। নিয়মই হল যে, দরজা দিয়ে কেউ যখন আসে এবং যায়—দুই-ই দেখা যায়। সাধনকালে যদি দুর্গুণ বৃদ্ধি পেতে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে যে দুর্গুণ আসছে। কিন্তু যদি দুর্গুণ কম হতে থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে দুর্গুণ অপসারিত হচ্ছে। এইরূপ পরিস্থিতিতে সাধকের নিরাশ হওয়া উচিত নয় বরং নিজের উদ্দেশ্যে দৃঢ় থেকে তৎপরতার সঙ্গে সাধনায় ব্যাপৃত থাকা উচিত। এইভাবে সাধনায় ব্যাপৃত থাকলে দুর্গুণ-দুরাচার সর্বতোভাবে দূর হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব—ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের বিভাগগুলির সম্বন্ধে অবহিত করানোর জন্য এই কুড়িটি সাধনকে 'জ্ঞান' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এর বিপরীত যা তাকে বলা হয় অজ্ঞান। সাধনা না করলে মানুষ জ্ঞানের কথা শিখতে পারলেও অনুভব করতে সক্ষম হয় না। সুতরাং সাধনা না করলে অজ্ঞতা (ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞকে এক করে দেখা) রয়েই যায় এবং অজ্ঞতা থাকাকালীন যদি কেউ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের ব্যাপার শিখে তাই নিয়ে আলোচনা করে তবে তা প্রকৃতপক্ষে দেহাভিমানকে পুষ্ট করে। কিন্তু যারা এগুলিকে জীবনে ধারণ করার জন্য সাধনা করে, তাদের ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের সম্পর্কে বিভাগ করার যোগ্যতা আসে।

* * *

সম্বন্ধ—পূর্বোক্ত জ্ঞানের (সাধন-সামগ্রীর) দ্বারা যা জানা যায়, সেই সাধ্য-তত্ত্বকে 'জ্ঞেয়' নাম দিয়ে এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে।

জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে॥ ১২ ॥

[যৎ, জ্ঞেয়ম্ (যা জ্ঞাতব্য) ; তৎ (সেই পরমাত্মতত্ত্ব) ; প্রবক্ষ্যামি (আমি উত্তমরূপে জানাচ্ছি) ; যৎ, জ্ঞাত্বা (যা জ্ঞাত হলে) ; অমৃতম্ (অমৃতত্ব বা মোক্ষ) ; অশ্নুতে (অনুভব করে) ; অনাদিমৎ (সেই জ্ঞেয়-তত্ত্ব অনাদি) ; পরম্ ব্রহ্ম (ও, পরম ব্রহ্ম) ; তৎ (তাকে) ; সৎ (সৎও) ; ন, উচ্যতে (বলা যায় না) ; ন, অসৎ (অসৎও বলা যায় না।)]

যা (পূর্বে কথিত জ্ঞানের দ্বারা) জ্ঞাতব্য, তা (পরমাত্মতত্ত্ব) আমি উত্তমরূপে জানাচ্ছি, যা জ্ঞাত হলে মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে। সেই জ্ঞেয়-তত্ত্ব অনাদি ও পরম ব্রহ্ম। তাঁকে সৎও বলা যায় না আবার অসৎও বলা যায় না॥ ১২ ॥

ব্যাখ্যা—[এই শ্লোকে ভগবান 'প্রবক্ষ্যামি' পদে জ্ঞেয় তত্ত্বের বর্ণনা করার কথা বলেছেন, 'অমৃতমশ্নুতে' পদে তা জানার ফল জানিয়েছেন, 'অনাদিমৎ' পদের দ্বারা তার লক্ষণ জানিয়েছেন, 'পরং ব্রহ্ম' পদে তার নাম জানিয়েছেন, এবং 'ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে' পদটির দ্বারা তার বর্ণনা করেছেন।]

'জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি'—ভগবান এখানে জ্ঞেয় তত্ত্বের বর্ণনার সূত্রপাত করে দৃঢ়তাপূর্বক বলেছেন যে, যা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে মনুষ্যদেহ লাভ হয়েছে, উপনিষদ্, শাস্ত্র এবং গ্রন্থাদিতে যার বর্ণনা করা হয়েছে, সেই প্রাপণীয় জ্ঞেয় তত্ত্ব আমি উত্তমরূপে বর্ণনা করব।

'জ্ঞেয়ম্'—(অবশ্যরূপে জানবার যোগ্য) বলার তাৎপর্য হল যে জগতে যতপ্রকার বিষয়, পদার্থ, বিদ্যা, কলা ইত্যাদি আছে, তার কোনোটিই অবশ্যরূপে জানার যোগ্য নয়। একমাত্র পরমাত্মাই অবশ্যরূপে জানবার যোগ্য। কারণ জাগতিক বিষয়াদি যতই জানা হোক, তার জানার কোনো শেষ নেই। জাগতিক বিষয়ের জ্ঞানে জন্ম-মৃত্যু চক্র হতে মুক্তি হয় না, আর পরমাত্মাকে তত্ত্বতঃ জানলে, জানার আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না এবং জন্ম-মৃত্যু চক্র হতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। তাই জগতে পরমাত্মা ব্যতিরেকে অন্য কোনো কিছুই জানার যোগ্য নয়।

'যজ্ জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে'—এই জ্ঞেয়-তত্ত্ব অবগত হলে অমৃতত্ব অনুভব হয় অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধভাবে তত্ত্ব প্রাপ্তি হয়, যার প্রাপ্তিতে কিছু জানা, করা, পাওয়ার বাকি থাকে না।

প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং প্রথম থেকেই অবিনশ্বর, কিন্তু সে মরণশীল শরীরাদির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত করে নিজেকে জন্ম-মরণশীল বলে মেনে নিয়েছে। পরমাত্মতত্ত্ব জানলে এই ভ্রান্তি দূর হয় এবং সে তার প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হয় অর্থাৎ অমরত্ব অনুভব করে।

'অনাদিমৎ'—জগৎ-সংসারমাত্রই যার হতে উৎপন্ন হয়েছে, যাতে অবস্থান করে এবং অন্তকালে যাতে লীন হয়, তা আদি, মধ্য এবং অন্তকালেও একভাবে বিরাজ করে, তাই তাকে বলা হয় 'অনাদি'।

'পরং ব্রহ্ম'—প্রকৃতিকেও 'ব্রহ্ম' বলা হয় ; বেদকেও ব্রহ্ম বলা হয়, কিন্তু এক পরমাত্মাই হলেন 'পরম ব্রহ্ম'। যাঁর অধিক কোনো ব্যাপক, নির্বিকার, চিরস্থায়ী তত্ত্ব নেই, তাঁকেই বলা হয় 'পরম ব্রহ্ম'।

'ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে'—সেই তত্ত্বকে 'সৎ'ও বলা যায় না, 'অসৎ'ও বলা যায় না। কারণ অসৎ-এর অস্তিত্ব ব্যতীত সেই পরমাত্মতত্ত্বে সৎ শব্দটির প্রয়োগ হয় না, তাই একে 'সৎ' বলা যায় না। আবার এই পরমাত্মতত্ত্বের কখনো অভাব হয় না, সেইজন্য একে 'অসৎ'ও বলা যায় না। তাৎপর্য হল যে এই পরমাত্মতত্ত্বে সৎ-অসৎ কোনো শব্দই প্রযোজ্য হয় না—এটি এরূপ করণ-নিরপেক্ষ তত্ত্ব।

পৃথিবীতে যেমন রাত ও দিন—দুই-ই হয়, এর মধ্যে দিনের লোপ হওয়াকে 'রাত' এবং রাতের লোপ হওয়াকে 'দিন' বলা হয়। কিন্তু সূর্যে রাত বা দিন বলে কিছু নেই। রাত এবং দিন শব্দ দুটি তুলনামূলক রূপে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সূর্যের ক্ষেত্রে অন্ধকার না থাকলে দিন শব্দের প্রয়োগ অর্থহীন, কারণ সূর্যে রাত হয়ই না। তেমনই সৎ-এর প্রতিতুলনায় 'অসৎ' শব্দের প্রয়োগ হয় এবং অসৎ-এর তুলনায় 'সৎ' শব্দটি প্রযুক্ত হয়। পরমাত্মাকে যেখানে 'সৎ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে 'অসৎ'-এর তুলনায় এটি উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু যেখানে 'অসৎ'-এর নামগন্ধ নেই সেখানে পরমাত্মাকে 'সৎ' বলা অর্থহীন আর যে পরমাত্মা চিরস্থায়ী সৎ, তাঁকে 'অসৎ' বলা যায় না। তাই পরমাত্মাতে সৎ ও অসৎ—এই দুটি শব্দই প্রয়োগ হয় না। যেমন সূর্য দিন-রাত দুটি থেকেই ভিন্ন কেবল প্রকাশরূপ, তেমনই এই জ্ঞেয় তত্ত্ব সৎ-অসৎ দুটি থেকেই ভিন্ন[১]।

দ্বিতীয়তঃ, সৎ ও অসৎ-এর নির্ণয় করে বুদ্ধি এবং সেখানেই এইসব কথা বলা হয়, যেখানে তা মন, বাক্য এবং বুদ্ধির বিষয়। কিন্তু জ্ঞেয়-তত্ত্ব মন, বাক্য ও বুদ্ধির অতীত। সুতরাং তার সৎ-অসৎ কোনো সংজ্ঞা হতে পারে না।

পরিশিষ্ট-ভাব—পরমাত্মতত্ত্বকে 'জ্ঞেয়' বলার অর্থ হল যে এই তত্ত্ব জানার উপযুক্ত, তাকে জানা উচিত এবং তাকে জানা সম্ভব। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই তত্ত্ব জানার অন্তর্গত হয় না ; কারণ প্রকৃতির অতীত হওয়ায় এটি প্রকৃতিরও অন্তর্গত হয়

[১]রাম সচ্চিদানন্দ দিনেসা। নহিঁ তহঁ মোহ নিসা লবলেসা॥
সহজ প্রকাসরূপ ভগবানা। নহিঁ তহঁ পুনি বিগ্যান বিহনা॥ (শ্রীরামচরিতমানস ১।১১৬।৩)

না অর্থাৎ মন-বুদ্ধি প্রভৃতির দ্বারা তত্ত্বকে জানা যায় না। স্বয়ং-এর দ্বারাই তাঁকে জানা সম্ভব।

প্রকৃতি ও পুরুষ—এই দুটিকেই বলা হয় অনাদি (গীতা ১৩।১৯) ; সুতরাং উভয়ের প্রভু হওয়ায় পরমাত্মাকে এখানে **'অনাদিমৎ'** অর্থাৎ অনাদি বলা হয়েছে[১]। সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্থ-পঞ্চম শ্লোকে ভগবান অপরা প্রকৃতিকে **'ইতীয়ং মে'** এবং পরা প্রকৃতিকে (জীবাত্মা) **'মে পরাম্'** বলে উভয়ই তাঁর অধীন বলে জানিয়েছেন। সুতরাং ভগবানই উভয়ের প্রভু। উপনিষদে বলা আছে—

ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ। (শ্বেতাশ্বতর ১।১০)। 'প্রকৃতি ক্ষর (পরিবর্তনশীল) এবং একে ভোগ করে যেসব ব্যক্তি (জীবাত্মা) তা হল অমৃতস্বরূপ অক্ষর (অপরিবর্তনশীল)। এই দুটিকে (প্রকৃতি ও পুরুষকে) ঈশ্বরই তাঁর শাসনে রাখেন।'

গীতায় এক সমগ্র পরমাত্মারই তিন প্রকার বর্ণনা আছে—

(১) পরমাত্মা সৎ ও অসৎ উভয়ই—**'সদসচ্চাহম্'** (৯।১৯)।

(২) পরমাত্মা সৎ, অসৎ এবং সদসতের অতীতও তিনিই—**'সদসৎতৎপরং যৎ'** (১১।৩৭)।

(৩) পরমাত্মা সৎ ও অসৎ কোনোটিই নন—**'ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে'** (১৩।১২)।

—এর অর্থ হল যে প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মা ব্যতীত আর কিছুই নেই। তিনি মন-বুদ্ধি এবং বাণীর থেকে সর্বতোভাবে অতীত, তাই তাঁর বর্ণনা করা যায় না, কিন্তু তাঁকে প্রাপ্ত করা সম্ভব।

পরমাত্মতত্ত্বের বর্ণনা বাক্য দ্বারা করা সম্ভব নয়। তাকে তুলনামূলকভাবে অসতের থেকে সৎ, বিকারের থেকে নির্বিকার, একদেশীয়ের থেকে সর্বদেশীয় ইত্যাদি বলা হলেও বাস্তবে এই তত্ত্বে সৎ, নির্বিকার ইত্যাদি শব্দ অনুপযুক্ত। কারণ সকল শব্দের প্রয়োগই সাপেক্ষতা এবং প্রকৃতির সম্পর্ক ধরেই হয় কিন্তু পরমাত্মতত্ত্ব নিরপেক্ষ এবং প্রকৃতির অতীত। দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, অবস্থা, গুণ ইত্যাদি নিয়েই সংজ্ঞার সৃষ্টি হয়। পরমাত্মাতে দেশ, কাল ইত্যাদিই নেই। তবে আর তার সংজ্ঞা কীসের ? তাই এখানে বলা হয়েছে এই তত্ত্বকে সৎও বলা যায় না আবার অসৎও বলা যায় না।

পরমাত্মতত্ত্বের আদি (আরম্ভ) নেই। যা সর্বদাই থাকে, তার আবার আদি কী ? সব অপর, শুধু তিনিই পর। তিনি সৎও নন, অসৎও নন। আদি-অনাদি, পর-অপর, সৎ-অসতের পার্থক্য প্রকৃতির সম্পর্ক থেকে হয়। সেই তত্ত্ব আদি-অনাদি, পর-অপর এবং সৎ-অসতের থেকেও বিশিষ্ট। এইভাবে ভগবান জ্ঞেয়-তত্ত্ব বর্ণনা করার যে কথা বলেছেন, প্রকৃতপক্ষে তা বর্ণনা নয়, তা হল লক্ষ্যকে অর্থাৎ উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টি ফেরানো। এর তাৎপর্য হল জ্ঞেয়-তত্ত্বের দিকে লক্ষ্যপাত করানো, শুধুমাত্র বর্ণনা করা নয়। তাই সাধকেরও লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে বিচার-বিবেচনা করা উচিত, শুধু শেখার উদ্দেশ্যে নয়।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে 'এই তত্ত্বকে সৎও বলা যায় না, অসৎও নয়'—এরূপ বলে জ্ঞেয় তত্ত্বের নির্গুণ-নিরাকার রূপের বর্ণনা করা হয়েছে। এখন সেই জ্ঞেয় তত্ত্বের সগুণ-নিরাকার রূপের বর্ণনা করা হচ্ছে।

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ ১৩ ॥

[**তৎ** (তিনি) ; **সর্বতঃ পাণিপাদম্** (সর্বত্র হস্ত ও পদাদিবিশিষ্ট) ; **সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্** (সর্বদিকে নেত্র, মস্তক ও মুখ-সম্পন্ন) ; **সর্বতঃ শ্রুতিমৎ** (সর্বদিকে কর্ণযুক্ত) ; **লোকে** (জগৎ-সংসারে) ; **সর্বম্** (সবকিছুকে) ; **আবৃত্য, তিষ্ঠতি** (ব্যাপ্ত করে অবস্থিত আছেন।)]

---

[১]'অনাদিমৎপরং ব্রহ্ম' পদটির এরূপ অর্থও নেওয়া যায়—'অনাদি, মৎপরং ব্রহ্ম' অর্থাৎ ব্রহ্ম আমার পরায়ণ (আশ্রিত)—'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্' (গীতা ১৪।২৭)।

তিনি (পরমাত্মা) সর্বত্র হস্ত ও পদবিশিষ্ট, সর্বদিকে নেত্র, মস্তক ও মুখসম্পন্ন এবং সর্বদিকে কর্ণযুক্ত। তিনি জগৎ-সংসারে সবকিছুতে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন ॥ ১৩ ॥

ব্যাখ্যা—**'সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ'**—যেমন কালিতে সর্বত্র সব রকমের লেখন বিদ্যমান ; তাই লেখক কালি দ্বারা সর্বপ্রকারের লিপি লিখতে সক্ষম। সোনাতে সর্বত্র সকল রকমের গহনা বিদ্যমান, তাই স্বর্ণকার সোনা দিয়ে যে কোনো গহনা তৈরি করতে সক্ষম। তেমনই ভগবানের হাত ও পা সর্বত্র বিদ্যমান ; তাই ভক্ত যে কোনো স্থানে যা কিছু ভগবানের হাতে দিতে চায়, অর্পণ করতে চায়, তা গ্রহণের জন্য ভগবানের হাত সর্বস্থানেই বিদ্যমান। ভক্ত বাইরে থেকে দিতে চাক বা অন্তর থেকে, পূর্ব দিক থেকে বা পশ্চিমে, উত্তর দিকে বা দক্ষিণে, তা গ্রহণ করার জন্য ভগবানের হাত সেখানেই উপস্থিত। এইভাবেই ভক্ত জলে-স্থলে-অগ্নিতে যে কোনো স্থানে বিপদে পড়ুক না কেন, ভগবানকে ডাকলে, তাকে সঙ্কট থেকে রক্ষা করতে ভগবান হাত বাড়িয়ে দেন অর্থাৎ সেখানেই ভগবান নিজ হাতে তাকে রক্ষা করেন।

ভক্ত যে কোনো স্থান থেকেই যদি ভগবানের শ্রীচরণে চন্দন লাগাতে চায়, পুষ্প দিতে চায়, নমস্কার করতে চায়, সেখানেই ভগবানের শ্রীচরণ উপস্থিত। হাজার-লক্ষ ভক্ত যদি একই সময়ে পৃথক্‌ভাবে ভগবানের শ্রীচরণ বন্দনা করতে চায়, তাহলে তাদের ভাব অনুযায়ী ভগবান সেখানেই উপস্থিত হয়ে থাকেন।

'সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্'—ভক্ত যে স্থানে দীপ জ্বালে, আরতি করে, সেখানেই ভগবানের চক্ষু বিরাজ করে। ভক্ত যেখানে ভক্তিভাবে নৃত্য করে, ভগবান সেখানেই তার নৃত্য উপভোগ করেন। তাৎপর্য হল, যে ব্যক্তি ভগবানকে সর্বত্র বিরাজমান দেখে, ভগবানও কখনো তার দৃষ্টির আড়াল হন না (গীতা ৬।৩০)।

ভক্ত যেখানে ভগবানের মস্তকে চন্দন চর্চিত করতে চায়, পুষ্প দিতে চায়, সেখানেই ভগবানের মস্তক থাকে।

ভক্ত যেখানে ভোগ উৎসর্গ করতে চায়, সেখানেই ভগবানের শ্রীমুখ অবস্থিত অর্থাৎ ভক্তের ভক্তিপূর্বক প্রদত্ত ভোগ ভগবান তৎক্ষণাৎ এবং সেই স্থানেই গ্রহণ করেন (গীতা ৯।২৬)।

'সর্বতঃ শ্রুতিমৎ'—ভক্ত যখনই যে কোনো স্থান থেকে উচ্চকণ্ঠেই প্রার্থনা করুক কি, নিম্ন স্বরে প্রার্থনা করুক বা মনে মনে প্রার্থনা করুক, ভগবান সেখানেই স্বকর্ণে তা শুনতে পান।

মানুষের সর্ব অবয়ব সর্বস্থানে থাকে না অর্থাৎ যেখানে চক্ষু সেখানে কর্ণ থাকে না, যেখানে কান থাকে সেখানে চোখ অবস্থান করে না ; যেখানে হাত আছে সেখানে পা থাকে না ; যেখানে পা থাকে সেখানে হাত থাকে না। কিন্তু ভগবানের ইন্দ্রিয়াদি, তাঁর অবয়ব সর্বত্র বিদ্যমান। তাই ভগবান চক্ষুর দ্বারাও শুনতে পারেন, কথাও বলতে পারেন এবং গ্রহণ করতেও পারেন। অর্থাৎ তিনি সর্ব অবয়বের সাহায্যেই সমস্ত ক্রিয়া করতে সক্ষম। কারণ তাঁর সব অবয়বের মধ্যেই সব অবয়ব বিদ্যমান। তাঁর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশেও সর্ব ইন্দ্রিয় বিদ্যমান থাকে।

ভগবানের সর্বদিকে হাত, পা, চক্ষু, কর্ণ, মুখ, মস্তক—এর অর্থ হল যে ভগবান কোনো প্রাণী থেকেই দূরে নন। কারণ তিনি সমস্ত দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা, পরিস্থিতিতেই পরিপূর্ণভাবে বিরাজিত। সাধুগণ বলেছেন—

চহুঁ দিসি আরতি চহুঁ দিসি পূজা।
চহুঁ দিসি রাম আউর নহিঁ দুজা॥

জাগতিক ব্যক্তি যেমন বাইরে-ভেতরে, উপরে-নীচে, সর্বত্র শুধু সংসারই দেখে, সংসার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না, তেমনই পরমাত্মাকে তত্ত্বতঃ জানেন যে ব্যক্তি তিনি সর্বত্র পরমাত্মাকেই বিরাজমান দেখেন।

'লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি'—অনন্ত সৃষ্টি আছে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আছে, অনন্ত ঐশ্বর্য এবং সেই সবে দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তিও অনন্ত, তা সমস্তই পরমাত্মার অন্তর্গত। পরমাত্মা সেইসব পরিব্যাপ্ত করে অবস্থিত। দশম অধ্যায়ের বিয়াল্লিশতম শ্লোকেও ভগবান বলেছেন যে আমি সমস্ত জগৎকে একাংশে স্থিত করে অবস্থান করছি।

পরিশিষ্ট-ভাব—পরমাত্মার মধ্যে সর্বত্র সব কিছু বর্তমান। যেমন, কলম ও কালি দিয়ে জগতের যে কোনো ভাষাই লেখা সম্ভব হয়। জ্ঞানী ব্যক্তি ওই একই কলম ও কালিদ্বারা অনেক ভাষাই লিখে ফেলতে সক্ষম। সোনার মধ্যে সবরকমের গহনাই নিহিত থাকে। স্বর্ণকার ওই সোনা থেকেই হার-বালা-নথ-কর্ণভূষণ ইত্যাদি অনেক গহনাই তৈরি করতে সক্ষম।

তেমনই লোহাতেও সর্বদেশের সর্বপ্রকার অস্ত্রসম্ভার মজুত থাকে। মাটি এবং পাথরেও বিদ্যমান থাকে নানাপ্রকার মূর্তি তৈরির উপকরণ। তেমনই পরমাত্মাতেও সর্বস্থান সর্ববস্তু বিদ্যমান। পরমাত্মা থেকেই এই জগৎ-সংসার উৎপন্ন হয়েছে, তাঁতেই অবস্থান করছে এবং অন্তকালে তাঁতেই বিলীন হয়ে যাবে। শুরুতে যখন তিনি আছেন, শেষকালেও তিনি থাকবেন, তবে মধ্যবর্তী সময়ে অন্য বস্তু আসবে কী করে ? এবং আসবে কোথা থেকে ? সাধক যদি এই ব্যাপারটি দৃঢ়তার সঙ্গে মেনে নেন, তাহলে পরমাত্মার দর্শন লাভ হয় ; কেন-না বাস্তবে তিনিই বিদ্যমান, অন্য কোনো বস্তু নেই-ই। ভগবান বলেছেন—

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ২।৯।৩২)

'জগৎ সৃষ্টির আগেও আমি ছিলাম, আমি ছাড়া আর কিছুই ছিল না এবং জগৎ উৎপন্ন হওয়ার পরে যা কিছু এই জগতে দেখা যায় তাও আমি। সৎ, অসৎ এবং সৎঅসতের অতীত যা কিছু কল্পনা করা সম্ভব, সেসবও আমিই। জগৎ ব্যতীতও যা কিছু আছে, সেসবও আমি এবং জগতের বিনাশ ঘটলে যা কিছু অবশিষ্ট থাকে, তা-ও আমি।'

তাৎপর্য হল যে সত্তা একটিই। দ্বন্দ্বের মধ্যে অর্থাৎ রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ থাকায় তা আমাদের অনুভবে আসে না।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে সগুণ-নিরাকারের বর্ণনা করে পরবর্তী তিনটি শ্লোকে তাঁর বিশেষত্ব, সর্বব্যাপকতা এবং সর্বসমর্থতার বর্ণনা করেছেন।

সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্।
অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥ ১৪ ॥

[**সবেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্** (পরমাত্মা সর্বেন্দ্রিয় বিবর্জিত) ; **সবেন্দ্রিয়গুণাভাসং** (সর্বেন্দ্রিয়ের বিষয়ের প্রকাশক) ; **অসক্তম্, চ** (আসক্তিবর্জিত, এবং) ; **সর্বভৃৎ** (সমস্ত জগতের ধারক ও পালক) ; **চ, এব** (এবং) ; **নির্গুণম্** (সর্বগুণবর্জিত) ; **গুণভোক্তৃ** (সকল গুণের ভোক্তা।)]

পরমাত্মা সর্বেন্দ্রিয় বিবর্জিত এবং সর্বেন্দ্রিয়ের বিষয়ের প্রকাশক ; আসক্তিবর্জিত আবার সমস্ত জগতের ধারক ও পালক ; সর্বগুণবর্জিত আবার সমস্ত গুণের ভোক্তা॥ ১৪ ॥

ব্যাখ্যা—**'সবেন্দ্রিয়গুণাভাসং সবেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্'**—প্রথমে পরমাত্মা তারপরে তাঁর শক্তি প্রকৃতি। প্রকৃতির কার্য মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্বের কার্য অহংকার, অহংকারের কার্য পঞ্চমহাভূত, পঞ্চমহাভূতের কার্য মন এবং দশ ইন্দ্রিয় আর দশ ইন্দ্রিয়ের কার্য পাঁচটি বিষয়[১]—এই সমস্তই প্রকৃতির কার্য। পরমাত্মা প্রকৃতি এবং তার কার্যের অতীত। তা সগুণই হোক বা নির্গুণ, সাকার হোক বা নিরাকার, সর্বদাই সেটি প্রকৃতির অতীত-ই থাকে। তিনি অবতাররূপে এলেও প্রকৃতির অতীত হয়েই থাকেন। অবতরণের সময় তিনি প্রকৃতিকে নিজ বশে রেখে প্রকটিত হয়ে থাকেন।

যারা গুণাদিতে লিপ্ত, গুণের দ্বারা আবদ্ধ বলে মনে করে জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হয়, তারাও যখন পরমাত্মাকে লাভ করে গুণাতীত (গুণরহিত) হয়ে ওঠে, তাহলে পরমাত্মা কীরূপে গুণাদিতে বদ্ধ হবেন ? তিনি সর্বদাই গুণাতীত (গুণরহিত)। অতএব পরমাত্মা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদিবর্জিত অর্থাৎ জাগতিক জীবের ন্যায় হাত-পা-চক্ষু-মস্তক-কান ইত্যাদি ইন্দ্রিয়যুক্ত নয় ; কিন্তু ওইসব ইন্দ্রিয় না থাকলেও সেগুলির বিষয় গ্রহণে বা আস্বাদনে সম্পূর্ণভাবে সক্ষম[২]। যেমন—কর্ণরহিত হওয়া সত্ত্বেও

---

[১] বিষয়ের জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হয়। ইন্দ্রিয়ই বিষয়কে প্রকাশ করে। এইজন্য বিষয় ইন্দ্রিয়েরই কার্য।

[২] ক) অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। (শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ৩।১৯)

'পরমাত্মা হস্ত-পদরহিত হলেও গ্রহণ করতে এবং সবেগে চলতে সক্ষম। ইনি বিনা নেত্রেই দর্শন করেন এবং কর্ণ বিনাই শ্রবণ করে থাকেন।'

তিনি ভক্তের আহ্বান শুনতে পান, ত্বকরহিত হলেও ভক্তকে আলিঙ্গন করেন, নেত্ররহিত হলেও প্রাণীগণকে সবসময় দেখেন, জিহ্বারহিত হলেও ভক্ত-প্রদত্ত ভোগ আস্বাদন করেন প্রভৃতি। এইভাবে জ্ঞানেন্দ্রিয় রহিত হয়েও পরমাত্মা শব্দ, স্পর্শ বিষয়াদি গ্রহণ করেন। তেমনই বাক্যরহিত হয়েও তিনি তাঁর প্রিয় ভক্তদের সঙ্গে কথোপকথন করেন, পদরহিত হয়েও ভক্তের আহ্বানে তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হন, হস্তরহিত হয়েও ভক্তপ্রদত্ত উপহারাদি অক্লেশে গ্রহণ করেন। সেইরূপ কর্মেন্দ্রিয় বর্জিত হয়েও পরমাত্মা কর্মেন্দ্রিয়ের সমস্ত কর্ম সুসম্পন্ন করেন। এককথায় ইন্দ্রিয়াদিরহিত হয়েও ভগবান ইন্দ্রিয়াদির বিষয়গুলি প্রকাশিত করেন।

'অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব'—সকল প্রাণীতেই ভগবানের আপনত্ব, প্রেম থাকে, যদিও কারও প্রতিই তাঁর আসক্তি নেই। আসক্তিরহিত হয়েও তিনি ব্রহ্মা থেকে পিঁপড়ে পর্যন্ত সমস্ত প্রাণীরই পালন-পোষণ করে থাকেন। মাতা-পিতা যেমন তাঁদের সন্তানদের পালন-পোষণ করেন, তার থেকে অধিক যত্নে ভগবান প্রাণীদের পালন-পোষণ করেন। কোন্ প্রাণী কোথায় অবস্থান করছে এবং কার কখন কীসের প্রয়োজন, এটি সম্পূর্ণভাবে জানেন বলেই ভগবান সেই বস্তু প্রয়োজনানুসারে যথোচিতভাবে দিয়ে থাকেন। প্রাণীরা যেখানেই থাকুক, পৃথিবীতেই হোক বা সমুদ্রে, আকাশেই থাকুক বা স্বর্গে অর্থাৎ ত্রিভুবনের যেখানেই অতি বৃহৎ বা অতি ক্ষুদ্র যে প্রাণীই অবস্থান করুক না কেন, ভগবান সেখানেই তাদের পালন ও পোষণ করে থাকেন। প্রাণীমাত্রেরই সুহৃদ হওয়ায় ভগবান অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতি ভোগ করিয়ে পাপ-পুণ্য নাশ করে প্রাণীদের শুদ্ধ, পবিত্র করে তোলেন।

'নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ'—পরমাত্মা সকল গুণরহিত হয়েও সর্বগুণের ভোক্তা। তাৎপর্য হল যে মাতা-পিতা যেমন শিশুদের ক্রিয়া দেখামাত্রই প্রসন্ন হয়ে ওঠেন, তেমনই পরমাত্মাও ভক্তদের দ্বারা সম্পাদিত কর্মসকল দেখে প্রসন্ন হন অর্থাৎ ভক্তগণ যেসব ক্রিয়া করেন, ভগবান তার ভোক্তা হন।

পরিশিষ্ট-ভাব—এই প্রকরণে ব্রহ্মের প্রাধান্য থাকলেও উপস্থিত শ্লোকটিতে **'সমগ্র'** পরমাত্মার বর্ণনা করা হয়েছে। এই সমগ্রটিই জ্ঞেয়-তত্ত্ব। অতএব জ্ঞান ও ভক্তি দুটিতেই **'সমগ্রের'** প্রাধান্য রয়েছে—**'বাসুদেবঃ সর্বম্'** (গীতা ৭।১৯), **'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'** (ছান্দোগ্য ৩।১৪।১)।

এই শ্লোকটির তাৎপর্য হল যে একমাত্র পরমাত্মা ব্যতীত আর কোনো অস্তিত্ব নেই। আমরা যা-ই বলি না কেন, তা পরমাত্মা থেকে ভিন্ন নয়। সব কিছু বর্জিতও আবার সবকিছুর সঙ্গেও তিনিই।

※ ※ ※

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥ ১৫ ॥

[তৎ, ভূতানাম্ (এই পরমাত্মা সকল প্রাণীর) ; **বহিঃ, অন্তঃ, চ** (অন্তর ও বাহির পরিপূর্ণ, এবং) ; **চরম্, অচরম্, এব** (চর-অচর প্রাণীর রূপেও তিনি) ; **দূরস্থম্, চ** (অতি দূরেও, এবং) ; **অন্তিকে, চ, তৎ** (অতি নিকটেও তিনি) ; **সূক্ষ্মত্বাৎ** (অতি সূক্ষ্মতাবশতঃ) ; **অবিজ্ঞেয়ম্** (অতি অবিজ্ঞেয় অর্থাৎ জানার অন্তর্গত নন।)]

এই পরমাত্মা সকল প্রাণীর অন্তরে এবং বাইরে পরিপূর্ণ, চর-অচর প্রাণীর রূপেও তিনি, অতি দূরেও তিনি আবার অতি নিকটেও তিনি। অতি সূক্ষ্মতাবশতঃ অবিজ্ঞেয় (জানার বিষয় নন)॥ ১৫ ॥

(খ) বিনু পদ চলই সুনই বিনু কানা। কর বিনু করম করই বিধি নানা॥
আনন রহিত সকল রস ভোগী। বিনু বানী বকতা বড় জোগী॥
তন বিনু পরস নয়ন বিনু দেখা। গ্রহই ঘ্রান বিনু বাস অসেষা॥
(শ্রীরামচরিতমানস ১।১১৮।৩-৪)

ব্যাখ্যা—[জ্ঞেয় তত্ত্বের বর্ণনা দ্বাদশ থেকে সপ্তদশ—মোট ছটি শ্লোকে আলোচিত হয়েছে। তার মধ্যে এই (পঞ্চদশ) শ্লোকটি চতুর্থ। এই শ্লোকে আগের তিনটি শ্লোকের এবং পরবর্তী দুটি শ্লোকের ভাবও বিদ্যমান। সুতরাং এই শ্লোকটিকে এই প্রকরণের সার বলা যায়।]

'বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ'—বরফ দ্বারা নির্মিত কলসকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলে যেমন তার বাইরেও জল, ভেতরেও জল এবং কলসটি নিজেও (বরফজল-নির্মিত হওয়ায়) জল, তেমনই সমস্ত চর-অচর প্রাণীগণের বাইরেও পরমাত্মা, অন্তরেও পরমাত্মা এবং প্রাণী নিজেও পরমাত্মাস্বরূপই। অর্থাৎ বরফের কলস যেমন জল ব্যতীত অন্য কিছুই নয়, তার সবই জল, তেমনই জগতে পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কোনো তত্ত্ব নেই, সবই পরমাত্মা। এই কথাই ভগবান মহাত্মাদের দৃষ্টিতে **'বাসুদেবঃ সর্বম্'** (গীতা ৭।১৯) এবং তাঁর দৃষ্টিতে **'সদসচ্চাহম্'** বলে (গীতা ৯।১৯) জানিয়েছেন।

'দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ'—কোনো বস্তুর দূরত্ব বা নৈকট্য বোঝাতে তিনভাবে তা বলা হয়—দেশকৃত, কালকৃত ও বস্তুকৃত। তিনভাবেই ভগবান দূরে থেকেও আরও দূরে আবার কাছে থেকেও আরও কাছে। যেমন অতি দূরেও পরমাত্মা বিরাজমান এবং অত্যন্ত কাছেও তিনি অবস্থিত[১] ; সুদূর অতীতেও এই পরমাত্মাই ছিলেন, বহুযুগ পরেও ইনিই থাকবেন, এখন তিনিই বিদ্যমান। সকল বস্তুর আদিতেও এই পরমাত্মা ছিলেন, এগুলির অন্ত হলেও তিনিই থাকবেন এবং এই বস্তুগুলিতে তিনিই বস্তুর রূপে বিদ্যমান।

উৎপত্তি ও বিনাশশীল বস্তু সংগ্রহ ও সুখভোগে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের কাছে পরমাত্মা (স্বরূপতঃ নিকটস্থ হলেও) দূরে অবস্থিত। কিন্তু যে ব্যক্তি কেবল পরমাত্মারই অভিমুখী তার কাছে পরমাত্মা অত্যন্ত নিকটে অবস্থিত। তাই সাধককে জাগতিক ভোগ ও সংগ্রহের ইচ্ছা পরিত্যাগ করে শুধুমাত্র পরমাত্মপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করতে হয়। পরমাত্মাকে লাভ করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা হলেই পরমাত্মার প্রাপ্তি ঘটে, অর্থাৎ পরমাত্মার সঙ্গে নিত্যযোগ অনুভূত হয়।

'সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ম্'—এই পরমাত্মা অতি সূক্ষ্ম বলে ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণের ঊর্ধ্বে অর্থাৎ সেই পরমাত্মা ইন্দ্রিয় এবং অন্তকরণের সাধ্যায়ত্ত নন। তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে যে যখন তাঁকে জানা যায় না তখন তাঁর অস্তিত্ব কীকরে থাকা সম্ভব ? তাঁর অনস্তিত্ব নেই। যেমন পরমাণুরূপ জল অতি সূক্ষ্ম হওয়ায় চোখে ধরা পড়ে না, কিন্তু দেখা না গেলেও তা অনস্তিত্ব নয়, সেই জল পরমাণুরূপে আকাশে থাকে, স্থূল হলে জলবিন্দু, বরফরূপে দেখা যায় ; তেমনই পরমাত্মা অত্যন্ত সূক্ষ্ম হওয়ায় ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদির সাহায্যে জ্ঞাত হন না। পরমাত্মা এগুলির ঊর্ধ্বে, এগুলির অতীত। তাই তাঁর অনস্তিত্ব নেই।

জীবসকল অজ্ঞানতার জন্যই পরমাত্মাকে জানতে পারে না। যেমন কোথাও যদি **'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা'** শব্দটি লেখা থাকে, তবে যে লেখাপড়া জানে না, সে কেবল সেটিকে কালির আঁচড়ই দেখবে আর যে লেখাপড়া জানে তার কাছে 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা' দৃষ্ট হবে। যে সংস্কৃত জানে সে এই শব্দটি কোন্ ধাতুতে গঠিত, এর অর্থ কী, এইসব জানতে পারে। গীতা মননকারী গীতার গভীর ভাব দর্শন করতে থাকে। এইরূপই যেসব লোকের পরমাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান নেই, তারা পরমাত্মার দর্শন পায় না, তাঁর সম্বন্ধে জানতে পারে না। কিন্তু যাঁর পরমাত্মতত্ত্বের জ্ঞান হয়েছে, তিনি সবই পরমাত্মারূপে দেখেন।

ওই পরমাত্মাকে 'জ্ঞেয়'ও (১৩।১২, ১৭) বলা হয়েছে এবং 'অবিজ্ঞেয়'ও বলা হয়েছে। এর তাৎপর্য হল যে এটি কেবল স্বয়ং-এর সাহায্যেই জানা সম্ভব, তাই এটি 'জ্ঞেয়' এবং এটি ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির সাহায্যে জানা সম্ভব নয়, তাই এটি 'অবিজ্ঞেয়'।

---

[১]পৃথিবী থেকে দূরে জল, জল থেকে দূরে তেজ, তেজ থেকে দূরে বায়ু, বায়ু থেকে দূরে আকাশ, আকাশ থেকে দূরে মহৎতত্ত্ব, মহৎতত্ত্ব থেকে দূরে প্রকৃতি এবং প্রকৃতি থেকে দূরে পরমাত্মা। এইভাবে দূরের থেকেও দূরে হয়েও পরমাত্মা ব্যাপকরূপে সবেতে অবস্থিত। কারণ পরমাত্মা সকলের কারণ এবং কারণ সকল কার্যে বিদ্যমান থাকে।

প্রকৃতির থেকে নিকটে স্থূলশরীর, স্থূলশরীর থেকে নিকটে সূক্ষ্মশরীর, সূক্ষ্মশরীর থেকে নিকটে কারণশরীর, কারণশরীরের থেকে নিকটে অহম্, সেই অহমের নিকটস্থ হলেন পরমাত্মা। এইভাবে নিকটের থেকেও অতি নিকটে পরমাত্মা। পরমাত্মা আমাদের যত নিকট (আপন), তত নিকট অপর কেউ নয়।

সর্বত্র পরিপূর্ণ পরমাত্মাকে জানতে গেলে সাধকের মেনে নিতে হয় যে পরমাত্মা সর্বত্র পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান। এইরকম মেনে নেওয়াও একপ্রকার জানা। যেমন (বোধ হলে পর) জ্ঞানকে (জানাকে) কেউ দূর করতে পারে না, তেমনই 'পরমাত্মা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন' এই মান্যতাকে (মেনে নেওয়া) কেউ দূর করতে পারে না। যখন সংসারের উপাধিগুলিকেও—'আমি ব্রাহ্মণ', 'আমি সাধু' ইত্যাদি (যা অবাস্তবিক) কেউ দূর করতে পারে না, তখন পারমার্থিক মান্যতাগুলিকে (যা প্রকৃত) আর কী প্রকারে দূর সম্ভব ? তাৎপর্য হল এই যে, দৃঢ়তা সহকারে মেনে নেওয়াও একপ্রকার সাধন। জানার মতো মেনে নেওয়ারও অনেক মহিমা আছে। 'পরমাত্মা সর্বত্র পরিপূর্ণরূপে বিরাজিত'—এই তত্ত্ব দৃঢ়তার সঙ্গে মেনে নিলে এটি আর শুধু মেনে নেওয়ার স্তরে থাকে না, বরং ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির অতীত যে অতি সূক্ষ্ম পরমাত্মাতত্ত্ব, তা অনুভূত হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব—দ্বাদশ শ্লোকে পরমাত্মাকে বলা হয়েছে 'জ্ঞেয়'। কিন্তু এই শ্লোকে তাঁকে 'অবিজ্ঞেয়' বলার অর্থ হল যে, পরমাত্মা জ্ঞেয় হলেও জগৎ-সংসারের মতো জ্ঞেয় নন। জগৎ-সংসারকে যেমন ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির সাহায্যে জানা যায়, পরমাত্মাকে তেমন ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির সহযোগে জানা সম্ভব নয়। ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি হল প্রকৃতির কার্য আর পরমাত্মা হলেন প্রকৃতির অতীত। প্রকৃতিও প্রকৃতির কার্যাদি সম্পূর্ণভাবে জানতে সক্ষম হয় না, তাহলে প্রকৃতির অতীত পরমাত্মাকে কীভাবে জানবে ? পরমাত্মাকে মেনে নিয়ে স্বীকার করতে হয় ; কারণ স্বীকৃতি হয় স্বয়ং-এ, করণে (মন-বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়তে) নয়[১]। পরমাত্মার সঙ্গে স্বয়ং-এর ঐক্য রয়েছে, তাই পরমাত্মা প্রাপ্তিও স্বীকৃতির দ্বারা হয়, চিন্তন, মনন বা বর্ণনার দ্বারা হয় না। শরীর ও সংসারের সঙ্গে কখনোই স্বয়ং-এর একত্ব হয়নি, হয় না, হবে না এবং কখনো হওয়া সম্ভবও নয়। স্বয়ং কখনো পরমাত্মা থেকে বিচ্যুত হয়নি, হবে না এবং তা হওয়া কখনোই সম্ভব নয়।

※ ※ ※

অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥ ১৬ ॥

[**তৎ** (সেই পরমাত্মা) ; **অবিভক্তম্, চ** (স্বয়ং অপরিচ্ছিন্ন হয়েও) ; **ভূতেষু, বিভক্তম্, ইব** (সর্বভূতে বিভক্তের ন্যায়) ; **স্থিতম্, চ** (অবস্থান করেন, এবং) ; **জ্ঞেয়ম্** (সেই জ্ঞেয় পরমাত্মাই) ; **ভূতভর্তৃ, চ** (সকল প্রাণীর সৃষ্টিকর্তা, এবং) ; **প্রভবিষ্ণু, চ** (পালনকর্তা, ও) ; **গ্রসিষ্ণু** (সংহারকর্তা।)]

সেই পরমাত্মা স্বয়ং অপরিচ্ছিন্ন হয়েও সর্বভূতে বিভক্তের ন্যায় যেন অবস্থান করেন। সেই জ্ঞেয় পরমাত্মাই সকল প্রাণীর সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং সংহারকর্তা॥ ১৬ ॥

ব্যাখ্যা—**'অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্'**—ত্রিভুবনে দেখা, শোনা এবং বোঝবার যে সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম প্রাণী আছে তাদের মধ্যে পরমাত্মা নিজে বিভাগরহিত হয়েও, সেইসবে বিভক্তের মতো প্রতীয়মান হন। এই বিভাগ শুধু প্রতীতিমাত্র।

যেমন আকাশ ঘট, মঠ ইত্যাদির উপাধিতে ঘটাকাশ, মঠাকাশ রূপে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দৃষ্ট হলেও স্বরূপতঃ একই, সেইরূপ পরমাত্মা বিভিন্ন প্রাণীর দেহে ভিন্ন ভিন্ন মনে হলেও স্বরূপতঃ একই।

এই অধ্যায়ের সাতাশতম শ্লোকে **'সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্'** পদের দ্বারা পরমাত্মাকে সমস্ত প্রাণীর মধ্যে সমভাবে অবস্থিত দেখতে বলা হয়েছে। এইরূপ অষ্টাদশ অধ্যায়ের বিশতম শ্লোকে **'অবিভক্তং বিভক্তেষু'** পদের দ্বারা সাত্ত্বিক জ্ঞানের বর্ণনাতে পরমাত্মাকে অবিভক্তরূপে দর্শন করাকেই 'সাত্ত্বিক জ্ঞান' বলা হয়েছে।

'ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ'—এই অধ্যায়ে দ্বিতীয় শ্লোকে **'বিদ্ধি'** পদের দ্বারা যে পরমাত্মাকে জানার কথা বলা হয়েছে এবং দ্বাদশ শ্লোকে যে **'জ্ঞেয়'**

[১]স্বীকৃতি স্বয়ং-এ হয়, তাই স্বীকৃতির কথা ভোলা যায় না ; যেমন—'আমি ব্রাহ্মণ' ; 'আমি বিবাহিত'। কিন্তু মন-বুদ্ধিতে মানা কথা ভুল হয়ে যায়। স্বীকৃতি-হওয়া কথায় কোনো সন্দেহ থাকে না এবং তাতে বিপরীত ভাবনাও থাকে না।

তত্ত্ব বর্ণনা করার কথা বলা হয়েছে, তাই এখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবরূপে বর্ণিত হয়েছে। বস্তুতঃ চেতনতত্ত্ব (পরমাত্মা) একই। সেই পরমাত্মা রজোগুণের প্রাধান্য স্বীকার করে ব্রহ্মারূপে সকলের সৃষ্টি করেন, সত্ত্বঃগুণের প্রাধান্য স্বীকার করে বিষ্ণুরূপে তাদের ভরণপোষণ করেন এবং তমোগুণের প্রাধান্য স্বীকার করে রুদ্ররূপে সকলের সংহার করে থাকেন। তাৎপর্য হল এই যে এক পরমাত্মাই সৃষ্টি, পালন এবং সংহার করার জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব নাম ধারণ করেন[১]। তবে পরমাত্মা সৃষ্টির কার্যের জন্য নানাপ্রকার গুণাদি স্বীকার করে নিলেও তিনি সেইসব গুণের বশীভূত নন। সমস্ত গুণের ওপরই তাঁর পূর্ণ আধিপত্য বর্তমান।

পরিশিষ্ট-ভাব— এই শ্লোকে পরমাত্মার সমগ্র রূপের বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন ভৌতিক দৃষ্টিতে জগৎ-সংসার এক, তেমনই প্রকৃত তত্ত্বও (পরমাত্মা) এক এবং অবিভক্ত। পাঞ্চভৌতিক দৃষ্টিতে যেমন জগৎ-সংসার এক হয়েও নানা বস্তু, ব্যক্তি (জড়-চেতন, স্থাবর-জঙ্গম) ইত্যাদি রূপে প্রতিভাত হয়, তেমনই পরমাত্মা এক হয়েও বহুরূপে প্রতীত হন। অর্থাৎ পরমাত্মা এক হয়েও অনেক এবং অনেক হয়েও একই। প্রকৃত অস্তিত্ব কখনো দুই হতে পারে না ; কারণ দুই হলে তাতে অসৎ স্পর্শ ঘটে।

উৎপন্নকারীও পরমাত্মা এবং উৎপন্ন যিনি হন তিনিও পরমাত্মা। ভরণ-পোষণকারীও পরমাত্মা আর যাঁর ভরণ-পোষণ করা হয় তিনিও পরমাত্মা। সংহারকারীও পরমাত্মা আর যাঁকে সংহার করা হয় তিনিও পরমাত্মা।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে ভগবান জ্ঞেয়-তত্ত্বকে আধাররূপে বর্ণনা করেছিলেন, পরবর্তী শ্লোকে একেই প্রকাশকরূপে বর্ণনা করেছেন।

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য বিষ্ঠিতম্॥ ১৭ ॥

[তৎ (সেই পরমাত্মা) ; **জ্যোতিষাম্, অপি, জ্যোতিঃ** (জ্যোতিসমূহেরও জ্যোতি, এবং) ; **তমসঃ** (অজ্ঞানরূপ অন্ধকারেরও) ; **পরম্, উচ্যতে** (ঊর্ধ্বে বলে কথিত) ; **জ্ঞানম্** (সেই জ্ঞানস্বরূপ) ; **জ্ঞেয়ম্, জ্ঞানগম্যং** (জ্ঞেয়-তত্ত্ব জ্ঞানের দ্বারা লভ্য এবং) ; **সর্বস্য** (সকলের) ; **হৃদি** (হৃদয়ে) ; **বিষ্ঠিতম্** (বিরাজমান।)]

এই পরমাত্মা জ্যোতিসকলেরও জ্যোতি এবং অজ্ঞানরূপ অন্ধকারেরও ঊর্ধ্বে বলে কথিত। সেই জ্ঞানস্বরূপ জ্ঞেয়-তত্ত্ব জ্ঞানের দ্বারা লভ্য এবং সকলের হৃদয়ে বিরাজমান ॥ ১৭ ॥

ব্যাখ্যা—'জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতি'—প্রকাশ (জ্ঞান)-কে বলা হয় জ্যোতি অর্থাৎ যার দ্বারা প্রকাশিত হয়, জ্ঞান হয়, তা সমস্তই জ্যোতি। ভৌতিক পদার্থ সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, তারা, অগ্নি, বিদ্যুৎ ইত্যাদি প্রকাশে দেখা যায় ; সুতরাং পার্থিব পদার্থে জ্যোতি (প্রকাশক) হল সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদি।

বর্ণাত্মক এবং ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির জ্ঞান কানের সাহায্যে হয়। সুতরাং শব্দের জ্যোতি (প্রকাশক) হল 'কান'। শীতল-উষ্ণ, কোমল-কঠোর ইত্যাদি স্পর্শের জ্ঞান হয় ত্বক-এর সাহায্যে ; সুতরাং স্পর্শের জ্যোতি (প্রকাশক) হল 'ত্বক্'। শ্বেত, নীল, পীত ইত্যাদি রং রূপের জ্ঞান হয় চক্ষুর দ্বারা ; সুতরাং রূপের জ্যোতি (প্রকাশক) হল 'নেত্র'। টক্, মিষ্টি, নুন ইত্যাদি নানাপ্রকার স্বাদের জ্ঞান হয় জিহ্বার সাহায্যে ; সুতরাং স্বাদের জ্যোতি (প্রকাশক) হল 'জিহ্বা'। সুগন্ধ-দুর্গন্ধের জ্ঞান হয় নাকের দ্বারা, সুতরাং গন্ধের জ্যোতি হল 'নাক'। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের শব্দাদি পঞ্চ বিষয়ের জ্ঞান হওয়া তখনই সম্ভব যখন ওই ইন্দ্রিয়গুলির সঙ্গে মনও থাকে। মন যদি ইন্দ্রিয়গুলির সঙ্গে না থাকে তবে কোনো বিষয়েরই জ্ঞান

[১]সৃষ্টিস্থিত্যন্তকরণাদ্ ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাত্মকঃ। স সংজ্ঞাং যাতি ভগবানেক এব জনার্দনঃ॥

(পদ্মপুরাণ, সৃষ্টি. ২।১১৪)

হওয়া সম্ভব হয় না। সুতরাং সকল ইন্দ্রিয়ের জ্যোতি (প্রকাশক) হল **'মন'**। মনের সাহায্যে বিষয়গুলির জ্ঞান হলেও যতক্ষণ বুদ্ধি মনের সঙ্গে যোগদান না করে ততক্ষণ বিষয় সম্বন্ধে স্পষ্ট ও স্থায়ী জ্ঞান হয় না। বুদ্ধি সঙ্গে থাকলে তবেই সেই বিষয়গুলি সম্বন্ধে স্পষ্ট ও স্থায়ী জ্ঞান হয়। সুতরাং মনের জ্যোতি (প্রকাশক) হল **'বুদ্ধি'**। বুদ্ধির সাহায্যে কর্তব্য-অকর্তব্য, সৎ-অসৎ, নিত্য-অনিত্যের জ্ঞান হলেও স্বয়ং (কর্তা) যদি তা ধারণ করতে না পারে, তাহলে সেটি বৌদ্ধিক জ্ঞানই থেকে যায়। সেই জ্ঞান জীবনে বা আচরণে প্রতিফলিত হয় না, তা স্বয়ং-এ প্রতিষ্ঠিত হয় না। যা স্বয়ং-এ স্থান নেয়, তা কখনো বিনষ্ট হয় না। সুতরাং বুদ্ধির জ্যোতি (প্রকাশক) হল **'স্বয়ং'**। স্বয়ং হল পরমাত্মার অংশ এবং পরমাত্মা হলেন অংশী। স্বয়ং-এর যে জ্ঞান বা প্রকাশ তা পরমাত্মা হতেই প্রকাশিত। সুতরাং স্বয়ং-এর জ্যোতি (প্রকাশক) হলেন **'পরমাত্মা'**। সেই স্বয়ং-প্রকাশিত পরমাত্মাকে কেউই প্রকাশ করতে পারে না।

তাৎপর্য হল এই যে, পরমাত্মার প্রকাশ (জ্ঞান) স্বয়ং-এ ঘটে। স্বয়ং-এর প্রকাশ বুদ্ধিতে, বুদ্ধির প্রকাশ মনে, মনের প্রকাশ ইন্দ্রিয়াদিতে এবং ইন্দ্রিয়াদির প্রকাশ বিষয়ে প্রতিফলিত হয়। এই সমস্ত প্রকাশই প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মা থেকে আসে। সুতরাং এইসব জ্যোতির জ্যোতি, প্রকাশকের প্রকাশক হলেন একমাত্র পরমাত্মা[১]। যেমন পরস্পরের পিছনে বসা পরীক্ষার্থীরা তাদের সামনে বসা পরীক্ষার্থীকে দেখতে পেলেও পিছনে বসা পরীক্ষার্থীকে দেখতে পায় না, তেমনই অহং, বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়াদিও তার অগ্রবর্তীদের দেখতে (জানতে) সক্ষম হয় কিন্তু নিজের পশ্চাতের কাউকে নয়। যেমন সর্ব পশ্চাতে উপবেশনকারী পরীক্ষার্থী তার সামনে উপবিষ্ট সকল পরীক্ষার্থীদের দেখতে সক্ষম হয়, তেমনই পরম প্রকাশক পরমাত্মা অহং, বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় সবকিছু দেখে থাকে, প্রকাশিত করে থাকে, কিন্তু তাঁকে কেউ প্রকাশিত করতে পারে না। সেই পরমাত্মা চর-অচর সমস্ত জগতের সমরূপে নিরপেক্ষ প্রকাশক—**'যস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি সচরাচরম্'** (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।১৩।৫৫)। সেখানে প্রকাশক, প্রকাশ এবং প্রকাশ্য—এই ত্রিত্ব (ভিন্ন ভিন্ন তিনটি) নেই।

'তমসঃ পরমুচ্যতে'—সেই পরমাত্মা অজ্ঞানের অতীত অর্থাৎ সর্বতোভাবে অসম্বন্ধ ও নির্লিপ্ত। ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও অহম্ এই তিনটিতে জ্ঞান ও অজ্ঞান দুটিই উঠানামা করে ; কিন্তু যিনি সকলের পরম প্রকাশক, সেই পরমাত্মাতে কখনো অজ্ঞানতা আসে না, আসতে পারে না এবং আসা সম্ভবও নয়। সূর্যে যেমন কখনো অন্ধকার আসতে পারে না, তেমনই সেই পরমাত্মায় কখনো অজ্ঞানতা আসে না। তাই তাঁকে অজ্ঞানের অতীত বলা হয়েছে।

'জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যম্'—পরমাত্মাতে কখনো অজ্ঞানতা আসে না। তিনি স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ এবং তাঁর থেকেই সমস্তই প্রকাশিত হয়। তাই পরমাত্মাকে **'জ্ঞান'** বা জ্ঞানস্বরূপ বলা হয়েছে।

ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদির সাহায্যেও বিষয়ের জ্ঞান হয়, কিন্তু তা অপরিহার্য নয়। কারণ এগুলি জানলেও জানার বাকি থাকে, সম্পূর্ণভাবে জানা হয় না। প্রকৃতপক্ষে একমাত্র পরমাত্মাই সত্যকার জানার যোগ্য—**'অবসি দেখিঅহিঁ দেখন জোগূ'**॥ (শ্রীরামচরিতমানস ১।২২৯।৩)। সেই পরমাত্মাকে জানলে আর কিছুই জানার বাকি থাকে না। পঞ্চদশ অধ্যায়ে ভগবান নিজের সম্বন্ধে বলেছেন যে, 'সমগ্র বেদের সাহায্যে জানার যোগ্য একমাত্র আমিই।' (১৫।১৫) ; 'আমাকে যে জানতে পারে, সে সর্ববিদ্ হয়ে থাকে' (১৫।১৯)। তাই পরমাত্মাকে **'জ্ঞেয়'** বলা হয়।

জ্ঞানের দ্বারা অসৎ ত্যাগ হলে পরমাত্মাকে তত্ত্বতঃ জানা সম্ভব। তাই সেই পরমাত্মাকে বলা হয়েছে 'জ্ঞানগম্য'।

'হৃদি সর্বস্য বিষ্ঠিতম্'—পরমাত্মা সর্বদাই সকলের হৃদয়ে নিত্য-নিরন্তর বিরাজ করেন। তাৎপর্য হল এই যে, যদিও এই পরমাত্মা সমস্ত দেশ, কাল, বস্তু,

---

[১] ক) বিষয় করন সুর জীব সমেতা। সকল এক তেঁ এক সচেতা॥
সব কর পরম প্রকাসক জোঈ। রাম অনাদি অবধপতি সোঈ॥ (শ্রীরামচরিতমানস ১।১১৭।৩)
খ) জো জ্যোতিয়োঁকা জ্যোতি হৈ, সবসে প্রথম জো ভাসতা। অব্যয় সনাতন দিব্য দীপক, সর্ব বিশ্ব প্রকাশতা॥

ব্যক্তি, ঘটনা, পরিস্থিতি, অবস্থা ইত্যাদিতে পরিপূর্ণভাবে বিরাজ করেন, তা সত্ত্বেও হৃদয়ই হল তাঁর উপলব্ধির স্থান।

পরমাত্মাকে নিজ হৃদয়ে অনুভব করার উপায় হল—

(১) মানুষ যে সকল বিষয়ে অবগত হয় তার সেই জানার মধ্যে সৎ ও অসৎ দুই-ই থাকে। এই দুটি ভাগ করার সময় সাধক অনুভব করে যে আমার জাগ্রত অবস্থা, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, বাল্যকাল, যৌবন, বৃদ্ধাবস্থা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের হলেও, মূলতঃ আমি একই আছি। সুখদায়ক-দুঃখদায়ক, অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতিগুলি আসে আবার চলে যায়, কিন্তু তার মধ্যে আমি সেই একই আছি। দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদির সংযোগ বা বিয়োগ হয়, আমি একইভাবে বিরাজ করি। তাৎপর্য হল এই যে, অবস্থা-পরিস্থিতি, সংযোগ-বিয়োগ বিভিন্ন প্রকারের হলেও সেগুলিতে যা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নয়, একভাবে বিরাজ করে, তাকে (অন্য সবকিছুর থেকে পৃথক্ করে) অনুভব করা উচিত। এরূপ করলে যিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন, তাঁকে অনুভব করা যায়। কারণ তিনি স্বয়ং পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্ন।

(২) যেমন অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ব্যক্তি অন্ন ছাড়া এবং অত্যন্ত পিপাসার্ত ব্যক্তি জল ছাড়া থাকতে পারে না, তেমনই সেই পরমাত্মা ব্যতিরেকে সবকিছু যেন অসহ্য হয়ে ওঠে ! একমাত্র তিনি ছাড়া ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ঘুম কিছুই যেন ভালো না লাগে। পরমাত্মা ছাড়া মন আর কোথাও যেন না টেকে। এইভাবে পরমাত্মাকে লাভ করার জন্য ব্যাকুল হলে নিজ হৃদয় মধ্যে সেই পরমাত্মা অনুভূত হন।

এইভাবে একবার যদি সাধকের হৃদয়ে পরমাত্মা অনুভূত হন, তাহলে সাধকের 'সর্বত্রই পরমাত্মা বিরাজমান'—এরূপ অনুভব হয়। এটিই হল প্রকৃত অনুভূতি।

পরিশিষ্ট-ভাব—দ্বাদশ থেকে সপ্তদশ শ্লোক পর্যন্ত যে জ্ঞেয়-তত্ত্বের বর্ণনা করা হয়েছে, তা ভগবানেরই সমগ্ররূপ (**'বাসুদেবঃ সর্বম্'**)। কারণ এতে নির্গুণ-নিরাকার (দ্বাদশ শ্লোক), সগুণ-নিরাকার (ত্রয়োদশ শ্লোক) এবং সগুণ-সাকার (ষোড়শ শ্লোক)—এই তিন রূপেরই বর্ণনা আছে।

'জ্ঞানগম্যম্'—পরমাত্মাকে তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যেই জানা যায়, ক্রিয়া, বস্তু ইত্যাদির দ্বারা নয়। তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত তাঁকে জানার অন্য কোনো সাধনা নেই। মানুষ কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ ইত্যাদি যে সাধনার দ্বারাই পরমাত্মাকে জানতে সক্ষম হোক না কেন তা আসলে জানবে তত্ত্বজ্ঞান দ্বারাই। শ্রদ্ধা-ভক্তি, বিশ্বাস, ভগবদ্কৃপা দ্বারা জানলেও, তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যেই জানা সম্ভব হয়। কেন-না 'জানা' জ্ঞানের দ্বারাই সম্ভব হয়ে থাকে।

এখানে **'জ্ঞানগম্যম্'** পদটির অর্থ হিসাবে সাধন সমুদায় থেকে প্রাপ্ত হওয়া কথাটিও ধরা যায়, এই অধ্যায়েরই সপ্তম থেকে একাদশ শ্লোক পর্যন্ত সেটি বর্ণিত আছে।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—প্রথম শ্লোক থেকে সপ্তদশ শ্লোক পর্যন্ত ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের যে বর্ণনা করা হয়েছে, পরবর্তী শ্লোকে ফলসহ তার উপসংহার করেছেন।

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥ ১৮ ॥

[**ইতি, ক্ষেত্রম্** (এইভাবে ক্ষেত্র) ; **তথা জ্ঞানম্, চ জ্ঞেয়ম্** (জ্ঞান এবং জ্ঞেয়) ; **সমাসতঃ, উক্তম্** (সংক্ষেপে কথিত হল) ; **মদ্ভক্তঃ** (আমার ভক্ত) ; **এতৎ** (এটি) ; **বিজ্ঞায়** (তত্ত্বতঃ জেনে) ; **মদ্ভাবায়** (আমার ভাব) ; **উপপদ্যতে** (প্রাপ্ত হন।)]

এইভাবে ক্ষেত্র, জ্ঞান এবং জ্ঞেয় সংক্ষেপে কথিত হল। আমার ভক্ত এটিকে তত্ত্বতঃ জেনে আমার ভাব প্রাপ্ত হন॥ ১৮ ॥

ব্যাখ্যা—**'ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চোক্তং সমাসতঃ'**—এই অধ্যায়ের পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শ্লোকে 'ক্ষেত্র' সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে ; সপ্তম থেকে একাদশ শ্লোক পর্যন্ত যে সাধন-সমুদায়ের বর্ণনা করা হয়েছে, তাকে 'জ্ঞান' বলা হয় এবং দ্বাদশ থেকে সপ্তদশ শ্লোক পর্যন্ত 'জ্ঞেয়'র সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এইভাবে ক্ষেত্র, জ্ঞান এবং জ্ঞেয়—সম্বন্ধে ক্রমান্বয়ে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে।

'মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে'—আমার ভক্তেরা ক্ষেত্র, সাধন-সমুদায়রূপ জ্ঞান এবং জ্ঞেয়-তত্ত্ব (পরমাত্মা) তত্ত্বতঃ জেনে আমার ভাব প্রাপ্ত হন।

ক্ষেত্রকে ঠিকমতো জানলে ক্ষেত্র হতে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। জ্ঞানকে অর্থাৎ সাধন-সমুদায় ঠিকমতো জানলে, আপন করে নিলে দেহাভিমান (অহং-কর্তত্ববোধ) দূর হয়। জ্ঞেয়-তত্ত্ব ঠিকমতো জানলে তাঁর প্রাপ্তিলাভ হয় অর্থাৎ পরমাত্মতত্ত্বের সঙ্গে অভিন্নতা অনুভূত হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব—এখানে **'মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায়'** পদটির অর্থ হল যে সমগ্র পরমাত্মার জ্ঞান ভক্তিদ্বারাই হওয়া সম্ভব[1]। সুতরাং সাধকের ভক্ত হওয়া উচিত।

এই শ্লোকে উদ্ধৃত **'মদ্ভাবায়োপদ্যতে'** পদটি গীতায় নানাভাবে বলা হয়েছে ; যেমন—**'মদ্ভাবমাগতাঃ'** (৪।১০), **'মম সাধর্ম্যমাগতাঃ'** (১৪।২), **'মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি'** (১৪।১৯)। **'মদ্ভাব'** কথাটির অর্থ হল—(আমি) পরমাত্মার সত্তা। সিদ্ধান্ত হল যে সত্তা বা অস্তিত্ব একটিই হয়, দুটি নয়। ভগবান গীতায় জ্ঞান এবং ভক্তি এই দুয়েতেই তাঁর ভাব প্রাপ্তির কথা বলেছেন। 'জ্ঞানে'-এর তাৎপর্য হল—ব্রহ্মের সঙ্গে সাধর্ম্য হওয়া অর্থাৎ ব্রহ্ম যেমন সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ, তেমনই জ্ঞানী মহাপুরুষেরও সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ হওয়া। 'ভক্তি-তে' এর তাৎপর্য হল—ভক্তের ভগবানের সঙ্গে আত্মীয়তা অর্থাৎ অভিন্ন হওয়া।

***

সম্বন্ধ—এই অধ্যায়ের প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্লোকে যে ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হয়েছে তারই বিস্তারিত বর্ণনার জন্য পরবর্তী প্রকরণের অবতারণা করেছেন।

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্॥ ১৯ ॥
কার্যকরণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥ ২০ ॥

[**প্রকৃতিম্, চ, পুরুষম্** (প্রকৃতি ও পুরুষ) ; **উভৌ, এব** (উভয়কেই) ; **অনাদী, বিদ্ধি** (অনাদি বলে জেনো) ; **চ, বিকারান্** (এবং বিকারাদি) ; **চ, গুণান্ অপি** (ও গুণসমূহকেও) ; **প্রকৃতিসম্ভবান্, এব, বিদ্ধি** (প্রকৃতি থেকেই উৎপন্ন বলে জানবে) ; **কার্যকরণ কর্তৃত্বে** (কার্য এবং করণের দ্বারা সংঘটিত ক্রিয়াগুলির জন্য) ; **প্রকৃতিঃ** (প্রকৃতিকেই) ; **হেতুঃ উচ্যতে** (হেতু বলা হয়) ; **সুখ-দুঃখানাম্** (সুখ-দুঃখের) ; **ভোক্তৃত্বে** (ভোগের বিষয়ে) ; **পুরুষঃ, হেতুঃ, উচ্যতে** (পুরুষকেই হেতু বলা হয়েছে।)]

প্রকৃতি ও পুরুষ—উভয়কেই তুমি অনাদি বলে জেনো এবং বিকারাদি ও গুণসমূহকেও প্রকৃতি থেকেই উৎপন্ন বলে জানবে। কার্য এবং করণের দ্বারা সংঘটিত ক্রিয়াগুলির উৎপত্তিতে প্রকৃতিকেই হেতু বলা হয় এবং সুখ-দুঃখের ভোগের বিষয়ে পুরুষকেই হেতু বলা হয়েছে॥ ১৯-২০ ॥

[1]প্রেম ভগতি জল বিনু রঘুরাঈ। অভিঅন্তর মল কবহুঁ ন জাঈ॥ (রামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ৪৯।৩)

ব্যাখ্যা—[এই অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে ভগবান ক্ষেত্রের বিষয়ে **'যচ্চ'** (যা), **'যাদৃক্ চ'** (যেরূপ), **'যদ্বিকারি'** (যেরূপ বিকারসম্পন্ন) এবং **'যতশ্চ যৎ'** (যার থেকে যা উৎপন্ন হয়েছে)—এই চারটি বিষয় শোনার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তার মধ্যে **'যচ্চ'**-এর বর্ণনা পঞ্চম শ্লোকে এবং **'যদ্বিকারি'**র বর্ণনা ষষ্ঠ শ্লোকে করেছেন। **'যাদৃক চ'**-এর বর্ণনা এই অধ্যায়ের ছাব্বিশ ও সাতাশতম শ্লোকে করা হয়েছে। এখন **'যতশ্চ যৎ'**-এর বর্ণনা করতে গিয়ে প্রকৃতি থেকে বিকারাদি ও গুণসমূহ উৎপন্ন হওয়ার কথা জানাচ্ছেন। উল্লেখনীয় যে, বিকারগুলির বর্ণনা আগে ষষ্ঠ শ্লোকে **'ইচ্ছা দ্বেষঃ'** ইত্যাদি পদে করা হয়েছে। এখানে গুণ যে প্রকৃতি হতে উৎপন্ন হয়—এই কথা নতুন করে বলা হয়েছে।

দ্বাদশ থেকে অষ্টাদশ শ্লোক পর্যন্ত 'জ্ঞেয় তত্ত্ব'—(পরমাত্মার) বর্ণনা আছে আর এই উনিশ থেকে চৌত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত 'পুরুষ'-এর (ক্ষেত্রজ্ঞ) বর্ণনা আছে। ওইস্থানে সবই জ্ঞেয় তত্ত্বেরই অন্তর্গত আর এইস্থানে সমস্তই পুরুষের অন্তর্গত অর্থাৎ ওইস্থানে পুরুষ জ্ঞেয়-তত্ত্বের অন্তর্গত আর এইস্থানে জ্ঞেয়-তত্ত্ব পুরুষের অন্তর্গত। তাৎপর্য হল এই যে জ্ঞেয়-তত্ত্ব (পরমাত্মা) এবং পুরুষ (ক্ষেত্রজ্ঞ)—উভয়ে তত্ত্বতঃ দুই নয়, বরং একই।]

'প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি'—এখানে **'প্রকৃতিম্'** পদটি সম্পূর্ণ ক্ষেত্রের (জগৎ-এর) কারণরূপ মূল প্রকৃতির বাচক। সাতটি প্রকৃতি-বিকৃতি (পঞ্চমহাভূত, অহংকার এবং মহত্তত্ত্ব) এবং ষোলটি বিকৃতি (দশ ইন্দ্রিয়, মন এবং পাঁচটি বিষয়)—এগুলি সবই প্রকৃতির কার্য এবং প্রকৃতি এই সবের মূল কারণ।

'পুরুষম্' পদটি এইস্থানে ক্ষেত্রজ্ঞের বাচক, যাকে এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে ক্ষেত্রের জ্ঞাতা বলা হয়েছে।

প্রকৃতি এবং পুরুষ—উভয়কেই অনাদি বলার অর্থ হল যে পরমাত্মার অংশ হিসাবে যেমন এই পুরুষ (জীবাত্মা) অনাদি, তেমনই এই প্রকৃতিও অনাদি। উভয়ের এই অনাদিত্বে কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু উভয়ের স্বরূপে পার্থক্য আছে, যেমন—প্রকৃতি গুণাদিসম্পন্ন আর পুরুষ সর্বভাবে গুণাদিরহিত । প্রকৃতিতে বিকার হয়, পুরুষ বিকাররহিত । প্রকৃতি জগতের কারণ হয়ে ওঠে, পুরুষ কারোরই কারণ নয়। প্রকৃতিতে কার্য এবং কারণ ভাব থাকে আর পুরুষ কার্য, কারণ ভাবরহিত।

'উভৌ এব' বলার তাৎপর্য হল যে প্রকৃতি এবং পুরুষ—উভয়ই ভিন্ন ভিন্ন। অতএব প্রকৃতি এবং পুরুষ যেমন অনাদি, তেমনই উভয়ের এই পার্থক্যও অনাদি।

এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে উদ্ধৃত **'ইদং শরীরং ক্ষেত্রম্'** পদের দ্বারা মনুষ্যদেহের প্রতিই ইঙ্গিত বোঝায় অর্থাৎ ব্যষ্টি মনুষ্যদেহেরই বোধ হয় এবং **'ক্ষেত্রজ্ঞঃ'** পদের দ্বারা মনুষ্যদেহ সম্পর্কে যিনি জানেন সেই ব্যষ্টি ক্ষেত্রজ্ঞের বোধ হয়। তাই প্রকৃতি এবং তার কার্য সম্বন্ধে বোধ করাবার জন্যই এখানে **'প্রকৃতিম্'** পদের এবং ক্ষেত্রজ্ঞের বোধ করাবার জন্য এখানে **'পুরুষম্'** পদের প্রয়োগ করা হয়েছে।

এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে ক্ষেত্রজ্ঞের পরমাত্মার সঙ্গে ঐক্য জানার **'বিদ্ধি'** পদটির প্রয়োগ করেছেন এবং এখানে পুরুষের প্রকৃতি থেকে পার্থক্য জানার জন্য **'বিদ্ধি'** পদটির প্রয়োগ করা হয়েছে। তাৎপর্য হল এই যে মানুষ স্বয়ংকে এবং শরীরকে এক বলে মনে করে, তাই ভগবান এখানে 'বিদ্ধি' পদটির দ্বারা অর্জুনকে এই নির্দেশ দিয়ে জানিয়েছেন যে এই দুটি যে সর্বতোভাবে পৃথক্—তা তুমি ঠিকভাবে বুঝে নাও।

'বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্'—ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত, চেতনা এবং ধৃতি—এই সাতটি বিকারকে এবং সত্ত্বঃ, রজঃ, তম—এই তিনটি গুণ প্রকৃতি হতে উৎপন্ন বলে জেনো। এর তাৎপর্য হল যে পুরুষের মধ্যে বিকার এবং গুণ নেই।

সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান জানিয়েছেন যে গুণসমূহ তাঁর থেকে উৎপন্ন হয় (৭।১২) এবং এখানে বলেছেন গুণসমূহ প্রকৃতি হতে জাত। এর তাৎপর্য হল যে পূর্ববর্তী স্থানে ভক্তির প্রকরণ হওয়ায় ভগবান গুণগুলি তাঁর থেকে উৎপন্ন বলে জানিয়েছেন এবং গুণময়ী মায়া অতিক্রম করার জন্য তাঁর শরণাগত হতে বলেছেন। কিন্তু এখানে জ্ঞানের প্রকরণ হওয়ায় গুণগুলি প্রকৃতি হতে উৎপন্ন বলে জানিয়েছেন। অতএব সাধক গুণের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক না মেনেই গুণগুলি হতে মুক্তি পেতে পারেন।

'কার্যকরণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে'—আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, মাটি এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—এই দশটি (মহাভূত এবং বিষয়ের) নাম 'কার্য'।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, বাক্য, হস্ত, পদ, উপস্থ ও গুহ্য এবং মন, বুদ্ধি, অহংকার—এই ত্রয়োদশটির (বাহ্যকরণ ও অন্তঃকরণের) নাম হল 'করণ'। এই সবগুলির দ্বারা যে ক্রিয়া সাধিত হয়, প্রকৃতিই হল তার উৎপত্তির কারণ বা হেতু।

যা উৎপন্ন হয় তাকে বলা হয় কার্য আর যার দ্বারা কার্যসিদ্ধ হয় তাকে বলা হয় 'করণ' অর্থাৎ ক্রিয়া করার যতপ্রকার হাতিয়ার বা সাধন আছে, সেগুলিকে 'করণ' বলা হয়। করণ তিন প্রকারের (১) কর্মেন্দ্রিয়, (২) জ্ঞানেন্দ্রিয়, (৩) মন, বুদ্ধি এবং অহংকার। কর্মেন্দ্রিয়গুলি হল স্থূল, জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি সূক্ষ্ম আর মন, বুদ্ধি, অহংকার হল অতীব সূক্ষ্ম। কর্মেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে 'বহিঃকরণ' বলা হয় আর মন, বুদ্ধি ও অহংকারকে বলা হয় 'অন্তঃকরণ'। যার সাহায্যে ক্রিয়াগুলি সংঘটিত হয়, সেগুলিকে বলা হয় কর্মেন্দ্রিয় আর কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ওপর যারা শাসন করে, তারা হল মন, বুদ্ধি এবং অহংকার। তাৎপর্য হল এই যে কর্মেন্দ্রিয়ের ওপর জ্ঞানেন্দ্রিয়ের শাসন থাকে, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ওপর থাকে মনের শাসন, মনের ওপর বুদ্ধির শাসন এবং বুদ্ধির ওপর অহংকার শাসন করে। মন, বুদ্ধি ও অহংকার ব্যতীত কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় কাজ করে না। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সঙ্গে যখন মন সম্পর্ক করে তখন তার বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান হয়। মনের দ্বারা যে বিষয়ের জ্ঞান হয়, তার মধ্যে কোন্‌টি গ্রাহ্য, কোন্‌টি ত্যাজ্য, কোন্‌টি ঠিক আর কোন্‌টিই বা বেঠিক, বুদ্ধি তা নির্ণয় করে। বুদ্ধির দ্বারা নির্ণীত বিষয়গুলিকে অহংকার শাসন করে।

অহংকার দু'প্রকারের—(১) অহংবৃত্তি এবং (২) অহংকর্তা। অহংবৃত্তি কখনোই কারও পক্ষে দোষের নয়, কিন্তু স্বয়ং যখন অহংবৃত্তির সঙ্গে নিজের সম্পর্ক স্থাপন করে, তাদাত্ম্য করে তখন সে অহংকর্তা হয়ে ওঠে। তাৎপর্য হল এই যে, এই অহংবৃত্তিতে মোহগ্রস্ত হয়ে, বশীভূত হয়ে স্বয়ং তাতেই তার স্থিতি মেনে নেয় এবং কর্তা হয়ে ওঠে—**'অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে'** (গীতা ৩।২৭)।

প্রকৃতির কার্য বুদ্ধি (মহত্তত্ত্ব) আর বুদ্ধির কার্য হল অহংবৃত্তি (অহংকার)। এই অহংবৃত্তি বুদ্ধির কার্য হলেও এটি বুদ্ধির সঙ্গে তাদাত্ম্য করে স্বয়ং বুদ্ধির মালিক হয়ে ওঠে অর্থাৎ কর্তা ও ভোক্তা হয়ে যায়—**'পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্‌গুণান্'** (গীতা ১৩।২১)। কিন্তু তত্ত্ববোধ হলে তখন আর স্বয়ং কর্তাও হয় না, ভোক্তাও হয় না—**'শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে'** (গীতা ১৩।৩১)। তারপর কর্তৃত্ব- ভোক্তৃত্বরহিত সেই ব্যক্তির শরীর দ্বারা যেসব ক্রিয়াদি সংঘটিত হয়, তা সব অহংবৃত্তির দ্বারাই হয়। এই অহং বৃত্তির সাহায্যে হওয়া ক্রিয়াগুলিকে গীতায় নানাপ্রকারে বলা হয়েছে; যেমন— সব কর্মই প্রকৃতির দ্বারা সংঘটিত হয় (১৩।২৯)। প্রকৃতির গুণাদির সাহায্যেই সমস্ত ক্রিয়া সংঘটিত হয় (৩।২৭); গুণই গুণাদিতে আবর্তিত হয় (৩।২৮) ; গুণাদি ব্যতীত অন্য আর কেউ কর্তা নয় (১৪।১৯) ; ইন্দ্রিয়াদি নিজেই বিষয়গুলিতে প্রবৃত্ত হচ্ছে (৫।৯) ইত্যাদি। তাৎপর্য হল এই যে বাহ্যকরণ ও অন্তঃকরণের সাহায্যে যে সমস্ত ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তা সবই প্রকৃতির দ্বারা হয়।

'পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে'— অনুকূল পরিস্থিতি এলে সুখী (প্রসন্ন) হওয়া—এটি হল সুখভোগ, আর প্রতিকূল পরিস্থিতি এলে দুঃখবোধ (অপ্রসন্ন) হওয়া—এটি হল দুঃখভোগ। এই সুখ-দুঃখের ভোগ পুরুষেই (চেতনে) হয়, প্রকৃতিতে (জড়ে) নয়। কারণ জড় প্রকৃতির সুখী বা দুঃখী হওয়ার সামর্থ্য নেই। তাই সুখ বা দুঃখের ভোক্তারূপে পুরুষকেই হেতু বলা হয়েছে। যদি পুরুষ অনুকূল বা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে প্রসন্ন বা অপ্রসন্ন না হয় তাহলে সে সুখ বা দুঃখের ভোক্তা হতে পারে না।

সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্থ-পঞ্চম শ্লোকে ভগবান অপরা (জড়) এবং পরা (চেতন) নামে তাঁর দুই প্রকৃতির বর্ণনা করেছেন। এই উভয় প্রকৃতিই ভগবানের স্বভাব, তাই দুটি স্বতঃই তাঁর অভিমুখে ধাবিত হয়। কিন্তু পরাপ্রকৃতি (চেতন) —যা পরমাত্মার অংশ এবং যার স্বাভাবিক রুচিই থাকে পরমাত্মার দিকেই যাবার, সে তাৎক্ষণিক সুখভোগে আকর্ষিত হয়ে অপরা প্রকৃতির (জড়ে) সঙ্গে তাদাত্ম্য করে বসে। শুধু তাই নয়, প্রকৃতির সঙ্গে তাদাত্ম্য করে সে 'প্রকৃতিস্থ পুরুষ' রূপে নিজের এক স্বতন্ত্র সত্তা সৃষ্টি করে (গীতা ১৩।২১), যাকে বলা হয় 'অহং'। এই 'অহং'-এ জড় ও চেতন উভয়ই থাকে। সুখ-দুঃখরূপ বিকারগুলি জড়-অংশে হয় কিন্তু জড়ের সঙ্গে তাদাত্ম্য হওয়ায় তার

পরিণাম জ্ঞাতা চেতনের ওপর হয় অর্থাৎ জড়ের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় সুখ-দুঃখরূপ বিকারগুলি চেতন নিজের মধ্যে মেনে নেয় যে, 'আমি সুখী' বা 'আমি দুঃখী'। যেমন দোকানে লোকসান হলে দোকানদার বলে যে 'আমার লোকসান হচ্ছে', দেহের তাপ বৃদ্ধি হলে মনে করে 'আমার জ্বর হয়েছে'। স্বয়ং-এর জ্বর হয় না[১]। যদি হত তাহলে কখনো দূর হত না।

সুখ-দুঃখের প্রভাব পড়ে চেতনের ওপর, তাই সে সুখ-দুঃখ থেকে মুক্তি চায়। সে যদি সুখ বা দুঃখ না পেত, তাহলে তার মুক্তিলাভের ইচ্ছাও হত না। মুক্তিলাভের ইচ্ছা জড়ের সম্বন্ধের জন্যই হয়। কারণ জড়কে স্বীকার করে নিলেই বন্ধন হয়। যে নিজেকে সুখী বা দুঃখী বলে মনে করে, সে-ই এইগুলি থেকে মুক্তি পেতে চায় এবং সে-ই মুক্তিলাভ করে। তাৎপর্য হল এই যে তাদাত্ম্যে মুক্তির (কল্যাণের) আকাঙ্ক্ষাতে চেতনের প্রাধান্য থাকে এবং ভোগের আকাঙ্ক্ষায় জড়ের প্রাধান্য থাকে, সেইজন্য অন্তিমে চেতনই কল্যাণের অধিকারী হয়, জড় নয়।

সব বিকৃতি জড়েই হয়, চেতনে নয়। সুতরাং আসলে সুখী বা দুঃখী 'হওয়া' চেতনের ধর্ম নয় প্রত্যুত জড়ের সংস্পর্শে নিজেকে সুখী বা দুঃখী 'মেনে নেওয়া'—এটি জ্ঞাতা চেতনের স্বভাব। তাৎপর্য হল এই যে, চেতন কখনো সুখী বা দুঃখী হয় না, বরং সে (সুখাকার বা দুঃখাকার বৃত্তিতে যুক্ত হয়ে) নিজেকে সুখী বা দুঃখী বলে মনে করে। চেতনে পরস্পরবিরুদ্ধ সুখ-দুঃখরূপ দুটি ভাব কী করে হতে পারে ? দুটি রূপ পরিবর্তনশীল প্রকৃতিরই হতে পারে। যা পরিবর্তনশীল নয়, তার কখনো দুটি রূপ হতে পারে না। তাৎপর্য হল এই যে, সকলপ্রকার বিকারই পরিবর্তনশীল পদার্থে হয়ে থাকে। চেতন স্বয়ং একইভাবে থাকলেও পরিবর্তনশীল প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ করে প্রকৃতির বিকারগুলি নিজেতে আরোপিত করে থাকে। সকলেই এটি অনুভব করে যে সুখে এবং দুঃখে সে স্বয়ং একই থাকে অর্থাৎ সুখে সে একজন এবং দুঃখে সে ভিন্ন আর-একজন তা নয়। সুখ ও দুঃখ দুটি পৃথক্ পৃথক্ হলেও আমরা একই থাকি ; তাই কখনো সুখী হই আবার কখনো দুঃখী।

পরিশিষ্ট-ভাব—ভগবান ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের বিভাগকেই প্রকৃতি ও পুরুষ নামের দ্বারা পুণরায় বর্ণনা করেছেন। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ হল ব্যষ্টি এবং প্রকৃতি-পুরুষ হল সমষ্টি।

প্রকৃতির একটি ভাগ আর পুরুষের অন্য একটি ভাগ। শরীর ও জগৎ-সংসার হল প্রকৃতি-বিভাগে আর আত্মা ও পরমাত্মা হল পুরুষ-বিভাগে। পুরুষ ও প্রকৃতি যেমন অনাদি, তেমনই এই দুইয়ের ভেদ-জ্ঞান অর্থাৎ বিবেকও অনাদি। সুতরাং বিবেক-দৃষ্টিতে দেখলে এই দুই বিভাগ পরস্পর থেকে অসম্বদ্ধরূপে থাকে অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে বিন্দুমাত্র কোনো সম্বন্ধ নেই। প্রকৃতি অসৎ, জড় এবং দুঃখস্বরূপ এবং পুরুষ সৎ, চিৎ এবং আনন্দস্বরূপ। প্রকৃতি বিনাশশীল, বিকারী এবং ক্রিয়াশীল আর পুরুষ অবিনাশী, নির্বিকার এবং অক্রিয়। প্রকৃতির নিত্য নিবৃত্তি হয় আর পুরুষের হয় নিত্যপ্রাপ্তি। গীতার প্রারম্ভেও ভগবান এই বিভাগটি শরীর ও শরীরী, দেহ ও দেহী, সৎ ও অসৎ ইত্যাদি নামে বর্ণনা করেছেন[২]। তাই প্রত্যেক সাধকেরই উচিত এই বিভাগটি ঠিকমতো বোঝা। এটি শীঘ্রই তত্ত্বপ্রাপ্তিতে সাহায্য করে। কারণ শরীর এবং শরীরীকে এক বলে মনে করাই বন্ধন আর এই দুটিকে একেবারে পৃথক্ বলে অনুভব করাই হল মুক্তি।

ভগবান হলেন শক্তিমান আর প্রকৃতি হল তাঁর শক্তি[৩]। জ্ঞানের দৃষ্টিতে শক্তি এবং শক্তিমান উভয়েই পৃথক্ পৃথক্, কারণ শক্তিতে পরিবর্তন (বৃদ্ধি ও ঘাটতি) হয়, কিন্তু শক্তিমান একইপ্রকার থাকেন। কিন্তু ভক্তির দৃষ্টিতে শক্তি ও শক্তিমান— দুই-ই অভিন্ন ; কারণ শক্তিকে শক্তিমানের থেকে পৃথক্ করা যায় না অর্থাৎ শক্তিমান ব্যতীত শক্তির পৃথক্ কোনো অস্তিত্ব নেই। জ্ঞান এবং ভক্তি—উভয়ের কথা রাখতেই ভগবান প্রকৃতিকে অনন্ত বা সান্ত না বলে 'অনাদি'

---

[১]আত্মানং চেদ্ বিজানীয়াদয়মস্মীতি পূরুষঃ। কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসংজ্বরেৎ।। (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৪।৪।১২)
'পুরুষ যদি আত্মাকে' 'আমিই এই' বলে বিশেষভাবে জানতে পারে, তাহলে তার কিসেরই বা ইচ্ছা হবে এবং কেনই বা সে কামনার তাপে অনুতপ্ত হবে ?

[২]পুরুষই অহংকে স্বীকার করায় জীব, ক্ষেত্রজ্ঞ, শরীরী, দেহী ইত্যাদি নামে কথিত হয়েছে।

[৩]'মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্ মায়িনং তু মহেশ্বরম্' (শ্বেতাশ্বতর. ৪।১০)

বলেছেন। কারণ প্রকৃতিকে অনন্ত (নিত্য) বললে জ্ঞানের খণ্ডন হয় ; কেন-না জ্ঞানের দৃষ্টিতে প্রকৃতির কোনো অস্তিত্বই নেই—**'নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ'** (গীতা ২।১৬)। প্রকৃতিকে যদি সান্ত অনিত্য বলা হয় তাহলে ভক্তির খণ্ডন হয় ; কারণ ভক্তির দৃষ্টিতে প্রকৃতি ভগবানের শক্তি হওয়ায় ভগবানের অভিন্ন—**'সদসচ্চাহম্'** (গীতা ৯।১৯)। বাস্তব দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যায় যে প্রকৃতি ও পুরুষের স্বভাব পৃথক্ পৃথক্ হওয়া সত্ত্বেও উভয়ে পরস্পরের অভিন্নই।

প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মার স্বরূপ 'সমগ্র'। পরমাত্মাতে কোনো শক্তি নেই—তা সম্ভব নয়। যদি মেনে নেওয়া যায় যে পরমাত্মা সর্বতোভাবে শক্তিরহিত, তাহলে তাঁর পরিচ্ছিন্নতা প্রমাণিত হয়। তাঁর শক্তির পরিবর্তন বা অদর্শন হওয়া সম্ভব হলেও শক্তির অভাব হতে পারে না। কারণরূপে শক্তি তাঁর মধ্যে বিরাজমান থাকেই, তা নাহলে শক্তির (প্রকৃতির) থাকার স্থান কোথায় ? তাই এখানে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই 'অনাদি' বলা হয়েছে।

*** *** ***

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে ভগবান পুরুষকে সুখ-দুঃখ ভোগে হেতু বলে জানিয়েছেন। তাতে প্রশ্ন আসতে পারে যে কোন্ পুরুষ সুখ-দুঃখের ভোক্তা হয় ? পরবর্তী শ্লোকে ভগবান তার উত্তর দিচ্ছেন।

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু॥ ২১ ॥

[**প্রকৃতিস্থঃ** (প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত) ; **পুরুষঃ, হি** (পুরুষই) ; **প্রকৃতিজান্** (প্রকৃতিজনিত) ; **গুণান্, ভুঙ্‌ক্তে** (গুণাদির ভোক্তা হন) ; **গুণসঙ্গঃ, অস্য** (গুণসমূহের সংসর্গই তাঁর) ; **সদসদ্‌যোনিজন্মসু** (উচ্চ-নীচ সৎ বা অসৎ যোনিতে জন্মগ্রহণ করার) ; **কারণম্** (কারণ হয়ে থাকে।)]

প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত পুরুষই প্রকৃতিজনিত গুণসমূহের ভোক্তা হয়ে থাকেন এবং গুণসমূহের সংসর্গই তাঁর উচ্চ-নীচ (সৎ বা অসৎ) যোনিতে জন্মগ্রহণ করার কারণ হয়ে থাকে ॥ ২১ ॥

ব্যাখ্যা—**'পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো[১] হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্'**—প্রকৃতপক্ষে পুরুষ প্রকৃতিতে (শরীরে) অবস্থিত নয়। কিন্তু পুরুষ যখন প্রকৃতির (শরীরের) সঙ্গে তাদাত্ম্য করে শরীরকে 'আমি' ও 'আমার' বলে মেনে নেয় তখন তাকে প্রকৃতিতে অবস্থিত বলা হয়। এরূপ প্রকৃতিস্থ পুরুষই (গুণসমূহের দ্বারা সৃষ্ট অনুকূল প্রতিকূল পরিস্থিতিগুলি সুখদায়ক বা দুঃখদায়ক মনে করে) অনুকূল পরিস্থিতিতে সুখী এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দুঃখী হয়ে থাকে। এটিই হল পুরুষের প্রকৃতিজনিত গুণসমূহের ভোক্তা হওয়া।

যেমন, মোটর দুর্ঘটনাতে মোটরগাড়ি এবং চালক উভয়ই জড়িত থাকে। ক্রিয়াটি হওয়ায় মোটর গাড়ির প্রাধান্য থাকলেও দুর্ঘটনার ফল (শাস্তি) মোটরটির সঙ্গে সম্পর্কিত গাড়ির চালক (কর্তা)কেই ভোগ করতে হয়। তেমনই জাগতিক কার্যাদি করাতে প্রকৃতি এবং পুরুষ— উভয়েরই হাত থাকে। ক্রিয়াগুলি হওয়ায় শরীরের প্রাধান্য থাকলেও সুখ-দুঃখরূপ ফল শরীরের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক স্থাপনকারী পুরুষকেই ভোগ করতে হয়। যদি সে শরীরের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক স্থাপন না করে এবং সমস্ত ক্রিয়াই প্রকৃতির দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে বলে মনে করে (গীতা ১৩।২১), তাহলে সে আর সেই ক্রিয়ার ফল ভোগকারী হয় না।

'কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু'—যে যোনিতে সুখের বাহুল্য থাকে, তাকে বলা হয় 'সৎ যোনি' আর যে যোনিতে দুঃখের বাহুল্য থাকে, তাকে বলা হয় 'অসৎ-যোনি'। গুণাদির সংস্পর্শেই পুরুষ সৎ বা অসৎ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—প্রকৃতিতে এই তিনটি গুণ উৎপন্ন হয়। এই তিনটি গুণ থেকেই সমস্ত পদার্থ এবং ক্রিয়া

[১]এখানে পুরুষকে 'প্রকৃতিস্থ' বলার তাৎপর্য হল 'শরীরস্থ' বলা। উনবিংশতিতম শ্লোক থেকে প্রকৃতি-পুরুষের প্রকরণ আরম্ভ হয়েছে। সেইজন্য এখানে পুরুষকে প্রকৃতিস্থ বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে পুরুষ প্রকৃতিস্থ বা শরীরস্থ হয় না। নিজেকে 'স্বস্থ' না মানলে অর্থাৎ 'স্ব'-তে নিজের স্থিতি অনুভব না করলে সে নিজেকে শরীরস্থ বলে ধারণ করে।

উৎপন্ন হয়। প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত পুরুষ যখন এই গুণ-সমূহের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নেয় তখনই তার উচ্চ নীচ (সৎ বা অসৎ) যোনিতে জন্মগ্রহণ করার কারণ তৈরি হয়।

প্রকৃতিতে অবস্থিত হওয়াতেই পুরুষ প্রকৃতিজনিত গুণাদির ভোক্তা হয় এবং এই গুণসমূহের সংস্পর্শ, আসক্তিই মানুষের উচ্চ-নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করার কারণ হয়। যদি সে প্রকৃতিতে অবস্থান না করে, প্রকৃতির (শরীরের) ওপর অহং ও মমত্ববোধ না রাখে, নিজ স্বরূপে অবস্থান করে, তাহলে পুরুষ কখনো সুখ-দুঃখের ভোক্তা হয় না, বরং সুখ-দুঃখে সম হয়ে যায়, স্ব-তে স্থিত হয়ে যায় (গীতা ১৪।২৪)। তাই সে প্রকৃতিতেও অবস্থান করতে পারে বা নিজস্বরূপেও অবস্থান করতে পারে, পার্থক্য শুধু এই যে, প্রকৃতিতে অবস্থান করা হল পরাধীনতা আর স্বরূপে স্থিত হওয়া হল স্বাভাবিক স্বাধীনতা। বন্ধনই হচ্ছে এর অস্বাভাবিকত্ব আর মুক্ত থাকাই হল তার স্বাভাবিক অবস্থা। তাই বন্ধন তার সহ্য হয় না, সে মুক্ত হতে চায়।

যেখানে প্রকৃতি এবং পুরুষ—দুইয়ের ভেদ (বিবেক) থাকে, সেখানেই প্রকৃতির সঙ্গে তাদাত্ম্য বা সম্বন্ধ পাতানোর অজ্ঞানতাও থাকে। এই অজ্ঞানতাবশতঃই সেই পুরুষ স্বয়ং প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা করে বসে। একাত্ম হওয়ায় সেই পুরুষ নিজেকে প্রকৃতিস্থ অর্থাৎ প্রকৃতিতে (শরীরে) অবস্থিত বলে মনে করে। প্রকৃতিতে অবস্থান করায় অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ হওয়ায় শরীরের সঙ্গে 'আমি' ও 'আমার' ভাব স্থাপিত হয়। এই হল গুণাদির সঙ্গ, এতেই মানুষ আবদ্ধ হয় (গীতা ১৪।৫)। গুণাদির দ্বারা আবদ্ধ হওয়ার জন্যই মানুষের গুণ অনুসারে গতি হয়ে থাকে (গীতা ১৪।১৮)।

পরিশিষ্ট-ভাব—ভগবান উনিশ সংখ্যক শ্লোকের উত্তরার্ধে এবং বিশ সংখ্যক শ্লোকের পূর্বার্ধে 'প্রকৃতি'র বর্ণনা করেছেন এবং বিশতম শ্লোকের উত্তরার্ধে এবং এখানে একুশতম শ্লোকে 'পুরুষে'র বর্ণনা করেছেন।

বস্তু, ব্যক্তি এবং ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ককেই বলা হয় 'গুণসঙ্গ', এটিই হল জন্ম-মৃত্যুর কারণ। গুণাদির সঙ্গ হল অনিত্য আর গুণাদির সঙ্গে অসঙ্গতা হল নিত্য। অসঙ্গতাই হল আমাদের স্বরূপ—**'অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ'** (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৪।৩।১৫)। আমরা যদি অনিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন না করি, তাহলে জন্ম-মৃত্যু হওয়া সম্ভবই হয় না।

'আমি আছি'—এতে 'আমি' হল জড় (প্রকৃতি) এবং 'আছি' হল চেতন (পুরুষ) এবং 'আমি আছি' এটি হল জড়-চেতনের তাদাত্ম্য। এই 'আমি'তেই কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের ভাব থাকে। 'আমি' না থাকলে 'আছি'ও থাকে না, তখন শুধু 'আছে' থাকে। যেমন লোহা ও অগ্নির মধ্যে তাদাত্ম্য না থাকায় লোহা থেকে যায় এবং অগ্নি নিরাকার তত্ত্বে লীন হয়ে যায়। তেমনই 'অহং' প্রকৃতিতে থেকে যায় আর 'আছি' ('আছে'র স্বরূপ হওয়ায়) 'আছে'তেই বিলীন হয়ে যায়। 'আছে'তে কর্তৃত্ব বা ভোক্তৃত্ব বোধ থাকে না। তাৎপর্য হল যে ভোগাদিতে 'আছি'ই আকর্ষণ করে, 'আছে' নয়। 'আছি'ই কর্তা ও ভোক্তা হয়, 'আছে' হয় না। সুতরাং সাধকের 'আছি'কে না মেনে 'আছে'কেই স্বীকার করা উচিত অর্থাৎ অনুভব করা উচিত।

সুখ ও দুঃখের যাওয়া-আসাকে এবং স্ব-স্বরূপের অস্তিত্বকে সকলেই অনুভব করে থাকে। অত্যন্ত পাপীয়সী ব্যক্তিও তা অনুভব করে থাকে। তা সত্ত্বেও মানুষ এই আগন্তুক সুখ দুঃখকে মেনে নিয়ে সুখী ও দুঃখী হয়। এর কারণ হল সুখের আসক্তি ও দুঃখের ভয় থাকায় 'আমি এবং সুখ-দুঃখ পৃথক্ পৃথক্'—এই বিবেক কাজ করে না। স্ব-স্বরূপ প্রকৃতপক্ষে সুখী বা দুঃখী হয় না, শরীরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে সে নিজেকে সুখী বা দুঃখী বলে মনে করে। অর্থাৎ সুখ-দুঃখকে শুধুমাত্র অবিবেকপূর্বক মানা হয় বলেই বজায় থাকে।

***

সম্বন্ধ—উনিশ, কুড়ি এবং একুশতম শ্লোকে প্রকৃতি ও পুরুষের বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী শ্লোকে পুরুষের বিশেষত্ব নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥ ২২ ॥

[**উপদ্রষ্টা** (এই পুরুষ দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় 'উপদ্রষ্টা') ; **অনুমন্তা** (তার সঙ্গে মিলিত হয়ে সম্মতি ও অনুমতি প্রদান করায় 'অনুমন্তা') ; **ভর্তা** (নিজেকে তার ভরণপোষণকারী মনে করায় 'ভর্তা') ; **ভোক্তা** (তার সাহচর্যে সুখ-দুঃখ ভোগ করায় 'ভোক্তা') ; **চ, মহেশ্বরঃ** (এবং নিজেকে তার প্রভু মনে করায় 'মহেশ্বর' হয়ে যান) ; **চ, পুরুষঃ, পরমাত্মা** (কিন্তু স্বরূপতঃ এঁকে পরমাত্মা) ; **ইতি, উক্তঃ** (নামে বলা হয়) ; **অস্মিন্, দেহে, অপি, পরঃ** (ইনি এই দেহে অবস্থান করেও দেহের সহিত সম্বন্ধরহিত হন।)]

এই পুরুষ দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় 'উপদ্রষ্টা', তার সঙ্গে মিলিত হয়ে সম্মতি, অনুমতি প্রদান করায় 'অনুমন্তা', নিজেকে তার ভরণপোষণকারী বলে মনে করায় 'ভর্তা', তার সাহচর্যে সুখ-দুঃখ ভোগ করায় 'ভোক্তা' এবং নিজেকে তার প্রভু বলে মনে করায় 'মহেশ্বর' রূপে বিবেচিত হন। কিন্তু স্বরূপতঃ এঁকে 'পরমাত্মা' বলা হয়। ইনি দেহে অবস্থান করলেও দেহের অতীতই (সর্বতোভাবে সম্বন্ধরহিত) থাকেন॥ ২২ ॥

ব্যাখ্যা—**'উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ'**— এই পুরুষ স্বরূপত নিত্য, সর্বত্র পরিপূর্ণ, স্থির, অচল এবং সনাতন (শাশ্বত) [গীতা ২।২৪]। এরূপ হওয়া সত্ত্বেও যখন তিনি প্রকৃতি এবং তার কার্য শরীরের দিকে আকৃষ্ট হন অর্থাৎ সেগুলির সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করেন, তখন তাঁর সংজ্ঞা হয় 'উপদ্রষ্টা'।

তিনি প্রত্যেক কাজে সম্মতি, অনুমতি দিয়ে থাকেন, তাই তাঁর নাম **'অনুমন্তা'**।

তিনি একটি ব্যষ্টি-দেহের সঙ্গে মিলিত হয়ে, তার সঙ্গে তাদাত্ম্য করে অন্ন-জল ইত্যাদির সাহায্যে দেহের পালন-পোষণে যত্নবান থাকেন ও শীত-গ্রীষ্মাদি থেকে দেহকে সংরক্ষণ করেন। তাই তিনি **'ভর্তা'** নামে অভিহিত হন।

তিনি এই দেহের সঙ্গে একাত্ম হয়ে অনুকূল পরিস্থিতিতে নিজেকে সুখী বলে মনে করেন এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নিজেকে দুঃখী বলে মনে করেন, তাই তাঁর **'ভোক্তা'** সংজ্ঞা হয়।

তিনি নিজেকে শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ও ধন-সম্পত্তির মালিক বলে মনে করেন, তাই তাঁকে **'মহেশ্বর'** নামে অভিহিত করা হয়।

'পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ'— পুরুষ সর্বোৎকৃষ্ট, পরম আত্মা, তাই শাস্ত্রে তাঁকে **'পরমাত্মা'** বলা হয়েছে। ইনি দেহে অবস্থান করলেও দেহসম্বন্ধরহিত। পরবর্তী একত্রিশতম শ্লোকে এঁর বিষয়ে বলা হয়েছে যে ইনি এই শরীরে অধিষ্ঠিত হলেও কিছুই করেন না এবং কিছুতে লিপ্তও হন না।

এই শ্লোকটিতে একই তত্ত্ব ভিন্ন উপাধি দ্বারা, 'উপদ্রষ্টা' ইত্যাদি পদ দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে, তাই এইসব পৃথক্ নামের দ্বারা পুরুষেরই বর্ণনা করা হয়েছে বলে বুঝতে হবে। প্রকৃতপক্ষে তাঁর মধ্যে কোনোপ্রকার পার্থক্য নেই। যেমন, একজন ব্যক্তিকেই দেশ, কাল, বেশভূষা, সম্পর্ক ইত্যাদি অনুসারে বিভিন্ন (বাবা, কাকা, দাদু, ভাই ইত্যাদি) সম্বোধনের দ্বারা ডাকা হয়, তেমনই পুরুষকে বিভিন্ন নামে ডাকলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি একই।

পরিশিষ্ট-ভাব— আসলে পুরুষ হল 'পর'। কিন্তু অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন হওয়ায় সে উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা ইত্যাদি হয়ে ওঠে। মানুষ যেমন পুত্রের সঙ্গে সম্পর্ক থেকে 'পিতা', 'পিতা'র সঙ্গে সম্পর্ক থেকে 'পুত্র', পত্নীর সঙ্গে সম্পর্ক থেকে 'পতি', বোনের সঙ্গে সম্পর্ক থেকে 'ভাই' ইত্যাদি হয়। এই সব সম্পর্ক শুধু নিজ নিজ কর্তব্য পালন করার উদ্দেশ্যেই, মমতা করার জন্য নয়। প্রকৃত স্বরূপ হল 'পর' অর্থাৎ সর্বতোভাবে সম্পর্করহিত।

এখানে উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা ইত্যাদি উপাধির তাৎপর্য একই অর্থাৎ চেতন-তত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে একটিই। জ্ঞানের প্রকরণে

প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ের বর্ণনাই প্রধান। অতএব এখানে উল্লিখিত উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, মহেশ্বর ইত্যাদি শব্দগুলিকে 'পুরুষের' বাচক বলে বুঝতে হবে।

***

সম্বন্ধ—উনিশতম শ্লোক থেকে বাইশতম শ্লোক পর্যন্ত প্রকৃতি ও পুরুষ সম্বন্ধে আলোচনা করে পরবর্তী শ্লোকে এই দুইটি তত্ত্বতঃ জানার কী ফল তা জানানো হয়েছে।

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে॥ ২৩ ॥

[**যঃ, এবম্, পুরুষম্, চ** (যে ব্যক্তি এইভাবে পুরুষকে এবং) ; **গুণৈঃ, সহ** (গুণাদি সহ) ; **প্রকৃতিম্** (প্রকৃতি সম্পর্কে) ; **বেত্তি** (অবগত হন) ; **সঃ** (তিনি) ; **সর্বথা** (সর্বপ্রকার) ; **বর্তমানঃ, অপি** (ব্যবহারাদি করলেও) ; **ভূয়ঃ** (আর কখনো) ; **ন, অভিজায়তে** (জন্মগ্রহণ করেন না।)]

যে ব্যক্তি এইভাবে পুরুষকে এবং গুণাদিসহ প্রকৃতিকে (ভিন্ন ভিন্ন বলে) অবগত হন, তিনি সর্বপ্রকার ব্যবহারাদি করলেও আর জন্মগ্রহণ করেন না॥ ২৩ ॥

ব্যাখ্যা—'যঃ এবং বেত্তি.....ন স ভূয়োঽভিজায়তে' —আগের শ্লোকে **'দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ'** পদটির দ্বারা পুরুষকে দেহের অতীত অর্থাৎ সম্পর্করহিত বলা হয়েছে, তাকেই এইস্থানে **'এবম্'** পদ দ্বারা বলেছেন যে, যে সাধক এইরূপ পুরুষকে দেহ বা প্রকৃতির অতীত অর্থাৎ সম্পর্করহিত বলে জানেন এবং বিকার, কার্য, করণ, বিষয়রূপে যা কিছু জগতে পরিলক্ষিত হয়, তা সবই প্রকৃতি এবং তার গুণসমূহের কার্য বলে সঠিকরূপে জেনেছেন ; তিনি বর্ণ, আশ্রম, পরিস্থিতি অনুসারে প্রাপ্ত কর্তব্য-কর্ম করলেও আর পুনর্জন্ম লাভ করেন না। কারণ গুণাদির সংসর্গেই জন্মলাভ হয়ে থাকে (গীতা ১৩।২১)।

এখানে **'সর্বথা বর্তমানোঽপি'** পদটিতে নিষিদ্ধ আচরণ মনে করা উচিত নয়। কারণ যে ব্যক্তি নিজেকে দেহসম্পর্করহিত বলে অনুভব করে এবং গুণাদিসহ প্রকৃতিকে নিজের থেকে পৃথক্ বলে অনুভব করতে পারে তার মধ্যে অসৎ বস্তুর আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হতেই পারে না। আকাঙ্ক্ষা না হওয়ায় তার দ্বারা নিষিদ্ধ আচরণ করা অসম্ভব। কারণ নিষিদ্ধ আচরণ করার পেছনে কামনা ও বাসনাই হেতু হয়ে থাকে (গীতা ৩।৩৭)।

ভগবান এখানে সাধকদের নিজ প্রকৃত স্বরূপ জানিয়ে সাবধান করেছেন, যাতে তাঁরা জানতে পারেন যে স্বরূপে আসলে কোনো ক্রিয়াশীলতা নেই। সুতরাং তিনি কোনো ক্রিয়ার কর্তা নন এবং কর্তা না হওয়ায় তিনি ভোক্তাও হন না। সাধক নিজেকে যখন অকর্তা বলে জানতে পারেন, তখন তাঁর কর্তৃত্বের অভিমান স্বতঃই দূর হয় এবং ক্রিয়ার ফলের প্রতিও আসক্তি থাকে না। তাঁর দ্বারা তখন স্বতঃ শাস্ত্রসম্মত কার্যাদি হতে থাকে। গুণাতীত হওয়ায় তাঁর আর পুনর্জন্ম হয় না।

পরিশিষ্ট-ভাব—আগের শ্লোকে উপস্থিত **'দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ'** কথাটির ব্যাখ্যা এই শ্লোকটিতে করা হয়েছে। যার বিবেক জাগ্রত হয়েছে অর্থাৎ **'দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ'** এই তত্ত্বটি অনুভূত হয়েছে, সে নিজ বর্ণাশ্রম অনুযায়ী সকল কর্ম করলেও নির্লিপ্ত থাকে। প্রকৃতপক্ষে মনুষ্যমাত্রেরই স্বরূপ হল নির্লিপ্ত, কিন্তু গুণাদির সংস্পর্শেই সে লিপ্ত হয়ে যায় এবং বারংবার তাকে জন্মমৃত্যু চক্রে আবর্তিত হতে হয় (১৩।২১)। প্রকৃতির সঙ্গেই গুণাদির সম্পর্ক, পুরুষের সঙ্গে নয় (১৩।১৯-২০)।

'সর্বথা বর্তমানোঽপি' পদটির মধ্যে 'অপি' কথাটির তাৎপর্য হল যে, সে আসক্ত মানুষের মতো সর্বপ্রকার আচরণ করলেও নির্বিকারই থাকে (গীতা ৩।৩৫)।

'ন স ভূয়োঽভিজায়তে'—ঘোল থেকে যে মাখন বার করা হয় তাকে যেমন পুনরায় ঘোলে মিশিয়ে দই প্রস্তুত করা যায় না, সেইরূপ প্রকৃতিজনিত গুণাদির সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হলে মানুষ আর গুণাদিতে আবদ্ধ হয় না। তার তখন ব্রহ্মের

সঙ্গে সমভাব হয় অর্থাৎ ব্রহ্মের যেমন জন্ম-মৃত্যু হয় না, তারও তেমনই জন্ম-মৃত্যু হয় না।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের একত্রিশতম শ্লোকে আছে—**'সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে'** এবং এখানে উদ্ধৃত আছে **'সর্বথা বর্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে'**। ষষ্ঠ অধ্যায়ে উদ্ধৃত **'স যোগী ময়ি বর্ততে'** পদে প্রেমপ্রাপ্তির এবং এখানকার **'ন স ভূয়োঽভিজায়তে'** পদটিতে বোধপ্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে। প্রেম এবং বোধ দুটিতেই গুণাদির সঙ্গ থাকে না। দুটির পার্থক্য হল এই যে বোধের দ্বারা জন্ম-মৃত্যু চক্র থেকে মুক্তি হয়, কিন্তু প্রেমে মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের সঙ্গে অভিন্নতা আসে।

***

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে ভগবান প্রকৃতি ও পুরুষকে যথার্থরূপে জানাকে পুনর্জন্ম না হওয়ার কারণ হিসাবে জানিয়েছিলেন। এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে জন্ম-মরণরহিত হওয়ার আর কোনো উপায় কী আছে ? পরবর্তী দুটি শ্লোকে ভগবান তাই চারপ্রকার সাধনের কথা জানাচ্ছেন।

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে॥ ২৪ ॥

[**কেচিৎ** (কোনো কোনো ব্যক্তি) ; **ধ্যানেন** (ধ্যানযোগের দ্বারা) ; **অন্যে, সাংখ্যেন, যোগেন** (কেহ সাংখ্যযোগের দ্বারা) ; **চ, অপরে, কর্মযোগেন** (আবার কেউ কর্মযোগদ্বারা) ; **আত্মনা, আত্মনি** (আপনাতেই আপনি) ; **আত্মানাম্, পশ্যন্তি** (পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব করেন।)]

কোনো কোনো ব্যক্তি ধ্যানযোগের দ্বারা, কেহ বা সাংখ্যযোগের দ্বারা আবার কেহ বা কর্মযোগের দ্বারা আপনাতেই আপনি পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব করে থাকেন॥ ২৪ ॥

ব্যাখ্যা—**'ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা'** — পঞ্চম অধ্যায়ের সাতাশ-আটাশতম শ্লোকে ; ষষ্ঠ অধ্যায়ের দশম থেকে আটাশতম শ্লোক পর্যন্ত যে সগুণ-সাকার, নির্গুণ-নিরাকার ইত্যাদির ধ্যানের বর্ণনা করা হয়েছে, সেই ধ্যানে যাঁর যেমন রুচি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস এবং যোগ্যতা থাকে সেই অনুযায়ী ধ্যান করে কিছু সাধক আপনাতে আপনিই পরমাত্ম(অধ্যাত্ম)তত্ত্ব অনুভব করে থাকেন।

প্রকৃতি ও পুরুষকে পৃথক্‌ভাবে জানলে যে সম্পর্ক ছিন্ন হয়, তা ধ্যানের দ্বারাও হয়ে থাকে। চিত্তের মূঢ়তা থাকলেও ধ্যান হয় না এবং ক্ষিপ্ততা থাকলেও ধ্যান হয় না। বিক্ষিপ্ত বৃত্তিতে ধ্যান আরম্ভ হয়। যখন চিত্ত স্বরূপে একাগ্র হয়, তখন সমাধি হয়। একাগ্র হলে চিত্ত নিরুদ্ধ হয়। এইভাবে যে অবস্থায় চিত্ত নিরুদ্ধ হয় সেই অবস্থায় চিত্ত সংসার, শরীর, বৃত্তি, চিন্তা ইত্যাদি থেকেও উপরত হয়। সেইসময় ধ্যানযোগী আপনা-আপনিতে, নিজের মধ্যেই নিজেকে অনুভব করে সন্তোষ লাভ করেন (গীতা ৬।১৯-২০)।

'অন্যে সাংখ্যেন যোগেন'—দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশ থেকে ত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত, চতুর্থ অধ্যায়ের তেত্রিশ থেকে উনচল্লিশতম শ্লোক পর্যন্ত, পঞ্চম অধ্যায়ের অষ্টম, নবম ও ত্রয়োদশ থেকে ছাব্বিশতম শ্লোক পর্যন্ত, দ্বাদশ অধ্যায়ের চতুর্থ-পঞ্চম ইত্যাদি শ্লোকগুলিতে কথিত সাংখ্যযোগের সাহায্যে বহু সাধক আপনাতে আপনি পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব করে থাকেন।

বিবেকের[১] অপর নাম হল সাংখ্যযোগ। সেই বিবেকের সাহায্যে সৎ-অসৎ নিরূপণ করা, যেমন 'সৎ' নিত্য, সর্বব্যাপী ও স্থির স্বভাবসম্পন্ন, অচল, অব্যক্ত ও অচিন্ত্য ; আর 'অসৎ' চলমান, অনিত্য, বিকারশীল ও পরিবর্তনশীল। এরূপ বিচার-বিবেচনার সাহায্যে সাংখ্যযোগী প্রকৃতি এবং তার কার্যাদি থেকে সম্পূর্ণভাবে নিঃস্পৃহ হয়ে থাকেন এবং আপনাতে আপনি পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব করেন।

'কর্মযোগেন চাপরে'—দ্বিতীয় অধ্যায়ের সাতচল্লিশ-তম থেকে তিপ্পান্নতম শ্লোক পর্যন্ত, তৃতীয় অধ্যায়ের সপ্তম থেকে উনবিংশতিতম শ্লোক পর্যন্ত, চতুর্থ অধ্যায়ের

[১]বিপরীতধর্মী দুই বস্তুকে জানার জ্ঞানকে বলা হয় বিবেক।

ষোড়শ থেকে বত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত, পঞ্চম অধ্যায়ের ষষ্ঠ-সপ্তম শ্লোকগুলিতে কথিত কর্মযোগের সাহায্যে অনেক সাধক আপনাতেই আপনি পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব করেন।

প্রকৃতি ও পুরুষকে পৃথক্ পৃথক্ বলে জানলে যেমন সম্বন্ধ ছিন্ন হয়, তেমনি কর্মযোগের দ্বারাও হয়ে থাকে। কর্মযোগী যে কাজই করুন না কেন, তা সংসারের হিতার্থেই করে থাকেন। যজ্ঞ, দান, তপস্যা, তীর্থ, ব্রত ইত্যাদি যা কিছু তিনি করেন, তা সবই প্রাণীদের কল্যাণার্থে করেন, নিজের জন্য নয়। এরূপে স্বয়ং-এর ওইসব ক্রিয়া, পদার্থ, শরীর ইত্যাদি থেকে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় এবং আপনিই আপনাতে পরমাত্মতত্ত্ব অনুভূত হয়।

মানুষ স্বাভাবিকভাবেই এই দেহকে নিজের বলে স্বীকার করেছে, মেনে নিয়েছে। এই মেনে নেওয়া দূর করতে গেলে নিজের মধ্যে পরমাত্মাকে দেখা অর্থাৎ দেহের স্থানে নিজের মধ্যে পরমাত্মাকে মেনে নেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন।

পরমাত্মাকে নিজের মধ্যে অনুভব করা করণ-নিরপেক্ষ হয়। প্রকৃতি সহযোগে করণ-সাপেক্ষ জ্ঞান হয়ে থাকে। তাই সাধক কোনো করণের সাহায্যে পরমাত্মাতে অবস্থিত হন না, স্বয়ং-ই স্থিত হন। স্বয়ং-এর পরমাত্মাতে স্থিতি কোনো করণের দ্বারা হতে পারে না।

পরিশিষ্ট-ভাব— আগের শ্লোকটিতে যেমন বিবেকের গুরুত্ব প্রদানকে মুক্তির উপায় বলা হয়েছিল, তেমনই এখানে ধ্যানযোগাদি অন্য উপায়ের কথা বলা হয়েছে। গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের আঠাশতম শ্লোকে ধ্যানযোগ দ্বারা পরমাত্মপ্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে সাংখ্যযোগ দ্বারা পরমাত্মপ্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়েরই একাত্তরতম শ্লোকে কর্মযোগ দ্বারা পরমাত্মপ্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে। এ সবই পরমাত্মপ্রাপ্তির স্বতন্ত্র সাধন।

※ ※ ※

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ॥ ২৫ ॥

[**অন্যে** (অন্য ব্যক্তিরা) ; **এবম্** (এইরূপ) ; **অজানতঃ, তু** (না জানতে পারে, তারা কেবল) ; **অন্যেভ্যঃ** (জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদের থেকে) ; **শ্রুত্বা, এব, উপাসতে** (শুনেই উপাসনা করেন) ; **চ, তে, শ্রুতিপরায়ণাঃ** (এইভাবে যাঁরা শ্রবণ করে আচরণ করেন) ; **অপি, মৃত্যুম্, অতিতরন্তি** (তাঁরাও মৃত্যুকে অতিক্রম করেন।)]

অন্য ব্যক্তি যারা এইরূপ (ধ্যানযোগ, সাংখ্যযোগ, কর্মযোগ ইত্যাদি সাধনগুলি) জানেন না, তাঁরা কেবল (জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদের থেকে) শুনে উপাসনা করেন, এইভাবে যাঁরা শ্রবণপরায়ণ হয়ে উপাসনা করেন, তাঁরাও মৃত্যুকে অতিক্রম করেন॥ ২৫ ॥

ব্যাখ্যা—'অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ .... মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ'—কিছু এরূপ তত্ত্বপ্রাপ্তির আগ্রহসম্পন্ন ব্যক্তি আছেন যাঁরা ধ্যানযোগ, সাংখ্যযোগ, কর্মযোগ, হঠযোগ, লয়যোগ ইত্যাদি সাধনগুলি অনুধাবন করতে পারেন না এবং এইসব সাধন তাঁদের পক্ষে সুসাধ্য হয় না। এরূপ মানুষ শুধুমাত্র তত্ত্বজ্ঞ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদের নির্দেশ পালন করে মৃত্যুকে অতিক্রম করেন অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন। যেমন, ধনীব্যক্তির নির্দেশ পালন করলে ধনলাভ হয়, তেমনই তত্ত্বজ্ঞ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদের নির্দেশ পালন করলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। তবে পার্থক্য এই যে, ধনী ব্যক্তি দিলে তবে ধনলাভ হয় ; কিন্তু সাধু-মহাপুরুষদের উপদেশ পালন করলে, তাঁদের মনের, সংকেতের নির্দেশ অনুসারে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে চললে মানুষ স্বতঃই সেই পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হয়, যা সকলেই সর্বদা স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্ত। কারণ ধন ধনীর অধীন, কিন্তু পরমাত্মতত্ত্ব কারও অধীন নয়।

শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলেই মৃত্যু হয়। যাঁরা মহাপুরুষদের নির্দেশের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ হন, তাদের শরীরের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক দূর হয়। সুতরাং তাঁরা মৃত্যুকে অতিক্রম করেন অর্থাৎ তাঁরা আগে যেমন শরীরের

মৃত্যুকে নিজের মৃত্যু বলে মনে করতেন, সেই ধারণা দূর হয়।

এরূপ শ্রবণপরায়ণ সাধক তিন শ্রেণীর হয়ে থাকেন—

(১) সাধকের যদি জাগতিক সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা না থাকে, শুধু তত্ত্বপ্রাপ্তির একাগ্র অভিলাষ থাকে এবং তিনি যাঁর নির্দেশ পালন করেন, তিনি তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষ হন, তাহলে সাধক শীঘ্রই পরমাত্মাকে লাভ করেন।

(২) সাধকের সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা যদি বাকি থাকে, তাহলে শুধুমাত্র মহাপুরুষের নির্দেশ পালন করলেই তাঁর সেই ইচ্ছা নাশ হয় এবং তাঁর পরমাত্মপ্রাপ্তি ঘটে।

(৩) সাধক যাঁর নির্দেশে চলেন, তিনি যদি তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষ না হন, তাহলেও সাধকের যদি বিন্দুমাত্র জাগতিক আকাঙ্ক্ষা না থাকে এবং তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য যদি পরমাত্মাকে লাভ করা হয়, তাহলে ভগবদ্‌কৃপায় তাঁর ভগবদ্‌প্রাপ্তি হয়ে থাকে। কারণ ভগবান তো তাঁকে জানেনই।

যদি কোনো কারণবশতঃ সাধকের সাধু-মহাপুরুষদের প্রতি অশ্রদ্ধা, দোষদৃষ্টি হয়, তাহলে সাধক সেই মহাপুরুষে শুধু দোষই দেখতে থাকবে, মহাপুরুষের কোনো গুণ তার চোখে পড়বে না। মহাপুরুষগণ দোষ-গুণের অনেক ঊর্ধ্বে (গুণাতীত) অবস্থান করেন ; তাই মহাপুরুষের প্রতি অশ্রদ্ধা হলে নিজের ভাবই তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। মানুষ যেভাবে দেখে, সেই ভাবের সঙ্গে তার সম্পর্ক হয়। দোষ দেখলে, দোষের সঙ্গেই তার সম্পর্ক হয়। তাই সাধকের উচিত, তিনি যেন তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষদের ক্রিয়া এবং আচরণের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে তাঁদের কাছে শ্রদ্ধাবনত থাকেন। সাধু-মহাপুরুষদের কাছ থেকে সেই সাধকই বেশি লাভবান হন, যিনি মহাপুরুষদের সঙ্গে কোনোপ্রকার জাগতিক ব্যবহারের সম্পর্ক না রেখেও শুধু পারমার্থিক (সাধনের) সম্পর্ক রাখেন। দ্বিতীয়তঃ, সাধককে সতর্ক থাকতে হয় যাতে তাঁর দ্বারা মহাপুরুষদের কোনো নিন্দা না হয়। যদি সাধক মহাপুরুষের নিন্দা করেন, তাহলে তাঁর কোথাও কখনো উন্নতি হয় না।

পরিশিষ্ট-ভাব—যে সব ব্যক্তির শাস্ত্র বোঝবার যোগ্যতা নেই, বিবেক তত জাগ্রত নয় কিন্তু জন্ম-মৃত্যু চক্র অতিক্রম করার প্রবল আগ্রহ আছে, তাঁরাও জীবন্মুক্ত সাধু-মহাত্মাদের নির্দেশ পালন করে মৃত্যু-সাগর অতিক্রম করে থাকেন।

উপনিষদে একটি উপাখ্যান বর্ণিত আছে। জবালার পুত্র সত্যকাম গৌতম ঋষির কাছে উপদেশ গ্রহণ করতে গিয়েছিলেন। ঋষি তাঁকে চারশত দুর্বল এবং ক্ষীণকায় গাভি প্রদান করে তাদের পালন করতে বললেন। সত্যকাম উৎসাহিত হয়ে বললেন যে এই চার'শ গাভিকে একহাজারে পরিণত করে তারপর তিনি আবার আসবেন। এই বলে সত্যকাম গাভিগুলি নিয়ে বনে গেলেন এবং সেগুলিকে প্রতিপালন করতে থাকলেন। বেশ কিছু বছর অতিক্রান্ত হলে যখন গাভিগুলির সংখ্যা এক হাজারে পৌঁছাল, তখন একটি বলদ তাঁকে জানাল যে গাভির সংখ্যা এক হাজারে পৌঁছেছে, এখন তাদের আচার্যের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত। এই বলে সেই বলদটি সত্যকামকে ব্রহ্মের প্রথম পাদের উপদেশ দিল। পরের দিন সত্যকাম গাভিগুলি সহ আচার্যের আশ্রমের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। পথে অগ্নি তাঁকে ব্রহ্মের দ্বিতীয় পাদের উপদেশ দেন, হংস ব্রহ্মের তৃতীয় পাদ এবং এক জলচর পক্ষী চতুর্থ পাদের উপদেশ প্রদান করে। এইভাবে পথেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে সত্যকাম গৌতম ঋষির নিকট পৌঁছান। গুরুর জিজ্ঞাসায় তিনি সমস্ত কথাই জানান এবং ঋষির কাছে উপদেশ শোনার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন গৌতম ঋষি তাঁকে উপদেশ দেন (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৪-৯ খণ্ড)। এইভাবে শুধুমাত্র তত্ত্বজ্ঞ, জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদের নির্দেশ পালন দ্বারাই সত্যকাম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন।

* * *

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকটিতে বলা হয়েছে যে শ্রুতিপরায়ণ সাধকও মৃত্যুকে অতিক্রম করে থাকেন, এখন প্রশ্ন হল যে কী কারণে মৃত্যু হয় ? ভগবান পরবর্তী শ্লোকে তার উত্তর দিয়েছেন।

যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ॥ ২৬ ॥

[ভরতর্ষভ (হে ভরতর্ষভ !) ; স্থাবরজঙ্গমম্ (স্থাবর এবং জঙ্গম) ; যাবৎ, কিঞ্চিৎ, সত্ত্বম্ (যত প্রাণী ও পদার্থ) ; সঞ্জায়তে, তৎ (উৎপন্ন হয়, তাদের) ; ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ, সংযোগাৎ (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগে) ; বিদ্ধি (জেনো।)]

হে ভরতর্ষভ ! স্থাবরজঙ্গম যত কিছু প্রাণী উৎপন্ন হয়, তা সমস্তই তুমি ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ থেকেই উৎপন্ন বলে জেনো॥ ২৬ ॥

ব্যাখ্যা—'যাবৎ সঞ্জায়তে .... ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ'—বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, পাহাড়, পর্বত ইত্যাদি যত স্থাবর প্রাণী এবং চলৎ শক্তিসম্পন্ন দেবতা, মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, মাছ, কচ্ছপ ইত্যাদি যত (স্থলচর, জলচর, নভচর) জঙ্গম প্রাণী আছে, তা সবই ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হতে উৎপন্ন হয়।

উৎপত্তি ও বিনাশশীল পদার্থ হল 'ক্ষেত্র' আর যিনি এই ক্ষেত্রকে জানেন, উৎপত্তি-বিনাশরহিত এবং সর্বদা একভাবে অবস্থান করেন তিনি হলেন 'ক্ষেত্রজ্ঞ'। সেই ক্ষেত্রজ্ঞের (প্রকৃতিস্থ পুরুষের) শরীরের সঙ্গে আমি-আমার বলে সম্পর্ক মেনে নেওয়াকেই বলা হয় ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ। এই মেনে নেওয়া সংযোগের জন্যই জীবকে স্থাবর-জঙ্গম যোনিতে জন্মগ্রহণ করতে হয়। পূর্ববর্তী একুশতম শ্লোকে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগকেই **'গুণসঙ্গঃ'** পদের দ্বারা বলা হয়েছে। তাৎপর্য হল এই যে নিত্য পরিবর্তনশীল প্রকৃতি এবং প্রকৃতির কার্য শরীরাদির সঙ্গে তাদাত্ম্য করায় স্বয়ং জীবাত্মাও নিজেকে জন্ম-মরণশীল বলে মেনে নেয়।

[স্থাবর-জঙ্গম প্রাণীদের উৎপত্তির কথা **'সংজায়তে'** পদের দ্বারা এখানে বলেছেন এবং পরবর্তী শ্লোকে **'বিনশ্যৎসু'** পদের দ্বারা মৃত্যুর কথা বলেছেন।]

'তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ'—ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষেত্রের সঙ্গে তার সম্পর্ক মেনে নেয়, তাই তার জন্ম হয়, কিন্তু যখন সে শরীরের সঙ্গে তার সম্পর্ক মেনে নেয় না, তখন তার জন্ম হয় না—এই কথাটি তুমি সম্যক্‌ভাবে অনুধাবন করো।

পরিশিষ্ট-ভাব—এখানে **'যাবৎ সঞ্জায়তে'** কথাটির মধ্যে জরায়ুজ-অণ্ডজ-উদ্ভিজ্জ-স্বেদজ, জলচর-নভচর-স্থলচর, মনুষ্য, দেবতা, পিতৃগণ, ভূত-প্রেত, পিশাচ ইত্যাদি সকলকেই বুঝতে হবে। সপ্তম অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকেও **'এতদ্‌যোনীনি ভূতানি'** পদটিতে এই কথাই বলা হয়েছে।

ভক্তির প্রকরণে ভগবান পরা এবং অপরা—উভয়কেই তাঁর প্রকৃতি বলে জানিয়েছেন এবং বলেছেন যে 'এই উভয় প্রকৃতির সংযোগেই সমস্ত প্রাণী উৎপন্ন হয় এবং আমি সমস্ত জগতের প্রভব ও প্রলয়' (গীতা ৭।৬)। কিন্তু এখানে জ্ঞানের প্রকরণে ভগবান বলেছেন যে সকল প্রাণী ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগে উৎপন্ন হয়। তাৎপর্য হল এই যে, ভক্তির প্রকরণে ভগবানের লক্ষ্য হল ভক্তের দৃষ্টি তাঁর দিকে ফেরানো, কারণ ভক্তের ভগবানের উপরই দৃঢ়বিশ্বাস থাকে। তাঁর সাধন ও সাধ্য—দুই-ই ভগবান। কিন্তু জ্ঞানে ভগবান ক্ষেত্রজ্ঞের (স্বরূপের) দিকে দৃষ্টি দেওয়ার কথা বলছেন, কেন-না ক্ষেত্রের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার জন্যই জীব জন্ম-মৃত্যুরূপ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে আকর্ষণ ও মিলন (সংযোগ) সজাতীয়ের মধ্যেই হয়, তাহলে বিজাতীয় ক্ষেত্রের (জড়ের) সঙ্গে ক্ষেত্রজ্ঞের (চেতনের) সংযোগ কীভাবে সম্ভব ? এর উত্তর হল যে রাত ও দিনের সংযোগ হওয়া যেমন সম্ভব নয়, তেমনই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগও হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু পরমাত্মার অংশ হওয়ায় ক্ষেত্রজ্ঞের মধ্যে এমন শক্তি থাকে যে, তা বিজাতীয় বস্তুকেও আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়, তার সঙ্গে সম্পর্ক করতে পারে। ভগবানই তাকে এই স্বাধীনতা দিয়েছেন। কিন্তু সে এই স্বাধীনতার অপব্যবহার করেছে অর্থাৎ ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক অস্বীকার করে জগৎ-সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক মেনে নিয়েছে এবং জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হয়ে চলেছে (গীতা ১৩।২১)।

❖ ❖ ❖

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে ক্ষেত্রের (শরীরের) সঙ্গে সম্পর্কিত হলে, তার দিকে দৃষ্টি রাখলে, এই পুরুষ জন্ম-মরণ চক্রে আবর্তিত হয়, তাহলে প্রশ্ন হল যে এই জন্ম-মৃত্যু চক্র থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তার কী করা উচিত ? পরবর্তী শ্লোকে ভগবান তার উত্তর দিয়েছেন।

সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ ২৭ ॥

[**যঃ, বিনশ্যৎসু** (যিনি বিনাশশীল) ; **সর্বেষু,** ভূতেষু (সকল প্রাণীতে) ; **পরমেশ্বরম্, অবিনশ্যন্তম্** (অবিনাশী পরমাত্মাকে) ; **সমম্** (সমভাবে) ; **তিষ্ঠন্তম্, পশ্যতি** (অবস্থানরত দেখেন) ; **সঃ** (তিনিই) ; **পশ্যতি** (যথার্থদর্শী।)]

যিনি বিনাশশীল সমস্ত প্রাণীতে পরমাত্মাকে অবিনাশীরূপে এবং সমভাবে অবস্থানরত দেখেন, তিনিই যথার্থদর্শী॥ ২৭ ॥

ব্যাখ্যা—'সমং সর্বেষু ভূতেষু'—পরমাত্মাকে সমস্ত প্রাণীতে সম বলার অর্থ হল এই যে সকল প্রাণী বিষম অর্থাৎ স্থাবর-জঙ্গম, সাত্ত্বিক-রাজসিক-তামসিক, ছোট-বড় নানা আকৃতির, লম্বা বা চওড়া, নানা বর্ণবিশিষ্ট—এইপ্রকার বিচিত্র রূপ ও আকৃতির যত প্রাণী আছে, সেইসব প্রাণীতেই পরমাত্মা সমভাবে অবস্থিত। পরমাত্মা কোনো প্রাণীতেই ছোট বা বড়, কম বা বেশি নন।

প্রথমে এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে ভগবান ক্ষেত্রজ্ঞের সঙ্গে নিজের একত্বের কথা জানাতে গিয়ে বলেছিলেন যে, 'তুমি সমস্ত প্রাণীর মধ্যে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে আমাকেই জেনো', সেই কথাই এখানে বলেছেন যে, পরমাত্মা সকল প্রাণীতেই সমভাবে অবস্থিত।

'তিষ্ঠন্তম্'—সকল প্রাণীই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় এই তিন অবস্থাতে পরিক্রমণ করে, সর্গ-প্রলয়, মহাসর্গ-মহাপ্রলয়ে গমন করে ; উচ্চ-নীচ গতিতে, যোনিতে গমন করে অর্থাৎ কোনো প্রাণীই একমুহূর্তও স্থিরভাবে থাকে না। কিন্তু পরমাত্মা ওই সব অস্থির প্রাণীতে নিত্য-নিরন্তর একভাবে বিরাজ করেন।

'পরমেশ্বরম্'—সকল প্রাণীই নিজেকে কারোর ঈশ্বর অর্থাৎ মালিক বলে মনে করে থাকে, কিন্তু পরমাত্মা সেইসব প্রাণীদের এবং সমস্ত জড়-চেতন জগতের পরমেশ্বর।

'বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি'—প্রতিমুহূর্তে বিনাশের পথে গমনকারী প্রাণীদের মধ্যে বিনাশরহিত, সদা একরূপে স্থিত পরমাত্মাকে যিনি নির্বিকাররূপে দেখেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে ঠিক দেখেন। অর্থাৎ যিনি পরিবর্তনশীল শরীরের সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত দেখেন, তাঁর দেখা ঠিক নয় ; কিন্তু যিনি সর্বদা একভাবে স্থিত পরমাত্মার সঙ্গে নিজেকে অভিন্নরূপে দেখেন, তিনিই প্রকৃত দ্রষ্টা।

প্রথমে এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, আমার মতে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান ; সেই কথাটিই এখানে বলেছেন যে, যিনি বিনাশশীল প্রাণীদের মধ্যে নাশরহিত ও সমভাবে অবস্থিত তাঁকে যিনি অনুভব করেন তিনিই প্রকৃতদর্শী। তাৎপর্য হল এই যে, যেমন ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগে ক্ষেত্রে অনবরত পরিবর্তন হয়ে থাকে, কিন্তু ক্ষেত্রজ্ঞ একইভাবে বিরাজ করেন, তেমনই সকল প্রাণীর উৎপত্তি ও নাশ হলেও পরমাত্মা সর্বাবস্থায় একভাবে বিরাজ করেন।

আগের ছাব্বিশতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে সমস্ত প্রাণীই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগে উৎপন্ন হয়। এই দুইয়ের মধ্যে ক্ষেত্র কখনোই স্থিরভাবে থাকে না এবং ক্ষেত্রজ্ঞ কখনো পরিবর্তিত হয় না (অর্থাৎ স্থিরভাবে বিরাজ করে)। অতএব ক্ষেত্রজ্ঞ থেকে ক্ষেত্রের যে সর্বক্ষণ বিয়োগ হয়ে চলেছে তা অনুভব করা উচিত। এই (সাতাশতম) শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, উৎপত্তি ও বিনাশশীল সমস্ত বিষম প্রাণীতে যে বিনাশরহিত পরমাত্মা সমভাবে অবস্থিত, তাঁর সঙ্গে নিজের একত্ব অনুভব করো।

পরিশিষ্ট-ভাব—যেমন আকাশ কখনো সূর্যালোকে ভরে যায়, কখনো অন্ধকারেও ছেয়ে যায়, কখনো ধোঁয়াশায় ভরে যায়, কখনো কালো মেঘে ঢেকে যায়, কখনো বিদ্যুৎ চমকায়, কখনো বর্ষণ হতে থাকে, কখনো শিলাবৃষ্টি হয়, কখনো

নানারূপ আওয়াজ হয় বা মেঘ গর্জন হয় ; কিন্তু তাতে আকাশের কোনো তারতম্য হয় না। আকাশ যেমন তেমনই নির্লিপ্ত ও নির্বিকার থাকে। তেমনই সর্বত্র পরিব্যাপ্ত সত্তায় কখনো মহাসর্গ ও মহাপ্রলয় হয়, কখনো সর্গ ও প্রলয় হয়, কখনো জন্ম ও মৃত্যু হয়, কখনো আকাল হয়, কখনো বন্যা হয়, কখনো ভূমিকম্প হয়, কখনো ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয় ; কিন্তু সত্তায় (অস্তিত্বে) তার কোনো প্রভাব পড়ে না। যতই ওলোটপালট হোক না কেন অস্তিত্ব একইভাবে নির্লিপ্ত ও নির্বিকার থাকে। এই নির্বিকার ভাবই হল স্বাভাবিক ভাব, বিকারই হল কৃত্রিম, মেনে নেওয়া। বদ্ধই হোক অথবা মুক্ত, পাপী হোক বা পুণ্যাত্মা, নির্বিকার সত্তা উভয়ের মধ্যেই সমভাবে অবস্থিত।

গঙ্গা যেমন নিরন্তর বহমান হলেও যার ওপর দিয়ে বহমান, সেই আধারশিলা একইভাবে স্থির থাকে। গঙ্গার জল কখনো স্বচ্ছ, কখনো ঘোলা, কখনো ক্ষীণকায়, কখনো বন্যার জন্য স্ফীত , কখনো তপ্ত পাহাড়ের জন্য গরম, কখনো বরফ পড়ায় ঠাণ্ডা, কখনো প্রবল বেগের জন্য শব্দময়, কখনো আবার শান্ত নিস্তব্ধ। কিন্তু তার আধার (শিলা) একইভাবে থাকে, তার কোনো তারতম্য হয় না। এইভাবেই জলে কখনো মাছ আসে, কখনো সাপ ও অন্যান্য জন্তু আসে, কখনো কাঠ ভেসে যায়, কখনো ফুল, কখনো নোংরা পদার্থ, কখনো শব ভেসে যায় আবার কখনো জীবিত ব্যক্তি সাঁতার কাটতে থাকে। এগুলি আসে আবার চলেও যায়, কিন্তু শিলাগাত্র অচল ও নির্বিকারভাবে স্থিত থাকে। এইভাবেই সমস্ত দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, ক্রিয়া, অবস্থা, পরিস্থিতি, ঘটনাদি নিরন্তর ঘটে চলেছে, কিন্তু স্ব-স্বরূপ (চিন্ময় সত্তা) সর্বদা অবিচল থাকেন। দেশ, কাল ইত্যাদিতে পরিবর্তন হয়, স্ব-স্বরূপে নয়।

'যঃ পশ্যতি স পশ্যতি'—এই পদটি পঞ্চম অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে সাধনের বিষয়ে বলা হয়েছে এবং উপস্থিত শ্লোকে সিদ্ধির বিষয়ে উক্ত হয়েছে। পরবর্তী অষ্টাদশ অধ্যায়ের ষোড়শ শ্লোকে ব্যতিরেক রীতিতে বলা হয়েছে যে, যে আত্মাকে কর্তা দেখে, সেই দুর্মতি সঠিক দেখে না—**'ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ'**।

※ ※ ※

সম্বন্ধ— এবারে ভগবান বিনাশশীল সমস্ত প্রাণীতে অবিনাশী পরমাত্মাকে অবলোকন করার ফল জানাচ্ছেন।

সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥ ২৮ ॥

[**হি, সর্বত্র** (কারণ সর্বত্র) ; **সমবস্থিতম্** (সমভাবে অবস্থিত) ; **ঈশ্বরম্** (ঈশ্বরকে) ; **সমম্, পশ্যন্** (সমরূপে দেখেন যে ব্যক্তি) ; **আত্মনা, আত্মানং** (তিনি আপনাকে আপনি) ; **ন, হিনস্তি** (হিংসা করেন না) ; **ততঃ** (সেইজন্য) ; **পরাম্, গতিম্** (পরম গতি) ; **যাতি** (প্রাপ্ত হন।)]

যেহেতু যিনি সর্বত্র সমান ও সমভাবে অবস্থিত ঈশ্বরকে দেখেন, তিনি আপনাকে আপনি হিংসা (হনন) করেন না, সেইজন্য তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন॥ ২৮ ॥

ব্যাখ্যা—'সমং পশ্যন্ হি .... হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং'—যে ব্যক্তি স্থাবর-জঙ্গম, জড়-চেতন প্রাণীতে, উচ্চ-নীচ যোনিতে, ত্রিলোকে সমভাবে পরিপূর্ণ পরমাত্মাকে অবলোকন করেন অর্থাৎ এই পরমাত্মার সঙ্গে নিজের অভিন্নতা অনুভব করেন, তিনি নিজে নিজেকে হত্যা করেন না।

যিনি শরীরের সঙ্গে তাদাত্ম্য করে শারীরিক বৃদ্ধিতে নিজের বৃদ্ধি এবং শারীরিক কৃশতাকে নিজের কৃশতা, শারীরিক রোগকে নিজের রোগ এবং শারীরিক রোগমুক্তিকে নিজ রোগমুক্তি, শরীরের জন্ম নেওয়াতে নিজের জন্ম এবং শরীরের মৃত্যুকে নিজের মৃত্যু বলে মনে করেন ও শরীরের বিকারগুলি নিজেরই বিকার বলে মেনে নেন, তিনি আপনাকে আপনি হত্যা করেন অর্থাৎ নিজেকে জন্ম-মৃত্যু চক্রে যুক্ত করেন। কিন্তু যাঁর দৃষ্টি শরীরের দিকে না গিয়ে শুধুমাত্র সর্বব্যাপী, সর্বশাসক পরমাত্মার দিকে যায়, তিনি নিজেকে হনন করেন না অর্থাৎ জগৎ ও শরীরের কোনো বিকারে প্রভাবিত হন না। তাই তিনি জন্ম-মৃত্যু চক্রে পতিত হন না।

প্রকৃতপক্ষে নিজেই নিজেকে (স্বরূপকে) হত্যা অর্থাৎ নাস্তি কেউ কখনো করতে পারে না এবং নিজের কখনো নাস্তি হতেও পারে না, আর নিজের নাস্তি কেউ চায়ও না। বাস্তবে বিনাশশীল শরীরের সঙ্গে তাদাত্ম্য করাই হল আপনাকে হনন করা, নিজের পতন ঘটানো এবং জন্ম-মৃত্যুর আবর্তনে পতিত হওয়া।

'ততো যাতি পরাং গতিম্'—শরীরের সঙ্গে তাদাত্ম্য করে যেসব প্রাণী উচ্চ-নীচ যোনিতে বারংবার জন্ম ও মৃত্যু বরণ করে, তারা যখন পরমাত্মার সঙ্গে নিজ অভিন্নতা অনুভব করে, তখন তারা পরমগতি অর্থাৎ নিত্যপ্রাপ্ত পরমাত্মাকে লাভ করে।

মর্মার্থ

পরমাত্মতত্ত্ব সর্বদেশে, সর্বকালে, সমস্ত জীবের মধ্যে সর্ববস্তুতে, সম্পূর্ণ ঘটনাবলীতে, সর্বপরিস্থিতিতে, সমস্ত ক্রিয়াতে অবস্থিত। এই পরমাত্মতত্ত্ব সর্বত্র একরূপে, সমরীতিতে একইভাবে পরিপূর্ণ। একে প্রাপ্ত করা যদি কঠিন হয় তাহলে সহজ কী হতে পারে? যেখানে চাও, সেখানেই লাভ করা সম্ভব। বাস্তবে এই জগতের যে অস্তিত্ব-ভাব প্রতিভাত হয় তা আসলে জগতের নয়। কারণ সংসার একমুহূর্তেও স্থিরভাবে থাকে না, এটি অনবরত পরিবর্তিত হচ্ছে। জগৎ পরিবর্তনেরই সমষ্টি। যেমন, বৈদ্যুতিক পাখা ঘুরলে সেটি এক চক্র-বিশিষ্ট বলে মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিক তা নয়, পাখাগুলি সমষ্টিগতভাবে একচক্ররূপে প্রতিভাত হয় মাত্র। তেমনই এই জগৎ 'নেই' হয়েও 'আছে' বলে পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এক পরমাত্মতত্ত্বই 'আছে' রূপে বিদ্যমান।

বিচার করে দেখতে হয়, এখন যত শরীরাদি পরিলক্ষিত হয়, সেগুলি কি একশত বছর আগে ছিল? আর একশত বছর পরেও কি থাকবে? এগুলি আগেও ছিল না আর শেষাবধিও থাকবে না; সুতরাং মধ্যবর্তীকালেও নেই। কিন্তু পরমাত্মা জগৎ সৃষ্টির আগেও ছিলেন, জগৎ লয় হলেও থাকবেন, সুতরাং মধ্যবর্তীকালে একইভাবে পরিপূর্ণ রয়েছেন। যা আগে ছিল না, পরে থাকবে না, তা বর্তমানেও নেই; যা আগে ছিল, পরেও থাকবে, তা বর্তমানেও আছে। সুতরাং জগতের যে 'আছে'-ভাব দেখা যায়, তা ভুল। পরমাত্মতত্ত্বই 'আছে' রূপে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। সেই পরমাত্মতত্ত্বের সত্তার জন্যই এই অসৎ জগৎ-সংসার মোহ (মূঢ়তা)বশতঃ সত্তাবান বলে প্রতিভাত হয়—

জাসু সত্যতা তেঁ জড় মায়া। ভাস সত্য ইব মোহ সহায়া॥

(শ্রীরামচরিতমানস ১।১১৭।৪)

মোহ না থাকলে, এই জগৎ-সংসার দৃশ্যমান হয় না, এক পরমাত্মতত্ত্বই পরিলক্ষিত হয়—**'বাসুদেবঃ সর্বম্'** (গীতা ৭।১৯)। কারণ পরমাত্মাই ছিলেন, তিনিই থাকবেন, মাঝখানে অন্য কেউ কোথা থেকে আসবে? সোনার যত গহনা আছে, তাতে আগে সোনাই ছিল, পরেও সোনাই থাকবে; তাহলে মাঝখানে সোনা ব্যতীত আর কিছু কী করে আসবে? শুধুমাত্র রূপ, আকৃতি ও ব্যবহারের জন্যই বলা হয় গহনা; তত্ত্বতঃ এটি তো সোনাই। তেমনই জগৎ-সংসার শুধু এক নাম মাত্র, তত্ত্বতঃ এ তো পরমাত্মাই। সেই পরমাত্মাকে অনুভব করাই হল মনুষ্যজন্মের সার্থকতা।

'আছে' (পরমাত্মা)-কে অনুভব না করে 'এই' (জগৎ)-এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়া মনুষ্যত্ব নয়, এটি হল পশুত্ব। এই পশুত্ব ত্যাগ করতে হয়—**'পশুবুদ্ধি মিমাং জহি'** (শ্রীমদ্ভাগবত ১২।৫।২)। তাই ভগবান বলেছেন যে যিনি বিনাশশীল প্রাণীদের মধ্যে অবিনাশী পরমাত্মাকে দর্শন করেন, তাঁর দেখাই সত্য। কিন্তু যিনি কেবল বিনাশশীল প্রাণীদেরই দেখেন এবং অবিনাশীর সন্ধান পান না, তিনি আত্মঘাতী—

যোঽন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা প্রতিপদ্যতে।
কিং তেন ন কৃতং পাপং চৌরেণাত্মাপহারিণা॥

(মহাভারত, উদ্যোগপর্ব ৪২।৩৭)

যিনি অন্য প্রকারের (অবিনাশী) হয়েও আত্মাকে অন্যরূপ (বিনাশশীল) বলে মনে করেন, সেই আত্মঘাতক চোর কোন্ পাপ না করে?

যিনি বিনাশশীল জগৎ না দেখে সর্বত্র সমভাবে পরিপূর্ণ পরমাত্মতত্ত্ব দেখেন, তিনি আত্মঘাতী হন না, অর্থাৎ আপনাকে আপনি হনন করেন না, তাই তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন। কিন্তু যিনি সর্বত্র সমভাবে পরিব্যাপ্ত পরমাত্মতত্ত্ব না দেখে জগৎ-সংসার-শরীরাদি দেখে থাকেন, সেই আত্মঘাতী পরমগতি প্রাপ্ত না হয়ে বারংবার জন্ম-মৃত্যু বরণ করেন এবং দুঃখ ভোগ করেন। তাই মানুষ যেন নিজেই নিজের উদ্ধার সাধন করে, নিজেই নিজের পতন ডেকে না আনে (গীতা ৬।৫)।

যেমন দর্পণের মধ্যে মুখ না থাকলেও মুখ দেখা যায় এবং স্বপ্নে হাতি না থাকলেও হাতি দেখা যায়, তেমনই জগৎ না হয়েও জগৎ পরিলক্ষিত হয়। জগৎ-সংসারের দিকে দৃষ্টি না থাকলে জগৎ-সংসার 'আছে' বলে পরিলক্ষিত হবে না, সাধক যদি এই কথা দৃঢ়তার সঙ্গে মেনে নেন, তাহলে এখনই দর্শন না পেলেও তিনি দর্শন লাভ করবেনই। যেমন, সাধকের বৃন্দাবনে বসবাসের সময় বৃন্দাবনকে স্মরণ করতে হয় না। শোওয়ার সময়, খাওয়ার সময়, প্রত্যেক কার্যের সময় বৃন্দাবনকে স্মরণ করেন না, কিন্তু 'আমি বৃন্দাবনে অবস্থান করছি'—এই ব্যাপারে তাঁর কোনোই সন্দেহ থাকে না। সেটি স্মরণ না করলেও স্মৃতিতে থাকে। তেমনই এখন যদি পরমাত্মাকে না-ও দেখা যায়, তবুও সাধক যদি দৃঢ়তার সঙ্গে মেনে নেন যে 'আছে'রূপে একমাত্র পরমাত্মাই বিদ্যমান, জগৎ-সংসার নয়, তাহলে পরে তাঁর পরমাত্মা অনুভূত হতে থাকবে। কারণ মিথ্যা বস্তু কতদিন টিকে থাকবে এবং সত্য বস্তু কতদিন লুক্কায়িত হয়ে থাকবে ?

পরিশিষ্ট-ভাব—সাতাশ-আঠাশতম শ্লোকে প্রকৃতপক্ষে আত্মারই বর্ণনা করা হয়েছে ; কিন্তু 'পরমেশ্বর' এবং 'ঈশ্বর' নামে বলায় এই শ্লোকগুলির ব্যাখ্যায় পরমাত্মারই বর্ণনা করা হয়েছে ; কারণ আত্মার পরমাত্মার সঙ্গে সাধর্ম্য বর্তমান (১৩।২২)।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—এই অধ্যায়ের ছাব্বিশতম শ্লোকে ভগবান ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগের কথা বলেছেন। এই সংযোগের থেকে মুক্তি পাবার দুটি উপায়—পরমাত্মার সঙ্গে নিজ স্বতঃসিদ্ধ সম্বন্ধকে জানা এবং প্রকৃতি (শরীর) থেকে নিজের মেনে নেওয়া সম্পর্ক পরিত্যাগ করা। সাতাশ-আটাশতম শ্লোকে পরমাত্মার সঙ্গে সম্পর্ক জানার কথা বলেছেন। এখন পরবর্তী দুটি শ্লোকে প্রকৃতি থেকে সম্পর্ক ত্যাগ করার কথা বলেছেন।

প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্যতি॥ ২৯ ॥

[**যঃ, কর্মাণি** (যিনি সমস্ত কর্মই) ; **সর্বশঃ** (সর্বপ্রকারে) ; **প্রকৃত্যা, এব** (প্রকৃতি দ্বারাই) ; **ক্রিয়মাণানি, পশ্যতি** (সংঘটিত দেখেন) ; **তথা, আত্মানম্** (এবং নিজেকে) ; **অকর্তারম্** (অকর্তারূপে) ; **পশ্যতি** (অনুভব করেন) ; **সঃ, চ** (তিনিই যথার্থদর্শী।)]

যিনি সমস্ত কর্মই সর্বপ্রকারে প্রকৃতি দ্বারা সংঘটিত দেখেন এবং নিজেকে অকর্তারূপে অনুভব করেন, তিনিই যথার্থ দ্রষ্টা॥ ২৯ ॥

ব্যাখ্যা—'প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ'—চেতনতত্ত্ব বাস্তবে স্বতঃই স্বাভাবিকভাবে নির্বিকার, সম এবং শান্তরূপে অবস্থিত। সেই চেতন তত্ত্বের (পরমাত্মার) শক্তিতে প্রকৃতি স্বতঃই ক্রিয়াশীল। এতে নিত্য-নিরন্তর ক্রিয়া হতে থাকে **'প্রকর্ষেণ করণং (ভাবে ল্যুট) ইতি প্রকৃতিঃ'**। যদিও প্রকৃতিকে সক্রিয় এবং অক্রিয়—দুই অবস্থাসম্পন্ন (সর্গ[১] অবস্থায় সক্রিয় এবং প্রলয়[১] অবস্থায় অক্রিয়) বলা হয়, তবুও সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে প্রলয় অবস্থাতেও তার ক্রিয়াশীলতা অনবরত বজায় থাকে। কারণ যখন প্রলয় আরম্ভ হয়, তখন প্রকৃতি সর্গের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। প্রকৃতিতে এইরূপ সূক্ষ্ম ক্রিয়া চলতেই থাকে। প্রকৃতির সূক্ষ্ম ক্রিয়াকেই অক্রিয় অবস্থা বলা হয়। কারণ এই অবস্থায় সৃষ্টি রচনাদি কার্য হয় না। কিন্তু মহাসর্গে[১] যখন এই জগৎ সৃষ্টি হয়, তখন সর্গের আরম্ভ থেকে সর্গের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত প্রকৃতি সর্গের দিকে চলতে থাকে আর সর্গের মধ্য ভাগ এলে প্রকৃতি প্রলয় অভিমুখে চলতে থাকে। এইরূপ প্রকৃতির স্থূল ক্রিয়াকে সক্রিয়া অবস্থা বলা হয়। যদি প্রলয় এবং মহাপ্রলয়ে[১] প্রকৃতিকে ক্রিয়াহীন বলে মানা হয়, তাহলে

[১]ব্রহ্মার একটি দিবসের সময়কালকে বলা হয় সর্গ বা কল্প এবং ব্রহ্মার একটি রাতের সময়কালকে বলা হয় প্রলয়। এইরূপে একশত বছর (যা হল ব্রহ্মার আয়ু) অতিক্রান্ত হলে ব্রহ্মাও যখন লয় প্রাপ্ত হন তখন হয় মহাপ্রলয় এবং পুনরায় ব্রহ্মার সৃষ্টি হলে আরম্ভ হয় মহাসর্গ। এখানে এটি জ্ঞাতব্য যে ব্রহ্মার আয়ুর অর্থাৎ একশত বছরের সমপরিমাণ কালই হল মহাপ্রলয়ের সময়কাল।

প্রলয়-মহাপ্রলয়ের আদি, মধ্য, অন্ত কী করে সম্ভব হয় ? এই তিনটিই তো প্রকৃতির সূক্ষ্ম ক্রিয়ার ফলেই সম্ভবপর হয়। তাই সর্গ অবস্থার থেকে প্রলয় অবস্থায় অপেক্ষাকৃত অক্রিয় হলেও তা সর্বতোভাবে ক্রিয়াহীন নয়।

সূর্যের উদয় হলে, তা মধ্যগগনে আসে এবং পরে অস্তাচলে যায়। এতে বোঝা যায় যে প্রাতঃকালে সূর্যোদয় হলে তার প্রভা মধ্যাহ্ন পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং মধ্যাহ্ন থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রভা কম হতে থাকে। সূর্যাস্তের পর অর্ধেক রাত পর্যন্ত অন্ধকার বাড়তে থাকে এবং অর্ধেক রাতের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত অন্ধকার কম হতে থাকে। আসলে আলো এবং অন্ধকারের যে সূক্ষ্মরূপ সন্ধিকাল তাই হল মধ্যাহ্ন এবং মধ্যরাত, কিন্তু তা সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের সময়ই স্পষ্টভাবে দেখা যায়। এইভাবে দেখলে বোঝা যায় যে, আলোর প্রকাশ এবং অন্ধকারের ক্রিয়া লোপ পায় না, বরং বহমানই থাকে। এইরূপই সর্গ (কল্প) এবং প্রলয়, মহাসর্গ এবং মহাপ্রলয়ে প্রকৃতির ক্রিয়া সূক্ষ্মভাবে নিরন্তর হতেই থাকে[১]।

এই ক্রিয়াশীল প্রকৃতির সঙ্গে যখন পুরুষ সম্বন্ধ স্থাপন করে, তখন শরীর দ্বারা হওয়া স্বাভাবিক ক্রিয়াগুলি (তাদাত্ম্যের জন্য) নিজের বলে প্রতীত হতে থাকে।

'যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্যতি'—প্রকৃতি এবং তার কার্য স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণশরীরে খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরা, ওঠা-বসা, শোওয়া-জাগা, চিন্তা করা, সমাধিস্থ হওয়া ইত্যাদি যে সমস্ত ক্রিয়া হয়, সে সবই প্রকৃতির দ্বারাই হয়ে থাকে, স্বয়ং-এর দ্বারা নয়। কারণ স্বয়ং-এ কোনো ক্রিয়া হয়ই না—যে এটি দেখে অর্থাৎ অনুভব করে, বাস্তবে সে-ই ঠিক দেখে। কারণ এরূপভাবে দেখলে নিজের মধ্যে অকর্তৃত্ব (অকর্তাভাব) অনুভূত হয়।

এখানে ক্রিয়াগুলি প্রকৃতির দ্বারা সংঘটিত হয় বলা হয়েছে, কোথাও গুণাদির দ্বারা সংঘটিত হয় বলে বলা হয়েছে, আবার কোথাও ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা হয় বলে বলা হয়েছে—এই তিনটি কথাই আসলে এক। প্রকৃতি সব কিছুর কারণ, গুণ হল প্রকৃতির কার্য এবং গুণাদির কার্য হল ইন্দ্রিয়াদি। অতএব প্রকৃতি, গুণ এবং ইন্দ্রিয়—এগুলির দ্বারা যে ক্রিয়া সংঘটিত হয় তা সবই প্রকৃতির দ্বারা সংঘটিত বলা হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব—ক্রিয়াগুলি সবই প্রকৃতিতে ঘটে। এতে জীবের কোনো হাত নেই। প্রকৃতির দ্বারা সংঘটিত ক্রিয়াগুলিকে গীতায় কোথাও 'গুণাদির দ্বারা সংঘটিত ক্রিয়া' এবং কোথাও 'ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা সংঘটিত ক্রিয়া' বলা হয়েছে ; যেমন—'সমস্ত কর্ম সর্বপ্রকারে প্রকৃতির গুণাদির সাহায্যে সংঘটিত হয়'—**'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণিসর্বশঃ'** (৩।২৭) ; 'গুণই গুণাদিতে আবর্তিত হয়'—**'গুণা গুণেষু বর্তন্তে'** (৩।২৮) ; 'গুণাদি ব্যতীত অন্য কেউই কর্তা নয়'—**'নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি'** (১৪।১৯) ; 'ইন্দ্রিয় সমূহই ইন্দ্রিয়াদির বিষয়ে আবর্তিত হয়'—**'ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্তে'** (৫।৯) ইত্যাদি। তাৎপর্য হল যে ক্রিয়ামাত্রেই প্রকৃতিজনিত। প্রকৃতি কখনোই ক্ষণমাত্র অক্রিয় থাকে না এবং পুরুষ কখনো ক্রিয়াশীল হয় না। তাই গীতায় বলা হয়েছে যে তত্ত্বজ্ঞ সাংখ্যযোগী অনুভব করেন যে 'আমি (স্ব-স্বরূপ) কোনো কিছু করি না'—**'নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ'** (৫।৮) ; স্ব-স্বরূপ নিজেও কিছু করেন না এবং কিছু করানও না—**'নৈব কুর্বন্ ন কারয়ন্'** (৫।১৩) ; এই পুরুষ শরীরে বাস করেও কিছু করেন না এবং লিপ্ত হন না—**'শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে'** (১৩।৩১) ; যে আত্মাকে কর্তা বলে মনে করে, সেই দুর্মতি সঠিক বোঝে না ; কারণ তার বুদ্ধি শুদ্ধ নয়—**'তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মানং ....'** (১৮।১৬) ইত্যাদি।

*** *** ***

যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥ ৩০ ॥

[**যদা** (যখন) ; **ভূতপৃথগ্ভাবম্** (প্রাণীদের পৃথক পৃথক ভাবগুলিকে) ; **একস্থম্** (এক প্রকৃতিতেই অবস্থিত) ; **অনুপশ্যতি**, চ

[১]মহাসর্গে সময়ের গণনা করা হয় সূর্যের সাহায্যে ; কিন্তু মহাপ্রলয়ে সূর্যও লীন হয়ে যায়। তাই মহাসর্গের কাল থেকেই মহাপ্রলয়ের কালের গণনা শুরু হয়। মহাপ্রলয়ের কালের গণনার একমাত্র উপায় হল নিত্য, চেতন, অবিনাশী পরমাত্মতত্ত্ব।

(দেখেন এবং) ; ততঃ, এব (সেই প্রকৃতি থেকেই) ; বিস্তারম্ (বিস্তার অনুভব করেন) ; তদা (তখন তিনি) ; **ব্রহ্ম, সম্পদ্যতে** (ব্রহ্মকে লাভ করেন।)]

যখন সাধক প্রাণীসমূহের পৃথক পৃথক ভাবগুলি এক প্রকৃতিতেই অবস্থিত দেখেন এবং সেই প্রকৃতি থেকেই তাদের বিস্তার অনুভব করেন, তখন তিনি ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন॥ ৩০ ॥

ব্যাখ্যা—[প্রকৃতির দুটি রূপ—ক্রিয়া এবং পদার্থ। ক্রিয়া থেকে সম্বন্ধ ছেদ করার জন্য উনত্রিশতম শ্লোকটি বলা হয়েছে, ত্রিশতম (এই) শ্লোকে পদার্থ থেকে সম্বন্ধ ছেদ করার কথা বলা হয়েছে।]

'যদা ভূতপৃথগ্ ভাবং ..... ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা'—যখন সাধক সমস্ত প্রাণীদের পৃথক্ পৃথক্ ভাবগুলি অর্থাৎ ত্রিলোকে যতপ্রকার প্রাণী উৎপন্ন হয় সেই প্রাণীদের স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ শরীরগুলি একই প্রকৃতিতেই অবস্থিত দেখেন, তখন তিনি ব্রহ্মলাভ করেন।

ত্রিলোকে স্থাবর-জঙ্গম প্রাণীদের শরীর, নাম, রূপ, আকৃতি, মনোবৃত্তি, গুণ, বিকার, উৎপত্তি, স্থিতি, প্রলয় ইত্যাদি সবই একই প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন হয়। সকল প্রাণীর শরীরই প্রকৃতি থেকেই উৎপন্ন হয়, প্রকৃতিতেই অবস্থান করে এবং প্রকৃতিতেই লীন হয়। এইরূপ যিনি দেখেন তিনি ব্রহ্মলাভ করেন অর্থাৎ প্রকৃতির অতীত স্বতঃসিদ্ধ নিজ স্বরূপ পরমাত্মতত্ত্ব লাভ করেন। আসলে এই স্ব-স্বরূপ প্রথম থেকেই প্রাপ্ত, শুধুমাত্র প্রকৃতিজাত বস্তুগুলির সঙ্গে সম্পর্ক মেনে নেওয়াতেই তাঁর প্রকৃত স্বরূপের অনুভূতি হয় না। কিন্তু যখন তিনি সবকিছু প্রকৃতিতেই স্থিত এবং প্রকৃতি থেকেই উদ্ভূত দেখেন, তখন তাঁর নিজ স্বতঃ স্বাভাবিক স্বরূপ অনুভূত হয়।

যেমন, পৃথিবীতে উৎপন্ন হওয়া যতপ্রকার স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণী থাকে এবং তাদের শরীরে যা কিছু পরিবর্তন হয়,[১] ক্রিয়াদি হয়[২] সে সবই পৃথিবীতেই (পৃথিবী-তত্ত্বেই) হয়। তেমনই প্রকৃতি হতে উৎপন্ন যতপ্রকার গুণ, বিকার আছে এবং তাতে যা কিছু পরিবর্তন হয়, হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, তা সবই প্রকৃতিতেই হয়। তাৎপর্য হল যে পৃথিবীতে উৎপন্ন পদার্থগুলি যেমন পৃথিবীতে অবস্থান করায় এবং পৃথিবীতেই লীন হওয়ায় সেগুলি পৃথিবীরই রূপ, তেমনই প্রকৃতি হতে জাত সমস্ত জগৎ প্রকৃতিতেই অবস্থান করায় ও প্রকৃতিতেই লীন হওয়ায় সেগুলি প্রকৃতিরই রূপ। এইরূপ স্থাবর-জঙ্গম প্রাণীদের রূপে যে চেতন-তত্ত্ব, তা নিরন্তর পরমাত্মাতে অবস্থিত। প্রকৃতির সাহচর্যে প্রাণী- দেহে যত বিকারই পরিলক্ষিত হোক, তত্ত্ব সর্বদাই অসঙ্গ (আসক্তি-বর্জিত) থাকে। এরূপ স্পষ্টভাবে অনুভূত হলে সাধক ব্রহ্মলাভ করেন।

প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করে স্বার্থ-বুদ্ধি, ভোগ-বুদ্ধি, সুখ-বুদ্ধি ইত্যাদি হৃদয়ে পোষণ করে প্রাণীদের পৃথক পৃথক ভাবে দেখলে রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ উৎপন্ন হয়—এই হল নিয়ম। (অনু-)রাগ হলে তারমধ্যে গুণ পরিলক্ষিত হয় এবং দ্বেষ হলে দোষ পরিলক্ষিত হয়। তাই দৃষ্টির সামনে রাগ-দ্বেষ-রূপ পর্দা থাকায় প্রকৃত সত্য অনুভূত হয় না। কিন্তু যখন সাধক নিজের বলে কথিত স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ-শরীরসহ সমস্ত প্রাণীর শরীরের উৎপত্তি, স্থিতি এবং বিনাশ প্রকৃতিতেই অনুভব করেন এবং নিজের মধ্যে তার অভাব বোধ করেন, তখন তাঁর দৃষ্টির সামনে থেকে রাগ-দ্বেষরূপ পর্দা সরে যায় এবং তাঁর স্বতঃই স্বাভাবিক পরমাত্মতত্ত্ব অনুভূত হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব— আগের শ্লোকে ব্যক্তির কথা আর এই শ্লোকে কালের কথা বলা হয়েছে।

ভক্তির প্রকরণে ভগবান সমস্ত ভাবই তাঁর মধ্যে স্থিত বলে জানিয়েছেন—**'ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ'** (১০।৫), কিন্তু এখানে জ্ঞানের প্রকরণে সব ভাবই প্রকৃতিতে অবস্থিত বলে জানিয়েছেন। অর্থাৎ যেখানে সৎ-অসতের

---

[১]প্রথমে মাটি এবং বীজকে নিয়ে ওজন করে একটি পাত্রে সেই মাটি রেখে তারপর বীজ বপন করো এবং জল সেচন করো। ফসল হয়ে গেলে তাকে কেটে নাও এবং মাটি শুকোতে দাও। মাটি শুকিয়ে গেলে মাটি এবং আনাজ ওজন করে দেখলে দেখা যায় মাটির ওজন কম এবং আনাজের ওজন বেশি হচ্ছে। এটি হল মাটির (পৃথিবী) আনাজে রূপান্তর হওয়া।

[২]ক্রিয়া দু'প্রকার—হওয়া এবং করা। শিশুর যৌবন থেকে বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি 'হয়' আর খাওয়া-দাওয়া, শোওয়া প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি হল 'করার' অন্তর্গত। এইসব ক্রিয়াই শরীরে হয়।

বিভাগ করেছেন, সেখানে সকল ভাবই অসতের বলেছেন, আর যেখানে সমগ্রের কথা বলেছেন, সেখানে সব ভাবই তাঁর বলে জানিয়েছেন। সমগ্রতে সৎ-অসৎ সবই পরমাত্মা—'সদসচ্চাহম্' (৯।১৯)।

সম্বন্ধ—বাইশতম শ্লোকে যাকে দেহের অতীত বলা হয়েছে, পূর্বের এবং (ত্রিশতম) শ্লোকে যাকে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া বলা হয়েছে, সেই পুরুষ (চেতন)-এর প্রকৃত স্বরূপের বর্ণনা পরবর্তী শ্লোকে করা হয়েছে।

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥ ৩১ ॥

[**কৌন্তেয়** (হে কৌন্তেয়!) ; **অয়ম্** (এই) ; **অনাদিত্বাৎ** (অনাদিও) ; **নির্গুণত্বাৎ** (গুণরহিত হওয়ায়) ; **অব্যয়ঃ** (অবিনাশী) ; **পরমাত্মা** (পরমাত্মস্বরূপই) ; **শরীরস্থঃ, অপি** (এই শরীরে অবস্থান করেও) ; **ন, করোতি** (তিনি কিছুই করেন না) ; **ন, লিপ্যতে** (কোনো কিছুতে লিপ্তও হন না।)]

হে কৌন্তেয়! এই পুরুষ স্বয়ং অনাদি ও গুণরহিত হওয়ায় তিনি অবিনাশী পরমাত্মস্বরূপই। এই শরীরে অবস্থান করেও তিনি কিছুই করেন না এবং কোনো কিছুতে লিপ্তও হন না॥ ৩১ ॥

ব্যাখ্যা—**'অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ'**—এই অধ্যায়ের উনিশতম শ্লোকে যাঁকে অনাদি বলা হয়েছে, তাঁকেই এখানে **'অনাদিত্বাৎ'** পদের দ্বারা অনাদি বলা হয়েছে অর্থাৎ এই পুরুষ আদি (আরম্ভ) রহিত। এখন প্রশ্ন হল যে সেখানে তো প্রকৃতিকেও অনাদি বলা হয়েছে, তাহলে প্রকৃতি ও পুরুষ—উভয়ের পার্থক্য কী? তার উত্তরে ভগবান বলেছেন যে, **'নির্গুণত্বাৎ'** অর্থাৎ এই পুরুষ গুণাদিরহিত। প্রকৃতি অনাদি হলেও তা গুণাদিরহিত নয়, বরং তা গুণ ও বিকারাদিসম্পন্ন। তার দ্বারা সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিনটি গুণ ও বিকার উৎপন্ন হয়। কিন্তু পুরুষ এই তিনটি গুণ এবং বিকার হতে সর্বতোভাবে মুক্ত (নির্গুণ ও অবিকারী)। তাই এই পুরুষই সাক্ষাৎ হলেন অবিনাশী পরমাত্মস্বরূপ অর্থাৎ এই পুরুষ বিনাশরহিত পরমশুদ্ধ আত্মা।

'শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে'—এই পুরুষ শরীরে অবস্থান করলেও কিছু করেন না বা কোনো কর্মে লিপ্ত হন না। তাৎপর্য হল এই যে, এই পুরুষ (স্বয়ং) পূর্বেও কোনো অবস্থায় কিছু করেননি, বর্তমানেও কিছু করেন না এবং পরেও ইনি কিছুই করবেন না অর্থাৎ তিনি সর্বদাই প্রকৃতি থেকে নির্লিপ্ত, সঙ্গ (আসক্তি) বর্জিত, গুণাদিরহিত এবং অবিনাশী। এঁর মধ্যে কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব বলে কিছু নেই।

এখানে **'শরীরস্থোঽপি'** বলার তাৎপর্য হল এই যে, যখন এই পুরুষ নিজেকে শরীরে অবস্থিত মনে করেন, নিজেকে কার্যগুলির কর্তা এবং সুখ-দুঃখের ভোক্তা বলে মনে করেন, তখনও তিনি তটস্থ এবং প্রকাশক মাত্রই থাকেন। এর ফলেই সুখ-দুঃখের আভাস হয় ; তাই একে প্রকাশক বলা হলেও এতে কিন্তু প্রকাশক-ধর্ম থাকে না।

এখানে **'অপি'** পদটিতে এমন ভাব প্রতীত হয় যে, অনাদিকাল হতে নিজেকে শরীরে অবস্থিত বলে মনে করা প্রতিটি (পিঁপড়ে থেকে ব্রহ্মা পর্যন্ত) প্রাণী স্বরূপতঃ সর্বদাই নির্লিপ্ত এবং অসঙ্গ। শরীরের সঙ্গে তার ঐক্য কখনো হয়ইনি। কারণ শরীর প্রকৃতির কার্য হওয়ায় তা সর্বদা প্রকৃতিতেই স্থিত এবং স্বয়ং পরমাত্মার অংশ হওয়ায় তা সর্বদা পরমাত্মাতেই স্থিত। স্বয়ং কখনো পরমাত্মা থেকে পৃথক হতেই পারে না। শরীরের সঙ্গে সে যতই একাত্মতা মেনে নিক, শরীরের সঙ্গে সে যতই মিলেমিশে যাক, শরীরকে নিজের স্বরূপ বলে মনে করুক, তাতে তার নির্লিপ্ততা কখনো ভঙ্গ হয় না, তা স্বরূপতঃ সর্বদাই নির্লিপ্ত থাকে। নিজ নির্লিপ্ততা অনুভূত না হলেও প্রাণীর স্বরূপে কোনো বিকৃতি হয় না। তাই সে তার স্বরূপ দ্বারা কিছু করেওনি এবং করেও না আর সে স্বয়ং কখনো লিপ্ত হয়নি এবং হয়ও না।

যদিও পুরুষ নিজেকে শরীরে অবস্থিত বলে মানলেই কর্তা এবং ভোক্তা হয়, তা সত্ত্বেও একুশতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, 'প্রকৃতি'-তে অবস্থানকারী পুরুষই ভোক্তা হয় আর এখানে বলেছেন যে, 'শরীরে' অবস্থিত হলেও পুরুষ কর্তা বা ভোক্তা হয় না। এ-কথা বলার তাৎপর্য

এই যে প্রকৃতি এবং তার কার্য শরীর—উভয়ই এক। সুতরাং পুরুষকে প্রকৃতিতেই অবস্থিত বলা হোক অথবা শরীরে স্থিত বলা হোক, তা একই। শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ামাত্রই প্রকৃতির সঙ্গে এবং অন্য শরীরাদির সঙ্গে সম্বন্ধ হয়ে যায়। বাস্তবে পুরুষের সম্বন্ধ ব্যষ্টি শরীরের সঙ্গেও থাকে না বা সমষ্টি প্রকৃতির সঙ্গেও থাকে না। শরীরের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মানলেই সে নিজেকে কর্তা বা ভোক্তা মনে করে। আসলে সে কর্তাও নয়, ভোক্তাও নয়।

পরিশিষ্ট-ভাব—পুরুষ অনাদি হলেও শরীর আদি সম্পন্ন। পুরুষ নির্গুণ, কিন্তু শরীর গুণময়। পুরুষ পরমাত্মা, কিন্তু শরীর অনাত্মা। পুরুষ অব্যয়, কিন্তু শরীর হল বিনাশশীল। তাই অজ্ঞ ব্যক্তি শরীরস্থ পুরুষকে (আত্মা) শরীরের সঙ্গে একাত্ম বলে মনে করলেও তা প্রকৃতপক্ষে শরীরে অবস্থান করে না অর্থাৎ শরীরের থেকে সর্বতোভাবে অসম্বন্ধ থাকে—**'ন করোতি ন লিপ্যতে'**। কারণ শরীরের সম্পর্ক হল জগৎ সংসারের সঙ্গে, কিন্তু পুরুষের সম্পর্ক পরমাত্মার সঙ্গে। সুতরাং বাস্তবে পুরুষ কখনো শরীরস্থ হতে পারে না। কিন্তু বাস্তব সত্যের জ্ঞান না হওয়ার জন্য মানুষ একে শরীরস্থ বলে মেনে নেয়।

'নির্গুণত্বাৎ'—পুরুষ স্বয়ং নির্গুণ হয়েও গুণাদির সঙ্গ করায় আবদ্ধ হয়ে পড়ে (গীতা ১৩।২১)। মনে হয় যে বন্ধন স্বতঃ ও স্বাভাবিক আর মুক্তি কষ্টসাধ্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মুক্তিই স্বতঃ ও স্বাভাবিক আর বন্ধনই কষ্টকৃত। পুরুষের সঙ্গে গুণাদির কোনো সম্পর্ক নেই, প্রকৃতির সঙ্গেই তার সম্পর্ক (গীতা ১৩।২৩)। তাই 'অনাদি, নির্গুণ, পরমাত্মা, অব্যয়' এবং **'ন করোতি ন লিপ্যতে'** হল স্বতঃ ও স্বাভাবিক। সাধকের এই স্বাভাবিকতা অনুভব করা উচিত।

যেমন ঘরে থাকলেও আমরা ঘরের থেকে আলাদা, তেমনই নিজেকে শরীরে স্থিত মেনে নিলেও আমরা শরীরের থেকে আলাদা।

'ন করোতি ন লিপ্যতে'—এটি সাধনাজনিত নয় বরং স্বতঃ স্বাভাবিক। তাৎপর্য হল যে, স্ব-স্বরূপে কিছুমাত্রও কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব নেই—এ হল স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। এতে কোনো পুরুষার্থ নেই, অর্থাৎ এর জন্য কিছু করার প্রয়োজন হয় না। তাৎপর্য হল, কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বকে দূর করা নয়, আসলে এগুলিকে নিজের মধ্যে স্বীকার না করা। এগুলি যে নেই তা অনুভব করতে হয়, কেন-না প্রকৃতপক্ষে এটি নিজেদের মধ্যে নেই-ই। তাই সাধকদের নিজেদের মধ্যে সর্বক্ষণ অকর্তৃত্ব এবং অভোক্তৃত্ব অনুভব করা উচিত। নিজের মধ্যে সর্বদা অকর্তৃত্ব ও অভোক্তৃত্ব (নিষ্কাম ও মমত্বহীনতা) অনুভূত হওয়াকেই বলা হয় জীবন্মুক্তি। গীতায় একেই স্মৃতি-প্রাপ্ত হওয়া বলা হয়েছে—**'নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা'** (১৮।৭৩)।

যদি স্ব-স্বরূপ কর্তা ও ভোক্তা না হয়, তাহলে কর্তা ও ভোক্তা কে? এটি বিচার করা হচ্ছে। প্রথমে বিচার করতে হবে যে কর্তা কে? শরীর কর্তা নয়, কারণ তা প্রতিমুহূর্তে ক্ষয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার—এই চারটি হল 'করণ', যাকে অন্তঃকরণ বলা হয়, অন্তঃকরণও কর্তা নয়। কারণ করণ হল কর্তার অধীন। কিন্তু কর্তা সর্বদাই স্বাধীন—**'স্বতন্ত্রঃ কর্তা'** (পাণি.অ.১।৪।৫৪)। করণ ক্রিয়ার সিদ্ধিতে অত্যন্ত সহায়ক হয়ে থাকে—**'সাধকতমং করণম্'** (পাণি.অ.১।৪।৪২), তাই করণ ব্যতীত কোনো ক্রিয়ারই সিদ্ধি হয় না। যেমন কলম স্বাধীনভাবে লিখতে পারে না, সেটি প্রকৃতপক্ষে লেখার একটি করণ (যন্ত্র), যা লেখকের (কর্তার) অধীন। অতএব করণ কর্তা হয় না এবং কর্তা করণ হয় না। দ্বিতীয়তঃ, করণে যদি কর্তাভাব থাকে তাহলে স্ব-স্বরূপ কেন সুখী বা দুঃখিত হয়? করণ যদি সুখী বা দুঃখিত হয় তাহলে আমাদের ক্ষতি কী? সৎ-স্বরূপও কর্তা নয়; কারণ অহংভাব প্রকৃতির কার্য, তা প্রকৃতির অতীত হতে পারে না। স্ব-স্বরূপে যদি কর্তাভাব থাকত, তাহলে তা কখনো লয় হত না, কারণ স্ব-স্বরূপ অবিনাশী। তাই ভগবান এখানে স্ব-স্বরূপের কর্তাভাব অস্বীকার করেছেন—**'ন করোতি'**। পরে অষ্টাদশ অধ্যায়েও ভগবান বলেছেন যে, যে ব্যক্তি আত্মাকে কর্তা বলে মনে করে, সেই দুর্মতি সঠিক বোঝে না; কারণ তার বুদ্ধি শুদ্ধ নয় (১৮।১৬)। বাস্তবে ভোক্তাই (যে সুখী বা দুঃখিত হয়) কর্তা হয়।

এবার বিচার করতে হবে ভোক্তা কে? ভোক্তা সৎও নয়, অসৎও নয়। সৎ কখনো ভোক্তা হতে পারে না, কারণ সৎ কখনো লয়প্রাপ্ত হয় না—**'নাভাবো বিদ্যতে সতঃ'**, কিন্তু ভোক্তৃত্বের লয় হয়—**'ন লিপ্যতে'**। অসৎও ভোক্তা হতে পারে না, কেন-না অসতের কোনো অস্তিত্বই নেই—**'নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ'**। অসতে চৈতন্যও নেই। অতএব এতে

ভোক্তৃত্বের কল্পনাও করা যায় না। তাৎপর্য হল যে কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব সৎ এবং অসৎ কোনোটিতেই নেই। সৎ-অসতের সংযোগেও কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব জন্মায় না। রাত ও দিনের সংযুক্তি যেমন অসম্ভব তেমনই সৎ ও অসতের সংযোগও অসম্ভব। সুতরাং কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব শুধু মেনে নেওয়া হয়—**'কর্তাহমিতি মন্যতে'** (৩।২৭)। সাধক যখন বিচার বিবেচনা দ্বারা শরীরের সঙ্গে সর্বতোভাবে সম্পর্ক ছেদ করেন অর্থাৎ আমি ও আমার ভাব দূর করেন (যা প্রকৃতপক্ষে নেই-ই), তখন কর্তাও থাকে না, ভোক্তাও থাকে না। এক চিন্ময় সত্তাই সেখানে বিরাজমান থাকে। এইভাবে নিজের মধ্যে কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বভাব দূর হলে সাধক মুক্ত হয়ে থাকেন অর্থাৎ কর্তা-ভোক্তা থাকেন না, তখন শুধুমাত্র শুদ্ধ স্বরূপ (চিন্ময় সত্তা) বিরাজ করে।

'ন করোতি ন লিপ্যতে' পদটির বিশ্লেষণ ভগবান পরবর্তী বত্রিশ-তেত্রিশতম শ্লোকে করেছেন।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে বলা হয়েছে যে সেই পুরুষ কিছু করেনও না বা কিছুতে লিপ্তও হন না, তাহলে এখন প্রশ্ন হল যে তিনি কী করে লিপ্ত হন না এবং কী করে কিছু করেন না ? পরের শ্লোকে ভগবান তার উত্তর দিচ্ছেন।

যথা সর্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥ ৩২ ॥

[যথা (যেমন) ; **সর্বগতম্, আকাশম্** (সর্বত্র পরিব্যাপ্ত আকাশ) ; **সৌক্ষ্ম্যাৎ** (অতিশয় সূক্ষ্মতা হেতু) ; **ন, উপলিপ্যতে** (কোনো কিছুতে লিপ্ত হয় না) ; **তথা, সর্বত্র** (তেমনই সর্বত্র) ; **অবস্থিতঃ, আত্মা** (পরিপূর্ণ আত্মা) ; **দেহে** (কোনো দেহতে) ; **ন, উপলিপ্যতে** (লিপ্ত হন না।)]

যেমন সর্বত্র পরিব্যাপ্ত আকাশ অতি সূক্ষ্মতা হেতু কোনো কিছুতে লিপ্ত হয় না, তেমনই সর্বত্র পরিপূর্ণ আত্মা কোনো দেহে লিপ্ত হন না॥ ৩২ ॥

ব্যাখ্যা—[পূর্বশ্লোকে ভগবান **'ন করোতি'** পদের দ্বারা প্রথমে কর্তৃত্বের এবং পরে **'ন লিপ্যতে'** পদের দ্বারা উপভোগ্যতার নাস্তি জানিয়েছেন। কিন্তু ওই দুটি বিবেচনা করে এই শ্লোকে প্রথমে ভোগাকাঙ্ক্ষার নাস্তিরই কথা জানানো হয়েছে এবং পরের শ্লোকে কর্তৃত্বের নাস্তির কথা বলা হয়েছে। এখানে এই বিভিন্নতা রাখায় ভগবানের অভিপ্রায় কী ? এর উত্তর হল যে যদিও কর্তৃত্বের পরই ভোগাকাঙ্ক্ষা হয় অর্থাৎ কর্ম করার পরই সেই কর্মের ফলভোগ হয়, তবুও মানুষ যা কিছু করে, প্রথমেই তার ফলের (সিদ্ধির) উদ্দেশ্য মনে রেখেই করে। সুতরাং মনে আগে ভোগেচ্ছা আসে, পরে সেই অনুসারে কাজ করা হয় অর্থাৎ পরে কর্তৃত্ব আসে। এই দৃষ্টিতে দেখলে ভগবান এখানে সর্বপ্রথম ভোগেচ্ছাকে ত্যাগ করার কথা জানাচ্ছেন। ভোগেচ্ছা (লিপ্ততা) ত্যাগ হলে কর্তৃত্ব স্বতঃই পরিত্যক্ত হয় অর্থাৎ ফলেচ্ছা ত্যাগ হলে ক্রিয়া করলেও কর্তৃত্ব হয় না।]

'যথা সর্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে'—আকাশের কার্য হল বায়ু, তেজ, জল এবং পৃথিবী। অতএব আকাশ নিজের কার্য রূপ বায়ু ইত্যাদি চারটি ভূতে পরিব্যাপ্ত, কিন্তু এই চারটি আকাশে পরিব্যাপ্ত নয়। এই চারটি আকাশের অন্তর্গত, কিন্তু আকাশ এগুলির অন্তর্গত নয়। তার কারণ হল এইগুলি আকাশের থেকে স্থূল এবং আকাশ এদের থেকে সূক্ষ্ম। এই চারটি সীমিত ও সান্ত আর আকাশ অসীম, অনন্ত। এই চার ভূতে বিকার উৎপন্ন হয় কিন্তু আকাশ বিকাররহিত।

'সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে'—যেমন আকাশ বায়ু ইত্যাদি চারটি ভূতে থেকেও এসবে লিপ্ত হয় না, তেমনই সর্বত্র, সর্বদেহে অবস্থানকারী আত্মা কোনো শরীরেই লিপ্ত হন না। আত্মা সর্বত্র পরিপূর্ণ হয়েও কিছুতে মিলে-মিশে যান না। তিনি সর্বদাই সর্বতোভাবে নির্লিপ্ত থাকেন। কারণ আত্মা স্বয়ং নিত্য, সর্বগত, স্থাণু, অচল, সনাতন, অব্যক্ত, অচিন্ত্য এবং অবিকারী (গীতা ২।২৪-২৫), এই অবিনাশী আত্মা দ্বারাই এই জগৎ-সংসার পরিব্যাপ্ত (গীতা ২।১৭)।

পরিশিষ্ট-ভাব—চিন্ময় সত্তা একটিই, অহংবশতঃ তা পৃথক পৃথক রূপে প্রতিভাত হয়। অপরা প্রকৃতির অংশ 'অহং'-কে আশ্রয় করার জন্যই জীবকে 'অংশ' বলা হয়—**'মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ'** (গীতা ১৫।৭)। যদি এটি অহংকে আশ্রয় না করে তাহলে শুধুমাত্র একটি সত্তা (অস্তিত্ব) থাকে। অস্তিত্ব ব্যতীত সবই কল্পনা। এই চিন্ময় সত্তা সকল কল্পনার আধার, অধিষ্ঠান, প্রকাশক এবং আশ্রয়। এই সত্তায় একদেশীয় অর্থাৎ পরিচ্ছিন্নভাব নেই। এটি সর্বব্যাপক। সমস্ত জগৎ সংসার (ক্রিয়াসমূহ ও পদার্থ) এই সত্তার অন্তর্গত। জগৎ-সংসার বিনাশশীল (উৎপন্ন হয় এবং বিনাশপ্রাপ্ত হয়), কিন্তু চিন্ময়সত্তা একই ভাবে বিরাজমান থাকে। তাৎপর্য হল যে চিন্ময় সত্তা শরীরস্থও নয় প্রকৃতিস্থও নয়। এটি আকাশের ন্যায় সর্বত্র ব্যাপৃত অর্থাৎ সকল শরীরের, সৃষ্টিমাত্রেরই বাইরে ও ভিতরে সর্বত্র পরিপূর্ণভাবে থাকে। এই সর্বব্যাপী সত্তাই আমাদের স্বরূপ এবং এটিই হল পরমাত্মতত্ত্ব। তাৎপর্য হল যে সর্বদেশীয় সত্তা একই। এটিই হল যোগীদের যোগ, জ্ঞানীদের জ্ঞান এবং ভক্তদের ভগবান। সেই চিন্ময়সত্তার দিকেই সাধকের নিরন্তর লক্ষ্য রাখা উচিত।

অহং-এর জন্যই চিন্ময় সত্তাতে পরিচ্ছিন্নতা (একদেশীয়তা) দৃষ্টিগোচর হয়। সুখলিপ্সার ওপরেই এই অহং নির্ভরশীল। সাধনরত অবস্থাতেও সাধক সুখভোগে আকৃষ্ট হন—**'সুখসঙ্গেন বধ্নাতি'** (গীতা ১৪।৬)। গুণাতীত না হওয়া পর্যন্ত এই সুখলিপ্সা থাকে। অতএব সাধকদের এই বিষয়ে খুবই সতর্ক থাকা উচিত এবং সাবধানে এই সুখলিপ্সা থেকে নিজেকে রক্ষা করা উচিত।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে ভগবান আত্মার ভোগেচ্ছা নেই বলে জানিয়েছেন, এবার পরবর্তী শ্লোকে আত্মার কর্তৃত্বহীনতার কথা জানিয়েছেন।

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত॥ ৩৩ ॥

[ভারত (হে ভরতবংশোদ্ভব অর্জুন !) ; যথা, একঃ, রবিঃ (যেমন এক সূর্য) ; ইমম্, কৃৎস্নম্ (এই সমস্ত) ; লোকম্ (জগৎ চরাচরকে) ; প্রকাশয়তি (প্রকাশিত করে) ; তথা, ক্ষেত্রী (তেমনই এক ক্ষেত্রী) ; কৃৎস্নম্, ক্ষেত্রম্ (সমস্ত ক্ষেত্রকে) ; প্রকাশয়তি (প্রকাশিত করেন।)]

হে ভরতবংশোদ্ভূত অর্জুন ! যেমন একটিই সূর্য সমস্ত জগৎ চরাচরকে প্রকাশিত করে, তেমনই এই ক্ষেত্রজ্ঞ (আত্মা) সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশিত করেন॥ ৩৩ ॥

ব্যাখ্যা—'যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ'—আমাদের দৃষ্টিগ্রাহ্য সমগ্র জগৎ-সংসারকে এবং জগতের পদার্থগুলিকে এক সূর্যই প্রকাশিত করে এবং জগতের সমস্ত ক্রিয়াই সূর্যের প্রকাশের অন্তর্গত, কিন্তু সূর্যে 'আমিই সবকিছুর প্রকাশক'—এই কর্তৃত্বভাব নেই। যেমন—সূর্যের আলোতেই ব্রাহ্মণ বেদপাঠ করেন আবার শিকারি পশুবধ করে, কিন্তু সূর্যের প্রকাশ বেদপাঠ এবং পশুবধের ক্রিয়াগুলি করা বা করানোর কারণ হয় না।

এখানে **'লোক'** শব্দটি জগৎমাত্রেরই (চতুর্দশ ভুবনের) বাচক। কারণ জগতের যা কিছু (চাঁদ, তারা, অগ্নি, মণি, সঞ্জীবনী ইত্যাদি) প্রকাশ, তা সবই সূর্যের।

'ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত'—সূর্যের মতো একই ক্ষেত্রী (ক্ষেত্রজ্ঞ, আত্মা) সকল ক্ষেত্রকে প্রকাশিত করেন অর্থাৎ সকল ক্ষেত্রেই করা এবং করানো—সমস্ত ক্রিয়াই ক্ষেত্রীর প্রকাশ দ্বারা হয়, কিন্তু ক্ষেত্রী সেই ক্রিয়াগুলি করা বা করানোর কারণ হন না।

সূর্য কেবলমাত্র স্থূল জগৎকে প্রকাশিত করে এবং সূর্যের প্রভায় স্থূল জগতের ক্রিয়াদি হয়। কিন্তু ক্ষেত্রী শুধুমাত্র স্থূল ক্ষেত্রকেই (জগৎ) প্রকাশিত করেন না, বরং স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ—তিন ক্ষেত্রকেই প্রকাশিত করেন এবং তার প্রকাশে স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ—এই তিনপ্রকার শরীরেরই সমস্ত ক্রিয়াদি সম্পন্ন হয়ে থাকে।

যেমন, সমস্ত জগৎকে প্রকাশিত করলেও সূর্যের (সকলকে প্রকাশিত করার) অহং-অভিমানবোধ থাকে না এবং নানাপ্রকার ক্রিয়াগুলি প্রকাশিত করলেও সূর্যে কোনো পার্থক্য আসে না, তেমনই ক্ষেত্রগুলিকে প্রকাশিত করায় বা

তাদের সত্তা-স্ফূর্তি দেওয়াতেও ক্ষেত্রীর মধ্যে কোনো অহংবোধ বা কর্তৃত্ব আসে না এবং নানাবিধ ক্রিয়াদি প্রকাশিত করলেও ক্ষেত্রীর মধ্যে কোনো পার্থক্য আসে না। ক্ষেত্রী সদা-সর্বদা একইভাবে নির্লিপ্ত এবং অসঙ্গ থাকেন।

কোনো ক্রিয়া বা বস্তু কোনো কিছুর আশ্রয় বা আধার ব্যতীত হতে পারে না এবং কোনো প্রতীতি জ্ঞান (প্রকাশ) ব্যতিরেকে হয় না। ক্ষেত্রী সকল ক্রিয়া, বস্তু এবং প্রতীতির আশ্রয় এবং প্রকাশক।

পরিশিষ্ট-ভাব—সূর্য যেমন সমস্ত জগৎকে (দৃশ্যমান বস্তুসমূহ) প্রকাশিত করে এবং তার আলোকে সমস্ত শুভ-অশুভ ক্রিয়াদি সংঘটিত হয়, কিন্তু সূর্য সেগুলির কর্তা বা ভোক্তা হয় না, তেমনই স্ব-স্বরূপ (চিন্ময় সত্তা) সমস্ত জগৎ-সংসারের সব শরীরকে প্রকাশিত করলেও অর্থাৎ তাতে জীবনীশক্তি সঞ্চার করলেও বাস্তবে তিনি কিছু করেনও না বা কিছুতে লিপ্তও হন না অর্থাৎ তাতে তাঁর কর্তৃত্ব বা ভোক্তৃত্ব কোনোটিই থাকে না। তাঁর মধ্যে এই প্রকাশের বিষয়ে কোনোরূপ অহং-অভিমান থাকে না।

করার দায়িত্ব তাঁরই থাকে, যার দ্বারা কিছু করা সম্ভব হয়। যেমন চিত্রকর যতই বুদ্ধিমান হোন, তিনি রং করার সামগ্রী (রং, তুলি, পট) ব্যতীত চিত্র তৈরি করতে সক্ষম হন না, তেমনই পুরুষ (চেতন বা আত্মা) প্রকৃতির সাহায্য ছাড়া কিছু করতে সক্ষম নন। সুতরাং তাঁর ওপরে কোনো কিছু করার দায় থাকে না। সকলেই অনুভব করেন যে, শরীর ব্যতীত আমরা কোনো কিছুই করতে পারি না। কোনো কিছু করার জন্য শরীরের প্রয়োজন হয়। আমরা যদি কিছু করতে না চাই, তাহলে শরীরের কী প্রয়োজন ? কিছুই না। আমরা যদি কিছু দেখতে না চাই, তাহলে চোখের কী প্রয়োজন ? কিছু যদি শুনতে না চাই, তাহলে কানের প্রয়োজন হয় না। স্থূল ক্রিয়ার জন্য স্থূল শরীরের প্রয়োজন। ধ্যান, চিন্তা করার জন্য প্রয়োজন হয় সূক্ষ্ম শরীরের। ধ্যান বা সমাধিতে কারণশরীরের প্রয়োজন হয়।[১] কিছুই যদি না করা হয়, তাহলে তিনটি শরীর আমাদের কী কাজে আসবে ? শরীর এবং তার দ্বারা যে কাজ হয় তা শুধু জগৎ-সংসারের কাজেই লাগে। আমাদের স্বরূপ শুধুমাত্র চিন্ময়সত্তা, সুতরাং তার জন্য শরীর বা তার দ্বারা সংঘটিত কোনো ক্রিয়ার প্রয়োজন নেই। চিন্ময় সত্তা কখনো ক্ষয় হয় না, তা সদাই পূর্ণ। সুতরাং আমাদের নিজের জন্য কিছুই প্রয়োজন নেই। চিন্ময় সত্তা ব্যতীত অন্য কিছুই নেই ; কারণ অস্তিত্ব একটিই, দুটি অস্তিত্ব হওয়া সম্ভব নয়। তাই আমাদের কোনো সঙ্গীর প্রয়োজন নেই। এইভাবে ক্রিয়ার সঙ্গেও কোনো সম্বন্ধ (কর্তৃত্ব) থাকে না, অপ্রাপ্ত বস্তুর কোনো সম্পর্ক (কামনা) থাকে না, প্রাপ্ত বস্তুর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক (মমত্ববোধ) থাকে না এবং প্রকৃতির সঙ্গেও কোনো একাত্মবোধ থাকে না। প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মবোধ না থাকায় প্রকৃতিতে ক্রিয়া থাকলেও তার কোনো কর্তা বা ভোক্তা থাকে না (১৩।২৯)।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—ভগবান এবার ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের বিভাগের ফল জানিয়ে প্রকরণের উপসংহার করেছেন।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্॥ ৩৪ ॥

[এবম্, যে (এইভাবে যাঁরা) ; জ্ঞানচক্ষুষা (জ্ঞানচক্ষুর সাহায্যে) ; ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ (ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের) ; অন্তরম্, চ (প্রভেদ এবং) ; ভূতপ্রকৃতিমোক্ষম্, বিদুঃ (কার্যকারণ সহ প্রকৃতির থেকে নিজেকে পৃথকভাবে জানেন) ; তে, পরম্, যান্তি (তাঁরা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন।)]

এইভাবে যাঁরা জ্ঞানচক্ষুর সাহায্যে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের প্রভেদ এবং কার্য-কারণসহ প্রকৃতির থেকে নিজেকে পৃথকভাবে জানেন (অনুভব করেন), তাঁরা পরমাত্মাকে লাভ করেন॥ ৩৪ ॥

---

[১]'সমাধি' এবং 'ব্যুত্থান'—এই দুটিই কারণশরীরে হয়। কারণশরীর থেকে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ হলে 'সহজ-সমাধি' অথবা 'সহজাবস্থা' হয়।

ব্যাখ্যা—[বিবেক-বিচার থেকেই জ্ঞানমার্গ আরম্ভ হয় এবং প্রকৃত বোধেই তা সমাপ্ত হয়। বাস্তবিক বিবেক- বোধ হলে প্রকৃতি থেকে সর্বতোভাবে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ হয়ে স্বতঃসিদ্ধ পরমাত্মার প্রাপ্তি লাভ হয়—এখানে সেই কথাই জানানো হয়েছে।]

'ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা'—সৎ-অসৎ, নিত্য-অনিত্য, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের প্রভেদ জানাকেই বলা হয় 'জ্ঞানচক্ষু' (বিবেক) জাগ্রত হওয়া। এই ক্ষেত্র সর্বদা পরিবর্তনশীল, তা কখনো একরূপে স্থায়ী থাকে না। এটি প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। এমন কোনো মুহূর্ত নেই যখন এর পরিবর্তন হয় না। কিন্তু এই ক্ষেত্রে অবস্থানকারী, জ্ঞাতা ক্ষেত্রজ্ঞ সর্বদা একভাবে অবস্থিত। ক্ষেত্রজ্ঞের পরিবর্তন হয় না, হবে না এবং হওয়া সম্ভবও নয়। এইভাবে জানা ও অনুভব করাই হল জ্ঞানচক্ষুর সাহায্যে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের প্রভেদকে ঠিকভাবে জানা।

'ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্'—বাস্তবিক বিবেকবোধ জাগ্রত হলে ভূত এবং প্রকৃতির প্রতিটি কার্য থেকে ও প্রকৃতি থেকে সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে যায়। প্রকৃতি থেকে সর্বতোভাবে সম্পর্ক ছেদ হলে অর্থাৎ প্রকৃতির থেকে নিজের পৃথকত্ব অনুভব করলে সাধক পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হন।

ভগবান প্রথমে অব্যক্তের উপাসকদের তাঁকে প্রাপ্তির কথা বলেছেন—**'তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব'** (১২।৪), সেই কথাই এই অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকে **'মদ্ভাবায়োপপদ্যতে'** পদের দ্বারা, তেইশতম শ্লোকে **'ন স ভূয়োঽভিজায়তে'** পদের দ্বারা এবং এখানে **'যান্তি তে পরম্'** পদগুলির সাহায্যে বলেছেন।

জ্ঞানমার্গে দেহাভিমানই প্রধান বাধা। এই বাধা দূর করার জন্য ভগবান এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে **'ইদং শরীরম্'** পদটির দ্বারা শরীর (ক্ষেত্র) থেকে নিজের (ক্ষেত্রজ্ঞের) পার্থক্য অনুভব করার জন্য বলেছেন এবং দ্বিতীয় শ্লোকে **'ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানম্'** পদের দ্বারা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানকে বাস্তবিক জ্ঞান বলে জানিয়েছেন। এরপর বিভিন্নভাবে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের পৃথকত্ব বর্ণনা করেছেন। এখন সেই বিষয়ের উপসংহার করতে গিয়ে ভগবান বলছেন যে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের পার্থক্য ঠিকমতো জানলে ক্ষেত্রের সঙ্গে সর্বতোভাবে সম্পর্ক ছেদ হয়ে যায়।

ক্ষেত্রজ্ঞই পরমাত্মা থেকে বিমুখ হয়ে পরমাত্মার সঙ্গে পার্থক্য মেনে নিয়েছে এবং ক্ষেত্রের প্রতি আকর্ষিত হয়ে ক্ষেত্রের সঙ্গে ঐক্য মেনে নিয়েছে। তাই পরমাত্মার সঙ্গে ঐক্য এবং ক্ষেত্রের সঙ্গে সর্বতোভাবে পার্থক্য—উভয় কথা বলার প্রয়োজন হয়েছে। সেজন্য ভগবান এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে **'ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি'** পদ দ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞের পরমাত্মার সঙ্গে ঐক্যের কথা বলেছেন এবং এখানে ক্ষেত্রের সমষ্টি-জগতের সঙ্গে ঐক্য বলেছেন। দুইয়েরই তাৎপর্য হল ক্ষেত্রজ্ঞ এবং পরমাত্মার অভিন্নতার কথা জানানো।

যেমন, কোনো বাড়ির চতুর্দিক অন্ধকার। কেউ বলে দিলেন যে বাড়িটিতে প্রেত থাকে, আর ক্রমে সেখানে প্রেত দেখা যেতে লাগল অর্থাৎ সেখানে প্রেত থাকার ভ্রম উৎপন্ন হল। কিন্তু কোনো সাহসী ব্যক্তি যদি বাড়ির ভিতরে গিয়ে আলো জ্বালিয়ে দেয় তাহলে অন্ধকার ও প্রেত দুই-ই দূর হয়ে যায়। অন্ধকারে চলার সময় মানুষ ধীরে ধীরে হাঁটে যাতে কোথাও ঠোক্কর না লাগে, বা চোট না পায়, কোথাও গর্তে যেন পা না পড়ে ! উপরন্তু সেইসঙ্গে সাপ-বিছে, চোর-ডাকাত প্রভৃতির ভয়ও মনে থাকে। কিন্তু আলোর প্রকাশ হলেই সব ভয় দূরীভূত হয়। তেমনই সর্বত্র পরিপূর্ণ প্রকাশমান পরমাত্মা থেকে বিমুখ হলে অন্ধকারময় জগতের পৃথক অস্তিত্ব দৃষ্টিগোচর হয় এবং নানাপ্রকার ভয় ব্যাকুল করে তোলে। কিন্তু প্রকৃত বোধ হলে জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না এবং সর্বভয় দূর হয়, একমাত্র প্রকাশমান পরমাত্মাই শুধু থাকেন। অন্ধকার দূর করার জন্য তো আলো আনতে হয়, কিন্তু পরমাত্মাকে কোথাও থেকে নিয়ে আসতে হয় না। তিনি সর্ব দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, পরিস্থিতি ইত্যাদিতে একইভাবে পরিপূর্ণ। তাই সংসার হতে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হলে তাঁর অনুভব আপনাতেই হয়ে থাকে।

পরিশিষ্ট-ভাব—ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বিভাগ সম্বন্ধে যে জ্ঞান, তাকে বলা হয় 'বিবেক'। যে সাধক এই বিবেককে গুরুত্ব দিয়ে ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের প্রভেদ জানতে পারেন এবং প্রকৃতি ও তার কার্যকে (শরীর) স্ব-স্বরূপ থেকে

সর্বতোভাবে পৃথক বলে অনুভব করেন, তিনি চিন্ময় পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হন। তাঁর দৃষ্টিতে এক চিন্ময় তত্ত্ব ব্যতীত আর কিছু থাকে না।

ভগবান **'মদ্ভাবায়োপপদ্যতে'** (১৩।১৮) পদটি দ্বারা সদ্গুণ প্রাপ্তির কথা বলেছেন এবং এখানে **'যে বিদুর্যান্তি তে পরম্'** পদের দ্বারা নির্গুণ প্রাপ্তির কথা বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে **'মদ্ভাব'** এবং **'পরম্'** প্রাপ্তি দুটিই এক (গীতা ১৮।২১ এবং ১৪।২৭)।

❈ ❈ ❈

ওঁ তৎ সৎ ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

এইভাবে ওঁ, তৎ, সৎ এই ভগবদ্নাম উচ্চারণপূর্বক ব্রহ্মবিদ্যা তথা যোগশাস্ত্রময় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদরূপ শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে 'ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ' নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত হল॥ ১৩ ॥

এই (ত্রয়োদশ) অধ্যায়ে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বিভাগের বর্ণনা করা হয়েছে। ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ দুটিই পৃথক্—এটি অনুভব হয়ে গেলে ক্ষেত্রজ্ঞের পরমাত্মার সঙ্গে যোগ হয়ে যায়, যা নিত্য। তাই এই অধ্যায়ের নাম **'ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ'** রাখা হয়েছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের পদ, অক্ষর এবং উবাচ

(১) এই অধ্যায়ে **'অথ ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ'**-এর তিন, **'শ্রীভগবানুবাচ'**-এর দুই, শ্লোকগুলির চারশত আট এবং পুষ্পিকার তেরটি পদ আছে। এইভাবে সম্পূর্ণ পদগুলির যোগসংখ্যা চারশত ছাব্বিশ।

(২) এই অধ্যায়ে **'অথ ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ'**-এর আট, **'শ্রীভগবানুবাচ'**-এর সাত, শ্লোকগুলির এক হাজার অষ্টাশী এবং পুষ্পিকার বাহান্নটি অক্ষর আছে। এইভাবে সমস্ত অক্ষরগুলির যোগসংখ্যা এক হাজার একশত পঞ্চান্ন। এই অধ্যায়ের সমস্ত শ্লোকই বত্রিশ অক্ষর সংবলিত।

(৩) এই অধ্যায়ে একটিমাত্র উবাচ—**'শ্রীভগবানুবাচ'**।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের প্রযুক্ত ছন্দ

এই অধ্যায়ের চৌত্রিশটি শ্লোকের মধ্যে প্রথম শ্লোকের প্রথম পংক্তি এবং অষ্টাদশ শ্লোকের তৃতীয় পংক্তিতে 'মগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় **'ম-বিপুলা'** ; সপ্তদশ শ্লোকের তৃতীয় পংক্তি এবং একত্রিশতম শ্লোকের প্রথম চরণে 'রগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় **'র-বিপুলা'** এবং তেইশতম শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে 'নগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় **'ন-বিপুলা'** সংজ্ঞাযুক্ত ছন্দ আছে। বাকি ঊনত্রিশটি শ্লোক ঠিক **'পথ্যাবক্ত্র'** অনুষ্টুপ ছন্দের লক্ষণ দ্বারা যুক্ত।

❈ ❈ ❈

॥ ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

অথ চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ

চতুর্দশ অধ্যায়

অবতরণিকা

শ্রীভগবান ত্রয়োদশ অধ্যায়ের শেষে বলেছেন যে জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা যিনি ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের পার্থক্য অনুভব করেন তিনি পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন। এখন প্রশ্ন হল যে সেই জ্ঞান কী ? তার কী মহিমা এবং সেই জ্ঞান প্রাপ্তির সরল উপায় কী ? এইগুলি বিশদভাবে বর্ণনা করার জন্যই ভগবান চতুর্দশ অধ্যায়ের বিষয় আরম্ভ করেছেন।

দু'ভাবে বন্ধন হয়—প্রকৃতির দ্বারা এবং প্রকৃতির কার্য গুণাদির দ্বারা। প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার উপায় ভগবান ত্রয়োদশ অধ্যায়ে জানিয়েছেন। এবার প্রকৃতির কার্য গুণাদির বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ভগবান চতুর্দশ অধ্যায়ের সূত্রপাত করতে গিয়ে প্রথম দুটি শ্লোকে জ্ঞানের মহিমা বর্ণনা করেছেন।

শ্রীভগবানুবাচ

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্‌জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ॥ ১ ॥

[**জ্ঞানানাম্** (সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে) ; **উত্তমম্, পরম্** (উত্তম এবং শ্রেষ্ঠ) ; **জ্ঞানম্** (জ্ঞান) ; **ভূয়ঃ, প্রবক্ষ্যামি** (আবার বলছি) ; **যৎ, জ্ঞাত্বা** (যা জেনে) ; **সর্বে, মুনয়ঃ** (সকল মুনি) ; **ইতঃ** (এই জগৎ-সংসার থেকে মুক্ত হয়ে) ; **পরাম্, সিদ্ধিম্** (পরম সিদ্ধি) ; **গতাঃ** (লাভ করেছেন।)]

শ্রীভগবান বললেন—সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে সর্বোত্তম জ্ঞান আমি আবার বলছি, যা জেনে সকল মুনি এই জগৎ-সংসার থেকে মুক্ত হয়ে পরম সিদ্ধি লাভ করেছেন॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা—**'পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্'**—ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অষ্টাদশ, তেইশতম এবং চৌত্রিশতম শ্লোকে ভগবান ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের, প্রকৃতি-পুরুষের যে জ্ঞানের (বিবেকের) কথা বলেছেন, সেই জ্ঞানের কথা পুনরায় বলার জন্য ভগবান **'ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি'** পদ ব্যবহার করেছেন।

লৌকিক ও পারলৌকিক যত প্রকার জ্ঞান আছে অর্থাৎ যত প্রকার বিদ্যা, কলা, ভাষা, লিপি ইত্যাদির জ্ঞান আছে, তাদের মধ্যে প্রকৃতি-পুরুষের পার্থক্য জানানো, প্রকৃতির অতীত করানো, পরমাত্মাকে প্রাপ্তি করানোর এই যে জ্ঞান, তা সর্বোৎকৃষ্ট। অন্য কোনো জ্ঞান এর সমকক্ষ নয়, তা হতে পারে না এবং হওয়া সম্ভবও নয়। কারণ অন্য সমস্ত জ্ঞানই সংসারে আবদ্ধ করে, বন্ধনে ফেলে।

যদিও 'উত্তম' এবং 'পর'—দুটি শব্দের একই অর্থ হয়, তবুও যেখানে একই অর্থের দুটি শব্দ এক সঙ্গে ব্যবহৃত হয়, সেখানে তার দুটি অর্থ হয়। সুতরাং এখানে 'উত্তম' শব্দের অর্থ হল, এই জ্ঞান প্রকৃতি এবং তার কার্য সংসার ও শরীর থেকে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদকারী হওয়ায় শ্রেষ্ঠ এবং 'পর' শব্দের অর্থ হল, এই জ্ঞান পরমাত্মপ্রাপ্তকারী হওয়ায় সর্বশ্রেষ্ঠ।

'যজ্‌জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ'— যে জ্ঞান লাভ করে বড় বড় মুনি-ঋষিগণ এই সংসার থেকে মুক্ত হয়ে পরমাত্মাকে লাভ করেছেন, আমি সেই জ্ঞানের কথা বলব। সেই জ্ঞান লাভ করলে কেউ মুক্ত হবে আর কেউ হবে না—তেমন হয় না, এই জ্ঞান প্রাপ্ত হলে সকল মুনিই মুক্ত হয়ে যান, সংসারের বন্ধন থেকে, সংসারের দাসত্ব থেকে মুক্ত হন এবং পরমাত্মাকে লাভ করেন।

তত্ত্বমননকারী যেসব ব্যক্তির শরীরের সঙ্গে একাত্মতা থাকে না, তাঁদের 'মুনি' বলা হয়।

'পরাং সিদ্ধিম্' কথাটির তাৎপর্য হল যে, জাগতিক কার্যাদির যা সিদ্ধি অথবা যোগ-সাধনে যে সমস্ত অণিমা, মহিমা, গরিমা ইত্যাদি সিদ্ধি হয়, প্রকৃতপক্ষে সেগুলি অসিদ্ধিই। কারণ সেগুলি সবই জন্ম-মৃত্যু আবর্তনে নিক্ষেপ করে, বন্ধনে আবদ্ধ করে এবং পরমাত্মপ্রাপ্তিতে বাধাপ্রদান করে। কিন্তু পরমাত্মপ্রাপ্তি-রূপ যে সিদ্ধি, তা সর্বোৎকৃষ্ট। কারণ তা প্রাপ্ত হলে মানুষ জন্ম-মৃত্যু চক্র হতে মুক্ত হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব—(এই চতুর্দশ অধ্যায়টি ত্রয়োদশ অধ্যায়েরই পরিশিষ্ট।) ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের বিভাগের জ্ঞান সমস্ত লৌকিক-পারলৌকিক জ্ঞানের থেকেও উত্তম এবং সর্বোৎকৃষ্ট। এই জ্ঞান পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তির সর্বোৎকৃষ্ট উপায়, তাই যে সব সাধক এই জ্ঞান লাভ করেন তাঁরা পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হন অর্থাৎ মুক্তি লাভ করেন।

'জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্'—এই পদটির তাৎপর্য হল—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক জ্ঞানের থেকে এবং লৌকিক-পারলৌকিক জ্ঞানের থেকেও উত্তম, সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞান। এই জ্ঞান ব্যতীত অন্য কোনো জ্ঞান দ্বারাই পরমসিদ্ধি প্রাপ্ত করা সম্ভব নয়। একমাত্র পরমাত্মতত্ত্ব ব্যতীত আর কিছুই নেই—এটি অনুভব করাকেই বলা হয় পরমসিদ্ধি লাভ। তাৎপর্য হল এই যে পরম সিদ্ধিলাভ হলে ক্রিয়া ও পদার্থের অভাব হয় এবং একমাত্র চিন্ময় সত্তা ব্যতীত অন্য কোনো জড় বস্তুই থাকে না, যা বাস্তব সত্য।

※ ※ ※

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥ ২ ॥

[**ইদম্, জ্ঞানম্** (এই জ্ঞানের) ; **উপাশ্রিত্য** (আশ্রয় নিয়ে) ; **মম** (আমার) ; **সাধর্ম্যম্, আগতাঃ** (সাধর্ম্য লাভ করেছেন) ; **সর্গে, অপি** (তাঁরা মহাসর্গের সময়েও) ; **ন, উপজায়ন্তে, চ** (জন্মগ্রহণ করেন না এবং) ; **প্রলয়ে** (মহাপ্রলয়েও) ; **ন, ব্যথন্তি** (ব্যথিত হন না।)]

এই জ্ঞানের আশ্রয় নিয়ে যে সকল ব্যক্তি আমার সাধর্ম্য লাভ করেছেন, তাঁরা মহাসর্গের (মূল সৃষ্টির) সময়ও জন্মগ্রহণ করেন না এবং মহাপ্রলয়েও ব্যথিত হন না॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা—'ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য'—আগের শ্লোকে ভগবান 'উত্তম' এবং 'পর'—এই দুটি বিশেষণের সাহায্যে যে জ্ঞানের মহিমা জানিয়েছিলেন, সেই জ্ঞান অনুভব করাই হল তাঁর আশ্রয় নেওয়া। সেই জ্ঞান অনুভূত হলে মানুষের সমস্ত সংশয় দূর হয় এবং তিনি জ্ঞানস্বরূপ হয়ে ওঠেন।

'মম সাধর্ম্যমাগতাঃ'—এই জ্ঞানের আশ্রয় নিয়ে মানুষ আমার সাধর্ম্য প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ আমার মধ্যে যেমন কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব নেই, তেমনই তাদের মধ্যেও কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব থাকে না। আমি যেমন সর্বদাই নির্লিপ্ত থাকি, তেমনই তাঁরাও নির্লিপ্ততা এবং নির্বিকারত্ব লাভ করে।

জ্ঞানী মহাপুরুষ ভগবানের মতোই নির্লিপ্ত ও নির্বিকার হলেও ভগবানের মতো তাঁরা জগতের উৎপত্তি, পালন এবং সংহার করতে সক্ষম হন না। যোগাভ্যাসের শক্তিতে কোনো কোনো যোগীর কিছুদূর ক্ষমতা লাভ হলেও তা ভগবানের সমান হয় না। কারণ তিনি 'যুঞ্জান্ যোগী' অর্থাৎ অভ্যাসের দ্বারা কিছু ক্ষমতা লাভ করেছেন মাত্র। কিন্তু ভগবান 'যুক্তযোগী' অর্থাৎ তাঁর সামর্থ্য চিরকালীন, স্বতঃসিদ্ধ। ভগবান সবকিছু করতে সক্ষম—**'কর্তুমকর্তুমন্যথা কর্তুং সমর্থঃ'**। যোগীর সামর্থ্য সীমিত, কিন্তু ভগবানের সামর্থ্য অসীম।

'সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে'—এখানে 'অপি' পদটিতে মনে হয় যে এই জ্ঞানী মহাপুরুষগণ মহাসর্গের প্রারম্ভেও উৎপন্ন হন না। মহাসর্গের আদিতে চতুর্দশ ভুবন এবং সেই ভুবনের অধিকারীগণের উৎপত্তি হয়, কিন্তু এইসব মহাপুরুষদের আর উৎপত্তি হয় না অর্থাৎ কর্মফল ভোগের জন্য তাঁদের পুনর্বার শরীর ধারণ করতে হয় না।

'প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ'—মহাপ্রলয়ে সংবর্তক অগ্নিতে চর-অচর সমস্ত প্রাণী ভস্ম হয়ে যায়। সমুদ্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে

পৃথিবীকে নিমজ্জিত করে। চতুর্দশ ভুবনে তুমুল আলোড়ন এবং হাহাকার পড়ে যায়। সকল প্রাণী ব্যথিত হয় এবং নাশপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু মহাপ্রলয়ে ওইসব জ্ঞানী মহাপুরুষরা ব্যথিত হন না, তাঁদের মধ্যে কোনো চাঞ্চল্য হয় না, বিকার উৎপন্ন হয় না। তাঁরা যে তত্ত্বলাভ করেছেন, তাতে কোনো বিকৃতি, বিকার নেই, তাহলে তাঁরা কীকরে ব্যথিত হবেন ? অর্থাৎ ব্যথিত হন না।

মহাসর্গেও সৃষ্ট না হওয়া এবং মহাপ্রলয়েও ব্যথিত না হওয়ার তাৎপর্য হল এই যে, জ্ঞানী মহাপুরুষদের প্রকৃতি এবং প্রকৃতিজাত গুণাদি হতে সর্বতোভাবে সম্বন্ধ-বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। তাই প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ থাকলে যে জন্ম-মরণ হয়, দুঃখ হয়, মনে চাঞ্চল্য আসে, প্রকৃতির থেকে সম্বন্ধরহিত মহাপুরুষদের এই জন্ম-মরণ, দুঃখ ইত্যাদি হয় না।

পরিশিষ্ট-ভাব—কারণ-শরীরের সম্বন্ধ থেকেই 'নির্বিকল্প স্থিতি' হয় এবং কারণ-শরীর থেকে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হলে (স্ব-স্বরূপে) 'নির্বিকল্প বোধ' হয়। নির্বিকল্প স্থিতি তো সবিকল্পে পরিবর্তিত হয় কিন্তু নির্বিকল্পবোধ সবিকল্পে পরিবর্তিত হয় না। অর্থাৎ নির্বিকল্প স্থিতিতে পরিবর্তন হলেও নির্বিকল্পবোধে কখনো পরিবর্তন হয় না, এটি সর্বদা একইপ্রকার থাকে। এই কথাটিই এখানে **'সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ'** পদদ্বারা বলা হয়েছে।

মহাসর্গ এবং মহাপ্রলয় প্রকৃতিতেই হয়। প্রকৃতি থেকে অতীত তত্ত্বের (পরমাত্মার) প্রাপ্তি হলে মহাসর্গ এবং মহাপ্রলয়ের কোনো প্রভাবই পড়ে না, কারণ প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কই থাকে না। প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক না থাকাকে 'আত্যন্তিক প্রলয়'ও বলা হয়। তাৎপর্য হল যে প্রকৃতির কার্য শরীরে আশ্রিত হলে মানুষ পরাধীন হয়[১], জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবদ্ধ হয়ে পড়ে ; কিন্তু প্রকৃতির কার্য থেকে সম্পর্ক ছেদ করলে সে হয় স্বাধীন, তার জীবন নিরপেক্ষ হয়, চিরকালের মতো জন্ম-মৃত্যু চক্র থেকে মুক্ত হয় ।

'মম সাধর্ম্যমাগতাঃ' পদটির তাৎপর্য হল যে, পরমাত্মা যেমন সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ, তেমনই তাঁকে প্রাপ্তকারী জ্ঞানী মহাপুরুষও সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ হয়ে ওঠেন।

* * *

সম্বন্ধ—যিনি ভগবানের সধর্মত্ব প্রাপ্ত হন, তিনি মহাসর্গে উৎপন্ন হন না, কিন্তু যেসকল প্রাণী মহাসর্গে উৎপন্ন হন তাদের সৃষ্ট হওয়ার কী প্রক্রিয়া—সেকথা পরবর্তী শ্লোকে জানিয়েছেন।

মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥ ৩ ॥

[ভারত (হে ভরতবংশীয় অর্জুন!) ; **মম, মহৎ, ব্রহ্ম** (আমার মূলপ্রকৃতি হল) ; **যোনিঃ** (উৎপত্তি স্থান) ; **অহম্, তস্মিন্** (আমি তাতে) ; **গর্ভম্, দধামি** (জীবরূপ গর্ভস্থাপনা করি) ; **ততঃ, সর্বভূতানাম্** (ফলে সমস্ত প্রাণীর) ; **সম্ভবঃ, ভবতি** (উৎপত্তি হয়।)]

হে ভরতবংশীয় অর্জুন ! আমার মূল প্রকৃতি হল উৎপত্তি স্থান এবং আমি তাতে জীবরূপ গর্ভ স্থাপনা করি। ফলে সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি হয়॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা—'মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম'—এখানে মূল প্রকৃতিকে **'মহদ্ব্রহ্ম'** বলা হয়েছে, এর কয়েকটি কারণ হতে পারে ; যেমন—

(১) পরমাত্মা ক্ষুদ্র-ভাব এবং বৃহৎ-ভাব বর্জিত ; সুতরাং তিনি যেমন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তেমনই মহৎ হতে মহত্তম—**'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্'** (শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ৩।২০)। কিন্তু জাগতিক দৃষ্টিতে মূল প্রকৃতিই সব থেকে বৃহৎ বস্তু অর্থাৎ জগতে সব থেকে

---

[১] 'কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ' (৩।৫)
'অবশং প্রকৃতের্বশাৎ' (৯।৮) 'রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে' (৮।১৯)

বড়, ব্যাপক তত্ত্ব হল মূল প্রকৃতি। পরমাত্মা ব্যতীত জগতে এর থেকে বড় কোনো ব্যাপক তত্ত্ব নেই। সেইজন্য এই মূল প্রকৃতিকে এখানে **'মহদ্ব্রহ্ম'** বলা হয়েছে।

(২) **'মহৎ'** (মহত্তত্ত্ব অর্থাৎ সমষ্টি-বুদ্ধি) এবং **'ব্রহ্ম'** (পরমাত্মা)-এর মধ্যবর্তী হওয়ায় মূল প্রকৃতিকে **'মহদ্-ব্রহ্ম'** বলা হয়েছে।

(৩) আগের (দ্বিতীয়) শ্লোকে **'সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ'** পদে উদ্ধৃত 'সর্গ' এবং 'প্রলয়' শব্দগুলির অর্থ যথাক্রমে ব্রহ্মার দিন ও রাতকে মানা যেতে পারে। সুতরাং এর অর্থ মহাসর্গ (ব্রহ্মার প্রকটিত হওয়া) এবং মহাপ্রলয় (ব্রহ্মার লীন হওয়া) সিদ্ধ করার জন্য এখানে **'মহদ্ব্রহ্ম'** শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তাৎপর্য হল এই যে, জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদের এই প্রকৃতি থেকেই সম্পর্ক বিচ্ছেদ হয়, তাই তাঁরা মহাসর্গেও উৎপন্ন হন না এবং মহাপ্রলয়েও ব্যথিত হন না।

সকলের উৎপত্তি স্থান হওয়ায় এই মূল প্রকৃতিকে **'যোনি'** বলা হয়েছে। এই মূল প্রকৃতি থেকেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হয় এবং এতেই লীন হয়। এই মূল প্রকৃতি থেকেই জগতের অনন্ত শক্তিগুলি উৎপন্ন হয়।

এই মূল প্রকৃতির জন্য **'মম'** পদটি প্রয়োগ করে ভগবান বলেছেন যে, এই প্রকৃতি আমারই। সুতরাং এর ওপর আমারই আধিপত্য বর্তমান। আমার ইচ্ছা ব্যতিরেকে এই প্রকৃতি নিজে কিছুই করতে সক্ষম নয়। প্রকৃতি যা কিছু করে, তা সব আমারই অধ্যক্ষতায় করে থাকে (গীতা ৯।১০)।

আমি সেই মূল প্রকৃতির (মহদ্ব্রহ্মের) থেকেও শ্রেষ্ঠ সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম পরমাত্মা—এটি জানানোর জন্য ভগবান **'মম মহদ্ব্রহ্ম'** পদটি প্রয়োগ করেছেন।

মহদ্ব্রহ্মের থেকেও শ্রেষ্ঠ পরব্রহ্ম পরমাত্মার অংশ হলেও জীব পরমাত্মা থেকে বিমুখ হয়ে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে। শুধু তাই নয়, সে প্রকৃতির কার্য ত্রিগুণাদির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে বসে এবং তার থেকেও নেমে গিয়ে গুণাদির কার্য শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তাই ভগবান **'মম মহদ্ব্রহ্ম'** পদের দ্বারা বলেছেন যে বাস্তবে জীবের সম্বন্ধ মূল প্রকৃতির থেকে শ্রেষ্ঠ পরামাত্মারূপী আমার সঙ্গে থাকে—**'মম এব অংশঃ'** (গীতা ১৫।৭)। তাই প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে জীবের নিজের পতন ডেকে আনা উচিত নয়।

'তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্'—**'গর্ভম্'** পদটি এইস্থানে কর্ম-সংস্কারসহ জীবসমূহের বাচক। ভগবান কোনো নতুন গর্ভস্থাপনা করেন না। অনাদিকাল থেকে যে জীবগণ জন্ম-মরণের আবর্তে পড়ে আছে, তারা মহাপ্রলয়ের সময় নিজ নিজ কর্মসংস্কারসহ প্রকৃতিতে লীন হয়ে যায় (গীতা ৯।৭)। প্রকৃতিতে লীনপ্রাপ্ত জীবেদের কর্ম যখন পরিপক্ক হয়ে ফলপ্রদানের উপযুক্ত হয়, তখন ভগবান মহাসর্গের প্রারম্ভে ওই সকল জীবকে প্রকৃতির সঙ্গে পুনরায় সংযুক্ত করে দেন (যা কারণ শরীররূপে আগেই ছিল)। এইভাবেই ভগবান জীবসমূহরূপী গর্ভকে প্রকৃতিরূপ যোনিতে স্থাপন করেন।

'সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত'—ভগবান প্রকৃতিতে গর্ভস্থাপনা করলে তারপর সমস্ত প্রাণী উৎপন্ন হয় অর্থাৎ এইসব প্রাণী সূক্ষ্ম এবং স্থূল শরীর ধারণ করে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয় । মহাসর্গের প্রারম্ভে এই উৎপন্ন হওয়াই হল ভগবানের বিসর্গ (ত্যাগ), আদিকর্ম (৮।৩)

[জীব যতক্ষণ না মুক্ত হয় ততক্ষণ প্রকৃতির অংশ কারণ-শরীরের সঙ্গে তার সম্বন্ধ বজায় থাকে এবং মহাপ্রলয়ে কারণ-শরীরসহ তারা প্রকৃতিতে লীন হয়ে যায়।]

পরিশিষ্ট-ভাব—ভগবানের কথার তাৎপর্য হল যে জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবদ্ধ হলেও জীব তাঁরই অংশ। তার সাধর্ম্য, ঐক্য সব ভগবানেরই সঙ্গে, শরীরের সঙ্গে নয়।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে সমষ্টি-জগতের উৎপত্তির কথা জানিয়েছেন। পরবর্তী শ্লোকে ব্যষ্টি-শরীরগুলির উৎপত্তির কথা বর্ণনা করছেন।

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥ ৪ ॥

[**কৌন্তেয়** (হে কৌন্তেয় !) ; **সর্বযোনিষু** (সমস্ত যোনিতে) ; **যাঃ, মূর্তয়ঃ** (যতপ্রকার প্রাণীদেহ) ; **সম্ভবন্তি** (উৎপন্ন হয়) ; **তাসাম্, মহৎ, ব্রহ্ম** (মূলপ্রকৃতি তাদের সকলেরই) ; **যোনিঃ** (মাতা) ; **অহম্** (আমি) ; **বীজপ্রদঃ** (বীজস্থাপনকারী) ; **পিতা** (পিতা।)]

হে কৌন্তেয় ! সমস্ত যোনিতে যতপ্রকার প্রাণীদেহ উৎপন্ন হয়, মূল প্রকৃতি তাদের সকলেরই মাতা এবং আমিই বীজস্থাপনকারী পিতা॥ ৪॥

ব্যাখ্যা—'সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ'— জরায়ুজ (জরায়ু দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে যারা জন্মায় যেমন, মানুষ, পশু ইত্যাদি), অণ্ডজ (অণ্ড হতে উৎপন্ন সর্প, পক্ষী ইত্যাদি), স্বেদজ (ঘাম থেকে উৎপন্ন উকুন ইত্যাদি) এবং উদ্ভিজ্জ (মাটি ভেদ করে উৎপন্ন বৃক্ষ, লতাদি)— সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তির এই চারটিই প্রকার আছে। এই চারটির এক একটিতে অসংখ্য যোনি উৎপন্ন হয়। যে সব প্রাণী উৎপন্ন হয় তাদের সকলের পৃথক্ পৃথক্ আকৃতি হয়। একই যোনিতে, একই জাতিতে উৎপন্ন হওয়া প্রাণীদের আকৃতিতেও স্থূল বা সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকে অর্থাৎ এক সমান আকৃতি কারোরই হয় না। যেমন, এক মনুষ্য যোনিতে বহু যুগ ধরে বহু কোটি দেহ উৎপন্ন হয়ে চলেছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত একটি মানুষের দেহের সঙ্গে অপর একজনের দেহ মেলে না। এ বিষয়ে কোনো এক কবি বলেছেন—

পাগ ভাগ বাণী প্রকৃতি, আকৃতি বচন বিবেক।
অক্ষর মিলত ন এক-সে, দেখে দেশ অনেক॥

অর্থাৎ শিরোপা, ভাগ্য, বাণী-(কণ্ঠ), স্বভাব, আকৃতি, শব্দ, বিচারশক্তি এবং হস্তাক্ষর—এই সমস্তই দুজন মানুষের কখনো মেলে না। এইরূপ চুরাশী লক্ষ যোনিতে যত দেহ অনাদিকাল থেকে উৎপন্ন হয়ে আসছে, তাদের সকলের আকৃতি-প্রকৃতিই পৃথক্ পৃথক্। চুরাশী লক্ষ যোনি ছাড়া দেবতা, পিতৃপুরুষ, গন্ধর্ব, ভূত-প্রেত ইত্যাদিকেও এই **'সর্বযোনিষু'** পদের অন্তর্গত বলে ধরতে হবে।

'তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা'— উপরিউক্ত চারটি উৎপত্তির প্রকার অর্থাৎ চুরাশী লক্ষ যোনি হল শরীর উৎপত্তির স্থান এবং ওইসব যোনির উৎপত্তির স্থান হল (মাতার স্থানে) **'মহদ্ব্রহ্ম'** অর্থাৎ মূল প্রকৃতি। সেই মূল প্রকৃতিতে জীবরূপ বীজ বপনকারী পিতা হলাম আমি।

বিভিন্ন বর্ণ এবং আকৃতিবিশিষ্ট নানাপ্রকার শরীরে ভগবান তাঁর চেতন-অংশরূপ বীজ স্থাপন করেন। এতে প্রমাণিত হয় যে প্রত্যেক প্রাণীতে অবস্থিত পরমাত্মার অংশ শরীরের আকৃতির বিভিন্নতার জন্যই ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীত হয়। বাস্তবে সকল প্রাণীতেই এক অভিন্ন পরমাত্মাই বিদ্যমান (গীতা ১৩।২)। এটি একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বোঝানো হচ্ছে। যদিও দৃষ্টান্ত সর্বাংশে মেলে না তবুও তা বুদ্ধিকে মূলের কাছাকাছি নিয়ে যেতে সাহায্য করে। কাপড় এবং পৃথিবী—দুইয়ে একই তত্ত্বের প্রাধান্য থাকে। কাপড়কে যদি জলে ফেলা হয়, তাহলে কাপড়টি সিক্ত হয়ে জলের নিম্নদেশে তলিয়ে যায়। লম্বা এবং আড়াআড়ি সুতোর দ্বারা বুনাই করে কাপড় তৈরি করা হয়। সুতোর ফাঁকে ফাঁকে অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র (জায়গা) থাকে। এরূপ অনেক ছিদ্র থাকে সমস্ত কাপড়ে। জলে ডোবালে কাপড়ের সমস্ত তন্তু এবং ছিদ্রগুলি জলে ভরে যায়। জল থেকে বার করলেও কাপড়ের তন্তু এবং ছিদ্রগুলিতে একই জল সমানভাবে পরিপূর্ণ থাকে। এই দৃষ্টান্তে কাপড় হল 'প্রকৃতি', পৃথক্ পৃথক্ ছিদ্রগুলি 'শরীর' এবং তন্তু ও তার ছিদ্রের জল হল 'পরমাত্মতত্ত্ব'। তাৎপর্য হল এই যে, স্থূল দৃষ্টিতে প্রত্যেক শরীরে পরমাত্মতত্ত্ব পৃথক্ পৃথক্ বলে প্রতীয়মান হলেও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যায় সমস্ত শরীরে এবং সমগ্র জগতে একই পরমাত্মতত্ত্ব পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান।

পরিশিষ্ট-ভাব—চুরাশী লক্ষ যোনি, দেবতা, পিতৃপুরুষ, গন্ধর্ব, ভূত-প্রেত-পিশাচ, ব্রহ্মরাক্ষস, গ্রহ, স্থাবর-জঙ্গম, জলচর-স্থলচর-নভশ্চর, জরায়ুজ-অণ্ডজ-স্বেদজ-উদ্ভিজ্জ ইত্যাদি সমস্ত জীবই **'সর্বযোনিষু'** পদটির অন্তর্গত বলে

ধরতে হবে। এই কথাই সপ্তম অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে **'এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয়'** পদ দ্বারা এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ছাব্বিশতম শ্লোকে **'যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্'** পদ দ্বারা বলা হয়েছে।

এখানে শরীরকে 'মূর্তি' বলা হয়েছে। এর দ্বারা মূর্ত-অমূর্ত, ব্যক্ত-অব্যক্ত উভয় শরীরকেই বোঝায়। ভূমি, জল এবং অগ্নি মূর্ত পদার্থ। বায়ু এবং আকাশ হল অমূর্ত। বায়ুপ্রধান শরীর হওয়ায় ভূত-প্রেত-পিশাচও অমূর্ত।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত না হলে জন্ম-মৃত্যু হয় না আর তৃতীয়-চতুর্থ শ্লোকে বলেছেন যে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক থাকলে জন্ম-মৃত্যু হয়। পরবর্তী পঞ্চম থেকে অষ্টাদশ শ্লোকে এই কথাই তিনি বিস্তারিতভাবে জানিয়েছেন।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—পরমাত্মা এবং তাঁর শক্তি প্রকৃতির সংযোগে উৎপন্ন জীবসকল প্রকৃতিসম্ভূত গুণাদিতে কী করে আবদ্ধ হয়—পরের শ্লোকটিতে সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করেছেন।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥ ৫ ॥

[**মহাবাহো** (হে মহাবাহো !) ; **প্রকৃতিসম্ভবাঃ** (প্রকৃতি হতে উৎপন্ন) ; **সত্ত্বম্, রজঃ, তমঃ, ইতি** (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটি) ; **গুণাঃ** (গুণ) ; **অব্যয়ম্, দেহিনম্** (অবিনাশী দেহীকে) ; **দেহে** (দেহে) ; **নিবধ্নন্তি** (আবদ্ধ করে।)]

হে মহাবাহো ! প্রকৃতি হতে উৎপন্ন সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিনটি গুণ অবিনাশী দেহীকে (জীবাত্মাকে) দেহে আবদ্ধ করে॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা—**'সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ'**—তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্লোকে যে মূল প্রকৃতিকে **'মহদ্‌ব্রহ্ম'** বলা হয়েছে, সেই মূল প্রকৃতি থেকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি গুণ উৎপন্ন হয়।

এখানে **'ইতি'** পদটির তাৎপর্য হল যে এই তিনটি গুণ থেকেই অনন্ত বিশ্ব উৎপন্ন হয় এবং তিনটি গুণের তারতম্যেই প্রাণীদের মধ্যে নানা প্রকার ভেদ হয়, কিন্তু গুণ দুইও হয় না, চারও হয় না, গুণ তিন প্রকারই থাকে ।

'নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্'—এই তিনটি গুণ অবিনাশী দেহীকে দেহে আবদ্ধ করে। আসলে এই তিনটি গুণ নিজে কাউকে আবদ্ধ করে না, পুরুষই এই গুণগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে আবদ্ধ হয়। তাৎপর্য হল এই যে ত্রিগুণপ্রধান কার্য, পদার্থ, ধন-সম্পদ, পরিবার, শরীর, স্বভাব, বৃত্তি, পরিস্থিতি, ক্রিয়া ইত্যাদিকে আপন বলে মেনে নেওয়ায় জীব স্বয়ং অবিনাশী হয়েও গুণে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, বিনাশশীল পদার্থ ইত্যাদির বশীভূত হয়ে পড়ে ; সর্বতোভাবে স্বাধীন হয়েও পরাধীন হয়ে পড়ে । যেমন, যে অর্থ-সম্পদকে মানুষ নিজের বলে মনে করে, তা কম বা বেশি হলে তার ওপর তার প্রভাব পড়ে ; যাদের আপন বলে মনে করা হয়, তাদের জন্ম বা মৃত্যুতে তার ওপর তার প্রভাব পড়ে ; যে শরীরকে নিজের বলে মনে করে তার ইতরবিশেষ হলে তার প্রভাব তার ওপর পড়ে। এই হল গুণাদির দ্বারা অবিনাশী দেহীর বন্ধনদশা প্রাপ্ত হওয়া।

এটি অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা যে দেহী স্বয়ং অবিনাশীরূপে একইভাবে বিরাজ করলেও গুণাদি এবং গুণাদির বৃত্তির অধীন হয়ে স্বয়ং সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক হয়ে পড়ে। শ্রীতুলসীদাসজী বলেছেন—

ঈশ্বর অংশ জীব অবিনাশী। চেতন অমল সহজ সুখরাশি॥
(শ্রীরামচরিতমানস ৭।১১৭।১)

জীবের এই অবিনাশী স্বরূপ প্রকৃতপক্ষে কখনো গুণাদির দ্বারা আবদ্ধ হয় না। কিন্তু স্বরূপ যখন বিনাশশীল দেহকে 'আমি', 'আমার', ও 'আমার জন্য' বলে মেনে নেয়, তখন তার এরূপ মেনে নেওয়ার জন্য সে গুণাদিতে আবদ্ধ হয় এবং পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তি কঠিন বলে মনে করতে থাকে (গীতা ১২।৫)। দেহাভিমানবশতঃ গুণাদির দ্বারা দেহে আবদ্ধ হওয়ার ফলে সে ত্রিগুণাতীত নিজ অবিনাশী স্বরূপকে জানতে পারে না। গুণাদির দ্বারা দেহে আবদ্ধ হলেও জীবের যে স্বাভাবিক অবিনাশী স্বরূপ, তা একইভাবে বিরাজ করে। **'অব্যয়ম্'** পদটির দ্বারা ভগবান

সেই কথাই জানাচ্ছেন।

এখানে **'দেহিনম্'** পদটির অর্থ হল যে, দেহে তাদাত্ম্য, মমতা এবং কামনা থাকলেই তিনটি গুণ এই পুরুষকে দেহে আবদ্ধ করে। যদি দেহের প্রতি তাদাত্ম্য-বোধ, মমত্ববোধ ও কামনা না থাকে, তবে সে পরমাত্মস্বরূপই থাকে।

বিশেষ কথা

জীব শরীরের সঙ্গে দুইভাবে নিজের সম্বন্ধ স্থাপন করে—(১) **অভেদ রূপে**—নিজেকে শরীর বলে মনে করা, যাতে 'আমি এই শরীর' এইরূপ প্রতীয়মান হয়, এবং (২) **ভেদ রূপে**—শরীরকে নিজের বলে মনে করা, যাতে 'শরীর আমার' বলে প্রতীত হয়। অভেদ রূপে সম্বন্ধ স্থাপন করলে জীব নিজেকে শরীর বলে মনে করে, যাকে 'অহং-ভাব' বলা হয় এবং ভেদরূপে সম্পর্ক স্থাপন করলে জীব শরীরকে নিজের বলে মনে করে। একে 'মমতা' বলা হয়। এইভাবে শরীরের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক স্থাপন করলে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—তিনটি গুণ তাদের নিজ বৃত্তিগুলির দ্বারা শরীরের প্রতি অহং ও মমত্ববোধকে দৃঢ় করে, যার ফলে জীব আবদ্ধ হয়।

যেমন, বিবাহের পরে স্ত্রীর বাড়ির (শ্বশুরবাড়ির) সকলের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত হয় ; স্ত্রীর বস্ত্র অলংকারের প্রয়োজন হলে তা নিজেরই প্রয়োজন বলে প্রতীয়মান হয়, তেমনই শরীরের সঙ্গে আমি-আমার সম্পর্ক হলে জীবের সমস্ত জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং শরীর-নির্বাহের বস্তুগুলি সে নিজের জন্য আবশ্যক বলে মনে করতে থাকে। অনিত্য শরীরের সঙ্গে (একাত্মতা) মেনে নেওয়ায় সে অনিত্য শরীরকে নিত্য করে রাখতে চায়। কারণ সে স্বয়ং নিত্য। শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার ফলেই তার মৃত্যুভয় আসে। কারণ শরীর বিনাশশীল। যদি শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকে, তাহলে তার নিত্য হয়ে থাকার ইচ্ছাও হবে না এবং মৃত্যুভয়ও থাকবে না। সুতরাং যতক্ষণ নিত্য হয়ে থাকার ইচ্ছা এবং মৃত্যুভয় থাকে, ততক্ষণ সে এই গুণগুলিতে আবদ্ধ থাকে।

জীব স্বয়ং অবিনাশী এবং শরীর বিনাশশীল। শরীর প্রতিমুহূর্তে স্বতঃই বিনাশ প্রাপ্ত হচ্ছে। যা বিনাশশীল, তার থেকে সম্বন্ধ ছিন্ন করা এমন কী কঠিন ? চেষ্টা করতে হয় শুধু এটুকুই যে, যেগুলি স্বাভাবিকভাবে বিনাশপ্রাপ্ত হচ্ছে সেগুলিকে ধরে রাখার বৃথা চেষ্টা না করা। সেগুলি ধরে রাখার ইচ্ছা না রাখলে নিজের অবিনাশী, গুণাতীত স্বরূপ স্বতঃই অনুভূত হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব—প্রকৃতি হতে উৎপন্ন হওয়ায় সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ—এই তিনটি গুণ প্রকৃতি বিভাগেই থাকে। কিন্তু প্রকৃতির কার্যরূপ শরীরের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক ('আমি' এবং 'আমার') স্থাপন করার জন্যই এই গুণ অবিনাশী চেতনকে বিনাশশীল জড় শরীরে আবদ্ধ করে অর্থাৎ 'আমি শরীর এবং শরীর আমার'—এইরকম দেহাভিমান উৎপন্ন করায়। তাৎপর্য হল যে সমস্ত বিকারই প্রকৃতির সম্বন্ধ থেকে উৎপন্ন হয়। সত্তারূপ স্বরূপে কোনো বিকার নেই—**'অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ'** (বৃহদারণ্যক. ৪।৩।১৫), **'দেহেঽস্মিন্পুরুষঃ পরঃ'** (গীতা ১৩।২২)। বিকারগুলির জন্যই জন্ম-মৃত্যু হয়।

প্রকৃতপক্ষে গুণ জীবকে আবদ্ধ করে না, জীবই সেগুলির সঙ্গ করে আবদ্ধ হয়ে পড়ে (এই অধ্যায়ের একুশতম শ্লোক)। গুণ যদি প্রকৃতই বন্ধনকারক হত, তাহলে গুণাদি থাকা পর্যন্ত কেউই তার থেকে মুক্তি পেত না, জীবন্মুক্ত হওয়া সম্ভব হত না।

*** *** ***

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে ভগবান সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি গুণে দেহীর আবদ্ধ হওয়ার কথা বলেছেন। সেই তিনটি গুণের মধ্যে সত্ত্বগুণের স্বরূপ এবং তার বন্ধনের প্রকার পরবর্তী শ্লোকে জানিয়েছেন।

তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥ ৬ ॥

[**অনঘ** (হে নিষ্পাপ অর্জুন !) ; **তত্র, সত্ত্বম্** (এই গুণগুলির মধ্যে সত্ত্বগুণ) ; **নির্মলত্বাৎ** (নির্মল হওয়ায়) ; **প্রকাশকম্,**

অনাময়ম্ (প্রকাশক এবং নির্বিকার) ; **সুখসঙ্গেন,** চ (এই সত্ত্বগুণ সুখ এবং) ; **জ্ঞানসঙ্গেন, বধ্নাতি** (জ্ঞানাসক্তির দ্বারা আবদ্ধ করে।)]

হে নিষ্পাপ অর্জুন ! এই গুণগুলির মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্মল (স্বচ্ছ) হওয়ায় প্রকাশক এবং নির্বিকার। এই সত্ত্বগুণ সুখ এবং জ্ঞানের আসক্তি দ্বারা (দেহীকে) আবদ্ধ করে॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা—'তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ'—আগের শ্লোকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি গুণের কথা বলেছিলেন। এই তিনটি গুণের মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্মল (মলবিহীন স্বচ্ছ)। অর্থাৎ রজোগুণ ও তমোগুণের ন্যায় সত্ত্বগুণে মালিন্য নেই অর্থাৎ এটি রজোগুণ এবং তমোগুণ অপেক্ষা নির্মল ও স্বচ্ছ। নির্মল হওয়ায় এটি পরমাত্মতত্ত্বের জ্ঞানলাভের সহায়ক।

'প্রকাশকম্'—সত্ত্বগুণ নির্মল ও স্বচ্ছ হওয়ায় এটি প্রকাশকারী। যেমন আলোর প্রকাশের অন্তর্গত বস্তুগুলি পরিষ্কার দেখা যায়, তেমনই সত্ত্বগুণের আধিক্য হলে রজোগুণ ও তমোগুণের বৃত্তিগুলি স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। রজোগুণ ও তমোগুণ থেকে উৎপন্ন কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য আদি দোষগুলি সম্পর্কে জানা যায় অর্থাৎ এইসব বিকারগুলির সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান হয়।

সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পেলে ইন্দ্রিয়াদিতে প্রকাশ, চেতনা এবং সূক্ষ্মভাব বিশেষভাবে প্রতীত হয়, যার ফলে প্রত্যেক পারমার্থিক বা লৌকিক বিষয় ভালোভাবে বুঝতে বুদ্ধি পূর্ণরূপে কাজ করে এবং কাজ করতেও খুব উৎসাহ থাকে।

সত্ত্বগুণের দুটি রূপ—(১) শুদ্ধ সত্ত্ব, যাতে উদ্দেশ্য থাকেন পরমাত্মা, আর (২) মলিন সত্ত্ব, যার উদ্দেশ্য জাগতিক ভোগ ও সংগ্রহ।[১]

শুদ্ধ সত্ত্বগুণে পরমাত্মা উদ্দেশ্য হওয়ায় পরমাত্মার প্রতি মতি হওয়ার স্বাভাবিক রুচি থাকে। মলিন সত্ত্বগুণে পদার্থ সংগ্রহ এবং সুখভোগের উদ্দেশ্য থাকায় সাংসারিক বিষয়ে রুচি হয়, যাতে মানুষ আবদ্ধ হয়।

মলিন সত্ত্বগুণেও বুদ্ধি সাংসারিক বিষয় ভালোভাবে বুঝতে সক্ষম হয়। যেমন, সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিতেই বৈজ্ঞানিক নতুন নতুন আবিষ্কার করেন ; কিন্তু তার উদ্দেশ্য পরমাত্ম-প্রাপ্তি না হওয়ায় সে অহং-ভাব, সম্মান-প্রতিপত্তি, অর্থ ইত্যাদি দ্বারা সংসারে আবদ্ধ হয়।

'অনাময়ম্'—সত্ত্বগুণ রজঃ এবং তমঃ অপেক্ষা বিকাররহিত। বাস্তবে প্রকৃতির কার্য হওয়ায় এটি সর্বতোভাবে বিকাররহিত নয়। একমাত্র নিজস্বরূপ বা পরমাত্মতত্ত্বই সর্বতোভাবে নির্বিকার হয়, যা গুণাতীত। পরমাত্মপ্রাপ্তিতে সহায়ক হওয়ায় ভগবান সত্ত্বগুণকেও বিকাররহিত বলেছেন।

'সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ'—চিত্তে যখন সাত্ত্বিক বৃত্তি হয়, কোনো বিকার থাকে না, তখন একপ্রকার সুখ অনুভব হয়, প্রশান্তি ভাব জাগে। তখন সাধকের মনে এই চিন্তা আসে যে, এই সুখ যেন সর্বদা বজায় থাকে, এই শান্তি যেন চিরস্থায়ী হয়, এই নির্বিকার-ভাব যেন সবসময় বিরাজ করে। কিন্তু এই সুখ, শান্তি, নির্বিকারত্ব যখন নষ্ট হয়ে যায় সাধকের তখন কিছুই ভালো লাগে না। এই ভালো লাগা এবং ভালো না-লাগাই হল সত্ত্বগুণের সুখেতে আসক্তি, যা বন্ধনকারক।

যখন সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি গুণের, বৃত্তির, বিকারের স্পষ্ট জ্ঞান হয় এবং সাধকের এরূপ নানা বিস্ময়কর ব্যাপার সম্পর্কে জ্ঞান হয়, যা তার পূর্বে ছিল না, তখন সাধকের মনে হয় যেন এই জ্ঞান সর্বদা বজায় থাকে। এই জ্ঞানেও যে আসক্তি, তাও বন্ধনকারক। 'আমি অন্যের চেয়ে বেশি (বিশেষ কিছু) জানি'—এই অহং-অভিমানও বন্ধনের কারণ হয়।

এইভাবে সত্ত্বগুণ সুখ ও জ্ঞানের আসক্তির দ্বারা সাধককে আবদ্ধ করে অর্থাৎ তাঁকে গুণাতীত হতে বাধা দেয়। এই আসক্তিই হল রজোগুণ যা বন্ধনের কারণ হয় (গীতা ১৩।২১)। সাধক যদি সুখ এবং জ্ঞানে আসক্ত না হন তাহলে সত্ত্বগুণের দ্বারা তিনি আবদ্ধ হন না, বরং তিনি গুণাতীত হয়ে ওঠেন। তাৎপর্য হল এই যে যদি আসক্তি না থাকে তাহলে সাধক সত্ত্বগুণ থেকে ঊর্ধ্বে আরোহণ করে নিজ গুণাতীত স্বরূপ অনুভব করতে পারেন।

সত্ত্বগুণের দ্বারা সুখ ও জ্ঞান হলে সাধকের এই বিষয়ে

[১]পরমাত্মা উদ্দেশ্য না হওয়ায় একে 'মলিন সত্ত্ব' বলা হয়। মলিন সত্ত্বে রজোগুণও সঙ্গে থাকে।

সতর্ক থাকা উচিত যে, এই সুখ এবং জ্ঞানই তাঁর লক্ষ্য নয়, এগুলি তাঁর ভোগ্য নয়, এগুলি উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত মাত্র। তাঁকে সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে, যা এই সুখ এবং জ্ঞানকেও প্রকাশিত করে।

সুখ, জ্ঞান ইত্যাদি সবই হল সত্ত্বগুণের বৃত্তি। এগুলির হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় ; কখনো আসে, কখনো যায়। কিন্তু স্বরূপ সর্বক্ষণ একরস থাকে। তার কখনো হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। অতএব সাধকের এবিষয়ে সর্বদা তটস্থ ও উদাসীন থাকা উচিত। এগুলি উপভোগ করা উচিত নয়। তাহলেই তিনি সেই সুখ এবং জ্ঞানের আসক্তিতে আবদ্ধ হন না।

যদি সাধক সত্ত্বগুণ থেকে উৎপন্ন সুখ এবং জ্ঞানে আসক্ত না হন, তাহলে তিনি শীঘ্রই পরমাত্মপ্রাপ্তি করেন। কিন্তু যদি তিনি এই আসক্তি পরিত্যাগ করতে না পারেন এবং লক্ষ্যে অবিচল থাকেন তাহলে উপযুক্ত সময়ে তাঁর এই সুখ এবং জ্ঞানে স্বতঃই অরুচি জন্মায় এবং তিনি পরমাত্মাকে লাভ করেন।

পরিশিষ্ট-ভাব—ভগবান এই স্থানে সত্ত্বগুণকে অনাময় (নির্বিকার) বলেছেন—এ হল সত্ত্বগুণের বৈশিষ্ট্য। কেন-না সত্ত্বগুণ হল গুণাতীতের নিকটতম। সত্ত্বগুণ নির্বিকার হলেও আসক্তির জন্য তা বিকারী হয়ে উঠতে পারে—**'সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ'**, কেন-না আসক্তি হল রজোগুণের কার্যস্বরূপ—**'রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি'** (গীতা ১৪।৭)। সুখ এবং জ্ঞান নিজস্ব ভাবে বাধাস্বরূপ নয়। তাদের আসক্তিই হল বাধাস্বরূপ। আসক্তির তাৎপর্য হল তাকে নিজের বলে মেনে নেওয়া। আসলে সত্ত্বগুণ কারো নিজস্ব নয়, তা হল প্রকৃতির।

মানুষের মধ্যে রজোগুণের প্রাধান্য থাকে—**'রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্মসঙ্গিষু জায়তে'** (১৪।১৫), **'মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ'** (১৪।১৮)। সুতরাং আসক্তি যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ মুক্তি হয় না। কারণ স্ব-স্বরূপ আসক্তিবর্জিত।

ভগবান সত্ত্বগুণকেও অনাময় বলেছেন এবং পরমপদকেও অনাময় বলেছেন—**'পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্'** (২।৫১)। এতে বুঝতে হবে যে সত্ত্বগুণ হল সাপেক্ষ অনাময় আর পরমপদ নিরপেক্ষ অনাময়।

তিনটি গুণই প্রকৃতিগত হলেও রজোগুণ তৃষ্ণা এবং আসক্তি হতে উৎপন্ন হয় এবং তমোগুণ অজ্ঞান থেকে উৎপন্ন হয় (১৪।৭-৮), কিন্তু সত্ত্বগুণই শুধু মাত্র প্রকৃতিজনিত। তবে প্রকৃতিজনিত হলেও কোনো বিকার থেকে উৎপন্ন নয়। তাই একে বলা হয়েছে 'অনাময়'।

সাত্ত্বিক সুখ এবং সাত্ত্বিক জ্ঞান স্ব-স্বরূপের নয়, এরা প্রকৃতিজনিত হওয়ায় 'পর' অর্থাৎ পরাধীন। এতে পরাধীনতার সুখ আছে, নিজ স্বরূপানন্দের সুখ নেই।

সাত্ত্বিক জ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য—সাত্ত্বিক জ্ঞানে 'আমি জ্ঞানী' এই সঙ্গ থাকে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান সর্বতোভাবে সঙ্গবর্জিত অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান হলে জ্ঞান সত্ত্বেও 'আমি জ্ঞানী'—এই অহমিকা থাকে না। সাত্ত্বিক জ্ঞানে দ্রষ্টা বিরাজ করে এবং আত্মাভিমান থাকে । কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানে কোনো দ্রষ্টা থাকে না এবং নিজের মধ্যে কোনো অপূর্ণতাবোধ বা অভিমানবোধ থাকে না ; কারণ তখন স্বতন্ত্রবোধই লোপ পায় । নিজের সম্পর্কে বৈশিষ্ট্য অনুভব করাই হল সঙ্গ। 'আমি জ্ঞানী'—এটি স্বীকার করলেই বিশিষ্টভাব আরোপ হয়। তত্ত্বজ্ঞান হলে নিজানন্দ অনুভূত হয়। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের সাতাশতম শ্লোকে সাত্ত্বিক জ্ঞান এবং আঠাশতম শ্লোকে তত্ত্বজ্ঞান বর্ণিত হয়েছে।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—এবার রজোগুণের স্বরূপ এবং তার বন্ধনের প্রকার জানাচ্ছেন।

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্॥ ৭ ॥

[**কৌন্তেয়** (হে কৌন্তেয় !) ; **তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্** (তৃষ্ণা ও আসক্তি উৎপন্নকারী) ; **রজঃ** (রজোগুণকে) ; **রাগাত্মকম্, বিদ্ধি** (রাগাত্মক বলে জেনো) ; **তৎ, কর্মসঙ্গেন** (এটি কর্মের আসক্তি দ্বারা) ; **দেহিনম্, নিবধ্নাতি** (দেহী বা জীবাত্মাকে আবদ্ধ করে।)]

হে কৌন্তেয় ! তৃষ্ণা ও আসক্তি উৎপন্নকারী রজোগুণকে তুমি রাগাত্মক বলে জেনো। এটি কর্মের আসক্তি দ্বারা দেহীকে (জীবাত্মাকে) আবদ্ধ করে॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা—**'রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি'**—এই রজোগুণ রাগ (আসক্তি) রূপ অর্থাৎ কোনো বস্তু, ব্যক্তি, পরিস্থিতি, ঘটনা, ক্রিয়া ইত্যাদিতে যে অনুরাগ জন্মায় সেই অনুরাগই হল রজোগুণের স্বরূপ।

'রাগাত্মকম্' বলার অর্থ হল যেমন সোনার গয়না স্বর্ণময় হয় তেমনই রজোগুণ রাগময় হয়।

পাতঞ্জল যোগদর্শনে ক্রিয়াকে বলা হয়েছে রজোগুণের স্বরূপ[১]। কিন্তু শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে ভগবান (ক্রিয়ামাত্রকেই গৌণরূপে রজোগুণ বলে মানলেও) প্রধানতঃ অনুরাগকেই রজোগুণের রূপ বলে প্রকাশ করেছেন।[২] তাই **'যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা'** (২।৪৮) পদের দ্বারা আসক্তি পরিত্যাগ করে কর্তব্য-কর্ম করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নিষ্কামভাবে করা কর্ম মুক্তিপ্রদানকারী হয়ে থাকে (৩।১৯)। এই অধ্যায়ের বাইশতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, 'প্রবৃত্তি' অর্থাৎ ক্রিয়া করার ইচ্ছা উৎপন্ন হলেও গুণাতীত ব্যক্তির তাতে আসক্তি হয় না। তাৎপর্য হল এই যে, গুণাতীত ব্যক্তিরও রজোগুণের প্রভাবে প্রবৃত্তি হয়ে থাকে কিন্তু তা আসক্তিযুক্ত হয় না। গুণাতীত হওয়ার সহায়ক হলেও সত্ত্বগুণকে সুখ এবং জ্ঞানের আসক্তির জন্য বন্ধনকারক বলা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, আসক্তিই বন্ধনের কারণ, সত্ত্বগুণ নিজে নয়। তাই ভগবান এখানে আসক্তিই রজোগুণের মুখ্য স্বরূপ বলে জানিয়েছেন।

মহাসর্গের আদিতে পরমাত্মার সংকল্প হয়—**'বহু স্যাং প্রজায়েয়'**। এই সংকল্প রজোগুণাত্মক। গীতায় একে 'কর্ম' বলা হয়েছে (৮।৩)। যেমন দইকে মন্থন করলে মাখন এবং ঘোল পৃথক্ হয়ে যায়, তেমনই জগৎ-সৃষ্টির এই রজঃগুণাত্মক সংকল্প দ্বারা প্রকৃতিতে আলোড়ন উৎপন্ন হয়। যার ফলে সত্ত্বগুণরূপী মাখন এবং তমোগুণরূপী ঘোল পৃথক্ হয়ে যায়। সত্ত্বগুণ দ্বারা চিত্ত এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি, রজোগুণ দ্বারা প্রাণ এবং কর্মেন্দ্রিয়গুলি আর তমোগুণ দ্বারা স্থূল পদার্থ শরীর ইত্যাদি তৈরি হয়। তিনটি গুণের সহযোগে জগতের অন্যান্য পদার্থগুলিও উৎপন্ন হয়। এইভাবে মহাসর্গের আদিতে ভগবানের জগৎ সৃষ্টিরূপ কর্মও সর্বতোভাবে আসক্তিবর্জিত হয়ে থাকে (গীতা ৪।১৩)।

'তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্'—প্রাপ্ত বস্তু, ব্যক্তি, পদার্থ, পরিস্থিতি, ঘটনা ইত্যাদি বজায় থাকুক এবং সেগুলি আরও বেশি করে প্রাপ্ত হতে থাকুক—**'জিমি প্রতিলাভ লোভ অধিকাঈ'**—এভাবে তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। এই তৃষ্ণা থেকেই পুনরায় বস্তু ইত্যাদিতে আসক্তি উৎপন্ন হয়।

ব্যাকরণ অনুযায়ী এই **'তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্'** পদটির দুটি অর্থ হয় (১) যাতে তৃষ্ণা এবং আসক্তি উৎপন্ন হয়[৩] অর্থাৎ তৃষ্ণা ও আসক্তি উৎপন্নকারী এবং (২) যা তৃষ্ণা এবং আসক্তি হতে উৎপন্ন হয়[৪] অর্থাৎ তৃষ্ণা এবং আসক্তি হতে উৎপন্ন। যেমন বীজ ও বৃক্ষ একে অপরের

[১]প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্। (যোগদর্শন ২।১৮)

[২]শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মহৎ বিশেষত্ব এই যে, এটি কারও মতবাদ খণ্ডন না করেই সেই বিষয়ে নিজ মত প্রকটিত করে। গীতায় ভগবান ক্রিয়াকেও রজোগুণ বলে স্বীকার করেছেন—'লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্মণাম্' (১৪।১২), এবং ক্রিয়াকে সাত্ত্বিকও বলেছেন (১৮।২৩)। তাই ক্রিয়াতে কোনো দোষ নেই, দোষ আসলে আসক্তি বা অনুরাগেই। রাগপূর্বক কর্ম করলে তা আবদ্ধ করে। অর্থাৎ মানুষ কর্মের আসক্তি ও ফলেচ্ছাতেই আবদ্ধ হয়, কর্ম করলে নয়। আসক্তি না থাকলে সর্ব কর্ম করলেও মানুষ তাতে আবদ্ধ হয় না (৪।১৯)। ক্রিয়ামাত্রই যদি বন্ধনকারক হত তাহলে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণও আবদ্ধ হতেন। কারণ তাঁদের দ্বারাও ক্রিয়াদি সংঘটিত হয় (১৪।২২)। ভগবানের জগৎ-সৃষ্টিও 'কর্ম' এবং অবতার হয়ে ক্রিয়া (লীলা) করে থাকেন, কিন্তু কর্মে আসক্ত না থাকায় কর্ম তাঁকে আবদ্ধ করে না (৯।৯)।

অষ্টাদশ অধ্যায়ের তেইশ, চব্বিশ ও পঁচিশতম শ্লোকে ভগবান সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—তিনপ্রকার কর্মের বর্ণনা দিয়েছেন। যদি কর্মমাত্রই রজোগুণ হত, তাহলে তার সাত্ত্বিক ও তামসিক বিভেদ কীভাবে হত ? এতেই প্রমাণিত হয় যে, গীতা প্রধানতঃ আসক্তিকেই রজোগুণ বলেছে।

[৩]তৃষ্ণায়াঃ সঙ্গস্য চ সমুদ্ভবো যস্মাৎ।

[৪]তৃষ্ণায়াঃ সঙ্গাচ্চ সমুদ্ভবো যস্য।

কারণ হয় অর্থাৎ বীজ হতে বৃক্ষ উৎপন্ন হয় এবং বৃক্ষ থেকে আবার বীজ উৎপন্ন হয়, তেমনই রাগ (আসক্তি)-রূপ রজোগুণ থেকে তৃষ্ণা এবং আসক্তি বৃদ্ধি পায় এবং তৃষ্ণা ও আসক্তি থেকে রজোগুণও বহুগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তাৎপর্য হল এই যে, এই দুটিই একে অপরের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। সুতরাং উপরোক্ত দুটি অর্থই ঠিক।

'তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্'—রজোগুণ কর্মের আসক্তি দ্বারা দেহীকে আবদ্ধ করে, অর্থাৎ রজোগুণ বৃদ্ধি পেলে যেমন তৃষ্ণা এবং আসক্তি বৃদ্ধি পায়, তেমনই মানুষের কর্ম করার প্রবৃত্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কর্ম করার প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পেলে মানুষ নতুন নতুন কর্ম করতে আরম্ভ করে। তখন সে রাতদিন এই প্রবৃত্তিতেই আবর্তিত হতে থাকে অর্থাৎ মানুষের মনোবৃত্তিগুলি দিবারাত্র নতুন নতুন কর্মোদ্যোগের চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে। এরূপ অবস্থায় তার নিজের কল্যাণ, উদ্ধার ইত্যাদি করার সময় থাকে না। এইভাবে রজোগুণ কর্মসুখের আসক্তির দ্বারা দেহীকে আবদ্ধ করে অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু আবর্তনে ঠেলে দেয়। সুতরাং সাধক প্রাপ্ত পরিস্থিতি অনুসারে নিষ্কামভাবে কর্তব্য-কর্ম সম্পন্ন করলেও, সম্পদ-সংগ্রহ এবং সুখভোগের জন্য নতুন নতুন কর্মে যেন প্রবৃত্ত না হয়।

'দেহিনম্' পদটির তাৎপর্য হল যে, দেহের সঙ্গে নিজ সম্বন্ধ মেনে নেয় যে দেহী, তাকে এই রজোগুণ কর্মের আসক্তি দ্বারা আবদ্ধ করে।

সকামভাবে কর্ম করলেও একপ্রকার সুখ হয় এবং 'কর্মের অমুক ফল ভোগ করব' এই ফলাসক্তিতেও একপ্রকার সুখ হয়। এই কর্ম এবং ফলের সুখাসক্তিতে মানুষ আবদ্ধ হয়ে যায়।

কর্মের সুখাসক্তি থেকে মুক্তি পাবার জন্য সাধকের এই চিন্তা করা উচিত যে, এইসব পদার্থ, ব্যক্তি, পরিস্থিতি, ঘটনা ইত্যাদি ক'দিন আর আমাদের সঙ্গে থাকবে ? কারণ সমস্ত দৃশ্যমান বস্তুই প্রতিমুহূর্তে বিনাশের দিকে যাচ্ছে ; জীবন প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হচ্ছে ; সর্গ প্রতিক্ষণ প্রলয়ের দিকে যাচ্ছে ; মহাসর্গ প্রতিক্ষণ মহাপ্রলয়ের দিকে যাচ্ছে। অদ্যাবধি যে বাল্য, যৌবন ইত্যাদি অবস্থা বিগত হয়েছে তা আর ফিরে পাওয়া যাবে না। যে সময় চলে গেছে, তা আর ফিরে পাওয়া যাবে না। বিগত কালের রাজা, মহারাজা এবং ধনীদের অন্তিম পরিণতি স্মরণ করলে এবং বড় বড় রাজপ্রাসাদ এবং অট্টালিকার ভগ্নস্তূপ দেখে সাধকের এই চিন্তা করা উচিত যে এগুলির যে দশা হয়েছে, সেই দশা একদিন এই শরীর, ধন-সম্পত্তি, বাড়ি-ঘর ইত্যাদিরও হবে। আমি এযাবৎ এইসব প্রলোভনের ফাঁদে পড়ে নিজের শক্তি, বুদ্ধি ও সময় নষ্ট করে দিয়েছি। এতে কত ক্ষতি হয়ে গেছে ! এইরূপ বিচার করলে সাধকের চিত্তে সাত্ত্বিক বৃত্তি আসবে এবং তিনি কর্মাসক্তির ঊর্ধ্বে উত্তীর্ণ হবেন।

আমি যদি দিন-রাত নতুন নতুন কর্মেই ব্যাপৃত থাকি, তাহলে আমার এই মনুষ্যজন্ম নিরর্থক হয়ে যাবে এবং সেই কর্মের আসক্তিতে আমাকে না জানি কোন্ কোন্ যোনিতে কত বার জন্মাতে এবং মরতে হবে ! তাই আমার সম্পদ-সংগ্রহ এবং সুখভোগের জন্য নতুন কোনো কর্ম আরম্ভ করা উচিত নয়, বরং পরিস্থিতি অনুযায়ী অনাসক্তভাবে কর্তব্য-কর্ম করা উচিত। এইরূপ বিচারের দ্বারাও সাধক কর্মের আসক্তি থেকে উদ্ধার পেতে পারবেন।

পরিশিষ্ট-ভাব—রজোগুণ কর্মের আসক্তিতে মানুষকে আবদ্ধ করে। অতএব সাত্ত্বিক কর্মেও আসক্তি থাকলে তা বন্ধনকারক হয়। আসক্তি না থাকলে তা বন্ধনকারক হয় না (গীতা ১৮।১৭)। তাই কর্মযোগের সাহায্যে মুক্তিলাভ হয়, কারণ কর্ম এবং তার ফলে আসক্তি না থাকলে তবেই সেটি কর্মযোগ হয় (গীতা ৬।৪)।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—পরবর্তী শ্লোকে তমোগুণের স্বরূপ এবং তার বন্ধনের প্রকার জানিয়েছেন।

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত॥ ৮ ॥

[**তু, ভারত** (হে ভরতবংশোদ্ভব অর্জুন !) ; **সর্বদেহিনাম্** (সমস্ত দেহীগণের) ; **মোহনম্** (মোহগ্রস্তকারী) ; **তমঃ** (তমোগুণকে) ; **অজ্ঞানজম্, বিদ্ধি** (অজ্ঞানজাত বলে জেনো) ; **তৎ** (এটি) ; **প্রমাদালস্যনিদ্রাভিঃ** (প্রমাদ, আলস্য এবং

নিদ্রাদ্বারা) ; নিবধ্নাতি (আবদ্ধ করে।)]

হে ভরতবংশোদ্ভব অর্জুন ! সমস্ত দেহীগণের মোহগ্রস্তকারী তমোগুণকে তুমি অজ্ঞান হতে উৎপন্ন বলে জেনো। এটি প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রার দ্বারা দেহের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ মান্যকারী জীবগণকে আবদ্ধ করে॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা—**'তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্'**—সত্ত্বগুণ ও রজোগুণ—এই দুইয়ের থেকে তমোগুণকে অতি নিকৃষ্ট জানাবার জন্য **'তু'** পদটি প্রযুক্ত হয়েছে।

এই তমোগুণ অজ্ঞান হতে অর্থাৎ বোধহীনতা, মূর্খতা থেকে উৎপন্ন হয় এবং সকল দেহীকে মোহগ্রস্ত করে রাখে অর্থাৎ সৎ-অসৎ, কর্তব্য-অকর্তব্যের জ্ঞান হতে দেয় না। শুধু তাই নয়, এটি জাগতিক সুখভোগ এবং সম্পদ-সংগ্রহের কাজেও ব্যাপৃত হতে দেয় না অর্থাৎ রাজসিক সুখেও বঞ্চিত রাখে, সাত্ত্বিক সুখের তো কথাই নেই !

এখানে তমোগুণের দ্বারা মোহগ্রস্ত হওয়ার কথা শুধুমাত্র মনুষ্যকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। কারণ অন্যান্য প্রাণীরা স্বভাবতঃই তমোগুণের দ্বারা মোহগ্রস্ত থাকে। তা সত্ত্বেও এখানে **'সর্বদেহিনাম্'** পদটি ব্যবহারের তাৎপর্য হল এই যে, যেসব মানুষের মধ্যে সৎ-অসৎ, কর্তব্য-অকর্তব্যের জ্ঞান নেই, তারা মানুষ হলেও মনুষ্যেতর প্রাণীর সমান অর্থাৎ পশু-পাখি ইত্যাদি ইতর প্রাণী যেমন খায়-দায় এবং ঘুমায়, এইসব মানুষও তেমনই হয়ে থাকে।

'প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত'—এই তমোগুণ প্রমাদ, আলস্য এবং নিদ্রার দ্বারা সমস্ত দেহীকে আবদ্ধ করে।

'প্রমাদ' দুপ্রকারে হয়—(১) কর্তব্য-কর্ম না করা অর্থাৎ যে কাজের দ্বারা নিজের এবং জগতের বর্তমানে এবং পরিণামে হিতসাধন হয়, এরূপ কর্তব্য-কর্মগুলি না করা এবং (২) না করার যোগ্য কাজ করা অর্থাৎ যে কাজে নিজের এবং জগতের, বর্তমানে বা পরিণামে অহিত হয়, সেরূপ কর্ম করা।

না করার যোগ্য কাজও দুপ্রকারের হয়—(১) অপব্যয় করা অর্থাৎ বিড়ি-সিগারেট, মদ জাতীয় জিনিস খাওয়ায় এবং নাটক-সিনেমা, খেল্-তামাসা ইত্যাদি দেখায় অর্থ ব্যয় করা এবং (২) নিষ্ফল কাজ করা অর্থাৎ তাস-দাবা খেলা, কাজের সময় খেলাধুলো করা, অকারণে পশু-পক্ষীকে উৎপীড়ন করা, অকারণে ছোট ছোট গাছপালা কেটে নষ্ট করা ইত্যাদি নিষ্ফল কাজ করা।

'আলস্য'ও দুপ্রকারের—(১) শুয়েবসে কাটানো, নিষ্কর্মা হয়ে সময় ক্ষেপ করা, প্রয়োজনীয় কাজ না করা এবং 'পরে কাজটা করব, এখন তো একটু আরাম করে নিই'—এরূপ অবসাদ মানুষকে আবদ্ধ করে এবং (২) নিদ্রার আগে শরীরে অলসতা আসা, বৃত্তিগুলি বোঝা-স্বরূপ বোধ হওয়া, বুঝবার শক্তি না থাকা—এরূপ আলস্য দোষের নয়। কারণ এগুলি আসে, মানুষ নিজে থেকে এগুলি করে না।

'নিদ্রা'ও দুপ্রকারের—(১) আবশ্যিক নিদ্রা—যা শরীর ও স্বাস্থ্যের জন্য নিয়মিতভাবে নেওয়া হয় যার ফলে শরীর ভালো থাকে, বৃত্তিগুলি স্বচ্ছ হয়, মস্তিষ্ক বিশ্রাম লাভ করে, এরূপ আবশ্যকীয় নিদ্রা দূষণীয় বা পরিত্যাজ্য নয়। ভগবানও এরূপ নিয়মিত নিদ্রাকে দূষণীয় বলে মনে করেননি, বরং যোগ-সাধনের পক্ষে সহায়ক বলেছেন—**'যুক্তস্বপ্নাববোধস্য'** (৬।১৭) এবং (২) অনাবশ্যক নিদ্রা—যা শুধুমাত্র নিদ্রার জন্যই নিদ্রা, যার ফলে অবসাদ আসে, নিদ্রা ভাঙলেও শরীর ভারী লাগে, বৃত্তিগুলি স্থূল হয়, পুরাতন স্মৃতি নষ্ট হয়ে যায়, এরূপ অনাবশ্যক নিদ্রা দূষণীয় এবং পরিত্যাজ্য। এই অনাবশ্যক নিদ্রাকে ভগবানও পরিত্যাগ করতে বলেছেন—**'ন চাতি স্বপ্নশীলস্য'** (৬।১৬)।

এইভাবে তমোগুণ প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা দ্বারা মানুষকে আবদ্ধ করে অর্থাৎ তার জাগতিক বা পারমার্থিক উন্নতির বাধা স্বরূপ হয়।

বিশেষ কথা

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি গুণ মানুষকে আবদ্ধ করে, কিন্তু এই তিনটির বন্ধনের প্রকারে পার্থক্য আছে। সত্ত্বগুণ ও রজোগুণ আসক্তির দ্বারা বন্ধন করে, অর্থাৎ সত্ত্বগুণ সুখ এবং জ্ঞানের আসক্তির দ্বারা এবং রজোগুণ কর্মাদির আসক্তির দ্বারা বন্ধন করে। সুতরাং সত্ত্বগুণে

'সুখাসক্তি ও জ্ঞানাসক্তি'র কথা বলেছেন এবং রজোগুণে 'কর্মাসক্তি'র কথা বলেছেন। কিন্তু তমোগুণে 'আসক্তি'র কথা বলেননি। কারণ তমোগুণ সম্মোহাত্মক। এটি আসক্তির অপেক্ষা রাখে না। এটি স্বরূপতঃই বন্ধনকারক। তাৎপর্য হল এই যে সত্ত্বগুণ এবং রজোগুণ সংসর্গের (সুখাসক্তির) দ্বারা আবদ্ধ করে, কিন্তু তমোগুণ স্বরূপতঃই বন্ধনকারী।

যদি সুখের আসক্তি না থাকে এবং জ্ঞানের অহংকার না থাকে তাহলে সুখ এবং জ্ঞান কখনো বন্ধনকারক হয় না, বরং এটি গুণাতীত করে থাকে। তেমনই কর্ম এবং কর্মফলে যদি আসক্তি না থাকে, তাহলে সেই কর্মের দ্বারা ভগবদ্প্রাপ্তি হয় (গীতা ৩।১৯)।

উপরিউক্ত তিনটি গুণ প্রকৃতির কার্য এবং জীব স্বয়ং প্রকৃতি ও তার গুণাদি কার্য থেকে সর্বতোভাবে রহিত। গুণাদির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত করার কারণে সে স্বয়ং নির্লিপ্ত, গুণাতীত হয়েও গুণাদির দ্বারা আবদ্ধ হয়। সুতরাং নিজ প্রকৃত স্বরূপের দিকে লক্ষ্য রাখলেই সাধক গুণাদির বন্ধন হতে মুক্ত হতে সক্ষম।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—বন্ধনের আগে এই তিনটি গুণ কী করে—পরবর্তী শ্লোকে তাই বলা হয়েছে।

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্চয়ত্যুত॥ ৯ ॥

[ভারত (হে ভরতবংশীয় অর্জুন!) ; **সত্ত্বম্, সুখে** (সত্ত্বগুণ সুখে) ; **রজঃ, কর্মণি** (রজোগুণ কর্মে আসক্ত করে) ; **সঞ্জয়তি** (বিজয় প্রাপ্ত করে) ; **তু, তমঃ, জ্ঞানম্** (তমোগুণ জ্ঞানকে) ; **আবৃত্য, উত** (আবৃত করে) ; **প্রমাদে** (প্রমাদে ব্যাপৃত করে) ; **সঞ্জয়তি** (জয় করে।)]

হে ভরতবংশীয় অর্জুন! সত্ত্বগুণ সুখে এবং রজোগুণ কর্মে আসক্ত করে মানুষকে জয় করে নেয় অর্থাৎ তাকে পরাভূত করে। তমোগুণ জ্ঞানকে আবৃত করে এবং প্রমাদে (কর্তব্যহীনতায়) ব্যাপৃত করে মানুষকে জয় করে॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা—'সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি'—সত্ত্বগুণ সাধককে সুখে আসক্ত করে জয়লাভ করে অর্থাৎ সাধককে নিজের বশীভূত করে। তাৎপর্য হল এই যে যখন সাত্ত্বিক সুখ হয় তখন সাধকের সেই সুখে আসক্তি জন্মে থাকে। সুখে আসক্তি হলে সেই সুখ সাধককে আবদ্ধ করে, অর্থাৎ তার সাধনকে আর অগ্রসর হতে দেয় না, যার ফলে সাধক সত্ত্বগুণের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন না, গুণাতীত হতে পারেন না।

ভগবান যদিও ষষ্ঠ শ্লোকে সত্ত্বগুণের দ্বারা সুখ এবং জ্ঞানের অভিমানের দ্বারা বন্ধনের কথা বলেছেন, তথাপি এখানে সত্ত্বগুণের বিজয় কেবল সুখেতেই বলেছেন, জ্ঞানে নয়। এর তাৎপর্য হল যে বাস্তবে সাধক সুখের আসক্তিতেই আবদ্ধ হন। জ্ঞান হলে সাধকের মনে এই অহংভাব আসে যে 'আমি কত জানি!' এই অহংভাব থেকে এক প্রকার সুখ অনুভূত হয়, যাতে সাধক আবদ্ধ হন। তাই এখানে সত্ত্বগুণের কেবলমাত্র সুখে আবদ্ধ করার কথা জানিয়েছেন।

'রজঃ কর্মণি ভারত'—রজোগুণ মানুষকে কর্মে ব্যাপৃত করে জয় করে। তাৎপর্য হল এই যে, মানুষের কাজে স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে, কাজ করে সে আনন্দ পায়। ছোট শিশু যেমন শুয়ে শুয়ে হাত-পা নাড়ে তাতে সে আনন্দ পায়, আর তার হাত-পা নাড়া বন্ধ করে দিলে সে কাঁদতে থাকে। তেমনই মানুষ কাজ করতে ভালোবাসে আর তার সেই কাজ কেউ মধ্যপথে থামিয়ে দিলে সে বিরক্ত হয়। এই হল ক্রিয়ার প্রতি আসক্তি, ভালোবাসা, যার ফলে রজোগুণ মানুষের ওপর কর্তৃত্ব করে।

'কর্মের ফলে তোমার অধিকার নেই' (গীতা ২।৪৭) ইত্যাদি উপদেশ থেকে সাধক কর্মফলে অনাসক্ত থাকা উচিত বুঝতে পারে কিন্তু কার্যকালে তা তার খেয়াল থাকে না। তিনি 'কর্মেই তোমার অধিকার, কর্মত্যাগে যেন তোমার আসক্তি না হয়' (গীতা ২।৪৭), 'যিনি যোগারূঢ়

হতে ইচ্ছুক, নিষ্কামভাবে কর্ম করাই তাঁর যোগারূঢ় হওয়ার পথ অর্থাৎ উপায়' (গীতা ৬।৩) ইত্যাদি উপদেশ থেকে সাধক এই কথাই ভেবে নেন যে কর্ম করাই উচিত। সুতরাং তিনি কর্ম করতে থাকেন এবং কর্ম করতে করতে তাঁর সেই কর্মে আসক্তি ও ভালোবাসা জন্মায়, আগ্রহ বেড়ে ওঠে। তাই এ বিষয়ে সজাগ করার জন্য, সতর্ক করার জন্য ভগবান এখানে বলেছেন যে রজোগুণ কর্মলিপ্ত করে বিজয়ী হয় অর্থাৎ কর্মে আসক্তি উৎপাদন করে আবদ্ধ করে। তাই সাধকের কর্তব্য-কর্মে অনুরক্তি থাকলেও, আসক্তি, ভালোবাসা, আগ্রহ কখনো থাকা উচিত নয়—'**ন কর্মস্বনুষজ্জতে**' (গীতা ৬।৪)।

'**জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত**'—যখন তমোগুণ আসে, তখন তা সৎ-অসৎ, কর্তব্য-অকর্তব্য, হিত-অহিতের জ্ঞানকে (বিবেক) আবৃত, আচ্ছাদিত করে দেয় অর্থাৎ সেই জ্ঞানকে জাগরিত হতে দেয় না। জ্ঞানকে আবৃত করে তা মানুষকে প্রমাদে নিমগ্ন করে অর্থাৎ কর্তব্য-কর্ম করতে দেয় না এবং অনুচিত কর্মে নিয়োজিত করে, এই হল তমোগুণের বিজয় লাভ করা।

সত্ত্বগুণ থেকে জ্ঞান (বিবেক) এবং প্রকাশ (স্বচ্ছ ভাব)—এই দুই বৃত্তি উৎপন্ন হয়। তমোগুণ এই দুটি বৃত্তিরই বিরোধী, তাই সেটি জ্ঞানকে আবৃত করে মানুষকে প্রমাদে নিমগ্ন করে এবং প্রকাশকে (ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণের নির্মলতাকে) আচ্ছাদিত করে মানুষকে আলস্য এবং অবসাদে এমন ভাবে আচ্ছন্ন করে যে, জ্ঞানের চর্চা করলে বা বিদ্যাভ্যাসের দ্বারাও তা বোধগম্য হয় না।

পরিশিষ্ট-ভাব—সত্ত্বগুণ শুধুমাত্র সুখ উৎপাদন করেই যে ক্ষান্ত হয় তা নয়, বরং সুখের আসক্তিতে লিপ্ত করে বিজয় লাভ করে—'**সুখসঙ্গেন বধ্নাতি**' (গীতা ১৪।৬)। এইরূপ রজোগুণও কর্মে আসক্তি দ্বারা বদ্ধ করে বিজয় লাভ করে—'**তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্**' (১৪।৭)। কিন্তু তমোগুণ স্বাভাবিকভাবেই বিজয় লাভ করে। তাই তমোগুণের বর্ণনায় 'আসক্তি' শব্দটি বলা হয়নি।

'আমি সুখী'—এ হল সুখের আসক্তি এবং 'আমি ভালো কর্ম করি, আমার কর্ম খুব ভালো'—এ হল কর্মের আসক্তি। আসক্তি হলে অর্থাৎ নিজের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলেই মানুষ আবদ্ধ হয়।

* * *

সম্বন্ধ—পরের শ্লোকটিতে জানিয়েছেন যে এক একটি গুণ কীভাবে মানুষের ওপর আধিপত্য করে।

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা॥ ১০ ॥

[**ভারত** (হে ভারত!) ; **রজঃ, চ, তমঃ** (রজোগুণ এবং তমোগুণকে) ; **অভিভূয়** (দমিত করে) ; **সত্ত্বম্, ভবতি** (সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পায়) ; **সত্ত্বম্, চ, তমঃ** (সত্ত্বগুণ এবং তমোগুণকে) ; **রজঃ** (রজোগুণ) ; **তথা, এব** (তেমনই) ; **সত্ত্বম্** (সত্ত্বগুণ) ; **রজঃ** (রজোগুণকে) ; **তমঃ** (তমোগুণ।)]

হে ভারত ! রজোগুণ এবং তমোগুণকে দমিত করে সত্ত্বগুণ, সত্ত্বগুণ এবং তমোগুণকে দমিত করে রজোগুণ এবং তেমনই সত্ত্বগুণ এবং রজোগুণকে দমিত করে তমোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা—'**রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত**'—রজোগুণ এবং তমোগুণের বৃত্তিগুলিকে দমিত করে সত্ত্ব-গুণ বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ রজোগুণের লোভ, প্রবৃত্তি, নতুন নতুন কর্মারম্ভ, অশান্তি, স্পৃহা, জাগতিক ভোগ এবং ধন-সংগ্রহের প্রতি ভালোবাসা ইত্যাদি বৃত্তি এবং তমোগুণের কারণ প্রমাদ, আলস্য, অনাবশ্যক নিদ্রা, মূর্খতা ইত্যাদি বৃত্তি—এগুলিকে সত্ত্বগুণ দমিত করে এবং অন্তঃকরণের স্বচ্ছতা, নির্মলতা, বৈরাগ্য, নিঃস্পৃহতা, উদারতা, নিবৃত্তি ইত্যাদি বৃত্তি উৎপন্ন করে।

'**রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব**'—সত্ত্বগুণ এবং তমোগুণের বৃত্তিগুলিকে দমিত করে রজোগুণ বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ সত্ত্বগুণের কারণভূত জ্ঞান, প্রকাশ, বৈরাগ্য, উদারতা

প্রভৃতি বৃত্তি এবং তমোগুণের কারণরূপ প্রমাদ, আলস্য, অনাবশ্যক নিদ্রা, মূঢ়তা ইত্যাদি বৃত্তি—এগুলিকে রজোগুণ দমিত করে এবং অন্তঃকরণে (চিত্তে) লোভ, প্রবৃত্তি, নতুন নতুন কর্মারম্ভ, অশান্তি, স্পৃহা ইত্যাদি বৃত্তিগুলি উৎপন্ন করে।

'তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা'—এইভাবেই সত্ত্বগুণ এবং রজোগুণকে দমিত করে তমোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সত্ত্বগুণের স্বচ্ছভাব, নির্মলতা, প্রকাশ, উদারতা ইত্যাদি বৃত্তিগুলিকে এবং রজোগুণের চঞ্চলতা, অশান্তি, লোভ ইত্যাদি বৃত্তিগুলিকে তমোগুণ দমিত করে এবং চিত্তে প্রমাদ, আলস্য, অতিনিদ্রা, মূঢ়তা ইত্যাদি বৃত্তি উৎপন্ন করে।

দুটি গুণকে দমিত করে একটি গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত গুণটি মানুষের ওপর আধিপত্য করে অর্থাৎ তাকে আবদ্ধ করে। কিন্তু ভগবান এখানে (ষষ্ঠ থেকে দশম শ্লোক পর্যন্ত) বিপরীত ক্রম দিয়েছেন অর্থাৎ প্রথমে বন্ধনের কথা বলেছেন, তারপর আধিপত্যের কথা বলেছেন এবং পরে দুটি গুণকে অবদমিত করে একটির বৃদ্ধি পাওয়ার কথা বলেছেন। এরূপ ক্রম দেওয়ার তাৎপর্য হল—আগে ভগবান দ্বিতীয় শ্লোকে বলেছিলেন যে, যে মহাপুরুষদের প্রকৃতি থেকে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে, তাঁরা আর মহাসর্গে জন্মগ্রহণ করেন না এবং মহাপ্রলয়ে ব্যথিত (শোকগ্রস্ত) হন না। কারণ মহাসর্গ এবং মহাপ্রলয় উভয়ই প্রকৃতির সম্বন্ধ থেকে হয়। যে ব্যক্তি প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, তাকে প্রকৃতিজনিত গুণগুলি আবদ্ধ করে (১৪।৫)। এতে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসে যে, ওই গুণগুলির স্বরূপ কী এবং সেগুলি মানুষকে কীভাবে আবদ্ধ করে ? এর উত্তরে ভগবান ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্লোক পর্যন্ত ক্রমশ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিনটি গুণের স্বরূপ এবং তার দ্বারা জীবের বন্ধনের প্রকার জানিয়েছেন। এতে প্রশ্ন আসে যে, বন্ধনের আগে এই তিনটি গুণ কী করে ? তার উত্তরে ভগবান বলেছেন যে, বন্ধনের আগে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত গুণগুলি মানুষের ওপর আধিপত্য করে, তারপর তাকে আবদ্ধ করে (১৪।৯)। এখন প্রশ্ন আসে যে, গুণ কীভাবে মানুষের ওপর আধিপত্য করে ? তার উত্তরে ভগবান বলেছেন যে, দুটি গুণকে অবদমিত করে একটি গুণ মানুষের ওপর আধিপত্য করে (১৪।১০)। এইভাবে আলোচনা করলে বোঝা যায় যে, ভগবান ষষ্ঠ থেকে দশম শ্লোক পর্যন্ত যে ক্রম স্থির করেছেন, তা ঠিকই হয়েছে।

পরিশিষ্ট-ভাব—যে গুণটি বৃদ্ধি পায়, সেটিই প্রাধান্য পায় এবং অন্য গুণাদি তখন গৌণ হয়ে যায়। গুণাদির স্বভাবই এরূপ।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—যখন দুটি গুণকে দমিত করে একটি গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তখন সেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত গুণটির কী লক্ষণ হয়—তা জানাবার জন্য প্রথমে বর্ধিত সত্ত্বগুণের লক্ষণগুলি বর্ণনা করছেন।

সর্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত॥ ১১ ॥

[**যদা, অস্মিন্, দেহে** (যখন এই মনুষ্যদেহে) ; **সর্বদ্বারেষু** (সর্বদ্বারে) ; **প্রকাশঃ, উত** (প্রকাশ, এবং) ; **জ্ঞানম্** (জ্ঞান) ; **উপজায়তে** (প্রকাশিত হয়) ; **তদা, ইতি** (তখন) ; **বিদ্যাৎ** (বুঝতে হবে) ; **সত্ত্বম্, বিবৃদ্ধম্** (সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে।)]

যখন এই মনুষ্যদেহে সর্বদ্বারে (ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণে) প্রকাশ (নির্মলতা) এবং জ্ঞান (বিবেক) উৎপন্ন হয়, তখন বুঝতে হবে যে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে ॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা—**'সর্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ ...... জ্ঞানং যদা'**—যখন রজোগুণ এবং তমোগুণের বৃত্তিগুলিকে অবদমিত করে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তখন সকল ইন্দ্রিয়ে এবং অন্তঃকরণে স্বচ্ছতা ও নির্মলতা উৎপন্ন হয়। যেমন সূর্যের আলোয় সব বস্তু স্পষ্টভাবে দেখা যায়, তেমনই স্বচ্ছ বহিঃকরণ ও অন্তঃকরণের দ্বারা শব্দাদি পাঁচটি বিষয়ের জ্ঞান যথার্থভাবে হয়, কোনো বিষয়ের যথাযথ চিন্তন-মনন করা সম্ভব হয়।

ইন্দ্রিয়গুলিতে এবং অন্তঃকরণে স্বচ্ছতা, নির্মলতা হলে সৎ কী আর অসৎ-ই বা কী ? কর্তব্য কী এবং অকর্তব্য কী ? লাভ কিসে এবং ক্ষতিই বা কিসে ? কিসে হিত এবং কিসে অহিত ? ইত্যাদি বিষয়ে স্পষ্ট জ্ঞান (বিবেক) হয়।

এখানে **'দেহেঽস্মিন্'** বলার তাৎপর্য হল যে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি পাওয়া অর্থাৎ বহিঃকরণ এবং অন্তঃকরণের স্বচ্ছতা, নির্মলতা এবং বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হবার শক্তি এই মনুষ্যদেহেই থাকে, অন্য দেহে নয়। ভগবান তমোগুণে আবদ্ধকারীদের জন্য **'সর্বদেহিনাম্'** (১৪।৮) পদটি প্রয়োগ করেছেন, যার অর্থ হল এই যে, রজোগুণ এবং তমোগুণ অন্যান্য শরীরেও বৃদ্ধি পায়, কিন্তু সত্ত্বগুণ একমাত্র মনুষ্যদেহেই বৃদ্ধি পেতে পারে। তাই মানুষের উচিত, সে যেন রজোগুণ ও তমোগুণকে জয় করে সত্ত্বগুণেরও ঊর্ধ্বে উঠতে সচেষ্ট হয়। এতেই মনুষ্যজীবনের সফলতা। ভগবান কৃপাপরবশ হয়ে এই মনুষ্যদেহে জন্ম দিয়ে আমাদের এই তিনটি গুণকে জয় করার পূর্ণ অবসর, অধিকার, যোগ্যতা, সামর্থ্য প্রদান করেছেন।

'তদা বিদ্যাদ্ বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত'—ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণে স্বচ্ছভাব এবং বিচার করার ক্ষমতা এলে সাধককে এটি জানতে হবে যে তাঁর সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি পেয়েছে এবং রজোগুণ ও তমোগুণের বৃত্তিগুলি দমিত হয়েছে। অতএব সাধক যেন কখনো নিজের মধ্যে এমন অহংভাব না রাখেন যে, 'আমি জ্ঞানী হয়ে গেছি' অর্থাৎ তিনি সত্ত্বগুণের কার্য প্রকাশ এবং জ্ঞানকে যেন নিজের গুণ বলে না মনে করেন, তিনি যেন এটিকে সত্ত্বগুণের কার্য এবং লক্ষণ বলে মনে করেন।

এখানে **'ইতি বিদ্যাৎ'** পদটির তাৎপর্য হল এই যে, তিনটি গুণের বৃত্তি উৎপন্ন হওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া, একটি গুণের প্রাধান্য হলে অপর দুটি গুণের দমিত হওয়া ইত্যাদি পরিবর্তন গুণাদিতেই হয়, স্বরূপে নয়—এই সমস্ত বিষয় মনুষ্যদেহেই ঠিকভাবে বোঝা সম্ভব। কিন্তু মানুষ ভগবদ্প্রদত্ত বিবেককে গুরুত্ব না দিয়ে গুণাদির সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করে এবং নিজেকে সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক বলে মানতে থাকে। মানুষের উচিত নিজেকে ওইরূপ না মনে করে নিজেকে সর্বতোভাবে নির্বিকার ও অপরিবর্তনশীল মনে করা।

সকলেই অনুভব করেন যে তিনটি গুণের বৃত্তিগুলির হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, আসে-যায়। স্বয়ং হলেন পরিবর্তনরহিত এবং এইসব বৃত্তির দ্রষ্টা। যদি স্বয়ং-ও পরিবর্তনশীল হতেন তবে এই বৃত্তিগুলির হ্রাস-বৃদ্ধির হিসাব কে রাখত ? পরিবর্তনরহিত-ই পরিবর্তনকে জানতে সক্ষম।

যখন সাত্ত্বিক বৃত্তির বৃদ্ধি হয় এবং ইন্দ্রিয়াদিতে ও চিত্তে স্বচ্ছতা ও নির্মলতা আসে এবং বিবেক জাগরিত হয়, তখন সংসার থেকে অনুরাগ দূরীভূত হয় ও বৈরাগ্য আসে। অশান্তি দূর হয়ে শান্তি আসে। লোভ দূর হয়ে ঔদার্য দেখা দেয়। প্রবৃত্তি নিষ্কামভাবে হতে থাকে (গীতা ১৮।৯)। ভোগ এবং অর্থ-সংগ্রহের জন্য নতুন নতুন কর্মাদি শুরু হয় না। মনে পদার্থ এবং ভোগের প্রয়োজন উৎপন্ন হয় না, শুধুমাত্র শরীরনির্বাহের দিকে দৃষ্টি থাকে। সকল বিষয় বোঝার মতো বুদ্ধির বিকাশ হতে থাকে। প্রত্যেকটি কাজ সাবধানতার সঙ্গে, সুচারুরূপে সংঘটিত হয়। কাজে ভুল কম হয়। কখনো ভুল হলেও তা শুধরে নেওয়া সম্ভব হয়, অসতর্কতা থাকে না। সৎ-অসৎ, কর্তব্য-অকর্তব্যের বিবেক স্পষ্টভাবে জাগরিত হয়। সুতরাং যে সময় সাত্ত্বিকভাব বৃদ্ধি পায়, সেইসময় সাধককে বিশেষভাবে ধ্যান-ভজনে ব্যাপৃত থাকতে হয়। এই সময়ে অল্প সাধনাতেও খুব তাড়াতাড়িই অনেক লাভ হতে পারে।

পরিশিষ্ট-ভাব—'প্রকাশ' এবং 'জ্ঞান' এই দুটিতে পার্থক্য আছে। 'প্রকাশ'-এর অর্থ হল— ইন্দ্রিয়সমূহ ও অন্তঃকরণের জাগৃতি অর্থাৎ রজোগুণ থেকে হওয়া মনোরাজ্যের এবং তমোগুণ থেকে উৎপন্ন হওয়া নিদ্রা, আলস্য, প্রমাদ না হয়ে স্বচ্ছ হওয়া। 'জ্ঞানের' অর্থ হল বিবেক অর্থাৎ সৎ-অসৎ, কর্তব্য-অকর্তব্য, নিত্য-অনিত্য, গ্রাহ্য-ত্যাজ্য ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক্ জ্ঞান হওয়া।

***

সম্বন্ধ—পরের শ্লোকটিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত রজোগুণের লক্ষণ জানিয়েছেন।

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ॥ ১২ ॥

[ভরতর্ষভ (হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন !) ; রজসি, বিবৃদ্ধে (রজোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে) ; লোভঃ, প্রবৃত্তিঃ (লোভ, কর্ম-প্রবৃত্তি) ; কর্মণাম্, আরম্ভঃ (কর্মে উদ্যম) ; অশমঃ, স্পৃহা (অশান্তি এবং আসক্তি) ; এতানি, জায়ন্তে (এইসব বৃত্তি উৎপন্ন হয়।)]

হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন ! রজোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে লোভ, কর্মপ্রবৃত্তি, কর্মে উদ্যম, শান্তির অভাব এবং আসক্তি—এইসব বৃত্তি উৎপন্ন হয়॥ ১২ ॥

ব্যাখ্যা—'লোভঃ'—শরীরনির্বাহের বস্তুগুলি কাছে থাকলেও সেগুলির বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষাকে বলা হয় 'লোভ'। কিন্তু সেই বস্তুগুলির স্বাভাবিক বৃদ্ধি লোভ নয়। যেমন, কেউ যদি চাষ করে আর তার ক্ষেতে অধিক ফলন হয় বা ব্যবসা করলে অধিক লাভ হয়, তাহলে এইভাবে পদার্থ, অর্থ ইত্যাদির স্বাভাবিক বৃদ্ধিকে লোভ বলা যায় না এবং তা দোষেরও নয়।

'প্রবৃত্তিঃ'—কর্মে যুক্ত থাকার ইচ্ছাকেই বলা হয় 'প্রবৃত্তি'। কিন্তু রাগ-দ্বেষ বর্জিত হয়ে কাজে ব্যাপৃত হওয়া দোষের নয়। কারণ গুণাতীত মহাপুরুষদেরও এরূপ প্রবৃত্তি হয়ে থাকে (গীতা ১৪।২২)। রাগ (আসক্তি)পূর্বক অর্থাৎ সুখ, আরাম, অর্থ ইত্যাদির আশায় কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া দোষের।

'আরম্ভঃ কর্মণাম্'—জগতে ধনী বা শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃতি লাভের জন্য সম্মান, যশ, প্রশংসা ইত্যাদি পাবার আশায় নতুন নতুন কর্ম করা, নতুন নতুন কার্যাদি শুরু করা ইত্যাদিকে বলা হয় কর্মের উদ্যম ।

প্রবৃত্তি এবং উদ্যম—এই দুইয়ে প্রভেদ আছে। পরিস্থিতি অনুযায়ী কোনো কার্যে প্রবৃত্তি হয় এবং কোনো কার্যে নিবৃত্তি হয়। কিন্তু ভোগ এবং সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নতুন নতুন কর্মাদি করাকে বলা হয় 'আরম্ভ'।

মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হলে শুধুমাত্র পরমাত্মপ্রাপ্তিরই উদ্দেশ্য যেন থাকে, ভোগ এবং সম্পদ-সংগ্রহের উদ্দেশ্য যেন একেবারেই না থাকে—এই দৃষ্টিতে ভক্তিযোগ এবং জ্ঞানযোগে **'সর্বারম্ভপরিত্যাগী'** (১২।১৬ ; ১৪।২৫) পদ দ্বারা সমস্ত (কর্মের) আরম্ভ পরিত্যাগ করতে বলা হয়েছে। কর্মযোগে কর্মের আরম্ভ হলেও এইসব আরম্ভ কামনা এবং সংকল্পরহিত হয় (গীতা ৪।১৯)। কর্মযোগে এরূপ উদ্যম দূষণীয় নয়, কারণ কর্মযোগে কর্ম করার বিধান রয়েছে এবং বিনা কর্মে কর্মযোগী যোগারূঢ় হতে পারেন না (গীতা ৬।৩)। সুতরাং আসক্তিবর্জিত হয়ে প্রাপ্ত পরিস্থিতি অনুসারে কর্মাদি আরম্ভ করলেও এগুলিকে আরম্ভ বলা যায় না, এগুলি প্রবৃত্তিই মাত্র। কারণ এগুলির দ্বারা কর্মাসক্তি দূর হয়। এটি নিবৃত্তিমূলক হওয়ায় দূষণীয় নয়।

'অশমঃ'—চিত্তে অশান্তি, অস্থিরতা থাকলে তাকে বলা হয় 'অশমঃ'। ইচ্ছা অনুযায়ী বস্তু (ধন, সম্পত্তি, যশ, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি) যখন পাওয়া যায় না, তখন চিত্তে অশান্তি ও অস্থিরতা আসে। কামনা পরিত্যাগ করলে আর অশান্তি থাকে না।

'স্পৃহা'—প্রয়োজন অনুভব করাকে বলা হয় 'স্পৃহা' ; যেমন—ক্ষুধার জন্য অন্নের, পিপাসার জন্য জলের, শীতের জন্য কাপড়ের আকাঙ্ক্ষা বা প্রয়োজনীয়তা হয়। প্রকৃতপক্ষে ক্ষুধা, পিপাসা এবং শীতের জ্ঞান হওয়া দোষের নয়, প্রত্যুত অন্ন, জল ইত্যাদি যেন পাই এইরকম ইচ্ছা থাকাই দোষের। সাধকদের এই ইচ্ছা পরিত্যাগ করা উচিত, কারণ কোনো বস্তুই ইচ্ছার অধীন নয়।

'রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ'—অন্তরে রজোগুণের বৃদ্ধি হলে উপরিউক্ত লোভ, প্রবৃত্তি এইসব বৃত্তি বৃদ্ধি পায়। এইরকম সময়ে সাধকদের বিচার করতে হয় যে, 'আমার জীবন-নির্বাহ তো হচ্ছেই, আর আমার কীসের প্রয়োজন ?' এরূপ চিন্তা করে রজোগুণের বৃত্তিগুলি দূর করতে হয়, ওইসবে উদাসীন হতে হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব—রজোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে সত্ত্বগুণের প্রকাশ এবং জ্ঞান দমিত হয়। রজোগুণ অনাসক্তির

বিরোধী—'রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি' (গীতা ১৪।৭)। ক্রিয়া ও পদার্থের আসক্তি মানুষের যোগারূঢ় হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক স্বরূপ। মানুষ ক্রিয়া ও পদার্থে অনাসক্ত হলে তবেই যোগারূঢ় হতে সক্ষম হয় (গীতা ৬।৪)।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—পরবর্তী শ্লোকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত তমোগুণের লক্ষণ জানানো হয়েছে।

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন॥ ১৩ ॥

[**কুরুনন্দন** (হে কুরুনন্দন !) ; **তমসি, বিবৃদ্ধে** (তমোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে) ; **অপ্রকাশঃ, অপ্রবৃত্তিঃ** (অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি) ; **প্রমাদঃ, চ, মোহঃ** (প্রমাদ এবং মোহ) ; **এতানি, এব** (এইসব বৃত্তিগুলিও) ; **জায়ন্তে** (উৎপন্ন হয়।)]

হে কুরুনন্দন ! তমোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ এবং মোহ—এইসব বৃত্তিগুলিও উৎপন্ন হয়॥ ১৩ ॥

ব্যাখ্যা—'অপ্রকাশঃ'—সত্ত্বগুণের প্রকাশক (নির্মলতা) বৃত্তিকে অবদমিত করে যখন তমোগুণ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়, সেইসময় ইন্দ্রিয়াদিতে এবং চিত্তে নির্মলতা থাকে না। ইন্দ্রিয়ে এবং চিত্তে যে বুঝবার ক্ষমতা থাকে, তমোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে তা লুপ্ত হয়ে যায় অর্থাৎ বুদ্ধি জাগ্রত হয় না এবং নতুন করে চিন্তা ভাবনা জাগে না। এই বৃত্তিকেই এখানে **'অপ্রকাশ'** বলে জানিয়ে এটিকে সত্ত্বগুণের বৃত্তি-প্রকাশের বিরোধী বলা হয়েছে।

'অপ্রবৃত্তিঃ'—রজোগুণের বৃত্তি 'প্রবৃত্তি'-কে অবদমিত করে যখন তমোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তখন কাজে উদ্যম, উৎসাহ থাকে না। অনর্থক বসে বা শুয়ে থাকতে ইচ্ছা হয়। আবশ্যক কর্মেও রুচি হয় না। এ সবই **'অপ্রবৃত্তি'** বৃত্তির কাজ।

'প্রমাদঃ'—অকরণীয় কর্মে ব্যাপৃত হওয়া এবং করণীয় কর্ম না করা, আর যেসব কর্ম করলে পারমার্থিক উন্নতি হয় না, সাংসারিক উন্নতি হয় না, সামাজিক কোনো কাজ হয় না এবং যা শরীরের পক্ষেও প্রয়োজনীয় নয় এইরকম, বিড়ি-সিগারেট খাওয়া, তাস-দাবা খেলা, হাসি-তামাশা করা—এ সবই হল **'প্রমাদ'** বৃত্তির অন্তর্গত।

'মোহঃ'—তমোগুণ বৃদ্ধি পেলে যখন 'মোহ' আসে, তখন অন্তরে বিবেক-বিরোধী ভাব উৎপন্ন হয়। ক্রিয়া করা বা না করাতে বিবেক কাজ করে না, মূঢ়তা আচ্ছন্ন করে রাখে, যার ফলে পারমার্থিক ও ব্যবহারিক কাজ করার ক্ষমতা থাকে না।

'এব চ'—এই পদটির দ্বারা অধিক নিদ্রা যাওয়া, সময় অনর্থক নষ্ট করা, অর্থের অপচয় করা ইত্যাদি যত নিরর্থক কাজ আছে সেগুলিকে ধরা উচিত।

'তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন'—এগুলি সব তমোগুণ বৃদ্ধির লক্ষণ অর্থাৎ যখনই অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি ইত্যাদি দেখা যাবে, তখনই বুঝতে হবে যে সত্ত্বগুণ ও রজোগুণকে অবদমিত করে তমোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে।

সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ—এই তিনটি গুণই সূক্ষ্ম হওয়ায় অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয় এবং চিত্তের বিষয় নয়। তাই এই তিনটি গুণ প্রত্যক্ষরূপে দেখা যায় না, এগুলির স্বরূপের সাক্ষাৎ জ্ঞান হয় না। এই গুণগুলি সম্পর্কে জ্ঞান—এগুলির পরিচয় তো এগুলি থেকে উদ্ভূত বৃত্তির সাহায্যেই হয়ে থাকে, কারণ বৃত্তিগুলি স্থূল হওয়ায় ইন্দ্রিয় এবং চিত্তের বিষয় হয়ে থাকে। তাই ভগবান একাদশ, দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শ্লোকে তিনটি গুণের লক্ষণগুলি ক্রমান্বয়ে বর্ণনা করেছেন, যাতে অতীন্দ্রিয় গুণগুলির লক্ষণ জানা যায় এবং সাধক সাবধানতাপূর্বক রজোগুণ-তমোগুণ পরিত্যাগ করে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি করতে পারে।

মর্মার্থ

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—তিনটি গুণের বৃত্তিগুলি স্বাভাবিকভাবেই উৎপন্ন, নষ্ট এবং বাড়তে-কমতে থাকে। এগুলি সবই পরিবর্তনশীল। সাধক নিজ জীবনে এই বৃত্তিগুলির পরিবর্তন অনুভবও করে থাকেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে তিনটি গুণের বৃত্তি পরিবর্তনশীল এবং এই পরিবর্তন বোঝেন যে পুরুষ, তাঁর কখনো কোনো

পরিবর্তন হয় না। তিনটি গুণের বৃত্তিগুলি দৃশ্যমান হয়ে থাকে এবং পুরুষ এগুলিকে অবলোকনকারী বলে তিনি দ্রষ্টা হন। দ্রষ্টা দৃশ্য থেকে সর্বতোভাবে পৃথক্ হন—এটিই হল নিয়ম। দৃশ্যের দিকে দৃষ্টি থাকলেই দ্রষ্টা সংজ্ঞা হয়। দৃশ্যের দিকে দৃষ্টি না থাকলে দ্রষ্টা সংজ্ঞা-বর্জিত হয়ে থাকেন। ভুল তখনই হয় যখন পুরুষ দৃশ্যকে নিজের ওপর আরোপিত করে 'আমি কামী', 'আমি ক্রোধী' বলে মনে করেন।

কাম-ক্রোধ বিকারাদির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে সেগুলি নিজের বলে মেনে নিলে সেগুলিকে আমন্ত্রণ জানানো এবং তাদের স্থায়ী করে রাখা হয়। মানুষ ভ্রমবশতঃ ক্রোধান্বিত হলে, ক্রোধ করাকে ঠিক বলে মনে করে এবং বলে থাকে 'এতো সকলেরই হয়ে থাকে'। অন্য সময়েও বলে যে, 'আমি ক্রোধী স্বভাবের'। এইরূপ 'আমি ক্রোধী' এটি মেনে নিলে 'ক্রোধ' তার অহংভাবে স্থায়িত্ব লাভ করে। তখন এই ক্রোধরূপ বিকার পরিত্যাগ করা কঠিন হয়ে ওঠে। এই জন্যই সাধক চেষ্টা করলেও ক্রোধাদি বিকারমুক্ত হতে পারেন না এবং তাতে হার স্বীকার করে নেন।

কাম-ক্রোধাদি বিকার দূর করার প্রধান এবং সহজ উপায় হল সাধকের এগুলিকে কখনো নিজের মধ্যে মেনে না নেওয়া। আসলে বিকার সবসময় থাকে না, বিকাররহিত অবস্থাই সবসময় থাকে। কেন-না বিকার আসে এবং চলে যায়, কিন্তু স্বয়ং সর্বদা নির্বিকারভাবে বিরাজমান। ক্রোধাদি বিকারও নিজের মধ্যে নয়, এটি মন ও বুদ্ধিতে আসে। কিন্তু সাধক ভ্রমবশতঃ মন-বুদ্ধির সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওই বিকারগুলিকে নিজের বলে মনে করেন। যদি ওইগুলি নিজের বলে মানা না হয়, তাহলে এই মেনে নেওয়া সম্পর্ক দূর হয়। তখন আর বিকারাদি দূর করতে হয় না, সেগুলি স্বতঃই দূর হয়ে যায়। যেমন, ক্রোধান্বিত হলে সাধকের চিন্তা করতে হয় 'আরে! আমি তো সে-ই; যা আসে ও চলে যায় সেই ক্রোধের সঙ্গে আমার কোনোই সম্পর্ক নেই।' এরূপ চিন্তা দৃঢ়ভাবে করলে ক্রোধের বেগ প্রশমিত হয় এবং আগের মতো অল্পে ক্রোধ উদ্রেক হয় না। ক্রমে তা একেবারেই দূর হয়ে যায়।

ভগবান পূর্বোক্ত তিনটি শ্লোকে ক্রমান্বয়ে সত্ত্বগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণের বৃদ্ধির বৃত্তিগুলি বর্ণনা করে সাধককে সাবধান করে বলেছেন যে গুণাদির সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নিলেই গুণগুলির বৃত্তি নিজের বলে প্রতীত হয়ে থাকে, যদিও সাধকের এগুলির সঙ্গে বিন্দুমাত্র সম্পর্ক থাকে না। গুণ এবং গুণের বৃত্তিসমূহ প্রকৃতির কার্য হওয়ায় সেগুলি পরিবর্তনশীল আর স্বয়ং পুরুষ পরমাত্মার অংশ হওয়ায় অপরিবর্তনীয়। প্রকৃতি এবং পুরুষ—উভয়ই বিজাতীয়। পরিবর্তনশীলের সঙ্গে অপরিবর্তনীয়ের একাত্মভাব কী করেই বা হতে পারে? এই সত্যের দিকে দৃষ্টি রাখলে তমোগুণ ও রজোগুণ দমিত হয় ও সাধকের মধ্যে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি স্বতঃই হয়ে থাকে। সত্ত্বগুণে ভোগবুদ্ধি হলে অর্থাৎ তার দ্বারা যে সুখ পাওয়া যায় তাতে অনুরাগ হলে এই সত্ত্বগুণও গুণাতীত হওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। অতএব সাধকদের সত্ত্বগুণ থেকে উৎপন্ন সুখও উপভোগ করা উচিত নয়। সাত্ত্বিক সুখের উপভোগও রজোগুণের অংশ। রজোগুণে অনুরাগ বৃদ্ধি হলে অনুরাগে বাধাদানকারীর প্রতি ক্রোধ জন্মায় এবং তাতে সম্মোহ হয়, আর অনুরাগ অনুসারে পদার্থ লাভ হলে তাতে লোভ জন্মায় এবং লোভ থেকে সম্মোহ হয়। এইভাবে সম্মোহ উৎপন্ন হলে সে রজোগুণ থেকে তমোগুণে চলে যায় এবং তার পতন হয় (গীতা ২।৬২-৬৩)।

পরিশিষ্ট-ভাব—অপ্রকাশ এবং অপ্রবৃত্তি সত্ত্বগুণ ও রজোগুণের বিরোধী এবং প্রমাদ ও মোহ তমোগুণের (নিজস্ব) গুণ।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—পরবর্তী দুটি শ্লোকে তাৎকালিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত গুণের বৃত্তিগুলির ফল কী হয় তাই জানিয়েছেন।

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে॥ ১৪ ॥

[**যদা, সত্ত্বে, প্রবৃদ্ধে** (সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে) ; **তদা, তু, দেহভৃৎ** (সেই সময় যদি মানুষের) ; **প্রলয়ম্, যাতি** (মৃত্যু হয় তাহলে) ; **উত্তমবিদাম্** (উত্তম কর্মকারীগণের) ; **অমলান্, লোকান্** (নির্মল লোকসমূহ) ; **প্রতিপদ্যতে** (প্রাপ্ত হন।)]

সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অবস্থায় যদি মনুষ্যের মৃত্যু হয়, তাহলে তিনি উত্তম কর্মকারীগণের নির্মল লোক প্রাপ্ত হন ॥ ১৪ ॥

ব্যাখ্যা—**'যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে......প্রতিপদ্যতে'**—যদি কোনো মানুষের, তা তিনি সত্ত্বগুণী, রজোগুণী বা তমোগুণী যা-ই হোন, কোনো কারণবশতঃ সত্ত্বগুণ তাৎকালিক বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ সত্ত্বগুণের কার্য স্বচ্ছতা, নির্মলতা ইত্যাদি বৃত্তিগুলির বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অবস্থায় মৃত্যু হয়, তাহলে তিনি উত্তম (শুভ) কর্মকারীদের নির্মল লোকগুলিতে গমন করেন।

'উত্তমবিদাম্'—বলার অর্থ হল এই যে, যেসব ব্যক্তি উত্তম (শুভ) কর্মই করেন, কখনোই অশুভ কর্ম করেন না অর্থাৎ উত্তমই তাঁদের ভাব, উত্তমই তাঁদের কর্ম এবং উত্তমই তাঁদের জ্ঞান এরূপ পুণ্যকর্মা ব্যক্তিদের যে লোকে অধিকার থাকে, সেই নির্মল লোকগুলিতে সেই ব্যক্তিরাও গমন করেন, যাদের সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হয়েছে। তাৎপর্য হল এই যে, সারাজীবন ধরে শুভকর্মকারী ব্যক্তি যে উচ্চলোক লাভ করেন, তাৎকালিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিকালে শরীর পরিত্যাগকারী ব্যক্তিও সেই উচ্চলোক লাভ করেন।

সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিকালে শরীর পরিত্যাগকারী মানুষ পুণ্যাত্মাদের প্রাপ্তব্য উচ্চলোকে গমন করেন—এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, গুণাদি হতে উৎপন্ন বৃত্তিগুলি কর্মের থেকে কম শক্তিশালী নয়। সুতরাং সাত্ত্বিক বৃত্তিও পুণ্যকর্মের সমান শ্রেষ্ঠ। এই দৃষ্টিতে শাস্ত্রবিহিত পুণ্যকর্মে ভাবেরই গুরুত্ব থাকে, কোনো পুণ্যকর্ম বিশেষের নয়। তাই সাত্ত্বিক ভাবের স্থান অনেক উচ্চে অবস্থিত। পদার্থ, ক্রিয়া, ভাব এবং উদ্দেশ্য—এই চারটি একটি অপরটির থেকে শ্রেষ্ঠ।

রজোগুণ এবং তমোগুণ অপেক্ষা সত্ত্বগুণের বৃত্তি সূক্ষ্ম এবং ব্যাপক হয়ে থাকে। লোকাদির বিচারেও স্থূল অপেক্ষা সূক্ষ্মের আহার কম হয়ে থাকে ; যেমন—দেবলোকে দেবতাগণ সূক্ষ্ম হওয়ায় তাঁরা শুধুমাত্র সুগন্ধির দ্বারাই তৃপ্ত হয়ে থাকেন। এটি ঠিক যে স্থূলের চেয়ে সূক্ষ্মের শক্তি অবশ্যই বেশি হয়ে থাকে। এইজন্যই সূক্ষ্মভাবের প্রাধান্যে অন্ত সময়ে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পেলে মানুষ উচ্চলোকে গমন করে।

'অমলান্' বলার অর্থ হল এই যে, সত্ত্বগুণের স্বরূপ হল নির্মল ; তাই সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি প্রাপ্ত অবস্থায় যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সে নির্মল লোক লাভ করে।

এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, সারাজীবন শুভকর্ম করেন যাঁরা তাঁরা যে লোক প্রাপ্ত হন, সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিকালে মৃত্যুপ্রাপ্ত ব্যক্তি কী করে সেই লোক প্রাপ্ত হন ? এর কারণ এই যে, ভগবান এভাবে একটি বিশেষ সুযোগ প্রদান করেছেন যে মৃত্যুর সময়ে মানুষের মতি যেমন হয়, সেইরূপ গতিই সে লাভ করে থাকে (গীতা ৮।৬)। অতএব সত্ত্বগুণের লক্ষণ বৃদ্ধি পেলে দেহত্যাগকারী মানুষ উত্তমলোকে যাত্রা করে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

পরিশিষ্ট-ভাব—'তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্'—বিবেকশীল ব্যক্তি উত্তমবুদ্ধিসম্পন্ন হন। সত্ত্বগুণকে নিজস্ব মনে করে যদি তাতে আসক্ত না হন এবং ভগবানে শরণাগতি থাকে তাহলে সেই সাত্ত্বিক ব্যক্তি ভগবানের পরমধাম প্রাপ্ত করেন। অন্যথায় সত্ত্বগুণের সম্পর্কিত হওয়ায় তিনি ব্রহ্মলোকের মতো উচ্চস্থানে গমন করেন।

'অমলান্'—ব্রহ্মলোক পর্যন্ত যেসব লোক সেগুলি হল সাপেক্ষ নির্মল লোক, আর ভগবানের পরমধামে নিরপেক্ষ নির্মলতা থাকে।

* * *

রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে॥ ১৫ ॥

[**রজসি** (রজোগুণ বৃদ্ধিকালে) ; **প্রলয়ম্, গত্বা** (মৃত্যুপ্রাপ্ত ব্যক্তি) ; **কর্মসঙ্গিষু, জায়তে** (মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ

করে) ; **তথা, তমসি** (এবং তমোগুণ বৃদ্ধিকালে) ; **প্রলীনঃ** (মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি) ; **মূঢ়যোনিষু, জায়তে** (মূঢ়যোনিতে জন্মগ্রহণ করে।)]

রজোগুণ বৃদ্ধিকালে মৃত্যুপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্মে আসক্ত মনুষ্য-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং তমোগুণ বৃদ্ধিকালে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি মূঢ়-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে॥ ১৫॥

ব্যাখ্যা—'রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্মসঙ্গিষু জায়তে'—মৃত্যুকালে কোনো মানুষের কোনো কারণবশতঃ রজোগুণের কার্য লোভ, প্রবৃত্তি, অশান্তি, স্পৃহা ইত্যাদি যদি বেড়ে যায় এবং সেই চিন্তায় যদি তার দেহত্যাগ হয়, তাহলে সেই ব্যক্তি কর্মাসক্ত মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করে।

যিনি সারাজীবন ভালো কাজ এবং ভালো আচরণ করেছেন, যাঁর ভাব ভালো, যদি মৃত্যুর সময় তাঁর রজোগুণের বৃদ্ধি হয়, তাহলে মৃত্যুর পর মনুষ্য-যোনিতে জন্ম নিলেও তাঁর আচরণ, ভাব ভালোই থাকে এবং তিনি শুভকর্মই করে থাকেন। যিনি সাধারণভাবে কোনওরকমে জীবনযাপন করেছেন, তিনি যদি রজোগুণের লোভ ইত্যাদির বৃদ্ধিকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাহলে তিনি মনুষ্য-জন্ম নিয়ে পদার্থ, ব্যক্তি, ক্রিয়া ইত্যাদিতে আসক্ত হন। যাঁর জীবনে কাম, ক্রোধ ইত্যাদির প্রাধান্য থাকে, তিনি যদি রজোগুণ বৃদ্ধিকালে মারা যান, তবে তিনি মনুষ্য-জন্ম পেলেও বিশেষভাবে আসুরী-সম্পদসম্পন্ন হন। তাৎপর্য হল এই যে মনুষ্যলোকে জন্ম নিলেও গুণাদির তারতম্য অনুযায়ী মানুষ তিন প্রকারের হয় অর্থাৎ তিন প্রকার স্বভাবসম্পন্ন হয়। কিন্তু বিশেষ লক্ষণীয় হল এই যে, রজোগুণ বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হলে এবং মানুষ হয়ে জন্মালে, তার আচরণ যেমনই হোক না কেন, তার মধ্যে ভগবদ্-প্রদত্ত বিবেক থাকেই। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তিই এই বিবেককে গুরুত্ব দিয়ে, সৎসঙ্গ, স্বাধ্যায় ইত্যাদির দ্বারা বিবেককে নির্মল করে ঊর্ধ্বে উঠতে পারে, পরমাত্মাকে লাভ করতে পারে। ভগবদ্প্রদত্ত এই বিবেকের জন্যই সকল মানুষই ঈশ্বর প্রাপ্তির অধিকারী।

'তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে'—মৃত্যুকালে কোনো মানুষের যদি কোনো কারণবশতঃ তমোগুণ বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ তমোগুণের কার্য প্রমাদ, মোহ, অপ্রকাশ ইত্যাদি বেড়ে যায় এবং সেগুলির চিন্তা করতে করতে যদি ওই ব্যক্তি মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়, তাহলে সেই ব্যক্তি পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা ইত্যাদি মূঢ়যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। মূঢ়যোনিতে মূঢ়তা তো সকলের মধ্যে থাকেই, কিন্তু তার মধ্যে তারতম্য থাকে ; যেমন—বৃক্ষ, লতা ইত্যাদিতে যত অধিক মূঢ়তা থাকে, পশু-পক্ষী ইত্যাদিতে তত মূঢ়তা থাকে না।

শুভকর্মকারী ব্যক্তিকে যদি অন্তকালে তমোগুণের তাৎকালিক বৃদ্ধির ফলে মৃত্যুর পর মূঢ়যোনিতে জন্ম নিতেও হয়, তাহলেও সেই জন্মে তার গুণ, আচরণ ভালো হবে এবং সে ভালো কাজ করার স্বভাবযুক্ত হবে। যেমন, ভরত মুনির মৃত্যুর সময়ে তমোগুণের বৃদ্ধি পেয়েছিল, অর্থাৎ হরিণের চিন্তা নিয়ে তিনি শরীর ত্যাগ করেছিলেন, সেইজন্য তিনি মূঢ়যোনিসম্পন্ন হরিণ হয়ে জন্মালেন। কিন্তু মনুষ্য-জন্মে কৃত সৎকর্ম—ত্যাগ, তপস্যা হরিণ-জন্মেও বজায় ছিল। তিনি হরিণ-জন্মেও নিজ মাতার সঙ্গে বাস করেননি, সবুজ পাতার বদলে শুক্‌নো পাতা খেতেন, ইত্যাদি। ভরত মুনি হরিণ-জন্মে যেরূপ সজাগ সতর্ক থাকতেন, তা মনুষ্য-জন্মেও খুব কম দেখা যায়।

পরিশিষ্ট-ভাব—রজোগুণে 'রাগ' অংশটিই হল বন্ধনকারক, জন্ম-মৃত্যু প্রদানকারী ; ক্রিয়া অংশটি নয়। রাগের (আসক্তির) জন্যই একে বলা হয়েছে **'কর্মসঙ্গিষু জায়তে'**। ক্রিয়ারূপে রজোগুণ গুণাতীত পুরুষের মধ্যেও থাকে—**'প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ'** (গীতা ১৪।২২)। পদার্থ, ক্রিয়া অথবা ব্যক্তি—কোনোকিছুতেই যদি রাগ অর্থাৎ আসক্তি জন্মায়, তাহলে সেই ব্যক্তি মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। মানুষ স্বাভাবিকভাবেই কর্মাসক্ত, কেন-না একমাত্র মনুষ্যযোনিতেই কর্ম করার অধিকার আছে—**'কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে'** (গীতা ১৫।২)।

*** *** ***

সম্বন্ধ—মৃত্যুকালে গুণগুলির তাৎকালিক বৃদ্ধি হলে মানুষের ওইরূপ গতি কেন হয়—পরবর্তী শ্লোকে সেই কথা জানানো হয়েছে।

কর্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্॥ ১৬ ॥

[**সুকৃতস্য, কর্মণঃ,** তু (শুভকর্মের) ; **সাত্ত্বিকম্** (সাত্ত্বিক) ; **নির্মলম, ফলম্** (নির্মল ফল) ; **আহুঃ** (বলেছেন) ; **রজসঃ, ফলম্** (রাজস কর্মের ফলকে) ; **দুঃখম্** (দুঃখ বলে জানিয়েছেন) ; **তমসঃ** (তামস কর্মের) ; **ফলম্** (ফলকে) ; **অজ্ঞানম্** (অজ্ঞান বলেছেন।)]

বিবেকবান পুরুষেরা শুভকর্মের ফল সাত্ত্বিক নির্মল বলেছেন, রাজস কর্মের ফলকে দুঃখ এবং তামস কর্মের ফলকে অজ্ঞান (মূঢ়তা) বলেছেন॥ ১৬ ॥

ব্যাখ্যা—[প্রকৃতপক্ষে কর্ম সাত্ত্বিক, রাজসিক অথবা তামসিক হয় না। সকল কর্মই ক্রিয়ামাত্র। আসলে সেই কর্মগুলি যিনি করেন, সেই কর্তাই সাত্ত্বিক, রাজসিক অথবা তামসিক ভাবসম্পন্ন হয়ে থাকেন। সাত্ত্বিক ব্যক্তির দ্বারা করা কর্ম 'সাত্ত্বিক', রাজসিক ব্যক্তির দ্বারা করা কর্ম 'রাজসিক' এবং তামসিক ব্যক্তির দ্বারা করা কর্মকে 'তামসিক' বলা হয়ে থাকে।]

'কর্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্মলং ফলম্'—সত্ত্বগুণের স্বরূপ হল নির্মল, স্বচ্ছ এবং নির্বিকার। তাই সত্ত্বগুণসম্পন্ন কর্তা যে কর্ম করেন, তা সাত্ত্বিক কর্মই হয়। কারণ কর্ম কর্তারই রূপ। এই সাত্ত্বিক কর্মের ফলরূপে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তাও তেমনই শুদ্ধ, নির্মল ও সুখদায়ক হয়।

ফলেচ্ছারহিত হয়ে কর্ম করলেও কর্তার যতক্ষণ সত্ত্বগুণের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে, ততক্ষণ তাঁর 'সাত্ত্বিক কর্তা' সংজ্ঞা থাকে এবং তখন পর্যন্ত তাঁর কর্মের ফল সৃষ্টি হয়। কিন্তু যখন গুণগুলি থেকে তাঁর সর্বতোভাবে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয়, তখন তাঁর আর 'সাত্ত্বিক কর্তা' সংজ্ঞা হয় না এবং তাঁর দ্বারা করা কর্মের কোনো ফলও হয় না, তখন তাঁর করা সমস্ত কর্মই অকর্ম হয়ে যায়।

'রজসস্তু ফলং দুঃখম্'—রজোগুণের স্বরূপ হল রাগাত্মক। অতএব কর্মানুরাগী কর্তা যে কর্ম করেন, সেগুলি রাজসিক কর্মই হয় এবং সেই রাজসিক কর্মের ফল ভোগ করতে হয়। তাৎপর্য হল এই যে, এই রাজসিক কর্ম দ্বারা পদার্থের ভোগ হয়, শরীরে সুখ-আরাম হয়, জগতে সম্মান-প্রতিপত্তি লাভ হয় আর মৃত্যুর পর স্বর্গভোগ প্রাপ্তি হয়। কিন্তু এই সম্বন্ধজনিত যত ভোগ, সেগুলি সবই দুঃখের কারণ স্বরূপ—**'যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে'** (গীতা ৫।২২) অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর কারণ। সেইজন্যই ভগবান এখানে রাজসিক কর্মের ফল দুঃখ বলে জানিয়েছেন।

রজোগুণ থেকে দুটি জিনিস উৎপন্ন হয়—পাপ এবং দুঃখ। রজোগুণসম্পন্ন ব্যক্তি বর্তমানে পাপ করে এবং পরিণামে তার ফল হিসাবে দুঃখ ভোগ করে। তৃতীয় অধ্যায়ের ছত্রিশতম শ্লোকে অর্জুনের প্রশ্ন ছিল 'মানুষ না চাইলেও পাপ করে কেন ?' এর উত্তরে ভগবান জানিয়েছিলেন যে, রজোগুণ হতে উৎপন্ন কামনাগুলিই পাপকার্যে প্রবৃত্ত করাবার হেতু।

'অজ্ঞানং তমসঃ ফলম্'—তমোগুণের স্বরূপ হল সম্মোহনাত্মক। সুতরাং মোহগ্রস্ত তামসিক ব্যক্তি পরিণাম, হিংসা, ক্ষতি এবং সামর্থ্য না জেনে মূর্খতাবশতঃ যেসব কর্ম করে, সেই কর্মগুলি তামসিকই হয়। সেই তামসিক কর্মের ফল অজ্ঞান অর্থাৎ অজ্ঞান (মূঢ়) যোনি প্রাপ্তিই হয়। ওই কর্ম অনুসারে তার পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা ইত্যাদি মূঢ়যোনিতে জন্ম হবে, যাতে অজ্ঞানতারই (মূঢ়তার) প্রাধান্য থাকে।

এই শ্লোকটির সার হল এই যে, সাত্ত্বিক পুরুষের নিকট যে পরিস্থিতিরই উদ্ভব হোক না কেন, তাতে তিনি দুঃখিত হন না। রাজসিক ব্যক্তির নিকট যে পরিস্থিতিই আসুক, তিনি তাতে সুখী হন না, তামসিক ব্যক্তির কাছে যে পরিস্থিতিই উপস্থিত হোক, তাতে তার বিবেক জাগ্রত হয় না, তার মূঢ়তাই বজায় থাকে।

গুণ (ভাব) এবং পরিস্থিতি কর্ম অনুসারে সৃষ্ট হয়। যতক্ষণ গুণ এবং কর্মের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে, মানুষ

ততক্ষণ কোনো পরিস্থিতিতে সুখী হতে পারে না। যখন গুণ এবং কর্মের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে না, তখন মানুষ কোনো পরিস্থিতিতেই দুঃখিত হয় না এবং আবদ্ধও হয় না।

জন্মগ্রহণের পিছনে অন্তকালীন চিন্তাই প্রধান আর অন্তকালীন চিন্তার মূলে থাকে গুণাদির প্রাধান্য। গুণাদি বৃদ্ধি পায় কর্মানুযায়ী। তাৎপর্য হল এই যে, মানুষের ভাব (গুণ) যেমন হবে, সে তেমনই কর্ম করবে আর যেমন কর্ম করবে, ভাবও সেইরূপ দৃঢ় হবে এবং তার মৃত্যুকালীন চিন্তাও সেই অনুযায়ী হবে। সুতরাং পরবর্তী জন্ম নেওয়ায় অন্তকালীন চিন্তাই হল প্রধান হেতু। চিন্তার মূলে থাকে ভাব এবং ভাবের মূলে থাকে কর্ম। এইভাবে দেখলে পরবর্তী জন্মপ্রাপ্তিতে অন্তিম চিন্তা, ভাব, কর্ম— এই তিনটিই হল কারণ।

পরিশিষ্ট-ভাব—রজোগুণের স্বরূপ হল রাগ বা আসক্তি, সেই আসক্তির জন্যই দুঃখ উৎপন্ন হয়—**'রজসস্তু ফলং দুঃখম্'**। জগতের সমস্ত দুঃখ এবং পাপ এই আসক্তির জন্যই হয়ে থাকে। আসক্তির জন্যই কাম (কামনা) উৎপন্ন হয়—**'কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ'** (গীতা ৩।৩৭)।

'অজ্ঞানং তমসঃ ফলম্'—তমোগুণ জ্ঞান, প্রকাশ, বিবেক-বুদ্ধির বিকাশে বাধা দেয় ; কারণ তমোগুণ অজ্ঞান উৎপন্নকারী এবং অজ্ঞান থেকেই উৎপন্ন হয় (১৪।৮, ১৭)।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে গুণাদির তাৎকালিক বৃত্তির বৃদ্ধি হলে যে গতি হয় তার মূলে হল সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক কর্ম। পরবর্তী শ্লোকে ভগবান সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক কর্মের মূলে গুণগুলির কথা জানিয়েছেন।

সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ॥ ১৭ ॥

[**সত্ত্বাৎ** (সত্ত্বগুণ থেকে) ; **জ্ঞানম্, চ** (জ্ঞান এবং) ; **রজসঃ, লোভঃ, এব** (রজোগুণ থেকে লোভ ইত্যাদি) ; **সঞ্জায়তে** (উৎপন্ন হয়) ; **তমসঃ** (তমোগুণ থেকে) ; **প্রমাদমোহৌ, চ** (প্রমাদ, মোহ এবং) ; **অজ্ঞানম্, এব** (অজ্ঞানও) ; **ভবতঃ** (উৎপন্ন হয়।)]

সত্ত্বগুণ থেকে জ্ঞান এবং রজোগুণ থেকে লোভ ইত্যাদি উৎপন্ন হয় এবং তমোগুণ থেকে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞানও উৎপন্ন হয়॥ ১৭ ॥

ব্যাখ্যা—**'সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানম্'**—সত্ত্বগুণ থেকে জ্ঞান হয় অর্থাৎ সৎকর্ম-দুষ্কর্মের বিবেক হয়। সেই বিবেকের সাহায্যে মানুষ, সৎকর্মই করে থাকে। সেই সুকৃত কর্মের ফল সাত্ত্বিক এবং নির্মল হয়।

'রজসো লোভ এব চ'—রজোগুণ থেকে লোভ ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। লোভের পরবশ হয়ে মানুষ যা কিছু কর্ম করে, সেই কর্মের ফল দুঃখদায়ক হয়ে থাকে।

যতটা পাওয়া গেছে, তার থেকে বেশি আকাঙ্ক্ষার নাম লোভ। লোভের দুটি রূপ—যথাযোগ্য খরচ না করা এবং অনুচিতভাবে সংগ্রহ করা। উচিত কাজে অর্থ ব্যয় না করলে, তার থেকে বিমুখ হলে মানুষের মনে অশান্তি, চাঞ্চল্য আসে এবং অনুচিতভাবে অর্থাৎ ছল, কপট ইত্যাদির দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করলে তাতে পাপ হয়, যার ফলে নরকের এবং চুরাশী লক্ষ যোনির দুঃখভোগ করতে হয়। এই দৃষ্টিতে রাজস কর্মের ফল হয় দুঃখ।

'প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ'—তমোগুণ থেকে প্রমাদ, মোহ এবং অজ্ঞান উৎপন্ন হয়। বুদ্ধিতে এই তিনটি এলে বিবেক-বিরুদ্ধ কাজ হয়ে থাকে (গীতা ১৮।৩২), যার ফলে অজ্ঞানতা বৃদ্ধি পায়, দৃঢ় হয়।

এইস্থানে তমোগুণ থেকে অজ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার কথা বলা হয়েছে আর এই অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে অজ্ঞান থেকে তমোগুণ উৎপন্ন হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর তাৎপর্য হল যেমন, বৃক্ষ থেকে বীজ উৎপন্ন হয় এবং বীজ

থেকে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, তেমনই তমোগুণ থেকে অজ্ঞান উদ্ভূত হয় এবং অজ্ঞান থেকে তমোগুণ বৃদ্ধি পায়, পুষ্ট হয়।

প্রথমে অষ্টম শ্লোকে ভগবান প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রার কথা বলেছেন। কিন্তু ত্রয়োদশ শ্লোকে ও এখানে প্রমাদের কথা বললেও নিদ্রার কথা বলেননি। এতে প্রমাণিত হয় যে প্রয়োজনীয় নিদ্রা তমোগুণ নয়, নিষিদ্ধও নয় এবং বন্ধনকারকও নয়। কারণ শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় নিদ্রা সাত্ত্বিক ব্যক্তিরও হয় এবং গুণাতীত ব্যক্তিরও হয়। আসলে অতি-নিদ্রাই বন্ধনকারক, নিষিদ্ধ এবং তমোগুণসম্পন্ন। কারণ অতি-নিদ্রাতে শরীরে আলস্য ও জড়তা আসে, সময় অযথা নষ্ট হয়।

বিশেষ কথা

জীব সাক্ষাৎ পরমাত্মার অংশ হলেও যখন প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, তখন প্রকৃতিজনিত গুণাবলীর সঙ্গে তার যোগসূত্র স্থাপিত হয় এবং গুণাদি অনুসারে তার অন্তঃকরণে বৃত্তি উৎপন্ন হয়। সেই বৃত্তি অনুযায়ী কর্ম হয় এবং সেই কর্মের ফলেই তার উচ্চ-নীচ গতি হয়। তাৎপর্য হল এই যে, জীবিত অবস্থায় অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতি আসে এবং মৃত্যুর পর উচ্চ-নীচ গতি হয়। প্রকৃতপক্ষে ওইসব কর্মের মূলেও গুণাদির বৃত্তি থাকে, যেগুলি পুনর্জন্মের প্রধান কারণ (গীতা ১৩।২১)। তাৎপর্য হল এই যে, গুণাদির সঙ্গ কর্মের থেকে কম শক্তিশালী নয়। কর্ম যেমন শুভ-অশুভ ফল প্রদান করে, তেমনই গুণাদির সঙ্গও শুভ-অশুভ ফল প্রদান করে (গীতা ৮।৬)। সেইজন্য পঞ্চম থেকে অষ্টাদশ শ্লোক পর্যন্ত এই প্রকরণে প্রথমে চতুর্দশ-পঞ্চদশ শ্লোকে গুণাদির তাৎকালিক বৃত্তি বৃদ্ধির ফল জানানো হয়েছে এবং জীবিতকালে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, সেগুলি ষোড়শ শ্লোকে জানিয়েছেন, পরে অষ্টাদশ শ্লোকে গুণাদির স্থায়ী বৃত্তিগুলির ফল জানিয়েছেন। অতএব বৃত্তি এবং কর্ম সংঘটিত হওয়ার মুখ্য কারণই হল গুণ। এই সম্পূর্ণ প্রকরণটিতে গুণাদির মুখ্য ব্যাপারগুলি এই (সপ্তদশ) শ্লোকেই আলোচিত হয়েছে।

যাঁর উদ্দেশ্য সংসার না হয়ে পরমাত্মা হয়ে থাকে, তিনি সাধারণ মানুষের ন্যায় প্রকৃতিতে অবস্থান করেন না। সুতরাং তাঁর মধ্যে প্রকৃতি-জনিত গুণাদির বশ্যতা থাকে না এবং সাধন করতে করতে ক্রমশঃ যখন তাঁর অহং পরিবর্তিত হয়ে লক্ষ্যে দৃঢ়তা আসে, তখন তাঁর নিজ স্বতঃসিদ্ধ গুণাতীত স্বরূপ অনুভূত হয়, একেই বলা হয় বোধ। এই বোধের বিষয়ে ভগবান এই অধ্যায়ের প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্লোকে বলেছেন এবং গুণাতীতের বিষয়ে বাইশ থেকে ছাব্বিশ পর্যন্ত পাঁচটি শ্লোকে বলেছেন। এইভাবে এই পুরো অধ্যায়টি গুণাদির অতীত স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপ অনুভব করার জন্যই বলা হয়েছে।

পরিশিষ্ট-ভাব—জ্ঞান (বিবেক-বুদ্ধি) প্রকটিত হয় সত্ত্বগুণ থেকে এবং আসক্তি না থাকলে তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে ক্রমশঃ তত্ত্ববোধ করায় অর্থাৎ তত্ত্ববোধে পরিণত হয়। অপরপক্ষে লোভ, প্রমাদ, মোহ, অজ্ঞানতা যদি বৃদ্ধি পেতে থাকে, তাহলে কোনো ক্ষতি হতে আর বাকি থাকে না, কোনো দুঃখ বাকি থাকে না এবং মূঢ়যোনি প্রাপ্তি বা নরক গমনও বাকি থাকে না।

*** *** ***

সম্বন্ধ—তাৎকালিক গুণাদির বৃত্তির বৃদ্ধিতে মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তির কী গতি হয়, চতুর্দশ-পঞ্চদশ শ্লোকে তার বর্ণনা করা হয়েছে ; কিন্তু যাদের জীবনে সত্ত্বগুণ, রজোগুণ অথবা তমোগুণের প্রাধান্য থাকে, মৃত্যুর পর তাদের কী গতি হয়—পরবর্তী শ্লোকে তার বর্ণনা করেছেন।

উর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ॥ ১৮ ॥

[**সত্ত্বস্থাঃ** (সত্ত্বগুণে অবস্থিত ব্যক্তি) ; **উর্ধ্বম্, গচ্ছন্তি** (উর্ধ্বলোকে গমন করেন) ; **রাজসাঃ** (রজোগুণে অবস্থিত ব্যক্তি) ; **মধ্যে, তিষ্ঠন্তি** (মধ্য অর্থাৎ মনুষ্যলোকে জন্ম নেন এবং) ; **জঘন্যগুণবৃত্তিস্থাঃ** (নিকৃষ্ট তমোগুণের বৃত্তিতে অবস্থিত) ; **তামসাঃ, অধঃ, গচ্ছন্তি** (ব্যক্তি অধোগতি প্রাপ্ত হন।)]

সত্ত্বগুণে অবস্থিত ব্যক্তি উর্ধ্বলোকে গমন করেন ; রজোগুণে অবস্থিত ব্যক্তি মৃত্যুলোকে জন্ম নেন এবং নিকৃষ্ট তমোগুণের বৃত্তিতে অবস্থিত ব্যক্তি অধোগতি প্রাপ্ত হন॥ ১৮ ॥

ব্যাখ্যা—**'উর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থাঃ'**—যাঁদের জীবনে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য থাকে এবং সেইজন্য যাঁরা ভোগাদিতে সংযম করেছেন, তীর্থ, ব্রত, দান ইত্যাদি শুভকর্ম করেছেন, অন্যের সুখ-সুবিধার জন্য জলসত্র, অন্নক্ষেত্র চালিয়েছেন, রাস্তা নির্মাণ করিয়েছেন, পশু-পক্ষীর সুবিধার জন্য গাছপালা লাগিয়েছেন, গোশালা তৈরি করিয়েছেন, এখানে তাঁদেরই **'সত্ত্বস্থাঃ'** বলা হয়েছে। সত্ত্বগুণের প্রাধান্যের মধ্যে এরূপ মানুষদের দেহত্যাগ হলে তার ফলে, সত্ত্বগুণের সঙ্গ হওয়ায়, তাতে আসক্তি থাকায় সেই ব্যক্তিগণ স্বর্গাদি উচ্চলোকে গমন করেন। সেইসব লোকের বর্ণনা এই অধ্যায়ের চতুর্দশতম শ্লোকে **'উত্তমবিদাং অমলান্ লোকান্'** পদের দ্বারা করা হয়েছে। উর্ধ্বলোকে গমনকারী ব্যক্তিদের তেজস্তত্ত্বপ্রধান শরীর প্রাপ্তি হয়।

'মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ'—যেসব মানুষের জীবনে রজোগুণ বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলে যাঁরা শাস্ত্র মর্যাদাতে থেকেও সম্পদ-সংগ্রহ ; ভোগ ; আয়েশ-আরাম ; বস্তুসমূহে মমত্ববোধ ও আসক্তি পোষণ করেন, তাঁদেরই এখানে **'রাজসাঃ'** বলা হয়েছে। রজোগুণের প্রাধান্যে অর্থাৎ রজোগুণের কার্যাবলীর চিন্তাতেই এরূপ মানুষেরা যখন শরীর ত্যাগ করেন, তখন তাঁরা পুনর্বার এই মৃত্যুলোকে জন্মগ্রহণ করেন। এখানে তাঁদের পৃথ্বীতত্ত্ব-প্রধান মনুষ্যদেহ প্রাপ্তি হয়।

এখানে **'তিষ্ঠন্তি'** পদটি ব্যবহারের অর্থ হল এই যে, এইসব রাজসিক ব্যক্তিগণ এখন যেমন মনুষ্যজগতে বাস করেন, মৃত্যুর পর তাঁরা পুনরায় এই লোকে এসে এইভাবেই থাকেন। এঁরা অশুদ্ধ আচরণ করেন না, শাস্ত্র মর্যাদা ভঙ্গ করেন না অর্থাৎ শাস্ত্রের মর্যাদার মধ্যেই থাকেন এবং শুদ্ধ আচরণ করেন, কিন্তু বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদিতে অনুরাগ, আসক্তি ও মমত্ববোধ থাকায় তাঁরা পুনরায় মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন।

'জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ'—যাদের জীবনে তমোগুণের প্রাধান্য থাকে এবং সেইজন্য যারা প্রমাদাদির বশীভূত হয়ে অনর্থক অর্থ ও সময় নষ্ট করে ; যারা আলস্যে ও নিদ্রায় দিন কাটায়, আবশ্যক কার্যাদি যারা সময়মত করে না, যারা অন্যের ক্ষতির কথা চিন্তা করে ; অন্যকে দুঃখ দেয়, যারা ছল, কপটাচারী, চুরি-ডাকাতি ইত্যাদি নিন্দনীয় কাজ করে, এইরূপ ব্যক্তিদেরই এখানে **'জঘন্যগুণবৃত্তিস্থাঃ'** বলা হয়েছে। তমোগুণের বৃদ্ধিকালে অর্থাৎ তমোগুণের কার্যাদির চিন্তায় যখন এরূপ ব্যক্তি দেহত্যাগ করে, তখন তারা অধোগতি প্রাপ্ত হয়।

অধোগতির দুটি ভাগ আছে—যোনিবিশেষ এবং স্থানবিশেষ। 'যোনিবিশেষ' অধোগতির মধ্যে পড়ে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, সাপ, বিছে, ভূত, প্রেত ইত্যাদি। আর 'স্থানবিশেষ' অধোগতি হল বৈতরিণী, অসিপত্র, লালাভক্ষ, কুম্ভীপাক, রৌরব, মহারৌরব ইত্যাদি নরক-কুণ্ড। যাঁদের জীবনে সত্ত্বগুণ অথবা রজোগুণ থাকা সত্ত্বেও মৃত্যুর সময়ে তাৎকালিক তমোগুণ বৃদ্ধি পায়, তাঁরা মৃত্যুর পর 'যোনিবিশেষ' অধোগতিতে অর্থাৎ মূঢ়- যোনিতে গমন করেন (গীতা ১৪।১৫)। যাদের জীবনে তমোগুণের প্রাধান্য থাকে এবং সেই তমোগুণের প্রাধান্যেই দেহত্যাগ হয়, তারা মৃত্যুর পর 'স্থানবিশেষ' অধোগতি অর্থাৎ নরকে গমন করে (গীতা ১৬।১৬)। তাৎপর্য হল এই যে সাত্ত্বিক, রাজসিক অথবা তামসিক মানুষের অন্তিম চিন্তা অন্য দিকে গেলে তার গতি সেই অন্তিম চিন্তা অনুসারেই হবে। তবে সুখ-দুঃখ ভোগ তার কর্ম অনুসারেই হবে। যেমন—কর্ম ভালো করলেও যদি অন্তিম সময়ে কুকুরের চিন্তা হয় তাহলে সেই চিন্তা অনুসারে সে কুকুর জন্ম পাবে, তবে সেই যোনিতেও কর্মের ফল হিসাবে সে অনেক সুখ-আরাম পাবে। জীবনভর খারাপ কর্ম করেছে কিন্তু মৃত্যুকালে যদি তার মানুষের চিন্তন হয় তাহলে অন্তিম চিন্তন অনুসারে সে মনুষ্য-জন্ম পাবে। কিন্তু কর্মের ফলরূপে তার জীবনে ভয়ংকর পরিস্থিতি আসবে। দেহে রোগ-ব্যাধির প্রকোপ থাকবে ; জীবন-নির্বাহের জন্য অন্ন-জল, বস্ত্রাদি পেতেও তার খুবই কষ্ট হবে।

সাত্ত্বিক গুণ বাড়াবার জন্য সাধকের সৎ-গ্রন্থ পড়া উচিত ; খাওয়া-দাওয়া রাজসিক বা তামসিক না করে সাত্ত্বিক আহার গ্রহণ করা উচিত। শ্রেষ্ঠ সাত্ত্বিক ব্যক্তিদের সঙ্গ করা উচিত, তাঁদের সান্নিধ্যে থেকে তাঁদের কথা অনুযায়ী সাধন-ভজন করা উচিত। শুদ্ধ-পবিত্র তীর্থাদি পরিভ্রমণ করতে

হয় ; যে স্থানে কোলাহল হয় সেইরকম রাজসিক স্থান এবং যেস্থানে ডিম, মাংস, মদ ইত্যাদি বিক্রি হয় সেইরকম তামসিক স্থান পরিহার করা উচিত। প্রাতঃকাল এবং সন্ধ্যাকালকে সাত্ত্বিক সময় বলে ধরা হয়, এই সময়গুলিতে ধ্যান-ভজন ইত্যাদিতে অতিবাহিত করা উচিত। শাস্ত্রবিহিত শুভকর্মই করা কর্তব্য, নিষিদ্ধ কর্ম নয় ; রাজসিক-তামসিক কর্ম কখনোই করা উচিত নয়। নিজ নিজ বর্ণাশ্রম অনুসারে নিজ নিজ কর্তব্য ঠিকভাবে পালন করা উচিত। ভগবানেরই ধ্যান করা উচিত। সাত্ত্বিক মন্ত্রই জপ করতে হয়। এইরূপ সাত্ত্বিকভাবে সমস্ত কাজ করলে পুরানো সংস্কার দূর হয় এবং সাত্ত্বিক সংস্কার (সত্ত্বগুণ) বৃদ্ধি পায়। শ্রীমদ্ভাগবতে গুণাদি বৃদ্ধির দশটি কারণ জানানো হয়েছে—

আগমোঽপঃ প্রজা দেশঃ কালঃ কর্ম চ জন্ম চ।
ধ্যানং মন্ত্রোঽথ সংস্কারো দশৈতে গুণহেতবঃ॥

(১১।১৩।৪)

'শাস্ত্র, জল (ভোজনাদি), প্রজা (সঙ্গ), স্থান, সময়, কর্ম, জন্ম, ধ্যান, মন্ত্র, সংস্কার—এই দশটি বস্তু যদি সাত্ত্বিক হয় তাহলে সত্ত্বগুণের, যদি রাজসিক হয় তাহলে রজোগুণের এবং তামসিক হলে তমোগুণের বৃদ্ধি ঘটায়।'

বিশেষ কথা

মৃত্যুকালে রজোগুণের তাৎকালিক বৃত্তি বৃদ্ধি পেলে মৃত্যুপথযাত্রী মানুষ মনুষ্যলোকে জন্ম নেয় (১৪।১৫) এবং রজোগুণের প্রাধান্য-বিশিষ্ট মানুষ মৃত্যুর পর পুনরায় এই মনুষ্যলোকেই ফিরে আসে (১৪।১৮)। এই দুটি বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মনুষ্যলোকের সকল মানুষই রজোগুণসম্পন্ন ; সত্ত্বগুণ এবং তমোগুণ এদের থাকে না। যদি প্রকৃতপক্ষে তা-ই হয়, তাহলে সত্ত্বগুণের তাৎকালিক বৃত্তিতে মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তি (১৪।১৪) এবং সত্ত্বগুণে স্থিত ব্যক্তি ঊর্ধ্বলোকে গমন করে (১৪।১৮) ; তমোগুণের তাৎকালিক বৃত্তির বৃদ্ধিতে মরণযাত্রী (১৪।১৫) এবং তমোগুণে স্থিত ব্যক্তি অধোগতি প্রাপ্ত হয় (১৪।১৮) ; সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ—এই তিনটি গুণ অবিনাশী দেহীকে দেহে বন্ধন করে (১৪।৫) ; সম্পূর্ণ জগৎ এই তিনটি গুণের দ্বারা মোহিত হয় (৭।১৩) ; সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক—কর্তা তিনপ্রকার বলে কথিত হয় (১৮।২৩-২৮) ; সমস্ত ত্রিলোকই ত্রিগুণাত্মক (১৮।৪০) ইত্যাদি কথাগুলি ভগবান কেন বলেছেন ?

এর উত্তর হল যে, ঊর্ধ্বগতি লাভে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য থাকলেও সঙ্গে রজোগুণ-তমোগুণও থাকে। তাই দেবতাদেরও সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক স্বভাব হয়ে থাকে। অতএব সত্ত্বগুণের প্রাধান্য হলেও এতে অবান্তর ভেদ থাকে। সেইরূপই মধ্যগতিতে রজোগুণের প্রাধান্য থাকলেও তার সঙ্গে সত্ত্বগুণ-তমোগুণও থাকে। সুতরাং মানুষেরও সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক স্বভাব হয়। অধোগতিতে তমোগুণের প্রাধান্য থাকলেও সঙ্গে সত্ত্বগুণ-রজোগুণও থাকে। সেইজন্যই পশু-পক্ষী ইত্যাদিতে, ভূত-প্রেতাদিতে এবং নরকের প্রাণীদের মধ্যেও বিভিন্ন স্বভাব দেখা যায়। কেউ সৌম্য স্বভাবসম্পন্ন হন, কেউ মধ্যম স্বভাববিশিষ্ট হন আবার কেউ ক্রূর স্বভাবের হয়ে থাকেন। তাৎপর্য হল এই যে, যেখানে কোনোপ্রকার গুণের সংস্রব থাকে, সেখানে এই তিনটি গুণ অবশ্যই থাকবে। তাই ভগবান (১৮।৪০) বলেছেন যে ত্রিলোকে এমন কোনো প্রাণী নেই যে তিনটি গুণরহিত।

ঊর্ধ্বগতিতে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য, রজোগুণের গৌণভাব এবং তমোগুণের অত্যন্ত গৌণভাব থাকে। মধ্যগতিতে রজোগুণের প্রাধান্য, সত্ত্বগুণের গৌণভাব এবং তমোগুণের অত্যন্ত গৌণভাব থাকে। অধোগতিতে তমোগুণের প্রাধান্য, রজোগুণের গৌণভাব এবং সত্ত্বগুণের অত্যন্ত গৌণভাব থাকে। তাৎপর্য হল এই যে, সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ—তিনটি গুণের প্রাধান্যতেও অধিক, মধ্যম এবং নিম্নমাত্রায় প্রত্যেক গুণই বজায় থাকে। এইভাবে গুণগুলিতে শত-সহস্র সূক্ষ্ম ভেদ থাকে এবং এর তারতম্য অনুসারে প্রত্যেক প্রাণীর পৃথক্ পৃথক্ স্বভাব হয়ে থাকে।

যেমন ভগবান সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক কর্ম করলেও তিনি গুণাতীতই থাকেন (৭।১৩), তেমনই গুণাতীত মহাপুরুষেরা অন্তঃকরণে সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক বৃত্তি এলেও তিনি গুণাতীতই থাকেন (১৪।২২)। তাই ভগবানের উপাসনা করা এবং গুণাতীত মহাপুরুষের সঙ্গ করা—এই দুটিই নির্গুণ হওয়ায় সাধককে গুণাতীত করে তোলে।

পরিশিষ্ট-ভাব—তমোগুণের সামান্য বৃদ্ধি হলে মানুষ মূঢ়যোনি প্রাপ্ত হয় এবং বেশি বৃদ্ধি হলে নরকগমন হয়।

সম্বন্ধ—পঞ্চম থেকে অষ্টাদশ শ্লোক পর্যন্ত প্রকৃতির কার্যাবলী—গুণগুলির পরিচয় দিয়ে পরবর্তী দুটি শ্লোকে স্বয়ংকে ত্রিগুণের অতীত অনুভব করার কথা বর্ণনা করছেন।

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি॥ ১৯ ॥

[**যদা, দ্রষ্টা** (যখন, মানুষ) ; **গুণেভ্যঃ** (তিনটি গুণ ব্যতীত) ; **অন্যম্** (অন্য কাউকে) ; **কর্তারম্, ন, অনুপশ্যতি** (কর্তা বলে না দেখেন) ; **চ, গুণেভ্যঃ** (এবং, ত্রিগুণের) ; **পরম্, বেত্তি** (অতীত বলে অনুভব করেন) ; **সঃ** (তিনি) ; **মদ্ভাবম্** (আমার স্বরূপ) ; **অধিগচ্ছতি** (প্রাপ্ত হন।)]

যখন বিচারশীল মানুষ তিনটি গুণ ব্যতিরেকে অন্য কাউকে কর্তা বলে না দেখেন এবং নিজেকে ত্রিগুণের অতীত বলে অনুভব করেন, তখন তিনি আমার স্বরূপ (ব্রহ্মভাব) প্রাপ্ত হন॥ ১৯ ॥

ব্যাখ্যা—'নান্যং গুণেভ্যঃ....মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি' —গুণগুলি ব্যতীত আর কেউ কর্তা নেই অর্থাৎ সমস্ত ক্রিয়া গুণাদির দ্বারাই সম্পন্ন হয়, যা কিছু পরিবর্তন, তা সবই গুণাদির মধ্যেই সংঘটিত হয়। তাৎপর্য হল এই যে, সকল ক্রিয়া এবং পরিবর্তনের জন্য গুণগুলিই হল কারণ, অন্য কোনো কারণই নেই। গুণগুলি যার থেকে প্রকাশিত হয়, সেটি গুণাদির অতীত তত্ত্ব। গুণাদির অতীত হওয়ায় সেটি কখনো গুণাদিতে লিপ্ত হয় না অর্থাৎ গুণ এবং ক্রিয়ার এর ওপর কোনো প্রভাব পড়ে না। যে বিচারশীল সাধক এই তত্ত্ব জানেন অর্থাৎ বিচার দ্বারা নিজেকে গুণাদির ঊর্ধ্বে, অসম্বন্ধ, নির্লিপ্ত বলে অনুভব করেন—অর্থাৎ গুণাদির সঙ্গে তাঁর কখনো সংযোগ হয়নি, এখনও নেই, হবে না এবং হওয়া সম্ভবও নয়, কারণ গুণ পরিবর্তনশীল আর স্বয়ং-এর কখনো কোনো পরিবর্তন হয় না—তিনি তখন ভগবানের ভাব অর্থাৎ তাঁর স্বরূপ প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ সাধক যে ভ্রমবশতঃ গুণাদির সঙ্গে নিজের সম্পর্ক আছে বলে মনে করেছিলেন সেই মনে করা সম্পর্ক দূর হয় এবং ভগবানের সঙ্গে যে স্বতঃসিদ্ধ সম্পর্ক তা জাগ্রত হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব—'গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি' কথাটির তাৎপর্য হল, যার দ্বারা গুণ প্রকাশিত হয়, সেই প্রকাশে নিজের অবস্থিতি অনুভব করা (গীতা ১৩।৩১)।

'মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি'—পদটির অর্থ হল যে সেই ব্যক্তি আমার ভাব অর্থাৎ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত করেন। এই কথাটিই দ্বিতীয় শ্লোকে **'মম সাধর্ম্যমাগতাঃ'** পদের দ্বারা বলা হয়েছে।

বিবেকবান সাধক গুণাদি ব্যতীত অন্য কাউকে কর্তা বলে মনে করেন না এবং নিজেকে গুণাদি অর্থাৎ ক্রিয়া ও পদার্থ থেকে আলাদা বলে অনুভব করেন। ক্রিয়া ও পদার্থ থেকে ভিন্ন অনুভব করলে তিনি যোগারূঢ় হন —**'যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু .....'** (গীতা ৬।৪)। যোগারূঢ় হলে শান্তিলাভ হয় এবং সেই শান্তিতে বাধা না পড়লে পরমাত্মা লাভ হয়।

❋ ❋ ❋

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥ ২০ ॥

[**দেহী** (বিবেকশীল মানুষ) ; **দেহসমুদ্ভবান্** (দেহ উৎপত্তির কারণরূপ) ; **এতান্, ত্রীণ্, গুণান্** (এই তিনটি গুণ) ; **অতীত্য** (অতিক্রম করে) ; **জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈঃ** (জন্ম-মৃত্যু-জরারূপ দুঃখ থেকে) ; **বিমুক্তঃ** (বিমুক্ত হয়ে) ; **অমৃতম্** (অমরত্ব) ; **অশ্নুতে** (অনুভব করেন।)]

মানুষ (বিবেকশীল মনুষ্য) দেহ উৎপত্তির কারণরূপ এই তিনটি গুণ অতিক্রম করে জন্ম, মৃত্যু, জরারূপ দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে অমরত্ব অনুভব করেন ॥ ২০ ॥

ব্যাখ্যা—**'গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্'**—যদিও বিচারশীল মানুষের দেহের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ থাকে না, তবুও সাধারণ দৃষ্টিতে দেহধারী হওয়ায় তাঁকে **'দেহী'** বলা হয়েছে।

দেহকে উৎপন্নকারী হল গুণ। মানুষ যে গুণের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নেয়, সেই অনুসারে তাকে উচ্চ-নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করতে হয় (গীতা ১৩।২১)।

এই অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোক থেকে অষ্টাদশ শ্লোক পর্যন্ত যার বর্ণনা করা হয়েছে, সেই তিনটি গুণের জন্যই এখানে **'এতান্ ত্রীন্ গুণান্'** পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। বিচারশীল মানুষ এই তিনটি গুণ অতিক্রম করেন অর্থাৎ এগুলির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক স্বীকার করেন না, এগুলির সঙ্গে তাঁর মেনে নেওয়া সম্পর্ক ত্যাগ করেন। কারণ তাঁর স্পষ্টভাবে বোধ হয় যে সমস্ত গুণই পরিবর্তনশীল, এগুলি উৎপন্ন হয় এবং বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং নিজ স্বরূপ গুণাদিতে কখনো লিপ্ত হয় না এবং হওয়া সম্ভবও নয়। লক্ষ্য করার বিষয় হল এই যে, যে প্রকৃতি থেকে এই গুণ উৎপন্ন হয়, সেই প্রকৃতির সঙ্গেও যখন স্বয়ং-এর বিন্দুমাত্র সম্বন্ধ নেই, তাহলে গুণাদির সঙ্গে তার সম্পর্ক হবে কী করে?

'জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে'—সাধক যখন এই তিনটি গুণ অতিক্রম করেন, তখন তাঁর আর জন্ম-মৃত্যু-জরা অবস্থার দুঃখ পেতে হয় না। তিনি জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদির দুঃখ থেকে মুক্ত হন। কারণ জন্ম ইত্যাদি হওয়াতে গুণাদির সঙ্গই হল কারণ। এই গুণ আসে এবং যায় সুতরাং এটি পরিবর্তনশীল। গুণাদির বৃত্তি কখনো সাত্ত্বিক, কখনো রাজসিক আবার কখনো তামসিক হয়ে থাকে; কিন্তু স্বয়ং-এর কখনো সাত্ত্বিকতা, রাজসিকতা এবং তামসিকতা আসেই না। স্বয়ং (স্বরূপ) সর্বদাই আসক্তিবর্জিত ভাবে থাকে। এই আসক্তিবর্জিত স্বরূপের কখনো জন্ম হয় না। যার জন্ম হয় না, তার মৃত্যুও হয় না। কারণ যে জন্মায়, সে-ই মৃত্যুবরণ করে এবং বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়। গুণাদির সঙ্গে সম্পর্কিত হলেই জন্ম, মৃত্যু এবং বৃদ্ধাবস্থার দুঃখ পেতে হয়। যিনি গুণাদিতে সর্বতোভাবে নির্লিপ্ত হয়েছেন, তিনি স্বতঃই অমরত্ব অনুভব করেন।

দেহের সঙ্গে তাদাত্ম্য (ঐক্য) মানলেই মানুষ নিজেকে মরণশীল বলে মনে করে। দেহের সম্পর্কে যতকিছু দুঃখবোধ আছে মৃত্যুই তার মধ্যে সব থেকে বেশি বলে মনে করা হয়। মানুষ স্বরূপতঃ অমর হলেও ভোগ এবং সম্পদ-সংগ্রহে আসক্ত হওয়ায় এবং প্রতিমুহূর্তে বিনাশশীল এই দেহকে অমর করে রাখার আকাঙ্ক্ষায় তার অমরত্ব অনুভব হয় না। দেহের সঙ্গে তাদাত্ম্য দূর হলে বিবেকশীল মানুষের অমরত্ব অনুভূত হয়।

আগের শ্লোকে **'মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি'** পদটির দ্বারা ভগবদ্ভাব প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে আর এখানে **'অমৃতমশ্নুতে'** পদটির দ্বারা অমরত্ব অনুভব করার কথা বলা হয়েছে—আসলে উভয় কথাই এক।

গীতায় **'জরামরণমোক্ষায়'** (৭।২৯) **'জন্মমৃত্যুজরা-ব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্'** (১৩।৮) এবং এইস্থানে **'জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তঃ'** (১৪।২০)—এই তিনটি স্থানে বাল্য এবং যুবাবস্থার কথা না বলে 'জরা' বা বৃদ্ধাবস্থার কথা বলা হয়েছে, যদিও দেহের বাল্য, যুবা এবং বৃদ্ধ—এই তিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে থাকে। এর কারণ হল এই যে শৈশবে এবং যুবাকালে মানুষ বেশি দুঃখ অনুভব করে না। কারণ সেই সময়ে শরীরে বল থাকে। বৃদ্ধাবস্থায় দেহের বল কমে যাওয়ায় মানুষ অধিক ক্লেশ অনুভব করে থাকে। তেমনই মানুষের যখন প্রাণত্যাগ হয়, তখন সে ভীষণ দুঃখ অনুভব করে। কিন্তু যে ব্যক্তি এই তিনটি গুণ অতিক্রম করতে পারে, সে সর্বতোভাবে জন্ম, মৃত্যু এবং বৃদ্ধাবস্থার দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে থাকে।

এই মনুষ্যদেহে থাকাকালীনই যার বোধ লাভ হয়, তার আর জন্মগ্রহণ করার কথাই আসে না। হ্যাঁ, যে শরীরকে নিজের বলা হয় সেটির বৃদ্ধাবস্থা এবং মৃত্যু তো আসবেই, কিন্তু তার জন্য তাঁর কোনো দুঃখবোধ থাকে না।

বর্তমান দেহের সঙ্গে স্ব-স্বরূপের ঐক্য মেনে নিলেই পুনর্জন্ম হয় এবং দেহে সংঘটিত জরা, ব্যাধি ইত্যাদি দুঃখগুলি জীব নিজের বলে মনে করে। গুণাদির সংস্পর্শেই শরীর উৎপন্ন হয়। দেহের উৎপাদক গুণ থেকে রহিত হওয়ার ফলেই গুণাতীত মহাপুরুষ দেহের সম্বন্ধজাত সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে থাকেন।

অতএব প্রত্যেক ব্যক্তিরই মৃত্যুর পূর্বে নিজ গুণাতীত স্বরূপ অনুভব করা কর্তব্য। গুণাতীত হলে জরা-ব্যাধি-মৃত্যু ইত্যাদি সর্বপ্রকার দুঃখ হতে মুক্তি হয়ে থাকে এবং অমরত্ব অনুভূত হয়, তখন তাঁর আর জন্ম হয় না।

পরিশিষ্ট-ভাব—মনুষ্যমাত্রেরই মধ্যে এই ভাব থাকে যে আমি যেন জীবিত থাকি, কখনো না মরি। সে অমর থাকতে চায়। অমর থাকার এই ইচ্ছাতেই প্রমাণিত হয় যে সে প্রকৃতপক্ষে অমর। যদি সে অমর না হত, তাহলে তার এই ইচ্ছা হত না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ক্ষুধা ও পিপাসাই প্রমাণ করে যে এমন বস্তু (অন্ন, জল) আছে যার দ্বারা ক্ষুধা-পিপাসা মেটানো যায়। অন্ন-জল না থাকলে ক্ষুধা ও পিপাসাও হত না। অতএব অমরত্ব স্বতঃসিদ্ধ **'ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ......'** (গীতা ৮।১৯)। কিন্তু স্বরূপতঃ অমর হয়েও মানুষ যখন নিজ বিবেককে উপেক্ষা করে মৃত্যুধর্মী শরীরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠে অর্থাৎ 'আমি শরীর' বলে মনে করে, তখন তার মধ্যে মৃত্যুভয় ও অমরত্বের ইচ্ছা উৎপন্ন হয়। যখন সে নিজ বিবেককে গুরুত্ব দিয়ে মনে করে যে 'আমি শরীর নই ; শরীর নিরন্তর মৃত্যুপথযাত্রী আর আমি স্বয়ং নিত্য অমর', তখন সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজ অমরত্ব অনুভব করে। স্ব-স্বরূপ সর্বদা একভাবে থাকার ফলেই শরীরের বিকারের পরিবর্তনের অনুভব করতে পারে। অতএব সাধকের কর্তব্য হল এই বিকারকে ও পরিবর্তনকে প্রাধান্য না দিয়ে তার নিজস্ব সত্তা ও অমরত্বকে প্রাধান্য দেওয়া।

এই শ্লোকটি হল চতুর্দশ অধ্যায়ের সার।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—গুণাতীত ব্যক্তি দুঃখ হতে মুক্ত হয়ে অমরত্ব লাভ করে—এ-কথা শুনে অর্জুনের মনে গুণাতীত ব্যক্তিদের লক্ষণ জানার ইচ্ছা হল। তাই তিনি পরবর্তী শ্লোকে ভগবানকে জিজ্ঞাসা করছেন—

অর্জুন উবাচ

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ততে॥ ২১ ॥

[**প্রভো** (হে প্রভু!) ; **এতান্, ত্রীন, গুণান্** (এই তিনটি গুণের) ; **অতীতঃ** (অতীত) ; **কৈঃ, লিঙ্গৈঃ, ভবতি** (কোন্ কোন্ লক্ষণ যুক্ত হয় ?) ; **কিমাচারঃ** (তাঁর আচরণ কেমন হয় ?) ; **চ, এতান্, ত্রীন, গুণান্** (আর এই তিনটি গুণকে) ; **কথম্, অতিবর্ততে** (কীভাবে অতিক্রম করা যেতে পারে ?)]

অর্জুন বললেন—হে প্রভু ! এই তিনটি গুণের অতীত মানুষকে কোন্ কোন্ লক্ষণ দ্বারা জানা যায় ? তাঁর আচরণ কেমন হয় ? আর এই তিনটি গুণকে কীভাবে অতিক্রম করা যেতে পারে ? ॥ ২১ ॥

ব্যাখ্যা—'কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো'—হে প্রভু ! যে ব্যক্তি এই গুণগুলি অতিক্রম করেছেন, তাঁর কী লক্ষণ তা আমি জানতে চাই। তাৎপর্য হল এই যে, সংসারী মানুষদের থেকে এইসব গুণাতীত মানুষদের এমন কোন্ বিশেষত্ব আছে যার দ্বারা সাধারণ ব্যক্তি বুঝতে পারে যে এঁরা গুণাতীত ব্যক্তি ?

'কিমাচারঃ'—এই গুণাতীত ব্যক্তিদের আচরণ কীরূপ হয়ে থাকে ? অর্থাৎ সাধারণ ব্যক্তিদের দিন ও রাত্রি যেভাবে যাপিত হয়, গুণাতীত ব্যক্তিদের দিন-রাত্রিও কী সেইভাবেই যাপিত হয়ে থাকে, নাকি তাতে বিশেষত্ব কিছু থাকে ? সাধারণ ব্যক্তিদের আচরণাদি যেমন হয়, খাওয়া-দাওয়া, ওঠা-বসা, শোওয়া-জাগা যেমন হয়, গুণাতীত মানুষদের আচরণও কী তেমনই হয়, নাকি কিছু বিশেষত্ব থাকে ?

'কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ততে'—এই তিনটি গুণ অতিক্রম করার উপায় কী ? অর্থাৎ কোন্ সাধনের সাহায্যে মানুষ গুণাতীত হতে সক্ষম হয় ?

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—অর্জুনের প্রশ্নাবলীর মধ্যে প্রথম প্রশ্নের উত্তরে ভগবান পরবর্তী দুটি শ্লোকে গুণাতীত মানুষের লক্ষণগুলি বর্ণনা করেছেন।

শ্রীভগবানুবাচ

প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥ ২২ ॥

[**পাণ্ডব** (হে পাণ্ডব !) ; **প্রকাশম্, চ, প্রবৃত্তিম্, চ, মোহম্** (প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ) ; **সম্প্রবৃত্তানি** (এই গুণসমূহতে সামগ্রিক রূপে প্রবৃত্তি হলেও) ; **এব, ন, দ্বেষ্টি, চ** (এগুলিতে দ্বেষ করেন না এবং) ; **নিবৃত্তানি** (এগুলির যদি নিবৃত্তি হয়) ; **ন, কাঙ্ক্ষতি** (ইচ্ছা রাখেন না।)]

শ্রীভগবান বললেন—হে পাণ্ডব ! প্রকাশ, প্রবৃত্তি এবং মোহ—এই গুণসমূহতে সামগ্রিকরূপে প্রবৃত্তি হলেও গুণাতীত ব্যক্তি এগুলিতে দ্বেষ করেন না এবং এগুলি যদি নিবৃত্ত হয় তবে সেগুলির ইচ্ছা রাখেন না॥ ২২ ॥

ব্যাখ্যা—'প্রকাশং চ'—ইন্দ্রিয়াদি এবং অন্তরে স্বচ্ছ জ্ঞান এবং নির্মলভাবকে বলা হয় প্রকাশ। তাৎপর্য হল এই যে, যাতে ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা শব্দাদি পঞ্চ বিষয়ের স্পষ্ট জ্ঞান হয়, মনের দ্বারা মনন হয় এবং বুদ্ধির দ্বারা নিরূপণ হয়, তাকেই বলা হয় 'প্রকাশ'।

ভগবান প্রথমে (১৪।১১) সত্ত্বগুণের দুটি বৃত্তির কথা বলেছেন—প্রকাশ এবং জ্ঞান। এ দুটির মধ্যে এখানে শুধু প্রকাশবৃত্তির কথা বলার অর্থ হল এই যে, সত্ত্বগুণে প্রকাশ-বৃত্তিই প্রধান। কারণ ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণে যতক্ষণ প্রকাশ (বিবেক) না হয়, স্বচ্ছ ও নির্মলভাব না আসে, ততক্ষণ জ্ঞান (বিবেক) জাগ্রত হয় না। প্রকাশ এলেই জ্ঞানও জাগ্রত হয়। সুতরাং এখানে জ্ঞান বৃত্তিকে প্রকাশের অন্তর্গত বলে ধরা উচিত।

'প্রবৃত্তিং চ'—যতক্ষণ গুণাদির সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে ততক্ষণ রজোগুণের কার্য লোভ, প্রবৃত্তি, আকাঙ্ক্ষাপূর্বক কর্মারম্ভ, অশান্তি, স্পৃহা—এই সমস্ত বৃত্তি উৎপন্ন হতে থাকে, কিন্তু মানুষ যখন গুণাতীত হয়ে যায়, তখন রজোগুণের সঙ্গে তাদাত্ম্য স্থাপন করার বৃত্তিগুলি আর উৎপন্ন হতে পারে না, কিন্তু আসক্তি ও কামনারহিত প্রবৃত্তি (ক্রিয়াশীলতা) থেকে যায়। তবে এই প্রবৃত্তি দূষণীয় নয়, গুণাতীত মানুষের দ্বারাও ক্রিয়া সংঘটিত হয়। সেইজন্য ভগবান এখানে শুধু 'প্রবৃত্তি'র কথাই বলেছেন।

রজোগুণের দুটি রূপ—রাগ (আসক্তি) এবং ক্রিয়া। এ দুটির মধ্যে রাগ হল দুঃখের কারণ, এটি গুণাতীত ব্যক্তির মধ্যে থাকে না। কিন্তু যতক্ষণ গুণাতীত মানুষের পার্থিব দেহ থাকে, ততক্ষণ তাঁর দ্বারা নিষ্কামভাবে কর্ম স্বতঃই হয়ে থাকে। এই ক্রিয়াশীলতাকেই ভগবান এখানে 'প্রবৃত্তি' নামে অভিহিত করেছেন।

'মোহমেব চ পাণ্ডব'—মোহ দু'প্রকারের—(১) নিত্য-অনিত্য, সৎ-অসৎ, কর্তব্য-অকর্তব্য বিচারবোধ না হওয়া এবং (২) ব্যবহারে ভুল হওয়া। গুণাতীত মহাপুরুষে পূর্বের ন্যায় মোহ (সৎ-অসৎ ইত্যাদির বিচারবুদ্ধি না থাকা) তো হয় না (গীতা ৪।৩৫)। কিন্তু ব্যবহারে ভুল হওয়া অর্থাৎ কারও কথায় কোনো নির্দোষ ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা এবং দোষী ব্যক্তিকে নির্দোষ বলে মেনে নেওয়া প্রভৃতি রজ্জুতে সর্পভ্রম, মরীচিকায় জলের ভ্রম, অভ্রকে রৌপ্য মনে করা ইত্যাদি ভুল গুণাতীত ব্যক্তিরও হয়ে থাকে।

'ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি'—সত্ত্বগুণের কার্য 'প্রকাশ', রজোগুণের কার্য 'প্রবৃত্তি', তমোগুণের কার্য 'মোহ'—এই তিনটিতে গভীরভাবে প্রবৃত্ত হলেও গুণাতীত মহাপুরুষ এগুলিতে দ্বেষ করেন না এবং এগুলি থেকে নিবৃত্ত হলেও এগুলির আকাঙ্ক্ষা করেন না। তাৎপর্য হল এই যে, 'এইসব বৃত্তি কেন উৎপন্ন হচ্ছে, এই বৃত্তিগুলির কোনোটিই যেন না থাকে'—এরূপ দ্বেষ করেন না এবং 'এই বৃত্তিগুলি আবার ফিরে আসুক; এ বৃত্তিগুলি বজায় থাকুক'—এরূপ অনুরাগ করেন না। গুণাতীত হওয়ায় গুণাদির বৃত্তিগুলির চলাচলে তাঁর ওপর কোনো প্রভাব পড়ে না। তিনি এই বৃত্তিগুলিতে স্বাভাবিকভাবেই নির্লিপ্ত থাকেন।

বিশেষ কথা

একটি হল বৃত্তিগুলির 'হওয়া' আর একটি হল বৃত্তিগুলি 'করা' (সেগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা অর্থাৎ রাগ-দ্বেষ করা)। হওয়া এবং করার মধ্যে বিরাট

পার্থক্য থাকে। 'হওয়া' সমষ্টিগত হয়, আর 'করা' ব্যক্তিগত হয়। জগতে যা কিছু 'হয়' তাতে আমাদের কোনো দায়িত্ব নেই। যা আমরা 'করি' তাতে আমাদের দায়িত্ব থাকে।

যে সমষ্টি-শক্তির দ্বারা জগৎমাত্র সঞ্চালিত হয়, সেই শক্তির দ্বারাই আমাদের শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি (যা জগতেরই অংশ) সঞ্চালিত হয়। জগতে সংঘটিত ক্রিয়াদির দোষগুণ দ্বারা আমরা যখন প্রভাবিত হই না, তখন শরীরাদির দ্বারা সংঘটিত ক্রিয়াদির দোষগুণে আমরা কীভাবে প্রভাবিত হব ? কিন্তু এই স্বতঃ সংঘটিত ক্রিয়াগুলির কয়েকটি ক্রিয়ার সঙ্গে মানুষ রাগ-দ্বেষপূর্বক নিজ সম্পর্ক স্থাপন করে অর্থাৎ তার কর্তা হয়ে বসে, তখন তার ফল মানুষকে ভুগতেই হয়। তাই অন্তরে সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ—এই তিনটি গুণ সহযোগে যে ভালো-মন্দ বৃত্তি উৎপন্ন হয়, সাধকের তাতে রাগ (আসক্তি) বা দ্বেষ করা উচিত নয় অর্থাৎ সেগুলির সঙ্গে নিজ সম্বন্ধ স্থাপন করা উচিত নয়।

বৃত্তিগুলি কারোরই একরূপ থাকে না। গুণাতীত মহাপুরুষের চিত্তেও তিনটি গুণের বৃত্তি থাকে, কিন্তু তাঁর এই বৃত্তির থেকে রাগ বা দ্বেষ উৎপন্ন হয় না। বৃত্তিগুলি আপনিই আসে, আপনিই অন্তর্হিত হয়। গুণাতীত মহাপুরুষের দৃষ্টি সেইদিকে যায়ই না। কারণ তাঁর দৃষ্টিতে এক পরমাত্মতত্ত্ব ব্যতিরেকে আর কিছুই থাকে না।

দেখা এবং দৃষ্ট হওয়া—এই দুইয়ে পার্থক্য অতি স্পষ্ট। 'দেখা' 'করা'র অন্তর্গত আর 'দৃষ্ট হওয়া' 'হওয়ার' অন্তর্গত। দেখলে দোষ হয়, কিন্তু দৃষ্ট হওয়াতে দোষ নেই। সুতরাং সাধকের চিত্তে যদি অতি মন্দ বৃত্তিও দৃষ্ট হয়, তাহলে তাতে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। স্বাভাবিকভাবে দৃষ্ট হওয়া (ঘটমান) বৃত্তিগুলিতে রাগ-দ্বেষ করা অর্থাৎ সেই অনুযায়ী নিজের অবস্থিতি মেনে নেওয়াই হল 'দেখা'। সাধক সাধারণতঃ এই ভুলই করেন যে 'দৃষ্ট হওয়া' বস্তুগুলিকে তিনি 'দেখে' থাকেন এবং তার ফলে তাতে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। ভগবান রাম বলেছেন—

সুনহু তাত মায়া কৃত গুন অরু দোষ অনেক।
গুন য়হ উভয় ন দেখিঅহিঁ দেখিঅ সো অবিবেক॥

(শ্রীরামচরিতমানস ৭।৪১)

সাধকের গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত যে বৃত্তিগুলি তো উৎপন্ন হয় এবং নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু স্বয়ং (স্ব-স্বরূপ) সর্বদা একইভাবে বিরাজ করে। বৃত্তিগুলির পরিবর্তন যিনি দেখেন সেই স্ব-স্বরূপ নিজে পরিবর্তনরহিত হয়ে থাকেন। কারণ পরিবর্তনশীলকে পরিবর্তনশীল দেখতে সক্ষম হন না, পরিবর্তনরহিতই পরিবর্তনশীলকে দেখতে সক্ষম হন। এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে স্ব-স্বরূপ বৃত্তিগুলির থেকে পৃথক্। পরিবর্তনশীল গুণগুলির সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নেওয়ার জন্যই গুণাদি থেকে উৎপন্ন হওয়া বৃত্তিগুলিকে নিজের বলে প্রতীত হয়। অতএব উৎপন্ন-বিনাশশীল বৃত্তিগুলিকে নিজের বলে মনে করে সাধকের বিচলিত হওয়া উচিত নয়। যেমনই অবস্থা আসুক তাতে বিচলিত হওয়া উচিত নয় ; সেগুলির সঙ্গে নিজের ঐক্য মনে করা উচিত নয়। সর্বদা একভাবে বিরাজিত ; গুণাদিতে সর্বতোভাবে নির্লিপ্ত, নির্বিকার এবং অবিনাশী নিজ স্বরূপের দিকে লক্ষ্য না রেখে পরিবর্তনশীল, বিকারশীল এবং বিনাশশীল বৃত্তির দিকে নজর দেওয়া সাধকের পক্ষে মস্ত বড় প্রতিবন্ধক।

পরিশিষ্ট-ভাব—গুণাতীত ব্যক্তির 'অনুকূলতা বজায় থাক, প্রতিকূলতা দূর হোক' এরূপ ইচ্ছার উদয় হয় না। নির্বিকারত্ব অনুভূত হলে, তাঁর অনুকূল-প্রতিকূল ভাবের জ্ঞান হলেও তাঁর স্বরূপে এর কোনো প্রভাব পড়ে না। অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহ পরিবর্তিত হয় কিন্তু স্বরূপ তাতে নির্লিপ্ত থাকে। সাধকের ওপরেও বৃত্তিসমূহের প্রভাব পড়া উচিত নয় ; কারণ গুণাতীত ব্যক্তি হলেন সাধকদের আদর্শ, সাধকগণ তাঁদেরই অনুসারী হন।

সাধকমাত্রেরই উচিত দেহধর্মকে নিজের বলে মনে না করা। বৃত্তিসমূহ অন্তঃকরণে হয়, নিজের মধ্যে নয়। অতএব এইসব বৃত্তিকে সাধক ভালো বা মন্দ বলে যেন মেনে না নেন এবং নিজের বলেও যেন না মানেন। কারণ বৃত্তিসমূহ আসে ও যায়, কিন্তু স্ব-স্বরূপ নিত্যবিরাজমান। যদি বৃত্তিসমূহ আমাদের হত, তাহলে যতক্ষণ আমরা থাকি, বৃত্তিগুলিও সঙ্গে থাকত। কিন্তু আমরা সকলেই অনুভব করি যে 'আমি' নিত্য বিরাজমান আর বৃত্তিগুলি আসা-যাওয়া করে। বৃত্তিসমূহ প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত আর আমি (স্ব-স্বরূপে)-এর সম্পর্ক পরমাত্মার সঙ্গে। তাই বৃত্তিগুলির পরিবর্তন অনুভবকারী স্বয়ং একইরূপে থাকেন।

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্তন্ত ইত্যেব যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥ ২৩ ॥

[**যঃ, উদাসীনবৎ** (যিনি উদাসীনের মতো) ; **আসীনঃ** (অবস্থান করেন) ; **গুণৈঃ** (গুণাদির দ্বারা) ; **ন, বিচাল্যতে** (অবিচলিত) ; **গুণাঃ, এব** (গুণই) ; **বর্তন্তে** (কার্যান্বিত হতে থাকে) ; **ইতি, যঃ** (এইভাবে) ; **অবতিষ্ঠতি** (অবস্থিত থাকেন) ; **ন, ইঙ্গতে** (চেষ্টা করেন না।)]

যিনি উদাসীনের মতো অবস্থান করেন এবং গুণাদির দ্বারা যিনি বিচালিত হন না, গুণই (গুণাদিতে) প্রবৃত্ত হতে থাকে—এই ভাব মনে রেখে যিনি নিজের স্বরূপে অবস্থিত থাকেন এবং স্বয়ং কোনো চেষ্টা করেন না॥ ২৩ ॥

ব্যাখ্যা—'উদাসীনবদাসীনঃ'—দুই ব্যক্তি যখন পরস্পর বিবাদ করে তখন তাদের মধ্যে একজনের পক্ষ অবলম্বনকারীকে বলা হয় 'পক্ষপাতী' আর উভয়ের মধ্যে ন্যায়বিচারকারীকে বলা হয় 'মধ্যস্থ'। কিন্তু যিনি সবকিছু দেখেও কোনো পক্ষ অবলম্বন করেন না, তাঁকে বলা হয় 'উদাসীন'। তেমনই গুণাতীত ব্যক্তি উদাসীনের ন্যায় অর্থাৎ সাক্ষীস্বরূপ জগৎ এবং পরমাত্মা—উভয়কেই অবলোকন করে থাকেন।

প্রকৃতপক্ষে জগৎ-সংসারের কোনো পৃথক্ অস্তিত্ব নেই-ই। সৎ-স্বরূপ পরমাত্মার অস্তিত্বের জন্যই জগৎকে অস্তিত্ববান বলে প্রতীত হয়। সুতরাং গুণাতীত মানুষের দৃষ্টিতে যখন জগতের কোনো অস্তিত্বই নেই, শুধু পরমাত্মাই আছেন, তখন তিনি কার প্রতি উদাসীন হবেন? কিন্তু যাঁদের দৃষ্টিতে জগৎ এবং পরমাত্মা উভয়েরই অস্তিত্ব থাকে, এইরকম মানুষদের দৃষ্টিতে সেই গুণাতীত মানুষ উদাসীনের মতো দৃষ্ট হন।

'গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে'—তাঁর বলে কথিত যে অন্তঃকরণ তাতে সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ—এই গুণগুলির বৃত্তিসমূহের আসা-যাওয়া থাকলেও, তিনি তাতে বিচলিত হন না। অর্থাৎ যেমন অপরের অন্তরে গুণাদি বৃত্তিগুলির উদয় হলে নিজের মধ্যে কোনো পার্থক্য অনুভূত হয় না, তেমনই তাঁর নিজের অন্তরেও গুণাদির বৃত্তির উদয় হলে কোনো পার্থক্য অনুভূত হয় না অর্থাৎ তিনি তাতে বিচলিত হন না। কারণ তাঁর বলে কথিত অন্তরে অন্তঃকরণসহ সম্পূর্ণ জগতের অত্যন্ত অভাব এবং পরমাত্মতত্ত্বের ভাব সর্বদা স্বাভাবিকভাবে জাগরূক থাকে।

'গুণা বর্তন্ত ইত্যেব যোঽবতিষ্ঠতি'—গুণই গুণাদিতে প্রবৃত্ত হচ্ছে (গীতা ৩।২৮) অর্থাৎ গুণাদিতেই সমস্ত ক্রিয়া সংঘটিত হয়—এইরূপ মনে করে তিনি নির্বিকারভাবে নিজ স্বরূপে অবস্থান করেন।

'ন ইঙ্গতে'—প্রথমে **'গুণা বর্তন্তে ইত্যেব'** পদ দ্বারা এটির গুণাদির সঙ্গে সম্বন্ধের নিষেধ করা হয়েছে। এবার **'ন ইঙ্গতে'** পদে এর ক্রিয়ার অভাব জানানোও হয়েছে। তাৎপর্য হল এই যে, গুণাতীত ব্যক্তি নিজে কিছু চেষ্টা করেন না, কারণ অবিনাশী শুদ্ধ স্বরূপে কখনো কোনো ক্রিয়া হয় না।

[বাইশ এবং তেইশতম শ্লোকে ভগবান গুণাতীত মহাপুরুষদের তটস্থ ও নির্লিপ্ত অবস্থার বর্ণনা করেছেন।]

পরিশিষ্ট-ভাব—'ন বিচাল্যতে' 'অবতিষ্ঠতি' এবং **'নেঙ্গতে'**—এই তিনটি পদের অর্থ একই। তা সত্ত্বেও এই তিনটি পদ ব্যবহারের তাৎপর্য হল যে গুণাতীত মহাপুরুষ স্বতঃ স্বাভাবিকভাবে এই স্থৈর্যে অবিচল থাকেন। তিনি নিজেও বিচলিত হন না এবং কেউ তাঁকে বিচলিতও করতে পারে না।

'করা', 'হওয়া' এবং 'আছে'—'করা' হওয়াতে এবং 'হওয়া' আছেতে পরিবর্তিত হলে অহংভাব চিরদিনের মতো দূর হয়ে যায়। যার অন্তরে ক্রিয়া ও পদার্থের গুরুত্ব থাকে সেই অসাধক (সংসারী ব্যক্তি) মনে করে যে 'আমি ক্রিয়া করছি', **'অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে'** (গীতা ৩।২৭)। যে কর্তা হয়, তাকে ভোক্তা হতেই হয়। যাদের মধ্যে বিবেক-বুদ্ধির প্রাধান্য থাকে, সেই সব সাধক অনুভব করেন যে 'ক্রিয়া হয়ে চলেছে' **'গুণাগুণেষু বর্তন্তে'** (গীতা ৩।২৮) অর্থাৎ 'আমি কিছুই করি না'—**'নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি'** (গীতা ৫।৮)। কিন্তু যাঁর তত্ত্বজ্ঞান হয়েছে, সেইরূপ সিদ্ধ

মহাপুরুষ শুধুমাত্র অস্তিরই (আছে) অনুভব করেন—**'যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে'**। সেই চিন্ময় সত্তা (অস্তিত্ব) সমস্ত ক্রিয়াতেই একইভাবে পরিপূর্ণ। ক্রিয়ার অন্ত হলেও চিন্ময় সত্তা একইভাবে বিরাজমান। মহাত্মাদের দৃষ্টি ক্রিয়ার ওপরে না থেকে স্বতঃ স্বাভাবিকভাবেই সেই একমাত্র চিন্ময় সত্তার ('আছে'র) দিকে থাকে।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—একুশতম শ্লোকের দ্বিতীয় প্রশ্নে অর্জুন গুণাতীত মানুষদের আচরণের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। পরবর্তী দুটি শ্লোকে ভগবান তার উত্তর দিয়েছেন।

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ॥ ২৪ ॥
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥ ২৫ ॥

[**ধীরঃ** (যে ধৈর্যশীল ব্যক্তি) ; **সমদুঃখসুখঃ** (দুঃখসুখে সমভাবাপন্ন) ; **স্বস্থঃ** (নিজস্বরূপে স্থিত) ; **সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ** (যিনি মাটির ডেলা, পাথর ও সোনায় সমভাবাপন্ন) ; **তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ** (যিনি প্রিয়-অপ্রিয়তে সমভাবে থাকেন) ; **তুল্যনিন্দাত্ম-সংস্তুতিঃ** (নিজের নিন্দা-স্তুতিতে সমভাবে থাকেন) ; **মানাপমানয়োঃ, তুল্যঃ** (যিনি মান-অপমানে সমভাবাপন্ন) ; **তুল্য, মিত্রারীপক্ষয়োঃ** (শত্রু-মিত্রে সমভাব রাখেন) ; **সর্বারম্ভপরিত্যাগী** (যিনি সর্ব কর্মারম্ভ পরিত্যাগকারী) ; **সঃ** (এইরূপ ব্যক্তিকেই) ; **গুণাতীতঃ, উচ্যতে** (গুণাতীত বলা হয়।)]

যে ধৈর্যশীল ব্যক্তি সুখদুঃখে সমভাবাপন্ন ও নিজস্বরূপে স্থিত, যিনি মাটির ডেলা, পাথর এবং সোনায় সমভাবাপন্ন ; যিনি প্রিয়-অপ্রিয় বিষয়ে তথা নিজের নিন্দা-স্তুতিতে সমভাব বজায় রাখেন ; যিনি মান-অপমানে ও মিত্র-শত্রু পক্ষের সঙ্গে সমভাব রাখেন, যিনি সর্ব কর্মারম্ভ পরিত্যাগ করেন, এইরূপ ব্যক্তিকেই গুণাতীত বলা হয় ॥ ২৪-২৫ ॥

ব্যাখ্যা—**'ধীরঃ সমদুঃখসুখঃ'**—নিত্য-অনিত্য, সার-অসার ইত্যাদি তত্ত্ব জেনে স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপে স্থিত হওয়ায় গুণাতীত মানুষকে ধৈর্যশীল বলা হয়।

পূর্বকর্ম অনুযায়ী অনুকূল-প্রতিকূল যে সব পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাকে বলা হয় সুখ ও দুঃখ অর্থাৎ প্রারব্ধ অনুসারে শরীর, ইন্দ্রিয় ইত্যাদির অনুকূল পরিস্থিতিকে 'সুখ' এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিকে 'দুঃখ' বলা হয়। গুণাতীত ব্যক্তি এই দুয়েতেই সম থাকেন। তাৎপর্য এই যে, সুখদুঃখরূপ বাহ্য পরিস্থিতি তার বলে কথিত অন্তঃকরণে বিকার উৎপন্ন করতে পারে না, তাকে সুখী বা দুঃখী করতে পারে না।

'স্বস্থঃ'—স্বরূপে সুখ বা দুঃখ নেই। সুখ এবং দুঃখ তো স্বরূপ থেকে প্রকাশিত হয় ! অতএব গুণাতীত পুরুষ সুখ বা দুঃখের ভোক্তা হন না, তিনি সদা বিরাজিত স্ব-স্বরূপে স্থিরভাবে অবস্থান করেন।

'সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ'—গুণাতীত ব্যক্তির মাটির ডেলা, পাথর এবং সোনাতে কোনো আকর্ষণ (অনুরাগ) তো থাকেই না এবং বিকর্ষণ (দ্বেষ)ও থাকে না। কিন্তু ব্যবহারকালে তিনি মাটির ডেলাকে তার স্বস্থানে রাখেন, পাথরকেও পাথরের জায়গায় এবং সোনাকেও সোনার জায়গায় (সুরক্ষিত স্থানে) রেখে থাকেন। তাৎপর্য হল এই যে, যদিও সেগুলির প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিতে তাঁর হর্ষ-শোক হয় না, তিনি সমভাবেই থাকেন, তা সত্ত্বেও তিনি সেগুলির যথাযোগ্য ব্যবহারই করে থাকেন।

মাটির ডেলা, পাথর বা স্বর্ণের জ্ঞান না থাকাকে সমতা বলে না, সমতা তাকেই বলা হয়, যখন এগুলির জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও এগুলির প্রতি কোনো অনুরাগ বা দ্বেষ না থাকে। জ্ঞান হওয়া দোষের নয়, দোষ হল বিকার হওয়ায়।

'তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ'—ক্রিয়মাণ কর্মগুলির সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে অর্থাৎ তার তৎকালিক ফলের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিতেও তিনি সমভাবে থাকেন।

'তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতি'—নিন্দা এবং স্তুতিতে নামের প্রাধান্য থাকে। গুণাতীত ব্যক্তির নামের সঙ্গে কোনো

সম্পর্ক থাকে না ; সুতরাং কেউ নিন্দা করলেও তাঁর চিত্ত ক্ষুণ্ণ হয় না এবং কেউ প্রশংসা করলেও তাঁর চিত্ত প্রসন্ন হয় না। এইরূপ নিন্দাকারীর প্রতি তাঁর কোনো দ্বেষভাব আসে না এবং প্রশংসাকারীদের প্রতিও অনুরাগ জন্মায় না।

সাধারণ মানুষদের এটি এক অভ্যাস হয়ে যায় যে কেউ নিন্দা করলে খারাপ লাগে এবং প্রশংসা করলে ভালো লাগে। কিন্তু যাঁরা গুণসমূহের ঊর্ধ্বে আরোহন করেন, তাঁদের নিন্দা-প্রশংসার জ্ঞান তো হয় এবং তাঁরা সকলের যথোচিত ব্যবহারও করে থাকেন। কিন্তু নিন্দা-প্রশংসা নিয়ে তাঁদের মধ্যে বিষণ্ণতা বা প্রসন্নতার অনুভূতি আসে না। কারণ তাঁরা যে তত্ত্বে অবস্থান করেন, সেখানে গুণাদি বিচালিত পরের দ্বারা কৃত নিন্দা-প্রশংসা পৌঁছতে পারে না।

নিন্দা এবং প্রশংসা—এই দুটিই পরকৃত ক্রিয়া। এসব ক্রিয়াতে খুশি বা বিরক্ত হওয়া ভুল। কারণ যার যেমন স্বভাব, যেমন ধারণা, সে সেই অনুযায়ীই কথা বলে থাকে। সে আমাদের অনুকূলেই কথা বলবে, নিন্দা করবে না— এরূপ ভাবা ন্যায্য নয় অর্থাৎ তাকে বলতে বাধ্য করার ভাবটি ঠিক নয়, এটি অন্যায়। অন্যের ওপর আমাদের এমন অধিকার থাকে না যার জোরে আমরা বলতে পারি যে, আমার নিন্দা কোরো না, প্রশংসা করো। দ্বিতীয়তঃ, কেউ নিন্দা করলে সাধকের তাতে প্রসন্ন হওয়া উচিত, কারণ এর দ্বারা তাঁর পাপ খণ্ডন হয়ে যাচ্ছে, তিনি শুদ্ধ হচ্ছেন। আমাদের যখন কেউ প্রশংসা করে, তার দ্বারা আমাদের পুণ্য ক্ষয় হয়। সুতরাং প্রশংসা দ্বারা খুশি হওয়া উচিত নয়, কারণ খুশি হওয়াতে বিপদ আছে।

'মানাপমানয়োস্তুল্যঃ'—মান ও অপমানে শরীরের প্রাধান্য থাকে। গুণাতীত মানুষের শরীরের সঙ্গে একাত্মতা থাকে না। সুতরাং তাকে কেউ অনাদর করুক বা সম্মান করুক, এই পরকৃত ক্রিয়ায় তাঁর ওপর কোনো প্রভাব পড়ে না।

নিন্দা-স্তুতি এবং মান-অপমান—এই দুই পরকৃত ক্রিয়াতেই গুণাতীত মানুষ সমভাবে বিরাজ করেন। এই পরকৃত ক্রিয়ার জ্ঞান হওয়া দূষণীয় নয়, কিন্তু নিন্দা এবং অপমানে দুঃখিত হওয়া এবং স্তুতি ও সম্মানে হর্ষান্বিত হওয়াই দোষের। কারণ উভয়ই প্রকৃতির বিকার। গুণাতীত ব্যক্তির নিন্দা-স্তুতি এবং মান-অপমানের জ্ঞান হলেও গুণাদি হতে সম্পর্ক-বিচ্ছেদ হওয়ায়, নাম ও শরীরের সঙ্গে একাত্মবোধ না থাকায় তিনি সুখী বা দুঃখী হন না। কারণ তিনি যে তত্ত্বে অবস্থান করেন, সেখানে কোনো বিকার থাকে না ; তা গুণরহিত ; নির্বিকার তত্ত্ব।

'তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ'—তিনি মিত্র ও শত্রুর মধ্যে সমভাবে থাকেন। গুণাতীত মানুষের কাছে যদিও মিত্র বা শত্রু বলে কিছু নেই, তা সত্ত্বেও অন্যান্য ব্যক্তিরা নিজ নিজ চিন্তা অনুসারে তাঁকে মিত্র বা শত্রু বলে মনে করতে পারে। সাধারণ ব্যক্তিদেরও অন্য ব্যক্তিরা নিজ চিন্তা অনুসারে মিত্র বা শত্রু বলে মনে করতে পারে ; কিন্তু তা জানতে পারলে সেইসব ব্যক্তিদের ওপর এটি প্রভাব ফেলে, যার ফলে তাদের রাগ-দ্বেষ উৎপন্ন হতে পারে। কিন্তু গুণাতীত ব্যক্তিরা তা জানলেও, তাঁদের ওপর এর কোনো প্রভাব পড়ে না। প্রকৃতপক্ষে মিত্র বা শত্রুপক্ষের চিন্তা অনুসারেই ব্যবহারে পার্থক্য হয়ে থাকে। গুণাতীত মানুষদের চিত্তে মিত্র বা শত্রু বলে কোনো চিন্তাই থাকে না, সুতরাং তাঁদের ব্যবহারেও কোনো পক্ষপাতিত্ব থাকে না।

কোনো ব্যক্তি একজন মহাপুরুষের সঙ্গে মিত্রতা করেন আর অন্য কোনো একজন তাঁর নিজ স্বভাববশতঃ সেই মহাপুরুষের সঙ্গে শত্রুতা করেন। যখন ওই দুই ব্যক্তির কোনো ব্যাপার নিয়ে ন্যায়বিচার করার প্রয়োজন হয়, তখন (ব্যবহারে) তিনি মিত্রভাবাপন্ন ব্যক্তির থেকে শত্রুভাবাপন্ন ব্যক্তির পক্ষই বেশি করে নিয়ে থাকেন। যেমন—বস্তু ইত্যাদি ভাগ করার সময় তিনি মিত্রভাবাপন্ন ব্যক্তির জন্য কম (এতটা কম, যতটা সেই ব্যক্তি প্রসন্নতা সহকারে নিতে পারে) এবং শত্রুভাবাপন্ন ব্যক্তিকে কিছু বেশিই প্রদান করেন। একে সমতাই বলা হয়, কারণ নিজের পক্ষাবলম্বী লোকেদের সঙ্গে ন্যায় এবং বিপক্ষের লোকেদের সঙ্গে উদারতা করা উচিত।

'সর্বারম্ভপরিত্যাগী'—এই মহাপুরুষ সকল কর্মোদ্যোগ পরিত্যাগ করে থাকেন। অর্থাৎ ধন-সম্পত্তি সংগ্রহ এবং ভোগাদির জন্য তিনি কোনো নতুন কর্ম আরম্ভ করেন না। স্বতঃপ্রাপ্ত পরিস্থিতি অনুসারেই তাঁর প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি হয়ে থাকে অর্থাৎ ক্রিয়াদিতে তাঁর প্রবৃত্তি কামনা, বাসনারহিত হয় এবং নিবৃত্তিও মান-সম্মান ইত্যাদির ইচ্ছাবর্জিত হয়।

'গুণাতীতঃ স উচ্যতে'—এখানে **'উচ্যতে'** পদের দ্বারা মনে হয় যে এই মহাপুরুষের **'গুণাতীত'** সংজ্ঞা নেই ; কিন্তু তাঁর দেহ এবং অন্তঃকরণের লক্ষণ দৃষ্টে তাঁকে

গুণাতীত বলা হয়।

আসলে গুণাতীত ব্যক্তির কোনো লক্ষণ থাকে না। গুণাদির দ্বারাই লক্ষণ হয়, সুতরাং যাঁর লক্ষণ থাকে, তিনি গুণাতীত হন কীভাবে ? কিন্তু অর্জুন গুণাতীতের লক্ষণই জানতে চেয়েছিলেন এবং ভগবান তাঁকে গুণাতীতের লক্ষণই জানিয়েছেন। অর্থাৎ লোকে প্রথমে ওই গুণাতীতের শরীরে ও অন্তঃকরণে তাঁর অবস্থান মেনে নিয়েছেন, সেই শরীর ও অন্তঃকরণের লক্ষণ ধরেই তারা সেই মহাপুরুষকে মনে করবেন যে, ইনি গুণাতীত। সুতরাং ওই লক্ষণগুলি গুণাতীত মানুষকে জানার সংকেত মাত্র।

প্রকৃতির কার্য গুণ এবং গুণাদির কার্য হল শরীর-ইন্দ্রিয়াদি-মন-বুদ্ধি। সুতরাং মন-বুদ্ধি ইত্যাদির দ্বারা নিজ কারণ গুণাদিরও সম্পূর্ণ বর্ণনা করা সম্ভব নয়, তাহলে গুণাদিরও কারণ প্রকৃতির বর্ণনা করা কী করে সম্ভবপর ? যিনি প্রকৃতিরও অতীত (গুণাতীত), তাঁর বর্ণনা করা তো মন-বুদ্ধি ইত্যাদির দ্বারা সম্ভবই নয়। গুণাতীতের এইসব লক্ষণ বাস্তবে স্বরূপে হয় না ; কিন্তু অন্তরে মেনে নেওয়া অহং-মমত্ববোধ নষ্ট হয়ে গেলে তাঁর অন্তরের যে লক্ষণ হয় তাকেই বলা হয় গুণাতীতের লক্ষণ।

ভগবান এখানে সুখ-দুঃখ, প্রিয়-অপ্রিয়, নিন্দা-প্রশংসা এবং মান-অপমান—এই আটটির কথা বলেছেন, যাতে সাধারণ মানুষদের মধ্যে বৈষম্য তো আসেই, সাধকদের মধ্যেও কখনো কখনো বৈষম্য দেখা দেয়। এই আটটি বিষম পরিস্থিতিতে যিনি সমতা লাভ করেন, তাঁর পক্ষে অন্য সমস্ত অবস্থায় সমতা বজায় রাখা সহজ হয়ে যায়। তাই এখানে সেই আটটি বিপরীত অবস্থার কথা বলে ভগবান জানাচ্ছেন যে, গুণাতীত মহাপুরুষদের এই আটটি স্থানে স্বাভাবিকভাবেই সমতা থাকে।

গুণাতীত মানুষদের যে স্বতঃসিদ্ধ নির্বিকার ভাব থাকে, তাঁর যে স্বাভাবিক স্থিতি, তাতে অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতির আসা-যাওয়াতে কোনো প্রভাব পড়ে না। তাঁর নির্বিকার ভাব, সমতা একইভাবে অটল থাকে। তাঁর কখনো শান্তি নষ্ট হয় না।

[চব্বিশ এবং পঁচিশতম—এই দুই শ্লোকে ভগবান গুণাতীত মহাপুরুষদের সমতার কথা বর্ণনা করেছেন।]

পরিশিষ্ট-ভাব— রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি বিকার জড়েও থাকে না, চেতনেও থাকে না এবং এটি অন্তরের ধর্মও নয়, এটি শুধুমাত্র দেহাভিমানেই থাকে। দেহাভিমান বলেও বাস্তবে কিছু নেই, শুধু অবিবেক এবং অবিচারপূর্বকই এটি মেনে নেওয়া হয়। অর্থাৎ বিকার প্রকৃতপক্ষে কারো মধ্যে থাকে না, মানুষ নির্বুদ্ধিতাবশতঃ এটি নিজের মধ্যে মেনে নেয়। সে বিকারের ভাব এবং অভাব এবং স্ব-স্বরূপের ভাব অনুভব করলেও এই অনুভবকে গুরুত্ব দেয় না। যদি সে বিচার বিবেচনা সহকারে নিজের মধ্যে এই বিকারের অনস্তিত্ব অনুভব করে, তাহলে সে আর তার ভোক্তা (সুখী-দুঃখী) হয় না।

❊ ❊ ❊

সম্বন্ধ—অর্জুন তৃতীয় প্রশ্নে গুণাতীত হওয়ার উপায় জিজ্ঞাসা করেছেন। পরবর্তী শ্লোকে ভগবান তার উত্তর দিচ্ছেন—

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ২৬ ॥

[চ, যঃ (এবং যে ব্যক্তি) ; অব্যভিচারেণ (ঐকান্তিক) ; ভক্তিযোগেন (ভক্তিযোগের সাহায্যে) ; মাম্, সেবতে (আমার উপাসনা করেন) ; সঃ (তিনি) ; এতান্, গুণান্ (এই সকল গুণ) ; সমতীত্য (অতিক্রম করে) ; ব্রহ্মভূয়ায়, কল্পতে (ব্রহ্মপ্রাপ্তির যোগ্য হয়ে ওঠেন।)]

যে ব্যক্তি ঐকান্তিক ভক্তিযোগের সাহায্যে আমার উপাসনা করেন, তিনি এইসকল গুণ অতিক্রম করে ব্রহ্মপ্রাপ্তির যোগ্য হয়ে ওঠেন ॥ ২৬ ॥

ব্যাখ্যা—[যদিও ভগবান এই অধ্যায়ের উনিশ ও বিশতম শ্লোকে গুণগুলি অতিক্রম করার উপায় জানিয়েছিলেন, তবুও অর্জুন একুশতম শ্লোকে গুণাতীত হওয়ার উপায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন। এতে মনে হয় যে, অর্জুন পূর্বোক্ত উপায় ছাড়াও গুণাতীত হওয়ার অন্য কোনো উপায় জানতে চেয়েছিলেন। তাই অর্জুনকে ভক্তিপথের

অধিকারী জেনে ভগবান তাঁকে গুণাতীত হওয়ার উপায় হিসাবে ভক্তির কথা জানিয়েছেন।]

'মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে'—এই পদটিতে উপাসক, উপাস্য এবং উপাসনা—এই তিনটিই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে অর্থাৎ **'যঃ'** পদের দ্বারা উপাসক, **'মাম্'** পদের দ্বারা উপাস্য এবং **'অব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে'** পদের দ্বারা উপাসনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

'অব্যভিচারেণ' পদটির তাৎপর্য হল অন্য কারও ভরসা না থাকা। জাগতিক সহায়তা তো দূরের কথা, জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ইত্যাদি যোগেরও (সাধনের) ভরসা যেন না থাকে এবং **'ভক্তিযোগেন'** পদটির অর্থ শুধু ভগবানেরই সহায়, আশ্রয়, আশা, বল ও বিশ্বাস যেন থাকে। এইরূপ **'অব্যভিচারেণ'** পদটির দ্বারা অপরের আশ্রয় নিতে নিষেধ করে **'ভক্তিযোগেন'** পদ দ্বারা শুধুমাত্র ভগবানেরই আশ্রয় গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে।

'সেবতে' পদটির তাৎপর্য হল অনন্য ভক্তিযোগের দ্বারা ভগবানের ভজন, তাঁর উপাসনা, তাঁর শরণাগত হওয়া, তাঁর অনুকূলে চলা।

'স গুণান্ সমতীত্যৈতান্'—যিনি অনন্যভাবে শুধু ভগবানেরই শরণাগত হন, তাঁর আর গুণগুলি অতিক্রম করতে হয় না, ভগবানের কৃপায় তিনি স্বতঃই সেই গুণগুলি অতিক্রম করেন (গীতা ১২।৬-৭)।

'ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে'—তিনি গুণগুলি অতিক্রম করে ব্রহ্মপ্রাপ্তির অধিকারী হন। ভগবান যখন এখানে ভক্তির কথা বলেছেন, তখন ভগবানের এইস্থানে ব্রহ্মপ্রাপ্তির কথা না বলে তাঁর প্রাপ্তির কথা বলা উচিত। তা সত্ত্বেও এখানে ব্রহ্মপ্রাপ্তির কথা বলার তাৎপর্য এই যে অর্জুন গুণাতীত হওয়ার (নির্গুণ ব্রহ্মপ্রাপ্তির) উপায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তাই ভগবান ভক্তিকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় বলে জানিয়েছেন।

দ্বিতীয়তঃ, শাস্ত্রে বলা আছে যে ভগবদ্-উপাসনাকারীদের জ্ঞানের সিদ্ধির জন্য অন্য কোনো সাধন বা চেষ্টা করার প্রয়োজন হয় না, বরং তার জন্য জ্ঞানের ভূমিকাগুলি স্বতঃই সিদ্ধ হয়। সেইদিকে লক্ষ্য রেখেই ভগবান এখানে বলেছেন যে, অনন্য ভক্তিযোগের সাহায্যে যাঁরা ব্রহ্মলাভের জন্য আমার উপাসনা করেন তাঁদের আর অন্য কোনো সাধনা করার প্রয়োজন হয় না, কারণ তাঁরা স্বতঃই ব্রহ্মপ্রাপ্তি লাভ করেন। কিন্তু সেই ব্যক্তিগণ ব্রহ্মপ্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট হন না। তাঁদের শুধু এইভাব থাকে যে ভগবান কীভাবে প্রসন্ন হবেন ? ভগবানের প্রসন্নতাতেই তাঁদের আনন্দ। তাৎপর্য হল এই যে, যিনি ভগবদ্পরায়ণ, ভগবানেই আকৃষ্ট, তাঁর পক্ষে ব্রহ্মপ্রাপ্তি লাভ স্বতঃসিদ্ধ। তিনি ব্রহ্মপ্রাপ্তিকে গুরুত্ব দিন বা না দিন—সে কথা আলাদা, কিন্তু তিনি স্বতঃই ব্রহ্মপ্রাপ্তির অধিকারী হয়ে থাকেন।

তৃতীয়তঃ, যে তত্ত্ব জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ইত্যাদি সাধনা দ্বারা প্রাপ্ত হয়, সেই তত্ত্ব ভক্তি দ্বারাও প্রাপ্ত করা যায়। সাধনায় প্রভেদ থাকলেও তত্ত্ব প্রাপ্তিতে কোনো বিভেদ নেই।

পরিশিষ্ট-ভাব—সাধক ভক্তিদ্বারা যা কিছু চান, তাই লাভ করেন। যে সাধক মুখ্যতঃ ব্রহ্মপ্রাপ্তি অর্থাৎ মুক্তি, তত্ত্বজ্ঞান চান, তিনি ভক্তিদ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি লাভ করেন। কারণ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠাই হল ভগবানে (১৪।২৭), ব্রহ্ম সমগ্র ভগবানেরই এক অঙ্গ স্বরূপ (৭।২৯-৩০)। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের দশম শ্লোকেও ভক্তিকে জ্ঞানপ্রাপ্তির উপায় বলে জানানো হয়েছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে সগুণের উপাসনাকে বলা হয়েছে নির্গুণ (গুণাতীত) ; যেমন—**'মন্নিকেতং তু নির্গুণম্'** (১১।২৫।২৫), **'মৎসেবায়াং তু নির্গুণা'** (১১।২৫।২৭) ইত্যাদি। তাই সগুণের উপাসনাকারী ব্যক্তি ত্রিগুণের অতীত হয়ে থাকেন। সগুণ ভগবানও গুণাশ্রিত নন, গুণই বরং তাঁর আশ্রিত। যে সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ গুণাদির বশে থাকে, তাকে 'সগুণ' বলা হয় না, বরং যার মধ্যে অসীম ঐশ্বর্য, মাধুর্য, সৌন্দর্য, ঔদার্য ইত্যাদি অনন্ত দিব্যগুণ নিত্যবিরাজমান থাকে, তাকেই 'সগুণ' বলা হয়। ভগবানের দ্বারা সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক ক্রিয়া সম্পাদিত হলেও, তিনি এইসব গুণের বশীভূত নন।

ভগবানের শরণাগত হলে ভক্ত স্বতঃই অনায়াসে গুণাতীত হয়ে ওঠেন। শুধু তা-ই নয়, তিনি ভগবানের সমগ্ররূপ সম্পর্কেও জ্ঞান লাভ করেন।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—ভগবানের উপাসনা করলে ব্রহ্মপ্রাপ্তির অধিকারী হওয়া যায়—এটি কী ব্যাপার ? পরবর্তী শ্লোকে এর উত্তর দিয়েছেন।

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥ ২৭ ॥

[**হি, ব্রহ্মণঃ, চ** (যেহেতু ব্রহ্ম এবং) ; **অব্যয়স্য, অমৃতস্য** (অবিনাশী অমৃত) ; **চ, শাশ্বতস্য, ধর্মস্য** (ও সনাতন ধর্ম) ; **চ** (এবং) ; **ঐকান্তিকস্য** (ঐকান্তিক) ; **সুখস্য** (সুখের) ; **প্রতিষ্ঠা** (আশ্রয়) ; **অহম্** (আমিই।)]

যেহেতু ব্রহ্ম, অবিনাশী অমৃত, সনাতন ধর্ম এবং ঐকান্তিক সুখের আশ্রয়, সবই আমিই॥ ২৭ ॥

ব্যাখ্যা—**'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্'**—আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, আশ্রয়—ব্রহ্মের সঙ্গে নিজ অভিন্নতা জানাতে এ কথাটি বলা হয়েছে। যেমন জ্বলন্ত অগ্নি সাকার এবং কাষ্ঠাদিতে অবস্থিত অগ্নি নিরাকার—অগ্নির এই দু'প্রকার রূপ হলেও তত্ত্বতঃ অগ্নি একই। তেমনই ভগবান সাকাররূপে আছেন এবং ব্রহ্ম নিরাকাররূপে আছেন—এই দু'প্রকার রূপ সাধকদের উপাসনার দৃষ্টিতে থাকলেও তত্ত্বতঃ ভগবান এবং ব্রহ্ম একই, দুই নয়। খাদ্যে যেমন সুগন্ধ থাকে স্বাদও থাকে ; নাসিকা সুগন্ধ পায় আর রসনা স্বাদ গ্রহণ করে, কিন্তু খাদ্যদ্রব্য একই থাকে। তেমনই জ্ঞানের দৃষ্টিতে হলেন ব্রহ্ম এবং ভক্তির দৃষ্টিতে হলেন ভগবান, কিন্তু তত্ত্বতঃ ব্রহ্ম এবং ভগবান একই।

ভগবান কৃষ্ণ আলাদা ও ব্রহ্ম আলাদা—এই পার্থক্য নেই ; ভগবান কৃষ্ণই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মই ভগবান কৃষ্ণ। গীতায় ভগবান নিজের কথায় 'ব্রহ্ম' শব্দেরও ব্যবহার করেছেন—**'ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি'** (৫।১০) এবং নিজেকে 'অব্যক্ত মূর্তি'ও বলেছেন—**'ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা'** (৯।৪)। তাৎপর্য হল এই যে সাকার ও নিরাকার উভয়ই এক, দুই নয়।

'অমৃতস্যাব্যয়স্য চ'—আমিই অবিনাশী অমৃতের অধিষ্ঠান এবং আমার অধিষ্ঠানই অবিনাশী অমৃত। অর্থাৎ অবিনাশী অমৃত এবং আমি—এই দুটি একই, পৃথক্ নয়। এই অবিনাশী অমৃত প্রাপ্তিকে ভগবান **'অমৃতমশ্নুতে'** (১৩।১২ ; ১৪।২০) পদ দ্বারা বলেছেন।

'শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য'—সনাতন ধর্মের আধার আমি এবং আমার আধার সনাতন ধর্ম। অর্থাৎ এই দুটিই এক—পৃথক্ নয়। সনাতন ধর্ম আমারই স্বরূপ[১]। গীতায় অর্জুন ভগবানকে শাশ্বত ধর্মের রক্ষক বলে জানিয়েছেন (১১।১৮)। ভগবান অবতাররূপে এসে সনাতন ধর্মকে রক্ষা করেন (৪।৮)।

'সুখস্যৈকান্তিকস্য চ'—আমি ঐকান্তিক সুখের আধার এবং আমার আধারই ঐকান্তিক সুখ অর্থাৎ আমার স্বরূপই ঐকান্তিক সুখ। ভগবান এই ঐকান্তিক সুখকে 'অক্ষয় সুখ' (৫।২১), 'আত্যন্তিক সুখ' (৬।২১) এবং 'অত্যন্ত সুখ' (৬।২৮) নামে অভিহিত করেছেন।

এই শ্লোকে **'ব্রহ্মণঃ'**, **'অমৃতস্য'** ইত্যাদি পদে

---

[১]হিন্দু (সনাতন), বৌদ্ধ, খ্রীষ্ট, ইসলাম—বর্তমানে এই চারটি ধর্মকে প্রধান বলে মানা হয়। এই চারটির প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা কয়েক কোটি করে। বৌদ্ধ, খ্রীষ্ট ও ইসলাম ধর্মের প্রবর্তকদের নাম যথাক্রমে বুদ্ধ, যীশু এবং মোহম্মদ বলে মানা হয়। এই তিনটি ধর্মই অর্বাচীন। কিন্তু সনাতন হিন্দুধর্ম কোনো মনুষ্য কর্তৃক প্রবর্তিত নয় অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি-বিশেষের বুদ্ধির ফল নয়। এটি বিভিন্ন ঋষিগণের সামগ্রিক অন্বেষণের ফল। অনুসন্ধান তারই হয়, যা প্রথম থেকেই থাকে। হিন্দুধর্ম অনাদি, অনন্ত এবং শাশ্বত। ভগবান যেমন শাশ্বত (সনাতন), তেমন হিন্দুধর্মও শাশ্বত। তাই ভগবান এখানে (গীতা ১৪।২৭) সনাতন হিন্দুধর্মকে নিজ স্বরূপ বলেছেন। যখনই এই ধর্মের হানি ঘটে, তখনই ভগবান অবতাররূপ গ্রহণ করে এর সংস্থাপন করেন (গীতা ৪।৭-৮)। অর্থাৎ ভগবানও হিন্দু ধর্মের সংস্থাপন বা রক্ষা করার জন্যই আসেন, এটি সৃষ্টির জন্য বা উৎপন্ন করার জন্য নয়। প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য সকল ধর্ম ও মত-মতান্তর এই সনাতন ধর্ম থেকে উৎপন্ন হয়েছে। তাই সেইসব ধর্মে মানুষের কল্যাণের জন্য যেসকল সাধন-প্রণালীর উল্লেখ রয়েছে, সেগুলিও হিন্দুধর্মের দান বলে মনে করা উচিত। সুতরাং সেই সেই ধর্মে কথিত অনুষ্ঠানগুলি নিষ্কামভাবে কর্তব্য মনে করে পালন করলে কল্যাণ হওয়ার পথে কোনো বাধা থাকে না। প্রাণীমাত্রেরই কল্যাণ লাভের উপায় হিন্দুধর্মে যত গভীরভাবে আলোচনা করা হয়েছে, অপরাপর ধর্মে সেরূপ দেখা যায় না। হিন্দুধর্মের সকল সিদ্ধান্তই সম্পূর্ণ যুক্তিসম্মত এবং কল্যাণকারী।

'রাহোঃ শিরঃ'-এর মতো অভিন্নতায় ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ করা হয়েছে। অর্থাৎ 'রাহুর মাথা'—এরূপে যে ব্যবহার, এতে রাহু আলাদা এবং মাথা আলাদা নয়, বরং রাহু মানেই মাথা এবং মাথার নামই রাহু, তেমনই এখানে ব্রহ্ম, অবিনাশী অমৃত ইত্যাদিই ভগবান কৃষ্ণ এবং ভগবান কৃষ্ণই ব্রহ্ম, অবিনাশী অমৃত ইত্যাদি।

ব্রহ্ম বলো অথবা কৃষ্ণ, আর কৃষ্ণ বলো বা ব্রহ্ম ; অবিনাশী অমৃত বলো অথবা কৃষ্ণ আর কৃষ্ণ বলো বা অবিনাশী অমৃত ; শাশ্বত ধর্ম বলো অথবা কৃষ্ণ আর কৃষ্ণ বলো বা শাশ্বত ধর্ম ; ঐকান্তিক সুখ বলো বা কৃষ্ণ আর কৃষ্ণ বলো বা ঐকান্তিক সুখ ; এ সবই এক। এখানে কোনো আধার-আধেয় নেই, একই তত্ত্ব। তাই ভগবানের উপাসনা করলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়—এটি যথার্থ।

পরিশিষ্ট-ভাব—'ব্রহ্ম এবং অবিনাশী অমৃতের আশ্রয়ও আমিই'— এ হল নির্গুণ-নিরাকার ও জ্ঞানযোগের কথা, 'আমিই শাশ্বত ধর্মের আশ্রয়'—এটি সগুণ-সাকার এবং কর্মযোগের কথা আর 'আমি ঐকান্তিক সুখের আশ্রয়'—এ হল সগুণ-নিরাকার বা ধ্যানযোগের কথা। তাৎপর্য হল যে আমার (সগুণ-সাকারের) উপাসনা করলে, আমার শরণাগত হলে জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ধ্যানযোগ—তিনটিই সিদ্ধিলাভ করে। তিনটির দ্বারা এক তত্ত্বই প্রাপ্ত হয়, যাকে বলা হয় 'সমগ্র'।

যত প্রকার বিভূতি আছে, সে সবই ভগবানের ঐশ্বর্য। ব্রহ্মও ভগবানের এক বিভূতি, ঐশ্বর্য। তাই ভগবান এখানে বলেছেন—**'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্'**। পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নখ থেকে বিচ্ছুরিত একটি জ্যোতি হল 'ব্রহ্ম'।

যন্নখেন্দুরুচির্ব্রহ্ম ধ্যেয়ং ব্রহ্মাদিভিঃ সুরৈঃ। গুণত্রয়মতীতং তং বন্দে বৃন্দাবনেশ্বরম্॥ (পাতাল. ৭৭।৬০)

(ভগবান শংকর বলেছেন) 'দেবগণ যাঁর নখচন্দ্রের কান্তিরূপ ব্রহ্মের ধ্যান করেন, সেই ত্রিগুণাতীত বৃন্দাবনেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আমি বন্দনা করি।'

❋ ❋ ❋

ওঁ তৎ সৎ ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

এইভাবে ওঁ, তৎ, সৎ —এই ভগবৎ নাম উচ্চারণপূর্বক ব্রহ্মবিদ্যা এবং যোগশাস্ত্রময় শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা উপনিষদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে 'গুণত্রয়বিভাগযোগ' নামক চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত হল ॥ ১৪ ॥

এই অধ্যায়ে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিনটি গুণ বিভাগসহ বর্ণনা করা হয়েছে। এই তিন গুণের অতীত হলে, এর সম্বন্ধ পরিত্যাগ করলে পরমাত্মার সঙ্গে নিত্যযোগ অনুভূত হয়। তাই এই অধ্যায়ের নাম রাখা হয়েছে '**গুণত্রয়বিভাগযোগ**'।

চতুর্দশ অধ্যায়ের পদ, অক্ষর এবং উবাচ

(১) এই অধ্যায়ে **'অথ চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ'** এর তিন, **'শ্রীভগবানুবাচ'** ইত্যাদি পদের ছয়, শ্লোকগুলির তিনশত বাইশ এবং পুষ্পিকার তেরটি পদ আছে। এইরূপে সম্পূর্ণ পদের যোগসংখ্যা তিনশত চুয়াল্লিশ।

(২) এই অধ্যায়ে **'অথ চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ'**-এর আট, **'শ্রীভগবানুবাচ'** ইত্যাদি পদগুলির কুড়ি, শ্লোকগুলির আটশত চৌষট্টি এবং পুষ্পিকাতে একান্নটি অক্ষর আছে। এইভাবে সমস্ত অক্ষরগুলির যোগসংখ্যা নয় শত তেতাল্লিশ। এই অধ্যায়ের সমস্ত শ্লোকই বত্রিশ অক্ষর সংবলিত।

(৩) এই অধ্যায়ের তিনটি উবাচ—দু'টি **'শ্রীভগবানুবাচ'** এবং অন্যটি **'অর্জুন উবাচ'**।

চতুর্দশ অধ্যায়ের প্রযুক্ত ছন্দ

এই অধ্যায়ের সাতাশটি শ্লোকের মধ্যে—পঞ্চম শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে 'নগণ' যুক্ত হওয়ায় **'ন-বিপুলা'** ; ষষ্ঠ এবং দশম শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে 'রগণ' যুক্ত হওয়ায় **'র-বিপুলা'** ; পঞ্চদশ এবং সপ্তদশ শ্লোকের তৃতীয় পংক্তিতে 'ভগণ' যুক্ত হওয়ায় **'ভ-বিপুলা'** ; উনিশতম শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে 'মগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় **'ম-বিপুলা'** এবং নবম শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে 'ভগণ' ও তৃতীয় পংক্তিতে 'নগণ' যুক্ত হওয়ায় **'সংকীর্ণ-বিপুলা'** সংজ্ঞাযুক্ত ছন্দ আছে। বাকি কুড়িটি শ্লোক ঠিক **'পথ্যাবক্ত্র'** অনুষ্টুপ ছন্দের লক্ষণ দ্বারা যুক্ত।

❋ ❋ ❋

॥ ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

অথ পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

পঞ্চদশ অধ্যায়

অবতরণিকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে 'সগুণ এবং নির্গুণ উপাসকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ?'—এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান সগুণ উপাসকদেরই শ্রেষ্ঠ বলে জানিয়েছেন। পঞ্চম শ্লোকে সগুণ ও নির্গুণ উপাসনার তুলনাকালে ভগবান বলেছেন যে, দেহাভিমানীদের পক্ষে অব্যক্ত অর্থাৎ নির্গুণ তত্ত্বের উপাসনা করা কঠিন। এই দেহাভিমান-রূপ বাধা কী করে দূর হবে—সেই বিষয় ও নির্গুণ তত্ত্বের আলোচনা ভগবান ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ অধ্যায়ে করেছেন।

চতুর্দশ অধ্যায়ের একুশতম শ্লোকে অর্জুন গুণাতীত পুরুষদের লক্ষণ এবং আচরণাদির সঙ্গে সঙ্গে গুণাতীত হওয়ার উপায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তার উত্তরে ভগবান বাইশ থেকে পঁচিশতম শ্লোক পর্যন্ত গুণাতীত পুরুষদের লক্ষণ এবং আচরণাদির বর্ণনা করে ছাব্বিশতম শ্লোকে সগুণ-উপাসকদের জন্য 'অব্যভিচারী ভক্তিযোগ'-কে গুণাতীত হওয়ার উপায় বলে জানিয়েছেন। তাৎপর্য হল এই যে ভগবানের অনন্য ভক্ত (ভগবানেরই আশ্রিত এবং ভগবানকেই আপন বলে মনে করায়) সহজেই গুণাতীত হতে সক্ষম হয়। এই (ছাব্বিশতম) শ্লোকে ভগবান ***'অব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন'*** *পদের দ্বারা ব্যভিচারদোষ (সংসারের আশ্রয়)বর্জিত ভক্তিযোগের,* ***'যঃ'*** *পদের দ্বারা জীবের এবং* ***'মাম্'*** *পদের দ্বারা নিজের (পরমাত্মার) সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। তাই এই তিনটি বিষয় অর্থাৎ জগৎ, জীব এবং পরমাত্মার বিস্তারিত আলোচনা ভগবান এই (পঞ্চদশ) অধ্যায়ে করেছেন।*

(পরমাত্মার অংশ হওয়ায়) জীব স্বরূপতঃ গুণাতীত হলেও অনাদি অজ্ঞানতাবশতঃ গুণাদির প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে গুণাদির কার্যভূত শরীরের (জগৎ-সংসারের) সঙ্গে একাত্ম হয়ে মমতা ও কামনা দ্বারা আবদ্ধ হয়। যতক্ষণ সে গুণাদির অতীত (বিশেষ তত্ত্ব) পরমাত্মার প্রভাব জানতে না পারে, ততক্ষণ সে প্রকৃতিজনিত গুণাদির প্রভাব থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হতে পারে না। তাই ভগবান (তাঁর প্রাপ্তির প্রিয় সাধন 'অব্যভিচারিণী ভক্তি' প্রাপ্ত করবার জন্য) তাঁর অতি গোপনীয় এবং বিশেষ মাহাত্ম্য জানাতে এই (পঞ্চদশ) অধ্যায়ের বিষয় জানাচ্ছেন।

জীব পরমাত্মার অংশ (গীতা ১৫।৭)। এর সম্পর্ক শুধুমাত্র নিজ অংশী ভগবানের প্রতিই থাকে। কিন্তু জীব ভ্রমবশতঃ তার সম্পর্ক প্রকৃতির কার্য শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদির সঙ্গে মেনে থাকে, বাস্তবে যার সঙ্গে তার সম্পর্ক কখনো ছিল না, নেই, হবে না এবং হওয়া সম্ভবও নয়। পরমাত্মার সঙ্গে নিজ প্রকৃত সম্বন্ধ ভুলে শরীরাদি বিজাতীয় পদার্থগুলিকে 'আমি', 'আমার' এবং 'আমার জন্য' মেনে নেওয়াই হল ব্যভিচারদোষ। এই ব্যভিচার-দোষই অনন্য ভক্তিযোগের প্রধান বাধা। এই বাধা দূর করার জন্য পঞ্চদশ অধ্যায়ের প্রথম পাঁচটি শ্লোকের প্রকরণে ভগবান সংসার-বৃক্ষের বর্ণনা করে সেটি ছেদন করার নির্দেশ দিয়েছেন।

শ্রীভগবানুবাচ

ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥ ১ ॥[১]

---

[১]ঊর্ধ্বমূলোঽবাক্শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ। তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈতৎ॥ (কঠোপনিষদ্ ২।৩।১)

[**ঊর্ধ্বমূলম্** (ঊর্ধ্বে যাহার মূল) ; **অধঃ শাখম্** (নিম্নদিকে শাখা) ; **অশ্বত্থম্** (জগৎরূপ অশ্বত্থ বৃক্ষকে) ; **অব্যয়ম্, প্রাহুঃ** (অব্যয় বলা হয়) ; **ছন্দাংসি** (বেদ) ; **যস্য, পর্ণানি** (যার পত্রসমূহ) ; **তম্** (সেই জগৎবৃক্ষকে) ; **যঃ, বেদ** (যিনি জানেন) ; **সঃ** (তিনিই) ; **বেদবিৎ** (সম্পূর্ণ বেদবিৎ ।)]

শ্রীভগবান বললেন—উর্ধ্বে মূলযুক্ত এবং নিম্ন শাখাবিশিষ্ট যে জগৎরূপ অশ্বত্থবৃক্ষকে (প্রবাহরূপে) অব্যয় বলা হয় এবং বেদ যার পত্রসমূহ, সেই জগৎবৃক্ষকে যিনি জানেন, তিনিই বেদবিৎ ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা—**'ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখম্'**—[ত্রয়োদশ অধ্যায়ের আরম্ভের দুটি শ্লোকের ন্যায় এখানে পঞ্চদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকেও ভগবান সমস্ত বিষয়টির দিগ্‌দর্শন করিয়েছেন এবং **'ঊর্ধ্বমূলম্'** পদে পরমাত্মার, **'অধঃশাখম্'** পদে সমস্ত জীবের প্রতিনিধিরূপে ব্রহ্মার এবং **'অশ্বত্থম্'** পদে জগৎকে ইঙ্গিত করে (জগৎরূপ অশ্বত্থবৃক্ষের মূল) সর্বশক্তিমান পরমাত্মাকে যথার্থরূপে যাঁরা জানেন, তাঁদের **'বেদবিৎ'** বলেছেন।]

বৃক্ষের মূল সাধারণতঃ নীচে এবং শাখাগুলি উপরদিকে অবস্থিত হয়, কিন্তু এই জগৎ-বৃক্ষ এমনই বিচিত্র যে, এর মূল ওপরে এবং শাখাগুলি নীচে অবস্থান করে।

যেখানে গেলে মানুষ আর জগতে ফিরে আসে না, সেই ভগবানের পরমধামই সমস্ত ভৌতিক জগতের ঊর্ধ্বে (সর্বোপরি) অবস্থিত। জগৎ-বৃক্ষের প্রধান শাখা হচ্ছেন ব্রহ্মা। কারণ জগৎ-বৃক্ষের উৎপত্তির সময় সর্বপ্রথম ব্রহ্মা আবির্ভূত হন। এইজন্য ব্রহ্মাই হলেন এর প্রধান কাণ্ড। ভগবদ্‌ধামের থেকে ব্রহ্মালোক নিম্নে অবস্থিত। স্থান, গুণ, পদ, পরমায়ু ইত্যাদি সর্বদিক থেকেই পরমধামের নিম্নশ্রেণীর হওয়ার জন্যই এটিকে **'অধঃ'** (নীচের দিকে) বলা হয়েছে।[১]

এই সংসাররূপ বৃক্ষ ঊর্ধ্বে মূলসম্পন্ন হয়। বৃক্ষের মূলই প্রধান। তেমনই এই সংসাররূপ বৃক্ষে পরমাত্মাই প্রধান। তাঁর থেকে ব্রহ্মা প্রকটিত হন, যার বর্ণনা **'অধঃশাখম্'** পদে করা হয়েছে।

পরমাত্মাই সকলের মূল প্রকাশক এবং আধার। দেশ, কাল, ভাব, সিদ্ধান্ত, গুণ, রূপ, বিদ্যা ইত্যাদি সমস্ত দিক থেকে পরমাত্মাই সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর থেকে বেশি বা তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ হবার কথা দূরে থাক, তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই[২] (গীতা ১১।৪৩)। জগৎ-বৃক্ষের মূলে সর্বোপরি পরমাত্মা বিরাজমান। 'মূল' যেমন বৃক্ষের আধার, তেমনই 'পরমাত্মা' সমস্ত জগতের আধার। তাই ওই বৃক্ষকে বলা হয়েছে **'ঊর্ধ্বমূলম্'**।

'মূল' শব্দটি কারণের বাচক। জগৎ-বৃক্ষের উৎপত্তি ও তার বিস্তার পরমাত্মা থেকেই লাভ করেছে। সেই পরমাত্মা নিত্য, অনন্ত এবং সকলের আধার ও সগুণরূপে সব থেকে ওপরে নিত্যধামে নিবাস করেন, তাই একে **'ঊর্ধ্ব'** নামে অভিহিত করা হয়। এই সংসার-বৃক্ষ সেই পরমাত্মা থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। তাই একে ঊর্ধ্বমূল বলা হয়।

বৃক্ষের মূল হতেই শাখা-প্রশাখা, পত্র জন্মায়। এইরূপ পরমাত্মা থেকেই সম্পূর্ণ জগৎ উৎপন্ন হয়, তাঁর থেকেই বিস্তার লাভ করে এবং তাঁতেই অবস্থান করে। তাঁর শক্তিতেই সমস্ত জগৎ ক্রিয়াশীল[৩]। এরূপ সর্বোত্তম পরমাত্মার শরণাগত হলে মানুষ সর্বতোভাবে কৃতার্থ হয়। (শরণ গ্রহণ করার কথা পরবর্তী চতুর্থ শ্লোকে **'তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে'** পদের দ্বারা বলা হয়েছে।)

জগৎ সৃষ্টির জন্য ব্রহ্মা প্রকৃতিকে অঙ্গীকার করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি (প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কবর্জিত হওয়ায়) মুক্তই। ব্রহ্মা ব্যতীত অন্য সমস্ত জীব প্রকৃতি এবং তার কার্য শরীরাদির সঙ্গে অহং ও মমত্বপূর্বক যতই গভীরভাবে নিজ

---

[১]এখানে 'অধঃশাখম্' পদটির দ্বারা ব্রহ্মা থেকে কীট পর্যন্ত সমস্ত প্রাণীকেই ধরা হয়েছে।

[২]'ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে'। (শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ৬।৮)

তাঁর (পরমাত্মার) থেকে শ্রেষ্ঠ বা তাঁর সমান অন্য আর কিছু দেখা যায় না।

[৩]গীতায় যেমন বলা হয়েছে—'অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা' (৭।৬), 'প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্' (৯।১৮) ; 'অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে' (১০।৮) ; 'যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী' (১৫।৪) এবং 'যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাম্' (১৮।৪৬)।

সম্পর্ক মেনে নেয়, ততই তারা বন্ধনযুক্ত হয় এবং বারংবার তাদের পতন (জন্ম-মৃত্যু) হতে থাকে অর্থাৎ ততই তাদের শাখা নীচের দিকে প্রসারিত হতে থাকে। সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক— এই ত্রিবিধ গতি **'অধঃশাখম্'**-এরই অন্তর্গত (গীতা ১৪।১৮)।

'অশ্বত্থম্'—'অশ্বত্থম্' শব্দের দুটি অর্থ হয়—(১) যা আগামীকাল পর্যন্তও অর্থাৎ একদিনের জন্যও স্থায়ী হয় না[১] এবং (২) অশ্বত্থগাছ।

প্রথম অর্থ অনুসারে—'অশ্বত্থ' পদের তাৎপর্য হল যে জগৎ একমুহূর্তও[২] স্থির থাকে না। পরিবর্তন সমূহের নামই জগৎ। পরিবর্তনের নতুন যে রূপ দেখা যায়, তাকে বলা হয় উৎপত্তি ; আরও একটু পরিবর্তন হলে সেটিকে স্থিতিরূপে মেনে নেওয়া হয় আর যখন সেই স্থিতিও পরিবর্তিত হয়ে যায়, তখন তাকে সমাপ্তি বা প্রলয় বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয় হয়ই না। প্রতিক্ষণ পরিবর্তিত হওয়ার জন্য এই জগৎ এক মুহূর্তও স্থিরভাবে থাকে না। যা পরিলক্ষিত হয়, তা প্রতিক্ষণ পরিবর্তমান অবস্থারই রূপ। এইজন্যই এই জগৎ-সংসারকে **'অশ্বত্থম্'** বলা হয়েছে।

অন্য অর্থ অনুযায়ী—এই জগৎ-সংসার হল অশ্বত্থ গাছ। শাস্ত্রে অশ্বত্থগাছের নানা মহিমা গীত হয়েছে। স্বয়ং ভগবানও সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থকেই নিজ বিভূতি বলে একে পূজনীয় এবং শ্রেষ্ঠ বলে জানিয়েছেন—**'অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাম্'** (গীতা ১০।২৬)। অশ্বত্থ, আমলকী, তুলসী—এই তিনটি গাছকে ভগবদ্‌ভাবে পূজা করলে তাতে ভগবানেরই পূজা হয়ে থাকে।

পরমাত্মা থেকে জগৎ উৎপন্ন হয়। তিনিই জগতের অভিন্ননিমিত্তোপাদান কারণ। সুতরাং জগৎ-সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষও তত্ত্বতঃ পরমাত্মার রূপ হওয়ায় পূজনীয়। এই জগৎ-সংসার রূপ বৃক্ষের পূজা হল এই যে, এর থেকে সুখ পাওয়ার আশা পরিত্যাগ করে শুধুমাত্র এর সেবা করা। যারা সুখের ইচ্ছা পোষণ করে না, তাদের কাছে এই জগৎ-সংসার সাক্ষাৎ ভগবদ্‌স্বরূপ **'বাসুদেবঃ সর্বম্'** (গীতা ৭।১৯)। কিন্তু যারা সংসারে সুখ পাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে, তাদের কাছে এই জগৎ দুঃখের আগার হয়। কারণ জীব স্বয়ং হল অবিনাশী আর এই জগৎ-বৃক্ষ প্রতিক্ষণ পরিবর্তনশীল হওয়ায় এটি বিনাশশীল ; অনিত্য এবং ক্ষণভঙ্গুর। তাই স্বয়ং কখনো জগৎ থেকে তৃপ্ত হতে পারে না ; তবুও মানুষ এতে সুখের আকাঙ্ক্ষা করে বারংবার জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হতে থাকে। তাই সংসারে বিন্দুমাত্র স্বার্থ-সম্বন্ধ না রেখে কেবলমাত্র জগতের সেবা করার ভাবই রাখা উচিত।

'প্রাহুরব্যয়ম্'—সংসার-বৃক্ষকে অব্যয় বলা হয়। ক্ষণভঙ্গুর অনিত্য জগতের আদি অন্ত না জানার জন্য, প্রবাহের নিত্যতার জন্য এবং এর মূল সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর নিত্য ও অবিনাশী হওয়ার জন্য একে অব্যয় বলা হয়। সমুদ্রের জল যেমন সূর্যতাপে বাষ্পায়িত হয়ে মেঘরূপে পরিণত হয় এবং আকাশের শীতলতার স্পর্শে সেই মেঘ পুনরায় জলরূপে পৃথিবীতে ফিরে আসে আর সেই জল নদী-নালারূপে সমুদ্রে গিয়ে আবার বাষ্পায়িত হয়ে মেঘরূপ ধারণ করে—এই চক্রাকার পরিবর্তনের যেমন কোনো অন্ত নেই, তেমনই এই সংসার-চক্রেরও কোনো অন্ত নেই। এই সংসার-চক্র এত বেগে পরিবর্তিত হয় যে চলচ্চিত্রের ফিল্মের ন্যায় অনবরত গতিশীল হয়েও সিনেমার পর্দায় স্থির চিত্রের মতো প্রতীত হয়।

সংসার-বৃক্ষকে অব্যয় বলা হয় (প্রাহুঃ), প্রকৃতপক্ষে এটি অব্যয় (অবিনাশী) নয়। এটি যদি অব্যয় হত তাহলে এই অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে বলা হত না যে এটি জগৎ-সংসারের স্বরূপ যেমন বলা হয়েছে তেমন উপলব্ধি হয় না এবং এই সংসার-বৃক্ষকে তীব্র বৈরাগ্যরূপ সুদৃঢ় শস্ত্র দ্বারা ছেদন করতেও ভগবান প্রেরণা দিতেন না।

'ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি'—বেদ হল এই সংসার-বৃক্ষের পত্র। এখানে বেদের সেই অংশটিকে লক্ষ্য করা হয়েছে, যেস্থানে সকাম কর্ম অনুষ্ঠানগুলির বর্ণনা করা

---

[১]'শ্বঃ পর্যন্তং ন তিষ্ঠতীতি অশ্বত্থঃ'—'শ্বস্' অব্যয় আগামীকালের বাচক। যা কাল পর্যন্ত স্থির থাকে তাকে 'শ্বত্থ' এবং যা কাল পর্যন্ত স্থির থাকে না তাকে 'অশ্বত্থ' বলা হয়।

[২]দার্শনিকগণ 'ক্ষণ'-এর আলোচনায় বলেছেন যে—পদ্মপত্রে সূঁচ গাঁথলে সেটি অন্যদিকে বেরোতে তিনক্ষণ লাগে—প্রথম ক্ষণে স্পর্শ, দ্বিতীয় ক্ষণে ছেদন এবং তৃতীয় ক্ষণে অন্যদিকে বার হওয়া।

হয়েছে[১]। তাৎপর্য এই যে, যে বৃক্ষে পত্র-পুষ্প আছে কিন্তু ফল নেই, সেই বৃক্ষ হল অনুপযোগী। কারণ প্রকৃতপক্ষে তৃপ্তি ফল হতেই পাওয়া যায়, ফুল-পাতার সৌন্দর্যে নয়। এইরূপ সুখ-ভোগকামী ব্যক্তিদের দৃষ্টিতে ভোগ-ঐশ্বর্যরূপ পত্র-পুষ্পে সজ্জিত এই সংসার-বৃক্ষ বাহ্যতঃ সুন্দর বলে প্রতীত হলেও এর থেকে সুখ আকাঙ্ক্ষা করায় তাদের অক্ষয় সুখরূপ তৃপ্তি অর্থাৎ পরমানন্দ প্রাপ্তি হয় না।

বেদবিহিত পুণ্যকর্মাদির অনুষ্ঠান স্বর্গপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় করলে সেটি নিষিদ্ধ কর্ম করার থেকে শ্রেষ্ঠ হলেও, তার থেকে মুক্তি লাভ করা যায় না। কারণ ফলভোগের পর পুণ্যকর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং তাদের পুনরায় জগতে ফিরে আসতে হয় (গীতা ৯।২১)। এইরূপ সকাম কর্ম এবং তার ফল—দুই-ই উৎপন্ন এবং বিনাশশীল। সুতরাং সাধকদের এই দুটি থেকেই সর্বতোভাবে আসক্তিবর্জিত হয়ে একমাত্র পরমাত্ম-তত্ত্বলাভেই যত্নশীল হওয়া উচিত।

পাতা বৃক্ষের শাখা থেকে উৎপন্ন হয় এবং বৃক্ষকে রক্ষা ও বৃদ্ধি করে থাকে। পাতার জন্য বৃক্ষকে সুন্দর দেখায় এবং বৃক্ষ দৃঢ় হয় (পাতার নড়াচড়াতে বৃক্ষের মূল, শাখা-প্রশাখা দৃঢ় হয়)। বেদও এই সংসার-বৃক্ষের মুখ্য শাখারূপ ব্রহ্মা থেকে প্রকটিত এবং বেদবিহিত কর্মের দ্বারাই সংসারের বৃদ্ধি ও রক্ষা হয়। তাই বেদকে পাতা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। জগতে সকাম-কর্মাদির দ্বারা স্বর্গে দেব-যোনি প্রাপ্তি হয়—জগৎ-সংসার বৃক্ষের এই হল বৃদ্ধি লাভ। স্বর্গাদিতে নন্দনবন, সুন্দর বিমান, রমণীয় অপ্সরা ইত্যাদি বিরাজ করে—এগুলি সংসার-বৃক্ষের সৌন্দর্যের প্রতীতি। সকাম-কর্ম করতে থাকলে বারংবার জন্ম ও মৃত্যু হতে থাকে—এটি হল জগৎ-বৃক্ষ দৃঢ়তর হওয়া।

এই পদটির দ্বারা ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, সাধকের সকাম ভাব, বৈদিক সকাম-কর্মানুষ্ঠানরূপ পত্রাদিতে আকৃষ্ট না হয়ে জগৎ-বৃক্ষের মূল—পরমাত্মার আশ্রয়ই গ্রহণ করা উচিত। পরমাত্মার আশ্রয় নিলে বেদের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। বেদের প্রকৃত তত্ত্ব জগৎ বা স্বর্গ লাভ করা নয়, প্রকৃত তত্ত্ব হল পরমাত্মাকে লাভ করা (গীতা ১৫।১৫)[২]।

'যস্তং বেদ স বেদবিৎ'—যে ব্যক্তি এই জগৎ-বৃক্ষকে সম্পূর্ণরূপে জানেন, তিনিই সম্পূর্ণ বেদকে যথার্থরূপে জানেন। জগৎকে ক্ষণভঙ্গুর (অনিত্য) জেনে এর থেকে কখনো বিন্দুমাত্র সুখের আশা না রাখাই হল জগৎ-সংসারকে যথার্থরূপে জানা। প্রকৃতপক্ষে জগৎকে ক্ষণভঙ্গুর বলে জানলে এ-থেকে সুখভোগের ইচ্ছা জন্মাতেই পারে না। সুখভোগের সময় জগৎ ক্ষণভঙ্গুর বলে প্রতীয়মান হয় না। যতক্ষণ জগতের প্রাণী ও পদার্থগুলি স্থায়ী বলে মনে করা হয়, ততক্ষণ সুখভোগ, সুখের আশা ও আকাঙ্ক্ষা এবং জগতের আশ্রয়, গুরুত্ব ও বিশ্বাস বজায় থাকে। যখন অনুভব হয় যে সংসার প্রতিক্ষণ ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে, তখন এর থেকে সুখ গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা দূর হয় এবং সাধক সেই প্রকৃত তত্ত্ব জেনে (জগতের থেকে বিমুখ এবং পরমাত্মার সম্মুখীন হয়ে) পরমাত্মার সঙ্গে নিজ অভিন্নভাব অনুভব করে। বেদের প্রকৃত অর্থই হল পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্নতা অনুভব করা। যে ব্যক্তি সংসারে বিমুখ হয়ে পরমাত্মতত্ত্বের সঙ্গে নিজ অভিন্নতা (যা বাস্তবসত্য) অনুভব করেন, তাঁকেই প্রকৃত **'বেদবিৎ'** বলা হয়। শুধুমাত্র বেদ অধ্যয়ন করলে মানুষ বেদশাস্ত্রে পণ্ডিত হতে পারে কিন্তু যথার্থ বেদবেত্তা হতে পারে না। বেদ অধ্যয়ন না করলেও যাঁর (সংসারে সম্বন্ধবিচ্ছেদ হওয়ায়) পরমাত্মতত্ত্ব অনুভূত হয়েছে, তিনিই প্রকৃত বেদবেত্তা (বেদের তাৎপর্য অনুভবকারী)।

ভগবান এই অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে নিজেকে **'বেদবিৎ'** বলে জানিয়েছেন। এখানে তিনি জগতের তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিদের **'বেদবিৎ'** বলে তাঁদের সঙ্গে নিজ ঐক্য প্রকট করেছেন। তাৎপর্য হল এই যে মনুষ্যদেহে প্রাপ্ত বিবেকের এমনই মহিমা যে, তার সাহায্যে জীব জগতের

---

[১]বেদে সকাম মন্ত্রগুলির সংখ্যা আশি হাজার এবং মুক্তিপ্রদানকারী মন্ত্রের সংখ্যা কুড়ি হাজার, যার মধ্যে চার হাজার মন্ত্র জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত এবং ষোল হাজার মন্ত্র উপাসনাকাণ্ডের অন্তর্গত।

[২]সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি (কঠোপনিষদ্ ১।২।১৫)

'সমস্ত বেদ যে পরমপদ পরমাত্মার বারংবার প্রতিপাদন করে।'

প্রকৃততত্ত্ব জেনে ভগবানের ন্যায় বেদবেত্তা হতে পারে[১]।

পরমাত্মার অংশ হওয়ায় জীবের প্রকৃত সম্পর্ক একমাত্র পরমাত্মার সঙ্গেই থাকে। সে ভ্রমবশতঃ জগতের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক মেনে থাকে, প্রকৃতপক্ষে এটি তার ভ্রম। বিচার-বিবেচনার দ্বারা এই ভুল দূর করে অর্থাৎ জগতের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক পরিত্যাগ করে শুধুমাত্র নিজ অংশী পরমাত্মার সঙ্গে নিজ স্বতঃ-স্বাভাবিক অভিন্নতা অনুভব যিনি করেন, তিনিই জগৎ-বৃক্ষের যথার্থ তত্ত্বজ্ঞাতা ; সেই ব্যক্তিকেই ভগবান এখানে 'বেদবিৎ' বলেছেন।

পরিশিষ্ট-ভাব—জগৎ, জীব এবং পরমাত্মা—এই তিনটিই হল বাসুদেবরূপ **'বাসুদেবঃ সর্বম্'**। সেই কথাই এখানে বৃক্ষরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

পরিবর্তনশীল হলেও জগৎকে 'অব্যয়' বলার অর্থ হল এই যে জগতে নিরন্তর পরিবর্তন হতে থাকলেও কিছুই ব্যয় (খরচ) হয় না অর্থাৎ শেষ হয় না। যেমন সমুদ্রে অজস্র তরঙ্গ উঠছে দেখা যায়, জোয়ার-ভাঁটা হয়, কিন্তু সমুদ্রের জল একই থাকে, তা কমেও না, বাড়েও না। তেমনই অনবরত পরিবর্তন ঘটতে থাকলেও জগৎ-সংসার অব্যয়ই থাকে। কেন-না পরিবর্তনরূপ জগৎ-সংসারও পরমাত্মার শক্তি—'অপরা প্রকৃতির' কার্য হওয়ায় পরমাত্মারই স্বরূপ—**'সদসচ্চাহমর্জুন'** (গীতা ৯।১৯)। পরিবর্তনরূপ অপরা প্রকৃতিও পরমাত্মার স্বরূপ আর অপরিবর্তনরূপ পরা প্রকৃতিও পরমাত্মার স্বরূপ। এই জগৎ-সংসার সেই পরমাত্মারই তরঙ্গরূপ। উপর ভাগে তরঙ্গ দেখা গেলেও সমুদ্রের তলদেশে যেমন কোনো তরঙ্গ থাকে না, শুধু এক সম, শান্ত সমুদ্র বিরাজ করে, তেমনই বাহ্যিকরূপে জগৎ পরিবর্তনশীল বলে প্রতিভাত হলেও মূলত এক সম, শান্ত পরমাত্মা বিরাজ করেন (গীতা ১৩।২৭)। অর্থাৎ জগৎ জগৎরূপে অব্যয় নয়, ভগবদ্রূপে অব্যয়। জগৎ-সংসার রূপে ভগবানেরই রূপের বিচিত্র প্রকাশ দেখা যায়। সাধকের দৃষ্টি সেই বৈচিত্র্যের দিকে না থেকে ভগবানের দিকে হওয়া উচিত। রূপবৈচিত্র্যের দিকে দৃষ্টি দেওয়া অর্থাৎ তাকে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রদান করা এবং গুরুত্ব দিয়ে তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করাই হল বন্ধন।

জগৎকে 'অব্যয়' বলার আর একটি কারণ হল এই যে, এই জগৎ-সংসারের সঙ্গে যে সম্পর্ক স্থাপন করবে, তার সেই সম্পর্ক অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুও অব্যয় হয়ে যাবে, কখনো দূর হবে না, কখনো শেষ হবে না। রাস্তা যত লম্বাই হোক না কেন, তা শেষ হয়, কিন্তু গোল রাস্তা শেষ হয় না। কলুর বলদের ন্যায় জন্মের পর মৃত্যু আর মৃত্যুর পর জন্ম—এভাবে চলতে থাকে। এই গোল রাস্তার শেষ নেই।

জগৎ-সংসার 'অব্যয়' ; কারণ জগতের বীজও 'অব্যয়'—**'বীজমব্যয়ম্'** (গীতা ৯।১৮)।

❊ ❊ ❊

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে ভগবান যে জগৎ-বৃক্ষের দিগ্‌দর্শন করিয়েছেন, পরবর্তী শ্লোকে তাই অবয়বসহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করছেন।

অধশ্চোর্ধ্বং প্রসৃতাস্তস্য শাখা গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে॥ ২ ॥

[তস্য (ওই জগৎবৃক্ষের) ; **গুণপ্রবৃদ্ধাঃ** (গুণাদির সাহায্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও) ; **বিষয়প্রবালাঃ** (বিষয়রূপ পল্লববিশিষ্ট) ; **শাখাঃ, অধঃ, চ** (শাখাগুলি নীচে, মধ্যে এবং) ; **ঊর্ধ্বম্, প্রসৃতাঃ** (ঊর্ধ্বে সর্বত্র বিস্তৃত) ; **মনুষ্যলোকে** (ইহলোকে) ; **কর্মানুবন্ধীনি** (কর্মানুসারে বন্ধনকারী) ; **মূলানি, অধঃ, চ** (মূল নিম্নে ও ঊর্ধ্বভাগে) ; **অনুসন্ততানি** (সর্বলোকে বিস্তৃত হয়ে চলেছে।)]

ওই জগৎ-বৃক্ষের গুণাদির (সত্ত্ব, রজঃ ও তমের) সাহায্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও বিষয়রূপ পল্লববিশিষ্ট শাখাগুলি

[১]'মম সাধর্ম্যমাগতাঃ' (গীতা ১৪।২)-তেও এই কথাই বলা হয়েছে।

নীচে, মধ্যভাগে ও উর্ধ্বে সর্বত্র বিস্তৃত। মনুষ্যলোকে কর্মানুসারে বন্ধনকারী মূল নিম্নে ও উর্ধ্বভাগে সর্বলোকে পরিব্যাপ্ত হয়ে চলেছে॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা—**'তস্য শাখা গুণপ্রবৃদ্ধাঃ'**—জগৎ-বৃক্ষের প্রধান শাখা হলেন ব্রহ্মা। ব্রহ্মার থেকেই যত দেবতা, মানুষ, তির্যক ইত্যাদি যোনির উৎপত্তি ও বিস্তার হয়। তাই ব্রহ্মলোক থেকে পাতাল পর্যন্ত যত লোক এবং তাতে অবস্থানকারী দেবতা, মানুষ, কীট পতঙ্গাদি প্রাণী আছে, তারা সকলেই জগৎ-বৃক্ষের শাখা। জল সিঞ্চন করলে যেমন বৃক্ষের শাখাগুলি বৃদ্ধি পেতে থাকে, সেইরূপ গুণরূপ জলের সংস্পর্শে এই সংসাররূপ বৃক্ষের শাখাগুলি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তাই ভগবান জীবাত্মার উচ্চ, মধ্য এবং নিম্ন যোনিতে জন্ম নেবার জন্য গুণাদির আসক্তিকেই কারণ বলে জানিয়েছেন (গীতা ১৩।২১ ; ১৪।১৮)। সমস্ত জগতে এমন কোনো স্থান, বস্তু, ব্যক্তি নেই যা প্রকৃতিজাত ত্রিগুণবর্জিত (গীতা ১৮।৪০)। অতএব গুণাদির সম্বন্ধেই এই জগতের স্থিতি রয়েছে। গুণাদির অনুভূতি গুণগুলি হতে উৎপন্ন বৃত্তি এবং পদার্থের দ্বারা হয়। তাই বৃত্তি এবং পদার্থের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক পরিত্যাগ করানোর জন্যই **'গুণপ্রবৃদ্ধাঃ'** পদটি ব্যবহার করে ভগবান এখানে বলেছেন যে যতক্ষণ গুণাদির সঙ্গে বিন্দুমাত্রও সম্পর্ক বজায় থাকে, ততক্ষণ জগৎ-সংসার বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতেই থাকবে। অতএব এই সংসার-বৃক্ষ ছেদন করতে হলে বিন্দুমাত্র গুণাদির আসক্তি রাখা উচিত নয়। কারণ গুণাদির আসক্তি থাকলে জগৎ-সংসার থেকে সম্পর্ক ছেদ করা যায় না।

'বিষয়প্রবালাঃ'—শাখা থেকে বহির্গত নতুন কচি ডাল-পাতাকে যেমন প্রবাল (কোঁপল) বলা হয়, তেমনই গুণাদির বৃত্তি ও তা থেকে উৎপন্ন দৃশ্য পদার্থগুলিকেও এখানে **'বিষয়প্রবালাঃ'** বলা হয়েছে।

বৃক্ষের মূল থেকে কাণ্ড, কাণ্ড থেকে শাখা-প্রশাখা এবং তার থেকে কচি উপশাখা ইত্যাদি বের হয় এবং এভাবে শাখাগুলি বাড়তে থাকে। এই জগৎ-বৃক্ষে বিষয়-চিন্তাই হল মুকুল। ত্রিগুণের সংস্পর্শেই বিষয়-চিন্তা হয়। গুণরূপ জলের দ্বারা যেমন জগৎ-বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা বৃদ্ধি পেতে থাকে, তেমনই গুণরূপ জলের সাহায্যে বিষয়রূপ মুকুল বিকশিত হয়। মুকুলকেই যেমন শুধু দেখা যায়, তার মধ্যে সংপৃক্ত জলকে দেখা যায় না, তেমনই শব্দাদি বিষয় অনুভব করা যায়, তার অন্তঃস্থিত গুণগুলি দেখা যায় না। সুতরাং বিষয় দ্বারাই গুণকে জানা যায়।

'বিষয়প্রবালাঃ' পদটির এই তাৎপর্য প্রতীত হয় যে বিষয়-চিন্তায় নিমগ্ন হলে মানুষের জগৎ হতে সম্পর্ক-বিচ্ছিন্ন হওয়া সম্ভব নয়[১] (গীতা ২।৬২-৬৩)। অন্তকালে মানুষ যে যে ভাব চিন্তা করতে করতে শরীর ত্যাগ করেন, তিনি সেই সেই ভাবই প্রাপ্ত হন (গীতা ৮।৬)—এই হল বিষয়রূপ মুকুলের প্রস্ফুটন।

মুকুলের ন্যায় বিষয়ও অত্যন্ত সুন্দর বলে প্রতীত হয়, যার ফলে মানুষ তাতে আকৃষ্ট হয়। সাধক নিজ বিচার-বিবেচনার সাহায্যে এগুলি ক্ষণভঙ্গুর, বিনাশশীল এবং দুঃখরূপী জেনে সহজেই এই বিষয়গুলিকে পরিত্যাগ করতে পারেন (গীতা ৫।২২)। বিষয়গুলিতে যে সৌন্দর্য ও আকর্ষণ প্রতীত হয় তা প্রকৃতপক্ষে সেগুলির নিজস্ব নয়, ব্যক্তির নিজস্ব আকর্ষণের জন্যই তাতে ওইরূপ প্রতিভাত হয়। তাই বিষয়ের আসক্তি পরিত্যাগ করাই প্রকৃত ত্যাগ। মুকুলকে নষ্ট করতে যেমন কোনো পরিশ্রম হয় না, তেমনই সাধকেরও বিষয় পরিত্যাগ করতে কোনো পরিশ্রম অনুভব করা উচিত নয়। মনে আসক্তি থাকলেই এই বিষয়রূপ মুকুলগুলিকে সুন্দর ও আকর্ষক বলে মনে হয়, নচেৎ এগুলি বিষযুক্ত মিষ্টান্নের মতোই[২]। সেইজন্য এই জগৎ-বৃক্ষকে ছেদনের উদ্দেশ্যে ভোগবুদ্ধিযুক্ত হয়ে বিষয়চিন্তা এবং বিষয় ভোগ করা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ

[১]সেবত বিষয় বিবর্ধ জিমি নিত নিত নূতন মার॥ (শ্রীরামচরিতমানস ৬।৯২)

[২]দোষেণ তীব্রো বিষয়ঃ কৃষ্ণসর্পবিষাদপি। বিষং নিহন্তি ভোক্তারং দ্রষ্টারং চক্ষুষাপ্যয়ম্॥ (বিবেকচূড়ামণি ৭৯)

বিষয়-দোষ কালসর্পের বিষের থেকেও অধিক তীব্র। কারণ বিষ ভক্ষণ করলে শুধু মৃত্যু হয়, কিন্তু বিষয়কে যারা শুধু চক্ষু দিয়ে ভোগ করে তারাও এর থেকে রেহাই পায় না।

করা প্রয়োজন[১]।

'অধশ্চোর্ধ্বং প্রসৃতাঃ'—এইস্থানে 'চ' পদটিকে মধ্যলোকে অর্থাৎ মনুষ্যলোকের (এই শ্লোকের **'মনুষ্যলোকে কর্মানুবন্ধীনি'** পদটির) বাচক বলে বুঝতে হবে। **'ঊর্ধ্বম্'** পদটির তাৎপর্য ব্রহ্মলোক ইত্যাদিতেই, যেখানে যাবার দুটি পথ আছে—দেবযান এবং পিতৃযান (যার বর্ণনা অষ্টম অধ্যায়ের চব্বিশ-পঁচিশতম শ্লোকে শুক্ল এবং কৃষ্ণ মার্গ নামে করা হয়েছে)। **'অধঃ'** পদের তাৎপর্য হল নরক, এরও দুটি ভাগ—যোনি বিশেষ নরক এবং স্থান বিশেষ নরক।

এই পদগুলিতে বলা হয়েছে যে ঊর্ধ্বমূল পরমাত্মা হতে নিম্নে এবং এই সংসার-বৃক্ষের শাখাগুলি নীচে, মধ্যভাগে এবং উপরে সর্বত্র প্রসারিত। এর মধ্যে মনুষ্য-যোনিরূপ শাখাই মূল শাখা। কারণ মনুষ্যজন্মেই নতুন কর্ম করার অধিকার থাকে। অন্য শাখাগুলি ভোগযোনি, যাতে শুধুমাত্র পূর্বকৃত কর্মের ফল ভোগ করার অধিকারই থাকে। এই মনুষ্য-যোনিরূপ মূলশাখা থেকে মানুষ নীচে (অধঃলোকে) ও উপরে (ঊর্ধ্বলোকে)—দুদিকে যেতে সক্ষম হয়। আবার সংসার-বৃক্ষ ছেদ করে সব থেকে ঊর্ধ্বেও (পরমাত্মা পর্যন্ত) যেতে পারে। মনুষ্যদেহে এমন বিবেক বুদ্ধি থাকে যার সাহায্যে মানুষ পরমধামে পৌঁছাতে পারে আবার সেটিকে অবজ্ঞা করে বিষয় সেবন করে নরকেও যেতে পারে। তাই তুলসীদাস বলেছেন—

নরক স্বর্গ অপবর্গ নিসেনী। গ্যান বিরাগ ভগতি শুভ দেনী।
(শ্রীরামচরিতমানস ৭।১২১।৫)

'অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে'—মনুষ্য ব্যতিরেকে অন্য সবগুলিই ভোগযোনি। মনুষ্যজন্মের কৃত পাপ-পুণ্যের ফলভোগ করার জন্যই মানুষকে অন্যান্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করতে হয়। নতুন পাপ-পুণ্য করার অথবা পাপ-পুণ্য রহিত হয়ে মুক্ত হবার অধিকার ও সুযোগ এই মনুষ্যজন্মেই থাকে।

এখানে **'মূলানি'** পদটির তাৎপর্য হল তাদাত্ম্য, মমত্ববোধ এবং কামনারূপ মূলে, বাস্তবিক ঊর্ধ্বমূল পরমাত্মাতে নয়। 'আমি শরীর'—এটি মেনে নেওয়াই হল 'তাদাত্ম্য'। শরীরাদি পদার্থকে নিজের মনে করা হল 'মমত্ববোধ'। কামনা মুখ্যতঃ তিন প্রকারের হয়ে থাকে—পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা এবং লোকৈষণা। পুত্র পরিবারের কামনাকে বলা হয় 'পুত্রৈষণা' এবং ধনসম্পত্তির কামনাকে বলা হয় 'বিত্তৈষণা'। 'জগতে আমার মান-মর্যাদা হোক', 'আমি ভালো থাকি', 'আমার শরীর নিরোগ থাক', 'আমি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হই' ইত্যাদি বিভিন্ন কামনা 'লোকৈষণা'র অন্তর্গত। শুধু তাই নয়, কীর্তির কামনা মৃত্যুর পরও টিকে থাকে যে, লোকে আমার প্রশংসা করতে থাকুক ; আমার স্মৃতিতে জীবনী লেখা হোক ; লোকে আমাকে স্মরণ করতে থাকুক ইত্যাদি। যদিও কামনাগুলি অল্পবিস্তর সমস্ত যোনিতেই থাকে, কিন্তু সেগুলি মনুষ্যজন্মেই বন্ধনকারক হয়ে থাকে[২]। কামনা তাড়িত হয়ে মানুষ যখন কর্ম করে, তখন সেই কর্মের সংস্কার তার অন্তরে সঞ্চিত হয়ে ভবিষ্যতে জন্ম-মৃত্যুর কারণ হয়। মনুষ্যজন্মের কৃতকর্মের ফল ইহজন্মে এবং

---

[১]মোক্ষস্য কাঙ্ক্ষা যদি বৈ তবাস্তি ত্যজাতিদূরাদ্বিষয়ান্ বিষং যথা। (বিবেকচূড়ামণি ৮৪)
'যদি তোমার মোক্ষলাভের ইচ্ছা থাকে, তাহলে বিষয়কে বিষেরই ন্যায় দূর থেকে পরিত্যাগ কর।'

[২](ক) ভগবদ্দর্শন বা ভগবদ্‌প্রেমের আকাঙ্ক্ষা, (খ) স্বরূপবোধের কামনা ও (গ) সেবা করার ইচ্ছা—এই তিনটি ইচ্ছাকে (বন্ধনকারী না হওয়ায়) 'কামনা' বলা হয় না। স্বরূপবোধ বা পরমাত্মাকে পাওয়ার (ভগবদ্দর্শন বা ভগবদ্‌প্রেম) আকাঙ্ক্ষা 'কামনা' নয়। কারণ স্বরূপ এবং পরমাত্মা এই দুই-ই 'নিত্যপ্রাপ্ত' এবং 'আপনার'। যেমন নিজ পকেট থেকে পয়সা নিলে চুরি করা হয় না, তেমনই স্বরূপ বা পরমাত্মাকে পাবার ইচ্ছাকে 'কামনা' বলে না। জাগতিক পদার্থগুলি জগতের সেবাতেই নিয়োগ করার ইচ্ছা 'কামনা' নয়, বরং তাকে ত্যাগই বলা হয়। কারণ 'কামনা' নেওয়ার ইচ্ছাকে বলা হয়, দেওয়ার ইচ্ছাকে নয়। তাৎপর্য হল এই যে, যা নিজের এবং অবিনাশী, তার কামনাকে 'আবশ্যকতা' বলা হয় ; আর যেসব বস্তু অন্যের এবং বিনাশশীল সেগুলি অপরকে প্রদান করার ইচ্ছাকে বলা হয় 'ত্যাগ'। যেমন শরীরের ক্ষুধা উপশমের জন্য ভোজনের আগ্রহকেও 'কামনা' বলা যায় না, তেমনই 'স্বয়ং'-এর জিজ্ঞাসা দূর করার জন্য পরমাত্মতত্ত্বের কামনাও 'কামনা' নয়। 'কামনা' হয় বিনাশশীল জড়বস্তুর আর আবশ্যকতা থাকে চিন্ময়তত্ত্বের। কামনার পরিপূর্তি হয় না, তা বেড়েই চলে, তাই এটি পরিত্যাগ করতে হয়। কিন্তু আবশ্যকতা পূরণ হয়। আবশ্যকতা পূরণের তিনটি উপায়—কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ। মানুষ জগতের বিনাশশীল

মৃত্যুর পর অবশ্যই ভোগ করতে হয় (গীতা ১৮।১২)। সুতরাং তাদাত্ম্যবোধ, মমত্ববোধ এবং কামনা পোষণ করতে থাকলে কর্ম-বন্ধন দূর হয় না।

নিয়ম হল এই যে, বন্ধন যেখান থেকে হয়, সেখান থেকেই মুক্তি লাভ হয় ; যেমন—দড়ির যেখানে গিঁট লাগে, সেখানেই সেটি খুলতে হয়। মনুষ্যজন্মেই জীব শুভাশুভ কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয় ; তাই মনুষ্য-যোনিতেই সে সেই বন্ধন হতে মুক্ত হতে সক্ষম হয়।

প্রথম শ্লোকে উদ্ধৃত **'ঊর্ধ্বমূলম্'** পদটির তাৎপর্য হল—পরমাত্মা, যিনি জগৎ-সংসারের রচয়িতা এবং এর মূল আধার ; আর এখানে **'মূলানি'** পদটির তাৎপর্য হল তাদাত্ম্য, মমতা এবং কামনারূপ মূল, যা সংসারে মানুষকে আবদ্ধ করে। সাধকের এই তাদাত্ম্য, মমতা ও কামনারূপ মূলগুলি ছেদন করে ঊর্ধ্বমূল ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়, **'তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে'**, এই অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে যার উল্লেখ করা হয়েছে।

মনুষ্যলোকে কর্মানুসারে বন্ধনকারী তাদাত্ম্য, মমতা এবং কামনারূপী মূল নীচে এবং ওপরে সমস্ত লোকে ও যোনিতে পরিব্যাপ্ত রয়েছে। পশু-পক্ষীরও নিজ নিজ শরীরে 'তাদাত্ম্য' থাকে। নিজ সন্তানের প্রতি 'মমতা' থাকে এবং ক্ষুধাবোধ হলে খাবার জন্য সুখাদ্যের 'কামনা' থাকে। তেমনই দেবতাদের মধ্যেও নিজ দিব্য-শরীরের সঙ্গে 'তাদাত্ম্য', প্রাপ্ত পদার্থে 'মমতা' এবং অপ্রাপ্ত ভোগের 'কামনা' থাকে। এইরূপ তাদাত্ম্য, মমতা, কামনারূপ দোষ কোনো না কোনো রূপে উচ্চ-নীচ সকল যোনিতেই থাকে। কিন্তু মনুষ্যজন্ম ব্যতীত অন্য জন্মে এগুলি বন্ধনকারক হয় না। যদিও মনুষ্যজন্ম ব্যতিরেকে দেবাদি অন্যান্য জন্মেও বিবেক থাকে, কিন্তু ভোগের আধিক্য থাকায় এবং ভোগ করার জন্যই ওই জন্ম হওয়ায়, ওই জন্মগুলিতে বিচার-বিবেচনা কার্যকর করা সম্ভব হয় না। তাই ওইসব জন্মে উপরিউক্ত দোষগুলি হতে 'স্বয়ং'-কে পৃথক্‌ভাবে দেখা সম্ভবপর নয়। একমাত্র মনুষ্যজন্মেই বিবেক থাকায় এরূপ অনুভব করা সম্ভব যে আমি (স্বরূপতঃ) তাদাত্ম্য, মমত্ববোধ এবং কামনারূপ দোষাদি হতে সর্বতোভাবে মুক্ত।

মনুষ্যদেহেই ভোগের পরিণামের প্রতি দৃষ্টি রাখার যোগ্যতা থাকে। পরিণামের দিকে দৃষ্টি না রেখে যেসব ব্যক্তি ভোগ করে তাদের পশু বললে, পশুদেরও নিন্দা করা হয়। কারণ পশুরা নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করে মনুষ্যজন্মের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, আর এইসব মানুষ নিষিদ্ধভাবে ভোগ করে পশুযোনির দিকেই অগ্রসর হচ্ছে।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—আগের দুটি শ্লোকে সংসার-বৃক্ষের যে বর্ণনা করা হয়েছে, তার কী প্রয়োজন—পরবর্তী শ্লোকে ভগবান তা জানিয়েছেন।

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে নান্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা।। ৩ ।।

[অস্য (এই সংসারবৃক্ষের) ; **রূপম্, তথা** (রূপ তেমন) ; **ইহ, ন, উপলভ্যতে** (এখানে উপলব্ধ হয় না) ; **ন, আদিঃ**

পদার্থগুলিকে নিজের বলে মনে করেছে, তাই তারা বিষয়ের গোলাম হয়েছে। যদি তারা এগুলি সকলের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে জগতের সেবার জন্য নিয়োগ করে, তাহলে তাদের পরাধীনতা দূর হয় এবং স্বাধীন হতে পারে—একে বলে কর্মযোগ। পরমাত্মা নিজেরই স্বরূপ, জীব তার থেকে পৃথক্ নয়, শুধু বিনাশশীল পদার্থের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মানাতেই তারা নিজ স্বরূপচ্যুত হয়েছে। সুতরাং বিনাশশীলের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে হয়, তাহলেই স্বরূপবোধ হয়—এই হল জ্ঞানযোগ। ভগবান অংশী আর জীব অংশ, এরা পরস্পর নিত্য সম্পর্কিত। বিনাশশীল পদার্থের সঙ্গে সম্পর্ক মানাতেই জীব ঈশ্বর হতে বিমুখ হয়েছে। বিনাশশীল বস্তুকে নিজের বলে মনে না করে একমাত্র ভগবানকেই আপন বলে মানলে সে স্বতঃই ভগবানের সম্মুখীন হয় এবং ভগবদ্‌প্রেম লাভ করে—এই হল ভক্তিযোগ। অর্থাৎ বিনাশশীল বস্তুকে নিজের বলে মনে করলেই, জীব জগতের গোলাম, নিজ স্বরূপচ্যুত এবং ভগবানে বিমুখ হয়। সে যদি বিনাশশীল বস্তুকে নিজের বলে মনে না করে (যা বাস্তবে তার নিজের নয়) ; তাহলে তার সংসারের দাসত্ব দূর হয়ে নিজ স্বরূপ বোধ হয় এবং ভগবদ্‌প্রেম লাভ হয়।

(কারণ এর আদি) ; **ন, অন্তঃ, চ** (অন্ত বা) ; **ন, সম্প্রতিষ্ঠা** (স্থিতি কিছুই নেই) ; **চ, এনম্** (তাই এই) ; **সুবিরূঢ়মূলম্** (সুদৃঢ় মূল) ; **অশ্বত্থম্** (জগৎ-সংসার রূপ অশ্বত্থ বৃক্ষের) ; **দৃঢ়েন** (দৃঢ়) ; **অসঙ্গশস্ত্রেণ** (অনাসক্তিরূপ শস্ত্রের দ্বারা) ; **ছিত্ত্বা** (ছেদন করে।)]

এই সংসার-বৃক্ষের যেমন রূপ দেখা যায়, বিচার করলে তেমন উপলব্ধ হয় না ; কারণ এর আদি-অন্ত বা স্থিতি কিছুই নেই। তাই এই সদৃঢ়মূল জগৎ-সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষকে দৃঢ় অনাসক্তিরূপ শস্ত্রের দ্বারা ছেদন করে— ॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা—'ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে'—এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে সংসার-বৃক্ষের বিষয়ে বলা হয়েছে যে, লোকে একে অব্যয় বা অবিনাশী বলে থাকে এবং শাস্ত্রেও বর্ণনা করা হয়েছে যে, সকাম অনুষ্ঠান করলে ইহলোক-পরলোকে বিপুল ভোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই কথায় ইহলোক এবং স্বর্গলোকে সুখ, রমণীয়তা এবং স্থায়িত্ব আছে বলে মনে হয়। এইজন্যই অজ্ঞান ব্যক্তিরা কাম এবং ভোগাদিপরায়ণ হয় এবং 'এর থেকে বড় আর কোনো সুখ নেই'—তাদের এইরূপ দৃঢ় ধারণা হয় (গীতা ২।৪২ ; ১৬।১১)। যতক্ষণ জগতে তাদাত্ম্য, মমতা এবং কামনার সম্বন্ধ থাকে, ততক্ষণ এরূপ প্রতীয়মান হয়। কিন্তু ভগবান বলেছেন যে বিবেক-বুদ্ধির দ্বারা সংসারের থেকে পৃথক্ হয়ে অর্থাৎ সংসার থেকে সম্পর্ক ছেদ করে দেখলে তার যে-রূপ আমরা মেনে থাকি, তেমন উপলব্ধি হয় না অর্থাৎ এটি বিনাশশীল এবং দুঃখরূপ বলে প্রতীত হয়।

'নান্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা'—কোনো বস্তুর আদি, মধ্য ও অন্তের জ্ঞান দু'ভাবে হয়—দেশকৃত এবং কালকৃত। এই জগতের আদি কোথায়, এর মধ্য কোথায় আর অন্তই বা কোথায় ?—এইরূপ জগৎ-সংসারের 'দেশকৃত' অর্থাৎ আদি, মধ্য ও অন্তের অনির্ণেয়তা ; আর 'কবে এর আরম্ভ হয়েছে, কতদিন থাকবে এবং কবে এর শেষ হবে ?'—এইরূপ জগতের 'কালকৃত' স্থিতিরও ঠিক নেই।

মানুষ কোনো বিশাল প্রদর্শনীতে নানাপ্রকার বস্তু দেখে মুগ্ধ হয়ে ঘুরে বেড়ালে তার আদি ও অন্ত জানতে পারে না। সেখান থেকে বাইরে এলে তবেই সে তার আদি-অন্ত জানতে পারে। তেমনই সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে ভোগাদিতে মত্ত থাকলে কখনো এই সংসারের আদি-অন্ত জানা সম্ভব নয়।

জগৎ-সংসারের আদি-অন্ত জানার জন্য মানুষের যে শক্তি-সামর্থ্য (ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি) আছে, সেগুলি সবই জগতেরই অংশ। নিয়মই হল যে কার্য তার কারণে বিলীন হতে পারে কিন্তু তাকে জানতে পারে না। মৃত্তিকা নির্মিত কলস যেমন পৃথিবীকে নিজের মধ্যে ধরতে পারে না, তেমনই ব্যষ্টি ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি সমষ্টিগত জগৎ এবং তার কার্যকে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারে না। সুতরাং জগৎ থেকে (মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয় থেকেও) পৃথক্ হলেই জগতের স্বরূপ (স্বয়ং-এর সাহায্যে) ঠিকমতো জানা সম্ভব হয়।

প্রকৃতপক্ষে জগতের কোনো স্বাধীন সত্তাই (স্থিতি) নেই। আছে শুধু উৎপত্তি এবং বিনাশের ক্রম। জগৎ-সংসারের এই উৎপত্তি-বিনাশের প্রবাহই 'স্থিতি' রূপে প্রতীয়মান হয়। আসলে দেখা যায় যে উৎপত্তিও নেই, শুধুমাত্র বিনাশই আছে। যা স্বরূপতঃ একমুহূর্তও স্থায়ী হয় না, সেই জগতের প্রতিষ্ঠা (স্থিতি) কেমন ? সংসারের সঙ্গে নিজে থেকে মেনে নেওয়া সম্পর্ক পরিত্যাগ করলেই 'নিজের জন্য সবকিছু'রই অন্ত হয় এবং প্রকৃত স্বরূপ অথবা পরমাত্মাতে স্থিতিলাভ হয়ে থাকে।

বিশেষ কথা

কোনো বৈজ্ঞানিকই আজ পর্যন্ত এই জগতের আদি-মধ্য বা অন্তের সন্ধান করতে পারেননি এবং পারবেনও না। সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে অথবা সাংসারিক ভোগ গ্রহণে আসক্তি রেখে যদি কেউ জগতের আদি, মধ্য ও অন্তের খোঁজ করতে চায়, তবে সে কলুর বলদের ন্যায় সারাজীবন ঘুরেও কিছুই জানতে পারবে না।

প্রকৃতপক্ষে এই জগতের আদি-মধ্য-অন্ত জানার কোনো প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন শুধু জগতের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক দূর করা।

এই জগৎ অনাদি-সান্ত, না অনাদি-অনন্ত অথবা প্রতীতিমাত্র, সেই বিষয়ে দার্শনিকদের মধ্যে নানা মতভেদ

আছে। কিন্তু জগতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যে অবিদ্যমান, যা বিচ্ছেদ করা প্রয়োজন—সেই বিষয়ে সকল দার্শনিকই একমত।

সংসার থেকে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করার সহজ উপায় হল—জগৎ থেকে প্রাপ্ত (মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি, শরীর, ধন-সম্পত্তি ইত্যাদি) সমস্ত সামগ্রী 'নিজের' এবং 'নিজের জন্য' বলে মনে না করে সেগুলি জগতের সেবাতেই নিয়োজিত করা।

স্ত্রী, পুত্র, মান, সম্মান, ধন, সম্পত্তি, আয়ু যতই পাওয়া যাক, জাগতিক যত ভোগ সবই যদি একটি মানুষ পায়, তবুও সে তাতে তৃপ্ত হয় না। কারণ জীব স্বয়ং অবিনাশী আর সাংসারিক ভোগগুলিও বিনাশশীল। বিনাশশীল পদার্থ দ্বারা অবিনাশী তৃপ্ত হবেন কীভাবে ?

'অশ্বত্থমেনম্ সুবিরূঢ়মূলম্'—জগৎ-সংসারকে **'সুবিরূঢ়মূলম্'** বলার অর্থ হল এই যে তাদাত্ম্য, মমতা ও কামনার জন্য এই জগৎ-সংসার (স্থিত না হলেও) দৃঢ়মূলসম্পন্ন বলে প্রতীয়মান হয়।

ব্যক্তি, পদার্থ, ক্রিয়া ইত্যাদিতে অনুরাগ, মমতা হলে জাগতিক বন্ধন দৃঢ় হতে দৃঢ়তর হতে থাকে। যেসব পদার্থ বা ব্যক্তিতে অনুরাগ ও মমত্ব ঘনিষ্ঠ হয়, মানুষ সেগুলিকে নিজস্ব বলেই মনে করতে থাকে। যেমন, অর্থের প্রতি মমতা হওয়ায় অর্থ-প্রাপ্তি হলে মানুষ অত্যন্ত প্রসন্ন হয় এবং 'আমি অতি ধনবান'—বলে তার অহংকার জন্মায়। অর্থ নাশে সেই ব্যক্তি নিজেরই বিনাশ হল বলে মনে করে। লোভ বৃদ্ধি পেতে থাকলে অর্থ প্রাপ্তির জন্য মানুষ অন্যায়, পাপ ইত্যাদি কুকাজও করে বসে। ক্রমে লোভ এত বেড়ে যায় যে তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে যায় যে, ছল-চাতুরী বা বেইমানী না করলে অর্থ উপার্জন করা যায় না। কিন্তু সে একথা চিন্তা করে না যে 'পাপের সাহায্যে অর্থ উপার্জন করে আমি ক'দিন বাঁচব ?' পাপের দ্বারা উপার্জিত অর্থ তো শরীরের সঙ্গেই পরিত্যক্ত হবে ; কিন্তু সেই অর্থ প্রাপ্তির জন্য যে ছল-চাতুরী, বেইমানী, চুরি ইত্যাদি পাপ করা হয়েছে, তা তো আমার সঙ্গেই যাবে[১], ফলে পরলোকে আমাকে নানা দুর্গতি ভুগতে হবে। শুধু তাই নয়, সে অন্যকেও প্ররোচনা দিতে থাকে যে 'অর্থ উপার্জনের জন্য পাপ করাতে কোনো অন্যায় নেই, এটি তো ব্যবসায়, এতে মিথ্যাচার, লোক ঠকানো সবই করা চলে।' এরূপ দুর্মতি হলেই তাদাত্ম্য, মমতা এবং কামনারূপ মূল দৃঢ় হয়। এইরূপ দূষিত ভাব দৃঢ়মূল হলে মানুষ সেরূপই হয়ে ওঠে (গীতা ১৭।৩)।

এই তাদাত্ম্য, মমতা এবং কামনারূপী মূল অন্তরে এত সুদৃঢ় হয় যে পড়া, শোনা বা আলোচনা করলেও এটি সর্বতোভাবে নষ্ট হয় না। সাধকগণ প্রায়শঃ বলে থাকেন যে সৎসঙ্গের আলোচনা শোনার সময় এই দোষগুলি ত্যাগ করা উচিত এবং সহজেই করা যায় বলে মনে হয় ; কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তা পারা যায় না, এগুলি পরিত্যাগ করতে চাইলেও, এগুলি ছাড়তে চায় না। আসলে এই দোষগুলি দূর না হওয়ার প্রধান কারণ—সাংসারিক সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা। সাধকেরা এই ভুল করেন যে তাঁরা সাংসারিক সুখও ভোগ করতে চান আবার দোষ হতেও রক্ষা পেতে চান। লোভী ব্যক্তি যেমন লোভনীয় বিষাক্ত মিষ্টান্নের রসাস্বাদনও করতে চায় আবার বিষ হতেও রক্ষা পেতে চায় ! কিন্তু তা কখনো সম্ভব নয়। জগতের কোনো কিছুতেই বিন্দুমাত্র সুখের আশা না রাখলে তবেই এর মূল স্বতঃই নষ্ট হয়ে যায়।

দ্বিতীয়তঃ 'তাদাত্ম্য, মমতা এবং কামনা দূর করা অত্যন্ত কঠিন'—সাধকদের এইরূপ মনোভাবই এই দোষগুলিকে দূর হতে দেয় না। আসলে এটি স্বাভাবিকভাবেই দূর হচ্ছে। কোনো মানুষের মধ্যেই এই দোষ সর্বদা থাকে না, এটি উৎপন্ন হয় এবং নষ্ট হয়ে যেতে থাকে। কিন্তু নিজে মেনে নেওয়ার ফলেই এটি স্থায়ী বলে প্রতীয়মান হয়। তাই সাধকদের এই দোষগুলি দূর করা কঠিন বলে মনে করাও উচিত নয়।

'অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা'—ভগবান বলেছেন যদিও এই সংসার-বৃক্ষের শাখাপ্রশাখা ও মূল অত্যন্ত দৃঢ়, তাহলেও এটি দৃঢ় অনাসক্তিরূপ অস্ত্রের সাহায্যে ছেদন করা সম্ভব। কোনো স্থান, ব্যক্তি, বস্তু, পরিস্থিতি ইত্যাদির প্রতি মনে আকর্ষণ, সুখ গ্রহণের ইচ্ছা হওয়া, সেগুলির

---

[১]ধনানি ভূমৌ পশবশ্চ গোষ্ঠে নারী গৃহদ্বারি সুতাঃ শ্মশানে। দেহশ্চিতায়াং পরলোকমার্গে ধর্মানুগো গচ্ছতি জীব একঃ॥

'শরীর ত্যাগের সময় অর্থ সিন্দুকে পড়ে থাকে ; পশুগুলি যেখানে সেখানে বাঁধা থাকে ; স্ত্রী গৃহদ্বার পর্যন্ত সঙ্গ দেয় ; পুত্র শ্মশান পর্যন্ত সঙ্গ দেয়, শরীর চিতায় ওঠা পর্যন্তই সঙ্গে থাকে। তার পরে পরলোকের পথে একমাত্র ধর্মই জীবের সঙ্গে যায়।'

প্রাধান্যে নিজেকে বড় এবং সুখী বলে মনে করা, পদার্থগুলির প্রাপ্তি বা সংগ্রহে খুশি হওয়া—একেই আসক্তি বলা হয়। এগুলি না রাখাই হল অনাসক্তি বা বৈরাগ্য। বৈরাগ্য দুপ্রকারে হয়—(১) সাধারণ বৈরাগ্য এবং (২) দৃঢ় বৈরাগ্য। দৃঢ় বৈরাগ্যকে উপরতি অথবা 'পর বৈরাগ্য'ও বলা হয়।

বৈরাগ্য-সম্পর্কে বিশেষ কথা

বৈরাগ্যের অনেক শ্রেণী রয়েছে, সেগুলি এইরূপ—

প্রথমে বৈরাগ্য অর্থ, গৃহ, ভূসম্পত্তি ইত্যাদিতে হয়। এগুলি স্বরূপতঃ পরিত্যাগ করলেও যদি মনে এগুলির লেশমাত্র ছাপ থাকে এবং 'আমি ত্যাগী'—এই অহং-অভিমান থাকে, তাহলে প্রকৃতপক্ষে সেটি বৈরাগ্য নয়। যখন চিত্তে জড় পদার্থের কোনো গুরুত্ব বা আকর্ষণ থাকে না তখনই তাকে বিষয়-বৈরাগ্য বলা হয়।

দ্বিতীয়তঃ বৈরাগ্য আসে নিজ মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র, ভাই ইত্যাদি পরিবার পরিজনে। তাঁদের সেবা করার জন্য, তাদের সুখী করার জন্যই তাঁদের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে হয়। নিজ সুখের জন্য তাঁদের সঙ্গে বিন্দুমাত্র সম্পর্ক না রাখাকেই বলা হয় স্বজন-বৈরাগ্য।

তৃতীয়তঃ এবং প্রকৃত বৈরাগ্য হয় নিজ শরীরে। যদি শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় থাকে তাহলে সমস্ত জগতের সঙ্গেই সম্পর্ক বজায় থাকে। কারণ শরীর জগতেরই অংশ। শরীরের সঙ্গে একাত্মভাব না থাকাই হল কায়-বৈরাগ্য।

তাদাত্ম্য (শরীরের সঙ্গে মেনে নেওয়া ঐক্য বা অহং ভাব) নাশ করার জন্যই সাধকদের প্রথমে মান, প্রতিষ্ঠা, মান্যতা, অর্থ ইত্যাদির কামনা ত্যাগ করতে হয়। এই কামনাগুলি পরিত্যাগ করলেও (দেহের) 'নামে'র প্রতি মমত্ববোধ থাকায় যশ, কীর্তি, সম্মান ইত্যাদির কামনা থেকে যায়। সেইজন্যই মৃত্যুর পরও স্বীয় কীর্তি, নিজের স্মারক তৈরি ইত্যাদি সূক্ষ্ম কামনাগুলি থেকে যায়। এইসব কামনাগুলি নাশ করা প্রয়োজন। কখনো কখনো সাধকের অন্তরে অন্যের প্রশংসা শুনে, অন্যের মান-মর্যাদা দেখে ঈর্ষাভাব জাগ্রত হয়। সুতরাং সেটিও দূর করা প্রয়োজন।

উপরিউক্ত কামনাগুলি দূর করার পরও শরীরে মমত্ববোধ থেকে যায়। মৃত্যুর পরও এই মমত্ববোধ বজায় থাকে। সেইজন্যই মৃতদেহ দাহ করার পরে অস্থি গঙ্গায় বিসর্জন দিলে (যিনি দেহের প্রতি মমত্ববোধ করেছেন সেই) জীবের গতি হয়। 'বিবেক' (জড় চেতন, প্রকৃতি-পুরুষ অথবা দেহ-দেহীর ভিন্নতার জ্ঞান) জাগ্রত হলে মমত্ববোধ দূর হয়। কামনা এবং মমতা—দুটি নাশ হওয়ার পর তাদাত্ম্য (অহংবোধ) দূর হয় বটে তবে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে অহংভাব থেকে যায়। ভগবদ্প্রেম প্রাপ্ত হলে এই সূক্ষ্ম অহংভাবের সর্বতোভাবে নাশ হয়।

মানুষ যখন স্বয়ং এটি উপলব্ধি করতে পারে যে 'আমি শরীর নই ; শরীর আমার নয়', তখন কামনা, মমতা এবং তাদাত্ম্য বা একাত্মবোধ—সবই দূর হয়। এটিই হল প্রকৃত বৈরাগ্য।

প্রকৃত বৈরাগ্য যার থাকে, তার অন্তরের সমস্ত বাসনা নাশ হয়ে থাকে। নিজ স্বরূপের বিজাতীয় (জড়) পদার্থ—শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদিতে কোনোরূপ সম্পর্ক না মেনে 'সকলের কল্যাণ হোক', 'সবাই সুখী হোক', 'সকলে নীরোগ থাকুক', 'কখনো কারও বিন্দুমাত্র দুঃখ না হয়'[1]—এই ভাব থাকাই দৃঢ় বৈরাগ্যের লক্ষণ।

'এই' (ইদম্) রূপে জানা স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ শরীরসহ সমস্ত জগৎকে যে জানে, তাকে বলা হয় 'আমি' (অহম্)। 'এই' (দৃষ্টিগ্রাহ্য বস্তু) এবং 'আমি' (দ্রষ্টা) কখনো এক হতে পারে না, এই হল নিয়ম। এইরূপ জগৎ এবং শরীর হল বিনাশশীল আর আমি (স্বয়ং) অবিনাশী—এই বিচারবোধের মর্যাদা দিয়ে, নিজেকে জগৎ এবং শরীর হতে সর্বতোভাবে পৃথক্ অনুভব করাই হল নিরাসক্তি-অস্ত্রের সাহায্যে সংসার-বৃক্ষ ছেদন করা। এই বিবেককে গুরুত্ব না দেওয়াতেই জগৎ-সংসারকে দৃঢ় মূলসম্পন্ন বলে প্রতীত হয়।

জাগতিক বস্তুগুলির সর্বতোভাবে নাশ করা তো সম্ভব নয়, কিন্তু তার প্রতি আসক্তি সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা সম্ভব। সুতরাং 'ছেদন'-এর অর্থ এইসব বস্তু নাশ করা নয়, সেগুলি থেকে আসক্তিমুক্ত হওয়া। সংসার থেকে সম্পর্ক বিচ্ছেদ হলে নিজের কাছে সংসার সর্বতোভাবে

[1]সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ। সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্ দুঃখভাগ্ ভবেৎ॥

লয় হয়ে যায়, যাকে 'আত্যন্তিক প্রলয়'ও বলা হয়ে থাকে। যেটি আমাদের স্বরূপ নয় এবং যার সঙ্গে আমাদের প্রকৃত কোনো সম্বন্ধ নেই, তাকেই ত্যাগ বা ছেদন করা বলে। আমরা স্বরূপতঃ চেতন এবং অবিনাশী এবং জগৎ-সংসার জড় এবং বিনাশশীল। সুতরাং সংসারের সঙ্গে আমাদের এই সম্পর্ক অবাস্তবিক এবং ভ্রান্ত। আমরা স্বরূপতঃ জগতে অনাসক্তই। প্রথম থেকেই যে অনাসক্ত, সেই অনাসক্ত হতে পারে—এটিই নিয়ম। সুতরাং জগতে আমাদের যে অনাসক্তি, তা স্বতঃসিদ্ধ—এই বাস্তবিক তথ্য দৃঢ়তার সঙ্গে মেনে নেওয়া উচিত। জগৎ যতই দৃঢ় আসক্তিসম্পন্ন হোক না কেন, তার সঙ্গে সম্পর্ক না মানলে তা আপনিই কেটে যায়। কারণ জগতের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্কই নেই, তা শুধু মেনে নেওয়া হয়েছে। তাই জগৎ-সংসারের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক না মানলে তা যে ছেদ হয়ে যায়—এতে সাধকের সন্দেহ রাখা উচিত নয় ; বাহ্যিক ব্যবহারে সেরূপ দেখাক বা না দেখাক।

জীব ভ্রমবশতঃ শরীর-সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক মেনে নিয়েছে। তাই এটি ছেদন করার দায়িত্বও জীবের। তাই ভগবান তাকেই ছেদন করার কথা বলেছেন।

জগৎ থেকে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করার কয়েকটি সহজ উপায়

(১) কোনো কিছু প্রাপ্তির আশা না করে জগৎ হতে প্রাপ্ত সামগ্রীগুলি জগতেরই সেবায় নিয়োজিত করা।

(২) সাংসারিক সুখের (ভোগ ও সম্পদ-সংগ্রহের) কামনা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা।

(৩) সংসারের আশ্রয় সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা।

(৪) শরীর এবং সংসার থেকে 'আমি' এবং 'আমার' ভাব একেবারে দূর করা।

(৫) 'আমি ভগবানের', 'ভগবান আমার'—এই বাস্তব সত্যকে দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করা।

(৬) আমাকে একমাত্র পরমাত্মার দিকেই অগ্রসর হতে হবে—এরূপ দৃঢ়নিশ্চয় (একনিষ্ঠা) হওয়া।

(৭) শাস্ত্রবিহিত নিজ নিজ কর্তব্য-কর্মগুলি (স্ব-ধর্ম) তৎপরতার সঙ্গে পালন করা[১] (গীতা ১৮।৪৫)।

(৮) যুবাবস্থায় শরীর, পদার্থ, পরিস্থিতি, বিদ্যা, সামর্থ্য ইত্যাদি যেমন ছিল, এখন সেরূপ নেই অর্থাৎ সেগুলি সবই পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু আমি 'স্বয়ং' তাই আছি, পরিবর্তিত হইনি—নিজের এই অনুভবের গুরুত্ব দেওয়া।

(৯) সংসারের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্কের সদ্‌ভাব (অস্তি ভাব) দূর করা।

পরিশিষ্ট-ভাব—ভগবান তাঁর বিষয়ে বলেছেন—**'অহমাদিশ্চ মধ্যং চ ভূতানামন্ত এব চ'** (গীতা ১০।২০), **'সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যং চৈবাহমর্জুনং'** (গীতা ১০।৩২) এবং এখানে জগৎ-সংসারের বিষয়ে বলেছেন—**'নান্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা'**। তাৎপর্য হল যে ভগবান আদিতেও আছেন, অন্তেও আছেন এবং মধ্যেও আছেন ; কিন্তু জগৎ-সংসার আদিতেও নেই, মধ্যেও নেই, অন্তেও নেই ; অর্থাৎ জগৎ নেই-ই— **'নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ'** (গীতা ২।১৬)। অতএব একমাত্র ভগবান ব্যতীত আর কিছুই নেই।

'অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা'— এই পদে ব্যবহৃত **'ছিত্ত্বা'** শব্দের অর্থ কাটা অথবা নাশ করা নয়, এর অর্থ হল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা। কারণ এই জগৎ-সংসাররূপী বৃক্ষ ভগবানের অপরা প্রকৃতি হওয়ায় অব্যয়। স্বরূপ আসক্তিবর্জিত— **'অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ'** (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৪।৩।১৫)। স্বরূপে গুণাসক্তি নেই। গুণাসক্তির জন্যই জন্ম-মৃত্যু হয়— **'কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু'** (গীতা ১৩।২১)। অতএব স্বরূপের নিরাসক্তির, নির্লিপ্ততার, অজরতার, অমরতার অনুভব করে তাতে অবস্থান করাকেই বলা হয় জগৎ-সংসার-বৃক্ষ ছেদন করা।

আসক্তির জন্যই জগৎ পরিলক্ষিত হয়। যে বস্তুতে আসক্তি হয়, সেই বস্তুর অস্তিত্ব এবং গুরুত্ব প্রতিপন্ন হয়। যদি আসক্তি না থাকে তাহলে জগতের অস্তিত্ব উপলব্ধ হলেও তার গুরুত্ব থাকে না। সুতরাং **'অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা'** পদটির অর্থ হল—জগৎ-সংসারের আসক্তি সর্বতোভাবে দূর করা অর্থাৎ নিজের হৃদয়ে পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কিছুর

[১] ধর্ম তেঁ বিরতি জোগ তেঁ গ্যানা। গ্যান মোচ্ছপ্রদ বেদ বখানা॥ (শ্রীরামচরিতমানস ৩।১৬।১)

সঙ্গে সম্পর্ক না মানা, জগতের কোনো বস্তুকে নিজের বলে মনে না করা। প্রকৃতপক্ষে জগৎ বন্ধনকারক নয়, তার সঙ্গে আসক্তিপূর্বক সম্পর্ক মেনে নিলেই তা বন্ধনকারক হয়। অস্তিত্ব অর্থাৎ সত্তা কোনো বাধা নয়, বাধা হল আসক্তি। তাই দার্শনিকগণ একে সৎ, অসৎ ইত্যাদি নানাপ্রকারের বললেও ভগবান জগৎ-সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করার কথা বলেছেন। সম্পর্ক ছেদ করলে জগৎ জগৎরূপে অস্তিত্বহীন হয়ে যায় এবং ভগবদ্রূপে প্রতিভাত হয়—**'বাসুদেবঃ সর্বম্'**।

❊ ❊ ❊

সম্বন্ধ—সংসার-বৃক্ষ ছেদন করে সাধকের কী করা কর্তব্য—পরবর্তী শ্লোকে সেই আলোচনা করা হয়েছে।

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী॥ ৪ ॥

[**ততঃ, তৎ** (তারপর সেই) ; **পদম্** (পরমপদ) ; **পরিমার্গিতব্যঃ** (অন্বেষণ করতে হয়) ; **যস্মিন্, গতাঃ** (যাঁকে প্রাপ্ত হলে মানুষ) ; **ভূয়ঃ, ন, নিবর্তন্তি** (আর ইহজগতে ফিরে আসে না) ; **চ, যতঃ** (এবং যাঁর হতে) ; **পুরাণী** (অনাদিকাল থেকে) ; **প্রবৃত্তিঃ** (এই সৃষ্টি) ; **প্রসৃতা** (বিস্তার লাভ করেছে) ; **তম্, আদ্যম্** (সেই আদি) ; **পুরুষম্, এব** (পুরুষ পরমাত্মারই) ; **প্রপদ্যে** (শরণ গ্রহণ করি।)]

তারপর সেই পরমপদ পরমাত্মা, যাঁকে প্রাপ্ত হলে মানুষ আর ইহজগতে ফিরে আসে না এবং যাঁর হতে অনাদিকাল থেকে এই সৃষ্টি বিস্তারলাভ করেছে—'আমি সেই আদি পুরুষ পরমাত্মার শরণ গ্রহণ করি' এই ভাবে তাঁর অন্বেষণ করতে হয়॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা—**'ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যম্'**—ভগবান আগের শ্লোকে **'ছিত্ত্বা'** পদটির সাহায্যে জগৎ থেকে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করার কথা বলেছিলেন। এতে প্রমাণিত হয় যে পরমাত্মাকে অন্বেষণ করার আগে সংসার থেকে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ পরমাত্মা সমস্ত দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদিতে একইভাবে বিদ্যমান, শুধুমাত্র জগতের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নেওয়ার জন্য নিত্যপ্রাপ্ত পরমাত্মার অনুভবে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় থাকলে পরমাত্মার অন্বেষণে শিথিলতা আসে এবং জপ, কীর্তন, স্বাধ্যায় ইত্যাদি সবকিছু করলেও বিশেষ লাভ হয় না। তাই সাধকদের প্রথমে জগৎ হতে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করাকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত।

জীব পরমাত্মারই অংশ। সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক মেনে নেওয়ার জন্যই সে নিজ অংশী পরমাত্মার সঙ্গে নিত্য-সম্বন্ধ বিস্মৃত হয়েছে। সুতরাং এই ভ্রম দূর হলে 'আমি ভগবানেরই'—এই প্রকৃত স্মৃতি ফিরে আসে। তাই ভগবান বলেছেন যে সেই পরমপদ পরমাত্মার সঙ্গে আগে থেকেই নিত্যসম্বন্ধ বিদ্যমান। শুধু সেটিকে অন্বেষণ করতে হবে।

সংসারকে নিজের বলে মনে করায় নিত্যপ্রাপ্ত পরমাত্মাকে অপ্রাপ্ত বলে মনে হয় এবং অপ্রাপ্ত সংসার প্রাপ্ত বলে পরিলক্ষিত হয়। তাই পরমপদ পরমাত্মাকে 'তৎ' পদের দ্বারা নির্দেশ করে ভগবান বলেছেন যে, যে পরমাত্মা নিত্যপ্রাপ্ত, তাঁকেই পূর্ণরূপে সচেষ্ট হয়ে অন্বেষণ করতে হয়।

অন্বেষণ তাকেই করা হয়, যার অস্তিত্ব আগে থেকেই আছে। পরমাত্মা অনাদি এবং সর্বত্র পরিপূর্ণ। সুতরাং এখানে অন্বেষণ মানে এই নয় যে কোনো বিশেষ সাধনার সাহায্যে তাঁকে খুঁজতে হবে। যে সংসার (শরীর, পরিবার, অর্থ-সামগ্রী) কখনো আপন ছিল না, নেই, হবে না ; তার আশ্রয় না নিয়ে, যে পরমাত্মা সর্বদাই আপন, আপনাতে অবস্থিত এবং এখনো আছেন, তাঁর আশ্রয় নেওয়াই হল তাঁর অন্বেষণ করা।

সাধন-ভজন করা সাধকদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ এর মতো ভালো কাজ আর নেই ; কিন্তু 'সাধন-ভজনের দ্বারা পরমাত্মাকে লাভ করব'—এরূপ মনে করা ঠিক নয়। কারণ এরূপ মনে করলে অহংভাব জন্মায়, যা পরমাত্মপ্রাপ্তির পথে বাধাস্বরূপ। পরমাত্মা কৃপা দ্বারা লভ্য। কোনো সাধনা দ্বারা তাঁকে ক্রয় করা যায় না। সাধনার দ্বারা

শুধু অসাধনের (সংসারে একাত্মতা, মমতা এবং কামনার সম্বন্ধ অথবা পরমাত্মাতে বিমুখতা) নাশ হয়, যা নিজেরই করা। তাই সাধনের তাৎপর্য হল অসাধন দূর করা। যদি অসাধন দূর করার সত্যই অভিপ্রায় থাকে, তাহলে পরমাত্মাই কৃপা করে সেই অসাধন দূর করার শক্তি দেন।

সাধকদের চিত্তে প্রায়শঃই এক দৃঢ় ধারণা থাকে যে, যেমন উদ্যোগ করলে জাগতিক পদার্থগুলি প্রাপ্ত করা যায়, তেমনই সাধনা করতে করতে চিত্ত শুদ্ধ হলে পরমাত্মার প্রাপ্তি সম্ভব। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। কারণ পরমাত্মপ্রাপ্তি কোনো কর্মের ফল নয়, তা সে কর্ম যত শ্রেষ্ঠই হোক না কেন ! কারণ কর্ম যত শ্রেষ্ঠই হোক না কেন, তার আরম্ভ এবং শেষ থাকে। সুতরাং তার ফল কী করে নিত্য হবে ? কর্মের ফলও আদি-অন্তবিশিষ্ট হয়। তাই নিত্য পরমাত্মতত্ত্বপ্রাপ্তি কোনো কর্মের দ্বারা হয় না। আসলে ত্যাগ, তপস্যা ইত্যাদির সাহায্যে জড়ত্বের (সংসার এবং শরীর) থেকে শুধু সম্পর্ক ছেদই হয়ে থাকে, যা ভ্রমবশতঃ মেনে নেওয়া হয়েছে। সম্পর্ক ছেদ হলেই যে-তত্ত্ব সর্বত্র সদা বিরাজিত, নিত্যপ্রাপ্ত, তা অনুভূত হয়—তার স্মৃতি জাগরিত হয়।

সম্পূর্ণ উপদেশ শোনার পর অর্জুনও শেষকালে বলেছেন যে—'স্মৃতির্লব্ধা' (১৮।৭৩) 'আমি স্মৃতি ফিরে পেয়েছি'। বিস্মৃতি অনাদি হলেও তার অন্ত আছে। সংসারের স্মৃতি এবং পরমাত্মার স্মৃতিতে অনেক পার্থক্য। জগৎ-সংসারের যে স্মৃতি তাতে বিস্মৃতি হওয়া সম্ভব ; যেমন—পক্ষাঘাত হলে অধীত বিদ্যার বিস্মৃতি হওয়া সম্ভব। অন্যদিকে পরমাত্মার স্মৃতি একবার জাগরিত হলে আর কখনো বিস্মৃতি হয় না (গীতা ২।৭২ ; ৪।৩৫) ; যেমন—পক্ষাঘাত হলেও নিজ অস্তিত্বের ('আমি আছি') বিস্মৃতি হয় না। কারণ হল এই যে, সংসারের সঙ্গে কখনো সম্পর্ক হয় না এবং পরমাত্মার সঙ্গে সম্পর্ক কখনো চ্যুত হয় না।

শরীর ও সংসারের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই—এই তত্ত্ব অনুভব করাই হল সংসার-বৃক্ষ ছেদন করা এবং আমি পরমাত্মার অংশ—এই সত্যে স্থিত থাকাই হল পরমাত্মার অন্বেষণ করা। আসলে সংসার থেকে সম্পর্ক ছেদ হওয়ামাত্রই নিত্যপ্রাপ্ত পরমাত্মতত্ত্ব অনুভূত হয়।

'যস্মিন্গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ'—যাকে প্রথম শ্লোকে **'ঊর্ধ্বমূলম্'** পদে এবং এই শ্লোকে **'আদ্যম্ পুরুষম্'** পদে বলা হয়েছে এবং পরে ষষ্ঠ শ্লোকে যার বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে, সেই পরমাত্মতত্ত্বের নির্দেশ এখানে **'অস্মিন্'** পদের দ্বারা করা হয়েছে।

জলবিন্দু যেমন একবার সমুদ্রে মিশে গেলে তাকে আর পৃথক্ করা যায় না, তেমনই পরমাত্মার অংশ (জীবাত্মা) পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হলে, তাকে আর পৃথক্ করা যায় না অর্থাৎ জগতে পুনরাবর্তন হয় না। প্রকৃতি এবং তার কার্য গুণাদির প্রতি আসক্তির জন্যই উচ্চ-নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করতে হয় (গীতা ১৩।২১)। তাই সাধক যখন নিরাসক্তি-অস্ত্রের সাহায্যে গুণাদির আসক্তি সর্বতোভাবে ছেদন (অসতের সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ) করেন, তখন তাঁর পুনর্জন্মের প্রশ্ন ওঠে না।

'যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী'—এক পরমাত্মাই সমস্ত জগতের স্রষ্টা। তিনিই এই জগতের আশ্রয় এবং প্রকাশক। মানুষ ভ্রমবশতঃ জাগতিক পদার্থে সুখ অনুভব করে জগৎ-সংসারের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং জগতের সৃষ্টিকর্তাকে (পরমাত্মা) ভুলে যায়। পরমাত্মার সৃষ্ট এই জগৎ যখন এত প্রিয় বোধ হয়, তাহলে (জগতের স্রষ্টা) পরমাত্মাকে কতই না প্রিয় লাগবে ? যদিও সৃষ্ট বস্তুতে আকর্ষিত হওয়া একভাবে সৃষ্টিকর্তাতেই আকৃষ্ট হওয়া (গীতা ১০।৪১), তবুও মানুষ অজ্ঞানবশতঃ সেই আকর্ষণে পরমাত্মাকে কারণ বলে মনে না করে জগৎ-সংসারকেই কারণ বলে মনে করে এবং তাতেই আবদ্ধ হয়।

প্রাণীমাত্রেরই স্বভাব হল এই যে, সে যাকে সব থেকে বড় বলে মনে করে অথবা যার থেকে কিছু পাবার আশা করে, তারই আশ্রয় গ্রহণ করতে চায়, তাকেই লাভ করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। যেমন জগতে লোক ধন প্রাপ্তির জন্য এবং তার সংগ্রহের জন্য অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে লেগে থাকে, কারণ অর্থের দ্বারা তার পছন্দ অনুযায়ী বস্তু লাভ করার আশা থাকে। তারা ভাবে যে, 'শরীর-নির্বাহের বস্তুসমূহ অর্থের দ্বারাই পাওয়া যায়, নানাপ্রকার ভোগ, আরামের সামগ্রীও অর্থের দ্বারাই প্রাপ্ত হয়। অতএব অর্থ প্রাপ্তি হলে আমি সুখী হব এবং লোকে আমাকে ধনী বলে মনে করে খুব সম্মান করবে।' এইভাবে অর্থকে সবার ওপরে মেনে নিয়ে তারা লোভের বশবর্তী হয়ে অন্যায়

এবং পাপ-কাজ করতেও দ্বিধাবোধ করে না। এমনকি তারা শরীরের আরামকেও উপেক্ষা করে অর্থ উপার্জনেই তৎপর হয়ে থাকে। তাদের কাছে অর্থের থেকে বড় আর কিছু নয়।

এইরূপে সাধক যখন বুঝতে পারেন যে পরমাত্মার থেকে বড় আর কিছু নেই এবং তাঁর প্রাপ্তিতে এমন আনন্দ লাভ হয় যেখানে জগতের সমস্ত সুখই বিস্বাদ হয়ে যায় (গীতা ৬।২২), তখন তিনি পরমাত্মাকেই লাভ করার জন্য তৎপর হন (গীতা ১৫।১৯)।

'তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে'—যাঁর কোনো আদি (আরম্ভ) নেই ; কিন্তু যিনি সকলের আদি (গীতা ১০।২), সেই আদিপুরুষ পরমাত্মারই আশ্রয় নেওয়া উচিত। পরমাত্মা ব্যতিরেকে কোনো আশ্রয়ই স্থায়ী নয়। অন্য আশ্রয় প্রকৃতপক্ষে কোনো আশ্রয়ই নয়, বরং সেই আশ্রয় পতনকারী হয়। যেমন—সমুদ্রে ডুবন্ত ব্যক্তির কুমিরের আশ্রয় গ্রহণ। এই মৃত্যুরূপ সংসার-সাগরের সকল আশ্রয়ই কুমিরের আশ্রয়ের মতো। সুতরাং মানুষের এই বিনাশশীল জগৎ-সংসারের আশ্রয় না নিয়ে অবিনাশী পরমাত্মার আশ্রয়ই গ্রহণ করা কর্তব্য।

সাধক যখন সম্পূর্ণভাবে চেষ্টা করেও নিজদোষ দূর করতে সক্ষম হন না, তখন তিনি নিজের শক্তির ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। ঠিক এরূপ সময়েই যদি তিনি (নিজের শক্তিতে সর্বতোভাবে নিরাশ হয়ে) একমাত্র ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহলে ভগবদ্‌কৃপায় তাঁর দোষ নিশ্চিতরূপে দূর হয়ে ভগবদ্‌প্রাপ্তি হয়[১]। তাই সাধকের ভগবদ্‌প্রাপ্তিতে কখনো নিরাশ হওয়া উচিত নয়। ভগবানের শরণ গ্রহণ করে নির্ভয় এবং নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত। ভগবানের শরণাগত হলে তাঁর কৃপায় বিঘ্ননাশ এবং ভগবদ্‌প্রাপ্তি—উভয় সিদ্ধিই লাভ হয় (গীতা ১৮।৫৮, ৬২)।

সাধককে যেমন সাংসারিক আসক্তি ত্যাগ করতে হয়, তেমনই নিরাসক্তির আসক্তিও ত্যাগ করতে হয়। কারণ অনাসক্ত হলেও সাধকের মধ্যে 'আমি অনাসক্ত'—এরূপ সূক্ষ্ম অহংভাব (পরিচ্ছিন্নতা) থাকতে পারে, যা পরমাত্মার শরণাগত হলে সহজে মিটে যায়। পরমাত্মার শরণাগত হওয়ার তাৎপর্য হল—নিজ শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহংবোধ, অর্থ-সম্পদ, পরিবার, গৃহ ইত্যাদি সমস্ত পদার্থই পরমাত্মাকে অর্পণ করে দেওয়া অর্থাৎ ওইসব পদার্থগুলি থেকে আপন-ভাব সর্বতোভাবে দূর করা।

শরণাগত ভক্তের মধ্যে দুটি ভাব থাকে—'আমি ভগবানের' আর 'ভগবান আমার'। এই দুইয়ের মধ্যেও 'আমি ভগবানের এবং ভগবানেরই জন্য'—এই ভাবটি বেশি ভালো। কারণ 'ভগবান আমার এবং আমার জন্য'—এই ভাবের মধ্যে নিজের জন্য ভগবানের কাছে কিছু প্রার্থনা থাকে। অর্থাৎ সাধক ভগবানকে দিয়ে নিজের ইচ্ছানুযায়ী কিছু করাতে চায়। কিন্তু 'আমি ভগবানের এবং ভগবানেরই জন্য'—এই ভাবটি কেবল ভগবানের ইচ্ছাই প্রকাশ করে। এইরূপ সাধকের মধ্যে নিজের জন্য কোনো কিছু করা বা পাওয়ার অভীপ্সা না থাকাই হল প্রকৃতপক্ষে অনন্য শরণাগতি। এই অনন্য শরণাগতির দ্বারাই তাঁর ভগবানের প্রতি সেই অনির্বচনীয় এবং অলৌকিক প্রেম জাগরিত হয়, যা ক্ষতি, পূর্তি এবং নিবৃত্তিরহিত হয়ে থাকে ; যাতে নিজ প্রেমীর (প্রভুর) মিলনেও তৃপ্তি হয় না এবং বিরহেও অতৃপ্তি হয় না ; যা প্রতিমুহূর্তে বৃদ্ধি পেতে থাকে ; যাতে অসীম অপার আনন্দ, যার দ্বারা আনন্দ-দাতা ভগবানও আনন্দ পান। তত্ত্বজ্ঞান লাভের পর যে প্রেম লাভ হয়, সেই প্রেম অনন্য শরণাগতির দ্বারাও লাভ করা যায়।

'এব' পদটির তাৎপর্য হল যে অন্যান্য সমস্ত আশ্রয় পরিত্যাগ করে একমাত্র ভগবানেরই আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। এই ভাবই গীতায় **'মামেব যে প্রপদ্যন্তে'** (৭।১৪), **'তমেব শরণং গচ্ছ'** (১৮।৬২) এবং **'মামেকং শরণং ব্রজ'** (১৮।৬৬) পদগুলিতেও ব্যক্ত হয়েছে।

'প্রপদ্যে' বলার অর্থ—'আমি শরণাগত'। এখানে প্রশ্ন আসতে পারে, ভগবান কী করে বলেন যে 'আমি শরণাগত ?' ভগবানও কি কারোর শরণ নেন ? যদি নেন তবে কার ? এর উত্তর হল যে ভগবান কারোরই শরণ

---

[১]জব লগি গজ বল অপনো বরত্যো, নেক সর্‌য়ো নহিঁ কাম।
নিরবল হ্বৈ বলরাম পুকার্‌য়ো আয়ে আধে নাম॥
সুনে রী মৈনে নিরবল কে বল রাম।

গ্রহণ করেন না। কারণ তিনি সকল কিছুর ঊর্ধ্বে। শুধু লোকশিক্ষার জন্য ভগবান সাধকদের ভাষাতেই সাধকদের বলেছেন যে তাঁরা 'আমি শরণাগত' এরূপ যেন চিন্তা করেন।

'পরমাত্মা আছেন' আর 'আমি (স্বয়ং) আছি'—এই দুটিতে 'আছে' রূপে এক পরমাত্মসত্তাই বিদ্যমান। 'আমি' সঙ্গে থাকাতেই 'আছে' পরিবর্তিত হয়েছে 'আছি'-তে। যদি 'আমি' রূপ একদেশীয় স্থিতিকে সর্বদেশীয় 'আছে'-তে লীন করা যায়, তাহলে 'আছে'ই থাকে, 'আছি' থাকে না। যতক্ষণ 'স্বয়ং'-এর সঙ্গে বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়, শরীর ইত্যাদির সম্পর্ক রেখে 'আছি' বজায় থাকে, ততক্ষণ ব্যভিচার-দোষ (ভিন্ন আকর্ষণ) থাকায় অনন্য শরণাগতি হয় না।

পরমাত্মার অংশ হওয়ায় জীব সর্বদা পরমাত্মারই আশ্রিত থাকে ; কিন্তু পরমাত্মা হতে বিমুখ হলে (আশ্রয় নেওয়ার স্বভাব পরিত্যক্ত না হওয়ায়) সে ভ্রমবশতঃ বিনাশশীল জগতের আশ্রয়ের অধীন হয়ে পড়ে, যা কখনো স্থায়ী হয় না। তাই সে দুঃখ পেতেই থাকে। তাই সাধকদের উচিত তার নিজ প্রকৃত সম্বন্ধ জেনে একমাত্র পরমাত্মারই শরণাগত হওয়া।

পরিশিষ্ট-ভাব—জগৎ-সংসার নিত্য নিবৃত্ত, তাই তাকে ত্যাগ করা হয়—**'অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা'** এবং পরমাত্মা নিত্যপ্রাপ্ত, তাই তাঁকে অন্বেষণ করতে হয়—**'ততঃ পদং তৎপরিমার্গিতব্যম্'**। নির্মাণ এবং অনুসন্ধান— দুইয়ের মধ্যে অনেক তফাৎ। সেই বস্তুই তৈরি করা হয়, যা আগে ছিল না আর অন্বেষণ তাকেই করা হয়, যা আগে থেকেই আছে। পরমাত্মা নিত্যপ্রাপ্ত এবং স্বতঃসিদ্ধ, তাই তাঁকে অন্বেষণ করতে হয়, নতুন সৃষ্টি করতে হয় না। সাধক যখন পরমাত্মার সত্তা (অস্তিত্ব) স্বীকার করেন, তখনই অন্বেষণ শুরু হয়। অন্বেষণ দু'প্রকারের—এক হল যেমন কণ্ঠীটি কোথাও রেখে ভুলে গেলে আমরা নানাস্থানে সেটির অনুসন্ধান করতে থাকি, আর দ্বিতীয়টি হল যে কণ্ঠী গলাতেই রয়েছে অথচ যদি মনে হয় যে কণ্ঠী হারিয়ে গেছে, তাহলে নানা স্থানে অন্বেষণ করতে থাকি। পরমাত্মার অন্বেষণ সেই গলার কণ্ঠী খোঁজারই মতো। পরমাত্মা প্রকৃতপক্ষে হারিয়ে যাননি। সংসারের আসক্তির জন্য আমাদের দৃষ্টি পরমাত্মার দিকে যায় না। সেদিকে দৃষ্টি না দেওয়াকেই বলা হয় হারিয়ে যাওয়া। তাৎপর্য হল যে, যে-পরমাত্মাকে আমি চাই, আর যাঁকে আমি অনুসন্ধান করি, সেই পরমাত্মা নিত্য নিরন্তর আমাদের মধ্যেই অবস্থান করছেন ! কিন্তু জগৎ আমাদের মধ্যে নেই। যা আমাদের মধ্যে আছে, তার অন্বেষণ করলে পরিণামে তা পাওয়া যায়। কিন্তু যা আমাদের মধ্যে নেই, তাকে অন্বেষণ করলে, তাকে পাওয়া যায় না ; কারণ প্রকৃতপক্ষে তার কোনো অস্তিত্বই নেই।

পরমাত্মা কখনো অপ্রাপ্ত হননি, হন না এবং অপ্রাপ্ত হওয়া সম্ভবও নয়। তিনি অপ্রাপ্ত হননি, শুধু বিস্মৃত হয়েছেন। এই বিস্মৃতি অনাদি এবং সান্ত (যার অন্ত আছে)। যেমন দুটি ব্যক্তি একে অপরকে চেনে না। এই অপরিচয় কবে থেকে কেউ বলতে পারে না। আমরা যদি সংস্কৃত ভাষা না জানি তবে এই না-জানা কবে থেকে, তা আমরা বলতে পারি না। তাৎপর্য হল যে ব্যক্তিদের অস্তিত্ব, আমাদের অস্তিত্ব, সংস্কৃত ভাষার অস্তিত্ব আগে থেকেই আছে, কিন্তু তার সঙ্গে আগে পরিচয় ছিল না। তেমনই বিস্মৃতির সময়ও পরমাত্মার অস্তিত্ব একইভাবে থাকে। পরমাত্মা নিত্যপ্রাপ্ত, কিন্তু ভ্রান্তিবশতঃ আমরা তা বিস্মৃত হই অর্থাৎ সেদিকে দৃষ্টি দিই না, তাঁর থেকে বিমুখ হই ! তাঁকে অন্বেষণ করলে এই বিস্মৃতি দূর হয় এবং তিনি প্রাপ্ত হন। পরমাত্মাকে অনুসন্ধান করার উপায় হল—যা নেই, সেগুলি পরিত্যাগ করতে থাকা— **'অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা'**। পরিত্যাগ করার অর্থ হল সেগুলির অস্তিত্ব ও গুরুত্ব না মেনে সেগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন না করা, সেগুলিকে অস্বীকার করা। অতএব সাংসারিক বস্তুর পরিত্যাগ করার মধ্যেই পরমাত্মার অনুসন্ধান নিহিত থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত আছে—**'অতত্ত্যজন্তো মৃগয়ন্তি সন্তঃ'** (১০।১৪।২৮)।

'তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে'—সংসার থেকে সম্পর্ক ছেদ হলে ভাবরূপ স্বরূপে স্থিতিলাভ হয় ও সাধক মুক্ত হন। মুক্ত হলে সাংসারিক কামনা দূর হলেও প্রেমের ক্ষুধা মেটে না। ব্রহ্মসূত্রে আছে—**'মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ'** (১।৩।২)। সেই প্রেমস্বরূপ ভগবানকে মুক্ত পুরুষগণের নিকটেও প্রাপ্তব্য বলা হয়েছে। তাৎপর্য হল যে স্বরূপ যার অংশ সেই অংশীর (পরমাত্মার) প্রেম-প্রাপ্তিতেই মানবজীবন পূর্ণতা লাভ করে। স্বরূপে থাকে নিজানন্দ (অখণ্ড আনন্দ) আর অংশীতে থাকে পরমানন্দ (অনন্ত আনন্দ)। যিনি মুক্তিতে বাঁধা পড়েন না, তাতে সন্তুষ্ট হন না, তিনি

প্রতিমুহূর্তে বর্ধমান প্রেমলাভ করেন—**'মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্'** (গীতা ১৮।৫৪)। তাই ভগবান সংসার থেকে সম্বন্ধ ছেদ করে অর্থাৎ মুক্ত হওয়ার পর পরমাত্মার অনুসন্ধান করে তাঁর শরণ গ্রহণ করার কথা বলেছেন।

*** *** ***

সম্বন্ধ—যেসব মহাপুরুষ আদিপুরুষ পরমাত্মার শরণাগত হয়ে পরমপদ প্রাপ্ত হন, পরবর্তী শ্লোকে তাঁদের লক্ষণ বর্ণনা করেছেন।

নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈর্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ॥ ৫ ॥

[**নির্মানমোহাঃ** (অভিমান ও মোহবর্জিত) ; **জিতসঙ্গদোষাঃ** (আসক্তিজনিত দোষগুলি জয় করেছেন) ; **অধ্যাত্মনিত্যাঃ** (পরমাত্মতত্ত্বে নিত্যপ্রতিষ্ঠিত) ; **বিনিবৃত্তকামাঃ** (সমস্ত কামনারহিত) ; **সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ** (সুখ-দুঃখরূপ) ; **দ্বন্দ্বৈঃ, বিমুক্তাঃ** (দ্বন্দ্ব হতে মুক্ত) ; **অমূঢ়াঃ** (মোহবর্জিত) ; **তৎ** (সেই) ; **অব্যয়ম্, পদম্** (অবিনাশী পরমপদকে) ; **গচ্ছন্তি** (প্রাপ্ত হন।)]

যাঁরা অভিমান ও মোহবর্জিত হয়েছেন, যাঁরা সাংসারিক আসক্তিজনিত দোষগুলি জয় করেছেন, যাঁরা নিত্য পরমাত্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত, যাঁরা (স্বদৃষ্টিতে) সমস্ত কামনারহিত হয়েছেন, যাঁরা সুখ-দুঃখরূপ দ্বন্দ্ব হতে মুক্ত, এরূপ (উচ্চ স্থিতিসম্পন্ন) মোহরহিত সাধক ভক্তগণ সেই অবিনাশী পরমপদ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা—**'নির্মানমোহাঃ'**—শরীরে আমি-আমার ভাব থাকলেই মান-সম্মান, মর্যাদা ইত্যাদি পাবার ইচ্ছা হয়। শরীরের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নেওয়ার ফলেই মানুষ শরীরের আদর-আপ্যায়নগুলিকে স্বয়ং-এর আদর-আপ্যায়ন বলে ভুল করে এবং তাতে আবদ্ধ হয়। যেসব ভক্তের শুধু ভগবানের সঙ্গেই আপনভাবের সম্পর্ক, তাঁদের শরীরে 'আমি-আমার' ভাব থাকে না ; তাই তাঁরা দেহের আদর-আপ্যায়নে খুশি হন না। একমাত্র ভগবানের শরণাগত হওয়ায় যখন তাঁদের শরীরের প্রতি মোহ থাকে না, তখন মান-সম্মানের ইচ্ছা কী করে থাকবে ?

একমাত্র ভগবানই উদ্দেশ্য হওয়ায় এবং শুধু ভগবানের শরণপরায়ণ হওয়ায় সেই ভক্তগণ সংসার থেকে বিমুখ হন। তাঁদের মধ্যে কোনো সাংসারিক আসক্তি থাকে না।

'জিতসঙ্গদোষাঃ'—ভগবানের প্রতি আকর্ষণকে 'প্রেম' এবং সংসারের প্রতি আকর্ষণকে 'আসক্তি' বলা হয়। মমতা, আকাঙ্ক্ষা, বাসনা, আশা ইত্যাদি দোষ আসক্তির জন্যই হয়ে থাকে। কিন্তু ভগবদ্‌পরায়ণ হওয়ায় ভক্তদের সাংসারিক ভোগের আসক্তি থাকে না। আসক্তি না থাকায় আসক্তি থেকে উদ্ভূত মমতা ইত্যাদি দোষগুলিও তাঁদের থাকে না।

প্রাপ্ত এবং অপ্রাপ্ত—দুয়েতেই আসক্তি হয় ; কিন্তু কামনা হয় শুধুমাত্র অপ্রাপ্ত বস্তুরই। তাই এই শ্লোকে **'বিনিবৃত্তকামাঃ'** পদটি পৃথক্‌ভাবে উদ্ধৃত হয়েছে।

'অধ্যাত্মনিত্যাঃ'—শুধুমাত্র ভগবানেরই শরণাগত ভক্তের অহংবোধ পরিবর্তিত হয়। 'আমি ভগবানের' এবং 'ভগবান আমার', 'আমি সংসারের নই এবং সংসার আমার নয়'—অহংবোধ এইভাবে পরিবর্তিত হওয়ায়, সাধকের স্থিতি সর্বদা ভগবানেই থাকে[১]। কারণ মানুষের অহংবোধ যেমন হয়, তার স্থিতিও সেইরূপ হয়ে থাকে। কেউ যেমন জন্ম অনুসারে নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে মনে করে এবং তার সেই ব্রাহ্মণত্বের মেনে নেওয়া সম্পর্ক সর্বদা থাকে অর্থাৎ সে সর্বদা ব্রাহ্মণ-ভাবে অবস্থান করে, তা সে সর্বদা মনে রাখুক বা না রাখুক। তেমনই ভক্ত নিজ সম্পর্ক কেবল ভগবানের সঙ্গেই মেনে থাকেন এবং সর্বদা ভগবানেই অবস্থান করেন।

[১]যদিও প্রাণীমাত্রেরই স্থিতি সর্বদা সেই সর্বব্যাপী, সর্বপ্রকাশক, সর্বেশ্বর ভগবানেই থাকে, তবুও তারা ভ্রমবশতঃ নিজ স্থিতি ভগবানে না মেনে, জগতের সঙ্গে মেনে নেয়, যেমন—আমি অমুক বর্ণ, আশ্রম, সম্প্রদায়, নাম, জাতি ইত্যাদির। এই বিপরীত ভাব মেনে নেওয়ার জন্যই তারা আবদ্ধ হয় এবং বারংবার জন্ম-মৃত্যু বরণ করতে থাকে।

'বিনিবৃত্তকামাঃ'—সংসারই ধ্যেয় বা লক্ষ্য হওয়ায় সাংসারিক বস্তু, পরিস্থিতি ইত্যাদির কামনা হয় অর্থাৎ 'ওই বস্তু বা ব্যক্তিকে আমি পেতে চাই'—এইরূপ অপ্রাপ্ত বস্তুর কামনা হয়ে থাকে। কিন্তু যেসব ভক্তের এইসব সাংসারিক বস্তু লাভ করার কোনো উদ্দেশ্য থাকে না, তাঁরা কামনা থেকে সর্বপ্রকারে রহিত হন।

শরীরের প্রতি মমতা থাকায় কামনা উৎপন্ন হয়, যে 'আমার শরীর যেন সুস্থ থাকে, অসুখ না হয় ; শরীর সবল থাকে, যেন দুর্বল না হয়ে পড়ে।' এর ফলে ক্রমশঃ জাগতিক বস্তু, অর্থ, বিষয়-সম্পত্তি ইত্যাদি নানা কামনা উৎপন্ন হয়ে থাকে। শরীরাদিতে মমত্ববোধ না থাকলে ভক্তদের কামনা দূর হয়।

ভক্তগণ অনুভব করে থাকেন যে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহংবোধ (আমি-ভাব)—এ সমস্তই ভগবানের। ভগবান ব্যতীত তাঁর নিজের কিছুই নয়। এরূপ ভক্তদের সমস্ত কামনা বিদূরিত হয়ে থাকে। সেজন্য তাঁদের এইস্থানে **'বিনিবৃত্তকামাঃ'** বলা হয়েছে।

বিশেষ কথা

আসলে শরীরাদি প্রতিক্ষণই বিয়োগের দিকে যাচ্ছে। সাধকের প্রতিমুহূর্তে হওয়া এই বিয়োগকে স্বীকার করে নিতে হয়। এই বিযুক্ত হতে থাকা পদার্থগুলির সঙ্গে সংযোগ মেনে নিলেই কামনা উৎপন্ন হয়। জন্ম থেকে এখন পর্যন্ত নিরন্তর আমাদের প্রাণশক্তি ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে এবং শরীর থেকে প্রতিক্ষণ বিচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে। একদিন যখন মানুষ মারা যায়, তখন লোকে বলে যে, এই ব্যক্তি আজ মারা গেছে। প্রকৃত সত্য হল শরীর আজ মারা যায়নি, প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হওয়া শরীরের আজ শেষ হল। সুতরাং কামনা-নিবৃত্তির জন্য সাধকদের উচিত তাঁরা যেন প্রতিক্ষণ বিয়োগশীল এই শরীরাদি পদার্থকে স্থির মনে করে সেগুলির সঙ্গে কখনো কোনো সম্পর্ক না মানেন।

আসলে কামনা কখনই পূরণ হয় না। যখনই একটি কামনার পূরণ হয়েছে বলে মনে হয় তখনই অন্য অনেক কামনা উৎপন্ন হয়ে থাকে। কামনাগুলির মধ্যে যখন কোনো একটি কামনা পূরণ হওয়ায় মানুষের সুখ প্রতীত হয়, তখন সে অন্যান্য কামনাগুলি পূরণের জন্য চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু নিয়মই হল যে, যতই ভোগ্যপদার্থ পাওয়া যাক, তাতে কামনার নিবৃত্তি কখনোই হয় না। কামনা পূরণের সুখভোগ থেকে নতুন নতুন কামনা উৎপন্ন হতে থাকে—**'জিমি প্রতিলাভ লোভ অধিকাঈ'**। জগতের সমস্ত ব্যক্তি, বস্তু একত্র হলেও যখন কোনো একজন মানুষের কামনা পূরণ করতে সক্ষম হয় না, তখন সীমাবদ্ধ পদার্থের কামনা করে সুখের আশা করাই মহা ভুল। কামনা থাকলে কখনো মানুষ শান্তি পায় না—**'স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী'** (গীতা ২।৭০)। সুতরাং কামনার নিবৃত্তিই হল পরমশান্তির উপায়। তাই নতুন নতুন কামনা পূরণের চেষ্টা না করে সেগুলির নিবৃত্তি করা উচিত।

জাগতিক ভোগ্যপদার্থের দ্বারা সুখলাভ হয়—এরূপ ধারণার ফলেই কামনা উৎপন্ন হয়। এই কামনা যত প্রবল হবে, কাম্য পদার্থ লাভে ততই সুখ হয়। আসলে কামনার পূর্তিতে সুখ হয় না। মানুষ যখন কোনো পদার্থের কামনায় ব্যাকুল হয়ে কামনার দ্বারা সেই পদার্থের সঙ্গে মনে মনে সম্পর্ক স্থাপন করে, তখন সেই পদার্থটি লাভ হলে অর্থাৎ সেই পদার্থটির মন হতে সম্পর্ক বিচ্ছেদ হলে (অভাব চলে যাওয়ায় দুঃখ দূর হলে) সুখ প্রতীয়মান হয়। যদি সে প্রথম থেকেই কামনা না করে, তাহলে পদার্থের প্রাপ্তিতে সুখ এবং অপ্রাপ্তিতে দুঃখ হতে পারে না।

মূলে কামনার সত্তা বলে কিছু নেই-ই। কারণ কাম্য পদার্থেরই যখন কোনো পৃথক্ অস্তিত্ব নেই, তখন তার কামনা কী করে টিঁকে থাকবে ? অতএব সকল সাধকই নিষ্কাম হতে সক্ষম।

'দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ'—এই ভক্তেরা সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদ, রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি দ্বন্দ্বরহিত হন। কারণ তাঁদের কাছে অনুকূল-প্রতিকূল যেসব পরিস্থিতি উপস্থিত হয়, তাঁরা সেগুলি ভগবদ্‌প্রেরিত প্রসাদ বলে মনে করেন। তাঁদের দৃষ্টি থাকে শুধুমাত্র ভগবদ্‌কৃপারই দিকে, অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতির দিকে নয়। সুতরাং 'যা কিছু হয়, তা সবই আমাদের প্রিয় প্রভুরই মঙ্গলময় বিধান'—এরূপ ভাব থাকায় তাঁদের দ্বন্দ্ব সহজেই দূর হয়।

ভগবান সকলেরই সুহৃদ্—**'সুহৃদং সর্বভূতানাম্'** (গীতা ৫।২৯)। তিনি কখনোই তাঁর অংশের (জীবাত্মার) কোনো অহিত করতেই পারেন না। তাঁর মঙ্গলময় বিধানে যেসব পরিস্থিতি আমাদের সামনে উপস্থিত হয়, তা হয় আমাদের পরম হিতেরই জন্য। তাই ভক্ত ভগবানের বিধানে পরম প্রসন্ন থাকেন। শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির দ্বারা অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতির জ্ঞান হলেও 'কেন এমন

পরিস্থিতি হল ?' 'কিংবা এরূপ পরিস্থিতি আসতে থাকুক' ইত্যাদি বিকার বা দ্বন্দ্ব তাঁর মধ্যে আসে না।

বিশেষ কথা

দ্বন্দ্বই রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ ইত্যাদি বিষম, যার থেকে সর্বপ্রকার পাপ উৎপন্ন হয়। অতএব সেই বৈষম্য পরিত্যাগ করার জন্য সাধকদের বিনাশশীল পদার্থের সঙ্গে মেনে নেওয়া গুরুত্ব অন্তর থেকে দূর করা উচিত। দ্বন্দ্বের ভেদ দু'প্রকার—

(১) স্থূল (ব্যবহারিক) দ্বন্দ্ব—সুখ-দুঃখ, অনুকূলতা-প্রতিকূলতা ইত্যাদিকে বলা হয় 'স্থূল দ্বন্দ্ব'। প্রাণীরা সুখ এবং অনুকূল অবস্থা কামনা করে, কিন্তু দুঃখ বা প্রতিকূলতা ইত্যাদি আশা করে না। এই স্থূল দ্বন্দ্ব মানুষ, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ ইত্যাদি সকলের মধ্যেই দেখা যায়।

(২) সূক্ষ্ম (আধ্যাত্মিক) দ্বন্দ্ব—যদিও নিজ উপাসনা এবং উপাস্যকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করে তাঁর সম্মান করা উচিত এবং তা কল্যাণপ্রদ, তা সত্ত্বেও অন্যের উপাসনা এবং উপাস্যকে হীন মনে করে তাকে খণ্ডন বা নিন্দা করাকে বলা হয় 'সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব' ; এটি সাধকদের পক্ষে ক্ষতিকারক।

প্রকৃতপক্ষে সমস্ত উপাসনারই একমাত্র উদ্দেশ্য হল সংসার (জড়ত্বের) থেকে সর্বতোভাবে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করা। সাধকদের রুচি, শ্রদ্ধা-বিশ্বাস এবং যোগ্যতা অনুসারে উপাসনাগুলির মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়, যা হওয়া উচিতও। তাই সাধকদের উপাসনার বিভিন্নতার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে 'উদ্দেশ্যের' অভিন্নতার দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। অন্যের সাধনার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে নিজ উপাসনায় তৎপরতার সঙ্গে ব্যাপৃত থাকলে উপাসনা-সম্পর্কীয় 'সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব' স্বতঃই দূর হয়।

গীতায় **'স্থূল দ্বন্দ্বকে' 'মোহকলিলম্'** (২।৫২) এবং **'সূক্ষ্ম দ্বন্দ্বকে' 'শ্রুতিবিপ্রতিপন্না'**[১] (২।৫৩) পদে বলা হয়েছে। সাধকদের চিত্তে যতক্ষণ সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক বা গুরুত্ব থাকে, ততক্ষণ এই দ্বন্দ্ব থাকে। 'স্থূল দ্বন্দ্ব' সংসারকে বিশেষভাবে অস্তিত্ব ও গুরুত্ব দেয়। অতএব 'স্থূল দ্বন্দ্ব'-কে দূর করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

যতক্ষণ মূঢ়তা থাকে, ততক্ষণ দ্বন্দ্বও থাকে। প্রকৃতভাবে দেখলে বোঝা যায় যে সাধকদের নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব মানা হল মূর্খতার লক্ষণ। রাগ-দ্বেষ, সুখ-দুঃখ, হর্ষ-শোক ইত্যাদি দ্বন্দ্ব অন্তঃকরণে হয়ে থাকে, স্বয়ং-এ (নিজস্বরূপে) নয়। অন্তঃকরণ হল জড় আর 'স্বয়ং' হল চেতন এবং জড়ের প্রকাশক, সুতরাং অন্তঃকরণের সঙ্গে 'স্বয়ং'-এর কোনো সম্বন্ধই নেই। শুধু মেনে নেওয়ার জন্যই এই সম্বন্ধ প্রতীয়মান হয়।

সকলের এই অভিজ্ঞতা আছে যে সুখ-দুঃখ ইত্যাদির দ্বন্দ্বের সময়েও আমরা একই থাকি। এমন নয় যে সুখ এলে আমরা অন্যজন হই আর দুঃখ পেলে অন্যজন। কিন্তু মূর্খতাবশতঃ এই সুখ-দুঃখাদিতে একাত্মতা করে আমরা সুখী বা দুঃখী হয়ে থাকি। আমরা যদি এই গতাগত সুখ-দুঃখের সঙ্গে না মিলে নিজ স্বরূপে স্থিত হই, তাহলে সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব থেকে স্বতঃই রহিত হতে পারি। তাই সাধকদের পরিবর্তনশীল অর্থাৎ এই যাতায়াতকারী অবস্থা (সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদ)গুলির উপর দৃষ্টি না দিয়ে অপরিবর্তনশীল নিজস্বরূপের ওপর দৃষ্টি রাখা উচিত, যা সর্ব অবস্থারই অতীত।

গীতায় ভগবান রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি দ্বন্দ্ব হতে মুক্ত হবার এক অতি সহজ উপায় জানিয়ে বলেছেন যে অনুকূলতা এবং প্রতিকূলতার মধ্যেই রাগ-দ্বেষ লুকিয়ে থাকে। সেগুলি থেকে রক্ষা পাবার জন্য সাধকের কেবল এই সতর্কতার প্রয়োজন হয় যেন তাঁরা যেন এর বশীভূত না হন (গীতা ৩।৩৪)। তাৎপর্য হল এই যে রাগ-দ্বেষের পরিস্থিতি উপস্থিত হলেও সাধক এগুলির বশীভূত হয়ে যেন তদনুসারে কর্ম না করেন। কারণ এগুলির (রাগ- দ্বেষের) প্রভাবে ক্রিয়া করলেই এগুলি পুষ্ট হয়।

'গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ'—বিনাশশীল পদার্থগুলি পাবার আকাঙ্ক্ষা বা চেষ্টা করা এবং সেগুলিতে সুখী বা দুঃখী হওয়া 'মূঢ়তা'। আসলে জগৎ নিত্য পরিবর্তনশীল এবং পরমাত্মা সদা বিরাজিত। পরমাত্মার সত্তা থেকেই এই জগৎ অস্তিত্বসম্পন্নরূপে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু অবিনাশী পরমাত্মা এবং বিনাশশীল জগতের সত্তাকে এক

[১]'শ্রুতিবিপ্রতিপন্ন'র অর্থ হল—শাস্ত্রাদিতে জ্ঞান, কর্ম এবং ভক্তি ; দ্বৈত, অদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত ইত্যাদি সিদ্ধান্ত ; বিষ্ণু, রাম, কৃষ্ণ, শিব, শক্তি, গণেশ ইত্যাদি উপাস্য দেবতা ; সকাম এবং নিষ্কাম-ভাব ইত্যাদি বিভিন্ন বিচারাদি দেখে কোনো একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে না পারা অর্থাৎ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হওয়া।

ধরে নিয়ে 'জগৎ-সংসার আছে' এটি মেনে নেওয়া হল 'মূঢ়তা'।

যেপ্রকার মূর্খ (অজ্ঞান) মানুষদের 'সংসার আছে' বলে স্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়, সেইরূপ জ্ঞানী (মোহবর্জিত) ভক্তদের 'পরমাত্মা আছেন' বলে স্পষ্ট অনুভব হয়। সংসার যেমন দেখা যায়, তা বাস্তবতঃ সেইরূপই—এইরূপ জগৎ-সংসারকে স্থায়ী বলে মনে করা মূঢ়তা (মোহ)। যাঁর এই মূঢ়তা দূর হয়েছে, সেই ভক্তকে এখানে **'অমূঢ়াঃ'** বলা হয়েছে। মূঢ়তা দূর হলে সুখ-দুঃখের কোনো প্রভাব আর পড়ে না। যার ওপর সুখ দুঃখ ইত্যাদি দ্বন্দ্বের প্রভাব পড়ে না, সে মুক্তি লাভের যোগ্য হয় (গীতা ২।১৫)। সেইজন্য এই শ্লোকে ভগবান দুবার মূঢ়তা ত্যাগ করার কথা (**নির্মানমোহাঃ** এবং **অমূঢ়াঃ**) বলে মূঢ়তা ত্যাগ করার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন।

মূঢ়তা বা মোহ দু'প্রকারের হয়—(১) পরমাত্মার শরণাগত না হয়ে সংসারে আকৃষ্ট হওয়া এবং (২) পরমাত্মাকে ঠিকভাবে না জানা। এই শ্লোকে প্রথমে **'নির্মানমোহাঃ'** পদে সংসারের মোহ অপসারণের কথা বলা হয়েছে এবং এখানে **'অমূঢ়াঃ'**[১] পদে পরমাত্মাকে ঠিকমতো জেনে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

যে পরমাত্মার কথা এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে **'ঊর্ধ্বমূলম্'** পদে বলা হয়েছে এবং যে পরমপদরূপ পরমাত্মার অন্বেষণ করার জন্য চতুর্থ শ্লোকে প্রেরণা দেওয়া হয়েছে এবং পরে ষষ্ঠ শ্লোকে যাঁর মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে, সেই পরমাত্মরূপ পরমপদকেই এখানে **'অব্যয়ম্ পদম্'** বলা হয়েছে। উচ্চ স্থিতিসম্পন্ন যে সাধক ভক্ত মান, মোহ, মমতা ইত্যাদি দোষাদি সর্বতোভাবে রহিত হন, তিনি সেই অবিনাশী পরমপদ অবশ্যই প্রাপ্ত হন, যা প্রাপ্ত করে নিলে মানুষ আর এই বিনাশশীল পৃথিবীর জন্ম-মৃত্যু চক্রে ফিরে আসে না।

প্রকৃতপক্ষে মনুষ্যমাত্রই এই পরমপদ স্বতঃই প্রাপ্ত, কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি না থাকায় তারা তা অনুভব করে না। একটি উদাহরণের সাহায্যে এটি বোঝা সম্ভব হবে। আমরা রেলগাড়িতে ভ্রমণ করার সময়, গাড়ি কোনো স্টেশনে থামলে সেইসময় আমাদের পাশে অন্য কোনো গাড়ি হঠাৎ চলতে শুরু করলে সেইদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ভ্রমবশতঃ আমাদের গাড়িটি চলছে বলে মনে হয়। কিন্তু সেদিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে স্টেশনের দিকে তাকালেই বোঝা যায় যে আমাদের গাড়ি একই স্থানে আগের মতোই থেমে আছে। এইরূপ সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক হলে মানুষ নিজেকে সংসারের মতো ক্রিয়াশীল (যাতায়াতকারী) রূপে দেখে থাকে। কিন্তু যখন সে জগৎ-সংসার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিজের স্বরূপের দিকে তাকায়, তখন সে বুঝতে পারে যে আমি সেই স্বয়ং, যে একইভাবে বিরাজমান।

পরিশিষ্ট-ভাব—ভক্তি জ্ঞানযোগ বা কর্মযোগের অন্তর্গত নয়। কিন্তু জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ উভয়ই ভক্তির অন্তর্গত (গীতা ১০।১০-১১)। তাই এইস্থানে **'অধ্যাত্মনিত্যাঃ'** পদে জ্ঞানযোগ এবং **'বিনিবৃত্তকামাঃ'** পদে কর্মযোগকে ধরা যেতে পারে।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—পূর্বশ্লোকে বর্ণিত যে অবিনাশী পদ ভক্তগণ প্রাপ্ত হন, সেই অবিনাশী পদ কেমন—ভগবান তা ব্যক্ত করেছেন।

ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ ৬ ॥

[**তৎ** (সেই পরমপদকে) ; **সূর্যঃ, শশাঙ্কঃ, ন, পাবকঃ** (সূর্য, চন্দ্র বা অগ্নি) ; **ন, ভাসয়তে** (প্রকাশিত করতে পারে না) ; **যৎ, গত্বা** (যাকে প্রাপ্ত হলে) ; **ন, নিবর্তন্তে** (আর ফিরে আসে না) ; **তৎ** (সেটিই) ; **মম** (আমার) ; **পরমম্, ধাম** (পরম ধাম।)]

[১]নির্গুণ তত্ত্বকে যিনি জানেন, তিনি যেমন অমূঢ় (মোহরহিত) হন (৫।২০), তেমনই সগুণ-সাকারকে যিনি দৃঢ়তাপূর্বক মানেন, তিনিও অমূঢ় হয়ে ওঠেন (১০।৩ ; ১৫।১৯)।

সেই পরমপদকে সূর্য, চন্দ্র বা অগ্নি প্রকাশিত করতে পারে না এবং যাকে প্রাপ্ত হলে জীব আর সংসারে ফিরে আসে না, সেইটিই আমার পরম ধাম॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা—[ষষ্ঠ শ্লোকটি পঞ্চম এবং সপ্তম শ্লোক দুটিকে যুক্ত করেছে। এই শ্লোকগুলিতে ভগবান বলেছেন যে, 'এই অবিনাশী পদ আমারই পরম ধাম, এগুলি আমা হতে অভিন্ন এবং জীবও আমার অংশ হওয়ায় আমা হতে অভিন্ন।' সুতরাং জীবেরও এই ধামের সঙ্গে অভিন্ন সম্পর্ক থাকে অর্থাৎ সে এই ধাম (পরমপদ) নিত্যপ্রাপ্ত।

যদিও দ্বাদশ শ্লোকের সঙ্গে এই ষষ্ঠ শ্লোকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে তা সত্ত্বেও পঞ্চম এবং সপ্তম শ্লোক দুটির সমন্বয় করার জন্য এটি এখানে দেওয়া হয়েছে। এই শ্লোকে ভগবান দুটি বিশেষ কথা জানিয়েছেন—(১) সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদি সেই ধামকে প্রকাশিত করতে পারে না (এই অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে ভগবান তার কারণ নিরূপণ করেছেন) এবং (২) সেই ধাম প্রাপ্ত হলে জীব আর ইহজগতে ফিরে আসে না (এই অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে ভগবান কারণরূপে যার নিরূপণ করেছেন।)]

'ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ'—দৃশ্যমান জগতে সূর্যের ন্যায় তেজস্বী, প্রকাশমান আর কোনো বস্তু নেই। সেই সূর্যও যখন এই পরমধামকে প্রকাশ করতে সমর্থ হয় না, তাহলে সূর্য হতে প্রকাশিত চন্দ্র ও অগ্নি তাকে কীভাবে প্রকাশিত করতে সক্ষম ? এই অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে ভগবান স্পষ্টভাবে বলেছেন যে সূর্য, চন্দ্র এবং অগ্নিতেও আমারই তেজ বিরাজমান। আমা হতেই তেজ প্রাপ্ত হয়ে এরা এই ভৌতিক জগৎ প্রকাশিত করে থাকে। সুতরাং যারা এই পরমাত্মতত্ত্ব হতে প্রকাশিত, পরমাত্মস্বরূপ পরমধাম তাদের দ্বারা কীভাবে প্রকাশিত হবে[১] ? তাৎপর্য হল এই যে, পরমাত্মতত্ত্ব চেতন এবং সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি আদি জড় (প্রাকৃত) বস্তু। এই সূর্য, চন্দ্র এবং অগ্নি ক্রমশঃ নেত্র, মন এবং বাণীকে প্রকাশিত করে। এই তিনটিও (নেত্র, মন এবং বাক্য) জড় ! তাই নেত্রের দ্বারা সেই পরমাত্মতত্ত্বকে দেখা যায় না, মনের দ্বারা তাঁকে চিন্তা করা যায় না এবং বাণীর সাহায্যে তাঁর বর্ণনা করা যায় না। জড়-তত্ত্বের দ্বারা চেতন পরমাত্ম-তত্ত্বকে অনুভব করা যায় না। সেই চেতন (প্রকাশক) তত্ত্ব এই সমস্ত প্রকাশিত পদার্থে সর্বদা পরিপূর্ণ। সেই তত্ত্বে নিজ প্রকাশক ভাবের অহংকর্তৃত্ব নেই।

চেতন জীবাত্মাও পরমাত্মার অংশ হওয়ায় 'স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ'। সুতরাং একেও জড় পদার্থ (মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি) প্রকাশিত করতে পারে না। ওইসব জড় পদার্থের প্রয়োজন হল (ভগবানের সম্পর্কে অন্যের সেবা করে) শুধু জড়ত্বের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করানোতে।

এখানে একটি ব্যাপার লক্ষ্য করার হল এই যে, সূর্যকে এইস্থানে 'ভগবান' বা 'দেবতা' বলে না দেখে শুধুমাত্র প্রকাশকারী পদার্থ বলে দেখা হয়েছে। তাৎপর্য হল এই যে, তেজস্-তত্ত্বে সূর্য শ্রেষ্ঠ ; তাই এখানে শুধু সূর্যের কথা নয়, চন্দ্র ইত্যাদি সমস্ত তেজস্-তত্ত্বের কথাই বলা হয়েছে। যেমন, দশম অধ্যায়ের সাঁইত্রিশতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, 'বৃষ্ণিবংশীয়দের মধ্যে আমি বাসুদেব' (গীতা ১০।৩৭), সেখানে 'বাসুদেব'-কে ভগবানরূপে বর্ণনা করা হয়নি, তাঁকে সেখানে বৃষ্ণিবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

'যদ্গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম'—জীব পরমাত্মার অংশ। সে যতক্ষণ নিজ অংশী পরমাত্মাকে প্রাপ্ত না করে, ততক্ষণ তার যাতায়াত দূর হয় না। নদীর জল যেমন তার অংশী সমুদ্রের সঙ্গে মিলনেই স্থিতিলাভ করে, তেমনই জীব তার অংশী পরমাত্মার সঙ্গে মিলনেই প্রকৃত, স্থায়ী শান্তি লাভ করে। জীব প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্ন, কিন্তু জাগতিক (মেনে নেওয়া) আসক্তিবশতঃ

---

[১](ক) ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥
(কঠোপনিষদ্ ২।২।১৫ ; মুণ্ডকোপনিষদ্ ২।২।১০ ; শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ৬।১৪)

'এই পরমাত্মাকে সূর্য প্রকাশিত করতে পারে না, চন্দ্র এবং তারকাও প্রকাশিত করতে পারে না, বিদ্যুৎও প্রকাশ করতে পারে না, তাহলে অগ্নি তাঁকে কীভাবে প্রকাশ করবে ? এই সমস্ত জগৎ সেই পরমাত্মার প্রকাশ থেকেই প্রকাশিত হয়।'

(খ) 'জগৎ প্রকাস্য প্রকাসক রামূ।' (শ্রীরামচরিতমানস ১।১১৭।৪)

তাকে উচ্চ-নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করতে হয়।

এখানে 'পরমধাম' কথাটি পরমাত্মার ধাম এবং পরমাত্মা—উভয়েরই বাচক। পরমধাম হল প্রকাশ-স্বরূপ। যেমন সূর্য নিজ স্থানেও বিশেষভাবে অবস্থিত আবার প্রকাশরূপেও সর্বত্র অবস্থিত অর্থাৎ সূর্য এবং তার প্রকাশ যেমন পরস্পর অভিন্ন, তেমনই পরমধাম এবং সর্বব্যাপী পরমাত্মাও তেমনই পরস্পর অভিন্ন।

ভক্তদের বিশ্বাসের ভিন্নতার জন্য ব্রহ্মালোক, সাকেত ধাম, গোলোক ধাম, দেবীদ্বীপ, শিবলোক ইত্যাদি সমস্তই এক পরমধামের ভিন্ন ভিন্ন নাম। এই পরমধাম চেতন, জ্ঞানস্বরূপ, প্রকাশস্বরূপ এবং পরমাত্মস্বরূপ।

এই অবিনাশী পরমপদ আত্মরূপে সর্বত্র সমানরূপে পরিব্যাপ্ত। সুতরাং আমরা স্বরূপতঃ সেই পরমপদেই অবস্থিত ; কিন্তু জড়ের (শরীর ইত্যাদির) সঙ্গে তাদাত্ম্য, মমতা এবং কামনা থাকায় আমাদের তার প্রাপ্তি অথবা এতে নিজ স্বাভাবিক স্থিতি অনুভূত হয় না।

পরিশিষ্ট-ভাব— আমরা ভগবানের অংশ—**'মমৈবাংশো জীবলোকে'** (গীতা ১৫।৭)। তাই ভগবানের ধাম (লোক), আমাদেরও ধাম। সেই ধামের প্রাপ্তি হলে আর সংসারে (জগতে) ফিরে আসতে হয় না। যতক্ষণ আমরা সেই ধামে পৌঁছতে না পারছি ততক্ষণ আমাদের পথিকের মতো নানা জন্ম ও নানা ধামে (স্থানে) ঘুরতেই হবে, কোথাওই থামতে পারব না। আমরা যদি অতি উচ্চ ব্রহ্মলোকেও যাই, তাহলেও আমাদের সেখান থেকে ফিরে আসতে হবে—**'আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন'** (গীতা ৮।১৬)। কারণ এই সম্পূর্ণ জগৎ-সংসার (সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড) পরদেশ, স্বদেশ নয়। এ হল পরের ঘর, নিজের নয়। নানা জন্মে ও নানা লোকে পরিভ্রমণ করা আমাদের তখনই বন্ধ হবে যখন আমরা আমাদের আসল ঘরে পৌঁছাব।

পরমপদ লাভ করে জগৎ-সংসারে ফিরে না আসার কথা বলা হয়েছে গীতার তিনটি স্থানে—

(১) **যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।** (৮।২১)

(২) **ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্‌গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ।** (১৫।৪)

(৩) **যদ্‌গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।** (১৫।৬)

ভগবান জ্ঞানমার্গে অপুনরাবৃত্তি প্রাপ্তির কথা বললেও —**'গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ'** (গীতা ৫।১৭), ভক্তিমার্গে তাঁর আপন ধাম প্রাপ্তিলাভের কথা বলেছেন—এই হল ভক্তের বৈশিষ্ট্য ! ভগবৎধামে প্রেমের বিশেষ আস্বাদন হয়।

পরমপদকে আধিভৌতিক (সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদি) অথবা আধিদৈবিক (নেত্র, মন, বুদ্ধি, বাক্য ইত্যাদি) কেউই প্রকাশিত করতে সক্ষম হয় না। কেন-না তিনি স্বপ্রকাশ। এতে প্রকাশ্য-প্রকাশকের কোনো পার্থক্য নেই।

'গত্বা'-তে গতি আছে, প্রবৃত্তি নেই ; কারণ অংশের অংশীর দিকেই গতি হয়ে থাকে, প্রবৃত্তি নয়। প্রবৃত্তি পরকীয়, কিন্তু গতি স্বকীয়।

গতি এবং প্রবৃত্তি—গতি হল স্বতঃ এবং স্বাভাবিক এবং এতে পরিশ্রম (চেষ্টা), উদ্যোগ বা কর্তৃত্ব থাকে না। কিন্তু প্রবৃত্তি হল অস্বাভাবিক, শ্রমসাধ্য, উদ্যোগসাধ্য এবং কর্তৃত্ব সহযোগে হয়। প্রবৃত্তি অহং-কর্তৃত্বযোগে হয়, গতি অহং-কর্তৃত্ববোধ না থাকলেও হয়। তাই গতি 'স্ব'-এর দিকে হয় এবং প্রবৃত্তি 'পর'-এর দিকে হয়। গতি পরমাত্মার দিকে হয় আর প্রবৃত্তি সংসারমুখী হয়। গতি চিন্ময়তার দিকে হয় এবং প্রবৃত্তি জড়মুখী হয়। গতি অসীমের দিকে নিয়ে যায় আর প্রবৃত্তি সসীমের দিকে নিয়ে যায়, গতি স্বাধীন করে, প্রবৃত্তি পরাধীন করে। ভোগ এবং সম্পদ সংগ্রহের ইচ্ছা থাকলে প্রবৃত্তি হয় আর অপরকে সেবা দিলে গতি হয়।

গতির উৎপত্তি হয় 'সৎ' থেকে আর প্রবৃত্তির উৎপত্তি 'অসৎ' থেকে। যেমন গঙ্গার উৎপত্তিস্থল গঙ্গোত্রী। যদি গঙ্গার গতি রুদ্ধ করে একটি বাঁধ দেওয়া হয়, যা গঙ্গোত্রীর থেকেও উচ্চ, তাহলে গঙ্গার জল স্বতঃই তার উৎপত্তিস্থল গঙ্গোত্রীর দিকেই যাবে। এইভাবে গঙ্গার নিজ উৎপত্তিস্থলের দিকে যাওয়াকে বলা হয় 'গতি'। সুতরাং গতি দু'প্রকারের হয়—সংসারের (ভোগ ও সম্পদ সংগ্রহের) দিকে যাওয়া বন্ধ করলে অর্থাৎ ওইদিক থেকে মুখ ফেরালে অথবা নিজ উদ্দেশ্য স্থল পরমাত্মার দিকে গেলে অর্থাৎ তাঁর শরণাগত হলে। নিত্যপ্রাপ্ত পরমাত্মাকে অপ্রাপ্ত বলে মেনে নেওয়া হয়েছে—এই

ধারণা দূর করলে পরমাত্মার দিকে স্বতঃই গতি হয়। গতিতে পরমাত্মার সঙ্গে ভিন্নতাবোধের যে ধারণা তা দূর হয়ে প্রকৃত ঐক্য প্রকট হয়।

সাধকের অনেক সময় মনে হয় যে কয়েক বছর আগে যেমন ভাব ও আচরণ ছিল, এখন তা নেই, বরং তার থেকেও ভালো হয়েছে, এটিই হল সাধকের গতি। সাধনাবস্থায় যে গতি থাকে, তাতে অহং-ভাবের সূক্ষ্ম সংস্কার থাকতে পারে, কিন্তু মুক্তিলাভ করার পর প্রতিমুহূর্তে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্রেমের দিকে যে গতি হয়, তাতে অহংভাবের কোনো সূক্ষ্ম-সংস্কারও থাকে না অর্থাৎ অহং সর্বতোভাবে দূর হয়। এর কারণ হল জীব পরমাত্মা থেকে যত সরে থাকে ততই তার মধ্যে অহংভাব থাকে। স্বরূপে স্থিত হলে সূক্ষ্ম অহংভাব থাকে, যা মুক্তির পথে প্রতিবন্ধক স্বরূপ না হলেও অন্যান্য দার্শনিকদের সঙ্গে একমত হতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্নতা হলে অহংবোধ সর্বতোভাবে দূরীভূত হয়।

***

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকটিতে ভগবান তাঁর পরমধাম বর্ণনাকালে বলেছিলেন যে এটি প্রাপ্ত হলে জীব আর ইহলোকে ফিরে আসে না। সেই আলোচনায় তাঁর অংশ জীবাত্মাকেও (পরমধামের ন্যায়) তাঁর থেকে অভিন্ন জানিয়ে, জীবের দ্বারা কী ভুল হয় যার জন্য তারা সেই নিত্যপ্রাপ্ত পরমাত্মস্বরূপ পরমধাম অনুভব করতে পারে না ?—হেতুসহ তারই বর্ণনা পরবর্তী শ্লোকে করেছেন।

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥ ৭ ॥

[**জীবলোকে** (এই জগতে) ; **জীবভূতঃ** (জীবরূপে অবস্থিত) ; **মম, এব** (আমারই) ; **সনাতনঃ, অংশঃ** (সনাতন অংশ) ; **প্রকৃতিস্থানি** (প্রকৃতিতে অবস্থিত হয়ে) ; **মনঃ ষষ্ঠানি** (মনের সহিত ছয়) ; **ইন্দ্রিয়াণি, কর্ষতি** (ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করে।)]

এই জগতে আমারই সনাতন অংশ জীবরূপে অবস্থিত ; কিন্তু সে প্রকৃতিতে স্থিত হয়ে মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে আকর্ষিত করে (নিজের বলে মেনে নেয়)॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা—'**মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ**'—যার সঙ্গে জীবের কোনো তাত্ত্বিক বা স্বরূপগত ঐক্য নেই, সেই প্রকৃতি এবং প্রকৃতির কার্যগুলিকে '**লোক**' বলা হয়। ত্রিলোক, চতুর্দশ ভুবনে জীব যতপ্রকার যোনিতে জন্ম নেয় সমস্ত লোক এবং যোনিগুলিকে '**জীবলোকে**' পদের অন্তর্গত বলে বুঝতে হবে।

আত্মা পরমাত্মার অংশ ; কিন্তু প্রকৃতির কার্য শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ইত্যাদির সঙ্গে নিজের একত্ব মেনে নিয়ে সে 'জীব' হয়ে রয়েছে—'**জীবভূতঃ**'। তার এই জীবভাব সাজানো, বাস্তবিক নয়। নাটকের চরিত্রে অভিনয়ের মতোই এই আত্মা জীবলোকে 'জীব' হয়ে রয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন যে, এই সমস্ত জগৎকে আমার 'জীবভূতা' পরা প্রকৃতি ধারণ করে রেখেছে (৭।৫) অর্থাৎ অপরা প্রকৃতির (জগতের) সঙ্গে প্রকৃত সম্বন্ধ না থাকলেও জীব তার সঙ্গে নিজ সম্বন্ধ মেনে নিয়েছে।

ভগবান জীবকে এত আপন বলে মনে করেন যে তাকে তিনি বলেন—'**মমৈবাংশঃ**'। শুধু মনেই করা নয়, তিনি জানেনও ; তাঁর এই আত্মীয়ভাব কল্যাণদায়ী, অখণ্ড এবং স্বতঃসিদ্ধ।

ভগবান এখানে এই বাস্তব তথ্য প্রকট করেছেন যে জীব কেবল আমারই অংশ ; এতে প্রকৃতির বিন্দুমাত্র অংশও নেই। সিংহশিশু যেমন মেষশাবকের সঙ্গে মিশে নিজেকে মেষ বলে মনে করে, তেমনই জীব শরীর ইত্যাদি জড় পদার্থের সঙ্গে মিশে তার নিজের প্রকৃত চেতনস্বরূপকে ভুলে যায়। সুতরাং এই ভুল দূর করে নিজেকে সর্বদা চেতনস্বরূপ বলে অনুভব করা উচিত। সিংহশিশু মেষশাবকের সঙ্গে থাকলেও সে কখনো মেষ হয় না। অন্য সিংহ এসে তাকে যদি বোধ করিয়ে দেয় যে, '**দেখ ! তোমার আর আমার আকৃতি, স্বভাব, গর্জন সবই একপ্রকার ; সুতরাং তুমি কখনোই মেষ নও, আমারই মতো সিংহ।**' তখন সে নিজেকে চিনতে পারে, তেমনই

ভগবান এখানে **'মম এব'** পদের দ্বারা জীবকে বোধ করাচ্ছেন যে, হে জীব ! তুমি আমারই অংশ। প্রকৃতির সঙ্গে তোমার কখনো সম্বন্ধ ছিল না, নেই, হবে না এবং হওয়া সম্ভবও নয়।

ভগবদ্‌প্রাপ্তির সমস্ত সাধনাতেই অহং-ভাব (আমি-ভাব) এবং মমত্ববোধ (আমার-ভাব)-এর পরিবর্তনরূপ সাধনা অত্যন্ত সহজ এবং শ্রেষ্ঠ । অহংবোধ এবং মমত্ববোধ—এই দুয়েতে সাধকের যেমন ভাব থাকে, সেই অনুসারে তার ভাব এবং ক্রিয়াও স্বতঃ হয়ে থাকে। সাধকের অহংবোধে এই ভাব থাকা উচিত যে 'আমি ভগবানেরই' এবং মমত্ববোধ এরূপ থাকা উচিত যে 'ভগবানই আমার'।

সকলের মধ্যেই এই বোধ থাকে যে আমরা আমাদের যে বর্ণ, আশ্রম, সম্প্রদায় ইত্যাদির বলে মনে করে থাকি, সেই অনুসারেই আমাদের জীবন গড়ে ওঠে। কিন্তু এই মনে করা (যেমন, আমি ব্রাহ্মণ ; আমি সাধু ইত্যাদি) শুধুমাত্র (নাটকের অভিনেতার মতো) কর্তব্য-পালনেরই জন্য। কারণ এটি চিরস্থায়ী নয়। কিন্তু 'আমি ভগবানের' এই বাস্তব সত্য চিরস্থায়ী। 'আমি ব্রাহ্মণ' ; 'আমি সাধু' ইত্যাদি ভাবগুলি কখনো আমাদের বলে না যে 'তুমি ব্রাহ্মণ' বা 'তুমি সাধু।' তেমনই মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, শরীর, অর্থ, সম্পত্তি ইত্যাদি যেসব পদার্থগুলি ভ্রমবশতঃ আমরা নিজের বলে মনে করি, সেগুলি কখনো বলে না যে, তুমি আমার, কিন্তু সমস্ত জগতের সৃষ্টিকর্তা পরমাত্মা স্পষ্ট ঘোষণা করছেন যে জীব সকল আমারই ।

বিচার করে দেখা উচিত যে, শরীরাদি পদার্থগুলি আমরা সঙ্গে করে আনিনি, ইচ্ছানুযায়ী তার পরিবর্তন করতে পারি না, ইচ্ছানুযায়ী সেগুলি নিজের কাছে রাখতে পারি না, আমরাও তার সঙ্গে সর্বদা থাকতে পারি না, নিজের সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি না, তা সত্ত্বেও সেগুলিকে নিজের বলে মনে করি—এ আমাদের এক বড় ভ্রম !

অল্পবয়সে আমাদের মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, শরীর যেমন ছিল, এখন তা নেই, সবই পরিবর্তিত হয়েছে, তা সত্ত্বেও আমরা (স্বয়ং) প্রথমে যেমন ছিলাম, এখনও তাই আছি। কারণ দেহের পরিবর্তন হলেও 'আমার' নিজের কোনো পরিবর্তন হয়নি। এইভাবে দেহের পরিবর্তন আমরা স্পষ্টই প্রত্যক্ষ করতে পারি। যে এই পরিবর্তন অনুধাবন করতে পারে, সে স্বয়ং পরিবর্তনরহিত হয়। অতএব জগতের পদার্থ বা ব্যক্তিসমূহ কেউই আমাদের সঙ্গী নয়।

'আমি ভগবানের'—এরূপ ভাব পোষণ করার অর্থ নিজেকে ভগবানে নিবেদিত করা। সাধকগণের দ্বারা এই ভুলই হয় যে তাঁরা নিজেকে ভগবানে নিবেদিত না করে মন-বুদ্ধিকে ভগবানে নিয়োগ করার চেষ্টা করেন। 'আমি ভগবানের'—এই বাস্তব সত্য ভুলে 'আমি ব্রাহ্মণ' ; 'আমি সাধু' ইত্যাদি বলে মনে করেন এবং মন-বুদ্ধি ভগবানে নিয়োগ করেন। ফলে তার দ্বন্দ্ব কখনো দূর হয় না এবং অনেক চেষ্টা করলেও মন-বুদ্ধি যেমনভাবে ভগবানে রত হওয়া উচিত, তেমন হয় না। ভগবানও এই অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে 'আমি সেই পরমাত্মার শরণাগত' পদটির দ্বারা নিজেকে পরমাত্মাতে সমর্পণ করার কথা বলেছেন। তুলসীদাসও বলেছেন যে, প্রথমে ভগবানের হয়ে গিয়ে তারপর নাম-জপ ইত্যাদি সাধন করলে বহু জন্মের ভুল-ত্রুটি আজ এবং এখনই শুধরে যেতে পারে—

বিগরী জনম অনেক কী সুধ্‌রৈ অবহীঁ আজু।
হোহি রাম কো নাম জপু তুলসী তজি কুসমাজু॥
(দোঁহাবলী ২২)

তাৎপর্য হল এই যে, ভগবানে মন-বুদ্ধি নিয়োগ করার থেকে নিজেকে সমর্পণ করাই শ্রেষ্ঠ। নিজেকে ভগবানে সমর্পণ করলে স্বতঃই অতি সহজে মন-বুদ্ধি ভগবানে নিয়োজিত হয়। নাটকে অভিনেতা হাজার হাজার দর্শকের সামনে বলে থাকেন যে 'আমি রাবণপুত্র মেঘনাদ' আর মেঘনাদের ন্যায় বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপও করে থাকেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে এই অনুভূতি সবসময় থাকে যে, 'এ তো অভিনয়, আসলে আমি তো মেঘনাদ নই।' এইরূপ সাধকদেরও নাটকের অভিনেতাদের মতো নিজ কর্তব্য পালনকালে সর্বদা মনে রাখতে হয় যে 'আমি তো ভগবানের'।

জীব সর্বদাই ভগবানের—**'সনাতনঃ'**। ভগবান জীবকে কখনো ত্যাগও করেননি এবং জীব থেকে কখনো বিমুখ হননি। জীবও ভগবানকে ত্যাগ করতে পারে না। ভগবদ্‌প্রদত্ত স্বাধীনতার অপব্যবহার করে তারা ভগবানের থেকে বিমুখ হয়ে পড়ে। সোনার গহনা যেমন তত্ত্বতঃ সোনা থেকে পৃথক্ হতে পারে না, জীবও সেইরূপ তত্ত্বতঃ পরমাত্মা থেকে কখনো পৃথক্ হতে পারে না।

বুদ্ধিমান বলে কথিত মানুষদের সব থেকে বড় ভুল হল যে তারা আপন অংশী ভগবানে বিমুখ হয়ে থাকে। তারা এদিকে খেয়াল করে না যে ভগবান আমাদের এত সুহৃদ্ (দয়ালু ও প্রেমিক) যে আমরা না চাইলেও তিনি আমাদের চান, আমরা না জানলেও তিনি আমাদের জানেন। তিনি কত উদার, দয়ালু ও প্রেমিক—তা বর্ণনা করা ভাষা, ভাব বা বুদ্ধির দ্বারা সম্ভব নয়। এরূপ সুহৃদ্ ভগবানকে পরিত্যাগ করে বিনাশশীল জড় পদার্থকে নিজের বলে মেনে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়, বরং তা মহামূর্খেরই লক্ষণ।

মানুষ যখন ভগবানের নির্দেশানুসারে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করে, তখন তিনি তার এত উন্নতি সাধন করেন যে তার জীবন সফল হয় এবং জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন চিরকালের মতো দূর হয়। মানুষ যখন ভুলবশতঃ কোনো নিষিদ্ধ আচরণ (পাপ-কাজ) করে বসে, তখন তিনি দুঃখ দিয়ে তাকে সাবধান করেন, পুরানো পাপগুলি ভোগ করিয়ে তাকে শুদ্ধ করেন এবং নতুন পাপের প্রবৃত্তি থেকে রক্ষা করেন।

জীব যেখানেই থাক, নরকে অথবা স্বর্গে, মনুষ্যজন্মে অথবা পশু জন্মে ; ভগবান সবসময়ই তাকে নিজের অংশ বলে মানেন। এ তাঁর অশেষ অহৈতুকী কৃপা, উদারতা এবং মহত্ত্ব। জীবের পতন দেখে ভগবান দুঃখ করে বলেন যে আমার কাছে আসার তাদের সম্পূর্ণ অধিকার থাকা সত্ত্বেও তারা আমাকে প্রাপ্ত না করে (**'মাম্ অপ্রাপ্য'**) নরকে গমন করে (গীতা ১৬।২০)।

মানুষ যে অবস্থাতেই অবস্থান করুক না কেন, ভগবান তাকে কখনো সেই অবস্থায় স্থির থাকতে দেন না ; তাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে থাকেন। যখন আমাদের বর্তমান স্থিতিতে কোনো কিছু পরিবর্তন (সুখ-দুঃখ, সম্মান-নিন্দা ইত্যাদি) আসে, তখন মনে করতে হবে যে, ভগবান আমাদের বিশেষভাবে স্মরণ করে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব করছেন ; আমাদের তাঁর দিকে আকর্ষণ করছেন। এরূপ মনে করে সাধক প্রত্যেক পরিস্থিতিতে বিশেষভাবে ভগবদ্‌কৃপা অনুভব করে যেন আনন্দিত থাকেন এবং কখনো ভগবানকে বিস্মৃত না হন।

অংশীকে লাভ করতে অংশের কোনো কষ্ট বা বিলম্ব হয় না। কষ্ট বা বিলম্ব হয় এইজন্য যে অংশ তার অংশী থেকে বিমুখ হয়ে শরীরাদি প্রাকৃত বস্তুকে নিজের বলে মনে করে আত্মবিস্মৃত থাকে। তাই ভগবানের শরণাগত হলেই তাঁকে লাভ করা স্বতঃসিদ্ধ হয়। তাঁর সম্মুখীন হওয়া জীবেরই কাজ। কারণ জীবই ভগবান হতে বিমুখ হয়েছে। ভগবান জীবকে নিজের বলেই মনে করেন ; জীব ভগবানকে নিজের বলে মেনে নেয় তবে এটি হয় জীবের ভগবানের প্রতি সম্মুখীনতা।

মানুষ মস্ত বড় এই ভুল করে বসে যে, যেসব বস্তু, ব্যক্তি, পরিস্থিতি এখন নেই, অথবা যা পাওয়া নিশ্চিত নয় এবং যা পাওয়া গেলেও সর্বদা থাকবে না—তার প্রাপ্তিকে সে তার সম্পূর্ণ পুরুষার্থ এবং উন্নতি বলে মনে করে। এটি আত্মবঞ্চনা ছাড়া আর কী ? প্রকৃতপক্ষে যা নিত্যপ্রাপ্ত এবং নিজস্ব, সেই পরমাত্মাকে লাভ করাই হল মানুষের পরম পুরুষার্থ এবং শৌর্য। আমরা ধন, সম্পত্তি, সাংসারিক পদার্থ যতই প্রাপ্ত করি না কেন, শেষ পর্যন্ত হয় এগুলি থাকবে না, নতুবা আমরা থাকব না। শেষকালে 'নেই'-ই অবশেষ থাকে। প্রকৃতপক্ষে সর্বদা যা 'থাকে', তাকে (অবিনাশী পরমাত্মাকে) লাভ করাই হল আসল কৃতিত্ব। যা 'নেই' তাকে লাভ করার মধ্যে কোনো বাহাদুরী নেই।

জীব বিনাশশীল পদার্থকে যত গুরুত্ব দেয়, ততই সে পতনের সম্মুখীন হয় আর যতই অবিনাশী পরমাত্মাকে গুরুত্ব দেয়, ততই সে ঊর্ধ্বগতি লাভ করে। কারণ জীব পরমাত্মারই অংশ।

বিনাশশীল জাগতিক বস্তু লাভ করে মানুষ কখনো বড় হতে পারে না। শুধু বড় হবার ভ্রম হয় আর প্রকৃত বড় হওয়া (পরমাত্মপ্রাপ্তি) থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। বিনাশশীল পদার্থগুলি নিয়ে বড় হওয়া কখনো স্থায়ী হয় না এবং পরমাত্মার জন্য যে বড় হওয়া তা কখনো নষ্ট হয় না। তাই জীব যাঁর অংশ, সেই সর্বোচ্চ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করলেই সে বড় হতে পারে। এত বড় হয় যে দেবগণও তাকে সম্মান করেন এবং সে যাতে দেবলোকে যায়, সেই ইচ্ছা পোষণ করেন। শুধু তাই নয়, ভগবানও তার অধীনতা মেনে নেন।

'মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি'—ভগবান যেমন এই শ্লোকের পূর্বার্ধে জীবগণকে নিজের মধ্যে অবস্থিত না বলে, তাঁদের নিজ অংশ বলে জানিয়েছেন, তেমনই শ্লোকের উত্তরার্ধে মন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রকৃতির

অংশ না বলে সেগুলিকে প্রকৃতিতে অবস্থিত বলে জানিয়েছেন। তাৎপর্য হল এই যে, ভগবানের অংশ জীব সর্বদা ভগবানেই অবস্থিত এবং প্রকৃতিতে স্থিত মন এবং ইন্দ্রিয় প্রকৃতিরই অংশ। মন এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে নিজের বলে মনে করা, সেগুলির সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নেওয়াই হল সেগুলিকে আকর্ষিত করা।

এখানে বুদ্ধির অন্তর্ভাব 'মন' শব্দে (যা অন্তঃকরণের উপলক্ষ্য) এবং পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চপ্রাণের অন্তর্ভাব 'ইন্দ্রিয়' শব্দে মেনে নেওয়া উচিত। উপরিউক্ত পদ দ্বারা ভগবান বলেছেন যে আমার অংশোদ্ভূত জীব আমাতে অবস্থিত হয়েও ভ্রমক্রমে নিজের অবস্থিতি শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধিতে বলে মনে করে। যেমন শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রকৃতির অংশ হওয়ায় কখনো প্রকৃতি থেকে পৃথক হয় না, তেমনই জীবও আমার অংশ হওয়ায় আমার থেকে কখনো পৃথক হয় না, হওয়া সম্ভবও নয়। কিন্তু জীব আমা হতে বিমুখ হয়ে আমাকে বিস্মৃত হয়েছে।

এখানে মন এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কথা বলার তাৎপর্য এই যে, এই ছটি দ্বারাই সম্পর্কিত হয়ে জীব আবদ্ধ হয়। সুতরাং সাধকের শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি সমস্তই জগৎ-সংসারে অর্পণ করা উচিত অর্থাৎ জগতের সেবায় নিয়োগ করে নিজেকে ভগবদ্‌চরণে সমর্পণ করতে হয়।

বিশেষ কথা

(১)

মানুষ ভুলবশতঃ শরীর, স্ত্রী-পুত্র, অর্থ, গৃহ-সম্পত্তি, মান-মর্যাদা ইত্যাদি বিনাশশীল বস্তুগুলিকে নিজের এবং নিজের জন্য ভেবে দুঃখ পায়। তার থেকেও হীন ব্যাপার হল এই যে, তারা এই বস্তুগুলিকেই ভোগ ও সংগ্রহের কারণে নিজেকে ধনী বলে ভাবতে থাকে। এগুলিকে নিজের বলে ভাবলেই প্রকৃতপক্ষে এর দাসত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়। আমরা বুঝতে পারি বা না পারি, যেসব পদার্থগুলিকে আমরা প্রয়োজনীয় বলে মনে করি, যার মধ্যে কোনো বিশেষত্ব বা মহত্ত্ব দেখি বা যার জন্য আমাদের কোনো গরজ থাকে, সেই (অর্থ, বিদ্যা) বস্তুগুলি আমাদের থেকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে আর আমরা তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যাই। ওইসব পদার্থের সম্পর্কে যে নিজেকে বড় বলে ভাবে আসলে সে অত্যন্ত তুচ্ছ, তা সেই পদার্থ তার কাছে থাকুক বা না থাকুক।

ভগবানের দাস হলে ভগবান বলে থাকেন—'**মৈ তো হূঁ ভগতনকা দাস, ভগত মেরে মুকুটমণি !**' কিন্তু আমরা যার দাস হয়ে আছি, সেই ধনাদি জড় পদার্থ কখনো বলে না '**লোভী মেরে মুকুটমণি !**' এগুলি কেবল আমাদের দাসই তৈরি করে রাখে। প্রকৃতপক্ষে ভগবানকে নিজের জেনে, তাঁর শরণাগত হলেই মানুষ বড় হয়, ঊর্ধ্বে উঠতে পারে। শুধু তাই নয়, ভগবান এরূপ ভক্তদের নিজের থেকেও বড় বলে মনে করেন ও বলেন—

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগত ৯।৪।৬৩)

'হে দ্বিজ ! আমি ভক্তদের অধীন, স্বাধীন নই। ভক্তগণ আমার অত্যন্ত প্রিয়। আমার চিত্তে তাদের পূর্ণ অধিকার।' কোনো জাগতিক ব্যক্তি-পদার্থ কী আমাদের এত মর্যাদা দিতে পারে ?

জীব পরমাত্মার অংশ হয়েও প্রকৃতির অংশ শরীরাদিকে নিজের বলে মনে করে নিজেই নিজের অপমান করে এবং নিজের পতন ঘটায়। যদি মানুষ এই শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ইত্যাদি জাগতিক পদার্থের দাস না হয়, তবে সে ভগবানেরও ইষ্ট হয়ে ওঠে—'**ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি**' (গীতা ১৮।৬৪)। যিনি ভগবানকে লাভ করেছেন, তাঁকে ভগবান তাঁর প্রিয় বলেন (গীতা ১২।১৩-১৯)। কিন্তু যাঁরা ভগবানকে লাভ করেননি, কিন্তু তাঁকে লাভ করতে চান, সেইসব সাধকদেরও তিনি তাঁর 'অত্যন্ত প্রিয়' বলে থাকেন—'**ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ**' (গীতা ১২।২০)। যিনি সাধকদের 'অত্যন্ত প্রিয়' এবং সিদ্ধ ভক্তদের 'প্রিয়' বলে থাকেন, সেই পরম দয়াময় ভগবানকে মানুষ নিজের বলে মনে করে না—এ তাদের কত বড় ভ্রম !

(২)

জগতের একটি ছোট্ট অংশ হল শরীর আর পরমাত্মার অংশ হল স্বয়ং (জীবাত্মা)। এই ভুল হয় যে, পরমাত্মার অংশ জগতের অংশের সঙ্গে মিলে জগৎ ও পরমাত্মা—উভয়কেই নিজের অনুকূল করে নিতে চায়। এই ভুল মেটানোই হল সাধকের কাজ। এর জন্য তার উচিত শরীরকে জগতের অনুকূল করা আর স্বয়ং পরমাত্মার

অনুকূল হওয়া। তাৎপর্য হল এই যে, শরীরকে জগতের সেবায় সমর্পণ করা, যাতে জগৎ অনুযায়ী এটি কাজ করে ; আর নিজেকে পরমাত্মার প্রতি সমর্পণ করা, যাতে এটি পরমাত্মার ইচ্ছানুযায়ী চলে।

জাগতিক বস্তু জগৎকে দেওয়া আর পরমাত্মার বস্তু পরমাত্মাকে সমর্পণ করা—এটিই হল সততা। এই সততাকেই বলা হয় 'মুক্তি'। যার বস্তু, তাকে না দেওয়া ; জাগতিক বস্তুও নিয়ে নেওয়া আর পরমাত্মার বস্তুও তাঁকে না দেওয়া—এটিই হয় 'বেইমানী'। এর নামই বন্ধন।

জাগতিক বস্তু জগতের প্রতি আর পরমাত্মার বস্তু পরমাত্মায় সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত থাকতে হয়। নিজের কোনো কামনা যেন না থাকে, বাঁচার আকাঙ্ক্ষাও নয়, মৃত্যুর ভয়ও নয়। ভগবান এরূপ করলে ভালো হত ; ভগবান বর্ষা করলে ভালো হত ; খুব গরম পড়ছে, গরম একটু কম পরলে ভালো হত ; বন্যা হচ্ছে, বৃষ্টি একটু কম হলে ভালো হত—এইভাবে মানুষ পরমাত্মাকে এবং জগৎকেও তার অনুকূল করতে চায়। এইসব পরিত্যাগ করে নিজেকে সর্বতোভাবে ভগবদ্চরণে সমর্পণ করে ভগবানে নিবেদন করতে হয় যে, 'হে নাথ ! তুমি আমাকে স্বর্গ-নরক বা পৃথিবী যেখানেই রাখ, শিশু-যুবক বা বৃদ্ধ যে অবস্থাতেই রাখ, অপমানিত কর অথবা সম্মানিত, সুখী কর বা দুঃখী, যে কোনো পরিস্থিতিতেই আমাকে তুমি রাখ না কেন, আমি তোমাকে কখনোই যেন না ভুলি !'

মানুষ যে গৃহটিকে নিজের বলে মনে করে, যে পরিজনদের নিজের বলে মনে করে, যে অর্থ ইত্যাদিকে নিজের মনে করে, তার চিন্তাই সে করে থাকে। জগতে লাখ লাখ গৃহ আছে, কোটি কোটি মানুষ আছে, অজস্র টাকা আছে, কিন্তু সেসবের চিন্তা করে না। কারণ সেগুলিকে সে নিজের বলে মনে করে না। যেগুলি সে নিজের বলে মানে না, সেগুলির থেকে তো সে মুক্তই। সুতরাং বেশির ভাগ মুক্তি তো হয়েই আছে, অল্পই বাকি !

চিন্তা করে দেখতে হয় যে, যেসব বস্তুকে আমরা নিজের বলে মনে করি, এগুলির কোনোটি কি আমাদের সঙ্গে চিরকাল থাকবে ? বস্তু তো চিরস্থায়ী নয়, কিন্তু বন্ধান (ওগুলির সঙ্গে সম্পর্ক) থেকে যায়, যা জন্ম-জন্মান্তর পর্যন্ত সঙ্গে থাকে। সেজন্য সাধকদের উচিত হল, শরীরকে সংসারে অর্পণ করে দেওয়া, যাকে কর্মযোগ বলে ; বা নিজেকে শরীর-সংসার থেকে সর্বতোভাবে পৃথক্ করে নেওয়া, যাকে বলা হয় জ্ঞানযোগ ; অথবা নিজেকে ভগবানে সমর্পণ করা, যাকে বলা হয় ভক্তিযোগ। এই তিনটি সাধনার যে কোনো একটিতে অগ্রসর হলে অন্তিম ফল একই হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব—ভগবান এখানে যাকে নিজ অংশ বলেছেন, সেটিকেই সপ্তম অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে নিজের 'পরা প্রকৃতি' বলে জানিয়েছেন (গীতা ৭।৫)। তাই দুটি স্থানেই 'জীবভূত' (জীব হয়ে থাকা) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে—'জীবভূতঃ', 'জীবভূতাম্'। পরা ও অপরা—দুটিই ভগবানের শক্তি (গীতা ৭।৪-৫)। পরার দৃষ্টি যখনই ভগবানের থেকে সরে গিয়ে অপরার দিকে যায়, তখনই পরা জন্ম-মৃত্যু চক্রে পতিত হয়। এই কথাটিই সপ্তম অধ্যায়ে **'যয়েদং ধার্যতে জগৎ'** পদের দ্বারা এবং এইস্থানে **'মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি'** পদের দ্বারা বলা হয়েছে।

যদিও অপরাও ভগবানেরই, তাহলেও তার স্বভাব আলাদা (পরিবর্তনশীল)। তাই ভগবান নিজেকে অপরার অতীত বলে জানিয়েছেন—**'যস্মাৎক্ষরমতীতোঽহম্'** (গীতা ১৫।১৮)। কিন্তু পরা এবং ভগবান একই স্বভাব-সম্পন্ন (অপরিবর্তনশীল)। তাই **'মমৈবাংশঃ'** পদটিতে **'এব'** বলার অর্থ হল যে জীব শুধুমাত্র আমার (ভগবানের) অংশ, এতে প্রকৃতির বিন্দুমাত্র অংশ নেই। যেমন শরীরে মা এবং বাবা—উভয়ের অংশের মিশ্রণ থাকে, তদনুরূপ জীবে আমার ও প্রকৃতির অংশের মিশ্রণ (সংযোগ) নেই, এ শুধু আমারই অংশ। অতএব এর সম্বন্ধ কেবল আমারই সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে নয়। এ নিজেই প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে—**'মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি।'**

অপরা প্রকৃতি হল ভগবানের, কিন্তু জীব তাকে নিজের বলে মনে করে তার থেকে সুখ গ্রহণ করতে থাকে, সেইজন্যই সে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। নিজের নয় বলেই বস্তু অথবা সুখ—কোনোটিই স্থায়ী হয় না।

স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ-শরীরের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নেওয়াই হল বিপদের মূল কারণ। জীব শরীরকে নিজের

দিকে আকর্ষণ করে (কর্ষতি) অর্থাৎ নিজের বলে মেনে নেয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যা আপন, সেই পরমাত্মাকে নিজের বলে মানে না। জীবের এটিই হল প্রধান ভুল।

জীব ব্রহ্মের (নির্গুণের) অংশ নয়, জীব হল ঈশ্বরের (সগুণের) অংশ—**'ঈশ্বর অংস জীব অবিনাশী'** (শ্রীরামচরিতমানস ৭।১১৭।১)। কারণ ব্রহ্ম হলেন শুধুমাত্র চিন্ময় সত্তা, সুতরাং তাতে অংশ-অংশীভাব হতেই পারে না। জীবের ব্রহ্মর সঙ্গে ঐক্য (সাধর্ম্য) আছে অর্থাৎ নানা রূপে যে জীব প্রতিভাত হয়, তাই সমগ্ররূপে ব্রহ্ম । শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক থাকায় সেটি হল জীব আর শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকায় সেটি হল ব্রহ্ম। অতএব প্রকৃত পক্ষে জীব এবং ব্রহ্ম—উভয়ই সমগ্র ভগবানেরই অংশ। তাই ভগবান নিজেকে ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা (আধার) বলে জানিয়েছেন— **'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্'** (১৪।২৭) এবং ব্রহ্মকে তাঁর নিজের সমগ্ররূপেরই এক অঙ্গ বলে জানিয়েছেন—**'তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ ......'** (৭।২৯-৩০)।

মন এবং ইন্দ্রিয় যার অংশ, তাতেই অবস্থান করে—**'প্রকৃতিস্থানি।'** এর থেকে জীবের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যে, আমিও যাঁর অংশ, তাঁতেই নিরন্তর থাকা উচিত, তাঁরই সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত। এই সম্পর্ক স্ব-স্বরূপকেই স্থাপন করতে হয়, অন্য কেউ করে না। কারণ স্ব-স্বরূপই জগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে এবং সে-ই পরমাত্মা হতে বিমুখ হয়েছে। জগতের সম্মুখীন হওয়াতে (সম্পর্ক স্থাপনে) জগৎ কারণ নয় এবং পরমাত্মা হতে বিমুখ হওয়ায় পরমাত্মা কারণ নন, দুটিতেই স্ব-স্বরূপ হল কারণ। পরমাত্মার অংশ হওয়ায় জীব স্বাধীন এবং সে এই স্বাধীনতারই দুরুপযোগ করে। তাই স্ব-স্বরূপকেই এর সদুপযোগ করতে হবে—**'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্'** (গীতা ৬।৫)।

প্রকৃতির সঙ্গে মন এবং ইন্দ্রিয়গুলির নিত্য ও যথার্থ সম্পর্ক থাকে, কিন্তু মন এবং ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে স্বস্বরূপের (আত্মার) সম্পর্ক হল অনিত্য ও মেনে নেওয়া। অনিত্য সম্পর্ক কখনো স্থায়ী হয় না, এটি পরিবর্তিত হয় এবং বিনষ্ট হতে থাকে। স্ব-স্বরূপের পরমাত্মার সঙ্গে নিত্য সম্পর্ক, যার কখনো পরিবর্তন হয় না, বিনাশও হয় না। কিন্তু অনিত্য সম্পর্ককে স্বীকার করে নেওয়ায় সেই নিত্য সম্পর্ক হতে বিমুখভাব আসে, যার ফলে নিত্য-সম্পর্কের অনুভব হয় না।

'মমৈবাংশো জীবলোকে' পদটিতে এই অর্থ হয় যে আমরা প্রভুকে শুধু আপন বলে মনে করি, কিন্তু তিনি আমাদের আপন বলে জানেন ! জীব যখন ভগবানের শরণাগত হয়, তখন সেও প্রভুকে আপন বলে জানতে পারে—**'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে'** (গীতা ৭।১৪)।

জীব ভগবানের সনাতন অংশ ; সুতরাং ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক যোগ করা অর্থাৎ তাঁকে আপন বলে মনে করাই হল তার প্রকৃত উদ্যম। শরীরের দ্বারা মুখ্য উদ্যম হল ক্রিয়া, যা সংসারের জন্যই হয় ; কারণ শরীরও সংসারের অংশ। কিন্তু স্ব-স্বরূপ দ্বারা যে পুরুষার্থ হয় তাতে ভাব হল মুখ্য। তাই কু-কর্মরহিত হওয়া, আসক্তিবর্জিত হওয়া, ভগবানকে আপন বলে মনে করা—এগুলি স্ব-স্বরূপেরই পুরুষার্থ। কু-কর্মরহিত হলে মানুষ জগৎ-সংসারের পক্ষে উপযোগী হয়ে ওঠে। শরীর সংসার থেকে আসক্তিবর্জিত হলে সে নিজের জন্য উপযুক্ত হয়। ভগবানকে আপন বলে মেনে নিলে ভগবানের উপযুক্ত হয়। কু-কর্মরহিত না হলে মানুষ সংসারের উপযুক্ত হয় না। শরীর-সংসারে আসক্তিবর্জিত না হলে মানুষ নিজের জন্য উপযুক্ত হতে পারে না। ভগবানের সঙ্গে আত্মীয়তাবোধ না জন্মালে মানুষ ভগবানের জন্য উপযুক্ত হয় না।

আমি কু-কর্মরহিত হব, আমি অনাসক্ত হব, আমি ভগবৎপ্রেমিক হব—এই তাগিদ অনুভব করাও প্রকৃত পুরুষার্থ (উদ্যম)। কিন্তু সর্বপ্রথম সাধকের অনুধাবন করা উচিত যে আমি কু-কর্মরহিত হতে পারি, অনাসক্ত হতে পারি, প্রেমিক হতে পারি। তার জন্য সাধককে জানতে হবে যে সংসারের সম্পর্কে আমরা সব এক, আত্মার সম্পর্কেও আমরা সব এক এবং পরমাত্মার সম্পর্কেও আমরা সবাই এক। যেমন নিজ শরীর সম্পর্কে হিতের ভাবনা থাকে, তেমনই সকল শরীরের জন্যও হিতের ভাবনা থাকা উচিত অথবা যেমন সকল শরীরের প্রতি আমরা নির্লিপ্ত থাকি, তেমনই নিজ শরীরের প্রতিও আমাদের নির্লিপ্ত থাকা উচিত। সকল শরীরের সঙ্গে নিজ শরীরের ঐক্য মেনে নিলে আমরা কু-কর্মবর্জিত হতে পারি। নিজ শরীর সহ সকল শরীরে মমত্ব পরিত্যাগ করে আমরা অনাসক্ত (স্ব-স্বরূপে স্থিত) হতে পারি। সমস্ত জগৎ-সংসারে অনাসক্ত হয়ে আমরা ভগবৎপ্রেমী হতে পারি।

আমাদের সম্পর্ক পরমাত্মার সঙ্গে—**'মমৈবাংশো জীবলোকে'**, তাই আমরা পরমাত্মায় অবস্থিত। কিন্তু শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির সম্বন্ধ অপরা প্রকৃতির সঙ্গে, সেইজন্য এগুলি প্রকৃতিতে স্থিত—**'প্রকৃতিস্থানি'** । **'বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্'** (গীতা ১৩।১৯)। শরীরের সঙ্গে আমাদের একাত্মতা কখনো হয়নি, তা নেই, তা হবে না এবং তা হতে পারে না এবং পরমাত্মা থেকে আমরা কখনো পৃথক্ হইনি, হব না এবং হতে পারি না। আমাদের কাছে দূর হতে দূরতম বস্তু হল শরীর আর নিকট হতে নিকটতম হলেন পরমাত্মা। কিন্তু কামনা-মমতা দ্বারা একাত্মতাবশতঃ মানুষ বিপরীতভাব পোষণ করে অর্থাৎ শরীরকে নিকটতম এবং পরমাত্মাকে দূরতম ভাবে ! শরীরকে প্রাপ্ত ও পরমাত্মাকে অপ্রাপ্ত ভাবে।

শরীরকে নিজের বলে মেনে নেওয়া হয় যে ধারণা থেকে সেটি ত্যাগ করার জন্য সাধককে তিনটি বিষয় মেনে চলতে হয়—১) শরীর আমার নয় ; কারণ এটি আমার বশে নেই। ২) আমার কিছু প্রয়োজন নেই এবং ৩) আমার নিজের জন্য কিছু করার নেই। সাধক যতক্ষণ স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ—এই তিনিটি শরীরের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মানতে থাকেন, ততক্ষণ স্থূল শরীর দ্বারা হওয়া 'কর্ম', সূক্ষ্মশরীর দ্বারা হওয়া 'চিন্তা' এবং কারণশরীর দ্বারা হওয়া 'স্থিরতা' (নির্বিকল্প অবস্থা)—এই তিনটিই তাঁর পক্ষে বন্ধনকারক হয়। কিন্তু তিনটি শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হলে সে কর্ম, চিন্তা এবং স্থিরতা—এই তিনের দ্বারা বাঁধা পড়ে না অর্থাৎ এই তিনটি থেকে আসক্তি দূর হয়।

ভগবানের নিত্য সম্পর্কের জাগৃতির জন্য সাধকের তিনটি ব্যাপার মানা উচিত— ১) প্রভু আমার, ২) আমি প্রভুর এবং ৩) সবকিছু প্রভুরই। ভগবানের সঙ্গে নিত্য সম্পর্ক জাগ্রত হলে সাধকের ভগবৎপ্রেমের প্রাপ্তি হয়। ভগবৎপ্রেমের প্রাপ্তিতেই মনুষ্যজীবন পূর্ণতা পায়।

মানুষের তিন প্রকারের ইচ্ছা থাকে—ভোগেচ্ছা, তত্ত্বের ইচ্ছা এবং প্রেমের পিপাসা। ভোগেচ্ছাকে বলা হয় 'কামনা', তত্ত্বের ইচ্ছা হল 'জিজ্ঞাসা', আর প্রেমের ইচ্ছাকে বলা হয় 'পিপাসা' (অভিলাষ)। ভোগের কামনা হয় শরীরকে ধরে, তত্ত্বের জিজ্ঞাসা হয় স্বরূপকে নিয়ে আর প্রেমপিপাসা হয় পরমাত্মাকে নিয়ে। শরীরকে নিজের বলে মনে করা ভুল ; কারণ শরীর প্রকৃতির অংশ। সুতরাং শরীর নিয়ে যে ভোগের আকাঙ্ক্ষা, তা প্রাকৃত (অসৎ), তাই সেটি নিজের নয় ; এটি ভ্রমবশতঃ হয়। কিন্তু তত্ত্ব ও প্রেমের ইচ্ছা ভ্রম নয়, এগুলির নিজেরই। তাই শরীরকে নিষ্কামভাবে পরিবার, সমাজ এবং জগৎ-সংসারের সেবায় নিয়োগ করলে অথবা তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার জোর হলে ভ্রম দূরীভূত হয়। ভ্রম দূর হলে ভোগেচ্ছা দূর হয়। ভোগেচ্ছা দূর হলে তত্ত্বজিজ্ঞাসা পূর্ণ হয় এবং সাধক স্বরূপে স্বাভাবিক স্থিতি অনুভব করেন অর্থাৎ তাঁর তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় এবং তিনি জীবন্মুক্ত হন। তারপর স্বরূপ যাঁর অংশ, সেই পরমাত্মার প্রেমপিপাসা জাগ্রত হয়। সকল জীবই পরমাত্মার অংশ। তাই জীবমাত্রেরই অন্তিম ইচ্ছা হল প্রেমের। প্রেমের ইচ্ছা হল সার্বভৌম ইচ্ছা। প্রেমপ্রাপ্তি হলে মনুষ্যজন্ম পূর্ণতা লাভ করে, তারপরে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

***

সম্বন্ধ—মন সহ ইন্দ্রিয়াদিকে নিজের বলে মনে করলে জীব কীভাবে সেগুলিকে নিয়ে নানা যোনিতে পরিভ্রমণ করে—দৃষ্টান্ত সহযোগে ভগবান তার বর্ণনা করছেন।

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥ ৮ ॥

[**বায়ুঃ** (বায়ু) ; **আশয়াৎ** (গন্ধের স্থান থেকে) ; **গন্ধান্** (গন্ধকে) ; **ইব, ঈশ্বরঃ, অপি** (তেমনই শরীরের অধিপতি জীবাত্মাও) ; **যৎ, শরীরম্** (যখন শরীরকে) ; **উৎক্রামতি** (পরিত্যাগ করার কালে) ; **এতানি** (মনসহ ইন্দ্রিয়কে) ; **গৃহীত্বা** (গ্রহণ করে) ; **যৎ** (যে দেহকে) ; **অবাপ্নোতি** (প্রাপ্ত হয়) ; **সংযাতি** (গমন করে।)]

বায়ু যেমন গন্ধের স্থান থেকে গন্ধ গ্রহণ করে নিয়ে যায়, তেমনই শরীরের অধিপতি জীবাত্মাও একটি দেহ পরিত্যাগ করার কালে মন সহ ইন্দ্রিয়াদিকে সঙ্গে নিয়ে অন্য দেহকে আশ্রয় করে॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা—'বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ'—যেমন, বায়ু আতরের সুগন্ধ থেকে গন্ধ নিয়ে যায় ; কিন্তু সেই গন্ধ বায়ুতে স্থায়ীভাবে থাকে না, কারণ বায়ু ও গন্ধের সম্পর্ক নিত্য নয়, তেমনই ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, স্বভাব ইত্যাদি (সূক্ষ্ম এবং কারণ—উভয় শরীরই) নিজের বলে মনে করায় জীবাত্মা সেগুলিসহ অন্য যোনিতে জন্ম নেয়।

বায়ু যেমন তত্ত্বতঃ গন্ধে নির্লিপ্ত, তেমনই জীবাত্মাও তত্ত্বতঃ মন, ইন্দ্রিয়াদি, শরীর ইত্যাদিতে নির্লিপ্ত ; কিন্তু এই মন, ইন্দ্রিয় ও শরীরাদিতে আমি ও আমার ভাব থাকায় জীবাত্মা এগুলিকে আকর্ষণ করে থাকে।

যেমন, বায়ু আকাশের কার্য হয়েও পৃথিবীর অংশোদ্ভূত গন্ধকে নিয়ে পরিভ্রমণ করে, তেমনই জীবাত্মা পরমাত্মার সনাতন অংশ হয়েও প্রকৃতির কার্য (প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তনশীল) শরীরকে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন যোনিতে পরিভ্রমণ করে। জড় পদার্থ হওয়ায় বায়ুর গন্ধ বহন করবে কিনা এই বিচারবোধ থাকে না ; কিন্তু জীবাত্মার এই বিবেক এবং সামর্থ্য আছে যে, সে যখনই ইচ্ছা করবে তখনই শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে। ভগবান প্রত্যেক মানুষকেই এই স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছেন যে, সে যার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে চায় তার সঙ্গেই সম্পর্কিত হয় আবার যার সঙ্গে সম্পর্ক না রাখতে চায়, তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতেও পারে। নিজের ভুল দূর করার জন্য তার শুধু নিজের মান্যতার এই ব্যাপারই বদলাতে হয় যে প্রকৃতির অংশ এই স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ শরীরের সঙ্গে আমার (জীবাত্মার) কোনো সম্পর্ক নেই। তাহলেই অত্যন্ত সহজে জন্ম-মৃত্যু বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ হয়।

ভগবান দৃষ্টান্তরূপে এখানে তিনটি শব্দ বলেছেন—(১) বায়ু, (২) গন্ধ, (৩) আশয়। 'আশয়' বলা হয় আধারকে ; যেমন—জলাশয় (জল+আশয়)। এখানে স্থূল শরীরকে বলা হয়েছে আশয়। যেমন গন্ধের স্থান (আশয়) আতর থেকে বায়ু সুগন্ধ বহন করে নিয়ে যায় এবং পিছনে আতরের শূন্য স্থানটি পড়ে থাকে, জীবাত্মাও তেমনই বায়ুবহ গন্ধরূপ সূক্ষ্ম এবং কারণ শরীরকে সঙ্গে করে নিয়ে যায় এবং গন্ধের আশয়রূপ স্থূলশরীর পিছনে পড়ে থাকে।

'শরীরং যদবাপ্নোতি ...... গৃহীত্বৈতানি সংযাতি'—এখানে **'ঈশ্বরঃ'** পদটি জীবাত্মার বাচক। এই জীবাত্মার দ্বারা প্রধানতঃ তিনটি ভুল হয়ে থাকে—

(১) নিজেকে মন, বুদ্ধি, শরীর ইত্যাদি জড় পদার্থের প্রভু বলে মনে করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে স্বয়ং তার দাস হয়ে যায়।

(২) নিজেকে এই সমস্ত জড় পদার্থের প্রভু বলে মনে করায় নিজের প্রকৃত প্রভু পরমাত্মাকে ভুলে যায়।

(৩) জড় পদার্থের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক ত্যাগ করাতে স্বাধীন হলেও সে সেগুলিকে ত্যাগ করতে চায় না।

পরমাত্মা জীবাত্মাকে শরীর ইত্যাদি সামগ্রীর সদ্ব্যবহার করার স্বাধীনতা প্রদান করেছেন। এগুলির সুব্যবহার করে জীবকে উদ্ধারলাভের জন্যই এইসব বস্তু প্রদান করেছেন, প্রভু হবার জন্য নয়। কিন্তু জীব ভ্রমবশতঃ সেগুলির সদ্ব্যবহার না করে নিজেকে সেগুলির মালিক বলে মনে করে, আর সেগুলির দাস হয়ে পড়ে।

জীবাত্মা জড় পদার্থের সঙ্গে সম্পর্ক তখনই পরিত্যাগ করতে সক্ষম হয় যখন সে বুঝতে পারে যে এগুলির মালিক হলে সে এগুলির অধীন হবে এবং তার পতন হবে। সে যার প্রভু হয়, তাকে তার দাসত্বই করতে হয়। কিন্তু ভ্রমবশতঃ সে মনে করে যে, সে-ই এগুলির মালিক। জড় পদার্থগুলির মালিক হলে প্রথমতঃ তার সেই পদার্থগুলির অভাব অনুভূত হয় এবং দ্বিতীয়তঃ নিজেকে 'অসহায়' বলে মেনে নেয়।

যার কর্তৃত্ব বা অধিকার প্রিয় বলে মনে হয়, সে পরমাত্মাকে লাভ করতে পারে না। কারণ যে ব্যক্তি কোনো মানুষের, বস্তুর, পদের প্রভু হয়ে ওঠে, সে নিজের প্রভুকে ভুলে যাবে—এই হল নিয়ম। উদাহরণ—বালক যখন মাকে তার নিজের বলে মনে করে, তাঁকে পেতে চায়, তখন সে মাকে ছাড়া থাকতে পারে না। কিন্তু সে যখন বড় হয়ে সংসার করে এবং নিজেকে স্ত্রী-পুত্রের প্রভু বলে মনে করে, তখন সেই মায়ের কাছে থাকতে তার আর ভালো লাগে না। প্রভু হওয়ার এই হল পরিণাম ! এইরূপ এই জীবাত্মাও শরীর ইত্যাদি জড় পদার্থের প্রভু হয়ে তার প্রকৃত প্রভু পরমাত্মাকে বিস্মৃত হয়—তাঁর প্রতি বিমুখ হয়ে পড়ে। যতক্ষণ এই ভুল বা বিমুখতা থাকে, ততক্ষণ জীবাত্মা দুঃখই পেতে থাকে।

'ঈশ্বরঃ' পদের সঙ্গে **'অপি'** পদটির এক বিশেষ তাৎপর্য হল এই যে এই ঈশ্বর হয়ে ওঠা জীবাত্মা বায়ুর ন্যায় অসমর্থ, জড় ও পরাধীন নয়। জীবাত্মাতে এমন সামর্থ্য এবং চিন্তাশক্তি থাকে যে, সে যখনই ইচ্ছা করে, তখনই সে এই মেনে নেওয়া সম্পর্ক পরিত্যাগ করতে পারে এবং

পরমাত্মার সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ অনুভব করতে পারে। কিন্তু সংযোগজনিত সুখের আকাঙ্ক্ষায় সে এই জগতের মেনে নেওয়া সম্পর্কগুলি ত্যাগ করে না এবং ত্যাগ করতে চায়ও না। জড়ত্বের সঙ্গে (শরীরাদি) তাদাত্ম্য দূর হলে জীবাত্মা গন্ধের মতো শরীরকে (সূক্ষ্ম-কারণ) সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে না।

জীব দুটি শক্তি লাভ করেছে—(১) প্রাণশক্তি, যার দ্বারা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস হয় এবং (২) ইচ্ছাশক্তি, যার দ্বারা ভোগাকাঙ্ক্ষা জন্মায়। প্রাণশক্তি নিত্য ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে। প্রাণশক্তি ফুরিয়ে যাওয়াকেই মৃত্যু বলা হয়। জড়ের প্রতি আসক্তি থাকলে কিছু করার ও কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা দূর হয় না। প্রাণশক্তি থাকতে থাকতে যদি ইচ্ছাশক্তি অর্থাৎ কিছু করার ও কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা দূর হয়, তাহলে মানুষ জীবন্মুক্ত হতে পারে। প্রাণশক্তি শেষ হলেও যদি ইচ্ছাশক্তি বজায় থাকে তাহলে পুনর্জন্ম গ্রহণ করতেই হয়। নবজন্ম হলে পূর্বজন্মের সেই ইচ্ছাশক্তিই বজায় থাকে, প্রাণশক্তি নতুন করে লাভ হয়।

আকাঙ্ক্ষাগুলি মেটাতেই প্রাণশক্তির ব্যয় হওয়া উচিত। নিঃস্বার্থভাবে সকল প্রাণীর হিতে রত হলে আকাঙ্ক্ষাগুলি সহজেই দূর হয়।

এখানে 'গৃহীত্বা' পদটির তাৎপর্য হল যা নিজের নয়, তাতে অনুরাগ, মমত্ববোধ ও প্রিয়বোধ করা। যে মন ও ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে জীবাত্মা একাত্মতা করে থাকে, সেই মন-ইন্দ্রিয়াদি কখনো বলে না যে আমরা তোমার এবং তুমি আমাদের। এর ওপর জীবাত্মার কোনো শাসন চলে না ; যেমন ইচ্ছা তেমন রাখতে পারে না, পরিবর্তন করতে পারে না ; তবুও এগুলির সঙ্গে ভ্রমবশে একাত্মভাব রাখে। প্রকৃতপক্ষে জড় পদার্থের প্রতি এই একাত্মবোধই অনুরাগ ও মমত্বযুক্ত হয়ে বন্ধনকারক হয়।

বস্তুগুলি আমরা প্রাপ্ত হই বা না হই, ভালো হোক বা মন্দ, আমাদের কাজে লাগুক বা না লাগুক, দূরে থাক বা নিকটে, যদি আমরা সেই বস্তুগুলিকে নিজের বলে মনে করি তাহলেই তার সঙ্গে আমরা সম্পর্কিত হয়ে পড়ি।

নিজে থেকে পরিত্যাগ না করলে শরীরাদির প্রতি মমত্ববোধ মৃত্যু হলেও দূর হয় না। সেইজন্য মৃতের অস্থি গঙ্গায় প্রদান করা হয়, তবেই মৃতব্যক্তি গতিলাভ করে। এই মেনে নেওয়া সম্পর্ক পরিত্যাগ করতে আমরা সর্বতোভাবে স্বাধীন ও সক্ষম। শরীর থাকতে থাকতেই যদি আমরা তা করতে পারি, তাহলে জীবিতকালেই আমরা মুক্ত হতে পারি।

যা নিজের নয়, তাকে নিজের বলে মনে করা আর যা নিজের তাকে নিজের বলে না মানা—এ হল দুর্লঙ্ঘ্য বাধা, এইজন্যই পারমার্থিক পথে উন্নতি হয় না।

এই শ্লোকে উদ্ধৃত **'এতানি'** পদটি সপ্তম শ্লোকের **'মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি'**র (পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং মনের) বাচক। এখানে **'এতানি'** পদটি সতেরোটি তত্ত্বের সমুদায়রূপ সূক্ষ্মশরীর এবং কারণ-শরীরের (স্বভাবের) দ্যোতক বলে মনে করতে হয়। জীবাত্মা এইসব গ্রহণ করে অপর দেহে গমন করে। মানুষ যেমন পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক নতুন বস্ত্র পরিধান করে, তেমনই জীবাত্মা পুরাতন দেহ পরিত্যাগ করে নতুন দেহ প্রাপ্ত হয় (গীতা ২।২২)।

প্রকৃতপক্ষে শুদ্ধ চেতনের (আত্মার) কোনো শরীর প্রাপ্ত হওয়া এবং তা পরিত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করা সম্ভবই নয়। কারণ আত্মা অচল এবং সমানভাবে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত (গীতা ২।১৭, ২৪)। শরীর গ্রহণ করা বা পরিত্যাগ করা পরিচ্ছিন্ন (একদেশীয়) তত্ত্বের দ্বারাই হওয়া সম্ভব, কিন্তু আত্মা কখনো কোনো দেশ বা কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হতে পারে না। কিন্তু এই আত্মা যখন প্রকৃতির কার্য শরীরের সঙ্গে তাদাত্ম্য করে অর্থাৎ প্রকৃতিগত হয়ে যায়, তখন (স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ—তিনটি শরীরে নিজেকে এবং নিজের মধ্যে তিনটি শরীর ধারণ করলে অর্থাৎ তাতে একাত্মতা বোধ করলে) সে প্রকৃতির কার্য শরীরকে গ্রহণ ও পরিত্যাগ করতে থাকে। তাৎপর্য হল এই যে, শরীরকে 'আমি' এবং 'আমার' মেনে নেওয়ার জন্য আত্মা সূক্ষ্মশরীরের আসা-যাওয়াকে নিজের আসা-যাওয়া বলে মনে করে। যখন প্রকৃতির কার্য শরীরের সঙ্গে তাদাত্ম্যবোধ দূর হয় অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ-শরীরের সঙ্গে আত্মার মেনে নেওয়া সম্পর্ক থাকে না, তখন এই শরীর নিজ কারণভূত সমষ্টি তত্ত্বে লীন হয়ে যায়। তাৎপর্য হল এই যে, পুনর্জন্মের আসল কারণই হল জীবের শরীরের সঙ্গে মেনে নেওয়া একাত্মবোধ।

পরিশিষ্ট-ভাব—আগের শ্লোকে '**কর্ষতি**' পদটি এবং এই শ্লোকে '**গৃহীত্বা**' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। '**কর্ষতি**' কথাটির অর্থ হল নিজের দিকে আকর্ষণ করা, আর '**গৃহীত্বা**' কথাটির অর্থ হল ধরা অর্থাৎ একাত্ম করা। বায়ুর দৃষ্টান্ত দেওয়ার অর্থ হল জীব বায়ুর মতো নির্লিপ্ত থাকে। শরীরে লিপ্ত হলেও প্রকৃতপক্ষে এর নির্লিপ্ততা কখনো দূর হয় না—'**শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে**' (গীতা ১৩।৩১)। বায়ুতে গন্ধ সবসময় থাকে না, স্বতঃই দূর হয়ে যায়, কিন্তু জীব যতক্ষণ পর্যন্ত মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়গুলিকে পরিত্যাগ না করে, ততক্ষণ এই আকর্ষণ দূর হয় না। এর কারণ এই যে জীব স্বয়ংই মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়গুলিকে আকর্ষণ করে—'**গৃহীত্বৈতানি**' ; সুতরাং নিজে পরিত্যাগ করলেই এগুলি পরিত্যক্ত হয়।

প্রত্যেকটি ভোগ থেকেই স্বাভাবিকভাবে উপরতি হয়—এটি সকলেই অনুভব করে থাকে। ভোগের প্রবৃত্তি কৃত্রিমভাবে অর্থাৎ স্বতঃপ্রণোদিতভাবে হলেও নিবৃত্তি স্বাভাবিকভাবে হয়। প্রবৃত্তি জীব নিজে করলেও নিবৃত্তি স্বতঃ হয়। যেমন ধূমপায়ী ব্যক্তি নিজের ভিতরে ধোঁয়া টেনে নিলেও তা স্বতঃই বাইরে চলে আসে, মুখ বন্ধ করে রাখলে নাক দিয়ে বেরোয়। ধোঁয়া টিঁকে থাকে না, কিন্তু এতে স্বভাব খারাপ হয়ে যায়, লোকে বাসনাগ্রস্ত হয়। এভাবেই ভোগ টিঁকে থাকে না, কিন্তু স্বভাব খারাপ হয়। ভোগ স্বতঃই দূর হয়, অরুচিও স্বতঃ হয়ে থাকে কিন্তু স্বভাব খারাপ হওয়ায় জীব তাকে বারংবার ধরতে থাকে এবং 'ঈশ্বর' অর্থাৎ স্বাধীন হয়েও পরাধীনতা অনুভব করতে থাকে। ভোগে লিপ্ত থাকলেও জীবের নির্লিপ্তভাব দূর হয় না, কিন্তু জীব সেদিকে লক্ষ্যও করে না এবং কোনো গুরুত্বও দেয় না। শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলেও জীব তার সঙ্গে সম্পর্ক মেনে নিয়ে সুখ গ্রহণ করে। সম্পর্ক অনিত্য আর সম্পর্ক-বিচ্ছেদ নিত্য। কারণ শরীর এবং জগৎ-সংসার একই শ্রেণীভুক্ত (জড় ও পরিবর্তনশীল) হওয়ায় শরীর বিজাতীয়। বিজাতীয় বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক হওয়া কখনোই সম্ভব নয়। পরমাত্মার অংশ হওয়ায় জীবের পরমাত্মার সঙ্গে সজাতীয়তা থাকে। সুতরাং তার পরমাত্মার সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক থাকে। জীব যদি সাধু-মহাপুরুষ, ভগবান এবং শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস রেখে পরমাত্মার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে তাহলে এটি অনুভূত হয়। কিন্তু জীব জাগতিক পদার্থগুলিকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। জীব যতক্ষণ ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন না করে, ততক্ষণ ভগবান কোনো সম্পর্ক টিঁকতে দেন না, শুধু ভাঙতেই থাকেন। জীব যতই চেষ্টা করুক না কেন, জগৎ-সংসারের সঙ্গে কোনো স্থায়ী সম্পর্ক রাখতে সক্ষম হয় না।

※ ※ ※

*সম্বন্ধ—ভগবান এবার সপ্তম শ্লোকে উদ্ধৃত '**মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি**' পদটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা করছেন।*

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে॥ ৯ ॥

[**অয়ম্, মনঃ** (এই জীবাত্মা মনকে) ; **অধিষ্ঠায়, এব** (আশ্রয় করেই) ; **শ্রোত্রম্, চ** (কর্ণ ও) ; **চক্ষুঃ, চ, স্পর্শনম্** (চক্ষু, ত্বক) ; **রসনম্, চ, ঘ্রাণম্** (জিহ্বা ও নাসিকা) ; **বিষয়ান্** (বিষয়গুলি) ; **উপসেবতে** (উপভোগ করে থাকে।)]

এই জীবাত্মা মনকে আশ্রয় করে কর্ণ, চক্ষু, ত্বক, জিহ্বা ও নাসিকা—এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিষয় উপভোগ করে থাকে॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা—'**অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ম্**'—মনে নানাপ্রকার (ভালো-মন্দ) সঙ্কল্প-বিকল্প উদিত হয়। তাতে 'স্বয়ং'-এর স্থিতিতে কোনো পার্থক্য আসে না। কারণ 'স্বয়ং' (চেতন-তত্ত্ব, আত্মা) জড় দেহ, ইন্দ্রিয়াদি, মন-বুদ্ধির অতীত এবং এগুলির আশ্রয় ও প্রকাশক। সংকল্প-বিকল্প আসে ও যায় আর 'স্বয়ং' একইভাবে বিরাজমান।

মনের সংযোগেই শোনা, দেখা, স্পর্শ করা, স্বাদ গ্রহণ করা এবং গন্ধ নেওয়ার জ্ঞান হয়ে থাকে। মনের সাহায্য ব্যতিরেকে জীবাত্মা ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা সুখ-দুঃখ অনুভব করতে পারে না। সেইজন্য এখানে মনকে অধিষ্ঠিত করার কথা বলা হয়েছে। তাৎপর্য হল এই যে জীবাত্মা মনকে অধিষ্ঠিত করেই অর্থাৎ তার আশ্রয়েই ইন্দ্রিয়াদির

সাহায্যে বিষয় উপভোগ করে।

'শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনং চ রসনং ঘ্রাণমেব চ'—শ্রবণেন্দ্রিয় অর্থাৎ কানে শ্রবণ করার শক্তিকে[1] **'শ্রোত্রম্'** বলা হয়। আজ পর্যন্ত আমরা নানাপ্রকারের অনুকূল (প্রশংসা, মান-মর্যাদা, আশীর্বাদ, সুমধুর সঙ্গীত, বাজনা ইত্যাদি) এবং প্রতিকূল (নিন্দা, অপমান, অভিশাপ, গালি-গালাজ ইত্যাদি) কথা শুনেছি ; কিন্তু তাতে 'স্বয়ং'-এর কী পার্থক্য হয় ?

কারও পৌত্রের জন্ম এবং পুত্রের মৃত্যুর সংবাদ একই সঙ্গে পাওয়া গেছে। দুটি সংবাদ শুনে একের 'জন্ম' এবং অপরজনের 'মৃত্যুর' সম্বন্ধে যে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানে কোনো পার্থক্য আসে না। যখন জ্ঞানেই কোনো পার্থক্য আসে না, তখন 'জ্ঞাতার' মধ্যে পার্থক্য আসবে কী প্রকারে ! অতএব জন্ম ও মৃত্যুর খবর শুনে চিত্তে (মেনে নেওয়া সম্পর্কের জন্য) যে প্রভাব পড়ে, সেইদিকে দৃষ্টি না দিয়ে এই 'জ্ঞানের' দিকেই দৃষ্টি দিতে হয়। এইরূপ অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের বিষয়েও বুঝতে হবে।

নেত্রেন্দ্রিয় অর্থাৎ নেত্র দ্বারা দেখার শক্তিকে বলা হয় **'চক্ষুঃ'**। আজ পর্যন্ত আমরা নানা সুন্দর, অসুন্দর, মনোহর, ভীষণ রূপ বা দৃশ্য দেখেছি, কিন্তু তার দ্বারা আমাদের 'স্বরূপে' কী তফাৎ হয়েছে ?

স্পর্শেন্দ্রিয় অর্থাৎ ত্বকের স্পর্শনের শক্তিকে বলা হয় **'স্পর্শনম্'**। জীবনে আমাদের নানাপ্রকার কোমল, কঠোর, চিট্‌চিটে, ঠাণ্ডা, গরম ইত্যাদি স্পর্শ প্রাপ্তি হয়েছে, কিন্তু তাতে 'স্বয়ং'-এর অবস্থানে কী পার্থক্য হয়েছে ?

রসনেন্দ্রিয় অর্থাৎ জিভে স্বাদ গ্রহণ করার ক্ষমতাকে বলা হয় **'রসনম্'**। কটু, তীক্ষ্ণ, মিষ্ট, কষা, টক এবং নোন্‌তা—খাদ্যের এই ছয় প্রকার রস থাকে। আজ পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন প্রকার রসযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করেছি ; কিন্তু চিন্তা করতে হয় যে তার দ্বারা 'স্বয়ং'-এর কী তফাৎ হয়েছে ?

ঘ্রাণেন্দ্রিয় অর্থাৎ নাসিকার গন্ধ নেবার শক্তিকে **'ঘ্রাণম্'** বলা হয়। আমরা জীবনে নাসিকার দ্বারা নানা সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ গ্রহণ করেছি ; কিন্তু তার জন্য 'স্বয়ং'-এর কী পার্থক্য ঘটেছে ?

বিশেষ কথা

শ্রোত্রের বাণীর সঙ্গে, নেত্রের পায়ের সঙ্গে, ত্বক-এর হাতের সঙ্গে, রসনার উপস্থের সঙ্গে, ঘ্রাণের গুহ্যের সঙ্গে (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের সঙ্গে) ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। যেমন, যে ব্যক্তি জন্ম থেকে বধির হয়, সে বোবাও হয়। পায়ের তলায় তেল মালিশ করলে চোখে তার প্রভাব পড়ে। ত্বক থাকাতেই হাত স্পর্শের কাজ করে। রসনেন্দ্রিয়কে বশে রাখলে উপস্থ বশে থাকে। ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা গন্ধের গ্রহণ এবং গুহ্য দ্বারা ত্যাগ করা হয়।

পঞ্চমহাভূতের এক একটি মহাভূতের সত্ত্বগুণ অংশে জ্ঞানেন্দ্রিয়, রজোগুণ অংশে কর্মেন্দ্রিয় এবং তমোগুণ অংশে শব্দাদি পাঁচটি বিষয় উৎপন্ন হয়েছে।

পঞ্চ মহাভূতের মিলিত হয়ে সত্ত্বগুণ-অংশ দ্বারা মন ও বুদ্ধি, রজোগুণ-অংশ দ্বারা প্রাণ এবং তমোগুণ-অংশ দ্বারা শরীর সৃষ্টি করেছে।

'বিষয়ানুপসেবতে'—ব্যবসায়ী যেমন কোনো কারণবশতঃ এক স্থান থেকে দোকান তুলে নিয়ে গিয়ে অন্যস্থানে লাগায়, তেমনই জীবাত্মা একটি দেহ ছেড়ে, অন্য দেহে আশ্রয় নেয় ; আর যেমন আগের দেহটিতে আকাঙ্ক্ষাজনিত বিষয় উপভোগ করে থাকে, তেমনই অপর দেহে আশ্রয় নিয়েও (পূর্ব স্বভাববশতঃ) বিষয়াদি

---

[1]মানুষ মনে মনে সবসময় কিছু না কিছু চিন্তা করে, যাকে সঙ্কল্প-বিকল্প, মনোরথ বা মনোরাজ্য বলা হয়। নিদ্রার সময় সেটিই 'স্বপ্ন'রূপে দেখা যায়। মনের ওপর বুদ্ধির প্রভাব থাকায় আমরা মনে উদিত প্রত্যেকটি কথা প্রকাশ করি না। কিন্তু বুদ্ধির প্রভাব সরে গেলে মনে উদিত প্রত্যেকটি কথা প্রকাশ করা বা সেই অনুযায়ী আচরণ করাকে 'পাগলামী' বলা হয়। এইভাবে মনোরাজ্য, স্বপ্ন এবং পাগলামী—এই তিনটি একই।

শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা দু'প্রকারের জ্ঞান হয়—(১) অপরোক্ষ শব্দের জ্ঞান ও (২) পরোক্ষ বিষয়ের জ্ঞান—তাই শ্রবণের অনেক মহিমা। জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ—উভয় মার্গেই 'শ্রবণের' স্থান প্রধান। যদিও নেত্র দ্বারা শাস্ত্রাদি অবলোকন, অধ্যয়ন করলেও পরোক্ষে বিষয়ের জ্ঞান হয়, তাহলেও আসলে সেটিও (শব্দেরই লিখিতরূপ হওয়ায়) প্রকারান্তরে শব্দেরই শক্তি। শাস্ত্রজ্ঞানও (গুরুর মুখ হতে) শুনলে যেমন হয়, পড়লে তেমন হয় না। বিদ্যা অধ্যয়নও প্রথমে শুনলে বোধ হয়। শব্দে অচিন্ত্য শক্তি থাকে, যা শুধু শ্রবণেন্দ্রিয়ই গ্রহণ করতে সক্ষম, অন্য ইন্দ্রিয়গুলি নয়।

পঞ্চমহাভূত	সত্ত্বগুণ-অংশ	রজোগুণ-অংশ	তমোগুণ-অংশ
আকাশ	শ্রোত্র	বাক্	শব্দ
বায়ু	ত্বক	হস্ত	স্পর্শ
অগ্নি	নেত্র	পদ	রূপ
জল	রসনা (জিহ্বা)	উপস্থ	রস
পৃথিবী	ঘ্রাণ	গুহ্য	গন্ধ

উপভোগ করে। এইভাবে জীবাত্মা বারংবার বিষয়াসক্ত হওয়ার ফলে উচ্চ-নীচ যোনিতে জন্ম নিতে বাধ্য হয়।

ভগবান মনুষ্য-জন্ম প্রদান করেছেন জীবের নিজের উদ্ধারের জন্য, সুখ-দুঃখ ভোগ করার জন্য নয়। যেমন, ব্রাহ্মণকে গো-দান করার পর আমরা সেই গোরুকে খাদ্য, জল দিলেও তার দুধে আমাদের কোনো অধিকার থাকে না, তেমনই প্রাপ্ত শরীরের সদ্ব্যবহার করাই আমাদের কর্তব্য, একে নিজের মনে করে সুখভোগ করার আমাদের কোনো অধিকার থাকে না।

বিশেষ কথা

বিষয়াদি উপভোগ করলে পরিণামে বিষয়ের ওপর অনুরাগ এবং আসক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে, যা পুনর্জন্ম এবং সমস্ত দুঃখেরই কারণ হয়। বস্তুতঃ বিষয়ে সুখ নেই-ই। কেবল শুরুতে ভ্রমবশতঃ সুখ প্রতীয়মান হয় (১৮।৩৮)। যদি বিষয়ে সুখ থাকত, তাহলে যার প্রচুর ধন-সম্পদ আছে, এরূপ ধনী, ভোগী ও পদাধিকারী ব্যক্তি সকলেই সুখী হত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খোঁজ নিলে দেখা যায় এরাও দুঃখ এবং অশান্তি ভোগ করে। কারণ ভোগ্যপদার্থে সুখ নেই, সুখ হয় না এবং হওয়া সম্ভবও নয়। সুখলাভের আশায় যেসব ভোগবিলাস করা হয়েছে, সেইসব ভোগাদির দ্বারা ধৈর্য নষ্ট হয়েছে, অশান্তি হয়েছে, রোগ হয়েছে, চিন্তা এসেছে, আকুলতা এসেছে, মনস্তাপ হয়েছে, শক্তি ক্ষীণ হয়েছে, অর্থ নষ্ট হয়েছে এবং প্রায়শঃই দুঃখ-শোক-উদ্বেগ দেখা দিয়েছে—চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এইসব প্রত্যক্ষ দেখেছেন[১]।

স্বপ্নে জলপান করলে যেমন পিপাসা দূর হয় না, তেমনই ভোগ্যপদার্থের দ্বারা শান্তিও পাওয়া যায় না আর জ্বালাও দূর হয় না। মানুষ ভাবে যে অনেক অর্থ প্রাপ্তি হোক, অনেক জিনিস সংগ্রহ হোক, অনেক বস্তু প্রাপ্ত হোক, তাহলেই শান্তি লাভ হবে। কিন্তু সেসব প্রাপ্ত হলেও শান্তি পাওয়া যায় না, উল্টে সেইসব বস্তুর প্রাপ্তিতে লোভ আরও বেড়ে যায়[২]। ধনাদি ভোগ্যপদার্থ প্রাপ্তি হলে 'আরও পাওয়া যাক, আরও পাওয়া যাক'—এই ভাবনা চলতেই থাকে। কিন্তু জগতে যত ধন-ধান্য আছে, যত সুন্দরী নারী আছে, যত উত্তম বস্তু আছে, সে সবই কোনো একজন ব্যক্তি যদি একসঙ্গে পেয়ে যান, তাহলেও তিনি তাতে তৃপ্তিলাভ করেন না[৩]। এর কারণ হল এই যে, জীব অবিনাশী পরমাত্মার অংশ অর্থাৎ চেতন আর ভোগ্যপদার্থ বিনাশশীল প্রকৃতির অংশ অর্থাৎ জড়। চেতনের আকাঙ্ক্ষা

[১]ভোগা ন ভুক্তা বয়মেব ভুক্তাস্তপো ন তপ্তং বয়মেব তপ্তাঃ। কালো ন যাতো বয়মেব যাতাস্তৃষ্ণা ন জীর্ণা বয়মেব জীর্ণাঃ॥
(ভর্তৃহরিবৈরাগ্যশতক)

'আমরা ভোগ উপভোগ করিনি, ভোগাদিই আমাদের ভোগ করেছে ; আমরা তপ্ত করিনি, নিজেরাই তপ্ত হয়েছি ; কাল ব্যয়ীত হয়নি, আমরাই ব্যয়ীত হয়েছি ; তৃষ্ণা জীর্ণ হয়নি, আমরাই জীর্ণ হয়েছি।'

[২]ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে॥
(মনুস্মৃতি ২।৯৪ ; শ্রীমদ্ভাগবত ৯।১৯।১৪)

'ভোগ্যপদার্থ উপভোগের দ্বারা কামনা কখনো শান্ত হয় না, আসলে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে যেমন অগ্নি অধিক জ্বলে ওঠে ; ভোগ্যপদার্থ পেলে ভোগবাসনাও তেমনই বৃদ্ধি পেতে থাকে।'

[৩]যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিয়বং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ। একস্যাপি ন পর্যাপ্তং তস্মাৎ তৃষ্ণাং পরিত্যজেৎ॥
(বিষ্ণুপুরাণ ৪।১০।২৪ ; মহাভারত, আদিপর্ব ৮৫।১৩)

জড় পদার্থের দ্বারা কীভাবে মেটানো সম্ভব ? পেটে খিদে থাকলে, খাদ্যবস্তু পিঠের ওপর বেঁধে রাখলে কি খিদে মেটে ? জলতৃষ্ণা হলে গরম সুস্বাদু হালুয়া খেলে কি তৃষ্ণা মেটে ? এইরূপ জীবের চিন্ময় পরমাত্মার জন্য যে তৃষ্ণা, তা এই জড় পদার্থের দ্বারা মেটা সম্ভব নয়। তৃপ্তি হওয়া দূরের কথা, যেমন যেমন মানুষ এইসব জড় পদার্থকে আপন করে নিতে থাকে, তেমনই তার খিদেও বৃদ্ধি পেতে থাকে। মানুষের এ কত বড় ভুল !

সাধকের উচিত এখনই দৃঢ় সিদ্ধান্ত করা যে, ভোগবুদ্ধি সহকারে সে কখনও বিষয়-ভোগ করবে না। সমস্ত জগৎ মিলেও যে তাঁকে তৃপ্ত করতে সক্ষম নয় একথাটি তাকে সম্পূর্ণরূপে মেনে নিতে হয়। বিষয় ভোগ না করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত হলে ইন্দ্রিয়গুলি নির্বিষয় হয়ে যায় এবং ইন্দ্রিয়গুলি নির্বিষয় হলে মন নির্বিকল্প হয়। মন নির্বিকল্প হলে বুদ্ধি স্বভাবতঃই সম হয় এবং বুদ্ধি সম হলে পরমাত্মপ্রাপ্তি স্বতঃই অনুভূত হয় (গীতা ৫।১৯)। কারণ পরমাত্মা সদাই প্রাপ্ত। বিষয়াদিতে প্রবৃত্তি থাকাতেই তাঁর প্রাপ্তি অনুভূত হয় না।

সুখভোগ এবং সম্পদ-সংগ্রহ—এই দুটিতে যারা আসক্ত হয়, তাদের পরমাত্মপ্রাপ্তি তো দূরের কথা, পরমাত্মার অভিমুখে চলার এক নিশ্চয়ও তারা করতে পারে না (গীতা ২।৪৪)।

তুলসীদাস শ্রীরামচরিতমানসের শেষে প্রার্থনা করেছেন—

কামিহি নারি পিয়ারি জিমি লোভিহি প্রিয় জিমি দাম।
তিমি রঘুনাথ নিরন্তর প্রিয় লাগহু মোহি রাম॥
(শ্রীরামচরিতমানস ৭।১৩০)

'কামুকের যেমন নারী (ভোগ) এবং লোভীর সম্পদ (সংগ্রহ) প্রিয় বলে মনে হয়, তেমনই রঘুনাথের রূপ এবং রামনাম আমার নিরন্তর যেন প্রিয় হয়।'

তাৎপর্য হল এই যে, কামুক ব্যক্তি যেমন নারীর রূপে আকৃষ্ট হয়, তেমনই আমিও যেন রঘুনাথের রূপে আকৃষ্ট থাকি এবং লোভী ব্যক্তি যেমন সম্পদ-সংগ্রহ করতে থাকে, তেমনই আমিও যেন (জপের সাহায্যে) নিত্য রামনাম সংগ্রহ করতে থাকি। জাগতিক ভোগ ও সংগ্রহ নিরন্তর প্রিয় মনে হয় না—এটিই হল নিয়ম ; কিন্তু ভগবানের রূপ ও নাম নিরন্তর প্রিয় লাগে। সন্ত মহাপুরুষগণও নিজ অনুভবে জানিয়েছেন যে—

চাখ চাখ সব ছাড়িয়া মায়া-রস খারা হো।
নাম-সুধারস পীজিয়ে ছিন বারংবারা হো॥
লগে মোহি রাম পিয়ারা হো॥

পরিশিষ্ট-ভাব— বিষয়গুলি উপভোগ করলে স্ব-স্বরূপের প্রাধান্য কমে যায় এবং শরীর-সংসারের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। তাই স্ব-স্বরূপও জগৎরূপ হয়ে যান (গীতা ৭।১৩)।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—আগের তিনটি শ্লোকে জীবাত্মার স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। সেই বিষয়টির উপসংহার করার জন্য পরবর্তী শ্লোকে 'জীবাত্মার স্বরূপ কারা জানেন এবং কারা জানেন না'—তার বর্ণনা করছেন।

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ॥ ১০ ॥

[**উৎক্রামন্তম্** (শরীর পরিত্যাগ করে) ; **বা, স্থিতম্** (অথবা অন্য শরীরে কীভাবে অবস্থিত হয়) ; **বা, গুণান্বিতম্** (অথবা গুণাদি সংযুক্ত হয়) ; **ভুঞ্জানম্, অপি** (বিষয়াদি ভোগ করে) ; **বিমূঢ়াঃ, ন, অনুপশ্যন্তি** (অজ্ঞ ব্যক্তিগণ তা জানে না) ; **জ্ঞানচক্ষুষঃ, পশ্যন্তি** (জ্ঞানচক্ষুবিশিষ্ট জ্ঞানীগণ তা জানতে পারেন।)]

শরীর কীভাবে পরিত্যাগ করা হয় এবং অন্য শরীরে কীভাবে অবস্থিতি হয়, গুণ সংযুক্ত হয়ে জীবাত্মা কীরূপে বিষয়াদি ভোগ করেন অজ্ঞ ব্যক্তিগণ তা জানতে পারে না, জ্ঞানরূপ নেত্রের সাহায্যে জ্ঞানীগণই তা জানতে পারেন॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা—**'উৎক্রামন্তম্'**—স্থূলদেহ পরিত্যাগ করার সময় জীব সূক্ষ্ম এবং কারণ-শরীর সঙ্গে নিয়ে যায়। একেই এখানে **'উৎক্রামন্তম্'** পদে বলা হয়েছে। যতক্ষণ হৃদয়ের স্পন্দন থাকে, ততক্ষণ জীব প্রস্থান করেছে বলা যায় না। হৃদয়ের স্পন্দন রুদ্ধ হওয়ার পরও জীব কিছু সময় পর্যন্ত দেহে থাকতে পারে। প্রকৃতপক্ষে অচল হওয়ায় শুদ্ধ চেতনতত্ত্বের যাতায়াত হয় না, প্রাণেরই যাতায়াত হয়। কিন্তু সূক্ষ্ম এবং কারণ-শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক থাকায় জীবের গমনাগমনের কথা বলা হয়।

অষ্টম শ্লোকে ঈশ্বর হওয়া জীবাত্মার বিষয়ে উদ্ধৃত **'উৎক্রামতি'** পদটিকে এখানে **'উৎক্রামন্তম্'** পদের দ্বারা বলা হয়েছে।

'স্থিতং বা'—ক্যামেরাতে যেমন বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়ে ঠিক তেমনই চিত্র অঙ্কিত হয়, সেইরূপ মৃত্যুর সময় চিত্তে যে ভাবের চিন্তা উদিত হয় তারই অনুরূপ সূক্ষ্ম দেহ তৈরি হয়। ক্যামেরাতে প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব অনুযায়ী চিত্রটি প্রস্তুত হতে যেমন সময় লাগে, তেমনই অন্তকালীন চিন্তানুযায়ী ভাবী স্থূলশরীর সৃষ্ট হতে (শরীর অনুসারে কম বা বেশি) সময় লাগে।

অষ্টম শ্লোকে যেটি **'যদবাপ্নোতি'** পদে বর্ণিত হয়েছে, সেটিকেই এখানে **'স্থিতম্'** পদে বলা হয়েছে ।

'অপি ভুঞ্জানং বা'—মানুষ যখন বিষয় উপভোগ করে, তখন সে নিজে অত্যন্ত তৎপর হয়ে তা করে। বিষয়ী মানুষ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—প্রতিটি বিষয়েই খুবই সজাগ। প্রত্যেকটি বিষয় সে অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করতে পারে। এগুলিতে এত বিশেষজ্ঞ হলেও সে আসলে মূঢ় (অজ্ঞানী)-ই। কারণ বিষয়ের প্রতি তার এই আসক্তি কোনো প্রকৃত কাজে লাগে না, বরং মৃত্যুর পর এগুলিই তাকে নরকগামী করে বা তার নিম্ন যোনিতে জন্মের কারণ হয়।

পরমাত্মা, জীবাত্মা এবং জগৎ—এই তিনটি বিষয়ে শাস্ত্র এবং দার্শনিকদের মধ্যে নানা মতভেদ আছে। কিন্তু জীবাত্মা যে জাগতিক সম্পর্কগুলি থেকে মহাদুঃখ পায় এবং পরমাত্মার সংস্পর্শে মহৎ সুখ লাভ করে—এতে সকল শাস্ত্র এবং সকল দার্শনিকই একমত ।

জগৎ একমুহূর্তও স্থিরভাবে থাকে না—এটি অমোঘ নিয়ম। জগৎ যে ক্ষণভঙ্গুর—একথা বলে, শুনে এবং পড়েও অজ্ঞানী মানুষেরা একে স্থির বলেই মনে করে। ভোগ্য-সামগ্রী, ভোক্তা এবং ভোগরূপী ক্রিয়া—এগুলি স্থায়ী বলে মনে না করলে ভোগ করা সম্ভবই হয় না। ভোগী মানুষেরা এমন বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে পড়ে যে, তারা 'এই ভোগের চেয়ে বেশি আর কিছু হতেই পারে না' এটি দৃঢ় নিশ্চয় করে নেয় (গীতা ১৬।১১)। এইসব মানুষদের জ্ঞানচক্ষু বন্ধই থাকে। এরা মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও ভোগ করার জন্য (মৃত্যুলোকে বসবাস করেও) সর্বদা বেঁচে থাকতে চায়।

'অপি' পদটির দ্বারা এই তাৎপর্য ব্যক্ত হয় যে, এই যে জীবাত্মা স্থূলশরীর থেকে বের হয়ে (সূক্ষ্ম এবং কারণ-শরীরসহ) অন্য দেহ প্রাপ্ত হয় এবং বিষয়ভোগে রত হয়—এই অবস্থাগুলিতে গুণাদি লিপ্ত বলে প্রতীয়মান হলেও প্রকৃতপক্ষে সে স্বয়ং নির্লিপ্তই থাকে। কেন-না স্বরূপের 'উৎক্রমণ' নেই, 'স্থিতি'ও নেই এবং 'ভোক্তাভাব'-ও নেই।

আগের শ্লোকের **'বিষয়ানুপসেবতে'** পদটিকেই এইখানে **'ভুঞ্জানম্'** পদে বলা হয়েছে।

'গুণান্বিতম্'—এখানে **'গুণান্বিতম্'** পদটির তাৎপর্য হল এই যে, গুণাদির সঙ্গে সম্পর্ক মানার জন্যই জীবাত্মাতে উৎক্রমণ, স্থিতি এবং ভোগ—এই তিনটি ক্রিয়া প্রতীত হয়।

প্রকৃতপক্ষে আত্মার গুণাদির সঙ্গে সম্পর্কই নেই। আত্মা ভ্রমবশতঃ গুণগুলির সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নেয়, যার জন্য একে বারংবার উচ্চ-নীচ যোনিতে জন্ম নিতে হয়। তার ভুল এই যে, গুণাদির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে সে সংসার থেকে সুখ পেতে চায়। যে শরীরাদি দ্বারা সুখভোগ করা হয় সেটিই যখন নিজের নয়, অন্যের কথা আর কি বলার আছে !

মানুষ কোনো না কোনোভাবে জগতেই আবদ্ধ থাকতে চায়। ধর্ম ব্যাখ্যাকারী ব্যক্তি শ্রোতাদের আপন বলে ভাবতে চায়। কারও যদি নিজের ভাই-বোন না থাকে, তাহলে সে ধর্ম-ভাই বা বোন পাতিয়ে নেয়। কারও সন্তান না থাকলে, সে অন্য ছেলেকে দত্তক নেয়। এইরূপ সুখের আকাঙ্ক্ষা থেকেই মানুষ নতুন নতুন সম্পর্ক স্থাপন করে কিন্তু পরিবর্তে সে সুখের বদলে দুঃখই পায়। ভগবান সেই কথাই এখানে জানিয়েছেন যে, জীব স্বরূপতঃ গুণাতীত

হয়েও গুণাদিতে (দেশ, কাল, ব্যক্তি, বস্তু) সম্পর্ক স্থাপন করে তাতে আবদ্ধ হয়ে যায়।

এই অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে উদ্ধৃত **'প্রকৃতিস্থানি'** পদটি এখানে **'গুণান্বিতম্'** পদ দ্বারা বলা হয়েছে।

মর্মার্থ

মানুষের যতক্ষণ প্রকৃতি বা তার কার্য গুণাদির সঙ্গে বিন্দুমাত্র সম্পর্ক থাকে, ততক্ষণ তাকে বাধ্য হয়ে সেই গুণাদির অধীনে কার্য করতে হয় (গীতা ৩।৫)। চেতন হয়ে গুণাদির অধীন থাকা অর্থাৎ জড়ের অধীনতা স্বীকার করাকে ব্যভিচার-দোষ বলা হয়। প্রকৃতি ও গুণাদি থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হলে যে স্বাধীনতা অনুভূত হয়, সাধক যদি তা থেকেও (যা সূক্ষ্ম অহং) রসগ্রহণ করেন ; তবে তাও ব্যভিচার-দোষ। রসগ্রহণ না করলে ব্যভিচার-দোষ দূর হয়, তখন নিজ প্রেমাস্পদ ভগবানের প্রতি স্বতঃই প্রিয়বোধ জাগরিত হয়। তখন শুধু ক্রমবর্ধমান প্রেমই থাকে। জীবের অন্তিম লক্ষ্যই হল এই প্রেম লাভ করা। এই প্রেম প্রাপ্তিকেই বলা হয় পূর্ণতা। ভগবানও ভক্তকে তাঁর অলৌকিক প্রেম প্রদান করে সন্তুষ্ট হন এবং এইরূপ প্রেমিক ভক্তকে যোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোগী বলে মান্য করেন (গীতা ৬।৪৭)।

গুণাতীত হবার জন্য (বিবেক স্বয়ং-এর সহায়ক হওয়ার কারণে) নিজের সাধনার ভূমিকা থাকে, কিন্তু গুণাতীত হওয়ার পর প্রেম প্রাপ্তির জন্য ভগবানের একমাত্র কৃপারই অবলম্বন থাকে।

'বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি'—বিভিন্ন প্রকার কার্য করলেও আমরা (স্বয়ং) যেমন একই থাকি, তেমনই গুণাদি সংযুক্ত অবস্থায় দেহ পরিত্যাগ করে অন্য দেহ লাভ এবং ভোগ করার সময়ও 'স্বয়ং' (আত্মা) একই থাকে। তাৎপর্য হল এই যে, পরিবর্তন যা হয় তা সবই ক্রিয়াতে হয়, 'স্বয়ং'-এ হয় না। কিন্তু যারা ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াগুলির সঙ্গে এক হয়ে 'স্বয়ং'-কেও ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখে (৩।২৭), সেই জ্ঞানহীন (তত্ত্ব না জানা) মানুষদের উদ্দেশ্যেই এখানে **'বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি'** পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

মূঢ় ব্যক্তিগণ ভোগ ও সম্পদ-সংগ্রহে এত আসক্ত হয় যে শরীর ইত্যাদি পদার্থ যে নিত্য নয়—সে-কথা তারা ভেবে দেখে না। ভোগ করার পরিণাম কী তা তারা চিন্তা করে না। **ভগবান গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ের যেখানে সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ব্যক্তিদের প্রিয় আহার্যের বর্ণনা করেছেন, সেখানে সাত্ত্বিক আহার্যের পরিণামের কথা আগে বলা হয়েছে, রাজসিক আহার্যের পরিণামের বর্ণনা সব শেষে করা হয়েছে এবং তামসিক আহার্যের পরিণাম সম্পর্কে কোনো বর্ণনাই করা হয়নি (গীতা ১৭।৮-১০)। তার কারণ হল যে সাত্ত্বিক মানুষ কর্ম করার আগে তার পরিণামের দিকে দৃষ্টি রাখে ; রাজসিক মানুষ পরিণাম চিন্তা না করে হঠাৎ কোনো কাজ করে ফেলে। কিন্তু তামসিক মানুষ পরিণামের দিকে দৃষ্টি দেয়ই না।** এইভাবে এখানেও **'বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি'** পদের দ্বারা ভগবান যেন বলতে চেয়েছেন যে তামসিক ব্যক্তিরা মোহগ্রস্তই থাকে। কারণ মোহ তমোগুণেরই কার্য। তারা বিষয়াদি ভোগের সময় পরিণামের কথা চিন্তা করে না, শুধু ভোগবিলাস এবং সম্পদ-সংগ্রহেই ব্যাপৃত থাকে। এরূপ মানুষের জ্ঞান তমোগুণের দ্বারা আবৃত থাকে বলে তারা শরীর এবং আত্মার পার্থক্য জানতে পারে না।

'পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ'—প্রাণী, পদার্থ, ঘটনা, পরিস্থিতি—কিছুই স্থির নয়, অর্থাৎ দৃশ্যমাত্রই নিত্য অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে—এরূপ প্রত্যক্ষ অনুভূত হওয়াই হল জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হওয়া। পরিবর্তনের দিকে দৃষ্টি থাকলে অপরিবর্তনশীল তত্ত্বে স্বতঃই স্থিতি হয়, কারণ নিত্য পরিবর্তনশীল পদার্থকে অনুভব করতে পারে কেবল অপরিবর্তনশীল তত্ত্বই।

এখানে এমন মনে করা উচিত নয় যে জ্ঞানী ব্যক্তিদেরও স্থূলদেহ পরিত্যাগ করে অন্যদেহ প্রাপ্তি হয় বা ভোগ উপভোগ করতে হয়। জ্ঞানী ব্যক্তিদেরও স্থূলদেহ পরিত্যক্ত হয়, কিন্তু অন্য দেহ প্রাপ্ত করা বা রাগ-দ্বেষযুক্ত চিত্তে বিষয় উপভোগ করা তাঁদের দ্বারা হয় না। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, যেমন জীবাত্মার এই দেহে বাল্য, যৌবন এবং বৃদ্ধাবস্থা আসে, তেমনই

মৃত্যুর পর অন্যদেহ প্রাপ্তি ঘটে, কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি সেই বিষয়ে মোহগ্রস্ত বা বিকারগ্রস্ত হন না। কারণ জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁর জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা স্পষ্ট দেখতে পান যে, জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি সকল ক্রিয়া বা বিকার পরিবর্তনশীল দেহেরই কাজ, অপরিবর্তনশীল স্বরূপের নয়। স্বরূপ এই সমস্ত বিকার হতে সর্বদা সর্বতোভাবে নির্লিপ্ত থাকে। দেহকে নিজের বলে মনে করলে অথবা তার থেকে সুখাস্বাদনের আশা করলেই অর্থাৎ অজ্ঞান ব্যক্তিদের তাদাত্ম্যতার কারণেই এই বিকার স্বয়ং-এ হয় বলে প্রতীত হয়। মোহগ্রস্ত মানুষ আত্মাকে গুণাদি-যুক্ত বলে দেখে থাকে এবং জ্ঞানচক্ষুসম্পন্ন ব্যক্তিগণ আত্মাকে গুণাদিরহিত—বাস্তবিকরূপে দেখে থাকেন।

পরিশিষ্ট-ভাব—গুণের সঙ্গে সম্পর্ক মানলে জীব 'গুণান্বিত' হয়ে যায়। সম্বন্ধ না মানলে সে নির্গুণই (ত্রিগুণ রহিত) থাকে—**'অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ'** (গীতা ১৩।৩১)। অর্থাৎ গুণাদির সঙ্গে সম্পর্কিত হলেই জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হতে হয় (গীতা ১৩।২১)। যদিও কেউই নিজের ক্ষতি চায় না, কিন্তু সুখভোগের আশায় জীব বুঝতে পারে না তার উন্নতি কিসে হবে! সে বিনাশশীল পদার্থের দ্বারা নিজের উন্নতি মনে করে, কিন্তু পরিণামে তার বিরাট অবনতি হয়।

শরীর পরিত্যাগ করা, অন্য শরীরে অবস্থান করা এবং বিষয় উপভোগ করা—তিনটি ক্রিয়া পৃথক্ হলেও, তাতে অবস্থানকারী জীবাত্মা একই—এটি প্রত্যক্ষ অনুভূত হলেও অবিবেচক মানুষেরা এটি জানে না অর্থাৎ নিজের অনুভূতির দিকে লক্ষ্য করে না, তাকে গুরুত্ব দেয় না। তিনটি গুণে মোহিত হয়ে জীব হুঁশ হারিয়ে বসে (গীতা ৭।১৩)। জীবাত্মা কোনো অবস্থার সঙ্গে সবসময় থাকে না—সকলেই তা অনুভব করে। তার নির্লিপ্ততা স্বতঃসিদ্ধ।

ভগবান আগের শ্লোকে পাঁচটি ক্রিয়ার কথা বলেছেন—দেখা, শোনা, স্পর্শ করা, স্বাদ গ্রহণ করা, গন্ধ গ্রহণ করা আর এই শ্লোকে তিনটি ক্রিয়ার কথা বলেছেন—শরীর পরিত্যাগ করা, অন্য শরীরে অবস্থান করা এবং বিষয় উপভোগ করা। এই আটটির কোনো ক্রিয়াই সর্বক্ষণ থাকে না, কিন্তু স্ব-স্বরূপ নিরন্তর বিরাজমান। ক্রিয়া আটপ্রকার হলেও সেগুলিতে একই স্বরূপ বিরাজ করে। তাই তার ভাব-অভাব, আরম্ভ-শেষ সম্পর্কে জ্ঞান সকলেরই হয়। যার শুরু ও শেষের জ্ঞান হয়, সে স্বয়ং নিত্য হয়ে থাকে।

শরীর ও পদার্থে নানাপ্রকার ভোগের সংযোগ ও বিয়োগ হয়। কিন্তু নানাপ্রকার অবস্থাতেও স্ব-স্বরূপ একই থাকে এবং এক থেকেই নানা অবস্থায় ভ্রমণ করে। স্ব-স্বরূপ যদি একভাবে বিরাজ না করত তাহলে সব অবস্থার পৃথক্ পৃথক্ অনুভব কে করত? বিমূঢ় মানুষ এসব প্রত্যক্ষ অনুভব করা সত্ত্বেও এইদিকে নজর দেয় না, শুধু জ্ঞানচক্ষুবিশিষ্ট যোগী মহাপুরুষগণই তা প্রত্যক্ষ করে থাকেন।

***

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে বর্ণিত তত্ত্ব যে ব্যক্তি চেষ্টা করে জানতে পারেন, একথার তাৎপর্য কী? আর যে যত্ন করেও জানতে পারে না, তার কী ভুল হয়, পরবর্তী শ্লোকে সেই কথাই বলা হয়েছে।

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ॥ ১১॥

[**যতন্তঃ, যোগিনঃ** (যত্নশীল যোগীগণ); **আত্মনি, অবস্থিতম্** (আপনাতে অবস্থিত); **এনম্** (এই পরমাত্মতত্ত্বকে); **পশ্যন্তি, চ** (অনুভব করে থাকেন, কিন্তু); **অকৃতাত্মানঃ** (যারা নিজেদের চিত্ত শুদ্ধ করেনি); **অচেতসঃ** (অবিবেকী মানুষ); **যতন্তঃ, অপি** (যত্ন করলেও); **এনম্, ন, পশ্যন্তি** (এই তত্ত্ব অনুভব করতে পারে না।)]

যত্নশীল যোগীগণ আপনাতে অবস্থিত এই পরমাত্মতত্ত্বকে অনুভব করে থাকেন, কিন্তু যারা নিজেদের চিত্ত (অন্তঃকরণ) শুদ্ধ করেনি, এরূপ অবিবেকী মানুষ যত্ন করলেও এই তত্ত্ব অনুভব করতে পারে না॥ ১১॥

ব্যাখ্যা—'যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্তি'—এখানে **'যোগিনঃ'** পদটি সেইসব সাংখ্যযোগী সাধকদের বাচক, যাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্যই হল পরমাত্মতত্ত্ব লাভ করা।

এখানে **'যতন্তঃ'** পদটি হল সাধন সম্পর্কিত। অন্তরের একান্ত ইচ্ছা, যা পূর্ণ না হলে স্বস্তিতে থাকা যায় না, তাকে বলা হয় যত্ন।

যে সাধকদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত করা, তাঁদের মধ্যে আসক্তিহীনতা, নির্মমতা এবং নিষ্কামভাব স্বতঃই আসে। উদ্দেশ্য পূরণের জন্য অনন্যভাবে যে ব্যগ্রতা, তৎপরতা, ব্যাকুলতা, বিরহ-ভাবনা, প্রার্থনা এবং বিচার সাধকের চিত্তে প্রকটিত হয়, সেগুলিকেই এখানে **'যতন্তঃ'** পদের অন্তর্গত বলে জানতে হবে। পরমতত্ত্ব লাভ করাই একমাত্র উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্যের পথে যা অন্তরায় সেগুলি যিনি সযত্নে দূর করেছেন সেরূপ যোগীগণ সেই তত্ত্ব আপনিই অনুভব করে থাকেন। সম্পূর্ণভাবে পরমাত্মার শরণাগত হলে যোগীগণের পরমাত্মতত্ত্বে সর্বদা স্বাভাবিক স্থিতি থাকে। **'পশ্যন্তি'** পদটির এই হল প্রকৃত ভাব।

যে সাংখ্যযোগী সাধক সদসৎ বিচার দ্বারা সৎ-তত্ত্ব লাভ এবং অসৎ-জগৎ হতে নিবৃত্ত হতে চান, তাঁর বিবেক সম্পূর্ণরূপে জাগ্রত হয়। তখন তিনি আপনাতে অবস্থিত পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব করেন।

'আত্মন্যবস্থিতম্'—দেশ-কাল পরমাত্মতত্ত্ব থেকে ভিন্ন নয়। ইনি সমানরূপে সর্বত্র এবং সর্বদা বিদ্যমান। ইনি সমস্ত জীবের হৃদয়ে অবস্থিত সকলের আত্মা স্বরূপ—**'অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ'** (গীতা ১০।২০)। সেইজন্য যোগীগণ নিজেদের মধ্যেই এই তত্ত্ব অনুভব করে থাকেন।

সত্তা (অস্তিত্ব বা 'আছি' ভাব) দু'প্রকারের হয়—(১) বিকারী এবং (২) স্বতঃসিদ্ধ। যে সত্তা উৎপন্ন হবার পর প্রতীত হয়, তাকে বিকারী সত্তা বলা হয় আর যে সত্তা কখনো উৎপন্ন হয় না, বরং সর্বদা (অনাদিকাল থেকে) একইভাবে বিরাজমান, তাকে 'স্বতঃসিদ্ধ' বলা হয়। এই দৃষ্টিতে জগৎ এবং শরীরের অস্তিত্ব বিকারী এবং পরমাত্মা এবং আত্মার সত্তাকে 'স্বতঃসিদ্ধ' বলা হয়। বিকারী সত্তাকে স্বতঃসিদ্ধ সত্তার সঙ্গে এক করে মিলিয়ে দেখা হল বড় ভুল[১]। উৎপন্নধর্মী বিকারী সত্তা থেকে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করে অনুৎপন্ন স্বতঃসিদ্ধ সত্তায় স্থিত হওয়াই **'আত্মনি অবস্থিতম্'** পদটির ভাব।

জীব (চেতন) ভগবদ্প্রদত্ত বিবেক-বুদ্ধির অনাদর করে শরীর (জড়)-কে 'আমি' এবং 'আমার' বলে মেনে নেয় অর্থাৎ শরীরের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ হল স্বীকার করে নেয়। এই মেনে নেওয়া সম্বন্ধই হল জীবের বন্ধনের কারণ। এই সম্বন্ধ এত দৃঢ় যে মৃত্যুতেও এটি দূর হয় না আবার এত ভঙ্গুর যে যখন ইচ্ছা তখনই এটি পরিত্যাগ করা যায়। কারও সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করায় এবং ছিন্ন করায় জীব সম্পূর্ণ স্বাধীন। এই স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার না করে জীব শরীর ইত্যাদি বিজাতীয় পদার্থের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নেয়।

নিজের বিবেক-বোধকে (দেহের সঙ্গে নিজ পার্থক্যের জ্ঞান) গুরুত্ব না দিলে বিবেক অবদমিত হয়। বিবেক অবদমিত হলে দেহের (জড় তত্ত্বের) প্রাধান্য হয় এবং সেটি সত্য বলে প্রতীত হতে থাকে। সৎসঙ্গ, স্বাধ্যায় ইত্যাদির সাহায্যে যেমন যেমন বিবেক বিকশিত হয়, তেমন তেমনই দেহের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্বন্ধ দূর হতে থাকে। বিবেক জাগ্রত হলে পরমাত্মার (চিন্ময় তত্ত্বের) সঙ্গে যে নিজের প্রকৃত সম্পর্ক—তাতে নিজ স্বাভাবিক স্থিতি অনুভূত হয়। এটিই এই **'আত্মনি অবস্থিতম্'** পদটির ভাব।

বিকারী সত্তার (জগতের) সম্বন্ধ থেকে অহং (আমি)-বোধ উৎপন্ন হয়। এটি দু'প্রকারের হয় (১) শ্রবণ দ্বারা মানা, যেমন—অন্যের থেকে শুনে। আমি অমুক নামধারী ; 'আমি অমুক বর্ণবিশিষ্ট' ইত্যাদি অহংবোধ মেনে নেওয়া। (২) ক্রিয়া দ্বারা মানা ; যেমন—প্রবচন দেওয়া, শিক্ষা প্রদান করা, চিকিৎসা ইত্যাদি ক্রিয়াতে 'আমি বক্তা', 'আমি শিক্ষক', 'আমি চিকিৎসক' ইত্যাদি অহংবোধ মেনে নেওয়া। এই দু'প্রকারের অহংবোধই সর্বদা থাকে না, কিন্তু 'আছি'রূপ স্বতঃসিদ্ধ সত্তা সর্বদা বিরাজমান। 'আমি'রূপ মেনে নেওয়া অহংবোধ ত্যাগ

[১]বিকারী সত্তাকে (শরীর) স্বতঃসিদ্ধ সত্তার সঙ্গে মেলানোর তাৎপর্য হল—নিজেকে শরীর বলে মনে করা (অহংবোধ) ও শরীরকে নিজের বলে মনে করা (মমত্ববোধ)। নিজেকে শরীর বলে মনে করলে শরীর সত্য বলে প্রতীত হয় এবং শরীরকে নিজের বলে মনে করলে শরীরে মমত্ব জন্মায়।

করা হলে 'আছি'-রূপ বিকারী সত্তাও স্বতঃ পরিত্যাগ হয়ে যায় এবং যোগীদের 'আছে'রূপ স্বতঃসিদ্ধ সত্তায় নিজ অবস্থিতি অনুভব হয়ে যায়। একেই বলা হয় আপনাতে আপনি তত্ত্ব অনুভব করা।

মর্মার্থ

(১)

দেশ-কাল ইত্যাদির অপেক্ষায় কথিত 'আমি', 'তুমি', 'এ', 'সে'—এই চারটির মূলে 'আছি' রূপে এক পরমাত্মতত্ত্বই সমানভাবে সর্বত্র বিদ্যমান, যা এই চারটিরই প্রকাশক এবং আধার। 'আমি', 'তুমি', 'ও' এবং 'সে'—এই চারটি নিত্য পরিবর্তনশীল আর 'আছে' সর্বদা অপরিবর্তনশীল। এর মধ্যে 'তুমি আছ', 'এ আছে', 'সে আছে' এরূপ বলা হয়েও 'আমি আছে'— না বলে 'আমি আছি' বলা হয়। কারণ 'আমি আছি'-তে 'আছি' 'আমি' ভাবের জন্য ব্যবহৃত । যতক্ষণ 'আমি' ভাব থাকে, ততক্ষণ 'আছি'রূপে একদেশীয়তা বা পরিচ্ছিন্নতা থাকে। 'আমি' ভাব দূর হলে শেষ পর্যন্ত 'আছে'ই থেকে যায়।

'আত্মনি অবস্থিতম্'—কথাটির তাৎপর্য হল এই যে 'আছি'-তে 'আছে' এবং 'আছে'-তে 'আছি' অবস্থিত। অন্যভাবে বললে ব্যষ্টিতে সমষ্টি এবং সমষ্টিতে ব্যষ্টি অবস্থিত। যেমন সমুদ্র এবং তার তরঙ্গ একটিকে অপরটির থেকে পৃথক্ করা যায় না, তেমনই 'আছে' এবং 'আছি' এই দুটিকেও একটির থেকে অপরটিকে পৃথক্ করা যায় না। কিন্তু জল-তত্ত্বে যেমন সমুদ্র এবং তরঙ্গ—এই দুটিই নেই (প্রকৃতপক্ষে এক জল-তত্ত্বই বিরাজমান), তেমনই পরমাত্মতত্ত্ব ('আছে')-তে 'আছি' এবং 'আছে'—এর কোনোটিই নেই। এরূপ অনুভব করাই হল আপনাতে আপনি (স্বয়ং-এ স্থিত) তত্ত্বকে অনুভব করা বোঝায়।

'আমি'-বোধের জন্য (জগতে সুখাসক্তি ও পরমাত্মাতে বিমুখতা থাকার ফলেই) নিজের মধ্যে স্থিত পরমাত্মতত্ত্ব অনুভূত হয় না। তাই পরমাত্মাকে নিজের মধ্যে অনুভব না করে অন্যত্র খোঁজার তাৎপর্য হল তাঁকে নিজের থেকে ভিন্ন এবং দূরে মনে করা। ফলে তাঁকে প্রাপ্ত করার জন্যই নানা স্থানে ঘুরে বেড়াতে হয়। স্বয়ং ব্যতিরেকে যত পদার্থ আছে, সেগুলির সঙ্গে বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু নিজের মধ্যে পরমাত্মাকে যাঁরা অনুভব করেন তাঁরা কখনো কোনো অবস্থাতেই পরমাত্মা হতে বিচ্ছেদ অনুভব করেন না[১]।

আপনার মধ্যে পরমাত্মাকে দর্শন করা ভিন্নতা (দ্বৈতভাবের) পোষক নয়, বরং এটি ভিন্নতা-নাশক। 'আমি' ভাবই হল ভিন্নতার পোষক। মানুষ ভিন্নতার বাচক 'আমি'-ভাব অথবা পরিচ্ছিন্নতা, পরাধীনতা, অভাব, অজ্ঞান ইত্যাদি বিকারসমূহ ভ্রমক্রমে নিজের বলে মেনে নেয় । এগুলি দূর করার জন্য পরমাত্মাকে নিজের মধ্যে অনুভব করতে হয়। নিজের মধ্যে পরমাত্মাকে অনুভব করলেই এই বিকারসমূহ নাশ হতে পারে। এই বিকার ততক্ষণই থাকে, যতক্ষণ সাধক 'আছি'-কে দেখে (মান্য করে) 'আছে'-কে নয়। এই 'আছি'-র স্থানে 'আছে'-কে দেখলেই আর কোনো বিকার থাকে না। কারণ 'আছে'-তে কোনো বিকার নেই।

জগৎ পরিবর্তনশীল। জগতের অংশ হওয়ায় 'আমি'ও পরিবর্তনশীল ; যেমন—'আমি বালক', 'আমি যুবক', 'আমি বৃদ্ধ', 'আমি রোগী', 'আমি নীরোগ' ইত্যাদি[২]।

---

[১]তমাৎমস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥

(কঠোপনিষদ্ ২।২।১৩ ; শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ৬।১২)

'আপনাতে আপনি অবস্থিত (আত্মস্থ) পরমাত্মাকে যে জ্ঞানী ব্যক্তি নিত্য দর্শন করে থাকেন, তিনিই সদা বিরাজমান সুখ প্রাপ্ত হন, অন্যেরা নয়।'

[২]এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, বাল্য ও যুবাবস্থা তো পরিবর্তিত হয়, কিন্তু 'আমি' তো সেই 'আছি' অর্থাৎ 'আমি' তো পরিবর্তিত হয়নি। উত্তর হল যে, 'বিকারী সত্তা'-কে (জড়) 'স্বতঃসিদ্ধ সত্তা'-তে (চেতন) মেলাবার জন্যই 'আমি'-তে পরিবর্তন দেখা যায় না। আসলে 'আমার' প্রকাশক (স্বয়ং) সেই থাকে, 'আমি' সেই থাকে না। 'আমি বালক' এ কথায় যে 'আমি' থাকে, সে 'আমি যুবা'-তে থাকে না। অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্মরূপে 'আমি'ও পরিবর্তিত হয়। এইরূপ অন্য দেহ (জন্ম) প্রাপ্ত হলেও পূর্বের দেহের 'আমি' থাকে না, কিন্তু সত্তা থাকে (গীতা ২।১৩)।

'স্বতঃসিদ্ধ' অস্তিত্বকে ধরে 'আমি সেই' বলা হয় এবং 'বিকারী' সত্তাকে ধরে 'আমি পরিবর্তিত হয়েছি' বলা হয়।

জগতের মতো আমিও উৎপন্ন ও বিনাশশীল। যেমন, জগৎ নেই, তেমনই 'আমি'ও নেই।

হৈ সো সুন্দর হৈ সদা, নহিঁ সো সুন্দর নাহিঁ।
নহিঁ সো পরগট দেখিয়ে, হৈ সো দীখে নাহিঁ॥

'আছে' সর্বদাই আছে আর 'নেই' কখনো নেই। 'আছে' দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু 'নেই' দেখা যায় ; কারণ যার সাহায্যে আমরা 'নেই'-কে দেখি, সেই মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদিও 'নেই'-এরই অংশ। ত্রিপুটী দ্বারা দর্শন সজাতীয়তাতেই হয় অর্থাৎ ত্রিপুটীতে হওয়া (করণ-সাপেক্ষ) জ্ঞানে সজাতীয়তা হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং 'নেই'-এর সাহায্যে 'নেই'-কেই দেখা যায়, 'আছে'-কে নয়। 'আছে'র জ্ঞান ত্রিপুটিরহিত (করণ-নিরপেক্ষ)।

'নেই'-এর পৃথক্ সত্তা না থাকলেও 'আছে'র সত্তাতেই তা অস্তিত্ববান। 'আছে'ই হল 'নেই'-এর প্রকাশক এবং আধার। যেমন চক্ষুর সাহায্যে জগৎকে দেখা গেলেও চক্ষু চক্ষুকে দেখতে পায় না। কারণ যার দ্বারা দেখা যায়, তা হল চক্ষুই। এইরূপ যিনি সর্বজ্ঞ, সেই পরমাত্মাকে কেমন করে কীসের সাহায্যে জানা সম্ভব **'বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ'** (বৃহদারণ্যক ২।৪।১৪)। যা 'আছে' দ্বারা প্রকাশিত, তা ('নেই') 'আছে'-কে কেমনভাবে প্রকাশিত করতে পারে ?

আপনাতে স্থিত তত্ত্বের ('আছে'র) অনুভব নিজেই নিজের ('আছে') দ্বারাই হওয়া সম্ভব ; ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি ('নেই') দ্বারা নয়। নিজেতে নিজে যে জ্ঞান হয়, তা হল স্বাধীন আর অপরের (মন-বুদ্ধি ইত্যাদির) দ্বারা হওয়া জ্ঞান হল পরাধীন (নিজের মধ্যে অবস্থিত তত্ত্ব অনুভব করার জন্য অপর কারোর সাহায্যের প্রয়োজন হয় না)।

কানের দ্বারা শ্রবণ, মন দ্বারা মনন, বুদ্ধির দ্বারা বিচার প্রভৃতি উপায়গুলির দ্বারা কেউ তত্ত্বকে জানতে পারে না[১]। কারণ ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, দেশ, কাল, বস্তু ইত্যাদি সবই প্রাকৃতিক কার্য। প্রাকৃতিক কার্যাদির সাহায্যে সেই তত্ত্বকে কীভাবে জানা সম্ভব ? সুতরাং প্রাকৃতিক কার্যাদি পরিত্যাগ করলেই (সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হলেই) তত্ত্ব প্রাপ্তি হয় এবং তা আপনাতে আপনিই হয়।

সাধকদের সব থেকে বড় ভুল এই হয় যে তিনি যে রীতিতে জগৎকে জানেন, সেই রীতিতেই পরমাত্মাকেও জানতে চান। কিন্তু জগৎ ও পরমাত্মা—উভয়কে জানার রীতি বা নিয়ম একটি অপরটি থেকে ভিন্ন। জগৎকে ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদির সাহায্যে জানা যায়। কারণ তাকে জানা করণ-সাপেক্ষ। কিন্তু পরমাত্মাকে ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদির দ্বারা জানা সম্ভব নয়। কারণ তাঁকে জানা করণ-নিরপেক্ষ।

জড়ত্বের আশ্রয়ে থেকে চিন্ময়ে অবস্থিতি অনুভব করা যায় না। জড়ত্বের (স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ-শরীরের) আশ্রয় নিয়ে যেসব ব্যক্তি পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব করতে চান, তাঁরা সমাধিস্থ হলেও পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত করতে পারেন না। কারণ সমাধি কারণ-শরীরকে আশ্রয় করেই হয়ে থাকে[২]।

যিনি পরমাত্মাকে নিজের এবং নিজেকে পরমাত্মার বলে জানেন, সেই জ্ঞানরূপ চক্ষুসম্পন্ন যোগী শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি থেকে নিজেকে পৃথক্ করে আপনাতে-আপনি অবস্থিত পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব করেন। কিন্তু যিনি শরীরকে নিজের এবং নিজেকে শরীর বলে মনে করেন সেই মূঢ় এবং অকৃতাত্মা ব্যক্তি শরীর, ইন্দ্রিয়, মন,

---

[১](ক) নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। (কঠোপনিষদ্ ১।২।২৩ ; মুণ্ডকোপনিষদ্ ৩।২।৩)
'এই পরমাত্মতত্ত্ব কোনো প্রবচনের সাহায্যে, কোনো প্রকার বুদ্ধির দ্বারা বা অনেক শুনলেও প্রাপ্ত হওয়া যায় না।'
(খ) নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা। (কঠোপনিষদ্ ২।৩।১২)
'এই পরমাত্মতত্ত্ব কোনো বাক্যের সাহায্যে, মনের সাহায্যে বা নেত্র দ্বারা প্রাপ্ত করা সম্ভব নয়।'

[২]স্থূলশরীর দ্বারা 'ক্রিয়া', সূক্ষ্মশরীর দ্বারা 'চিন্তন' এবং কারণশরীর দ্বারা 'সমাধি' হয়। কারণশরীর এবং তার সাহায্যে হওয়া সমাধি জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি অবস্থার থেকে বিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সূক্ষ্মরূপে নিরন্তর ক্রিয়াশীল থাকে। এই কারণ-দেহেরও অতীত হলে একমাত্র তত্ত্বই থাকে। এটিই হল ক্রিয়া-অক্রিয়া দুইয়ের অতীত এবং সর্বদা অখণ্ডরূপে বিরাজিত 'স্বরূপের সমাধি'। কারণদেহে হওয়া সমাধিতে তো ব্যুত্থান হয়, কিন্তু 'স্বরূপের সমাধি'-তে অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপের বোধ হলে সমাধি এবং ব্যুত্থান—দুই-ই হয় না। একে 'নির্বীজ সমাধি'ও বলা হয়, কারণ এতে সংসারের সম্বন্ধ (বীজ) নষ্ট হয়ে যায়। একেই বলা হয় সহজাবস্থা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি কোনো অবস্থা নয় ; বরং এটি অবস্থার অতীত। অবস্থাতীত অবস্থাকে কোনো অবস্থা বলা যায় না।

বুদ্ধি ইত্যাদির সাহায্যে চেষ্টা করলেও আপনাতে স্থিত পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব করতে পারে না।

(২)

'আত্মনি অবস্থিতম্' পদটির দ্বারা ভগবান নিজেকে সকল প্রাণীর আত্মায় অবস্থিত (সর্বব্যাপী) বলে জানিয়েছেন। এটি অনুভব করার জন্য সাধকের নিম্নোক্ত চারটি বিষয় দৃঢ়তার সঙ্গে মেনে নিতে হয়—

১. পরমাত্মা এখানে আছেন।

২. পরমাত্মা এখন আছেন।

৩. পরমাত্মা নিজের মধ্যে আছেন।

৪. পরমাত্মা আমার আপন।

পরমাত্মা সর্বত্র (সর্বব্যাপী) হওয়ায় এখানেও আছেন, সর্বসময় অবস্থিত (ত্রিকালে অবস্থিত) হওয়ায়, এখনও অবস্থিত আছেন ; সবার মধ্যে অবস্থান করলে, আমার মধ্যেও আছেন ; আর তিনি সকলের হলে আমারও। এই দৃষ্টিতে ভগবান এখানে হলে তাঁকে লাভ করার জন্য অন্য স্থানে যাবার প্রয়োজন নেই, এখন হওয়ায় তাঁর প্রাপ্তির জন্য ভবিষ্যতের প্রতীক্ষা করতে হয় না ; নিজের মধ্যে হওয়ায়, তাঁকে বাইরে খুঁজতে হয় না এবং আপন বলে তাঁকে ব্যতীত অন্য কাউকে মানার প্রয়োজন নেই। আপনজন হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে তাঁকে অত্যন্ত প্রিয় বলে মনে হওয়া উচিত।

প্রত্যেক সাধকের পক্ষে উপরিউক্ত চারটি বিষয় অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ এবং তাৎক্ষণিক কল্যাণদায়ক। সাধকদের এই চারটি বিষয় দৃঢ়তার সঙ্গে মেনে নিতে হয়। এগুলি সমস্ত সাধনের সার। এতে কোনো যোগ্যতা, অভ্যাস, গুণ ইত্যাদির প্রয়োজন নেই। এগুলি স্বতঃসিদ্ধ এবং বাস্তবিক। এই বিষয় মেনে নেবার পক্ষে সকলেই যোগ্য, সকলেই পাত্র এবং সকলেই সমর্থ। শর্ত হল যে একমাত্র সেই পরমাত্মাকেই যেন চাওয়া হয়।

'যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ'—যাঁরা তাঁদের চিত্ত শুদ্ধ করেননি, তাঁদের জন্য এখানে **'অকৃতাত্মানঃ'** পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। সদসৎ জ্ঞান (বিবেক)-কে গুরুত্ব না দেওয়ার জন্যই এইসব ব্যক্তিকে **'অচেতসঃ'** বলা হয়েছে।

যাঁদের চিত্তে জাগতিক ব্যক্তি, পদার্থ ইত্যাদির গুরুত্ব থাকে এবং যাঁরা শরীরাদিকে নিজের বলে মনে করে তাতে সুখভোগের ইচ্ছা রাখেন, সেইসব ব্যক্তিকে **'অকৃতাত্মানঃ'** এবং **'অচেতসঃ'** বলা হয়েছে। এরূপ ব্যক্তিগণ তত্ত্বপ্রাপ্তি লাভ করতে চাইলেও শরীর, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি জড় (প্রাকৃত) পদার্থের সাহায্যেই উপলব্ধি করতে চান। পরমাত্মা জড় পদার্থের সাহায্যে নয়, বরং জড়ত্ব ত্যাগ (সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন) করলেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই শ্লোকে **'যতন্তঃ'** পদটি দু'বার ব্যবহৃত হয়েছে। এর তাৎপর্য হল এই যে যত্ন করাতে সমান হলেও একজন (জ্ঞানী) তত্ত্ব অনুভব করেন আর অপরজন (মূঢ় ব্যক্তি) তা অনুভব করেন না। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দেহ, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধির দ্বারা যে যত্ন করা হয় তা তত্ত্বপ্রাপ্তিতে সহায়ক হলেও চিত্তের (জড়ত্বের) সঙ্গে সম্পর্ক বজায় থাকার জন্য এবং চিত্তে জাগতিক পদার্থের গুরুত্ব থাকায় (চেষ্টা করলেও) তত্ত্বকে প্রাপ্ত করা যায় না। যাদের দৃষ্টি অসতের (জাগতিক ভোগ ও সংগ্রহের) দিকে থাকে, তারা সৎ (তত্ত্ব) কীভাবে উপলব্ধি করবে ?

অকৃতাত্মা এবং অচেতন ব্যক্তিগণ ধ্যান, স্বাধ্যায়, জপ ইত্যাদি সবকিছুই করে থাকেন, কিন্তু চিত্তে জড়ত্বের গুরুত্ব থাকায় তাঁদের এই তত্ত্ব অনুভূত হয় না। যদিও এরূপ ব্যক্তিদের করা চেষ্টাও নিষ্ফল হয় না। কিন্তু তাঁরা তৎ-কালে তত্ত্ব অনুভব করতে সক্ষম হন না। জড়ত্ব সম্পূর্ণ- ভাবে ত্যাগ করলে তবেই তৎক্ষণাৎ তত্ত্ব অনুভূত হয়।

যার আশ্রয় নেওয়া হয়, তাকে ত্যাগ করা যায় না— এই হল নিয়ম। সুতরাং শরীর, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি জড় পদার্থের আশ্রয় গ্রহণ করে সাধক জড়ত্বকে ত্যাগ করতে সক্ষম হন না। এতদ্ব্যতিরেকে মন, বুদ্ধি ইত্যাদি জড় পদার্থের দ্বারা সাধন করলে সাধনকারীদের একপ্রকার সূক্ষ্ম অহংকার হয়ে থাকে, যা জড়ত্ব ত্যাগ করলে তবেই নিবৃত্ত হয়। জড়ত্ব ত্যাগ করার সহজ উপায় হল একমাত্র ভগবানের শরণাগত হওয়া অর্থাৎ 'আমি ভগবানের, ভগবানই আমার' এই প্রকৃত সত্য স্বীকার করে নেওয়া ; এর ওপর অটল বিশ্বাস রাখা। এটিতে কোনো চেষ্টা বা অভ্যাসের প্রয়োজন হয় না। যথার্থ কথা দৃঢ়তা সহকারে শুধুমাত্র স্বীকার করারই প্রয়োজন হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব—ভোগও সর্বদা সঙ্গে থাকে না আর সম্পদও সর্বদা সঙ্গে থাকে না—মানুষের মধ্যে এই বিবেক স্বতঃই থাকে। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি শাস্ত্র পড়ে, সৎসঙ্গ করে, সাধন ইত্যাদি করে অথচ নিজের বিবেকবোধকে প্রাধান্য

দেয় না, ভোগ ও সম্পদ-সংগ্রহের প্রতি বিতৃষ্ণ হয় না, সেই সব মানুষকে বলা হয় **'অকৃতাত্মা'**। এরূপ মানুষকে অষ্টাদশ অধ্যায়ের ষোড়শ শ্লোকে **'অকৃতবুদ্ধি'** এবং **'দুর্মতি'** বলে অভিহিত করা হয়েছে। যদিও পরমাত্মপ্রাপ্তি করা কঠিন নয়, তবুও অন্তরে অনুরাগ, আসক্তি, সুখবুদ্ধি থাকলে সেই সব মানুষ সাধন করলেও পরমাত্মাকে জানতে পারে না। কারণ ভোগ ও সংগ্রহে যাদের আগ্রহ থাকে তাদের বিবেকবোধ স্থায়ী হয় না।

আগের শ্লোকে যাকে **'বিমূঢ়াঃ'** বলা হয়েছে, এখানে তাকে বলা হয়েছে **'অচেতসঃ'**, গুণাদিতে মোহগ্রস্ত হওয়ায় তারা বিষয়াদির বিভাগও জানে না এবং স্ব-স্বরূপের বিভাগও জানে না অর্থাৎ ভোগাদির সংযোগ-বিয়োগ এবং স্ব-স্বরূপ যে পৃথক্ পৃথক্—তা জানে না।

এই প্রকরণের সপ্তম থেকে একাদশ শ্লোক পর্যন্ত ভগবান বলতে চেয়েছেন যে আমার অংশ হল জীবাত্মা এবং যেসব সামগ্রীকে (শরীরাদি পদার্থগুলি) তারা ভ্রমক্রমে নিজের বলে মনে করে তা সম্পূর্ণ পৃথক্—**'প্রকৃতিস্থানি'**। সূর্য ও অমাবস্যার রাত্রির মতোই দুটি বিভাগ একেবারে আলাদা। তাদের একের সঙ্গে অপরের সংযোগ কখনোই সম্ভবপর নয়। যে ব্যক্তি উপরিউক্ত জড় ও চেতনের দুটি বিভাগ সর্বদা পৃথক্‌রূপে দেখেন, তিনিই জ্ঞানী ও যোগী। কিন্তু যে ব্যক্তি দুটিকে এক করে দেখে, সে হল অজ্ঞান এবং ভোগী।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—পঞ্চদশ অধ্যায়ে পাঁচটি করে শ্লোকের চারটি প্রকরণ রয়েছে। তার মধ্যে এই তৃতীয় প্রকরণটি দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শ্লোক পর্যন্ত বিস্তৃত, যাতে ষষ্ঠ শ্লোকটি সম্মিলিত করলে পাঁচটি শ্লোক হয়। এই তৃতীয় প্রকরণটি বিশেষভাবে ভগবানের প্রভাব এবং গুরুত্বের প্রকাশক। ষষ্ঠ শ্লোকে যে বিষয়টি (পরমধামকে সূর্য, চন্দ্র বা অগ্নিও প্রকাশ করতে সক্ষম নয়) স্পষ্ট হয়নি, নিম্নোক্ত শ্লোকে ভগবান তা স্পষ্টভাবে আলোচনা করছেন।

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥ ১২ ॥

[**আদিত্যগতম্** (সূর্যকে আশ্রয় করে) ; **যৎ, তেজঃ** (যে তেজ) ; **অখিলম্, জগৎ** (সমস্ত জগৎকে) ; **ভাসয়তে** (উদ্ভাসিত করে) ; **যৎ, চন্দ্রমসি, চ** (যে তেজ চন্দ্র ও) ; **যৎ** (যে) ; **অগ্নৌ** (অগ্নিতে আছে) ; **তৎ, তেজঃ** (সেই তেজ) ; **মামকম্, বিদ্ধি** (আমারই বলে জানবে।)]

সূর্যকে আশ্রয় করে যে তেজ সমস্ত জগৎ উদ্ভাসিত করে এবং যে তেজ চন্দ্র ও অগ্নিতে আছে, সেই তেজ আমারই বলে জানবে॥ ১২ ॥

ব্যাখ্যা—[জীবের স্বভাবই হল প্রভাব এবং গুরুত্বের দিকে আকর্ষিত হওয়া। প্রাকৃত পদার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় জীব প্রাকৃত পদার্থের প্রভাবে প্রভাবিত হয়। কারণ প্রকৃতিতে অবস্থান করায় জীবগণ প্রাকৃত পদার্থগুলিতে (শরীর, স্ত্রী, পুত্র, অর্থ, সম্পদে) গুরুত্ব অনুভব করে, ভগবানে নয়। তাই জীবের এই প্রাকৃত পদার্থের প্রভাব দূর করার জন্য ভগবান তাঁর প্রভাব বর্ণনা করে তার রহস্য উন্মোচন করতে গিয়ে জানিয়েছেন যে ওইসব প্রাকৃত পদার্থে যে প্রভাব এবং গুরুত্ব দেখা যায় তা প্রকৃতপক্ষে তাঁরই, ওই প্রাকৃত বস্তুর নয়। সর্বোপরি প্রভাবশালী একমাত্র তিনিই। তাঁর প্রকাশ থেকেই সবকিছু প্রকাশিত, উদ্ভাসিত হয়।]

'যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্'—ভগবান যেমন (গীতা ২।৫৫) কামনাগুলিকে **'মনোগতান্'** বলে জানিয়েছেন, এখানে তেমনই তেজকে **'আদিত্যগতম্'** বলে জানিয়েছেন। তাৎপর্য হল যে মনোস্থিত কামনাগুলি যেমন মনের ধর্ম বা স্বরূপ নয়, এগুলি আগন্তুক, তেমনই সূর্যে অবস্থিত তেজ সূর্যের ধর্ম বা স্বরূপ নয়, আগন্তুক অর্থাৎ এটি সূর্যের নিজস্ব নয়, ভগবানের কাছ থেকে পাওয়া।

সূর্যের তেজ (প্রকাশ) এত মহান যে তার দ্বারা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হয়। এটি সূর্যের তেজ বলে মনে হলেও

এটি প্রকৃতপক্ষে ভগবানেরই। তাই সূর্য ভগবানকে বা তাঁর পরমধামকে প্রকাশিত করতে সমর্থ নয়। মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন—

পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ॥

(যোগদর্শন ১।২৬)

ঈশ্বর সকলের পূর্বপুরুষেরও গুরু। কারণ কাল দ্বারা তাঁর অবচ্ছেদ নেই।

সম্পূর্ণ ভৌতিক জগতে সূর্যের ন্যায় প্রত্যক্ষ প্রভাবশালী আর কোনো পদার্থ নেই। চন্দ্র, অগ্নি, নক্ষত্রপুঞ্জ, বিদ্যুৎ ইত্যাদি যতপ্রকার প্রকাশমান পদার্থ আছে, সেগুলি সবই সূর্যের থেকে প্রকাশ পায়। ভগবানের থেকে আহরিত তেজে যখন সূর্য এত বিশিষ্ট ও প্রভাবশালী, তখন স্বয়ং ভগবান কত বিশিষ্ট এবং প্রভাবশালী হতে পারেন! এইভাবে বিচার করলে স্বতঃ ভগবানের প্রতি আকর্ষণ জন্মায়।

সূর্য 'নেত্রে'র অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। সুতরাং নেত্রে যে প্রকাশ (দেখার শক্তি) থাকে, তাও পরম্পরাক্রমে ভগবানের কাছ থেকেই আসা বলে জানতে হবে।

'যচ্চন্দ্রমসি'—যেমন সূর্যে অবস্থিত প্রকাশিকা শক্তি এবং দাহিকা শক্তি—উভয়ই ভগবানের থেকে আগত, তেমনই চন্দ্রের প্রকাশ-শক্তি এবং পোষণ-শক্তি—উভয়ই (সূর্য থেকে প্রাপ্ত হলেও পরম্পরাক্রমে) ভগবদ্-প্রদত্তই, যেমন ভগবানের তেজ 'আদিত্যগত', তেমনই তাঁরই তেজ 'চন্দ্রগত' বলে বুঝতে হবে। চন্দ্রের প্রকাশের সঙ্গে শীতলতা, মধুরতা, পোষণতা ইত্যাদি যে সমস্ত গুণ আছে, তা সবই ভগবানের প্রভাব।

এখানে চন্দ্রকে তারা, নক্ষত্র ইত্যাদিরও উপলক্ষণ বলে বুঝতে হবে।

চন্দ্র **'মন'**-এর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। সুতরাং মনের যে প্রকাশ (মনন করার শক্তি), তাও পরম্পরাক্রমে ভগবানের থেকে আসা বলে জানতে হবে।

'যচ্চাগ্নৌ'—ভগবানে তেজ যেমন 'আদিত্যগত', তেমনই তাঁর তেজ 'অগ্নিগত'ও বলে জানতে হবে। তাৎপর্য হল এই যে অগ্নির প্রকাশিকা শক্তি এবং দাহিকা শক্তি—উভয়ই ভগবানের, অগ্নির নয়।

এখানে অগ্নিকে বিদ্যুৎ, প্রদীপ, জোনাকি ইত্যাদিরও উপলক্ষণ বলে জানতে হবে।

অগ্নি হল 'বাণী'র অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। সুতরাং বাণীতে যে প্রকাশ (অর্থপ্রকাশ করার শক্তি) থাকে, তা-ও ভগবানের কাছ থেকেই পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত বলে জানতে হবে।

'তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্'—যে তেজ সূর্য, চন্দ্র এবং অগ্নিতে আছে এবং যে তেজ এই তিনটির প্রকাশ থেকে প্রকাশিত অন্য পদার্থে (তারা, নক্ষত্র, বিদ্যুৎ, জোনাকি ইত্যাদি) দেখা বা শোনা যায়, সেগুলিও ভগবানেরই তেজ বলে জানতে হবে।

উপরিউক্ত পদের দ্বারা ভগবান জানিয়েছেন যে মানুষ যেসব তেজঃপূর্ণ পদার্থে আকর্ষিত হয়, সেইসব পদার্থে আমারই প্রভাব দেখা উচিত (গীতা ১০।৪১)। যেমন, বোঁদের লাড্ডুর মিষ্টত্ব তার নিজস্ব নয়, তা হল চিনির মিষ্টভাব, তেমনই সূর্য, চন্দ্র এবং অগ্নিতে যে তেজ, তা তাদের নিজস্ব নয়, সেগুলি ভগবানের। ভগবানের আলোকেই এই সমস্ত জগৎ আলোকিত হচ্ছে—**'তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি'** (কঠোপনিষদ্ ২।২।১৫)। তিনি সকল জ্যোতির জ্যোতি—**'জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিঃ'** (গীতা ১৩।১৭)।

সূর্য, চন্দ্র এবং অগ্নি যথাক্রমে নেত্র, মন এবং বাণীর অধিষ্ঠাতা এবং তাদের প্রকাশক। মানুষ নিজের ভাব প্রকাশ করার এবং বোঝার জন্য চক্ষু, মন (চিত্ত) এবং বাক্য—এই তিনটি ইন্দ্রিয়ই ব্যবহার করে। এই তিনটি ইন্দ্রিয় যত প্রকাশ করে তত অন্য ইন্দ্রিয় করে না। প্রকাশের অর্থ হল পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান করানো। নেত্র এবং বাক্য বাহ্যিক করণ এবং মন হল আভ্যন্তর করণ। করণের সাহায্যে বস্তুর জ্ঞান হয়। এই তিনটি করণই ভগবানকে প্রকাশিত করতে পারে না। কারণ এর মধ্যে যে তেজ এবং প্রকাশ অবস্থিত, তা এদের নিজস্ব নয়, তা ভগবানেরই।

পরিশিষ্ট-ভাব—পরমাত্মাই সমস্ত শক্তির মূল। এই বিষয়ে কেনোপনিষদের একটি গল্প আছে। একবার পরমাত্মা দেবতাদের পক্ষ হয়ে অসুরদের পরাজিত করেন। কিন্তু দেবতারা এই বিজয়কে তাঁদেরই শক্তির জন্য প্রাপ্ত হয়েছে বলে অহংকার করেন। তাঁরা মনে করতে থাকেন তাঁদের শক্তিতেই অসুরেরা পরাভূত হয়েছে। দেবতাদের এই অহংকার দূর করার জন্য পরমাত্মা যক্ষরূপে তাঁদের সামনে প্রকটিত হলেন। যক্ষকে দেখে দেবতারা আশ্চর্যান্বিত হয়ে ভাবতে থাকেন

এই যক্ষ কে ? যক্ষের পরিচয় জানার জন্য দেবতারা অগ্নিদেবকে তাঁর কাছে প্রেরণ করেন। যক্ষের জিজ্ঞাসায় অগ্নিদেব বলেন , আমি অগ্নিদেবতা, 'জাতবেদা' নামে প্রসিদ্ধ এবং আমি ইচ্ছা করলে পৃথিবীর সব কিছু পুড়িয়ে ভস্মে পরিণত করতে পারি। যক্ষ তখন তাঁর সামনে একটি তৃণ রেখে বললেন, তুমি এই তৃণটিকে পোড়াও। অগ্নিদেব নিজের সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করেও সেই তৃণটিকে পোড়াতে সক্ষম হলেন না। তখন তিনি লজ্জিত হয়ে দেবতাদের কাছে ফিরে এসে বললেন—এই যক্ষ কে, তা আমি জানতে পারলাম না। তখন দেবতারা বায়ুদেবকে যক্ষের কাছে পাঠালেন। যক্ষের জিজ্ঞাসায় বায়ুদেব বললেন, আমি বায়ুদেব, 'মাতরিশ্বা' নামে প্রসিদ্ধ এবং আমি ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সব উড়িয়ে দিতে পারি। যক্ষ তখন তাঁরও সামনে একটি তৃণ রেখে বললেন, তুমি এই তৃণটিকে উড়িয়ে দাও। বায়ুদেব তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়েও সেই তৃণটিকে ওড়াতে পারলেন না। তিনিও লজ্জা পেয়ে দেবতাদের কাছে এসে জানালেন যে তিনিও যক্ষের পরিচয় জানতে পারেননি। দেবতারা এবার ইন্দ্রকে পাঠালেন যক্ষের পরিচয় জানার উদ্দেশ্যে। কিন্তু ইন্দ্র সেখানে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই যক্ষ অন্তর্ধান করেন এবং সেইস্থানে হিমালয়কন্যা উমা প্রকটিতা হন। ইন্দ্রের জিজ্ঞাসার উত্তরে উমাদেবী বললেন, স্বয়ং পরমাত্মাই তোমাদের অহংকার দূর করার উদ্দেশ্যে যক্ষরূপে প্রকটিত হয়েছিলেন। তাৎপর্য হল এই যে, জগৎ-সংসারে যা কিছু শক্তি, বিশেষত্ব, অলৌকিকতা দৃষ্টিগোচর হয়, তা সবই পরমাত্মা হতে প্রাপ্ত হয়েছে (গীতা ১০।৪১)।

***

সম্বন্ধ—দৃশ্য-পদার্থে নিজের প্রভাব জানাবার পর ভগবান এবার পরবর্তী শ্লোকে যে শক্তির সাহায্যে সমষ্টি জগতে ক্রিয়াদি হয়ে চলেছে, সেই সমষ্টি-শক্তিতে তাঁর প্রভাবের কথা জানাচ্ছেন।

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ॥ ১৩ ॥

[**অহম্, চ, গাম্** (আমিই পৃথিবীতে) ; **আবিশ্য** (অনুপ্রবেশ করে) ; **ওজসা** (নিজ শক্তির দ্বারা) ; **ভূতানি, ধারয়ামি** (সমস্ত প্রাণীকে ধারণ করি) ; **চ, রসাত্মকঃ** (এবং রসযুক্ত) ; **সোমঃ, ভূত্বা** (চন্দ্রের রূপে) ; **সর্বাঃ, ঔষধীঃ** (ওষধি সমূহকে) ; **পুষ্ণামি** (পরিপুষ্ট করি।)]

আমিই পৃথিবীতে অনুপ্রবেশ করে নিজ শক্তির সাহায্যে সমস্ত প্রাণীকে ধারণ করি এবং আমিই রসযুক্ত চন্দ্রের রূপে ওষধি (বনস্পতি) সমূহকে পরিপুষ্ট করি॥ ১৩ ॥

ব্যাখ্যা—'গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা'—ভগবানই পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হয়ে তার ওপর অবস্থিত সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম প্রাণীদের ধারণ করেন। তাৎপর্য হল এই যে পৃথিবীর যে ধারণশক্তি তা পৃথিবীর নিজস্ব নয়, তা ভগবানেরই[১]।

বৈজ্ঞানিকেরাও স্বীকার করেছেন যে, পৃথিবীর থেকে

---

[১](ক) দ্যৌঃ সচন্দ্রার্কনক্ষত্রা খং দিশো ভূর্মহোদধিঃ। বাসুদেবস্য বীর্যেণ বিধৃতানি মহাত্মনঃ॥

(মহাভারত, অনুশাসনপর্ব ১৪৯।১৩৪)

'স্বর্গ, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রখচিত আকাশ, দশদিক, পৃথিবী এবং মহাসাগর—এ সবই ভগবান বাসুদেবের শক্তি দ্বারা বিধৃত।'

(খ) পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ যো যময়তি মহীং বেদ ন ধরা যমিত্যাদৌ বেদো বদতি জগতামীশমমলম্।
নিয়ন্তারং ধ্যেয়ং মুনিসুরনৃণাং মোক্ষদমসৌ শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ॥

(শঙ্করাচার্যকৃত কৃষ্ণাষ্টকম্)

'পৃথিবীতে থেকে যিনি পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করেন অথচ পৃথিবী যাঁকে জানে না, যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথ্বীং যময়তি যং পৃথিবী ন বেদ' ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা বেদ যে অমল স্বরূপকে জগৎস্বামী, নিয়ন্তা, ধ্যেয়, দেবতা, মনুষ্য ও মুনিগণের মোক্ষ প্রদানকারী বলেছেন, সেই শরণাগতবৎসল নিখিল ভুবনেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আমার চক্ষুর বিষয় হোন।'

জলস্তর উচ্চ এবং পৃথিবীতে স্থলের থেকে জলের ভাগ অধিক[১]। তা সত্ত্বেও পৃথিবী জলমগ্ন হয় না—ভগবানের ধারণশক্তির এই হল প্রভাব।

পৃথিবীর উপলক্ষণে বুঝতে হবে যে পৃথিবী ব্যতীত আর যেখানেই ধারণশক্তি দেখা যায়, তা সবই ভগবানের। পৃথিবীতে অন্নাদি, ওষধি উৎপন্ন করার (উৎপাদিকা) শক্তি এবং গুরুত্বাকর্ষণ শক্তিও ভগবানের বলেই জানতে হবে।

'পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ'—চন্দ্রের দুটি শক্তি—প্রকাশিকাশক্তি এবং পোষণশক্তি। প্রকাশিকা শক্তিতে নিজের প্রভাব আগের শ্লোকে বর্ণনা করার পর ভগবান এবার এই শ্লোকে চন্দ্রের পোষণ-শক্তিতে তাঁর প্রভাবের কথা জানিয়ে বলছেন যে তিনি চন্দ্রের মাধ্যমে সমস্ত বনস্পতিকে পরিপুষ্ট করে থাকেন।

চন্দ্র শুক্লপক্ষে পোষক ও কৃষ্ণপক্ষে শোষক হয়ে থাকে। শুক্লপক্ষের রসময় চন্দ্রের মধুর কিরণে অমৃত বর্ষণ হওয়ার জন্যই বৃক্ষ-লতাদি পরিপুষ্ট হয় এবং ফলে-ফুলে পূর্ণ হয়। মাতৃজঠরে স্থিত শিশুও শুক্লপক্ষে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

'সোমঃ' পদটি এখানে চন্দ্রলোকের বাচক, চন্দ্রমণ্ডলের বাচক নয়। চক্ষু দ্বারা আমরা যা দেখি, তাকে বলে চন্দ্রমণ্ডল। চন্দ্রমণ্ডলেরও ওপরে (চক্ষু দ্বারা অদৃষ্ট) চন্দ্রলোক রয়েছে। উপরিউক্ত পদে বিশেষভাবে **'সোমঃ'** পদটি ব্যবহার করার অভিপ্রায় হল চন্দ্রে জ্যোৎস্না প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অমৃত-বর্ষণের শক্তিও থাকে। এই অমৃত প্রথমে চন্দ্রলোক থেকে চন্দ্রমণ্ডলে আসে, তারপর চন্দ্রমণ্ডল থেকে ভূ-মণ্ডলে আসে।

এখানে **'ওষধীঃ'** পদের অন্তর্গত চাল, গম, ছোলা ইত্যাদি সর্বপ্রকার খাদ্যবস্তু বুঝতে হবে। চন্দ্রের দ্বারা পরিপুষ্ট অন্ন ভোজন করলেই মানুষ, পশু, পক্ষী ইত্যাদি সমস্ত প্রাণী পুষ্টিলাভ করে। ওষধী এবং বনস্পতিতে শরীর পরিপুষ্ট করার যে শক্তি, তা চন্দ্র থেকেই আসে। চন্দ্রের এই পোষণশক্তিও তার নিজস্ব নয়, ভগবানের কাছ থেকেই প্রাপ্ত। ভগবানই চন্দ্রকে নিমিত্ত করে সকলের পোষণ করে থাকেন।

পরিশিষ্ট-ভাব—পৃথিবী, চন্দ্র ইত্যাদি সবই ভগবানের অপরা প্রকৃতি (গীতা ৭।৪)। সুতরাং এগুলির ধারক, উৎপাদক, পালক, সংরক্ষক, প্রকাশক ইত্যাদি সবই ভগবান। ভগবানের শক্তি হওয়ায় অপরা প্রকৃতি ভগবান হতে অভিন্ন।

এখানে **'সোম'** শব্দটি চন্দ্রলোকের বাচক, যা সূর্যেরও ঊর্ধ্বে[২] অবস্থিত।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—সমষ্টি-শক্তিতে নিজের প্রভাব জানাবার পরে, যে শক্তির সাহায্যে ব্যষ্টি-জগতের ক্রিয়াদি সম্পাদিত হচ্ছে, ভগবান এবার সেই ব্যষ্টি-শক্তিতে তাঁর প্রভাবের কথা জানাচ্ছেন।

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্॥ ১৪ ॥

[**প্রাণীনাম্** (প্রাণিগণের) ; **দেহম্** (শরীরে) ; **আশ্রিতঃ** (অবস্থিত) ; **অহম্** (আমি) ; **প্রাণাপানসমাযুক্তঃ** (প্রাণ ও অপান বায়ুর সহিত মিলিত) ; **বৈশ্বানরঃ, ভূত্বা** (বৈশ্বানর অগ্নিরূপে) ; **চতুর্বিধম্** (চতুর্বিধ প্রকারের) ; **অন্নম্, পচামি** (অন্ন পরিপাক করি।)]

প্রাণীগণের শরীরে অবস্থিত আমি প্রাণ ও অপান বায়ুর সহিত মিলিত হয়ে বৈশ্বানর (জঠরাগ্নি)রূপে চতুর্বিধ প্রকারের অন্ন পরিপাক করি॥ ১৪ ॥

---

[১]পৃথিবীতে মোট জল প্রায় শতকরা একাত্তর ভাগ এবং স্থল মোট প্রায় শতকরা উনত্রিশ ভাগ বলে মনে করা হয়।

[২]ন বিদুঃ সোম তে মায়াং যে চ নক্ষত্রযোনয়ঃ।
ত্বমাদিত্যপথাদূর্ধ্বং জ্যোতিষাং চোপরিস্থিতঃ॥ (পদ্মপুরাণ, সৃষ্টি. ৪১।১২৮)

ব্যাখ্যা—**'অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ'**—দ্বাদশ শ্লোকে অগ্নির প্রকাশ করার শক্তিতে নিজ প্রভাবের বর্ণনা করে ভগবান এই শ্লোকে বৈশ্বানররূপ অগ্নির পাচন-শক্তিতে নিজ প্রভাব বর্ণনা করেছেন[১]। তাৎপর্য হল এই যে অগ্নির এই দুটি কাজই (উদ্ভাসিত করা এবং পাচন বা হজম করানো) ভগবানের শক্তির সাহায্যেই হয়ে থাকে।

প্রাণীদের শরীর পরিপুষ্ট করা এবং তাদের রক্ষা করার জন্য ভগবানই বৈশ্বানর (জঠরাগ্নি) রূপে তাদের শরীরে বাস করেন। মানুষের ন্যায় লতা-বৃক্ষ ইত্যাদি স্থাবর এবং পশু-পক্ষী ইত্যাদি জঙ্গম প্রাণীদের মধ্যেও বৈশ্বানরের পাচন-শক্তি কাজ করে। লতা-বৃক্ষ যে খাদ্য-জল গ্রহণ করে, পাচন-শক্তির দ্বারা তার পাচন হওয়ার ফলস্বরূপেই ওইসব লতা-বৃক্ষাদি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

'প্রাণাপানসমাযুক্তঃ'—শরীরে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান—এই পাঁচটি প্রধান বায়ু এবং নাগ, কূর্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়—এই পাঁচটি উপপ্রধান বায়ু থাকে।[২] এই শ্লোকে ভগবান দুটি প্রধান বায়ু—প্রাণ ও অপানের বর্ণনা করেছেন। কারণ এই উভয় বায়ু জঠরাগ্নিকে প্রদীপ্ত করে। জঠরাগ্নির দ্বারা হজম হওয়া খাদ্যের সূক্ষ্ম অংশ বা রসকে শরীরের প্রত্যেক অঙ্গে সঞ্চারিত করার সূক্ষ্ম কার্যও মুখ্যত প্রাণ ও অপান বায়ুরই।

'পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্'—প্রাণী চার প্রকারের খাদ্যবস্তু ভক্ষণ করে—

১. **ভোজ্য**—যে খাদ্য দাঁত দিয়ে চিবিয়ে খাওয়া হয় ; যেমন—রুটি, ভাত, সব্জী ইত্যাদি।

২. **পেয়**—যে খাদ্য গলাধঃকরণ করা হয় ; যেমন—খিচুড়ী, পায়েস, হালুয়া, দুধ ইত্যাদি।

৩. **চোষ্য**—দাঁত দিয়ে চিবিয়ে যে খাদ্যের রস শুষে নেওয়া হয় এবং চর্বিত অংশ ফেলে দেওয়া হয় ; যেমন—আখ, পেয়ারা, আম ইত্যাদি। বৃক্ষযোনিতে স্থাবর প্রাণী এইভাবে খাদ্য গ্রহণ করে।

৪. **লেহ্য**—যে খাদ্য জিহ্বা দ্বারা লেহন করে খাওয়া হয় ; যেমন—চাটনী, মধু ইত্যাদি।

খাদ্যের উপরিউক্ত চারটি প্রকারেরও এক একটির অনেক ভাগ থাকে। ভগবান বলেছেন যে, ওই চার প্রকারের খাদ্যই বৈশ্বানর (জঠরাগ্নি)-রূপে আমিই হজম করাই। খাদ্যের কোনো অংশ আমার শক্তি ব্যতীত হজম হওয়া সম্ভব হয় না।

পরিশিষ্ট-ভাব—পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সমস্ত প্রাণীকে ধারণ করা, চন্দ্র হয়ে সমস্ত বনস্পতিকে পোষণ করা এবং সেগুলি যারা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে তাদের শরীরে জঠরাগ্নি হয়ে ভোজন করা, অন্ন পরিপাক করা ইত্যাদি সমস্ত

---

[১]অয়মগ্নির্বৈশ্বানরো যোঽয়মন্তঃ পুরুষে যেনেদমন্নং পচ্যতে যদিদমদ্যতে। (বৃহদারণ্যক ৫।৯।১)

এই পুরুষের উদরে যে অগ্নি, তাকে বৈশ্বানর বলে ; যার জন্য ভক্ষিত খাদ্যদ্রব্য হজম হয়।

[২]এই দশটি প্রাণ-বায়ুর ভিন্ন ভিন্ন কার্যগুলি এইরূপ :—

(ক) প্রাণ—হৃদয়-এর নিবাসস্থল, এর কাজ নিঃশ্বাস ফেলা এবং ভক্ষ্যদ্রব্য হজম করা ইত্যাদি।

(খ) অপান—এর নিবাস হল গুহ্য, এর কাজ প্রশ্বাস ভেতরে নেওয়া, মল-মূত্র ত্যাগ করানো এবং গর্ভকে বাইরে আনা।

(গ) সমান—এর নিবাসস্থল নাভি, এর কাজ হল হজম হওয়া খাদ্যরস সর্ব অঙ্গে সঞ্চারিত করা।

(ঘ) উদান—এর নিবাসস্থল কণ্ঠ। ভোজনকালে খাদ্যের শক্ত অংশ এবং জলীয় অংশকে এটি পৃথক্ করে। সূক্ষ্মশরীরকে স্থূলশরীরের বাইরে আনা এবং অন্য শরীর বা অন্যলোকেও নিয়ে যাওয়া এর কাজ।

(ঙ) ব্যান—সম্পূর্ণ শরীরই এর নিবাসস্থল। এর কার্য হল সমস্ত দেহকে সঙ্কুচিত প্রসারিত করা।

(চ) নাগ—এর কাজ হিক্কা তোলা।

(ছ) কূর্ম—এটি নেত্র খোলা ও বন্ধের কাজ করে।

(জ) কৃকর—হাঁচি দেওয়া এর কাজ।

(ঝ) দেবদত্ত—এর কাজ হল হাই তোলা।

(ঞ) ধনঞ্জয়—এটি মৃত্যুর পরেও দেহে থাকে, যার ফলে মৃতদেহ ফুলে যায়।

আসলে এক প্রাণ-বায়ুরই বিভিন্ন কার্য অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন নাম হয়।

কাজই ভগবানের শক্তি দ্বারাই সাধিত হয়। কিন্তু মানুষ সেইসব কর্মগুলি নিজেই করে মনে করে বৃথাই অহংকার করে থাকে—**'অহং করোমীতি বৃথাভিমানঃ'**, যেমন বলদের গাড়ির নীচে ছায়াতে চলতে থাকা কুকুর মনে করে যে এই বলদের গাড়িটি আমিই চালাচ্ছি।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—আগের তিনটি শ্লোকে ভগবান তাঁর প্রভাবযুক্ত বিভূতিগুলি বর্ণনা করে এবার তার উপসংহার করতে গিয়ে সর্বপ্রকারে জানার উপযুক্ত তত্ত্ব স্বয়ং-এর কথা জানাচ্ছেন।

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্॥ ১৫ ॥

[**অহম্, চ** (আমিই) ; **সর্বস্য, হৃদি** (সকল প্রাণীর হৃদয়ে) ; **সন্নিবিষ্টঃ, চ** (অধিষ্ঠিত এবং) ; **মত্তঃ** (আমা হতেই) ; **স্মৃতিঃ, জ্ঞানম্, চ** (স্মৃতি, জ্ঞান ও) ; **অপোহনম্** (অপোহন হয়ে থাকে) ; **সর্বৈঃ, বেদৈঃ** (বেদ সমূহের) ; **বেদ্যঃ** (জ্ঞাতব্য বিষয়) ; **অহম্, এব** (আমিই) ; **বেদান্তকৃৎ** (বেদের তত্ত্ব নির্ণয়কারী) ; **চ, বেদবিৎ, এব** (এবং বেদার্থের জ্ঞাতাও) ; **অহম্** (আমিই।)]

আমিই সকল প্রাণীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। আমা হতেই সকলের স্মৃতি, জ্ঞান ও অপোহন (সংশয়াদি দোষের নাশ) হয়ে থাকে। বেদসমূহের জ্ঞাতব্য বিষয় আমিই। বেদের তত্ত্ব নির্ণয়কারী এবং বেদার্থের জ্ঞাতাও আমি-ই॥ ১৫ ॥

ব্যাখ্যা—'সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ'[১]—আগের শ্লোকে নিজের বিভূতির বর্ণনা করে ভগবান এবার তার রহস্য প্রকট করে বলেছেন যে, আমি স্বয়ং সকল প্রাণীর হৃদয়ে বিরাজ করি। যদিও দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি সকল স্থানেই ভগবান বিদ্যমান, তা হলেও হৃদয়ে তিনি বিশেষভাবে বিরাজ করেন।

শরীরের প্রধান অঙ্গ হৃদয়, হৃদয়েই সকল প্রকার ভাব উৎপন্ন হয়। সমস্ত কর্মে ভাবই প্রধান। ভাব শুদ্ধ হলে সকল ক্রিয়া এবং পদার্থই শুদ্ধ হয়ে যায়। সুতরাং ভাবেরই গুরুত্ব ; বস্তু, ব্যক্তি, কর্ম ইত্যাদির নয়। এই ভাব হৃদয়ে উৎপন্ন হওয়ায় হৃদয়ের অত্যন্ত মহত্ত্ব থাকে। হৃদয় সত্ত্বগুণের কার্য, তাই ভগবান হৃদয়েই বিশেষভাবে অবস্থান করেন।

ভগবান বলেছেন যে, আমি সমস্ত মানুষের হৃদয়ে অবস্থান করি ; সুতরাং কোনো সাধকেরই (আমার থেকে দূরে অথবা বিচ্ছেদ অনুভব করলেও) আমার প্রাপ্তিতে নিরাশ হওয়া উচিত নয়। সুতরাং পাপী-পুণ্যাত্মা, মূর্খ-পণ্ডিত, নির্ধন-ধনী, রোগী-রোগহীন প্রভৃতি যে কোনো জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায়, আশ্রম, দেশ, কাল, পরিস্থিতি ইত্যাদি যাই হোক না কেন, ভগবদ্প্রাপ্তিতে সকলেই পূর্ণরূপে অধিকারী। প্রয়োজন শুধু ভগবদ্প্রাপ্তি লাভের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা, আগ্রহ, ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতা এমন তীব্র হওয়া চাই যাতে ভগবদ্প্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিন্ত না থাকা যায়।

পরমাত্মা সর্বব্যাপী অর্থাৎ সর্বত্র সমানভাবে পরিপূর্ণ হলেও হৃদয়েই তাঁকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেমন গাভীর সমস্ত দেহে দুগ্ধ পরিব্যাপ্ত হলেও একমাত্র তার স্তন হতেই দুগ্ধ পাওয়া যায় এবং পৃথিবীতে সর্বত্র জল থাকলেও কূপ ইত্যাদি জলাশয় থেকেই জল পাওয়া যায়, তেমনই সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, পৃথিবী, বৈশ্বানর ইত্যাদি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হলেও পরমাত্মাকে 'হৃদয়ে'ই

---

[১]দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি॥

(মুণ্ডকোপনিষদ্ ৩।১।১, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ৪।৬)

'সর্বদা একত্রে বাসকারী এবং একত্রে সখ্যভাবে অবস্থিত দুটি পাখি—জীবাত্মা ও পরমাত্মা একই বৃক্ষ—দেহকে আশ্রয় করে থাকে। উভয়ের মধ্যে একজন (জীবাত্মা) সেই বৃক্ষের কর্মফলের স্বাদ গ্রহণ ও উপভোগ করে ; কিন্তু অপরটি (পরমাত্মা) তা উপভোগ না করে শুধু দর্শক হয়ে থাকে।'

উপলব্ধি করা যায় (গীতা ১৩।১৭ ; ১৮।৬১)।

পরমাত্মপ্রাপ্তি সম্পর্কিত বিশেষ কথা

পরমাত্মা নিরন্তর হৃদয়ে অবস্থিত হওয়ায় মনুষ্যমাত্রের কাছেই তিনি নিত্যপ্রাপ্ত ; কিন্তু জড়ত্বের (জগতের) সঙ্গে সম্পর্ক মেনে নেওয়ার জন্য এবং জড়ত্বের দিকেই দৃষ্টি থাকায় এই নিত্যপ্রাপ্ত পরমাত্মা অপ্রাপ্ত বলে প্রতীয়মান হয় অর্থাৎ তাঁর প্রাপ্তি অনুভূত হয় না। জড়ত্বের সঙ্গে সর্বতোভাবে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হলে তবেই সর্বত্র বিদ্যমান (নিত্যপ্রাপ্ত) পরমাত্মতত্ত্ব স্বতঃ অনুভূত হয়।

পরমাত্মপ্রাপ্তির জন্য যে সৎকর্ম, সৎচর্চা এবং সৎ-চিন্তা করা হয়, তাতে জড়ত্বের (অসতের) সম্বন্ধ থাকেই। কারণ জড়ত্বের (স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণশরীরের) আশ্রয় গ্রহণ না করে এগুলি হওয়া সম্ভবই নয়। প্রকৃতপক্ষে এসবের সার্থকতা হল জড়ত্বের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করানোতে। জড়ত্বের সঙ্গে সম্পর্ক তখনই বিচ্ছিন্ন হয়, যখন এইসব সৎকর্ম, সৎচর্চা, সৎচিন্তা শুধুমাত্র জগতের হিতার্থে করা হয়, নিজের জন্য নয়।

কোনো বিশেষ সাধনা, গুণ, যোগ্যতা, লক্ষণ ইত্যাদি অর্জন করলে তবে পরমাত্মপ্রাপ্তি হয়—এই ধারণা অত্যন্ত ভুল। কোনো মূল্য দিয়ে যে বস্তু পাওয়া যায়, তা সেই মূল্যের থেকে কম মূল্যবান হয়ে থাকে—এই হল সিদ্ধান্ত। সুতরাং যদি কোনো বিশেষ সাধন, যোগ্যতা ইত্যাদির দ্বারাই পরমাত্মপ্রাপ্তি হয় বলে মনে করা হয়, তাহলে পরমাত্মা সেই সাধন, যোগ্যতা ইত্যাদির থেকে কম মূল্যবান (সস্তা) বলে প্রমাণিত হয়, কিন্তু পরমাত্মা কোনো কিছুর থেকে কম মূল্যবান নন (গীতা ১১।৪৩)। তাই তাঁকে কোনো সাধন ইত্যাদির বিনিময়ে লাভ করা যায় না। তাছাড়াও যদি কোনো মূল্যের (সাধন, যোগ্যতা ইত্যাদির) পরিবর্তে পরমাত্মপ্রাপ্তি সম্ভব বলে মানাও হয়, তবে আমাদের তাতে কী লাভ ? কারণ তাহলে পরমাত্মা থেকে বেশি মূল্যবান বস্তু (সাধন ইত্যাদি) তো আমাদের কাছে আগে থেকেই রয়েছে।

সাংসারিক বস্তু যেমন কর্ম দ্বারা পাওয়া যায়, পরমাত্মাকে সেইরূপ কর্মের দ্বারা পাওয়া যায় না। কারণ পরমাত্মপ্রাপ্তি কোনো কর্মের ফল নয়। প্রত্যেক কর্মেরই উৎপত্তি হয় অহংবোধ থেকে আর পরমাত্মপ্রাপ্তি হয় অহংভাব দূর হলে। কারণ অহংবোধ হল কৃতি বা কর্ম আর পরমাত্মা হলেন কৃতিরহিত। কৃতিরহিত তত্ত্বকে কোনো কৃতির সাহায্যে লাভ করা যায় না—**'নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন'** (মুণ্ডক. ১।২।১২)। তাৎপর্য হল এই যে পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তি মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, শরীর ইত্যাদি জড় পদার্থের সাহায্যে হয় না, বরং জড়ত্বের আশ্রয় ত্যাগ করলে তবেই হয়ে থাকে। যতক্ষণ মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, শরীর, দেশ, কাল, বস্তু ইত্যাদির আশ্রয় নেওয়া হয়, ততক্ষণ একান্তভাবে পরমাত্মার আশ্রয় (শরণ) গ্রহণ করা সম্ভব নয়। সাধকের প্রধান ভুল হল এই যে, সে মনে করে মন, বুদ্ধি ইত্যাদির সাহায্যে পরমাত্মপ্রাপ্তি হবে। যদি জড়ত্বের আশ্রয় এবং তাতে বিশ্বাস দূর হয় এবং একমাত্র পরমাত্মারই আশ্রয়ে বিশ্বাস জন্মায় তাহলে পরমাত্মপ্রাপ্তি হতে আর বিলম্ব হয় না।

'মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ'—কোনো বিস্মৃত ঘটনা (কোনো কারণে) পুনরায় মনে পড়াকে 'স্মৃতি' বলা হয়। 'চিন্তা' নতুন বিষয়ের এবং 'স্মৃতি' পুরাতন বিষয়ের হয়ে থাকে। স্মৃতি এবং চিন্তন, এই দুইয়ে এই হল পার্থক্য। সুতরাং চিন্তন জগতের আর স্মৃতি হয় পরমাত্মার ; কারণ জগৎ আগে ছিল না আর পরমাত্মা অনাদিকাল থেকে বিরাজমান। স্মৃতিতে যে শক্তি থাকে, তা চিন্তনে নেই। স্মৃতিতে কর্তৃত্ব-ভাব কম থাকে, আর চিন্তনে কর্তৃত্ব-ভাব বেশি থাকে।

একটি স্মৃতি করা হয় আর অন্য একটি স্মৃতি হয়ে থাকে। যে স্মৃতি করা হয়, সেটি 'বুদ্ধি'-তে আর যেটি হয়, তা 'স্বয়ং'-এ হয়। যে স্মৃতি হয়, সেটি জড়ত্বের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ সম্বন্ধ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়। ভগবান এখানে বলেছেন যে এরূপ (স্বতঃ হওয়া) যে স্মৃতি হয় তা আমার দ্বারাই হয়।

পরমাত্মার অংশ হয়েও জীব ভ্রমবশতঃ পরমাত্মা হতে বিমুখ হয়ে যায় এবং জগতের সঙ্গে নিজ সম্বন্ধ মেনে থাকে। এই ভুল দূর হলে 'আমি ভগবানের, জগতের নই' এরূপ স্পষ্ট অনুভব হওয়াই হল 'স্মৃতি' (গীতা ১৮।৭৩)। কোনো নতুন জ্ঞান বা অনুভব স্মৃতিতে হয় না, বরং শুধু বিস্মৃতির (মোহ) নাশ হয়। ভগবানের সঙ্গেই আমাদের প্রকৃত সম্বন্ধ। এই প্রকৃত সত্য জানাই হল স্মৃতি প্রাপ্ত হওয়া।

জীবে নিষ্কামভাব (কর্মযোগ), স্বরূপবোধ (জ্ঞানযোগ)

এবং ভগবদ্‌প্রেম (ভক্তিযোগ)—তিনটি স্বাভাবিকভাবে বর্তমান। জীব (অনাদিকাল হতে) এটি বিস্মৃত হয়েছে। একবার এটি স্মৃতিতে জাগরূক হলে আর বিস্মৃতি হয় না। কারণ এই স্মৃতি জাগ্রত হয় 'স্বয়ং'-এ। 'বুদ্ধি'-তে যে লৌকিক স্মৃতি হয় (বুদ্ধি ক্ষীণ হলে) তা নষ্টও হতে পারে, কিন্তু 'স্বয়ং'-এর স্মৃতি কখনো নষ্ট হয় না।

কোনো বিষয় জানাকে বলা হয় 'জ্ঞান'। লৌকিক বা পারমার্থিক যত জ্ঞান আছে, তা সবই জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার আভাস মাত্র। তাই ভগবান জ্ঞানগুলি সবই তাঁর থেকে হয় বলে জানিয়েছেন। প্রকৃত জ্ঞান হল তাই, যা 'স্বয়ং' থেকে জানা যায়। অনন্ত, পূর্ণ এবং নিত্য হওয়ায় এই জ্ঞানে কোনো সন্দেহ বা ভ্রম থাকে না। যদিও ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধিজনিত জ্ঞানকেও 'জ্ঞান' বলা হয়, কিন্তু এটি সীমিত, অপূর্ণ এবং পরিবর্তনশীল হওয়ায় এই জ্ঞানে সন্দেহ বা ভ্রম থাকে। যেমন, সূর্য অত্যন্ত বিরাট হলেও চোখে দেখলে একে ছোটই দেখায়। যেকথা প্রথমে ঠিক বলে মনে হত, বুদ্ধি বিকশিত হলে বা শুদ্ধ হলে, সেটিই ভুল বলে প্রতীত হয়। তাৎপর্য হল এই যে ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি-জনিত জ্ঞান করণ-সাপেক্ষ এবং অপূর্ণ হয়ে থাকে। অসম্পূর্ণ জ্ঞানকেই 'অজ্ঞান' বলে। অপরপক্ষে, 'স্বয়ং'-এর জ্ঞান কোনো করণের (ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ইত্যাদির) অপেক্ষা রাখে না এবং তা সর্বদাই পূর্ণ। আসলে ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি-জনিত জ্ঞানও 'স্বয়ং'-এর জ্ঞান হতে প্রকাশিত হয় অর্থাৎ অস্তিত্ব লাভ করে।

সংশয়, ভ্রম, বিপর্যয় (বিপরীত ধারণা) তর্ক-বিতর্ক ইত্যাদি দোষ দূর করাকে বলা হয় 'অপোহন'। ভগবান বলেন যে এই সমস্ত সংশয়াদি দোষও আমার কৃপাতেই দূর হয়।

শাস্ত্রাদি বাক্য সত্য না অসত্য ? ভগবানকে কে দেখেছেন ? জগৎই সত্য—ইত্যাদি যে সংশয় ও ভ্রম তা ভগবানের কৃপাতেই দূর হয়। সাংসারিক পদার্থাদিতে নিজের হিত মনে করা, সেগুলির প্রাপ্তিতে সুখী হওয়া, প্রতিমুহূর্তে বিনাশপ্রাপ্ত জগৎকে অস্তিত্বসম্পন্ন মনে করা ইত্যাদি বিপরীত ভাবও ভগবানের কৃপাতেই দূর হয়। গীতা উপদেশের শেষে অর্জুনও ভগবানের কৃপায় তাঁর মোহ নাশ, স্মৃতি প্রাপ্তি এবং সংশয় নাশের কথা স্বীকার করেছেন (১৮।৭৩)।

'বেদৈশ্চসর্বৈরহমেব বেদ্যঃ'—এখানে **'সর্বৈঃ'** পদটি বেদ এবং বেদানুকূল সমস্ত শাস্ত্রের বাচক। সমস্ত শাস্ত্রের একমাত্র তাৎপর্য হল পরমাত্মার প্রকৃত জ্ঞান করানো অথবা প্রাপ্তি করানো।

ভগবান এখানে এই কথাটি স্পষ্ট করে জানিয়েছেন যে বেদের প্রকৃত তাৎপর্য হল তাঁকে প্রাপ্তি করানো, জাগতিক ভোগ প্রাপ্তি করানো নয়। শ্রুতি ইত্যাদিতে সকামভাবের অধিক বর্ণনা করার একটি কারণ হল এই যে জগতে সকাম মানুষের সংখ্যা অধিক হয়ে থাকে। এইভাবে শ্রুতি (সকলের ধারয়িত্রী-স্বরূপ হয়ে) তাদেরও পালন করে থাকে।

পরমাত্মাই একমাত্র জানার উপযুক্ত বিষয়, যাঁকে জানলে আর কিছুই জানার বাকি থাকে না। পরমাত্মাকে না জেনে জগতের যতই সব জানা যাক, তাতে জ্ঞান কখনো পূর্ণ হয় না, সর্বদা অপূর্ণ থাকে[১]। অর্জুনের ভগবানকে জানার বিশেষ আগ্রহ ছিল। তাই ভগবান বলেছেন যে সমস্ত বেদ এবং শাস্ত্রাদির সাহায্যে জানার উপযুক্ত একমাত্র আমিই, যে স্বয়ং তোমার সামনে উপবিষ্ট রয়েছি।

'বেদান্তকৃৎ'—ভগবানের থেকেই বেদ প্রকটিত হয়েছে (গীতা ৩।১৫ ; ১৭।২৩)। সুতরাং তিনিই বেদের সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত ঠিকমতো জানিয়ে বেদে প্রতীত হওয়া বিরোধগুলির যথার্থ সমন্বয় করতে পারেন। তাই ভগবান বলেছেন যে (বেদের প্রকৃত জ্ঞাতা হওয়ায়) আমিই বেদের যথার্থ তাৎপর্য নির্ণয়কারী।

'বেদবিদেব চাহম্‌'—বেদের অর্থ, ভাব ইত্যাদি ভগবানই ঠিকভাবে জানেন। বেদে কোন্‌ কথা, কী ভাব বা উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, বেদের প্রকৃত তাৎপর্য কী ইত্যাদি ভগবানই পূর্ণরূপে জানেন। কারণ বেদ ভগবান হতেই প্রকটিত হয়েছে।

---

[১]সাঙ্গোপাঙ্গানপি যদি যশ্চ বেদানধীয়তে। বেদবেদ্যং ন জানীতে বেদভারবহো হি সঃ॥

(মহাভারত, শান্তিপর্ব ৩১৮।৫০)

'সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করেও যে ব্যক্তি জ্ঞেয় পরমাত্মাকে না জানে, সেই মূঢ় ব্যক্তি বেদের ভারবাহী-স্বরূপই হয়ে থাকে।'

বেদে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা থাকায় বড় বড় বিদ্বান ব্যক্তিও অভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন না (গীতা ২।৫৩)। একমাত্র বেদের প্রকৃত জ্ঞাতা ভগবানে শরণ গ্রহণ করলেই তাঁরা বেদের তত্ত্ব জানতে সক্ষম হন এবং তবেই 'শ্রুতি-বিপ্রতিপত্তি'—অর্থাৎ শাস্ত্র-সংশয় থেকে মুক্ত হতে পারেন।

এই (পঞ্চদশ) অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে ভগবান জগৎ-বৃক্ষকে তত্ত্ব দ্বারা জ্ঞাত ব্যক্তিদের 'বেদবিৎ' বলে জানিয়েছেন। এই শ্লোকে ভগবান স্বয়ংই নিজেকে বেদবিৎ বলেছেন। এর তাৎপর্য হল যে জগতের প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞাতা মহাপুরুষ ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে থাকেন। জগতের প্রকৃত তত্ত্ব জানার অভিপ্রায় হল—'জগতের পৃথক্ অস্তিত্ব নেই এবং শুধু পরমাত্মার অস্তিত্বই আছে'—এইরূপ জেনে জগতের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক পরিত্যাগ করে নিজ সম্পর্ক ভগবানের সঙ্গে স্থাপন করা, জগৎ-সংসারের আশ্রয় পরিত্যাগ করে ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করা।

প্রকরণ সম্পর্কিত বিশেষ কথা

ভগবান শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চার অধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপে তাঁর বিভূতিগুলি বর্ণনা করেছেন—

সপ্তম অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোক থেকে দ্বাদশ শ্লোক পর্যন্ত সৃষ্টির প্রধান প্রধান পদার্থে কারণরূপে সতেরোটি বিভূতির কথা বর্ণনা করে ভগবান তাঁর সর্বব্যাপ্ত রূপটি সিদ্ধ করেছেন।

নবম অধ্যায়ের ষোড়শ শ্লোক থেকে উনিশতম শ্লোক পর্যন্ত ক্রিয়া, ভাব, পদার্থ ইত্যাদিতে কার্য-কারণরূপে সাঁইত্রিশটি বিভূতির বর্ণনা করে ভগবান নিজে যে সর্বব্যাপক তা জানিয়েছেন।

দশম অধ্যায়ের তো নামই হল 'বিভূতিযোগ'। এই অধ্যায়ের চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্লোকে ভগবান প্রাণীদের ভাবরূপ কুড়িটি বিভূতি এবং ষষ্ঠ শ্লোকে ব্যক্তিরূপে পঁচিশটি বিভূতির বর্ণনা করেছেন। এরপর বিশতম শ্লোক থেকে উনচল্লিশতম শ্লোক পর্যন্ত ভগবান বিরাশীটি প্রধান বিভূতির বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন।

এই পঞ্চদশ অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোক থেকে পঞ্চদশ শ্লোক পর্যন্ত ভগবান তাঁর প্রভাব জানাবার জন্য তেরটি বিভূতির বর্ণনা করেছেন[১]।

উপরিউক্ত চার অধ্যায়ে বিভিন্নরূপে বিভূতিগুলি বর্ণনা করার তাৎপর্য হল যে সাধকদের **'বাসুদেবঃ সর্বম্'** (গীতা ৭।১৯) 'সবকিছুই বাসুদেব' এই তত্ত্ব অনুভব করানো। তাই নিজ বিভূতিগুলি বর্ণনা করার সময় ভগবান তাঁর সর্বব্যাপক ভাবটি বিশেষরূপে সিদ্ধ করেছেন ; যেমন—

'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি' (৭।৭)

'আমা হতে শ্রেষ্ঠ জগতে আর কোনো মহৎ কারণ নেই।'

'সদসচ্চাহমর্জুন' (৯।১৯)

'সৎ ও অসৎ—সবকিছুই আমি।'

'অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে' (১০।৮)

'আমিই সবকিছু উৎপত্তির কারণ আর আমা হতেই সমস্ত জগৎ প্রকটিত হয়।'

'ন তদস্তি বিনা যৎস্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্' (১০।৩৯)

'চর ও অচরে এমন কোনো প্রাণী নেই যা আমার হিত অর্থাৎ চরাচরে যত প্রাণী আছে, তারা সব আমারই স্বরূপ।'

এইরূপ এই পঞ্চদশ অধ্যায়েও তাঁর বিভূতি বর্ণনার উপসংহার করতে গিয়ে ভগবান বলেছেন—

'সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ' (১৫।১৫)

'সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে আমি সম্যক্‌রূপে অবস্থিত।'

তাৎপর্য হল এই যে সকল প্রাণী, পদার্থ পরমাত্মার সত্তা থেকেই অস্তিত্ববান হচ্ছে, পরমাত্মা ব্যতিরেকে কারোরই কোনো পৃথক্ সত্তা নেই।

প্রকাশের অভাবে (অন্ধকারে) কোনো বস্তুই পরিলক্ষিত হয় না। চক্ষু দ্বারা কোনো বস্তু দেখার সময়ে প্রথমে আলো দেখা যায়, তারপর বস্তু দেখা যায়, অর্থাৎ সমস্ত বস্তুই প্রকাশের অন্তর্গত বলেই দৃশ্য হয়। কিন্তু আমাদের দৃষ্টি আলোর প্রকাশের দিকে না গিয়ে প্রকাশিত

[১]এই অধ্যায়ে বর্ণিত তেরটি বিভূতি এইপ্রকার—

১. সূর্যে অবস্থিত তেজ, ২. চন্দ্রে অবস্থিত তেজ, ৩. অগ্নিতে অবস্থিত তেজ, ৪. পৃথিবীর ধারণশক্তি, ৫. চন্দ্রের পোষণ শক্তি, ৬. বৈশ্বানর, ৭. হৃদয়ে অবস্থিত অন্তর্যামী, ৮. স্মৃতি, ৯. জ্ঞান, ১০. অপোহন, ১১. বেদ সহায়ে জ্ঞাতব্য, ১২. বেদান্তের কর্তা এবং ১৩. বেদজ্ঞ।

বস্তুর দিকে পড়ে। এইপ্রকার যাবতীয় বস্তু, ক্রিয়া, ভাব ইত্যাদির জ্ঞান এক বিশেষ এবং অলুপ্ত প্রকাশ—অর্থাৎ জ্ঞানের অন্তর্গত হয়, যা সবকিছুর প্রকাশক এবং আধার। প্রত্যেক বস্তুরই সর্বাগ্রে জ্ঞান (স্বয়ংপ্রকাশ পরমাত্মতত্ত্ব) থাকে। সুতরাং জগতে পরমাত্মাকে ব্যাপ্ত বললেও বস্তুতঃ জগতের অস্তিত্ব পরে, জগতের অধিষ্ঠান পরমাত্মতত্ত্ব হল সর্বপ্রথম। অর্থাৎ প্রথমে পরমাত্মতত্ত্ব পরিলক্ষিত হয়, তারপর জগৎ-সংসার। কিন্তু জগতে আসক্তি থাকায় মানুষের দৃষ্টি তার প্রকাশকের (পরমাত্মতত্ত্বের) দিকে যায় না।

পরমাত্মার সত্তা ভিন্ন জগৎ-সংসারের কোনো সত্তা নেই। কিন্তু পরমাত্মসত্তার দিকে দৃষ্টি না থাকায় এবং জাগতিক প্রাণী বা পদার্থে অনুরাগ বা সুখাসক্তি থাকায় সেইসবে পৃথক্ (স্বতন্ত্র) অস্তিত্ব প্রতীত হতে থাকে এবং পরমাত্মার প্রকৃত অস্তিত্ব (যা তত্ত্বতঃ বিদ্যমান) পরিলক্ষিত হয় না। যদি জগতের প্রতি অনুরাগ বা সুখাসক্তি দূর হয়, তাহলে তত্ত্বতঃ এক পরমাত্মসত্তাই পরিলক্ষিত বা অনুভূত হয়। সুতরাং বিভূতিগুলির বর্ণনার তাৎপর্য হল এই যে, কোনো প্রাণী বা পদার্থের দিকে দৃষ্টি গেলে সাধকের একমাত্র ভগবানের স্মৃতিই মনে উদয় হওয়া উচিত অর্থাৎ তাঁর প্রতিটি প্রাণী ও পদার্থে ভগবানকেই অনুভব করা উচিত (গীতা ১০।৪১)।

বর্তমানে সমাজের অবস্থা খুবই আশ্চর্যজনক। প্রায় সকলেই অর্থ-সম্পদকে খুব বেশি করে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। অর্থ নিজে কোনো কাজে আসে না, কিন্তু তার দ্বারা খরিদ করা বস্তুগুলি কাজে আসে। কিন্তু লোকেরা অর্থের উপযোগিতাতে গুরুত্ব না দিয়ে, তার পরিমাণ বৃদ্ধিকে গুরুত্ব দিয়ে বসে, তাই মানুষের কাছে যত বেশি অর্থ থাকে, সে নিজেকে তত বড় বলে মনে করে[১]। এরূপ যারা অর্থকেই গুরুত্ব দেয় তারা পরমাত্মার মহত্ত্ব কিছুতেই বুঝতে সক্ষম হয় না। তাহলে পরমাত্মপ্রাপ্তি বিনা শান্তি নেই—এরূপ ইচ্ছা বা আগ্রহ তাদের মধ্যে কীভাবে আসবে ? যাদের মনে এমন ভাব আশ্রয় করেছে যে টাকা ছাড়া বাঁচা যায় না, অর্থ ছাড়া কোনো কাজ হয় না, তাদের পরমাত্মাতে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হতেই পারে না। তারা ভাবতেই পারে না যে অর্থ ব্যতিরেকেও ভালোভাবে জীবন অতিবাহিত হতে পারে।

ব্যবসায়ী যেমন (একমাত্র অর্থপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে) সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি ব্যবসায় সম্পর্কীয় ক্রিয়াতে অর্থই দেখে থাকে, তেমনই পরমাত্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ব্যক্তির (একমাত্র পরমাত্মপ্রাপ্তি উদ্দেশ্য থাকায়) প্রত্যেক বস্তু, ক্রিয়া ইত্যাদিতে তত্ত্বরূপে পরমাত্মাই পরিলক্ষিত হয়। তিনি অনুভব করেন যে, পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কোনো তত্ত্ব নেই, থাকতে পারেও না।

মর্মার্থ

অর্জুন চতুর্দশ অধ্যায়ে গুণাতীত হওয়ার উপায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন। গুণাদির আসক্তিতেই জীব জগতে আবদ্ধ হয়। সুতরাং গুণাদির আসক্তি দূর করার জন্য ভগবান তাঁর প্রভাব বর্ণনা করেছেন। ছোট ছোট প্রভাব দূর করার জন্য বড় প্রভাবের কথা জানার প্রয়োজন হয়। তাই যতক্ষণ জীবের ওপর গুণাদির (জগৎ-সংসারের) প্রভাব থাকে, ততক্ষণ ভগবানের প্রভাব জানা অত্যন্ত প্রয়োজন।

নিজ প্রভাব বর্ণনা করতে গিয়ে ভগবান (এই অধ্যায়ের দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শ্লোক পর্যন্ত) বলেছেন যে, আমিই সমস্ত জগতের প্রকাশক, আমিই পৃথিবীতে প্রবেশ করে সমস্ত প্রাণীকে ধারণ করি ; আমিই পৃথিবীতে খাদ্য উৎপন্ন করে তাদের পরিপুষ্ট করি ; মানুষ সেই অন্নগ্রহণ করলে আমিই বৈশ্বানর-রূপে সেই খাদ্যকে হজম করাই এবং মানুষের মধ্যে স্মৃতি, জ্ঞান এবং অপোহনও আমিই করাই। এই বর্ণনার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত, সমষ্টি থেকে ব্যষ্টি পর্যন্ত সমস্ত ক্রিয়াই ভগবানের অন্তর্গত, তাঁরই শক্তিতে সবকিছু হয়। মানুষ অহংকারবশতঃ নিজেকে সেইসব ক্রিয়ার কর্তা বলে মেনে নেয় এবং ওই ক্রিয়াগুলিকে ব্যক্তিগত বলে মনে করে তাতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

[১]প্রকৃতপক্ষে অর্থের দ্বারা নিজেকে ছোট বা বড় বলে মনে করা পতনের লক্ষণ। অর্থের সংখ্যা অহং-অভিমান বৃদ্ধি করা ব্যতীত আর কোনো কাজেই আসে না। অহং-অভিমান আসুরী-সম্পদের আধার। যত প্রকার দুর্গুণ-দুরাচার, পাপ, তা সবই অহং-অভিমানরূপ বৃক্ষের আশ্রয়ে জন্মায় এবং বৃদ্ধি লাভ করে।

পরিশিষ্ট-ভাব—এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে ভগবান যে কথা বলেছিলেন, এই শ্লোকটিতে তারই উপসংহার করেছেন।

প্রথম তিনটি শ্লোকে ভগবান প্রভাব এবং ক্রিয়ারূপে নিজ বিভূতি সমূহের বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এই শ্লোকটিতে তিনি স্বয়ং নিজের বর্ণনা করেছেন। তাৎপর্য হল যে এই শ্লোকে স্বয়ং ভগবানের বর্ণনা আছে, আদিত্যগত, চন্দ্রগত, অগ্নিগত অথবা বৈশ্বানরগত ভগবানের বর্ণনা নয়। মূলে তত্ত্ব একই, পার্থক্য যা, তা শুধু বর্ণনাতে।

প্রথমে **'মমৈবাংশো জীবলোকে'** পদটিতে প্রমাণিত হয় যে ভগবান 'আপনজন' আর এখানে **'সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ'** পদটির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ভগবান 'নিজের মধ্যেই' আছেন। ভগবানকে 'নিজের' বলে স্বীকার করে নিলে তাঁতে স্বাভাবিকভাবে প্রেম হয় আর 'নিজের মধ্যে' বলে স্বীকার করে নিলে তাঁকে পাবার জন্য আর অন্যত্র যাবার প্রয়োজন থাকে না।

'অপোহনম্' পদটির অর্থ হল—**'অপগত আোহনম্'** অর্থাৎ সংশয় নিবারণ। 'বেদান্ত' কথাটির অর্থ হল—বেদের অন্ত অর্থাৎ নিষ্কর্ষ, সারাংশ—**'উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তঃ'** (গীতা ২।১৬)।

ভগবান বলেছেন বেদ অনেক, কিন্তু সেই সবগুলির মধ্যে জ্ঞাতব্য একমাত্র আমিই আর সেগুলির জ্ঞাতাও আমিই। অর্থাৎ সব কিছুই আমি।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—ভগবান এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক থেকে পঞ্চদশ শ্লোক পর্যন্ত (তিনটি প্রকরণে) ক্রমান্বয়ে জগৎ, জীবাত্মা এবং পরমাত্মার কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। এবার সেই বিষয়ের উপসংহারে পরবর্তী দুটি শ্লোকের মধ্যে ওই তিনটি যথাক্রমে ক্ষর, অক্ষর এবং পুরুষোত্তম নামে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করছেন।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥ ১৬ ॥

[**লোকে** (এই জগতে) ; **ক্ষরঃ, চ, অক্ষরঃ** (ক্ষর ও অক্ষর) ; **ইমৌ, দ্বৌ, এব** (এই দু'প্রকারের) ; **পুরুষৌ** (পুরুষ অবস্থিত) ; **সর্বাণি, ভূতানি** (সমস্ত প্রাণীর দেহ) ; **ক্ষরঃ, চ, কূটস্থঃ** (বিনাশশীল ও জীবাত্মাকে) ; **অক্ষরঃ, উচ্যতে** (অবিনাশী বলা হয়।)]

এ জগতে ক্ষর (বিনাশশীল) এবং অক্ষর (অবিনাশী)—এই দু'প্রকারের পুরুষ অবস্থিত। তার মধ্যে সমস্ত প্রাণীর দেহ বিনাশশীল এবং কূটস্থ (জীবাত্মা) হল অবিনাশী॥ ১৬ ॥

ব্যাখ্যা—**'দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ'**—এখানে **'লোকে'** পদটি সমস্ত জগতের বাচক বলে বুঝতে হবে। এই অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে **'জীবলোকে'** পদটিও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

এই জগতে দু'টি বিভাগ জানা যায়—শরীরাদি বিনাশশীল পদার্থ (জড়) এবং অবিনাশী জীবাত্মা (চেতন)। যেমন, বিচার করলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে একটি হল প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে শরীর এবং অন্যটি হল তাতে অবস্থানকারী জীবাত্মা। জীবাত্মা অবস্থান করার জন্যই প্রাণ কার্য করে এবং শরীর সঞ্চালিত হয়। জীবাত্মার সঙ্গে প্রাণ নির্গত হলেই শরীরের সঞ্চালন বন্ধ হয়ে যায় এবং শরীরের পচন ধরে। লোকে তখন সেই শরীরকে পুড়িয়ে দেয়। কারণ বিনাশশীল এই দেহের কোনো গুরুত্ব নেই, গুরুত্ব এই দেহে অবস্থানকারী অবিনাশী জীবাত্মার।

পঞ্চ মহাভূত (আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী) হতে সৃষ্ট শরীর ইত্যাদি যত পদার্থ আছে, তা সবই জড় এবং বিনাশশীল। প্রাণীদের (প্রত্যক্ষভাবে পরিলক্ষিত) স্থূল-শরীর স্থূল সমষ্টি-জগতের সঙ্গে এক ; দশ ইন্দ্রিয়, পাঁচ প্রাণ, মন ও বুদ্ধি—এই সতেরোটি তত্ত্ব দ্বারা যুক্ত সূক্ষ্মশরীর সূক্ষ্ম সমষ্টি-জগতের সঙ্গে এক এবং কারণ-শরীর (স্বভাব, কর্ম-সংস্কার, অজ্ঞান) কারণ সমষ্টি জগতের (মূল প্রকৃতির) সঙ্গে এক। এগুলি ক্ষরণশীল (বিনাশশীল) হওয়ায় **'ক্ষর'** নামে বলা হয়।

আসলে 'ব্যষ্টি' নামক কোনো বস্তুই নেই ; শুধুমাত্র

সমষ্টি জগতের কিছু অংশের বস্তুকে আপন মনে করায় এগুলিকে ব্যষ্টি বলা হয়। জগতের সঙ্গে শরীরাদি বস্তুগুলির ভিন্নতা শুধু (অনুরাগ-মমত্ববোধের জন্য) মেনে নেওয়া হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তা নেই। সমগ্র পদার্থ এবং ক্রিয়া প্রকৃতিরই[১]। তাই স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ-শরীরের সমস্ত ক্রিয়া ক্রমশঃ স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ সমষ্টি-জগতের হিতের জন্যই করতে হয়, নিজের জন্য নয়।

যে তত্ত্বের কখনো বিনাশ হয় না এবং যা সর্বদা নির্বিকার থাকে, সেই জীবাত্মার বাচক হল এখানে 'অক্ষর' পদটি[২]। প্রকৃতি জড় এবং জীবাত্মা (চেতন পরমাত্মার অংশ হওয়ায়) চেতন।

এই অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে ভগবান যার ছেদন করার কথা বলেছেন, সেই জগৎকে এখানে '**ক্ষরঃ**' পদের দ্বারা এবং সপ্তম শ্লোকে ভগবান যেটিকে নিজ অংশ বলে জানিয়েছেন, সেই জীবাত্মাকে এখানে '**অক্ষরঃ**' পদের দ্বারা বলা হয়েছে।

এখানে উদ্ধৃত ক্ষর, অক্ষর এবং পুরুষোত্তম শব্দ যথাক্রমে পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ এবং ক্লীবলিঙ্গ রূপে রয়েছে[৩]। এর দ্বারা বোঝা উচিত যে প্রকৃতি, জীবাত্মা এবং পরমাত্মা স্ত্রীলিঙ্গ নয়, পুংলিঙ্গও নয় এবং ক্লীবলিঙ্গও নয়। আসলে লিঙ্গও শব্দের দৃষ্টিতে বলা হয়, তত্ত্বত কোনো লিঙ্গ নেই।

ক্ষর এবং অক্ষর—উভয় থেকে উত্তম 'পুরুষোত্তম' কথাটি প্রমাণিত করার জন্য ভগবান এখানে ক্ষর এবং অক্ষর—এই দুটিকে 'পুরুষ' নামে উল্লেখ করেছেন।

'**ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি**'—এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে যে সংসার-বৃক্ষের স্বরূপ জানিয়ে তাকে ছেদন করার প্রেরণা প্রদান করা হয়েছে, সেই (জগৎ) সংসার-বৃক্ষকেই এখানে '**ক্ষর**' নামে বলা হয়েছে।

এখানে 'ভূতানি' পদটি প্রাণীদের স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ-শরীরের বাচক বলে জানতে হবে। কারণ এখানে ভূতগণকে বিনাশশীল বলা হয়েছে। প্রাণীদের শরীরই বিনাশশীল, প্রাণী স্বয়ং নয়। তাই 'ভূতানি' পদটি এখানে জড় শরীরের উদ্দেশ্যেই বলা হয়েছে।

'**কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে**'—এই অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে ভগবান যাকে তাঁর সনাতন অংশ বলে

---

[১]পদার্থ এবং ক্রিয়াগুলিকে জগতের বলে মনে করা হল 'কর্মযোগ', প্রকৃতির বলে মনে করা হল 'জ্ঞানযোগ' এবং ভগবানের বলে মনে করা হল 'ভক্তিযোগ'। পদার্থ এবং ক্রিয়াকে যারই মানা হোক না কেন, এগুলি যে নিজের জন্য নয়—তা মানতে হবেই।

[২]গীতায় ক্ষর, অক্ষর এবং পুরুষোত্তম—এই তিনটির একসঙ্গে বর্ণনা ভিন্ন ভিন্ন নামে এইভাবে করা হয়েছে—

অধ্যায় শ্লোক	ক্ষর	অক্ষর	পুরুষোত্তম
৭।৪-৬	অপরা প্রকৃতি	পরা প্রকৃতি	অহম্
৮।৩-৪	অধিভূত ; কর্ম	অধ্যাত্ম ; অধিদৈব	ব্রহ্ম ; অধিযজ্ঞ
১৩।১-২	ক্ষেত্র	ক্ষেত্রজ্ঞ	মাম্
১৪।৩-৪	মহদ্‌ব্রহ্ম ; যোনি	গর্ভ ; বীজ	অহম্ ; পিতা

[৩]গীতায় তিনটি লিঙ্গে ক্ষর, অক্ষর এবং পুরুষোত্তমের বর্ণনা পাওয়া যায়।

উদাহরণ— (১) ক্ষর—
ক্ষরঃ (১৫।১৬)— পুংলিঙ্গ
অপরা (৭।৫)— স্ত্রীলিঙ্গ
মহদ্‌ব্রহ্ম (১৪।৩-৪)— ক্লীবলিঙ্গ

(২) অক্ষর—
জীবভূতঃ (১৫।৭)— পুংলিঙ্গ
জীবভূতাম্ (৭।৫)— স্ত্রীলিঙ্গ
অধ্যাত্মম্ (৮।৩))— ক্লীবলিঙ্গ

(৩) পুরুষোত্তম—
ভর্তা (৯।১৮)— পুংলিঙ্গ
গতিঃ (৯।১৮)— স্ত্রীলিঙ্গ
শরণম্ (৯।১৮)—ক্লীবলিঙ্গ

জানিয়েছেন, সেই জীবাত্মাকে এখানে **'অক্ষর'** নামে বলা হয়েছে।

জীবাত্মা যতই শরীর ধারণ করুক এবং যতই নানা লোকে যাতায়াত করুক ; এতে কখনো কোনো বিকার উৎপন্ন হয় না ; এটি সর্বদাই একইভাবে বিরাজ করে (গীতা ৮।১৯ ; ১৩।৩১)। তাই এখানে একে **'কূটস্থ'** বলা হয়েছে।

গীতায় পরমাত্মা এবং জীবাত্মা—উভয়েরই স্বরূপ বর্ণনা প্রায় একইরকম পাওয়া যায়। যেমন পরমাত্মাকে (১২।৩) 'কূটস্থ' এবং (৮।৩) 'অক্ষর' বলা হয়েছে, তেমনই এখানে (১৫।১৬) জীবাত্মাকেও 'কূটস্থ' এবং 'অক্ষর' বলা হয়েছে। জীবাত্মা এবং পরমাত্মা—উভয়ের মধ্যেই পরস্পর তাত্ত্বিক এবং স্বরূপগত ঐক্য আছে।

স্বরূপতঃ জীবাত্মা সদাসর্বদাই নির্বিকার ; কিন্তু ভ্রমবশত প্রকৃতি এবং তার কার্য শরীরাদির সঙ্গে নিজ ঐক্য মেনে নেওয়ায় একে 'জীব' সংজ্ঞা দেওয়া হয়, নচেৎ (অদ্বৈত-সিদ্ধান্ত অনুসারে) এটি সাক্ষাৎ পরমাত্মতত্ত্বই।

পরিশিষ্ট-ভাব—প্রথম ছয়টি শ্লোকে এবং তারপর দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শ্লোক পর্যন্ত ভগবান অলৌকিক তত্ত্বের বর্ণনা করেছেন যে স্বাধীন সত্তা হল অলৌকিকের, লৌকিকের নয় ; লৌকিক সত্তাও অলৌকিকেরই আশ্রিত। অলৌকিক থেকেই লৌকিক প্রকাশিত হয়। লৌকিকের যেসব প্রভাব দেখা যায়, তা অলৌকিকেরই। এখানে ষোড়শ শ্লোকে ভগবান 'লোকে' শব্দের দ্বারা 'লৌকিকতত্ত্বে'র বর্ণনা করেছেন।

জগৎ (ক্ষর) এবং জীব (অক্ষর)— দুইই 'লৌকিক'—**'দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ'** এবং এই দুইয়ের থেকেও ভগবান বিশিষ্ট অর্থাৎ অলৌকিক—**'উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ'** (গীতা ১৫।১৭)। কর্মযোগ এবং জ্ঞান-যোগ—এই উভয় যোগমার্গই 'লৌকিক'—**'লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা ...'** (গীতা ৩।৩)। ক্ষরকে নিয়ে কর্মযোগ আর অক্ষরকে নিয়ে জ্ঞানযোগ অবলম্বিত থাকে, কিন্তু ভক্তিযোগ 'অলৌকিক', যা শুধু ভগবানকেই অবলম্বন করে থাকে। সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত 'অপরা প্রকৃতি'-কে এখানে 'ক্ষর' নামে এবং 'পরা প্রকৃতি'-কে 'অক্ষর' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

***

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥ ১৭ ॥

[**উত্তমঃ, পুরুষঃ** (উত্তম পুরুষ) ; **তু, অন্যঃ** (হলেন অন্য) ; **যঃ, পরমাত্মা** (যাঁকে পরমাত্মা) ; **ইতি, উদাহৃতঃ** (নামে অভিহিত করা হয়) ; **অব্যয়ঃ, ঈশ্বরঃ** (অবিনাশী ঈশ্বর) ; **লোকত্রয়ম্** (ত্রিলোকে) ; **আবিশ্য** (প্রবিষ্ট থেকে) ; **বিভর্তি** (ভরণ-পোষণ করেন।)]

কিন্তু উত্তম পুরুষ হলেন অন্য বিশিষ্ট একজন, যাঁকে পরমাত্মা নামে অভিহিত করা হয়। সেই অবিনাশী ঈশ্বর ত্রিলোকে প্রবিষ্ট থেকে সকলের পালন-পোষণ করেন ॥ ১৭ ॥

ব্যাখ্যা—'উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ'—আগের শ্লোকে ক্ষর ও অক্ষর এই দু'প্রকার পুরুষের বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবান এবার জানিয়েছেন যে, অন্য এক উত্তম পুরুষ এই দুয়ের থেকেই পৃথক[১]।

এখানে **'অন্যঃ'** পদটি পরমাত্মাকে অবিনাশী অক্ষর (জীবাত্মা) থেকে পৃথক্ বলার জন্য নয়, তার থেকে

[১](ক) দ্বে অক্ষরে ব্রহ্মপরে ত্বনন্তে বিদ্যাবিদ্যে নিহিতে যত্র গূঢ়ে।
ক্ষরং ত্ববিদ্যা হ্যমৃতং তু বিদ্যা বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে যস্তু সোঽন্যঃ॥ (শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ৫।১)

'যা ব্রহ্মা হতেও শ্রেষ্ঠ, গুপ্ত, অসীম ; সেই পরম অক্ষর পরমাত্মাতে বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়ই অবস্থিত, তিনিই ব্রহ্ম। বিনাশশীল জড়বর্গকে অবিদ্যা নামে এবং অবিনাশী জীবাত্মাকে বিদ্যা নামে অভিহিত করা হয় । যিনি এই বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়কে শাসন করেন, সেই পরমেশ্বর এই উভয় থেকেই পৃথক্—সর্বতোভাবে বিশেষ।'

বিশেষরূপ জানাবার জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। তাই ভগবান পরবর্তী অষ্টাদশ শ্লোকে নিজেকে বিনাশশীল ক্ষরের 'অতীত' এবং অবিনাশী অক্ষরের থেকে 'উত্তম' বলে জানিয়েছেন। পরমাত্মার অংশ হলেও জীবাত্মার দৃষ্টি বা আকর্ষণ বিনাশশীল ক্ষরের দিকে হয়ে থাকে। তাই এখানে ভগবানকে তার চেয়ে বিশেষ বলা হয়েছে।

'পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ'—সেই উত্তম পুরুষকেই 'পরমাত্মা' নামে অভিহিত করা হয়। 'পরমাত্মা' শব্দটি নির্গুণের বাচক বলে মানা হয়, যার অর্থ—পরম (শ্রেষ্ঠ) আত্মা অথবা সমস্ত জীবের আত্মা। এই শ্লোকে 'পরমাত্মা' এবং 'ঈশ্বর'—উভয় শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার তাৎপর্য হল নির্গুণ এবং সগুণ সবই তিনি ; তিনিই পুরুষোত্তম।

'যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ'—এই উত্তম পুরুষ (পরমাত্মা) তিন লোকে অর্থাৎ সর্বত্র সমানভাবে নিত্য পরিব্যাপ্ত।

এখানে **'বিভর্তি'** পদটির তাৎপর্য হল এই যে প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মাই সমস্ত প্রাণীদের ভরণ-পোষণ করেন, কিন্তু জীবাত্মা জগতের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নেওয়ায় ভুলবশতঃ সাংসারিক প্রাণীদের নিজের বলে মনে করে তাদের ভরণ-পোষণের ভার নিজের ওপর নিয়ে নেয়। তাতে সে অকারণ দুঃখ পেতে থাকে[১]।

ভগবানকে অব্যয়ঃ বলার তাৎপর্য হল সমগ্র লোকাদির ভরণ-পোষণ করলেও তাঁর কিছুই ব্যয় হয় না, তাঁর মধ্যে কিঞ্চিৎমাত্রও ন্যূনতা আসে না। তিনি যেমনকার তেমনই থাকেন।

'ঈশ্বরঃ' শব্দটিকে সগুণের বাচক বলে মানা হয়, যার অর্থ হল—শাসনকর্তা।

মর্মার্থ

মা-বাবা সন্তানের পালন-পোষণ করলেও, সন্তানের ধারণা থাকে না যে, কে আমার পালন করছেন, কীভাবে করছেন এবং কেন করছেন ? এইরূপ ভগবান যদিও প্রাণীমাত্রেরই পালনকর্তা, তবুও অজ্ঞান ব্যক্তিগণ (ভগবানের দিকে দৃষ্টি না থাকায়) এই কথা জানতে পারে না যে কে তার পালন-পোষণ করছেন। ভগবানের শরণাগত ভক্তই শুধু ঠিকভাবে জানেন যে একমাত্র ভগবানই সকলকে সম্যক্‌রূপে পালন-পোষণ করছেন।

পালন-পোষণকর্তা ভগবান কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন না। তিনি ভক্ত-অভক্ত, আস্তিক-নাস্তিক প্রভৃতি সকলকেই সমানভাবে পালন করেন[২]। প্রত্যক্ষ করা যায় যে ভগবানের সৃষ্ট জগতে সূর্য সকলকে সমানভাবে আলোক দেয়, ভূমি সকলকে সমানভাবে বহন করে, বৈশ্বানর-অগ্নি প্রত্যেকের খাদ্যই সমানভাবে হজম করায়, বায়ু সকলের শ্বাস গ্রহণের জন্য সমানভাবে প্রবাহিত হয়, অন্ন-জল সকলকে সমানভাবে তৃপ্ত করে ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট-ভাব—পুরুষোত্তমকে 'অন্য' বলার অর্থ হল এই যে ক্ষর ও অক্ষর হল লৌকিক, কিন্তু পুরুষোত্তম এই দুইয়ের থেকেই বিশিষ্ট অর্থাৎ অলৌকিক। সুতরাং পরমাত্মা বিচারের বিষয় নন, তিনি হলেন শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের বিষয়। পরমাত্মার অস্তিত্বের বিষয়ে ভক্ত, সাধু-মহাত্মা, বেদ এবং শাস্ত্রের বাক্যই হল প্রমাণ। 'অন্য' সম্বন্ধে ভগবান পরবর্তী

(খ) ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ। (শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ১।১০)

'প্রকৃতি তো বিনাশশীল আর একে ভোগ করেন যে জীবাত্মা তিনি অমৃতস্বরূপ অবিনাশী। এই দুটিকেই (ক্ষর এবং অক্ষর) এক ঈশ্বর তাঁর শাসনে রাখেন।'

[১]ভরণ-পোষণের কথা ভক্তিমার্গেই আসে, জ্ঞানমার্গে নয়। কারণ ভক্তিমার্গে জীব এবং পরমাত্মাতে পার্থক্য মানা হয়। অতএব এই প্রকরণটিকে ভক্তির প্রকরণ বলে মনে করা উচিত।

[২]অয়মুত্তমোঽয়মধমো জাত্যা রূপেণ সম্পদা বয়সা। শ্লাঘ্যোঽশ্লাঘ্যো বেত্থং ন বেত্তি ভগবাননুগ্রহাবসরে॥
অন্তঃস্বভাবভোক্তা ততোঽন্তরাত্মা মহামেঘঃ। খদিরশ্চম্পক ইব বা প্রবর্ষণং কিং বিচারয়তি॥
(প্রবোধসুধাকর ২৫২-২৫৩)

'কারও ওপর কৃপা করার সময় ভগবান এরূপ চিন্তা করেন না যে, সে জাতি, রূপ, ধন ও বয়সে উত্তম, না অধম, প্রশংসনীয় না নিন্দনীয়।'

'এই অন্তরাত্মারূপী মহামেঘ ভাবেরই ভোক্তা (ভাবগ্রাহী)। মেঘ কি বর্ষণের সময় চিন্তা করে যে এটি কণ্টক, গুল্ম, না চম্পক ?'

শ্লোকে বর্ণনা করেছেন।

'যো লোকত্রয়মাবিশ্য .....' এই পদটিতে দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শ্লোকের মূল ভাব অন্তর্নিহিত আছে। মানুষের কর্তব্য শুধু মনুষ্যলোকেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু ভগবানের কর্তব্য ত্রিলোকেই। প্রকৃতপক্ষে ভগবানের নিজের কোনো কর্তব্য নেই, তা সত্ত্বেও তিনি জীবের হিতের জন্যই কর্তব্য-কর্মের পালন করেন (গীতা ৩।২২, ২৩, ২৪)।

* * *

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে বর্ণিত উত্তম পুরুষের সঙ্গে নিজ ঐক্য জানিয়ে এবার সাকার-রূপে প্রকটিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অত্যন্ত গোপনীয় রহস্য প্রকটিত করছেন।

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥ ১৮ ॥

[**যস্মাৎ, অহম্** (যেহেতু, আমি) ; **ক্ষরম্, অতীতঃ, চ** (ক্ষরের অতীত এবং) ; **অক্ষরাৎ, অপি, উত্তমঃ** (অক্ষরের থেকে উত্তম) ; **অতঃ, লোকে, চ** (তাই লোকের মধ্যে এবং) ; **বেদে, পুরুষোত্তমঃ** (বেদে 'পুরুষোত্তম' নামে) ; **প্রথিতঃ, অস্মি** (আমি প্রসিদ্ধ।)]

আমি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষরের থেকে উত্তম, তাই জগতে এবং বেদে পুরুষোত্তম নামে আমি প্রসিদ্ধ॥ ১৮ ॥

ব্যাখ্যা—'যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহম্'—এই পদটিতে ভগবানের বলার তাৎপর্য হল এই যে, ক্ষর বা প্রকৃতি নিত্য পরিবর্তনশীল এবং আমি নিত্য-নিরন্তর নির্বিকার রূপে একইভাবে বিরাজ করি। তাই আমি ক্ষরের অতীত।

শরীরের অতীত (ব্যাপক, শ্রেষ্ঠ, প্রকাশক, সবল, সূক্ষ্ম) ইন্দ্রিয়াদি, ইন্দ্রিয়াদির অতীত মন, মনের অতীত বুদ্ধি (গীতা ৩।৪২)। এইরূপ একটি অপরের অতীত হলেও শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি একই জাতীয়, এগুলি সবই জড়। কিন্তু পরমাত্মতত্ত্ব সকলের অতীত, কারণ তা জড় নয় ; তা হল চেতন।

'অক্ষরাদপি চোত্তমঃ'—যদিও পরমাত্মার অংশ হওয়ায় জীবাত্মার (অক্ষরের) পরমাত্মার সঙ্গে তত্ত্বগত ঐক্য থাকে, তা সত্ত্বেও ভগবান নিজেকে জীবাত্মা হতে উত্তম বলে জানিয়েছেন। তার কারণ হল—(১) পরমাত্মার অংশ হয়েও জীবাত্মা ক্ষরের (জড় প্রকৃতির) সঙ্গে নিজ সম্বন্ধ মেনে নেয় (গীতা ১৫।৭) এবং প্রকৃতির গুণাদিতে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু পরমাত্মা (প্রকৃতির অতীত হওয়ায়) কখনোই মোহগ্রস্ত হন না (গীতা ৭।১৩)। (২) পরমাত্মা প্রকৃতিকে নিজের অধীন করে ইহলোকে আসেন এবং অবতারত্ব গ্রহণ করেন (গীতা ৪।৬) কিন্তু জীবাত্মা প্রকৃতির বশীভূত হয়ে ইহলোকে আসে (গীতা ৮।১৯)। (৩) পরমাত্মা সর্বদাই নির্লিপ্ত থাকেন (গীতা ৪।১৪ ; ৯।৯), কিন্তু জীবাত্মার নির্লিপ্ত হওয়ার জন্য সাধনা করতে হয় (গীতা ৪।১৮ ; ৭।১৪)।

ভগবান নিজেকে ক্ষরের 'অতীত' এবং অক্ষর হতে 'উত্তম' বলায় এই ভাবও প্রকটিত হয় যে ক্ষর এবং অক্ষর—দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। যদি উভয়ের মধ্যে পার্থক্য না থাকত তাহলে ভগবান নিজেকে হয় দুইয়েরই অতীত বলে জানাতেন, না হয় উভয় থেকেই উত্তম বলতেন। সুতরাং এটিই প্রমাণিত হয় যে, ভগবান যেমন ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর হতে উত্তম, তেমনই অক্ষরও ক্ষরের অতীত এবং উত্তম।

'অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ'—এখানে 'লোকে' পদটির অর্থ হল—পুরাণ স্মৃতি ইত্যাদি শাস্ত্র। শাস্ত্রে ভগবান 'পুরুষোত্তম' নামে প্রসিদ্ধ।

শুদ্ধ জ্ঞানের নাম হল 'বেদ', যা অনাদি। সেই জ্ঞানই আনুপূর্বীরূপে ঋক্, যজুঃ ইত্যাদি বেদ রূপে প্রকটিত হয়েছে। বেদেও ভগবান 'পুরুষোত্তম' নামেই প্রসিদ্ধ।

আগের শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে ক্ষর এবং অক্ষর—উভয় থেকেই উত্তম পুরুষ পৃথক্। সেই উত্তম পুরুষকে জানাতে গিয়ে ভগবান এই রহস্য প্রকটিত করেছেন যে, সেই উত্তম পুরুষ হলাম আমি।

বিশেষ কথা

(১) ভৌতিক সৃষ্টি মাত্রই হল ক্ষর (বিনাশশীল) এবং

পরমাত্মার সনাতন অংশ জীবাত্মা হল 'অক্ষর' (অবিনাশী)। ক্ষরের অতীত এবং উত্তম হলেও অক্ষর ক্ষরের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নিয়েছে—এর থেকে বড় কোনো দোষ, ভুল বা ত্রুটি আর হয় না। ক্ষরের সঙ্গে এ শুধু মেনে নেওয়া সম্পর্ক। প্রকৃতপক্ষে এটি এক মুহূর্তও থাকে না। যেমন, বাল্যাবস্থা থেকে এখন পর্যন্ত শরীর এক রকম নেই, পরিবর্তিত হয়েছে, তবুও আমরা বলে থাকি যে 'আমরা সেই একই আছি'। আমরা বলতে পারি না কবে আমাদের বাল্যাবস্থা শেষ হয়েছে এবং যৌবন শুরু হয়েছে। কারণ নদীপ্রবাহের ন্যায় শরীরও নিরন্তর অবস্থান্তরে বহমান, কিন্তু অক্ষর (জীবাত্মা) নদীতে স্থিত শিলার ন্যায় সর্বদা অচল ও অসঙ্গ থাকে। অক্ষরও যদি ক্ষরের ন্যায় নিত্য পরিবর্তনশীল এবং বিনাশশীল হত তাহলে বন্ধন বা মুক্তির কোনো সমস্যাই থাকত না। কিন্তু স্বয়ং (অক্ষর) অপরিবর্তনশীল এবং অবিনাশী হয়েও নিরন্তর পরিবর্তনশীল এবং বিনাশশীল ক্ষরকে ধরে নেয়—তাকে আপন মনে করে। অক্ষর, ক্ষরকে ত্যাগ করে না আর ক্ষর একমুহূর্তও স্থির থাকে না। এই সমস্যার একটি সহজ সমাধান হল—ক্ষর-(শরীরাদি)কে ক্ষরের (জগৎ-সংসারের) সেবাতেই নিয়োগ করা, সংসাররূপী বাগানের উন্নয়নে নিজেকে সার রূপে সমর্পণ করা।

মানুষ শরীরাদি বিনাশশীল পদার্থ, অধিকার প্রয়োগ বা নিজের বলে মনে করার জন্য পায়নি, বরং সেবা করার হেতু রূপে পেয়েছে। এই পদার্থের দ্বারা অপরকে সেবা করাতেই মানুষের অধিকার, নিজের বলে মানার অধিকার তাকে দেওয়া হয়নি।

(২) পঞ্চদশ অধ্যায়ে ভগবান প্রথমে ক্ষর—সংসার-বৃক্ষের বর্ণনা করেছেন। পরে সেটি ছেদন করে পরম পুরুষ পরমাত্মার শরণাগত হওয়ার অর্থাৎ জগতের সঙ্গে একাত্মভাব দূর করে একমাত্র পরমাত্মাকে নিজের বলে মনে করার প্রেরণা দিয়েছেন। পরে অক্ষর-জীবাত্মাকে নিজ সনাতন অংশ বলে তার স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। তারপরে ভগবান (দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শ্লোক পর্যন্ত) নিজ প্রভাব বর্ণনা করতে গিয়ে জানিয়েছেন যে, 'সূর্য, চন্দ্র এবং অগ্নিতে আমারই তেজ বিদ্যমান ; আমিই পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হয়ে নিজ শক্তি বলে চরাচর সকল প্রাণীকে ধারণ করি ; আমি অমৃতময় চন্দ্ররূপে সমস্ত বনস্পতিকে পরিপুষ্ট করি ; বৈশ্বানর-অগ্নিরূপে আমি প্রাণীগণের শরীরে অবস্থান করে তাদের গ্রহণ করা খাদ্য পরিপাক করি ; আমি সকল প্রাণীর হৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত ; আমা হতেই স্মৃতি, জ্ঞান, অপোহন (ভ্রম-সংশয়াদি দোষ-নাশ) হয় ; আমিই বেদাদি শাস্ত্রের দ্বারা একমাত্র জ্ঞাতব্য এবং বেদের অন্তিম সিদ্ধান্তের নির্ণয়কারী ও বেদের প্রকৃত জ্ঞাতাও আমিই। এইভাবে নিজ প্রভাব প্রকটিত করার পর ভগবান এই শ্লোকে এক পরম গুহ্যতম রহস্য প্রকটিত করেছেন যে, যাঁর এই সমস্ত প্রভাব সেই (ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর হতে উত্তম) 'পুরুষোত্তম' আমিই (সাক্ষাৎ সাকাররূপে প্রকটিত শ্রীকৃষ্ণ)।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের ওপর বিশেষ কৃপা করেই নিজ রহস্যের কথা নিজ শ্রীমুখে প্রকটিত করেছেন ; যেমন—কোনো পিতা নিজ পুত্রের কাছে তাঁর গুপ্ত রহস্য প্রকটিত করে দেন অথবা কোনো ব্যক্তি কোনো পরিশ্রান্ত পথিককে নিজ পরিচয় দিয়ে বলেন যে, 'তুমি যাকে অনুসন্ধান করছ, আমিই সেই ব্যক্তি।'

পরিশিষ্ট-ভাব—নিজের অলৌকিকত্বের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে ভগবান এখানে **'যস্মাৎ'** পদটি ব্যবহার করেছেন।

'অক্ষরাদপি চোত্তমঃ'—'অক্ষর' শব্দটি জীবাত্মা এবং ব্রহ্ম উভয়ের জন্যই ব্যবহৃত হয়—**'অক্ষরং ব্রহ্ম পরমম্‌'** (গীতা ৮।৩)। এই শব্দটি সর্বক্ষেত্রেই চেতনের বাচক হিসাবে ব্যবহৃত হয়, জড়ের বাচক হিসাবে কখনো ব্যবহৃত হয় না।

ক্ষর এবং অক্ষরের কোনো স্বাধীন অস্তিত্ব নেই, কিন্তু পরমাত্মার স্বাধীন অস্তিত্ব আছে। ক্ষর ও অক্ষর এই দুটিই পরমাত্মাতে অবস্থিত। কিন্তু অক্ষর অর্থাৎ জীব ক্ষরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে তার অধীন হয়—**'যয়েদং ধার্যতে জগৎ'** (গীতা ৭।৫)। পরমাত্মা স্বতঃই আসক্তিবর্জিত, তিনি কখনো ক্ষরের অধীন হন না—**'যস্মাৎক্ষরমতীতোঽহম্‌'**। তাই পরমাত্মা অক্ষরের (জীবের) থেকেও উত্তম। জীব যদি জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত না হয়ে তার প্রভু পরমাত্মার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে তাহলে সে পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্ন (আত্মীয়) হয়ে ওঠে—**'জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্‌'** (গীতা ৭।১৮)।

মুক্তিতে তো অক্ষরে (স্বরূপে) স্থিতিলাভ হয়, কিন্তু ভক্তির দ্বারা অক্ষরের থেকেও উত্তম পুরুষোত্তমের প্রাপ্তি হয়।

স্বরূপ হল অংশ আর পুরুষোত্তম হলেন অংশী।

***

সম্বন্ধ—চতুর্দশ অধ্যায়ের ছাব্বিশতম শ্লোকে ভগবান যে অব্যভিচারিণী ভক্তির কথা বলেছেন এবং যেটি প্রাপ্তির জন্য এই পঞ্চদশ অধ্যায়ে জগৎ, জীব এবং পরমাত্মার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, পরবর্তী শ্লোকে তার উপসংহার করেছেন।

যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ববিদ্ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত॥ ১৯ ॥

[ভারত (হে ভরতবংশোদ্ভূত অর্জুন!) ; **এবম্, যঃ, অসম্মূঢ়ঃ** (এইরূপ মোহবর্জিত হয়ে) ; **মাম্, পুরুষোত্তমম্** (আমাকে পুরুষোত্তম বলে) ; **জানাতি, সঃ** (জানতে পারেন, তিনিই) ; **সর্ববিৎ, সর্বভাবেন** (সর্বজ্ঞ এবং সর্বতোভাবে) ; **মাম্, ভজতি** (আমারই ভজনা করে থাকেন।)]

হে ভরতবংশোদ্ভূত অর্জুন ! এইরূপ মোহবর্জিত হয়ে যে ব্যক্তি আমাকে পুরুষোত্তম বলে জানতে পারেন, তিনি সর্বজ্ঞ হন এবং সর্বতোভাবে তিনি আমারই ভজনা করে থাকেন॥ ১৯ ॥

ব্যাখ্যা—**'যো মামেবমসম্মূঢ়ো'**—পরমাত্মার সনাতন অংশ হল জীবাত্মা। সুতরাং নিজ অংশী পরমাত্মার প্রকৃত সম্পর্ক (যা সর্বদাই বিদ্যমান) অনুভব করাই হল অসম্মূঢ় (মোহবর্জিত) হওয়া।

জগৎ বা পরমাত্মাকে তত্ত্বতঃ না জানার মূল কারণ হল মোহ বা মূঢ়তা। কোনো বস্তুকে বাস্তবিকভাবে তখনই জানা যায় যখন সেই বস্তুতে অনুরাগ বা দ্বেষপূর্বক মেনে নেওয়া কোনো সম্পর্ক না থাকে। বিনাশশীল পদার্থতে রাগ-দ্বেষপূর্বক সম্পর্ক মেনে নেওয়াই হল মূঢ়তা।

জগৎকে তত্ত্বতঃ জানলেই পরমাত্মার সঙ্গে নিজ অভিন্ন সম্পর্ক অনুভূত হয় এবং পরমাত্মাকে তত্ত্বতঃ জানলে জগতের সঙ্গে নিজ পার্থক্য অনুভূত হয়। তাৎপর্য হল এই যে, জগৎকে তত্ত্বতঃ জানলে জগতের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয় এবং পরমাত্মাকে তত্ত্বতঃ জানলে পরমাত্মার সঙ্গে প্রকৃত সম্বন্ধ অনুভূত হয়।

জগৎ-সংসারকে নিজের বলে মনে করাই হল ভক্তির ব্যভিচার-দোষ অর্থাৎ ঐকান্তিকী ভক্তির অভাব। উপরিউক্ত পদটির তাৎপর্য এই ব্যভিচার-দোষ থেকে সর্বতোভাবে রহিত হওয়া বলে বুঝতে হবে।

'জানাতি পুরুষোত্তমম্'—যাঁদের মূঢ়তা সর্বতোভাবে অপসারিত হয়েছে, তাঁরাই ভগবানকে 'পুরুষোত্তম' বলে জানেন।

ক্ষরের সর্বতোভাবে অতীত পুরুষোত্তমকেই (পরম পুরুষ পরমাত্মাকেই) সবার ঊর্ধ্বে জেনে তাঁর শরণাগত হওয়া, শুধু তাঁকেই নিজের বলে মেনে নেওয়াই হল ভগবানকে যথার্থভাবে 'পুরুষোত্তম' বলে জানা।

জগতের যে সমস্ত প্রভাব দেখা যায়, শোনা যায়, তা সবই এক ভগবানেরই (পুরুষোত্তমের)—এরূপ মেনে নিলে সংসারের আকর্ষণ দূর হয়। যদি বিন্দুমাত্রও সংসারের আকর্ষণ থাকে, তাহলে বুঝতে হবে যে এখনও ভগবানকে দৃঢ়ভাবে মেনে নেওয়া হয়নি।

'স সর্ববিদ্ ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত'—যিনি ভগবানকে 'পুরুষোত্তম' বলে জানেন এবং এই বিষয়ে যাঁর চিত্তে কোনো বিকল্প, ভ্রম বা সংশয় থাকে না, সেই ব্যক্তির জানবার উপযুক্ত কোনো তত্ত্ব আর বাকি থাকে না। তাই ভগবান তাঁকে **'সর্ববিৎ'** বলেছেন[1]।

যাঁরা ভগবানকে জানেন তাঁরা যতই কম শিক্ষিত হোন, তাঁরা সর্বজ্ঞ হন। কারণ তাঁদের জানার শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব জানা হয়েছে, তাই তাঁদের জানার আর কিছু বাকি থাকে না।

যাঁরা ভগবানকে 'পুরুষোত্তম' বলে জেনেছেন সেই **'সর্ববিৎ'** ব্যক্তিদের পরিচয় হল এই যে তাঁরা সর্বভাবে স্বতঃই ভগবদভজনা করেন।

মানুষ যখন ভগবানকে 'ক্ষরের অতীত' বলে জানতে পারে, তখন তার মন (অনুরাগ) ক্ষর (জগৎ-সংসার)

[1]তদক্ষরং বেদয়তে যস্তু সৌম্য স সর্বজ্ঞঃ সর্বমেবাবিবেশেতি॥ (প্রশ্নোপনিষদ্ ৪।১১)
'হে সৌম্য ! যিনি এই অবিনাশী পরমাত্মাকে জানেন, তিনিই সর্বজ্ঞ। তিনি সর্বরূপ পরমেশ্বরে প্রবিষ্ট হন।'

থেকে অপসারিত হয়ে ভগবানে আকৃষ্ট হয় আর যখন সে ভগবানকে 'অক্ষর হতে উত্তম' বলে জানতে পারে, তখন তার বুদ্ধি (শ্রদ্ধা) ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হয়[১]। তখন তার প্রত্যেক মনোবৃত্তি ও ক্রিয়ার দ্বারা স্বতঃ ভগবদ্‌ভজনা হয়ে থাকে। এইরূপ সর্বতোভাবে ভগবদ্‌ভজনা করাই হল 'অব্যভিচারিণী ভক্তি'।

শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি জাগতিক পদার্থগুলির সঙ্গে মানুষ যতক্ষণ আসক্তিপূর্বক নিজ সম্পর্ক মেনে নেয়, ততক্ষণ সে সর্বতোভাবে ভগবানের ভজনা করতে পারে না। কারণ আসক্তি যেদিকে থাকে, মনোবৃত্তি স্বতঃই সেইদিকে ধাবিত হয়।

'আমি ভগবানের এবং ভগবানই আমার'—এই বাস্তবিক সত্য দৃঢ়তা সহকারে মেনে নিলে স্বতঃই সর্বতোভাবে ভগবানের ভজনা হয়ে থাকে। তখন ভক্তের ক্রিয়ামাত্রই (শয়ন, জাগরণ, চলা-ফেরা, খাওয়া-দাওয়া) ইত্যাদি ভগবানের প্রসন্নতার জন্য হয়, নিজের জন্য নয়।

জ্ঞানমার্গে 'জানা' আর ভক্তিমার্গে **'মানা'** হল প্রধান। যে বিষয়ে কোনো প্রকার সন্দেহ থাকে না, তাকে দৃঢ়তা সহকারে মেনে নেওয়াই হল ভক্তিমার্গে 'জানা'। ভগবানকে সবার ওপরে মেনে নেওয়ার পর ভক্ত সর্বপ্রকারে ভগবানেরই ভজনা করে থাকে (গীতা ১০।৮)।

ভগবানকে 'পুরুষোত্তম' (সবার ঊর্ধ্বে) বলে মানলেই মানুষ যখন 'সর্ববিৎ' হয়, তাহলে সর্বতোভাবে ভগবানের ভজনা করে ভগবানকে 'পুরুষোত্তম' বলে জানতে পারবে তাতে আর আশ্চর্য কী?

পরিশিষ্ট-ভাব—'যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্'—যিনি ভগবানকে জানেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে 'অসম্মূঢ়' (গীতা ১০।৩)। কিন্তু যিনি ভগবানকে জানেন না, তিনি 'মূঢ়'—**'অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ'** (গীতা ৯।১১)।

'স সর্ববিদ্‌ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত'—ক্ষর এবং অক্ষর উভয়ই সমগ্র ভগবানের অঙ্গ ; সুতরাং এদের জানলে মানুষ সর্ববিৎ (সর্বজ্ঞ) হয় না। যিনি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষরের থেকেও উত্তম পুরুষোত্তমকে জানেন, তিনিই 'সর্ববিৎ' অর্থাৎ সমগ্রকে জেনে থাকেন। এরূপ সর্ববিৎ ভক্ত সর্বপ্রকারে ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে থাকেন— **'সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে'** (গীতা ৬।৩১) ; কারণ তাঁর দৃষ্টিতে এক ভগবান ব্যতীত আর কিছুই থাকে না।

গীতায় 'সর্ববিৎ' শব্দটি শুধুমাত্র ভক্তদের জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। ভক্ত সমগ্রকে অর্থাৎ লৌকিক ও অলৌকিক উভয়কেই জানেন, তাই তিনি সর্ববিৎ। অলৌকিক কখনো লৌকিকের অন্তর্গত হয় না, কিন্তু লৌকিক অলৌকিকের অন্তর্গত হতে পারে। অতএব নির্গুণ তত্ত্বকে (অক্ষরকে) যিনি জানেন সেই ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি সর্ববিৎ হন না, যিনি সমগ্র ভগবানকে জানেন সেই ভক্তই সর্ববিৎ হন।

* * *

সম্বন্ধ—'অরুন্ধতী-দর্শন-ন্যায়' (স্থূল হতে ক্রমশঃ সূক্ষ্মের দিকে যাওয়া) অনুযায়ী ভগবান এই অধ্যায়ে প্রথমে 'ক্ষর' এবং তারপরে 'অক্ষর'-এর বিশ্লেষণ করার পর শেষকালে 'পুরুষোত্তমে'র বর্ণনা করেছেন—নিজ পুরুষোত্তমতত্ত্ব প্রমাণিত করেছেন। এরূপ বর্ণনা করার তাৎপর্য ও প্রয়োজন কী?—পরবর্তী শ্লোকে ভগবান সেই আলোচনা করছেন।

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত॥ ২০ ॥

[অনঘ (হে নিষ্পাপ অর্জুন!) ; **ময়া, ইতি, ইদম্** (এইরূপে আমার দ্বারা এই) ; **গুহ্যতমম্, শাস্ত্রম্** (অত্যন্ত গোপনীয় রহস্য) ; **উক্তম্** (বলা হল) ; **ভারত** (হে ভারত!) ; **এতৎ, বুদ্ধ্বা** (এগুলি জেনে) ; **বুদ্ধিমান্** (জ্ঞানী) ; **চ** (ও) ; **কৃতকৃত্যঃ** (কৃতার্থ) ; **স্যাৎ** (হয়।)]

হে নিষ্পাপ অর্জুন! আমি এরূপে এই অত্যন্ত গোপনীয় রহস্য তোমাকে জানালাম। হে ভারত! এটি জেনে মানুষ জ্ঞানী (জ্ঞাত-জ্ঞাতব্য তথা প্রাপ্ত-প্রাপ্তব্য) এবং কৃত-কৃতার্থ হয়॥ ২০ ॥

---

[১]কোনো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মন সানুরাগে এবং বুদ্ধি শ্রদ্ধাপূর্বক আকৃষ্ট হয়।

ব্যাখ্যা—**'অনঘ'**—অর্জুন দোষদৃষ্টি (অসূয়া)বর্জিত ছিলেন, তাই তাঁকে নিষ্পাপ বলা হয়েছে। দোষদৃষ্টি থাকা পাপ, এতে চিত্ত অপবিত্র হয়। যিনি দোষদৃষ্টিরহিত, তিনিই ভক্তির পাত্র হন।

দোষদৃষ্টি-বর্জিত ব্যক্তির কাছেই গোপনীয় কথা বলা যায়[১]। দোষদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে যদি কোনো গোপনীয় কথা বলা হয়, তবে তার ওপর এর বিপরীত প্রভাব পড়ে অর্থাৎ সে এই গোপনীয় বিষয়ের বিপরীত অর্থ করে বক্তারও দোষ দেখতে থাকে যে, ইনি আত্মশ্লাঘাসম্পন্ন, অপরকে মোহিত করার জন্য বলছেন ; ইত্যাদি। এতে দোষদৃষ্টিযুক্ত ব্যক্তির অত্যন্ত ক্ষতি হয়।

দোষদৃষ্টির প্রধান কারণ—অহং-অভিমান। যে ব্যাপারে মানুষের অহং-ভাব থাকে, সেই ব্যাপারে তার মধ্যে কিছু না কিছু দোষ থাকেই। নিজের এই দোষ সে অপরের মধ্যে খুঁজতে থাকে। নিজের মধ্যে ভালোত্বের অহংকার থাকলে, অন্যের মধ্যে মন্দভাব চোখে পড়ে এবং অন্যের মধ্যে মন্দভাব দেখলেই নিজের মধ্যে ভালোত্বের অহংকার জন্মায়।

দোষদৃষ্টিযুক্ত ব্যক্তিদের সম্মুখে যদি ভগবান নিজেকে সর্বোপরি 'পুরুষোত্তম' বলে জানান, তবে তারা তা বিশ্বাস করবে না, বরং মনে করবে যে ভগবান আত্মশ্লাঘী (নিজ মুখে নিজ প্রশংসা করেন)—

'নিজ অগ্যান রাম পর ধরহীঁ।'

(শ্রীরামচরিতমানস ৭।৭৩।৫)

ভগবানের প্রতি কারও দোষদৃষ্টি থাকলে তার পক্ষে সেটি অত্যন্ত ক্ষতিকারক হয়। তাই ভগবান এবং সাধুগণ দোষদৃষ্টিযুক্ত শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিদের কাছে গোপনীয় বিষয় ব্যক্ত করেন না (গীতা ১৮।৬৭)। প্রকৃতপক্ষে দোষদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে গোপনীয় (রহস্যযুক্ত) কথা মুখনিঃসৃত হতেই চায় না।

অর্জুনকে **'অনঘ'** সম্বোধন করার আরও একটি কারণ এই হতে পারে যে, এই অধ্যায়ে ভগবান যে পরম গোপনীয় প্রভাব জানিয়েছেন, তা অর্জুনের মতো দোষদৃষ্টিবর্জিত সরল ব্যক্তির সামনেই ব্যক্ত করা যেতে পারে।

'ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদম্'—চতুর্দশ অধ্যায়ের ছাব্বিশতম শ্লোকে অব্যভিচারিণী ভক্তির কথা বলার পর ভগবান পঞ্চদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক থেকে উনিশতম শ্লোক পর্যন্ত যে (ক্ষর, অক্ষর এবং পুরুষোত্তমের) কথা বর্ণনা করেছেন, সেই বিষয়ের পূর্ণতা এবং লক্ষ্য নির্দেশ করা হয়েছে **'ইতি ইদম্'** পদটির দ্বারা।

এই অধ্যায়ে প্রথমে ভগবান ক্ষর (জগৎ-সংসার) এবং অক্ষর (জীবাত্মা) সম্পর্কে বর্ণনা করে তাঁর অপ্রতিম প্রভাব (দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শ্লোক পর্যন্ত) প্রকটিত করেছেন। পরে ভগবান তাঁর গোপনীয় বিষয় ব্যক্ত করে জানাচ্ছেন যে, যাঁর এইসব প্রভাব সেই (ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর হতে উত্তম) 'পুরুষোত্তম' আমিই।

নাটকের অভিনেতার ন্যায় ভগবান এই পৃথিবীতে মানুষের রূপ ধারণ করে অবতরণ করেন এবং এমন এমনভাবে আচার-ব্যবহার করেন যে জ্ঞানহীন ব্যক্তিরা তাঁকে জানতে সক্ষম হন না (গীতা ৭।২৪)। নাটকাভিনয়ে অভিনেতার প্রকৃত পরিচয় জানানো হয় না, তা গোপন রাখা হয়। কিন্তু ভগবান এই অধ্যায়ে (অষ্টাদশ শ্লোকে) নিজের প্রকৃত পরিচয় জানিয়ে অত্যন্ত গোপনীয় বিষয় প্রকটিত করেছেন যে, আমিই পুরুষোত্তম। সেইজন্যই এই অধ্যায়টিকে 'গুহ্যতম' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

শাস্ত্রে প্রায়শই জগৎ-সংসার, জীবাত্মা ও পরমাত্মার বর্ণনা পাওয়া যায়। পঞ্চদশ অধ্যায়ে এই তিনটির বর্ণনাই করা হয়েছে, তাই এই অধ্যায়টিকে **'শাস্ত্র'** ও বলা হয়েছে।

সর্বশাস্ত্রময়ী গীতায় শুধুমাত্র এই অধ্যায়টিই **'শাস্ত্র'** উপাধি লাভ করেছে। এই অধ্যায়ে মুখ্যরূপে পুরুষোত্তম-এর বর্ণনা হওয়ায় এই অধ্যায়কে 'গুহ্যতম শাস্ত্র' বলা হয়েছে। এই গুহ্যতম শাস্ত্রে ভগবান তাঁকে প্রাপ্ত করার ছটি উপায় বর্ণনা করেছেন—

(১) 'তত্ত্ব' দ্বারা জগৎকে জানা (শ্লোক-১)।

(২) জগতের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক ছেদ করে একমাত্র ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া (শ্লোক-৪)।

(৩) নিজের মধ্যে অবস্থিত পরমাত্মতত্ত্বকে জানা (শ্লোক-১১)।

(৪) বেদাধ্যয়নের সাহায্যে তত্ত্বকে জানা (শ্লোক-১৫)।

---

[১]নবম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকেও ভগবান অর্জুনকে দোষদৃষ্টিরহিত বলে অর্জুনকে গুহ্যতম জ্ঞান জানাবার কথা বলেছিলেন—'ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে'। এই পঞ্চদশ অধ্যায়ে তিনি নবম অধ্যায় থেকেও অধিক গোপনীয় বিষয় জানিয়েছেন। সুতরাং এখানে 'অনঘ'-এর অর্থ 'অনসূয়া' বলে মনে করা উচিত।

(৫) ভগবানকে পুরুষোত্তম বলে জেনে সর্বতোভাবে তাঁকে ভজনা করা (শ্লোক-১৯)।

(৬) সমস্ত অধ্যায়টির তত্ত্ব জানা (শ্লোক-২০)।

যে অধ্যায়ে ভগবদ্‌প্রাপ্তির এত সহজ উপায় জানানো হয়েছে, তাকে শাস্ত্র বলাই উচিত ।

'ময়া উক্তম্'—এই পদটিতে ভগবান বলেছেন যে সমগ্র ভৌতিক জগতের প্রকাশক এবং অধিষ্ঠান, সকল প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত, বেদের দ্বারা জানার যোগ্য এবং ক্ষর ও অক্ষর উভয় থেকে উত্তম সাক্ষাৎ যে আমি— সেই পুরুষোত্তম দ্বারাই এই গোপনীয় শাস্ত্র অত্যন্ত কৃপাপূর্বক বলা হয়েছে। নিজের বিষয়ে আমি যতটা বলতে সক্ষম, অন্য কেউ তত সক্ষম নয়। কারণ অন্যেরা প্রথমে আমাকে জানবে[১], তারপর আমার বিষয়ে বলবে, কিন্তু আমার অজানা কিছুই নেই।

প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং ভগবান ব্যতীত অন্য কেউই তাঁকে পূর্ণভাবে জানতে সক্ষম নয় (গীতা ১০।২, ১৫)। ষষ্ঠ অধ্যায়ের উনচল্লিশতম শ্লোকে অর্জুন ভগবানকে বলেছেন যে, আপনি ছাড়া অন্য কেউই আমার সংশয় ছেদন করতে সক্ষম নয়। ভগবানও যেন এখানে বলেছেন যে আমার কথিত বিষয়ে কোনো প্রকার সংশয় থাকার সম্ভাবনাই নেই।

'এতদ্‌বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত'—পুরো অধ্যায়ে ভগবান যে জগতের বাস্তবিকতা, জীবাত্মার স্বরূপ, নিজ অপ্রতিম প্রভাব ও গোপনীয়তার কথা বর্ণনা করেছেন, তার (বিশেষভাবে উনিশতম শ্লোকের) নির্দেশ এই **'এতৎ'** পদে করেছেন। যে ব্যক্তি এই গুহ্যতম শাস্ত্র তত্ত্বতঃ জানেন, তিনি জ্ঞানী অর্থাৎ জ্ঞাত-জ্ঞাতব্য হন। তাঁর জানার আর কিছুই বাকি থাকে না। কারণ তিনি একমাত্র জ্ঞাতব্য পুরুষোত্তমকেই জেনেছেন।

পরমাত্মতত্ত্ব জানলে মানুষের মূঢ়তা নাশ হয়। পরমাত্মতত্ত্ব না জেনে লৌকিক বিদ্যা, ভাষা, কলা ইত্যাদি যতই জানা হোক, মূর্খতা দূর হয় না। কারণ লৌকিক বিদ্যাগুলির সবই আরম্ভ ও শেষ আছে অর্থাৎ সেগুলি অপূর্ণ। যতপ্রকার লৌকিক বিদ্যা আছে, সে সবই পরমাত্মা হতে প্রকাশিত ; সুতরাং সেগুলি পরমাত্মাকে কীভাবে প্রকাশ করবে ? এইসব লৌকিক বিদ্যা না জেনেও যিনি পরমাত্মাকে জেনেছেন, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী।

উনিশতম শ্লোকে সর্বতোভাবে ভজনাকারী যে মোহরহিত ভক্তকে **'সর্ববিৎ'** বলা হয়েছে, তাঁকেই এখানে **'বুদ্ধিমান্'** বলা হয়েছে।

এখানে **'চ'** পদের দ্বারা আগের শ্লোকে উদ্ধৃত বাক্যের ফলটির (প্রাপ্ত-প্রাপ্তব্যতার) অনুকর্ষণ ব্যক্ত হয়েছে। আগের শ্লোকে সর্বতোভাবে ভগবানের ভজনা করা অর্থাৎ অব্যভিচারিণী ভক্তির কথা বিশেষভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। ভক্তির সমান কোনো লাভ নেই **'লাভু কি কিছু হরি ভগতি সমানা'** (শ্রীরামচরিতমানস ৭।১১২।৪)। তাই যিনি ভক্তিলাভ করেছেন, তিনি প্রাপ্ত-প্রাপ্তব্য হয়েছেন, অর্থাৎ তাঁর আর কিছুই পাবার বাকি নেই।

ভগবদ্‌তত্ত্বের বিশেষত্ব হল এই যে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ বা ভক্তিযোগ—তিনটির কোনো একটিতে সিদ্ধি হলেই কৃতকৃত্যতা, জ্ঞাতজ্ঞাতব্যতা এবং প্রাপ্ত-প্রাপ্তব্যতা—তিনেরই প্রাপ্তিলাভ হয়। তাই যিনি ভগবদ্‌-তত্ত্ব জেনেছেন, তাঁর পক্ষে আর কিছুই জানার, পাওয়ার এবং করার বাকি থাকে না। তাঁর মনুষ্যজীবন সফল হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব—ভগবান এই অধ্যায়ে নিজেকে পুরুষোত্তমরূপে অর্থাৎ অলৌকিক সমগ্ররূপে প্রকটিত করেছেন। সেইজন্য একে 'গুহ্যতম শাস্ত্র' বলা হয়েছে।

মানুষ কর্মযোগের দ্বারা কৃতকৃত্য, জ্ঞানযোগের দ্বারা জ্ঞাতজ্ঞাতব্য এবং ভক্তিযোগের দ্বারা প্রাপ্তপ্রাপ্তব্য হয়। আমার নিজের জন্য কিছু করার নেই—এরূপ অনুভব হলে মানুষ কৃতকৃত্য হয়ে থাকে । শরীর আমার নয়, তার ওপর আমার কোনো অধিকার নেই এবং শরীরের সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধ নেই—এটি অনুভব হলে মানুষ জ্ঞাতজ্ঞাতব্য হয়। আমার কিছু চাই না—এটি অনুভব হলে মানুষ প্রাপ্তপ্রাপ্তব্য হতে পারে। এই শ্লোকে উদ্ধৃত **'বুদ্ধিমান'** পদে জ্ঞাতজ্ঞাতব্য হবার ভাব অন্তর্নিহিত আছে। আগের শ্লোকে **'স সর্ববিদ্‌ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত'** পদটিতে প্রাপ্তপ্রাপ্তব্য হওয়ার ভাব রয়েছে। এই শ্লোকে উদ্ধৃত **'চ'** পদেও অনুক্ত সমুচ্চয় অর্থ—প্রাপ্তপ্রাপ্তব্য ধরা যেতে পারে। লৌকিক ক্ষর ও অক্ষর তো

[১]সোই জানই জেহি দেহু জনাঈ। জানত তুম্হহি তুম্হই হোই জাঈ॥
তুম্হরিহি কৃপাঁ তুম্হহি রঘুনন্দন। জানহিঁ ভগত ভগত উর চন্দন॥ (শ্রীরামচরিতমানস ২।১২৭।২)

প্রাপ্ত রয়েছে অতএব অলৌকিক পরমাত্মাই হলেন প্রাপ্তব্য। এই শ্লোকে এই ভাবটিই পরিস্ফুট হয় যে ভক্ত জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ—উভয়ের ফলই প্রাপ্ত হন অর্থাৎ তিনি জ্ঞাতজ্ঞাতব্য ও কৃতকৃত্যও হন (গীতা ৭।২৯, ৩০, এবং ১০।১০, ১১)।

***

ওঁ তৎ সৎ ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে পুরুষোত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৫ ॥

এইভাবে ওঁ, তৎ, সৎ—এই ভগবদ্নাম উচ্চারণপূর্বক ব্রহ্মবিদ্যা এবং যোগশাস্ত্রময় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে **'পুরুষোত্তমযোগ'** নামক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত হল॥ ১৫ ॥

এই অধ্যায়ে কথিত বিষয় যথার্থভাবে বুঝতে পারলে পুরুষোত্তমের (ভগবানের) সঙ্গে নিত্যযোগ অনুভূত হয়। তাই এই অধ্যায়টির নাম দেওয়া হয়েছে **'পুরুষোত্তমযোগ'**।

পঞ্চদশ অধ্যায়ের পদ, অক্ষর এবং উবাচ

(১) এই অধ্যায়ে **'অথ পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ'**-এর তিন, **'শ্রীভগবানুবাচ'**-এর দুই, শ্লোকগুলির দুইশত অষ্টাশী এবং পুষ্পিকার তেরটি পদ আছে। এইরূপে সমস্ত পদগুলির যোগসংখ্যা তিনশত ছয়।

(২) **'অথ পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ'**-এর আট, **'শ্রীভগবানুবাচ'**-এর সাত, শ্লোকগুলির সাতশত এক এবং পুষ্পিকাতে ছেচল্লিশটি অক্ষর আছে। এইভাবে সমস্ত অক্ষরগুলির যোগসংখ্যা হল সাতশত বাষট্টি। এই অধ্যায়ের কুড়িটি শ্লোকের মধ্যে দ্বিতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম এবং পঞ্চদশ—এই চারটি শ্লোক চুয়াল্লিশ অক্ষর সংবলিত এবং তৃতীয় শ্লোক পঁয়তাল্লিশ অক্ষর সংবলিত। বাকি পনেরোটি শ্লোক বত্রিশ অক্ষরযুক্ত।

(৩) এই অধ্যায়ে একটিই উবাচ—**'শ্রীভগবানুবাচ'**।

পঞ্চদশ অধ্যায়ের প্রযুক্ত ছন্দ

এই অধ্যায়ের কুড়িটি শ্লোকের মধ্যে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ—এই তিনটি শ্লোক **'উপজাতি'** ছন্দ সংবলিত এবং পঞ্চম ও পঞ্চদশ—এই দু'টি শ্লোক **'ইন্দ্রবজ্রা'** ছন্দযুক্ত। অবশিষ্ট পনেরোটি শ্লোকের মধ্যে সপ্তম শ্লোকের প্রথম এবং তৃতীয় পংক্তিতে 'রগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় **'জাতিপক্ষ-বিপুলা'**; নবম শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে ও কুড়িতম শ্লোকের তৃতীয় পংক্তিতে 'রগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় **'র-বিপুলা'**; অষ্টাদশ শ্লোকের তৃতীয় পংক্তিতে 'মগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় **'ম-বিপুলা'** এবং উনিশতম শ্লোকের তৃতীয় পংক্তিতে 'নগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় **'ন-বিপুলা'** সংজ্ঞাযুক্ত ছন্দ আছে। বাকি দশটি (১, ৬, ৮, ১০-১৪, ১৬-১৭) শ্লোক ঠিক **'পথ্যাবক্ত্র'** অনুষ্টুপ ছন্দের লক্ষণ দ্বারা যুক্ত।

***

পঞ্চদশ অধ্যায়ের নিষ্কর্ষ

ভগবান সপ্তম অধ্যায়ে অপরা এবং পরা (৭।৪-৫) রূপে তাঁর দুটি প্রকৃতির বর্ণনা করেছিলেন। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহংকার—এই আট প্রকারে বিভক্ত হল 'অপরা প্রকৃতি' আর যা জগৎকে ধারণ করে রেখেছে তা হল জীবরূপে 'পরা প্রকৃতি'। অপরা এবং পরা—দুই-ই ঈশ্বরের প্রকৃতি অর্থাৎ স্বভাব। ভগবান এই তিনটির অর্থাৎ অপরা, পরা এবং ঈশ্বরের—বিস্তারিত বর্ণনা পঞ্চদশ অধ্যায়ে করেছেন। পঞ্চদশ অধ্যায়ের প্রথমে সংসার-বৃক্ষের রূপে 'অপরা'র বর্ণনা করেছেন, পরে সপ্তম থেকে একাদশ শ্লোক পর্যন্ত নিজের অংশ-রূপ 'পরার' বর্ণনা করেছেন। পুনরায় দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শ্লোক পর্যন্ত নিজ প্রভাবের বর্ণনা করেছেন। সর্বশেষে অপরা, পরা এবং ঈশ্বর—এই তিনটির ক্ষর, অক্ষর এবং পুরুষোত্তম নামে বর্ণনা করে অধ্যায়ের উপসংহার করেছেন।

সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান অপরা ও পরা—দুটিকেই নিজ প্রকৃতি অর্থাৎ তাঁর থেকে অভিন্ন বলে জানিয়েছেন—**'ইতীয়ং মে'** (৭।৪), **'মে পরাম্'** (৭।৫)। কিন্তু পঞ্চদশ অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকে নিজেকে অপরার (ক্ষরের) অতীত এবং পরার (অক্ষরের) থেকে উত্তম বলেছেন। এর তাৎপর্য হল যে, সাধক যতক্ষণ অপরা (জগৎ-সংসার) এবং পরা (স্ব-স্বরূপ)—উভয়কে পৃথক্ বলে মনে করেন, ততক্ষণ ভগবান অপরার অতীত এবং পরা হতে উত্তম। কিন্তু যখন সাধকের দৃষ্টিতে অপরা এবং পরার

পৃথক অস্তিত্ব থাকে না, তখন অপরা, পরা এবং ভগবান—এই তিনই অভিন্ন—**'বাসুদেবঃ সর্বম্'** (৭।১৯), **'সদসচ্চাহম্'** (৯।১৯)।

পঞ্চদশ অধ্যায়ের মধ্যভাগে অক্ষরের (জীবাত্মার) বর্ণনার তাৎপর্য হল, জীবের একদিকে ক্ষর (জগৎ সংসার) এবং অন্যদিকে পুরুষোত্তমের (পরমাত্মার) অবস্থান। জীবের সম্পর্ক পরমাত্মারই সঙ্গে—**'মমৈবাংশো জীবলোকে'**, কারণ পরমাত্মা যেরূপ চেতন, অবিনাশী এবং অপরিবর্তনশীল সেইরূপই জীবও চেতন, অবিনাশী এবং অপরিবর্তনশীল। জগতের সঙ্গে শুধুমাত্র শরীরেরই সম্পর্ক—**'মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি'** ; কারণ জগৎ সংসার যেমন জড়, বিনাশশীল এবং পরিবর্তনশীল, তেমনই শরীরও জড়, বিনাশশীল এবং পরিবর্তনশীল। জীবকে পরমাত্মা হতে কখনো পৃথক্ করা সম্ভব নয় এবং শরীরকে জগৎ-সংসার হতে কখনো আলাদা করা যায় না।

পরমাত্মা তাঁকেই বলা হয়, যিনি বর্তমানেও রয়েছেন, সর্বত্র আছেন, সবার জন্য আছেন, সর্বসমর্থ, পরমদয়ালু এবং অদ্বিতীয়। তিনি সদাই বর্তমান তাই তাঁকে প্রাপ্ত করার জন্য ভবিষ্যতের আশায় থাকতে হয় না। সর্বত্র রয়েছেন, তাই তিনি আমার নিজের মধ্যেও অবস্থিত, অতএব তাঁকে খোঁজার জন্য অন্য কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন নেই। সবার জন্য হওয়ায় তিনি আমারও, সুতরাং তাঁর প্রতি স্বাভাবিকভাবেই প্রেম জাগ্রত হবে। সর্বসমর্থ হওয়ায় আমাদের ভীতসন্ত্রস্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই। পরমদয়ালু বলে আমাদের নিরাশ হতে হয় না। অদ্বিতীয় হওয়ায় আমাদের তাঁকে চেনাবার বা তাঁর বর্ণনা করার প্রয়োজন থাকে না।

পরমাত্মার প্রাপ্তি না হওয়ার কারণ হল এই যে আমরা তাঁর অস্তিত্ব এবং মহিমা অস্বীকার করি এবং তাঁকে আপন বলে মানি না। আমরা যদি তাঁর অস্তিত্ব, মহিমা এবং আপন ভাবকে স্বীকার করি তাহলে তিনি আর আমাদের কাছে অপ্রাপ্ত বলে মনে হন না। তিনি স্বাভাবিকভাবে আমাদের প্রিয় হবেন ; কারণ পরমাত্মাকে আপন বলে মানা ব্যতীত প্রেম-প্রাপ্তির আর কোনোই উপায় নেই। প্রেম, যজ্ঞ, দান, তপ, তীর্থ, ব্রত ইত্যাদি মহা মহা পুণ্যকর্মের দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায় না ; বরং ভগবানকে একান্ত আপনজন বলে মানলেই তাঁকে লাভ করা যায়। ভগবান বলেছেন—**'মমৈবাংশো জীবলোকে'** (১৫।৭)। এর তাৎপর্য হল জীব শুধু ভগবানেরই অংশ, তাতে অন্য কিছুই মিশ্রিত নেই। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে একমাত্র ভগবানেরই অংশ হওয়ায় আমাদের অটুট সম্বন্ধ রয়েছে কেবল ভগবানেরই সঙ্গে। আমরা যখন ভগবানেরই অংশ তখন প্রকৃতির কার্য এই শরীর আমাদের আপন হতে পারে না। সুতরাং ভগবানই প্রিয় পরম, অন্য কেউই নয়। ভগবানেরই অংশ হওয়ায় আমরা ভগবানের থেকে পৃথক্ হতে পারি না এবং তাঁকে ত্যাগ করতেও অক্ষম। সর্বসমর্থ ভগবানও জীবের থেকে পৃথক্ হতে পারেন না, তাকে ত্যাগ করতে অসমর্থ। ভগবান যদি জীবকে পরিত্যাগ করেন, তাহলে জীব এক নতুন ভগবান হয়ে উঠবে অর্থাৎ ভগবান তখন এক থাকবেন না, বহু হয়ে যাবেন, যা কখনো সম্ভব নয়। যাঁকে আমরা ত্যাগ করতে পারি না, তাঁর বিষয়ে এ প্রশ্নই অভিপ্রেত নয় যে তিনি কেমন ? সুতরাং এভাবে বিচার না করে তাঁকে ভালোবাসাই উচিত। মানুষ যখন জগৎ-সংসারের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ মেনে নেয় তখন সে আবদ্ধ হয়ে পড়ে আর যখন পরমাত্মার সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ মেনে নেয়, তখন সে মুক্ত হয়ে তাঁর ভক্ত হয়ে ওঠে। মানুষ সব থেকে বড় ভুল এই করে যে, যে শরীর জগৎ-সংসারের, তাকে আপন বলে মনে করে আর যা যথার্থই নিজস্ব, সেই পরমাত্মাকে ভুলে যায়। সাধক যখন এই সত্য উপলব্ধি করতে পারে যে এই শরীর আমার নয় এবং আমার জন্যও নয়, তখন তার দ্বারা স্বতঃই জগতের 'সেবা' হয়। যখন সে এই সত্য স্বীকার করে যে ভগবান আমার এবং আমার জন্য, তখন তার স্বতঃই ভগবানে 'প্রেম' জন্মে। সেবার বিনিময়ে সাধকের কিছুই প্রত্যাশা করা উচিত নয়, কারণ জগতের বস্তুই জগৎকে ফিরিয়ে দিলে নিজের কিছু ব্যয় হয় না, এতে নতুন কিছু করাও হয় না। প্রেমের বিনিময়েও তার কিছুই চাওয়ার থাকে না। কারণ যিনি চিরকালের আপনার, তার প্রতি ভালোবাসার চেয়ে শ্রেষ্ঠ এমন কিছুরই তার প্রয়োজন থাকতে পারে না। প্রভু একান্তই আমার, তাই নিজেকে তাঁর কাছে সমর্পণ করতে হয়, তাঁর কাছ থেকে নিতে নেই। তাঁর কাছ থেকে কিছু চাইলে আমরা তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে যাব আর নিজেকে তাঁকে দিলে, তাঁর সঙ্গে একাত্ম হব।

সেবার দ্বারা মুক্তি আর প্রেম দ্বারা পরাভক্তি লাভ হয়। মুক্তির দ্বারা নিরপেক্ষ (বন্ধনহীন) জীবন এবং ভক্তির দ্বারা সরস জীবন লাভ হয়।

❋ ❋ ❋

॥ ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

অথ ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

ষোড়শ অধ্যায়

অবতরণিকা

শ্রীভগবান সপ্তম অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে **'দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ মাং ন প্রপদ্যন্তে'**—(অশুভ কর্মকারী ও আসুরী প্রকৃতিসম্পন্ন মূঢ় ব্যক্তিগণ আমার ভজনা করে না) পদটির দ্বারা আসুরী-সম্পদসম্পন্ন এবং ষোড়শ শ্লোকে **'সুকৃতিনঃ মাং ভজন্তে'** (পুণ্যকর্মকারী ব্যক্তিগণ আমার ভজনা করেন) পদের দ্বারা দৈবী-সম্পদসম্পন্নদের সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। সপ্তম অধ্যায়ের শেষ দুটি শ্লোকের ওপরে অর্জুন অষ্টম অধ্যায়ের প্রারম্ভে সাতটি প্রশ্ন করেছেন। সেই প্রশ্নগুলির উত্তরে অষ্টম অধ্যায় সম্পূর্ণ হয়েছে।

ভগবান সপ্তম অধ্যায়ের যে বিজ্ঞানযুক্ত জ্ঞান বিষয়ে জানাতে অঙ্গীকার করেছিলেন, সেই বিজ্ঞানযুক্ত জ্ঞানের কথা জানাবার জন্য নবম অধ্যায় বলতে শুরু করেছিলেন। নবম অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকেও **'রাক্ষসীমাসুরীং চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ'** পদদ্বারা আসুরী-সম্পদযুক্ত এবং ত্রয়োদশ শ্লোকে **'দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ মাং ভজন্তে'** পদের দ্বারা দৈবী-সম্পদযুক্ত ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করে দশম অধ্যায়ের একাদশ শ্লোক পর্যন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়ে বলেছেন।

দশম অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকের পরে ভগবানের দৈবী ও আসুরী-সম্পদ সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা করা উচিত ছিল, কিন্তু ভগবানের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে অর্জুন ভগবানের স্তুতি করে পুনরায় তাঁর বিভূতি বলার জন্য প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। তাই বিভূতিগুলির বর্ণনা করে ভগবান দশম অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোকে অর্জুনকে বলেছিলেন যে, 'তোমার বেশি জানার দরকার কী ? আমি তো সমগ্র জগৎকে আমার মাত্র একাংশ দ্বারা ব্যাপ্ত করে আছি।' তখন সেই স্বরূপকে (যার একাংশে সমস্ত জগৎ অবস্থিত) দর্শন করতে উৎসুক অর্জুন, একাদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে ভগবানের কাছে তাঁর বিশ্বরূপ দেখাবার জন্য প্রার্থনা করেন।

অর্জুনকে তাঁর বিশ্বরূপ দেখাবার পর ভগবান একাদশ অধ্যায়ের চুয়ান্ন-পঞ্চান্নতম শ্লোকে অনন্যভক্তির মহিমা এবং তার স্বরূপ জানালেন। তারপর সগুণ এবং নির্গুণ উপাসকদের শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে অর্জুন দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে প্রশ্ন করেন। তাই ভগবান দ্বাদশ অধ্যায়ে সগুণ উপাসকের বর্ণনা করে ত্রয়োদশ অধ্যায় থেকে চতুর্দশ অধ্যায়ের বিংশতম শ্লোক পর্যন্ত নির্গুণ বিষয়ের বর্ণনা করেছেন। তারপর অর্জুন আবার চতুর্দশ অধ্যায়ের একুশতম শ্লোকে গুণাতীতের লক্ষণ, আচরণ এবং গুণাতীত হওয়ার উপায় জানতে চাইলেন। সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ভগবান ছাব্বিশতম শ্লোকে **'মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে'** পদের দ্বারা অব্যভিচারিণী ভক্তিকে গুণাতীত হওয়ার উপায় বলে জানিয়েছেন। অর্থাৎ অব্যভিচারী ভক্তি দ্বারা দৈবী-সম্পদ এবং ব্যভিচারী ভক্তির দ্বারা আসুরী-সম্পদের ইঙ্গিত করেছেন। সেই অব্যভিচারী ভক্তি কীভাবে লাভ হয়—তা জানাবার জন্যই পঞ্চদশ অধ্যায় আরম্ভ হয়েছে।

পঞ্চদশ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে ভগবান **'অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা'** পদের দ্বারা আসুরী-সম্পদের কারণরূপ 'সঙ্গ' (সাংসারিক আসক্তি) ত্যাগ করে অনাসক্তি থেকে প্রকটিত দৈবী-সম্পদের কথা বলেছেন। পরে চতুর্থ শ্লোকে **'তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে'** পদটির দ্বারা শরণাগতিরূপ দৈবী-সম্পদের বর্ণনা করেছেন এবং অর্থান্তরে যারা শরণাগত হন না, সেই আসুরী-সম্পদযুক্তদের ইঙ্গিত দিয়েছেন। এরপর উনিশতম শ্লোকে **'স সর্ববিদ্ ভজতি মাং সর্বভাবেন'** ... **'অসম্মূঢ়ঃ মাং সর্বভাবেন ভজতি'** পদটির দ্বারা দৈবী-সম্পদযুক্ত ব্যক্তিদের অর্থাৎ অধিকারীদের বর্ণনা করেছেন এবং অর্থান্তরে যারা

ভগবানের ভজনা করে না সেই আসুরী-সম্পদযুক্ত অর্থাৎ অনধিকারীদের কথা বর্ণনা করেছেন।

এইভাবে অর্জুনের নানাবিধ প্রশ্নের জন্য ভগবান এ পর্যন্ত দৈবী এবং আসুরী-সম্পদের ওপর বিস্তারিত আলোচনা করার অবকাশ পাননি। এখন অর্জুনের আর কোনো প্রশ্ন না থাকায় ভগবান এই ষোড়শ অধ্যায়ে দৈবী এবং আসুরী সম্পদ নিয়ে সবিস্তারে বর্ণনা শুরু করেছেন।

শ্রীভগবানুবাচ

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্॥ ১ ॥

[অভয়ম্ (সর্বতোভাবে নির্ভয়তা) ; **সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ** (চিত্তশুদ্ধি) ; **জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ** (জ্ঞানের জন্য যোগে দৃঢ় নিষ্ঠা) ; **চ, দানম্** (এবং সাত্ত্বিক দান) ; **দমঃ, যজ্ঞঃ** (ইন্দ্রিয়াদির সংযম, যজ্ঞ) ; **স্বাধ্যায়ঃ, তপঃ** (স্বাধ্যায়, কর্তব্যপালনের জন্য কষ্ট স্বীকার) ; **চ, আর্জবম্** (ও কায়মনোবাক্যে সরলতা।)]

শ্রীভগবান বললেন—সর্বতোভাবে নির্ভয়তা, সম্পূর্ণ চিত্তশুদ্ধি, জ্ঞানের জন্য যোগে দৃঢ়ভাবে অবস্থান বা নিষ্ঠা, সাত্ত্বিক দান, ইন্দ্রিয়াদির সংযম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায় (সৎ-শাস্ত্রাদির পঠন-পাঠন), কর্তব্য পালনের জন্য কষ্ট স্বীকার, কায়মনোবাক্যে সরলতা॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা—[পঞ্চদশ অধ্যায়ের উনিশতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে 'যারা আমাকে পুরুষোত্তম বলে জানে, তারা সর্বভাবে আমারই ভজনা করে অর্থাৎ আমার অনন্যভক্ত হয়।' এইভাবে একমাত্র ভগবানই উদ্দেশ্য হওয়ায় সাধকের মধ্যে দৈবী-সম্পদ স্বাভাবিকভাবেই প্রকটিত হতে থাকে। তাই ভগবান প্রথম তিনটি শ্লোকে ক্রমান্বয়ে ভাব, আচরণ এবং প্রভাবের কথা নিয়ে দৈবী-সম্পদের বর্ণনা করেছেন।]

'অভয়ম্'[১]—অনিষ্টের আশঙ্কায় মানুষের অন্তরে যে উদ্বেগ জন্মায়, তাকে ভয় বলা হয়। বিন্দুমাত্র এই ভয় না থাকাকেই বলা হয় 'অভয়'।

ভয় দুপ্রকারের হয়—(১) বাহ্যিক আর (২) অভ্যন্তরীণ।

১) বাহ্যিক ভয়—

(ক) চোর, ডাকাত, বাঘ, সাপ ইত্যাদি থেকে যে ভয় উৎপন্ন হয়, সেগুলি হল বাহ্যিক ভয়। শরীরনাশের আশঙ্কা থেকেই এই ভয় উৎপন্ন হয়। কিন্তু যখন মানুষ বুঝতে পারে যে এই শরীর বিনাশশীল এবং এর মৃত্যু হবেই, তখন আর ভয় থাকে না।

বিড়ি, সিগারেট, আফিম, গাঁজা, মদ প্রভৃতি মাদকদ্রব্য ছাড়বার এবং এতে আসক্তসম্পন্ন বন্ধুদের বন্ধুত্ব ভেঙে যাওয়ার যে ভয়, তা মানুষের নিজের কাপুরুষতা থেকেই হয়ে থাকে। কাপুরুষতা দূর হলে সেই ভয় আর থাকে না।

(খ) নিজ বর্ণ, আশ্রম ইত্যাদি অনুসারে কর্তব্য পালনকালে যেন ভগবদাদেশ-বিরুদ্ধ কোনো কাজ না হয় ; আমাদের বিদ্যা প্রদানকারী, সুশিক্ষাদানকারী আচার্য, গুরু, সাধু-মহাত্মা, মাতা-পিতার ও গুরুজনদের বাক্যের অবহেলা না করে ফেলি ; আমাদের দ্বারা শাস্ত্র এবং কুল-মর্যাদার বিরুদ্ধ কোনো আচরণ যেন না হয়ে যায়—এইপ্রকার ভীতিকেও বাহ্যিক ভয় বলা হয়। কিন্তু এগুলি প্রকৃতপক্ষে কোনো ভয় নয়, এগুলি আসলে অভয় সৃষ্টিকারী ভয়। সাধকের জীবনে এরূপ ভয় থাকাই উচিত, এরূপ ভয় থাকলেই সাধক নিজ পথে ঠিকভাবে চলতে সক্ষম হয়। এ সম্বন্ধে বলাও হয়েছে যে—

[১]এখানে দৈবী-সম্পদের মধ্যে সর্বপ্রথমে 'অভয়ম্' পদটি ব্যবহারের তাৎপর্য হল এই যে, যে ব্যক্তি ভগবানের শরণাগত হয়ে সর্বতোভাবে ভগবানের ভজনা করেন, তিনি সর্বত্র অভয় হয়ে থাকেন। ভগবান শ্রীরাম বলেছেন—

সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে। অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম॥ (বাল্মীকি রামায়ণ ৬।১৮।৩৩)

হরি-ডর, গুরু-ডর, জগৎ-ডর, ডর করনী মেঁ সার।
রজ্জব ডর্‌য়া সো উবর্‌য়া গাফিল খায়ী মার॥

২) অভ্যন্তরীণ (অন্তর থেকে উৎপন্ন হওয়া) ভয়—

ক) মানুষ যখন পাপ, অন্যায়, অত্যাচার ইত্যাদি নিষিদ্ধ আচরণ করতে চায়, তখন (পাপকাজ করার চিন্তা মনে উদয় হলেই) চিত্তে ভয় উৎপন্ন হয়। মানুষ তখনই নিষিদ্ধ কর্ম করে, যখন তার মনে 'আমার শরীর বজায় থাক, আমার মান-সম্মান বৃদ্ধি পেতে থাক, আমার জাগতিক ভোগ্যপদার্থ প্রাপ্তি ঘটুক', এইরূপ জাগতিক জড় বস্তু প্রাপ্তি এবং তা রক্ষার উদ্দেশ্য থাকে[১]। কিন্তু যখন মানুষের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় চিন্ময় তত্ত্ব লাভ করা[২] তখন তাঁর দ্বারা অন্যায়, দুরাচার ত্যাজ্য হয়ে যায় এবং তিনি সর্বতোভাবে ভয়হীন হয়ে যান। কারণ তাঁর লক্ষ্য পরমাত্মতত্ত্বে কখনো ন্যূনতা হয় না এবং তা নষ্টও হয় না।

খ) মানুষের যখন আচরণ ঠিক থাকে না এবং সে অন্যায়, অত্যাচার ইত্যাদি কর্মে ব্যাপৃত হয়, তখন তার ভয় হয়। যেমন ; রাবণকে মানুষ, দেবতা, যক্ষ, রাক্ষস ইত্যাদি সকলেই ভয় পেতো, কিন্তু সেই রাবণই যখন সীতা হরণ করে, তখন সে-ই সকলকে ভয় করতে থাকে। তেমন-ই যখন কৌরবপক্ষের একাদশ অক্ষৌহিণী সেনার বাদ্য বেজে উঠল, তাতে পাণ্ডব সৈন্যদলের ওপর তার কোনো প্রভাবই পড়েনি (গীতা ১।১৩)। কিন্তু যখন পাণ্ডবদের সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনার বাদ্য বেজে উঠল, তখন কৌরব সৈন্যদলের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেল (১।১৯)। তাৎপর্য হল এই যে অন্যায়, অত্যাচার-কারীদের চিত্ত দুর্বল হয়ে থাকে, সেইজন্য তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়। যখন মানুষ অন্যায় পরিত্যাগ করে নিজ শুদ্ধ আচরণ এবং শুদ্ধভাব নিয়ে থাকে, তখন তার ভয় দূর হয়।

গ) মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হয়ে এই জীব যতক্ষণ পর্যন্ত কর্তব্য কর্ম না করে, জানার উপযুক্তকে না জানে, প্রকৃত প্রাপ্তব্যকে লাভ না করে, ততক্ষণ সে সর্বতোভাবে ভয়হীন হতে পারে না, তার জীবনে ভয় থাকেই।

ভগবদ্‌ভিমুখী সাধক ভগবানে যেমন যেমন বিশ্বাস করতে থাকেন এবং তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করেন, তেমন-তেমনই তিনি ভয়হীন হতে থাকেন। তাঁর মধ্যে স্বতঃই এই চিন্তার উদয় হয় যে, আমি তো পরমাত্মার অংশ ; সুতরাং কখনো বিনাশপ্রাপ্ত হবার নয়, তাহলে ভয় কিসের ?[৩] আর জাগতিক অংশ শরীর ইত্যাদি সমস্ত পদার্থ প্রতিমুহূর্তে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তাহলে ভয় কিসের ? স্পষ্ট রূপে এরূপ বিবেক জাগ্রত হলে ভয় স্বতঃই দূর হয় এবং সাধক সর্বতোভাবে ভয়হীন হয়ে যান।

ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলে, ভগবানকেই নিজের বলে মানলে শরীর, আত্মীয়-স্বজন ইত্যাদির ওপর কোনো মমত্ববোধ থাকে না। মমত্ববোধ না থাকলে ভয় থাকে না এবং সাধক ভয়হীন হন।

'সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ'—চিত্তের সম্যক্ শুদ্ধিকে বলা হয় সত্ত্বসংশুদ্ধি। সম্যক্ শুদ্ধি কাকে বলে ? সংসারে আসক্তিরহিত হয়ে ভগবানে অনুরাগ জন্মানোই হল চিত্তের সম্যক্ বুদ্ধি। যখন কারও চিন্তা, ভাব, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য শুধু একমাত্র পরমাত্মাকে প্রাপ্তি করা হয়, তখন তাঁর চিত্ত শুদ্ধ হয়ে ওঠে। কারণ বিনাশশীল বস্তু প্রাপ্ত করার উদ্দেশ্য হলে চিত্তে মল, বিক্ষেপ এবং আবরণ—এই তিন প্রকারের

---

[১]ভোগে রোগভয়ং কুলে চ্যুতিভয়ং বিত্তে নৃপালাদ্ ভয়ং মানে দৈন্যভয়ং বলে রিপুভয়ং রূপে জরায়া ভয়ম্।
শাস্ত্রে বাদভয়ং গুণে খলভয়ং কার্যে কৃতান্তাদ্ ভয়ং সর্বং বস্তু ভয়াবহং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্॥
(ভর্তৃহরিবৈরাগ্যশতক)

'ভোগে রোগের ভয়, উচ্চ কুলে পতনের ভয়, ধনে রাজভয়, মানে দৈন্যভয়, বলে শত্রুভয়, রূপে বৃদ্ধাবস্থার ভয়, শাস্ত্রে বাদ-বিবাদের ভয়, গুণে দুর্জনের ভয় এবং দেহে মৃত্যুভয়। এইরূপ জগতে মানুষের কাছে সব কিছুই ভয়াবহ, একমাত্র বৈরাগ্যই হল ভয়রহিত।'

তাৎপর্য হল এই যে, মানুষের মনে সর্বদাই ভয় থাকে পাছে তার জাগতিক বস্তুসমূহ নষ্ট হয়ে যায়—তাই তারা অভয় (ভয়হীন) হতে পারে না।

[২]উদ্দেশ্য তো আগেই তৈরি হয়েছে, তারপরে আমরা এই মনুষ্যদেহ লাভ করেছি। তাই উদ্দেশ্যকে কেবল চিনে নিতে হয়, তৈরি করতে হয় না।

[৩]রাম মরে তো মৈঁ মরুঁ, নহিঁ তো মরে বলায়। অবিনাশী কা বালকা, মরে ন মারা জায়॥

দোষ আসে। শাস্ত্রাদিতে মলদোষ দূর করার জন্য নিষ্কামভাবে কর্ম (সেবা), বিক্ষেপদোষ দূরীকরণের জন্য উপাসনা আর আবরণ-দোষ দূর করার জন্য জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। তা সত্ত্বেও চিত্তশুদ্ধির সব থেকে বড় উপায় হল—চিত্তকে নিজের বলে মনে না করা।

সাধকের পুরানো পাপ অপনোদনের (দূর করার) জন্য বা কোনো পরিস্থিতির বশীভূত হয়ে করা নতুন পাপ দূর করার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করার তেমন কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। এক্ষেত্রে তিনি যে সাধনায় ব্যাপৃত, সেটিই উৎসাহ এবং তৎপরতার সঙ্গে তার করে যাওয়া উচিত। তাহলেই তাঁর জানা-অজানা সমস্ত পাপ দূরীভূত হবে এবং তাঁর চিত্ত স্বতঃই শুদ্ধ হবে।

সাধকের মনে অনেক সময় এমন ভাবনার উদ্রেক হয় যে, সাধন-ভজন করা একটি পৃথক্ কাজ আর ব্যবসায় বা সংসারের কাজ অপর একটি পৃথক্ কাজ অর্থাৎ এই দুটি বিষয়ই ভিন্ন। তাই ব্যবসায় ইত্যাদিতে মিথ্যাচার ইত্যাদি তো একটু করতেই হয়—এরূপ মনোভাবকে যে প্রশ্রয় দেওয়া হয় তাতে চিত্ত খুবই অশুদ্ধ হয়। সাধনের সঙ্গে সঙ্গে যে অসাধন হয়, এতে সাধনার উন্নতি বিঘ্নিত হয়। তাই সাধকের সর্বদা সাবধান থাকতে হয় যেন এরূপ নতুন পাপ কখনো না হয়—এই সতর্কতা সদা-সর্বদা বজায় রাখা উচিত।

সাধক ভ্রমবশতঃ পূর্বকৃত দুষ্কর্ম অনুসারে নিজেকে দোষী বলে মনে করে, আর তার যে ক্ষতি করে, সেই ব্যক্তিকেও দোষী বলে মনে করে ; এতে তার চিত্ত অশুদ্ধ হয়। এই অশুদ্ধি দূর করার জন্য সাধকের উচিত হল ভ্রমবশতঃ করা দুষ্কর্মগুলির পুনরাবৃত্তি না করা এবং তার যে ক্ষতি করেছে তাকে অযাচিতভাবে ক্ষমা করে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা, 'হে প্রভু ! আমার যা কিছু খারাপ হয়েছে, তা সবই আমার দুষ্কর্মের ফল। এই ব্যক্তি এতে নিমিত্তমাত্র হয়েছে। ওর এতে কোনো দোষ নেই, তুমি ওকে ক্ষমা করো।' এরূপ চিন্তায় চিত্ত শুদ্ধ হয়।

'জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ'—জ্ঞানের জন্য যোগে স্থিত হওয়া অর্থাৎ পরমাত্মতত্ত্বের যে জ্ঞান (বোধ) হয়, তা সগুণেরই হোক বা নির্গুণের, সেই জ্ঞানলাভের জন্য যোগে স্থিত হওয়া আবশ্যক। যোগের অর্থ হল—জাগতিক পদার্থের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিতে, মান-অপমানে, নিন্দা-স্তুতিতে, সুস্থতা-অসুস্থতায় সম থাকা অর্থাৎ চিত্তে হর্ষ-শোকাদি উৎপন্ন না হয়ে নির্বিকারভাবে থাকা।

'দানম্'—লোকদৃষ্টিতে যে বস্তুগুলি নিজের বলে মনে করা হয়, সেই বস্তুগুলিকে সৎপাত্রে এবং দেশ-কাল-পরিস্থিতি ইত্যাদি বিচার করে প্রয়োজনানুসারে অপরকে বিতরণ করাকে 'দান' বলা হয়। দান কয়েক প্রকারের হয় ; যেমন—ভূমিদান, গোদান, স্বর্ণদান, অন্নদান, বস্ত্রদান ইত্যাদি। এর মধ্যে অন্নদান প্রধান। কিন্তু তার থেকেও অভয়দান শ্রেষ্ঠ[১]। এই অভয়দানের দুটি ভাগ হয়—

(১) সাংসারিক বিপদ থেকে, বিঘ্ন থেকে, পরিস্থিতি থেকে ভীত ব্যক্তিদের নিজ শক্তি, সামর্থ্য অনুযায়ী সাহস প্রদান করা, আশ্বাস দেওয়া, সাহায্য করা। এই অভয় প্রদান তার শরীরাদির জাগতিক পদার্থগুলি নিয়েই হয়।

(২) সংসারে আবদ্ধ ব্যক্তিদের জন্ম-মরণ চক্ররহিত করার জন্য ভগবদ্‌কথা শোনানো[২], গীতা, রামায়ণ, ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থ এবং তার ভাবগুলি সরল ভাষাতে প্রকাশ করে সুলভ মূল্যে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার

---

[১]ন গোপ্রদানং ন মহীপ্রদানং ন চান্নদানং হি তথা প্রধানম্। যথা বদন্তীহ বুধাঃ প্রধানং সর্বপ্রদানেষ্বভয়প্রদানম্॥

(পঞ্চতন্ত্র, মিত্রভেদ ৩১৩)

'গোদান, ভূমিদান বা অন্নদানও তত মহত্ত্বপূর্ণ নয়, অভয়দান যত মহত্ত্বপূর্ণ। বিদ্বান ব্যক্তিগণ অভয় দানকেই সব দানের থেকে শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করে থাকেন।'

[২]তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্। শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩১।৯)

'হে প্রভু ! সংসারে যেসব শোকসন্তপ্ত প্রাণী আছে, আপনার কথামৃত তাদের জীবন প্রদানকারী, শান্তিদানকারী, মহাপুরুষগণও তা আন্তরিকভাবে বর্ণনা করেন। আপনার কথামৃত সমস্ত পাপ অর্থাৎ ভগবদ্‌বিমুখতা নাশকারী, শ্রবণমাত্রই মঙ্গলকারী হয়, সন্ত-মহাপুরুষগণ এবিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। এই কথামৃতকে যিনি পৃথিবীতে কথন করেন, তিনি মহাদাতা অর্থাৎ তিনি জগতের সব থেকে বেশি উপকার ও হিত করে থাকেন।'

করা অথবা কেউ ভাগবৎ-কথা বুঝতে চাইলে তাকে বোঝানো, যাতে তার কল্যাণ হয়, এরূপ দানে ভগবান অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন (গীতা ১৮।৬৮-৬৯)। কারণ ভগবান সর্বত্র পরিপূর্ণ। তাই যত বেশি জীবের কল্যাণ হয়, ততই তিনি প্রসন্ন হন। এই হল সর্বশ্রেষ্ঠ অভয়দান। এর মধ্যেও ভগবদ্‌সম্বন্ধীয় কথা অন্যকে শোনাবার সময় সাধক বক্তার সতর্ক থাকা উচিত যাতে অন্যের থেকে নিজের মধ্যে তিনি কোনো বৈশিষ্ট্য না দেখেন, বরং তিনি যেন এটি ভগবদ্‌কৃপা বলে মনে করেন যে ভগবানই শ্রোতার রূপ ধারণ করে তাঁর সময় সার্থক করে তুলেছেন।

যতপ্রকার দানের কথা ওপরে বলা হয়েছে, তাতে সাধক যেন নিজের সম্বন্ধ না মানেন। বরং, এরূপ মনে করেন যে তাঁর কাছে যে বস্তু, সামর্থ্য, যোগ্যতা আছে, ভগবানই অন্যের সেবার নিমিত্ত করে তাঁকে দিয়েছেন। সুতরাং ভগবানের প্রীত্যর্থে প্রয়োজন অনুসারে যাকে যা কিছু দেওয়া হয়, সেগুলি তাঁরই মনে করে তাঁকে দেওয়াই হল 'দান'।

'দমঃ'—ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্পূর্ণভাবে বশীভূত করাকে বলা হয় **'দমঃ'**। তাৎপর্য হল এই যে ইন্দ্রিয়াদি, চিত্ত এবং শরীর দ্বারা কোনো প্রবৃত্তিই শাস্ত্রনিষিদ্ধ হওয়া উচিত নয়। শাস্ত্রবিহিত প্রবৃত্তিও নিজ স্বার্থ এবং অহংবোধ পরিত্যাগ করে অপরের হিতার্থে হওয়া উচিত। এইভাবে করলে প্রবৃত্তির দ্বারা ইন্দ্রিয় লালসা, আসক্তি এবং পরাধীনতা থাকে না এবং শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির ব্যবহার শুদ্ধ ও নির্মল হয়।

সাধকের উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয় দমন করা হলে অকর্তব্যে তাঁর প্রবৃত্তি হয় না এবং কর্তব্যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয়, তবে তাতে স্বার্থ, অহংবোধ, আসক্তি, কামনা ইত্যাদি দোষ থাকে না। যদি কখনো কোনো কাজে স্বার্থভাব এসেও যায়, তাহলে তিনি সেটি দমন করে থাকেন, যাতে অশুদ্ধি দূর হয় এবং শুদ্ধতা আসে এবং পরে তাঁর দম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-সংযম সিদ্ধ হয়।

'যজ্ঞঃ'—'যজ্ঞে'র অর্থ আহুতি প্রদান করা। অতএব নিজ বর্ণাশ্রম অনুসারে হোম, বলিবৈশ্বদেব (অন্ন-আহুতি) ইত্যাদি করাকে বলা হয় 'যজ্ঞ'। তা ছাড়াও গীতার মতে নিজ বর্ণ, আশ্রম, পরিস্থিতি ইত্যাদি অনুসারে বিভিন্ন সময়ে যে কর্তব্য প্রাপ্ত হয়, স্বার্থ এবং অভিমান ত্যাগ করে অপরের হিত চিন্তায় বা ভগবদ্‌প্রীত্যর্থে সেগুলি সম্পাদন করাকেও বলা হয় 'যজ্ঞ'। এতদ্‌ব্যতিরেকে জীবিকা-সম্বন্ধীয় কর্ম, চাষ-বাস ইত্যাদি এবং জীবন ধারণের পক্ষে উপযুক্ত পান-ভোজন, চলা-ফেরা, শোওয়া-জাগা, আদান-প্রদান করা ইত্যাদি সমস্ত কর্ম ঈশ্বরের প্রসন্নতার জন্য করা হলে সেগুলিকেও যজ্ঞ বলা হয়। তেমনই মাতা-পিতা, আচার্য, গুরুজন প্রভৃতির নির্দেশ পালন করা, তাঁদের সেবা করা, তাঁদের কায়মনোবাক্যে এবং অর্থ দ্বারা সুখী করে তাঁদের প্রসন্নতা লাভ করা এবং গো-ব্রাহ্মণ-দেবতা-পরমাত্মার পূজা ও সৎকার করা—এ সবই হল 'যজ্ঞ'।

'স্বাধ্যায়ঃ'—নিজ লক্ষ্য প্রাপ্তির জন্য ভগবদ্‌নাম জপ এবং গীতা, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদির পঠন-পাঠনকে বলা হয় 'স্বাধ্যায়'। প্রকৃতপক্ষে **'স্বস্য অধ্যায়ঃ (অধ্যয়নম্) স্বাধ্যায়ঃ'** এই অনুযায়ী নিজ বৃত্তির, নিজ স্থিতিকে ঠিকমতো অধ্যয়ন করাকেই বলা হয় 'স্বাধ্যায়'। এতেও সাধকের তাঁর বৃত্তি অনুসারে স্ব-স্থিতির পরীক্ষা না করা এবং নিজেকে বৃত্তির অধীন মানা উচিত নয়। কারণ বৃত্তিগুলি আসে ও যায়, পরিবর্তিত হতে থাকে। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে তাহলে আমি কি নিজের বৃত্তি শুদ্ধ করব না ? বস্তুতঃ সাধকদের কর্তব্যই হওয়া উচিত এইসব বৃত্তিগুলি শুদ্ধ করা। কিন্তু চিত্ত এবং বৃত্তিগুলিকে নিজের বলে মনে না করলে সেই শুদ্ধি খুব শীঘ্রই হয়ে যায় ; কারণ সেগুলি নিজের বলে মনে করাই হল প্রকৃত অশুদ্ধি। সাক্ষাৎ পরমাত্মার অংশ হওয়ায় স্বরূপ কখনো অশুদ্ধ হয় না। শুধু বৃত্তিগুলি অশুদ্ধ হওয়াতেই তত্ত্ব অনুভূত হয় না।

'তপঃ'—ক্ষুৎ-পিপাসা, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা ইত্যাদি সহ্য করাও একপ্রকারের তপস্যা, কিন্তু এই তপস্যায় ক্ষুৎ-পিপাসা প্রভৃতিকে জেনেশুনে সহ্য করা হয়। প্রকৃতপক্ষে সাধনকালে বা জীবিকা নির্বাহের সময় দেশ-কাল-পরিস্থিতি ইত্যাদিতে যে কষ্ট, বিঘ্ন, ঝঞ্ঝাট ইত্যাদি

আসে, সেগুলি প্রসন্নতা সহকারে সহ্য করাই হল 'তপ'[১]। কারণ এই তপস্যায় পূর্বকৃত পাপ নাশ হয় এবং সাধকের সহ্য করার এক নতুন শক্তি, নতুন বল আসে।

সাধকের সতর্ক থাকা উচিত যাতে তিনি সেই তপোবল অপরকে বর প্রদানে, অভিশাপ দানে বা অনিষ্ট করায় বা নিজ ইচ্ছাপূর্তির জন্য প্রয়োগ না করেন, বরং তাঁর সাধনায় যে বাধা-বিপত্তি আসে প্রসন্নতা সহকারে তাতে সহ্যশক্তি বৃদ্ধির কাজে সেটির প্রয়োগ করেন।

সাধক যখন সাধনা করেন সেই সময় তিনি নানা প্রকার বিঘ্ন অনুভব করে থাকেন। তিনি মনে করেন যদি নির্জন স্থান পাই তাহলে সাধনা ভালো হয়, পরিবেশ যদি ভালো হয় তবে সাধনা করতে পারি ইত্যাদি। এইসব অনুকূল অবস্থার কামনা না করা অর্থাৎ তার অধীন না হওয়াও তপস্যা। সাধকের কোনো সাধন পরিস্থিতির অধীন হওয়া উচিত নয়, বরং পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজ সাধনার সামঞ্জস্য করে নেওয়া উচিত। সাধকের চেষ্টা থাকা উচিত নির্জনে সাধনা করার, কিন্তু নির্জন স্থান না পেলে প্রাপ্ত অবস্থাকে ভগবানেরই ইচ্ছা মনে করে উৎসাহ ও প্রসন্নতা সহকারে সেই অবস্থাতেই সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।

'আর্জবম্'—সহজ, সরলতাকে বলা হয় **'আর্জবম্'**। এই সরলতা সাধকের এক বিশেষ গুণ। সাধক যদি মনে করেন যে অন্য লোকে আমাকে যেন ভালো মনে করে, আমার ব্যবহার যদি ভালো না হয় তাহলে লোকে আমাকে ভালো চোখে দেখবে না, তাই আমাকে সরল ব্যবহার করতে হবে—এও একপ্রকারের দম্ভ। এভাবেও সাধকদের মধ্যে দম্ভ এসে পড়ে, কিন্তু সাধকদের সোজা (অকপট), সরলভাব রাখা উচিত। সহজ, সরল হলে লোকে তাকে মূর্খ, বোকা মনে করলেও তার কোনো ক্ষতি হয় না। নিজ উদ্ধার প্রাপ্তির জন্য সরলতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়—

কপট গাঁঠ মন মেঁ নহীঁ, সবসোঁ সরল সুভাব।
'নারায়ন' তা ভক্ত কী, লগী কিনারে নাব॥

সেইজন্য সাধকের কায়মনোবাক্যে লোকের সঙ্গে ব্যবহারে কোনোপ্রকার ছল, কাপট্য রাখা উচিত নয়[২]। তার মধ্যে স্বাভাবিক সহজতা যেন থাকে।

*** *** ***

অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেস্বলোলুপ্ত্বং মার্দবং হ্রীরচাপলম্॥ ২ ॥

[**অহিংসা** (অহিংসা) ; **সত্যম্** (সত্যভাষণ) ; **অক্রোধঃ** (ক্রোধনহীনতা) ; **ত্যাগঃ** (সাংসারিক কামনাত্যাগ) ; **শান্তিঃ** (চিত্তে রাগ-দ্বেষ জনিত চাঞ্চল্য না হওয়া) ; **অপৈশুনম্** (পরনিন্দাবর্জন) ; **ভূতেষু, দয়া** (জীবে দয়া) ; **অলোলুপ্ত্বম্** (সাংসারিক পদার্থে লোভহীনতা) ; **মার্দবম্, হ্রীঃ** (চিত্তের কোমলভাব, কুকর্মে লজ্জা) ; **অচাপলম্** (চাপল্যের অভাব।)]

অহিংসা (পরপীড়াবর্জন), সত্যভাষণ, ক্রোধহীনতা, সংসারের কামনা-ত্যাগ, চিত্তে রাগ-দ্বেষজনিত চাঞ্চল্য না হওয়া, পরনিন্দা-বর্জন, জীবে দয়া, সাংসারিক পদার্থে লোভহীনতা, অন্তঃকরণের (চিত্তের) কোমলভাব, কু-কর্মে লজ্জা, চাপল্যের অভাব॥ ২ ॥

---

[১]আগতে স্বাগতং কুর্যাদ্ গচ্ছন্তং ন নিবারয়েৎ। যথাপ্রাপ্তং সহেৎসর্বং সা তপস্যোত্তমোত্তমা॥ **(বোধসার)**

'প্রারব্ধবশতঃ পরিস্থিতিরূপে যা কিছু আসে, তাকে স্বাগত করা উচিত, যা যায় তাতে বাধা প্রদান করা উচিত নয় এবং যেটি যেমনভাবে ঘটে, তাকে তেমনভাবেই সহ্য করতে হয়, এই হল অতি উত্তম তপস্যা'।

[২]মনস্যেকং বচস্যেকং কর্মণ্যেকং মহাত্মনাম্। মনস্যন্যদ্ বচস্যন্যৎ কর্মণ্যন্যদ্ দুরাত্মনাম্॥

মহাত্মাদের মন, বাক্য এবং কর্ম—তিনটিতে সামঞ্জস্য থাকে ; কিন্তু দুরাত্মাদের মন, বাক্য এবং কর্ম—তিনটি ভিন্ন রকমের হয়ে থাকে।

ব্যাখ্যা—**'অহিংসা'**—কায়মনোবাক্যে কারও কোনোপ্রকার অনিষ্ট না করা বা অনিষ্ট না চাওয়াকে 'অহিংসা' বলা হয়। বাস্তবে সর্বতোভাবে অহিংসা তাকেই বলে, যখন মানুষ জগতের থেকে বিমুখ হয়ে পরমাত্মার শরণাগত হয়, তখন তার দ্বারা স্বতঃই অহিংসা পালন করা হয়। কিন্তু যারা আসক্তি সহকারে, ভোগবুদ্ধির দ্বারা ভোগবিলাস করতে থাকে, তারা কখনো সম্পূর্ণভাবে অহিংসক হতে পারে না। তারা নিজের পতন তো করেই উপরন্তু যেগুলিকে ভোগ করে সেগুলিও নষ্ট করে থাকে।

যারা জগতের সীমিত পদার্থগুলিকে ব্যক্তিগত (নিজের) না হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিগত বলেই মনে করে সুখবুদ্ধিতে ভোগ করে, তারা হিংসাই করে থাকে। কারণ সমষ্টিগত জগৎ-সংসারের সেবার জন্য প্রাপ্ত পদার্থ, বস্তু, ইত্যাদির মধ্যে কোনো কিছুই নিজের ব্যক্তিগত ভোগের পদার্থ বলে মনে করাও একপ্রকারের হিংসা। মানুষ যদি ওইসব পদার্থকে জগৎ-সংসারের বলে মনে করে মমত্ববোধ ত্যাগ করে সংসারের সেবাতেই নিয়োগ করে তাহলে সে হিংসা থেকে বাঁচতে পারে এবং অহিংসক হয়ে ওঠে।

যারা সুখ ও ভোগবুদ্ধিতে এইসব ভোগবিলাস করে থাকে, তাদের দেখে যারা এইসব ভোগ্যপদার্থ পায় না—সেইসব অভাবী ব্যক্তিরা দুঃখিত ও সন্তপ্ত হয়ে থাকে। এইগুলিও একপ্রকারের হিংসা। কারণ ভোগী ব্যক্তিদের স্বার্থপরতা এবং আত্মসুখবুদ্ধি থাকে এবং অপরের দুঃখের তারা পরোয়া করে না। কিন্তু যাঁরা সাধু-মহাপুরুষ তাঁরা শুধুমাত্র অন্যের হিতের জন্যই জীবিকা-নির্বাহ করেন ; তাঁদের দেখে যদি কেউ দুঃখিত বা সন্তপ্ত হয়, তাহলেও তাঁদের দ্বারা হিংসা হয় না। কারণ তাঁরা ভোগ-বুদ্ধি সহকারে জীবিকা নির্বাহ করেন না—**'শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্'** (গীতা ৪।২১)।

যাঁরা ভগবদ্মুখী হন তাঁদের দ্বারা হিংসা হয় না। কারণ তাঁরা ভোগবুদ্ধি সহকারে পদার্থাদি ভোগ করেন না। পরমাত্মার অভিমুখী সাধকগণ কায়মনোবাক্যে কখনো কাউকে দুঃখ দেন না। যদি তাঁদের বাহ্যক্রিয়ায় কেউ দুঃখিত হয়, তবে সে দুঃখ সেই ব্যক্তি নিজ স্বভাবদোষেই পেয়ে থাকে। সাধকের অন্তরে কখনো কাউকে বিন্দুমাত্র দুঃখ দেবার ইচ্ছা না থাকা উচিত। তাঁর ভাব সবসময় সকলের হিত করার জন্য হওয়া উচিত—**'সর্বভূতহিতে রতাঃ'**।

সাধকের সাধনায় যদি কেউ বাধাপ্রদান করে, তাহলে তাঁর সেই ব্যক্তির ওপর ক্রোধ জন্মায় না বা তার অহিত করার ভাব মনে আসে না। পরমাত্মার দিকে অগ্রসর হওয়ায় বাধা পড়লে তিনি দুঃখ পেতে পারেন কিন্তু সেই দুঃখ সাংসারিক দুঃখের মতো হয় না। বাধাপ্রাপ্ত হলে সাধক তখন ভগবানের কাছেই কেঁদে বলেন, 'হে প্রভু ! আমার কী ভুল হয়েছে যে এত বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে !' এইরকম চিন্তা করে তাঁর চোখে জল আসতে পারে, কিন্তু বাধাপ্রদানকারীর প্রতি তাঁর ক্রোধ বা হিংসা আসতে পারে না। বাধাপ্রাপ্ত হলে সাধকের তৎপরতা এবং সাবধানতা আসে। যদি তাতে বাধাপ্রদানকারীর প্রতি ক্রোধের উন্মেষ হয়, তাহলে যতটা অংশে দোষ-বৃত্তি থাকে, ততটা অংশে তৎপরতার ঘাটতি থাকে এবং নিজ সাধনের জেদ থাকে।

সাধকদের মধ্যে একটি হল তৎপরতা এবং অপরটি হল আগ্রহ। তৎপরতায় সাধনার রুচি আর আগ্রহে সাধনায় আসক্তি থাকে। রুচি হলে সাধনায় কোন্ কোন্ স্থানে ঘাটতি আছে, তার জ্ঞান হয় এবং সেটি দূর করার সামর্থ্য আসে এবং তা দূর করার চেষ্টাও হয়ে থাকে। কিন্তু আসক্তি হলে সাধনায় বিঘ্নপ্রদানকারীদের সঙ্গে দ্বেষ্যভাব হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় সাধনায় আমাদের রুচি কম থাকাতেই অন্যেরা আমাদের সাধনায় বাধাপ্রদান করে। যদি সাধনায় আমাদের রুচি কম না হয়, তাহলে কেউ আমাদের বাধা দিতে পারে না, বরং তারা তখন একথাই ভাববে যে এতো কোনো কথা শুনবে না, তাই যা চায়, করতে দাও।

ফুল থেকে যেমন স্বতঃই সুগন্ধ ছড়ায়, সাধক হতেও তেমনই পারমার্থিক পরমাণু স্বতঃই ছড়িয়ে পড়ে বায়ুমণ্ডল পবিত্র হয়। এতে স্বভাবতঃই প্রাণীকুলের অত্যন্ত হিত হয়। কিন্তু যারা নিজ দুর্গুণ-দুরাচার দ্বারা পরিবেশকে অশুদ্ধ করতে থাকে তারা প্রাণীদের হিংসা করার অপরাধে অভিযুক্ত হয়।

'সত্যম্'—নিজ স্বার্থ এবং অহংবোধ পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র অন্যের হিতার্থে যেমন যেমন দেখা, শোনা, পড়া বা বোঝা যায়, তার বেশি বা কম না করে—ঠিক সেগুলিই প্রিয় বাক্যে বলাকে বলা হয় **'সত্যম্'**।

সত্যস্বরূপ পরমাত্মাকে লাভ করা এবং জানাই একমাত্র উদ্দেশ্য হলে সাধকের দ্বারা মন, বাক্য এবং ক্রিয়াতে অসত্য ব্যবহার হওয়া সম্ভবই নয়। তাঁর দ্বারা শুধু সত্য

ব্যবহার এবং সকলের হিতের জন্য কাজ হয়ে থাকে। যিনি সত্যকে জানতে চান, তিনি সত্যের সম্মুখীনই হয়ে থাকেন। তাই তাঁর কায়মনোবাক্যের দ্বারা যে সমস্ত ক্রিয়া হয়, তা সমস্তই উৎসাহ সহকারে সত্যের পথে চলার জন্যই হয়।

'অক্রোধঃ'—অন্যের অনিষ্ট করার জন্য চিত্তে যে জ্বালা বোধ হয়, তাকে বলা হয় 'ক্রোধ'। কিন্তু যদি তাতে অন্যের অনিষ্ট-ভাবনা না থাকে, তাহলে সেটিকে 'ক্ষোভ' বলা হয়, ক্রোধ নয়।

যেসব সাধক পরমাত্মপ্রাপ্তির জন্য সাধনা করেন তাঁদের অপকারকারীরও কোনো ক্ষতি তাঁরা করেন না। তাঁরা ভালো করেই জানেন যে অনিষ্টকারী ব্যক্তিরা প্রকৃতপক্ষে আমাদের কোনো অনিষ্টই করতে পারে না। এরা আমাদের যে দুঃখ দিচ্ছে তা আমাদের পূর্বকৃত কোনো পাপেরই ফল। সুতরাং এরা আমাদের পরিশুদ্ধ করছে, নির্মল করে তুলছে। যেমন, চিকিৎসক যদি কারও রুগ্ন অঙ্গ কেটে বাদ দেন, তাহলে রোগী তাঁর ওপর ক্রোধ প্রকাশ না করে চিকিৎসকের সিদ্ধান্তই সঠিক বলে মেনে নেয় কেন-না সেই পচনশীল অঙ্গ কেটে বাদ দেওয়াই প্রয়োজনীয় চিকিৎসা। তেমনই সাধকদের অহিত চিন্তায় যদি কেউ কোনোপ্রকার দুঃখ প্রদান করে, তাহলে তাঁদের মনেও এই ভাবনার উদ্রেক হয় যে এরা তো আমাকে শুদ্ধ, নির্মল করাতে নিমিত্তমাত্র হয়েছে, এদের ওপর রাগ কীসের ? এরা আমার উপকারই করছে এবং ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করে দিচ্ছে যাতে আর কোনো ভুল আমার দ্বারা না হয়।

যাঁরা সাধকদের হিতকারী, সাধকদের সেবা করেন, তাঁরা সাধকদের সুখ প্রদান করে সাধকদের পুণ্য নাশ করেন। কিন্তু পুণ্য নাশ করলেও সাধকগণ তাঁদের ওপর ক্রোধ প্রকাশ করেন না। সাধক তখন চিন্তা করেন যে এঁরা যে আমার সেবা করছেন, আমার অনুকূল আচরণ করছেন, এগুলি তাঁদের সততা, উদারতা । পুণ্য নাশ তখনই হতে পারে যখন এঁদের সেবা থেকে সুখভোগ করা হয়। এইভাবে সাধকদের দৃষ্টি সেবাকারীদের গুণ, শুদ্ধ ব্যবহারের দিকে যায়। তাই সাধকদের দুঃখ প্রদানকারীর ওপরেও ক্রোধ হয় না বা সুখ প্রদানকারীর ওপরেও ক্রোধ হয় না।

'ত্যাগঃ'—জগৎ-সংসার থেকে বিমুখ হওয়াই হল প্রকৃত ত্যাগ। সাধকের জীবনে আভ্যন্তরীণ ত্যাগ ও বাহ্যিক ত্যাগ—দুই-ই থাকা উচিত। যেমন বাইরে থেকে অন্যায়, অত্যাচার, দুরাচার ইত্যাদি বাহ্যিক সুখ-আরাম ইত্যাদিও ত্যাগ করা উচিত ও অন্তর থেকে জাগতিক বিনাশশীল বস্তুর কামনাও ত্যাগ করা উচিত। এ দুটির মধ্যে বাহ্যিক ত্যাগের থেকে অভ্যন্তরীণ কামনা ত্যাগই শ্রেষ্ঠ। কামনা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করলে শীঘ্র শান্তি লাভ হয়— **'ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্'** (গীতা ১২।১২)।

সাধকদের পক্ষে উৎপন্ন ও বিনাশশীল বস্তুর কামনাই সব থেকে বেশি বাধা হয়ে থাকে। সুতরাং কামনা সর্বতোভাবে ত্যাগ করা উচিত। ত্যাগ কখন হয় ? যখন সাধকের উদ্দেশ্য হয় একমাত্র পরমাত্মাকে লাভ করা, তখনই তাঁর কামনা ধীরে ধীরে অপসারিত হয়। কারণ সাংসারিক ভোগ বা সংগ্রহ সাধকের উদ্দেশ্য হয় না। সুতরাং তিনি ওইসব কামনা পরিত্যাগ করে নিজ সাধনায় অগ্রসর হতে থাকেন।

'শান্তিঃ'—চিত্তে রাগ-দ্বেষজনিত চাঞ্চল্য না হওয়াকে বলা হয় 'শান্তি'। কারণ সংসারে রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ থাকলেই অশান্তি আসে। সেগুলি না থাকলে চিত্ত স্বাভাবিকভাবে শান্ত, প্রসন্ন থাকে।

অনুকূল অবস্থায় পুরাতন পুণ্য নাশ হয় এবং তাতে নিজ স্বভাব শুধরানোর চেয়ে খারাপ হবারই বেশি সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু প্রতিকূল অবস্থায় পাপ নাশ হয় এবং স্বভাবও শুধরে যায়। এই কথা জানা থাকলে প্রতিকূল অবস্থা এলেও মনে শান্তি থাকে।

কোনো পরিস্থিতিতে সাধকের মধ্যে যদি রাগ-দ্বেষ উৎপন্ন হয় এবং মনে অশান্তির উদ্রেক হয় তাহলে তাঁর তৎক্ষণাৎ সতর্ক হয়ে চিন্তা করা কর্তব্য যে রাগদ্বেষপূর্বক কোনো কর্ম করা আমার উদ্দেশ্য নয়। এইভাবে চিন্তা করলে শান্তি ফিরে আসে এবং যথাসময়ে স্থিরতা লাভ হয়।

'অপৈশুনম্'—কারও কোনো দোষ অপরের নিকট প্রকাশ করে অন্যের মনে তার প্রতি দুর্ভাব উৎপন্ন করাকে 'পিশুনতা' বা ক্রূরতা বলা হয়, এটি না থাকাই হল 'অপৈশুন'। যে সাধকের উদ্দেশ্য থাকে পরমাত্মাপ্রাপ্তি করা, তিনি কখনো কারোর সম্বন্ধে কুৎসা রটনা করেন না। তাঁর সাধনা যেমন উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে, তেমনই তাঁর দোষদৃষ্টি এবং দ্বেষপ্রবৃত্তি নিবৃত্ত হয়ে অপরের প্রতি স্বতঃই ভালোবাসা জন্মায়। তাঁর মনে এই চিন্তা আসে না যে আমি সাধক আর এরা (সাধন-ভজন না-করা) সাধারণ মানুষ, বরং নিজের সাধনায় তাঁর নিজের অবস্থিতি সম্বন্ধে

যেমন (জড়ত্বের সঙ্গে সম্পর্ক না-থাকা) অনুভব হয়, তেমনই অপরের স্থিতি সম্পর্কেও ধারণা হয় যে প্রকৃতপক্ষে তাদেরও জড়ত্বের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, শুধু মেনে নেওয়া সম্পর্ক। এইরূপ, তাঁর দৃষ্টিতে যখন কারোরই জড়ত্বের সঙ্গে সম্পর্ক নেই বলে প্রতিভাত হয়, তখন তিনি অপরের দোষ কেন দেখবেন, কেনই বা নিন্দা করবেন ?

ভক্তিমার্গের সাধকগণ সর্বত্র তাঁদের প্রভুকে দর্শন করে থাকেন, জ্ঞানমার্গের সাধকগণ দেখেন শুধু নিজ-স্বরূপ আর কর্মযোগের সাধকগণ নিজ সেব্যকে দর্শন করে থাকেন। অতএব সাধকগণ কারও ক্ষতি, নিন্দা বা কুৎসা কী করে করবেন ?

'দয়া ভূতেষু'—অন্যের দুঃখ দেখে তা দূর করার চিন্তাকে বলা হয় 'দয়া'। ভগবানের, সন্ত-মহাত্মাদের, সাধকদের এবং সাধারণ মানুষদের দয়ার প্রকার পৃথক্ পৃথক্ হয়ে থাকে—

(১) **ভগবানের দয়া**—প্রত্যেককে শুদ্ধ করার জন্য ভগবানের দয়া কাজ করে। ভক্তেরা এই দয়ার দুটি ভাগ আছে বলে মনে করেন—কৃপা এবং দয়া। মনুষ্যমাত্রকে পাপ থেকে শুদ্ধ করার জন্য তার মনের প্রতিকূল পরিস্থিতির উদ্ভব করাকে বলা হয় 'কৃপা' এবং অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি করাকে বলা হয় 'দয়া'।

(২) **সন্ত-মহাত্মাদের দয়া**—সন্ত-মহাত্মাগণ অপরের দুঃখে দুঃখী এবং সুখে সুখী হয়ে থাকেন—**'পর দুখ দুখ সুখ সুখ দেখে পর'**(শ্রীরামচরিতমানস ৭।৩৮।১)। তাঁদের অন্তরে অপরের দুঃখে দুঃখ হয় না এবং নিজের দুঃখেও দুঃখ হয় না, কেন-না পরমাত্ম-তত্ত্বে সুখও নেই, দুঃখও নেই। যেমন, সমুদ্রে ঢেউ দেখা যায় কিন্তু সমুদ্রের ভিতরে ঢেউ নেই। ভিতর অংশে সমুদ্র শান্ত থাকে। তেমনই ব্যবহারিক জীবনে সাধুমহাপুরুষগণ দুঃখী বলে প্রতীত হন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁদের ভিতর সুখও নেই, দুঃখও নেই। তাৎপর্য এই যে, বাস্তবে তাঁরা দুঃখী হন না কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের দ্বারা অপরের দুঃখ দূর করার চেষ্টা হয়ে থাকে। নিজের উপরে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতি এলে তিনি সেটিকে ভগবানের কৃপা বলে গ্রহণ করেন, কিন্তু অন্য কেউ দুঃখ পেলে, তিনি সেই দুঃখ নিজে গ্রহণ করে তাকে সুখী করার চেষ্টা করে থাকেন। যেমন, ইন্দ্র ক্রোধান্বিত হয়ে বিনা অপরাধে দধীচি ঋষির মাথা কেটে নিয়েছিলেন, কিন্তু ইন্দ্র যখন তাঁর নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য ঋষির অস্থি চাইলেন, ঋষি দধীচি তখন সানন্দে তাঁর অস্থি প্রদান করার জন্য প্রাণত্যাগ করলেন । সন্ত-মহাত্মাগণ এইরূপ অন্যের দুঃখ সহ্য করতে পারেন না, বরং তাদের সুখী করার জন্য নিজ সুখ, সামগ্রী এমনকি প্রাণ পর্যন্ত অর্পণ করেন, তা অন্যে তাঁদের যতই অপকার করুক না কেন![1] তাই সন্ত-মহাত্মাদের দয়া বিশেষ শুদ্ধ ও নির্মল হয়ে থাকে!

(৩) **সাধকদের দয়া**—সাধকগণ মনে মনে অপরের দুঃখ দূর করার কথা চিন্তা করেন এবং তা দূর করার চেষ্টা করেন। অন্যের দুঃখে তাঁদের হৃদয় দ্রবীভূত হয়। কারণ তাঁরা অপরের দুঃখকে নিজের দুঃখের মতোই মনে করেন। তাই তাঁদের মনে হয় সকলে কী করে সুখী হবে ? কী করে সকলের হিত হবে ? সকলে কী করে উদ্ধার লাভ করবে ? এরূপ অপরের হিতসাধনে রত থাকলেও 'আমি সকলের হিতসাধন করি, সকলের হিতের জন্য চেষ্টা করি'— তাঁদের মনে এইরূপ অহংবোধ থাকে না। কারণ সকলের মঙ্গল করার এক সহজ ইচ্ছা থাকায় তাঁরা তাঁদের এই আচরণে কোনো বিশেষত্ব বোধ করেন না। তাই তাঁদের মধ্যে কোনো অহংবোধ থাকে না।

যে প্রাণীরা ভগবানের শরণাগত হয় না, দুর্গুণ-দুরাচারে ব্যস্ত থাকে, অপরাধ করে, আর এভাবে নিজেদের পতন ঘটায়—সেইসব প্রাণীদের ওপর সাধকদের ক্রোধ না হয়ে দয়া আসে। তাই তাঁরা চেষ্টা করেন এইসব প্রাণী কী করে এই পাপ-কাজ হতে বিরত হবে! কী করে এদের ভালো হয়। কখনো কখনো তাঁরা নিজেদের একান্ত শক্তিহীন মনে করে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে থাকেন যে, 'হে প্রভু ! এরা যেন এই দোষগুলি হতে মুক্ত হয়ে আপনার শরণ নেয়।'

(৪) **সাধারণ মানুষদের দয়া**—সাধারণ মানুষের দয়ায়

[1]কর্ণস্ত্বচং শিবির্মাংসং জীবং জীমূতবাহনঃ। দদৌ দধীচিরস্থীনি নাস্ত্যদেয়ং মহাত্মনাম্।।
কর্ণ তাঁর ত্বক, শিবি দেহের মাংস, দধীচি তাঁর অস্থি দিয়েছিলেন। মেঘ নিজ জীবন দান করে দেয়। মহাত্মাদের পক্ষে (পরহিতের জন্য) কিছুই অদেয় নয়।

কিছুটা মালিন্য থাকে। তারা কারও হিতের চেষ্টা করলে, মনে করে 'আমি কত দয়ালু ! আমি একে সুখী করেছি, আমি কত মহান ! সব লোক আমার মতো দয়ালু নয়, কেউ কেউ হতে পারে', লোক আমাকে মহৎ বলে মনে করবে, আমাকে সম্মান করবে ইত্যাদি ভাব নিয়ে নিজেদের মধ্যে মহত্ত্ববুদ্ধি আরোপ করে যে দয়া করা হয়, তাতে দয়ার অংশটি ভালো হলেও, তার সঙ্গে উপরিউক্ত অহম্-মালিন্য থাকায় সেই দয়াতে অশুদ্ধি এসে যায়।

এদের থেকেও সাধারণ শ্রেণীর মানুষ দয়া তো করেন কিন্তু তা কেবলমাত্র ব্যক্তিদের ওপর মমত্ব থেকে হয়ে থাকে। যেমন, এরা আমাদের পরিবারের লোক, আমাদের মতামত, সিদ্ধান্ত মেনে চলে, এই মমত্ববশতঃ তাদের দুঃখ দূর করার ইচ্ছায় তাদের সুখ ও আরাম দেওয়ার চেষ্টা করে থাকে। এই দয়া মমত্ব ও পক্ষপাতযুক্ত হওয়ায় অত্যন্ত অশুদ্ধ।

এর থেকেও নিম্নশ্রেণীর মানুষেরা কেবলমাত্র নিজ সুখ এবং স্বার্থের জন্য অপরের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে।

'আলোলুপ্ত্বম্'—ইন্দ্রিয়াদির বিষয়াদিতে সম্পর্ক হওয়ায় অথবা অন্যকে ভোগবিলাস করতে দেখলে মনে (ভোগ করার জন্য) লালসার উদ্রেক হওয়াকে বলা হয় 'লোলুপতা' এবং তার সর্বতোভাবে অবিদ্যমানতাকে বলা হয় **'অলোলুপ্ত্ব'**।

অলোলুপতার উপায়—(১) সাধকদের পক্ষে বিশেষ সতর্কতার কথা হল এই যে তাঁরা যেন নিজ ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে ভোগের কোনো সম্পর্ক না রাখেন এবং মনে কখনো এমন ভাব বা অহংভাব না আনেন যে ইন্দ্রিয়াদির ওপর আমাদের অধিকার আছে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলি আমাদের বশীভূত । এতে আমাদের কী ক্ষতি হবে ?

(২) 'আমি হৃদয় দিয়ে পরমাত্মার প্রাপ্তিলাভ করতে চাই, যদি কখনো বিষয়-লালসা হৃদয়ে উদ্রেক হয়, তাহলে আমার পতন হবে এবং আমি পরমাত্মাতে বিমুখ হয়ে পড়ব'—সাধকদের এইভাবে খুব সাবধান থাকতে হয়, আর যদি কখনো হঠাৎ বিচলিত হবার কারণ ঘটে তখন 'হে প্রভু রক্ষা করো ! রক্ষা করো !' বলে আন্তরিকভাবে ভগবানকে ডাকতে হয়।

(৩) নারী-পুরুষ বা জন্তু-জানোয়ারদের রতিদৃশ্য না দেখা। যদি চোখে পড়ে তাহলে চিন্তা করতে হয় যে 'এসব চুরাশী লক্ষ জন্মের পথ, এটি মানুষ-পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ সবার মধ্যেই বিদ্যমান, কিন্তু আমি এই চুরাশী লক্ষ জন্মের ঊর্ধ্বে উঠতে চাই, জন্ম-মৃত্যু চক্রের বাইরে যেতে চাই, আমি সে-পথের পথিক নই। আমাকে জন্ম-মৃত্যুর দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে পরমাত্মার প্রাপ্তিলাভ করতে হবে।' এই ভাবটি অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে সজাগ রাখতে হয় এবং কোনো কাম-দৃশ্য যাতে চোখে না পড়ে সেদিকে সতর্ক থাকতে হয়।

'মার্দবম্'—যারা বিনা কারণে দুঃখ দেয় এবং শত্রুতা করে, তাদের প্রতিও চিত্তে কঠোর ভাব না-রাখা এবং স্বাভাবিক কোমল ব্যবহার করাকে বলা হয় **'মার্দব'**[১]।

সাধকের চিত্তে সকলের প্রতি সহৃদয় ভাব থাকে। তাঁর প্রতি কেউ যদি কঠোর এবং অহিত ব্যবহারও করে, তাহলেও তাঁর সহৃদয়তা কমে না। সাধক যদি কখনো কাউকে কঠোর জবাব দেন, তাহলে সেই কঠোর জবাবটি তার হিতের জন্যই দিয়ে থাকেন। কিন্তু পরে তাঁর মনে এমন চিন্তা হয় যে আমি কেন তার প্রতি এত কঠোর ব্যবহার করলাম ? আমি তো ভালোবেসে বা অন্য কোনোভাবে ওকে বোঝাতে পারতাম—এইপ্রকার ভাব এলে ক্রমে তার কঠোরভাব দূর হতে থাকে এবং হৃদয়ের কোমল-ভাব বৃদ্ধি পায়।

যদিও সাধকদের ভাবে এবং বাক্যে কোমলভাব থাকেই, তা সত্ত্বেও ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ হওয়ায় সকলের বাক্যে একরকম কোমলতা থাকে না। কিন্তু তাঁদের হৃদয়ে সবার প্রতি কোমল ভাব থাকে। সেইরূপই কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ ইত্যাদির সাধকদের স্বভাবে পার্থক্য থাকায় তাঁদের ব্যবহারও সকলের প্রতি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে । তবে তাঁদের আচরণে এক প্রকারের কোমলভাব দেখা না গেলেও চিত্তে অত্যন্ত কোমলতা থাকে।

'হ্রীঃ'—শাস্ত্র এবং লোকমর্যাদার বিরুদ্ধে কাজ করলে হৃদয়ে যে দ্বিধা আসে, তাকে বলা হয় **'হ্রীঃ'** (লজ্জা)। সাধকের সাধনা-বিরুদ্ধ কাজ করায় লোকলজ্জা থাকে। সেই লজ্জা শুধুমাত্র লোক দেখানো নয়, বরং তাঁর মনে

---

[১]শরীরের প্রাধান্য নিয়ে 'আর্জব' এবং চিত্তের প্রাধান্য নিয়ে 'মার্দব' বলা হয়—এই হল উভয়ের মধ্যে পার্থক্য।

আপনা থেকেই এই চিন্তার উদয় হয় যে, 'হে ভগবন্! আমি এই কাজ কী করে করলাম ? কারণ আমি তো পরমাত্মার শরণাগত সাধক, লোকেও আমাকে তাই জানে। আমি এরূপ সাধন-বিরুদ্ধ কাজ একান্তে বা লোকেদের সামনে কী করে করতে পারি ?'— এই লজ্জার জন্য সাধক মন্দ কাজ থেকে রক্ষা পান ও তাঁর আচরণ সংশোধিত হতে থাকে। সাধক যখন তাঁর আমি সেবক, আমি জিজ্ঞাসু, আমি ভক্ত এই অহংভাব পরিবর্তন করেন তখন তাঁর নিজ অহং-এর বিরুদ্ধ কাজ করতে স্বতঃই লজ্জা আসে। সেইজন্য পারমার্থিক উদ্দেশ্যরক্ষাকারী প্রত্যেক সাধকেরই নিজ নিজ অহংবোধের 'আমি সাধক, আমি সেবক, আমি জিজ্ঞাসু, আমি ভগবদ্‌ভক্ত'—এইভাব যথারুচি পরিবর্তন করে নেওয়া উচিত, যাতে তিনি সাধন-বিরুদ্ধ কর্ম থেকে রক্ষা পান এবং নিজ উদ্দেশ্যে শীঘ্র সিদ্ধিলাভ করেন।

'অচাপলম্'—কোনো কার্য করার সময় চাঞ্চল্য না থাকা বা চপলতার অভাবকে বলা হয় **'অচাপলম্'**। চাঞ্চল্য থাকলে কাজ যে শীঘ্র হয়, তা নয়। সাত্ত্বিক ব্যক্তি সমস্ত কাজই ধৈর্য সহকারে করেন ; তাই তাঁর সব কাজই সুচারুভাবে, যথাসময়ে হয়। কাজটি যখন ঠিকমতো হয়, তখন তাঁর চিত্তে চাঞ্চল্য বা চিন্তা থাকে না। চাঞ্চল্য না থাকায় কর্মে দীর্ঘসূত্রতার দোষও থাকে না। বরং তৎপরতা বৃদ্ধি পায়, যার ফলে সমস্ত কাজই সুচারুরূপে হয়। নিজ কর্তব্য-কর্ম করা ছাড়া অন্য কোনো কিছুর আগ্রহ না থাকায় তাঁর চিত্ত বিক্ষিপ্ত বা চঞ্চল হয় না (গীতা ১৮।২৬)।

※ ※ ※

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত॥ ৩ ॥

[তেজঃ (তেজস্বিতা) ; ক্ষমা, ধৃতিঃ (ক্ষমা, ধৈর্য) ; শৌচম্ (শারীরিক শুদ্ধি) ; অদ্রোহঃ, নাতিমানিতা (শত্রুভাব না-রাখা এবং নিরভিমানতা) ; ভারত (হে ভারত!) ; দৈবীম্, সম্পদম্, অভিজাতস্য, ভবন্তি (দৈবী-সম্পদ প্রাপ্ত মানুষের লক্ষণ।)]

তেজস্বিতা (প্রভাব), ক্ষমা, ধৈর্য, শারীরিক শুদ্ধি, শত্রুভাব না-রাখা এবং নিরভিমানতা, হে ভারত ! এই সমস্তই দৈবী-সম্পদপ্রাপ্ত মানুষের লক্ষণ॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা—**'তেজঃ'**—মহাপুরুষদের সংস্পর্শে এলে তাঁদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে সাধারণ মানুষও দুর্গুণ-দুরাচার পরিত্যাগ করে সদ্‌গুণ-সদাচারে ব্যাপৃত হয়। মহাপুরুষদের সেই শক্তিকেই এখানে 'তেজ' বলা হয়েছে। এইরূপে যদিও ক্রোধী ব্যক্তিদের সামনেও লোকে তাঁদের স্বভাবের বিরুদ্ধ কাজ করতে ভয় পায় ; কিন্তু এটি হল ক্রোধরূপ দোষের তেজ।

সাধকদের মধ্যে দৈবী-সম্পদ প্রকটিত হলে, তাই দেখে অন্য লোকেদের মধ্যেও সৌম্যভাব জাগরিত হয় অর্থাৎ তাঁদের সামনে অন্য ব্যক্তিরাও দুরাচরণ করতে শঙ্কিত হয়, ইতস্তত করে এবং সহজেই সদাচরণ করতে বাধ্য হয়। একেই বলা হয় দৈবী-সম্পদসম্পন্ন ব্যক্তিদের তেজ বা প্রভাব।

'ক্ষমা'—অকারণে যারা অপরাধ করে সেই অপরাধকারীদের শাস্তি দেবার সামর্থ্য থাকলেও তাদের অপরাধ সহ্য করা বা অগ্রাহ্য করাকে বলা হয় **'ক্ষমা'**[১]। এই ক্ষমা মায়া-মমতা, ভয় এবং স্বার্থভাবের থেকেও হতে পারে। যেমন, পুত্রের অপরাধ পিতা ক্ষমা করে থাকেন, কিন্তু এই ক্ষমা মোহ ও মমত্ববোধ থেকে হওয়ায়, এটি শুদ্ধ নয়। এইরূপ কোনো বলশালী এবং খল ব্যক্তি

[১]ক্ষমা এবং অক্রোধের মধ্যে পার্থক্য কী ? ক্ষমায় যে অপরাধ করেছে, তার ওপর বিশেষভাবে দৃষ্টি থাকে, যাতে তার কখনো কোনো শাস্তি না হয় আর অক্রোধে নিজের ওপর দৃষ্টি থাকে যাতে আমার ক্রোধ না হয়, অন্তরে কোনো জ্বালা বা চাঞ্চল্য না আসে। যদিও অক্রোধ ক্ষমারই অন্তর্গত, তা সত্ত্বেও ক্ষমাশীল বললে তাকে আর ক্রোধরহিত বলার প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু ক্রোধরহিত বললেও ইনি ক্ষমাশীল একথা বলার প্রয়োজন থাকে। সুতরাং এই গুণ (ক্ষমা এবং অক্রোধ) দুটি পৃথক। অর্থাৎ ক্ষমা এবং অক্রোধ—এদুটি পৃথক গুণ।

আমাদের কোনো ক্ষতি করলে আমরা ভয়বশতঃ তাকে কিছু বলি না, ভয়ের জন্যই এই ক্ষমা হয়ে থাকে। সঞ্চিত অর্থসম্পদের পরিমাণ দেখতে ইনকাম-ট্যাক্সের লোক আসে, নানাপ্রকার কটুকথা বলে থাকে, আমাদের তা খারাপ লাগলেও, ক্ষতি হবার ভয়ে আমরা তাদের কিছু বলি না, এই ক্ষমা আমাদের নিজেদের স্বার্থেই হয়ে থাকে। কিন্তু এগুলি প্রকৃত ক্ষমা নয়। বাস্তবিক ক্ষমা হল সেটিই যাতে 'আমাদের অনিষ্টকারীর ইহজন্মে অথবা পরজন্মে কোথাও শাস্তি না হয়'—এই ভাব থাকে।

ক্ষমা প্রার্থনা করা দুপ্রকারে হয়—

(১) আমি কারও ক্ষতি করেছি, সেই শাস্তি যাতে আমার না হয়—এই ভয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়, কিন্তু এতে স্বার্থভাব থাকায় এটি উচ্চশ্রেণীর ক্ষমা নয়।

(২) আমাদ্বারা কারও অনিষ্ট সাধন হয়েছে, পরে আর কখনো এরূপ কাজ করব না—এইভাবে যে ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়, সেটি নিজেকে শোধরাবার জন্য হওয়ায় তাতে মানুষের উন্নতি হয়।

হৃদয়ে ক্ষমার ভাব আনতে চাইলে কী করা কর্তব্য ? মানুষ যদি কারও থেকে কোনোপ্রকার সুখ আশা না করে এবং ক্ষতিসাধনকারীর মন্দ কামনা না করে, তাহলেই তার মধ্যে ক্ষমার ভাব প্রকটিত হয়।

'ধৃতিঃ'—কোনো অনুকূল-প্রতিকূল অবস্থায় বিচলিত না হয়ে স্থিতিতে অবিচল থাকার শক্তিকে বলে 'ধৃতিঃ' (ধৈর্য) (গীতা ১৮।৩৩)।

বৃত্তিগুলি সাত্ত্বিক হলে ধৈর্য ঠিক থাকে আর বৃত্তি যদি রাজসিক বা তামসিক হয়, তবে ধৈর্য ঠিক থাকে না। যেমন, বদ্রীনারায়ণের রাস্তায় চলতে গিয়ে পথিক কখনো গরম, চড়াই ইত্যাদি প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হন আবার কখনো ঠাণ্ডা, উৎরাই ইত্যাদি অনুকূল অবস্থাপ্রাপ্ত হন। কিন্তু পথিকের সেইসব অনুকূল-প্রতিকূল অবস্থা দেখে থেমে থাকা উচিত নয়, তাঁর 'আমাকে বদ্রীনারারণ পৌঁছাতেই হবে'—এই উদ্দেশ্য নিয়ে ধৈর্য এবং তৎপরতার সঙ্গে চলতে হয়। সাধকেরও তেমনই ভালো-মন্দ বৃত্তি এবং অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টি দেওয়াই উচিত নয়। তাঁর এইসবে ধৈর্যধারণ করতে হয় । কারণ যিনি নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চান, তিনি পথের সুখ ও দুঃখের দিকে দৃষ্টি দেন না—

মনস্বী কার্যার্থী ন গণয়তি দুঃখং ন চ সুখম্

(ভর্তৃহরিনীতিশতক)

'শৌচম্'—বাহ্য ও অন্তর শুদ্ধিকে বলা হয় **'শৌচ'**[১]। যেসব সাধক পরমাত্মপ্রাপ্তিকে উদ্দেশ্য করে থাকেন, তাঁরা বাহ্যশুদ্ধির দিকে দৃষ্টি রাখেন, কারণ বাহ্যশুদ্ধ হলে অন্তঃকরণের শুদ্ধি স্বতঃই হয়ে থাকে এবং অন্তঃকরণ শুদ্ধ হলে বাহ্য অশুদ্ধি তাঁদের থাকে না। এই বিষয়ে পতঞ্জলি বলেছেন—

শৌচাৎ স্বাঙ্গজুগুপ্সা পরৈরসংসর্গঃ। (যোগদর্শন ২।৪০)

'শৌচের দ্বারা সাধকদের নিজের শরীরে ঘৃণা অর্থাৎ অপবিত্র বুদ্ধি এবং অপরের সংসর্গ না করার ইচ্ছা জন্মায়।'

তাৎপর্য হল এই যে নিজ শরীর শুদ্ধ রাখলে দেহের অপবিত্রতা সম্পর্কে জ্ঞান হয়। দেহের অপবিত্রতা সম্পর্কে জ্ঞান হলে 'সমস্ত শরীর এইরূপ'—এই বোধ হয়। এই বোধ হলে অন্য দেহের প্রতি যে আকর্ষণ তা দূর হয় অর্থাৎ অন্যের দেহ থেকে সুখ আহরণের আকাঙ্ক্ষা দূর হয়।

বাহ্যশুদ্ধি চারপ্রকারে হয়ে থাকে—(১) শারীরিক, (২) বাচিক, (৩) কৌটুম্বিক এবং (৪) আর্থিক।

(১) **শারীরিক শুদ্ধি**—প্রমাদ, আলস্য, আরাম-আয়েস, স্বাদ-শৌখীনতা ইত্যাদির দ্বারা শরীর অশুদ্ধ হয়, পক্ষান্তরে সরলতা, তৎপরতা, পুরুষার্থ ও উদ্যমী হয়ে কর্ম করলে শরীর শুদ্ধ হয়। সেরূপ জল-মাটি ইত্যাদির দ্বারাও দেহ শুদ্ধ হয়।

(২) **বাচিক শুদ্ধি**—মিথ্যা কথা বলা, কটু ভাষা বলা, বৃথা বাক্য বলা, নিন্দা করা, কুৎসা করা ইত্যাদিতে বাণী অশুদ্ধ হয়। এই দোষরহিত হয়ে সত্য, প্রিয় এবং হিতকারক প্রয়োজনীয় বাক্য বলা (যাতে অপরের পারমার্থিক উন্নতি হয় এবং দেশ, গ্রাম, লোকালয়, পরিবার, আত্মীয় ইত্যাদির মঙ্গল হয়) এবং অনাবশ্যক বাক্য ব্যয় না-করা—একে বলা হয় বাচিক শুদ্ধি।

(৩) **কৌটুম্বিক শুদ্ধি**—নিজ সন্তানদের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য তাদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা ; আত্মীয়দের

[১]এইস্থানে 'শৌচম্' পদটির দ্বারা বাহ্যশুদ্ধিই ধরতে হবে। কারণ 'সত্ত্বসংশুদ্ধি' পদটির দ্বারা এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে অন্তঃশুদ্ধির কথা আগেই বলা হয়েছে।

আমাদের ওপর যে ন্যায়সঙ্গত অধিকার, নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী তা পূরণ করা, আত্মীয়দের মধ্যে কোনো পক্ষপাতিত্ব না করে সকলের হিতসাধন করাকে বলা হয় কৌটুম্বিক শুদ্ধি।

(৪) **আর্থিক শুদ্ধি**—ন্যায়সম্মতভাবে ও সততার সঙ্গে, অপরের হিত আচরণ করে যে ধন উপার্জন করা হয়, তা যথাসাধ্য অরক্ষিত, অভাবগ্রস্ত, দরিদ্র, রোগী, আকালপীড়িত, ক্ষুধার্ত ব্যক্তিদের দিলে এবং গো-ব্রাহ্মণ ও অসহায় মহিলাদের মঙ্গলের কাজে ব্যয় করলে দ্রব্যশুদ্ধি হয়।

ত্যাগী-বৈরাগী ও তপস্বী সাধু-মহাপুরুষদের সেবায় নিয়োগ করলে এবং সদ্‌গ্রন্থ সরল ভাষায় প্রকাশ করে অল্পমূল্যে দান করলে ও লোকেদের মধ্যে প্রচার করলে অর্থ মহাশুদ্ধ হয়।

পরমাত্মপ্রাপ্তিই উদ্দেশ্য হলে নিজের (স্বয়ং-এর) শুদ্ধি হয়। স্বয়ং শুদ্ধ হলে শরীর, বাক্য, আত্মীয়, অর্থ ইত্যাদি সবই শুদ্ধ এবং পবিত্র হতে থাকে। শরীরাদি শুদ্ধ হলে বাসস্থান, পরিবেশও শুদ্ধ হয়ে থাকে। বাহ্য-শুদ্ধি এবং পবিত্রতার দিকে দৃষ্টি রাখলে শরীরের বাস্তবিকতা অনুভবে আসে, যার ফলে দেহের অহং-মমত্ববোধ ত্যাগ করাতে সাহায্য হয়। এইভাবে এই সাধনও পরমাত্মপ্রাপ্তির পথে নিমিত্ত হয়।

'অদ্রোহঃ'—অকারণ অনিষ্টকারীর প্রতিও প্রতিশোধ না নেওয়ার ভাব যদি চিত্তে থাকে, তবে তাকে বলা হয় 'অদ্রোহঃ'[১]। কেউ যদি কোনো ব্যক্তির অনিষ্ট করে, তাহলে তার মনে এই হিংসার বীজ বপন করা হয় যে, সুযোগ পেলে আমি এর প্রতিশোধ নেব। কিন্তু যাঁদের পরমাত্মপ্রাপ্তির উদ্দেশ্য থাকে, সেই সাধকদের যতই অনিষ্ট করা হোক, তাঁদের মনে অনিষ্টকারীদের প্রতি প্রতিশোধ নেবার ভাব আসে না। কারণ কর্মযোগের সাধক সকলের হিতের জন্য কর্তব্য-কর্ম করে থাকেন, জ্ঞানযোগের সাধকরা সকলকেই নিজ স্বরূপ বলে মনে করেন এবং ভক্তিযোগের সাধকগণ সবার মধ্যে নিজ ইষ্ট ভগবানকে দর্শন করেন। সুতরাং তাঁরা কী করে কারও প্রতি দ্রোহভাব রাখতে পারেন ?

নিজ প্রভুময় দেখহিঁ জগৎ কেহি সন করহিঁ বিরোধ॥
(শ্রীরামচরিতমানস ৭।১১২খ)

'নাতিমানিতা'—এক হল 'মানিতা' অপরটি 'অতিমানিতা'। জনসাধারণের কাছ থেকে মান আশা করা হল 'মানিতা' এবং যাঁদের থেকে আমরা শিক্ষা লাভ করেছি, যাঁদের আদর্শ গ্রহণ করেছি এবং গ্রহণ করতে চাই, তাঁদের কাছ থেকেও মান, সম্মান, শ্রদ্ধা আশা করা হল 'অতিমানিতা'। এই 'মানিতা' এবং 'অতিমানিতা' না থাকাই হল 'নাতিমানিতা'।

স্থূল দৃষ্টিতে 'মানিতা'র দুটি ভাগ আছে—

(১) **সাংসারিক মানিতা**—অর্থ, বিদ্যা, গুণ, বুদ্ধি, যোগ্যতা, অধিকার, পদ, বর্ণ, আশ্রম ইত্যাদি নিয়ে অপরের থেকে নিজের এমন শ্রেষ্ঠতার ভাব হয়ে থাকে যে 'আমি মোটেই সাধারণ মানুষের মতো নই, কত লোক আমাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করে থাকে ! যারা সম্মান করে, তারা ঠিকই করে কারণ আমি সম্মাননীয় ব্যক্তি'—এইরূপ নিজের সম্বন্ধে যে ভাব, তাকে সাংসারিক মানিতা বলা হয়।

(২) **পারমার্থিক মানিতা**—সাধনার প্রারম্ভে যখন নিজের মধ্যে কিছু দৈবী-সম্পদ প্রকটিত হতে থাকে, তখন অপরের থেকে নিজের মধ্যে কিছু বিশেষ ভাব পরিলক্ষিত হয়। এই সময়ে কিছু ব্যক্তিও তাঁকে পরমাত্মার পথে যাত্রাকারী সাধক মনে করে তাঁকে বিশেষ সম্মান করেন এবং 'ইনি সাধন-ভজনকারী, বিশিষ্ট সজ্জনব্যক্তি' — বলে প্রশংসা করে থাকেন। এই প্রশংসার ফলে সাধকের মনে এক বিশেষ ভাবের উদয় হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই বিশেষত্ব দেখা দেয় সাধনার ন্যূনতা হলেই। এই বিশেষভাব দেখাও পারমার্থিক মানিতা।

যতক্ষণ নিজের ব্যক্তিত্ব (একদেশীয়তা, পরিচ্ছিন্নতা) থাকে, ততক্ষণ নিজেকে অন্যের থেকে বিশেষ বলে মনে হয়। এই ব্যক্তিত্ব (অহংভাব) যেমন যেমন দূর হতে থাকে, তেমন তেমনই সাধকের অন্যের থেকে নিজের বিশেষভাব দূর হয়ে যায়। শেষকালে এইসব মানিতা দূর হয়ে সাধকের মনে দেবী-সম্পদের গুণ 'নাতিমানিতা' প্রকটিত হয়।

---

[১]ক্রোধ এবং দ্রোহ—এই দুইয়ে পার্থক্য থাকে। নিজ অনিষ্টকারীর প্রতি তৎক্ষণাৎ যে জ্বালার সৃষ্টি হয়, তাকে বলে 'ক্রোধ', আর যেটি অন্তরে গেঁথে যায় যে, 'সুযোগ পেলে তার অনিষ্ট করব' এই অনিষ্ট চিন্তাকে বলে 'দ্রোহ'।

দৈবী-সম্পদে যতপ্রকার সদগুণ-সদাচার আছে, সাধকের উদ্দেশ্য হল সেগুলিকে পূর্ণভাবে জাগ্রত করা। তবে প্রকৃতি বা স্বভাবের পার্থক্যে সাধকের মধ্যে গুণের তারতম্য থাকতে পারে। যার মধ্যে যে গুণের ঘাটতি থাকে সেটি সেই সাধকের অন্তরে পীড়া দেয় এবং তিনি প্রভুর আশ্রয় নিয়ে তৎপরতার সঙ্গে তাঁর সাধনা করতে থাকেন, সুতরাং ভগবদ্‌কৃপায় তাঁর সব ঘাটতি দূর হয়। যেমন যেমন ঘাটতি দূর হতে থাকে, তেমন তেমন উৎসাহ এবং সেই ঘাটতি উত্তরোত্তর দূর হবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর ফলে দুর্গুণ-দুরাচার সর্বতোভাবে নষ্ট হয়ে সদ্‌গুণ-সদাচার অর্থাৎ দৈবী-সম্পদ প্রকটিত হয়ে থাকে।

'ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত'—ভগবান বলেছেন, 'হে অর্জুন ! এই সবই দৈবী-সম্পদ প্রাপ্ত মানুষদের লক্ষণ।'

পরমাত্মপ্রাপ্তি করা উদ্দেশ্য হলে সাধকদের মধ্যে এই দৈবী-সম্পদের লক্ষণ স্বাভাবিকভাবে ফুটে ওঠে। পূর্ব-জন্মের সংস্কার থেকেও কিছু কিছু লক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু সাধকেরা এই গুণগুলিকে নিজেদের বলে মনে করেন না এবং তাঁদের পুরুষার্থ দ্বারা উপার্জিত বলেও মানেন না। তাঁরা সেগুলি ভগবানের কৃপা বলেই মনে করে থাকেন। কখনো সাধকের মনে এই চিন্তা আসে যে আমার মধ্যে তো এইসব গুণাদি আগে ছিল না। এসব কোথা থেকে এলো ? এসব নিশ্চয়ই ভগবদ্‌কৃপাতেই এসেছে—এরূপ অনুভব হলে সাধকের মনে আর দৈবী-সম্পদের অহংকার আসে না।

দৈবী-সম্পদের গুণগুলি সাধকদের নিজেদের বলে মনে করা উচিত নয়। কারণ এসব পরমাত্মার সম্পদ, কারও ব্যক্তিগত নয়। দৈবী-সম্পদ ব্যক্তিগত হলে, নিজের মধ্যেই থাকত, অন্য কারও মধ্যে বিস্তারলাভ করত না। এগুলিকে ব্যক্তিগত বলে মনে করলেই অহং-অভিমান আসে। অহং-অভিমান আসুরী-সম্পদের প্রধান লক্ষণ। অভিমানের আড়ালেই আসুরী-সম্পদের সমস্ত দুর্গুণ বিরাজ করে। দৈবী-সম্পদ থেকে যদি আসুরী-সম্পদের উদ্ভব হয়, তবে সেই আসুরী-সম্পদ কখনো দূর হতে পারে না। কিন্তু দৈবী-সম্পদ থেকে আসুরী-সম্পদের কখনো উদ্ভব হয় না, বরং দৈবী-সম্পদের গুণগুলির সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু অসাধন থাকায় অহং-অভিমান দোষ এসে যায়। যেমন, যদি কারোর সত্য কথা বলার অহংকার থাকে, তবে আসলে তিনি সত্যের সঙ্গে কিছু কিছু অসত্য কথাও অবশ্যই বলেন, তাই তাঁর সত্যের ওপর অহংকার জন্মায়। অর্থাৎ দৈবী-সম্পদের গুণগুলি নিজের বলে মনে করলে এবং গুণাদির সঙ্গে দুর্গুণ থাকলেই অহং-অভিমান জন্মায়। সর্বতোভাবে সদ্‌গুণ থাকলে গুণাদির অভিমান থাকতেই পারে না।

দৈবী-সম্পদ বলার অর্থ হল এই যে এগুলি সবই ভগবানের সম্পদ। সুতরাং ভগবানের সম্পদের সঙ্গে সম্বন্ধ হলে, তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করলে শরণাগত ভক্তের মধ্যে এটি স্বাভাবিকভাবেই সঞ্চারিত হয়। যেমন, শবরীর প্রসঙ্গে ভগবান শ্রীরাম বলেছেন—

নবধা ভগতি কহউঁ তোহি পাহীঁ।
সাবধান সুনু ধরু মন মাহীঁ॥
....
নব মহুঁ একউ জিন্হ কেঁ হোঈ।
নারি পুরুষ সচরাচর কোঈ॥
সোই অতিশয় প্রিয় ভামিনি মোরেঁ।
সকল প্রকার ভগতি দৃঢ় তোরেঁ॥

(শ্রীরামচরিতমানস ৩।৩৫-৩৬)

মানুষ, দেবতা, ভূত, পিশাচ, পশু-পক্ষী, নরকের কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ-লতা ইত্যাদি যত স্থাবর-জঙ্গম প্রাণী আছে, তাদের সকলের নিজ নিজ জন্ম অনুসারে প্রাপ্ত শরীর রুগ্ন এবং শীর্ণপ্রায় হলেও আমি বেঁচে থাকব, আমার প্রাণ বজায় থাকবে এই ইচ্ছা জাগরূক থাকে[১]। এই ইচ্ছা থাকাই হল আসুরী-সম্পদ।

ত্যাগী, বৈরাগী সাধকদেরও বেঁচে থাকার ইচ্ছা থাকে ; কিন্তু তাঁদের শরীরের প্রতি প্রাণপোষণ-বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়-লালসা থাকে না। কারণ তাঁদের উদ্দেশ্য থাকে ভগবান, শরীর বা সংসার নয়।

সাধক ভক্তের যখন ভগবানের সঙ্গে প্রেম হয়, তখন প্রাণের চেয়েও তাঁর ভগবানকে প্রিয় বলে মনে হয়। প্রাণের মোহ না থাকায় তাঁর প্রাণের আধার তখন ভগবান হয়ে ওঠেন। তাই তিনি ভগবানকে 'প্রাণনাথ ! প্রাণেশ্বর ! প্রাণপ্রিয় !' ইত্যাদি সম্বোধন করেন। ভগবানের বিচ্ছেদ

[১]যজ্জীর্যত্যপি দেহেঽস্মিন্ জীবিতাশা বলীয়সী॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।১৪।৫৩)

সইতে না পেরে তাঁর প্রাণত্যাগও হতে পারে। কারণ মানুষ যে বস্তুকে প্রাণের থেকেও বড় বলে মনে করে, তার জন্য যদি প্রাণও ত্যাগ করতে হয়, তাহলে সে সহর্ষে প্রাণত্যাগ করতে পারে ; যেমন, পতিব্রতা স্ত্রী পতিকে প্রাণের চেয়ে বেশি বলে মনে করে, তাই তার প্রাণ-শরীর-বস্তু-ব্যক্তি ইত্যাদিতে কোনো মোহ থাকে না। তাই পতির মৃত্যুর পর সে প্রশান্তচিত্তে সতী হয়ে যায়। তাৎপর্য হল এই যে ভগবানে অনন্য প্রেম হলে, প্রাণের মোহ আর থাকে না। প্রাণের মোহ না থাকলে আসুরী-সম্পদ দূর হয় এবং দৈবী-সম্পদ স্বতঃ প্রকটিত হয়। তুলসীদাস মহারাজ বলেছেন—

প্রেম ভগতি জল বিনু রঘুরাঈ।
অভিঅন্তর মল কবহুঁ ন জাঈ॥
(শ্রীরামচরিতমানস ৭।৪৯।৩)

※ ※ ※

সম্বন্ধ—এতক্ষণ পর্যন্ত পরমাত্মাই যাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য তাঁদের দৈবী-সম্পদের কথা জানিয়েছেন ; কিন্তু জাগতিক বিষয় ভোগ এবং সম্পদ-সংগ্রহ করাই যাদের উদ্দেশ্য, সেইরূপ প্রাণপোষণপরায়ণ ব্যক্তিদের সম্পদ সম্বন্ধে পরবর্তী শ্লোকে জানাচ্ছেন।

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্॥ ৪ ॥

[**পার্থ** (হে পার্থ !) ; **দম্ভঃ, দর্পঃ** (দম্ভ, দর্প) ; **চ, অভিমানঃ** (অহংকার) ; **ক্রোধঃ, চ, পারুষ্যম্** (ক্রোধ ও কঠোরতা) ; **চ, অজ্ঞানম্** (এবং অবিবেচকতা) ; **এব** (এগুলি সবই) ; **আসুরীম, সম্পদম্** (আসুরী-সম্পদপ্রাপ্ত) ; **অভিজাতস্য** (ব্যক্তির লক্ষণ।)]

হে পার্থ ! দম্ভ, দর্প, অহংকার, ক্রোধ, কঠোরতা এবং অবিবেচকতা—এগুলি সবই আসুরী-সম্পদ প্রাপ্ত ব্যক্তির লক্ষণ॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা—**'দম্ভঃ'**—মান, শ্রদ্ধা, সম্মান, খ্যাতি ইত্যাদিতে, নিজের সেরূপ অবস্থিতি না হলেও সেরূপ ভাব দেখাবার নামই হল 'দম্ভ'। দম্ভ দু'প্রকারের—

(১) **সদ্গুণ-সদাচারের জন্য**—নিজেকে ধর্মাত্মা, সাধক, বিদ্বান, গুণবান ইত্যাদি ভাবে প্রকাশ করা অর্থাৎ নিজে সেরূপ না হয়েও লোকের কাছে নিজেকে সেরূপ দেখানো, সেরূপ ভান করা, অল্প-স্বল্প থাকলে তা বেশি করে দেখানো, ভোগী হয়েও যোগীর ভাব দেখানো—ইত্যাদি লোকদেখানো ভাব ও ক্রিয়া করা। এই হল সদ্গুণ-সদাচারের দম্ভ।

(২) **দুর্গুণ-দুরাচারের জন্য**—যার আচার-ব্যবহার, খাওয়া-দাওয়া স্বাভাবিকভাবে অশুদ্ধ নয়, সেইরকম মানুষ যাদের আচার-ব্যবহার, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি অশুদ্ধ—এরূপ দুর্গুণ-দুরাচারী লোকেদের মধ্যে গিয়ে তাদের সন্তুষ্ট করতে নিজের মান-সম্মান প্রদর্শনের জন্য, বা মান-মর্যাদা পাবার জন্য, মনে মনে খারাপ লাগলেও ওইসব লোকের মতো আচার-ব্যবহার ও খাওয়া-দাওয়া করে— এগুলিই হল দুর্গুণ-দুরাচারের দম্ভ।

তাৎপর্য হল এই যে মানুষ যখন প্রাণ, দেহ, অর্থ, সম্পত্তি, মান-মর্যাদা, মহিমা ইত্যাদিকে প্রাধান্য দিতে থাকে, তখন তার মধ্যে দম্ভ হয়।

'দর্পঃ'—অহংকারকে বলা হয় 'দর্প'। ধন-সম্পত্তি, জমি-জায়গা, গৃহ-পরিবার ইত্যাদি নিজস্ব প্রিয় জিনিস নিয়ে নিজের মধ্যে যে বড়োত্বের অহংকার হয়, তাকে বলা হয় 'দর্প'। যেমন—আমার এত অর্থ আছে ; আমার এত বড় সংসার ; আমার মস্ত বড় রাজ্য ; আমার অনেক ভূ-সম্পত্তি আছে ; আমার অনুকূলে অনেক লোক আছে ; আমার সঙ্গে বহুলোক গলা মেলায় ; ধন-সম্পদ ও অর্থে আমার সমান কে হতে পারে ; আমি এরূপ উঁচু পদে রয়েছি, আমার এত ক্ষমতা ; জগতে আমার কত যশ-প্রতিষ্ঠা, বহু লোক আমার অনুগামী ; আমি কত উচ্চ-সম্প্রদায়ভুক্ত, আমার গুরু কত প্রভাবসম্পন্ন ইত্যাদি।

'অভিমানঃ'—অহং-সম্পন্ন বস্তুগুলিকে নিয়ে অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ-শরীর নিয়ে নিজের মধ্যে যে

শ্রেষ্ঠত্ব অনুভূত হয়, তাকে বলা হয় 'অভিমান'[১]। যেমন—আমি জাতিতে কুলীন ; আমি বর্ণ ও আশ্রমে উচ্চ ; জাতির মধ্যে আমার প্রাধান্য আছে ; সারা দেশে আমার কথা চলে অর্থাৎ আমি যা বলব সকলেই তা শুনবে ; আমি যাকে আশ্রয় দেব, তার বিরুদ্ধে যেতে সকলেই ভীত হবে আর আমি যার বিরুদ্ধে যাব, তাকে সঙ্গ দিতে সকলেই ভীত হবে ; শাসকবর্গের মধ্যেও আমার সম্মান আছে, তাই আমি যা বলব, তার কেউ বিরোধিতা করবে না ; ন্যায়-অন্যায় আমি যা কিছু করি না কেন, তার বিরোধিতা কেউ করতে পারে না ; আমি খুব বিদ্বান, আমি অণিমা, মহিমা, গরিমা ইত্যাদি সিদ্ধিগুলি জানি, সমস্ত জগৎকে আমি উথাল-পাথাল করে দিতে পারি।

'ক্রোধঃ'—অন্যের অনিষ্ট করার জন্য চিত্তে যে জ্বালার সৃষ্টি হয়, তাকে বলে **'ক্রোধ'**।

কোনো মানুষের পছন্দের বা রুচির বিপরীতে যদি কেউ কিছু করে, তাহলে তার অনিষ্ট করার জন্য চিত্তে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়ে যে জ্বালার উদ্রেক হয়, সেটি হল ক্রোধ। ক্রোধ এবং ক্ষোভে পার্থক্য থাকে। বাচ্চারা দুষ্টুমি করলে, কথা না শুনলে, মাতা-পিতা উত্তেজিত হয়ে যে তাদের তাড়না করেন—সেগুলি হল 'ক্ষোভ' (অন্তরের চাঞ্চল্য), ক্রোধ নয়। কারণ তাঁদের মনে বাচ্চার অনিষ্ট করার কোনো চিন্তা থাকে না, তাদের হিতের চিন্তাই থাকে। কিন্তু যখন উত্তেজিত হয়ে অপরের অনিষ্ট, অহিত করে, তাদের দুঃখ দিয়ে আনন্দ অনুভূত হয়, সেটি হল 'ক্রোধ'। আসুরী-প্রকৃতি ব্যক্তিদের মধ্যে এইরূপ ক্রোধ হয়ে থাকে।

ক্রোধের বশীভূত হয়ে মানুষ অকাজ, কুকাজ করে বসে, যার ফলে পরে তাকে অনুতাপ করতে হয়। ক্রোধান্বিত ব্যক্তি উত্তেজিত হয়ে যে অন্যের অপকার করে, তাতে তার নিজেরও কম অপকার হয় না। কারণ নিজ অনিষ্ট না করে ক্রুদ্ধ ব্যক্তি অন্যের অনিষ্ট করতেই পারে না। এর মধ্যেও একটি তাৎপর্যপূর্ণ কথা হল এই যে, ক্রুদ্ধ ব্যক্তি যার অনিষ্ট করেন, তিনি তাঁর পূর্বকৃত কোনো দুষ্কর্মেরই ফল ভোগ করেন, যা তাঁর প্রাপ্য ছিল অর্থাৎ তাঁর নতুন করে কোনো অনিষ্ট হয় না। কিন্তু ক্রোধান্বিত ব্যক্তির অন্যের অনিষ্ট চিন্তায় বা অনিষ্ট করায় তার নিজের নতুন পাপ সংগ্রহ হয় এবং তাঁর স্বভাবও কলুষিত হয়ে যায়। এই স্বভাব তাঁকে নরকে পতিত করার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং তিনি যেখানেই জন্ম নেন, সেখানেই দুঃখ পান।

ক্রোধ যে করে, ক্রোধ তাকেও কষ্ট দেয়[২]। ক্রোধী ব্যক্তির জগতে সুখ্যাতি হয় না, নিন্দা হয়ে থাকে। তার বাড়ির লোকও তাকে ভয় পায়, (তার থেকে দূরে থাকতে চায়)। এই অধ্যায়ের একুশতম শ্লোকে ভগবান ক্রোধকে বলেছেন নরকের দ্বার। মানুষের যখন স্বার্থ ও অহং-অভিমানে বাধা পড়ে, তখন ক্রোধ উৎপন্ন হয়। তখন ক্রোধ থেকে সম্মোহ, সম্মোহ থেকে স্মৃতিবিভ্রম, স্মৃতিবিভ্রম থেকে বুদ্ধিনাশ ও বুদ্ধিনাশ থেকে পতন হয় (গীতা ২।৬২-৬৩)।

'পারুষ্যম্'—কঠোরতাকে বলা হয় **'পারুষ্য'**। এগুলি কয়েক প্রকারের হয় ; যেমন—উদ্ধতভাব, বিস্রস্ত অবস্থায় চলাফেরা—এগুলি হল শারীরিক পারুষ্য। কুটিলভাবে তাকানো—এগুলিকে বলা হয় চোখের পারুষ্য। কঠোর ভাষা বলা, যাতে অপরে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়—এগুলি হল বাক্যের পারুষ্য। অন্যের বিপদ, সংকট, দুঃখ এলেও তাকে সাহায্য করতে না যাওয়া এবং এতে খুশি হওয়া, এই যে কঠোর ভাব, এটি হল হৃদয়ের পারুষ্য।

যারা শরীর ও প্রাণে এক হয়ে গেছে, এরূপ মানুষদের যদি অন্যের ক্রিয়া এবং বাক্য খারাপ লাগে তাহলে সে তার জন্য তাকে কঠোর বাক্য শোনায়, তাকে দুঃখ দেয় এবং

[১]যেখানে অহংকার ও দর্প—দুটির মধ্যে কোনো একটি থাকে, সেখানে অভিমানেরই অন্তর্গত দর্প এবং দর্পের অন্তর্গতই অহংকার আসে। কিন্তু যেখানে এই দুটি একই সঙ্গে পৃথকরূপে আসে, সেখানে দুটির মধ্যে একটু পার্থক্য থাকে। 'মমত্ব' সম্বন্ধ নিয়ে 'দর্প' আর 'অহংভাব' নিয়ে 'অহংকার' বলা হয় অর্থাৎ বাইরের জিনিস নিয়ে নিজের যে শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করা হয়, তা হল 'দর্প' এবং বিদ্যা-বুদ্ধি ইত্যাদি অন্তরঙ্গ জিনিস নিয়ে যে শ্রেষ্ঠত্ব ভাব অনুভূত হয়, তাকে বলা হয় 'অহংকার'।

[২]ক্রোধো হি শত্রুঃ প্রথমো নরাণাং দেহস্থিতো দেহবিনাশনায়।
যথাস্থিতঃ কাষ্ঠগতো হি বহ্নিঃ স এব বহ্নির্দহতে শরীরম্॥

'ক্রোধই মানুষের প্রথম শত্রু, যা দেহে অবস্থান করে দেহ বিনাশ করে। যেমন কাষ্ঠস্থিত অগ্নি কাঠকেই জ্বালায়, তেমনি দেহস্থিত ক্রোধরূপ অগ্নি দেহকেই দগ্ধ করে।'

সন্তুষ্টচিত্তে বলে, 'দেখেছ ! আমি তার সাথে কী কড়া ব্যবহার করলাম, মুখ ভেঙে দিয়েছি ! আমার সঙ্গে আর লড়তে আসবে না।' এইগুলি হল ব্যবহারের পারুষ্য।

স্বার্থবুদ্ধির আধিক্যের জন্য, নিজ মতলব সিদ্ধ করার জন্য, অপরে কষ্ট পাবে, তাদের কোনো বিপদ আসবে —সেকথা মানুষ চিন্তা করে দেখে না। হৃদয়ে কঠোর হওয়ায় তারা শুধু নিজ স্বার্থ দেখে ; তাই তাদের মন, বাক্য, শরীর, ব্যবহার সবই কঠোর হয়। স্বার্থভাব খুব বেড়ে গেলে এরা হিংস্র হয়ে ওঠে, ফলে তাদের স্বভাবে স্বতঃই ক্রূরতা এসে যায়। ক্রূরভাব এলে হৃদয়ে সৌম্যভাব আর একেবারেই থাকে না। সৌম্যভাব না থাকায় তাদের ব্যবহারে, আচার-আচরণে কঠোরতা পরিলক্ষিত হয়। তখন তারা অপরের টাকা মেরে দিতে, অপরকে দুঃখ দিতেই ব্যাপৃত থাকে। এর পরিণামে তাদের সুখ হবে, না দুঃখ—সে চিন্তা তারা করে না।

'অজ্ঞানম্'—অবিবেচনাকে বলা হয় **'অজ্ঞান'**। অবিবেচক ব্যক্তিদের সৎ-অসৎ, সার-অসার, কর্তব্য-অকর্তব্য ইত্যাদির বোধ থাকে না। কারণ তাঁদের দৃষ্টি থাকে বিনাশশীল পদার্থের ভোগ ও সংগ্রহের দিকে। তাই (পরিণামের দিকে দৃষ্টি না থাকায়) তাঁরা চিন্তাও করতে পারেন না যে এইসব বিনাশশীল পদার্থ কতদিন আমাদের সঙ্গে থাকবে এবং আমরা কতদিন এগুলির সঙ্গে থাকব ! পশুর ন্যায় প্রাণধারণেই ব্যাপৃত থাকায় এঁরা কর্তব্য-অকর্তব্য জানতে পারেনও না, জানতে চানও না।

এঁরা তাৎক্ষণিক সংযোগজনিত সুখকেই সুখ বলে মনে করেন এবং শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির প্রতিকূল অবস্থাকেই দুঃখ বলে মনে করেন। তাই তাঁরা সুখের জন্য চেষ্টা করলেও পরিণামে আগের চেয়ে বেশি দুঃখ পান[১]। তবুও তাঁরা সচেতন হন না যে তাঁদের কী পরিণাম হবে ? তাঁরা মান-মর্যাদা, সুখ-আরাম ও অর্থ-সম্পদের প্রলোভনে পড়ে অকাজ-কুকাজ করতে থাকেন যার ফলে তাঁদের নিজেদের এবং জগতের পক্ষেও অত্যন্ত অমঙ্গলজনক হয়।

'অভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্'—হে পার্থ ! এসবই আসুরী-সম্পদ্[২] প্রাপ্ত ব্যক্তিদের লক্ষণ। মরণশীল দেহের সঙ্গে ঐক্য করে 'আমি যেন কখনো না মরি ; সর্বদা যেন বেঁচে থাকি এবং সুখভোগ করতে থাকি'—এরূপ ইচ্ছাযুক্ত মানুষের এই লক্ষণ হয়।

অষ্টাদশ অধ্যায়ের চল্লিশতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে কোনো সাধারণ প্রাণীই প্রকৃতির গুণাদি সম্বন্ধ থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হতে পারে না। এর দ্বার প্রমাণিত হয় যে প্রতিটি জীব পরমাত্মার অংশ হলেও প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েই জন্মায়। প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার তাৎপর্য হল—প্রকৃতির কার্য শরীরে 'আমি-আমার' সম্পর্ক (তাদাত্ম্য) এবং পদার্থে মমতা, আসক্তি ও কামনা হওয়া। শরীরে 'আমি-আমার' সম্পর্কই হল আসুরী-সম্পদের মূল লক্ষণ। যার প্রকৃতির সঙ্গেই প্রধানতঃ সম্পর্ক থাকে, এখানে তাকেই আসুরী-সম্পদ প্রাপ্ত হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

জীব নিজেই প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক মেনে নিয়েছে। তাই সে যখনই ইচ্ছা করে, তখনই এই সম্পর্ক ত্যাগ করতে পারে। কারণ জীব (আত্মা) চেতন ও নির্বিকার আর প্রকৃতি জড় এবং সর্বদা পরিবর্তনশীল। তাই চেতনের জড়ের সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে কোনো সম্বন্ধ নেই-ই, শুধুমাত্র মেনে নেওয়া হয়েছে। এই সম্পর্ক পরিত্যাগ করলেই আসুরী-সম্পদ সর্বতোভাবে নাশ হয়। অতএব মানুষের মধ্যে আসুরী-সম্পদ দূর করার সম্পূর্ণ যোগ্যতা থাকে। তাৎপর্য হল এই যে আসুরী-সম্পদ সহজাত হলেও মানুষ প্রকৃতি থেকে নিজের সম্বন্ধ সর্বতোভাবে বিচ্ছিন্ন

---

[১]কর্মাণ্যারভমাণানাং দুঃখহত্যৈ সুখায় চ। পশ্যেৎ পাকবিপর্যাসং মিথুনীচারিণাং নৃণাম্॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৩।১৮)

'হে রাজন্ ! নারী-পুরুষ ইত্যাকার সম্বন্ধ বন্ধনে আবদ্ধ মানুষ সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখ নিবৃত্তির আশায় কর্ম করেন। কিন্তু যিনি এই মায়া হতে পরিত্রাণ চান, তিনি চিন্তা করলেই দেখতে পাবেন তাঁর কর্মের ফল কীভাবে বিপরীত হয়ে যায়। তিনি সুখের বদলে দুঃখই পেয়ে থাকেন এবং দুঃখ দূর হওয়ার বদলে তাঁর দুঃখ বেড়েই যায়।'

[২]এখানে 'আসুরী' শব্দটিতে দেবতাদের বিরোধবাচক 'নঞ্' সমাস হয়নি ; এটি 'অসুষু প্রাণেষু রমন্তে ইতি আসুরাঃ' এই অনুসারে যে ব্যক্তি শুধু ইন্দ্রিয় এবং প্রাণকে পোষণ করে থাকে অর্থাৎ যারা কেবল সংযোগজনিত সুখে আসক্ত, তাদেরই এখানে 'অসুর' বলা হয়েছে। অর্থাৎ যাদের পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করা উদ্দেশ্য থাকে না, যারা শরীর ধারণ করে শুধু ভোগ করতে চায়, তারাই হল অসুর। সেই অসুরদের স্বভাবকে বলা হয় 'আসুরী-সম্পদ'।

করে আসুরী-সম্পদ নাশ করতে সক্ষম।

মানুষের নিজ প্রাণের প্রতি যতই মোহ বৃদ্ধি হতে থাকে, ততই আসুরী-সম্পদ বৃদ্ধি পায়। আসুরী-সম্পদ অত্যধিক বৃদ্ধি পেলে মানুষ তার জীবন রক্ষার জন্য অন্যের ক্ষতি করে বসে। শুধু তাই নয় অপরকে হত্যা করতে পর্যন্ত সে দ্বিধাগ্রস্ত হয় না।

মানুষ যখন অস্থায়ী বস্তুগুলিকে স্থায়ী বলে মেনে নেয় তখন আসুরী-সম্পদের দুর্গুণ-দুরাচারের সমূহ তার মধ্যে এসে পড়ে। তাৎপর্য হল এই যে অসৎ সঙ্গ করলে অসৎ আচরণ, অসৎ ভাব এবং দুর্গুণ অনায়াসে আয়ত্ত হয়, যেগুলি মানুষকে পরমাত্মা হতে বিমুখ করে অধঃগতিতে নিয়ে যায়।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—ভগবান এবার দৈবী ও আসুরী—উভয় সম্পদের ফল জানাচ্ছেন।

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব॥ ৫ ॥

[**দৈবী, সম্পৎ, বিমোক্ষায়** (দৈবী-সম্পদ মুক্তির হেতু) ; **আসুরী** (আসুরী-সম্পদ) ; **নিবন্ধায়, মতা** (বন্ধনের হেতু) ; **পাণ্ডব** (হে পাণ্ডব !) ; **দৈবীম্, সম্পদম্** (দৈব-সম্পদ) ; **অভিজাতঃ, অসি** (প্রাপ্ত হয়েছ, অতএব) ; **মা, শুচঃ** (শোক করার কোনো কারণ নেই।)]

দৈবী-সম্পদ মুক্তির হেতু এবং আসুরী-সম্পদ সংসার বন্ধনের হেতু। হে পাণ্ডব ! তুমি দৈব-সম্পদই লাভ করেছ, অতএব তোমার শোক করার কোনো কারণ নেই॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা—**'দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায়'**—আমাকে ঈশ্বরের পথে চলতে হবে—সাধকের মধ্যে এই ভাব যত স্পষ্টরূপে আসে, ততই তিনি সেই পথে অগ্রসর হতে থাকেন। ভগবৎ-অভিমুখী হলে তাঁর সংসারে বিমুখতা দেখা দেয়। সংসার-বিমুখ হলে আসুরী-সম্পদের যতপ্রকার দুর্গুণ-দুরাচার আছে, তা ক্ষয় হতে থাকে এবং দৈবী-সম্পদের সদ্‌গুণ-সদাচার প্রকটিত হতে থাকে। ফলে সাধকের ভগবানে এবং ভগবানের নাম-রূপ-লীলা-গুণ-চরিত্র ইত্যাদিতে মন আকৃষ্ট হয়।

এতে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় হল এই যে, সাধকের উদ্দেশ্য যত দৃঢ় হয়, ততই পরমাত্মার সঙ্গে তাঁর অনাদিকালের যে সম্পর্ক, তা প্রকটিত হতে থাকে এবং জগৎ-সংসারের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক দূর হতে থাকে। এ সম্পর্ক তো সর্বদাই দূরীভূত হচ্ছে, প্রকৃতির সঙ্গে বাস্তবে তো কোনো সম্পর্কই নেই। জীব কেবল সম্পর্ক মেনে নিয়েছে। এই মেনে নেওয়া সম্পর্ক শুধু সদ্‌ভাবনায় অর্থাৎ 'শরীরই আমি এবং আমারই শরীর'— এই ভাবনাতেই টিকে রয়েছে। এই ভাবনা দূর হলেই সংসারের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক দূর হয় এবং দৈবী-সম্পদের সমস্ত গুণ প্রকটিত হয়, যা মুক্তির হেতু।

দৈবী-সম্পদ শুধু নিজের জন্যই নয়, বরং এটি সকল প্রাণীরই কল্যাণের জন্য রয়েছে। যেমন, গৃহে ছোট, বড়, বৃদ্ধ নানা সদস্য থাকলেও সকলের পালন-পোষণের জন্য গৃহস্বামী (গৃহের মুখ্য ব্যক্তি) স্বয়ং উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তেমনই জগৎ-সংসারের উদ্ধারের জন্য ভগবান মানুষের সৃষ্টি করেছেন। এই মানুষ ভগবদ্‌প্রদত্ত বিশেষ শক্তির সাহায্যে ভগবদ্‌ভিমুখী হয়ে ভগবানের সেবা করে তাঁকেও নিজের বশীভূত করতে পারে। এই অদ্ভুত ক্ষমতা মানুষকে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং মানুষ সেই অধিকার অনুসারে যজ্ঞ, দান, তপস্যা, তীর্থ, ব্রত, জপ, ধ্যান, স্বাধ্যায়, সৎসঙ্গ ইত্যাদি যতপ্রকার সাধন আছে, সেগুলির অনুষ্ঠান শুধু অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত জীবের কল্যাণের সঙ্কল্প নিয়ে এই প্রার্থনা জানায় যে, 'হে প্রভু ! জীবমাত্রের কল্যাণ যেন হয়, জীব যেন জীবন্মুক্ত হয়, জীব-সকলেই যেন আপনার অনন্য প্রেমিক ও ভক্ত হয় ; কিন্তু হে নাথ ! তা শুধু আপনার কৃপাতেই সম্ভব। আমি শুধু প্রার্থনাই করতে পারি এবং তা আপনারই প্রদত্ত সদ্‌বুদ্ধির দ্বারা !' এরূপ ভাব রেখে নিজ শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অর্থ, সম্পদ সমস্ত কিছুই

জগতের কল্যাণের নিমিত্ত ভগবানে অর্পণ করতে হয়[১]। এরূপ করলে নিজের বলে কথিত জিনিসগুলিসহ জগৎ-সংসারের এবং নিজের অর্থাৎ স্বয়ং ভগবানের সঙ্গে যে স্বতঃসিদ্ধ ঐক্য তা প্রকটিত হয়ে থাকে। এই কথাই ভগবান **'দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায়'** পদের দ্বারা জানিয়েছেন।

'নিবন্ধায়াসুরী মতা'—যা জন্ম-মৃত্যু প্রদান করে, সেগুলি সবই আসুরী-সম্পদ।

মানুষের অহংভাব যতক্ষণ পর্যন্ত না দূর হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তার বিবিধ সদ্গুণ অর্থহীন না হলেও, তার দ্বারা তার মুক্তিলাভ হয় না। অর্থাৎ যতক্ষণ তার অহং-এ 'আমার শরীর যেন বজায় থাকে, আমার সুখ-শান্তি লাভ ঘটে' এরূপ চিন্তা থাকে, ততক্ষণ দৈবী-সম্পদ তার পক্ষে মুক্তিদায়ক হয়ে ওঠে না। এই সম্পদ তাকে শুভফল প্রদান করতে পারে, উচ্চলোকে যাবার অধিকারী করতে পারে, কিন্তু মুক্তি প্রদান করতে পারে না।

বীজকে যেমন ভূমিতে বপন করলে মাটি, জল, হাওয়া ইত্যাদি বীজকে পরিপুষ্ট করে ; বীজ থেকে সেই গাছই জন্ম নেয় এবং সেই জাতের ফলই হয়ে থাকে। তেমনই অহংভাবে (আমি-ভাবে) জগতের সংস্কার-রূপ বীজ রেখে যে শুভকর্ম করা যায়, তা ওই বীজকেই পরিপুষ্ট করে এবং ওই বীজ অনুসারেই ফল দেয়। তাৎপর্য হল এই যে সকাম মানুষের অহংভাবের মধ্যে সংসারের যে সংস্কার পড়ে, সেই সংস্কার অনুসারেই তার সকাম সাধনায় অণিমা, গরিমা ইত্যাদি সিদ্ধিলাভ হয়। তার আরও কিছু বিশেষ ভাব প্রকটিত হলে সে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত গিয়ে উচ্চভোগ লাভ করতে পারে, কিন্তু মুক্তিলাভ হতে পারে না (গীতা ৮।১৬)।

এখন প্রশ্ন হল মানুষ মুক্তির জন্য কী করবে ? তার উত্তরে বলা হয়েছে যে, বীজকে যেমন ভাজা করলে বা সিদ্ধ করলে তা থেকে অঙ্কুর উদ্গম হয় না[২], সেই বীজকে বপন করলে মাটি তাকে নিজের সঙ্গে মিলিয়ে নেয়, তখন আর জানাই যায় না যে বীজটি ছিল কিনা ? তেমনই মানুষ যখন পরমাত্মপ্রাপ্তির জন্য দৃঢ়নিশ্চয় হয়, তখন জগতের সমস্ত বীজ (সংস্কার) অহংভাব থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

শরীর ও প্রাণে একপ্রকার আসক্তি হয়ে থাকে, যেমন 'আমি সুখে বেঁচে থাকি, আমি মান-সম্মান পেতে থাকি, আমি ভোগ করতে থাকি' ইত্যাদি। এইভাবে যে নিজ ব্যক্তিত্বের প্রাধান্য রেখে চলে, তার মধ্যে গুণসমূহ এলেও আসক্তির জন্য তার মুক্তি হয় না। কারণ উচ্চ-নীচ কুলে জন্ম নেওয়ায় প্রকৃতির সঙ্গই হেতু হয় (গীতা ১৩।২১)। তাৎপর্য হল এই যে, সেই ব্যক্তি শুভকর্ম করে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত গেলেও তার বন্ধনমুক্তি হয় না।

মর্মার্থ

ভগবান এই অধ্যায়ে আসুরী-সম্পদযুক্ত ব্যক্তিদের তিনটি ফলের কথা জানিয়েছেন, যার মধ্যে এই শ্লোকে **'নিবন্ধায়াসুরী মতা'** পদটির দ্বারা বন্ধনরূপ সাধারণ ফল বলেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের একচল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশতম পর্যন্ত শ্লোকগুলিতে এবং নবম অধ্যায়ের কুড়ি-একুশতম শ্লোকে বর্ণিত সকাম উপাসকও এর মধ্যে গণ্য হন। যাঁদের উদ্দেশ্য শুধু ভোগ করা ও সম্পদ-সংগ্রহ করার দিকে থাকে, তাঁদের বহু শাখাসমন্বিত অনন্ত কামনা হয়ে থাকে অর্থাৎ তাঁদের কামনার কোনো শেষ থাকে না। যে ব্যক্তি কামনায় মগ্ন হন এবং কর্মফলের প্রশংসাকারী বেদবাক্যে আকর্ষিত হন, তিনি বৈদিক যাগযজ্ঞাদি বিধিমতো করলেও কামনা থাকায় জন্ম-মৃত্যুরূপ বন্ধন দশায় আবদ্ধ হন (গীতা ২।৪১-৪৪)। তেমনই যিনি সংসারের ভোগবিলাস আকাঙ্ক্ষা না করে স্বর্গের দিব্য ভোগাদির কামনায় শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞ করেন, তিনি যজ্ঞের ফলস্বরূপ (স্বর্গলাভের প্রতিবন্ধকরূপ পাপ ক্ষীণ হওয়ায়) স্বর্গ প্রাপ্ত হয়ে দিব্য ভোগ আস্বাদন করেন। যখন তাঁর (স্বর্গ প্রদানকারী) পুণ্যক্ষয় হয়ে যায়, তখন তিনি আবার সেই জন্ম-মরণ চক্রে ফিরে আসেন (গীতা ৯।২০-২১)।

এখন প্রশ্ন হল, যে-কৃষ্ণমার্গ (গীতা ৮।২৫) দ্বারা উপরিউক্ত সকাম ব্যক্তি যান, সেই মার্গ দ্বারা যোগভ্রষ্ট

[১]জীবমাত্রেরই যে কল্যাণের ভাব, তাও ভগবদ্প্রদত্ত বিভূতি (দৈবী-সম্পদ), নিজের নয়। নিজের বলতে একমাত্র ভগবানই আছেন।

[২]ভর্জিতা কথিতা ধানা প্রায়ো বীজায় নেষ্যতে॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।২২।২৬)

ব্যক্তিও (গীতা ৬।৪১) গমন করেন। অতএব উভয়ের মার্গ এক হওয়ায় এবং উভয়েই পুনরাবর্তী হওয়ায় সকাম ব্যক্তিদের মতোই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিদেরও **'নিবন্ধায়াসুরী মতা'** অনুসারে বন্ধন হওয়া উচিত। এর উত্তর হল এই যে যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিদের এই বন্ধন হয় না। কারণ পূর্ব (মনুষ্য-জন্মে কৃত) সাধনাতে তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল নিজ কল্যাণের কিন্তু অন্তকালে বাসনা, সজ্ঞালোপ হওয়া, অসুস্থতা ইত্যাদি বিঘ্নবশতঃ তাঁদের স্বর্গগমন করতে হয়েছিল। সুতরাং এইসব যোগভ্রষ্টদের এই মার্গে গমন করার জন্যই (গীতা ৮।২৫) সকাম ব্যক্তিদের জন্যও 'যোগী' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে, না হলে সকাম ব্যক্তিদের যোগী বলা চলে না।

আসুরী-সম্পদের দ্বিতীয় ফল হল—**'পতন্তি নরকেঽশুচৌ'** (গীতা ১৬।১৬)। যে ব্যক্তি কামনার বশবর্তী হয়ে পাপ, অন্যায়, দুরাচার করে থাকে, তার ফলস্বরূপ সে স্থানবিশেষ-নরক প্রাপ্ত হয়।

আসুরী-সম্পদের তৃতীয় ফল—**'আসুরীষ্বেব যোনিষু', 'ততো যান্ত্যধমাং গতিম্'** (গীতা ১৬।১৯-২০)। যার মধ্যে দুর্গুণ-দুর্ভাব থাকে এবং তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সে মাঝেমধ্যে দুরাচার করে, সেই অনুসারে প্রথমে আসুরী যোনি প্রাপ্তি এবং পরে দুরাচার অনুসারে অধমগতি (নরকাদি) প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে।

'মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব'— যারা শুধু অবিনাশী পরমাত্মাকে পাবার আকাঙ্ক্ষা করে, তারা দৈবী-সম্পদ প্রাপ্ত হয়, ফলে তারা মুক্তিলাভ করে এবং বিনাশশীল জাগতিক ভোগ ও সম্পদ-সংগ্রহ অভিলাষীরা আসুরী-সম্পদ প্রাপ্ত হয়, যার ফল হয় বন্ধন—এইসব শুনে অর্জুনের মনে যাতে আশঙ্কার উদ্ভব না হয় যে, 'আমি তো নিজের মধ্যে কোনো দৈবী-সম্পদ দেখছি না!' তাই ভগবান বলেছেন, 'ওহে অর্জুন! তুমি দৈবী-সম্পদ প্রাপ্ত হয়েছ, সুতরাং শোক বা সন্দেহ কোরো না।'

দৈবী-সম্পদ প্রাপ্ত হলে সাধকের সহজেই কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগের সাধনা স্বাভাবিকভাবেই হয়ে থাকে। কর্তব্য পালন দ্বারা কর্মযোগীর এবং জ্ঞানাগ্নির দ্বারা জ্ঞানযোগীর সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে যায় (গীতা ৪।২৩, ৩৭), কিন্তু ভক্তিযোগীর সমস্ত পাপ স্বয়ং ভগবান বিনাশ করেন (গীতা ১৮।৬৬) এবং সংসার থেকে তাকে উদ্ধার করেন (গীতা ১২।৭)।

'মা শুচঃ'[১]—তৃতীয় শ্লোকে **'ভারত'**, চতুর্থ শ্লোকে **'পার্থ'** এবং এই পঞ্চম শ্লোকে **'পাণ্ডব'**—এই তিনটি সম্বোধন প্রয়োগ করে ভগবান অর্জুনকে উৎসাহ দিয়ে বলেছেন যে 'ভারত! তোমার বংশ অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ; পার্থ! তুমি সেই মাতার (পৃথার) পুত্র, যিনি শত্রুরও সেবা করেন; তুমি অত্যন্ত ধর্মাত্মা এবং শ্রেষ্ঠ পিতা পাণ্ডুর পুত্র। অর্থাৎ 'বংশ, মাতা, পিতা—এই তিন ভাবেই তুমি শ্রেষ্ঠ; সুতরাং তোমার মধ্যে স্বাভাবিকভাবে দৈবী-সম্পদ অবস্থিত। সতুরাং তোমার শোক করা উচিত নয়।'

গীতায় দুবার **'মা শুচঃ'** পদটি বলা হয়েছে—একবার এখানে এবং দ্বিতীয়বার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ছেষট্টিতম শ্লোকে। এই পদটি দুবার প্রয়োগ করে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে তোমাকে সাধন এবং সিদ্ধি কোনো বিষয়েই চিন্তা করতে হবে না। সাধনার বিষয়ে আশ্বাস দিয়েছেন যে, তুমি দৈবী-সম্পদ প্রাপ্ত হয়েছ এবং সিদ্ধির বিষয়ে (১৮।৬৬) আশ্বাস দিয়ে বলেছেন যে আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হতে মুক্ত করব। অর্থাৎ সাধক নিজের সাধনে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করেন, সেগুলি তিনি দূর করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সেই ন্যূনতার জন্য তাঁর চিত্তে বিনম্র নিরাশভাব থাকে যে, আমার মধ্যে সেই উপযুক্ত গুণ কোথায়, যাতে আমি সাধ্যকে লাভ করব। সাধকের সেই নিরাশা দূর করার জন্য ভগবান অর্জুনকে সাধকমাত্রেরই প্রতিনিধি রূপে আশ্বাস দিচ্ছেন যে তুমি সাধন এবং সাধ্যের বিষয়ে চিন্তা বা শোক কোরো না এবং নিরাশ হয়ো না।

দৈবী-সম্পদসম্পন্ন ব্যক্তিদের স্বভাব হল—তাঁদের সম্মুখে অনুকূল বা প্রতিকূল যে কোনো পরিস্থিতি, ঘটনা আসুক না কেন তাঁদের দৃষ্টি সবসময় নিজেদের কল্যাণের দিকেই থাকে। যুদ্ধের সময় ভগবান যখন অর্জুনের রথ উভয়পক্ষের সেনার মধ্যস্থলে স্থাপন করেন, তখন ওই সৈন্যদলের মধ্যে উপস্থিত নিজ আত্মীয়-স্বজনদের দেখে অর্জুনের স্বজনপ্রীতিরূপ মোহের উন্মেষ হয় এবং তিনি করুণা ও শোকে বিচলিত হয়ে যুদ্ধরূপ কর্তব্য থেকে চ্যুত হতে চান। তাঁর চিন্তা হল যে, যুদ্ধে এই আত্মীয়দের বধ করলে আমার পাপ হবে, এতে আমার কল্যাণে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হবে। এদের বধ করলে আমি এই

[১]এখানে 'মা শুচঃ' ক্রিয়াটি দিবাদিগণের 'শুচির পূতীভাবে' ধাতুর লুঙ্ লকারের রূপ।

বিনাশশীল রাজ্য ও সুখ লাভ করব ঠিকই, কিন্তু এর ফলে শ্রেয় (কল্যাণ) প্রাপ্তিতে বাধা আসবে। অর্জুনের মনে এইরূপ কৌটুম্বিক মোহ এবং পাপের (অন্যায়, অধর্মের) ভয়—দুই-ই একসাথে উপস্থিত হয়। এর মধ্যে কৌটুম্বিক মোহ হল আসুরী-সম্পদ এবং পাপের জন্য নিজ কল্যাণে বাধা সৃষ্টি হওয়ার যে ভয়, তা হল দৈবী-সম্পদ।

এতেও একটি বিশেষ কথা লক্ষ্য করতে হবে। অর্জুন বলেছেন যে, 'আমরা যে যুদ্ধ করতে দৃঢ়নিশ্চিত হয়েছি এও মহাপাপ'—**'অহো বত মহৎপাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়ম্'** (১।৩৪)। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রেও বারংবার নিজ কল্যাণের কথা জিজ্ঞাসা করেছেন—**'যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে'** (২।৭) ; **'তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্'** (৩।২) ; **'যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্'** (৫।১)। এইসব অর্জুনের মধ্যে দৈবী-সম্পদ থাকারই ফল। অপরপক্ষে যাদের মধ্যে রাজ্য ও অর্থের এত লোভ ছিল যে আত্মীয়বধের ফলে যে পাপ হবে সেদিকে তাদের লক্ষ্যই ছিল না (১।৩৮)। অর্জুনের মধ্যে এই দৈবী-সম্পদ প্রথম থেকেই ছিল। মোহরূপ আসুরী-সম্পদ আগন্তুকরূপে তাঁর মধ্যে এসেছিল, যা পরে ভগবদ্‌কৃপায় দূর হয়—**'নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদাৎ ময়াচ্যুত'** (১৮।৭৩)। তাই ভগবান এখানে বলেছেন, 'ওহে অর্জুন ! তুমি চিন্তা কোরো না ; তুমি দৈবী-সম্পদ প্রাপ্ত।'

অর্জুন নিজের মধ্যে দৈবী-সম্পদ দেখতে পাননি তাই ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে তোমার মধ্যে দৈবী-সম্পদ প্রকটিত। যাঁরা শ্রেষ্ঠ পুরুষ, তাঁরা নিজেদের ভালো গুণ দেখতে পান না এবং কোনো অবগুণ (দোষ) তাঁদের মধ্যে থাকে না। নিজের গুণ দেখতে না পাওয়ার কারণ হল এই যে গুণগুলির সঙ্গে তিনি অভিন্ন হন। যেমন, কাজলকে চোখে লাগালে সেই কাজল আর দেখা যায় না, তা চোখের সঙ্গে মিশে থাকে । তেমনই দৈবী-সম্পদের সঙ্গে অভিন্ন হলে গুণ আর দেখা যায় না। যতক্ষণ নিজ গুণ পরিলক্ষিত হয়, বুঝতে হবে ততক্ষণ গুণাদির সঙ্গে ঐক্য হয়নি। গুণকে তখনই দেখা যায়, যখন এগুলি নিজের থেকে দূরে থাকে। তাই ভগবান অর্জুনকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, তোমার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই দৈবী-সম্পদ বিরাজমান, তা যদি তুমি বুঝতে নাও পার তার জন্য চিন্তা কোরো না।

মর্মার্থ

ভগবান কৃপা করে মানবশরীর প্রদান করেছেন, তাই জীবনের সাফল্যের জন্য নিজ ভাব ও আচরণাদির ওপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। কারণ এ দেহের কিছুই ঠিক নেই, কখন প্রাণত্যাগ হয়ে যায়। এই অবস্থায় শীঘ্রই নিজ উদ্ধারের জন্য দৈবী-সম্পদের আশ্রয় এবং আসুরী-সম্পদ পরিত্যাগ করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

দৈবী-সম্পদে 'দেব' শব্দটি পরমাত্মার বাচক এবং তাঁর সম্পদকে বলা হয় 'দৈবী-সম্পদ'—**'দেবস্যেয়ং দৈবী'**। পরমাত্মার অংশ হওয়ায় জীবের মধ্যে দৈবী-সম্পদ স্বাভাবিকভাবেই থাকে। যখন জীব নিজ অংশী পরমাত্মা হতে বিমুখ হয়ে জড় প্রকৃতির সম্মুখীন হয় অর্থাৎ উৎপত্তি-বিনাশশীল শরীরাদি পদার্থে আসক্ত হয়, তখন তার মধ্যে আসুরী-সম্পদ উৎপন্ন হয়। কারণ কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-দম্ভ-দ্বেষ ইত্যাদি যত দুর্গুণ-দুরাচার আছে, সে সবই বিনাশশীল পদার্থের আসক্তি থেকেই উদ্ভূত হয়। যারা প্রাণকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়, প্রাণেতেই যাদের ভালোবাসা, আনন্দ, এরূপ প্রাণপোষণপরায়ণ ব্যক্তিদের বাচক হল 'অসুর' শব্দটি—**'অসুষু প্রাণেষু রমন্তে ইতি অসুরাঃ'**। তাই 'আমি সুখে বেঁচে থাকব'—এই আকাঙ্ক্ষা আসুরী-সম্পদের প্রধান লক্ষণ।

সকল প্রাণীর মধ্যেই দৈবী ও আসুরী-সম্পদ পাওয়া যায় (১৬।৬)। এমন কোনো সাধারণ প্রাণী নেই, যার মধ্যে এই দুটি না থাকে। তবে এর মধ্যে জীবন্মুক্ত, তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষগণ আসুরী-সম্পদ থেকে সর্বতোভাবে বর্জিত হন[১], কিন্তু কেউই কখনো দৈবী-সম্পদ রহিত হন না। কারণ জীব 'দেব' অর্থাৎ পরমাত্মার সনাতন অংশ। তাই পরমাত্মার অংশ হওয়ায় তার মধ্যে দৈবী-সম্পদ থাকেই। আসুরী-সম্পদ প্রাধান্য পাওয়ায় দৈবী-সম্পদ অবদমিত হয়

[১]জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ বিনাশশীল বস্তুগুলিতে আসক্তিবর্জিত হয়ে অবিনাশী পরমাত্মায় স্থিত হন। তাই তাঁর মধ্যে বাঁচার আগ্রহ বা মৃত্যুভয়—কোনোটাই থাকে না। সত্যস্বরূপ পরমাত্মাতে স্থিত হওয়ায় তাঁদের মধ্যে সদ্‌গুণ-সদাচার স্বতঃই স্বাভাবিকভাবে থাকে। এইসব সিদ্ধমহাপুরুষ দৈবী-সম্পদেরও ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন। তাই তাঁদের মধ্যে দৈবী-সম্পদের গুণ স্বাভাবিকভাবেই থাকে, সাধকের পক্ষে যা আদর্শস্বরূপ।

কিন্তু দূর হয় না। কারণ সৎ-বস্তু কখনোই নষ্ট হয় না। তাই কোনো ব্যক্তি সর্বতোভাবে দুর্গুণ ও দুরাচারী হতে পারে না, সর্বভাবে মিথ্যাবাদী হতে পারে না, সর্বতোভাবে ব্যভিচারী হতে পারে না। কোনো ব্যক্তিই সম্পূর্ণভাবে দুর্গুণ-দুরাচারী হতে পারে না। কোনো ব্যক্তি যতই দুর্গুণ-দুরাচারী হোক না কেন, তার মধ্যে অংশতঃ সদ্‌গুণ-সদাচার থাকেই। দৈবী-সম্পদ প্রকটিত হলে আসুরী-সম্পদ দূর হয়ে যায়। কারণ দৈবী-সম্পদ পরমাত্মার হওয়ায় এটি অবিনাশী আর আসুরী-সম্পদ জগৎ-সংসারের হওয়ায় বিনাশশীল।

সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মার অংশ হওয়ায় 'আমি সর্বদা বেঁচে থাকব অর্থাৎ কখনো যেন না মরি' ; 'আমি সবকিছু জানবো অর্থাৎ অজ্ঞান হয়ে থাকব না' ; 'আমি সর্বদা সুখে থাকব অর্থাৎ কখনো দুঃখ যেন না পাই'—এইরূপ সৎ-চিৎ-আনন্দের আকাঙ্ক্ষা প্রাণীমাত্রেরই থাকে। কিন্তু তার ভ্রম হয় এই যে সে, 'আমি এই দেহসহিত বাঁচব', 'এই বুদ্ধি সহযোগে জ্ঞানী হব', 'এই ইন্দ্রিয় ও দেহ সহযোগে সুখ নেব'—এইসব আকাঙ্ক্ষা বিনাশশীল জগৎ দ্বারাই পূর্ণ করতে চায়। এইরূপ প্রাণের প্রতি আসক্তি থাকায় আসুরী-সম্পদই[1] বিরাজ করে। এতে একটি বিশেষ ব্যাপার হল এই যে, প্রাণীর মধ্যে যে চিরকাল বেঁচে থাকার ইচ্ছা— আমি যেন না মরি, এরূপ যে ইচ্ছা তার তাৎপর্য যে সে অমর হতে চায়। বেঁচে থাকতে ভালো লাগে অর্থাৎ বেঁচে থাকাই তার পক্ষে স্বাভাবিক চাহিদা আর মৃত্যুতে ভয় হয় তার মানে হল মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। তেমনই জ্ঞানবর্জিত হওয়া খারাপ লাগে অর্থাৎ অজ্ঞান তার সঙ্গী নয়। দুঃখ খারাপ লাগে—এর তাৎপর্য হল দুঃখ তার স্বাভাবিক সঙ্গী নয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে জীব হল 'সৎ' স্বরূপ। তার স্বরূপ 'অসৎ' নয়। সৎ-স্বরূপ হয়েও সে সৎকে কেন চায় ? কারণ সে বিনাশশীল অসৎ শরীরাদিকে 'আমি' ও 'আমার' বলে মেনে তাতে আসক্ত হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ নিজে সৎ হয়েও অসৎকে স্বীকার করাতেই তার সৎ-এর আকাঙ্ক্ষা হয় ; জড়ত্ব স্বীকার করার ফলে স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ হওয়ায় জ্ঞানের পিপাসা জাগে ; স্বয়ং সুখস্বরূপ হয়েও দুঃখরূপ জগৎকে স্বীকার করায় সুখের আকাঙ্ক্ষা হয়। কিন্তু এই সকল আকাঙ্ক্ষার পূর্তিও সে অসৎ-জড়-দুঃখরূপ জগৎ-সংসারের সাহায্যেই করতে চায়। তাদাত্ম্যের জন্য এই শরীরকেই চিরকাল ধরে রাখতে চায়, বুদ্ধির সাহায্যেই জ্ঞানী হতে চায়, শরীরের সাহায্যেই শ্রেষ্ঠ ও সুখী হতে চায়, নিজ নাম ও রূপকে স্থায়ী করে রাখতে চায়। এইরূপ অসৎ-এর সঙ্গ (আসক্তি) থেকে আসুরী-সম্পদের উদ্ভব হয়। তদনুরূপ অসৎ-সঙ্গ ত্যাগ করলে আসুরী-সম্পদ দূর হয় এবং দৈবী-সম্পদ প্রকটিত হয়।

যখন সৎসঙ্গ, স্বাধ্যায় ইত্যাদির দ্বারা মানুষের পরমাত্ম-প্রাপ্তি করার চিন্তা হয়, তখন সে তার জন্য দৈবী-সম্পদ অবলম্বন করতে চায়। সে দৈবী-সম্পদ কর্মজাত ভেবে চেষ্টা দ্বারা অর্জন করতে চায়। যেমন, আমার সত্য বলা উচিত, আমাকে অহিংসক হতে হবে, দয়ালু হতে হবে ইত্যাদি। এইরূপ যত দৈবী-সম্পদরূপ গুণরাজি, সে সেগুলি নিজ ক্ষমতার সাহায্যে আহরণ করতে চায়। সিদ্ধান্ত হল এই যে কর্তব্যরূপে প্রাপ্ত এবং নিজ সামর্থ্য (পুরুষার্থ) দ্বারা প্রাপ্ত বস্তুগুলি স্বাভাবিক হয় না, সেগুলি কৃত্রিম হয়ে থাকে। তাছাড়াও নিজের পুরুষার্থের দ্বারা উপার্জিত বলে মনে করায় তা থেকে অহংবোধ জন্মায় যে 'আমি অত্যন্ত সত্যবাদী', 'আমি খুব ভালো লোক' ইত্যাদি। যতপ্রকার দুর্গুণ দুরাচার আছে, সেসব এই অহংবোধের প্রশ্রয়েই হয়ে থাকে এবং তাতেই পরিপুষ্ট হয়। তাই নিজ প্রচেষ্টায় যেসব সাধন করা হয়, সেই সাধনায় অহংবোধ একইভাবে থাকে এবং এই অহংকারে আসুরী-সম্পদ বিরাজ করে। ফলে দৈবী-সম্পদ প্রাপ্তির চেষ্টা করলেও আসুরী-সম্পদ পরিত্যক্ত হয় না। পরিণামে সে নিরাশ হয় এবং তার উৎসাহে ভাঁটা পড়ে, তার চেষ্টা কমে যায় এবং সে মেনে নেয় যে এসব তার কর্ম নয়। **সাধকের এমন অবস্থা কেন হয় ? কারণ সাধক বুঝতে পারে না যে আসুরী-সম্পদ থাকার আসল কারণ কী ? আসুরী-সম্পদের মূল কারণ হল বিনাশশীল বস্তুর আসক্তি । যতক্ষণ এই আসক্তি থাকবে, ততক্ষণ আসুরী সম্পদও থেকে যাবে । সে**

[1] দেহাভিমানে 'আমি সুখে জীবিত থাকি' এইরূপ প্রাণের মোহ থাকে। এই দেহাভিমান থেকে আসুরী-সম্পদের উদ্ভব হয়। তাই গীতায় 'দেহবদ্ভিঃ' (১২।৫), 'দেহিনম্' (৩।৪০ ; ১৪।৫, ৭) ইত্যাদি পদের দ্বারা যে দেহাভিমানীদের কথা বলা হয়েছে, তাদের আসুরী-সম্পদেরই অন্তর্গত বলে বুঝতে হবে।

বিনাশশীল বস্তুর আসক্তি ত্যাগ করে না ফলে আসুরী-সম্পদও তাকে ছাড়ে না অর্থাৎ আসুরী-সম্পদ থেকে সে সর্বতোভাবে রহিত হয় না। তাই যদি দৈবী-সম্পদ প্রাপ্ত করতে হয়, তাহলে বিনাশশীল জড়ের সঙ্গ (আসক্তি) পরিত্যাগ করতে হবে। বিনাশশীল বস্তুর সঙ্গ পরিত্যাগ করলে দৈবী-সম্পদ স্বতঃই প্রকটিত হয়। কারণ পরমাত্মার অংশ হওয়ায় পরমাত্মার সম্পদ তার মধ্যে স্বতঃসিদ্ধ, তা কর্তব্যরূপে তাকে উপার্জন করতে হয় না।

এখানে আর একটি বিশেষ কথা হল দৈবী-সম্পদের গুণ স্বতঃ স্বাভাবিক থাকে। একে কেউ পরিত্যাগ করতে পারে না। এটি কী করে জানা যায় ? যেমন, কেউ যদি চিন্তা করে যে আমি সারাজীবন সত্য কথা বলব, তাহলে সে সারা জীবন সত্য কথা বলতে পারে। কিন্তু কেউ যদি চিন্তা করে যে, আমি মিথ্যা কথা বলব, তবে সে আটটি প্রহরও মিথ্যা কথা বলতে পারবে না। সত্য কথা বলা ঠিক করলে সে সত্যের জন্য দুঃখ সহ্য করতে পারে, কিন্তু মিথ্যা বলতে বাধ্য করা যায় না। মিথ্যা কথাই বলব—এরূপ স্থির করলে তার পক্ষে খাওয়া-দাওয়া, কথা-বলা, চলা-ফেরা সবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায় । ক্ষুধা পেলে মিথ্যা বলতে হবে যে, 'ক্ষুধা নেই', এতে প্রাণ ধারণ করাই দুষ্কর হয়ে উঠবে। যদি সে প্রতিজ্ঞা করে বসে মিথ্যা বললে যদি মরতেও হয়, তবুও মিথ্যাই বলব, তাহলে তার এই প্রতিজ্ঞাই সত্য হয়ে ওঠে। সুতরাং হয় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হলে সত্য প্রকাশিত হবে অথবা প্রতিজ্ঞাই সত্য হয়ে উঠবে। সত্য ত্যাগ করা সম্ভব হবে না, কারণ মনুষ্যমাত্রেই সত্যের আকর্ষণ স্বাভাবিকভাবে রয়েছে। এইরূপ দৈবী-সম্পদের যত গুণই আছে সকলের সম্পর্কে এই একই কথা। এগুলো নিত্য বিরাজিত এবং স্বাভাবিক। শুধু বিনাশশীল পদার্থের সঙ্গ ত্যাগ করতে হয়। কারণ তা অনিত্য ও অস্বাভাবিক।

আসুরী-সম্পদ আগন্তুক। দুর্গুণ-দুরাচারও একেবারেই আগন্তুক। কেউ প্রসন্নভাবে থাকলে, লোকে বলে না যে তুমি প্রসন্ন থাক কেন ? কিন্তু কোনও ব্যক্তি দুঃখিত থাকলে, লোকে বলে তুমি দুঃখিতভাবে থাক কেন ? কারণ প্রসন্নতা স্বাভাবিক আর দুঃখভাব অস্বাভাবিক (আগন্তুক)। তাই সুব্যবহার যাঁরা করেন, তাঁদের কেউ বলে না যে আপনি কেন এত ভালো ব্যবহার করছেন। কিন্তু মন্দ ব্যবহার যাঁরা করেন, তাঁদের সকলে বলে, একি আপনি খারাপ ব্যবহার করছেন কেন ? সুতরাং সদ্‌গুণ ও সদাচার স্বতঃ ও স্বাভাবিক আর দুর্গুণ-দুরাচার সঙ্গদোষে হয়, তাই তা আগন্তুক।

অর্জুনের মধ্যে বিশেষভাবে দৈবী-সম্পদ ছিল। তাঁর মধ্যে যখন কাপুরুষতা দেখা গেল, ভগবান আশ্চর্য হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার মধ্যে এই কাপুরুষতা কোথা থেকে এল' (২।২-৩) ? তাৎপর্য হল এই যে, অর্জুনের এই দোষটি স্বাভাবিক নয়, আগন্তুক। আগে তাঁর মধ্যে এই দোষ ছিল না। অর্জুন পরে বলেছেন, 'যাতে আমার মঙ্গল সুনিশ্চিত হয় তাই আমাকে বলুন' (২।৭ ; ৩।২ ; ৫।১), যুদ্ধ নিয়েও 'আমার যেন মঙ্গল হয়' অর্জুনের সেই ইচ্ছাই ছিল। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে অর্জুনের মধ্যে আগে থেকেই দৈবী-সম্পদ ছিল, নচেৎ উর্বশীর ন্যায় সুন্দরী অপ্সরাকে ফিরিয়ে দেওয়া কোনো সাধারণ মানুষের কাজ নয়। সেই অর্জুনই চিন্তা করছেন যে, 'আমি দৈবীসম্পদপ্রাপ্ত কি না ?' 'আমি তার অধিকারী কি না ?' তাই তাঁকে আশ্বস্ত করে ভগবান বলেছেন যে, 'তুমি শোক কোরো না ; তুমি দৈবী-সম্পদ প্রাপ্ত'—**'মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব'** (১৬।৫)।

সৎ (চেতন) ও অসৎ (জড়)-এর তাদাত্ম্য থেকে 'অহম্' ভাব জন্ম নেয়। মানুষ শুভ বা অশুভ যে কোনো কাজই করুক, নিজ অহংভাব নিয়ে করে। যখন সে পরমাত্মার অভিমুখী হয় তখন তার অহংভাবে সৎ-অংশের প্রাধান্য থাকে আবার যখন জগৎ-অভিমুখী হয় তখন তার অহং-এ বিনাশশীল অসৎ-অংশ প্রাধান্য পায়। সৎ-অংশের প্রাধান্য হলে তিনি দৈবী-সম্পদের অধিকারী বলে বলা হয় আর অসৎ-অংশের প্রাধান্য হলে তিনি তার অনধিকারী হয়ে থাকেন। অসৎ-অংশ দূর করার জন্যই এই মানব-দেহ প্রাপ্তি। সুতরাং মানুষ হীনবল নয়, পরাধীন নয়, বরং সে সর্বতোভাবে সবল এবং স্বাধীন। বিনাশশীল, অসৎ-অংশ সকলেরই দূর হতে থাকে, কিন্তু মানুষ তার সঙ্গে নিজ সম্বন্ধ (আসক্তি) বজায় রাখে, এই হল তার ভুল। বিনাশশীল পদার্থের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার জন্যই আসুরী-সম্পদ সর্বতোভাবে দূর হয় না।

অহংবোধ আসে বিনাশশীল, অসৎ-এর সম্পর্ক থেকেই। অসৎ-এর সঙ্গে সম্পর্ক দূর হলেই অহংভাব দূর হয়। প্রকৃতির অংশ ধরে রাখলেই অহংভাব হয়। অহং-এ জড় ও চেতন দুই-ই থাকে। তাদাত্ম্য হওয়ায় পুরুষ (চেতন)

জড়ের সঙ্গে নিজেকে এক বলে মনে করে। ভোগ করার আকাঙ্ক্ষাগুলি সবই অসৎ-অংশে থাকে। কিন্তু সুখ-দুঃখ ভোগে পুরুষই হেতু হয়ে থাকে—**'পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে'** (১৩।২০)। আসলে সে হেতু হয় না ; পুরুষ প্রকৃতিস্থ হলে তবেই ভোক্তা হয়—**'পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে'** (১৩।২১)। সুতরাং সুখ-দুঃখরূপ যে বিকার উৎপন্ন হয়, তা প্রধানতঃ জড়-অংশেই হয়। কিন্তু তাদাত্ম্য হওয়ায় তার পরিণাম জ্ঞাতা-চেতনেই হয় যে 'আমি সুখী' অথবা 'আমি দুঃখী'। যেমন, বিবাহের পর স্ত্রীর (মহিলার) যা প্রয়োজন হয়, সেগুলিকে স্বামীর নিজেরই প্রয়োজন বলে বোধ হয়। কোনো ব্যক্তি যখন গহনা ইত্যাদি ক্রয় করে, তা স্ত্রীর জন্যই ক্রয় করে, তার নিজের গহনার কোনো প্রয়োজনীয়তা থাকে না। তেমনই জড়-অংশের সম্বন্ধের জন্যই চেতনে জড়ের ইচ্ছা ও ভোগ করার আকাঙ্ক্ষা জন্মায়। জড়ের ভোগ জড়-অংশেই হয়, কিন্তু জড়ের সঙ্গে তাদাত্ম্য হওয়ায় ভোগের পরিণাম শুধু জড়ের হয় না অর্থাৎ সুখ-দুঃখের ভোক্তা কেবলমাত্র জড়-অংশ হতে পারে না। পরিণামের জ্ঞাতা চেতনই ভোক্তা হয়। যতপ্রকার ক্রিয়া সংঘটিত হয়, তা সবই প্রকৃতিতে হয়ে থাকে (৩।২৭ ; ১৩।২৯), কিন্তু তাদাত্ম্যের জন্য চেতন সেগুলি নিজের বলে জ্ঞান করে যে 'আমি কর্তা'। তাদাত্ম্যতে চেতনের (পরমাত্মার) ইচ্ছায় চেতনের প্রাধান্য এবং জড় (জগৎ)-এর ইচ্ছায় জড়ের প্রাধান্য থাকে। যখন চেতনের প্রাধান্য থাকে তখন দৈবী-সম্পদ প্রকটিত হয় আর যখন জড়ের প্রাধান্য থাকে তখন আসুরী-সম্পদ উদ্ভূত হয়। জড়ের সঙ্গে একাত্ম হলেও সৎ-চিৎ ও আনন্দের ইচ্ছা চেতনে জাগরূক থাকে। জগতে এমন কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই, যা এই তিনটি (সর্বদা থাকা, সবকিছু জানা এবং সর্বসময় সুখী থাকা) ইচ্ছাতে সম্মিলিত না হয়। তবে এতে ভুল এই হয় যে, এই ইচ্ছাগুলি জড়-জগৎ দ্বারা পূরণের ইচ্ছা রাখা হয়।

জড় এবং আসুরী-সম্পদ স্বয়ং (চেতন) স্বীকার করেছে। জড়ের এমন ক্ষমতা নেই যে, সে স্বয়ং-এর সঙ্গে স্থিরভাবে অবস্থান করে, কারণ জড়ে সর্বসময় পরিবর্তন হতে থাকে। চেতন যদি সেটি না ধরে, তবে সে স্বতঃই মুক্ত থাকে। কারণ চেতনে কখনো বিকার হয় না। এটি সর্বদা একইভাবে বিরাজ করে। কিন্তু অসৎ প্রকৃতি নিত্য-নিরন্তর পরিবর্তিত হয়। তা কখনো একরূপে থাকে না। চেতন প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্বীকার করে নিয়েছে। সেই সম্পর্কের অস্তিত্ব সে 'আমি' এবং 'আমার'রূপে স্বীকার করেছে। সুতরাং জড়ের সম্পর্ক এবং তার থেকে উদ্ভূত আসুরী-সম্পদ আগন্তুক। এটি যদি স্বয়ং-এ হয়, তাহলে এর কোনো বিনাশ নেই ; কারণ স্বয়ং কখনো নাশ হয় না এবং তাহলে আসুরী-সম্পদ ত্যাগ করার কথাই ওঠে না। অনিত্য হলেও চেতনের সম্পর্কে থাকায় এটি নিত্য বলে প্রতিভাত হয়। অবিনাশীর সম্বন্ধ থেকে বিনাশশীলও অবিনাশীর মতো পরিলক্ষিত হয়। তাই যেসব ব্যক্তির মধ্যে আসুরী-সম্পদ থাকে তারা আসুরী-সম্পদ পরিত্যাগ করে কল্যাণ আচরণ দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হতে সক্ষম (১৬।২২)।

পরমাত্মার সম্মুখীন হওয়ামাত্রই আসুরী-সম্পদ দূর হতে থাকে—

সনমুখ হোই জীব মোহি জবহীঁ।
জন্ম কোটি অঘ নাসহিঁ তবহীঁ॥

(শ্রীরামচরিতমানস ৫।৪৪।১)

কারণ কোটি জন্মের পাপ প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্বীকার করলেই হয়। প্রকৃতিকে যদি স্বীকার না করা হয় তাহলে আর জন্ম-মৃত্যু কী করে হবে ? প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধই জন্ম-মৃত্যুর কারণ—**'কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু'** (১৩।২৯)। কিন্তু জীবাত্মা প্রকৃতির ক্রিয়াগুলিকে নিজের বলে মেনে নেয়, এবং প্রকৃতির কার্য শরীরে আমি-আমার সম্বন্ধ করে, যার ফলে সে জন্ম-মৃত্যু চক্রে ঘুরতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে সে কর্তাও নয় এবং লিপ্তও হয় না—**'শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে'** (১৩।৩১)। এই বাস্তব সত্য অনুভব করাই হল 'কর্মে অকর্ম' এবং 'অকর্মে কর্ম' দেখা। এর তাৎপর্য হল এই যে, কর্ম করেও এটি সর্বদা নির্লিপ্ত ও অকর্তা হয়ে থাকে এবং নির্লিপ্ত বা অকর্তা রূপে থেকেও এটি কর্ম করে থাকে অর্থাৎ কর্ম করাকালে এবং কর্ম না-করার কালে এটি (আত্মা) সর্বসময় নির্লিপ্ত এবং অকর্তা রূপে থাকে। যে ব্যক্তি এই বাস্তব সত্য অনুভব করেন, তিনিই সকল মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমান (৪।১৮)। যার মধ্যে কর্তৃত্ব-ভাব নেই আর যার বুদ্ধিতে লিপ্ততা নেই অর্থাৎ কোনো কামনা নেই, সে যদি সকল প্রাণীকে বধও করে, তাহলেও তার পাপ হয় না (১৮।১৭)। অর্জুন প্রশ্ন করেছিলেন যে, 'মানুষ কার দ্বারা প্রেরিত হয়ে পাপ-কাজ করে থাকে ?'

ভগবান উত্তরে বললেন—কামনাবশতঃই (৩।৩৬-৩৭) সকল পাপ-কাজ হয়ে থাকে। শরীরের সঙ্গে তাদাত্ম্যের জন্যই ভোগ ও সংগ্রহের কামনা হয়ে থাকে[১]। সুতরাং জড়ের সঙ্গ (আসক্তিই) সমস্ত পাপ ও আসুরী-সম্পদের কারণ। জড়ের সঙ্গ না হলে দৈবী-সম্পদ স্বতঃসিদ্ধ হয়।

অর্জুন সাধকমাত্রেরই প্রতিনিধি। তাই অর্জুনকে নিমিত্ত করে ভগবান সাধকদের আশ্বাস দিয়ে বলেছেন যে, 'তুমি চিন্তা কোরো না ; আসুরী-সম্পদ যদি অনুভূত হয়, তাহলেও ভয় পেয়ো না। কারণ তোমার মধ্যে দৈবী-সম্পদ স্বতঃই বিরাজমান'—

মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব। (১৬।৫)

তাৎপর্য হল এই যে সাধকের পারমার্থিক উন্নতির ব্যাপারে কখনো নিরাশ হতে নেই। কারণ পরমাত্মার অংশ হওয়ায় মনুষ্যমাত্রের মধ্যেই পরমাত্মার সম্পদ (দৈবী-সম্পদ) থাকেই। পরমাত্মপ্রাপ্তির উদ্দেশ্য হলেই দৈবী-সম্পদ স্বতঃই প্রকটিত হয়।

পরমাত্মার অংশ হওয়ায় সাধকের পরমাত্মপ্রাপ্তিতে কখনো নিরাশ হওয়া উচিত নয়। কারণ পরমাত্মা কৃপা করে এই মনুষ্যদেহ দিয়েছেন, তাঁকে লাভ করার জন্যই। পরমাত্মার সংকল্প হল আমাদের কল্যাণের। আমরা যদি পৃথক্ কোনো সংকল্প না করি, তাঁর সংকল্পেই আমাদের সংকল্প মিলিত করে দিই, তাহলে তাঁর কৃপায় স্বতঃই আমাদের কল্যাণ লাভ হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব—জীবের একদিকে ভগবান অন্যদিকে জগৎ সংসার। যখন সে ভগবানের দিকে মুখ ফেরায় (শরণাগত হয়) তখন তার মধ্যে দৈবী-সম্পদ আসে আর যখন সংসারমুখী হয়, তখন তার মধ্যে আসুরী-সম্পদ আসে। দৈবী-সম্পদে আস্তিক ভাব থাকে আর আসুরী-সম্পদে নাস্তিক ভাব থাকে। যদিও মুক্তির সকল সাধনই (কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ ইত্যাদি) দৈবী-সম্পদের অন্তর্গত—**'দৈবী-সম্পদ-বিমোক্ষায়'**, তা সত্ত্বেও দৈবী-সম্পদে ভক্তিরই প্রাধান্য। তাই ভক্তির প্রকরণে ভগবান বলেছেন—

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ। ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্॥ (গীতা ৯।১৩)

'হে পার্থ ! দৈবী-প্রকৃতির আশ্রিত অনন্যচিত্ত মহাপুরুষগণ আমাকে সকল প্রাণীর আদি ও অবিনাশী জেনে আমার ভজনা করেন।'

পরেও ভগবান বলেছেন যে—**'মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয়'** (১৬।২০)। মুক্তির সকল সাধনই ভক্তির অন্তর্গত। নিজের প্রাণের প্রতি যার মোহ থাকে, সেই প্রাণপোষণপরায়ণ মানুষরা আসুরী-সম্পদযুক্ত হয়ে থাকে। কিন্তু যাঁরা ভগবানকে নিজের প্রাণের থেকেও প্রিয় বলে মনে করেন তাঁরা দৈবী-সম্পদসম্পন্ন হন।

অন্যের সুখের জন্য কর্ম করা অথবা অন্যের সুখ আকাঙ্ক্ষা করা হল 'চৈতন্য' আর নিজ সুখের জন্য কর্ম করা অথবা নিজের সুখ কামনা করা হল 'জড়ত্ব'। ভজন-ধ্যানও নিজের সুখের জন্য, শরীরের আরাম, মান-সম্মানের জন্য করাও জড়ত্ব। চৈতন্যের প্রাধান্য থাকলে দৈবী-সম্পদ প্রাপ্তি হয় আর জড়ত্বের প্রাধান্যে আসুরী-সম্পদ প্রাপ্তি হয়।

মূল দোষ একটিই, যার ফলে সমস্ত আসুরী-সম্পদ উৎপন্ন হয় আর মূল গুণও একটি, যাতে সমস্ত দৈবী-সম্পদ প্রকটিত হয়। মূল দোষ হল— শরীর এবং জগৎ-সংসারকে অস্তিত্ব ও গুরুত্ব দিয়ে তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা। মূল গুণ হল—ভগবানের অস্তিত্ব ও মহত্ত্ব স্বীকার করে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা। এই মূল দোষ আর মূল গুণই স্থানভেদে নানারূপে প্রতিভাত হয়।

যতক্ষণ গুণের সঙ্গে অপগুণ থাকে, ততক্ষণ গুণাদির মহত্ত্ব দেখা যায় এবং তার অহংকার হয়ে থাকে। অপগুণ না থাকলে অহংকারও হয় না। অহংবোধ আসুরী-সম্পদের মূল। অহংকারের জন্যই মানুষ অন্যের চেয়ে নিজেকে বিশিষ্ট

[১]কেউই নিজেকে দোষী ভাবতে চায় না। কারণ ইহলোকে দোষী ব্যক্তিদের অপমান, তিরস্কার ও নিন্দা হয়ে থাকে এবং পরলোকে চুরাশী লক্ষ যোনি ও নরক ভোগ করতে হয়। কিন্তু মানুষ বিনাশশীল জড়ের সঙ্গদোষে উদ্ভূত কামনার বশীভূত হয়ে শাস্ত্র-নিষিদ্ধ কাজ করে বসে। সুতরাং সেই ক্রিয়ার পরিণাম কর্তার ইচ্ছা (আমি নির্দোষ থাকব—সেই) অনুযায়ী হয় না এবং কর্তা (নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে) দোষী বা পাপী হয়ে পড়েন।

বলে ভাবে—এটিই হল আসুরী-সম্পদ। অহংকারের জন্য দৈবী-সম্পদও আসুরী-সম্পদ বৃদ্ধির কারণ হয়ে ওঠে। গুণের সঙ্গে যদি অপগুণ না থাকে, তাহলে গুণের মহত্ত্ব চোখে পড়ে না আর তার অহংকারও হয় না। গুণাদির মহত্ত্ব না থাকায় সাধকের দৃষ্টি তাঁর নিজের গুণের দিকে যায় না, ফলে তিনি ভীত হয়ে পড়েন[১]। নিজের গুণাদির দিকে দৃষ্টি না থাকাতেই অর্জুন ভীত হয়ে মনে করেছিলেন যে তাঁর মধ্যে দৈবী-সম্পদ নেই ! এই অবস্থায় তাঁর চিন্তা দূর করার উদ্দেশ্যেই ভগবান বলেছেন—**'মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডবঃ'**।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—সকল প্রাণীতেই দুটি অংশ থাকে —চেতন ও জড়। তার মধ্যে কিছু প্রাণীর জড়ের থেকে বিমুখ হয়ে প্রধানতঃ চেতনের (পরমাত্মার) দিকে লক্ষ্য থাকে আর কিছু প্রাণীর লক্ষ্য থাকে চেতন থেকে বিমুখ হয়ে জড়ত্বের (ভোগ ও সম্পদ-সংগ্রহের) দিকে। এইরূপ চেতন ও জড়ের প্রাধান্য নিয়ে প্রাণীদের দুটি ভাগ হয়, ভগবান পরবর্তী শ্লোকে তাই জানাচ্ছেন।

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু॥ ৬ ॥

[**অস্মিন্, লোকে** (ইহলোকে) ; **দ্বৌ, এব** (দু'প্রকারেরই) ; **ভূতসর্গৌ** (প্রাণীর সৃষ্টি হয়) ; **দৈবঃ, চ, আসুরঃ** (দৈব ও আসুর) ; **দৈবঃ** (দৈবী-প্রকৃতির বর্ণনা) ; **বিস্তরশঃ, প্রোক্তঃ** (বিস্তারিতভাবে বলেছি) ; **পার্থ** (হে পার্থ!) ; **আসুরম্** (আসুরী-প্রকৃতিদের বর্ণনা) ; **মে, শৃণু** (আমার কাছে শোনো।)]

ইহলোকে (জগতে) দুইপ্রকার প্রাণীর সৃষ্টি হয়—দৈব ও আসুর। দৈবী প্রকৃতির বর্ণনা বিস্তারিতভাবে করেছি, তাই এখন হে পার্থ ! আসুরী-প্রকৃতির বিস্তারিত বর্ণনা আমার কাছে শোনো॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা—**'দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ'**—আসুরী-সম্পদের বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করতে গিয়ে ভগবান বলেছেন যে ইহলোকে প্রাণী দু'প্রকারের—দৈব এবং আসুর। তাৎপর্য হল এই যে প্রাণীমাত্রেই পরমাত্মা ও প্রকৃতি—এই দুটি অংশ থাকে (গীতা ১০।৩৯ ; ১৮।৪০)। পরমাত্মার অংশ হল চেতন আর প্রকৃতির অংশ জড়। এই চেতন অংশ যখন পরিবর্তনশীল, জড় অংশের সম্মুখীন হয়, তখন তার মধ্যে আসুরী-সম্পদ প্রকটিত হয় আর যখন সে জড় প্রকৃতি থেকে বিমুখ হয়ে পরমাত্মার সম্মুখীন হয়, তখন তার মধ্যে দৈবী-সম্পদ জাগরিত হয়।

'দেব' বলা হয় পরমাত্মাকে। পরমাত্মাকে লাভ করার যতপ্রকার সদ্‌গুণ-সদাচারের সাধন আছে, সেগুলি সবই দৈবী-সম্পদ। ভগবান যেমন নিত্য, তাঁর সাধন-সম্পদও তেমনই নিত্য। ভগবান পরমাত্মপ্রাপ্তির সাধনকে 'অব্যয়' বা অবিনাশী বলেছেন—**'ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্'** (গীতা ৪।১)।

'দ্বৌ ভূতসর্গৌ'-তে ভূত শব্দটির দ্বারা মানুষ, দেবতা, অসুর, রাক্ষস, ভূত, প্রেত, পিশাচ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা ইত্যাদি সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম প্রাণী ধরা হয়। কিন্তু অসুর-স্বভাব পরিত্যাগ করার বিচার শক্তি প্রধানতঃ মনুষ্যশরীরেই থাকে। তাই মানুষের আসুরী-স্বভাব সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা উচিত। সেটি ত্যাগ করলেই দৈবী-সম্পদ স্বতঃই প্রকটিত হয়।

মানুষের মধ্যে দৈবী এবং আসুরী—উভয় সম্পদই থাকে— **সুমতি কুমতি সব কেঁ উর রহহীঁ।**
নাথ পুরান নিগম অস কহহীঁ॥
(শ্রীরামচরিতমানস ৫।৪০।৩)

---

[১]একবার একজন সাধু অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে বলেন, 'আমার গীতার ওপর শ্রদ্ধা নেই, আমার কী হবে ? কারণ ভগবান বলেছেন যে—'অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি' (৪।৪০)।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, শ্রদ্ধা যারা করে না তাদের নাশ হয়—একথা কোথায় লিখেছে ? সাধু বললেন 'গীতায়'। আমি বললাম, গীতায় উদ্ধৃত বাক্যে আপনি ভয় পেয়েছেন, তাহলে এটি কী গীতার ওপর শ্রদ্ধা সূচিত করে না ? এই কথা শুনে সাধুটি প্রসন্ন হলেন।

অতি ক্রূর ব্যক্তির মনেও দয়া থাকে, খুব বড় চোরের মধ্যেও সততা বাস করে। এইভাবে দৈবী-সম্পদরহিত কেউই হতে পারে না। কারণ জীবমাত্রেই পরমাত্মার অংশ। তাদের মধ্যে দৈবী-সম্পদ স্বাভাবিকভাবে থাকে আর আসুরী-সম্পদ নিজের দ্বারা সৃষ্টি করা হয়। নির্মল হৃদয়ের পরমাত্মা-অভিমুখী সাধকদের আসুরী-সম্পদ সর্বক্ষণ কষ্ট দেয়, অসহনীয় হয়, তাঁরা সেগুলি দূর করতেও যত্নশীল হন। কিন্তু যাঁরা ভজন-স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে আসুরী-সম্পদও পোষণ করেন অর্থাৎ কিছু কিছু ভজন-স্মরণ, জপ-ধ্যান ইত্যাদি করেন আবার জাগতিক ভোগ ও সংগ্রহেও ব্যাপৃত থাকেন এবং এটি প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন, তাঁদের প্রকৃতপক্ষে সাধক বলা যায় না। কারণ কিছুটা দৈবী-স্বভাব আর কিছুটা আসুরী-স্বভাব তো অতি নীচ প্রাণীর মধ্যেও স্বাভাবিকভাবে থাকে।

বিশেষভাবে লক্ষণীয় হল এই যে, অহংবোধের অনুরূপ প্রবৃত্তি হয় এবং প্রবৃত্তি অনুসারে অহংবোধ দৃঢ় হয়। যাঁর অহংবোধে 'আমি সত্যবাদী' এই ভাব থাকে, তিনি সত্য কথা বলেন এবং এতে তাঁর সত্যনিষ্ঠা দৃঢ় হয়। পরে আর তিনি কখনো মিথ্যা বলতে পারেন না। কিন্তু যার অহংবোধে 'আমি সংসারী এবং সংসারে ভোগ করা ও সম্পদ-সংগ্রহ করাই আমার কাজ' এরূপ ভাব থাকে, তার পক্ষে ছল-কপটতা করতে করতে তার অহংবোধে এই ভাব এতই দৃঢ় হয়ে যায় এবং সে ছল-চাতুরী ছাড়া কোনো কাজ করতে পারে না। 'আজকালের দিনে তো এমন করতেই হয়, এছাড়া কেউ বাঁচতে পারে না।' এইরূপে অহংবোধে দুর্ভাব বদ্ধমূল হলে দুরাচার থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে এবং এইজন্যই লোকে দুর্গুণ-দুরাচার থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব মনে করে।

পরমাত্মার অংশ হওয়ায় সৎ-ভাব থেকে কেউই রহিত হন না এবং শরীরের সঙ্গে অহং-মমত্ববোধ রাখলে দুর্ভাব থেকে কেউই সর্বতোভাবে রহিত হন না। দুর্ভাব এলেও সদ্‌ভাবের বীজ কখনো নষ্ট হয় না। কারণ সদ্‌ভাব হল 'সৎ' এবং 'সৎ'-এর কখনো বিনাশ নেই—**'নাভাবো বিদ্যতে সতঃ'** (২।১৬)। এর বিপরীত কুসঙ্গে দুর্ভাব উৎপন্ন হয় এবং যা উৎপন্ন হয় তা বিনাশশীল হয়ে থাকে—**'নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ'** (গীতা ২।১৬)।

মানুষের সদ্‌ভাব বা দুর্ভাবের প্রাধান্য নিয়েই প্রবৃত্তি গড়ে ওঠে। সদ্‌ভাব যখন প্রাধান্য পায় তখন মানুষ সদাচারী হয় আর যখন দুর্ভাব প্রাধান্য পায়, তখন সে দুষ্কর্ম করে থাকে। তাৎপর্য হল এই যে, যার উদ্দেশ্য থাকে পরমাত্মপ্রাপ্তি করা, তার মধ্যে সদ্‌ভাবের প্রাধান্য হয় এবং দুর্ভাব দূর হয়ে যায় এবং যার উদ্দেশ্য জাগতিক ভোগ ও সংগ্রহের দিকে থাকে, তার মধ্যে দুর্ভাব প্রাধান্য পায় এবং সদ্‌ভাব আচ্ছাদিত হতে থাকে।

'লোকেঽস্মিন্‌'—পদটির অর্থ হল পৃথিবীতেই নতুন নতুন অধিকার পাওয়া যায়। পৃথিবীর মধ্যে ভারতেই বিশেষ অধিকার পাওয়া যায়। ভারতে জন্ম নেওয়া ব্যক্তিদের দেবতারাও প্রশংসা করে থাকেন[১]। কল্যাণ লাভের সুযোগ একমাত্র ইহলোকেই থাকে। ইহলোকে জন্ম নিয়ে মানুষের বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে দৈবী-সম্পদ জাগ্রত করা উচিত। ভগবান অত্যন্ত কৃপাপূর্বক এই মনুষ্য-দেহ প্রদান করেছেন—

কবহুঁক করি করুনা নর দেহী।
দেত ঈস বিনু হেতু সনেহী॥

(শ্রীরামচরিতমানস ৭।৪৪।৩)

ভগবান যাদের মানুষ জন্ম প্রদান করেন, তিনি তাদের ওপর বিশ্বাস করেন যে, তারা নিজেদের উদ্ধার করবে। সেই আশাতেই তিনি মনুষ্যদেহ প্রদান করেন। ভগবান

---

[১](ক) অহো অমীষাং কিমকারি শোভনং প্রসন্ন এষাং স্বিদুত স্বয়ং হরিঃ।
যৈর্জন্ম লব্ধং নৃষু ভারতাজিরে মুকুন্দসেবৌপয়িকং স্পৃহা হি নঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ৫।১৯।২১)

'অহো! যে জীবগণ ভারতবর্ষে ভগবানের সেবা করার যোগ্য মনুষ্য জন্ম লাভ করেছেন, তাঁরা এমনকি পুণ্য করেছেন যে তাঁদের ওপর স্বয়ং শ্রীহরি প্রসন্ন হলেন? এই পরম সৌভাগ্য লাভের জন্য আমরাও নিরন্তর ব্যাকুল হই।'

(খ) গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি ধন্যাস্তু তে ভারতভূমিভাগে। স্বর্গাপবর্গাস্পদমার্গভূতে ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ॥

(বিষ্ণুপুরাণ ২।৩।২৪)

'দেবতাগণও নিরন্তর এই গায়ন করে থাকেন যে, যাঁরা স্বর্গ এবং অপবর্গের মোক্ষ মার্গভূত ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছেন, সেইসব ব্যক্তি আমাদের মতো দেবতাদের থেকেও বেশি ধন্য।'

বিশেষভাবে কৃপাপরবশ হয়ে মানুষকে তাঁর প্রাপ্তিলাভের সামগ্রী ও যোগ্যতা দিয়েছেন, তার সঙ্গে বিবেকও দিয়েছেন। তাই **'লোকেঽস্মিন্‌'** পদটি বিশেষভাবে মানুষের দিকেই ইঙ্গিত করায়। কিন্তু ভগবান তো প্রাণীমাত্রেই সমভাবে বিরাজমান—**'সমোঽহং সর্বভূতেষু'** (গীতা ৯।২৯)। ভগবান যেস্থানে বিরাজ করেন, তাঁর সম্পদও সেখানে থাকে, তাই **'ভূতসর্গৌ'** পদ ব্যবহার করেছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে প্রাণীমাত্রেই ভগবদ্‌ভিমুখী হতে সক্ষম। ভগবানের দিক থেকে তাতে কোনো বাধা নেই।

মানুষের মধ্যে যারা সর্বভাবে দুর্গুণ-দুরাচারে ব্যাপৃত থাকে, তারা চণ্ডাল এবং পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি পাপ-যোনি সম্ভূত প্রাণীদের থেকেও বেশি দোষী হয়। কারণ পাপ-যোনি সম্ভূত প্রাণীগণ পূর্বজন্মকৃত পাপবশতঃ পাপ-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং সেখানে বহু পূর্বজন্মের পাপের ফল ভোগ করে থাকে । কিন্তু দুর্গুণ-দুরাচারী ব্যক্তি জেনেশুনে বদ্‌ আচরণে প্রবৃত্ত হয় এবং নতুন নতুন পাপ করতে থাকে। পাপ-যোনিসম্পন্ন প্রাণী পূর্বতন পাপের ফল ভোগ করে উন্নতির দিকে অগ্রসর হয় আর দুরাচারী ব্যক্তি নতুন নতুন পাপ করে পতনের দিকে অগ্রসর হয়। এরূপ দুরাচারী ব্যক্তিদের জন্য ভগবান বলেছেন যে, যদি অত্যন্ত দুরাচারী ব্যক্তিও আমার অনন্য শরণাগত হয়ে আমাকে ভজনা করে, তাহলে সেও সদা বিরাজিত শান্তি প্রাপ্ত করতে পারে (৯।৩০-৩১)। এইরূপ অত্যন্ত পাপী ব্যক্তিও জ্ঞানরূপ নৌকার সাহায্যে সমস্ত পাপ হতে উদ্ধার পেতে সক্ষম হয় (৪।৩৬)। তাৎপর্য হল এই যে অত্যন্ত দুরাচারী এবং অত্যন্ত পাপী ব্যক্তিও যখন ভক্তি ও জ্ঞান লাভ করে নিজ উদ্ধার প্রাপ্ত করতে সক্ষম হয়, তাহলে অন্যান্য পাপযোনি-সম্ভূত প্রাণীর জন্য ভগবানের দিক থেকে কীসের বাধা থাকতে পারে। তাই এখানে 'ভূত' (প্রাণীকুল) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

মানবেতর প্রাণীর মধ্যেও অনেকের দৈবী প্রকৃতি লাভ করার কথা শুনতে, পড়তে বা দেখতে পাওয়া যায়। এরূপ অনেক উদাহরণ আছে, যাতে পশু-পক্ষী-যোনি সম্ভূত হলেও তাদের মধ্যে দৈবী-গুণ প্রকাশ পেয়েছে[১]। অনেক কুকুর এমনও দেখা গেছে, যে তাঁরা অমাবস্যা, একাদশী

[১]মহাভারতের শান্তিপর্বে এরূপ একটি প্রসঙ্গ আছে। শকুনিলুব্ধক নামে এক শিকারি ছিল। তার কাজ ছিল পশু-পক্ষী বধ করা। সে একদিন শিকার করতে জঙ্গলে গিয়েছিল। সারাদিন ঘুরেও কোনো শিকার পেল না। হঠাৎ আকাশ মেঘে ঢেকে গিয়ে জোরে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। শিকারি একটি গাছতলায় আশ্রয় নিল।

সেই গাছের ওপর এক কপোত-কপোতী থাকত। খাবার আনতে তারা বাইরে গিয়েছিল, বর্ষার জন্য কপোতী শীঘ্র ফিরে আসে। ডানা ভিজে থাকায় সে হঠাৎ নীচে পড়ে যায় এবং শিকারি তাকে ধরে খাঁচায় বন্ধ করে। কপোত বাসায় ফিরে কপোতীকে না দেখে বিলাপ করতে থাকে। তাই শুনে কপোতী বলল, 'হে প্রাণনাথ ! আপনি আমার জন্য কেন বিলাপ করছেন ? আপনি আপনার কর্তব্য পালন করুন। আমাদের এখানে উপস্থিত অতিথিকে রক্ষা করুন। কেন-না এটি গৃহস্থের প্রধান কর্তব্য। এঁর যাতে শীত না লাগে, ক্ষুধা দূর হয়—আপনার তা করা উচিত। আমি তো খাঁচায় বন্দি !' কপোতীর কথা শুনে কপোত ঠোঁটে করে শুকনো পাতা এবং ছোট ছোট কাঠ এনে জড়ো করল এবং কোনো গৃহ থেকে জ্বলন্ত কাঠ এনে আগুন জ্বালাল। শিকারি ঠাণ্ডায় কাঁপছিল। অগ্নিতাপে সে সুস্থ হল। তখন সে কপোতকে বলল, 'আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত, কী করা যায় ?' কপোত বলল, 'আপনি চিন্তা করবেন না, আপনি আমার অতিথি ; আমি আপনার ক্ষুধা দূর করার ব্যবস্থা করব।' কপোত কিছুক্ষণ চিন্তা করল কিন্তু সে নিজেকে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া ভিন্ন কোনো উপায় খুঁজে পেল না। সুতরাং সে তিনবার অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করে তাতে ঝাঁপ দিল। তাকে অগ্নিতে জ্বলতে দেখে শিকারি ভাবতে লাগল যে, এই কপোত আমাকে কত আরাম দিয়েছে ! এখন আমার ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য সে নিজেকেই আগুনে বিসর্জন দিল ! হায় আমি কত নিষ্ঠুর, নির্দয়, পাপী ! এ পক্ষী হয়েও এত মহৎ কাজ করছে আর আমি মানুষ হয়েও এমন নিষ্ঠুর কাজ করছি ! আজ থেকে আমি এমন পাপকাজ আর করব না। এরূপ স্থির করে সে খাঁচা থেকে কপোতীকে মুক্ত করে দিল। অগ্নি-দগ্ধ কপোতের শোকে বিলাপ করতে করতে কপোতী আগুনে ঝাঁপ দিল। তখনই সেই পাখি দুটিকে নিতে বিমান এল এবং পাখি দুটি তাতে বসে স্বর্গে গমন করল।

পাখিদের বিমানে যেতে দেখে শিকারি অস্ত্র ফেলে ভাবতে লাগল যে এখন থেকে আমিও সাধন-ভজন করব এবং ত্যাগ-তপস্যায় দেহ বিশীর্ণ করব—কিছুই খাব না। এই ভেবে সে কণ্টকপূর্ণ জঙ্গলে গিয়ে সাধনায় প্রবৃত্ত হল। কণ্টকে তার দেহের চামড়া ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল। বনে দাবাগ্নি জ্বলছিল। সে সেই অগ্নিতে প্রবেশ করে পুড়ে মরে যায়। অন্তকালে সাধন-ভজন করায় সেই ব্যাধ সদ্‌গতি লাভ করে।

ব্রত পালন করে এবং সেইদিন ভাত খায় না। সৎসঙ্গ অনুষ্ঠানেও মনুষ্যেতর প্রাণীদের এসে ভগবতীকথা শুনতে দেখা গেছে, সৎসঙ্গে সাপকে আসতেও দেখা গেছে। গোরক্ষপুরে যখন বারোমাস ধরে কীর্তন হয়েছিল, তখন একটি কালো কুকুর কীর্তন-মণ্ডলীর মধ্য দিয়ে হাঁটতো এবং যেখানে সৎসঙ্গ হত, সেখানে গিয়ে বসত। ঋষিকেশে স্বর্গাশ্রমে বটগাছের নীচে একটি সাপ আসত। সেখানে একজন সাধু থাকতেন। একদিন তিনি সাপটিকে বললেন, 'দাঁড়াও', সাপটি সেখানেই থেমে রইল। সাধুটি তাকে গীতা শোনালেন, সে চুপচাপ বসে রইল। গীতা সম্পূর্ণ হতেই সাপটি সেখান থেকে চলে গেল, আর কখনো সেখানে আসেনি। পশু-পক্ষীর মধ্যে এরূপ প্রকৃতি পূর্ব-সংস্কারবশতঃ স্বাভাবিকভাবেই হয়ে থাকে।

পশু-পক্ষীর মধ্যেও এরূপ দৈবী-সম্পদ গুণ দেখা গেলেও এটিও ঠিক যে সকলক্ষেত্রেই তাদের মধ্যে দৈবী-সম্পদ গুণগুলির বিকাশের ক্ষেত্র বা যোগ্যতা থাকে না। মানুষের মধ্যেই শুধু সেই সম্ভাবনা ও যোগ্যতা থাকে।

পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-লতা ইত্যাদি যত স্থাবর-জঙ্গম প্রাণী আছে, তাদের সকলের মধ্যে দৈবী ও আসুরী-সম্পদসম্পন্ন প্রাণী থাকে। মানুষের উচিত এইগুলিকে রক্ষা করা। কারণ এগুলিকে রক্ষা করার জন্য, সকলের ব্যবস্থা করার জন্যই মানুষের সৃষ্টি হয়েছে। এগুলির মধ্যেও যেসব সাত্ত্বিক পশু-পক্ষী ও বৃক্ষ-লতা আছে, সেগুলিকে বিশেষভাবে রক্ষা করা উচিত। কারণ সেগুলিকে রক্ষা করলে আমাদের দৈবী-সম্পদ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যেমন, গাভী আমাদের পূজ্য, তাকে ভালোভাবে রক্ষা ও পালন করা কর্তব্য ; গাভীই আমাদের জগৎ সৃষ্টির কারণ—**'গাবো বিশ্বস্য মাতরঃ'**। গাভীর ঘৃত থেকে যজ্ঞ হয়, মহিষের ঘী থেকে নয়। যজ্ঞ থেকে বৃষ্টি হয়। বৃষ্টি থেকে অন্নাদি খাদ্য এবং খাদ্য থেকে প্রাণী উৎপন্ন হয়। চাষের জন্য সেই প্রাণীর অর্থাৎ বলদের প্রয়োজন হয়। এই বলদও গো-ধন শ্রেণীভুক্ত। বলদের দ্বারা চাষ হয় অর্থাৎ বলদ দ্বারা হালচাষ হয় এবং কূপ থেকে জল সেচন করে চাষবাস করা হয়। চাষের দ্বারা অন্ন-বস্ত্র ইত্যাদি নির্বাহের বস্তুসকল উৎপন্ন হয়, যার সাহায্যে মানুষ, পশু ইত্যাদি সকলেরই জীবন নির্বাহ হয়। শরীর-নির্বাহে গাভীর ঘি-দুধও আমাদের প্রয়োজন। এই ঘি-দুধের দ্বারা আমাদের শরীরে বল আসে এবং চিত্তে সাত্ত্বিক ভাব জন্মায়। এইরূপ যতপ্রকার বৃক্ষ-লতা আছে, তার মধ্যে সাত্ত্বিক পদার্থে কায়কল্প হয়, রোগ দূর হয় এবং দেহ পুষ্টি লাভ করে। তাই এইসব সাত্ত্বিক পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-লতাকে বিশেষভাবে রক্ষা করা উচিত, যাতে আমাদের ইহলোক এবং পরলোক—উভয়ই পরিশুদ্ধ হয়।

'দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্তঃ'—ভগবান বলেছেন যে আমি বিস্তারিতভাবে দৈবী-সম্পদের কথা বর্ণনা করেছি। এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে নটি, দ্বিতীয় শ্লোকে এগারোটি এবং তৃতীয় শ্লোকে ছটি—এইভাবে দৈবী-সম্পদের মোট ছাব্বিশটি লক্ষণের বর্ণনা করা হয়েছে। তার আগেও গুণাতীতের লক্ষণে (১৪।২২-২৫), জ্ঞানের সাধনে (১৩।৭-১১), ভক্তদের লক্ষণে (১২।১৩-১৯), কর্মযোগীর লক্ষণে (৬।৭-৯) এবং স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণে (২।৫৫-৭১) দৈবী-সম্পদের বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

'আসুরং পার্থ মে শৃণু'—ভগবান বলেছেন যে, এবার তুমি আসুরী-সম্পদের কথা বিস্তারিতভাবে আমার কাছে শোনো। অর্থাৎ যেসব ব্যক্তি শুধুমাত্র প্রাণ পোষণ-পরায়ণ হয়, তাদের স্বভাব কেমন হয়—তা আমার কাছ থেকে শোনো।

পরিশিষ্ট-ভাব—দৈবী এবং আসুরী—জাগতিক হওয়ায় দু'প্রকারের প্রাণীই লৌকিক। অলৌকিক তত্ত্বে এই দুটিই নেই। সাধনও লৌকিক এবং অলৌকিক দু'প্রকারের হয়, কিন্তু সাধ্য শুধু অলৌকিকই হয়ে থাকে। অলৌকিক তত্ত্ব ব্যাপক, অনন্ত,অপার। লৌকিকও তার অন্তর্গত। প্রকৃতপক্ষে লৌকিকের কোনো পৃথক্ অস্তিত্বই নেই। সবই অলৌকিক। জীবই লৌকিককে ধারণ করেছে—**'যয়েদং ধার্যতে জগৎ'** (গীতা ৭।৫)। তাৎপর্য হল যে, যতক্ষণ জীবের দৃষ্টিতে জগৎ-সংসারের গুরুত্ব পরিলক্ষিত হয়, ততক্ষণ জগৎ 'লৌকিক' থাকে। সংসারের অস্তিত্ব না থাকলে সবই 'অলৌকিক'—**'বাসুদেব সর্বম্'**, **'সদসচ্চাহম্'**।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—ভগবানে বিমুখ মানুষের মধ্যে আসুরী-সম্পদ কোন্ ক্রম[১] *অনুসারে আসে, পরবর্তী শ্লোকে সে কথা বর্ণনা করেছেন।*

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে॥ ৭ ॥

[আসুরাঃ (আসুরীপ্রকৃতি সম্পন্ন) ; জনাঃ (ব্যক্তিগণ) ; ন, বিদুঃ (জানে না) ; প্রবৃত্তিম্, চ, নিবৃত্তিম্ (প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি কী) ; চ, তেষু (এবং তাদের মধ্যে) ; শৌচম্ (বাহ্যশুদ্ধি) ; আচারঃ (শ্রেষ্ঠ আচরণ) ; চ, সত্যম্ (তথা সত্যপালন) ; অপি (বলেও) ; ন, বিদ্যতে (কিছু থাকে না।)]

প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি কী তা আসুরী প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ জানে না এবং তাদের মধ্যে বাহ্যশুদ্ধি, শ্রেষ্ঠ আচরণ এবং সত্য পালন বলেও কিছু থাকে না ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা—**'প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ'** —আজকালকার উচ্ছৃঙ্খল পরিবেশ, খাওয়া-দাওয়া, শিক্ষা ইত্যাদির প্রভাবে মানুষ প্রায়শঃই প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি অর্থাৎ কিসে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত আর কিসে নিবৃত্ত হওয়া উচিত—তা জানে না, জানতে আগ্রহীও হয় না। কেউ তাদের বলতে গেলে তারা শোনে না, হাসি-ঠাট্টায় উড়িয়ে দেয়, তাকে মূর্খ বলে মনে করে এবং অহংবশতঃ নিজেদের অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলে মনে করে। কিছু ব্যক্তি (প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি) জানলেও, আসুরী প্রভাববশতঃ কর্তব্য-কর্মে প্রবৃত্ত এবং নিষিদ্ধ কর্মে নিবৃত্ত হয় না। সেইজন্যই সর্বপ্রথমে আসুরী-সম্পদের আগমন হয়—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি না জানলে।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিকে কেমন করে জানা যায় ? এটি গুরুর সাহায্যে, গ্রন্থের সাহায্যে বা আলাপ-আলোচনার দ্বারা জানা যায়। তাছাড়াও মানুষের যখন কোনো বিপদ হয়, মানুষ যখন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে, কোনো বিশেষ ঘটনা ঘটে, তখন বিবেক-শক্তি জাগরিত হলেও এটি জানতে পারে। কোনো মহাপুরুষের দর্শন লাভ করলে পূর্ব-সংস্কারবশতঃ মানুষের আচার পরিবর্তিত হয় অথবা যেস্থানে মহাপ্রভাবশালী সাধুগণ জন্মেছেন, সেই স্থানে, তীর্থাদিতে গেলেও বিচারশক্তি জাগরিত হয়।

প্রাণীমাত্রেরই বিবেক থাকে, কিন্তু পশু-পক্ষীর মধ্যে এটি বিকশিত করার অবকাশ, ব্যবস্থা এবং যোগ্যতা থাকে না এবং মানুষের মধ্যে এটি বিকশিত করার অবকাশ, ব্যবস্থা এবং সম্পূর্ণ যোগ্যতা থাকে। পশু-পক্ষীর মধ্যে এই বিবেক শুধুমাত্র তাদের শরীর-নির্বাহ পর্যন্তই সীমিত থাকে, কিন্তু মানুষ সেই বিবেকের সাহায্যে নিজের, নিজের পরিবারের এবং অন্যান্য প্রাণীর পালন-পোষণও করতে সক্ষম হয়, দুর্গুণ-দুরাচার পরিত্যাগ করে সদ্‌গুণ-সদাচার গ্রহণ করতে পারে। মানুষ এতে সর্বতোভাবে স্বাধীন কারণ সে সাধন-যোনি সম্ভূত। কিন্তু পশু-পক্ষী ভোগ-যোনি হওয়ায় এতে স্বাধীন নয় ।

মানুষ যখন খাওয়া-পরাতেই বিশেষ নজর দেয়, তখন তার মধ্যে কর্তব্য-অকর্তব্য সম্বন্ধে কোনো খেয়াল থাকে না। এরূপ মানুষদের দৈবী-সম্পদ পশুদের ন্যায় সুপ্ত থাকে, প্রকাশিত হয় না। এরূপ মানুষদের সম্বন্ধেও ভগবান **'জনাঃ'** পদটি ব্যবহার করেছেন অর্থাৎ এরাও মনুষ্যনামের যোগ্য, কারণ এদের মধ্যে দৈবী-সম্পদ প্রকটিত হবার শক্তি আছে।

বিশেষ কথা

'জনাঃ' (১৬।৭) থেকে নিয়ে **'নরাধমান্'** (১৬।১৯)

[১]প্রথমেই সৎশিক্ষা না পাওয়ায় এই আসুরীভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ কী করা উচিত আর কী করা উচিত নয়, দেহের শুদ্ধি বা শৌচ কাকে বলে আর অশুদ্ধি কী, শুদ্ধ খাওয়া-দাওয়া কেমন হয় আর অশুদ্ধ খাদ্যই বা কেমন, বড় এবং ছোটদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করা উচিত এবং কেমন ব্যবহার করা উচিত নয়, সত্য বাক্য কী, অসত্য কাকে বলে—এইসব বিষয় জানে না অর্থাৎ সুশিক্ষার অভাবে এরা প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, শৌচ, সদাচার এবং সত্য—কিছুই জানে না। সেইজন্য এরা সত্য-তত্ত্ব পরমাত্মাতে বিমুখ থাকে। পরমাত্মাতে বিমুখ হওয়ায় এরা ঈশ্বর, ধর্ম ইত্যাদিকেও মানে না এবং তার মর্যাদাকেও গুরুত্ব দেয় না। তারা মনে করে স্ত্রী-পুরুষ সংসর্গেই এই জগতের উদ্ভব হয়েছে। এইরূপ নাস্তিক হয়ে তারা অপরকে দুঃখ দেয় এবং নিজেদেরও মহাপতন ডেকে আনে।

পদ পর্যন্ত মধ্যবর্তী শ্লোকগুলিতে ভগবান কোথাও মনুষ্যবাচক শব্দ ব্যবহার করেননি। এর অর্থ হল যে, যদিও মানুষের আসুরী ভাব পরিত্যাগ করে দৈবী ভাব লাভ করার যোগ্যতা থাকে, তবুও যারা মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করে দৈবী-সম্পদ পুষ্ট না করে আসুরীভাবে মজে থাকে, তারা মনুষ্য নামের উপযুক্ত নয়। তারা পশু এবং নারকীয় প্রাণীদের থেকেও অধম। কারণ পশু এবং নারকীয় প্রাণীরা তাদের পাপের ফল ভোগ করে পবিত্রতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং এই আসুরীভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ, যারা পুণ্যবলে মনুষ্য দেহ পেয়েছে, তা নষ্ট করে নতুন নতুন পাপ কাজ করে পশু-পক্ষী ইত্যাদি জন্মের দিকে এবং নরকের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তাদের দুর্গতির বর্ণনা এই অধ্যায়ের ষোড়শ এবং উনবিংশতম শ্লোকগুলিতে করা হয়েছে।

ভগবান আসুর-ভাবের মানুষদের যেসব লক্ষণ জানিয়েছেন, তাতে তিনি পশুদের বিশেষণ না দিয়ে **'অশুভান্'**, **'নরাধমান্'** বিশেষণ ব্যবহার করেছেন। কারণ পশুগণ তত পাপী নয় এবং তাদের দর্শনে পাপ হয় না, কিন্তু আসুরভাবাপন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিশেষভাবে পাপ থাকে এবং তার দর্শনে পাপ হয়, মনে অপবিত্র ভাব আসে। এই অধ্যায়ের বাইশতম শ্লোকে **'নরঃ'** পদটি দিয়ে তিনি জানাচ্ছেন যে যারা কাম-ক্রোধ-লোভ রূপ নরকের দ্বার থেকে মুক্ত হয়ে কল্যাণ আচরণ করে তারা-ই মানুষ নামের যোগ্য। পঞ্চম অধ্যায়ের তেইশতম শ্লোকেও **'নরঃ'** পদটির দ্বারা এই কথাটির পুষ্টি করেছেন।

'ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে'— প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তিকে না জানা সেই আসুরী-ভাবাপন্ন ব্যক্তিদের শুদ্ধি-অশুদ্ধি সম্পর্কে কোনো জ্ঞান থাকে না। তাদের সাংসারিক আচার-ব্যবহার সম্পর্কে কোনো হুঁশ থাকে না অর্থাৎ মা-বাবা বা বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষদের সঙ্গে বা অন্যান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করা উচিত— সে ব্যাপার তারা জানেই না। তাদের মধ্যে সত্য থাকে না, অর্থাৎ তারা অসত্য বলে এবং অসদাচরণ করে। এই সবের অর্থ হল যে এরা আসুরী ব্যক্তি । খাওয়া-পরা, আরামে থাকা ও 'আমি বেঁচে থাকব, জগতের সুখভোগ করব, সম্পদ-সংগ্রহ করব' ইত্যাদি উদ্দেশ্য হওয়ায় তাদের শৌচ ও সদাচারের দিকে লক্ষ্য থাকে না।

ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ের চুয়াল্লিশতম শ্লোকে বলেছেন যে বৈদিক প্রক্রিয়া অনুসারে জাগতিক ভোগ ও সংগ্রহে ব্যাপৃত ব্যক্তিরও পরমাত্মার প্রাপ্তি সম্বন্ধে নিশ্চয়তা থাকে না। ভাব হল এই যে আসুরী-সম্পদ থাকার জন্য শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞকর্মে ব্যাপৃত ব্যক্তিও যখন পরমাত্মাকে প্রাপ্তির বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারেন না, তখন যেসব ব্যক্তির মধ্যে আসুরী-ভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে অর্থাৎ যারা অন্যায়ভাবে ভোগ ও সংগ্রহে ব্যস্ত থাকে, তাদের বুদ্ধিতে পরমাত্মার এক-নিশ্চয় হয়ে ওঠা কত কঠিন ব্যাপার[১] !

পরিশিষ্ট-ভাব—মানুষ যেমন যেমন আসুরী-সম্পদ গ্রহণ করতে থাকে, বিবেকও তেমন তেমন লুপ্ত হতে থাকে। ভোগপরায়ণ হওয়ায় আসুর ব্যক্তি জানতেই পারে না তার কী করা উচিত আর কী করা উচিত নয়। তার নিষ্ঠা লৌকিক অর্থাৎ জাগতিকও হয় না, তাহলে অলৌকিকে নিষ্ঠা হওয়া তো দূর অস্ত! এই নিষ্ঠা তাকে নরকগামী করে।

আসুরী ব্যক্তি পিণ্ডপ্রাণপোষণপরায়ণ হয়। সেইজন্য তারা শুধুমাত্র নিজ সুখ-আরাম, নিজ স্বার্থপরায়ণ হয়ে থাকে। যার মধ্যে তারা নিজের সুখ দেখে তাতেই তাদের প্রবৃত্তি হয়, আর যাতে দুঃখ হবে, স্বার্থ সিদ্ধ হবে না মনে করে, তাতে তারা নিবৃত্ত হয়। বাস্তবে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিতে শাস্ত্রই প্রমাণ (গীতা ১৬।২৪)। কিন্তু নিজ শরীর এবং প্রাণের প্রতি মোহবশতঃ আসুরী ব্যক্তির প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি শাস্ত্র ধরে চলে না। আসুরী স্বভাবের জন্য এরা শাস্ত্রবাক্য শোনে না আর যদি শোনেও তাহলে বুঝতে সক্ষম হয় না—**'যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ'** (গীতা ১৫।১১)।

❖ ❖ ❖

[১]পাপবন্ত কর সহজ সুভাউ। ভজনু মোর তেহি ভাব না কাউ।। (শ্রীরামচরিতমানস ৫।৪৪।২)

সম্বন্ধ—যেখানে সৎকর্মে প্রবৃত্তি হয় না, সেখানে সদ্‌ভাবেরও অনাদর হয় অর্থাৎ সদ্‌ভাব অবদমিত হতে থাকে—এখানে সেকথাই জানাচ্ছেন।

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্॥ ৮ ॥

[**তে** (এই আসুরী-প্রকৃতির লোকেরা) ; **আহুঃ** (বলে থাকে যে) ; **জগৎ, অসত্যম্** (এই জগৎ অসত্য) ; **অপ্রতিষ্ঠম্** (অপ্রতিষ্ঠিত) ; **অনীশ্বরম্** (ঈশ্বর ব্যতিরেকে) ; **অপরস্পরসম্ভূতম্** (কেবলমাত্র স্ত্রী-পুরুষ সংযোগেই উৎপন্ন) ; **কামহৈতুকম্** (স্ত্রী-পুরুষের কামই) ; **অন্যৎ, কিম্** (আর কোনো কারণই নেই।)]

এই আসুরী-প্রকৃতির লোকেরা বলে থাকে যে এই জগৎ অসত্য, অপ্রতিষ্ঠিত (শৃঙ্খলাবিহীন) এবং ঈশ্বর ব্যতিরেকে কেবলমাত্র স্ত্রী-পুরুষ সংযোগেই উৎপন্ন হয়েছে। স্ত্রী-পুরুষের কামই এর একমাত্র কারণ, অন্য কোনো কারণই নেই॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা—'অসত্যম্'—আসুরী-ভাবাপন্ন ব্যক্তিরা বলে থাকে যে জগৎ মিথ্যা অর্থাৎ এর মধ্যে কোনো সত্যতা নেই। যজ্ঞ, দান, তপ, ধ্যান, তীর্থ, ব্রত ইত্যাদি যত শুভ কর্ম আছে, এরা সেগুলি সত্য বলে মনে করে না। সেগুলিকে অনাবশ্যক আড়ম্বর বলে মনে করে।

'অপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্'—জগতে আস্তিক ব্যক্তিদের ধর্ম, ঈশ্বর, পরলোক[১] (পুনর্জন্ম) ইত্যাদিতে শ্রদ্ধা থাকে। কিন্তু আসুরী-প্রকৃতির মানুষ ধর্ম, ঈশ্বর ইত্যাদিতে শ্রদ্ধাশীল হয় না ; তাই তারা মনে করে যে এই জগতে ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পুণ্যের কোনো প্রতিষ্ঠা-মর্যাদা নেই। জগৎকে তারা মালিকবিহীন বলে মনে করে অর্থাৎ এই জগৎ রচনাকারী, শাসনকর্তা, এখানকার পাপ-পুণ্যের ফল প্রদানকারী কেউ নেই।[২]

'অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্'—তারা বলে থাকে যে স্ত্রী-পুরুষে পরস্পরের কামনা হয়ে থাকে এবং তাদের উভয়ের সংযোগেই এই জগৎ উৎপন্ন হয়। সুতরাং কামনাই এই জগতের কারণ। অতএব তার জন্য ঈশ্বর, প্রারব্ধ এইসবের প্রয়োজন কী ? ঈশ্বরকে এর কারণ বলে মনে করা বুজরুকি, জগৎকে শুধু প্রতারণা করা মাত্র।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—যেখানে সদ্‌ভাব থাকে না, সেখানে সদ্‌বিচার কাজ করে না অর্থাৎ সদ্‌বিচার প্রকটিত হয় না—পরের শ্লোকে সে কথাই জানাচ্ছেন।

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ॥ ৯ ॥

[**এতাম্, দৃষ্টিম্** (পূর্বোক্ত নাস্তিক) ; **অবষ্টভ্য** (মতাবলম্বী) ; **নষ্টাত্মানঃ** (যেসব ব্যক্তি তাদের নিত্যস্বরূপ মানে না) ; **অল্পবুদ্ধয়ঃ, উগ্রকর্মাণঃ** (যারা অল্পবুদ্ধি, উগ্রকর্মা) ; **জগতঃ, অহিতাঃ** (জগতের শত্রু) ; **ক্ষয়ায়, প্রভবন্তি** (তাদের সামর্থ্য জগতের বিনাশের জন্যই হয়ে থাকে।)]

---

[১]মৃত্যুর পরে যে জন্ম হয়, তা ইহলোকে হোক বা অন্যলোকে, মানুষ বা পশু-পক্ষী যে জন্মই হোক না কেন, তাকে 'পরলোক'ই বলা হয়।

[২]'অনীশ্বর' পদটির অর্থ হল এই যে আসুরী-প্রকৃতির ব্যক্তিরা ঈশ্বরকে মানে না। 'প্রাপ্তৌ সত্যাং নিষেধঃ' এই ন্যায় অনুযায়ী প্রমাণিত হয়, ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে, কিন্তু এরা তা স্বীকার করে না। না মানার জন্য এরা অকূল চিন্তায় ভাসে (১৬।১১), কিন্তু যাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে মেনে তাঁর আশ্রিত হয়, সেই দৈবী-প্রকৃতির ব্যক্তিরা নিশ্চিন্ত ও নির্ভয়ে থাকে ।

পূর্বোক্ত (নাস্তিক) মতাবলম্বী যেসব ব্যক্তি তাদের নিত্যস্বরূপ মানে না, যারা অল্পবুদ্ধি, উগ্রকর্মা এবং জগতের শত্রু, তাদের সামর্থ্য জগতের বিনাশের জন্যই হয়ে থাকে॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা—**'এতাং দৃষ্টিমষ্টভ্য'**—কোনো কর্তব্য-অকর্তব্য নেই, শৌচ বা সদাচার নেই। ঈশ্বর নেই, প্রারব্ধ নেই, পাপ বা পুণ্য নেই, পরলোক বলে কিছু নেই, কৃত-কর্মাদির কোনো দণ্ডবিধান নেই—এরূপ নাস্তিক দৃষ্টি-ভঙ্গী নিয়ে এরা জগতে বিচরণ করে।

'নষ্টাত্মানঃ'—আত্মা যে এক চেতন তত্ত্ব, তার কোনো অস্তিত্ব থাকতে পারে—একথা তারা বিশ্বাসই করে না। তারা শুধু মনে করে যে খয়ের আর চুন একত্রিত হলে যেমন লাল রং উৎপন্ন হয়, তেমনই ভৌতিক তত্ত্বগুলি সংযোগে এক চৈতন্য উৎপন্ন হয়। সেই চৈতন্য যে কোনো পৃথক্ তত্ত্ব, তা নয়। তাদের কাছে জড়ই হল আসল। তাই তারা চেতন-তত্ত্বে বিমুখ হয়ে থাকে। এই চেতন-তত্ত্বে (আত্মায়) বিমুখ থাকার জন্যই তাদের পতন হয়ে থাকে।

'অল্পবুদ্ধয়ঃ'—এদের মধ্যে যে বিচার-বিবেচনা থাকে তা অতি তুচ্ছ, নগণ্য হয়ে থাকে। তাদের দৃষ্টি থাকে দৃশ্যমান পদার্থের দিকে যে শুধু উপার্জন কর, খাও-দাও আর আরাম কর। পরে ভবিষ্যতে কী হবে, পরকালে কী হবে, এসব তাদের বুদ্ধিতে আসে না।

অল্পবুদ্ধির মানে এই নয় যে কোনো কাজেই তাদের বুদ্ধি কাজ করে না। সত্য-তত্ত্ব কী। ধর্ম কী ? অধর্ম কাকে বলে ? সদাচার-দুরাচার কী ? তার পরিণাম কেমন ?—এইসব বিষয়ে তাদের বুদ্ধি কাজ করে না। কিন্তু অর্থ ইত্যাদি সংগ্রহে তাদের বুদ্ধি অত্যন্ত প্রখর হয়। অর্থাৎ পারমার্থিক উন্নতির ব্যাপারে তাদের বুদ্ধি শিথিল হলেও জাগতিক ভোগে আবদ্ধ হওয়ার কর্মে তাদের বুদ্ধি অত্যন্ত প্রখর হয়।

'উগ্রকর্মাণঃ'—এরা কাউকে ভয় পায় না, ভয় পায় কেবল চোর-ডাকাত বা রাজার (সরকারের) লোককে। ঈশ্বর, পরলোক বা মর্যাদাকে ভয় করে না, তাই তারা হত্যার মতো ভীষণ কর্ম করতেও পিছপা হয় না।

'অহিতাঃ'—তাদের স্বভাব খারাপ হওয়ায় অপরের অহিত কাজে তারা ব্যাপৃত থাকে এবং তাতেই তারা সুখ পায়।

'জগতঃ ক্ষয়ায় প্রভবন্তি'—তাদের যে শক্তি, ঐশ্বর্য, সামর্থ্য, পদ, অধিকার থাকে, তা সমস্তই অন্যের সর্বনাশ করার জন্য হয়। অন্যের সর্বনাশ করাই তাদের উদ্দেশ্য হয়। নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধ হোক বা না হোক, অন্যের উন্নতি এরা কখনোই সহ্য করতে পারে না। অন্যের সর্বনাশেই তারা সুখ পায় অর্থাৎ অপরের অধিকার কেড়ে নেওয়া, কাউকে হত্যা করা—এসবেই তারা আনন্দ পায়। সিংহ যেমন অন্য পশু বধ করে খায়, কারও দুঃখের কথা ভাবে না এবং সরকারি স্বার্থপর অফিসার যেমন দশ-পঞ্চাশ বা একশো টাকার জন্য সরকারের হাজার হাজার টাকার ক্ষতি করে, তেমনই নিজস্বার্থ পূর্ণ করার জন্য অন্যের যতই লোকসান হোক, এরা তা পরোয়া করে না। এই আসুরীভাবাপন্ন মানুষেরা পশু-পক্ষীদের মেরে খেয়ে ফেলে এবং নিজেদের সামান্য সুখের জন্য অন্যে কতটা দুঃখ পেল—তা চিন্তা করেও দেখে না।

*** *** ***

সম্বন্ধ—সৎকর্ম, সদ্‌ভাব এবং সদ্‌বিচারের অবহেলা যেখানে করা হয়, সেখানে মানুষ কামনার বশবর্তী হয়ে কী করে—পরবর্তী শ্লোকে তাই জানিয়েছেন।

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্ গৃহীত্বাসদ্‌গ্রাহান্ প্রবর্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ॥ ১০ ॥

[**দুষ্পূরং** (যা কখনো পূর্ণ হবার নয়) ; **কামম্, আশ্রিত্য** (সেই কামনার আশ্রয় গ্রহণ করে) ; **দম্ভমানমদান্বিতাঃ** (দম্ভ, অহংভাব ও গর্বে মত্ত হয়ে) ; **অশুচিব্রতাঃ** (অশুদ্ধক্রিয়া-কর্মকারী মানুষ) ; **মোহাৎ, অসদ্‌গ্রাহান্** (মোহবশতঃ দুরাশার) ; **গৃহীত্বা, প্রবর্তন্তে** (বশবর্তী হয়ে থাকে।)]

যা কখনো পূর্ণ হবার নয়, সেই কামনার আশ্রয় গ্রহণ করে দম্ভ, অহংভাব ও গর্বে মত্ত হয়ে অশুদ্ধ ক্রিয়াকর্ম অবলম্বনকারী মানুষ মোহবশতঃ দুরাশার বশবর্তী হয়ে জগতে বাস করে॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা—**'কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরম্'**—এই আসুরী প্রকৃতির ব্যক্তিগণ যে কামনা কখনো পূরণ হবার নয় তার আশ্রয় গ্রহণ করে। কোনো কোনো ব্যক্তি যেমন ভগবান, কর্তব্য, ধর্ম বা পরলোক ইত্যাদির আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে তেমনই আসুরীভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ যে কামনা পূরণ হবার নয়, তার আশ্রয় গ্রহণ করে। তাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল থাকে যে কামনাহীন মানুষ (পাথরের মতো) জড় পদার্থ হয়, কামনা না থাকলে মানুষের উন্নতি হতেই পারে না। যত নেতা, পণ্ডিত, ধনী ইত্যাদি হয়েছেন, তাঁরা কামনার জন্যই ওইস্থানে পৌঁছেছেন। এরূপ কামনা-আশ্রিত ব্যক্তি ভগবান, পরলোক, প্রারব্ধ ইত্যাদি মানেন না।

সেইসব কামনা কীসের দ্বারা পূরণ হয় ? তাদের কে সাহায্য করে ? তার উত্তর হল **'দম্ভমানমদান্বিতা'**। এরা দম্ভ, মান এবং অহংকারে মত্ত হয়ে থাকে অর্থাৎ ওইগুলি হল তাদের কামনা পূরণের শক্তি। লোকের কাছে যেমনভাবে নিজ মতলব সিদ্ধ হয় অর্থাৎ অর্থ-মান-মর্যাদা-পূজা-প্রতিষ্ঠা-শ্রদ্ধা-বাহবা ইত্যাদি পাওয়া যায়, সেখানে সেরূপ ভাবে নিজেকে প্রদর্শন করানোকে বলা হয় 'দম্ভ'। নিজেকে বড় বলে মনে করা, শ্রেষ্ঠ বলে ভাবাকে বলা হয় 'মান'। আমার অনেক বিদ্যা-বুদ্ধি বা যোগ্যতা আছে—এইসব নিয়ে অহংকার করাকে বলা হয় 'মদ'। তারা সর্বদা দম্ভ, মান এবং অহংকারে গর্বিত হয়ে থাকে।

'অশুচিব্রতাঃ'—তাদের ব্রত-নিয়মও অত্যন্ত অপবিত্র হয়, যেমন, 'এতগুলি গ্রামে এতগুলি ঘরে আগুন লাগাতে হবে ; এতগুলি লোককে হত্যা করতে হবে' ইত্যাদি। এইসব বর্ণ, আশ্রম, আচরণ-শুদ্ধি ইত্যাদি সবই প্রতারণা, সুতরাং যে কোনো লোকের সঙ্গেই খাওয়া-দাওয়া কর। আমরা কোনো কথা শুনব না, তীর্থ, মন্দির ইত্যাদি স্থানে যাব না—এইসবই তাদের ব্রত-নিয়ম হয়ে থাকে।

খুনে, ডাকাতদেরও এরূপ মনোভাব থাকে। তাদের নিয়ম হল মারপিট ছাড়া কোনো বস্তু পেলেও তারা তা নেবে না। যতক্ষণ না মারা হচ্ছে, ক্ষত দিয়ে রক্ত না পড়ছে, ততক্ষণ আমরা কোনো বস্তু নেব না ইত্যাদি।

'মোহাদ্ গৃহীত্বাসদ্গ্রাহান্'—মূর্খতাবশতঃ এরা নানা দুর্দশাগ্রস্ত হয়। তামসিক বুদ্ধির দ্বারা চালিত হওয়াই হল মূর্খতা (গীতা ১৮।৩২)। তারা শাস্ত্র, বেদ, বর্ণাশ্রম এবং কুল-মর্যাদা মানে না, বরং এর বিপরীতে চলতে, এগুলি নষ্ট করাতেই তারা নিজ কৃতিত্ব, গৌরব বলে মনে করে। তারা কর্তব্যকে অকর্তব্য এবং অকর্তব্যকে কর্তব্য বলে মনে করে, হিতকে অহিত আর অহিতকে হিত বলে মনে করে, ঠিককে বেঠিক আর বেঠিককে ঠিক বলে ভাবে। এই অসদ্বিচারের জন্য তাদের বুদ্ধি এত নিম্নমুখী হয় যে তারা বলতে দ্বিধা করে না যে মা-বাবার কাছে আমাদের কোনো ঋণ নেই। তাঁদের সঙ্গে আমাদের কীসের সম্পর্ক ? ছল-কপট-জালিয়াতি যেভাবেই হোক অর্থ সংগ্রহও রক্ষা করতে হবে।

পরিশিষ্ট-ভাব—'কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরম্'—তৃতীয় অধ্যায়েও ভগবান বলেছেন যে এই কাম (কামনা) অত্যন্ত ক্ষতিকারক—**'মহাশনঃ'** (৩।৩৭) এবং অগ্নির মতোই কখনো তৃপ্ত হয় না—**'দুষ্পূরেণানলেন চ'** (৩।৩৯)। তাই সমস্ত কামনার পূরণ কখনোই সম্ভবপর হয় না। সুতরাং কামনাপূরণ করাই যার উদ্দেশ্য থাকে, সে কখনোই শান্তি পায় না। কামনা পূরণ অত্যন্ত পরনির্ভরশীল, কিন্তু আসুরী ব্যক্তি এই পরনির্ভরতায় স্বাধীনতা অনুভব করে মনে করে যে, অর্থ ইত্যাদি ভোগ সামগ্রী সংগৃহীত হলেই আমি স্বাধীন হতে পারব। এই সব ব্যক্তি শাস্ত্র, গুরু, ঈশ্বর, ধর্ম ইত্যাদি মানে না, অতএব তারা কাম ব্যতীত আর কীসের আশ্রয় নেবে ?

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—সৎকর্ম, সদ্ভাব এবং সদ্বিচারের অভাবে ওই আসুরীভাবাপন্ন ব্যক্তিদের নিয়ম, ভাব এবং আচরণ কী উদ্দেশ্য নিয়ে, কেমন হয়—পরবর্তী দুটি শ্লোকে তা জানাচ্ছেন।

চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ　　　প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা　এতাবদিতি　নিশ্চিতাঃ॥ ১১ ॥

[প্রলয়ান্তাম্ (মৃত্যু পর্যন্ত) ; অপরিমেয়াম্, চিন্তাম্ (সেই অপার চিন্তার) ; উপাশ্রিতাঃ (আশ্রয় গ্রহণকারী) ; কামোপভোগপরমাঃ (পদার্থগুলির সংগ্রহ ও ভোগ নিরত) ; চ, এতাবৎ (এবং যা কিছু আছে, তা সব এই-ই) ; ইতি, নিশ্চিতাঃ (এইরকম নিশ্চয় করে থাকেন।)]

আমৃত্যু অনন্ত দুশ্চিন্তার আশ্রয় গ্রহণকারী, পদার্থগুলির সংগ্রহ এবং ভোগনিরত এবং 'যা আছে, তা সব এই-ই'—এইরকম নিশ্চয় করে থাকেন॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা—**'চিন্তামপরিমেয়াং চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ'**—আসুরী-প্রকৃতির মানুষের মধ্যে এমন সব চিন্তা থাকে যার কোনো পরিমাপ নেই। প্রলয় অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্তও তাদের চিন্তা দূর হয় না। এরূপ প্রলয়কাল পর্যন্ত স্থিত চিন্তার ফলও প্রলয়ই হয় অর্থাৎ বারংবার মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হয়।

চিন্তার বিষয় দুটি—এক, পারমার্থিক, দুই জাগতিক বা সাংসারিক। আমার কল্যাণ, আমার উদ্ধার হবে কীভাবে ? পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে প্রাপ্তিলাভ নিশ্চিতভাবে হবে কীভাবে ? (**'চিন্তা পরব্রহ্মবিনিশ্চয়ায়'**) ? যাঁদের এরূপ পারমার্থিক চিন্তা হয়, তাঁরা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আসুরী-সম্পদবিশিষ্ট ব্যক্তিদের এরূপ চিন্তা হয় না। তার পরিবর্তে এরা এই সাংসারিক চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে যে, আমি কী করে বাঁচব ? জীবিকা-নির্বাহ করব কীভাবে ? আমরা না থাকলে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা কার আশ্রয়ে বেঁচে থাকবে ? আমাদের মান-মর্যাদা, সম্মান-প্রতিষ্ঠা, নাম-প্রসিদ্ধি কীভাবে বজায় থাকবে ? আমাদের মৃত্যুর পর আমাদের সন্তানদের কী হবে ? অর্থ-সম্পদ, জমি-জায়গার কী হবে ? ইত্যাদি।

এসব চিন্তা মানুষ বৃথাই করে থাকে। জীবিকা-নির্বাহ তো হতেই থাকবে। জীবন-নির্বাহের বস্তু থাকতে-থাকতেই মরতে হবে। সংসার-বিরক্ত সন্ন্যাসী যাঁর কৌপিনেও কোনো আসক্তি নেই তিনিও তাঁর ছিন্ন কৌপিনটি রেখেই মৃত্যুবরণ করেন। এরূপে সকল ব্যক্তিই, বস্তুগুলি থাকতেই মৃত্যু বরণ করে। এমন কোনো নিয়ম নেই যে, যার অর্থ আছে সে মারা যাবে না। অর্থ থাকলেও মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং অর্থ পড়ে থাকে, এটি তার কোনো কাজে আসে না।

একজন অত্যন্ত ধনী ব্যক্তি ছিল। সে সিন্দুকের মতো এক লোহার মজবুত বাড়ি তৈরি করেছিল এবং তাতে অনেক রত্ন সঞ্চিত করেছিল। সেই বাড়ির দরজা বন্ধ হলে চাবি ছাড়া খুলত না। একবার সেই ধনী ব্যক্তি ভুল করে বাইরে চাবি রেখে বাড়ির ভিতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। তারপর দরজা খুলতে না পেরে অন্ন-জল-হাওয়ার অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার সময় কাগজে লিখে গিয়েছিল যে, 'আজ এত অর্থ আমার কাছে থাকলেও আমাকে মরতে হচ্ছে। কারণ আমি খাদ্য-জল-হাওয়া পাচ্ছি না !' তেমনই খাদ্যবস্তু থাকলেও যে মৃত্যু হবে না—তা নয়। ভোগাদি বস্তু থাকলেও এইরূপ মরতেই হবে। যেমন, পেটের রোগ হলে ডাক্তার রোগীকে (অন্ন থাকলেও) খেতে দেয় না, তেমনই মৃত্যু এলেও, পদার্থ ইত্যাদি থাকলেও মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

যিনি এক কপর্দকও সংগ্রহ করেন না, এরূপ বৈরাগী সাধুরও প্রারব্ধ অনুসারে প্রয়োজনের অধিক বস্তু লাভ হয়। সুতরাং জীবন-নির্বাহ কোনো বস্তুর অধীন নয়[১]। কিন্তু আসুরীভাবাপন্ন ব্যক্তিরা এটি মানতে চায় না। তারা মনে করে আমরা চিন্তা করে, কামনা করে, বিচার করে, উদ্যোগ করি তাই বস্তু লাভ করি। তা না হলে মরতে হত।

'কামোপভোগপরমাঃ'—যারা ধনাদি বস্তু উপভোগ করে, তাদের এই আকাঙ্ক্ষা থাকে যে সুখ-সামগ্রী সংগ্রহ করে ভোগ করতে হবে। তাদের ভোগের জন্য অর্থ চাই, জগতে বড় হবার জন্য অর্থ চাই, সুখ-আরাম-শখের জন্য অর্থ চাই। তাৎপর্য হল এই যে তাদের কাছে ভোগের চেয়ে বড় আর কিছুই নেই।

---

[১](ক) প্রারব্ধ পহলে রচা, পীছে রচা শরীর। তুলসী চিন্তা কিঁউ করে ভজলে শ্রীরঘুবীর॥

(খ) মুরদেকো হরি দেত হ্যায়, কপড়ো লকড়ী আগে। জীবিত নর চিন্তা করে, উনকা বড়া অভাগ॥

(গ) ধান নহীঁ ধীণোঁ নহীঁ, নহীঁ রূপৈয়ো রোক। জীমণ বৈঠে রামদাস, আন মিলৈ সব থোক॥

'এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ'—তারা মনে করে যে, সুখভোগ আর সংগ্রহ করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই[1]। এ জগতে সব এ-ই। তাদের কাছে পরলোক হল বুজরুকী। তারা মনে করে মৃত্যুর পর আর কোথাও যেতে হয় না, যতক্ষণ দেহ আছে সুখভোগ করে নাও, তাই ঠিক; কারণ মৃত্যুর পর দেহ থাকবে না[2]। শরীর চিরকাল তো থাকবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। ভোগ করাই একমাত্র লক্ষ্য হওয়ায় এরা পাপ-পুণ্য, পুনর্জন্ম কিছুই মানে না।

পরিশিষ্ট-ভাব—ভোগ ও সম্পদ সংগ্রহে ব্যাপৃত মানুষ অন্ধ হয়ে যায়। তারা জগৎ সংসারকেও জানতে পারে না, ভগবানকেও জানতে পারে না। অস্বাভাবিকত্বতেই স্বাভাবিক বুদ্ধি হওয়ায় তাদের দৃষ্টি ভগবানের দিকে যায় না। তারা অস্বাভাবিক জগৎ-সংসারকে সত্য বলে মনে করে।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—বস্তুসকল হল বিনাশশীল, স্বয়ং হল অবিনাশী ; তাহলে এগুলির দ্বারা সন্তুষ্টি কীভাবে হবে ? বিনাশশীলের দ্বারা অবিনাশীর সন্তুষ্টি কীভাবে হবে ?

আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥ ১২ ॥

[আশাপাশশতৈঃ (এরূপ আশার শত সহস্র বন্ধনে) ; বদ্ধাঃ (আবদ্ধ মানুষ) ; কামক্রোধপরায়ণাঃ (কামক্রোধপরায়ণ হয়ে) ; কামভোগার্থম্ (ভোগ করার নিমিত্ত) ; অন্যায়েন (অন্যায়পূর্বক) ; অর্থসঞ্চয়ান্, ঈহন্তে (ধন সঞ্চয়ের চেষ্টা করতে থাকে।)]

এরূপ আশার শত-সহস্র বন্ধনে আবদ্ধ মানুষ কাম-ক্রোধপরায়ণ হয়ে ভোগ করার নিমিত্ত অন্যায়ভাবে ধন সঞ্চয় করার চেষ্টা করতে থাকে॥ ১২ ॥

ব্যাখ্যা—'আশপাশশতৈর্বদ্ধাঃ'—আসুরী-সম্পদযুক্ত ব্যক্তিগণ আশারূপ শত সহস্র বন্ধনে আবদ্ধ থাকে অর্থাৎ তাদের 'এত অর্থ হবে, এত সম্মান-প্রতিপত্তি হবে, শরীর নীরোগ হবে', ইত্যাদি শত-সহস্র আশার ফাঁসে জড়িয়ে থাকে। আশায় আবদ্ধ মানুষদের কাছে কোটি কোটি টাকা থাকলেও তাদের আকাঙ্ক্ষা দূর হয় না। তাদের তো এই আশাই থাকে যে যদি সাধুদের কাছ থেকে কিছু পাওয়া যায়, ভগবানের কাছ হতে কিছু পাওয়া যায় অথবা কোনো লোকের কাছে কিছু পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, তারা পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-লতা, সমুদ্র-পর্বতের কাছ থেকেও কিছু পাবার আশা করে থাকে। এইভাবে তাদের মধ্যে সর্বদা অদম্য আকাঙ্ক্ষার ক্ষুধা প্রজ্বলিত থাকে। এরূপ ব্যক্তিদের সাংসারিক আকাঙ্ক্ষা কখনো পূর্ণ হয় না (গীতা ৯।১২)। যদি পূরণ হয়ও তাতেও কিছু লাভ হয় না। কারণ যদি এরা বেঁচে থাকে তাহলেও আকাঙ্ক্ষার বস্তুগুলি একদিন নষ্ট হবে, আর যদি আকাঙ্ক্ষার বস্তুগুলি ঠিকভাবে থাকে, তবুও এরা একদিন মৃত্যুমুখে পতিত হবেই কিংবা উভয়ই নষ্ট হবে।

যারা এই আশারূপ বন্ধনে আবদ্ধ, তারা কখনো নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না আর যারা এই বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছে, তারা আনন্দে থাকে—

আশা নাম মনুষ্যাণাং কাচিদাশ্চর্যশৃঙ্খলা।
যয়া বদ্ধাঃ প্রধাবন্তি মুক্তাস্তিষ্ঠন্তি পঙ্গুবৎ॥

'কামক্রোধপরায়ণাঃ'—তাঁর পরম আশ্রয়, ভরসা হয় কাম এবং ক্রোধ[3] অর্থাৎ নিজ কামনা পূরণের জন্য এবং ক্রোধপূর্বক অন্যকে কষ্ট প্রদান করার জন্য তারা জীবন

[1]এরূপ, স্বর্গকে মানেন যেসব সকাম ব্যক্তি তাঁরা বলে থাকেন যে স্বর্গের থেকে বড় আর কিছু নেই—'নান্যদস্তীতি বাদিনঃ' (গীতা ২।৪২)। তাঁদের এই কামনা থাকে যে মৃত্যুর পর আমরা স্বর্গে গিয়ে সেখানে ভোগ করব। স্বর্গের ভোগের কাছে এখানকার ভোগবিলাস কিছুই নয়—তাঁরা এরূপই মনে করে থাকেন।

[2]যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেদ্ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ। ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥

[3]এই অধ্যায়ের দশম শ্লোকে উদ্ধৃত 'দম্ভ, মান এবং মদ' তো এদের সঙ্গী হয়ই এবং এখানে উদ্ধৃত 'কাম এবং ক্রোধ'ও তাদের আশ্রয় করে।

ধারণ করে। কাম-ক্রোধপরায়ণ ব্যক্তির ধারণা থাকে যে কামনাবিহীন ব্যক্তি জড় পদার্থের ন্যায় হয়। ক্রোধ না থাকলে তার মধ্যে কোনো তেজও থাকে না। কামনাবশতঃই মানুষ সব কাজ করে, নাহলে মানুষ কাজই করবে না। কামনা ব্যতীত মানুষের জীবন নিশ্চল হয়ে পড়বে। জগতে কাম ও ক্রোধই সারবস্তু। তাছাড়া লোকে আমাকে জগতে থাকতেই দেবে না। ক্রোধের দ্বারাই শাসন করা হয়, নাহলে শাসন করা হবে কীভাবে ? ক্রোধের দ্বারাই অন্য লোককে দমন করা হয়, ক্রোধ না থাকলে লোকে আমার সর্বস্ব কেড়ে নেবে। তখন আমার আর কোনো অস্তিত্বই থাকবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

'ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্'—আসুরী-সম্পদযুক্ত মানুষের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় অর্থ সংগ্রহ করা এবং বিষয় উপভোগ করা। এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য এরা প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা, ট্যাক্স ফাঁকি, অপরের স্বত্ব, মন্দির, নাবালক বা বিধবার সম্পত্তি আত্মসাৎ — এইরূপ নানা পাপে ধন সঞ্চয় করতে চায়। কেন-না তাদের মনে গভীর বিশ্বাস থাকে যে আজকালকার যুগে বিশ্বাসের দ্বারা, ন্যায় পথে কেউই ধনী হতে পারে না। যারা ধনী হয়েছে, তারা প্রত্যেকেই এরূপ অন্যায়, চুরি বা ধাপ্পাবাজী করেই হয়েছে। বিশ্বাসের দ্বারা, ন্যায়ের পথে যে কাজ করার কথা বলা হয়, তা শুধু কথার কথা, কাজে সম্ভব নয়। আমরা যদি সৎপথ অনুসরণ করে কাজ করি তাহলে আমাদের দুঃখ পেতে হবে এবং জীবনধারণ করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে। আসুরী-সম্পদবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এইরূপ দৃঢ় ধারণা করে থাকে।

যারা ন্যায়ের পথে স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য সচেষ্ট রয়েছে, ভগবান তাদের সম্পর্কে বলেছেন যে, ওইসব ব্যক্তির বুদ্ধিতে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করার নিষ্ঠার অভাব থাকে (গীতা ২।৪৪)। অতএব যারা অন্যায়ভাবে অর্থ উপার্জন করে প্রাণধারণ করে, তাদের অন্তরে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করার আগ্রহ হওয়া কীভাবে সম্ভব ? কিন্তু এরাও যদি পরমাত্মপ্রাপ্তি করতে চায়, তাহলে তারা সাধন-পরায়ণ হতে পারে। এরূপ স্থির নিশ্চয় করাতে কোনো বাধা নেই, কারণ এই মনুষ্যজন্ম লাভ হয়েছে পরমাত্মপ্রাপ্তিরই জন্য।

পরিশিষ্ট-ভাব—'আশাপাশশতৈর্বদ্ধা'—'শতৈঃ' পদটি এখানে অনন্তের বাচক। সংসারের সঙ্গে যতক্ষণ সম্পর্ক থাকে, ততক্ষণ কামনার কোনো শেষ থাকে না। দ্বিতীয় অধ্যায়ের একচল্লিশতম শ্লোকে উদ্ধৃত হয়েছে যে—**'বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্'**, 'অব্যবসায়ী মানুষদের বুদ্ধি অনন্ত এবং বহুশাখাযুক্তই হয়ে থাকে।' কারণ তারা অবিনাশী থেকে বিমুখ হয়ে বিনাশশীলকে অস্তিত্ব ও গুরুত্ব প্রদান করে এবং তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে।

'কামক্রোধপরায়ণাঃ'—আসুরী স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিগণ কাম ও ক্রোধকে স্বাভাবিক বলে মনে করে। কাম ও ক্রোধ ব্যতীত তারা আর কিছু দেখেই না, এর বেশি আর তাদের দৃষ্টি যায় না । এই হল তাদের অন্তিম লক্ষ্য।

মানুষ মনে করে যে ক্রোধ প্রকাশ করলে অন্যেরা আমার বশে থাকবে। কিন্তু যারা নিরুপায় হয়ে আমাদের বশ্যতা মেনে নিয়েছে, তারা কতদিন আমাদের বশে থাকবে ? সুযোগ পেলেই তারা প্রতিশোধ নেবে। সুতরাং ক্রোধের পরিণাম খারাপই হয়।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—আসুরী স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিরা লোভ, ক্রোধ এবং অহং-অভিমান নিয়ে কী আকাঙ্ক্ষা করে, পরবর্তী তিনটি শ্লোকে তাই জানিয়েছেন।

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥ ১৩ ॥

[**ইদম্, ময়া** (এইসব আমি) ; **অদ্য, লব্ধম্** (আজ প্রাপ্ত করেছি) ; **ইমম্, মনোরথম্** (এই মনোবাসনাগুলি) ; **প্রাপ্স্যে, ইদম্, ধনম্** (পেয়ে যাব ! এত ধন) ; **মে, অস্তি** (আমার কাছে আছে) ; **ইদম্, পুনঃ, অপি, ভবিষ্যতি** (আবার এত ধন হয়ে যাবে।)]

তারা এরূপ মনোবাসনা পোষণ করে যে এতসব বস্তু তো আমরা প্রাপ্ত করেছি এবং এবার এই ঈপ্সিত বস্তুগুলি পেয়ে যাব। এত ধন তো আমাদের কাছে আছে, আবার এত ধন হয়ে যাবে ॥ ১৩ ॥

ব্যাখ্যা—'ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্'—আসুরী-প্রকৃতিপরায়ণ ব্যক্তিরা লোভ পরবশ হয়ে এই কামনা করে থাকে যে আমরা নিজ উদ্যোগে, বুদ্ধিতে, চাতুর্যে, চালাকি করে এত বস্তু প্রাপ্ত করেছি, আরও অনেক প্রাপ্ত করব। এত বস্তু আমাদের আছে আর এত ওখান থেকে আসবে। ব্যবসায়ে এত লাভ করব। আমার জ্যেষ্ঠপুত্র অনেক লেখাপড়া করেছে, সুতরাং তার বিবাহে যৌতুক হিসাবে অনেক কিছু পাওয়া যাবে। ট্যাক্স ফাঁকি থেকে অনেক টাকা বাঁচাব, জমি থেকে এত লাভ করব, বাড়িভাড়া থেকে এত টাকা আসবে, সুদ থেকে কিছু টাকা পাব ইত্যাদি ইত্যাদি।

'ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্'—তাদের লোভও যেমন বৃদ্ধি পেতে থাকে, তেমনই আকাঙ্ক্ষাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাদের চিন্তা যখন অধিক বৃদ্ধি পায়, তখন তারা চলতে-ফিরতে, কাজ-কর্ম করতে, আহার করার সময়, স্নানাদি নিত্যকর্ম (জপ-ধ্যান ইত্যাদি) করার সময়ও 'অর্থ কী করে আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে' সেই চিন্তাই করতে থাকে। এত দোকান, মিল, কারখানা তো খুলেছি, আরও যেন এতগুলি খুলতে পারি। এতগুলি গোরু-মহিষ-আদি পশু তো আছে আরও যেন এতগুলি হয়। আমার যা জমি আছে, তা এমন বেশি কিছু নয়, কোনোপ্রকারে আরও পাওয়া গেলে খুব ভালো হয়। এইভাবে ধন-সম্পদ বৃদ্ধির চিন্তাতেই তাদের মন ডুবে থাকে।

তাদের দৃষ্টি যখন নিজ শরীর ও পরিবারের দিকে যায়, তখন তারা সেই বিষয়ে ভাবতে থাকে যে কী কী ওষুধ খেলে দেহ ঠিক থাকে। অমুক জিনিসগুলি পেলে আমরা সুখে-আরামে থাকব। এয়ারকন্ডিশন গাড়ি ক্রয় কর, যাতে গরম না লাগে। এমন কাপড় খরিদ কর, যাতে শরীর ঠান্ডা থাকে। চিত্তাকর্ষক বর্ষাতি বা ছাতা কেন, যাতে বর্ষায় কষ্ট না হয়। এমন সব গহনা-কাপড়-প্রসাধন-সামগ্রী কেন যাতে খুব সুন্দর দেখায় ইত্যাদি।

কামনা-বাসনায় তারা এত মগ্ন হয়ে যায় যে তাদের স্মরণে থাকে না যে আমরা বুড়ো হলে এইগুলির কী হবে ? মরার সময় এইসব সামগ্রীতে আমাদের কী কাজ হবে ? শেষকালে এই সম্পত্তির মালিক কে হবে ? পুত্র তো কুপুত্র, এ সবই সে নষ্ট করে দেবে। মৃত্যুর সময় এই ধন-সম্পত্তির জন্যই পুত্র-কন্যাকে ভয় করতে হয় এবং চাকরিতেও ভয় হয় যে কি জানি সেখানে আবার অশান্তি না হয় !

প্রশ্ন—দৈবী-সম্পদের অধিকারী সাধকের মনেও কখনো কখনো ব্যবসায় ইত্যাদি কাজের জন্য (এই শ্লোকটির মতো) এতটা কাজ হয়েছে, এত কাজ করা বাকি, আরও এতটা কাজ পরে হবে ; এত টাকা পাওয়া গেছে, এত টাকা ট্যাক্স দিতে হবে ইত্যাদির স্ফুরণ হয়ে থাকে। এরূপ স্ফুরণ জড়ত্বের আশ্রয় নিয়ে থাকা আসুরী- প্রকৃতির লোকেদের মনেও হয়ে থাকে, তাহলে উভয়ের বৃত্তির পার্থক্য কী ?

উত্তর—উভয়ের বৃত্তি একপ্রকার দেখতে হলেও এর পার্থক্য অনেক। সাধকের উদ্দেশ্য হল পরমাত্মপ্রাপ্তি করা, সুতরাং তিনি সেই বৃত্তিগুলিতে লীন হয়ে যান না। কিন্তু আসুরী-প্রকৃতির মানুষদের উদ্দেশ্য হল অর্থ সংগ্রহ করা, ভোগ করা এবং তারা এই বৃত্তিগুলিতে লীন হয়ে যায়। তাৎপর্য হল এই যে উভয়ের উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকে।

পরিশিষ্ট-ভাব—এখানে ভগবান একাদশ শ্লোকে কথিত **'কামোপভোগপরমাঃ'** পদটির ব্যাখ্যা করেছেন।

❋ ❋ ❋

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী॥ ১৪ ॥

[**অসৌ, শত্রুঃ** (এই শত্রু) ; **ময়া, হতঃ** (আমাদ্বারা হত হয়েছে) ; **চ** (এবং) ; **অপরান্, অপি, হনিষ্যে** (অন্য শত্রুদেরও মেরে ফেলব) ; **অহম্, ঈশ্বরঃ** (আমি সবকিছু করতে সক্ষম) ; **অহম্, ভোগী** (আমার ভোগসামগ্রী আছে) ; **অহম্, সিদ্ধঃ, বলবান্, সুখী** (আমি সফল, আমি অত্যন্ত বলবান ও সুখী)]

সেই শত্রু আমার দ্বারা হত হয়েছে, অন্য শত্রুদেরও আমি মেরে ফেলব। আমি সবকিছু করতে সক্ষম। আমি বহু প্রকারের সুখ-আরামের ভোগকারী। আমি সিদ্ধ, আমি অত্যন্ত বলবান এবং সুখী ॥ ১৪ ॥

ব্যাখ্যা—আসুরী-সম্পদযুক্ত ব্যক্তিগণ ক্রোধপরায়ণ হয়ে এরূপ চিন্তা করে থাকে যে—**'অসৌ ময়া হতঃ শত্রুঃ'**—ওই ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধাচারণ করত, আমার সঙ্গে শত্রুতা করত, তাকে আমি হত্যা করেছি এবং **'হনিষ্যে চ্যাপরানপি'**—অন্য যে কেউ আমার বিরুদ্ধাচরণ করে, আমার সঙ্গে শত্রুতা করে, আমার অনিষ্ট চিন্তা করে, তাকে আমি মজা দেখিয়ে দেব, হত্যা করে ফেলব। **'ঈশ্বরোঽহম্'**—আমি অর্থ-সামর্থ্য-বুদ্ধি সবেতেই সক্ষম, আমার কী নেই ? আমার সমান কে হতে পারে ? **'অহং ভোগী'**—আমি ভোগী। আমার স্ত্রী-পুত্র, গাড়ি-বাড়ি, কত ভোগ্য-সামগ্রী আছে। **'সিদ্ধোঽহম্'**—আমি সর্বপ্রকারে প্রতিষ্ঠিত। আমি যে ভবিষ্যৎবাণী করেছি তাই তো ফলেছে ? যারা জপ-ধ্যান ইত্যাদি করে তারা অন্যের কু-পরামর্শে কান দিয়েছে। ওদের ভবিষ্যতে অমঙ্গল হবে—আমি আগে থেকেই বলে দিতে পারি। আমার সমান কৃতকৃত্য কে আছে ? অণিমা, গরিমা ইত্যাদি সমস্ত সিদ্ধি আমার আছে। একটি ফুৎকারে আমি সকলকে ভস্ম করে দিতে পারি। **'বলবান্'**—আমি অত্যন্ত শক্তিশালী। অমুক ব্যক্তি আমার সঙ্গে শত্রুতা করতে এসেছিল, তার কী ফল হল ? ইত্যাদি। কিন্তু যেখানে সে নিজে পরাস্ত হয়, সে কথা অন্যদের জানায় না, যাতে কেউ তাকে বলহীন বলে মনে না করে। তার নিজেরও পরাজিত হওয়ার কথা স্মরণে থাকে না, কিন্তু অহং-অভিমানের কথা তার সর্বক্ষণ মনে থাকে। **'সুখী'**—আমি কত সুখী, কত আরামে আছি। জগতে আমার মতো সুখী আর কে ?

এরূপ ব্যক্তিদের মধ্যেও নানাপ্রকার অশান্তি থাকে, কিন্তু তারা ওপর-ওপর নানাপ্রকার অহংকার দেখিয়ে থাকে।

পরিশিষ্ট-ভাব—ভগবান এখানে দ্বাদশ শ্লোকে কথিত **'কামক্রোধপরায়ণাঃ'** পদের ব্যাখ্যা করেছেন।

আসুরী-স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে 'আমি সুখী'—এরূপ অহংকার হয়ে থাকে। বাস্তবিক তারা সুখী হয় না। বাস্তবে সে-ই সুখী যার ওপর অনুকূল-প্রতিকূল কোনো কিছুরই প্রভাব পড়ে না (গীতা ৫।২৩)।

আসুরী-স্বভাবসম্পন্ন মানুষের কাম আর ক্রোধই হল শক্তি। তারা বিনাশশীল বস্তু দ্বারা নিজেকে বলবান বলে মনে করে। হিরণ্যকশিপু ইত্যাদির মতো এরা নিজেকেই সবার ওপরে বলে মনে করে ; অন্যান্যদের এরা নিকৃষ্ট মনে করে।

***

আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ॥ ১৫ ॥

[**আঢ্যঃ** (আমি ধনবান) ; **অভিজনবান্, অস্মি** (অনেক ব্যক্তি আমার আছে) ; **ময়া, সদৃশঃ** (আমার মতো) ; **অন্যঃ, কঃ, অস্তি** (আর কে আছে ?) ; **যক্ষ্যে** (আমি যজ্ঞ করব) ; **দাস্যামি** (দান করব) ; **মোদিষ্যে** (মজা করব) ; **ইতি** (এইরূপ) ; **অজ্ঞানবিমোহিতাঃ** (অজ্ঞানে সে মোহগ্রস্ত হয়ে থাকে।)]

আমি ধনবান, আমি বহুজন পরিবৃত, আমার সমান আর কে আছে ? আমি যজ্ঞ করব, দান করব, মজা করব—এইরূপ অজ্ঞানে সে মোহাচ্ছন্ন থাকে॥ ১৫ ॥

ব্যাখ্যা—আসুরী-প্রকৃতির ব্যক্তিগণ অহং-পরবশ হয়ে এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করে থাকে—

'আঢ্যোঽভিজনবানস্মি'—আমার কত অর্থ আছে ! কত সোনা-রূপা, বাড়ি-জমি আছে। আমার সঙ্গে কত বড় বড় উচ্চ-পদাধিকারী ব্যক্তি আছে। এই ধন ও জনের শক্তিতে, ঘুষ এবং সুপারিশের দ্বারা আমি যা চাই, তাই করাতে পারি।

'কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া'—আপনি তো এত জায়গা ঘুরেছেন, অনেককে নিশ্চয়ই দেখেছেন, বলুন তো, আমার মতো কাউকে দেখেছেন ?

'যক্ষ্যে দাস্যামি'—আমি এমন যজ্ঞ করব, এমন দান করব যে সকলকে টেক্কা দিয়ে যাব। ছোটখাট যজ্ঞ করলে, এত অল্প দান করলে, অতি অল্প ব্রাহ্মণ ভোজন করালে কী হয় ? আমি এমন যজ্ঞ, দান করব আজ পর্যন্ত যা কেউ করেনি ! সাধারণভাবে যজ্ঞ বা দান করলে লোকে জানতেই পারবে না যে আমি যজ্ঞ বা দান করেছি। অনেক বড় করে

যজ্ঞ বা দান করলে আমার নাম কাগজে বেরোবে। কোনো ধর্মশালাতে ঘর করলে, তাতে আমার নাম লিখিয়ে রাখব, যাতে লোকে আমাকে স্মরণে রাখে।

'মোদিষ্যে'—আমি কত বড় লোক ! সমস্ত জিনিসই আমার অত্যন্ত সহজলভ্য ! অতএব আমি আনন্দে আমোদ করব।

এইরূপ অহংভাব নিয়ে নানান বাসনা করে যেসব অসুখী ব্যক্তি, তারা শুধু 'করব' 'করব' এই মনোভাব নিয়েই থাকে, তারা প্রকৃতপক্ষে কিছুই করে না। যদি করেও, তবে সেটি নামমাত্রই করা হয়ে থাকে (পূর্ববর্তী সপ্তদশ শ্লোকে যার উল্লেখ করা হয়েছে।) কারণ **'ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ'**—ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ শ্লোকে বর্ণিত এইরূপ বাসনাকারী আসুরী ব্যক্তিরা অজ্ঞান ও মোহগ্রস্ত হয়ে থাকে অর্থাৎ মূঢ়তার জন্যই তাদের এইরূপ মনোভাব হয়ে থাকে।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—পরমাত্মা হতে বিমুখ হওয়া আসুরী-সম্পদসম্পন্ন ব্যক্তিদের ইহলোকে তো অশান্তি, মনস্তাপ, অন্তর্দাহ ইত্যাদি হয়ই, মৃত্যুর পরে তাদের কী গতি হয়—পরবর্তী শ্লোকে তাই জানানো হয়েছে।

অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥ ১৬ ॥

[**অনেকচিত্তবিভ্রান্তাঃ** (কামনাবশতঃ বিবিধ চিন্তায় বিভ্রান্তচিত্ত) ; **মোহজালসমাবৃতাঃ** (মোহজালে উত্তমরূপে আবদ্ধ); **কামভোগেষু** (পদার্থভোগে) ; **প্রসক্তাঃ** (বিশেষভাবে আসক্ত ব্যক্তি) ; **অশুচৌ** (ভয়ঙ্কর) ; **নরকে পতন্তি** (নরকে পতিত হয়।)]

কামনাবশতঃ বিবিধ চিন্তায় বিভ্রান্তচিত্ত, মোহজালে উত্তমরূপে আবদ্ধ এবং পদার্থ-ভোগে বিশেষভাবে আসক্ত ব্যক্তিগণ ভয়ঙ্কর নরকে পতিত হয়॥ ১৬ ॥

ব্যাখ্যা—**'অনেকচিত্তবিভ্রান্তাঃ'**—ওইসব আসুরী ব্যক্তিদের নিশ্চয় একপ্রকার না থাকায় তাদের মনে নানাপ্রকার আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়, সেই এক একটি আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য নানারূপ উপায় হয় এবং সেই উপায়ের জন্য তাদের নানাপ্রকার ব্যবস্থাদি করতে হয়। কোনো একটি বিষয়ে তাদের চিন্তা স্থির থাকে না, নানা স্থানে সে ঘুরে মরে।

'মোহজালসমাবৃতাঃ'—তাদের উদ্দেশ্য জড়ত্বের দিকে থাকায় তারা মোহজালে আবৃত থাকে। মোহজালের অর্থ হল যে, ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শ্লোক পর্যন্ত কাম, ক্রোধ এবং অহং-অভিমান নিয়ে যত বাসনার কথা বলা হয়েছে, সেইসবের দ্বারা তারা উত্তমরূপে আচ্ছাদিত হয়ে থাকে। এগুলির থেকে তারা কখনো মুক্ত হয় না। মাছ যেমন জালে বদ্ধ হয়, এইসব প্রাণীও তেমন বাসনারূপ মোহজালে আবদ্ধ হয়ে থাকে। তাদের বাসনাতেও কেবল একপ্রকার বৃত্তি থাকে না, নানা বৃত্তি উঠতে থাকে ; যেমন—এত অর্থ তো পেয়ে যাব, কিন্তু তাতে যদি এইসব বাধা এসে যায় ? আমার কাছে এত দুনম্বরী অর্থ আছে, সরকারি কর্মচারীরা তা জেনে যায়নি তো ? আমার বেতনভুক কর্মচারীরা আমার নামে লাগিয়ে দেবে নাতো ? আমি অমুক ব্যক্তিকে খতম করব, কিন্তু তাতে যদি ধরা পড়ে যাই ? আমি অন্যের ক্ষতি করব, তাতে আমার ক্ষতি হবে নাতো ?—এইরূপে মোহজালে আবদ্ধ আসুরী ব্যক্তিদের মধ্যে কাম, ক্রোধ, অহং-অভিমানের সঙ্গে ভয়ও বিরাজ করে। সেইজন্য তারা কোনো ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। কোথাও কিছু করতে গেলে, তা বেঠিক হয়ে যায় ! মনোবাসনা পূরণ না হওয়াতে তারা যে কী দুঃখ পায়, তা কেবল তারাই জানে।

'প্রসক্তাঃ কামভোগেষু'—বিষয়, অর্থ ইত্যাদি সংগ্রহ করায় এবং তার উপভোগে ও মান-মর্যাদা, সুখাসক্তিতে তারা অত্যন্ত আসক্ত হয়ে থাকে।

'পতন্তি নরকেঽশুচৌ'—এই মোহজাল তাদের পক্ষে ইহজীবনেই নরক হয়ে ওঠে এবং মৃত্যুর পর তাদের কুম্ভীপাক, মহারৌরব ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ নরক প্রাপ্তি ঘটে। এইসব নরকের মধ্যেও তারা বিশেষ যাতনাময় নরক প্রাপ্ত হয়। **'নরকে অশুচৌ'** বলার অর্থ হল যে, যেসব

নরকে তীব্র যন্ত্রণা এবং ভীষণ দুঃখ সহ্য করতে হয়, এরূপ ভীষণ নরকে এরা পতিত হয়[১]। কারণ যাদের যেমন স্থিতি, মৃত্যুর পরও তাদের তেমনই (স্থিতি অনুসারে) গতি হয়ে থাকে।

পরিশিষ্ট-ভাব—প্রকৃতপক্ষে আসুরী ব্যক্তিগণ কামক্রোধপরায়ণ হওয়ায় নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে এবং অভাবরূপ অগ্নিতে দগ্ধ হতে থাকে। পরিণামে তাদের ভয়ঙ্কর নরকপ্রাপ্তি হয়।

উচ্চলোক গমনে বা নরক গমন করায় পদার্থ বা ক্রিয়া প্রধান কারণ নয়, ভাবই হল প্রধান কারণ। ভাবের বিশেষ মূল্য আছে। ভাব যেমন হয়, ক্রিয়া স্বতঃই সেইরূপ হয়ে থাকে। তাই ভগবান আসুরী ব্যক্তিদের মনোবাসনার বর্ণনা করেছেন।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—ভগবদ্প্রাপ্তির উদ্দেশ্য থেকে বিমুখ আসুরী-প্রকৃতিযুক্ত ব্যক্তিদের দুরাচারের ফল হয় নরক প্রাপ্তি—এই কথা জানিয়ে, দুরাচারীদের দ্বারা প্রোথিত দুর্ভাবে তাদের বর্তমানে কত ভয়ঙ্কর দুর্দশাগ্রস্ত হতে হয় এবং ভবিষ্যতে কী পরিণাম হয়—সেটি জানাবার জন্যই পরবর্তী (চারটি শ্লোকের) প্রকরণ শুরু করেছেন।

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্বকম্॥ ১৭ ॥

[**আত্মসম্ভাবিতাঃ** (নিজেকে সব থেকে বেশি শ্রদ্ধার পাত্র বলে মনে করা) ; **স্তব্ধাঃ** (অবিনয়ী এবং) ; **ধনমানমদান্বিতাঃ** (ধন ও মানের গর্বে গর্বান্বিত) ; **তে, দম্ভেন** (সেই ব্যক্তিগণ দম্ভ সহকারে) ; **অবিধিপূর্বকম্** (অবিধিপূর্বক) ; **নামযজ্ঞৈঃ** (নামমাত্র যজ্ঞের দ্বারা) ; **যজন্তে** (পূজা করে।)]

নিজেকে সব থেকে বেশি শ্রদ্ধার পাত্র বলে মনে করা, অবিনয়ী এবং ধন ও মানের গর্বে গর্বান্বিত সেই ব্যক্তিগণ দম্ভ সহকারে অবিধিপূর্বক নামমাত্র যাগযজ্ঞ করে থাকে॥ ১৭ ॥

ব্যাখ্যা—'আত্মসম্ভাবিতাঃ'—তারা ধন-মান-মর্যাদা-সম্মান এইসবের দৃষ্টিতে নিজেদের মনে নিজেকেই বড় বলে মনে করে, পূজনীয় বলে ভাবে যে, আমার মতো আর কেউ নেই ; সুতরাং আমাকে পূজা করা উচিত, আমার সম্মান হওয়া উচিত, আমার প্রশংসা হওয়া উচিত। বর্ণ, আশ্রম, বিদ্যা, বুদ্ধি, পদ, অধিকার, যোগ্যতা ইত্যাদি সর্বপ্রকারেই আমি শ্রেষ্ঠ ; অতএব সকলেরই আমার কথা অনুযায়ী চলা উচিত।

'স্তব্ধাঃ'—এরা কারও কাছেই নম্র হয় না, নত হয় না। কোনো সন্ত-মহাপুরুষ বা অবতারী ভগবানও যদি তাদের কাছে উপস্থিত হন, তাহলেও তারা তাঁদের নমস্কার করে না। তারা তো নিজেদেরই বড় বলে মনে করে, তাহলে আর কার কাছে তারা নম্র হবে বা কাকে নমস্কার করবে ! কোনো কারণে যদি কারও কাছে নম্রতা স্বীকার করতে হয়ও, তারা অহংভাব বজায় রেখেই তা করে। এইরূপ তাদের মধ্যে অত্যন্ত জেদ ও অহংকার থাকে।

'ধনমানমদান্বিতাঃ'—এরা ধন ও মানের অহংকারে সদা মত্ত হয়ে থাকে। তাদের অর্থ, নিজ পরিবার, জমি-বাড়ি ইত্যাদি নিয়ে খুব অহংভাব হয়। কিছু পরিচিতি হলে তারা অত্যন্ত অহঙ্কৃত হয়ে ওঠে যে, আমার অনেক বড় বড় মন্ত্রীর সঙ্গে জানাশোনা। আমার এমন ক্ষমতা যে আমি যা খুশি লাভ করতে পারি, যাকে খুশি শেষ করে দিতে পারি। এইরূপ অর্থ ও মানকেই তারা আশ্রয় করে থাকে। সেটাই তাদের নেশা হয়ে যায়, তাদের অহংকার হয়ে ওঠে। তাই ধন-মানকেই তারা শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে।

'যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেন'—এইসব লোকেরা (পঞ্চদশ শ্লোকে উদ্ধৃত **'যক্ষ্যে দাস্যামি'** পদ অনুসারে)

[১]নরক গমনকারী ব্যক্তিদের 'যাতনাশরীর' প্রাপ্তি হয়। সেই যাতনাশরীরকে খণ্ড খণ্ড করা হয় ও গরম তেলে ফেলা হয়, তবুও তাদের মৃত্যু হয় না। প্রাণী যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের পাপকর্মের ফল ভোগ করছে, ততক্ষণ যতই কষ্ট দেওয়া হোক, সে মরে না।

দম্ভপূর্বক নামমাত্র যজ্ঞ করে। এটিও শুধুমাত্র লোক দেখাবার জন্য ও নিজ মহিমা বৃদ্ধি করার জন্যই করে থাকে। তারা এই মনোভাব নিয়ে যজ্ঞাদি করে যে, অন্যের ওপর যাতে এর প্রভাব পড়ে এবং তারা সেই প্রভাবে প্রভাবিত হয়, যেন তারা বুঝতে পারে যে আমি কে ?

লোকের মধ্যে আমার নাম হবে, প্রসিদ্ধি হবে, সম্মান হবে—এইজন্য তারা যজ্ঞের নামে নিজের খুব প্রচার করে, নিজের নামে প্রচার-পত্র ছাপায়। ব্রাহ্মণদের খাবারের পায়েসে কর্পূর মিশিয়ে দেবে যাতে তারা বেশি খেতে না পারে, এতে অর্থের সাশ্রয় হবে, আর বেশি ব্রাহ্মণ-ভোজন করাবার নামও হবে। পংক্তি ভোজন করাবার সময় একসঙ্গে অনেকগুলি করে পাতা ও মাটির খুরি দেবে, যাতে বাইরে ফেললে লোকে মনে করে যে বহু লোক এখানে পংক্তি ভোজন করেছে, অনেক পদ রান্না হয়েছে। এই ব্যক্তি কত ভালো, যিনি এত ব্রাহ্মণ ভোজন করাচ্ছেন। আসুরী-ভাবাপন্ন ব্যক্তিদের এইরূপ মনোভাব হয় এবং সেই মনোভাব অনুসারেই তাদের আচরণ হয়ে থাকে।

আসুরী-সম্পদযুক্ত ব্যক্তিগণ শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ, দান-পূজা ইত্যাদি কর্ম করে এবং তার জন্য খরচাদিও করে থাকে, কিন্তু তারা তার জন্য শাস্ত্রবিধির পরোয়া না করে দম্ভ সহকারে করে থাকে।

মন্দিরে যখন কোনো মেলা বা মহোৎসব হয়, সেখানে অনেক লোক আসার কথা থাকে বা উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসার, ধনী ব্যক্তিরা আসে, তখন তারা খুব সুন্দর করে মন্দিরকে সাজায়, ঠাকুরকে নানাপ্রকার গহনা কাপড়ে সাজায়, যাতে বহুলোক দেখে অনেক প্রণামী দেয়। এইভাবে নামমাত্র ঠাকুরের পূজা হয়, বাস্তবে পূজা হয় সেই ধনি ব্যক্তির বা সরকারী অধিকারীরই। তেমনই কোনো মন্ত্রী বা উচ্চপদস্থ আধিকারিক আসার ব্যাপার হলে তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য বিগ্রহকে খুব সাজায় এবং ওইসব লোকেরা মন্দিরে এলে তাদের খুব আদর-আপ্যায়ন করে, তাদের ঠাকুরের প্রসাদী ফুল-মালা দেয়, (বিশেষভাবে তাদের জন্য প্রস্তুত) প্রসাদ দেয় যাতে ওইসব উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা খুশি হয়ে এদের সব কাজে সহায়তা করে, মামলা-মোকদ্দমায় তাদের পক্ষ নেয় ইত্যাদি। এইভাব দ্বারা এরা ভগবানের যে পূজা করে, তা নামমাত্রই পূজা। তাদের আসল পূজা হল নিজ নিজ ব্যবসায়ের, ঘরের কাজের, মামলা-মোকদ্দমার, কেন-না তাদের সেইটিই উদ্দেশ্য।

গো-সেবক সংস্থা সঞ্চালকেরাও গো-শালাতে প্রায়শঃ দুগ্ধ-প্রদানকারী সুস্থ গাভীকেই স্থান দেয় এবং তাদের অধিক খাদ্য দেয় ; কিন্তু অসুস্থ, অন্ধ, বৃদ্ধ, দুধপ্রদানে অক্ষম গাভীকে রাখে না, যদি তেমন গাভী রাখেও তাহলে দুধ প্রদানকারীদের তুলনায় এদের কম খেতে দেয়। কিন্তু লোককে আসল কথা জানতে না দিয়ে, মিথ্যা প্রচার করে থাকে। পুস্তিকা, লেখা ইত্যাদির দ্বারা এমন প্রচার চালায়, যাতে অনেক অর্থ আসে এবং খরচ কম হয়।

ধর্মীয়-সংস্থাতেও যারা সঞ্চালক থাকেন, তাঁরা প্রায়শঃই ওইসব সংস্থার অর্থ নিজ ব্যক্তিগত কাজে লাগান। নিজের কীসে লাভ হবে, ব্যবসা কী করে ভালো হবে, কেমন করে অর্থলাভ হবে—এইরূপ নিজ স্বার্থ চিন্তা করে শুধু লোক দেখিয়ে সব কাজ করেন।

সাধন-ভজনকারী ব্যক্তিরাও প্রায়শঃ লোক আসছে দেখে আসন পেতে ভজন-ধ্যান ও মালাজপ করতে শুরু করে দেয়। কিন্তু কেউ লক্ষ্য করছে না দেখলে, কথা বলতে থাকে, তাস-দাবা খেলে বা শুয়ে পড়ে। এই যে সাধন-ভজন, তা কেবল এইজন্য যে, লোকে যাতে তাকে ধার্মিক বলে মনে করে, ভক্ত বলে মানে, প্রশংসা করে, আদর-আপ্যায়ন করে, অর্থ দেয় ইত্যাদি। এই সাধন-ভজন তো ভগবানের জন্য নাম-মাত্রই হয় আসলে, কিন্তু নিজের নাম, শরীর ও অর্থের জন্যই তা হয়ে থাকে। এইসব আসুরী-সম্পদসম্পন্ন লোকের বিষয়ে আর কত বলা যায় ?

'অবিধিপূর্বকম্'—এই আসুরী ব্যক্তিরা শাস্ত্রবিধি তো মানেই না, সর্বদা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ কাজই করে থাকে। তারা যে যজ্ঞ, দানাদি করে, তা-ও বিধিসম্মতভাবে করে না। দান করে কুপাত্রে, সুপাত্রে নয় । কু-ব্যক্তির সঙ্গেই তাদের বন্ধুত্ব থাকে। এইরূপ বিপরীত কাজই তারা করে থাকে। বিপরীত বুদ্ধি হওয়ায় প্রতিকূল কাজকেই তারা অনুকূল বলে মনে করে **'সর্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ'** (গীতা ১৮।৩২)।

পরিশিষ্ট-ভাব—আসুরী-স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তি অপরের প্রতি স্পর্ধা রেখে যজ্ঞ ইত্যাদি করে এবং যজ্ঞ করার পিছনে তার এই মনোভাব থাকে যে অপরের চাইতে তার মধ্যে যেন কোনো ন্যূনতা না থাকে, কেউ যেন মনে না করে যে অন্যান্য যজ্ঞকারীদের থেকে সে ক্ষুদ্র। এঁরা শুধু লোকেদের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভের জন্যই যজ্ঞ করে, যজ্ঞের ফলেতে এরা বিশ্বাস

করে না। অন্য ব্যক্তি যখন যজ্ঞ করে, তখন এরা মনে করে ওই ব্যক্তিও নিজ প্রসিদ্ধি লাভের জন্যই যজ্ঞ করছে। ঈশ্বর এবং পরলোকে বিশ্বাস না থাকায় এরা বিধি-নিষেধ মানে না। বিধি-নিষেধের বিচার তারাই করে যারা পরলোকে বিশ্বাস রাখে আর জানে কোন্ কর্ম করলে তার কী ফল হবে।

আসুরী ব্যক্তিদের সকল কাজই লোকদেখানো হয়ে থাকে। উপরন্তু তাদের মধ্যে এই অহংকার জন্মায় যে আমরা অন্যের থেকে আরও ভালোভাবে যজ্ঞ করব। নিজেদের জ্ঞান সম্বন্ধেও তাদের এরূপ অহংকার থাকে যে আমরা খুব বুদ্ধিমান, আর সকলে মূর্খ, কিছু বোঝে না। আসলে তারা নিজেরাই যে নীরেট মূর্খ তা বুঝতে পারে না।

※ ※ ※

অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥ ১৮ ॥

[**অহংকারম্** (সেই অহংকার) ; **বলম্, দর্পম্** (বল, দর্প) ; **কামম্, চ, ক্রোধম্** (কাম ও ক্রোধের) ; **সংশ্রিতাঃ** (বশবর্তী মানুষ) ; **আত্মপরদেহেষু** (নিজের এবং অন্যের দেহে অবস্থিত) ; **মাম্** (অন্তর্যামীরূপে আমাকে) ; **প্রদ্বিষন্তঃ** (দ্বেষ করে) ; **অভ্যাসূয়কাঃ** (গুণাবলীতে দোষদৃষ্টি রাখে।)]

সেই অহংকার, জেদ, দর্প, ক্রোধ, কামনার বশবর্তী ব্যক্তিগণ নিজেদের এবং অন্যের দেহে অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত আমাকে দ্বেষ করে এবং (আমার ও অপরের) গুণাবলীতে দোষ-দৃষ্টি রাখে ॥ ১৮ ॥

ব্যাখ্যা—**'অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ'**—এই আসুরী ব্যক্তিরা যে কাজই করে তা অহংকার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের বশীভূত হয়ে করে থাকে। ভক্ত যেমন ভগবানের আশ্রিত হয়, তেমনই এই আসুরী ব্যক্তিগণ অহংকার, বল, কামনা ইত্যাদির আশ্রিত হয়। তাদের মনে এই ভাব দৃঢ়ভাবে থাকে যে অহংকার, বল, দর্প, কামনা ও ক্রোধ ব্যতীত কোনো কাজ হয় না ; সংসারে এরূপভাবে থাকলেই কাজ হয়, নাহলে মানুষকে শুধু দুঃখই পেতে হয় ; যারা এইসবের (অহংকার, বল ইত্যাদির) আশ্রয় নেয় না, তারা নিপীড়িত ও বঞ্চিত হয় ; সহজ সরল মানুষদের সংসারে কে মান্য করে ? সুতরাং অহংকার ইত্যাদি থাকলেই মান বাড়বে, মর্যাদা হবে, যশ হবে, লোকের ওপর অধিকার, আধিপত্য থাকবে।

'মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তঃ'—ভগবান বলেছেন যে, আমি যে তাদের এবং অন্যের শরীরে অবস্থান করি, সেই আমার সঙ্গেও এই আসুরী ব্যক্তিগণ শত্রুতা করে। ভগবানের সঙ্গে শত্রুতা কী রূপ ?—

শ্রুতিস্মৃতি মমৈবাজ্ঞে য উল্লঙ্ঘ্য প্রবর্ততে।
আজ্ঞাভঙ্গী মম দ্বেষী নরকে পততিধ্রুবম্॥

'শ্রুতি ও স্মৃতি'—এই দুটি আমার নির্দেশ। এগুলি উল্লঙ্ঘন করে যারা নিজেদের খুশিমতো আচরণ করে, তারা আমার নির্দেশ অমান্যকারী এবং আমার প্রতি দ্বেষকারী। সেইসব মানুষ নিশ্চিতভাবে নরকে পতিত হয়।

তারা নিজ হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মার সঙ্গেও বিরোধিতা করে অর্থাৎ হৃদয়ে যে পবিত্র ভাবের স্ফুরণ হয়, সুসিদ্ধান্তের উদয় হয়, সেগুলিকে তারা উপেক্ষা-অগ্রাহ্য করে, সেগুলিকে তারা মানে না। তারা অপরকে অবজ্ঞা করে, তিরস্কার করে, অপমান করে, দুঃখ দেয় এবং দ্বেষভাব রাখে। এইভাবে সব প্রাণীদের মাধ্যমে ভগবানকেই দ্বেষ করা হয়।

'অভ্যসূয়কাঃ'—এরা আমার এবং অন্যের গুণাবলীর প্রতি দোষ-দৃষ্টি রাখে। আমার সম্বন্ধে এরা বলে থাকে যে, ভগবান অত্যন্ত পক্ষপাতী ; তিনি ভক্তদের রক্ষা করেন, আর অন্যের বিনাশ করেন, এটা ঠিক নয়। আজ পর্যন্ত যত সাধু-মহাত্মা বা উত্তম স্থিতিসম্পন্ন সাধক হয়েছেন, তাঁদের সম্পর্কে এইসব আসুরী লোকেরা বলে থাকে যে, তাঁদের মধ্যেও রাগ-দ্বেষ, কাম-ক্রোধ, স্বার্থপরতা, লোক দেখানো ভাব ইত্যাদি দোষ দেখা যায় ; কোনো সন্ত-মহাত্মার চরিত্র এমন নেই যাঁর মধ্যে কোনো দোষ নেই ; সুতরাং সকলেই পাষণ্ড। আমিও এসব করেছি, সংযম করেছি, সাধন-ভজন, ব্রত-তীর্থ সবই করেছি, কিন্তু আসলে এসবে কিছুই নেই ; আমি তো কিছুই পাইনি, খালি দুঃখই পেয়েছি, শুধু বৃথাই সময় নষ্ট

হয়েছে ; এরাও কারও কথায় নিজেদের সময় বৃথা নষ্ট করছে ; তারা যে উল্টো পথ ধরে চলেছে, এখন সেই খেয়াল নেই, কিন্তু যখন খেয়াল হবে, তখন তারাও জানতে পারবে ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট-ভাব—আসুরী-প্রকৃতির ব্যক্তিগণ নিজ জেদে অটল থাকে এবং নিজের কথাকেই ঠিক বলে মনে করে। সিদ্ধান্ত হল এই যে, যে নিজে দুঃখী হয়, সেই অপরকে দুঃখ দেয়। আসুরী ব্যক্তিরা নিজেরা দুঃখী হয়, তাই তারা অপরকেও দুঃখ দেয়। তারা কোথাও গুণ দেখে না, সর্বত্র দোষই দেখে থাকে। তারা মনে করে যা কিছু ভালো তা সব তাদের মধ্যেই বিরাজমান। জগতে কোনো ভালো লোক তাদের নজরেই পড়ে না।

*** *** ***

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥ ১৯ ॥

[**তান্, দ্বিষতঃ** (সেই দ্বেষপরবশ) ; **ক্রূরান্** (ক্রূর স্বভাবসম্পন্ন) ; **সংসারেষু, নরাধমান্** (জগতের অতি নীচ) ; **অশুভান্, অহম্** (অপবিত্র মানুষদের আমি) ; **অজস্রম্, আসুরীষু, যোনিষু** (বারংবার আসুরী যোনিতে) ; **এব, ক্ষিপামি** (নিক্ষেপ করি।)]

সেই দ্বেষপরবশ, ক্রূর স্বভাবসম্পন্ন এবং জগতের অতি নীচ অপবিত্র মানুষদের আমি বারংবার আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করি॥ ১৯ ॥

ব্যাখ্যা—**'তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্'**—সপ্তম অধ্যায়ের পঞ্চদশ এবং নবম অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে বর্ণিত আসুরী-সম্পদগুলির এই অধ্যায়ের সপ্তম থেকে অষ্টাদশ শ্লোক পর্যন্ত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই উনিশ এবং বিশতম শ্লোকে আসুরী-সম্পদের বিষয়ে উপসংহার করতে গিয়ে ভগবান বলেছেন যে, এইসব আসুরী ব্যক্তিরা বিনা কারণে সকলের অনিষ্ট করার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে থাকে। তাদের কর্মগুলি অত্যন্ত ক্রূর হয়, যার ফলে তারা অন্যকে হিংসা করে থাকে। এইরূপে এই ক্রূর, নির্দয়, হিংসক মানুষেরা নরাধম অর্থাৎ মানুষের মধ্যে অত্যন্ত নীচ হয়ে ওঠে—**'নরাধমান্'**। তাদের নীচ বলার অর্থ হল এই যে নরকস্থিত পশু-পক্ষী (চুরাশী লক্ষ যোনি) ইত্যাদি তাদের পূর্বকর্মের ফলভোগ করে শুদ্ধ হয়ে উঠছে আর এইসব আসুরী ব্যক্তিরা অন্যায় পাপ-কর্ম করে পশু-পক্ষীর থেকেও অধম গতিতে গমন করছে। তাই এইসব লোকের সংস্পর্শকে অত্যন্ত অপবিত্র বলা হয়েছে—

বরু ভল বাস নরক কর তাতা।
দুষ্ট সঙ্গ জনি দেই বিধাতা॥

(শ্রীরামচরিতমানস ৫।৪৬।৪)

নরকবাস তবুও শ্রেয়, কিন্তু বিধাতা যেন আমাকে কখনো দুষ্ট-সঙ্গ না দেন, কেন-না নরকবাসে পাপ নাশ হয়ে শুদ্ধি আসে, আর দুষ্ট-সঙ্গে অশুদ্ধি আসে, পাপ সৃষ্টি হয় ; পাপের এমন বীজ রোপিত হয় যে পরে নরক এবং চুরাশী লক্ষ যোনি ভোগ করলেও তা সম্পূর্ণ দূর হয় না।

প্রকৃতির অংশ এই দেহে রাগ বৃদ্ধি পেলে আসুরী-সম্পদও বৃদ্ধি পায়। কারণ ভগবান কামনা (রাগ)-কেই সমস্ত পাপের হেতু বলে উল্লেখ করেছেন (৩।৩৭)। এই কামনা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে আসুরী-সম্পদও বৃদ্ধি পেতে থাকে। যেমন, অর্থ কামনা বৃদ্ধি হলে ছল-কপটতা-মিথ্যাচার ইত্যাদি দোষ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায় এবং মনে কী করে অধিক অর্থ উপার্জন হয়—সেই লোভ বৃদ্ধি পায়। তখন মানুষ ছলেবলে, অন্যায়পথে, চুরি করে ধন আহরণ করার ইচ্ছা পোষণ করতে থাকে। লোভ আরও বৃদ্ধি হলে, মানুষ তখন ডাকাতি শুরু করে এবং সামান্য অর্থের লোভে মানুষকে হত্যা করতেও দ্বিধা করে না। এইভাবে তার মধ্যে ক্রূর ভাব বৃদ্ধি পায় এবং তার স্বভাব রাক্ষসের মতো হয়ে ওঠে। তার ফলে তার পতন হতে থাকে এবং শেষকালে তার কীট-পতঙ্গাদি আসুরী যোনিতে জন্ম হয় এবং ভীষণ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।

'ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু'—যাদের নাম নেওয়া, দর্শন করা, স্মরণ করা ইত্যাদিও মহা অশুভকারী—**'অশুভান্'** এরূপ ক্রূর, নির্দয়, সকলের

শত্রুভাবাপন্ন মানুষদের স্বভাব অনুসারেই ভগবান আসুরী যোনি প্রদান করেন। ভগবান বলেছেন—**'আসুরীষ্বেব যোনিষু ক্ষিপামি'** অর্থাৎ আমি তাদের স্বভাব অনুসারেই কুকুর, সাপ, বাঘ, সিংহ ইত্যাদি ইতর যোনিতে নিক্ষেপ করে থাকি। একবার, দুবার নয়, বারংবার নিক্ষেপ করি—**'অজস্রম্'**, যাতে তারা তাদের কর্মফল ভোগ করে শুদ্ধ, নির্মল হয়ে ওঠে।

এদের আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করায় ভগবানের তাৎপর্য কী?

—এইসব ক্রূর, নির্দয় মানুষের সঙ্গেও ভগবানের একাত্মতা থাকে। ভগবানের কাছে এরা পর নয়, এদের প্রতি তাঁর দ্বেষ বা বৈরীতাও নেই, বরং এরা তাঁর আপনই। যেমন, যে ভক্ত যেভাবে ভগবানের শরণ গ্রহণ করে, ভগবানও তাকে সেইভাবে আশ্রয় প্রদান করেন (গীতা ৪।১১)। তাই যে ব্যক্তি ভগবানের প্রতি দ্বেষভাব রাখে, ভগবান তার প্রতি সেই ভাব পোষণ করেন না, বরং তাকে আপনই মনে করেন। অন্য সাধারণ মানুষেরা যারা মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তা করে, তারা তাদের সুখ ও আরাম দিয়ে লৌকিক সুখে আবদ্ধ করে ; কিন্তু ভগবান যাকে আপন করেন, তাকে শুদ্ধ করার জন্য তিনি প্রতিকূল পরিস্থিতির সাহায্য নেন, যাতে সে চিরকালের মতো সুখী হয়—উদ্ধার লাভ করে।

হিতৈষী অধ্যাপক যেমন বিদ্যার্থীদের শাসন ও তাড়না দ্বারা পাঠাভ্যাস করান, যাতে ছাত্ররা বিদ্বান হয়, উন্নত হয়, যোগ্য হয়, তেমনই যেসব প্রাণী ভগবানকে জানে না, মানে না এবং তাঁকে খণ্ডন করে থাকে ; পরম কৃপাময় ভগবান তাদেরও জানেন, নিজের বলে মনে করেন এবং আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করেন, যাতে তারা তাদের কৃতকর্মের পাপ স্খালন করে শুদ্ধ ও নির্মল হয়ে কল্যাণ প্রাপ্তি করতে পারে।

※ ※ ※

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥ ২০ ॥

[কৌন্তেয় (হে কুন্তীনন্দন!) ; মূঢ়াঃ (এই মূঢ় ব্যক্তিগণ) ; মাম্, অপ্রাপ্য, এব (আমাকে প্রাপ্তি না করেই) ; জন্মনি, জন্মনি, আসুরীম্ (জন্ম-জন্মান্তরে আসুরী) ; যোনিম্, আপন্নাঃ (যোনিপ্রাপ্ত হয়) ; ততঃ, অধমাম্, গতিম্ (এবং তার থেকেও অধমগতি) ; যান্তি (প্রাপ্ত হয়।)]

হে কুন্তীনন্দন ! এই মূঢ় ব্যক্তিগণ আমাকে প্রাপ্তি না করে জন্ম-জন্মান্তরে আসুরী যোনি প্রাপ্ত হয় এবং তার থেকেও অধোগতি অর্থাৎ ভয়ঙ্কর নরকে গমন করে॥ ২০ ॥

ব্যাখ্যা—**'আসুরীং যোনিমাপন্না .... মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয়'**—আগের শ্লোকে ভগবান আসুরী ব্যক্তিদের বারংবার পশু-পক্ষী ইত্যাদি যোনিতে নিক্ষেপ করার কথা বলেছেন। সেই কথা ধরেই ভগবান এখানে বলেছেন যে মনুষ্য-জন্মে আমাকে লাভ করার দুর্লভ অবকাশ পেয়েও এই আসুরী ব্যক্তিরা আমাকে না পেয়ে পশু-পক্ষী ইত্যাদি আসুরী যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং বারংবার ওই সকল আসুরী যোনিতেই জন্মাতে থাকে।

'মামপ্রাপ্যৈব' পদটির দ্বারা ভগবান দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছেন যে, আমি অত্যন্ত কৃপা করে জীবেদের মনুষ্য-দেহ প্রদান করেছিলাম যাতে তারা নিজেদের উদ্ধার করতে পারে এবং ভেবেছিলাম যে তারা নিশ্চয়ই সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে ; কিন্তু এই নরাধমেরা এত মূর্খ এবং বিশ্বাসঘাতক যে, যে শরীরের সাহায্যে আমাকে প্রাপ্ত করতে পারত, তার দ্বারা তারা বিপরীত কর্ম করে অধমগতিতে জন্মগ্রহণ করতে থাকে।

মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত করে তারা যেমনই আচরণসম্পন্ন হোক না কেন অর্থাৎ যতই দুরাচারী হোক, ইচ্ছা করলে তারা অল্প সময়েই (গীতা ৯।৩-৩১) এবং মৃত্যুকালেও (গীতা ৮।৫) ভগবানকে লাভ করতে পারে। কারণ **'সমোঽহং সর্বভূতেষু'** (গীতা ৯।২৯) এই কথা বলে ভগবান তাঁকে প্রাপ্ত করতে সকলের জন্য অর্থাৎ প্রাণীমাত্রেরই জন্য দ্বার উন্মুক্ত করে রেখেছেন। একথা সত্য যে পশু-পক্ষী ইত্যাদির মধ্যে তাঁকে লাভ করার যোগ্যতা থাকে না ; কিন্তু ভগবানের দিক থেকে কারও কোনো বাধা নেই। পুরোপুরি এরূপ সুযোগ পেয়েও

এইসব আসুরী ব্যক্তি ভগবানকে প্রাপ্ত না করে অধমগতি প্রাপ্ত হয়, তাদের এই দুর্গতি দেখে পরম দয়ালু প্রভু দুঃখিত হন।

'ততো যান্ত্যধমাং গতিম্'—আসুরী যোনিতে গেলেও তাদের সমস্ত পাপ নষ্ট হয় না। তাই অবশিষ্ট পাপ ভোগ করার জন্য তারা সেই আসুরী যোনি অপেক্ষা আরও অধমগতি অর্থাৎ নরক প্রাপ্ত হয়।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আসুরী যোনি প্রাপ্ত ব্যক্তিদের তো সেই জন্মে ভগবানকে লাভ করার সুযোগই নেই এবং তাদের সেই যোগ্যতাও নেই, তাহলে ভগবান একথা কেন বললেন যে তারা আমাকে প্রাপ্ত না হয়ে তার থেকেও অধমগতিতে চলে যায় ? তার উত্তর হল যে আসুরী জন্ম প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে মনুষ্য শরীরকে নিয়েই ভগবান একথা বলেছেন। অর্থাৎ মনুষ্যদেহ লাভ করে, আমাকে লাভ করার অধিকার পেয়েও এইসব মানুষ আমাকে প্রাপ্তিলাভের চেষ্টা না করে জন্ম-জন্মান্তরে আসুরী যোনি প্রাপ্ত হয়। শুধু তাই নয়, তারা এই আসুরী যোনির চেয়েও অধম কুম্ভীপাক ইত্যাদি ভয়ঙ্কর নরক ভোগ করে।

বিশেষ কথা

ভগবদ্প্রাপ্তি অথবা কল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রাপ্ত মনুষ্যদেহ লাভ করেও মানুষ কামনা, স্বার্থ এবং অভিমানের বশবর্তী হয়ে চুরি-ডাকাতি, মিথ্যাচার, বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি যেসব কর্ম করে তার পরিণাম দু'প্রকারের হয়—(১) বাহ্যিক ফলের অংশ আর (২) অভ্যন্তরীণ সংস্কারের অংশ। কাউকে দুঃখ দিলে তার (যাকে দুঃখ দেওয়া হয়েছে) সেই ক্ষতি হয়, যা তার প্রারব্ধ থেকে হবার থাকে ; কিন্তু যে দুঃখ দেয়, সে নতুন পাপ করে, যার জন্য তাকে নরক ভোগ করতে হয়। শুধু তাই নয়, এই দুর্ব্যবহারের দ্বারা যে নতুন পাপ করার বীজ প্রোথিত হয় অর্থাৎ এই দুরাচারীর দ্বারা অহংভাবে যে দুষ্কর্মের উদয় হয়, তাতে মানুষের ভয়ঙ্কর ক্ষতি হয়। যেমন, চৌর্যকর্মের দ্বারা মানুষ প্রথমে চোর হয়। কারণ সে চোর হয়েই চুরি করে এবং চুরি করার ফলে তার (অহং-এ) চোরের ভাব দৃঢ় হয়[১]। এইভাবে তার অহং-এ চুরির সংস্কার দৃঢ়তা লাভ করে। এই সংস্কার মানুষের পতন ঘটায়—তার দ্বারা বারংবার চৌর্য কর্ম করায়, যার ফলে তার নরকে গমন করতে হয়। সুতরাং যতক্ষণ সেই ব্যক্তি নিজ কল্যাণ না করে অর্থাৎ যতক্ষণ সে তার অহং-এ প্রোথিত এই ভাব দূর না করে, ততক্ষণ এই দুর্মতি জন্ম-জন্মান্তর ধরে তার দুরাচারকে শক্তি দেয়, প্রলোভিত করে, যার ফলে সে আসুরী যোনি এবং তার থেকেও ভয়ঙ্কর নরকে গমন করে দুঃখ, কষ্ট ও বিপদের সম্মুখীন হয়।

আসুরী যোনিতে দেখা যায় তারা তাদের প্রকৃতি অনুযায়ী কেউ পশু-পক্ষী, ভূত-পিশাচ, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি জীবনে সৌম্য প্রকৃতি লাভ করে আবার কেউ ক্রূর প্রকৃতির হয়ে থাকে। তাদের প্রকৃতির (স্বভাবের) এই পার্থক্য তাদের নিজ নিজ সৃষ্ট শুদ্ধ বা অশুদ্ধ অহংবশতঃই হয়ে থাকে। সুতরাং ওইসব যোনিতে নিজ নিজ কর্মের ফলভোগ হলেও তাদের প্রকৃতির পার্থক্য তেমনই থেকে যায়। শুধু তাই নয় সমস্ত যোনি এবং নরক ভোগ করার পর কোনো ক্রমানুসারে অথবা ভগবদ্কৃপায় সে যদি মনুষ্যদেহ লাভও করে, তাহলেও তার অহং-এ অবস্থিত কাম-ক্রোধ ইত্যাদির ভাব আগের মতোই থেকে যায়[২]। এইরূপ যারা স্বর্গলাভের জন্য সুকর্ম করে থাকে এবং মৃত্যুর পরে সেই কর্ম অনুসারে স্বর্গে গমন করে, সেখানে তাদের

---

[১]দুর্ভাবনা থেকে দুরাচারের জন্ম হয় এবং দুরাচার থেকে দুর্ভাবনা পুষ্টি লাভ করে।

[২]অত্যন্তকোপঃ কটুকা চ বাণী দরিদ্রতা চ স্বজনেষু বৈরম্। নীচপ্রসঙ্গঃ কুলহীনসেবা চিহ্নানি দেহে নরকস্থিতানাম্॥

(চাণক্যনীতি ৭।১৭)

নরক থেকে আসা লোকেদের এই লক্ষণ দেখা যায়—অত্যন্ত ক্রোধ, কটু বচন বলা, দারিদ্র্য, আত্মীয়দের সঙ্গে শত্রুতা, নীচদের সঙ্গ এবং কুলহীন বা নীচ ব্যক্তিদের সেবা।

(কার্পণ্যবৃত্তি স্বজনেষু নিন্দা কুচৈলতা নীচজনেষু ভক্তিঃ। অতীব ক্রোধঃ কটুকা চ বাণী নরস্য চিহ্নং নরকাগতস্য॥)

(পদ্মপুরাণ, সৃষ্টি ৫১।১৩২)

কর্মফলের ভোগ হলেও তাদের স্বভাবের পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ তাদের অহং-এর পরিবর্তন হয় না[1]। স্বভাব পরিবর্তন করার, শুদ্ধ করে তোলার অবকাশ একমাত্র মনুষ্যদেহেই থাকে।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, জীব মনুষ্যদেহে আমাকে লাভ করার সুযোগ পেয়েও আমাকে লাভ করে না, যার জন্য আমাকে তাদের অধম যোনিতে নিক্ষেপ করতে হয়। তাদের অধম যোনি এবং অধমগতিতে (নরকে) যাবার মূল কারণটি কী—পরবর্তী শ্লোকে ভগবান তাই জানাচ্ছেন।

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ॥ ২১ ॥

[**কামঃ, ক্রোধঃ, তথা, লোভঃ** (কাম, ক্রোধ এবং লোভ) ; **ইদম্, ত্রিবিধম্** (এই তিনটি) ; **নরকস্য, দ্বারম্** (নরকের দ্বারস্বরূপ) ; **আত্মনঃ, নাশনম্** (জীবাত্মার পতনকারক) ; **তস্মাৎ** (সুতরাং) ; **এতৎ, ত্রয়ম্** (এই তিনটিকে) ; **ত্যজেৎ** (ত্যাগ করা উচিত।)]

কাম, ক্রোধ এবং লোভ—নরকের দ্বাররূপ এই তিনটি জীবাত্মার পতন ঘটায়, সুতরাং এই তিনটিকে ত্যাগ করা উচিত॥ ২১ ॥

ব্যাখ্যা—'কামঃ ক্রোধস্তথা লোভঃ ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারম্'—ভগবান পঞ্চম শ্লোকে বলেছিলেন যে দৈবী-সম্পদ মোক্ষের এবং আসুরী-সম্পদ বন্ধনের কারণ। এই আসুরী-সম্পদ কোথা থেকে আসে ? যেখানে সাংসারিক কামনা হয়, জাগতিক ভোগ্যপদার্থের সংগ্রহ, মান, অহংকার, আরাম ইত্যাদিতে ভালো লাগা, সেগুলিতে যে গুরুত্ব বা আকর্ষণ থাকে, সেই গুরুত্ব-ই মানুষকে নরকের দিকে আকর্ষণ করে। তাই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য—এগুলিকে ষড়রিপু বলে মানা হয়। এর মধ্যে কোথাও তিনটি, কোথাও দুটি আবার কোথাও একটির সম্বন্ধে বলা হলেও, এগুলি মিলিতভাবে সবই এক ধাতুর। এগুলির মধ্যে 'কাম'ই হল প্রধান। কারণ কামনার জন্যই মানুষ আবদ্ধ হয় (গীতা ৫।১২)।

তৃতীয় অধ্যায়ের ছত্রিশতম শ্লোকে অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, মানুষ ইচ্ছা না করলেও কেন পাপাচরণ করে ? তার উত্তরে ভগবান 'কাম' ও 'ক্রোধ'—এই দুটিকেই শত্রু বলে জানিয়েছেন। কিন্তু এই দুটির মধ্যেও আবার '**এষ**' শব্দটি ব্যবহার করে কামনাকেই প্রধান বলে চিহ্নিত করেছেন, কারণ কামনা বিঘ্নিত হলেই ক্রোধের উদয় হয়। এখানে কাম, ক্রোধ ও লোভ—এই তিনটিকে বলেছেন শত্রু। তাৎপর্য হল এই যে ভোগের দিকে বৃত্তি থাকাকে বলে 'কাম' আর সংগ্রহের দিকে বৃত্তি থাকলে বলা হয় 'লোভ'। যখন শুধুমাত্র 'কাম' শব্দটি ব্যবহৃত হয়, তখন ভোগ ও সংগ্রহের ইচ্ছাকেও তার অন্তর্গত ধরা হয়। কিন্তু যেখানে 'কাম' এবং 'লোভ'—উভয় শব্দ স্বতন্ত্রভাবে আসে সেখানে ভোগের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে 'কাম' আর সংগ্রহের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে 'লোভ'-এর উদয় হয় এবং এ দুটিতে প্রতিবন্ধকতা এলে ক্রোধ হয়। কাম, ক্রোধ ও লোভ—এই তিনটি অত্যন্ত বৃদ্ধি পেলে 'মোহ'-এর উদয় হয়।

কাম হতে ক্রোধের উদ্ভব হয় এবং ক্রোধ হতে সম্মোহ আসে (গীতা ২।৬২-৬৩)। কামনাতে যদি

---

[1]স্বর্গস্থিতানামিহ জীবলোকে চত্বারি চিহ্নানি বসন্তি দেহে। দানপ্রসঙ্গো মধুরা চ বাণী দেবার্চনং ব্রাহ্মণতর্পণং চ॥
(চাণক্যনীতি ৭।১৬)

স্বর্গ থেকে আসা লোকেদের মধ্যে চারটি লক্ষণ দেখা যায়—দানে প্রবৃত্তি, মধুর বাক্য বলা, দেবার্চনা এবং ব্রাহ্মণদের পূজার্চনার দ্বারা সন্তুষ্ট করা।

(স্বর্গস্থিতানামিহ জীবলোকে চত্বারি তেষাং হৃদয়ে বসন্তি। দানং প্রশস্তং মধুরা চ বাণী দেবার্চনং ব্রাহ্মণতর্পণং চ॥)
(পদ্মপুরাণ, সৃষ্টি. ৫১।১৩১)

প্রতিবন্ধকতা না আসে তাহলে লোভ জন্মায় এবং লোভ থেকে সম্মোহ আসে। প্রকৃতপক্ষে এই 'কাম'ই ক্রোধ এবং লোভের রূপ ধারণ করে। সম্মোহ হলে তমোগুণের উদয় হয় এবং তারপর সম্পূর্ণ আসুরী-সম্পদের উদ্ভব হয়।

'নাশনমাত্মনঃ'—কাম, ক্রোধ এবং লোভ—এই তিনটিই মানুষের পতনকারক। যাদের উদ্দেশ্য ভোগ ও সংগ্রহ করার দিকে থাকে, তারা (নিজের বুদ্ধিতে) উন্নতির পক্ষে এই দোষ তিনটি হিতকারক বলে মনে করে। তাদের মনে এই ভাব থাকে যে, আমরা কামের দ্বারা সুখভোগ করব, আরামে থাকব। এই ভাবই তাদের পতন ঘটায়।

'তস্মাদেৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ'—এই কাম, ক্রোধই হল নরকের দ্বারস্বরূপ। তাই মানুষের উচিত এগুলি পরিত্যাগ করা। কীভাবে এগুলি ত্যাগ করবে ? তৃতীয় অধ্যায়ের চৌত্রিশতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়েরই বিষয়ের ওপর রাগ (কাম) এবং দ্বেষ (ক্রোধ) বিরাজ করে। সাধকের সেগুলির বশীভূত না হওয়া উচিত। বশীভূত না হওয়ার অর্থ হল কাম, ক্রোধ বা লোভের বশবর্তী হয়ে কোনো কার্য না করা। কারণ এগুলির বশীভূত হয়ে শাস্ত্র, ধর্ম এবং লোকমর্যাদার বিরুদ্ধ কাজ করলে মানুষের পতন হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব—ভোগ করা হল 'কাম'। সংগ্রহ করাকে বলা হয় 'লোভ'। ভোগ এবং সংগ্রহে বাধাপ্রদানকারীর ওপর 'ক্রোধ' জন্মায়। এই তিনটিই হল আসুরী-সম্পদের মূল। সমস্ত পাপই এই তিনটি থেকে উৎপন্ন হয়।

ব্যক্তি ও পদার্থ এখানেই পরিত্যক্ত হয় কিন্তু অন্তরের ভাব আসুরী ব্যক্তিদের নরকে নিয়ে যায়।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—ভগবান এবার কাম, ক্রোধ এবং লোভরহিত হওয়ার মাহাত্ম্য জানাচ্ছেন।

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্॥ ২২ ॥

[**কৌন্তেয়** (হে কুন্তীনন্দন !) ; **এতৈঃ, ত্রিভিঃ, তমোদ্বারৈঃ** (নরকের দ্বারস্বরূপ এই তিনটি থেকে) ; **বিমুক্তঃ** (মুক্ত হয়ে) ; **নরঃ, আত্মনঃ** (যে ব্যক্তি নিজ) ; **শ্রেয়ঃ, আচরতি** (কল্যাণ আচরণ করেন) ; **ততঃ** (তার দ্বারা) ; **পরাম্, গতিম্** (পরমগতি) ; **যাতি** (প্রাপ্ত হন।)]

হে কুন্তীনন্দন ! নরকের দ্বাররূপ এই তিনটি থেকে মুক্ত হয়ে যে ব্যক্তি নিজ কল্যাণ আচরণ করেন, তিনিই পরমগতি প্রাপ্ত হন॥ ২২ ॥

ব্যাখ্যা—'এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় ..... ততো যাতি পরাং গতিম্'—আগের শ্লোকে যেগুলিকে নরকের দ্বার বলা হয়েছে, সেই কাম, ক্রোধ এবং লোভকে এখানে **'তমোদ্বার'** বলে অভিহিত করা হয়েছে। অন্ধকারকে বলা হয় 'তম', অজ্ঞান থেকে যা উৎপন্ন হয়—**'তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি'** (গীতা ১৪।৮)। তাৎপর্য হল এই যে, এই কামাদির জন্যই 'আমার সঙ্গে এই ধন-সম্পদ, স্ত্রী-পুরুষ, ঘর-পরিবার ইত্যাদি আগেও ছিল না, পরেও থাকবে না এবং এখনও প্রতিমুহূর্তে বিচ্ছিন্ন হয়ে চলেছে ; সুতরাং এগুলিতে মমত্ববোধ করলে আমার পরিণাম কী হবে'—এইসব বিষয়ে লক্ষ্য করা যায় না অর্থাৎ বুদ্ধি আচ্ছন্ন থাকে। তাই যারা এই কামাদি দোষ থেকে মুক্ত হয়ে কল্যাণ আচরণ করে, তারা পরমগতি প্রাপ্ত হয়। সুতরাং সাধকের কাম, ক্রোধ, লোভ—এই তিনটি ব্যাপারে অত্যন্ত সাবধান থাকতে হয়। কারণ যারা এই তিনটি বজায় রেখে সাধনা করে, তারা প্রকৃত সাধক নয়। প্রকৃত সাধক তিনিই, যিনি এই দোষগুলি থেকে মুক্ত। এই দোষ থাকলে তা সবসময় পীড়া দেয় ; এগুলিকে থাকার সুযোগ দেওয়াই হল মারাত্মক ভুল।

মানুষ সাধনার দিকে তো দৃষ্টি দেয়, কিন্তু সেইসঙ্গে কাম-ক্রোধাদি যেসব দোষ থাকে, তাতে যে আমাদের কত অহিত হয়—সেদিকে তারা তত লক্ষ্য রাখে না। এইজন্যই সাধনকালে সদাচারও হতে থাকে, দুরাচারও হতে থাকে ; সদ্‌গুণও হয় এবং দুর্গুণও সঙ্গে থাকে। জপ, ধ্যান,

কীর্তন, সৎসঙ্গ, স্বাধ্যায়, তীর্থ, ব্রতাদি করে নিজেদের শুদ্ধ করে তোলার ব্যাপারে সাধক বিশেষভাবে যত্নশীল থাকলেও যেগুলি আমাদের অশুদ্ধ করে থাকে সেই দুর্গুণ-দুরাচার দূর করার দিকে তত দৃষ্টি দেয় না, তাই—

আসুপ্তেরামৃতে কালং নরেদ্ বেদান্তচিন্তয়া।
ন বা দদ্যাদবসরং কামাদীনাং মনাগপি॥

নিদ্রাভঙ্গ থেকে নিদ্রা আসা পর্যন্ত এবং যে দিন জানা যায়, সেই দিন থেকে মৃত্যুর আগমন পর্যন্ত—সর্বসময় পরমাত্মতত্ত্বের (সগুণ-নির্গুণ) চিন্তায় ব্যাপৃত থাকাই উচিত। ঈশ্বর চিন্তা ব্যতীত কামাদিকে কোনোপ্রকার গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়।

'এতৈর্বিমুক্তঃ' কথাটির মানে এই নয় যে, যখন আমাদের দুর্গুণ-দুরাচার সর্বতোভাবে পরিত্যক্ত হবে, তখন আমরা সাধন করব। সাধকের ভগবদ্প্রাপ্তিই প্রধান উদ্দেশ্য ধরে এগুলি থেকেও মুক্ত হবার লক্ষ্য রাখা উচিত। কারণ মিথ্যা, কপটাচার, বিশ্বাসঘাতকতা, কাম, ক্রোধ এগুলি যদি আমাদের মধ্যে থাকে তাহলে নিত্য নতুন পাপ হতে থাকবে, যার ফলে সাধনার সাক্ষাৎ ফল লাভ হবে না। এইজন্যই বহুবছর সাধনায় ব্যাপৃত থাকলেও সাধক তার উন্নতি বুঝতে পারে না, কোনো বিশেষ পরিবর্তন অনুভব করে না। এই দোষগুলি বর্জিত হলে তার শুদ্ধি স্বতঃ ও স্বাভাবিকভাবে আসে। সংসারে আসক্ত হলেই জীবের অশুদ্ধি আসে, নচেৎ পরমাত্মার অংশ হওয়ায় জীব সর্বদা স্বতঃ শুদ্ধ—

ঈশ্বর অংস জীব অবিনাসী।
চেতন অমল সহজ সুখরাসী॥

(শ্রীরামচরিতমানস ৭।১১৭।১)

'শ্রেয়ঃ আচরতি'র অর্থ হল এই যে কাম, ক্রোধ, লোভ—এগুলির কোনোটিরই আচরণ করা উচিত নয়। অর্থাৎ নিষিদ্ধ আচরণ রহিত হয়ে শুদ্ধ আচরণ করা উচিত। অন্তরে কখনো কোনো মলিন চিন্তা এলেও তা ব্যবহারে আনা উচিত নয়। নিজেই এইসব (কাম, ক্রোধাদি) বৃত্তি দূর করার চেষ্টা করতে হয়। যদি নিজ উদ্যোগে এগুলি দূর না হয় তাহলে 'হে প্রভু! হে প্রভু!' বলে ভগবানকে আর্ত হয়ে ডাকতে হয়। তুলসীদাস বলেছেন যে,—

মম হৃদয় ভবন প্রভু তোরা।
তহঁ বসে আই বহু চোরা॥
অতি কঠিন করহিঁ বরজোরা।
মানহিঁ নহিঁ বিনয় নিহোরা॥

(বিনয়পত্রিকা ১২৫।২-৩)

পরিশিষ্ট-ভাব—'এতৈর্বিমুক্তঃ'—কাম-ক্রোধ-লোভ-রহিত হওয়ার তাৎপর্য হল—এইগুলি ত্যাগ করার আগ্রহ রাখা, এগুলির বশীভূত না হওয়া। কাম, ক্রোধ বা লোভের বশবর্তী হয়ে করা শুভ কর্মও কল্যাণকর হয় না। তাই এগুলির ত্যাগের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া উচিত। কাম-ক্রোধ-লোভকে ধরে থেকে শুভ কর্ম (জপ, ধ্যানাদি) করলেও কল্যাণ হয় না; কারণ কাম-ক্রোধ-লোভ সমস্ত পাপের মূল (৩।৩৭)।

কাম-ক্রোধ-লোভের জন্য ধর্ম ও সামাজিক মর্যাদাও নষ্ট হয়ে যায়, যার ফলে জগতের অহিত হয়। আসুরী-স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তি কাম-ক্রোধ ও লোভপরায়ণ হয়ে থাকে। তারা যজ্ঞ, দানাদি শুভ কর্মগুলি নামমাত্র করে থাকে কিন্তু নিজ কল্যাণের জন্য কিছু করে না। অপরপক্ষে দৈবী সম্পদশালী ব্যক্তিগণ কাম-ক্রোধ-লোভের বশবর্তী না হয়ে নিজ কল্যাণের জন্য আচরণ করেন, যাতে জগতের হিত সাধন হয়। আসুরী ব্যক্তিগণ এইসব সাধককে অবুঝ মনে করে হিংসা করে কিন্তু এই সাধকগণ ওইসব আসুরী ব্যক্তিদের জন্য কষ্ট পান এবং তাদের যাতে সদ্বুদ্ধি হয় ভগবানের কাছে তার জন্য প্রার্থনা করে থাকেন।

***

সম্বন্ধ—যাঁরা নিজ কল্যাণের জন্য শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী চলেন, তাঁরা তো পরমগতি প্রাপ্ত হন, কিন্তু যারা তা না করে নিজের খুশীমতো চলে, তাদের কী গতি হয়—পরবর্তী শ্লোকে তাই জানাচ্ছেন।

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥ ২৩ ॥

[**যঃ, শাস্ত্রবিধিম্** (যেসব ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি); **উৎসৃজ্য** (পরিত্যাগ করে); **কামকারতঃ, বর্ততে** (নিজ খেয়াল-খুশিতে কাজ

করে) ; **সঃ, ন, সিদ্ধিম্** (তারা সিদ্ধিও লাভ করে না) ; **ন, সুখম্** (সুখও পায় না) ; **ন, পরাম্, গতিম্** (এবং পরমগতিও) ; অবাপ্নোতি (লাভ করে না।)]

যেসব ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করে নিজেদেরই খেয়াল-খুশিমতো আচরণ করে, তারা সিদ্ধিও লাভ করে না, সুখও পায় না এবং পরমগতি বা মোক্ষও লাভ করে না॥ ২৩ ॥

ব্যাখ্যা—[সতেরোতম অধ্যায়ের আটাশতম শ্লোকের সঙ্গে এই শ্লোকটির সাযুজ্য আছে।]

'যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে'—যেসব ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি অবহেলা করে শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞ, দান, পরোপকার বা জগতের হিতার্থে নানাপ্রকার সুকর্ম করে ; তারা সেগুলি করে **'কামকারতঃ'**[১] অর্থাৎ শাস্ত্রবিধির দিকে দৃষ্টি না দিয়ে তারা তা নিজের খেয়াল-খুশিমতো করে থাকে। নিজের খেয়াল-খুশিমতো করার কারণ হল এই যে তার মধ্যে কাম-ক্রোধ ইত্যাদি থাকে, তার পরোয়া না করে বাহ্যিক আচরণগুলিকে সে শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নেয়। অন্য লোকেরাও বাহ্যিক আচরণই বিশেষভাবে লক্ষ্য করে। অন্তরের ভাব এবং সিদ্ধান্তগুলি জানার লোক খুব কম হয়। প্রকৃতপক্ষে অন্তরের ভাবেরই বিশেষ মহত্ত্ব থাকে।

অন্তরে যদি দুর্গুণ-দুর্ভাবনা থাকে আর বাহ্যিকভাবে মস্ত বড় ত্যাগী-তপস্বী হয়, তাহলে অহংকারবশতঃ সে অন্যকে তিরস্কার করতে থাকে। এইভাবে অন্তরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত দেহাভিমানের জন্য তার গুণগুলিও দোষে পরিণত হয়, তার মহিমা নিন্দায় পর্যবসিত হয়, তার ত্যাগ রাগে, আসক্তিতে ও ভোগে পরিণত হয় এবং ক্রমে তার পতন হয়। তাই অন্তরে দোষ থাকার ফলেই সে শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করে খেয়াল-খুশিমতো আচরণ করে থাকে।

রোগী যেমন নিজ দৃষ্টিতে কুপথ্য পরিত্যাগ করে পথ্য সেবন করলেও, আসক্তিবশতঃ কুপথ্যও গ্রহণ করে থাকে যার ফলে তার স্বাস্থ্য আরও খারাপ হয় তেমনই এইসব ব্যক্তি নিজ দৃষ্টিতে নানা সুকর্ম করলেও, অন্তরে কাম, ক্রোধ ও লোভের প্রভাব থাকায় শাস্ত্রবিধি অবহেলা করে নিজ নিজ ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে, যার ফলে তারা অধোগতি প্রাপ্ত হয়।

'ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি'—আসুরী-সম্পদবিশিষ্ট যে ব্যক্তিগণ শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করে যজ্ঞাদি শুভকর্ম করে, তাদের ধন-মান মর্যাদা ইত্যাদির রূপে কিছু প্রসিদ্ধি লাভ হলেও প্রকৃতপক্ষে অন্তরের শুদ্ধিরূপ যে সিদ্ধি, তা তারা প্রাপ্ত হয় না।

'ন সুখম্'—তারা সুখও পায় না—কেন-না তাদের অন্তরে কাম-ক্রোধের জ্বালা তাদের কষ্ট দেয়। পদার্থাদির সংযোগে যে সুখ, সেগুলি তাদের দুঃখই দেয় অর্থাৎ ওইগুলি থেকে শুধু দুঃখই উৎপন্ন হয় (গীতা ৫।২২)। তাৎপর্য হল এই যে পারমাত্মিক মার্গে গমন করলে যে সাত্ত্বিক সুখ লাভ হয়, তা এরা পায় না।

'ন পরাং গতিম্'—তারা পরমগতিও পায় না। কী করে পাবে ? প্রথমতঃ পরমগতিকে তারা মানেই না আর যদিও মানে, তাহলে তারা তা লাভ করতে পারে না, কারণ কাম, ক্রোধ আর লোভের জন্য তাদের কর্ম সেইরূপই হয়ে থাকে।

সিদ্ধি, সুখ এবং পরমগতি লাভ না করার তাৎপর্য হল এই যে, এদের আচরণাদি শ্রেষ্ঠ হওয়ায় এদের সিদ্ধি-সুখ-

---

[১](ক) এখানে উদ্ধৃত 'কামকারতঃ বর্ততে' (শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করে ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করা) এবং পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে উদ্ধৃত 'কামকারেণ ফলে সক্তঃ (ভোগ, পদার্থের আকাঙ্ক্ষায় ফলে আসক্ত)—এই দুয়েতে কিছু পার্থক্য আছে।' 'কামকারতঃ'-তে ক্রিয়াতে উচ্ছৃঙ্খল বৃত্তি এবং 'কামকারেণ'-তে ভোগের ইচ্ছা থাকে। তাৎপর্য এই যে 'কামকারতঃ'-র দৃষ্টি ক্রিয়ার দিকে আর 'কামকারেণ'-র দৃষ্টি ক্রিয়ার ফলের দিকে থাকে, পরিণামে আমার এইসব লাভ হবে। কিন্তু উভয়েরই মূল কারণ হল 'কাম'।

(খ) লক্ষ্য করার বিষয় হল যে সপ্তম শ্লোক থেকে এই তেইশতম শ্লোক পর্যন্ত যে আসুরী-সম্পদ বর্ণিত হয়েছে, তাতে মোট ন'বার 'কাম' শব্দটি এসেছে ; যেমন, ১—'কামহৈতুকম্' (১৬।৮), ২—'কামমাশ্রিত্য' (১৬।১০), ৩—'কামোপভোগপরমাঃ' (১৬।১১), ৪—'কামক্রোধপরায়ণাঃ' (১৬।১২), ৫—'কামভোগার্থম্' (১৬।১২), ৬—'কামভোগেষু' (১৬।১৬), ৭—'কামম্' (১৬।১৮), ৮—'কামঃ' (১৬।২১) এবং ৯—'কামকারতঃ' (১৬।২৩)। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আসুরী-সম্পদের প্রধান কারণই হল 'কাম' বা কামনা।

পরমগতি প্রাপ্ত হওয়া উচিত, কিন্তু অন্তরে কাম-ক্রোধ-লোভ-অহং-অভিমান ইত্যাদি থাকায় তাদের এইসব শ্রেষ্ঠ আচরণাদিও কুফলে পর্যবসিত হয়। যার জন্য তারা উপরিউক্ত ফল লাভ করে না। যদি মনে করা হয় যে তাদের আচরণই মন্দ, তাহলে ভগবানের **'ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্'**—এরূপ কথার কোনো অর্থ হয় না। কারণ প্রাপ্তি হলেই নিষেধ আসে—**'প্রাপ্তৌ সত্যাং নিষেধঃ'**।

পরিশিষ্ট-ভাব—আসুরী ব্যক্তিগণ অহংকারবশতঃ নিজেদের সফল ও সুখী বলে মনে করে—**'সিদ্ধোঽহং বলবান্সুখী'** (গীতা ১৬।১৪), কিন্তু তারা প্রকৃতপক্ষে সুখী হয় না—**'ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখম্'**। তাদের অন্তরে অহংকার ও ঈর্ষার আগুন জ্বলতে থাকে।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করলে মানুষ সিদ্ধিলাভ করে না, সুতরাং তাদের কী করা কর্তব্য—পরবর্তী শ্লোকে ভগবান তাই জানাচ্ছেন।

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি॥ ২৪ ॥

[**তস্মাৎ, তে** (অতএব তোমার জন্য) ; **কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ** (কর্তব্য-অকর্তব্য নিরূপণে) ; **শাস্ত্রম্, প্রমাণম্** (শাস্ত্রই প্রমাণ) ; **জ্ঞাত্বা, ইহ** (জেনে ইহলোকে) ; **শাস্ত্রবিধানোক্তম্** (শাস্ত্রবিধিসম্মতভাবে) ; **কর্ম** (কর্তব্য-কর্ম) ; **কর্তুম্** (পালন করতে) ; **অর্হসি** (সচেষ্ট হও।)]

অতএব তোমার জন্য কর্তব্য-অকর্তব্য নিরূপণে শাস্ত্রই প্রমাণ—এরূপ জেনে তুমি ইহলোকে শাস্ত্রবিধিসম্মত ভাবে নিয়মিত কর্তব্য-কর্ম করতে সচেষ্ট হও অর্থাৎ শাস্ত্রবিধি অনুসারে তোমার কর্তব্য-কর্মের পালন করা উচিত ॥ ২৪ ॥

ব্যাখ্যা—**'তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ'**—যেসব মানুষের নিজের প্রাণের ওপর মোহ থাকে, তারা প্রবৃত্তি কী এবং নিবৃত্তি কাকে বলে অর্থাৎ কর্তব্য-অকর্তব্য জানতে পারে না। তাই বিশেষভাবে আসুরী-কর্মে প্রবৃত্ত হয়। তাই তুমি কর্তব্য-অকর্তব্য নিরূপণ করার জন্য শাস্ত্রকে সামনে রাখ।

শাস্ত্রে যাদের মহিমা গীত হয়েছে এবং শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যাদের আচরণাদি হয়, এরূপ সাধু-মহাপুরুষদের আচরণ ও বচন অনুসারে চলাকেই বলা হয় শাস্ত্রানুযায়ী আচরণ করা। কারণ ওইসব মহাপুরুষ শাস্ত্রকে মর্যাদা দিয়েছেন এবং শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে চলার ফলেই তাঁরা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় যে, যেসব মহাপুরুষ পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁদের আচরণ, আদর্শ এবং ভাব ইত্যাদি থেকেই শাস্ত্র তৈরি হয়।

'শাস্ত্রং প্রমাণম্'-এর তাৎপর্য হল এই যে, ইহলোক ও পরলোকের আশ্রয় নিয়ে যারা চলে তাদের কর্তব্য-অকর্তব্যের ব্যবস্থাতে শাস্ত্রই হল প্রমাণ।

'জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি[১]'—প্রাণপোষণ-পরায়ণ ব্যক্তিরা শাস্ত্রবিধি (কিসে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত আর কিসে নিবৃত্ত হওয়া উচিত) জানে না (গীতা ১৬।৭) ; তাই তারা সিদ্ধিলাভ করে না। ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে, 'তুমি দৈবী-সম্পদ প্রাপ্ত ; সুতরাং তুমি শাস্ত্রবিধি জেনে কর্তব্য পালন করার উপযুক্ত।'

অর্জুন প্রথমে নিজের ধারণা অনুযায়ী বলেছেন যে, 'যুদ্ধ করলে আমার পাপ হবে, কিন্তু ভাগ্যবান শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়দের পক্ষে স্বতঃপ্রাপ্ত যুদ্ধ স্বর্গপ্রদানকারী (গীতা ২।৩২)। ভগবান বলেছেন—'হে অর্জুন ! তুমি নিজ ইচ্ছানুসারে পাপ-পুণ্যের নিরূপণ করছ ; এই ব্যাপারে তোমার শাস্ত্রকে প্রমাণ হিসাবে নেওয়া উচিত । শাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ীই তোমার কর্তব্য-কর্ম করা উচিত।'

[১]এখানে **'ইহ'** পদটি ব্যবহারের তাৎপর্য হল এই যে, এই জগতে মনুষ্যদেহ শুধুমাত্র শ্রেষ্ঠকর্ম করে পরমাত্মাকে লাভ করার জন্যই প্রাপ্ত হয়েছে। সুতরাং এই সুযোগ কখনো বৃথা নষ্ট করা উচিত নয়।

এর তাৎপর্য হল এই যে, যুদ্ধরূপ ক্রিয়া বন্ধনকারী নয়, আসলে স্বার্থ এবং অহং-অভিমান নিয়ে করা শাস্ত্রীয় ক্রিয়াদিও (যজ্ঞ, দান ইত্যাদি) বন্ধনকারক হয় এবং নিজ ইচ্ছানুযায়ী করা (শাস্ত্রবিরুদ্ধ) কর্মগুলি পতনের কারণ হয়।

স্বতঃপ্রাপ্ত যুদ্ধরূপ ক্রিয়া ক্রূর এবং হিংসাত্মকরূপে প্রতিভাত হলেও তা পাপজনক হয় না (গীতা ১৮।৪৭)। তাৎপর্য হল এই যে স্বাভাবিক নিয়ত কর্ম করলে, স্বার্থবর্জিত মানুষ কখনো পাপভাগী হয় না অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এদের স্বভাব অনুযায়ী শাস্ত্র যে নির্দেশ দিয়েছে, সেই অনুসারে কাজ করলে তারা পাপভাগী হয় না। পাপ হয়—স্বার্থ, অহং-অভিমান এবং অন্যের অনিষ্ট চিন্তা করলে।

মনুষ্য-জন্মের সার্থকতা হল এই যে, সে যেন প্রাণের মোহে আবদ্ধ না হয়ে শুধুমাত্র পরমাত্মপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে শাস্ত্রবিহিত কর্মগুলি করে।

পরিশিষ্ট-ভাব—সপ্তম শ্লোকে ভগবান বলেছিলেন যে আসুরী-স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্তব্য ও অকর্তব্য কী তা জানে না। এখানে ভগবান বলেছেন যে শাস্ত্র অনুসারে আচরণ করলেই ওই আসুরী-স্বভাব দূরীভূত হবে।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, যে শাস্ত্র পড়েনি, তার কর্তব্যের জ্ঞান হবে কী করে ? এর সমাধান হল যে, যদি তার নিজ কল্যাণ করার উদ্দেশ্য থাকে তাহলে কর্তব্যের জ্ঞান আপনিই হবে। কারণ প্রয়োজনই হল আবিষ্কারের জননী। যদি তার নিজ কল্যাণের উদ্দেশ্য না থাকে তাহলে শাস্ত্র পড়লেও কর্তব্যজ্ঞান হবে না, উল্টে অহংকার জন্মাবে যে আমি বেশি জানি !

⁂ ⁂ ⁂

ওঁতৎসদিতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

এইভাবে ওঁ, তৎ, সৎ—ভগবানের এই নাম উচ্চারণপূর্বক ব্রহ্মবিদ্যা তথা যোগশাস্ত্রময় শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা উপনিষদরূপ শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন সংবাদে 'দৈবাসুরসম্পদ্‌বিভাগযোগ' নামক ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত হল ॥ ১৬ ॥

এই (ষোড়শ) অধ্যায়ের নাম **'দৈবাসুরসম্পদ্‌-বিভাগযোগ'**। কারণ এই অধ্যায়ে যে দুই সম্পদের কথা বর্ণিত হয়েছে, তা একটি অপরের একেবারে বিপরীত অর্থাৎ দৈবী-সম্পদ কল্যাণকারক এবং আসুরী-সম্পদ বন্ধনকারক, এটি নীচ যোনি ও নরকে নিয়ে যায়। যে সাধক এই দুই বিভাগকে যথার্থরূপে জানেন, তিনি এই আসুরী-সম্পদ সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করেন। আসুরী-সম্পদ সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করলেই দৈবী-সম্পদ স্বতই প্রকটিত হয়। দৈবী-সম্পদ প্রকটিত হলেই পরমাত্মার সঙ্গে সম্বন্ধ জাগ্রত হয়।

ষোড়শ অধ্যায়ের পদ, অক্ষর এবং উবাচ

(১) এই অধ্যায়ে **'অথ ষোড়শোঽধ্যায়ঃ'**-এর তিন, **'শ্রীভগবানুবাচ'**-এর দুটি, শ্লোকগুলির দুইশত সাতাশি এবং পুষ্পিকার তেরটি পদ আছে। এইভাবে সম্পূর্ণ পদের যোগসংখ্যা তিনশত পাঁচ।

(২) এই অধ্যায়ে **'অথ ষোড়শোঽধ্যায়ঃ'**-এর সাত, **'শ্রীভগবানুবাচ'**-এর সাত, শ্লোকগুলির সাত-শত আটষট্টি এবং পুষ্পিকায় বাহান্নটি অক্ষর আছে। এইরূপে সমস্ত অক্ষরগুলির যোগসংখ্যা হল আটশত চৌত্রিশ। এই অধ্যায়ের সমস্ত শ্লোকই বত্রিশ-অক্ষর সংবলিত।

(৩) এই অধ্যায়ের একমাত্র উবাচ হল—**'শ্রীভগবানুবাচ'**।

ষোড়শ অধ্যায়ের প্রযুক্ত ছন্দ

এই অধ্যায়ের চব্বিশটি শ্লোকের মধ্যে—ষষ্ঠ শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে, দশম শ্লোকের তৃতীয় পংক্তিতে এবং বাইশতম শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে **'মগণ'** প্রযুক্ত হওয়ায় **'ম-বিপুলা'** এবং একাদশ, ত্রয়োদশ এবং ঊনবিংশতিতম শ্লোকের তৃতীয় চরণে **'নগণ'** প্রযুক্ত হওয়ায় **'ন-বিপুলা'** সংজ্ঞাযুক্ত ছন্দ হয়েছে। অবশিষ্ট অষ্টাদশ শ্লোকগুলি ঠিক **'পথ্যাবক্ত্র'** অনুষ্টুপ ছন্দের লক্ষণ দ্বারা যুক্ত।

⁂ ⁂ ⁂

॥ ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

অথ সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

সপ্তদশ অধ্যায়

অবতরণিকা

ষোড়শ অধ্যায়ের তেইশতম শ্লোকে ভগবান শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করে যারা ইচ্ছানুযায়ী আচরণ করে, তারা সিদ্ধি, সুখ এবং পরমগতি পায় না, সেই কথা জানিয়েছেন। একথা শুনে অর্জুনের মনে হল যে ঠিকমতো শাস্ত্রবিধি জানা মানুষ অত্যন্ত কম। শাস্ত্রবিধি না-জানা মানুষই বেশি, তবুও তারা বংশপরম্পরা, বর্ণ, আশ্রম, সংস্কার ইত্যাদি অনুসারে দেবতাদের শ্রদ্ধা সহকারে পূজা-অর্চনা করে থাকে। শাস্ত্রবিধি অনুসারে না হওয়ায় এইসব ব্যক্তিদের অধোগতি (আসুরী) হওয়া উচিত এবং শ্রদ্ধা থাকায় উচ্চ (দৈবী) স্থিতি হওয়া উচিত। সুতরাং এদের প্রকৃত স্থিতি কী—তাই জানার জন্য অর্জুন প্রথম শ্লোকে প্রশ্ন করেছেন[১]।

অর্জুন উবাচ

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ॥ ১ ॥

[**কৃষ্ণ** (হে কৃষ্ণ !) ; **যে, শাস্ত্রবিধিম্** (যেসব ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি) ; **উৎসৃজ্য** (ত্যাগ করে) ; **শ্রদ্ধয়া, অন্বিতাঃ, যজন্তে** (শ্রদ্ধাসহকারে দেবতাদের পূজা করেন) ; **তেষাম্, নিষ্ঠা, তু, কা** (তাঁদের নিষ্ঠা কিরূপ ?) ; **সত্ত্বম্, আহো** (সাত্ত্বিকী, না) ; **রজঃ, তমঃ** (রাজসী, তামসী ? ।)]

অর্জুন বললেন—হে কৃষ্ণ ! যেসব ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করে শ্রদ্ধা সহকারে দেবতাদির পূজা করেন, তাঁদের নিষ্ঠা কিরূপ ? তা সাত্ত্বিকী, না রাজসী, না তামসী ? ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা—[এই সপ্তদশ অধ্যায়টি ষোড়শ অধ্যায়ের তেইশতম শ্লোকের ওপরই আধারিত। সেটিকে ধরেই অর্জুন **'যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য'** (যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করতঃ) স্থানে **'যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য'** বলে **'কামকারতঃ'** (খুশিমতো)-এর স্থানে **'শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ'** (শ্রদ্ধা সহকারে) বলেছেন ; **'বর্ততে'** (আচরণ করা)-এর স্থানে **'যজন্তে'** (পূজন করা) বলেছেন এবং **'ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্'** (যে সিদ্ধি, সুখ বা পরমগতি লাভ করে না)-এর স্থানে **'তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ'** (তাঁদের নিষ্ঠা কেমন ? সাত্ত্বিকী—দৈবী-সম্পদসম্পন্ন, না রাজসী-তামসী—আসুরী-সম্পদবিশিষ্ট ?) বলে ভগবানের কাছে জানতে চেয়েছেন।]

'যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য.........সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ'—শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের কথোপকথন সমস্ত জীবেরই কল্যাণের জন্য। তাঁদের লক্ষ্য ছিল কলিযুগের মানুষেরা। কারণ দ্বাপর যুগ তখন শেষ হওয়ার মুখে। আসন্ন কলিযুগের জীবদের দিকে লক্ষ্য

---

[১]এই সপ্তদশ অধ্যায়টি নবম অধ্যায়ের সাতাশতম শ্লোকের (যৎকরোষি যদশ্নাসি.....তৎকুরুষ্বমদর্পণম্) ব্যাখ্যা মনে করা যুক্তিসঙ্গত হয় না। কারণ নবম অধ্যায়ের সাতাশতম শ্লোকটি 'ভগবদর্পণ-বিষয়ক' প্রকরণে উদ্ধৃত, যেটি ছাব্বিশতম শ্লোকে শুরু হয়ে আটাশতম শ্লোকে (ভগবদর্পণের ফল জানিয়ে) শেষ হয়েছে। কিন্তু এখানে মানুষের শ্রদ্ধাকে চেনার প্রসঙ্গ আছে। কারণ এই সপ্তদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে অর্জুনের প্রশ্ন ছিল মানুষের নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা নিয়ে। ভগবান তাই এর উত্তরও শ্রদ্ধা সম্পর্কে দিচ্ছেন ।

রেখেই অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছেন যে, প্রভু! যেসব মানুষের ভাব অত্যন্ত উচ্চ, শ্রদ্ধা-ভক্তিও আছে, অথচ শাস্ত্রবিধি ঠিকমতো জানেন না[১], কিন্তু শাস্ত্রবিধি অগ্রাহ্য বা অনাদর করেন না, তাঁদের কী হবে?

পরবর্তী সময়ে যেসব মানুষের সৃষ্টি হবে তাদের মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞান অত্যন্ত কম হবে। তাদের প্রকৃত সৎসঙ্গ লাভ করাও কঠিন হবে ; কেন-না উচ্চকোটির সাধু-মহাত্মা আগের যুগেও কম ছিলেন, কলিযুগে তো আরও কম হবেন। কম হলেও কারো অন্তরে যদি আকাঙ্ক্ষা থাকে তাহলে তাদের সৎসঙ্গ লাভ হবে। কিন্তু মুস্কিল হল এই যে, কলিযুগে দম্ভ, কপটাচারের প্রাবল্যে দাম্ভিক, কপটাচারী ভণ্ড লোকও সাধুর ভেক ধরবে। তাই সত্যকার সাধু চেনা মুস্কিল হবে। যদি পাওয়াও যায় তাহলেও তাদের সহজে চেনা যাবে না। এরূপ অবস্থায় তাদের সঙ্গ করে যে বিশেষ কোনো লাভ হবে তা-ও স্পষ্ট নয়। তাই যাঁরা শাস্ত্রবিধি জানেন না, ঠিকমতো সাধুসঙ্গও লাভ করেন না, তবুও শ্রদ্ধা সহকারে পূজা-অর্চনা করেন, এরূপ মানুষের কী প্রকার নিষ্ঠা হয়? তা সাত্ত্বিকী, রাজসী না তামসী?

'সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ' পদটিতে সত্ত্বগুণকে দৈবী-সম্পদের আর রজোগুণ ও তমোগুণকে আসুরী-সম্পদের অন্তর্বর্তী ধরা হয়েছে। রজোগুণকে আসুরী-সম্পদের মধ্যে ধরার কারণ হল রজোগুণ তমোগুণের অত্যন্ত কাছাকাছি[২]। গীতায় অনেক স্থানে এই কথা এসেছে যেমন—দ্বিতীয় অধ্যায়ের বাষট্টি-তেষট্টি শ্লোকে কাম অর্থাৎ রজোগুণ থেকে ক্রোধ এবং ক্রোধ থেকে মোহরূপ তমোগুণের উৎপত্তির কথা বলা হয়েছে[৩]। এইভাবেই অষ্টাদশ অধ্যায়ের সাতাশতম শ্লোকে হিংসক ও শোকাকুল মনোভাবকে রজোগুণযুক্ত মানুষের লক্ষণ বলে জানিয়েছেন এবং ওই অধ্যায়েরই পঁচিশতম শ্লোকে 'হিংসা'-কে তামসিক কর্মের লক্ষণ আর পঁয়ত্রিশতম শ্লোকে 'শোক'-কে তামসিক ধৃতির লক্ষণ বলেছেন। এইভাবে রজোগুণ ও তমোগুণের অনেক লক্ষণেই সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

সাত্ত্বিক ভাব, আচরণ, বিচার-বুদ্ধি দৈবী-সম্পদের লক্ষণ এবং রাজসিক-তামসিক ভাব, আচরণ, বিচার-বুদ্ধি আসুরী-সম্পদের লক্ষণ হয়ে থাকে। সম্পদ অনুসারেই নিষ্ঠা হয় এবং মানুষের ভাব, আচরণ ও বিচার যেমন হয়, সেই অনুসারেই তার স্থিতি বা নিষ্ঠা হয়ে থাকে। স্থিতি অনুযায়ীই পরবর্তী গতি নির্ধারিত হয়। আপনি বলেছেন যে স্বেচ্ছাচারী হলে সিদ্ধি, সুখ এবং পরমগতি লাভ করা যায় না, তাহলে তাদের নিষ্ঠার সম্বন্ধেই যখন জানা যায় না, তখন তাদের গতি সম্বন্ধে কী করে জানা যাবে? অতএব আপনি তাদের নিষ্ঠার কথা বলুন, যাতে জানা যায় এঁরা সাত্ত্বিকী গতিতে যাবেন, না রাজসী বা তামসী গতিতে যাবেন?

'কৃষ্ণ' অর্থ আকর্ষণকারী। এখানে 'কৃষ্ণ' সম্বোধন দেওয়ার অর্থ বোধহয় এই যে 'আপনি এরূপ মানুষকে অন্তকালে কোন্ দিকে আকর্ষণ করবেন? তাদের কোন্ দিকে নিয়ে যাবেন?' ষষ্ঠ অধ্যায়ের সাঁইত্রিশতম শ্লোকেও অর্জুন গতি-বিষয়ক প্রশ্নে 'কৃষ্ণ' সম্বোধন করেছিলেন—**'কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি'**। এখানেও অর্জুনের নিষ্ঠার কথা জিজ্ঞাসার অর্থ হল গতি তাদের গতি সম্বন্ধে।

ভগবান মানুষকে আকর্ষণ করেন, না সে কর্ম অনুযায়ী নিজেই আকর্ষিত হয়? আসলে কর্ম অনুযায়ীই ফল পাওয়া যায়, কিন্তু কর্মফলের বিধায়ক হওয়ায় ভগবানের আকর্ষণ হয় সমস্ত ফলেরই ওপর। তামসিক কর্মের ফল যদি নরক ভোগ হয়, তাহলে ভগবান নরকের দিকেই আকর্ষণ করবেন। প্রকৃতপক্ষে নরকের সাহায্যে পাপ নাশ করে ভগবান প্রকারান্তরে তাঁর দিকেই আকর্ষণ করেন। কারও প্রতি তাকে নিজের কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই। তাই আসুরী যোনি গমনকারী ব্যক্তিদের জন্যও ভগবান দুঃখ করেন যে,

---

[১]শাস্ত্রবিধি তিনটি কারণে ত্যাগ হয়—(১) অজ্ঞতা, (২) উপেক্ষা ও (৩) বিরোধিতা।

[২]তমোগুণ, রজোগুণ ও সত্ত্বগুণ—এই তিনটি গুণের পরস্পরের মধ্যে দশগুণের পার্থক্য থাকে। যেমন, একের দশ গুণ হল দশ ; দশের দশ গুণ একশত, তেমনই তমোগুণের (১) থেকে দশ গুণ শ্রেষ্ঠ রজোগুণ (১০), আর রজোগুণের দশ গুণ শ্রেষ্ঠ সত্ত্বগুণ (১০০)। অর্থাৎ তমোগুণ ও রজোগুণ কাছাকাছি থাকে আর সত্ত্বগুণ হল এই দুয়ের থেকে বহুদূরে।

[৩]ক্রোধের কারণ হল রজোগুণ আর সেই রজোগুণের কার্য হল তমোগুণ।

এরা আমাকে প্রাপ্ত না হয়ে অধোগতি প্রাপ্ত হয় (১৬।২০)। কারণ এদের অধোগতিতে যাওয়া ভগবানের মনঃপূত নয়। তাই মানুষ সাত্ত্বিক হোক, বা রাজসিক কিংবা তামসিক, ভগবান সকলকেই তাঁর দিকে আকর্ষিত করেন। সেই তাৎপর্যের দিকে লক্ষ্য করাবার জন্যই এখানে 'কৃষ্ণ' সম্বোধনটি উদ্ধৃত হয়েছে।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—শাস্ত্রবিধি না জানলেও মনুষ্যমাত্রেরই কোনো-না-কোনো প্রকারের স্বভাবজ শ্রদ্ধা থাকেই। পরবর্তী শ্লোকে সেই শ্রদ্ধার ভেদের কথা বলেছেন।

শ্রীভগবানুবাচ

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু॥ ২ ॥

[**দেহিনাম্, স্বভাবজা** (মানুষের স্বভাবজাত) ; **শ্রদ্ধা, ত্রিবিধা** (শ্রদ্ধা, তিন প্রকারের) ; **এব, ভবতি** (হয়ে থাকে) ; **সাত্ত্বিকী, চ, রাজসী, চ, তামসী** (সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী) ; **তাম্** (সেগুলি) ; **শৃণু** (শোনো।)]

শ্রীভগবান বললেন—মানুষের স্বভাবজাত শ্রদ্ধা তিন প্রকারের হয়ে থাকে—সাত্ত্বিকী, রাজসী এবং তামসী। সেগুলি বিস্তারিতভাবে আমার কাছে শোনো॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা—[অর্জুন নিষ্ঠা কী, তা জানার জন্য প্রশ্ন করেছিলেন, কিন্তু ভগবান তার উত্তরে শ্রদ্ধার কথা জানালেন। কারণ শ্রদ্ধা অনুসারেই নিষ্ঠা হয়ে থাকে।]

'ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা'—শ্রদ্ধা তিন প্রকারের। সেই শ্রদ্ধা কেমন ? সঙ্গজাত, শাস্ত্রজাত, না স্বভাবজাত ? এর উত্তরে জানাচ্ছেন যে, এই শ্রদ্ধা স্বভাবজাত—**'সা স্বভাবজা'** অর্থাৎ স্বভাব থেকে উৎপন্ন স্বতঃসিদ্ধ শ্রদ্ধা। এটি সঙ্গ হতেও উৎপন্ন হয় না, শাস্ত্র হতেও নয়। এরা স্বাভাবিক প্রবাহেই প্রবাহিত হয়ে দেবতা প্রমুখের পূজা করে থাকে।

'সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু'—স্বভাবজ শ্রদ্ধা তিন প্রকারের—সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক। পৃথক্‌ভাবে এই তিনটির বিষয়ে শোনো।

আগের শ্লোকে **'সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ'** পদটিতে **'আহো'** অব্যয় ব্যবহারের অর্থ হল যে অর্জুনের দৃষ্টিতে **'সত্ত্বম্'** দৈবী-সম্পদ এবং **'রজস্তমঃ'** আসুরী-সম্পদ—এই দুটি বিভাগ হয় এবং ভগবানও বন্ধনের দৃষ্টিতে রাজসিক-তামসিক উভয়কেই আসুরী-সম্পদ বলেই মনে করেন—**'নিবন্ধায়াসুরীমতা'** (১৬।৫)। কিন্তু বন্ধনের দৃষ্টিতে রাজসিক ও তামসিক এক হলেও উভয়ের বন্ধনে পার্থক্য আছে। রাজসিক ব্যক্তিরা সকামভাবে শাস্ত্রবিহিত কর্মাদিও করে থাকেন ; সুতরাং তাঁরা স্বর্গাদি উচ্চলোকে গমন করে সেখানকার ভোগ আস্বাদন করে পুণ্য ক্ষীণ হলে পুনরায় ইহলোকে প্রত্যাবর্তন করেন—**'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি'** (গীতা ৯।২১)। কিন্তু তামসিক ব্যক্তিগণ শাস্ত্রবিহিত কর্মাদি করে না, তাই তারা কামনা এবং মূঢ়তার জন্য অধমগতিতে গমন করে—**'অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ'** (গীতা ১৪।১৮)। এইভাবে রাজসিক এবং তামসিক—উভয়ই মানুষকে আবদ্ধ করে থাকে। উভয় বন্ধনের পার্থক্যের দৃষ্টিতেই ভগবান আসুরী-সম্পদবিশিষ্টদের শ্রদ্ধার রাজসিক ও তামসিক দুটি ভাগ করেছেন এবং সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—এই তিনপ্রকার শ্রদ্ধা পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে শোনার কথা বলেছেন।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে বর্ণিত স্বভাবজাত শ্রদ্ধার তিন প্রকার ভাগ কেন হয়—পরবর্তী শ্লোকে ভগবান তাই জানাচ্ছেন।

সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ॥ ৩ ॥

[ভারত (হে ভারত!) ; **সর্বস্য, শ্রদ্ধা** (সকল মানুষেরই শ্রদ্ধা) ; **সত্ত্বানুরূপা, ভবতি** (তার অন্তঃকরণ অনুযায়ী হয়) ; **অয়ম্, পুরুষঃ, শ্রদ্ধাময়ঃ** (মানুষ শ্রদ্ধাময়) ; **যঃ, যচ্ছ্রদ্ধঃ** (যে যেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত) ; **সঃ, এব, সঃ** (সেটিই তার স্বরূপ।)]

হে ভারত ! সকল ব্যক্তির শ্রদ্ধাই তার অন্তঃকরণ অনুযায়ী হয়ে থাকে। মানুষ শ্রদ্ধাময়, তাই যে যেমন শ্রদ্ধাযুক্ত, সেটিই তার স্বরূপ অর্থাৎ সেটিই তার নিষ্ঠা—স্থিতি॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা—**'সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত'**—আগের শ্লোকটিতে যাকে **'স্বভাবজা'** বলা হয়েছে, তাকেই এখানে **'সত্ত্বানুরূপা'** বলা হয়েছে। 'সত্ত্ব' বলা হয় অন্তঃকরণকে। অন্তঃকরণ অনুযায়ীই শ্রদ্ধা হয় অর্থাৎ অন্তঃকরণ যেমন হয়, তাতে সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক যেমন সংস্কার থাকে, শ্রদ্ধাও সেই রূপ হয়।

দ্বিতীয় শ্লোকে **'দেহিনাম্'** পদে যাঁকে উল্লেখ করা হয়েছে তাঁকেই এখানে **'সর্বস্য'** পদে বলেছেন। **'সর্বস্য'** পদটির তাৎপর্য হল এই যে, যাঁরা শাস্ত্রবিধি না জেনে দেবতাদের পূজা করেন—শুধু তাঁরাই নন, আসলে যাঁরা শাস্ত্রবিধি জানেন বা না-জানেন, মানেন বা না-মানেন, অনুষ্ঠান করেন বা না-করেন, এরূপ যে কোনো জাতি, বর্ণ, আশ্রম, সম্প্রদায়, দেশের যে কোনো ব্যক্তি হোন না কেন—সেই সকলেরই শ্রদ্ধা তিন প্রকারের হয়ে থাকে।

'শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষঃ'—মানুষ শ্রদ্ধা-প্রধান জীব। অতএব যার যেমন শ্রদ্ধা, তেমনই তার রূপ হয়ে থাকে। তার যে প্রবৃত্তি হয়, তা শ্রদ্ধাকে নিয়ে, শ্রদ্ধা অনুযায়ীই হয়।

'যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ'—যে ব্যক্তি যেমন শ্রদ্ধাসম্পন্ন, তার নিষ্ঠাও তেমনই এবং সেই অনুযায়ী তার গতি হয়। তার প্রত্যেক ভাব ও ক্রিয়া চিত্তের শ্রদ্ধা অনুযায়ী হয়। যতক্ষণ সংসারের সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকে, ততক্ষণ তার স্বরূপ চিত্তের অনুরূপই হয়ে থাকে।

মর্মার্থ

মানুষের সাংসারিক প্রবৃত্তির উদ্রেক হয় সাংসারিক পদার্থগুলি সত্য বলে মনে করা, দেখা, শোনা এবং ভোগ করার ফলে এবং পারমার্থিক প্রবৃত্তি হয় পরমাত্মাতে শ্রদ্ধাশীল হলে। আমরা যা অনুভবের সাহায্যে জানতে পারি না, কিন্তু পূর্বকার স্বাভাবিক সংস্কার থেকে, শাস্ত্র থেকে, সাধু মহাত্মাদের থেকে শুনে ভক্তির সঙ্গে বিশ্বাস করে নিই, তাকেই বলা হয় শ্রদ্ধা। আধ্যাত্মিক জগতে (মার্গে) প্রবেশ করতে গেলে শ্রদ্ধা সহকারেই করতে হয়, তা সেই মার্গ কর্মযোগের হোক বা জ্ঞানযোগের অথবা ভক্তিযোগের। সাধ্য এবং সাধন—এই দুইয়ে শ্রদ্ধা না হলে আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় না।

মানুষের জীবনে শ্রদ্ধার গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষ যেমন শ্রদ্ধাবিশিষ্ট, তার স্বরূপ ও নিষ্ঠা তেমনই হয়ে থাকে—**'যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ'** (গীতা ১৭।৩)। তাকে প্রথমে সেরূপ না দেখালেও, পরে সময়মতো সে তেমনই হয়ে ওঠে।

আজকাল সাধকের পক্ষে তার নিজের স্বাভাবিক শ্রদ্ধাকে জানা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। কারণ নানাপ্রকার মতবাদ সৃষ্টি হয়েছে। কেউ বলেন জ্ঞানই প্রধান, কেউ বলেন ভক্তি প্রধান আবার কেউ বলেন যোগই প্রধান। এরূপ নানাপ্রকার সিদ্ধান্ত পড়ে ও শুনে মানুষের ওপর সেগুলির প্রভাব পড়ে, যার ফলে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ভাবতে থাকে, 'আমি কী করব ?' 'আমার প্রকৃত ধ্যেয় বা লক্ষ্য কী ?' 'আমার কোন্ পথ অবলম্বন করা উচিত ?' এরূপ অবস্থায় তার গভীরভাবে নিজের অন্তরের ভাবগুলি বিচার করা উচিত যে, সঙ্গ দ্বারা সৃষ্ট রুচি, শাস্ত্র দ্বারা গঠিত রুচি, কারও শিক্ষায় তৈরি রুচি, গুরুর উপদেশে তৈরি রুচি—এরূপ যে নানাপ্রকার রুচি আছে, সেই সবেরই মূলে স্বতঃ-উদ্বুদ্ধ নিজের স্বাভাবিক রুচি কোন্‌টি ?

মূলে সকলেরই স্বাভাবিক রুচি বা ইচ্ছা থাকে যে, 'আমি যেন সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্ত হই এবং চিরকালের জন্য যেন মহাসুখ প্রাপ্ত হই'। প্রত্যেক প্রাণীর অন্তরেই এই আকাঙ্ক্ষা থাকে। মানুষের মধ্যে এটি বেশিমাত্রায় জাগ্রত থাকে। তাদের পূর্বজন্মের যেমন সংস্কার থাকে এবং

ইহজন্মে যেমন মাতা-পিতা হতে জন্ম হয়, যেমন পরিবেশে অবস্থান করে, শিক্ষা লাভ হয়, পরিস্থিতি আসে এবং তারা ঈশ্বরীয় কথা, পরলোক-পরজন্মের কথা, মুক্তি ও বন্ধনের কথা, সৎ কথা এবং অসৎ কথা শুনতে থাকে, তাদের ওপর অজ্ঞাতে সেইসবেরই প্রভাব পড়তে থাকে। সেই প্রভাব থেকেই তাদের ধারণার সৃষ্টি হয়। তাদের সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক, যেমন প্রকৃতি হয়, সেই অনুযায়ী তারা এই ধারণার আশ্রয় নেয় এবং সেই ধারণা অনুসারেই তাদের রুচি-শ্রদ্ধা গঠিত হয়। এর মধ্যে সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা পরমাত্মার দিকে চালিত করে আর রাজসিক-তামসিক শ্রদ্ধা চালিত করে সংসারের পথে।

গীতায় যেখানেই সাত্ত্বিকতার কথা বর্ণিত হয়েছে সেখানেই তা পরমাত্মার অভিমুখ করে। সুতরাং সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা হল পারমার্থিক এবং রাজসিক-তামসিক শ্রদ্ধা হল সাংসারিক বা জাগতিক অর্থাৎ সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা হল দৈবী-সম্পদ এবং রাজসিক-তামসিক শ্রদ্ধা হল আসুরী-সম্পদ। দৈবী-সম্পদ জাগ্রত করার এবং আসুরী-সম্পদ ত্যাগ করার উদ্দেশ্যেই সপ্তদশ অধ্যায় কথিত হয়েছে। কেন-না কল্যাণকামী মানুষদের সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা (দৈবী-সম্পদ) বাঞ্ছনীয় এবং রাজসী ও তামসী শ্রদ্ধা (আসুরী-সম্পদ) বর্জনীয়।

যেসব মানুষ নিজেদের কল্যাণ কামনা করে তাদের সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা হয়ে থাকে। যেসব মানুষ ইহজন্মে অথবা পরজন্মেও সুখ-সম্পদ (স্বর্গ ইত্যাদি) আকাঙ্ক্ষা করে, তাদের শ্রদ্ধা রাজসিক হয় এবং যার পশুদের ন্যায় (মূর্খতাবশতঃ) শুধুমাত্র খাওয়া-দাওয়া, ভোগ-প্রমাদ, আলস্য-নিদ্রা, খেলা-ধুলো, হাসি-তামাশাতে সময় কাটায় তাদের শ্রদ্ধা তামসিক হয়ে থাকে। সাত্ত্বিক শ্রদ্ধার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম কথাই হল 'পরমাত্মা আছেন'। শাস্ত্র, সাধু-মহাত্মা, গুরুজন প্রভৃতির কাছ থেকে শুনে মনে এমন ভক্তিও বিশ্বাস হয় যে, 'পরমাত্মা আছেন এবং তাঁকে প্রাপ্ত করতে হবে'—একেই বলা হয় শ্রদ্ধা। ঠিকমতো শ্রদ্ধা যেখানে হয়, সেখানে স্বতঃই প্রেম জন্মায়। কারণ যে পরমাত্মাতে শ্রদ্ধা হয়, জীবাত্মা হল সেই পরমাত্মারই অংশ। তাই শ্রদ্ধা হলেই সে পরমাত্মার দিকে আকর্ষিত হয়। জীব যে পরমাত্মা হতে বিমুখ হয়ে সংসারে আকৃষ্ট হয়, সেটির কারণও সংসারের ওপর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। কিন্তু এটি প্রকৃত শ্রদ্ধা নয়, এটি হল শ্রদ্ধার অপব্যবহার। যেমন, জগতে টাকার ওপর বিশেষ শ্রদ্ধা করা হয় কারণ এর দ্বারা সবকিছু পাওয়া যায়। এ শ্রদ্ধা কেমন ? অল্প বয়স থেকেই এরূপ অভিজ্ঞতা অর্জিত হয় যে খাবার-দাবার ও দ্রব্য-সামগ্রী সবই অর্থের বিনিময়ে পাওয়া যায়। তাই দেখে অর্থকেই প্রধান বলে মনে করে, তাকেই শ্রদ্ধা করতে শুরু করে, যার ফলে পতনের সূত্রপাত হয়। একে বলে বৈষয়িক শ্রদ্ধা। এর চাইতে উচ্চ শ্রেণীর শ্রদ্ধা (বিশ্বাস) হল ধর্মীয় শ্রদ্ধা অর্থাৎ আমি অমুক বর্ণের বা আশ্রমের। কিন্তু পারমার্থিক শ্রদ্ধাই হল সবচেয়ে উচ্চ শ্রদ্ধা। এটিই প্রকৃত শ্রদ্ধা যার ফলে কল্যাণ হয়। শাস্ত্র, সাধু-মহাত্মা, তত্ত্বজ্ঞ, জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদের প্রতি যে শ্রদ্ধা তাও হল পারমার্থিক শ্রদ্ধা।[১]

যাদের শাস্ত্রজ্ঞান নেই এবং সাধু-মহাত্মাদের সঙ্গও প্রাপ্তি হয়নি, তেমন ব্যক্তিদেরও পূর্ব-সংস্কারবশতঃ পারমার্থিক শ্রদ্ধা থাকতে পারে। সেটি কীভাবে জানা যায় ? তা জানা যায় এইভাবে যে, এরূপ মানুষের মধ্যে স্বতঃই এই ভাব আসে যে, এমন কোনো মহৎ পুরুষ (পরমাত্মা) আছেন, যাঁকে দেখা যায় না, কিন্তু তিনি অবশ্যই আছেন। এরূপ ব্যক্তিদের পারমার্থিক আলোচনা স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত প্রিয় হয় এবং এরা স্বাভাবিকভাবেই যজ্ঞ-দান-তপ-তীর্থ-ব্রত-সৎসঙ্গ-স্বাধ্যায় ইত্যাদি শুভকর্মে প্রবৃত্ত হয়। তারা যদি এগুলি পালন নাও করে তাহলেও তাদের সাত্ত্বিক আহারে স্বাভাবিক রুচি দেখে, তাদের শ্রদ্ধাকে জানা সম্ভব হয়।

মানুষ, পশু-পক্ষী, লতা-বৃক্ষ ইত্যাদি যতপ্রকার স্থাবর-জঙ্গম প্রাণী আছে, তারা সকলেই কোনো একজনকে কোনো কারণে নিজের থেকে বড় বা শ্রেষ্ঠ মনে করে এবং তার সাহায্য গ্রহণ করে থাকে। মানুষের যখন কোনো বিপদ আসে, তখন সেও কাউকে শ্রেষ্ঠ মনে করে তার সাহায্য নেয়। পশু-পক্ষীও আত্মরক্ষার জন্য ভীত হলে অন্যের সাহায্য নেয়। লতাও অন্যের সাহায্যে বেড়ে ওঠে। এইভাবে যারা কাউকে বড় বলে মেনে তার সাহায্য নেয়, তারা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরবাদের সিদ্ধান্তকে স্বীকার করে

[১]সাংসারিক (জাগতিক) শ্রদ্ধাতে 'ভোগে'র, ধর্মীয় শ্রদ্ধায় 'ভাবে'র এবং পারমার্থিক শ্রদ্ধায় 'তত্ত্বে'র প্রাধান্য থাকে।

নেয়, তা তারা ঈশ্বরকে মানুক বা না-মানুক। তাই আয়ু, বিদ্যা, গুণ, বুদ্ধি, সামর্থ্য, যোগ্যতা, পদ, অধিকার, ঐশ্বর্য এগুলির মধ্যে একটির থেকে অন্যটিকে বড় বলে দেখায়, এইভাবে বড়ভাব দেখতে দেখতে যেখানে ওই দেখার সমাপ্তি হয়, তাকেই বলা হয় ঈশ্বর। কারণ বড়োর থেকে যিনি বড়, তিনিই হলেন ঈশ্বর। তাঁর থেকে বড় আর কেউ নেই—

'পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ।'

(যোগদর্শন ১।২৬)

'এই পরমাত্মা সবার পূর্বপুরুষেরও গুরু। কারণ তিনি কালের দ্বারা অবচ্ছেদিত নন, অর্থাৎ তিনি কাল সীমার বাইরে।'

এইভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি তার দৃষ্টিতে কাউকে না কাউকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে। শ্রেষ্ঠত্বের এই মান্যতা নিজ নিজ চিত্তের ভাব অনুযায়ী পৃথক্ পৃথক্ হয়ে থাকে। সেইজন্য প্রত্যেকের শ্রদ্ধাও ভিন্ন ভিন্ন হয়।

অন্তঃকরণ অনুসারেই শ্রদ্ধা হয়। ধারণা, মান্যতা, ভাবনা ইত্যাদি অন্তঃকরণেই থাকে। তাই অন্তঃকরণে সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক যে গুণের প্রাধান্য থাকে, সেই গুণ অনুসারে ধারণা, মান্যতা ইত্যাদি গড়ে ওঠে আর সেই ধারণা ইত্যাদি অনুসারেই তিন প্রকারের (সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক) শ্রদ্ধা তৈরি হয়।

সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক—সকল প্রাণীর মধ্যেই এই তিনটি গুণ থাকে (গীতা ১৮।৪০)। প্রাণীদের মধ্যে কারও সত্ত্বগুণের প্রাধান্য থাকে, কারও মধ্যে রজোগুণের প্রাধান্য হয় আবার কারও মধ্যে তমোগুণের প্রাধান্য দেখা যায়। সুতরাং নিয়ম এই নয় যে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য যেসব মানুষের মধ্যে থাকে, তাদের মধ্যে রজোগুণ ও তমোগুণ থাকবে না, রজোগুণের প্রাধান্য যেসব মানুষের মধ্যে থাকে তাদের মধ্যে সত্ত্বগুণ ও রজোগুণ থাকবে না (গীতা ১৪।১০)। কারণ প্রকৃতি পরিবর্তনশীল—**'প্রকর্ষেণ করণং (ভাবে ল্যুট্) ইতি প্রকৃতিঃ'**। তাই প্রকৃতিজনিত গুণাদিরও পরিবর্তন হয়ে থাকে। সুতরাং যেসব সাধক একমাত্র পরমাত্মপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সাধনা করেন তাঁদের এইসব পরিবর্তনশীল গুণাদির সঙ্গে সম্পর্ক মেনে বিচলিত হওয়া উচিত নয়।

জীবমাত্র পরমাত্মারই অংশ। সুতরাং কোনো মানুষের মধ্যে রজোগুণ বা তমোগুণের প্রাধান্য দেখে তাকে নীচ বলে মনে করা উচিত নয়। কারণ কখন যে কোন্ ব্যক্তি উন্নতি লাভ করবে তা বলা যায় না। পরমাত্মার অংশ হওয়ায় সকলের স্বরূপই (আত্মাই) শুদ্ধ, শুধুমাত্র সঙ্গ, শাস্ত্র, বিচার, পরিবেশ ইত্যাদির জন্য চিত্তে কোনো একটি গুণ প্রধান হয়ে ওঠে অর্থাৎ ওইগুলির যেমন যেমন প্রাপ্তি হয় মানুষের অন্তঃকরণও তেমনই হয়ে ওঠে এবং সেই অনুযায়ী তার চিত্তে সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক শ্রদ্ধা তৈরি হয়। সেইজন্যই মানুষের সদা-সর্বদা সাত্ত্বিক সঙ্গ, শাস্ত্র, বিচার, পরিমণ্ডলের সংস্পর্শে থাকা উচিত। এরূপ করলে তার চিত্তে সেই অনুযায়ী শ্রদ্ধাও সাত্ত্বিকী হয়ে ওঠে, যা তার উদ্ধারকারক হয়। অপরপক্ষে মানুষের রাজসিক-তামসিক সঙ্গ, শাস্ত্র প্রভৃতির সংস্পর্শ কখনো করা উচিত নয়, তাহলে তার শ্রদ্ধাও রাজসিক-তামসিক হয়ে ওঠে, যা তার পতন ঘটায়।

পরিশিষ্ট-ভাব—শ্রদ্ধা হল ভাব। যার যেমন ভাব, তার স্বরূপও তেমনই হয়ে থাকে। ভাব দুপ্রকার—সদ্ভাব এবং অসদ্ভাব। যা পরমাত্মার দিকে নিয়ে যায়, তাকে বলে সদ্ভাব আর যা জগৎ-সংসারের দিকে আকর্ষণ করে, তাকে বলে অসদ্ভাব। দৈবী সম্পদে সদ্ভাবের প্রাধান্য থাকে আর আসুরী সম্পদে অসদ্ভাবের প্রাধান্য থাকে।

'আমি সাধক'—এই কথাটিতে অসদ্ভাবের প্রাধান্য থাকলে আত্মাভিমান হয় আর যদি সদ্ভাবের প্রাধান্য থাকে তাহলে স্বাভিমান হয়। অহং অভিমানে আসুরী-সম্পদ হয় আর স্বাভিমানে দৈবী-সম্পদ হয়। অন্যের থেকে নিজেকে বিশিষ্ট বলে মনে করলে অহং-অভিমান (অহংকার) হয় আর নিজ কর্তব্যকে দেখলে স্বাভিমান হয় যে আমি সাধন-বিরুদ্ধ কাজ কেমন করে করব ? অহং-অভিমানে মানুষ সাধন-বিরুদ্ধ কাজ করে বসে, কিন্তু স্বাভিমান হলে মানুষ সাধন-বিরুদ্ধ কাজ করতে লজ্জিত হয়। স্বাভিমান হলে মানুষ সাত্ত্বিক হয়ে ওঠে আর অহং-অভিমানের দ্বারা মানুষ রাজসিক ও তামসিক হয়।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—ইষ্টের পূজা-পাঠের দ্বারা কোনো ব্যক্তির নিষ্ঠা কেমন তা জানার উপায় এখানে জানানো হয়েছে।

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ॥ ৪ ॥

[সাত্ত্বিকাঃ (সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ) ; দেবান্, যজন্তে (দেবতাদের পূজা করেন) ; রাজসাঃ (রাজসিক ব্যক্তিগণ) ; যক্ষরক্ষাংসি, চ (যক্ষ ও রাক্ষসাদির) ; অন্যে, তামসাঃ (তামসিক প্রকৃতির) ; জনাঃ (ব্যক্তিগণ) ; প্রেতান্ (প্রেতাদি) ; ভূতগণান্ (ভূতগণের) ; যজন্তে (পূজা করে থাকেন।)]

সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ দেবতাদের পূজা করেন, রাজসিক ব্যক্তিগণ যক্ষ ও রাক্ষসাদির পূজা করেন আর তামসিক প্রকৃতির ব্যক্তিরা ভূত ও প্রেতের পূজা করে থাকেন ॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা—**'যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্'**—সাত্ত্বিক অর্থাৎ দৈবী-সম্পদবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ দেবতাদের পূজা করেন। এখানে **'দেবান্'** শব্দের দ্বারা বিষ্ণু, শংকর, গণেশ, শক্তি এবং সূর্য—এই পাঁচ ঈশ্বরকোটির দেবতাকে মনে করতে হবে, কারণ দৈবী-সম্পদে 'দেব' শব্দটি ঈশ্বরের বাচক এবং তাঁর সম্পদ বা দৈবী-সম্পদ মুক্তি প্রদায়িনী—**'দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায়'** (১৬।৫)। দৈবী-সম্পদ যার মধ্যে প্রকটিত হয়, সেই সাধকদের স্বাভাবিক শ্রদ্ধার পরিচয় জানাবার জন্য এখানে **'যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্'** পদটি উদ্ধৃত হয়েছে।

সাধকদের শ্রদ্ধা ঈশ্বরকোটির দেবতাদের মধ্যেও পৃথক্ পৃথক্ হয়ে থাকে। কারও শ্রদ্ধা থাকে ভগবান বিষ্ণু (রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি)র প্রতি, কারও থাকে ভগবান শংকরে, কারও গণেশে, কারও আদ্যাশক্তি মহামায়াতে আবার কারও বা সূর্যদেবে। ঈশ্বরের যে রূপে তাদের স্বাভাবিক শ্রদ্ধা থাকে তাঁকেই তারা বিশেষভাবে পূজা করে থাকে।

দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় শাস্ত্রোক্ত এই তেত্রিশ কোটি (প্রকারের) দেবতাদেরও নিষ্কামভাবে পূজা করা **'যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্'**-এর অন্তর্গত ধরা উচিত।

'যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ'—রাজসিক ব্যক্তিরা যক্ষ এবং রাক্ষসের পূজা করে। দেবযোনিতে যক্ষ ও রাক্ষসও থাকেন। যক্ষগণের অর্থসংগ্রহ করার এবং রাক্ষসদের অন্যকে বিনাশ করার প্রাবল্য থাকে। নিজ কামনা পূর্তির জন্য, অন্যের বিনাশের নিমিত্ত রাজসিক ব্যক্তিগণের যক্ষ ও রাক্ষসের পূজা করার প্রবৃত্তি হয়।

'প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ'—তামসিক ব্যক্তিরা ভূত-প্রেতের পূজা করে। 'প্রেত' বলা হয় তাদের যাদের মৃত্যু হয়েছে, আর যে ভূতযোনিতে গেছে, তাকে বলা হয় 'ভূত'।

এখানে 'প্রেত' শব্দটির অন্তর্গত নিজ পিতৃপুরুষকে ধরা উচিত নয়। কারণ কর্তব্য মনে করে যাঁরা নিষ্কামভাবে নিজ নিজ পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি করেন, তাঁদের তামসিক বলা হয় না, সাত্ত্বিকই বলা হয়। ভগবান নিজ নিজ পিতৃপুরুষের পূজা করতে নিষেধ করেননি—**'পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ'** (গীতা ৯।২৫)। তাৎপর্য হল এই যে যাঁরা সকামভাবে পিতৃপুরুষদের পূজা করেন অর্থাৎ তাঁরা আমাদের রক্ষা করবেন অথবা আমরা যেমন আমাদের পিতৃ-পিতামহের জন্য শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি করি তেমনি আমাদের সন্তানাদিও আমাদের নিমিত্ত শ্রাদ্ধ-তর্পণ করবে, এইরূপ মনোভাব নিয়ে যাঁরা পূজা করেন তাঁরা পিতৃলোক প্রাপ্ত হন। কিন্তু পিতৃ-পিতামহ প্রভৃতি পিতৃপুরুষদের পূজা করলেই যে পিতৃলোক প্রাপ্ত হবে— এমন কোনো কথা নেই। যাঁরা পিতৃঋণ থেকে উদ্ধারলাভের জন্য কর্তব্য মনে করে নিষ্কামভাবে পিতৃকর্ম করেন, তাঁরা সাত্ত্বিক পুরুষ, রাজসিক নন। যাঁরা পিতৃপুরুষের ওপর সব থেকে বেশি নিষ্ঠা রাখেন, তাঁদের সর্বোপরি এবং ইষ্ট বলে মনে করেন, তাঁরাই পিতৃলোকে গমন করেন, তাঁদের বলা হয় **'পিতৃব্রতাঃ'**। এঁরা পিতৃলোকেই যান, তার বেশি তাঁরা যেতে পারেন না।

যারা পশুদের (কুকুর, বিড়াল ইত্যাদিকে) নিষ্কামভাবে খেতে দেয় (শাস্ত্রে সেরূপ বিধান আছে), তারা ওইসব যোনি প্রাপ্ত হয় না, কারণ সেগুলি তাদের ইষ্ট নয়। তারা শাস্ত্র-নির্দেশেই একাজ করে থাকে। এইভাবেই শাস্ত্র-নির্দেশে শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি নিষ্কামভাবে করলে পিতৃযোনি প্রাপ্তি হয় না। শাস্ত্র বা ভগবানের নির্দেশ পালন

করলে তাদের উদ্ধার-লাভ হয়। সেইজন্য নিষ্কামভাবে করা গয়াশ্রাদ্ধ প্রভৃতিকে তামসিক প্রেতকর্ম বলে মনে করা উচিত নয়, কারণ এগুলি মৃতব্যক্তির সদ্‌গতির জন্য করা অত্যাবশ্যকীয় কর্ম, শাস্ত্র নির্দেশানুযায়ী সকলেরই তা পালন করা কর্তব্য।

আমরা শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞাদি শুভকর্ম করার সময় প্রথমে গণেশ, নবগ্রহ, ষোড়শ মাতৃকা প্রমুখের পূজা নিষ্কামভাবে করে থাকি। প্রকৃতপক্ষে নবগ্রহ ইত্যাদির পূজা দ্বারা শাস্ত্রকেই পূজা করা বা সম্মান করা হয়। যেমন, নারী তার স্বামীর সেবা করলে, নারীর উদ্ধার হয়। বিবাহ তো সকল পুরুষই করে থাকে, তা সে রাক্ষসই হোক বা অসুরই হোক, তারাও স্বামী হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কেবলমাত্র কল্যাণ পতিসেবাতে হয় না, প্রত্যুত পতিসেবা করা, পতিব্রত্য-ধর্ম পালন করা হল ঋষি, শাস্ত্র, ভগবানের নির্দেশ, তাই তাঁদের আদেশ পালন করলে তবেই কল্যাণ হয়।

দেবতাদির পূজা করলে পূজকের গতি তেমনই হবে— তা বলার জন্য **'যজন্তে'** পদটি এখানে উদ্ধৃত হয়নি। অর্জুন শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে শ্রদ্ধা সহকারে যাঁরা পূজা করেন, তাঁদের নিষ্ঠা জানতে চেয়েছিলেন ; সুতরাং নিজ নিজ ইষ্ট (পূজ্য) অনুযায়ী পূজকের নিষ্ঠা—শ্রদ্ধা হয়, তা জানাবার জন্যই এখানে **'যজন্তে'** পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

পরিশিষ্ট-ভাব—দেবগণের পূজক সাত্ত্বিক মানুষ মৃত্যুর পর দেবলোক প্রাপ্ত হন, যক্ষ-রাক্ষসাদির পূজক রাজসিক মানুষ যক্ষ-রাক্ষসলোক প্রাপ্ত হন এবং ভূত-প্রেতাদির পূজক তামসিক ব্যক্তি ভূত-প্রেতলোক প্রাপ্ত হন (গীতা ৯।২৫)।

গীতায় যজ্ঞ শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক, এর মধ্যে যজ্ঞ-দান-তপ-ব্রত ইত্যাদি সমস্ত কর্তব্য-কর্মই অন্তর্ভুক্ত (গীতা ৪।২৪-২৫)। সুতরাং এখানেও **'যজন্তে'** পদটির দ্বারা সমস্ত কর্তব্য-কর্মই ধরা উচিত, যাতে যজ্ঞই প্রধান।

'প্রেতান্ভূতগণাংশ্চান্যে'—আমাদের পিতৃপুরুষ অন্যের কাছে ভূত ; আবার অন্যের পিতৃপুরুষ আমাদের কাছে ভূত। পিতৃপুরুষের পূজা তামস কর্ম নয়, কিন্তু ভূতাদির পূজা করা হল তামস কর্ম।

* * *

সম্বন্ধ—ভগবান এতক্ষণ তাদের কথা বলেছেন, যারা শাস্ত্রবিধি জানা না থাকায় তা (অজ্ঞানতাবশতঃ) পরিত্যাগ করলেও নিজ ইষ্ট এবং পূজাপাঠে শ্রদ্ধাসম্পন্ন। এখন বিরোধিতা সহকারে যারা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করে, সেই শ্রদ্ধাবর্জিত মানুষদের কর্মের বর্ণনা ভগবান পরবর্তী দুটি শ্লোকে করেছেন।

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ॥ ৫ ॥
কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাং চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্॥ ৬ ॥

[**যে জনাঃ** (যে ব্যক্তিগণ) ; **অশাস্ত্রবিহিতম্** (শাস্ত্রবিধিবিরুদ্ধ হয়ে) ; **ঘোরম্, তপঃ, তপ্যন্তে** (কঠোর তপস্যা করে) ; **দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ** (দম্ভ ও অহংকারে মত্ত) ; **কামরাগবলান্বিতাঃ** (ভোগ ও আসক্তিতে বলগর্বিত) ; **শরীরস্থম্, ভূতগ্রামম্, চ** (শরীরস্থ পঞ্চভূত অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক শরীর ও) ; **অন্তঃশরীরস্থম্** (অন্তর্যামীরূপে স্থিত) ; **মাম্, এব, কর্ষয়ন্তঃ** (আমাকে কৃশ করে) ; **তান্, অচেতসঃ** (সেই মূঢ় ব্যক্তিদের) ; **আসুর-নিশ্চয়ান্** (আসুরী-সম্পদবিশিষ্ট) ; **বিদ্ধি** (বলে জানবে।)]

দম্ভ, অহংকার, ভোগ ও আসক্তিযুক্ত এবং বলগর্বিত যেসকল ব্যক্তি শরীরস্থ পঞ্চভূত অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক শরীর এবং অন্তর্যামিরূপে স্থিত আমাকে কৃশ করে, কঠোর তপস্যা করে ; সেই মূঢ় ব্যক্তিদের তুমি আসুরী-সম্পদবিশিষ্ট বলে জানবে ॥ ৫-৬ ॥

ব্যাখ্যা—**'অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ'**—শাস্ত্রে যার বিধান নেই, বরং নিষেধ করা আছে সেই কঠোর তপস্যাতে তাদের ইচ্ছা বা রুচি হয় অর্থাৎ তাদের রুচি সর্বদাই শাস্ত্র-বিরুদ্ধ হয়। কারণ বুদ্ধি তামসিক

হওয়ায় তারা নিজেরা শাস্ত্র তো জানেই না আর অন্য কেউ বললেও তারা তা মানতে বা পালন করতে চায় না।

'দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ'—তাদের মধ্যে এই ভাবনা গভীরভাবে প্রোথিত থাকে যে, যারা জগতে এইসব ভজন, ধ্যান, স্বাধ্যায় ইত্যাদি করে, তারা তা করে দম্ভ প্রকাশের জন্যই। তাই তারাও সব কাজ দম্ভ সহকারে করে। তাদের মধ্যে নিজ বুদ্ধির, চাতুর্যের, জ্ঞানের এই অহং-অভিমান থাকে যে 'আমি খুব জ্ঞানী', 'আমি সকলকে বোঝাতে পারি', 'সকলকে পথ দেখাতে পারি', 'আমি কেন শাস্ত্রের কথা শুনব ?' 'আমি কি কিছু কম জানি ?' 'আমার কথায় চললে তুমিও বুঝতে পারবে', ইত্যাদি।

'কামরাগবলান্বিতাঃ'—'কাম' শব্দটি ভোগ্য-পদার্থের বাচক। সেইসব পদার্থে আকৃষ্ট হওয়া, লিপ্ত হওয়াকেই বলা হয় 'রাগ' (আসক্তি) আর সেগুলি প্রাপ্ত করার বা সেগুলি অধিকারে রাখার যে চেষ্টা, দুরাগ্রহ, তাকে বলা হয় 'বল'। তারা সর্বদাই এগুলিতে যুক্ত থাকে। আসুরী-স্বভাবসম্পন্ন সেইসব লোকের এই ভাব থাকে যে মনুষ্যদেহ পেয়ে যদি ভোগই না করা হয় তাহলে এই মনুষ্যদেহ তো পশুরই সামিল। মানুষ যদি এইসব ভোগ্যসামগ্রী প্রাপ্ত না হয়, তাহলে সে আর কী করল ? মানুষের দেহ লাভ করে ইচ্ছামতো ভোগ্যপদার্থই যদি না পাওয়া যায়, তাহলে তার জীবনই বৃথা ইত্যাদি। এইরূপে তারা প্রাপ্ত সামগ্রীতে মজে থাকে এবং ধন-সম্পত্তি ইত্যাদি ভোগ্যপদার্থ লাভ করার জন্য হঠকারিতাপূর্বক জেদের বশে তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়।

'কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামম্'—এরা শরীরস্থ পঞ্চভূতকে (ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও ব্যোমকে) কষ্ট দেয়, দেহকে কৃশ করে এবং একেই তপস্যা বলে মনে করে। তাদের স্বাভাবিক ধারণা হল যে শরীরকে কষ্ট না দিয়ে তপস্যা করা যায় না।

পরবর্তী চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শ্লোকে যেখানে কায়মনোবাক্যে তপস্যার বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে শরীরকে কষ্ট দেওয়ার কথা বলা হয়নি। সেই তপস্যা খুব শান্তির সঙ্গে হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে যে তপস্যার কথা বলা হয়েছে, সেটি শাস্ত্রবিরুদ্ধ ভয়ঙ্কর তপস্যা এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধভাবে শরীরকে কষ্ট দিয়ে করা হয়ে থাকে।

'মাং চৈবান্তঃশরীরস্থম্'—ভগবান বলেছেন যে এরূপ ব্যক্তিরা তাদের অন্তরে স্থিত আমাকেও (পরমাত্মাকে) কৃশ করে, দুঃখ দেয়। তারা আমার নির্দেশ এবং মতানুসারে না চলে তার বিপরীত আচরণ করে থাকে।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছিলেন এঁরা কিরূপ নিষ্ঠাসম্পন্ন—সাত্ত্বিক, রাজসিক না তামসিক ? দৈবী-সম্পদসম্পন্ন, নাকি আসুরী-সম্পদবিশিষ্ট ? তার উত্তরে ভগবান বলেছেন যে এদের আসুরী-সম্পদবিশিষ্ট বলে জেনো—**'তান্‌বিদ্ধি আসুরনিশ্চয়ান্'**। এখানে **'আসুর-নিশ্চয়ান্'** পদটি সাধারণ আসুরী-সম্পদবিশিষ্টদের বাচক নয়, তার থেকেও যারা অত্যন্ত নীচ—বিশেষভাবে নাস্তিক, তাদের লক্ষ্য করে বলা হয়েছে।

বিশেষ কথা

চতুর্থ শ্লোকে যেসব মানুষ শাস্ত্রবিধি না জেনে শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে ভজন-পূজন করে তাদের উপলক্ষে **'যজন্তে'** পদটি ব্যবহৃত হয়েছে ; কিন্তু এখানে শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগকারী শ্রদ্ধারহিত মানুষদের দ্বারা পূজাকে বলা হয়েছে **'তপ্যন্তে'**। তার কারণ হল এই যে, আসুরী-সম্পদবিশিষ্ট মানুষদের মধ্যে তপস্যাতেই পূজ্য-বুদ্ধি হয়ে থাকে—তপস্যাই তাদের সবকিছু এবং নিজেদের মনোমতো রীতি দ্বারা শরীরকে কষ্ট দেওয়াকেই তারা তপস্যা বলে মনে করে। এদের তপস্যার লক্ষণ হল—শরীরকে কৃশ করা, কষ্ট দেওয়া। তারা এরূপ তপস্যাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়, খুব উচ্চ বলে মনে করে ; কিন্তু ভগবানকে বা শাস্ত্রকে তারা মানে না। সেই তপস্যাই তারা করে, যা শাস্ত্রবিরুদ্ধ । অত্যন্ত উপবাস করা, কাঁটার বিছানায় শোওয়া, উল্টো হয়ে ঝোলা, একপায়ে দাঁড়িয়ে থাকা, শাস্ত্র নির্দেশের বিরুদ্ধে অগ্নির দ্বারা দেহ তাপিত করা, নিজ শরীর, মন, ইন্দ্রিয়াদিকে নানাপ্রকারে কষ্ট দেওয়া ইত্যাদি—এগুলি সবই আসুরী-স্বভাবসম্পন্নদের তপস্যা।

ষোড়শ অধ্যায়ের তেইশতম শ্লোকে শাস্ত্রবিধি জেনেও তা উপেক্ষা করে দান, সেবা, উপকার ইত্যাদি শুভকর্ম করার কথা বলা হয়েছে, সেগুলি তত খারাপ নয়, কারণ তাদের দানাদি কর্ম শাস্ত্র-বিধিসম্পন্ন না হলেও শাস্ত্রনিষিদ্ধও নয়। কিন্তু এখানে যা শাস্ত্রবিহিত নয়, তাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করে ইচ্ছানুসারে বিপরীত আচরণ করার কথা বলা হয়েছে। দুইয়েতে পার্থক্য কী ? তেইশতম শ্লোকে

কথিত লোকেদের সিদ্ধি, সুখ এবং পরমগতি প্রাপ্তি হয় না এবং তাদের সেই নামমাত্র শুভকর্মেরও পুরো ফল মেলে না। কিন্তু এখানে উল্লিখিত ব্যক্তিদের নীচ যোনি এবং নরক প্রাপ্তি হয়। কারণ এদের মধ্যে দম্ভ, অহংকার ইত্যাদি থাকে। এরা শাস্ত্রকে মানে না, শাস্ত্রের কথা শোনে না এবং কেউ শোনাতে গেলেও শুনতে চায় না।

ষোড়শ অধ্যায়ের তেইশতম শ্লোকে 'উপেক্ষাপূর্বক' শাস্ত্রত্যাগ, এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে 'অজ্ঞতাপূর্বক' শাস্ত্রত্যাগ এবং এখানে 'বিরোধিতাপূর্বক' শাস্ত্রত্যাগের কথা বলা হয়েছে। পরে তামসিক যজ্ঞাদিতেও শাস্ত্রকে উপেক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এখানে শ্রদ্ধা, শাস্ত্রবিধি, জীব ও ভগবান—এই চারের প্রতি বিরুদ্ধতা করা হয়েছে। এরূপ বিরুদ্ধতা রাজসিক ও তামসিক কোনো বর্ণনাতেই আর উদ্ধৃত হয়নি।

***

সম্বন্ধ—কোনো ব্যক্তি যদি কোনো প্রকারেরই পূজা না করেন, তাহলে তাঁর শ্রদ্ধা কীভাবে জানা যাবে ?—সেটি জানাবার জন্য ভগবান ব্যক্তির আহারের রুচির দ্বারা তার নিষ্ঠাকে জানার প্রকরণটি আরম্ভ করেছেন।

আহারস্ত্বপি সর্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু॥ ৭ ॥

[আহারঃ, অপি (আহারও) ; সর্বস্য (সকলেরই) ; ত্রিবিধঃ, প্রিয়ঃ, ভবতি (তিন প্রকারের প্রিয় হয়) ; তথা (তেমনই) ; যজ্ঞঃ, তপঃ (যজ্ঞ, তপঃ) ; দানম্ (দান) ; তেষাম্ (তার) ; ইমম্, ভেদম্ (প্রভেদগুলি) ; শৃণু (শোনো।)]

আহারও সকলের তিন প্রকারের প্রিয় হয় ; তেমনিই যজ্ঞ, দান ও তপস্যাও তিন প্রকারের হয় অর্থাৎ শাস্ত্রীয় কর্মাদিও গুণাদি ভেদে তিন প্রকারের হয়, তুমি তার প্রভেদগুলি শোন ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা—**'আহারস্ত্বপি সর্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ'** —চতুর্থ শ্লোকে ভগবান অর্জুনের প্রশ্ন অনুযায়ী মানুষের নিষ্ঠার পরীক্ষা করার জন্য সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক—এই তিনপ্রকার পূজার কথা জানিয়েছেন। কিন্তু যাদের শ্রদ্ধা, রুচি, প্রিয়তা পূজা-অর্চনাতে নেই, তাদের নিষ্ঠা কীভাবে জানা যায় ? তাই বলা হয়েছে যে যাদের পূজা-অর্চনাতে শ্রদ্ধা নেই, তাদেরও শরীর-নির্বাহের জন্য আহার্য গ্রহণ করতে হয়, তা তারা নাস্তিক হোক বা আস্তিক, বৈদিক হোক বা খ্রীষ্টান, পারসী, ইহুদী, মুসলমান যাই হোক না কেন ! এদের সকলের জন্যই এই **'আহারস্ত্বপি'** পদটির দ্বারা বলেছেন যে, নিষ্ঠা জানার উপায় শুধু পূজা-অর্চনা নয়, প্রত্যুত আহার্যের রুচি দ্বারাও তাদের নিষ্ঠাকে জানা যায়।

মানুষের মন স্বাভাবিকভাবে যে খাদ্যের জন্য উৎসুক হয়ে ওঠে অর্থাৎ যে খাদ্যের কথা শুনে, দেখে এবং স্বাদ নিয়ে মন আকৃষ্ট হয়, সেই অনুযায়ী সেই ব্যক্তির সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক নিষ্ঠা বোঝা যায়।

এখানে কেউ এ কথাও বলতে পারেন যে, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক আহার কেমন হয় ?—সেটি জানাবার জন্যই এই প্রকরণটি বলা হয়েছে। স্থূলদৃষ্টিতে দেখলে এই কথাই মনে হবে, কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, তা নয়। আসলে এখানে আহারের নয়, আহারকারীর রুচিরই বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং আহারকারীর শ্রদ্ধা কিরূপ, সেটি জানাতেই এই প্রকরণের অবতারণা হয়েছে।

'সর্বস্য' ও **'প্রিয়ঃ'** পদটি উল্লেখের তাৎপর্য এই যে সাধারণভাবে কোন্ কোন্ মানুষের কী ধরনের খাদ্যবস্তুতে রুচি রয়েছে, তা দেখে সেই ব্যক্তি সাত্ত্বিক, রাজসিক না তামসিক—তা জানা যায়। তেমনই **'যজ্ঞস্তপস্তথা দানম্'**[১] পদটির দ্বারা যতপ্রকার শাস্ত্রীয় কর্ম আছে, তার মধ্যে এইসব মানুষের কোন্ কোন্ কর্মে কী প্রকার রুচি বা আগ্রহ সে-কথা জানানো হয়েছে। **'তথা'** কথাটি বলার অর্থ হল এই যে, পূজা যেমন তিন প্রকারের, আহার্য যেমন তিন প্রকারের, তেমনই শাস্ত্রীয় যজ্ঞ, তপস্যা ইত্যাদি কর্মও তিন

[১]যদিও এখানে **'যজ্ঞ'** শব্দটি হোমরূপ যজ্ঞের বাচক, সমস্ত কর্তব্য-কর্মের নয় (কারণ যজ্ঞের সঙ্গে তপ ও দান পৃথকভাবে বলা হয়েছে), তা সত্ত্বেও গৌণভাবে তীর্থ-ব্রতাদি কর্তব্য-কর্মও এখানে ধরা যায়।

প্রকারের হয়ে থাকে। এর দ্বারা আর একটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, শাস্ত্র, সৎসঙ্গ, আলাপ-আলোচনা, কথা, পুস্তক, ব্রত, তীর্থ, ব্যক্তি ইত্যাদির মধ্যে যেগুলি সাত্ত্বিক, সেগুলি সত্ত্বিক ব্যক্তিদের, যেগুলি রাজসিক সেগুলি রাজসিক ব্যক্তিদের, যেগুলি তামসিক, তা তামসিকদের প্রিয় হয়।

'তেষাং ভেদমিমং শৃণু'—যজ্ঞ, তপ ও দানের পার্থক্য শোনো অর্থাৎ মানুষের স্বাভাবিক রুচি ও প্রবৃত্তি কিসে হয়, তা শোনো। যেমন, কেউ নিজ রুচি অনুযায়ী ব্রাহ্মণকে দান করা পছন্দ করে, কেউ সাধারণ মানুষকে দান করে, কেউ শুদ্ধ আচরণশীল ব্যক্তিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, কেউ অশুদ্ধ আহার-বিহারকারীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করাই পছন্দ করে, ইত্যাদি ইত্যাদি[১]।

তাৎপর্য হল এই যে সাত্ত্বিক ব্যক্তিদের রুচি সাত্ত্বিক খাওয়া-দাওয়া, ওঠা-বসা, কার্য-সমাজ, ব্যক্তি ইত্যাদির প্রতি হয়ে থাকে এবং তাদেরই সঙ্গ ভালো লাগে। রাজসিক মানুষদের রুচি রাজসিক খাওয়া-দাওয়া, ওঠা-বসা, কার্য-সমাজ, ব্যক্তিদের প্রতিই হয় এবং তাদের সঙ্গই তাদের ভালো লাগে। তামসিক মানুষদের রুচিও তেমনই তামসিক খাওয়া-দাওয়া, ওঠা-বসা ইত্যাদি ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ আচরণকারী নীচ ব্যক্তিদের সঙ্গে ওঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া, কথা-বার্তা, সঙ্গে থাকা, বন্ধুত্ব করাতেই আবদ্ধ থাকে এবং তাদের সঙ্গই এদের ভালো লাগে, এদের নীচ আচরণের প্রতিই তাদের প্রবৃত্তি হয়ে থাকে।

পরিশিষ্ট-ভাব—মানুষের ক্রিয়া স্বভাবতঃ দুপ্রকারের হয়ে থাকে—ব্যবহারিক এবং শাস্ত্রীয়। সুতরাং এখানে 'আহার'-এর অন্তর্গত ব্যবহারিক (খাওয়া-পরা, শোওয়া-বসা ইত্যাদি) এবং 'যজ্ঞ-তপ-দান'-এর অন্তর্গত শাস্ত্রীয় ক্রিয়াসমূহকে বুঝতে হবে।

* * *

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥ ৮ ॥

[**আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ** (আয়ু, সত্ত্বগুণ, বল, আরোগ্য, সুখ, চিত্তপ্রসন্নতাবৃদ্ধিকারী) ; **স্থিরাঃ, হৃদ্যা** (সারবান, হৃদয়ে শক্তিবৃদ্ধিকারী) ; **রস্যাঃ, স্নিগ্ধাঃ** (সরস, স্নিগ্ধ) ; **আহারাঃ** (আহার্য) ; **সাত্ত্বিক, প্রিয়াঃ** (সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের প্রিয়।)]

আয়ু, সত্ত্বগুণ, বল, আরোগ্য, সুখ, চিত্তপ্রসন্নতা বৃদ্ধিকারী এবং সারবান্, হৃদয়ে শক্তিবর্ধনকারী, সরস, স্নিগ্ধ—এরূপ আহার্য সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের প্রিয় হয়॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা—**'আয়ুঃ'**—যা আহার করলে মানুষের আয়ু বৃদ্ধি হয় ; **'সত্ত্বম্'**—সত্ত্বগুণ বাড়ে ; **'বলম্'**—শরীর, মন, বুদ্ধি ইত্যাদিতে সাত্ত্বিক বল ও উৎসাহ উৎপন্ন হয় ; **'আরোগ্যঃ'**—শরীর নীরোগ হয় ; **'সুখম্'**—সুখ-শান্তি প্রাপ্ত হয় এবং **'প্রীতিবিবর্ধনাঃ'**—যা দেখলে প্রীতি উৎপন্ন হয়[২], সেগুলি ভালো লাগে।

এইরূপ **'স্থিরাঃ'**—যা দুষ্পাচ্য নয়, সুপাচ্য এবং বহুদিন ধরে শরীরে শক্তিপ্রদান করে ;

[১]মৃগা মৃগৈঃ সঙ্গমনুব্রজন্তি গাবশ্চ গোভিস্তুরগাস্তুরঙ্গৈঃ।
মূর্খাশ্চ মূর্খৈঃ সুধয়ঃ সুধীভিঃ সমানশীলব্যসনেষু সখ্যম্॥ (পঞ্চতন্ত্র, মিত্রভেদ ৩০৫)

'হরিণ যেমন হরিণের সঙ্গে, গোরু গোরুর সঙ্গে, ঘোড়া ঘোড়ার সঙ্গেই মেলামেশা করে, তেমনই মানুষের মধ্যে মূর্খ মূর্খের সঙ্গে, বিদ্বান বিদ্বানের সঙ্গে মিত্রতা করে। কারণ মিত্রতা (বন্ধুত্ব) একমাত্র সম-স্বভাব ও সম-আচরণের মধ্যেই হয়ে থাকে।'

[২]যদিও অনুকূল আহার্যে রাজসিক ব্যক্তিও প্রীত হয়, কিন্তু সেই প্রীতি পরিণামে বিষরূপ (১৮।৩৮)। তেমনই তামসিক ব্যক্তিও প্রীত হয়, কিন্তু সেই প্রীতি পরিণামে তাকে মূঢ়তা অর্থাৎ অতিনিদ্রা, আলস্য এবং প্রমাদে (খেলাধুলো, বৃথা বাক্য ব্যয়, দুর্ব্যবহার ইত্যাদিতে) লিপ্ত করে (১৮।৩৯)।

'হৃদ্যাঃ'—হৃদয়, ফুসফুস ইত্যাদিকে শক্তিপ্রদান করে ও বুদ্ধিতে সৌম্যভাব আনে ; **'রস্যাঃ'**—ফল- দুধ-শর্করা জাতীয় রসযুক্ত খাদ্য ; **'স্নিগ্ধাঃ'**—ঘি, মাখন, বাদাম-কাজু-কিশমিশ জাতীয় স্নেহযুক্ত সাত্ত্বিক ভোজ্যপদার্থ যেগুলি সুপুষ্ট, সুপক্ব এবং টাটকা।

'আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ'—এরূপ ভোজ্য (চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয়) পদার্থ সাত্ত্বিক মানুষদের প্রিয় হয়। সুতরাং এরূপ আহারে রুচিযুক্ত ব্যক্তিকে বলা হয় সাত্ত্বিক।

※ ※ ※

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥ ৯ ॥

[**কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ** (অত্যন্ত কটু, অতি টক, অতি লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি শুষ্ক এবং প্রদাহ-কারক) ; **আহারাঃ** (আহার) ; **রাজসস্য, ইষ্টাঃ** (রাজসিক ব্যক্তিগণের প্রিয়) ; **দুঃখশোকাময়প্রদাঃ** (দুঃখ-শোক এবং রোগ উৎপন্নকারী।)]

অত্যন্ত কটু, অতি টক, অতি লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি শুষ্ক এবং অতি প্রদাহকারক আহার বা ভোজ্যপদার্থ রাজসিক ব্যক্তিগণের প্রিয়, যা দুঃখ-শোক এবং রোগ উৎপন্নকারী॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা—**'কটু'**—করলা, নিমপাতা ইত্যাদি অত্যন্ত কটু পদার্থ ; **'অম্ল'**—তেঁতুল, আমচুর, লেবু, ঘোল ইত্যাদি থেকে তৈরি অত্যন্ত টক পদার্থ ; **'লবণম্'**—অতিরিক্ত লবণাক্ত পদার্থ ; **'অতি উষ্ণম্'**—যা থেকে গরম ধোঁয়া বার হয়, সেইরূপ অত্যন্ত গরম পদার্থ ; **'তীক্ষ্ণম্'**—যা আহার করলে নাক-চোখ-মুখ দিয়ে জল বার হয়, সেইরূপ লঙ্কা ইত্যাদি তীক্ষ্ণ পদার্থ ; **'রূক্ষম্'**—যাতে ঘি, দুধ ইত্যাদির সম্পর্ক নেই, এরূপ ভাজা ছোলা, ছাতু ইত্যাদি রুক্ষ পদার্থ এবং **'বিদাহিনঃ'**—রাই ইত্যাদি প্রদাহকারী পদার্থ (রাইকে যদি দু-তিন ঘণ্টা ঘোলের মধ্যে রাখা হয় তাহলে তাতে গাঁজা হয়, যা অত্যন্ত প্রদাহকারক হয়)।

'আহারা রাজসস্যেষ্টাঃ'—এইরূপ ভোজ্য (চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয়) পদার্থ রাজসিক ব্যক্তিদের প্রিয় হয়। এর দ্বারা তাদের নিষ্ঠা জানা যায়।

'দুঃখশোকাময়প্রদাঃ'—কিন্তু এই পদার্থগুলি পরিণামে দুঃখ, শোক এবং রোগ উৎপন্নকারী হয়। টক, তীক্ষ্ণ (ঝাল) এবং দাহকারক আহার্য গ্রহণকালে মুখে যে জ্বালার সৃষ্টি হয়, তাকেই বলা হয় দুঃখ। আহার গ্রহণের পরে মনে প্রসন্নভাব না এসে চিন্তা হতে থাকে, তাকে বলে শোক। এরূপ ভোজনের ফলে শরীর প্রায়শঃ রোগগ্রস্ত হতে থাকে।

※ ※ ※

যাতযামং গতরসং পূতি পর্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥ ১০ ॥

[**যৎ, ভোজনম্** (যে খাদ্য) ; **যাতযামম্** (অর্ধপক্ব) ; **গতরসম্, পূতি** (রসবর্জিত, দুর্গন্ধময়) ; **পর্যুষিতম্, চ, উচ্ছিষ্টম্** (বাসি ও উচ্ছিষ্ট) ; **চ, অমেধ্যং** (এবং অত্যন্ত অপবিত্র) ; **অপি** (হলেও) ; **তামসপ্রিয়ম্** (তামস ব্যক্তিগণের প্রিয়।)]

যে খাদ্য অর্ধপক্ব, রসবর্জিত, দুর্গন্ধময়, বাসি, উচ্ছিষ্ট এবং অত্যন্ত অপবিত্র (মাংসাদি বস্তু) তথাপি তামস ব্যক্তিগণের সেরূপ খাদ্যই প্রিয় হয়॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা—**'যাতযামং'**—যে খাদ্য পুরো সময় নিয়ে রান্না করা হয়নি, এরূপ অর্ধপক্ব অথবা যা অধিক সিদ্ধ হয়ে গেছে অথবা যার সময় চলে গিয়েছে এমন অসময়ের ফল বা সব্জী যেগুলিকে দীর্ঘদিন হিমঘরে রেখে খাওয়া হয়।

'গতরসম্'—গরমে বা অন্য কোনো কারণে যার স্বাভাবিক রস শুষ্ক হয়ে গেছে অথবা মেশিন দ্বারা যার

সারপদার্থ বের করে নেওয়া হয়েছে সেইরূপ দুধ বা ফল।

‘পূতি’—পচে যাওয়া জিনিস থেকে তৈরি মদ[১] এবং স্বাভাবিক দুর্গন্ধযুক্ত পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি।

‘পর্যুষিতম্’—জল ও নুন দিয়ে রান্না করা সব্জী, রুটি ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্যকে রাত্রি পার হলে বাসি বলা হয়। কিন্তু শুদ্ধ ঘি, দুধ, চিনি ইত্যাদি দিয়ে তৈরি বরফি, জিলাপি, লাড্ডু ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্যে যতক্ষণ বিকৃতি না আসে ততক্ষণ তাদের বাসি বলা হয় না। কিছুদিন থাকার পর তাদের বিকৃতি বা দুর্গন্ধ বার হলে তাদের তখন বাসি বলা হয়।

‘উচ্ছিষ্টম্’—ভুক্তাবশেষ অর্থাৎ খাওয়ার পর উদ্বৃত্ত অথবা এঁটো-হাতে ধরা কিংবা বিড়াল, গোরু, কুকুর, কাক প্রভৃতি পশু-পক্ষীর শোঁকা বা খাওয়া অংশকে এঁটো বা উচ্ছিষ্ট বলা হয়।

‘অমেধ্যম্’—রজ-বীর্যের দ্বারা উৎপন্ন মাংস, মাছ, ডিম—ইত্যাদি অপবিত্র দ্রব্য এবং মরদেহ স্পর্শ করলেই স্নান করার প্রয়োজন হয়।[২]

‘অপি চ’—এই অব্যয়ের সাহায্যে সমস্ত শাস্ত্রনিষিদ্ধ পদার্থগুলিকে বোঝায়। যে বর্ণ আশ্রমের জন্য যে যে পদার্থের নিষেধ থাকে, সেই বর্ণ-আশ্রমের জন্য ওইসব পদার্থকে নিষিদ্ধ বলে মনে করা হয়েছে ; যেমন—মুসুর ডাল, গাজর, শালগম ইত্যাদি।

‘ভোজনং তামসপ্রিয়ম্’—তামসিক মানুষদের এইরূপ খাদ্য প্রিয় হয়ে থাকে। এর দ্বারা তাদের নিষ্ঠাকে জানা যায়।

উপরিউক্ত খাদ্যগুলির মধ্যে সাত্ত্বিক খাদ্যও যদি আসক্তিপূর্বক খাওয়া হয়, তাহলে সেটি রাজসিক হয়ে ওঠে এবং লোভবশতঃ যদি অধিক খাওয়া হয় (যাতে অজীর্ণ হয়) তাহলে তা তামসিক হয়। এইরূপই ভিক্ষুক যদি বিধিমতো ভিক্ষাতে রুক্ষ, শুষ্ক, তীক্ষ্ণ বা বাসি খাদ্যদ্রব্য পায়, যেগুলি রাজসিক বা তামসিক গোত্রের অন্তর্গত এবং তা যদি ভগবানকে অর্পণ করে স্বল্পমাত্রায়[৩] প্রসাদ হিসাবে খায়, তাহলে সেই খাদ্যও ভাব ও ত্যাগের দৃষ্টিতে সাত্ত্বিক হয়ে ওঠে।

প্রকরণ সম্পর্কিত বিশেষ কথা

চার শ্লোকের এই প্রকরণে, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—তিন প্রকার আহারের বর্ণনা বলে মনে হয় ; কিন্তু এটি প্রকৃতপক্ষে আহারের প্রসঙ্গ নয়, আহার গ্রহণকারীর রুচির প্রসঙ্গ। তাই এখানে ‘আহার গ্রহণকারী’র রুচিরই বর্ণনা করা হয়েছে—এতে নিম্নলিখিত যুক্তি দেওয়া যায়—

(১) ষোড়শ অধ্যায়ের তেইশতম শ্লোকে উদ্ধৃত **‘যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ’** পদটি নিয়ে অর্জুন প্রশ্ন করেছেন যে খুশিমতো শ্রদ্ধাপূর্বক কর্ম যারা করে তাদের নিষ্ঠা কীভাবে জানা যায়। তাই ভগবান এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে শ্রদ্ধার তিনটি ভাগ জানিয়ে তৃতীয় শ্লোকে **‘সর্বস্য’** পদটির দ্বারা মানুষমাত্রেরই শ্রদ্ধা তার চিত্তের

---

[১]শাস্ত্রে মদ্যপানকারীদের মহাপাপী বলা হয়েছে—

স্তেনো হিরণ্যস্য সুরাং পিবংশ্চ গুরোস্তল্পমাবসন্ব্রহ্মহা চৈতে পতন্তি চত্বারঃ পঞ্চমশ্চারংস্তৈরিতি ।

(ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৫।১০।৯)

অর্থাৎ স্বর্ণ চোর, মদ্যপায়ী, গুরুপত্নী গমনকারী, ব্রহ্ম হত্যাকারী—এই চারজন মহাপাপী এবং এদের সঙ্গ যারা করে তারা পঞ্চম মহাপাপী।

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে মদ্যপান সর্বদা নিন্দনীয়, মাংসাহারের থেকেও তা নিন্দনীয় এবং পতনকারক।

গঙ্গা সকলকেই শুদ্ধ করে, কিন্তু গঙ্গাতে মদ্য পাত্র ফেললে তা শুদ্ধ হয় না। মদিরা পাত্রই যখন এত অশুদ্ধ তখন মদিরা পানকারী যে কত অপবিত্র হয় তার কোনো শেষ নেই।

মদ্য প্রস্তুত করতে অসংখ্য জীবের হত্যা হয়। মদ্যপানের সব থেকে বড় ক্ষতি হল এই যে, এতে অন্তরের ধর্মের বীজ নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ মানুষের মধ্যে যে সদ্ভাব, চিন্তা, রুচি বা সংস্কার থাকে, মদ্যপানে তা নষ্ট হয়। এর ফলে মানুষের ঘোর পতন হয়।

[২]এখানে তামসিক আহার্যে ‘অমেধ্য’ শব্দের প্রয়োগ করে ভগবান যেন ওইসব বস্তুর নামও উল্লেখ করতে চাননি।

[৩]স্বল্পাহার করার তাৎপর্য হল এই যে, খাদ্য গ্রহণের পর যেন পেটের কথা মনে না থাকে। দুই কারণে পেটের কথা স্মরণে আসে—এক, অধিক আহারে ; দুই, অতি অল্প আহারে।

অনুরূপ বলে জানিয়েছেন, চতুর্থ শ্লোকে পূজ্য অনুযায়ী পূজকের নিষ্ঠার পরিচয় জানিয়েছেন। সপ্তম শ্লোকে সেই **'সর্বস্য'** পদটি প্রয়োগ করে ভগবান বলেছেন যে মানুষমাত্রেরই নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী তিন প্রকারের খাদ্য প্রিয় হয়ে থাকে—**'আহারস্ত্বপি সর্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ'**। এই খাদ্যরুচি দ্বারাই মানুষের নিষ্ঠা বা স্থিতির পরিচয় জানা যায়।

'প্রিয়ঃ' শব্দটি শুধু সপ্তম শ্লোকেই বলা হয়নি, এটি অষ্টম শ্লোকে **'সাত্ত্বিক প্রিয়াঃ'**, নবম শ্লোকে **'রাজসস্যেষ্টাঃ'** এবং দশম শ্লোকে **'তামসপ্রিয়ম্'** এতে 'প্রিয়' এবং **'ইষ্ট'** শব্দ বলা হয়েছে, এগুলি রুচির বাচক। এখানে যদি শুধু আহার্যেরই বর্ণনা থাকত, তাহলে ভগবান প্রিয় ও ইষ্ট শব্দ ব্যবহার না করে কেবলমাত্র এটি সাত্ত্বিক আহার, এটি রাজসিক আহার, এটি তামসিক আহার—এইভাবে বর্ণনা করতেন।

(২) দ্বিতীয় প্রবল যুক্তি হল এই যে, সাত্ত্বিক আহার্যে প্রথমে **'আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ'** পদটির দ্বারা ভোজনের ফল জানিয়ে পরে ভোজ্যপদার্থের বর্ণনা করেছেন। কারণ সাত্ত্বিক ব্যক্তি ভোজন ইত্যাদি যে কোনো কর্মেই অগ্র-পশ্চাৎ চিন্তা করে প্রবৃত্ত হয়, তাদের দৃষ্টি সর্বপ্রথম তার পরিণামের দিকেই থাকে।

আসক্তি থাকায় রাজসিক ব্যক্তিদের দৃষ্টি সর্বপ্রথম আহার্যের দিকেই থাকে, তাই রাজসিক আহার্যের বর্ণনায় প্রথমে ভোজ্যপদার্থের বর্ণনা করে পরে **'দুঃখশোকাময়প্রদাঃ'** পদটির সাহায্যে তার ফল জানিয়েছেন। তাৎপর্য হল এই যে, রাজসিক মানুষ যদি শুরুতেই আহারের পরিণাম নিয়ে চিন্তা করে, তাহলে তার রাজসিক খাদ্যে দ্বিধা ভাব আসে। কারণ পরিণামে তার দুঃখ, শোক বা রোগ হবে—কোনো ব্যক্তিই তা চায় না। কিন্তু লোভ বা আসক্তি থাকায় রাজসিক ব্যক্তিরা পরিণাম নিয়ে চিন্তা করে না।

সাত্ত্বিক আহারের ফল প্রথমে এবং রাজসিক আহারের ফল পরে বর্ণনা করা হয়েছে ; কিন্তু তামসিক আহারের ফলের কথা বলাই হয়নি। কারণ মূঢ়তার জন্য তামসিক ব্যক্তিরা খাদ্য এবং তার পরিণাম নিয়ে কোনোরূপ চিন্তা-ভাবনা করে না। ভোজন বিধিসঙ্গত কি না, তাতে আমাদের অধিকার আছে কি না, শাস্ত্রের নির্দেশ আছে কি না—এইসব কোনো কথা চিন্তা না করে পশুর ন্যায় তামসিক ব্যক্তিরা খাদ্যগ্রহণে প্রবৃত্ত হয়ে থাকে। তাৎপর্য হল এই যে সাত্ত্বিক ভোজনকারী দৈবী-সম্পদসম্পন্ন হয় এবং রাজসিক ও তামসিক ভোজনকারীগণ আসুরী-সম্পদবিশিষ্ট হয়ে থাকে।

(৩) ভগবান যদি এখানে আহার্যের বর্ণনাই করতেন, তাহলে তিনি আহারের বিধি এবং তার জন্য কর্মের শুদ্ধি-অশুদ্ধির কথা বর্ণনা করতেন, যেমন—

সৎভাবে রোজগারের অর্থে শাক-সব্জী, পবিত্র খাদ্য-বস্তু কিনে রান্নাঘরে উনুনে শুদ্ধ বস্ত্র পরে পবিত্রভাবে খাদ্য রন্ধন করা উচিত, পরে সেই আহার্যবস্তু ভগবানকে অর্পণ করে তাঁর চিন্তা ও জপ করে প্রসাদ মনে করে গ্রহণ করলে সেটি সাত্ত্বিক ভোজন হয়।

স্বার্থ এবং অহং-এর প্রাধান্য নিয়ে সত্য-অসত্য বিচার না করে অর্থ উপার্জন করা ; স্বাদ, শারীরিক পুষ্টি, ভোগ করার ক্ষমতা বাড়ানোর উদ্দেশ্য নিয়ে আহার্য-বস্তু কেনা ; খেতে এবং দেখতে ভালো লাগে, সেইভাবে রান্না করা এবং লোভবশতঃ সেটি ভোজন করাকে বলা হয় রাজসিক আহার।

ছল-কপট, চুরি-ডাকাতি, ধাপ্পাবাজি ইত্যাদি যে কোনোভাবে অর্থ উপার্জন করা ; শুদ্ধি-অশুদ্ধি বিচার না করে মাংস, ডিম ইত্যাদি কেনা ; বিধি পালন না করে রান্না করা এবং অশুদ্ধ পরিবেশে, হাত-পা না ধুয়ে খাদ্য যদি গ্রহণ করা হয়, তাহলে তাকে বলা হয় তামসিক আহার।

কিন্তু ভগবান এখানে শুধুমাত্র সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ব্যক্তিদের ভালো-লাগা খাদ্যগুলির বর্ণনা করেছেন, যাতে তাঁদের রুচি সম্বন্ধে জানা যায়।

(৪) তাছাড়া গীতায় যে যে স্থানে খাদ্যের বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে ভোজনকারীর বর্ণনাই করা হয়েছে ; যেমন—**'নিয়তাহারাঃ'** (৪।৩০) পদে নিয়মিত আহারকারীদের ; **'নাত্যশ্নতস্তু'** এবং **'যুক্তাহারবিহারস্য'** (৬।১৬-১৭) পদগুলিতে অধিক আহারকারী এবং পরিমিত আহারকারীদের ; **'যদশ্নাসি'** (৯।২৭) পদে ভোজ্যপদার্থ ভগবদর্পণকারীদের এবং **'লঘ্বাশী'** (১৮।৫২) পদে অল্প আহারকারীদের বর্ণনা করা হয়েছে।

এইরূপ এই অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে **'যজ্ঞস্তপস্তথা দানম্'** পদে উদ্ধৃত **'তথা'** (তেমনই) পদের দ্বারা এই অর্থ

হয় যে, মানুষ যেসব যজ্ঞ, তপস্যা, দান ইত্যাদি কার্য করে, তা নিজ (সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক) রুচি অনুযায়ীই করে থাকে। পরে একাদশ থেকে বাইশতম শ্লোক পর্যন্ত যে প্রকরণ আছে, তাতেও যজ্ঞ, তপস্যা এবং দানকারীদের স্বভাব বর্ণিত হয়েছে।

আহারের জন্য আবশ্যকীয় চিন্তা-ভাবনা

উপনিষদে বলা হয়েছে যে অন্ন যেমন হয়ে থাকে, মনও সেরূপ তৈরি হয়—**'অন্নময়ং হি সৌম্য মনঃ।'** (ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৬।৫।৪) অর্থাৎ মনের ওপর অন্নের প্রভাব পড়ে। অন্নের সূক্ষ্ম সারভাগ থেকে মন (অন্তঃকরণ) সৃষ্ট হয়, দ্বিতীয় ভাগ থেকে বীর্য, তৃতীয় ভাগে রক্ত ইত্যাদি, চতুর্থ স্থূলভাগ থেকে মল তৈরি হয়, যা বর্জ্য পদার্থ। তাই মন শুদ্ধ করার জন্য খাদ্যও শুদ্ধ এবং পবিত্র হওয়া উচিত। আহারশুদ্ধিতে মন (অন্তঃকরণ)ও শুদ্ধ হয়—**'আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ'** (ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ২।২৬।২)। যেস্থানে আহার করা হয় তার বায়ুমণ্ডল, দৃশ্য এবং যেখানে বসে আহার করা হয়, সেই আসনও শুদ্ধ, পবিত্র হওয়া উচিত। কারণ আহারের সময় প্রাণ যখন অন্নগ্রহণ করে, তখন শরীরের সমস্ত রোমকূপ দ্বারা আশপাশের পরমাণুকেও আকর্ষণ করে—গ্রহণ করে। সুতরাং সেখানকার স্থান, বায়ুমণ্ডল যেমন হয়, প্রাণ সেইরূপ পরমাণুকে আকর্ষণ করে এবং সেই অনুযায়ী মন সৃষ্ট হয়। যিনি খাদ্য প্রস্তুত করেন তাঁর ভাব-চিন্তাও শুদ্ধ এবং সাত্ত্বিক হওয়া উচিত।

খাদ্য গ্রহণের আগে দুই হাত, পা এবং মুখ পবিত্র জলে পরিষ্কার করতে হয়। তারপর পূর্ব বা উত্তর মুখে শুদ্ধ আসনে বসে ভোজ্য-পদার্থগুলি **'পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ'** (গীতা ৯।২৬)। এই শ্লোক বলে, আচমন করে, খাদ্যের প্রথম গ্রাস ভগবানের নাম নিয়ে মুখে দিতে হয়। চর্বণের সময় 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥'—এই মন্ত্র মনে মনে বলে বা নিজ ইষ্ট নাম গ্রহণ করে, খেতে হয়। এই মন্ত্রে মোট ষোলটি নাম আছে এবং দুবার বললেই বত্রিশ নাম করা হয়। আমাদের মুখেও বত্রিশটি দাঁত আছে। তাই (মন্ত্রের প্রতিটি নামের সঙ্গে) বত্রিশ বার চর্বণ করলে সেই খাদ্য সুপাচ্য এবং আরোগ্যদায়ক হয় এবং অল্প অন্নেই তৃপ্তি লাভ হয় ও তার রস সুপাচ্য হয়, তার সঙ্গে সঙ্গে ভোজন ভজন হয়ে ওঠে।

ভোজনের সময় প্রতি গ্রাসে ভগবদ্‌নাম জপ করতে থাকলে অন্নদোষও দূর হয়[১]।

যারা ঈর্ষা-ভয় এবং ক্রোধযুক্ত ও লোভী এবং রোগ ও দৈন্য পীড়িত ও দ্বেষযুক্ত, তারা যা-ই ভোজন করুক না কেন, তা ভালোমতো হজম হয় না অর্থাৎ খাদ্যবস্তু অজীর্ণ হয়ে যায়[২]। তাই সকলের উচিত খাওয়ার সময় মন শান্ত ও প্রফুল্ল রাখা। সেইসময় মনে কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ ইত্যাদি দোষবৃত্তি আসতে না দেওয়া। যদি খাওয়ার সময় এইসব দোষ উৎপন্ন হয়, তাহলে তখন খাওয়া উচিত নয়। কারণ তার প্রভাব খাদ্যের ওপর পড়ে এবং সেই অনুসারে অন্তঃকরণ তৈরি হয়। এমনও শোনা যায় যে, সৈনিকেরা গাভী দোহন করার আগে তার বাছুরকে ছেড়ে দেয় এবং বাছুরের পিছনে কুকুরকে লেলিয়ে দেয়। নিজের বাচ্চার পিছনে কুকুরকে ছুটতে দেখে গাভী রাগান্বিত হলে তখন বাছুরকে এনে বেঁধে রাখে ও গাভী দোহন করে। সেই দুধ সৈনিকেরা পান করে। এর ফলে তারা হিংস্র হয়ে ওঠে।

এইরূপে দুধের প্রভাবও প্রাণীদের ওপর পড়ে। একবার কোনো এক ব্যক্তি পরীক্ষা করার জন্য কিছু ঘোড়াকে মহিষের দুধ এবং কিছু ঘোড়াকে গোরুর দুধ খাইয়ে প্রস্তুত করেছিল। একদিন যখন সমস্ত ঘোড়া যাচ্ছিল, পথে নদী এল, যাতে জল ছিল। মহিষের দুধ খাওয়া ঘোড়াগুলি তাতে বসে পড়ল আর গোরুর দুধ খাওয়া ঘোড়াগুলি পার হয়ে চলে গেল। এইভাবেই বলদ ও মহিষের মধ্যে যুদ্ধ লাগিয়ে দিলে, মহিষ তো বলদগুলিকে মেরে দেয় কিন্তু যদি উভয়কে গাড়িতে জোড়া হয়, তাহলে মহিষ গরমে জিভ বার করে ফেলবে কিন্তু বলদ রোদে চলতেই থাকবে। কারণ মহিষের দুধে সাত্ত্বিক বল হয় না,

[১]কবলে কবলে কুর্বন্ রামনামানুকীর্তনম্। যঃ কশ্চিৎ পুরুষোঽশ্নাতি সোঽন্নদোষৈর্ন লিপ্যতে॥

[২]ঈর্ষাভয়ক্রোধসমন্বিতেন লুব্ধেন রুগ্‌দৈন্যনিপীড়িতেন। বিদ্বেষযুক্তেন চ সেব্যমানমন্নং ন সম্যক্ পরিপাকমেতি॥

(ভাবপ্রকাশ-দিনচর্যাপ্রকরণ ৫।২২৮)

কিন্তু গোরুর দুধে সাত্ত্বিক বল হয়।

পদার্থের ওপরে যেমন প্রাণীদের বৃত্তির প্রভাব পড়ে, তেমনই প্রাণীদের দৃষ্টির প্রভাবও পড়ে। মন্দ লোকের বা ক্ষুধার্ত কুকুরের দৃষ্টি খাদ্যের ওপর পড়লে, সেই খাদ্য অপবিত্র হয়ে যায়। এবার সেটি পবিত্র হবে কীভাবে ? খাদ্যের ওপর কারোর দৃষ্টি পড়েছে দেখে প্রসন্ন চিত্তে ভাবা উচিত যে ভগবান উপস্থিত হয়েছেন। সুতরাং সর্বপ্রথম তাদের কিছু অন্ন দিয়ে খাইয়ে দাও, তাদের দেওয়ার পর অবশিষ্ট শুদ্ধ অন্ন নিজে গ্রহণ করো। তাতে দৃষ্টিদোষ দূর হয়ে অন্ন পবিত্র হয়ে যায়।

দ্বিতীয়তঃ, লোকে গো-বৎসকে পেট ভরে দুধ খেতে না দিয়ে সমস্ত দুধই নিজেরা দোহন করে নেয়। সেই দুধ পবিত্র হয় না। কারণ তার ওপর গো-বৎসের অধিকার থাকে। বাছুরকে পেট ভরে দুধ খেতে দেওয়া উচিত, তার পরে যা দুধ থাকবে, তা যদি মাত্র এক পোয়া হয়, তা-ও অত্যন্ত পবিত্র হয়ে থাকে।

ভোজনকারী এবং ভোজন পরিবেশনকারী—উভয়ের ভাবেরও প্রভাব পড়ে খাদ্যের ওপরে ; যেমন—(১) ভোজনকারীর চাইতে যিনি ভোজন করান, তাঁর মন যত প্রসন্ন হয়, খাদ্য তত উত্তম হয়। (২) ভোজন করান যিনি তিনি প্রসন্ন হয়ে ভোজন করালেও, ভোজনকারী যদি 'বিনা পয়সায় খাবার পাওয়া গেছে ; অনেক পয়সা বেঁচে গেল, শরীরে বল এসে গেল' এই মনোভাব বা স্বার্থ নিয়ে আহার করে তবে তা মধ্যম মানের আহার হয়, এবং (৩) যিনি ভোজন করান, তাঁর যদি মনোভাব এমন হয় যে 'এসে পড়েছে যখন তখন খরচ করতেই হবে, রান্না করতে হবে' এবং ভোজনকারীর মনেও যদি স্বার্থভাব থাকে, তাহলে সেই আহার নিকৃষ্ট মানের হয়।

গীতায় এই ব্যাপারে সিদ্ধান্তের রূপে বলা হয়েছে—**'সর্বভূতহিতে রতাঃ'** (৫।২৫, ১২।৪)। তাৎপর্য হল এই যে, যার মধ্যে সমস্ত প্রাণীর প্রতি হিত করার ভাব যত বেশি হয়, তার পদার্থ, ক্রিয়া প্রভৃতি ততই পবিত্র হয়ে ওঠে।

আহারের পর আচমনের শেষে এই শ্লোক পড়া উচিত—

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ॥
কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥
(গীতা ৩।১৪-১৫)

পরে ভোজ্যপদার্থ হজম করার জন্য **'অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা'** (গীতা ১৫।১৪) শ্লোক পড়তে পড়তে মধ্যম আঙুলের দ্বারা নাভিকে ধীরে ধীরে ঘোরাতে হয়।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—প্রথমে যাগ-যজ্ঞ ও আহারের দ্বারা যে শ্রদ্ধার কথা বলা হয়েছে, তাতে অজ্ঞতা সহকারে শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগকারীদের স্বাভাবিক নিষ্ঠা, রুচি জানা যায় ; কিন্তু যারা ব্যবসায়, চাষ-বাস ইত্যাদি জীবিকায় লিপ্ত বা শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞাদি শুভকর্ম করেন, তাঁদের স্বাভাবিক রুচি কেমন—তাই জানাবার জন্য যজ্ঞ, তপস্যা ও দানের তিন প্রকার বিভাগের প্রকরণ আরম্ভ করেছেন।

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদৃষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ॥ ১১ ॥

[**যষ্টব্যম্, এব** (যজ্ঞ করাই উচিত) ; **ইতি, মনঃ, সমাধায়** (এইরূপ কর্তব্য মনে করে) ; **অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ** (ফলেচ্ছাত্যাগী ব্যক্তিগণের দ্বারা) ; **যঃ, বিধিদৃষ্টঃ** (শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী যে) ; **যজ্ঞঃ, ইজ্যতে** (যজ্ঞ করা হয়) ; **সঃ** (তাকে বলা হয়) ; **সাত্ত্বিকঃ** (সাত্ত্বিক যজ্ঞ।)]

'যজ্ঞ করা উচিত'—এইরূপ কর্তব্য মনে করেই ফলেচ্ছা ত্যাগকারী ব্যক্তিগণের দ্বারা শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী যে যজ্ঞ করা হয়, তাকে বলা হয় সাত্ত্বিক যজ্ঞ॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা—**'যষ্টব্যমেবেতি'**—মনুষ্য-শরীর যখন লাভ হয়েছে এবং নিজ কর্তব্য করার অধিকার যখন আছে, তখন নিজ বর্ণ-আশ্রম ও শাস্ত্রনির্দেশ অনুসারে যজ্ঞ করাই আমার কর্তব্য। **'এব ইতি'**—এই দুটি অব্যয় ব্যবহারের

অর্থ হল যে এটি ছাড়া অন্য কোনো ভাব রাখবে না অর্থাৎ এই যজ্ঞ হতে আমার ইহলোকে বা পরলোকে কী লাভ হবে, কী প্রাপ্তি হবে ?—এই ভাব না রেখে, শুধুমাত্র কর্তব্য ভাব রাখবে।

যখন ওগুলির থেকে কিছু পাওয়ার আশা নেই, তখন (ফলেচ্ছা পরিত্যাগ করে) যজ্ঞ করার প্রয়োজন কী ?—উত্তরে ভগবান বলেছেন—**'মনঃ সমাধায়'** অর্থাৎ 'যজ্ঞ করাই আমার কর্তব্য' মনে এই ভাব স্থির-নিশ্চয় করে যজ্ঞ করা উচিত।

'অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ'—মানুষ যেন ফলের ইচ্ছা পোষণ না করে অর্থাৎ ইহলোকে বা পরলোকে আমার যজ্ঞের সুফল প্রাপ্ত হব—এরূপ ভাব যেন না থাকে।

'যজ্ঞো বিধিদৃষ্টো য ইজ্যতে'—শাস্ত্রাদিতে যেমন বিধি অনুযায়ী নির্দেশ দেওয়া আছে, সেই অনুযায়ীই যজ্ঞ করা কর্তব্য। এইভাবে যে যজ্ঞ করা হয়, সেগুলি সাত্ত্বিক হয়ে ওঠে—**'স সাত্ত্বিকঃ'**।

সাত্ত্বিকতার অর্থ

সাত্ত্বিকতার অর্থ কী ? এটি নিয়ে আলোচনা করা যাক। **'যষ্টব্যম্'**[১]—'যজ্ঞ করাই কর্তব্য'—যখন উদ্দেশ্য এইরূপ থাকে, তখন সেই যজ্ঞের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। কিন্তু যখন কর্তার মধ্যে 'বর্তমান সময়ে মান-সম্মান, শ্রদ্ধা ইত্যাদি প্রাপ্তি হয়, মৃত্যুর পর স্বর্গপ্রাপ্তি হয় এবং পরজন্মে যেন অর্থ-সম্পদ প্রাপ্তি হয়'—এরূপ ইচ্ছা থাকে, তখন সেই যজ্ঞের সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থাপিত হয় অর্থাৎ ফলের ইচ্ছা থাকলেই যজ্ঞের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। শুধুমাত্র কর্তব্য পালন করলে তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয় না, বরং তাতে সম্পর্ক-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং (স্বার্থভাব ও অহংবোধ না থাকায়) কর্তার অহংবোধও পরিশুদ্ধ হয়।

এতে একটি গূঢ় তাৎপর্য আছে সেটি হল এই যে, যে কোনো কর্মেই কর্তার সঙ্গে কর্মের সম্বন্ধ থাকে, কর্ম কখনো কর্তা হতে পৃথক্ হয় না ; তা কর্তাকেই প্রতিফলিত করে অর্থাৎ কর্তা যেমন হন, তাঁর কর্মও সেই অনুরূপ হয়। এই অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, **'যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ'** অর্থাৎ যে যেমন শ্রদ্ধাযুক্ত, সে তেমনই হয় এবং সে সেই (শ্রদ্ধা) অনুসারেই কর্ম করে। তাৎপর্য হল এই যে কর্তার কর্মের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে এবং কর্মের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকার ফলেই কর্তার বন্ধন হয়। শুধুমাত্র কর্তব্য মনে করে কর্ম করলে কর্তার কর্মের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকে না অর্থাৎ কর্তা মুক্ত হয়ে যায়।

শুধুমাত্র কর্তব্য মনে করে কর্ম করা কাকে বলে ? নিজের জন্য কিছু না করা, কোনো কিছুর সঙ্গেই আমার কোনো সম্পর্ক নেই ; দেশ, কাল ইত্যাদির সঙ্গেও আমার কোনো সম্পর্ক নেই, মনুষ্য-জন্ম হওয়ায় যে কর্তব্য প্রাপ্ত হয়েছে, তা সাধিত করা—এরূপ ভাব হলে কর্তা ফলাকাঙ্ক্ষী হয় না এবং কর্মফলও তাঁকে আবদ্ধ করে না অর্থাৎ যজ্ঞের ক্রিয়া বা তার ফলের সঙ্গে কর্তার কোনো সম্বন্ধ হয় না। গীতায় বলা হয়েছে—**'কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।'** (গীতা ৫।১১) অর্থাৎ করণ, (শরীর, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি) উপকরণ (যজ্ঞ করার উপযোগী সামগ্রীসকল) এবং অধিকরণ (স্থান) ইত্যাদি কোনো কিছুর সঙ্গেই যেন আমাদের সম্বন্ধ না থাকে।

যজ্ঞের ক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং তা শেষ হয়। তেমনই তার ফলও আরম্ভ হয় এবং শেষ হয়। ক্রিয়া এবং ফল উভয়ই উৎপন্ন হয়ে নষ্ট হয়ে যায় আর স্ব-স্বরূপ (আত্মা) নিত্য-নিরন্তর বিরাজমান ; কিন্তু সে (স্বয়ং) ক্রিয়া এবং ফলের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক মেনে নেয়। এই মেনে নেওয়া সম্পর্ক সে যতক্ষণ পরিত্যাগ না করে, ততক্ষণ সে জন্ম-মরণরূপ চক্রে আবদ্ধ থাকে—**'ফলে সক্তো নিবধ্যতে'** (গীতা ৫।১২)।

বিশেষ কথা হল এই যে, গীতায় যাকে সত্ত্বগুণ বলা হয়েছে, সেটি জগৎ-সংসার থেকে সম্পর্ক-বিচ্ছিন্ন করে পরমাত্মার পথে নিয়ে যায় বলে সেটি 'সৎ' বা নির্গুণ[২]।

---

[১]যা করার উপযুক্ত, নিজ সামর্থ্যের অনুকূল, তা অবশ্য করা উচিত এবং যা করলে অবশ্যই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়, তাকে 'কর্তব্য' বলা হয়। এই কর্তব্যকেই যজ্ঞে 'যষ্টব্য' এবং দানে 'দাতব্য' বলা হয়।

[২]শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধের পঁচিশতম অধ্যায়ে যেখানে তামসিক-রাজসিক-সাত্ত্বিক গুণের বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে তার সঙ্গে একটি 'নির্গুণের' কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু গীতায় তিনটি গুণের কথাই বলা হয়েছে। উভয়েরই বক্তা যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তখন এরূপ পার্থক্য কেন ?

গীতায় যে সাত্ত্বিক ভাব, তাতে ভগবান 'যষ্টব্যম্' (১৭।১১) 'দাতব্যম্' (১৭।২০), 'কার্যমিত্যেব' (১৮।৯) ইত্যাদি পদ

দৈবী-সম্পদেও যতপ্রকার গুণ আছে, সেগুলিও সব সাত্ত্বিক, কিন্তু দৈবী-সম্পদধারী ব্যক্তিগণ তখনই পরমাত্মাকে লাভ করতে পারেন, যখন তাঁরা সত্ত্বগুণের থেকেও উর্ধ্বে আরোহণ করেন অর্থাৎ গুণাদির সঙ্গ থেকে সর্বতোভাবে যখন রহিত হন।

❋ ❋ ❋

অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্॥ ১২ ॥

[**তু, ভরতশ্রেষ্ঠ** (কিন্তু হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন !) ; **যৎ, ফলম্** (যে যজ্ঞ ফলের) ; **অভিসন্ধায়** (আশা নিয়ে) ; **চ, দম্ভার্থম্** (অথবা দম্ভসহকারে) ; **ইজ্যতে** (করা হয়) ; **তম্, যজ্ঞম্** (সেই যজ্ঞকে) ; **রাজসম্** (রাজসিক বলে) ; **বিদ্ধি** (জানবে।)]

কিন্তু হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন ! (যে যজ্ঞ) ফলের আশা নিয়ে অথবা দম্ভ সহকারে (লোক দেখাবার জন্য) করা হয়, তাকে তুমি রাজসিক বলে জানবে ॥ ১২ ॥

ব্যাখ্যা—'অভিসন্ধায় তু ফলম্'—ফল অর্থাৎ ইষ্ট প্রাপ্তির আশায় এবং অনিষ্ট নিবৃত্তির কামনায় যে যজ্ঞ করা হয়, তাকে রাজসিক বলা হয়।

'ইহলোকে যেন আমার অর্থ-সম্পদ প্রাপ্তি হয়' ; 'স্ত্রী-পুত্র, পরিবার-পরিজন, ভৃত্য, গবাদি পশু যেন ইচ্ছামতো পাই' ; 'শরীর যেন নীরোগ থাকে' ; 'আমাদের মান-সম্মান, যশ-মর্যাদা, খ্যাতি যেন বৃদ্ধি পায়' এবং 'মৃত্যুর পরে যেন স্বর্গলোকের দিব্যভোগ প্রাপ্তি হয়' ইত্যাদি হল ইষ্ট প্রাপ্তির কামনা।

'আমাদের শত্রু যেন নাশ হয়' ; 'সংসারে যেন কখনো আমার অপমান-নিন্দা না হয়' ; 'কখনো যেন প্রতিকূল অবস্থা না আসে' ইত্যাদি হল অনিষ্ট নিবৃত্তির কামনা।

'দম্ভার্থমপি চৈব যৎ'—লোকে যেন আমাদের সদ্‌গুণসম্পন্ন, সদাচারী, সংযমী, তপস্বী, দানশীল, ধর্মাত্মা, যজ্ঞকারী বলে মনে করে, যাতে জগতে আমাদের খ্যাতি হয়—এরূপ লোক দেখাবার জন্য যারা যজ্ঞ করে, তাদের রাজসিক বলা হয়। এইরূপ লোক দেখানো যজ্ঞ করে যারা তাদের মধ্যে **'যক্ষ্যে দাস্যামি'** (১৬।১৫) এবং **'যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে'** (১৬।১৭) ইত্যাদি ভাব বিশেষ-ভাবে পরিলক্ষিত হয়।

'ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্'—এইরূপ ফলের কামনা ও দম্ভ সহকারে যারা যজ্ঞ করে, তারা রাজসিক হয়।

কামনা পূরণের জন্য যে যজ্ঞ করা হয়, তাতে শাস্ত্রবিধির প্রাধান্য থাকে। কারণ যজ্ঞের বিধি এবং ক্রিয়াতে যদি কোনো ত্রুটি ঘটে তাহলে তার থেকে প্রাপ্ত ফলের প্রাপ্তিতে অন্তরায়ের সৃষ্টি হয়। এইভাবেই যজ্ঞের বিধি এবং ক্রিয়াতে যদি বিপরীত ব্যাপার হয়, তাহলে তার ফলও

ব্যবহার করেছেন। এটি বলার অর্থ হল এই যে, যে কর্তার শুধুমাত্র যজ্ঞ করার, দান করার এবং কর্তব্য করার উদ্দেশ্য থাকে, তাঁর কর্ম এবং কর্মফলের সঙ্গে প্রকৃতি এবং প্রকৃতির কার্যের বিন্দুমাত্রও সম্পর্ক থাকে না অর্থাৎ সাত্ত্বিক যজ্ঞ-দান ইত্যাদিও 'নির্গুণ' হয়ে থাকে।'

সপ্তদশ অধ্যায়ের শেষে তিনটি নাম 'ওঁ তৎ সৎ'-এর বর্ণনায় 'সৎ' শব্দের ব্যাখ্যায় ভগবান বলেছেন যে পরমাত্মার জন্য যে কর্ম করা হয়, সে-সবই 'সৎ' (নির্গুণ) হয়—'কর্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে' (১৭।২৭)। অর্থাৎ কর্মযোগীর কর্ম এবং কর্মফলের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হলেও ভক্তিযোগীর কর্মগুলি ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করার ফলে সব কর্মই 'নির্গুণ' হয়। এইভাবে উভয় কথাই একটিতে বর্ণিত হওয়ায় গীতায় পৃথক্‌ভাবে নির্গুণের বর্ণনা করা হয়নি।

গীতায় যেখানে সত্ত্বগুণকে 'অনাময়' বলা হয়েছে, সেখানে সত্ত্বগুণের দ্বারা বন্ধনের কথাও বলা হয়েছে (১৪।৬) এবং বলা হয়েছে সত্ত্বগুণস্থিত পুরুষ উর্ধ্বলোকে যান (১৪।১৮) অর্থাৎ সত্ত্বগুণে বন্ধন হয় না, কিন্তু তাতে আসক্ত হলেই বন্ধন হয়—'সুখ সঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞান সঙ্গেন চানঘ' (১৪।৬) এবং 'কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু॥' (১৩।২১)। এইভাবে সত্ত্বগুণে নিজ অবস্থান মেনে নেওয়া 'সত্ত্বস্থাঃ'-ও (১৪।১৮) হল বন্ধনকারক।

বিপরীত হয়ে অর্থাৎ সেই যজ্ঞ সিদ্ধপ্রদ না হয়ে যজ্ঞকর্তার ঘাতক হয়ে ওঠে।

কিন্তু যে যজ্ঞ শুধু লোক দেখাবার জন্য করা হয়, তাতে শাস্ত্রবিধির পরোয়া করা হয় না।

এখানে 'বিদ্ধি' ক্রিয়াটি ব্যবহারের তাৎপর্য হল এই যে, হে অর্জুন ! সাংসারিক কামনাই জন্ম-মৃত্যুর কারণ। সুতরাং তোমার এ ব্যাপারে সাবধান থাকা উচিত।

পরিশিষ্ট-ভাব—এই শ্লোকে ব্যবহৃত **'যৎ'** পদটির দ্বারা এই ভাব পরিস্ফুট হয় যে ফলেচ্ছা এবং দম্ভপূর্বক যেসব যজ্ঞ, দান, তপ ইত্যাদি কর্ম করা হয়, সেগুলিকে রাজসিক কর্ম বলে মনে করতে হবে।

※ ※ ※

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং　মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে॥ ১৩ ॥

[**বিধিহীনম্** (শাস্ত্রবিধিরহিত) ; **অসৃষ্টান্নম্** (অন্নদানবিহীন) ; **মন্ত্রহীনম্** (মন্ত্রহীন) ; **অদক্ষিণম্** (দক্ষিণাহীন) ; **শ্রদ্ধাবিরহিতম্** (শ্রদ্ধাবর্জিত) ; **যজ্ঞম্** (যেসব যজ্ঞ হয়) ; **তামসম্** (তামসিক যজ্ঞ) ; **পরিচক্ষতে** (বলে অভিহিত করা হয়।)]

শাস্ত্রবিধিরহিত, অন্নদানবিহীন, মন্ত্রহীন, দক্ষিণাহীন, শ্রদ্ধাবর্জিত যেসব যজ্ঞ হয়, সেইগুলিকে তামসিক যজ্ঞ বলা হয় ॥ ১৩ ॥

ব্যাখ্যা—**'বিধিহীনম্'**—ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞের ভিন্ন ভিন্ন বিধি হয় এবং সেই অনুসারে যজ্ঞকুণ্ড, স্রুবা ইত্যাদি পাত্র, উপবেশনের দিক, আসন ইত্যাদি ঠিক করা হয়। বিভিন্ন দেবতার বিভিন্নপ্রকার সামগ্রী হয় ; যেমন—দেবীর যজ্ঞে লাল বস্ত্র, লাল সামগ্রীর প্রয়োজন। কিন্তু তামস যজ্ঞে এইসব বিধি পালন করা হয় না, উপেক্ষা সহকারে এইসব বিধি ত্যাগ করা হয় ।

'অসৃষ্টান্নম্'—তামসিক ব্যক্তিগণ যে যজ্ঞ করেন, তাতে ব্রাহ্মণাদিকে অন্নদান করা হয় না। তাদের ধারণা থাকে যে বিনা পয়সায় খাদ্য পেলে তারা অলস হয়ে উঠবে, কাজকর্ম করবে না।

'মন্ত্রহীনম্'—বেদ এবং বেদানুকূল শাস্ত্রে নির্দেশিত মন্ত্র দ্বারাই দ্রব্যযজ্ঞ সাধিত হয়। কিন্তু তামস যজ্ঞ বৈদিক বা শাস্ত্রীয় মন্ত্র দ্বারা করা হয় না। কিন্তু তামস ব্যক্তিদের ধারণা থাকে যে আহূতি প্রদান করলেই যজ্ঞ করা হয়, সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ে, অহিতকারী পরমাণু নাশ হয়, অতএব মন্ত্রের কী প্রয়োজন ? ইত্যাদি।

'অদক্ষিণম্'—তামস যজ্ঞে দান করা হয় না। কারণ তামস ব্যক্তিদের ধারণা থাকে যে আমরা যজ্ঞে আহূতি দিয়েছি এবং ব্রাহ্মণদের ভালোভাবে ভোজনও করিয়েছি, তাঁদের আবার দক্ষিণা দেওয়ার কী দরকার ? আমরা এঁদের দক্ষিণা দিলে এঁরা অলস-প্রমাদী, পুরুষার্থহীন হয়ে পড়বেন, যার ফলে পৃথিবীতে বেকার বৃদ্ধি পাবে। দ্বিতীয়তঃ যেসব ব্রাহ্মণ দক্ষিণা পেতে থাকেন, তাঁরা আর কিছু করেন না, তাই তাঁরা পৃথিবীর বোঝাস্বরূপ ইত্যাদি। এইসব তামস ব্যক্তিরা একবার ভেবে দেখে না যে, এইসব ব্রাহ্মণদের অন্নদান, দক্ষিণা না দিলে এঁরা হয়ত অলস, প্রমাদী হবে না ; কিন্তু শাস্ত্রবিধি, নিজ কর্তব্য পরিত্যাগ করায় তারা নিজেরা তো প্রমাদী হয়েই যাচ্ছে !

'শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে'—আগুনে আহুতি দেবার ব্যাপারে তামসিক ব্যক্তিদের ধারণা থাকে যে, অন্ন, ঘৃত, চাল, নারিকেল ইত্যাদি মানুষের জীবন-ধারণের বস্তু। এইসব বস্তু আগুনে আহুতি দেওয়া অত্যন্ত মূর্খতা[১] ! নিজ খ্যাতি, মান-সম্মানের জন্য এরা যজ্ঞ

[১]ক্ষেতে চাষ করার সময় চাষীরা ভালো ভালো বীজ মাটিতে সিঞ্চন করে, তার থেকে কয়েক গুণ অধিক ফসল উৎপন্ন হয় ; সুতরাং শাস্ত্রীয় মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক যজ্ঞে যে আহুতি দেওয়া হয়, তা কি বৃথা যায় ? মাটিতে মেশানো বীজ হল আধিভৌতিক, কারণ পৃথিবী জড় কিন্তু শাস্ত্রবিধিসহ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করা হল আধিদৈবিক, কারণ পৃথিবী জড় হলেও শাস্ত্রবিধিসহ অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি হল আধিদৈবিক। কেন-না দেবতা চেতন, তাই দেবতাদের প্রদত্ত আহুতি বর্ষার রূপে আমাদের উপকার করে।

করলেও তা শাস্ত্রবিধিবর্জিত, অন্নদানবর্জিত, মন্ত্র এবং দক্ষিণাবর্জিতভাবে করে। এদের শাস্ত্রের ওপর, শাস্ত্রোক্ত মন্ত্রের ওপর, তাতে নির্দেশিত বিধি-নিয়মের ওপর এবং শাস্ত্রোক্ত বিধি সহকারে করা যজ্ঞের ক্রিয়ার ওপর, আর তার পারলৌকিক ফলের ওপরও শ্রদ্ধা-বিশ্বাস থাকে না। কারণ তারা মূর্খ। তাদের নিজেদের বুদ্ধি তো নেই-ই অন্যে বোঝালেও তা মানে না।

এই তামস যজ্ঞে **'যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ'** (গীতা ১৬।২৩) এবং **'অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতং চ যৎ'** (গীতা ১৭।২৮)—এই দুটি ভাবই থাকে। তাই এরা ইহলোক ও পরলোকে যে ফল আশা করে, তা তারা পায় না—**'ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্‌', 'ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ।'** তাৎপর্য এই যে উপেক্ষা সহকারে করা শুভকর্মের আশানুরূপ ফল তারা পায় না, কিন্তু অশুভ কর্মের ফল (অধোগতি) পেতেই হয়—**'অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ'** (১৪।১৮)। কারণ অশুদ্ধ ফলে অশ্রদ্ধাই হেতু হয়ে থাকে এবং এইসব ব্যক্তি অশ্রদ্ধা সহকারে শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণ করে থাকে, অতএব তার শাস্তি তাদের পেতেই হয়।

যজ্ঞে কর্তা, জ্ঞান, ক্রিয়া, ধৃতি, বুদ্ধি, সঙ্গ, শাস্ত্র, খাওয়া, আচার, ব্যবহার এইসব যদি সাত্ত্বিক হয়, তাহলে সেই যজ্ঞও সাত্ত্বিক হয়ে ওঠে ; রাজসিক কর্তা হলে যজ্ঞও রাজসিক হয় আর যদি তামসিক কর্তা হয়, তাহলে যজ্ঞও তামসিক হয়।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—একাদশ, দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শ্লোকে ক্রমান্বয়ে সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক যজ্ঞের বর্ণনা করে, পরবর্তী তিনটি শ্লোকে ক্রমান্বয়ে শারীরিক, বাচিক ও মানসিক তপস্যার বর্ণনা করেছেন (যার সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক পার্থক্যগুলি পরে জানাবেন)।

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্‌।
ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥ ১৪ ॥

[**দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞ পূজনম্‌** (দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু স্থানীয়, জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদের পূজা করা) ; **শৌচম্‌, আর্জবম্‌** (শুদ্ধভাবে থাকা, সরলতা) ; **ব্রহ্মচর্যম্‌, চ** (ব্রহ্মচর্য পালন ও) ; **অহিংসা** (অহিংসা) ; **শারীরম্‌** (কায়িক) ; **তপঃ** (তপস্যা) ; **উচ্যতে** (বলা হয়।)]

দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরুজন এবং জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদের পূজা করা, শুদ্ধভাবে থাকা, সরলতা, বহ্মচর্য পালন এবং অহিংসা—এগুলিকে বলা হয় শারীরিক (কায়িক) তপস্যা॥ ১৪ ॥

ব্যাখ্যা—'দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনম্‌'—এখানে **'দেব'** শব্দটি প্রধানতঃ বিষ্ণু, শিব, গণেশ, আদ্যাশক্তি এবং সূর্য—এই পাঁচ ঈশ্বরকোটির দেবতাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এই পাঁচজনের মধ্যে যিনি যার ইষ্ট, যাঁর ওপর অত্যধিক শ্রদ্ধা থাকে, তাঁকে নিষ্কামভাবে পূজা করা কর্তব্য[১]।

মনু বলেছেন—

অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ॥ (মনুস্মৃতি ৩।৭৬)

অর্থাৎ অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি আদিত্য-কিরণকে পরিপুষ্ট করে এবং সেই কিরণ হতে বৃষ্টি হয় (ভৌতিক বৈজ্ঞানিকগণও এখন এটি মানছেন)।

জীবমাত্রই অন্ন হতে উৎপন্ন হয় এবং অন্ন জল হতে উৎপন্ন হয়—'অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।' (গীতা ৩।১৪)। সুতরাং সৃষ্টিতে জলই প্রধান। 'যজ্ঞ'ই বৃষ্টি হওয়ার প্রধান কারণ—'যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যো' (৩।১৪)।

[১]এঁদের মধ্যেও বৈষ্ণব ভগবান বিষ্ণুকে, শৈব ভগবান শিবকে, গাণপৎ ভগবান গণেশকে, শাক্ত আদ্যাশক্তিকে এবং সৌর ভগবান সূর্যকে সর্বোচ্চ ঈশ্বর বলে মনে করেন। সুতরাং এই পাঁচজনের মধ্যেও নিজ শ্রদ্ধা-ভক্তি অনুযায়ী নিজ ইষ্টকে সর্বোত্তম ঈশ্বররূপে মান্য করা হয়, অপর চারজন তার দৃষ্টিতে দেবতা রূপে গণ্য হন।

দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র এবং অশ্বিনী-কুমারদ্বয়—এই তেত্রিশজন শাস্ত্রোক্ত দেবতাও 'দেব' শব্দের অন্তর্গত। যজ্ঞ, তীর্থ, ব্রতাদি বিশেষ পর্বকালে এবং জাতকর্ম, চূড়াকর্ম, উপনয়ন, বিবাহ ইত্যাদি সংস্কারের সময় শাস্ত্রে যেসব দেবতাদের পূজা করার বিধান আছে, সেইসব দেবতাদেরও 'দেব' শব্দের অন্তর্গত বলে মনে করা উচিত। এইসব দেবতাগণকেও যথাসময়ে পূজা করার শাস্ত্রে নির্দেশ আছে। অতএব আমাদের শুধুমাত্র শাস্ত্রমর্যাদা সুরক্ষিত রাখার জন্য কর্তব্য মনে করে নিষ্কামভাবে পূজা-অর্চনা করা প্রয়োজন—এই ভাব নিয়ে এইসব দেবতাদেরও যথাযথ পূজা করা উচিত। অর্থাৎ শাস্ত্রে যে যে তিথি, বার, নক্ষত্র ইত্যাদিতে যে যে দেবতার পূজা করার বিধান আছে, সেই মতো সেইসব দেবতার পূজা করা উচিত।

'দ্বিজ' শব্দটি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—এই তিনটি বর্ণের বাচক ; কিন্তু এখানে পূজার বিষয় হওয়ায় এটি শুধুমাত্র ব্রাহ্মণেরই বাচক বলে মনে করতে হবে, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের নয়।

যাঁর কাছ থেকে আমরা শিক্ষালাভ করি, এরূপ মা-বাবা, বয়োজ্যেষ্ঠগণ, কুলাচার্য, শিক্ষাদানকারী আচার্য, এঁদের সকলকেই 'গুরু' শব্দের অন্তর্গত বলে মনে করতে হবে।

ব্রাহ্মণ, মা-বাবা, আচার্য এবং গুরুজনদের নির্দেশ পালন করা, তাঁদের সেবা করা এবং তাঁদের প্রসন্নতা লাভ করা ও পত্র-পুষ্পাদির দ্বারা তাঁদের পূজা করা—এসবই হল তাঁদের পূজন করা।

এখানে 'প্রাজ্ঞ' শব্দটি বিশেষভাবে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদের জন্যই উদ্ধৃত । বর্ণ ও আশ্রমে উচ্চ হলে 'দ্বিজ' বলা হয়, শারীরিক সম্পর্কে (জন্ম এবং বিদ্যাতে) বড় হলে 'গুরু' বলা হয়। সুতরাং যিনি বর্ণ এবং আশ্রম সম্পর্কে উচ্চ নন এবং যাঁর সঙ্গে গুরুরও সম্বন্ধ নেই—এরূপ তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষকে এখানে 'প্রাজ্ঞ' বলা হয়েছে। এরূপ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদের বাক্য, সিদ্ধান্তকে শ্রদ্ধা করে সেই অনুযায়ী নিজ জীবন গড়ে তোলাই প্রকৃতপক্ষে তাঁর পূজা করা। আসলে দ্বিজ এবং গুরু সাংসারিক দৃষ্টিতে শ্রদ্ধাভাজন, পূজনীয় ; কিন্তু প্রাজ্ঞ (জীবন্মুক্ত) ব্যক্তি আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে শ্রদ্ধাভাজন—পূজনীয়। সুতরাং জীবন্মুক্ত ব্যক্তিকে আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করা উচিত। কারণ বাহ্যিক শ্রদ্ধা শ্রদ্ধা নয় ; হৃদয়ের শ্রদ্ধাই হল যথার্থ শ্রদ্ধা, পূজা।

'শৌচম্'—জল, মাটি ইত্যাদির সাহায্যে শরীরকে পবিত্র করাকে বলা হয় 'শৌচ'। শারীরিক শুদ্ধিতে অন্তঃকরণও শুদ্ধ হয়।

'শৌচাৎস্বাঙ্গজুগুপ্সা পরৈরসংসর্গঃ' (যোগদর্শন ২।৪০)

শৌচের দ্বারা নিজ শরীরের প্রতি ঘৃণা আসে যে আমি এই শরীরকে রাতদিন এত পরিষ্কার করি, তবুও এর থেকে মল, মূত্র, ঘাম, কফ, থুথু প্রভৃতি এত ময়লা নিষ্কাশিত হতে থাকে ! এই দেহ অস্থি-মাংস-মজ্জা ইত্যাদি অপবিত্র বস্তু দ্বারা তৈরি। এই অস্থি-মাংসের থলিতে একরত্তিও শুদ্ধ, পবিত্র, নির্মল, সুগন্ধী বস্তু নেই—এ শুধুই নোংরার পাত্র। এ কেবলই মালিন্যে ভরা, ময়লাবস্তু তৈরি করার যন্ত্রবিশেষ। এইভাবে দেহকে অশুদ্ধ, মলিন জ্ঞান করলে মানুষ দেহবোধ থেকে উচ্চে উঠতে সক্ষম হয়। উচ্চে আরোহণ করলে তাঁর আর বর্ণ, আশ্রম, অবস্থা ইত্যাদি নিয়ে বড়োত্বের অহংবোধ থাকে না। এইজন্যই এখানে শৌচ কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে।

আজকাল প্রায়শঃ লোকে বলে থাকে যে যারা শৌচাচার রাখে, তারা অন্যকে অপমান করে, ঘৃণা করে। কিন্তু তা ঠিক নয়। কারণ শৌচে একথা বলা হয়নি যে, তুমি অপরকে নিন্দা করো, বরং একথা বলা হয়েছে যে অপরের সঙ্গে কোনো প্রকার সংসর্গ কোরো না—**'পরৈরসংসর্গঃ'**। অর্থাৎ যখনই ধারণা হবে যে এইসব এত অশুদ্ধ, তখন শরীরমাত্রেই গ্লানি আসবে। যেমন, মাটির খণ্ডকে জল দিয়ে অনবরত ধুতে থাকলে সেটি শেষকালে গলে শেষ হয়ে যায়, তাতে মাটি ছাড়া অন্য কোনো ভালো জিনিস পাওয়া যায় না ; তেমনই দেহকে যতই শুদ্ধ করা হোক, তা কখনো শুদ্ধ হয় না। কারণ তার মূলেই অশুদ্ধি বিরাজ করে—**স্থানাদ্ বীজাদুপষ্টম্ভান্নিঃস্যন্দান্নিধনাদপি।**

কায়মাধেয়শৌচত্বাৎ পণ্ডিতা হ্যশুচিং বিদুঃ॥

(যোগদর্শন ২।৫-এর ব্যাসভাষ্য)

'বিদ্বান ব্যক্তিগণ দেহকে স্থান (মাতৃউদরস্থিত), বীজ (পিতা-মাতার রজোবীর্য-উদ্ভূত), উপষ্টম্ভ (খাদ্যরসে পরিপুষ্ট), নিঃস্যন্দ (মল-মূত্র ইত্যাদি ময়লাযুক্ত), নিধন (মরণশীল) এবং আধেয় শৌচ (জল-মাটি ইত্যাদির সাহায্যে ধৌতযোগ্য) হওয়ায় অপবিত্র বলে মনে করেন'।

'আর্জবম্'—শরীর বিষয়ে শ্লাঘার ভাব পরিত্যাগ করে ওঠা-বসা ইত্যাদি শারীরিক ক্রিয়াগুলি সহজ সরলভাবে করাকে বলা হয় **'আর্জবম্'**। অহংকার বেশি হলে শরীরে সারল্য থাকে না। সুতরাং যাঁরা নিজেদের কল্যাণ চান,

সেই সাধকদের আত্মঅহংকার পোষণ করতে নেই। নিরভিমান হলে শরীরে এবং শরীরের ওঠা-বসা, চলা-ফেরা, বলা-দেখা প্রভৃতি সকল ক্রিয়ায় স্বাভাবিকভাবেই সরলতা আসে, যা হল **'আর্জব'**।

'ব্রহ্মচর্যম্'—নিম্নোক্ত আটটি ক্রিয়ার দ্বারা ব্রহ্মচর্য ভঙ্গ হয়—(১) আগে যে নারীসঙ্গ করা হয়েছে, তা স্মরণ করা ; (২) অনুরাগের সঙ্গে নারীদের সঙ্গে কথা বলা ; (৩) নারীদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করা ; (৪) তাদের দিকে অনুরাগ সহকারে তাকানো ; (৫) তাদের সঙ্গে একান্তে কথা বলা ; (৬) মনে মনে নারীসঙ্গের সঙ্কল্প করা ; (৭) নারীসঙ্গের নিশ্চয় করা এবং (৮) প্রত্যক্ষভাবে নারীসঙ্গ করা। বিদ্বান ব্যক্তিগণ এই আটপ্রকার মৈথুনের কথা বলেছেন[১]। এর কোনোটিই না করাকে **'ব্রহ্মচর্য'** বলা হয়।

ব্রহ্মচারী, বাণপ্রস্থী এবং সন্ন্যাসী—এই তিনের বীর্যপাত হওয়া কখনোই উচিত নয় এবং সেরূপ ইচ্ছা থাকাও অনুচিত। শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদনের নিমিত্ত শাস্ত্রবিধি অনুসারে ঋতুকালে যারা স্ত্রীসঙ্গ করেন, গৃহস্থাশ্রমে থাকলেও তাঁদের ব্রহ্মচারী বলা হয়। বিধবা স্ত্রীলোকদের বিষয়েও বলা হয় যে, যাঁরা পতির জীবিত-কালে পাতিব্রত্য-ধর্ম পালন করেন এবং পতির মৃত্যুর পর ব্রহ্মচর্য পালন করেন তাঁরা আবাল্য ব্রহ্মচারী যে গতি প্রাপ্ত হন, সেই গতি লাভ করেন।

আসলে **'ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ'** (গীতা ৬।১৪)—ব্রহ্মচারী ব্রতে অবস্থান করাই ব্রহ্মচর্য। কিন্তু এর পরে যদি স্বপ্নদোষ হয় বা শরীরের কোনো দোষে বীর্যপাত হয়ে যায়, তাহলে তাকে ব্রহ্মচর্য-ভঙ্গ বলা যায় না। অন্তঃকরণের কামভাবের দ্বারা যে বীর্যপাত হয়, তাকে ব্রহ্মচর্য-ভঙ্গ বলা হয়। কারণ ভাবের সঙ্গে ব্রহ্মচর্যের সম্বন্ধ থাকে। তাই ব্রহ্মচর্য পালনকারীদের নিজভাব শুদ্ধ রাখার জন্য মনকে কখনো পরস্ত্রীর দিকে যেতে দেওয়া উচিত নয়। সতর্কতা অবলম্বন করলেও যদি কখনো মন সেদিকে যায় , তবে মনে মনে চিন্তা করতে হয় যে, 'এটি আমার কাজ নয়, আমি এমন কাজ করতেই পারি না। কারণ আমি ব্রহ্মচর্য পালন করার দৃঢ় সংকল্প করেছি, আমি একাজ কী করে করতে পারি ?'

'অহিংসা'—সকলপ্রকার হিংসার অভাবকেই বলা হয় অহিংসা। হিংসা, স্বার্থ, ক্রোধ, লোভ, মূঢ়তা এবং মোহকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে। যেমন, নিজের স্বার্থের জন্য কারও অর্থ অপহরণ করা, অন্যের লোকসান করা— এগুলি হল 'স্বার্থের' জন্য হিংসা। ক্রোধান্বিত হয়ে কাউকে আঘাত করা বা মেরে ফেলা—এ হল 'ক্রোধের' জন্য হিংসা। চামড়া, মাংস প্রভৃতির লোভে পশুহত্যা করা বা অর্থের লোভে কাউকে মেরে ফেলা—এ হল লোভের জন্য হিংসা। রাস্তা দিয়ে যাবার সময় কোনো কুকুর বা বিড়ালকে মারা, গাছের ডাল ভাঙা, ঘাস বা ফুল ছেঁড়া, কাউকে আঘাত করা—যাতে ক্রোধ, লোভ বা স্বার্থের কোনো সম্ভাবনাই নেই, সেগুলি 'মোহ' (মূঢ়তা) জনিত হিংসা। অহিংসার তাৎপর্য হল এরূপ কোনো হিংসা একেবারেই না হওয়া[২]।

'শারীরং তপ উচ্যতে'—দেবপূজা, শৌচ, আর্জব, ব্রহ্মচর্য এবং অহিংসা—এই পাঁচটিকে 'শারীরিক তপ' বলা হয়। এই শারীরিক তপে তীর্থ, ব্রত, সংযম ইত্যাদিকেও ধরা উচিত।

যখন কষ্ট করতে হয়, তপশ্চরণ হয়, তখন হয় তপ ; কিন্তু উপরিউক্ত শারীরিক তপে তো তেমন কিছু নেই তাহলে এই তপ কেমন ? কষ্ট করে যে তপ করা হয়, প্রকৃতপক্ষে সেগুলি উচ্চশ্রেণীর তপ নয়। তপস্যায় কষ্টের প্রাধান্য যাঁরা রাখেন ভগবান তাঁদের **'আসুর নিশ্চয়ান্'** (১৭।৬) আসুরী নিশ্চয়সম্পন্ন বলেছেন। সেটিই শ্রেষ্ঠ তপস্যা যা উচ্ছৃঙ্খল বৃত্তিকে রোধ করে শাস্ত্র, কুল ও লোকপরম্পরার সীমার মধ্যে সংযম সহকারে চালনা করে। তেমন সাধনকালে স্বাভাবিকভাবে দেশ-কাল-পরিস্থিতি-ঘটনা যদি প্রতিকূল হয়ে যায়, তাহলে সাধনায় সিদ্ধির জন্য প্রসন্নভাবে তা সহ্য করা হল তপস্যা, এতে

---

[১]স্মরণং কীর্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্। সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেব চ॥
এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ। বিপরীতং ব্রহ্মচর্যমনুষ্ঠেয়ং মুমুক্ষুভিঃ॥

[২]এখানে 'অহিংসা'-কে শারীরিক তপস্যার অন্তর্গত বলা হয়েছে, সেইজন্য এইস্থানে শরীর সম্পর্কীয় অহিংসাই বিবেচিত হবে, মন ও বাক্যের অহিংসা নয়।

শরীর-ইন্দ্রিয়-মন ইত্যাদি সংযত হয়।

অষ্টাঙ্গযোগে যেখানে যম-নিয়ম ইত্যাদি আটপ্রকার অঙ্গের বর্ণনা করা হয়েছে[১], সেই স্থানে সর্বপ্রথম 'যম'-এর কথা বলা হয়েছে। যদিও 'যম' পাঁচ প্রকারের—**'অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহা যমাঃ'** (যোগদর্শন ২।৩০) এবং নিয়মও পাঁচটি **'শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ'** (যোগদর্শন ২।৩২), তা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে 'যম'-এর মহিমাই বেশি। কারণ 'নিয়মে' ব্রত-পালন করতে হয় আর 'যম'-এ ইন্দ্রিয়াদি ও মনের সংযম করতে হয়[২]।

এরূপ মনে হতে পারে যে শরীরকে কষ্ট দেওয়াই হল তপস্যা আর আরামে থেকে সংযম করা, ত্যাগ করা তপস্যা নয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমস্ত জাগতিক বিষয়ে অনাসক্ত হয়ে যে সংযম ও ত্যাগ করা যায়, তা তপস্যার থেকে কিছু কম নয়, বরং পারমার্থিক পথে তার স্থান উচ্চে। কারণ ত্যাগের দ্বারাই পরমাত্মপ্রাপ্তি হয়—**'ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্'** (গীতা ১২।১২)। শুধুমাত্র যে বাহ্যিক তপস্যার দ্বারা পরমাত্মাকে লাভ করা যায়, সে-কথা বলা হয়নি ; অন্তঃকরণ শুদ্ধির কারণ হওয়ায় এই তপস্যা পরমাত্মপ্রাপ্তিতে সহায়ক হতে পারে। তাই সাধকদের প্রধানতঃ যম পালন করলেও সময়-সময়ে নিয়মাদিও পালন করা উচিত।

পরিশিষ্ট-ভাব—কায়িক তপস্যায় ত্যাগই প্রধান ; যেমন—পূজা করার সময় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ভাবকে পরিত্যাগ করা ; শুদ্ধভাবে থাকার জন্য আলস্য-প্রমাদ পরিত্যাগ করা ; সারল্য রক্ষায় অহং-অভিমান পরিত্যাগ করা ; ব্রহ্মচর্যে বিষয়সুখ পরিত্যাগ করা ; অহিংসাতে নিজ সুখ-ভাব পরিত্যাগ করা। এইভাবে ত্যাগ করলে কায়িক তপ হয়।

※ ※ ※

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে॥ ১৫ ॥

[**যৎ, অনুদ্বেগকরং** (যা অনুদ্বেগকারী) ; **সত্যম্, চ, প্রিয়হিতম্** (সত্য, প্রিয় ও হিতকারী) ; **বাক্যম্, চ** (বাক্য এবং) ; **স্বাধ্যায়াভ্যসনম্ এব** (স্বাধ্যায়, নামজপাদিকেও) ; **বাঙ্ময়ম্** (বাচিক) ; **তপঃ** (তপস্যা) ; **উচ্যতে** (বলা হয়।)]

অনুদ্বেগকারী, সত্য, প্রিয় ও হিতকর বাক্য এবং স্বাধ্যায় ও নামজপাদি—এইগুলিকে বলা হয় বাচিক তপস্যা॥ ১৫ ॥

ব্যাখ্যা—**'অনুদ্বেগকরং বাক্যম্'**—যে বাক্য বর্তমানে ও ভবিষ্যতে কখনো কারও উদ্বেগ, চিত্তবিক্ষেপকারী এবং অশান্তিদায়ক হয় না, তাকে 'অনুদ্বেগকর' বাক্য বলা হয়।

'সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ'—নিজ স্বার্থ এবং অহংকারকে পরিত্যাগ করে যেমনটি পড়া, শোনা, দেখা এবং সিদ্ধান্ত করা হয়েছে সেগুলিকে যেমনকার তেমনভাবে বলা হল 'সত্য'[৩]।

যেসব বাক্য ক্রূর, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ, ব্যঙ্গ, নিন্দা এবং অপমানজনক শব্দবর্জিত এবং যেসব বাক্য প্রেমযুক্ত, মিষ্ট, সরল এবং শান্ত, তাকে 'প্রিয়' বাক্য বলা হয়[৪]।

---

[১]যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি। (পাতঞ্জলযোগদর্শন ২।২৯)

[২]হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ, রাবণ ইত্যাদি রাক্ষসদের মধ্যেও 'নিয়ম' দেখা যায়, কিন্তু তাদের মধ্যে 'যম' দেখা যায় না।

[৩]সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্। প্রিয়ং চ নানৃতং ব্রূয়াদেষ ধর্মঃ সনাতনঃ॥ (মনুস্মৃতি ৪।১৩৮)

'মানুষের সত্য কথা ও প্রিয় কথা বলা উচিত। তবে এর মধ্যেও যেন সত্য অপ্রিয় না হয় এবং প্রিয় হলেও যেন অসত্য না হয়—এটিই সনাতন ধর্ম।'

[৪]প্রিয়বাক্যপ্রদানেন সর্বে তুষ্যন্তি জন্তবঃ। তস্মাত্তদেব বক্তব্যং বচনে কা দরিদ্রতা॥

'প্রিয় বাক্যে মানুষ-পশু-পক্ষী ইত্যাদি সকল প্রাণীই প্রসন্ন হয়, তাই মানুষের প্রিয় বাক্য বলা উচিত—এতে দারিদ্র্য বা কৃপণতা কীসের ?'

যে বাক্য হিংসা-দ্বেষ-বৈরিতা বর্জিত এবং প্রেম, দয়া, ক্ষমা, উদারতা ও কল্যাণকর, যে বাক্য বর্তমানে অথবা ভবিষ্যতে নিজের বা অন্যের কোনো অনিষ্ট করে না, সেগুলিকে বলা হয় 'হিত' (হিতকারী) বাক্য।

'স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব'—আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়ক গীতা, রামায়ণ, ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থ নিজে পড়া এবং অন্যকে পড়ানো, ভগবান ও তাঁর ভক্তদের চরিত্র পাঠ করাকে বলা হয় **'স্বাধ্যায়'**।

গীতা ইত্যাদি আধ্যাত্মিক গ্রন্থ বারংবার আবৃত্তি করা, কণ্ঠস্থ করা, ভগবদ্‌নাম জপ করা, স্তুতি ও প্রার্থনা করাকে বলা হয় 'অভ্যসন'।

'চ এব'—এই অব্যয় পদ দ্বারা তপস্যার বাক্য সম্বন্ধীয় অন্য কথাও ধরা উচিত ; যেমন—অপরের নিন্দা না করা, কাউকে দোষারোপ না করা, বৃথা বাক্য ব্যয় না করা অর্থাৎ যাতে নিজের বা অন্যের কোনো লৌকিক বা পারমার্থিক সিদ্ধি না হয়, এরূপ বাক্য না বলা। পারমার্থিক সাধনায় বিঘ্ন-সৃষ্টিকারী শৃঙ্গার রসের কাব্য-নাটকাদি, কাম-ক্রোধ-লোভ ইত্যাদি বর্ধনকারী বই না পড়া ইত্যাদি ইত্যাদি।

'বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে'—উপরিউক্ত লক্ষণ যাদের মধ্যে দেখা যায়, তাদের বাচিক তপস্যাকারী বলা হয়।

※ ※ ※

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে॥ ১৬ ॥

[**মনঃপ্রসাদঃ** (চিত্তের প্রসন্নতা) ; **সৌম্যত্বম্‌, মৌনম্‌** (সৌম্যভাব, মননশীলতা) ; **আত্মবিনিগ্রহঃ** (মনঃসংযম) ; **ভাবসংশুদ্ধি** (ভাবশুদ্ধি) ; **ইতি, এতৎ** (এইগুলিকে) ; **মানসম্‌** (মানসিক) ; **তপঃ** (তপস্যা) ; **উচ্যতে** (বলা হয়।)]

চিত্তের প্রসন্নতা, সৌম্যভাব, মননশীলতা (মৌনতা), মনঃসংযম এবং ভাবশুদ্ধি বা ব্যবহারে অকপট ভাব—এইগুলিকে বলা হয় মানসিক তপস্যা॥ ১৬ ॥

ব্যাখ্যা—**'মনঃপ্রসাদঃ'**—মন বা চিত্তের প্রসন্নতাকে বলা হয় **'মনপ্রসাদঃ'**। বস্তু, ব্যক্তি, দেশ, কাল, পরিস্থিতি, ঘটনা ইত্যাদির সংযোগে উৎপন্ন যে প্রসন্নভাব তা সবসময় স্থায়ী হয় না। কারণ যা উৎপন্ন হয় তা চিরস্থায়ী হয় না। কিন্তু দুর্গুণ-দুরাচার থেকে সম্পর্কচ্ছেদ হলে যে স্থায়ী ও স্বাভাবিক প্রসন্নতা প্রকটিত হয়, তা চিরস্থায়ী হয় এবং তা মন-বুদ্ধিতেও স্থায়ী হয়, যার ফলে মনে কখনো অশান্তি হয় না এবং মন সর্বদা প্রসন্ন থাকে।

মনে অশান্তি ও বিক্ষোভ কখন হয় ? যখন মানুষ ধন-সম্পদ, স্ত্রী-পুত্র ইত্যাদি বিনাশশীল বস্তুর আশ্রয় নেয়। এসব বস্তু বিনাশশীল, চিরস্থায়ী নয়। তাই সেগুলির সংযোগ ও বিয়োগে মানুষের মনে বিক্ষেপ উৎপন্ন হয়। যদি সাধক অস্থায়ী বস্তুর আশ্রয় ত্যাগ করে নিত্য বিরাজিত প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহলে পদার্থ, ব্যক্তি ইত্যাদির বিচ্ছেদে তাঁর মনে কখনো অশান্তি বা বিক্ষোভ উৎপন্ন হয় না।

মনের প্রসন্নতা লাভের উপায়

(১) জাগতিক বস্তু, ব্যক্তি, পরিস্থিতি, দেশ, কাল, ঘটনা ইত্যাদির জন্য মনে রাগ (আসক্তি) বা দ্বেষ উৎপন্ন হতে না দেওয়া।

(২) নিজের স্বার্থ বা অহংভাবের জন্য কারও পক্ষপাতিত্ব না করা।

(৩) মনকে সর্বদা দয়া, ক্ষমা, উদারতার দ্বারা পূর্ণ রাখা।

(৪) প্রাণীমাত্রেরই হিতের ভাবনা মনে পোষণ করা।

(৫) **হিতপরিমিতভোজী নিত্যমেকান্তসেবী**
সকৃদুচিতহিতোক্তিঃ স্বল্পনিদ্রাবিহারঃ।
অনুনিয়মনশীলো যে ভজত্যুক্তকালে
স লভত ইব শীঘ্রং সাধুচিত্তপ্রসাদম্‌॥

(সর্ববেদান্তসিদ্ধান্তসারসংগ্রহ ৩৭২)

'যিনি শরীরের পক্ষে হিতকারক এবং পরিমিত ভোজনকারী, একান্তপ্রিয় স্বভাবযুক্ত, জিজ্ঞাসা করলে হিতকারক উচিত কথা বলেন অর্থাৎ স্বল্পভাষী, শয়ন ও ভ্রমণ যাঁর কম, এরূপ শাস্ত্র মর্যাদা অনুযায়ী যিনি খাওয়া-দাওয়া, শয়ন-ভ্রমণ করেন, সেই সাধক অতি শীঘ্রই চিত্তের প্রসন্নতা প্রাপ্ত হন।'

—এই উপায়গুলি দ্বারা মন সর্বদা প্রসন্ন থাকে।

'সৌম্যত্বম্'—হৃদয়ে হিংসা, ক্রূরভাব, কুটিলতা, অসহিষ্ণুতা, দ্বেষ ইত্যাদি ভাব না থাকলে এবং ভগবানের গুণ, প্রভাব, দয়া, সর্বব্যাপকতা ইত্যাদিতে অবিচল বিশ্বাস হলে সাধকের মনে স্বাভাবিকভাবেই 'সৌম্যভাব' থাকে। এরূপ সাধককে কেউ যদি তীক্ষ্ণ বাক্য বলেন, তাঁর নিন্দা করেন, তাঁকে বিনা কারণে দোষারোপ করেন, তাঁর সঙ্গে কেউ শত্রুতা করেন বা তাঁর ধন-মান-মর্যাদা ইত্যাদির ক্ষতি করেন, তাহলেও তাঁর সৌম্যভাব বিন্দুমাত্র নষ্ট হয় না।

মৌনম্—অনুকূল-প্রতিকূল অবস্থা, সংযোগ-বিয়োগ, রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি দ্বন্দ্ব নিয়ে মনে কোনোরকম চাঞ্চল্য না হওয়াকেই 'মৌন' বলা হয়[১]।

শাস্ত্র, পুরাণ এবং সন্ত-মহাপুরুষদের বাক্য এবং তাঁদের গভীর ভাবের মনন করা ; গীতা, রামায়ণ, ভাগবত ইত্যাদি ভগবদ্‌সম্বন্ধীয় গ্রন্থে উক্ত ভগবানের গুণ-চরিত্রের মনন করা ; জগতের প্রাণী কীভাবে সুখী হতে পারে, কীভাবে সকলের কল্যাণ হয়, কী উপায় করলে সকলে ভালো থাকে, সেইসব উপায়ের কথা সবসময় মনন করা—এগুলি সবই 'মৌন' শব্দের অন্তর্গত।

'আত্মবিনিগ্রহঃ'—মন সম্পূর্ণরূপে একাগ্র হওয়া এবং তৈলধারাবৎ একই চিন্তায় ব্যাপৃত থাকাকেও বলা হয় মননিগ্রহ । কিন্তু মনের সত্যকার নিগ্রহ হল মন সাধকের বশে থাকবে, অর্থাৎ মনকে যেখান থেকে সরাতে চাইবে, সেখান থেকে সরানো আর যেখানে যতক্ষণ রাখতে চাইবে, ততক্ষণ সেখানে থাকবে। তাৎপর্য হল সাধক মনের বশীভূত হয়ে কাজ করবেন না, বরং মনই তাঁর বশীভূত হয়ে কাজ করতে থাকবে। এইভাবে মনের সংযমিত হওয়াকেই বলা হয় **'আত্মবিনিগ্রহ'**।

'ভাবসংশুদ্ধিঃ'—যে ভাবের দ্বারা নিজ স্বার্থ এবং অহংভাব ত্যাগ হয়ে অপরের জন্য মঙ্গল কামনা আসে, তাকে বলা হয় **'ভাবসংশুদ্ধি'** অর্থাৎ ভাবের মহাপবিত্রকরণ।

যাঁর অন্তরে একমাত্র ভগবানের ওপরই আশা-ভরসা থাকে, এক ভগবানের চিন্তাই থাকে এবং একমাত্র তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করারই নিশ্চয়তা থাকে, তাঁর অন্তরের ভাব অত্যন্ত শীঘ্র পরিশুদ্ধ হয়। তখন তাঁর মধ্যে এই বিনাশশীল জগতের বস্তুগুলির কোনো আকর্ষণ থাকে না। কারণ জগতের প্রতি আকর্ষণ থাকলেই ভাব অশুদ্ধ হয়ে যায়।

'ইত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে'—এইরূপ যে তপস্যায় মনের প্রাধান্য থাকে, তাকে মানস (মন-সম্পর্কীয়) তপ বলা হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব—প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও প্রসন্ন থাকা, নিজের ওপর এই পরিস্থিতির প্রভাব না পড়া, অপরের প্রতিকূল বাক্য শুনেও সৌম্য থাকা এবং মনের স্বাতন্ত্র্য পরিত্যাগ করে মনন করা উচিত । কারণ মনকে স্বাতন্ত্র্য দিলে সুখ ভোগ হয়, মননশীলতা আসে না। মনের মূঢ়, ক্ষিপ্ত এবং বিক্ষিপ্ত বৃত্তিগুলি পরিত্যাগ করা উচিত। নিজের মনে কারোর ক্ষতি করার ভাব যেন না থাকে। এই সবগুলিকে মানসিক তপস্যা বলা হয়।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—এবার ভগবান পরবর্তী তিনটি শ্লোকে ক্রমশঃ সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক তপস্যার বর্ণনা করছেন।

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে॥ ১৭ ॥

---

[১]এখানে 'মৌনম্' পদটির অর্থ বাক্যে বিরত থাকা নয়, যদি বাক্যে বিরত থাকা বোঝাত, তাহলে এটি বাক্য সম্বন্ধীয় তপে উদ্ধৃত হত। কিন্তু এটিকে মানসিক তপের অন্তর্গত ধরা হয়েছে।

গীতায় প্রায়শঃ দেখা যায় যে, যেখানে অর্জুন ক্রিয়াত্মক প্রশ্ন করেছেন, সেখানে ভগবান ভাবাত্মক উত্তর দিয়েছেন। যেমন, দ্বিতীয় অধ্যায়ের চুয়ান্নতম শ্লোকে অর্জুনের প্রশ্ন 'স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত' 'স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কীভাবে বলেন ? ভগবান উত্তরে বললেন 'দুঃখেষু..............স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে।' অর্থাৎ অনুকূল-প্রতিকূল অবস্থা নিয়ে যাঁর মনে হর্ষ-বিষাদ উপস্থিত না হয়, তাঁকে স্থিতপ্রজ্ঞ (মৌন) বলা হয়। অর্থাৎ ভগবান ক্রিয়ার থেকে ভাবকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন। তাই এখানে 'মৌন'-কে মানসিক তপের অন্তর্গত করেছেন।

[**পরয়া, শ্রদ্ধয়া, যুক্তৈঃ** (পরম শ্রদ্ধা সহকারে) ; **অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ** (ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত) ; **নরৈঃ** (ব্যক্তি দ্বারা) ; **ত্রিবিধম্** (ত্রিবিধ) ; **তপঃ, তপ্তম্** (তপস্যা করা হয়) ; **তৎ** (তাকে) ; **সাত্ত্বিকম্** (সাত্ত্বিক তপস্যা) ; **পরিচক্ষতে** (বলা হয়।)]

পরম শ্রদ্ধা সহকারে, ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত ব্যক্তির দ্বারা যে ত্রিবিধ (কায়মনোবাক্যে) তপস্যা করা হয় তাকে বলা হয় সাত্ত্বিক তপস্যা ॥ ১৭ ॥

ব্যাখ্যা—'শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তম্'—শরীর, মন ও বাক্যের সাহায্যে যে তপস্যা করা হয়, সেটিই হল মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য এবং মানব-জীবনের উদ্দেশ্য পূরণের নিশ্চিত উপায়[১] এবং এটি সর্বাঙ্গীণভাবে, ঠিকমতো করলে মানুষের আর কিছু করা বাকি থাকে না অর্থাৎ প্রকৃত যে তত্ত্ব তাতে স্বাভাবিক স্থিতি হয়—এরূপ অবিচল বিশ্বাসে দৃঢ় চিত্তে বিঘ্ন-বাধার কোনো প্রকার পরোয়া না করে উৎসাহ সহকারে তপস্যা করাই হল পরম শ্রদ্ধা সহকারে তপস্যা করা।

'অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ যুক্তৈঃ নরৈঃ'—এখানে দুটি বিশেষণসহ **'নরৈঃ'** পদটি ব্যবহারের তাৎপর্য হল এই যে সদ্‌গুণ ও সদাচার প্রাণীমাত্রের মধ্যেই আংশিকভাবে থাকে, কিন্তু মানুষের বিশেষত্ব হল এই যে, সে ইচ্ছে করলে সর্বাঙ্গীণভাবে ও বিশেষভাবে নিজের মধ্যে এই সদ্‌গুণ সদাচার আনয়ন করতে পারে এবং দুর্গুণ-দুরাচার, কামনা, মূঢ়তা এইসব দোষ দূর করতে পারে। মনুষ্যমাত্রের মধ্যেই নিষ্কাম ভাব হতে পারে।

সাত্ত্বিক তপে **'নর'** শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে ; কিন্তু রাজস-তামস তপস্যায় মনুষ্যবাচক শব্দ ব্যবহার করাই হয়নি। তাৎপর্য হল এই যে নিজ কল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রাপ্ত এই অমূল্য শরীর লাভ করেও যে ব্যক্তি কামনা, দম্ভ, মূঢ়তা ইত্যাদি দোষকে ধরে রাখে, সে ব্যক্তি মনুষ্য নামের যোগ্য নয়।

ফলাকাঙ্ক্ষা না রেখে নিষ্কামভাবে যাঁরা তপস্যা করেন, উপরিউক্ত পদটি তাঁদের জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে।

'তপস্তৎ ত্রিবিধম্'—এখানে শুধুমাত্র সাত্ত্বিক তপস্যার উদ্দেশ্যে 'ত্রিবিধ' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে এবং রাজস ও তামস তপস্যাতে 'ত্রিবিধ' পদ ব্যবহার না করে শুধু 'যৎ-তৎ' পদ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হল শারীরিক, বাচিক ও মানসিক—এই তিনপ্রকার তপস্যা সাত্ত্বিকের মধ্যেই সর্বাঙ্গীণভাবে হতে পারে, রাজসিক বা তামসিকের মধ্যে তা অংশত আসতে পারে। তবে রাজসিকের মধ্যেও কিছু লক্ষণ দেখা যায়। কারণ রাজসিক ব্যক্তিরা শাস্ত্রবিধির দিকে দৃষ্টি রাখেন। কিন্তু তামসিক ব্যক্তিদের মধ্যে এই তপস্যার লক্ষণ খুবই কম দেখা যায়। কারণ তামস মানুষদের মধ্যে মূঢ়তা, অন্যকে কষ্ট দেওয়া প্রভৃতি দোষ থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, ত্রয়োদশ অধ্যায়ের সপ্তম থেকে একাদশ শ্লোক পর্যন্ত জ্ঞানের যে কুড়িটি সাধনের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে শারীরিক তপস্যার তিনটি লক্ষণ—শৌচ, আর্জব (সরলতা) এবং অহিংসা ও মানসিক তপস্যার দুটি লক্ষণ—মৌন এবং আত্মবিনিগ্রহ উদ্ধৃত হয়েছে। তেমনই ষোড়শ অধ্যায়ের প্রথম থেকে তৃতীয় শ্লোক পর্যন্ত দৈবী সম্পদের যে ছাব্বিশটি লক্ষণের বর্ণনা করা হয়েছে তার মধ্যেও, শারীরিক তপস্যার তিনটি লক্ষণ—শৌচ, অহিংসা এবং আর্জব ও বাচিক তপস্যার দুটি লক্ষণ সত্য এবং স্বাধ্যায় উদ্ধৃত হয়েছে। অতএব জ্ঞানের যেসব সাধনার দ্বারা তত্ত্ববোধ হয় এবং দৈবী সম্পদের যে গুণাবলীর সাহায্যে মুক্তিলাভ হয়, সেই লক্ষণ বা গুণগুলি রাজসিক বা তামসিকের হওয়া সম্ভব নয়। সেইজন্য রাজসিক এবং তামসিক তপে শারীরিক, বাচিক এবং মানসিক—এই তিনপ্রকার তপস্যাকে সর্বাঙ্গীণভাবে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। তাই ওইস্থানে 'যৎ-তৎ' পদের দ্বারা আংশিক যতটুকু হওয়া সম্ভব, ততটাই ধরা উচিত।

তৃতীয়তঃ, ভগবদ্‌গীতার আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত অধ্যয়ন করলে বোঝা যায় যে, এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য জীবের কল্যাণ করা। কারণ অর্জুনের প্রশ্ন ছিল নিশ্চিত শ্রেয়ের (কল্যাণের ২।৭ ; ৩।২ ; ৫।১)। ভগবানও তার উত্তরে 'জীবের যাতে নিশ্চিতরূপে কল্যাণ হয়'—সেই উদ্দেশ্যেই সমস্ত সাধনগুলি জানিয়েছেন। তাই গীতায় যে যে স্থানে সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভেদ করা হয়েছে, সেখানে সাত্ত্বিক বিভাগই গ্রহণযোগ্য। কারণ তা মুক্তিপ্রদ—

[১]শরীর-মন-বাক্যের তপস্যা তখনই সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হয় যখন বিনাশশীল বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করার একমাত্র উদ্দেশ্য হয়।

'দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায়' আর রাজসিক ও তামসিক ত্যজনীয়। কারণ সেগুলি আবদ্ধকারক—'নিবন্ধায়াসুরী মতা'। এইজন্যই ভগবান এখানে সাত্ত্বিক তপস্যাতে শারীরিক, বাচিক এবং মানসিক—এই তিনটি তপস্যার দিকে দৃষ্টি দেবার জন্য 'ত্রিবিধম্' পদটি ব্যবহার করেছেন।

'সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে'—পরম শ্রদ্ধাযুক্ত, ফলাকাঙ্ক্ষাবিহীন ব্যক্তিরা যে তপস্যা করেন, তাকে বলা হয় সাত্ত্বিক তপ।

❋ ❋ ❋

সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্॥ ১৮ ॥

[**যৎ, তপঃ** (যে তপস্যা) ; **সৎকারমানপূজার্থম্** (সৎকার, মান ও পূজা পাবার জন্য) ; **চ, দম্ভেন** (এবং লোক দেখানো ভাবে) ; **ক্রিয়তে** (করা হয়) ; **তৎ, ইহ** (তা, ইহলোকে) ; **চলম্** (অনিশ্চিত) ; **অধ্রুবম্** (বিনাশশীল ফলপ্রদায়ী) ; **রাজসম্, প্রোক্তম্** (রাজস তপস্যা বলা হয়।)]

যে তপস্যা সৎকার, মান ও পূজা পাবার জন্য এবং কপট ভাব নিয়ে করা হয় তথা ইহলোকে অনিশ্চিত এবং বিনাশশীল ফলপ্রদায়ী, সেই তপকে রাজস তপ বলা হয় ॥ ১৮ ॥

ব্যাখ্যা—**'সৎকারমানপূজার্থং তপঃ ক্রিয়তে'**—রাজসিক ব্যক্তিরা সৎকার, মান এবং পূজা পাবার লোভেই তপস্যা করে থাকেন ; যেমন—আমরা যেখানেই যাব, সেখানেই লোকেরা আমাদের তপস্বী মনে করে স্বাগত জানাতে আসবে। আমাদের নিয়ে শোভাযাত্রা বেরোবে, স্থানে স্থানে লোকে আমাদের জন্য গাত্রোত্থান করবে, আমাদের বসার জন্য আসন দেবে, আমাদের সঙ্গে মিষ্ট কথা বলবে, অভিনন্দন জানাবে, এইসব বাহ্য ক্রিয়ার দ্বারা আমাদের 'সৎকার' করবে। লোকেরা অন্তর থেকে আমাদের শ্রেষ্ঠ বলে মনে করবে এই বলে যে, এরা অত্যন্ত সংযমী, সত্যবাদী এবং অহিংসক। সাধারণ ব্যক্তিদের থেকে আমাদের প্রতি বিশেষ ভাব পোষণের দ্বারা লোকে আমাদের সম্মান করবে। জীবিতকালেই লোকেরা আমাদের চরণ পূজা করবে, মাথায় পুষ্পবর্ষণ করবে, মালা পরাবে, আরতি করবে, প্রণাম করবে, পদধূলি নেবে এবং মৃত্যুর পর শোকসভা করবে, স্মারক প্রস্তুত করবে এবং লোকে তাতে পত্র-পুষ্প সাজিয়ে 'পূজা' করবে।

'দম্ভেন চৈব যৎ'—হৃদয়ে তপস্যার প্রতি শ্রদ্ধাভাব না থাকলেও বাহ্যতঃ লোক দেখাবার জন্য আসনে বসা, মালা জপ করা, পূজা করা, সহজ-সরল ভাবে চলা, হিংসা না করা প্রভৃতি।

'তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্'—রাজসিক তপস্যার ফলকে চল (অস্থির) এবং অধ্রুব বলা হয়। তাৎপর্য হল এই যে, যে তপস্যা সৎকার, মান ও পূজার জন্য করা হয়, এখানে সেই রাজসিক তপস্যার ফলকে 'চল' বা বিনাশশীল বলা হয়েছে এবং যে তপস্যা শুধু লোক দেখানোর জন্য করা হয়, এখানে তার ফল অধ্রুব বা অনিশ্চিত বলে জানানো হয়েছে।

'ইহ প্রোক্তম্', পদটির অর্থ হল যে, এই রাজসিক তপস্যার ইষ্টফল প্রায়শঃ এখানেই প্রাপ্ত হয়। কারণ সাত্ত্বিক ব্যক্তিদের অবস্থান হল ঊর্ধ্বলোকে, তামসিক ব্যক্তিদের থাকে অধঃলোক আর রাজসিক ব্যক্তিদের হল মধ্যলোক বা ইহলোকে (গীতা ১৪।১৮)। তাই রাজসিক তপস্যার ফল স্বর্গ বা নরক হয় না ; ইহলোকেই তার মহিমা ও প্রশংসা হয়ে সেটি শেষ হয়ে যায়।

রাজসিক ব্যক্তিদের দ্বারা শারীরিক, বাচিক এবং মানসিক তপস্যা কী হওয়া সম্ভব ? ফলেচ্ছা থাকায় তারা দেবপূজা করতে পারে। তাদের মধ্যে সহজ-সরল ভাবও থাকতে পারে। ব্রহ্মচর্য রক্ষা করা শক্ত, অহিংসক হওয়াও শক্ত। পুস্তকাদিতে মনোযোগ হওয়া সম্ভব, মন সবসময় প্রসন্ন থাকতে পারে না, সৌম্যভাবও সর্বদা থাকে না। মনে কামনা থাকায় সংকল্প-বিকল্প হতে থাকে। এরা সৎকার-মান-পূজা ও দম্ভের জন্যই তপস্যা করে, তাই তাদের ভাব পরিশুদ্ধ হয় না। তাই রাজসিক ব্যক্তিরা তিন প্রকারের তপস্যা সর্বাঙ্গীণভাবে করতে সক্ষম হয় না।

❋ ❋ ❋

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ১৯ ॥

[যৎ, তপঃ (যে তপ) ; মূঢ়গ্রাহেণ (মূঢ়তাপূর্বক) ; আত্মনঃ, পীড়য়া (নিজেকে পীড়া প্রদান করে) ; বা, পরস্য, উৎসাদনার্থম্ (অথবা অন্যকে কষ্ট প্রদান করার জন্য) ; ক্রিয়তে (অনুষ্ঠিত হয়) ; তৎ (তাকে) ; তামসম্ (তামস তপ) ; উদাহৃতম্ (বলা হয়।)]

যে তপ মূঢ়বুদ্ধিবশতঃ নিজেকে পীড়া প্রদান করে, অথবা অন্যকে কষ্ট প্রদান করার জন্য অনুষ্ঠিত হয়, তাকে বলা হয় তামস তপ॥ ১৯ ॥

ব্যাখ্যা—'মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ'—তামসিক তপস্যায় মূর্খতাবশতঃ আগ্রহান্বিত হয়ে নিজেকে কষ্ট দিয়ে তপস্যা করা হয়। তামসিক ব্যক্তিদের মধ্যে মূর্খতা থাকে তাই যার মধ্যে শরীর, মনকে কষ্ট দেবার ব্যাপার থাকে, তাকেই এরা তপস্যা বলে মনে করে।

'পরস্যোৎসাদনার্থং বা'—অথবা এরা অন্যকে কষ্ট প্রদানের নিমিত্ত তপস্যা করে। তাদের মধ্যে এই ভাব কাজ করে যে, শক্তি লাভ করার জন্য তপ (সংযম) করাতে আমাকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, অন্যদের আমি ছেড়ে দেব কেন ? তামসিক ব্যক্তিরা অপরকে দুঃখ দেওয়ার জন্য এই তিন (মানসিক, বাচিক, কায়িক) তপস্যার আংশিক ভাগের গ্রহণ ছাড়াও ইচ্ছামতো উপবাস, শীত-গ্রীষ্ম সহ্য করা ইত্যাদি তপস্যাও করে থাকে।

'তৎ তামসমুদাহৃতম্'—তামসিক ব্যক্তিদের অন্যতম উদ্দেশ্য হল অপরকে কষ্ট দেওয়া, তাদের অনিষ্ট করা। সুতরাং সেই উদ্দেশ্যে করা তপস্যাকে তামস তপস্যা বলা হয়।

[সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জিত হয়ে পরম শ্রদ্ধা সহকারে তপস্যা করে, তাই তাদেরই মনুষ্য নামের উপযুক্ত বলা হয়। রাজসিক ব্যক্তি সৎকার, পূজা, মান ও দম্ভের জন্য পূজা করে, তাই তারা মনুষ্য নামের যোগ্য নয়। কারণ সৎকার, মান পশু-পক্ষীদেরও প্রিয় হয় এবং তারা দম্ভও করে না। তামসিক ব্যক্তিরা পশুদের থেকে অধম ; কারণ পশু-পক্ষী দুঃখ পেলেও অপরকে দুঃখ দেয় না, কিন্তু তামসিক ব্যক্তিরা নিজেদের দুঃখের বিনিময়ে অপরকে দুঃখ দেয়।]

পরিশিষ্ট-ভাব—'মূঢ়গ্রাহেণ'-তে কেবল তমোগুণ থাকে, কিন্তু **'পরস্যোৎসাদনার্থম্'**-এ রজোগুণ মিশ্রিত আছে। মূঢ়তা তমোগুণসম্পন্ন হয় আর স্বার্থভাব, ক্রোধ ইত্যাদি হল রজোগুণ। ক্রোধ রজোগুণ থেকে উৎপন্ন হয়ে তমোগুণে পরিণত হয়—**'ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ'** (গীতা ২।৬৩)।

* * *

সম্বন্ধ—ভগবান এবার পরবর্তী তিনটি শ্লোকে ক্রমশঃ সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক দানের লক্ষণ জানিয়েছেন।

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥ ২০ ॥

[দাতব্যম্ (দান করা কর্তব্য) ; ইতি, যৎ, দানম্ (এই ভাবে যে দান) ; দেশে, চ, কালে চ (দেশ, কাল এবং) ; পাত্রে (পাত্র প্রাপ্ত হয়ে) ; অনুপকারিণে (অনুপকারী ব্যক্তিকে) ; দীয়তে (দেওয়া হয়) ; তৎ, দানম্ (সেই দানকে) ; সাত্ত্বিকম্ (সাত্ত্বিক) ; স্মৃতম্ (বলা হয়।)]

দান করা কর্তব্য—এই মনোভাব নিয়ে যে দান দেশ, কাল এবং পাত্র অনুসারে অনুপকারী ব্যক্তিকে অর্থাৎ নিষ্কামভাবে করা হয়, সেই দানকে সাত্ত্বিক দান বলা হয়॥ ২০ ॥

ব্যাখ্যা—এই শ্লোকটিতে দানের দুটি বিভাগ আছে—**'দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তে অনুপকারিণে'** এবং **'দেশে কালে চ পাত্রে চ'**।

'দাতব্যমিতি .... দেশে কালে চ পাত্রে চ'—দান করাই আমার কর্তব্য। কারণ আমি বস্তুগুলিকে স্বীকার করেছি অর্থাৎ সেগুলিকে নিজের বলে মেনে নিয়েছি। বস্তুগুলি যিনি স্বীকার করেছেন, দেওয়ার দায়িত্ব তাঁরই। সুতরাং দান করাই আমার কর্তব্য—এই ভাব নিয়ে দান করা উচিত। তাতে ইহলোকে বা পরলোকে কী ফল লাভ হবে—এই ভাব একেবারেই রাখা উচিত নয়। 'দাতব্য' কথাটির তাৎপর্যই হল ত্যাগ।

কাকে দান করা হবে? তাই বলেছেন—**'দীয়তেঽনুপকারিণে'** অর্থাৎ যিনি আগে কখনো আমার কোনো উপকার করেননি, এখনও করেন না এবং পরেও করবার কোনো সম্ভাবনা নেই, এইরূপ 'অনুপকারী' ব্যক্তিকে নিষ্কামভাবে দান করা উচিত। এর অর্থ এই নয় যে, যারা আমাদের উপকার করেছেন তাদের দেবে না, বরং যারা আমাদের উপকার করেছেন তাদের দিয়ে সেটিকে দান বলে মনে করবে না। কারণ সত্যকার উপকারী যে ব্যক্তি, তাঁকে দান করলেই উপকারের শোধ দেওয়া যায় না। সুতরাং উপকারীর সেবা, সহায়তা অতি অবশ্যই করা উচিত, কিন্তু তাকে দান মনে করা উচিত নয়। উপকারের আশা নিয়ে দান করলে সেটি রাজসিক দান হয়।

'দেশে কালে চ পাত্রে চ'[১] পদটির দুটি অর্থ হয়—

(১) যে দেশে যে বস্তুটি নেই অথচ তার প্রয়োজন আছে, সেই দেশে সেই বস্তুটি প্রদান করা ; যে সময়ে যেটি আবশ্যক, সেই সময়ে সেটি দান করা এবং যার কাছে যে বস্তুটি প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও নেই, তাকে সেই বস্তুটি দেওয়া।

(২) গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী ইত্যাদি পবিত্র নদী এবং কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ, কাশী ইত্যাদি তীর্থস্থানে গেলে দান করা, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, অক্ষয় তৃতীয়া, সংক্রান্তি ইত্যাদি পুণ্যতিথিতে দান করা এবং বেদপাঠক ব্রাহ্মণ, সদ্‌গুণ-সদাচারী-ভিক্ষুক ইত্যাদি উত্তম পাত্রকে দান করা।

'দেশে কালে চ পাত্রে চ' পদের দ্বারা উপরোক্ত দুটি অর্থই নেওয়া উচিত।

'তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্'—এরূপ দানকে সাত্ত্বিক দান বলা হয়। অর্থাৎ পৃথিবীতে যত জিনিস আছে, তা সকলেরই এবং সকলেরই জন্য, কারও ব্যক্তিগত নয়। তাই অনুপকারী ব্যক্তিকেও তার যে বস্তুর প্রয়োজনীয়তা আছে, সেটি তারই মনে করে তাকে দিয়ে দেওয়া উচিত। যার কাছে বস্তুটি যাবে, সেটি তারই প্রাপ্য ; কারণ সেটি তার না হলে, সেটি সে ইচ্ছা করলেও তাকে সেটি দেওয়া সম্ভব নয়। তাই আগে থেকেই বুঝতে হবে যে, যার বস্তু তাকেই দিতে হবে, নিজের বস্তু (মনে করে) দেওয়া নয়। অর্থাৎ যে বস্তু আমার নয় অথচ আমার কাছে আছে অর্থাৎ সেটি আমি নিজের বলে মনে করেছি, সেটি প্রার্থীরই মনে করে তাঁকেই দিয়ে দেওয়া উচিত।

এইভাবে যে দান করাতে বস্তু, ফল এবং ক্রিয়ার সঙ্গে নিজের সম্পর্কছেদ হয়, তাকে বলা হয় সাত্ত্বিক দান।

পরিশিষ্ট-ভাব—এই সাত্ত্বিক দান হল প্রকৃতপক্ষে ত্যাগ। এ সেই দান নয়, যাকে বলা হয়—'এক গুণ দান, সহস্র গুণ পুণ্য' ; কেন-না সেই দানে (সহস্রের সঙ্গে) সম্পর্ক স্থাপন হয়[২]। কিন্তু ত্যাগের দ্বারা সম্পর্ক ছেদ হয়। দানের প্রতিদানে অন্য কিছু পাবার আশা করলে তা রাজসিক হয়ে পড়ে—**'যত্তু প্রত্যুপকারার্থম্'** (গীতা ১৭।২১)। এই রাজসিক ভাব না রাখার জন্যই এখানে **'অনুপকারিণে'** পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

গীতায় বর্ণিত সাত্ত্বিক গুণ ত্যাগের দিকে নিয়ে যায়, সেইজন্য ভগবান এটিকে 'অনাময়' বলে অভিহিত করেছেন (১৪।৬)। সত্ত্বগুণ সম্বন্ধ বিচ্ছেদ (ত্যাগ) করায় ; রজোগুণ সম্পর্ক স্থাপন করে এবং তমোগুণে মূঢ়তা আসে।

গীতা অনুযায়ী অন্যের হিতার্থে কর্ম করাকে 'যজ্ঞ' বলে, সর্বক্ষণ প্রসন্ন থাকাকে বলা হয় 'তপ' এবং যার জিনিস তাকেই দিয়ে দেওয়াকে বলা হয় 'দান'। স্বার্থবুদ্ধি নিয়ে নিজের জন্য যজ্ঞ-তপস্যা-দান করা হল আসুরী অথবা রাক্ষসী স্বভাব।

*** *** ***

[১]এখানে দেশ, কাল এবং পাত্র—এই তিনটিতে 'যস্য চ ভাবেন ভাবলক্ষণম্' সূত্র অনুসারে সপ্তমী বিভক্তি করা হয়েছে।

[২]সুপাত্রদানাচ্চ ভবেদ্ধনাঢ্যো ধনপ্রভাবেণ করোতি পুণ্যম্। পুণ্যপ্রভাবাৎসুরলোকবাসী পুনর্ধনাঢ্যঃ পুনরেব ভোগী॥
কুপাত্রদানাচ্চ ভবেদ্দরিদ্রো দারিদ্র্যদোষেণ করোতি পাপম্। পাপপ্রভাবান্নরকং প্রয়াতি পুনর্দরিদ্রঃ পুনরেব পাপী॥

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্‌॥ ২১ ॥

[**তু, যৎ** (কিন্তু যে দান) ; **প্রত্যুপকারার্থম্‌, বা** (প্রত্যুপকারের আশায় বা) ; **ফলম্‌, উদ্দিশ্য** (ফলপ্রাপ্তির আশায়) ; **পরিক্লিষ্টম্‌, দীয়তে** (ক্লেশসহকারে দেওয়া হয়) ; **তৎ, দানম্‌** (সেই দানকে) ; **রাজসম্‌, স্মৃতম্‌** (রাজস দান বলা হয়।)]

পরন্তু যে দান ক্লেশ সহকারে এবং প্রত্যুপকারের আশায় অথবা ফলপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে করা হয়, তাকে বলা হয় রাজস দান॥ ২১ ॥

ব্যাখ্যা—'যত্তু প্রত্যুপকারার্থম্‌'—রাজসিক দান করা হয় প্রত্যুপকারের আশায় ; যেমন—রাজসিক ব্যক্তি কোনো বিশেষ সময়ে দানের বস্তু হিসাব করে বার করে, সে চিন্তা করে যে আমাদের বংশের যে কুলপুরোহিত, তাঁকে যদি আমি দান করি তাহলে অনেকেই তাঁকে দান করবে এবং তাতে আমাদের কুলপুরোহিত ধনী হয়ে উঠবেন। অমুক পণ্ডিত খুব ভালো এবং বড় জ্যোতিষী, ওঁকে দান করলে তিনি যাত্রার সময়, পুত্র বা কন্যাদের বিবাহের কিংবা নতুন গৃহে প্রবেশ করার শুভ মুহূর্ত জানিয়ে দেবেন। আমার আত্মীয় অথবা আমার হিতাকাঙ্ক্ষীদের সাহায্য করার জন্য আমি অর্থ প্রদান করব, তাহলে তারা আমাদের হিতকাজ করবে। যে ব্যক্তি আমাদের ঔষধ দেন, তাঁকে দান করব ; তাহলে তিনি খুশি হয়ে ভালো ভালো ঔষধ প্রদান করবেন ইত্যাদি, এইরূপ প্রতিফলের আশা নিয়ে অর্থাৎ ইহলোকের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনা করে যে দান করা হয়, তাকে বলা হয় **'প্রত্যুপকারার্থ'**।

'ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ'—ফলকাঙ্ক্ষা নিয়ে অর্থাৎ পরলোকের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে যে দান করা হয়, তাতে রাজসিক ব্যক্তিরা তীর্থ (গঙ্গা, যমুনা, কুরুক্ষেত্র ইত্যাদি), তিথি (অমাবস্যা, পূর্ণিমা ইত্যাদি) এবং পাত্র (ব্রাহ্মণ ইত্যাদি) বিচার করেন এবং শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিধি-নির্দেশের দিকেও লক্ষ্য রাখেন। এইরূপ বিচার-বিবেচনা করে দান করলেও ফলাকাঙ্ক্ষা থাকায় সেই দান রাজস দান হয়। তাই এঁদের জন্য ভগবান অন্য কোনো বিধি-নির্দেশ জানাবার আবশ্যকতা বোধ করেননি, তাই রাজস দানে **'দেশে কালে চ পাত্রে'** পদটির প্রয়োগ হয়নি।

এইস্থানে **'পুনঃ'** পদটি ব্যবহারের অর্থ হল এই যে, যার থেকে কোনো উপকার পাওয়া গেছে অথবা যার থেকে ভবিষ্যতে কিছু পাওয়ার আশা আছে, রাজসিক ব্যক্তি প্রথমে তার বিচার করে, তারপরে দান করে।

'দীয়তে চ পরিক্লিষ্টম্‌'—অত্যন্ত ক্লেশ সহকারে রাজস দান করা হয় ; যেমন—সময় হয়েছে, এখন দিতেই হবে, এত জিনিস দিলে আমার কম হয়ে যাবে, এত অর্থ দিলে আমার অর্থ অনেক কমে যাবে, এই ব্যক্তি অসময়ে আমার কাজে লাগে, তাই একে দিতে হচ্ছে, এটুকু দিলেই যদি কাজ হয় তো খুব ভালো—এতখানি দিলেই তো কাজ হবে, তাহলে বেশি কেন দেওয়া, বেশি কোথা থেকে পাব ? বেশি দিলে গ্রহীতার স্বভাব নষ্ট হবে—এইভাবে বিস্তর ভাবনা-চিন্তা করে রাজসিক ব্যক্তিরা দান করে থাকেন।

'তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্‌'—উপরিউক্ত ভাবে দান করাকে রাজস দান বলা হয়।

※ ※ ※

অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তৎ তামসমুদাহৃতম্‌॥ ২২ ॥

[**যৎ, দানম্‌, অসৎকৃতম্‌** (যে দান সৎকারবর্জিত) ; **অবজ্ঞাতম্‌** (অবজ্ঞাপূর্বক) ; **অদেশকালে** (অযোগ্য দেশ ও কালে) ; **অপাত্রেভ্যঃ, দীয়তে** (অনুপযুক্ত পাত্রে করা হয়) ; **তৎ** (সেই দানকে) ; **তামসম্‌** (তামস) ; **উদাহৃতম্‌** (বলা হয়।)]

যে দান সৎকারবর্জিত, অবজ্ঞা সহকারে, অযোগ্য দেশ (স্থান) ও কালে, অনুপযুক্ত পাত্রে করা হয়, তাকে বলা হয় তামস দান ॥ ২২ ॥

ব্যাখ্যা—**'অসৎকৃতমবজ্ঞাতম্'**—তামস দান অ-সৎকার ও অবজ্ঞা সহকারে করা হয় ; যেমন—তামসিক ব্যক্তির কাছে দান পাবার আশায় কোনো ব্রাহ্মণ এলে, সেই ব্যক্তি কটু ভাষায় বলে, 'দেখো পণ্ডিত ! আমার মায়ের যখন মৃত্যু হয়, তখন তুমি আসনি, কিন্তু তা সত্ত্বেও কুলগুরু বলে তোমাকে দিতে হচ্ছে !' এর মধ্যে গৃহের অন্য ব্যক্তি বলতে থাকে, 'আরে ! তুমি এই ব্রাহ্মণদের মধ্যে কেন নিজেকে জড়াচ্ছ ! কোনো গরীবকে দান করো। যাকে কেউ দেয় না, তাকেই দেওয়া উচিত। তাকেই দান বলে। ব্রাহ্মণদের তো অনেকেই দেয়, গরীবদের কে দেয় ?' ব্রাহ্মণ নয়, যেন ঘরে কুকুর এসেছে ! এভাবে অপমানিত করে দান দেওয়া হয়। এইভাবে শাস্ত্রবিধি ও ব্রাহ্মণদের নিন্দা-অপমান করায় একে তামস দান বলা হয়।

'অদেশকালে যদ্দানম্'—মূর্খতার জন্য তামসিক ব্যক্তি নিজের মনকেই পরীক্ষা করে ; যেমন—দান করার জন্য আবার দেশ-কালের কথা ভাবার কী দরকার ? যখন খুশি দান করা যায়। কোনো বিশেষ দেশ বা কালে যদি পুণ্য হতে পারে, তাহলে এখানে কেন পুণ্য হবে না ? তার জন্য আবার বিশেষ সময়, পর্বের কী দরকার ? নিজের জিনিসই তো দেব, তা যখনই হোক, ইত্যাদি। তামসিক ব্যক্তিরা এইভাবে শাস্ত্র-নির্দেশের অমর্যাদা ও অপমান করে দান করে। কারণ তাদের মধ্যে শাস্ত্র-নির্দেশের কোনো মূল্যবোধ থাকে না, থাকে অর্থের গুরুত্ব।

'অপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে'—তামস দান করা হয় অপাত্রে। তামসিক ব্যক্তিরা পাত্রবিচারে নানাপ্রকার তর্ক-বিতর্ক করে, যেমন—শাস্ত্রে দেশ-কাল-পাত্রের কথা এমনিই লেখা হয়েছে, এখানে কেউ দান গ্রহণ করলে কী তার পেট ভরবে না ? তৃপ্তি হবে না ? যখন বিশেষ কোনো পাত্রকে দান করলে পুণ্য হয়, তখন এই ব্যক্তিকে দিলে কেন পুণ্য হবে না ? এ কি মানুষ নয় ? একে দিলে কি পাপ হবে ? নিজেদের জীবিকা-নির্বাহের জন্য, নিজ উদ্দেশ্য সাধন করার জন্যই ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রে এইসব লিখেছে ইত্যাদি।

'তত্তামসমুদাহৃতম্'—উপরিউক্ত ভাবে যে দান করা হয়, তাকে বলা হয় তামস দান।

প্রশ্ন—গীতায় তামস কর্মের ফল অধোগতি বলে জানানো হয়েছে—**'অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ'** (১৪।১৮) এবং রামচরিতমানসে বলা হয়েছে যে, যে কোনোভাবে দান করলেই কল্যাণ হয়—

'জেন কেন বিধি দীন্হে দান করই কল্যান।'

(শ্রীরামচরিতমানস ৭।১০৩ খ)

এই দুইয়ে বিরোধ কেন ?

উত্তর—তামসিক ব্যক্তি অধোগতি প্রাপ্ত হয়—এই নিয়ম দানের বিষয়ে প্রযোজ্য নয়। কারণ ধর্মের চারটি চরণ—**'সত্যং দয়া তপো দানমিতি'** (শ্রীমদ্ভাগবত ১২।৩।১৮)। এই চারটি চরণের মধ্যে কলিযুগে একটিই স্থিত আছে, তা হল 'দান'—**'দানমেকং কলৌ যুগে'** (মনুস্মৃতি ১।৮৬)। তাই তুলসীদাস গোস্বামী বলেছেন—

প্রগট চারি ধর্মকে কলি মহুঁ এক প্রধান।
জেন কেন বিধি দীনহেঁ দান করই কল্যান॥

(শ্রীরামচরিতমানস ৭।১০৩ খ)

একথা বলার অর্থ হল যে যেভাবেই দান করা হোক না কেন তাতে বস্তু ইত্যাদির সঙ্গে নিজের সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করা হয়। এই দৃষ্টিতে অংশতঃ ত্যাগ হওয়ায় তামস দানেও দাতা কখনো অধোগতির পাত্র হতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, কলিযুগে মানুষের অন্তর অত্যন্ত কলুষিত হচ্ছে। তাই কলিযুগে এই সুযোগ দেওয়া হয়েছে যে, যেভাবেই হোক দান করলে কল্যাণ হবে। এতে মানুষের স্বভাবে দান করার বৃত্তি জাগ্রত থাকবে যা পরে কখনো কোনো জন্মে তার কল্যাণও করতে পারে। কিন্তু দান করা যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে দান করার স্বভাবই আর তৈরি হবে না। সেইজন্যই কোনো একজন সাধু—**'শ্রদ্ধয়া দেয়ম্ অশ্রদ্ধয়াদেয়ম্'** (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ১।১১)—শ্রুতির এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, প্রথম পদটির অর্থ হল শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করা উচিত, দ্বিতীয় পদটির অর্থ **'অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্'** অশ্রদ্ধা সহকারে দান করা উচিত নয়—এটি না হয়ে শ্রদ্ধা না থাকলেও দান করা উচিত—এই অর্থই ধরা উচিত।

দান-সম্পর্কে বিশেষ কথা

অন্ন (খাদ্য), জল, বস্ত্র এবং ঔষধ—এই চারপ্রকার দানে পাত্র-অপাত্র ইত্যাদির বিশেষভাবে বিচার করা উচিত নয়। শুধু অন্যের প্রয়োজনীয়তার দিকেই লক্ষ্য রাখতে হয়।

এতে যদি দেশ, কাল, পাত্র, ঠিকমতো পাওয়া যায় তো ভালো, না পেলেও কোনো কথা নেই। আমার তো ক্ষুধার্তকে অন্ন, পিপাসার্তকে জল, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র এবং রোগীকে ঔষধ দেবার কথা। এইরূপই কেউ যদি কাউকে অন্যায়ভাবে ভয় দেখায়, দুঃখ দেয়, তবে তাকে রক্ষা করা, অভয় দান করা আমার কর্তব্য।

তবে কুপাত্রকে অন্ন-জল এত বেশি দান করা উচিত নয় যে তাতে তার হিংসাপ্রবৃত্তি বৃদ্ধি পেয়ে পাপে প্রবৃত্ত হয়। হিংসুটে ব্যক্তি যদি অন্ন-জল না পেয়ে মৃত্যুমুখে পড়বে, এমন হয়, তাহলে তাকে ততটাই অন্ন-জল দিতে হয় যাতে তার প্রাণ বাঁচে। এইভাবে উপরোক্ত চারপ্রকার দানে পাত্র বিবেচনা করা উচিত নয়, প্রয়োজনীয়তা বিচার করা উচিত।

ভগবদ্‌ভক্তগণও বস্তু প্রদানের সময় পাত্র বিবেচনা করেন না, তাঁরা দানই করে যান। কারণ তাঁরা সকলের মধ্যেই তাঁদের প্রিয় প্রভুকে দর্শন করেন যে, এইরূপে আমার প্রভুই বিরাজমান। তাই তাঁরা দান বা কর্তব্য পালন না করে পূজাই করে থাকেন—**'স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য'** (গীতা ১৮।৪৬)। তাৎপর্য হল এই যে ভক্তের সমস্ত ক্রিয়াগুলিই ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত।

কর্মফল সম্পর্কে বিশেষ কথা

একাদশ থেকে বাইশতম শ্লোক পর্যন্ত এই প্রকরণে যে সাত্ত্বিক যজ্ঞ, তপ ও দানের কথা বলা হয়েছে, সেগুলি সবই 'দৈবী-সম্পদ' এবং যে রাজস ও তামস যজ্ঞ, দান ও তপস্যার কথা বলা হয়েছে, সেগুলি সবই 'আসুরী-সম্পদ'।

আসুরী সম্পদে উদ্ধৃত 'রাজস' যজ্ঞ, তপ ও দানের দুটি ভাগ—দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট। দৃষ্টেরও দুটি ফল—তাৎকালিক এবং কালান্তরিক। যেমন, রাজসিক আহারের পরে যে তৃপ্তি হয়, সেটি তাৎকালিক ফল আর তার জন্য যে অসুখ হয় সেটি কালান্তরিক ফল। তেমনই অদৃষ্টেরও দুটি ফল—লৌকিক এবং পারলৌকিক। যেমন—দম্ভ সহকারে **'দম্ভার্থমপি চৈব যৎ'** (১৭।১২), সৎকার-মান-পূজার জন্য **'সৎকারমানপূজার্থম্'** (১৭।১৮), প্রত্যুপকারের জন্য **'প্রত্যুপকারার্থম্'** (১৭।২১) করা রাজস যজ্ঞ, তপ এবং দানের ফল লৌকিক এবং সেটি ইহলোকে, ইহজন্মে এবং শরীর থাকাকালীনই পাবার সম্ভাবনা থাকে[১]। স্বর্গই পরম প্রাপ্য বস্তু মনে করে তার প্রাপ্তির জন্য করা যজ্ঞের ফল 'পারলৌকিক' হয়ে থাকে। কিন্তু রাজস যজ্ঞ **'অভিসন্ধায় তু ফলম্'** (১৭।১২) এবং দান **'ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ'** (১৭।২১) এগুলির ফল লৌকিক ও পারলৌকিক—উভয়ই হতে পারে। এর মধ্যেও স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য যজ্ঞ করলে (২।৪২-৪৩ ; ৯।২০-২১) এবং শুধুমাত্র দম্ভ-সৎকার-মান-পূজা ও প্রত্যুপকারের জন্য যজ্ঞ-তপ-দান (১৭।১২, ১৮, ২১) করলে উভয় প্রকারের রাজসিক পুরুষরা জন্ম-মরণ চক্রে আবর্তিত হয়[২]। কিন্তু যারা তামস যজ্ঞ ও তপ করে (১৭।১৩, ১৯) সেই তামসিক ব্যক্তিরা অধোগতি প্রাপ্ত হয়—**'অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ'** (১৪।১৮), **'পতন্তি নরকেঽশুচৌ'** (১৬।১৬), **'আসুরীষ্বেব যোনিষু'** (১৬।১৯), **'ততো যান্ত্যধমাং গতিম্'** (১৬।২০)।

যে ব্যক্তি যজ্ঞ করে স্বর্গে যান, তিনি স্বর্গেও দুঃখ, শোক, জ্বালা, ঈর্ষা ইত্যাদি অনুভব করে থাকেন[৩]। যেমন—শতক্রতু ইন্দ্রেরও অসুরের অত্যাচারে কষ্ট হয়, কেউ তপস্যা করলে তাঁর হৃদয়ে জ্বালা হয়, ভীত-সন্ত্রস্ত হয়। একে পূর্বজন্মের পাপের ফলও বলা যায় না। কারণ তাঁদের

[১]রাজসের দৃষ্ট কালান্তরিক ফল ও অদৃষ্ট লৌকিক ফল—দুটি একরকম দেখালেও দুয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে ; যেমন—আহারের পরিণামে যে রোগ হয় তা ভৌতিক (কালান্তরিক) ফল অর্থাৎ বর্তমান আহারেরই পরিণাম এবং পুত্রেষ্টি যজ্ঞের যে ফল তা আধিদৈবিক (লৌকিক) ফল অর্থাৎ তা প্রারব্ধ হয়ে ফলের (পুত্রের) রূপে আসে।

[২]রাজসিক ব্যক্তিদের দম্ভ (১৭।১২, ১৮) অধিক বৃদ্ধি পেলে তারা নরকেও যেতে পারে।

[৩]স্বর্গলোকেও পুণ্যকর্ম অনুযায়ী উচ্চ, মধ্য ও কনিষ্ঠ—তিনটি শ্রেণী থাকে। এদের মধ্যেও উচ্চশ্রেণীর লোক যখন অন্য উচ্চশ্রেণীকে দেখে তখন ঈর্ষা সহকারে ভাবে যে এ কী করে আমার সমান হল ? মধ্য ও কনিষ্ঠ শ্রেণীকে দেখে নিজেকে বড় ভেবে অহংভাব আসে।

মধ্যম শ্রেণী উচ্চশ্রেণীদের ভোগ্যসামগ্রী, পদ, অধিকার দেখে ঈর্ষাবোধ করে এবং কনিষ্ঠ শ্রেণীদের দেখে তাদের মধ্যে অহংবোধ আসে।

কনিষ্ঠ শ্রেণীরাও উচ্চ ও মধ্যম শ্রেণীদের দেখে অসহিষ্ণু হয় ও তাদের ভোগ্যসামগ্রী দেখে জ্বালা বোধ করে, উচ্চশ্রেণীদের

স্বর্গপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধকরূপ পাপ দূর হয়েছে—**'পূতপাপাঃ'** (৯।২০) এবং তাঁরা যজ্ঞের পুণ্যে স্বর্গলোক গমন করেন। তাহলে তাঁদের দুঃখ, জ্বালা, ভয় ইত্যাদি কোন্ পাপের ফল ? তার উত্তর হল, এই সবই যজ্ঞে কৃত পশুহিংসার পাপের ফল।

দ্বিতীয়তঃ, যজ্ঞাদি সকাম কর্মের দ্বারাও নানাপ্রকার দোষ হয়। গীতায় বলা হয়েছে **'সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ'** (১৮।৪৮) অর্থাৎ ধূমে অগ্নির মতো সমস্ত কর্মই কোনো না কোনো দোষের সঙ্গে যুক্ত। সমস্ত কর্মের আরম্ভেই যখন দোষ থাকে, তখন সকাম কর্মেও (সকাম ভাব থাকায়) দোষের সম্ভাবনা বেশি থাকে এবং তাতে নানাপ্রকার দোষ উৎপন্নও হয়। তাই শাস্ত্রে যজ্ঞ করার পর প্রায়শ্চিত্ত করার বিধান থাকে। প্রায়শ্চিত্তের বিধান থেকেই প্রমাণিত হয় যে, যজ্ঞে দোষ (পাপ) অবশ্যই হয়। যদি দোষ না হত তাহলে প্রায়শ্চিত্ত কীসের ? কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করলেও সব দোষ দূর হয় না, কিছু পাপ থেকেই যায় ; যেমন—কাপড়ে ময়লা লাগলে তা সাবান দিয়ে পরিষ্কার করলেও তার তন্তুর মধ্যে কিছু ময়লা থেকেই যায়। সেইজন্যই ইন্দ্রাদি দেবতাদেরও প্রতিকূল-পরিস্থিতিজনিত দুঃখ ভোগ করতে হয়।

নিষ্কামভাবে কর্তব্য-কর্ম করে সেই কর্ম ভগবানকে অর্পণ করলে তবেই দোষের পূর্ণ নিবৃত্তি সম্ভব। তাই নিষ্কামভাবে করা কর্মই হল শ্রেষ্ঠকর্ম। 'আমি শুধু ভগবানেরই'—এইভাবে অহংবোধ পরিবর্তন করে ভগবদ্প্রাপ্তির উদ্দেশ্য রেখে কর্ম করলে সব থেকে বেশি শুদ্ধি (দোষ-নিবৃত্তি) হয়। এর দ্বারা যত পরিশুদ্ধ হওয়া যায়, কর্মের দ্বারা তা সম্ভব নয়[১]। ভগবান বলেছেন—

সনমুখ হোই জীব মোহি জবহীঁ।
জন্ম কোটি অঘ নাসহিঁ তবহীঁ॥

(শ্রীরামচরিতমানস ৫।৪৪।১)

তৃতীয়তঃ, গীতায় অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে মানুষ না চাইলেও পাপাচরণ কেন করে ? উত্তরে ভগবান বললেন—**'কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ'** (৩।৩৭)। অর্থাৎ রজোগুণ থেকে উদ্ভূত কামনাই পাপে প্রবৃত্ত করায় তাই কামনাসহ যে রাজস যজ্ঞ করা হয় তাতে পাপ হবার সম্ভাবনা থাকে।

রাজস ও তামস যজ্ঞ যাঁরা করেন, তাঁরা আসুরী-সম্পদসম্পন্ন হন, আর সাত্ত্বিক যজ্ঞ যাঁরা করেন, তাঁরা দৈবী-সম্পদসম্পন্ন হয়ে থাকেন ; কিন্তু দৈবী-সম্পদের গুণেও যদি 'রাগ' বা আসক্তি থাকে, তাহলে রজোগুণের ধর্ম হওয়ায় সেটিও বন্ধনকারক হয়ে ওঠে (গীতা ১৪।৬)।

পরিশিষ্ট-ভাব—শাস্ত্রে আছে কলিযুগে দানই একমাত্র ধর্ম ; অতএব যে কোনোভাবেই দান করা হোক না কেন, তাতে কল্যাণই হয়। এর অর্থ হল যে কলিযুগে যজ্ঞ-দান-তপ-ব্রতাদি শুভকর্ম বিধিপূর্বক পালন করা অত্যন্ত কঠিন ; অতএব যে কোনোভাবে দান করার অভ্যাস যেন হয়। তাই যে কোনো প্রকারেই হোক দান করে যাওয়া উচিত।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—ষোড়শ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে মোক্ষের জন্য দৈবী-সম্পদ এবং বন্ধনের জন্য আসুরী-সম্পদের কথা বলা হয়েছে। দৈবী-সম্পদধারী সাত্ত্বিক ব্যক্তি পরমাত্মপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে যে যজ্ঞ, তপ ও দানরূপ কর্ম করে থাকেন, সেই কর্মে ভাব, বিধি, ক্রিয়া ইত্যাদির অভাব পূরণের জন্য কী করা কর্তব্য ? সেটি জানাবার জন্য ভগবান পরবর্তী প্রকরণ আরম্ভ করেছেন।

দেখে ঈর্ষান্বিত হয় এবং সমশ্রেণীভুক্তদের দেখেও ঈর্ষান্বিত হয় যে, এরা কী করে আমার সমকক্ষ হল, আর যারা স্বর্গে আসতে পারেনি, তাদের দেখে অহংভাব আসে যে আমি কত বড়।

স্বর্গের স্থিতিও নিত্য নয়। কারণ যে শ্রেণীতেই থাকুক, পুণ্য ক্ষীণ হলে তাকে মৃত্যুলোকে ফিরতেই হয়—'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি' (গীতা ৯।২১) এবং সবসময় তার জন্য চিন্তা থাকে যে, আমার এই স্থিতি থাকবে না, একদিন শেষ হবে।

[১]পরশ্রীকাতরতা, ঈর্ষা ইত্যাদি যতপ্রকার দোষ, সেগুলি পূর্বকৃত কর্মের ফল নয়। এগুলি অন্তরের অশুদ্ধির জন্য হয়। শাস্ত্রবিহিত সকাম কর্ম করলে অন্তঃকরণ সর্বতোভাবে পরিশুদ্ধ হয় না, আংশিক শুদ্ধি হয় ; যার ফলে স্বর্গাদি লোকের ভোগ লাভ হয়। অন্তঃকরণের অশুদ্ধি তখনই সর্বতোভাবে দূর হয়, যখন একমাত্র ভগবানই উদ্দেশ্য হয়ে থাকেন।

ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা॥ ২৩ ॥

[ওঁ, তৎ, সৎ (ওঁ, তৎ, সৎ) ; ইতি, ত্রিবিধঃ (এই তিন নামে) ; ব্রহ্মণঃ (যে পরমাত্মাকে) ; নির্দেশঃ, স্মৃতঃ (নির্দেশ করা হয়েছে) ; তেন, পুরা (সেই পরমাত্মাই, পুরাকালে) ; বেদাঃ, চ, ব্রাহ্মণাঃ (বেদ ও ব্রাহ্মণ) ; চ, যজ্ঞাঃ (এবং যজ্ঞাদি) ; বিহিতাঃ (সৃষ্টি করেছেন।)]

'ওঁ, তৎ, সৎ'—এই তিন নামে যে পরমাত্মাকে নির্দেশ করা হয়েছে, সেই পরমাত্মার দ্বারা পুরাকালে বেদ, ব্রাহ্মণ এবং যজ্ঞাদি সৃষ্ট হয়েছে॥ ২৩ ॥

ব্যাখ্যা—'ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ'—ওঁ, তৎ এবং সৎ—এই তিনটি পরমাত্মাকে নির্দেশ করে অর্থাৎ পরমাত্মার তিনটি নাম (পরবর্তী চারটি শ্লোকে ভগবান এই তিনটি নামের ব্যাখ্যা করেছেন)।

'ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা'—এই পরমাত্মাই পুরাকালে বেদ, ব্রাহ্মণ এবং যজ্ঞ সৃষ্টি করেছেন। এই তিনের মধ্যে বিধি জানাবার জন্য বেদ, অনুষ্ঠান করার জন্য ব্রাহ্মণ এবং ক্রিয়া করার জন্য যজ্ঞ রয়েছে। এখন এই যজ্ঞ, তপ, দান ইত্যাদি ক্রিয়াতে যদি কোনো ত্রুটি বা ন্যূনতা হয় তবে কী করা উচিত? পরমাত্মার নাম স্মরণ করলে সেই অভাব পূর্ণ হয়। যেমন, রন্ধনকারী আটা মাখার সময় যদি বেশি জল দিয়ে ফেলে তখন সে কী করে ? আরও আটা মিশিয়ে নেয়। তেমনই যদি কেউ নিষ্কামভাবে যজ্ঞ, দান ইত্যাদি শুভ-কর্ম করে আর তাতে যদি কোনো কিছুর অভাব বা অঙ্গহানি ঘটে, তাহলে যে ভগবান যজ্ঞাদির সৃষ্টি করেছেন, তাঁর নাম স্মরণ করলে সেই অঙ্গহানি দোষ পূরণ হয়ে যায়।

পরিশিষ্ট-ভাব—মহানির্বাণতন্ত্রে উদ্ধৃত আছে—

ওঁ তৎসদিতি মন্ত্রেণ যো যৎকর্ম সমাচরেৎ। গৃহস্থো বাপ্যুদাসীনস্তস্যাভীষ্টায় তদ্‌ ভবেৎ॥
জপো হোমঃ প্রতিষ্ঠা চ সংস্কারাদ্যখিলাঃ ক্রিয়াঃ। ওঁ তৎসন্মন্ত্রনিষ্পন্নাঃ সম্পূর্ণাঃ স্যুর্ন সংশয়ঃ॥ (১৪।১৫৪-১৫৫)

'ওঁ তৎ সৎ'—এই মন্ত্রের সাহায্যে গৃহস্থ বা উদাসীন ব্যক্তি (সাধু) যে কর্মই আরম্ভ করুন, এর দ্বারা তাঁরা তাঁদের অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হন। জপ, হোম, প্রতিষ্ঠা, সংস্কার ইত্যাদি সমস্ত ক্রিয়াই যে 'ওঁ, তৎ, সৎ'—এই মন্ত্রের দ্বারা সফল হয়, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।

❋ ❋ ❋

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্॥ ২৪ ॥

[তস্মাৎ (সেইজন্য) ; ব্রহ্মবাদিনাম্ (বৈদিক সিদ্ধান্ত মান্যকারী পুরুষদের) ; বিধানোক্তাঃ (শাস্ত্রবিধি নিয়ত) ; যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ (যজ্ঞ, দান ও তপরূপ কাজগুলি) ; সততম্, ওঁ (সর্বদা, ওঁ) ; ইতি (পরমাত্মার এই নাম) ; উদাহৃত্য (উচ্চারণের দ্বারাই) ; প্রবর্তন্তে (আরম্ভ হয়ে থাকে।)]

সেইজন্য বৈদিক সিদ্ধান্তগুলির মান্যকারী পুরুষদের শাস্ত্রবিধি নিয়ত যজ্ঞ, দান এবং তপরূপ ক্রিয়াগুলি সর্বদা 'ওঁ'—পরমাত্মার এই নাম উচ্চারণের দ্বারাই আরম্ভ হয়ে থাকে॥ ২৪ ॥

ব্যাখ্যা—'তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য......ব্রহ্মবাদিনাম্'—বেদবাদীদের জন্য অর্থাৎ বেদকে প্রধান বলে মানেন যে বৈদিক সম্প্রদায়, তাঁদের পক্ষে 'ওঁ' উচ্চারণই প্রধান বলে মানা হয়। তাঁরা 'ওঁ' উচ্চারণ করেই বেদপাঠ, যজ্ঞ, তপস্যা, দান ইত্যাদি শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হন। কারণ বেদের যত মন্ত্র এবং শ্রুতি আছে, তা 'ওঁ' উচ্চারণ ব্যতীত ফলদান করে না।

সর্বপ্রথমেই কেন 'ওঁ' উচ্চারণ করা হয় ? কারণ

সর্বপ্রথম 'ওঁ'—প্রণব প্রকটিত হয়েছে। প্রণবের তিনটি মাত্রা। সেই মাত্রা থেকে ত্রিপদা গায়ত্রী প্রকটিত হয়েছেন এবং ত্রিপদা গায়ত্রী থেকে ঋক্-সাম-যজুঃ—এই ত্রিবেদ প্রকটিত হয়েছেন। সেই দৃষ্টিতে 'ওঁ' সবকিছুর মূল এবং গায়ত্রী ও সমস্ত বেদই এর অন্তর্গত। তাই যতপ্রকার বৈদিক ক্রিয়া করা হয়, তা সবই 'ওঁ' উচ্চারণ করেই করা হয়।

*** *** ***

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ॥ ২৫ ॥

[তৎ (তৎ) ; **ইতি** (এরূপ মেনে নিয়ে) ; **মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ** (মুক্তি কামনাকারী ব্যক্তিগণ) ; **ফলম্, অনভিসন্ধায়** (ফলেচ্ছাবর্জন করে) ; **বিবিধাঃ, যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ** (নানা যজ্ঞ ও তপস্যা) ; **চ, দানক্রিয়াঃ, ক্রিয়ন্তে** (ও দানাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত করেন।)]

'তৎ'—এই নামের দ্বারা যাঁকে নির্দেশ করা হয়েছে সেই পরমাত্মার জন্যই সমস্ত কিছু করা, এরূপ মেনে নিয়ে মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ ফলেচ্ছা বর্জন করে নানা প্রকারের যজ্ঞ এবং তপস্যা ও দানাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন॥ ২৫ ॥

ব্যাখ্যা—**'তদিত্যনভিসন্ধায়........মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ'** সেই পরমাত্মার প্রসন্নতা লাভের উদ্দেশ্যে, মনে বিন্দুমাত্র ফলের আশা না রেখে শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞ, তপ, দানাদি শুভকর্ম করা উচিত। কারণ বিহিত-নিষিদ্ধ, শুভ-অশুভ ক্রিয়াদি আরম্ভ ও সমাপ্ত হয়। এইভাবেই সেই ক্রিয়ার যে ফল, তার সংযোগ এবং বিয়োগ হয় অর্থাৎ কর্মফলের ভোগেরও আরম্ভ ও সমাপ্তি হয়। কিন্তু পরমাত্মা সেই ক্রিয়া এবং ফলভোগের আরম্ভ হওয়ার আগেও ছিলেন আর ক্রিয়া ও ফলভোগের সমাপ্তির পরেও থাকবেন এবং ক্রিয়া ও ফলভোগের সময়ও একইভাবে থাকেন। পরমাত্মার অস্তিত্ব নিত্য এবং নিরন্তর। নিত্য বিরাজিত এই অস্তিত্বের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই **'তৎ ইতি'** পদটি ব্যবহৃত এবং বিনাশশীল ফলের দিকে দৃষ্টি না দেওয়াই **'অনভিসন্ধায় ফলম্'** পদটির তাৎপর্য অর্থাৎ নিত্য বিরাজমান তত্ত্বের স্মৃতি থাকা উচিত এবং বিনাশশীল ফলের অভিসন্ধি বা আকাঙ্ক্ষা কোনোভাবেই রাখা উচিত নয়।

নিত্য-নিরন্তর যা বিযুক্ত হয়, প্রতিমুহূর্তে যা অনস্তিত্বের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, জগতে এইসব পদার্থ যা দেখা, শোনা ও জানা যায়, সেগুলিকেই আমরা প্রত্যক্ষ ও সত্য বলে মনে করি, সেগুলির প্রাপ্তিতে আমরা নিজেদের বুদ্ধিমান ও সেই পরিশ্রমকে সার্থক বলে ভেবে নিই। এই পরিবর্তনশীল জগৎকে সত্য বলে মনে করার জন্যই পরমাত্মা সদাসর্বদা সর্বত্র পরিপূর্ণভাবে বিরাজ করলেও আমরা তাঁকে অনুভব করতে পারি না। তাই একমাত্র পরমাত্মাকেই উদ্দেশ্য মনে করে জগতের সঙ্গে অহং ও মমত্ববোধ (আমি-আমার ভাব) পরিত্যাগ করে, তাঁর প্রদত্ত শক্তিতে, তাঁরই মনে করে নিষ্কামভাবে তাঁর জন্যই যজ্ঞাদি শুভকর্ম করা উচিত। এতেই মানুষের প্রকৃত বুদ্ধি, বল (পুরুষার্থ) ও সাফল্য বিরাজ করে। অর্থাৎ এই যে জগৎ-সংসার প্রত্যক্ষ বলে প্রতীত হচ্ছে অন্তর থেকে তার গুরুত্ব দূর করতে হবে আর যাকে অপ্রত্যক্ষ বলে মনে করা হয়, সেই 'তৎ' নামে কথিত পরমাত্মাকে অনুভব করতে হবে, যিনি নিত্য-নিরন্তর প্রাপ্ত রয়েছেন।

ভগবানের ভক্তগণ (ভগবানকে উদ্দেশ্য করে) **'তৎ'** পদের বোধক রাম, কৃষ্ণ, গোবিন্দ, নারায়ণ, বাসুদেব, শিব ইত্যাদি নাম উচ্চারণ করে সকল ক্রিয়া আরম্ভ করেন।

কল্যাণকামী মানুষ যজ্ঞ-দান-তপ-তীর্থ-ব্রত-জপ-স্বাধ্যায়-ধ্যান-সমাধি ইত্যাদি যেসব ক্রিয়া করেন, তা সবই ভগবানের জন্য, তাঁর প্রসন্নতার জন্য, তাঁর আদেশ পালনের জন্যই করে থাকেন, নিজের জন্য নয়। কারণ যে শরীর, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ ইত্যাদির সাহায্যে ক্রিয়াদি অনুষ্ঠিত হয়, তার কোনোটিই আমাদের নয়, সবই পরমাত্মার। যখন শরীর ইত্যাদিই আমাদের নিজের নয়, তখন ঘর-বাড়ি, জমি-জায়গা, অর্থ-সম্পদ, আত্মীয়-স্বজন ইত্যাদিও আমাদের নয়। এগুলি সবই ভগবানের আর এতে যে সামর্থ্য বা শক্তি, তাও ভগবানের এবং আমি নিজেও ভগবানেরই। আমি তাঁর এবং তিনি আমার—এইভাবে তাঁরা সমস্ত ক্রিয়াই ভগবানের প্রসন্নতার জন্য করেন।

পরিশিষ্ট-ভাব—পরমাত্মার উদ্দেশ্যে পরোক্ষবাচক 'তৎ' (তিনি) পদটির ব্যবহারের অর্থ হল যে পরমাত্মা অলৌকিক—**'উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ'** (গীতা ১৫।১৭)-কোনো বিচারের বিষয় নয়, তিনি হলেন শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের বিষয়।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—চব্বিশতম শ্লোকে 'ওঁ' এবং পঁচিশতম শ্লোকে 'তৎ'শব্দের ব্যাখ্যা করে ভগবান পরবর্তী দুটি শ্লোকে পাঁচ প্রকারে 'সৎ' শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন।

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে॥ ২৬ ॥

[**পার্থ** (হে পার্থ !) ; **সৎ, ইতি, এতৎ** (পরমাত্মার 'সৎ' এই নামটি) ; **সদ্ভাবে, চ** (অস্তিত্ব মাত্রে এবং) ; **সাধুভাবে** (শ্রেষ্ঠভাবে) ; **প্রযুজ্যতে** (প্রয়োগ করা হয়) ; **প্রশস্তে, কর্মণি** (মাঙ্গলিক কাজের সঙ্গেও) ; **সৎ, শব্দঃ** ('সৎ'শব্দটি) ; **যুজ্যতে** (ব্যবহৃত হয়।)]

হে পার্থ। পরমাত্মার 'সৎ'—এই নামটি অস্তিত্ব মাত্রে এবং শ্রেষ্ঠভাবে প্রয়োগ করা হয়, মঙ্গলজনক কাজের সঙ্গেও 'সৎ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়॥ ২৬ ॥

ব্যাখ্যা—'সদ্ভাবে'—'পরমাত্মা বিরাজমান' এইরূপ পরমাত্মার অস্তিত্বকে বোঝানোকে বলা হয় 'সদ্ভাব'। সেই পরমাত্মার সগুণ-নির্গুণ, সাকার-নিরাকার ইত্যাদি যতরূপ এবং সগুণ-সাকারে তাঁর বিষ্ণু, রাম, কৃষ্ণ, শিব, শক্তি, গণেশ, সূর্য ইত্যাদি যত অবতার আছেন, তাঁরা সবই এই 'সদ্‌ভাবের' অন্তর্গত। এইরূপ কোনো দেশ, কাল, বস্তু ইত্যাদিতে যাঁর কখনো অভাব হয় না ; এরূপ পরমাত্মার, যাঁর অনেক রূপ, অনেক নাম, বহুপ্রকার লীলা, তাঁদের সকলই এই সদ্ভাবের অন্তর্গত।

'সাধুভাবে'—পরমাত্মপ্রাপ্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের পৃথক্ পৃথক্ যতপ্রকার সাধন-প্রণালী বলা আছে, তার মধ্যে হৃদয়ের দয়া, ক্ষমা ইত্যাদি যত শ্রেষ্ঠ, উত্তম ভাব, তা সবই সাধু-ভাবের অন্তর্গত।

'সদিতেতৎ প্রযুজ্যতে'—অস্তিত্বে এবং শ্রেষ্ঠত্বে 'সৎ' শব্দটি প্রয়োগ করা হয় অর্থাৎ যা সদা বিরাজমান, যাতে কখনো, বিন্দুমাত্র হ্রাস বা অভাব হয় না—সেই পরমাত্মার জন্য এবং তার প্রাপ্তির জন্য দৈবী-সম্পদের সত্য, ক্ষমা, উদারতা, ত্যাগ ইত্যাদি যেসব শ্রেষ্ঠ গুণ, সেই গুণের জন্য 'সৎ' শব্দটি প্রয়োগ করা হয় ; যেমন—সৎ-তত্ত্ব, সদ্‌গুণ, সদ্‌ভাব ইত্যাদি।

'প্রশস্তে কর্মাণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে'—পরমাত্মাপ্রাপ্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যত বিভিন্ন প্রকার সাধনের কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে ক্রিয়ারূপে যে আচরণগুলি শ্রেষ্ঠ, সেগুলিকেই **'প্রশস্তে কর্মণি'** বলা হয়েছে। এইরূপ শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী যজ্ঞোপবীত (পৈতেধারণ), বিবাহ ইত্যাদি যে মঙ্গলকার্য, অন্নদান, ভূমিদান, গোদান রূপ যে দান, কূপ-পুষ্করিণী খনন, ধর্মশালা, মন্দির নির্মাণ ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ কর্মগুলিও **'প্রশস্তে কর্মণি'**র অন্তর্গত। এইসব শ্রেষ্ঠ আচরণাদিতে, শ্রেষ্ঠ কর্মগুলিতে 'সৎ' শব্দের প্রয়োগ হয়ে থাকে ; যেমন—সদাচার, সৎকর্ম, সৎ সেবা, সৎ ব্যবহার ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট-ভাব—পরমাত্মার সত্তা বা অস্তিত্বকে **'সদ্ভাব'** বলা হয়, যাঁর কখনো অনস্তিত্ব (না-থাকা) হয় না **'নাভাবো বিদ্যতে সতঃ'** (গীতা ২।১৬)। প্রায় সকল আস্তিক ব্যক্তিই মেনে নিয়ে থাকেন যে সবার ওপরে সর্ব নিয়ন্তা কোনো এক বিশেষ শক্তি সর্বদা বিরাজমান এবং তা অপরিবর্তনশীল। যে জগৎ-সংসার প্রত্যক্ষভাবে প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তিত হচ্ছে এবং যার অনস্তিত্ব (না-থাকা) ঘটছে, তাকে 'আছে' অথবা স্থির কী করে বলা যায় ? কারণ ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ইত্যাদির সাহায্যে যাকে দেখা এবং জানা যায়, সেই জগৎ-সংসার আগে ছিল না, পরেও থাকবে না এবং বর্তমানেও পরিবর্তিত হচ্ছে—সকলেই এটি অনুভব করে থাকেন। যার সাহায্যে এই জগৎ-সংসার দেখা হয়, জানা হয়, সেই ইন্দ্রিয়াদি তথা বুদ্ধিও জগৎ-সংসারেরই। তবু আশ্চর্যের ব্যাপার হল যে 'না থাকলে'ও এই জগৎ-সংসার 'আছে' রূপে স্থিররূপে

প্রতিভাত হয়। যদি বাস্তবিক জগৎ-সংসার সত্য হত তাহলে এটি পরিবর্তিত হত না, আর যদি পরিবর্তিত হয় তাহলে এটি 'নেই'। সুতরাং এর যে অস্তিত্ব তা জগৎ-সংসার বা শরীর ইত্যাদির নয়, তা হল প্রকৃতপক্ষে সৎ-তত্ত্বের (পরমাত্মার) ; যার জন্য না থাকলেও জগৎ-সংসার 'আছে' বলে প্রতিভাত হয়।

অন্তঃকরণের শ্রেষ্ঠ ভাবগুলিকে **'সাধুভাব'** বলা হয়। পরমাত্মার প্রাপ্তিতে সাহায্যকারী হওয়ায় শ্রেষ্ঠ ভাবের জন্য 'সৎ' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। শ্রেষ্ঠ ভাব অর্থাৎ সদ্‌গুণ-সদাচার দৈবী সম্পদ। দৈবী সম্পদকে 'সৎ' এবং আসুরী সম্পদকে 'অসৎ' বলা হয়। মুক্তিপ্রদানকারী সকল সাধনই 'সৎ' আর বন্ধনকারক সকল কর্মই 'অসৎ'। অপগুণ-দুরাচার হল 'অসৎ' আর তার ত্যাগ করাকেই বলা হয় 'সৎ'। অসতের ত্যাগও 'সৎ' আর সৎকে গ্রহণ করাও 'সৎ'। প্রকৃতপক্ষে 'অসৎ' ত্যাগ করা যত প্রয়োজন, 'সৎ' গ্রহণ করা তত প্রয়োজনীয় নয়। 'অসৎ' পরিত্যাগ না করে 'সৎ' গ্রহণ করলে তা হয় অদৃঢ়, তাই স্থায়ী হয় না। অসৎ ত্যাগ করলে 'সৎ'-এর উন্মেষ অন্তর থেকে হয়। সুতরাং আমরা যা অসৎ-বলে জানি, তা পরিত্যাগ করলেই 'সৎ' অনুভূত হয়।

যজ্ঞ-তপস্যা-দান-তীর্থ-ব্রত-পূজা-পাঠ, বিবাহ ইত্যাদি যতপ্রকার শাস্ত্রবিহিত শুভকর্ম আছে, সেগুলি স্বভাবতঃই প্রশংসনীয় হওয়ায় সৎকর্ম বলে পরিগণিত হয়। কিন্তু এই প্রশংসনীয় কর্মগুলির সম্পর্ক যদি ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত না হয় তাহলে এগুলি 'সৎ' কর্ম না হয়ে শুধুমাত্র শাস্ত্রবিহিত কর্ম হয়ে থাকে। দৈত্য-দানবেরা যদিও তপস্যা ইত্যাদি প্রশংসনীয় কর্ম করে, কিন্তু তাতে অসদ্‌ভাব অর্থাৎ নিজ স্বার্থ ও অপরের অহিতের ভাবনা থাকায় সেগুলি বন্ধন-কারক অসৎ কর্ম হয়ে ওঠে (১৭।১৯)। সেই সৎ কর্মগুলির দ্বারা যদি তাদের ব্রহ্মলোকও প্রাপ্তি হয়, তাহলে তাদের সেখান থেকে ফিরে আসতে হয়—**'আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন'** (গীতা ৮।১৬)। যাঁরা ভগবদ্‌প্রাপ্তির জন্য কর্ম করেন, তাঁরা কখনো দুর্দশাগ্রস্ত হন না—**'নহি কল্যাণকৃৎকশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি'** (গীতা ৬।৪০) ; কেন-না তার ফল 'সৎ' হয়। যে কর্ম স্বার্থ ও অহং-অভিমান পরিত্যাগ করে প্রাণীমাত্রেরই হিতের উদ্দেশ্যে করা হয়, প্রকৃতপক্ষে সেগুলিই প্রশংসনীয় সৎকর্ম বলে পরিগণিত হয়।

❋ ❋ ❋

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে॥ ২৭ ॥

[**যজ্ঞে, চ, তপসি** (যজ্ঞ, তপস্যা) ; **চ, দানে** (এবং দানরূপ ক্রিয়ায় যে) ; **স্থিতিঃ** (স্থিতি বা নিষ্ঠা) ; **এব, সৎ** (তাকেও সৎ) ; **ইতি, উচ্যতে, চ** (বলা হয় এবং) ; **তদর্থীয়ম্** (পরমাত্মাকে উদ্দেশ্য করে) ; **কর্ম** (যে কর্ম করা হয়) ; **এব, সৎ, ইতি** (তাকেও সৎ বলে) ; **অভিধীয়তে** (অভিহিত করা হয়।)]

যজ্ঞ, তপস্যা এবং দানরূপ ক্রিয়ায় যে স্থিতি বা নিষ্ঠা—তাকেও 'সৎ' বলা হয় এবং পরমাত্মাকে উদ্দেশ্য করে যে কর্ম করা হয় তাকেও 'সৎ' বলে অভিহিত করা হয় ॥ ২৭ ॥

ব্যাখ্যা—'যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে'—যজ্ঞ, তপস্যা ও দানরূপ প্রশংসনীয় ক্রিয়াতে যে স্থিতি বা নিষ্ঠা, তাকে 'সৎ' বলা হয়। যেমন, কারও সাত্ত্বিক যজ্ঞে, সাত্ত্বিক তপে, সাত্ত্বিক দানে যে স্থিতি বা নিষ্ঠা থাকে অর্থাৎ এগুলির প্রতি চিত্তে যে শ্রদ্ধা এবং অনুষ্ঠিত করার যে তৎপরতা থাকে, তাকে বলা হয় **'সন্নিষ্ঠা'** বা 'সৎ-নিষ্ঠা'।

'চ' পদটি ব্যবহারের অর্থ হল যেমন, লোকেদের সাত্ত্বিক যজ্ঞ, তপ ও দানে শ্রদ্ধা-নিষ্ঠা থাকে, তেমনই কারও বর্ণ-ধর্মে, কারও আশ্রমধর্মে, কারও সত্য-ব্রত-পালনে, কারও অতিথি-সৎকারে, কারও সেবায়, কারও নির্দেশ পালনে, কারও পাতিব্রাত্য-ধর্মে, কারও গঙ্গাতে, কারও যমুনাতে, কারও প্রয়াগে বা বিশেষ তীর্থের প্রতি হৃদয়ে যে শ্রদ্ধা, রুচি, বিশ্বাস থাকে, তাকেও বলা হয় **'সন্নিষ্ঠা'**।

'কর্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে'—এই প্রশংসনীয় কর্ম ব্যতীত কর্মের দুটি প্রকার হয়—লৌকিক (বাহ্যতঃ সংসার সম্পর্কীয়) এবং পারমার্থিক

(বাহ্যতঃ ভগবদ্সম্পর্কীয়)

(১) বর্ণ ও আশ্রম অনুযায়ী জীবিকার জন্য যজ্ঞ, অধ্যাপনা, ব্যবসায়, চাষ-আবাদ ইত্যাদি ব্যবহারিক কর্তব্য-কর্ম এবং খাওয়া-দাওয়া, ওঠা-বসা, চলা-ফেরা, শোওয়া-জাগা ইত্যাদি যে শারীরিক কর্ম—এগুলি সবই 'লৌকিক'।

(২) জপ-ধ্যান, পূজা-পাঠ, কথা-কীর্তন, শ্রবণ-মনন, ধ্যান-চিন্তা ইত্যাদি যেসব কর্ম করা হয়, তা সবই 'পারমার্থিক'।

এই দুপ্রকার কর্মই যদি সুখ-আরামের আশা পরিত্যাগ করে নিষ্কামভাবে এবং শ্রদ্ধা-বিশ্বাস সহকারে শুধু ভগবানের জন্য অর্থাৎ ভগবদ্প্রীত্যর্থে করা হয় তাহলে এ সবই 'তদর্থীয় কর্ম' হয়ে থাকে অর্থাৎ সৎস্বরূপ পরমাত্মার সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় এগুলি সব 'দৈবীসম্পদ' হয়, যা মুক্তি প্রদান করে।

আগুনে মৃন্ময় পাত্রের একটি টুকরো রাখলে আগুনের তাপে সেটিও আগুনের রূপ ধারণ করে, এটি আগুনেরই বিশেষত্ব। তেমনই পরমাত্মার উদ্দেশ্যে যে কর্মই করা হোক, তা সবই সৎ অর্থাৎ পরমাত্মস্বরূপ হয়ে ওঠে অর্থাৎ সেই কর্মের দ্বারা পরমাত্মপ্রাপ্তি হয়। সেই কর্মে যে বিশেষ ভাব দেখা যায়, তা পরমাত্মার সম্বন্ধ থেকেই আসে। প্রকৃতপক্ষে কর্মের নিজের কোনো বিশেষত্ব নেই।

'তদর্থীয়ম্' কথাটি এইস্থানে ব্যবহারের তাৎপর্য হল এই যে, যারা উচ্চভোগ এবং স্বর্গাদি কামনা না করে শুধু পরমাত্মাকে চায়, নিজ কল্যাণ চায়, মুক্তি চায়, সেইসব সাধকদের যা কিছু পারমার্থিক সাধনসম্পদ সঞ্চিত হয় তা সবই সৎরূপে পরিণত হয়। ভগবান এই বিষয়ে বলেছেন যে 'যারা কল্যাণকর কাজ করে, তাদের কখনো দুর্গতি হয় না (গীতা ৬।৪০) শুধু তাই নয়, যেসব ব্যক্তি যোগের (সমত্ব বা পরমাত্মতত্ত্বের) জিজ্ঞাসু, তাঁরাও বেদে স্বর্গাদি প্রাপ্তির জন্য বর্ণিত সকাম কর্ম থেকে উচ্চে আরোহণ করে থাকেন' (গীতা ৬।৪৪)। কারণ সেই কর্মগুলি ফল প্রদান করে নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু পরমাত্মার জন্য যে সাধনা করা হয়, তা কখনো নষ্ট হয় না, তা 'সৎ' হয়ে ওঠে।

পরিশিষ্ট-ভাব—পঁচিশতম শ্লোকে নিষ্কামভাবে কর্ম করার কথা বলা হয়েছিল—**'অনভিসন্ধায় ফলম্'**। এখন এইস্থানে ভগবানের জন্য কর্ম করার কথা বলা হয়েছে। যাঁরা মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁরা নিষ্কামভাবে কর্ম করে থাকেন—**'মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ'** (গীতা ১৭।২৫) এবং যাঁরা ভক্তি লাভে ইচ্ছুক তাঁরা ভগবানের জন্য কর্ম করেন (গীতা ৯।২৬, ২৭, ২৮)।

ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও কর্ম 'সৎ' অর্থাৎ সৎ-ফলপ্রদানকারী হয় এবং অসতের সম্বন্ধ ত্যাগ করলেও কর্ম 'সৎ' হয়ে ওঠে।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে বলা হয়েছে যে, পরমাত্মার উদ্দেশ্যে কর্ম করলে সেই কর্ম 'সৎ' হয়ে ওঠে। কিন্তু পরমাত্মার উদ্দেশ্যরহিত হয়ে যে কর্ম করা হয়, তার সংজ্ঞা কী ? পরবর্তী শ্লোকে সেটি জানানো হচ্ছে।

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ॥ ২৮ ॥

[**পার্থ** (হে পার্থ!) ; **হুতম্, দত্তম্, তপ্তম্** (হোম, দান, তপস্যা) ; **তপঃ, চ, যৎ** (অথবা অন্য যা কিছু) ; **অশ্রদ্ধয়া, কৃতম্** (অশ্রদ্ধা সহকারে করা হয়) ; **অসৎ** (অসৎ) ; **ইতি, উচ্যতে** (বলা হয়) ; **তৎ, ইহ** (তার ফল ইহজন্মে) ; **নো, চ** (পাওয়া যায় না, অথবা) ; **ন, প্রেত্য** (পরজন্মেও না।)]

হে পার্থ ! হোম, দান, তপস্যা অথবা অন্য যা কিছু অশ্রদ্ধা সহকারে করা হয়, সেগুলিকে বলা হয় 'অসৎ'। তার ফল ইহজন্মেও পাওয়া যায় না, পরজন্মেও না অর্থাৎ এগুলি কখনো সৎ ফল প্রদানকারী হয় না॥ ২৮ ॥

ব্যাখ্যা—'**অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ**' —অশ্রদ্ধা সহকারে যজ্ঞ, দান ও তপস্যা করা এবং 'কৃতঞ্চ যৎ'[১] অর্থাৎ শাস্ত্রে যার নির্দেশ আছে, এরূপ যেসব কর্ম অশ্রদ্ধাপূর্বক করা হয়—সেগুলিকে 'অসৎ' বলা হয়।

'অশ্রদ্ধয়া' শব্দে শ্রদ্ধার অভাব বাচক 'নঞ্' সমাস ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ হল আসুরী ব্যক্তিরা পরলোক, পুনর্জন্ম, ধর্ম, ঈশ্বর ইত্যাদিতে শ্রদ্ধাশীল হয় না।

বরন ধর্ম নহিঁ আশ্রম চারী।
শ্রুতি বিরোধ রত সব নর নারী॥

(শ্রীরামচরিতমানস ৭।৯৮।১)

—এইরূপ বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করে এরা যজ্ঞ, দান ইত্যাদি ক্রিয়া করে থাকে।

এঁরা যখন শাস্ত্রে শ্রদ্ধাশীল নন, তখন যজ্ঞাদি শাস্ত্রীয় কর্ম কেন করেন ? তাঁরা এইজন্য শাস্ত্রীয় কর্ম করেন যে, লোকের মধ্যে এগুলির অত্যন্ত সমাদর আছে এবং যাঁরা এইসব শাস্ত্রীয় কর্ম করেন, জগতে তাঁদের সম্মান বাড়ে ও এই কর্মগুলি করাকে লোকে ভালো বলে মনে করে। তাই সমাজের চোখে ভালো হওয়ার জন্য এবং যাঁরা যজ্ঞাদি শাস্ত্রীয় কর্ম করেন, তাঁদের মধ্যে পরিগণিত হওয়ার জন্য এঁরা শ্রদ্ধা না থাকলেও শাস্ত্রীয় কর্ম করে থাকেন।

'**অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ**'—অশ্রদ্ধা সহকারে যেসব শাস্ত্রীয় কর্ম করা হয়, সেগুলিকে বলা হয় 'অসৎ'। সেগুলি ইহলোকেও ফল প্রদান করে না এবং পরলোকে বা জন্ম-জন্মান্তরেও ফল প্রদান করে না। তাৎপর্য হল এই যে সকামভাব নিয়ে শ্রদ্ধা ও বিধিপূর্বক শাস্ত্রীয় কর্মাদি করলে ইহকালে ধন-সম্পদ, স্ত্রী-পুত্র-পরিজন লাভ এবং মৃত্যুর পরে স্বর্গপ্রাপ্তি হয় আর সেই কর্মই নিষ্কামভাবে শ্রদ্ধা এবং বিধিপূর্বক করলে চিত্তশুদ্ধ হয়ে পরমাত্মপ্রাপ্তি হয় ; কিন্তু অশ্রদ্ধাপূর্বক কর্ম করলে এর কোনো ফলই লাভ হয় না।

এখানে যদি বলা হয় যে, অশ্রদ্ধা সহকারে যা কিছু করা হয় তার ইহলোকে বা পরলোকে কোনো ফল হয় না, তাহলে যত পাপকর্ম করা হয় সেগুলি সবই অশ্রদ্ধা সহকারে করা হলে তারও তো কোনো ফল হওয়া উচিত নয় ? আর মানুষ সুখভোগের জন্য এবং সংগ্রহ করার ইচ্ছা নিয়ে অন্যায়, অত্যাচার, মিথ্যা, কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি যত পাপকর্ম করে, সেইসব কর্মের ফল হিসাবে দণ্ডও চায় না অতএব এসবের ফলভোগও তার হওয়া উচিত নয় ? কিন্তু আসলে তা হয় না। বাস্তব হল, আসক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি আসক্তি সহকারে যে কর্মই করে, কর্তা না চাইলেও তার ফল তাকে ভোগ করতেই হয়। তাই আসুরী-সম্পদধারীদের বন্ধন এবং আসুরী যোনি ও নরক প্রাপ্তি হয়।

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এবং অত্যন্ত সাধারণ কর্মও যদি পরমাত্মার উদ্দেশ্যে নিষ্কামভাবে করা হয় তাহলে সেই কর্ম 'সৎ' হয়ে যায় অর্থাৎ তার দ্বারা পরমাত্মপ্রাপ্তি করা যায়। কিন্তু অতি বৃহৎ যজ্ঞাদি কর্মও যদি শ্রদ্ধাপূর্বক, শাস্ত্রীয়বিধি অনুসারে সকামভাবে করা হয়, তাহলে সেই কর্ম ফলপ্রদান করে নষ্ট হয়ে যায় ; পরমাত্মাকে লাভ করা যায় না এবং এই যজ্ঞকর্ম যদি অশ্রদ্ধাপূর্বক করা হয়, তাহলে সেগুলি সবই অসৎ হয়ে যায় অর্থাৎ 'সৎ' ফল প্রদানকারী হয় না। তাৎপর্য হল এই যে পরমাত্মার প্রাপ্তিতে ক্রিয়ার প্রাধান্য থাকে না, শ্রদ্ধাভাবেরই প্রাধান্য থাকে।

পূর্বোক্ত সদ্ভাব, সাধুভাব, প্রশস্ত কর্ম, সৎ-স্থিতি এবং তদর্থীয় কর্ম—এই পাঁচটির দ্বারা পরমাত্মা প্রাপ্তি করা যায় অর্থাৎ 'সৎ'—পরমাত্মার সঙ্গে সম্বন্ধ যোগ করাতে এগুলিকে 'সৎ' বলা হয়।

অশ্রদ্ধা দ্বারা করা কর্মগুলি 'অসৎ' কেন হয় ? বেদ, ভগবান এবং শাস্ত্র কৃপা করে মানুষের কল্যাণের জন্যই শুভকর্মগুলি জানিয়েছেন, কিন্তু যেসব ব্যক্তি এই তিনটির প্রতি অশ্রদ্ধা সহকারে শুভকর্ম করে, তাদের সব কর্ম 'অসৎ' হয়ে থাকে । এই তিনের ওপর অশ্রদ্ধা থাকায় তাদের নরকাদি সাজা পাওয়া উচিত ; কিন্তু যেহেতু তাদের কর্মগুলি শুভ, তাই তারা তার কোনো ফল পায় না— এই হল তাদের সাজা।

[১]এখানে 'সহচরিতাসহচরিতয়োর্মধ্যে সহচরিতস্যৈব গ্রহণম্'—ব্যাকরণের এই ন্যায় অনুসারে যজ্ঞ, দান এবং তপস্যার সাহচর্য থেকে 'কৃতম্' পদ দ্বারা শাস্ত্রীয় কর্মগুলিকেই ধরতে হবে।

যজ্ঞ-দান-তপ-তীর্থ-ব্রত ইত্যাদি শাস্ত্রবিহিত শুভকর্মগুলি মানুষের শ্রদ্ধা সহকারে নিষ্কামভাবে করা উচিত। বিশেষ কৃপাপরবশ হয়ে ভগবান এই মানবদেহ দিয়েছেন, এর দ্বারা শুভকর্ম করলে নিজের এবং অন্যের মঙ্গল হয়। তাই যার দ্বারা এখন এবং পরিণামে সকলের মঙ্গল হয়—সেই শ্রেষ্ঠ কর্তব্য-কর্ম শ্রদ্ধা সহকারে এবং ভগবানের প্রসন্নতার জন্য করা উচিত।

পরিশিষ্ট-ভাব—'**কৃতং চ যৎ**' পদটিতে নামজপ, কীর্তন এগুলি ধরা হয় না ; কারণ এগুলির সঙ্গে ভগবানের সম্বন্ধ থাকায় এগুলি 'কর্ম' নয়, এগুলিকে 'উপাসনা' বলা হয়।

❋ ❋ ❋

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

এইভাবে ওঁ, তৎ, সৎ—এই ভগবদ্‌নাম উচ্চারণপূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যা এবং যোগশাস্ত্রময় শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা উপনিষদ্‌রূপ শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে 'শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ' নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত হল ॥ ১৭ ॥

এই অধ্যায়ে শ্রদ্ধার তিনটি বিভাগ করা হয়েছে—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। যিনি এই বিভাগ ঠিকমতো অনুধাবন করবেন, তিনি সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা গ্রহণ করে রাজসিক ও তামসিক শ্রদ্ধা পরিত্যাগ করবেন। রাজসিক-তামসিক শ্রদ্ধা ত্যাগ করলেই (সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা দ্বারা) ভগবানের সঙ্গে স্বতঃসিদ্ধ নিত্য সম্পর্ক অনুভূত হয়। তাই এই অধ্যায়কে '**শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ**' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

সপ্তদশ অধ্যায়ের পদ, অক্ষর ও উবাচ

(১) এই অধ্যায়ে '**অথ সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ**'-এর তিন, '**অর্জুন উবাচ**' ইত্যাদি পদের চার, শ্লোকগুলির তিনশত আটত্রিশ এবং পুষ্পিকার তেরটি পদ আছে। এইভাবে সমস্ত পদের যোগসংখ্যা তিনশত আটান্ন।

(২) এই অধ্যায়ে '**অথ সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ**'-এর আট, '**অর্জুন উবাচ**' ইত্যাদি পদের তেরো, শ্লোকাদির আটশত ছিয়ানব্বই এবং পুষ্পিকার একান্নটি অক্ষর আছে। এইভাবে সমস্ত অক্ষরগুলির যোগসংখ্যা নয়শত আটষট্টি। এই অধ্যায়ের সমস্ত শ্লোকই বত্রিশ অক্ষর সংবলিত।

(৩) এই অধ্যায়ে দুটি উবাচ আছে—'**অর্জুন উবাচ**' এবং '**শ্রীভগবানুবাচ**'।

সপ্তদশ অধ্যায়ের প্রযুক্ত ছন্দ

এই অধ্যায়ের আঠাশটি শ্লোকের মধ্যে তৃতীয় শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে 'মগণ' এবং তৃতীয় পংক্তিতে 'ভগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় '**সঙ্কীর্ণ-বিপুলা**' ; দশম এবং দ্বাদশ শ্লোকের প্রথম পংক্তি ও পঁচিশ-ছাব্বিশতম শ্লোকের তৃতীয় পংক্তিতে 'নগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় '**ন-বিপুলা**' ষোড়শ-সপ্তদশতম শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে 'মগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় '**ম-বিপুলা**' ; একাদশ শ্লোকের তৃতীয় পংক্তিতে 'ভগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় 'ভ-বিপুলা' এবং উনিশতম শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে 'রগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় '**র-বিপুলা**' সংজ্ঞাসম্পন্ন ছন্দ হয়েছে। বাকি উনিশটি শ্লোক ঠিক '**পথ্যাবক্ত্র**' অনুষ্টুপ ছন্দের লক্ষণযুক্ত।

❋ ❋ ❋

॥ ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

অথাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

অষ্টাদশ অধ্যায়

অবতরণিকা

শ্রীভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ের উনচল্লিশতম শ্লোকে 'এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু' পদ দ্বারা যে সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগের কথা বলেছেন, তাকেই তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে সাংখ্যনিষ্ঠা ও যোগনিষ্ঠা নামে অভিহিত করেছেন। উভয় নিষ্ঠার তত্ত্ব পৃথক্‌ভাবে যথার্থরূপে জানার ইচ্ছা অর্জুনের মনে ছিল। কিন্তু ভগবানের যেমন সপ্তম অধ্যায় থেকে পঞ্চদশ অধ্যায় পর্যন্ত দৈবী-সম্পদ এবং আসুরী-সম্পদ সম্পর্কে বলার অবকাশ হয়নি, সেইরূপ অর্জুনও তৃতীয় থেকে সপ্তদশ অধ্যায় পর্যন্ত ওই দুটি নিষ্ঠার বিষয়ে নিজ জিজ্ঞাসা ব্যক্ত করার অবকাশ পাননি।

তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে দুটি নিষ্ঠার কথা বলে ভগবান চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে বলেছেন যে আমি সূর্যকে এই অবিনাশী যোগের কথা বলেছিলাম। তাতে অর্জুন প্রশ্ন করেছিলেন যে 'আপনার জন্ম তো এখন হয়েছে, তাহলে সৃষ্টির আদিতে সূর্যকে আপনি কী করে উপদেশ দিলেন ?' তার উত্তরে ভগবান তাঁর অবতারত্ব এবং কর্মযোগের তত্ত্ব বর্ণনা করেন। চতুর্থ অধ্যায়েরই চৌত্রিশতম শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে জ্ঞানপ্রাপ্ত করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন— 'তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া' এবং বিয়াল্লিশতম শ্লোকে যোগে স্থিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন— 'ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত'। এই দুটি পৃথক্ নির্দেশের জন্য অর্জুন পঞ্চম অধ্যায়ের প্রারম্ভে দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টি তাঁর কাছে নিশ্চিত কল্যাণকর সাধন, তাই জানতে চেয়েছিলেন। তার উত্তরে ভগবান সমগ্র পঞ্চম অধ্যায়ে এটির বর্ণনা করে নিজে থেকেই ষষ্ঠ অধ্যায়ের বিষয় বর্ণনা করতে শুরু করেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের তেত্রিশ-চৌত্রিশতম শ্লোকে অর্জুন মনের চাঞ্চল্য বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। ভগবান অত্যন্ত সংক্ষেপে তার উত্তর দিয়েছেন। পুনরায় অর্জুন সাঁইত্রিশ থেকে উনচল্লিশতম শ্লোক পর্যন্ত যোগভ্রষ্ট পুরুষের গতি বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন। ভগবান তার উত্তর দিয়ে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত করেছেন। ষষ্ঠ অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোকে ভগবান বলেছেন সমস্ত যোগীর মধ্যে তাঁর ভক্তই পরম শ্রেষ্ঠ। সেই সূত্র ধরেই ভগবান সপ্তম অধ্যায়ের বিষয় আরম্ভ করেছেন এবং এতে ভক্তির বিষয়ে সবিশেষ বর্ণনা করেছেন।

সপ্তম অধ্যায়ের শেষে উদ্ধৃত ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম প্রভৃতি নিয়ে অর্জুন অষ্টম অধ্যায়ের প্রারম্ভে সাতটি প্রশ্ন করেছেন। তার ছটি প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে দিয়ে শেষকালে গতি-বিষয়ক সপ্তম প্রশ্নের উত্তরে ভগবান বিস্তারিতভাবে অষ্টম অধ্যায়ের অবতারণা করেছেন। আবার সপ্তম অধ্যায়ে যে বিষয়টি বলা বাকি ছিল, তার বর্ণনা নবম অধ্যায়ে ও দশম অধ্যায়ের একাদশ শ্লোক পর্যন্ত করেছেন। দশম অধ্যায়ের নবম, দশম ও একাদশ শ্লোকে ভক্ত এবং তাঁর ওপরে কৃপার কথা শুনে অর্জুন অত্যন্ত প্রসন্ন ও প্রভাবিত হন। তাই তিনি দ্বাদশ থেকে অষ্টাদশ শ্লোক পর্যন্ত ভগবানের স্তুতি করেন এবং তাঁর বিভূতিগুলি বিস্তারিতভাবে বলার জন্য অনুরোধ করেন। ভগবান তাঁর প্রধান বিভূতিগুলি জানাবার পর দশম অধ্যায়ের শেষে বলেছেন—' হে অর্জুন ! তোমার অধিক জানার প্রয়োজন কী ? আমি সমস্ত জগৎকে আমার এক অংশে ধারণ করে অবস্থান করছি।' এই কথা শুনে একাদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে অর্জুন ভগবানের কাছে তাঁর বিশ্বরূপ দেখাবার জন্য প্রার্থনা জানান। ভগবান তাঁর বিশ্বরূপ দেখিয়ে একাদশ অধ্যায়ের শেষে বলেছেন যে, একমাত্র অনন্য-ভক্তি দ্বারা আমার দর্শন, জ্ঞান এবং আমাতে একীভূত হওয়া—এই তিনটিই সম্ভব হয়।

একাদশ অধ্যায়ের শেষে ভগবান ভক্তির মহিমা বর্ণনা করেছেন এবং তার আগে (৪।৩৪-৩৭ ; ৫।১৩-

২৬; ৬।২৪-২৮; ৮।১১-১৩) নির্গুণ তত্ত্বের উপাসনার কথা বলেছেন। দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছেন উভয়ের মধ্যে কোনটি শ্রেয় ? তার উত্তরে ভগবান দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তির এবং ত্রয়োদশ-চতুর্দশ অধ্যায়ে নির্গুণ সাধনার কথা বলেছেন। চতুর্দশ অধ্যায়ের একুশতম শ্লোকে অর্জুন গুণাতীতের লক্ষণ, আচরণ এবং গুণাতীত হওয়ার উপায় জিজ্ঞাসা করলে ভগবান গুণাতীতের লক্ষণ ও আচরণ বর্ণনা করে তাঁর অব্যভিচারিণী (একনিষ্ঠ) ভক্তিকে গুণাতীত হওয়ার উপায় বলে জানিয়েছেন। পঞ্চদশ অধ্যায়ে ভগবান সেই অব্যভিচারিণী ভক্তিরই বর্ণনা করেছেন। এই অধ্যায়ের শেষে 'স সর্ববিদ্ ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত' পদটির দ্বারা বলেছেন যে, দৈবী-সম্পদসম্পন্ন ব্যক্তি আমার ভজনা করেন এবং অর্থান্তরে আসুরী-সম্পদসম্পন্ন ব্যক্তি আমার ভজনা করেন না। এর আগেও সপ্তম অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে ও নবম অধ্যায়ের দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শ্লোকে সঙ্কেতরূপে দৈবী এবং আসুরী-সম্পদ বর্ণিত হয়েছে। সেইজন্য দৈবী ও আসুরী-সম্পদের বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার জন্যই ষোড়শ অধ্যায় বর্ণনা করেছেন।

ষোড়শ অধ্যায়ের শেষের আগের (উপান্ত্য) শ্লোকটিকে ধরে অর্জুন সপ্তদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে নিষ্ঠার বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। তার উত্তরে ভগবান তিনপ্রকার শ্রদ্ধার (নিষ্ঠার) কথা বর্ণনা করে অধ্যায়টির বিষয় সম্পূর্ণ করেন। সপ্তদশ অধ্যায়ের পরে অর্জুন এবার তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে কথিত উভয় নিষ্ঠার তত্ত্ব পৃথক্‌ভাবে স্পষ্টরূপে জানার জন্য ভগবানের নিকট তাঁর জিজ্ঞাসা প্রকটিত করেন।

অর্জুন উবাচ

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন॥ ১ ॥[১]

[১]অর্জুনের এই প্রশ্নের সমাধানে ভগবান যা বলেছেন, তার উত্তরে অর্জুনের মনে উদ্ভূত অন্য জিজ্ঞাসাগুলিও অনুমান করা যায়, সেগুলি এইরূপ——

(ক) সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।

১. সন্ন্যাস কাকে বলে ?
কোনো কর্মের সঙ্গে কর্তৃত্বভাব না থাকা এবং কোথাও বুদ্ধির লিপ্ত না হওয়া (১৮।১৭)।

২. সন্ন্যাসী কেমন হওয়া উচিত ?
রাগ (আসক্তি) বর্জিত, অনহংবাদী, ধৈর্য ও উৎসাহযুক্ত এবং সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে নির্বিকার (১৮।২৬)।

৩. সন্ন্যাসীর সাধন কেমন হওয়া উচিত ?
সাত্ত্বিকবুদ্ধিসম্পন্ন, বৈরাগ্যবান, একান্তসেবী, ইন্দ্রিয়সংযমী, কায়-মন-বাক্যে সংযম ইত্যাদি হওয়া উচিত (১৮।৫১-৫৩)।

৪. সন্ন্যাসীর আচরণ কেমন হওয়া উচিত ?
কর্তৃত্বাভিমান এবং রাগ (আসক্তি)-দ্বেষরহিত হয়ে কর্ম করা (১৮।২৩)।

৫. সন্ন্যাসীর ভাব কেমন হওয়া উচিত ?
ভিন্ন প্রাণীতে বিভাগরহিত একমাত্র পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব করা (১৮।২০)।

৬. সন্ন্যাসের ফল কী ?
পরমাত্মতত্ত্বে একীভূত হওয়া (১৮।৫৫)।

(খ) ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন

১. ত্যাগ কাকে বলে ?
কর্ম এবং কর্মফলের আসক্তি পরিত্যাগ করে কর্তব্য-কর্ম করা (১৮।৬)।

২. ত্যাগী কেমন হওয়া উচিত ?

[**মহাবাহো, হৃষীকেশ** (হে মহাবাহো ! হে হৃষীকেশ !) ; **কেশিনিসূদন** (হে কেশিনিসূদন !) ; **সন্ন্যাসস্য, চ** (সন্ন্যাস এবং) ; **ত্যাগস্য, তত্ত্বম্** (ত্যাগের তত্ত্ব) ; **পৃথক্** (পৃথক্‌ভাবে) ; **বেদিতুম্, ইচ্ছামি** (জানতে চাই।)]

অর্জুন বললেন——হে মহাবাহো ! হে হৃষীকেশ ! হে কেশিনিসূদন ! আমি সন্ন্যাস এবং ত্যাগের তত্ত্ব পৃথক্‌ভাবে জানতে চাই ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা—**'সন্ন্যাসস্য মহাবাহো........পৃথক্ কেশিনিসূদন'**—এখানে 'মহাবাহো' সম্বোধনটি শক্তি ও সামর্থ্যের সূচক। অর্জুনের এই সম্বোধনটি প্রয়োগ করার অর্থ হল এই যে, আপনি সমস্ত বিষয়ে বলতে সমর্থ ; সুতরাং আমার প্রশ্নের উত্তর এমনভাবে দিন, যাতে সহজেই আমি তা অনুধাবন করতে পারি।

'হৃষীকেশ' সম্বোধন হল অন্তর্যামীর বাচক। এটি প্রয়োগ করায় অর্জুনের মনোভাব হল এই যে, আমি সন্ন্যাস এবং ত্যাগের তত্ত্ব জানতে ইচ্ছুক ; সুতরাং এর প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি (প্রশ্নে ব্যক্ত না হলেও) আপনি আমাকে বলুন।

'কেশিনিসূদন' সম্বোধন হল বিঘ্ননাশের সূচক। এটি প্রয়োগ করার অর্থ হল যে, আপনি যেভাবে ভক্তদের সমস্ত বিঘ্ন দূর করেন, সেইভাবে আমারও সমস্ত বিঘ্ন অর্থাৎ শঙ্কা-সংশয় দূর করুন।

জিজ্ঞাসা সাধারণতঃ দুই কারণে প্রকটিত করা হয়—(১) নিজের আচরণের জন্য এবং (২) সিদ্ধান্ত বোঝার জন্য। যারা শুধুমাত্র পড়াশোনার (শেখার) জন্য সিদ্ধান্তগুলিকে অধিগত করে, তারা পুস্তকজনিত বিদ্বান হয়, নতুন পুস্তক রচনাও করে থাকে, কিন্তু নিজ কল্যাণ করতে সক্ষম হয় না[১]। নিজ কল্যাণ করতে তিনিই সক্ষম, যিনি সিদ্ধান্তগুলি বুঝে সেই অনুসারে নিজ জীবন গঠন করতে তৎপর হন।

এখানে অর্জুনের প্রশ্ন শুধুমাত্র সিদ্ধান্তগুলি জানার জন্যই নয়, প্রত্যুত সিদ্ধান্তগুলি জেনে সেই অনুসারে জীবন নিয়ন্ত্রিত করার জন্য।

'এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে' (গীতা ২।৩৯) এতে উল্লেখিত **'সাংখ্য'** পদটিকেই এখানে **'সন্ন্যাস'** পদে বলা হয়েছে। ভগবানও সাংখ্য এবং সন্ন্যাসকে পর্যায়বাচী বলেছেন, যেমন—পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে **'সন্ন্যাসঃ'** ; চতুর্থ শ্লোকে **'সাংখ্যযোগৌ'** ; পঞ্চম শ্লোকে **'যৎসাংখ্যৈঃ'** এবং ষষ্ঠ শ্লোকে **'সন্ন্যাসস্তু'** পদগুলি একই অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। সেইজন্য অর্জুন এখানে সাংখ্যকেই সন্ন্যাস বলে উদ্ধৃত করেছেন।

এইরূপ **'বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু'** (গীতা ২।৩৯)-তে উদ্ধৃত **'যোগ'** পদটিকেই এখানে 'ত্যাগ' পদে উদ্ধৃত করা হয়েছে। ভগবানও যোগ (কর্মযোগ) এবং ত্যাগকে পর্যায়বাচীরূপে বর্ণনা করেছেন। যেমন, দ্বিতীয় অধ্যায়ের আটচল্লিশতম শ্লোকে **'সঙ্গং ত্যক্ত্বা'** এবং একান্নতম শ্লোকে **'ফলং ত্যক্ত্বা'**, তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে **'কর্মযোগেন যোগিনাম্'**, চতুর্থ অধ্যায়ের বিশতম শ্লোকে **'ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গম্'**, পঞ্চম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে **'যোগৌ'** পঞ্চম শ্লোকে **'তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে'**, একাদশ শ্লোকে **'সঙ্গং ত্যক্ত্বা'** ও দ্বাদশ শ্লোকে **'কর্মফলং**

কর্মফলের ত্যাগী হওয়া উচিত (১৮।১১)।

৩. ত্যাগের সাধন কেমন হওয়া উচিত ?
কর্ম এবং ফলের আসক্তি ত্যাগ (১৮।৯)।

৪. ত্যাগীর আচরণ কেমন হওয়া উচিত ?
অকুশল কর্মে দ্বেষ না করা এবং কুশল কর্মে আসক্ত না হওয়া (১৮।১০ পূর্বার্ধ)।

৫. ত্যাগীর ভাব কেমন হওয়া উচিত ?
শুধুমাত্র কর্তব্য করা (১৮।৯)।

৬. ত্যাগের ফল কী ?
পরমাত্মতত্ত্বে স্থিত হওয়া (১৮।১০ উত্তরার্ধ)।

[১]অসৎকে অসৎ বলে জানলেই সৎ-প্রাপ্তি লাভ হয় না, যতক্ষণ না মানুষ সৎ-প্রাপ্তিকেই তার জীবনের সর্বোপরি লক্ষ্য বলে স্থির করে।

ত্যক্ত্বা', দ্বাদশ অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে 'ত্যাগাৎ' পদগুলি একই অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। সেইজন্যই অর্জুন এখানে কর্মযোগকেই ত্যাগরূপে বলেছেন।

সর্বতোভাবে অন্তর থেকে সম্পর্ক ত্যাগ করাকে বলা হয় **'সন্ন্যাস'—'সম্যক্ ন্যাসঃ সন্ন্যাসঃ'**। তাৎপর্য হল এই যে, প্রকৃতির বস্তু সর্বতোভাবে প্রকৃতিকে অর্পণ করলে এবং বিবেকের সাহায্যে প্রকৃতি থেকে সর্বতোভাবে নিজ সম্পর্ক ছেদ করে নেওয়ার নাম 'সন্ন্যাস'।

'কর্ম' এবং 'ফলের' আসক্তি পরিত্যাগ করাকে বলা হয় 'ত্যাগ'। ষষ্ঠ অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে বলা হয়েছে যে, যিনি কর্ম এবং তার ফলে আসক্ত হন না, তিনি যোগারূঢ় হন।

পরিশিষ্ট-ভাব—কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের বিষয়ে অর্জুন ভগবানকে তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে অনুযোগ করেছিলেন, পঞ্চম অধ্যায়ের প্রারম্ভে জানতে চেয়েছিলেন এই দুইয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্‌টি আর এখানে জানতে চেয়েছেন এই দুটির তত্ত্ব।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—অর্জুনের জিজ্ঞাসার উত্তরে ভগবান প্রথমে পরবর্তী দুটি শ্লোকে অন্য দার্শনিক বিদ্বানদের চারটি মত জানিয়েছেন।

শ্রীভগবানুবাচ

কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥ ২ ॥
ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে॥ ৩ ॥

[**কবয়ঃ** (কিছু পণ্ডিত ব্যক্তি) ; **কাম্যানাম্, কর্মণাম্** (কাম্য কর্মগুলি) ; **ন্যাসম্** (ত্যাগ করাকেই) ; **সন্ন্যাসম্, বিদুঃ** (সন্ন্যাস বলেন) ; **বিচক্ষণাঃ** (কোনো কোনো পণ্ডিত ব্যক্তি) ; **সর্বকর্মফলত্যাগম্** (সমস্ত কর্মের ফল ত্যাগকেই) ; **ত্যাগম্, প্রাহুঃ** (সন্ন্যাস বলেন) ; **একে, মনীষিণঃ** (কোনো কোনো পণ্ডিত) ; **ইতি, প্রাহুঃ** (এরূপ বলেন) ; **কর্ম, দোষবৎ** (কর্ম দোষযুক্ত) ; **ত্যাজম্, চ** (অতএব তা ত্যাগ করা উচিত, আবার) ; **অপরে, ইতি** (কিছু পণ্ডিত বলেন, যে) ; **যজ্ঞদাততপঃকর্ম** (যজ্ঞ, দান ও তপস্যা রূপ কর্মগুলি) ; **ন, ত্যাজম্** (পরিত্যাগ করা উচিত নয়।)]

শ্রীভগবান বললেন—কিছু পণ্ডিত ব্যক্তি কাম্য-কর্ম ত্যাগ করাকেই সন্ন্যাস বলেন, আবার কোনো কোনো পণ্ডিত সমস্ত কর্মের ফল ত্যাগকেই সন্ন্যাস বলেন। আবার কোনো কোনো পণ্ডিত বলেন, কর্ম দোষযুক্ত অতএব তা ত্যাগ করা উচিত আবার কিছু পণ্ডিত বলেন, যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম পরিত্যাগ করা উচিত নয়॥ ২-৩ ॥

ব্যাখ্যা—দার্শনিক বিদ্বান ব্যক্তিদের মত চারপ্রকার—

(১) **'কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ'**—অনেক পণ্ডিত বলে থাকেন যে কাম্য-কর্মের ত্যাগকেই বলা হয় **'সন্ন্যাস'** অর্থাৎ ইষ্ট প্রাপ্তি এবং অনিষ্ট নিবৃত্তির জন্য যে কর্ম করা হয়, তা পরিত্যাগ করাকেই বলা হয় 'সন্ন্যাস'।

(২) **'সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ'**—কোনো কোনো বিদ্বান বলে থাকেন যে সম্পূর্ণ কর্মের ফলের ইচ্ছা ত্যাগ করাকেই বলে 'ত্যাগ' অর্থাৎ ফলের আকাঙ্ক্ষা না করে কর্তব্য-কর্ম করে যাওয়াকে বলা হয় 'ত্যাগ'।

(৩) **'ত্যাজ্যং দোষ[১] বদিত্যেকে কর্ম প্রাহু-**

[১]'দোষবৎ' পদটি ব্যাকরণের 'বতি' এবং 'মতুপ্' উভয় প্রত্যয়েই সৃষ্ট হয় ; কিন্তু দুইয়ের অর্থ দু'প্রকার। 'বতি' প্রত্যয় করলে 'দোষবৎ' পদটির অর্থ হয়—কর্মগুলি দোষের মতো পরিত্যাগ করা উচিত আর 'মতুপ্' প্রত্যয় করলে এর অর্থ হয়—দোষযুক্ত কর্ম পরিত্যাগ করা উচিত। কিন্তু এখানে 'বতি' প্রত্যয়েরই অর্থ ধরা উচিত, 'মতুপ্' প্রত্যয়ের নয়। কারণ 'মতুপ্'

মনীষিণঃ'—কোনো কোনো বিদ্বান বলে থাকেন সম্পূর্ণ কর্মকেই দোষের ন্যায় পরিত্যাগ করা উচিত।

(৪) 'যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে'—আবার কোনো কোনো পণ্ডিত বলে থাকেন যে অন্যান্য সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করা হলেও যজ্ঞ, দান এবং তপরূপ কর্মের কখনো ত্যাগ করা উচিত নয়।

উপরিউক্ত চারপ্রকার মতে দুটি বিভাগ দেখা যায়—প্রথম এবং তৃতীয় মত হল **'সন্ন্যাস'** (সাংখ্যযোগ)-এর এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ মত হল **'ত্যাগ'** (কর্মযোগ)-এর। এই দুটি বিভাগেও কিছু কিছু পার্থক্য আছে। প্রথম মতটিতে শুধুমাত্র কাম্য-কর্ম ত্যাগ এবং তৃতীয় মতে কর্মমাত্রই ত্যাগ করার কথা আছে। এইরূপই দ্বিতীয় মতে কর্মের ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে এবং চতুর্থ মতে যজ্ঞ, দান, তপস্যারূপ কর্ম ত্যাগ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

দার্শনিকদের উপরিউক্ত চারটি মতে কী কী ন্যূনতা আছে এবং তাঁদের থেকে ভগবানের মতে কী কী বিশেষত্ব আছে, তার আলোচনা এইরূপ—

(১) **'কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসম্'**—সন্ন্যাসের এই প্রথম মতটিতে শুধুমাত্র কাম্য-কর্মগুলি পরিত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এ ছাড়াও নিত্য, নৈমিত্তিক ইত্যাদি আবশ্যক কর্তব্য-কর্ম অবশিষ্ট থাকে[১]। সুতরাং এই মতটি সম্পূর্ণ নয়। কারণ এতে কর্তৃত্ব ত্যাগ করার কথাও বলা হয়নি বা স্বরূপে স্থিতিলাভ করার কথাও বলা হয়নি। কিন্তু ভগবানের মতে কর্মে কর্তৃত্বাভিমান না থাকলে স্বরূপে স্থিতিলাভ হয়; যেমন, এই অধ্যায়ের সপ্তদশ শ্লোকে 'যার মধ্যে অহং-কর্তৃত্ব ভাব নেই এবং যার বুদ্ধি কর্মফলে লিপ্ত হয় না'—এই বলে কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগের কথা বলেছেন এবং তিনি যদি সমস্ত প্রাণীকে বধও করেন, তাহলেও তিনি হত্যা করেন না এবং আবদ্ধ হন না—এই বলে স্বরূপে স্থিতিলাভের কথা বলেছেন।

(২) **'ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে'**—সন্ন্যাসের দ্বিতীয় মতটিকে সমস্ত কর্মই দূষণীয় বলে ত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কেউই সম্পূর্ণ কর্ম পরিত্যাগ করতে পারে না (গীতা ৩।৫) এবং কর্মমাত্রই পরিত্যাগ করলে জীবন-নির্বাহ করা সম্ভব হয় না (গীতা ৩।৮)। তাই ভগবান নিত্য কর্ম বাহ্যতঃ পরিত্যাগ করাকে রাজস-তামস ত্যাগ বলে অভিহিত করেছেন (১৮।৭-৮)।

(৩) **'সর্বকর্মফলত্যাগম্'**—ত্যাগের প্রথম মতটিতে

প্রত্যয়ের অর্থ ভগবানের মতেরই সমান (গীতা ১৮।৪৮), দার্শনিকদের মত অনুযায়ী নয়।

দ্বিতীয় পার্থক্য হল যে 'বতি' প্রত্যয় অব্যয় হয়ে ক্রিয়ার বিশেষণ হয় এবং 'মতুপ্' কর্তা ও কর্মের বিশেষণ হয়।

[১]কর্ম পাঁচ প্রকারের—

ক) নিত্যকর্ম—শাস্ত্রের নির্দেশানুযায়ী নিত্য প্রয়োজনীয় যে দৈনন্দিন কর্ম করা হয়, সেগুলিকে বলা হয় 'নিত্য-কর্ম'; যেমন, সন্ধ্যাহ্নিক, উপাসনা, ইত্যাদি।

খ) নৈমিত্তিক কর্ম—দেশ, কাল, পরিস্থিতি ইত্যাদি উপলক্ষে যে কর্ম করা হয়, সেগুলিকে বলা হয় 'নৈমিত্তিক কর্ম'; যেমন—গঙ্গা, প্রয়াগ, নৈমিষারণ্য, পুষ্কর ইত্যাদি তীর্থে গিয়ে যেসব শাস্ত্রবিহিত কর্ম করা হয়, সেগুলি 'দেশকৃত নৈমিত্তিক কর্ম'; একাদশী, পূর্ণিমা, গ্রহণ, ব্রত ইত্যাদিতে যে শাস্ত্রবিহিত কর্ম করা হয়, সেগুলি 'কালকৃত নৈমিত্তিক কর্ম'; পুত্রের জন্মের সময় বা বিবাহের সময় বা কারও মৃত্যু হলে অথবা সাধু-মহাত্মাদের সৎসঙ্গের আয়োজন কালে যে শাস্ত্রবিহিত কর্ম করা হয়, সেগুলিকে 'পরিস্থিতিকৃত নৈমিত্তিক কর্ম' বলা হয়।

গ) কাম্যকর্ম—যাতে আমাদের সম্মান হয়, যশ হয়, পুত্রলাভ হয়, অর্থ-সম্পদ লাভ হয়, ইষ্টপ্রাপ্তি ঘটে, রোগ দূর হয়, বিপদ দূর হয়, এইসবের জন্য যে শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান করা হয়, সেগুলিকে বলা হয় 'কাম্যকর্ম'।

ঘ) প্রায়শ্চিত্ত কর্ম—আমাদের পাপগুলি দূর করার জন্য যে কর্ম করা হয়, সেগুলিকে বলা হয় 'প্রায়শ্চিত্ত কর্ম'। এটি দু'প্রকারের হয়—বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত এবং সাধারণ প্রায়শ্চিত্ত। যেমন, কারও দ্বারা যদি ইঁদুর, বিড়াল, পায়রা প্রভৃতির মৃত্যু হয় তাহলে এই জ্ঞাত-পাপ দূর করার জন্য ধর্মসিন্ধু, নির্ণয়সিন্ধু ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত নির্দেশানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করাকে 'বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত' বলা হয় এবং জ্ঞাত-অজ্ঞাত সমস্ত পাপ দূর করার জন্য গঙ্গাস্নান, একাদশীব্রত, নামজপ, সেবা ইত্যাদি যেসব শুভকর্ম করা হয়, সেগুলিকে 'সাধারণ প্রায়শ্চিত্ত' বলা হয়।

ঙ) আবশ্যক কর্তব্য-কর্ম—চাষ-বাস, ব্যবসা, চাকরি ইত্যাদি জীবিকা এবং খাওয়া-পরা, শোওয়া-জাগা ইত্যাদি যে শারীরিক কর্ম—এগুলিকে বলা হয় 'আবশ্যক কর্তব্য-কর্ম'।

শুধুমাত্র ফল ত্যাগের কথা বলা হয়েছে। এখানে ফল ত্যাগের অন্তর্গত শুধুমাত্র কামনা ত্যাগ করার কথাই বলা হয়েছে[১]। মমত্ববোধ ও আসক্তি ত্যাগ করার কথা এর অন্তর্গত নয়। কারণ তা মনে করলে দার্শনিক ও ভগবানের মতবাদে কোনো পার্থক্য থাকে না। ভগবানের মতে কর্মের আসক্তি এবং ফলের আসক্তি—দুটিই পরিত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে—**'সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ'** (গীতা ১৮।৬)।

(৪) **'যজ্ঞদানতপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যম্'**—ত্যাগ অর্থাৎ কর্মযোগের এই দ্বিতীয় মতটিতে যজ্ঞ, দান এবং তপস্যারূপ কর্মগুলি পরিত্যাগ না করার কথা আছে। কিন্তু এই তিনটি ব্যতীত বর্ণ-আশ্রম পরিস্থিতি পরিপ্রেক্ষিতে যেসব কর্ম আছে, সেগুলি করা বা না-করার ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি—এখানে এই অপূর্ণতা রয়েছে। ভগবানের মতে এগুলি ত্যাগ করার তো কোনো প্রশ্নই নেই, বরং এগুলি যদি এ-যাবৎ করা না হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই আরম্ভ করা উচিত। এ ছাড়াও তীর্থ, ব্রত ইত্যাদি কর্ম-গুলিকেও ফল এবং আসক্তি পরিত্যাগ করে করা উচিত (১৮।৫-৬)।

***

সম্বন্ধ—আগের দুটি শ্লোকে দার্শনিক বিদ্বান ব্যক্তিদের চার প্রকার মত জানাবার পরে ভগবান এবার পরবর্তী তিনটি শ্লোকে প্রথমে ত্যাগের বিষয়ে নিজের মত জানাচ্ছেন।

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্তিতঃ॥ ৪ ॥

[**ভরতসত্তম** (হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন!) ; **তত্র** (সন্ন্যাস এবং ত্যাগ এই দুইয়ের মধ্যে প্রথমে) ; **ত্যাগে** (ত্যাগের বিষয়ে) ; **মে, নিশ্চয়ম্, শৃণু** (আমার সিদ্ধান্ত শোনো) ; **হি, পুরুষব্যাঘ্র** (কারণ হে পুরুষশ্রেষ্ঠ!) ; **ত্যাগঃ, ত্রিবিধঃ** (ত্যাগ তিন প্রকার) ; **সম্প্রকীর্তিত** (বলে কথিত আছে।)]

হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন! সন্ন্যাস এবং ত্যাগ—এই দুটির মধ্যে তুমি প্রথমে ত্যাগের বিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত শোনো। কারণ হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! ত্যাগ তিন প্রকার বলে কথিত আছে ॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা—[এই শ্লোকের পূর্বার্ধের ব্যাখ্যা রূপে ভগবান পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শ্লোকে তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন এবং উত্তরার্ধের ব্যাখ্যা রূপে সপ্তম থেকে নবম শ্লোক পর্যন্ত তিনপ্রকার ত্যাগের বর্ণনা করেছেন।

যেমন, দেহ এবং দেহধারীর বিবেক সমস্ত যোগীরই পক্ষে পরম আবশ্যকীয় হওয়ায় গীতায় তার বর্ণনা সর্বপ্রথম (২।১১-৩০) করা হয়েছে, তেমনই ফলাকাঙ্ক্ষা এবং কর্মের আসক্তি বর্জন করা সকল যোগীর পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যকীয় হওয়ায়, ভগবান এইস্থানে সর্বপ্রথমেই 'ত্যাগ'-এর বর্ণনা আরম্ভ করেছেন।]

'নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম'— হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন! আমি এবার সন্ন্যাস এবং ত্যাগ—উভয়ের মধ্যে প্রথমে ত্যাগের সম্পর্কে আমার সিদ্ধান্ত জানাচ্ছি, তুমি শোনো।

'ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্তিতঃ'—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! ত্যাগ তিন প্রকারের কথিত হয়েছে—সাত্ত্বিক,

---

[১]যেখানে ফলত্যাগের কথা বলা হয়েছে, সেস্থানে ফলকামনা ত্যাগ করাকেই বুঝতে হবে। কারণ ফলত্যাগ হতেই পারে না। নিয়মই হল প্রত্যেক কর্ম ফলের রূপেই পরিণত হয়। যেমন, কেউ চাষ করলে, শষ্যগুলি কী করে ত্যাগ করবে ? ব্যবসা করলে, লভ্যাংশ কী করে পরিত্যাগ করবে ? চাষ করলে যেমন আনাজরূপী ফল হয়, তেমনই আনাজ না হওয়াও চাষের ফল। লাভ হওয়া যেমন ব্যবসায়ের ফল, তেমনই লোকসান হওয়াও ব্যবসায়েরই ফল। কিন্তু কামনা ত্যাগ করলে ফলের থেকে স্বতঃই সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয় (গীতা ১৮।১২)। তাই ভগবান সিদ্ধি-অসিদ্ধি, দুয়েতেই সম থাকাকে যোগ বা সমতা বলেছেন (গীতা ২।৪৮)। কারণ সিদ্ধি-অসিদ্ধি উভয়ই কর্মের ফল। সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সম থাকার অর্থ হল—কর্মফলে মমত্ববোধ বা আসক্তি না থাকা অথবা কর্মফলে নিজ সম্বন্ধ স্থাপন না করা।

রাজসিক ও তামসিক। প্রকৃতপক্ষে ভগবানের সিদ্ধান্ত অনুসারে সাত্ত্বিক ত্যাগই প্রকৃত 'ত্যাগ'। কিন্তু তার সঙ্গে রাজসিক এবং তামসিক ত্যাগেরও বর্ণনা করার তাৎপর্য হল এই যে এগুলি ব্যতীত ভগবানের অভীষ্ট সাত্ত্বিক ত্যাগের শ্রেষ্ঠত্ব স্পষ্ট হয় না। কারণ পরীক্ষা বা তুলনা দ্বারা কোনো বস্তুর শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণ করতে হলে অপর বস্তুকে সামনে রাখতে হয়।

ত্রিবিধ ত্যাগের কথা বলার আর একটি তাৎপর্য হল এই যে, সাধক যেন সাত্ত্বিক ত্যাগের আদর্শ গ্রহণ করেন ; রাজসিক ও তামসিক ত্যাগ বর্জন করেন।

***

যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥ ৫ ॥

[**যজ্ঞদানতপঃ কর্ম** (যজ্ঞ, দান এবং তপস্যারূপ কর্ম) ; **ন, ত্যাজ্যম্** (ত্যাগ করা উচিত নয়) ; **তৎ, কার্যম্, এব** (সেগুলি করাই উচিত) ; **যজ্ঞঃ, দানম্, চ, তপঃ** (যজ্ঞ, দান ও তপস্যা) ; **মনীষিণাম্, এব** (মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিদেরও) ; **পাবনানি** (পবিত্র করে তোলে।)]

যজ্ঞ, দান এবং তপস্যারূপ কর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়, বরং সেগুলি অবশ্যই করা উচিত। কারণ যজ্ঞ, দান ও তপস্যা——এই তিনপ্রকার কর্ম মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিদের পবিত্র করে তোলে ॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা—**'যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ'**—ভগবান এখানে অন্যের মতকে (১৮।৩) সঠিক বলে জানিয়েছেন। ভগবান কঠোর শব্দ দ্বারা কারও মতবাদকে খণ্ডন করেন না। সম্মান জানাতে ভগবান অপরের মতের সার অংশ গ্রহণ করে, তাতে নিজ মতও যুক্ত করেন। ভগবান তাই অন্যের মত অনুসরণ করে বলেছেন যে, যজ্ঞ-দান-তপস্যারূপ কর্ম পরিত্যাগ করা উচিত নয়। এইসঙ্গে ভগবান নিজ মত জানিয়ে বলেছেন যে, শুধু তাই নয়, তারা যদি সেগুলি না করে থাকে তবে সেগুলি অবশ্যই পালন করা উচিত—**'কার্যমেব তৎ'**। কারণ যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা—এই তিন প্রকার কর্ম মনীষীদেরও পবিত্র করে।

'যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্'—এখানে **'চৈব'** পদটি দেওয়ার তাৎপর্য হল এই যে, নিত্য-নৈমিত্তিক, জীবিকা-সম্পর্কীয়, শরীর-সম্পর্কীয়, যতপ্রকার কর্তব্য-কর্ম আছে, সেগুলিও অতি অবশ্য করা উচিত। কারণ এই কর্মগুলিও মনীষীদের পবিত্র করে।

যেসব ব্যক্তি সমত্ব-বুদ্ধিযুক্ত হয়ে কর্মজনিত ফল পরিত্যাগ করেন, তাঁদেরই মনীষী বলা হয়—**'কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষীণঃ'** (গীতা ২।৫১)। এরূপ মনীষীদের এইসব যজ্ঞাদিকর্ম পবিত্র করে তোলে। কিন্তু যাঁরা প্রকৃত মনীষী নন, যাঁদের ইন্দ্রিয় নিজ বশীভূত নয় অর্থাৎ নিজেদের সুখভোগের জন্যই যাঁরা যজ্ঞ, দানাদি কর্ম করে থাকেন, এইসব কর্ম তাঁদের শুদ্ধ করে না, বরং তাঁদের বন্ধনকারকই হয়।

এই শ্লোকের পূর্বার্ধে **'যজ্ঞদানতপঃ কর্ম'**—এই সমাসযুক্ত পদটি ব্যবহার করা হয়েছে এবং উত্তরার্ধে **'যজ্ঞো দানং তপঃ'**—এরূপ পৃথক্ পদ ব্যবহৃত হয়েছে। এর তাৎপর্য হল এই যে ভগবান সমাস-যুক্ত পদটির দ্বারা জানিয়েছেন যে যজ্ঞ, দান এবং তপস্যারূপ কার্য ত্যাগ করা উচিত নয়, বরং এগুলি অতি অবশ্যই করা উচিত এবং পৃথক্ পদগুলির দ্বারা বলেছেন যে এর প্রত্যেকটি কর্ম মনীষীদের পবিত্র করে তোলে।

পরিশিষ্ট-ভাব—মনীষীর অর্থ হল—বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন। যে কর্ম নিজের কোনো কামনা না রেখে অন্যের হিত সাধনের উদ্দেশ্যে করা হয়, সেই কর্ম পবিত্রকর হয়ে ওঠে অর্থাৎ দুর্গুণ-দুরাচার, ইত্যাদি পাপ দূর করে মহাআনন্দ প্রদানকারী হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই কর্মই যদি নিজের কামনা পূরণের জন্য ও অন্যের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে করা হয় তাহলে তা অপবিত্রকারক হয়ে থাকে অর্থাৎ তা ইহলোকে-পরলোকে মহাদুঃখদায়ক হয়ে ওঠে।

***

এতান্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্॥ ৬ ॥

[পার্থ (হে পার্থ!) ; এতানি (এইসব) ; কর্মাণি, তু, অপি (কর্ম এবং অন্যান্য কর্মও) ; সঙ্গম্, চ (আসক্তি ও) ; ফলানি, ত্যক্ত্বা (ফল কামনা ত্যাগ করে) ; কর্তব্যানি (করা উচিত) ; ইতি, মে (এই আমার) ; নিশ্চিতম্ (নিশ্চিত) ; উত্তমম্ (উত্তম) ; মতম্ (মত।)]

হে পার্থ! এইসব কর্ম (পূর্বোক্ত যজ্ঞ, দান ও তপস্যা) ও অন্যান্য কর্মও আসক্তি ও ফলকামনা ত্যাগ করে করা উচিত—এই আমার নিশ্চিত মত এবং ইহাই উত্তম মত॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা—**'এতান্যপি তু কর্মাণি.........নিশ্চিতং মত্তমুত্তমম্'**—**'এতানি'** পদ দ্বারা পূর্বশ্লোকে কথিত যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্মগুলি এবং **'অপি'** পদ দ্বারা শাস্ত্রবিহিত পঠন-পাঠন, চাষ-বাস, ব্যবসায় ইত্যাদি জীবিকা-সম্পর্কীয় কর্ম ; শাস্ত্র মর্যাদা অনুসারে খাওয়া-পরা, ওঠা-বসা, শোওয়া-জাগা ইত্যাদি শারীরিক কর্ম এবং পরিস্থিতি অনুসারে উপস্থিত অবশ্য-করণীয় কর্ম— এই সবই ধরা উচিত। এই সমস্ত কর্মই আসক্তি এবং ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে করা অবশ্য কর্তব্য। নিজ কামনা, মমতা এবং আসক্তি পরিত্যাগ করে সকল কর্মই শুধুমাত্র প্রাণীদের হিতার্থে করলে কর্মের গতি জগৎমুখী হয় এবং নিজের যোগ সাধিত হয়। কিন্তু কর্মগুলি নিজের জন্য করলে সেগুলি বন্ধনকারক হয়ে নিজ ব্যক্তি-সত্তাকে নষ্ট হতে দেয় না।

গীতায় কোনো স্থানে আসক্তি ত্যাগের কথা বলা হয়েছে আবার কোথাও কর্মের ফল ত্যাগের কথা বলা হয়েছে। এই শ্লোকটিতে আসক্তি এবং ফল উভয়ই ত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে। এর তাৎপর্য হল যে গীতার যেসব স্থানে আসক্তি ত্যাগের কথা বলা হয়েছে, সেখানে তার সঙ্গে ফল ত্যাগ করার কথাও বলা হয়েছে বুঝতে হবে। আবার যেস্থানে ফল ত্যাগের কথা বলা হয়েছে, সেখানে আসক্তিও ত্যাগ করতে বলা হয়েছে বলে বুঝতে হবে। অর্জুন এখানে ত্যাগের তত্ত্ব জানতে চেয়েছিলেন ; তাই ভগবান ত্যাগের এই বিশেষ তত্ত্ব জানিয়েছেন যে, আসক্তি এবং ফল—উভয়ই ত্যাগ করা উচিত, যাতে সাধক সুস্পষ্টভাবে বোঝেন যে আসক্তি কর্মেও থাকা উচিত নয় এবং তার ফলেও থাকা উচিত নয়। আসক্তি না থাকলে মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি, শরীর ইত্যাদি কর্মের উপকরণগুলিতে এবং প্রাপ্ত বস্তুগুলিতে মমতা আসে না (গীতা ৫।১১)।

আসক্তি বা সম্বন্ধ সূক্ষ্ম হয় আর ফলেচ্ছা হয় স্থূল। আসক্তির সূক্ষ্মতা সেই পর্যন্ত থাকে, যেখানে চেতন-স্বরূপ বিনাশশীলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে। সেখান থেকেই আসক্তি উৎপন্ন হয়, যার ফলে জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি সবই ভোগ করতে হয়—**'কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু'** (গীতা ১৩।২১)। আসক্তি পরিত্যাগ করলে বিনাশশীলের সঙ্গে স্থাপিত সম্পর্ক ছেদ হয় এবং অনাসক্তি স্বাভাবিকভাবে অনুভূত হয়।

এই ব্যাপারে আরও একটি কথা জানার হল এই যে, কোনো কোনো দার্শনিক এই বিনাশশীল জগৎকে নাস্তি বলে মনে করেন। কারণ এটি আগে ছিল না, পরেও থাকবে না, তাই বর্তমানেও এটি নেই, এটি যেন স্বপ্ন-সদৃশ। আবার কোনো কোনো দার্শনিকের মত হল, জগৎ পরিবর্তনশীল, এটি সর্বক্ষণ পরিবর্তিত হচ্ছে, কখনো এক রূপে থাকে না ; যেমন—আমাদের শরীর। কেউ কেউ মনে করেন যে পরিবর্তনশীল হলেও জগৎ কখনো শেষ হয়ে যায় না, তত্ত্বতঃ এটি সর্বদা বিরাজমান ; যেমন—জল (জলই বরফ, মেঘ, বাষ্প এবং পরমাণুরূপে আবর্তিত, স্বরূপত এটি কখনোই শেষ হয়ে যায় না)। এইরূপ নানাপ্রকার মতপার্থক্য আছে। কিন্তু বিনাশশীল জড়ের নিজ অবিনাশী চেতন-স্বরূপের সঙ্গে যে কোনোপ্রকার সম্বন্ধ নেই, এবিষয়ে কোনো দার্শনিকেরই মতভেদ নেই। **'সঙ্গং ত্যক্ত্বা'** পদটির দ্বারা ভগবান সেই সম্বন্ধ ত্যাগের কথা বলেছেন।

প্রকৃতি সৎ, না অসৎ অথবা সৎ-অসৎ-এর থেকেও বিশেষ কিছু ? অনাদি-সান্ত, না অনাদি-অনন্ত ? এই মতবিরোধে সাধকের তাঁর অমূল্য সময় নষ্ট করা উচিত নয়, তার পরিবর্তে এই প্রকৃতি এবং প্রকৃতির কার্য শরীর-সংসার থেকে তাঁর সম্বন্ধ ছেদ করা উচিত, যা স্বতঃই হয়ে চলেছে। স্বতঃ হওয়া এই সম্বন্ধ বিচ্ছেদ শুধু অনুভব করতে হয় যে এই শরীর প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তিত হচ্ছে আর স্বয়ং

নির্বিকারভাবে সর্বদা একইভাবে বিদ্যমান।

এখন প্রশ্ন হল যে ফল কাকে বলে ? প্রারব্ধ কর্মানুসারে আমরা যে পরিস্থিতি, বস্তু, দেশ, কাল প্রাপ্ত হয়েছি, তা হল কর্মের 'প্রাপ্ত ফল' আর ভবিষ্যতে যে পরিস্থিতি, বস্তু ইত্যাদি পাওয়া যাবে, সেগুলি কর্মের 'অপ্রাপ্ত ফল'। প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত ফলে আসক্তি থাকলেই প্রাপ্ত ফলে মমতা ও অপ্রাপ্তের কামনা হয়। তাই ভগবান **'ত্যক্ত্বা ফলানি চ'**[১] বাক্য দ্বারা ফলত্যাগ করতে বলেছেন।

কর্মফল কেন ত্যাগ করা উচিত ? কেন-না কর্মফল আমাদের সঙ্গে থাকার নয়। কারণ যে কর্মের দ্বারা ফলসৃষ্টি হয়, সেই কর্মগুলির আরম্ভ ও শেষ থাকে ; অতএব তার ফলও প্রাপ্ত এবং বিনষ্ট হয়ে যায়। সেইজন্যই কর্মফল পরিত্যাগ করা উচিত। ফলত্যাগের তাৎপর্য হল ফলের আসক্তি বা কামনাই ত্যাগ করা। আসলে আসক্তি আমাদের স্বরূপে থাকে না, এটি শুধু মেনে নেওয়া হয়।

দ্বিতীয়তঃ নিজের স্বরূপ যেটি, তার কখনো পরিত্যাগ করা যায় না ; যেমন—অগ্নি নিজের তাপ এবং প্রকাশ পরিত্যাগ করতে পারে না। যে বস্তু নিজের নয়, তা-ও পরিত্যাগ করা যায় না ; যেমন জগতে নানাবস্তু আছে, কিন্তু সেগুলি আমরা ত্যাগ করব—এমন কথা বলা চলে না ; কেন-না সেগুলি আমাদের নয়। তাই ত্যাগ সেই বস্তুরই করা সম্ভব, যেটি আসলে আমার নয়, অথচ আমার বলে ভেবে রেখেছি, এই ভেবে নেওয়া ভাবটিই পরিত্যাগ করতে হয়।

মানুষের নিকট কর্তব্যরূপে যেসব কর্ম উপস্থিত হয়, ফল এবং আসক্তি পরিত্যাগ করে সতর্কতাপূর্বক তৎপরতার সঙ্গে সেগুলি করা উচিত—**'কর্তব্যানি'**। কর্মযোগে বিধি-নিষেধ মেনে 'এই কাজ করা উচিত, ওই কাজ করা উচিত নয়'—এরূপ চিন্তা করতেই হয়। কিন্তু 'এই কাজটি বড়, ওই কাজটি ছোট'—এরূপ চিন্তা করতে নেই। কারণ যেখানে কর্ম বা তার ফলের সঙ্গে নিজের কোনোপ্রকার সম্পর্কই নেই, সেখানে এই কর্মটি বড়, ওইটি ছোট ; এই কর্মের ফল বড়, ওইটির ছোট—এমন চিন্তা আসতেই পারে না। ফলের ইচ্ছা থেকেই কর্মটি ছোট, না বড় মনে হয় অথচ কর্মযোগে ফলের ইচ্ছা (কামনা) ত্যাগ করা হয়।

কর্ম, আসক্তিপূরণের জন্যও করা হয় আবার আসক্তি নিবৃত্তির জন্যও করা হয়। কর্মযোগী তাঁর সকল কর্তব্য-কর্মই করেন আসক্তি নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে—**'আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে'** (গীতা ৬।৩), **'ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে'** (গীতা ৩।৪)। নিজের জন্য কর্ম করলে তাতে আসক্তি আসে। তাই কর্মযোগী নিজের জন্য কোনো কর্ম করেন না, তিনি সকল কর্মই করেন অপরের হিতার্থে। তাঁর স্থূলদেহ দ্বারা করা 'কর্ম', সূক্ষ্মশরীর দ্বারা হওয়া 'পরহিতচিন্তা' এবং কারণ-শরীর দ্বারা হওয়া 'স্থিরতা'—সবই অন্যের হিতার্থে হয়, নিজের জন্য নয়। তাই তাঁর কর্মের আসক্তি সহজেই দূর হয়। পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তিতে সংসারের আসক্তিই প্রধান বাধা। সুতরাং আসক্তি দূর হলে কর্মযোগী অতি সহজেই পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হন (গীতা ৪।৩৮)।

'কর্তব্য' শব্দটির অর্থ হল—যা আমরা করতে পারি, যা অতি অবশ্যই করা উচিত এবং যা করলে অবশ্যই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। উদ্দেশ্য তাকেই বলা হয়, যা নিত্যসিদ্ধ এবং অনুৎপন্ন অর্থাৎ অনাদি এবং অবিনাশী। সেই উদ্দেশ্য মনুষ্যজন্মেই সিদ্ধ (সফল) হয় এবং সেই সিদ্ধিলাভের জন্যই মনুষ্যদেহ লাভ হয়েছে, কর্মজনিত পরিস্থিতিরূপ সুখ বা দুঃখ ভোগের জন্য নয়। কর্মজনিত পরিস্থিতি হল সেইটি যা উৎপন্ন হয় ও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। সেই পরিস্থিতি মানুষ ছাড়াও পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ-লতা, নারকীয়, স্বর্গীয় প্রভৃতি সকল যোনির প্রাণীরাও লাভ করে থাকে, সেখানে কর্তব্য করার কোনো প্রশ্নই নেই এবং উদ্দেশ্য পূরণের কোনো অধিকারও নেই।

ভগবানের তাঁর মতকে **'নিশ্চিতম্'** বলার তাৎপর্য হল এই যে এই মতটিতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই, এটি অটল অর্থাৎ এর বিন্দুমাত্রও নড়চড় হতে পারে না এবং **'উত্তমম্'** বলার তাৎপর্য হল এই যে এই মতে শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে কোনো ন্যূনতা নেই, বরং এটির দ্বারা পূর্ণত্ব লাভ অবশ্যম্ভাবী।

---

[১]'ফলানি' শব্দটিতে বহুবচন ব্যবহারের অর্থ হল, সকামভাবে কর্ম করলে লোকের নানারূপ ফলের ইচ্ছা হয়—'বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্' (গীতা ২।৪১)। তারা ইহলোকে সুখ-আরাম, মান-সম্মান, যশ-প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ও পরলোকে স্বর্গাদি প্রাপ্তি কামনা করে। ভগবানের মত হল—এই সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করা।

পরিশিষ্ট-ভাব—এই শ্লোকে কর্মাসক্তি ও ফলাসক্তি—উভয়কে ত্যাগের কথা বলা হয়েছে। কর্মাসক্তি ও ফলাসক্তিই হল প্রধান বন্ধন, যা পরিত্যাগ করলে মানুষ যোগারূঢ় হয়—**'যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্মস্বনুষজ্জ্যতে .....'** (গীতা ৬।৪)।

শুভ কর্মও নিষ্কামভাব রেখে করা হলে কল্যাণকারক হয়। নিষ্কামভাব না থাকলে শুভকর্মও বন্ধনকারক হয়—**'আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন'** (গীতা ৮।১৬)।

* * *

সম্বন্ধ—এই অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে ভগবান তিন প্রকার ত্যাগের কথা বলেছেন। পরবর্তী তিনটি শ্লোকে সেই ত্রিবিধ ত্যাগের বর্ণনা করছেন।

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্তিতঃ॥ ৭ ॥

[**নিয়তস্য কর্মণঃ** (যে কর্ম নির্দিষ্ট আছে) ; **তু, সন্ন্যাসঃ** (তা ত্যাগ করা) ; **ন, উপপদ্যতে** (উচিত নয়) ; **তস্য, মোহাৎ** (মোহবশতঃ সেই কর্ম) ; **পরিত্যাগঃ** (পরিত্যাগ করাকে) ; **তামসঃ** (তামস ত্যাগ) ; **পরিকীর্তিতঃ** (বলা হয়।)]

যে কর্ম নির্দিষ্ট করা আছে তা ত্যাগ করা উচিত নয়। মোহবশতঃ সেই কর্ম পরিত্যাগ করাকে তামস ত্যাগ বলা হয়॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা—ভগবান তিন প্রকার ত্যাগের বর্ণনা এইজন্য করেছেন যে, অর্জুন স্বরূপতঃ কর্ম ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন—**'শ্রেয়োভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে'** (গীতা ২।৫)। তাই তিন প্রকার ত্যাগের কথা বলে অর্জুনকে স্মরণ করাবার প্রয়োজন ছিল যে, নির্দিষ্ট কর্ম স্বরূপতঃ ত্যাগ করা ভগবানের উদ্দেশ্য নয়। ভগবান সাত্ত্বিক ত্যাগকেই ত্যাগ বলে মনে করেন। সাত্ত্বিক ত্যাগ দ্বারাই জগতের সম্বন্ধ সর্বতোভাবে বিচ্ছেদ হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, সপ্তদশ অধ্যায়েও ভগবান গুণাদি অনুসারে শ্রদ্ধা, আহারাদির তিন প্রকার পার্থক্যের কথা বলেছেন, তাই এখানেও অর্জুন ত্যাগের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করায় ভগবান ত্যাগের তিনটি বিভাগের কথা জানিয়েছেন।

'নিয়তস্য সন্ন্যাসঃ কর্মণো নোপপদ্যতে'—আগের শ্লোকে ভগবান ত্যাগ সম্পর্কে নিজের যে নিশ্চিত এবং উত্তম সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন, এই তামসিক ত্যাগ তার একেবারে বিপরীত এবং সর্বতোভাবে নিকৃষ্ট, সেটি জানাবার জন্যই এখানে 'তু' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

নিত্য বা স্বধর্মরূপ কর্ম কখনো ত্যাগ করা উচিত নয়, কারণ সেগুলি অবশ্যকর্তব্য। সন্ধ্যা-উপাসনাদি করা, অতিথি গৃহে এলে গার্হস্থ্য ধর্ম অনুসারে অতিথির সৎকার করা, বিশেষ বিশেষ পর্বে অথবা শ্রাদ্ধ-তর্পণাদিতে ব্রাহ্মণ-ভোজন করানো, নিজ বর্ণ-আশ্রম অনুসারে প্রাতঃ ও সান্ধ্যপূজা করা, এইসব কর্ম না করাই হল নিত্য বা স্বধর্মরূপ কর্মত্যাগ।

'মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্তিতঃ'—এরূপ নিত্য-কর্মগুলি মূর্খতাবশতঃ বা বিচার না করে পরিত্যাগ করাকে বলা হয় তামস ত্যাগ। সৎসঙ্গ, সভা-সমিতিতে যাবার প্রয়োজন থাকলেও আলস্যবশতঃ না গিয়ে শুয়ে থাকা বা আরাম করা ; মাতা-পিতার অসুস্থতার জন্য ডাক্তার আনতে গিয়ে বা ওষুধ সংগ্রহ করতে গিয়ে কোথাও কোনো খেলাতে আকৃষ্ট হয়ে নিজ কর্তব্য বিস্মরণ হওয়া, কোর্টে মোকদ্দমায় হাজিরা না দিয়ে হাসি-ঠাট্টা বা খেলাধুলোয় সময় কাটানো, শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় স্নানাদি কর্ম আলস্যবশতঃ পরিত্যাগ করা—এগুলি সবই তামসিক ত্যাগের উদাহরণ।

বিহিত কর্ম এবং নির্দিষ্ট কর্মের মধ্যে পার্থক্য কী ? শাস্ত্রে যেসব কর্ম করার নির্দেশ দেওয়া আছে, সেগুলি হল 'বিহিত কর্ম'। সমস্ত বিহিত কর্মের পালন একজন ব্যক্তির দ্বারা কখনো সম্ভব নয়। কারণ শাস্ত্রে প্রত্যেক বার এবং তিথিতে ব্রতের বিধান দেওয়া আছে। একজন ব্যক্তি যদি সকল বার (দিন) অথবা সমস্ত তিথির ব্রতপালন করেন, তবে তিনি ভোজন করবেন কখন ? এর দ্বারা প্রমাণিত হয়

যে মানুষের পক্ষে সকল বিহিত-কর্ম করা সম্ভব নয়। কিন্তু সেই বিহিত-কর্মগুলির মধ্যেও বর্ণ-আশ্রম এবং পরিস্থিতি অনুসারে যার পক্ষে যা করা কর্তব্য, তার কাছে সেটিই 'নিয়ত বা নির্দিষ্ট-কর্ম' হয়ে থাকে। যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—চার বর্ণের মধ্যে জীবিকা এবং শরীর-নির্বাহ সম্বন্ধীয় যেসব নিয়মাদি আছে, সেই সেই বর্ণের কাছে সেগুলিই হল 'নিয়ত-কর্ম'।

মোহবশতঃ এই 'নিয়ত-কর্ম' ত্যাগ করলে সেটি 'তামসত্যাগ' হয় আর সুখ ও আরামের জন্য ত্যাগ করলে সেই ত্যাগকে বলা হয় 'রাজসত্যাগ'। সুখের ইচ্ছা, ফলের আকাঙ্ক্ষা এবং আসক্তি ত্যাগ করে নিয়ত-কর্ম করাকে 'সাত্ত্বিকত্যাগ' বলা হয়। তাৎপর্য হল এই যে মোহে ভেসে যাওয়া হল তামসিক পুরুষের লক্ষণ, রাজসিক পুরুষের লক্ষণ হল সুখ ও আরামে ভেসে যাওয়া আর এই দুটি থেকে রহিত হয়ে সতর্কতা সহকারে, নিষ্কামভাবে যাঁরা কর্তব্য করে থাকেন, তাঁদেরই বলা হয় সাত্ত্বিক পুরুষ। এই সাত্ত্বিক স্বভাব অথবা সাত্ত্বিক ত্যাগ থেকেই কর্ম এবং কর্মফলের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। রাজসিক বা তামসিক ত্যাগ দ্বারা তা হয় না। কারণ রাজসিক বা তামসিক ত্যাগ প্রকৃতপক্ষে কোনো ত্যাগই নয়।

সাধারণভাবে লোকে বাহ্যতঃ কর্ম ত্যাগ করাকেই ত্যাগ বলে মনে করে। কারণ তারা সেটিই প্রত্যক্ষভাব দেখতে পায়। কোন্ ব্যক্তি কোন্ কাজ কোন্ ভাব নিয়ে করছে, তা তারা বুঝতে পারে না। কিন্তু ভগবান অন্তরের কামনা-বাসনা-আসক্তি ত্যাগকেই প্রকৃত ত্যাগ বলে জানিয়েছেন, কারণ এটিই হল জন্ম-মৃত্যুর প্রকৃত কারণ (গীতা ১৩।২১)।

বাহ্য ত্যাগকেই যদি প্রকৃত ত্যাগ বলে মনে করা হয় তাহলে মৃত সকল ব্যক্তির কল্যাণ হওয়া উচিত, কারণ তাদের তো সমস্ত বস্তুই ত্যাগ করতে হয়, এমনকি নিজ শরীরও ত্যাগ করতে হয় এবং তাদের সেসব বস্তুর কথা প্রায়ই স্মরণে পর্যন্ত থাকে না! অতএব অন্তরের ত্যাগই হল প্রকৃত ত্যাগ। অন্তর থেকে ত্যাগ করলে বাহ্যতঃ বস্তুগুলি থাকুক বা না থাকুক, মানুষ তাতে আর আবদ্ধ হয় না।

পরিশিষ্ট-ভাব—'নিয়ত' কর্ম থেকে 'নির্দিষ্ট' কর্মে মানুষের বিশেষ দায়িত্ব থাকে। যেমন, কাউকে যদি পাহারা দেবার জন্য রাখা হয় অথবা পিপাসার্তকে জল পান করাবার জন্য জলসত্রে বসানো হয় তাহলে তা হল তার নির্দিষ্ট-কর্ম, যা সম্পাদনে তার ওপর বিশেষ দায়িত্ব থাকে। নির্দিষ্ট-কর্ম পরিত্যাগ করা অত্যন্ত দূষণীয়। এর ফলে সমগ্র ব্যবস্থাই বিপর্যস্ত হয়। সুতরাং অর্থ প্রাপ্তি কম হোক অথবা বেশি, নিজের নির্দিষ্ট কর্ম কখনো পরিত্যাগ করা উচিত নয়। নির্দিষ্ট-কর্মে অবহেলা হওয়ার ফলেই আজকাল সমাজে অব্যবস্থা হচ্ছে। যাকে যে কাজের জন্য নিযুক্ত করা হচ্ছে, সে যদি সেই কাজটি না করে তাহলে কী অবস্থা হবে? নির্দিষ্ট-কর্ম মোহবশতঃ পরিত্যাগ করা হল তামসকর্ম, যার ফলে অধোগতি হয়—**'অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ'** (গীতা ১৪।১৮)।

※ ※ ※

দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ॥ ৮ ॥

[**যৎ, কর্ম** (সমস্ত কর্মই) ; **দুঃখম্, এব** (দুঃখস্বরূপ) ; **ইতি** (এই মনে করে) ; **কায়ক্লেশভয়াৎ** (শারীরিক কষ্টের ভয়ে) ; **ত্যজেৎ, সঃ** (ত্যাগ করেন, তিনি) ; **রাজসম্, ত্যাগম্** (এরূপ রাজসত্যাগ) ; **কৃত্বা, এব** (করলেও) ; **ত্যাগফলম্** (ত্যাগের ফল) ; **ন, লভ্যতে** (লাভ করেন না।)]

যা সব কর্ম আছে, সেগুলি দুঃখস্বরূপ—এই মনে করে কেউ যদি শারীরিক কষ্টের ভয়ে তা ত্যাগ করেন, তাহলে তিনি এরূপ রাজসত্যাগ করলেও প্রকৃত ত্যাগের ফল লাভ করেন না॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা—**'দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম'**—যজ্ঞ-দানাদি শাস্ত্রীয় নিয়ত-কর্মগুলি করলে কেবল দুঃখই ভোগ করতে হয়, আর তাতে আছেই বা কী? ওইসব কর্ম করতে গেলে নানা নিয়মে আবদ্ধ থাকতে হয় আর খরচও করতে হয়—রাজস-ব্যক্তিগণ এইভাবে ওইসব কর্মে শুধু দুঃখই দেখে থাকেন। দুঃখ দেখার কারণ হল যে রাজস-ব্যক্তিদের

পরলোক, শাস্ত্রাদি, শাস্ত্রবিহিত কর্ম এবং তার পরিণামের ওপর কোনো শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস থাকে না।

'কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ'—রাজস-ব্যক্তিদের শাস্ত্র-মর্যাদা এবং লোকমর্যাদা অনুসারে চলায় শরীরে কষ্ট অর্থাৎ পরিশ্রম মনে হয়[১]। রাজসিক ব্যক্তি নিজ বর্ণ, আশ্রমাদির ধর্ম পালন করতে এবং পিতা-মাতা-গুরু প্রমুখের নির্দেশ পালন করাতে পরাধীনতা ও ক্লেশ অনুভব করেন। এঁদের নির্দেশ অমান্য করে যেমন-খুশি-তেমন কাজ করাতেই তাঁরা স্বাধীনতা ও সুখ অনুভব করে থাকেন। রাজসিক ব্যক্তিদের ভাব এরূপ হয়ে থাকে যে, 'ঘরে কোনো আরাম নেই, স্ত্রী-পুত্রাদি মনের মতো নয়, সাহায্য করার জন্য কোনো আত্মীয়-স্বজন নেই, নিজেকেই সব করতে হয়। অতএব সাধু হলে আরামে থাকা যাবে, বিনা খরচায় খাদ্য-বস্ত্র পাওয়া যাবে, পরিশ্রম করতে হবে না ; অথবা এমন কোনো সরকারি চাকরি যদি পাওয়া যায়, যেখানে কাজ কম করতে হয় আর বেতন ঠিকমতো পাওয়া যায়, কাজ যদি না-ও করি, কেউ আমাকে বরখাস্ত করতে পারবে না, চাকরি ছাড়ার পর পেন্‌শন পেতে থাকব ইত্যাদি।' এইসব চিন্তার ফলে তাঁদের ঘরের কাজকর্ম করতে ভালো লাগে না এবং তাঁরা তা পরিত্যাগ করেন।

এখানে প্রশ্ন আসে এই যে, জ্ঞানপ্রাপ্তির সাধনায় বারংবার দুঃখ ও দোষ দেখার কথা বলা হয়েছে (গীতা ১৩।৮) আর এইস্থানে কর্মে ক্লেশ দেখে তা পরিত্যাগ করাকে রাজস-ত্যাগ বলা হয়েছে—অর্থাৎ কর্ম পরিত্যাগ করতে নিষেধ করা হয়েছে—এই দুটি কথা পরস্পর-বিরোধী বলে প্রতীয়মান হয়। তার উত্তর হল এই যে, বাস্তবে এই দুটির মধ্যে কোনো বিরোধ নেই, এই দুটির বিষয়ই বিভিন্ন। গীতার ১৩।৮ শ্লোকে ভোগে দুঃখ এবং দোষ দেখার কথা বলা হয়েছে আর এইস্থানে নিয়ত-কর্তব্য-কর্মে দুঃখ দেখার কথা বলা হয়েছে। তাই ওইস্থানে ভোগ ত্যাগ করার কথা আছে এবং এখানে কর্তব্য-কর্ম ত্যাগ করার কথা আছে। ভোগাদি ত্যাগ করাই উচিত, কিন্তু কর্তব্য-কর্ম কখনো ত্যাগ করা উচিত নয়। কারণ যেসব ভোগে সুখ এবং গুণবুদ্ধি জন্মায় সেইসব ভোগে বারংবার দুঃখ এবং দোষের চিন্তা করলে ভোগে বৈরাগ্য আসে, যার ফলে পরমাত্মতত্ত্ব লাভ হয়। কিন্তু নিয়ত-কর্তব্য-কর্মতে দুঃখ-কষ্ট চিন্তা করে সেটি পরিত্যাগ করলে সর্বদাই পরাধীনতা এবং দুঃখ ভোগ করতে হয়—**'যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোহন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ'** (গীতা ৩।৯)। তাৎপর্য হল এই যে, ভোগে দুঃখ এবং দোষ দেখলে ভোগাসক্তি দূর হয়, যার ফলে কল্যাণ হয়, আর কর্তব্য-কর্মে দুঃখ অনুভব করলে কর্তব্যে বিমুখতা আসে, যার ফলে পতন ঘটে।

কর্তব্য-কর্মের ত্যাগে রাজস ও তামস দু'প্রকার পার্থক্য থাকলেও পরিণাম (আলস্য, প্রমাদ, অতিনিদ্রা) উভয়েরই অভিন্ন, অর্থাৎ উভয়ই তামসিক হয়ে যায়, যার ফলে অধোগতি হয়—**'অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ'** (গীতা ১৪।১৮)।

এখানে আর একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, সৎসঙ্গ, ভগবদ্‌কথা, ভক্তচরিত্রাদি শুনে যদি কারও মনে বৈরাগ্য উদয় হয় এবং সে প্রভুকে লাভ করার আশায় কর্তব্য-কর্ম পরিত্যাগ করে শুধু ভগবানের ভজনা করতে থাকে, তাহলে তার এই কর্তব্য-কর্ম পরিত্যাগকে কি রাজসত্যাগ বলা যায় ? এর উত্তর হল, না, তা নয়। জাগতিক কর্ম ত্যাগ করে যিনি ভজন-পূজনে ব্যাপৃত হন, তাঁর ত্যাগকে রাজস বা তামস ত্যাগ বলা যায় না। কারণ মনুষ্যজন্মের উদ্দেশ্যই হল ঈশ্বর লাভ করা ; সুতরাং সেই উদ্দেশ্যের সিদ্ধির জন্য যদি কর্তব্য-কর্ম ত্যাগ করতে হয়, তবে তাকে কর্তব্য ত্যাগ করা বলে না, বরং সেটিই হল প্রকৃত কর্তব্য। এই প্রকৃত কর্তব্যে আলস্য, প্রমাদ ইত্যাদি দোষ আসতে পারে না। কারণ তার রুচি থাকে ভগবানের দিকে। অপরপক্ষে রাজস ও তামস ত্যাগীদের মধ্যে আলস্য, প্রমাদ ইত্যাদি দোষ আসতে বাধ্য, কারণ তাদের রুচি থাকে ভোগের দিকে।

'স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ'—ত্যাগের ফল শান্তি। রাজসিক ব্যক্তি ত্যাগ করেও ত্যাগের ফল যে শান্তি তা লাভ করেন না। কারণ তিনি নিজ সুখ ও আরামের জন্যই ত্যাগ স্বীকার করেছেন। এরূপ ত্যাগ পশু-পক্ষীও করে থাকে। নিজের সুখ বা আরামের জন্য শুভ কর্মাদি পরিত্যাগ করায় রাজসিক ব্যক্তিগণ শান্তি তো লাভ করেনই না, উপরন্তু শুভকর্ম ত্যাগ করায় তাঁদের তার জন্য দণ্ড অবশ্যই ভোগ করতে হয়।

---

[১]শরীরে মমতা ও আসক্তির জন্যই কষ্ট অনুভূত হয়ে থাকে।

পরিশিষ্ট-ভাব—ত্যাগের ফল হল 'শান্তি'—**'ত্যাগাৎ শান্তিরনন্তরম্'** (গীতা ১২।১২) এবং রাগ বা আসক্তির ফল হল 'দুঃখ'—**'রাজসস্ত ফলং দুঃখম্'** (গীতা ১৪।১৬)। ত্যাগের ফল যে 'শান্তি' রাজসিক মানুষ তা পায় না, কিন্তু আসক্তির ফল যে 'দুঃখ' তা তারা এড়াতে পারে না।

* * *

কার্যমিত্যেব যৎ কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ॥ ৯ ॥

[**অর্জুন** (হে অর্জুন !) ; **কার্যম্, এব** (কর্তব্য-কর্ম করাই উচিত) ; **ইতি, যৎ, কর্ম** (এরূপ মনে করে যে কর্তব্য-কর্ম) ; **সঙ্গম্, চ** (আসক্তি ও) ; **ফলম্, ত্যক্ত্বা** (ফল ত্যাগ করে) ; **ক্রিয়তে** (করা হয়) ; **সঃ, এব** (তাকেই) ; **সাত্ত্বিকঃ** (সাত্ত্বিক) ; **ত্যাগঃ, মতঃ** (বলে মানা হয়।)]

হে অর্জুন ! 'কর্তব্য-কর্ম করাই উচিত'—এরূপ মনে করে যখন কর্তব্য-কর্ম আসক্তি ও ফল ত্যাগ করে করা হয়, তাকেই সাত্ত্বিকত্যাগ বলে মানা হয়॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা—**'কার্যমিত্যেব যৎ কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জুন'**—এখানে **'কার্যম্'** পদটির সঙ্গে **'ইতি'** এবং **'এব'** দুটি অব্যয় যুক্ত করায় এর অর্থ হয় যে শুধুমাত্র কর্তব্য-কর্মই করা উচিত। এটি করায় কোনো ফলাসক্তি নেই, কোনো স্বার্থ নেই এবং কোনো ক্রিয়াজনিত সুখভোগও নেই। এইভাবে শুধুমাত্র কর্তব্য করে গেলে কর্তার কর্ম হতে সম্পর্ক ছেদ হয়। ফলে সেই কর্ম আর বন্ধনকারক হয় না এবং সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। কর্ম বা তার ফলে আসক্তি থাকলেই বন্ধন হয়—**'ফলে সক্তো নিবধ্যতে'** (গীতা ৫।১২)।

শাস্ত্রবিহিত কর্মগুলিতে দেশ-কাল-বর্ণ-আশ্রম-পরিস্থিতি অনুসারে যে-যে কর্মে, যাকে-যাকে নিয়োগ করা হয়, সেগুলিকেই অবশ্য কর্তব্য-কর্ম বলা হয়। যেমন—সাধুদের এইসব কাজ করা উচিত, গৃহস্থদের এরূপ করা উচিত, ব্রাহ্মণদের এই কাজ করা উচিত, ক্ষত্রিয়দের এরূপ করা উচিত ইত্যাদি। সেইসব কাজ প্রমাদ, আলস্য, উপেক্ষা, উদাসীনতা পরিত্যাগ করে তৎপরতা ও উৎসাহ সহকারে করা উচিত। তাই ভগবান কর্মযোগের প্রসঙ্গে বিভিন্ন স্থানে **'সমাচার'** শব্দটি ব্যবহার করেছেন (গীতা ৩।৯,১৯)

'সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চৈব'—আসক্তি ত্যাগের অর্থ হল, কর্ম, কর্ম করার যন্ত্রাদিতে (শরীর, মন, বুদ্ধি ইত্যাদিতে) আসক্তি, ভালোবাসা ও মমত্ববোধ না থাকা এবং ফলত্যাগের অর্থ হল কর্মের পরিণামের সঙ্গে সম্পর্কিত না হওয়া অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকা। এই দুটির তাৎপর্য কর্ম এবং ফলে আসক্তি ও আকাঙ্ক্ষা যেন ত্যাগ করা হয়।

'স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ'[1]—কর্ম এবং ফলে আসক্তি ও কামনা ত্যাগ করে শুধুমাত্র কর্তব্য জ্ঞানে কর্ম করলে সেই ত্যাগ সাত্ত্বিক ত্যাগ হয়। রাজসত্যাগে কায়িক ক্লেশের ভয়ে এবং তামস ত্যাগে মোহবশতঃ কর্মগুলি স্বরূপতঃ পরিত্যাগ করা হয় ; কিন্তু সাত্ত্বিকত্যাগে কর্ম স্বরূপতঃ পরিত্যাগ করা হয় না, বরং কর্মগুলি সাবধানতা, তৎপরতা, বিধিসম্মতভাবে নিষ্কামভাবে করা হয়।

---

[1]সমস্ত গীতায় যেসব স্থানে (৭।১২ ; ১৪।৫-১৮ ; ১৭।১, ২, ৮-১০, ১১-১৩, ১৭-২২ এবং ১৮।২০-২৮, ৩০-৩৫, ৩৭-৩৯) গুণাদি বর্ণিত হয়েছে, সেখানেই সত্ত্ব, রজ, তম—এই ক্রম করা হয়েছে। শুধু এখানে (১৮।৭-৯) ব্যতিক্রম হয়েছে অর্থাৎ তম, রজ, সত্ত্ব—এই ক্রম দেওয়া হয়েছে। তার কারণ—(১) যদি ষষ্ঠ শ্লোকের পরেই (৭ম শ্লোকে) সাত্ত্বিক ত্যাগের বর্ণনা হত তাহলে ভগবানের নিশ্চিত সিদ্ধান্ত ও সাত্ত্বিকত্যাগে পুনরুক্তি দোষ হত। (২) কোনো বস্তুর শ্রেষ্ঠত্ব তখনই প্রমাণিত হয়, যখন প্রথমে অশ্রেষ্ঠ বস্তুর বর্ণনা করা হয়। তাই ভগবান সাত্ত্বিকত্যাগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য আগে অশ্রেষ্ঠ তামস ও রাজসত্যাগের বর্ণনা করেছেন। (৩) পরবর্তী দশম থেকে দ্বাদশ শ্লোক পর্যন্ত 'সাত্ত্বিকত্যাগীর' বর্ণনা করা হয়েছে। সাত্ত্বিকত্যাগের বর্ণনা সাত্ত্বিকত্যাগীর কাছে যদি না থাকে (নবম শ্লোকে) তবে তামসত্যাগের কাছে হলে সাত্ত্বিকত্যাগীর সঙ্গে সাত্ত্বিকত্যাগের সম্বন্ধ স্থাপিত হত না।

সাত্ত্বিকত্যাগে কর্ম এবং কর্মফলরূপ শরীর-সংসার থেকে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। রাজস এবং তামস ত্যাগে কর্মগুলি স্বরূপতঃ পরিত্যাগ করলেও প্রকৃতপক্ষে কর্ম হতে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয় না। কারণ শারীরিক ক্লেশের ভয়ে কর্মত্যাগ করা হলেও তার সঙ্গে নিজ সুখ ও আরামের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থেকে যায়। এরূপই মোহবশতঃ কর্ম পরিত্যাগ করলে, কর্ম দূর হলেও, মোহের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত থাকে। তাৎপর্য হল এই যে, কর্মকে স্বরূপতঃ ত্যাগ করলে বন্ধন হয় আর তৎপরতার সঙ্গে বিধিপূর্বক কর্ম করলে মুক্তি (সম্বন্ধ-ছেদ) হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব—তমোগুণে মূঢ়ভাব (নির্বুদ্ধি) থাকে আর রজোগুণে থাকে স্বার্থবুদ্ধি, কিন্তু সত্ত্বগুণে মূঢ়ভাবও থাকে না এবং স্বার্থবুদ্ধিও থাকে না, বরং সাত্ত্বিক ত্যাগে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে থাকে। সাত্ত্বিক মানুষ নিত্যকর্মসমূহকে কর্তব্য মনে করে থাকেন। মর্মকথা হল এই যে, কর্তব্য মনে করে যে কর্মই করা হোক, তাতে কর্মসম্পর্ক ছিন্ন হয়ে থাকে। লৌকিক সাধনে (কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগে) শরীর ও জগৎ-সংসার থেকে সম্পর্ক ছেদই প্রধান লক্ষ্য। তাই সাধককে প্রতিটি কর্মই কর্তব্য-কর্ম বলে মনে করতে হবে। কর্মগুলি বাহ্যিকভাবে ত্যাগ করলে বন্ধন হয়, কিন্তু সম্বন্ধযুক্ত না হয়ে কর্তব্যমাত্র মনে করে কর্ম করলে মুক্তি হয়[১]।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে উপস্থিত শ্লোকটিতে কর্ম করার কথা বলা হয়েছে, ত্যাগের কথা বলা হয়নি, তাহলে এটি 'সাত্ত্বিকত্যাগ' হল কীভাবে? তার উত্তরে বলা যায় যে, সাত্ত্বিক-কর্তার মধ্যে মোহ, স্বার্থ, আসক্তি বা ফলেচ্ছা কোনোটিই থাকে না, শুধুমাত্র কর্তব্যই থাকে, তাই কর্মের সঙ্গে কর্তার কোনো সম্বন্ধ না হওয়ায় এটিকে 'ত্যাগ' বলা হয়। জড়-বিভাগেই কর্তব্য থাকে, চেতনের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই। চেতন (শরীরী) যখন শরীরের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নেয়, তখন শরীরের যেসব কর্ম হয় তার সঙ্গে দেহীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়। যদি শরীরী শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন না করে, শুধুমাত্র কর্তব্য করে, তাহলে তার কর্মের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। শরীর এবং জগৎ-সংসার থেকে সম্পর্ক বিচ্ছেদ হয় বলেই একে 'ত্যাগ' বলা হয়। এর ফলে কর্ম এবং ফল উভয়ের সঙ্গেই সম্পর্ক ছিন্ন হয়।

❈ ❈ ❈

*সম্বন্ধ—ষষ্ঠ শ্লোকে **'এতানি'** এবং **'অপি তু'** পদ দ্বারা বর্ণিত যজ্ঞ, দান, তপস্যা ইত্যাদি শাস্ত্রবিহিত কর্মগুলি করাতে এবং শাস্ত্র-নিষিদ্ধ ও কাম্য-কর্মগুলি ত্যাগ করাতে কেমন ভাব হওয়া উচিত, পরের শ্লোকে তাই বলা হয়েছে।*

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ॥ ১০ ॥

[**অকুশলম্, কর্ম** (যিনি অকুশল-কর্মে); **ন, দ্বেষ্টি** (দ্বেষ করেন না); **কুশলে, ন, অনুষজ্জতে** (কুশল-কর্মে আসক্ত হন না); **ত্যাগী, মেধাবী** (তিনি ত্যাগী, বুদ্ধিমান); **ছিন্নসংশয়** (সংশয়বর্জিত এবং); **সত্ত্বসমাবিষ্টঃ** (নিজ স্বরূপে স্থিত রয়েছেন।)]

যিনি অকুশল-কর্মে দ্বেষ করেন না এবং কুশল-কর্মে আসক্ত হন না, তিনি ত্যাগী, বুদ্ধিমান, সংশয় বর্জিত এবং নিজ স্বরূপে স্থিত রয়েছেন ॥ ১০ ॥

---

[১]অলৌকিক সাধনে (ভক্তিযোগে) ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করাই হল প্রধান। তাই ভক্তের জপ-ধ্যান, কীর্তন ইত্যাদিকে কেবল কর্তব্য মাত্র মনে করে করা উচিত নয়, তা নিজ প্রিয়তমের কাজ (সেবা-পূজা) মনে করে তাঁর প্রসন্নতার জন্য প্রেমসহকারে করা উচিত। ভগবানের সমস্ত বিষয় ও কাজই (নাম, রূপ ইত্যাদি) ভালো লাগা উচিত। ভগবানের কাজ আনন্দ সহকারে করা উচিত। যেমন, কর্তব্য মনে করে ওষুধ খাওয়া হয়, কিন্তু কর্তব্য মনে করে আহার করা হয় না, তা নিজ ক্ষুধা নিবারণের উদ্দেশ্যেই করা হয়। তাই ভক্তের জপ, ধ্যান ইত্যাদি শুধুমাত্র কর্তব্য মনে করে সেগুলি ত্যাগের উদ্দেশ্য নিয়ে করা উচিত নয়, ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ জাগ্রত করার জন্যই করা উচিত। ভক্ত যদি জপ-ধ্যান ইত্যাদি কর্তব্য মাত্র মনে করে করেন তাহলে ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ জাগ্রত হতে পারে না, প্রেমের উদয় হয় না।

ব্যাখ্যা—'ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম'—শাস্ত্রবিহিত যা কিছু শুভকর্ম ফলের আশায় করা হয় এবং পরিণামে যার থেকে পুনর্জন্ম হয় (গীতা ২।৪৪ ; ৯।২০-২১) এবং যেসব শাস্ত্র-নিষিদ্ধ পাপকর্ম আছে এবং যার থেকে পরিণামে নীচ জন্ম বা নরকে গমন করতে হয় (গীতা ১৬।৭-২০), সেই কর্মগুলিকেই 'অকুশল' কর্ম বলা হয়। সাধক এইসব কর্ম পরিত্যাগ করে থাকেন, কিন্তু তা দ্বেষ সহকারে নয়। কেন-না দ্বেষপূর্বক কর্ম ত্যাগ করায়, কর্ম হতে মুক্তি লাভ করলেও, দ্বেষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়, যা শাস্ত্র-বিহিত কাম্য-কর্ম এবং শাস্ত্র-নিষিদ্ধ পাপ-কর্মের থেকেও ভয়ঙ্কর।

'কুশলে নানুষজ্জতে'—শাস্ত্রবিহিত কর্মেও যা বর্ণ-আশ্রম-পরিস্থিতি ইত্যাদি অনুসারে নিয়ত এবং যা আসক্তি এবং ফলেচ্ছা ত্যাগ করে করা হয় আর পরিণামে যা মুক্তিদায়ক হয়, সেইসব কর্মকে **'কুশল'** কর্ম বলা হয়। এইরূপ কুশল-কর্ম করতে থাকলেও সাধক তাতে আসক্ত হন না।

'ত্যাগী'—কুশল-কর্ম সাধনে যাঁর কোনো অনুরাগ নেই এবং অকুশল-কর্ম ত্যাগে যিনি দ্বেষ করেন না, তিনিই হলেন প্রকৃত ত্যাগী[1]। এই ত্যাগ সম্পূর্ণভাবে তখনই সিদ্ধ হয়, যখন কর্ম করা বা না-করাতে কোনো পার্থক্য আসে না অর্থাৎ নির্লিপ্ততা বজায় থাকে (গীতা ৩।১৮ ; ৪।১৮)। এরূপ হলে সাধক 'যোগারূঢ়' হয়ে থাকেন (গীতা ৬।৪)।

'মেধাবী'—যাঁর সমস্ত কার্য সর্বাঙ্গীণভাবে হয় এবং সংকল্প ও কামনা বর্জিত হয়, জ্ঞানরূপ অগ্নিতে যাঁর সমস্ত কর্ম ভস্মীভূত হয়েছে, তাঁকে পণ্ডিতগণও পণ্ডিত (মেধাবী ও বুদ্ধিমান) বলে থাকেন (গীতা ৪।১৯)। কারণ কর্ম করেও কর্মে লিপ্ত না হওয়াই হল অতিশয় বুদ্ধিমত্তা।

এরূপ মেধাবী ব্যক্তিদের চতুর্থ অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকে **'স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু'** পদের দ্বারা সকল মনুষ্যগণের মধ্যে বুদ্ধিমান বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

'ছিন্নসংশয়ঃ'—এইসব ত্যাগী ব্যক্তিদের মধ্যে কোনো সংশয় থাকে না। অভিন্নভাবে তত্ত্বে অবস্থান করায় তাঁদের মনে কোনো প্রকার সন্দেহ স্থান পায় না। সন্দেহ সেখানেই থাকে, যেখানে অসম্পূর্ণ জ্ঞান হয় অর্থাৎ কিছু জানা আছে, কিছু জানা নেই।

'সত্ত্বসমাবিষ্টঃ'—আসক্তি ইত্যাদি দূর হওয়ায় তাঁরা নিজস্বরূপে, চিন্ময়-তত্ত্বে স্বতঃই স্থিতিলাভ করেন। সেইজন্য তাঁদের **'সত্ত্বসমাবিষ্টঃ'** বলা হয়। এঁদেরই পঞ্চম অধ্যায়ের ঊনবিংশতিতম শ্লোকে **'তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ'** পদের দ্বারা পরমাত্মাতে স্থিত বলা হয়েছে।

পরিশিষ্ট-ভাব—এই শ্লোকটির তাৎপর্য আসক্তি ও দ্বেষ পরিত্যাগ করার মধ্যে নিহিত। মানুষের স্বভাব হল আসক্তিবশে গ্রহণ করা আর দ্বেষবশে পরিত্যাগ করা। আসক্তি এবং দ্বেষ—উভয় দ্বারাই জগৎ-সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন হয়। ভগবান বলেছেন, বাস্তবে সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ যিনি সম্পূর্ণভাবে আসক্তিশূন্য হয়ে শুভকর্ম করেন এবং দ্বেষপরবশ না হয়ে অশুভকর্ম ত্যাগ করেন।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—কর্ম করাতে অনুরাগ হবে না, ছাড়তে দ্বেষ হবে না—এসব ঝামেলা কেন করা ? কর্মগুলি সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করলেই তো হয় ?—এই আশঙ্কা দূর করতেই ভগবান পরবর্তী শ্লোকটি বলেছেন।

---

[1]দোষবুদ্ধ্যোভয়াতীতো নিষেধান্ন নিবর্ততে। গুণবদ্ধ্যা চ বিহিতং ন করোতি যথার্ভকঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৭।১১)

'যে ব্যক্তি অনুকূল-প্রতিকূলরূপ দ্বন্দ্ব থেকে উত্তীর্ণ হন, তিনি শাস্ত্র-নিষিদ্ধ কর্মগুলি পরিত্যাগ করেন, কিন্তু তা দ্বেষবশতঃ করেন না এবং শাস্ত্রবিহিত কর্মগুলি করেন, কিন্তু সেগুলিও গুণবুদ্ধি সহকারে বা অনুরাগবশতঃ করেন না। যেমন, হামাগুড়ি দিয়ে চলা শিশুদের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি কোনো রাগ-দ্বেষের জন্য হয় না, তেমনই উভয়াতীত ব্যক্তিদেরও নিবৃত্তি বা প্রবৃত্তি রাগ-দ্বেষ সহকারে হয় না। (শিশুদের অজ্ঞতার জন্য রাগ-দ্বেষ থাকে না, কিন্তু রাগ-দ্বেষরহিত পুরুষগণের বিজ্ঞতা থাকে)।'

ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥ ১১ ॥

[হি (কারণ) ; দেহভৃতা (দেহধারণকারীর) ; অশেষতঃ, কর্মাণি (কর্ম সম্পূর্ণভাবে) ; ত্যক্তুম্, ন, শক্যম্ (ত্যাগকরা সম্ভব নয়) ; তু, যঃ (তাই যিনি) ; কর্মফলত্যাগী (কর্মফল ত্যাগ করেছেন) ; সঃ (তাঁকেই) ; ত্যাগী (ত্যাগী) ; ইতি, অভিধীয়তে (বলা হয়।)]

(কারণ) যিনি দেহধারণ করেছেন তাঁর পক্ষে কর্ম সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করা সম্ভবপর হয় না। তাই যিনি কর্মফল ত্যাগ করেছেন—তাঁকেই ত্যাগী বলা হয়॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা—'ন হি দেহভৃতা[১] শক্যং ত্যক্তুং কমার্ণ্যশেষতঃ'—দেহধারণকারী অর্থাৎ দেহের সঙ্গে একাত্ম হওয়া ব্যক্তিগণের পক্ষে কর্ম সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করা সম্ভব নয়। কারণ শরীর প্রকৃতির কার্য এবং প্রকৃতি সর্বদাই ক্রিয়াশীল। সুতরাং শরীরের সঙ্গে একাত্ম হলে ক্রিয়ারহিত হওয়া কী করে সম্ভব হয় ? মানুষ যজ্ঞ, দান, তপস্যা, তীর্থ ইত্যাদি পরিত্যাগ করতে পারে ; কিন্তু সে খাওয়া-দাওয়া, ওঠা-বসা, শোওয়া-জাগা ইত্যাদি অত্যাবশ্যক শারীরিক ক্রিয়া পরিত্যাগ করবে কীভাবে ?

দ্বিতীয়তঃ, অন্তর থেকে কর্মের সম্বন্ধ পরিত্যাগ করাই হল প্রকৃত ত্যাগ। বাহ্যতঃ ত্যাগে কর্মত্যাগ হয় না। যদি বাহ্যতই সম্বন্ধ পরিত্যাগ করা হয় তবে তা কতদিন ? যেমন, কেউ সমাধিস্থ হলে সেইসময় তিনি বাহ্যিক ক্রিয়াগুলি হতে সম্পর্করহিত হন। কিন্তু সমাধিও একপ্রকার ক্রিয়া, কর্ম। কারণ এতে প্রকৃতিজনিত কারণ-শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে। তাই সমাধি থেকে ব্যুত্থান হয়।

কোনো (দেহের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত) ব্যক্তিই কর্ম হতে স্বরূপতঃ সম্পর্ক ছেদ করতে পারে না (গীতা ৩।৫)। কর্ম আরম্ভ না করে নৈষ্কর্ম (যোগনিষ্ঠা) প্রাপ্ত হওয়া যায় না এবং শুধু কর্ম ত্যাগ করলেই সিদ্ধি বা সাংখ্যনিষ্ঠা লাভ হয় না (গীতা ৩।৪)।

মর্মার্থ

চেতন (পুরুষ) সর্বদা নির্বিকার এবং একভাবে বিরাজমান ; কিন্তু প্রকৃতি বিকারশীল এবং সর্বদা পরিবর্তনশীল। যার মধ্যে অত্যন্ত ক্রিয়াশীলতা থাকে, তাকে বলা হয় 'প্রকৃতি'—'**প্রকর্ষেণ করণং (ভাবে ল্যুট্) ইতি প্রকৃতিঃ**'। প্রকৃতির কার্যাদির সঙ্গে পুরুষ যতক্ষণ নিজ সম্পর্ক (একাত্মতা) মেনে থাকে, ততক্ষণ সে কর্ম পরিত্যাগ করতেই পারে না। কারণ দেহে অহংবোধ ও মমত্ব থাকায় মানুষ দেহের প্রতিটি ক্রিয়াকেই নিজের ক্রিয়া বলে মনে করে, তাই সে কখনো কোনো অবস্থাতেই ক্রিয়ারহিত হতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, পুরুষই শুধু প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থাপন করেছে, প্রকৃতি করেনি। প্রাপ্ত বিবেককে উপেক্ষা করে পুরুষ প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধকে সত্য বলে মেনে নেয়। এই সম্বন্ধকে সত্য বলে মেনে নেওয়ার জন্যই বন্ধন হয়। সম্বন্ধ দু'ভাবে করা হয়, নিজেকে শরীর বলে মনে করা আর শরীরকে নিজের বলে মনে করা। নিজেকে শরীর বলে মনে করলে 'অহংভাব' এবং শরীরকে নিজের বলে মনে করলে 'মমত্ববোধ' হয়। এই অহং এবং মমত্ব-রূপ সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠ হওয়াই হল দেহধারীর লক্ষণ। দেহধারী ব্যক্তি কর্মকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করতে সক্ষম হন না।

'যস্তু[২] **কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে**'—যিনি

---

[১]এখানে 'দেহভৃতা' পদটি দেহাভিমানী অর্থাৎ দেহের সঙ্গে একাত্মতাবোধকারী সাধারণ ব্যক্তিদের বাচক বলে বুঝতে হবে। গুণাতীত মহাপুরুষদের দেহ দ্বারাও ক্রিয়াকর্মাদি হতে থাকে। কিন্তু তাঁদের দেহের সঙ্গে একাত্মবোধ না থাকায় ওইসব কর্মের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক তৈরি হয় না অর্থাৎ তাঁরা ওইসব কর্মের কর্তা হন না।

[২]এইস্থানে 'তু' অব্যয় ব্যবহারের অর্থ হল যে, যারা সাধারণ ব্যক্তি, তাঁদের থেকে কর্মফলত্যাগী ব্যক্তিরা শ্রেষ্ঠ, বিশিষ্ট। কারণ তাঁদের উদ্দেশ্য থাকে পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তি করা অর্থাৎ নিজ কল্যাণ সাধন করা।

কোনো কর্ম বা ফলের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক রাখেন না, তিনিই প্রকৃত ত্যাগী। মানুষ যতক্ষণ কুশল-অকুশল, ভালো-মন্দের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে চলেন, ততক্ষণ তাঁকে ত্যাগী বলা যায় না।

পুরুষ যে প্রাকৃত ক্রিয়া এবং পদার্থকে নিজের বলে মনে করেন, তাতে তাঁর ভালোবাসা জন্মায়—তাকেই বলা হয় 'আসক্তি'। এই আসক্তিই বর্তমানের কর্মগুলিকে আশ্রয় করলে 'কর্মাসক্তি' এবং ভবিষ্যতে প্রাপ্তব্য ফলের আশা নিলে 'ফলাসক্তি' হয়। মানুষ যখন ফল-ত্যাগের উদ্দেশ্য স্থির করেন, তখন তাঁর সমস্ত কর্মই জগতের হিতের জন্য হয়ে থাকে, নিজের জন্য নয়। কারণ তিনি তখন জানেন যে কর্মসামগ্রীগুলি সবই জগতের থেকে পাওয়া, সেগুলি জগতেরই, তাঁর নিজের নয়। এইসব কর্মেরও আদি এবং অন্ত থাকে আর তার ফলও উৎপন্ন হয়ে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু স্বয়ং সর্বদা নির্বিকারভাবে বিরাজমান, তা উৎপন্ন হয় না, তার বিনাশ নেই এবং তা কখনো বিকৃত হয় না। এই তত্ত্ব জানা হলে অতি সহজেই ফলেচ্ছা দূর হয়। ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে সেই বিবেকশীল পুরুষের কোনো অহংকার হয় না। কেন-না তিনি স্পষ্টই অনুভব করেন যে কর্ম এবং কর্মের ফল—দুটিরই প্রতিমুহূর্তে বিয়োগ হচ্ছে। কাজেই এগুলির সঙ্গে আমার সম্পর্ক কোথায় ? এ কারণেই ভগবান জানিয়েছেন যে, যে কর্মফলত্যাগী সেই প্রকৃত ত্যাগী।

বিকারশীল কর্মফলের সঙ্গে নির্বিকারের কখনো সম্পর্ক ছিল না, নেই এবং হবার কোনো সম্ভাবনাও নেই। শুধু অজ্ঞানতাবশতঃ এর সঙ্গে সম্পর্ক মেনে নেওয়া হয়। সেই অজ্ঞান দূর হলে মানুষের 'অভিধা' অর্থাৎ তাঁকে 'ত্যাগী' বলা হয়—**'স ত্যাগীত্যভিধীয়তে'**।

মেনে নেওয়া সম্পর্কগুলির সম্পর্কে দৃষ্টান্তরূপে একটি কথা বলা যায়। কোনো ব্যক্তি গৃহ-পরিবার পরিত্যাগ করে আন্তরিকভাবে যদি সাধু-সন্ন্যাসী হয়ে যান, তাহলে তার গৃহের যতই উন্নতি বা অবনতি হোক, যদি সকলেই মারা যায়, তাদের কারও কোনো চিহ্ন যদি না থাকে তাহলেও, সেই সাধুর মনে তার কোনোই প্রভাব পড়ে না। এতে চিন্তা করতে হয় যে ওই ব্যক্তির পরিবারের সঙ্গে যে সম্পর্ক ছিল তা উভয়পক্ষের স্বীকৃত অর্থাৎ তিনি পরিবারকে নিজের বলে মনে করতেন এবং পরিবারের লোকেরাও তাঁকে আপন বলে ভাবতেন। কিন্তু পুরুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক শুধু পুরুষের দিক থেকেই মেনে নেওয়া হয়, প্রকৃতির দিক থেকে নয়। দু'দিক থেকে (ব্যক্তি ও পরিবার) মেনে নেওয়া সম্পর্কও যখন এক পক্ষ থেকে ত্যাগ করলে ছিন্ন হয়ে যায়, তখন কেবলমাত্র এক পক্ষের মানা সম্পর্ক (প্রকৃতি ও পুরুষের) ত্যাগ করলে তা যে বিচ্ছিন্ন হবে, এতে আর সন্দেহের কী আছে ?

পরিশিষ্ট-ভাব—এই শ্লোকটি কর্মযোগের দৃষ্টিতে বলা হয়েছে। কর্মযোগে কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করা হয় আর জ্ঞানযোগে কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ হয়।

'কর্মফল ত্যাগের' তাৎপর্য হল—কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করা। কারণ কর্মের ফল ত্যাগ করা যায় না, যেমন—শরীর আমাদের কর্মফল, তা কী করে ত্যাগ করা যাবে ? আহার করলে আহারের তৃপ্তি কী করে পরিত্যাগ করা যাবে ? চাষ করলে তার ফসল কী করে ত্যাগ করা যাবে ? সুতরাং সাধকের পক্ষে উচিত হল কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করা। ফলেচ্ছা ত্যাগ করলে সাধক সুখী বা দুঃখী হয় না। তাই গীতায় ফলেচ্ছা ত্যাগ করাকেই ফলত্যাগ বলা হয়েছে।

বাহ্যিক ত্যাগ প্রকৃত ত্যাগ নয়, অন্তরের ত্যাগই হল প্রকৃত ত্যাগ। যদি কোনো ব্যক্তি বাহ্যতঃ সংসার ত্যাগ করে একান্তে নির্জনবাস করে তাহলেও সংসারের বীজরূপ শরীর তার সঙ্গে থাকে। মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির শরীর সহ সমস্ত বস্তুই পরিত্যাগ হয়, কিন্তু তাতে তার মুক্তি হয় না। সুতরাং আমাদের কামনা-মমতা-আসক্তিই হল বন্ধনকারক, জগৎ-সংসার নয়। তাই নিজের জন্য কোনো কিছু না করলে কর্মের থেকে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ হয়—**'যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে'** (গীতা ৪।২৩)।

***

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকটিতে বলা হয়েছে যে কর্মফল পরিত্যাগকারীই হল প্রকৃত ত্যাগী। মানুষ কর্মফল পরিত্যাগ না করলে কী হয়—পরবর্তী শ্লোকে তাই জানানো হয়েছে।

763 Sadhak Sanjivani (Bangla)_Section_40_2_Front

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং চ ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ॥ ১২ ॥

[অত্যাগিনাম্ (যাঁরা কর্মফল ত্যাগ করেন না) ; প্রেত্য (মৃত্যুর পর) ; **ইষ্টম্, অনিষ্টম্, চ, মিশ্রম্** (ইষ্ট, অনিষ্ট ও মিশ্রিত) ; **ত্রিবিধম্, ফলম্** (তিন প্রকার ফল) ; ভবতি (লাভ হয়) ; তু (কিন্তু) ; **সন্ন্যাসিনাম্** (যাঁরা কর্মফল ত্যাগ করে কর্ম করেন) ; **ক্বচিৎ, ন** (তাঁদের কখনো নয়।)]

যাঁরা কর্মফল ত্যাগ করেন না, তাঁদের মৃত্যুর পর ইষ্ট, অনিষ্ট ও মিশ্রিত—এই তিন প্রকার ফল লাভ হয় ; কিন্তু যাঁরা কর্মফল ত্যাগ করে কর্ম করেন, তাঁদের কখনো কর্মফল ভোগ করতে হয় না॥ ১২ ॥

ব্যাখ্যা—**'অনিষ্টমিষ্টং, মিশ্রং চ ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলম্'**—কর্মের ফল তিন প্রকার—ইষ্ট, অনিষ্ট এবং মিশ্র। মানুষ যে পরিস্থিতি কামনা করে তা হল **'ইষ্ট'** কর্মফল, যে পরিস্থিতি মানুষ চায় না, তাকে বলা হয় **'অনিষ্ট'** কর্মফল আর যার মধ্যে কিছুটা ইষ্ট আর কিছু অনিষ্ট থাকে তাকে বলা হয় **'মিশ্র'** কর্মফল। বাস্তবে দেখতে গেলে জগতে প্রায় মিশ্রিত ফলই হয়ে থাকে ; যেমন—অর্থ হলে তা থেকে অনুকূল (ইষ্ট) এবং প্রতিকূল (অনিষ্ট) উভয় পরিস্থিতিরই উদ্ভব হয়। অর্থে জীবিকা নির্বাহ হয়—এটি হল অনুকূল অবস্থা আর ট্যাক্স দিতে হয়, অর্থ নষ্ট হয়, চোরে নিয়ে যায়—এসব হল প্রতিকূল অবস্থা। তাৎপর্য হল এই যে ইষ্টে আংশিক অনিষ্ট এবং অনিষ্টেও আংশিকভাবে ইষ্ট থাকে। কারণ সমগ্র জগৎ ত্রিগুণাত্মক (গীতা ১৮।৪০) ; এই জন্মও দুঃখালয় (৮।১৫) এবং সুখরহিত (৯।৩৩)। সুতরাং পরিস্থিতি ইষ্ট (অনুকূল) হোক বা অনিষ্ট (প্রতিকূল) তা কখনো এককভাবে অনুকূল বা প্রতিকূল হয় না। এখানে ইষ্ট এবং অনিষ্ট বলার অর্থ হল যে ইষ্টতে অনুকূলতার এবং অনিষ্টতে প্রতিকূলতার প্রাধান্য থাকে। বাস্তবে কর্মের ফলগুলি সবই মিশ্রিত ফল হয় ; কেন-না কোনো কর্মই সর্বতোভাবে নির্দোষ হয় না (১৮।৪৮)।

'ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য'—অত্যাগীগণ অর্থাৎ যাঁরা ফলের আশা করে কর্ম করেন উপরিউক্ত সকল ফল তাঁরাই প্রাপ্ত হন, সন্ন্যাসীগণ অর্থাৎ ত্যাগীরা নয়। কারণ যা কিছু কর্ম সাধিত হয়, তা সবই প্রকৃতির সাহায্যে হয় অর্থাৎ প্রকৃতির সকল কার্য শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সাহায্যেই হয়ে থাকে এবং ফলরূপ পরিস্থিতিও প্রকৃতির দ্বারাই সৃষ্ট হয়। তাই কর্ম এবং তার ফলের সম্বন্ধ শুধু প্রকৃতির সঙ্গেই হয়, 'স্বয়ং' বা 'চেতনস্বরূপের' সঙ্গে নয়। কিন্তু 'স্বয়ং' যখন তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তখন সে আর ভোগী থাকে না, সে হয় ত্যাগী।

অত্যাগীর মানে হল—পূর্বের দুটি শ্লোকে (দশম ও একাদশে) যে ত্যাগীদের কথা বলা হয়েছে, যাঁরা তাঁদের মতো নন অর্থাৎ যাঁরা কর্মফল ত্যাগ করেননি, তাঁরা হলেন অত্যাগী আর এমন ব্যক্তিদের কাছে ইষ্ট, অনিষ্ট এবং মিশ্র—তিন প্রকার কর্মফল উপস্থিত হয়, যার ফলে তাঁরা সুখী ও দুঃখী হয়ে থাকেন। এই সুখী বা দুঃখী হওয়াই হল প্রকৃত বন্ধন।

অনুকূল অবস্থাতে সুখভোগ করাই হল বাস্তবে প্রতিকূল অবস্থাতে দুঃখ পাওয়ার মূল। কারণ পরিস্থিতিজনিত সুখভোগকারী কখনো দুঃখের হাত থেকে রেহাই পায় না। যতক্ষণ তার সুখভোগের লালসা থাকবে ততক্ষণই সে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দুঃখও পেতে থাকবে। চিন্তা-শোক-ভয়-উদ্বেগ ইত্যাদি কখনো তাকে পরিত্যাগ করবে না এবং সে-ও এগুলি থেকে কখনো মুক্তিলাভ করবে না।

'প্রেত্য ভবতি' কথাটির অর্থ হল যে যিনি কর্মফলত্যাগী নন, মৃত্যুর পর তিনি ইষ্ট, অনিষ্ট ও মিশ্র—এই তিন প্রকার কর্মফল অবশ্যই প্রাপ্ত হন। কিন্তু এর সঙ্গে **'ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ'** পদের দ্বারা বলা হয়েছে যে যিনি কর্মফল পরিত্যাগী, তিনি কোথাও অর্থাৎ ইহলোক বা পরলোকে কোথাও কর্মফল প্রাপ্ত হন না। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে অত্যাগীগণের মৃত্যুর পর কর্মফল ভোগ করতেই হয় এবং বেঁচে থাকতেও কর্মফল প্রাপ্তি হয়ে থাকে।

'ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ'—সন্ন্যাসী অর্থাৎ ত্যাগীদের কখনো অর্থাৎ ইহলোকে বা পরলোকে, এই জন্মে অথবা মৃত্যুর পর, কর্মফল ভোগ করতে হয় না। তবে পূর্বের জন্মে কৃত কর্মানুসারে ইহজন্মে তাঁদের নানা অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, কিন্তু তাঁরা তাঁদের

বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে ওইসব পরিস্থিতির শিকার হন না, সুখী বা দুঃখী না হয়ে সর্বদা নির্লিপ্ত থাকেন।

সন্ন্যাসীদের অর্থাৎ ত্যাগীদের কেন ফলভোগ করতে হয় না ? কারণ তাঁরা নিজেদের জন্য কিছু করেন না। তাঁরা জানেন যে নিজের যে সত্যস্বরূপ, তার জন্য কোনো ক্রিয়া বা বস্তুরই প্রয়োজন নেই। নিজের জন্য সাধক যদি কিছু করেন, তাহলে সেটি তাঁর অহংভাবকেই দৃঢ় করে ; কারণ তিনি তাঁর হিত সংসারের হিতের থেকে পৃথক্ বলে মনে করেন। তিনি যখন সংসারের হিতের থেকে নিজ হিত পৃথক্ বলে মনে না করেন অর্থাৎ সকলের হিতকেই নিজের হিত বলে মনে করেন, তখন তিনি স্বতঃই **'সর্বভূতহিতে রতাঃ'** হয়ে ওঠেন। তখন তাঁর স্থূলশরীর দ্বারা কৃত ক্রিয়া, সূক্ষ্মশরীরের সাহায্যে হওয়া পরহিত-চিন্তা এবং কারণ-শরীর দ্বারা হওয়া স্থৈর্য—সবই জগৎমাত্রেরই প্রাণীদের হিতার্থে হয়ে থাকে। কারণ শরীরাদি সকল সামগ্রীই জগতের সঙ্গে অভিন্ন। সেই সামগ্রী দ্বারা নিজ ব্যক্তিগত হিত কামনা করাই হল মহাভ্রম, নিজ পরিচ্ছিন্নতার সেটিই হল কারণ।

এখানে **'সন্ন্যাসিনাম্'** পদে ত্যাগী (কর্মযোগী) এবং সন্ন্যাসী (সাংখ্যযোগী)—উভয়ের ঐক্য জানানো হয়েছে ; যেমন, কর্মযোগী কর্মে আসক্তিবিহীন থাকেন তেমনি সাংখ্যযোগীও কর্মে সর্বতোভাবে নির্লিপ্ত থাকেন। কর্মযোগী (নিষ্কামভাবে) কর্ম করলেও ফলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন না আর সাংখ্যযোগী কোনোরকম কর্মের সঙ্গে বিন্দুমাত্রও সংযোগ রাখেন না। কর্মযোগী ফলের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করেন অর্থাৎ মমত্ববোধ পরিত্যাগ করেন আর সাংখ্যযোগী কর্তৃত্বাভিমান অর্থাৎ অহংবোধ পরিত্যাগ করেন। মমত্ববোধ পরিত্যাগ করলে অহংবোধ স্বতঃই পরিত্যক্ত হয় এবং অহংবোধ পরিত্যাগ করলে মমত্ববোধ স্বতঃই পরিত্যক্ত হয়। তাই ভগবান কর্মযোগে মমত্ববোধ ত্যাগের পর অহংবোধ ত্যাগ করার কথা বলেছেন—**'নির্মমো নিরহংকারঃ'** (২।৭১) এবং সাংখ্যযোগে অহংবোধ ত্যাগের পর মমত্ববোধ ত্যাগের কথা বলেছেন—**'অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্। বিমুচ্য নির্মমঃ........'** (১৮।৫৩)। উভয়েরই এই ত্যাগের প্রক্রিয়াতে পার্থক্য থাকে ; কিন্তু পরিবর্তনশীল প্রকৃতি এবং প্রকৃতির কার্য-এর কোনোটিরই সঙ্গে উভয়ের কোনো সম্বন্ধ থাকে না অর্থাৎ তত্ত্বগতভাবে কর্মযোগী এবং সাংখ্যযোগী উভয়ই অভিন্ন।

অর্জুন প্রথমে সন্ন্যাস এবং ত্যাগের তত্ত্ব সম্বন্ধে জানতে চেয়েছিলেন ; তাই ভগবান এইস্থানে **'সন্ন্যাসিনাম্'** পদ দ্বারা উভয় তত্ত্ব সম্বন্ধেই জানিয়েছেন যে, কর্মযোগীর মধ্যে এইভাব থাকে যে, নিজের কিছু নয়, নিজের জন্য কিছু চাই না এবং নিজের জন্য কিছু করারও নেই। সাংখ্যযোগীরও তেমনই ভাব থাকে যে, নিজের কিছু নয় এবং নিজের জন্য কিছু চাই না। সাংখ্যযোগী প্রকৃতি এবং প্রকৃতির কার্যাদির সঙ্গে নিজের বিন্দুমাত্র সম্বন্ধ স্বীকার করেন না, তাই তাঁর পক্ষে 'নিজের জন্য কিছু করার নেই'—কথাটি বলার অর্থ হয় না।

এখানে **'ত্যাগিনাম্'** পদ ব্যবহার না করে **'সন্ন্যাসিনাম্'** পদটি ব্যবহার করার অর্থ হল এই যে, সাংখ্যযোগে যে নির্লিপ্তভাব আসে, ত্যাগে অথবা কর্মযোগেও সেই নির্লিপ্ততা আসে (গীতা ৫।৪-৫)। দ্বিতীয়তঃ ভগবান কর্মযোগে এই পর্যন্ত নির্লিপ্ততার কথা বলেছেন, এবার **'সন্ন্যাসিনাম্'** পদটি বলে পরে সাংখ্যযোগে নির্লিপ্ততার কথা জানাবার সূচনা করেছেন।

কর্ম সম্পর্কে বিশেষ কথা

পুরুষ ও প্রকৃতি—এই দুটি বিদ্যমান। পুরুষে কখনো পরিবর্তন হয় না আর প্রকৃতি কখনো পরিবর্তন রহিত হয় না। পুরুষ যখন প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, তখন প্রকৃতির ক্রিয়াগুলি পুরুষের 'কর্ম'রূপে পরিগণিত হয়। কারণ প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্বীকার করায় তার সঙ্গে সে একাত্ম হয়ে যায়। একাত্ম হওয়ায় যেসব প্রাকৃত বস্তু প্রাপ্তি হয়, তাতে মমত্ববোধ জন্মায় এবং সেইজন্যই অপ্রাপ্ত বস্তুতে কামনা হয়। এইভাবে যতক্ষণ কামনা, মমতা এবং একাত্মবোধ থাকে, ততক্ষণ যা কিছু পরিবর্তনরূপ ক্রিয়া হয়, তাকে বলা হয় 'কর্ম'।

একাত্মতা দূর হলে সেই কর্মই পুরুষের পক্ষে 'অকর্ম' হয়ে ওঠে অর্থাৎ সেইসব কর্ম ক্রিয়ামাত্র হয়, তা ফলপ্রদ হয় না—একেই বলা হয় 'কর্মে অকর্ম'। অকর্ম-অবস্থায় অর্থাৎ স্বরূপের অনুভব হলে সেই মহাপুরুষের শরীর দ্বারা যেসব ক্রিয়া হতে থাকে, তাকেই বলা হয় 'অকর্মে কর্ম' (গীতা ৪।১৮)। তাৎপর্য হল এই যে, নিজ নির্লিপ্ত স্বরূপ অনুভূত না হলেও বাস্তবে সকল ক্রিয়া প্রকৃতিতে এবং তার কার্য শরীরে হয়ে থাকে ; কিন্তু প্রকৃতি বা শরীরে নিজ পৃথকত্ব

অনুভব না হলে এই ক্রিয়াগুলি 'কর্ম' হয়ে ওঠে। (গীতা ৩।২৭ ; ১৩।২৯)।

কর্ম তিন প্রকারের—ক্রিয়মাণ, সঞ্চিত এবং প্রারব্ধ। বর্তমানে যে কর্ম করা হয়, সেগুলিকে বলা হয় 'ক্রিয়মাণ'[১] কর্ম। বর্তমান জন্মের অব্যবহিত পূর্ববর্তী অথবা পূর্বের অন্যান্য মনুষ্য জন্মে কৃত যেসব কর্ম সংগৃহীত হয়েছে, সেগুলিকে বলা হয় 'সঞ্চিত' কর্ম। সঞ্চিত কর্মগুলির মধ্যে যেসব কর্ম ফল প্রদানের উপযোগী ও উন্মুখ হয়েছে অর্থাৎ জন্ম, আয়ু এবং অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতি রূপে সমুপস্থিত সেগুলিকে বলা হয় 'প্রারব্ধ' কর্ম।

ক্রিয়মাণ-কর্ম

ক্রিয়মাণ-কর্ম
- ফল অংশ
  - দৃষ্ট
    - তাৎকালিক
    - কালান্তরিক
  - অদৃষ্ট
    - লৌকিক
    - পারলৌকিক
- সংস্কার অংশ
  - শুদ্ধ
  - অশুদ্ধ

ক্রিয়মাণ কর্ম দু'প্রকারের—শুভ এবং অশুভ। যেসব কর্ম শাস্ত্রবিধি অনুসারে করা হয়, সেগুলিকে বলা হয় শুভকর্ম। আর কাম, ক্রোধ, লোভ, আসক্তি ইত্যাদির জন্য যেসব শাস্ত্র-নিষিদ্ধ কর্ম করা হয়, সেগুলিকে বলা হয় অশুভকর্ম।

শুভ বা অশুভ প্রত্যেক ক্রিয়মাণ কর্মের দুটি অংশ, একটি হল ফল অংশ, অপরটি সংস্কার অংশ।

ক্রিয়মাণ কর্মের ফল অংশ দুপ্রকার—দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট। এর মধ্যে দৃষ্টেরও দুটি ভাগ—তাৎকালিক এবং কালান্তরিক। যেমন, খাদ্যগ্রহণের সময় যে রস অনুভূত হয়, সুখ হয়, প্রসন্ন ভাব আসে ও তৃপ্তি হয়—তা হল দৃষ্টের 'তাৎকালিক' ফল আর আহারের ফলে আয়ু, বল ও আরোগ্য ইত্যাদি হওয়াকে বলা হয় দৃষ্টের কালান্তরিক ফল। তেমনই যার অত্যন্ত মশলা খাওয়া অভ্যাস, সে যখন অধিক মশলাদার খাদ্যগ্রহণ করে, তখন তার আনন্দ হয়, সুখ হয় এবং মশলার তীব্রতার জন্য মুখ ও জিভে জ্বালা অনুভূত হয়, চোখ ও নাক দিয়ে জল আসে, মাথায় ঘাম হয়—এগুলি হল দৃষ্টের 'তাৎকালিক' ফল আর কুপথ্য করার জন্য পেট জ্বালা, রোগ ইত্যাদি হলে সেগুলিকে বলা হয় দৃষ্টের 'কালান্তরিক' ফল।

অদৃষ্টেরও এইরূপ দুটি ভেদ আছে—লৌকিক এবং পারলৌকিক। এই জন্মেই যেন ফল পাওয়া যায়—এই ভাবনা নিয়ে যজ্ঞ, দান, তপস্যা, তীর্থ, ব্রত, মন্ত্র, জপ ইত্যাদি শুভ-কর্ম বিধিপূর্বক করা এবং কোনো প্রবল প্রতিবন্ধকতা যদি না থাকে তাহলে ইহজন্মেই পুত্র-ধন-যশ-প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি অনুকূলতার প্রাপ্তি ও রোগ-দ্রারিদ্র্য ইত্যাদি প্রতিকূল অবস্থা দূরীভূত হওয়া—এগুলিকে বলা হয় অদৃষ্টের 'লৌকিক' ফল[২] এবং মৃত্যুর পর যাতে স্বর্গাদি প্রাপ্তি ঘটে—এই ভাবনা নিয়ে ঠিকভাবে নিয়ম মেনে এবং শ্রদ্ধা সহকারে, যে যজ্ঞ, দান, তপস্যা ইত্যাদি শুভকর্ম করা হয় ও তার ফল স্বরূপ মৃত্যুর পর স্বর্গলোকের প্রাপ্তি ঘটে—তাকে বলা হয় অদৃষ্টের 'পারলৌকিক' ফল। তেমনই ডাকাতি করা, চুরি করা, মানুষকে হত্যা করা এইসব অশুভ কর্মের ফলে ইহজীবনেই জেল, জরিমানা, ফাঁসি ইত্যাদি হওয়া হল অদৃষ্টের 'লৌকিক' ফল এবং পাপের জন্য মৃত্যুর পর নরকগমন, পশু-পক্ষীরূপে জন্ম নেওয়া—এগুলি হল অদৃষ্টের 'পারলৌকিক' ফল।

পাপ-পুণ্যের এই লৌকিক ও পারলৌকিক ফলের ব্যাপারে একটি কথা জেনে রাখতে হয় যে, যে পাপ-কর্মের ফলে ইহলোকে জেল-জরিমানা-অপমান-নিন্দা ইত্যাদি ভোগ করা হয়েছে, মৃত্যুর পর সেগুলি আর ভোগ করতে হয় না। কিন্তু একজন ব্যক্তির পাপের মাত্রা কত ছিল এবং কতটা সে ফলভোগ করেছে, তার পুরোটাই ভোগ করেছে না আংশিক ভোগ করেছে—মানুষ তা সম্পূর্ণরূপে জানতে পারে না, কারণ মানুষের সেই ক্ষমতা নেই। কিন্তু তার সম্পূর্ণ হিসাব ভগবানের কাছে থাকে, তাই তাঁর নিয়ম অনুযায়ী পাপের ফল এখানে যতটুকু অংশ কম ভোগ করা

[১] যেসব নতুন কর্ম এবং তার সংস্কার তৈরি হয়, সেগুলি সবই মনুষ্যজন্মে তৈরি হয় (গীতা ৪।১২ ; ১৫।২), পশু-পক্ষী প্রভৃতি যোনিগুলিতে নয়। কারণ ওইসব যোনি শুধু কর্মফল ভোগ করার জন্যই প্রাপ্ত হয়।

[২] এখানে দৃষ্টের 'কালান্তরিক' ফল এবং অদৃষ্টের 'লৌকিক' ফল—উভয়ই এক বলে প্রতিভাত হলেও, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। 'কালান্তরিক' ফল সোজাসুজি পাওয়া যায়, প্রারব্ধ হিসাবে নয় ; কিন্তু 'লৌকিক' ফল প্রারব্ধ হয়ে প্রাপ্ত হয়।

হয়েছে, তা ইহজন্মে অথবা মৃত্যুর পর ভোগ করতেই হয়। অতএব কারও এরূপ সংশয় থাকা উচিত নয় যে আমার পাপ কম ছিল তবু আমাকে বেশি দণ্ড ভোগ করতে হয়েছে অথবা আমি কোনো পাপ না করেও দণ্ড পেলাম ! কারণ এ হল সর্বজ্ঞ, সর্বসুহৃদ সর্বসমর্থ ভগবানের বিধান, এখানে পাপের থেকে বেশি শাস্তি কেউই পায় না, আর যে শাস্তি পায় তা কোনো না কোনো পাপেরই ফল[১]।

এইরূপ ধন-সম্পত্তি, মান-সম্মান, প্রশংসা, নীরোগ অবস্থা ইত্যাদি অনুকূল পরিস্থিতির রূপে পুণ্য কর্মের যত ফল এখানে প্রাপ্ত হয়েছে, তা এখানে ভোগ হয়ে গেছে, বাকি যা আছে তা পরলোকে আবার ভোগ হতে পারে। যদি ইহজীবনেই সম্পূর্ণ ফল ভোগ হয়ে যায়, তবে পুণ্য

[১]একটি শোনা ঘটনা। এক গ্রামে একজন সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর বাড়ির কাছে এক স্বর্ণকার থাকতেন। লোকেরা স্বর্ণ দিয়ে সেই স্বর্ণকার দ্বারা নিজেদের পছন্দমতো অলঙ্কার তৈরি করিয়ে নিতেন। এইভাবে স্বর্ণকার নিজের সংসার চালাতেন। একদিন, তাঁর কাছে যে অনেক সোনা জমা হয়েছে, সেই কথা গ্রামের পাহারাদার সিপাহী জেনে যায়। রাত্রে সে স্বর্ণকারকে হত্যা করে সোনার বাক্সটি নিয়ে পলায়ন করে। সেই সময়ে সামনের প্রতিবেশী সজ্জন ব্যক্তি কোনো কাজে বাইরে আসেন। তিনি সেই সিপাহীকে ধরে ফেলে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি এই বাক্স নিয়ে কোথায় যাচ্ছ ?' সিপাহী বলল, 'চুপ, চীৎকার কোর না। তুমি এর কিছু ভাগ নাও, আমিও কিছুটা নিই।' ভদ্রলোক বললেন, 'আমি কেন নেবো, আমি কি চোর ?' সিপাহী বলল, 'তুমি আমার কথামতো কাজ করো, নাহলে অনেক দুঃখ আছে।' কিন্তু ভদ্রলোক তার কথা শুনলেন না। তখন সিপাহী বাক্সটি মাটিতে ফেলে দিয়ে ভদ্রলোককে ধরে রেখে বাঁশী বাজিয়ে দিল। বাঁশী শুনে অন্যান্য পাহারাদারেরা সেখানে দৌড়ে এল, সিপাহী তখন সবাইকে জানাল যে, 'এই ভদ্রলোক এই বাক্সটি ঘর থেকে চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছিল, আমি ধরে ফেলেছি।' সিপাহীরা সকলে ঘরে ঢুকে দেখল স্বর্ণকার মৃতাবস্থায় পড়ে আছে। তারা ভদ্রলোককে ধরে পুলিশে দিল। জজের সামনে বিচারকালে ভদ্রলোক বললেন, 'আমি স্বর্ণকারকে হত্যা করিনি, এই পাহারাদার সিপাহী খুন করেছে।' কিন্তু সমস্ত সিপাহীরা একজোট হয়ে সাক্ষী দিল যে, 'ভদ্রলোকই হত্যা করেছে এবং আমরা একে গ্রেফতার করেছি।' মোকদ্দমা চলতে থাকল এবং শেষকালে ভদ্রলোকের ফাঁসির হুকুম হল। রায় শুনে ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'দেখো, কী অন্যায় ! ভগবানের বিচারে ন্যায় নেই। আমি খুন না করেও শাস্তি পেলাম, আর যে খুন করেছে, সে নির্দোষ হয়ে মুক্তি পেল, কী অন্যায় !' জজের ওপর এই কথার প্রভাব পড়ল, তিনি ভাবলেন কোনোপ্রকারে এর একটা তদন্ত করা দরকার। তিনি তখন এক উপায় বের করলেন। সকালেই একটি লোক কাঁদতে কাঁদতে এসে বলল, 'জজসাহেব, আমার ভাই খুন হয়েছে, তার বিচার চাই।' জজ তখন সেই সিপাহী এবং দণ্ডপ্রাপ্ত ভদ্রলোককে পাঠালেন লাশ নিয়ে আসতে। তারা গিয়ে দেখল খাটের ওপর কাপড়-ঢাকা লাশ এবং চতুর্দিকে রক্ত ছড়িয়ে আছে। দু'জনে খাটটি তুলে চলতে আরম্ভ করল। সঙ্গী ব্যক্তিটি খবর দেবার ছলে দৌড়ে আগে চলে গেল। চলতে চলতে সিপাহী দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বলল, 'দেখ, সেদিন যদি তুমি আমার কথা মেনে নিতে, তাহলে সোনাও পেতে, ফাঁসিও হত না, দেখলে তো সত্য কথার কী ফল ?' ভদ্রলোক বললেন, 'আমি সত্য কাজই করেছি, ফাঁসি হল তো হল ! হত্যা করলে তুমি আর শাস্তি পেতে হল আমাকে, ভগবানের এ ন্যায় বিচার হয়নি !'

খাটের ওপর মৃত সেজে শুয়ে থাকা লোকটি দু'জনের কথাই শুনছিল। জজের সামনে খাট নামাতেই সে উঠে বসে সমস্ত কথা ব্যক্ত করল। শুনে জজ অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন। সেই সিপাহীও হতবুদ্ধি হয়ে গেল ; তাকে গ্রেফতার করা হল। কিন্তু জজ সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি সেই দণ্ডপ্রাপ্ত ভদ্রলোককে একান্তে ডেকে বললেন, 'এই মামলাতে তুমি নির্দোষ, কিন্তু সত্য করে বলো ইহজন্মে তুমি কাউকে খুন করেছ কি না ?' সেই ভদ্রলোক বললেন, 'বহুদিন আগের কথা। এক দুষ্ট ব্যক্তি গোপনে আমার স্ত্রীর কাছে আসত। আমি দু'জনকেই পৃথক্‌ভাবে অনেক বুঝিয়েছি, কিন্তু তারা আমার কথা শোনেনি। একরাত্রে হঠাৎ বাড়ি এসে দেখি সে আমার ঘরে স্ত্রীর সঙ্গে রয়েছে, আমি ক্রোধান্বিত হয়ে তরবারি দিয়ে তাকে টুকরো করে বাড়ির পিছনের নদীতে ফেলে দিয়েছিলাম। এ-কথা কেউ জানে না।' এই কথা শুনে জজ বললেন, 'তাহলে আমার হাত দিয়ে কি কারণে ফাঁসির হুকুম লেখা হল এখন ব্যাপারটি স্পষ্ট হল। সেই আগের পাপের ফলই তোমায় পেতে হবে। সিপাহীরও ফাঁসি হবে।'

[সেই ভদ্রলোক চোর-সিপাহীটিকে ধরে নিজ কর্তব্য পালন করেছেন। পরে তাঁর যে সাজা হয়, তা এই কর্তব্য পালনের জন্য নয়, অনেক আগে যে হত্যা করেছিলেন, এটি তারই ফল। মানুষের নিজেকে রক্ষা করার অধিকার আছে, কাউকে হত্যা করার নয় ; মারার অধিকার একমাত্র রক্ষক ও রাজার। সুতরাং হত্যা করার সাজা এখানে পেয়ে তিনি পরলোকের ভীষণ সাজা থেকে মুক্তি পেলেন। ইহলোকে যে দণ্ড ভোগ করা হয়, তাতে অল্পেই মুক্তি হয়, শুদ্ধি আসে, নচেৎ পরলোকে সুদসহ ভয়ঙ্কর কষ্ট ভোগ করতে হয়।]

এখানেই সমাপ্ত হয়।

ক্রিয়মাণ-কর্মের সংস্কার-অংশেরও দুটি ভাগ থাকে—শুদ্ধ পবিত্র সংস্কার এবং অশুদ্ধ বা অপবিত্র সংস্কার। শাস্ত্রবিহিত কর্মাদি করলে যে সংস্কার লাভ হয়, তা শুদ্ধ এবং পবিত্র হয় আর শাস্ত্রনীতি-লোকমর্যাদার বিরুদ্ধ কর্ম করলে যে সংস্কার জন্মে, সেগুলি হয় অশুদ্ধ এবং অপবিত্র।

এই দুই শুদ্ধ এবং অশুদ্ধ সংস্কার নিয়েই স্বভাব বা প্রকৃতি তৈরি হয়। এই সংস্কারগুলির মধ্যে অশুদ্ধ অংশ সর্বতোভাবে নাশ হলে স্বভাব শুদ্ধ, নির্মল ও পবিত্র হয়। পূর্বকৃত কর্মের দ্বারা স্বভাব তৈরি হয়, তাই কর্মের বিভিন্নতার জন্য জীবন্মুক্ত ব্যক্তিদেরও স্বভাবে বিভিন্নতা থাকে। সুতরাং বিভিন্ন স্বভাবের জন্যই তাঁদের কর্মও বিভিন্ন প্রকার হয়। কিন্তু যেসব কর্ম দোষের নয়, সেগুলি সর্বতোভাবে শুদ্ধ এবং কল্যাণকর হয়ে থাকে।

সংস্কার-অংশের জন্য যে স্বভাব সৃষ্ট হয়, তা এক দৃষ্টিতে প্রবল হয়—'স্বভাবো মূর্ধ্নি বর্ততে' সুতরাং তাকে দূর করা সম্ভব নয়[১]। এইরূপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণের যে স্বভাব, তাতে কৃত কর্মেরই প্রাধান্য থাকে। তাই ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে, 'যে কর্ম তুমি মোহবশতঃ করতে চাইছো না, তা তুমি নিজ স্বাভাবিক কর্ম দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পরবশ হয়ে করবে।' (গীতা ১৮।৬০)।

এখন চিন্তা করার একটি বিষয় হল এই যে একদিকে স্বভাবের আত্যন্তিক প্রাবল্য, যা মানুষ ত্যাগ করতে পারে না আর অপরদিকে মনুষ্যজন্মের উদ্যোগের এই প্রাধান্য এমনই যে মানুষ সবকিছু করতে স্বাধীন। সুতরাং এই দুইয়ের মধ্যে কে জয়ী হবে এবং কে-ই বা পরাজিত হবে ? এতে জয়-পরাজয়ের কোনো ব্যাপার নেই। নিজ নিজ স্থানে উভয়েই প্রবল। কিন্তু এখানে স্বভাব পরিত্যাগ না করার যে কথা বলা হয়েছে তা জাতি-বিশেষের জন্য। তার অর্থ হল যে, জীব যে বর্ণে জন্মগ্রহণ করে, যেমন, মাতা-পিতার ঔরসে জন্মায়, সেই অনুসারে যে স্বভাব পায়, তা কেউ সহজে পরিবর্তন করতে পারে না। সুতরাং সেই স্বভাব দোষের নয়, নির্দোষই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণের যার যে স্বভাব, তা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়, তার প্রয়োজনও নেই, শাস্ত্রও তা পরিবর্তন করতে বলে না। কিন্তু সেই স্বভাবের যে দোষযুক্ত অংশ—রাগ ও দ্বেষ, তা দূর করার ক্ষমতা ভগবান মানুষকে দিয়েছেন। অতএব যে দোষগুলির জন্য মানুষের স্বভাব খারাপ হয়, সেগুলি দূর করে মানুষ স্বাধীনভাবে নিজ নিজ স্বভাব শুদ্ধ করে নিতে পারে (গীতা ১৮।৬২)। এইভাবে প্রকৃতি বা স্বভাবের প্রবলতা যেমন প্রমাণিত হয় আবার মানুষের স্বাতন্ত্র্যও প্রমাণিত হয়। তাৎপর্য হল এই যে স্বভাবকে শুদ্ধ রাখতে প্রকৃতির প্রাধান্য থাকে আর অশুদ্ধ স্বভাব দূর করাতে মানুষের স্বাতন্ত্র্য সাহায্য করে।

যেমন, লৌহনির্মিত তরবারি পরশমণি দ্বারা স্পর্শ করালে সেটি সোনার হয়ে গেলেও তার আকার বা ধার পরিবর্তিত হয় না। সোনা হওয়ায় পরশমণি প্রাধান্য পেলেও তরবারির আকার এবং ধারে তরবারিরই স্বাতন্ত্র্য থাকে। তেমনই যেসব ব্যক্তি তাঁদের স্বভাব শুদ্ধ করে তুলেছেন, তাঁদের কর্ম সর্বথা শুদ্ধ হলেও বর্ণ, আশ্রম, সম্প্রদায়, সাধন-পদ্ধতি অনুসারে তাঁদের মধ্যে কর্মের পার্থক্য দেখা যায়। যেমন, কোনো ব্রাহ্মণের তত্ত্বজ্ঞান লাভ হলেও খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে তিনি পবিত্রতা বজায় রাখেন, নিজ হাতে রন্ধন করে খান। কারণ তাঁর স্বভাবেই এই পবিত্র ভাব থাকে। কিন্তু কোনো হরিজন বা সাধারণ বর্ণের কোনো মানুষের যখন তত্ত্ববোধ হয় তখন তিনি

এই ঘটনা থেকে জানা যায়, মানুষের কোনো পাপের শাস্তি কবে পাওয়া যাবে, তা জানা নেই। ভগবানের বিচিত্র বিধান। যতক্ষণ পুণ্য প্রবল থাকে, ততক্ষণ উগ্র পাপ-কাজের ফলও তৎক্ষণাৎ মেলে না। পুরাতন পুণ্য শেষ হলে, তখন তার সময় হয়। ইহজন্মে বা পরজন্মে পাপের ফল ভোগ করতেই হয়।

অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম শুভাশুভম্। নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম জন্মকোটিশতৈরপি॥

[১]ব্যাঘ্রস্তুষ্যতি কাননে সুগহনাং সিংহো গুহাং সেবতে হংসো বাঞ্ছতি পদ্মিনীং কুসুমিতাং গৃধ্রঃ শ্মশানে স্থলে।

সাধুঃ সৎকৃতিসাধুমেব ভজতে নীচোঽপি নীচং জনং যা যস্য প্রকৃতিঃ স্বভাবজনিতা কেনাপি ন ত্যজ্যতে॥

'গভীর অরণ্যে বাঘ সন্তুষ্ট হয়, সিংহ হয় গভীর গুহাতে, হংস প্রস্ফুটিত পদ্ম পছন্দ করে, শকুনি পছন্দ করে শ্মশান-বাস, সৎ ব্যক্তি পছন্দ করেন সৎ-সঙ্গ আর নীচ ব্যক্তি চান নীচ ব্যক্তিদের সঙ্গ। এ-কথা সত্য যে, যার যেমন প্রকৃতি তা সে ছাড়তে পারে না।'

এইসব খাওয়া-দাওয়ার পবিত্রতা নিয়ে চিন্তা করেন না, কারণ তাঁর স্বভাবই ওইভাবে গঠিত। এটি কোনো দোষের ব্যাপার নয়।

অনাদিকাল থেকে জীবের অসৎ-এর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার স্বভাব হয়ে রয়েছে যার ফলে জীব জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হয় এবং উচ্চ-নীচ কুলে জন্ম নিয়ে থাকে। মানুষ এই স্বভাবকে শুদ্ধ করে তুলতে পারে অর্থাৎ তার মধ্যে যে কামনা, মমতা এবং একাত্মবোধ থাকে, তা দূর করতে সক্ষম হয়। এই কামনা, মমতা এবং একাত্মতা দূর হলে যে স্বভাব থাকে, সেটি দূষণীয় হয় না। তাই এই দোষমুক্ত স্বভাব দূর করার কথা বলা হয়নি এবং তার প্রয়োজনও নেই।

মানুষ যখন অহংকারের আশ্রয় ত্যাগ করে সর্বতোভাবে ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন তার স্বভাব শুদ্ধ হয়; যেমন, লোহা পরশমণির ছোঁয়ায় সোনায় পরিণত হয়। স্বভাব শুদ্ধ হওয়ায় সে স্বভাবজ কর্ম করলেও তাতে আর দোষী বা পাপী হয় না (গীতা ১৮।৪৭)। সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হলে ভক্তের প্রকৃতির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকে না, তখন ভক্তের জীবনে ভগবানের স্বভাব কাজ করে। ভগবান সকল প্রাণীরই সুহৃদ—**'সুহৃদং সর্বভূতানাম্'** (গীতা ৫।২৯), তাই ভক্তও সকল প্রাণীর সুহৃদ হয়ে ওঠেন—**'সুহৃদঃ সর্বদেহিনাম্'** (শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২৫।২১)।

এইভাবে কর্মযোগের দ্বারা মানুষ যখন রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ দূর করে, তখন তার স্বভাব শুদ্ধ হয়, যার ফলে আত্মস্বার্থ দূর হয়ে তার মধ্যে সংসারের সকলের প্রতি হিতের ভাব স্বতঃই প্রকটিত হয়। যেমন, ভগবানের স্বভাব হল প্রাণীমাত্রেরই হিত-সাধন করা, তেমনই তার স্বভাবও হয় প্রাণীমাত্রেরই হিত করা। তার সকল চিন্তাই যখন প্রাণীর হিতের দিকে যায়, তখন ভগবানের সর্বভূতসুহৃৎ-শক্তির সঙ্গে তার ঐক্য হয়। তার স্বভাবে তখন ভগবানের সুহৃৎ-শক্তি কাজ করে থাকে।

ভগবানের এই সর্বভূতসুহৃৎ-শক্তি প্রকৃতপক্ষে সকল ব্যক্তির জন্যই সমানভাবে উন্মুক্ত। কিন্তু অহং, কর্তৃত্ববোধ ও রাগ-দ্বেষ থাকায় সেই শক্তিতে প্রতিবন্ধকতা আসে অর্থাৎ সেই শক্তি যথাযথ কাজ করে না। মহাপুরুষদের অহংবোধ এবং রাগ-দ্বেষ না থাকায় তাঁদের মধ্যে এই শক্তি কার্যকর হয়।

সঞ্চিত কর্ম

```
              সঞ্চিত কর্ম
                   |
     ┌─────────────┴─────────────┐
  ফল অংশ                    সংস্কার অংশ
     |                            |
  প্রারব্ধ                        স্ফুরণ
```

অনেক জন্ম ধরে যেসব কর্ম (ফল অংশ ও সংস্কার অংশ) মানুষের অন্তরে সঞ্চিত হয়, সেগুলিকেই বলা হয় সঞ্চিত কর্ম। তার ফল অংশ থেকে সৃষ্টি হয় 'প্রারব্ধে'র আর সংস্কার অংশ থেকে হতে থাকে স্ফুরণ। সেই স্ফুরণগুলিতেও বর্তমানে কৃত যেসব নতুন নতুন কর্ম সঞ্চয় হয়, সেগুলিরই অধিক স্ফুরণ হয়। কখনো কখনো সঞ্চিত পুরাতন কর্মেরও স্ফুরণ হয়[১]; যেমন, কোনো জায়গায় আগে পেঁয়াজ রেখে তারপর ক্রমশঃ গম, ছোলা, যব, বাজরা, ডাল ইত্যাদি রাখলে বার করার সময় যেটি সর্বশেষে রাখা হয়েছিল, সেটিই সর্বপ্রথম বার হবে, কিন্তু মাঝে মাঝে এতে পেঁয়াজের গন্ধও আসবে। তবে এই উদাহরণ সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য হয় না। কারণ পেঁয়াজ, গম এগুলি হল সাবয়ব পদার্থ আর সঞ্চিত কর্ম হল নিরাবয়ব। এই দৃষ্টান্ত শুধু এইজন্যই দেওয়া হল যে, নতুন ক্রিয়মাণ কর্মের স্ফুরণ বেশি হয় এবং কখনো কখনো পুরাতন কর্মেরও স্ফুরণ হয়।

এইরূপ নিদ্রার সময়ও স্ফুরণ হয়। ঘুমের সময় জাগ্রত-অবস্থা অবসিত হওয়ায় সঞ্চিতের স্ফুরণ স্বপ্নরূপে

[১]স্ফুরণ সঞ্চিত কর্ম অনুযায়ী হয় আবার প্রারব্ধ অনুসারেও হয়। সঞ্চিত কর্ম অনুসারে যে স্ফুরণ হয় তা মানুষকে কর্মে বাধ্য করে না, কিন্তু এতে যদি রাগ-দ্বেষ জন্মায়, তবে তা 'সঙ্কল্প' হয়ে মানুষকে কর্মে বাধ্য করে। প্রারব্ধানুসারে যে স্ফুরণ হয়, তা ভোগের জন্য মানুষকে কর্ম করতে বাধ্য করে; কিন্তু তা বিহিত কর্মেই বাধ্য করে, নিষিদ্ধ কর্মে নয়। কারণ বিবেক-প্রধান এই মনুষ্যদেহ নিষিদ্ধ কর্ম করার জন্য নয়। সুতরাং নিজ নিজ বিবেক-শক্তিকে প্রবল করে নিষিদ্ধ কর্ম ত্যাগ করার দায়িত্ব মানুষেরই থাকে এবং তা করাতে মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন।

প্রতিভাত হয়, একেই বলা হয় স্বপ্নাবস্থা[১]। স্বপ্নঅবস্থায় বুদ্ধি সজাগ না থাকায় ক্রম, ব্যতিক্রম বা অনুক্রম থাকে না। যেমন, শহরটি হয়ত দিল্লী, বাজার দেখা যায় মুম্বাইর আর সেখানে দোকানগুলি কলকাতার মতো ; কোনও জীবিত ব্যক্তিকে দেখা যায় অথবা কোনো মৃত ব্যক্তির সঙ্গে মিলন হয়, তার সঙ্গে কথাবার্তা হয় ইত্যাদি।

জাগ্রত অবস্থায় প্রত্যেক মানুষের মনে নানাপ্রকার স্ফুরণ হতে থাকে। জাগ্রত অবস্থায় যদি শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন থেকে বুদ্ধির আবরণ সরে যায় তাহলে মানুষ যা মনে আসে, তাই বলতে থাকে। এইরূপ উচিত-অনুচিতের বিচার করার শক্তি কাজ না করায় সেই ব্যক্তিকে সহজ, সরল অথবা পাগল বলা হয়। কিন্তু যাঁর শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের ওপর বুদ্ধির আধিপত্য থাকে, তিনি যা উচিত বলে মনে করেন, তাই বলেন এবং যা অনুচিত মনে করেন তা বলেন না। বুদ্ধি সতর্ক থাকায় তিনি সাবধান থাকেন, তাই তিনি হলেন 'চতুর পাগল'।

এইভাবে মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত ভগবানকে লাভ না করে ততক্ষণ সে নিজেকে এইসব স্ফুরণ থেকে রক্ষা করতে পারে না। পরমাত্মপ্রাপ্তি হলে মন্দ স্ফুরণগুলি সর্বতোভাবে দূর হয়। সেইজন্যই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদের মনে অপবিত্র মন্দ চিন্তার কখনো উদয় হয় না। যাকে শরীর বলা হয় তাতে (ব্যাধি প্রভৃতি কোনো কারণে) প্রারব্ধবশতঃ যদি কখনো অচৈতন্য-ভাব, উন্মাদ-ভাব হয়ও, তবুও তার ফলে তিনি শাস্ত্রনিষিদ্ধ কথা বলেন না বা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ কোনো কিছু করেনও না। অন্তঃকরণ শুদ্ধ হওয়ায় শাস্ত্রনিষিদ্ধ কোনো কথা বলা বা কর্ম করা তাঁর স্বভাবে থাকে না।

প্রারব্ধ কর্ম

প্রারব্ধ কর্ম

অনুকূল পরিস্থিতি — মিশ্রিত পরিস্থিতি (অনুকূল-প্রতিকূল) — প্রতিকূল পরিস্থিতি

স্বেচ্ছাপূর্বক ক্রিয়া — অনিচ্ছাপূর্বক ক্রিয়া — পরেচ্ছাপূর্বক ক্রিয়া

স্বেচ্ছাপূর্বক ক্রিয়া — অনিচ্ছাপূর্বক ক্রিয়া — পরেচ্ছাপূর্বক ক্রিয়া

স্বেচ্ছাপূর্বক ক্রিয়া — অনিচ্ছাপূর্বক ক্রিয়া — পরেচ্ছাপূর্বক ক্রিয়া

সঞ্চিতের মধ্যে যেসব কর্ম ফল দেবার জন্য উন্মুখ হয়, তাকে বলা হয় প্রারব্ধ কর্ম[২]। প্রারব্ধ কর্মের ফল অনুকূল বা প্রতিকূল পরিস্থিতিরূপে উপস্থিত হয়। কিন্তু সেই প্রারব্ধ কর্ম ভোগ করার জন্য প্রাণীদের তিন প্রকার প্রবৃত্তি হয়ে থাকে—(১) স্বেচ্ছাপূর্বক, (২) অনিচ্ছা(দৈবেচ্ছা) পূর্বক, (৩) পরেচ্ছাপূর্বক। উদাহরণরূপে বলা হয়—

(১) কোনো ব্যবসায়ী জিনিস ক্রয় করায় তাঁর লাভ হল, তেমনই অন্য কোনো ব্যবসায়ী জিনিস ক্রয় করায় তাঁর লোকসান হল। এই দুজনের ক্রয়-বিক্রয়ের লাভ ও

---

[১]জাগ্রত অবস্থাতেও জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি—এই তিন অবস্থা হয় ; যেমন—মানুষ জাগ্রত অবস্থাতে সতর্কতাপূর্বক কাজ করে, একে বলা হয় জাগ্রতে জাগ্রত অবস্থা। জাগ্রত অবস্থায় মানুষের হঠাৎ যে অন্য স্ফুরণ হয়, তাকে বলে জাগ্রতের স্বপ্ন অবস্থা। জাগ্রত অবস্থাতে কখনো কখনো কাজের মধ্যে সেই কাজ অথবা পূর্বের কাজের কোনো স্ফুরণ হয় না, একেবারে বৃত্তিরহিত অবস্থা হয়, একে বলে জাগ্রতে সুষুপ্তি-অবস্থা।

কর্মের বেগ বেশি হলে জাগ্রত অবস্থাতে জাগ্রত এবং স্বপ্ন অবস্থা বেশি হলেও সুষুপ্তি অবস্থা কম হয়। কোনো সাধক যদি জাগ্রতকে স্বাভাবিক সুষুপ্তি করেন, তবে তাঁর সাধন খুব জোর হয়। কারণ জাগ্রত-সুষুপ্তিতে সাধকের পরমাত্মার সঙ্গে নিরাবরণরূপে স্বতঃই সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এমনিতেই সুষুপ্তিতে সাংসারিক সম্পর্ক দূর হয় ; কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি অজ্ঞানে লীন হওয়ায় স্বরূপ স্পষ্ট অনুভূত হয় না। জাগ্রত-সুষুপ্তিতে বুদ্ধি জাগ্রত থাকায় স্বরূপ স্পষ্ট অনুভূত হয়।

এই জাগ্রত-সুষুপ্তি সমাধির থেকেও বিশিষ্ট। কারণ তা আপনিই হয় আর সমাধিতে অভ্যাসের সাহায্যে বৃত্তি একাগ্র করতে হয়। তাই সমাধিতে পুরুষার্থ থাকায় কারণ-শরীরে স্থিতি হয় ; কিন্তু জাগ্রত-সুষুপ্তিতে অভ্যাস এবং অহংকার ছাড়া বৃত্তি স্বতঃনিরুদ্ধ হওয়ায় স্বরূপে স্থিতি হয় অর্থাৎ স্বরূপ অনুভূত হয়।

[২]'প্রকর্ষেণ আরব্ধঃ প্রারব্ধঃ' অর্থাৎ যথাযথভাবে ফল প্রদানের জন্য যা আরম্ভ হয়েছে, তাকেই বলা হয় 'প্রারব্ধ'।

লোকসান এঁদের শুভ-অশুভ কর্ম হতে সৃষ্ট প্রারব্ধের ফল ; যদিও তাঁরা স্বেচ্ছাপূর্বকই জিনিস ক্রয় করেছিলেন।

(২) এক ভদ্রলোক কোথাও যাচ্ছিলেন, নদীতে বন্যা আসায় তাঁর সামনে জলে ভেসে এলো একটি পুঁটলি, ভদ্রলোক খুলে দেখলেন তাতে অনেক টাকা রয়েছে। তেমনই কোনো ভদ্রলোক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ মাথার ওপর গাছের একটি ডাল ভেঙে পড়ল এবং তিনি আহত হলেন। এই দুজনের অর্থ প্রাপ্তি ও আঘাত প্রাপ্তি তাঁদের শুভ-অশুভ কর্ম হতে সৃষ্ট প্রারব্ধের ফল। কিন্তু অর্থলাভ করা এবং গাছের ডাল ভেঙে পড়া—এই দুর্দৈব তাঁর অনিচ্ছা (দৈবেচ্ছা)-পূর্বক হয়েছে।

(৩) কোনো এক ধনী ব্যক্তি একটি শিশুকে দত্তক নিয়েছেন। অর্থাৎ তাকে পুত্ররূপে স্বীকার করেছেন, যার ফলে তাঁর সব অর্থ ওই বাচ্চাটি পায়। তেমনই চোর কারও সমস্ত অর্থ চুরি করে নেয়। এই দুটির মধ্যে শিশুটির অর্থলাভ ও চোরের দ্বারা অর্থের ক্ষতি এই দুটিই তাদের শুভ-অশুভ কর্ম হতে সৃষ্ট প্রারব্ধেরই ফল। কিন্তু দত্তক পুত্র হওয়া এবং চুরি হওয়া এই দুটিই পরেচ্ছাপূর্বক হয়েছে।

এখানে আর একটি বিষয় জানতে হবে যে কর্মের ফল 'কর্ম' হয় না, 'পরিস্থিতি' হয় অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্মের ফল 'পরিস্থিতি' রূপে উপস্থিত হয়। যদি নতুন (ক্রিয়মাণ) কর্মকে প্রারব্ধের ফলরূপে মানা হয় তাহলে 'এমন করো, অমন কোরো না'—এইসব শাস্ত্র, গুরুজনের বিধি-নিষেধ নিরর্থক হয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ আগে যেমন কর্ম করেছিলে সেই অনুযায়ী জন্ম হবে এবং সেইমতোই কর্ম হবে, তাহলে এইসব কর্ম পরে নতুন কর্ম সৃষ্টি করবে, যার ফলে এই কর্ম-পরম্পরা চলতেই থাকবে অর্থাৎ এর কখনো শেষ হবে না।

প্রারব্ধ-কর্ম থেকে প্রাপ্ত ফলের দুটি ভেদ হয়—প্রাপ্ত ফল এবং অপ্রাপ্ত ফল। প্রাণীদের কাছে অনুকূল ও প্রতিকূল পরিস্থিতিরূপে যা উপস্থিত হয়, সেগুলি 'প্রাপ্ত' ফল আর ইহজন্মের যেসব অনুকূল ও প্রতিকূল পরিস্থিতি ভবিষ্যতে আসবে, সেগুলিকে বলা হয় 'অপ্রাপ্ত' ফল।

ক্রিয়মাণ কর্মের যে ফল অংশ সঞ্চিত রূপে জমা থাকে, সেগুলিই প্রারব্ধ হয়ে অনুকূল, প্রতিকূল এবং মিশ্রিত পরিস্থিতির রূপে মানুষের জীবনে উপস্থিত হয়। তাই যতক্ষণ সঞ্চিত কর্ম থাকে, ততক্ষণ প্রারব্ধও সৃষ্টি হয় এবং তা পরিস্থিতিরূপে পরিণত হতে থাকে। কিন্তু পরিস্থিতি মানুষকে সুখী বা দুঃখী হতে বাধ্য করে না। পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করাই হল সুখী বা দুঃখী হওয়ার প্রধান কারণ। পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা বা না-করাতে মানুষ সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন। যিনি পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সঙ্গে নিজের সম্পর্ক মেনে নেন, সেই অবিবেচক ব্যক্তিই সুখী বা দুঃখী হয়ে থাকেন। কিন্তু যিনি পরিস্থিতির সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নেন না, সেই বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনো সুখী বা দুঃখী হন না ; তাই তাঁর স্থিতি স্বতঃই সাম্যাবস্থায় থাকে, যা হল তাঁর প্রকৃত স্বরূপ।

কর্মে মানুষের প্রারব্ধের প্রাধান্য থাকে, না পুরুষার্থের, অথবা প্রারব্ধ বলবান, না পুরুষার্থ ? এই বিষয়ে নানা প্রশ্ন জাগে। তার সমাধানের জন্য প্রথমে জানতে হবে প্রারব্ধ কী আর পুরুষার্থ কাকে বলে ?

মানুষের মধ্যে চার প্রকার আকাঙ্ক্ষা থাকে—এক অর্থের, দুই ধর্মের, তিন ভোগের এবং চার মুক্তির। প্রচলিত ভাষায় একে বলা হয় অর্থ-ধর্ম-কাম-মোক্ষ।

(১) **অর্থ**—অর্থ দুপ্রকার, স্থাবর ও জঙ্গম। সোনা-রূপা, টাকা, জমি-জায়গা, বাড়ি ইত্যাদি হল স্থাবর আর গৃহপালিত গোরু, মোষ, ছাগল প্রভৃতি হল জঙ্গম অর্থ।

(২) **ধর্ম**—সকাম বা নিষ্কামভাবে যে যজ্ঞ-তপ-দান-ব্রত-তীর্থাদি করা হয় সেগুলিকে বলা হয় 'ধর্ম'।

(৩) **কাম**—জাগতিক সুখভোগকে বলা হয় 'কাম'। এই সুখভোগ আট প্রকারের—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, মান, মর্যাদা এবং আরাম।

(ক) **শব্দ**—শব্দ দুপ্রকারের, বর্ণাত্মক ও ধ্বন্যাত্মক। ব্যাকরণ, সাহিত্য, উপন্যাস, গল্প ইত্যাদি 'বর্ণাত্মক' শব্দ[১]। চর্মজ, তার এবং ফুৎকারের তিনটি বাজনা এবং তালের অর্ধেক বাদ্য—এই সাড়ে তিন প্রকারের বাদ্যযন্ত্র

[১]বর্ণাত্মক শব্দেও দশটি রস থাকে—শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত, শান্ত ও বাৎসল্য। চিত্ত দ্রবীভূত হলেই এই দশটি রস উৎপন্ন হয়। ভগবানের জন্য যদি এই দশটি রস ব্যবহার করা হয় তবে এগুলি কল্যাণকারী হয়ে ওঠে আর সুখভোগের জন্য ব্যবহার করলে তা পতনকারক হয়।

'ধ্বন্যাত্মক' শব্দ প্রকটিতকারী[১]। এই বর্ণাত্মক ও ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি শুনে যে সুখ হয়, তা হল শব্দজ সুখ।

(খ) **স্পর্শ**—স্ত্রী-পুত্র-মিত্রের সঙ্গে মিলনে এবং ঠাণ্ডা, গরম, কোমল ইত্যাদির সঙ্গে ত্বকের সংযোগে যে সুখ উৎপন্ন হয়, তাকে বলা হয় স্পর্শজ সুখ।

(গ) **রূপ**—চক্ষু দ্বারা খেলাধুলো, সিনেমা, সার্কাস, বন-পর্বত, গৃহ-সরোবর ইত্যাদি সুন্দর দৃশ্য দেখে যে সুখ অনুভব হয় তা হল রূপজ সুখ।

(ঘ) **রস**—মিষ্ট, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত ও কষা—এই ছয় প্রকার রস আস্বাদনে যে সুখ অনুভূত হয়, তা হল রসজ সুখ।

(ঙ) **গন্ধ**—নাসিকার দ্বারা আতর, তেল, পুষ্পজাত, ল্যাভেন্ডার ইত্যাদি সুগন্ধী এবং রসুন, পেঁয়াজ ইত্যাদি গন্ধের ঘ্রাণ গ্রহণে যে সুখ হয়, তাকে বলা হয় গন্ধজ সুখ।

(চ) **মান**—শরীরের আদর-যত্নে যে সুখ হয়, তাকে বলা হয় মান বা সম্মান সুখ।

(ছ) **মর্যাদা**—নামের প্রশংসা হলে যে সুখ হয়, তাকেই বলা হয় মর্যাদা সুখ।

(জ) **আরাম**—পরিশ্রম না করলে বা নিষ্কর্মা হয়ে থাকলে যে সুখ অনুভূত হয়, তাকে বলে আরামের সুখ।

৪. মোক্ষ—আত্মসাক্ষাৎকার, তত্ত্বজ্ঞান, কল্যাণ, উদ্ধার, মুক্তি, ভগবদর্শন লাভ, ভগবদ্প্রেম ইত্যাদিকে বলা হয় 'মোক্ষ'।

এই চারটিতে (অর্থ, ধর্ম, কাম, মোক্ষ) দেখা যায় যে অর্থ এবং ধর্ম—উভয়ই একটি অপরটিকে বৃদ্ধি করে অর্থাৎ অর্থ থেকে ধর্ম এবং ধর্ম থেকে অর্থ বৃদ্ধিলাভ করে। কিন্তু কামনা পূরণের জন্য যদি ধর্মপালন করা হয় তবে সেই ধর্ম কামনা পূরণ করে শেষ হয়ে যায়। অর্থকেও যদি কামনা পূরণের উদ্দেশ্যে লাগান হয় তাহলে অর্থও কামনা পূরণ করে শেষ হয়ে যায়। তাৎপর্য হল এই যে কামনা, ধর্ম ও অর্থ উভয়কেই গ্রাস করে। তাই ভগবান গীতাতে কামনাকে 'মহাশন' (বিশেষ গ্রাসকারী) বলে উল্লেখ করে সেটিকে ত্যাগ করার জন্য বিশেষভাবে বলেছেন। (৩।৩৭-৪৩)।

ধর্মানুষ্ঠান যদি কামনা পরিত্যাগ করে করা হয় তাহলে তা চিত্ত শুদ্ধ করে মুক্তি প্রদান করে। তদ্রূপ অর্থকে যদি কামনা ত্যাগ করে অন্যের উপকারের জন্য, অন্যের হিতার্থে বা সুখের উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হয় তাহলে সেটিও চিত্ত শুদ্ধ করে মুক্তি প্রদান করে।

অর্থ, ধর্ম, কাম, মোক্ষ—এই চারটির মধ্যে 'অর্থ' ও 'কাম' প্রাপ্তিতে প্রারব্ধের মুখ্যতা এবং পুরুষার্থের গৌণতা থাকে এবং 'ধর্ম' ও 'মোক্ষ'-তে পুরুষার্থের মুখ্যতা এবং প্রারব্ধের গৌণতা থাকে। প্রারব্ধ ও পুরুষার্থ—উভয়েরই ক্ষেত্র ভিন্ন ভিন্ন এবং উভয়ই নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রধান। তাই বলা হয়—

সন্তোষস্ত্রিষু কর্তব্যঃ স্বদারে ভোজনে ধনে।
ত্রিষু চৈব ন কর্তব্যঃ স্বাধ্যায়ে জপদানয়োঃ॥

অর্থাৎ নিজের স্ত্রী, পুত্র, পরিজন, খাদ্য ও অর্থে সন্তুষ্ট থাকা উচিত কিন্তু স্বাধ্যায়, পূজা-পাঠ, নাম-জপ, কীর্তন ও দান করার ব্যাপারে কখনো সন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়। অর্থাৎ প্রারব্ধের ফল—অর্থ ও ভোগে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। কারণ প্রারব্ধ অনুসারে এটি যতটা পাবার, তা পাওয়া যাবেই, তার বেশি বা কম নয়। কিন্তু ধর্মানুষ্ঠান এবং নিজ কল্যাণের কাজে কখনোই সন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়। কারণ এগুলি নতুন পুরুষার্থ এবং পুরুষার্থের জন্যই এই মনুষ্যদেহ লাভ হয়েছে।

কর্মের দুটি ভাগ—শুভ (পুণ্য) এবং অশুভ (পাপ)। শুভ কর্মের ফল অনুকূল পরিস্থিতি প্রাপ্ত হওয়া আর অশুভ কর্মের ফল হল প্রতিকূল পরিস্থিতি প্রাপ্ত হওয়া। কর্ম বাহ্যতঃ করা হয়, তাই কর্মের ফলও বাহ্যিক পরিস্থিতি রূপেই প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সেই পরিস্থিতি হতে যে সুখ বা দুঃখ উৎপন্ন হয়, তা অন্তরে হয়ে থাকে। তাই ওই পরিস্থিতিতে সুখী বা দুঃখী হওয়া শুভাশুভ কর্মের বা প্রারব্ধের ফল নয়, সেটি নিজ নিজ মূর্খতারই ফল। যদি এই মূর্খতা অপসারিত হয়, ভগবানের ওপর[২] অথবা প্রারব্ধের

[১]ঢোল, তবলা, পাখোয়াজ, মৃদঙ্গ ইত্যাদি হল 'চর্মজ' ; সেতার, সারেঙ্গী, তানপুরা এগুলি হল 'তার' এবং হারমোনিয়াম, বাঁশী ইত্যাদি 'ফুৎকার'-এর আর ঝাঁঝ, মঞ্জীরা, করতাল ইত্যাদি হল 'তালবাদ্য'।

[২]লালনে তাড়নে মাতুর্নাকারুণ্যং যথার্ভকে। তদ্বদেব মহেশস্য নিয়ন্তুর্গুণদোষয়োঃ॥

'মা যেমন শিশুকে লালন-পালন ও তাড়না করাতে কখনো অকৃপণ হন না, তেমনই জীবেদের দোষগুণ নিয়ন্ত্রণকারী পরমেশ্বর কখনো কারও পরে অকৃপণ হন না।'

ওপর[১] বিশ্বাস ফিরে আসে তাহলে যতই প্রতিকূল পরিস্থিতি আসুক চিত্ত প্রসন্ন থাকে, মনে আনন্দ থাকে। কারণ প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পাপ দূর হয়, পরবর্তীকালে পাপ না করার জন্য সতর্কতা আসে এবং পাপ নাশ হওয়ায় চিত্ত শুদ্ধ হয়।

সাধকের অনুকূল ও প্রতিকূল পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করা উচিত, অপব্যবহার নয়। অনুকূল পরিস্থিতি যদি আসে তাহলে বস্তু অন্যের হিতার্থে সেবাবুদ্ধি নিয়ে ব্যয় করাই হল অনুকূল পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করা এবং সেগুলিকে সুখবুদ্ধিতে ভোগ করাকে বলা হয় অপব্যবহার করা। তেমনই প্রতিকূল পরিস্থিতি যদি আসে তাহলে সুখের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে, আমার পূর্বকৃত পাপ নাশ করার জন্য, ভবিষ্যতে যাতে আর পাপ না করি তার সাবধানতার জন্য এবং আমার উন্নতির জন্য ভগবানের কৃপায় এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে—এই মনে করে পরম প্রসন্ন থাকাই হল প্রতিকূল পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করা এবং এতে দুঃখবোধ করা হল পরিস্থিতির অপব্যবহার করা।

সুখ বা দুঃখ ভোগ করার জন্য এই মনুষ্যদেহ নয়। সুখ ভোগ করার স্থান হল স্বর্গ আর দুঃখ ভোগ করার স্থান হল নরক এবং চুরাশী লক্ষ যোনি। তাই এগুলি ভোগযোনি আর মানুষ হল কর্মযোনি। যারা মনুষ্যশরীরে সাবধান না থাকে তাদের জন্য এটি কর্মযোনি, তারা কেবলমাত্র জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহেই আবর্তিত হতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এই মনুষ্যদেহ লাভ হয়েছে সুখ-দুঃখ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে মুক্তি প্রাপ্তির জন্য। তাই একে কর্মযোনি না বলে 'সাধনযোনি' বলাই উচিত।

প্রারব্ধ কর্মের ফলরূপে যে অনুকূল ও প্রতিকূল পরিস্থিতি আসে, তার মধ্যে অনুকূল পরিস্থিতি স্বরূপতঃ পরিত্যাগ করায় মানুষ স্বাধীন হলেও প্রতিকূল পরিস্থিতি পরিত্যাগ করতে সে স্বাধীন নয়, অর্থাৎ সে তা পরিত্যাগ করতে সক্ষম হয় না। কারণ অনুকূল পরিস্থিতি অপরের হিতার্থে, তাদের সুখ প্রদানের জন্য উদ্ভূত হয়েছে আর প্রতিকূল পরিস্থিতি অপরকে দুঃখ প্রদান করার ফলস্বরূপ সৃষ্ট হয়েছে। একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা এটি বোঝা যায়—

শ্যামলাল রামলালকে একশ টাকা ধার দিয়েছিল। রামলাল সেই একশ টাকা সুদসমেত এক নির্দিষ্ট মাসে ফেরত দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। মাসের পর মাস চলে গেলেও রামলাল টাকা ফেরত না দেওয়াতে শ্যামলাল রামলালের ঘরে গেল এবং বলল—'তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী টাকা ফেরত দিলে না, এবার দাও।' রামলাল বলল—'আমার কাছে এখন টাকা নেই, পরশু দিয়ে দেব।' তৃতীয় দিন শ্যামলাল আবার এলো এবং বলল—'কই, টাকা দাও।' রামলাল বলল, 'আমি এখনও আপনার টাকার যোগাড় করতে পারিনি, পরশু নিশ্চয়ই দেব।' তৃতীয় দিন শ্যামলাল আবার এসে টাকা চাইলে, রামলাল বলল, 'কাল নিশ্চয়ই দেব।' এবারও শ্যামলাল টাকা চাইতে এলে রামলাল বলল, 'যোগাড় করতে পারিনি, আমার কাছে তো টাকা নেই, কোথা থেকে দেব ? পরশু দিন আসুন।' রামলালের কথা শুনে শ্যামলাল ক্রোধান্বিত হয়ে 'পরশু পরশু করছ, অথচ টাকা দিচ্ছ না' বলে পাঁচ ঘা জুতোর বাড়ি মারল। রামলাল কোর্টে নালিশ ঠুকে দিল। শ্যামলালকে কোর্টে ডেকে জিজ্ঞাসা করা হল—'তুমি কি এর বাড়ি গিয়ে একে জুতো মেরেছ ?' শ্যামলাল উত্তরে বললে, 'হ্যাঁ সাহেব, আমি জুতো মেরেছি।' ম্যাজিস্ট্রেট জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন ?'

শ্যামলাল উত্তর দিল—'আমি একে টাকা ধার দিয়েছিলাম এবং সে বলেছিল যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা ফেরত দেবে। কয়েক মাস যাবার পর আমি এর বাড়ি গিয়ে টাকা চাইলে, কাল-পরশু, কাল-পরশু করে আমাকে অনেক ঘুরিয়েছে। তাই আমি ক্রোধান্বিত হয়ে ওকে পাঁচ ঘা জুতো মেরেছি, তো হুজুর পাঁচ ঘা জুতোর জন্য পাঁচ টাকা কেটে নিয়ে বাকি টাকা আমাকে পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন।'

ম্যাজিস্ট্রেট হেসে বললেন—'এটা ফৌজদারী কোর্ট। এখানে টাকা পাইয়ে দেবার নিয়ম নেই, এখানে শাস্তি দেওয়াই নিয়ম। তাই জুতো মারার জন্য তোমাকে হাজতবাস বা জরিমানা দিতে হবে। টাকা পেতে হলে তোমাকে দেওয়ানী আদালতে গিয়ে নালিশ করতে হবে,

[১]যদভাবি ভভবত্যেব যদ্ভাব্যং ন তদ্ভবেৎ। ইতি নিশ্চিতবুদ্ধিনাং ন চিন্তা বাধতে ক্বচিৎ॥ (নারদপুরাণ পূর্ব ৩৭।৪৭)
'যা হবার তা হবেই, আর যা না-হবার তা কখনো হবে না।'—এরূপ স্থির-সিদ্ধান্ত যাঁর বুদ্ধিতে আসে, তাঁকে কখনো চিন্তা পীড়িত করতে পারে না।

সেখানে টাকা পাবার ব্যবস্থা আছে, কেন-না সেই বিভাগটি পৃথক্।'

এইরূপ অশুভ কর্মের ফলে যে প্রতিকূল পরিস্থিতি হয়, তা 'ফৌজদারী', তাই একে স্বরূপতঃ পরিত্যাগ করা যায় না এবং শুভ কর্মের ফলে যে অনুকূল পরিস্থিতি আসে, তা হল 'দেওয়ানী', তাই তাকে স্বরূপতঃ ত্যাগ করা সম্ভব হয়। এতেই প্রমাণিত হয় যে মানুষের শুভ ও অশুভ কর্মের বিভাগ পৃথক্ পৃথক্। তাই শুভ কর্মের ও অশুভ কর্মের ফলও পৃথক্ পৃথক্ হয়ে থাকে। স্বাভাবিকভাবে এই দুটির একটি অপরটিকে লঙ্ঘন করে না অর্থাৎ পাপের সাহায্যে পুণ্য দূর হয় না এবং পুণ্যের সাহায্যে পাপও দূর হয় না। তবে, মানুষ যদি পাপ স্খালন করার উদ্দেশ্য নিয়ে (প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ) শুভকর্ম করে, তাহলে তার পাপ দূর হতে পারে।

দেখা যায় একজন পুণ্যাত্মা ও সদাচারী ব্যক্তি দুঃখ ভোগ করে থাকেন আর একজন পাপাত্মা, দুরাচারী ব্যক্তি সুখভোগ করে থাকে—এই বিষয়ে অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের মধ্যেও প্রশ্ন আসে যে এতে ঈশ্বরের ন্যায়-বিচার কোথায় ?[১] তার উত্তর হল এই যে পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরা এখন যে দুঃখভোগ করছেন তা তাদের পূর্বের কোনো জন্মে করা পাপের ফল, এখনকার পুণ্যের নয়, তেমনই পাপী ব্যক্তিরা যে সুখভোগ করছে তা আগের কোনো জন্মে করা পুণ্যের ফল, এখনকার পাপের ফল নয়।

এতে আরও একটি তত্ত্বকথা আছে। কর্মের ফলরূপে যে অনুকূল পরিস্থিতি আসে, তাতে সুখই হয় এবং প্রতিকূল পরিস্থিতি এলে তাতে দুঃখই হয়—এমন নয়। যেমন, অনুকূল পরিস্থিতি এলে মনে অহংভাব আসে, অন্ত্যজ মানুষের প্রতি ঘৃণাভাব হয়, নিজের থেকে বেশি ধনীদের দেখলে ঈর্ষা হয়, অসহিষ্ণুতা আসে, চিত্তে জ্বালাবোধ হয় এবং মনে দুর্বুদ্ধি আসে যে, কীভাবে অন্য লোকের ধন-সম্পদ নষ্ট করা যায় এবং সময়ে-অসময়ে কীকরে তাকে হেয় করা যায় ? এভাবে সুখ-সামগ্রী ও ধন-সম্পত্তি থাকলেও তারা সুখী হতে পারে না। কিন্তু বাইরে থেকে দেখলে অন্য লোকেরা ভুল করে ভাবে যে, ওরা অত্যন্ত সুখে আছে। তেমনই কোনো সংসার-বিরক্ত, ত্যাগী ব্যক্তিকে দেখে ভোগী মানুষদের তাঁর ওপর দয়া হয় যে, বেচারীর কোনো ধন-সম্পত্তি নেই, সে দুঃখী ! কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ত্যাগী ব্যক্তির মনে অত্যন্ত শান্তি ও প্রসন্নতা থাকে। সেই শান্তি ও প্রসন্ন ভাব কোনো ধনীর মধ্যে থাকে না। তাই অর্থ হলেই সুখ হয় না আর অর্থের অভাব হলেই দুঃখ আসে না। সুখ হল হৃদয়ের শান্তি ও প্রসন্নতার ভিন্ন নাম, দুঃখ হচ্ছে অন্তরের জ্বালা ও শোকের নাম।

পুণ্য এবং পাপের ফল ভোগের একই নিয়ম নয়। পুণ্য নিষ্কামভাবে ভগবানে অর্পণ করলে তা সমাপ্ত হতে পারে, কিন্তু পাপ ভগবানে অর্পণ করলে শেষ হয় না। পাপের ফল ভোগ করতেই হয়, ভগবানের নির্দেশের বিরুদ্ধে করা কর্ম কীভাবে ভগবানে অর্পণ করা যাবে ? তাছাড়া অর্পণকারী ভগবানের বিরুদ্ধ-কর্মগুলি কীভাবে ভগবানকে অর্পণ করবে ? ভগবানের নির্দেশানুসারে করা কর্মই ভগবানকে অর্পণ করা যায়। এই বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল—

এক রাজা প্রজাদের নিয়ে হরিদ্বার গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে সব শ্রেণীর মানুষ ছিল। তার মধ্যে একজন চর্মকারও ছিল। সে ভাবল যে ব্যবসায়ীরা অত্যন্ত চালাক হয়ে থাকে, তারা তাদের বুদ্ধির জন্য ধনবান হয়। যদি আমি তাদের বুদ্ধি অনুযায়ী চলি তাহলে আমিও ধনী হতে পারব। এই ভেবে সে এক ব্যবসায়ীর চাল-চলনে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে লাগল। হরিদ্বারের ব্রহ্মকুণ্ডে পাণ্ডা যখন দান ও পুণ্যের সংকল্প করাচ্ছিলেন, তখন সেই ব্যবসায়ী বলল, 'আমি এক ব্রাহ্মণকে একশো টাকা ধার দিয়েছিলাম, সেই টাকাই আমি দানরূপে তাকে অর্পণ করলাম।' পাণ্ডা সেইমতো সংকল্প করালেন। চর্মকার দেখল যে এ তো খুব চালাক ! এক পয়সা খরচ না করে একশো টাকা দানের সুনাম লাভ করল !

---

[১]মহাভারত, বনপর্বে একটি কাহিনী আছে। একদিন দ্রৌপদী মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, 'আপনি ধর্ম ছাড়া এক পাও চলেন না, তবুও আপনি বনবাসে কত দুঃখ পাচ্ছেন, আর দুর্যোধন ধর্মের পরোয়া না করে স্বার্থপর হয়ে কী করে রাজ্য ও সুখভোগ করছে ?' এর উত্তরে যুধিষ্ঠির বললেন, 'যারা সুখের আশায় ধর্ম-পালন করে, তারা ধর্মের তত্ত্ব জানে না। তারা পশুর মতো সুখভোগের জন্য লোলুপ হয় আর দুঃখ-ভয়ে ভীত হয়, কাজেই তারা আর ধর্মতত্ত্ব কী করে জানবে ? তাই মনুষ্যত্ব হল এই যে, অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতিকে পরোয়া না করে শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে কেবল নিজ নিজ ধর্ম (কর্তব্য) পালন করা।'

আমিও তাই করব ! এবার পাণ্ডা যখন চর্মকারকে দিয়ে সংকল্প করাতে গেলেন, তখন চর্মকার বলল, 'এক ব্যবসাদার আমাকে একশো টাকা ধার দিয়েছিল, আমি সেই টাকা তাকে অর্পণ করলাম।' তার গ্রাম্য ভাষা পাণ্ডাঠাকুর ঠিকমতো বুঝতে না পেরে সংকল্প করিয়ে দিলেন। চর্মকার খুশি মনে ভাবল, আমিও ব্যবসায়ীর মতো একশো টাকা দান করে পুণ্য করেছি।

সবাই বাড়ি ফিরে এলো। ঠিক সময়ে চাষাবাদ হল। ব্রাহ্মণ এবং চর্মকারের ক্ষেতে খুব শস্যের ফলন হল। ব্রাহ্মণ তখন সেই ব্যবসায়ীকে গিয়ে বলল, 'বাবু ! আপনি যদি চান তাহলে একশো টাকার শস্য নিতে পারেন, এতে আপনার লাভও হতে পারে। আমার যে দেনা আছে, তা শোধ করতে চাই।' ব্যবসায়ী বলল, 'হে ব্রাহ্মণ ! আমি হরিদ্বারে গিয়ে আপনাকে যে টাকা ধার দিয়েছিলাম, তা দান করে এসেছি। অতএব ওই টাকা আর ফেরত নেব না।' ব্রাহ্মণ বলল, 'বাবু, আমি তো আপনার কাছ থেকে ধার নিয়েছিলাম, দান নয় অতএব এ টাকা আমি আপনাকে সুদসহ ফেরত দিতে চাই।' বাবু জবাব দিল, 'আপনি যদি ফেরত দিতেই চান তাহলে এ টাকা আপনার ভগ্নী বা কন্যাকে দিয়ে দিন। ভগবানে অর্পিত টাকা আমি নিতে পারি না।' ব্রাহ্মণ আর কী করে, সে বাড়ি ফিরে গেল।

এদিকে চর্মকার যে ব্যবসায়ীর কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছিল সে এসে বলল, 'কই আমার টাকা দাও। তোমার তো অনেক শস্য হয়েছে, তাহলে একশো টাকার শস্য দিয়ে দাও।' চর্মকার শুনেছিল যে, ব্রাহ্মণ টাকা ফেরত দিতে গেলেও ওই ব্যবসায়ী টাকা ফেরত নেয়নি। তাই সে ভেবেছিল যে আমিও যখন সংকল্প করেছি, তখন আমাকে কেন টাকা ফেরত দিতে হবে ? এই ভেবে চর্মকার ব্যবসায়ীকে বলল, 'আমি তো ওই বাবুর মতোই গঙ্গায় দাঁড়িয়ে সমস্ত টাকা অর্পণ করে এসেছি, তাহলে আমাকে কেন টাকা দিতে হবে ?' ব্যবসায়ী বলল, 'তোমার অর্পণ করায় ঋণ তো শোধ হতে পারে না। কারণ তুমি আমার কাছ থেকে ঋণ করেছ, সেকথা তুমি অর্পণ করে দিলে ঋণ কী করে শোধ হবে ? আমি সুদ-সহ আমার টাকা ফেরত চাই ; আমার টাকা তুমি নিয়ে এস।' এই বলে সে চর্মকারের কাছ থেকে উক্ত টাকার সমপরিমাণ শস্য নিয়ে নিল।

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আমরা যে ঋণ অন্যের কাছ থেকে নিই, তা আমরা এড়িয়ে যেতে পারি না। তেমনই ভগবদ্‌নির্দেশিত শুভকর্ম আমরা ভগবানে অর্পণ করে তার বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে পারি, কিন্তু অশুভ কর্মের ফল আমাদের ভোগ করতেই হবে। সুতরাং শুভ বা অশুভ কর্মে একই নিয়ম চলে না। যদি এই নিয়ম হত যে ভগবানে অর্পণ করলেই সমস্ত ঋণ ও পাপ-কর্ম দূর হবে, তাহলে সকলেই মুক্তিলাভ করত ; কিন্তু তা সম্ভব নয়। তবে এর মর্মকথা হল এই যে, নিজেকে সর্বতোভাবে ভগবানের চরণে অর্পণ করলে, তাঁর শরণাগত হলে, পাপ-পুণ্য চিরতরে দূর হয় (গীতা ১৮।৬৬)।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হল যে, অর্থ ও ভোগ প্রাপ্তি যে প্রারব্ধ কর্ম অনুযায়ী হয়—সে-কথা ঠিক বোঝা যায় না ; কারণ আমরা দেখতে পাই যে যারা ইন্‌কাম ট্যাক্স, সেলস্ ট্যাক্স ফাঁকি দেয় তাদের টাকা বেঁচে যায়, আর যারা ট্যাক্স দেয়, তাদের টাকা খরচ হয়ে যায়, তাহলে টাকা পাওয়া বা না-পাওয়া প্রারব্ধের অধীন কী করে হয় ? এ তো চুরিরই নামান্তর বলা চলে।

এর উত্তর হল, অর্থ লাভ করা এবং ভোগ করা— এই দুয়েতেই প্রারব্ধের প্রাধান্য থাকে। কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে কারও অর্থ-প্রাপ্তির প্রারব্ধ থাকে, ভোগের নয় আবার কারও ভোগের প্রারব্ধ থাকে অর্থ লাভের নয়, কারও বা অর্থ ও ভোগ দুইয়েরই প্রারব্ধ থাকে। যার অর্থ লাভের প্রারব্ধ থাকে, ভোগের নয়, তার লাখ লাখ টাকা থাকলেও অসুখের জন্য ডাক্তারের নিষেধে সে ভোগ্য-বস্তু ভোগ করতে পারে না। যার ভোগের প্রারব্ধ থাকে অথচ অর্থের নয় তার অর্থের অভাব থাকলেও সুখ-আরামের কোনো অভাব থাকে না[১]। তার কারও দয়াতে বা বন্ধুর সাহায্যে

[১]সর্বত্যাগী ব্যক্তিরও অনুকূল বস্তু লাভ হতে দেখা যায়। (তিনি যদি তা না নেন, সেকথা আলাদা)। ত্যাগের আর একটি বিশেষত্ব হল এই যে, যিনি অর্থ ত্যাগ করেন, যাঁর মনে অর্থের মোহ নেই এবং নিজেকে অর্থের অধীন বলে মনে করেন না, তাঁর জন্য অর্থের এক নতুন প্রারব্ধের সৃষ্টি হয়। কারণ ত্যাগও এক মস্ত বড় পুণ্য, যাতে তৎক্ষণাৎ এক নতুন প্রারব্ধের উদ্ভব হয়।

ধান নহী ধীনোঁ নহীঁ নহীঁ রূপেয়ো রোক। জীমণ বৈঠে রামদাস, আন মিলৈ সব থোক॥

কাজ জুটে যাওয়ায় প্রারব্ধানুযায়ী জীবিকা নির্বাহের বস্তু লাভ হয়।

অর্থপ্রাপ্তি যদি প্রারব্ধে না থাকে, তবে চুরি করলেও তা রাখা যায় না। অপরপক্ষে চুরি যদি ধরা পড়ে, তাহলে নিজের সঞ্চিত অর্থও ব্যয় হয়ে যায়, উপরন্তু শাস্তি হয়। ইহলোকে যদি শাস্তি না-ও হয়, পরলোকে অবশ্যই শাস্তি হবে, তার থেকে রক্ষা নেই। প্রারব্ধবশতঃ চুরি করে ধনলাভ হলেও, তা ভোগ করা সম্ভব হয় না। সেই অর্থ, অসুখ-বিসুখ, চুরি-ডাকাতি, মামলা-মোকদ্দমা বা ঠগ-জোচ্চুরিতে ব্যয়িত হয়। তাৎপর্য হল যে অর্থ যতদিন থাকার থাকবে, পরে নষ্ট হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, ইন্‌কাম ট্যাক্স ইত্যাদি ফাঁকি দেবার যে সংস্কার ভেতরে থাকে, সেই সংস্কার জন্ম-জন্মান্তর ধরে তাকে চুরি করার জন্য উৎসাহিত করতে থাকে এবং ওই ব্যক্তি সেই কারণে দণ্ড ভোগ করতে থাকে।

প্রারব্ধে যদি অর্থপ্রাপ্তি থাকে তাহলে কোনো ধনী দত্তক নিতে পারে বা কোনো ধনী আত্মীয় মৃত্যুকালে উইল করে অর্থ দিয়ে যেতে পারে অথবা বাড়ি তৈরি করার সময় নীচের জমি থেকে গুপ্তধন লাভ হতে পারে, ইত্যাদি। এইভাবে প্রারব্ধ অনুসারে যদি অর্থ পাওয়ার থাকে, তাহলে কোনো না কোনো উপায়ে তা পাওয়া যাবেই[১]। কিন্তু মানুষ প্রারব্ধে বিশ্বাস করে না এবং নিজের পুরুষকারের ওপরও এমন বিশ্বাস রাখে না, যাতে নিজের ক্ষমতায় উপার্জন করে নিতে পারে! সেইজন্যই তারা চুরি ইত্যাদি কর্মে প্রবৃত্ত হয়, যার ফলে চিত্তে জ্বালা হয়, অন্যের কাছ থেকে লুকিয়ে থাকতে হয়, ধরা পড়লে শাস্তি পেতে হয়। মানুষ যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস ও মনে সন্তোষ রাখে, তাহলে হৃদয়ে মহা শান্তি, আনন্দ ও প্রসন্নতা বিরাজ করে। অর্থ যা পাবার তা ঠিকই এসে যায় এবং জীবিকা-নির্বাহের বস্তুও কোনো-না-কোনো ভাবে জোগাড় হতে থাকে। যেমন, ব্যবসায়ে মন্দাভাব, গৃহে কারও মৃত্যু, অকারণে অপযশ বা অপমান ইত্যাদি প্রতিকূল পরিস্থিতি না চাইলেও এসে হাজির হয়, তেমনই অনুকূল পরিস্থিতিও এভাবে আসে, তাকে কেউই বাধা দিতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—

সুখমৈন্দ্রিয়কং রাজন্ স্বর্গে নরক এব চ।
দেহিনাং যদ্ যথা দুঃখং তস্মান্নেচ্ছেত তদ্ বুধঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৮।১)

'রাজন্ ! প্রাণীদের যেমন ইচ্ছা না থাকলেও প্রারব্ধানুযায়ী দুঃখ পেতে হয়, তেমনই ইন্দ্রিয়সুখ স্বর্গে বা নরকেও লাভ করা যায়। সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের সুখের আকাঙ্ক্ষা করা উচিত নয়।'

যেমন, অর্থ ও ভোগের প্রারব্ধ পৃথক্ পৃথক্ হয় অর্থাৎ কারও অর্থের প্রারব্ধ হয়, কারও বা ভোগের, তেমনই ধর্ম ও মোক্ষের পুরুষার্থও পৃথক্ পৃথক্ হয়ে থাকে অর্থাৎ কেউ ধর্মের জন্য পুরুষার্থ করে, কেউ মোক্ষের জন্য করে। ধর্মানুষ্ঠানে শরীর, অর্থ ইত্যাদি বস্তুর প্রাধান্য থাকে আর মোক্ষপ্রাপ্তিতে ভাব এবং বিচারের প্রাধান্য থাকে।

এক হল 'করা' আর এক হল 'হওয়া'। এই দুটি বিভাগই ভিন্ন ভিন্ন। করার বীজ হল 'কর্তব্য' আর হওয়ার বীজ হল 'ফল'। মানুষের কর্মেই অধিকার, ফলে নয়— **'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'** (গীতা ২।৪৭)। তাৎপর্য হল যে প্রারব্ধ অনুসারে যা হওয়ার তা অবশ্যই হয়, তার জন্য 'এটা হওয়া উচিত এবং ওটা হওয়া উচিত নয়'—এরূপ ইচ্ছা করা উচিত নয় এবং শাস্ত্র ও লোকমর্যাদা অনুসারে কর্তব্য-কর্ম করা উচিত। 'করা' পুরুষার্থের অধীন আর 'হওয়া' প্রারব্ধের অধীন। তাই মানুষ করার ক্ষেত্রে স্বাধীন আর 'হওয়াতে' অর্থাৎ ফলে পরাধীন। মানুষের উন্নতির প্রধান কথা হল—'করাতে সাবধান থাকা এবং হওয়াতে প্রসন্ন থাকা'।

ক্রিয়মাণ, সঞ্চিত এবং প্রারব্ধ —এই তিন কর্ম থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় কী ?

প্রকৃতি ও পুরুষ—এই দুটি আছে। প্রকৃতি সর্বদা ক্রিয়াশীল, কিন্তু পুরুষের মধ্যে কখনো পরিবর্তনরূপ ক্রিয়া

---

[১]প্রাপ্তব্যমর্থং লভতে মনুষ্যো দেবোঽপি তং লঙ্ঘয়িতুং ন শক্তঃ। তস্মান্ন শোচামি ন বিস্ময়ো মে যদস্মদীয়ং ন হি তৎ পরেষাম্॥ (পঞ্চতন্ত্র, মিত্রসম্প্রাপ্তি ১১২)

'যে ধন প্রাপ্ত হবার, তা মানুষ পায়ই, দৈবও তাকে উল্লঙ্ঘন করতে পারে না। তাই আমি শোকও করি না বা বিস্মিতও হই না। কারণ যা আমার, তা কখনো অপরের হতে পারে না।'

হয় না। প্রকৃতির সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মান্যকারী 'প্রকৃতিস্থ' পুরুষই কর্তা ও ভোক্তা হয়ে ওঠেন। যখন তিনি প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন অর্থাৎ নিজ স্বরূপে স্থিতিলাভ করেন, তখন কোনো কর্মই তাঁতে প্রযোজ্য হয় না।

প্রারব্ধ-সম্বন্ধীয় অন্যান্য কথা হল এইরূপ—

(১) বোধ হলেও জ্ঞানীর প্রারব্ধ থাকে—এটি শুধুমাত্র অজ্ঞান ব্যক্তিদের বোঝাবার জন্য বলা। কারণ অনুকূল বা প্রতিকূল ঘটনা ঘটাকেই বলা হয় প্রারব্ধ। প্রারব্ধ কোনো প্রাণীকে সুখী বা দুঃখী করে না, সেগুলি হল অজ্ঞানের কাজ। অজ্ঞান দূর হলে মানুষ আর সুখী বা দুঃখী হয় না। তার তখন শুধু অনুকূলতা বা প্রতিকূলতার জ্ঞান হয়। জ্ঞান থাকা দোষের নয়, কিন্তু সুখ-দুঃখরূপ বিকার হওয়াই দোষের। তাই বলা হয় জ্ঞানীর কোনো প্রারব্ধ হয় না।

(২) প্রারব্ধ যেমন হয়, বুদ্ধিও তেমনই হয়ে যায়। যেমন, একই বাজারে কোনো ব্যবসায়ী জিনিস বিক্রয় করে আবার কোনো ব্যবসায়ী জিনিস ক্রয় করে। পরে যখন বাজারে দাম বাড়ে, তখন বিক্রেতা ব্যবসায়ীর লোকসান হয় এবং ক্রেতা ব্যবসায়ীর লাভ হয়। আবার যখন বাজারে দাম কমে, তখন বিক্রেতা ব্যবসায়ীর লাভ হয় ও ক্রেতা ব্যবসায়ীর লোকসান হয়। অতএব ক্রয় করা ও বিক্রয় করার বুদ্ধি প্রারব্ধ থেকেই হয় অর্থাৎ লাভ ও লোকসানের যেমন প্রারব্ধ থাকে, সেই অনুযায়ী বুদ্ধি তৈরি হয়, যাতে প্রারব্ধ অনুসারে ফল ভোগ করা সম্ভব হয়। কিন্তু ক্রয় ও বিক্রয়ের ক্রিয়া ন্যায়যুক্ত হবে না অন্যায়যুক্ত—তার সিদ্ধান্ত নিতে মানুষ স্বাধীন। কারণ এটি হল নতুন কর্ম (ক্রিয়মাণ), প্রারব্ধ নয়।

(৩) একটি লোকের হাত থেকে যদি গ্লাস পড়ে ভেঙে যায় তাহলে কী বলা হবে, তার অসতর্কতা, না প্রারব্ধ ?

কাজ করার সময় সতর্ক থাকাই উচিত কিন্তু ভালো বা মন্দ যা হয়ে যায় তাকে সম্পূর্ণভাবে প্রারব্ধ বলে মনে করাই উচিত। ওই সময় যারা বলে যে তুমি যদি সাবধান হতে, তাহলে গ্লাসটি ভাঙতো না—তাতে এই কথা মনে করতে হবে যে পরবর্তীকালে আমাকে সতর্ক থাকতে হবে, যাতে দ্বিতীয়বার এই ভুল না হয়। প্রকৃতপক্ষে যা হয়ে যায়, তাকে অসতর্কতা না ভেবে, হবেই বলে মনে করতে হয়। তাই কাজ করতে সতর্ক হওয়া এবং ফলের প্রাপ্তিতে প্রসন্ন থাকাই উচিত।

(৪) প্রারব্ধ থেকে হওয়া এবং কুপথ্য থেকে হওয়া অসুখে কী পার্থক্য ?

কুপথ্যজনিত রোগ ওষুধে ভালো হয় ; কিন্তু প্রারব্ধ-জনিত অসুখ ওষুধে সারে না। মহামৃত্যুঞ্জয় জপ ও যজ্ঞাদি করলে প্রারব্ধজনিত অসুখ প্রশমিত হতে পারে, যদি অনুষ্ঠান যথাযথ হয় অর্থাৎ প্রারব্ধের প্রভাবকে দমিত করতে পারে।

অসুখ দুপ্রকার—আধি (মানসিক রোগ) ও ব্যাধি (শারীরিক রোগ)। আধিও দুপ্রকার—এক শোক আর অন্যটি পাগলামি। চিন্তা, শোক ইত্যাদি অজ্ঞান থেকে হয় আর প্রারব্ধ থেকে হয় পাগলামি। তাই জ্ঞান হলে চিন্তা ও শোক দূর হয়, কিন্তু প্রারব্ধ অনুসারে পাগলামি হতে পারে। তবে পাগলভাব হলেও জ্ঞানী ব্যক্তি কোনো অনুচিত, শাস্ত্রবিরুদ্ধ কাজ করেন না।

(৫) আকস্মিক মৃত্যু এবং অকাল মৃত্যুতে কী তফাৎ ?

সাপে কাটায় কেউ মারা যায়, হঠাৎ ওপর থেকে পড়ে কেউ মারা যায়, জলে ডুবে কেউ মারা যায়, হার্টফেল করে মারা যায়, দুর্ঘটনাতে কেউ মারা যায়—এগুলিকে বলা হয় 'আকস্মিক মৃত্যু'। স্বাভাবিক মৃত্যুর মতোই আকস্মিক মৃত্যুও প্রারব্ধ অনুসারে আয়ুষ্কাল পূর্ণ হলে হয়।

কোনো ব্যক্তি যদি জেনেশুনে আত্মহত্যা করে অর্থাৎ গলায় দড়ি দেয়, জলে ঝাঁপ দেয়, গাড়ির নীচে লাফ দেয়, ছাত থেকে পড়ে, বিষ খায় বা আগুনে পুড়ে মরে, তাকে 'অকাল মৃত্যু' বলা হয়। আয়ু থাকলেও এই মৃত্যু হতে পারে। আত্মহত্যাকারীর মনুষ্য-হত্যার পাপ হয়। সুতরাং এটি নতুন পাপকর্ম, প্রারব্ধ নয়। এই মনুষ্যদেহ পরমাত্মপ্রাপ্তির জন্য প্রাপ্ত ; তাই আত্মহত্যা করে একে নষ্ট করা অত্যন্ত পাপ কাজ।

অনেকে আত্মহত্যা করবার অনেক চেষ্টা করেও সফল হয় না, বেঁচে যায়, তার কারণ হল তাদের অন্য ব্যক্তিদের সঙ্গে প্রারব্ধের যোগসম্পর্ক আছে ; তাই সেইসব ব্যক্তির জন্য তারা বেঁচে যায়। যেমন, কারও ভবিষ্যতে পুত্র লাভের সম্ভাবনা আছে, তাই তার আগে (পুত্র-জন্মের আগে) সে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করলেও তার (পরবর্তীকালে যার জন্মাবার কথা) পুত্রের প্রারব্ধ তাকে মরতে দেয় না। যদি কোনো ব্যক্তির দ্বারা ভবিষ্যতে কোনো বিশেষ ভালো কাজ হবার থাকে, লোকের উপকার হওয়ার থাকে অথবা এই জন্মেই এই শরীরে প্রারব্ধের কোনো উৎকট ভোগ (সুখ বা দুঃখ) করার থাকে, তাহলে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেও

তার মৃত্যু হবে না।

(৬) কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে যদি হত্যা করে, তাহলে সে তার আগের জন্মের শত্রুতার শোধ নিল এবং নিহত ব্যক্তি পুরাতন কর্মের ফল পেল, এতে হত্যাকারীর কী দোষ ?

হত্যাকারী হল অপরাধী। শাস্তিদান হল শাসকের কাজ, সাধারণের কাজ নয়। এক ব্যক্তির দশটার সময় ফাঁসি হওয়ার কথা। অন্য একজন ব্যক্তি তাকে জহ্লাদের হাত থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে ঠিক দশটার সময়ই যদি হত্যা করে, তাহলে সেই হত্যাকারী ব্যক্তিরও ফাঁসি হবে, কারণ রাজ্যের শাসক তো তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়নি।

হত্যাকারীর আগের জন্মের কথা স্মরণে থাকে না যে সে পূর্বজন্মের প্রতিশোধ নিচ্ছে, কিন্তু যখন সে খুন করে, সে অন্যায় কাজই করে। অপরকে আঘাত করার, হত্যা করার অধিকার কারও নাই। কেউই মরতে চায় না। অপরকে হত্যা করা হল নিজের বিবেকের অনাদর করা। মনুষ্যমাত্রেরই বিবেক-শক্তি থাকে এবং সেই বিবেক অনুযায়ী ভালো-মন্দ কাজ করতে প্রত্যেক মানুষই স্বাধীন। তাই বিবেককে অবহেলা করে অপরকে হত্যা করা বা হত্যা করার মনোভাব রাখা পাপ।

পূর্বজন্মের প্রতিশোধ যদি একে অপরে এইভাবে নিতে থাকে তাহলে এর কখনো শেষ হয় না এবং মানুষ কখনো মুক্ত হতে পারে না।

অন্যান্য যোনিতে আগের জন্মের প্রতিশোধ নেওয়া গেলেও, মনুষ্যজন্ম প্রতিশোধ নেবার জন্য নয়। তবে এমন হতে পারে যে, আগের জন্মের হত্যাকারীকে দেখলে আমাদের স্বাভাবিকভাবে ভালো না লাগতে পারে, কিন্তু তার জন্য সেই ব্যক্তিকে দ্বেষ করা বা কষ্ট দেওয়া অন্যায়, কারণ সেগুলি হল নতুন কর্ম।

প্রশ্ন—যেমন যার প্রারব্ধ, সেই অনুযায়ী তার বুদ্ধি হয়, তাহলে দোষ কীসের ?

উত্তর—বুদ্ধিতে যে দ্বেষ থাকে, তার বশীভূত হওয়াই হল দোষের। মানুষের উচিত এগুলির বশীভূত না হয়ে বিবেকের সম্মান করা। গীতাতেও আছে যে বুদ্ধিতে যে রাগ-দ্বেষ থাকে (৩।৪০), তার বশীভূত না হওয়া—**'তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ'** (৩।৩৪)।

(৭) প্রারব্ধ ও ভগবদ্কৃপায় পার্থক্য কী ?

জীব যা কিছু পায়, তা প্রারব্ধ অনুসারেই পায়। কিন্তু সেই প্রারব্ধের বিধান করেন বিধাতা স্বয়ং। কারণ কর্ম জড় হওয়ায় নিজে থেকে কোনো ফল প্রদান করতে পারে না। ভগবানের বিধানেই এগুলি ফলপ্রসূ হয়। যেমন, কোনো ব্যক্তি সারাদিন ক্ষেতের কাজ করলে সন্ধ্যাবেলা তার কাজ অনুযায়ী পয়সা পায়, সেই পয়সা তাকে ক্ষেত দেয় না, দেয় সেই ক্ষেতের মালিক।

(৮) কাজ করলে তবেই মজুরি (টাকা) পাওয়া যায়, কাজ না করলে কি কেউ টাকা পাবে ?

কাজ করলে টাকা পাওয়া যায় কিন্তু মালিক ছাড়া সেই টাকা দেবে কে ? কেউ যদি জঙ্গলে গিয়ে সারাদিন মেহনত করে, তাহলে কি সে টাকা পাবে ? পাবে না। এতে দেখতে হবে যে কার কথায় কাজ করেছিল এবং দায়িত্ব কার ছিল।

কোনো পরিচারক যদি অত্যন্ত তৎপরতা, বুদ্ধি ও উৎসাহ নিয়ে প্রভুর প্রসন্নতা লাভের উদ্দেশ্যে কাজ করে তাহলে তার প্রভু তাকে নির্ধারিত মজুরির অপেক্ষা বেশি টাকা দেয় এবং তার তৎপরতা ইত্যাদি গুণ দেখে তাকে নিজ সম্পত্তির অংশীদারও করে নেয়। ভগবানও তেমনই মানুষকে তার কর্ম অনুযায়ী ফল প্রদান করেন। কোনো মানুষ যদি ভগবানের নির্দেশ অনুযায়ী, তাঁর প্রসন্নতা লাভের জন্য সকল কার্য করে, ভগবানও তাকে অন্যের থেকে বেশি দেন। কিন্তু যে ব্যক্তি সর্বতোভাবে ভগবানে সমর্পিত হয়ে সব কাজ করেন, ভগবান সেই ভক্তেরও ভক্ত হয়ে যান[১]। জগতে কেউই পরিচারককে নিজের প্রভু বলে মনে করেন না ; কিন্তু ভগবান শরণাগত ভক্তকে তাঁর প্রভু বানিয়ে নেন। এমন উদারতা কেবল তাঁরই আছে। এমন প্রভুর চরণে শরণ না নিয়ে যারা প্রাকৃত উৎপত্তি-বিনাশশীল পদার্থের অধীন হয়, তাদের বুদ্ধি একেবারে ভ্রষ্ট হয়ে গেছে ! তারা একথা বুঝতেই পারে না যে প্রত্যক্ষরূপে উৎপন্ন ও বিনাশশীল পদার্থগুলি আমাদের কতদূর সাহায্য করতে পারে !

---

[১]এবং স্বভক্তয়ো রাজন্ ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৮৬।৫৯)

সম্বন্ধ—যেমন কর্মযোগে কর্মগুলির সঙ্গে নিজের কোনো সম্বন্ধ থাকে না, তেমনই সাংখ্যসিদ্ধান্তেও কর্মগুলির সঙ্গে নিজের কোনো সম্বন্ধ থাকে না—এ বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্বকর্মণাম্॥ ১৩ ॥

[**মহাবাহো, কৃতান্তে** (হে মহাবাহো ! কর্মগুলির অন্তকারী) ; **সাংখ্যে, সর্বকর্মণাম্** (সাংখ্য-সিদ্ধান্তে সমস্ত কর্মগুলি) ; **সিদ্ধয়ে, এতানি, পঞ্চ** (সিদ্ধির জন্য যে পাঁচটি) ; **কারণানি, প্রোক্তানি** (কারণ বলা হয়েছে) ; **মে, নিবোধ** (আমার কাছ থেকে তা শোনো।)]

হে মহাবাহো ! কর্মগুলির অন্তকারী সাংখ্য-সিদ্ধান্তে সমস্ত কর্মগুলি সিদ্ধির জন্য যে পাঁচটি কারণ বলা হয়েছে, তা তুমি আমার কাছ থেকে শোনো ॥ ১৩ ॥

ব্যাখ্যা—**'পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি'**—হে মহাবাহো ! কর্মগুলির অন্তকারী সাংখ্যসিদ্ধান্তে সম্পূর্ণ বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্মগুলি হওয়ার পাঁচটি কারণ বলা হয়েছে। স্বয়ং (স্বরূপ) সেই কর্মগুলির হেতু নয়।

'নিবোধ মে'—এই অধ্যায়ে ভগবান যেখানে যেখানে সাংখ্য-সিদ্ধান্তের বর্ণনা আরম্ভ করেছেন, সেখানেই এই **'নিবোধ'** ক্রিয়া প্রয়োগ করেছেন (১৮। ১৩, ৫০), আবার অন্যস্থানে **'শৃণু'** ক্রিয়া প্রয়োগ করেছেন (১৮।৪, ১৯, ২৯, ৩৬, ৪৫, ৬৪)। তাৎপর্য হল এই যে সাংখ্য সিদ্ধান্তের **'নিবোধ'** পদটির দ্বারা ভালোভাবে অনুধাবন করার কথা বলা হয়েছে এবং অন্যস্থানে **'শৃণু'** পদটির সাহায্যে শোনার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং সাংখ্য-সিদ্ধান্ত গভীরভাবে অনুধাবন করা উচিত। এটি যদি যথাযথভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হয়, তাহলে সহজেই তত্ত্ব অনুভূত হয়ে থাকে ।

'সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্বকর্মণাম্'—কর্ম শাস্ত্রবিহিত হোক বা শাস্ত্রনিষিদ্ধ, শারীরিক হোক বা মানসিক বা বাচিক, স্থূল হোক বা সূক্ষ্ম—এই সমস্ত কর্মের সিদ্ধিতে পাঁচটি কারণের কথা বলা হয়েছে। যখন কোনো ব্যক্তির কর্মে কর্তৃত্ব থাকে, তখন কর্মসিদ্ধি এবং কর্মসংগ্রহ উভয়ই হতে থাকে। কিন্তু যখন সেই ব্যক্তির এইসব কর্মে কর্তৃত্ববোধ থাকে না, তখন কর্মসিদ্ধি হলেও কর্মসংগ্রহ হয় না, ক্রিয়ামাত্রই হয়ে থাকে। যেমন, জগৎ পরিবর্তনশীল অর্থাৎ নদী প্রবহমান, হাওয়া বইছে, গাছপালা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ইত্যাদি ক্রিয়াগুলি হয়ে চলেছে ; কিন্তু এই ক্রিয়াগুলি পাপ-পুণ্য বা বন্ধনকারক হয় না। অর্থাৎ কর্তৃত্বাভিমান থেকেই কর্মসিদ্ধি ও কর্মসংগ্রহ হয়। কর্তৃত্বাভিমান দূর হলে ক্রিয়ামাত্রে অধিষ্ঠান, করণ, চেষ্টা ও দৈব—শুধু এই চারটিই কারণ হয়ে থাকে (গীতা ১৮।১৪)।

এখানে সাংখ্য সিদ্ধান্তের বর্ণনা করা হয়েছে। সাংখ্য-সিদ্ধান্তে বিবেক-বিচারের প্রাধান্য থাকে, তাহলে ভগবান **'সর্বকর্মণাং সিদ্ধয়ে'** বাচক কর্মের কথা এখানে কেন বলেছেন ? কারণ তখন অর্জুনের যুদ্ধোন্মুখ অবস্থা । ক্ষত্রিয় বংশে জন্মানোয় যুদ্ধ হল তাঁর কর্তব্য-কর্ম। তাই কর্মযোগে বা সাংখ্যযোগে এমনভাবে কর্ম করা উচিত, যাতে কর্ম করেও কর্মে সর্বতোভাবে নির্লিপ্ত থাকা যায়—ভগবানের বলার এই ছিল উদ্দেশ্য। অর্জুন সাংখ্য-তত্ত্ব সম্বন্ধে জানতে চেয়েছিলেন, তাই ভগবান সাংখ্য-সিদ্ধান্তের দ্বারা কর্ম করার কথা জানাচ্ছেন।

অর্জুন কর্মগুলি স্বরূপতঃ ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন ; তাই তাঁকে বোঝাবার ছিল যে কর্ম গ্রহণ বা ত্যাগ—কোনোটিই কল্যাণের হেতু নয়। কল্যাণের হেতু হল পরিবর্তনশীল-বিনাশশীল প্রকৃতি থেকে অপরিবর্তনীয় অবিনাশী স্ব-স্বরূপের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ উপলব্ধি করা। সেই সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করার প্রক্রিয়া হল দুটি—কর্মযোগ এবং সাংখ্যযোগ। কর্মযোগে ফল অর্থাৎ মমত্ব ত্যাগ হল প্রধান আর সাংখ্যযোগে অহংবোধ ত্যাগ করাই হল প্রধান। মমত্ব ত্যাগে অহংবোধ এবং অহংবোধ ত্যাগ করলে মমত্ব স্বতঃই ত্যাগ হয়ে যায়। কারণ অহংবোধেও মমত্ব আসে ; যেমন—আমার কথা যেন থাকে ; আমার কথা যেন না লঙ্ঘন করা হয়—এই আমি-বোধের সঙ্গেও আমার বোধ থাকে। তাই মমত্ব

(আমার-ভাব) ত্যাগ করলে অহংবোধ (আমি-ভাব) দূর হয়[১]। এইভাবেই প্রথমে অহংবোধ হয়, পরে মমত্ববোধ আসে। অর্থাৎ প্রথমে 'আমি' হয় পরে 'আমার-ভাব' আসে। কিন্তু যেখানে অহংবোধই পরিত্যাগ করা হয়, সেখানে মমত্ববোধ থাকবে কী করে ? তাই সেটিও দূর হয়ে থাকে।

পরিশিষ্ট-ভাব—আত্মা যে অকর্তা তা জানাবার জন্য পাঁচটি কারণের বর্ণনা করেছেন। এই পাঁচটিতে কর্তৃত্ব পরিত্যাগ হলে কর্মগুলির থেকে সর্বতোভাবে সম্পর্ক ছিন্ন হয়।

***

সম্বন্ধ—সমস্ত কর্মের সিদ্ধিতে পাঁচটি কী কী কারণ তা এখন জানানো হচ্ছে।

অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণং চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্॥ ১৪ ॥

[**অত্র, অধিষ্ঠানম্** (কর্মের সিদ্ধিতে অধিষ্ঠান) ; **তথা, কর্তা, চ** (এবং কর্তা ও) ; **পৃথগ্‌বিধম্** (নানাপ্রকার) ; **করণম্, চ** (করণ) ; বিবিধা, পৃথক (বহুপ্রকার) ; **চেষ্টা, চ, এব** (চেষ্টা এবং) ; **পঞ্চমম্** (পঞ্চম কারণ হল) ; **দৈবম্** (দৈব।)]

কর্মের সিদ্ধিতে অধিষ্ঠান (আধার) এবং কর্তা ও নানাপ্রকার করণ (সাধনযন্ত্র), বহুপ্রকার চেষ্টা আর পঞ্চম কারণ হল দৈব ॥ ১৪ ॥

ব্যাখ্যা—'অধিষ্ঠানম্'—শরীর এবং যেস্থানে এই শরীর অবস্থিত, সেই স্থান—এই দুই-ই হল **'অধিষ্ঠান'**।

'কর্তা'—সমস্ত ক্রিয়াই প্রকৃতি এবং তার কার্যাদির দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। সেই ক্রিয়া সমষ্টি হোক বা ব্যষ্টি, তার কর্তা 'স্বয়ং' নয়। শুধু অহংকারে মোহাচ্ছন্ন অর্থাৎ যার জড় বা চেতনের কোনো জ্ঞান নেই—সেই অবিবেচক ব্যক্তি যখন প্রকৃতিতে হওয়া ক্রিয়াগুলিকে নিজের বলে মনে করে তখন সে 'কর্তা' হয়[২]। এইরূপ কর্তাই কর্মসিদ্ধির হেতু হয়ে থাকে।

'করণং চ পৃথগ্‌বিধম্'—মোট তেরটি করণ আছে।

---

[১]স্বয়ং পরমাত্মার অংশ হওয়ায় জীবের পরমাত্মার সঙ্গে স্বতঃসিদ্ধ আত্মভাব থাকে। সেই পরমাত্মা হতে বিমুখ হয়ে জীব অহংবোধের সঙ্গে মমত্ব করেছে, যার ফলে স্বয়ং 'আমি সংসারী, আমি ত্যাগী, আমি লেখাপড়া জানা বুদ্ধিমান'—এইরূপ আমিত্ববোধকে প্রিয় মনে করে এবং যাতে এটি চলে না যায়, সেদিকে সজাগ থাকে। এই হল অহংবোধের প্রতি মমতা। এটি ত্যাগ করার জন্য আমার কিছু নেই, কিছু চাই না এবং কিছু করারও নেই'—এইভাবে জগতের হিতার্থে সমস্ত ক্রিয়া করা উচিত (কারণ কর্মের সম্বন্ধ 'পরে'র জন্য 'স্ব'-এর জন্য নয়)। এরূপ করলে মমত্ব দূর হয়। মমত্ববোধ দূর হলেই অহংবোধও সর্বতোভাবে দূর হয়।

কর্মযোগে স্থূল-শরীর দ্বারা ক্রিয়া, সূক্ষ্ম-শরীরে পরহিত চিন্তা ও কারণ-শরীরে স্থিরতা (একাগ্রতা)—এই তিনটিই জগৎ-হিতার্থে হয়। তাই অন্যের হিতার্থে কর্ম করতে করতে সকলের হিতের চিন্তা হয়, হিতের চিন্তা হলে স্বতঃই স্থিরতা আসে, সেই স্থিরতায় অহংবোধ ও মমত্ব দুই-ই ত্যাগ হয় আর ত্যাগ হলেই শান্তি লাভ হয়।

সংসার-ত্যাগে যে শান্তি লাভ হয়, তা স্বরূপ বা সাধ্য নয়, তা হল এক সাধন—'যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে' (গীতা ৬।৩)। কিন্তু পরমাত্মা প্রাপ্তিতে যে শান্তি লাভ হয়, তা হল সাধ্য অর্থাৎ পরমাত্মার স্বরূপ—'শান্তিং নির্বাণপরমাম্' (গীতা ৬।১৫)।

সুতরাং সাধকের সতর্ক থাকতে হয় যে তিনি যেন সেই সাধনজনিত শান্তি ভোগ না করেন। ভোগ না করলে স্বতঃই বাস্তবিকতা অনুভূত হয় আর ভোগ করলে অগ্রগতি রুদ্ধ হবে।

[২]সমস্ত ক্রিয়াই প্রকৃতির দ্বারা সাধিত হয়—গীতায় এর বর্ণনা নানাভাবে আছে ; যেমন—

ক) সর্ব কর্ম প্রকৃতির দ্বারাই হয়—'প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ' (১৩।২৯), সকল কর্ম প্রকৃতির গুণাদির দ্বারা হয়—'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বতঃ' (৩।২৭)।

পাণি, পাদ, বাক্, উপস্থ, পায়ু—এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় ; শ্রোত্র, চক্ষু, ত্বক, জিহ্বা, ঘ্রাণ—পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়—এই দশটি বহিঃকরণ এবং মন, বুদ্ধি, অহংকার—এই তিনটি হল অন্তঃকরণ। সর্বশুদ্ধ করণ হল তেরটি।

'বিবিধাশ্চ পৃথক চেষ্টাঃ'—উল্লিখিত তেরটি করণের কাজও পৃথক্ পৃথক্ হয় ; যেমন—**পাণি** (হাত) আদান-প্রদানের জন্য, **পাদ** (পা) আসা-যাওয়া, চলা-ফেরার জন্য, **বাক্**—কথা বলার জন্য, **উপস্থ**—মূত্র ত্যাগের জন্য, **পায়ু** (বাহ্যদ্বার)—মলত্যাগের জন্য ; **শ্রোত্র** (কর্ণ)—শোনার জন্য, **চক্ষু**—দেখার জন্য, **ত্বক**—স্পর্শের জন্য, **জিহ্বা**—আস্বাদনের জন্য, **ঘ্রাণ** (নাসিকা)—গন্ধ গ্রহণের জন্য, **মন**—মনন করা, **বুদ্ধি**—চিন্তা করা, সিদ্ধান্ত করা ও **অহংকার**—অহং-কর্তৃত্ব ভাব।

'দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্'—কর্মাদির সিদ্ধিতে পঞ্চম হেতু হল **'দৈব'**। এখানে সংস্কারকে বলা হয়েছে দৈব। মানুষ যেমন কর্ম করে, তার অন্তঃকরণে তেমনই সংস্কার পড়ে। শুভ কর্মের শুভ সংস্কার হয় আর অশুভ কর্মের অশুভ সংস্কার। এই সংস্কারই পরবর্তীকালে কর্মের প্রেরণা দেয়। যার মধ্যে যে কর্মের সংস্কার যত বেশি থাকে, সে সেই কর্ম তত অনায়াসে করতে সক্ষম হয় আর যে কর্মের সংস্কার তত বেশি নয়, সেই কর্ম করতে তাকে বেগ পেতে হতে পারে। এইভাবেই মানুষ শোনে, বই পড়ে এবং চিন্তাও করে নিজেরই সংস্কার অনুসারে। তাৎপর্য হল এই যে মানুষের অন্তঃকরণে শুভ ও অশুভ—যেমন সংস্কার হয়, সেই অনুসারে তার কর্মের প্রেরণা হয়ে থাকে।

এই শ্লোকে কর্মের সিদ্ধিতে পাঁচটি হেতু বলা হয়েছে—অধিষ্ঠান, কর্তা, করণ, চেষ্টা এবং দৈব। কারণ হিসাবে বলা যায় যে, আধার ব্যতীত কোনো কাজই করা যায় না। তাই **'অধিষ্ঠান'** পদটি এসেছে। কর্তা না হলে কে ক্রিয়াটি করবে ? সেইজন্য **'কর্তা'** পদ ব্যবহৃত হয়েছে। ক্রিয়াটি করার সাধন (যন্ত্রাদি) থাকলে, তবেই কর্তা ক্রিয়াটি সম্পাদন করে, তাই **'করণ'** পদটি উল্লিখিত হয়েছে। কর্ম করার সাধন হলেও ক্রিয়াটি না করলে কর্মসিদ্ধি কীভাবে হবে ? তাই **'চেষ্টা'** পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। কর্তা তার নিজ নিজ সংস্কার অনুযায়ীই কর্ম করেন, সংস্কারের বিরুদ্ধ অথবা সংস্কার বিনা ক্রিয়া করতে সক্ষম হন না, তাই এখানে **'দৈব'** পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। এইভাবে এই পাঁচটি হলেই তবে কর্মসিদ্ধ হয়ে থাকে।

পরিশিষ্ট-ভাব—**'কর্তা'** অর্থাৎ অহংকার হল অপরা প্রকৃতি এবং জীব পরা প্রকৃতি। জীবের সম্পর্ক (সজাতীয়তা) পরমাত্মার সঙ্গে, কিন্তু অহংকারবশতঃ সে নিজেকে কর্তা বলে মনে করে থাকে।

'দৈবম্'—সকলের মধ্যেই ভালো-মন্দ সংস্কার থাকে—**'সুমতি কুমতি সব কেঁ উর রহহীঁ'** (শ্রীরামচরিতমানস, সুন্দরকাণ্ড ৪০।৩)। আসক্তি, শাস্ত্র এবং বিচার—এই তিনটির দ্বারা ভালো বা মন্দ সংস্কারগুলি পুষ্ট হয়, যার দ্বারা নতুন কর্ম হয়।

※　※　※

খ) গুণই গুণেতে আবর্তিত হয়—'গুণাগুণেষু বর্তন্তে' (৩।২৮) ; দ্রষ্টা গুণাদি ভিন্ন অন্য কাউকেও কর্তা মনে করে না—'নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি' (১৪।১৯)।

গ) সকল ইন্দ্রিয়ই নিজ নিজ বিষয়ে আবর্তিত হয়—'ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্তে' (৫।৯)।

ঘ) এখানে (১৮।১৪) কর্মাদির সিদ্ধিতে অধিষ্ঠানাদি পাঁচটি হেতুর কথা বলা হয়েছে।

এইসবের অর্থ হল এই যে প্রকৃতি ও পুরুষ—এই দুইয়ের মধ্যে শুধু প্রকৃতিতেই ক্রিয়া হয়, পুরুষে নয়। প্রকৃতির সঙ্গে তাদাত্ম্য করাতেই পুরুষ ওই ক্রিয়াগুলি নিজের বলে মনে করে। যেমন, কোনো ব্যক্তি এরোপ্লেনে বসে মনে করে আমি আকাশপথে যাচ্ছি, আসলে এরোপ্লেনই চলছে, মানুষ নয়। তেমনই পুরুষ নিজেকে প্রকৃতির ক্রিয়াগুলির কর্তা বলে মনে করে—'অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে' (৩।২৭)।

তত্ত্বজ্ঞ বিবেকী পুরুষ অনুভব করেন যে সমস্ত ক্রিয়াই প্রকৃতি এবং প্রকৃতির কার্যেই হচ্ছে, আমি কিছু করি না—'নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তোমন্যেত তত্ত্ববিৎ' (গীতা ৫।৮)।

শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ॥ ১৫ ॥

[নরঃ (মানুষ) ; শরীরবাঙ্‌মনোভিঃ (কায়মনোবাক্যে) ; ন্যায্যম্‌, বা (শাস্ত্রবিহিত অথবা) ; বিপরীতম্‌ (শাস্ত্রবিরুদ্ধ) ; যৎ, বা, কর্ম (যা কিছু কর্ম) ; প্রারভতে (করে) ; এতে, পঞ্চ (পূর্বোক্ত পাঁচটি কারণই) ; তস্য, হেতবঃ (তার হেতু।)]

মানুষ কায়মনোবাক্যে শাস্ত্রবিহিত বা শাস্ত্রবিরুদ্ধ যা কিছু কর্ম করে, পূর্বোক্ত পাঁচটি কারণই হল তার হেতু॥ ১৫ ॥

ব্যাখ্যা—**'শরীরবাঙ্‌মনোভির্যৎ কর্ম ...... পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ'**—আগের (চতুর্দশ) শ্লোকে কর্ম সম্পাদিত হওয়াতে অধিষ্ঠানাদি যে পাঁচটি হেতু বলা হয়েছে, সেই পাঁচটি এই পদেও উল্লিখিত হয়েছে। যেমন—**'শরীর'** পদে অধিষ্ঠান বোঝায়, **'বাক্‌'** পদে বহিঃকরণ ও **'মন'** পদে অন্তঃকরণ, **'নরঃ'** পদে কর্তা এবং **'প্রারভতে'** পদে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলির চেষ্টা বোঝায়। বাকি থাকল **'দৈব'**। 'দৈব' বা 'সংস্কার' অন্তঃকরণেই থাকে ; কিন্তু তা স্পষ্ট-রূপে বোঝা যায় না। তা বোঝা যায় অন্তঃকরণ হতে উৎপন্ন বৃত্তি এবং সেই বৃত্তি অনুসারে সাধিত কর্মেরই দ্বারা।

মানুষ শরীর, বাক্য ও মনের দ্বারা যে কর্ম আরম্ভ করে অর্থাৎ কোথাও শরীরের প্রাধান্যে, কোথাও বাক্যের প্রাধান্যে আর কোনো স্থানে মনের প্রাধান্যে যেসব কর্ম করে, তা শাস্ত্রবিহিত হোক বা শাস্ত্রবিরুদ্ধ, তাতে (পূর্বশ্লোকে উদ্ধৃত) পাঁচটিই হল কারণ।

শরীর, বাক্য ও মন—এই তিনটির দ্বারাই কর্ম সাধিত হয়। এগুলির সাহায্যে করা কর্মকেই কায়িক, বাচিক ও মানসিক কর্মের সংজ্ঞা দেওয়া হয়। এই তিনটিতে অশুদ্ধি হলেই বন্ধন হয়। সেইজন্য এই তিনটির শুদ্ধিকরণের জন্য সপ্তদশ অধ্যায়ের চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শ্লোকে ক্রমান্বয়ে কায়িক, বাচিক ও মানসিক তপের বর্ণনা করা হয়েছে। তাৎপর্য হল এই যে শরীর, বাক্য ও মনের দ্বারা যদি কোনো শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম না করা হয়, শুধুমাত্র শাস্ত্রবিহিত কর্মই করা হয়, তবে তা 'তপস্যা' হয়ে ওঠে। সপ্তদশ অধ্যায়েরই সপ্তদশ শ্লোকে **'অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ'** পদটিতে এই কথা বলা হয়েছে যে, নিষ্কামভাবে করা তপস্যা সাত্ত্বিক হয়। সাত্ত্বিক তপ বন্ধনকারক নয়, বরং এটি মুক্তিপ্রদান করে। কিন্তু রাজসিক ও তামসিক তপ বন্ধনকারক হয়।

এই শরীর, বাক্য ইত্যাদিকে নিজের মনে করে নিজের জন্য কর্ম করলেই এতে অশুদ্ধি আসে, তাই এগুলিকে শুদ্ধ না করে শুধুমাত্র বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে সাংখ্য-সিদ্ধান্তের কথা বোঝা গেলেও, 'কর্মের সঙ্গে আমার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই'—একথা স্পষ্টভাবে বোধে আসে না। এরূপ অবস্থায় সাধক যেন শরীর ইত্যাদিকে নিজের বলে মনে না করেন এবং নিজের জন্য কোনো কর্ম না করেন, তাহলে তাঁর শরীর ইত্যাদি খুব শীঘ্রই শুদ্ধ হয়ে যায়। সুতরাং কর্মযোগের দ্বারা এগুলি শুদ্ধ করে এর থেকে সম্পর্ক ছেদ করা উচিত অথবা সাংখ্যযোগের দ্বারা প্রবল বিবেক-বুদ্ধির সাহায্যে এগুলির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করা উচিত। উভয় সাধনার দ্বারাই প্রকৃতি ও প্রকৃতির কার্যের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং প্রকৃত তত্ত্ব অনুভূত হয়।

যে সমষ্টি-শক্তির দ্বারা জগৎ-মাত্রেরই ক্রিয়াগুলি সম্পাদিত হয়, সেই সমষ্টি-শক্তির দ্বারাই ব্যষ্টি-শারীরিক ক্রিয়াও স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন হয়। বিচার-বুদ্ধিকে মহত্ত্ব না দেওয়ায় 'স্বয়ং' ওই ক্রিয়াগুলির দ্বারা খাওয়া-দাওয়া, ওঠা-বসা, শোওয়া, জাগা ইত্যাদি যেসব ক্রিয়ার কর্তা বলে নিজেকে মনে করে, সেইসব ক্রিয়ার সাহায্যে কর্মসংগ্রহ হয় অর্থাৎ এইসব ক্রিয়া বন্ধনকারক হয়ে ওঠে। কিন্তু স্বয়ং যেখানে নিজেকে কর্তা বলে মনে করেন না, সেখানে কর্মসংগ্রহ হয় না, সেখানে শুধুমাত্র ক্রিয়াই সাধিত হয়। তাই সেই ক্রিয়া ফলপ্রদায়ক অর্থাৎ বন্ধনকারী হয় না। যেমন, শিশু অবস্থা থেকে যৌবন প্রাপ্ত হওয়া, নিঃশ্বাস নেওয়া-ত্যাগ করা, খাদ্যদ্রব্য হজম হওয়া ইত্যাদি ক্রিয়াগুলি কর্তৃত্বাভিমান ব্যতীত প্রকৃতির দ্বারা স্বাভাবিকভাবে হয়ে থাকে এবং তার জন্য কোনো কর্মসংগ্রহ অর্থাৎ পাপ-পুণ্য হয় না। তেমনই অহং-কর্তৃত্ববোধ না থাকায় **'সকল ক্রিয়াই প্রকৃতির দ্বারা সংঘটিত হয়'**—এটি স্পষ্টরূপে অনুভূত হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব—মনে রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ, আনন্দ-শোক ইত্যাদি হওয়াকে বলা হয় মানসিক কর্ম।

'ন্যায্যম্' পদটির অর্থ হল—সাত্ত্বিক কর্ম, শাস্ত্রবিহিত কর্ম অথবা শুভ কর্ম। **'বিপরীতম্'** পদটির অর্থ হল—রাজসিক-তামসিক কর্ম, শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম অথবা অশুভ কর্ম। **'ন্যায্যং বা বিপরীতং বা'** পদটির অর্থ হল—যাবতীয় শুভ এবং অশুভ কর্ম।

*** *** ***

সম্বন্ধ—ভগবান সাংখ্য-সিদ্ধান্ত জানাবার যে উপক্রম করেছেন, তাতে কর্ম করার পাঁচটি হেতু জানাবার তাৎপর্য কী—পরের শ্লোকে তারই বর্ণনা করেছেন।

তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মানং কেবলং তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ॥ ১৬ ॥

[তু, এবম্ (কিন্তু এরূপ পাঁচটি হেতু) ; সতি, যঃ (থাকলেও যে ব্যক্তি) ; তত্র (ওই ব্যাপারে) ; কেবলম্, আত্মানম্ (শুধু আত্মাকেই) ; কর্তারম্, পশ্যতি (কর্তা বলে মনে করে) ; সঃ, দুর্মতি (সেই দুর্মতি) ; ন, পশ্যতি (প্রকৃত তত্ত্ব বুঝতে পারে না) ; অকৃতবুদ্ধিত্বাৎ (তার বুদ্ধি অশুদ্ধ)]

কিন্তু এরূপ পাঁচটি কারণ থাকলেও যে ব্যক্তি ওই (কর্মের) ব্যাপারে শুধু (শুদ্ধ) আত্মাকে কর্তা বলে মনে করে, সেই দুর্মতি প্রকৃত তত্ত্ব বুঝতে পারে না ; কারণ তার জ্ঞান পরিমার্জিত নয়॥ ১৬ ॥

ব্যাখ্যা—**'তত্রৈবং সতি .... পশ্যতি দুর্মতিঃ'**—কর্ম যত প্রকারের হয়ে থাকে, সেগুলি সবই অধিষ্ঠান, কর্তা, করণ, চেষ্টা ও দৈব—এই পাঁচটি হেতুর জন্যই হয়, নিজ স্বরূপের দ্বারা নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি নিজ স্বরূপকে কর্তা বলে মেনে নেয়, তার বুদ্ধি পরিশুদ্ধ নয়—**'অকৃতবুদ্ধিত্বাৎ'** অর্থাৎ তিনি নিজ বিচার-বুদ্ধিকে গুরুত্ব দেন না। জড় ও চেতন, প্রকৃতি ও পুরুষের যে স্বাভাবিক বিবেক, পার্থক্য, তার দিকে তিনি লক্ষ্য করেন না। তাই তাঁর বুদ্ধিতে দোষ স্পর্শ করে। সেইজন্যই তিনি নিজেকে কর্তা বলে মেনে নেন।

এখানে উদ্ধৃত **'অকৃতবুদ্ধিত্বাৎ'** ও **'দুর্মতিঃ'** পদ দুটির একই অর্থ প্রতীয়মান হলেও এর মধ্যে সামান্য পার্থক্য আছে। **'অকৃতবুদ্ধিত্বাৎ'** পদটি হেতুরূপে ব্যবহৃত এবং **'দুর্মতিঃ'** পদটি কর্তার বিশেষণরূপে উদ্ধৃত অর্থাৎ কর্তার দুর্মতির হেতুই হল অকৃতবুদ্ধি। তাৎপর্য হল এই যে বুদ্ধিকে পরিমার্জিত না করলে অর্থাৎ বুদ্ধির সংস্কার না হলে, তাকে বলা হয় দুর্মতি। যদি তিনি শুভ বুদ্ধি সহায়ে বিবেককে জাগ্রত করেন, তাহলে তিনি আর দুর্মতি হন না।

শুদ্ধ আত্মা কিছু করেন না—**'ন করোতি ন লিপ্যতে'** (গীতা ১৩।৩১) ; কিন্তু একাত্মবোধের জন্য—'আমি করি না'—এই বোধ হয় না। বোধ না হওয়ার অকৃতবুদ্ধিই হল কারণ অর্থাৎ যিনি বুদ্ধিকে পরিমার্জিত করেননি, সেই দুর্মতিই নিজেকে কর্তা বলে মনে করেন ; আসলে শুদ্ধ আত্মায় কোনো কর্তৃত্ব নেই।

'কেবলম্' পদটি কর্মযোগ ও সাংখ্যযোগ—দুয়েতেই ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকৃতি এবং পুরুষের বিবেকই হল কর্মযোগ ও সাংখ্যযোগ সাধন-পথের মূল ভিত্তি। কর্মযোগ অনুসারে সকল ক্রিয়াই শরীর, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে হয়, কিন্তু সেগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা হয় না অর্থাৎ তাতে মমত্ববোধ হয় না। মমত্ববোধ না হওয়ায় শরীর, মন ইত্যাদির জগতের সঙ্গে যে একত্ব, তা অনুভূত হয়। একত্ব অনুভূত হলেই স্বরূপে স্বতঃই স্থিতি অনুভব হয়। তাই কর্মযোগে **'কেবলৈঃ'** পদটি শরীর, মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়গুলির সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে—**'কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি'** (গীতা ৫।১১)।

সাংখ্যযোগে বিচার-বুদ্ধির প্রাধান্য থাকে। যত কর্ম সাধিত হয়, তা সবই পাঁচটি হেতুর সাহায্যে হয়, নিজ স্বরূপের দ্বারা নয়। কিন্তু অহংকারে মোহিত অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট ব্যক্তি নিজেকে কর্তা বলে মনে করেন। বিবেক বিকশিত হলে মোহ নাশ হয়। মোহ দূর হলে তিনি নিজেকে কর্তা মনে করবেন কেন ? তখন তাঁর শুদ্ধ স্বরূপ অনুভূত হয়। সেইজন্য সাংখ্যযোগে **'কেবলম্'** পদটি স্বরূপের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে—**'কেবলম্ আত্মানম্'**।

এখানে একটি ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষণীয় হল এই যে, কর্মযোগে **'কেবল'** শব্দটি শরীর, মন ইত্যাদির সঙ্গে থাকায় শরীর, মন, বুদ্ধি ইত্যাদির সঙ্গে **'অহম্'**ও জগতের সেবায় ব্যাপৃত হয় ও স্বরূপ একইভাবে অবস্থান করে আর সাংখ্যযোগে স্বরূপের সঙ্গে **'কেবল'** থাকায় 'আমি নির্লিপ্ত' 'আমি শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত' এই ভাবে সূক্ষ্মরীতিতে 'অহম্'-এর রেশ থেকে যায়। 'আমি নির্লিপ্ত' ; 'আমাতে কর্তৃত্ববোধ নেই'—দীর্ঘসময় ধরে এরূপ স্থিতি থাকায় এই 'অহম্'ও স্বতঃই দ্রবীভূত হয় অর্থাৎ তা নিজ কারণ প্রকৃতিতে লীন হয়ে যায়।

পরিশিষ্ট-ভাব—সমস্ত কারকের মধ্যে কর্তা হল মুখ্য। কর্তার মধ্যে চেতনের আভাস দেখা যায়, অন্য কারকে নয়। আসলে চেতন 'কর্তা' নয়। এ শুধু মেনে নেওয়া কর্তা—**'অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে'** (গীতা ৩।২৭)। তাই ভগবান এখানে প্রকৃত স্বরূপকে যাঁরা কর্তা বলে মানেন তাঁদের নিন্দা করে বলেছেন যে তাঁদের বুদ্ধি শুদ্ধ নয়, তাঁরা দুর্মতি। কেন-না স্বরূপে কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব কোনোটিই নেই—**'শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে'** (গীতা ১৩।৩১)। মূলে এটি নেই, তাই সেটি ত্যাগ হয়ে যায়। এইসব কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব ভগবানেরও সৃষ্ট নয় বা প্রকৃতিরও সৃষ্ট নয়, আসলে এটি জীবের দ্বারাই সৃষ্ট।

আসলে কর্তা বলে কেউ নেই ; চেতনও কর্তা নয়, জড়ও কর্তা নয়। যদি কর্তা বলে কাউকে মানতেই হয়, তবে তা জড়কেই মানা উচিত। ভগবান গীতায় একথা কয়েকভাবে বলেছেন ; যেমন—সমস্ত ক্রিয়া প্রকৃতির দ্বারাই সংঘটিত হয় অর্থাৎ প্রকৃতি কর্তা (১৩।২৯) ; সমস্ত ক্রিয়া গুণাদির সাহায্যে হয় ; গুণই গুণাদিতে আবর্তিত হয় অর্থাৎ গুণই কর্তা (৩।২৭-২৮, ১৪।২৩) ; ইন্দ্রিয়গুলিই ইন্দ্রিয়াদির বিষয়ে আবর্তিত হচ্ছে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ই কর্তা (৫।৯)। তাৎপর্য হল যে কর্তৃত্ব প্রকৃতিতেই বিরাজমান, স্বরূপে নয়। তাই চেতন স্বরূপে স্থিত তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষ 'আমি কিছুই করি না' এরূপ অনুভব করেন—**'নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ'** (গীতা ৫।৮)। ভগবানও বলেছেন যে মানুষ যখন গুণাদি ব্যতীত অন্য কাউকে কর্তা বলে মনে করে না অর্থাৎ সকল ক্রিয়াতে এরূপ অনুভব করে থাকে যে গুণাদি সকল কর্মের কর্তা এবং নিজেকে গুণাদির থেকে ভিন্ন বা বিচ্ছিন্ন বলে অনুভব করতে পারে, যা বাস্তব সত্য[1], তখন সে আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হয় (১৪।১৯)।

সাধক খাওয়া-দাওয়া, শোয়া-বসা ইত্যাদি জাগতিক ক্রিয়াগুলিকে বিচারপূর্বক প্রকৃতির দ্বারা হয় বলে সহজেই মেনে নিতে পারেন, কিন্তু জপ-ধ্যান-সমাধি ইত্যাদি পারমার্থিক ক্রিয়াসমূহ নিজে করেন এবং নিজের জন্যই করা হয় বলে যদি মনে করেন তাহলে তা সাধকের কাছে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ জ্ঞানযোগের দৃষ্টিতে ক্রিয়া যত উন্নত হোক বা যত হীন হোক তা সবই এক জাতির (প্রাকৃত)। লাঠি ঘোরানো এবং মালা জপ করা—এই দুটি ক্রিয়া পৃথক্ পৃথক্ হলেও তা প্রকৃতিতেই হয়। তাৎপর্য হল যে খাওয়া-দাওয়া, শোয়া-বসা ইত্যাদি জপ-ধ্যান-সমাধি পর্যন্ত সমস্ত লৌকিক পারমার্থিক ক্রিয়াই প্রকৃতিতে সংঘটিত হয়। প্রকৃতির সম্পর্ক ব্যতীত ক্রিয়া সম্ভবপর নয়। সুতরাং সাধকের উচিত তার পারমার্থিক ক্রিয়াদি ত্যাগ না করা, কিন্তু সেই ক্রিয়াতে নিজ কর্তৃত্ব যেন মেনে না নেন অর্থাৎ সেগুলি তিনি করছেন বা নিজের জন্য করছেন বলে মনে না করেন। ক্রিয়া লৌকিকই হোক অথবা পারমার্থিক, তার গুরুত্ব আসলে জড়ত্বেরই গুরুত্ব। শাস্ত্রবিহিত হওয়ায় পারমার্থিক ক্রিয়াগুলির জন্য হৃদয়ে যে বিশেষ গুরুত্ব থাকে, তাও জড়ত্বেরই গুরুত্ব হওয়ায় সাধকের পক্ষে প্রতিবন্ধকস্বরূপ[2]। পারমার্থিক ক্রিয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য পরমাত্মা হওয়ায় তা কল্যাণকারক হয়। যেমন যেমন ক্রিয়াগুলির গৌণতা এবং ভগবদ্‌সম্পর্কের প্রাধান্য হতে থাকে, তেমনই অধিক লাভ হতে থাকে। ক্রিয়াগুলি প্রাধান্য পেলে বহু বৎসর

---

[1]স্বরূপ (আত্মা) সর্বতোভাবে গুণরহিত—'নির্গুণত্বাৎ' (গীতা ১৩।৩১)। গুণ প্রকাশ্য, স্বরূপ প্রকাশক। গুণ পরিবর্তনশীল, স্বরূপ অপরিবর্তনশীল। গুণ অনিত্য, স্বরূপ নিত্য। স্বরূপ নির্গুণ হয়েও যখন গুণাদির সঙ্গে একাত্মভাব করে তখন সে জন্ম-মৃত্যু চক্রে পতিত হয়—'কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু' (গীতা ১৩।২১)।

[2]ভগবানের জন্য করা উপাসনাতে ভগবৎ-কৃপাই প্রধান। সুতরাং এতে সাধকের কর্তৃত্ব নেই। ক্রিয়া, কর্ম, উপাসনা এবং বিবেক—চারটি পৃথক্ পৃথক্। 'ক্রিয়া' কারো সঙ্গেই সম্পর্ক পাতায় না, 'কর্ম' অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতির (ফলের) সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে। 'উপাসনা' ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে। 'বিবেক' জড়-চেতনের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে।

ধরে সাধনা করলেও লাভ হয় না। সুতরাং ক্রিয়াতে গুরুত্ব না দিয়ে ভগবানেই প্রীতি হওয়া উচিত। ভগবদ্‌প্রীতিভাবই হল ভজনা, ক্রিয়া নয়।

যার বুদ্ধি বিবেকবর্জিত অর্থাৎ যে বিবেককে গুরুত্ব দেয় না, সে হল দুর্মতি। বিবেকই বোধের কারণ, বুদ্ধি নয়। বিবেকের সাহায্যে বুদ্ধি শুদ্ধ হয়। বুদ্ধির শুদ্ধিতে শুভকর্মও কিছুটা সাহায্য করে। তবে বিবেক-বিচারের দ্বারা বুদ্ধি যেমন শুদ্ধি প্রাপ্ত হয়, শুভকর্মের সাহায্যে তেমন হয় না। বিবেককে গুরুত্ব না দেওয়া যত দূষণীয়, মল-বিক্ষেপ-আবরণ তত দূষণীয় নয়। বিবেক অনাদি এবং নিত্য। তাই মল-বিক্ষেপ-আবরণ থাকা সত্ত্বেও বিবেক জাগরিত হতে পারে। পাপের দ্বারা বিবেক নাশ হয় না, কিন্তু পাপ বিবেক জাগরিত হতে বাধার সৃষ্টি করে। বিবেককে গুরুত্ব না দেওয়ার কারণ হল—ক্রিয়া ও পদার্থকে গুরুত্ব প্রদান। ক্রিয়া ও পদার্থকে গুরুত্ব প্রদানকারীই হল 'দুর্মতি'।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে বলা হয়েছে যে শুদ্ধ স্বরূপকে যিনি কর্তা বলে দেখেন সেই দুর্মতিপরায়ণ ব্যক্তি সঠিক দেখেন না। তাহলে কে সঠিক দেখেন ? পরের শ্লোকে তারই বর্ণনা করা হয়েছে।

যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥ ১৭ ॥

[যস্য (যাঁর) ; অহংকৃতঃ, ভাবঃ, ন (অহং-কর্তৃত্ব ভাব নেই) ; যস্য, বুদ্ধিঃ (যাঁর বুদ্ধি) ; ন, লিপ্যতে (লিপ্ত হয় না) ; সঃ, ইমান্, লোকান্ (তিনি সকল প্রাণীকে) ; হত্বা, অপি (হত্যা করলেও) ; ন, হন্তি (তাদের বধ করেন না) ; ন, নিবধ্যতে (আবদ্ধ হন না।)]

যাঁর অহং-কর্তৃত্ব ভাব নেই এবং যাঁর বুদ্ধি কর্মফলে লিপ্ত হয় না, তিনি সকল প্রাণীকে হত্যা করলেও তাদের বধ করেন না বা আবদ্ধ হন না॥ ১৭ ॥

ব্যাখ্যা—'যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে'—যাঁর মধ্যে 'আমি করি'—এরূপ অহং-কর্তৃত্ব ভাব নেই এবং যাঁর বুদ্ধিতে কর্মফল প্রাপ্তির কোনো প্রলেপ নেই, যেমন, শাস্ত্রবিহিত এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ সকল কর্মই এক প্রকাশ দ্বারা হয় এবং প্রকাশের আশ্রিত হয় ; কিন্তু প্রকাশ কোনো ক্রিয়ারই 'কর্তা' হন না অর্থাৎ প্রকাশ ওই ক্রিয়াগুলি করেনও না বা করানও না। তেমনই স্বরূপের সত্তা ব্যতিরেকে বিহিত বা নিষিদ্ধ—কোনো ক্রিয়া হয় না। কিন্তু এই সত্তা ওই ক্রিয়াগুলি করেনও না অথবা করানও না—যিনি এটি ঠিক ঠিক অনুভব করেন, তাঁর মধ্যে 'আমি ক্রিয়া করি'—এই অহং-কর্তৃত্ববোধ থাকে না এবং 'এই জিনিস চাই', 'ওটি চাই না', 'অমুক ঘটনা যেন ঘটে', 'অমুক ঘটনা যেন না ঘটে' বুদ্ধিতে এরূপ লিপ্ততা থাকে না। অহং-কর্তৃত্ব ভাব এবং বুদ্ধিতে লিপ্ত না থাকায় তাঁর কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব দুই-ই নাশ হয় অর্থাৎ এই দুটিই যে বাস্তবিকভাবে আমাতে নেই, তার বোধ হয়ে যায়।

প্রকৃতির কার্য স্বাভাবিক গতিতেই চলে, পরিবর্তিত হয় আর স্ব-স্বরূপ হল তার প্রকাশক—এই বোধ নিয়ে যিনি স্ব-স্বরূপে স্থিত হন, তাঁর 'আমি করি', এই অহং-কর্তৃত্ব ভাব থাকে না ; এই অহং-কর্তৃত্ববোধ আসে প্রকৃতির কার্য শরীরকে নিজের বলে স্বীকার করলে। অহং-কর্তৃত্ব ভাব সর্বতোভাবে দূর হলে তার বুদ্ধিতে ফলপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাও থাকে না।

অহং-কর্তৃত্ববোধ হল একপ্রকার মনোবৃত্তি। মনোবৃত্তি হলেও এই ভাব স্বয়ং-এ (কর্তাতে) বিদ্যমান থাকে। কারণ কর্তৃত্ব ও অকর্তৃত্ব বোধ স্বয়ংই স্বীকার করেন।

'হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে'—তিনি যদি সমস্ত প্রাণীকে হত্যাও করেন, তাহলেও তিনি হত্যাকারী হন না। কারণ তাঁর মধ্যে কোনোপ্রকার কর্তৃত্ববোধ থাকে না। তিনি আবদ্ধও হন না। কারণ তাঁর মধ্যে ভোক্তৃত্বও নেই। তাৎপর্য হল এই যে ক্রিয়া এবং তার ফল কিছুরই সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকে না।

প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতিই ক্রিয়া ও ফলে পরিণত হয়। কিন্তু এই বাস্তবতত্ত্ব অনুভূত না হওয়ায় পুরুষ (চেতন) কর্তা ও

ভোক্তা হয়ে ওঠে। কারণ যখন অহংভাব নিয়ে ক্রিয়া করা হয়, তখন কর্তা, করণ ও কর্ম—তিনটি মিলিত হয় আর তখনই কর্মসংগ্রহ হয়ে থাকে। কিন্তু যার মধ্যে অহং-কর্তৃত্ব ভাব নেই, যে শুধুমাত্র সকলের প্রকাশক, আশ্রয় ও সর্বগত চেতন, সে কী করে অন্যকে হত্যা করবে ? আর কী করেই বা তাকে আবদ্ধ করা যাবে ? তাকে 'বধ করা' বা 'আবদ্ধ করা' কোনোটাই সম্ভব হয় না (গীতা ২।১৯)।

সকল প্রাণীকে বধ করা কী ? যাঁর মধ্যে অহং-কর্তৃত্ব ভাব নেই এবং যাঁর বুদ্ধিতে লিপ্ততা নেই—এরূপ ব্যক্তির দেহ যে বর্ণ বা আশ্রমে অবস্থান করে, সেই অনুযায়ী তাঁর সামনে যেসব পরিস্থিতি উপস্থিত হয়, তাতে প্রবৃত্ত হলেও তার কোনো পাপ হয় না। যেমন, কোনো জীবন্মুক্ত ক্ষত্রিয় ব্যক্তির সামনে স্বতঃই যুদ্ধের পরিস্থিতি উপস্থিত হলে, তিনি সকলকে বধ করলেও হত্যাকারী হন না এবং আবদ্ধও হন না। কারণ তাঁর মধ্যে অহং-অভিমান ও স্বার্থভাব থাকে না।

এখানে অর্জুনের নিকটও যুদ্ধ-প্রসঙ্গ উপস্থিত। তাই ভগবান '**হত্বাপি**' পদটির দ্বারা অর্জুনকে যুদ্ধ করতে প্রেরণা দিয়েছেন। 'অপি' পদটির ভাব হল '**কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ**' (গীতা ৪।২০) 'কর্মে ভালোমত প্রবৃত্ত হলেও তিনি কিছুই করেন না।' '**সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে**' (গীতা ৬।৩১)। তিনি সবরকম ব্যবহার করলেও আমাতেই অবস্থান করেন। '**শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে**' (গীতা ১৩।৩১), 'শরীরে অবস্থান করলেও কিছু করেন না বা কিছুতে লিপ্ত হন না।' তাৎপর্য হল এই যে সর্বাঙ্গীণভাবে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার কালে বা কর্মে প্রবৃত্ত না থাকাকালে তাঁর স্বরূপের নির্বিকল্পতা একই থাকে অর্থাৎ ক্রিয়া করা বা না-করায় তাঁর স্বরূপের কোনো তফাৎ হয় না। কারণ ক্রিয়া হয় প্রকৃতিতে, স্বরূপে নয়।

অহং-বোধই মানুষের মধ্যে পার্থক্য আনে। অহংভাব না থাকলে পরমাত্মার সঙ্গে পার্থক্য থাকার কোনো কারণই নেই। তখন শুধুমাত্র সকলের আশ্রয়, প্রকাশক, সর্বগত চেতনই থাকে। তিনি কোনো ক্রিয়ার কর্তাও হন না এবং কোনো ফলের ভোক্তাও হন না। ক্রিয়াগুলির কর্তা ও ফলের ভোক্তা তিনি আগেও ছিলেন না, শুধুমাত্র বিনাশশীল শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করায় যে অহংভাবকে স্বীকার করা হয়েছে, সেই অহংভাবের জন্যই তাঁর মধ্যে কর্তৃত্বভাব এবং ভোক্তৃত্বভাব উদিত হয়েছে।

'অহং' দুপ্রকারের—অহংস্ফুর্তি এবং অহংকৃতি। গভীর নিদ্রা থেকে উত্থিত হলেই সর্বপ্রথম মানুষের নিজ অস্তিত্বের আভাস হয়ে থাকে, একেই বলা হয় অহংস্ফুর্তি। তারপরে সে নিজের মধ্যে 'আমার এই নাম, আমি এই বর্ণ ও আশ্রমের'—ইত্যাদি আরোপ করে, এটিই হল অসতের সম্পর্ক। অসতের সম্পর্কে অর্থাৎ শরীরের সঙ্গে একাত্মতা করলে শরীরের ক্রিয়াগুলিকে 'আমি করি'—এই ভাব উৎপন্ন হয়, একেই বলা হয় 'অহংকৃতি'।

'অহং' থেকেই সৃষ্টি হয় পরিচ্ছিন্নতা। তাই 'অহং-স্ফুর্তি'তেও পরিচ্ছিন্নতা (ব্যক্তিত্ব বোধ) দোষ থাকে। কিন্তু এই পরিচ্ছিন্নতা বন্ধন কারক নয় অর্থাৎ পরিচ্ছিন্নতা থাকলেও 'অহংস্ফুর্তি' দূষণীয় নয়। কারণ অহংকৃতি অর্থাৎ কর্তৃত্ব ছাড়া নিজের ওপর গুণ বা দোষ আরোপিত হয় না। অহংকৃতি হলেই নিজের মধ্যে গুণ ও দোষ আরোপিত হয়, যার ফলে শুভাশুভ কর্মের সৃষ্টি হয়। বোধ হলে অহংস্ফুর্তিতে যে পরিচ্ছিন্নতা থাকে, তা নাশ হয় এবং শুধুমাত্র স্ফুর্তি থাকে। এই অবস্থায় মানুষ বধ করলেও সে বধকারী হয় না এবং আবদ্ধও হয় না।

'**ন হন্তি ন নিবধ্যতে**' (মারেনও না বা আবদ্ধও হন না) এর কী ভাব ? একটি হল নির্বিকল্প অবস্থা আর অন্যটি হল নির্বিকল্প বোধ। নির্বিকল্প অবস্থা সাধন-সাধ্য আর তার উত্থানও হয় অর্থাৎ তা একরস থাকে না। এই নির্বিকল্প অবস্থাতেও আসক্তি না থাকায় স্বতঃই নির্বিকল্পবোধ অনুভূত হয়। নির্বিকল্পবোধ সাধন-সাধ্য নয় এবং তার নির্বিকল্পতা কোনো অবস্থাতেই বিন্দুমাত্র ভঙ্গ হয় না। নির্বিকল্পবোধে কখনো পরিবর্তন হয় না এবং হওয়া সম্ভবও নয়। তাৎপর্য হল এই যে নির্বিকল্পবোধে কখনো কোনো চাঞ্চল্য হয় না—এই হল '**ন হন্তি ন নিবধ্যতে**' কথাটির তাৎপর্য।

অহং-কর্তৃত্বভাব ও বুদ্ধিতে লিপ্ত না হওয়ার উপায় কী ? ক্রিয়ারূপের পরিবর্তন শুধু প্রকৃতিতেই হয়ে থাকে আর এই ক্রিয়াগুলির আদি ও অন্ত থাকে এবং সেই কর্মের ফলরূপে যে পদার্থ পাওয়া যায়, তারও সংযুক্তি ও বিযুক্তি হয়। এইভাবে ক্রিয়া ও পদার্থ—উভয়েরই সঙ্গে সংযুক্তি ও

বিযুক্তি হতে থাকে। এগুলি হলেও স্ব-স্বরূপ প্রকাশরূপে একইভাবে বিরাজ করেন। বিবেক-বিচার সহকারে এই ভাব অনুভূত হলে অহং-কর্তৃত্ববোধ ও বুদ্ধির লিপ্ততা থাকে না।

পরিশিষ্ট-ভাব—অহং-কর্তৃত্ব ভাব না থাকার অর্থ হল—অহংবর্জিত হওয়া এবং বুদ্ধিলিপ্ত না হওয়ার অর্থ হল—কামনা, মমতা এবং স্বার্থভাব-বর্জিত হওয়া।

অর্জুন বলেছিলেন যে এই সব আততায়ীকে বধ করলে আমাদের পাপ হবে—**'পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ'** (গীতা ১।৩৬) এবং গুরুজনদের হত্যা করলে পাপ হবে **'গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্.......'** (গীতা ২।৫)। তাই ভগবান এখানে বলছেন যে এদের হত্যা করলে পাপ স্পর্শ করার কথা কি, সমস্ত প্রাণী হত্যা করলেও পাপ হবে না। কারণ পাপ স্পর্শ করার হেতু হল অহংভাব এবং বুদ্ধির লিপ্ততা। বুদ্ধি কামনা, মমতা এবং স্বার্থভাব ইত্যাদির দ্বারা লিপ্ত হয়। গঙ্গাতে কেউ যদি ডুবে মরে, তাহলে গঙ্গার কোনো পাপ হয় না। আবার কেউ তার জল পান করে, স্নান করে, চাষবাস করে তাতেও গঙ্গার কোনো পুণ্য হয় না। বর্ষার ফলে কত জীবের মৃত্যু হয়, কত জীব জীবন লাভ করে, কিন্তু বর্ষার তাতে পাপ-পুণ্য কিছুই হয় না। কারণ গঙ্গা ও বর্ষার মধ্যে অহং-কর্তৃত্বভাব এবং বুদ্ধির লিপ্ততা নেই। ডাক্তারের মধ্যে যদি কামনা, মমতা, স্বার্থবুদ্ধি না থাকে তাহলে তিনি অপারেশন করে অঙ্গ কাটলেও তাঁর পাপ হয় না। তাঁর মধ্যে যদি অহং-কর্তৃত্ব ভাব না থাকে তাহলে পাপ হওয়ার কথা ওঠেই বা কী করে ?

জ্ঞানযোগের দ্বারা 'অহং-কর্তৃত্বভাব' নাশ হয় এবং কর্মযোগের দ্বারা 'বুদ্ধির লিপ্ততা' দূর হয়। উভয়ের মধ্যে কোনো একটি নাশ হলে দ্বিতীয়টি স্বতঃই দূর হয়। অহং-কর্তৃত্বভাবের জন্যই জীবের মধ্যে ভোগ এবং মোক্ষের আকাঙ্ক্ষার উৎপত্তি হয়। অহং-কর্তৃত্ব ভাব দূর হলে ভোগেচ্ছাও দূর হয়—**'বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে'**। ভোগেচ্ছা দূর হলে মোক্ষের আকাঙ্ক্ষাও স্বতঃই পূর্ণ হয় ; কারণ মোক্ষ স্বতঃসিদ্ধ।

✻ ✻ ✻

সম্বন্ধ—জ্ঞান এবং প্রবৃত্তি (ক্রিয়া) দূষণীয় নয়, কর্তৃত্বাভিমানই দোষের ; কারণ কর্তৃত্বাভিমান থেকেই কর্মসংগ্রহ হয়—পরের শ্লোকে সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্মচোদনা।
করণং কর্ম কর্তেতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ॥ ১৮ ॥

[**জ্ঞানম্, জ্ঞেয়ম্** (জ্ঞান, জ্ঞেয়) ; **পরিজ্ঞাতা** (পরিজ্ঞাতা) ; **ত্রিবিধা** (এই তিনটি হতে) ; **কর্মচোদনা** (কর্মে প্রেরণা আসে) ; **করণম্, কর্ম** (করণ, কর্ম) ; **কর্তা** (কর্তা) ; **ইতি, ত্রিবিধঃ** (এই তিনটির দ্বারা) ; **কর্মসংগ্রহঃ** (কর্মসংগ্রহ হয়।)]

জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং পরিজ্ঞাতা—এই তিনটি হতে কর্মে প্রেরণা আসে এবং করণ, কর্ম ও কর্তা—এই তিনটির দ্বারা কর্মসংগ্রহ হয় ॥ ১৮ ॥

ব্যাখ্যা—[এই অধ্যায়ের চতুর্দশ শ্লোকে ভগবান কর্ম হওয়ার পিছনে পাঁচটি কারণ জানিয়েছিলেন—সেগুলি হল—অধিষ্ঠান, কর্তা, করণ, চেষ্টা এবং দৈব বা সংস্কার। এই পাঁচটিরই মূল কারণ হল কর্তা। এই মূল কারণকে নাশ করার জন্য ভগবান ষোড়শ শ্লোকে যারা কর্তৃত্বভাব বজায় রাখে তাদের নিন্দা করেছেন এবং সপ্তদশ শ্লোকে যারা কর্তৃত্বভাব রাখে না তাদের প্রশংসা করেছেন। কর্তৃত্বভাব যাতে একেবারে না থাকে তা ভালোভাবে বোঝাবার জন্যই অষ্টাদশ শ্লোকের অবতারণা করা হয়েছে।]

'জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্মচোদনা'—জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং পরিজ্ঞাতা—কর্মপ্রেরণা এই তিনটি থেকে আসে। জ্ঞানের কথা সর্বপ্রথম বলার মধ্যে এই ভাবটি আছে যে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে কোনো প্রবৃত্তি হলে সেই প্রবৃত্তির আগে জ্ঞান হয়। যেমন, জল পানের প্রবৃত্তি হওয়ার আগে পিপাসার জ্ঞান হয়, পরে সে জলের দ্বারা পিপাসা মেটায়। জল ইত্যাদি যে বিষয়ে জ্ঞান হয়, তাকে

বলা হয় 'জ্ঞেয়' আর যার জ্ঞান হয় তাকে বলে বলা হয় 'পরিজ্ঞাতা'। জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা—এই তিনটি হলেই কর্ম করার প্রেরণা আসে। এই তিনটির মধ্যে যদি একটি না থাকে তাহলে কর্ম করার প্রেরণা থাকে না।

'পরিজ্ঞাতা' বলা হয় তাঁকে, যিনি **'পরিতঃ'** জ্ঞাতা অর্থাৎ যিনি সর্বপ্রকার ক্রিয়ার স্ফুরণার জ্ঞাতা। তিনি শুধুমাত্র 'জ্ঞাতা' অর্থাৎ তাঁর শুধুমাত্র ক্রিয়ার স্ফুরণার জ্ঞান হয়, তাঁর মধ্যে নিজের কোনো আকাঙ্ক্ষা বা সেই ক্রিয়াটি সম্পন্ন করার কর্তৃত্বভাব কখনো-ই থাকে না।

যে কোনো ক্রিয়া করার স্ফুরণ কোনো ব্যক্তি বিশেষেই হয়। তাই রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ—এই বিষয়গুলিতে দর্শনকারী, আস্বাদ গ্রহণকারী, গন্ধ গ্রহণকারী, স্পর্শকারী ও শব্দ গ্রহণকারী—এইরূপ অনেক 'কর্তা' হতে পারে ; কিন্তু ওইগুলিকে যিনি জানেন তিনি একই থাকেন, তাঁকেই এখানে বলা হয়েছে 'পরিজ্ঞাতা'।

'করণং কর্ম কর্তেতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ'—কর্ম-সংগ্রহ করার তিনটি কারণ—করণ, কর্ম এবং কর্তা। এই তিনের সহযোগে কর্ম সম্পূর্ণ হয়। যে সাধন দ্বারা কর্তা কর্ম করে, সেই ক্রিয়ার সাধন (ইন্দ্রিয়) গুলিকে বলা হয় 'করণ'। খাওয়া-দাওয়া, ওঠা-বসা, চলা-ফেরা, আসা যাওয়া ইত্যাদি যে কাজ করা হয়, সেগুলিকে বলা হয় 'কর্ম'। করণ এবং ক্রিয়ার সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করে যিনি কর্ম করেন, তাঁকে বলা হয় 'কর্তা'। এইভাবে তিনের সহযোগে কর্ম সৃষ্ট হয়।

ভগবানের এখানে যে বিশেষ কথাটি বলার তা হল এই যে, কর্মসংগ্রহ হয় কীভাবে ? অর্থাৎ কর্ম কী করে বন্ধন-কারক হয় ? কর্ম সৃষ্ট হওয়ার তিনটি কারণ জানাতে গিয়ে ভগবানের প্রধান লক্ষ্য ছিল 'কর্তা'কে জানাবার। কারণ কর্মসংগ্রহের প্রধান সম্পর্ক হচ্ছে কর্তা। যদি কর্তৃত্ব-বোধ না থাকে তাহলে কর্মসংগ্রহ হয় না, শুধুমাত্র ক্রিয়াই হয়।

'করণ' কর্মসংগ্রহের হেতু নয়। কারণ করণ হল কর্তার অধীন। কর্তা যেমন কর্ম করতে চান, তেমনই কর্ম হয়ে থাকে, তাই কর্মও কর্মসংগ্রহের প্রধান হেতু নয়। সাংখ্যসিদ্ধান্ত অনুসারে অহং-কর্তৃত্ববোধই হল আসল বন্ধনকারী এবং এর জন্যই কর্মসংগ্রহ হয়। অহং-কর্তৃত্ব বোধ না থাকলে কর্মসংগ্রহ হয় না অর্থাৎ কর্ম ফলদায়ক হয় না। এই মৌল বিষয়ের জ্ঞান করাবার জন্যই ভগবান করণ ও কর্মকে প্রথমে রেখে কর্তাকে কর্মসংগ্রহের নিকট রেখেছেন, যাতে এটি বোঝা যায় যে কর্তা-ই হল 'বন্ধনকারী'।

পরিশিষ্ট-ভাব—অর্জুন জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগের তত্ত্ব জানার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন (১৮।১), তাই ভগবান দ্বাদশ শ্লোক পর্যন্ত কর্মযোগের বর্ণনা করেছেন। তারপরে ভগবান জ্ঞানযোগের দৃষ্টিতে কর্মগুলির আলোচনা করে প্রথমে কর্মের জন্য পাঁচটি কারণ বলেছেন (১৮।১৩-১৫)। সেই কথাই এখন প্রকারান্তরে কর্মপ্রেরণা এবং কর্মসংগ্রহের রূপে বর্ণনা করছেন।

মানুষের মধ্যে যখন অহংকার ও আসক্তি থাকে, তখন জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয়রূপ ত্রিপুটীর সাহায্যে 'কর্মপ্রেরণা' অর্থাৎ কর্ম করার এরূপ প্রবৃত্তি জন্মায় যে আমি ওই কার্যটি করলে এই ফল লাভ করব। কর্মপ্রেরণা হলে 'কর্মসংগ্রহ' অর্থাৎ পাপ ও পুণ্যজনক কাজ হতে থাকে । এই পাপ ও পুণ্যকর্ম কীভাবে হয় তা পরবর্তী কুড়িতম শ্লোক থেকে বিস্তারিতভাবে জানানো হবে।

*** *** ***

সম্বন্ধ—গুণাতীত হওয়ার উদ্দেশ্যে পরবর্তী শ্লোক থেকে ত্রিগুণাত্মক পদার্থগুলির প্রকরণ আরম্ভ করছেন।

জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি॥ ১৯ ॥

[**গুণসংখ্যানে** (সাংখ্যশাস্ত্রে) ; **গুণভেদতঃ** (গুণাদি ভেদে) ; **জ্ঞানম্, চ, কর্ম** (জ্ঞান, কর্ম) ; **চ, কর্তা, ত্রিধা, এব** (এবং কর্তাকে তিন প্রকারেই) ; **প্রোচ্যতে** (বলা হয়েছে) ; **তানি** (সেগুলি) ; **অপি** (কেও) ; **যথাবৎ, শৃণু** (যথাযথভাবে শোনো।)]

গুণসংখ্যান (সাংখ্যশাস্ত্রে) গুণাদি ভেদে জ্ঞান, কর্ম ও কর্তাকে তিন প্রকারেই বলা হয়েছে। সেগুলি তুমি

যথাযথভাবে শোনো ॥ ১৯ ॥

ব্যাখ্যা—**'প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে'**—যে শাস্ত্রে গুণাদির সম্পর্ক থেকে প্রত্যেক পদার্থের বিভিন্ন ভাগের গণনা করা হয়েছে, সেই শাস্ত্র অনুসারে আমি তোমাকে জ্ঞান, কর্ম ও কর্তার পার্থক্য জানাচ্ছি।

'জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ'—আগের শ্লোকে ভগবান কর্মের প্রেরণার কারণ হিসাবে তিনটি হেতু দর্শিয়েছেন। এইরূপ কর্মসংগ্রহ হওয়া পর্যন্ত মোট ছয়টি বিষয়ের কথা বলেছেন[১]। এবার ভগবান এই শ্লোকে জ্ঞান, কর্ম ও কর্তা—এই তিনটির সম্বন্ধে জানাচ্ছেন। কর্মপ্রেরক বিভাগ থেকে বিচার করার জন্য শুধু 'জ্ঞান'-কে নেওয়া হয়েছে, কারণ যে কোনো কর্মেরই প্রেরণায় প্রথম আসে জ্ঞান। জ্ঞান হলেই কর্ম আরম্ভ হয়। কর্মসংগ্রহ বিভাগের থেকে শুধু 'কর্ম' এবং 'কর্তা'-কে নেওয়া হয়েছে। যদিও কর্ম সম্পাদনে কর্তাই মুখ্য, তা সত্ত্বেও কর্মকে নেওয়ার কারণ হল এই যে কর্তা কর্ম করলে তবেই কর্মসংগ্রহ হয়ে থাকে। কর্তা যদি কর্ম না করে তাহলে কর্মসংগ্রহ হবে না। তাৎপর্য হল কর্ম-প্রেরণাতে 'জ্ঞান' এবং কর্মসংগ্রহে 'কর্ম' ও 'কর্তা' হল প্রধান। এই তিনটি (জ্ঞান, কর্ম ও কর্তা) সাত্ত্বিক হলে তবেই মানুষ নির্লিপ্ত হতে পারে, রাজস বা তামস হলে নয়। তাই এখানে কর্মপ্রেরক বিভাগে 'জ্ঞাতা' এবং 'জ্ঞেয়'-কে আর কর্মসংগ্রহ বিভাগে 'করণ'-কে ধরা হয়নি।

কর্মপ্রেরক বিভাগের 'জ্ঞাতা' এবং 'জ্ঞেয়'-এর বিচার করা হয়নি কেন ? কারণ জ্ঞাতা যখন ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, তখন তাকে বলা হয় 'কর্তা' এবং কর্তার তিনটি (সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক) বিভাগের অন্তর্গতই জ্ঞাতারও তিনটি ভাগ হয়। কিন্তু জ্ঞাতা যখন জ্ঞানমাত্র থাকে, তখন তার তিন ভাগ হয় না, কারণ তার মধ্যে তখন গুণাদির আসক্তি থাকে না। গুণাদির আসক্তি থাকলেই তার তিন ভাগ হয়। তাই বৃত্তিজ্ঞানই সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক হয়ে থাকে।

যাকে জানা যায়, সেই বিষয়কে বলা হয় 'জ্ঞেয়'। জানার বিষয় প্রচুর, তাই তার কোনো পৃথক্ বিভাগ করা হয়নি। কিন্তু জানার যোগ্য সমস্ত বিষয়েরই একমাত্র লক্ষ্য হল 'সুখ' প্রাপ্ত করা। যেমন, কেউ বিদ্যালাভ করে, কেউ অর্থোপার্জন করে, কেউ অধিকার লাভের চেষ্টা করে, তাই এইসব জানা বা পাওয়ার যে চেষ্টা তার একমাত্র লক্ষ্য হল 'সুখ'। বিদ্যালাভেতে এই ভাব থাকে যে বেশি পড়াশুনা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করব, সম্মান পাব এবং সুখী হব। এইরূপ প্রত্যেক কাজেরই লক্ষ্য পরম্পরাতে সুখই থাকে। তাই ভগবান জ্ঞেয়ের তিনটি বিভাগ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক 'সুখের' নামের পরে (১৮।৩৬-৩৯) জানিয়েছেন।

এইরূপেই ভগবান করণকে তিনভাগে বিভক্ত করেননি ; কারণ ইন্দ্রিয়াদি যতপ্রকার করণ আছে, সেগুলি শুধুমাত্র সাধন। তাই তার তিন ভাগ হয় না। কিন্তু এইসব করণে বুদ্ধিরই প্রাধান্য থাকে। কারণ মানুষ এই করণের সাহায্যে যেসব কাজ করে, তা সে বিচার-বিবেচনা (বুদ্ধি) সহকারেই করে থাকে। তাই ভগবান করণের তিনটি ভাগ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিককে 'বুদ্ধি'র নামে পরে (১৮।৩০-৩২-এ) জানিয়েছেন।

বুদ্ধিকে দৃঢ়তর করতে 'ধৃতি' বুদ্ধির সহায়ক হয়। জ্ঞানযোগের সাধনায় ভগবান দুটি স্থানে (৬।২৫ এবং ১৮।৫১) বুদ্ধির সঙ্গে 'ধৃতি' পদটিও ব্যবহার করেছেন। তাতে মনে হয় যে জ্ঞানমার্গে বুদ্ধির সঙ্গে ধৃতির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা থাকে। তাই ভগবান ধৃতিরও তিনটি বিভাগের কথা (১৮।৩৩-৩৫) বলেছেন।

'ত্রিধৈবঃ' পদটির ভাব হল এই যে, এই বিভাগ তিনটিই (সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিকই) হয়ে থাকে, কম বা বেশি নয় অর্থাৎ দুইও হয় না বা চারও নয়। কারণ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিনটি গুণই প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন—**'সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ'** (গীতা ১৪।৫)। সেইজন্য এই তিনটি গুণ নিয়েই তিনটি বিভাগ হয়।

'যথাবৎ'—গুণসংখ্যান-শাস্ত্রে এই বিষয়ের যেমন বর্ণনা করা হয়েছে, তেমনই তোমাকে জানাচ্ছি ; আমি নিজে এর কিছু কম বা বেশি করিনি।

'শৃণু'—এই ব্যাপারটি মনোযোগ দিয়ে শোনো। কারণ

[১]কর্মপ্রেরণা হল সূক্ষ্ম আর কর্মসংগ্রহ হল স্থূল, অর্থাৎ জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা—এই তিনটি হল সূক্ষ্ম সামগ্রী আর কর্ম, করণ ও কর্তা—এই তিনটি হল স্থূল সামগ্রী।

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—এই তিনটির মধ্যে 'সাত্ত্বিক' নিষ্ঠা থাকলে তা ক্রমশঃ সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করে পরমাত্মতত্ত্ব বোধ করায় ; 'রাজস' জন্ম-মৃত্যু প্রদান করে এবং 'তামস' পতন ঘটায় অর্থাৎ নীচগতি প্রাপ্ত করায়। তাই এর বর্ণনা শুনে সাত্ত্বিকতা গ্রহণ এবং রাজসিক-তামসিকতা পরিত্যাগ করা উচিত।

'তানি'—এই জ্ঞান ইত্যাদির তোমার স্বরূপের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই। তোমার স্বরূপ সর্বদাই নির্লিপ্ত।

'অপি'—এর বিভাগগুলি জানারও প্রয়োজনীয়তা আছে, কারণ এগুলি ঠিকভাবে জানলে **'যস্য নাহং কৃতো ভাবো ..... ন হন্তি ন নিবধ্যতে'** (১৮।১৭) এই শ্লোকটি ভালোভাবে অনুভূত হয় অর্থাৎ স্ব-স্বরূপ বোধ হয়।

সম্বন্ধ—এর পর ভগবান সাত্ত্বিক জ্ঞানের বর্ণনা করেছেন।

সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্‌॥ ২০ ॥

[**যেন** (যে জ্ঞানের সাহায্যে) ; **বিভক্তেষু, সর্বভূতেষু** (ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিভক্ত প্রাণীতে) ; **অবিভক্তম্‌, একম্‌** (অবিভক্ত এক) ; **অব্যয়ম্‌, ভাবম্‌** (অবিনাশী সত্তার) ; **ঈক্ষতে, তৎ** (পরিদর্শন করে, সেই) ; **জ্ঞানম্‌** (জ্ঞানকে) ; **সাত্ত্বিকম্‌** (সাত্ত্বিক) ; **বিদ্ধি** (বলে জেনো।)]

যে জ্ঞানের সাহায্যে সাধক ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিভক্ত প্রাণীতে এক অবিনাশী সত্তা (ভাব) পরিদর্শন করে, সেই জ্ঞানকে তুমি সাত্ত্বিক জ্ঞান বলে জানবে॥ ২০ ॥

ব্যাখ্যা—'সর্বভূতেষু যেনৈকং........অবিক্তং বিভক্তেষু'—ব্যক্তি, বস্তু ইত্যাদিতে যে সত্তা পরিলক্ষিত হয়, তা সেই ব্যক্তি, বস্ত ইত্যাদির নয়, তা হল সর্বত্র পরিপূর্ণ পরমাত্মার। ওইসব ব্যক্তি, বস্তু ইত্যাদির স্বতন্ত্র কোনো সত্তাই নেই। কারণ তার মধ্যে প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তন হতে থাকে। কোনো ব্যক্তি বা বস্তু এমন নেই, যার মধ্যে পরিবর্তন হয় না ; কিন্তু নিজের অজ্ঞতার জন্য সে তাতে অস্তিত্ব অনুভব করে। যখন অজ্ঞতা দূর হয়, জ্ঞান হয়, তখন সাধকের দৃষ্টি সেই অবিনাশী তত্ত্বের দিকে যায়, যে অস্তিত্বের দ্বারা এইসব প্রাণী অস্তিত্বসম্পন্ন হয়।

জ্ঞান হলে সাধকের দৃষ্টি পরিবর্তনশীল বস্তুগুলির রহস্য ভেদ করে পরিবর্তনরহিত তত্ত্বের দিকেই যায় (গীতা ১৩।২৭)। তখন তিনি বিভক্ত অর্থাৎ পৃথক্‌ পৃথক্‌ বস্তু, ব্যক্তি, পরিস্থিতি, ঘটনা ইত্যাদিতে বিভাগহীন একই তত্ত্ব দর্শন করেন (গীতা ১৩।১৬)। তাৎপর্য হল এই যে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান এবং তদনুরূপ বিভিন্ন প্রকার আচার-ব্যবহার হলেও তিনি এই বিকারশীল বস্তুগুলিতে সেই স্বতঃসিদ্ধ নির্বিকার এক তত্ত্বই দর্শন করেন। কিন্তু এরূপ অনুভূতি তখনই হওয়া সম্ভব যখন অন্তর থেকে রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ সর্বতোভাবে দূর হয়।

'তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্‌'—এই জ্ঞানকে তুমি সাত্ত্বিক বলে জেনো। পরিবর্তনশীল বস্তুগুলির, বৃত্তিগুলির সম্পর্ক থেকেই একে 'সাত্ত্বিক জ্ঞান' বলা হয়। সম্পর্করহিত হলে এই জ্ঞানকে 'বাস্তবিক বোধ' বলে, যাকে ভগবান সব সাধনের অন্তিম ফলরূপে জ্ঞেয়-তত্ত্বের নামে বলেছেন—**'জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌ জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে'** (গীতা ১৩।১২)।

মর্মার্থ

ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সাংসারিক জ্ঞান হয়, ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান হয় বুদ্ধি থেকে আর বুদ্ধির জ্ঞান আসে 'আমি' থেকে। এই 'আমি' বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় এবং বিষয়—এই তিনটিকেই জানে। কিন্তু এই 'আমি'রও এক প্রকাশক আছে, যাতে 'আমি' একদেশীয় এবং সীমিত। সেই প্রকাশে যেমন 'আমি'র বোধ হয়, তেমনই 'তুমি' 'ও', 'তার'ও বোধ হয়। এই প্রকাশ কারোরই বিষয় নয়। আসলে এই প্রকাশ হল নির্গুণ ; কিন্তু ব্যক্তি-বিশেষে বিরাজ করায় (বৃত্তিগুলির সম্পর্কে) একে 'সাত্ত্বিক জ্ঞান' বলা হয়।

এই সাত্ত্বিক জ্ঞানকে অন্যভাবে বুঝতে হবে—'আমি', 'তুমি', 'সে', 'ও'—এই চারজনই কোনো এক প্রকাশ

দ্বারা প্রকাশিত। এই চারের মধ্যেই সমস্ত প্রাণী অন্তর্ভুক্ত, যা নানাভাগে বিভক্ত, কিন্তু এদের যিনি প্রকাশক, তিনি বিভাগরহিত।

বক্তাকে 'আমি', তার শ্রোতাকে 'তুমি', নিকটস্থকে 'ও', দূরবর্তীকে 'সে' বলা হয় অর্থাৎ বক্তা নিজেকে বলে, 'আমি', সামনে যে থাকে, তাকে বলে 'তুমি', সমীপস্থ ব্যক্তিকে বলে 'ও', আর দূরবর্তী মানুষকে বলে 'সে'। যে ব্যক্তি 'তুমি' হয়েছিল, সে যখন 'আমি' হয় তখন 'আমি' 'তুমি' হয়ে যায়, কিন্তু 'সে' এবং 'ও' একই থাকে। এইরূপই 'ও' যদি 'আমি' হয়, তখন 'তুমি' 'সে' হয়ে যায় এবং 'আমি' 'তুমি' হয়ে যায়। 'সে' পরোক্ষ হওয়ায় একই স্থানে থাকে। এখন 'সে' যদি 'আমি' হয় তাহলে তার কাছে 'আমি' এবং 'ও' সবই 'সে' হয়ে যায়[১]। এইভাবে 'আমি', 'তুমি', 'ও', 'সে' —এই চারজনই একে অপরের কাছে চারজনই হতে পারে।

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে 'আমি', 'তুমি', 'ও', 'সে'—এগুলি সবই পরিবর্তনশীল অর্থাৎ স্থায়ী নয়, বাস্তবিক নয়। যদি বাস্তবিক হত, তাহলে একই থাকত। বাস্তবিক হল সেই, যিনি এই সবের প্রকাশক ও আশ্রয়, যাঁর প্রকাশে 'আমি', 'তুমি', 'ও', 'সে' সকলে প্রকাশিত হচ্ছে। সেই প্রকাশে 'আমি', 'তুমি', 'ও', 'সে'—আলাদা আলাদা নয়, বরঞ্চ তাঁর হতেই এই চার অস্তিত্ববান হয়। নিজেদের মেনে নেওয়ার জন্য 'আমি', 'তুমি', 'ও', 'সে'—এগুলি সব বিভাগশীল প্রাণীদের স্বরূপ হয় আর যিনি প্রকৃত প্রকাশক তিনি বিভাগরহিত, একেই বলা হয় প্রকৃত 'সাত্ত্বিক জ্ঞান'।

বিভাগসম্পন্ন, পরিবর্তনশীল এবং বিনাশীল যত বস্তু আছে, এই জ্ঞান যে সবের প্রকাশক এবং স্বয়ং নির্মল ও বিকাররহিত—**'তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্'** (গীতা ১৪।৬)। তাই এই জ্ঞানকে **'সাত্ত্বিক জ্ঞান'** বলা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে এই 'সাত্ত্বিক জ্ঞান'-কে প্রকাশ্যের দৃষ্টি (সম্বন্ধ)-তে 'প্রকাশক' এবং বিভক্ত দৃষ্টিতে 'অবিভক্ত' বলা হয়। প্রকাশ্য এবং অবিভক্ত হলেও এটি আসলে নির্গুণ, নিরপেক্ষ ও বাস্তবিক জ্ঞান।

পরিশিষ্ট-ভাব—সাধারণ ব্যক্তি যেমন নিজ শরীরে নিজেকে ব্যাপকভাবে অবস্থিত বলে মনে করে, তেমনই সাধক জগতে পরমাত্মাই ব্যাপকভাবে আছেন বলে মনে করেন। যেমন শরীর ও জগৎ সংসার এক, তেমনই স্ব-স্বরূপ এবং পরমাত্মাও অভিন্ন।

সাধকের দৃষ্টিতে প্রাণীদেরও সত্তা থাকে, তাই একে 'সাত্ত্বিক জ্ঞান' (বিবেক) বলা হয়। যদি তাঁর দৃষ্টিতে প্রাণীদের পৃথক্ সত্তা না থাকে, শুধু অবিনাশী সত্তাই বিরাজমান প্রতীয়মান হয়, তাহলে তাকে গুণাতীত 'তত্ত্বজ্ঞানী' (ব্রহ্মপ্রাপ্ত) বলা হয়। এই অবিনাশী সত্তা সর্বত্র সমভাবে বিদ্যমান। এই সত্তার সঙ্গে আমাদের স্বাভাবিক ঐক্য রয়েছে।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—পরবর্তী শ্লোকে রাজসিক জ্ঞানের বর্ণনা করেছেন।

পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ২১ ॥

---

[১]উদাহরণ—রাম, শ্যাম, গোবিন্দ, গোপাল—চার ব্যক্তি। রাম ও শ্যাম পরস্পর মুখোমুখি, গোবিন্দ তাদের কাছে, গোপাল দূরে আছে। রাম নিজেকে বলে 'আমি', নিকটস্থ শ্যামকে বলে 'তুমি', গোবিন্দও কাছে থাকায় বলে 'ও' এবং দূরবর্তী গোপালকে বলে 'সে'। শ্যাম যদি নিজেকে 'আমি' বলে, রামকে বলবে 'তুমি', গোবিন্দকে 'ও' এবং গোপালকে 'সে'। এইরূপ গোবিন্দ নিজেকে যদি 'আমি' বলে, তবে সে শ্যামকে বলে 'ও', রামকে 'তুমি' বা শ্যামকে 'তুমি' এবং রামকে 'ও' বলে দূরবর্তী গোপালকে 'সে' বলে। যদি গোপাল নিজেকে 'আমি' বলে তাহলে সে রাম, শ্যাম ও গোবিন্দ তিনজনকেই 'তারা' বলবে। এইভাবে রাম, শ্যাম, গোবিন্দ, গোপাল—চারজনই একজন অপরের কাছে 'আমি', 'তুমি', 'ও', 'সে' হতে পারে।

[তু (কিন্তু) ; যৎ, জ্ঞানম্ (যে জ্ঞানের সাহায্যে) ; সর্বেষু, ভূতেষু (সমস্ত প্রাণীতে) ; পৃথক্ত্বেন, নানাভাবান্ (ভিন্ন ভিন্ন ভাবগুলিকে) ; পৃথগ্বিধান, বেত্তি (পৃথক্ পৃথক্ বলে মনে করে) ; তৎ, জ্ঞানম্ (সেই জ্ঞানকে) ; রাজস (রাজস জ্ঞান) ; বিদ্ধি (বলা হয়।)]

কিন্তু যে জ্ঞানের সাহায্যে মানুষ সমস্ত প্রাণীতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবগুলিকে পৃথক্ পৃথক্ বলে মনে করে, সেই জ্ঞানকে বলা হয় রাজস জ্ঞান ॥ ২১ ॥

ব্যাখ্যা—'পৃথক্ত্বেন তু[১] যজ্ জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্'—রাজস জ্ঞানে 'রাগের' (আসক্তির) প্রাধান্য থাকে— **'রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি'** (গীতা ১৪।৭)। রাগের নিয়ম হল এই যে এটি যার মধ্যে সঞ্চারিত হয়, তার কারও প্রতি আসক্তি, প্রিয়ভাব উৎপন্ন করিয়ে দেয় এবং কারও প্রতি দ্বেষভাব সৃষ্টি করে দেয়। এই রাগের (আসক্তির) জন্যই মানুষ, দেবতা, যক্ষ-রাক্ষস, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ-লতাদি যত চর ও অচর প্রাণী আছে, সেইসব প্রাণীর বিভিন্ন আকৃতি, স্বভাব, নাম, রূপ, গুণ ইত্যাদি ধরে রাজস জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ তাদের মধ্যে অবস্থিত এক অবিনাশী আত্মাকেই তত্ত্বতঃ ভিন্ন ভিন্ন বলে মনে করে।

'বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ্ জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্'—এইরূপ যে জ্ঞানের সাহায্যে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন শরীরে অন্তঃকরণ, স্বভাব, ইন্দ্রিয়াদি, প্রাণ ইত্যাদির সম্পর্কের প্রাণীদের পৃথক পৃথক বলে মনে করে, সেই জ্ঞানকে বলা হয় 'রাজস জ্ঞান'। রাজস-জ্ঞানে জড়-চেতনের বিবেক থাকে না।

পরিশিষ্ট-ভাব—ক্রিয়া এবং পদার্থ—উভয়কে সত্তা প্রদান করে, সেগুলির সঙ্গে আসক্তি সহকারে সম্পর্ক স্থাপন করার ফলেই সব পৃথক পৃথক রূপে পরিদৃষ্ট হয়।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—পরবর্তী শ্লোকে তামসিক জ্ঞান বর্ণনা করা হয়েছে।

যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তৎ তামসমুদাহৃতম্॥ ২২ ॥

[তু (কিন্তু) ; যৎ, একস্মিনকার্যে (যে জ্ঞান একটি শরীরেই) ; কৃৎস্নবৎ, সক্তম্ (সম্পূর্ণভাবে আসক্ত) ; চ, অহৈতুকম্ (এবং যুক্তিরহিত) ; অতত্ত্বার্থবৎ (প্রকৃত জ্ঞানের বিরোধী) ; অল্পম্ (তুচ্ছ) ; তৎ, তামসম্ (তাকে তামস জ্ঞান) ; উদাহৃতম্ (বলা হয়।)]

কিন্তু যে জ্ঞান একটি শরীরেই সম্পূর্ণভাবে আসক্ত এবং যা যুক্তিরহিত, প্রকৃত জ্ঞানের বিরোধী এবং তুচ্ছ, তা হল তামস (জ্ঞান)॥ ২২ ॥

ব্যাখ্যা—'যত্তু[২] কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্যে সক্তম্'—তামস ব্যক্তিগণ একটি শরীরেই সম্পূর্ণভাবে আসক্ত থাকে অর্থাৎ উৎপন্ন ও বিনাশশীল এই পাঞ্চভৌতিক শরীরকেই নিজ স্বরূপ বলে মনে করে। তারা মনে করে যে আমি শিশু ছিলাম, যুবক হয়েছি এবং আমিই বৃদ্ধ হব ; আমি ভোগী, বলবান এবং সুখী ; আমি ধনবান, আত্মীয় পরিজন পরিবৃত ; আমার সমান আর কে আছে ? মূঢ়তাবশতঃ এইরূপ মনে হয়—**'ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ'** (১৬।১৫)।

'অহৈতুকম্'—তামস ব্যক্তির ধারণা যুক্তি ও শাস্ত্র-প্রমাণের বিরুদ্ধ হয়। এই শরীর সর্বদাই পরিবর্তিত হয়, শরীরাদি বস্তুমাত্রই অ-ভাবের দিকে অগ্রসরমান, দৃশ্যমান বস্তু অদৃশ্য হয়ে যায় আর এর মধ্যে তুমি সর্বদাই একভাবে

[১]এখানে 'তু' পদটি সাত্ত্বিক জ্ঞানের থেকে রাজস জ্ঞানকে ভিন্ন জানাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

[২]এই শ্লোকে রাজস জ্ঞানের থেকে তামস জ্ঞানের পার্থক্য বোঝাতে 'তু' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

থাক ; তাহলে এই শরীর আর তুমি কী করে এক হও ? —এইরূপ যুক্তি এরা স্বীকার করে না।

'অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ'—এই 'শরীর' আর 'আমি' যে দুই পৃথক্ বিষয়—এই প্রকৃত জ্ঞান তাদের থাকে না। তাদের বুদ্ধি অত্যন্ত তুচ্ছ হয় অর্থাৎ তা শুধু তুচ্ছতা প্রাপ্তি করায়। তাই একে ভগবান 'জ্ঞান' বলে উল্লেখ করেননি। কারণ তামস ব্যক্তিদের মধ্যে মূঢ়তার প্রাধান্য দেখা যায়। মূঢ়তা ও জ্ঞানের মধ্যে বিরোধ থাকে। তাই ভগবান 'জ্ঞান' পদটি ব্যবহার না করে 'যৎ' এবং 'তৎ' পদের দ্বারাই বুঝিয়েছেন।

'তৎ তামসমুদাহৃতম্'—যুক্তিবর্জিত, অল্প এবং অত্যন্ত তুচ্ছ বুদ্ধিকে (জানাকে) গুরুত্ব দেওয়াকে 'তামস' বলা হয়েছে।

যখন তামস-বোধ 'জ্ঞান'ই নয় এবং ভগবানও একে 'জ্ঞান' বলতে সংকোচ বোধ করেছেন, তখন তিনি এর বর্ণনা কেন করেছেন ? কারণ ভগবান উনিশতম শ্লোকে জ্ঞানের ত্রিবিধ বিভাগ সম্বন্ধে জানানোর উপক্রম করেছেন, তাই সাত্ত্বিক ও রাজস-জ্ঞানের বর্ণনা করার পর তামস সম্বন্ধে জানাবারও প্রয়োজন ছিল।

পরিশিষ্ট-ভাব—তামস জ্ঞানে আসুরী-সম্পদ বিশেষভাবে থাকে। এই শ্লোকটিতে 'জ্ঞান' শব্দ ব্যবহার না করার অর্থ হল যে এটি প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান নয়, বরং তা অজ্ঞানেরই নামান্তর। এটি তামসিক মানুষদের বুদ্ধি, যাকে 'পশুবুদ্ধি' বলা হয়—

ত্বং তু রাজন্ মরিষ্যেতি পশুবুদ্ধিমিমাং জহি।
ন জাতঃ প্রাগ্‌ভূতোঽদ্য দেহবত্ত্বং ন নঙ্‌ক্ষ্যসি॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ১২।৫।২)

(শ্রীশুকদেব বলেন—) 'হে রাজন্! তুমি যে এবার মৃত্যুমুখে পতিত হবে, সেই পশুবুদ্ধি পরিত্যাগ করো। দেহ যেমন পূর্বে ছিল না, পরে জন্মগ্রহণ করেছে এবং পুনরায় তা নাশ হবে, তেমনই তুমি আগে ছিলে না, পরে জন্মেছ এবং অবশেষে মারা যাবে—তা ঠিক নয়।'

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—পরবর্তী শ্লোকে সাত্ত্বিক কর্মের বর্ণনা করেছেন।

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে॥ ২৩ ॥

[যৎ, কর্ম (যে কর্ম) ; নিয়তম্ (শাস্ত্রবিধিদ্বারা কর্তব্য বলে নির্দিষ্ট) ; সঙ্গরহিতম্ (কর্তৃত্বাভিমান রহিত) ; অফলপ্রেপ্সুনা (ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত ব্যক্তি) ; অরাগদ্বেষতঃ, কৃতম্ (রাগ-দ্বেষ বর্জন করে করলে) ; তৎ, সাত্ত্বিকম্, উচ্যতে (তাকে সাত্ত্বিক কর্ম বলা হয়।)]

যে কর্ম শাস্ত্রবিধি দ্বারা অবশ্য-কর্তব্য বলে নির্দিষ্ট, সেগুলি কর্তৃত্বাভিমান রহিত ও ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জিত মানুষ রাগ-দ্বেষ বর্জন করে করলে, তাকে বলা হয় সাত্ত্বিক কর্ম॥ ২৩ ॥

ব্যাখ্যা—'নিয়তং সঙ্গরহিতম্ ..... সাত্ত্বিকমুচ্যতে' —বর্ণ ও আশ্রম অনুযায়ী যে ব্যক্তির জন্য যে পরিস্থিতিতে ও সময়ে শাস্ত্রে যেমনভাবে কর্ম করতে বলা হয়েছে, তার পক্ষে সেটিই 'অবশ্য কর্তব্য-কর্ম' হয়।

এখানে 'নিয়তম্' পদটির দ্বারা প্রথমতঃ কর্মের স্বরূপ জানানো হয়েছে এবং দ্বিতীয়তঃ শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম করতে নিষেধ করা হয়েছে।

'সঙ্গরহিতম্' পদটির অর্থ হল এই যে সেই অবশ্য কর্তব্য-কর্ম কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করে করণীয়। কর্তৃত্বাভিমান রহিত হওয়ার অর্থ হল এই যে যেমন বৃক্ষাদির মধ্যে মূঢ়তা থাকায় তাদের মধ্যে কর্তৃত্বের অবকাশ নেই কিন্তু ঋতুবদল হলে পাতা ঝরে যাওয়া, নতুন পাতার উদ্‌গম হওয়া, ডাল কাটলে সেই ক্ষত শুকিয়ে যাওয়া, শাখা-প্রশাখা বৃদ্ধি পাওয়া, ফল-ফুল হওয়া ইত্যাদি ক্রিয়াগুলি সমষ্টি শক্তির দ্বারা আপনিই হয়ে থাকে ; তেমনই অন্যান্য হ্রাস-বৃদ্ধি, খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরা

ইত্যাদি সকল ক্রিয়াই সেই সমষ্টি শক্তির সাহায্যে আপনিই হয়ে থাকে। এই ক্রিয়াগুলির সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই, আগেও ছিল না, পরেও থাকবে না। সাধক যখন এটি প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করেন, তখন আর তাঁর মধ্যে কোনো কর্তৃত্ববোধ থাকে না। কর্তৃত্ববোধ না থাকায় তিনি যেসব কর্ম করেন, সেগুলি সঙ্গরহিত অর্থাৎ কর্তৃত্বাভিমান বর্জিত হয়।

এইস্থানে সাংখ্য-প্রকরণে কর্তৃত্ব পরিত্যাগ প্রধান লক্ষ্য হওয়ায় এবং পরে **'অরাগদ্বেষতঃ কৃতম্'** পদেও আসক্তি ত্যাগ করার কথা হওয়ায় এখানে **'সঙ্গরহিতম্'** পদের অর্থ হিসাবে অহং-কর্তৃত্ব রহিত বলা হয়েছে[১]।

'অরাগদ্বেষতঃ কৃতম্' পদটির তাৎপর্য হল এই যে রাগ-দ্বেষ রহিত হয়ে কর্ম করা উচিত অর্থাৎ রাগপূর্বক কর্ম গ্রহণ না করা এবং কর্ম ত্যাগও দ্বেষপূর্বক যেন না হয় আর কর্ম করার যতপ্রকার সাধন (শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, অন্তকরণ ইত্যাদি) আছে, সে সবেও যেন রাগ বা দ্বেষ না থাকে।

'অরাগদ্বেষতঃ' পদে বর্তমানে রাগের (আসক্তির) অভাবের কথা বলা হয়েছে এবং **'অফলপ্রেপ্‌সুনা'** পদের দ্বারা ভবিষ্যতে রাগের অভাবের কথা বলা হয়েছে। তাৎপর্য হল এই যে ভবিষ্যতে লভ্য ফলেচ্ছারহিত হয়ে কর্ম করা উচিত অর্থাৎ ক্রিয়া এবং পদার্থে নির্লিপ্ত থেকে আসক্তিবিহীন হয়ে কর্ম করলে, সেই কর্মকে সাত্ত্বিক কর্ম বলা হয়।

সাত্ত্বিক কর্মে ততক্ষণই সাত্ত্বিকতা থাকে যতক্ষণ অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবেও প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক থাকে। প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণরূপে সম্বন্ধ ছেদ হলে, তখন এই কর্মগুলি 'অকর্ম' হয়ে যায়।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—পরবর্তী শ্লোকে রাজস কর্মের বর্ণনা করা হয়েছে।

যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্॥ ২৪ ॥

[তু (কিন্তু) ; **যৎ, কর্ম** (যে কর্ম) ; **কামেপ্সুনা,** বা (ভোগাকাঙ্ক্ষায়) ; **সাহংকারেণ, পুনঃ** (অহংকার সহকারে) ; **বহুলায়াসম্** (অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে) ; **ক্রিয়তে** (করে থাকে) ; **তৎ, রাজসম্** (তাকে রাজসকর্ম) ; **উদাহৃতম্** (বলা হয়।)]

কিন্তু যে কর্ম ভোগাকাঙ্ক্ষী মানুষ অহংকার সহকারে অত্যন্ত পরিশ্রম স্বীকার করে থাকে, তাকে বলা হয় রাজস কর্ম ॥ ২৪ ॥

ব্যাখ্যা—'যত্তু[২] কামেপ্সুনা কর্ম'—আমরা যদি কর্ম করি তাহলে আমাদের বস্তু লাভ হবে, সুখ-আরাম লাভ হবে, ভোগ প্রাপ্তি হবে, মান-সম্মান-যশ লাভ হবে এই চিন্তায় ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি দ্বারা কর্ম করা হয়।

'সাহঙ্কারেণ'—লোক-দেখানোর ভাব নিয়ে কর্ম করলে তা দেখে লোকে বাহবা দেয় তাতে অহংকার জন্মায়। আর যেখানে দেখার কেউ থাকে না সেখানে (একান্তে) কর্ম করলে নিজের মধ্যে বিশেষত্ব দেখে অহংভাব আসে ; যেমন—অন্য লোকেরা আমার মতো সুচারুভাবে সমস্ত কাজ করতে পারে না ; আমার মধ্যে কাজ করার যে যোগ্যতা, বিদ্যা চাতুর্য আছে, তা সকল লোকের মধ্যে থাকে না ; আমি যে কাজই করি না কেন, তা অত্যন্ত

[১]এখানে সন্ন্যাসে (সাংখ্যযোগে) 'সঙ্গরহিতম্' পদ দ্বারা কর্তৃত্বাভিমান রহিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে এবং ত্যাগে (কর্মযোগে) 'সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চৈব' (১৮।৯) পদ দ্বারা আসক্তি ও ফলেচ্ছা রহিত হবার কথা বলা হয়েছে। এর তাৎপর্য হল এই যে সাংখ্যযোগীর মধ্যে যদি একটুও অহং-ভাব থাকে, তাহলে তার শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় থাকে, যা তত্ত্বপ্রাপ্তির পথে বাধাস্বরূপ ; কিন্তু কর্মযোগীর মধ্যে যদি অল্প অহংভাব থাকেও, তবে তা সাংখ্যযোগীর মতো তত বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। কারণ (নিজের জন্য কোনো কর্ম না করায়) কর্মযোগীর কর্তৃত্বাভিমান শুধুমাত্র কর্তব্য পালনের জন্যই হয়ে থাকে অর্থাৎ তিনি যখন যে কাজ করেন, সেইসময় তাতে তাৎক্ষণিক কর্তৃত্বাভিমান থাকে। কার্য শেষ হলে সেই কর্তৃত্বাভিমান, সেই কর্মেই বিলীন হয়ে যায়।

[২]সাত্ত্বিক কর্ম থেকে রাজস কর্ম যে ভিন্ন, তা জানাবার জন্য এখানে 'তু' পদটি প্রয়োগ করা হয়েছে।

বিশ্বস্ততার সঙ্গে এবং তাড়াতাড়ি করি, ইত্যাদি। এইরূপ অহংকারপূর্বক যে কর্ম করা হয়, তাকে বলে রাজস কর্ম।

'বা পুনঃ'—ভবিষ্যতে ফললাভের আশায় যদি কর্ম করা হয় অথবা বর্তমানে নিজ বিশেষত্ব দেখাবার জন্য অহংকারবশতঃ যদি কোনো কর্ম করা হয়—তবে এই দুটিতে একই ভাব থাকায় তা রাজস কর্ম হয়। সেই কথা জানাবার জন্যই এখানে **'বা পুনঃ'** পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। তাৎপর্য হল এই যে ফলেচ্ছা এবং অহংকার—এর মধ্যে যে কোনো একটি ভাব হলেই যখন রাজস কর্ম হয়, তাহলে দুটি ভাব থাকলে তা তো কথাই নেই।

'ক্রিয়তে বহুলায়াসম্'—কর্ম করলে প্রত্যেক ব্যক্তিরই কায়িক শ্রম হয়, কিন্তু যেসব ব্যক্তির প্রধান লক্ষ্য হল দৈহিক সুখ ও আরাম, তাদের কর্ম করতে বেশি পরিশ্রম অনুভূত হয়।

যেসব ব্যক্তির কর্মফলের আকাঙ্ক্ষার প্রাধান্য থাকে কিন্তু শারীরিক সুখ-আরামের আকাঙ্ক্ষা থাকে না, কর্ম করলেও তাদের পরিশ্রমকে বেশি বলে মনে হয় না। কারণ অন্তরে ভোগ এবং সম্পদ-সংগ্রহের তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকায় তাদের বৃত্তি কামনা পূর্তির জন্যই ব্যাপৃত থাকে ; শরীরের দিকে নয়। তাৎপর্য হল, এই দেহের সুখ-আরামের প্রাধান্য থাকলে ফলেচ্ছা দমিত হয় আবার ফলেচ্ছা প্রাধান্য পেলে সুখ-আরাম দমিত থাকে।

লোকেদের সামনে কর্ম করার সময় অহংকারজনিত সুখপ্রাপ্তি হওয়ায় এবং সুখ ও আরামের প্রাধান্য না থাকায় রাজস ব্যক্তিদের কর্ম করায় পরিশ্রম বোধ হয় না। কিন্তু একান্তে কর্ম করার সময় অহংকারজনিত সুখপ্রাপ্তি না হওয়ায় এবং দৈহিক সুখ-আরামের প্রাধান্য থাকায় রাজস ব্যক্তিদের কর্মে পরিশ্রম বেশি বলে বোধ হয়।

'তদ্রাজসমুদাহৃতম্'—এরূপ ফলাকাঙ্ক্ষী মানুষ অহংকার এবং পরিশ্রম সহকারে যে কর্ম করে থাকেন, তাকে বলা হয় রাজস কর্ম।

পরিশিষ্ট-ভাব—রাজসিক ব্যক্তিগণ তাঁদের প্রয়োজনীয়তা আবশ্যকের বেশি বাড়িয়ে তোলেন, যার জন্য প্রতিটি কাজে তাঁদের অধিক বস্তুর প্রয়োজন হয়। অধিক বস্তু সংগ্রহ করতে অধিক পরিশ্রম করতে হয়। রাজসিক ব্যক্তি কর্মের পরিধি খুব বিস্তৃত করেন, এতেও তাঁর পরিশ্রম বেশি হয়। শরীরের প্রতি আসক্তি থাকায় রাজসিক ব্যক্তি শারীরিক আরামের কামনা করতে থাকেন, যার জন্য অল্প কাজ করলেও তাঁর মনে হয় তিনি বেশি কাজ করেছেন।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—এর পর তামস কর্মের বর্ণনা করছেন।

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনবেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে॥ ২৫ ॥

[**যৎ, কর্ম** (যেসব কর্ম) ; **অনুবন্ধম্, ক্ষয়ম্** (পরিণাম, হানি) ; **হিংসাম্, চ, পৌরুষম্** (হিংসা এবং সামর্থ্য) ; **অনবেক্ষ্য, মোহাৎ** (বিচার না করে মোহবশতঃ) ; **আরভ্য তে** (আরম্ভ করা হয়) ; **তৎ, তামসম্, উচ্যতে** (তাকে বলা হয় তামস কর্ম।)]

যেসব কর্ম পরিণাম, হানি, হিংসা এবং সামর্থ্য বিচার না করে মোহবশতঃ আরম্ভ করা হয়, তাকে বলা হয় তামস কর্ম ॥ ২৫ ॥

ব্যাখ্যা—'অনুবন্ধম্'—যাদের ফলের কামনা থাকে, তারা ফলপ্রাপ্তির আশায় বিচার-বিবেচনা করে কর্ম করে ; কিন্তু তামস ব্যক্তি মূঢ়তাবশতঃ কর্মের প্রারম্ভ কালে কোনো চিন্তাই করে না। এই কার্য করলে আমার বা অন্য প্রাণীর এখন বা পরিণামে কত ক্ষতি হবে, কত অহিত হতে পারে—এই অনুবন্ধ অর্থাৎ পরিণাম বিবেচনা না করে তারা কার্য করতে আরম্ভ করে।

'ক্ষয়ম্'—এই কার্যটি করলে নিজের ও অপরের শরীরের কী ক্ষতি হবে ? অর্থ ও সময় কত নষ্ট হবে ? এজন্য জগতে আমার কত অপমান, নিন্দা, বদনাম হবে ; আমার ইহজন্ম-পরজন্ম নষ্ট হবে কিনা ইত্যাদি ক্ষতির কথা চিন্তা না করে তারা কার্য আরম্ভ

করে দেয়।

'হিংসাম্'—এই কর্মের দ্বারা কত জীবহত্যা হবে ; কত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সিদ্ধান্ত ও স্বীকৃতি বিনষ্ট হবে ; অপর ব্যক্তির মনুষ্যত্বের কত ক্ষতি করা হবে ; এখন এবং ভবিষ্যতের জীবেদের শুদ্ধ-ভাব, আচরণ, বেশ-ভূষা, আহার-বিহার ইত্যাদির কত ক্ষতি হবে ; এর ফলে আমার এবং দেশের কত অধঃপতন হবে ইত্যাদি হিংসার কথা না ভেবেই তারা কার্য আরম্ভ করে।

'অনবেক্ষ্য চ পৌরুষম্'—এই কাজটি করার আমার কতটা যোগ্যতা আছে, কীরূপ শক্তি ও সামর্থ্য আছে, আমার কতটা সময় আছে, কীরূপ বুদ্ধি, পারদর্শিতা ও স্থান আছে—এরূপ নিজ পৌরুষ না দেখেই তারা কার্য আরম্ভ করে।

'মোহাদারভ্যতে কর্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে'—তামস ব্যক্তি কর্ম করার সময় তার পরিণাম, তার থেকে হওয়া ক্ষতি, হিংসা এবং নিজ সামর্থ্য—কোনো কিছু চিন্তা না করে, মনে যখন যেমন ভাব উদিত হয় সেইরূপ কাজ করে বসে, এইরূপ কর্মকে বলা হয় তামস কর্ম।

পরিশিষ্ট-ভাব—তামসিক ব্যক্তিগণ নিজের শক্তি, পরিণাম ইত্যাদি বিচার না করে মূঢ়তাবশে কাজ করে[১]। তারা স্বভাবতঃ যে কর্ম করে, তাতে অন্যের প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় ; যেমন—পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে কথা বলা, পথের মাঝখানে সাইকেল দাঁড় করানো ইত্যাদি। অন্যের অসুবিধার প্রতি তাদের কোনো খেয়ালই থাকে না।

সাত্ত্বিকের স্বভাব হল স্বতঃই উন্নত হওয়া, রাজসিক স্বভাবে উন্নতি বাধা পায় এবং তামসিকের স্বভাব স্বতঃ পতনমুখী হয়।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—ভগবান এবার সাত্ত্বিক পুরুষের লক্ষণ জানাচ্ছেন।

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে।। ২৬ ।।

[**মুক্তসঙ্গঃ** (আসক্তিবর্জিত) ; **অনহংবাদী** (অহংকর্তৃত্বরহিত) ; **ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ** (ধৈর্য ও উৎসাহযুক্ত); **সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ** (সিদ্ধি অসিদ্ধিতে নির্বিকারচিত্ত) ; **কর্তা** (কর্তা) ; **সাত্ত্বিকঃ, উচ্যতে** (সাত্ত্বিক বলে কথিত হন।)]

আসক্তিবর্জিত, অহং-কর্তৃত্ব রহিত, ধৈর্য ও উৎসাহযুক্ত, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্বিকার চিত্ত কর্তা সাত্ত্বিক বলে কথিত হন।। ২৬ ।।

ব্যাখ্যা—'মুক্তসঙ্গঃ'—সাংখ্যযোগীর যেমন কর্মের প্রতি কোনো আসক্তি থাকে না, সাত্ত্বিক কর্তাও সেইরূপ আসক্তিবর্জিত হন।

কামনা, বাসনা, আসক্তি, স্পৃহা, মমতা ইত্যাদিতে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করার জন্যই বস্তু, ব্যক্তি, পদার্থ, পরিস্থিতি, ঘটনা ইত্যাদিতে আসক্তি ও লিপ্ততা হয়। সাত্ত্বিক ব্যক্তি এইসব লিপ্ততা থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হন।

'অনহংবাদী'—পদার্থ, বস্তু, পরিস্থিতি ইত্যাদি নিয়ে নিজের মধ্যে যে বিশেষত্ব মনে হয় এটি হল অহংবদনশীলতা। এটি আসুরী-সম্পদ হওয়ায় অত্যন্ত নিকৃষ্ট। সাত্ত্বিক ব্যক্তির মধ্যে এই কর্তৃত্বাভিমান তো থাকেই না, বরং 'আমি ত্যাগী', 'আমার মধ্যে এই অহংকার নেই', 'আমি নির্বিকার', 'আমি সম', 'আমি সর্বতোভাবে নিষ্কাম', 'আমি সাংসারিক-সম্পর্ক-রহিত'—এইরূপ অহংভাবও তাঁর মধ্যে থাকে না।

'ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ'—কর্তব্য-কর্ম করতে গিয়ে যদি বাধা-বিঘ্ন আসে, সেই কর্মের ফল যদি আশানুরূপ না হয়, তাহলে বাধা-বিঘ্ন না হলে যেমন ধৈর্য থাকে, বাধা-বিঘ্ন এলেও সেরূপ ধৈর্য বজায় থাকে—একেই বলা হয় 'ধৃতি'। আর যখন সাফল্যের পর সাফল্য আসে, উন্নতি হতে থাকে, লোকের মধ্যে মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পায়—এরূপ

[১]বিনা বিচারে জো করৈ, সো পাছে পছিতায়। কাম বিগারৈ আপনো, জগ মেঁ হোত হঁসায়।।
জগ মে হোত হঁসায়, চিত্ত মেঁ চৈন ন পাবৈ। খান পান সনমান, রাজ-রঙ্গ মন নহিঁ ভাবৈ।।
কহ গিরিধর কবিরায় করমগতি টরত ন টারে। খটকত হৈ জিয় মাহিঁ কিয়ৌ জো বিনা বিচারে।।

অবস্থায় মানুষের মনে যে প্রত্যাশা থাকে, সাফল্যের জন্য যে উৎসাহ থাকে, তেমনই আশার বিপরীত নৈরাশ্য, অসাফল্য, অবনতি, নিন্দা প্রভৃতি হলেও যদি ধৃতি বজায় থাকে—তাকেই বলা হয় 'উৎসাহ'। সাত্ত্বিক ব্যক্তি এইরূপ ধৃতি ও উৎসাহ-যুক্ত হন।

'সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ'—সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে নিজের মধ্যে যদি কোনো বিকার না আসে, কোনো প্রভাব না পড়ে অর্থাৎ কার্যাদি সর্বাঙ্গীণরূপে যদি করা হয় অথবা নিজ শক্তি, সামর্থ্য, বুদ্ধি সম্পূর্ণ নিয়োগ করেও কার্য সম্পন্ন না হয় ; ফলপ্রাপ্তি হোক বা না হোক, উভয় ক্ষেত্রেই নিজ চিত্তে প্রসন্নতা বা বিষণ্ণতা, হর্ষ-শোক ইত্যাদি না হওয়াকেই সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে নির্বিকার থাকা বলে।

'কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে'—এরূপ আসক্তি ও অহংকার-বর্জিত, ধৈর্য এবং উৎসাহযুক্ত, সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে নির্বিকার ব্যক্তিকে 'সাত্ত্বিক' বলা হয়।

এই শ্লোকে ছ'টি বিষয় বলা হয়েছে—আসক্তি, অহংবদনশীলতা, ধৃতি (ধৈর্য), উৎসাহ, সিদ্ধি এবং অসিদ্ধি। এর মধ্যে প্রথম দুটি বিষয়ে রহিত, মধ্যের দুটি বিষয়ে যুক্ত এবং শেষ দুটি বিষয়ে নির্বিকার থাকতে বলা হয়েছে।

পরিশিষ্ট-ভাব—সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে নির্বিকার, সমভাবে থাকার কথা গীতায় তিনবার উদ্ধৃত হয়েছে—**'সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সম ভূত্বা'** (২।৪৮), **'সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ'** (৪।২২) আর এইস্থানে **'সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ'**। তাৎপর্য হল যে সিদ্ধি-অসিদ্ধি নিজের আয়ত্তের মধ্যে নয়, কিন্তু এতে নির্বিকার থাকা নিজের আয়ত্তের মধ্যে। যা আয়ত্তের মধ্যে, তা সিদ্ধ করা সম্ভব।

'অনহংবাদী'—সাত্ত্বিক মানুষ কখনো মুখে বা অন্তরে বলেন না যে 'আমি যেমন করি, তেমন আর কেউ করতে পারে না।' নিজের মধ্যে কোনো বৈশিষ্ট্য অনুভব করাই হল অন্তর থেকে বলা।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—এবার রাজস কর্তার লক্ষণ বলা হয়েছে।

রাগী কর্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ॥ ২৭ ॥

[**কর্তা, রাগী** (যে কর্তা বিষয়ানুরাগী) ; **কর্মফলপ্রেপ্সু** (কর্মফলাকাঙ্ক্ষী) ; **লুব্ধঃ, হিংসাত্মকঃ** (লোভী, হিংসাপরায়ণ) ; **অশুচিঃ** (শুচিতাহীন) ; **হর্ষশোকান্বিতঃ** (হর্ষ-শোকযুক্ত) ; **রাজসঃ, পরিকীর্তিতঃ** (বলা হয় রাজস।)]

যিনি বিষয়ানুরাগী, কর্মফলাকাঙ্ক্ষী, লোভী, হিংসাপরায়ণ, শুচিতাহীন (শৌচাচারহীন) এবং হর্ষ-শোকযুক্ত, সেই কর্তাকে বলা হয় রাজস ॥ ২৭ ॥

ব্যাখ্যা—**'রাগী'**—রাগের স্বরূপ রজোগুণ হওয়ায় ভগবান রাজস ব্যক্তির লক্ষণে সর্বপ্রথমেই 'রাগী' (আসক্তিযুক্ত) পদটি ব্যবহার করেছেন। রাগের অর্থ হল—কর্মে, কর্মফলে ও বস্তু, পদার্থ ইত্যাদিতে মন আকর্ষিত হওয়া, মনের প্রিয়ভাব হওয়া। যাঁর ওপর এইসব বস্তু মোহ বিস্তার করে, তাঁকে বলা হয় 'রাগী'।

'কর্মফলপ্রেপ্সু'—রাজস ব্যক্তি যদি কোনো কাজ করেন তাহলে তিনি সেটি করেন কোনো ফলেরই আকাঙ্ক্ষায় ; যেমন—আমি যেসব অনুষ্ঠান করছি, দান করছি, তার জন্য ইহজন্মে অর্থ-যশ-মান-সম্মান পাব এবং পরলোকে স্বর্গভোগ ও সুখলাভ করব ; আমি এমন সব ওষুধ গ্রহণ করছি, যার ফলে আমার শরীর নীরোগ থাকবে ইত্যাদি।

'লুব্ধঃ'—রাজস ব্যক্তি যা কিছু যতই পান না কেন, কিছুতেই তিনি সন্তুষ্ট হন না, বরং **'জিমি প্রতিলাভ লোভ অধিকাঈ'**-এর ন্যায় 'আরও যেন পাই', 'আরও যেন পাই' অর্থাৎ মান-মর্যাদা-প্রতিষ্ঠা আরও যেন বৃদ্ধি পায় ; অর্থ-পুত্র-পরিবার ইত্যাদি আরও বাড়তে থাকুক—এইরূপ আশা, লোভ লেগেই থাকে।

'হিংসাত্মকঃ'—তারা হিংসাপরায়ণ হয়। নিজের স্বার্থের জন্য অন্যের ক্ষতি করতে, অপরকে দুঃখ দিতে তারা পরোয়া করে না। তারা অর্থ সংগ্রহ করে এমনভাবে ভোগ করতে থাকে, যে অন্য অভাবগ্রস্ত লোকের অন্তরে জ্বালার সৃষ্টি হয়। এরূপ অন্যের দুঃখকে গ্রাহ্য না করে

ভোগ করা একপ্রকারের হিংসা করা হয়।

তামস কর্ম (১৮।২৫) এবং তামস কর্তা—উভয়ের মধ্যে হিংসার কথা বলার অর্থ হল এই যে মূঢ়তার জন্য তামস ব্যক্তিদের ক্রিয়া বিচার-বুদ্ধিপূর্বক হয় না ; তাই চলা-ফেরা, ওঠা-বসা ইত্যাদিতে তাদের হিংসাভাব হয়। রাজস ব্যক্তি নিজ সুখের জন্য উত্তম-উত্তম ভোগ করে থাকেন আর তাঁকে দেখে যারা এই ভোগ করতে পারে না, তাদের অন্তরে জ্বালা সৃষ্টি হয়, এই হিংসা সেই ভোগে যারা আসক্ত তাদের স্পর্শ করে। কারণ কোনো ভোগই হিংসা ছাড়া হয় না। তাৎপর্য হল এই যে তামস ব্যক্তির কর্মে হিংসা হয় আর রাজস ব্যক্তি স্বয়ং হিংসাত্মক হয়।

'অশুচিঃ'—রাগী (ফলাকাঙ্ক্ষী) ব্যক্তি ভোগবুদ্ধিতে যেসব বস্তু, পদার্থ সংগ্রহ করেন, সে-সব বস্তু অপবিত্র হয়ে ওঠে। তিনি যেস্থানে থাকেন, সেখানকার বায়ুমণ্ডল অপবিত্র হয়ে যায়। যে কাপড় পরিধান করেন, তাও অপবিত্র হয়ে ওঠে। সেইজন্যই আসক্তি ও মমত্ববোধ-সম্পন্ন মানুষ মারা গেলে কেউ তার কাপড় প্রভৃতি বস্তু নিতে চায় না। যেস্থানে তার শবদাহ হয়, সেখানে ধ্যান-ভজনে মন বসে না। কেউ ভুলবশতঃ সেইস্থানে নিদ্রা গেলে, দুঃস্বপ্ন দেখে। তাৎপর্য হল এই যে উৎপত্তি-বিনাশশীল বস্তুতে আকৃষ্ট হলেই আসক্তি ও মমত্বরূপ মালিন্য আসে, যার ফলে মানুষের শরীর এবং অস্থি-মজ্জা পর্যন্তও অপবিত্র হয়ে যায়।

'হর্ষশোকান্বিতঃ'—সারাদিনে তাঁর বহুবার সফলতা-বিফলতা, অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতি, ঘটনা আসতে থাকে আর সেইজন্য তিনি সেইসবে হর্ষ-শোক, রাগ-দ্বেষ, দুঃখ-শোকাদিতে পীড়িত হতে থাকেন।

'কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ'—উপরিউক্ত লক্ষণ-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের 'রাজস' বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট-ভাব—'হিংসাত্মকঃ'—এর আগে তামসকর্মেও হিংসার কথা বলা হয়েছে (১৮।২৫), কারণ রজোগুণ এবং তমোগুণ—দুই-ই খুব নিকটস্থ , কিন্তু সত্ত্বগুণ এই দুইয়ের থেকে দূরবর্তী । রজোগুণ বিষয়াসক্ত হয় আর তমোগুণ হয় মোহাসক্ত। রজোগুণে যদিও চৈতন্য ও সতর্কভাব থাকে কিন্তু তমোগুণে থাকে শুধুই অ-চৈতন্য ও অসতর্ক ভাব। আসক্তি ও স্বার্থবুদ্ধি থাকলে হিংসা যত সংঘটিত হয়, মোহ হলে তত হয় না। তাই রজোগুণে হিংসা অধিক হয়ে থাকে। রাজস ব্যক্তি আসক্তি ও স্বার্থবুদ্ধিবশতঃ 'হিংসাত্মক' হয়ে ওঠে। সে হিংসায় অন্ধ হয়ে ওঠে।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—পরবর্তী শ্লোকে তামস ব্যক্তির লক্ষণ বলা হয়েছে।

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠোঽনৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে॥ ২৮ ॥

[**কর্তা, অযুক্ত** (যে কর্তা অসতর্ক) ; **প্রাকৃতঃ, স্তব্ধঃ, শঠঃ** (অভদ্র, অনম্র, জেদী) ; **অনৈষ্কৃতিকঃ** (উপকারী ব্যক্তির অপকার সাধনকারী) ; **অলসঃ, বিষাদী, চ** (অলস, অবসন্নচিত্ত এবং) ; **দীর্ঘসূত্রী** (দীর্ঘসূত্রী) ; **তামসঃ** (তামস) ; **উচ্যতে** (বলা হয়।)]

যে কর্তা অসতর্ক, অভদ্র (অমার্জিত), অনম্র, জেদী, উপকারী ব্যক্তির অপকার-সাধনকারী, অলস, অবসন্নচিত্ত এবং দীর্ঘসূত্রী, তাকে 'তামস' বলা হয় ॥ ২৮ ॥

ব্যাখ্যা—'অযুক্তঃ'—তমোগুণ মানুষকে নির্বুদ্ধি করে (গীতা ১৪।৮)। সেইজন্য কখন কী কাজ করা উচিত, কীভাবে কাজ করলে আমাদের লাভ হয় আর কীসে ক্ষতি হয়—এই ব্যাপারে তামস ব্যক্তি সতর্ক থাকে না অর্থাৎ সে কর্তব্য-অকর্তব্য বিষয় নিরূপণ করতে পারে না। তাই তাকে বলা হয়েছে 'অযুক্ত' অর্থাৎ অসতর্ক।

'প্রাকৃতঃ'—যেসব ব্যক্তি শাস্ত্র, সৎসঙ্গ, সুশিক্ষা, উপদেশ ইত্যাদির দ্বারা নিজ জীবন সুগঠিত করেনি অথবা নিজ জীবন সম্বন্ধে কোনো চিন্তা করেনি, যেমন জন্মলাভ করেছে—তেমনই অসংস্কৃত, কর্তব্য-অকর্তব্য শিক্ষারহিত অবস্থায় থাকে, তাদের 'প্রাকৃত' বা অশিক্ষিত, অভদ্র বলা হয়।

'স্তব্ধঃ'—তমোগুণের প্রাধান্য থাকায় তার মন, বাক্য এবং শরীর উদ্ধত হয়। সেইজন্য সে নিজ বর্ণ-আশ্রমের বয়োবৃদ্ধ, বাবা-মা, গুরু-আচার্য কারও কাছেই কখনো নত হয় না। সে কায়মনোবাক্যে কখনো সরল ও নম্র ব্যবহার

করে না, বরং কঠোর ব্যবহার করে। এরূপ ব্যক্তিকে 'স্তব্ধ' বা উদ্ধত, অনম্র বলা হয়।

'শঠঃ'—তামস ব্যক্তি অত্যন্ত জেদী হওয়ায় অন্যের প্রদত্ত সুশিক্ষা, সুচিন্তিত মতামত গ্রহণ করে না। মূর্খতাবশতঃ সে তার নিজের সিদ্ধান্তই সঠিক বলে মনে করে। সেজন্য তাকে 'শঠ' বা জেদী বলা হয়[১]।

'অনৈষ্কৃতিকঃ'—যার থেকে কোনো উপকার লাভ করেছে তাকে প্রত্যুপকার করা যাদের স্বভাব, তাদের বলা হয় 'নৈষ্কৃতিক'। কিন্তু তামস ব্যক্তি অন্যের কাছ থেকে উপকৃত হয়েও তাদের উপকার করে না, বরং অপকার করে থাকে, তাই তাদের বলা হয় 'অনৈষ্কৃতিক'।

'অলসঃ'—বর্ণাশ্রম অনুসারে কর্তব্য-কর্ম প্রাপ্ত হলেও মূঢ়তাবশে তামস ব্যক্তির সেই কাজ ভালো লাগে না বরং নিরর্থক চিন্তা অথবা শুয়ে থাকতেই ভালো লাগে। সেইজন্য তাকে অলস বলা হয়েছে।

'বিষাদী'—যদিও তামস ব্যক্তিরা কোন্‌টা কর্তব্য কোন্‌টা অকর্তব্য তা চিন্তা করে না বা নিদ্রা, আলস্য, প্রমাদে তাদের শক্তি, জীবনের অমূল্য সময় কতটা নষ্ট হচ্ছে তাও দেখে না, তবুও সুপথ থেকে এবং কর্তব্য থেকে দূরে থাকায় তাদের মনে এক বিষাদ (অবসন্নতা) ভরে থাকে। তাই তাদের বিষাদী বলা হয়।

'দীর্ঘসূত্রী'—কোনো কাজ কী উপায়ে ভালোভাবে এবং শীঘ্র করা সম্ভব হয়—সে কথা তারা ভাবেই না। তাই তারা অবিবেচনাপূর্বক কোনো কাজে ব্যাপৃত হলেও অল্পসময়ে যে কাজ সমাধা করা সম্ভব, সেটি শেষ করতে অনেক সময় নেয়, যার ফলে সেটি সুচারুরূপে হয় না। এরূপ ব্যক্তিকে বলা হয় 'দীর্ঘসূত্রী'।

'কর্তা তামস উচ্যতে'—উপরিউক্ত আটটি লক্ষণযুক্ত ব্যক্তিদের বলা হয় 'তামস'।

বিশেষ কথা

ছাব্বিশ, সাতাশ এবং আটাশতম শ্লোকে যত কথা বলা হয়েছে, সেগুলি সবই কর্তাকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। কর্তার লক্ষণ যেমন হয়, সেই অনুসারেই তাঁর কর্ম হয়। কর্তা যেসব গুণ স্বীকার করেন, সেই গুণানুসারে কর্মের রূপ হয়। যে ব্যক্তি যে সাধন করেন, সেটিই ব্যক্তিবিশেষের রূপ হয়। কর্তার সামনে যে করণ থাকে, তাও কর্তার অনুরূপ হয়। তাৎপর্য হল এই যে কর্তা যেমন হয়, সেইরূপই কর্ম ও করণ হয়ে থাকে। কর্তা সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক হলে কর্মও সেইরূপ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক হয়।

সাত্ত্বিক ব্যক্তি তাঁর কর্ম, বুদ্ধি ইত্যাদিকে সাত্ত্বিকতায় পরিণত করে সাত্ত্বিক সুখ অনুভব করতঃ আসক্তিবর্জিত হয়ে পরমাত্মতত্ত্বে অভিন্ন হয়ে যান—**'দুঃখান্তং চ নিগচ্ছতি'** (গীতা ১৮।৩৬)। কারণ সাত্ত্বিক কর্তার আরাধ্য হলেন পরমাত্মা। তাই তিনি কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব রহিত হয়ে চিন্ময় তত্ত্বে অভিন্ন হয়ে যান। কারণ তিনি তত্ত্বতঃ অভিন্নই। কিন্তু রাজস বা তামস ব্যক্তি সুখে লিপ্ত হন, সেইজন্য তাঁরা পরমাত্মতত্ত্বে অভিন্ন হতে পারেন না। কেন-না তাঁদের পরমাত্মপ্রাপ্তির উদ্দেশ্য থাকে না এবং তাঁদের মধ্যে জড়ত্বের বন্ধন বেশি পরিমাণে থাকে।

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে, কর্তার পক্ষে সাত্ত্বিক হওয়া তো ঠিক, কিন্তু কর্ম কী করে সাত্ত্বিক হয় ? এর উত্তর হল যে, যে কর্মের সঙ্গে কর্তার কোনো আসক্তির সম্পর্ক নেই, কর্তৃত্বাভিমান নেই, লিপ্ততা (ফলেচ্ছা) নেই, সেই কর্ম সাত্ত্বিক হয়ে ওঠে। এরূপ সাত্ত্বিক কর্মে জগতের অত্যন্ত মঙ্গল হয়। এই সাত্ত্বিক কর্ম যেসব বস্তু, ব্যক্তি, পদার্থ, স্থান ইত্যাদির সংস্পর্শে আসে, সেগুলিও নির্মল হয়ে যায় ; কেন-না সত্ত্বগুণের স্বভাবই হল নির্মলতা—**'তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ'** (গীতা ১৪।৬)।

অপরদিকে পতঞ্জলি ঋষি রজোগুণকে ক্রিয়াত্মক বলে মনে করেছেন—**'প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্'** (যোগদর্শন ২।১৮)। কিন্তু গীতা রজোগুণকে ক্রিয়াত্মক বলে মেনে নিলেও প্রধানতঃ রাগাত্মক বলেই মনে করেন—**'রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি'** (১৪।৭)। প্রকৃতপক্ষে 'আসক্তি'ই বন্ধনকারক, 'ক্রিয়া' নয়।

গীতায় কর্মের তিনটি ভাগ করা হয়েছে—সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক (১৮।২৩-২৫)। কর্ম সম্পাদনকারীর ভাব অনুসারে সেই কর্মটি সাত্ত্বিক, রাজসিক অথবা তামসিক হয়ে উঠবে। এইজন্য ভগবান ক্রিয়ামাত্রকে রজোগুণ বলে স্বীকার করেননি।

[১]মূর্খস্য পঞ্চ চিহ্নানি গর্বী দুর্বচনী তথা। হঠী চাপ্রিয়বাদী চ পরোক্তং নৈব মন্যতে ॥

পরিশিষ্ট-ভাব—'বিষাদী' কথাটি রজোগুণের বর্ণনায় থাকা উচিত ছিল, কিন্তু এটি এখানে তমোগুণের মধ্যে এসেছে। তামস বৃত্তির বিবেকের সঙ্গে বিরোধ থাকে। তাই তামস ব্যক্তির বিষাদ একটু বেশি হয় ।

* * *

সম্বন্ধ—সকল কর্মই বিচার-বিবেচনাপূর্বক করা হয়। সেই কর্মের বিচারে বুদ্ধি এবং ধৃতি —এই কর্মসংগ্রাহক করণগুলির প্রাধান্য হওয়ায় এখানে এগুলির পার্থক্যের কথা জানানো হচ্ছে।

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয় ॥ ২৯ ॥

[**ধনঞ্জয়** (হে ধনঞ্জয় !) ; **গুণতঃ** (গুণানুসারে) ; **বুদ্ধেঃ, চ, ধৃতেঃ, এব** (বুদ্ধি ও ধৃতিরও) ; **ত্রিবিধম্, ভেদম্** (তিন প্রকার ভেদের কথা) ; **পৃথক্ত্বেন** (পৃথক্ পৃথক্‌রূপে) ; **অশেষেণ প্রোচ্যমানম্** (পূর্ণভাবে বর্ণনা করছি) ; **শৃণু** (শোনো।)]

হে ধনঞ্জয় ! এখন আমি গুণানুসারে বুদ্ধি ও ধৃতির তিন প্রকার ভেদের কথা পৃথক্ পৃথক্ ও সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করছি, তুমি সেগুলি শোনো॥ ২৯ ॥

ব্যাখ্যা—[এই অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকে কর্ম-সংগ্রহের তিনটি হেতুর কথা বলা হয়েছে—করণ, কর্ম এবং কর্তা। এর মধ্যে কর্ম করার যে ইন্দ্রিয়াদি করণ আছে, সেগুলি সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক হয় না। এই ইন্দ্রিয়গুলিতে বুদ্ধির প্রাধান্য থাকে এবং ইন্দ্রিয়গুলি বুদ্ধি অনুসারেই কাজ করে থাকে। তাই এখানে বুদ্ধি-ভেদে করণাদির ভেদের কথা বলা হয়েছে।

বুদ্ধির নিশ্চয়কে, বিচারকে ঠিকমতো যে নির্ধারণ করে এবং লক্ষ্য থেকে বিচ্যুতি প্রতিহত করে যে নিয়ন্ত্রিকা শক্তি, তাকে বলে ধৃতি। ধারণা-শক্তি বা ধৃতি ব্যতীত বুদ্ধি নিজ নিশ্চয়ে দৃঢ়ভাবে থাকে না। সেইজন্য বুদ্ধির সঙ্গে ধৃতিরও তিনটি ভাগের কথা বলার প্রয়োজন হয়েছে[১]।

মানুষ যা কিছু করে, তা বুদ্ধি সহকারেই করে অর্থাৎ নিজের বুদ্ধি অনুসারে ভেবেচিন্তেই কোনো কাজে প্রবৃত্ত হয়। কার্যে প্রবৃত্ত হলেও তার ধৈর্যের অত্যন্ত প্রয়োজন। তার বুদ্ধিতে বিচার-বিবেচনার তেজ থাকে এবং তাকে ধারণ করে যে শক্তি তা হল ধৃতি যা মানুষের বুদ্ধিকে তার স্থির সিদ্ধান্ত থেকে বিচলিত হতে দেয় না। যখন বুদ্ধি নিজ লক্ষ্যে দৃঢ় থাকে, তখনই সেই ব্যক্তির কার্য সিদ্ধ হয়।

সাধকদের জন্য কর্মপ্রেরক এবং কর্মসংগ্রহের যে প্রকরণ বলা হয়েছে তাতে জ্ঞান, কর্ম এবং কর্তার বিশেষ প্রয়োজন। তেমনই সাধক তাঁর সাধনায় একাগ্র যাতে থাকেন, সেইজন্য বুদ্ধি ও ধৃতির পার্থক্য জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ এই পার্থক্যগুলি ঠিকমতো জানলেই তিনি সংসারে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হন। কীরূপ বুদ্ধি ও ধৃতি ধারণ করলে সাধক সংসারে উত্তীর্ণ হন আর কীরূপ বুদ্ধি ও ধৃতি থাকলে তাতে বাধা আসে—সাধকের পক্ষে এটি জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই ভগবান এই দুটি পার্থক্য জানিয়েছেন। ভগবানের এটি জানাবার তাৎপর্য এই যে সাধক সাত্ত্বিক বুদ্ধি ও ধৃতির সাহায্যেই সংসারজয়ী হতে সক্ষম হন, রাজসী বা তামসী বুদ্ধি বা ধৃতির সাহায্যে নয়।]

'ধনঞ্জয়'—পাণ্ডবেরা যখন রাজসূয় যজ্ঞ করেছিলেন, সেইসময় অর্জুন অনেক রাজাকে পরাজিত করে বহু ধনরত্ন নিয়ে এসেছিলেন, সেইজন্যই তাঁর নাম হয়েছিল 'ধনঞ্জয়'। ভগবান এখন অর্জুনকে বলছেন যে সাধনার দ্বারা সাত্ত্বিক বুদ্ধি ও ধৃতি গ্রহণ করে গুণাতীত তত্ত্ব প্রাপ্ত করাই হল প্রকৃত ধন লাভ ; অতএব তুমি এই প্রকৃত ধন ধারণ করো, তোমার 'ধনঞ্জয়' নামের সার্থকতা সেখানেই।

'বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু'—ভগবান বলেছেন বুদ্ধিও একটি আর ধৃতিও একটি, কিন্তু গুণাদির প্রাধান্যে এই বুদ্ধি এবং ধৃতিও সাত্ত্বিক, রাজসিক ও

[১]সাংখ্যযোগে বুদ্ধি ও ধৃতির অত্যন্ত প্রয়োজনীয়তা থাকে ; পরমাত্মপ্রাপ্তির অন্যান্য যতপ্রকার সাধন আছে, সবগুলিতেই বুদ্ধি ও ধৃতি প্রয়োজন। সেইজন্য গীতায় বুদ্ধি ও ধৃতি—এই দুটিকে একই সঙ্গে বলা হয়েছে ; যেমন— 'শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্‌ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া' (৬।২৫) এবং 'বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ' (১৮।৫১)।

তামসিক এই তিন ভাগে ভাগ হয়ে যায়। সেগুলি আমি ঠিকমতো উত্থাপিত করব এবং অল্প কথায় খুবই বিশেষ বর্ণনা করব, তুমি তা মন দিয়ে, নিবিষ্টভাবে শোন।

ধৃতি, শ্রোত্র ইত্যাদি করণের বর্ণনার প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়নি। তাই ভগবান **'চৈব'** পদটির প্রয়োগ করে বলেছেন যে আমি বুদ্ধির এবং ধৃতির তিনটি করে যে ভাগ আছে তার কথা বলছি। সাধারণভাবে দেখলে ধৃতিও বুদ্ধিরই একটি গুণ বলে মনে হয়। কিন্তু বুদ্ধির গুণবিশিষ্ট বলে মনে হলেও ধৃতি বুদ্ধির থেকে পৃথক্ এবং বিশিষ্ট ; কারণ ধৃতি বিরাজ করে স্বয়ং-এ অর্থাৎ কর্তার মধ্যে। এই ধৃতির জন্যই মানুষ তার বুদ্ধি ঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে। ধৃতি যদি শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সাত্ত্বিক হয়, সাধকের (সাধনায়) বুদ্ধি ততই স্থির হয়। সাধনাতে বুদ্ধির স্থিরতা যত প্রয়োজন, মনের স্থিরতার তত নয়। তবে এক অংশে অণিমা ইত্যাদি সিদ্ধির প্রাপ্তিতে মনে স্থৈর্যের প্রয়োজন হয়। কিন্তু পারমার্থিক উন্নতিতে বুদ্ধির নিজ উদ্দেশ্যে স্থির থাকারই বেশি প্রয়োজন[১]। সাধকের বুদ্ধি এবং ধৃতি দুই-ই যদি সাত্ত্বিক হয়, তবেই সাধক তাঁর সাধনে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকেন। তাই এই দুটিরই পার্থক্য জানার প্রয়োজনীয়তা আছে।

'পৃথক্ত্বেন'—এদের পার্থক্য পৃথক্ পৃথক্ এবং স্পষ্টভাবে বলব অর্থাৎ বুদ্ধি এবং ধৃতির ব্যাপারে কী কী পার্থক্য হয়, তাও বলব।

'প্রোচ্যমানমশেষেণ'—ভগবান বলছেন যে, বুদ্ধি ও ধৃতির বিষয়ে জানবার যেসব প্রয়োজনীয় ব্যাপার আছে, তা আমি সম্পূর্ণভাবে জানাব, যা জানলে আর কোনো কিছু জানা বাকি থাকে না।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—ভগবান এবার সাত্ত্বিক বুদ্ধির লক্ষণ জানাচ্ছেন।

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ কার্যাকার্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥ ৩০ ॥

[**পার্থ** (হে পার্থ !) ; **যা প্রবৃত্তিম, চ, নিবৃত্তিম্** (যে বুদ্ধি দ্বারা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি) ; **কার্যাকার্যে** (কর্তব্য ও অকর্তব্য) ; **ভয়াভয়ে, চ** (ভয় ও অভয়) ; **বন্ধম্, চ, মোক্ষম্** (বন্ধন এবং মোক্ষকে) ; **বেত্তি** (যথার্থরূপে জানা যায়) ; **সা** (তাকে বলা হয়) ; **সাত্ত্বিকী** (সাত্ত্বিকী) ; **বুদ্ধিঃ** (বুদ্ধি।)]

হে পার্থ ! যে বুদ্ধি দ্বারা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, কর্তব্য ও অকর্তব্য, ভয় ও অভয়, বন্ধন এবং মোক্ষকে যথার্থরূপে জানা যায়, তাকে বলা হয় সাত্ত্বিকী বুদ্ধি ॥ ৩০ ॥

ব্যাখ্যা—'প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ'—সাধকমাত্রেরই প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি দুটি অবস্থা হয়। যখন তিনি সংসারের কাজ-কর্ম করেন, তখন সেটি হল প্রবৃত্তি অবস্থা আবার যখন সংসারের কাজ-কর্ম ছেড়ে তিনি একান্তে ধ্যান-ভজন করেন, তখন সেটি হল নিবৃত্তি অবস্থা। কিন্তু এই দুটির মধ্যে জাগতিক কামনাযুক্ত প্রবৃত্তি এবং বাসনাযুক্ত নিবৃত্তি[২]—এই দুটি অবস্থাই 'প্রবৃত্তি' অর্থাৎ জগতে প্রবৃত্তিকারী, আর জাগতিক কামনারহিত প্রবৃত্তি এবং বাসনারহিত নিবৃত্তি—এই দুটি অবস্থাই 'নিবৃত্তি' অর্থাৎ পরমাত্মার অভিমুখে নিয়ে যায়। তাই সাধক যেন সজাগ থেকে কামনা-বাসনা রহিত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিকেই গ্রহণ করেন।

বাস্তবে গভীরভাবে দেখলে বোঝা যায় যে কামনা-বাসনারহিত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিও যদি নিজের সুখ-আরামের

---

[১]বুদ্ধির সাহায্যে নিজ ধ্যেয় (লক্ষ্য) ঠিকমতো বোঝা যায় এবং ধৃতির সাহায্যে কর্তা স্বয়ং সেই লক্ষ্যে দৃঢ় থাকেন। সাধক আগে যেমনই ভাব ও আচরণবিশিষ্ট অর্থাৎ অত্যন্ত পাপী ও দুরাচারী হোন না কেন, তিনিও যদি 'আমাকে পরমাত্মপ্রাপ্তি করতেই হবে'—এই উদ্দেশ্যে দৃঢ় থাকেন, তাহলে তাঁর সব পাপ নাশ হয় (গীতা ৯।৩০)।

[২]প্রবৃত্তি ত্যাগ করে কেউ যখন একান্তে ধ্যান-ভজন করেন, তখন তাঁর কাছে দ্রব্য বা পদার্থ থাকে না, কিন্তু 'লোকে আমাকে জ্ঞানী, ধ্যানী, সাধক বলে মনে করবে, আমার মান-সম্মান হবে' অন্তরে এইরূপ একপ্রকার সূক্ষ্ম আকাঙ্ক্ষা থাকে। একেই বলা হয় 'বাসনা'।

জন্য করা হয়, তাহলে এই দুটিই 'প্রবৃত্তি' হয়ে যায়। কারণ এই দুটিই বন্ধনকারী অর্থাৎ এর দ্বারা নিজ ব্যক্তিত্ব দূর হয় না। কিন্তু এই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি যদি কামনা-বাসনা রহিত হয়ে অপরের সুখ-আরাম ও হিতের উদ্দেশ্যে করা হয়, তাহলে এই দুটিই নিবৃত্তি হয়ে যায়। কারণ ওইগুলিতে তখন নিজ ব্যক্তিত্ব (ভাব) থাকে না। এই ব্যক্তিত্ব বা অহংভাব কখন থাকে না ? যখন প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি যাঁর প্রকাশে প্রকাশিত হয় এবং যিনি প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরহিত, সেই প্রকাশকের অর্থাৎ তত্ত্বপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যেই প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি করা হয়। প্রাণীমাত্রেরই সেবার জন্য যেন প্রবৃত্তি করা হয় এবং সেরূপ নিবৃত্তিও যেন করা হয় পরম-বিশ্রাম বা স্বরূপ স্থিতির জন্য।

'কার্যাকার্যে'—শাস্ত্র, বর্ণ, মর্যাদা অনুযায়ী যা কিছু করা হয়, তাকে বলে 'কার্য' এবং শাস্ত্র-মর্যাদার বিরুদ্ধে যে কাজ করা হয়, সেগুলি হল 'অকার্য'।

যেগুলি আমরা করতে সক্ষম, যা অবশ্যই করা উচিত এবং যা করলে জীবের কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী, তাকে 'কার্য' বা কর্তব্য বলা হয়। যেগুলি আমাদের করা উচিত নয়, যা করলে জীব আবদ্ধ হয়, সেগুলিকে বলা হয় 'অকার্য' বা অকর্তব্য। যেগুলি আমরা করতে সক্ষম নই, তাকে অকর্তব্য বলে না, সেগুলি হল অসামর্থ্য।

'ভয়াভয়ে'—ভয় এবং অভয়ের কারণগুলি বিচার করা উচিত। যে কর্মের দ্বারা এখন এবং পরিণামে নিজের এবং জগতের অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে, সেই কর্ম 'ভয়' অর্থাৎ ভয়দায়ক এবং যে কর্মে এখন এবং পরিণামে নিজের এবং জগতের মঙ্গল হবার সম্ভাবনা থাকে, সেই কর্মকে 'অভয়' অর্থাৎ সকলকে অভয় প্রদানকারী বলা হয়।

মানুষ যখন কর্তব্য-কর্ম থেকে চ্যুত হয়ে অকার্যে প্রবৃত্ত হয়, তখন তার মনে নিজ মান-মর্যাদা হানি এবং নিন্দা-অপমানের আশঙ্কা থেকে ভয় উৎপন্ন হয়। কিন্তু যিনি তাঁর মর্যাদা থেকে কখনো বিচলিত হন না ; কখনো মনে মনেও কারও অনিষ্ট চিন্তা করেন না এবং সর্বদা পরমাত্মাতে মন নিবিষ্ট রাখেন, তাঁর মনে সর্বক্ষণ অভয় বিরাজ করে। এই অভয়ই মানুষকে সর্বতোভাবে অভয়পদ—পরমাত্মপ্রাপ্তি করায়।

'বন্ধন মোক্ষং চ যা বেত্তি'—যে ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে দান, তীর্থ, ব্রতাদি উত্তম কার্য করেন, কিন্তু অন্তরে অসৎ, জড়, বিনাশশীল পদার্থ এবং স্বর্গাদি কামনা করেন, তার জন্য এইসব কর্ম 'বন্ধ' অর্থাৎ বন্ধনকারকই হয়ে থাকে। শুধুমাত্র পরমাত্মার সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়া, তাঁকে ছাড়া কখনো কোনো অবস্থাতেই অসৎ সংসারের সঙ্গে বিন্দুমাত্র সম্পর্ক না রাখাই হল **'মোক্ষ'** বা মোক্ষদায়ক।

যে বস্তুগুলি পাওয়া যায়নি, সেগুলির জন্য কামনা থাকলে মানুষ সেগুলির অভাব অনুভব করে। সে নিজেকে সেইসব বস্তুর অধীন বলে মনে করে আর সেগুলি পেলে নিজেকে স্বাধীন বলে অনুভব করে। সে মনে করে যে ওইসব বস্তু পেলেই সে স্বাধীন, কিন্তু আসলে সে তখন সেই বস্তুগুলির অধীন হয়ে যায়। বস্তুর অভাব এবং বস্তুর লাভ—এই দুটির অধীনতায় শুধু এটুকুই পার্থক্য যে, বস্তুর অভাবে নিজেকে অধীন মনে হয়, মন খারাপ লাগে আর বস্তু লাভ হলে অধীনতাকে অধীনতা বলে মনে হয় না। কারণ মানুষ সেইসময় অন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু, এই দুটিই অধীনতা এবং অধীনতাই হল বন্ধন। অভাবের অধীনতা হল প্রকট বিষ আর পাওয়ার পর যে অধীনতা হয় তা হল মিষ্ট প্রলেপ যুক্ত গুপ্ত বিষ, কিন্তু বিষ দুটিই। বিষ তো জীবন নাশকারীই হয়।

সারকথা হল এই যে জাগতিক বস্তুর কামনা থেকে বন্ধন হয় এবং পরমাত্মা ব্যতীত কোনো বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা, পরিস্থিতি, দেশ, কাল ইত্যাদির কামনা না থাকলে মুক্তি হয়[১]। মনে যদি কামনা থাকে তাহলে বস্তু কাছে থাকলেও বন্ধন, না থাকলেও বন্ধন। যদি মনে কামনা না থাকে তাহলে বস্তু কাছে থাকলেও মুক্তি, না থাকলেও মুক্তি।

'বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী'—এইরূপ যিনি প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি, কার্য-অকার্য, ভয়-অভয় এবং বন্ধন-মোক্ষের প্রকৃত তত্ত্ব জানেন, তাঁর বুদ্ধি সাত্ত্বিকী বলে কথিত হয়।

---

[১]একটি হল 'কামনা' অপরটি হল 'প্রয়োজনীয়তা'। সাংসারিক বিষয়ের হয় 'কামনা' আর পরমাত্মার হয় 'প্রয়োজনীয়তা'। কামনা কখনোই পূরণ হয় না, কিন্তু প্রয়োজনীয়তা পূরণ হয়।

পরমাত্মার প্রয়োজনীয়তাও সাংসারিক কামনা থেকেই উৎপন্ন হয়। কামনার আত্যন্তিক অভাব হলে প্রয়োজনীয়তা থাকে না অর্থাৎ পরমাত্মপ্রাপ্তি হয়।

এদের প্রকৃত তত্ত্ব জানা কাকে বলে ? প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি, কার্য-অকার্য, ভয়-অভয় এবং বন্ধন-মোক্ষ—এগুলি গভীরভাবে বুঝে, যার সঙ্গে আমাদের বাস্তবিক কোনো সম্বন্ধ নেই, সেই জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ না মানা আর যার সঙ্গে আমাদের স্বতঃসিদ্ধ সম্বন্ধ আছে, সেই (প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির আশ্রয় এবং প্রকাশক) পরমাত্মাকে তত্ত্বতঃ সঠিকভাবে জানা—একেই বলা হয় সাত্ত্বিকী বুদ্ধির সাহায্যে প্রকৃত তত্ত্ব ঠিকমতো জানা।

পরিশিষ্ট-ভাব—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, কর্তব্য এবং অকর্তব্য, ভয় ও অভয় এবং বন্ধন ও মোক্ষ—এগুলি জানার অর্থ জগৎ-সংসার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা। যদি জগৎ-সংসার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন না হয়, তাহলে সে জানা প্রকৃত জানা হয় না, তা হল শেখা মাত্র।

গীতার 'সাত্ত্বিক গুণ' গুণাতীত করে, জগৎ-সংসার থেকে সম্পর্ক রহিত করে। তাই এতে বন্ধন এবং মোক্ষ পর্যন্ত বিচার হয়—**'বন্ধং মোক্ষং চ যা বেত্তি'**। সাত্ত্বিকী বিবেকই তত্ত্বজ্ঞানে পরিণত হয়। বিবেকবান এই বুদ্ধি লাভ করে যে 'ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি পর্যন্ত সবই বন্ধন'।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—এবার রাজসী বুদ্ধির লক্ষণ জানাচ্ছেন।

যয়া ধর্মমধর্মঞ্চ কার্যঞ্চাকার্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী॥ ৩১ ॥

[**পার্থ, যয়া** (হে পার্থ!, মানুষ যে বুদ্ধির দ্বারা) ; **ধর্মম্, চ, অধর্মম্** (ধর্ম ও অধর্ম) ; **কার্যম্, চ, অকার্যম্, এব** (কর্তব্য এবং অকর্তব্যকেও) ; **অযথাবৎ** (ঠিকভাবে) ; **প্রজানাতি** (বুঝতে পারে না) ; **সা, বুদ্ধিঃ** (সেই বুদ্ধি) ; **রাজসী** (রাজসী বুদ্ধি।)]

হে পার্থ ! মানুষ যে বুদ্ধির সাহায্যে ধর্ম ও অধর্ম, কর্তব্য এবং অকর্তব্য ঠিকভাবে বুঝতে পারে না, সেই বুদ্ধিকে বলা হয় রাজসী বুদ্ধি ॥ ৩১ ॥

ব্যাখ্যা—'যয়া ধর্মমধর্মঞ্চ'—শাস্ত্র যে সব বিধান দিয়েছে সেগুলিকে বলে **'ধর্ম'** অর্থাৎ শাস্ত্র যে নির্দেশ দিয়েছে এবং যাতে পরলোকে সদ্‌গতি হয়, সেটি হল ধর্ম। শাস্ত্রে যা নিষেধ করা হয়েছে, সেটি হল **'অধর্ম'** অর্থাৎ শাস্ত্রে যে নির্দেশ দেওয়া হয়নি, যার দ্বারা পরলোকে দুর্গতি হয়, তা হল অধর্ম। যেমন, বাবা-মা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সেবা-যত্ন করা, অপরকে সুখী করা, অন্যের হিতার্থে নিজ দেহ, মন, অর্থ, যোগ্যতা, পদ, অধিকার, সামর্থ্য ইত্যাদি নিয়োজিত করা, এগুলিকে বলা হয় **'ধর্ম'**। তেমনই কূপ-পুষ্করিণী খনন, ধর্মশালা, হাসপাতাল নির্মাণ, সদাব্রত করা, দেশ-গ্রামের অনাথ ও গরীব শিশু ও সমাজের উন্নতির জন্য নিজের দ্রব্য নিষ্কামভাবে প্রয়োজনানুসারে উদার মনে দান করা, এগুলিকেও বলা হয় **'ধর্ম'**। অপর দিকে নিজ স্বার্থ-সুখ ও আরামের জন্য অপরের ধন-সম্পত্তি, অধিকার, পদ কেড়ে নেওয়া ; অন্যের অপকার, ক্ষতিসাধন, হত্যা করা এবং শরীর, মন, অর্থ, যোগ্যতা, পদ, অধিকার ইত্যাদির সাহায্যে অপরকে দুঃখ প্রদান করা, এগুলিকে বলা হয় **'অধর্ম'**।

আসলে ধর্ম তাকেই বলে, যা জীবের কল্যাণ করে আর অধর্ম হল, যা জীবকে আবদ্ধ করে।

'কার্যঞ্চাকার্যমেব চ'—শাস্ত্রে বর্ণ, আশ্রম, দেশ, কাল, লোকমর্যাদা, পরিস্থিতি অনুসারে যে কর্ম করার নির্দেশ করা আছে, সেই কর্মগুলি হল **'কর্তব্য'**। প্রাপ্ত কর্তব্য না করা এবং করার উপযুক্ত কর্ম না করাকে বলা হয় অকর্তব্য। যেমন, ভিক্ষা চাওয়া ; যজ্ঞ-বিবাহ ইত্যাদি সম্পন্ন করানো এবং তার জন্য দান ও দক্ষিণা গ্রহণ, এগুলি ব্রাহ্মণদের কর্তব্য হলেও ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কাছে অকর্তব্য। এইরূপ শাস্ত্রে যে যে বর্ণ ও আশ্রমের জন্য যে যে কর্ম বলা হয়েছে, সেগুলি সব তাদের জন্য কর্তব্য ; আর যাদের জন্য সেইগুলি বারণ করা হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে সেগুলি অকর্তব্য।

যেখানে কাজ করা হয়, সেখানে বিশ্বস্ততার সঙ্গে পুরো সময় ব্যয় করা, কার্যটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করা, মালিকের যাতে মঙ্গল হয়, সেইরূপ কাজ করা— কর্মচারীদের কাছে

এগুলি সবই 'কর্তব্য'। নিজ স্বার্থ, সুখ এবং আরামের জন্য পুরো সময় কাজ না করা, তৎপরতার সঙ্গে কাজ না করা বা সামান্য উপরি (ঘুষ) টাকার জন্য মালিকের ক্ষতি করা—এ সবই হল কর্মচারীদের 'অকর্তব্য'।

সরকারি যত অফিসার আছেন, তাঁদের রাজ্যের সুব্যবস্থাদি করার জন্য, সকলের মঙ্গল করার জন্যই উচ্চপদে রাখা হয়েছে। অতএব নিজ স্বার্থ এবং অহং-অভিমান পরিত্যাগ করে যাতে সকলের মঙ্গল হয়, সকলে সুখে, শান্তিতে, আরামে থাকে—এরূপ করা হল তাঁদের জন্য 'কর্তব্য'। নিজের তুচ্ছ স্বার্থের জন্য দেশের ক্ষতি করা, লোকেদের দুঃখ দেওয়া, এইসব হল তাঁদের পক্ষে 'অকর্তব্য'।

সাত্ত্বিকী-বুদ্ধিতে কথিত প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি, ভয়-অভয় এবং বন্ধন-মোক্ষকেই এইস্থানে **'এব চ'** পদের অর্থ ধরতে হবে।

'অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী'—আসক্তি হলে রাজসী বুদ্ধিতে স্বার্থ, পক্ষপাত, বৈষম্য ইত্যাদি দোষ আসে। এইসব দোষ থাকলে ধর্ম-অধর্ম, কার্য-অকার্য, ভয়-অভয়, বন্ধন-মোক্ষ ইত্যাদির প্রকৃত তত্ত্ব ঠিকভাবে বোধগম্য হয় না। অতএব কোন্ বর্ণ-আশ্রমের জন্য কোন্ পরিস্থিতিতে কাকে ধর্ম বলা হয় এবং কাকে অধর্ম বলা হয়, এই ধর্ম কোন্ বর্ণ-আশ্রমের জন্য কর্তব্য হয়ে থাকে আর কাদের কাছে অকর্তব্য, কীসে ভয় হয় এবং কীসে অভয় হয়, এগুলি যে বুদ্ধির দ্বারা ঠিকমতো জানা যায় না তাকে বলা হয় রাজসী বুদ্ধি।

যখন সাংসারিক বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা, পরিস্থিতি, ক্রিয়া, পদার্থ ইত্যাদিতে আসক্তি হয়, তখন এই আসক্তি অপরের প্রতি দ্বেষ উৎপন্নকারী হয়ে থাকে। তখন যার প্রতি আসক্তি হয়, তার দোষগুলিতে এবং যার প্রতি বিদ্বেষ হয়, তার গুণের প্রতি মানুষের দৃষ্টি যায় না। আসক্তি এবং বিদ্বেষ—এই দুটির দ্বারাই সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলে মানুষ সংসারকে জানতে পারে না। তেমনই পরমাত্মা হতে পৃথক্ থাকলেও মানুষ পরমাত্মাকে জানতে সক্ষম হয় না। সংসার থেকে পৃথক্ হয়েই সংসারকে জানতে পারে এবং পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্ন হলেই পরমাত্মাকে জানতে সক্ষম হয়, সেই অভিন্নতা প্রেম অথবা জ্ঞান—যেভাবেই হোক না কেন!

পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্ন হওয়াতে সাত্ত্বিকী বুদ্ধিই কাজ করে। কারণ সাত্ত্বিকী বুদ্ধিতে বিবেক-শক্তি জাগ্রত থাকে। কিন্তু রাজসী বুদ্ধিতে এই বিবেক-শক্তি অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। জলে মাটি মিশে গেলে যেমন জলের স্বচ্ছতা, নির্মলতা থাকে না, তেমনই বুদ্ধিতে রজোগুণ থাকলে বুদ্ধির স্বচ্ছতা ও নির্মলতা থাকে না। তখন ধর্ম-অধর্ম বুঝতে কষ্ট হয়। রাজসী বুদ্ধি হলে মানুষ যে যে বিষয় বোঝার চেষ্টা করে, সেগুলি বুঝতে অপারগ হয়। এসব বিষয়ের দোষ-গুণ ঠিকমতো না বুঝে সে গ্রহণ বা ত্যাগ করতে পারে না অর্থাৎ সে গ্রাহ্য বস্তু গ্রহণ করতে পারে না এবং ত্যাজ্য বস্তু ত্যাগ করতে সক্ষম হয় না।

পরিশিষ্ট-ভাব—যে ব্যক্তি ধর্ম-অধর্ম এবং কর্তব্য-অকর্তব্যকে ঠিকভাবে জানে না, সে বন্ধন ও মুক্তিকে কীভাবে জানবে? জানা সম্ভব নয়। বুদ্ধি আসক্তিরঞ্জিত হওয়ায় সে এইসব ঠিকভাবে জানে না, আসক্তির প্রাধান্য থাকায় সে বিবেক-বুদ্ধিকে গুরুত্ব দিতে পারে না। উৎপত্তি ও বিনাশশীল বস্তুগুলির প্রতি আসক্তি গভীর হওয়ায় তার বিবেক লুপ্ত হয়।

*** *** ***

সম্বন্ধ—পরবর্তী শ্লোকে তামসী বুদ্ধির বর্ণনা করা হয়েছে।

অধর্মং ধর্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী॥ ৩২ ॥

[**পার্থ, তমসা** (হে পার্থ! তমোগুণে) ; **আবৃতা, যা, বুদ্ধিঃ** (আচ্ছন্ন যে বুদ্ধি) ; **অধর্মম্, ধর্মম্** (অধর্মকে ধর্ম) ; **চ, সর্বাথান্** (এবং সমস্ত জিনিসকেই) ; **বিপরীতান্** (বিপরীত দেখে) ; **সা** (হল) ; **তামসী** (তামসী বুদ্ধি।)]

হে পার্থ! তমোগুণে আচ্ছন্ন যে বুদ্ধি অধর্মকে ধর্ম এবং সমস্ত জিনিসকেই বিপরীত দেখে, তাকে

বলে তামসী বুদ্ধি॥ ৩২ ॥

ব্যাখ্যা—**'অধর্মং ধর্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা'**—ঈশ্বরের নিন্দা করা ; শাস্ত্র, বর্ণ, আশ্রম ও লোকমর্যাদার বিপরীত কাজ করা ; মা-বাবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার না করা ; সাধু-মহাত্মা, গুরু-আচার্য প্রভৃতির অপমান করা ; ছলনা, কপটতা, বেঈমানী, জালিয়াতি, অখাদ্য-ভোজন, পরস্ত্রী গমন ইত্যাদি শাস্ত্রনিষিদ্ধ পাপ কর্মকে অবৈধ বলে না মানা—এসব হল অধর্মকে 'ধর্ম' বলে মনে করা।

নিজ শাস্ত্র, বর্ণ, আশ্রমের মর্যাদা অনুসারে চলা ; মাতা-পিতার আদেশ পালন করা ও তাঁদের কায়মনোবাক্যে সেবা করা ; সাধু-মহাপুরুষদের উপদেশানুযায়ী জীবন গঠন করা ; শাস্ত্রগ্রন্থ পঠন-মনন ; অপরের সেবা ও উপকার করা, শুদ্ধ পবিত্র খাদ্য ভোজন করা ইত্যাদি শাস্ত্রবিহিত কর্মকে উচিত বলে মনে না করা হল ধর্মকে 'অধর্ম' বলে মনে করা।

তামসী বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের ধারণ হল যে শাস্ত্রকারগণ ও ব্রাহ্মণগণ নিজেদের বড় বলে জাহির করে নানাপ্রকার বিধি-নিষেধ সৃষ্টি করে লোককে অধীন করে রেখেছে ; যার ফলে ভারত পরাধীন হয়েছে। যতদিন পর্যন্ত এই শাস্ত্র-বিধি শাসন থাকবে, এই ধর্মীয় পুস্তকগুলি থাকবে, ততদিন ভারতের উত্থান হবে না, ভারত এই পরাধীনতার বেড়ীতেই আবদ্ধ থাকবে ইত্যাদি। তারা শাস্ত্র-মর্যাদা ভঙ্গ করাকেই ধর্ম বলে মনে করে।

'সর্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ'—আত্মাকে স্বরূপ বলে মনে না করে শরীরকেই স্বরূপ বলে ভাবা ; ঈশ্বরে বিশ্বাস না করে জগৎকে সত্য বলে মনে করা ; অন্যকে মূর্খ মনে করে নিজেকে শিক্ষিত ও বিদ্বান বলে ভাবা ; যত সাধু-মহাত্মা হয়েছেন, তাঁদের সিদ্ধান্তের থেকে নিজের কথাকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা ; প্রকৃত সুখের দিকে নজর না দিয়ে বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে এরূপ সংযোগজনিত সুখকে আসল সুখ বলে মনে করা ; অকর্তব্যকে কর্তব্য বলে ভাবা ; অপবিত্র বস্তুকে পবিত্র মনে করা—এসবই হল সমস্ত জিনিসকে বিপরীতভাবে দেখা।

'বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী'—তমোগুণে আবৃত যে বুদ্ধি অধর্মকে ধর্ম, ধর্মকে অধর্ম এবং ভালোকে মন্দ ও সোজাকে উল্টো বলে মনে করে, তা হল তামসী বুদ্ধি। এই তামসী বুদ্ধিই মানুষকে অধোগতিতে নিয়ে যায়—**'অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ'** (গীতা ১৪।১৮)। তাই যাঁরা নিজেদের উদ্ধার করতে চান, তাঁদের এই তামসী বুদ্ধি সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা উচিত।

পরিশিষ্ট-ভাব—যার তামসী বুদ্ধি, তার মধ্যে ব্যবহার এবং পরমার্থ—সর্বত্রই বিপরীতভাব দেখা যায়। বর্তমানে এটি স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। যেমন—পশু বিনাশকে বলা হয় 'মাংস উৎপাদন'। গর্ভপাতরূপ মহাপাপকে বলা হয় 'পরিবার পরিকল্পনা' ! নারীদের উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারকে, মর্যাদা ভঙ্গ করাকে বলা হয় 'নারী-মুক্তি'। আগে নারী গৃহলক্ষ্মী হত, এখন গৃহের বাইরে অনেক পুরুষের দাসত্ব (চাকরি) করাকে 'নারী-স্বাধীনতা' বলা হয় ! এইরূপ পরাধীনতাকে বলা হয় স্বাধীনতা। নৈতিক পতনকে উন্নতির সংজ্ঞা দেওয়া হয়। পশুত্বকে আধুনিকতার চিহ্ন বলে মানা হয়। ধার্মিকতাকে বলা হয় সাম্প্রদায়িকতা আর ধর্মবিরুদ্ধ ভাবের নাম হল ধর্ম-নিরপেক্ষতা। যখন বিনাশকাল উপস্থিত হয়, তখনই এরূপ বিপরীত, তামসীবুদ্ধি উপস্থিত হয়—**'বিনাশকালে বিপরীতবুদ্ধিঃ'**, **'বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি'** (গীতা ২।৬৩)।

* * *

সম্বন্ধ—ভগবান এবার সাত্ত্বিকী ধৃতির লক্ষণ জানাচ্ছেন।

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥ ৩৩ ॥

[**পার্থ, যোগেন** (হে পার্থ ! সমত্বযুক্ত) ; **যয়া, অব্যভিচারিণ্যা** (যে অব্যভিচারিণী) ; **ধৃত্যা** (ধৃতিদ্বারা) ; **মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়-ক্রিয়াঃ** (মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াকে) ; **ধারয়তে** (ধারণ করা হয়) ; **সা** (তাকে বলে) ; **ধৃতিঃ, সাত্ত্বিকী** (সাত্ত্বিকী ধৃতি।)]

হে পার্থ ! সমত্বযুক্ত যে অব্যভিচারিণী ধৃতি দ্বারা মানুষ মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াকে ধারণ করে, তাকে বলে সাত্ত্বিকী ধৃতি॥ ৩৩ ॥

ব্যাখ্যা—'ধৃত্যা যয়া ধারয়তে ...... যোগেনাব্যভিচারিণ্যা'—জাগতিক লাভ-ক্ষতি, জয়-পরাজয়, সুখ-দুঃখ, আদর-অনাদর, সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সম থাকাকে বলা হয় 'যোগ' (সমতা)।

পরমাত্মাকে চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহলোকে সিদ্ধি-অসিদ্ধি, বস্তু, পদার্থ, আপ্যায়ন, পূজা ইত্যাদি এবং পরলোকে সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা করা হল 'ব্যভিচার' এবং ইহলোক ও পরলোকে সুখ, ভোগ, বস্তু, পদার্থ ইত্যাদির বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষা না রেখে শুধু পরমাত্মাকে চাওয়াই হল 'অব্যভিচার'। এই অব্যভিচার যার মধ্যে থাকে, তার ধৃতিকে 'অব্যভিচারিণী' বলা হয়।

নিজের ধারণা, সিদ্ধান্ত, লক্ষ্য, ভাব, ক্রিয়া, বৃত্তি, বিচার ইত্যাদি দৃঢ় ও অটল রাখার শক্তিকে বলা হয় 'ধৃতি'। যোগ অর্থাৎ সমত্বযুক্ত এই অব্যভিচারিণী ধৃতির সাহায্যে মানুষ মন, প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া ধারণ করে।

মনে রাগ (আসক্তি)-দ্বেষের জন্য হওয়া চিন্তার থেকে মুক্ত হওয়া, মনকে যেখানে ইচ্ছা নিযুক্ত করা এবং সরিয়ে নেওয়া ইত্যাদি হল মনের ক্রিয়াগুলি ধৃতির সাহায্যে ধারণ করা।

প্রাণায়াম করার সময় রেচকে পূরক না হওয়া, পূরকে রেচক না হওয়া এবং বাহ্য কুম্ভকে পূরক না হওয়া ও আভ্যন্তর কুম্ভকে রেচক না হওয়া অর্থাৎ প্রাণায়ামের নিয়ম বিরুদ্ধ শ্বাস-প্রশ্বাস না হওয়াকে বলা হয় ধৃতি দ্বারা প্রাণের ক্রিয়া ধারণ করা।

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ইত্যাদি বিষয়গুলিতে ইন্দ্রিয়াদির বিশৃঙ্খল না হওয়া, যে বিষয়ে যেমনভাবে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত, তাতে প্রবৃত্ত হওয়া এবং যে বিষয়ে নিবৃত্ত থাকা উচিত, তাতে নিবৃত্ত হওয়া হল ধৃতির সাহায্যে ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া ধারণ করা।

'ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী'—যে ধৃতির দ্বারা মন, প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়ার ওপর আধিপত্য হয়, হে পার্থ! সেই ধৃতি হল সাত্ত্বিকী ধৃতি।

পরিশিষ্ট-ভাব—জীব পরমাত্মার অংশ, তাই পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কোনো দিকে মন দেওয়াকে বলা হয় 'ব্যভিচার' আর পরমাত্মা অভিমুখে যাওয়াকে বলা হয় 'অব্যভিচার'। শুধু পরমাত্মার দিকে চলার যে ধৃতি তাকে বলে 'অব্যভিচারিণী ধৃতি'।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—পরের শ্লোকটিতে রাজসী ধৃতির লক্ষণ বলেছেন।

যয়া তু ধর্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী॥ ৩৪ ॥

[তু, পার্থ, অর্জুন (কিন্তু হে পৃথানন্দন অর্জুন!) ; ফলাকাঙ্ক্ষী (ফলাকাঙ্ক্ষী মানুষ) ; যয়া, ধৃত্যা (যে ধৃতির দ্বারা) ; ধর্ম-কামার্থান্ (ধর্ম, অর্থ ও কামে) ; প্রসঙ্গেন, ধারয়তে (অত্যন্ত আসক্তিপূর্বক লিপ্ত থাকে) ; সা, ধৃতিঃ (সেই ধৃতি হল) ; রাজসী (রাজসী ধৃতি।)]

হে পৃথানন্দন অর্জুন! ফলাকাঙ্ক্ষী মানুষ যে ধৃতির দ্বারা ধর্ম, অর্থ ও কাম উপভোগে অত্যন্ত আসক্তিপূর্বক লেগে থাকে, সেই ধৃতি হল রাজসী ধৃতি॥ ৩৪ ॥

ব্যাখ্যা—'যয়া তু ধর্মকামার্থান্ ধৃত্যা.......সা পার্থ রাজসী'—রাজসী ধারণ-শক্তির দ্বারা মানুষ কামনা পূরণের জন্য ধর্মের অনুষ্ঠান করেন, কামোপভোগ করেন এবং অর্থ সঞ্চয় করেন।

অমাবস্যা, পূর্ণিমা ইত্যাদিতে দান করা, তীর্থাদিতে অন্ন দান করা, পর্বাদিতে উৎসব করা, তীর্থে যাওয়া, ধর্মীয় সংস্থাতে চাঁদা প্রদান, কখনো ভাগবতকথা কীর্তন, ভাগবত-সপ্তাহ ইত্যাদির আয়োজন করানো—এগুলি কামনা পূরণের উদ্দেশ্যে করা হল 'ধর্ম'-কে ধারণ করা[১]।

[১]ধর্মানুষ্ঠান যদি অর্থের জন্য করা হয় এবং সেই অর্থ ধর্মের জন্য ব্যয় করা হয়, তবে ধর্মের দ্বারা অর্থ এবং অর্থের দ্বারা ধর্ম—উভয়ই পরস্পর বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ধর্মের অনুষ্ঠান এবং অর্থ ব্যয় যদি শুধুমাত্র কামনা পূরণের উদ্দেশ্যে করা হয়, তাহলে ধর্ম (পুণ্য) এবং অর্থ—উভয়ই কামনা পূরণ করে নষ্ট হয়ে যায়।

সাংসারিক ভোগোপকরণ তো প্রাপ্ত হওয়াই প্রয়োজন, কারণ তাতেই সুখ পাওয়া যায়। জগতে এমন কোনো প্রাণী নেই যে ভোগ্যপদার্থ কামনা করে না ; যে মানুষ ভোগ কামনা করে না, তার জীবনই ব্যর্থ—এই ধারণা নিয়ে ভোগ্যপদার্থের কামনা পূরণে ব্যাপৃত থাকাই হল 'কাম'-কে ধারণ করা।

অর্থ ছাড়া জগতে কোনো কাজই হয় না ; অর্থ দ্বারাই ধর্ম হয়, যদি অর্থ না থাকে তাহলে মানুষ ধর্ম করতে পারে না ; ধর্মের যে অনুষ্ঠান করা হয়, তা অর্থ দ্বারাই করা সম্ভব হয়। আজ পর্যন্ত যত মানুষকে বড় বলা হয়, তারা সবাই অর্থের সাহায্যেই বড় হয়েছে, অর্থ হলে লোকে সম্মান করে ; যার অর্থ নেই, সংসারে কেউ তার খবর নেয় না, সুতরাং অধিক অর্থ উপার্জন করা উচিত—এইরূপ অর্থের মধ্যে ডুবে থাকাকেই বলা হয় 'অর্থ'-কে ধারণ করা। সংসারে অত্যন্ত আসক্তি হওয়ায় রাজস ব্যক্তি শাস্ত্র মর্যাদা অনুসারে যা কিছু শুভকর্ম করেন, তাতে তাঁর এই কামনা থাকে যে, এইসব কর্মের দ্বারা তিনি যেন ইহলোকে সুখ, আরাম, মান, সম্মান পান এবং পরলোকে সুখভোগ হয়। এরূপ ফলাকাঙ্ক্ষী এবং সংসারে অত্যন্ত আসক্তিযুক্ত মানুষের ধারণ-শক্তিও রাজসী হয়ে থাকে।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—পরবর্তী শ্লোকে তামসী ধৃতির লক্ষণ জানিয়েছেন।

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী॥ ৩৫ ॥

[**পার্থ!** (হে পার্থ!) ; **দুর্মেধাঃ** (দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি) ; **যয়া, স্বপ্নম্** (যে ধৃতির দ্বারা নিদ্রা) ; **ভয়ম্, শোকম্, বিষাদম্** (ভয়, চিন্তা, দুঃখ) ; **চ, মদম্, এব** (এবং অহংকারকেও) ; **ন, বিমুঞ্চতি** (ত্যাগ করতে পারে না) ; **সা** (তা হল) ; **ধৃতিঃ, তামসী** (তামসী ধৃতি ।)]

হে পার্থ ! দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি যে ধৃতির দ্বারা নিদ্রা, ভয়, চিন্তা, দুঃখ এবং অহংকার ত্যাগ করতে পারে না (অর্থাৎ এই সবে আবদ্ধ থাকে) তা হল তামসী ধৃতি॥ ৩৫ ॥

ব্যাখ্যা—'**যয়া স্বপ্নং ভয়ং ...... সা পার্থ তামসী**'—তামসী ধারণ-শক্তিতে মানুষ অত্যন্ত নিদ্রা, বাহ্যান্তরিক ভয়, চিন্তা, দুঃখ, অহংকার—এগুলি পরিত্যাগ করতে পারে না, বরং এতেই আবদ্ধ হয়ে থাকে। সে কখনো অত্যন্ত নিদ্রাকাতর হয়ে থাকে, কখনো মৃত্যু, রোগ, নিন্দা, অপমান, স্বাস্থ্য, অর্থ ইত্যাদির ভয়ে ভীত হয়, কখনো শোকে নিমজ্জিত থাকে, কখনো দুঃখে বিষাদগ্রস্ত থাকে আবার কখনো অনুকূল পদার্থ পেয়ে অহংকারে মত্ত হয়।

নিদ্রা, ভয়, শোক ছাড়াও প্রমাদ, অহংবোধ, দম্ভ, দ্বেষ, ঈর্ষা ইত্যাদি অবগুণ এবং হিংসা, অপরের ক্ষতি করা, অন্যকে কষ্ট দেওয়া, যে কোনো উপায়ে অপরের ধন অপহরণ করা ইত্যাদি দুরাচারগুলিকেও '**এব চ**' পদের অন্তর্গত ধরে নিতে হবে।

এইরূপ নিদ্রা, ভয় ইত্যাদি এবং দুর্গুণ-দুরাচারকে যারা আশ্রয় করে থাকে, তাদের ধৃতি তামসী হয়।

ভগবান তেত্রিশ-চৌত্রিশতম শ্লোকে '**ধারয়তে**' পদের দ্বারা সাত্ত্বিক ও রাজস ব্যক্তির ক্রমশঃ সাত্ত্বিকী এবং রাজসী ধৃতিকে ধারণ করার কথা বলেছেন ; কিন্তু এখানে তামস ব্যক্তির তামসী ধৃতিকে ধারণ করার কথা বলেননি। এর কারণ হল ; যে ব্যক্তি অত্যন্ত দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন, যার বুদ্ধিতে অজ্ঞতা, মূঢ়তা পূর্ণমাত্রায় রয়েছে, এরূপ মলিন অন্তঃকরণবিশিষ্ট তামস ব্যক্তি নিদ্রা, ভয়, শোকাদি পরিত্যাগ করতে পারে না। সে স্বাভাবিকভাবে তাতেই ডুবে থাকে।

সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী ধৃতির বর্ণনাতে রাজসী ও তামসী ধৃতিতে যথাক্রমে '**ফলাকাঙ্ক্ষী**' এবং '**দুর্মেধাঃ**' পদ দ্বারা কর্তার উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু সাত্ত্বিকী ধৃতিতে কর্তার উল্লেখই করা হয়নি, কারণ সাত্ত্বিকী ধৃতিতে কর্তা নির্লিপ্ত থাকেন অর্থাৎ তাঁর মধ্যে কর্তৃত্বের লেশমাত্র থাকে না। কিন্তু রাজসী ও তামসী ধৃতিতে কর্তা লিপ্ত হয়।

বিশেষ কথা

মানুষ হল বিবেকপ্রধান, সে যা কিছু করে তা বিচার-

বিবেচনা করেই করে। সে যখনই বিচারপূর্বক কাজ করে, তখনই তার বিবেক আরও বেশি স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়। সাত্ত্বিক ব্যক্তির ধৃতিতে (ধারণশক্তিতে) এই বিবেক পরিষ্কারভাবে প্রকটিত হয় যে তাঁকে শুধুমাত্র পরমাত্মার দিকেই অগ্রসর হতে হবে। রাজস ব্যক্তির ধৃতিতে সাংসারিক পদার্থ ও ভোগের আসক্তির প্রাধান্য থাকায় বিবেক তত পরিস্ফুট হয় না ; তবুও ইহলোকে সুখ-আরাম, মান-সম্মান প্রাপ্ত হবে এবং পরলোকে সদ্গতি হবে, ভোগপ্রাপ্তি হবে—এই বিষয়ে বিবেক কাজ করে এবং তার আচরণও মর্যাদা অনুযায়ী হয়। কিন্তু তামস ব্যক্তির ধৃতিতে বিবেক একেবারে সুপ্ত থাকে। তামস ভাবে তার এত দৃঢ়তা হয় যে তার সেই ভাব ধারণ করার কোনো প্রয়োজনই মনে হয় না। সে তো নিদ্রা, ভয় ইত্যাদি তামস ভাবেই বিভোর হয়ে থাকে।

ক্রিয়া পরমার্থ মার্গে তত কাজ করে না, যত নিজ উদ্দেশ্য (লক্ষ্য) কাজ করে। স্থূল ক্রিয়ার প্রাধান্য স্থূল-শরীরে, চিন্তার প্রাধান্য সূক্ষ্ম-শরীরে, এবং স্থৈর্যের প্রাধান্য হয় কারণ-শরীরে, এগুলি সবই ক্রিয়া। 'ক্রিয়া শরীরে হয়, কিন্তু আমাকে কেবলমাত্র পারমার্থিক মার্গে চলতে হবে'—এইরূপ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য থাকে স্ব-স্বরূপেই (চেতন স্বরূপেই)। স্ব-স্বরূপের লক্ষ্য যেমন হয়, সেই অনুসারে ক্রিয়াও স্বতঃই হয়ে থাকে। স্বয়ং-এর যে লক্ষ্য তাতে কখনো পরিবর্তন হয় না। সেই লক্ষ্যের দৃঢ়তার জন্য সাত্ত্বিকী বুদ্ধির প্রয়োজন এবং বুদ্ধির দৃঢ়তা অটল রাখার জন্য সাত্ত্বিকী ধৃতির প্রয়োজন হয়। তাই এখানে ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ শ্লোক পর্যন্ত মোট ছটি শ্লোকে ছবার 'পার্থ' সম্বোধন করে ভগবান সাধকদের প্রতিনিধিরূপে অর্জুনকে উদ্বুদ্ধ করে বলেছেন, 'হে পার্থ ! লৌকিক বস্তু বা ব্যক্তির কথা চিন্তা না করে নিজ লক্ষ্য দৃঢ়তার সঙ্গে ধারণ করে থাকো। তোমার মধ্যে যাতে কখনো রাজস-তামস ভাবের উদয় না হয়—তার জন্য সর্বদা সজাগ থাকো।'

পরিশিষ্ট-ভাব—নিদ্রা, ভয়, চিন্তা, দুঃখ, অহংকার ইত্যাদি দোষ তো থাকবেই, এগুলি দূর করা সম্ভব নয়— যেসব ব্যক্তি এরূপ ভাব নিশ্চিত করে নেয় তারা হল 'দুর্বুদ্ধি সম্পন্ন' ব্যক্তি। এইসব ব্যক্তি দোষগুলি পরিত্যাগ করার কথা ভাবে না এবং পরিত্যাগ করার সাহসও তাদের থাকে না, তারা উল্টে এগুলিকে স্বাভাবিক বলেই জ্ঞান করে।

অতি-নিদ্রাও প্রতিবন্ধক হয়। প্রয়োজনীয় আবশ্যক নিদ্রা বাধাস্বরূপ হয় না (গীতা ৬।১৬।১৭)।

* * *

সম্বন্ধ—সুখভোগের জন্যই মানুষ কর্মে প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ কর্মসংগ্রহের হেতু হল সুখ। তাই পরবর্তী চারটি শ্লোকে ভগবান সুখের ভেদগুলি জানাচ্ছেন।

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি॥ ৩৬ ॥
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্॥ ৩৭ ॥

[ভরতর্ষভ (হে ভরতবংশ-শ্রেষ্ঠ অর্জুন !) ; **ইদানীম্, ত্রিবিধম্** (এবার তিন প্রকার) ; **সুখম্, তু** (সুখের বিষয়) ; **মে, শৃণু** (আমার কাছ থেকে শোনো) ; **যত্র, অভ্যাসাৎ** (যে অভ্যাসে) ; **রমতে, চ** (সুখ লাভ হয় এবং) ; **দুঃখান্তম্, নিগচ্ছতি** (দুঃখের অন্ত হয়) ; **তৎ, আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্** (এরূপ পরমাত্মবিষয়ক বুদ্ধির প্রসন্নতায়) ; **যৎ, সুখম্** (যে সুখ) ; **অগ্রে, বিষম্, ইব** (যা প্রথমে বিষবৎ) ; **পরিণামে, অমৃতোপমম্** (পরে অমৃততুল্য) ; **তৎ, প্রোক্তম্** (তাকে বলা হয়) ; **সাত্ত্বিকম্** (সাত্ত্বিক সুখ।)]

হে ভরতবংশ-শ্রেষ্ঠ অর্জুন ! এবার তুমি তিন প্রকার সুখের বিষয় আমার কাছ থেকে শোনো। যে অভ্যাসে মানুষ ক্রমে ক্রমে সুখ লাভ করে এবং দুঃখের অন্ত হয় এরূপ পরমাত্ম-বিষয়ক বুদ্ধির প্রসন্নতা থেকে উদ্ভূত যে সুখ (সাংসারিক আসক্তির জন্য), যা প্রথমে বিষবৎ এবং পরে অমৃততুল্য হয়,

তাকে বলা হয় সাত্ত্বিক সুখ॥ ৩৬-৩৭ ॥

ব্যাখ্যা—**'ভরতর্ষভ'**—এই সম্বোধন করাতে ভগবানের এই ভাব প্রকটিত হয় যে ভরতবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ অর্জুন ! তুমি রাজস-তামস সুখে লুব্ধ বা মোহিত হওয়ার যোগ্য নও। কারণ তোমার পক্ষে রাজস-তামস সুখ জয় করা কোনো কঠিন ব্যাপার নয়। তুমি রাজস সুখও জয় করেছ, কারণ স্বর্গের উর্বশীর মতো সুন্দরী অপ্সরাকেও ফিরিয়ে দিয়েছ। তেমনই তুমি তামস-সুখও জয় করেছ ; কেন-না প্রাণীমাত্রেরই আবশ্যকীয় নিদ্রায় যে তামস সুখ, তাকে তুমি জয় করেছ। তাই তোমার নাম হয়েছে **'গুড়াকেশ'**।

'সুখং তু ইদানীম্'—জ্ঞান, কর্ম, কর্তা, বুদ্ধি এবং ধৃতির তিন প্রকার পার্থক্য জানিয়ে এখানে 'তু' পদটি প্রয়োগ করে ভগবান বলেছেন যে, সুখও তিন প্রকারের। **এতে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার ব্যাপার হল এই যে, পারমার্থিক মার্গের যত সাধক আছেন, সেই সাধকদের উচ্চ স্থিতি লাভ না হওয়া অথবা পরমাত্মতত্ত্ব অনুভূত না হওয়ায় প্রধান প্রতিবন্ধক হল জাগতিক সুখের আকাঙ্ক্ষা।**

সাত্ত্বিক সুখও আসক্তিবশতঃ বন্ধনকারক হয়ে ওঠে। তাৎপর্য হল এই যে যদি সাধনকালে ধ্যান ও একাগ্রতার সুখও গ্রহণ করা হয়, তবে সেটিও বন্ধনকারক হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, সমাধি-সুখ আস্বাদন করলেও সেটি পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তির পথে প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে—**'সুখসঙ্গেন বধ্নাতি'** (গীতা ১৪।৬)। এই ব্যাপারে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন যে, তাহলে কী পরমাত্মতত্ত্বজনিত সুখ এলেও তা গ্রহণ করব না ? প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মতত্ত্ব থেকে সুখ নেওয়া হয় না, সেই অক্ষয় সুখ স্বতঃই অনুভূত হয় (গীতা ৫।২১ ; ৬।২১, ২৮)। সাধনজনিত সুখভোগ না করলে সেই অক্ষয় সুখ স্বতঃই স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্ত হয়। সেই অক্ষয় সুখের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করাবার জন্যই ভগবান এখানে 'তু' পদটি প্রয়োগ করেছেন।

এখানে **'ইদানীম্'** বলার অর্থ হল এই যে অর্জুন সন্ন্যাস এবং ত্যাগের তত্ত্ব জানতে চেয়েছিলেন ; তাই তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তরে ভগবান ত্যাগ, জ্ঞান, কর্ম, কর্তা, বুদ্ধি ও ধৃতির তিনটি করে পার্থক্যের কথা জানিয়েছেন। কিন্তু এই সবকিছুর লক্ষ্য থাকে সুখেরই প্রতি। তাই ভগবান বলেছেন যে, তুমি সেই লক্ষ্যের সিদ্ধির জন্য সুখের বিভাগগুলি শোনো।

'ত্রিবিধং শৃণু মে'—লোকে দিনরাত রাজস ও তামস সুখে মগ্ন থাকে এবং তাকেই প্রকৃত সুখ বলে মনে করে। সেইজন্যই 'জাগতিক ভোগের ঊর্ধ্বে কোনো সুখ পাওয়া যেতে পারে', 'রাজস ও তামস সুখের পরেও আর কোনো সুখ থাকতে পারে' 'রাজস ও তামস সুখের পরেও যে সাত্ত্বিক সুখ হতে পারে'—এইসব কথা তাদের বোধের বাইরে থাকে। তাই ভগবান বলেছেন, হে অর্জুন ! সুখ তিন প্রকারের, সেগুলি তুমি আমার কাছ থেকে শুনে সাত্ত্বিক সুখ গ্রহণ করো আর রাজস ও তামস সুখ পরিত্যাগ করো। কারণ সাত্ত্বিক সুখ পরমাত্মার দিকে পরিচালিত করে এবং রাজস ও তামস সুখ সংসারে আবদ্ধ করে পতন ঘটায়।

'অভ্যাসাদ্ রমতে যত্র'—অভ্যাসের দ্বারা মানুষ ক্রমশঃ সাত্ত্বিক সুখ লাভ করে। সাধারণ ব্যক্তিরা অভ্যাস ব্যতীত এই সুখ অনুভব করতে পারে না। রাজস ও তামস সুখে অভ্যাসের কোনো প্রয়োজন নেই। সেগুলিতে প্রাণীমাত্রেরই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থাকে।

রাজস-তামস সুখে ইন্দ্রিয়াদির বিষয়ের দিকে, মন-বুদ্ধির ভোগ-সংগ্রহের দিকে এবং নিদ্রা ও আলস্যের দিকে স্বতঃই আকর্ষণ থাকে। বিষয়জনিত, অহংকার-জনিত, প্রশংসাজনিত ও নিদ্রাজনিত সুখ সকল প্রাণীরই স্বাভাবিকভাবে ভালো লাগে। কুকুর ইত্যাদি ইতর প্রাণীকেও আদর করলে, তারা খুশি হয় আর অবহেলা করলে অসন্তুষ্ট হয়, দুঃখিত হয়। তাৎপর্য হল এই যে রাজস ও তামস সুখে অভ্যাসের কোনো প্রয়োজন নেই ; কেন-না সকল প্রাণীই এই সুখ অন্যান্য যোনি থেকে আস্বাদন করে এসেছে।

সাত্ত্বিক সুখের জন্য অভ্যাস কেমন ? শ্রবণ-মনন করাও অভ্যাস, শাস্ত্রকে বোঝাও অভ্যাস আবার রাজসী বা তামসী বৃত্তিগুলি দূর করাও অভ্যাস। যে রাজস ও তামস সুখে প্রাণীমাত্রেরই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থাকে, তা ব্যতীত অন্য নতুন প্রবৃত্তি করাকেই বলা হয় 'অভ্যাস'। সাত্ত্বিক সুখে অভ্যাস করা আবশ্যক হলেও রমণ করায় বাধা আছে।

এখানে **'অভ্যাসাদ্ রমতে'** পদটির মানে সাত্ত্বিক সুখ ভোগ করা নয়, বরং সাত্ত্বিক সুখের অভ্যাসেই

রুচি, আকর্ষণ, প্রবৃত্তি ইত্যাদিই এখানে রমণ শব্দে বলা হয়েছে।

'দুঃখান্তং চ নিগচ্ছতি'—এই সাত্ত্বিক সুখে যেমন যেমন রুচি ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পেতে থাকে, তেমনই পরিণামে দুঃখ নাশ হতে থাকে এবং প্রসন্নভাব, সুখ ও আনন্দ বৃদ্ধি পেতে থাকে (গীতা ২।৬৫)।

'চ' অব্যয়টি ব্যবহারের অর্থ হল, যতক্ষণ পর্যন্ত সাত্ত্বিক সুখে রমণ হবে অর্থাৎ সাধক সাত্ত্বিক সুখ গ্রহণ করতে থাকবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত দুঃখের আত্যন্তিক অভাব ঘটবে না। কারণ সাত্ত্বিক সুখও পরমাত্ম-বিষয়ক বুদ্ধির প্রসন্নতা থেকে উদ্ভূত—**'আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্'**। যা উৎপন্ন হয়, তার অবশ্যই নাশ হয়। এরূপ সুখের থেকে কী করে দুঃখের অন্ত হয়? তাই সাত্ত্বিক সুখেও আসক্ত হওয়া উচিত নয়। সাত্ত্বিক সুখেরও ঊর্ধ্বে উঠলে মানুষের দুঃখের অন্ত হয়, মানুষ গুণাতীত হয়।

'আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্'—যে বুদ্ধিতে জাগতিক মান-মর্যাদা, ধন সংগ্রহ, বিষয়জনিত সুখ ইত্যাদির কোনো গুরুত্ব থাকে না, শুধুমাত্র পরমাত্ম-বিষয়ক চিন্তাই থাকে, সেই বুদ্ধির প্রসন্নতা (গীতা ২।৬৪) অর্থাৎ স্বচ্ছতা থেকেই সাত্ত্বিক সুখ উৎপন্ন হয়। তাৎপর্য হল এই যে জাগতিক সংযোগজনিত সুখ থেকে সর্বতোভাবে উপরত হয়ে পরমাত্মায় বুদ্ধি লীন হলে যে সুখ হয়, তাকেই বলে সাত্ত্বিক সুখ।

'যত্তদগ্রে বিষমিব'—এখানে **'যত্তৎ'** কথাটির অর্থ হল **'যৎ'**—যা সাত্ত্বিক সুখ ; **'তৎ'**—এটি হল পরোক্ষ অর্থাৎ তা এখনও অনুভূত হয়নি। এখন শুধু সেই সুখের উদ্দেশ্য করা হয়েছে আর রাজস ও তামস সুখ এখনই অনুভূত হচ্ছে। তাই এখন অনুভব করা রাজস ও তামস সুখ ত্যাগে কষ্ট হয় এবং লক্ষ্যরূপে যে সাত্ত্বিক সুখ থাকে, তা লাভ করার জন্য যে নীরস পরিশ্রম বা অভ্যাস তা বিষবৎ লাগে—**'অগ্রে বিষমিব'**। অর্থাৎ বর্তমানে অনুভব করা রাজস ও তামস সুখ ত্যাগ করে, সাত্ত্বিক সুখের উদ্দেশ্য করলেও তা তখনই প্রাপ্ত করা যায় না, রসও তখনই মেলে না ; তাই সাত্ত্বিক সুখ লাভের চেষ্টা বিষবৎ প্রতীত হয়।

রাজস ও তামস সুখ বহু জন্ম ধরে ভোগ করা হয়েছে এবং এই জন্মেও ভোগ করা হয়। সেই ভোগের সুখ-স্মৃতি থাকায় রাজস ও তামস সুখে স্বভাবতঃই মন আকৃষ্ট হয়। কিন্তু সাত্ত্বিক সুখ তত ভোগ করা হয়নি ; তাই তাতে শীঘ্র মন আকর্ষিত হয় না, সেইজন্যই সাত্ত্বিক সুখের আয়াস বিষের মতো লাগে।

সাত্ত্বিক সুখ আসলে বিষের মতো নয়, রাজস ও তামস সুখ ত্যাগ করতেই প্রকৃতপক্ষে বিষের মতো লাগে। যেমন, শিশুকে খেলাধুলো ত্যাগ করে পড়তে বসালে তার যেমন পড়াশুনাকে খারাপ লাগে ! পড়াতে তার মন বসে না আবার খেলাধুলোও করতে পারে না, ফলে তার তখন পড়াকে বিষবৎ মনে হয়। কিন্তু সে যদি পড়াশুনা চালিয়ে যায় এবং দু-একটি পরীক্ষায় পাস করে তখন তার পড়ায় মন বসে অর্থাৎ পড়াশুনা ভালো লাগে এবং তাতে রুচি ও ভালোবাসা জন্মায়।

প্রকৃতপক্ষে সাত্ত্বিক সুখের প্রয়াস তাদেরই কাছে আরম্ভে বিষবৎ লাগে, যাদের রাজস এবং তামস সুখে আসক্তি থাকে। কিন্তু যাঁদের সাংসারিক ভোগে স্বাভাবিক বৈরাগ্য থাকে, যাঁদের পারমার্থিক শাস্ত্রাধ্যয়ন, সৎসঙ্গ, কথা-কীর্তন, সাধন-ভজন ইত্যাদিতে স্বাভাবিক রুচি থাকে এবং যাঁদের জ্ঞান, কর্ম, বুদ্ধি ও ধৃতি সাত্ত্বিক, সেইসব সাধকের এই সাত্ত্বিক সুখ আরম্ভ থেকেই অমৃতের ন্যায় আনন্দ প্রদানকারী হয়। তাঁদের এতে কষ্ট, পরিশ্রম কিছুই মনে হয় না।

'পরিণামেঽমৃতোপমম্'—সাধন করলে সাধকের সত্ত্বগুণ বাড়ে। সত্ত্বগুণে ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণে স্বচ্ছতা, নির্মলতা, জ্ঞানের দীপ্তি, শরীরে নির্বিকার ভাব এইসব সদ্ভাব-সদ্‌গুণ প্রকটিত হয়[১]। এই সদ্‌গুণ প্রকটিত হওয়াই হল সাত্ত্বিক সুখের পরিণাম অমৃতের মতো হওয়া। এগুলি উপভোগ না করলে অর্থাৎ এর থেকে রস গ্রহণ না করলেই প্রকৃত অক্ষয় সুখ লাভ হয় (গীতা ৫।২১)।

পরিণামে সাত্ত্বিক সুখ রাজস ও তামস সুখ থেকে উত্তরণ করে জড়ত্বের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করায় এবং এই সাত্ত্বিক সুখেও যদি আসক্তি না রাখা হয় তাহলে পরিণামে পরমাত্মাপ্রাপ্তি হয়। তাই এটি পরিণামে অমৃত তুল্য হয়।

---

[১] সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—এই তিনটি অন্তঃকরণে অমূর্তরূপে (অপ্রকটরূপে) থাকে। বৃত্তির সাহায্যেই এগুলি জানা যায়, যেগুলি চতুর্দশ অধ্যায়ের একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে।

'তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তম্'—সৎসঙ্গ, স্বাধ্যায়, সংকীর্তন, জপ, ধ্যান, চিন্তন ইত্যাদিতে যে সুখ হয়, তা মান-সম্মান, আরাম, অর্থ, ভোগ ইত্যাদির মতো বিষয় ও ইন্দ্রিয়াদির সংযোগজনিত নয় এবং প্রমাদ, আলস্য, নিদ্রারও নয়। তা হল পরমাত্মার সম্বন্ধ থেকে উৎপন্ন। তাই একে বলা হয়েছে সাত্ত্বিক সুখ।

পরিশিষ্ট-ভাব—চতুর্দশ অধ্যায়ে সাত্ত্বিক সুখকে বন্ধনকারক বলে জানানো হয়েছিল—**'সুখসঙ্গেন বধ্নাতি'** (১৪।৬), কিন্তু এই স্থানে তাকে দুঃখ নাশকারী বলা হয়েছে—**'দুঃখান্তং চ নিগচ্ছতি'**। এর তাৎপর্য হল যে সাত্ত্বিক সুখে রমণ (সুখভোগ) করলে তা বন্ধনকারী হয়ে ওঠে অর্থাৎ গুণাতীত হতে দেয় না। যদি সুখভোগ না করা হয়, তাহলে এই সাত্ত্বিকতা সুখ-দুঃখ নাশক হয়ে থাকে। সুখ ভোগ করলে দুঃখনাশ হয় না। ভোগ ত্যাগ করলেই যোগ হয়। তাই সাত্ত্বিক সুখেও আসক্তিরহিত হওয়া উচিত। আসক্তি থাকলেই বন্ধনকারক রজোগুণের উৎপত্তি হয়। সত্ত্বগুণে রজোগুণের আবির্ভাব হলেই পতন হয়।

বিবেক-বুদ্ধিকে গুরুত্ব না দেওয়ায় সাত্ত্বিক সুখের প্রয়াসকে প্রারম্ভে বিষবৎ মনে হয়। রাজসিক ব্যক্তি বিচার-বুদ্ধির মর্যাদা দেয় না। তাই সাত্ত্বিকতাকে প্রারম্ভে বিষবৎ মনে হয় এবং তা হল রাজসিকভাব। তাৎপর্য হল যে সাত্ত্বিক সুখ দুঃখদায়ক হয় না, কিন্তু মানুষের বুদ্ধিতে রাজসিকভাব থাকায় সাত্ত্বিক সুখ তার কাছে বিষময় বলে প্রতিভাত হয়। তার উদ্দেশ্য সাত্ত্বিক সুখ হলেও, অন্তরে রাজসিক ভাব বিদ্যমান থাকে।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—এরপর রাজস সুখের বর্ণনা করেছেন।

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্॥ ৩৮ ॥

[**যৎ, সুখম্** (যে সুখ) ; **বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ** (ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংযোগবশতঃ) ; **তৎ, অগ্রে, অমৃতোপমম্** (প্রথমে অমৃতের ন্যায়) ; **পরিণামে, বিষম্, ইব** (পরিণামে বিষতুল্য) ; **তৎ, রাজসম্** (তাকে রাজস সুখ) ; **স্মৃতম্** (বলা হয়।)]

যে সুখ ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংযোগবশতঃ প্রথমে অমৃতের ন্যায় এবং পরিণামে বিষতুল্য, তাকে বলা হয় রাজস সুখ ॥ ৩৮ ॥

ব্যাখ্যা—'বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ'—বিষয় ও ইন্দ্রিয়াদির সংযোগে যে সুখ হয় তার জন্য অভ্যাস করার প্রয়োজন হয় না। কারণ প্রাণী যে যোনিতেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, সেখানেই তার বিষয় ও ইন্দ্রিয়াদি জনিত সুখ প্রাপ্তি হয়। শব্দ, স্পর্শ ইত্যাদি পাঁচটি বিষয়ের সুখ পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদি সকল প্রাণীই পেয়ে থাকে। তাই সেই সুখে প্রাণীমাত্রেরই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থাকে। মানুষের জীবনেও শিশুকাল থেকে লক্ষ্য করা যায় যে অনুকূল অবস্থায় সন্তুষ্টি ও প্রতিকূল অবস্থায় অসন্তুষ্টি স্বাভাবিকভাবে আসে। তাই রাজস সুখে অভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা থাকে না।

'যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্'—রাজস সুখকে আরম্ভে অমৃতের ন্যায় বলার অর্থ হল এই যে সাংসারিক বিষয় প্রাপ্তির সম্ভাবনাতে মনে যত সুখ হয়, তত সুখ, আনন্দ এবং সন্তোষ বিষয় প্রাপ্ত হয়ে গেলে আর থাকে না। পাওয়া গেলেও শুরুতে (সংযোগ হলেই) যে সুখ হয়, কিছু পরে আর সেই সুখবোধ থাকে না। সেই বিষয় ভোগ করতে করতে যখন ভোগ করার ক্ষমতা ক্ষীণ হয়ে আসে, তখন আর সুখ হয় না, বরং বিষয় ভোগে অরুচি হয়ে যায়। ভোগ করার শক্তি ক্ষীণ হলেও যদি বিষয় ভোগ করা হয় তাহলে দুঃখ, জ্বালা উৎপন্ন হয়, চিত্তে সুখ থাকে না, তাই রাজস সুখ আরম্ভে অমৃতের মতো মনে হয়।

অমৃতের মতো বলার অন্য অর্থ হল এই যে, মন যখন বিষয়ের দিকে আকর্ষিত হয়, তখন সেই বিষয়টিকে মন অত্যন্ত প্রিয় বলে ভাবে। বিষয় ও ভোগের কথা শুনতে যত ভালো লাগে, তত ভোগ করাতে নয়। তাই গীতায় বলা

হয়েছে—**'যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্য-বিপশ্চিতঃ'** (২।৪২) ; রাজস ব্যক্তি স্বর্গাদি ভোগের কথা শুনলে, সেই সুখও তার অত্যন্ত প্রিয় লাগে ; কিন্তু স্বর্গে যাবার পর সেই সুখভোগে আর তত আনন্দ লাগে না, তত প্রিয়ও মনে হয় না।

'পরিণামে বিষমিব'—আরম্ভে বিষয়কে খুব সুন্দর সুখপ্রদ মনে হয় ; কিন্তু সেগুলি ভোগ করতে করতে যখন তা নীরস হয়ে ওঠে, তখন সেই সুখে অরুচি হয়, সেই সুখকেই তখন বিষের মতো মনে হয়।

জগতে যত প্রাণী জেল খাটছে, যত প্রাণী চুরাশী লক্ষ যোনি ও নরকে পতিত আছে, তা সবই বিষয় ভোগের জন্য। সেটি হল বিষয় থেকে সুখ গ্রহণের পরিণাম। তার জন্যই তারা এই বন্ধন, নরক ইত্যাদি দুঃখ ভোগ করছে। কারণ রাজস সুখের পরিণামই হল দুঃখ—**'রজসস্তু ফলং দুঃখম্'** (গীতা ১৪।১৬)।

বর্তমানেও মানুষ যে ভয় পায়, দুঃখ অনুভব করে, তা সবই পদার্থে আসক্তির জন্যই। যে ব্যক্তি ধনলাভ করে পরে ধনহীন হন, তিনি যত দুঃখী এবং শোকগ্রস্ত হন, কোনো স্বাভাবিক নির্ধন ব্যক্তি তত দুঃখী বা শোকগ্রস্ত হন না, কেন-না তাঁর মনে সুখের ধারণা বেশি নেই। অপরপক্ষে ধনী ব্যক্তি রাজস সুখ বেশি পরিমাণে ভোগ করেছেন, তাই তাঁর মধ্যে সুখের ধারণা (সংস্কার) বেশি আছে, সেইজন্যই ধনের অভাব তাঁকে বেশি দুঃখ দেয়। যেমন, যে ব্যক্তি নানাপ্রকারের খাদ্যগ্রহণ করেন, তাঁর খাদ্যে যদি কখনো ব্যঞ্জনের ঘাটতি হয় তাহলে তার জন্য তাঁর খুব কষ্ট হয়, আজ খাদ্যে চাটনী নেই, মিষ্টি নেই, এটা-সেটা নেই—এইরূপ নেই-নেই বুলি লেগে থাকে। কিন্তু সাধারণ মানুষ শুকনো রুটি খেয়েও আনন্দে থাকে, তার খাদ্যে তাই কোনো কিছুর অভাব তাকে কষ্ট দেয় না। তাৎপর্য হল এই যে পদার্থের সংযোগে যত সুখ পাওয়া যায়, ততই তার অভাব অনুভূত হয়, তার জন্য দুঃখ হয়।

যে পদার্থের কামনা হয়, তা প্রাপ্তির জন্য মানুষ উদ্যোগ করে, চেষ্টা করে। চেষ্টা করলেও বস্তুটি পাওয়া যাবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে। বস্তুটি প্রাপ্ত না হলে তার অভাবে দুঃখ হয় আর প্রাপ্তি ঘটলে আরও বেশি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা হয়। এইভাবে ইচ্ছাপূর্তির দ্বারা নতুন ইচ্ছা সৃষ্টি হয়, পরে ইচ্ছাপূরণ ও আবার ইচ্ছার উৎপত্তি—এইভাবে চক্রাকারে অতৃপ্তি চলতে থাকে, যার কখনো শেষ হয় না। তাৎপর্য হল এই যে আকাঙ্ক্ষার কোনো শেষ নেই এবং আকাঙ্ক্ষার অভাব দুঃখদায়ক হয়। এই অভাবই বিষের ন্যায় দুঃখ প্রদান করে।

রাজস সুখ যদি বিষের মতো হয়, তাহলে যাঁরা রাজস সুখ ভোগ করেন, তাঁদের সকলের তো সুখভোগের শেষে মৃত্যু হওয়া উচিত ? কিন্তু রাজস সুখের সুখ সেভাবে মৃত্যু ঘটায় না, এটি বিষের মতো অরুচিকর হয়ে ওঠে। প্রথমে রাজস সুখে যেমন রুচি, তৃপ্তি থাকে, শেষে আর তেমন তৃপ্তি থাকে না, সুখ বিষবৎ হয়ে যায়, একেবারে সাক্ষাৎ বিষ হয় না।

রাজস সুখ কেন বিষের মতো হয় ? কারণ বিষে এক জন্মেই মৃত্যু হয়, কিন্তু রাজস সুখ জন্ম-জন্ম ধরে মৃত্যু ঘটায়। রাজস সুখ গ্রহণকারী আসক্ত ব্যক্তি যদি শুভ কর্ম করে স্বর্গেও যান, তাহলে সেখানেও তাঁর সুখ, শান্তি জোটে না। স্বর্গে গিয়েও তাঁর থেকে উচ্চশ্রেণীভুক্ত মানুষদের দেখে ঈর্ষা অনুভব করেন যে, এরা কেন আমার থেকে উচ্চে অবস্থিত। সমপর্যায়ভুক্তদের দেখে দুঃখিত হয়ে মনে করেন, এরা কী করে আমার সমপর্যায়ভুক্ত হল! আর নিম্ন শ্রেণীভুক্তদের দেখে অহংবোধে ভাবতে থাকেন যে, আমি এদের থেকে উচ্চে অবস্থিত ! এইরূপ তাঁদের মনে ঈর্ষা-দুঃখ-অহং-অভিমান হতেই থাকে, তাহলে তাঁদের মনে সুখই কোথায় আর শান্তিই বা কোথায় ? শুধু তাই নয়, পুণ্য ক্ষীণ হলে তাঁদের পুনরায় ইহজগতে আসতে হয়—**'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি'** (গীতা ৯।২১)। ইহজগতে এসে আবার শুভ-কর্ম করে স্বর্গে যান। এইভাবে তাঁরা জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হতে থাকেন—**'গতাগতং কামকামা লভন্তে'** (৯।২১)। যদি তাঁরা আসক্তিবশতঃ পাপকর্মে ব্যাপৃত হন, তাহলে পরিণামে চুরাশী লক্ষ যোনি এবং নরকে গমন করে, না জানি কত জন্ম তাঁদের জন্ম-মরণ চক্রে আবর্তিত হতে হবে ! সেইজন্যই এই সুখকে বিষবৎ বলা হয়েছে।

'তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্'—সাত্ত্বিক সুখের কথা (সাঁইত্রিশতম শ্লোকে) **'প্রোক্তম্'** পদে বলা হয়েছে, কিন্তু রাজস সুখের কথায় এইস্থানে **'স্মৃতম্'** পদটি বলার তাৎপর্য হল এই যে মানুষ আগেও রাজস সুখের ফল

হিসাবে দুঃখভোগ করেছে, কিন্তু আসক্তিবশতঃ সে পুনরায় সংযোগের দিকে লালায়িত হয়ে উঠেছে। কারণ তার ওপর সংযোগের প্রভাব রয়েছে এবং সে পরিণামের প্রভাবকে স্বীকার করে না। যদি সে পরিণামের কথা চিন্তা করে, তাহলে সে আর এই রাজস সুখের ফাঁদে পড়ে না। স্মৃতি, শাস্ত্র, পুরাণাদিতে এমন বহু ঘটনার উল্লেখ আছে, যাতে মানুষ রাজস সুখের জন্য যে কত দুঃখ পেয়েছে, তা বলা আছে। সেই কথা স্মরণ করানোর জন্যই **'স্মৃতম্'** পদটি উল্লিখিত হয়েছে।

যাঁদের বৃত্তি যত সাত্ত্বিক, তাঁরা ততই বিষয়ের পরিণাম চিন্তা করেন। তাৎকালিক সুখের দিকে দৃষ্টি দেন না। কিন্তু রাজসী বৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি পরিণাম চিন্তা করেন না, তাঁদের বৃত্তি তাৎকালিক সুখের দিকে থাকে। তাই তাঁরা সংসারে আবদ্ধ হন। রাজস ব্যক্তির বর্তমান সাংসারিক সম্বন্ধ ভালো মনে হলেও পরিণামে তার পক্ষে ক্ষতিকারক হয়—**'যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে'** (গীতা ৫।২২)। সুতরাং সাধকের রাজস-সুখে আবদ্ধ না হয়ে, সংসারে-অনাসক্ত থাকা উচিত।

পরিশিষ্ট-ভাব—জাগতিক ভোগের সুখ প্রারম্ভে অমৃতের ন্যায় এবং পরিণামে বিষবৎ হয়ে থাকে। অবিবেচক ব্যক্তিরা আপাত অবস্থাকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আপাত অবস্থা বা আরম্ভ সর্বদা স্থায়ী হয় না, কিন্তু তার কামনা সর্বদা থেকে যায়, যা সকল দুঃখের কারণ। কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি আরম্ভের দিকে দৃষ্টিপাত না করে পরিণামের দিকে দৃষ্টি দেয়, তাই সে ভোগাদিতে আসক্ত হয় না। **'ন তেষু রমতে বুধঃ'** (গীতা ৫।২২)। **মানুষেরই পরিণাম বিচার করার যোগ্যতা থাকে। পরিণাম না দেখা হল পশুত্ব।**

আসলে আরম্ভ (সংযোগ) মুখ্য নয়, মুখ্য হল তার অন্ত (বিয়োগ)। মানুষ আরম্ভকেই চায়, কিন্তু তা থাকে না ; কারণ প্রত্যেক সংযোগই বিয়োগান্তক হয়ে থাকে—তাই হল নিয়ম। আরম্ভ অনিত্য কিন্তু অন্ত নিত্য। অনিত্যের সংযোগে দুঃখের উৎপত্তি। জগৎ-সংসার মাত্রেই বিয়োগ নিত্য। কিন্তু রাজসিক বৃত্তির জন্য সংযোগকে ভালো লাগে। মানুষ যদি প্রারম্ভের সুখকে গুরুত্ব না দেয় তাহলে দুঃখ কখনো আসতেই পারে না। আরম্ভে নজর দিলে ভোগ হয় আর পরিণামে দেখলে যোগ হয়।

সাংসারিক সংযোগে যে আপাত সুখ লাভ হয় তার সঙ্গে দুঃখ মিশ্রিত থাকে। কিন্তু তার বিয়োগে সুখ-দুঃখের অতীত এক অখণ্ড আনন্দের প্রাপ্তি হয়।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—এবার তামস সুখের কথা জানাচ্ছেন।

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ৩৯ ॥

[**নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থম্** (নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ থেকে উৎপন্ন) ; **যৎ, সুখম্** (যে সুখ) ; **অগ্রে, চ** (আরম্ভে এবং) ; **অনুবন্ধে, চ** (পরিণামেও) ; **আত্মনম্, মোহনম্** (মোহাচ্ছন্ন করে রাখে) ; **তৎ** (তাকে) ; **তামসম্, উদাহৃতম্** (তামস বলা হয়।)]

নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ (কর্তব্যবিস্মৃতি) থেকে উৎপন্ন যে সুখ আরম্ভে এবং পরিণামেও মোহাচ্ছন্ন করে রাখে, তাকে বলা হয় তামস সুখ ॥ ৩৯ ॥

ব্যাখ্যা—'নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং'—যখন আসক্তি অত্যধিক হয় তখন তা তমোগুণের রূপ ধারণ করে, তাকেই বলে মোহ। এই মোহের জন্যই মানুষের অধিক নিদ্রা যেতে ভালো লাগে। যারা অধিক নিদ্রা যায় তাদের গাঢ় নিদ্রা হয় না, নিদ্রা গাঢ় না হলে তন্দ্রা ও স্বপ্ন বেশি হয়। তন্দ্রা ও স্বপ্নে তামস ব্যক্তিদের অনেক সময় নষ্ট হয়। কিন্তু তারা তাতেই সুখ পায়, সেইজন্য এই সুখকে বলা হয় নিদ্রা হতে উৎপন্ন সুখ।

তমোগুণ যখন অত্যন্ত বেড়ে যায়, তখন বৃত্তিগুলি প্রবল হয়ে ওঠে এবং সে অবসাদগ্রস্ত হয়। প্রয়োজনীয় কাজ উপস্থিত হলেও সে বলে, 'পরে করব, এখন বিশ্রাম করছি।' এরূপ আলস্য-অবস্থাই তার কাছে সুখের বলে

মনে হয়। কিন্তু নিষ্কর্মা থাকায় তার ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণে শৈথিল্য আসে, মনে নানা রকম বাজে চিন্তা হতে থাকে আর অশান্তি, শোক, বিষাদ, চিন্তা, দুঃখ হতে থাকে।

তমোগুণ যখন আরও বৃদ্ধি পায়, তখন মানুষ প্রমাদে সময় কাটায়। প্রমাদ দুপ্রকারের হয়—নিষ্ক্রিয় প্রমাদ ও সক্রিয় প্রমাদ। ঘর-সংসার, শরীর ইত্যাদি সম্পর্কীয় আবশ্যক কর্ম না করে নিষ্কর্মা হয়ে থাকাকে বলা হয় 'নিষ্ক্রিয় প্রমাদ'[১]। অনর্থক কাজ করা (দেখা, শোনা, চিন্তা করা ইত্যাদি) ; বিড়ি, সিগারেট, মদ, তামাক, খেল্-তামাসা ইত্যাদি দুর্ব্যসনে মগ্ন থাকা এবং চুরি, ডাকাতি, মিথ্যাচার, বেইমানী, ব্যভিচার, অখাদ্য-ভক্ষণ ইত্যাদি দুরাচারে ব্যাপৃত থাকাকে বলা হয় 'সক্রিয় প্রমাদ'।

প্রমাদের জন্য তামস ব্যক্তিরা নিরর্থক সময় নষ্ট করে এবং ছল, কপট, বেইমানী এইসব করাতে সুখ পায়। যেমন, পয়সা (বেতন) পুরো নিয়ে নেয়, কিন্তু কাজ পুরো এবং সুচারুরূপে করে না। চিকিৎসকও রোগীদের ঠিকমতো চিকিৎসা করেন না, যার ফলে রোগীকে বারংবার পয়সা খরচ করে আসতে হয়। গোয়ালারা অধিক লাভের আশায় দুধে জল মেশায়, টাকা বেশি দিলেও তারা জল মেশানো বন্ধ করে না। এরূপ পাপ-প্রমাদে এদের ঘোর নরকে গমন করতে হয়।

তমোগুণী প্রমাদবৃত্তির যখন উদয় হয়, তখন তা সত্ত্বগুণের বিবেকবোধকে আবৃত করে এবং যখন তমোগুণের নিদ্রা-আলস্য বৃত্তি দেখা দেয় তখন তা সত্ত্বগুণের প্রকাশকে আবৃত করে রাখে। বিবেক আবৃত হলে প্রমাদ উৎপন্ন হয় আর প্রকাশ আবৃত হলে আলস্য, নিদ্রা ইত্যাদি আসে। তামস ব্যক্তিরা নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ—এই তিনটিতে সুখ পায়, তাই এই তিনটি থেকে তামস সুখ উৎপন্ন হয় বলে বলা হয়েছে।

বিশেষ কথা

নিদ্রা দুই প্রকারের—যুক্তনিদ্রা এবং অতিনিদ্রা।

(১) **যুক্তনিদ্রা**—নিদ্রায় বিশ্রাম পাওয়া যায়। বিশ্রামে শরীর, মন, বুদ্ধি, অন্তঃকরণে সুস্থতা, স্ফূর্তি, স্বচ্ছতা, নির্মলতা এবং সতেজতা আসে। সতেজ ভাব হলে সাধন-ভজনে ও সাংসারিক কাজকর্মে শক্তি ও উৎসাহ থাকে। তাই যুক্তনিদ্রা দূষণীয় নয়, বরং সকলের পক্ষেই এটি প্রয়োজনীয়। ভগবানও যুক্তনিদ্রাকে আবশ্যক বলে জানিয়েছেন—**'যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা'** (গীতা ৬।১৭)।

শুধু শারীরিক ও মানসিক সতেজতার জন্যই সাধকের নিদ্রার প্রয়োজন। যে সাধকের আসক্তি সহকারে সাংসারিক সংকল্প না হয়, তাঁর নিদ্রা অতি শীঘ্র আসে আর যিনি অত্যন্ত সংকল্পশীল, তাঁর নিদ্রা শীঘ্র আসে না। এতে প্রমাণ হয় যে, সংসারের সঙ্গে যে সম্পর্ক তা নিদ্রায় যে সুখ সেটিও উপভোগ করতে দেয় না। নিদ্রা কেন প্রয়োজন ? কারণ নিদ্রাতে যে স্থির তত্ত্ব থাকে,তা সাধকদের সাধনায় প্রবৃত্ত করতে এবং সাংসারিক কাজ করতে শক্তি যোগায়।

যদিও নিদ্রা তামসী, তবুও নিদ্রার বেহুঁশ ভাবটি পরিত্যাজ্য কিন্তু বিশ্রাম ভাবটি গ্রহণীয়। কিন্তু ব্যক্তি বেহুঁশ না হয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করতে সক্ষম হন না ; তাই তাঁদের নিদ্রার বেহুঁশ ভাবটিও গ্রহণ করতে হয়। তবে যাঁরা সাধনায় উচ্চাবস্থা লাভ করেছেন, তাঁরা নিদ্রায় বেহুঁশ না হয়েও জাগ্রত-সুষুপ্তিতে বিশ্রাম করেন। কারণ জাগ্রত-সুষুপ্তি অবস্থায় জগতের চিন্তা থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হয়ে পরমাত্মতত্ত্বে স্থিতি হয়, তাই এতে মহাবিশ্রাম ও সুখ পাওয়া যায় ; এই স্থিতিতেও আসক্তিশূন্য হলে, প্রকৃত তত্ত্ব প্রাপ্তি হয়।

যিনি সাধনা করেন, তাঁর বিশ্রামের জন্য ঘুমের প্রয়োজন নেই। তাঁর এই ভাব হওয়া উচিত যে প্রথমে কেবল কাজ-কর্ম করতে করতে ভগবদ্ভজন করতাম, এখন শুয়ে শুয়েও সাধনা করব।

(২) **'অতিনিদ্রা'**—সময়ে ঘুম ও সময়ে জাগরণকে বলা হয় যুক্তনিদ্রা ; আর অধিক ঘুমকে বলা হয় অতিনিদ্রা। অতিনিদ্রার আগে এবং পরে শরীর আলস্যে পূর্ণ থাকে। শরীরে ভারী-ভাব হয়ে থাকে। বেশি নিদ্রা যাওয়ার অভ্যাস থাকলে, সব কাজেই ঘুম পায়।

চতুর্দশ অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে ভগবান প্রথমে প্রমাদ, পরে আলস্য এবং তারপরে নিদ্রার কথা বলেছেন—

---

[১]আলস্য এবং নিষ্ক্রিয় প্রমাদ একরূপ দেখতে হলেও দুইয়ের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য থাকে। আলস্যে বৃত্তিগুলি ভারী হলে সুখবোধ হয় আর নিষ্ক্রিয় প্রমাদে কর্তব্য-কর্ম ত্যাগে সুখবোধ হয়।

'প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত'। কিন্তু এখানে প্রথমে নিদ্রা, পরে আলস্য এবং তারপরে প্রমাদের কথা আলোচনা করেছেন—**'নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থম্'**। এই ব্যতিক্রমের কারণ হল এই যে, প্রথমোক্ত স্থানে এই তিনটির দ্বারা মানুষের পতনের প্রসঙ্গ আছে। বন্ধনের ব্যাপারে প্রমাদ বা কর্তব্য-বিমুখতা সব থেকে বেশি বন্ধনকারক, তাই এটিকে সর্বপ্রথমে রাখা হয়েছে। কেন-না প্রমাদ নিষিদ্ধ কর্মে প্রবৃত্ত করায়, যার দ্বারা অধোগতি হয়। আলস্য শুধু সুপ্রবৃত্তিগুলি রোধ করে, তাই একে দ্বিতীয় স্থান দেওয়া হয়েছে। নিদ্রার প্রয়োজন থাকায় এটি বন্ধনকারক নয়, কিন্তু অতিনিদ্রা বন্ধনকারক ; তাই অতিনিদ্রাকে তারপরে রাখা হয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে এর বিপরীত ক্রম দেওয়ার অর্থ হল এই যে নিদ্রা সকলেরই প্রয়োজন হওয়ায় এটি তত বেশি পতনকারক নয়। নিদ্রার থেকে আলস্য বেশি পতন ঘটায় এবং আলস্যের থেকে প্রমাদ বেশি পতন ঘটায়। কারণ মানুষ নিদ্রাসক্ত হলে বৃক্ষাদি মূঢ় যোনি প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু আলস্য ও প্রমাদে কর্তব্যচ্যুত হয়ে দুরাচার করে নরকগামী হয়[১]।

'যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ'—নিদ্রা, আলস্য এবং প্রমাদ থেকে উৎপন্ন সুখ আরম্ভে এবং পরিণামে মানুষকে মোহগ্রস্ত করে। এই সুখের আরম্ভেও বিবেক-বুদ্ধি থাকে না এবং পরিণামেও বিবেক-বুদ্ধি থাকে না অর্থাৎ এই সুখ বিবেক-বুদ্ধিকে জাগরিত হতে দেয় না। পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদিরও এই বিবেক-বুদ্ধি না থাকায় তারা ক্রিয়ার আরম্ভ ও পরিণাম চিন্তা করতে পারে না। তদনুরূপভাবে যে সুখের জন্য মানুষ চিন্তা করতে পারে না যে এই নিদ্রাদি থেকে উৎপন্ন সুখের পরিণামে আমার কী হবে, কী লাভ হবে, কী ক্ষতি হবে, হিত বা অহিত কী হবে, সেই সুখকে তামস সুখ বলা হয়—**'তৎ তামসমুদাহৃতম্'**।

বিশেষ কথা

(১) প্রকৃতি ও পুরুষ—দুই-ই অনাদি এবং 'এরা দুটি', এই পৃথকত্বের বিবেকও (ভাবনাও) অনাদি। এই বিচার পুরুষের (মানুষের) মধ্যেই থাকে, প্রকৃতিতে নয়। পুরুষ যখন এই বিচার-ভাবনার অমর্যাদা করে অবিবেচনা বশে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, তখন এই সম্পর্কের জন্য পুরুষের মধ্যে আসক্তি উৎপন্ন হয়[২]।

আসক্তি যখন সূক্ষ্মাকারে থাকে, তখন বিবেক প্রবল থাকে। আসক্তি যখন বৃদ্ধি পায়, তখন বিবেক অবদমিত হয়, দূর হয় না। আবার বিবেক যদি জাগ্রত হয়ে ওঠে, তাহলে আর আসক্তি থাকে না, আসক্তি দূর হয়ে যায় এবং সেই আসক্তিবর্জিত পুরুষকে মুক্ত বলা হয়।

এই আসক্তির জন্যই মানুষ প্রকৃতিজনিত সুখে লিপ্ত হয়। সেই আসক্তি থাকাকালীন মানুষ যখন কোনো কারণবশতঃ সাত্ত্বিক সুখ লাভ করতে চায়, তখন রাজস ও তামস সুখ পরিত্যাগ করতে কষ্ট হয়—**'যত্তদগ্রে বিষমিব'**। কিন্তু যখন আসক্তি দূর হয়, তখন সেই সুখ অমৃতবৎ হয়ে ওঠে—**'পরিণামেঽমৃতোপমম্'**।

আসক্তিবশতঃই রজোগুণের সুখ আরম্ভে অমৃতের ন্যায় মনে হয়। কিন্তু পরিণামে এই সুখই প্রাণীদের পক্ষে বিষের ন্যায় অনিষ্টকারক ও মহাদুঃখের কারণ হয়ে ওঠে। প্রকৃতিজনিত সুখের প্রতি আসক্তি থাকলে দুঃখ-পরম্পরার কোনো অন্ত হয় না।

এই আসক্তি যখন তমোগুণের রূপ ধারণ করে, তখন মানুষের বৃত্তিগুলি অবসাদগ্রস্ত হয়। তখন মানুষ নিদ্রা ও আলস্যে সময় নষ্ট করে এবং আবশ্যক কর্মে বিমুখ হয়ে অকর্তব্যে ব্যাপৃত হয়। কিন্তু তামস ব্যক্তিরা এতেই সুখ অনুভব করে। তাই তামস সুখ আদি ও অন্তে মোহগ্রস্তকারী হয়।

(২) যা প্রতিমুহূর্তে নাস্তির দিকে যাচ্ছে, সেটি আসলে

---

[১]তমোগুণের বৃত্তি যে প্রমাদ, তা সুপ্রবৃত্তি রোধ করে খেল্-তামাশা ইত্যাদি সাধারণ কর্মে নিয়োজিত করে ; কিন্তু যখন প্রমাদের সঙ্গে আসক্তি মেশে (যা রজোগুণাত্মক), তখন এতে কামনা উৎপন্ন হয়। কামনা থেকে নানাপ্রকার পাপ ও অনর্থ হয়, যার পরিণাম হয় অতি ভয়ঙ্কর।

[২]আসক্তি থেকে নানা বিকার উৎপন্ন হয়, কিন্তু সেসব বিকার প্রকৃতিতেই হয়, পুরুষে নয়। প্রকৃতির সঙ্গে তাদাত্ম্য হলে পুরুষ প্রকৃতির ওইসব বিকারগুলিকে নিজের বলে মনে করে এবং তার ভোগী হয়ে ওঠে। কিন্তু যখন পুরুষের বোধ হয় যে এইসব বিকার আসে এবং যায়, উৎপন্ন হয় ও নষ্ট হয় এবং (যিনি তা দেখেন), সেই নিত্য সত্তা একইভাবে বিরাজ করে, সেই অবস্থায় সেই পুরুষ যোগী হন।

'নেই'। কিন্তু যে 'নেই'-কে প্রকাশিত করে এবং তার আধার ; সেটি প্রকৃতপক্ষে 'আছে' তত্ত্ব। এই তত্ত্বকেই বলা হয় 'সচ্চিদানন্দ'। নিরন্তর অস্তিত্বসম্পন্ন বা সত্তারূপে বিরাজ করায় একে 'সৎ' বলা হয়, জ্ঞানস্বরূপ হওয়ায় একে বলা হয় 'চিৎ' এবং আনন্দস্বরূপ হওয়ায় বলা হয় 'আনন্দ'। এই সচ্চিদানন্দ পরমাত্মার অংশ বলেই প্রাণীরাও সচ্চিদানন্দস্বরূপ। কিন্তু প্রাণী যখন অসৎ বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করে যে, অমুক বস্তু যেন আমি প্রাপ্ত করি, তখন সেই আকাঙ্ক্ষাতে স্বতঃই আনন্দ ঢাকা পড়ে যায়। যখন অসৎ বস্তুর আকাঙ্ক্ষা দূর হয়, তখন স্বতঃই স্বাভাবিক সুখ প্রকটিত হয়।

নিত্য বিরাজিত যে সুখরূপ 'তত্ত্ব', তাতে যখন সাত্ত্বিকী বুদ্ধি লীন হয়, তখন বুদ্ধিতে স্বচ্ছতা ও নির্মলতা আসে। এই স্বচ্ছ ও নির্মল বুদ্ধিতে অনুভূত হওয়া স্বাভাবিক সুখকেই সাত্ত্বিক সুখ বলা হয়। বুদ্ধি হতেও যখন সম্পর্ক দূর হয়, তখন শুধুমাত্র প্রকৃত সুখ থাকে। সাত্ত্বিকী বুদ্ধির সংস্পর্শেই এই সুখের 'সাত্ত্বিক' সংজ্ঞা হয়। বুদ্ধির থেকে সম্পর্ক দূর হলে তার আর 'সাত্ত্বিক' সংজ্ঞা থাকে না।

কোনো জিনিস প্রাপ্ত করার ইচ্ছা যখন মনে উদয় হয় তখন সেই বস্তুটি মনে স্থান করে নেয়, অর্থাৎ মন ও বুদ্ধির সঙ্গে সেটির সম্পর্ক হয়। সেই প্রার্থিত বস্তুটি লাভ করলে, প্রাপ্তির ইচ্ছা মন থেকে দূর হয় অর্থাৎ বস্তুটির যে আকর্ষণ থাকে, তা দূরীভূত হয়। সেটি দূর হলেই, তার জন্য মনে যে অভাববোধ ছিল, দুঃখ ছিল তা দূর হয় এবং নিত্য বিরাজিত স্বতঃসিদ্ধ সুখের তাৎকালিক অনুভব হয়। প্রকৃতপক্ষে বস্তুটি পাওয়ার জন্য এই সুখপ্রাপ্তি হয়নি, বরং তা হয়েছে তাৎকালিক আসক্তি দূর হওয়ায়। কিন্তু রাজস পুরুষ ভ্রমবশতঃ মনে করেন যে বস্তুটি প্রাপ্তির ফলেই এই সুখ লাভ হয়েছে। আসলে বস্তুর সংযোগ হয় বাইরে থেকে আর প্রসন্নতা আসে অন্তর থেকে। অন্তরের যে প্রসন্নতা, তা বাহ্যিক সংযোগে উৎপন্ন হয় না, মনের মধ্যে লালিত বস্তুগুলির সঙ্গে যে সম্পর্ক থাকে, সেই সম্পর্কগুলির ত্যাগ হলেই তা উৎপন্ন হয়। তাৎপর্য হল এই যে বস্তুর প্রাপ্তি হলে অন্তরে তার সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন হয় আর সম্বন্ধ ছিন্ন হওয়া মাত্রই নিত্য বিরাজিত স্বাভাবিক সুখের আভাস পাওয়া যায়।

নিদ্রার সময়ে বুদ্ধি যখন তমোগুণে লীন হয় তখন বুদ্ধির স্থিরতার জন্য সুখ প্রকটিত হয়। কারণ তমোগুণের প্রভাবে নিদ্রায় জাগ্রত ও স্বপ্নের পদার্থগুলি বিস্মরণ হয়ে যায়। পদার্থের স্মৃতি হল দুঃখের কারণ। পদার্থগুলি বিস্মৃত হওয়ায় নিদ্রাবস্থায় পদার্থগুলির বিচ্ছেদ হয়, এই বিচ্ছেদের জন্যই স্বাভাবিক সুখের আভাস হয়, একেই বলা হয় নিদ্রাসুখ। কিন্তু বুদ্ধির মালিন্যের জন্য সেই স্বাভাবিক সুখ অনুভূত হয় না। তাৎপর্য হল এই যে বুদ্ধি তমোগুণী হওয়ায় বুদ্ধিতে স্বচ্ছভাব থাকে না, সেইজন্যই সেই সুখ স্পষ্টভাবে অনুভূত হয় না। তাই নিদ্রাসুখকে তামস সুখ বলা হয়[১]।

এইসবের তাৎপর্য হল এই যে সাত্ত্বিক ব্যক্তি সংসারে বিমুখ হয়ে তত্ত্বে বুদ্ধিকে লীন করলে সুখপ্রাপ্তি হয় ; রাজস ব্যক্তি আসক্তিবশতঃ চিত্তে অবস্থিত বস্তুগুলি ত্যাগ করলে সুখপ্রাপ্তি হয় এবং তামস ব্যক্তির বস্তুগুলির জন্য প্রয়োজনীয় কর্তব্য-ভুলে যাওয়া এবং নিরর্থক কর্মে ব্যাপৃত করলে সুখ হয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে নিত্য-নিরন্তর অবস্থিত যে সুখরূপ তত্ত্ব, সেটি অসৎ-এর সম্বন্ধ দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। বিচার-বিবেচনাপূর্বক অসতের থেকে সম্পর্ক ছেদ করলে, আসক্তিযুক্ত বস্তুগুলিকে মন থেকে

---

[১]নিদ্রাকে তামস সুখ বলার অভিপ্রায় হল এই যে এতে বুদ্ধি মোহগ্রস্ত হয়। অর্থাৎ এতে মানুষ বেহুঁশ হয়। এর দ্বারা জগতের সবকিছুতে বিস্মৃতি আসে এবং জাগ্রত-অবস্থা দমিত হয়, তাই একে বলা হয় তামস সুখ। যদি ইন্দ্রিয়গুলির সঙ্গে বুদ্ধি মোহগ্রস্ত না হয়, তাহলে একেই বলা হয় 'সমাধি' অবস্থা। সমাধিতেও বিশ্রাম হয়। নিদ্রাতে যে সতেজ ভাব আসে, এই বিশ্রামেও তাই পাওয়া যায় ; কিন্তু সতেজতার সুখ গ্রহণ করলে গুণাতীত হওয়া যায় না। সমাধি সুখে আসক্তিবর্জিত হলে তবেই গুণাতীত হওয়া যায়।

প্রকৃতি ক্রিয়াশীল, পরিবর্তনশীল আর পরমাত্মতত্ত্ব অপরিবর্তনশীল, নির্বিকার, শান্ত, নিশ্চল। নিদ্রাবস্থায় এই নিশ্চল তত্ত্বে স্থিতি হয় ; কিন্তু চিত্তে ভোগের গুরুত্ব থাকায়, নিদ্রোত্থিত হলে মানুষের পুনরায় ভোগ ও সম্পদ সংগ্রহে রুচি আসে এবং তারা তাতেই ব্যাপৃত হয়। তাই আসক্তির জন্য মানুষ সেই নিশ্চল তত্ত্ব থেকে কিছু লাভ করতে পারে না, সেইজন্য তারা নিদ্রা থেকে শুধু ক্লান্তি অপনোদন করে। যদি তারা ভোগ ও অর্থ-লালসা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করে, তাহলে তাদের নিদ্রাকালে এবং তারপরেও স্ব-স্বরূপে স্বতঃ স্বাভাবিক অটল স্থিতি লাভ হয়।

দূর করলে এবং বুদ্ধি তমোগুণে লীন হলে যে সুখ হয়, তা সেই সুখেরই আভাস মাত্র। তাৎপর্য হল এই যে সংসার থেকে বিবেচনা সহকারে বিমুখ হলে সাত্ত্বিক-সুখ, অন্তর থেকে বস্তুগুলি দূর করলে রাজস সুখ এবং মোহবশতঃ নিদ্রা-আলস্যে জগৎ-সংসার বিস্মৃত হলে তামস সুখ হয়। কিন্তু প্রকৃত সুখ হয় তখনই যখন, প্রকৃতিজনিত পদার্থ থেকে সর্বতোভাবে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করা হয়। এই সুখে যে ভালোবাসা, আকর্ষণ ও সুখভোগ থাকে, সেগুলিই পারমার্থিক উন্নতিতে বাধা প্রদান করে এবং পতন ঘটায়। তাই পারমার্থিক উন্নতিকামী সাধকদের এই তিন প্রকার সুখের থেকে সম্পর্ক ছেদ করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

পরিশিষ্ট-ভাব—তামসিক ব্যক্তির মোহ থাকে—**'তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্'** (গীতা ১৪।৮)। মোহ বিচার-বুদ্ধির পথে বাধাস্বরূপ। তামসিক বৃত্তি বিবেক-বুদ্ধি জাগরিত হতে দেয় না। তাই তামসিক ব্যক্তির বিবেক মোহের প্রভাবে লুপ্ত হয়ে যায়, যার জন্য সে আরম্ভ ও শেষ কোনোটাই দেখতে পায় না।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—কুড়ি থেকে উনচল্লিশতম শ্লোক পর্যন্ত ভগবান গুণসমূহের প্রাধান্য নিয়ে জ্ঞান, কর্ম ইত্যাদির তিনটি করে বিভাগের কথা বলেছেন। এবার এগুলি ব্যতীত গুণসমূহ নিয়ে জগতের সমস্ত বস্তুরও যে তিন প্রকার বিভাগ হয়—সেটির ইঙ্গিত করে ভগবান পরবর্তী শ্লোকে প্রকরণের উপসংহার করেছেন।

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎ ত্রিভির্গুণৈঃ॥ ৪০ ॥

[**পৃথিব্যাম্, বা, দিবি** (পৃথিবীতে, স্বর্গে) ; **বা, দেবেষু** (অথবা দেবতাদের মধ্যেও) ; **পুনঃ** (আবার অন্য কোথাও) ; **তৎ, সত্ত্বম্** (এমন কোনো প্রাণী বা বস্তু) ; **ন, অস্তি** (নেই) ; **যৎ, প্রকৃতিজৈঃ** (যা প্রকৃতি হতে উৎপন্ন) ; **এভিঃ, ত্রিভিঃ** (এই তিন) ; **গুণৈঃ, মুক্তম্, স্যাৎ** (গুণ থেকে মুক্ত বা রহিত ।)]

পৃথিবীতে, স্বর্গে অথবা দেবতাদের মধ্যেও অথবা এ ছাড়াও অন্য কোথাও এমন কোনো প্রাণী বা বস্তু নেই, যা প্রকৃতি হতে উৎপন্ন এই তিনটি গুণ থেকে মুক্ত বা রহিত॥ ৪০ ॥

ব্যাখ্যা—[এই অধ্যায়ের আরম্ভে অর্জুন সন্ন্যাস এবং ত্যাগের তত্ত্ব জানতে চেয়েছিলেন, তাই ভগবান প্রথমে ত্যাগ অর্থাৎ কর্মযোগের বর্ণনা করেছেন। সেই প্রকরণের উপসংহার করতে গিয়ে ভগবান বলেছেন যে যারা ত্যাগী নয়, তাদের অনিষ্ট, ইষ্ট এবং মিশ্র—এই তিন প্রকারের কর্মের ফল ভোগ হয় এবং যারা সন্ন্যাসী তাদের কোনো ফল ভোগ হয় না। এই কথা বলে ত্রয়োদশ শ্লোক থেকে সন্ন্যাস—সাংখ্যযোগের প্রকরণ আরম্ভ করে প্রথমে কর্ম অনুষ্ঠিত হওয়ার অধিষ্ঠানাদির পাঁচটি কারণ বলেছেন। ষোড়শ-সপ্তদশ শ্লোকে যাঁরা কর্তৃত্ব মানেন তাঁদের নিন্দা করেছেন আর যাঁরা কর্তৃত্ব ত্যাগ করেছেন, তাঁদের প্রশংসা করেছেন। অষ্টাদশ শ্লোকে কর্ম-প্রেরণা ও কর্ম-সংগ্রহের বর্ণনা করেছেন। কিন্তু যা প্রকৃত তত্ত্ব, সেটি কর্মপ্রেরকও নয়, কর্ম-সংগ্রাহকও নয়। কর্ম-প্রেরণা এবং কর্ম-সংগ্রহ হয় প্রকৃতির গুণাদির সঙ্গে সম্পর্ক রাখলেই। পরে গুণাদি অনুসারে জ্ঞান, কর্তা, কর্ম, বুদ্ধি, ধৃতি এবং সুখের তিন প্রকার ভাগের বর্ণনা করেছেন। সুখের বর্ণনায় তিনি জানিয়েছেন যে প্রকৃতির সঙ্গে অল্পবিস্তর সম্পর্কিত হয়ে যে উচ্চ হতে উচ্চতর সুখ লাভ করা যায়, তাকে বলে সাত্ত্বিক সুখ। কিন্তু যা স্বরূপের প্রকৃত সুখ, তা হল গুণাতীত, অনুপম এবং অলৌকিক (গীতা ৬।২১)।

সাত্ত্বিক সুখকে **'আত্মবুদ্ধি প্রসাদজম্'** বলে ভগবান সেটিকে জাত (উৎপন্ন হয়) বলেছেন। যার উৎপত্তি হয়, সেটি নিত্য হয় না। তাই এটি জাত বলার অর্থ হল যে এই 'জাত' সুখের ঊর্ধ্বে উঠতে হয় অর্থাৎ প্রকৃতি এবং প্রকৃতির তিন গুণরহিত হয়ে সেই পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত করতে হয়, যা সকলের স্বাভাবিক স্বরূপ। সেইজন্যই বলছেন—]

'ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ'—এখানে **'পৃথিব্যাং'** পদে ইহলোক এবং পৃথিবীর নিম্নে অতল, বিতল ইত্যাদি সকল লোকের, **'দিবি'** পদে স্বর্গাদি

লোকের, **'দেবেষু'** পদে প্রাণীমাত্রেরই উপলক্ষণের রূপে সেইসব স্থানে বসবাসকারী মানুষ, দেবতা, অসুর, রাক্ষস, নাগ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ ইত্যাদি সমস্ত চর ও অচর প্রাণীদের এবং **'বা পুনঃ'** পদে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ ত্রিলোক এবং অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড এবং তথায় বসবাসকারী এমন কোনো বস্তু নেই, যা প্রকৃতিজাত এই তিন গুণরহিত অর্থাৎ সর্বই ত্রিগুণাত্মক— **'সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎ ত্রিভির্গুণৈঃ'**।

প্রকৃতি এবং তার কার্য—এগুলি সর্বই ত্রিগুণাত্মক এবং পরিবর্তনশীল। এগুলির সঙ্গে সম্বন্ধ করলেই বন্ধন হয় আর সম্বন্ধ ছেদ করলেই মুক্তি হয়। কারণ স্ব-স্বরূপ আসক্তিবিহীন। স্বরূপ হলেন **'স্ব'** আর প্রকৃতি হল **'পর'**। প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলেই অহং-কর্তৃত্ব ভাবের উৎপত্তি হয়, যার থেকে পরাধীনতা সৃষ্টি হয়। এ এক বিচিত্র ব্যাপার যে, যে অহং-কর্তৃত্ব ভাবকে স্বাধীনতা বলে মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে সেটিই হল পরাধীনতা। কারণ অহং-ভাবের জন্য প্রকৃতিজনিত পদার্থে আসক্তি, কামনা ইত্যাদি উৎপন্ন হয়, যার জন্য পরাধীনতাকে স্বাধীনতা বলে মনে হয়। তাই প্রকৃতিজনিত গুণাদিরহিত হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন।

প্রকৃতিজাত গুণাদিতে রজোগুণ এবং তমোগুণ পরিত্যাগ করে সত্ত্বগুণ বাড়ানোর প্রয়োজন থাকে। সত্ত্বগুণেও প্রসন্ন-ভাব এবং বিবেক-বিচারের প্রয়োজন থাকলেও সাত্ত্বিক সুখ ও জ্ঞানের প্রতি আসক্তি থাকা উচিত নয়। কারণ সুখ ও জ্ঞানের আসক্তি বন্ধনকারক হয়। অতএব এই আসক্তিগুলি পরিত্যাগ করে সত্ত্বগুণের অতীত হতে হয়। সমস্ত গুণোত্তীর্ণ হওয়ার জন্যই এখানে গুণাদির প্রকরণ উল্লিখিত হয়েছে।

সাধকদের সাত্ত্বিক জ্ঞান, কর্ম, কর্তা, বুদ্ধি, ধৃতি ও সুখ—এগুলির ওপর দৃষ্টি রেখে সেই অনুসারে নিজেদের জীবন গঠন করা উচিত এবং সতর্কতা সহকারে রাজস ও তামস ত্যাগ করা উচিত । এগুলি পরিত্যাগ করাতে সতর্কতাই হল সাধনা। সাবধানতার দ্বারা সকল সাধনা স্বতঃই প্রকটিত হয়। প্রকৃতি হতে সম্পর্ক ছিন্ন করায় সাত্ত্বিকতারই বিশেষ প্রয়োজন। কারণ এতে বিবেক-বুদ্ধি জগ্রত থাকে, যার ফলে প্রকৃতি হতে মুক্ত হওয়া সহজ হয়। আসলে এর থেকেও অনাসক্ত হতে হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব—দশম অধ্যায়ে ভগবান ভক্তির (বিশ্বাসের) দৃষ্টিতে বস্তুসমূহ তাঁর থেকে উৎপন্ন হয় বলে জানিয়েছেন—**'ন তদস্তি বিনা যৎস্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্'** (১০।৩৯)। ভগবান এখানে জ্ঞানের (বিবেক-বুদ্ধির) দৃষ্টিতে সমস্ত বস্তু প্রকৃতিজনিত গুণাদি হতে উৎপন্ন হয় বলে জানিয়েছেন। কারণ বিবেকীদের দৃষ্টিতে সৎ-অসৎ এই বিচার থাকে, কিন্তু ভক্তের দৃষ্টিতে শুধু ভগবানই বিরাজমান—**'সদসচ্চাহমর্জুন'** (গীতা ৯।১৯)। বিবেক-বুদ্ধির পথে অসৎ ও গুণাদি ত্যাগই মুখ্য আর ভক্তিমার্গে ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধই মুখ্য।

'জগতের কোনো বস্তুই ত্রিগুণরহিত নয়'—এটি হল অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে, তত্ত্বজ্ঞানীর দৃষ্টিতে নয়। তত্ত্বজ্ঞানীর দৃষ্টি অস্তিত্বের প্রতি অর্থাৎ স্বরূপের দিকে থাকে, যা স্বতঃ স্বাভাবিক নির্গুণ (গীতা ১৩।২১)।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—ত্যাগের প্রকরণে ভগবান বলেছেন, নিয়ত কর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়, সেগুলি মূর্খতাবশতঃ ত্যাগ করলে তা তামস ত্যাগ হয়; শারীরিক কষ্টের ভয়ে নিয়ত-কর্ম ত্যাগ করলে, সেটি রাজস ত্যাগ হয় এবং ফল ও আসক্তি ত্যাগ করে কর্ম করলে তা সাত্ত্বিক ত্যাগ হয়ে ওঠে (১৮।৭-৯)। সাংখ্যযোগের দৃষ্টিতে সকল কর্মের সিদ্ধিতে পাঁচটি কারণ জানিয়ে, যেখানে সাত্ত্বিক কর্ম বর্ণিত হয়েছে, সেখানে নিয়ত-কর্ম কর্তৃত্বাভিমানরহিত, রাগ-দ্বেষরহিত ও ফলেচ্ছা-রহিত ব্যক্তির দ্বারা করার কথা উল্লেখ করেছেন (১৮।২৩)। সেই কর্মে কোন্ বর্ণের কোন্‌টি নিয়ত-কর্ম এবং সেগুলি কীভাবে করা উচিত তা জানাবার জন্য এবং তার সঙ্গে ভক্তিযোগের কথা জানাতে ভগবান পরবর্তী প্রকরণ আরম্ভ করছেন।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥ ৪১ ॥

[পরন্তপ (হে পরন্তপ !) ; ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাম্ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) ; চ, শূদ্রাণাম্ (এবং শূদ্রদের) ; কর্মাণি, স্বভাবপ্রভবৈঃ (কর্মগুলি স্বভাব থেকে উৎপন্ন) ; গুণৈঃ (তিনটি গুণ অনুসারে) ; প্রবিভক্তানি (পৃথকভাবে বিভক্ত করা হয়েছে।)]

হে পরন্তপ ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রদের কর্মগুলি স্বভাব থেকে উৎপন্ন তিন গুণ অনুসারে পৃথক্‌ভাবে বিভক্ত করা হয়েছে ॥ ৪১ ॥

ব্যাখ্যা—**'ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ'**—এইস্থানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিনটির জন্য একটি পদ এবং শূদ্রের জন্য পৃথক্ পদ ব্যবহারের তাৎপর্য হল এই যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—এরা হল দ্বিজাতি, কিন্তু শূদ্র দ্বিজাতি নয়। তাই তাদের কর্মবিভাগ পৃথক্ এবং কর্মানুসারে শাস্ত্রীয় অধিকারও পৃথক্।

'কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ'—মানুষ যেরূপ কর্ম করে, তার চিত্তে সেই কর্মের সংস্কার হয় এবং সেই সংস্কার অনুসারেই তার স্বভাব গড়ে ওঠে। এইভাবে আগের বহু জন্মের অর্জিত সংস্কার অনুযায়ী মানুষের যেমন স্বভাব গড়ে ওঠে, সেই অনুসারেই তার মধ্যে সত্ত্ব, রজ এবং তম—তিনটি গুণের বৃত্তি উৎপন্ন হয়। এই গুণাদির তারতম্যের অনুসারেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের কর্ম বিভাগ করা হয়েছে (গীতা ৪।১৩)। কারণ মানুষের যেমন গুণবৃত্তি হয়, সে তেমন কর্মেরই উপযোগী হয়।

বিশেষ কথা

(১)

কর্ম দুপ্রকারের—(১) জন্মারম্ভক কর্ম (২) ভোগদায়ক কর্ম। যে কর্মের দ্বারা উচ্চ-নীচ যোনিতে জন্ম হয়, তাকে বলা হয় 'জন্মারম্ভক কর্ম' আর যে কর্মের দ্বারা সুখ-দুঃখাদি ভোগ হয়, তাকে বলা হয় 'ভোগদায়ক কর্ম'। ভোগদায়ক কর্মই অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, যেগুলি গীতায় অনিষ্ট, ইষ্ট ও মিশ্র নামে অভিহিত করা হয়েছে (১৮।১২)।

বিশেষভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে কর্মমাত্রই ভোগদায়ক হয় অর্থাৎ জন্মারম্ভক কর্ম থেকেও ভোগ হয় এবং ভোগদায়ক কর্ম থেকেও ভোগ হয়। যেমন যে উত্তম কুলে জন্মগ্রহণ করে, তার আদর হয়, সম্মান হয় ; আর যে নীচ কুলে জন্মায় তার অনাদর হয়, অবহেলা হয়। তেমনই অনুকূল পরিস্থিতিতে লোকেদের সম্মান হয় আর প্রতিকূল পরিস্থিতিতে লোকেদের অবহেলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ সম্মান ও অবহেলারূপে ভোগ জন্মারম্ভক ও ভোগদায়ক —উভয় কর্মেরই হয়ে থাকে। কিন্তু জন্মারম্ভক কর্ম থেকে যার জন্ম হয়, তার কাছে সম্মান-অসম্মানরূপ ভোগ গৌণ হয়ে থাকে। কারণ সম্মান বা অসম্মান কখনো কখনো হয়, সবসময় হয় না আর ভোগদায়ক কর্ম থেকে যে অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তাতে পরিস্থিতির ভোগ মুখ্য হয়, কারণ পরিস্থিতি চলতে থাকে।

ভোগদায়ক কর্মের সদুপযোগ অথবা দুরুপযোগ করায় মানুষমাত্রেই স্বাধীন। অর্থাৎ সে অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতির দ্বারা সুখ বা দুঃখ ভোগ করতেও পারে আবার সেগুলিকে তার সাধন-সামগ্রীও করতে পারে। যে ব্যক্তি অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সুখী বা দুঃখী হয়, সে ব্যক্তি মূর্খ ; আর যে তাকে সাধন-সামগ্রী করে, সে হল বুদ্ধিমান সাধক। কারণ মনুষ্যজন্ম পরমাত্মার প্রাপ্তির জন্যই পাওয়া গেছে, সুতরাং এতে যেসব অনুকূল বা প্রতিকূল পরিস্থিতি আসে, সেগুলি সবই হল সাধন-সামগ্রী।

অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতিকে সাধন-সামগ্রী করা কাকে বলে ? অনুকূল পরিস্থিতি উপস্থিত হলে তা অন্যের সেবায়, সুখ ও আরামে নিয়োজিত করা এবং প্রতিকূল পরিস্থিতি এলে সুখের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করা। অন্যের সেবা করা এবং সুখেচ্ছা পরিত্যাগ করা—এই দুটিই হল সাধন।

(২)

শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে পুণ্যের আধিক্য হলে জীব স্বর্গে গমন করে এবং পাপের আধিক্য হলে নরকে গমন করে। আর যদি পাপ-পুণ্য সমান সমান হয়, তাহলে মানুষরূপে জন্ম নেয়। এই দৃষ্টিতে মানুষ যে কোনো বর্ণ, আশ্রম, দেশ, বেশ ইত্যাদির হোক, সে সর্বতোভাবে পুণ্যাত্মা বা পাপাত্মা হতে পারে না।

পুণ্য-পাপ সমান হওয়ায় যারা মানুষ হয়ে জন্মায়, লক্ষ্য করলে তাদের মধ্যেও পাপ-পুণ্যের তারতম্য দেখা যায় অর্থাৎ কারও পুণ্য বেশি থাকে কারও পাপ বেশি

থাকে[১]। সেইরূপ গুণাদিরও বিভাগ থাকে। সত্ত্বগুণের প্রাধান্য যাদের থাকে, তারা উর্ধ্বলোকে যায়, রজোগুণের প্রাধান্যে ইহলোকে জন্ম হয় এবং তমোগুণের প্রাধান্য হলে অধোগতি প্রাপ্ত হয়। এই তিনটির মধ্যেও আবার গুণাদির তারতম্যে নানাপ্রকার ভেদ হয়।

সত্ত্বগুণের প্রাধান্যে ব্রাহ্মণ, রজোগুণের প্রাধান্যে ও সত্ত্বগুণের গৌণতায় ক্ষত্রিয়, রজোগুণের প্রাধান্যে ও তমোগুণের গৌণতায় বৈশ্য এবং তমোগুণের প্রাধান্যে শূদ্র জন্ম হয়। সাধারণ রীতিতে গুণের কথা এখানে বলা হয়েছে। এছাড়া যে অবান্তর তারতম্য তার বিচার এরূপ—রজোগুণ-প্রধান মানুষদের মধ্যে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য যাদের মধ্যে থাকে তারা ব্রাহ্মণ হয়। এই ব্রাহ্মণদের মধ্যেও জন্ম-ভেদে উচ্চ-নীচ ব্রাহ্মণ রূপে গণ্য করা হয় এবং পরিস্থিতি বিশেষে কর্মের ফলও নানাপ্রকারের হয় অর্থাৎ সমস্ত ব্রাহ্মণের এক প্রকারের অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতি হয় না। এই দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণ জন্মেও তিনটি গুণের প্রভাব মানতে হয়। এইরূপে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রও জন্মের দ্বারা উচ্চ-নীচ গণ্য হয় এবং তাদেরও নানাপ্রকার অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতি আসে। তাই গীতায় বলা হয়েছে যে ত্রিলোকে এমন কোনো বস্তু নেই, যা তিন গুণরহিত (১৮।৪০)।

মনুষ্যেতর যেসব পশু-পক্ষী প্রভৃতি আছে, তাদের মধ্যেও উচ্চ-নীচ ভেদ হয় ; যেমন গোরু ইত্যাদিকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয় এবং কুকুর, গাধা, শূকর ইত্যাদিকে নীচ বলে মনে করা হয়। পায়রা ইত্যাদিকে শ্রেষ্ঠ মনে করা হয় আর কাক, চিল ইত্যাদিকে নীচ বলে মনে করা হয়। এদের সকলের অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতিও একপ্রকার হয় না। তাৎপর্য হল এই যে উর্ধ্বগতি, মধ্যগতি ও অধোগতিসম্পন্ন জীবদের মধ্যেও নানাপ্রকার শ্রেণীভেদ ও পরিস্থিতি ভেদ হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব—চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন যে গুণ কর্ম বিভাগ অনুসারে আমি চার বর্ণের সৃষ্টি করেছি—**'গুণকর্মবিভাগশঃ'** (৪।১৩) আর এখানে বলছেন চার বর্ণের কর্ম স্বভাব থেকে উৎপন্ন হয়ে ত্রিগুণাদির সাহায্যে পৃথক্ হয়েছে **'স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ'**। চতুর্থ অধ্যায়ে তো চার বর্ণের উৎপত্তির কথা আছে আর এই অধ্যায়ে চার বর্ণের কর্মের কথা আছে। তাৎপর্য হল যে, চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন যে চার বর্ণের জন্ম হয়ে থাকে পূর্বজন্মলব্ধ গুণকর্ম অনুসারে আর এখানে বলছেন জন্মের পরে চার বর্ণের কী কী কর্ম করা উচিত, যার দ্বারা তার ভবিষ্যতের গতি নির্ধারিত হবে।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—ভগবান পরবর্তী শ্লোকে ব্রাহ্মণদের স্বাভাবিক কর্ম সম্বন্ধে জানাচ্ছেন।

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্॥ ৪২ ॥

[**শমঃ, দমঃ** (মনঃসংযম, ইন্দ্রিয়সংযম) ; **তপঃ, শৌচম্** (ধর্মপালনের জন্য কষ্ট স্বীকার, অন্তরে বাইরে শুদ্ধ থাকা) ; **ক্ষান্তিঃ** (অন্যের অপরাধে ক্ষমা) ; **আর্জবম্** (কায়মনোবাক্যে সারল্য) ; **জ্ঞানম্, বিজ্ঞানম্** (শাস্ত্রজ্ঞান, যজ্ঞবিধি পালন) ; **চ** (এবং) ; **আস্তিক্যম্, এব** (পরমাত্মা, বেদ ইত্যাদিতে শ্রদ্ধা এসবই হল) ; **ব্রহ্মকর্ম, স্বভাবজম্** (ব্রাহ্মণদের স্বভাবজাত কর্ম।)]

মনঃসংযম, ইন্দ্রিয়সংযম, ধর্ম পালনের জন্য কষ্ট স্বীকার, অন্তরে বাইরে শুদ্ধ থাকা, অন্যের অপরাধে ক্ষমা, কায়মনোবাক্যে সারল্য, শাস্ত্রজ্ঞান, যজ্ঞবিধি পালন, পরমাত্মা, বেদ ইত্যাদিতে শ্রদ্ধা—এ সবই হল ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম ॥ ৪২ ॥

---

[১]যেমন পরীক্ষায় অনেক বিষয় থাকে এবং তার মধ্যে কোনো বিষয়ে কম ও কোনো বিষয়ে বেশি নম্বর পাওয়া যায়। সেইসব মোট নম্বর মিলিয়ে যত হয়, তার থেকেই পরীক্ষার ফল প্রস্তুত হয়। তেমনই প্রত্যেক ব্যক্তির কোনো বিষয়ে পুণ্য বেশি থাকে, কোনো বিষয়ে পাপ বেশি থাকে, সব মিলিয়ে যেমন পাপ-পুণ্য হয়, সেই অনুসারেই তার জন্ম হয়। যদি সকলেরই নানা বিষয়ে পাপ-পুণ্য সমান হয়, তাহলে সকলেরই একরকমের অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতি প্রাপ্ত হওয়া উচিত, কিন্তু তা হয় না। তাই সকলেরই পাপ-পুণ্যে নানাপ্রকার তারতম্য থাকে। এই ব্যাপারটি সত্ত্বাদি গুণের ক্ষেত্রেও বোঝা উচিত।

ব্যাখ্যা—'শমঃ'—মনকে যেখানে নিবিষ্ট করার ইচ্ছা, সেখানে নিয়োগ করা এবং যেখান থেকে সরিয়ে নেবার ইচ্ছা, সেখান থেকে সরানো—এইরূপ মনঃসংযম করাকে বলা হয় **'শমঃ'**।

'দমঃ'—যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে কাজ করাবার ইচ্ছা, তাকে সেই কাজ করানো এবং যে ইন্দ্রিয়কে যেখান থেকে সরাবার ইচ্ছা সেখান থেকে তাকে সরানো—এইভাবে ইন্দ্রিয়াদি সংযম করাকে বলা হয় **'দম'**।

'তপঃ'—গীতায় কায়মনোবাক্যে তপস্যার কথা বর্ণনা করা হয়েছে (১৭।১৪-১৬), সেই তপের কথা ধরে নিলেও এখানে 'তপের' প্রকৃত অর্থ হল—নিজ ধর্ম পালনে যে ক্লেশ হয়, তা প্রসন্নতা সহ স্বীকার করা অর্থাৎ কষ্ট হলেও চিত্তে প্রসন্ন থাকা।

'শৌচম্'—নিজ মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, শরীর ইত্যাদি পবিত্র রাখা ও খাওয়া-দাওয়া, ব্যবহার ইত্যাদি পবিত্র রাখা—এইরূপ শৌচাচার-সদাচার ঠিকমতো পালন করাকে বলা হয় **'শৌচ'**।

'ক্ষান্তিঃ'—অন্যে যতই অপমান করুক, নিন্দা করুক, দুঃখ দিক এবং নিজের মধ্যে তাকে শাস্তি দেবার যোগ্যতা, শক্তি ও অধিকার থাকলেও তাকে শাস্তি না দিয়ে সে ক্ষমা প্রার্থনা না করলেও প্রসন্নভাবে তাকে ক্ষমা করাকে বলা হয় **'ক্ষান্তিঃ'**।

'আর্জবম্'—কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে সরল থাকা এবং ছল-কপটতা ইত্যাদি ভাব না থাকা অর্থাৎ সহজ-সরল থাকাকে বলা হয় **'আর্জব'**।

'জ্ঞানম্'—বেদ, শাস্ত্র, পুরাণ, ইতিহাস ইত্যাদি ভালোভাবে অধ্যয়ন এবং তার ভাবগুলি ঠিকমতো অধিগত করা ও কর্তব্যাকর্তব্য বোধ হওয়াকে বলা হয় **'জ্ঞান'**।

'বিজ্ঞানম্'—যজ্ঞের কোন্ দ্রব্য, কখন, কীভাবে প্রয়োগ করা হয় অর্থাৎ যজ্ঞবিধি ও অনুষ্ঠান ঠিকমতো জানা ও পালন করাকে বলা হয় **'বিজ্ঞান'**।

'আস্তিক্যম্'—পরমাত্মা, বেদ, শাস্ত্র, পরলোক ইত্যাদির প্রতি অন্তরে শ্রদ্ধা থাকা এবং সেগুলির সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ না থাকা ও সেই অনুযায়ী আচরণ করাকে বলা হয় **'আস্তিক্য'**।

'ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্'—এই শম, দম ইত্যাদি ব্রাহ্মণদের স্বাভাবিক কর্ম (গুণ)। এইগুলি ধারণ করায় ব্রাহ্মণদের পরিশ্রম হয় না।

যে ব্রাহ্মণদের মধ্যে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য থাকে, যাঁদের বংশ-পরম্পরা অত্যন্ত শুদ্ধ এবং যাঁদের পূর্বজন্মকৃত কর্মও শুদ্ধ, সেইরূপ ব্রাহ্মণদের পক্ষে শম, দম ইত্যাদি গুণ স্বাভাবিক এবং তাঁদের মধ্যে নির্দিষ্ট কোনও গুণ না থাকলে বা কোনো গুণের ঘাটতি থাকলে, তা পূরণ করা সেই ব্রাহ্মণদের পক্ষে সহজ হয়ে থাকে।

গুণাদির তারতম্যেই চার বর্ণের সৃষ্টি করা হয়েছে, তাই গুণাদি অনুসারে সেই সেই বর্ণের কর্ম স্বাভাবিক-ভাবে প্রকটিত হয় এবং অন্য কর্ম গৌণ হয়ে যায়। যেমন, ব্রাহ্মণদের মধ্যে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য থাকায় তাদের মধ্যে শম, দম ইত্যাদি গুণ স্বাভাবিকভাবে থাকে এবং জীবিকার কর্ম গৌণ হয়ে যায়। অন্যান্য বর্ণে রজোগুণ ও তমোগুণের প্রাধান্য থাকায় সেই বর্ণাদির জীবিকা-কর্মও স্বাভাবিক কর্মের অন্তর্গত হয়। এই দৃষ্টিতে গীতায় ব্রাহ্মণের স্বভাবজ কর্মে জীবিকা-উপার্জনের পক্ষে উপযুক্ত কোনো কর্মের কথা না বলে শম, দম ইত্যাদি কর্ম অর্থাৎ গুণের উল্লেখ করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট-ভাব—বর্ণ-পরম্পরা ঠিক থাকলে এই সব গুণ ব্রাহ্মণের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে থাকে। কিন্তু বর্ণসংকর হলে এই গুণ আর স্বাভাবিক থাকে না, এতে ন্যূনতা এসে পড়ে।

আগের শ্লোকে **'স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ'** বলেছেন, তাই এখানে স্বভাবজাত কর্মের কথা বলেছেন। স্বভাব তৈরিতে পূর্ব সংস্কার প্রধান এবং জন্মানোর পরে সঙ্গই হল প্রধান। সঙ্গ, স্বাধ্যায়, অভ্যাস ইত্যাদির দ্বারা স্বভাব পরিবর্তিত হয়।

***

সম্বন্ধ—পরবর্তী শ্লোকে ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজ কর্মের কথা বলা হয়েছে।

শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্॥ ৪৩ ॥

[**শৌর্যম্‌, তেজঃ** (পরাক্রম, তেজ) ; **ধৃতিঃ, দাক্ষ্যম্‌, চ** (ধৈর্য, প্রজাপালনের ক্ষমতা এবং) ; **যুদ্ধে, অপি, অপলায়নম্‌** (যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা) ; **দানম্‌** (দানে মুক্তহস্ত) ; **চ, ঈশ্বরভাবঃ** (এবং শাসনক্ষমতা) ; **ক্ষাত্রম্‌** (ক্ষত্রিয়ের) ; **স্বভাবজম্‌, কর্ম** (স্বভাবজাত কর্ম।)]

শৌর্য বা পরাক্রম, তেজ, ধৈর্য, প্রজা পরিচালনের ক্ষমতা, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা, দানে মুক্তহস্ত, শাসন-ক্ষমতা, এগুলি সবই ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত কর্ম ॥ ৪৩ ॥

ব্যাখ্যা—'শৌর্যম্‌'—অন্তরে নিজ ধর্ম পালনে তৎপরতা থাকা, ধর্মযুদ্ধ[১] উপস্থিত হলে তাতে আহত হওয়া, অঙ্গচ্ছেদ হওয়া প্রভৃতিতে বিন্দুমাত্র ভয় না থাকা, আঘাত পেলেও মনে প্রসন্ন ও উৎসাহপূর্ণ থাকা এবং মাথা কাটা গেলেও আগের মতো অস্ত্র প্রয়োগ করতে থাকা—এরই নাম হয় **'শৌর্য'**।

'তেজঃ'—যে প্রভাব বা শক্তির কাছে পাপী ও দুরাচারী ব্যক্তিও পাপ এবং দুরাচার করতে দ্বিধাবোধ করে, যার উপস্থিতিতে মানুষ মর্যাদাবিরুদ্ধ কাজ করতে সাহস পায় না, তাকে বলা হয় **'তেজ'**।

'ধৃতিঃ'—নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও নিজ ধর্মে বিচলিত না হওয়া এবং শত্রুরা ধর্ম ও নীতি-বিরুদ্ধ অনুচিত ব্যবহারে বিরক্ত করলেও ধৈর্য ধারণ করে ধর্ম ও নীতিরক্ষা দ্বারা মর্যাদানুযায়ী কাজ করাকে বলা হয় **'ধৃতি'**।

'দাক্ষ্যম্‌'—প্রজা-পালন, প্রজাদের যথাযোগ্য শাসন ও রক্ষা এবং তাদের পরিচালনা করার বিশেষ যোগ্যতা ও কলাকে বলে **'দাক্ষ্য'**।

'যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্‌'—যুদ্ধে কখনো পরাঙ্মুখ না হওয়া, মনে মনেও কখনো পরাজয় স্বীকার না করা, যুদ্ধক্ষেত্রে পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করা—এগুলিকে বলা হয় **'অপলায়ন'**।

'দানম্‌'—ক্ষত্রিয়গণ উদারতাপূর্বক দান করেন। বর্তমানে বৈশ্যদের মধ্যে দান করার স্বভাব দেখা যায় ; কিন্তু তাঁদের দানে কিছুটা কৃপণতা লক্ষ্য করা যায় অর্থাৎ কম দান করলে যদি হয় তাহলে বেশি দান করার কী প্রয়োজন—এরূপ দ্রব্য-লোভ থাকে। সেইজন্য তাঁদের ধর্মপালনে বাধা আসে, যার ফলে সাত্ত্বিক দান (গীতা ১৭।২০) করা কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু ক্ষত্রিয়রা দানবীর হয়ে থাকেন। তাই **'দান'** শব্দটি ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত বলা হয়।

'ঈশ্বরভাবশ্চ'—ক্ষত্রিয়দের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই শাসন করার প্রবৃত্তি থাকে। লোকেদের নীতি, ধর্ম ও মর্যাদা-বিরুদ্ধ কাজ করতে দেখলে তাঁদের মনে স্বাভাবিকভাবে শাসন করার এবং তাদের ঠিকভাবে চালনা করার ইচ্ছা জাগে। এই শাসন-ভাবে কোনো অহং-অভিমান থাকে না। কারণ ক্ষত্রিয়ের মধ্যে স্বভাবতঃ নম্রতা, সরলতা ইত্যাদি গুণ থাকে।

'ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্‌'—যিনি প্রজামাত্রকেই দুঃখ থেকে রক্ষা করেন, তাঁকে বলা হয় 'ক্ষত্রিয়'—**'ক্ষতাৎ ত্রায়ত ইতি ক্ষত্রিয়ঃ'**। ক্ষত্রিয়দের স্বাভাবিক যে কর্ম থাকে, তাকে বলা হয় ক্ষাত্রকর্ম।

পরিশিষ্ট-ভাব—ক্ষত্রিয়গণ অত্যন্ত শূরবীর ও পরাক্রমশালী হন। কিন্তু ঈর্ষা-দ্বেষ ইত্যাদির জন্য যে রাজারঅধিকারে শাসন ক্ষমতা ছিল, তিনি নিজের অধীনস্ত রাজপুতদের উৎসাহ খর্ব করার চেষ্টা করেছেন, তাদের উন্নতিসাধনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন যাতে তারা প্রবল হয়ে তাঁর রাজ্য ছিনিয়ে নিতে না পারে। এইরূপ ঈর্ষার জন্যই নিজেদের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হওয়ায় বিধর্মীরা ভারত জয় করতে সক্ষম হয়েছিল।

***

সম্বন্ধ—পরবর্তী শ্লোকে বৈশ্য এবং শূদ্রদের স্বাভাবিক কর্মের কথা জানিয়েছেন।

কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্‌।
পরিচর্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্‌॥ ৪৪ ॥

---

[১]নিজের জন্য যুদ্ধ করার চিন্তা নেই, কোনো স্বার্থও নেই, কিন্তু পরিস্থিতির বশবর্তী হয়ে শুধুমাত্র কর্তব্যরূপে যে যুদ্ধ প্রাপ্ত হয়, তাকেই বলা হয় 'ধর্মময় যুদ্ধ'।

[**কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যম্** (চাষ করা, গোরক্ষা করা ও বাণিজ্য করা এগুলি সবই) ; **বৈশ্যকর্ম, স্বভাবজম্** (বৈশ্যদের স্বভাবজ কর্ম) ; **পরিচর্যাত্মকং** (চারবর্ণের সেবা করা) ; **শূদ্রস্য, অপি** (শূদ্রদেরও) ; **স্বভাবজম্, কর্ম** (স্বাভাবিক কর্ম।)]

চাষ করা, গোরক্ষা করা ও ব্যবসা-বাণিজ্য করা—এগুলি বৈশ্যদের স্বভাবজ কর্ম এবং চার বর্ণের সেবা করা হল শূদ্রদের স্বাভাবিক কর্ম ॥ ৪৪ ॥

ব্যাখ্যা—**'কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্'** —কৃষিকাজ করা, গোরক্ষা করা, গো-বংশ বৃদ্ধি করানো এবং শুদ্ধ ব্যবসায়-বাণিজ্য করা—এগুলি হল বৈশ্যদের স্বাভাবিক কর্ম।

শুদ্ধ ব্যবসায় করার অর্থ হল—যে দেশে, যে সময়ে, যে বস্তুটির প্রয়োজন থাকে, অন্যের হিতার্থে সেই বস্তু (যেস্থানে পাওয়া যায়, সেখান থেকে এনে) সেই দেশে প্রেরণ করা, লোকের প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাব পূরণ করা, যাতে কেউ কষ্ট না পায়—এই মনোভাব নিয়ে সততার সঙ্গে সেই বস্তুগুলির বিপণন করা।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ (যাদবকুলে প্রতিপালিত হওয়ায়) নিজেকে বৈশ্য বলে মনে করতেন[১]। তাই উনি নিজে গাভী চরাতেন। মনুঋষি বৈশ্যদের জন্য **'পশুনাং রক্ষণম্'** (মনুস্মৃতি ১।৯০) (পশুদের রক্ষা করার কথা) বলেছেন, কিন্তু ভগবান এখানে (উপরিউক্ত পদে) তাঁদের জ্ঞাতিভাইদের যেন বলতে চেয়েছেন যে, তোমরা সমস্ত পশুদের পালন বা রক্ষা করতে সক্ষম না হলেও অন্তত গাভীদের রক্ষা ও প্রতিপালন অবশ্যই করবে। তাদের বংশ বৃদ্ধিতে সাহায্য করতে না পারলেও, তাদের সংখ্যা যাতে কমে না যায়, সেদিকে দৃষ্টি রাখবে। তাই বৈশ্য সমাজের উচিত নিজেদের শরীর, অর্থ সর্বস্ব দিয়ে গো-বংশ রক্ষা করা।

গোরক্ষা সম্পর্কে বিশেষ কথা

মানুষের পক্ষে সব দিক থেকেই গোরু অবশ্য পালনীয়। গোরু থেকে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—চারটি পুরুষার্থের সিদ্ধি হয়। এখনকার অর্থ-প্রধান যুগে গোরু অত্যন্ত উপযোগী। গো-পালন দ্বারা দুধ, ঘি, গোবর ইত্যাদির সাহায্যে অর্থ বৃদ্ধি হয়। আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান। এখানে কৃষিকাজের জন্য বলদের যত দরকার অন্যান্য দেশে তত নয়। মহিষের দ্বারা ক্ষেতের কাজ হলেও বলদের সাহায্যে যতটা সম্ভব হয়, মহিষের দ্বারা তত হয় না। কারণ মহিষ বলবান হলেও, গরম সহ্য করতে পারে না। কেন-না মহিষের মধ্যে সাত্ত্বিক শক্তি থাকে না, যা বলদের থাকে। এ ছাড়া মহিষের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম হয়। তেমনি উটের দ্বারাও ক্ষেতের কাজ করানো সম্ভব হলেও, উট সংখ্যায় মহিষের থেকে কম হওয়ায়, তার দাম খুব বেশি। তাই চাষীরা উট ক্রয় করতে পারে না। আজকাল বলদের মৃত্যুহার বেড়ে যাওয়ায় বলদের দামও বেশি হয়ে গেছে, তা সত্ত্বেও উটের চেয়ে এখনও কম দামে বলদ পাওয়া যায়। চাষীর কাছে যদি গোরু থাকে, তাহলে তার ঘরেই বলদের জন্ম হতে পারে ; তবে আর চাষীকে বলদ কিনতে হয় না। বিদেশী বলদ চাষের কাজ করতে পারে না। কারণ সেগুলির কাঁধ না থাকায় তাতে জোয়াল চাপানো যায় না।

গোরু অতি পবিত্র, তার সংস্পর্শে বাতাস পবিত্র হয়, গাভীর গোবর, গো-মূত্রও পবিত্র। গোবর-লিপ্ত স্থানে প্লেগ-কলেরা ইত্যাদি ভয়ঙ্কর রোগের জীবাণুও থাকে না। যুদ্ধে বোমার নিক্ষেপে সিমেন্টের তৈরি বাড়ি যেমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় গোবর-লিপ্ত মাটির তৈরি বাড়ি তেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। গোবরের বিষ আকর্ষণের এক বিশেষ শক্তি থাকে। কাশীতে কোনো এক ব্যক্তি সর্পদংশনে মারা যায়। দাহকার্যের জন্য তাকে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে এক সাধু জিজ্ঞাসা করেন, কী করে সেই ব্যক্তিটি মারা গেছে ! সঙ্গীরা জানাল যে সর্প-দংশনে সেই ব্যক্তির মৃত্যু ঘটেছে।

সাধু জানালেন, লোকটি মরেনি এবং তাদের গোবর আনতে বললেন। তারা গোবর নিয়ে এলে সাধু সেই

[১]কৃষিবাণিজ্যগোরক্ষং কুসীদং তুর্যমুচ্যতে। বার্তা চতুর্বিধা তত্র বয়ং গোবৃত্তয়োঽনিশম্॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।২৪।২১)
'বৈশ্যগণের বৃত্তি চার প্রকারের—কৃষি, বাণিজ্য, গো-রক্ষা এবং সুদ গ্রহণ। এই চারটির মধ্যে আমরা সর্বদা গো-পালনই করে এসেছি।'

ব্যক্তির নাক বাদ দিয়ে সর্বাঙ্গে গোবর লিপ্ত করলেন। আধঘণ্টা পরে পুনরায় গোবর মাখালেন। কিছু পরে লোকটির নিঃশ্বাস বইতে শুরু করল এবং সে বেঁচে উঠল। হৃদ্‌রোগ দূর করার জন্যও গো-মূত্র অত্যন্ত কার্যকরী। ছোট বাছুরের গো-মূত্র প্রত্যহ এক তোলা, দু- তোলা পান করলে পেটের রোগ দূর হয়। একজন সাধুর হাঁপানী ছিল, গো-মূত্র সেবন করে তাঁর অত্যন্ত উপকার হয়। এখন গোবর এবং গো-মূত্রের থেকে অনেক ওষুধ তৈরি করা হচ্ছে। আজকাল গোবর থেকে গোবর-গ্যাসও তৈরি হচ্ছে।

ক্ষেতে গোবর ও গো-মূত্রের সার পেয়ে যে শস্য উৎপন্ন হয়, তা পবিত্র হয়। ক্ষেতে গোরু চরালে তার গোবর এবং মূত্রের দ্বারা জমির যে পুষ্টি হয়, বিদেশী রাসায়নিক সারে তা হয় না। একবার এক আঙ্গুর-চাষী বলেছিল যে গোবর সার দিলে আঙ্গুরের থোকা যেমন বড় হয়, বিদেশী সারে তত হয় না। বিদেশী সারে কিছুদিন পর থেকেই জমি খারাপ হতে থাকে অর্থাৎ তার শস্য জন্মানোর ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু গো-ময় ও গো-মূত্রে জমির উপজাত ক্ষমতা সমানই থাকে। বিদেশে এইভাবেই রাসায়নিক সারে অনেক জমি নষ্ট হয়ে গেছে। যা ঠিক করার জন্য বিদেশীরা ভারত থেকে জাহাজ-ভর্তি গোবর কিনে নিয়ে যাচ্ছে।

আমাদের দেশের গোরু সৌম্য ও সাত্ত্বিক। তার দুধও সাত্ত্বিক, যা পান করলে বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয় এবং স্বভাব শান্ত ও সৌম্য হয়। বিদেশী গোরুর দুধ বেশি হলেও, তাদের স্বভাব শান্ত হয় না। তাই সেই দুধ পান করলে মানুষের স্বভাবও ক্রূর হয়ে ওঠে। মহিষের দুধও বেশি হয়, কিন্তু তা সাত্ত্বিক নয়। তাতে সাত্ত্বিক বল হয় না। সৈন্যদের ঘোড়াদেরও গোরুর দুধ দেওয়া হয়, যার ফলে তারা খুব তেজী হয়। একবার সৈনিকরা পরীক্ষা করার জন্য কিছু ঘোড়াকে মহিষের দুধ পান করিয়েছিল, এতে সেগুলি খুব মোটা হয়ে গিয়েছিল আর নদী পেরোনোর সময়, নদীতে বসে পড়ে। মহিষ যেমন নদীতে বসে পড়ে, সেই স্বভাব ঘোড়ার মধ্যেও এসে যায়। উটেরও দুধ হয়, কিন্তু তাতে দই, মাখন ইত্যাদি হয় না। উটের দুধ তামসিক, তাই এটি দুর্গতিদায়ক। স্মৃতিশাস্ত্রে উট, কুকুর, গাধা ইত্যাদিকে অস্পৃশ্য বলা হয়েছে।

সমস্ত ধর্মীয় কাজে গোরুর প্রাধান্য থাকে। জাতকর্ম, চূড়াকর্ম, উপনয়ন ইত্যাদি ষোড়শ সংস্কার কার্যে গোরু, গোরুর দুধ, ঘি ইত্যাদির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা থাকে। গব্য ঘি দিয়ে যজ্ঞ করা হয়। স্থান শুদ্ধির জন্য গোবরের প্রয়োজন হয়। শ্রাদ্ধকর্মে গোরুর দুধের পায়সান্ন তৈরি করা হয়। নরক-ভোগ থেকে রক্ষা পেতে গো-দান করা হয়। ধর্মীয় কর্মে 'পঞ্চগব্য' লাগে, যা গোরুর দুধ-দই-ঘি-গোবর ও গো-মূত্র দ্বারা প্রস্তুত করা হয়।

কামনা সিদ্ধির জন্য যে যজ্ঞ করা হয় তাতে গব্য ঘি ইত্যাদি কাজে লাগে। রঘুবংশের রাজত্বকালে গোরুর প্রাধান্য ছিল। পুষ্টিকর ও বীর্যবর্ধক হিসাবে গোরুর দুধ ও ঘি অত্যন্ত উপকারী।

নিষ্কামভাবে গোরুর সেবা করলে মুক্তি হয় এবং চিত্ত নির্মল হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও পাদুকাবিহীন হয়ে গোচারণা করতেন, যার জন্য তাঁর নাম হয়েছিল 'গোপাল'। প্রাচীনকালে ঋষিরা তাঁদের আরণ্যক আশ্রমে গোরু পুষতেন। গোরুর দুধ-ঘিতে তাঁদের বুদ্ধি প্রখর ও তীক্ষ্ণ হত, যার ফলে তাঁরা বহু গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। আজকাল সেগুলি অনুধাবন করারই লোক পাওয়া যায় না। ঘি-দুধের জন্য তাঁরা দীর্ঘায়ু হতেন। তাই গব্য ঘৃতের আরেক নাম 'আয়ু'। বড় বড় রাজা মহারাজাও এইসব ঋষিদের কাছে আসতেন রাজ্য পরিচালনের পরামর্শ নিতে।

যাঁরা গো-রক্ষার জন্য আত্মদান করেছেন, ইতিহাস পুরাণে তাঁরা স্মরণীয় হয়ে আছেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হল যে আজকাল আমাদের দেশে অর্থের লোভে প্রত্যহ হাজার হাজার গো-হত্যা করা হয়। এইভাবে গো-হত্যা করলে এক সময় গো-বংশ ধ্বংস হয়ে যাবে। গোরু না থাকলে যে কী বিপদ হতে পারে—তা কেউ ভাবতে পারে না। গোবর উৎপাদন হবে না, সার তৈরি হবে না, জমি গোবর-সার ছাড়া ফসল ফলাবার উপযোগী থাকবে না, তার ফলে চাষ-বাস ভালো হবে না, অন্ন-বস্ত্রের অভাব দেখা দেবে। ঘি-দুধ পাওয়া যাবে না। এই গো-ধনের অভাবে দেশ পরাধীন ও দুর্বল হয়ে পড়বে। এখনও যে এত অনাবৃষ্টি, দলাদলি, রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা যায়, তার পরোক্ষ কারণ গো-হত্যা। সুতরাং পূর্ণ শক্তি দিয়ে গো-বংশ রক্ষা করা দরকার, এ আমাদের পরম কর্তব্য।

গো-রক্ষার জন্য আমাদের উচিত গো-পালন করা,

নিজগৃহে তাদের প্রতিপালন ও পরিচর্যা করা। গব্য ঘৃত ও গো-দুগ্ধই পান করা উচিত, মহিষের নয়। গোবর-গ্যাসও রন্ধন কাজে ব্যবহার করা যায়। গোরুর জন্য পরিচ্ছন্ন গোশালা করা উচিত, গো-বংশ রক্ষা এবং বৃদ্ধির জন্য গোশালা স্থাপন করা প্রয়োজন, শুধুমাত্র দুগ্ধের জন্য নয়। গোচারণ ভূমি রক্ষা প্রয়োজন। সরকারের গো-হত্যা নীতির বিরোধিতা করা উচিত এবং সরকারকে অনুরোধ করা দরকার যে তাঁরা যেন দেশে গো-হত্যা নিষেধ করেন।

'পরিচর্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্'—চার বর্ণের লোকের সেবা করা, সেবার সামগ্রী প্রস্তুত করা এবং চার বর্ণের মানুষের কাজে যাতে কোনো বাধা না আসে, সকলে যাতে সুখে-আরামে থাকে—সেই ভাবনাতে নিজ শক্তি, সামর্থ্য, যোগ্যতা দ্বারা সকলের কাজে ব্যাপৃত থাকা হল শূদ্রের স্বভাবজ কর্ম।

এখানে একটি সংশয় আসতে পারে যে ভগবান চার বর্ণের উৎপত্তি সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিনটি গুণ থেকে হয়েছে বলেন। তার মধ্যে তমোগুণের প্রাধান্যে শূদ্রের উৎপত্তি বলে জানিয়েছেন এবং গীতায় যেখানে তমোগুণের বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে তমোগুণের অজ্ঞান, প্রমাদ, আলস্য, নিদ্রা, অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি, মোহ—এই সাতটি দোষের কথা বলা হয়েছে (গীতা ১৪।৮ ; ১৪।১৭)। সুতরাং এরূপ তমোগুণী শূদ্রদের দ্বারা সেবার কাজ কীভাবে হবে ? আলস্য, প্রমাদে যদি তারা ব্যাপৃত থাকে, তবে সেবা করবে কখন ? সেবা অতি উচ্চ ব্যাপার। এরূপ উচ্চ-কর্মের বিধান ভগবান শূদ্রদের ক্ষেত্রে কেন করলেন ?

যদি এই সংশয়কে গুণাদির দৃষ্টিতে বিচার করা হয় তাহলে দেখা যায় গীতায় বলা হয়েছে যে সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তি উচ্চলোকে গমন করেন, রজোগুণসম্পন্ন ব্যক্তি মৃত্যুর পর মধ্যলোকে অর্থাৎ মৃত্যুলোকে যায় এবং তমোগুণী ব্যক্তি অধোগতি লাভ করে (গীতা ১৪।১৮)। এতেও প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় যে রজোগুণের বৃদ্ধিতে মৃত্যু হলে, কর্মপ্রধান মনুষ্যযোনিতে জন্ম হয়—**'রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্মসঙ্গিষু জায়তে'** (গীতা ১৪।১৫)। এই সবের অর্থ হল যে মানুষমাত্রেই রজঃপ্রধান (রজোগুণের প্রাধান্যসম্পন্ন)। রজোগুণের প্রাধান্য থাকাতে যে সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস—তিনটি গুণ হয়, সেই তিনটি গুণ হতেই চার বর্ণের উদ্ভব হয়। তাই সকলের ক্ষেত্রেই কর্ম করা হল মুখ্য এবং সেইজন্যই মানুষকে কর্মযোনি বলা হয়েছে। গীতাতেও চার বর্ণের কর্মের জন্য 'স্বভাবজ কর্ম' 'স্বভাবনিয়ত কর্ম' ইত্যাদি পদ উল্লিখিত হয়েছে। সুতরাং শূদ্রের পরিচর্যা বা সেবা করা তাদের 'স্বভাবজ কর্ম', তাতে এদের পরিশ্রম বোধ হয় না।

মনুষ্যমাত্রই কর্মযোনি হলেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের মধ্যে বিচার-বিবেচনার বিশেষ তারতম্য থাকে এবং শুদ্ধিও থাকে। কিন্তু শূদ্রের মধ্যে মোহের প্রাধান্য থাকায়, তাদের বিবেক সুপ্তাবস্থায় থাকে। সেইজন্য শূদ্রের সেবা-কার্যে চিন্তাশক্তির প্রাধান্য না থেকে নির্দেশপালন করার প্রাধান্য থাকে—**'অগ্যা সম ন সুসাহিব সেবা'** (শ্রীরামচরিতমানস ২।৩০১।২)। তাই চার বর্ণের নির্দেশানুযায়ী সেবা করা, সুখ-সুবিধা করে দেওয়া শূদ্রদের পক্ষে স্বাভাবিক হয়।

শূদ্রদের কর্ম হয় পরিচর্যাত্মক অর্থাৎ তা সেবামূলক হয়ে থাকে। তাদের দ্বারা শারীরিক, সামাজিক, নাগরিক, গ্রামীণ ইত্যাদি সকল কর্মই সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়, যার ফলে চার বর্ণের জীবন-নির্বাহের সুখ-সুবিধা, অনুকূলতা এবং আবশ্যকতার পূরণ হয়।

স্বাভাবিক কর্মের অর্থ

চেতনস্বরূপ জীবাত্মা এবং জড়-প্রকৃতি—এই দুইয়ের স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। চেতনস্বরূপ স্বভাবতঃই নির্বিকার অর্থাৎ অপরিবর্তনশীল এবং প্রকৃতি স্বাভাবিকভাবে বিকারশীল বা পরিবর্তনশীল। সুতরাং উভয়ের স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় এদের সম্বন্ধ স্বাভাবিক নয় ; কিন্তু চেতন প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্পর্ক মেনে নিয়েছে। একেই বলা হয় গুণাদির সঙ্গ বা আসক্তি, এটিই জীবাত্মার উচ্চ-নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করার কারণ হয়ে থাকে—**'কারণং গুণাসঙ্গোহস্য সদসদ্ যোনি জন্মসু'** (গীতা ১৩।২১)। এই আসক্তির জন্য, গুণাদির তারতম্যে জীবের ব্রাহ্মণ ইত্যাদি বর্ণে জন্ম হয়। গুণাদির তারতম্যে যে বর্ণে জন্ম হয়, সেই গুণানুসারেই সেই বর্ণের কর্ম তার পক্ষে স্বাভাবিক ও সহজ হয় ; যেমন—ব্রাহ্মণদের পক্ষে শম, দম, তপস্যাদি ; ক্ষত্রিয়দের পক্ষে শৌর্য, তেজ

ইত্যাদি ; বৈশ্যদের পক্ষে কৃষি, গো-রক্ষা ইত্যাদি এবং শূদ্রদের পক্ষে সেবা কার্য—এগুলি তাদের দ্বারা স্বতঃ স্বাভাবিকভাবে হয়ে থাকে। তাৎপর্য হল এই যে চার বর্ণের লোকেদের এইসব কর্ম করতে কষ্টবোধ হয় না। কারণ গুণাদি অনুসারে স্বভাব এবং স্বভাব অনুসারে তাদের জন্য কর্মবিধান করা হয়েছে। তাই এইসব কর্মে তাদের স্বাভাবিকভাবে রুচি থাকে। মানুষ এইসব স্বাভাবিক কর্ম যখন নিজের জন্য অর্থাৎ নিজ স্বার্থ, ভোগ ও আরামের জন্য করে, তখন সে ওই কর্মের দ্বারা আবদ্ধ হয়। কিন্তু সেগুলিই স্বার্থ ও অহং-কর্তৃত্ব বোধ পরিত্যাগ করে নিষ্কামভাবে জগতের হিতার্থে করলে সেটি 'কর্মযোগ' হয়ে ওঠে, আবার সেই কর্মের দ্বারাই জগতে পরিব্যাপ্ত পরমাত্মার পূজন করলে বা ভগবদ্‌পরায়ণ হয়ে শুধুমাত্র ভগবদ্‌সম্বন্ধীয় কর্ম (জপ-ধ্যান-সৎসঙ্গ-স্বাধ্যায় ইত্যাদি) করলে, সেটি 'ভক্তিযোগ' হয়ে থাকে। তখন প্রকৃতির গুণগুলি সর্বতোভাবে বিচ্ছেদ হয়ে শুধুমাত্র পরমাত্মতত্ত্ব থেকে যায়, যাতে সিদ্ধ মহাপুরুষের স্বরূপের স্বতঃসিদ্ধ স্বাতন্ত্র্য, অখণ্ডতা, নির্বিকার-ভাবের অনুভূতি থাকে। তা সত্ত্বেও তাঁর শরীর, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা নিজ নিজ বর্ণ, আশ্রমের মর্যাদা অনুসারে নির্লিপ্তভাবে শাস্ত্রবিহিত কর্ম স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন হয়, যা হয় জগতের কাছে আদর্শ-স্বরূপ। ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় প্রতিক্ষণ তাঁর প্রেম বর্ধিত হতে থাকে, যা অনন্ত আনন্দস্বরূপ।

জাতি জন্মের দ্বারা মানা হবে, না কর্মের দ্বারা ?

উচ্চ-নীচ যোনিতে যত শরীর (জন্ম) প্রাপ্ত হয়, সেগুলি সবই গুণ ও কর্মানুসারে প্রাপ্ত হয়ে থাকে। মনুষ্যজন্মও গুণ ও কর্মানুসারে প্রাপ্ত হয় ; তাই মনুষ্য জাতিও জন্ম অনুযায়ীই মানা হয়। অতএব স্থূল-শরীরের দৃষ্টিতে বিবাহ, ভোজন ইত্যাদি কর্ম জন্মের প্রাধান্য ধরেই করা উচিত অর্থাৎ নিজ নিজ জাতি বা বর্ণ অনুযায়ী ভোজন, বিবাহ ইত্যাদি হওয়া উচিত।

অপরপক্ষে, যেসব প্রাণীর জাগতিক ভোগ, ধন, আরাম ও সুখের দিকে লক্ষ্য থাকে, তাদের পক্ষে বর্ণানুযায়ী কর্তব্য-কর্ম করা এবং বর্ণের মর্যাদা অনুসারে চলা অত্যন্ত আবশ্যক। তারা যদি সেই মর্যাদা অনুসারে না চলে তাহলে তাদের পতন হয়[১]। কিন্তু যাদের শুধুমাত্র পরমাত্মাই উদ্দেশ্য থাকে, জাগতিক ভোগাদি নয়, তাদের পক্ষে সৎসঙ্গ, স্বাধ্যায়, জপ, ধ্যান, কথা-কীর্তন, পরস্পর ভাব-বিনিময় ইত্যাদি ভগবদ্‌সম্বন্ধীয় কাজ প্রধান হয়ে থাকে। তাৎপর্য হল এই যে পরমাত্মাপ্রাপ্তিতে প্রাণীর পারমার্থিক ভাব, আচরণ ইত্যাদির প্রাধান্য থাকে, জাতি বা বর্ণের নয়।

তৃতীয়তঃ, যাদের উদ্দেশ্য থাকে পরমাত্মাকে লাভ করা, তারা প্রধানতঃ ভগবদ্‌সম্পর্কীয় কর্ম করলেও বর্ণ-আশ্রম অনুসারে ভগবদ্‌প্রীত্যর্থে নিজ নিজ কর্তব্য-কর্ম পূজার ন্যায় সম্পন্ন করে থাকে।

পরবর্তী ছেচল্লিশতম শ্লোকে ভগবান একটি অতি শ্রেষ্ঠ কথা জানিয়েছেন যে যাঁর থেকে সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হয়েছে এবং সমস্ত জগৎকে যিনি ব্যাপ্ত করে আছেন, সেই পরমাত্মার দিকে লক্ষ্য রেখে, তাঁর প্রীত্যর্থে, পূজার ভাবে নিজ নিজ বর্ণানুসারে কর্ম করতে হয়। মনুষ্যমাত্রেরই এতে অধিকার আছে। দেবতা, অসুর, পশু, পক্ষীর এতে স্বাভাবিক-ভাবে অধিকার না থাকলেও পরমাত্মার দিক থেকে তাদের কোনো বাধা নেই। কারণ সকলেই পরমাত্মার অংশ হওয়ায় পরমাত্মার প্রাপ্তিতে সকলেই অধিকারী। প্রাণী-মাত্রেরই ভগবানের ওপর সম্পূর্ণ অধিকার থাকে। এর দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে নিজেদের মধ্যে ব্যবহারে অর্থাৎ খাদ্য, সন্তান ও শরীরের সঙ্গে ব্যবহারে জন্মের প্রাধান্য থাকে আর পরমাত্মার প্রাপ্তিতে ভাব, বিবেক ও 'কর্মের' প্রাধান্য থাকে। এই বিষয়ে ভাগবতে বলা হয়েছে যে, বর্ণ-নির্দিষ্ট লক্ষণ যদি কারও অন্য বর্ণের লক্ষণের সঙ্গে মেলে তবে তাকে সেই বর্ণেরই বলে জানতে হবে[২]। তার অর্থ হল যে ব্রাহ্মণের শম, দম

---

[১]আচারহীনং ন পুনন্তি বেদা যদ্যপ্যধীতাঃ সহ ষড়্‌ভিরঙ্গৈঃ। ছন্দাংস্যেনং মৃত্যুকালে ত্যজন্তি নীড়ং শকুন্তা ইব জাতপক্ষাঃ॥ (বশিষ্ঠস্মৃতি)

'শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ছন্দ, ব্যাকরণ ও জ্যোতিষ—এই ষষ্ঠ অঙ্গসহ অধীত বেদও আচারহীন ব্যক্তিকে পবিত্র করে না। পাখার উদ্গম হলে পাখি যেমন বাসা ছেড়ে যায়, তেমনই বেদ আচারহীন ব্যক্তিকে মৃত্যুকালে পরিত্যাগ করে।'

[২]যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্। যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তৎ তেনৈব বিনির্দিশেৎ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ৭।১১।৩৫)

ইত্যাদি যতপ্রকার লক্ষণ ও গুণ তা যদি স্বাভাবিকভাবে অন্য কারও মধ্যে দেখা যায়, তাহলে জন্মগতভাবে নীচ বর্ণ হলেও তাকে নীচ বর্ণের বলে মনে করা উচিত নয়। এইরূপই মহাভারতে যুধিষ্ঠির ও নহুষের কথোপকথনে আছে যে, যে শূদ্র আচার-আচরণে শ্রেষ্ঠ, তাঁকে শূদ্র বলে মানা উচিত নয় এবং যে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণোচিত আচরণ-বর্জিত, তাঁকে ব্রাহ্মণ বলে মনে করা উচিত নয়[১] অর্থাৎ সেখানে গুণ ও কর্মকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, জন্মকে নয়।

শাস্ত্রে যে এইসব কথা বলা হয়েছে, তার অর্থ হল যে, কোনো নীচ বর্ণের সাধারণ মানুষও পারমার্থিক উন্নতি করতে সক্ষম, তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। শুধু তাই নয়, সে নিজ বর্ণে থেকেই শম, দম ইত্যাদি সাধারণ ধর্ম যথাযথ পালন করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকট করতে পারে। জন্ম পূর্বজন্মের কর্মানুসারে লাভ হয়, তাতে কোনো মানুষের হাত নেই। কিন্তু সে নিম্নবর্ণে থেকেও নিজের উন্নতি সাধন করতে পারে। সেই নতুন কর্মে উৎসাহদান করাই হল শাস্ত্রগুলির উদ্দেশ্য যাতে, নিম্ন বর্ণের মানুষেরা নিজেদের উন্নতি করতে পশ্চাদ্‌পদ না হয়। যে ব্যক্তি উচ্চবর্ণসম্পন্ন হয়েও বর্ণোচিত কর্ম করে না, তাকেও শাস্ত্র নিজ বর্ণোচিত কাজ করতে উৎসাহ প্রদান করে। যেমন—**'ব্রাহ্মণস্য হি দেহোঽয়ং ক্ষুদ্রকামায় নেষ্যতে।'** (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৭।৪২)।

স্মৃতিশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, যেসব ব্রাহ্মণের খাওয়া-দাওয়া, আচার-আচরণ সর্বতোভাবে ভ্রষ্ট, ব্রাহ্মণ হলেও তাদের কথায় সম্মান করা উচিত নয়।[২] কিন্তু যাঁদের আচরণ শ্রেষ্ঠ, যাঁরা ভগবদ্‌ভক্ত, ভাগবত, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ও ইতিহাসে সেইসব ব্রাহ্মণদের অনেক মহিমা গীত হয়েছে।

ভগবদ্‌ভক্ত যত নীচ জাতিরই হোন না কেন, তিনি ভক্তিহীন বিদ্বান ব্রাহ্মণদের থেকে শ্রেষ্ঠ[৩]।

বিরাটরূপ ভগবানের ব্রাহ্মণরা হলেন মুখ, ক্ষত্রিয়রা হাত, বৈশ্যেরা উরু বা মধ্যভাগ এবং শূদ্রেরা হলেন পা। ব্রাহ্মণদের মুখ বলার অর্থ হল যে তাঁদের কাছে জ্ঞানের

---

[১]শূদ্রে তু যদ্‌ ভবেল্লক্ষ্ম দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে। ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ॥
যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ। যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নির্দিশেৎ॥
(মহাভারত, বনপর্ব ১৮০।২৫-২৬)

[২](ক) পাষণ্ডিনো বিকর্মস্থান্‌ বৈডালব্রতিকাঞ্ছঠান্‌। হৈতুকান্‌ বকবৃত্তীংশ্চ বাঙ্‌মাত্রেণাপি নার্চয়েৎ॥ (মনুস্মৃতি ৪।৩০)
'ভণ্ড, বিরুদ্ধকর্মকারী, বৈডালব্রতী, হঠকারী ও বকবৃত্তিযুক্ত ব্রাহ্মণদের বাক্যদ্বারাও সম্মান জানানো উচিত নয়।'
(খ) ন বার্যপি প্রযচ্ছেত্তু বৈডালব্রতিকে দ্বিজে। ন বকব্রতিকে বিপ্রে নাবেদবিতি ধর্মবিৎ॥ (মনুস্মৃতি ৪।১৯২)
'ধর্মজ্ঞ, গৃহাশ্রমী, বৈড়ালব্রতী, বকব্রতী এবং বেদে অনভিজ্ঞ ব্রাহ্মণদের জলদানও করা উচিত নয়।'

[৩](ক) অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্‌ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্‌।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্যা ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ৩।৩৩।৭)
'অহো! সেই চণ্ডালও সর্বশ্রেষ্ঠ, যার জিহ্বাগ্রে আপনার নাম বিরাজ করে। যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আপনার নাম জপ করেন, তিনি তপ, যজ্ঞ, সদাচার পালন ও বেদাধ্যয়ন—সবই করেছেন।'
(খ) বিপ্রাদ্‌ দ্বিষড়্‌গুণযুতাদরবিন্দনাভপাদারবিন্দবিমুখাচ্ছ্বপচং পচং বরিষ্ঠম্‌।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থপ্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ৭।৯।১০)
'দ্বাদশ গুণাদি যুক্ত ব্রাহ্মণও যদি ভগবান কমলনাভের চরণ-কমলে বিমুখ হয়, তাহলে আমার বুদ্ধিতে (মতে) সেই চণ্ডালই শ্রেষ্ঠ, যে তার মন, বাক্য, কর্ম, অর্থ এবং প্রাণ ভগবানে অর্পণ করেছে, কারণ সে তো নিজের কুলকেও পবিত্র করেছে ; কিন্তু শ্রেষ্ঠত্বের অহংসর্বস্ব ভগবদ্‌বিমুখ ব্রাহ্মণ নিজেকেও পবিত্র করতে সক্ষম নয়।'
(গ) চাণ্ডালোঽপি মুনেঃ শ্রেষ্ঠো বিষ্ণুভক্তিপরায়ণঃ। বিষ্ণুভক্তিবিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপতোঽধমঃ॥ (পদ্মপুরাণ)
'হরিভক্তিতে লীন চণ্ডালও মুনিদের থেকে শ্রেষ্ঠ এবং হরিভক্তিরহিত ব্রাহ্মণ চণ্ডালেরও অধম।'
(ঘ) অবৈষ্ণবাদ্‌ দ্বিজাদ্‌ বিপ্র চাণ্ডালো বৈষ্ণবো বরঃ। সগণঃ শ্বপচো মুক্তো ব্রাহ্মণো নরকং ব্রজেৎ॥
(ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ব্রহ্মা. ১১।৩৯)

সংগ্রহ থাকে, তাই চার বর্ণের লোকেদের অধ্যয়ন করানো, শিক্ষা ও উপদেশ প্রদান করা—এ সবই মুখের কাজ। তাই ব্রাহ্মণদের উচ্চবর্ণ বলা হয়।

ক্ষত্রিয়দের হাত বলার অর্থ হল যে এরা চার বর্ণের মানুষকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করে। রক্ষা করা প্রধানতঃ হাতেরই কাজ ; যেমন, শরীরে কোনো কিছু হলে হাত দিয়েই তা রক্ষা করা ; শরীরে কোনো আঘাত লাগলে হাত দিয়েই তাকে আড়াল করা হয়, নিজেকে রক্ষা করতে গেলে অপরকে হাত দিয়েই আঘাত করতে হয়। মানুষ পড়ে যাবার সময় হাত দিয়েই পতন সামলায়। তাই ক্ষত্রিয়দের হাত বলা হয়। অরাজকতার সময় জীবন, অর্থ রক্ষা করা চার বর্ণেরই ধর্ম হয়ে থাকে ।

বৈশ্যদের মধ্যভাগ বলার অর্থ হল যে, যেমন—অন্ন, জল, ওষুধ ইত্যাদি উদরে গেলে তার থেকে শরীরের সমস্ত অংশের পরিপোষণ হয় এবং পুষ্টি হয়, তেমনই বস্তু সংগ্রহ করা, সেগুলি আদান-প্রদান করা, যেখানে যে বস্তুর অভাব সেখানে সেটি নিয়ে যাওয়া, প্রজাদের কোনো কিছু অভাব হতে না দেওয়া—এ সবই বৈশ্যদের কাজ। উদরে অন্ন-জলের সংগ্রহ সমস্ত শরীরের জন্যই এবং তার সঙ্গে উদরও পূর্ণ হয় ; মানুষ শুধুমাত্র তার উদরের জন্যই তা পূর্ণ করে না। তেমনই বৈশ্যও যেন অপরের জন্যই বস্তু সংগ্রহ করে, শুধুমাত্র নিজের জন্য নয়। তারা ব্রাহ্মণকে দান করে, ক্ষত্রিয়কে খাজনা দেয়, নিজের পালন করে এবং শূদ্রদের দিয়ে কায়িক পরিশ্রম করায় । এইভাবে তারা সকলেরই পালন করে। যদি তারা সংগ্রহ না করে, কৃষি- গো-রক্ষা-বাণিজ্য না করে তাহলে কী দেবে ?

শূদ্রদের চরণ বলার অর্থ হল যে, চরণ যেমন শরীরকে চালনা করে, সমস্ত শরীরের সেবা যেমন চরণদ্বয়ের সাহায্যে হয়, তেমনই সেবার সাহায্যেই চার বর্ণের কাজ চলে। শূদ্র তাদের সেবাকার্যের সাহায্যে সকলের আবশ্যক কার্য পূরণ করে।

উপরিউক্ত আলোচনাতে একটি ব্যাপার লক্ষ্য করার হল এই যে, গীতার চার বর্ণের সেই স্বাভাবিক কর্মের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, যা স্বাভাবিকভাবে হয় অর্থাৎ যেগুলি করতে অধিক শ্রম হয় না। চার বর্ণের জন্য আরও অন্যান্য কর্মের বিধান আছে, সেগুলি স্মৃতিশাস্ত্রে দেখতে হয়, সেই অনুযায়ী নিজের আচরণ ঠিক করা উচিত (গীতা ১৬।২৪)।

বর্তমান সময়ে চার বর্ণের মধ্যে স্বধর্মের লঙ্ঘন হলেও যদি চার বর্ণের কিছু লোককে একত্র করে বর্ণ অনুসারে ভাগ করে লক্ষ্য করা হয়, তাহলে দেখা যাবে ব্রাহ্মণের মধ্যে শম-দম ইত্যাদি গুণ যত বেশি পাওয়া যাবে, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের মধ্যে তত নয়। ক্ষত্রিয়দের মধ্যে শৌর্য-বীর্য-তেজ ইত্যাদি গুণ যত বেশি পাওয়া যায় ব্রাহ্মণ-বৈশ্য-শূদ্রের মধ্যে তত নয়। বৈশ্যদের মধ্যে ব্যবসায় করা, ধন উপার্জন করা ইত্যাদি গুণ যত বেশি দেখা যায়, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-শূদ্রের মধ্যে তত নয়। তেমনই শূদ্রের মধ্যে সেবা করার প্রবৃত্তি যত দেখা যায় অন্য তিন বর্ণের মধ্যে তত দেখা যায় না। তাৎপর্য হল এই যে বর্তমান সময়ে সকল বর্ণই মর্যাদাবর্জিত এবং বিশৃঙ্খল হয়ে পড়লেও স্বভাবজ কর্ম প্রত্যেকের মধ্যে বিশেষভাবে দেখা যায় অর্থাৎ ব্যক্তিগতভাবে না হলেও সামগ্রিকভাবে তা দেখা যায়।

যাঁরা শাস্ত্রের গভীর রহস্য জানেন না, তাঁরা বলে থাকেন যে, যেহেতু ব্রাহ্মণই শাস্ত্রাদি রচনা করেছেন, তাই তাঁরা 'ব্রাহ্মণই সর্বশ্রেষ্ঠ' এই কথা লিখে ব্রাহ্মণদের সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন। রাজারা অর্থাৎ ক্ষত্রিয়রা ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মহারাজ ! আমরা কি কেউ নই ?' ব্রাহ্মণেরা জবাব দিলেন, 'না-না, তা নয়, আপনারা আছেন, দু-নম্বরে।' বৈশ্যেরা জিজ্ঞাসা করল, 'মহারাজ ! আমরা না থাকলে আপনাদের জীবিকা-নির্বাহ হবে কী করে ?' ব্রাহ্মণ বললেন, 'তা তো ঠিকই, আপনারা তিন নম্বরে আছেন।' আর যাদের কাছে রাজ্যও ছিল না, অর্থও নয়, তারা উচ্চপদে যেতে চাইলে ব্রাহ্মণেরা বললেন, 'আপনাদের ভাগ্যে রাজ্য বা অর্থ কিছুই নেই। আপনারা এইসব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের

'অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বৈষ্ণব চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ। কারণ সেই বৈষ্ণব চণ্ডাল সবান্ধবে ভববন্ধন মুক্ত হয় আর অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ নরকে পতিত হয়।'

(৬) ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তা বিপ্রা ভাগবতাঃ স্মৃতাঃ। সর্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে হ্যভক্তা জনার্দনে॥ (মহাভারত)

'শূদ্র যদি ভগবদ্ভক্ত হয়, তাহলে সে শূদ্র নয়, পরম শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। আসলে সমস্ত বর্ণেই শূদ্র তাকে বলা হয় যে ভগবদ্ভক্তি রহিত।'

সেবা করতে থাকুন। চতুর্থ স্থান আপনাদের জন্য।' এইভাবে সকলকে প্রভাবিত করে বিদ্যা, অর্থ ও রাজ্যের প্রভাবে নিজেরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে চতুর্থ বর্ণকে পদদলিত করেছে অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের স্বার্থ ও আত্মাভিমানই হল উচ্চবর্গের সমাজবিধি রচনার কারণ।

তার উত্তর হল যে, ব্রাহ্মণেরা কোথাও তাঁদের ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম সম্বন্ধে এরূপ কিছু লেখেননি যে ব্রাহ্মণেরাই সর্বশ্রেষ্ঠ, তাই তাঁদের আরামে থাকা উচিত, ধন-সম্পত্তি পরিবৃত হয়ে সুখভোগ করা উচিত, বরং ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাঁদের ত্যাগ স্বীকার করা উচিত, কষ্টসহিষ্ণু হওয়া উচিত, তপশ্চর্যা করা উচিত। গৃহে অবস্থান করলেও সম্পদ-সংগ্রহ করা উচিত নয়, অন্নও স্বল্প সংগ্রহ করা উচিত। লৌকিক ভোগে আসক্ত হওয়া উচিত নয় এবং জীবিকা-নির্বাহের জন্য কারও দান গ্রহণ করলেও তার জন্য যজ্ঞ, হোম, জপ, পাঠ ইত্যাদি কাজ করে তবেই নিতে হয়। গো-দান গ্রহণ করলে তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত।

কেউ যদি কোনো ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধের জন্য ডাকতে চান, তাহলে তাঁকে শ্রাদ্ধের আগের দিন সেকথা বলতে হবে, যাতে ব্রাহ্মণ তাঁর পিতৃপুরুষকে নিজের মধ্যে আবাহন করে রাত্রে ব্রহ্মচর্য পালন ও সংযমপূর্বক থাকতে পারেন। পরের দিন তিনি আমন্ত্রণকর্তার পিতৃশ্রাদ্ধ ও তর্পণ ঠিকমতো করাবেন, পরে ভোজন গ্রহণ করবেন। একজন আমন্ত্রণকর্তার নিমন্ত্রণই গ্রহণ করবেন এবং তারই গৃহে ভোজন করবেন। শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ খাওয়ার পরে গায়ত্রী-জপ করে শুদ্ধ হওয়া উচিত। দান গ্রহণ, শ্রাদ্ধে ভোজন, এসব ব্রাহ্মণদের পক্ষে উত্তম নয়। ব্রাহ্মণদের পক্ষে ত্যাগই হল শ্রেষ্ঠ। তাঁরা কেবল সেই ব্যক্তির পিতৃপুরুষের কল্যাণ-চিন্তায় শ্রাদ্ধে ভোজন ও দান গ্রহণ করেন, স্বার্থের চিন্তায় নয়। সুতরাং একেও ত্যাগ বলা যায়।

ব্রাহ্মণদের জীবিকা হিসাবে ঋত, অমৃত, মৃত, সত্যানৃত ও প্রমৃত এই পাঁচ বৃত্তির কথা বলা হয়েছে[১]—

(১) ঋত-বৃত্তিকে সর্বোচ্চ বৃত্তি বলে মানা হয়। একে শিলোঞ্ছ বা কপোত-বৃত্তিও বলা হয়। ধান পাকলে চাষীরা যখন তা কেটে ঘরে নিয়ে যায়, সেইসময় কিছু ধান মাটিতে পড়ে থাকে, সেগুলি ভূ-দেব বা ব্রাহ্মণদের হয়। সুতরাং সেগুলি বেছে নিয়ে জীবিকা-নির্বাহ করাকে বলা হয় 'শিলোঞ্ছ বৃত্তি'। অথবা ধানের বাজারে যেখানে ধান ওজন করা হয় সেখানে মাটিতে যে ধান পড়ে থাকে সেগুলিও ভূ-দেব বা ব্রাহ্মণদের প্রাপ্য ; তাই সেগুলিকে কুড়িয়ে নিয়ে যদি জীবিকা-নির্বাহ করা হয়, তাকে বলে 'কপোত-বৃত্তি'।

(২) না চাইতে বা ইশারা ইঙ্গিত ছাড়া যদি কোনো যজমান কিছু দান করে, তাহলে শুধুমাত্র জীবিকা-নির্বাহের বস্তু গ্রহণ করাকে বলা হয় 'অমৃত-বৃত্তি'। এটিকে 'অযাচক-বৃত্তি'ও বলা হয়।

(৩) সকালে ভিক্ষার নিমিত্ত গ্রামে গিয়ে তাদের বার, তিথি, মুহূর্ত ইত্যাদি সম্বন্ধে অবহিত করে, ভিক্ষা গ্রহণ করা ও তার দ্বারা জীবিকা-নির্বাহ করাকে বলে 'মৃত বৃত্তি'।

(৪) ব্যবসার দ্বারা জীবিকা-নির্বাহ করাকে বলে 'সত্যানৃত বৃত্তি'।

(৫) উপরিউক্ত চার প্রকারের বৃত্তিতেও জীবিকা-নির্বাহ না হলে চাষ করতে হয়, কিন্তু তা কঠিন নিয়মপালন করেই করতে হয় ; যেমন, এক বলদ দিয়ে চাষ না করা, রোদের সময় চাষ না করা ইত্যাদি। একে বলা হয় 'প্রমৃত-বৃত্তি'।

উপরিউক্ত বৃত্তির যে কোনোটির সাহায্যে জীবিকা-নির্বাহ করা উচিত, তারপর পঞ্চমহাযজ্ঞ, অতিথি সেবা করে যজ্ঞ শেষে খাদ্য গ্রহণ করতে হয়[২]।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আলোচনায় দেখা যায় যে ব্রাহ্মণদের পালনীয় যে নটি স্বাভাবিক ধর্মের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে জীবিকা-নির্বাহকারী কোনো ধর্মই নেই। ক্ষত্রিয়দের যে সাতটি স্বাভাবিক ধর্মের কথা বলা হয়েছে,

---

[১]ঋতামৃতাভ্যাং জীবেত্তু মৃতেন প্রমৃতেন বা। সত্যানৃতাভ্যামপি বা ন শ্ববৃত্ত্যা কদাচন॥ (মনুস্মৃতি ৪।৪)

'ঋত, অমৃত, মৃত, প্রমৃত এবং সত্যানৃত—এর মধ্যে যে কোনোটির দ্বারাই জীবিকানির্বাহ করা হোক না কেন, শ্ববৃত্তি বা সেবাবৃত্তি দ্বারা কখনো জীবিকানির্বাহ করবে না।'

[২]ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের জন্য বলা হয়েছে, তাঁরা যেন কখনো শ্ববৃত্তি বা সেবাবৃত্তি গ্রহণ না করেন—'ন শ্ববৃত্ত্যা কদাচন' (মনু ৪।৪), 'সেবা শ্ববৃত্তিরাখ্যাতা তস্মাত্তাং পরিবর্জয়েৎ' (মনু ৪।৬)। আসলে সেবাবৃত্তি নিষেধ করা হয়েছে, সেবাকে নয়। মাতা-পিতার ন্যায় এরা অত্যন্ত নিম্নবর্ণেরও সেবা করতে পারেন। তাতে তাঁদের মহত্ত্বই বৃদ্ধি পায়। সেইজন্য শুধু বৃত্তিরই নিন্দা করা হয়েছে। মান, সম্মান, উপার্জন ইত্যাদি স্বার্থের জন্য সেবা করার নিন্দা করা হয়েছে। স্বার্থত্যাগ করে সেবা কার্যের নিন্দা করা হয়নি।

তাতে যুদ্ধ করা ও শাসনকার্য করা—এই দুটিতে জীবিকা-নির্বাহের জন্য উপার্জনের সম্ভাবনা থাকে। বৈশ্যদের তিনটি ধর্ম—চাষ করা, গো-রক্ষা ও ব্যবসা-বাণিজ্য, তিনটিই জীবিকা-নির্বাহকারী কর্ম। শূদ্রদের জন্য সেবা-ধর্মের কথা বলেছেন, যাতে শুধু উপার্জনই হয়। এ ছাড়া শূদ্রদের খাওয়া-দাওয়া, জীবিকা-নির্বাহের সব ব্যাপারেই অনেক স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে।

ভগবান **'স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ'** (গীতা ১৮।৪৫) পদটির দ্বারা এই অতি বিশেষ কথা বলেছেন যে, শম-দমাদি ন'টি ধর্ম পালন করলে ব্রাহ্মণের যে কল্যাণ হয়, ক্ষত্রিয়ের শৌর্য-তেজাদি সাতটি ধর্ম পালনেও সেই কল্যাণ হয়, বৈশ্যদের চাষ, গো-রক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্যেও সেই কল্যাণই হয় এবং শূদ্রদের সেবা কার্যের দ্বারাও সেই একই কল্যাণ সাধিত হয়।

পরে ভগবান একটি অতি বিশিষ্ট কথা জানিয়েছেন যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র নিজ নিজ বর্ণ অনুযায়ী কর্মের দ্বারা পরমাত্মার আরাধনা করে পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত করতে সক্ষম—**'স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ'** (১৮।৪৬)। আসলে বর্ণোচিত কর্মের দ্বারা কল্যাণ হয় না, কল্যাণ হয় নিষ্কামভাবে আরাধনা করলে। শূদ্রের স্বভাবজ কর্মই হল পরিচর্যাত্মক বা পূজনরূপ, তাই তাঁদের পরিচর্যা দ্বারাই পূজার কার্য হয় অর্থাৎ তাঁদের দ্বারা দ্বিগুণ পূজা হয়। তাই তাঁদের কল্যাণ যত শীঘ্র হয়, ব্রাহ্মণদের তত নয়।

শাস্ত্রকারগণ উদ্ধারের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণকে বেশি ছাড় দিয়েছেন। কারণ ছোট যে সে সবসময়ই ভালোবাসার পাত্র, আর বড় হল অধিকারের পাত্র। বড়োর ভাবনা-চিন্তা বেশি থাকে, ছোটদের কোনো চিন্তা থাকে না। শূদ্রদের চিন্তার ভার লাঘব করে জীবিকা-নির্দেশ করা হয়েছে এবং ভালোবাসা জানানো হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে বর্ণাশ্রমে যে যত উচ্চে অবস্থিত, শাস্ত্রে তার জন্য ততই কঠোর নিয়ম নির্দেশ করা আছে। সেই নিয়মাদি উপযুক্তভাবে পালন করতে অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করতে হয়। কিন্তু যারা বর্ণাশ্রমে নিম্নে অবস্থিত, তাদের কল্যাণলাভের পথ অত্যন্ত সহজ। এই ব্যাপারে বিষ্ণুপুরাণে একটি ঘটনার উল্লেখ আছে—একবার অনেক মুনি-ঋষি একত্র হয়ে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয় করার জন্য বেদব্যাসের কাছে গেলেন। ব্যাসদেব সকলকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করলেন এবং গঙ্গাস্নান করতে গেলেন। স্নান করতে করতে তিনি বলতে লাগলেন,— 'কলিযুগ ! তুমি ধন্য। স্ত্রীগণ ! তোমরা ধন্য ! শূদ্রগণ ! তোমরা ধন্য !' স্নান করে ব্যাসদেব ঋষিদের কাছে এলে তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, 'মহারাজ! আপনি কলিযুগ, স্ত্রীগণ এবং শূদ্রগণকে সাধুবাদ জানালেন কেন ?' ব্যাসদেব উত্তর দিলেন—কলিযুগে স্ত্রীগণ ও শূদ্রগণ যদি নিজ নিজ ধর্ম পালন করেন, তাহলে শীঘ্র এবং অতি সহজেই তাঁদের কল্যাণ হয়।

এখানে একটি কথা চিন্তা করার আছে, যে ব্যক্তি নিজ স্বার্থের জন্য কাজ করে, সে সমাজে বা সংসারে শ্রদ্ধার পাত্র হয় না। শুধু সমাজেই নয়, যে ব্যক্তি লোভী ও পেটুক হয়, গৃহেও তার নিন্দা হয়। ব্রাহ্মণেরা নিজেদের স্বার্থে বা কোনো উদ্দেশ্যে নিজেদের (ব্রাহ্মণদের) শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলেননি। তাঁরা ব্রাহ্মণদের জন্য ত্যাগই শ্রেষ্ঠ বলে জানিয়েছেন। সাত্ত্বিক ব্যক্তিরা নিজেদের প্রশংসা করেন না, তাঁরা অপরের প্রশংসা ও সম্মানই করে থাকেন। তাৎপর্য হল এই যে ব্রাহ্মণগণ কখনো তাঁদের স্বার্থ বা অহং-অভিমানের কথা বলেন না। তাঁরা যদি তাঁদের স্বার্থ ও অহং-অভিমানের কথা বলতেন, তাহলে এত সম্মানের পাত্র হতেন না এবং সংসারে ও শাস্ত্রাদিতে এত সম্মান লাভ করতেন না। তাঁরা তাঁদের ত্যাগের জন্যই এই সম্মান পেয়ে থাকেন।

এইভাবে মানুষের গভীরভাবে শাস্ত্র-অধ্যয়ন করে উপরি উক্ত সমস্ত ব্যাপার অনুধাবন করা উচিত এবং ঋষি মুনি ও শাস্ত্রকারদের ওপর মিথ্যা দোষারোপ করা উচিত নয়।

প্রধানতঃ গুণ ও কর্মানুসারে প্রাণীদের উচ্চ-নীচ বর্ণে জন্ম হয়ে থাকে—**'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ'** (গীতা ৪।১৩) ; কিন্তু ঋণানুবন্ধ, অভিশাপ, আশীর্বাদ, আসক্তি ইত্যাদি কোনো বিশেষ কারণবশতঃও উচ্চ-নীচ বর্ণে জন্ম হয়ে থাকে । সেই বর্ণে জন্মগ্রহণ করলেও তারা নিজ পূর্ব-স্বভাব অনুযায়ী আচরণ করে থাকে। এইজন্যই উচ্চবর্ণে জন্মালেও অনেকের নীচ আচরণ দেখা যায়। যেমন, ধুন্ধুকারী প্রভৃতি। আবার নীচ বর্ণে জন্মালেও অনেকে মহাপুরুষ হন, যেমন—বিদুর, কবীর, রৈদাস।

এখন যে মনুষ্যসমাজে জাতিগত, কুলপরম্পরাগত সমাজগত ও ব্যক্তিগত এত শাস্ত্র-বিরুদ্ধ দোষ দেখা যায়, সেগুলি নিজের বিচার-বিবেচনা, সৎসঙ্গ, স্বাধ্যায় ইত্যাদির সাহায্যে দূর করে, নিজের মধ্যে স্বচ্ছতা, নির্মলতা ও পবিত্রতা আনতে হবে, যাতে নিজ মনুষ্য-জন্মের ধ্যেয় সিদ্ধ হয়।

***

সম্বন্ধ—স্বভাবজ কর্মের বর্ণনা করার কী প্রয়োজন ?—পরের দুটি শ্লোকে তা জানাচ্ছেন।

স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥ ৪৫ ॥

[**স্বে, স্বে, কর্মণি** (নিজ নিজ কর্মে) ; **অভিরতঃ, নরঃ** (তৎপরভাবে ব্যাপৃত ব্যক্তি) ; **সংসিদ্ধিম্, লভতে** (সিদ্ধিলাভ করে) ; **স্বকর্মনিরতঃ** (নিজ কর্মে তৎপরভাবে ব্যাপৃত মানুষ) ; **যথা** (কীভাবে) ; **সিদ্ধিম্, বিন্দতি** (সিদ্ধিলাভ করে) ; **তৎ** (তা) ; **শৃণু** (শোনো।)]

নিজ নিজ কর্মে তৎপর ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ (পরমাত্মাকে লাভ) করে। স্বকর্মে তৎপর ব্যক্তি কীভাবে সিদ্ধি লাভ করে, তা শোন॥ ৪৫ ॥

ব্যাখ্যা—**'স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ'**—গীতার অধ্যয়নে প্রতিভাত হয় যে, মানুষ স্বাভাবিকভাবে যে প্রকৃতি বা স্বভাব পায়, তাতে যদি কোনোপ্রকার নতুন ঝামেলার সৃষ্টি না করে, রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ মনে না আনে তাহলে প্রকৃতি স্বভাবতঃই তার কল্যাণ করে। তাৎপর্য হল এই যে প্রকৃতির প্রবাহরূপে স্বতঃ যে স্বাভাবিক কর্ম হয়ে থাকে, সেগুলি স্বার্থত্যাগ করে প্রীতি ও তৎপরতার সঙ্গে পালন করা উচিত। কিন্তু কর্মের প্রবাহের (বেগের) উপর রাগ-দ্বেষ বা ফলেচ্ছা যেন না থাকে। রাগ-দ্বেষ ও ফলেচ্ছা বর্জন করে ক্রিয়া করলে 'কর্মের বেগ' প্রশমিত হয় এবং কর্মে আসক্তি না থাকলে নতুন বেগ উৎপন্ন হয় না। এর ফলে প্রকৃতির পদার্থ এবং ক্রিয়াদিতে নির্লিপ্ততা বা অনাসক্তি আসে। নির্লিপ্ততা এলে প্রকৃতির ক্রিয়ার প্রবাহ স্বাভাবিকভাবে চলতে থাকে এবং তার সঙ্গে নিজের কোনো সম্পর্ক না থাকায় সাধকের স্ব-স্বরূপে স্থিতি হয়, যা প্রাণীমাত্রেরই স্বাভাবিক। স্ব-স্বরূপে স্থিতি হলে তার স্বাভাবিকভাবে পরমাত্মার দিকে আকর্ষণ হয়। কিন্তু এগুলি সবই হয় কর্মে 'অভিরতি' হলে, আসক্তি থাকলে নয়।

কর্মে এক তো 'অভিরতি' হয় আর এক হয় আসক্তি। নিজ স্বাভাবিক কর্ম শুধুমাত্র অপরের হিতার্থে তৎপরতা ও উৎসাহপূর্বক করলে মনে যে প্রশান্তি আসে, তাকে বলে 'অভিরতি'। ফলের আকাঙ্ক্ষায় কিছু করা অর্থাৎ কিছু পাবার জন্য কর্ম করাকে বলা হয় 'আসক্তি'। কর্মের অভিরতিতে কল্যাণ হয় আর আসক্তিতে বন্ধন হয়।

এই প্রকরণে **'স্বে স্বে কর্মণি', 'স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য', 'স্বভাবনিয়তং কর্ম', 'সহজং কর্ম'** ইত্যাদি পদগুলিতে 'কর্ম' শব্দটি একবচনে ব্যবহৃত হয়েছে। এর তাৎপর্য হল এই যে মানুষ প্রীতি ও তৎপরতা সহকারে একটি কর্মই করুক অথবা অনেক, তার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র পরমাত্মপ্রাপ্তি হওয়ায় তার কর্তব্য-নিষ্ঠা একই হয়। পরমাত্মপ্রাপ্তির উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষ যেসব কর্ম করে, তা সবই অন্তকালে সেই উদ্দেশ্যে লীন হয়ে যায় অর্থাৎ সেই উদ্দেশ্য পূরণ করে থাকে। যেমন, হিমালয় থেকে গঙ্গা আবির্ভূত হয়ে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত যাওয়ার সময় নদ, নদী, প্রস্রবণ, সরোবর, বর্ষার জল—এসবই গঙ্গার ধারায় মিশে একীভূত হয়, তেমনই উদ্দেশ্যকারীর সকল কর্মই তার উদ্দেশ্যে মিশে যায়। কিন্তু যার কর্মে আসক্তি থাকে, সে একটি কর্ম করে অনেক ফল আশা করে অথবা অনেক কর্ম করে একটি ফল চায় ; অতএব তার উদ্দেশ্য একমাত্র পরমাত্মপ্রাপ্তি না হওয়ায় তার কর্তব্য-নিষ্ঠাও এক হয় না (গীতা ২।৪১)।

'স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু'—নিজ কর্মে প্রীতিপূর্বক তৎপরতার সঙ্গে নিরত মানুষ পরমাত্মাকে

কীভাবে প্রাপ্ত হয়, তা শোনো অর্থাৎ কর্মমাত্রই পরমাত্মপ্রাপ্তির সাধন, এই কথাটি শোনো এবং অনুধাবন করার চেষ্টা করো।

বিশেষ কথা

মণিবের সুখ-সুবিধার জন্য জিনিস সংগ্রহ করা, মণিবের নিত্যকর্মে সাহায্য করা ইত্যাদি বেতনভুক ভৃত্যও করতে পারে। কিন্তু তাতে 'ক্রিয়ার' (অর্থাৎ এতটা কাজ করতে হবে) এবং 'সময়ে'র (অর্থাৎ এত ঘণ্টা কাজ করতে হবে) প্রাধান্য থাকে। তাই সেই কাজগুলি 'সেবা' নামের যোগ্য নয়। যদি মণিবের কাজকর্ম শ্রদ্ধা সহকারে সেবা বুদ্ধিতে, মহত্ত্ব বুদ্ধির দ্বারা করা হয়, তাহলে তাকে বলে 'সেবা'।

সেব্যবুদ্ধি, মহত্ত্ববুদ্ধি জন্মের সম্পর্কে হোক বা বিদ্যার সম্পর্কে ; বর্ণ-আশ্রমের সম্পর্কে হোক অথবা যোগ্যতা, অধিকার, সদ্‌গুণ-সদাচারের সম্পর্কে ; যেখানে মহত্ত্ববুদ্ধি হয়, সেখানে সেব্যর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কীভাবে হবে, সেব্য কীসে প্রসন্ন হবেন, তাঁর রুচি কী ?—এইসব ভাব নিয়ে যে কর্ম করা হয়, তাকে বলে 'সেবা'।

সেব্যর সেই কাজ পূজার ভাবে, ভগবদ্‌বুদ্ধি, গুরু বুদ্ধিতে যদি করা হয় এবং পূজ্যভাবে চন্দন দিয়ে পুষ্প-মাল্য দিয়ে আরতি করা হয়, তাহলে সেটি 'পূজা' হয়ে ওঠে। এতে সেব্যের চরণ স্পর্শে বা দর্শনমাত্রে চিত্তে প্রসন্নভাব, হৃদয়ের আবেগ, শরীরের রোমাঞ্চভাব হতে থাকে এবং সেব্যের প্রতি বিশেষ ভাব প্রকটিত হয়। এতে সেব্যর সেবায় কিছু শিথিলতাও আসতে পারে ; কিন্তু ভাবের বৃদ্ধি হলে চিত্তশুদ্ধি ভগবদ্‌প্রেম, ভগবৎ-দর্শন ইত্যাদি হতে পারে।

সময়-অসময়ে মণিবের কাজ-কর্ম করে দিলে ভৃত্য কিছু বক্‌শিস পেতে পারে আর সেব্যকে সেবা করলে সেবকের চিত্ত-শুদ্ধি হয়ে ভগবদ্‌প্রাপ্তি হয় ; কিন্তু পূজ্য-ভাব যদি অত্যধিক বৃদ্ধি পায়, তাহলে পূজকের সত্বর ভগবদ্‌প্রাপ্তি হয়। তাৎপর্য হল এই যে চরণ-সেবা ভৃত্যও করে থাকে কিন্তু সেবা করার আনন্দ সে লাভ করে না। কারণ তার নজর থাকে অর্থের দিকে। অপরপক্ষে যে সেবাবুদ্ধি নিয়ে পদসেবা করে, সে সেবা করে বিশেষ আনন্দ লাভ করে। কারণ তার দৃষ্টি থাকে সেব্যের সুখের দিকে। পূজাকালে চরণ স্পর্শমাত্রই শরীর রোমাঞ্চিত হয় এবং অন্তরে এক পারমার্থিক আনন্দ অনুভূত হয়। তার দৃষ্টি পূজ্যের মহত্ত্বের দিকে এবং নিজের ক্ষুদ্রতার দিকে থাকে। সাধারণভাবে দেখতে গেলে ভৃত্যের কাজ-কর্মে মণিব সুখবোধ করে, সেবাতে সেব্য বিশেষ আরাম বা সুখ পান এবং পূজাতে পূজকের ভাবে পূজ্য প্রসন্ন হন। পূজাতে শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রাধান্য থাকে না।

নিজ স্বভাবজ কর্মের দ্বারা পূজা করলে, পূজকের ভাব বৃদ্ধি হলে তার স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ-শরীর দ্বারা হওয়া (চেষ্টা, চিন্তা, সমাধি ইত্যাদি) সমস্ত ছোট-বড় কর্ম সকল প্রাণীর মধ্যে ব্যাপ্ত পরমাত্মার পূজার সামগ্রী হয়ে ওঠে। তার প্রাত্যহিক কর্ম অর্থাৎ খাওয়া-দাওয়া সমস্ত ক্রিয়াই পূজার সামগ্রী হয়ে ওঠে।

জ্ঞানযোগীর মধ্যে যেমন 'আমি কিছুই করি না' এই ভাব সর্বদা বজায় থাকে, তেমনই নানাপ্রকার কর্ম করলেও ভক্তের মধ্যে ভগবদ্‌ভাব সর্বদা বজায় থাকে। সেইভাবের বৃদ্ধি হলে অহংভাব দূর হয়ে যায়।

পরিশিষ্ট-ভাব—যেসব ব্যক্তি নিজ বর্ণগত কর্ম ছাড়াও ভিন্ন কর্ম স্বীকার করে নিয়েছেন, সেগুলিকে সবই **'স্বে স্বে কর্মণি'**-র মধ্যে ধরতে হবে। যেমন, যদি কেউ উকিল, পরিচারক, অধ্যাপক বা চিকিৎসক বৃত্তি গ্রহণ করেন তাহলে সেইসব কর্তব্য সম্মানের সঙ্গে, সস্নেহে, নিঃস্বার্থভাবে যথাযথ পালন করা হল তাঁর পক্ষে 'স্বধর্ম'।

মানুষ স্বার্থবুদ্ধি, পক্ষপাতিত্ব, কামনা ইত্যাদি নিয়ে কর্ম করলে তাকে 'আসক্তি' বলা হয়। তিনি যদি প্রেমপূর্বক, নিষ্কামভাবে এবং লোকহিতার্থে কর্ম করেন তবে তাকে 'অভিরতি' বলা হয়। ভগবান কর্মে 'আসক্তি' করতে নিষেধ করেছেন—**'ন কর্মস্বনুষজ্জতে'** (গীতা৬।৪)। মানুষ তার জাতি, বর্ণ প্রভৃতিকে প্রাধান্য দিয়ে নিজেকে যেন শ্রেষ্ঠ বলে মনে না করেন, অধম বলেও না ভাবেন তিনি যেন নিজেকে ঘড়ির যন্ত্রাংশের মতো নিজের অবস্থানে স্থির থেকে কর্তব্য পালন করে যান, অপরের নিন্দা যেন না করেন, নিজের অহং-ভাবও পোষণ না করেন, তাহলেই 'অভিরতি' হয়।

আসলে 'কর্মের' কোনো প্রাধান্য নেই, প্রাধান্য আছে শুধু 'ভাবের'। কর্তা যে বর্ণেরই হোক তার ভাব যদি শুদ্ধ হয় তাহলে তা কল্যাণকারী হয়ে ওঠে। 'কর্মে' বর্ণের প্রাধান্য থাকে আর 'ভাবে' দৈবী অথবা আসুরী-সম্পদের প্রাধান্য

থাকে। সুতরাং দৈবী বা আসুরী-সম্পদ কোনো বর্ণ ধরে হয় না, তা সর্ব ক্ষেত্রেই হওয়া সম্ভব। দৈবী-সম্পদ মোক্ষ প্রদানকারী এবং আসুরী-সম্পদ বন্ধনকারী হয়। তাই ব্রাহ্মণেরও যদি অহং-অভিমান থাকে, তবে তা আসুরী-সম্পদসম্পন্ন হয়ে যায় অর্থাৎ তাঁর পতন হয়—

নীচ নীচ সব তর গয়ে, রাম ভজন লবলীন। জাতি কে অভিমান সে, ডূবে সভী কুলীন ॥

***

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥ ৪৬ ॥

[**যতঃ** (যে পরমাত্মা হতে) ; **ভূতানাম্, প্রবৃত্তিঃ** (সকল জীবের উৎপত্তি এবং) ; **যেন, ইদম্, সর্বম্** (যিনি এই চরাচরে) ; **ততম্** (ব্যাপ্তরূপে বর্তমান) ; **তম্, স্বকর্মণা** (সেই পরমাত্মাকে নিজ কর্ম দ্বারা) ; **অভ্যর্চ্য** (পূজা করে) ; **মানবঃ** (মানুষ) ; **সিদ্ধিম্, বিন্দতি** (সিদ্ধিলাভ করে।)]

যে পরমাত্মা হতে জীবসমূহের উৎপত্তি এবং যিনি এই চরাচরে ব্যাপ্তরূপে বর্তমান, সেই পরমাত্মাকে নিজ কর্ম দ্বারা পূজা করে মানুষ সিদ্ধিলাভ করে ॥ ৪৬ ॥

ব্যাখ্যা—'যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্'—যে পরমাত্মা হতে সমস্ত জগৎ-সংসার উদ্ভূত হয়েছে, যাঁর দ্বারা সমস্ত জগৎ সঞ্চালিত হয়, যিনি সকলের উৎপাদক, আধার ও প্রকাশক, যিনি সবকিছুতে ব্যাপ্তস্বরূপে অবস্থান করছেন অর্থাৎ যিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির আগেও ছিলেন, লীন হওয়ার পরেও থাকবেন এবং বর্তমানেও ব্যাপ্তস্বরূপ হয়ে আছেন, সেই পরমাত্মাকে নিজ নিজ স্বভাবজ (বর্ণোচিত স্বাভাবিক) কর্মের দ্বারা পূজা করা উচিত।

'স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য'—মনু স্মৃতিশাস্ত্রে ব্রাহ্মণদের জন্য ছটি কর্ম চিহ্নিত করা হয়েছে—অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজ্ঞ করা এবং করানো, দান গ্রহণ ও দান করা। এর মধ্যে অধ্যাপন, যজ্ঞ করানো এবং দান গ্রহণ—এই তিনটি কর্ম জীবিকার আর অধ্যয়ন, যজ্ঞ করা এবং দান করা[১]—এই তিনটি হল কর্তব্য-কর্ম। উপরিউক্ত শাস্ত্রনির্দিষ্ট ছটি কর্ম ও শম-দমাদি নটি স্বভাবজ কর্ম এবং এ ছাড়া খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরা ইত্যাদি যতপ্রকার কর্ম আছে, সেই কর্মগুলির সাহায্যে ব্রাহ্মণের চার বর্ণে ব্যাপ্ত পরমাত্মার পূজা করা উচিত। তাৎপর্য হল এই যে পরমাত্মার নির্দেশে তাঁর প্রসন্নতার জন্যই ভগবদ্‌বুদ্ধিতে নিষ্কামভাবে সকলের সেবা করা কর্তব্য।

এইরূপ ক্ষত্রিয়দের জন্যও পাঁচটি কর্মের কথা বলা হয়েছে—প্রজাপালন ও রক্ষা, দান করা, যজ্ঞ করা, অধ্যয়ন এবং বিষয়ে অনাসক্তি[২]। এই পাঁচটি কর্ম ও শৌর্য, তেজাদি সাতটি স্বভাবজ কর্মের দ্বারা এবং খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি সকল কর্মের দ্বারা যেন ক্ষত্রিয় সর্বত্র ব্যাপক পরমাত্মার পূজা করেন।

বৈশ্যদের যজ্ঞ করা, অধ্যয়ন, দান করা, সুদ গ্রহণ, কৃষি, গো-রক্ষা, বাণিজ্য[৩]—এই শাস্ত্রনির্দিষ্ট ও স্বভাবজ কর্মাদির দ্বারা এবং শূদ্রগণ শাস্ত্রবিহিত ও স্বভাবজ কর্ম অর্থাৎ সেবা[৪] দ্বারা সর্বত্র ব্যাপক পরমাত্মার পূজা করবে অর্থাৎ নিজ নিজ শাস্ত্রবিহিত স্বভাবজ কর্ম এবং খাওয়া-দাওয়া, শোওয়া-জাগা ইত্যাদি সকল কর্মের দ্বারা ভগবানের নির্দেশে, তাঁর প্রসন্নতার জন্য, ভগবদ্‌বুদ্ধিতে নিষ্কামভাবে সকলের সেবা করবে।

শাস্ত্রে মানুষের জন্য বর্ণ ও আশ্রম অনুযায়ী যেসব কর্তব্য-কর্ম বলা হয়েছে সেগুলি সবই সংসাররূপ পরমাত্মারই পূজার জন্য। সাধক যদি তাঁর কর্মের সাহায্যে

[১]অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা। দানং প্রতিগ্রহং চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ ॥ (মনুস্মৃতি ১।৮৮)

[২]প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ। বিষয়েষ্বপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ॥ (মনুস্মৃতি ১।৮৯)

[৩]পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ। বণিক্‌পথং কুসীদং চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ ॥ (মনুস্মৃতি ১।৯০)

[৪]একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম সমাদিশৎ। এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া। (মনুস্মৃতি ১।৯১)

ভাবযুক্ত হয়ে পরমাত্মার পূজা করেন, তাহলে তাঁর ক্রিয়ামাত্রই পরমাত্মার পূজা হয়ে যায়। যেমন, পিতামহ ভীষ্ম (অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধের সময়) অর্জুনের সারথিরূপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর যুদ্ধরূপ কর্মের সাহায্যে (বাণের দ্বারা) পূজা করেছিলেন। ভীষ্মের বাণে ভগবানের কবচ ভেঙে গিয়েছিল, যাতে ভগবানের শরীরে ক্ষত হয়েছিল এবং হাতের আঙুলেও বাণের আঘাত লাগার জন্য ঘোড়ার লাগাম ধরে রাখাও কঠিন হয়েছিল। এরূপ পূজার পর অন্তকালে শরশয্যায় শায়িত ভীষ্ম তাঁর বাণের আঘাতে আহত ভগবানের ধ্যান করতে লাগলেন—'যুদ্ধে আমার তীক্ষ্ণ বাণে যাঁর কবচ ভেঙে গিয়েছিল, যার জন্য ভগবানের দেহে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে, পরিশ্রমবশতঃ যাঁর মুখমণ্ডল স্বেদকণা শোভিত, অশ্বক্ষুরের ধুলোয় যাঁর কেশ ধূলিলিপ্ত, সেই বাণ দ্বারা অলঙ্কৃত ভগবান কৃষ্ণেই যেন আমার মন-বুদ্ধি নিবিষ্ট হয়[১]।'

লৌকিক এবং পারমার্থিক কর্মের দ্বারা পরমাত্মার পূজা করলেও, সেই কর্ম এবং কর্মের করণ-উপকরণে মমত্ববোধ রাখা উচিত নয়। কারণ যেসব বস্তু-ক্রিয়াদিতে মমত্ববোধ হয়, সেগুলি অপবিত্র হয়ে ওঠে[২], পূজা-সামগ্রী থাকে না (অপবিত্র ফল বা ফুল যেমন ভগবানে নিবেদন করা যায় না)। তাই 'আমার যা কিছু আছে, তা সবই সেই ব্যাপ্তিস্বরূপ পরমাত্মার, আমার শুধুমাত্র নিমিত্ত হয়ে তাঁর প্রদত্ত শক্তিতে তাঁকে পূজা করতে হবে'—এই ভাব নিয়ে যা কিছু কর্ম করা হয়, তা সবই পরমাত্মার পূজা হয়ে ওঠে। তা না করে যদি সেই ক্রিয়া এবং বস্তুসমূহকে মানুষ যত নিজের বলে মনে করে, ততই সে (নিজের মেনে নেওয়া) ক্রিয়া, বস্তুসমূহ (অপবিত্র হওয়ায়) পরমাত্মার পূজার থেকে বঞ্চিত থেকে যায়।

'সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ'—সিদ্ধি প্রাপ্তি করার অর্থ হল যে, নিজ কর্মের দ্বারা পরমাত্মাকে পূজনকারী ব্যক্তি প্রকৃতির সম্পর্করহিত হয়ে স্বতঃ স্ব-স্বরূপে স্থিত হয়। স্ব-স্বরূপে স্থিত হলে আগে যা পরমাত্মাকে সমর্পণ করেছিল, সেই সংস্কারবশতঃ তার প্রভুর প্রতি অনন্য প্রেম জাগরিত হয়। তখন তার আর কিছু পাওয়ার বাকি থাকে না।

এখানে 'মানবঃ' পদটির তাৎপর্য শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বাণপ্রস্থী, সন্ন্যাস এইসব বর্ণ আশ্রমই নয়, বরং হিন্দু, মুসলমান, শিখ, বৌদ্ধ, পারসী, ইহুদী ইত্যাদি সমস্ত জাতি বা সম্প্রদায়ই এর অন্তর্গত। যে কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের লোক হোন না কেন সকলেই পরমাত্মাকে পূজা করার অধিকারী। কারণ সকলেই পরমাত্মার আপন। যেমন, গৃহে নানা স্বভাবের ছেলে হলেও তাদের মা একজনই হন এবং সেই বালকেরা নানাপ্রকার ক্রিয়া-কর্ম করলেও মা তাদের প্রতি প্রসন্ন থাকেন, কেন-না সন্তানদের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা বা আপনবোধ আছে। তেমনই ভগবানের শরণাগত মানুষের সকল ক্রিয়াই ভগবান তার পূজা মনে করে প্রসন্ন হন।

এই অধ্যায়ের সপ্ততিতম শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে, যে ব্যক্তি আমাদের দুজনের এই কথোপকথন পাঠ করবেন, তাঁর জ্ঞান-যজ্ঞের দ্বারা আমি পূজিত হব। এতেই প্রমাণিত হয় যে, যদি কোনো ব্যক্তি গীতা পাঠ করেন, অধ্যয়ন করেন, ভগবান তা নিজের পূজা বলে গ্রহণ করেন।

বিশেষ কথা

কর্মযোগে কর্মের দ্বারা জড়ত্বের আসক্তি বর্জন হয় এবং ভক্তিযোগে সংসারের আসক্তি ত্যাগ হয়ে পরমাত্মার প্রতি পূজ্য ভাব হওয়ায় পরমাত্মার শরণাগতি থাকে।

কর্মযোগী তো তার শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি যা কিছু ঐহিক জড়-অংশ থাকে, সেগুলির প্রতি স্বার্থ, অহংবোধ ও কামনা পরিত্যাগ করে তা জগতের সেবায় ব্যাপৃত করেন। এতে নিজের বলে মনে করা বস্তু থেকে আপনবোধ দূর হয়ে তা থেকে সর্বতোভাবে সম্বন্ধ ছেদ হয় এবং স্বাভাবিক যে অনাসক্তিবোধ, তা প্রকটিত হয়।

ভক্ত তাঁর স্বাভাবিক বর্ণ-আশ্রম অনুযায়ী কর্ম এবং নিত্য-নৈমিত্তিক পারমার্থিক কর্মাদি (জপ, ধ্যানাদি) দ্বারা জগতে ব্যাপ্তিস্বরূপ পরমাত্মার পূজা করেন।

উভয়ের ভাবের পার্থক্য হওয়ায় শুধু এই তফাত হয়

---

[১]যুধি তুরগরজোবিধূম্রবিষ্বক্‌কচলুলিতশ্রমবার্যনস্কৃতাস্যে। মম নিশিতশরৈর্বিভিদ্যমানত্বচি বিলসৎকবচেঽস্তু কৃষ্ণ আত্মা॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ১।৯।৩৪)

[২]'মমতা মল জরি জাই' (শ্রীরামচরিতমানস ৭।১১৭ক)

যে, যে কর্মযোগীর সমস্ত ক্রিয়ার প্রবাহ সকল প্রাণীকে সুখী করে এবং ক্রিয়ার বেগ প্রশমিত হয়ে নিজ দেহের প্রতি অনাসক্তি আসে ; আর ভক্তের সমস্ত ক্রিয়াই পরমাত্মার পূজার সামগ্রী হয়ে ওঠায় জড়ত্ব কেটে গিয়ে ভগবানের শরণাগত হয় এবং প্রেম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

ভক্ত প্রথম থেকেই ভগবানের শরণাগত হয়ে নিজেকে ভগবানের পাদপদ্মে সমর্পণ করেন। অনন্যভাবে ভগবানে সমর্পিত হলে খাওয়া-দাওয়া, কাজ-কর্মাদি লৌকিক এবং জপ-ধ্যান-সৎসঙ্গ-স্বাধ্যায় ইত্যাদি পারমার্থিক ক্রিয়াদিও ভগবানে অর্পিত হয়। তাঁর লৌকিক ও পারমার্থিক ক্রিয়াগুলি শুধু বাহ্যতঃ পৃথক্ বলে মনে হয় ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোনো পার্থক্য থাকে না।

কর্মযোগী ও জ্ঞানযোগী—শেষকালে দুই-ই এক হয়ে যান। যেমন, কর্মযোগী কর্মের দ্বারা জড়ত্ব পরিত্যাগ করেন অর্থাৎ সেবার সাহায্যে তাঁর সমস্ত ক্রিয়াই জগতে অর্পিত হয় এবং স্বয়ং আসক্তি বর্জিত হন আর জ্ঞানযোগী বিচার-বিবেচনার সাহায্যে জড়ত্ব ত্যাগ করেন অর্থাৎ বিচারের দ্বারা সকল ক্রিয়াই প্রকৃতিতে অর্পিত হয় এবং তিনি আসক্তিরহিত হন। তাৎপর্য হল এই যে, উভয়ের অর্পণ করার প্রকারে পার্থক্য থাকলেও অনাসক্তিতে উভয়েই এক হয়ে যান[১]। এই অনাসক্তির ব্যাপারে কর্মযোগী ও জ্ঞানযোগী—উভয়েই স্বতন্ত্র হন । তাদের জন্য কর্মের কোনো বন্ধনই থাকে না। শুধু কর্তব্য পালন করার জন্য কর্ম করায় কর্মযোগীর সমস্ত কর্ম লীন হয়ে যায় (গীতা ৪।২৩), এবং জ্ঞানরূপ অগ্নিতে জ্ঞানযোগীর সম্পূর্ণ কর্ম ভস্মীভূত হয় (গীতা ৪।৩৭)। কিন্তু এই স্বাতন্ত্র্যেতেও যিনি সন্তোষলাভ করেন না, ভগবদ্‌কৃপায় তাঁর মধ্যে প্রেম প্রকটিত হতে পারে।

পরিশিষ্ট-ভাব—এখানে **'যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাম্'** পদে ব্যবহৃত **'প্রবৃত্তিঃ'** পদটির অর্থ 'উৎপত্তি' বলে বুঝতে হবে। কেন-না সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি পরমাত্মা থেকে হয় কিন্তু ক্রিয়ার উৎপত্তি হয় না। ক্রিয়া রজোগুণ থেকে হয়—**'লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ'** (গীতা ১৪।১২) পঞ্চদশ অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকেও 'প্রবৃত্তি' পদটি 'উৎপত্তি' অর্থেই ব্যবহৃত—**'যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী'**।

এই জগৎ-সংসার ভগবানের প্রথম অবতার—**'আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্যঃ'** (শ্রীমদ্ভাগবত ২।৬।৪১)। অতএব এই জগৎ ভগবানেরই মূর্তি, শ্রীবিগ্রহ। যেমন আমরা মূর্তিতে ভগবৎ-পূজা করি, পুষ্প-চন্দনে তাঁকে সাজাই। আমাদের ভাব মূর্তিতে না হয়ে ভগবানের প্রতি হয় অর্থাৎ মূর্তিকে নয় আমরা ভগবানেরই পূজা করে থাকি। তেমনই আমাদের প্রতিটি ক্রিয়ার দ্বারা সংসাররূপ ভগবানেরই পূজা করা উচিত। শ্রোতা শুনে বক্তাকে পূজা করবেন, বক্তা বক্তৃতা দিয়ে শ্রোতাকে পূজা করবেন—এইভাবে সকলেরই নিজ নিজ কর্মের দ্বারা একে অপরের পূজা করা উচিত। দৃষ্টি যেন ভগবানের দিকেই থাকে, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় ইত্যাদি কোনো বিশেষ বর্ণের দিকে নয়। ভগবান শ্রীরামকে মুনি-ঋষিরা যখন প্রণাম করেন তা ভগবান ভাবেই করেন, ক্ষত্রিয়ের ভাবে নয়। পূজা করার প্রকৃত ভাব হল—সব কিছু ভগবানের এবং ভগবানের জন্যই। যেমন গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করা হয়, তেমনই ভগবানের বস্তু দিয়েই ভগবানের পূজা করা। প্রকৃতপক্ষে সকল ক্রিয়াই ভগবানের পূজা, আমাদের কাজ শুধু নিজের ভ্রম সংশোধন করা। ভগবানের বস্তুসমূহ ভগবানে অর্পণ করছি এই ভাব থাকলে স্বার্থবুদ্ধি, ভোগেচ্ছা, ফলেচ্ছা দূর হয় এবং নিজের শক্তি-সামর্থ্যকেও ভগবানের বলে মনে করলে কর্তৃত্ব দূরীভূত হয় এবং ভগবদ্‌প্রাপ্তি অনুভূত হয়।

প্রকৃতপক্ষে মূর্তিপূজা করার থেকে ভগবদ্‌ভাবে সংসারের পূজা করা বিশেষ মূল্যবান। কারণ মূর্তিপূজা করলে মূর্তির প্রসন্নভাব দেখা যায় না, কিন্তু প্রাণীর সেবা করলে তাকে প্রসন্ন (সুখী) হতে প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায়।

যদি মানুষকে ভগবানের স্বরূপ মনে করে কর্ম ও পদার্থের দ্বারা তাদের সেবা করা হয়, তবে জগৎ-সংসার লুপ্ত হয়ে একমাত্র ভগবানই বিরাজ করেন অর্থাৎ 'সব কিছুই ভগবান'—এই সত্য অনুভব হয়ে যায়। যেমন রজ্জুতে সর্পের ভ্রম

---

[১]কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ—এই তিন যোগমার্গের সাধকদের পক্ষেই জগৎ-সংসারে আসক্তি বর্জিত হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। গীতায় **'সঙ্গং ত্যক্ত্বা'** (৫।১১) পদটির দ্বারা কর্মযোগীর, **'মুক্তসঙ্গঃ'** (১৮।২৬) পদের দ্বারা জ্ঞানযোগীর এবং **'সঙ্গবর্জিতঃ'** (১১।৫৫) পদটির দ্বারা ভক্তিযোগীকে আসক্তিবর্জিত হতে বলা হয়েছে।

দূর হলে সর্প আর থাকে না, কিন্তু রজ্জু থেকে যায়, তেমনই ভগবানে জগতের ভ্রম দূর হলে জগৎ জগৎরূপে লুপ্ত হয়ে ভগবদ্‌রূপে বিরাজ করে। কারণ জগৎ হচ্ছে মেনে নেওয়া ব্যাপার, কিন্তু ভগবান হলেন বাস্তব সত্য। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান বলেছেন—

নরেষ্বভীক্ষ্ণং মদ্ভাবং পুংসো ভাবয়তোঽচিরাৎ। স্পর্ধাসূয়াতিরস্কারাঃ সাহঙ্কারা বিয়ন্তি হি॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৯।১৫)

'ভক্ত যখন সমস্ত স্ত্রী-পুরুষে নিরন্তর আমারই ভাব প্রত্যক্ষ করেন[১], তখন অচিরাৎ তাঁর চিত্ত থেকে ঈর্ষা, দোষদৃষ্টি, সঙ্কোচ, ভয় ইত্যাদি দোষ অহংকার সহ দূর হয়।'

গীতায় ভগবান বলেছেন—**'অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ'** (১০।২০) 'সকল প্রাণীর অন্তঃকরণে স্থিত যে আত্মা, তা আমি-ই।' অতএব ভগবদ্‌ভাবে কোনো প্রাণীর সেবা-শুশ্রূষা-সম্মান করলে তা ভগবদ্‌সেবা হয়ে ওঠে। কোনো প্রাণীকে অনাদর অবহেলা করলে তাতে ভগবানেরই অনাদর-অবহেলা করা হয়—**'কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ'** (১৭।৬)।

জ্ঞানমার্গে যেমন গুণই গুণাদিতে প্রবৃত্ত হয়—**'গুণা গুণেষু বর্তন্তে'**, তেমনই ভক্তিমার্গে ভগবৎ-বস্তু দ্বারাই ভগবদ্‌পূজা হয়। কিন্তু দুইয়ে অনেক পার্থক্য থাকে। **'গুণা গুণেষু বর্তন্তে'**র মধ্যে জড়ত্বের প্রাধান্য থাকে, যা জ্ঞানমার্গের ব্যক্তিগণ পরিত্যাগ করেন। কিন্তু **'স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য'**-তে চিন্ময়ভাবের প্রাধান্য থাকে, যা ভক্তিমার্গের ব্যক্তিগণ গ্রহণ করেন। তাই ভক্তিমার্গে জড়ত্ব দূরীভূত হয়, জগৎ-সংসার সংসাররূপে লোপ পায় এবং ভগবদ্‌রূপে প্রকট হয়ে যায় ; কারণ প্রকৃতপক্ষে ভগবানই বিরাজ করেন। সাধক যদি জগৎকে জগৎরূপেই দেখেন তাহলে তিনি যেন তার 'সেবা' করেন আর ভগবদ্‌রূপে দেখলে যেন তার 'পূজা' করেন। তিনি যেন নিজের জন্য কিছু না করেন। নিজের জন্য কর্ম করলে বন্ধন হয়, সংসারের জন্য করলে সেবা করা হয় আর ভগবানের জন্য করলে তাকে বলা হয় 'পূজা'।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—স্বভাবজ (সহজ) কর্মসকল নিষ্কামভাবে এবং পূজার ভাবে করার সময় তাতে যদি কিছু অভাব থেকে যায়, তাহলেও সাধকের হতাশ হওয়া উচিত নয়—পরবর্তী দুটি শ্লোকে তাই জানিয়েছেন।

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ৪৭ ॥

[**স্বনুষ্ঠিতাৎ** (সম্যক্‌ভাবে অনুষ্ঠিত) ; **পরধর্মাৎ** (পরধর্ম অপেক্ষা) ; **বিগুণঃ, স্বধর্মঃ** (গুণরহিত নিজধর্ম) ; **শ্রেয়ান্** (শ্রেষ্ঠ) ; **স্বভাবনিয়তম্ কর্ম** (স্বভাবনির্দিষ্ট স্বধর্মরূপ কর্ম) ; **কুর্বন্** (করলে) ; **কিল্বিষম্** (পাপের) ; **ন, আপ্নোতি** (ভাগী হয় না।)]

সম্যকভাবে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা গুণরহিত নিজধর্ম শ্রেষ্ঠ। কারণ স্বভাবনির্দিষ্ট স্বধর্মরূপ কর্ম করলে মানুষ পাপভাগী হয় না॥ ৪৭ ॥

ব্যাখ্যা—**'শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ'**—এখানে **'স্বধর্ম'** শব্দটির দ্বারা প্রধানতঃ বর্ণ-ধর্মই ধরা হয়েছে।

পরমাত্মপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যবিশিষ্ট মানুষ 'স্ব'কে অর্থাৎ নিজেকে যা মনে করে, তাই (কর্তব্য) হল তার 'স্বধর্ম'। যেমন, যে নিজেকে মানুষ বলে মনে করে, মনুষ্যত্ব পালন করাই তার স্বধর্ম। তেমনই কর্মানুসারে নিজেকে যদি কেউ বিদ্যার্থী বা অধ্যাপক বলে মনে করেন তাহলে পঠন বা পাঠন তাঁর স্বধর্ম হয়ে ওঠে। কেউ যদি নিজেকে সাধক বলে মনে করেন, তাহলে তাঁর সাধন করাই স্বধর্ম হয়। কেউ যদি

[১]নারী-পুরুষে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করার কথা বলা হয়েছে এইজন্য যে আমরা স্বভাবতঃ নারী ও পুরুষে শুধু দোষ-গুণই দেখে থাকি। যার ফলে ভগবদ্‌ভাব হয় না। সুতরাং নারী-পুরুষের মধ্যে দোষ-গুণ না দেখে শুধু ভগবানকে প্রত্যক্ষ করলে সমস্ত প্রাণী ও পদার্থে অতি সহজেই ভগবদ্‌ভাব এসে থাকে।

নিজেকে ভক্ত, জিজ্ঞাসু ও সেবক বলে মনে করেন, তাহলে ভক্তি, জিজ্ঞাসা এবং সেবাই তাঁর স্বধর্ম হয়। এইভাবে যে যে কর্মে নিযুক্ত হয় এবং যে কর্ম সে স্বীকার করে নিয়েছে, তার পক্ষে সেই কাজকে সর্বাঙ্গীণভাবে করাই হল তার স্বধর্ম।

তেমনই মানুষ জন্ম ও কর্ম অনুসারে নিজেকে যে বর্ণ ও আশ্রমের বলে মনে করে থাকেন, তাঁর জন্য সেই বর্ণ এবং আশ্রমের ধর্মই স্বধর্ম হয়। ব্রাহ্মণবর্ণে জন্ম হওয়ায় নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে মনে করলে যজ্ঞ করানো, দান গ্রহণ করা, অধ্যাপনা ইত্যাদি জীবিকা সম্বন্ধীয় কর্ম তাঁর কাছে স্বধর্ম হয়। ক্ষত্রিয়দের পক্ষে যুদ্ধ করা, শাসকভাব ইত্যাদি জীবিকা-সম্বন্ধীয় কর্ম তাঁর কাছে স্বধর্ম হয়। বৈশ্যদের কৃষি, গো-রক্ষা, ব্যবসায়াদি এবং শূদ্রদের সেবা—এই জীবিকা সম্বন্ধীয় কর্মগুলি হল তাদের স্বধর্ম। এইরূপ নিজ স্বধর্ম যদি অন্যের ধর্মের থেকে গুণরহিত হয় অর্থাৎ স্বধর্মে যদি গুণাদির কোনো অভাব থাকে, সেটি করতে যদি কষ্ট হয় এবং অন্যের ধর্ম গুণবিশিষ্ট হয় এবং সেগুলি সম্যক্‌ভাবে অনুষ্ঠান করা যদি সহজও হয় তবুও নিজ ধর্ম পালন করাই সর্বশ্রেষ্ঠ।

শাস্ত্রে যে বর্ণের জন্য যে কর্মের বিধান দেওয়া হয়েছে, সেই বর্ণের পক্ষে সেটিই 'স্বধর্ম' আর সেই কর্মই অন্য বর্ণের মানুষের কাছে 'পরধর্ম', কারণ শাস্ত্রে তাদের সেই কর্ম করতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন, যজ্ঞ করানো, দান গ্রহণ করা ইত্যাদি কর্ম ব্রাহ্মণদের করার জন্য শাস্ত্রের নির্দেশ থাকায় সেগুলি ব্রাহ্মণদের স্বধর্ম ; কিন্তু সেই কর্মই ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের জন্য শাস্ত্রের নিষেধ থাকায় পরধর্ম হয়ে থাকে। কিন্তু আপৎকালে শাস্ত্র জীবিকা সম্বন্ধীয় যেসব কর্ম করাতে নিষেধ করেনি সেসব কর্ম সকল বর্ণের কাছেই স্বধর্ম হয়ে থাকে। যেমন আপৎকালে বৈশ্যদের জন্য নির্দিষ্ট কর্ম চাষ-বাস, ব্যবসায় ইত্যাদি জীবিকা-সম্বন্ধীয় কর্ম ব্রাহ্মণগণও করতে পারেন[১]।

ব্রাহ্মণের শম, দমাদি যেসব স্বভাবজ ধর্ম, তা সাধারণ ধর্ম হওয়ায় চার বর্ণের কাছেই সেগুলি স্বধর্ম হয়ে থাকে। সকলেরই সেগুলি পালন করার অনুমতি থাকে। কারও জন্যই তা নিষিদ্ধ নয়।

পরমাত্মপ্রাপ্তির জন্যই এই মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হয়েছে। সেই দৃষ্টিতে মানুষমাত্রই সাধক। তাই দৈবী-সম্পদের যতপ্রকার সদ্‌গুণ-সদাচার থাকে, সে সবই নিজস্ব হওয়ায় সব মানুষের পক্ষেই স্বধর্ম হয়। কিন্তু আসুরী-সম্পদের যতপ্রকার দুর্গুণ-দুরাচার, তার কোনোটিই মানুষের স্বধর্ম নয়, পরধর্মও নয় ; এগুলি সকলের পক্ষেই নিষিদ্ধ, ত্যাজ্য। কারণ এগুলি অধর্ম। দৈবী-সম্পদের গুণগুলি ধারণ করাতে এবং আসুরী-সম্পদের পাপ কর্মগুলি ত্যাগ করাতে সকলেই স্বাধীন, সমর্থ এবং অধিকারী ; কেউই পরাধীন, হীনবল বা অনধিকারী নয়। তবে এ-কথা আলাদা যে, কোনো সদ্‌গুণ কারও স্বভাবের অনুকূল, আবার অন্য কোনো সদ্‌গুণ আর একজনের স্বভাবের অনুকূল হতে পারে। যেমন কারও স্বভাবে দয়ার প্রাধান্য থাকে এবং কারও স্বভাবে উদাসীন ভাবের প্রাবল্য থাকে, কারও স্বভাব স্বতঃই ক্ষমাপ্রধান হয়, কারও স্বভাবে ক্ষমা আসে চাইলে পরে, কারোর উদারতা স্বাভাবিক হয়, কারও হয়ত সেটি বিচার-বিবেচনা দ্বারা আসে। এরূপ পার্থক্য থাকতে পারে।

'স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্'—শাস্ত্রে দুপ্রকার কর্মের কথা বলা হয়েছে,—বিহিত ও নিষিদ্ধ। তার মধ্যে বিহিত কর্ম করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং নিষিদ্ধ কর্ম করতে নিষেধ করা হয়েছে। সেই বিহিত কর্মগুলির মধ্যেও শাস্ত্র যে বর্ণ, আশ্রম, দেশ, কাল, ঘটনা, পরিস্থিতি, বস্তু সংযোগ, বিয়োগ ইত্যাদিকে নিয়ে যে পৃথক্ পৃথক্ কর্মের নির্দেশ দিয়েছেন, সেই বর্ণ, আশ্রম ইত্যাদির পক্ষে সেগুলিই 'নির্দিষ্ট কর্ম' বলে অভিহিত হয়।

সত্ত্বঃ, রজ, তম—এই তিনটি গুণের জন্য যে স্বভাব গঠিত হয়, সেই স্বভাব অনুসারে যে কর্ম নির্দিষ্ট করা হয়,

---

[১]আপৎকালে ব্রাহ্মণ ক্ষাত্রবৃত্তির সাহায্যে জীবিকানির্বাহ করতে পারেন, এমন কি তিনি বৈশ্যবৃত্তিও করতে পারেন ; কিন্তু তাঁর বৈশ্যবৃত্তিতে পার্থক্য থাকে এই যে তিনি যেন চাষ করেন সকাল ও সন্ধ্যায় এবং দুটি বলদের সাহায্যে যেন হলকর্ষণ করেন, একটি বলদের দ্বারা নয়। তেমনই ব্যবসায় করলেও তিনি যেন রসযুক্ত জিনিসের ব্যবসা না করেন, অর্থাৎ চিনি-গুড়, তেল, ঘি, নুন ইত্যাদির ব্যবসা না করেন।

তেমনই আপৎকালে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের বৃত্তি—গো-রক্ষা, কৃষি, বাণিজ্য করতে পারেন এবং বৈশ্যও শূদ্রবৃত্তি গ্রহণ করতে পারেন।

সেগুলিকে 'স্বভাবনির্দিষ্ট কর্ম' বলা হয়। সেইগুলিকে স্বভাবপ্রভব, স্বভাবজ, স্বধর্ম, স্বকর্ম ও সহজ কর্ম বলা হয়।

তাৎপর্য হল, যে বর্ণ, জাতিতে জন্মগ্রহণ করার আগে এই জীবের যেমন গুণ ও কর্ম ছিল, সেই গুণ ও কর্ম অনুসারেই এই জন্মে সেই বর্ণে তার জন্ম হয়েছে। কর্ম সমাপ্ত হলেও গুণ-রূপে তার সংস্কার থেকে যায়। জন্মাবার সময় সেই গুণানুসারেই তার গুণ ও পালনীয় আচরণ স্বাভাবিকভাবে উৎপন্ন হয় অর্থাৎ এগুলি তার কোথাও থেকে সংগ্রহ করতেও হয় না এবং কোনো পরিশ্রমও করতে হয় না, তাই এগুলিকে তার স্বভাবজ এবং স্বভাবনির্দিষ্ট কর্ম বলা হয়েছে।

যদিও **'সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ'** (গীতা ১৮।৪৮) অনুসারে কর্মমাত্রেই দোষ থাকে, তা সত্ত্বেও স্বভাব অনুযায়ী শাস্ত্রে যে বর্ণের জন্য যে কর্মের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেই কর্মগুলি নিজ স্বার্থ এবং অহং-অভিমান পরিত্যাগ করে শুধুমাত্র অপরের হিতার্থে যদি করা হয় তাহলে সেই বর্ণের ব্যক্তির ওই কর্মের জন্য কোনো দোষ (পাপ) হয় না। তেমনই যে ব্যক্তি শুধুমাত্র শরীর-নির্বাহের জন্য কর্ম করে, তারও পাপ হয় না— **'শরীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্'** (গীতা ৪।২১)।

বিশেষ কথা

এখানে এই একটি বিশেষ সংশয় উদিত হয় যে, এক ব্যক্তি কসাইয়ের ঘরে যদি জন্মায়, তাহলে তার সহজ বা স্বভাবজ কর্ম হল কসাইয়ের কাজ। স্বভাবনির্দিষ্ট কর্ম করলে মানুষের পাপ হয় না, তাহলে কসাইয়ের কর্ম কি পরিত্যাগ করা উচিত নয় ? যদি তার কসাইয়ের কর্ম ত্যাগ করা উচিত না হয়, তাহলে নিষিদ্ধ আচরণ কী করে ত্যাগ হবে ? তার কল্যাণ হবে কী করে ?

এর উত্তর হল যে স্বভাবনির্দিষ্ট কর্ম তাকেই বলা হয় যা বিহিত কর্ম, কোনোভাবেই নিষিদ্ধ নয় অর্থাৎ তার দ্বারা কারও অহিত হয় না। যে কর্ম কারও পক্ষে অহিতকারী হয়, সেগুলিকে 'সহজ কর্ম' বলা যায় না। এরূপ কর্মগুলি আসক্তি ও কামনা থেকেই উৎপন্ন হয়। নিষিদ্ধ কর্ম, তা এ জন্মেই করা হোক অথবা পূর্ব জন্মে, তা দোষসম্পন্ন হবেই। দোষ-ভাগ ত্যজনীয়, কারণ দোষ হল আসুরী-সম্পদ, আর গুণ হল দৈবী-সম্পদ। আগের জন্মের সংস্কার থেকেও দুর্গুণ-দুরাচারে প্রবৃত্তি হতে পারে, কিন্তু তা দুর্গুণ-দুরাচার করতে বাধ্য করে না। বিবেক, বিচার, সৎসঙ্গ, শাস্ত্রাদির সাহায্যে সেই সংস্কার দূর করা সম্ভব।

যুক্তি দ্বারাও বোঝা যায় যে কোনো প্রাণীই তার অহিত কামনা করে না, নিজের হত্যা চায় না। তাই কারও অহিত করার বা কাউকে হত্যা করার অধিকার কারোরই নেই। মানুষ নিজে ভালো চাইলে তার অন্যের জন্যও ভালো কাজ করতে হয়। শাস্ত্রাদিতেও দেখা যায় যে, যাতে দোষ থাকে, পাপ থাকে, অন্যায় থাকে সেই কর্মগুলি 'বৈকৃত', 'প্রাকৃত' নয় অর্থাৎ সেগুলি বিকার থেকে উৎপন্ন, স্বভাব থেকে নয়। তৃতীয় অধ্যায়ে অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, মানুষ না চাইলেও কার দ্বারা প্রেরিত হয়ে পাপ-কাজ করে ? ভগবান তার উত্তরে বলেছেন যে, কামনার বশীভূত হয়েই মানুষ পাপ করে (৩।৩৬-৩৭)। কামনা, ক্রোধ, স্বার্থ এবং অহং-অভিমানের বশীভূত হয়ে যে কর্ম করা হয়, সেগুলি শুদ্ধ কর্ম নয়, অশুদ্ধ কর্ম।

পরমাত্মপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে যে কর্ম করা হয়, সেই সকল কর্মে পার্থক্য থাকলেও, সেগুলি দূষণীয় হয় না। ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হলে ব্রাহ্মণোচিত কর্ম হয়, শূদ্রের ঘরে জন্ম হলে শূদ্রোচিত কর্ম হয়, কিন্তু দোষ কিছুতেই থাকে না। দোষীভাগ সহজ নয়, স্বভাবনির্দিষ্টও নয়। দোষযুক্ত কর্ম স্বাভাবিক হতে পারে, কিন্তু স্বভাবনির্দিষ্ট হতে পারে না। একজন ব্রাহ্মণের যদি পরমাত্মপ্রাপ্তি হয়, তাহলে তার পরেও তিনি পবিত্রভাবে রান্না করবেন ; যেমন, পবিত্রতার সঙ্গে তাঁর থাকা উচিত, তেমনভাবেই থাকবেন। তেমনই একজন অন্ত্যজ যদি পরমাত্মাকে লাভ করেন, তাহলেও তিনি অপরের অর্ধভুক্ত খাদ্য খেতে থাকেন ; আগে যেমন ছিলেন, তেমনই থাকবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ তা করেন না। কারণ পবিত্রভাবে খাদ্য গ্রহণ করা তাঁর স্বভাব-নির্দিষ্ট কর্ম, কিন্তু অন্ত্যজের পক্ষে ভুক্তাবশেষ খাওয়া দূষণীয় নয়। তবে সিদ্ধ মহাপুরুষদের মধ্যে নানাপ্রকার বিচিত্র কর্ম দেখা যায়, কিন্তু সেগুলি দূষণীয় নয়। তাঁদের স্বভাব রাগ (আসক্তি)-দ্বেষরহিত হওয়ায় শুদ্ধ হয়।

আগের কোনো পাপ-কর্মের জন্য কসাইয়ের ঘরে যদি জন্ম হয়, তবে তা পূর্বজন্মের পাপের ফল ভোগ করার জন্যই হয়েছে, নতুন পাপ করার জন্য নয়। পাপের ফল

জাতি, আয়ু এবং ভোগ বলা হয়েছে, নতুন কোনও কর্ম বলা হয়নি—**'সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ'** (যোগদর্শন ২।১৩)। কর্ম করায় তিনি স্বাধীন। যদি তাঁর চিত্ত শুদ্ধ হয়ে ওঠে তাহলে তিনি কসাইয়ের কাজ করতে পারেন না। কোনো এক ব্যক্তি একজন সাধুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি পশুবধ করাই তার ধর্ম বলে মনে করে তাহলে সে কী করবে ? সাধু দৃঢ়তার সঙ্গে জানালেন যে, সেই ব্যক্তি তার ধর্ম অনুসারেই যদি একাদিক্রমে তিন বৎসর পবিত্রতা সহকারে ভগবদ্‌নাম (নিজ ইষ্টনাম) জপ করেন, তাহলে আর তিনি পশুবধ করতে পারেন না। কারণ তাঁর পূর্বজন্মের বা এখানকার যে স্বভাব গঠিত হয়েছে, সেই স্বভাবই দোষী। যদি পবিত্র হৃদয়ে ঠিকভাবে পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তির ইচ্ছা করা হয়, তাহলে তিনি আর কসাইয়ের কাজ করতে পারেন না। তাঁর স্বতঃই গ্লানি আসে, কাজে উপরতি হয়। কোনো উপদেশাদি ছাড়াই স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মধ্যে সদ্‌গুণ স্ফুরিত হয়।

শ্রীরামচরিতমানসে শবরীর প্রসঙ্গে ভগবান শ্রীরাম শবরীকে বলেছিলেন—

'নবধা ভগতি কহউঁ তোহি পাহীঁ।
সাবধান সুনু ধরু মন মাহীঁ॥' (৩।৩৫।৪)

তারপর ন'প্রকার ভক্তির কথা বলে ভগবান পরিশেষে বললেন—

সকল প্রকার ভগতি দৃঢ় তোরেঁ ॥ (৩।৩৬।৪)

'অর্থাৎ শবরী জানতেনই না যে ভক্তি নপ্রকারের হয়, তবুও তাঁর মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই সর্বপ্রকারের ভক্তি বিদ্যমান ছিল। সৎসঙ্গ, ভজন, ধ্যানাদির সাহায্যে যেসব গুণ সম্বন্ধে আমাদের কোনো ধারণা নেই, সেই গুণগুলি লাভ হয়। যিনি শুধু অন্যকে শোনাবার জন্য ভালো ভালো কথা শেখেন, তিনি তা অপরকে শোনাতে পারেন, কিন্তু এই গুণ তখনই তাঁর কাজে লাগে, যখন তিনি নিজের স্বভাব শুদ্ধ করে ভগবদ্‌মুখী হন। তাই মানুষের নিজ স্বভাব এবং কর্ম নির্মল ও শুদ্ধ করতে হয়। এতে কেউই কারও অধীন নয়, হীনবল নয়, অযোগ্য নয় বা অপাত্র নয়। মানুষ মনে করে যে, সে কর্তব্য পালনে বা সদ্‌গুণগুলি ব্যবহারে আনতে অসমর্থ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। জাগতিক ভোগাদিতে অভ্যস্ত ও পদার্থের সংগ্রহে আগ্রহ থাকাতেই এই অসমর্থতা অনুভব হয়।

উদ্ধার পাওয়ার যোগ্য মনে করেই ভগবান মনুষ্যদেহ প্রদান করেছেন। তাই স্বভাব শুধরিয়ে নিজের উদ্ধার করতে সকলেই স্বাধীন, সক্ষম, যোগ্য ও সমর্থ। স্বভাব শোধরানো অসম্ভব নয়, কঠিনও নয়। মনুষ্যজন্মকেই মুক্তির দ্বার বলে বলা হয়েছে,—**'সাধন ধাম মোচ্ছ কর দ্বারা'** (শ্রীরামচরিতমানস ৭।৪৩।৪)। যদি স্বভাব শোধরানো অসম্ভব কাজই হত, তাহলে তাকে মুক্তির দ্বার বলা হবে কেন ? মানুষ যদি তার নিজের স্বভাব শোধরাতে না পারে, তবে আর মনুষ্য জীবনের সার্থকতা কীসের ?

পরিশিষ্ট-ভাব—স্বধর্মরূপ কর্ম দ্বারা পাপ হলেও সেই পাপ স্পর্শ করে না—**'কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্'**। কেন-না পাপ স্পর্শ করার প্রধান কারণ ক্রিয়া নয়, ভাব। তাই কর্মের দ্বারা পাপ স্পর্শ করে না, কর্মে স্বার্থ ও অহং-অভিমান এলেই পাপ স্পর্শ করে।

❋ ❋ ❋

সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ॥ ৪৮ ॥

[**কৌন্তেয়** (হে কুন্তীপুত্র !) ; **সদোষম্, অপি** (দোষযুক্ত হলেও) ; **সহজম্, কর্ম** (সহজ কর্ম) ; **ন, ত্যজেৎ** (পরিত্যাগ করা উচিত নয়) ; **হি, সর্বারম্ভাঃ** (কারণ সমস্ত কর্মই) ; **ধূমেন, অগ্নিঃ, ইব** (ধূমদ্বারা অগ্নি যেমন আবৃত থাকে তেমনই কোনো না কোনো) ; **দোষেণ, আবৃতাঃ** (দোষ দ্বারা আবৃত ।)]

হে কুন্তীপুত্র ! দোষযুক্ত হলেও স্বভাবজ কর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়। কারণ সমস্ত কর্মই, ধূম দ্বারা অগ্নি যেমন আবৃত থাকে তেমনই কোনো না কোনো দোষ দ্বারা যুক্ত থাকে ॥ ৪৮ ॥

ব্যাখ্যা—[আগের শ্লোকে বলা হয়েছে যে, স্বভাবানুসারে শাস্ত্র যে কর্ম নির্দিষ্ট করেছেন, মানুষ সেই কর্ম করলে পাপভাগী হয় না। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে স্বভাবনির্দিষ্ট কর্মেও পাপ-ক্রিয়া হয়। পাপ যদি না হয়, তবে 'পাপভাগী হয় না' কথাটির কোনো মানে হয় না। সুতরাং ভগবান এখানে বলেছেন যে, 'স্বভাবজ বা সহজ কর্ম করলে যদি কোনো দোষ হয়ও, তবুও তা পরিত্যাগ করা উচিত নয়। কারণ সকল কর্মই ধূম দ্বারা অগ্নির ন্যায় দোষ দ্বারা আবৃত'।]

'সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ'—স্বভাবনির্দিষ্ট কর্মকে সহজ কর্ম বলা হয় ; যেমন, ব্রাহ্মণের শম-দমাদি ; ক্ষত্রিয়ের, শৌর্য-তেজাদি ; বৈশ্যের কৃষি, গো-রক্ষাদি এবং শূদ্রের সেবা—এ সবই সহজ কর্ম। জন্মের পর থেকে শাস্ত্র গুণ ও কর্ম অনুযায়ী যে বর্ণকে যে কর্মের নির্দেশ দিয়েছেন, সেই শাস্ত্রনির্দিষ্ট কর্মকেই সহজ কর্ম বা স্বভাবজ কর্ম বলা হয়। যেমন— ব্রাহ্মণদের জন্য যজ্ঞ করা এবং যজ্ঞ করানো, অধ্যয়ন ও অধ্যাপন ইত্যাদি, ক্ষত্রিয়দের জন্য যজ্ঞ করা এবং দান করা ইত্যাদি ; বৈশ্যদের জন্য যজ্ঞ করা এবং শূদ্রদের জন্য সেবা।

সহজ কর্মে এই দোষ থাকে—

(১) পরমাত্মা এবং পরমাত্মার অংশ—এই দুই-ই 'স্ব' এবং প্রকৃতি ও প্রকৃতির কার্য শরীর ইত্যাদি—এই দুই-ই 'পর'। কিন্তু পরমাত্মার অংশ স্বয়ং প্রকৃতির বশীভূত হয়ে অপরের অধীন হয়ে যায় অর্থাৎ সকল ক্রিয়াই প্রকৃতিতে হয় কিন্তু সেই ক্রিয়াগুলিকে নিজের বলে মেনে নিয়ে সেগুলির অধীন হয়ে যায়। এইভাবে প্রকৃতির অধীন হওয়া হল মহা দোষের।

(২) প্রত্যেক কর্মেই কোনো না কোনো আনুষঙ্গিক অনিবার্য হিংসাদি দোষ থাকেই।

(৩) যে কোনো কর্ম করলেই, সেটি কারও পক্ষে অনুকূল, কারও পক্ষে প্রতিকূল হয়, প্রতিকূল হওয়াও দূষণীয়।

(৪) প্রমাদাদি দোষের জন্য কর্মে কিছু ঘাটতি থেকে যায় অথবা করার সময় নিয়মাদিতে কিছু ভুল হয়ে যায়, সেগুলিও দোষের।

নিজের সহজ কর্ম দূষণীয় হলেও সেগুলি পরিত্যাগ করা উচিত নয়। এর অর্থ হল যে ব্রাহ্মণের কর্ম যত সৌম্য, ব্রাহ্মণেতর বর্ণের কর্ম তত সৌম্য নয়, কিন্তু সৌম্য না হলেও সেগুলি দোষের বলে মনে করা হয় না অর্থাৎ ব্রাহ্মণের সহজ কর্মের চেয়ে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য আদির কর্ম ন্যূনতার জন্য কোনো দোষযুক্ত হয় না এবং অনিবার্য হিংসা আদি দোষও তাদের স্পর্শ করে না, সেগুলি পালন করলে লাভই হয়। কারণ তাদের স্বভাবের অনুকূল হওয়ায়, সেগুলি করা তাদের পক্ষে সহজ ও শাস্ত্রবিহিত ।

ব্রাহ্মণদের জন্য ভিক্ষার কথা বলা হয়েছে। ভিক্ষা নির্দোষ বলে প্রতিভাত হলেও, এতেও দোষ হয়। যেমন—একজন গৃহস্থের দ্বারে একটি ভিক্ষুক থাকাকালীন অপর ভিক্ষুক এসে পড়লে তা গৃহস্থের কাছে বোঝা স্বরূপ হয়। ভিক্ষুকদের পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ভিক্ষা প্রদানকারীর ভিক্ষা প্রদানের উপযুক্ত ক্ষমতা না থাকায় তিনিও দুঃখিত হন। যদি কোনো গৃহস্থ ভিক্ষা দিতে না চান, তাঁর গৃহে ভিক্ষুক গেলে তিনি রুষ্ট হন। ভিক্ষা দিলে খরচ হয় আর না দিলে ভিক্ষুক নিরাশ হয়ে চলে যায়। তাতে গৃহস্থের পাপ হয়। এইরূপ ভিক্ষাতে যদিও দোষ থাকে, তা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণের ভিক্ষা (মাধুকরী) পরিত্যাগ করা উচিত নয়।

ক্ষত্রিয়দের পক্ষে ন্যায়সম্মত যুদ্ধ প্রাপ্ত হলে, সেই যুদ্ধ করলে তাঁদের পাপ হয় না। যদিও যুদ্ধরূপ কর্ম দোষের। কারণ এতে মানুষকে হত্যা করতে হয়, তা সত্ত্বেও যুদ্ধ সহজকর্ম এবং শাস্ত্রবিহিত হওয়ায় ক্ষত্রিয়দের এতে দোষ হয় না। তেমনই বৈশ্যদের জন্য চাষ করার কথা বলা হয়েছে। চাষ করলে অনেক প্রাণীর হত্যা হয়। কিন্তু বৈশ্যদের পক্ষে সহজকর্ম এবং শাস্ত্রবিহিত হওয়ায় এই হিংসাতে তাদের দোষ হয় না। তাই সহজ কর্ম পরিত্যাগ করা উচিত নয়।

সহজ (স্বভাবজ) কর্ম করায় দোষ (পাপ) হয় না—একথা ঠিক ; কিন্তু এই সাধারণ সহজ কর্ম দ্বারা মুক্তি হবে কী প্রকারে ? আসলে মুক্তির জন্য সহজ কর্ম বাধা প্রদানকারী হয় না। কামনা, আসক্তি, স্বার্থ, অহং-অভিমান ইত্যাদি থেকেই বন্ধন হয় এবং এর জন্যই পাপ হয়। তাই মানুষের নিষ্কামভাবে ভগবদ্প্রীত্যর্থে সহজ কর্ম করা উচিত, তাহলেই বন্ধন দশা কাটবে।

'সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ'—যত প্রকার কর্ম আছে সেগুলি সবই দোষযুক্ত ; যেমন—আগুন

জ্বালালে আরম্ভে ধোঁয়া বার হয়। কর্ম করলে দেশ, কাল, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদির অধীনতা এবং অপরের প্রতিকূলতাও দূষণীয়, কিন্তু শাস্ত্রে স্বভাব অনুসারেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই নির্দেশ অনুযায়ী নিষ্কামভাবে কর্ম করলে মানুষ পাপভাগী হয় না। সেইজন্যই ভগবান যেন অর্জুনকে বলেছেন, 'ওহে অর্জুন ! তুমি যে যুদ্ধরূপ ক্রিয়াকে ভয়ঙ্কর কর্ম মনে করছ, কিন্তু তা তোমার ধর্ম। কারণ ন্যায়তঃ প্রাপ্ত যুদ্ধতে যোগদান করা ক্ষত্রিয়ের কর্ম, ক্ষত্রিয়ের এ ছাড়া অন্য কোনো সাধন শ্রেয় নয়' (গীতা ২।৩১)।

পরিশিষ্ট-ভাব—নিষিদ্ধ কর্মে আসক্তি জন্মালে অথবা নিষিদ্ধভাবে ভোগ করলে বিহিত কর্ম কঠিন বলে মনে হয়। বাস্তবে বিহিত কর্ম সহজ এবং স্বাভাবিক, এতে কোনো পরিশ্রম নেই।

একচল্লিশতম শ্লোক পর্যন্ত **'স্বকর্ম'**, **'স্বধর্ম'** এবং **'সহজকর্ম'** শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে গীতা স্বকর্ম এবং সহজকর্মকেই **'স্বধর্ম'** বলে মানে।

বিহিত কর্ম থেকে দোষ হলেও, কামনা, সুখবুদ্ধি এবং ভোগবাসনা না থাকলে দোষ স্পর্শ করে না। অর্থাৎ দোষ হওয়া বা না হওয়া নির্ভর করে কর্তার উদ্দেশ্যের ওপর ; যেমন—ডাক্তারের উদ্দেশ্য যদি ঠিক থাকে, পয়সা যদি তাঁর লক্ষ্য না হয়ে সেবা করার উদ্দেশ্য হয় তাহলে তিনি অপারেশান করে রোগীর অঙ্গচ্ছেদ করলেও তাঁর পাপ হয় না, বরং নিঃস্বার্থভাব ও হিত করার দৃষ্টি থাকায় পুণ্যই হয়।

※　※　※

সম্বন্ধ—ভগবান এবার সাংখ্যযোগের প্রকরণ আরম্ভ করতে গিয়ে প্রথমে সাংখ্যযোগের অধিকারীর বর্ণনা করছেন।

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি॥ ৪৯ ॥

[**সর্বত্র, অসক্তবুদ্ধিঃ** (যাঁর বুদ্ধি সর্বত্র আসক্তিবর্জিত) ; **জিতাত্মা** (যিনি শরীরকে বশীভূত করেছেন) ; **বিগতস্পৃহঃ** (যিনি স্পৃহাশূন্য) ; **সন্ন্যাসেন, পরমাম্** (সাংখ্যযোগের দ্বারা) ; **নৈষ্কর্ম্য, সিদ্ধিম্, অধিগচ্ছতি** (সর্বশ্রেষ্ঠ নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি লাভ করেন।)]

যাঁর বুদ্ধি সর্ববিষয়ে আসক্তিবর্জিত, যিনি শরীরকে বশীভূত করেছেন, যিনি স্পৃহাশূন্য (নিস্পৃহ), তিনি সাংখ্যযোগের সাহায্যে কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি (নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি) লাভ করেন ॥ ৪৯ ॥

ব্যাখ্যা—**'সন্ন্যাস'** (সাংখ্য) যোগের অধিকারী হলেই সিদ্ধিলাভ হয়। তাই তার অধিকারীর কেমন হওয়া উচিত—সেটি জানাবার জন্যই শ্লোকের পূর্বার্ধে তিনটি বিষয় বলা হয়েছে—

(১) **'অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র'**—যাঁর বুদ্ধি সর্ববিষয়ে আসক্তিরহিত অর্থাৎ দেশ, কাল, ঘটনা, পরিস্থিতি, বস্তু, ব্যক্তি, ক্রিয়া, পদার্থ ইত্যাদি কোনো কিছুতেই যাঁর বুদ্ধি লিপ্ত হয় না।

(২) **'জিতাত্মা'**—যিনি শরীরকে বশীভূত করেছেন অর্থাৎ যিনি আলস্য, প্রমাদ ইত্যাদির দ্বারা শরীরের বশীভূত নন, বরং শরীরকে নিজের বশে রেখেছেন। তাৎপর্য হল এই যে তিনি কোনো কাজ সিদ্ধান্তমত করতে চাইলে, তাঁর শরীরও তাতে তৎপরতার সঙ্গে যুক্ত হয় আর কোনো ক্রিয়া, ঘটনা ইত্যাদি থেকে দূরে থাকতে চাইলে, শরীর সহযোগী হয় না। এইরূপ যিনি শরীরকে জয় করেছেন, তাঁকে বলা হয় **'জিতাত্মা'**।

(৩) **'বিগতস্পৃহঃ'**—জীবনধারণ করার জন্য যা কিছু বিশেষ প্রয়োজন, সেই জিনিসের সূক্ষ্ম কামনাকে বলা হয় 'স্পৃহা' ; যেমন—শাক-পাতা যদি কিছু পাওয়া যায়, শুক্‌নো রুটিই যদি পাওয়া যায়, কিছু না খেয়ে আমি কী করে বাঁচব ? জল না পেলে কীভাবে বাঁচব ? শীতের দিনে বিনাবস্ত্রে কী করে বেঁচে থাকব ? সাংখ্যযোগের সাধক এই প্রয়োজনীয় জীবন-নির্বাহের সামগ্রী নিয়েও বিন্দুমাত্র চিন্তা করেন না।

তাৎপর্য হল এই যে, সাংখ্যযোগের সাধকদের জড়ত্ব ত্যাগ করতে হয়। সেই জড়ত্ব ত্যাগ করতে তিনটি বিষয়ের

কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অসক্তবুদ্ধি অর্থাৎ নিরাসক্ত হলে তিনি জিতাত্মা হন এবং জিতাত্মা হলে তিনি স্পৃহাহীন বা নিস্পৃহ হন, তখনই তিনি সাংখ্যযোগের অধিকারী হন।

'নৈষ্কর্মসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি'—এরূপ নিরাসক্ত, জিতাত্মা এবং নিস্পৃহ ব্যক্তি সাংখ্যযোগের সাহায্যে পরম নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি অর্থাৎ নৈষ্কর্ম্যরূপ পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হন। কারণ ক্রিয়ামাত্রই প্রকৃতিতে সংঘটিত হয় এবং স্ব-স্বরূপের যখন সেই ক্রিয়ার সঙ্গে বিন্দুমাত্র সম্পর্ক থাকে না, তখন কোনো ক্রিয়া বা তার ফল তাঁর ওপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না। অতএব তাঁর মধ্যে যে স্বাভাবিক, স্বতঃসিদ্ধ নৈষ্কর্ম্য-নির্লিপ্ত ভাব, তা প্রকটিত হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব—নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধির অর্থ হল—কর্ম সর্বতোভাবে অ-কর্ম হোক, কর্মের সঙ্গে কোনোরূপ সম্বন্ধ যেন না থাকে, কর্ম করলেও লিপ্ততা যেন না থাকে—**'কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ'** (গীতা ৪।১৮)। কর্ম না-করাকে নৈষ্কর্ম্য বলে না (গীতা ৩।৪) বরং কর্ম করা তো সাধকদের পক্ষে খুবই প্রয়োজন (গীতা ৬।৩)।

'অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ'—এ হল কর্মযোগের সিদ্ধি (গীতা ২।৭১), যা সিদ্ধ হলে কর্মযোগী সাংখ্যযোগে স্থিত হন (গীতা ৫।৬) এবং সাংখ্যযোগ থেকে নৈষ্কর্মসিদ্ধি-প্রাপ্ত হয়। এইভাবে কর্মযোগ থেকে **'নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি'** হয়—**'ন কর্মণামনারম্ভা নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে'** (গীতা ৩।৪), কিন্তু ভক্তিযোগের দ্বারা **'পরম নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি'** হয়। কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ হল 'নিষ্ঠা'—**'লোকেঽস্মিন্দ্বিবিধা নিষ্ঠা'** (৩।৩), কিন্তু কর্মযোগ ভক্তিযোগের 'পরা-নিষ্ঠা' ভক্তির দ্বারাই প্রাপ্ত হয়—**'নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা'** (১৮।৫০)। তাৎপর্য হল যে 'পরম নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি' এবং 'পরা নিষ্ঠা'—উভয়ই ভক্তির দ্বারা হয়ে থাকে।

* * *

সম্বন্ধ—পরবর্তী শ্লোকে পরমসিদ্ধিলাভ করার বিধি সম্বন্ধে বলছেন।

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা॥ ৫০ ॥

[**কৌন্তেয়** (হে কৌন্তেয়!) ; **সিদ্ধিম্, প্রাপ্তঃ** (সিদ্ধিপ্রাপ্ত সাধকগণ) ; **ব্রহ্ম** (ব্রহ্ম) ; **যা, জ্ঞানস্য** (যা জ্ঞানের) ; **পরা, নিষ্ঠা** (পরা নিষ্ঠা) ; **যথা, আপ্নোতি** (কীভাবে লাভ করেন) ; **তথা, মে** (সেই প্রকারটি আমার কাছ থেকে) ; **সমাসেন, এব** (সংক্ষেপে) ; **নিবোধ** (বুঝে নাও।)]

হে কৌন্তেয়! সিদ্ধি (অন্তঃকরণের শুদ্ধি) প্রাপ্ত সাধকগণ ব্রহ্মকে কী প্রকারে লাভ করেন, সেই প্রকারটি তুমি আমার কাছ থেকে সংক্ষেপে বুঝে নাও, উহাই জ্ঞানের পরা নিষ্ঠা॥ ৫০ ॥

ব্যাখ্যা—'সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে'—এখানে অন্তঃকরণের শুদ্ধিকে সিদ্ধি বলা হয়েছে, এগুলি আগের শ্লোকে **'অসক্তবুদ্ধিঃ'**, **'জিতাত্মা'** এবং **'বিগতস্পৃহঃ'** পদের দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। যাঁর অন্তঃকরণ অত্যন্ত শুদ্ধ অর্থাৎ তাতে কোনোপ্রকার কামনা, মমতা, আসক্তি নেই, তাঁর পক্ষে কখনো কোনো বস্তু, ব্যক্তি, পরিস্থিতি ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না অর্থাৎ তাঁর আর কোনো কিছু পাওয়ার বাকি থাকে না। তাই তাকে বলা হয়েছে সিদ্ধি।

লোকে বলে থাকে যে মনোমতো জিনিস পাওয়াই হল সিদ্ধি, আবার অণিমাদি সিদ্ধিলাভ হওয়াও একপ্রকার সিদ্ধি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলি সিদ্ধি নয়, কারণ এতে পরাধীনতা থাকে, কোনো বিষয়ের অভাব থাকে আর কোনো বস্তু, পরিস্থিতির প্রয়োজন হয়। সুতরাং যে সিদ্ধিতে কোনো প্রকার কামনা উদ্ভূত হয় না, তাকেই প্রকৃতপক্ষে সিদ্ধি বলা হয়। যে সিদ্ধি প্রাপ্তিতে কামনা বৃদ্ধি পায়, তা প্রকৃত সিদ্ধি নয়, তা এক প্রকারের বন্ধন।

অন্তঃকরণের শুদ্ধিরূপ সিদ্ধিপ্রাপ্ত সাধকই ব্রহ্মকে লাভ করেন। তিনি যে ক্রম অনুযায়ী ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, তা আমার কাছ থেকে শোনো—**'নিবোধ মে'**। কারণ সাংখ্যযোগের

যেসব সারগর্ভ কথা আছে, তা সাংখ্যযোগীর জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন এবং সেগুলি জানাও অত্যন্ত প্রয়োজন।

'নিবোধ' পদটির অর্থ হল যে সাংখ্যযোগে ক্রিয়া ও সামগ্রীর প্রাধান্য থাকে না। কিন্তু তত্ত্বটি জানার প্রাধান্য থাকে। এই অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকেও সাংখ্যযোগীর বিষয়ে **'নিবোধ'** পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

'সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা'—সাংখ্যযোগীর যে সর্বশেষ স্থিতি, যার থেকে বড় আর কোনো স্থিতি সাধকের হতে পারে না, তাকেই বলা হয় জ্ঞানের পরানিষ্ঠা। সেই পরানিষ্ঠাকে অর্থাৎ ব্রহ্মকে সাংখ্যযোগের সাধক যেভাবে লাভ করেন, তা আমি সংক্ষেপে বলব অর্থাৎ তার সারমর্ম বলব।

পরিশিষ্ট-ভাব—এইস্থানে **'সিদ্ধিম্'** পদটির অর্থ হল—সাধনরূপ কর্মযোগের দ্বারা সাধিত অন্তঃকরণের পূর্ণ শুদ্ধি, যা প্রাপ্ত হলে কর্মযোগী জ্ঞানযোগে বা ভক্তিযোগে যে কোনো যোগে স্থিত হতে পারেন—

তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২০।৯)

'ততক্ষণ কর্ম করা উচিত, যতক্ষণ ভোগাদিতে বৈরাগ্য না হয় অথবা যতক্ষণ আমার লীলা-কথা শ্রবণে-কীর্তনে শ্রদ্ধা না আসে।'

কর্মযোগীর মধ্যে যদি জ্ঞানের সংস্কার থাকে, তাহলে তিনি জ্ঞানের পথে যান আর যদি ভক্তির সংস্কার থাকে, তবে তিনি ভক্তিপথে যান।

যদি কোনো একটিতেও আগ্রহ না থাকে, তাহলে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ—তিনটিই 'সাধন'রূপেও আছে এবং 'সাধ্য' রূপেও আছে। সাধনরূপে তিনটি পৃথক্ পৃথক্ হলেও সাধ্যরূপে তিনটিই এক। তাই গীতায় ভগবান কোথাও ভক্তির দ্বারা জ্ঞানপ্রাপ্তি অর্থাৎ সাধন-ভক্তির দ্বারা সাধ্য-জ্ঞানের প্রাপ্তির কথা বলেছেন—**'ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী'** (১৩।১০), **'মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ...... ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে'** (১৪।২৬), আবার কোথাও জ্ঞানের দ্বারা ভক্তি প্রাপ্তি অর্থাৎ সাধন-জ্ঞানের সাহায্যে সাধ্য-ভক্তি প্রাপ্তির কথা বলেছেন— **'সন্নিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র ....সর্বভূতহিতে রতাঃ'** (১২।৪), **'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা .... মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্'** (১৮।৫৪)।

ভগবান প্রথমে **'স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ'** (১৮।৪৬)—এই পদটিতে কর্মযোগের সাহায্যে ভক্তিযোগের সিদ্ধির কথা বলেছেন আর এখানে **'সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম'** পদটিতে কর্মযোগের সাহায্যে জ্ঞানযোগের সিদ্ধির কথা বলেছেন। পঞ্চম অধ্যায়েও সাধনরূপ কর্মযোগের সাহায্যে জ্ঞানযোগের শীঘ্র সিদ্ধি লাভের কথা জানিয়েছেন—**'যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম নচিরেণাধিগচ্ছতি'** (৫।৬)।

* * *

সম্বন্ধ—জ্ঞানের পরানিষ্ঠা প্রাপ্ত করার জন্য কী কী সাধন-সামগ্রীর প্রয়োজন, পরবর্তী তিনটি শ্লোকে তা বলা হয়েছে।

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ॥ ৫১ ॥
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥ ৫২ ॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ৫৩ ॥

[**বিশুদ্ধয়া** (যিনি বিশুদ্ধ) ; **বুদ্ধ্যা, যুক্তঃ** (বুদ্ধিযুক্ত) ; **বৈরাগ্যম্, সমুপ্রাশ্রিতঃ** (বৈরাগ্য অবলম্বন করেন) ; **বিবিক্তসেবী** (একান্তে অবস্থান করেন) ; **লঘ্বাশী** (মিতাহারী) ; **ধৃত্যা, আত্মানম্, নিয়ম্য** (ধৈর্য সহকারে ইন্দ্রিয় দমন করেন) ; **যতবাক্কায়মানসঃ** (শরীর-বাক্য-মন বশীভূত করেন) ; **শব্দাদীন্, বিষয়ান্** (শব্দাদি বিষয়) ; **ত্যক্ত্বা, চ** (পরিত্যাগ করেন

এবং) ; রাগদ্বেষৌ, ব্যুদস্য (রাগদ্বেষ বর্জন করে) ; নিত্যম্, ধ্যানযোগপরঃ (নিত্য-নিরন্তর ধ্যানে নিরত থাকেন) ; অহংকারম্, বলম্, দর্পম্ (অহংকার, বল, দর্প) ; কামম্, ক্রোধম্ (কাম, ক্রোধ) ; চ, পরিগ্রহম্, বিমুচ্য (পরিগ্রহ পরিত্যাগ করে) ; নির্মমঃ (মমত্ব-বুদ্ধিহীন এবং) ; শান্তঃ (প্রশান্তচিত্ত লাভ করে) ; ব্রহ্মভূয়ায়, কল্পতে (ব্রহ্মপ্রাপ্ত করতে সমর্থ হন।)]

যিনি বিশুদ্ধ (সাত্ত্বিক) বুদ্ধিযুক্ত, বৈরাগ্য অবলম্বন করেন, একান্তে অবস্থান করেন, মিতাহারী, ধৈর্য সহকারে ইন্দ্রিয় দমন করেন, শরীর-বাক্য-মন বশীভূত করেন, শব্দাদি বিষয় পরিত্যাগ করেন এবং রাগ-দ্বেষ বর্জন করে নিত্য-নিরন্তর ধ্যানে নিরত থাকেন, সেই সাধক অহংকার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ, পরিগ্রহ পরিত্যাগ করে, মমত্ব-বুদ্ধিহীন ও চিত্তের প্রশান্তভাব লাভ করে ব্রহ্মপ্রাপ্ত করতে সমর্থ হন॥ ৫১-৫৩ ॥

ব্যাখ্যা—**'বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তঃ'**—যে সাংখ্যযোগী সাধক পরমাত্মতত্ত্ব লাভ করতে চান, তাঁর বুদ্ধি বিশুদ্ধ অর্থাৎ সাত্ত্বিক হতে হয় (গীতা ১৮।৩০)। তাঁর বিবেক-বুদ্ধি যে অত্যন্ত পরিষ্কার, তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না।

সাংখ্যযোগের প্রকরণে সর্বপ্রথম বুদ্ধির কথা বলা হয়েছে। এর তাৎপর্য হল এই যে সাংখ্যযোগীর যে বিচারশক্তির প্রয়োজন, তা বিবেক-বুদ্ধির দ্বারাই প্রকটিত হয়। সেই বিবেকের সাহায্যেই তিনি জড়ত্ব পরিত্যাগ করেন।

'বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ'—সংসারী ব্যক্তিরা যেমন আসক্তিপূর্বক বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদির আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন, সেগুলিকেই তাঁদের আশ্রয় ও ভরসা বলে মনে করেন, তেমনই সাংখ্যযোগের সাধক বৈরাগ্য অবলম্বন করে থাকেন অর্থাৎ জনসমাগম ইত্যাদিতে তাঁর স্বাভাবিক নির্লিপ্ত ভাব বজায় থাকে। লৌকিক ও পারলৌকিক সমস্ত ভোগেই তাঁর বৈরাগ্য দৃঢ় থাকে।

'বিবিক্তসেবী'—সাংখ্যযোগের সাধকদের স্বভাব, রুচি স্বতঃই স্বাভাবিকভাবে একান্তে থাকার হয়ে থাকে। নির্জন স্থানে থাকার রুচি অত্যন্ত উত্তম, কিন্তু তার জন্য আগ্রহ থাকা উচিত নয় অর্থাৎ নির্জন স্থান না হলে তাঁর মনে যেন কোনো বিক্ষেপ, চাঞ্চল্য না আসে। আগ্রহ না থাকলে মনোমতো নির্জন স্থান যদি না পাওয়া যায়, যদি বহু লোক থাকে, খুব শোরগোল হয়, তবুও সাধক বিরক্ত হবেন না অর্থাৎ সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমভাবে থাকবেন। কিন্তু যদি আগ্রহ থাকে, তাহলে তিনি বিরক্ত হবেন, জন-সমাগম তাঁর সহ্য হবে না। সুতরাং সাধকের স্বভাব নির্জনে থাকার হলেও নির্জন স্থান না পেলে তাঁর চিত্তে কোনো চাঞ্চল্য উপস্থিত হওয়া উচিত নয়। কারণ চাঞ্চল্য হলে চিত্তে সংসারের গুরুত্ব আসে, সংসারের গুরুত্ব হলে চাঞ্চল্য আসে, যা ধ্যানযোগের বাধাস্বরূপ।

'একান্তে থাকলে ভালোভাবে সাধন হবে, মন উত্তমরূপে ভগবানে নিবিষ্ট হবে ; অন্তঃকরণ নির্মল হবে'—এইসব ভেবে মনে যে প্রশান্তি আসে তা সাধনার সহায়ক হয়। কিন্তু 'একান্তে কেউ শোরগোল করবে না ; তাই সেখানে সুনিদ্রা হবে, সেইস্থানে ইচ্ছামতো বসে থাকলে কেউ দেখার থাকবে না, সর্বপ্রকার আরাম থাকবে, নির্জন স্থানে বসবাস করলে লোকে বেশি সম্মান ও শ্রদ্ধা করবে'—এইসব ভেবে মনে যে আনন্দ হয়, তা সাধনার বাধাস্বরূপ। কারণ এ সবই হল ভোগ। সাধকের এইসব সুখ-সুবিধাতে আবদ্ধ হওয়া উচিত নয় এবং এগুলি থেকে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

'লঘ্বাশী'—সাধকের পরিমিত ও নিয়মিত ভোজন করার অভ্যাস থাকবে। আহারের ব্যাপারে হিত, মিত ও মেধ্য—এই তিনটি বিষয় বলা হয়েছে। 'হিতে'র অর্থ হল—আহার শরীরের অনুকূল হবে। 'মিতে'র অর্থ হল—আহার যেন অধিক না হয় আবার কমও না হয়, যতটুকু খেলে শরীর-নির্বাহ হয়, ততটাই আহার করবে (গীতা ৬।১৬)। আহার করলে শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট হবে এই ভাব নিয়ে আহার করবে না, শুধু ওষুধের মতো ক্ষুন্নি-বৃত্তির জন্যই আহার গ্রহণ করবে, যাতে সাধনায় বিঘ্ন না হয়। 'মেধ্য'র তাৎপর্য হল—আহার্য বস্তু যেন পবিত্র হয়।

'ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ'—জাগতিক যত প্রলোভনই আসুক বুদ্ধিকে নিজ ধ্যেয় পরমাত্মতত্ত্ব থেকে বিচলিত হতে না দেওয়া—এরূপ দৃঢ় সাত্ত্বিক ধৃতি (গীতা ১৮।৩৩) দ্বারা ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করবে অর্থাৎ মর্যাদার লঙ্ঘন করবে না। অষ্টপ্রহর এই চিন্তা মনে রাখতে হয় যে সাধনার বিরুদ্ধ কোনো কাজ যেন ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা না হয়।

'যতবাক্কায়মানসঃ'—শরীর, বাক্য ও মনকে বশীভূত

করাও সাধকের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন (গীতা ১৭।১৪-১৬)। সুতরাং অনর্থক বেড়ানো, দেখাশোনার জন্য শৌখিন যাত্রা ও বৃথা বাক্য ব্যয় না করা, আবশ্যক হলে কথা বলা, অসত্য না বলা, নিন্দা-কুৎসা না করা, আসক্তিপূর্বক সাংসারিক চিন্তা না করা এবং পরমাত্মাকে চিন্তা করা, এইসব সাধকের অবশ্য প্রয়োজন।

'শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা'—ধ্যানের সময় বাহ্যিক যতপ্রকার সম্পর্ক, যা বিষয়রূপে আসে এবং যার থেকে সংযোগজনিত সুখ হয়, সেই শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—পাঁচটি বিষয় স্বরূপতঃ পরিত্যাগ করা উচিত। কারণ আসক্তিপূর্বক বিষয় সেবনকারী ধ্যানযোগের সাধনা করতে সক্ষম হন না। যদি আসক্তি সহকারে বিষয় ভোগ করেন, তাহলে (মন বহির্মুখ হওয়ায়) ধ্যানে বৃত্তি লাগে না এবং বিষয় চিন্তা হতে থাকে।

'রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ'—জাগতিক বস্তুগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, নিজের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী—এই মনোভাবকে বলা হয় 'আসক্তি'। অর্থাৎ চিত্তে অসৎ (বিনাশশীল) বস্তুর যে গুরুত্ব অনুভূত হয়, সেটিই হল 'আসক্তি' বা 'রাগ'। এই অসৎ বস্তুতে আসক্তি থাকলে যদি কেউ সেগুলির প্রাপ্তিতে বাধা প্রদান করে, তাহলে তার প্রতি দ্বেষ জন্মায়।

অসৎ জগতের কোনো অংশে যদি আসক্তি জন্মায় তাহলে তার অপর অংশে বিদ্বেষ আসে—এটিই নিয়ম। যেমন—শরীরে আসক্তি জন্মালে শরীরের অনুকূল বস্তুগুলিতে আসক্তি হয় আর প্রতিকূল বস্তুগুলিতে দ্বেষ জন্মায়।

জগতের সঙ্গে সম্পর্ক আসক্তিতেও হয় আবার বিদ্বেষেও হয়। আসক্তিপূর্ণ বিষয়ের চিন্তা হয় আবার বিদ্বেষপূর্ণ বিষয়েরও চিন্তা হয়। তাই সাধকের রাগ বা দ্বেষ করা উচিত নয়।

'ধ্যানযোগপরো নিত্যম্'—সাধক যেন নিত্যই ধ্যানযোগপরায়ণ থাকেন অর্থাৎ ধ্যান ভিন্ন অন্য কোনো সাধনা না করেন। ধ্যানের সময় ধ্যান তো করবেনই, অন্য কাজের সময়ও অর্থাৎ চলা-ফেরা, খাওয়া-শোওয়া, কাজ-কর্ম ইত্যাদি করার সময়ও এই ধ্যান ভাব সর্বদা বজায় রাখতে হয় যে প্রকৃতপক্ষে এক পরমাত্মা ভিন্ন জগতের পৃথক্ কোনো অস্তিত্বই নেই (গীতা ১৮।২০)।

'অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্ বিমুচ্য'—গুণাদির জন্য নিজের মধ্যে যে এক বিশেষ ভাব দেখা যায়, তাকে বলা হয় 'অহংকার'। জোর করে, বিশেষভাবে যা ইচ্ছা করার যে আগ্রহ হয়, তাকে বলে 'জেদ'। জমি-সম্পত্তি ইত্যাদি বাহ্য বস্তুসমূহের জন্য মনে যে অহংকার হয়, তাকে বলে 'দর্প'। ভোগ, বস্তু এবং অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতি প্রাপ্ত হোক, এরূপ ইচ্ছার নাম 'কাম'। নিজ স্বার্থ ও অহং-অভিমানে আঘাত লাগলে অন্যের অনিষ্ট করার নিমিত্ত মনে যে জ্বালার সৃষ্টি হয়, তাকে বলে 'ক্রোধ'। ভোগ-বুদ্ধি দ্বারা সুখ-আরাম প্রভৃতি যা সংগ্রহ করা হয়, তাকে বলে 'পরিগ্রহ'[1]।

সাধক উপরিউক্ত অহংকার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ এবং পরিগ্রহ—এইসব ত্যাগ করে থাকেন।

'নির্মমঃ'—নিজের কাছে জীবিকা-নির্বাহের জন্য যা সামগ্রী থাকে এবং কর্ম করার শরীর-ইন্দ্রিয়াদি যেসব সাধন আছে, তাতে মমত্ববোধ বা আপনবোধ যেন না থাকে[2]। নিজের শরীর, বস্তু ইত্যাদি যা আমার প্রিয় সেগুলি বজায় না রাখার ইচ্ছাকেই বলা হয় 'নির্মম' বা মমত্বহীন।

যেসব ব্যক্তি এবং বস্তুসমূহকে আমরা নিজের বলে মনে করি, সেগুলি এখন থেকে একশত বছর আগে নিজের ছিল না এবং একশত বছর পরেও নিজের থাকবে না। সুতরাং যা নিজের থাকবে না, সেগুলি ব্যবহার বা সেবা করার মাধ্যমে হলেও নিজের মনে করে নিজের কাছে রাখতে পারা যায় না। যদি সেগুলো নিজের কাছে রাখতে পারা না যায় তাহলে 'সেগুলি যে নিজের নয়' তা মানতে বাধা কীসের ? সেগুলি নিজের বলে না মানলেই সাধক নির্মম বা মমত্বহীন হতে পারেন।

'শান্তঃ'—অসৎ (নাস্তি) জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলেই চিত্তে অশান্তি, চাঞ্চল্য উৎপন্ন হয়। জড়ত্ব থেকে

[1]ব্রহ্মচারী, বাণপ্রস্থী এবং সন্ন্যাসী—এঁদের সকলেরই স্বরূপতঃ পরিগ্রহ (সংগ্রহ) পরিত্যাগ করা উচিত । গৃহস্থ ব্যক্তিও যদি নিজের সুখবুদ্ধিতে সংগ্রহ না করে অন্যের সেবা ও হিতার্থে সংগ্রহ করেন, তাহলে তাকে পরিগ্রহ বলে না।

[2]শুধুমাত্র সাংসারিক ব্যবহারের জন্য বস্তু আদিতে আপনভাব করা দূষণীয় নয়, সেগুলি চিরকালের মতো নিজের বলে মনে করাই দোষের ।

সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হলে কখনোই মনে অশান্তি আসে না। তাই রাগ-দ্বেষ না থাকায় সাধক সর্বক্ষণ শান্ত থাকেন।

'ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে'—মমত্বরহিত এবং শান্ত ব্যক্তি (সাংখ্যযোগের সাধক) পরমাত্মপ্রাপ্তির অধিকারী হয়ে ওঠেন অর্থাৎ অসতের সম্বন্ধ সর্বতোভাবে পরিত্যক্ত হলেই তাঁর মধ্যে ব্রহ্মপ্রাপ্তির যোগ্যতা, সামর্থ্য আসে। কারণ যতক্ষণ অসতের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে, ততক্ষণ পরমাত্মপ্রাপ্তির সামর্থ্য হয় না।

সম্বন্ধ—উপরিউক্ত সাধন-সামগ্রী দ্বারা নিষ্ঠা লাভ হলে কী হয়—পরবর্তী শ্লোকে তা জানাচ্ছেন।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্‌॥ ৫৪ ॥

[ব্রহ্মভূতঃ (ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত) ; প্রসন্নাত্মা (প্রসন্নচিত্ত সাধক) ; ন, শোচতি (শোকও করেন না) ; ন, কাঙ্ক্ষতি (কোনো কিছু আকাঙ্ক্ষাও করেন না) ; সর্বেষু, ভূতেষু (সর্বভূতে) ; সমঃ (সমদর্শী) ; পরাম্‌, মদ্ভক্তিম্‌ (আমাতে পরাভক্তি) ; লভতে (লাভ করেন।)]

ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত প্রসন্নচিত্ত সাধক শোকও করেন না বা কিছু আকাঙ্ক্ষাও করেন না। এরূপ সর্বভূতে সমদর্শী সাধক আমাতে পরাভক্তি লাভ করেন॥ ৫৪ ॥

ব্যাখ্যা—**'ব্রহ্মভূতঃ'**—যখন অন্তরে বিনাশশীল বস্তুর গুরুত্ব দূর হয়, তখন চিত্তে অহংকার, দর্প ইত্যাদি বৃত্তি শান্ত হয় অর্থাৎ সেগুলি পরিত্যক্ত হয়ে যায়। আর নিজের বলে যে বস্তু, তাতেও মমত্ববোধ থাকে না। মমত্ববোধ না থাকলে সুখ এবং ভোগবুদ্ধির দ্বারা বস্তুসমূহ সংগ্রহ করা যায় না। সুখ এবং ভোগবুদ্ধি দূর হলে, চিত্তে স্বাভাবিকভাবে শান্তি আসে।

এইভাবে সাধক যখন অসৎ-এর ঊর্ধ্বে ওঠেন, তখন তিনি ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপযুক্ত হয়ে ওঠেন। উপযুক্ত হলে তিনি স্বতঃই ব্রহ্মভূত-অবস্থা প্রাপ্ত হন। এর জন্য তাঁর কিছুই করতে হয় না। এই অবস্থায় 'আমি ব্রহ্মস্বরূপ এবং ব্রহ্ম আমার স্বরূপ' তাঁর এটি অনুভব হয়ে থাকে । এই অবস্থাকে এখানে (এবং গীতা ৫।২৫-এও) **'ব্রহ্মভূতঃ'** পদে বলা হয়েছে।

'প্রসন্নাত্মা'—চিত্তে যখন অসৎ বস্তুর গুরুত্ব হয়, তখন সেগুলি পাওয়ার জন্য কামনা উৎপন্ন হয়। কামনা উৎপন্ন হলেই চিত্তের শান্তি নষ্ট হয় এবং অশান্তি (চাঞ্চল্য) আসে। কিন্তু যখন অসৎ বস্তুর গুরুত্ব চলে যায়, তখন সাধকের চিত্তে স্বাভাবিকভাবে প্রশান্তি থাকে। অপ্রসন্নতার কারণ দূর হলে আর কখনো অপ্রসন্নতা আসে না। কারণ সাংখ্যযোগী সাধকের চিত্তে সংসারের অভাব এবং পরমাত্মতত্ত্বের ভাব অটল থাকে।

'ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি'—সাধকের যখন কোনো শোক বা চিন্তা না থাকে তখন তাঁর এই প্রসন্নতা জানা যায়। সংসারে যত দুঃখই আসুক তবুও তিনি শোক করেন না এবং বিশেষ কোনো পরিস্থিতি লাভ করার কোনো ইচ্ছাও জাগে না। তাৎপর্য হল এই যে উৎপন্ন ও বিনাশশীল এবং পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি, বস্তু, ব্যক্তি, পদার্থের হওয়া বা না হওয়ায় তাঁর ওপর কোনো প্রভাব পড়ে না। যিনি পরমাত্মাতে অটলভাবে অবস্থিত, তাঁর ওপর এইসব পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির প্রভাব পড়বে কীভাবে ?

'সমঃ সর্বেষু ভূতেষু'—সাধকের মধ্যে যতক্ষণ একটুও হর্ষ-শোক, রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি দ্বন্দ্ব থাকে, ততক্ষণ ব্যাপ্তিস্বরূপ পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্নতা অনুভব করা সম্ভব নয়। অভিন্নতা অনুভূত না হলে তিনি সর্বভূতে সমদর্শী হন না। কিন্তু যখন সাধক হর্ষ-শোকাদি দ্বন্দ্বরহিত হন, তখন পরমাত্মার সঙ্গে স্বতঃই স্বাভাবিকভাবে অভিন্নতা (যা সর্বদাই আছে) অনুভূত হয়। পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্নতা হলে নিজের আর কোনো ব্যক্তিত্ব[১] (অহংবোধ) থাকে না অর্থাৎ 'আমি আছি' এইরূপে নিজের কোনো পৃথক্ অস্তিত্ব না থাকায় তিনি সমস্ত প্রাণীতে সমদর্শী হন। যেমন, পরমাত্মা সকল প্রাণীতে

[১]ব্যক্তিত্ব তাকে বলা হয়, যাতে মানুষ নিজের সত্তাকে ভিন্ন মনে করে এবং যার দ্বারা বন্ধন হয়।

সম—'**সমোঽহং সর্বভূতেষু**' (গীতা ৯।২৯), তেমনই সাধকও সমস্ত প্রাণীতে সম হয়ে থাকেন।

তিনি কীভাবে সমস্ত প্রাণীতে সম হন ? যেমন—মনোরাজ্য ও স্বপ্নে যে নানাপ্রকার সৃষ্টি হয়, তাতে মনই নানা রূপ ধারণ করে অর্থাৎ সেই সৃষ্টি মনোময়ী হয়। মনোময়ী হওয়ায় যেমন সব সৃষ্টিতে মন থাকে, একই মনে সব সৃষ্টি হয়, তেমনই সকল প্রাণীতে (আত্মরূপে) তিনি স্থিত এবং তাঁতে সকল প্রাণী অবস্থিত (গীতা ৬।২৯)। এখানে '**সমঃ সর্বেষু ভূতেষু**' পদে সেই কথাই বলা হয়েছে।

'**মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্**'—সমরূপ পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্নতা অনুভূত হলে যখন সাধকের সমভাব হয়, তখন তাঁর পরমাত্মাতে প্রতিমুহূর্তে বর্ধমান এক বিশেষ আকর্ষণ ও অনুরাগ জন্মায়। এখানে তাকেই পরাভক্তি বলা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ের চব্বিশতম শ্লোকে যেমন ব্রহ্মভূত অবস্থার পর ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে—'**স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি**', তেমনই এখানে ব্রহ্মভূত অবস্থার পর পরাভক্তির প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে।

পরিশিষ্ট-ভাব—জ্ঞানযোগের যে সাধকের মধ্যে ভক্তির সংস্কার থাকে, যিনি নিজের মত আঁকড়ে থাকেন না, মুক্তি অর্থাৎ সংসার থেকে সম্বন্ধ বিচ্ছেদকেই সর্বসার বলে মনে করেন না এবং ভক্তির খণ্ডন এবং নিন্দা করেন না, তিনি মুক্তিতেও সন্তোষ লাভ করেন না। সুতরাং তিনি মুক্তি প্রাপ্ত হয়ে ভক্তি (প্রেম) লাভ করেন।

তাঁরা নিজ দৃষ্টিতে অর্থাৎ নিজের ধারণায় ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়েছেন, ব্রহ্ম হননি, তাঁদের উদ্দেশ্যেই এখানে '**ব্রহ্মভূতঃ**' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হলে জীবের ব্রহ্মের সঙ্গে তাত্ত্বিক সম্বন্ধ (সাধর্ম্য) হয়—'**মম সাধর্ম্যমাগতাঃ**' (গীতা ১৪।২)। তাত্ত্বিক সম্বন্ধ হওয়াই মুক্তি। তারপরে সর্বত্র পরিপূর্ণ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু পরমাত্মাতে নিজেকে সমর্পিত করায় পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্ন সম্পর্ক স্থাপিত হয়—'**জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্**' (গীতা ৭।১৮)। অভিন্ন সম্পর্ক (আত্মীয়) হওয়াকেই পরাভক্তি (প্রেম) প্রাপ্তি বলা হয়।

জ্ঞানমার্গের প্রধান উদ্দেশ্য হল জড়ত্ব ত্যাগ। বিচার বিবেচনার সাহায্যে জড়ত্ব পরিত্যাগ করলে শেষ পর্যন্ত ত্যাজ্যবস্তুর সংস্কার থেকে যায়, যার ফলে দার্শনিক মতভেদের উৎপত্তি হয়। কিন্তু প্রেম প্রাপ্তি হলে আর ত্যাজ্য বস্তুর সংস্কার থাকে না ; কারণ ভক্ত কোনো কিছু ত্যাগ করেন না, তিনি সবকিছুই ভগবানের স্বরূপ বলে মনে করে থাকেন—'**সদসচ্চাহম্**' (গীতা ৯।১৯)। প্রেম প্রাপ্তি বিচার বিবেচনার দ্বারা সম্ভব নয়, তা বিশ্বাসের দ্বারাই সম্ভব। বিশ্বাসে শুধু ভগবদ্কৃপার ওপরই নির্ভরতা থাকে। তাই যাঁর মধ্যে ভক্তির সংস্কার থাকে, তাঁকে ভগবদ্কৃপা মুক্তিতে সন্তুষ্টিলাভ করতে দেয় না, তাঁর মুক্তির রস (অখণ্ডরস) গৌণ করে প্রেমরস (অনন্তরস) প্রদান করে।

সংসারের সম্পর্ক থেকেই অশান্তি হয়, তাই কর্মযোগে সংসার থেকে সম্পর্কচ্যুত হলে 'শান্ত-আনন্দ' লাভ হয়। জ্ঞানযোগে আপন স্বরূপে স্থিতিলাভ হলে 'অখণ্ড-আনন্দ' লাভ হয়। ভক্তিযোগে ভগবানের সঙ্গে অভিন্নসম্পর্ক হলে পরম আনন্দ অর্থাৎ 'অনন্ত আনন্দ' (প্রতিক্ষণ বর্ধমান প্রেম) লাভ হয়।

*** *** ***

সম্বন্ধ—পরবর্তী শ্লোকে পরাভক্তির ফলের কথা জানাচ্ছেন।

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥ ৫৫ ॥

[**ভক্ত্যা** (পরাভক্তির দ্বারা) ; **মাম্** (আমাকে) ; **যাবান্, চ** (আমি কে এবং) ; **যঃ, অস্মি** (আমার স্বরূপ কী) ; **তত্ত্বতঃ, অভিজানাতি** (স্বরূপতঃ জানতে পেরে) ; **ততঃ, মাম্, তত্ত্বতঃ** (পরে আমাকে তত্ত্বত) ; **জ্ঞাত্বা** (জেনে) ; **তদনন্তরম্** (তারপর তাঁরা) ; **বিশতে** (আমাতে প্রবিষ্ট হন।)]

এই পরাভক্তির দ্বারা তাঁরা আমাকে স্বরূপতঃ জানতে পারেন যে আমি কে এবং আমার স্বরূপ কী ?

আমাকে তত্ত্বতঃ জেনে তাঁরা আমাতে প্রবেশ করেন ॥ ৫৫ ॥

ব্যাখ্যা—**'ভক্ত্যা মামভিজানাতি'**—পরমাত্মতত্ত্বে যখন আকর্ষণ ও অনুরাগ জন্মায়, সাধক তখন স্বয়ং সেই পরমাত্মাতে সর্বতোভাবে সমর্পিত হন, সেই তত্ত্বে অভিন্ন হয়ে যান। তখন তাঁর আর পৃথক্ কোনো অস্তিত্ব থাকে না অর্থাৎ তাঁর অহংভাবের অতিসূক্ষ্ম অংশও আর থাকে না। তাই তিনি প্রেমস্বরূপ প্রেমভক্তি প্রাপ্ত হন। সেই ভক্তির সাহায্যে পরমাত্মতত্ত্বের বাস্তবিক বোধ হয়ে থাকে।

ব্রহ্মভূত অবস্থা প্রাপ্ত হলে জাগতিক সম্বন্ধ সর্বতোরূপে পরিত্যক্ত হয়, কিন্তু 'আমি ব্রহ্ম, আমি শান্ত, নির্বিকার' এরূপ সূক্ষ্ম অহংভাব থেকে যায়। যতক্ষণ এই অহংভাব থাকে, ততক্ষণ পরিচ্ছিন্নতা ও পরাধীনতা থাকে। কারণ অহং বা স্বাতন্ত্র্য ভাব প্রকৃতির কার্য এবং প্রকৃতি 'পর' ; তাই পরাধীনতা থাকে। পরমাত্মাতে আকৃষ্ট হলে, পরাভক্তির উদয় হলে অহংভাব দূর হয়[১]। অহংভাব সর্বতোভাবে দূর হলে প্রকৃত তত্ত্ববোধ হয়।

'যাবান্'—সপ্তম অধ্যায়ের প্রারম্ভে ভগবান অর্জুনকে তাঁর 'সমগ্র'-রূপ সম্পর্কে শোনার নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন যে, যার মন আমাতে আসক্ত, যে আমারই আশ্রিত, সে অনন্যভাবে আমার সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সম্পর্কিত হয়ে কীভাবে আমার সমগ্ররূপ জানতে পারে, তা আমার কাছে শোনো। সপ্তম অধ্যায়ের শেষেও ভগবান এই কথাই বলেছেন যে, জরা মরণ থেকে মুক্তি লাভের জন্য যাঁরা আমার আশ্রয় গ্রহণ করে সচেষ্ট হয়, তাঁরা ব্রহ্ম, সম্পূর্ণ অধ্যাত্মতত্ত্ব এবং সমস্ত কর্ম অর্থাৎ সমস্ত নির্গুণ বিষয় জ্ঞাত হন এবং অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞ-সহ আমাকে অর্থাৎ সকল সগুণ বিষয়কে জানতে পারেন।

নির্গুণ ও সগুণ ব্যতিরেকে রাম, কৃষ্ণ, শিব, গণেশ, শক্তি, সূর্য ইত্যাদি নানারূপে প্রকটিত হয়ে পরমাত্মা যে লীলা করে থাকেন, সেগুলিও তিনি জানেন—এটিই হল পরাভক্তির দ্বারা **'যাবান্'** অর্থাৎ সমগ্ররূপকে জানা।

'যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ'—এই পরমাত্মাই নানা রূপে, নানা আকৃতিতে অনেক শক্তি-সহ, বিভিন্ন কার্য সম্পন্ন করার জন্য বারংবার প্রকটিত হয়ে থাকেন এবং তিনিই নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের নিজ নিজ চিন্তা অনুযায়ী নানা ইষ্টদেবের রূপে বর্ণিত হন। প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মা একই। এই হল—আমি যা সেটি তত্ত্বতঃ জানা।

'ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্'—আমাকে এইভাবে স্বরূপতঃ জেনে তৎকালেই[২] তিনি আমাতে প্রবেশ করেন অর্থাৎ আমার সঙ্গে তাঁর যে ভিন্ন ভাব তা সর্বতোভাবে দূর হয়।

তত্ত্বতঃ জানলে তাঁর মধ্যে যে অপূর্ণতা থাকে, তা দূর হয়ে তিনি সেই তত্ত্বে প্রবিষ্ট হন। একেই বলা হয় পূর্ণতা এবং মনুষ্যজন্মের সার্থকতাও এখানে।

বিশেষ কথা

জীবের স্বতঃই পরমাত্মার প্রতি প্রেম (রতি, প্রীতি বা আকর্ষণ) থাকে। কিন্তু জীব যখন প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, তখন সে পরমাত্মাতে বিমুখ হয়ে পড়ে এবং সংসারের প্রতি তার আকর্ষণ আসে। এই আকর্ষণকেই বাসনা, স্পৃহা, কামনা, আশা, তৃষ্ণা ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়।

এই বাসনাদির যা বিষয় (প্রকৃতিজাত পদার্থ), তা ক্ষণভঙ্গুর এবং পরিবর্তনশীল আর জীবাত্মা স্বয়ং নিত্য এবং অপরিবর্তনশীল। এতদ্ সত্ত্বেও প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হওয়ায় সে এই পরিবর্তনশীলের প্রতিই আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। এতে তার লাভ কিছুই হয় না, কিন্তু 'কিছু পাওয়া যাবে'—এই ভ্রমে, বাসনাবশতঃ জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হয়ে সে মহাদুঃখ ভোগ করতে থাকে। এর থেকে মুক্তি পাবার জন্য ভগবান যোগের কথা বলেছেন। এই যোগ জড়ত্বের থেকে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করে পরমাত্মার সঙ্গে নিত্যযোগ অনুভব করায়।

গীতায় প্রধানতঃ তিনটি যোগের কথা বলা হয়েছে—কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ। এই তিনটি নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় যে ভগবদ্প্রেম তিন যোগেই বিদ্যমান। কর্মযোগে একে 'কর্তব্যরতি' বলা হয় অর্থাৎ তাঁর কর্তব্যে রতি হয়—**'স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ'**

---

[১]প্রেম ভগতি জল বিনু রঘুরাঈ। অভিঅন্তর মল কবহুঁ ন জাঈ॥ (শ্রীরামচরিতমানস ৭।৪৯।৩)

[২]জানতে এবং প্রাপ্ত করাতে কোনো কালভেদ হয় না।

(১৮।৪৫)। [কর্মযোগের এই রতি শেষে আত্মরতিতে পরিণত হয় (গীতা ২।৫৫ ; ৩।১৭) এবং যে কর্মযোগীর ভক্তির সংস্কার থাকে, তাঁর এই রতি ভগবদ্‌রতিতে পরিণত হয়।] জ্ঞানযোগে সেই প্রেমকেই 'আত্মরতি' বলা হয় অর্থাৎ এই রতি স্বরূপে হয়ে থাকে—**'যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামঃ'** (৪।২৪)। ভক্তিযোগে এই প্রেমকেই বলা হয় 'ভগবদ্‌রতি' অর্থাৎ তাঁর রতি ভগবানে হয়[1]—**'তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ'** (১০।৯)। এইরূপ তিনযোগে রতি হলেও গীতায় 'ভগবদ্‌রতি'র বিশেষ মহিমা গীত হয়েছে।

তপস্বী, জ্ঞানী ও কর্মী—এই তিনের থেকে যোগী (সমদর্শী) শ্রেষ্ঠ (গীতা ৬।৪৬)। তাৎপর্য হল যে জড়ত্বের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে অত্যন্ত কঠিন তপস্যা করলে, বহুপ্রকার শাস্ত্রের (অনেক রকমের) জ্ঞান আহরণ করলে এবং যজ্ঞ, দান, তীর্থ প্রভৃতি বড় বড় অনুষ্ঠান করলে যা কিছু পাওয়া যায়, তা সবই অনিত্য, কিন্তু যোগী নিত্য-তত্ত্ব প্রাপ্ত করেন। সুতরাং তপস্বী, জ্ঞানী ও কর্মী—এই তিনের থেকেও যোগী শ্রেষ্ঠ। এরূপ কর্মযোগী, জ্ঞানযোগী, হঠযোগী, লয়যোগী ইত্যাদি সব যোগীদের মধ্যে ভগবান 'ভক্তিযোগী'কেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলেছেন (গীতা ৬।৪৭)। এই ভক্তিযোগীই ভগবানের সমগ্ররূপ জানতে পারেন। সাংখ্যযোগীও পরাভক্তির সাহায্যে সেই সমগ্ররূপ জেনে থাকেন। সেই সমগ্ররূপের বর্ণনা এখানে **'যাবান্‌'** পদে করা হয়েছে[2]।

এই প্রকরণের প্রারম্ভে 'চিত্তের শুদ্ধিরূপ সিদ্ধিপ্রাপ্ত সাধক যেভাবে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন'—তা জানাবার কথা বলেছেন এবং জানিয়েছেন যে ধ্যানযোগপরায়ণ হলে সাধক বৈরাগ্যপ্রাপ্ত হন। বৈরাগ্যের দ্বারা অহংকারাদি ত্যাগ করে মমত্বরহিত হয়ে যখন স্থিরচিত্ত হন, তখন তিনি ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপযুক্ত হন। উপযুক্ত হলেই তাঁর ব্রহ্মভূত অবস্থা প্রাপ্তি হয়। এই অবস্থায় জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকলে যে রাগ-দ্বেষ, হর্ষ-শোকাদি দ্বন্দ্ব উৎপন্ন হয়, তা চিরতরে দূর হয় এবং তিনি সকল প্রাণীতে সমভাবাপন্ন হন। সমভাবাপন্ন হলে পরাভক্তি প্রাপ্তি হয়। এই পরাভক্তিই হল প্রকৃত প্রীতি। সেই প্রীতির দ্বারাই পরমাত্মার সমগ্ররূপের বোধ হয় আর বোধ হলেই সেই তত্ত্বে প্রবেশ লাভ হয়—**'বিশতে তদনন্তরম্‌'**।

অনন্য ভক্তির দ্বারা মানুষ ভগবানকে তত্ত্বতঃ জানতে পারে, তাঁতে প্রবিষ্ট হতে পারে, তাঁর দর্শন লাভ করতেও সক্ষম হয় (গীতা ১১।৫৪)। কিন্তু সাংখ্যযোগী ভগবানকে তত্ত্বতঃ জেনে তাঁতে প্রবিষ্ট হলেও ভগবান তাঁকে দর্শন দিতে বাধ্য থাকেন না। কারণ তাঁর সাধনা শুরু থেকেই বিচার-প্রধান হয়, যার জন্য তাঁর ভগবদ্দর্শনের আকাঙ্ক্ষা

---

[1]ভগবানকে নিজের বলে ভাবলে রতি বা প্রিয়তা প্রকটিত হয়। পরমাত্মার সঙ্গে জীবের অনাদিকাল থেকে স্বতঃসিদ্ধ সম্পর্ক। নিজের জিনিস স্বতঃই প্রিয় হয়। তাই আপনভাব প্রকট হলেই ভগবানকে প্রিয় লাগে। এই প্রিয়ভাবে অনন্ত আনন্দ ও অলৌকিক বিশেষত্ব থাকে। এই আনন্দ প্রাপ্তি হলে মানুষের মধ্যে স্বতঃই নির্বিকার ভাব আসে। তখন কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মাৎসর্য কোনো বিকারই থাকে না। পারমার্থিক আনন্দ না পেলেই এইসব বিকার উৎপন্ন হয় অর্থাৎ আনন্দ না পেলে নাশবান বস্তু থেকে সুখ পাবার ইচ্ছা হয়, যার থেকে সমস্ত বিকার উৎপন্ন হয়।

উৎপত্তি-বিনাশশীল বস্তুগুলির সঙ্গে একাত্ম হলেই জীব ভগবানে বিমুখ হয়। বিমুখ হলেও ভগবানের ভালোবাসা কখনো দূর হয় না। অত্যন্ত নাস্তিক ব্যক্তিও কোনো বিপদে পড়লে ডেকে ওঠে, 'ঈশ্বর যদি থাকেন, তাহলে আমাকে রক্ষা করুন।'

[2]গীতায় 'যাবান্‌'-কেই 'বাসুদেবঃ সর্বম্‌' (৭।১৯) বলা হয়েছে। সেই তত্ত্বকেই সৎ-অসৎ, পরা-অপরা, পুরুষ-প্রকৃতি, ক্ষেত্রজ্ঞ-ক্ষেত্র ইত্যাদি দুটি রূপে বলা হয়েছে এবং এই তত্ত্বকেই সৎ-অসতের অতীতও বলা হয়েছে—'ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎপরং যৎ' (১১।৩৭)। গীতায় এই তত্ত্বকে তিন রূপেও বলা হয়েছে—অপরা, পরা এবং অহম্‌ (৭।৫-৬), ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ এবং মাম্‌ (১৩।১-২) এবং ক্ষর, অক্ষর এবং পুরুষোত্তম (১৫।১৬-১৭)। এই তিনের (অষ্টম অধ্যায়ের প্রারম্ভে অর্জুনের জিজ্ঞাসার উত্তরে) ভগবান ছটি পার্থক্য জানিয়েছেন, 'অপরা'—ক্রিয়া ও পদার্থ, 'পরা'—সাধারণ জীব ও কারক পুরুষ এবং অহম্‌—নির্গুণ ও সগুণ।

এই ছটি বিভাগ দৃষ্টান্তরূপে এইভাবে বুঝতে হবে—জলতত্ত্ব এক হলেও তার ছটি ভাগ আছে ; এতে পরমাণুরূপে জল নির্গুণ ব্রহ্ম, বাষ্পরূপে জল সগুণ পরমাত্মা, মেঘ রূপে জল কারক-পুরুষ (ব্রহ্মা), বৃষ্টিরূপে জল সাধারণ জীব, বর্ষারূপে জল জগৎ-সৃষ্টিরূপ ক্রিয়া এবং বরফরূপে জল (পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ইত্যাদি) পদার্থ।

থাকে না। দর্শন না হলেও তাঁর মধ্যে কোনো ন্যূনতা থাকে না ; তাই সাংখ্যযোগীকে কোনো অংশে কম বলে মনে করা উচিত নয়।

সেই তত্ত্বে প্রবিষ্ট হওয়াকে এখানে অনির্বচনীয় প্রেম প্রাপ্তি বলা হয়েছে। নারদ ভক্তিসূত্রে বলা হয়েছে এই প্রেম প্রতিক্ষণ বৃদ্ধি পায়[১]। এই প্রেমে সর্বতোভাবে পূর্ণতা প্রাপ্তি হয় অর্থাৎ তাঁর আর কিছু করা, জানা বা পাওয়া বাকি থাকে না। তাই তাঁর কিছু করার আকাঙ্ক্ষা থাকে না, কিছু জানার জন্য জিজ্ঞাসা থাকে না, বেঁচে থাকার আশা থাকে না, মৃত্যুভয় থাকে না এবং কোনো কিছু পাবার লোভও থাকে না।

যতক্ষণ ভগবানে পরাভক্তি অর্থাৎ পরম প্রেম না হয়, ততক্ষণ ব্রহ্মভূত অবস্থাতেও 'আমি ব্রহ্ম' এই সূক্ষ্ম অহংকারবোধ থাকে । অহংকারের লেশমাত্র যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ পরিচ্ছিন্নতা দূর হয় না। কিন্তু তাঁর মধ্যে প্রকৃতিজনিত গুণাদির আসক্তি না থাকায় 'আমি ব্রহ্ম' এই সূক্ষ্ম অহংভাব তাঁর জন্ম-মৃত্যুর কারণ হয় না। কারণ গুণাদির আসক্তিতেই বন্ধন হয়ে থাকে—'**কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু**' (গীতা ১৩।২১)। উদাহরণ—গভীর নিদ্রা হতে উত্থিত হয়ে মানুষমাত্রেই সর্বপ্রথম অনুভব করেন 'আমি আছি'। এটি অনুভব হলে নাম, রূপ, দেশ, কাল, জাতি ইত্যাদির সঙ্গে স্বয়ং-এর সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তখন 'আমি আছি' এই অহং-অভিমান শুভ-অশুভ কর্মের কারণ হয়ে ওঠে, যার ফলে জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হতে হয়। কিন্তু যাঁরা উচ্চকোটির সাধক অর্থাৎ যাঁদের নিরন্তর ব্রহ্মভূত-অবস্থা থাকে, তাঁদের সাত্ত্বিক জ্ঞানে (১৮।২০) সর্বত্র নিজস্বরূপ বোধ হয়ে থাকে। কিন্তু যতক্ষণ সাধকের সত্ত্বগুণের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে, ততক্ষণ নিদ্রাভঙ্গ হলে তখনই 'আমি ব্রহ্ম' অথবা 'সবকিছুই এক পরমাত্মা'—এরূপ চিন্তা হয় এবং মনে হয় যে নিদ্রাকালে এই চিন্তা ছিল না, যেন তাঁর ভ্রম হয়েছিল এবং এখন তাঁর সেই তত্ত্বের জাগৃতি হয়েছে, স্মৃতি ফিরে এসেছে। গুণাতীত হলে অর্থাৎ গুণ হতে সর্বতোভাবে সম্পর্ক ছেদ হলে স্মৃতি বা বিস্মৃতি— কোনো অবস্থাই হয় না অর্থাৎ নিদ্রাকালে বিস্মরণ হয়েছিল, এখন স্মৃতি ফিরে এসেছে—এরূপ অনুভব হয় না, কারণ নিদ্রা শুধু অন্তঃকরণের হয়েছিল, নিজের মধ্যে হয়নি, নিজের স্বরূপ তো একইভাবে বিরাজমান—এরূপ অনুভব হয়ে থাকে। এই অবস্থাকে চতুর্দশ অধ্যায়ের বাইশতম শ্লোকে বলা হয়েছে যে প্রকাশ অর্থাৎ নিদ্রা থেকে ওঠা এবং মোহ অর্থাৎ নিদ্রা যাওয়া—এই দুইয়ে গুণাতীত ব্যক্তির কোনোপ্রকার রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ হয় না।

পরিশিষ্ট-ভাব—'আমি যেমন এবং যতটুকু'—**যাবান্ যশ্চাস্মি**—এটি সগুণেরই কথা। কারণ '**যাবান্-তাবান্**' নির্গুণে থাকতেই পারে না, এ শুধু সগুণেই সম্ভব। চতুঃশ্লোকী ভাগবতেও ভগবান '**যাবান্**' পদটির প্রয়োগ করে ব্রহ্মাকে বলেছেন—

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্মকঃ। তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তুতে মদনুগ্রহাৎ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ২।৯।৩১)

'আমি যেমন, যে ভাবসম্পন্ন, যে রূপ, গুণ এবং কর্মসম্পন্ন, সেই আমার (সমগ্র রূপের) তত্ত্বের যথার্থ অনুভব আমার কৃপায় তোমার যেন প্রকৃতভাবে হয়ে যায়।'

'**যাবান্ যশ্চাস্মি**' কথাটির বর্ণনা ভগবান সপ্তম অধ্যায়ের ত্রিশতম শ্লোকে '**সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞং চ যে বিদুঃ**' পদটির দ্বারা করেছেন। এর দ্বারা সগুণের বৈশিষ্ট্য এবং প্রাধান্য প্রমাণিত হয়।

জ্ঞানমার্গ অনুসরণকারীগণ যখন (জ্ঞানোত্তরকালে) ভক্তি প্রাপ্ত হন তখন তাঁদের তত্ত্বতঃ জানা (জ্ঞাত্বা) এবং প্রবিষ্ট হওয়া (বিশতে)—দুটিই হয়, দর্শন হয় না। তাঁদের কোনো ন্যূনতা থাকে না, তাঁদের দর্শনের আকাঙ্ক্ষাও থাকে না। কিন্তু প্রথম থেকেই যাঁরা ভক্তিমার্গ অনুসরণ করেন, তাঁদের তত্ত্বতঃ জানা (জ্ঞাতুম্) এবং প্রবিষ্ট হওয়া (প্রবেষ্টুম্) ব্যতীত ভগবদ্দর্শন (দ্রষ্টুম্)ও হয়ে থাকে (গীতা ১১।৫৪)। তাই জ্ঞানমার্গী সাধকদের মধ্যে ভগবদ্প্রেমের (ভক্তির) উল্লেখ

---

[১]গুণরহিতং কামনারহিতং প্রতিক্ষণবর্ধমানমবিচ্ছিন্নং সূক্ষ্মতরমনুভবরূপম্॥ (নারদভক্তিসূত্র ৫৪)

এই প্রেম গুণরহিত, কামনারহিত, প্রতিক্ষণ বর্ধমান ; বিচ্ছেদরহিত, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এবং অনুভবরূপ।

থাকলেও, দর্শনের কথা পাওয়া যায় না।

ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে আসা ব্যক্তিরা যেমন দরজায় প্রবেশ করে একত্র মিলিত হয়, তেমনই ভিন্ন ভিন্ন যোগপথে চলা সাধকগণ ভগবানে প্রবিষ্ট হয়ে (বিশতে) এক হয়ে যান অর্থাৎ অহং-এর সূক্ষ্ম রেশও না থাকায় তাঁদের মধ্যে আর কোনো মতপার্থক্য থাকে না।

প্রেমের অবস্থা দুপ্রকারের হয়—(১) কখনো ভক্ত প্রেমে ডুবে যান, তখন প্রেমিক এবং প্রেমাস্পদ আর দুজন থাকেন না, এক হয়ে যান (২) কখনো ভক্তের মধ্যে প্রেমের উচ্ছলতা আসে, তখন প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ এক হয়েও লীলার জন্য দুই রূপ ধারণ করেন। এখানে প্রথম অবস্থাটি জানাবার জন্য **'বিশতে'** পদটি ব্যবহার করা হয়েছে।

*** *** ***

সম্বন্ধ—প্রথম শ্লোকে অর্জুন সন্ন্যাস এবং ত্যাগের তত্ত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তার উত্তরে ভগবান চতুর্থ থেকে দ্বাদশ শ্লোক পর্যন্ত কর্মযোগ এবং একচল্লিশ থেকে আটচল্লিশতম শ্লোক পর্যন্ত কর্মযোগ ও সংক্ষেপে ভক্তিযোগের বর্ণনা করেছেন; ত্রয়োদশ থেকে চল্লিশ শ্লোক পর্যন্ত বিচার-প্রধান সাংখ্যযোগ এবং উনপঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন শ্লোক পর্যন্ত ধ্যান-প্রধান সাংখ্যযোগের এবং সংক্ষেপে পরাভক্তি প্রাপ্তির বর্ণনা করেছেন। ভগবান এবার শরণাগতির প্রাধান্যসম্পন্ন ভক্তিযোগের বর্ণনা শুরু করছেন।

সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥ ৫৬ ॥

[**মদ্ব্যাপাশ্রয়ঃ** (আমার আশ্রয়গ্রহণকারী ভক্ত) ; **সদা, সর্বকর্মাণি** (সর্বদা সর্বকর্ম) ; **কুর্বাণঃ, অপি** (করতে থাকলেও) ; **মৎপ্রসাদাৎ** (আমার কৃপায়) ; **শাশ্বতম্, অব্যয়ম্** (শাশ্বত অবিনাশী) ; **পদম্, আপ্নোতি** (পদ প্রাপ্ত হন।)]

আমার আশ্রয় গ্রহণকারী ভক্ত সর্বদা সর্বকর্ম করতে থাকলেও আমার কৃপায় শাশ্বত অবিনাশী পদ প্রাপ্ত হন॥ ৫৬ ॥

ব্যাখ্যা—**'মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ'**—কর্মের, কর্মফলের, কর্মগুলি সম্পূর্ণ হওয়া বা না হওয়ার, কোনো ঘটনা, পরিস্থিতি, বস্তু, ব্যক্তির যেন আশ্রয় না থাকে। কেবলমাত্র আমারই আশ্রয় যেন থাকে। এইভাবে যে ব্যক্তি সর্বদা মৎপরায়ণ হয়, নিজের বলে পৃথক্ কিছু জানে না, কোনো কিছুকে নিজের বলে মনে করে না, সর্বদা আমার আশ্রিত হয়ে থাকে, এরূপ ভক্তের উদ্ধারের জন্য কিছুই করতে হয় না। আমি তাকে উদ্ধার করি (গীতা ১২।৭) ; আমি তার অপূর্ণতা পূর্ণ করে দিই (গীতা ৯।২২)—এই আমার শাশ্বত বিধান, নিয়ম। সর্বতোভাবে আমার শরণাগত হলে সব প্রাণীর ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য (গীতা ৯।৩০-৩২)।

'সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণঃ'—এখানে **'কর্মাণি'** পদটির সঙ্গে **'সর্ব'** এবং **'কুর্বাণঃ'** পদের সঙ্গে **'সদা'** পদটি ব্যবহারের তাৎপর্য হল এই যে, যে ধ্যানপরায়ণ সাংখ্যযোগী শরীর, মন, বাক্যকে সংযত করেছেন অর্থাৎ যিনি শরীরাদির ক্রিয়াগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পেরেছেন এবং একান্তে থেকে সর্বদা ধ্যানযোগে ব্যাপৃত থাকেন ; তিনি যে পদ প্রাপ্তি করেন, সেই পদই, লৌকিক, পারলৌকিক, সামাজিক, শারীরিক সকল কর্তব্য সর্বদা পালন করেও আমার আশ্রয়গ্রহণকারী ভক্তগণ আমার কৃপাতে লাভ করে থাকেন।

প্রত্যেক ব্যক্তিই একথা জানে যে একান্তে থেকে সাধন-ভজন করলে কল্যাণ হয়। কিন্তু তারা বুঝতে পারে না যে, সর্বদা সংসার-চক্রে কর্মরত থাকলেও কল্যাণ লাভ হতে পারে! এতে যে কল্যাণ হবে, তার স্বপক্ষে কোনো যুক্তি তারা খুঁজে পায় না। কারণ সকলেই তো এইরূপ কর্ম করে থাকে। শুধু তাই নয়, জীবমাত্রেই কর্ম করে থাকে, কিন্তু তাদের সকলের কল্যাণ পরিলক্ষিত হয় না আর শাস্ত্রেও সে কথা চোখে পড়ে না। এর উত্তরে ভগবান বলেছেন **'মৎপ্রসাদাৎ'**। অর্থাৎ যারা শুধু আমারই আশ্রয় গ্রহণ করেছে, আমার কৃপায় তাদের কল্যাণ হবেই, এতে বাধা দেবে কে ?

যদিও প্রাণীমাত্রেরই ওপর ভগবানের একাত্মতা ও কৃপা সদা-সর্বদা থাকে, তা সত্ত্বেও মানুষ যতক্ষণ এই বিনাশশীল জগতের আশ্রয় গ্রহণ করে ভগবানে বিমুখ হয়ে থাকে, ততক্ষণ ভগবদ্‌কৃপা তাঁর প্রতি ফলপ্রসূ হয় না অর্থাৎ তাঁর কাজে আসে না। কিন্তু মানুষ যখন ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করে অন্যান্য আশ্রয় ত্যাগ করতে থাকে, তখনই তাঁর ভগবানের আশ্রয় দৃঢ় হতে থাকে আর যতই ভগবদাশ্রয় দৃঢ় হতে থাকে, ততই ভগবদ্‌কৃপা অনুভূত হতে থাকে ! পূর্ণভাবে ভগবদাশ্রয় গ্রহণ করলে, ভগবদ্-কৃপা পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়।

'অবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্'—স্বতঃসিদ্ধ পরম-পদের প্রাপ্তি নিজের কর্মের দ্বারা, পুরুষার্থ দ্বারা বা সাধনার দ্বারা লাভ করা যায় না। শুধুমাত্র ভগবদ্‌কৃপাতেই তা সম্ভব। শাশ্বত অব্যয় পদ হল সর্বোৎকৃষ্ট। সেই পরমপদকে ভক্তিমার্গে পরমধাম, সত্যলোক, বৈকুণ্ঠলোক, গোলোক, সাকেতলোক ইত্যাদি বলা হয় এবং জ্ঞানমার্গে বিদেহ-কৈবল্য, মুক্তি, স্বরূপস্থিতি ইত্যাদি বলা হয়। এটি তত্ত্বতঃ এক হলেও পথ এবং উপাসনা ভেদে উপাসকদের দৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে বলা হয় (গীতা ৮।২১ ; ১৪।২৭)। ভগবানের চিন্ময়লোক বিশেষ কোনো স্থানে হয়েও সর্বত্র ব্যাপকরূপেও পরিপূর্ণ। ভগবান যেস্থানে বিরাজ করেন, তাঁর লোকও সেইখানে বিরাজমান। কারণ ভগবান এবং তাঁর লোক তত্ত্বতঃ একই। ভগবান সর্বত্র বিরাজমান, সুতরাং তাঁর লোকও সর্বত্র স্থিত (ব্যাপ্তিস্বরূপ)। ভক্তের অনন্য নিষ্ঠা যখন সিদ্ধ হয় তখন পরিচ্ছিন্নতা বোধের অভাব হয় এবং ওই লোক তাঁর সম্মুখে প্রকটিত হয় এবং তাঁর ইহলোকেই সেই চিন্ময় লোকের দিব্য লীলাগুলি অনুভূত হতে থাকে। কিন্তু কোনো ভক্তের যদি ধারণা থাকে যে ওই দিব্যলোক কোনো এক বিশেষ স্থানেই আছে তবে দেহত্যাগ করার পরই সে সেই লোক লাভ করবে। তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভগবানের পার্ষদ আসেন, আবার কখনো কখনো স্বয়ং ভগবানও আসেন।

পরিশিষ্ট-ভাব—জ্ঞানযোগীদের জন্য ভগবান বলেছেন যে, তাঁরা সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করে সংযম সহকারে নিত্য ধ্যানপরায়ণ যদি হন, তাহলে তাঁরা অহংভাব, মমত্ববোধ, কাম, ক্রোধ ইত্যাদি পরিত্যাগ করে ব্রহ্মলাভের উপযুক্ত হন (গীতা ১৮।৫১, ৫২, ৫৩)। কিন্তু ভক্তদের জন্য বলা হয়েছে যে তাঁরা নিজ বর্ণ-আশ্রম অনুসারে সর্বদা সমস্ত বিহিত কর্মের পালন করেও ভগবানের কৃপায় পরমপদ প্রাপ্ত হন, কেন-না তাঁরা ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করেন—**'মদ্ব্যাপাশ্রয়ঃ'**। তাৎপর্য হল যে, ভগবৎ-শ্রীচরণের আশ্রয় গ্রহণ করলে অতি সহজেই কল্যাণ লাভ হয়। ভক্তদের নিজেদের কল্যাণ নিজেদের করতে হয় না, নিজ শক্তি, বিদ্যা ইত্যাদির ওপর কোনোরূপ নির্ভর না করে শুধুমাত্র বিশ্বাস সহকারে ভগবদাশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। তখন ভগবদ্‌কৃপাতেই তাদের কল্যাণ লাভ হয়—**'মদ্প্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্।'** ভগবানও শুধু ভক্তের আশ্রয়ের দিকেই দৃষ্টি দেন[১], দোষের দিকে নয়। রামায়ণে আছে—

রহতি ন প্রভু চিত চূক কিএ কী। করত সুরতি সয় বার হিএ কী॥ (শ্রীরামচরিতমানস, বালকাণ্ড ১৯।৩)
জন অবগুন প্রভু মান ন কাউ। দীন বন্ধু অতি মৃদুল সুভাউ॥ (শ্রীরামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ১।৩)
'মদ্ব্যাপাশ্রয়ঃ' কথাটির অর্থ হল আমার বিশেষ আশ্রয়, যাতে অন্য কারো বিন্দুমাত্র আশ্রয় না থাকে।
এক বানি করুণানিধান কী। সো প্রিয় জাকে গতি ন আন কী॥ (শ্রীরামচরিতমানস, অরণ্যকাণ্ড ১০।৪)

*** *** ***

সম্বন্ধ—পূর্বশ্লোকে নিজের সাধারণ নিয়ম জানিয়ে এখন পরবর্তী শ্লোকে ভগবান অর্জুনের জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দিচ্ছেন।

চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব॥ ৫৭ ॥

[**চেতসা** (মনে মনে) ; **সর্বকর্মাণি** (সমস্ত কর্ম) ; **ময়ি, সন্ন্যস্য** (আমাকে অর্পণ করে) ; **মৎপরঃ** (মৎপরায়ণ হয়ে) ;

[১]যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। (গীতা ৪।১১)

বুদ্ধিযোগম্, উপাশ্রিত্য (সমবুদ্ধি অবলম্বন করে) ; সততম্ (নিরন্তর) ; মচ্চিত্তঃ (আমাতে নিবিষ্টচিত্ত) ; ভব (হও।)]

মনে মনে সমস্ত কর্ম আমাকে অর্পণ করে, মৎপরায়ণ হয়ে, সমবুদ্ধি অবলম্বন করে নিরন্তর আমাতে নিবিষ্টচিত্ত হও ॥ ৫৭ ॥

ব্যাখ্যা—[এই শ্লোকে ভগবান চারটি বিষয় বলেছেন—

(১) **'চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সংন্যস্য'**—সমস্ত কর্ম মনে মনে আমাকে সমর্পণ করো।

(২) **'মৎপরঃ'**—নিজেকে আমাতে সমর্পণ করো।

(৩) **'বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য'**—সমত্ব-বুদ্ধির আশ্রয় নিয়ে সংসার থেকে সম্পর্ক ছেদ করো।

(৪) **'মচ্চিত্তঃ সততং ভব'**—নিরন্তর আমাতেই চিত্ত রাখ অর্থাৎ আমার সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রাখো।]

'চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য'—মনে মনে কর্ম সমর্পণের অর্থ হল যে মানুষ দৃঢ়তার সঙ্গে মেনে নিক যে মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি, শরীর ইত্যাদি এবং জগতের ব্যক্তি, ঘটনা, পদার্থ, পরিস্থিতি সবই ভগবানের। ভগবানই এই সবের প্রভু। এর কোনোটিই কারোর ব্যক্তিগত নয়। শুধু সদ্-ব্যবহার করার জন্যই ভগবান এগুলির ব্যক্তিগত অধিকার প্রদান করেছেন। এই অধিকারও ভগবানে সমর্পণ করে দিতে হয়।

শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ইত্যাদির দ্বারা যে সমস্ত শাস্ত্রবিহিত, জাগতিক বা পারমার্থিক ক্রিয়া সংঘটিত হয়, তা সমস্তই ভগবানের ইচ্ছায় হয়। মানুষ শুধুমাত্র অহংবশতঃ সেগুলি নিজের বলে মনে করে। সেই ক্রিয়াগুলিতে যে একাত্মভাব থাকে, তাও ভগবানে সমর্পণ করে দিতে হয়। কারণ মূর্খতাবশতঃ সেগুলি নিজের বলে মনে করা হয়, প্রকৃতপক্ষে তা নিজের নয়। তাই সেগুলির থেকে একাত্মভাবনা সরিয়ে নিতে হয় এবং সেগুলি যে ভগবানেরই এরূপ দৃঢ়বিশ্বাস রাখতে হয়।

'মৎপরঃ'—ভগবানই আমার পরম আশ্রয়, তিনি ছাড়া আমার আর কিছুই নেই, কিছু করারও নেই, পাওয়ারও নেই, কিছু নেওয়ারও নেই অর্থাৎ দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদিতে আমার কোনো-ই প্রয়োজন নেই—এরূপ অনন্যভাব হওয়াকেই বলা হয় ভগবদ্‌পরায়ণ হওয়া।

একটি বিষয় বিশেষভাবে খেয়াল করার আছে। অর্থ-সম্পদ, আত্মীয়-স্বজন ইত্যাদিকে মানুষ নিজের বলে মনে করে এবং ভাবে যে আমিই এসবের প্রভু, এদের ওপর আমার আধিপত্য আছে। কিন্তু আসলে এই বোধ একেবারে মিথ্যা, সম্পূর্ণ ভ্রম। যে ব্যক্তি কোনো কিছুকে নিজের বলে মনে করে সে সেগুলির অধীন হয়ে যায় এবং সেই জিনিসটি তার প্রভু হয়ে ওঠে। তখন সে সেই জিনিস ব্যতিরেকে থাকতে পারে না। সুতরাং যে বস্তুকে মানুষ নিজের বলে মেনে নেয়, সেই বস্তু তার ওপর আধিপত্য বিস্তার করে এবং সেই ব্যক্তি গৌণ হয়ে যায় ; সেই বস্তু অর্থই হোক বা আত্মীয়-কুটুম্ব, শরীর, বিদ্যা-বুদ্ধি যাই হোক না কেন। এইসব বস্তু প্রাকৃত এবং নিজের থেকে ভিন্ন, পর। তাই এদের অধীন হওয়াকেই পরাধীন হওয়া বলে।

ভগবান হলেন স্বকীয়, আপন। তাঁকে মানুষ আপন বলে মনে করলে তিনি মানুষের বশীভূত হয়ে পড়েন। ভগবানের হৃদয়ে ভক্তের প্রতি যত স্নেহ আছে, জগতে তত স্নেহ করার আর কেউ নেই। ভগবান ভক্তের দাস হয়ে তাকে তাঁর মাথার মণি করে রাখেন—**'ম্যায় তো হূঁ ভগতন কা দাস, ভগত মেরে মুকুটমণি'**, কিন্তু জগৎ মানুষের দাস হয়ে তাকে নিজের মাথার মণি করবে না। সে মানুষকে তার দাস করে পদদলিত করবে। তাই শুধু ভগবানের শরণাগত হয়ে সর্বতোভাবে তাঁরই পরায়ণ হওয়া উচিত।

'বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য'—সমগ্র গীতায় সমত্ব-বুদ্ধির অত্যন্ত মহিমা গীত হয়েছে। মানুষের মধ্যে সমত্ব-বুদ্ধি হলে তিনি জ্ঞানী, ধ্যানী, যোগী, ভক্ত ইত্যাদি সবই হতে পারেন। কিন্তু যদি তাঁর মধ্যে সমত্ববোধ না থাকে তাহলে যত ভালো লক্ষণই তার হোক, ভগবান তাঁকে পূর্ণ বলে মনে করেন না। শুধুমাত্র বিনাশশীল পরিস্থিতির প্রতি একাত্মবোধ করায় সে সুখী বা দুঃখী হয়। তাই মানুষের এই বিনাশশীল পরিস্থিতির থেকে সতর্ক থাকতে হয়। সুখ এলে, অনুকূল পরিস্থিতি এলেও আমি আছি আর সুখ না থাকলে, অনুকূল পরিস্থিতি চলে গেলেও আমি আছি। সুতরাং সুখে-দুঃখে, অনুকূল-প্রতিকূলতায়, লাভ-ক্ষতিতে আমি সর্বদা একইভাবে বিদ্যমান। পরিস্থিতির পরিবর্তন হলেও আমি পরিবর্তিত হই না, সর্বদা একই থাকি। এইরূপ

নিজের মধ্যে নিজে স্থিত থাকতে হয়। নিজেতে নিজে স্থিত হলে সুখ-দুঃখে ইত্যাদিতে সমত্ববোধ আসে। এই সমত্ববোধই ভগবানের আরাধনা **'সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য'** (বিষ্ণুপুরাণ ১।১৭।৯০)। তাই এখানে বুদ্ধিযোগ বা সমত্ববোধের আশ্রয় গ্রহণ করার কথা বলেছেন।

'মচ্চিত্তঃ সততং ভব'—যিনি নিজেকে সর্বপ্রকারে ভগবানের পাদপদ্মে সমর্পণ করেন, তাঁর চিত্তও স্বতঃই ভগবানের শ্রীচরণে সমর্পিত হয়। তখন তাঁর ওপর ভগবানের যে স্বাভাবিক অধিকার তা প্রকটিত হয় এবং তাঁর চিত্তে ভগবান স্বয়ং বিরাজ করেন। একেই বলে **'মচ্চিত্তঃ'** হওয়া।

'মচ্চিত্তঃ' পদটির সঙ্গে **'সততম্'** পদটি ব্যবহারের অর্থ হল যে সর্বদা আমাতে (ভগবানে) চিত্ত নিবিষ্ট রাখো। তখনই ভগবদ্চিন্তন হয়, যখন 'আমি ভগবানেরই' এই অহংভাব ভগবানে আরোপিত হয়। অহংভাব ভগবানে সমর্পিত হলে চিত্ত সততই ভগবানে নিবিষ্ট হয়। যেমন, শিষ্য হলে 'আমি গুরুর' এইরূপ অহংবোধ গুরুতে সন্নিবিষ্ট হয় এবং সর্বদা গুরুর স্মরণ হয়ে থাকে। গুরুর সম্পর্ক অহংবোধে স্থান নেওয়ায় গুরুকে স্মরণ করলেও তিনি স্মরণে থাকেন আর স্মরণ না করলেও তিনি স্মরণে থাকেন। কারণ স্ব-স্বরূপ নিত্য বিরাজমান। এতেও একটি ব্যাপার দেখার আছে যে গুরুর সঙ্গে শিষ্য নিজেই সম্পর্ক স্থাপন করে ; কিন্তু ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক নিত্য এবং স্বতঃসিদ্ধ । জগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার ফলেই তার এই নিত্যসম্পর্কের বিস্মৃতি হয়েছে। সেই বিস্মৃতি দূর করার জন্যই ভগবান বলেছেন যে, সর্বদা মদ্গতচিত্ত হও।

সাধক সাংসারিক যে কোনো কাজই করুন না কেন, তাঁকে এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে যেন তাঁর চিত্ত সেইসব কাজ-কর্মে জড়িয়ে না পড়ে, চিত্ত সংসারের জালে যেন জড়িয়ে না যায়, বরং জাগতিক বস্তু পদার্থাদি সম্পর্কে নিজ চিত্তে কঠোরতা রাখা হয়। কিন্তু ভগবদ্নাম জপ, কীর্তন, ভগবদ্কথা, ভগবদ্চিন্তন ইত্যাদি ভগবদ্-সম্পর্কীয় কার্যে চিত্তকে ব্যাপৃত রাখতে হয়, তল্লীন করতে হয় এবং ভগবদ্রসে চিত্তকে জারিত করতে হয়[১]। এইরূপ করতে থাকলে সাধক অতি শীঘ্র ভগবদ্গত চিত্ত হয়ে ওঠেন।

প্রেম-সম্পর্কিত বিশেষ কথা

চিত্ত দ্বারা সকল কর্ম ভগবানে অর্পণ করলে সংসার হতে নিত্যবিয়োগ অনুভূত হয়[২] এবং ভগবদ্পরায়ণ হলে নিত্যযোগ (প্রেম) জাগরিত হয়। নিত্যযোগে যোগ, নিত্যযোগে বিয়োগ, বিয়োগে নিত্যযোগ এবং বিয়োগে বিয়োগ—এই চারটি অবস্থা চিত্তবৃত্তি থেকে হয়। চারটি অবস্থা এইভাবে বুঝতে হবে—যেমন, শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের পরস্পর মিলন—এটি হল 'নিত্যযোগে যোগ'। মিলন হলেও শ্রীরাধার এরূপ ভাব হয় যে প্রিয়তম কোথাও চলে গেছেন, তাই তিনি বলে ওঠেন, 'প্রিয়তম ! তুমি কোথায় ?'—এটি হল 'নিত্যযোগে বিয়োগ', শ্যামসুন্দর কাছে নেই, কিন্তু মনে মনে তাঁর জন্য গভীর চিন্তা হচ্ছে এবং তিনি মনে মনে প্রত্যক্ষভাবে মিলন দেখছেন, একে বলে 'বিয়োগে নিত্যযোগ'। শ্যামসুন্দর অল্পক্ষণের জন্য অন্তর্হিত হয়েছেন, কিন্তু মনে হচ্ছে, অনেকক্ষণ হয়ে গেছে শ্যামসুন্দরকে দেখতে পাইনি, কী করি ? কোথায় যাই ? শ্যামসুন্দরকে কোথায় পাই ?—একে বলে 'বিয়োগে বিয়োগ'।

প্রকৃতপক্ষে এই চারপ্রকার অবস্থাতে ভগবানের সঙ্গে নিত্যযোগ একইভাবে বজায় থাকে, বিচ্ছেদ কখনোই হয়ই না, হওয়া সম্ভব নয় এবং সে সম্ভাবনাও নেই। এই

---

[১]কাঠিন্যং বিষয়ে কুর্যাদ্ দ্রবত্বং ভগবৎপদে। উপায়ৈঃ শাস্ত্রনির্দিষ্টৈরণুক্ষণমতো বুধঃ॥ (ভক্তিরসায়ন ১।৩২)

[২]প্রকৃতপক্ষে জগতের সঙ্গে সংযোগ কখনোই হওয়া সম্ভব নয়। জগতের তো নিত্য বিয়োগই হয়ে থাকে। যেমন, মনে কোনো বস্তুর চিন্তা হলে, সেই বস্তুর সংযোগ মেনে নেওয়া হয়, যার ফলে সেই বস্তু না পেলে দুঃখ হয়। যখন বস্তুটি (বাহ্যতঃ) প্রাপ্তি ঘটে, তখন সেটির অন্তর থেকে বিয়োগ হয়, যাতে সুখ হয়। তেমনই কোনো কারণবশতঃ বাহ্যতঃ বস্তুটি যদি চলে যায় বা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে মনে সেই বস্তুটির সংযোগ হলে দুঃখ হয় এবং বিচার-বিবেচনার দ্বারা 'এই বস্তুটি আমার ছিল না, আমার হতেই পারে না' এইভাবে বস্তুটিকে মন থেকে দূর করলে তখন সুখ হয়। তাৎপর্য হল এই যে ভিতর থেকে সংযোগ মেনে নিলে বাহ্যতঃ বিচ্ছেদ আর বাহ্যতঃ সংযোগ মানলে ভিতর থেকে বিচ্ছেদ হয়। সুতরাং বাস্তবে জগতের সঙ্গে নিত্যবিচ্ছেদই থাকে। মানুষ শুধু ভ্রমবশতঃ জগৎ-সংসারের সঙ্গে সংযোগ (সম্বন্ধ) মেনে চলে।

নিত্যযোগকেই বলা হয় 'প্রেম'। কারণ প্রেমে প্রেমিক এবং প্রেমাস্পদ উভয়েই অভিন্ন ভাবে থাকেন। সেখানে ভিন্ন ভাব কখনো হতেই পারে না। প্রেমের আদান-প্রদানের জন্যই ভক্ত ও ভগবানের সংযোগ-বিয়োগের লীলা অনুষ্ঠিত হয়।

এই প্রেম কীভাবে প্রতিক্ষণ বর্ধমান ? যখন প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের পরস্পর মিলন হয়, তখন 'প্রিয়তম চলে গিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়েছিল, এখন আবার না তিনি চলে যান !'[১] এই বিচ্ছেদ ভাবের জন্য প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলনেও বিরহ থাকে, সন্তোষ লাভ হয় না। 'ইনি চলে যাবেন'—এই ভাবনায় মন বেশি রকম আকৃষ্ট থাকে। সেইজন্য প্রেমকে প্রতিক্ষণ বর্ধমান বলা হয়েছে।

প্রেমে (ভক্তিতে) চার প্রকারের রস বা রতি হয়—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মাধুর্য। এই রসগুলির মধ্যে দাস্য থেকে সখ্য, সখ্য থেকে বাৎসল্য এবং বাৎসল্য থেকে মাধুর্য রস শ্রেষ্ঠ। কারণ এতে ভগবানের ঐশ্বর্যের বিস্মৃতি ক্রমশঃ বেশি হয়ে থাকে। কিন্তু যখন এই চারটির মধ্যে কোনো একটি রস পূর্ণতা পায়, তখন তাতে অন্যান্য রসেরও অভাব থাকে না অর্থাৎ তাতে সমস্ত রসই থাকে। যেমন, দাস্যরস পূর্ণতা পেলে তাতে সখ্য, বাৎসল্য এবং মাধুর্য—তিনটি রসই বিদ্যমান থাকে। একই ব্যাপার অন্যান্য রসের বিষয়েও বুঝতে হবে। কারণ ভগবান পূর্ণ, তাঁর প্রেমও পূর্ণ এবং পরমাত্মার অংশ হওয়ায় জীবও স্বয়ং পূর্ণ। সংসারের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেই অপূর্ণতা আসে। তাই ভগবানের সঙ্গে যে কোনোভাবে সম্পর্ক হলেই মানুষ পূর্ণত্ব লাভ করে, তার মধ্যে কোনো ন্যূনতা থাকে না।

'দাস্য' রতিতে ভগবানের প্রতি এই ভাব থাকে যে ভগবান আমার প্রভু, আমি তাঁর সেবক। আমার ওপর তাঁর সম্পূর্ণ অধিকার—তিনি যা ইচ্ছে করুন, যে পরিস্থিতিতে রাখুন বা যেমন খুশি আমাকে দিয়ে কাজ করান। আমার ওপর তাঁর অত্যধিক একান্তভাব থাকাতেই তিনি আমার সম্মতি ব্যতিরেকেই আমার সবকিছুর বিধান করেন।

'সখ্য' রতিতে ভক্তের ভগবানের প্রতি এই ভাব থাকে যে ভগবান আমার সখা আর আমিও তাঁর সখা। তিনি আমার প্রিয়, আমিও তাঁর প্রিয়। আমার ওপর তাঁর সম্পূর্ণ অধিকার, তাঁর ওপরও আমার সম্পূর্ণ অধিকার। তাই আমি তাঁর কথা মেনে চলি, তাঁকেও আমার কথা মানতে হবে।

'বাৎসল্য' রতিতে ভক্তের নিজের মধ্যে প্রভুত্বের ভাব থাকে। যেন আমি ভগবানের মা অথবা বাবা বা তাঁর গুরু আর ভগবান আমার সন্তান বা শিষ্য, স্নেহভাজন ভগবানকে আমার পালন-পোষণ করতে হবে। তাঁকে নজরে নজরে রাখতে হবে যেন তাঁর কোনো ক্ষতি না হয় ; যেমন—নন্দ ও মাতা যশোদা কানাইকে নজরে রাখতেন এবং কানাই বনে গেলে তাঁকে দেখাশোনা করার জন্য দাদা বলাইকে সঙ্গে পাঠাতেন।

'মাধুর্য'[২] রতিতে ভক্তের ভগবানের ঐশ্বর্য সম্পর্কে বিশেষভাবে বিস্মরণ হয়ে থাকে ; তাই এই রতিতে ভক্ত ভগবানের সঙ্গে তাঁর অভিন্নতা (ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাবোধ) মেনে নেন। অভিন্নতা মেনে নেওয়ায় 'তাঁর জন্য সুখদায়ক বস্তু যোগাড় করতে হবে, তাঁকে সুখ ও আরামে রাখতে হবে, তাঁর যেন কোনোপ্রকার কষ্ট না হয়'—এই ভাব

---

[১]যোগ ও বিয়োগে প্রেম-রস বৃদ্ধি পায়। সর্বদাই যদি যোগ থাকে, বিয়োগ (বিচ্ছেদ) না থাকে, তাহলে প্রেম-রস বৃদ্ধি পায় না, প্রত্যুত অখণ্ড একরস থাকে। তাই প্রেম-রস বর্ধিত করার জন্য ভগবানও অন্তর্ধান করে থাকেন।

[২]লোকেরা প্রায়ই মাধুর্যভাবে স্ত্রী-পুরুষের ভাবকেই মনে করে ; কিন্তু এমন কোনো নিয়ম নেই যে এটি স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধেই হবে। মাধুর্য হল মধুরতা বা মিষ্টত্ব এবং তা আসে ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন হলেই। অভিন্নতা যত বেশি হয়, মাধুর্য ততই বেশি হয়। সুতরাং দাস্য, সখ্য এবং বাৎসল্যভাবের মধ্যে কোনো একটিতে পূর্ণতা এলে তাতে মাধুর্য কম থাকে না। ভক্তির সব ভাবেই মাধুর্যভাব থাকে।

অভেদ এবং অভিন্নতায় পার্থক্য আছে। যাতে দ্বৈতভাব সর্বতোভাবে শেষ হয়ে শুধুমাত্র একটিই তত্ত্ব থাকে, তাকে বলা হয় 'অভেদ' আর দুটি হলেও এক থাকাকে বলা হয় 'অভিন্নতা', যেমন—দুই বন্ধুর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা হলে অভিন্নতা হয়। অভিন্নতা যত গভীর হয়, মাধুর্য-রস তত প্রকট হয়। একেই বলে প্রেম-রস। ভগবানও এই প্রেম-রসলোভী। প্রেম-রস আস্বাদনের জন্যই ভগবান এক থেকে বহুরূপ ধারণ করেছেন—'একাকী ন রমতে' (বৃহদারণ্যক. ১।৪।৩), 'সদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি' (ছান্দোগ্য. ৬।২।৩)।

বজায় থাকে।

প্রেম-রস অলৌকিক, চিন্ময়। ভগবানই শুধু তা আস্বাদন করতে পারেন। প্রেমে প্রেমিক এবং প্রেমাস্পদ উভয়েই চিন্ময়-তত্ত্ব হন। কখনো প্রেমিক প্রেমাস্পদ হন আবার কখনো প্রেমাস্পদ প্রেমিক হয়ে ওঠেন। সুতরাং এক চিন্ময়-তত্ত্বই প্রেম-আস্বাদনের জন্য দুই রূপ ধারণ করে।

প্রেমের তত্ত্ব না জানায় লোকে লৌকিক কামকেই প্রেম বলে। তা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ চুরাশী লক্ষ যোনির সমস্ত জীবেই কাম অধিষ্ঠান করে আর তাদের মধ্যে যারা ভূত, প্রেত, পিশাচ, তাদের কাম (সুখভোগেচ্ছা) অত্যধিক প্রকারের হয়। শুধুমাত্র জীবনমুক্ত মহাপুরুষই প্রেমের অধিকারী।

প্রেম ও কামে পার্থক্য

কামে শুধু গ্রহণ করার চিন্তা থাকে আর প্রেমে থাকে প্রতিদান দেওয়ার ভাবনা। কামে নিজ ইন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করার—সুখ-আস্বাদনের ভাব থাকে আর প্রেমে নিজ প্রেমাস্পদকে সুখী করার এবং সেবা করার ভাব থাকে। কাম কেবল শরীর ঘিরেই হয় আর প্রেম স্থূলদৃষ্টিতে শরীরের বলে মনে হলেও বাস্তবে তা চিন্ময়-তত্ত্বই। কামে মূঢ়ভাব থাকে কিন্তু প্রেমে কোনো মোহ গন্ধ থাকে না। কামে জাগতিক দুঃখ পূর্ণ থাকে আর প্রেমে মুক্তি ও মুক্তির থেকেও বিশেষ আনন্দ পরিপূর্ণ থাকে। কামে জড়ত্বের (শরীর-ইন্দ্রিয়াদির) প্রাধান্য থাকে আর প্রেমে চিন্ময়তার (চেতন স্বরূপের) প্রাধান্য থাকে। কামে আসক্তি থাকে আর প্রেমে থাকে ত্যাগ। কামে পরাধীনতা থাকে, প্রেমে পরাধীনতার লেশমাত্র থাকে না অর্থাৎ সর্বতোভাবে স্বাধীনতা থাকে। কামে 'সে আমার কাজে যেন আসে' এই ভাব আর প্রেমে 'আমি যেন তার কাজে লাগি' এরূপ ভাব থাকে। কামে কামী-ব্যক্তি ভোগ্যবস্তুর দাস হয়ে থাকে আর প্রেমে স্বয়ং ভগবানও প্রেমিকের অধীন হয়ে থাকেন। কাম-রস নীরসতায় পর্যবসিত হয় আর প্রেম-রস আনন্দরূপে প্রতিমুহূর্তে বৃদ্ধি পেতে থাকে। কাম বিষণ্ণতা থেকে উৎপন্ন হয় আর প্রেম প্রেমাস্পদের প্রসন্নতায় প্রকটিত হয়। কামের উদ্দেশ্য হল আত্মসুখ আর প্রেমে প্রেমাস্পদকে প্রসন্ন করাই হল প্রধান উদ্দেশ্য। কাম নরকের পথে আকর্ষণ করে আর প্রেম ভগবানের কাছে পৌঁছে দেয়। কামে দুই দুই-ই থাকে অর্থাৎ দ্বিত্বভাব (ভিন্নতা বা ভেদ) কখনো দূর হয় না আর প্রেমে একই হয়ে দুই হয় অর্থাৎ অভিন্ন ভাব কখনো লোপ পায় না[১]।

পরিশিষ্ট-ভাব—আগের শ্লোকে শাশ্বত পদপ্রাপ্তির কথা বলে এবার তার নিয়ম জানাচ্ছেন যে সেটি কীভাবে প্রাপ্ত করা যায়। সাধকের প্রধান কাজ হল দুটি—সাংসারিক সম্পর্ক পরিত্যাগ এবং ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক (প্রেম) স্থাপন। পূর্ব শ্লোকে উদ্ধৃত **'মদ্‌ব্যাপাশ্রয়ঃ'** পদে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কের প্রাধান্য রয়েছে এবং এই শ্লোকে উদ্ধৃত **'বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য'** পদে সংসার থেকে সম্পর্ক বিচ্ছেদের প্রাধান্য রয়েছে।

'বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য' কথাটি বলার অর্থ হল যে সংসারের সঙ্গে সূক্ষ্ম সম্পর্কও যেন না থাকে—**'দূরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়'** (গীতা ২।৪৯), কারো প্রতি বিন্দুমাত্র রাগ-দ্বেষ যেন না থাকে।

একমাত্র ভগবদ্‌চিন্তা করলে সমত্ব (বুদ্ধিযোগ) স্বাভাবিকভাবে আসে, তাই বলা হয়েছে **'মচ্চিত্তঃ সততং ভব'**।

✻ ✻ ✻

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে প্রদত্ত নির্দেশটি ভগবান পরবর্তী দুটি শ্লোকে ক্রমশঃ অন্বয় ও ব্যতিরেক রীতির সাহায্যে দৃঢ়তর করেছেন।

---

[১]দ্বৈতং মোহায় বোধাৎপ্রাগ্‌জাতে বোধে মনীষয়া। ভক্ত্যর্থং কল্পিতং দ্বৈতমদ্বৈতাদপি সুন্দরম্।।
পারমার্থিকমদ্বৈতং দ্বৈতং ভজনহেতবে। তাদৃশী যদি ভক্তিঃ স্যাৎসা তু মুক্তিশতাধিকা।। (বোধসার)

'বোধের আগে দ্বৈত মোহে পর্যবসিত হতে পারে। কিন্তু বোধ হয়ে গেলে ভক্তির জন্য বুদ্ধির দ্বারা কল্পিত দ্বৈত, অদ্বৈত থেকে অধিক সুন্দর হয়।'

'অদ্বৈতই প্রকৃত তত্ত্ব, শুধু সাধন-ভজনের জন্য দ্বৈত হয়। ভক্তি যদি এরূপ হয় তবে সেই ভক্তি মুক্তি অপেক্ষা শতগুণ শ্রেষ্ঠ'।

মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।
অথ চেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি॥ ৫৮ ॥

[**মচ্চিত্তঃ** (মদ্‌গতচিত্ত হলে) ; **মৎপ্রসাদাৎ** (আমার কৃপায়) ; **সর্বদুর্গাণি** (সমস্ত বিঘ্ন থেকে) ; **তরিষ্যসি, অথ** (উত্তীর্ণ হবে আর) ; **চেৎ, ত্বম্, অহঙ্কারাৎ** (যদি তুমি অহংকারবশতঃ) ; **ন, শ্রোষ্যসি** (না শোনো) ; **বিনঙ্ক্ষ্যসি** (বিনষ্ট হবে।)]

মদ্‌গতচিত্ত হলে আমার কৃপায় সমস্ত বিঘ্ন থেকে উত্তীর্ণ হবে আর যদি অহংকারবশতঃ তুমি আমার কথা না শোনো তাহলে বিনষ্ট হবে ॥ ৫৮ ॥

ব্যাখ্যা—**'মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি'**—ভগবান বলেছেন যে মদ্‌গতচিত্ত হলে আমার কৃপায় সমস্ত বাধা-বিঘ্ন, শোক-দুঃখাদি তুমি অতিক্রম করবে অর্থাৎ এইগুলি থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য তোমাকে কোনো কষ্ট করতে হবে না।

ভগবদ্‌ভক্ত তাঁর সমস্ত কর্ম ভগবানে অর্পণ করেন, নিজেও ভগবানে সমর্পিত হন, সমত্বের আশ্রয় নিয়ে সাংসারিক সংযোগজনিত লোভ থেকে সর্বতোভাবে বিমুখ হন এবং ভগবানের সঙ্গে অটল সম্পর্ক স্থাপন করেন। এইসব হলেও প্রকৃত তত্ত্ব প্রাপ্তিতে যদি কিছু ন্যূনতা থেকে যায় বা সাধারণ লোকের থেকে নিজের মধ্যে কোনো বিশেষ ভাব, অহংকার জন্মায় অথবা এইরূপ কোনো সূক্ষ্ম দোষ থেকে যায়, তাহলে সেই দোষগুলি দূর করার দায়িত্ব সাধকের ওপর থাকে না, সেই দোষগুলি, বাধা-বিঘ্নগুলি দূর করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ভগবানের উপর বর্তায়। তাই ভগবান বলেছেন—**'মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি'** অর্থাৎ আমার কৃপায় সমস্ত বাধা-বিঘ্ন উত্তীর্ণ হবে। এর তাৎপর্য হল যে, ভক্ত নিজে যতটা বোঝে, সেইরূপ সাবধানতা সহকারে কাজ করবে, পরে যতটুকু অভাব থাকবে, তা ভগবানের কৃপায় পূর্ণ হয়ে যাবে।

মানুষের যদি কোনো অপরাধ হয়ে থাকে তবে তা হল জগৎ-সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে ভগবানে বিমুখ হওয়া। তাই সেই অপরাধ দূর করার জন্য তাঁর নিজেকে জগৎ-সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে ভগবানের সম্মুখীন হতে হয়। তারপর যেটুকু অভাব থাকে ভগবানের কৃপায় তা পূর্ণ হয়ে যায়। এবারে সব কাজ ভগবান করেন। তাৎপর্য হল যে ভগবদ্‌কৃপা প্রাপ্তিতে বাধা ছিল সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে ভগবানে বিমুখ হওয়া। সেই বাধা দূর হলে ভগবান নিজেই তাঁকে পূর্ণতা দান করেন।

যাঁর প্রকৃতি এবং প্রকৃতির কার্য শরীরাদির সঙ্গে সম্পর্ক থাকে, তাঁর ওপরই শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ, নিজ বর্ণ-আশ্রম অনুযায়ী কর্তব্য-কর্ম পালনাদি নিয়ম জারি করা হয় এবং তাঁর সেইসব নিয়মাদি ঠিকমতো অবশ্যই পালন করা উচিত কারণ প্রকৃতি এবং প্রকৃতির কার্য শরীরের সম্পর্ক ধরেই পাপ-পুণ্য হয় এবং তার ফল হিসাবে সুখ-দুঃখও ভোগ করতে হয়। তাই তার ওপর শাস্ত্রীয় নিয়ম ও মর্যাদা বিশেষভাবে প্রযোজ্য হয়। কিন্তু যিনি প্রকৃতি ও তার কার্য থেকে সর্বতোভাবে বিমুখ হয়ে ভগবানের শরণাগত হন, তিনি শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ এবং বর্ণাশ্রমের মর্যাদার অধীন হয়ে থাকেন না। তিনি সমস্ত বিধি-নিষেধের ঊর্ধ্বে ওঠেন অর্থাৎ কোনো বিধি-নিষেধই তাঁর ওপর প্রযোজ্য হয় না। কারণ বিধি-নিষেধের প্রাধান্য প্রকৃতির রাজ্যেই থাকে। প্রভুর রাজ্যে থাকে শুধু শরণাগতির প্রাধান্য।

জীব সাক্ষাৎ পরমাত্মার অংশ (গীতা ১৫।৭)। যদি সে শুধু তাঁর অংশী পরমাত্মার দিকে অগ্রসর হয় তাহলে তার ওপর দেব-ঋষি-প্রাণী-মাতা-পিতা আদি আপ্তজন ও পিতা-পিতামহের কোনও ঋণই থাকে না[১]। কারণ শুদ্ধ চেতন অংশ এঁদের কাছে কোনো কিছু গ্রহণ করেনি। নেওয়া তখনই হয়, যখন জীব জড়-দেহের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করে। সম্বন্ধ স্থাপন করলেই অভাব দেখা

[১]দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্। সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তম্॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৫।৪১)

'রাজন্! যিনি সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণরূপে শরণাগতবৎসল ভগবানের শরণাগত হন, তিনি দেব, ঋষি, প্রাণী, আত্মীয়-স্বজন ও পিতৃপুরুষ—এঁদের কারোরই ঋণী বা সেবক থাকেন না।'

যায় ; না হলে তার মধ্যে কখনো কোনো কিছুর অভাব হয় না—**'নাভাবো বিদ্যতে সতঃ'** (গীতা ২।১৬)। তার মধ্যে যখন কোনো কিছুর অভাবই থাকে না তখন সে এঁদের কাছে ঋণী হবে কেন ? একেই বলা হয় সমস্ত বিঘ্ন উত্তীর্ণ হওয়া।

সাধনকালে জীবিকা-নির্বাহের সমস্যা, রোগাদি নানা বাধা-বিঘ্ন আসে ; কিন্তু সেগুলি এলেও সাধক তাতে বিচলিত হন না। তিনি সেই বাধা-বিঘ্নের মধ্যেও ভগবানের বিশেষ কৃপা অনুভব করেন। তাই তিনি সেই বাধা-বিঘ্ন-গুলিকে বাধাস্বরূপ দেখেন না, কৃপারূপেই অনুভব করে থাকেন।

পারমার্থিক সাধনায় বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত হবার এবং ভগবদ্প্রাপ্তিতে বাধাপ্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে। তাই ভগবান বলেছেন যে আমার আশ্রয় গ্রহণকারীদের জন্য আমি দুটি কাজ করব অর্থাৎ আমি কৃপা করে তাঁদের সাধনার সমস্ত বাধা-বিঘ্নও দূর করব আর সাধনার দ্বারা যাতে আমাকে লাভ করে তাতেও সাহায্য করব।

'অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি'—ভগবান অত্যন্ত কৃপাপরবশ হয়ে আত্মীয়তার সম্পর্কে অর্জুনকে বলেছেন যে, **'অথ'**—পক্ষান্তরে আমি যা বলেছি, সেগুলি না মেনে যদি অহংকারবশতঃ অর্থাৎ 'আমিও অনেক কিছু জানি, করি, আমি অনেক কিছু বুঝি, কিছু করতে পারি' ইত্যাদি ভাব নিয়ে তুমি আমার কথা না শোনো, আমার ইঙ্গিত অনুযায়ী না চল, আমার কথা মেনে না নাও, তাহলে তোমার পতন হবে—**'বিনঙ্ক্ষ্যসি'**।

যদিও অর্জুনের পক্ষে ভগবানের কথা না শোনা বা না মানা অসম্ভব কথা, তা সত্ত্বেও ভগবান বলেছেন যে **'চেৎ'**—যদি তুমি আমার কথা না শোনো, তাহলে তোমার পতন হবে। অর্থাৎ যদি তুমি অজ্ঞতাবোধে অর্থাৎ না জেনে আমার কথা না শোনো বা ভুল করে না শোনো, তবে তা ক্ষমা করা যায় ; কিন্তু অহংকারবশতঃ যদি না শোনো, তবে তোমার পতন হবে। কারণ অহংকারবশতঃ আমার কথা না শুনলে তোমার অহং-ভাব বৃদ্ধি পাবে, যা আসুরী-সম্পদের মূল।

প্রথমে চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান স্বয়ং শ্রীমুখে বলেছেন যে, 'তুমি আমার ভক্ত ও প্রিয় সখা'—**'ভক্তোঽসি মে সখা চেতি'** (৪।৩) এবং তারপর নবম অধ্যায়ে বলেছেন, 'হে অর্জুন ! তুমি প্রতিজ্ঞাপূর্বক জেনো যে আমার ভক্তের পতন হয় না'—**'কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি'** (৯।৩১)। এতে প্রমাণিত হয় যে অর্জুন ছিলেন ভগবানের ভক্ত ; সুতরাং তিনি কখনো ভগবানে বিমুখ হতে পারেন না এবং তাঁর পতনও কখনো হতে পারে না। কিন্তু সেই অর্জুনও যদি ভগবানে বিমুখ হয়ে তাঁর কথা না শোনেন, তাহলে তাঁরও পতন হবে। অর্থাৎ ভগবানে বিমুখ হওয়াতেই প্রাণীদের পতন হয়, তারা জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হয়ে থাকে (গীতা ৯।৩ ; ১৬।২০)।

বিশেষ কথা

এই অধ্যায়ের ছাপ্পান্নতম শ্লোকে ভগবান প্রথম পুরুষ **'অবাপ্নোতি'** প্রয়োগের দ্বারা সাধারণ রীতিতে সকলকে বলেছেন যে, আমার কৃপায় পরমপদ লাভ হয় আর এখানে মধ্যম পুরুষ **'তরিষ্যসি'** প্রয়োগ করে অর্জুনকে বলেছেন যে, আমার কৃপায় তুমি সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করবে। এই দুটি কথার অর্থ হল যে ভগবানের কৃপায় যে শক্তি থাকে, সে শক্তি কোনো সাধনাতে নেই। তার অর্থ এই নয় যে, সাধন করবে না, বরং পরমাত্ম-প্রাপ্তির জন্য সাধন করা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম হওয়া উচিত। কারণ পরমাত্মপ্রাপ্তির জন্যই এই মনুষ্যজন্ম পাওয়া। মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত করেও যদি মানুষ পরমাত্মাকে লাভ না করে উচ্চ হতে উচ্চতর লোকেও যায়, তবুও তাকে ইহজগতে (জন্ম-মৃত্যু চক্রে) আসতেই হয়[১] (গীতা ৮।১৬)। তাই সে যখন এই মনুষ্যজন্ম লাভ করেছে, তখন ইহজন্মেই তার ভগবদ্প্রাপ্তি করা উচিত যাতে সে জন্ম-মরণরহিত হয়। কর্মযোগীকেও ভগবান বলেছেন যে, সমত্বযুক্ত ব্যক্তি

[১]যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।২।৩২)

'হে কমলনয়ন ! যেসব ব্যক্তি আপনার চরণের শরণাগত নয় এবং আপনাতে ভক্তিরহিত হওয়ায় যাদের বুদ্ধিও শুদ্ধ নয়, তারা নিজেদের মুক্ত বলে মনে করলেও, প্রকৃতপক্ষে বদ্ধই হয়ে থাকে। তারা যদি কষ্ট স্বীকার করে সাধনার দ্বারা উচ্চপদে আরোহণও করে, তবুও তাদের পতনই হয়ে থাকে'।

ইহজীবনেই পাপ ও পুণ্য-রহিত হয় (গীতা ২।৫০), অর্থাৎ কর্মবন্ধন থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হওয়া বা জন্ম-মৃত্যু রহিত হওয়াই হল মানুষের একমাত্র ধ্যেয়।

দশম অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, আমি কৃপা করে ভক্তদের হৃদয়ে জ্ঞান উদ্ভাসিত করি আর একাদশ অধ্যায়ের সাতচল্লিশতম শ্লোকে বলেছেন যে, আমি কৃপাপূর্বক বিরাটরূপ দেখিয়েছি। সেই কৃপাকে নিয়েই ভগবান এখানে বলেছেন যে, আমার কৃপায় পরমপদপ্রাপ্তি হবে (১৮।৫৬) আর আমার কৃপাতেই সমস্ত বিঘ্ন উত্তীর্ণ হবে (১৮।৫৮)। পরমপদপ্রাপ্ত হলে কোনো বাধা-বিঘ্ন আসারই সম্ভাবনা থাকে না। তা সত্ত্বেও সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করার কথা বলার অর্থ হল যে অর্জুনের মনে ভয় ছিল যে যুদ্ধ করলে তাঁর পাপ হবে ; যুদ্ধের জন্য বংশ-পরম্পরা নষ্ট হলে পিতৃপুরুষের পতন হবে এবং এতে অনর্থ বৃদ্ধি পাবে ; আমরা রাজ্যলোভে এই মহাপাপ করতে উদ্যত হয়েছি, অতএব আমি অস্ত্র সংবরণ করছি, তাতে যদি ধৃতরাষ্ট্রের সৈন্যরা এসে আমাকে হত্যাও করে তাহলেও তাতে আমার কল্যাণই হবে (গীতা ১।৩৬-৪৬)। এইসব ব্যাপার নিয়ে এবং নানা জন্মের দোষগুলি সম্বন্ধে চিন্তা করে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে আমার কৃপায় তুমি সমস্ত বাধা-বিঘ্ন, পাপ অতিক্রম করবে—**'সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি'**। ভগবান বহুবচনে **'দুর্গাণি'** পদটি ব্যবহার করেও তার সঙ্গে **'সর্ব'** শব্দটি যোগ করেছেন। এর অর্থ হল যে আমার কৃপায় তোমার কোনো পাপ থাকবে না ; কোনো বন্ধন থাকবে না এবং সর্বতোভাবে শুদ্ধ হয়ে তুমি পরমপদ প্রাপ্ত হবে।

পরিশিষ্ট-ভাব—ভক্তের একমাত্র কাজ হল ভগবানের শরণাগত হওয়া, ভগবদ্‌চিন্তা করা। তখন তার সব কাজই ভগবান করে থাকেন। ভগবান ভক্তের ওপর বিশেষ কৃপা করে তার সাধনার সমস্ত বাধা-বিঘ্ন দূর করেন এবং তাঁকে লাভ করার উপায় করে দেন—**'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্'** (গীতা ৯।২২)। তাই ব্রহ্মসূত্রে বলা হয়েছে— **'বিশেষানুগ্রহশ্চ'** (৩।৪।৩৮)। 'ভগবানকে ভক্তি করলে ভগবান বিশেষভাবে অনুগ্রহ করেন।' প্রকৃতপক্ষে ভগবানের কৃপা তো মানুষের ওপর আছেই, কিন্তু ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করলে তবেই ভক্ত সেই কৃপা বিশেষভাবে অনুভব করেন।

※ ※ ※

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি॥ ৫৯ ॥

[**অহঙ্কারম্, আশ্রিত্য** (অহংকারপরবশ হয়ে) ; **যৎ, ইতি, মন্যসে** (এইরূপ যে মনে করছ) ; **ন, যোৎস্যে** (যুদ্ধ করবে না) ; **তে, এষঃ** (তোমার এই) ; **ব্যবসায়ঃ, মিথ্যা** (সঙ্কল্প মিথ্যা) ; **প্রকৃতিঃ** (তোমার ক্ষত্রিয়-স্বভাবই) ; **ত্বাম্** (তোমাকে) ; **নিয়োক্ষ্যতি** (যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করবে।)]

অহংকারপরবশ হয়ে এই যে মনে করছ তুমি যুদ্ধ করবে না, তোমার এই সঙ্কল্প মিথ্যা, কারণ তোমার ক্ষত্রিয়-স্বভাবই তোমাকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করবে ॥ ৫৯ ॥

ব্যাখ্যা—'যদহঙ্কারমাশ্রিত্য'—প্রকৃতি থেকে মহত্তত্ত্ব এবং মহত্তত্ত্ব থেকে অহংকার উৎপন্ন হয়েছে। সেই অহংকারেরই এক বিকৃত অংশ হল—'আমি শরীর' এই মান্যতা। এই বিকৃত অহংকারের আশ্রয় গ্রহণকারী পুরুষ কখনো ক্রিয়ারহিত হতে পারে না। কারণ প্রকৃতি সর্বদা ক্রিয়াশীল ও পরিবর্তনশীল, তাই তার আশ্রয় গ্রহণকারী কোনো মানুষই কর্ম না করে থাকতে পারেন না (গীতা ৩।৫)।

মানুষ যখন অহংকারবশতঃ ক্রিয়াশীল প্রকৃতির বশীভূত হন, তখন তিনি কী করে বলেন যে আমি এই কর্মটি করব, ওই কর্মটি করব না ? অর্থাৎ প্রকৃতির বশ হয়ে মানুষ করা ও না-করা—এই দুইয়ের থেকেই মুক্তি পান না। কারণ প্রকৃতির দ্বারা বশীভূত মানুষের কিছু 'করাও' কর্ম আর 'না-করাও' কর্ম। কিন্তু মানুষ যখন প্রকৃতির বশে থাকে না, নির্লিপ্তভাবে থাকে (যা তার প্রকৃত স্বরূপ), তখন তার ক্ষেত্রে করা এবং না-করার কথা প্রযোজ্য হয় না।

তাৎপর্য হল এই যে, প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলে কর্ম না করে থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু যিনি প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ ছেদ করেছেন বা সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হয়েছেন, তাকে কর্ম করতে বাধ্য হতে হয় না।

'ন যোৎস্য ইতি মন্যসে'—দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্জুন ভগবানের শরণাগত হয়ে শিক্ষা চাইছিলেন—**'শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্'** (২।৭) এবং তারপর অর্জুন স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে 'আমি যুদ্ধ করব না'—**'ন যোৎস্যে'** (২।৯)। ভগবানের এই কথাটি মনঃপূত হয়নি। ভগবান দেখলেন যে, এ তো আমার শরণাগত হয়েছিল আর আমি কিছু বলার আগেই বলে কিনা 'আমি যুদ্ধ করব না !' তাহলে এটা কি আমার শরণাগতি ? এ তো অহংকারের শরণাগতি হল। কারণ প্রকৃত শরণাগত ব্যক্তি 'আমি এটা করব, ওটা করব না' বলে না। ভগবানের শরণাগত হলে, ভগবান যেমন করাবেন, তেমনই করতে হবে। তাই অর্জুনের কথা শুনে ভগবান মুচকি হাসলেন (২।১০)। কিন্তু অর্জুনের ওপর তাঁর অত্যধিক কৃপা ও স্নেহ থাকায় তিনি উপদেশ দিতে শুরু করেন, নচেৎ তখনই তিনি বলে দিতেন 'যেমন খুশি, তেমনই করো'—**'যথেচ্ছসি তথা কুরু'** (১৮।৬৩)। কিন্তু অর্জুনের এই যে কথাটি 'আমি যুদ্ধ করব না' ভগবানের মনে বাসা বেঁধেছিল। তাই ভগবান সেই শব্দটি—**'ন যোৎস্যে'** এখানে উল্লেখ করে বলেছেন যে তুমি অহংকারেরই শরণাগত, আমার নয়। যদি আমার শরণাগত হতে তাহলে, 'যুদ্ধ করব না' একথা বলতেই পারতে না। আমার শরণাগত হলে তুমি কী করবে, আর কী না করবে—তার দায়িত্ব আমার ওপর থাকত। তাছাড়া আমার শরণাগত হলে এই প্রকৃতিও তোমাকে বাধ্য করত না (গীতা ৭।১৪)। ত্রিগুণময়ী মায়া বা প্রকৃতি তাকেই বাধ্য করে, যে আমার শরণাগত হয় না (গীতা ৭।১৩)। কারণ প্রকৃতির প্রবাহে থাকা প্রাণী প্রকৃতির গুণে সর্বদা বশীভূত থাকে।

একটি অত্যন্ত সত্য কথা হল যে, মানুষ যেসব প্রাকৃত পদার্থকে নিজের বলে মনে করে, সে সেই পদার্থগুলির অধীন হয়ে পড়ে। সে ভ্রমবশতঃ মনে করে যে, সে-ই সেগুলির মালিক, কিন্তু আসলে সে হয়ে ওঠে সেগুলির দাস (গোলাম) ! কিন্তু যেগুলিকে নিজের বলে মনে করে না, সে সেগুলির বশ হয় না। তাই মানুষের কোনো প্রাকৃত পদার্থকেই নিজের মনে করা উচিত নয়। কারণ সেগুলি প্রকৃতই নিজস্ব নয়। ভগবানই বাস্তবে আপন। ভগবানকে নিজের বলে মেনে নিলে মানুষের অধীনতা চিরকালের মতো দূর হয়। তাৎপর্য হল এই যে মানুষ পদার্থ এবং ক্রিয়াগুলিকে নিজের বলে মনে করলে সর্বতোভাবে সেগুলির অধীন হয়ে যায় আর ভগবানকে নিজের মনে করলে, অনন্যভাবে ভগবানের শরণাগত হলে সর্বতোভাবে স্বাধীন হয়ে যায়। প্রভুর শরণাগত হলে পরাধীনতার লেশ থাকে না—শরণাগতির এই হল মহিমা। কিন্তু যিনি প্রভুর শরণাগত না হয়ে অহংকারের শরণ নেন, তিনি মৃত্যুর দিকে (সংসার-পথে) অগ্রসর হন—**'নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি'** (৯।৩)। এই ব্যাপারে সতর্ক করে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে, 'তুমি যে বলছ যুদ্ধ করবে না, তোমার সেই কথা চলবে না। তোমাকে ক্ষত্রিয় প্রকৃতির বশীভূত হয়ে যুদ্ধ করতেই হবে'।

'মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে'—ব্যবসায় অর্থাৎ সঙ্কল্প দুপ্রকারের, বাস্তবিক এবং অবাস্তবিক। পরমাত্মার সঙ্গে যে নিত্য সম্পর্ক, সেই সঙ্কল্প বাস্তবিক আর প্রকৃতির সঙ্গে মিলে প্রাকৃত পদার্থের যে সঙ্কল্প করা, তা অবাস্তবিক। যে সঙ্কল্প পরমাত্মাকে ধরে হয়, তাতে স্ব-স্বরূপের প্রাধান্য থাকে আর যে সঙ্কল্প প্রকৃতিকে নিয়ে হয়, তাতে নিজের অন্তঃকরণের প্রাধান্য থাকে। তাই ভগবান এখানে অর্জুনকে বলেছেন যে, তুমি যে অহংকারের অর্থাৎ প্রকৃতির আশ্রয় নিয়ে বলছ যে তুমি যুদ্ধ করবে না, তোমার এই (ক্ষত্রিয়-প্রকৃতির বিরুদ্ধ) সঙ্কল্প অবাস্তবিক অর্থাৎ মিথ্যা। আশ্রয় একমাত্র পরমাত্মারই গ্রহণ করা উচিত, প্রকৃতি অথবা প্রকৃতির কার্য জগতের নয়।

প্রাণী যদি সঠিকভাবে জানতে পারে যে আমি শুধু পরমাত্মারই এবং আমার তাঁকে লক্ষ্য করেই চলতে হবে, তাহলে তার এই সঙ্কল্প বাস্তব অর্থাৎ সত্য, নিত্য। এই সঙ্কল্পের মহিমা ভগবান নবম অধ্যায়ের ত্রিশতম শ্লোকে বর্ণনা করে বলেছেন যে, অত্যন্ত দুরাচারী ব্যক্তিও যদি অনন্যভাবে আমার ভজনা করে, তাহলে তাকে দুরাচারী মনে করা উচিত নয়, সাধু বলে মানা উচিত। কারণ তার প্রকৃত সিদ্ধান্ত এই হয় যে আমি ভগবানেরই

এবং শুধু তাঁরই ভজনা করব।

'প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি'—এই পদটিতে ভগবান বলেছেন যে তোমার ক্ষাত্র-প্রকৃতি তোমাকে জোর করে যুদ্ধে নিয়োগ করবে। ক্ষত্রিয়ের স্বভাব হল—শৌর্য-বীর্য, যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করা (গীতা ১৮।৪৩)। তাই ধর্মযুদ্ধ উপস্থিত হলে তুমি যুদ্ধ না করে থাকতে পারবে না।

পরিশিষ্ট-ভাব—আগের শ্লোকে বলা হয়েছে যে অহংকারের 'পরিণাম' ভালো হয় না আর এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে অহংকারের জন্য 'ক্রিয়া' সঠিক হয় না। অর্থাৎ শোনা বা না শোনায় পতন হয় না, পতন হয় অহংকারেরই জন্য। কর্ম করা বা না-করা বাধক হয় না, অহংকারই হল বাধা।

ভগবান বলেছেন, তুমি যাতে আমাকে প্রাপ্ত করতে পার, তার ব্যবস্থাও করব আর তোমার সমস্ত বাধা-বিঘ্নও দূর করে দেব (১৮।৫৬, ৫৮)। কিন্তু এত কথা শুনেও অর্জুন কিছু বলেননি, কিন্তু তাঁর বলা উচিত ছিল **'করিষ্যে বচনং তব'**। অতএব ভগবান বলেছেন যে তুমি যদি ভ্রমবশতঃ আমার কথা না শোন, তাহলে ঠিক আছে, কিন্তু যদি অহংকারবশতঃ আমার বাক্য অবহেলা কর, তাহলে তোমার পতন হবে। ভগবানের কথার তাৎপর্য হল যে, আমি যেমন ভক্তের সব কাজ (সাধনা ও সিদ্ধি) করে দিই, তেমনই ভক্তের উচিত সর্বপ্রকারে আমার শরণাগত হওয়া। কিন্তু আমার শরণ না নিয়ে যদি সে অহংকারকে আশ্রয় করে তাহলে তার পতন হয়। অহংকারকে আশ্রয় করলে **'মদ্ব্যপাশ্রয়'** হয় না। কারণ আমার শরণের পরিবর্তে আমার অপরা প্রকৃতি 'অহংকার'-এর আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে। কর্তব্য-কর্মে (যুদ্ধে) আমার বাক্যানুসারে নিয়োজিত হওয়া আর প্রকৃতির দ্বারা নিযুক্ত হওয়া—এই দুটির মধ্যে বিশাল পার্থক্য। তুমি যদি আমার কথা না শোনো তাহলে তোমার ক্ষাত্র-প্রকৃতি তোমাকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করবে। যদি প্রকৃতি তোমায় নিযুক্ত করে, তবে তার দায়িত্ব হবে তোমার আর যদি আমার কথায় কর্তব্য কর তাহলে তার দায়ত্বি হবে আমার। তোমার দায়িত্ব থাকলে তুমি আবদ্ধ হয়ে পড়বে আর আমি যদি তোমার ভার নিই তাহলে তুমি মুক্ত হয়ে যাবে।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে প্রকৃতি তোমাকে কর্মে নিয়োগ করবে, পরবর্তী শ্লোকে তারই বিশ্লেষণ করছেন।

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্মণা।
কর্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ॥ ৬০ ॥

[**কৌন্তেয়** (হে কৌন্তেয়!) ; **স্বেন, স্বভাবজেন** (নিজের স্বভাবজ) ; **কর্মণা, নিবদ্ধঃ** (কর্মের দ্বারা বাঁধা) ; **মোহাৎ, যৎ** (মোহবশতঃ যা) ; **ন, কর্তুম্, ইচ্ছসি** (করতে চাইছ না) ; **তৎ, অপি** (তাও) ; **অবশঃ** (বাধ্য হয়ে) ; **করিষ্যসি** (করবে।)]

হে কৌন্তেয়! নিজের স্বভাবজ কর্মের দ্বারা বাঁধা তুমি মোহবশতঃ যা করতে চাইছ না তা তুমি বাধ্য হয়ে (ক্ষত্রিয়-প্রকৃতিবশতঃ) করবেই ॥ ৬০ ॥

ব্যাখ্যা—**'স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্মণা'**—আগের জন্মে যেমন গুণ ও কর্মাদির সংস্কার ছিল, এই জন্মে যেমন মাতা-পিতার ঔরসে জন্ম হয়েছে অর্থাৎ মাতা-পিতার যেমন সংস্কার থাকে, জন্মের পর যেমন দেখা বা শোনা হয়েছে, যেমন শিক্ষাপ্রাপ্তি ঘটেছে, যেমন কর্ম করা হয়েছে—সেইসব মিলে যে কর্ম করার একটি অভ্যাস গড়ে ওঠে, তাকে বলে স্বভাব। ভগবান একে স্বভাবজনিত স্বকীয় কর্ম বলেছেন। একে স্বধর্ম বলা হয়—**'স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি'** (গীতা ২।৩১)।

'কর্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ'—স্বভাবজ ক্ষাত্র-প্রকৃতিতে আবদ্ধ হয়ে তুমি যা করতে চাও না, সেগুলি তুমি অবশ হয়ে করবে। শাস্ত্রে স্বভাব অনুসারেই কর্তব্য-কর্ম করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই নির্দেশে অন্যের কর্মের থেকে নিজ কর্মে যদি কিছু ন্যূনতা বা দোষও দেখা যায়, তাহলেও সেই দোষ প্রতিবন্ধক (পাপজনক) হয় না—**'শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ**

স্বনুষ্ঠিতাৎ' (গীতা ৩।৩৫ ; ১৮।৪৭)। সেই স্বভাবজ কর্ম (ক্ষাত্রধর্ম) অনুযায়ী তুমি যুদ্ধ করতে বাধ্য। মূঢ়তাপূর্বক তুমি ঠিক করেছ যে তুমি যুদ্ধরূপ কর্তব্য করবে না।

যিনি জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ, তাঁর স্বভাব সর্বতোভাবে শুদ্ধ হয়। তাই তাঁর ওপর স্বভাবের আধিপত্য থাকে না অর্থাৎ তিনি স্বভাবের বশ হন না, তা সত্ত্বেও যদি তিনি কোনো কাজে প্রবৃত্ত হন, তা তিনি তাঁর প্রকৃতি (স্বভাব) অনুযায়ীই করে থাকেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ প্রকৃতির পরবশ হন, তাই তাঁদের স্বভাব জোর করে কর্মে প্রবৃত্ত করায় (গীতা ৩।৩৩)। ভগবান অর্জুনকে বলেছেন, তোমার ক্ষাত্র-স্বভাবই তোমাকে জোর করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাবে ; কিন্তু তার ফল তোমার পক্ষে ভালো হবে না। তুমি যদি শাস্ত্র বা মহাপুরুষদের নির্দেশে অথবা আমার উপদেশে যুদ্ধরূপ কর্ম কর, তাহলে সেটি তোমার পক্ষে কল্যাণকর হবে। কারণ শাস্ত্র বা আমার নির্দেশ অনুসারে কর্ম করলে, সেই কর্মে যে রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ থাকে, তা স্বতঃই দূর হয়ে যায় ; কেন-না তখন তোমার দৃষ্টি থাকে নির্দেশের দিকে, রাগ-দ্বেষের দিকে নয়। সুতরাং সেই কর্ম বন্ধনকারক না হয়ে কল্যাণকারকই হয়ে থাকে।

বিশেষ কথা

গীতায় প্রকৃতির অধীনতার কথা সাধারণভাবে কয়েক স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে (যেমন—৩।৫ ; ৮।১৯ ; ৯।৮ ইত্যাদি)। কিন্তু দুটি স্থানে বিশেষভাবে প্রকৃতির বশ্যতার কথা উক্ত হয়েছে—'প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি' (৩।৩৩) এবং এখানে 'প্রকৃতি স্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি' (১৮।৫৯)[১]। এতে স্বভাবের প্রাবল্য প্রমাণিত হয় ; কেন-না কোনো প্রাণী যে কোনো যোনিতেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, তার প্রকৃতি বা স্বভাব তার সঙ্গেই থাকে। যদি তার স্বভাব পরম শুদ্ধই হবে অর্থাৎ স্বভাবে সর্বতোভাবে অনাসক্তি থাকে তবে তাঁর জন্ম কেন হবে ? যদি তাঁর জন্ম হয় তবে তাতে স্বভাবেরই প্রাধান্য থাকবে—'কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনি-জন্মসু' (গীতা ১৩।২১)। যখন স্বভাবেরই প্রাধান্য অথবা বশ্যতা থাকে এবং প্রত্যেক ক্রিয়াই স্বভাবানুসারে হয়, তাহলে শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ কার ওপর জারি হয় ? গুরুজনদের শিক্ষা কোন্ কাজে আসে ? মানুষই বা দুর্গুণ-দুরাচার পরিত্যাগ করে সদ্‌গুণ-সদাচারে প্রবৃত্ত হবে কীভাবে ?

উপরিউক্ত প্রশ্নের উত্তর হল যে, মানুষ যেমন গঙ্গা-প্রবাহ রোধ করতে না পারলেও, তার গতিপথ ঘুরিয়ে দিতে পারে, তেমনই মানুষ তার বর্ণোচিত স্বভাব ত্যাগ করতে না পারলেও ভগবদ্‌প্রাপ্তির উদ্দেশ্য নিয়ে চললে তা রাগ-দ্বেষরহিত পরম শুদ্ধ, নির্মল হয়ে উঠতে পারে। তাৎপর্য হল এই যে স্বভাবকে পরিশুদ্ধ করতে মনুষ্যমাত্রেই সক্ষম ও স্বাধীন, অক্ষম ও পরাধীন নয়। অক্ষমতা ও পরাধীনতা প্রতীয়মান হয় শুধু রাগ-দ্বেষের জন্য।

এই স্বভাব শোধরাবার জন্য ভগবান গীতায় কর্মযোগ ও ভক্তিযোগের দৃষ্টিতে দুটি উপায় দেখিয়েছেন—

'কর্মযোগের দৃষ্টিতে'—তৃতীয় অধ্যায়ের চৌত্রিশতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে মানুষের প্রধান শত্রু হল রাগ ও দ্বেষ। সুতরাং রাগ-দ্বেষের বশীভূত হওয়া উচিত নয় অর্থাৎ রাগ-দ্বেষের বশীভূত হয়ে কোনো কর্মই করা উচিত নয়, শাস্ত্র নির্দেশানুসারেই প্রতিটি কর্ম করা উচিত। শাস্ত্র নির্দেশানুসারে অর্থাৎ শিষ্য গুরুর, পুত্র মাতা-পিতার, পত্নী পতির এবং সেবক প্রভুর নির্দেশানুসারে প্রসন্নতাপূর্বক সমস্ত কর্ম করলে, তার আর রাগ-দ্বেষ থাকে না। কারণ নিজের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করলেই রাগ- দ্বেষ পুষ্টি লাভ করে। শাস্ত্রাদির নির্দেশানুসারে কাজ করলে এবং কখনো মনে অন্য কোনো নতুন চিন্তা হলেও শাস্ত্রের নির্দেশ না থাকলে আমরা সে কাজ করি না, ফলে আমাদের 'রাগ' বা আকাঙ্ক্ষা দূর হয় ; আবার কখনো কার্যটি না করার ইচ্ছা মনে এলেও শাস্ত্রের নির্দেশে আমরা প্রসন্নতা সহকারে সেই কাজটি করা উচিত, যাতে আমাদের 'দ্বেষ' দূর হয়।

(২) ভক্তিযোগের দৃষ্টিতে—মানুষ যখন তার মমত্ব-সম্পন্ন বস্তুগুলি-সহ স্বয়ং ভগবানের শরণাগত হয়, তখন তার নিজের বলে কিছু থাকে না। সে ভগবানের হাতের পুতুল হয়ে ওঠে। তখন ভগবানের নির্দেশানুযায়ী তাঁর ইচ্ছানুসারেই সমস্ত কর্ম সম্পন্ন হয়, যার ফলে তার স্বভাবগতঃ রাগ-দ্বেষ দূর হয়।

তাৎপর্য হল এই যে কর্মযোগে রাগ-দ্বেষের বশীভূত না

[১]জ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞানযোগের সাহায্যে প্রকৃতির থেকে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করেন তাই তাঁর জন্য প্রকৃতির বশ্যতার কথা উল্লেখ করা হয়নি।

হয়ে কর্ম করলে স্বভাব শুদ্ধ হয় (গীতা ৩।৩৪) আর ভক্তিযোগে ভগবানে সর্বতোভাবে সমর্পিত হলে স্বভাব শুদ্ধ হয়ে যায় (গীতা ১৮।৬২)। স্বভাব শুদ্ধ হলে বন্ধনের কোনো প্রশ্নই থাকে না।

মানুষ যেসব কর্ম করে, সেগুলি কখনো রাগ-দ্বেষের বশীভূত হয়ে করে আবার কখনো সিদ্ধান্ত অনুসারে করে। রাগ-দ্বেষ সহকারে কর্ম করলে রাগ-দ্বেষ দৃঢ় হয় এবং মানুষের স্বভাব তেমনভাবেই গড়ে ওঠে। সিদ্ধান্ত অনুসারে কর্ম করলে তার সিদ্ধান্ত অনুসারেই কর্ম করার স্বভাব গড়ে ওঠে। যে ব্যক্তি পরমাত্মপ্রাপ্তি উদ্দেশ্য করে শাস্ত্র ও মহাপুরুষদের সিদ্ধান্ত অনুসারে কর্ম করেন এবং যিনি পরমাত্মা প্রাপ্ত হয়েছেন—উভয়েরই (সাধক এবং সিদ্ধ মহাপুরুষদের) কর্ম জগতের পক্ষে আদর্শ, অনুসরণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় (গীতা ৩।২১)।

পরিশিষ্ট-ভাব—স্বভাব দুপ্রকার হয়—১) বিহিত (বিধিসম্মত) কর্মের স্বভাব এবং ২) নিষিদ্ধ কর্মের স্বভাব। এর মধ্যে বিহিত কর্মের স্বভাব স্বাভাবিক হওয়ায় তা হল 'স্ব-স্বভাব'। কিন্তু নিষিদ্ধ কর্মের স্বভাব আগন্তুক হওয়ায় একে 'পর-স্বভাব' বলে। বিহিত কর্মের স্বভাব সজাতীয় হওয়া জনিত নয়, কিন্তু নিষিদ্ধ কর্মের স্বভাব বিজাতীয় হওয়ায় তা জনিত (আসক্তিজনিত, কুসঙ্গজনিত) হয়। মানুষের প্রধান কর্তব্য হল নিজ স্বভাব ঠিক রাখা এবং নিষিদ্ধ কর্মের স্বভাব পরিত্যাগ করে বিহিত কর্মের স্বভাব অনুসারে কর্ম করা। ভগবান বিহিত কর্মের স্বভাব অনুসারেই নিজ নিজ বর্ণ ও ধর্ম পালন করার আদেশ দিয়েছেন।

ভগবান বলেছেন, তুমি কর্তব্য মনে করে যুদ্ধ কর অথবা আমার নির্দেশ মনে করে যুদ্ধ কর, যুদ্ধ তোমাকে করতেই হবে। আমার শরণ না নিলে তোমার অহংভাব থাকবে, যার ফলে বিহিত কর্মও আবদ্ধকারক হবে। কিন্তু যদি আমার শরণ নাও তাহলে অহংভাব থাকবে না। অহংভাবই বন্ধনকারক, যিনি প্রকৃতির বশীভূত নয়, যাঁর প্রকৃতি শুদ্ধ, এরূপ জ্ঞানী মহাপুরুষও যখন প্রকৃতি (স্বভাব) অনুসারে কর্ম করেন তখন প্রকৃতির পরাধীন অশুদ্ধ স্বভাবসম্পন্ন মানুষ প্রকৃতির বিরুদ্ধ কর্ম কেমন করে করবেন ?

※ ※ ※

সম্বন্ধ—জীব স্বয়ং পরমাত্মার অংশ আর স্বভাব প্রকৃতির অংশ ; স্বয়ং স্বতঃসিদ্ধ আর স্বভাব নিজের সৃষ্ট ; স্বয়ং চেতন আর স্বভাব জড়—তা সত্ত্বেও জীব কী করে স্বভাবের বশীভূত হয় ? তার উত্তর ভগবান পরবর্তী শ্লোকে দিয়েছেন।

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ ৬১ ॥

[**অর্জুন** (হে অর্জুন !) ; **ঈশ্বরঃ, সর্বভূতানাম্** (ঈশ্বর সমস্ত প্রাণীর) ; **হৃদ্দেশে, তিষ্ঠতি** (হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকেন) ; **মায়য়া** (নিজ মায়া দ্বারা) ; **যন্ত্রারূঢ়ানি** (শরীর রূপী যন্ত্রে আরূঢ় হয়ে থাকা) ; **সর্বভূতানি, ভ্রাময়ন্** (সমস্ত প্রাণীকে চালিত করাতে থাকেন।)]

হে অর্জুন ! ঈশ্বর সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকেন এবং নিজ মায়া দ্বারা শরীররূপী যন্ত্রে আরূঢ় হয়ে থাকা সমস্ত প্রাণীকে (তাদের স্বভাব অনুসারে) চালিত করাতে থাকেন ॥ ৬১ ॥

ব্যাখ্যা—'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং...........যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া'—এর অর্থ হল যে, যে ঈশ্বর সকলের শাসক, নিয়ামক, সকলের ভরণ-পোষণকারী এবং সকলের নিরপেক্ষ সঞ্চালক, তিনি তাঁর শক্তির দ্বারা সেইসকল প্রাণীকে চালিত করেন, যাঁরা শরীরকে 'আমি' ও 'আমার' বলে মনে করে।

যেমন, বিদ্যুৎ-চালিত যন্ত্র—রেলগাড়িতে কেউ আরোহণ করলে চলমান ট্রেন অনুসারে যেতে সে বাধ্য হয়, কিন্তু যখন সে রেলগাড়িতে আরূঢ় থাকে না, নীচে নেমে আসে, তখন তাকে আর রেলের চলার অনুসারে চলতে হয় না। তেমনই মানুষ যতক্ষণ শরীররূপী যন্ত্রের সঙ্গে 'আমি' ও 'আমার' সম্বন্ধ রাখে, ততক্ষণ

ঈশ্বর তার স্বভাব[১] অনুসারে তাকে চালিত করতে থাকেন এবং সেই ব্যক্তি জন্ম-মরণরূপ চক্রে আবর্তিত হতে থাকে।

শরীরের সঙ্গে 'আমি' ও 'আমার' বোধের সম্পর্ক হলেই রাগ-দ্বেষ উৎপন্ন হয়, যার ফলে স্বভাব অশুদ্ধ হয়। স্বভাব অশুদ্ধ হলে মানুষ প্রকৃতি বা স্বভাবের বশীভূত হয়। কিন্তু শরীর হতে সর্বতোভাবে সম্পর্ক ছিন্ন হলে যখন স্বভাব রাগ-দ্বেষবর্জিত হয়, তখন প্রকৃতির বশ্যতা থাকে না। প্রকৃতির (স্বভাবের) বশীভূত না হওয়ায় ঈশ্বরের মায়া তাকে সঞ্চালিত করে না।

এখানে একটি প্রশ্ন আসে যে, যখন ঈশ্বরই আমাদের চালিত করাচ্ছেন, ক্রিয়া করাচ্ছেন, তখন এই কাজ করা উচিত, ওই কাজ নয়—এরূপ পার্থক্য কেন ? কারণ যন্ত্রারূঢ় হওয়ায় আমরা যন্ত্র এবং তার সঞ্চালক ঈশ্বরের অধীনে থাকি, পরাধীন হয়ে যাই, তাহলে যন্ত্রের সঞ্চালক যেমন করাবেন, তেমনই তো হবে। তার উত্তর হল এইরকম—

বিদ্যুৎ-চালিত যন্ত্র যেমন নানাপ্রকার হয়ে থাকে। একই বিদ্যুতের দ্বারা চালিত হলেও যেমন কোনোটিতে বরফ জমে আবার কোনোটিতে আগুন জ্বলে অর্থাৎ একটিতে অপরটির বিপরীত কাজ হয়। কিন্তু বিদ্যুতের তাতে কোনো আগ্রহ থাকে না যে আমি শুধু বরফ জমাব অথবা অগ্নি প্রজ্বলিত করব ! যন্ত্রেরও তেমন কোনো আগ্রহ থাকে না। যন্ত্র তৈরির কারিগর যন্ত্রগুলিকে যেমনভাবে তৈরি করে, সেই অনুসারে যন্ত্রগুলির দ্বারা স্বাভাবিকভাবে আপন আপন কর্ম হয়ে থাকে। তেমনই মনুষ্য, পশু, পক্ষী, দেবতা, যক্ষ, রাক্ষস ইত্যাদি যত প্রাণী আছে, তা সবই শরীররূপ যন্ত্রে আরূঢ় এবং সেগুলি সঞ্চালিত করেন ঈশ্বর। সেই পৃথক্ পৃথক্ শরীরগুলিতে যাঁদের যেমন স্বভাব, সেই অনুযায়ী তাঁরা ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রেরণা পান এবং কার্য করেন। অর্থাৎ ওই শরীরগুলিতে আমি-আমার ভাবের সম্পর্ক মান্যকারীদের (ভালো বা মন্দ) যেমন স্বভাব হয় তাঁদের দ্বারা সেইরূপ ক্রিয়া হতে থাকে। ভালো স্বভাবের (সজ্জন) ব্যক্তিদের দ্বারা শ্রেষ্ঠ কর্ম হয় আর মন্দ স্বভাবের (দুষ্ট) ব্যক্তিদের দ্বারা নিন্দনীয় কর্ম হয়। তাই ভালো-মন্দ কাজ করানোতে ঈশ্বরের হাত নেই, এতে নিজেরই সৃষ্ট ভালো বা মন্দ স্বভাবের হাত থাকে।

বিদ্যুৎ, যন্ত্রের স্বভাব অনুসারেই যেমন তাকে চালিত করে, তেমনই ঈশ্বর প্রাণীর (শরীরে অবস্থিত) স্বভাব অনুসারে তাকে সঞ্চালিত করেন। স্বভাব যেমন হয়, কর্মও সেইরূপ হয়ে থাকে। তবে এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করার হল যে স্বভাব শোধরাতে বা খারাপ করতে সকল মানুষই স্বাধীন, কেউই কারও অধীন নয়। কিন্তু পশু-পক্ষী ইত্যাদি যত মনুষ্যেতর প্রাণী আছে তাদের নিজস্ব স্বভাব শোধরাবার বা খারাপ করার অধিকার বা স্বাধীনতা কোনোটিই নেই। নিজ নিজ উদ্ধারের জন্যই এই মনুষ্য দেহ লাভ হয়েছে, তাই এতে নিজ স্বভাব শোধন করার সম্পূর্ণ অধিকার ও স্বাধীনতা আছে। সেই স্বাধীনতার সদ্-ব্যবহার করে স্বভাব শুদ্ধ করার বা স্বাধীনতার অপব্যবহার করে স্বভাব নষ্ট করার মূল হেতু মানুষ নিজেই হয়ে থাকে।

ঈশ্বর সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থান করেন—এই কথা বলার অর্থ হল যে, যেমন পৃথিবীর সর্বত্র জল থাকলেও যেখানে কূপ থাকে, সেখান থেকেই সহজে জল পাওয়া যায়, তেমনই পরমাত্মা সর্বত্র সমভাবে পরিপূর্ণ হলেও হৃদয়ে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ হৃদয়ই হল সর্বব্যাপী পরমাত্মাকে উপলব্ধি করার বিশেষ স্থান। তেমনই তৃতীয় অধ্যায়ে সর্বব্যাপী পরমাত্মাকে যজ্ঞে (নিষ্কাম কর্মে) অবস্থিত বলা হয়েছে।—**'তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্মনিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্'** (গীতা ৩।১৫)।

বিশেষ কথা

সাধকগণ প্রায়শঃই এই ভুল করে থাকেন যে, তাঁরা ভজন, কীর্তন, ধ্যানাদি করলেও 'ভগবান দূরে অবস্থিত ; তাঁকে এখন পাওয়া যাবে না ; এখানে তিনি লভ্য নন ; আমি এখন তাঁর যোগ্য নই ; ভগবানের কৃপা নেই'। এ সব চিন্তা করে তাঁরা ভগবানের সঙ্গে দূরত্বকে দৃঢ় করতে থাকেন। এক্ষেত্রে সাধকদের এই ভেবে সতর্ক থাকতে হয় যে ভগবান যখন সমস্ত প্রাণীতেই অবস্থিত তখন তিনি আমাতেও আছেন। তিনি সর্বত্র ব্যাপ্তিস্বরূপ, তাহলে আমি যে জপ করি, সেই জপেও ভগবান আছেন ; আমি যে শ্বাস গ্রহণ করি, তাতেও তিনি বিদ্যমান ; আমার মনেও

[১]স্বভাব কারণ-শরীরে থাকে। সেই স্বভাবই সূক্ষ্ম এবং স্থূল-শরীরে প্রকটিত হয়।

ভগবান ; বুদ্ধিতেও ভগবান ; আমার 'আমি'-তেও ভগবান, সেই 'আমি'র যে আধার অর্থাৎ স্ব-স্বরূপ, তাও ভগবানের থেকে অভিন্ন অর্থাৎ 'আমি' ভাব তো দূরের বস্তু, ভগবান তার থেকেও সমীপে অবস্থিত। এইভাবে নিজের মধ্যে ভগবানকে অনুভব করেই সাধন-ভজন, জপ-ধ্যান ইত্যাদি করা কর্তব্য।

প্রশ্ন হতে পারে যে নিজের মধ্যে পরমাত্মাকে মেনে নিলে আমি এবং পরমাত্মা দুই (পৃথক্ পৃথক্) হয়—অর্থাৎ দ্বৈতাপত্তি হয়। এর উত্তর হল যে পরমাত্মাকে নিজের মধ্যে মনে করলে দ্বৈতাপত্তি হয় না, অহংভাব স্বীকার করলে যখন নিজের পৃথক্ সত্তা প্রতীত হয়, তখনই দ্বৈতাপত্তি হয়ে থাকে। পরমাত্মাকে নিজের এবং নিজের মধ্যে বলে মনে করলে তাঁর সঙ্গে অভিন্ন ভাব হয়, যার ফলে প্রেম প্রকটিত হয়।

যেমন, গঙ্গায় বন্যা হলে জল অত্যন্ত বেড়ে যায়, আবার বর্ষা না হলে তার জল পুনরায় কমে যায়। কিন্তু তার যে জলটি গর্তে থেকে যায় তা গঙ্গা থেকে পৃথক্ হয়ে যায়, তাকে বলে 'গঙ্গোত্থ'। সেই গঙ্গোত্থকে মদের সমান অপবিত্র মনে করা হয়। গঙ্গার প্রবহমান স্রোত থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ায় এটি নোংরা বা অশুদ্ধ হয়ে যায় এবং এতে নানাপ্রকার জীবাণু জন্মায়, যা বহু রোগের কারণ হয়। কিন্তু যদি আবার কখনো বন্যা হয়, তাহলে গঙ্গোত্থ গঙ্গায় মিশে যায়, ফলে তার একদেশীয়তা (পরিচ্ছিন্নতা), অপবিত্রতা, অশুদ্ধি ইত্যাদি সমস্ত দোষ দূর হয় এবং সেটি পুনরায় মহাপবিত্র গঙ্গাজলে পরিণত হয়।

তেমনই মানুষ যখন অহংভাব স্বীকার করে পরমাত্মা থেকে বিমুখ হয়, তখন তার মধ্যে পরিচ্ছিন্নতা, পরাধীনতা, জড়তা, বৈষম্য, অভাব, অশান্তি, অপবিত্রতা ইত্যাদি দোষ (বিকার) দেখা দেয়। কিন্তু যখন সে নিজ অংশী পরমাত্মার সম্মুখীন হয়, তাঁর শরণাগত হয় অর্থাৎ নিজের পৃথক্ কোনো ব্যক্তিত্ব না রাখে, তখন তার মধ্যের পার্থক্য, পরাধীনতা ইত্যাদি সকল দোষ দূর হয়। কারণ চেতনস্বরূপে কোনো দোষ থাকে না। অহংভাবকে স্বীকার করলেই দোষ আসে।

পরিশিষ্ট-ভাব—**'ভ্রাময়ন্'** কথাটির তাৎপর্য হল যে ভগবানের শক্তি দ্বারাই জগৎমাত্রের সব কিছু সঞ্চালিত হয়—**'মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে'** (গীতা ১০।৮)। ভগবান প্রাণীদের তাদের নিজ নিজ স্বভাব অনুসারে কর্মের প্রেরণা দিলেও, তাতে তাঁর নিজ আগ্রহ থাকে না। ভগবানের আগ্রহ থাকে না বলেই মানুষ নিজ কামনা-বাসনা-মমতার বশীভূত হয়ে পুণ্য ও পাপকাজ করে এবং তার ফল ভোগ করার জন্যই স্বর্গ-নরক এবং নিম্নযোনিতে গমন করে। কিন্তু যারা ভগবানের শরণাগত হয়, তাঁদের ভগবান বিশেষ প্রেরণা দান করেন। তাঁদের অহংভাব না থাকায় তাঁরা যা কিছু করেন, ভগবানের প্রেরণা অনুসারেই করেন।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—ভগবান এবার যন্ত্রারূঢ় প্রাণীদের পরাধীনতা দূর করার উপায় জানাচ্ছেন।

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥ ৬২ ॥

[ভারত (হে ভরতবংশোদ্ভব অর্জুন!) ; সর্বভাবেন (সর্বতোভাবে) ; তম্, এব (সেই ঈশ্বরেরই) ; শরণম্, গচ্ছ (শরণ গ্রহণ করো) ; তৎ, প্রসাদাৎ (তাঁর কৃপায়) ; পরাম্, শান্তিম্ (পরম শান্তি) ; শাশ্বতম্, স্থানম্ (অবিনাশী পরম পদ) ; প্রাপ্স্যসি (প্রাপ্ত হবে।)]

হে ভরতবংশোদ্ভব অর্জুন! তুমি সর্বতোভাবে সেই ঈশ্বরেরই শরণ গ্রহণ করো। তাঁর কৃপায় তুমি পরম শান্তি ও অবিনাশী পরমপদ লাভ করবে ॥ ৬২ ॥

ব্যাখ্যা—[মানুষের মধ্যে প্রায়ই এই দুর্বলতা থাকে যে যখন কোনও সাধু-মহাত্মা সশরীরে থাকেন, তখন তাঁর ওপর তার শ্রদ্ধা-বিশ্বাস এবং গুরুত্ববোধ থাকে না[১]। কিন্তু যখন তিনি থাকেন না তখন সে দুঃখ করে, হা-হুতাশ করে। তেমনই ভগবান অর্জুনের রথের ঘোড়া চালাচ্ছেন এবং তাঁর নির্দেশ পালন করছেন। সেই ভগবানই যখন অর্জুনকে বলেছেন যে আমার শরণাগত ভক্ত আমার কৃপাতে শাশ্বত পদ প্রাপ্ত হয় এবং তুমিও আমাতে চিত্ত রেখে আমার কৃপায় সকল বিঘ্ন অতিক্রম করবে, তখন অর্জুন কিছুই বলেননি। তাতে মনে হয় যে ভগবানের বাক্য অর্জুন সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করেননি। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই ভগবানকে এখানে অর্জুনকে অন্তর্যামী ঈশ্বরের শরণাগত হওয়ার কথা বলতে হয়।]

'ত্বমেব শরণং গচ্ছ'—ভগবান বলেছেন যে, যে সর্বব্যাপী ঈশ্বর সকলের হৃদয়ে বিরাজমান এবং সকলের সঞ্চালক, তুমি তার শরণাগত হও। তাৎপর্য হল যে জাগতিক উৎপত্তি-বিনাশশীল পদার্থ, বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদি কোনো কিছুর আশ্রয় না নিয়ে শুধু অবিনাশী পরমাত্মার আশ্রয়ই গ্রহণ করা কর্তব্য।

আগের শ্লোকে বলা হয়েছে যে মানুষ যতক্ষণ শরীররূপী যন্ত্রের সঙ্গে আমি-আমার সম্পর্ক রাখে, ততক্ষণ ঈশ্বর তাঁর মায়া দ্বারা তাকে পরিভ্রমণ করাতে থাকেন। এখানে **'এব'** পদের দ্বারা তা নিষেধ করে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে, শরীররূপী যন্ত্রের সঙ্গে একাত্ম না হয়ে তুমি সেই ঈশ্বরের শরণাগত হও।

'সর্বভাবেন'—সর্বভাবে শরণাগত হওয়ার অর্থ হল যে, মনে মনে সেই পরমাত্মার চিন্তা করা, শারীরিক ভাবে তাঁকে পূজা করা, প্রেমপূর্বক তাঁরই ভজন গীত করা এবং তাঁর প্রত্যেক বিধান প্রসন্নতাপূর্বক মেনে নেওয়া। সেই বিধান শরীর, ইন্দ্রিয়, মনের অনুকূলই হোক অথবা প্রতিকূল ; সেগুলি ভগবানেরই করা মনে করে অত্যন্ত প্রসন্ন হওয়া যে, আহা! আমার ওপর ভগবানের কী অশেষ কৃপা যে, আমাকে না জিজ্ঞাসা করে, আমার মন, বুদ্ধি ইত্যাদির বিপরীত জেনেও শুধু আমার হিত চিন্তায়, আমার পরম কল্যাণের নিমিত্ত তিনি এইরূপ বিধান করেছেন!

'তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্'—ভগবান প্রথমে এই কথাই বলেছিলেন যে আমার কৃপায় শাশ্বতপদ লাভ হয় (১৮।৫৬) এবং আমার কৃপায় তুমি সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করবে (১৮।৫৮)। সেই কথাই এখানে বলেছেন যে সেই অন্তর্যামী পরমাত্মার কৃপায় তুমি পরমশান্তি এবং শাশ্বত স্থান (পদ) প্রাপ্ত হবে।

অবিনাশী পরম পদকেই গীতায় 'পরা শান্তি' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এখানে ভগবান 'পরা শান্তি' ও 'শাশ্বত স্থান' (পরমপদ) দুই-ই একসঙ্গে প্রয়োগ করেছেন। সুতরাং এখানে 'পরা শান্তি'র অর্থ সংসারে সর্বতোভাবে আসক্তি ত্যাগ এবং **'শাশ্বত স্থান'**-এর অর্থ পরমপদ বলেই বুঝতে হবে।

ভগবান **'তমেব শরণং গচ্ছ'** পদে অর্জুনকে সর্বব্যাপী ঈশ্বরের শরণাগত হতে বলেছেন। এতে প্রশ্ন আসতে পারে যে তাহলে কি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর নন ? কেন-না ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর হলে, 'তাঁর শরণাগত হও'—এরূপ (পরোক্ষভাবে) বলতেন না।

তার উত্তর হল যে ভগবান সর্বব্যাপক ঈশ্বরের শরণাগতিকে **'গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরম্'** (১৮।৬৩) অর্থাৎ গুহ্য থেকেও গুহ্যতর বলেছেন, আর নিজের শরণাগতিকে **'সর্বগুহ্যতমম্'** (১৮।৬৪) অর্থাৎ সব থেকে গুহ্য বলেছেন। এর দ্বারা তো সর্বব্যাপী ঈশ্বরের থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বড় বলেই প্রমাণিত হন!

ভগবান প্রথমে বলেছিলেন যে আমি অজ (জন্মরহিত), অবিনাশী এবং সমস্ত প্রাণীর ঈশ্বর হয়েও নিজ প্রকৃতিকে অধীন করে আপন যোগমায়ার সাহায্যে প্রকটিত হই (৪।৬) ; আমি সকল যজ্ঞ এবং তপের ভোক্তা, সমগ্র লোকের মহেশ্বর এবং সকল প্রাণীর সুহৃদ্—আমাকে এইভাবে মেনে নিলে শান্তি প্রাপ্তি হয় (৫।২৯)। কিন্তু যারা আমাকে সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা এবং সবকিছুর প্রভু বলে মানে না, তাদের পতন হয় (৯।২৪)। এইরূপ অন্বয় ও ব্যতিরেক প্রণালীতেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রমাণিত হয়।

এই অধ্যায়ে **'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি'** (১৮।৬১) পদ দ্বারা অন্তর্যামী ঈশ্বর যে সকল

[১]'অতিপরিচয়াদবজ্ঞা' অর্থাৎ কারোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা অর্থাৎ অতিশয় পরিচিত হলে তার অবজ্ঞা হয় অর্থাৎ তার গুরুত্ব হ্রাস পায়।

প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত তা বলা হয়েছে এবং পঞ্চদশ অধ্যায়ে **'সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ'** (১৫।১৫) পদের দ্বারা নিজেকে তিনি সকলের হৃদয়ে অবস্থিত বলেছেন। এর তাৎপর্য হল যে অন্তর্যামী পরমাত্মা এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দুজন পৃথক্ নন, একই।

অন্তর্যামী পরমাত্মা এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন একই, তাহলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে **'তমেব শরণং গচ্ছ'** কথাটি কেন বলেছেন ? তার কারণ হল যে আগে ছাপ্পান্নতম শ্লোকে ভগবান তাঁর কৃপায় শাশ্বত অবিনাশী পদ প্রাপ্ত করার কথা বলেছেন এবং সাতান্ন-আটান্নতম শ্লোকে অর্জুনকে তার পরায়ণ হওয়ার নির্দেশ দিয়ে 'আমার কৃপায় সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করবে'—এই কথাটি বলেছেন। কিন্তু অর্জুন কোনো উত্তর দেননি, অর্থাৎ তিনি কিছুই স্বীকার করেননি। তাতে ভগবান শাসনের সুরে বলেছিলেন যে, যদি অহংকারবশতঃ তুমি আমার কথা না শোনো, তাহলে তোমার পতন হবে। উনষাট এবং ষাটতম শ্লোকে বলেছেন যে 'আমি যুদ্ধ করব না'—এইরূপ অহংকারের আশ্রয় নিয়ে তুমি যে সঙ্কল্প করেছ, তাও থাকবে না এবং স্বভাবজ কর্মে অবশ হয়ে তোমাকে যুদ্ধ করতেই হবে। ভগবান এতকিছু বললেও অর্জুন কোনো উত্তর দেননি। অতএব ভগবানকে তাই বলতে হল যে, 'তুমি যদি আমার শরণাগত হতে না চাও, তাহলে সকলের হৃদয়ে যে অন্তর্যামী অবস্থান করছেন, তুমি তাঁরই শরণাগত হও'।

প্রকৃতপক্ষে অন্তর্যামী ঈশ্বর এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বতোভাবে অভিন্ন অর্থাৎ সকলের হৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে বিরাজমান ঈশ্বরই হলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সকলের হৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে বিরাজমান ঈশ্বর।

পরিশিষ্ট-ভাব—জীব ঈশ্বরেরই অংশ, তাই ভগবান ঈশ্বরের শরণাগত হওয়ার কথা বলেছেন। ঈশ্বরের শরণাগত হলে অহং থাকে না। জীব যতক্ষণ পর্যন্ত ঈশ্বরের বশ (শরণাগত) না হয়, ততক্ষণ সে প্রকৃতির বশীভূত হয়ে থাকে। সে যতই জড়ত্বের দিকে অগ্রসর হয়, ততই তার মধ্যে আসুরী-সম্পদ আসতে থাকে আর যখন সে চিন্ময়ত্বের দিকে অগ্রসর হয় তখন তার মধ্যে দৈবী-সম্পদ প্রকাশিত হতে থাকে।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে তুমি সেই অন্তর্যামী ঈশ্বরের শরণাগত হও। একথা শুনেও অর্জুন কিছু বললেন না। তাই ভগবান পরবর্তী শ্লোকে অর্জুনকে সতর্ক করার জন্য তাঁকে স্বাধীনতা প্রদান করছেন।

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু॥ ৬৩ ॥

[**ইতি, গুহ্যাৎ, গুহ্যতরং** (এই গুহ্য হতে গুহ্যতর) ; **জ্ঞানম্** (জ্ঞান) ; **ময়া, তে, আখ্যাতম্** (আমি তোমার কাছে ব্যাখ্যা করলাম) ; **এতৎ, অশেষেণ** (এটি বিশেষভাবে) ; **বিমৃশ্য** (চিন্তা করে) ; **যথা, ইচ্ছসি** (যেমন ইচ্ছা) ; **তথা, কুরু** (তেমন করো।)]

গুহ্য হতে গুহ্যতর (শরণাগতিরূপ) তত্ত্বজ্ঞান আমি তোমার কাছে ব্যাখ্যা করলাম। এখন তুমি এটি বিশেষভাবে চিন্তা করে, যেমন ইচ্ছা তেমন করো॥ ৬৩ ॥

ব্যাখ্যা—'ইত তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া'—আগের শ্লোকে ব্যাপ্তিস্বরূপ অন্তর্যামী পরমাত্মার যে শরণাগতির কথা বলা হয়েছে, সেটিকেই এখানে **'ইতি'** পদ দ্বারা বলা হয়েছে। ভগবান বলেছেন যে এই অতি গুহ্য থেকে গুহ্যতর শরণাগতিরূপ জ্ঞান আমি তোমাকে বলেছি। কর্মযোগ 'গুহ্য' এবং অন্তর্যামী নিরাকার পরমাত্মার শরণাগতি হল 'গুহ্যতর'[১]।

'বিমৃশৈতদশেষেণ'—গুহ্য হতে গুহ্যতর শরণাগতি-

[১]যোগযুক্ত বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ কর্মফল পরিত্যাগ করে অনাময় পদ লাভ করে (২।৫১) জ্ঞানযোগে যা প্রাপ্তি হয়, কর্মযোগেও তাই প্রাপ্তি লাভ হয় (৪।৩৮) ; যোগযুক্ত মুনিগণ অতি সহজেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন (৫।৬) ; কর্মফল ত্যাগ করলে সদা বিরাজমান শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় (৫।১২) ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা কর্মযোগ পরমাত্মপ্রাপ্তির স্বতন্ত্র সাধন সিদ্ধ হয়।

রূপ জ্ঞানের কথা জানিয়ে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে, আমি প্রথমে যে ভক্তির কথা বলেছি সেটি তুমি ভালোভাবে চিন্তা করে দেখো। ভগবান এই অধ্যায়ের সাতান্ন-আটান্নতম শ্লোকে তাঁকে ভক্তির (শরণাগতির) যে কথা বলেছিলেন, তা এই **'এতৎ'** পদের অন্তর্নিহিত বলে ধরতে হবে। গীতায় যে যে স্থানে ভক্তির কথা বলা হয়েছে, সেগুলিকে **'অশেষেণ'** পদে ধরা উচিত[১]।

'বিমৃশ্যৈতদশেষেণ' কথাটি বলায় ভগবানের অত্যধিক কৃপার এক গূঢ়াভিসন্ধি আছে যে, অর্জুন যেন আমা হতে বিমুখ না হয়। অতএব সে যদি আমার বলা কথা বিশেষভাবে লক্ষ্য করে তাহলে প্রকৃত ব্যাপার অবশ্যই বুঝতে পারবে এবং সে আর আমাতে বিরূপ হবে না।

'যথেচ্ছসি তথা কুরু'—আগে বলা সমস্ত কথাগুলি সম্পূর্ণভাবে চিন্তা করে, তারপর তোমার যেমন ইচ্ছা তাই করো। তুমি যা করতে চাও তাই করো—এ কথাটি বলার মধ্যেও ভগবানের আত্মীয়তা, কৃপা ও হিতৈষীভাব প্রত্যক্ষ করা যায়।

আগে **'বক্ষ্যাম্যশেষতঃ'** (৭।২), **'ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে'** (৯।১), **'বক্ষ্যামিহিত-কাময়া'** (১০।১) ইত্যাদি শ্লোকে ভগবান অর্জুনের মঙ্গলের কথা বলেছেন, কিন্তু এতে ভগবানের অর্জুনের ওপর 'সাধারণ কৃপা' পরিলক্ষিত হয়।

'ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি' (১৮।৫৮)—এই শ্লোকে অর্জুনকে ধমক দেওয়ায় ভগবানের 'বিশেষ কৃপা' এবং আত্মীয়তা ভাব লক্ষ্য করা যায়।

এখানে **'যথেচ্ছসি তথা কুরু'** কথাটি বলে ভগবান যে তাঁর আপন-ভাব ত্যাগ করছেন, তাতে তাঁর **'অত্যন্ত কৃপা'** এবং আত্মীয়তা পরিপূর্ণ রয়েছে। কারণ ভক্ত ভগবানের ধমক সহ্য করতে পারেন, কিন্তু তাঁকে ত্যাগ করার কথা ভাবতে পারেন না। তাই **'ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি'** ইত্যাদি

এইজন্য কর্মযোগকে 'গুহ্য' বলা হয়।

জড়ত্বের থেকে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করে নিরাকার পরমাত্মার শরণ গ্রহণ করা—এটি কর্মযোগের থেকেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ, তাই একে বলা হয় 'গুহ্যতর'।

সূর্যকে আমিই উপদেশ দিয়েছিলাম, সেই উপদেশ আমি তোমাকেও বলছি (৪।৬) ; সমস্ত জগতে আমি ব্যাপ্তি স্বরূপ হয়ে আছি (৯।৪) ; ক্ষরের অতীত এবং অক্ষরের থেকে উত্তম সেই 'পুরুষোত্তম' আমিই (১৫।১৮) ; ইত্যাদি বাক্যে ভগবান তাঁর ভগবৎ-স্বরূপ প্রকটিত করেছেন, তাই এগুলিকে বলা হয় 'গুহ্যতম'।

তুমি শুধু আমারই শরণাগত হও, তারপরে তোমাকে আর কিছুই করতে হবে না, আমি তোমাকে সর্ব পাপ হতে মুক্ত করে দেব, তুমি শোক বা চিন্তা কোরো না (১৮।৬৬)—এইরূপ নিজ শরণাগতির কথা জানানো হল 'সর্বগুহ্যতম'।

যাতে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ইত্যাদি সমস্ত প্রকার সাধনা বর্ণনা করা হয়েছে, সেই যোগশাস্ত্রকে 'পরমগুহ্য' আখ্যা দেওয়া হয়েছে (১৮।৬৮, ৭৫)।

[১]গীতায় এইসব শ্লোকে ভক্তির কথা বলা হয়েছে—সকল যোগীর মধ্যে ভক্তিযোগী শ্রেষ্ঠ (৬।৪৭) ; আমার শরণাগত মায়া অতিক্রম করে (৭।১৪) ; সবকিছুই ভগবান বাসুদেব—এইভাবে আমার (ভগবানের) শরণাগত মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ (৭।১৯) ; অনন্য-ভক্তি দ্বারা আমি সুলভে প্রাপ্ত হই (৮।১৪) ; অনন্য-ভক্তির সাহায্যে পরমপুরুষকে লাভ হয় (৮।২২) ; দৈবী-সম্পদ আশ্রিত মহাত্মাগণ অনন্যমনে আমার ভজনা করেন (৯।১৩) ; দৃঢ় সঙ্কল্পযুক্ত ভক্ত নিরন্তর কীর্তন করেও আমাকে নমস্কার করে ভক্তিপূর্বক আমার উপাসনা করে থাকেন (৯।১৪) ; অনন্য ভক্তের যোগক্ষেম আমি বহন করে থাকি ; ভক্তদের প্রেম সহকারে প্রদত্ত পত্র, পুষ্প, ফল ইত্যাদি আমি ভক্ষণ করি (৯।২৬) ; তুমি যা কর, যজ্ঞ কর বা তপস্যা কর, তা সবই আমাতে অর্পণ কর (৯।২৭) ; সমস্ত কর্ম আমাতে অর্পণ করলে তুমি শুভাশুভ কর্মফলের বন্ধন থেকে মুক্ত হবে (৯।২৮) ; মৎচিত্ত হও, মদ্‌ভক্ত হও, আমার পূজা কর ও আমাকে নমস্কার কর (৯।৩৪) ; সর্ব প্রকারে আমাতে চিত্ত রাখলে আমি সেই ভক্তের অজ্ঞানতা দূর করি, যার ফলে সে আমাকে প্রাপ্ত হয় (১০।৯-১১) ; অনন্য-ভক্তি দ্বারাই আমাকে দেখা বা জানা সম্ভব এবং আমাতে প্রবিষ্ট হওয়া সম্ভব (১১।৫৪) ; অনন্য-ভক্তিসম্পন্ন ভক্ত আমাকেই প্রাপ্ত হন (১১।৫৫) ; আমার ভজনাকারী ভক্ত অতি উত্তম যোগী (১২।২) ; যে ব্যক্তি সমস্ত কর্ম আমাতে অর্পণ করে মৎপরায়ণ হয়, তাকে আমি অতি শীঘ্র উদ্ধার করি (১২।৬-৭) ; তুমি আমাতে মন ও বুদ্ধি অর্পণ কর, তাহলে আমাকে প্রাপ্ত হবে (১২।৮) ; অব্যভিচারী ভক্তিযোগে মানুষ গুণাতীত হয় (১৪।২৬) ; সর্বভাবে আমার ভজনাকারী ভক্ত সর্ববিদ্ হয় (১৫।১৯) ইত্যাদি।

বলতেও অর্জুনের ওপর তার তেমন কোনো প্রভাব পড়েনি, যত প্রভাব পড়েছে **'যথেচ্ছসি তথা কুরু'** কথাটি বলায়। একথা শুনে অর্জুন ভয় পেয়ে গেলেন যে, ভগবান তাহলে আমাকে ত্যাগ করছেন ! কেন-না আমি অত্যন্ত ভুল করেছি, ভগবান আমাকে প্রিয়ভাবে কত বুঝিয়েছেন, আপনবোধে ধমক দিয়েছেন আর অন্তর্যামীর শরণাগতির কথা বলাতেও আমি কোনো উত্তর দিইনি, তাই তিনি রাগ করে 'যা ইচ্ছে তাই কর'—বলেছেন। এখন আমি আর কিছু বলার যোগ্য নই !—এই ভেবে অর্জুন অত্যন্ত দুঃখিত হলেন, তাই দেখে অর্জুনের জিজ্ঞাসা ছাড়াই কৃপালু ভগবান সর্বগুহ্যতম কথা বলতে আরম্ভ করলেন, পরবর্তী শ্লোকে তার বর্ণনা করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট-ভাব—'যথেচ্ছসি তথা কুরু'—এই কথার দ্বারা ভগবানের তাৎপর্য অর্জুনকে ত্যাগ করা নয় বরং তাকে বিশেষভাবে নিজের প্রতি আকর্ষিত করা ; যেমন—বল ছোঁড়া হয় বিশেষভাবে তাকে গ্রহণ করার জন্য, ত্যাগ করার জন্য নয়। তাৎপর্য হল এই যে আগের শ্লোকে অন্তর্যামী নিরাকার ঈশ্বরের শরণাগতির কথা বলে এবার ভগবান অর্জুনকে তাঁর দিকে অর্থাৎ সগুণ সাকারের দিকে আকর্ষণ করতে চাইছেন, যাতে অর্জুন সমগ্রপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত না থাকেন। নিরাকারে সাকার অন্তর্গত হয় না, কিন্তু সাকারে নিরাকার অন্তর্ভুক্ত থাকে।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে ভগবান ***'বিমৃশ্যৈতদশেষেণ'*** *পদে অর্জুনকে বলেছেন যে আমার সম্পূর্ণ উপদেশটির সার বুঝে নেবে। কিন্তু ভগবানের সম্পূর্ণ উপদেশের সার বোঝা অর্জুনের পক্ষে অত সোজা নয় ! কারণ নিজ উপদেশের সারকথা জানানো বক্তার পক্ষে যত সহজ, শ্রোতার পক্ষে তা বুঝে নেওয়া তত সহজ নয়। দ্বিতীয়তঃ, 'যেমন ইচ্ছা তেমন করো'—ভগবানের মুখে এইভাবে দায়িত্ব ত্যাগ করার কথা শুনে অর্জুন খুব হতচকিত হলেন, তাই পরবর্তী দুটি শ্লোকে ভগবান তাঁর প্রিয় সখা অর্জুনকে আশ্বস্ত করেছেন।*

সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥ ৬৪ ॥

[**সর্বগুহ্যতমম্** (সর্বাপেক্ষা গুহ্যতম) ; **বচঃ, ভূয়ঃ** (বাক্য এবার) ; **মে, শৃণু** (আমার কাছ থেকে শোনো) ; **মে, দৃঢ়ম্** (আমার অত্যন্ত) ; **ইষ্টঃ, অসি** (প্রিয়) ; **ততঃ, ইতি** (তাই এই) ; **হিতম্, তে** (কল্যাণের কথা তোমাকে) ; **বক্ষ্যামি** (বলছি।)]

এবার তুমি সর্বাপেক্ষা গুহ্যতম বাক্য আমার নিকট থেকে আবার শোনো। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, তাই এই কল্যাণের কথা আমি তোমাকে বলছি ॥ ৬৪ ॥

ব্যাখ্যা—**'সর্বগুহ্যতমং ভূয়ং শৃণু মে পরমং বচঃ'**—আগের তেষট্টিতম শ্লোকে ভগবান গুহ্য (কর্মযোগের) এবং গুহ্যতর (অন্তর্যামী নিরাকারের শরণাগতির) কথা বলেছেন এবং **'ইদং তু তে গুহ্যতমং'** (৯।১) ও **'ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রম্'** (১৫।২০)—এই পদগুলিতে গুহ্যতম (নিজ প্রভাবের) কথা বলেছেন, কিন্তু গীতায় এর আগে আর কোথাও সর্বগুহ্যতম কথাটি বলেননি। এখন অর্জুনের ব্যাকুলতা দেখে ভগবান বলেছেন যে, আমি সর্বগুহ্যতম অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা গোপনীয় কথাটি তোমাকে আবার বলছি, তুমি আমার পরম, সর্বশ্রেষ্ঠ বাক্য শোনো।

এই শ্লোকে **'সর্বগুহ্যতমম্'** পদে ভগবান বলেছেন যে, একথা সকলের সামনে প্রকাশিত করার নয় এবং সাতষট্টিতম শ্লোকে **'ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন'** পদে ভগবান বলেছেন যে এই কথা অসহিষ্ণু এবং অভক্ত ব্যক্তিদের কখনো বলবে না। এইভাবে দুপ্রকারে নিষেধ করে মাঝখানে (ছেষট্টিতম শ্লোকে) **'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'**—এই সর্বগুহ্যতম কথাটি বলেছেন। দুভাবে নিষেধ করার অর্থ হল এই যে এটি (১৮।৬৬) সমগ্র গীতার মধ্যে অত্যন্ত রহস্যময়

বিশেষ উপদেশ[১]।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে **'ধর্মসম্মূঢ়চেতাঃ'** কথাটি বলে অর্জুন নিজেকে ধর্ম নিরূপণের অযোগ্য মনে করে ভগবানকে জিজ্ঞাসা করেছেন এবং তাঁর শিষ্য হয়ে তাঁকে শিক্ষা প্রদানের জন্য অনুরোধ করেছেন। তাই ভগবান এখানে (১৮।৬৬) বলেছেন যে তুমি নিজের ওপর ধর্ম নিরূপণ করার ভার নিয়ো না, তা আমাকে অর্পণ করো এবং অনন্যভাবে আমার শরণ নাও। তোমার মনে যে পাপের ভয় রয়েছে, সেসব থেকে আমি তোমাকে মুক্ত করে দেব। তুমি সমস্ত চিন্তা পরিত্যাগ করো। এই হল ভগবানের **'সর্বগুহ্যতম পরম বচন'**।

'ভূয়ঃ শৃণু'র অর্থ হল যে আমি একথা আগেও অন্য ভাবে বলেছি, কিন্তু তুমি লক্ষ্য করোনি। সুতরাং আমি আবার সেই কথা বলছি, তুমি এবার বিশেষভাবে লক্ষ্য করো।

এই সর্বগুহ্যতম কথাটি ভগবান প্রথমে **'মৎপরঃ...... মচ্চিত্তঃ সততং ভব'** (১৮।৫৭) এবং **'মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি'** (১৮।৫৮) পদ দুটিতে বলেছিলেন কিন্তু অর্জুন সেই কথাগুলি লক্ষ্য করেননি। তাই পুনরায় সেই কথায় অর্জুনের লক্ষ্য ফেরাবার জন্য এবং তার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য ভগবান এখানে **'সর্বগুহ্যতমম্'** পদটি ব্যবহার করেছেন।

'ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি'—তার আগে ভগবান বলেছিলেন, যেমন খুশি তেমন করো। যিনি অনুগামী, নির্দেশপালনকারী, শরণাগত, তাঁকে এমন কথা বলার মতো আর কী শাস্তি হতে পারে ! তাই একথা শুনে অর্জুনের মনে ভয় হল যে, ভগবান আমাকে বুঝি ত্যাগ করছেন। সেই ভয় দূর করার জন্য ভগবান এখানে বলেছেন, তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু[২]। যদি অর্জুনের মনে এরূপ ভয় বা সন্দেহ না হত তাহলে ভগবানের 'তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় সখা' একথা বলার প্রয়োজন কী ? আশ্বাস তখনই দিতে হয়, যখন অপরের মনে ভয়, সন্দেহ বা চঞ্চলতা দেখা দেয়।

'ইষ্ট' কথাটি বলার অন্য অর্থ হল যে ভগবান তাঁর শরণাগত ভক্তকে নিজ ইষ্ট বলে মেনে থাকেন। ভক্ত যখন সবকিছু পরিত্যাগ করে ভগবানকেই তাঁর ইষ্ট বলে মেনে নেন, তখন ভগবানও তাঁকে ইষ্ট বলে মনে করেন। কারণ ভক্তির ব্যাপারে ভগবানের নিয়ম হল—**'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'** (গীতা ৪।১১) অর্থাৎ যে ভক্ত যেমনভাবে আমার শরণ গ্রহণ করেন, আমি সেইভাবে তাঁকে আশ্রয় দিয়ে থাকি। ভগবানের কাছে ভক্তের থেকে প্রিয় আর কেউ নেই। ভাগবতে ভগবান উদ্ধবকে বলেছেন—'তোমার মতো প্রেমিক-ভক্ত আমার যত প্রিয় ব্রহ্মা, শঙ্কর, বলরাম এমনকি আমার হৃদয়ে অবস্থিত শ্রীমতী লক্ষ্মী এবং আমার আত্মাও তত প্রিয় নয়[৩]।'

---

[১]দশম অধ্যায়ের প্রারম্ভে ভগবান 'ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ' কথাটি বলেছেন এবং এখানে 'সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু যে পরমং বচঃ' বলেছেন। এই দুয়ের মধ্যে কেবল 'এব মহাবাহো'র স্থানে 'সর্বগুহ্যতমম্' পদটি এসেছে অর্থাৎ শুধু ছটি অক্ষরের পরিবর্তন হয়েছে, অন্য দশটি অক্ষর একই আছে। পূর্বে 'ভূয়' এবং 'মহাবাহো' বলে 'মচ্চিত্তা' (১০।৯) বলেছেন আর এখানে 'মচ্চিতঃ' (১৮।৫৭-৫৮) বলে 'সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ' বলেছেন। কিন্তু 'মচ্চিত্তাঃ' এবং 'মচ্চিত্তে' একটু পার্থক্য আছে। ওইখানে 'মচ্চিত্তাঃ'-তে প্রথম পুরুষ প্রয়োগ করে সাধারণভাবে সকলের জন্যই বলেছেন, আর এখানে 'মচ্চিত্তঃ'-তে মধ্যম পুরুষ প্রয়োগ করে অর্জুনকে বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। ওইখানেও বলেছেন 'আমার কৃপায় অজ্ঞানতা দূর হবে'; এখানেও বলেছেন 'আমার কৃপায় তুমি সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করবে'।

ওইখানে 'যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া' (১০।১) বলেছেন আর এখানে বলেছেন 'ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্'। ওখানে 'মন্মনা ভব ....' (৯।৩৪) বলে অব্যবহিতরূপে (এক নাগাড়ে, কাছেই) 'ভূয়ঃ এবং মহাবাহো.....' বলেছেন, আর এখানে 'সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ......' বলে অব্যবহিত রূপে 'মন্মনা ভব..........' (১৮।৬৫) কথাটি বলেছেন।

'সর্বগুহ্যতমম্' পদটি যেমন গীতায় একবারই এসেছে, তেমনই 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'—এই বাক্যটিও একবারই মাত্র উদ্ধৃত হয়েছে।

[২]সাসতি করি পুনি করহিঁ পসাউ। নাথ প্রভুন্হ কর সহজ সুভাউ।। (শ্রীরামচরিতমানস ১।৮৯।২)

[৩]ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ। ন চ সংকর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৪।১৫)

'দৃঢ়ম্' কথাটির অর্থ হল যে, তুমি যখন একবার বলেছ যে 'আমি আপনার শরণাগত' (২।৭), তখন আর তোমার একেবারেই ভয় করা উচিত নয়। কারণ যে আমার শরণাগত হয়ে একবার সত্য করে বলে যে 'আমি আপনারই' আমি তাকে সবকিছু থেকে নির্ভয় (সুরক্ষিত) করে থাকি—এই আমার ব্রত[1]।

'ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্'—তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় সখা, তাই তোমাকে আমার হৃদয়ের অত্যন্ত গোপনীয় এবং শ্রেষ্ঠ কথা বলব। দ্বিতীয়তঃ, আমি যে শরণাগতির কথা বলব, তার অর্থ এই নয় যে তুমি আমার শরণাগত হলে আমার কিছু লাভ হবে, বরং এতে তোমারই কল্যাণ হবে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে প্রাণীমাত্রেরই অন্য কারও সাহায্য না নিয়ে শুধু ভগবানেরই আশ্রিত থাকতে হয় এবং এতেই প্রাণীর নিশ্চিত কল্যাণ হয়।

ভগবানের শরণাগত হওয়া ছাড়া জীবের অন্য কোথাও বিন্দুমাত্র কল্যাণ হয় না। কারণ জীব সাক্ষাৎ পরমাত্মার অংশ। তাই সে পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কারও সাহায্য নিলে তা টেঁকে না। জগতের কোনো বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা, পরিস্থিতি যখন স্থির থাকে না, তখন অন্য কারও সাহায্য কীভাবে স্থির থাকবে? তাদের সাহায্য থাকে না, শুধু চিন্তা, শোক, দুঃখ থেকে যায়! যেমন আগুন থেকে কয়লা দূর হলে তা কালো হয়ে যায় 'কয়লা হোয় নহী উজ্জ্বলা, সৌমন সাবুন লগায়।' অর্থাৎ কয়লা যতই সাবান দিয়ে পরিষ্কার করা হোক, তা কালোই থাকবে। কিন্তু সেটি যখন পুনরায় আগুনে দেওয়া হয় তখন তা জ্বলন্ত অঙ্গার (অগ্নি) হয়ে চমক দেয়। তেমনই জীব ভগবানে বিমুখ হলে বারংবার জন্মায় ও মৃত্যুমুখে পতিত হয় ও দুঃখ পায়। কিন্তু যখন ভগবানের সম্মুখীন হয় অর্থাৎ অনন্যভাবে তাঁর শরণাগত হয়, তখন সে ভগবদ্স্বরূপ হয়ে ওঠে এবং চমক দেয় অর্থাৎ সংসারমাত্রের পক্ষেই কল্যাণকারী হয়ে ওঠে।

পরিশিষ্ট-ভাব—**'তমেব শরণং গচ্ছ'** (১৮।৬২)—এই কথাটিতে নিরাকারের শরণাগতির কথা বলা হয়েছে আর **'মামেকং শরণং ব্রজ'**—কথাটিতে সাকারের শরণাগতির কথা আছে। নিরাকারের শরণাগত হলে মুক্তি হয়, আর সাকারের শরণাগত হলে মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রেমও প্রাপ্তি হয়। তাই সাকারের শরণাগতিকে বলা হয় **'সর্বগুহ্যতম'**। ভগবান ভক্তির প্রসঙ্গেই 'পরম বচন' বলেছেন। দশম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকেও ভগবান বলেছেন—**'শৃণু মে পরমং বচঃ'**।

অর্জুন ভগবানকে বলেছেন যে আমি আপনার শিষ্য—**'শিষ্যস্তেঽহম্'** (২।৭), কিন্তু ভগবান বলছেন যে, তুমি আমার ইষ্ট অর্থাৎ মিত্র—**'ইষ্টোঽসি'**। অর্থাৎ গুরু শিষ্য তৈরি করেন, কিন্তু ভগবান শিষ্য তৈরি না করে তাঁকে নিজের মিত্র করলেন।

ভগবানের প্রত্যেক কথাই কল্যাণকর হয়, কিন্তু তার মধ্যেও বিশেষভাবে কল্যাণের কথা হওয়ায় ভগবান বলেছেন—**'ততো বক্ষ্যাসি তে হিতম্'**।

❋ ❋ ❋

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ ৬৫ ॥

[**মদ্ভক্তঃ, ভব** (আমার ভক্ত হও) ; **মন্মনাঃ** (আমাতে চিত্ত প্রদান করো) ; **মদ্‌যাজী** (আমাকে পূজা করো) ; **মাম্, নমস্কুরু** (আমাকে নমস্কার করো) ; **মাম, এব, এষ্যসি** (আমাকেই পাবে) ; **তে, সত্যম্** (তোমার কাছে সত্য) ; **প্রতিজানে** (প্রতিজ্ঞা করে বলছি) ; **মে, প্রিয়ঃ, অসি** (আমার প্রিয় হও।)]

তুমি আমার ভক্ত হও (ভক্তি রাখ), আমাতে চিত্ত প্রদান করো, আমাকে পূজা করো এবং আমাকে নমস্কার করো। এরূপ করলে তুমি আমাকেই পাবে—আমি তোমার কাছে সত্য প্রতিজ্ঞা করে একথা বলছি ; কেন-না তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়॥ ৬৫ ॥

[1] সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে। অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্‌ব্রতং মম॥ (বাল্মীকিরামায়ণ ৬।১৮।৩৩)

ব্যাখ্যা—**'মন্তক্তঃ'**—সর্বপ্রথমে সাধকের নিজের অহংভাবকে 'আমি ভগবানের' এই বোধে পরিবর্তিত করা উচিত । কারণ অহংবোধের পরিবর্তন না হলে সাধনা সহজ হয় না । অহংবোধ পরিবর্তিত হলে সাধনা সহজে এবং স্বাভাবিকভাবে হতে থাকে। তাই সাধকের সর্বপ্রথম **'মন্তক্ত'** হওয়া উচিত।

কারও শিষ্যত্ব গ্রহণ করলে অহংবোধ এরূপ পরিবর্তিত হয় যে 'আমি গুরু মহারাজের শিষ্য'। বিবাহের পর কন্যা তার অহং পরিবর্তন করে যে 'আমি তো শ্বশুর বাড়ির লোক', আর পিতার কুলের সঙ্গে সম্পর্ক একেবারেই চলে যায়। সাধকেরও এইভাবে নিজের অহংবোধ বদলে ফেলা উচিত যে 'আমি তো ভগবানেরই আর ভগবানই আমার ; আমি সংসারের নই, সংসারও আমার নয়।' [অহংবোধ পরিবর্তিত হলে মমতাও স্বতঃই পরিবর্তিত হয়।]

'মন্মনা ভব'—উপরোক্তভাবে নিজেকে ভগবানের বলে মেনে নিলে স্বাভাবিকভাবেই ভগবানে মন স্থিত হয়। কারণ যেটি নিজের, তা স্বভাবতঃই প্রিয় বলে মনে হয় আর যা প্রিয় বলে মনে হয়, তাতে স্বাভাবিকভাবে মন আকৃষ্ট হয়। সুতরাং ভগবানকে নিজের মনে করায় ভগবানকে স্বতঃই প্রিয় মনে হয়। তখন স্বাভাবিকভাবে মনে মনে ভগবানের নাম, গুণ, প্রভাব, লীলা ইত্যাদির চিন্তা (পর্যালোচনা) হতে থাকে এবং তাঁর নামের জপ ও ধ্যান অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে হতে থাকে।

'মদ্‌যাজী'—অহংবোধের পরিবর্তন হলে অর্থাৎ নিজেকে ভগবানের বলে মেনে নিলে সংসারের সমস্ত কাজই ভগবানের সেবারূপে পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ সাধক আগে যেসব সাংসারিক কাজকর্ম করতেন সেগুলিই এখন ভগবানের কাজ হয়ে ওঠে। ভগবানের সম্বন্ধ যতই দৃঢ় হতে থাকে, ততই সাধকের সেবা-ভাব পূজা-ভাবে পরিণত হতে থাকে। তখন তিনি সংসারের কাজই করুন, বা ঘরের কাজ করুন, বা শরীরের কাজ করুন, উচ্চ-নীচ যে কোনো কাজই করুন না কেন, তাতে ভগবানের পূজার ভাবই বজায় থাকে। তাঁর দৃঢ় ধারণা হয় যে ভগবানের পূজা ব্যতীত তাঁর আর কোনো কাজই নেই।

'মাং নমস্কুরু'—ভগবানের চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে সর্বতোভাবে ভগবানে সমর্পিত হওয়া উচিত। 'আমি প্রভুর চরণে পতিত আছি'—এইরূপ মনোভাব নিয়ে যা কিছু অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতি উপস্থিত হয়, সেগুলিকে ভগবানের মঙ্গলময় বিধান মনে করে প্রসন্ন থাকা উচিত।

ভগবান আমার জন্য যা কিছু বিধান করবেন, তা মঙ্গলজনকই হবে। সমগ্র পরিস্থিতি আমার বোধে আসুক বা না আসুক—সে কথা আলাদা, কিন্তু ভগবানের বিধান আমার পক্ষে যে কল্যাণকরই হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং যা কিছু হচ্ছে, সেগুলি আমার কর্মের ফল নয়, ভগবানই কৃপা করে আমার মঙ্গলের জন্য এইসব বিধান করেছেন। কারণ ভগবান প্রাণীমাত্রেরই পরম সুহৃদ, তাই তিনি যা কিছু বিধান করেন, সেগুলি জীবের কল্যাণের জন্যই করে থাকেন। তাই ভগবান অনুকূল বা প্রতিকূল পরিস্থিতি প্রেরণ করে প্রাণীদের পাপ-পুণ্য নাশ করে, তাদের পরম শুদ্ধ করে নিজ পাদপদ্মে আশ্রয় দেন—এই ভাব দৃঢ়তার সঙ্গে মনে রাখাই হল ভগবানের চরণে নমস্কার জানানো।

'মামেবৈশ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে'—ভগবান বলেছেন যে এইভাবে আমার ভক্ত হলে, মৎচিত্ত হলে, আমার পূজা করলে আর আমাকে নমস্কার করলে তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হবে অর্থাৎ আমাতে নিবাস করবে[১]—আমি একথা সত্য প্রতিজ্ঞাপূর্বক বলছি। কারণ তুমি আমার প্রিয়।

'প্রিয়োঽসি মে' কথাটি বলার অর্থ হল যে জীবমাত্রের ওপরই ভগবানের অত্যধিক স্নেহ থাকে। তাঁর অংশ হওয়ায় কোনো জীবই ভগবানের অপ্রিয় নয়। তিনি জীবগণকে চুরাশী লক্ষ যোনিতেই প্রেরণ করুন বা নরকে প্রেরণ করুন, তাঁর উদ্দেশ্য থাকে জীবগণকে পবিত্র করে তোলা। জীবগণের প্রতি ভগবানের এই যে বিধান, তা তাঁর ভালোবাসারই দ্যোতক। এটি প্রকট করার জন্য ভগবান অর্জুনকে জীবমাত্রের প্রতিনিধি রূপে **'প্রিয়োঽসি মে'** কথাটি বলেছেন।

জীবমাত্রেই ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। জীবই শুধু ভগবানের থেকে বিমুখ হয়ে প্রতিক্ষণ বিনাশের পথে যাওয়া এই জগৎ-সংসার (ধন-সম্পত্তি, আত্মীয়-স্বজন,

[১]ভগবানের ভক্ত হওয়া, তাঁতে চিত্ত নিবিষ্ট করা, তাঁর পূজন করা এবং তাঁকে নমস্কার করা—এই চারটি সাধনের মধ্যে একটিও সম্যক্‌ভাবে করলে শেষ তিনটির ফলও স্বতই লাভ হয়।

শরীর-ইন্দ্রিয়াদি, মন-বুদ্ধি ইত্যাদি)-কে নিজের বলে মনে করতে থাকে, কিন্তু সংসার কখনো জীবকে নিজের বলে মনে করেনি। জীবই নিজে সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে। সংসার প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তনশীল আর জীব নিত্য অপরিবর্তনশীল। জীব এই প্রতিমুহূর্ত পরিবর্তনশীল সংসারকে ভুল করে নিত্য বলে মেনে নেয়। এইজন্যই যার সঙ্গে সম্বন্ধ পাতানো হয়েছে সেই বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদি না থাকলেও মেনে নেওয়া সেই সম্বন্ধ থেকে যায়। এই মেনে নেওয়া সম্পর্কই অনর্থের হেতু। এই সম্বন্ধ মানা বা না-মানাতে সকলেই স্বাধীন। অতএব এই মেনে নেওয়া সম্পর্ক পরিত্যাগ করে, যার সঙ্গে আমাদের প্রকৃত ও নিত্য সম্পর্ক আছে সেই ভগবানের শরণাগত হওয়া উচিত।

পরিশিষ্ট-ভাব—অর্জুন ভগবানকে লাভ করেছেন। সুতরাং এইস্থানে '**মামেবৈষ্যসি**' বলার তাৎপর্য হল যে তুমি সমগ্রকে ('মাম্') লাভ করবে, যে কথা ভগবান সপ্তম অধ্যায়ের আরম্ভে বলেছেন—'**অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যাসি তচ্ছৃণু**'। আর তোমার আমাতে আপন-ভাব জেগে উঠবে, যার জন্য ভগবান সপ্তম অধ্যায়ে বলেছেন—'**জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্**' (৭।১৮), '**প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ**' (৭।১৭)।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—পূর্বের দুটি শ্লোকে অর্জুনকে আশ্বাস প্রদান করে পরবর্তী শ্লোকে ভগবান তাঁর উপদেশের অত্যন্ত গোপনীয় সার কথাটি জানাচ্ছেন।

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ৬৬ ॥

[**সর্বধর্মান্** (সমস্ত ধর্মের আশ্রয়) ; **পরিত্যজ্য** (পরিত্যাগ করে) ; **একম্, মাম্** (কেবলমাত্র আমার) ; **শরণম্, ব্রজ** (শরণ গ্রহণ করো) ; **অহম্, ত্বাৎ** (আমি তোমাকে) ; **সর্বপাপেভ্যঃ** (সমস্ত পাপ থেকে) ; **মোক্ষয়িষ্যামি** (মুক্ত করবো) ; **মা, শুচঃ** (তুমি শোক কোরো না।)]

সমস্ত ধর্মের আশ্রয় পরিত্যাগ করে তুমি কেবলমাত্র আমার শরণ গ্রহণ করো। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করবো, তুমি শোক কোরো না॥ ৬৬ ॥

ব্যাখ্যা—'**সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ**'—ভগবান বলেছেন যে, সকল ধর্মের আশ্রয়—ধর্ম নিরূপণের বিচার পরিত্যাগ করে অর্থাৎ কী করতে হবে, কী করতে হবে না—এসব কথা বাদ দিয়ে শুধু আমারই শরণাগত হও।

স্বয়ং ভগবানের শরণাগত হওয়া—এ হল সকল সাধনার সারকথা। শরণাগত ভক্তের তখন আর কোনো কিছু করার বাকি থাকে না ; যেমন—পতিব্রতা নারীর নিজের কোনো কাজ থাকে না, সে নিজ দেহের পরিচর্যাও করে স্বামীরই জন্য। সে গৃহ, আত্মীয়-স্বজন, বস্ত্র, পুত্র-কন্যা এবং নিজ শরীরও নিজের বলে মনে করে না, সবই পতির বলে মনে করে। অর্থাৎ পতিব্রতা পত্নী যেমন পতিপরায়ণ হয়ে পতির গোত্রে নিজ গোত্র মিলিয়ে নেয় এবং পতিগৃহেই বাস করে, তেমনই শরণাগত ভক্তও তাঁর দেহের বলে মানা গোত্র, জাতি, নাম ইত্যাদি ভগবদ্পাদপদ্মে অর্পণ করে নির্ভয়, নিঃশোক, নিশ্চিন্ত ও নিঃশঙ্ক হয়ে থাকেন।

গীতানুসারে '**ধর্ম**' শব্দটি এখানে কর্তব্য-কর্মের বাচক। কারণ এই অধ্যায়ের একচল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশতম শ্লোক পর্যন্ত 'স্বভাবজ কর্ম' বলা হয়েছে, পরে সাতচল্লিশতম শ্লোকে পূর্বার্ধে 'স্বধর্ম' শব্দ উল্লেখ হয়েছে। পরে ওই শ্লোকেরই শেষে ও আটচল্লিশতম শ্লোকে 'কর্ম' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আদি ও অন্তে '**কর্ম**' শব্দটি উদ্ধৃত হয়েছে এবং মধ্যস্থলে '**স্বধর্ম**' শব্দটি এসেছে, তাই এতে স্বতঃই '**ধর্ম**' শব্দটি যে কর্তব্য-কর্মের বাচক তা প্রমাণিত হয়।

এখানে প্রশ্ন আসে যে '**সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য**' পদটির দ্বারা কি ধর্ম অর্থাৎ কর্তব্য-কর্মকে স্বরূপতঃ (বাহ্যতঃ) ত্যাগ বলে মেনে নেওয়া যায় ? তার উত্তর হল কর্তব্য-কর্ম স্বরূপতঃ ত্যাগ করা গীতানুসারেও উচিত নয় এবং এই

প্রসঙ্গ অনুযায়ীও উচিত নয়, কারণ ভগবানের এই কথায় অর্জুন তাঁর কর্তব্য পরিত্যাগ করেননি, বরং **'করিষ্যে বচনং তব'** (১৮।৭৩) বলে ভগবানের নির্দেশ অনুসারে কর্তব্য পালন করতে স্বীকার করেছেন। শুধু স্বীকারই নয়, তিনি ক্ষাত্রধর্মানুসারে যুদ্ধও করেছেন। সুতরাং উপরিউক্ত পদে ধর্ম বা কর্তব্য পরিত্যাগের কথা বলা হয়নি। ভগবানও তা কেন বলবেন ? ভগবান এই অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে বলেছেন যে যজ্ঞ-দান-তপ ও নিজ নিজ বর্ণাশ্রমের যেসব কর্তব্য আছে, সেগুলি ত্যাগ করা কখনো উচিত নয়, বরং সেগুলি অবশ্য পালনীয়[১]।

গীতা সম্পূর্ণ অধ্যয়ন করলে জানা যায় যে, মানুষের কোনো অবস্থাতেই কর্তব্য-কর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়। অর্জুন যুদ্ধরূপ কর্তব্য-কর্ম পরিত্যাগ করে ভিক্ষা করা শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেছিলেন (২।৫) ; কিন্তু ভগবান তা নিষেধ করেছেন (২২।৩১-৩৮)। এতেই প্রমাণিত হয় যে এখানে ধর্মকে স্বরূপতঃ ত্যাগের কথা বলা হয়নি।

চিন্তা করে দেখতে হয় যে এখানে সম্পূর্ণ ধর্ম ত্যাগের প্রকৃত অর্থ কী ? গীতা অনুসারে সম্পূর্ণ ধর্ম বা কর্ম ভগবানে সমর্পণ করাই হল শ্রেষ্ঠ ধর্ম। তাতে সম্পূর্ণ ধর্মের আশ্রয় পরিত্যাগ করা এবং একমাত্র ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করা—দুটি কথাই সিদ্ধ হয়। ধর্মের আশ্রয় গ্রহণকারীগণ বারংবার জন্ম-মৃত্যু প্রাপ্ত হতে থাকেন—**'এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে'** (গীতা ৯।২১)। তাই ধর্মের আশ্রয় ছেড়ে ভগবানের আশ্রয় নিলে তখন আর নিজ ধর্ম নিরূপণের প্রয়োজন থাকে না। পরে অর্জুনের জীবনে এমনই হয়েছে।

কর্ণের সঙ্গে অর্জুন যুদ্ধ করছিলেন, সেইসময় কর্ণের রথের চাকা মাটিতে বসে গিয়েছিল। কর্ণ রথ থেকে নেমে রথের চাকাটি বার করার সময় অর্জুনকে বলেছিলেন যে, 'আমি যতক্ষণ চাকাটি না বার করতে পারি, ততক্ষণ তুমি অপেক্ষা করো ; কেন-না তুমি রথের ওপরে রয়েছ আর আমি জমিতে, তাছাড়া আমি অন্য কার্যে ব্যাপৃত আছি। এইসময় কোনো রথীর শরসন্ধান করা উচিত নয়। তুমি সহস্রার্জুনের ন্যায় শস্ত্র ও শাস্ত্রের জ্ঞাতা এবং ধর্মজ্ঞ, তাই তোমার উচিত নয় এ অবস্থায় আমাকে প্রহার করা।' কর্ণের কথায় অর্জুন আর শরসন্ধান করেননি। তখন ভগবান কর্ণকে বললেন যে, 'তোমার মতো আততায়ীকে যেকোনো প্রকারে বধ করাই ধর্ম, পাপ নয়[২] ; আর এখনই

---

[১]তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান কর্তব্য-কর্ম পরিত্যাগ না করার জন্য বিস্তৃত আলোচনা করেছেন—কর্ম ত্যাগ করলে নৈষ্কর্ম লাভ হয় না এবং সিদ্ধিলাভ হয় না (৩।৪) ; কোনো ব্যক্তিই কোনো অবস্থাতে কর্ম না করে একমুহূর্তও থাকতে পারে না (৩।৫) ; যে ব্যক্তি বাহ্যতঃ কর্মত্যাগ করে অন্তরে বিষয়চিন্তা করে, সে মিথ্যাবাদী (৩।৬) ; যে ব্যক্তি মন-ইন্দ্রিয় বশীভূত করে কর্তব্য পালন করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ (৩।৭) ; কর্ম না করলে শরীর নির্বাহ হয় না, তাই কর্ম করা উচিত (৩।৮) ; বন্ধনের ভয়ে কর্মত্যাগ করা উচিত নয়। কারণ শুধুমাত্র কর্তব্য পালনের জন্য করা কর্ম বন্ধনকারক নয়, বরং কর্তব্য-কর্মের পরম্পরা সুরক্ষিত রাখা ছাড়া নিজের জন্য কোনো কিছু করাই বন্ধনকারক হয় (৩।৯) ; ব্রহ্মা কর্তব্য-সহ প্রজাসৃষ্টি করে বলেছেন যে, এই কর্তব্য-কর্মের দ্বারাই তোমাদের বৃদ্ধি হবে এবং এই কর্তব্য-কর্ম তোমাদের কর্তব্য-সামগ্রী প্রদানকারী হবে (৩।১০) ; মানুষ ও দেবতা উভয়েই কর্তব্য পালনের দ্বারা কল্যাণ লাভ করবে (৩।১১) ; যে ব্যক্তি কর্তব্য পালন না করে প্রাপ্ত সামগ্রী উপভোগ করে, সে চোর (৩।১২) ; কর্তব্য পালন করে নিজের নির্বাহকারী ব্যক্তি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায় আর যে ব্যক্তি শুধু নিজের জন্য কর্ম করে, সেই পাপী পাপ ভক্ষণ করে (৩।১৩) ; কর্তব্য পালনের দ্বারাই সৃষ্টিচক্র আবর্তিত হয় ; কিন্তু যে ব্যক্তি জগতে থেকে নিজ কর্তব্য পালন করে না, তার জীবন ব্যর্থ (৩।১৬) ; আসক্তিবর্জিত হয়ে কর্তব্য করলে মানুষ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় (৩।১৯) ; জনকাদি জ্ঞানীগণও কর্তব্য-কর্ম পালন করে সিদ্ধিলাভ করেছেন ; লোকসংগ্রহের জন্যও কর্তব্য পালন করা উচিত (৩।২০) ; ভগবান তাঁর নিজের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে, যদি আমি সতর্ক হয়ে কর্তব্য পালন না করি, তাহলে আমি বর্ণ-সংকরের উৎপাদক এবং লোকনাশকারী হব (৩।২৩-২৪) ; জ্ঞানী ব্যক্তিদেরও আসক্তি পরিত্যাগ করে আস্তিক অজ্ঞানীদের মতো কর্তব্য পালন করা উচিত (৩।২৫) ; জ্ঞানীদের উচিত যে তাঁরা যেন অজ্ঞানীদের মধ্যে বুদ্ধিভেদ উৎপন্ন না করে নিজ কর্তব্য ঠিকমতো পালন করেন এবং তাদের দ্বারাও সেইরূপ করান (৩।২৬)। এইরূপে ভগবান তৃতীয় অধ্যায়ে কর্তব্য-কর্ম পালনের ওপর খুব জোর দিয়েছেন।

[২]আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্। নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন॥ (মনুস্মৃতি ৮।৩৫০-৩৫১)

'অনিষ্ট করতে আসা আততায়ীকে দ্বিধা না করে হত্যা করা উচিত। আততায়ীকে হত্যা করলে হত্যাকারীর কোনো দোষ হয় না।'

তো তুমি ছয় মহারথীতে মিলিত হয়ে একলা অভিমন্যুকে ঘিরে ফেলে হত্যা করেছ। সুতরাং ধর্মের দোহাই দিয়ে কোনো লাভ হবে না। তবে সৌভাগ্যের কথা এই যে এখন তোমার ধর্মের কথা মনে পড়েছে। কিন্তু যে নিজে ধর্মপালন করে না, তার ধর্মের দোহাই দেবার কোনো অধিকার নেই।' একথা বলে ভগবান অর্জুনকে শর-নিক্ষেপের আদেশ দিলেন এবং অর্জুন শরসন্ধান করতে শুরু করলেন।

এইরূপ অর্জুন যদি তাঁর নিজের বুদ্ধিতে ধর্ম নিরূপণ করতেন, তাহলে তিনি ভুল করে ফেলতেন ; তাই তিনি ধর্ম নিরূপণের ভার ভগবানের ওপর দিয়েছিলেন এবং ভগবান ধর্মের নিরূপণ করেও ছিলেন।

অর্জুনের মনে সন্দেহ ছিল যে তাঁদের পক্ষে যুদ্ধ করা শ্রেয়, না না-করাই শ্রেয় (২।৬)। আমরা যদি যুদ্ধ করি, তাহলে আত্মীয়-বধ হবে এবং আত্মীয়-বধ করা অত্যন্ত পাপ। এর দ্বারা অনর্থ হবে (২।৪০-৪৪)। অন্যদিকে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধের চেয়ে শ্রেয় কোনো সাধন নেই। তাই ভগবান বলেছেন যে, কী করা উচিত, কী করা উচিত নয়, ধর্ম কী, অধর্ম কাকে বলে, এসব ঝামেলায় তুমি কেন জড়াচ্ছ ? ধর্ম নিরূপণের ভার তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও। **'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য'** কথাটির এই হল তাৎপর্য।

'মামেকং শরণং ব্রজ'—'একম্' পদটি এখানে 'মাম'-এর বিশেষণ হতে পারে না। কারণ 'মাম্' (ভগবান) একই, অনেক নয়। তাই **'একম্'** পদটির অর্থ 'অনন্য' ধরা উচিত। দ্বিতীয়তঃ, অর্জুন **'তদেকং বদ নিশ্চিত্য'** (৩।২) এবং **'যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকম্'** (৫।১) পদেও সাংখ্য এবং কর্মযোগের বিষয়ে এক নিশ্চিত শ্রেয়র সাধন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। সেই **'একম্'** পদটি নিয়ে ভগবান এখানে জানাচ্ছেন যে সাংখ্যযোগ, কর্মযোগ ইত্যাদি যতপ্রকার ভগবদ্প্রাপ্তির সাধন আছে, সেই সমস্ত সাধন-সমূহের মধ্যে প্রধান সাধন হল অনন্য শরণাগতি।

গীতায় অর্জুন তাঁর কল্যাণ সাধনের ব্যাপারে নানাপ্রকার প্রশ্ন করেছিলেন, ভগবান তার উত্তরও দিয়েছেন। সেইসব সাধনের মধ্যেও গীতার পূর্বাপর আলোচনা করলে এই কথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে সমস্ত সাধনার সারকথা এবং শিরোমণি হল অনন্যভাবে ভগবানের শরণাগত হওয়া।

ভগবান গীতায় বিভিন্ন স্থানে অনন্য-ভক্তির অনেক মহিমা গীত করেছেন। যেমন, দুস্তর মায়া সহজে অতিক্রম করার উপায় একমাত্র অনন্য শরণাগতি[১] (৭।১৪) ; অনন্যচেতা ব্যক্তির কাছে আমি সুলভ[২] (৮।১৪) ; অনন্য ভক্তির দ্বারাই পরম পুরুষকে লাভ করা যায় (৮।২২) ; অনন্য ভক্তের যোগক্ষেম আমি বহন করি (৯।২২) ; অনন্য ভক্তির সাহায্যেই ভগবানকে জানা, দেখা ও প্রাপ্ত করা সম্ভব হয় (১১।৫৪) ; অনন্য ভক্তদের আমি অতি শীঘ্র উদ্ধার করি (১২।৬-৭) ; অনন্য-ভক্তিই গুণাতীত হওয়ার উপায় (১৪।২৬)। এইভাবে অনন্য ভক্তির মহিমা বলে ভগবান সম্পূর্ণ গীতার সার বলেছেন—**'মামেকং শরণং ব্রজ'**। অর্থাৎ উপায় ও উপেয়, সাধন ও সাধ্য—সবই আমি।

'মামেকং শরণং ব্রজ' কথাটির তাৎপর্য মন-বুদ্ধির দ্বারা শরণাগতি স্বীকার করা নয়, বরং নিজে ভগবানের শরণাগত হওয়া। কারণ স্বয়ং শরণ গ্রহণ করলে মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, শরীর ইত্যাদিও স্বয়ং-এর অন্তর্গত বোঝায়, পৃথক্ নয়।

'অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ'— এখানে কেউ কেউ মনে করতে পারেন যে প্রথম অধ্যায়ে অর্জুন যুদ্ধের থেকে যে পাপ হওয়ার কথা বলেছিলেন, ভগবান সেই পাপ হতে মুক্তি দেবার প্রলোভন দিয়েছেন। কিন্তু তা যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ অর্জুনের সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হয়ে যাবার পর কী করে তাঁর পাপ থাকবে[৩] এবং তাঁকে প্রলোভন কী করে দেওয়া যাবে অর্থাৎ তাকে প্রলোভিত করা সম্ভব নয়। তবে পাপ থেকে মুক্ত করার প্রলোভন দেওয়া যায় শরণাগত হওয়ার আগে, শরণাগত হওয়ার পরে নয়।

'আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব'— কথাটির ভাব হল যে তুমি যখন সকল ধর্মের আশ্রয় ত্যাগ

[১]এই শ্লোকে 'এব' পদটি 'অনন্যতা'র বাচক।

[২]এই শ্লোকে 'অনন্যচেতাঃ' পদটি অনন্য-আশ্রয়ের বাচক।

[৩]সনমুখ হোই জীব মোহি জবহীঁ। জন্ম কোটি অঘ নাসহিঁ তবহীঁ॥ (শ্রীরামচরিতমানস ৫।৪৪।১)

করে আমার শরণাগত হয়েছ এবং তারপরেও তোমার ভাব, বৃত্তি, আচরণাদিতে কোনো পার্থক্য আসেনি অর্থাৎ সেগুলি শোধরায়নি ; ভগবদ্‌প্রেম, ভগবদ্দর্শন ইত্যাদি হয়নি এবং তোমার নিজের মধ্যে অযোগ্যতা, বলহীনতা, অনধিকারিতা বোধ হচ্ছে, তাহলেও সেগুলির জন্য তুমি কোনোপ্রকার চিন্তা বা ভয় কোরো না। কারণ তুমি যখন আমার অনন্য শরণাগত হয়েছ তখন তোমার আবার ভয় কিসের ? সেগুলি শোধরাবার কাজ তোমার নয়। তোমার অযোগ্যতা, অপূর্ণতা সবই দূর করার দায়িত্ব হল আমার। তোমার একমাত্র কাজ হল—নির্ভয়, নিঃশোক, নিশ্চিন্ত এবং নিঃশঙ্ক হয়ে আমার চরণে পড়ে থাকা[১]। কিন্তু তোমার মধ্যে যদি ভয়, চিন্তা, ভ্রম ইত্যাদি দোষ আসে তবে তা শরণাগতির পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে এবং সব দায়িত্বও তোমার উপরে বর্তাবে। শরণাগত হয়ে নিজের ওপর দায়িত্ব রাখা হল ছদ্ম শরণাগতি।

যেমন, বিভীষণ ভগবান রামের পাদপদ্মে শরণ নেওয়ায় তাঁর সব দোষ ভগবান নিজের দোষ বলে মানতেন। একবার বিভীষণ সমুদ্র পার হন, সেখানে বিপ্রঘোষ গ্রামে তাঁর হাতে এক অজ্ঞাত ব্রাহ্মণের হত্যাকার্য ঘটে যায়। এতে সেখানকার ব্রাহ্মণেরা সবাই মিলে বিভীষণকে খুব মারধোর করেন, কিন্তু তিনি তাতে মরেননি। তখন ব্রাহ্মণেরা তাঁকে শিকলে বেঁধে মাটির নীচে এক গুহায় আটকে রাখেন। শ্রীরাম বিভীষণের আটক হওয়ার খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ পুষ্পক বিমানে করে বিপ্রঘোষ গ্রামে এলেন এবং বিভীষণের খোঁজ করে তার কাছে গেলেন। ব্রাহ্মণেরা শ্রীরামকে শ্রদ্ধা সহকারে অনেক আদর-আপ্যায়ন করলেন এবং বললেন, 'হে মহারাজ ! ইনি ব্রহ্মহত্যা করেছেন। আমরা এঁকে খুব মেরেছি, কিন্তু ইনি মরেননি।' ভগবান রাম বললেন, 'হে ব্রাহ্মণগণ ! আমি বিভীষণকে এক কল্প পর্যন্ত আয়ু প্রদান করেছি ও রাজ্য দিয়ে রেখেছি, তাঁকে কী করে মারবেন ? তাছাড়া এঁকে মারার প্রয়োজন কী, ইনি তো আমার ভক্ত। ভক্তের জন্য আমি নিজে মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত। দাসের অপরাধের দায়িত্ব প্রকৃতপক্ষে তার মালিকেরই হয় অর্থাৎ মালিকই তার দণ্ড নেবার অধিকারী। সুতরাং বিভীষণের পরিবর্তে আপনারা আমাকেই দণ্ড প্রদান করুন[২]।' ভগবানের শরণাগত বাৎসল্য দেখে সব ব্রাহ্মণ আশ্চর্যান্বিত হলেন এবং সকলেই তাঁর শরণ গ্রহণ করলেন।

তাৎপর্য হল এই যে 'আমি ভগবানের আর ভগবান আমার'—এই একাত্মভাবের মতো যোগ্যতা, পাত্র, অধিকারী ইত্যাদি কিছুই নেই। এটিই হল সকল সাধনার সার। ছোট শিশুও এই একাত্মতার শক্তিতে মাঝরাতে সমস্ত বাড়িকে সরগরম করে রাখে অর্থাৎ সে যখন রাত্রে কাঁদে তখন সকলে জেগে উঠে তাকে ভোলাতে থাকে। তাই শরণাগত ভক্তের নিজ যোগ্যতা ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি না দিয়ে ভগবানের সঙ্গে একাত্মবোধে থাকা উচিত।

'মা শুচঃ' কথাটির অর্থ হল—

(১) আমার শরণাগত হয়ে তুমি চিন্তা করছ, এটি আমার প্রতি অপরাধ তুল্য, এটি তোমার অহংকার এবং শরণাগতির কলঙ্ক।

আমার শরণ নিয়ে আমার ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা না রাখা হল আমার প্রতি অন্যায় করা। নিজের দোষ নিয়ে চিন্তা করা হল প্রকৃতপক্ষে নিজের বলের অহংকার ; কারণ দোষ দূর করায় নিজ সামর্থ্যের আন্দাজ হওয়াতেই ওগুলি মেটানোর চিন্তা হয়ে থাকে। যদি দোষ দূর করার চিন্তা না হয়ে দুঃখ হয় তাহলে দুঃখ হওয়া তত দোষের নয়। যেমন, ছোট শিশুর কাছে কুকুর এলে সে কুকুর দেখে কাঁদে, চিন্তা করে না। তেমনই দোষগুলিকে সহ্য না করা দোষের নয়, দোষ হল চিন্তা করাতে। চিন্তা করার অর্থ হল নিজের

---

[১]কাহূ কে বল ভজন কৌ, কাহূ কে আচার। 'ব্যাস' ভরোসে কুঁবির কে, সোবত পাঁব পসার॥

[২]বরং মমৈব মরণং মদ্ভক্তো হন্যতে কথম্। রাজ্যমায়ুর্ময়া দত্তং তথৈব স ভবিষ্যতি॥
ভৃত্যাপরাধে সর্বত্র স্বামিনো দণ্ড ইষ্যতে। রামবাক্যং দ্বিজাঃ শ্রুত্বা বিস্ময়াদিদমব্রুবন্॥

(পদ্মপুরাণ, পাতাল ১০৪।১৫০-১৫১)

অন্তরে বলের আশ্রয়[১] লুকিয়ে আছে আর এর কারণ হল তোমার অন্তর্নিহিত অহংকার যে তুমি কিছু করতে পারো! আমার ভক্ত হয়ে যদি তুমি চিন্তা কর, তাহলে তোমার চিন্তা দূর হবে কী প্রকারে ? লোকেও তা দেখলে ভাববে যে ভগবানের ভক্ত হয়ে এ চিন্তা করছে? ভগবান এর চিন্তা দূর করেন না! তুমি আমাকে বিশ্বাস না করে চিন্তা করলে এটি হবে তোমারই বিশ্বাসের ঘাটতি আর কলঙ্ক হবে আমার, আমার শরণাগতির—তাই এ-চিন্তা তুমি ছেড়ে দাও।

(২) তোমার ভাব, বৃত্তি, আচরণ শুদ্ধ না হলেও তুমি এর চিন্তা কোরো না, আমি তার চিন্তা করব।

(৩) দ্বিতীয় অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে অর্জুন ভগবানের শরণ গ্রহণ করেন আর অষ্টম শ্লোকে বলেছেন যে, এই পৃথিবীর ধন-ধান্য সংবলিত নিষ্কণ্টক রাজ্য লাভ করলেও অথবা দেবতাদের ওপর আধিপত্য পেলেও ইন্দ্রিয় শুষ্ককারী আমার এই শোক দূর হবে না। ভগবান যেন বলেছেন, তোমার কথা ঠিকই। কারণ ইহ জগতের বিনাশশীল পদার্থের সম্পর্ক থেকে কারও শোক কখনো দূর হয় না, হতে পারে না এবং তার সম্ভাবনাও নেই। কিন্তু আমার শরণাগত হয়ে যে তুমি শোক করছ, এ অত্যন্ত অন্যায়। আমার শরণ নিয়ে তুমি নিজের ভার নিজেই বহন করছ!

(৪) শরণাগত হয়ে ভক্তের ইহলোক-পরলোক, সদ্‌গতি-দুর্গতি ইত্যাদি কোনো কিছু নিয়েই চিন্তা করা উচিত নয়। এই নিয়ে এক ভক্ত বলেছেন—

> দিবি বা ভূবি বা মমাস্তু বাসো।
> নরকে বা নরকান্তক প্রকামম্।
> অবধীরিতশারদারবিন্দৌ চরণৌ
> তে মরণেঽপি চিন্তয়ামি॥

'হে নরকাসুরের বিনাশকারী প্রভু ! আপনি যদি চান আমাকে স্বর্গে রাখুন বা ভূমণ্ডলে অথবা ইচ্ছা করলে নরকে রাখুন অর্থাৎ আপনি যেখানে রাখতে চান, সেখানেই রাখুন। যা করতে চান, তাই করুন, এই বিষয়ে আমার কোনো কিছু বলার নেই। আমার শুধু একটিই আকাঙ্ক্ষা যে শরৎকালের পদ্মের শোভাকেও কুণ্ঠিত করে আপনার অত্যন্ত সুন্দর যে পদযুগল, তা যেন মৃত্যুর মতো ভয়ঙ্কর অবস্থাতেও আমি চিন্তা করতে পারি। আপনার চরণকে যেন না ভুলে যাই'।

শরণাগতি সম্পর্কিত বিশেষ কথা

শরণাগত ভক্ত এই ভাবটি দৃঢ়তার সঙ্গে ধরে থাকেন যে 'আমি ভগবানের এবং ভগবান আমার', একথা স্বীকার করে নেওয়াতে তাঁর ভয়, শোক, চিন্তা, আশঙ্কা ইত্যাদি দোষগুলি দূর হয় অর্থাৎ দোষের আধার নষ্ট হয়। কারণ ভক্তির দৃষ্টিতে সব দোষই ভগবানে বিমুখ হলে টিকে থাকে।

ভগবানের শরণাগত হলেও সংসার ও শরীরের আশ্রয়ের সংস্কার থাকে, যা ভগবানের সম্বন্ধ দৃঢ় হলে দূর হয়[২]। সেগুলি দূর হলে সর্ব দোষ দূর হয়।

সম্বন্ধ দৃঢ় হওয়া কাকে বলে ? ভয়-শোক-চিন্তা-আশঙ্কা, পরীক্ষা ও বিপরীত ভাবনা না থাকাই হল সম্বন্ধ দৃঢ় হওয়া। এবার এটিকে নিয়ে আলোচনা করা যাক—

(১) **নির্ভয় হওয়া**—আচরণাদি ঠিক না হলে অন্তরে ভয়ের উৎপত্তি হয় এবং সাপ, বিছে, বাঘ ইত্যাদি থেকে বাহ্যিক ভয় আসে। শরণাগত ভক্তের এই উভয় প্রকারের ভয়-ই দূরীভূত হয়। শুধু তাই নয়, পতঞ্জলি মৃত্যুভয়ের যে পাঁচটি ক্লেশের কথা বলেছেন[৩] এবং যা বড় বড়

---

[১] কৌরব সভায় যখন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করা হচ্ছিল, তখন তিনি হাত দিয়ে, দাঁত দিয়ে কাপড় ধরে ভগবানকে ডাকছিলেন। নিজের শক্তির ওপর নির্ভর করে ভগবানকে ডাকতে থাকায়, ভগবান আসতে দেরি করছিলেন। কিন্তু যখন দ্রৌপদী সর্বপ্রকার চেষ্টা ছেড়ে একমাত্র ভগবানের ওপরই নির্ভরশীল হলেন, তখন দুঃশাসন বস্ত্র টানতে টানতে পরিশ্রান্ত হয়ে গেলেন আর বস্ত্রের রাশি জমে উঠল, কিন্তু দ্রৌপদীর কোনো অঙ্গই উন্মোচিত হল না।

[২] ভগবানের সম্বন্ধ দৃঢ় হলে যখন সংসার ও শরীরের কোনোপ্রকার আশ্রয় থাকে না, তখন বাঁচার আশা, মরার ভয়, কাজ করার আসক্তি ও পাওয়ার আশা—এই চারটিই থাকে না।

[৩] অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ ক্লেশাঃ (যোগদর্শন ২।৩)

বিদ্বানেরও হয়ে থাকে[১], সে ভয়ও সর্বতোভাবে দূর হয়ে যায়[২]।

এবার আমার বৃত্তিগুলিও খারাপ হয়ে যাবে !— সাধকের এইরূপ ভয়পূর্ণ মনোভাবও অন্তর থেকে দূর করতে হয়। কারণ 'আমার উপর অশেষ ভগবদ্‌কৃপা রয়েছে, এখন আমার আর কোনো কিছুতে ভয় নেই। এই বৃত্তিগুলিকে নিজের বলে মনে করেছিলাম বলেই আমি এগুলিকে শুদ্ধ করতে পারিনি। কারণ এগুলিকে নিজের মনে করাই হল মলিনতা—**'মমতা মল জরি জাই'** (শ্রীরামচরিতমানস ৭।১১৭ক)। তাই এবার থেকে আমি কখনো এগুলিকে নিজের মনে করব না। বৃত্তিগুলিই যখন আমার নয় তখন আমার ভয় কীসের ? এখন তো শুধুই ভগবানের কৃপা আর কৃপা ! তাঁর কৃপাই সর্বত্র পরিপূর্ণ ! এটি অতিশয় আনন্দের কথা !

কেউ কেউ আশঙ্কা করেন যে ভগবানের শরণাগত হয়ে তাঁর ভজনা করলে দ্বৈতভাব হয় অর্থাৎ ভগবান ও ভক্ত— এই দুই ভাব হয় এবং দ্বিতীয়ের থেকে ভয় হয়— **'দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি'** (বৃহদারণ্যক ১।৪।২)। কিন্তু এই আশঙ্কা অমূলক। ভয় দ্বিতীয়ের থেকে হলেও আত্মীয়ের থেকে হয় না অর্থাৎ ভয় অপরের থেকে হয়, নিজের থেকে নয়। প্রকৃতি এবং তার কার্য শরীর-সংসার হল দ্বিতীয় অর্থাৎ পর, তাই সেগুলির সঙ্গে সম্পর্ক রাখলেই ভয় হয়। কারণ এগুলির সঙ্গে সর্বদা সম্পর্ক থাকতেই পারে না। প্রকৃতি ও পুরুষের সম্পর্ক সর্বদাই ভিন্ন ভিন্ন ; যেমন, একটি জড়, অপরটি চেতন, একটি বিকারশীল, অন্যটি নির্বিকার, একটি পরিবর্তনশীল আর অপরটি অপরিবর্তনশীল, একটি প্রকাশ্য অন্যটি প্রকাশক ইত্যাদি।

ভগবান দ্বিতীয় অর্থাৎ পর নন। তিনি পরম আপন-জন। কারণ জীব তাঁর সনাতন অংশ, স্বরূপ। সুতরাং ভগবানের শরণাগত হলে তাঁর থেকে ভয় কী করে হবে ? বরং তাঁর শরণ নিলে মানুষ চিরকালের মতো অভয় হয়ে যায়। স্থূল দৃষ্টিতে দেখা যায় যে শিশু মায়ের থেকে দূরে থাকলে ভয় পায়, কিন্তু মায়ের কোলে গেলে তার ভয় দূর হয়, কারণ মা তার নিজের। ভগবানের ভক্ত তার থেকেও বিশিষ্ট, কারণ শিশু ও মায়ের মধ্যে ভেদ দেখা যায়, কিন্তু ভক্ত ও ভগবানে ভেদ থাকা সম্ভবই নয়।

(২) শোকহীন হওয়া—যে ঘটনা ঘটে গেছে, তার জন্য শোক হয়। ঘটে যাওয়া ঘটনার জন্য শোক করা অত্যন্ত ভুল ; কারণ যা হয়েছে, তা অবশ্যম্ভাবী ছিল আর যা না হওয়ার, তা কখনো হতে পারে না এবং এখন যা হচ্ছে তা হবার বলেই হচ্ছে, তাই তাতে শোক করার কোনো কারণ নেই[৩]। প্রভুর এই মঙ্গলময় বিধান জেনে শরণাগত ভক্ত সর্বদা শোকহীন থাকে ; শোক তার কাছে কখনো আসতেই পারে না।

(৩) নিশ্চিন্ত হওয়া—ভক্ত যখন তার নিজের জিনিসগুলিসহ নিজেকেও ভগবানে সমর্পণ করেন, তখন তাঁর ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কোনো চিন্তা থাকে না অর্থাৎ কী করে জীবিকা-নির্বাহ হবে ? কোথায় থাকা যাবে ? আমার কী দশা হবে ? কী গতি হবে ? এইসব কোনো চিন্তাই থাকে না[৪]।

ভগবানের শরণ নিলে শরণাগত ভক্তের মনে এক চিন্তা আসে যে 'যদি আমার জীবন প্রভুর উপযুক্ত অর্থাৎ শুদ্ধ ও সুন্দর না হয় তাহলে আমার জীবনে ভক্তের ন্যায় আচরণ কোথায় ? অর্থাৎ তা নেই। কারণ আমার মনোবৃত্তিগুলি ঠিক নয়।' আসলে 'আমার বৃত্তি' এরূপ মনে করাই দূষণীয়, বৃত্তি তত দোষের নয়। মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়গুলি,

---

[১]স্বরসবাহী বিদুষোঽপি তথারূঢ়োঽভিনিবেশঃ। (যোগদর্শন ২।৯)

[২]তথা ন তে মাধব তারকাঃ ক্বচিদ্ ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।

ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপমূর্ধসু প্রভো।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।২।৩৩)

'হে ঠাকুর ! যাঁরা আপনার ভক্ত, যাঁরা আপনার পাদপদ্মে তাঁদের সত্যকার প্রীতি উজাড় করে দিয়েছেন, তাঁরা কখনো জ্ঞানাভিমানীদের মতো নিজেদের সাধনা থেকে চ্যুত হন না।' প্রভু ! এঁরা মহাবিঘ্ন প্রদানকারী সৈনিকদের মাথার ওপর পা রেখে নির্ভয়ে বিচরণ করে থাকেন, কোনো বিঘ্নই তাঁদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না।

[৩]ক. রাম কীন্‌হ চাহহিঁ সোই হোঈ। করৈ অন্যথা অস নহিঁ কোঈ।। (শ্রীরামচরিতমানস ১।১২৮।১)

খ. হোইহি সোই জো রাম রচি রাখা। কো করি তর্ক বঢ়াবৈ সাখা।। (শ্রীরামচরিতমানস ১।৫২।৪)

[৪]চিন্তা দীনদয়ালকো, মো মন সদা আনন্দ। জায়ো সো প্রতিপালসী, রামদাস গোবিন্দ।।

শরীর ইত্যাদিতে যে আমি ভাব থাকে— সেটিই ভুল। কারণ যখন আমি ভগবানের শরণাগত হয়েছি আর সবকিছু তাঁকে অর্পণ করেছি, তখন মন-বুদ্ধি ইত্যাদি আর আমার থাকে কী করে ? তাই শরণাগত ভক্তের মন, বুদ্ধি ইত্যাদির অশুদ্ধির চিন্তা কখনো মনে আসতে দিতে নেই অর্থাৎ আমার বৃত্তিগুলি ঠিক নয়—এই ভাব মনে আনতে নেই। কোনো কারণবশতঃ এরূপ চিন্তা এলেও, 'হে ভগবান ! হে আমার প্রভু ! আমাকে রক্ষা করো ! রক্ষা করো !' বলে প্রভুকে ডাকতে হয়, কারণ তিনি আমার প্রভু, আমার সর্বসমর্থ প্রভু, সুতরাং আমি কেন চিন্তা করব ? আর ভগবানও বলেছেন, 'তুমি চিন্তা কোরো না' (মা শুচঃ)। অতএব আমি নিশ্চিন্ত—এই বলে মনে মনে ভগবানের পায়ে নিজেকে সমর্পণ করতে হয় এবং নিশ্চিন্ত মনে ভগবানকে বলতে হয়—'হে প্রভু ! আপনিই সর্বসমর্থ, আপনিই জানেন আমার মঙ্গল কিসে হবে !'

সর্বশক্তিমান প্রভুর শরণাগতও হবে আবার চিন্তাও করতে থাকবে—এই দুটি অত্যন্ত পরস্পর-বিরুদ্ধ ব্যাপার। কারণ শরণাগত হলে আবার চিন্তা কীসের ? আর চিন্তাই যদি হবে তাহলে শরণাগতি কেমন ? তাই শরণাগত ভক্তের চিন্তা করতে হয় যে ভগবান যখন বলেছেন যে 'আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব', তখন আমার এইসব বৃত্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমাকে কিছু করতে হবে কেন ? আমি তো আপনারই। হে ভগবান ! আমি যেন এই বৃত্তিগুলিকে কখনো নিজের বলে মনে না করি। হে প্রভু ! শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, প্রাণ, মন, বুদ্ধি—এইসব কখনো যেন আমার বলে মনে না হয়। কিন্তু হে ভগবান ! সবকিছু আপনাকে সমর্পণ করার পরেও এই শরীরাদি যদি কখনো কখনো নিজের বলে প্রতীত হয়, তাহলে আমার এই অপরাধ আপনি ক্ষমা করবেন—এই বলে নিশ্চিন্ত থাকতে হয়।

(৪) **নিঃশঙ্ক হওয়া**—ভগবানের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক নিয়ে কখনো এমন সন্দেহ যেন না আসে যে আমি ভগবানের কি না ? ভগবান আমাকে স্বীকার করেছেন কি না ? বরং এই ব্যাপারটি দেখতে হয় যে 'আমি অনাদিকাল থেকে ভগবানেরই ছিলাম, আছি এবং চিরকালই থাকব। আমি মূর্খতাবশতঃ ভগবানের থেকে নিজেকে পৃথক্ মেনে নিয়েছিলাম, বিমুখ হয়েছিলাম। কিন্তু আমি নিজেকে যতই ভগবানের থেকে পৃথক বলে মনে করি, তবুও আমি তাঁর থেকে পৃথক্ হতে পারি না আর থাকা সম্ভবও নয়। যদি আমি পৃথক্ হতে চাইও, তবুও তা সম্ভব হবে কী করে ? কেন-না ভগবান বলেছেন যে জীব আমারই অংশ'— **'মম এব অংশঃ'** (গীতা ১৫।৭)। এইরূপ 'আমি ভগবানের আর ভগবান আমার'—এই প্রকৃত তথ্য অনুধাবন করলেই সমস্ত আশঙ্কা—সন্দেহ দূর হয়ে যায়, সে সবের কোনো স্থানই থাকে না।

(৫) **পরীক্ষা না করা**—ভগবানের শরণাগত হয়ে এমন পরীক্ষা করতে নেই যে 'আমি যখন ভগবানের শরণাগত হয়েছি তখন আমার এই-এই লক্ষণ হওয়া উচিত। যদি এইসব লক্ষণ দেখা না যায়, তাহলে আর ভগবানের শরণাগত হলাম কীসের ?' বরং **'অদ্বেষ্টা'** ইত্যাদি (গীতা ১২।১৩-১৯) গুণগুলির নিজের মধ্যে অভাব দেখলে আশ্চর্য হতে হয় যে আমার মধ্যে এই অভাব কী করে এল ![১] যদি এরূপ ভাব জাগে তাহলে গুণগুলির ন্যূনতা দূর হয়। সে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করতে থাকে যে

[১]এই বিষয়ে এক গ্রাম্য কাহিনী আছে। এক মহিলার তিন পুত্র, বড় দুজন কাজ করে, ছোটটি সহজ সরল। মায়ের মৃত্যু হলে, বড় দুই ছেলে ছোট ভাইকে বলল গঙ্গায় অস্থি বিসর্জন দিতে, সে বলল—ঠিক আছে। গঙ্গা বাড়ি থেকে ৩০০ মাইল দূরে। ছোট ভাই রওনা হল। পথে ক্লান্ত হয়ে সে একজনকে জিজ্ঞাসা করল—'ভাই ! গঙ্গা কত দূরে ?' সে বলল, 'তুমি ১৫০ মাইল এসেছো আরও ১৫০ মাইল বাকি।' ছেলেটি ভাবল কতক্ষণে গঙ্গায় পৌঁছাব আর কখনই বা ফিরব ! তাই দুঃখিত মনে সে অস্থি জঙ্গলে ছুঁড়ে দিয়ে সেখান থেকে বর্ষার জল কলসীতে ভরে নিল, কারণ অস্থি বিসর্জনের পর কলসীতে গঙ্গাজল ভরে নিয়ে আসতে হয়। সে গ্রামে ফিরে এল। বড় ভাই ভাবল যে, ভাইটি গঙ্গায় গেলে এত তাড়াতাড়ি ফিরত না, ও গঙ্গায় যায়নি। বড় ভাই তাকে জিজ্ঞাসা করল—'তুই গঙ্গায় গিয়েছিলি তো ?' সে বলল, 'হ্যাঁ, আমি গঙ্গার ব্রহ্মকুণ্ডে অস্থি বিসর্জন দিয়ে, গঙ্গাজল নিয়ে এসেছি।' এইভাবে সে মিথ্যা কথা বলল। ভাই বুঝল যে সে মিথ্যা কথা বলছে, কিন্তু সে চুপ করে থাকল। দ্বিতীয় দিন ঘুম থেকে উঠে অন্যজন বলল—'ভাই ! ঠিক করে বল, তুমি গঙ্গায় ঠিকমতো অস্থি বিসর্জন দিয়েছ তো ?' সে বলল, 'হ্যাঁ গঙ্গাতেই গিয়েছিলাম।' বড় ভাই বলল—'দেখ, আমি রাত্রে মাকে স্বপ্ন দেখেছি, মা বলেছেন যে তুমি অস্থি গঙ্গাতে বিসর্জন না দিয়ে মাঝপথে ফেলে এসেছো। তুমিই বল মায়ের কথা সত্য, না তোমার কথা সত্য ?' ছোটো ভাই বলল—'মা ওদিকে না গিয়ে এদিকে এলেন কেন ? অর্থাৎ আমি তো ১৫০ মাইল পৌঁছে গিয়েছিলাম, ওদিকে গেলে তো গঙ্গাতেই পৌঁছে যেতেন।'

'অদ্বেষ্টা' ইত্যাদি গুণ আগে যত কম ছিল, এখন আর তত কম নেই। শরণাগত হলে ভক্তের যতপ্রকার লক্ষণ, তা বিনা যত্নেই বিকশিত হতে থাকে।

(৬) **বিপরীত ধারণা না করা**—ভগবানের শরণাগত ভক্তের মনে এরূপ বিপরীত ধারণা কী করে আসে যে 'আমি ভগবানের নই'। কারণ এটি মানা বা না-মানার ওপর নির্ভর নয়। ভগবানের সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক, তা অটুট, অখণ্ড এবং নিত্য। আমি এটির দিকে খেয়াল না করে ভুল করেছি। এখন সেই ভুল দূর হয়েছে তাহলে বিপরীত ধারণা আর কী করে হবে ?

যে ব্যক্তি প্রকৃত ভাবে ভগবানের শরণাগতি স্বীকার করে নেয়, তার মধ্যে ভয়, শোক, চিন্তা ইত্যাদি দোষ থাকে না। তার শরণাগত-ভাবটি স্বতঃই দৃঢ় হতে থাকে ; যেমন—বিবাহের পর কন্যার পিতৃগৃহ থেকে সম্পর্ক-বিচ্ছিন্ন হতে থাকে আর পতিগৃহের সঙ্গে সম্বন্ধ দৃঢ় হতে থাকে। এ-সম্বন্ধ এতদূর পর্যন্ত দৃঢ় হয় যে যখন সেই কন্যা ঠাকুমা হয়, তখন তার আর স্বপ্নেও মনে হয় না, যে আমি এখানকার নই। তার মনে দৃঢ় ভাব থাকে যে, আমি এখানকারই আর এই সবই আমার। যখন তার পৌত্রবধূ আসে এবং ঝগড়া-বিবাদ করতে থাকে তখন সে (ঠাকুমা) বলতে থাকে, দেখ এই অন্য ঘরের মেয়ে এসে আমার ঘর বরবাদ করে দিল। তখন সেই বৃদ্ধার (ঠাকুমার) মনে থাকে না যে, সেও তো অপর ঘরের (অন্য পরিবারের) মেয়ে। তাৎপর্য হল এই যে, বানানো সম্পর্কেও যখন এত দৃঢ়তা থাকে, তখন ভগবানেরই অংশ এই প্রাণীর ভগবানের সঙ্গে যে নিত্য-সম্পর্ক তা যে দৃঢ় হবে—এতে আর আশ্চর্যের কী আছে ! আসলে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় হয় সংসারের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্কগুলি পরিত্যাগ করলেই।

সত্যিকার হৃদয় দিয়ে প্রভুর চরণে শরণাগত হয়ে সেই ভক্তের যদি কোনো ভাব, আচরণ ইত্যাদির কোনো ন্যূনতা থাকে, কখনো বিপরীত ধারণা উৎপন্ন হয় অথবা কোনো পরিস্থিতিতে পড়ে পরবশ হয়ে কখনো কোনো দুষ্কর্ম ঘটে যায়, তাহলে তার হৃদয়ে জ্বালার সৃষ্টি হবে। তাই তার আর অন্য কোনো প্রায়শ্চিত্ত করার প্রয়োজন নেই। ভগবান কৃপা করে তাকে সেই পাপ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করে দেন[১]।

ভগবান ভক্তের একাত্মবোধই দেখেন, গুণ বা দোষগুলিকে নয়[২]। অর্থাৎ ভগবান ভক্তের দোষ লক্ষ্যই করেন না, ভক্তের সঙ্গে তাঁর যে একাত্মবোধ তিনি শুধু তাই দেখেন। কারণ স্বরূপতঃ ভক্ত সর্বদাই ভগবানের। দোষ আগন্তুক, তা আসে ও যায় কিন্তু স্ব-স্বরূপ নিত্য একইভাবে বিরাজিত। তাই ভগবানের দৃষ্টি সর্বদাই এই বাস্তবিকতার দিকে থাকে। যেমন, ধুলো-বালি মাখা অবস্থায় শিশু তার মায়ের কাছে এলে, মার লক্ষ্য শিশুর দিকেই যায়, ময়লার দিকে নয়। শিশুও ময়লার দিকে নজর করে না। মা পরিষ্কার করুন বা না করুন, শিশুর কাছে ময়লা নেই-ই, তার চোখে কেবল মা-ই থাকে। দ্রৌপদীর মনে কত দ্বেষ ও ক্রোধ জমা হয়েছিল—দুঃশাসনের রক্তে চুল ধোব, তবেই চুল বাঁধব ! কিন্তু দ্রৌপদী যখনই ভগবানকে ডাকতেন, ভগবান তৎক্ষণাৎ আসতেন। কারণ তাঁর সঙ্গে দ্রৌপদীর গভীর একাত্মবোধ ছিল।

এই কাহিনিটির অর্থ এই যে ভগবানের শরণাগত হওয়ার পর নিজেকে এভাবে পরীক্ষা করা যে—কই ! আমার মধ্যে তো ভক্ত বা সাধু-সন্তের লক্ষণ ঘটছে না, অতএব আমি ভক্ত নই। এরূপ ধারণা করাই হল উল্টো ধারণা পোষণ করা অর্থাৎ মা উল্টোদিকে কেন এলেন ? এতে কাজ হয় না। বরং এরূপ দৃঢ় ধারণা রাখতে হয় যে যখন আমি ভগবানের শরণাগত হয়েছি তাহলে ভক্তের যে সকল গুণ, আমার মধ্যে তার ন্যূনতা কী করে থাকবে অর্থাৎ আমার মধ্যে গুণের কোনো ঘাটতি থাকতেই পারে না। এরূপ দৃঢ় ধারণা রাখলে সাধক প্রকৃত শরণাগত হবেন এবং পূর্ণতা লাভ করবেন। কিন্তু যদি এরূপ ধারণা করা হয় যে, যেহেতু আমার মধ্যে ভক্তের লক্ষণ ঘটছে না, অতএব আমি শরণাগত নই তাহলে নিজেকে বঞ্চনা করা হবে।

[১]স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ। বিকর্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্ ধুনোতি সবং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৫।৪২)

'যে প্রেমিক ভক্ত ভগবানের শ্রীচরণ অনন্যভাবে ভজনা করে থাকেন, তাঁর দ্বারা অকস্মাৎ যদি কোনো পাপ-কর্ম ঘটে যায় তাহলে তাঁর হৃদয়ে বিরাজমান পরমপুরুষ ভগবান শ্রীহরি সেই পাপ সর্বতোভাবে নাশ করে থাকেন।'

[২]রহতি ন প্রভু চিত চূক কিয়ে কী। করত সুরতি সয় বার হিএ কী॥ (শ্রীরামচরিতমানস ১।২৯।৩)

ভগবানের সঙ্গে একাত্ম হলে দুটি ভাব হয়—(১) ভগবান আমার ও (২) আমি ভগবানের। দুটিতেই ভগবানের সম্বন্ধ সমানভাবে থাকলেও 'ভগবান আমার'—এইভাবে ভগবানের থেকে নিজের আনুকূল্য পাবার ইচ্ছা হতে পারে যে, 'ভগবান আমার হলে আমার ইচ্ছা কেন পূরণ করেন না ?' কিন্তু 'আমি ভগবানের' এইভাবে ভগবান থেকে নিজ আনুকূল্য পাবার ইচ্ছা হয় না। কারণ 'আমি ভগবানের হলে ভগবান আমার জন্য যা উচিত মনে করেন, নিঃসঙ্কোচে তাই করেন।' তাই সাধকের উচিত তিনি যেন ভগবানের ইচ্ছাতেই নিজ ইচ্ছা মিলিয়ে দেন এবং ভগবানের ওপর কোনো আধিপত্য না করেন, অর্থাৎ ভগবানের আধিপত্য যেন সম্পূর্ণভাবে মেনে নেন। কখনো ভগবান আমাদের ইচ্ছা পূরণ করলে, তাতে সঙ্কোচ বোধ করা উচিত যে আমার জন্য ভগবানের এই কাজ করতে হল ! যদি মনস্কামনা পূর্ণ হলে সঙ্কোচ না এসে সন্তুষ্টি আসে তাহলে সেটি শরণাগতি নয়। শরণাগত ভক্ত শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধির প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও ভগবানের ইচ্ছা মনে করে প্রসন্ন থাকেন।

শরণাগত ভক্তের কখনো নিজের জন্য কিছুই করার বাকি থাকে না। কারণ তিনি তাঁর সমস্ত মমতাসম্পন্ন বস্তু-সমেত নিজেকেও ভগবানের পাদপদ্মে সমর্পণ করে দেন, যা প্রকৃতপক্ষে ভগবানেরই। তার করা বা করানোর সকল কাজই ভগবানের হয়ে যায়। এরূপ অবস্থায় তিনি অত্যন্ত কঠিন এবং ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতেও তাঁর ওপর প্রভুর অপার কৃপা অনুভব করে সর্বদা প্রসন্ন থাকেন, মত্ত হয়ে থাকেন। যেমন—গরুড়ের জিজ্ঞাসার উত্তরে কাকভূশণ্ডি তাঁকে তাঁর পূর্বের ব্রাহ্মণ জন্মের কথা শোনালেন, যাতে লোমশ ঋষি তাঁকে অভিশাপ দিয়ে পক্ষিকুলের নীচ চণ্ডাল পক্ষি কাকরূপে সৃষ্টি করেন। কিন্তু কাকভূশণ্ডির মনে তার জন্য কোনো ভয় বা দীনতা আসেনি। তিনি তাতে ভগবানের শুদ্ধ বিধানই অনুভব করেছিলেন। শুধু বোঝেনইনি, মনে মনে বলে উঠেছিলেন যে **'উর প্রেরক রঘুবংস বিভূষন'** (শ্রীরামচরিতমানস ৭।১১৩।১)। এরূপ ভীষণ শাপগ্রস্ত হয়েও যখন কাকভূশণ্ডির প্রসন্নভাব একটুও বিচলিত হল না, তখন লোমশ ঋষি তাঁকে ভগবানের প্রিয় ভক্ত মনে করে নিজের কাছে ডেকে বালক রামের ধ্যানমন্ত্র জানালেন। তারপর ভগবানের কথা শুনিয়ে, প্রসন্ন হয়ে কাকভূশণ্ডির মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন যে,—'আমার কৃপায় তোমার হৃদয়ে অবাধ, অখণ্ড রামভক্তি থাকবে। তুমি শ্রীরামের প্রিয় হবে এবং সমস্ত গুণের আকর হবে। যে রূপ চাইবে, তাই ধারণ করবে, যেস্থানে থাকবে তার এক যোজন পর্যন্ত কোনো মায়াকণ্টক থাকবে না' ইত্যাদি। এইভাবে অনেক আশীর্বাদ দিতেই আকাশবাণী হল যে, 'হে ঋষি ! তুমি যা সব বলেছ, তা সত্য হবে, এ কায়মনোবাক্যে আমারই ভক্ত।' এ কথায় ভগবানের বিধানে সদাপ্রসন্ন কাকভূশণ্ডি বলে উঠলেন—

ভগতি পচ্ছ হঠ করি রহেউঁ দীন্হি মহা রিষি সাপ।
মুনি দুর্লভ বর পায়উঁ দেখহু ভজন প্রতাপ॥
(শ্রীরামচরিতমানস ৭।১১৪ খ)

এখানে 'ভজন-প্রতাপ' শব্দটির অর্থ হল—ভগবানের বিধানে সর্বদা প্রসন্ন থাকা। অত্যন্ত বিপরীত অবস্থাতেও প্রেমিক ভক্তের প্রসন্নতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। কারণ প্রেমের স্বরূপই হল প্রতিমুহূর্তে বৃদ্ধি পাওয়া।

মানুষের যেটি নিজস্ব সেটি তার প্রিয় হয়ে থাকে, এই হল স্বাভাবিক নিয়ম। সমস্ত জীবকে ভগবান তাঁর প্রিয় বলে মনে করেন—**'সব মম প্রিয় সব মম উপজাএ'** (শ্রীরামচরিতমানস ৭।৮৬।২) আর এই জীবেরও প্রভুকে স্বাভাবিকভাবেই প্রিয় বলে মনে হয়। তবে একথা আলাদা যে এই জীব পরিবর্তনশীল জগৎ ও শরীরকে ভ্রমক্রমে নিজের বলে মনে করে নিজ প্রিয় প্রভু থেকে বিমুখ হয়ে পড়ে। সে বিমুখ হলেও ভগবান নিজে কখনো কাউকে ত্যাগ করেননি এবং ত্যাগ করতে পারেনও না। কারণ জীব সর্বদাই সাক্ষাৎ ভগবানেরই অংশ। তাই সমস্ত জীবের সঙ্গে ভগবানের আপন-ভাব অক্ষুণ্ণ, অখণ্ডিতরূপে স্বাভাবিকভাবেই বজায় থাকে। তিনি জীবের ওপর কৃপা পরবশ হয়ে ভক্তদের রক্ষা এবং দুষ্টদের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপন—এই তিনটি কাজের জন্য সময় সময়ে অবতাররূপে পৃথিবীতে আসেন (গীতা ৪।৮)। এই তিন ব্যাপারেই ভগবানের আপন-ভাব দেখা যায়, নচেৎ ভক্তদের রক্ষা, দুষ্টদের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপনাতে ভগবানের কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ হয় ? অর্থাৎ কোনো প্রয়োজনই সিদ্ধ হয় না। এই তিনটি কাজই ভগবান প্রাণীমাত্রেরই কল্যাণের জন্য করে থাকেন। এর দ্বারা ভগবানের প্রাণীদের সঙ্গে স্বাভাবিক আপন-ভাব,

কৃপালুতা, প্রিয়তা, হিতৈষিতা, সহৃদয়তা এবং উদারতা প্রমাণিত হয় এবং এখানেও সেদিকে লক্ষ্য করেই অর্জুনকে তিনি বলেছেন—**'মদ্ভক্তো ভব, মন্মনা ভব, মদ্‌যোজী ভব, মাং নমস্কুরু'**। এই চারটি কথায় ভগবানের একমাত্র উদ্দেশ্য জীবকে তাঁর অভিমুখী করা, যাতে সমস্ত জীব অসৎ থেকে বিমুখ হয়। কারণ দুঃখ, শোক, বারংবার জন্ম-মৃত্যু গ্রহণ করা, বিপত্তি ঘটা ইত্যাদির প্রধান কারণই হল ভগবান থেকে বিমুখ হওয়া।

ভগবান যা কিছু বিধান করেন, তা সংসার-মাত্রেরই সমস্ত জীবের কল্যাণের জন্যই করে থাকেন—ভগবানের এই কৃপার দিকে যদি প্রাণীরা দৃষ্টি দেয় তাহলে আর তাদের কিছু করার বাকি থাকে না। জীবদের হিতসাধনের জন্য ভগবানের হৃদয়ে এক ব্যাকুলতা থাকে, তাই তিনি **'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'**-এর মতো অত্যন্ত গোপনীয় কথা বলে দিয়েছেন। কারণ ভগবান জীবমাত্রকেই নিজের বলে মনে করেন—**'সুহৃদং সর্বভূতানাম্'** (৫।২৯) এবং তাদের এই স্বাধীনতা দিয়েছেন যাতে তারা কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ইত্যাদি যত প্রকারের সাধনা আছে, তার মধ্যে কোনো একটি সাধনার সাহায্যে সহজেই ভগবানকে প্রাপ্ত করতে সক্ষম হয় এবং দুঃখ-শোক ইত্যাদি চিরকালের মতো সমূলে দূর করতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে ভগবদ্‌কৃপাতেই জীবের উদ্ধার হয়। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, অষ্টাঙ্গযোগ, লয়যোগ, হঠযোগ, রাজযোগ, মন্ত্রযোগ ইত্যাদি যত প্রকারের সাধনা আছে, সেগুলি সবই ভগবানের দ্বারা এবং ভগবদ্‌তত্ত্ব জানা মহাপুরুষগণের দ্বারাই প্রকটিত হয়েছে[১]। সুতরাং এইসব সাধনায় ভগবদ্‌কৃপাই ওতঃপ্রোত হয়ে আছে। সাধনা করায় সাধক তো নিমিত্তমাত্র হয় কিন্তু সাধনার সিদ্ধিতে ভগবদ্‌কৃপাই প্রধান।

শরণাগত ভক্তের এমন চিন্তা কখনো করতে নেই যে এখনও ভগবদ্দর্শন হল না, ভগবানের পাদপদ্মে ভক্তি হয়নি, বৃত্তিসকল শুদ্ধ হয়নি ইত্যাদি। এইরূপ চিন্তা করা যেন বাঁদরের বাচ্চার মতো হওয়া। বাঁদর-বাচ্চা নিজেই মাকে আঁকড়ে থাকে। বাঁদরী লাফায়-ঝাঁপায় এদিক-ওদিক যায় আর বাচ্চা মাকে জড়িয়ে ধরে থাকে।

ভক্তের সমস্ত চিন্তাই ভগবানে অর্পণ করতে হয় অর্থাৎ তিনি দর্শন দেবেন কি দেবেন না, প্রেম করবেন কি করবেন না, বৃত্তিগুলি ঠিক করবেন কি করবেন না, আমাকে পরিশুদ্ধ করবেন কি করবেন না—এ সবই ভগবানের ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিতে হয়। ভক্তকে বিড়ালের বাচ্চার মতো হতে হয়। বিড়াল-বাচ্চা তার মায়ের ওপর নির্ভর করে। বিড়ালী তাকে যেমন খুশি রাখে, যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যায়। বিড়ালী যখন তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়, বাচ্চা পা গুটিয়ে চুপ করে থাকে। তেমনই শরণাগত ভক্ত জগতের থেকে তাঁর হাত-পা গুটিয়ে[২] শুধু ভগবদ্‌-চিন্তা, নাম-জপ ইত্যাদি করতে করতে ভগবানের দিকেই চেয়ে থাকেন। তিনি ভগবানের সকল বিধানেই পরম প্রসন্ন থাকেন, কোনো কিছুতেই আগ্রহ রাখেন না।

যেমন, কুমোর প্রথমে মাটিকে মাথায় করে নিয়ে আসে, সেটি তারই ইচ্ছামতো, পরে সেই মাটিকে পায়ে করে মাখে, সেটিও তার ইচ্ছামতো, তারপরে চাকে তুলে ঘোরায়, তাও তারই (কুমোরেরই) ইচ্ছামতো। মাটি কখনো বলে না যে তুমি কলসী তৈরি করো, হাঁড়ি তৈরি বা ভাঁড় তৈরি করো। কুমোর তার ইচ্ছামতো যা খুশি তৈরি করে। শরণাগত ভক্তও তেমনই নিজের মনে কোনো ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা রাখেন না। তিনি যত বেশি নিশ্চিন্ত এবং নির্ভয় হন, ততই ভগবদ্‌কৃপা তাঁকে আরও অধিকভাবে তাঁর অনুকূল করে তোলে আর যত তিনি চিন্তা করেন, নিজের শক্তির ওপর নির্ভর করেন, ততই ভগবদ্‌কৃপা আসার পথে বাধার সৃষ্টি হয় অর্থাৎ শরণাগত হলে ভগবানের যে বিশেষ, অলৌকিক, অখণ্ড কৃপা বর্ষণ হয়, সেই কৃপাতে অন্তরায়ের সৃষ্টি হয়।

যেমন, ধীবর মাছ ধরার জন্য জাল ফেললে, সব মাছই জালের ভেতরে ধরা পড়ে, শুধু যেগুলি ধীবরের পায়ের কাছে থাকে—তারা ধরা পড়ে না। তেমনই ভগবানের মায়াতে (সংসারে) মমত্ববোধ করে জীব আবদ্ধ হয় আর জন্মাতে ও মৃত্যুবরণ করতে থাকে। কিন্তু যে জীব মায়াধীশ

---

[১]হেতুরহিত জগ জুগ উপকারী। তুম্‌হ তুম্‌হার সেবক অসুরারী॥ (শ্রীরামচরিতমানস ৭।৪৭।৩)

[২]ভক্ত যা কিছু করেন, সেগুলি ভগবানেরই মনে করে, ভগবানেরই শক্তি মেনে নিয়ে, ভগবানেরই জন্য করে থাকেন, নিজের জন্য কিছুই করেন না—এই হল তাঁর হাত-পা গুটিয়ে রাখা।

ভগবানের চরণের শরণ নেয়, সে মায়া অতিক্রম করে—**'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে'** (গীতা ৭।১৪)। এই দৃষ্টান্তের একটি অংশই গ্রহণযোগ্য। কারণ ধীবরের মাছ ধরার ভাব থাকে ; কিন্তু ভগবানের জীবগণকে মায়াতে আবদ্ধ করার কোনো ভাব বা ইচ্ছা থাকে না। তাঁর ভাব হল জীবদের মায়াজাল থেকে মুক্ত করে তাঁর শরণাগত করে নেওয়া, তাইতো তিনি বলেন—**'মামেকং শরণং ব্রজ'**। জীব সংযোগজনিত সুখের আকাঙ্ক্ষায় নিজেই মায়াতে আবদ্ধ হয়।

ঘুরন্ত যাঁতার মধ্যে যেমন সমস্ত বীজই চূর্ণ হয়ে যায়[১] ; কিন্তু যে আধারটির ওপর যাঁতাটি ঘোরে, সেই দণ্ডের আশপাশের দানাগুলি চূর্ণ হয় না, তেমনই জন্ম-মৃত্যুরূপ জগতের ঘুরন্ত যাঁতায় পড়ে সকল জীবই নিষ্পেষিত হয় অর্থাৎ দুঃখ পেতে থাকে ; কিন্তু যে আধারের ওপর সংসার-চক্র চলতে থাকে, সেই ভগবানের পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণকারী জীব সেই নিষ্পেষণ থেকে রক্ষা পায়—**'কৌঙ্গ হরিজন উবরে, কীল মাকড়ী পাস'**। কিন্তু এই উদাহরণ সম্পূর্ণ ঠিক নয়। কারণ বীজ স্বাভাবিকভাবেই দণ্ডের কাছে থেকে যায়, সেগুলি রক্ষা পাবার কোনো চেষ্টা করে না। কিন্তু ভগবানের ভক্তগণ সংসারে বিমুখ হয়ে প্রভুর শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাৎপর্য এই যে যারা ভগবানের অংশ হয়েও জগৎ-সংসারকে আপন বলে মনে করে অথবা সংসার থেকে কিছু আকাঙ্ক্ষা করে, তারাই জন্ম-মৃত্যুরূপ চক্রে আবর্তিত হয়ে দুঃখভোগ করতে থাকে।

সংসার ও ভগবান—এই দুইয়ের সম্পর্ক দুপ্রকারের। সংসারের সঙ্গে শুধু মেনে নেওয়া সম্পর্ক আর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক বাস্তবিক। সাংসারিক সম্পর্ক মানুষকে পরাধীন করে, গোলাম বানায় ; ভগবানের সম্পর্ক মানুষকে স্বাধীন করে, চিন্ময় করে এবং ভগবানেরও মালিক বানিয়ে তোলে।

কোনো বিষয়ে নিজের মধ্যে কোনো বৈশিষ্ট্য দেখা হল প্রকৃতপক্ষে পরাধীনতা। মানুষ যদি বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন-সম্পত্তি, ত্যাগ, বৈরাগ্য ইত্যাদি কোনো কিছু নিয়ে নিজেকে বিশিষ্ট বলে মনে করে তাহলে প্রকৃতপক্ষে তা ওই বিদ্যা ইত্যাদিরই পরাধীনতা, দাসত্ব হয়ে থাকে। যেমন, কেউ যদি অর্থের জন্য নিজেকে বিশিষ্ট বলে মনে করে, তাহলে সেই বৈশিষ্ট্য অর্থেরই, মানুষটির নয়। সে নিজেকে অর্থের মালিক বলে মনে করলেও, আসলে সে অর্থের গোলাম।

সংসারের বৈশিষ্ট্যই হল যে সাংসারিক কোনো বস্তু নিয়ে যে ব্যক্তি নিজেকে বিশেষ কিছু বলে মনে করে, সেই বস্তুটিই তাকে তুচ্ছ করে দেয়, পদদলিত করে রাখে। কিন্তু যিনি ভগবানের আশ্রিত হয়ে সর্বদা তাঁর ওপর নির্ভর করে থাকেন, তিনি নিজস্ব কোনো বৈশিষ্ট্য দেখেন না, বরং ভগবানেরই অলৌকিকত্ব, বিশেষত্ব ও বিচিত্র-ভাব প্রত্যক্ষ করেন। ভগবান তাঁকে তাঁর মাথার মণি করে রাখুন, বা নিজের প্রভু করে নিন, তাহলেও কোনো কিছুতে তার অহংভাব আসে না। এরূপ ভক্তের মধ্যে ভগবানের বিশেষ ভাব আবির্ভূত হয়। কারও কারও মধ্যে এই বিশেষ ভাব এত বেশি দেখা যায় যে তাঁর শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি প্রাকৃত বস্তুগুলিও চিন্ময় হয়ে ওঠে। তাঁর মধ্যে জড়ত্বের একান্তই অভাব হয়ে যায়। এরূপ ভগবানের কত প্রেমিক ভক্ত ভগবানে মিশে গেছেন, শেষকালে তাঁদের দেহও পাওয়া যায়নি। যেমন, ভক্তিমতি মীরা সশরীরে ভগবানের বিগ্রহে লীন হয়ে গিয়েছিলেন। কেবল চিহ্নরূপে তাঁর শাড়ির একটি ছোট টুকরো বিগ্রহের মুখে আটকে ছিল, আর কিছুই ছিল না। এইভাবে সন্ত তুকারামও সশরীরে বৈকুণ্ঠে গমন করেছিলেন।

জ্ঞানমার্গে শরীর চিন্ময়ত্ব লাভ করে না। কারণ জ্ঞানী অসৎ-এর সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করে, অসৎ-এর থেকে পৃথক্ হয়ে স্বয়ং চিন্ময়-তত্ত্বে স্থিত হন। কিন্তু ভক্ত যখন ভগবানের সম্মুখীন হন, তখন তাঁর দেহ-মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয় সবই ভগবানের সম্মুখীন হয়ে যায়। তাৎপর্য হল যে যাঁর দৃষ্টিতে চিন্ময়-তত্ত্ব ছাড়া জড়ত্বের কোনো পৃথক্ অস্তিত্ব নেই, সেই চিন্ময়তা তাঁর শরীর ইত্যাদিতে পরিব্যাপ্ত হয় এবং শরীরাদি চিন্ময়ত্ব লাভ করে। সাধারণ লোকে তাঁর শরীরে জড়ত্ব দেখলেও, বাস্তবে তাঁর শরীর চিন্ময় হয়ে যায়।

সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হলে ভগবানের কৃপা শরণাগতের জন্য বিশেষভাবে প্রকটিত হয়, কিন্তু জগৎকে স্নেহপূর্বক পালনকারিণী এবং ভগবানে অভিন্ন

[১]চলতী চক্কী দেখকর দিয়া কবীরা রোয়। দো পাটনমে আয়কে সাবুত বচা ন কোয়॥

বাৎসল্যময়ী মাতা লক্ষ্মীদেবীর প্রভুর শরণাগতদের প্রতি কত স্নেহ, কত ভালোবাসা, তার বর্ণনা কেউ করতে পারে না। লৌকিক ব্যবহারেও দেখা যায় যে পতিব্রতা স্ত্রী পিতৃভক্ত পুত্রকে অত্যন্ত ভালোবাসেন।

দ্বিতীয়তঃ, প্রেমভাবপূর্ণ প্রভু যখন তাঁর ভক্তদের দেখার জন্য গরুড় বাহনে করে আসেন, তখন মাতা লক্ষ্মীদেবীও তাঁর সঙ্গে গরুড়ে করে আসেন, যে গরুড়ের পাখায় সামবেদের মন্ত্র ঝঙ্কৃত হয়। কিন্তু কেউ কেউ ভগবানকে চায় না, চায় শুধু মাতা লক্ষ্মীদেবীকেই। ভক্তদের ভালোবাসায় মা আসেন, কিন্তু তাঁর বাহন হল দিবান্ধ পেঁচা। এরূপ বাহনবিশিষ্ট লক্ষ্মীদেবীকে লাভ করে মানুষ মদান্ধ হয়ে যায়। মাকে যদি কেউ ভোগ্যা বলে মনে করে তাহলে তার নিশ্চিত পতন হয় ; কেন-না সে তার মাকেই কু-দৃষ্টিতে দেখেছে, তাই সে মহা অধম ব্যক্তি।

তৃতীয়তঃ, যেখানে শুধু ভগবানকে ভালোবাসা হয়, সেখানে ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন মাতা লক্ষ্মীদেবীও আসেন, কিন্তু যেখানে শুধু লক্ষ্মীদেবীকেই কামনা করা হয়, সেখানে লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে যে ভগবানও আসবেন— এমন কোনো নিয়ম নেই।

শরণাগতির বিষয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। একবার সীতা, রাম এবং হনুমান জঙ্গলের মধ্যে এক বৃক্ষের নীচে বসেছিলেন। সেই বৃক্ষের শাখা-প্রশাখার ওপর একটি লতা বেড়ে উঠেছিল। সেই লতার নরম তন্তু চারদিক ছেয়ে গিয়েছিল। তাতে কোথাও কচি-কচি মুকুল বেরিয়েছে, কোথাও তাম্রবর্ণ পাতা বেরিয়েছে, ফুল আর পাতায় লতাটি ছেয়ে রয়েছে, ফলে সেই বৃক্ষটির সুন্দর শোভা হয়েছে, দেখতে অতি চমৎকার লাগছে। সেই বৃক্ষশোভা দেখে রাম হনুমানকে বললেন, 'হনুমান ! দেখো এই লতাটি কী সুন্দর ! গাছটির চারিদিকে ছেয়ে আছে ! এই লতাটি তার সুন্দর সুন্দর ফল, সুগন্ধিত ফুল আর সবুজ পাতায় এই বৃক্ষের শোভা কেমন বাড়িয়ে দিয়েছে। জঙ্গলের অন্য সব বৃক্ষের চেয়ে এই বৃক্ষটিকে কত সুন্দর দেখাচ্ছে ! শুধু তাই নয়, এই বৃক্ষটির জন্যই সমস্ত জঙ্গলটিই শোভাময় হয়ে আছে। এই লতাটির জন্যই বনের পশু-পক্ষী এই বৃক্ষটিকেই আশ্রয় করছে। ধন্য এই লতা !'

ভগবান রামের মুখে লতার প্রশংসা শুনে সীতা হনুমানকে বললেন, 'দেখো বাবা হনুমান ! তুমি কি খেয়াল করেছ যে এই লতাটির ওপরে ওঠা, ফুল-পাতায় পল্লবিত হওয়া, তন্তুগুলির বিস্তার লাভ করা—এসবই বৃক্ষের আশ্রয়ে হয়েছে, বৃক্ষের জন্যই হয়েছে। বৃক্ষই এই লতাটির শোভার কারণ। তাই এর মূল মহিমা হল বৃক্ষই। আধার তো বৃক্ষই। বৃক্ষটির আশ্রয় ছাড়া লতাটি নিজে কি কিছু করতে পারত ? কেমন করে বিস্তার লাভ করত ? এখন বলো হনুমান, মহিমা বৃক্ষটিরই কি না ?'

রাম বললেন—'কি হনুমান ! এই মহিমা লতারই তো ?'

হনুমান বললেন—'আমি অন্য কথা মনে করছি।'

সীতা জিজ্ঞাসা করলেন—'সেটি কী বাবা ?'

হনুমান বললেন—'মা ! বৃক্ষ ও লতার ছায়া খুবই সুন্দর। তাই আমার এই দুটির ছায়াতে থাকতেই ভালো লাগছে অর্থাৎ আমার আপনাদের দুজনের ছায়াতে (শ্রীচরণের আশ্রয়ে) থাকাই ভালো লাগে।'

সেবক সুত পতি মাতু ভরোসেঁ।
রহউ অসোচ বনই প্রভু পোসেঁ॥

(শ্রীরামচরিতমানস ৪।৩।২)

এমনিতে ভগবান আর তাঁর দিব্য হ্লাদিনী শক্তি— একে অপরের শোভা বর্ধন করে। কিন্তু কেউ কেউ তো ওই দুজনকেই শ্রেষ্ঠ বলে থাকেন আবার কেউ ভগবানকেই শ্রেষ্ঠ বলেন ; আবার কেউ শুধু তাঁর হ্লাদিনী শক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলে থাকেন। শরণাগত ভক্তের পক্ষে প্রভু এবং তাঁর হ্লাদিনী শক্তি—উভয়ের আশ্রয়ই শ্রেষ্ঠ।

একবার এক প্রজ্ঞাচক্ষু (নেত্রহীন) সাধু লাঠি হাতে যমুনার ধার দিয়ে যাচ্ছিলেন। নদীতে বন্যা এসেছিল, তাতে একস্থানে যমুনার পাড় ভেঙেছিল, তাই সাধু জলে পড়ে গেলেন আর লাঠি হস্তচ্যুত হল। তিনি দেখতেও পান না, কী করে সাঁতার দেবেন ? ভগবানের শরণাগতির কথা স্মরণে আসায় তিনি সমস্ত চেষ্টা ত্যাগ করে শরীর ভাসিয়ে দিলেন, তখন তাঁর মনে হল কে যেন তাঁর হাত ধরে পাড়ে উঠিয়ে দিল। সেখানে অন্য একটি লাঠি হস্তগত হওয়ায় তিনি তার সাহায্যে চলতে শুরু করলেন। তাৎপর্য হল যে যাঁরা ভগবানের শরণ গ্রহণ করে ভগবানের ওপর নির্ভর করে থাকেন, তাঁদের নিজেদের জন্য কিছু করতে হয় না। ভগবানের বিধানে যা হয়, তাতেই তাঁরা প্রসন্ন থাকেন।

অনেকগুলি ভেড়া-ছাগল জঙ্গলে চরতে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে একটি ছাগল চরতে চরতে লতায় আটকে গিয়েছিল। সেই লতাটি ছাড়িয়ে মুক্ত হতে তার অনেক সময় লাগল। ততক্ষণে অন্য ছাগল-ভেড়াগুলি নিজেদের

ঘরে পৌঁছিয়ে গিয়েছিল। অন্ধকারও হয়ে আসছিল। সেই ছাগলটি ঘুরতে ঘুরতে এক সরোবরের কাছে পৌঁছাল। সেখানে ভেজা মাটিতে সিংহের পায়ের ছাপ পড়েছিল, ছাগলটি সেই পায়ের ছাপের শরণাগত হয়ে তার কাছে বসল। রাত্রে শিয়াল, ভাল্লুক, বাঘ ইত্যাদি প্রাণী ছাগলটিকে খাবার জন্য এল, তখন ছাগলটি বলল যে, 'আগে দেখ আমি কার শরণ নিয়েছি, তারপরে আমাকে খেও!' তারা সেই চিহ্ন দেখে বলাবলি করতে লাগল ; 'আরে! এতো সিংহের শরণ নিয়েছে, শীগ্‌গির পালাও এখান থেকে! সিংহ এসে পড়লে আর রক্ষা নেই।' এইভাবে সকল প্রাণী ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পালিয়ে গেল। শেষকালে সেই সিংহ এল এবং ছাগলকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি এই জঙ্গলে একলা কী করে আছ ?' ছাগল বলল, 'আগে এই পায়ের ছাপ দেখ, তারপরে কথা বল। এখানে এটি যার পায়ের ছাপ, আমি তারই শরণাগত।' সিংহ দেখল, 'আরে এতো আমারই পদচিহ্ন, এতো আমার শরণই নিয়েছে।' তখন সে ছাগলকে আশ্বাস দিয়ে বলল, 'তুমি ভয় পেও না, এখানে নির্ভয়ে থাক।'

রাত্রে যখন হাতি জল খেতে এল তখন সিংহ হাতিকে বলল, 'তুমি এই ছাগলকে নিজের পিঠে করে জঙ্গলে চরিয়ে আন, সবসময় একে তোমার পিঠেই রাখবে, নাহলে তুমি তো জান আমি কে ? তোমাকে মেরে ফেলব!' সিংহের কথায় হাতি কাঁপতে লাগল এবং শুঁড়ে করে ছাগলকে পিঠে তুলে নিল। ছাগল তখন নির্ভয়ে হাতির পিঠের ওপরে বসে গাছের উঁচু ডাল থেকে কচি মুকুল ও পল্লব খেতে থাকল আর বেশ মজায় থেকে গেল।

খোজ পকড় সৈঁঠে রহো, ধনী মিলেঙ্গে আয়।
অজয়া গজ মস্তক চঢ়ে নির্ভয় কোঁপল খায়॥

এমনভাবে মানুষ যখন ভগবানের শরণাগত হয়, তাঁর পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন সে সকল প্রাণী থেকে, বাধা-বিঘ্ন থেকে, নির্ভয় হতে পারে। তাকে কেউ ভীত-সন্ত্রস্ত করতে পারে না, তার কোনো কিছু কেউ নষ্ট করতে পারে না।

জো জাকো শরণো গহৈ, তাকহঁ তাকী লাজ।
উলটে জল মছলী চলে, বহ্যো জাত গজরাজ॥

ভগবানের সঙ্গে কাম, ক্রোধ, ভয়, দ্বেষ, স্নেহ ইত্যাদির দ্বারা যে কোনো সম্পর্ক পাতানো হোক না কেন, সবই জীবের মঙ্গলকারী হয়ে থাকে[১]। তাৎপর্য হল এই

---

[১](ক) কামাদ্‌, দ্বেষাদ্‌ ভয়াৎ স্নেহাদ্‌ যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ। আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্‌গতিং গতাঃ॥
গোপ্যঃ কামাদ্‌ ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ। সম্বন্ধাদ্‌ বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্‌ যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ৭।১।২৯-৩০)

'একজন নয়, অনেক ব্যক্তিই কাম, দ্বেষ, ভয়, স্নেহ দ্বারা মনকে ভগবানে নিবিষ্ট করে এবং নিজের সকল পাপ মুছে সেইভাবেই ভগবানকে লাভ করে, যেমন, ভক্ত ভক্তি দ্বারা লাভ করে। যেমন, গোপীরা কাম দ্বারা, কংস ভয়ের দ্বারা, শিশুপাল-দন্তবক্ত্র প্রমুখ রাজারা দ্বেষের দ্বারা, যদুবংশীয়রা পারিবারিক সম্পর্কের দ্বারা, যুধিষ্ঠির ইত্যাদি স্নেহ দ্বারা এবং নারদাদি ভক্তি দ্বারা নিজ মন ভগবানে নিবিষ্ট করেছেন।'

(খ) সৎসঙ্গেন হি দৈতেয়া যাতুধানা মৃগাঃ খগাঃ। গন্ধর্বাপ্সরসো নাগাঃ সিদ্ধাশ্চারণগুহ্যকাঃ॥
বিদ্যাধরা মনুষ্যেষু বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ স্ত্রিয়োঽন্ত্যজাঃ। রজস্তমঃ প্রকৃতয়স্তস্মিংস্তস্মিন্‌ যুগেঽনঘ॥
বহবো মৎপদং প্রাপ্তাস্ত্বাষ্ট্রকায়াধবাদয়ঃ। বৃষপর্বা বলির্বাণো ময়শ্চাথ বিভীষণঃ॥
সুগ্রীবো হনুমানৃক্ষো গজো গৃধ্রো বণিক্‌পথঃ। ব্যাধঃ কুব্জা ব্রজে গোপ্যো যজ্ঞপত্ন্যস্তথাপরে॥
তে নাধীতশ্রুতিগণা নোপাসিতমহত্তমাঃ। অব্রতাতপ্ততপসঃ সৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১২।৩-৭)

ভগবান বলেছেন—হে নিষ্পাপ উদ্ধব! এ একযুগের কথা নয়, সমস্ত যুগেরই এক রকম কথা। সৎসঙ্গ অর্থাৎ আমার সম্বন্ধের প্রভাবেই দৈত্য-রাক্ষস, পশু-পক্ষী, গন্ধর্ব-অপ্সরা, নাগ-সিদ্ধ, চারণ-গুহ্যক এবং বিদ্যাধরগণ আমাকে প্রাপ্ত হয়েছে। মানুষের মধ্যে বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী এবং অন্ত্যজাদি রজোগুণী-তমোগুণী প্রকৃতির বহু জীবই আমার পরমপদ প্রাপ্ত হয়েছে। বৃত্রাসুর, প্রহ্লাদ, বৃষপর্বা, বলি, বাণাসুর, ময়দানব, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান, জাম্ববান, গজেন্দ্র, জটায়ু, তুলাধার বৈশ্য, ধর্মব্যাধ, কুব্জা, ব্রজগোপিগণ, যজ্ঞপত্নী ও অন্যান্যেরাও সৎসঙ্গের প্রভাবে আমাকে প্রাপ্ত করতে সক্ষম হয়েছেন।

ওইসব ব্যক্তি বেদের স্বাধ্যায়ও করেননি এবং বিধিপূর্বক মহাপুরুষদের উপাসনাও করেননি। তেমনই তাঁরা কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণাদি ব্রত বা কোনো তপস্যা করেননি। শুধুমাত্র সৎসঙ্গ—আমার সম্বন্ধের প্রভাবেই এঁরা আমাকে লাভ করেছেন।

যে, এসবের সাহায্যে যাঁরা ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন, তাঁরাই উদ্ধার লাভ করেছেন, কিন্তু যাঁরা কোনোভাবেই ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেননি, ভগবান থেকে দূরে রয়েছেন তাঁরা ভগবদ্‌প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হন। ভগবানের অনন্যভক্তদের সম্পর্কে নারদ বলেছেন—

নাস্তি তেষু জাতিবিদ্যারূপকুলধনক্রিয়াদিভেদঃ।

(নারদ ভক্তিসূত্র ৭২)

'সেই ভক্তদের মধ্যে জাতি, বিদ্যা, রূপ, কুল, ধন, ক্রিয়াদির ভেদ থাকে না।'

তাৎপর্য হল এই যে স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ-শরীর নিয়ে সাংসারিক যতপ্রকার জাতি, বিদ্যার পার্থক্য হওয়া সম্ভব, তার কোনোটিই তাঁদের ওপর প্রযোজ্য হয় না, যাঁরা সর্বতোভাবে ভগবানে সমর্পিত হয়েছেন[১]। কারণ তাঁরা অচ্যুত ভগবানেরই লোক—**'যতস্তদীয়াঃ'** (নারদ ভক্তিসূত্র ৭৩), সংসারের নয়। অচ্যুত ভগবানের হওয়ায় এঁদের **'অচ্যুত-গোত্র'** বলা হয়[২]।

শরণাগতির রহস্য

শরণাগতির কী রহস্য—তা একমাত্র ভগবানই জানেন। তবুও আমার বুদ্ধিতে যা আসে তা বলার চেষ্টা করছি ; কেন-না প্রত্যেক ব্যক্তি যে কথা বলে থাকেন, তাতে তাঁর বুদ্ধিরই পরিচয় পাওয়া যায়। পাঠকদের কাছে অনুরোধ তাঁরা যেন এর বিপরীত অর্থ গ্রহণ না করেন। কারণ প্রায়শঃ লোকে তাত্ত্বিক রহস্যপূর্ণ বিষয় গভীরভাবে অনুধাবন না করে অতি শীঘ্র তার বিপরীত অর্থ করে নেয়, তাই এরূপ বিষয় বলার ও শোনার ব্যক্তি খুব কমই পাওয়া যায়।

ভগবান গীতায় শরণাগতির ওপর দুটি কথা বলেছেন—

(১) **'মামেকং শরণং ব্রজ'** (১৮।৬৬) 'অনন্যভাবে আমার শরণাগত হও।'

(২) **'স সর্ববিদ্ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত'** (১৫।১৯) 'সেই সর্বজ্ঞ পুরুষ সর্বভাবে আমার ভজনা করেন', **'তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত'** (১৮।৬২), 'তুমি সর্বভাবে সেই পরমাত্মার শরণাগত হও।'

আমরা কীভাবে ভগবানের শরণাগত হব ? একমাত্র ভগবানেরই শরণাগত হওয়ার তাৎপর্য হল ভগবানের গুণ, ঐশ্বর্য ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি না দেওয়া এবং সর্বভাবে ভগবানের শরণাগত হওয়া অর্থাৎ নিজের কোনো সাংসারিক কামনা না রাখা।

কেবলমাত্র ভগবানের শরণাগত হওয়ার রহস্য হল এই যে ভগবানের অনন্ত গুণ, প্রভাব, তত্ত্ব, রহস্য, মহিমা, লীলা, নাম-ধাম আছে, তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য, মাধুর্য, সৌন্দর্য—কিন্তু শরণাগত ভক্ত এই বিভূতিগুলি দেখেন না। তাঁর শুধু একটি ভাবই থাকে যে 'আমি শুধু ভগবানের এবং ভগবানই আমার'। যদি তিনি গুণ, প্রভাব ইত্যাদি

---

[১](ক) পুংস্ত্বে স্ত্রীত্বে বিশেষো বা জাতিনামাশ্রমাদয়ঃ। ন কারণং মদ্ভজনে ভক্তিরেব হি কারণম্॥

(অধ্যাত্ম. অরণ্য ১০।২০)

'আমার ভজনা করায় পুরুষ-নারীর পার্থক্য অথবা জাতি, নাম বা আশ্রয় কোনো কারণ নয়, বরং আমার প্রতি ভক্তিই একমাত্র কারণ।'

(খ) কিং জন্মনা সকলবর্ণজনোত্তমেন কিং বিদ্যয়া সকলশাস্ত্রবিচারবত্যা।

যস্যাস্তি চেতসি সদা পরমেশভক্তিঃ কোঽন্যস্ততস্ত্রিভুবনে পুরুষোঽস্তি ধন্যঃ॥ (ব্র. স. ভ ১৭)

'সকল বর্ণের মধ্যে উত্তম বর্ণে (ব্রাহ্মণকুলে) জন্ম হলে কী হয় ? সমস্ত শাস্ত্র গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে কী হয় ? অর্থাৎ কিছুই হয় না। যার হৃদয়ে ভগবানে ভক্তি বিরাজ করে, ত্রিভুবনে তার মত ধন্য আর কে হতে পারে ?'

(গ) ব্যাধস্যাচরণং ধ্রুবস্য চ বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা কা জাতির্বিদুরস্য যাদবপতেরুগ্রস্য কিং পৌরুষম্।

কুব্জায়াঃ কিমু নাম রূপমধিকং কিং তৎসুদাম্নো ধনং ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং ন চ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ॥

'ব্যাধের কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ আচরণ ছিল ? ধ্রুবের কত বয়স হয়েছিল ? গজেন্দ্রের কী বিদ্যা ছিল ? বিদুর কোন্ উচ্চ জাতির ছিলেন ? যদুপতি উগ্রসেনের কী পরাক্রম ছিল ? কুব্জা কী সুন্দরী ছিলেন ? সুদামার কাছে কী ধন ছিল ? তা সত্ত্বেও তাঁরা ভগবদ্‌প্রাপ্তি করেছিলেন। কারণ ভগবানের ভক্তিই প্রিয়, তিনি ভক্তিতেই সন্তুষ্ট হন, আচরণ, বিদ্যা ইত্যাদিতে নয়।'

[২]পিতৃগোত্রী যথা কন্যা স্বামীগোত্রেণ গোত্রিকা। শ্রীরামভক্তিমাত্রেণাচ্যুতগোত্রেণ গোত্রকঃ॥ (নারদপাঞ্চরাত্র)

দেখে ভগবানের শরণ গ্রহণ করেন, তাহলে সেটি আসলে গুণ ও প্রভাবাদিরই শরণ নেওয়া হয়, ভগবানের শরণ নয়। কিন্তু এই কথাগুলির বিপরীত অর্থ যেন ধরা না হয়।

বিপরীত অর্থ কী ? ভগবানের গুণ, প্রভাব, নাম, ধাম, ঐশ্বর্য, মাধুর্য, সৌন্দর্য ইত্যাদিকে না মানা এবং সেগুলিকে গ্রাহ্য না করা। কিছুই না করা, ভজন না করা, ভগবানের গুণ, প্রভাব, লীলাকথা না শোনা, ভগবদ্ধাম না মানা— এ সবই হল বিপরীত অর্থ করা। এরূপ অর্থ মনে করলে খুবই ভুল করা হয়।

কেবলমাত্র ভগবানের শরণাগত হওয়ার অর্থ হল— শুধু ভগবান আমার। তিনি যদি ঐশ্বর্যসম্পন্ন হন তো ভালো, আর কোনো ঐশ্বর্য যদি না থাকে তাহলেও ভালো। তিনি যদি অত্যন্ত দয়ালু হন, তাহলে অত্যন্ত ভালো কথা আর তা না হয় যদি অত্যন্ত নিষ্ঠুর, কঠোর হন অর্থাৎ তাঁর মতো নিষ্ঠুর, শক্ত আর কেউ না থাকে তাহলেও ভালো। তিনি যদি প্রভাবশালী হন, তাহলে খুবই ভালো আর যদি কোনো প্রভাব না থাকে, তাহলেও খুব ভালো। শরণাগতের এইসব বিষয়ে কোনোই চিন্তা থাকে না। তাঁর একটিই ভাব থাকে যে ভগবান যেমনই হোন, তিনি আমার[১]। ভগবানের এইসব ব্যাপারে চিন্তা না থাকায় ভগবানের ঐশ্বর্য, মাধুর্য, সৌন্দর্য, গুণ, প্রভাব ইত্যাদি যে চলে যাবে, তা নয়। কিন্তু আমি যদি তার জন্য চিন্তা না করি, তবেই আমার প্রকৃত শরণাগতি হয়।

যেখানে গুণ, প্রভাব ইত্যাদির জন্য ভগবানের শরণাগতি আসে, সেখানে শুধু ভগবানের শরণ নেওয়া হয় না, বরং গুণ, প্রভাব ইত্যাদির শরণই নেওয়া হয় ; যেমন—কোনো ধনী ব্যক্তির সম্মান করা হলে, প্রকৃতপক্ষে সম্মান করা হয় তার টাকার, সেই ব্যক্তির নয়। কোনো মন্ত্রীকে যে সম্মান করা হয় তা আসলে তাঁর নয়, সেগুলি তাঁর (মন্ত্রী) পদের সম্মান। কোনো বলবান ব্যক্তিকে যে সম্মান করা হয়, সেটি তাঁর বলবত্তার সম্মান, মানুষটির নয়। কিন্তু যদি কেউ শুধু ব্যক্তিটিকেই (ধনী বা মন্ত্রী ইত্যাদির) সম্মান করে তাহলে তাঁর যে ধন বা মন্ত্রীত্ব চলে যাবে—তা নয়, সেগুলো থাকবেই। তেমনই ভগবানের শরণ গ্রহণ করলে ভগবানের গুণ, প্রভাব যে চলে যাবে—তা নয়। কিন্তু আমাদের দৃষ্টি ভগবানের দিকেই থাকা উচিত, তাঁর গুণের দিকে নয়।

সপ্তর্ষিগণ যখন পার্বতীর সম্মুখে শিবের নানা দোষ ও বিষ্ণুর বিবিধ গুণের বর্ণনা করে তাঁকে শিবের সংস্পর্শ ত্যাগ করতে বললেন তখন পার্বতী তাঁদের বলেছিলেন—

মহাদেব অবগুণ ভবন, বিষ্ণু সকল গুণ ধাম।
জেহি কর মনু রম জাহি সন, তেহি তেহী সন কাম॥

(শ্রীরামচরিতমানস ১।৮০)

এরূপ কথা গোপিনীরাও উদ্ধবকে বলেছিলেন—

উধো ! মন মানে কী বাত।
দাখ ছোহারা ছাড়ি অমৃতফল, বিষকীরা বিষ খাত॥
জো চকোর কো দৈ কপূর কোউ, তজি অঙ্গার অঘাত।
মধুপ করত ঘর কোরে কাঠমে, বঁধত কমলকে পাত॥
জ্যো পতঙ্গ হিত জান আপনো, দীপক সোঁ লপটাত।
'সুরদাস' জাকো মন জাঁসো, তাকো সোই সুহাত॥

যাঁরা ভগবানের প্রভাব ইত্যাদি দেখেন, তাঁকে ভালোবাসেন—তাঁরা মুক্তি, ঐশ্বর্য ইত্যাদি লাভ করলেও ভগবানকে লাভ করেন না। যাঁরা ভগবানের প্রভাবের দিকে লক্ষ্য করেন না, সেই ভগবদ্‌প্রেমী ভক্তই ভগবানকে লাভ করে থাকেন। শুধু তাই নয়, সেই প্রেমিক ভক্ত তাঁকে বাঁধতেও পারেন, তাঁকে বিক্রিও করে দিতে পারেন। ভগবান দেখেন যে এ শুধু আমাকেই ভালোবাসে, আমার প্রভাবের দিকে তাকিয়েও দেখে না, তাই তাঁর মনে এরূপ

---

[১](ক) অসুন্দরঃ সুন্দরশেখরো বা গুণৈর্বিহীনো গুণিনাং বরো বা।
দ্বেষী ময়ি স্যাৎ করুণাম্বুধির্বা শ্যামঃ স এবাদ্য গতির্মমায়ম্॥

'আমার প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ অসুন্দর হোন বা সুন্দর-শিরোমণি হোন, গুণহীন হোন অথবা গুণীশ্রেষ্ঠ হোন, আমার প্রতি দ্বেষ ভাবাপন্ন হোন অথবা কৃপাসিন্ধুরূপে কৃপা করতে থাকুন, তিনি যেমনই হোন না কেন, তিনিই আমার একমাত্র গতি।'

(খ) আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥ (শিক্ষাষ্টক ৮)

'তিনি আমাকে হৃদয়ে নিয়ে আনন্দ করুন অথবা শ্রীচরণে ফেলে দলিত করুন বা দর্শন না দিয়ে মর্মাহত করুন ! সেই পরম প্রভু শ্রীকৃষ্ণ যেমন ইচ্ছা তেমন করুন, আমার তিনিই একমাত্র প্রাণনাথ, আর কেউই নয়।'

ভক্তের অত্যন্ত আদর হয়ে থাকে।

প্রভাবের দিকে দৃষ্টি দিলে প্রমাণিত হয় যে, আমাদের কিছু পাওয়ার কামনা আছে। আমাদের মনে ওইসব কাম্য বস্তুগুলির আকাঙ্ক্ষা আছে। যতক্ষণ আমাদের মনে কামনা থাকে, ততক্ষণ আমরা তাঁর প্রভাব দেখে থাকি। আমাদের মনে যদি কোনো কামনা না থাকে তাহলে ভগবানের প্রভাব ও ঐশ্বর্যের দিকে আমাদের লক্ষ্য যায় না। শুধু ভগবানের দিকে দৃষ্টি থাকলে তবেই আমরা তাঁর শরণাগত হব এবং ভগবানের আপনজন হব।

পুতনা রাক্ষসী তার স্তনে বিষ মাখিয়ে ভগবানকে খাওয়ানোর জন্য ভগবান তাকে মাতৃগতি প্রদান করেন[১], অর্থাৎ মাতা যশোদার যে মুক্তি প্রাপ্য, পুতনা রাক্ষসীও তাই পায়। যে মুখে বিষ তুলে দেয়, তাকে ভগবান মুক্তি প্রদান করেন। আর তাহলে যিনি প্রত্যহ দুধপান করান, সেই মাতাকে ভগবান কী দেবেন ? অনন্ত জীবের মুক্তি প্রদানকারী ভগবান সেই মায়েরই অধীন হয়ে যান ; তিনি নিজেকেই প্রদান করেন। মায়ের এত বশীভূত হন যে, মা ছড়ি দেখালে তিনি ভয়ে কাঁদতে থাকেন ! কারণ মায়ের ভগবানের প্রভাব ও ঐশ্বর্যের দিকে কোনো লক্ষ্যই থাকে না। এইভাবে যাঁরা ভগবানের কাছে মুক্তি চান, ভগবান তাঁদের মুক্তি প্রদান করেন, আর যাঁরা কিছুই চান না, ভগবান তাঁদের কাছে নিজেকেই প্রদান করেন।

সর্বভাবে ভগবানের শরণাগত হওয়ার রহস্য হল যে, আমার শরীর ভালো, ইন্দ্রিয় বশে আছে, মন-শুদ্ধ নির্মল, বুদ্ধি ঠিকমতো কাজ করে, আমি লেখাপড়া জানি, যশস্বী, সংসারে আমার সম্মান আছে—এইভাবে 'আমিও একজন' এরূপ ভেবে ভগবানের শরণ নেওয়াকে শরণাগতি বলে না। ভগবানের শরণ নিয়ে শরণাগতের এমন চিন্তাও করা উচিত নয় যে, আমার শরীর এমন হওয়া চাই ; আমার বুদ্ধি এরূপ হওয়া উচিত ; আমার মন এরূপ হওয়া উচিত ; আমার মনোযোগ এরূপ হওয়া উচিত ; আমার জীবনে এরূপ লক্ষণ আসা উচিত ; আমার আচরণ এরূপ হওয়া উচিত ; আমার মধ্যে এমন প্রেম থাকা উচিত যাতে কথা-কীর্তন শুনলে চোখে জল আসে, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায় ; কিন্তু আমার জীবনে সেরকম হয়নি, তাহলে আমি কী করে ভগবানের শরণাগত হব ? ইত্যাদি । এইগুলি অনন্য শরণাগতির কষ্টিপাথর নয়। যিনি অনন্যভাবে শরণ নেন, তিনি দেখেনই না তাঁর শরীর সুস্থ না অসুস্থ, মন চঞ্চল না স্থির, বুদ্ধি জ্ঞানসম্পন্ন না অজ্ঞান, মূর্খ না বিদ্বান, যোগ্যতা আছে, না অযোগ্য। তিনি স্বপ্নেও এসব দেখেন না। কারণ তাঁর কাছে এ সবই বর্জনীয় জঞ্জাল, যেগুলি সঙ্গে নেবার নয়। এসবে দৃষ্টি দিলে অহংবোধই বাড়ে যে 'আমি ভগবানের শরণাগত ভক্ত' অথবা নিরাশ হতে হয় যে 'আমি ভগবানের শরণ নিলেও ভক্তের গুণাবলী (গীতা ১২।১৩-১৯) আমাতে অর্শায়নি।' তাৎপর্য হল এই যে যদি তাঁর মধ্যে ভক্তের গুণাবলী পরিলক্ষিত হয়, তাহলে অহং-অভিমান হবে আর দেখা না গেলে নিরাশা আসবে। তাই সব থেকে ভালো এই যে ভগবানের শরণাগত হয়ে এইসব গুণের দিকে ভুলেও নজর না দেওয়া। এর এমন কোনো বিপরীত অর্থ করা উচিত নয় যে আমি রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ, অহং-মমত্ব—যা খুশি করি না কেন, কিছু আসে যায় না। তাৎপর্য হল যে গুণগুলির প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ করা উচিত নয়। ভগবানের শরণাগত ভক্তের মধ্যে এইসব গুণ স্বতঃই এসে যায়। কিন্তু এগুলি আসা না আসায় তাঁর কোনো উদ্দেশ্য থাকা উচিত নয়। কোনো মাপদণ্ড করে পরীক্ষা না করা যে এইসব গুণ আমার মধ্যে আছে কি না ?

সত্যকার শরণাগত ভক্ত ভগবানের গুণের দিকে নজর দেন না, নিজের গুণের দিকেও তাকান না। তিনি ভগবানের উচ্চ সাধকদের দিকেও দেখেন না যে উচ্চ সাধকগণ এইরূপ হন, তত্ত্বজ্ঞ জীবন্মুক্ত পুরুষ এইরূপ হয়ে থাকেন প্রভৃতি।

সাধারণতঃ লোকে প্রশ্ন করে থাকে যে ওই ব্যক্তি তো ভগবানের ভজনা করে, তাহলে অসুখ হল কেন ? ভগবানের ভক্তের জ্বর হল কেন ? ও এত দুঃখ পেল

[১](ক) অহো বকী যং স্তনকালকূটং জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধবী।

লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ২।৩।২৩)

'অহো ! পাপিনী পুতনা যাঁকে মারার জন্য স্তনে কালকূট-বিষ লাগিয়েছিলেন, সেই পুতনার যদি এই গতি লাভ হয়, যা ধাত্রীর পাওয়া উচিত, তবে তিনি ছাড়া এমন কোনো দয়ালু আছেন যে তাঁর শরণাগত হবে ?'

(খ) গঈ মারন পুতনা কুচ কালকূট লগাই। মাতুকী গতি দঈ তাহি কৃপালু জাদবরাই॥ (বিনয়পত্রিকা ২১৪।২)

কেন ? ওর সন্তান কেন মারা গেল ? ওর কেন অর্থের অভাব হল ? ওর কেন অপযশ হল ? ওর কেন অসম্মান হল ? ইত্যাদি। এসব প্রশ্ন অত্যন্তই বাজে, ফালতু কথা। এতে কোনও সারতত্ত্ব নেই। এসব লোকেদের কীকরে বোঝানো যাবে ! তারা সৎসঙ্গের ধারে কাছেও নেই, তাই এরা জানেও না ভক্তি কী, শরণাগতি কাকে বলে ? এরা এসব বুঝতেই পারবে না। তার মানে এই নয় যে ভগবদ্ভক্ত গরীবই হবে, জগতে তাদের অপমানই হবে, নিন্দাই হবে। শরণাগত ভক্তের নিন্দা-প্রশংসা, সুখ-অসুখ ইত্যাদি কোনো কিছুতে কোনো উদ্দেশ্য থাকে না। তিনি সেদিকে খেয়ালই রাখেন না। তিনি শুধু দেখেন যে ভগবান আছেন আর আমি আছি, ব্যাস। এবার জগতে কী আছে, কী নেই, ত্রিলোকে কী আছে, কী নেই, প্রভু এই প্রকার, তিনি উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়কারী—এইসব বিষয়ে তাঁর লক্ষ্যই যায় না।

কোনো এক ব্যক্তি একজন সন্তকে জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনি কোন্ ভগবানের ভক্ত ? যিনি উৎপত্তি-স্থিতি-প্রলয় করে থাকেন, তার ভক্ত কি ?' সন্ত উত্তর দিলেন—'আমার ভগবানের উৎপত্তি-স্থিতি বা প্রলয়ের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই। এগুলি আমার প্রভুর একটি ঐশ্বর্য। এ কোনো বিশেষ ব্যাপার নয়।' শরণাগত ভক্তের এইরূপই ভাব হওয়া উচিত। ঐশ্বর্য ইত্যাদির দিকে তাঁর দৃষ্টি থাকাই উচিত নয়।

ঋষিকেশে গঙ্গার ধারে সন্ধ্যাবেলায় সৎসঙ্গ হচ্ছিল। গরম কাল। হঠাৎ গঙ্গার ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করলে এক ভদ্রলোক বললেন—'কী সুন্দর ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে।' পাশের এক ভদ্রলোক তাঁকে বললেন—'হাওয়া দেখার আপনি সময় পেলেন কী করে। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, গরম হাওয়া বইছে— সেদিকে আপনার লক্ষ্য গেল কী করে ?' ভগবদ্ভজনায় ব্যাপৃত থাকলে হাওয়া ঠাণ্ডা হল না গরম, সুখ এল না দুঃখ—সেদিকে যতক্ষণ খেয়াল থাকে, ততক্ষণ ভগবানের দিকে কী করে নজর দেবে ? এই ব্যাপারে আমি একটি কাহিনি শুনেছি, যদিও সেটি নিম্ন শ্রেণীর কিন্তু তার সারমর্ম অত্যন্ত উত্তম।

এক কুলটা নারী ছিল। কোনো এক ব্যক্তি তাকে ইশারা করল যে এইসময় তুমি অমুক স্থানে আসবে। তাই সে সেইসময় তার প্রেমিকের কাছে যাচ্ছিল। রাস্তায় একটি মসজিদ ছিল, তার দেওয়ালগুলি ছোট ছোট। সেই দেওয়ালের কাছেই মসজিদের মৌলবী মাথা নামিয়ে নামাজ পড়ছিলেন। সেই কুলটা নারী না জেনে তার ওপর দিয়ে হেঁটে গেল। মৌলবী অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলেন যে, আরে এ কেমন মহিলা ! আমার ওপর জুতোশুদ্ধ পা রেখে আমাকে অশুদ্ধ করে গেল ! তিনি সেখানেই বসে নারীটির ফেরার অপেক্ষা করতে লাগলেন। সেই কুলটা নারী যখন ফিরে এল, মৌলবী তখন তাকে ধমক দিলেন, 'কেমন বেয়াক্কেলে মানুষ তুমি ! আমি বসে নামাজ পড়ছিলাম আর তুমি আমার ওপর পা রেখে চলে গেলে !' তখন সেই নারী বলল—

ম্যায় নর-রাচী না লখী, তুম কস লখ্যো সুজান।
পঢ়ি কুরান বৌরা ভয়া, রাচ্যো নহিঁ রহমান॥

অর্থাৎ একটি পুরুষের চিন্তায় মগ্ন থাকায় আমি বুঝতে পারিনি যে সামনে দেওয়াল না মানুষ, কিন্তু আপনি তো ভগবানের ধ্যান করছিলেন, তাহলে আপনি কী করে আমাকে চিনতে পারলেন যে আমিই সেই ? যদি আপনি ভগবানের ধ্যানে মগ্ন থাকতেন, তাহলে কি আমাকে চিনতে পারতেন যে কে এল, কে গেল, মানুষ না পশু-পক্ষী, কী ছিল, কী না ছিল, কে ওপরে এল, কে নীচে গেল, কে পা রাখল—এ সবে আপনার কী খেয়াল হত ? অর্থাৎ ভগবান ছাড়া অন্য দিকে মন যায় কী করে ? অন্য বিষয় জানা সম্ভব হয় কী প্রকারে ? যতক্ষণ অন্য বিষয় সম্বন্ধে জানা যায়, ততক্ষণ তাঁর শরণাগতি আসে কীভাবে ?

বালক বয়সে কৌরব-পাণ্ডব অস্ত্রশিক্ষা করছিলেন। শিক্ষাশেষে তাঁরা তৈরি হয়ে উঠলেন। তখন তাঁদের পরীক্ষা নেওয়া হল। একটি গাছের ওপর একটি নকল পাখি বসানো হল এবং সবাইকে বলা হল যে ওই পাখির কণ্ঠভেদ করে দেখাও। এক এক করে সকলে আসতে লাগল। গুরু দ্রোণ প্রথমে সকলকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, 'বল, তুমি ওখানে কী দেখছ ?' কেউ বলল 'আমি গাছ দেখতে পাচ্ছি,' কেউ বলল, 'আমি গাছের কচি শাখা দেখতে পাচ্ছি,' কেউ বলল, 'আমি পাখি দেখতে পাচ্ছি', 'ঠোঁট দেখতে পাচ্ছি', 'পাখা দেখতে পাচ্ছি।' যারা একথা বলল, তাদের সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। যখন অর্জুনের পালা এল, তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল—'অর্জুন, তুমি কী দেখছ ?' অর্জুন বললেন, 'আমি শুধু

কণ্ঠ দেখতে পাচ্ছি, আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।' তখন অর্জুনকে তীর চালাতে বলা হল। অর্জুন তীর দিয়ে পাখির কণ্ঠভেদ করলেন। কারণ তাঁর দৃষ্টি ঠিক লক্ষ্যের ওপরই ছিল। যদি পাখি, বৃক্ষ, শাখা-প্রশাখা ইত্যাদি দেখতেন, তাহলে লক্ষ্য কী করে ভেদ করতেন ? এখন দৃষ্টি ছড়ানো আছে, লক্ষ্য হলে সেটিই দেখবে, যাকে লক্ষ্য করা হচ্ছে। এইরূপ যতক্ষণ মানুষের লক্ষ্য এক না হয় ততক্ষণ সে অনন্য হবে কীভাবে ? অব্যভিচারী 'অনন্যযোগ' হওয়া উচিত—**'ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী'** (গীতা ১৩।১০)। 'অন্যযোগ' হওয়া উচিত নয় অর্থাৎ শরীর, মন, বুদ্ধি, অহম্ ইত্যাদির সাহায্য না থাকা উচিত ; সেখানে একমাত্র ভগবানই থাকবেন, অন্য কিছুই নয়।

গোস্বামী তুলসীদাস মহারাজকে কোনো একজন জিজ্ঞেস করলেন যে, 'আপনি যে রামলালাকে ভক্তি করেন, তিনি দ্বাদশ কলার অবতার, আর সুরদাস যে কৃষ্ণের ভক্তি করেন, তিনি ষোড়শ কলার অবতার।' একথা শুনেই গোস্বামী মহারাজ তাঁর চরণে পতিত হয়ে বললেন—'আহা, আপনি কী কৃপা করলেন ! আমি তো দশরথের পুত্র ভেবে তাঁকে ভক্তি করতাম। এখন বুঝলাম তিনি দ্বাদশ কলার অবতার ! ইনি এত বড় ? আপনি আজ নতুন কথা শুনিয়ে আমার অনেক উপকার করলেন।' শ্রীকৃষ্ণ যে ষোড়শ কলার অবতার—সে কথা তিনি শুনতেই পাননি, সেদিকে তাঁর লক্ষ্যই ছিল না।

ভগবানের প্রতি ভক্তদের পৃথক্ পৃথক্ ভাব হয়ে থাকে। কেউ বলেন দশরথের ক্রোড়ে ক্রীড়ারত যে রামলালা, তিনিই আমার ইষ্ট—**'ইষ্টদেব মম বালক রামা'** (শ্রীরামচরিতমানস ৭।৭৫।৩) ; রাজাধিরাজ রামচন্দ্র নয়, শিশু রামলালা। কোনো ভক্ত বলেন, আমার ইষ্ট নাড়ুগোপাল, নন্দের দুলাল। এই ভক্তরা তাঁদের রামলালাকে, নন্দলালাকে সাধুদের দিয়ে আশীর্বাদ করান, ভগবানের তা অত্যন্ত প্রিয় লাগে। তাৎপর্য হল এই যে ভক্তদের দৃষ্টি ভগবানের ঐশ্বর্যের দিকেই যায় না।

যা বজ্ররজ কী পরস সে, সুকতি মিলল হ্যায় চার।
বা রজ কো নিত গোপিকা, ডারত ডগর বুহার॥

অঙ্গনের যে ধুলোয় কানাই খেলা করেন, সেই ধুলো যিনি গ্রহণ করেন, তিনি চার প্রকারের মুক্তির যে কোনোটিই লাভ করতে পারেন। কিন্তু মাতা যশোদা সেই ধুলো ঝাঁট দিয়ে বাইরে ফেলে দিতেন। মায়ের কাছে তো সেগুলি ধুলো-ময়লা। মুক্তি কার চাই ? মায়ের দৃষ্টি তো শুধু কানাইয়ের দিকে। কানাইয়ের ঐশ্বর্যের দিকেও তাঁর দৃষ্টি নেই আর যোগ্যতার দিকেও না।

সাধু মহাপুরুষগণ বলেছেন যে যদি ভগবানকে পেতে চাও, তবে সঙ্গে যেন কোনো সঙ্গী বা বস্তু না থাকে অর্থাৎ সঙ্গী ও বস্তু ছাড়াই তাঁকে লাভ করো। সঙ্গী আর সাহায্য যখন তোমার সঙ্গে রয়েছে, তখন আর তুমি ভগবানকে পাবে কী করে ? তাছাড়া মন, বুদ্ধি, বিদ্যা, অর্থ ইত্যাদি বস্তু সঙ্গে থাকলে, সেগুলির জন্য ব্যবধান থাকবেই। ব্যবধান থাকলে মিলন হয় না। সেখানে বস্ত্রের ব্যবধান হয়, বস্ত্রই শুধু নয়, মাঝখানে ফুলের মালা থাকলে, তারও ব্যবধান হয়। তাই সঙ্গে কোনো সঙ্গী বা জিনিসপত্র যেন না থাকে ; তাহলে ভগবানের সঙ্গে যে মিলন হবে, তা অত্যন্ত বিশিষ্ট ও দিব্যমিলন হবে।

এক মহাত্মার সঙ্গে ক্ষেতে কাজ করা একজন ব্রজবাসী গোয়ালার দেখা হয়েছিল। সে ভগবদ্‌ভক্ত ছিল। মহাত্মা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'তুমি কী কর ?' সে উত্তর দিল—'আমি লালা কানাইয়ের কাজ করি।' মহাত্মা বললেন—'আমি ভগবানের অনন্য ভক্ত, তুমি কী ?' সে বলল—'আমি ফনন্য ভক্ত।' মহাত্মা জিজ্ঞাসা করলেন—'ফনন্য ভক্ত আবার কী ?' তখন সেও জিজ্ঞাসা করল—'অনন্য ভক্ত কী ?' মহাত্মা বললেন—'অনন্য ভক্ত তাঁকেই বলে, যিনি সূর্য, শক্তি, গণেশ, ব্রহ্ম ইত্যাদি কাউকেই না মেনে শুধু কানাইকে মানেন।' তখন গোয়ালা বলল—'বাবাজী, আমি তো সেসব লোকের নামও জানি না যে তাঁরা সব কে ? আমার তো সে সম্বন্ধে কোনো ধারণাই নেই, তাহলে আমি ফনন্য ভক্ত হলাম কি না ?' এইরূপ ব্রহ্ম কী ? আত্মা কাকে বলে ? সগুণ ও নির্গুণ কী ? সাকার ও নিরাকার কেমন হয় ?—এইসব বিষয়ে শরণাগত ভক্তের দৃষ্টি থাকেই না।

ব্রজের একটি কাহিনি। এক সাধু কুয়ার কাছে বসে কারও সঙ্গে ব্রহ্ম আছে, পরমাত্মা আছে, জীবাত্মা আছে ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করছিলেন। সেখানে এক গোপিনী জল নিতে এল। সে কান পেতে শুনল বাবাজী কী নিয়ে আলোচনা করে যাচ্ছেন। সে অন্য গোপিনীর কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করল—'আরে সখী ! এই ব্রহ্ম কী ?' সে

বলল, 'আমাদের লালারই কোনো প্রতিবেশী, আত্মীয়-কুটুম্ব হবে ! আমরা তো সখী জানি না ! এরা তার কথাতেই ব্যস্ত। তাই সব জানে। আমাদের তো একমাত্র নন্দলালাই আছে। কোনো কাজ থাকলে নন্দবাবাকে বলে দেব, গিরিরাজকে বলে দেব যে মহারাজ ! আপনি কৃপা করুন। কানাই অত্যন্ত সহজ সরল, ও কী বা বুঝবে আর কী করবে ? কানাইয়ের কাছ থেকে কী পাওয়া যাবে ? এই কানাই আমাদের, আর কী চাই ? আমরাও একলা, কানাইও একলা। আমাদেরও কিছু নেই, তারও কিছু নেই, একদম দিগম্বর,'—'**নগন মূরতি বাল গোপালকী, কতরনী বরণী জপ-জালকী।**' এইরূপ কানাইয়ের কাছে কী পাওয়া যাবে ?

যশোদা মাতা বলরামকে বলছেন—'দেখো ! এই কানাই অত্যন্ত সহজ-সরল, তুমি এর খেয়াল রেখো, যেন জঙ্গলে হারিয়ে না যায়।' দাদা বলরাম বলছেন—'মা ! কানাই অত্যন্ত চঞ্চল। আমার সঙ্গে জঙ্গলের মধ্যে যেতে যেতে কোনো সাপকে নড়তে দেখলেই তাকে হাতে নেবে, যদি কামড়ে দেয় ?' মা বলেন—'বাবা ! এখনও ও ছোট, অবোধ বালক, তুমি বড়, তুমি একটু লক্ষ্য রেখো।' তাই বড় ভাই এবং সব গোপবালক কানাইয়ের দিকে নজর রাখতেন। গোপবালকদের যদি কেউ বলে যে কানাই সমস্ত জগৎ পালন করেন, তাহলে তারা বলবে যে তোমাদের তেমন ভগবান থাকতে পারেন যিনি সকল জগৎ পালন করেন। আমাদের তা নয়। আমাদের এই ছোট্ট কানাই কী করে জগৎ পালন করবে ?

একজন বাবাজী গোপিনীদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। তিনি বলছিলেন যে 'কৃষ্ণ কত ঐশ্বর্যশালী, তাঁর কত মাধুর্য, তাঁর ঐশ্বর্যের খনি আছে, ইত্যাদি।' তখন গোপিনীরা বললেন—'মহারাজ ! সেই খনির চাবি আমাদের কাছে আছে। কানাইয়ের কী আছে ? তার কাছে কিছুই নেই। তার কাছে কেউ কিছু চাইলে সে কোথা থেকে দেবে ?' সুতরাং কারো যদি কিছু চাইতে হয় তাহলে সে যেন কানাইয়ের কাছে না যায়। যার কখনো কিছুরই দরকার নেই, সে-ই যেন কানাইয়ের কাছে যায়, তার শরণাগত হয়। কোনো অবস্থাতেই যেন কোনো আকাঙ্ক্ষার ভাব না থাকে অর্থাৎ বিপদ, মৃত্যু ইত্যাদিতেও 'আমাকে একটু সাহায্য করো, রক্ষা করো' এরূপ ভাব যেন না হয় !

ভগবান শ্রীরামকে বাল্মীকি বলেছেন—

জাহি না চাহিয় কবহুঁ কছু তুম্হ সন সহজ সনেহু।
বসহু নিরন্তর তাসু মন সো রাউর নিজ গেহু॥
(শ্রীরামচরিতমানস ২।১৩১)

কিছু না চাওয়ার ভাব হলে ভগবান স্বাভাবিকই প্রিয় হন, মিষ্টি লাগে—'**তুম্হ সন সহজ সনেহু।**' যার মধ্যে কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই, তা হল ভগবানের থাকার নিজস্ব-স্থান—'**সো রাউর নিজ গেহু।**' যদি আকাঙ্ক্ষাও থাকে আর ভগবানকেও সঙ্গে রাখে তবে সেটি ভগবানের নিজস্ব স্থান নয়। ভগবানের সঙ্গে যেন 'সহজ' ভালোবাসা হয়, তাতে যেন কোনো খাদ মেশানো না হয় অর্থাৎ কোনো আকাঙ্ক্ষা যেন না থাকে। যেখানে কোনো কিছু চাইবার থাকে, সেখানে ভালোবাসা কোথায় ? সেখানে আসক্তি, বাসনা, মোহ আর মমতা থাকে। তাই গোপিনীরা সাবধান করে বলেছেন যে—

মা যাত পান্থাঃ পথিভীমরথ্যাং
দিগম্বরঃ কোঽপি তমালনীলঃ।
বিন্যস্তহস্তোঽপি নিতম্ববিম্বে
ধূতঃ সমাকর্ষতি চিত্তবিত্তম্॥

'আরে পথিক ! ওই রাস্তা দিয়ে যেও না, ওখানে ভয় আছে । ওখানে কোমরে দুহাত রেখে তমালের ন্যায় নীলবর্ণের এক উলঙ্গ বালক দাঁড়িয়ে আছে, তাকে শুধু দেখতেই অবধূতের মতো ! আসলে তার কাছ দিয়ে যে কেউ যাক না কেন তার চিত্তরূপী ধন লুণ্ঠন না করে সে ছাড়ে না।'

ওই যে কৃষ্ণবর্ণ উলঙ্গ বালকটি দাঁড়িয়ে আছে, সে তোমাকে লুট করে নেবে, তুমি রিক্ত হয়ে যাবে ! ও এমন চোর যে সমস্ত শেষ করে দেবে। ওদিকে খবরদার যেও না, প্রথম থেকেই খেয়াল রেখো। যদি যেতে চাও তাহলে চিরকালের জন্য যেতে হবে ! সেইজন্য কেউ যদি ভালোভাবে বাঁচতে চায় সে যেন ওদিকে না যায়। ওর নাম যে কৃষ্ণ ! আকর্ষণকারীকেই তো কৃষ্ণ বলা হয় ! একবার যদি টেনে নেয় তাহলে আর ছাড়ে না। ওর সঙ্গে আলাপ না হওয়া পর্যন্ত ঠিক আছে, তার সঙ্গে পরিচয় হলেই সব শেষ। তখন আর কিছুই করার থাকবে না, ত্রিভুবনে অকর্মণ্য হয়ে যাবে।

'নারায়ণ' বৌরী ভঈ ডোলৈ, রহী না কাহূ কাম কী॥
জাহি লগন লগী ঘনস্যাম কী।

তবে এটি ঠিক যে, যে কোনো কাজের হয় না সে

সকলের সব কাজের হয়ে থাকে কিন্তু কোনো কাজে তার কোনো স্বার্থ থাকে না।

শরণাগত ভক্তের সাধন-ভজনও করতে হয় না। তার দ্বারা ভজন স্বতঃ স্বাভাবিকভাবে হয়ে থাকে। ভগবানের নাম তার অত্যন্ত মিষ্ট ও প্রিয় লাগে। যদি কাউকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে তুমি নিঃশ্বাস কেন নাও ? এই বায়ুকে ভিতরে নেওয়া এবং বাইরে আনার ঝামেলা কেন করছ ? তাহলে সে বলবে যে ভাই ! এটা ঝামেলা নয়, এ ছাড়া আমি বাঁচতেই পারি না। তেমনই শরণাগত ভক্ত ভজন ব্যতীত বাঁচতে পারে না। যাঁকে সবকিছু সমর্পণ করে দিয়েছে, তাঁকে বিস্মরণ হলে পরম ব্যাকুলতা, মহা চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়—**'তদ্বিস্মরণে পরম ব্যাকুলতেতি'** (নারদভক্তিসূত্র ১৯)। এরূপ ভক্তকে কেউ যদি বলে যে অর্ধক্ষণের জন্য ভগবানকে ভুলে গেলে ত্রিলোকের রাজ্য প্রাপ্ত হবে, তবে তিনি তাও প্রত্যাখ্যান করেন। ভাগবতে আছে—

ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠ
স্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দা
ল্লবনিমিষার্ধমপি যঃ স বৈষ্ণবাগ্রয়ঃ ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২।৫৩)

'ত্রিলোকের সমস্ত ঐশ্বর্যের বিনিময়েও যিনি ওই দেবদুর্লভ ভগবদ্‌চরণকমল অর্ধনিমেষের জন্যও পরিত্যাগ করতে পারেন না, তিনিই শ্রেষ্ঠ ভগবদ্‌ভক্ত।'

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষয়ং
ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্ বিনান্যৎ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৪।১৪)

ভগবান বলেছেন যে 'যিনি আমাতে নিজেকে সমর্পণ করেছেন, সেই ভক্ত আমা বিনা ব্রহ্মপদ, ইন্দ্রপদ, সমস্ত পৃথিবী, পাতালরাজ্য, যোগের সকল সিদ্ধি এবং মোক্ষও চান না।' ভরত বলেছেন—

অরথ ন ধরম ন কাম রুচি গতি ন চহউঁ নিরবান।
জনম জনম রতি রাম পদ য়হ বরদানু ন আন॥
(শ্রীরামচরিতমানস ২।২০৪)

পরিশিষ্ট-ভাব—ভগবানের সঙ্গে কর্মযোগীর 'নিত্য' সম্বন্ধ থাকে, জ্ঞানযোগীর হয় 'তাত্ত্বিক' সম্পর্ক আর শরণাগত ভক্তের সঙ্গে হয় 'আপনত্ব'-র সম্পর্ক। নিত্য সম্বন্ধে জগতের অনিত্য সম্পর্কের পরিত্যাগ হয়ে যায়, তাত্ত্বিক সম্বন্ধের দ্বারা তত্ত্বের সঙ্গে ঐক্য (তত্ত্ববোধ) হয় আর আপনত্ব সম্বন্ধে ভগবানের সঙ্গে অভিন্নতা (প্রেম) হয়। নিত্য সম্বন্ধে শান্তরস থাকে, তাত্ত্বিক সম্বন্ধে থাকে অখণ্ডরস আর 'আপনত্ব' (আত্মীয়) সম্বন্ধে থাকে অনন্তরস। অনন্তরসের প্রাপ্তি না হলে জীবের সম্পূর্ণরূপে তৃপ্তি হয় না। শরণাগতির দ্বারাই অনন্তরস প্রাপ্তি হয়। তাই শরণাগতি হল সর্বগুহ্যতম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন।

'সর্বধর্মান্‌পরিত্যজ্য' পদটির অর্থ 'সমস্ত ধর্ম স্বরূপতঃ ত্যাগ করা নয়' এ হল 'সমস্ত ধর্মের আশ্রয় ত্যাগ'। অর্থাৎ কোনো ধর্মেরই (কর্তব্য কর্মের) আশ্রয় যেন না থাকে। যেমন, প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছে—'ত **ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ'** (১।৩৩)। এখানেও **'প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা'**র অর্থ 'প্রাণত্যাগ' না ধরে প্রাণের আশ্রয় (আশা) ত্যাগ কথাটি ধরতে হবে ; কেন-না প্রাণত্যাগ করলে আর কি-করে যুদ্ধ করবে ? তা অসম্ভব ব্যাপার। তেমনই প্রথম অধ্যায়ের নবম শ্লোকে উক্ত—**'অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ'** কথাটির অর্থ এই নয় যে অন্য বহু শূরবীর তাঁদের জীবন ত্যাগ করে এখানে দণ্ডায়মান আছেন। এর প্রকৃত অর্থ হল যে এই শূরবীরগণ তাঁদের জীবনের আশা পরিত্যাগ করে এখানে দণ্ডায়মান অর্থাৎ তাঁরা জীবনের পরোয়া করেন না। সুতরাং এখানেও **'সর্বধর্মান্‌পরিত্যজ্য'** পদটির অর্থ ধর্মের আশ্রয় ত্যাগ বলে মনে করতে হবে। শূরবীরগণ যেমন নিজ নিজ প্রাণ বা জীবনের পরোয়া করেন না, তেমনই ভক্তগণও অন্য ধর্মের পরোয়া করেন না। তাঁদের কাছে অন্য ধর্মের (কর্তব্য-কর্মের) কোনো গুরুত্ব নেই। কারণ ভগবানের শরণাগতির যত গুরুত্ব থাকে, ধর্মের তত গুরুত্ব নেই। ধর্মে (কর্তব্য কর্মে) জড়ত্ব এবং শরণাগতিতে চিন্ময়ত্বের সম্পর্ক থাকে। নিজ বর্ণাশ্রম ধরে কর্তব্য কর্ম হয়, তাই তাতে শরীরের প্রাধান্য থাকে। কিন্তু শরণাগতি হয় স্ব-স্বরূপকে নিয়ে, সেইজন্য তাতে ভগবানের প্রাধান্য থাকে।

'মামেকং শরণং ব্রজ' কথাটির তাৎপর্য হল—সবার সঙ্গে প্রেম, প্রীতি, সম্মান, সদ্ব্যবহার ইত্যাদির সম্পর্ক

থাকলেও, তা যেন বহিরঙ্গেই থাকে অন্তরে কারো জন্য যেন মমত্ব-বন্ধন না থাকে, কারোর প্রত্যাশা যেন না থাকে, আশ্রয় যেন শুধু ভগবানেরই থাকে—

য়হ বিনতী রঘুবীর গোঁসাঈ।
ঔর আস-বিশ্বাস-ভরোসো, হরৌ জীব-জড়তাঈ॥ (বিনয়পত্রিকা ১০৩)

● ● ●

এক ভরোসো এক বল এক আস বিশ্বাস।
এক রাম ঘন স্যাম হিত চাতক তুলসীদাস॥ (দোঁহাবলী ২৭৭)

আসলে ভগবানই পূর্ণ শরণাগতি প্রদান করেন। ছোট্ট শিশু যেমন হাত উঁচু করলে মা তাকে ক্রোড়ে তুলে নেন, তেমনই ভক্ত যখন নিজ সামর্থ্যে ভগবানের শরণাগত হয় তখন ভগবান তাকে পূর্ণ শরণাগতি প্রদান করেন।

অর্জুন পাপ থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিলেন, তাই ভগবানও তাঁকে পাপমুক্ত করার কথা বলেছেন ; কেন-না ভগবানের স্বভাবই হল—**'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'** (গীতা ৪।১১)। বাস্তবে শুধুমাত্র পাপমুক্ত হওয়াই শরণাগতির ফল নয়। অনন্য শরণাগতির দ্বারা মানুষ ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে অনন্তরস প্রাপ্ত করতে সক্ষম হয়। তাই সাধকদের পাপ থেকে অথবা দুঃখ থেকে মুক্তি পাবার আকাঙ্ক্ষা না করে শুধু ভগবানের শরণাগত হওয়া উচিত। কোনো কিছু চাইলে কিছু (অন্তবিশিষ্ট) পাওয়া যাবে, কিন্তু কোনো কিছু না চাইলে সব কিছু (অনন্ত) পাওয়া যায়। ভগবানও শরণাগত ভক্তের বশীভূত হন, তার কাছে ঋণী হয়ে থাকেন।

গীতার সারকথা হল এই শরণাগতি, ভগবান যা বিশেষ কৃপা করে বলেছেন। এই শরণাগতিতেই গীতার উপদেশ পূর্ণতা লাভ করে। এটি ছাড়া গীতা সম্পূর্ণ হয় না। তাই অর্জুন **'করিষ্যে বচনং তব'** বলে সম্পূর্ণভাবে ভগবানের শরণাগত হলে তিনি উপদেশ দান সমাপ্ত করলেন অর্থাৎ আর কিছুই বললেন না।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—পূর্বশ্লোকে কথিত অত্যন্ত গুহ্য কথা অনধিকারীদের কাছে বলতে নিষেধ করেছেন।

ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি॥ ৬৭ ॥

[**ইদম্** (এই অতি গুহ্যতম বচন) ; **তে, অতপস্কায়** (অতপস্বীকে) ; **ন, বাচ্যম্** (বলবে না) ; **অভক্তায়, কদাচন, ন** (অভক্তকে কখনো বলবে না) ; **চ, অশুশ্রূষবে, ন** (এবং যে ব্যক্তি শুনতে আগ্রহী নয় তাকেও বলবে না) ; **চ, যঃ, মাম্** (এবং যে ব্যক্তি আমাতে) ; **অভ্যসূয়তি** (দোষদৃষ্টিসম্পন্ন) ; **ন** (বলবে না।)]

এই অতি গুহ্যতম বচন অতপস্বীকে বলবে না ; অভক্তকে কখনো বলবে না ; যে ব্যক্তি শুনতে আগ্রহী নয়, তাকে বলবে না এবং যে ব্যক্তি আমার প্রতি দোষদৃষ্টিসম্পন্ন তাকেও বলবে না ॥ ৬৭ ॥

ব্যাখ্যা—'ইদং তে নাতপস্কায়'—আগের শ্লোকে উক্ত **'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'**—এই সর্বগুহ্যতম বচনটির উদ্দেশ্যেই এখানে **'ইদম্'** পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

নিজ কর্তব্য পালনকালে স্বাভাবিকভাবে যে কষ্ট উপস্থিত হয়, বিপরীত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, প্রসন্নতা সহকারে তাকে সহ্য করার নাম 'তপ'। তপ ব্যতীত চিত্তে পবিত্রতা আসে না, আর পবিত্রতা না এলে সদুপদেশ ধারণ করা যায় না। তাই ভগবান বলেছেন যে, যে ব্যক্তি তপস্বী নয়, তাকে এই সর্বগুহ্যতম রহস্য জানাবে না।

যে সহিষ্ণু (সহ্যশীল) নয়, সে-ও অতপস্বী। সুতরাং তাকেও এই সর্বগুহ্যতম রহস্য বলবে না। সহিষ্ণুতা চার প্রকারের হয়—

(১) **দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা**—রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ, হর্ষ-শোক, সুখ-দুঃখ, মান-অপমান, নিন্দা-স্তুতি ইত্যাদি দ্বন্দ্ব-রহিত হওয়া—**'তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তাঃ'** (গীতা ৭।২৮) ; **'দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ'** (গীতা ১৫।৫)।

(২) **বেগসহিষ্ণুতা**—কাম, ক্রোধ, লোভ, দ্বেষ

ইত্যাদির বেগ উৎপন্ন হতে না দেওয়া—'**কামক্রোধোদ্ভবং বেগম্**' (গীতা ৫।২৩)।

(৩) **পরমতসহিষ্ণুতা**—অন্যের মতের মহিমা শুনে নিজ মতে সন্দেহ না হওয়া এবং তার মতে উদ্বিগ্ন না হওয়া[১]—'**একং সাংখ্যং চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি**' (গীতা ৫।৫)।

(৪) '**পরোৎকর্ষসহিষ্ণুতা**'—নিজের যোগ্যতা, অধিকার, পদ, ত্যাগ, তপস্যা ইত্যাদির ন্যূনতা আছে, তা সত্ত্বেও অন্যের যোগ্যতা, অধিকার ইত্যাদির প্রশংসা শুনে কোনোরূপ বিকার মনের মধ্যে না আসা—'**বিমৎসরঃ**' (গীতা ৪।২২) ; '**হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তঃ**' (গীতা ১২।১৫)।

সিদ্ধদের এই চার সহিষ্ণুতা থাকে। যাঁদের এই সহিষ্ণুতার দিকে লক্ষ্য থাকে তাঁরা হলেন তপস্বী, আর যাঁদের সেই লক্ষ্য থাকে না, তাঁরা অতপস্বী।

এরূপ অতপস্বী অর্থাৎ অসহিষ্ণুকে[২] সর্বগুহ্যতম রহস্য না জানানোর উদ্দেশ্য হল এই যে 'সকল ধর্ম আমাতে সমর্পণ করে তুমি অনন্যভাবে আমার শরণাগত হও'—এই কথা শুনে তার মনে যদি কোনো বিপরীত চিন্তা বা দোষ উপস্থিত হয়, তাহলে সে আমার এই সর্বগুহ্যতম কথা সহ্য করতে পারবে না এবং তাকে অশ্রদ্ধা করবে, যার ফলে তার পতন হবে।

অন্য ভাবটি হল এই যে, যার নিজ বৃত্তি, আচরণ, ভাব ইত্যাদি পরিশুদ্ধ করার উদ্দেশ্য থাকে না, সে আমার, 'তুমি আমার শরণ গ্রহণ করো, আমি তোমাকে সর্বপাপ থেকে মুক্ত করব, তুমি চিন্তা কোরো না'—এই কথাটি শুনে 'আমি চিন্তা করব কেন ? চিন্তা ভগবান করবেন'—এরূপ বিপরীত অর্থ ভেবে দুর্গুণ-দুরাচারে ব্যাপৃত হয় এবং নিজের অমঙ্গল করে। এতে আমার সর্বগুহ্যতম কথাটির অপব্যবহার হবে। সুতরাং এরূপ কু-পাত্রকে কখনো শোনাবে না।

'**নাভক্তায় কদাচন**'—যে ভক্তিরহিত, যার ভগবানের ওপর শ্রদ্ধা, বিশ্বাস নেই, তাকেও একথা বলো না ; কারণ শ্রদ্ধা, বিশ্বাস এবং ভক্তি না থাকলে তার এগুলির বিপরীত ধারণা হতে পারে যে 'ভগবান আত্মশ্লাঘাসম্পন্ন, স্বার্থপর এবং অপরকে নিজ বশে আনতে চান। যিনি অপরকে নিজ নির্দেশে পরিচালিত করতে চান, তিনি অন্যের কী মঙ্গল করবেন ? তাঁর শরণাগত হয়ে কী লাভ ?' ইত্যাদি। এইরূপ বিপরীত চিন্তা করে সে নিজের পতন ঘটায়। তাই এরূপ অভক্তকে কখনো বলো না।

'**ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যম্**'—যে এই অতিশয় গোপনীয় বাক্য শুনতে চায় না, তাকে উপেক্ষা করবে, তাকেও কখনো বলো না। কারণ রুচি না থাকলে, জোর করে শোনালে সে এই কথার নিন্দা করবে, তার শুনতে ভালো লাগবে না, তার মন এই কথাগুলি গ্রহণ করবে না। ফলে তার দ্বারা অপরাধ করা হবে। যারা অপরাধ করে তাদের ভালো হয় না। তাই যারা শুনতে চায় না, তাদের শোনাবে না।

'**ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি**'—যে গুণের মধ্যে দোষ আরোপণ করে, তাকেও শোনাবে না। কারণ তার চিত্ত অত্যন্ত মলিন হওয়ায় সে ভগবানের কথা শুনে উল্টে তাঁর মধ্যে দোষ আরোপণ করবে।

দোষদৃষ্টি থাকলে মানুষ মহালাভ থেকে বঞ্চিত হয় এবং নিজের পতন ডেকে আনে। সুতরাং দোষদৃষ্টি করা অত্যন্ত দোষের। শ্রদ্ধাভাজনদেরও এই দোষ থাকে। তাই সাধকদের অত্যন্ত সাবধান হয়ে এই দোষ থেকে দূরে থাকতে হয়। ভগবানও (গীতা ৩। ৩১) যেখানে নিজের মত ব্যক্ত করেছেন, সেখানে '**শ্রদ্ধাবন্তঃ অনসূয়ন্তঃ**' পদের দ্বারা একথাই বলেছেন যে শ্রদ্ধাযুক্ত এবং দোষদৃষ্টিরহিত মানুষ কর্ম-বন্ধন হতে মুক্তি পায়। এরূপ গীতা মাহাত্ম্যতেও (গীতা ১৮।৭১) '**শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ**' পদে বলেছেন যে শ্রদ্ধাবান এবং দোষদৃষ্টিরহিত ব্যক্তি শুধুমাত্র গীতা শ্রবণ করেই বৈকুণ্ঠাদিলোকে গমন করে।

এই গোপনীয় রহস্য অন্যকে বলো না—এটি বলার অর্থ হল অপরকে এই গোপনীয় তত্ত্ব থেকে বঞ্চিত করে রাখা নয়, বরং যার ভগবান এবং তাঁর বচনের ওপর শ্রদ্ধা-ভক্তি নেই, যে ভগবানকে স্বার্থপর মনে করে

---

[১]নিজেদের মধ্যে মতভেদ হওয়া এবং নিজ মতানুযায়ী সাধনা করে জীবন তৈরি করা দূষণীয় নয়, বরং অন্যের মতকে খারাপ লাগা, তাদের মত খণ্ডন করা এবং তাদের মতকে ঘৃণা করাই হল দোষের।

[২]অসহিষ্ণুতা এবং অসূয়া বা ঈর্ষাতে একটু পার্থক্য আছে। অন্যের বিশেষ ভাবকে সহ্য না করাকে বলে 'অসহিষ্ণুতা' আর অপরের গুণগুলিতে দোষ দেখাকে বলা হয় 'অসূয়া'।

(যেমন, সাধারণ মানুষ নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই কাউকে মেনে নেয়), সে যেন ভগবানের ওপর দোষারোপণ করে মহাপতনের দিকে অগ্রসর না হয়, তাই তাকে বলতে নিষেধ করে দিয়েছেন।

পরিশিষ্ট-ভাব—ভগবান অ-ভক্ত এবং দোষদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে সর্বগুহ্যতম এই বিষয় প্রকাশ না করার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। অ-ভক্ত এবং দোষদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের বলায় যত দোষ হয়, সাধনরহিত অথবা যারা শুনতে আগ্রহী নয়, তাদের বলায় তত দোষ হয় না। কারণ অ-ভক্ত এবং দোষদৃষ্টিসম্পন্নদের বিপরীত বুদ্ধি থাকে।

'অ-ভক্ত' কথাটির অর্থ হল—ভক্তি বিরোধী। যার ভক্তির অভাব, তাকে 'অ-ভক্ত' বলা হয়নি। যারা ভক্ত, তাদের মধ্যেও ভুলবশতঃ ঈর্ষা দোষ আসতে পারে[১], কিন্তু ভক্তির ফলে সেই দোষ স্বভাবতঃই দূর হয়ে যায়।

'অশুশ্রূষবে' কথাটির অর্থ হল—যারা অহংকারবশতঃ কিছু শুনতে চায় না। যারা ভুলবশতঃ বা বুদ্ধিহীনতার কারণে শুনতে চায় না, তাদের এখানে 'অশুশ্রূষবে' বলা হয়নি।

※ ※ ※

সম্বন্ধ—গীতার মাহাত্ম্য হল এই যে—যে ব্যক্তি এর প্রচার করবে, তার থেকে বেশি প্রিয় আর আমার কেউ হবে না—পরের দুটি শ্লোকে ভগবান এই কথা জানিয়েছেন।

য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ॥ ৬৮ ॥

[**ময়ি, পরাম্, ভক্তিম্, কৃত্বা** (আমাকে পরাভক্তি করে) ; **যঃ, ইদম্** (যিনি এই) ; **পরমম্, গুহ্যম্** (পরম গুহ্যশাস্ত্র) ; **মদ্ভক্তেষু** (আমার ভক্তদের কাছে) ; **অভিধাস্যতি** (ব্যাখ্যা করবেন, তিনি) ; **মাম্, এব** (আমাকেই) ; **এষ্যতি** (লাভ করবেন) ; **অসংশয়ঃ** (এতে কোনো সন্দেহ নেই।)]

আমাকে পরাভক্তি করে যিনি এই পরম গুহ্যশাস্ত্র (গীতাগ্রন্থ) আমার ভক্তদের কাছে ব্যাখ্যা করবেন, তিনি আমাকেই লাভ করবেন এতে কোনো সন্দেহ নেই॥ ৬৮ ॥

ব্যাখ্যা—**'ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা'**—যে ব্যক্তি আমাকে পরাভক্তি করে এই গীতাগ্রন্থের ব্যাখ্যা করেন। এর অর্থ হল যে, অর্থ, মান-সম্মান, উপহার-পূজা, মান-মর্যাদা ইত্যাদি কোনো কিছুর জন্য নয় বরং ভগবানে যাতে ভক্তির উদ্রেক হয়, ভগবদ্ভাবের মনন হয়, এইসব ভাবের প্রচার-প্রসার হয়, আলোচনা হয়, শুনে লোকের দুঃখ, জ্বালা, শোকাদি দূর হয়, সকলের কল্যাণ হয়—এই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি গীতাগ্রন্থের ব্যাখ্যা করে থাকেন, এইরূপ ভগবানের প্রতি ভক্তির উদ্দেশ্যে বলাকেই পরাভক্তি বলা হয়।

এই অধ্যায়ের চুয়ান্নতম শ্লোকে কথিত এবং এই শ্লোকে কথিত পরাভক্তির মধ্যে পার্থক্য আছে। ওইস্থানে **'মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্'** পদের দ্বারা বলা হয়েছে ব্রহ্মভূত হলে সাংখ্যযোগী পরাভক্তি প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ভগবানের সঙ্গে যে অনাদিকাল হতে সম্পর্ক থাকে, তার স্মৃতি জাগরূক হয়। কিন্তু এইস্থানে জাগতিক মান-মর্যাদা ইত্যাদি কোনো কিছুর কামনা না করে শুধুমাত্র ভগবদ্ভক্তির, ভগবদপ্রেমের আকাঙ্ক্ষা রাখাকেই বলা হয়েছে পরাভক্তি। তাই এখানে **'ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা'** 'আমাকে পরাভক্তি করে'—এরূপ বলা হয়েছে।

'য ইদং পরমং গুহ্যম্'—এই পদটির দ্বারা সম্পূর্ণ গীতার পরমগুহ্য আলোচনা ধরে নিতে হবে, যা গীতাগ্রন্থে বলা হয়েছে। **'পরমং গুহ্যম্'** পদেই গুহ্য, গুহ্যতর, গুহ্যতম এবং সর্বগুহ্যতম—এইসব কথাই এসে পড়ে।

'মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি'—যাঁর ভগবান এবং তাঁর বচনে পূজ্যভাব থাকে, সম্মানভাব থাকে, শ্রদ্ধা-বিশ্বাস থাকে এবং শোনার আগ্রহ থাকে, তিনি ভক্ত হয়ে থাকেন। আমার এরূপ ভক্তকে যিনি এই আলোচনা জানাবেন, তিনি

[১]শ্রদ্ধা থাকলেও তার সঙ্গে ঈর্ষা-দোষ থাকতে পারে, তাই ভগবান শ্রদ্ধার সঙ্গে ঈর্ষা-দোষরহিত হওয়ার কথাও বলেছেন—'শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্ত' (গীতা ৩।৩১), 'শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ' (গীতা ১৮।৭১)।

আমাকেই প্রাপ্ত হবেন।

আগের শ্লোকে **'নাভক্তায়'** পদে একবচন আর এখানে **'মদ্ভক্তেষু'** পদে বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হল যেখানে অনেক শ্রোতা থাকেন, সেখানে পূর্বোক্ত দোষসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি থাকলে বক্তার জন্য পূর্বোল্লিখিত নিষেধ প্রযুক্ত হয় না। কারণ বক্তা শুধু সেই (দোষযুক্ত) ব্যক্তিটিকেই যে গীতা শোনাচ্ছেন, তা নয়। যেমন, যদি কেউ পায়রার জন্য শস্যের দানা দেয় আর পায়রার সঙ্গে কোনো কাক এসে দানা খায় তো তাকে তাড়ানো যায় না। তবে যে শস্য দেয় তার উদ্দেশ্য থাকে পায়রাকে খাওয়ানো, কাককে নয়। তেমনই কেউ যদি গীতা প্রবচন করতে থাকেন এবং তা শোনার জন্য কোনো নতুন লোক আসেন বা কেউ উঠে যান সেদিকে গীতা বক্তার লক্ষ্য থাকে না। তাঁর লক্ষ্য থাকে যাঁরা শোনেন, তাঁদের প্রতি, কারণ তাঁদেরই তিনি গীতা শোনাচ্ছেন।

'মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ'—গীতা শ্রবণকারীদের যদি কেবল আমার প্রতিই লক্ষ্য থাকে, তাহলে তাঁরা আমাকেই প্রাপ্ত হন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ গীতার এ এক বিচিত্র মহিমা যে, মানুষ তার স্বাভাবিক কর্মের দ্বারাও পরমাত্মাকে নিষ্কামভাবে পূজা করে তাঁকে প্রাপ্ত করতে সক্ষম হয় (১৮।৪৬)। যে ব্যক্তি খাওয়া-দাওয়া, আচার-বিচার ইত্যাদি শারীরিক কার্য ভগবানে সমর্পণ করেন, তিনিও শুভাশুভ ফলরূপ কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানকে প্রাপ্ত হন (৯।২৭-২৮)। তাহলে যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তির লক্ষ্য নিয়ে গীতা প্রচার করেন, তিনি যে ভগবানকে প্রাপ্ত হবেন, তাতে আর বলার কী আছে!

❋ ❋ ❋

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি॥ ৬৯ ॥

[**মনুষ্যেষু, তস্মাৎ** (মনুষ্য মধ্যে তাঁর সমান) ; **মে, প্রিয়কৃত্তমঃ** (অধিক প্রিয় কার্যকারী) ; **কশ্চিৎ, ন, চ** (আর কেউ নেই এবং) ; **ভুবি** (এই পৃথিবীতে) ; **তস্মাৎ, মে** (তাঁর থেকে আমার) ; **প্রিয়তরঃ** (প্রিয়) ; **অন্য, ভবিতা** (আর কেউ) ; **চ, ন** (হবে না।)]

মনুষ্যমধ্যে তাঁর সমান অধিক প্রিয় কার্যকারী আর কেউ নেই এবং এই পৃথিবীতে তাঁর থেকে প্রিয় আমার আর কেউ হবেও না॥ ৬৯ ॥

ব্যাখ্যা—'ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তম'— যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে ইহলোক-পরলোকের প্রাকৃত পদার্থের গুরুত্ব, আকাঙ্ক্ষা, প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, তিনি পরাভক্তির (১৮।৬৮) অন্তর্গত হতে পারেন না। সেই ব্যক্তিই পরাভক্তির অন্তর্গত হন, যাঁর প্রাকৃত পদার্থ প্রাপ্ত করার বিন্দুমাত্র লক্ষ্য থাকে না এবং যিনি ভগবদ্প্রাপ্তি, ভগবদ্দর্শন, ভগবদ্প্রেম ইত্যাদি পারমার্থিক উদ্দেশ্য নিয়ে গীতা অনুসারেই নিজ জীবন গঠন করতে আগ্রহী। এরূপ ব্যক্তিই ভগবদ্গীতা প্রচারের অধিকারী হয়ে থাকেন। যদি তাঁর মনে কখনো মান-সম্মানাদির আকাঙ্ক্ষা আসেও তবে তা স্থায়ী হয় না ; কারণ মান-সম্মান লাভ করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়।

ভগবদ্ভক্তদের মধ্যে গীতা প্রচারকারী উপরিউক্ত অধিকারী ব্যক্তিদের জন্যই **'তস্মাৎ'** পদটি ব্যবহার করে ভগবান বলেছেন যে, মানুষের মধ্যে তাঁর সমান আমার প্রিয়কৃত্তম অর্থাৎ অত্যন্ত প্রিয় কর্মকারী আর কেউ নেই ; কেন-না গীতা প্রচারের ন্যায় অন্য কোনো প্রিয় কর্ম আমার নেই।

'প্রিয়কৃত্তমঃ' পদে যে **'কৃৎ'** পদটি উক্ত হয়েছে, তার তাৎপর্য হল যে গীতা প্রচার করায় তাঁর নিজের কোনো স্বার্থ থাকে না, মান-মর্যাদা, সম্মান-শ্রদ্ধা ইত্যাদির কোনো আকাঙ্ক্ষা থাকে না ; শুধুমাত্র ভগবদ্প্রীত্যর্থে গীতার ভাব তিনি প্রচার করেন। তাই তিনি হলেন প্রিয়কৃত্তম— ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় কর্মকারী।

মানুষের মধ্যে তাকে প্রিয়কৃত্তম বলার অর্থ হল যে মানুষেরই একমাত্র অধিকার থাকে ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় হয়ে ওঠার। জগতে কামনাগুলি পূর্ণ করা কোনো মহত্ত্ব বা বাহাদুরীর ব্যাপার নয়। দেবতা, পশু-পক্ষী, নারকীয় জীব, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ-লতা ইত্যাদি সকল প্রাণীরই কামনা পূর্ণ করার সুযোগ মেলে ; কিন্তু কামনা পরিত্যাগ করে

পরমাত্মাকে প্রাপ্তি করার সুযোগ একমাত্র মনুষ্য-জন্মেই পাওয়া যায়। এই মনুষ্যজন্ম লাভ করে পরমাত্মাকে প্রাপ্তি করে পরমাত্মার অত্যন্ত প্রিয় হওয়াতেই মনুষ্যজন্মের সাফল্য।

'ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি'—যার মধ্যে নিজের মান-মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা থাকে, কিছুটা স্বার্থভাব থাকে এবং যার নিজের উদ্ধারের ও গীতা অনুযায়ী জীবন গঠন করার তেমন উদ্দেশ্য (প্রিয়কৃত্তমের মতো) তৈরি হয়নি ; কিন্তু যার অন্তরে গীতার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা আছে এবং গীতা পাঠ করানো, গীতা কণ্ঠস্থ করানো, গীতা মুদ্রিত করে তা সুলভ মূল্যে বিক্রি করা, ইত্যাদি প্রচারকার্যে যিনি নিযুক্ত এবং লোকেদেরও যিনি গীতার প্রতি আকর্ষিত করেন তাঁর মতো পৃথিবীতে অন্য কেউ আমার কাছে প্রিয়তর হয় না।

নিজ ধর্ম, সম্প্রদায়, সিদ্ধান্ত ইত্যাদির প্রচারকারী ব্যক্তি ভগবানের প্রিয় হলেও, প্রিয়তর হয় না। যে কোনোভাবে গীতা প্রচার করলেই সে প্রিয়তর হয়ে ওঠে।

ভগবদ্‌গীতাতে মানুষের উদ্ধারের জন্য এরূপ বিশেষ, সহজ, সরল কথা বলা হয়েছে, যা মানুষমাত্রেই পালন করতে সক্ষম। অর্থাৎ যিনি গীতাকে সম্মান করেন, তিনি হিন্দু, ইসলাম, খ্রিস্টান, ইহুদী, পারসী, শিখ, বৌদ্ধ বা অন্য যে কোনো ধর্মেরই হোন না কেন ; যে কোনো দেশ, বেশ, বর্ণ, আশ্রম, সম্প্রদায়েরই হোন না কেন ; নিজ রুচি অনুযায়ী যে কোনো রীতি, নিয়ম, সিদ্ধান্ত মানুন না কেন, তিনি যদি নিজের কোনোপ্রকার আগ্রহ না রেখে, পক্ষপাতিত্ব ত্যাগ করে, কোনো প্রাণীকে দুঃখ দেবার চেষ্টা ত্যাগ করে, মনে কোনোপ্রকার ইহলোক-পরলোকের বিনাশশীল বস্তুর কামনা না রেখে, নিজের কোনো সম্প্রদায় বা আশ্রম তৈরির উদ্দেশ্য না করে, শুধুমাত্র নিজের কল্যাণের উদ্দেশ্যে গীতা অনুসারে চলেন (সর্বতোভাবে অকর্তব্য পরিত্যাগ করে প্রাপ্ত পরিস্থিতি অনুযায়ী লোকহিতার্থে, নিষ্কামভাবে কর্তব্য পালন করেন), তাহলে তিনিও জীবিকা-সম্বন্ধীয় খাওয়া-দাওয়া, শয়ন-জাগরণ এবং শরীর-সম্বন্ধীয় সমস্ত কাজ করেও পরমাত্মাকে লাভ করতে পারেন, মহা-আনন্দ, মহাসুখ (গীতা ৬।২২) প্রাপ্ত করতে সক্ষম হন।

গীতা বেশ, আশ্রম, অবস্থা, ক্রিয়া ইত্যাদির পরিবর্তনের কথা বলে না, বরং পরিমার্জন করার কথা বলে অর্থাৎ শুধুমাত্র নিজের ভাব ও উদ্দেশ্যকে শুদ্ধ করার কথা বলে। গীতার এইসব যুক্তিগুলি যাঁরা ভগবানের লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া ভক্তদের বলেন, তাহলে তাঁদের পারমার্থিক পথে অগ্রসর হবার আগ্রহ বাড়ে। প্রশ্নের সমাধান হয়, সাধন পথের প্রতিবন্ধকতা দূর হয়, পারমার্থিক পথের বাধা অপসারিত হয়। ফলে তাঁরা উৎসাহপূর্বক অনায়াসে অতি শীঘ্রই নিজ লক্ষ্য প্রাপ্ত করতে সক্ষম হন। তাই তিনি ভগবানের সব থেকে অধিক প্রিয় হন। কারণ ভগবান জীবের উদ্ধারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন, প্রসন্ন হন।

পরিশিষ্ট-ভাব—গীতার শিক্ষাদ্বারা মনুষ্যমাত্রেরই সর্ব অবস্থায় সহজেই কল্যাণ হতে পারে, তাই ভগবান এর প্রচারের বিশেষ মাহাত্ম্যের কথা বলেছেন। গীতা যুদ্ধের মতো পরিস্থিতিকেও কল্যাণপ্রদ বলে বলেছে—**'সুখদুঃখে সমে কৃত্বা'** (২।৩৮), **'যৎ করোষি যদশ্নাসি'** (৯।২৭), **'স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য'** (১৮।৪৬) ইত্যাদি। যুদ্ধের মতো ঘোর কর্মেও যখন নিঃশ্রেয়স লাভ সম্ভব, তখন অন্য কাজে কেন হবে না ?

যে ব্যক্তি ভগবানের প্রিয় হন, তিনি কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ—তিনটি যোগই লাভ করেন।

* * *

সম্বন্ধ—যার গীতা প্রচার করার কোনো যোগ্যতা নেই, তার কী করা উচিত ? পরবর্তী শ্লোকটিতে ভগবান তাই জানাচ্ছেন।

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ॥ ৭০ ॥

[**যঃ, আবয়োঃ** (যে ব্যক্তি আমাদের উভয়ের) ; **ইমম্, ধর্ম্যম্ সংবাদম্** (এই ধর্মযুক্ত কথোপকথন) ; **সংবাদম্** (সংবাদ) ; **অধ্যেষ্যতে** (অধ্যয়ন করবেন) ; **তেন, চ, অহম্** (তাঁর দ্বারা আমি) ; **জ্ঞানযজ্ঞেন** (জ্ঞানযজ্ঞের সাহায্যে) ; **ইষ্টঃ, স্যাম্** (পূজিত

হলাম) ; **ইতি, মে, মতিঃ** (আমি তাই মনে করব।)]

যে ব্যক্তি আমাদের উভয়ের এই ধর্মসংবাদ (গীতাশাস্ত্র) অধ্যয়ন করবেন, তাঁর দ্বারা আমি জ্ঞানযজ্ঞের সাহায্যে পূজিত হলাম—আমি তাই মনে করব॥ ৭০ ॥

ব্যাখ্যা—**'অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ'**—তোমার এবং আমার এই সংবাদ (কথোপকথন) শাস্ত্রাদি ও সিদ্ধান্তের সাররূপ ধর্ম দ্বারা যুক্ত। এ এক বিচিত্র ব্যাপার যে আমরা পরস্পর একসঙ্গে অনেক বছর থাকলেও, আমাদের মধ্যে এরূপ আলোচনা আগে কখনো হয়নি। এরূপ ধর্মময় আলোচনা কোনো বিশেষ, অলৌকিক সময়েই হয়ে থাকে।

মানুষ যতক্ষণ না সংসারে উত্যক্ত হয়, বৈরাগ্য বা উদাসীনতা না আসে এবং হৃদয়ে ব্যাকুলতা না আসে, ততক্ষণ তার প্রকৃত জিজ্ঞাসার উদয় হয় না। কোনো কারণবশতঃ মানুষ যখন তার কর্তব্য নিরূপণে ব্যাকুল হয়ে ওঠে, যখন সে কল্যাণের আর কোনো রাস্তা খুঁজে সে পায় না, সমাধান না হওয়ায় এবং সাংসারিক কোনো বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদিতে মনও বসে না, শুধুমাত্র অন্তরের সন্দেহ দূর করার আগ্রহ জেগে থাকে, একটিমাত্র জিজ্ঞাসা জেগে থাকে এবং অন্য দিক থেকে মন সর্বতোভাবে দূরে সরে যায়, তখন মানুষ যেখান থেকে আলো ও সমাধান পাবার সম্ভাবনা থাকে, সেখানে নিজ হৃদয় উন্মুক্ত করে সবকিছু জিজ্ঞাসা করে, প্রার্থনা করে, শরণ গ্রহণ করে, শিষ্যত্ব গ্রহণ করে।

প্রশ্নকারীর মনে যেমন উৎকণ্ঠা বাড়তে থাকে উত্তরদাতার মনেও তেমনই অত্যন্ত বিচিত্র এবং বিশেষ সমাধান উৎপন্ন হয়ে থাকে। যেমন, দুধ পান করার সময় বাছুর তার মায়ের স্তনে বারংবার ধাক্কা মারতে থাকে, ফলে গাভীর স্তন দুধে পরিপূর্ণ হয়ে যায়, তেমনই মনে বিশেষ জিজ্ঞাসা উদ্ভূত হলে যখন জিজ্ঞাসু বারংবার প্রশ্ন করতে থাকে, তখন উত্তরদাতার মনে নতুন নতুন সমাধান প্রস্তুত হয়ে যায়। শ্রোতা যতই নতুন কথা শোনে, ততই তার মনে আরও নতুন নতুন বিষয় জানার আগ্রহ বেড়ে ওঠে। এরূপ হলে তখনই বক্তা এবং শ্রোতা—উভয়ের কথোপকথন অত্যন্ত মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে।

অর্জুন এর আগে কখনো এরূপ ব্যাকুলতা নিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করেননি এবং ভগবানেরও কখনো এভাবে কথা বলার অবকাশ আসেনি। কিন্তু অর্জুন যখন **'স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা ...'** (২।৫৪)—বলে জিজ্ঞাসা শুরু করলেন, তখন থেকেই উভয়ের প্রশ্নোত্তররূপ কথোপকথন শুরু হল। এতে বেদাদি ও উপনিষদের সার এবং ভগবানের হৃদয়ের প্রকৃত ভাব ব্যক্ত হয়েছে, যা ধারণ করলে মানুষ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতেও তার মনুষ্যজন্মের ধ্যেয়কে অতি সহজেই লাভ করতে পারে। অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থাতেও মনোবল হারায় না, বরং প্রতিকূল পরিস্থিতিকে সম্মান করে তার সদ্ব্যবহার করে অর্থাৎ অনুকূলতার ইচ্ছা পরিত্যাগ করে। কারণ প্রতিকূলতা আসে পূর্বকৃত পাপ নাশ করতে এবং ভবিষ্যতে অনুকূলতার ইচ্ছা ত্যাগ করানোর জন্যই। অনুকূলতার জন্য আগ্রহ যত বেশি হয়, প্রতিকূল অবস্থা ততই ভয়ঙ্কর হয়। অনুকূলতার ইচ্ছা যেমনই দূর হতে থাকে, তেমনই অনুকূলতার জন্য আকাঙ্ক্ষা ও প্রতিকূলতার প্রতি ভয় দূর হতে থাকে। আকাঙ্ক্ষা ও ভয়—এই দুটি দূর হলে সমতা আসে। সমতা পরমাত্মার সাক্ষাৎস্বরূপ। গীতায় সমত্বের কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে এবং একেই গীতায় যোগ বলে অভিহিত করা হয়েছে। এইরূপ কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, ধ্যানযোগ, প্রাণায়াম ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ বিষয় গীতায় বর্ণিত হয়েছে।

'অধ্যেষ্যতে' কথাটির অর্থ হল, এই সংবাদ (আলোচনা) যে ব্যক্তি যেমনভাবে পড়বেন, পাঠ করবেন, স্মরণ করবেন, তার তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করবেন, তেমনই তাঁর হৃদয়ে আগ্রহ, ব্যাকুলতা বাড়তে থাকবে। তিনি যেমন যেমন বুঝতে থাকবেন ; তেমন তেমনই তাঁর জিজ্ঞাসার সমাধান হবে। যতই সমাধান হতে থাকবে, ততই তাঁর এসবে আরও বেশি আগ্রহ হতে থাকবে। আগ্রহ যত বাড়বে, ততই এর গভীর ভাব তাঁর হৃদয়ঙ্গম হবে এবং তখন এই ভাব তাঁর আচরণে, কাজে-কর্মে, ব্যবহারে প্রতিফলিত হবে। শ্রদ্ধার সঙ্গে আচরণ করলে তিনি গীতার প্রতিমূর্তি হয়ে ওঠেন , তাঁর জীবন গীতার মতো হয়ে যায় অর্থাৎ তিনি জীবন্ত ভগবদ্‌গীতা হয়ে ওঠেন। তাঁকে দেখে সকলের গীতা স্মরণে আসে ; যেমন, নিষাদরাজ গুহককে দেখে মায়েদের এবং অন্যদের

লক্ষ্মণের কথা স্মরণে আসে[১]।

'জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যাম্'—যজ্ঞ দুপ্রকারের হয়— জ্ঞানযজ্ঞ এবং দ্রব্যযজ্ঞ। যে যজ্ঞ পদার্থাদি এবং ক্রিয়াদির প্রাধান্যে করা হয়, তাকে বলা হয় **'দ্রব্যযজ্ঞ'** ; আর ব্যাকুলতার জন্য, নিজ প্রয়োজনীয় বাস্তবিকতা জানার জন্য যে প্রশ্ন করা হয়, বিজ্ঞ পণ্ডিতগণ তার সমাধান করেন, তার ওপর গভীরভাবে চিন্তা করা হয়, চিন্তা অনুসারে নিজ বাস্তবিক স্থিতি অনুভব করা হয় এবং প্রকৃত তত্ত্ব জেনে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ হওয়া যায়, একেই বলা হয় **'জ্ঞানযজ্ঞ'**। কিন্তু এখানে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে তোমার-আমার সংবাদ (কথোপকথন) যদি কেউ পাঠ করে তাহলে আমি তার দ্বারা জ্ঞানযজ্ঞের সাহায্যে পূজিত হব। এর কারণ হল এই যে যেমন, প্রেমিক ভক্তকে যদি কেউ ভগবানের কথা শোনায়, তাঁর কথা স্মরণ করায়, তাহলে ভক্ত অত্যন্ত প্রসন্ন হন, তেমনই যদি কেউ গীতা পাঠ করেন, অভ্যাস করেন, তাহলে ভগবানের তাঁর অনন্যভক্তের ব্যাকুলতাপূর্বক জিজ্ঞাসা এবং তাঁকে প্রদত্ত উপদেশ স্মরণে আসে—এতে তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হন আর এই পাঠ, অভ্যাস ইত্যাদিকে জ্ঞানযজ্ঞ মনে করে তার দ্বারা পূজিত হন। কারণ পাঠ, অভ্যাস ইত্যাদি যিনি করেন তাঁর হৃদয়ে তাঁর ভাব অনুসারে ভগবানের নিত্যজ্ঞান বিশেষভাবে স্ফুরিত হতে থাকে।

'ইতি মে মতিঃ'—একথা বলার অর্থ হল যে কেউ যখন গীতা পাঠ করেন, আমি তা শুনি। কারণ আমি সর্বত্র বিরাজ করি—**'ময়া ততমিদং সর্বম্'** (গীতা ৯।৪) আর সর্বত্রই আমার কান আছে—**'সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে'** (গীতা ১৩।১৩)। সুতরাং এই পাঠ শুনলেই আমার হৃদয়ে বিশেষভাবে জ্ঞান, প্রেম, দয়া ইত্যাদির প্লাবন হয় এবং গীতোপদেশের স্মরণে আমার বুদ্ধি আপ্লুত হয়ে যায়। তিনি যে পূজা করেন—তা নয়, তিনি তো পাঠ করেন ; কিন্তু আমি সেই পাঠের দ্বারা পূজিত হই অর্থাৎ সেই ব্যক্তির জ্ঞানযজ্ঞের ফললাভ হয়।

অন্য ভাব হল এই যে, পাঠক যদি তত গভীরভাবে মর্মকথায় প্রবেশ করতে না পারেন, শুধুমাত্র পাঠ করেন বা স্মরণ করেন তাহলেও তার দ্বারা আমার হৃদয়ে আমাদের সমস্ত সংবাদের (ব্যাকুলতা সহকারে করা তোমার প্রশ্ন এবং আমার প্রদত্ত যথাযথ গভীর উত্তরের) এক গভীর সুমিষ্ট স্মৃতি বারংবার উদিত হতে থাকে। এইভাবে গীতা অধ্যয়নকারী আমার অত্যন্ত সেবা করে বলে আমি মনে করে থাকি।

বিদেশে কোনো এক স্থানে জলসা হচ্ছিল, সেখানে বহুলোক একত্র হয়েছিল। এক পাদ্রী সেই জলসাতে একটি ছেলেকে নিয়ে এসেছিলেন। ছেলেটি আগে নাটক অভিনয় করত। পাদ্রী তাকে দশ-পনের মিনিট ধরে একটি খুব সুন্দর কাহিনি শেখালেন এবং সেই অনুসারে কায়দা করে ওঠা, বসা, দাঁড়ানো, এদিক-ওদিকে তাকানো ইত্যাদির পারদর্শিতাও শেখালেন। কাহিনিটিতে অতি উচ্চমানের ইংরাজি প্রয়োগ করা হয়েছিল এবং বিষয়টি ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তারপর পাদ্রী সেই কাহিনিটি বলার জন্য ছেলেটিকে টেবিলের ওপর তুলে দিলেন। ছেলেটি অত্যন্ত মেজাজ নিয়ে টেবিলে দাঁড়াল এবং এদিক-ওদিক তাকিয়ে নানারূপ সম্বোধন করে বলতে আরম্ভ করল। সে নাটক করত, কথা বলার অভ্যাস তো ছিলই, তাই সে গাম্ভীর্যপূর্ণভাবে, অর্থ বোঝানোর ভঙ্গীতে এমনভাবে বলতে লাগল যে, সেখানে যত লোক ছিল তারা তাদের আসনে উচ্ছল হয়ে উঠল। তারা এত প্রসন্ন হল যে কাহিনি শেষ হওয়ামাত্র টাকার ধারা বইয়ে দিল। সেই বালকটিকে সভার চারিদিকে ঘোরানো হতে লাগল। সকলেই তাকে কাঁধে তুলতে লাগল। কিন্তু বালকটি বোঝেইনি যে সে আসলে কী বলেছে ! সে বেচারি বেশি লেখাপড়া না জানায় ইংরাজি কথার ভাবই ভালোভাবে বোঝেনি, কিন্তু সভার আর সকলেই তা হৃদয়ঙ্গম করেছিল। এইরূপ কেউ যদি গীতা অধ্যয়ন করেন, পাঠ করেন, তাহলে তিনি তার অর্থ, ভাব না বুঝলেও ভগবান তা বুঝতে পারেন। তাই ভগবান বলেছেন যে, আমি তার পাঠরূপ, অধ্যয়নরূপ জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা পূজিত হই। উক্ত সভায় যেমন বালকের ব্যাখ্যাতে সভাপতি এবং সভাসদগণ অত্যন্ত খুশি

[১]জানি লখন সম দেহিঁ অসীসা। জিয়হু সুখী সয় লাখ বরীসা॥ নিরখি নিষাদু নগর নর নারী। ভয়ে সুখী জনু লখনু নিহারী॥
(শ্রীরামচরিতমানস ২।১৯৬।৩)

হয়েছিলেন এবং উৎসাহ সহকারে তাকে আদর করছিলেন, তেমনই গীতা অধ্যয়নকারীর দ্বারা ভগবান জ্ঞানযজ্ঞের পূজায় পূজিত হন এবং স্বয়ং সেখানে বাস করেন, তাঁর সঙ্গে প্রয়াগাদি তীর্থ, দেবতা, ঋষি, যোগী, দিব্য নাগ, গোপাল, গোপিনীগণ, নারদ, উদ্ধবাদিও সেখানে বাস করেন[১]।

পরিশিষ্ট-ভাব—ভগবান জ্ঞানযজ্ঞকে দ্রব্যময় যজ্ঞের থেকেও শ্রেষ্ঠ বলে বলেছেন—**'শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ**।' (গীতা ৪।৩৩)। গীতা অধ্যয়নেরই যখন এত মাহাত্ম্য তখন গীতার উপদেশ মতো আচরণ করার মাহাত্ম্য বলার অপেক্ষা রাখে না।

* * *

সম্বন্ধ—যে ব্যক্তি গীতার প্রচার বা অধ্যয়ন করতে সক্ষম হয় না, সে কী করবে ? পরবর্তী শ্লোকে তার উপায় বলা হচ্ছে।

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভাঁল্লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্মণাম্॥ ৭১ ॥

[**যঃ, নরঃ, শ্রদ্ধাবান্, চ** (যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান এবং) ; **অনসূয়ঃ** (দোষদৃষ্টিবর্জিত হয়ে) ; **শৃণুয়াৎ, অপি, সঃ** (গীতাগ্রন্থ শ্রবণও করেন, তিনি) ; **মুক্তঃ** (সম্পূর্ণ পাপমুক্ত হয়ে) ; **পুণ্য কর্মণাম্** (পুণ্যবান ব্যক্তিদের) ; **শুভান্, লোকান্** (শুভলোক) ; **প্রাপ্নুয়াৎ** (প্রাপ্ত হন।)]

যিনি শ্রদ্ধাবান এবং দোষদৃষ্টিবর্জিত হয়ে এই গীতাগ্রন্থ শ্রবণও করেন, তিনিও সম্পূর্ণ পাপবিমুক্ত হয়ে পুণ্যবান ব্যক্তিদের প্রাপ্য শুভলোক প্রাপ্ত হন॥ ৭১ ॥

ব্যাখ্যা—'শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ .... পুণ্যকর্মণাম্'—গীতার কথাকে যেমন শ্রবণ করবে, তাকে প্রত্যক্ষের চেয়েও বেশি বাস্তব মনে করে পূজ্যভাবে সেইরূপ যে মান্য করে, তাকে বলা হয় **'শ্রদ্ধাবান্'** এবং সেই বিষয়ে যে বিন্দুমাত্রও ন্যূনতা বা সন্দেহ না করে তাকে বলা হয় **'অনসূয়ঃ'**। এরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত এবং দোষদৃষ্টিবর্জিত মানুষ যদি শুধুমাত্র গীতা শ্রবণ করেন, তাহলেও তিনি সর্বপাপ থেকে মুক্ত হয়ে পুণ্যার্থীদের শুভলোক প্রাপ্ত হন।

এখানে দুবার 'অপি' পদটি ব্যবহারের তাৎপর্য হল এই যে, যিনি গীতা প্রচার করেন, অধ্যয়ন করেন, তাঁর সম্বন্ধে তো আর কিছু বলারই নেই। কিন্তু যাঁরা কেবলমাত্র শ্রবণ করেন, সেই ব্যক্তিগণও পাপ হতে মুক্ত হয়ে শুভলোকে গমন করেন।

মানুষের বাক্যে প্রায়শঃই ভ্রম, প্রমাদ, লিপ্সা এবং করণাপাটব—এই চার প্রকারের দোষ দেখা যায়[২]। অতএব মানুষের বাক্য সর্বতোভাবে নির্দোষ হতে পারে না। কিন্তু ভগবানের দিব্য বাণীতে এর কোনো দোষই থাকে না। কারণ তিনি নির্দোষের পরাকাষ্ঠা অর্থাৎ তাঁর থেকে বেশি নির্দোষ আর কেউ কখনোই হতে পারে না। তাই তাঁর বাণীতে কোনোপ্রকার সংশয়ের সম্ভাবনাই নেই। সুতরাং

[১]গীতায়াঃ পুস্তকং যত্র যত্র পাঠঃ প্রবর্ততে। তত্র সর্বাণি তীর্থানি প্রয়াগাদীনি তত্র বৈ।
সর্বে দেবাশ্চ ঋষয়ো যোগিনঃ পন্নগাশ্চ যে।
গোপালা গোপিকা বাপি নারদোদ্ধবপার্ষদৈঃ। সহায়ো জায়তে শীঘ্রং যত্র গীতা প্রবর্ততে॥
যত্র গীতাবিচারশ্চ পঠনং পাঠনং শ্রুতম্। তত্রাহং নিশ্চিতং পৃথ্বি নিবসামি সদৈব হি॥

[২](ক) বক্তা যে বিষয়ের প্রতিপাদন করেন, তাতে যদি তিনি সম্পূর্ণভাবে নিঃসন্দেহ না হন, তাহলে তাকে বলা হয় 'ভ্রম' ; (খ) বক্তার বুদ্ধিতে শিথিলতা, উপেক্ষা, উদাসীনতা, তৎপরতার অভাব, লোকে বুঝুক বা না বুঝুক তার পরোয়া না করা, এগুলিকে বলা হয় 'প্রমাদ' ; (গ) বক্তার অর্থ, মর্যাদা, সম্মান, সুখ-আরাম ইত্যাদি ইহলৌকিক অথবা পারলৌকিক কিছু পাবার আকাঙ্ক্ষাকে বলা হয় 'লিপ্সা' ; (ঘ) বক্তা যে ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, বাণীর সাহায্যে তাঁর ভাব প্রকট করেন, সেই করণগুলিতে পটুত্ব, কৌশল নেই এবং তিনি শ্রোতার ভাষা, ভাব ও যোগ্যতাও জানেন না, তাঁকে বলা হয় 'করণাপাটব'।

শ্রবণকারী যদি কোনো বিষয়ে কম বোঝেন, বুদ্ধি দ্বারা কোনো কথা বোঝা না যায়, তাহলে বুঝতে হবে যে সেটি তারই অযোগ্যতা, যার ফলে তিনি বুঝতে পারছেন না— এই ভাব দৃঢ়ভাবে ধারণ করলে অসূয়া দোষ দূর হয়। ভগবানে অত্যধিক শ্রদ্ধা-বিশ্বাসপূর্বক ভক্তি হলেও অসূয়া দোষ থাকে না।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এক ভক্ত ছিলেন। তিনি প্রত্যহ গীতা পাঠ করতে করতে ভাবে মত্ত হয়ে অশ্রুপাত করতেন। কিন্তু তাঁর পাঠ শুদ্ধ হত না, উচ্চারণ ভুল হত। তাই নিয়ে কোনো একজন শ্রীচৈতন্যদেবের কাছে নালিশ করল যে, 'প্রভু দেখুন! ওই ব্যক্তি অত্যন্ত পাষণ্ড, একে তো শুদ্ধ পাঠ করে না তার ওপর আবার ভণ্ডামী করে।' শ্রীচৈতন্যদেব তাঁকে নিজের কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—'তুমি যে গীতা পাঠ কর, তার অর্থ বুঝতে পার তো ?' সেই ভক্ত বললেন—'না প্রভু!' তখন মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন— 'তাহলে কাঁদ কেন ?' তিনি উত্তর দিলেন,—'যখন আমি **'অর্জুন উবাচ'** কথাটি পড়ি, তখন আমি প্রত্যক্ষ করি অর্জুন ভগবানকে জিজ্ঞাসা করছেন, আবার যখন, **'শ্রীভগবানুবাচ'** পড়ি , তখন ভগবান অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন, তাই প্রত্যক্ষ করি। এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন একে অপরের সঙ্গে কথা বলছেন—এটি প্রত্যক্ষ দেখতে পাই; কিন্তু অর্জুন কী জিজ্ঞাসা করছেন আর ভগবান তার কী উত্তর দিচ্ছেন, তা বুঝতে পারি না। আমি শুধু তাঁদের দুজনকে দর্শন করেই সন্তুষ্ট হয়ে থাকি।' সেই ভক্তের এরূপ শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখে মহাপ্রভু অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। এইরূপ শ্রদ্ধা-ভক্তিযুক্ত ব্যক্তি যদি শুধু গীতা পাঠ শ্রবণ করেন, তাহলে তাঁর মুক্তিতে আর কোনো সন্দেহ থাকে না। তিনি সম্পূর্ণ পাপমুক্ত হয়ে পুণ্যবানদের কাঙ্ক্ষিত শুভলোকে গমন করেন।

এখানে **'পুণ্যকর্মনাম্'** পদটির দ্বারা সকামভাবে যজ্ঞানুষ্ঠান ইত্যাদি পুণ্যকর্মকারীদের ধরা উচিত নয় ; কারণ ভগবান তাঁদের উচ্চশ্রেণীর বলেননি, তাদের কথায় বলেছেন যে এরা বারংবার আসা-যাওয়া (জন্ম ও মৃত্যু গ্রহণ) করে (গীতা ৯।২১)। এখানে সেই পুণ্যকর্মকারী ভক্তদের ধরা উচিত যাঁরা ভগবানের প্রেম ও দর্শন প্রাপ্ত হন। এরূপ ভক্তরা নিজ নিজ ইষ্ট অনুযায়ী বৈকুণ্ঠ, সাকেত, গোলোক, কৈলাস ইত্যাদি যেসব দিব্যলোক প্রাপ্ত হন, অসূয়া-দোষবর্জিত শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি শুধুমাত্র গীতা শ্রবণ করে ওইসব লোক প্রাপ্ত হয়ে থাকেন।

পরিশিষ্ট-ভাব—'শুভাঁল্লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্মণাম্'—শ্রদ্ধাভক্তির তারতম্যে গীতা শ্রবণ করায় ভাবের তারতম্য হয়ে থাকে এবং শোনার তারতম্যে শ্রোতার স্বর্গাদি লোক থেকে ভগবদ্‌লোক পর্যন্ত যাওয়ার অধিকার প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ শ্রদ্ধাভক্তি বেশি হলে মানুষ ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হয় এবং শ্রদ্ধাভক্তি যদি কম হয় তাহলে অন্য লোক প্রাপ্ত হয়।

গীতা অধ্যয়ন এবং শ্রবণ তো অনেক বড় কথা, গীতা গ্রন্থ ঘরে রাখারও অনেক মাহাত্ম্য। একজন সিপাহী ছিল। সে একরাত্রে নিজের ঘরে ফিরছিল। পথে চাঁদের আলোয় সে দেখল একজন সুন্দরী নারী গাছের নীচে রয়েছে। সিপাহী সেই নারীটির সঙ্গে কথা বলায় সে বলল, 'আমি তোমার সঙ্গে যাব ?' সিপাহী বলল, 'আচ্ছা এসো'। সিপাহী এই কথা বলায় সেই স্ত্রীলোকটি, যে আসলে ছিল এক পেত্নী, তার পিছনে পিছনে এলো। তারপর থেকে সেই স্ত্রীলোকটি প্রত্যহ রাত্রে সিপাহীটির কাছে আসত, রাত্রে থাকত আর সকাল হলে চলে যেতো। এইভাবে সে সিপাহীটির সঙ্গ করে তাকে শোষণ করতে লাগল অর্থাৎ তার রক্ত শুষে তার শক্তি হ্রাস করতে লাগল। এক রাত্রে দুজনে যখন শুয়ে পড়েছে, ঘরে আলো জ্বলছিল, তখন সিপাহী স্ত্রীলোকটিকে বলল, 'তুমি আলোটা নিভিয়ে দাও।' স্ত্রীলোকটি শুয়ে শুয়েই লম্বা হাত বাড়িয়ে আলো নিভিয়ে দিল। সিপাহীটি তখন বুঝতে পারল যে এ কোনো সাধারণ নারী নয়, এ নিশ্চয়ই পেত্নী! তখন সে খুব ভয় পেল। পেত্নীটি তখন তাকে ধমক দিয়ে বলল 'তুমি যদি আমার কথা কাউকে বল তাহলে তোমাকে আমি মেরে ফেলব।' এইভাবে সে রোজ রাত্রে আসে আর সকালে চলে যায়। সিপাহী দিনে দিনে শুকিয়ে যেতে থাকল। লোকে তাকে জিজ্ঞাসা করত, 'ভাই! তুমি এতো শুকিয়ে যাচ্ছ কেন ? কি হয়েছে, বলো না!' কিন্তু পেত্নীর ভয়ে সে কাউকেই কিছু বলত না। একদিন সে দোকান থেকে ওষুধ আনতে গিয়েছিল। দোকানদার ওষুধটি একটি কাগজে বেঁধে তাকে দিল। সিপাহী সেই পুরিয়া পকেটে করে ঘরে এলো। রাত্রে সেই পেত্নী এসে ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে সিপাহীকে বলল, 'তোমার পকেটে যে পুরিয়া আছে, সেটা বার করে ফেলে দাও।' সিপাহী তখন বুঝতে পারল যে পুরিয়াতে নিশ্চয়ই এমন কিছু আছে যার জন্য

পেত্নীটি আমার কাছে আসতে পারছে না। সিপাহী বলল, 'না, আমি পুরিয়া ফেলব না।' পেত্নী তাকে অনেক অনুনয় বিনয় করল, কিন্তু সিপাহী তার কথায় কান দিল না। যখন পেত্নীর কথা সিপাহী কিছুতেই শুনল না, তখন সে চলে গেল। সিপাহী পকেট থেকে পুরিয়া বার করে দেখল যে সেটি একটি গীতার ছেঁড়া পাতাতে জড়ানো হয়েছে। এইভাবে গীতার প্রভাব দেখে সিপাহী সব সময় নিজের পকেটে গীতা রাখতে লাগল। সেই পেত্নী আর কখনো তার কাছে আসেনি।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে গীতা শ্রবণের মাহাত্ম্য জানিয়ে এখানে অর্জুনের স্থিতি ও দশা ইত্যাদি সম্বন্ধে সবকিছু জেনেও ভগবান সকলের কাছে ভগবদ্‌গীতা শ্রবণের মাহাত্ম্য প্রকট করার উদ্দেশ্যে পরবর্তী শ্লোকে অর্জুনকে প্রশ্ন করছেন।

কচ্চিদেতচ্ছ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয়॥ ৭২ ॥

[**পার্থ, ত্বয়া** (হে পৃথানন্দন ! তুমি) ; **একাগ্রেণ, চেতসা, এতৎ** (একাগ্রচিত্তে এটি) ; **শ্রুতম্, কচ্চিৎ** (শ্রবণ করেছ তো ?) ; **ধনঞ্জয়** (হে ধনঞ্জয় !) ; **তে** (তোমার) ; **অজ্ঞানসম্মোহঃ** (অজ্ঞানজনিত মোহ কি) ; **কচ্চিৎ, প্রনষ্টঃ** (নষ্ট হয়েছে।)]

হে পৃথানন্দন ! তুমি একাগ্রচিত্তে এটি শ্রবণ করেছ তো ? এবং হে ধনঞ্জয় ! তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ নাশ হয়েছে তো ? ॥ ৭২ ॥

ব্যাখ্যা—'কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা'—'এতৎ' শব্দটি অত্যন্ত নিকটের বাচক এবং এখানে অত্যন্ত নিকটে রয়েছে একাত্তরতম শ্লোকটি। ঊনসত্তর-সত্তরতম শ্লোকে কথিত গীতার প্রচার এবং অধ্যয়ন নিয়ে অর্জুনের কিছু করার ছিল না। তাই একাত্তরতম শ্লোককে লক্ষ্য করে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে, 'মানুষ শ্রদ্ধা সহকারে এবং দোষদৃষ্টিবর্জিত হয়ে গীতা শ্রবণ করবে'—এই কথা তুমি বিশেষভাবে শুনেছ তো ? অর্থাৎ তুমি নিজে শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে এবং দোষদৃষ্টি বর্জন করে গীতা শ্রবণ করেছ তো ?

'একাগ্রেণ চেতসা' কথাটি বলার অর্থ হল যে গীতাতেও যে অত্যন্ত গোপনীয় রহস্য প্রথম চৌষট্টিতম শ্লোকে জানাবার কথা বলেছিলাম, সাতষট্টিতম শ্লোকে **'ইদং তে নাতপস্কায়'** বলে নিষেধ করেছিলাম এবং আমার বচনে যেগুলিকে আমি পরম বচন বলেছি, সেই সর্বগুহ্যতম শরণাগতির কথা (১৮।৬৬) তুমি মনোযোগ দিয়ে শুনেছ তো ? তাতে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিয়েছ তো ?

'কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রণষ্টস্তে ধনঞ্জয়'—ভগবানের দ্বিতীয় প্রশ্ন হল যে, 'তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ নাশ হয়েছে কি ? যদি মোহ নাশ হয়ে থাকে, তাহলে তুমি আমার উপদেশ শ্রবণ করেছ আর মোহ নাশ না হয়ে থাকে তুমি একাগ্রতা সহকারে আমার এই রহস্যপূর্ণ উপদেশ শোনইনি বুঝতে হবে। কারণ এটি বিশেষ এক নিয়ম যে, যে ব্যক্তি দোষদৃষ্টিবর্জিত হয়ে শ্রদ্ধা সহকারে গীতোপদেশ শোনেন, তাঁর মোহ নাশ হবেই।'

'পার্থ' সম্বোধনের দ্বারা ভগবান আপন-ভাবে, অত্যন্ত প্রেমের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছেন, 'তোমার মোহ কি নাশ হয়েছে ?' প্রথম অধ্যায়ের পঁচিশতম শ্লোকেও ভগবান অর্জুনকে তাঁর কথা শুনতে উন্মুখ করার জন্য **'পার্থ'** সম্বোধন করে সর্বপ্রথম বলতে শুরু করেন এবং বলতে থাকেন, 'হে পার্থ ! এখানে যুদ্ধের জন্য একত্রিত এইসব আত্মীয়-স্বজনকে অবলোকন করো !' একথা বলার অর্থ হল যে অর্জুনের চিত্তে লুক্কায়িত যে কৌটুম্বিক মোহ ছিল, তা যেন জাগ্রত হয় এবং সেই মোহ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য তাঁর মনে যাতে উৎকণ্ঠা জেগে ওঠে ; যাতে তিনি আমার পরায়ণ হয়ে আমার উপদেশ শুনতে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। এখানে সেই মোহ দূর হওয়ার কথারই উপসংহার করতে গিয়ে ভগবান **'পার্থ'** সম্বোধন করেছেন।

'ধনঞ্জয়' সম্বোধনের দ্বারা ভগবান বলেছেন যে, 'তুমি লৌকিক অর্থের (ধনের) জন্য ধনঞ্জয় হয়েছ। এবার এই বাস্তবিক তত্ত্ব-স্বরূপ ধন প্রাপ্ত করে নিজ মোহ নাশ কর এবং প্রকৃত অর্থে **'ধনঞ্জয়'** হয়ে ওঠো।'

* * *

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে ভগবান যে প্রশ্ন করেছেন, পরবর্তী শ্লোকে অর্জুন তার উত্তর দিচ্ছেন।

অর্জুন উবাচ

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥ ৭৩ ॥

[**অচ্যুত, ত্বৎপ্রসাদাৎ** (হে অচ্যুত ! আপনার কৃপায়) ; **মোহঃ, নষ্টঃ** (মোহ দূরীভূত হয়েছে) ; **ময়া, স্মৃতিঃ, লব্ধা** (আমি স্মৃতি ফিরে পেয়েছি) ; **গতসন্দেহঃ** (নিঃসংশয় হয়ে) ; **স্থিতঃ, অস্মি** (স্থির হয়েছি) ; **তব, বচনম্** (আপনার নির্দেশ) ; **করিষ্যে** (পালন করবো।)]

অর্জুন বললেন—হে অচ্যুত ! আপনার কৃপায় আমার মোহ দূরীভূত হয়েছে এবং আমি স্মৃতি ফিরে পেয়েছি। আমি নিঃসংশয় হয়ে স্থির হয়েছি। এখন আপনার নির্দেশ পালন করবো॥ ৭৩ ॥

ব্যাখ্যা—'নষ্টোঃ মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত'—ভগবানকে এখানে অর্জুন 'অচ্যুত' নামে সম্বোধন করেছেন। এর অর্থ হল যে, জীব চ্যুত হয়ে যায় অর্থাৎ স্বরূপ থেকে বিমুখ হয়ে থাকে ও পতনের দিকে অগ্রসর হয় ; কিন্তু ভগবান কখনো চ্যুত হন না। তিনি সর্বদা একরস থাকেন। এই বিষয় ব্যক্ত করার জন্যই গীতাতে অর্জুন ভগবানকে তিনবার 'অচ্যুত' বলে সম্বোধন করেছেন। প্রথমে (গীতা ১।২১) 'অচ্যুত' সম্বোধন করে ভগবানকে অনুরোধ করেছিলেন উভয়পক্ষের সৈন্যদলের মধ্যে তাঁর রথ স্থাপন করার জন্য। এরূপ বলা সত্ত্বেও কোনো পার্থক্য আসেনি ভগবানের মধ্যে। দ্বিতীয়বার (১১।৪২) এই সম্বোধন দ্বারা অর্জুন ভগবানের স্তুতি এবং প্রার্থনা করেছিলেন, কিন্তু তাতেও ভগবানে কোনো পার্থক্য আসেনি। শেষকালে এখানে (১৮।৭৩) এই সম্বোধন দ্বারা অর্জুন নিঃসন্দেহে বলেছেন যে, 'আমি এখন আপনার নির্দেশ পালন করব', এতেও ভগবানের কোনো পার্থক্য হয়নি। তাৎপর্য হল যে, অর্জুনের আদি, মধ্য ও অন্তকালে তিন প্রকার অবস্থা হয়েছিল, কিন্তু ভগবানের কোনো সময়ই বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি, অর্থাৎ তিনি সর্বদা একরস হয়েই থাকেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্জুন **'শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্'** (২।৭) কথাটি বলে ভগবানের শরণাগতি স্বীকার করেছিলেন। এই শ্লোকে সেই শরণাগতি পূর্ণতা লাভ করে।

দশম অধ্যায়ের শেষে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে, 'তোমার এতকিছু জানার কী দরকার ? আমি সমস্ত জগৎ আমার একাংশে ব্যাপ্ত করে অবস্থিত !' এই কথা শুনে অর্জুনের মনে এই এক বিশেষ ভাবের উদয় হয় যে ভগবান কত বিশিষ্ট ! ভগবানের বিশিষ্টতার দিকে লক্ষ্য যাওয়াতে অর্জুন এক আলোর সন্ধান পান। সেই প্রকাশে প্রসন্ন হয়ে অর্জুন বলে ওঠেন 'আমার মোহ দূর হয়েছে'—**'মোহোঽয়ং বিগতো মম'** (১১।১)। কিন্তু ভগবানের বিরাটরূপ দর্শন করে অর্জুনের হৃদয়ে যখন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, তখন ভগবান বলেন যে, 'এ তোমার মূঢ়তা, তুমি ব্যথিত ও মোহগ্রস্ত হয়ো না'—**'মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবঃ'** (১১।৪৯)। এতে প্রমাণিত হয় যে, সেইসময় অর্জুনের মোহ দূর হয়নি। এখন এইস্থানে সর্বজ্ঞ ভগবান জিজ্ঞাসা করায় অর্জুন বলেছেন যে 'আমার মোহ দূর হয়েছে এবং আমি তত্ত্বের অনাদি স্মৃতি লাভ করেছি'—**'নষ্টো মোহ স্মৃতির্লব্ধা'**[১]।

[১]এখানে অর্জুনের সাংসারিক (গীতা ২।৫২) এবং শাস্ত্রীয় (গীতা ২।৫৩)—দুপ্রকারের মোহই অপসারিত হয়েছে।

চিত্তের স্মৃতি এবং তত্ত্বের স্মৃতিতে অনেক পার্থক্য থাকে। প্রমাণ থেকে প্রমেয়র সম্বন্ধে জ্ঞান হয়[১]। কিন্তু পরমাত্মতত্ত্ব অপ্রমেয়। সুতরাং পরমাত্মা প্রমাণের অন্তর্গত হতে পারেন না অর্থাৎ পরমাত্মা প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মতো তত্ত্ব নয়। কিন্তু জগতের সবকিছুই প্রমাণের অন্তর্গত এবং প্রমাণ প্রমাতার অন্তর্গত হয়[২]।

প্রমাতা একই হয়ে থাকেন, কিন্তু প্রমাণ অনেক হয়। প্রমাণের ব্যাপারে প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আগম—এই তিনটিকে প্রধান প্রমাণ মানা হয় ; কোথাও প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ—এই চারটিকে প্রমাণ মানা হয়, কোথাও এই চারটি ব্যতীত অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি এবং ঐতিহ্য—এই তিনটিকেও প্রমাণ মানা হয়। এইরূপ প্রমাণ মানার নানা মতভেদ আছে ; কিন্তু প্রমাতার ব্যাপারে কারও কোনো মতভেদ নেই। এই প্রত্যক্ষ, অনুমান ইত্যাদি প্রমাণ বৃত্তিরূপ হয়ে থাকে ; কিন্তু প্রমাতা বৃত্তিস্বরূপ নন, তিনি স্বয়ং অনুভবরূপ হয়ে থাকেন।

এই 'স্মৃতি' শব্দটির যেখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, সেখানে এর লক্ষণ জানানো হয়েছে—

(১) অনভূতবিষয়াসম্প্র মোষঃ স্মৃতিঃ (যোগদর্শন ১।১১)

'অনুভূত বিষয় গোপন না হওয়া অর্থাৎ প্রকটিত হওয়াকেই স্মৃতি বলা হয়।'

(২) সংস্কারমাত্রজন্যং জ্ঞানং স্মৃতিঃ। (তর্কসংগ্রহ)

'সংস্কারজনিত এবং জ্ঞানজনিত হলে তাকে স্মৃতি বলা হয়।'

এই স্মৃতি চিত্তের একটি 'বৃত্তি'। এই বৃত্তি পাঁচ প্রকারের—প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা, স্মৃতি। প্রত্যেক বৃত্তির আবার দুটি করে ভাগ হয়—ক্লিষ্ট এবং অক্লিষ্ট। সংসারের বৃত্তিরূপ স্মৃতিকে **'ক্লিষ্ট'** বলা হয় অর্থাৎ সেটি বন্ধনকারক হয় আর ভগবদ্‌সম্বন্ধীয় বৃত্তিরূপ স্মৃতিকে বলা হয় **'অক্লিষ্ট'** অর্থাৎ তা ক্লেশ হরণকারী হয়ে থাকে। 'অবিদ্যা' হল এইসব বৃত্তির কারণ। কিন্তু পরমাত্মা অবিদ্যারহিত। তাই পরমাত্মার স্মৃতি 'স্ব-স্বরূপ' থেকেই হয়, বৃত্তি বা করণ থেকে নয়। পরমাত্মার স্মৃতি জাগরূক হলে তা আর কখনো বিস্মৃতি হয় না, কিন্তু অন্তঃকরণের বৃত্তিতে স্মৃতি এবং বিস্মৃতি—দুই-ই হয়।

পরমাত্মতত্ত্বে বিস্মৃতি অথবা ভ্রম আসে অসৎ সংসারকে গুরুত্ব এবং অস্তিত্ব প্রদান করলে। অনাদিকাল থেকে এই বিস্মৃতি হয়ে রয়েছে। অনাদিকাল থেকে হলেও এর অন্ত হওয়া সম্ভব। যখন এর অন্ত হয় এবং নিজ স্বরূপের স্মৃতি জাগ্রত হয়, তখন তাকে বলা হয় **'স্মৃতির্লব্ধা'** অর্থাৎ অসতের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় যে স্মৃতি সুষুপ্ত ছিল তা জাগ্রত হয়ে যায়। যেমন, এক ব্যক্তি ঘুমিয়ে আছে আর একজন মৃত পড়ে আছে—এই দুয়ে বিরাট পার্থক্য, তেমনই অন্তরে স্মৃতি-বিস্মৃতি দুইই মৃতের ন্যায় জড়, কিন্তু স্বরূপের স্মৃতি সুপ্ত থাকে, তা জড় নয়। কেবল জড়কে সম্মান করলে নিদ্রিতের ন্যায় ওপর থেকে সেই স্মৃতি লুপ্ত থাকে, অর্থাৎ আবৃত থাকে। সেই আচরণ সরে গেলেই স্মৃতি প্রকটিত হয়, তাই তাকে বলা হয় **'স্মৃতির্লব্ধা'** অর্থাৎ শুরু থেকেই যে তত্ত্ব উপস্থিত আছে,

---

[১]আমাদের জগৎ সম্বন্ধে যে জ্ঞান হয়, তা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সাহায্যেই হয়। কারণ জগৎ বিবেক-বিচারের বিষয়। কিন্তু যা বিবেক-বিচারের বিষয় নয়, বরং তারই প্রকাশক, তাঁকে বিবেক-বিচারের সাহায্যে জানা যায় না। কারণ যা প্রকাশ্য, তা প্রকাশককে প্রকাশিত করতে অসমর্থ হয়। তাই যিনি সকলের প্রকাশক এবং আশ্রয় সেই পরমাত্মতত্ত্ব শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের বিষয়, বিচারের নয়।

যাঁদের শাস্ত্রের ওপর শ্রদ্ধা থাকে, তাঁরা শাস্ত্র দ্বারা পরমাত্মাকে মেনে নেন অথবা যাঁদের তত্ত্বজ্ঞ জীবন্মুক্ত অনুভবী ভগবদ্-প্রেমিক সাধু-মহাত্মাদের ওপর শ্রদ্ধা থাকে, তাঁরা তাঁদের বাক্যে পরমাত্মাকে মেনে নেন, স্বীকার করে নেন। এতে তাঁদের চিত্ত ও ইন্দ্রিয় কোনো প্রমাণ নয়। এতে শাস্ত্র এবং সাধু-মহাত্মাই প্রমাণস্বরূপ। যাঁরা শ্রদ্ধাযুক্ত এবং আস্তিক তাঁদের জন্য শাস্ত্র ও সাধু-মহাত্মা প্রমাণ হলেও যাঁরা অশ্রদ্ধাযুক্ত এবং নাস্তিক, তাঁদের জন্য শাস্ত্র ও সাধু-মহাত্মাগণ প্রমাণ হতে পারেন না। তাৎপর্য হল যে ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের যে বিষয় তা হল প্রত্যক্ষ প্রমাণ আর অনুমানাদি যেসব প্রমাণ আছে সেগুলি প্রত্যক্ষমূলক যুক্তি-প্রমাণ। কিন্তু সাধু-মহাত্মা ও শাস্ত্র-প্রমাণে শুধুমাত্র শ্রদ্ধাই প্রধান হেতু হয়ে থাকে।

[২]যার সাহায্যে জানা যায়, তাকে বলা হয় 'প্রমাণ', যার দ্বারা জ্ঞান হয় তাকে বলে 'প্রমেয়' এবং যাঁকে জানা যায়, তিনি হলেন 'প্রমাতা' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি এবং অন্তঃকরণ হল 'প্রমাণ' ; সংসার 'প্রমেয়' এবং স্ব-স্বরূপ (চেতন) হলেন 'প্রমাতা'।

তা প্রকটিত হওয়া হল 'স্মৃতি' আর আবরণ থেকে মুক্ত হওয়াকে বলা হয় '**লব্ধা**'।

সাধকদের রুচি অনুসারে স্মৃতি তিন ভাগে বিভক্ত—(১) কর্মযোগ অর্থাৎ নিষ্কামভাবের স্মৃতি, (২) জ্ঞানযোগ অর্থাৎ স্ব-স্বরূপের স্মৃতি, (৩) ভক্তিযোগ অর্থাৎ ভগবানের স্মৃতি। এইভাবে এই তিন যোগের স্মৃতি জাগরূক হয়ে ওঠে ; কেন-না এই তিন যোগই স্বতঃসিদ্ধ এবং নিত্য। তিনটি যোগ যখন বৃত্তির বিষয় হয়, তখন তাকে সাধন বলা হয় ; কিন্তু স্বরূপতঃ এই তিনটিই নিত্য। তাই নিত্যের প্রাপ্তিকে বলা হয় স্মৃতি। অর্থাৎ এই সাধনাসমূহের বিস্মৃতি ঘটেছিল, তার অবলুপ্তি হয়নি।

অসৎ (বিনাশশীল) জাগতিক পদার্থকে মহত্ত্ব দেওয়ায় অর্থাৎ সেগুলিকে অস্তিত্ব ও গুরুত্ব দেওয়াতেই আসক্তি উৎপন্ন হয়—এটিই হল 'কর্মযোগের' বিস্মৃতি বা আবরণ। অসৎ পদার্থের সংস্পর্শে নিজস্বরূপে বিমুখতা আসে অর্থাৎ অজ্ঞানতা আসে—এটি হল 'জ্ঞানযোগের' বিস্মৃতি। জীবের স্বরূপ সাক্ষাৎ পরমাত্মার অংশ এই পরমাত্মা থেকে বিমুখ হয়ে জগতের সম্মুখীন হওয়ায় জগতে আসক্তি উৎপন্ন হয়। সেই আসক্তিতে প্রেম আবৃত হয়—একে বলা হয় 'ভক্তিযোগের' বিস্মৃতি।

স্বরূপের বিস্মৃতি বা বিমুখতা নাশ হওয়াকেই এখানে 'স্মৃতি' বলা হয়েছে। সেই স্মৃতিপ্রাপ্ত হওয়ার অর্থ অপ্রাপ্তকে প্রাপ্ত করা নয়, বরং এটি হল নিত্যপ্রাপ্তকে প্রাপ্ত হওয়া। নিত্যস্বরূপ প্রাপ্তি হলে তার আর বিস্মৃতি হওয়া সম্ভব নয়। কারণ স্বরূপের কখনো পরিবর্তন হয় না। তা সর্বদা নির্বিকার ও একরস হয়ে থাকে। কিন্তু বৃত্তিরূপ স্মৃতি বিস্মৃত হওয়া সম্ভব ; কারণ সেটি প্রকৃতির কার্য হওয়ায় পরিবর্তনশীল।

এ সবের অর্থ হল যে, সংসার ও শরীরের সঙ্গে নিজস্বরূপকে মিশ্রিত মনে করাকে বলে 'বিস্মৃতি' এবং জগৎ ও দেহ থেকে নিজেকে আলাদা মনে করে নিজস্বরূপের উপলব্ধি হওয়াকে বলা হয় 'স্মৃতি'। স্ব-স্বরূপের স্বয়ং থেকে স্মৃতি হয়। এতে করণাদির প্রয়োজন থাকে না ; যেমন—মানুষের নিজ অস্তিত্বের জ্ঞানের জন্য কোনো প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। যাতে করণাদির প্রয়োজন হয়, সেই স্মৃতি হল চিত্তেরই এক বৃত্তি।

স্মৃতি অচিরেই প্রাপ্ত হয়। এতে বিলম্ব বা পরিশ্রম নেই। কর্ণ ছিলেন কুন্তীর পুত্র। কিন্তু জন্মের পর কুন্তী তাঁকে পরিত্যাগ করলে অধিরথ সূতের পত্নী রাধা তাঁর প্রতিপালন করেন, তার জন্য কর্ণ তাঁকেই মা বলে মনে করতেন। কিন্তু যখন সূর্যদেবের কাছ থেকে জানতে পারলেন যে কুন্তীই তাঁর প্রকৃত মা, তখন তাঁর স্মৃতি লাভ হয়। এখন 'আমি কুন্তীর পুত্র'—এই স্মৃতি প্রাপ্ত হতে কর্ণের কত সময় লাগল ? কত পরিশ্রম বা চেষ্টা করার প্রয়োজন হল ? আগে ওদিকে লক্ষ্য ছিল না, এবার ওইদিকে লক্ষ্য গেল—শুধু এইটুকুই ব্যাপার।

স্বরূপ হল নিষ্কাম, শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত এবং ভগবানের। স্বরূপের বিস্মৃতিতেই জীব সকাম, বদ্ধ এবং সংসারাসক্ত হয়। এরূপ স্বরূপের স্মৃতি বৃত্তির অপেক্ষা রাখে না অর্থাৎ চিত্তের বৃত্তি দ্বারা স্বরূপের স্মৃতি জাগ্রত হওয়া সম্ভব নয়। স্মৃতি তখনই জাগ্রত হয় যখন অন্তঃকরণ থেকে সর্বতোভাবে সম্পর্ক ছেদ হয়। স্মৃতি তখন নিজেই নিজের মধ্যে জাগ্রত হয়। সুতরাং স্মৃতি লাভের জন্য কারও সহায়তা বা অভ্যাসের প্রয়োজন নেই। কেন-না জড়ের সাহায্য ছাড়া অভ্যাস হয় না, কিন্তু স্বরূপের সঙ্গে জড়ের কোনোপ্রকার সম্বন্ধ নেই। স্মৃতি অনুভবসিদ্ধ, অভ্যাসসাধ্য নয়। তাই একবার স্মৃতি জাগরূক হলে তার আর পুনরাবৃত্তি করতে হয় না।

ভগবানের কৃপাতেই স্মৃতি জাগ্রত হয়। কৃপা আসে ভগবানের শরণাগতির দ্বারা আর শরণাগতি আসে সংসারের প্রতি বৈরাগ্যের দ্বারা। যেমন, অর্জুন বলেছেন যে, 'আমি শুধু আপনার আদেশই পালন করব'—'**করিষ্যে বচনং তব**', তেমনই সংসারে আশ্রয় পরিত্যাগ করে শুধুমাত্র ভগবানের শরণাগত হয়ে বলতে হয়, 'হে প্রভু ! আমি এবার থেকে শুধু আপনার আদেশই পালন করব।'

তাৎপর্য হল যে, এই স্মৃতির উপলব্ধিতে সাধকের অভিমুখীনতা এবং ভগবানের কৃপাই হল কারণ। তাই অর্জুন স্মৃতি-প্রাপ্তিকে ভগবানেরই কৃপা বলে মনে করেছেন। ভগবদ্কৃপা সকল প্রাণীর ওপরই অপার-অটুট-অখণ্ডরূপে বিরাজিত। মানুষ যখন ভগবানের অভিমুখী হয়, তখন তার সেই কৃপার অনুভূতি এসে যায়।

'**ত্বৎ প্রসাদাৎ ময়াচ্যুত**'—এই পদটিতে অর্জুন বলেছেন, 'আপনি বিশেষভাবে যে সর্বগুহ্যতম তত্ত্ব

জানিয়েছেন, তাতে আমার বিশেষ স্মৃতি প্রাপ্তি হয়েছে যে, আমি আপনারই ছিলাম, আছি এবং থাকব'। এই যে স্মৃতি জাগ্রত হওয়া, এটি আমার একাগ্রতায় শোনার ফল নয়, এটি আপনার কৃপার জন্যই সম্ভব হয়েছে। আগে আমি আপনার শরণাগত হয়ে শিক্ষা প্রদান করার জন্য প্রার্থনা করেছিলাম আর বলেছিলাম যে আমি যুদ্ধ করব না। কিন্তু আমার যতক্ষণ বাস্তবিক বোধ আসেনি, ততক্ষণ আপনি ক্রমাগতঃ আমাকে বুঝিয়েছেন। আপনার কৃপাই তার কারণ। আমার যেভাবে আপনার অভিমুখী হওয়া উচিত ছিল, আমি ততটা হইনি ; কিন্তু আপনি কোনো কারণ ব্যতিরেকেই আমাকে কৃপা করেছেন অর্থাৎ আমাকে কৃপা করতে আপনি নিজেই আপনার কৃপার বশীভূত হয়েছেন এবং আমি জিজ্ঞাসা না করলেও আপনি আমাকে শরণাগতির বিষয়ে সর্বগুহ্যতম কথাটি বলেছেন (১৮।৬৪-৬৬)। এই অহৈতুকী কৃপায় আমার মোহ দূরীভূত হয়েছে।

'স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব'—অর্জুন বলেছেন, 'আগে আমার যে সন্দেহ ছিল যুদ্ধ করব কি করব না (**'ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ঃ'** ২।৬), তা সর্বতোভাবে দূর হয়ে গিয়েছে এবং আমি বাস্তববোধে স্থিত হয়েছি। সেই সন্দেহ এমনভাবে দূর হয়েছে যে আমার যুদ্ধ করারও ইচ্ছা নেই আর যুদ্ধ না করারও ইচ্ছা নেই। এখন তো শুধু একটিই ব্যাপার যে, আপনি যা বলবেন, তাই করব অর্থাৎ শুধু আপনার আদেশই পালন করব—**'করিষ্যে বচনং তব'**। এখন আর যুদ্ধ করা বা না-করায় আমার কোনো প্রয়োজন নেই। কেবল আপনার নির্দেশ অনুযায়ী লোকসংগ্রহার্থে যুদ্ধ ইত্যাদি যে কর্তব্য-কর্ম উপস্থিত হবে, তাই করব।'

এখানে একটি বিশেষ লক্ষণীয় ব্যাপার হল যে, প্রথমে আত্মীয়-স্বজনের স্মরণ হওয়ায় অর্জুনের মোহের উদ্রেক হয়েছিল। সেই মোহের বর্ণনার প্রক্রিয়াতে ভগবান বলেছিলেন যে বিষয়াদির চিন্তা থেকে আসক্তি, আসক্তি থেকে কামনা, কামনা থেকে ক্রোধ, ক্রোধ থেকে মোহ, মোহ থেকে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ থেকে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ থেকে পতন হয় (গীতা ২।৬২-৬৩)। অর্জুনও এখানে সেই প্রক্রিয়া স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন যে, 'আমার মোহ দূর হয়েছে এবং মোহ থেকে যে স্মৃতিভ্রংশ হয়ে থাকে সেই স্মৃতিও প্রাপ্ত হয়েছি'—**'নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা'**। স্মৃতিভ্রংশ হলে বুদ্ধিনাশ হয়, তার উত্তরে অর্জুন বলেছেন, আমি এখন স্বাভাবিক অবস্থায় স্থিত হয়েছি—**'স্থিতোঽস্মি'**। এইভাবে এই প্রক্রিয়াটি বলায় অর্জুনের ভাব হল যে, 'আমি আপনার কাছ থেকে মনোযোগ সহকারে গীতা শ্রবণ করেছি, তাইতো আপনি সম্মোহ শব্দের প্রয়োগ কোথায় করেছেন এবং সম্মোহের পরম্পরা কোথায় তা ব্যক্ত করেছেন, তাও আমার স্মরণ আছে। কিন্তু আপনার কৃপাই হল আমার মোহ দূর হওয়ার কারণ।'

যদিও এখানকার ও ওখানকার—দুটি বিষয় ভিন্ন ভিন্ন বলে মনে হয়, কারণ ওইস্থানে বিষয়াদি চিন্তা করার থেকে ক্রমশঃ সম্মোহ হওয়ার কথা বলা হয়েছে আর এখানে সম্মোহ হল মূল অজ্ঞানের বাচক, তবুও গভীরভাবে বিচার করলে পার্থক্য দেখা যায় না। সেখানকার বিষয়ই এখানে আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের একষট্টি থেকে তেষট্টিতম শ্লোক পর্যন্ত ভগবান বলেছেন যে ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করে অর্থাৎ সংসার থেকে সর্বতোভাবে বিমুখ হয়ে শুধুমাত্র মৎপরায়ণ হলে বুদ্ধি স্থির হয়। কিন্তু মৎপরায়ণ না হলে মনে স্বতঃই বিষয়-চিন্তা হতে থাকে। বিষয়াদির চিন্তায় ক্রমশঃ আসক্তি, কামনা, ক্রোধ, মোহ ইত্যাদি উৎপন্ন হবার কথা বলেছেন। এতে তো পতন-ই হয়। কারণ বিষয়াদি চিন্তা আসুরী-সম্পদ। এখানে উত্তরণের কথা বলে বলা হয়েছে যে সংসারে বিমুখ হয়ে ভগবানের শরণাগত হলে মোহ নাশ হয়। কারণ এটি দৈবী-সম্পদ। অর্থাৎ ওইস্থানে ভগবানে বিমুখ হয়ে ইন্দ্রিয় ও বিষয়-পরায়ণ হওয়া পতনের হেতু আর এখানে ভগবানের শরণাগত হয়ে ভগবানের সঙ্গে প্রকৃত সম্বন্ধের স্মৃতি জাগরূক হওয়াতে ভগবদ্‌কৃপাই হেতু।

ভগবদ্‌কৃপায় যে কাজ হয়, তা শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, ধ্যান, সমাধি ইত্যাদি সাধনার দ্বারাও হয় না। কারণ নিজের পুরুষার্থ মনে করে যে সাধনা করা হয়, তাতে নিজের সূক্ষ্ম ব্যক্তিত্ব বা অহংভাব বজায় থাকে। সেই ব্যক্তিত্ব দূর হয়ে যায় যদি সাধনে নিজ পুরুষার্থ মনে না করে ভগবদ্‌কৃপা বলে মেনে নেওয়া হয়।

মর্মার্থ

অর্জুন বলেছেন আমার স্মৃতি লাভ হয়েছে—**'স্মৃতির্লব্ধা'**। তাহলে বিস্মৃতি কেন হয়েছিল ? জীব অসতের সঙ্গে একাত্মতা করে অসতের প্রাধান্য মেনে নেয়, ফলে জীব তার নিজ সৎ-স্বরূপকে বিস্মৃত হয়। বিস্মৃত হওয়ায় সে অসতের অভাবকে নিজ অভাব বলে মনে করে, নিজেকে শরীর (আমি-ভাব) ও শরীরকে নিজের (আমার-ভাব) বলে মনে করার জন্য সে অসৎ শরীরের উৎপত্তি ও বিনাশকে নিজের উৎপত্তি ও বিনাশ বলে মনে করে এবং যার থেকে এই শরীর উৎপন্ন হয়েছে, তাকেই নিজের উৎপাদক বলে ধরে নেয়।

এখন কেউ যদি প্রশ্ন করেন যে ভুল আগে হয়েছে, না অসতের সম্বন্ধ আগে হয়েছে ? অর্থাৎ ভুল করে অসতের সঙ্গে সম্বন্ধ হয়েছে, না অসতের সম্পর্কে এসে ভুল হয়েছে ? তার উত্তর হল যে অনাদিকাল থেকে জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত জীবকে এই আবর্তন থেকে সর্বদার জন্য মুক্ত করে মহাসুখী করার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ তাঁর প্রাপ্তি করাবার নিমিত্তই ভগবান জীবকে মনুষ্যদেহ প্রদান করেছেন। একাকী ভগবানের ভালো লাগছিল না—**'একাকী ন রমতে'** (বৃহদারণ্যক. ১।৪।৩), তাই তিনি নিজের সঙ্গে খেলা করার জন্য মনুষ্যদেহ সৃষ্টি করেছেন। খেলা তখনই হওয়া সম্ভব যখন দুপক্ষের খেলোয়াড়-ই স্বতন্ত্র হয়। তাই ভগবান মনুষ্যদেহ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে স্বাধীনতা ও বিবেক (সদসৎ জ্ঞান) দুই-ই দিয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ, এদের যদি স্বাধীনতা ও বিবেক না থাকত, তাহলে এরা পশুর মতো হত এবং মানুষের কোনোই বৈশিষ্ট্য থাকত না। এই ভগবদ্প্রদত্ত বিবেকের ফলে মানুষ অসৎকে অসৎ জেনেও তার স্বাধীনতার অপব্যবহার করে এবং অসতেই (সাংসারিক ভোগ ও সংগ্রহের সুখে) আসক্ত হয়ে যায়। অসতে আসক্ত হওয়াতেই ভুল হয়।

অসৎকে অসৎ জেনেও মানুষ কেন তাতে আসক্ত হয় ? এইজন্য আসক্ত হয় যে, মানুষ অসতের সংস্পর্শে প্রতীত হওয়া তাৎকালিক সুখের দিকে দৃষ্টি রাখে, কিন্তু তার পরিণাম যে কী হবে, সেদিকে দৃষ্টি দেয় না। (যাঁরা পরিণামের দিকে লক্ষ্য রাখেন, তাঁরা সাধক হন আর যাঁরা পরিণাম দেখেন না, তাঁরা সংসারী হন)।

তাই অসতের সংস্পর্শেই ভ্রম উৎপন্ন হয়। কী করে তা জানা যায় ? যখন সে নিজ অনুভবে আসা অসতের আসক্তি পরিত্যাগ করে পরমাত্মার শরণাগত হয়, তখন এই ভ্রম দূর হয়ে স্মৃতি জাগ্রত হয়। এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে পরমাত্মাতে বিমুখ হয়ে অসতে আসক্ত হওয়াতেই এই ভুল বা ভ্রম উৎপন্ন হয়েছে।

অসৎকে গুরুত্ব দেওয়াতে যে ভুল হয় তা স্বাভাবিক নয়। মানুষ নিজেই তা সৃষ্টি করেছে। যে বস্তু স্বাভাবিক, তার পরিবর্তন যদি হয়ও তবু তার সম্পূর্ণভাবে অভাব হয় না। কিন্তু ভুল সর্বতোভাবে দূর হয়। এর দ্বারাই প্রমাণ হয় যে এই ভুল মানুষ নিজেই সৃষ্টি করেছে। কারণ যা দূর হয়, তার উৎপত্তি হয়। তাই এই ভ্রম দূর করার দায়িত্ব মানুষেরই, যা সে অতি সহজেই করতে পারে। তাৎপর্য হল যে নিজের সৃষ্ট ভুল দূর করতে মানুষমাত্রেই সক্ষম এবং সমর্থ। ভগবান মানুষকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়েছেন যাতে সে এই ভুল (ভ্রম) দূর করতে পারে। ভ্রম দূরীভূত হলেই মানুষের প্রকৃত স্বরূপের স্মৃতি জাগরূক হয় এবং সে চিরকালের জন্য কৃতকৃত্য, জ্ঞাত-জ্ঞাতব্য এবং প্রাপ্ত-প্রাপ্তব্য হয়ে ওঠে।

এখন পর্যন্ত মানুষ বহুবার জন্মগ্রহণ করেছে এবং বহুবার নানা বস্তু, ব্যক্তি, পরিস্থিতি, অবস্থা, ঘটনা ইত্যাদির সঙ্গে তার সংযোগ হয়েছে, কিন্তু সেসবের সঙ্গেই তার বিচ্ছেদ হয়েছে এবং সে স্বয়ং ওই একই আছে। **কারণ বিয়োগের সংযোগ অবশ্যম্ভাবী নয় কিন্তু সংযোগের বিয়োগ অবশ্যম্ভাবী**। এতে প্রমাণিত হয় যে জগতে শুধু বিচ্ছেদই আছে, সংযোগ বলে কিছু নেই। অনাদিকাল থেকে বস্তু ইত্যাদির নিরন্তর বিয়োগই হয়ে চলেছে, তাই বিয়োগই সত্য। এইভাবে জগতে সর্বতোভাবে বিচ্ছেদ অনুভব হওয়াকেই বলা হয় **'যোগ'—'তং বিদ্যাদ্ দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্'** (গীতা ৬।২৩)। এই যোগ নিত্যসিদ্ধ। স্বরূপ অথবা পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের নিত্যযোগ[১] আর শরীর সংসারের সঙ্গে নিত্যবিচ্ছেদ রয়েছে। জগতে

[১]কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগে স্বরূপের সঙ্গে নিত্যযোগ থাকে, আর ভক্তিযোগে ভগবানের সঙ্গে নিত্যযোগ থাকে।

সংযোগের কামনা পোষণ করার ফলেই বাস্তবে নিত্যযোগ অনুভূত হয় না। এই কামনা সর্বতোভাবে দূর হলেই নিত্যযোগ অনুভূত হয়, যার বিচ্ছেদ কখনো হয়নি।

সংসারের সঙ্গে সংযোগ মেনে নেওয়াই হল বিস্মৃতি আর সংসার থেকে নিত্যবিয়োগ অনুভূত হওয়া অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে সংসারের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, ছিল না, হবে না এবং হওয়া সম্ভবও নয়—এরূপ অনুভব হওয়াকেই বলা হয় 'স্মৃতি'।

পরিশিষ্ট-ভাব—লৌকিক স্মৃতি বিস্মৃতির পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়, কিন্তু অলৌকিক তত্ত্বের স্মৃতি বিস্মৃতির তুলনা সাপেক্ষে হয় না, তা অনুভবস্বরূপ। এই তত্ত্বের নিরপেক্ষ স্মৃতি অর্থাৎ অনুভবকেই এখানে **'স্মৃতির্লব্ধা'** বলে জানানো হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে তত্ত্বের বিস্মৃতি হয় না, তত্ত্বে বিমুখতা আসে। তাৎপর্য হল যে, আগে জ্ঞান ছিল পরে তার বিস্মৃতি হয়েছে—এই ভাবে তত্ত্বের বিস্মৃতি হয় না[১]। যদি একে বিস্মৃতি মনে করা হয় তাহলে স্মরণ হওয়ার পরে আবার বিস্মরণ হয়ে যাবে। তাই গীতায় বলা হয়েছে **'যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহম্'** (৪।৩৫) অর্থাৎ এটি জানার পর আর মোহ আসে না। অ-ভাবরূপ অ-সৎকে ভাবরূপ মনে করে গুরুত্ব দিলে তত্ত্বের দিক থেকে বৃত্তি সরে যায়—তাকেই বিস্মৃতি বলা হয়। বৃত্তি সরে যাওয়া এবং বৃত্তিতে আকৃষ্ট হওয়া—এ শুধু সাধকের ক্ষেত্রেই হয়, তত্ত্বের ক্ষেত্রে নয়। তত্ত্বের দিকে দৃষ্টি থাক বা না থাক, তত্ত্ব একইরকম থাকে, তার কোনো পরিবর্তন হয় না। অ-ভাবরূপ অ-সৎকে অভাবরূপ বলেই মেনে নিলে ভাবরূপ তত্ত্ব স্বতঃ একইরূপে থেকে যায়।

বিচার দুই প্রকারের। এক হল বিচার করা আর অপরটি হল বিচারবোধ উদয় হওয়া। বিচার করা হল ক্রিয়ারূপ আর বিচারবোধ উদিত হওয়াতে ক্রিয়া থাকে না। বিচার করায় বুদ্ধির প্রাধান্য থাকে, কিন্তু বিচারবোধ উদিত হলে বুদ্ধির সঙ্গে সম্বন্ধ হয়ে যায়। তাই বিচার করলে তত্ত্ববোধ হয় না, বিচারবোধ উদিত হলেই তত্ত্বজ্ঞান জাগ্রত হয়।

তাৎপর্য হল যে, তত্ত্বপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সৎ-অসৎ বিচার করতে করতে যখন অসৎ পরিত্যক্ত হয়, তখন 'জগৎ বলে কিছু নেই, ছিল না, হবে না, হওয়া সম্ভবপর নয়'—এই জ্ঞানের উদয় হয়। আর বিচারবোধ উদিত হলেই তা বিবেকবোধে পরিণত হয় অর্থাৎ জগৎ-সংসার লুপ্ত হয়ে তত্ত্ব প্রকাশিত হয়। মেনে নেওয়া সম্পর্ক দূর হয়ে বাস্তব তত্ত্ব থেকে যায়। বিচার উদিত হওয়াকেই এখানে **'স্মৃতির্লব্ধা'** বলা হয়েছে।

অপরা প্রকৃতি ভগবানেরই। কিন্তু আমরা অপরার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে অর্থাৎ তাকে নিজের এবং নিজের জন্য মনে করে ভুল করে থাকি। আমরাই এই সম্পর্ক স্থাপন করে থাকি তাই এটা ছাড়াবার দায়িত্বও আমাদেরই। অপরার সঙ্গে সম্পর্ক মেনে নেওয়াতেই আমরা ভগবানের নিত্যসম্বন্ধ বিস্মৃত হয়েছি এবং বন্ধনচক্রে আবদ্ধ হয়েছি। তাই অপরার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হলেই আমাদের কল্যাণ হবে। অপরার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য 'শরীর আমার বা আমার জন্য নয়'—এই বিচার-বুদ্ধিকে গুরুত্ব দিতে হবে। এই বিচার-বুদ্ধিকে গুরুত্ব দিলে 'অপরা আমার বা আমার জন্য নয়'—এই স্মৃতি জাগ্রত হয়।

অর্জুনের দ্বৈত-অদ্বৈতের অনুভব হয়নি, দ্বৈত-অদ্বৈতের অতীত প্রকৃত তত্ত্বের অনুভব হয়েছিল। কারণ দ্বৈত-অদ্বৈত হল মোহ[২], প্রকৃতপক্ষে অর্জুনের মোহ দূরীভূত হয়েছিল।

জীব অনাদিকাল হতে স্বাভাবিকভাবেই পরমাত্মার, তার শুধু জগৎ-সংসারের আশ্রয় ত্যাগ করতে হয়। অর্জুনের মুখ্যতঃ ভক্তিযোগের স্মৃতিলাভ হয়েছিল। কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ হল সাধন আর ভক্তিযোগ হল সাধ্য। তাই ভক্তিযোগের

---

[১] জ্ঞান হওয়া মানে নতুন কিছু হল তা নয় অর্থাৎ আগে অজ্ঞান ছিল, এখন জ্ঞান হয়েছে—তা মনে হয় না। জ্ঞান হলে এটিই অনুভব হয় যে জ্ঞান তো সর্বদাই ছিল, শুধু সেদিকে আমার মনোযোগ ছিল না। যদি মনে করা হয় যে আগে জ্ঞান ছিল না, এখন হয়েছে তাহলে জ্ঞানে অনাদিত্ব থাকে না। আসলে জ্ঞান হল অনাদি। যা অনাদি নয়, তা হল সান্ত, আর অনাদি হল অনন্ত।

[২] 'দ্বৈতাদ্বৈতমহামোহঃ' (মাহেশ্বরতন্ত্র)

'অহো মায়া মহামোহৌ দ্বৈতাদ্বৈতবিকল্পনা॥' (অবধূতগীতা ১।৬১)

স্মৃতিই হল বাস্তবিক স্মৃতি। ভক্তিযোগের স্মৃতি হল—**'বাসুদেবঃ সর্বম্'** অর্থাৎ সব কিছু ভগবান। **'বাসুদেবঃ সর্বম্'** এটি অনুভব করাই হল **'স্মৃতির্লব্ধা'**। এই অনুভব শুধু ভগবৎকৃপাতেই সম্ভব—**'ত্বৎ প্রসাদাৎ'**। বচন সীমাবদ্ধ হয়, কৃপা হয় অসীম।

চিন্তায় কর্তৃত্ব থাকে কিন্তু স্মৃতিতে কর্তৃত্ব থাকে না। কেন-না চিন্তা মনের দ্বারা হয়, মনের অতীত বুদ্ধি, বুদ্ধির অতীত অহম্ এবং অহমের অতীত হল স্বরূপ, এই স্বরূপেই স্মৃতি জাগ্রত হয়। চিন্তন আমরা করি কিন্তু স্মৃতিতে শুধু ওদিকেই দৃষ্টি যায়। বিস্মৃতির সময়ও তত্ত্ব একইরকম থাকে। তত্ত্বে বিস্মৃতি নেই, তাই সেদিকে দৃষ্টি পড়লেই স্মৃতি প্রকাশিত হয়ে ওঠে।

'স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ'—প্রথমে ক্ষাত্রধর্মের দৃষ্টিতে যুদ্ধ করা সঠিক বলে মনে হয়েছিল, পরে আত্মীয় গুরুজনের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধ করাকে অর্জুন পাপ মনে করেছিলেন। কিন্তু স্মৃতি লাভ হতেই সমস্ত সংশয়ও দূর হয়েছিল। আমি কী করব ? যুদ্ধ করব কি করব না ?—এই সন্দেহ, সংশয়, প্রশ্ন কিছুই আর থাকল না। আমার আর কিছু করা বাকি নেই, শুধু আপনার আদেশ পালন করাই বাকি—**'করিষ্যে বচনং তব'**। একেই বলা হয় শরণাগতি।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—প্রথম অধ্যায়ে কুড়িতম শ্লোকে ***'অথ'*** *পদটি দিয়ে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদরূপে গীতা আরম্ভ হয়েছিল, পরবর্তী শ্লোকে* ***'ইতি'*** *পদের দ্বারা তার সমাপ্তি করে সঞ্জয় এই সংবাদের মহিমা গীত করেছেন।*

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্॥ ৭৪ ॥

[**ইতি, অহম্** (এইরূপে আমি) ; **বাসুদেবস্য, চ** (ভগবান বাসুদেব এবং) ; **মহাত্মনঃ, পার্থস্য** (মহাত্মা অর্জুনের) ; **ইমম্, রোমহর্ষণম্** (এই রোমাঞ্চকর) ; **অদ্ভুতম্, সংবাদম্** (অদ্ভুত কথোপকথন) ; **অশ্রৌষম্** (শ্রবণ করেছি।)]

সঞ্জয় বললেন—এইরূপে আমি ভগবান বাসুদেব ও মহাত্মা অর্জুনের এই রোমাঞ্চকর অদ্ভুত কথোপকথন শ্রবণ করেছি॥ ৭৪ ॥

ব্যাখ্যা—**'ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ'**—সঞ্জয় বলেছেন যে এইভাবে আমি ভগবান বাসুদেব এবং কুন্তিনন্দন মহাত্মা অর্জুনের কথোপকথন শুনেছি, যা অত্যন্ত অদ্ভুত, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং এটি স্মরণমাত্রেই শরীর আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।

এখানে **'ইতি'** পদটির অর্থ হল প্রথম অধ্যায়ের কুড়িতম শ্লোকে **'অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ'** পদের দ্বারা সঞ্জয় শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সংবাদরূপে গীতা আরম্ভ করেছেন আর এইস্থানে **'ইতি'** পদের দ্বারা সেই সংবাদ (আলোচনা) সমাপ্ত করেছেন।

অর্জুনকে **'মহাত্মনঃ'** বিশেষণে ভূষিত করার অর্থ হল যে অর্জুন অতি বিশিষ্ট মহাপুরুষ, স্বয়ং ভগবান যাঁর নির্দেশ পালন করে থাকেন। অর্জুন বলেছিলেন, 'হে অচ্যুত ! আমার রথটিকে উভয় সেনার মধ্যস্থলে সন্নিবিষ্ট করো' (গীতা ১।২১), আর ভগবান উভয় সেনার মধ্যভাগে রথ উপস্থাপন করেছিলেন (গীতা ১।২৪)। গীতায় অর্জুন যেমন যেমন প্রশ্ন করেছেন, ভগবান সেই সেই স্থানে অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে, বিশিষ্ট রীতিতে, প্রায়শঃই বিস্তারিতভাবে তার উত্তর দিয়েছেন। এইরূপ মহাত্মা অর্জুন এবং ভগবান বাসুদেবের কথোপকথন আমি শ্রবণ করেছি।

'সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্'—এই আলোচনাতে অদ্ভুত ও রোমাঞ্চকর কী ছিল ? শাস্ত্রে প্রায়ই দেখা যায় যে সংসার থেকে নিবৃত্ত হলেই মানুষ পারমার্থিক পথে অগ্রসর হতে সক্ষম হয় এবং তার কল্যাণ লাভ হয়। সাধারণ মানুষের মধ্যেও প্রায়শঃই এমন ধারণা থাকে যে গৃহ, আত্মীয়-স্বজন ইত্যাদি পরিত্যাগ করে সাধু-সন্ন্যাসী হলেই কল্যাণ হয়। কিন্তু গীতায় বলা হয়েছে যে, যে কোনো পরিস্থিতি, অবস্থা, ঘটনা, দেশ, কাল ইত্যাদি যাই হোক না কেন, সেগুলির সদ্ব্যবহার করলে মানুষের কল্যাণ হওয়া সম্ভব। শুধু তাই নয়, সেই পরিস্থিতি যত ভালো হোক বা

মন্দ, অত্যন্ত সৌম্য হোক অথবা ভয়ানক যুদ্ধের ন্যায় পরিস্থিতি হোক, যাতে সারাদিন মানুষ বধ করতে হয়, তাতেও মানুষের কল্যাণ হওয়া সম্ভব, মুক্তি লাভ করা সম্ভব[১]। কারণ জন্ম-মৃত্যুরূপ বন্ধনের জন্য সংসারের আসক্তিই হল প্রধান কারণ (গীতা ১৩।২১)। সেই আসক্তি দূর করার জন্য পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করাই কর্তব্য অর্থাৎ যে ব্যক্তি পরিস্থিতি হেতু রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ না করে নিজ কর্তব্য পালন করে, সেই ব্যক্তি সহজেই মুক্ত হয়ে যায় (গীতা ৫।৩)। এই আলোচনার এইটিই হল অদ্ভুত দিক।

ভগবানের স্বয়ং অবতার হয়ে মানুষের মতো কাজ করে নিজেকেই প্রকটিত করে দেওয়া এবং 'আমার শরণাগত হয়ে যাও' অত্যন্ত গোপনীয় এই রহস্যময় কথা বলে দেওয়া—এটিই হল এই আলোচনার অত্যন্ত রহস্যময়, প্রসন্নকারী ও আনন্দদায়ক বিষয়।

পরিশিষ্ট-ভাব—গীতায় 'মহাত্মা' শব্দটি শুধুমাত্র ভক্তদের জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে সঞ্জয় অর্জুনকেও 'মহাত্মা' বলেছেন, কেন-না তিনি অর্জুনকে ভক্ত বলেই মনে করেন। ভগবানও বলেছেন—**'ভক্তোঽসি মে'** (গীতা ৪।৩)।

❋ ❋ ❋

সম্বন্ধ—সত্যকার সাধক পারমার্থিক পথে যাঁর দ্বারা লাভবান হন, তাঁর প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেই থাকেন। তাই সঞ্জয়ও পরবর্তী তিনটি শ্লোকে শ্রীবেদব্যাসের নিকট কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবানেতদ্ গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্॥ ৭৫ ॥

[**ব্যাসপ্রসাদাৎ** (শ্রীব্যাসদেবের কৃপায়) ; **অহম্, স্বয়ম্** (আমি স্বয়ং) ; **এতৎ, পরম্, গুহ্যম্** (এই পরম গুহ্য) ; **যোগম্** (যোগের কথা) ; **সাক্ষাৎ, যোগেশ্বরাৎ** (সাক্ষাৎ যোগেশ্বর) ; **কৃষ্ণাৎ, কথয়তঃ** (শ্রীকৃষ্ণকে বলতে) ; **শ্রুতবান্** (শুনেছি।)]

শ্রীবেদব্যাসের কৃপায় দিব্যদৃষ্টি লাভ করে আমি স্বয়ং এই পরম গুহ্য যোগের কথা সাক্ষাৎ যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলতে শুনেছি॥ ৭৫ ॥

ব্যাখ্যা—'ব্যাসপ্রসাদাৎ শ্রুতবান্'—সঞ্জয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাত্মা অর্জুনের সম্পূর্ণ কথোপকথন শুনে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তাই প্রসন্নচিত্তে তিনি বলেছেন যে, আমি এই পরমগোপনীয় যোগের কথা ভগবান ব্যাসদেবের কৃপায় শ্রবণ করেছি। ব্যাসদেবের কৃপায় শোনার অর্থ হল যে ভগবান **'যত্তেঽহংপ্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া'** (১০।১), **'ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি তো বক্ষ্যামি তে হিতম্'** (১৮।৬৪), **'মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে'** (১৮।৬৫), **'অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ'** (১৮।৬৬) ইত্যাদি অত্যন্ত প্রিয় বাক্যের দ্বারা নিজ হৃদয় উন্মুক্ত করে অর্জুনকে যেসব কথা বলেছেন, সেগুলি কেবলমাত্র ব্যাসদেবের কৃপাতেই শ্রবণ করা সম্ভব হয়েছে অর্থাৎ সেসব কথা আমি ব্যাসদেবের কৃপার সাহায্যেই শ্রবণ করেছি।

'এতদ্ গুহ্যং পরং যোগম্'—সকল যোগের মহেশ্বর দ্বারা কথিত হওয়ায় এই গীতাশাস্ত্রকে **'যোগ'** অর্থাৎ যোগশাস্ত্র বলা হয়, এটি অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ এবং গোপনীয় তত্ত্ব। অন্য কোনো গ্রন্থে এর মতো শ্রেষ্ঠ ও গোপনীয় আলোচনা

[১]সকল পরিস্থিতিতেই যখন সম্বন্ধ ছেদ হলে কল্যাণ হয়, তখন প্রাকৃত পরিস্থিতির ভালো বা মন্দের কোনো গুরুত্বই থাকে না। তবে তার থেকে পৃথক্ হবার উপায় (কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ইত্যাদি) পৃথক্ পৃথক্ হতে পারে। কিন্তু এগুলির দ্বারা আসক্তি দূর করাই হল আসল কথা। কারণ আসক্তি দূর হলেই দ্বেষ দূর হয় এবং রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ দূর হলে সংসারের থেকে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয়। সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হলেই মুক্তি হয়।

আসলে যে বদ্ধ, সে মুক্ত হয় না, আর যে মুক্ত সে মুক্ত হবে কী করে ? কেন-না সে তো মুক্তই ; তার আবার মুক্তি কীসের ? প্রকৃতপক্ষে মুক্ত হয়েও যে বন্ধনকে স্বীকার করেছে, সেই বন্ধন থেকে ছাড়া পাওয়াকেই মুক্তি বলা হয়।

দেখা যায় না।

জীবের ভগবানের সঙ্গে যে নিত্য সম্পর্ক, তাকে বলা হয় 'যোগ'। সেই নিত্যযোগের পরিচয় অর্থাৎ সেটি চেনাবার জন্য কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ইত্যাদি যোগের কথা বলা হয়েছে। এইসব যোগসাধনার বর্ণনা গীতাতে থাকায় গীতাও 'যোগ' অর্থাৎ যোগশাস্ত্র।

'যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্'— সঞ্জয়ের আনন্দের কোনো সীমা নেই ! সেইজন্য তিনি হর্ষোৎফুল্ল হয়ে বলেছেন যে, এই যোগ আমি সমস্ত যোগের মহেশ্বর সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ থেকে শ্রবণ করেছি। সঞ্জয়ের **'যোগেশ্বরাৎ', 'কৃষ্ণাৎ' 'সাক্ষাৎ' 'কথয়তঃ' 'স্বয়ম্'**—এই পাঁচটি শব্দ বলার কী প্রয়োজন ছিল ? সঞ্জয় এ শব্দগুলি প্রয়োগ করে বলতে চেয়েছেন যে তিনি এই উপদেশ লোক পরম্পরায় শোনেননি এবং অপর কেউ যে বলেছে—তাও নয় ; এগুলি তিনি স্বয়ং ভগবানকে বলতে শুনেছেন।

পরিশিষ্ট-ভাব—অর্জুন **'ত্বৎ প্রাসাদাৎ'** কথাটি বলেছেন (১৮।৭৩) এবং সঞ্জয় **'ব্যাসপ্রসাদাৎ'** বলেছেন। ভগবানের কৃপায় অর্জুন দিব্যদৃষ্টি লাভ করেছিলেন আর সঞ্জয় দিব্যদৃষ্টি লাভ করেছিলেন ব্যাসদেবের কৃপায়।

❊ ❊ ❊

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ॥ ৭৬ ॥

[রাজন্ (হে রাজন্!) ; **কেশবার্জুনয়োঃ** (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের) ; **ইমম্, পুণ্যম্** (এই পবিত্র) ; **চ, অদ্ভুতম্, সংবাদম্** (এবং অদ্ভুত কথোপকথন) ; **সংস্মৃত্য, সংস্মৃত্য** (স্মরণ করে) ; **মুহুর্মুহুঃ** (বারংবার) ; **হৃষ্যামি** (হর্ষান্বিত হয়ে উঠছি।)]

হে রাজন্ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের এই পবিত্র ও অদ্ভুত কথোপকথন স্মরণ করে আমি বারংবার হর্ষান্বিত হয়ে উঠছি ॥ ৭৬ ॥

ব্যাখ্যা—**'রাজন্ সংস্মৃত্য ..... মুহুর্মুহুঃ'**—সঞ্জয় বলেছেন যে, 'হে মহারাজ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের এই অত্যন্ত অলৌকিক, বিশিষ্ট আলোচনা হয়েছে। এতে কত রহস্য পরিপূর্ণ আছে যে যুদ্ধরূপ ভয়ানক কর্মে সংলগ্ন থেকেও অতি উচ্চ পারমার্থিক সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব ! মানুষমাত্রেই সব পরিস্থিতিতে নিজের উদ্ধার করতে সক্ষম ! এই কথা স্মরণ করে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হচ্ছি, প্রসন্ন হচ্ছি।'

শ্রীভগবান এবং অর্জুনের এই অদ্ভুত কথোপকথনের মহিমাও অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন সর্বদা একত্রে থাকলেও উভয়ের মধ্যে এরূপ আলোচনা কখনো হয়নি। যুদ্ধের সময় অর্জুন উভয় সঙ্কটে পড়ে গিয়েছিলেন। কারণ একদিকে কৌটুম্বিক মোহ তাঁকে পীড়িত করছিল অন্যদিকে ক্ষাত্রধর্মের দৃষ্টিতে তিনি যুদ্ধ করা অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করছিলেন। মানুষের যখন কোনো একটি সিদ্ধান্তের ওপর, মতের উপর স্থিতি না থাকে, তখন তার ব্যাকুলতা অত্যন্ত বিচিত্র হয়[১]। অর্জুনও 'যুদ্ধ করা শ্রেষ্ঠ, অথবা না-করা শ্রেষ্ঠ'—এই দুটির মধ্যে কোনো একটিতে স্থির সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না। সেইজন্যই তিনি ভগবানের দিকে আকর্ষিত হয়েছিলেন, তাঁর শরণাগত হয়েছিলেন। শরণাগত হওয়ায় তিনি ভগবানের কৃপা বিশেষভাবে লাভ করেছিলেন। অর্জুনের অনন্য চিন্তা, উৎকণ্ঠার জন্য ভগবান যোগস্থ হয়েছিলেন অর্থাৎ ঐশ্বর্যে স্থিত না থেকে শুধু তাঁর প্রেম-তত্ত্বে আপ্লুত হয়েছিলেন এবং সেই অবস্থাতেই অর্জুনকে উপদেশ করেছিলেন। এইরূপ উৎকট অভিলাষসম্পন্ন অর্জুন এবং অলৌকিক অটল যোগেস্থিত ভগবানের কথোপকথনের মহিমা কী বলব ? সেই মহিমা বর্ণনা করাতে কেউই সক্ষম নয়।

---

[১]আজকাল মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক বিষয়ে যে বিশেষ কোনো ব্যাকুলতা দেখা যায় না, তার কারণ হল যে তারা ধন, জন, মান, মর্যাদা, বর্ণ, আশ্রম, বিদ্যা, বুদ্ধি, ভোগ, ঐশ্বর্য ইত্যাদি ক্ষণিক সুখ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে। এর জন্যই তাদের প্রকৃত তত্ত্ব জানার ব্যাকুলতা দমিত হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের কথোপকথনে যে তত্ত্ব রয়েছে তা পূর্বে কোনো গ্রন্থ বা মহাপুরুষের কাছ থেকে শোনা যায়নি। ভগবান এবং তাঁর ভক্তের এ এক অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংবাদ। এরূপ স্পষ্টভাবে বর্ণনা আর কোথাওই পড়া বা শোনা যায় না। এই কথোপকথনে যুদ্ধের মতো ভীষণ কর্মের দ্বারাও কল্যাণ লাভের কথা বলা হয়েছে। প্রত্যেক বর্ণ, আশ্রম, সম্প্রদায় প্রভৃতির মানুষ জীবনের প্রত্যেক পরিস্থিতিতে নিজ কল্যাণ করতে সক্ষম—এই কথোপকথনের দ্বারা সেই কথা জানা যায়। সেইজন্য এই কথোপকথন অত্যন্ত অদ্ভুত—**'সংবাদমিমমদ্ভুতম্'**। শুধু কথোপকথনেই যদি এই বৈশিষ্ট্য থাকে, তাহলে সেই অনুযায়ী আচার-আচরণ করার মাহাত্ম্যের কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী খুবই অনুপম[১], উপরন্তু ভগবান যোগে স্থিত হয়ে গীতার বাণী বলেছিলেন[২], অতএব এর বৈচিত্র্য এবং বিলক্ষণতার কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কৌরবসভাতে ভগবানের বলা রাজনৈতিক ব্যাখ্যাও এত বিশিষ্ট ছিল যে মুনি ঋষিরাও তা শোনার জন্য এসেছিলেন[৩], উপরন্তু এটি (গীতা) তো পারমার্থিক কথোপকথন ! শ্রীমদ্ভাগবতেও যখন উদ্ধব দেখলেন যে ভগবান প্রশ্নগুলির উত্তর অত্যন্ত বিশিষ্ট রীতিতে দিচ্ছেন, তখন তিনি একসঙ্গে পঁয়ত্রিশটি প্রশ্ন করে বসেন (শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধ, উনিশ অধ্যায়, আঠাশ-বত্রিশ শ্লোক)।

'হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ'—কর্ম-জ্ঞান-ভক্তির এরূপ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কথা অন্য কোথাও শোনা যায়নি, সঞ্জয় তাই এরূপ বাণী শুনে বারংবার হর্ষান্বিত হচ্ছিলেন।

সঞ্জয় ভগবানকে তত্ত্বতঃ জানতেন। ধৃতরাষ্ট্র এর কারণ জিজ্ঞাসা করায় সঞ্জয় বলেছিলেন—

মায়াং ন সেবে ভদ্রং তে ন বৃথা ধর্মমাচরে। শুদ্ধভাবং গতো ভক্ত্যা শাস্ত্রাদ্ বেদ্মি জনার্দনম্॥

(মহাভারত, উদ্যোগপর্ব ৬৯।৫)

'মহারাজ ! আপনার কল্যাণ হোক ! আমি কখনো ছল-কপট করি না। দম্ভ রেখে ধর্মের আচরণ করি না। ভগবদ্‌ভক্তিতে আমার হৃদয় শুদ্ধ হয়েছে, অতএব আমি শাস্ত্র-বচন দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ প্রকৃষ্টরূপে জানি।'

সঞ্জয় এইভাবে আগেই শাস্ত্র-বচন দ্বারা ভগবানকে জানতেন, কিন্তু এখন তিনি সাক্ষাৎ ভগবদ্‌বচনের সাহায্যে তাঁর প্রকৃত স্বরূপ জানলেন।

* * *

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ॥ ৭৭ ॥

[**রাজন্** (হে রাজন্!) ; **হরেঃ** (ভগবান শ্রীহরির) ; **তৎ, অতি, অদ্ভুতম্** (সেই অতি অদ্ভুত) ; **রূপম্, চ** (বিরাটরূপ) ;

---

[১]বাচং তাং বচনার্হস্য শিক্ষাক্ষরসমন্বিতাম্।
অশ্রৌষমহমিষ্টার্থাং পশ্চাদ্‌ধৃদয়হারিণীম্॥ (মহাভারত, উদ্যোগপর্ব ৫৯।১৭)

(সঞ্জয় বললেন)—'আমি তারপরে কথাবার্তায় সুকুশল ভগবানের সেইসব বাণী শুনেছি, যার প্রতিটি অক্ষর শিক্ষাপ্রদ। সেগুলি ছিল অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ এবং হৃদয়গ্রাহী।'

[২]ন শক্যং তন্ময়া ভূয়স্তথা বক্তুমশেষতঃ। পরং হি ব্রহ্ম কথিতং যোগযুক্তেন তন্ময়া॥ (মহাভারত, অশ্বমেধপর্ব ১৬।১২-১৩)

(ভগবান বললেন)—'সেই সমস্ত কথা সেই ভাবে দ্বিতীয়বার বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ওই সময় আমি যোগযুক্ত হয়ে পরমাত্মতত্ত্বের বর্ণনা করেছিলাম।'

[৩]ধর্মার্থসহিতা বাচঃ শ্রোতুমিচ্ছাম মাধব।
ত্বয়োচ্যমানাঃ কুরুষু রাজমধ্যে পরন্তপ॥ (মহাভারত, উদ্যোগপর্ব ৮৩।৬৮-৬৯)

(পরশুরাম বললেন)—'শত্রুদের সন্তাপ প্রদানকারী হে মাধব ! কৌরব এবং অন্যান্য নৃপতিমণ্ডলীর মধ্যে আপনার বলা সেই ধর্ম এবং অর্থযুক্ত বচন আমরা শুনতে আগ্রহী।'

ব্যাখ্যা—'তচ্চ সংস্মৃত্য .... পুনঃ পুনঃ'—সঞ্জয় আগের শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের কথোপকথনকে অদ্ভুত বলেছিলেন, কিন্তু এখানে ভগবানের বিরাটরূপকে অত্যন্ত অদ্ভুত বলে জানিয়েছেন। তার অর্থ হল যে সেই কথোপকথন তো এখনও পড়া যায়, তা নিয়ে আলোচনা করাও সম্ভবপর হয়, কিন্তু সেই বিরাটরূপ দর্শন করা আর সম্ভব নয়। তাই এই রূপ অত্যন্ত অদ্ভুত ও অত্যাশ্চর্য।

একাদশ অধ্যায়ের নবম শ্লোকে সঞ্জয় ভগবানকে বলেছেন **'মহাযোগেশ্বরঃ'**। এখানে **'বিস্ময়ো মে মহান্'** পদের দ্বারা বলেছেন যে, এরূপ মহাযোগেশ্বর ভগবানের রূপ স্মরণ করে মহাবিস্মিত হওয়াই স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত ভগবান কৃপাপরবশ হয়ে অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখিয়েছেন, কিন্তু আমি ব্যাসদেবের কৃপায় এই রূপ দর্শন করেছি।

যদিও ভগবান রাম অবতারকালে মাতা কৌশল্যাকে বিরাটরূপ দেখিয়েছিলেন এবং কৃষ্ণ অবতারকালে মাতা যশোদাকে ও কৌরব সভায় দুর্যোধনাদিকে বিরাটরূপ দেখিয়েছিলেন, কিন্তু সেই রূপ এত অদ্ভুত ছিল না যে যাঁর চোয়ালে বিরাট সব যোদ্ধাগণ সংশ্লিষ্ট এবং দুই পক্ষের সেনা সংহার হচ্ছে! এমন অতি অদ্ভুত রূপ স্মরণ করে সঞ্জয় বলেছেন, 'হে রাজন্ ! এই সমস্তই মহারাজ ব্যাসদেবের কৃপাতে দর্শন করা সম্ভব হয়েছে। নাহলে আমার মতো লোকের ভাগ্যে এই রূপ দেখা কী করে সম্ভব ?'

পরিশিষ্ট-ভাব—ভগবান তাঁর বিরাটরূপ সীমিতাকারে দেখিয়েছিলেন। যদি অর্জুন তাতে হতচকিত না হতেন, তাহলে ভগবান তাঁকে আরো অনেক রূপ দেখাতেন। কিন্তু সঞ্জয় সেই রূপরাশি অবলোকন করেই আশ্চর্যান্বিত হয়েছেন।

সঞ্জয় ইতিপূর্বে তাঁর শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা ভগবান সম্পর্কে জেনেছিলেন, তারপর তাঁর অত্যদ্ভুত কথোপকথন শ্রবণ করলেন এবং পুনরায় অতি বিচিত্র বিশ্বরূপ দর্শন করলেন। তাৎপর্য হল যে, শাস্ত্রের থেকেও শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথন অত্যন্ত বিশিষ্ট এবং কথোপকথনের থেকেও বিরাটরূপ আরো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তাই সঞ্জয় এই কথোপকথনকে অদ্ভুত বা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বলেছেন—**'সংবাদমিমমদ্ভুতং'** (১৮।৭৬) এবং বিরাটরূপকে অত্যন্ত অদ্ভুত বলেছেন **'রূপমত্যদ্ভুতং'**।

* * *

সম্বন্ধ—গীতার প্রারম্ভে ধৃতরাষ্ট্রের গূঢ়াভিসন্ধিমূলক প্রশ্ন ছিল যে যুদ্ধের পরিণাম কী হবে ? অর্থাৎ আমার পুত্রেরা বিজয় লাভ করবে, না পাণ্ডুপুত্রেরা ? পরবর্তী শ্লোকে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের সেই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম॥ ৭৮ ॥

[যত্র (যেখানে) ; যোগেশ্বরঃ, কৃষ্ণঃ (যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) ; যত্র, ধনুর্ধরঃ (গাণ্ডীব ধনুর্ধারী) ; পার্থঃ (অর্জুন অবস্থিত) ; তত্র, শ্রীঃ (সেখানেই শ্রী) ; বিজয়ঃ, ভূতিঃ (বিজয়, বিভূতি ও) ; ধ্রুবা, নীতিঃ (অচল, নীতি বিদ্যমান) ; মম (আমার) ; মতিঃ (অভিমত ।)]

যেখানে যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং গাণ্ডীব ধনুর্ধারী অর্জুন অবস্থিত ; সেখানেই শ্রী, বিজয়, বিভূতি ও অচল নীতি বিদ্যমান—এই হল আমার অভিমত॥ ৭৮ ॥

ব্যাখ্যা—'যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ'—সঞ্জয় বলেছেন যে, 'হে রাজন্ ! যেখানে অর্জুনের রক্ষাকারী, সম্মতি প্রদানকারী, সকল যোগের মহেশ্বর, মহাবলশালী, মহাঐশ্বর্যশালী, মহাবিদ্বান, মহাবুদ্ধিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত আর যেস্থানে ভগবানের আদেশ পালনকারী, ভগবানের প্রিয় সখা ও ভক্ত গাণ্ডীবধারী অর্জুন আছেন সেই পক্ষে শ্রী, বিজয়, বিভূতি, অচল নীতি—এই সবই থাকে এবং আমার মতও সেইদিকে রয়েছে।'

ভগবান যখন অর্জুনকে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করেন, তখন

সঞ্জয় ভগবানকে **'মহাযোগেশ্বরঃ'**[1] বলেছিলেন। সেই মহাযোগেশ্বরের কথা স্মরণ করে এখানে বলেছেন **'যোগেশ্বরঃ'**। সেই সমস্ত যোগের ঈশ্বর (প্রভু) ভগবান কৃষ্ণ হলেন প্রেরক আর তাঁর নির্দেশ পালনকারী ধনুর্ধারী অর্জুন হলেন প্রের্য।

গীতায় ভগবানকে **'মহাযোগেশ্বর'**, **'যোগেশ্বর'** ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়েছে। তার অর্থ হল যে ভগবান সকল যোগীর শিক্ষা প্রদানকারী। কিন্তু ভগবানকে যোগ শিক্ষা করতে হয় না, কারণ যোগ তাঁর স্বতঃসিদ্ধ। সর্বজ্ঞতা, ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য, মাধুর্য ইত্যাদি যতপ্রকার বৈভবশালী গুণ বিদ্যমান তা সব স্বতঃই ভগবানে বিরাজিত। এইসব গুণ ভগবানে নিত্য ও অসীমভাবে থাকে। যেমন, পিতার পিতা, তাঁর পিতা—সবই শেষকালে পরমপিতা পরমাত্মাতে সমাপ্ত হয়, তেমনই যতপ্রকার গুণ আছে, তা সবই পরমাত্মাতে সমাপ্তি লাভ করে।

প্রথম অধ্যায়ে যেখানে যুদ্ধের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে সেখানে সর্বপ্রথম কৌরবপক্ষের ভীষ্ম শঙ্খ বাজিয়েছিলেন। ভীষ্ম ছিলেন কৌরবপক্ষের সেনাপতি, তাই তাঁর শঙ্খ বাজানো উচিত হয়েছিল। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবপক্ষে সারথি ছিলেন আর তিনিই সর্বপ্রথম শঙ্খবাদন করে যুদ্ধের ঘোষণা করলেন ! লৌকিক দৃষ্টিতে ভগবানের সর্বপ্রথম শঙ্খ বাজাবার কোনো অধিকারই ছিল না, তা সত্ত্বেও সর্বপ্রথমে তিনি শঙ্খ ধ্বনি করায় প্রমাণিত হয় যে, পাণ্ডবপক্ষের প্রধান ছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন অর্জুন। তাই এঁরা দুজনেই পাণ্ডবপক্ষে প্রথম শঙ্খ বাজান। তাৎপর্য হল যে, সঞ্জয় যেমন প্রারম্ভে (শঙ্খবাদনরূপ ক্রিয়াতে) উভয়ের প্রাধান্য প্রকটিত করেছিলেন, তেমনই শেষকালেও এই দুজনের নাম নিয়ে এঁদের প্রাধান্য প্রকট করেছেন।

সমগ্র গীতায় **'পার্থ'** সম্বোধনটি আটত্রিশবার এসেছে। অর্জুনকে এতবার অন্য কোনো নামে ডাকা হয়নি। এতে মনে হয় যে, ভগবানের **'পার্থ'** সম্বোধনটি অত্যন্ত প্রিয় ছিল। এই রীতিতে অর্জুনেরও **'কৃষ্ণ'** সম্বোধনটি বেশি প্রিয় ছিল, তাই গীতায় অর্জুনের দ্বারা ন'বার **'কৃষ্ণ'** নামের আবৃত্তি করা হয়েছে। ভগবানের সম্বোধনে এত অধিক সংখ্যায় আর কোনো সম্বোধন করা হয়নি। তাই শেষকালে উপ-সংহারের সময় সঞ্জয়ও **'কৃষ্ণ'** এবং **'পার্থ'**—এই দুটি নামের উল্লেখ করেছেন।

'তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম'—লক্ষ্মী, শোভা, সম্পত্তি—এগুলি সবই 'শ্রী' শব্দের অন্তর্গত। যেখানে শ্রীপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান, সেখানে শ্রী থাকবেনই।

'বিজয়' অর্জুনকেও বলা হয় এবং শৌর্যকেও বলা হয়। যেখানে বিজয়রূপ অর্জুন বিরাজমান, সেখানে শৌর্য, উৎসাহ ইত্যাদি ক্ষাত্র-ঐশ্বর্য অবশ্যম্ভাবী।

তেমনই যেখানে যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত, সেখানে **'বিভূতি'**—ঐশ্বর্য, মহত্ত্ব, প্রভাব, সামর্থ্য ইত্যাদি সকল ঈশ্বরীয় গুণ অবশ্যম্ভাবী ; আর যেখানে ধর্মাত্মা অর্জুন থাকেন, সেখানে **'ধ্রুবা নীতি'**—অটল নীতি, ন্যায়, ধর্ম ইত্যাদি থাকবেই।

প্রকৃতপক্ষে শ্রী, বিজয়, বিভূতি এবং ধ্রুবা নীতি—এইসব গুণ ভগবান ও অর্জুনে সর্বক্ষণ বিদ্যমান। উপরিউক্ত দুটি বিভাগ প্রাধান্য নিয়ে করা হয়েছে। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এবং ধনুর্ধারী অর্জুন—এই দুজন যেখানে বিরাজিত, সেখানে অনন্ত ঐশ্বর্য, অনন্ত মাধুর্য, অনন্ত সৌশীল্য, অনন্ত সৌজন্য, অনন্ত সৌন্দর্য ইত্যাদি দিব্যগুণ অবশ্যই বিরাজ করে।

ধৃতরাষ্ট্রের বিজয়ের গূঢ়াভিসন্ধিরূপ যে প্রশ্ন ছিল, তার উত্তর সঞ্জয় সম্যক্‌ভাবে দিয়েছেন। এর অর্থ হল পাণ্ডু-পুত্রদের বিজয় যে সুনিশ্চিত তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

জ্ঞানযজ্ঞঃ সুসম্পন্নঃ প্রীতয়ে পার্থসারথেঃ।
অঙ্গীকরোতু তৎসর্বং মুকুন্দো ভক্তবৎসলঃ॥
নেত্রবেদখযুগ্মে হি বহুধান্যে চ বৎসরে[2]**।**
সঞ্জীবনী মুমুক্ষূণাং মাধবে পূর্ণতামিয়াৎ॥

***

[1]যোগীশ্বর অর্থাৎ যোগীদের ঈশ্বর হওয়া সহজ কিন্তু যোগেশ্বর অর্থাৎ সমস্ত যোগাদির ঈশ্বর হওয়া হল শেষ কথা—'সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ'।

[2]বিক্রম সম্বৎ ২০৪২ (তদনুসারে বাংলা ১৩৯২ সাল)।

ওঁ তৎসৎইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে মোক্ষসন্ন্যাসযোগো নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

এইভাবে ওঁ, তৎ, সৎ—এই ভগবদ্‌নাম উচ্চারণপূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যা এবং যোগশাস্ত্রময় শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা উপনিষদ্‌রূপ শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে 'মোক্ষসন্ন্যাসযোগ' নামক অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত হল ॥ ১৮ ॥

যাতে মোক্ষের সন্ন্যাস অর্থাৎ ত্যাগ হয়, এরূপ ভগবদ্‌ভক্তির বর্ণনার প্রাধান্য থাকায় এই অধ্যায়ের নাম রাখা হয়েছে 'মোক্ষসন্ন্যাসযোগ' ॥ ১৮ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়ের পদ ও উবাচ

(১) এই অধ্যায়ে 'অথাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ'-এর তিন, 'অর্জুন উবাচ' ইত্যাদি পদের আট, শ্লোকাদির নয়শত উনআশী এবং পুষ্পিকার তেরোটি পদ আছে। এইভাবে সমস্ত পদের যোগসংখ্যা এক হাজার তেরো।

(২) এই অধ্যায়ে 'অথাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ'-এর সাত, 'অর্জুন উবাচ' ইত্যাদির পঁচিশ, শ্লোকের দুহাজার চারশত ছিয়ানব্বই এবং পুষ্পিকার আটচল্লিশ অক্ষর আছে। এইরূপে সমস্ত অক্ষরগুলির যোগসংখ্যা দুহাজার পাঁচশত ছিয়াত্তর, এই অধ্যায়ের সমস্ত শ্লোক বত্রিশ অক্ষর-সংবলিত।

(৩) এই অধ্যায়ে চারটি উবাচ আছে—দুটি 'অর্জুন উবাচ', একটি 'শ্রীভগবানুবাচ' এবং একটি 'সঞ্জয় উবাচ'।

অষ্টাদশ অধ্যায়ে প্রযুক্ত ছন্দ

এই অধ্যায়ের আটাত্তরটি শ্লোকের মধ্যে দ্বাদশ, ছেচল্লিশ এবং বাহান্নতম শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে 'মগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় 'ম-বিপুলা', তেইশ, বত্রিশ, সাঁইত্রিশ, একচল্লিশ, পঁয়তাল্লিশ, ছাপ্পান্ন এবং সত্তরতম শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে 'নগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় 'ন-বিপুলা'; তেত্রিশ, ছত্রিশ, সাতচল্লিশ এবং পঁচাত্তরতম শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে 'ভগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় 'ভ-বিপুলা', ত্রয়োদশ শ্লোকের তৃতীয় পংক্তিতে 'মগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় 'ম-বিপুলা'; ছাব্বিশতম শ্লোকের তৃতীয় চরণে 'রগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় 'র-বিপুলা'; আটত্রিশ এবং চৌষট্টিতম শ্লোকের তৃতীয় চরণে 'নগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় 'ন-বিপুলা'; উনপঞ্চাশতম শ্লোকে প্রথম চরণে 'মগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় 'ম-বিপুলা' এবং তৃতীয় চরণে 'ভগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় 'ভ-বিপুলা' সংজ্ঞাযুক্ত ছন্দ আছে। বাকি উনষাটটি শ্লোক যথাযথভাবে 'পথ্যাবক্ত্র' অনুষ্টুপছন্দ লক্ষণযুক্ত।

❋ ❋ ❋

আরতি

জয় ভগবদ্‌গীতে, জয় ভগবদ্‌গীতে। হরি-হিয়-কমল বিহারিণি, সুন্দর সুপুনীতে॥ জয়.
কর্ম-সুমর্ম-প্রকাশিনি, কামাসক্তিহরা। তত্ত্বজ্ঞান-বিকাশিনি, বিদ্যা ব্রহ্ম পরা॥ জয়.
নিশ্চল-ভক্তি-বিধায়িনি, নির্মল মলহারী। শরণ-রহস্য-প্রদায়িনি, সব বিধি সুখকারী॥ জয়.
রাগ-দ্বেষ-বিদারিণি, কারিণি মোদ সদা। ভব-ভয়-হারিণি তারিণি, পরমানন্দপ্রদা॥ জয়.
আসুর-ভাব-বিনাশিনি, নাশিনি তম-রজনী। দৈবী সদ্‌গুণদায়িনি, হরি-রসিকা সজনী॥ জয়.
সমতা ত্যাগ সিখাবনি, হরি-মুখকী বানী। সকল শাস্ত্রকী স্বামিনি, শ্রুতিয়োঁকী রানী॥ জয়.
দয়া-সুধা বরসাবনি, মাতু! কৃপা কীজৈ। হরিপদ-প্রেম দান কর, অপনো কর লীজৈ॥ জয়.

❋ ❋ ❋

মহাভারতে গীতার মাহাত্ম্য

গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রসংগ্রহৈঃ। যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্‌বিনিঃসৃতা॥
সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা সর্বদেবময়ো হরিঃ। সর্বতীর্থময়ী গঙ্গা সর্ববেদময়ো মনুঃ॥
গীতা গঙ্গা চ গায়ত্রী গোবিন্দেতি হৃদি স্থিতে। চতুর্গকারসংযুক্তে পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥
ভারতামৃতসর্বস্বগীতায়া মথিতস্য চ। সারমুদ্‌ধৃত্য কৃষ্ণেন অর্জুনস্য মুখে হুতম্‌॥
(মহাভারত ভীষ্মপর্ব ৪৩।১, ২, ৩, ৪)

অন্যান্য শাস্ত্রাদি সংগ্রহ করার কী প্রয়োজন ? শুধুমাত্র গীতাগ্রন্থেরই সম্যক্‌ভাবে পঠন-পাঠন করা উচিত, কেননা এটি ভগবান পদ্মনাভ বিষ্ণুর শ্রীমুখকমল হতে প্রকাশিত হয়েছে। গীতা সর্বশাস্ত্রময়ী, শ্রীহরি সর্বদেবময়, গঙ্গা সর্বতীর্থময়ী এবং মনু হলেন সর্ববেদময়। গীতা, গঙ্গা, গায়ত্রী এবং গোবিন্দ—এই চারটি গ-কার সংযুক্ত নাম যাঁর হৃদয়ে বাস করে, তাঁর পুনর্জন্ম হয় না। মহাভারতরূপী অমৃতের সর্বস্ব গীতাকে মন্থন করে তার সারতত্ত্ব বের করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মুখে এটিকে আহুতি দিয়েছেন।

* * *

যং ব্রহ্মাবরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈর্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ॥
ধ্যানাবস্থিত-তদ্‌গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো। যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ॥

ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র ও মরুৎ (পবন) দিব্য—অলৌকিক স্তোত্র যারা যাঁকে স্তব করেন, সামবেদাদির গায়কগণ অঙ্গসহ[১], পদপাঠ, ক্রমপাঠাদিযুক্ত স্বরভাগ সমৃদ্ধ উপনিষদ্‌ সহ বেদসকলের দ্বারা যাঁর গুণগাথা বা স্বরূপ গান করেন, যোগিগণ ধ্যানে বসে তদ্‌গতচিত্ত হয়ে মনের দ্বারা যাঁকে দর্শন করেন এবং দেব ও দানবগণ যাঁর অন্ত—চরম ও পরম তত্ত্ব জানতে পারেন না, সেই দেব (জ্যোতির্ময় পরমেশ্বর) শ্রীকৃষ্ণকে আমি প্রণাম করি। (এই শ্লোকটি যেরূপ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার ধ্যানমালায় আছে, সেইরূপ শ্রীমদ্‌ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকেও উল্লিখিত আছে।)

শান্তাকারং ভুজগশয়নং পদ্মনাভং সুরেশং। বিশ্বাধারং গগনসদৃশ্যং মেঘবর্ণং শুভাঙ্গম্‌॥
লক্ষ্মীকান্তং কমলনয়নং যোগিভির্ধ্যানগম্যং। বন্দে বিষ্ণু ভবভয়হরং সর্বলোকৈকনাথম্‌॥

যাঁর আকৃতি সদা শান্ত অর্থাৎ গুণত্রয়ের ও প্রকৃতির অতীত হওয়ায় সর্ববিকারশূন্য, যিনি ভুজগ—অনন্তশয্যায় শয়ন করে আছেন, যাঁর নাভিদেশ থেকে পদ্ম উৎপন্ন হয়ে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে ধারণ করে বিরাজমান, যিনি দেবগণের নিয়ামক ও পরিচালক, যিনি বিশ্বের—চতুর্দশ ভুবনের আধার অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধরে রেখেছেন অথবা বিশ্ব যাঁর আধার অর্থাৎ যিনি বিশ্বরূপে বিরাজমান, গগনসদৃশ অর্থাৎ যিনি গগনতুল্য স্বচ্ছ ও সদা উন্মুক্ত, মেঘ—বর্ষণোন্মুখ মেঘের ন্যায় শ্যামলসুন্দর বর্ণ, শুভাঙ্গ—যাঁর প্রতি অঙ্গে কেবল শুভেরই সমাবেশ অর্থাৎ পরম মঙ্গলময়, লক্ষ্মীকান্ত—লক্ষ্মীদেবীর পরমারাধ্য পতিদেব, কমলনয়ন—যাঁর নয়নযুগল কমলের ন্যায় সুন্দর ও প্রফুল্ল, যোগিগণের ধ্যানলভ্য পরম ও চরম তত্ত্ব, যিনি সমস্ত লোকের একমাত্র প্রভু—পরিত্রাণ কর্তা এবং ভবভয়হর অর্থাৎ সংসার ভয়নাশকারী, আমি সেই শ্রীবিষ্ণুকে—সর্বব্যাপী পরমেশ্বরকে বন্দনা করি, অবনতমস্তকে প্রণাম করি॥

---

[১]বেদের ছয়টি অঙ্গ—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ।

বেদের স্বরমান সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য— বেদোক্ত মন্ত্রসমূহের একাদশ প্রকার পাঠ দেখা যায়। তাদের মধ্যে সংহিতা পাঠ, পদপাঠ এবং ক্রমপাঠ এই ত্রিবিধ পাঠকেই প্রধানরূপে গ্রহণ করা হয়। এই ত্রিবিধ পাঠের মধ্যে সংহিতাপাঠকে যোগা প্রকৃতি বলে আর পদপাঠ ও ক্রমপাঠ—এই দুই পাঠকে রূঢ়া প্রকৃতি বলে। এই ত্রিবিধ প্রকৃতি পাঠ ব্যতীত আরও আট প্রকারের পাঠ আছে, যাদের বিকৃতি পাঠ বলে। অতএব সর্বসাকুল্যে ১১ প্রকার পাঠ পরিলক্ষিত হয়। মহর্ষি পতঞ্জলির শিষ্য বাড়ীমুনি তাঁর 'জটাপটল' গ্রন্থে একটি শ্লোকে আট প্রকার বিকৃতি পাঠের নাম লিপিবদ্ধ করেছেন।—

জটা মালা শিখা লেখা ধ্বজো দণ্ডো রথো ঘনঃ। অষ্টৌ বিকৃতয়ঃ প্রোক্তাঃ ক্রমপূর্বা মনীষিভিঃ॥

জটা, মালা, শিখা, লেখা, ধ্বজ, দণ্ড, রথ এবং ঘন—এই আট প্রকারের বিকৃতি পাঠ কথিত হয়েছে।

সামবেদের পারঙ্গম বৈদিকগণ এই ত্রিবিধ প্রকৃতিপাঠ ও অষ্টবিধ বিকৃতিপাঠ দ্বারা যে বেদপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ও তদীয় মহিমা গান করেন।

'সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈঃ বেদৈঃ গায়ন্তি যং সামগাঃ'—এটিই হল এই বাক্যের নির্গতার্থ।

গীতা-মাহাত্ম্য

শ্রীভগবানুবাচ

ন বন্ধোঽস্তি ন মোক্ষোঽস্তি ব্রহ্মৈবাস্তি নিরাময়ম্।
নৈকমস্তি ন চ দ্বিত্বং সচ্চিৎকারং বিজৃম্ভতে॥ ১ ॥
গীতাসারমিদং শাস্ত্রং সর্বশাস্ত্রসুনিশ্চিতম্।
যত্র স্থিতং ব্রহ্মজ্ঞানং বেদশাস্ত্রসুনিশ্চিতম্॥ ২ ॥
ইদং শাস্ত্রং ময়া প্রোক্তং গুহ্যবেদার্থদর্পণম্।
যঃ পঠেৎ প্রয়তো ভূত্বা স গচ্ছেদ্ বিষ্ণুশাশ্বতম্॥ ৩ ॥

শ্রীভগবান বললেন—বন্ধন নেই, মোক্ষ নেই, কেবল নিরাময় ব্রহ্মই সর্বত্র বিরাজমান।

অদ্বৈতে নেই, দ্বৈতেও নেই, কেবল সচ্চিদানন্দেই সকল স্থান পূর্ণ হয়ে আছে॥ ১ ॥

গীতার সারভূত—এই শাস্ত্র হল সকল শাস্ত্রের দ্বারা সুষ্ঠুভাবে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত।

বেদশাস্ত্রের দ্বারা ভালোভাবে নিরূপিত ব্রহ্মজ্ঞান এতে বিদ্যমান॥ ২ ॥

আমার দ্বারা কথিত এই গীতা-শাস্ত্র বেদের গূঢ় অর্থকে দর্পণের মতো প্রকাশিত করে।

যে পবিত্র হয়ে ইন্দ্রিয় এবং মনকে বশীভূত করে এর পাঠ করে, সে সনাতন ভগবান বিষ্ণুস্বরূপ আমাকে প্রাপ্ত হয় ॥ ৩ ॥

এতৎ পুণ্যং পাপহরং ধন্যং দুঃখপ্রণাশনম্।
পঠতাং শৃণ্বতাং বাপি বিষ্ণোর্মাহাত্ম্যমুত্তমম্॥ ৪ ॥
অষ্টাদশপুরাণানি নবব্যাকরণানি চ।
নির্মথ্য চতুরো বেদান্ মুনিনা ভারতং কৃতম্॥ ৫ ॥
ভারতোদধি নির্মথ্য গীতানির্মথিতস্য চ।
সারমুদ্ধৃত্য কৃষ্ণেন অর্জুনস্য মুখে ধৃতম্॥ ৬ ॥
মলনির্মোচনং পুংসাং গঙ্গাস্নানং দিনে দিনে।
সকৃদ্ গীতাম্ভসি স্নানং সংসারমলনাশনম্॥ ৭ ॥
গীতানামসহস্রেণ স্তবরাজো বিনির্মিতঃ।
যস্য কুক্ষৌ চ বর্তেত সোঽপি নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥ ৮ ॥

ভগবান বিষ্ণুর এই উত্তম মাহাত্ম্য গীতাশাস্ত্র পাঠ করলে এবং শ্রবণ করলে পুণ্য সঞ্চয় হয়, পাপ বিনষ্ট হয়, মানুষ ধন্য হয়ে যায় এবং তার সমস্ত দুঃখ বিদূরিত হয় ॥ ৪ ॥ মহামুনি ব্যাসদেব অষ্টাদশ পুরাণ, নয়টি ব্যাকরণ এবং চারটি বেদ মন্থন করে মহাভারত রচনা করেছেন ॥ ৫ ॥ আবার মহাভারতরূপী সমুদ্রকে মন্থন করায় গীতা প্রকটিত হয়। সেই গীতাকেও মন্থন করে গীতাসার রূপ তার অর্থ নিষ্কাশন করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মুখে তা আহুতিরূপে ঢেলে দিয়েছেন॥ ৬ ॥ গঙ্গায় প্রতিদিন স্নান করলে মানুষের কলুষ দূর হয়। গীতারূপিণী গঙ্গার জলে একবার মাত্র স্নান করলেই সমগ্র সংসারের মল বিনষ্ট হয়ে যায় ॥ ৭ ॥ গীতার সহস্র নামের দ্বারা যে স্তবরত্নটি বিরচিত হয়েছে, সেইটি যাঁর কুক্ষিতে (হৃদয়ে) বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ যিনি মনে মনে তাঁকে সর্বদা স্মরণ করেন, বলা হয় যে, তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণে পরিণত হয়ে যান॥ ৮ ॥

সর্ববেদময়ী গীতা সর্বধর্মময়ো মনুঃ।
সর্বতীর্থময়ী গঙ্গা সর্বদেবময়ো হরিঃ॥ ৯ ॥
পাদস্যাপ্যর্ধপাদং বা শ্লোকং শ্লোকার্ধমেব বা।
নিত্যং ধারয়তে যস্তু স মোক্ষমধিগচ্ছতি॥ ১০ ॥
কৃষ্ণবৃক্ষসমুদ্ভূতা গীতামৃতহরীতকী।
মানুষৈঃ কিং ন খাদ্যেত কলৌ মলবিরেচনী॥ ১১ ॥
গঙ্গা গীতা তথা ভিক্ষুঃ কপিলাশ্বত্থসেবনম্।
বাসরং পদ্মনাভস্য পাবনং কিং কলৌ যুগে॥ ১২ ॥
গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্ বিনিঃসৃতা॥ ১৩ ॥
আপদং নরকং ঘোরং গীতাধ্যায়ী ন পশ্যতি॥ ১৪ ॥

গীতা সম্পূর্ণ বেদময়ী, মনুস্মৃতি সর্বধর্মময়ী, গঙ্গা সর্বতীর্থময়ী এবং ভগবান বিষ্ণু হলেন সর্বদেবময়॥ ৯ ॥ যিনি গীতার সম্পূর্ণ একটি শ্লোক, অর্ধশ্লোক, একটি চরণ অথবা অর্ধচরণও প্রতিদিন পাঠের দ্বারা ধারণ করেন, তিনি অন্তে মোক্ষপ্রাপ্ত হন॥ ১০ ॥ শ্রীকৃষ্ণরূপী বৃক্ষ হতে আবির্ভূত গীতারূপ অমৃতময়ী হরীতকী মানুষ কেন ভক্ষণ করে না, যা কলির সমস্ত মলকে দেহ হতে নিষ্কাশিত করে॥ ১১ ॥ কলিযুগে গঙ্গা, গীতা, সন্ন্যাসী, কপিলা গাভী, অশ্বত্থবৃক্ষসেবা এবং ভগবান বিষ্ণুর চিহ্নিত তিথি (একাদশী)—এদের চেয়ে বেশি পবিত্রকারী বস্তু আর কি আছে ? ॥ ১২ ॥ গীতাকেই সুষ্ঠুভাবে পাঠ করা কর্তব্য। বিস্তৃতভাবে অন্য শাস্ত্র পাঠের আর প্রয়োজন কী ? সাক্ষাৎ ভগবান বিষ্ণুর মুখপদ্ম হতে এই গীতার আবির্ভাব হয়েছে ॥ ১৩ ॥

গীতার অধ্যয়ন যিনি করেন, তাঁকে আপদ-বিপদ ও ঘোর নরক দেখতে হয় না॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে শ্রীগীতাসারে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা-মাহাত্ম্যং সম্পূর্ণম্।

শ্রীস্কন্দপুরাণে ব্রহ্মবিদ্যারূপ যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে শ্রীগীতাসারে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা-মাহাত্ম্য সম্পূর্ণ হল।